কর হাতে মুক্তির মশাল

মে-ডে আনে নূতন প্রেরণা—

এবার আনিয়াছে শ্রমিকের বিজয়-গৌরব

মে-দিবস

...মত্ততায় সারা পৃথিবী আজ ভারাক্রান্ত। ...ভদ করিয়া ছুনিয়ার শ্রমিক নূতন সমাজের ...করিতেছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতা সোভিয়েট ...জয় অভিযান ইউরোপের জনগণকে মুক্তি-...মুহূর্ত্ত অদম্য প্রেরণা দিতেছে। আমাদের ...হা হইতে বঞ্চিত নয়।

...আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে মে-দিবসে ছুনিয়ার ...ক মুক্তি আন্দোলনের যে নিশান উড়াইয়াছিল, ...জ তাহারই চারিদিকে সারা পৃথিবীর মানুষ জাগিয়া ...ছ। সেদিনের মে-দিবসে শ্রমিক তাহার ...ীর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিকের ...া সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত জনসাধারণের ...ন সমাজের প্রতিষ্ঠা। পুরাতন পৃথিবীর ...বিধ্বস্ত করিয়া নূতন সভ্যতা ও নবীন ...স্ত করাই হইল শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই-এর

... সমস্ত জনগণের যে রাজনৈতিক ...রা বলিয়া আসিতেছি। বিংশ ...ক্ষিক্ষণে সে কথা পৃথিবীর কাছে ... জনসাধারণের পরিপূর্ণ মুক্তির ...লড়িতে হয় তাহা সর্বহারার ...য। সমাজকে শোষণ-মুক্ত ... নেতৃত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ...শ্রমিকের পার্টি কমিউনিষ্ট ... ঐক্যবদ্ধ করিয়া মানুষের ... জন্য যে মহান্ অভিযান ... আজ শ্রমিকশ্রেণীর ...ক আকৃষ্ট

...ও কি সে পথ ... নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ...সাধারণকে দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ...করিতেছে না? গত ছুই বছর ধরিয়া আমাদের দেশের ...মিক যে কর্মস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার সম্মুখে ...সরকারের বাধা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধা-সন্দেহ চূর্ণ ...হইয়া পড়িতেছে।

ভারতের উপর ফ্যাশিষ্ট-আক্রমণের আশংকা লক্ষ্য করিয়া ১৯৪২ সালের মে-দিবসে কলিকাতায় ৬০০০ শ্রোতার শ্রমিক-সভায় ঘোষণা করা হয়—"চাকরীতে জবাব দিও না। বেতন বাড়াও, মাগগীভাতা ...ও। মজুর ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িবে: সে হার মানিবে না, পিছ-পা হইবে না। কারখানা ছাড়িবে না। সারা বাংলার শ্রমিক কারখানায় ও মিলে উৎপাদন কমিটি গঠন কর।" শ্রমিক চিনিয়া ছিল ... শত্রুকে। সে তাহার অভ্রান্ত রাজনীতিতে সুদৃঢ় ... বুঝিয়াছিল—ফ্যাসিষ্ট-দস্যুদের ধ্বংস করার লড়াই, তাহার মধ্য দিয়া আসিবে যুগ-যুগান্তের অত্যাচার ও শোষণ প্রথার শেষ। বঞ্চিত জনসাধারণ রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধার হইবে।

দেশ যখন বিভ্রান্ত

...চার দিকে দিকে তখন চলিয়াছে মতবাদের লড়াই। ... শ্রমিক বলিতেছে—স্ট্রাইক করিও না, ...দন বাড়াও। দস্যু আক্রমণকারীকে পরাস্ত ...বার জন্য আগুয়ান হও। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ...তেছে—এ যুদ্ধ আবার আমাদের যুদ্ধ কি করিয়া ... যেন দেশ আমাদের নয়! শ্রমিকদের মধ্যে ...াছে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার ও স্ট্রাইকের উস্কানী। ...ভক্তরা প্রায় সবাই বিভ্রান্ত। দেশরক্ষার ব্যবস্থা ...ন করিলে বুঝিবা ভারত স্বাধীন হইবে। শ্রমিক ...া লইল,—তাহাদের এতদিনের হাতিয়ার স্ট্রাইক শত্রুকেই শক্তিশালী করে। ৯ই অগাষ্টের পর ...হইতে উস্কানী চলিয়াছে তবু শ্রমিক উৎপাদন ...খানা চালু রাখার পথ ছাড়িল না। ...৭ বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও ...নাইল।

অগাষ্ট সংকটের পর হইতে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও দেশরক্ষার কথা প্রচার করিতে শ্রমিক আগাইল। কলিকাতার এসেন্সিয়াল সার্ভিসের সমস্ত শ্রমিক ২০শে সেপ্টেম্বর এক সম্মেলনে ঘোষণা করিল—কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাপানকে রুখিবার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে। ৪২

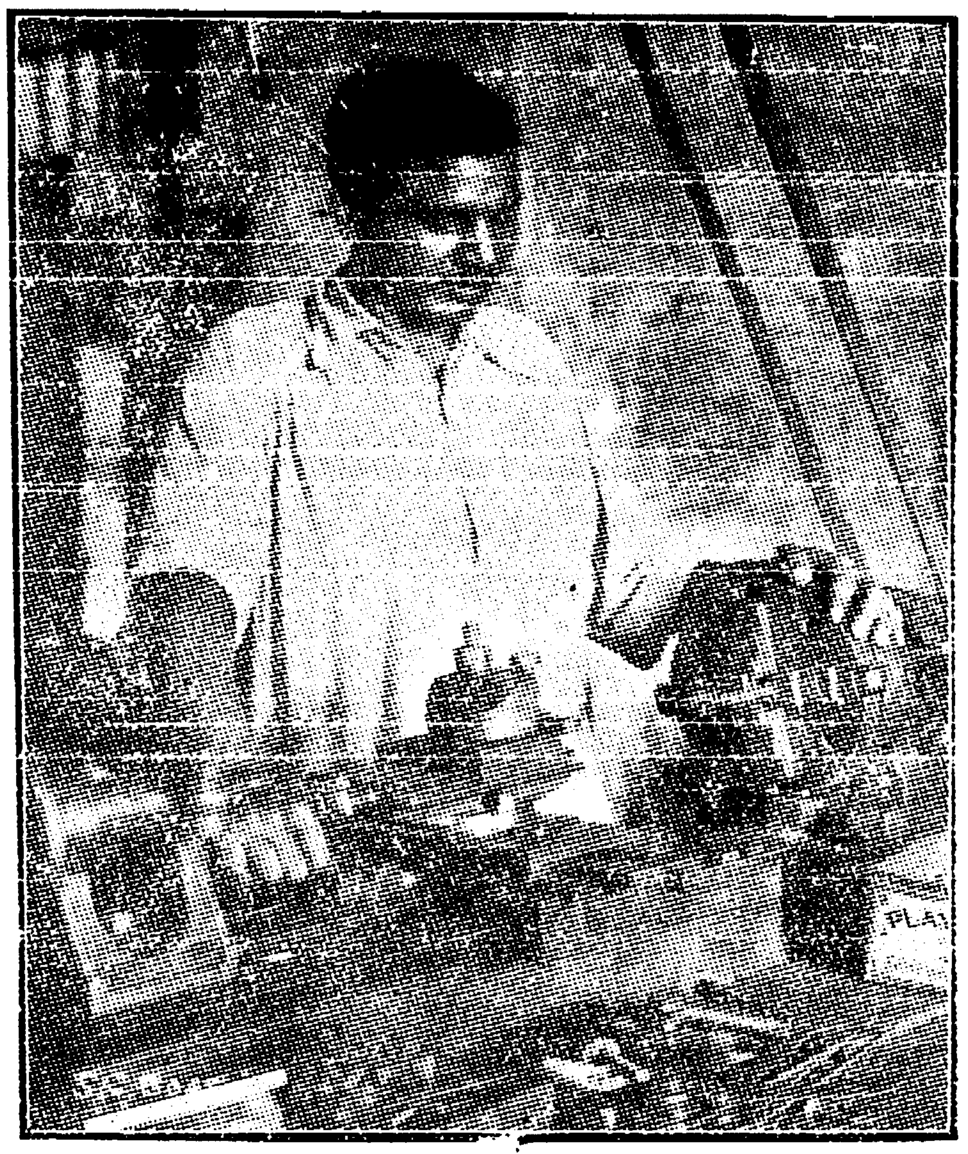

দেশরক্ষার বীর সৈনিক
কলিকাতা লোহা কারখানায় উৎপাদনরত মজুর

সালের সেপ্টেম্বর, পুরা একমাস বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রচার চলিয়াছে। শ্রমিক তাহার দেশরক্ষার রাজনীতি লইয়া হাজির—দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধ্বংসকারী আন্দোলনের সমর্থনে ভ্রান্ত রাজনীতির আঘাতে শ্রমিককে হারাইতে চায়। হাওড়ার বার্ণ, খিদিরপুরের বার্ড, খড়গপুরের রেল, ঢাকার সূতাকল, হুগলীর বেণ্টীং, চট্টগ্রামের চা-বাগান ও কলিকাতার ট্রাম, বাস, গ্যাস, ইলেকট্রীক প্রভৃতি এসেন্সিয়াল সার্ভিস এবং রাজগঞ্জ চেঙ্গাইলের চটকল মজুরের দুই মাস ধরিয়া জাপানের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য ঐক্য আন্দোলন বাংলার দেশপ্রেমকে জাগাইয়া রাখিল। বি-এণ্ড-এ রেলের শ্রমিক ও দর্শনার চিনির কলের শ্রমিককে স্ট্রাইকের বহু উস্কানী থামাইতে হইয়াছে। এত উস্কানী, এত অপপ্রচার কিন্তু **শ্রমিক তখন দেশ-রক্ষার পথে অবিচলিত।**

শত্রুর যখন জোর কদম

সত্যই আবার বাংলার বুকে জাপানের বোমার আঘাত আসিল। কলিকাতার ট্রাম মজুর ট্রাম ছাড়িল না। বাহাদুর মজুর দেখাইল দেশরক্ষার কাজ শুধু মুখের কথা নয়। বোমার আগুনে পুড়িয়া ছাই হওয়ার বিপদ সামনে রাখিয়া শ্রমিকই পারে দেশকে বাঁচাইবার জন্য আগুয়ান হইতে।

বাংলার শ্রমিক জাপানী আক্রমণের নূতন আঘাত রুখিতে দৃঢ়বদ্ধ। কলিকাতায় ট্রাম থামে নাই। জাপ-বিমানের ষষ্ঠ আক্রমণের সময় সংবাদপত্রে বাহির হইল;—কারখানা ও পাবলিক ইউটিলিটী সার্ভিসের মজুরের হাজিরা সব ঠিক আছে।

রাশিয়ার রণাঙ্গনে তখন ফ্যাসিস্ট শত্রুর আক্রমণ জোর কদমে চলিতেছে। আমাদের দেশের ভিতর পঞ্চম বাহিনীর দালালরা দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য অসীম প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

বাংলার শ্রমিক তাহার রাজনীতি হইতে বিচ্যুত হইবে না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া মজুর শ্রেণীর সংগঠন আগাইয়া চলিয়াছে। বজবজ চিভিয়ট জুট মিলের চাঞ্চল্য কে না জানে? পঞ্চমবাহিনী স্ট্রাইকের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতেছে। বীর মজুর অমূল্য বন্ধ সামনে আসিল। দলে দলে মজুর কর্মী বস্তাগুলি ছাইয়া ফেলিল। দেশ আমাদের। উৎপাদন চালু রাখিয়া নিজেদের দাবী লইয়া লড়ো। মিল চালু হইল। **শ্রমিকের দৃঢ়তা তখন বাড়িয়াছে।**

কর্তৃপক্ষের বাধা যখন প্রবল

জাপ-বোমার হিড়িক কমিয়া আসিল। সরকার ও মালিক নিজেদের স্বার্থান্ধ নীতি লইয়া শ্রমিকের সামনে হাজির। বীর মজুর অমূল্য রঙ্গের দলের উপর মালিক থাপ্পা। তাদের নেতৃত্ব ও সংগঠন মালিকদের মনে আতঙ্ক আনিল। ১৫ জন বাছাই করা ইউনিয়নের নেতার জবাব হইল। ইউনিয়ন কারখানা চালু রাখিয়াই তাহার বিরুদ্ধে লড়িয়া চলিল।

বোমার সময় ট্রামের নির্ভীক মজুরদের জন্য কোম্পানী বহু দাবী মানিয়াছিল, পাকাবাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন আবার চলিল — তাহাদের জুলুম। ইউনিয়নের নেতারা 'জনযুদ্ধের' মারফৎ শ্রমিকদের বুঝাইল— ট্রাম শ্রমিকদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় জয়: এ জয়-লাভের মূল কথা যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখিয়া দেশরক্ষা করা। এই পথেই দৃঢ় থাক—কোম্পানীর বর্ত্তমান জুলুম-বাজীও চূর্ণ হইবে।

কর্পোরেশন দক্ষিণ কলিকাতার ধাঙ্গড়দের জন্য যে পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা তুলিয়া দিল। চেঙ্গাইলের চটকল মজুরদের উপর গুলী চলিল। ১১৫ জনকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ মজুর যখন রুখিয়া দাঁড়াইল মালিক ও পুলিশ তখন এই পথই বাছিয়া লইয়াছিল। বিজলী মজুরদের ছাঁটাই হইতে লাগিল।

সর্বত্রই যেন মজুরদের উপর একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে।

বাংলার শ্রমিক পথ দেখাইল—উৎপাদন বাড়াইয়া জুলুম রোখো। সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হইয়া জুলুম বন্ধ কর। উৎপাদনের বাধা চূর্ণ করিতে হইবে, তাই **শ্রমিক তখন ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ।**

উৎপাদনে যখন অব্যবস্থা

৪৩ সালের এপ্রিলে সুরু হয় কারখানায় কারখানায় উৎপাদন সম্মেলন। ৪ঠা এপ্রিল হুগলীর রিষড়ায় সম্মেলন শুরু হইল। আগষ্ট মাসে ঢাকায় ১০ হাজার মজুরের সমাবেশে তাহার চরম পরিণতি। ট্রাম মজুর ঘোষণা করিল—জাপানী বোমা, পঞ্চমবাহিনী, কোম্পানীর উস্কানী আর সরকারের টালবাহানা কিছুই মজুরদের দমাইতে পারিবে না। বিজলীর মজুর একতার জোরে ৮০ আনা সাইরেন ভাতা, দোকান খোলা ও পাকা শেণ্টারের দাবী আদায় করিল।

৪৩ সালের মে-দিবসে বাংলার শ্রমিকদের অবদান—উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নূতন নূতন আবিষ্কার। ঢাকেশ্বরীর মজুর সতীশ কর ও যোগেশ সরকার এমন ব্যবস্থা করিয়া দিল যাহার ফলে মশারীর নেট প্রস্তুতে ৬৫ খানা তাঁত বেশী চলে, দিনে ৫২০ জোড়া কাপড় বেশী উৎপাদন হয়। জুলাই মাসে টেক্সম্যাকোর মজুর এমন পরিশ্রম করিতে লাগিল যাহার ফলে ৭০০ জিনিষের জায়গায় ১২০০ জিনিষ তৈরী হইতে লাগিল।

সম্মেলনের ভিতর দিয়া মজুর দেখিয়াছে—কোথায় অপচয়, কোথায় ঘাটতি। এই সমস্ত দূর করিতে পারিলে কলে কারখানায় এত জিনিস উৎপন্ন হইবে যে জাপ দস্যুর আক্রমণের ভরসার ভিৎ চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

উৎপাদন বাড়ানোর আন্দোলনের এই বিশেষ যুগে বাংলায় আড়াই লাখ চটকল মজুরের বিরাট অভিযান কেহ ভুলিবে না। ২০ দিনে ৫০ হাজার মজুরের স্বাক্ষর। ৩০৲ টাকা ভাতা, সস্তায় খাদ্য সরবরাহ ও তদন্ত কমিটির দাবীতে চটকলের মজুর প্রচণ্ড আওয়াজ তুলিল।

চট্টগ্রামে চা বাগানের মালিক বাগান তুলিয়া দিবে। শ্রমিকদের প্রায় অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয়, কিন্তু তারা উৎপাদন বন্ধ করিবে না। মজুর-গার্ড তৈরী করিয়া তাহারা পাহারা বসাইল। বাগান যন্ত্রপাতি কিছুই সরাইতে পারিবে না। বাগানের কাজ চালাইতেই হইবে।

শ্রমিকের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইউনিয়নের বহু দাবী মালিকরা মিটাইতে বাধ্য হইয়াছে। চটকলের শ্রমিককে শ্রমমন্ত্রী দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। টেক্সম্যাকোর মজুর কয়েকটী দাবী আদায় করিল। ঢাকায় মজুরের পক্ষে এডজুডিকেটর সিদ্ধান্ত দিল ২১ জন বরখাস্ত মজুরের কোন দোষ ছিল না।

১৮ই ও ১৯শে মে হঠাৎ কলিকাতায় জল... হাহাকার। টালা ও পলতার শ্রমিক ২৫ লক্ষ লোকের জলের হাহাকার রুখিবে। অর্দ্ধাহারে থাকিয়া পলতার শ্রমিক কাজ চালায়। তাহাদের দাবী-দাওয়া আংশিক ভাবে আদায় হয়।

ভার্ত্তিয়ার লোহাকারখানার মজুর দেশরক্ষার ... নিজের সংগঠন মজবুত করিতে মাসের পর মাস লড়িয়াছে। ইউনিয়নের জোরে তারা বহু দাবী আদায় করিয়াছে। লোহাকারখানায় উৎপাদন এক মিনিট বন্ধ করা যায় না এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা।

রেলের এঞ্জিন অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে, মালিক উদাসীন। ভারতের বীর সন্তান দ্বিজু ও সোনেলাল দোমহানীর রেল লাইনে গাড়ী চলা থামিতে দিবে না। অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহারাই শেষে ... মধ্যে এঞ্জিন মেরামতের কাজে অগ্রসর। এই ... **শ্রমিক তখন দেশরক্ষার নেতা।**

শ্রমিক জাতীয়-আন্দোলন থামায় নাই

জাতীয় আন্দোলন যখন নেতৃহারা

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতারা কারাগারে। যাঁহারা বাহিরে আছেন তাঁহারা হতাশ, সঠিক পথ ধরিতে পারিতেছেন না। বাংলার শ্রমিক জাতীয় ঐক্যের আওয়াজে শুধু বস্তী নয়, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের ভিতরেও চাঞ্চল্য আনিয়া দিল। বিভ্রান্ত দেশভক্তদের চিন্তা করিতে শিখাইল। শ্রমিকেরা শুধু আওয়াজই তোলে না—কাজের মধ্যে পরিশ্রম করিয়া দেখাইয়া দেয় তাহাদের প্রদর্শিত পথ কত নির্ভুল। শ্রম তাহাদের জীবনের মূল বস্তু। দেশরক্ষার কাজ তাহাদের জাতীয় আন্দোলনে নব জীবন আনিয়া দিল। ৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী বঙ্গেশ্বরীর মজুররা বিপুল সমাবেশের মধ্যে মিলের ভিতরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্য মজুররা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ৪৩ সালে টিউনিসিয়ার বিজয় উৎসবে কুমারডুবির ৫ হাজার মজুর ঘোষণা করে—এ জয় শুধু মিত্রশক্তির জয় নয়। মজুর শ্রেণীর জয়, পদানত দেশের মুক্তি আন্দোলনের জয়। সোভিয়েট দিবসে নারায়ণগঞ্জের সাড়ে তিন হাজার মজুর যুদ্ধ-জয়ের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে—এ যুদ্ধ আমাদেরই স্বাধীনতার যুদ্ধ। কংগ্রেস ও লীগ কর্মীরা আগাইয়া আসুন। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যখন কেহই চালাইতে পারে না **শ্রমিকরা তখন মুক্তি-যুদ্ধে পুরোভাগে।**

চারিদিকে যখন খাদ্যাভাব

বজবজের শ্রমিক জনসাধারণের সভা ডাকিল, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে বলিল—জনসাধারণের মিলিত খাদ্য কমিটি গঠন করিতে আগাইয়া আসুন; খাদ্য চোরদের শায়েস্তা করিতে হইবে। মহল্লা মহল্লায় শ্রমিকরা জনরক্ষা ও খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া জনসাধারণের খাদ্য আদায়ের আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। মজুতদারদের মজুত বাহির করিয়া দেশকে বাঁচাইব—এই তাহাদের সংকল্প।

চারিদিকে দুঃস্থের ভীড়। বাংলা মা এ দুঃখ আর যেন সহ্য করিতে পারে না। শ্রমিক আগাইয়া আসিল দুঃস্থের রিলিফ সংগঠনে। ১৮ই আগষ্ট হইতে প্রতিদিন

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্বাধীনতার যুদ্ধে অজেয় চীন

পুর্ব্বহোপে-র একটি গ্রাম ফুংজিয়া। ১৯৪০-এর ২৫শে জানুয়ারী জাপানী শত্রুরা গ্রামে প্রবেশ করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তি এদের নেই; দুচোখে এদের জংলী হিংস্রতা। যে গ্রামে যায়—ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়, কাউকে জীবন্ত রাখে না, গ্রামবাসীর সব কিছু লুট করে।

ভোর না হ'তেই তারা সৈন্য দিয়ে গ্রামটা ঘিরে ফেললো। তারপর সঙীন উঁচিয়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে জড়ো করল একটা ঘেরা জায়গায়। দরজা বন্ধ হ'ল। রাশিকৃত খড় আর জ্বালানী কাঠ অগ্নিসংযোগের অপেক্ষায় তৈরী। একদল জাপানী একদিক থেকে এই নিরীহ জনতার ওপর সমানে কামানের গোলা ছুঁড়তে লাগলো, অন্যদিক থেকে ছুটে এলো আগুনে বোমা। সমস্ত গ্রামে আগুন ছড়িয়ে প'ড়লো। অসহায় গ্রামবাসীর মর্মভেদী চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হ'ল।

বিকালে দেখা গেল, গোটা গ্রাম ভস্মস্তূপে পরিণত। দগ্ধ মাটির ওপর ১,০১৫ জন গ্রামবাসীর মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ১১ শত কুটিরের চিহ্ন নেই আর ৩০ টিরও বেশী পরিবার হয়েছে নির্বংশ।

●

চীনের মাটিতে এমনি অসংখ্য ফুংজিয়া জাপানীদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। সহস্র সহস্র নিরীহ শিশুর বুকে তারা সঙীনের ধার পরীক্ষা করেছে। আজ তাই ফ্যাশিস্ট জাপানের বিরুদ্ধে গোটা চীন রুখে দাঁড়িয়েছে।

চীনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে চীনের মানুষ আজ এক হ'য়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। চীনের ফৌজের প্রতি তাদের অসীম মমতা। যারা দেশরক্ষার জন্য আগুয়ান হয়ে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের বাঁচাবার জন্য চীনের মানুষ যে কোন বিপদ্ মাথায় করতে রাজী।

মধ্য হোপেই-তে একদিন এক গেরিলা দলের নেতা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়। হঠাৎ কাছের কোন এক গ্রাম থেকে এক বুড়ী এসে হাজির। বুক চাপড়িয়ে সে কান্না সুরু ক'রে দিল। জাপানীদের কাছে বুড়ীটি কাকুতি মিনতি ক'রে জানালো, ও হ'চ্ছে তার একমাত্র ছেলে; ওকে ধ'রে নিয়ে গেলে বুড়ী আর বাঁচবে না। তাছাড়া তার ছেলেটি নেহাৎ ভাল মানুষ, জাপানীদের শত্রুতা ক'রবে এমন স্বভাবই নয় ওর।

জাপানীরা ছাড়বে না, বুড়ীও শুনবে না। অনেকটা রাস্তা জাপানীরা চ'লে এসেছে—বুড়ী তবু নাছোড়বান্দা। বুড়ী কাঁদে আর বলে, 'জাপানে তোমাদের ঘরেও ত মা আছে। তাদের কথা মনে ক'রে আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।' কথাগুলো জাপানী সৈন্যদের মনে বিঁধেছিল। শেষ পর্যান্ত লোকটিকে তারা ছেড়ে দিল।

বুড়ীর চোখে আনন্দের অশ্রু। গেরিলা নেতাকে মুক্ত করার গর্বে তার মন ভ'রে গিয়েছে।

পশ্চিম পাইপিং অঞ্চলে জাপানী সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে। কিন্তু একদল চীনা পল্টনের হঠাৎ আক্রমণে প্রায়ই তাদের বিব্রত হ'তে হ'চ্ছে। অথচ তাদের ঘাঁটি কিছুতেই জানা যাচ্ছে না।

একদিন গুপ্তচরের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, কাছেই এক গ্রামে গেরিলারা আস্তানা করেছে।

হাজার হাজার জাপানী সৈন্য সেই গ্রাম অতর্কিতে ঘেরাও ক'রলো। গেরিলা বাহিনীর পক্ষে পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'ল।

কিন্তু আশ্চর্য! প্রত্যেকটা অলিগলি, প্রত্যেকটা বাড়ীঘর তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল—কোথাও গেরিলা সৈন্যদের চিহ্ন নেই। একটা বন্দুকও কোথাও তারা খুঁজে পেল না। গ্রামের মধ্যে কৃষক ভিন্ন কেউ নেই—প্রত্যেকে বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে বাস ক'রছে। বিদেশী একজনও নেই।

জাপানী সেনাধ্যক্ষের তবু সন্দেহ দূর হ'ল না। গ্রামের সমস্ত পুরুষমানুষকে সার বেঁধে দাঁড়াতে বলা হ'ল। ছোট ছেলেমেয়ে ডেকে তাদের বাপ, দাদা ও আত্মীয় স্বজনদের চিনিয়ে দিতে বলা হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত একজন পুরুষকেও চেনাতে বাকি থাকলো না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছদ্মবেশী গেরিলাদের আপন লোক ব'লে দেখিয়ে দিয়েছে। সনাক্ত ক'রতে গিয়ে তারা এতটুকু দ্বিধা করেনি। তাদের সপ্রতিভ ধরণ দেখে জাপানীরা অবিশ্বাস করতে পারেনি।

জাপানীরা বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যাবার আগে দেশী গোয়েন্দাটাকে রাইফেলের গুলিতে খুন করে গেল।

জাপানী সৈন্যদের ওপর গেরিলাদের উৎপাত আবার পুরো দমে সুরু হ'ল।

যে জাপানী দস্যুর দল চীনের মাটিতে ধ্বংসের আগুন জ্বেলেছে, তারাই আজ ভারতের মাটিতে হানা দিয়েছে। চীনের দেশভক্ত বীরের দল এদের ক্ষমা করেনি। ফ্যাশিস্ট জাপানের বিরুদ্ধে চীনের মানুষ শক্ত প্রাচীর হ'য়ে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে। জাপান যদি আশা ক'রে থাকে আত্মবিক্রীত দালাল সুভাষের সাহায্যে ভারতের জনগণকে শৃংখলিত ক'রবে, তবে তাদের সে আশা নিষ্ফল। চীনদেশে দেশদ্রোহীর অভাব হয়নি, কিন্তু তবুও চীনের জাতীয় প্রতিরোধের সামনে জাপানের চক্রান্ত ভেঙে গেছে। জনকয়েক দেশদ্রোহীর ছলচাতুরী দিয়ে কোটি কোটি লোকের স্বদেশপ্রেম আচ্ছন্ন করা যায় না। চীন থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছি।

যে খবর টোকিও গোপন রাখে

জাপানী ফ্যাশিস্টদের প্রতীক হ'চ্ছে সূর্য; কিন্তু সারা দুনিয়ার কাছে জাপান আজ এক রহস্যাবৃত অন্ধকার। এই দ্বীপের অধিবাসীদের এক খাঁটি খবরও বাইরের লোক জানতে পারে না। কিন্তু আজ চীনদেশে জাপানীদের যে 'যুদ্ধবিরোধী লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা জাপানী যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে অনেক বিস্ময়কর খবর জেনেছে। তাতে মনে হয়, ভূমিকম্পের দেশ জাপানে আজ ফ্যাশিস্টদের পায়ের নীচে এক নূতন ভূমিকম্প মাথা তুলছে—জনগণের অনাগত এক বিপ্লব!

শৃংখলিত জাপানী মজুর

১৯৩৯ সালে জাপানে কলকারখানায় মজুরী বেঁধে দেওয়া হ'ল। খনি মজুরদের সপরিবারে খনি এলাকার মধ্যে থাকার হুকুম জারী হ'ল। কেউ যাতে বাইরে না যেতে পারে তার জন্য কাঁটা-তার আর সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা হ'ল।

এতদিন গ্রামের কৃষকদের ধ'রে এনে কলকারখানায় মজুরের অভাব মেটানো হ'ত; কিন্তু অধিকাংশ কৃষক আজ পল্টনে কাজ নিয়েছে। কাজেই মজুর জোটানো দুঃসাধ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের পর এদিকে সংকট আরও বেড়ে গেল। ১৯৪১-৪২ সালে জাপানী স্ত্রীলোক আর নাবালকদের এবং অধিকৃত দেশের ক্রীতদাসদের কলকারখানার কাজে লাগানো হ'ল। ১৯৪২-সালের শেষের দিকে দেখা গেল, জাপানী কলকারখানায় শতকরা ৫১ জনই মেয়ে মজুর। ইয়াহাটার বিরাট লৌহকেন্দ্রের ৪ লক্ষ মজুরের মধ্যে মেয়ে মজুরের সংখ্যাই ১ লক্ষ ২৮ হাজার।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বাধ্যতামূলক শ্রমিক বৃত্তির আইনবলে জাপানী মজুরদের শেষ স্বাধীনতাও লুপ্ত হল। জাপানী সরকার ১৫ বছরের বেশী বয়সের যে কোন স্ত্রী পুরুষকে মজুর হিসাবে জাপানী সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে ইচ্ছামত খাটাতে ও পাঠাতে পারবে। ৬০ থেকে ৭০ বছরের বুড়োরাও এই আদেশ থেকে রেহাই পেল না। মজুর তলব করার জন্য শাদা কার্ডের ব্যবস্থা হ'ল। এই কার্ডের নাম শুনলে জাপানী মজুর শ্রেণী রীতিমত ডরায়। কারণ, কর্তৃপক্ষ মজুরদের সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা না ক'রেই যেখানে খুশী তাদের কাজে নিয়োগ করতে লাগলো। শিল্পনৈপুণ্য থাকলেও পূর্বের রোজগারের ৩ ভাগের ১ ভাগ মাত্র মজুরী বেঁধে দেওয়া হ'ল। বাজার দর যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন মজুরদের জন্য যা নূনতম মজুরী ছিল, সেই মজুরীই এখন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াল। যারা সাধারণভাবে কারখানায় খেটে খাচ্ছিল—তাদের ওপর অকারণে আইন প্রয়োগ করার ফলে তাদের মজুরী সিকির সিকি কমে গেল। মজুর শ্রেণীর দুর্গতির সীমা থাকলো না।

ব্যাপক হারাকিরি

শাদা কার্ডের এই জুলুম জবরদস্তির ফলে জাপানে ব্যাপক আত্মহত্যা দেখা দিল। কোবে শহরের এক যুবক মজুর। তার ঘরে তার মা আর দুটি ছোট বোন। স্থানান্তরে যাবার জন্য তার কাছে শাদা চিঠির হুকুম এল। সেই দিনই গোটা পরিবার ট্রেণের নীচে লাফিয়ে আত্মহত্যা ক'রল। এই মজুর পরিবারের শবানুগমনে শহরের হাজার হাজার মজুর যোগ দিল। পুলিশের সামনে তারা সভায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানালো।

দিন ১৬ ঘণ্টা একটানা খাটুনি ও লোকাভাবে অপটু হাতে জটিল যন্ত্রপাতির ভার দেওয়ায় দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার মাত্রা অসম্ভব বেড়ে গেল। মিৎসুবিশি-র বৈদ্যুতিক কারখানায় ১ দিনে ৫০টি দুর্ঘটনা ঘটা বড় কম কথা নয়। বিশেষ ক'রে রাত্রের কাজেই বেশী বেশী দুর্ঘটনা দেখা যেতে থাকে। সপ্তাহে মজুরদের একটি দিনও ছুটি নেই—তার উপর দুদিন রাত জাগা কাজ। জাপানের যুদ্ধকর্তাদের মুখে বুলি: 'আজ আর শনিবার, রবিবার আর সোমবার নয়—শুধু শনিবার, সোমবার আর সোমবার।'

১৯৩৯-এর পর থেকেই মজুরীর হার সমান আছে; কোথাও কোথাও বরং কমেছে। কিন্তু এদিকে জিনিষের দাম হয়ে উঠেছে চতুর্গুণ। যেসব মজুরদের বাধ্যতামূলক কাজে তলব করা হয়েছে তাদের আয় শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ কমে গিয়েছে। জাপানী ফ্যাশিস্টরা বহু দেশ অধিকার করেছে—কিন্তু আগের চেয়ে মজুরদের খোরাক কমে গিয়েছে। একজন জাপানী সৈনিক আজ যা রসদ পায়, একজন মজুর তার অর্ধেকও পায় না।

এই হাড় ভাঙা পরিশ্রম আর খাদ্যাভাবে জাপানী মজুর শ্রেণী আজ নানা ধরণের রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। বহু মজুরের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের অভিমত হচ্ছে: অবিশ্রান্ত কাজ আর রাত্রি জাগরণই এই রোগের কারণ। যক্ষ্মা আর যৌনব্যাধি জাপানী মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ওসাকায় গত বছর শতকরা ২০ জন যুবক শারীরিক অসুস্থতার জন্য সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশাধিকার পায় নি। ওসাকার ভারপ্রাপ্ত জেনারাল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে: 'এই অবস্থা চলতে থাকলে গোটা জাত ধ্বংস হ'তে দেরী হবে না।'

১ লক্ষ মজুরের ধর্মঘট

জাপানের মজুর শ্রেণীর কাছে শাসকদের এই অত্যাচার ক্রমে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ধর্মঘট জাপানের কলকারখানায় দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লো। দিনের পর দিন হাড় ভাঙা খাটুনি, একদিনও বিশ্রাম নেই; মজুরী নামমাত্র, ভরপেট খাওয়া নেই। কোবে শহরের মজুররা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। মজুর প্রতিনিধিদের গোপন সভায় আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। মালিকের দল মজুরদের একটি দাবী মানতেও রাজী হ'ল না। প্রথম ৫ দিন অবস্থান ধর্মঘট চললো। তারপর ঠিক হ'ল, মালিক যখন আপোষ চায় না তখন কলকব্জা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে জাপানী মজুররা উঠে দাঁড়ালো। জাপানের যুদ্ধ শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

পাছে অন্যান্য জায়গার কারখানায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্য কোবে-র মজুরদের দমন করার জন্য জাপানী সরকার সশস্ত্র পল্টন পাঠালো। মজুররা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অস্ত্রশক্তির সামনে ভেঙে পড়লো। ধর্মঘটে মজুরদের পরাজয় হ'লো। ২০ হাজার মজুর গ্রেপ্তার হ'ল। তাদের প্রত্যেকের কাছে ধর্মঘটের পাণ্ডাদের নাম জিজ্ঞেস করাতে সকলে একবাক্যে বললো, 'জানি না।' তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করে পুলিশ ৪ জনকে আন্দোলনের নেতা হিসাবে গুলি করে হত্যা করলো। ২৪ জন মজুরকর্মীর জন্য কালাপানির ব্যবস্থা হল।

কিন্তু জাপানী মজুর শ্রেণীর মনোবল ভাঙে নি। নাগোয়া-র মজুররা আগস্ট মাসে আবার ধর্মঘট আরম্ভ করল। বিমান নির্মাণের কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল। মজুররা যন্ত্রপাতি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আপোষে আসতে রাজী হল। কিন্তু পুলিশ বহু মজুরকে গ্রেপ্তার করল। সেপ্টেম্বর মাসে ওকোকুরা কারখানায় আংশিক ধর্মঘট সুরু হল। মজুরদের দাবী কর্তৃপক্ষ অনেকটা মেনে নিল। মালিকরা এবার প্রতিশোধ নেবার বিশেষ চেষ্টা ক'রল না।

টোকিও ও ইয়োকোহামার মাঝামাঝি সুরুমি শহরে অক্টোবর মাসে বিরাট এক ধর্মঘট সুরু হয়। মজুর এবং বেতনভুক্ত কর্মচারীরা এক সঙ্গে এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ধর্মঘট সম্বন্ধে খুব বেশী খবর পাওয়া যায় নি। তবে জানা গিয়েছে, এখানে পুলিশ মজুর ধর্মঘটীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়।

১৯৪১ সালের এই ব্যাপক ধর্মঘট সোভিয়েটের উপর জাপানের আকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। সোভিয়েট সীমান্তে আক্রমণের জন্য জাপান প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে মজুর শ্রেণীর এই অসন্তোষ দেখে জাপানকে তার পূর্ব সংকল্প ত্যাগ ক'রতে হ'ল। জাপানী যুদ্ধকর্তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রল।

● জাপানী শাসকরা ১৯৩৮ সালে সদম্ভে বলেছিল, হ্যাঙ্কাউ নিতে পারলেই চীন-যুদ্ধের খতম হবে। হ্যাঙ্কাউ-এর পতনের পর ছ' বছর কেটে গেছে—যুদ্ধ-বিরতির চিহ্ন নেই। জাপানী শাসকদের আজ বুলি বদলেছে—দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও!

জাপানের অত্যাচারিত জনসাধারণ আজ যন্ত্রণায় অস্থির। জাপানী যুদ্ধবাদী আর পুঁজিপতিদের প্রবঞ্চনায় আস্তে আস্তে তাদের চোখ খুলছে। তারা দেখছে, যুদ্ধে শুধু বলির পাঁঠার মত তারা মরছে। ১৩ বছর ধ'রে ফ্যাশিস্টরা সমানে তাদের ভুল বুঝিয়েছে।

জাপানী জনগণের মুক্তির আজ একটি মাত্র পথ—জাপানের সামরিক শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়। আজ তাই জাপানী সমরশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেকটি আঘাত জাপানী জনগণের হাতে মুক্তির অস্ত্র তুলে দেবে।

মে-দিবসের গান

এদিন মৃত্যুরে ভুলি, ভুলে যাই ক্লান্তি, অবসাদ,
এদিন দুচোখে আনে উচ্ছ্বসিত আলোর সংবাদ।
প্রত্যহ ক্লেদাক্ত দিন অভিশপ্ত অপবাদে ঘেরা ;
আমরা বিষণ্ণ যারা, হতাশ্বাস ক্লিষ্ট মানুষেরা
কামনা করেছি নিত্য অফুরন্ত প্রাণের উল্লাস—
পেয়েছি সুদীর্ঘ এক শতজীর্ণ দীর্ণ ইতিহাস।
অহরহ তবু সেই স্বপ্ন আজো ক'রে আসে ভীড়।
বিদ্যুৎস্পর্শের মত অকস্মাৎ হৃদয় অস্থির
উগ্রতর কামনায়, রক্তে লাগে প্রচণ্ড জোয়ার,
অন্তহীন অন্ধকার কশাঘাতে হয় চুরমার,
অবরুদ্ধ প্রাণে জাগে জন-গণ-সমুদ্র-সংগীত ;
ধূমায়িত চক্রবালে প্রত্যাসন্ন দিনের ইংগিত
প্রত্যেক হৃদয়ে তোলে তীব্রতর সংশয় সংঘাত।
তোমার পুরুষ হাতে, হে মজুর, আজ রাখি হাত
অগ্রসর ইতিহাসে সহযাত্রী মোরা পরস্পর
হ'তে চাই, প্রাণচিহ্নে প্রত্যহের জলন্ত স্বাক্ষর।
ধূলিতে মলিন হাতে, হে কিষাণ, জানি আমি জানি
হাত যদি রাখি আজ, একত্রের সমগ্র সন্ধানী
দৃষ্টির আগুনে পুড়ে ছাই হবে যত গুপ্তচর।
প্রচণ্ড বন্যার মুখে লৌহদৃঢ় বন্ধুতা নির্ভর।
প্রাত্যহিক স্বার্থস্বপ্নে সংক্রামিত আমার যৌবন
মৃত্যুহীন মহাদেশে ব্যাপ্ত হতে চায় সারাক্ষণ,
অবসাদে গুপ্ত প্রাণ চায় শুধু বজ্র-আশীর্ব্বাদ ;
দুরন্ত আগ্রহভরা উগ্রতপ্ত জীবনের স্বাদ
বলিষ্ঠ বাহুর চাপে ধরা দেয় প্রাণ-সূর্য্য যার।
হে মজুর, হে কিষাণ দিকে দিকে তার'ই অঙ্গীকার।

অবন্তী সান্যাল

কিশোর বাহিনীর গান

আমরা কিশোর, আমরা তরুণ ছেলে মেয়ের দল,
ভবিষ্যতের আমরা আশা; উৎসাহে চঞ্চল।
—কিশোর ছেলে মেয়ের দল ॥
স্বাস্থ্যে হবো লোহার মতো বিপুল শক্তিধর,
জ্ঞানের আলোয় ক'রবো বিশাল মনের পরিসর,
নেইকো ফাঁকি পড়ার মাঝে,
ঘরের কাজে, দেশের কাজে
স্বপ্ন মোদের স্বাধীন মানুষ—আনন্দ উজ্জ্বল।
—কিশোর ছেলেমেয়ের দল ॥
স্বাধীন ভারতভূমির হবো প্রধান নাগরিক
দেশের সেবা ব্রত মোদের, এই করেছি ঠিক।
রইবে মানুষ অনাহারে—
সইবোনারে, সইবোনারে
অনাহারের দানব মেরে গ'ড়বো জাতির বল।
—কিশোর ছেলেমেয়ের দল ॥

—দয়ালকুমার

চীনের দেশভক্ত কিশোর

চীনের 'সিয়াও-কুয়ে' কিশোর দেশভক্তদের দুর্ধর্ষ বাহিনী। অসীম সাহস আর অসম্ভব বুদ্ধি এদের। এরা শত্রুর খবর, তাদের পথঘাটের খোঁজ রাখতে ওস্তাদ। চীন দেশের অধিবাসীরা এই ক্ষুদে যোদ্ধাদের রীতিমত সম্মান করে।

একদিন এক সিয়াও-কুয়ে জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। গারদ-ঘরে গ্রামের এক মোড়লের সঙ্গে দেখা। তাকে জাপানীরা জেরা করার জন্য ধরে এনেছে। এক চীনে দালাল দরোজায় পাহারা দিচ্ছে। গভীর রাত্রে সে যখন ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে, সিয়াও-কুয়ে গ্রাম্য মোড়লটিকে পালাবার রাস্তা দেখিয়ে দিল।

তারপর সে গারদঘরে ফিরে এসে চীনে দালালটাকে ডেকে বললো, 'ও ভাই! উঠে পড়ো। তোমার সর্বনাশ হয়েছে—মোড়ল পালিয়েছে।' চীনে পাহারাদারের মাথায় যেন বাজ প'ড়লো। এবার তার প্রাণ যাবে!

সিয়াও-কুয়ে তাকে গম্ভীর ভাবে ব'ললো, 'শোনো ভাই, এখন তোমার খবর দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তোমার উপরওয়ালা যখন কাল তোমার কীর্তি জানতে পারবে, তখন তোমার ধড়ে আর মাথা রাখবে না। তার চেয়ে তুমিও এখান থেকে পালিয়ে চলো। আমাদের দলে যোগ দেবে।'

গোড়ায় লোকটা সাহস পাচ্ছিল না। তারপর একটু ভেবে সিয়াও-কুয়ের প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে গেল। অন্যান্য আরও বন্দীদের নিয়ে তারা যখন রাস্তায় বেরুলো, পাহারাদার লোকটাকে সিয়াও-কুয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, 'সঙ্গে তোমার রাইফেলটা এনেছো ত'?' লোকটা অবাক হ'য়ে উত্তর দিল, 'কই না ত'। সিয়াও-কুয়ে ব'ললো, 'যাও, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। গেরিলাদের কাছে একটা রাইফেলের দাম অনেক।'

ছোট্ট সিয়াও-কুয়ে। অথচ দেশপ্রেম তার বুদ্ধিকে কত ধারালো করেছে!

যুদ্ধরত বাংলার কিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

গোবিন্দর বাবা ঝড়ের মতো কিশোরবাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিসে ঢুকলেন. চিঠির ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকাতেই তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন: 'কোথায় আমার ছেলে গোবিন্দ? আজ তিন দিন হ'লো সে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, বলো কোথায় সে?' সবিস্ময়ে ব'ললাম: 'গোবিন্দ?' 'হাঁ, হাঁ গোবিন্দ, তোমাদের বাহিনীর সভ্য'। 'জানিনাতো'। 'জানো না মানে? তোমরাইতো আমি যা চাই না তাই ক'রছো, বাংলা দেশের ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছো, আর এখন ব'লছো জানিনাতো। বলো, তোমরা কী করেছো আজ পর্যন্ত দেশের ছেলেপিলেদের জন্য; বলো'। একটুও দেরী না ক'রে উত্তর হিসেবে চিঠির ফাইলটাই ঠেলে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি চীৎকার ক'রে প'ড়তে লাগলেন: **ফরিদপুরের খাসকুলা কিশোর বাহিনী**—তিন জন ছাড়া সবাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তাই এখন আমাদের কাজ হ'চ্ছে জল পরিষ্কার করা, রাস্তা বাঁধা, কোদাল কোপানো ইত্যাদি আর এই সব দেখে অনেক ছেলেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায় এবং নিষেধের জন্য যাঁদের ছেলেরা যোগ দিতে চায়নি তাঁরা যখন দেখলেন বাহিনীর ছেলেরা দিব্যি শিক্ষিত ও সভ্য হ'চ্ছে তখন তাঁরা আর নিষেধ ক'রলেন না বরং নিজেরাই বাহিনীকে সাহায্য ক'রতে আরম্ভ করলেন। এ'ছাড়া আমরা বিকেলে একঘণ্টা ড্রিল, স্বদেশী খেলা ও নাচগান ক'রে থাকি।

ঢাকা নবাবপুর কিশোর বাহিনী—অনেক দিন হ'লো আমরা কিশোর বাহিনীর তরফ থেকে একটি দুধের ক্যাণ্টিন খুলেছি। প্রথমে আমরা চাঁদা তুলে ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুধের ক্যাণ্টিন চালাতাম, বর্তমানে রিলিফ কমিটির কাছে গ্রান্ট ক'রে সপ্তাহে ৭০ টাকা ক'রে পাচ্ছি, তা দিয়েই দুধের ক্যাণ্টিন চালানো হ'চ্ছে।

ভদ্রলোক 'হুম্' ক'রে একটা শব্দ ক'রলেন, তারপর প'ড়তে লাগলেন: **রংপুরের মধুরাম প্রাইমারী স্কুলের কিশোর বাহিনী**—এক বছর আগে আমাদের স্কুলে ছাত্র ছিলো ৭০ জন, এখন ছাত্র সংখ্যা ৫৩। গড়ে উপস্থিত হয় ২০।২৫ জন, সবাই ম্যালেরিয়া অথবা

—যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে মার্শাল টিটো-র কিশোর বাহিনী—

পাঁচড়ায় ভুগছে, তাই বেশির ভাগ ছেলে স্কুলে আসতে পারে না, বই নাই ২০ জনের, জামা কাপড় নাই এমন ছাত্রের সংখ্যা ১০ জন। ১৪৲ ও ১২৲ টাকা হারে স্কুলের শিক্ষক দুইজন। তাঁরা সপরিবারে রোগে ভুগছেন, তাঁদের দু'মাসের মাইনেও বাকী। মধুরাম স্কুলের কিশোরদের রক্ষা করার জন্য আমরা ৩২ জনকে নিয়ে একটি কিশোরবাহিনী গ'ড়েছি এবং ৩৮ জনকে পাঁচড়া ও ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়েছি। স্কুলেই আমাদের অফিস। কাগজের জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে আমরা পাঁচ আনা ক'রে চাঁদা তুলছি।

অজ্ঞাতসারে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: 'বাঃ'। তারপর তিনি আর একটা চিঠি পড়তে লাগলেন: **কলকাতার ফার্ণরোডের কিশোর বাহিনী**—আমরা আগে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে জামা-কাপড় জোগাড় ক'রে তাদের সাহায্য ক'রেছি। এখন নিজেরাই মাটির খেলনা ইত্যাদি হাতের কাজ ক'রে সেইগুলো বিক্রী ক'রে দুঃস্থ কিশোরদের সাহায্য করছি।

চট্টগ্রামের ফাবিলাসদ্বীপ কিশোর বাহিনী—মহামারী যাতে না ছড়ায় তার জন্য আমরা প্রচার ক'রছি, তাছাড়া স্থানীয় দেশ-সেবকদের সঙ্গে মিলে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য শস্য, তরিতরকারী ইত্যাদি ফলানোর কাজও ক'রছি........' ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করলেন। বিপুলাকৃতি ফাইলের দিকে তাকিয়ে মেঘমুক্ত মুখে ব'লে উঠলেন: যাক্, বুঝেছি, আমার ছেলেটাই হতভাগা—যাই দেখি একবার থানায় খোঁজ করি... তিনি আবার ঝড়ের মতোই মিলিয়ে গেলেন!

দুঃখ হ'লো, কিশোর বাহিনীর এতো ভালো চিঠি থাকতে তিনি মাত্র এই ক'খানাই প'ড়লেন।

মণিপুরী নৃত্য

গৌরচন্দ্রিকা

আমাদের চৈতন্যের ভাবস্নিগ্ধ পিচ্ছিল এ পথে
কংসের চক্রান্তে কত দৈত্যদের পদধ্বনি শুনি।
প্রতিরোধী বৈষ্ণবের রক্তে তাই প্রখর উত্তাপ,
শ্রীখোলের বোলে নাচে উন্মুক্ত এ পেশী।
উদ্ভিজ্জাশী মৃগ বলে আমাদের করেছে কি ভুল?
কোহিমা আক্রান্ত আজ, আক্রান্ত এ বৈষ্ণব মহিমা।
আরক্তিম কত ধূলি ওড়ে রুক্ষ মণিপুর রোডে।

ঝুমুর

মোরা আর দেবো না, আর দেবো না
আর দেবোনা ছেড়ে,
তাড়াবো সুদূর।
রুখ্‌বোই আজ, রাখ্‌বো মোরা
কল্‌জে দিয়ে গড়া
মোদের রক্ত দিয়ে গড়া,
মোদের সোনার মণিপুর।

চক্রব্যূহ

পদ-লালিত্য ঘুচে গেছে আজ
রসকলি মুছে গেছে।
রণতাণ্ডবে মুদ্রিত দেহ ভঙ্গী
কণ্ঠে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারই আজ সঙ্গী।
ঘিরে ফেলো ঐ নাগা পর্ব্বত
পিষে ফেলো জাপ্ সেনা—
রক্তে পেশীতে স্নায়ুতে দিয়েছে ডাক
দেশ রক্ষীরে সঘনে পাঠায় হাঁক
বোমা-বিদগ্ধ ইম্ফল্।
জানি জানি হবে নিষ্ফল
কংসের এ চক্রান্ত।
মৃদঙ্গে বাজে দুন্দুভি-ঘন বোল,
চিত্রাঙ্গদা পেয়েছে কি পার্থকে।
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত দেশরক্ষার রোল।
যুবকের হাতে, যুবতীর হাতে ঐক্যের করতালি;
পায়ে পায়ে ঝঙ্কৃত
শপথের সে নুপুর,
দুর্ম্মদ মণিপুর।

ঝুমুর

মোরা আর দেবো না, আর দেবো না
আর দেবো না ছেড়ে,
ভাঙ্গিব দস্যুর এ
যতই জারি জুরি,
মোরা তাড়াবো সুদূর।
তবু নাচের তালেই ঘুরি
আমরা মণিপুরী
রুখ্‌বোই আজ, রাখ্‌বো মোরা,
কল্‌জে দিয়ে গড়া,
মোদের রক্ত দিয়ে গড়া
মোদের সোনার মণিপুর ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

যাত্রার গান

(৪ঠা জুলাই, ১৭৯৪, শেনিৎ ও মেউল্ রচিত 'ল শাঁ দু দেপার্')

জয়গানে করি লঙ্ঘন শত বাধা,
আমাদের চলা মুক্তির নির্দেশে
উত্তর থেকে দক্ষিণে সারা দেশে
যুদ্ধের ভেরী সাধা
চলেছে, ঘোষণা প্রতি সংগ্রাম ক্ষণে।
ফরাসী দেশের শত্রুর বিভ্রাট!
রক্তের নেশা উদ্ধত প্রভু যতো!
দেখ জনগণ তোমাদের সম্রাট!
শোষক শাসক নেমে এসো পদাহত।
গণতন্ত্রের ডাক শুনি দিকে দিকে,
বিজয়ের পণ অথবা মরণ মানি,
স্বদেশের টান প্রত্যেক ফরাসীকে
জীবনে মরণে মর্মে দিয়েছে বাণী।

বিষ্ণু দে

প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন—শিল্পী সূর্য্য রায়

Regd. No. C. 2836. ৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১লা মে ১৯৪৪, ১৮ই বৈশাখ ১৩৫১

★ ★ গান্ধীজির চিঠি ★ ★ ★

জাপ আক্রমণের সম্মুখে ভারতবাসীর কর্তব্য

"মনে রাখিও, আমাদের নীতি জাপানী সৈন্যবাহিনীর সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতার নীতি। সুতরাং, আমরা তাহাদের কোনমতেই সাহায্য করিতে পারি না, আর তাহাদের সহিত কোন কারবার করিয়া আমাদের কিছু লাভও হইতে পারে না। অতএব আমরা তাহাদের কাছে কোন কিছু বিক্রয় করিব না। যদি কেহ কেহ জাপ-সৈন্যদের সম্মুখীন হইতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সশস্ত্র সৈন্য যাহা করে তাহারা তাহাই করিবে—অর্থাৎ শক্তিতে না কুলাইলে পরাভূত হওয়ার আগে পিছু হটিবে। যদি জাপ-সৈন্য কোনও স্থানে ঢুকিয়া পড়ে, তাহা হইলে জাপানীদের সহিত কোন রকমের কারবার করার কথাই উঠে না—উঠা উচিত নয়। কোথাও লোকের মধ্যে যদি জাপানীদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে এবং জাপানীদের দখল-করা স্থান হইতে সরিয়া পড়ার সাহস ও শক্তি না থাকে, তবে তাহারা আমার এই নির্দেশ অনুসারে যাহা সব চেয়ে ভাল মনে করে তাহাই করিবে। কিন্তু একটা কাজ তাহাদের কখনই করা উচিত হইবে না—তাহা হইতেছে জাপানীদের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। ইহা ভীরু কাপুরুষের কাজ—স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির পক্ষে ইহা কলঙ্ক। এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়ার মত কাজ জনসাধারণ যেন কখনই না করে। এবং সম্ভবতঃ, এই আসন্ন বিপদ আরো বেশী গুরুতর। সুতরাং **জনসাধারণের সব সময়েরই কর্তব্য হইবে জাপানীদের প্রতিরোধ করা।** বৃটিশের নোট লইব, না জাপানীদের কাছ হইতে মুদ্রা লইব—এ প্রশ্ন উঠেই না। জাপানীদের কাছ হইতে আমাদের দেশের লোক কোন কিছুই লইবে না।

*　　*　　*　　*

[জাপ আক্রমণ সম্পর্কে মীরা বেনের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজি এই চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন। ১৯৪৩-এর ১৫ই অক্টোবর "বম্বে ক্রনিকেল" কাগজে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।]

সম্পাদকীয়

'জনযুদ্ধে'র নববর্ষ

পয়লা মে জনযুদ্ধের পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আজ শুধু জনযুদ্ধের নববর্ষের দিন নয়, আজ বিশ্ববাসী শ্রমিকের ঐক্য ও সমাবেশের মহোৎসবের দিন। প্রতি বৎসর এই দিনে পৃথিবীর দিকে দিকে নির্যাতিত জনগণ ঐক্য ও মুক্তির সংকল্প গ্রহণ করে।

গত চারি বৎসর রক্তাক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়া মে-দিবসের উৎসব পালিত হইয়াছে। গত চারি বৎসর ফ্যাসিস্ট দস্যুদের আঘাত প্রতিহত করিয়া দুনিয়ার জনগণ মরণপণ সংঘর্ষের ভিতর দিয়া তাহাদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

এবারকার মে দিবস আনিয়াছে নূতন আশার বাণী, নূতন বিজয়োল্লাস। সোভিয়েটের দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী রুশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিতাড়িত করিতেছে, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আজ সমাধিস্থানের দিকে ছুটিতেছে কাতারে কাতারে ফ্যাসিস্টদের মিছিল। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিবিরে জনগণের প্রভাব এবং ঐক্য আজ শতগুণ বেশী। যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, ইটালিতে এবং ফ্রান্সে জনগণের উদ্ধত অভিযান সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে হৃৎকম্প তুলিয়াছে।

কিন্তু ভারতে আরম্ভ হইয়াছে নূতন সংকট। জাপ-দস্যুর আক্রমণে আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল পর্য্যন্ত প্রতি শহর এবং প্রতি গ্রাম আজ বিপন্ন। দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃস্থ বাংলা কি করিয়া এই নূতন আঘাতের সম্মুখীন হইবে? এ ক্ষেত্রেও নববর্ষ আমাদের জন্য আনিয়াছে অভয়বাণী। আসামের রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বীরের মত শত্রুকে বাধা দিতেছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ জনগণের উদ্দেশ্যে জাপ-শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানাইয়াছেন। দেশভক্তদের মধ্যে ধীরে ধীরে এই আশা জাগিতেছে যে কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য সম্ভবপর। পয়লা মে আমাদের জন্য এই আশ্বাস আনিয়াছে যে আসাম দ্বিতীয় বর্ম্মায় পরিণত হইতে পারে না, ভারতের শতাব্দীসঞ্চিত স্বদেশপ্রেম নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেই। আজ স্বদেশের এই ঘোর সংকটে জাতীয় ঐক্যের নূতন উদ্যোগ প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। দেশভক্তগণ অগ্রসর হইয়া আসুন, আক্রমণকারীর গতিরোধের জন্য জনগণের বজ্রদৃঢ় ঐক্য গড়িয়া তুলুন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সম্মুখে আজ এক কঠোর সমস্যা—কি করিয়া ফ্যাসিস্ট জাপানের নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিব, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পথ ছাড়ে না, কি করিয়া তাহার হাত হইতে দেশ স্বাধীন করিব? ইহার উত্তর—দেশরক্ষার ভিতর দিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলুন। আজ যদি মণিপুরের পতন হয় তাহা হইলে বৃটিশ হারাইবে একখণ্ড জমি, আমরা হারাইব আমাদের দেশপ্রেম জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ও মর্য্যাদা। কিন্তু আমরা যদি এইশক্তি ও মর্য্যাদা বাঁচাইবার জন্য দেশরক্ষার পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করি এবং জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত করি, তবে আমাদের একতাবদ্ধ শক্তির কাছে ফ্যাসিস্ট জাপান পরাস্ত হইবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীও অবনত হইবে। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাপ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের শক্তি নিযুক্ত করুন, শুধু এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই আমরা ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিতে পারি।

এই পথে জয়লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া আজ এই মে-দিবসে নূতন করিয়া বিপ্লবী সংকল্প গ্রহণ করিতেছে।

'জনযুদ্ধ'কে অভিনন্দন

কংগ্রেস নেতা

জনযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আমি তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমাদের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে বাংলা দেশে 'জনযুদ্ধে'র দান অদ্বিতীয়। আমাদের মহান জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার, ঐক্য আন্দোলন ও জাপ-বিরোধী প্রচারের ভিতর দিয়া "জনযুদ্ধ" বাঙ্গালীর দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

বাংলার জাতীয় আন্দোলনে জনযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান জাপ-বিরোধী প্রচার। জাপান আমাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করার পর আবার কংগ্রেস নেতারা ভারতবাসীকে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। জাপানের সঙ্গে আমাদের কোন বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না। জাপান আমাদের শত্রু। "জনযুদ্ধ" গত দুই বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের ঐতিহ্য প্রচার করিয়া দেশের জাপ-বিরোধী মনোভাব গড়িতে সাহায্য করিয়াছে। এবং যাহারা দেশপ্রেমের সুযোগ লইয়া জাপানীদের দাসত্বকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে সাহায্য করিয়াছে।

২২-৪-৪৪　　　　জে, সি, গুপ্ত

দুই বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় সঙ্কটের মধ্যে "জনযুদ্ধ" জন্মগ্রহণ করে। গত দুই বৎসরের বিপদের মধ্যে এই পত্রিকা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিবার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া আসিতেছে। একদিকে সাম্রাজ্যের প্রাচীন শৃঙ্খল ও অপরদিকে ফ্যাশিষ্ট বন্ধনের অগ্রগতি—এই উভয়ের মাঝ হইতে জাতিকে উদ্ধার করিয়া নিজেদের দেশের গণভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের আদর্শ। আশা করি আগামী তৃতীয় বর্ষে "জনযুদ্ধ" জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিবে। ইতি

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৮ই বৈশাখ, ১৩৫১ সাল

লীগ নেতা

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদক আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর কাগজ আগামী ১লা মে তার জন্মের তৃতীয় বছরে পা দেবে। এই অবকাশে তিনি তাঁর পত্রিকা সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। সম্পাদক মিঃ বঙ্কিম মুখার্জি একজন বন্ধু ব্যক্তি—ব্যবস্থাপক সভায় ও তার বাইরে তাঁর সাথে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। সত্যিকথা বলতে গেলে তাঁর পত্রিকা নিয়মিত দেখবার আমার সুযোগ হয় না। তবে সাধারণভাবে কাগজের সাথে আমার পরিচয় আছে। এই পত্রিকা কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র, তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই দিক থেকে কিছু কিছু বিষয়ও আছে যেখানে হয়ত আমরা একমত নই। তবে দুটো কারণে 'জনযুদ্ধ'কে আমি অভিনন্দিত করি। সেই দুটি হল, 'জনযুদ্ধে'র বলিষ্ঠ খাদ্যনীতি ও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের জন্য নির্ভীক প্রচেষ্টা। আজকের দিনে খাদ্যের জন্য বাংলার সমস্ত দলকে প্রতি শহরে ও গ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা দেশের প্রধান ও প্রথম কাজ। এই দিকে 'জনযুদ্ধ' যে তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি 'জনযুদ্ধ'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৮-৪-৪৪　　　　আবুল হাশিম

শ্রমিক নেতা

আদিম বা প্রাকৃতিক যুগের অবসান কালে, মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার অল্প বিস্তর পরে, ইদানিং কাল পর্য্যন্ত, যুদ্ধ ব্যাপারটা ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুশাসনের গণ্ডীর মধ্যে। প্রায় সর্ব্বদেশেই এই কারণে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। "ক্ষত্রিয়রা" যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত জনগণ নিরাপদ শান্তিময় জীবন যাপন করেছে। বর্ণাশ্রম যুগের অবসান আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারটা ব্যাপক হোয়ে জনগণের জীবনের মধ্যে এসেছে। কতদুর ব্যাপকতা সেটা রুশিয়ার জনযুদ্ধে প্রকটিত হোয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রের রক্ষা করতে পারে জনগণ। জনশক্তি যতটা উদ্বুদ্ধ হোয়েছে ঠিক ততটাই জনযুদ্ধের ব্যাপকতার পরিমাণ। রুশিয়ার গণশক্তি আজ পূর্ণ জাগ্রত। তাই সেখানে জনযুদ্ধের বিশালতা ও শক্তিমত্তার পূর্ণ-প্রকাশ। সেই শক্তির প্রভাবে জগতের জনগণ সর্ব্বত্র আলোড়িত। জনযুদ্ধ তাদের কাছে নতুন জীবনের নতুন বার্ত্তা নিয়ে এসেছে। ভারতের জনগণ সেই বার্ত্তা শুনেছে, সুপ্ত চেতনা তাদের জাগরিত হোচ্ছে। আশাকরি "জনযুদ্ধ" সেই চেতনার পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করবে।

মৃণালকান্তি বসু

বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী

বিগত দুই বৎসর ধরিয়া 'জনযুদ্ধে'র ভেরী যাঁহারা বাজাইলেন, আনন্দের কথা তাঁহাদের দম ফুরাইয়া যায় নাই। নানা ক্ষেত্রে—সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জনশিক্ষা বিষয়ে—যত দিন যাইতেছে যুদ্ধ ততই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, ভেরী নিনাদ উচ্চ হইতে উচ্চতর, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 'জনযুদ্ধে'র কণ্ঠ জনগণের সেই দাবী পূরণ করিবার বলিষ্ঠতা উত্তরোত্তর অর্জ্জন করিয়া চলিবে, এই আশা জনকল্যাণকামিদের উল্লসিত করে।

২০-৪-৪৪　　　　শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিখ্যাত সাংবাদিক

'জনযুদ্ধ' তাহার সংগ্রামবহুল জীবনের দ্বিতীয়বর্ষ অতিক্রম করিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই 'জনযুদ্ধ' বাংলার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। জনসাধারণের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা এমনভাবে আর কোন কাগজ প্রকাশ করে না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে পীড়িত বাংলার বেদনাকে 'জনযুদ্ধ' কেবল ভাষায় প্রকাশ করে নাই, সেবা ও সান্ত্বনার বাণী অখ্যাত ও অজ্ঞাত পল্লীতেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে জাতির বাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার দাবিকেও সে জনপ্রিয় করিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে এমন একখানি নির্ভীক সংবাদ পত্রের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন 'জনযুদ্ধ' পূরণ করিয়াছে। 'জনযুদ্ধ' কৃষক ও শ্রমিকের মুখপত্র—'জনযুদ্ধ' মানুষের পীড়ন ও বন্ধন অসম্মানের বিরুদ্ধে নিরলস যোদ্ধা। জনসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ কর্ম্মীদের অক্লান্ত সেবায় 'জনযুদ্ধ' গৌরবান্বিত। 'জনযুদ্ধে'র নিয়মিত পাঠক ও অনুরাগীরূপে আমি পরিচালকগুলীকে তাহার জন্মদিনে গভীর প্রীতিজ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকাবাহী 'জনযুদ্ধ' অধিকতর জনপ্রিয় হউক, আজিকার দিনে ইহাই আমার প্রেমসহকৃত অভিনন্দন।

২৪-৪-৪৪　　　　শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

চটকলে
শ্রমিক সম্মেলন

গত ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৪ শুক্রবার, চাঁপদানী শ্রীরামপুর, রিশড়া, শিবপুর, বেলেঘাটা ও নারিকেল-ডাঙ্গা শাখার প্রতিনিধি সহযোগে ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের বাৎসরিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতের পর সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয় এবং কমরেড আবদুল মোমিন বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টখানি কোন বিশেষ সময়ের কার্য্যাবলীর হিসাব নয়, পরন্তু ইহা চটকল শ্রমিকের সমগ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার ভেতর চটকল মালিকের অবস্থান, শ্রমিকের প্রাথমিক জাগরণ, জাতীয় আন্দোলনের সহিত তাহার যোগাযোগ, বিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক সংগ্রাম, নেতৃত্ব ও সংগঠন এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার অবদান প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহার দুর্ব্বলতা ও সংশোধনের কথাও বাদ যায় নাই। এই দিক দিয়া রিপোর্টখানি মূল্যবান এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হইয়াছে।

তারপর বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় আলোচনী প্রস্তাবগুলি এক এক করিয়া পেশ করা হয়। কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ইউনিয়নের নিয়মাবলীর সংশোধন করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যথাযথভাবে তাহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবও গৃহিত হয়;— নূতন নিয়মে ইউনিয়নে সভ্যের বাৎসরিক চাঁদার হার ৷৵০ বার আনা ধার্য্য হয়।

তারপর জীবিকার মান অনুসারে পুরা মাগ্গী ভাতা, নিয়মিত কয়লা সরবরাহ, রেশনিং, শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লেবার কোর্ট, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন ও তাহার নেতৃবর্গের ঐক্য, জাতীয় নেতৃবর্গ ও ফ্যাশীবিরোধী বন্দীর মুক্তি এবং কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এবং অনিচ্ছাকৃত বেকার অবস্থার জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড শিবনাথ ব্যানার্জ্জীর মুক্তি দাবি করিয়াও প্রস্তাব গৃহিত হয়। অন্য প্রস্তাবে ভারত সরকারের শ্রমিক নীতি তথা ভারতীয় শ্রমিকের একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া সরকারের অর্থে পুষ্ট ও স্বার্থরক্ষায় সৃষ্ট ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের মিঃ যমুনা দাস মেটাকে ফিলাডেলফিয়া আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করায় তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়। জাপ আক্রমণে পঞ্চমবাহিনীর মিথ্যা প্রচার ও আত্মঘাতী কার্য্যের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং আর একটী প্রস্তাবে করপোরেশন নির্ব্বাচনে শ্রমিক কেন্দ্র হইতে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও কমরেড ইসমাইলের বিপুল জয়ে সম্মেলন অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

অতঃপর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী—সভাপতি, কমরেড শিবনাথ ব্যানার্জ্জী, নীরদ চক্রবর্ত্তী, আবদুর রেজাক খাঁ, রাজধারী সিং এবং আলী মহম্মদ—সহ-সভাপতি, কমরেড আবদুল মোমিন—জেনারেল সেক্রেটারী, কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত—অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী, কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জী—কোষাধ্যক্ষ এবং কমরেড রণেন সেন, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ি, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ চৌধুরি প্রভৃতি মোট ৪৫ জনকে লইয়া একটী শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। কমরেড সত্যেন সেনের সঙ্গীতের পর সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

ট্রামে যাতায়াতের দারুণ অসুবিধা
নাগরিকদের এই বিপদ দূর করার উপায় কি

কলিকাতা শহরের ট্রাম চলাচলে এক মহাসংকট দেখা দিয়াছে। শহরের লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে কিন্তু সে অনুপাতে গাড়ী বাড়ে নাই। সম্প্রতি ট্রাম কোম্পানীর এজেণ্ট এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, মিলিটারী লরীর সহিত সংঘর্ষে বহু গাড়ী নষ্ট হওয়ায় বিপদ আরো বাড়িয়াছে।

কিন্তু ফল হইয়াছে মারাত্মক। প্রত্যহ গাড়ীতে উঠানামা করিতে হয়রানি, গাড়ী থামানো, চেঞ্জ প্রভৃতি লইয়া কণ্ডাকটর ও ড্রাইভারদের সহিত বচসা ও মারামারি, নাগরিক জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে।

কলিকাতার নাগরিকদের এই অসুবিধার প্রতি ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড বীরেন মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে কমরেড মজুমদার 'জনযুদ্ধে'র প্রতিনিধির নিকট নিম্নরূপ বিবৃতি দেন: "ট্রাম চলাচলের অসুবিধা সম্পর্কে এজেণ্ট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। বস্তুত, এজেণ্ট সাহেব ট্রাম পরিচালনার অব্যবস্থাগুলি ঢাকিবার জন্য কেবল গাড়ীর অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন।

যাত্রীর সংখ্যা বাড়িবার ফলে গাড়ীর অভাব হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যুদ্ধের অবস্থায়ও গাড়ী মেরামত বা আগেকার ধরণের গাড়ী তৈরী করা ভারতবর্ষেও সম্ভব এবং সেই দিকে কোম্পানীর কোন নজর নাই: ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানে যত গাড়ী আছে তাহাতেও সার্ভিসের অনেক উন্নতি সম্ভব। বর্ত্তমানে যে গাড়ী আছে তাহাই যথাযথ চালু রাখার ব্যবস্থা হইতেছে কি? গাড়ী বাড়ানো না হইলেও একই গাড়ী যদি বারবার এবং সময়মত ঘুরিয়া আসে তাহা হইলেও জনসাধারণের প্রয়োজন অনেকটা মিটিতে পারে। তাহার জন্য দরকার জনসাধারণের প্রয়োজন এবং শ্রমিকদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি কার্য্যকরী 'টাইম টেবিল।' কিন্তু কোম্পানী ঠিক তাহারই বিরোধিতা করিতেছে। এতদিন ট্রাম শ্রমিকরা একে অপরের সহিত ডিউটি বদলাইয়া প্রত্যেকটি ট্রাম চালু রাখার যে সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কাজে এক আধ মিনিট দেরী হইলেও গাড়ী পাইবার যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কোম্পানী ইদানিং তাহাও কাড়িয়া লওয়ায় প্রত্যহ বহু গাড়ী ডিপোতে অচল হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত খাটুনী, প্রয়োজন অপেক্ষা কম এবং খারাপ রেশন; কম মাগ্গী ভাতা প্রভৃতির দরুণ প্রত্যহ দুই তিন শত শ্রমিক অসুস্থতার জন্য ছুটি লইতে বাধ্য হয় এবং ফলে বহু গাড়ী ডিপোতে পড়িয়া থাকে।

ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বহুবার কোম্পানীর নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়াছে, একটি কার্য্যকরী 'টাইম টেবিল' তৈরী করার জন্য যুক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে, রেশনের পরিমাণ এবং মাগ্গী ভাতা বাড়ানোর জন্য দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু কোম্পানী তাহাতে সাড়া দেয় নাই।

কোম্পানীর মুনাফালোভী মনোবৃত্তিই ইহার পথে বাধা। ঐ মনোবৃত্তির ফলে ট্রামের মান্থলী, মিড-ডে, ট্রান্সফার প্রভৃতি টিকেটের সকল সুবিধা হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে মজুরদের উপর বহু রকমের জুলুমের ফলে ট্রাম গাড়ী অচল হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আজিকার এই সংকটে শহরের গাড়ী চলাচল বন্ধ হইলে আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না; বিভেদকারীদের মহাসুযোগ উপস্থিত হইবে।

এই অবস্থার উন্নতির জন্য জনসাধারণের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দরকার। ট্রাম শ্রমিকরা ইউনিয়নের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া ট্রাম সার্ভিসের উন্নতি সাধনের প্রতিজ্ঞা লইয়াছে, জনসাধারণ এবং জাতীয় নেতারা ট্রাম শ্রমিকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেই উহা সম্ভব হইবে।"

বাহাদুর মজুর নেতা বসীরের মৃত্যু

কমরেড বসীরের বাড়ী যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর গ্রামে। ১৯২৪ সালে বসীর কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরী নেয়। তখন ট্রামের কোন

ইউনিয়ন ছিল না। কিন্তু ট্রাম ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই কমরেড বসীর ইউনিয়নের একজন উৎসাহী সভ্য হইয়া উঠেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ট্রাম ইউনিয়নের সহসভাপতি হন। তাঁর চেষ্টায় ট্রামের ট্রাফিক বিভাগের মজুররা ইউনিয়নের মধ্যে আসে।

১৯৪২ সালে পর পর ৩ দিন বিমান হানায় কলিকাতার ট্রামমজুরদের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য দেখা দিল, তখন কমরেড বসীর খাঁ দেশরক্ষার কাজে অবিচলিত থাকিবার জন্য মজুর ভাইদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পার্টি অফিসের ছাদে সেদিনকার সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কাছে কমরেড বসীরের দেশপ্রেমের আবেগময় আবেদন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কমরেড বসীর তার নিজের গ্রাম সম্বন্ধেও সমান উৎসাহী ছিল। গ্রামের জমিদার যখন গ্রামের স্কুলে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল, তখন কমরেড বসীরের নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের সাহায্যের উপর স্কুলটি দাঁড় করাইয়া রাখিল। কলিকাতায় থাকিয়াও স্কুলটি সম্বন্ধে কমরেড বসীরের আগ্রহের অন্ত ছিল না।

কমরেড বসীর শুধু ইউনিয়নের নয়, পার্টিরও একজন নেতা ছিল। পার্টির জন্য সে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কমরেড বসীরের শরীর ভাঙিয়া পড়ায়, তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে গত ১২ই এপ্রিল কমরেড বসীরের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৫ বৎসর। কমরেড বসীরকে হারাইয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিয়া তাহার স্মৃতির সম্মান রাখিব।

কিষাণ দাশগুপ্ত
কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন

শ্রমিকের হাতে মুক্তির মশাল

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ট্রামের মজুর বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য ৩০।৩৫্ টাকা করিয়া চাঁদা আদায় করে। লেক রোড মেসে তাহারা দৈনিক একশত জন নিরাশ্রয়কে খাওয়াইতে থাকে কোম্পানী শ্রমিকের এই প্রচেষ্টা দেখিয়া ১০ মণ কয়লা বিনা পয়সায় দিবার জন্য আগাইয়া আসে। ব্রুকবণ্ডের শ্রমিক বুভুক্ষুদের জন্য ৭০০্ টাকা জমা করে, কোম্পানীর কাছ হইতে আরো ৭০০্ টাকা আদায় করে। ২৮শে আগষ্ট নিজেদের রেশন হইতে মুষ্টি ভিক্ষা তুলিয়া ১০০০ নিরন্ন লোককে খাওয়ায়। পাড়ার লোক আগাইয়া আসে শ্রমিকের হাতে চাঁদা গুঁজিয়া দেয়। কাদাপাড়ার চটকল মজুর ছোট ছোট শিশুর জন্য ৩৫ সের চাল উঠায়। কাঁচড়াপাড়ায় রেলমজুর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর প্রতিদিন ৮০০ লোককে খাওয়ায়। টেক্সম্যাকোর মজুর ১৩০০ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। চাঁপদানীর মজুর ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ বিতরণের ব্যবস্থা করে। চিৎপুরের রেলমজুররা দুঃস্থদের খাওয়াইবার নিয়মিত ব্যবস্থা করিল।

খাদ্যের অভাব বাংলায় আনিয়া দিল মহামারী। শ্রমিক অগ্রসর হইল চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে। নারায়ণগঞ্জের মজুর প্রত্যেকটী মিলে ১টী করিয়া অস্থায়ী হাঁসপাতাল খুলিল। ইউনিয়ন হইতে ৩০০্ টাকা লইয়া রোগের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়।

সর্বত্র মজুর যখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রুখিতে উদ্যোগী হইল—তখনই জনসাধারণ ও সরকার সকলেই এই লড়াই জোরদার করিতে লাগিল। রিলিফের এই বিরাট কাজে বাংলার সমস্ত লোক যেন এক হইয়া দাঁড়াইল।

ডিসেম্বর হইতে মজুররা আন্দোলন শুরু করিল—জনসাধারণের খাদ্যাভাব ঘুচাইতে সর্ব্বত্র শহরে রেশনিং চাই। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্য আন্দোলনে তখন শ্রমিকরা পুরোভাগে।

আবার যখন পঞ্চমবাহিনী মাথা তুলিল

ডিসেম্বরে বোমা পড়িতে শুরু করিল। শ্রমিকরা আর কেহই পলাইবে না। ২৫-২৬শে সেপ্টেম্বর বাংলায় সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনে যে দুর্ভেদ্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা ভাঙ্গিবে কে? তাহারা উৎপাদন অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য নিজ নিজ ইউনিয়ন মজবুত করিতেছে। ইউনিয়নের মজুররা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, কে মালিকের দালাল আর কে জাপানের চর। বেলেঘাটায় এক সাধারণ মজুর পঞ্চমবাহিনীর কৌশলপূর্ণ প্রচার ধরিয়া ফেলে। যত ঘুরাইয়াই বল, তুমি নিশ্চয়ই জাপানের দালাল—ইহাই ছিল সেই মজুরটীর জবাব।

বোমা পড়িতেছে। কেহ হতাশ হইও না। কালীঘাটের মজুররা নিজেরাই গড়খাই খুঁড়িতেছে। পোর্টের মজুর এবার দুর্দ্দাম বেগে অগ্রসর। এ আর পির দাবী পূরণ কর। প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত কর। এ সব দাবী মালিক তো মানিলই। ইউনিয়নের ৫ জন মজুর নেতাকে প্রচারের জন্য বেতনসহ ছুটী মঞ্জুর করিতেও সে বাধ্য হইল।

কয়লা সংকট ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মিল কারখানা সব প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গলক্ষ্মী সূতাকল মালিক বন্ধ করিয়া দেয়। মজুররা আন্দোলন করিয়া মিল খুলায়। ঢাকার শ্রমিকরা শহরে শহরে গিয়া কয়লা সংকটের সমাধানের জন্য আন্দোলন করিতে জনসাধারণকে আহ্বান জানায়। সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়া উঠে। ঢাকা, কুষ্টিয়া, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি স্থানে মজুররা অনবরত আন্দোলন চালায়। খনি মজুরের বিরুদ্ধে মালিকের জারীজুরী ভাঙ্গিবার জন্য বাংলার বিভিন্ন মিলের শ্রমিক আগাইয়া আসে। চট্টগ্রামের চা বাগানের মজুর তাহাদের বিরাট সম্মেলনে কয়লা সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার সংকল্প গ্রহণ করে। উৎপাদন সংকট দূর কর, পঞ্চমবাহিনীর পায়ের তলার মাটী ধ্বসিয়া পড়িবে। শ্রমিকদের উৎপাদন সংগ্রাম তখন ইহাদের যম।

জনগণের রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হইবেই

৪৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতায় ট্রাম ও বাসে জাতীয় পতাকার কি সম্মান! ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভায় মজুররা যে আয়োজন করিয়াছিল—তাহা স্বাধীনতা দিবস পালনের ইতিহাসে অভিনব। কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে মজুর দেখাইয়াছে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত প্রচেষ্টা গুঁড়া হইয়া যায়। লালঝাণ্ডা তাহাদের অন্তরের বস্তু। তাহাকে তাহারা কখনই নামাইতে দিবে না। অন্য ইউনিয়নের লোক, তবুও সে লাল নিশানের জয় আনিবেই। রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক অধিকার নাকি নিরক্ষর শ্রমিক সদব্যবহার করিতে পারিবে না। কর্পোরেশনের সামান্য একটী ঘটনা প্রমাণ করে ইহা মিথ্যা। মজুরা ২০ হাজার ভোট দিয়াছে—নিরক্ষর হইলে কি হয় মাত্র ৪০০টী ভোট নাকচ হইয়াছিল, আর শিক্ষিত শ্রেণীর লোকও ভোট দিয়াছে, প্রত্যেক কেন্দ্রে হাজারে প্রায় ৫০।৬০টী বাতিল হইয়াছিল। এই মামুলী ঘটনা প্রমাণ করে একটী শ্রমিক যাহা প্রাণ দিয়া বুঝে তাহা কাজে পরিণত করিতে সে ভুলে না। যাহারা সন্দেহ দোলায় দুলিতে থাকে, যাহাদের রাজনীতির নির্দ্দিষ্ট পথ বাছাইএর ক্ষমতা নাই তাহাদের কাজেও গাফিলতি দেখা দিতে বাধ্য।

ঘটনার পর ঘটনা প্রমাণ করিতেছে দুনিয়ার শ্রমিক জনগণকে সঙ্গে লইয়া যখন বিজয় অভিযানের শেষ পালা শুরু করিয়াছে, বাংলার শ্রমিকও তখন দেশের সমস্ত জনগণের স্বার্থরক্ষার নীতিকে কাজে পরিণত করিতে দৃঢ়পদে আগুয়ান। মণিপুরে যখন ফ্যাশিস্ট শত্রু সৈন্য প্রবেশ করিতেছে—বাংলার মজুর তখন জাতীয় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এবারের মেদিবস আমাদের কাছে একটী বাণীই আনিয়া দিয়াছে—দুনিয়ায় দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জনগণ জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতের শ্রমিক তুমিও পিছাইয়া নাই। তোমার রাজনীতি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, দেশরক্ষার জন্য সমস্ত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা—এই নীতি আজ সমস্ত দেশপ্রেমিক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার শ্রমিক তোমার চরম পরীক্ষা। জনগণ যে পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে সে পথের তুমিই অগ্রদূত। বিপ্লবী অগ্রদূতের দায়িত্ব প্রচণ্ড। নিরলস পরিশ্রমে তোমার দায়িত্ব পালন কর। তোমার বীর পদক্ষেপ জনগণের দুর্ভেদ্য ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করিবে। শত্রু সৈন্য বাংলা ও আসামের মাটীতেই কবর পাইবে। বাংলার শ্রমিক ভারতের দুয়ার হইতে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দেশকে বাঁচাও। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই চরম দিনে শ্রমিক তাহার কর্তব্য পালনে দৃঢ় থাক—মেদিবসের ইহাই ডাক।

সরোজ মুখার্জ্জি

● মাধ্যমিক শিক্ষাবিল ●

বিলের মূল গলদ

বঙ্গীয় আইন সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া এক নূতন সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। যে বিলটি আইন সভায় হাজির করা হইয়াছে তাহার ভূমিকায় পরিষ্কার বলা হইয়াছে, মাধ্যমিক শিক্ষা আর বিস্তার করা হইবে না, ইহাকে আরো সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। "গত ৩০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষাবিস্তার অতি দ্রুত গতিতে লয়াছে।" তাই লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী এই বিল পাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসারের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চান। এই বিলে আছে:

(১) ৫৩ জন সভ্যকে লইয়া একটী বোর্ড গঠন করা হইবে। (২) ইঁহাদের মধ্যে ২১ জন সরকারী কর্মচারী বা সরকারের মনোনীত সভ্য থাকিবেন। (৩) পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ইউনিভার্সিটী, স্কুল ও পরিষদের দ্বারা ৩০ জন সভ্য নির্বাচিত হইবেন (৪) বাকী ২ জন সভ্য বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হইবেন। (৫) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সর্ব-বিষয়ে এই বোর্ডের পুরাপুরি কর্তৃত্ব থাকিবে। (৬) বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

বর্তমানে কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটীর অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক বেশী স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আছে। আর এই বিল পাশ হওয়ার পর ছয় জন নির্বাচিত সভ্যকে সরকারী সদস্যরা দলে টানিতে পারিলেই সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। শিক্ষায়তনের প্রতিনিধিদের—তাঁরা হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন—কোন কথাই খাটিবে না।

এক কথায়, এই বিলের ফলে শুধু যে শিক্ষাব্যবস্থার উপর কড়া সরকারী লাগাম বসিল তাহাই নহে, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারী প্রতিনিধিদের একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতে থাকিবে। ছাত্র ও যুবকদের সর্ব ব্যাপারে আমলাতন্ত্রই হইবে কর্ণধার।

লীগ নেতারা কি চান

ইহা সত্য যে বাংলা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম শিক্ষাব্রতীদের বিশেষ কোন হাত নাই। তাঁহারা মনে করেন: মুসলমান বালকবালিকার শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের অধিকার মোটেই নাই। যেমন কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ২৪৫ জন অধ্যাপক ও লেকচারারের মধ্যে মাত্র ১৫ জন মুসলমান। এই নূতন বিলে বোর্ডের ৫৩ জন সভ্যের মধ্যে ২২ জন মুসলমান, ২৩ জন হিন্দু ও ৮ জন অন্যান্য সদস্য থাকিবেন।

লীগের সংবাদপত্রগুলি এই বিলকে প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দিত করিতেছেন। তাঁহারা মুসলিম জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন বোর্ডের ভিতর মুসলমান সদস্য সংখ্যায় অনেক হইবে, অতএব মুসলমানদের শিক্ষা ব্যাপারে এইবার যথেষ্ট অধিকার পাওয়া গেল। তাঁহারা কিন্তু অসল কথাটি চাপিয়া রাখিতেছেন যে, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক অধিকাংশ সভ্য সরকারী কর্মচারী বা সরকারের মনোনীত ব্যক্তিই হইবেন। ইহাতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলেও মুসলমানদের কোন লাভ হইবে না কারণ সত্যকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আমলাদের হাতে। আমলারা শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃত্ব করিতে থাকিবে এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলমান শিক্ষাব্রতীদের ও মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাঁহাদেরই তাঁবে থাকিতে বাধ্য হইবেন—এ কথাটি লীগ মন্ত্রিত্ব ও লীগ-পত্রিকাগুলি জনসাধারণের নিকট চাপিয়া রাখিতেছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কি চান

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও লীগ বিরোধী অন্যান্য নেতারা এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল অভিযান চালাইতেছেন। ইঁহাদের বিরোধিতার সব চেয়ে বড় কথা হইল পৃথক নির্বাচন। কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটী, মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ পৃথক নির্বাচনের পদ্ধতিতে সভ্য নির্বাচিত করিবেন।

অতএব বিরোধীদের মতে এই বিল সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ। ১,৮০০ মাধ্যমিক স্কুলে ৪০,০০০ শিক্ষকের অধিকাংশই হইল হিন্দু; বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থায় হিন্দুদেরই বেশী অবদান। অথচ মুসলমানরা বোর্ডের ভিতর এত বেশী সদস্য পাইবে? তাঁহাদের কথা, পৃথক নির্বাচনের ভিতর দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্র একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পৃথক নির্বাচন মানিয়া না লওয়ার অর্থ মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য করা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিক্ষাব্রতীদের ভেতর অধিকাংশই হিন্দু, সুতরাং যুক্ত নির্বাচনে রিজার্ভ সিট থাকিলেও মুসলমানরা তাহাদের নিজস্ব মুসলিম প্রতিনিধি পাইবে না।

পৃথক নির্বাচন গণতন্ত্রবিরোধী কেন হইবে? আজ মুসলমান জনগণের ভিতর বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে, শুধু মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করিলে প্রতিক্রিয়াশীলেরা নির্বাচিত হইবে একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা শিক্ষা বোর্ডের গণতন্ত্র ব্যাহত করে না। গণতন্ত্র ব্যাহত করিয়াছে সরকারী আমলাদের কর্তৃত্ব।

আসল কথা কি

হক নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিত্বের আমলে ১৯৪০ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তোলা হয়। সে সময় ছাত্র আন্দোলন জোর চলিতেছিল। আমলাতন্ত্র ছাত্রদের উপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালাইতেছিল। শিক্ষায়তনের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ছাত্র শিক্ষকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করাই ছিল আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিবাদ উঠায় তাহা তখন স্থগিত থাকে। তারপর দ্বিতীয় বার হক মন্ত্রিত্বের আমলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত আপোষে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া বিল আনা হয়। মন্ত্রিত্ব সংকটের ফলে তাহাও আবার চাপা পড়িয়া যায়।

বর্তমানে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীমণ্ডলী মজুতদারদের স্বার্থে খাদ্যনীতি চালাইতেছেন। তাহার ফলে বাংলায় হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের জ্বালায় ছটফট করিতেছে। লীগ মন্ত্রিত্বও মুসলমান জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যের এই মূল প্রশ্নকে ঢাকা দিবার জন্য 'মুসলমানদের জন্য কিছু করিলাম' এই ভাঁওতায় মুসলমান দেশভক্ত ও জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টাই হইল এই বিলের উদ্দেশ্য।

বিলের মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার ধ্বংস সম্বন্ধে কোন কথা নাই। বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টা এই বিলে নাই। মন্ত্রীরা এই বিলের সাহায্যে আমলাতন্ত্রের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরাপুরি ঠেলিয়া দিয়া মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষোন্নতির আগ্রহ মিটাইবেন ভাবিতেছেন। ঠিক এদিকে তেমনি আবার বিরোধী দল শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ন্যায় বিচার করিয়া পৃথক নির্বাচন মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। মাঝখান হইতে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের পুরাপুরি কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া বহুদিনের আশা মিটাইয়া লইতে চায়। ছাত্র ও শিক্ষকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না—তাহারা যেন দেশপ্রেমের ধ্বজা তুলিতে না পারে—ইহাই হইল শিক্ষা-বোর্ডের মধ্যে সরকারী সদস্যদের দলভারী করার উদ্দেশ্য।

সকলের ঐক্য চাই

শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই চরম আঘাত রুখিতে লীগ আর বিরোধী দল একত্রে আন্দোলন করিতেছেন না। শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লীগ বিরোধীদল এবং কংগ্রেসের দেশভক্তরা অনায়াসে মিলিতে পারেন। বাংলার বিরুদ্ধে চারিদিকে ষড়যন্ত্র—জাপানের আক্রমণ, মজুতকারীর খাদ্য চুরি আর আমলাতন্ত্রের স্বার্থান্ধ নীতি। ইহার বিরুদ্ধে সকলে এক হউন। শিক্ষার ব্যবস্থায় লীগ আমলাতন্ত্রের সহিত মিলিলে বাংলার দুঃখ আরো বাড়িবে। শিক্ষাবিল লইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের সহিত একসঙ্গে আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে না লড়িয়া লীগের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ করিলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্র তো প্রতিষ্ঠিত হইবেই না—হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের নিকৃষ্ট দাসে পরিণত হইবে। এ পথে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হইবে, বাঙ্গালী এক হইতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমান শিক্ষাব্রতীরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুন—শিক্ষাবোর্ডে সরকারের কর্তৃত্ব রাখিতে পারিবে না, পৃথক নির্বাচনের সাহায্যে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্য দাবী দিলে আমাদের কাহারও কোন ক্ষতি নাই।

আজ হিন্দু ও মুসলমান একযোগে যাহাতে স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে পারেন তাহার জন্য মিলিত হউন। আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত এমন একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করুন যাহা মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। লীগ, কংগ্রেস ও মহাসভা এজন্য মিলিত বৈঠক আহ্বান করুন।

আসামে এক সপ্তাহ

নিখিল চক্রবর্তী

আসামে আজ যুদ্ধক্ষেত্র। এক মাস হল জাপানীরা ভারতের সীমানা পার হয়ে মণিপুরে প্রবেশ করেছে। যুদ্ধের এই আশু বিপদে সেখানকার অবস্থা দেখতে সপ্তাহ খানেকের জন্য আসামে যাই।

দেশরক্ষায় কংগ্রেসের ডাক

আসামের কংগ্রেস কর্মীরা আজ তাঁদের কর্তব্য ভুলে যায় নি। গৌহাটিতে গিয়ে প্রথমেই দেখা করি আসামের কংগ্রেস নেতা, ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলৈর সঙ্গে। দেখলাম জাপানী আক্রমণে তিনি খুবই চিন্তিত, কিন্তু তিনি মোটেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েননি। খাঁটি কংগ্রেসসেবী হিসাবে তিনি জানেন যে দেশকে বাঁচাতেই হবে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে। তিনি আমাকে বলেন ১৯৪২ সালে যখন জাপানীরা বর্মা দখল করে আসামের সীমানায় এসে পড়ে তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আসামে এসে দেশরক্ষার ডাক দেন। বিপুল উৎসাহের সঙ্গে দেশবাসী তাতে সাড়া দেয় এবং গ্রামে গ্রামে "শান্তি-সেনা"র বাহিনী শুধু আতঙ্ক বন্ধ করে না প্রতিরোধের জন্যও সকলকে প্রস্তুত করে। আজ সরকারী কড়া হুকুমে "শান্তি সেনা" বে আইনী। দেখলাম বরদলৈ আজ আবার আসামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত, অথচ আজ তাঁদের মতো দেশের নেতাদের নির্বোধ আমলাতন্ত্র আটক করে রেখে দিয়েছে।

শ্রীহট্টের কংগ্রেস নেতা, আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসও পরিষ্কারভাবে বললেন যে দেশের সঙ্কট মুহূর্তে আপন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ভুলে দেশকে বাঁচাবার কাজে প্রত্যেককে ব্রতী হতে হবে। শ্রীহট্টের কংগ্রেসী পত্রিকা 'জনশক্তি' দেশরক্ষার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দিয়েছে। আমি যখন গৌহাটিতে ছিলাম তখন কংগ্রেসকর্মীরা একত্রিত হয়ে দেশরক্ষার জন্য নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। কলিকাতায় আটকবন্দী অবস্থায় আসাম কংগ্রেস পার্টির ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দও শ্রীযুক্ত বরদলৈকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন।

অপদার্থ আমলাতন্ত্রের বাধা

কিন্তু, দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তেও আমলাতন্ত্রের নির্বুদ্ধিতা দেশরক্ষার কাজে বাধা দিচ্ছে। মণিপুরের জন-নেতা শ্রীযুক্ত ইরাবত সিংকে এখনও মণিপুরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দশজন সহকর্মীকে সরকার কাছাড়ে গ্রেপ্তার করেছে। কামউনিস্ট পার্টি কিছুদিন আগে জাপ-বিরোধী দিবস পালনের জন্য বিভিন্ন জেলায় তার পাঠায়। সরকারী সেন্সর সেই তার প্রেরণ করতে দেয় নাই। মণিপুরের "প্রজামণ্ডল" আজ পার্বত্য জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র সক্রিয়ভাবে জনগণকে জাগিয়ে দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছে—অথচ আমলাতন্ত্রের আক্রমণ ঠিক এই সংগঠনের উপরই সবচেয়ে বেশী পড়েছে। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণের কথা বড় গলায় বলা হয় অথচ শ্রীযুক্ত বরদলৈ, ইরাবত সিং-এর মত দেশনেতাদের মুক্তির মূল্য যে দশটা খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভের চেয়ে কম নয় একথা আমলাতন্ত্রের মাথায় ঢোকে না।

মুসলীম লীগের কোন পথ?

আসামে সাদুল্লা মন্ত্রীমণ্ডলী গদিতে বসে, কিন্তু আসল কর্তা হল আমলাতন্ত্র। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য-সঙ্কটে জনগণের উপর নির্ভর করতে সাহস পান নি। তাই যদিও আসাম বাড়তি প্রদেশ তবু সেখানে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। দেশরক্ষার জন্য যারা আগুয়ান তাদের উপর থেকে কড়া নজর তুলতেও আসামের মন্ত্রী মণ্ডলী অক্ষম। অন্য যে কোনও প্রদেশের তুলনায়, আসামে ব্যক্তি স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। সভা সমিতি করবার সুযোগটুকু পর্যন্ত মন্ত্রীমণ্ডলী আনতে পারেন নি।

আসামের এই তাঁবেদারী মন্ত্রীমণ্ডলী লীগের নাম ডুবিয়ে দিচ্ছে। আজ তাই লীগের মধ্যেও মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এবারকার লীগ কাউন্সিলে প্রধান মন্ত্রী সাদুল্লার স্থানে **আব্দুল বারি** এম্. এল্. এ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আমার আসামে উপস্থিতিকালে বরপেটাতে লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সেখানে চৌধুরী খালিকুজ্জামান যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণার উল্লেখ ক'রে কংগ্রেস ও লীগের মিলিত চেষ্টায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেন। এই সম্মেলনে ৭৫,০০০ হাজার মুসলমানের গণ-সমাবেশ হয়। কিন্তু, এইখানেই লীগ নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আসামের আশু বিপদ, জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে কোনও রকম নির্দেশ বা দেশপ্রেমিক ডাক সেই সম্মেলন থেকে আসেনি।

একমাত্র পথ

বরদলৈ যে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, লীগের নেতাদের তাতে যোগদান করা উচিত। তাহলেই মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমলাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে লীগকে সবল করা চলবে, এবং কংগ্রেস ও লীগের মিলিত চেষ্টায় আসামে আতঙ্ক বন্ধ করা যাবে, পঞ্চমবাহিনীকে ব্যর্থ করে জাপানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে সচল করা সম্ভব হবে। এক সপ্তাহ আসাম ঘুরে আমার অভিজ্ঞতাও বলছে যে এ' করা শুধু সম্ভব নয়, আসাম থেকে জাপানীদের শীঘ্র হটাতে হলে এ' ছাড়া অন্য গতি নাই।

কলিকাতার এ, আর, পি-কে বাঁচাও

কলিকাতার এ, আর, পি সংগঠনের উপর আবার নূতন করিয়া আঘাত শুরু হইল। জাপানী বোমা পড়ার সম্ভাবনা আজ যখন সবচেয়ে বেশী, কর্তৃপক্ষ ঠিক সেই সময়টিকেই আক্রমণের জন্য বাছিয়া লইয়াছেন, ইহা খুবই বিস্ময়ের কথা।

দেশের অর্থ-সংকটের ফলে এ, আর, পি-র কিছু কিছু কর্মী বেশী বেতনের তাগিদে যখন অন্যত্র কাজ খুঁজিতে ব্যস্ত, সেই সময় কয়েকজন দেশপ্রেমিক এ, আর, পি কর্মী সমস্ত কর্মীকে এ, আর, পি-র কাজে লাগিয়া থাকিতে আহ্বান জানান। তাঁহারা এ, আর, পি সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কর্মীদের একটি এসোসিয়েশনে সংঘবদ্ধ করেন। বড় বাজার সাব-এরিয়ার কর্মী কালীপদ চৌধুরী ছিলেন তাহাদের মধ্যে, এসোসিয়েশনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক।

এই এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে স্যার নাজিমুদ্দিন, কনট্রোলার অফিসর ইন চার্জ্জ প্রভৃতির নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার বহু নাগরিক ইহাকে অভিনন্দন জানান। এসোসিয়েশন যাহাতে সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় তাহার জন্য প্রত্যেক পোষ্ট হইতে কনট্রোলারের নিকট চিঠি পাঠানো হয়। ঠিক এই সময়ে গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতার প্রাক্তন গোয়েন্দা নেতা এবং বর্তমান ও, সি, রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখার্জী কালীপদ চৌধুরীকে অত্যন্ত মামুলী কারণ দেখাইয়া এ, আর, পি-র কাজ হইতে বরখাস্ত করেন।

কংগ্রেস নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল আইন সভার বাজেট বক্তৃতার সময় এ, আর, পি-র দিকে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। জাপ আক্রমণের মুখে এ, আর, পি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য এক শ্রেণীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী যে ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে খুবই আশঙ্কার কথা। এই ব্যাপারে জনসাধারণের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার। যাহারা সারা জীবন দেশপ্রেমিকদের লাঞ্ছনা দিতে আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহাদের কাছে যে কোন রকমের দেশপ্রেমিক কর্মোদ্যম অসহ্য। তাই, যে এ, আর, পি, কর্মী গত বোমার সময় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বড় বাজারের নাগরিকদের সেবা করিয়াছে, আতঙ্ক দূর করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের সময় নিরাশ্রয়দের জন্য অন্নসত্র খুলিয়াছে, কাজ ছাড়িয়া পলায়নের বিরুদ্ধে লড়িয়া এ, আর, পি-কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে বরখাস্ত করিলে কেবল জাপানী দুষমণের পথই পরিষ্কার করা হয়। দিকে দিকে ইহার প্রতিবাদ ধ্বনিত হোক, কালী চৌধুরীকে কাজে পুনর্বহাল করার দাবী ধ্বনিত হোক।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৪ সালের মে-দিবসের মেনিফেষ্টো

দাম—এক আনা

স্থানীয় কর্মীদের নিকট চাহিলেই পাইবেন

ফ্রণ্টের খবর

আসাম-মণিপুর সীমান্ত

বিষেণপুরের পশ্চিমে শিলচরের রাস্তার যে অংশ জাপানীরা দখল করিয়াছিল মিত্রসৈন্য সেখান হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছে। মগাং উপত্যকায় প্রধান রাস্তার উপর বরাজুপ শহরটীও চীনা সৈন্যরা দখল করিয়াছে, কোহিমা ও ডিমাপুরের পথ কিছুটা জাপানীদের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারায় কোহিমা অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্যদের সঙ্গে মিত্র সৈন্যদলের আবার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। তবে কোহিমার উপর শত্রু সৈন্যের চাপ বেশী পড়িতেছে। মিত্রসৈন্য একস্থানে ইম্ফলের ত্রিশ মাইল নিকটে পৌছিয়াছে। ইম্ফল রণক্ষেত্রের উত্তর দিকে জাপানীরা আর বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না—এখন আক্রমণোদ্যোগ মিত্র-শক্তির চতুর্দ্দশ বাহিনীর হাতে আসিয়াছে। উখরুল সড়ক ধরিয়া মিত্রসৈন্য আগাইয়া চলিতেছে এবং বিষেণপুরের পশ্চিমে জাপানীদের সঙ্গে মিত্রসৈন্যের লড়াই চলিতেছে। তবে কোহিমা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য খবর নাই। "অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শত্রুসৈন্যদের খেদানো হইতেছে"—এই ধরণের সংবাদই এই কয়দিন আসিতেছে।

সোভিয়েট রণক্ষেত্র

গত ১৮ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, লাল ফৌজ সেবাস্তোপোলের দুর্গে যাইবার বাউডর সড়ক অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। এবং অপরদিকে জার্ম্মানরা কিশিনেভ রক্ষা করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। পরের দিনে খবর আসিয়াছে যে লাল ফৌজ বালাক্লাভা দখল করিয়াছে। এবং বাউডর সড়কের মধ্য দিয়া সেবাস্তোপোলের পথে যাত্রা করিয়াছে। সেবাস্তোপোলকে ঘিরিয়া দশ মাইল জায়গায় লালফৌজ জার্ম্মানদের বেড়াজালে ফেলিয়াছে। লালফৌজ কেবল বন্দর লইয়াই এবার ক্ষান্ত হইবে না, সেবাস্তোপোলে অবস্থিত সমস্ত জার্ম্মান সৈন্যদের তাহারা এক একটি করিয়া বন্দী করিবে। কৃষ্ণসাগরের পথে পলায়মান জার্ম্মান সৈন্যদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য তাই জলের মধ্যে ডুবন্ত বোমা পাতা হইয়াছে এবং সোভিয়েট বিমানবাহিনী দিবারাত্র জলের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে, জার্ম্মানদের ছোট বড় নৌকা জাহাজ ও বিমানবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিতেছে। লালফৌজ সেবাস্তোপোলের জার্ম্মাণ আত্মরক্ষা ব্যূহের প্রথম সারি ভেদ করিয়াছে। দুর্গের প্রাচীরে প্রাচীরে লাল ফৌজের কামান পাতা হইতেছে—এবং সেই সব কামান হইতে জ্বলন্ত সীসা নাৎসী-দস্যুদের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মানদের তাই উৎসুক দৃষ্টি, কৃষ্ণসাগরের পথে কন্সটান্‌জা। কিন্তু সোভিয়েট বিমান বাহিনীর অবিরত আক্রমণে কৃষ্ণসাগরের অতল অন্ধকারে হিটলারী দানবের দল ডুবিয়া মরিতেছে। নার্ভা, ষ্টানিস্লাভ ও কিশিনেভ অঞ্চলে জার্ম্মানরা প্রত্যাক্রমণ করিয়া নিজেদের বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। ঢেউ-এর পর ঢেউ জার্ম্মান ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী মার্শাল জুকভের বাহিনীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে চায় কিন্তু লাল গোলন্দাজের অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের ধান কাটার মত অবস্থা হইতেছে। পালাইবার আগে বাহ্যিক বাধা দিবার এই চেষ্টায় সেবাস্তোপোল ও কিশিনেভ এই দুই অঞ্চলেই জার্ম্মানদের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

জনযুদ্ধের আগামী সংখ্যা
১০ই মে বাহির হইবে।
—ম্যানেজার

নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির
দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন
বরিশাল শহরে

৩রা মে—প্রদর্শনী উদ্বোধন
৪ঠা ও ৫ই মে—প্রতিনিধিদের বৈঠক
৬ই মে—প্রকাশ্য অধিবেশন
৭ইমে—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৮ই মে—নবনির্বাচিত কাউন্সিলের অধিবেশন।

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস
অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী

মে দিবসের বাণী

প্রায় ৫৪ বছর আগে এই পয়লা মে-র দিনে পৃথিবীর এক কোনে মজুরেরা জমা হয়েছিল। আমেরিকার হে মার্কেটে দাঁড়িয়ে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরশ্রেণী দাবী উঠিয়েছিল – আমাদের আট ঘণ্টার বেশী খাটানো চলবে না, ভালভাবে বেঁচে থাকবার উপযোগী মজুরী দিতে হবে, মানুষের অধিকারে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হব। সেদিন অত্যাচারী মালিক আর ধনবাদী সরকার তাদের ওপরে গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু মজুরশ্রেণী তাতে টলেনি। নিহত শহীদ ভাইদের রক্ত তাদের যে পতাকায় গভীর লাল রং এঁকে দিল সেই লাল নিশানকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরে তারা কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল—দুনিয়ার সমস্ত মজুর আমরা এক হয়ে লড়াই করব, আমাদের দাবী আদায় করব, আর অত্যাচারী ধনবাদের প্রভুত্বকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাইয়েদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

তারপর দুনিয়ার দিকে দুরন্ত বন্যার মত লাল ঝাণ্ডা অগ্রসর হ'ল। কত নতুন শহীদের নির্ভীক মৃত্যু সে ঝাণ্ডাকে নতুন সম্মান এনে দিল, দেশে দেশে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ সোভিয়েট ভূমিতে তারা মালিক শ্রেণীর সমস্ত প্রভুত্ব চুরমার করে দিয়ে শ্রমিকের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করল। ভারতের মত পশ্চাদ্‌পদ দেশেও সে গর্জন প্রতিধ্বনিত হ'ল, মজুরেরা একত্র হয়ে তাদের সর্ব-ভারতীয় সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করল, রাজনীতিতে যারা অগ্রসর তারা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা ওড়াল, নিত্য নতুন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রমাণ হ'ল যে ভারতের রাজনীতিতে মজুরশ্রেণীর দান কারো চেয়ে কম নয়।

পৃথিবীর মজুরদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। ৫৪ বছর আগে পৃথিবীর এক কোনে যে মালিকশ্রেণী একদিন মজুরের রক্ত ছড়িয়েছিল, দুরন্ত লোভ আর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বাহক সেই মালিকশ্রেণীই আজ পৃথিবীর দিকে দিকে রক্ত আর আগুনের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদীদের সব চেয়ে ভয়াবহ ও জঘন্য অংশ ফ্যাশিজম মজুর শ্রেণীর দুর্গ সোভিয়েটভূমিকেই আক্রমণ করেছে, দেশে দেশে সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকারকেই তারা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দুনিয়ার মজুরশ্রেণীও আজ জাগ্রত চেতনা, বর্দ্ধিত বিক্রম আর গভীরতর অভিজ্ঞতার শক্তিতে দুর্জয়। তাই পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষের মহড়ায় দাঁড়িয়ে তারা ফ্যাশিজমের অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের নেতা সোভিয়েটের মজুর শ্রেণীর অমর আদর্শ আর মৃত্যুহীন সংগ্রাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে উদ্দীপিত করছে। সোভিয়েটের প্রবল পরাক্রমের কাছে ফ্যাশিজম আর দুনিয়ার সমস্ত মালিকশ্রেণীর অভিসন্ধি পদে পদে পরাজয় মানছে।

আজকে যখন নতুন বছরের ১লা মে এল, তখন আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে ক্ষতবিক্ষত। মালিকশ্রেণী আর সরকার উৎপাদন বাড়ানোর পথে পদে পদে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কয়লার সঙ্কটে কারখানায় কাজের ক্ষতি হচ্ছে। মজুরদের উপযুক্ত মাগগিভাতা নেই, যথেষ্ট রসদের বন্দোবস্ত নেই, বোমা থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা উন্নত করবার কোন চেষ্টা নেই। তাদের সভা, মিছিল ও সংগঠনের অধিকার পর্য্যন্ত অনেকখানি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার ওপরে এসেছে জাপানী ফ্যাশিস্ট দস্যুদের আক্রমণ। বাইরের শত্রু আজ আমাদের ভারতের স্বর্ণভূমিতে ঢুকে পড়েছে, এক শৃঙ্খল থেকে আর এক শৃঙ্খলের বন্ধনে পড়বার আশঙ্কা আজ দেশের সবার সামনে প্রত্যক্ষ। অথচ এমন দিনে মজুরশ্রেণী আর দেশবাসী দেশরক্ষার অধিকাংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত, দেশের নেতারা কারারুদ্ধ, দেশবাসীর প্রতি দমননীতিই সরকারের একমাত্র রাজনীতি।

কিন্তু ভারতের মজুরশ্রেণী যে সংগ্রামে মানুষ হয়েছে, সোভিয়েট আর পৃথিবীর সমস্ত মজুর-শ্রেণী তাকে যে সমর্থন ও শিক্ষা দিয়েছে তার থেকে সে ভাল করেই জানে যে অধিকার থাক বা না থাক ফ্যাশিজমের অভিশাপকে পরাস্ত করতেই হবে, নইলে সমস্ত অধিকারই চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাবে। জাতীয় রাজনীতিরও শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা বহন করবার গৌরব আজ ভারতের মজুর শ্রেণীরই, তাই সে জানে যে এদেশ আমার। ফ্যাশিস্ট আক্রমণ থেকে এদেশকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ও শক্তি শুধু আমাদেরই আছে, আর সেই রক্ষার পথে দেশের সমস্ত শক্তি ও সমস্ত দেশভক্ত একত্র হলে স্বাধীনতার অধিকার পর্য্যন্ত আমরা দখল করতে পারব। অল্প হোক, বেশী হোক এই পূর্ণ রাজনীতিক চেতনা ও খাঁটি দেশাত্মবোধ আছে বলেই শত্রুর বোমার আক্রমণের সামনেও ভারতের মজুরশ্রেণী উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে, দেশদ্রোহীদের প্ররোচনা বা দুর্ভিক্ষ মহামারীর দুঃসহ কষ্টও তাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করতে পারেনি, পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবী মজুরের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়বার গৌরব সে অর্জন করেছে।

শুধুমাত্র নিজেদের একতা ও শক্তিতে স্বাধীন হওয়া যায়—ভারতে স্বাধীনতার এই অমোঘ আদর্শকে গত দু বছর ধরে প্রধানত শুধু মজুর শ্রেণীই অম্লান করে তুলে ধরে রেখেছিল। তাদের নির্ভীক সংগ্রাম আর জাপানী দাসত্বের বাস্তব আক্রমণ দেশবাসীর মনেও আজ পরিবর্ত্তন আনছে। নেতার পর নেতা আজ ঘোষণা করছেন—অধিকার থাক বা না থাক জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলে একত্র হও।

এবারকার মে দিবসের এই একমাত্র বাণী। ক্ষুদ্র স্বার্থশূন্য যে বিরাট রাজনীতিক চেতনায় সহস্র কুৎসা ও অধিকারহীনতাকে উপেক্ষা করে ভারতের মজুরশ্রেণী গত দু বছর ধ'রে এই বাণীকে জাগিয়ে রেখেছে, সেই মজুর শ্রেণী আজ দৃঢ় পদক্ষেপে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হোক। দেশের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন তা এখনও অতি ক্ষীণ, এখনো সংশয়ে পরিপূর্ণ। মজুর শ্রেণী আজ অগ্রসর হোক, দেশবাসীর ঘরে ঘরে এই বাণীকে জাগিয়ে তুলুক, নিজের বলিষ্ঠ চেতনা ও বিশ্বাস দিয়ে দুর্বল ও সংশয়াকুলকে বিশ্বাস এনে দিক, দেশবাসীকে সংগ্রামে একত্র করুক—আমাদের সমস্ত অধিকার আমরা অর্জন করবই।

সোমনাথ লাহিড়ী

বোম্বে-র বিস্ফোরণ

বাংলার সাহায্য দান

গত ১০ই এপ্রিল বৈকাল ৪টায় বোম্বাইএর ডকে এক বিস্ফোরণ হয়। শুর শ্রীবাস্তবের মতে এই বিস্ফোরণের ফলে ৫৫ হাজার টন খাদ্য শস্য ধ্বংস হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর ৫০টী স্কুলের দালানের ক্ষতি হইয়াছে, কয়েকটী স্কুল সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছে। ৩৩৬ জনের মৃত্যু ও ১৭৯৮ জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সহরের এত বড় অগ্নিকাণ্ডের বিপদ এক রাত্রির মধ্যে বোম্বাইএর বিভিন্ন রিলিফ সংগঠনকে আগুন নেভানো, আতংক দূর করা প্রভৃতি কাজে টানিয়া আনিল। মুসলীম লীগের ভলাণ্টিয়াররা দলে দলে মিটিং করিয়া জনসাধারণের আতংক দূর করে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার স্কোয়াড একদিনে শ্রমিকের মধ্যে ২৯৮টী সভা করিয়া আতংক ও স্ট্রাইকের মনোভাব দূর করে।

অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসের বিরুদ্ধে রিলিফ কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত সৈন্যদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য পরিলক্ষিত হয়—সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মনোভাব কাটিয়া যাইতেছে।

বোম্বাইএর বিপদে সাহায্যের জন্য কলিকাতার মেয়র তাহার ফাণ্ড হইতে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। পিপ্‌লস্‌ রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল এক হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পাঠান হইতেছে।

বোম্বাই-তে বাংলার ভুখা নৃত্য

সম্প্রতি বোম্বাই-তে মাদাম ওয়াডিয়ার গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সমক্ষে বাংলাদেশের কালচারাল স্কোয়াড 'মায় ভুখা হুঁ' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে। কমরেড উষা দত্তের নৃত্যে সকলে খুবই মুগ্ধ হন। সভাগৃহে স্টেজ অথবা আলোকক্ষেপের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার এই নৃত্যরূপ দেখিয়া দর্শকেরা অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তৎক্ষণাৎ বাংলার সাহায্যে ১ শত টাকা দান করেন। শ্রীযুত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই নৃত্য দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি ঐ স্কোয়াডকে যুক্তপ্রদেশে বাংলার জন্য সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানাইলেন। নেপালের রাণী সভাস্থলেই ১,০০১৲ টাকা দান করিলেন।

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস-'সোস্যালিস্ট' মেয়র মিঃ মাসানিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্তব্ধতার ভাব। দর্শকদের চোখের সামনে দুর্গত বাংলার মর্ম্মস্পর্শী ছবি। কিন্তু মিঃ মাসানির হৃদয়বৃত্তির বালাই নাই। তিনি সমস্তক্ষণ দিব্যি হি-হি করিয়া হাসিতেছিলেন।

সীমান্তের চিঠি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে ভুলিনি আমি
তুমি যেন ভুলোনা আমায়।
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।

পর্বত দাঁড়ায় পাশে,
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ ;
—এখানে প্রস্তুত আমি,
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ।

তোমরা অক্লান্ত কর্মী মাঠে মাঠে,
তোমাদের হাতের ফসল
ক্ষুধিত মজ্জায় মেশে—
আমাদের বাড়ায় কদম।
শত্রুর শিবিরে হানি
তোমার হাতের বজ্র।

শৃংখল-ভাঙার ডাক দিকে দিকে
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।
শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি :
দিতে হবে জীবন দক্ষিণা।

আমলাতন্ত্র এখনও অন্ধ

আসাম সীমান্তে

রেলমজুর নেতার মুক্তি চাই

আসাম সীমান্ত হইতে খবর আসিয়াছে যে, বি এণ্ড এ রেলওয়ে মজুর ইউনিয়নের লামডিং শাখার সেক্রেটারী ও আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারী কমরেড কালিপ্রসন্ন দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খবরটি খুবই বিস্ময়কর। আজ যখন জাপদস্যুরা মণিপুর রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ইম্ফল কোহিমা পথে যখন প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে যখন বি এণ্ড এ রেলপথ বিপন্ন হইতে পারে, তখনইতো সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন রেল মজুরদের সংঘবদ্ধ করা ও দেশপ্রীতিতে উৎসাহিত করিয়া রেল চালু রাখা। কমরেড কালীপ্রসন্ন তাহাই করিতেছিলেন। তাঁহার গ্রেপ্তারে মজুরদের ভিতর হতাশা ও বিক্ষোভ বাড়িবে, পঞ্চমবাহিনী ইহার সুযোগ নিবে। আসাম রেলপথ রক্ষার জন্য এই মুহূর্ত্তে তাঁহার মুক্তি চাই।

বি এণ্ড এ রেল মজুর ইউনিয়নের কলিকাতা শাখাও কমরেড কালীপ্রসন্নের মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

কলিকাতায় ফ্যাশিষ্ট-বিরোধীদের গ্রেপ্তার

এবারকার জাতীয় সপ্তাহে দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত হইয়াছে। আমলাতন্ত্র তাহাতে ভীত। তাই, গত ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে বন্দীমুক্তির দাবীতে খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরী হলে যে ঘরোয়া সভা হয়, তাহাতে যোগদানের অভিযোগে পুলিশ খিদিরপুরের কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড জুড়ন গাঙ্গুলী, জলীমোহন কাউল, অজিত মিত্র, রাম সুরত সিং, মহাবীর সাহু, সুবোধ মুখার্জ্জী এবং বনমালী মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। শেষোক্ত তিনজন কর্মী ব্রুকবণ্ড কারখানার শ্রমিক। বর্ত্তমানে ইহাদের সকলকেই জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ইহাদের মুক্তির জন্য সর্ব্বত্র দাবী জানাও!

অভিযান

বিভূতি গুহ

ট্রেনের কামরায়।…ভীড়ের শেষ নাই। পা-দানিতে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া লোক চলিয়াছে। একজন ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "বেটারা জানে-প্রাণে মারলে। কাপড়-চোপড় কেনা যাবে না, কেরোসিনের অভাবে আঁধারে থাকো, চালে পর্য্যন্ত কাঁকড় আর পাথর কুঁচি, এবার ট্রেণে চলাও দায় করে তুলেছে।" আর একজন যোগ দিলেন, "আর ক'টা দিন। ওদিকে আসাম তো অর্দ্ধেক সাবাড়। বাছাধনরা বর্ম্মা-মালয় থেকে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছেন, এবার এ মুল্লুক থেকেও পাততাড়ি গুটাতে হবে।"… চমকাইয়া উঠি। কোনদিন মণিপুর দেখি নাই। তবু যেন দেখিতে পাই পাহাড়ের কোলে ছোট গ্রামগুলি জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত হইয়া চলিয়াছে। ভারতবাসীর বুকের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে পাহাড়ী পথঘাট। দুইশত বছর পরেও আবার বিদেশী গোলামী।…

একটা বড় রেল জংশনে নামিয়া পড়িয়াছি। বসিয়া আছি গাড়ীর অপেক্ষায়। বহুদিন এই পথে যাতায়াত করিয়াছি। কিন্তু আজ যেন ইহাকে নতুন করিয়া চোখে পড়িল। একটু আগেই এক গাড়ী ফৌজ সীমান্তের দিকে গিয়াছে। আর একটি ট্রেণ বহু লরী বোঝাই হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। দিনরাত চলিয়াছে লড়াইয়ের মাল মসলা! জংশনটির দিকে তাকাইলে মনে হয় যুদ্ধ-সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। সাঁজোয়ার অন্ত নাই। মনে পড়ে বর্ম্মা-মালয়ের পেছু হটার কথা। সেদিন আর আজ কত তফাৎ।

কয়েকজন আমেরিকান যুবক রাইফেল কাঁধে শিষ দিতে দিতে চলিয়া গেল। পাশের একটা এন্‌জিন হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নামিল আর একজন আমেরিকান, গায়ের কোটটি খোলা, মুখখানি গরমে লাল হইয়া উঠিয়াছে। বিরাট চেহারার কয়েকজন কাফ্রি প্রকাণ্ড বস্তা কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। দূরে প্ল্যাটফরমের উপর নির্ব্বিকার চিত্তে শুইয়া আছে কয়েকজন ইংরেজ তরুণ সৈনিক।…জানিনা ইহাদের সকলের বাড়ী কোথায়। আমেরিকার কোন গগনচুম্বী প্রাসাদের কোন্ কক্ষে কিংবা ওয়েলসের কোন্ কয়লা-খাদের বস্তিতে কিংবা আফ্রিকার কোন্ গভীর জঙ্গলে ভরা পল্লীতে। নানাদেশের নানারঙ্গের এই তরুণদল, প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়িয়া প্রিয়জনের কোমল পরশ পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে ফাশিস্ট দস্যুদের রুখিতে। ইহাদের অনেকেই হয়ত আর ফিরিবে না, বুকের রক্ত দিয়া তাহারা মণিপুরে জাপানীদের প্রতিরোধ করিবে।… মনে ভরসা জাগে।

এই বিরাট মিলিটারী সাঁজোয়ার ফাঁকে হঠাৎ বিদ্যুৎরেখার মত ঝলসিয়া উঠে ট্রেণের সেই বিক্ষুব্ধ বিরক্ত মুখগুলি। গত বছরের দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বেদনার ভরা। আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা ও অপদার্থতায় তিক্ত। হতাশা ও ব্যর্থতায় বিভ্রান্ত। বাংলার শহরে শহরে ইহাদের চাপা দীর্ঘশ্বাস শুনি।…ভাঙ্গা মেরুদণ্ডে দেশরক্ষা? শিহরিয়া উঠি।

কয়েক দিন পর।…তমলুক মহকুমা কৃষক সম্মেলনে গিয়াছি সভাপতি হইয়া। দুই হাজার কৃষকের সভা। বন্যায় বিধ্বস্ত, মহামারীতে পঙ্গু, অনাহারে শীর্ণ কৃষকের চোখ-মুখ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে দুর্জ্জয় শপথে। মেদিনীপুরের অতীত ঐতিহ্য—জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস ইহারা ভুলে নাই। ভুলে নাই কাঁথি, দাসপুর। ভুলে নাই শত শহীদের রক্তদান। বীরেন শাসমলের মেদিনীপুরকে তাহারা জাপানী দস্যুদের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হইতে দিবে না।

শত শত কৃষক মেয়েরা আসিয়াছে সম্মেলনে। মেদিনীপুরের কৃষক মেয়ে। বাংলার ইতিহাসে তাহারা

নিয়াছে। নারীত্ব পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে। দমননীতির এমন পীড়ন বোধহয় কোন বাঙ্গালী মেয়েকে সহিতে হয় নাই। তবু কংগ্রেস আন্দোলনের বিজয়-শাঁখ বাজাইয়াছে ইহারাই। ইহারাই আজ জাপ-দস্যুকে রুখিবার শপথ নিলো। শীর্ণকায় কিশোর মেয়ে-নেতা মিণ্টু। কতটুকুই বা তার বয়স। মা-মাসীদের পদ-চিহ্ন আঁকা পথে সেও পা বাড়াইয়াছে। জাপ-দস্যুদের কথায় মুখখানি তার চিন্তায় গম্ভীর হইয়া উঠে। সমুদ্রের কূল ধরিয়া উহারা নাকি তাহার দেশ এই মেদিনীপুরেও ঢুকিতে পারে। কি বোঝে সেই তা জানে। দৃঢ়তায় উজ্জ্বল চোখে বজ্র মুষ্টি তুলিয়া সেও শপথ নেয়।…মণিপুর আর মেদিনীপুর—শত শত মাইলের ব্যবধান আজ চূর্ণ হইয়া যায়।

মনে পড়ে সেদিনের ট্রেণের কথা। হতাশার কালো যবনিকা উঠে। নতুন জগতের শতদল একটি একটি করিয়া পাপড়ি মেলে।

চোখের সামনে ভাসে যশোহরের আড়ুয়ার বাঁধ। দূর দূরান্তের কৃষকরা আসিয়া মিলিয়াছে লাল নিশানের নীচে। কণ্ঠে তাদের সঙ্গীত, হাতে তাদের কোদাল। শুরু হইয়াছে লড়াই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। জলস্রোতকে তাহারা রুখিবে। ২০ হাজার বিঘা জমিকে মুক্তি দিবে। ৪ লাখ মণ ধানের শিষে মাঠ ভরিয়া উঠিবে। দেশ খাইয়া বাঁচিবে, সীমান্তের সৈনিক খাইয়া বাঁচিবে। অর্দ্ধাহারে হতাশার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন শান্ত হইবে। জাতির মেরুদণ্ড সোজা হইয়া দেশের ভিতরের সীমান্ত দৃঢ় করিবে।…মণিপুর আর যশোহর এক সূত্রে বাঁধা। সীমান্তে সৈনিকের হাতে রাইফেল, অভ্যন্তরে কৃষকের হাতে কোদাল। জলস্রোত রুখিবার বাঁধ, না জাপ পঙ্গপাল রুখিবার চীনের মহাপ্রাচীর!

স্বাধীনতার বীর সৈনিক, নতুন যুগের নতুন মানুষ জাগে।…মনে পড়ে যুদ্ধ সীমান্ত হইতে কয়েক শত মাইল দূরে দিনাজপুরের কথা। সীমান্ত ভাঙ্গে বিদেশী শত্রু জাপান; আর দেশের ভিতর ভাঙ্গে দেশী শত্রু মজুতদার—রচনা করে গোলামীর শিকল। মজুতদারের বিরুদ্ধে লড়িয়া দেশ বাঁচাইবে, জাপ-দস্যুর পথ রোধ করিবে। এই শপথ নিয়া দাঁড়ায় কৃষকের দল।…

চোরাকারবারীদের বড় আড্ডাও এই হাটে। লবণের অভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। মজুতদার কৃষকের নুন ভাতের নুনটুকু পর্য্যন্ত লুটিয়া লইয়াছে। বসিয়া থাকিবার আর সময় নাই। ভাতের হাঁড়ি ছাড়িয়া কৃষক মেয়েরা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। নুন-চোর তাহারা ধরিবে। পুরুষের পাশে মেয়েরা আসিয়া না দাঁড়াইলে দেশ বাঁচিবে কি করিয়া? কৃষক বধূ জয়মণি তাদের নেতা। এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিয়া ৫০ জন মেয়ে ভলাণ্টিয়ার সে জড় করিয়াছে। লাঠি হাতে মার্চ করিয়া তাহারা হাটে যায়, চোরাকারবারীর সন্ধান করে। পথের উপর কড়া নজর রাখে। লবণের বস্তা ধরিয়া সবাইকে বিলি করিয়া দেয়। আজ তাহারা মজুতদারের হাত হইতে হাট রক্ষা করে, কাল তাহারা জাপ-দস্যুর হাত হইতে গ্রাম রক্ষা করিবে।…মনে পড়ে চীনের মেয়েদের ইতিহাস। লাল ইয়েনানে দেশভক্ত নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়। জাপ প্রতিরোধের শিক্ষা তাহারা নেয়। চীনের গ্রামে গ্রামে তাহারা গড়িয়া তোলে প্রতিরোধের প্রাচীর। ছয় ছয়টি বছরের রক্তাক্ত ইতিহাসের শিক্ষা।…দিনাজপুরের গ্রামে নব চীন জন্ম নেয়। জয়মণি, না চীনের গেরিলা মা মাদাম চাও।

রাত প্রায় দুইটা। ফুলবাড়ী বন্দরে কৃষক সমিতির অফিসে ঘুমাইতেছি। "কমরেড শীগগীর ওঠো"—লাঠি হাতে ৪ জন কৃষক ভলাণ্টিয়ার উপস্থিত। নিদ্রা-জড়িত চোখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। ব্যাপার কি? একগাড়ী লবণ তাহারা ধরিয়াছে। মজুতদার মনে করিয়াছিল দিনের আলোয় ভলাণ্টিয়ারদের এড়াইয়া রাতের আঁধারে পাড়ি দিবে। কিন্তু সে জানে না নিশীথ রাতের পুঞ্জীভূত আঁধারে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে তীক্ষ্ণ চোখের মণি।

বিস্ময়ে তাকাই সংকল্পে দৃঢ় কৃষক তরুণদের মুখে। রাতের আঁধারে তাহারা পথঘাট পাহারা দেয়। রেল-ষ্টেশন-গুমটি ঘরে দাঁড়াইয়া থাকে ভলাণ্টিয়ার প্রহরী। পুলিশ-চৌকিদারের ভরসা তাহারা রাখে না। দেশ বাঁচাইবার দায়িত্ব তাহারা নিজ হাতে তুলিয়া নিয়াছে।…লড়াই সুরু হইয়াছে। পথে ঘাটে গেরিলা-দের অস্ফুট শব্দ। নিদ্রাহীন রজনী। শত্রুর প্রতীক্ষায় প্রহর গোণা। সৈনিক প্রস্তুত।…মজুতদার, না জাপান!

সম্মেলনে চলিয়াছে কৃষকবাহিনী। লাল নিশান হাতে সামনে দাঁড়াইয়া কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জী। কৃষকরা বলে বসন্তর পায়ের তলায় চাকা বাঁধা। হাওয়ার বেগে সে উড়িয়া চলে পথ ঘাট তুচ্ছ করিয়া। কৃষক তরুণ চৈতু হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ বাংরু পর্য্যন্ত কেহই বাদ যায় নাই। অপূর্ব্ব উৎসাহে আসিয়াছে ভুতেশ্বরী—শহীদ স্বামী কৃষ্ণপদর লাল নিশানকে বজ্রমুষ্টিতে সে আগাইয়া নিয়া চলিবে। স্বামীপুত্র সাথে করিয়া অভিযানে যোগ দিয়াছে বৃদ্ধা চাম্পামনি।

সুদূর উত্তর হইতে ৮০ মাইল পথ অভিযানে চলিয়াছে রাজেন, অভরণ, কম্প, স্পষ্টরাম, বিনোদ,—কৃষক আন্দোলনের বহু ঝড় বাদল ইহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। জয়মণিও ছোট্ট একটি মহিলা স্কোয়াড সাথে করিয়া তালে তালে মার্চ করিয়া চলিয়াছে। বিরাট আধিয়ার আন্দোলনের লড়াইয়ের দিনগুলি যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে নব রূপে।

গ্রামের পর গ্রাম তাহারা চলিয়াছে। জয়ধ্বনিতে মুখর পল্লীগুলি। কত অচেনা মুখ বিস্ময়ে তাকাইয়াছে পথে। অভিনন্দন জানাইয়াছে, ঘরে দিয়াছে আশ্রয়। কখনও বা কাটিয়াছে গাছের তলায়। কত মাঠ পার হইতে হইয়াছে, কত খাল, কত জঙ্গল। ক্লান্তিতে পা চলিতে চাহে না, রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া পড়িতে চায়, তবু চলার বিরাম নাই।…

মনে পড়ে চীনের লং মার্চ। ৫ হাজার মাইল দুর্গম পথ-মরু-কান্তার ঘিরিয়া মরণজয়ী চীনা কৃষকের অভিযান। তাহারাই আজ রক্ত মাংসের মহাপ্রাচীর গড়িয়া বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতেছে।…

অভিযান চলিয়াছে। যুগ যুগের তমসাবৃত, অন্ধ কুসংস্কারে ঘেরা অশিক্ষিত কৃষকের অভিযান। কৃষক মানবতা জাগিয়াছে, এ তারই চলার ধ্বনি।… ফুলবাড়িতে ৩০ হাজার, বেজওয়াদায় দেড় লাখ।… বরদলৈর আন্তরিক আবেদন। ইরাবত সিংয়ের দৃপ্ত আহ্বান।…দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মজুতদার, জাপান? স্রোতের মুখে তৃণের মত…। ট্রেণের সেই হতাশায় ভরা মুখগুলি…এইবার অভয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।…

দেশরক্ষায় বাংলার নারী

কনক মুখার্জী

হিটলারের সেনাদল তখন সোভিয়েটের যুদ্ধে আগাইয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন জাগিয়াছে—স্বাধীনতাকামী জনগণের আন্দোলনের এক নূতন পর্ব। ১৯৪১-এর ৭ই সেপ্টেম্বর। রেডিও-র কাছে রীতিমত আলোচনার আসর বসিয়াছে। হঠাৎ মেয়ে কণ্ঠে দীপ্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল: "দুনিয়ার নারী! আজ ফ্যাশিস্ট দস্যু তোমার দরজায় করাঘাত করিতেছে, তোমার মান ইজ্জত, তোমার সন্তান, তোমার দেশকে বাঁচাইতে হইলে সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে।" সেদিন মস্কোতে সোভিয়েট মেয়েদের প্রথম ফ্যাশিস্টবিরোধী সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া কমরেড ভ্যালেণ্টিনা গ্রীজোডুবোভা এই কথাই দুনিয়ার মা-বোনদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন।

দাবানলের মত যুদ্ধের আগুন ছড়াইল দেশ হইতে দেশান্তরে, ভারতবর্ষও রক্ষা পাইল না। লুব্ধ জাপান আগাইয়া আসিল। ভারতবর্ষকে সে গ্রাস করিতে চায়। সেদিন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায়। হয় মৃত্যুপণ প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা, না হয় পরাধীনতার কলঙ্ক—ভারতবাসীর সামনে দুটি মাত্র পথ।

আত্মরক্ষার ডাকে বাংলার নারী

১৯৪২ সালে দেখিতে দেখিতে রেঙ্গুণ ও বর্মার সীমানা ছাড়াইয়া বাংলার আকাশে জাপানী বিমান গরজিয়া উঠিল। বাংলার মা বোনের জীবনে চরম দুর্দিনের কালো ছায়া। দিকে দিকে জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের অভিযান সুরু হইয়া গেল। কলিকাতা নগরী হইতে সুরু করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাংলার নারী সমাজে সেদিন বাঁধ ভাঙা বন্যার মত গণ-আন্দোলনের ঢেউ। জাতীয় কংগ্রেসের এতদিনকার মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করিয়া বাংলার নারী সমাজে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার দাবী ধ্বনিত হইল। নারী জীবনের স্বতন্ত্র দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠি নবাংলায় গণ-নারী আন্দোলন।

দেশের উপর আসিল ৯ই আগষ্টের দুর্য্যোগ। আমলাতন্ত্র জাতীয় নেতাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাহাদের কারারুদ্ধ করিল। জাতীয় কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিল। যাঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন নেতৃস্থানীয়া নারীকর্ম্মী, তাঁহারা কেহবা রহিলেন কারাগারে, আর যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারাও কংগ্রেসের নিকট হইতে সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা পাইলেন না। ফলে, নারী আন্দোলন বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী হইয়াও সম্পূর্ণতা পাইল না। কিন্তু হাজার হাজার নরনারী আত্মরক্ষার দাবীর পিছনে এক হইয়া দাঁড়াইল—বাংলার অসংখ্য কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত নারী সমাজ। সেপ্টেম্বর—নভেম্বরের "আত্মরক্ষা সপ্তাহ", "জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের" মধ্য দিয়া তখন বাংলার নারী সমাজ আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছিল, ধ্বনিত করিয়াছিল জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী।

ডিসেম্বর মাস। কলিকাতা নগরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। চট্টগ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া জাপানী বোমা কলিকাতার বুকে হানা দিল। হাজার হাজার নিরীহ নরনারী ও শিশুর মৃত্যু রোধ করার জন্য মেয়েরা আগুয়ান হইল। প্রাথমিক চিকিৎসা ও এ, আর, পির কাজে মেয়েদের ভীড়। দলে দলে মেয়ে ভলাণ্টিয়ার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তথ্য যোগাড় করিতেছে। জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছে। সভা করিয়া মা বোনদের মনে বল যোগাইতেছে। দেশবাসীকে রক্ষা করার কাজে বিভিন্ন পার্টি ও দলের মেয়েরা হাত মিলাইল, গড়িয়া উঠিল "স্বয়ং সেবিকা সঙ্ঘ।"

দেশবাসীর সেবায় বাংলার নারী

১৯৪৩ সাল, বাঙ্গালীর জীবনে চরম দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল, জাতীয় নেতারা জেলে বন্দী; দেশবাসীর সামনে পথ অস্পষ্ট। ৯ই আগষ্টের ধ্বংসকারী আন্দোলনে দেশের বুকে হতাশার ছাপ। কোথায় গেল আত্মবিশ্বাস। কোথায় গেল স্বাধীনতাকামী ভারতের ঐতিহ্য! দেখিতে দেখিতে সমাজজীবন প্রবঞ্চনা আর অনাচারে ভরিয়া উঠিল। মজুতদারের হৃদয়হীন ষড়যন্ত্রে হাজার হাজার নিরীহ মা-বোন অনাহারে প্রাণ হারাইল। জাপানী বিমানের অগ্নিবর্ষণে ভারতের মাটি রক্তাক্ত হইল। বাংলার দিকে দিকে ধ্বংসের আর্ত রোল উঠিল।

মৃত্যুর এই প্লাবন রোধ করিতে প্রসারিত হইল হাজার মা বোনের স্নেহশীতল হস্ত। সন্তানের মুখে অন্ন যোগাইতে বাংলার মায়েরা মজুতদারের বিরুদ্ধে চালাইয়াছে অভিযান। বালিগঞ্জে, শিয়ালদহে কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে শত শত মেয়ের চালের লাইনে দেখা গিয়াছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকদের। তাহাদেরই আন্দোলনের জোরে মুসলমান বস্তিতে মেয়েদের জন্য খুলিয়াছে স্বতন্ত্র কণ্ট্রোলের দোকান। সেদিন বাংলার নারী সমাজে আন্দোলনের জোয়ার লাগিয়াছিল। ১৭ই মার্চ কলিকাতার ৫ হাজার বুভুক্ষু নারীর মিছিল আইন সভার দুর্গ কাঁপাইয়া আওয়াজ তুলিয়াছিল—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই। জেলায় জেলায় বুভুক্ষু নারীর মিছিল সেদিন ঘোষণা করিয়াছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা।

শ্মশান জ্বলিয়া উঠিল—লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর চিতার দাবানল। সর্বনাশের অট্টহাসি! জ্বলন্ত ঘর হইতে ঘুমন্ত গৃহীর মত সেদিন ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল যুগান্তের শৃঙ্খলিতা বাংলার নারী সমাজ! বুভুক্ষুর দিশাহীন আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—বাংলার মা! দুর্ভিক্ষের দাবানলে তোমার দেশ, তোমার সন্তান, তোমার মান ইজ্জত পুড়িয়া ছাই হইল!

ইহার বিরুদ্ধে শুরু হইল দেশভক্ত নারীর অক্লান্ত অভিযান। চট্টগ্রামের নারী সমিতি খুলিল ১২টী অন্নসত্র, কলিকাতার আত্মরক্ষা সমিতি

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

চাউলের অভাব নাই তবু দাম বাড়ে কেন

ভবানী সেন

, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমা—এই কয়েকটি অঞ্চল খাদ্য উৎপাদনের দিক হইতে ভীষণ ভাবে ঘাটতি এলাকা। চাউলের দাম এই অঞ্চলগুলিতে ভীষণ ভাবে বাড়িয়াছে, চাউলের মণ এই সব স্থানে এখন ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা। এখন মে মাস, বর্ষা আসিতেছে। গত বৎসর এই সময় হইতেই দেশময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এ বছর উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে এখনও চাউলের দাম অপেক্ষাকৃত কম আছে! মণিপুরের রণক্ষেত্রে যখন জাপ-আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতেছে তখন যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে জনগণের খাদ্যই আমাদের প্রধান জাতীয় শক্তি। পূর্ব্ববঙ্গই যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে নিকটে, পূর্ব্ববঙ্গেই যুদ্ধের চাপ সবচেয়ে বেশী পড়িবে; অথচ পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলি গত বছরের দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত। এবার যদি এই অঞ্চলে খাদ্য সংকট বাড়ে তাহা হইলে জনগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই ঘাটতি জেলাগুলির সংকট বাংলার সর্ব্বত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। এখন সুরাবর্দির খাদ্যনীতির উপর বাংলার ভাগ্য নির্ভর করে।

সরকারী খাদ্য নীতি

এবার সারা বাংলায় ২৭ কোটি মণ আমন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে; ২৫ কোটি মণ চাউল হইলে স্বাভাবিক ভাবে বাংলার নরনারী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই যুক্তি অনুসারে ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করিলেন যে এবৎসর মজুতকারীরা মজুত করিয়াও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে না। সরকার হইতে যে খাদ্য নীতি গ্রহণ করা হইল তাহার সারমর্ম্ম এই: সরকারী সরবরাহ বিভাগের অধীনে একটি ক্রয়বোর্ড গঠন করা হইল, এই ক্রয়বোর্ড প্রয়োজন মত ধান চাউল কিনিয়া ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করিবে। তাঁহারা স্থির করিলেন যে চাউলের দাম যখন আপনা আপনি কমিয়া যাইবে তখন সরকারী এজেন্টরা ক্রয় করিবে, আবার যেখানে যখন বাড়িবে সেইখানে তখন নিয়ন্ত্রিত দামে বিক্রীর ব্যবস্থা হইবে। চাউলের দাম আপনা আপনি কমিবে এই ধারণা লইয়া সরকার ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলেন, কেনা সুরু করিলেন না। কিন্তু দাম আপনা আপনি বেশী কমিল না। সরকারী ক্রয়বোর্ডে যে ব্যবসায়ীরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই সম্পূর্ণ যোগ্য এই ধারণা লইয়া তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটির হাতে ধান কেনার ভার দিলেন না; ব্যবসায়ীরা গত বৎসর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের উপরই দুর্ভিক্ষ দমনের ভার রহিল। ফলে এখন ঘাটতি জেলার সরবরাহ হয় না, আমন ধান রহিল মজুতদারের হাতে।

চাউলের দাম

আমাদের হিসাবে বাংলা দেশে ১৫টি উদ্বৃত্ত জেলা এবং কলিকাতাসহ ১২টি ঘাটতি জেলা আছে। ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সরকার হইতে চাউলের সর্ব্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের পাইকারী বিক্রীর দর ঠিক করা হয় উদ্বৃত্ত জেলায় ১৪৲ টাকা এবং ঘাটতি জেলায় ১৫৲ টাকা। ১৫ই মার্চ্চ হইতে ঐ দর কমাইয়া উদ্বৃত্ত জেলায় করা হয় ১৩৷৵০ এবং ঘাটতি জেলায় ১৪৷৵০। সরকারী খাদ্য নীতি কি এই দাম চালু করিতে পারিয়াছে? কলিকাতা গেজেটে বাংলার বিভিন্ন মহকুমার যে দামের হিসাব দেওয়া হয় তাহা হইতে প্রত্যেক জেলার গড়পড়তা দাম হিসাব করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে:—

প্রতিমণ চালের সর্ব্বোচ্চ দর

(১) উদ্বৃত্ত জেলা

জেলার নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
বীরভূম	১৩৶০	১৩৷৵০	১৪৶০
বাঁকুড়া	১৩৷৵০	১৫৶০	১৫৲
বগুড়া	১৩৶০	১২।৵০	১২।৵০
দিনাজপুর	১৩৷৵০	১৩।/০	১৩।/০
জলপাইগুড়ি	১৪।৵০	১৩।/০	১৩।/০
খুলনা	১৫৷/০	১৫।৵০	১৩৷৵০
মেদিনীপুর	১৪৲	১৩।৶০	১৪৲
রাজসাহী	১৩৷/০	১৩৶০	১৩৶০
বাখরগঞ্জ	১৬।৵০	১৬৲	১৫।৵০
ময়মনসিংহ	১৫।৵০	১৪।৵০	১৭৶০
বর্দ্ধমান	১৫।৵০	১৪।৵০	১৪৲
মালদা	১৩৶০	১২৷৵০	১২৷৵০
যশোহর	১৫৷০	১৭৶০	১৬৲
রংপুর	১৩৷৷৵০	১৩৷৵০	১৩৷/০
মুর্শিদাবাদ	১৩৷৵০	১৩৷৵০	১৩৷৵০

(২) ঘাটতি জেলা

জেলার নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
ঢাকা	১৭৶০	১৭৶০	১৭৶০
নোয়াখালি	১৭৶০	১৭৶০	১৭৶০
চট্টগ্রাম	১৭৶০	১৭৶০	১৭৶০
ত্রিপুরা	১৬৷৵০	১৬৲	১৭৶০
হাওড়া	১৫৷/০	১৬৲	১৬৲
নদীয়া	১৬।৵০	১৬৷/০	১৫।৵০
দার্জ্জিলিং	১৬৲	১৭৶০	১৬৲
ফরিদপুর	১৬৷৵০	১৬।৵০	১৬৲
পাবনা	১৬৲	১৬৲	১৬৲
হুগলী	১৬৷৵০	১৬।৵০	১৬।৵০
২৪ পরগণা	১৬৷৵০	১৬৵০	১৬।৵০

এই বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে ৪টি উদ্বৃত্ত জেলায় এবং ১১টি ঘাটতি জেলায় সরকার তাহার নিয়ন্ত্রিত সর্ব্বোচ্চ দর চালু করিতে পারে নাই; ১৫টি জেলায় অর্থাৎ বাংলার অর্দ্ধেকের বেশী জায়গায় এখনও চোরাবাজার অপ্রতিহত অবস্থায় বাজার দর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এপ্রিল মাস হইতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়াছে। বৎসরের প্রথম অর্দ্ধেকেই যদি এই অবস্থা হয় তাহা হইলে বৎসরের শেষ অর্দ্ধেকে কি হইবে? এ অবস্থার অর্থ এই যে উদ্বৃত্ত জেলা হইতে ক্রয় করিয়া ঘাটতি স্থলে সরকারী বিক্রীর ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাও উপযুক্ত যান বাহনের অভাবে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাইতে পারে নাই। উদ্বৃত্ত জেলা হইতে সময় মত উপযুক্ত পরিমাণ চাউল কিনিয়া ঘাটতি এলাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবারকার খাদ্য ব্যবস্থার গোড়ার কথা। এই ব্যবস্থা করিতে সরকারী খাদ্যনীতি ব্যর্থ হইয়াছে। শুধু এই জন্যই ঘাটতি অঞ্চলের খাদ্যের দাম বাড়িতেছে।

কলিকাতায় রেশনিং

স্বাধীন বাণিজ্যের মোহে যাহারা অন্ধ এই অবস্থা হইতে তাঁহাদের মগজে চেতনার উদ্রেক হওয়া উচিত। সরকারী ক্রয় এবং সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থাই যে চোরাবাজার বন্ধ করিতে পারে তাহার প্রধান প্রমাণ কলিকাতার রেশনিং। রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার আগে কলিকাতার গরীব জনসাধারণ দিনরাত কিউ-এর সামনে সময় কাটাইত তবু সব দিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য পাইত না। তখন চোরাবাজারে চাউলের দর ছিল ৩০৲ টাকা। এমন কি নূতন ধান উঠিবার পরও ২০৲ টাকার কমে কোথাও চাউল পাওয়া যায় নাই। রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবার পর কলিকাতার অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন নির্দ্দিষ্ট ১৬৷০ আনা দরে প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ঝঞ্ঝাটে রেশন শপ হইতে চাউল পায়। রেশনের চাউল খারাপ বলিয়া কিছুদিন আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে ভাল চাউলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। রেশন চাউল খারাপ বলিয়া যাঁহারা আন্দোলন করিয়াছেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে রেশনিং-এর আগে চোরাবাজার হইতে ৩০৲ মণ দরে যে চাউল কিনিতে হইয়াছে তাহাও বহুক্ষেত্রে অখাদ্য ছিল। শুধু যাহারা ধনী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি, চোরাবাজারের কারবারীদের সঙ্গে যাহাদের সামাজিক যোগাযোগ ছিল তখন তাঁহারাই শুধু ভাল চাউল পাইতেন, তাই রেশনিং-এর খারাপ চাউল দেখিয়া তাঁহারাই বেশী আতঙ্কিত হইয়াছিলেন।

আজ একথা সবাই স্বীকার করেন যে রেশনিং কলিকাতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, নতুবা এখন ঘাটতি জেলাগুলিতে চাউলের দর ২৫৲ টাকায় উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইয়া যাইত।

ডিসেম্বর মাসে যখন এ বছরকার খাদ্যনীতি লইয়া সরকারী মহলে আলোচনা সুরু হয় তখন আমরা দাবী করিয়াছিলাম, যে বাংলার সমস্ত শহরে রেশনিং চালু করিতে হইবে, ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বাঁধা দরের দোকান খুলিতে হইবে। সরকার যদি ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় করে তাহা হইলেই এ ব্যবস্থা সম্ভব। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মারফৎ ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় করা অসম্ভব, কাজেই সর্ব্বদলীয় প্রাদেশিক কমিটির উপর সরকারী ক্রয় বণ্টন পরিচালনার ভার দেওয়া হউক। সরকার তখন এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন, তাহার ফলে মজুতদারের প্রভাবই বাজারে বলবৎ থাকে।

কলিকাতার নিরাপত্তার মূলে কি আছে? কলিকাতার জন্য সরকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে পাইয়াছে, সেই শস্য নির্দ্দিষ্ট দরে সরবরাহ করিতেছে। বাংলার সমস্ত ঘাটতি অঞ্চলের জন্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নির্দ্দিষ্ট দরে সরবরাহ করে তাহা হইলে সারা বাংলাই কলিকাতার মত নিরাপদ হইতে পারে।

সরকারী ক্রয়

ঘাটতি জেলাগুলিতে চাউলের দর বাড়ে কেন একথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই উত্তর দেন যে সরকারী ব্যবস্থার বিফলতা ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার বিফলতা মানে কি? সরকারের কি করা উচিৎ? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেন! সরকার নির্দ্দিষ্ট দরে সরবরাহ করুক কিন্তু সরকার যেন বাংলার কোন জেলা হইতে খরিদ না করে—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু সরকার খরিদ না করিলে সরবরাহ করিতে পারে না, চোরাকারবারীরা সেই সুযোগে দাম বাড়ায়। বাংলার ঘাটতি অঞ্চলে প্রায় ২ কোটি লোকের বাস। এই দুই কোটি লোকের ভেতর অন্ততঃ এক কোটি লোকের জন্য ৫ কোটি মণ চাউল সরকারী সরবরাহ বিভাগের জিম্মায় জমা থাকিলে সমস্ত শহরে রেশনিং হইতে পারে এবং গ্রাম অঞ্চলেও বাঁধা দরের দোকান খোলা যায়! কিন্তু গত ৪ মাসের ভিতর সরকারী ক্রয় বিভাগ যে পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করিয়াছেন শুনা যায় তাহাতে বর্ত্তমানে মাত্র একটি বা দুইটি জেলায় সরবরাহ করা চলে। সেই জন্যই আজ ১৫টি জেলায় চোরাবাজার প্রভাবশালী, সেই জন্যই চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ঢাকায় চাউলের দাম ভয়াবহভাবে বাড়িতেছে। মজুতদার গুজব রটাইতেছে যে সরকার কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া দাম বাড়াইয়াছে, আসল কথা এই যে সরকার কিনিবার ব্যবস্থা না করিয়া দাম বাড়াইয়াছে। যাহারা চাউল জমাইয়া মজুত করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে চায় তাহারাই সরকারী ক্রয়ের বিরোধী, কারণ সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে চোরাবাজার চলে না।

চাউল কোথায়?

এবার বাংলায় সমস্ত আমন ধানের শতকরা ৭৫ ভাগ জমিদার ও জোতদারদের হাতে। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময় গরীব কৃষকদের শতকরা ৩০ জন জমা জমি বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছিল। গরীব চাষীদের হাতে খুব সামান্য ধানই এবার আসিয়াছে। অভাবের তাড়নায় ফেব্রুয়ারী মাসের ভেতরই তাহারা সব বেচিয়া ফেলিয়াছে। এই সময় উদ্বৃত্ত জেলায় চাউলের দর প্রতিমণ ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। কিন্তু সরকারী

মজুতদার নদী পথে

সরবরাহ বিভাগ হইতে তখন ধান চাউল ক্রয় করা হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার মত দুঃস্থ ভাবাপন্ন জেলা হইতে এই সময় হাজার হাজার মণ চাউল বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই চাউল কিনিয়াছে হাওড়ার ব্যাপারীরা, তাহারা নৌকা বোঝাই করিয়া চাউল সরাইয়াছে। ঐ সময় চাঁদপুরের ব্যাপারীরা বরিশাল হইতে এবং ঢাকার ব্যাপারীরা ময়মনসিংহ হইতে চাউল কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সব ব্যাপারীরাই এখন ১৬৲ হইতে ২০৲ টাকা মণ দরে চাউল বেচিয়া ঘাটতি জেলা হইতে অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী ক্রয় বিভাগ ধান চাউল কিনিতে নামিয়াছে। তখন গরীব চাষীদের হাতে আর ধান চাউল নাই। মধ্যবিত্ত চাষীরা ভবিষ্যতের ভয়ে চাউল বিক্রী করিতে চাহে না। জমিদার ও জোতদারেরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাহাদের উদ্বৃত্ত চাউল আটকাইয়া রাখিতেছে। ধান চাউল ক্রয়ের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী যদি সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটির সাহায্য গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে জমিদার, জোতদার ও মধ্যবিত্ত

চাষার স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া ক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু সে পথ গ্রহণ না করিয়া কয়েকজন মনোনীত ব্যবসায়ীর উপর ক্রয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই 'ব্যবসায়ীদের সাধ্য নাই যে তাহারা জনগণের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিতে পারে। তাহারা যে দাম দিতে চায় তাহার চেয়েও বেশী দাম দিয়া মজুতদার ব্যাপারীরা কিনিয়া লইয়া যায়।

জনগণের প্রতিনিধি মণ্ডলীর সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া ধান চাউল কিনিয়া ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে এবার কোন জেলায় দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। এই নীতি গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী মজুতদারের হাতে আমন ধান সমর্পণ করিয়াছেন। এই জন্যই বলি যে মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি মজুতদারের নীতি। শ্যামাপ্রসাদবাবু চাহিয়াছিলেন যে সরকার যেন এবার বেশী ধান কিনিবার ব্যবস্থা না করে, ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক, শুধু তাহাদের কারবার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন করা হউক। মন্ত্রীমণ্ডলী ঠিক তাহাই করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শ্যামাপ্রসাদবাবুর নীতি মানিয়া লইয়া মজুতদারের প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ ঠেকান সম্ভব

অবস্থা এখনও আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই। বাংলার অধিকাংশ স্থানে চাউলের কলগুলি পুরামাত্রায় কাজ চালাইতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে চাউলের কলগুলিতে প্রচুর ধান চাউল গিয়াছে। আইনতঃ চাউল কলের মালিকেরা ইচ্ছামত ক্রয় করিতে পারে কিন্তু একমাত্র সরকারী ক্রেতার নিকট ছাড়া অন্য কাহারও কাছে তাহাদের বিক্রয় করিবার অধিকার নাই। সরকার যদি এই চাউল সম্পূর্ণ হস্তগত করে এবং ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি নিশ্চয়ই ঘটিবে।

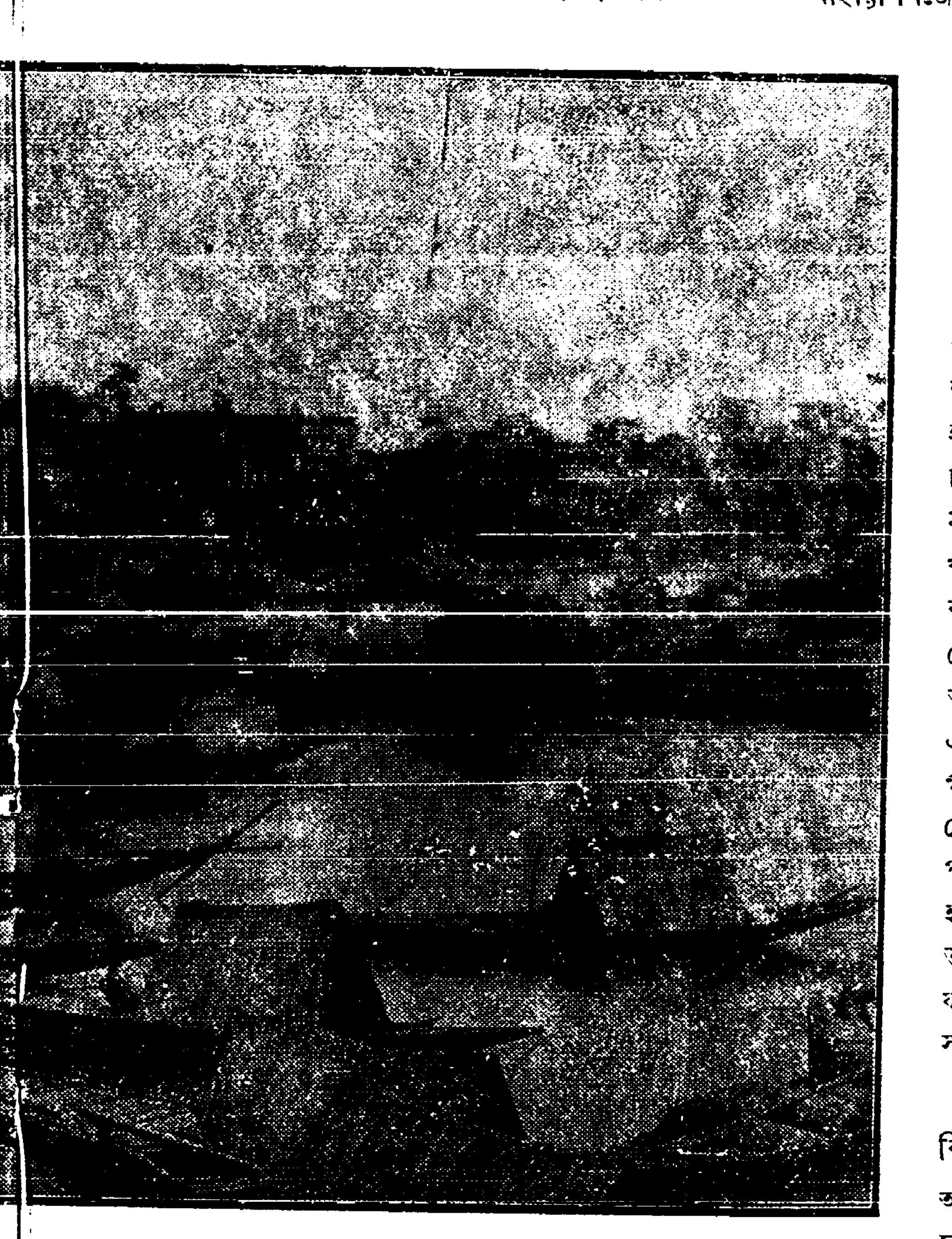

ন…কায় চাউল সরাইতেছে

চাউল কলের মাল সরকারের হাতে যাইবে না চোরা-বাজারে যাইবে তাহার উপরই বাংলার ভাগ্য নির্ভর করে। এই জন্য চাউল কলের উপর জনগণের মিলিত খাদ্য কমিটির কর্তৃত্ব দিতে হইবে। চাউল কলের একটি দানাও যেন চোরাবাজারে না যায়। কিন্তু খাদ্য কমিটির কর্তৃত্ব ছাড়া চাউল কলের মাল সরকারী সরবরাহ বিভাগের হাতে আসিবে না, এ চৈতন্য যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর এখনও না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা মজুতদারের সেবা করিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জনগণের চিন্তা তাঁহাদের মাথার ভিতর নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতি জেলায়, মহকুমায় এবং ইউনিয়নে সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিতেছেন। আমলাতন্ত্রের বাধা ঠেলিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ম্মীগণও এ বৎসর খাদ্য-কমিটিতে যোগ দিতেছেন। ইহাই এ বৎসর বাংলার প্রধানতম ভরসা। মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করিয়াছেন যে রেশনিং এবং খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহ ব্যবস্থা এই খাদ্য কমিটিগুলির সহযোগিতায় করা হইবে। সুতরাং জমিদার, জোতদার ও কৃষক সকলেই দ্বিধাহীনচিত্তে সরকারী সরবরাহ বিভাগের নিকট যাহা বিক্রী করিবেন খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে তাহা বিক্রীর ব্যবস্থা হইবে সুতরাং তাঁহাদের ভয় বা সন্দেহের কিছু নাই। সরকারের নিকট বিক্রী করিলে তাঁহারা পাইবেন ন্যায্য দাম এবং ন্যায্য মুনাফা আর জনসাধারণ পাইবে নির্দ্দিষ্ট দামে জীবন ধারণের খাদ্য। আর প্রত্যেকেই যদি ভয়ে কিংবা লোভে কিছু মজুত করিয়া রাখেন তাহা হইলে আপনাদেরই স্বদেশবাসী দুঃস্থ অবস্থায় মারা যাইবে, আপনাদেরই সমাজ, কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হইবে। এ বৎসর যদি গত বৎসরের মত মৃত্যু ও মহামারীর নূতন পর্ব্ব সুরু হয় তবে ফ্যাশিস্ট দস্যুদের বর্ব্বর অভিযান বাংলার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। এ বছর যাহারা মজুত করিয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিবে তাহারা কার্য্যতঃ জাপানী শৃঙ্খলের নায়ক, বাহক এবং পরিপোষক হইবে। বাংলায় এমন ৬০ লক্ষ পরিবার আছে যাঁহারা জমা জমিতে দখলী স্বত্ব ভোগ করে। তাঁহারা তাঁহাদের সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য রাখিয়া বাকিটা বিক্রী করিলে দশ কোটি মণ চাউল বাজারে আসিবে। সরকার ইহার অর্দ্ধেক কিনিয়া ঘাটতি অঞ্চলে রেশনিং ও কন্ট্রোল দোকানের ব্যবস্থা করিলে কোথাও কোনও অভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু এই ৬০ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেকেই যদি গড়ে ১৬ মণ অতিরিক্ত চাউল ধরিয়া রাখে তাহা হইলে বাজারে এক গোটা দানাও কেহ পাইবে না, শহরবাসীরা এবং ঘাটতি অঞ্চলের সর্ব্ব-সাধারণ তাহার ফলে দুর্ভিক্ষে পতিত হইবে। সুতরাং কেহই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত রাখিবেন না তাহা হইলে সকলেই বাঁচিবে, দেশরক্ষার জন্য জাতির মনোবল বাড়িবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার যা অর্থ, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে জনগণের খাদ্য লুকাইয়া রাখারও সেই একই অর্থ।

যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার জন্য মজুত করিয়া রাখিবে, যাহারা দেশ বাঁচাইবার ডাকে সাড়া দিবে না তাহারা নিজেদেরও বাঁচাইতে পারিবে না, দেশেরও ঘোর শত্রুতা করিবে। নিজেদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য যাহারা দেশের কোটি কোটি লোককে দুঃস্থতার কবলে ঠেলিয়া দেয় তাহারা স্বদেশদ্রোহী—তাহারা মানবতার পরম শত্রু। প্রত্যেক স্বদেশভক্ত অগ্রসর হইয়া মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালান, মজুত উদ্ধার করিয়া সরকারী সরবরাহ বিভাগের হাতে দিন, খাদ্যকমিটির মারফত তাহা বিতরণের ব্যবস্থা করুন। পূর্ব্ববঙ্গের ঘাটতি জেলাগুলি হইতে সতর্ক বাণী আসিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে সচেতন হউন। এবার যদি দুর্ভিক্ষ হয় তাহা হইলে গত বৎসরের চেয়েও ভীষণতর অবস্থা দেখা দিবে, কারণ এবার ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে জাপ-দস্যুর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। শত্রু যখন দেশের ভিতর তখন মৃত্যু ও মহামারীর নূতন পর্য্যায় যাহাতে আরম্ভ না হয় তাহার জন্য সকল দল সমবেত হন।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই বিপদের সময় সকল দল আগাইয়া আসুন, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠন করিয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর গতি রোধ করুন। আমাদের ইচ্ছা থাকিলেই আমরা এবার খাদ্যসঙ্কট রোধ করিতে পারি।

এ ঐক্যে শুধু তাহাদেরই আপত্তি থাকিতে পারে যাহাদের নিকট দেশ ও সমাজ তুচ্ছ, যাহারা নিজ নিজ স্বার্থের জন্য দেশের সভ্যতা ধ্বংস করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বাংলা দেশই স্বদেশপ্রেমের জন্মস্থান, বাংলা দেশই সারা ভারতে সভ্যতার আলোক প্রথম জ্বালিয়াছে, সেই বাংলা আজ পশ্চাৎপদ হইবে না।

কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র
জনযুদ্ধ
মে-দিবস বার্ষিক সংখ্যা :—তিন আনা.
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১।০

ফসল বাড়াইতে সেচের ব্যবস্থা চাই

ফসল বাড়াও, চলাচলের সুবন্দোবস্ত কর

১৩৫০ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সেই দুর্ভিক্ষের জের আজও চলিতেছে; এবং খাদ্যের অবস্থা আবার আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। জাপানীরা আগে হইতে বিমান আক্রমণ চালাইতেছিল; সম্প্রতি তাহারা আসামে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কোহিমা ও মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরুদ্ধপ্রায়। এই আক্রমণের ফলে খাদ্য সংকট তীব্রতর হইয়া উঠিতে পারে। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য যে সমস্ত কাজ করা দরকার, খাবার ফসল বাড়ানো ও চলাচলের ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ।

(১) **ফসল বাড়ানো** :—কিন্তু ফসল বাড়াইতে হইলে সেচ বিভাগের সুব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। বাঙালীর বছরের খোরাকের জন্য ২৫ কোটি মণ চাল দরকার। সেচের অব্যবস্থার জন্য এই ফসল উৎপাদনের কোন নিশ্চয়তা নেই—প্রকৃতির খেয়ালের উপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে সেচের সুব্যবস্থায় উৎপাদন উন্নত, নিশ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেচ বিভাগে এখনও কি রকম অব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

বাংলা দেশে মোট ৫,০৩,৭৩,৩৩২ একর জমি আছে। তার মধ্যে মোট ২,৩১,৪৩,০০০ একর জমিতে গত ১৯৪২।৪৩ সালে ধানের চাষ হয়। সব রকমের ফসল ধরিয়া মোট ২,৫৪,৮৮,৩০০ একর জমিতে চাষ হয়, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের সামান্য বেশী জমিতে চাষ হয়, বাকী সমস্ত জমিই পতিত থাকে। কেন বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক জমি পতিত পড়িয়া থাকে? ইহার জবাব দিয়াছেন স্যার আজিজুল হক্। তিনি বলিয়াছেন: "বাংলা দেশে মোট যত জমিতে চাষ হইয়া থাকে, তাহার মাত্র শতকরা ৭ ভাগ জমিতে সেচ ব্যবস্থা আছে। অনেকের মতে ইহা অপেক্ষাও কম জমিতে সেচ ব্যবস্থা আছে। সে যাহাই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বাংলায় চাষীরা সেচ ব্যবস্থার কোন সুবিধা পায় না বলিলেই চলে। বাংলার ফসলকে বৃষ্টিপাতের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়।" যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না বা বেশী হয়, সেখানে ফসল হয় না। তাই (ক) বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে ফসল হয় না। (খ) যে জমিতে ফসল হয়, তাহারও উৎপাদনের কোন নিশ্চয়তা থাকে না কোন বৎসর জন্মে, কোন বৎসর নষ্ট হয়। কয়েক বৎসরের ফসলের সরকারী হিসাব দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

সাল	ফসল
১৯৩৭-৩৮	৯০,৩৪,০০০ টন
১৯৩৮-৩৯	৭৫,৬৭,০০০ ,,
১৯৩৯-৪০	৮৩,৭১,০০০ ,,
১৯৪০-৪১	৬০,৪৩,০০০ ,,
১৯৪১-৪২	৯৮,২১,০০০ ,,
১৯৪২-৪৩	৬৯,১৬,০০০ ,,

সুতরাং পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য ও আবাদী জমিতে ফসলের পরিমাণ নিশ্চিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য সেচের সুব্যবস্থাই প্রথম ও প্রধান উপায়।

(২) **চলাচলের ব্যবস্থা** :—ঘাটতি এলাকা হইতে বাড়তি এলেকার খাদ্য শস্য চলাচলের অব্যবস্থা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমানের হিসাব অনুসারে বাঁকুড়া, বগুড়া, জলপাইগুড়ি খুলনা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, যশোহর, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান এই ১৫টী জেলা বাড়তি কিংবা স্বাবলম্বী। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, চট্টগ্রাম, নদীয়া, দার্জ্জিলিং, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা এই ১১টি ঘাটতি জেলা। কলিকাতার খাদ্য ত চিরদিনই মফঃস্বল হইতে আসে এবং আসিবে। ইহা ছাড়া এক একটি জেলার মধ্যেও কোন এলেকা বাড়তি এবং কোন এলেকা ঘাটতি। এই যুদ্ধের সময়ে যানবাহনের অভাবে ঘাটতি এলেকায় খাদ্যশস্য না লইতে পারায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সেচ বিভাগের কয়েকটি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইলে এই সমস্যার অনেক পরিমাণে সমাধান করা যাইত। উদাহরণ স্বরূপ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুন্দরবনের পথ দিয়া কলিকাতা ও খুলনার দূরত্ব ২৬১ মাইল আর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের পথে মাত্র ১২৬ মাইল। এই খাল সমাপ্ত হইলে চলাচলের ব্যবস্থা কত সহজ হইবে। ভৈরব সংস্কারের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার মধ্যে চলাচলের সমস্যা দূর হইত, ফসল অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত, জনস্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইত।

এই সমস্ত কারণেই ১৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে রয়াল কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে "এখনও পর্য্যন্ত বাংলা দেশে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি কি সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। সুতরাং নূতন সেচ বিভাগের সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হইবে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে এমন একটি বাস্তব পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, যাহাতে সুশৃঙ্খল ভাবে উহা কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়।" ১৯৪০ সাল পর্য্যন্তও তাহা করা হয় নাই। তাই ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় ধান ও চাউল তদন্ত কমিটি লিখিয়াছেন যে "ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কৃষি সম্পর্কিত রয়েল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আজ অবধি কিছুই করা হয় নাই।" এই কমিটি সুপারিশ করেন যে সারা বাংলায় অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে এইরূপ অসংখ্য সেচ পরিকল্পনা অবিলম্বে সরকারের হাতে লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তথাপি অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯৪৩ সালে গ্রেগরী কমিটি আবার সুপারিশ করেন "ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেচ ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা দরকার। কমিটি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে খুব বড় বড় কাজগুলি করা সম্ভব নয়; তবে অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার দ্বারা ফসল উৎপাদন উন্নত ও বর্দ্ধিত করা খুবই সহজ এবং টিউবওয়েল পাম্প প্রভৃতি দ্বারা সেচ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার কোন বাধা নাই বা থাকিতে পারে না।"

সেচবিভাগে ১০ কোটী টাকা সরকারী ব্যয় চাই

সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও সেচ বিভাগ উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন না। বর্ত্তমান বাজেট আলোচনা হইতে দেখা যায় বাংলা সরকার সেচ বিভাগের জন্য মোট ১,৪৯,১৩,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাহেন ও মঞ্জুর করাইয়া লন। গত ৮।৪।৪৪ তারিখের সরকারী সার্কুলার হইতে দেখা যায় প্রতি জেলায় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার জন্য জেলার কালেক্টরের হাতে ১ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানের বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা নিতান্ত সামান্যই বলিতে হয়।

কৃষ্ণবিনোদ রায়

শুধু ইহাই নহে। অতীতে সেচ বিভাগের জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার অনেক অংশ অপচয় হইয়াছে। আমলাতন্ত্র জনসাধারণের সহযোগিতা লইতে কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। এখন মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলেও এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথচ জনসাধারণের সহযোগিতা না লওয়া, জনসাধারণের মত উপেক্ষা করায় অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে; জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় হইয়াছে। একটি উদাহরণ উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেচ বিভাগের কয়েকটি পরিকল্পনার জন্য বাজেটে কয়েক কোটী টাকা মঞ্জুর হইল। সেই উপলক্ষে ১৯২৭ সালে ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা দিয়া ৫টি ড্রেজার কেনা হইল অথচ পরে দেখা গেল, এইগুলি কোথাও কাজে লাগানো সম্ভব হইল না, টাকাগুলি অনর্থক ব্যয় হইল; সেচ পরিকল্পনাগুলি পড়িয়া রহিল।

বাংলাদেশ আজ জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে। বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে হইলে, বাংলা দেশ রক্ষা করিতে হইলে ফসল উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য সেচ বিভাগে এ বৎসর অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা ব্যয় হওয়া উচিত। তাহার মধ্য হইতে ভারত সরকারকে অন্ততঃ ৫ কোটী টাকা বাংলার সেচ ব্যবস্থার জন্য দিতে হইবে এবং বাংলা সরকারকে ৫ কোটী টাকা দিতে হইবে। বাংলা সরকারের পরিকল্পিত কৃষি আয়করের লব্ধ আয়ের অর্দ্ধেক এই খাতে ব্যয় হওয়া সঙ্গত। একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এই অর্থ হাজা-মজা নদী-খাল-বিল সংস্কার, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, জলাভূমি হইতে জলনিকাশের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার জন্য দেশভক্ত জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা নিতে হইবে। নচেৎ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে বিলম্ব হইবে এবং অর্থ ও শক্তির অপচয় হওয়ার আশঙ্কা আছে। ফসল বাড়াইবার জন্য, দেশরক্ষার জন্য, দুর্ভিক্ষ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য সরকার ও জনসাধারণের সহযোগের ভিত্তিতেই সেচ পরিকল্পনা তাড়াতাড়ি গৃহীত ও কার্য্যকরী হইতে পারে। সেই পথে আজ সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এরা দেশের শত্রু

আসাম সীমান্তের যুদ্ধের প্রতি সমস্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। জাপানী ফ্যাশিস্ট সর্দ্দার তোজো ভাবিয়াছিল যে বার্মার মত ভারতকেও সে অনায়াসেই পদানত করিবে। কিন্তু তার সে আশা সফল হইতেছে না। একদিকে মিত্রশক্তির রণদক্ষতার ও সৈন্যবল জাপানের রণকৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেছে—অন্যদিকে আসাম ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষার আহ্বান জনসাধারণের ভিতর আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্যমও জাগাইয়া তুলিতেছে।

জনসমাবেশের বিরুদ্ধে গুণ্ডামি

জনগণের এই দেশপ্রেমিক জাগরণে আতঙ্কিত হইয়া ইহাকে নষ্ট করিবার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি, ঠাকুরপন্থী দল ও আর, এস্, পি-র একটি অংশ বিশেষভাবে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় সপ্তাহের পুণ্য দিবসগুলিতে যখন বাংলার জনগণ কংগ্রেসকর্ম্মী, কমিউনিস্ট ও ছাত্র কর্মীদের নেতৃত্বে সভা শোভাযাত্রায় সমবেত হইয়া দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিতেছিল তখন এই সব দলের লোকেরা অনেক স্থানে সেই সব সভা শোভাযাত্রা পণ্ড করিবার জন্য হল্লা ও গুণ্ডামি বাধাইয়াছিল। কৃষ্ণনগরে নদীয়ার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সভায় স্থানীয় ফরোয়ার্ড ব্লক ও ঠাকুরপন্থীরা গিয়া হল্লা করে। ক্ষিতীশ বাবুর বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, সভার বক্তারা যখন কংগ্রেসের দেশরক্ষার আদর্শের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন, ও নেতাদের মুক্তির দাবী তুলিতেছিলেন তখনই ঐ দেশদ্রোহীরা নানাপ্রকার চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু হল্লা করিয়া সভা পণ্ড করিবার কুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সভার পর একটি শোভাযাত্রা বাহির হইলে ঠাকুরপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের গুণ্ডারা লাঠি হাতে শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করে।

বরিশাল শহরে কংগ্রেসের উদ্যোগে আহূত একটি ছাত্র সভায় স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা 'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই' ধ্বনি করিলে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির কতকজন লোক মারপিট বাধাইয়া সভায় গোলযোগ করিবার চেষ্টা করে। সভায় উপস্থিত স্থানীয় কংগ্রেস নেতাগণ সি, এস্, পি কর্মীদের এই গুণ্ডামিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। দিনাজপুর, রংপুর ও মুর্শিদাবাদ শহরেও এই বিশ্বাসঘাতকের দল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের সভায় গোলমাল করিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক স্থানেই জনগণের দৃঢ়তার জন্যই এদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সব গুণ্ডামি একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আর, এস্, পি-র একটি অংশ সম্প্রতি 'সংগ্রাম' (ষ্ট্রাগ্‌ল) শিরোনামায় একটি ইস্তাহার বাহির করিয়াছে। সেই ইস্তাহারে তাহারা বলে যে, জাপানী আক্রমণে ভারতের সামনে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফাঁকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কর, এবং এর জন্য গুণ্ডা বদমায়েসদের সংঘবদ্ধ কর; কেননা "গুণ্ডা বদমায়েসরাই সেরা বিপ্লবী"। এর সোজা মানে এই যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের উপর নির্ভর না করিয়া গুণ্ডা বদমায়েসদের উপর নির্ভর কর অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম পরিত্যাগ করিয়া গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ কর। এই নীতি অনুসরণেই জাতীয় সপ্তাহের সভা শোভাযাত্রায় হল্লা করা হইয়াছে।

নেতাদের মুক্তির বিরোধিতা

জাপানী আক্রমণের সম্মুখে বাংলার জনগণের মাঝে কংগ্রেসের দেশরক্ষার আদর্শ যাহাতে প্রচারিত না হয়, জনগণের মনোবল যাহাতে ধ্বংস হয় সে উদ্দেশ্যেই যে এই সব দল সভা শোভাযাত্রায় গুণ্ডামি করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কংগ্রেসের আদর্শ লোকের মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আজ এরা আওয়াজ তুলিয়াছে যে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির প্রয়োজন নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীই মনেপ্রাণে অনুভব করেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির স্তম্ভে স্তম্ভে আজ জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার উপবাসের সময় জেল হইতে বড়লাটের নিকট যে চিঠি লেখেন তাহাতেও তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের মুক্তির দাবী করিয়াছিলেন।

সমস্ত দেশের এবং মহাত্মা গান্ধীর নিজের দাবীর পরও এই মিরজাফরী দলগুলি ধুঁয়া তুলিয়াছে যে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই না—কেননা মুক্তি চাওয়া নাকি ভারতের পক্ষে অপমানজনক! কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির নেতা জয়প্রকাশ তাহার "দ্বিতীয় পত্রে" (গত অক্টোবরে প্রকাশিত) এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস নেতাদের জেলে থাকাই ভাল—তাহা হইলেই নাকি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ভারতের প্রতি নিবদ্ধ থাকিবে। জওহরলাল প্রভৃতি নেতারা বাহিরে আসিলেই নাকি দুনিয়া ভারতকে ভুলিয়া যাইবে। আমেরী কোম্পানী প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে যে, ভারতের স্বার্থের জন্যই কংগ্রেসের নেতাদের জেলে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির নেতাও বলিতেছেন যে, কংগ্রেস নেতাদের জেলে থাকাই নাকি ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক! অন্যদিকে, তোজোর কামনাও ইহাই যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতারা জেলে আবদ্ধ থাকুক, দেশে অচল অবস্থা চলুক। কেননা ভারতের এই অন্ধকার অবস্থাই তাহার ভারত অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক। জয়প্রকাশ তাহার 'দ্বিতীয় পত্রে' তোজোর এই কামনার প্রতিধ্বনিই করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তাবাদী নেতা বলিয়া পরিচিত প্রঃ হুমায়ুন কবীরও ১৪ই মার্চ্চ 'ইউনাইটেড ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' নামধারী একটি তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের এক সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবী করা নাকি তাঁদের অসম্মান করা। প্রঃ কবীরের উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা জানি না—তবে স্বাধীনতাপ্রিয় ছাত্রদিগকে বিপথে চালাইবার এরূপ অপপ্রচেষ্টা বাংলাদেশে আর কখনও হয় নাই।

জয়প্রকাশের "দ্বিতীয় পত্র" প্রকাশিত হওয়ার পর এবং প্রঃ হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতাতে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ জেলায় জেলায় কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও ঠাকুরদলের ভক্তগণ প্রচার করিতেছে: কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই না। জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি হইতে পারে?

ধ্বংস কার্য্যের ষড়যন্ত্র

জাতীয় স্বার্থের অবমাননা করাই এই সব দলের উদ্দেশ্য; কেননা তোজোর দাসত্ব করিবার ব্রতই ইহারা গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই, ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরাকানে জাপানী সৈন্যদল আক্রমণ আরম্ভ করিলে, তাহাদের পথ সুগম করিবার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক ১৭ই ফেব্রুয়ারী এক ইস্তাহার দিয়া জনগণকে ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল। সি, এস্, পি-র অন্যতম নেতা রামমনোহর লোহিয়া তাদের দলের মুখপত্র 'ইনক্লাবের' ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় এই ধ্বংস কার্য্যের পক্ষেই ওকালতি করিয়াছিলেন। ধ্বংস কার্য্যের কায়দায় নিজেদের অনুচরদের শিক্ষিত করিবার জন্য সি, এস্, পি "ধ্বংস কার্য্যের অ, আ, ক, খ" (এ-বি-সি অব ডিসলোকেশন) নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছে। এই পুস্তিকাতে কি করিয়া রেল লাইন ভাঙ্গা যায়, টেলিগ্রাফের তার কাটা যায় তার বিশদ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শোনা যায়, ধ্বংস কার্য্যের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতিও নাকি ইহারা চালাইতেছে। অনেক স্থানেই নাকি গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হইতেছে এবং এই সব দলের লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, যুদ্ধটা একটু দানা বাঁধিয়া উঠিলেই কমিউনিস্টদের হত্যা করা হইবে।

উদ্দেশ্য এদের ইহাই যে, জাপান রণক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা করিতে পারিলেই এরা স্বদেশপ্রেমিকগণকে হত্যা করিবে এবং মহাউল্লাসে অরাজকতা ও ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে।

এই অরাজকতা ও ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধেই কিন্তু গান্ধিজী তাঁহার উপবাসের সময় দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। গত ২৫শে জানুয়ারী শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস কোনদিনই কোন অরাজকতা কিংবা ধ্বংস কার্য্য সমর্থন করে নাই।

গান্ধিজীর দৃঢ় অভিমত সত্ত্বেও এবং ২৫শে জানুয়ারী সরোজিনী নাইডুর বিবৃতির পরই ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ধ্বংস কার্য্যের প্ররোচনা দিয়া এবং বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস কার্য্যের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য এবং দেশকে জাপানের নিকট বিকাইয়া দিতে ইহারা কৃতসংকল্প।

এদেরকে দূর করুন

এইভাবে সারা দেশকে জাহান্নামে পাঠাইবার জন্য ঐ দলগুলি আজ ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে। কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক জনসমাবেশের উপর গুণ্ডামি, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির বিরোধিতা, ধ্বংস কার্য্য হত্যা ও অরাজকতার ষড়যন্ত্র—এইসব ফ্যাশিস্টসুলভ হাতিয়ারই ইহাদের প্রধান সম্বল। এছাড়া মিথ্যার বেসাতি লইয়াও আজ ইহারা পথে পথে বাহির হইয়াছে। 'জাপান সমস্ত মণিপুর দখল করিয়াছে,' 'মিত্রশক্তির সৈন্যরা দলে দলে পলায়ন করিতেছে'—এইসব অদ্ভুত গুজব ছড়াইয়া জনগণের মানসিক বল নষ্ট করিবার অপচেষ্টারও বিরাম নাই।

জাতীয় ঐক্যের অভাব এবং আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট রাজনৈতিক অচল অবস্থাই এদের আজ প্রভূত সুযোগ দিতেছে। এই মারাত্মক অবস্থার সুযোগ নিবার জন্যই জাপসৈন্যদল মণিপুর আক্রমণ করিয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরে দেশদ্রোহী দলগুলি জাপানের তাঁবেদার হইয়া গোলমাল বাধাইবার ফিকির করিতেছে।

আজ বাংলার দেশভক্ত জনগণকেই এই সংকটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গান্ধিজী, জওহরলাল প্রভৃতি কারারুদ্ধ নেতার বাণী স্মরণ

খোকা রায়

করিয়া জনগণকে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলুন। জনগণের মনে সাহস দিন, যাহাতে তাহারা দেশদ্রোহিদের মিথ্যা গুজবে ভীতিগ্রস্ত হইয়া না পড়ে। আসামের নেতা বরদলৈ এবং যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতারা যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন সেই পথেই আজ অগ্রসর হউন। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় নেতাদের মুক্ত করুন এবং সমস্ত দেশময় দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তুলুন।

এ পথের যারা কণ্টক তাদের বিরুদ্ধে জনগণের রোষবহ্নি জাগাইয়া তুলুন। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ দল আজ যাহাতে আবার ধ্বংস কার্য্য করিতে না পারে তার জন্য চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। এরা দেশের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করিয়াছে তার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আপনাদের ঘৃণার দ্বারা এদের জীবন অভিশপ্ত করিয়া তুলুন। দেশ-প্রেমিক বাংলার সমাজে এদের স্থান নাই—কেননা ইহারা দেশের পরম শত্রু।

দেশরক্ষায় বাংলার নারী

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

খুলিল ১৬টী, পাবনার অন্নসত্র ৮০০ নরনারীর অন্ন যোগাইত। তাহার পরই আসিল ঢাকার মেয়েরা। সেবার কাজ নারী সমাজকে পথ দেখাইল। জেলায় জেলায় তাহারা অন্নসত্র খুলিল, শিশুদের দুধের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাংলার নারী দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সমগ্র ভারতের নারী সমাজে সাড়া জাগিল। গাড়ী গাড়ী কাপড়, কম্বল, হাজার হাজার টাকা পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মালাবার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশের নারী সমাজের কাছ হইতে আসিতে লাগিল। সেবার কাজে হাত মিলাইল বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান। গড়িয়া উঠিল "বঙ্গীয় মহিলা খাদ্য কমিটী"। লক্ষাধিক টাকার ব্যয়ে তাহারা জেলায় সেবার কাজ করিয়াছে।

দেশবাসীর সেবার মধ্য দিয়া বাংলার নারী সমাজ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যই বহন করিয়া চলিল। দেশবাসীকে রক্ষা করিয়া বাংলার নারী সমাজ দেশরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

সামাজিক ভাঙ্গন রোধ করিতে বাংলার নারী

পিছনে তাকাইয়া দেখি প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ভগ্নপ্রায় বনিয়াদ। দুর্ভিক্ষে চাষী হারাইয়াছে জমি, কারিগর হারাইয়াছে যন্ত্র, বুদ্ধিজীবী হারাইয়াছে চাকরী। মুনাফার জগদ্দল পায়ের নীচে কত নারী তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা বিসর্জন দিয়াছে। কলিকাতার অলিগলিতে, গ্রাম ও শহরে বুভুক্ষু মায়ের আত্মবলির অসংখ্য করুণ ইতিহাস।

তারই পাশে বাংলার নারীর আত্মরক্ষার অভিযান দুর্ণিবার বেগে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা আওয়াজ তুলিয়াছে, সর্বনাশের সামনে একতার প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে হইবে। চাই অন্ন, চাই বস্ত্র, চাই ঔষধ। চাই নিরাশ্রয় ও দুঃস্থা নারীদের আশ্রয়। চাই কর্মক্ষম নারীর উপার্জ্জনের উপায়। এই ডাকে আগাইয়া আসিল বিভিন্ন নারী সংগঠন ও রিলিফ প্রতিষ্ঠান। তাহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিল "নারী সেবা সংঘ"। আজ নারী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কংগ্রেসনেত্রী সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, মুস্লিম লীগ নেত্রী মিসেস মোমিন। সারা ভারতের নারী সমাজকে একতার ডাক দিয়াছে "নিখিল ভারত নারী সম্মেলন"।

তাহারই মাঝখানে আসিয়াছে মে-দিবস—নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যমের বার্ত্তা লইয়া। এই মে দিবসে দুনিয়ার শোষিত জনগণের সাথে বাংলার নারীসমাজ হাত মিলাইতেছে। জাপানীর শৃঙ্খল সে ঘৃণা করে, তাই সে প্রস্তুত হইতেছে সীমান্তের জাপদস্যুকে উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য।

দেশবাসীর নিরাশার অন্ধকার কাটাইয়া নারী আন্দোলনের দুর্ণিবার গতি আগাইয়া চলিয়াছে স্বাধীনতার পথে।

———

জাপানকে রুখিতে

কংগ্রেসনেত্রী নেলী সেনগুপ্তার আহ্বান

গত ২২শে এপ্রিল প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা 'জনযুদ্ধে'র প্রতিনিধির কাছে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:

'আসামের সীমান্তের খবর খুবই আশঙ্কাজনক। শোনা যাইতেছে, শুধু ইম্ফল এলাকাতেই নয়, চট্টগ্রামের পাশেই আরাকানেও আবার জাপানী সৈন্যের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানী রেডিও হইতে রটনা করা হইতেছে যে, তাহারা 'স্বাধীনতা'র ফৌজ লইয়া আসিতেছে।

আজ দেশের এই দুঃসময়ে প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার—কংগ্রেস চিরদিন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী, যে কোনো বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে। যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘদিন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, জাপান অথবা কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত হইতেই তাহা উপহার হিসাবে আসিবে না—এ কথা কংগ্রেস জানে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, গোপীনাথ বরদলৈ এবং যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কর্মীরা এ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই ঘোষণাই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

দেশবাসীর মন হইতে আতঙ্ক দূর করিয়া নূতন বিপদের সম্মুখে জাতির মনোবল দৃঢ় করাই আজ শ্রেষ্ঠ দেশসেবা। আজ সমস্ত দলের দেশভক্তদের কাছে আমার আবেদন—সমস্ত আত্মকলহ, সকল দলাদলি দূরে ঠেলিয়া আজ সম্মিলিত বিপদের এই সঙ্কট মুহূর্তে মিলিত হোন্। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম ও আসাম এলাকায় বিপন্ন এবং দুঃস্থ অধিবাসীদের কাছে আমার আবেদন—জাতীয় ঐতিহ্যের ধ্বজা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরুন; বীর বিক্রমে শত্রুর সম্মুখে এক হইয়া উঠিয়া দাঁড়ান।'

নাৎসীবাদ ধ্বংসের চরম যুদ্ধে

বিদ্রোহী জনগণের জাগ্রত ইয়োরোপ

নিরঞ্জন সেন

ইয়োরৌপের পুরুষ গেরিলা

মুক্তিকামী ইয়োরোপের অভ্যন্তরে……।

ফ্রান্স, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী, পোল্যাণ্ড ……বিদ্রোহ মুখর এই দেশগুলির জনগণ আজ তাদের বলদৃপ্ত হাত বাড়িয়েছে, হিটলারী শৃংখলকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে……।

দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে তিল তিল করে জীবন দিয়ে তারা প্রতিরোধের যে নয়া বনিয়াদ গড়ে তুলেছে, তারই সংঘাতে নাৎসী শাসনের যা কিছু জঞ্জাল সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে……আর সম্মুখে দেখা দিচ্ছে নব প্রভাতের নতুন সূর্য্যোদয়……।

ফ্যাসিষ্ট শোষণের মরণের মুহূর্ত আসন্ন…… নাভিশ্বাস উপস্থিত। অধিকৃত ইয়োরোপে দুর্জ্জয় দেশপ্রেমের মিলিত ব্যূহ রচিত হয়েছে, তাদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে শোনা যাচ্ছে মুক্তির পদধ্বনি।

ইতিহাসের শুভ মুহূর্ত আগতপ্রায়

ফরাসী দেশভক্ত! শোনো, শোনো!…১৯৪৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী. গোপন রেডিওকেন্দ্র ডাক দিয়ে যাচ্ছে ফরাসী দেশের সমগ্র জনসাধারণকে।

……এই চরম মুহূর্ত্তে তোমাদের দেশপ্রেমের জ্বলন্ত শিখায় নাৎসীবাদকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল। নাৎসীবাদ তোমাদের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু, পৃথিবীর শত্রু……

……রেল চলাচল বন্ধ করো, রাস্তায় রাস্তায় বাধার অমোঘ স্তম্ভ গড়ে তোলো, যা কিছু শত্রুর সাহায্যে আসে, বিধ্বস্ত করো।……মুক্তি সংগ্রামে যোগ দাও।

……নাৎসীরা যে দিন থেকে ফরাসী মাটিতে পা দিয়েছে, সে দিন থেকে এ লড়াই সুরু হয়।

গেব্রিয়েল পেরী, মাকাস ডরমো, নরডম্যান, কাঁমেন, টিম্ব……আরো কত পরিচিত, অপরিচিত জননেতা নিজেদের খুনে এ-লড়াইয়ের পথ রাঙিয়ে দিয়েছে।

আবার হাওয়ায় ভেসে আসে……ফরাসী মজুর! শোনো, শোনো!…জার্ম্মাণ কবলিত কারখানায় বাধা জন্মাও…উৎপাদনে আঘাত হানো……।

—কারখানায় কারখানায় ফরাসী মজুরের দৃপ্ত আওয়াজ…ফ্যাসিজম মজুরের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে রোখো…ফরাসীর কণ্ঠরোধ ক'রেও হিটলার এ রণধ্বনি প্রথম থেকেই শুনতে পেয়েছে……

……প্যারীর উপকণ্ঠে বিরাট বিজলী কারখানা …জার্ম্মান শাসনকে অব্যাহত রাখার হাতিয়ার তৈরীর প্রাণকেন্দ্র……সশস্ত্র তিনজন মজুর…দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় ইঞ্জিন ঘরে…টহলদারী নাৎসী শান্ত্রী প্রমাদ গণে……। ইঞ্জিন ঘরের মজুররা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে……

……তারপর … পরের অধ্যায় বেশ স্পষ্ট …ইঞ্জিনগুলি টুকরো টুকরো হয়, নাৎসী প্রহরী প্রাণ হারায়, কারখানার মজুররা একযোগে কারখানা থেকে বেরিয়ে যায়।

……ফরাসী দেশের সর্ব্বত্র আজ এই সংগ্রাম চলছে। ফরাসীর কণ্ঠরোধ করে, ফরাসীকে দাবিয়ে, অগণিত ফরাসী সন্তানকে খুন করেও হিটলার ফরাসীকে পিষে মারতে পারে নি,………

……স্বাধীনতার যুদ্ধে ফরাসীর নাম চির উজ্জ্বল।

তোমরা ডেনমার্ককে ভুল বুঝেছিলে

ডেনমার্কের একটি বে-আইনী পোষ্টার……কোপেন হেগেনের রাস্তায় রাস্তায় কে জানে কারা লাগিয়ে গেছে……তাতে লেখা আছে…স্বাধীনতাকামীদের প্রতি আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন। তোমরা একথা স্থির জেনো, নাৎসীবাদকে ডেনিশ জনসাধারণ একটি দিনের তরেও বরদাস্ত করে নি……নাৎসী জার্ম্মানীর সাথে কোন রফা নয়। তার ধ্বংস আমরাও চাই।

হিটলারের দুর্দ্দান্ত আঘাত আমাদের আহত করেছে, কিন্তু তাই বলে কি আমরা আত্মসমর্পণ করেছি? না, করি নি, আমরা মাথা নোয়াই নি।

*　　*　　*

ডেনমার্কে স্বাধীনতার লড়াই সুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশভক্ত প্রতিজ্ঞা নিয়েছে……সভ্যতার শত্রু, সংস্কৃতির দুষমন নাৎসীবাদকে উপড়ে ফেলে দিবে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার রেভারেণ্ড কুজ মুঙ্ক। হিটলারের বিরুদ্ধে শক্ত আঘাত হানবার প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলার মুখেই নাৎসীরা তাকে হত্যা করে।

মুঙ্কর হত্যা ডেনমার্কে আগুন জ্বালে।……নাৎসী-বিরোধী ধ্বংস কার্য্যের জোয়ার বয়ে যায়……

কোপেনহেগেনে বুরমিষ্টার এণ্ড ওয়েন কারখানা অনেকদিন থেকেই দেশের দুষমনদের হাতে…অজস্র মাল উৎপাদন হচ্ছে এখানে।

মুঙ্ক পথ দেখিয়েছে…৫০ জন নওজোয়ানের একটি দল প্রাণ হাতে করে ঐ কারখানাকে অচল করে দেয়।……অনেককে প্রাণ দিতে হয়।

মুঙ্ক প্রাণ দিয়েছে, এরা প্রাণ দিল, আরো অনেক দিয়েছে, দেবেও অনেকে…কেন, কিসের জন্য এ আত্মদান?…যারা মনে করেছিলো নাৎসীদের সাথে ডেনমার্কের জনগণ রফা করেছে, তারা এই আত্মদানের ভিতর দিয়ে জবাব পেলো—কোন সাচ্চা মানুষ, কোন দেশপ্রেমিক জাতি ঘৃণ্য নাৎসীবাদকে ক্ষমা করে না, করতে পারে না।

তাই পোলাণ্ডের সবাইকে আজ লালফৌজের সাথে হাত মেলাতে হবে।

*　　*　　*　　*

পোলিশ দেশভক্তরা তাই তো আজ লালফৌজের জয়কে নিজেদের জয় মনে করে…পলায়িত পোলিশ সরকারের ফ্যাশিস্ট ঘেঁষা নীতিকে ঘৃণা করে।…তাই আজ অধিকৃত পোলাণ্ডের দেশভক্তদের মনে হিটলার-বিরোধী লড়াইকে জয়যুক্ত করার প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়।

কয়েক মাস আগের খবর……

ওয়ারস লুবলিন রেল লাইনের জার্ম্মান ডিরেক্টর বিপদের সংকেত জানায়, এ লাইনে জার্ম্মান সেনাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। দিনের পর দিন একটা না একটা ঘটনা ঘটেই…কোন দিন বা গাড়ী বোঝাই নাৎসী ফৌজ প্রাণ হারায়, কোন দিন বা অস্ত্র বোঝাই গাড়ীই উড়ে যায়।

……লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়বে, না এই গেরিলাদের সায়েস্তা করবে—জার্ম্মান কর্তৃপক্ষ মহা মুস্কিলে পড়ে……কিন্তু গেরিলারা হার মানে না। নাৎসীদের তারা কিছুতেই ছাড়বে না……।

মার্শাল তিতোর ফৌজ ইতিহাস রচনা করেছে

যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজ। জনসাধারণের সাথেই এর সংযোগ, জনগণের বলেই এ বলীয়ান।…জনগণের

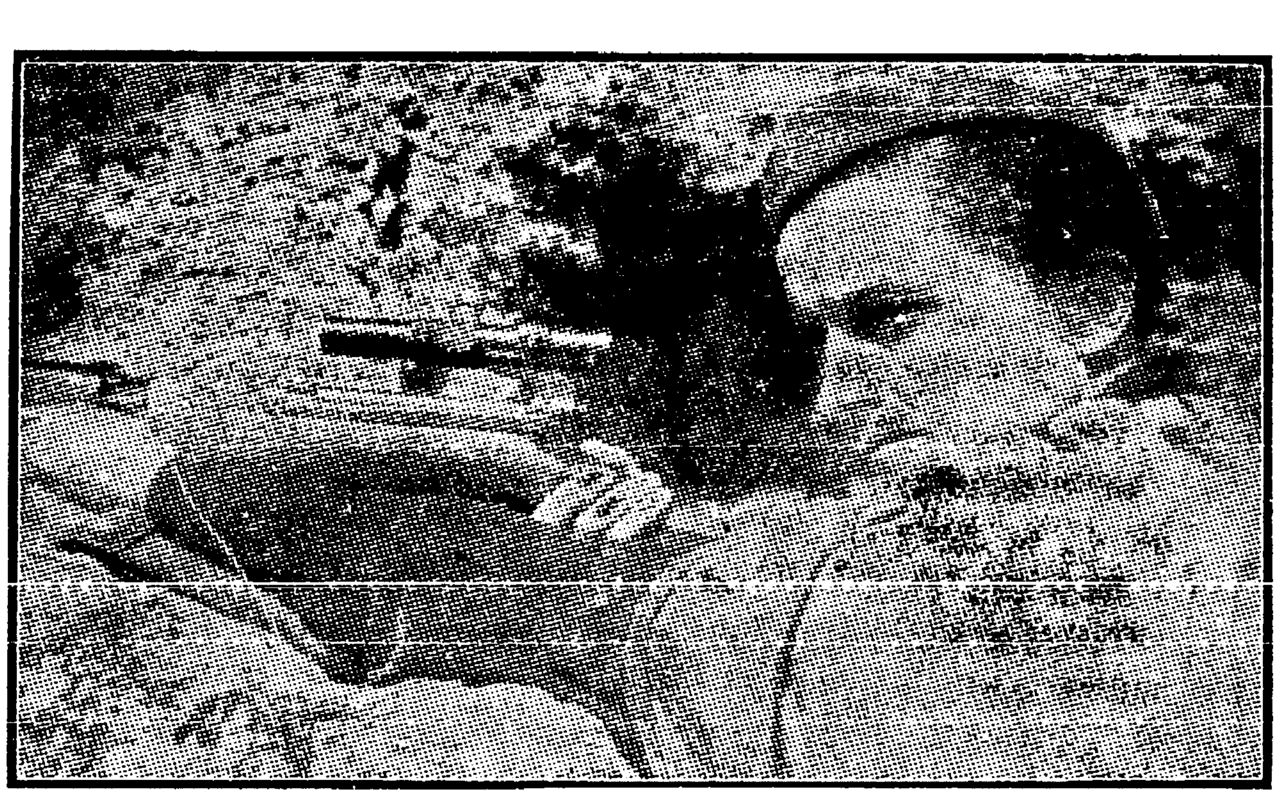

এই বীরের হাতে শত শত নাৎসী প্রাণ হারিয়েছে

আপনার লোক মার্শাল তিতো—এর নেতা। নাৎসীবাদ ধ্বংসের সংকল্প ফুটে উঠেছে এদের প্রতিটি কাজে।……

গত কয়েক মাসে এটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে যুগোশ্লাভিয়ায় হিটলারকে নিয়মিত সেনাদলই রাখতে হচ্ছে। রিতীমত লড়াই চলছে, জার্ম্মানরা কাবুও হচ্ছে যথেষ্ট, যেখানে এগোতে চায়, সেখানেই পথ রুখে দাড়ায় এই তিতোর বাহিনী।…

পশ্চিম বসনিয়া…। দুর্দ্দান্ত লড়াই চলেছে জার্ম্মান ফৌজের সাথে। তিতোর সেনানায়করা হুকুম দিয়েছে—মাটি কামড়ে থাকো, প্রতিটি ইঞ্চি জমি ধরে রাখো,…মুক্তিফৌজের সবাই আজ এ হুকুমের তাৎপর্য্য বোঝে, তাই প্রাণপণে তারা লড়াই করে।

সোভিয়েটের সাথে হাত মেলাও

নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অবিরাম ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যে সব পদানত দেশ স্বাধীনতার আদর্শকে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছে, পোলাণ্ড তার ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। লড়াইয়ের গোড়া থেকেই জার্ম্মানীর অত্যাচার জগদ্দল পাথরের মত পোলাণ্ডকে পিষে রেখেছে…পোলাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য, পোলাণ্ডের ভাষা, পোলাণ্ডের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সব কিছুর উপর নাৎসীরা ছাপ লাগাতে চেয়েছে…কিন্তু কে তা বরদাস্ত করবে? তাই পোলিশ জনসাধারণকে কথায় কথায় প্রাণ দিতে হয়েছে, সব কিছু হারাতে হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিঃস্ব হয়েও পোলাণ্ড ভেঙ্গে পড়েনি, বিদ্রোহের পতাকা অবনমিত করেনি।

………লালফৌজ মুক্তির নিশান হাতে আজ এগিয়ে এসেছে পোলাণ্ডের সীমান্তের দিকে, অধিকৃত পোলাণ্ডের লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক নরনারী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে তাদের সাথে হাত মেলাবার জন্য……

—জনসাধারণের এই আকাঙ্ক্ষা আজ ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে ইগ্নাসী প্রেটোয়াস্কীর ভাষায়।……

নাৎসী শিকল ভাঙ্গা চাই, তার জন্য দরকার লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করা। লালফৌজ চায় দুনিয়ার জনগণের মুক্তি আর সে মুক্তির প্রধান অন্তরায় হিটলার। তাই হিটলারী দানবের ধ্বংসই আজ শ্রেষ্ঠ কাজ। লালফৌজ তার অগ্রণী নায়ক।

ইয়োরোপের মেয়ে গেরিলা

স্বাধীনতার এ লড়াইয়ে কোনরূপ গাফিলতি নেই। এই মুক্তি ফৌজ কাদের নিয়ে গড়া? দেশের যারা মেরুদণ্ড তারাই এ ফৌজের প্রধান যোদ্ধা। গ্রামের কৃষক এসেছে, তার নিজের কাজের নিরপত্তা রাখার ব্যবস্থা করতে, মজুর এসেছে কারখানায় তার সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে।…ছাত্র, মহিলা প্রভৃতি সবাই এসেছে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। আজকের লড়াই, দুনিয়ায় মুক্তির এ লড়াই-এ জনগণ তাদের আপন স্থান করে নিয়েছে।

…তাই তিতোর মুক্তিফৌজ আজ শিকড় গেড়েছে দেশের অগণিত জনসাধারণের ভিতর—তাই তিতোর মুক্তিফৌজ আজ জনসাধারণের ফৌজ।

নরওয়ে যেন একটা বারুদের খনি

নরওয়ের বর্ত্তমানে ইতিহাসে যুদ্ধের ঝন ঝনানী নেই বল্লেই হয়। শান্তিপ্রিয় নরওয়ের অধিবাসীরা চোখ খুলে যেদিন দেখল নাৎসীবাদ তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তারা গুমরে গুমরে একথা বার বার স্মরণ করেছে—বিনা কারণে আমাদের যারা পরাধীন করেছে, তারা আমাদের শত্রুতো বটেই, তারা মানবসভ্যতারই শত্রু।…

…নাৎসী দানবের এই কুৎসিত আচরণে নরওয়ের লোকেরা বুঝেছে অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিজমের ধ্বংস না হলে দুনিয়ায় শান্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতির অস্তিত্বই থাকবে না।

নরওয়ের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা তাই পরাধীনতার প্রথম দিন থেকেই নাৎসীবাদের উপর দারুণ ঘৃণা পোষণ করে আসছে……

শত শত ঘটনায় তাদের এ ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে……

* * ভাগাসি তার নাম। বয়স খুবই অল্প, সতের আঠার হবে। মেয়ে কিনা, তাই কোমলত্ব ফুটে উঠেছে চেহারার ভিতর থেকে।…কিন্তু সাহসে দুর্জ্জয়। জার্ম্মানরা ও তাদের তাঁবেদার কুইসলিং-এর দল এর নাম জানে। অনেক জার্ম্মান এর হাতে প্রাণ দেয়,…অনেক কারখানার ঘরদোর উড়ে যায়, পরে জানা যায় ভাগাসাই এর মূলে, ভাগাসীকে একবার বলা হয়,…চুপচাপ থাক না কেন? ইচ্ছা করে এ কষ্ট বহন করছ কেন?

প্রশ্ন শুনে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে চুপ করে থাকি কেন জান? এ শত্রুর যদি পথ রোধ না করা যায়, এ বর্ব্বরতার যদি মেরুদণ্ড না ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তবে আমার নিজের বাঁচাই যে অসম্ভব হয়ে উঠবে। নিজের বাঁচার জন্যই আজ নাৎসীবাদকে রোখা দরকার।…আমি লাল ফৌজকে সম্মান করি, আমি সোভিয়েট নরনারীকে অভিনন্দন জানাই শুধু এই ভেবেই যে তারা বুঝেছে নাৎসীবাদকে না রুখলে দুনিয়ায় কত বড় সর্ব্বনাশ।……

ভাগাসীই নরওয়ের প্রতিরোধের প্রতীক্।

*　　*　　*

● হিটলারের দর্প আজ চুর্ণ হতে চলেছে। একদিকে লালফৌজের হাতে মৃত্যুবাণ, অন্যদিকে শৃংখলিত দেশে দেশে বিদ্রোহের ধূমায়িত বহ্নি। হল্যাণ্ড…বেলজিয়াম…ইতালী…হাঙ্গেরী…কার্পাথো রাশিয়া…ছোটবড় সমস্ত দেশে মুক্তিকামী জনশক্তি মাথা তুলেছে। দুর্দমনীয় দেশপ্রেম আজ শত্রুর সামনে প্রতিরোধের ব্যূহ নির্মাণ করছে, মুক্তিকামী জনগণের পদক্ষেপ ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

পড়িবার মত নূতন বই

১। সোভিয়েট কৃষক – ধরণী গোস্বামী ॥৵০
২। গ্রামের গরীবদের প্রতি লেনিন ১৲
৩। Light on Soviet Land – Pat Sloan ৸০
৪। Soviet School Today— Deana Levin ।৹
৫। Indo-Soviet Journal Souvenir ১৲
৬। রামধনু—ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেস্কা (যন্ত্রস্থ)
৭। সোভিয়েটের গল্প-সংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)
৮। পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি (যন্ত্রস্থ)

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জনযুদ্ধে সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতি

হীরেন মুখার্জী

সোভিয়েটের নীতি খুবই স্পষ্ট

সোভিয়েট সম্বন্ধে একটা জিনিষ সকলেরই চোখে পড়তে বাধ্য। সোভিয়েটের নেতারা কখনও কেবল কথার জাল বুনে কাজ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন না। ভাষার ছটায় কাজের কথাকে চাপা দেওয়া তাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে। যুদ্ধজয়ের পর নতুন দুনিয়াকে সত্যই সম্ভব করতে হলে এখনই যা করা দরকার, সে বিষয়ে সোভিয়েট সর্ব্বদা সজাগ।

ফ্যাশিস্ট শক্তিপুঞ্জকে ধ্বংস করতে হলে যুদ্ধ আজ যে কায়দায় লড়তে হবে, সে কায়দা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও সোভিয়েটের মিত্রদের মুখপাত্র অনেকে দেশের লোকের মন ভোলাবার জন্য কল্পনাবিলাস করে থাকেন। চার্চ্চিলসাহেব বচনবাগীশদের মধ্যে একজন সেরা; রুজভেল্ট সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে গালভরা বুলি আউড়ে থাকেন। কিন্তু এঁরাই আবার ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলতে প্রায় দুই বৎসর দেরী করেন; ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম না করলে জাপানকে বিধ্বস্ত করা সম্ভব নয়, একথা বুঝেও বুঝতে চান্ না। যুদ্ধ জয়ের পর দুনিয়ার চেহারা কেমন হবে, তাই নিয়ে রঙীন ফানুস উড়িয়ে আজকের কর্ত্তব্য পালনে নিজেদের ঔদাসীন্যকে এভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে লুকাবার চেষ্টা হয়।

কিন্তু সোভিয়েটের নীতি খুবই স্পষ্ট। সোভিয়েট চায় যে যুদ্ধের পর যেন সর্ব্বদেশে জনশক্তি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর সোভিয়েট জানে যে, জনশক্তি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পাবে শুধু ফ্যাশিস্টদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়ে। ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করতে হলে আজ জনশক্তিকেই অগ্রসর হতে হবে; আর ফ্যাশিজম্ ধ্বংস করার পর জনশক্তি সর্ব্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠ হবে, নতুন দুনিয়া তখনই সম্ভব হবে। সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হল এই।

ইতালীতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে

বাদোলিয়ো সরকারকে সোভিয়েট যখন মেনে নিল, তখন অনেকেরই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বাদোলিয়োর মত 'পুরাণো পাপীকে' সোভিয়েট কেমন করে বরদাস্ত করবে একথা অনেকে ভেবেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েটের উদ্দেশ্য হল ফ্যাশিস্ট শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য ইতালীর জনসাধারণকে নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে মিত্রপক্ষের মতলব মাফিক সামরিক শাসন ইতালীর উপর চাপানো চলে না। ইতালীতে যখন অন্য কোন দলের সমষ্টিকে এখনই একটা সরকার হিসাবে খাড়া করা সম্ভব নয়, বাদোলিয়োর সরকার যখন হিটলারীদের বিরুদ্ধে লড়তে রাজী, সোভিয়েটের পরামর্শমত বাদোলিয়ো সরকারের গণতান্ত্রিক বনিয়াদকে যখন ব্যাপক করা চলে, তখন বাদোলিয়ো সরকারকে বাতিল করার অর্থ হয় না, তাতে ইতালীয় জনসাধারণই বিক্ষুব্ধ হয়। আর সোভিয়েট বলতে সঙ্কোচ করেনি যে বাদোলিয়ো লড়াইয়ে গাফিলি করলে তখনই তার সরকারকে বরবাদ করা যাবে। এইজন্যই ইতালীতে যারা প্রথমটা সোভিয়েটের এই সংকল্পের অর্থ বুঝতে পারেনি, তারাও আজ বাদোলিয়োর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে ফ্যাশিস্ট বিরোধী লড়াইকে জোরদার করার কাজে লাগছে।

সোভিয়েট মার্কস্‌বাদে বিশ্বাস করে ব'লে একই ধরনে একই নীতি সব দেশ সম্পর্কে প্রয়োগ করে না। ফিনলাণ্ড, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি নানা দেশে সেখানকার বিশেষ অবস্থা অনুসারে সোভিয়েটের নীতি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। একটা সনাতন, অচল, অটল, অপরিবর্ত্তনীয় নীতি সর্ব্বত্র সময় ও সুযোগ নির্ব্বিশেষে খাটাতে যাওয়া মার্কস্‌বাদের সঙ্গে খাপ খায় না।

ফিনলাণ্ডের কাছে শান্তির সর্ত্ত

ফিনলাণ্ডে নিছক্ ফ্যাশিস্ট সরকার থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট তাদের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত নিয়ে আলোচনা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে মানারহাইম—রাইটির ছায়া মাড়াবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে নি। এর কারণ হল এই যে ফিনলাণ্ডের জনসাধারণ ফ্যাশিস্ট অত্যাচারে এতই অবসন্ন যে লালফৌজ মানারহাইমের দাঁত একেবার ভেঙে না দেওয়া পর্য্যন্ত তারা মাথা তুলতে পারে না। কিন্তু সেদেশের সরকার যদি যুদ্ধবিরতির সর্ত্তগুলি মেনে নেয়। তাহলে সেখানকার ফ্যাশিস্ট শাসকদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না, যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের এগিয়ে চলার সুযোগ এসে যায়। এই ভয় আছে বলেই মানারহাইমের দল কিছুতেই শান্তির সর্ত্ত আন্‌ল না। সোভিয়েট তাই আর মিটমাটের কথা বলবে না, খাস ফিনলাণ্ডে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে ফ্যাশিস্ট দুঃশাসনদের লালফৌজ উচ্ছেদ করবে।

লণ্ডনের পোলিশ সরকার: উপেক্ষিত

পোলাণ্ডের যে তথাকথিত সরকার এখনও ইংরাজদের আশ্রয়ে দিনগুজরান করছে, সে-সরকার যথেষ্ট বদমায়েস প্রকৃতির হলেও মানারহাইমের তুলনায় হয়তো তাদের ভালোমানুষ বলা চলে। কিন্তু ঐ সরকারকে সোভিয়েট মেনে নেয়নি। এর কারণ হল এই যে পোলাণ্ডের দেশভক্তরা ঐ সরকারের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে, সোভিয়েটে পোলিশ দেশভক্তদের এক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, পোলিশ সৈন্য লালফৌজের পাশাপাশি লড়ছে। সুতরাং পোলাণ্ডে হিটলারীদের হারাতে হলে লণ্ডনে আশ্রিত ফ্যাশিস্টগন্ধী সরকারের সঙ্গে হাত মিলানোর দরকার নেই। সোভিয়েট নীতি পোলাণ্ড সম্পর্কে সেই হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

ভিন্ন দেশে ভিন্ন পদ্ধতি

চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার সোভিয়েটের বন্ধু, চেক্ যোদ্ধারা লালফৌজের সঙ্গে রয়েছে। তাই সেখানে ঐ সরকারকে সোভিয়েট আনন্দে মেনে নিয়েছে। হাঙ্গেরী, রুমেনিয়ার মত দেশের শাসক-সম্প্রদায় হিটলারীদের আছে এমনভাবে নিজেদের বিক্রয় করেছে, আর সেদেশে জনগণ নিপীড়নের চাপে এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে এতটা অসমর্থ যে লালফৌজ সেখানে হাজির হয়ে ফ্যাশিস্টপদলেহী শাসকদের দূর ক'রে জনসাধারণের স্বাধীনতাকে সম্ভব করবে। যুগোশ্লাভিয়াতে মার্শাল তিতোর নায়কত্বে বিরাট প্রতিরোধবাহিনী সেখানকার জনশক্তির উপরই নির্ভর ক'রে এতদিন ধরে বিপুল বীরত্ব ও রণকৌশল দেখিয়ে আসছে। তাই সোভিয়েট তিতোর সরকারকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে, জনসাধারণের স্বার্থ যে তিতোর হাতে নিরাপদ, তা জানে।

জনশক্তির হাতে যুদ্ধজয়ের চাবিকাঠি

একটু তলিয়ে দেখলে তাই আমরা সব সময়ই দেখতে পাব যে ফ্যাশিস্ট শক্তিকে চূর্ণ করাই আজ সবচেয়ে বড় কাজ বলে সোভিয়েট তার নীতি সেই অনুসারে স্থির করে চলেছে। যুদ্ধ জয়ের পদ্ধতিটাই আজ এমন, যে জনশক্তিকে টেনে না নিলে যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা থাকে না। জনশক্তিকে ভয় করে বলেই এতদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা ব্যাপারে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। জনশক্তিকে ভয় করে বলেই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করার গ্লানি গায়ে না মেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনও পর্য্যন্ত ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম করতে রাজী নয়, ভারতের জনশক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের নিদারুণ ভয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ব'লে সোভিয়েটের মনে এ ধরণের কুণ্ঠার কোন স্থান নেই। সব দেশের জনসাধারণকে লড়াইয়ে প্রকৃতভাবে টেনে এনে যথাসম্ভব শীঘ্র ফ্যাশিজমের ধ্বংস সাধন সোভিয়েটের উদ্দেশ্য। এ কথা মনে রাখলেই সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কারও মনে জাগতে পারে না।

সেবাস্তোপোলের রণক্ষেত্রে

সেবাস্তোপোলের পোড়ামাটিতে

আবার মুক্তির পতাকা উড়বে

সোভিয়েট জার্ম্মান লড়াইয়ের তখনকার ইতিহাস ঠিক আজকের মত নয়।

......সেদিন বিশ্বাসঘাতক নাৎসী আক্রমণ রুখতে গিয়ে লালফৌজকে পেছু হটতে হয়েছিল অনেকখানি, আর আজ......।

আজ নাৎসীবাহিনী পালাচ্ছে, লালফৌজ এগিয়েই চলেছে।

সেদিন সোভিয়েট নরনারী নিজের দেশে আগুয়ান শত্রুসৈন্যকে রুখতে গিয়ে নিজেদের রক্তে দেশেরই মাটি লাল করেছিলো, আর আজ......

—আজ সোভিয়েট ভূমির সীমান্তে অজস্র শত্রুসৈন্য ক্ষয় করে লালফৌজ ফ্যাশিস্ট জার্ম্মানীর পরাজয় আসন্ন করে তুলেছে।

যুদ্ধের গতি আজ বদলে গেছে। লালফৌজের এই বিজয় অভিযানের দিনে সোভিয়েটের গৌরবময় ইতিহাস যারা প্রাণ দিয়ে রচনা করেছে, তাদের কথা আজ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে......।

*   *   *   *

প্রায় আড়াই বছর আগের সেবাস্তোপোলের যুদ্ধফ্রণ্ট...

রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে এর প্রতিটি কাহিনী। নাৎসী ফৌজ দানবের মত মাসের পর মাস এর প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরেছে, অগণিত ফৌজ প্রাণও দিয়েছে...কিন্তু সেবাস্তোপোল হিটলারের দম্ভকে পরোয়া করে নি...। আড়াইশো দিন ধরে সমস্ত বিপদের মাঝেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো...

সেবাস্তোপোলের জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে তখন যুদ্ধ।

উত্তর দিকের একটি সেক্টরে জার্ম্মানরা একটা উঁচু ঘাঁটি দখল করেছে। সেখান থেকে কামান ছুঁড়ে লালফৌজের যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিফল করে দিচ্ছে।... শুধু তাই নয়, ঐ পথ ধরেই সহরের অভ্যন্তরে হানা দিতেও চলেছে।...

...মেলিনকভের ওপর ভার ঐ পথ আগ্‌লে রাখার।...পথ আগলে রাখা যাবে না, যদি ঐ উঁচু ঘাঁটি জার্ম্মানদের কাছ থেকে কেড়ে না নেওয়া যায়। আবার কেড়ে নেওয়ার আগে সামনের পথটুকুও অধিকার করা চাই।...সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ চলে...রাত্রে মেলিনকভ তার সাথীদের ডেকে অবস্থার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা চালায়। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, শত্রুকে কিছুতেই পার হতে দেবোনা, উঁচু ঘাঁটি দখল করবোই।...

রাত্রের লড়াইতে অনেক বীরই প্রাণ দেয়, জার্ম্মানরা এগোতে পারে না।

......জার্ম্মানরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, পরাজয়ের গ্লানি তাদের মরিয়া করে তোলে।

সাভ্রাকভ ও লাভরভ কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রির মত অটল।

পরের দিন জার্ম্মানরা আবার নতুনভাবে আক্রমণ চালায়। এবার তাদের সাথে সাতটা ট্যাঙ্ক।

মেলিনকভকে এগুলির পথ রোধ করতেই হবে... চিন্তায় তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

—পাঁচজন এগিয়ে আসে...শপথ নেয়, ট্যাঙ্কের পথ রোধ করবই।

...এরা পাঁচজনই কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সেনানী...।

মেলিনকভ এদের হাতে হাত মেলায়...মেলিনকভ দেখে এদের মুখে হাসি, অথচ সে জানে, এদের মৃত্যু অবধারিত......।

...হাতবোমা, গলিত আগুনের বোতল, রাইফেল আর কার্ত্তুজ—এই নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে পাঁচজনই।

...দূরে ফ্যাসিষ্টদের ট্যাঙ্কগুলি আসছে।

সোভিয়েট ভূমিকে এরা বিষিয়ে তুলেছে...। টিবুলকো তার ব্রেনগানের নিশানা ঠিক করে গুলি ছোঁড়ে...একজন ট্যাঙ্কচালক তখনি মারা পড়ে।...তবুও জার্ম্মানরা আর একটু এগোয়... পাঁচজনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে...কিন্তু এ বিপদ তো বিপদই নয়...ট্যাঙ্কের পথ রোধ না করলে কত বড় যে বিপদ!...তুমুল লড়াই চলে...জার্ম্মানরা দেখে এগোতে হলে আরো ট্যাঙ্ক চাই...এবার আসে আরো পনরখানি......আবার সুরু হয় তেমনি প্রচণ্ড লড়াই...

টিবুলকোর হাতবোমা দু'খানি ট্যাঙ্কের পথ রোধ করে...ক্রাসলোসেলকি গলিত আগুনের বোতল নিয়ে লাফিয়ে পড়ে দু'খানি ট্যাঙ্কের মাঝে...ট্যাঙ্ক দু'খানি অচল হয়ে যায়, কিন্তু ক্রাসলোসেলকির প্রাণ দিতে হয়। ...এদিকে টিবুলকোর একখানি হাতও উড়ে যায়...বাকী আর তিন জন...জার্ম্মানরা কিন্তু তখন এগোতেই পারেনি।

...ফিনচেঙ্কো তার কোমর বাঁধে, হাতবোমাগুলি শক্ত করে বেঁধে নেয়...ওডিনট্‌ভ ও পারসিনও ফিনচেঙ্কোর পাশে এসে দাঁড়ায়...তিনজনেই তৈরী...।

...অদূরে ঐ শত্রুর ট্যাঙ্কগুলি আবার এগিয়ে আসছে। তিনজন একবার শেষবারের মত হাত মেলায়...তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ চলন্ত ট্যাঙ্কের সামনে।......তুমুল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়... সাতখানি ট্যাঙ্ক গুঁড়ো হয়ে যায়.........

......অদূরে আর একদল লাল নৌসেনানী এগিয়ে আসে...জার্ম্মানরা আর এগোতে পারে না।

*   *   *   *

তখনকার মত লড়াই থেমে গেছে।

...সবাই জড়ো হয়েছে আহত বীর টিবুলকোর পাশে...মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু মরার আগে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য টিবুলকোর জ্ঞান ফিরে এলো ...অতি কষ্টে সে জানিয়ে গেল কি ভাবে তার বাকী চার জন সাথী প্রাণ দিয়ে নাৎসী ট্যাঙ্কের গতি রোধ

(২য় কলমে দেখুন)

(৪র্থ কলমের শেষাংশ)

করেছে। টিবুলকো মরেছে, ফিনচেঙ্কো মরেছে, ক্রাসলোসেলকি মরেছে, ওডিনট্‌ভ মরেছে, পারসিনও মরেছে...

...কিন্তু মৃত্যু তাদের অমর করেছে...

...সেদিনের সেবাস্তোপোল তিন লাখ নাৎসী ফৌজের কবর খুঁড়ে নাৎসীদের গ্রীষ্ম অভিযান ব্যর্থ করেছে... দম্ভের মুখে পদাঘাত করে তাকে উপহাস করেছে...বিধ্বস্ত, ক্লান্ত সেবাস্তোপোল সেদিন নতুন ইতিহাস রচনা করেছে...

*   *   *

আড়াই বছরের ব্যবধানে আজ আবার বিজয়ী লালফৌজ সেবাস্তোপোলের দরজায় ...সেদিনকার পোড়ামাটির সেবাস্তোপোলের সর্ব্বত্র আজ আবার লালপতাকা উড়বে...সেবাস্তোপোলের মাটি থেকে আজ উদ্ধত হিটলারীদের উৎখাত করা হচ্ছে...তাই সেদিনকার হাজার হাজার শহীদের মৃত্যুর স্মৃতি আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে...

ফ্যাশিস্ট বিরোধী লড়াইয়ের বীর যোদ্ধারা আজকের দিনে সেই স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে...

সমুদ্র মন্থন

সুধী প্রধান

"বাংলার দাবী" অফিসের বাইরের ঘরে বসে সতীশ খবরগুলি সাজায় আর ভাবে। ঘরের বাইরের ফুটপাতে বসে জগা পাগলা মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি সব বকে আর আকাশের দিকে মুখটা উঁচু করে থুথু ফেলে। থুথু ফেলা তো না, যেন দেওয়ালী পূজার তুবড়ী, বাষ্পের মত জলকণা তীব্রবেগে উপরে উঠে যায়, মনে হয় যেন একটা সরু জলের পিচকারী মারা হ'ল। পাগলাটার গায়ে এক কালে জোর ছিল নিশ্চয়। ঘুণধরা কাঠামোর প্রশস্ত হাড্ডি আর দীর্ঘ ঋজু শরীরের উপর চওড়া কপাল—আজো সে কথার পরিচয় দেয়।

এত সবল ও সুন্দর গঠনের লোকও শেষে পাগল হয়ে যায়। সতীশ ভাবে আর মনে মনে শিউরে ওঠে। সতীশও হয়তো একদিন পাগল হয়ে যাবে, হয়তো এই অফিসের সামনে এসে বসবে, আর সামনের ঐ ডাষ্টবিনের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বার করে খাবে শত মানুষের আবর্জ্জনা। জগা পাগলা তো না—যেন পাগল হরনাথ ঠাকুর—যাঁর নিরাসক্তিতে হাজার হাজার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর মুখের লালা চেটে খেত। ধার্ম্মিক লোকে বলে, পৃথিবীর উপর যার মায়া নেই, যার তত্ত্বমসি জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে—তাদের গুয়ে-গোবরে পার্থক্যবোধ থাকে না। না থাকুকগে তাদের পার্থক্য বোধ—কিন্তু একথা ভাবতেও সতীশের পেটের মধ্যে সহস্র কৃমি যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। বমির ভাব বন্ধ করার জন্য সে তাড়াতাড়ি একটা বিড়ি ধরায়।

কিন্তু পাগল হওয়া এমন কি আর বিচিত্র ব্যাপার। আজ পনেরো বছর ধরে সতীশ কলকাতায় আছে। কিন্তু গত দু'বছরে কলকাতার যা হাল সে দেখেছে তাতে মানুষের মাথা ঠিক রাখাই মুস্কিল। রাস্তায় চলতে চলতে সতীশ লক্ষ্য করে কত লোক বিড়বিড় করে বকতে বকতে চলেছে, কেউ হয়তো আপন মনে হেসে নিল, কেউ বা যেন কোন অভিনয়ের রিহার্সেলটা রাস্তাতেই সেরে নিতে চায়। কিন্তু পার্থক্য শুধু এই যে তারা জগা পাগলার মত রাজকীয় চালে চলে না, ডাষ্টবিনে আবর্জ্জনা কুড়ায় না, তারা সবাই ত্রস্ত, এবং ব্যস্ত-সমস্ত। সেদিন সতীশ দেখেছিল, ফুটপাত থেকে জগা পাগলার নিয়মিত অথচ মাঝে মাঝে শুদ্ধ একটা প্রবল চীৎকারে "যা যা গঙ্গায় ডুবে মরগে যা"—এক জন পথ চলতি লোক এমনি থমকে দাঁড়াল যে, মনে হল, তার সামনে যেন একটা মোটর প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক কষেছে, আর একটু হলেই ওকে চাপা দিত।

বেশীক্ষণ ভাবার সময় সতীশ পায় না। উপর থেকে সহকারী সম্পাদকদের তাড়া আসে—"খবরগুলি জলদি পাঠাও, সতীশ।" বিলাতের খবর তারে আসে, তার সঙ্গে টাইপরাইটারের সম্পর্ক। কিন্তু দেশের মধ্যেকার যে সব খবর আর লেখা আসে—সেইগুলি গোছাবার ভার সতীশের। চুরি, ডাকাতির খবর, চমকদার মামলা মোকদ্দমার খবর, নারীহরণের খবর, চালের দাম বাড়ার খবর। মাঝে মাঝে কোন কোন নেতার বক্তৃতা, বিবৃতি। সুন্দর বনে জাপানীরা নামলে বাঘেরা পালাবে না লড়াই করবে তার উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ। এগুলি পরপর সাজিয়ে, ক'কলম আন্দাজ ম্যাটার হবে, তার একটা স্লিপ লিখে সতীশ ওপরে পাঠিয়ে দেয়। বড় ঝামেলার কাজ, একটু ভুল হলেই কড়া কথা শুনতে হয়। সেবারে দত্ত-খাঁ কোম্পানীর ডিরেকটার, লাট-কাউনসিলের মেম্বার বাবর সাহেবের বিবৃতি হারিয়ে ফেলেছিল বলে ওর চাকরী যায় আর কি। বাবর সাহেবের সঙ্গে কাগজের মালিকের গলায় গলায় ভাব কিনা। রোজ সন্ধ্যা বেলায় একবার তাঁর আসা চাই-ই অফিসে।

* * *

চালের দর উঠেছে—লাট কাউনসিলে তাই নিয়ে মারামারি হচ্ছে। সতীশ কাগজে পড়ে—বাবর সাহেবের খুব কড়া কড়া বক্তৃতা। গতবার সব চাল সৈন্তরা খেয়ে ভূত হয়ে গেছে, এবার সরকারের অব্যবস্থায় সব চারা বেরিয়ে যাচ্ছে—এমনি সব যুক্তি। বুঝতে পারে না সতীশ সব কথা—গ্রামের স্কুলে মাইনর পাশ করে সে বড় স্কুলে ঢুকে ছিল মাত্র। কাগজে পড়েছিল এবার অনেক ধান হয়েছে, কিন্তু আজকাল মফঃস্বল থেকে খবর আসছে চালের দাম বাড়ছে। কেন? বাবর সাহেব নিশ্চয় সে সব খবর রাখেন। কাগজের মালিকের ঘরে নানা রং-বেরং-এর লোক আসে, তারাও মাঝে মাঝে এসব নিয়ে আলোচনা করে। তিনটি কথা সতীশ খুব শুনতে পায়—"মুসলমান, ইনফ্লেশান আর জাপান।" শুধু অফিসে নয়, কথা কটাকে সব যায়গাতেই সে শোনে; রাস্তা ঘাটে, ট্রামে বাসে সর্ব্বত্র। "সর্ব্বনাশ করলে এই ইনফ্লেশান। বাড়বে না জিনিষের দাম? নোটের তো আর বাপ মা নেই, ছাপিয়ে গেলেই হ'ল। আর মুসলমানগুলোরও লজ্জা নেই—সাহেবরা যা বলছে সব সায় দিয়ে যাচ্ছে।" কেউ কেউ বলেন: "জাপান এলেই বাঁচি মশায়, এত কালের বোঝা কোন রকমে একবার নড় চড় না হলে কি আর উপায় আছে!" আবার খাঁকি গান্ধী টুপি পরা আমেরিকান সৈন্তদের দিকে তাকিয়ে একজন বলে "নবাবী দেখেছেন ব্যাটাদের। জিনিষ-পত্র, গাড়ী ঘোড়ার ভাড়া একেবারে দুর্মূল্য করে দিলে গো।" "শুধু গাড়ী ঘোড়া কি বলছেন মশায় দেশটাই যে একেবারে নিয়ে এল—নাঃ ইংরেজ একেবারে গেছে। নইলে ওদের চোখের সামনে রুজভেল্ট নগর আর ওয়াশিংটন গ্রাম গড়া হয়—আর একটী রা ও করতে পারে না ব্যাটারা?" "দেখবেন এই ক্লাইভ ষ্ট্রীট কবে উইল্কী ষ্ট্রীট হয়ে যাবে।" সতীশের কাছে এসব বিচিত্র লাগে। জাপান যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমেরিকা দেশটী নিয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? অফিসের সামনে এসে দেখে জগা পাগলা একটা ময়লা চাপাটীর পোড়া কোনা চিবুচ্ছে আর বিড়বিড় করে কি বলছে।—সারা দেশটাই যদি জগা পাগলা হয়ে যায়—আশংকায় সতীশের গা-টা আবার বমি বমি করে ওঠে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরায়—

* * *

সতীশের অফিসে সেদিন বড় গোলমাল হয়ে গেল। ছাপাখানার লোক, দোতলার সাব এডিটার বাবুরা, কাগজ বিলানো পিয়ন-বেয়ারা, সবাই সেদিন মালিকের কাছে গিয়ে বলেছে "মাইনে বাড়াতে হবে বাবু নইলে আর চলছেনা। গ্রাম থেকে খবর আসছে চালের দর বাড়ছে, বেশী টাকা না পাঠালে এবারে আর কাউকে বাঁচানো যাবে না"। মালিক গম্ভীর হয়ে বল্লেন "যে যার কাজে চলে যাও—সে বিবেচনা আমি করছি"। "আজ্ঞে, আপনি এখনই একটা কথা দশ জনের সামনে বলে দিন না—এতে বিবেচনার কি আছে?" "বড় ম্যাজিষ্টার হয়েছ দেখছি। যা বলছি শোন, যে যার কাজে যাও, যা' করবার আমি করবখন। দশ জনে তো তোমরা এখানে কাজ করতে আসনি—একা একাই এসেছ। আর দেখ, এ কাগজের গোড়া থেকেই তোমরা অনেকে এর সঙ্গে , তাই তোমাদের উপর আমারও একটা মায়া জন্মেছে। আমার দ্বারা তোমাদের কোন অন্যায় হবে না—এখন যাও। আর ভবিষ্যতে দল বেঁধে এ রকম এস না বুঝলে?" শেষের কথা গুলি এমন নরম হয়ে বেরুল যে লোকগুলি যে যার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কেবল ডাক পড়ল সাব এডিটার শরৎ সেনের।

একটা মোড়া খাম এগিয়ে দিয়ে মালিক খাঁকিয়ে বল্লেন "এই নাও তোমার আগামী মাসের মাইনে, আর এখানে থাকা তোমার চলবে না।" শরৎ মুখ তুলতেই মালিক গম্ভীর স্বরে বল্লেন "আমি সব জানি। সেবারেও তুমি এমনি করেছিলে, তখন তোমাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম গরীব লোকের ছেলে, খেটে খাচ্ছ, কেন মারা পড়বে। কিন্তু সেকথা তুমি শুনলে না। দেশের লোকের দারিদ্র্য আমিও বুঝি, তার জন্য অনেক বার জেল ঘুরে এসেছি তাও তোমার অজানা নেই। কিন্তু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করে—এমনি লোক ক্ষেপানো, একে দেশ সেবা বলে না—যাও।"

* * *

কাল সারা দিন সতীশের বড় খাটনি গেছে। মালিকের মৃত বাপের বাৎসরিক ক্রিয়া কর্ম্মের দিন তাঁর বাড়ী খাওয়ান দাওয়ান ছিল। পুলিশের অনুমতি নিয়ে কিছু বেশী লোককে খাওয়ানো হয়েছিল আর হয়েছিল কিছু কাঙ্গালী ভোজন। প্রায় ৫।৭ শো কাঙ্গালী হবে।

কলকাতায় আবার অনেক কাঙ্গালী এসেছে—মালিক সেদিন তাই বলে আপশোষ করছিলেন যে এবারও বোধ হয় আবার দুর্ভিক্ষ হবে। এবার আর তাহলে কেউ বাঁচবে না। সতীশ ভাবে লোকটী সত্যিই ভাল। খাওয়ান দাওয়ান ব্যাপারে, দান দক্ষিণে, সভা সমিতিতে চাঁদা এসব বিষয়ে তিনি কখনো আপত্তি করেন না। সে সবই জানে সে। সতীশের হাত দিয়েই ত কত যায়—তবু সেদিন শরৎ বাবুকে উনি কেন তাড়ালেন সতীশ বুঝতে পারে না।···রাত্রিতে বাইরের বসার ঘরে সতীশকে মালিক ডেকে পাঠালেন। সতীশ গিয়ে দেখে বাবর সাহেব তাঁর সঙ্গে কি সব বলাবলি করছেন। সতীশকে দেখে মালিক বল্লেন: এঁর ড্রাইভারকে চেন তো? রাত্রে কয়েক গাড়ী মাল নিয়ে সে রাখবে কাগজের গুদামে, তুমি খুলে দিও বুঝলে? আর চাবীটা তুমি আজ রাত্রে তোমার কাছেই রেখ, কাল আমি নিয়ে নেব।" বাবর সাহেবের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বল্লেন: "সতীশ আমার বড় বিশ্বাসী লোক, আমার গাঁয়ের ছেলে, জানেন বাবর সাহেব, ও যখন ১৩।১৪ বছর বয়সে মা-বাবা হারালো, তখনি আমি ওকে নিয়ে আসি। ম্যাট্রিকটা পাস করা থাকলে আমি ওকে সাব-এডিটারই করে দিতাম। লাট কাউনসিল দেখেছিস সতীশ? একদিন বরং বাবর সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসিস। আচ্ছা, এখন দুটো ডাব নিয়ে আয়তো।" ডাব, বরফ, সিগারেট ও এমনি সব জিনিষ নিয়ে আরো কয়েকবার সতীশ আসে ঐ ঘরে। ওদের টুকরো টুকরো আলাপের রেশ ভেসে আসে সতীশের কানে: "বোম্বাইএ এত লক্ষ মণ চাল পুড়েছে, ইউ, পি ও পাঞ্জাবে ফসল খারাপ, দেখি কি করে রেশনিং চালায় বেটারা।···এত করেও বেটাদের কাণ্ডজ্ঞান হয় না, জাপানের হাতে দেশটা তুলে দেবে সেও ভাল তবু যদি আমাদের কিছু দেয়। তা আমরা ছাড়বো কেন? যত টাকা আমাদের হাতে আসে ততই মঙ্গল, পরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ক্যাপিটালের অভাব হবে না, দেশের লোক চাকরীবাকরী করে খেয়ে বাঁচবে।" বাবর সাহেব উঠতে উঠতে বলেন: "এদেশের লোকের মশায় কেউ ভাল করতে পারবে না, হাজার হাজার লোক না খেয়ে ম'ল তবু একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হল?" সতীশের আবার চিন্তা আসে। সাব-এডিটার শরৎ বাবুর কথা মনে পড়ে—গরীব কর্ম্মচারীদের মাইনে বাড়ানোর জন্য তার চাকরী গেল। সবাই মিলে তাহলে ঐ মালিককে গিয়ে মারলে ভাল হত না কি? নাঃ সতীশও শেষে জগা পাগলা হয়ে যাবে না তো। জগা পাগলাটা বড় নোংরা জিনিষ খায়—সতীশের গাটা আবার বমি বমি করে।

* * * *

ভোরের কাগজ সবেমাত্র হকাররা নিয়ে গেছে। সমস্ত দিন রাত্রির পর বাড়ীটা একটু শান্ত হয়েছে—সতীশ এবারে ভাল করে ঘুমুবে। রোজ ভোরের এই ঘুমটী আজকালকার এই পচা গুমোট কলকাতায় সতীশের বড় ভাল লাগে।···তন্দ্রায় সতীশ দেখছে সে যেন কোন বরফের দেশে গেছে, সেখানে কেবল চারিদিকে সবুজ ঘাস আর গাছপালা। পাতার ফাঁক দিয়ে তুলোর আঁশের মত তুষারের কণাগুলি ঝরে পড়ছে। আঃ কি আরাম।···হঠাৎ যেন কোথা থেকে মেঘ ডেকে উঠলো, দুড়দাড় দুড়দাড়—

বাইরের দরজায় ঘন ঘন আঘাতে সতীশের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিতে দেখে ফুটপাত আর বারান্দা ভরে গেছে পুলিসে। একজন দারোগা গোছের লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার বড় বাবু কোথায়?" "বাড়ীতে।" "ফোনে খবর দাও, আর ঘরের চাবিগুলি দেখি।" সতীশ ইতস্তত করতে দারোগা আদেশ করলেন, "রহমান ওকে সার্চ্চ কর।" সতীশের ফতুয়ার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বেরিয়ে এল—তারমধ্যে আছে সেই পিছনের কাগজের গুদামের চাবি, যেখানে দত্ত-খাঁ কোম্পানীর মাল থরে থরে সাজানো। বস্তার ফুটো থেকে যে চালগুলি ঝরে পড়েছিল, সতীশের সেগুলি ভাল বলেই মনে হয়েছিল।

সমস্ত ঘরই তন্ন তন্ন করে দেখা হ'ল। সতীশ দেখলো কেবল সেই দিকেই কেউ যায়নি। বেটারা বোধ হয় জানেনা। ইতিমধ্যে মালিক এসে পড়েছিলেন। মুখ

(শেষাংশ ১৪পৃঃ দেখুন)

নূতন সাহিত্যের ভূমিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বাংলা সাহিত্য শক্তিতে, দৃঢ়তায়, নূতন বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ও তীক্ষ্নতায় তেজ, বল ও স্বাস্থ্য লাভ করেছে। আজ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে বিপর্য্যয় নেমে এসেছে, যার ভয়ঙ্করত্বের তুলনা ইতিহাসে নেই, সেই বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আধুনিক বাংলা সাহিত্য স্থৈর্য্য হারায় নি; ধীরস্থিরভাবে সে এই বিপর্য্যয়ের সকল রূঢ়তা, সকল দুঃখ, সকল বীভৎসতা, সকল আতঙ্ককে গ্রহণ করেছে, উপলব্ধি করেছে, এবং সেই উপলব্ধির ফলে সে জীবনীশক্তির প্রেরণাময় সংকেতকে ভাষায় বাঙ্ময় ক'রে তুলেছে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্যে একটা ঘোরতর রূপান্তর আসন্ন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ অভাবনীয়রূপে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জীবনপথে দুর্গমতম স্থানে এসে পৌঁছেছি—সম্মুখে একটা খাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র পৃথিবীর মানব-সমাজকে হয় প্রাণপণ শক্তিতে জীবনের সম্মুখে চলার বেগ সম্বরণ ক'রে পিছনের দিকে চলতে হবে, অথবা লাফ দিয়ে ওপারের সমতলক্ষেত্রে পৌঁছুতে হবে। বড় জোর আত্মসম্বরণ ক'রে কিছুদিনের জন্য মানুষের সমাজ এই স্থানেই জটলা পাকাতে পারে। কিন্তু পিছনে ফেরা বা ওপারে পৌঁছানোর প্রশ্ন আবার কয়েকদিন পরে আসবেই। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সেই সমস্যা। কিন্তু পিছনের পথের যে দুঃসহ দুর্ভোগের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা মানুষ অন্তরে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে, যে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা তার অতীত ইতিহাসের স্মৃতিকে তার কাছে তিক্ত ক'রে তুলেছে, যে অসাম্যের অস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের গতিছন্দ ব্যাহত হয়েছে, যে অকল্যাণের গ্লানিতে সে অসহনীয় দৈহিক এবং মানসিক দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পিছনে ফিরতে সে চাইবে না। পিছনে ফেরা স্বাভাবিকও নয়। অতীতকালের সকল বিশ্বাস সকল প্রত্যাশা আজ আমাদের শিথিল হয়ে গেছে। এই মহা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতম বীভৎসতার পটভূমিতে উলঙ্গ বাস্তবসত্যের সঙ্গে আমারা মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। একদিকে আমরা অনাহারে তিলে তিলে স্ত্রীপুত্রকন্যাকে মরতে দেখেছি, অন্যদিকে দেখেছি স্তুপিকৃত খাদ্য-দ্রব্যকে আড়াল ক'রে মহাজন বসে আছে লাভের প্রত্যাশায়। আমরা চীৎকার ক'রে ডেকেছি, পাপের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ বিপন্ন হয়েছে তুমি এস; কিন্তু সে আশা আমাদের পূর্ণ হয় নি। শুধু উলঙ্গ-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে, বৈষম্যমূলক বিধানের সুযোগে এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। মহামারীতে মরতে মরতে উপলব্ধি করেছি, কোন অনিবার্য্য অনির্দ্দেশ্য নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে আজ মৃত্যুপথযাত্রীর এই দেশজোড়া মিছিল ঘটে নি,—আমরা মরেছি খাদ্যাভাবে, অভক্ষ্যভক্ষণে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধে আমরা মরেছি, অদৃষ্ট আজ দৃষ্ট প্রত্যক্ষ। আকাশে উড়ছে মৃত্যুগর্ভ বোমার প্লেন, সে বোমার মৃত্যু অদৃষ্ট নয়। সে আজ বুঝেছে যে, যুদ্ধ মহাকালের লীলারহস্য নয়, বৈষম্যবাদের চরম পরিণতি। আরও বহুতর অভিনব উপলব্ধির ফলে এতকালের সকল বিশ্বাস আজ তাসের ঘরের মত কাঁপছে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটা অতিবাস্তব ছোট কথার উল্লেখ করলে বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে। বিষ্ণুদেবতার আকাশচারী গরুড়, রাবণরাজার পুষ্পকরথ, আরব্যউপন্যাসের উড়ন্ত যন্ত্রবাক্স, কি কলের ঘোড়ার কল্পনার রঙ মানুষের কাছে ফিকে হয়ে গিয়েছে; দ্বৈপায়নহ্রদে দুর্যোধনের আত্মগোপন, এ যুগের সাবমেরিনবিহারী মানুষের কাছে আর বিস্ময়ের উদ্রেক করবে না। সুতরাং এই বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনদর্শনের যে মহাপরিবর্ত্তন ঘ'টে যাচ্ছে, তার ফলে পুরাতন জীবনাদর্শে বা জীবন ভাবনায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। নূতন জীবনভাবনার সঙ্গে নূতনভাবে ভাবিত সাহিত্যের ভূমিকা রচিত হতে আরম্ভ করেছে। বহু বেদনা, বহু শোকাবহ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই সাহিত্য বহু ক্ষেত্রে আমাদের এতকালের বিশ্বাসের উপর নিষ্ঠুর আঘাত করবে; এতকালের সংস্কারের যে আশ্বাস আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে সাহিত্যের রূঢ় বাস্তব তার বিরোধী ব'লে প্রথম প্রথম আমাদের বেদনার কারণও হবে; কিন্তু তবু তাকে মানুষের গ্রহণ না ক'রে উপায় নেই। মানুষ আজ সকল দুঃখ, সকল অস্বাচ্ছন্দ্য, সকল অকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সকল অসত্য, সকল মিথ্যার হাত থেকেও মুক্তি চায়, সাহিত্যের বাণী সেই মুক্তির বাণী।

বিশ্বযুব আন্দোলন ও ভারতবর্ষ

"ফ্যাশিবাদের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কারণ আমরা মনে করি যে ফ্যাশিবাদ মানবসমাজের সমস্ত সুস্থ মনোবৃত্তির শত্রু।…আজ আমাদের প্রধান কাজ যুদ্ধক্ষেত্রে এই শত্রুকে পরাজিত করা।

"কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার সমস্ত সঙ্গীকেও নির্ম্মূল করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতার অধিকার আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।"

তাই "আমরা দাবী করিতেছি যে, জাতীয় সম্মিলিত সরকারের প্রতিষ্ঠার জন্ম এবং ভারতীয় জনসাধারণকে স্বাধীনতার ভিত্তিতে মিত্রশক্তির পক্ষে পাইবার জন্ম গ্রেট বৃটেন এখনই কথাবার্ত্তা শুরু করুক।"

এই দাবী ঘোষণা করা হয় বিশ্ব যুব কাউন্সিলের তরফ থেকে। ১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক যুব সম্মেলনে এই কাউন্সিল গঠিত হয়। এই সম্মেলনে এবং এর আগে ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র সমাবেশে (১৯৪২) পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতিনিধিরা এই নীতি গ্রহণ করে। শ্রীযুত তারিক চৌধুরী বিশ্ব ছাত্র কাউন্সিলের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, তিনি ভারতে ফেরবার পর বলেন যে কাউন্সিলের সভায় সোভিয়েট ইউনিয়নের পর ভারতীয় প্রতিনিধিরা সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন পেয়েছেন।

বিশ্ব ছাত্র কাউন্সিলের এই ঘোষণায় প্রত্যেকটী ভারতীয় যুবক প্রত্যেকটী স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী আনন্দিত হবেন—গৌরবান্বিত হবেন। কিন্তু স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন তাঁহাদের মনে জাগবে যে এই ঘোষণার মূল্য কতটুকু? আজও চার্চ্চিল আমেরীর দল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে, আজও পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের নেতারা তাদের এই আত্মঘাতী নীতিকে ব্যর্থ করতে পারছে না; হয়ত চেষ্টাও করছেন না। বয়োজ্যেষ্ঠদের এই দম্ভ অথবা নির্লিপ্ততার মধ্যে আদর্শবাদী ছাত্র আর যুবকদের ঘোষণায় আমরা আনন্দিত হলেও প্রকৃত আশার কোন কারণ আছে কি?

পৃথিবীর দিকে চাইলে আমরা দেখতে পাব যে গত পাঁচ বৎসরের যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন বিশ্বের ছাত্র ও যুবক সমাজের চেহারায়ও এনেছে আমূল পরিবর্ত্তন। এরা সে তরুণের দল নয় যাদের অধ্যয়নই ছিল তপস্যা,

বিশ্ব ছাত্র সংঘের প্রথম সম্পাদক ক্লুগম্যান

বর্ত্তমান যাদের ছিল পাখীর পালকের মত হালকা, আর ভবিষ্যৎ যাদের ছিল সোনালী আকাশের মত রঙ্গীন। বর্ত্তমানে দায়িত্বহীন তাদের হয়ত সমস্ত সদিচ্ছাই ছিল আদর্শবাদী হৃদয়োচ্ছ্বাস।

বিশ্ব যুব কাউন্সিলের সভায় যারা এসেছিল তাদের অনেকেরই গায়ে ছিল সামরিক পোষাক, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে এরা মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়েছে, জীবনকে চিনেছে। এদের সব হৃদয়োচ্ছ্বাস শেষ হয়ে গেছে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সেখানে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক বকদের প্রতিনিধি যারা প্রতিদিন ফ্যাক্টরীতে নির্দ্ধারিত করছে যুদ্ধের গতি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। এরা কারা? এরা আজকের সৈন্য কালকের সেনাপতি, এরা আজকের শ্রমিক কালকের নেতা, এরা আজকের ছাত্র কালকের শিক্ষক। এরাই আগামী পঁচিশ বছরে নিজের নিজের দেশের সমস্ত দায়িত্ব নেবে, পৃথিবীর আগামী ২৫ বছরের ইতিহাস তৈরী করবে।

শুধু ভবিষ্যতে নয় আজও এরা রয়েছে নিজের নিজের জাতির জীবনে সবচেয়ে দায়িত্বশীল কাজে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের যুবশক্তির মধ্যে "লক্ষ লক্ষ জন ক্লাসঘর গবেষণাগার ছেড়ে স্থান নিয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে, বই রেখে তুলে নিয়েছে রাইফেল। …দেড় লক্ষ ছাত্র লেখাপড়ার সাথে সাথেই সাহায্য করছে খনিতে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে। হাজার হাজার ছাত্র তাদের গবেষণাগারে আবিষ্কার করছে নূতন নূতন তথ্য, সমাধান করছে নূতন নূতন সমস্যার —যার মূল্য আজ যুদ্ধের পক্ষে অসামান্য।…এই যুদ্ধের মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার জন বিজ্ঞানের ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণ করেছে"—(সোভিয়েট যুব সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশারের বক্তৃতা—নবেম্বর, ১৯৪২)।

সোভিয়েট প্রতিনিধিদের পাশে ছিল চীনের প্রতিনিধিরা—যাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের দান আজ পুনরাবৃত্তির অবকাশ রাখে না, আজও যাদের সাহায্য ছাড়া চীনের ৪০ কোটী জনসাধারণকে জাগাবার কাজ প্রায় অসম্ভব হত।

যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর বাহিনী বিশ্বের চমক লাগিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ জনগণের অপরাজেয় শক্তির প্রমাণ দেখিয়েছে। মার্শাল টিটোর সেই বাহিনীর প্রতি তিন জনের দু'জনই ছাত্র এবং যুবক। শুধু যুবকদের নিয়ে গঠিত অন্ততঃ ২০টী ব্যাটেলিয়ন আছে যাদের কাজ সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলি করা।…এদেরই একজন পেয়ো ভাসেভিক্ আজ মণ্টেনিগ্রোর সমস্ত গেরিলা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, আর একজন উগলেজা দানিলোভিক্ বসনিয়ার প্রধান সেনাপতি। (সোভিয়েট যুব সম্মেলনে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি ভেলিমির হবালোভিকের বক্তৃতা)।

নরওয়েতে নাৎসীদের পুতুল কুইশলিং যখন চেষ্টা করিল প্রত্যেকটী শিক্ষায়তনকে ছোট ছোট কুইশলিং তৈরীর কারখানায় পরিণত করার, জার্ম্মানভাষা শিক্ষা হোল বাধ্যতামূলক, কুইশলিং-এর ছবি স্থান পেল প্রতিটী ক্লাস ঘরে তখন নরওয়ের সমস্ত "ছাত্র এবং শিক্ষক তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। স্বাধীন নরওয়েবাসীর জীবনে নাৎসী শাসনই প্রথম দাসত্ব, আর ছাত্র শিক্ষকদের সেই বিরাট আন্দোলনই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুরু। শিক্ষা মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্ম ছাত্র শিক্ষকের এই আন্দোলন জন্ম দিয়েছে অধিকৃত ইউরোপের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামের। সেদিনকার ছাত্র এবং শিক্ষকরাই আজ নরওয়ের তুষারাবৃত বনে অসংখ্য গেরিলা বাহিনীর পুরোভাগে।

অধিকৃত ইউরোপের স্বাধীনতা সংগ্রামে বে-আইনী সংবাদপত্রের স্থান অতুলনীয়। এদেরই মধ্যে একটী প্রধান কাগজের নাম 'প্রহরী'। এর ২০,০০০ কপি প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ পাঠকের কাছে স্বাধীনতার বাণী বয়ে নিয়ে যায় আর এ কাগজ চালায় যুবকরা।

ফ্রান্সে নাৎসী অধিকারের প্রথম কেন্দ্র প্যারী শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নাৎসীরা দুজন ফরাসী অধ্যাপককে তাড়িয়ে দুজন জার্ম্মানকে দিয়ে ইহুদী বিরোধী প্রচারের ব্যবস্থা করে তখন ছাত্ররা একবাক্যে ক্লাস ছেড়ে চলে আসে এবং নানা রকমে জার্ম্মান পণ্ডিতদের পড়ান অসম্ভব করে তোলে। তখন ফ্রান্সে নাৎসী অধিকারের প্রথম যুগ, তারপর হিটলারের ক্রীতদাস লাভাল যখন ফরাসী যুবকদের জোর করে জার্ম্মানীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তখন ফ্রান্সের যুবসম্প্রদায়ের বিক্ষোভ কি বিরাট আকার ধরেছিল তা আজ কারও অজানা নেই। সেই বিক্ষোভেরই অঙ্গ হিসাবে, দলে দলে যুবকরা হট্ স্তাভয়ের গিরি কন্দরে আশ্রয় নিয়ে মাসের পর মাস হাজার হাজার নাৎসী সৈন্যের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল—সে বীরত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

খাস জার্ম্মানীতে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, এপ্রিল মাসে আরও তিনজনকে। যে ছাত্ররা হিটলারের সিংহাসনের ঠিক নিচেই তার কবর খুঁড়ছে এরা ছিল তাদেরই নেতা। জার্ম্মান গোয়েন্দা বিভাগ নিজেই স্বীকার করছে যে এরা "১৯৪২ এবং '৪৩" সালে ব্যাপকভাবে ইস্তাহার ইত্যাদির সাহায্যে অস্ত্রকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়েছে।" জাপানে কিছুদিন আগেও তোজো শিক্ষাবিভাগের 'সংস্কার সাধন' করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বলিষ্ঠতরভাবে' মিলিয়েছে অর্থাৎ ছাত্র শিক্ষকদের জেলখানার কয়েদী করতে চেষ্টা করছে কারণ জাপানের ছাত্রদের মধ্যেও 'বিপজ্জনক বিদেশী মনোভাব' দেখা দিয়েছে। সামুরাই নীতির বিরুদ্ধে এই নীরব সংগ্রামের জন্য গত ৫ বৎসরে শত শত ছাত্র এবং শিক্ষককে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এদেরই প্রতিনিধিরা এসেছিল বিশ্ব যুব কাউন্সিলের সভায়, তাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আজ ভারতের স্বাধীনতার দাবী। এদের কথার মূল্য এইখানে যে, এরা প্রাণের মূল্য দিয়ে সে কথা বলার অধিকার অর্জ্জন করেছে। এদের গুরুত্ব এইখানে যে, এরা শুধু ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী নয়, বর্ত্তমান রূপ নিচ্ছে এদেরই হৃদয়ের রক্তে, হাতের কাজে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে, অধিকৃত ইউরোপের পাহাড়ে জঙ্গলে, প্রত্যেক দেশের খনিতে কারখানায়, স্কুলে ল্যাবরেটরীতে সারা জীবন দিয়ে লড়ছে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্ম তারাই এসে দাবী তুলতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্ম, দাড়াতে পেরেছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশে।

স্পেনে ফ্যাশিস্ট হামলার সময় ছাত্র সমাজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ সরকারের তোষণনীতির বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, আর তারাই ১৯৩৮ সালে লেবার পার্টি সম্মেলনে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব আনে, ১৯৩৯ সালে বিলাতে ন্যাশনেল ইউনিয়ন অব ষ্টুডেণ্টস্-এর সভায় একটী রক্ষণশীল ছাত্রের প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আজ বিলাতে ভারতের মুক্তির দাবীর সমর্থনে যে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে তার এক বিরাট অংশীদার হচ্ছে বৃটেনের ছাত্র সমাজ।

রমেন ব্যানার্জি

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিরুদ্ধে যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে তার মধ্যে মিঃ ফোর্ডের মত ফ্যাশিস্টপন্থী ধনকুবেরের সঙ্গে রয়েছে সেই সমস্ত রাজনীতিকরা (সাদার্ণ ডেমোক্রাট্স্) যাদের রুজভেল্টের বিরুদ্ধে প্রধান রূপ এই যে, তিনি নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্যের সমস্ত আইন তুলে দিচ্ছেন বা দিতে চান। তাই রুজভেল্টের পিছনে আমেরিকার যুব কংগ্রেস সমবেত হয়েছে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ফ্যাশিস্ট চরদের বিরুদ্ধে। আর এই আমেরিকান যুব কংগ্রেসের আহ্বানেই আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র সম্মেলন ওয়াশিংটন শহরে ভারতের জন্ম স্বাধীনতা দাবী করে।

আজ বাংলার মাটীতে জাপানের পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ছাত্র এবং যুবকদের শেষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের স্থান কোথায়, শক্তি কোথায়। শুধু জাতীয়তার ঐতিহ্য নয়, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের ডাক নয়, ১৯৪৪-এর মে দিবসে আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, বিশ্বের যুব শক্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের স্থান জাপ ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে, জাপানীদের ভবিষ্যৎ আমাদের জ্বলন্ত প্রতিরোধের নরকে।

নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়ছে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে, তারাই চাইছে ভারতের স্বাধীনতা। আমরা যারা ভারতের স্বাধীনতা চাই তারা এর কি উত্তর দেব?

(১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তার চিন্তাগ্রস্ত, রেখাগুলি দৃঢ় হয়ে উঠেছে কপালে চাড়া দিয়ে। দারোগা বাবু আর দুজন সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোককে নিয়ে তিনি তার ঘরে ঢুকলেন। কি সব কথাবার্ত্তা হল সতীশ জানেনা—সে কেবল তিনটে ডাব দিয়ে এসেছিল মাত্র।…কিছুক্ষণ পরে তারা সব একে বেরিয়ে গেলেন, পিছনে গেল বেহারী সেপাই আর জমাদারেরা খইনির ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তারা চলেছে, সাত পুরু ধুলো যেন ওদের হাতের তলায়। সেই গুদাম ঘর যেমন বন্ধ ছিল তেমনি আছে—প্রেস আবার তেমনি শান্ত, তেমনি নিস্তব্ধ, রাস্তায় কেবল ২।১টী প্রাতঃস্নানার্থী চলাচল করছে জগা পাগলা বাইরে বসে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে "যা ডুবে মরগে যা"—আর সেই তুবড়ি মত "থু-ওউ।"

কমিউনিষ্ট নেতা আর্কোলির আহ্বান

সর্ব্বাগ্রে হিটলারকে পরাস্ত করো

গত ১১ই এপ্রিল ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড আর্কোলি এক বক্তৃতায় বলেন :—

ইতালির যুদ্ধপ্রচেষ্টা সংগঠিত করা এবং ইতালি হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করা—এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জাতীয় ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা আজ এই মুহূর্ত্তের সাময়িক কর্মসূচি হিসাবে এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। যে সমস্ত দল ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত, তাহাদের বৈধতা স্বীকার করিয়া প্রগতিমূলক গণতন্ত্র স্থাপন করা—ইহাই কমিউনিস্টদের ব্যাপক লক্ষ্য।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরাইয়া ইতালির সমস্ত অধিবাসীকে আজ হাতে হাত মিলাইয়া মুক্তি যুদ্ধে এক সাথে লড়িতে হইবে।

টুরিন শহরে আগের সপ্তাহে নাৎসী ফ্যাশিস্টরা গোলন্দাজ বাহিনীর একজন সেনানায়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, একজন মজুর ও একজন পুস্তক বিক্রেতাকে হত্যা করিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, উত্তর ইতালির সকল শ্রেণী কিভাবে মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইতেছে। দক্ষিণ ইতালির অধিবাসীদেরও আজ সত্যকার যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তার জন্য আজ জাতীয় সমর গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন—এই জন্যই কমিউনিস্টরা রাজতন্ত্রের সমস্যা সম্প্রতি স্থগিত রাখিয়াছে।

দীর্ঘকাল যাবৎ রাজতন্ত্র বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজে শুধু যে অবহেলা করিয়াছে, তাহাই নহে—বরং এই কাজ পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু আজ যদি আমাদের সমস্ত কর্মপন্থা কেবল মাত্র রাজতন্ত্রের প্রশ্নে আচ্ছন্ন করি, তাহা হইলে আমরা কোন মীমাংসায় পৌঁছাইতে পারিব না।

বারি শহরের সম্মেলনে সমস্ত ফ্যাশিস্ট-বিরোধী দলগুলির মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ঐক্য বজায় রাখা ও তাহাকে শক্তিশালী করাই কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য।

ইতালীর জনসাধারণ আজ বিচলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। তাহারা এই সর্বনাশ হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিতেছে। দেশবাসীকে এই মুহূর্ত্তে নেতৃত্ব দিতে না পারিলে কমিউনিস্টরা, তাহাদের কর্তব্যে অবহেলা করিবে।

আমরা সকলেই জানি, এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া একার পক্ষে অসম্ভব! জার্মানদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে সমবেতভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের পতাকার নীচে শ্রমিক-শ্রেণীর পাশে সংহত হইয়া দাঁড়াইবার জন্ম আসুন আমরা ইতালির প্রত্যেক অধিবাসীকে আহ্বান জানাই।

গবর্ণমেণ্টে আমাদের প্রবেশ করা না করার প্রশ্ন আজ মুখ্য নয়। সৈন্যবাহিনী, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, ফ্যাশিস্ট বিতাড়ন এবং গণতন্ত্রমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা : এই বিষয়গুলির উপর আজ বলিষ্ঠ কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন।

ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কৃষকদের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে কমিউনিস্টরা তাহার ব্যবস্থা করিবে। কমিউনিস্টরা বক্তৃতা, সংগঠন ও ধর্মসম্পর্কে প্রত্যেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের স্বার্থে কমিউনিস্টরা ভূমিস্বত্ব সংস্কারের ব্যাপক ব্যবস্থা করিবে। কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণতন্ত্রের জন্ম সমানে দাবী জানাইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ খাঁটি লোককে তাহার মত প্রচারে বাধা দিবে না। মিথ্যার মুখোষপরা যে গণতন্ত্র ফ্যাশিজমের পথই প্রশস্ত করে, কমিউনিস্টরা সেরূপ গণতন্ত্র চায় না। ইহার পরিবর্তে তাহারা সুসংহত গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চায়।

কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপক পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। কৃষকদের মধ্য হইতে সেরা লোকদের সমর্থনে পার্টিকে জনগণের এক বৃহৎ পার্টিতে পরিণত করিতে হইবে। ইতালির দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ ও খাঁটি ঐতিহ্য কমিউনিস্ট পার্টি বহন করিয়া চলিয়াছে। এবং ইতালির ঐক্যবদ্ধ জনগণের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

—গত ২৩শে এপ্রিল খবরের কাগজে প্রকাশ, কমিউনিস্ট নীতি অনুযায়ী বাদোলিও-র নেতৃত্বে ইতালিতে সর্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জনযুদ্ধ—১০ই মে, ১৯৪৪ — ২৭শে বৈশাখ, ১৩৫১ [৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

বিনাসর্ত্তে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিলাভ

গান্ধীজির মুক্তি—ভারতের মুক্তির সূচনা

অন্য সব কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী কর

দেশরক্ষার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম আরম্ভ কর

গত শনিবার গান্ধীজি বিনাসর্ত্তে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি খুব অসুস্থ। পুণার "পর্ণকুটি" নামে বাড়ীতে আপাতত তাঁকে রাখা হয়েছে। শরীরের অবস্থা আরও ভাল না হলে তাঁর পক্ষে কোনো আলোচনা করা বা কাজেকর্ম্মে মন দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

সমগ্র জাতি অতন্দ্র চোখে প্রহর গুনছে। তার জীবনের মর্ম্মকেন্দ্র আজ পুণার পর্ণকুটিতে। সে জীবন এখন ক্ষীণ, তাই উদ্বেগে দেশবাসীর বুক কাঁপছে। কিন্তু যারা নিকটে এবং যারা দূরে, সেই লক্ষ-কোটী নরনারীর স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া গান্ধীজিকে ঘিরে আছে। তাঁকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পাওয়ায় দেশময় যে দুর্দম প্রেরণা জাগল, তাই আজ বিরাট প্রাচীরের মত সমস্ত অমঙ্গলের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। অমঙ্গল পরাস্ত হবেই। নব সূর্য্যের দীপ্তিতে গান্ধীজির জীবন আবার জ্বলে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবনও।

সত্যিই দেরী করবার আর এক মুহূর্ত্তও সময় নেই। সমরনায়কদের আশাপূর্ণ স্তোকবাক্য সত্ত্বেও জাপবিরোধী বাহিনী বুথিডং থেকে হঠে এসেছে, কোহিমার অবস্থা বোঝা যায় না, ইম্ফল এখনও প্রায় অবরুদ্ধ। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ ক্ষতবিক্ষত। নিষ্ঠুর দমননীতির প্রতি তিক্ততায় আর ভ্রান্ত সংগ্রামের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় দেশভক্ত সৈনিকরা ভগ্নোদ্যম। জাতির একমাত্র শক্তি জাতীয় ঐক্য—তা গড়ে তুলবার ভরসা কারও নেই। সবাই আজ স্তব্ধ আগ্রহে চেয়ে আছে সেই রোগজীর্ণ মানুষটীর দিকে। শুধু গান্ধীজিই তাদের এনে দিতে পারেন নতুন প্রেরণা ও নতুন চেতনা। এবং তিনি দেবেনই সে ভরসা সকলেই রাখে।

পরিবর্ত্তনের প্রথম সূচনার পরম ক্ষণেই গান্ধীজি বাইরে এসেছেন। দেশের মাটিতে জাপানীর হিংস্র আক্রমণ প্রদেশে প্রদেশে দেশ-ভক্তের চিত্তকে নাড়া দিয়ে নতুন ভাবে ভাবাতে আরম্ভ করেছে; আসাম ও ইউ-পিতে গান্ধীজিরই সেনানায়কদের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে দেশরক্ষার জন্যে সকলে প্রস্তুত হও, সকলে একতাবদ্ধ হও, কারণ মহান্ কংগ্রেসের আদর্শ তাই-ই। এসেম্বলিতে কংগ্রেস ও লীগ এক হয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করেছে। বাংলার কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে দেশবাসীর খাদ্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে হবে কারণ নিষ্ক্রিয় সমালোচক হয়ে বসে থাকা কংগ্রেসের আদর্শ নয়। আজ প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি এঁদের সকলকে সহস্রগুণ বল দেবে, ঐক্যের সূচনাকে সার্থক করবে, সক্রিয় সংগ্রামে পরিচালিত করবে।

পৃথিবীর দিকে দিকে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জনগণের অশ্রান্ত পদধ্বনি। জয়ের পর জয়ের পথে তারা এগিয়ে চলেছে। সেই জয়েরই প্রতিধ্বনি গান্ধীজির মুক্তিতে। শ্রেষ্ঠ নেতার শক্তি ও নির্দ্দেশে সঞ্জীবিত হয়ে ভারত আজ পৃথিবীর সংগ্রামে পতাকা বহন করবে, অন্য সমস্ত নেতাকে ছাড়িয়ে আনবে, জাতীয় সরকার ও জাতীয় প্রতিরোধ অমোঘ হয়ে উঠবে।

আমার মনে হয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একমাত্র নির্ভূল পথ হইতেছে, কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবর্গের মুক্তি দেওয়া, সমস্ত দমন-নীতি-মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা এবং আপোষ মীমাংসার বিষয় উদ্ভাবন করা।

(বড়লাটের কাছে গান্ধীজির চিঠি)

★ ★ ★

"এখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি কোন প্রস্তাব করি ইহা যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সঙ্গে রাখুন। এই অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য মনস্থির করিতে আমি অবশ্যই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

[উপবাসের ঠিক আগে বড়লাটের কাছে লেখা গান্ধীজির চিঠি।]

সম্পাদকীয়

পাঞ্জাবী রাজনীতি

জিন্না সাহেবের পাঞ্জাব অভিযান আপাতত ব্যর্থ হইয়াছে। ইউনিয়নিষ্ট দলের প্রভাব হইতে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের অধিকাংশ লীগ সদস্যকেই ছাড়াইয়া আনিতে পারেন নাই, বরং তাঁহারাই লীগ ছাড়িয়া ইউনিয়নিষ্ট দলে থাকিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রী-মণ্ডলীতে ছোটুরাম ও বলদেও সিংয়ের সহিত খিজির হায়াতের আঁতাতও তিনি ভাঙ্গিতে পারেন নাই, বরং মন্ত্রীমণ্ডলীতে লীগের একমাত্র প্রতিনিধি শৌকৎ হায়াত খান সামান্য অজুহাতে গভর্ণর কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছেন।

এই ইউনিয়নিষ্ট দলে পাঞ্জাবের বড় বড় জায়গীরদার, জমিদার ও মজুতদারদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ইহারাই গত সাত বৎসর ধরিয়া পাঞ্জাবে কংগ্রেসের শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি মিঞা ইফতিখারুদ্দীন অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ইহারাই তাঁহাকে কারামুক্তি দিতে অস্বীকার করিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের অন্যতম নেতা আবদুল কায়ুমকে ইহারাই কিছু দিন আগে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় ছোটুরাম ও বলদেও সিংয়ের প্ররোচনায় এই মন্ত্রীমণ্ডলীই পাঞ্জাবে শস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে বা দাম কমাইতে রাজি হয় নাই, অর্থাৎ বাংলার দুরবস্থার সুযোগ লইয়া পাঞ্জাবী মজুতদারের মুনাফা বাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। অথচ আজ বাংলার কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলি হঠাৎ রাতারাতি পরম ইউনিয়নিষ্ট ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পঞ্চমুখে ছোটুরাম, বলদেও ও খিজির হায়াতের গুণগান করিতেছে। গভর্ণরই বা এমন কি অন্যায় করিয়াছেন এ কথাও তাহাদের মুখে শোনা যাইতেছে! অন্ধ লীগ-বিরোধিতা এমনই জিনিষ!

পাঞ্জাব পরিষদে বা মন্ত্রীমণ্ডলীতে লীগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেই স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিত না। কিন্তু যে পাঞ্জাবী প্রতিক্রিয়ার দুর্ভেদ্য ইউনিয়নিষ্ট দুর্গকে ভাঙ্গিবার জন্য কংগ্রেস গত সাত বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে অথচ পারে নাই, তাহাতে লীগও যদি অন্তত খানিকটা ভাঙ্গন ধরাইতে পারিত তাহা হইলে পাঞ্জাববাসীর উপকারই হইত—কংগ্রেসও ভবিষ্যতে বাড়িবার সুযোগ পাইত। তা ছাড়া যত দুর্বলতাই থাক লীগ দল ইউনিয়নিষ্ট দলের মত শুধু পার্লামেণ্টারী প্রতিষ্ঠান নয়। পাঞ্জাবের মুসলমান জনসাধারণ অধিকাংশই লীগকে সমর্থন করে এবং লীগকেও তাহাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই যত অল্পই হোক, জনসাধারণের চাপে লীগকে খানিকটা নড়িতেই হইত।

জিন্না সাহেবের নিজের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই আজ খিজির হায়াত ও গভর্ণর সাহেব তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন। গভর্ণর কর্ত্তৃক বিনা দোষে আল্লাবক্সের বিতাড়ন, কৌশলে হক মন্ত্রীমণ্ডলীর অপসারণ—এ সবের বিরুদ্ধে জিন্না সাহেব প্রতিবাদ করেন নাই, বরং আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। সেই ভরসায় বাড়িয়া উঠিয়াই আজ আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি তাঁহাকেও আঘাত করিতে পারিল। লীগের নাম লইয়া বিভিন্ন প্রদেশে লীগের পরিষদ সদস্য ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে জনস্বার্থবিরোধী আত্মসর্বস্ব লোক নেতৃত্ব করিতেছে। জিন্না সাহেব তাহাদের দূর করিয়া দেন নাই, বরং আশ্রয় দিয়াছেন। সেই ভরসায় বাড়িয়া উঠিয়া আজ তাহারা পাঞ্জাবে লীগকেই অপদস্থ করিল। পাঞ্জাব পরিষদে ইউনিয়নিষ্ট চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি কংগ্রেসী সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলান নাই, বরং ছোটুরাম ও বলদেও সিংয়ের সঙ্গেই আপোষের বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। সেই ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া ছোটুরাম ও বলদেও সিং আজ তাঁহার দলেই ভাঙ্গন ধরাইলেন। ইহাতেও কি জিন্না সাহেবের শিক্ষা হইবে না?

ইঁহাদের স্বাধীনতাও এখনই চাইঃ তাহাতে জাপ-দস্যু পরাস্ত হইবে

দেশে ঐক্য, খাদ্য ও স্বাধীনতা আসিবে

★

★

★

শিক্ষার উন্নতি কোন্ পথে

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের স্বরূপ

লীগমন্ত্রীমণ্ডলী যে মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের খসড়া তৈরী করিয়াছেন তাহা লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে প্রস্তাবিত শিক্ষাবোর্ডের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে কি যুক্ত নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মুস্লিম লীগের মত এই যে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না থাকিলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ভিতর মুসলমানদের সত্যকার প্রতিনিধিগণ আসিতে পারিবেন না, তাহার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দু-প্রভাবান্বিত হইবে; লীগবিরোধীদের মত এই যে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিবে এবং তাহার ফলে শিক্ষার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। নির্ব্বাচনের পদ্ধতি লইয়া যে তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে তাহাতে প্রস্তাবিত আইনের আসল রূপটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

আসল রূপটি কি

প্রথমতঃ, উক্ত বিলে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বোর্ড ৫৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই ৫৩ জন সদস্যের ভিতর ৩০ জন হইবেন বিভিন্নভাবে নির্ব্বাচিত সদস্য, ১৯ জন শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী এবং সরকারী মনোনীত সদস্য, ২ জন (কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) ভাইস্ চ্যান্সেলর এবং ২ জন বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য। শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিবেন। ইহার অর্থ কি? সভাপতি সহ ১৯ জন সদস্য আমলাতন্ত্রের অনুগত ভৃত্য অনায়াসে সমগ্র বোর্ডের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেন। ৩০ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের ভিতর মাত্র ৮ জন যদি সরকারী পক্ষে যোগ দেন তাহা হইলেই সরকার পক্ষ জয়ী হইবে, কিন্তু নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ১০ ভাগের ৭ ভাগ যদি কোন সিদ্ধান্ত লইতে চাহেন, তাহা হইলেও সরকারের বিরোধীতা পরাস্ত করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ সভাপতির উপর শিক্ষাবোর্ডের কোন ক্ষমতা থাকিবে না, সভাপতি হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষাবোর্ড হইতে ২১ জন সদস্য লইয়া একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠিত হইবে, এই কমিটির হাতে শিক্ষা পরিচালনার বিস্তৃত ক্ষমতা থাকিবে। এই ২১ জনের ভিতর ৬ জন হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সরকার মনোনীত সদস্য। ১৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের ১০ জন যদি সরকারী নীতির বিপক্ষতা করেন তাহা হইলেও সরকার পক্ষ জয়ী হইবেন।

চতুর্থতঃ, এক্সিকিউটিভ কমিটির কোন সিদ্ধান্ত যদি বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যের অননুমোদীত হয় তাহা হইলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না কারণ এক্সিকিউটিভ্ কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বদলাইতে হইলে বোর্ডের সদস্যদের ৪ ভাগের ৩ ভাগের ভোট পাওয়া চাই। অর্থাৎ ৫৩ জনের ভিতর ৩৯ জন একমত না হইলে এক্সিকিউটিভ্ কমিটির সিদ্ধান্ত বদলানো যায় না, কিন্তু বোর্ডে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতি মিলিয়া নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ইহারও পর মোক্ষম বিধান হইতেছে এই যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সম্মত না হইলে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কোন সিদ্ধান্তই কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে এই বিলের উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া আসা। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পৃথকই হউক আর সংযুক্তই হউক, তাহাতে হিন্দু-প্রতিনিধিই বেশী থাকুন আর মুসলমান প্রতিনিধিই বেশী থাকুন এবং মুসলমান প্রতিনিধি যাঁহারা হইবেন তাঁহারা লীগপন্থীই হউন আর লীগ বিরোধীই হউন, শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের কাহারও হাতে যাইতেছে না, যাইতেছে সরকারী আমলাতন্ত্রের হাতে। ছাত্রেরা কি পড়িবে, কি শিখিবে, জীবনযাত্রার কোন পথ কল্যাণকর বলিয়া বাছিয়া লইবে তাহার নির্দ্দেশ দিবার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন সরকারী আমলারা।

সরকারী কর্ত্তৃত্ব কেন

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য সরকার বহুদিন হইতে আগ্রহান্বিত। এতদিন যাবত সরকারের চেষ্টা বা অপচেষ্টা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা যতটুকু বাড়িয়াছে তাহা সৃষ্টি করিয়াছে স্বদেশসেবায় অনুরাগী স্বাধীনতাকামী ছাত্র আন্দোলন। সরকারী কলেজ এবং সরকারী স্কুল ছাড়া অন্যত্র ছাত্রদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করা সরকারের পক্ষে সহজ নয়। সরকারী স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দমন করিবার জন্য ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর পুনঃ পুনঃ ফতোয়া জারী করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতে আমলাতন্ত্র অনুভব করিয়াছে প্রত্যেকটি স্কুলকেই সরকারী স্কুলের পর্য্যায়ে লইয়া আসা দরকার। শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার খুব কমই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দেশের দশজনের চেষ্টায় প্রসারিত শিক্ষার স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার জন্য সরকারের আগ্রহের অন্ত নাই।

এদিকে মুস্লিম লীগের ভিতর শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দারুন অভিযোগ রহিয়াছে। শিক্ষিতদের ভিতর অধিকাংশই হিন্দু এবং শিক্ষা পরিচালনায় হিন্দুদের প্রভাব অসাধারণ। মুস্লিমলীগের সভ্য ও সমর্থকরা দেখিতেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ছাড়া শিক্ষা-সংগঠনের ব্যাপারে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করা বা মুস্লিমজাতির ঐতিহ্য রক্ষাকরা অসম্ভব।

আমলাতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য, আমলাতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য। মুস্লিমলীগের মধ্যে পরিবর্ত্তনের আগ্রহ আছে দেখিয়া সরকারপক্ষ এই সুযোগটিকে নিজ সুবিধানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য এখন আগাইয়া আসিয়াছেন। ইহার ফলেই বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের উৎপত্তি। মুস্লিমলীগ পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা পাইয়াছে, ইহার ফলে মুসলমানদের সত্যকার প্রতিনিধি বোর্ডে আসিতে পারিবেন, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব যদি থাকে আমলাতন্ত্রের হাতে তাহা হইলে শুধু পৃথক নির্ব্বাচন তাঁহাদের কোন কাজেই লাগিবে না। আমলাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিবে তাহাতে হিন্দু ঐতিহ্যও থাকিবে না, মুস্লিম ঐতিহ্যও থাকিবে না, থাকিবে দাস-ঐতিহ্য।

লীগের কর্ম্মীগণ বলেন যে—সরকার মানে আমলাতন্ত্র নয়, সরকার মানে আইন সভার আস্থা-ভাজন মন্ত্রীমণ্ডলী; কাজেই সরকারী কর্ত্তৃত্বে ভয়ের কি আছে? ইহা নিতান্তই অন্ধযুক্তি। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা যে মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে নয়, প্রকৃত ক্ষমতা যে সরকারী আমলাতন্ত্রের হাতে তাহা মন্ত্রীমণ্ডলীও উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

একথা সত্য যে পিছনে জনগনের সমর্থনের জোর থাকিলে মন্ত্রীরাও আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিতে পারেন কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, জনগণের প্রতিনিধিদের নহে।

লীগ্ কর্ম্মীরা বলিবেন শিক্ষাবোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারীদের রাখা হইয়াছে অভিজ্ঞ হিসাবে, শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর অভিজ্ঞদের পরামর্শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অভিজ্ঞদের পরামর্শ লইবার জন্য তাহাদিগকে ভোটের অধিকার কেন দিতে হইবে? আইনসভায় যদি প্রদেশের সমস্ত আই, সি, এস অফিসারদের সদস্য করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সে আইনসভা আমলা-তন্ত্রের যন্ত্রে পরিণত হয় না কি? মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডে ডি, পি, আই হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল ইন্স্পেক্টরকে পর্য্যন্ত সভ্য করা হইয়াছে। হয় ইহাদের সভাপদ হইতে বাদ দেওয়া হউক অথবা নির্ব্বাচিত সভ্যদের সংখ্যা এমন ভাবে বাড়ান হউক যাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রাধান্য করিবার সম্ভাবনা দুর হয়, তাহা হইলেই শিক্ষাবোর্ড গণতান্ত্রিক হইবে। প্রস্তাবিত শিক্ষাবোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহা গণতান্ত্রিক নহে, প্রতিক্রিয়াশীল।

পৃথক নির্ব্বাচন

লীগবিরোধীদের প্রধান অভিযোগ যে শিক্ষাবোর্ডে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করা হইয়াছে। মুস্লিম লীগের ভয় যে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না থাকিলে সত্যকার মুসলমান প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। লীগের এই ভয় অমূলক নয়। শিক্ষাবোর্ড নির্ব্বাচন করিবেন বিশ্ববিদ্যালয় ও হেডমাষ্টারগণ। ইঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু এবং এখনও অধিকাংশক্ষেত্রে লীগবিরোধী। অথচ মুসলমানদের অধিকাংশ লীগের সমর্থক! যে মুসলমান লীগবিরোধী নন তাঁহার পক্ষে হিন্দুদের নিকট হইতে ভোট পাওয়া খুব শক্ত। অথচ সকল দলই মানিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষাবোর্ডে মুসলমান-দের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং হিন্দুদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্ত নির্ব্বাচনের অর্থ এই যে মুসলমানদের প্রতিনিধি কে হইবেন তাহা হিন্দুরাই নির্দ্ধারিত করিবেন। কাজেই মুস্লিম লীগ পৃথক নির্ব্বাচন চায়। কোন নেতা রুশিয়ার উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন রুশিয়াতেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির পৃথক নির্ব্বাচন নাই। কিন্তু রুশিয়াতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আছে, ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লউন, রুশিয়ার উদাহরণ নিজেরা গ্রহণ করুন; তাহা হইলে জাতিবিদ্বেষ এবং জাতি সংঘর্ষ চলিয়া যাইবে, তখন পৃথক নির্ব্বাচনও আবশ্যক হইবে না। (অবশ্য রুশিয়াতে নিখিল রুশীয় উচ্চতর পরিষদে পৃথক নির্ব্বানের ব্যবস্থা আছে।) অতদুর যাইতে হইবে না, লীগবিরোধীরা যদি লীগ বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে পারেন, লীগকে যদি মুসলমানদের জনপ্রতিষ্ঠান হিসাবে মানিয়া লন তাহা হইলে যুক্ত নির্ব্বাচনে মুস্লিম লীগের ভয় থাকিবে না। কিন্তু এই ভয়ের কারণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পৃথক নির্ব্বাচন অস্বীকার করার অর্থ আমলাতন্ত্রের অভিসন্ধি সফল করা। শিক্ষাবোর্ডে পৃথক নির্ব্বাচন আনিলে শিক্ষার ভিতর সাম্প্রদায়িকতা আসিবে বলিয়া যাঁহারা ভয় করেন তাঁহারা দেখিতেছেন না যে মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাঁহারা সকলেই সরকারের আনুগত্য এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা লইয়া চলেন না। তাঁহাদের পৃথকভাবে ভোটের অধিকার দিলে তাঁহারাও শিক্ষার স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দিতে জানেন।

পৃথক নির্ব্বাচন উচিত কি যুক্ত নির্ব্বাচন উচিত এই বিষয় লইয়া ঝগড়া চালাইবার অর্থ আমলাতন্ত্রকে সাহায্য করা, শিক্ষাব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া।

পরিবর্ত্তন চাই

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন যে অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে তাহা শিক্ষাবিদ্গণ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। বর্তমানে যে ধরণের শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাতে ছাত্রগণ জীবনযাত্রার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে না। শিক্ষকদের বেতন এত কম যে উপযুক্ত শিক্ষাদান তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উদ্বেগ তাঁহাদিগকে অনবরত এমনভাবে পীড়িত করে যে শিক্ষায়তনের গুরুত্ব বিবেচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহাদের নাই। বহু স্কুল উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের অভাবে অচল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের আঘাতে বহু শিক্ষক ও বহু ছাত্র শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। শিক্ষার প্রসার এখনও অত্যন্ত সামান্য, মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার দেশের অগণিত জনগণের কাছে রুদ্ধ। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কি ভাবে শিক্ষার প্রসার করা হইবে, শিক্ষক ও ছাত্রদের সামাজিক উন্নতি কোন্ পথ ধরিয়া চলিবে, গরীব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কি ভাবে শক্তিশালী করা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল জাতির সংস্কৃতি কি ভাবে বিকশিত করিয়া তোলা যায়—এইগুলিই আজ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা। প্রস্তাবিত শিক্ষাবিলে এই সমস্ত সমস্যার কোনটিই আলোচিত হয় নাই। আমলাতন্ত্রের লক্ষ্য কি করিয়া শিক্ষাজগতে শৃঙ্খল দৃঢ়তর করা যায়; অন্য সকলে নির্ব্বাচন পদ্ধতির আলোচনা লইয়া উন্মত্ত। এই উন্মত্ততা বর্জ্জন করিয়া শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও স্থির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এক প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন ডাকিয়া এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক। প্রস্তাবিত বিল পাশ হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি হইবে না বরং তাহার অবনতি ঘটিবে, কিন্তু এই বিল বাতিল করিয়া বসিয়া থাকিলেও শিক্ষা জগতে যে দুর্য্যোগ ও অরাজকতা চলিতেছে তাহা কমিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত বিলে সরকারী মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমান হউক, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ান হউক, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডটিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হউক। নির্ব্বাচন পদ্ধতি যুক্ত হইবে না পৃথক হইবে এ বিষয়ে লীগের সঙ্গে একমত হইয়া অন্যান্য সবাই সর্ব্ববাদী সম্মত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, তবেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাধীনতা ও প্রগতি সম্ভব হইবে।

২৪ পরগণা ও হুগলীতে রেশনিং আরম্ভ

রেশনিং-এর গলদ দূর কর

জনসাধারণের দাবী জয় যুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে পলাইয়া যে সব মুনাফাখোর মজুতদারেরা কলিকাতার আশে পাশে মৃত্যুর কারবার জমাইয়া তুলিতেছিল তাহাদের মাথায় আঘাত পড়িয়াছে।

কিন্তু জনগণের সাহায্য না লইয়া সরকারী আমলারা যাহাই করে না কেন তাহাতে এত গলদ রহিয়া যায় যে ভাল জিনিষও লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এ ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ত্তমান রেশনিং-এর আমলে আসিয়াছে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনবহুল শ্রমিক অঞ্চল—যাহাদের দাবী দাওয়ার কথা, ধর্ম্মঘটের কথা কাগজে লিখিতে গেলে সরকার "যুদ্ধশিল্প" বলিয়া সংবাদ চাপিয়া দেয়। অথচ এইসব যুদ্ধ-শিল্পের শ্রমিকরা যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদন বাড়াইতে পারে সেদিকে সরকারের খেয়াল নাই। সরকারী রেশনিং-এর আগে শ্রমিকরা মিলের দোকান হইতে মাথা পিছু পাঁচ সের রসদ পাইত। ইহাতে তাহাদের চলিত না বলিয়া তাহারা সর্ব্বত্র ৫.০ সের রসদ দাবী করিতেছিল। কিন্তু সরকারী রেশনিং চালু হইবার পর সওয়া পাঁচ সের তো দূরের কথা তাহাদের রেশন ৪ সেরে কমানো হইয়াছে। ইহার ফলে সমস্ত এলাকায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। জগদ্দল, নৈহাটী, গৌরীপুর, আলমবাজার ও হাজিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থার কার্য্যকরী প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মাথা পিছু সওয়া পাঁচ সের রসদ দিতে হইবে, ইহা হইল সমস্ত শ্রমিকদের প্রধান দাবী। কিন্তু ইহা ছাড়া আরো নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়াতে তাহাদের মুস্কিল বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন অধিকাংশ যায়গায় শ্রমিকদের মাহিনা এত কম যে এক সঙ্গে চার ইউনিট রসদ লইতে পারে না—অথচ তাহাদের সুবিধামত দিনে না লইতে পারায় তাহাদের উপবাস করিতে হয়। হুগলী, চুঁচুড়া, নৈহাটি অঞ্চলে দোকানগুলি সমানভাবে সমস্ত এলাকায় বিছাইয়া দেওয়া হয় নাই। কোন কোন দোকান লোকালয়ের এক প্রান্তে, আবার কোথাও এক যায়গাতেই ৩।৪টী দোকান। যেথানে একটী দোকান অথচ বহু লোকের ভিড় সেথানে রেশন লইতে গিয়া লোকে ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। রেশনিং অফিস কাজের উপযুক্ত না হওয়ায় এখনো বহু লোকের নাম লিখানো হয় নি। ইহাতে কেবল শ্রমিকরা নয়, মধ্যবিত্তরাও বাদ পড়িয়াছে। নৈহাটী হালিশহরে রেশন অফিস দুই মিউনিসিপ্যালিটীর এক প্রান্তে। শ্রমিকরা ৫।৭ মাইল দূর হইতে কাজ কামাই করিয়া আসিয়া অফিসের দুর্ব্যবস্থায় ফিরিয়া যায়। এবং গরীব শ্রমিকদের নিকট হইতে কার্ড লিখাইবার জন্য দুই চারি আনা পয়সাও নিয়মিত নেওয়া হইতেছে। রেশন লইবার সময় শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সকাল ৭টা হইতে ১১টা এবং বিকাল ৫টা হইতে ৮টার সময় অধিকাংশ শ্রমিক কলে থাকে—মধ্যবিত্তদের যাহারা কলিকাতায় ডেলি পাসেঞ্জারী করে তাহারাও অনুপস্থিত থাকে। শ্রমিকদের হয় কাজ কামাই করিতে হয়, না হয় এক শিফ্‌ট নষ্ট হয়। যাহারা বদলি কাজ পাইয়াছে, তাহাদের কেবল গেট পাস দেওয়া হয়, নম্বর দেওয়া হয় না। ফলে ইহারা রেশনিং হইতে বাদই পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ১০।১৫ হাজার হইবে। বজবজের শ্রমিকদের পরিবার রেশন এলাকার বাইরে থাকে। মিলের রেশনিং-এ শ্রমিকরা সপরিবারে রেশন পাইত—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকে কেবল নিজের রেশনই পাইতেছে, পরিবারের জন্য তাহাকে চোরা বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। হুগলীর কোদালিয়া ও ব্যাণ্ডেলের তিন হাজার লোক চুঁচুড়ার দোকান হইতে জিনিষ কিনিত—কিন্তু তাহাদের এলাকা রেশনিং-এর মধ্যে নয় বলিয়া তাহারাও আজ উপবাসে বা চোরা বাজারের শরণাপন্ন। কয়েক যায়গায় আবার দোকানগুলি একচেটিয়া ব্যবসাদারদের হাতে—ফলে পুরাতন ছোট দোকানদাররা মারা পড়িতেছে। ইহার অনেকগুলি ত্রুটীই জনগণের সহযোগিতায় দূর করা যায়। অনেক যায়গার খাদ্য কমিটি বা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করিতে চাহিয়া রেশন অফিসারদের কাছে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সহযোগিতা নেওয়া হয় নাই।

কিন্তু ইহাতে দমিলে চলিবে না। অনিচ্ছুক আমলাদের হাত হইতে জনসাধারণ মজুতদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ এই রেশনিং আদায় করিয়াছে—ইহার গলদও তাহারাই তাহাদের আন্দোলনের জোরে দূর করিবে।

পূর্ব-বগুড়ার চিঠি

গরীব কৃষকের ঘরে ধান নাই

বীজ, বলদ ও লোকের অভাবে সিকি ভাগ জমি অনাবাদী

অবনী বাগচী

সরকারী হিসাব মত বগুড়ায় ১০ লক্ষ মণ ধান উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে এই জিলা হইতে ৫ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করার কথা। কিন্তু সরকারের এজেন্টগণ এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ মণ চাউলও ক্রয় করিতে পারে নাই। চাউলের বাজার দর এখন ৯৲ হইতে ৯।০ এবং ধানের ৫—৫।০ (কাঁচির ওজন)। সরকারী এজেন্টগণ কারসাজি করিয়া এই বাজার দরেরও কমে কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করার চেষ্টায় আছে। তারা বলিতেছে যে ধান গোলায় তুলিয়া দিলে ঐ দাম পাইবে। তাই গাড়ী গাড়ী ধান ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকায় উঠিতেছে।

সমস্ত পূর্ব্ব বগুড়ার ও পশ্চিম বগুড়ার পল্লী অঞ্চলে গরীব কৃষকের ঘরে ধান শেষ হইয়াছে অথবা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদের এখন বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে হইবে। ঘাটতি জিলায় ইতিমধ্যেই ২৭৲ মণ পর্য্যন্ত (মুন্সিগঞ্জ) মূল্য উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট বগুড়াতে যে ভাবে ধানচাল ক্রয় করিতেছে, তাহাতে এভাবে চলিতে থাকিলে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে না।

গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ এবং তারপর মহামারীর তাণ্ডব পূর্ব্ব বগুড়াকে নিশ্চিহ্ন করার উপক্রম করিয়াছে। সারিয়াকান্দি, ধুনোট, গাবতলি ও পূর্ব্ব সেরপুর এই কয়টী থানায় অনাহারে, শোথে, কলেরায় ও ম্যালেরিয়া রোগে গত ৯ মাসে মরিয়াছে প্রায় ৫০০০। জেলে, তাঁতী ও জোলা মরিয়াছে প্রায় ১৫০০। বোহালী গ্রামের ৬০।৭০ ঘরের মধ্যে এখন মাত্র ৩১ ঘর কোন রকমে টিকিয়া আছে, তার ভিতরে ২৯টী বাড়ীতেই কোন উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ নাই; নৌকা, জাল সব বিক্রয় করিয়া তাহারা গিয়াছিল আসামে। কেহ কেহ আসামে, কেহ বা ফেরার পথে এবং কেহ ঘরে ফিরিয়া মারা গিয়াছে। এমনি গ্রাম আরও অনেক আছে। জেলেদের জাল নাই, তাঁতীদের সূতা নাই—কাজেই যারা কাজ করিতে পারে তাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

২০টী সরকারী ও ৩টী বেসরকারী লঙ্গরখানায় প্রায় ১০,০০০ লোক খাইত। ডিসেম্বর হইতে এগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু রুগীদের জন্য কোন হাসপাতাল খোলা হইল না বা এদের জন্য কোন কাজের ব্যবস্থা হইল না। এদের অর্দ্ধেক লোক কোন রকমে জমি ও উঠান হইতে ধান কুড়াইয়া এতদিন চালাইয়াছে। কিন্তু এখন তাহাদের অবস্থা আবার ভয়াবহ হইয়াছে। কিছু কিছু লোক বগুড়া টাউনেও যাইতেছে। স্ত্রীলোকরা গণিকালয়ে আশ্রয় লইতেছে—পূর্ব্ব বগুড়ার বহু গ্রামেই এরূপ খবর পাওয়া যায়।

গত বৎসর এই অঞ্চলে সরকার হইতে কিছু কৃষিঋণ দেওয়া হয়। এ বৎসর সে ঋণ শোধ না দিলে আর ঋণ দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে কিন্তু সে ঋণ শোধ দেওয়ার মত অবস্থা অনেকেরই নাই—যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাহা মহামারীতেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়া ও দুরন্ত পাচড়ায় ভুগিয়াছে, এখন শতকরা ৪০ জন ম্যালেরিয়ায় ও শতকরা ৭০ জন পাচরায় ভুগিতেছে। তার উপরে আবার দেখা দিয়াছে বসন্ত। সারিয়াকান্দিতে শতকরা ৫০ জনের বসন্ত হইয়াছে এবং তার অর্দ্ধেকই মরিতেছে। ডাঃ ক্ষিতীশ সেন বোঁচাগ্রাম হইতে আসিয়া বলিলেন, শতকরা ৬০।৭০টী ঘরেই বসন্ত। বাড়ী শুদ্ধ লোক আক্রান্ত হইতেছে, কবর দেওয়ার অভাবে শব পচিয়া দারুণ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

এবার চাষ করার লোকের অভাবে এবং বীজ বলদের অভাবে শতকরা ২৫ ভাগ আউসের জমিতে আবাদ হয় নাই!

দেশভক্তরা কোথায়

এত বড় দুর্দ্দিনেও যেখানে দেশভক্তরা একত্র হইতে পারে নাই সেখানে সরকারী প্রচেষ্টা যে সামান্যই হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। কুইনাইন হইতে আরম্ভ করিয়া রিলিফের কাপড় পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক মত পৌছিবে না। কৃষিঋণ এবং সূতার যে কোন ব্যবস্থা হইবে না—তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। তিন জন মিলিটারী ডাক্তারের প্রচেষ্টায়ও বিশেষ কিছু ফল হইল না। সমস্ত ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ৩৪৫৬ পয়েন্ট টিকা দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ খুব বেশী হইলে ১১২৮ জনকে (সমস্ত জিলায়)।

লীগ এবং কংগ্রেস নেতারা এক হইয়া ডাক দিলে শত শত দেশকর্ম্মী পূর্ব্ব বগুড়াকে বাঁচানর জন্য আগাইত।

যতীন্দ্র মোহনের বগুড়া

কিন্তু যতীন্দ্র মোহন রায়ের বগুড়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। ডাঃ ননী দেবদাসের (মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক এবং খ্যাতনামা ডাক্তার) নেতৃত্বে বগুড়া মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের যুক্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হইল। ২১শে জানুয়ারী হইতে পূর্ব্ব বগুড়ায় তিনটী কেন্দ্রে ক্যাম্প করিয়া তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। মেডিকেল স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজও পুরা দমে কাজ চলিতেছে। বিভিন্ন দলে ৫০টী মেডিকেল ছাত্র এই সব কেন্দ্রে ৭ দিন বা ১৪ দিন করিয়া থাকিয়া কাজ চালাইতেছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক ও ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটি ঔষধ ও সংগঠক পাঠাইয়া এবং পিপলস্ রিলিফ কমিটি ঔষধ দিয়া ইহাদের উৎসাহ বাড়াইয়াছে। সিবা কোং ও ইষ্টবেঙ্গল ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এঁদেরকে প্রায় ৫০০৲ টাকার ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়াছে।

প্রথম দিকে গভর্ণমেন্ট হইতে কোন ওষুধপত্র এঁরা পান নাই কিন্তু সোনাতলা, গোসাইবাড়ী ও ধুনটে যখন পুরাদমে কাজ চলিতে আরম্ভ করিল তখন কিছু কুইনাইন, দুধ ও লিম্প এঁরা পাইয়াছেন।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত এঁরা ১১৫০০ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন এবং শতকরা ৭৫% রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

জনসাধারণের সাড়া

প্রথম দল যখন সোনাতলায় যায় তখন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লীগের নামে এদের কাজকে নানা ভাবে বাধা দেয় কিন্তু জনসাধারণ এদেরকে সর্ব্বোতভাবে সমর্থন দিতে থাকে এবং জিলা মুসলীম লীগের ছাত্ররা ১০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহাদের সমর্থন জানান।

গোঁসাই বাড়ীর একটী ভদ্রলোক কংগ্রেসের নামে বাধা দেয় কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের গরীব কৃষকবৃন্দ তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ঘর, বাড়ী ও টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করে।

বিভিন্ন দলের একটী কমিশন এখন পূর্ব্ব বগুড়ার গ্রামগুলির অবস্থা ভাল ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় স্থির করার জন্য সফরে যাইতেছে। তাহারা ফিরিয়াই পূর্ব্ব বগুড়াকে পুনঃগঠিত করার জন্য একটী মিলিত রিলিফ কমিটী গঠন করিবেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহামারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহের বোয়ালিয়া গ্রাম। গ্রামবাসীদের সবাই মুসলমান, লীগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শিক্ষিত ও ধনী লোক গ্রামে আছে। এতদিন গিয়াছে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব। এখন সুরু হইয়াছে বসন্তের মহামারী। প্রত্যহই লোক মারা যাইতেছে। 'জনযুদ্ধের" সংবাদদাতা কমরেড সরসী ধর, অন্য আর একজন কর্ম্মীর সহিত ঐ গ্রামে গিয়া দেখেন এক বাড়ীতে একটি বসন্তের মৃতদেহ পচিতেছে। তার অর্দ্ধেকটা দিনের বেলাতেই শিয়ালে খাইয়া ফেলিয়াছে। গ্রাম অথবা পাড়ার লোকেরা তো আসেই নাই, এমন কি বাড়ীর লোকেরাও তাকে জীবন্ত অবস্থায়ই ফেলিয়া গিয়াছিল। এখন শিয়ালে খাইয়াছে শুনিয়া কবর দিতে আসিয়াছে। এ রকম ঘটনা শুধু একটিই নয়। এমনি ভাবে মৃতদেহ পচিতে থাকে, কবর দেওয়ার লোক মিলে না।

১০ই এপ্রিল প্রত্যেকটি দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়া নেত্রকোণা মহকুমা মেডিকেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে। ১৬ জনকে নিয়া ওয়ার্কিং কমিটি। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, জেলাবোর্ডের প্রতিনিধি, শিক্ষকসমিতি, ছাত্রফেডারেশন প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের লোকই কমিটীতে আছেন।

মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে কাজ সুরু করিবার জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। পিপলস্ রিলিফ কমিটির ডাঃ অমরনাথ সভায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও কাজের একটি পরিকল্পনা দেন। বালী ক্যাম্পে ডাঃ নাগ ও ডাঃ বক্সীর পরিচালনায় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের ৯ জন কর্ম্মী মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার কাজে লাগিয়াছেন।

বরিশালে

বরিশাল জেলার মুলাদী থানার 'জনযুদ্ধের' সংবাদদাতা কমরেড বিজয় চ্যাটার্জী স্থানীয় সেনিটারী ইনস্পেক্টরের কাছ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানাইতেছেন যে ১৯৪৩ সালে মুলাদী থানায় জন্মের সংখ্যা ১২০০, মৃত্যু সংখ্যা ২৯০০। বর্ত্তমানে শতকরা ৩০ জন বসন্তে আক্রান্ত এবং ইহা ব্যাপকভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পরিতেছে। ছবিপুর, নাজিরপুর, ও গাছুয়া ইউনিয়নে মৃত্যুস্রোত বন্ধ না হইলে কিছু দিনের মধ্যে কবর দেওয়ারও লোক পাওয়া যাইবে না। এক ছবিপুরেই বসন্ত, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে শতকরা ৮০ জন আক্রান্ত। প্রত্যহ ১০।১২ জন করিয়া মারা যায়। সমস্ত থানায় মাত্র ৫ জন টীকাদার।

গত ২৭শে এপ্রিল মিউনিসিপ্যালিটির গৃহে বরিশালের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একটি সভায় মিলিত হইয়া এখানে একটি মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেন। চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু বরিশালে আসিয়া এই সম্পর্কে সহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও ডাক্তারদের সহিত আলোচনা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই কমিটির গোড়াপত্তন হয়।

কমিটির সভাপতি হইয়াছেন মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত বরদাকান্ত ব্যানার্জি, যুগ্ম সম্পাদক হইয়াছেন ডাঃ অমল ঘোষ ও শ্রীযুত সন্তোষ দাস, সহ-সম্পাদক হইয়াছেন কমরেড সুধীর সেন ও ডাঃ দীলিপ ব্যানার্জি।

মহামারীর হাত হইতে রংপুরকে বাঁচাও

আমরা রাজারহাট অঞ্চলে ব্যাপক মহামারীর সংবাদ পাইয়া গত ২৪শে এপ্রিল সেখানে যাই। বসন্ত এই অঞ্চলে এক অবর্ণনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। রোগীদের দেখিবার, সাহায্য করিবার, জল দেবার এবং মরিলে গোর দেবার কোন উপায় নাই। বুড়ির হাটে কবিরাজ ফি ১০৲, চিনি ৫৲ সের, তিলতেল ২৲ সের, ফেনাইল ৫৲ সের।

মৃত্যু সংখ্যার কোন হিসাব নাই। বুড়ীরহাট গ্রামে একজন লোক বলে "প্রতি দিন যদি ১০।১৫ জন করিয়া মারা যায়, তবে লোকের বাকী আর কি থাকে?" এখানে পাঁচশতেরও বেশী লোক মারা গিয়াছে। চাকীর পশার ইউনিয়নে স্থানীয় লোকের হিসাব মতে ৯০০এর বেশী লোক মারা গিয়াছে, রাজারহাট গ্রামটিতে ৬৫ জন মারা গিয়াছে। প্রত্যেকটি বাড়ীতে এক থেকে দশ বারটি পর্য্যন্ত গোর দিয়াছে। অনেক বাড়ীতে কেবল গোর আছে মানুষ নাই, অনেক বাড়ীতে শুধু নাবালক আছে। গোর দেবার লোক নাই, কোন মতে টানিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গনেই মাটি দেওয়া হইতেছে। ফলে প্রায় দেহই শিয়ালে তুলিতেছে। দুর্গন্ধে থাকা অসম্ভব, মৃতদেহ ঘর হইতে সরাইবার পরও ফেনাইল অভাবে ঘরের গন্ধ দূর করিবার কোন উপায় নাই। বুড়ির হাটে বসন্তরোগী গরমে ও মাছিতে অস্থির হইয়া মাঠে গিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। উপায়হীন হইয়া হাটেবাজারে বসন্তরোগীই যাইতেছে!

একটি বাড়ীতে দেখিলাম থাকিবার একটি মাত্র ঘর। সেই ঘরে ৩ জন রোগী। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে একস্থানে শুইয়া আছে। স্ত্রীর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে, শীঘ্রই মারা যাইবে। কোনরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা নাই। বাড়ীতে অবশিষ্ট আছে দশবার বছরের এক জন বালক এবং দুই তিন বছরের একজন শিশু। তারা ঐ একই সাথে থাকে।

সিঙ্গারদাবরী ষ্টেশনে একটি বসন্তরোগীকে জীবিত অবস্থায়ই শকুনে খাইয়াছে জানা গেল। বুড়িরহাটেও এই রকম একটি ঘটনা জানা গিয়াছে। একটি মেয়েকে মরিবার সাথে সাথে শিয়াল কুকুরে ছিড়িয়া খাইয়াছে। রাজারহাট, চাকিরপশার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, নাজিমখাঁ এই চারিটি ইউনিয়নেই এই বিভৎস অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এর ফলে এক দিকে বর্ত্তমান গ্রামগুলি ও বাড়ীগুলি গোরস্থানে পরিণত হইতেছে। অন্যদিকে আউস আবাদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইতেছে। গৃহস্থ কাজ করিতে পারিতেছে না, কিষানের দারুন অভাব।

রংপুর জেলার অন্যান্য এলাকাতেও আজ এমনি অবস্থা। বাংলার কৃষক আন্দোলনের গৌরব এই রংপুর জেলা আজ ধ্বংসের পথে।

—রংপুর জেলা কৃষক সমিতির সহসম্পাদক মহম্মদ পনিরুদ্দিন, কিষাণ সভার প্রাদেশিক কমিটির সভ্য সুধীর মুখার্জ্জি ও কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক মণিকৃষ্ণ সেন এক আবেদনে অবিলম্বে দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

দুঃস্থরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে

ময়মনসিংহের লেঙ্গুরার কৃষককর্ম্মী হীরেন্দ্র হাজং-এর চিঠি:—

খাদ্য সংকট চারিদিকেই দেখা দিয়াছে। দুঃস্থরা ভিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে। ক্রমেই তাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। খোস পাচড়া সারে নাই, এখন আবার চারিদিকে বসন্ত দেখা দিয়াছে। গজারমাটি, বড়দল, নলচাপড়া গ্রামে বসন্তে অনেকে মারা গিয়াছে। সরকার হইতে টীকা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা অষ্টমীমেলা ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ২০০০ লোককে টীকা ও ইনজেকশন দিয়াছি।

লেঙ্গুরা ইউনিয়নে কন্‌ট্রোলের ব্যবস্থা নাই, জিনিষপত্রের দাম ভীষণভাবে বাড়িতেছে। লবণ এক-দম পাওয়া যায় না।

প্রতি গ্রামে ৩ ভাগের ১ ভাগ চাষীই হাল গরু যোগাড় করিতে পারে নাই, বেশীর ভাগ আউস জমিই এখনো পতিত আছে। 'বাওয়া' ধানও এখন পর্য্যন্ত বাইন করা হয় নাই। গরুও ভাড়া পাওয়া যায় না। কেনার ক্ষমতা নাই। গরুর দাম আগুন। সরকার হইতে অবিলম্বে গরু ও কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা না হইলে আউস ও বাওয়া দুই ফসলই নষ্ট হইবে।

খারনৈ ইউনিয়নে হালের অবস্থা

গ্রাম	১৯৪৩	১৯৪৪
নোয়াপাড়া	২০	১১
কাইট্যাপুর	২১	১৫
দারেংপুর	২৫	২৩
বিশচীপুর	২৩	২০
বিশ্বনাথপুর	২১	৮

গরুর অভাবে আউস চাষ বন্ধ। 'বাওয়া' বাইন করার উপায় নাই।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি

এপ্রিল	৩য় সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ
১৯৪৪	১১৭৫	১২২৪
১৯৪৩	৫০১	৫৬০

এই সপ্তাহে ২৫৬ জন নিঃস্বের মৃত্যু হয়, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ২২১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ২৭২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় ও ৯৫ জন মারা যায়। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ১৫৪ জনের কলেরা হইয়াছে ও ৫৮ জন মারা গিয়াছে। বসন্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৩৪০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এই সপ্তাহে ৩৫৬ উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৫৫ জন হইতে কমিয়া ৫৩ জনে দাঁড়াইয়াছে।

রেশনিং বিরোধীদের পরাজয়

জলপাইগুড়ীতে খাদ্য সম্মেলনে বিভিন্ন দলের দেশপ্রেমিক ঐক্য

বাড়তি জিলা জলপাইগুড়ী। কিন্তু সেখানেও আসন্ন দুর্য্যোগের পূর্ব্বাভাষ দেখা যাইতেছে। জিলার অবস্থা জানিবার জন্য পিপলস্ ফুড কমিটি জিলার সমস্ত ফুড কমিটির কাছে একটি প্রশ্ন পত্র পাঠান। জিলার ১৭টি থানার মধ্যে ১২টি থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে উত্তর আসে।

৫টি থানায় ধান চাউলের দর বাড়তির দিকে। মাত্র একটি থানায় কিছুটা কমের দিকে।—অন্যান্য থানায় দর সমান ভাবেই চলিতেছে।

অধিকাংশ ধান জোতদারদের কবলে

অধিকাংশ ইউনিয়নেই কৃষকদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন ভাগচাষী; তাহাদের ঘরে খাবার নাই। প্রতি এলাকায় অধিকাংশ ধান জোতদারদের কবলে। বেশী লাভের আশায় তাহারা বাজারে ধান চাউল আনিতেছে না।

তেল, লবণ, চিনি প্রভৃতি প্রতি ইউনিয়নেই দুষ্প্রাপ্য। লবণের দর প্রতি সের ১৲ হইতে ৪৲ টাকা।

প্রতি ইউনিয়নেই গো-মড়ক সুরু হইয়াছে। কোন কোন ইউনিয়নে শতকরা ৫০টির অধিক গরু মারা গিয়াছে।

রবিশস্যের উৎপাদন খুব কম। আউষের আবাদ ২৫ ভাগ কম হইয়াছে।

খাদ্য সম্মেলনে জেলার সকল অংশ

এই সংকট রুখিবার সংকল্প লইয়া গত ২৩শে এপ্রিল পিপলস্ ফুড কমিটির উদ্যোগে জলপাইগুড়ী জিলা খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন সহরের ১০টি ব্লক ফুড কমিটি, ৪৪টি ইউনিয়ন ফুডকমিটি, উকিল ও মোক্তার লাইব্রেরী, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মহিলা সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি ও ২৩টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট,—সর্ব্বসমেত ২৯৮ জন প্রতিনিধি। সময়ের স্বল্পতার জন্য জিলা কংগ্রেস কমিটি হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই, তবে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় ও আরও অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। জেলার দেশপ্রেমিক জনগনের প্রতিটি অংশ সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় জেলার জন্য জনগনের খাদ্যনীতি উদ্ভাবিত হয়।

জনগণের দাবী রেশনিং

সকালে তিন ঘণ্টা ধরিয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন চলে। সভাপতিত্ব করেন বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মহলানবিশ, এম্, এল সি। সভার প্রথমে রেশনিং-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা হিন্দুমহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও সমর্থন করেন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন জনৈক ব্যাঙ্কের এজেণ্ট। তাঁর মতে এবার প্রচুর ফসল হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই, সুতরাং রেশনিং-এরও কোন প্রয়োজন নাই। কয়েকজন জোতদার তাঁকে সমর্থন করেন। বিরোধী পক্ষের সমর্থনে সরবরাহ বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর মিঃ গুহ বলেন জেলায় এবার প্রচুর ফসল হইয়াছে এবং সরকারের হাতেও প্রচুর খাদ্যশস্য আছে, সুতরাং রেশনিং-এর আর প্রয়োজন নাই। সরকার এবার সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

সঙ্গে সঙ্গে সভায় এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দেয়। চাবাগানের মালিকরা জিজ্ঞাসা করেন "তবে সরকার চাবাগানে প্রতিশ্রুতি মত সরবরাহ দিতেছে না কেন?"

বেগতিক দেখিয়া মিঃ গুহ ও প্রস্তাবের বিরোধীরা বসিয়া যান। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

একযোগে সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের দাবী

সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের উপর প্রস্তাব আনে কমরেড নরেশ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহাকে সমর্থন করেন লীগ সম্পাদক মৌলবী এনামুল হোসেন। তিনি বলেন, "সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব আমরা চাই, কিন্তু মনে হয় মহাসভা ও জাতীয়তাবাদীরা উহা চান না।" সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন, "মহাসভার কথা বলিতে পারি না কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব আমরাও চাই।" প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গ্রাম পুনর্গঠন ও কৃষকের দাবীর উপর লীগের যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ মহম্মদ সোলেমান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

জেলাব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ফুড কমিটি

বিপদ গ্রামেরই বেশী, সুতরাং সমগ্র জেলার সংগঠিত সাহায্য ব্যতীত গ্রামগুলিকে বাঁচান যাইবে না। তাই প্রয়োজন জেলার ১০৭টি ফুড কমিটিকে মিলাইয়া একটি জেলাব্যাপী ফুড কমিটির। প্রস্তাবটি গৃহীত হইল এবং পিপলস্ ফুড কমিটি জিলার সমস্ত দল ও অংশের ঐক্যবদ্ধ গণসংগঠনে পরিণত হইল।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতার আহ্বান

বিকালে সুসজ্জিত মণ্ডপে প্রকাণ্ড অধিবেশন সুরু হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি জিলার প্রধানতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত তারিণী প্রসাদ রায় অসুস্থতার জন্য উপস্থিত থাকিতে না পারায় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ সভায় পড়া হয়। পল্লী পুনর্গঠন, কৃষকদের দাবী, মহামারীর নিবারণ, শিক্ষা জীবন সংরক্ষন প্রভৃতি কাজে যাহাতে সরকারের সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার জন্য তিনি সবাইকে ব্যক্তিগত ও দলগত মতবিরোধ ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আহ্বান করেন।

বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি এরপরে গৃহীত হয়।

অধিবেশনের শেষে লীগের সহঃ সভাপতি খান বাহাদুর মোকলেস্বর রহমান পিপলস রিলিফ কমিটি হইতে প্রাপ্ত ২০০ খানা বস্ত্র দুঃস্থের মধ্যে বিতরণ করেন।

ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে গঠিত মাড়োয়ারী বালক সঙ্ঘ, দর্জ্জি ইউনিয়ন ও ছাত্রদের ভলাণ্টিয়ার বাহিনী সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

খাদ্য কমিটী সম্পর্কে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের বিবৃতি

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—কোন কোন স্থানে সরকারী কর্ম্মচারীরা খাদ্য কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে উহাতে যোগ দিতে বলায় এই সম্পর্কে আমার নির্দ্দেশ চাওয়া হইয়াছে। সে কারণে এই প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সাধারণভাবে নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিতেছি।

জনসাধারণের বিশেষতঃ বিপন্নদিগের সেবা করা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। জনসাধারণের পাশে দাঁড়াইয়া বিপর্য্যয় এড়াইতে ও দুর্দ্দশা হ্রাস করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর কর্ত্তব্য। সেইজন্য এবং গত বৎসরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিবেচনা রাখিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীই স্থানীয় কর্ম্মচারীরা সহযোগিতা করিলে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে সাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত খাদ্য কমিটিতে যোগ দিতে পারেন। দেশের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মঙ্গলসাধনকল্পে যতদিন প্রয়োজন থাকে ততদিন কংগ্রেস কর্ম্মীরা ঐ সকল কমিটিতে থাকিবেন।

প্রাথমিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহের উপর সরকারী বাধা-নিষেধ থাকায় স্থানীয় কর্ম্মীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার পরে যোগ্যতম কর্ম্মীকে নির্ব্বাচিত করিবেন। তাহা হইলে সকল কর্ম্মীর সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। মূল নীতি সম্পর্কে কোনরূপ মতভেদ ঘটিলে আমার পরামর্শ চাওয়া যাইতে পারে।

★ লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস কর্ম

কংগ্রেস নেতা গে

'এই শহরে কয়েক দিন আগে কারামুক্ত কংগ্রেসীদের যে বৈঠক হইয়া গেল, তাহাকে কেবলমাত্র' পারিবারিক পুনর্মিলন বলিলে ভুল হইবে। পুরানো দিনের বহু পরিচিত মুখ নজরে পড়িল; নির্যাতন ভোগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া যাঁহাদের সহিত দীর্ঘ বিশ বছরের সম্পর্ক তাঁহাদের সহিত আবার নূতন করিয়া মিলিত হইলাম। দীর্ঘ কারাবাসের ফলে, অধিকাংশ কর্মীই আজ ভগ্নস্বাস্থ্য—দেখিলে চেনা যায় না। কিন্তু আজও তেমনি তেজস্বী তাঁহাদের হৃদয়, দুই চোখে পুরানো দিনের অনির্বাপিত আগুন।

...ভারতের মাটিতে জাপানী আক্রমণকারীরা পা বাড়াইয়াছে; তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া এবং আসামবাসীদের কাছে জাপদস্যু রুখিবার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল—এই সময় সভার মহিমান্বিত ভাব ও অবিচল আদর্শানুরাগ দেখিয়া আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করিলাম। যাঁহারা গত দুই বৎসর ব্রিটিশ কারাগারে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সভায় উপস্থিত— লাঞ্ছিত জীবনের তিক্ততা তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। পূর্ব সীমান্ত হইতে আক্রমণের নূতন ও ভীষণতর বিপদ্ দেশের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে,—সমবেত কর্মীদের মনে শুধু একটি মাত্র চিন্তা। সাম্প্রতিক ইতিহাসে ইহা এক অতুলনীয় ঘটনা। আজ সমগ্র জাতির মনে যখন বদ্ধমূল বিদ্বেষ, তখন জওহরলাল নেহেরুর নিজের প্রদেশে কংগ্রেসের মৌলিক ফ্যাশিস্টবিরোধী নীতি ঘোষণা করা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। এদেশের শ্রেষ্ঠ ফ্যাশিস্টবিরোধী নেতা জওহরলাল—সভার আবহাওয়ায় আমি যেন তাঁহার বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করিতেছিলাম।

আক্রমণকারীদের রুখিবার জন্য আসামের অধিবাসীদের কাছে গোপীনাথ বরদলৈ দৃপ্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। লক্ষ্ণৌয়ে গৃহীত এই প্রস্তাব তাঁহাকে শক্তিশালী করিবে। ইহা ছাড়াও, কংগ্রেসের মূলগত ফ্যাশিস্টবিরোধী নীতি সম্বন্ধে বিদেশে লোকের মনে যাহাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহার জন্য আমেরী যে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে, এই প্রস্তাব হইবে সেই কুৎসার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অকুণ্ঠিত জবাব। কংগ্রেসবিরোধী প্রচারের কুয়াশাচ্ছন্ন, কলুষিত আকাশ বিদীর্ণ করিয়া আজ কংগ্রেসী আদর্শের সূর্য আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রিটিশ কয়েদখানা হইতে সদ্যমুক্ত কংগ্রেসকর্মীদের এই ঘোষণা সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও মার্কিন জনগণকে বিশেষ ভাবে সজাগ দৃষ্টি দিতে হইবে। আজ তাহাদের ভাবা দরকার, যখন এই সঙ্কট মুহূর্তে দেশের বেসামরিক জনসাধারণের মনোবল বাড়ানো সব থেকে জরুরী কর্তব্য, তখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে না দিয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী মিত্রপক্ষের আদর্শ কতখানি পালন করিতেছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন জনসাধারণের কাছে ইহা আমার ব্যক্তিগত আবেদন। জাতীয় সরকারের দাবী নূতন করিয়া ঘোষণা করা সম্বন্ধে সভায় সাধারণ ভাবে একটা অনিচ্ছার ভাব দেখিলাম। অনেকেই ভাবিতেছিলেন, বার বার উপেক্ষিত হওয়ার পরও আবার এই দাবী উত্থাপন করা আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। প্রত্যাখ্যানের ফলে যাঁহাদের আত্মসম্মানে গভীরভাবে ঘা লাগিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক—অবশ্য তাঁহাদের ঐ মনোভাব আমি সমর্থন করি নাই। আমার বিশ্বাস, দেশরক্ষার স্বার্থ ব্রিটিশের চেয়ে আমাদেরই বেশী। ইহা আমাদের জীবনমৃত্যুর সমস্যা। ব্রিটিশের কাছে ইম্ফল হারাইবার অর্থ সাম্রাজ্যের কিছুটা ভূখণ্ড হারানো; কিন্তু আমাদের যে দেশবাসী আজ জাপানী বোমায় প্রাণ দিতেছে, ইম্ফল যদি জাপানীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমাদের সেই সমস্ত দেশবাসীর উপরই আবার রয়াল এয়ার ফোর্স হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইবে। এই দারুণ দুঃখ কাহাকে ভোগ করিতে হইবে? আমাদেরই স্বদেশবাসীকে।

যুদ্ধ-সীমান্তে

(নিজস্ব সংবা

পর্ব্বত ও জঙ্গলে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি আসাম আজ রণক্ষেত্র। এই রণক্ষেত্রের সংবাদ খবরের কাগজের মারফত সারা দেশের লোক জানিতেছে বটে, কিন্তু আজ বিপদের সামনে আসামের জনগণের মনে ক্রমশ যে দৃঢ়তা আসিতেছে, স্বদেশভক্তগণের মনেও হতাশা কাটাইয়া নূতন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগিতেছে সে খবর আজও বাহিরে পৌঁছায় নাই।

আসামভ্যালীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র গৌহাটী। মণিপুরে জাপানী আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণেও গৌহাটিতে চাউলের দাম ছিল কমতির দিকে। কিন্তু মজুতকারীদের ষড়যন্ত্রে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের একান্ত অভাব ঘটিতেছিল। এ-ছাড়া, আলো ও জলসরবরাহের ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত খারাপ এবং নানাপ্রকার রোগও দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মণিপুর আক্রমণের পর

এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে জাপানের আক্রমণ অবস্থাকে জটিলতর করিয়া তোলে। চাউলের দাম যদিও বা বাড়ে নাই—কিন্তু লবণ, চিনি, কাপড় প্রভৃতির দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া গৌহাটির নাগরিক জীবনে এক সংকট সৃষ্টি করে।

এই সময়েই কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গৌহাটিতে এক বৈঠকে সমবেত হন। তাঁহারা তখনও জাপানী আক্রমণের বিপদ সম্বন্ধে উদাসীন। যদিও সি, এস্, পি-র 'গণসত্যাগ্রহ' করিবার পরামর্শ তাঁহারা কানে তোলেন নাই কিন্তু 'গ্রাম-সংগঠনের' কার্য্যসূচী গ্রহণ করা ছাড়া বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার কোন আহ্বানও জানান নাই।

ইতিমধ্যে রণক্ষেত্র হইতে ইম্ফল ও কোহিমা অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ আসে। মণিপুর হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের মুখ হইতেও জাপানীদের অত্যাচারের নানা কাহিনী শোনা যায়। তাহারা বলে "জাপানীরা নিরর্থক অসহায় গ্রামবাসীদের উপর বোমাবর্ষন করিতেছে, গ্রামের খাদ্য লুঠ ত' নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কি জাপানীরা গ্রামের যুবকদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।"

এই সব সংবাদে সাধারণ গৌহাটিবাসী এবং কংগ্রেস কর্মীরাও সচকিত হইয়া ওঠে। প্রথম অবস্থায় কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে যে উদাসীনতা ছিল তার পরিবর্তে এখন আসিল হতাশা। "কিছুই করা যাইবে না" এই মনোবৃত্তিই প্রবল।

এই সন্ধিক্ষণেই আসামের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ আসামবাসীর নিকট তাঁহার আহ্বান জানান, "আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া অবিচলিত সাহসের সহিত এই গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হও।"

জনগণের নব-জাগরণ

আসামবাসী তাঁহাদের বরেণ্য নেতার এই আহ্বানে অভূতপূর্ব ভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংকটের প্রথম দিকে গৌহাটির জনসাধারণ কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বাঙ্গালী রেল কর্মচারী নিজেদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভীতির ভাব প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানী রেলশ্রমিকরাই সবচেয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিল। কম্যুনিষ্ট কর্মীদের প্রচারের ফলে তাহারাও আজ দৃঢ়তার সহিত নিজেদের কাজ করিতেছে। একটি রেল শ্রমিকও গৌহাটি পরিত্যাগ করে নাই বরঞ্চ তাহারা উৎসাহের সহিত তাহাদের কাজের মাত্রা বাড়াইয়াছে।

সহরের অধিকাংশ অধিবাসী অবিচলিত ভাবে নিজেদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। লবণের অভাব, জলের অভাব, বিজলীর কারখানা খারাপ হওয়াতে আলোর অভাব—নাগরিক জীবনে নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গৌহাটির নাগরিকগণ তাহাতে ভগ্নোদ্যম হয় নাই। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের লবণ ও আলোর ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছে। প্রত্যহ তাহারা ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে জল বহিয়া আনিয়া তাহা ফুটাইয়া পানীয় যোগ্য করিয়া নেয়। এর পূর্ব্বে সহরের ভদ্রলোক অধিবাসীরা রেশনিং সমর্থন করিত না। কিন্তু আজ কম্যুনিষ্ট কর্মীরা তাহাদের নিকট রেশনিং-এর কথা বলিতে গেলে তাহারা অতি উৎসাহের সহিত তাহা সমর্থন করিতেছে। তাঁহাদের রেশনিংয়ের দাবী সফল হইতে চলিয়াছে, শোনা যাইতেছে যে মে-মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে গৌহাটী শহরে রেশনিং চালু হইবে।

...ীদের বৈঠক সম্পর্কে

...াপীনাথ শ্রীবাস্তব

মিউনিসিপাল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত ...ুই সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের ...হিত সম্পর্ক নূতনভাবে স্থাপন করার সুযোগ হইবে। ...দেশের রাজনৈতিক জীবনে ইহা একদিকে শক্তি ...ার করিবে, অন্যদিকে দেশবাসীর মন হইতে হতাশার ...াব দূর করিবে। নিছক বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্বাচনে ...ড়াইব—এরূপ কোন মনোভাব কর্মীদের মনে না ...াখিয়া খুশী হইলাম।

কংগ্রেস চিরকাল জনসাধারণের সহিত সজীব ও ...জাগ সম্পর্ক রাখিয়াছে—তাই খাদ্য সমস্যার ...ালোচনার সময় উপস্থিত নেতাদের মধ্যে বেশ একটা ...দ্বেগ ও চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল। সংকট যাহাতে ...াড়িতে না পারে, তার জন্য একদিকে যেমন তাঁহাদের ...ধ্যে সংকট রুখিবার আগ্রহ, অন্যদিকে তাঁহাদের ...য়—সংকট দূর করিবার যে কোন বাস্তব চেষ্টার অর্থ বুঝি বর্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা। এইরূপ মনোভাবের আমি তীব্র নিন্দা করি। গবর্ণমেণ্টের অপদার্থতা দূর করিয়া আমরা যদি দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ না করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের প্রতি ...র্তব্যে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিব। আমাদেরই ...দেশবাসী অনাহারে প্রাণ হারাইবে।

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণের ...াবী ঠিক কতখানি সমর্থন লাভ করিয়াছে—তাহা ...িশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এলাহাবাদে নিখিল ...ারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে রাজাজীর প্রস্তাবে ...াত্র ১৪ জন কর্মী সমর্থন করিয়াছিলেন: সেই সময়ের ...বস্থার সহিত তুলনা করিয়া বলা চলে অন্যান্য প্রদেশের ...ত যুক্তপ্রদেশেও এখন আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর সমর্থকদের ...ংখ্যা বাড়িয়াছে। সভায় উপস্থিত বহু কর্মীর সহিত কথা ...লিয়া দেখিলাম, এ বিষয়ে রাজাজীর মতামত সম্পর্কে অনেকের মনেই এখনও নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। এই ধারণাগুলি যদি পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে এই নীতি গ্রহণ করা সহজ হইবে।

...কিন্তু এই দাবী যাহাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়, তাহার জন্য জনসাধারণের বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। আমরা যাহারা বিশ্বাস করি, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর স্বীকৃতি অপরিহার্য—তাহাদের উচিত, কংগ্রেসকর্মীদের লইয়া ক্রমান্বয়ে সভা ডাকা ও এই দাবী উত্থাপন করা। ইহা করিতে গিয়া, হয়ত আমাদের গোড়ায় সাধারণের বিরাগভাজনও হইতে হইবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা লাগিয়া থাকিব। বিশেষ করিয়া এই একটি বিষয়ের সমর্থনে রাজাজীর পাশে দাঁড়াইতে আমি নিজে গৌরব বোধ করি। আমরা জওহরলাল নেহেরুর নিজের প্রদেশের লোক; প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নির্বিবাদ বাদানুবাদে আমরা অভ্যস্ত—নেহেরুর কাছ হইতেই আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমি আশা করি, আমাদের প্রদেশে এই দাবী অচিরে স্বীকৃত হইবে।

সভায় কারামুক্ত কমিউনিস্ট কংগ্রেসকর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে আমি মোটেই খুশী হই নাই। আমি স্বীকার করি, কংগ্রেসকে কঠোর নিয়মানুবর্তী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য ইহার মূলনীতি হইতে বিচ্যুতির একটা পরিষ্কার সীমা থাকা উচিত। কিন্তু ইহা এমন একটি সর্বভারতীয় বিষয় যে, এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ঘোষণা করার ক্ষমতা একমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরই আছে। কংগ্রেস যখন আবার বৈধতা ফিরিয়া পাইবে, তখন নেতারা এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আজ এই সংকট সময়ে আমাদের পক্ষে কংগ্রেসকর্মীদের কোন একটি বিশেষ অংশকে এভাবে পৃথক্‌ করা মোটেই সঙ্গত নয়।'

(লক্ষ্ণৌয়ের ইংরাজী সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্তান' পত্রিকা হইতে)

...া আসাম

(...দাতার পত্র)

ডিব্রুগড় ও জোরহাটেও প্রাণের স্পন্দন

বিপন্ন মাতৃভূমিকে বাঁচাইবার প্রেরণা আসামের অন্যান্য সহরেও ছড়াইয়া পড়িতেছে! উত্তর আসামের প্রধান সহর ডিব্রুগড়; সীমান্তের এই সহরে কর্তৃপক্ষ এখনও পুরা রেশনিং চালু করে নাই। তাই যুদ্ধের চাপে সরবরাহের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিলে মজুতকারীরা তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লবণ, চিনি, কাপড় প্রভৃতি জিনিষ দুষ্প্রাপ্য করিয়া তোলে। দেশদ্রোহী ফরোয়ার্ড ব্লক, সি, এস, পি প্রমুখ দল নানাপ্রকার মিথ্যা গুজব রটাইয়া জনগণের মানসিক বল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই অবস্থায় ডিব্রুগড়ের দেশপ্রেমিকগণ তাঁহাদের কর্তব্য ভুলেন নাই। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ছাত্রফেডারেশন, মহিলা সমিতি, রেলশ্রমিক ইউনিয়ন, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সকল দলের মিলিত স্বাক্ষরে ডেপুটি কমিশনারের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে। **কংগ্রেস নেতা শ্রীলক্ষেশ্বর বড়ুয়া এম, এ, মুস্লিম লীগ সম্পাদক মিঃ শফিউর উদ্দিন আহম্মদ, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ লুৎফর রহমান এবং মিউনিসিপ্যালিটির জনপ্রিয় চেয়ারম্যান এই স্মারকলিপিতে সই দিয়াছেন। সহরে রেশনিং প্রবর্ত্তন ও সকল দলের সম্মেলন আহ্বান করিয়া বেসামরিক আত্মরক্ষা কমিটি গঠন করিবার দাবী জানান হইয়াছে।**

জোরহাটের অধিবাসীরাও বিদেশী আক্রমণ হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। কংগ্রেসের এক অংশ যদিও এখনও হতাশায় ডুবিয়া আছেন, সাধারণ কংগ্রেসসেবীরা আজ শ্রীযুত বরদলৈর আহ্বানে দেশরক্ষার কাজে অগ্রসর হইতেছে।

বসিয়া থাকিবার সময় নাই

আসাম ভ্যালীর দেশকর্মী ও জনগণ দেশপ্রীতি ও সাহসিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন তাহা সমস্ত দেশবাসীকেই অনুপ্রাণিত করিবে। কিন্তু আজ বিপদও অত্যন্ত গভীর। যুদ্ধের চাপে ও মজুতদারদের ষড়যন্ত্রে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থায় যে কোন সময়ে ভাঙ্গন ধরিতে পারে। ইতিমধ্যেই লবণ সরবরাহের ব্যবস্থায় দারুণ গোলযোগ হইতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে আসাম ভ্যালীতে লবণ আজ দুষ্প্রাপ্য। দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনী দলগুলি এখনও আসাম ভ্যালীর জনগণের ভিতর নানাপ্রকার কুপ্রচার চালাইতেছে। 'কোন কিছু করা যাইবে না' এই কথা কংগ্রেসীদের কানে কানে অনবরত বলিয়া তাহারা কংগ্রেস ভক্তদের মধ্যে হতাশা জন্মাইবার প্রয়াস করিতেছে। আজ আমলাতন্ত্রের এখনও শ্রীযুত বরদলৈর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেয় নাই। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর নিত্য নূতন বাধানিষেধ আরোপিত হইতেছে এবং সভা-শোভাযাত্রার সম্পর্কেও নানাপ্রকার বিধিনিষেধ রহিয়াছে।

তাই আজ আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই। আসামের বিপদ সমস্ত ভারতের বিপদ। এই বিপদে সমস্ত দেশের হিন্দু-মুসলমান দেশ-প্রেমিকগণ আসামের জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হউক। সারা বাংলা তথা সারা ভারতে শত শত সভা শোভাযাত্রা হইতে এই ধ্বনি উঠুক যে শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আসামে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ চাই, সভা শোভাযাত্রার অবাধ অধিকার চাই, আসামের কংগ্রেস নেতাদের ও মণিপুরের জননেতা ইরাবত সিংহের ও অন্যান্য দেশকর্মীদের উপর হইতে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হউক।

বর্দ্ধমানের খাদ্যকমিটি

মজুতদার ও দেশদ্রোহীর বিভেদের চেষ্টা পণ্ড

গত বৎসর মার্চ মাস হইতে বর্দ্ধমান শহরে খাদ্য আন্দোলন সুরু হয়। তখন চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল—যাহাও বা পাওয়া যাইত তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী ছিল। কণ্ট্রোল দোকান খোলা ও রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করার দাবী লইয়া আন্দোলন সুরু হয়। প্রথমে চিনি ও আটা ময়দা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এইজন্য কতকগুলি দোকান খাদ্যকমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত হয়। ধীরে ধীরে সমস্ত কণ্ট্রোল দ্রব্য বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার এই দোকানগুলিকে দেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া গত আগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শহরের মহল্লায় মহল্লায় জনসভায় মহল্লা খাদ্যকমিটি গঠিত হয়। গত ১২ই সেপ্টেম্বর মহল্লা কমিটিগুলির প্রতিনিধি লইয়া শহর খাদ্যকমিটির জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হয়। মহল্লা কমিটিগুলিতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই স্থান পায়। শহরের ধনী লোকরা তখনও খাদ্যকমিটির কাজে আগাইয়া আসেন নাই। কিন্তু আন্দোলন যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে ততই স্বচ্ছল অবস্থার লোকদের মধ্যে অনেকে খাদ্য আন্দোলনের কাজে আগাইয়া আসিতে থাকেন। এই সময় খাদ্যকমিটির পক্ষ হইতে মহল্লা কমিটীগুলিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য জনসভা ডাকিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে এই দিকে আরো বেশী জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে কোন কোন মহল্লা কমিটি ৪।৫ বার পর্য্যন্ত পুনর্গঠিত করা হয়।

বর্তমানে শহরে ৫১টা মহল্লা কমিটি আছে। প্রত্যেক কমিটিতেই পাড়ার সব শ্রেণীর লোকই যোগ দিয়াছেন। পাড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও কমিটির কাজে সাহায্য করেন। অধিকাংশ কমিটিতেই নূতন নূতন উৎসাহী কর্মী রহিয়াছেন। প্রত্যেক কমিটি এখন আটা, ময়দা, চিনি, কেরাসিন প্রভৃতি কণ্ট্রোলের দ্রব্যগুলি রেশন কার্ড বা কুপনের সাহায্যে সমভাবে বিলি করিতেছে। প্রত্যেক পাড়ায় পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য লোক গণনা কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত পুনর্গঠিত মহল্লা কমিটির ভিত্তিতে নূতন ভাবে শহর খাদ্য-কমিটি গড়িবার জন্য নূতন নির্বাচনের প্রচেষ্টা হয়। খাদ্যকমিটির নূতন গঠনতন্ত্রে বলা হইয়াছে—(১) জেনারেল কাউন্সিলে প্রত্যেক মহল্লা কমিটি লোক-সংখ্যার অনুপাতে (প্রতি হাজারে একজন) প্রতিনিধি পাঠাইবে। (২) বিভিন্ন পার্টি ও প্রতিষ্ঠান একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবে। (৩) জেলা জজ ইহার প্রেসিডেণ্ট হইবেন। ৯ই এপ্রিল প্রত্যেক মহল্লা কমিটি প্রতিনিধি নির্বাচনের আদেশ পায়।

খাদ্য আন্দোলনে ভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা

শহরে খাদ্য কমিটির কাজ চোরাবাজারের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাই মজুতদাররা খাদ্য কমিটিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। ইহাদের এই কাজে হাত মিলাইয়াছেন স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীকুমার মিত্র ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন কর্মী। ফুড কমিটি মজুত বিরোধী অভিযানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে এই অজুহাতে জেলা কমিটি হইতে শ্রীকুমার বাবু পদত্যাগ করেন। তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে টাউন ফুড কমিটি হইতে পদত্যাগ করিবার জন্য হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিদের উপর তিনি নির্দ্দেশ দেন। বহুদিন এই নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা অবশেষে শহর কমিটি হইতে পদত্যাগ করেন, কিন্তু হিন্দু-মহাসভার কর্মীরা মহল্লা কমিটিতে ভালভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ভেদ-সৃষ্টিকারীরা বুঝিয়াছিলেন যে কোন মহল্লা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া ফুড কমিটিতে যাইতে পারিবেন না। তাই মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্টের খাদ্য কমিটি সংক্রান্ত সার্কুলারের একটী ধারার সুযোগে সরকার মনোনীত খাদ্য কমিটি গঠনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন জানায়। এমন কি তাহারা লাট সাহেবের কাছেও নির্ব্বাচিত খাদ্য কমিটি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আবেদন জানায়। কোন জবাব না পাইয়া তাহারা মরিয়া হইয়া উঠে। গত ২৫শে মার্চ্চ যখন শহরে খাদ্য সম্মেলন হয়, তখন তাহারা সেই সম্মেলন পণ্ড করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। বর্দ্ধমানের এই বিরাট সভায় গণ্ডগোল করার ফলে জনসাধারণের নিকট তাহাদের স্বরূপ আরো বেশী করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সম্মেলনের দুইদিন পরে তাহারা "কনজিউমার্স এসোসিয়েশান"এর নাম দিয়া একটী সভা ডাকে। তাহাতে ১২৫ জন লোক সমাগম হয়। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা এই সভায় ফুড কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ও রেশনিংএর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করাইতে সক্ষম হয় নাই।

তাহারা শহর খাদ্য-আন্দোলনের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ভুজঙ্গ সেনের বিরুদ্ধে চুরি ও ঘুষখুরি প্রভৃতির অভিযোগ প্রচার করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে খাদ্য-কমিটির প্রকাশ্য অনুসন্ধান জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে এই সব কুৎসা রটনাকারীর উদ্দেশ্য কত হীন এবং খাদ্য আন্দোলনের এই সব অক্লান্ত কর্মীরা কত নিষ্ঠাবান।

জনগণের খাদ্য আন্দোলন ভাঙ্গা যায় না

ভেদসৃষ্টিকারীরা বিভিন্ন মহল্লায় প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গঠন করার চেষ্টা করিতেছে। এই সব কমিটির পক্ষ হইতে টাউন কমিটিতে প্রতিনিধি হইয়া যাইবার জন্যই তাহাদের এই প্রয়াস। প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গঠনের প্রচেষ্টায় তাহারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইতেছে। আলমগঞ্জে এইরূপ একটী কমিটি তাহারা গঠন করিয়া ফেলে কিন্তু ১৮জনের মধ্যে ১৪ জনই জানাইয়া দিয়াছেন যে তাহাদের সহিত এই কমিটির কোন সম্পর্ক নাই। কাঞ্চন নগর হইতে তাহারা প্রকৃত পক্ষে পালাইয়া আসিয়াছে। ভদ্রবেশী "গণ্যমান্য" মজুতদারদের কয়েকজন বন্ধু কমিটির প্রতিনিধি হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহল্লার সাধারণ লোকজন এই সব "বন্ধু"দের চিনিতে সুরু করিয়াছে। রাধা নগরের মত ধনী অঞ্চলেও শ্রীকুমার মিত্র ও বলাই মুখার্জ্জী প্রতিনিধি হইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ৩৫জন প্রতিনিধির নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কর্মীই টাউন ফুড কমিটির ভাল সমর্থক ও মহল্লা কমিটির ভাল কর্ম্মী। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মাত্র ১জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া যে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ফুড কমিটির কাজে আগাইয়া আসিতেছেন তাহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান গিরিন বাবু, প্রফেসর ভুজঙ্গ মিত্র, প্রবীণ উকিল দিবাকর কোঙার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধীরে ধীরে ফুড কমিটির শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পাণ্ডা মজুতদাররা একঘরে হইয়া পড়িতেছে। কয়েকজন ব্যবসায়ীও ফুড কমিটির কল্যাণকর কাজে সহায়তা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ডিব্রুগড় কংগ্রেসনেতা
লক্ষেশ্বর বড়ুয়ার বিবৃতি

আমার দেশ আজ জাপ-আক্রমণের সম্মুখে বিপন্ন। আমার ইচ্ছা আমি আমার দেশের লোকের কাছে ছুটিয়া যাই, তাহাদের বুঝাই কি বিপদ আজ তাহাদের সামনে, এবং তাহারা যাহাতে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মরক্ষায় তৎপর হয়—তার জন্য তাহাদের সাহায্য করি। কংগ্রেসের প্রতি আমাদের জনগণের অসীম শ্রদ্ধা আছে এবং কংগ্রেসের আহ্বানে তাহারা বিপুল সাড়া দিবে। তাই আমার গতিবিধির উপর পুলিশের কড়া আইন আজ যেন আমার কাছে অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছে, আমি আমার দেশের লোকের সঙ্গে মিলিতে পারিতেছি না।

এই কথাগুলি ডিব্রুগড় জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষেশ্বর বড়ুয়া, এম, এল, এ আমাদের সংবাদদাতা জ্যোতি বসুর কাছে বলেন।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ৯ই আগষ্টের পর গ্রেফতার হন এবং নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক থাকেন। সম্প্রতি গতিবিধির উপর বাধা আরোপ করিয়া তাঁহাকে ছাড়া হইয়াছে। ছাড়া পাইবার পর হইতে তিনি এই সব বাধা সত্ত্বেও জনগণের সেবা করিতেছেন। তিনি আরো বলেন যে কংগ্রেস সেবী ও অন্যান্য দেশ প্রেমিকরা যদি সারা ভারতে একত্র আন্দোলন করেন তাহা হইলে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে লোকের মনোবল দৃঢ় হইবে, গুজব ও অহেতুক ভয়ের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়া যাইবে।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা: ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪৷৹, ৬ মাস ২৷৹, ৩ মাস ১৷৹

সংঘবদ্ধ আন্দোলনে জয়ী
★বেল্টিং মজুর★

শ্রীরামপুর বেঙ্গল বেল্টিং মিল কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ মাস-মাহিনার স্থানে দিন-মজুরী প্রথা চালু করে। ইহাতে সাধারণ মজুর মালিকের হামলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তিনদিনে সমস্ত মজুর ইউনিয়নের মেম্বর হয়। মজুরের একতার কাছে মালিকের পরাজয় হয়। কেবল-মাত্র মাস মাহিনা প্রথাই বজায় থাকে না—শতকরা আরো দশটাকা বেশী মাগ্‌গী ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের গ্যারাণ্টি, লভ্যাংশের উপর বোনাস ও মিল কমিটিকে কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে এবং কমপক্ষে প্রত্যেক মজুরের ২৫ টাকা রোজগার ইত্যাদি দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

মজুর ও জনগণের চাপে মালিক কোন ঠাসা

কমরেড শান্তি রায়কে গুণ্ডারা পথে মার পিট করে ও বঙ্গলক্ষ্মী বেল্টিং মিলের গেটের মধ্যে বে-আইনীভাবে আটক করিয়া রাখে। ইহার প্রতিবাদে সমস্ত মিল মজুর ও স্থানীয় জনগণের পক্ষ হইতে একটা ডেপুটেশন মিল মালিকের কাছে যায়। মিল মালিক মজুর ও জনগণের একতা দেখিয়া মারপিটের জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয় ও ভবিষ্যতে এইরূপ আচরণ আর হইবে না তাহা ঘোষণা করে।

ছাঁটাই মজুররা কাজে বহাল

এক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া বেল্টিং মিলে মিল মালিক টাকায় দুই আনা মাগগী ভাতার স্থানে টাকায় ছয় আনা মাগগী ভাতা ও ১৫৲ মন দরে চালের স্থানে ১০৲ মন দরে চাউল দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক মাস পরে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটীশে এক শিফট মিল বন্ধ করার অজুহাতে দুই শিফট হইতে বাছাই করিয়া ২৭ জন ইউনিয়ন নেতাকে ছাঁটাই করে। মজুরেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করিতে থাকে এবং মালিকের কাছে ও লেবর কমিশনরের কাছে ছাঁটাই মজুরদের কাজ দাবী করে। লেবর কমিশনরের অফিস হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না—কিন্তু মিল মালিক মজুরদের একতার চাপে কিছু কিছু করিয়া মজুরদের আবার কাজে লইতেছে।

ট্রাম শ্রমিকের পিছনে
জননেতাদের বিপুল সমর্থন

ট্রাম চলাচলের অসুবিধা, যাত্রীদের ভীড়, কণ্ডাক্টর ও যাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং অন্যান্য ব্যাপারে যাত্রীদের দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা দূর করার জন্য কলিকাতার ট্রাম-শ্রমিক সহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিতেছে।

কলিকাতার নাগরিক এতদিন কোম্পানী বা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ট্রাম চলাচলের উন্নতির প্রতিশ্রুতিই পাইয়া আসিতেছিল, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার জন্য চেষ্টার কোন প্রমাণ পাইতেছিল না। বরং, দিনের পর দিন যাত্রীদের অভিযোগ বাড়িয়াই যাইতেছিল। ট্রাম শ্রমিকরাই প্রথম ট্রাম চলাচলের উন্নতি কিভাবে সম্ভব তাহার পথ দেখাইল।

গত এক সপ্তাহে ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল কংগ্রেস নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, মিঃ জে, সি, গুপ্ত; মুসলিম লীগের নেতা মিঃ মহম্মদ ওসমান, মিঃ মুজিবর রহমান, আব্দুল মজিদ, এম, এন, হক; হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, সরকার বিরোধীদলের নেতা মিঃ ফজলুল হক; সাংবাদিক শ্রীযুত সত্যেন মজুমদার; আইন পরিষদের স্পীকার মিঃ নওসের আলি; ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু; সুরশিল্পী শ্রীযুত সায়গল, শচীনদেব বর্ম্মন; ছাত্র নেতা শ্রীযুত অন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য্য; অধ্যাপক ডাঃ দুঃখহরণ চৌধুরী, মিস সেন; চিকিৎসক ডাঃ আসান, ডাঃ বিষ্ণুপদ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ নরেশ ঘোষ, ডাঃ সুধীর সেন; এডভোকেট শ্রীযুত সাধন গুপ্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জননেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা প্রত্যেকে ট্রাম শ্রমিক-দের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

প্রতিনিধি দল ট্রাম চলাচলের উন্নতির পথে বাধা কি তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, কেবল মাত্র বেলগাছিয়া সেকসনে গত ২০শে এপ্রিল হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, ৫ শত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় দুইশত শ্রমিক, হয় অনুপস্থিত, অসুস্থ, ছুটি অথবা সসপেণ্ড লিষ্টে আছে। ইহার কারণ, মজুরদের শোচনীয় আর্থিক সংকট, উপযুক্ত মাগগী ভাতা ও প্রয়োজনানুপাতে রেশন বরাদ্দ না হওয়া, অথচ, যাত্রীর ভীড়ে কাজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় ট্রাম শ্রমিক বাস্তবিকই মরিতে বসিয়াছে।

একজন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা প্রশ্ন করেন, আপনারা ধর্ম্মঘট করেন না কেন? প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন জবাবে বলেন, ধর্ম্মঘট নাগরিকদের দুর্দ্দশাকে আরো বাড়াইবে, আমলাতন্ত্রকে মজুরদের দেশপ্রেমিক একতার উপর আঘাত করিতে সুযোগ দিবে, দেশের সংকটকে আরো গভীর করিবে, বিভেদ সৃষ্টিকারীদের নাশকতার কাজে সুযোগ দিবে, জাপ গোলামীর পথ পরিষ্কার করিবে। হিন্দু নেতা তখন ট্রাম শ্রমিকদের দেশপ্রেমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কংগ্রেস নেতা ডাঃ সান্যাল বলিলেন, কোম্পানী যেখানে ট্রাম চলাচলের উন্নতি করিতে পারিতেছে না, আপনারা তাহা কি করিয়া পারিবেন? কোম্পানীর চেয়ে আপনাদের মাথায় কি বেশী বুদ্ধি আছে? ট্রাম শ্রমিকদের একজন বলিলেন, কোম্পানীর মাথায় যে বুদ্ধি কম আছে তাহা নয়, কিন্তু সে বুদ্ধি জনসাধারণের সেবা বা সুবিধার জন্য খাটানো হয় না, খাটানো হয় মুনাফা বাড়াবার জন্য আর, অশিক্ষিত হলেও ট্রাম চলাচলের ভার তো আমাদেরই হাতে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য কি ধরণের টাইমটেবিল চালু করা দরকার, তাহা আমরাই সবচেয়ে ভাল জানি। অথচ এতদিন আমরা এই সাধারণ দাবীটিই করিয়াছিলাম যে জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে টাইম টেবিল তৈরী হয় তাহার জন্য আমাদের সহিত একটি যুক্ত কমিটি গঠন করো। কিন্তু কোম্পানী তাহাতে রাজী নয়, গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে উদাসীন। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হইল, কোম্পানী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যে বিরোধ বর্ত্তমানে চলিয়াছে, ট্রাম চলাচলের উন্নতির স্বার্থে এই বিরোধের মীমাংসার ভার একজন এডজুডিকেটরের উপর দেওয়া হোক।

প্রত্যেক পাড়ায় ও মহল্লায় শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ ট্রাম শ্রমিকদের দাবীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

মাগগীভাতা সম্মেলনে
★শ্রমিকের দাবী★

১৬ই এপ্রিল হইতে ২৪-পরগণা জেলার শিল্পাঞ্চলে মজুরদের মাগগীভাতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন সফল করিবার জন্ম বস্তীতে বস্তীতে প্রচারকার্য চালানো হয়, মিলের গেটে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়। ফ্যাশিস্ট দস্যু আজ আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। তাহাকে পরাস্ত করার জন্ম উৎপাদন জোর কদমে বাড়াইতে হইবে। কিন্তু মজুরের শ্রমশক্তি বাড়াইতে হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকার উপযুক্ত সামান্যতম দাবী মিটাইতেই হইবে। তাই মজুরের মাগগীভাতার দাবী আজ দেশ-রক্ষারই দাবী।

কাঁচরাপাড়া, গৌরীপুর, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, জগদ্দল ও বেলঘরিয়ায়

মাগগীভাতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সভাতেই মজুরদের মধ্যে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়। প্রধানত মাগগীভাতা সম্মেলন হইলেও, প্রত্যেকটি সভা হইতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, মুসলিম জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জাপবিরোধী প্রচার সম্বন্ধে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে গ্রেগরী কমিশনের মাগগীভাতা সংক্রান্ত সুপারিশকে আইনে পরিণত করার জন্ম দাবী জানানো হয়; ইহা ছাড়া রেশনিং চালু করা, ভালো রেশন, এ-আর-পির সুব্যবস্থা, এ-আর-পি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, কয়লা সংকট দূর করা প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সোভিয়েটের লালফৌজ, চীনের স্বাধীনতা সৈনিক, মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুদ্ধরত মুক্তি ফৌজ ও আসাম ফ্রণ্টে দেশরক্ষার সৈনিকদের অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আই-এল-ও সম্মেলনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রেরণ না করায় গবর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়।

পূর্ব্ব-বগুড়ার চিঠি

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাজের পরিসর বাড়িতেছে

মেডিকেল ইউনিটকে এখন বহু গ্রাম হইতে ডাকিতেছে। তাহারা ঘরবাড়ী দিয়া ও টাকাপয়সা তুলিয়া সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি জানাইতেছে। নিজের গ্রামকে বাঁচানোর এই ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাগুলি ক্রমশঃ একটী জিলাময় আন্দোলনে পরিণত হইতেছে! নেতারা পিছাইয়া থাকিলেও লীগ ও কংগ্রেসের সাধারণ ভক্তরা আগাইয়া আসিতেছে—বগুড়ার সমস্ত দল এক না হইয়া পারে না।

ইতিমধ্যে আরও দুইটী কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে।

সরকার আসিতে বাধ্য

জানুয়ারী পর্যান্ত পূর্ব্ব বগুড়ায় একটীও বিশেষ হাসপাতাল সরকারপক্ষ হইতে খোলা হয় নাই যদিও ইহার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ যথেষ্ট আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মেডিকেল ইউনিটের কাজ ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া এই আন্দোলন শুরু হইল তখনই ৫০টী বেড সম্বলিত একটী বিশেষ হাসপাতাল খোলা হইল। সমস্ত বগুড়ায় সম্ভবতঃ এই একটী মাত্র বিশেষ হাসপাতাল খোলা হইয়াছে (টাউন বাদে)।

যতীন্দ্রমোহন রায়ের মুক্তি চাই

পূর্ব্ব বগুড়ার সমস্যা শুধু মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই নয়, সর্ব্বতোভাবে গ্রামগুলিকে গড়িয়া তোলার সমস্যা। ২৫০০ জেলে জোলা তাঁতীদের জন্য কুটিরশিল্পগুলি (তুলা, সূতা, জাল সরবরাহ করিয়া) চালু করা, কৃষকদের জমি ফেরৎ দেওয়া, হাল-বলদ বীজের ব্যবস্থা করা, যাহাদের আশ্রয় নাই তাহাদের আশ্রয় স্থান বা বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা, পতিতা নারীদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, শিশুদের বাঁচানো। বগুড়ার সমস্ত জনসাধারণকে এক করিয়া সরকারকে সাহায্য করিতে বাধ্য না করিলে এত বড় কাজ হইতে পারে না।

উত্তরবঙ্গ বন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে যতীন্দ্রমোহনই বার বার তাঁর সেবার আদর্শ, সংগঠন শক্তি ও অকপটতা লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন। তাঁকে বগুড়ার সমস্ত জনসাধারণ শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। তিনি এখন যশোহরে অন্তরীণ। তিনি আসিয়া দাঁড়াইলে এই আন্দোলন শতগুণে শক্তিশালী হইবে—পূর্ব্ব বগুড়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

আমরা অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি চাই।

মৃত্যুর মুখে ৭শত চা-মজুর

ভাটিয়া কোম্পানীর অধীনে চট্টগ্রামে ছয়টি চা বাগানে প্রায় ৭০০ মজুর কাজ করে। কোম্পানীর সমস্ত রকম জুলুম অত্যাচার সহ্য করিয়াও মজুররা তাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য হিসাবে উৎপাদন বাড়াইয়াছে। কিন্তু স্বার্থপর লোভী কোম্পানী মজুরের দেশপ্রেমকে বরদাস্ত করিতে পারে না।

চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভাটিয়ার জুলুমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, সরকার মজুরদের দাবী মানিয়া নেয়।

সরকার আদেশ জারী করিয়াই তার দায়ীত্ব শেষ করে। আদেশ কাজে পরিণত হইল কিনা সেদিকে নজর নাই। মজুরদের পক্ষ হইতে বার কয়েক ডেপুটেশন যাওয়া সত্ত্বেও সরকার নীরব থাকে। তাতে কোম্পানীও সাহস পায়। সরকারী আদেশ সে উপেক্ষা করে। গত তিন মাসের মধ্যে চার বার মজুরদের তলব বন্ধ হয়, একবার চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত তলব বন্ধ করিয়া রাখা হয়। গত তিন সপ্তাহ পর্যন্ত তলব বন্ধ। তাহার উপর সম্প্রতি কোম্পানী কোন নোটিশ না দিয়াই সমস্ত বাগান বন্ধের আদেশ দিয়াছে।

প্রায় ৭ শত মজুর বেকার হইয়াছে। মহামারী অনাহারের সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। মাসখানেক আগে কলেরায় অনেক মজুর মারা যায়। শতকরা ৭০ জন মজুর ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং কোম্পানী একত্রে ৭০০ মজুরকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিতেছে।

কয়েকজন মজুর বহু বছর ধরিয়া খাজনার উপরে কোম্পানীর জমি চাষ করিত। এবার কোম্পানী নানা অজুহাতে মজুরদের সে জমি হইতে উৎখাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং জমি কাড়িয়া নিতেছে। এবার কোম্পানীর খাস জমিগুলি খালি পড়িয়া আছে, আউশের চাষ করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই সময়টায় চা পাতা তোলা হয়। বাগান বন্ধের আদেশের ফলে সে পাতা নষ্ট হইয়া যাইবে। এ বৎসর এ সব বাগানে অর্দ্ধেক উৎপাদন হওয়াও সম্ভব নয়।

মজুররা কোম্পানীর উৎপাদন বন্ধ এবং মজুরদের উৎখাতের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। কোম্পানীর আদেশের বিরুদ্ধে তাহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন পাঠাইয়াছে। বাগানে বাগানে সভা ডাকিয়া ভাটিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এবং সরকারের নিকট দাবী পেশ করার জন্ম গণসহি সংগ্রহ করিতেছে।

কর্পোরেশন মজুর সমাবেশে
ঐক্যের আহ্বান

গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ হইতে সদ্য নির্ব্বাচিত শ্রমিক কাউন্সিলর কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইলকে কর্পোরেশন শ্রমিকদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় ইণ্টালী কারখানা, টালা, মোটর ভেহিকলস্, লাইটিং, ধাঙ্গড়, জমাদার, কেরাণী প্রভৃতি সকল বিভাগের শ্রমিক উপস্থিত ছিল।

সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা এবং সদ্যনির্ব্বাচিত কাউন্সিলর শ্রীযুত রাধানাথ দাস, এম এল, এ। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দাঁড়াইয়া কমরেড লাহিড়ী অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, "যুদ্ধ ভারতের অভ্যন্তরে চলিয়া আসায়—কর্পোরেশন শ্রমিকের দায়িত্ব অনেক বেশী বাড়িয়াছে। কর্পোরেশন শ্রমিক যাহাতে জনসাধারণের সেবায় দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা লইতে হইবে।"

মাগগী ভাতার দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "সরকারী কমিটির সুপারিশ মতো প্রত্যেক শ্রমিক ন্যায়সঙ্গতভাবে কমপক্ষে ৪৫৲ মাগগী ভাতা দাবী করিতে পারে। এই দাবীর উপর তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।" কমরেড ইসমাইল বলেন, একমাত্র কর্পোরেশন মজুর এবং কলিকাতার অন্যান্য মজুরের একতার আঘাতে কর্পোরেশনকে আবার দেশপ্রেমের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহার সুনাম ফিরাইয়া আনা যায়। শ্রীযুত রাধানাথ দাস শ্রমিকদের ভরসা দেন যে, তিনি যথাসম্ভব তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করিবেন।

সভায় স্থির হয় যে, কর্পোরেশন শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবীর উপর একটি মেমোরেণ্ডাম তৈরী করিয়া তাহার উপর সমস্ত শ্রমিকের এবং জনসাধারণের সমর্থন লইতে হইবে, ইউনিয়নের পতাকার নীচে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করিয়া ঐ দাবী আদায় করিতে হইবে।

রিক্সামজুর ইউনিয়ন গড়িল

গত ২৪শে এপ্রিল কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের রিক্সা শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সভায় "কলিকাতা রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন" গঠিত হয়। সদ্য নির্ব্বাচিত কর্পোরেশন কাউন্সিলের কমরেড ইসমাইল এবং কমরেড মিহির বোস যথাক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ২৬শে এপ্রিল শ্রমিকদের এক সাধারন সভায় ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র ও দাবী অনুমোদিত হয়।

রিক্সা কলিকাতার যানবাহনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। কলিকাতার লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু যানবাহনের ব্যবস্থা বাড়ে নাই। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া রিক্সার মালিকরা বেশ পয়সা কামাইতেছে, রিক্সার জমা কোন কোন ক্ষেত্রে চার পাঁচ গুণ বাড়াইয়াছে। অথচ জিনিষ পত্রের দর বাড়ার অনুপাতে রিক্সা চালকরা যাহা রোজগার করে তাহা কিছুই নয়। ইহা ছাড়া, চার সের চাউল আটায় রিক্সা শ্রমিকদের সপ্তাহ চলা অসম্ভব। পুলিশের ঘুষ আদায়, মামলা দায়ের ও জরিমানা ত লাগিয়াই আছে। প্রতিকারের ব্যবস্থা হিসাবে এতদিন রিক্সা শ্রমিকদের কোন সংগঠন ছিল না। সংগঠন যা কিছু ছিল তাহা মালিকদের পরিচালনাধীন। গত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে প্রথম তাহারা লাল ঝাণ্ডার নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। এবার তাহারা দলে দলে ইউনিয়নে যোগদান করিতেছে। জাপ বিরোধী সপ্তাহে তাহারা ৮৬ খানা "স্বাধীনতা" ক্রয় করিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনে ইহাদের জয় যাত্রাকে কে ঠেকাইতে পারে?

সোভিয়েটের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারত

কলিকাতায় সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলন

সোভিয়েটের বিরাট জয় কেবল হিটলারী দস্যুদের ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না—তাহার অপূর্ব্ব আদর্শনিষ্ঠা, দেশপ্রেম এবং প্রগতিমূলক মুক্তিযুদ্ধ আজ দেশে দেশে তাহার নূতন বন্ধু সৃষ্টি করিতেছে। যেদিন হিটলার সোভিয়েটকে আক্রমণ করে, সেদিন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে আমাদের শ্রেষ্ঠকবি, আমাদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, লেখক, সাংবাদিক সুদূর বাংলা হইতে অধিকৃত ইউরোপ ও মুক্তিকামী দুনিয়ার জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছিল—"আমরাও সোভিয়েটের বন্ধু"। আজ জাপানী ফাশিষ্টদের আক্রমণের মাঝে গত ২১শে — ২৩শে এপ্রিল **সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলনে** বাংলার বুদ্ধিজীবি, বাংলার বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, কবি, অভিনেতা, ছাত্র, যুবক, কংগ্রেসসেবী, লীগকর্ম্মী সকলে সমস্বরে আবার সেই কথা জানাইলেন।

সোভিয়েটের বন্ধুত্ব কামনায় এতবড় জনসমাবেশ কখনো হয় নাই। যে সভাপতিমণ্ডলী সভার কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহাও যেন বাংলার বিভিন্ন চিন্তা ধারার সার্থক প্রতিবিম্ব: কবিগুরুর পরিবার হইতে আসিয়াছিলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত, মুসলীমলীগের জনপ্রিয় সম্পাদক মৌলভী আবুল হাসেম, বাংলা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে ৫০ জন প্রতিনিধির বক্তৃতায় প্রকাশ পাইতেছিল যে সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘ সংগঠন হিসাবে আজো ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে নাই; কিন্তু সোভিয়েট আপন মহিমায় আপনার কাজের মধ্যদিয়া প্রতিজেলায় জেলায় তাহার বন্ধুর সংখ্যা বাড়াইতেছে। কাজেই সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘের কাজ ভাল ভাবে চালাইবার জন্য সংগঠন বৃদ্ধির দাবী প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইন সভার সভ্য, যুবক রাজনৈতিক কর্ম্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সরকারী কর্ম্মচারী, নাট্যজগতের নাম করা অভিনেতা, এবং ইউরোপিয়ান নরনারী। হলের চারিদিকে রক্ত পতাকা, সোভিয়েট নেতাদের চিত্র এবং সোভিয়েট হইতে প্রাপ্ত পোষ্টারে একটী রক্তাভ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার মাঝে বাংলার স্বদেশী যুগের বিপ্লবী নেতা ডাঃ ভূপেন দত্ত, যিনি সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘের জন্ম হইতেই তাহার সভাপতি, তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সোভিয়েটের গুণাবলীর কয়েকটি দিক বলিলেন। ইহার পর বিখ্যাত কংগ্রেস নেত্রী এবং কংগ্রেসের ১৯৩২ সালের বিশেষ অধিবেশনের সভানেতৃ শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা সভার উদ্বোধন করেন। পরে সভাপতি মণ্ডলীর প্রত্যেকে সোভিয়েটের জীবনধারার বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসনেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ ও মিঃ জে, সি, গুপ্ত বার বার তাঁহাদের বক্তৃতায় দেখান যে কিভাবে কংগ্রেস সোভিয়েটের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, কি ভাবে কংগ্রেসের শ্রমিক-কৃষক সম্পর্কিত-প্রস্তাবে সাম্যের আদর্শে রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে। ৮ই আগষ্টের বিখ্যাত প্রস্তাবের অনেক যায়গায় উদ্ধৃত করিয়া ক্ষিতীশবাবু তাঁহার যুক্তির পক্ষে দেখান। লীগ সম্পাদক আবুল হাসেম ও তারাশংকরের বক্তৃতা সমস্ত শ্রোতাদের মনে আবেগের বন্যা বহাইয়া দেয়। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বাংলার কৃষকের, বাংলার গ্রাম্য-সমাজের দুর্দ্দশা দেখিতে গিয়া, বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ভাগ লইতে গিয়া কিভাবে সোভিয়েটের আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন তাহা পরম আবেগের সঙ্গে তারাশংকর বিবৃত করেন। তাঁহার বক্তৃতার আন্তরিকতা সমস্ত শ্রোতার মন স্পর্শ করে। আবুল হাসেম বলেন যে তিনি মার্ক্সবাদী নন, তিনি খাঁটি ইসলামপন্থী। কিন্তু ইসলাম তাঁহাকে শিখাইয়াছে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র তাহাকে ভালবাসিতে। সোভিয়েট সুন্দর ও মহান, তাই তিনি

তাহার বন্ধু। সোভিয়েটের আদর্শে ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহা হইলে কিরূপে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল চূর্ণ করিয়া ভারত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবে তাহা তিনি দৃঢতার সহিত ঘোষণা করেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটীতে লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং অপরটীতে ফাশিজমের বিরুদ্ধে জনগণের জয় সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনের পরে সংঘের ঘরে চারদিন ধরিয়া পোস্টার প্রদর্শনী হয়।

সোভিয়েটের বৈদেশিক সংস্কৃতি সংঘের নিকট হইতে প্রাপ্ত নানাপ্রকার ছবি ও পোষ্টারে ঘর সাজানো ছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলার বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। তিনিও তাঁহার বক্তৃতায় সোভিয়েট শিল্পীদের সমাজ গঠনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমাদের দেশে বা ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পীরা কিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা দেখান। এই প্রদর্শনী দৈনিক গড়ে ৩.৪ শত লোক দেখিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই সম্মেলন উপলক্ষে রচিত ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন কংগ্রেসের জে, সি গুপ্ত, নেলী সেনগুপ্তা, লীগের সহ-সভাপতি নুরুল আমিন ও হাসেম। সব থেকে বেশী লোক আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এবং তাঁহাদের নেতৃত্ব করিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা এফ, আর, এস। লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখার্জী, প্রেমেন মিত্র, মাণিক বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু ও সজনী দাস। প্রকৃতপক্ষে বাংলার কোন বিশিষ্ট লেখকই ইহা হইতে বাদ যান নাই। চিত্র শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায়, যতীন্দ্রকুমার সেন, গায়কদের মধ্যে শচীনদেব বর্ম্মন ও তারাপদ চক্রবর্ত্তী, সিনেমার প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, যমুনা দেবী এবং নাট্য শাখার নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। খেলার জগত হইতে আসিয়াছেন গোষ্ঠপাল, বলাই চ্যাটার্জী, মন্মথ দত্ত, জে, কে শীল প্রভৃতি অনেকে। ইহা ছাড়া আছে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির নেতারা। ইঁহারা সকলে এক দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী ইস্তাহারের শেষে একত্র বলিতেছেন: সোভিয়েট ভূমিতে আজ গৌরবের রক্তরেখা জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে, আর লালফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদেশে জনগণের মনে আশা ও উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাইবীরিয়ান ও তাজিকরা স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে, যেখানে কাজাক যোদ্ধারা তাদেরই নিজস্ব সোভিয়েট মস্কোকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে অমর হয়ে থাকে, সেই সোভিয়েটের বহু জাতির বিরাট ঐক্যকে আমরা অভিনন্দিত করি। লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণকে আমরা অভিনন্দিত করি, আর প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার মত আবার আমরা সোভিয়েটকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সৌহার্দ্দ্য প্রেরণ করি।

কলিকাতা কিশোর বাহিনীর বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৪ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার কিশোর বাহিনীর বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন পাড়া হইতে ব্যাণ্ড, পতাকা, ফেষ্টুন প্রভৃতি লইয়া প্রায় এক হাজার কিশোর কিশোরী সভায় যোগদান করে। তাহাদের সঙ্গে প্রায় ৭০০ অভিভাবক সম্মেলন দেখিতে আসেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় অসুস্থতার জন্য আসিতে না পারায় সভায় তাঁর প্রেরিত বাণী পড়া হয়। তাহাতে তিনি কিশোর বাহিনীর কাজের প্রশংসা করেন ও কিশোর বাহিনীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কামনা করেন। ২২ জন কিশোর কিশোরীকে লইয়া এই বছরের নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। কিশোর বাহিনীর সভ্যদের ছুরী, লাঠি খেলা, কুচকাওয়াজ, গান, নাচ, নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রভৃতি দেখানোর পর তুমুল উৎসাহের মধ্যে সভা শেষ হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, রামনাথ বিশ্বাস, নীহার সরকার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি সাহিত্যিক ও কবি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন

মে মাসের শেষের দিকে কলিকাতা শহরে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির' এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রস্তাবিত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন যথাক্রমে 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস। সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ। বিভিন্ন শাখার সভাপতি: মোস্তাফিজুর রহমান, সাজ্জাদ হোসেন, মুজীবুর রহমান খাঁ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, আবুল হাসানৎ, জসিমুদ্দিন, আসরাফ হোসেন, মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ, আবদুল মওদুদ, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক আবদুল সাদেক

সম্মেলনে বাংলার মুসলমান লোক সংস্কৃতির একটি 'আনন্দ মজলিসের' ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বাংলার জেলায় জেলায় মে দিবস

জাপানী আক্রমণকারীকে রুখিবার সংকল্প

জেলায় জেলায় মে দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। **গোপাল নগরে** (যশোর) সভা, পোষ্টার প্রদর্শনী ও অভিনয়ের মধ্য দিয়া মে দিবসের এই বাণী ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বয়স্ক কংগ্রেস কর্ম্মীরা, তরুণ কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের এই উৎসবের মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন। **কুড়িগ্রামে (রংপুর)** কৃষক সমিতি, পার্টি ও মহিলা সমিতির জনসমাবেশে মহামারীর বিরুদ্ধে রিলিফের জন্য আহ্বান তোলা হইয়াছে। এখান হইতে জেলা কংগ্রেস কমিটিকে আইনী করিবার দাবী উঠিয়াছে এবং ঐক্য দাবী জানাইয়াছেন। **চাকদা'তে, বহরমপুর, নরহাটা** (মালদা) এবং **বাগবাটী** (পাবনা) তে মেদিবসের শপথ ধ্বনিত হয়।

লীগের নীতি জাপবিরোধী

বগুড়ায় এবার মে-দিবস উপলক্ষে সাড়া পড়িয়া গেল। বহুদিন শহরে এরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বিকালে এডওয়ার্ড পার্কে দেড় হাজার লোকের সমাবেশ হইল। সকল শ্রেণীর জনতা সভায় উপস্থিত। সভায় দেশপ্রেমিক গান ও জাতীয় নেতাদের দেশরক্ষার বাণী ধ্বনিত হইল। প্রত্যেকটি বক্তা জাপদস্যুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইলেন। স্থানীয় লীগের তরুণ কর্ম্মী মহম্মদ সিদ্দিকী বলেন, লীগের নীতি ফ্যাশিস্টবিরোধী নীতি। দেশরক্ষা সম্বন্ধে জিন্না বলিয়াছেন, **'ওদের লণ্ডন আছে, ওয়াশিংটন আছে—কিন্তু আমার আছে শুধু ভারতবর্ষ। আমার পিছু হটবার জায়গা নাই। আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাকে এখানেই থাকতে হবে, তাই জাপ আক্রমণ সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারি না।'** সভায় ডাঃ ননীগোপাল দেবদাস ও অমিতাভা চ্যাটার্জী বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় মে দিবস

১লা মে কলিকাতার রাজপথে ট্যাক্সি ও বাসের পুরোভাগে সুসজ্জিত লাল পতাকা উড়িতেছে। ট্রামের কর্ম্মীদের বুকেও ছোট ছোট ব্যাজ। কলিকাতার নাগরিক দেখিল, দেশরক্ষায় আজ মজুরশ্রেণীই সকলের

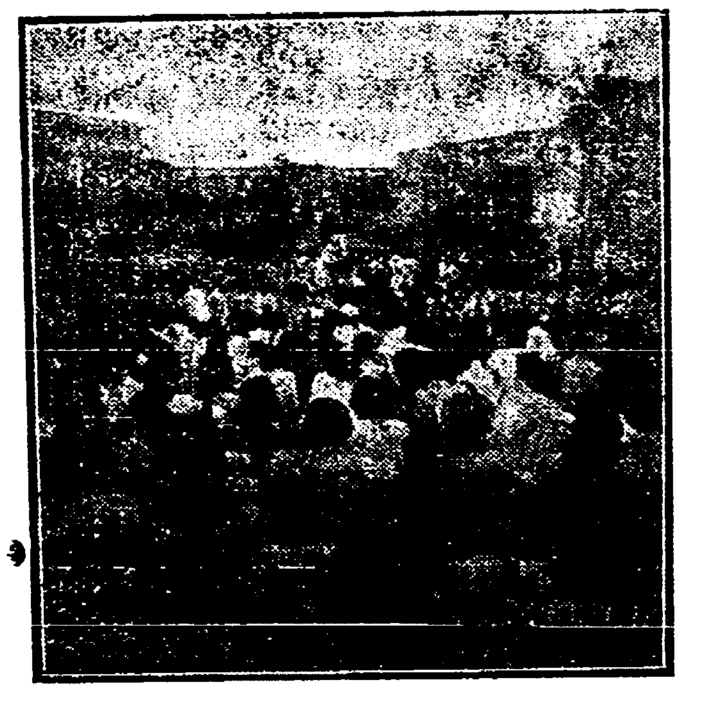

আগে। বিকালে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৩.৪ হাজার মজুরের বিরাট সভা হয়। সভায় মৃণালকান্তি বসু, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, সুধীন প্রামাণিক, রণেন সেন, ইসমাইল প্রভৃতি নেতারা বক্তৃতা দেন।

মে-দিবসের সভায় সমস্ত দল

ময়মনসিংহ জেলায় **নেত্রকোণা, বালী, লক্ষ্মীগঞ্জ, পাগলা ও বারহাটী** অঞ্চলে জাপবিরোধী সপ্তাহ উপলক্ষে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। নেত্রকোণায় মে দিবসের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ধর। স্থানীয় লীগের সম্পাদক মাজে আলি খাঁ এই সভায় উপস্থিত হইয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বাংলা, বালী, আমতলা, পিটুয়া, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামঞ্চল হইতে কৃষকরা দলে দলে মিছিল করিয়া এই সভায় আসে।

গত সংখ্যার ভুল

"আসামে এক সপ্তাহ" প্রবন্ধে আসামের প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের নির্বাচিত সভাপতির নাম—মিঃ আব্দুল বারির পরিবর্ত্তে মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ হইবে।

দেশদ্রোহীদের গুণ্ডামির জবাব দাও

গত ২রা মে রাত্রে **রাজসাহী সহরে** সি, এস, পি ও আর, এস, পি গুণ্ডার দল কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিস চড়াও করিয়া কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী অরুণ চৌধুরী, অমলেন্দু বাগচী, সুনীল চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জি ও প্রণব চক্রবর্ত্তীকে গুরুতর ভাবে মারধর করে, এবং অফিসের জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া টাকা পয়সা লুঠ করিয়া নিয়া যায়।

১লা মে কমরেড অমলেন্দু বাগচীর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মে দিবসের এক বৈঠকে এই গুণ্ডার দল ইটপাটকেল ছোড়ে এবং ঐ সভা হইতে মেয়ে কর্মীরা যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। ২রা মে সন্ধ্যা বেলায়ও একজন কম্যুনিষ্ট কর্মীকে ইহারা মারিতে চেষ্টা করে। সেখানে ব্যর্থকাম হইয়া রাত্রিবেলা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত প্রায় ৩০ জন গুণ্ডা অকস্মাৎ অফিস আক্রমন করিয়া ঐ পাঁচ জন কম্যুনিষ্ট কর্মীকে আহত করে এবং অফিস লুঠ করে।

দেশকর্মীদের উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে আজ দেশের জনমত জাগ্রত হউক। এই সব গুণ্ডার দল আমাদের মাতৃভূমির গলায় জাপানী পরাধীনতার শিকল পরাইয়া দিতে চায়। সে জন্যই দেশ কর্মীদের উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমন ও লুঠ। এই দেশদ্রোহী গুণ্ডা দলের বিরুদ্ধে আজ বাংলা দেশের বিশেষতঃ রাজসাহীর জনগনকে রুখিয়া দাঁড়াইয়া দেশ হইতে এই গুণ্ডামিকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

শত্রুকে রুখিবার সংকল্প

বাংলার জেলায় জেলায় জাপবিরোধী সপ্তাহ

জাপানী দস্যুর দল আজ ভারতের পুণ্যভূমি ভারতবাসীর রক্তে কলঙ্কিত করিয়াছে। আমাদের দুই শতাব্দীর সংকল্প ভারতের স্বাধীনতা—জাপানের হাতে আজ আক্রান্ত। আসাম ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতারা সুস্পষ্ট ভাবে দেশরক্ষার আহ্বান জানাইয়াছেন। বাংলার সর্বত্র কমিউনিষ্ট কর্মীরা জাপবিরোধী সপ্তাহে কংগ্রেসের এই দেশরক্ষার বাণী প্রচার করেন। সহস্র সহস্র লোকের জনতা সভায় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়াছে, ফ্যাশিস্ট জাপানের দেশজয়ের দম্ভ চূর্ণ করিব।

কলিকাতার অগ্রণী মজুর

নিজ নিজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে ট্রাম, বাস, পোর্ট, কর্পোরেশন, লোহারকারখানা, রিক্সা প্রভৃতির মজুররা জাপবিরোধী সপ্তাহ পালন করে। বিভিন্ন সভায় সমবেত হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে—দেশরক্ষার জন্য মালিক ও সরকারের বাধা চূর্ণ করিয়া উৎপাদন বাড়াইব, যানবাহন চালু করিব এবং মাগগী ভাতা আদায় করিব। এক সপ্তাহে মজুরদের মধ্যে ১৫ হাজার রক্তপতাকা বিক্রি হইল।

২৫শে এপ্রিল ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক জাপবিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন কারখানার মজুর শ্রেণী, কলিকাতার সাধারণ নাগরিক ও এ-আর-পি কর্মীরা সমবেত হইয়া এক প্রস্তাবে আসাম ও যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসনেতাদের সমর্থনে দেশবাসীর কাছে জাপ প্রতিরোধের আহ্বান জানাইলেন। সভা হইতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়াজ উঠিল। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ রোধ করার জন্য ও বিভেদকারী জাপানী দালালদের ধ্বংস করার জন্য দেশপ্রেমিক আবেদন জানানো হইল। কলিকাতার এ-আর-পি ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ও এ-আর-পি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য সভায় দাবী ধ্বনিত হইল।

২৯শে এপ্রিল হাজরা পার্কে এক জনসভায় অনুরূপ এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতার মহিলা আঃ রঃ সঃ কর্মীরা দেশরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেন।

২৪-পরগণার কৃষক ও মজুর এলাকায়

জাপবিরোধী সপ্তাহ উপলক্ষে চব্বিশ পরগণার আলিপুর সদর মহকুমায় গণিপুর গ্রামে ৩০শে এপ্রিল ৬ শত কৃষকের এক জনসভা হয়। এই অঞ্চলে এই প্রথম জনসভা।

২৩শে এপ্রিল ক্যানিং অঞ্চলে মঠের দিঘীতেও এক বিরাট জন-সমাবেশ হয়। দুই হাজার কৃষক জাপানী ফাসিষ্টদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার সংকল্প গ্রহণ করে।

বজবজ, দমদম, মেটিয়াবুরুজ, ইছাপুর, নৈহাটী গৌরীপুরে মে-দিবসের মিটিং হয়। মে-দিবস উপলক্ষে সবচেয়ে বড় জনসমাবেশ হয় গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে বদরের হাটে। আড়াই হাজার কৃষক সভায় সমবেত হইয়া জাপ-দস্যুদের ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করে।

ঢাকায় ৭৭টি জাপবিরোধী স্কোয়াড

কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে মোট ৭৭টী প্রচার বাহিনী এক সপ্তাহব্যাপী ঘরোয়া বৈঠক, বাড়ী বাড়ী প্রচার, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা প্রভৃতির মারফত জোর প্রচার চালায়। নারায়ণগঞ্জ সূতাকল অঞ্চলের শ্রমিক কমরেডদের ৩১টী প্রচার বাহিনী ৫৫০০ শ্রমিকের মধ্যে জাপ-বিরোধী প্রচার করে। মহিলা কমরেডদের ৭টী প্রচার বাহিনী জেলার বিভিন্ন জায়গায় জাপবিরোধী প্রচারের মারফত মহিলা আন্দোলনে এক নূতন সাড়া আনিয়াছে।

★ পঁচিশে বৈশাখ ★

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এই দিন শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আমরা তাঁকে স্মরণ করি। তিনি তাঁর জাতিকে, সমসাময়িক পৃথিবীকে আর মানুষের কালোত্তর সংস্কৃতিকে কি দিয়ে গেছেন তা আবার উপলব্ধি করি।

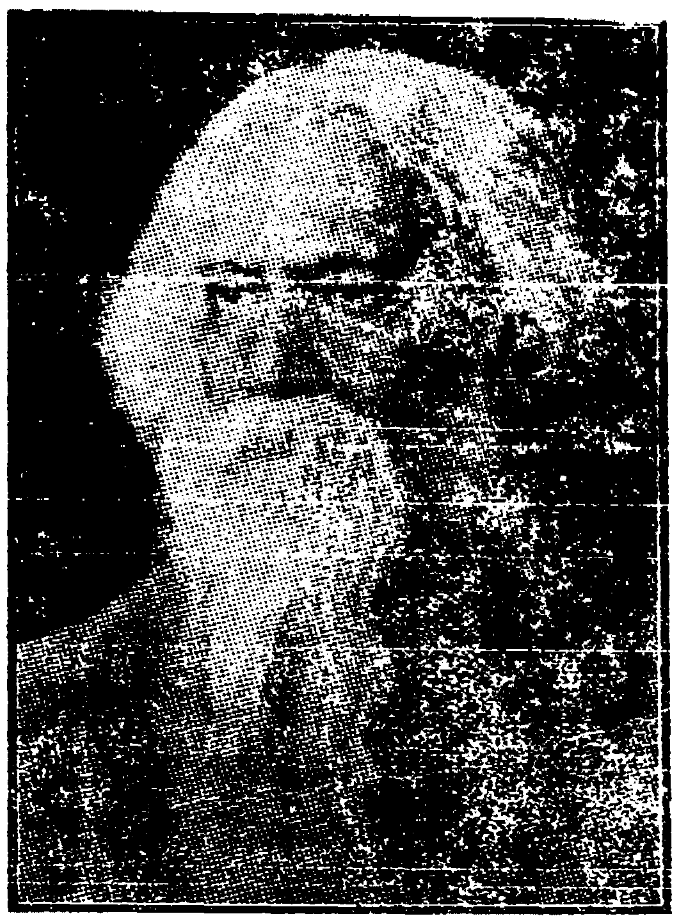

তিনি আমাদের জাতীয় কবি। এই সুপ্রাচীন জাতির অতীত ঐতিহ্যের যে বিরাট সম্পদ তার থেকেই তিনি প্রেরণা নিয়েছেন, বহুমুখী প্রতিভার ধারায় সেই ঐতিহ্যকেই দেশ ও পৃথিবীর সামনে আরও অম্লান করে তুলে ধরেছেন। দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খাও তাঁর সাহিত্য ও কাজের মধ্যে অনির্বাণ শিখার মত জ্বলছে।

আধুনিক যুগে তিনি আমাদের কবি। তাই দেশ ও অতীত থেকে জন্মলাভ করেও তাঁর জাতীয়তা তাঁরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভবিষ্যৎ পৃথিবী রচনার যে গৌরবময় সংগ্রাম দেশে দেশে চলেছে, সেই আগামী দিনের দিকে তাকিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্য ও রাজনীতির আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিকতার পৃষ্ঠপটে জাতীয় ঐতিহ্যকে দাঁড় করিয়েছেন, অতীতের পটভূমিকায় ভবিষ্যতের ছবিকে সাহস করে ফুটিয়েছেন—সেজন্যেই আধুনিক যুগে তিনি আমাদের জাতীয় কবি! আর সেজন্যেই পৃথিবীর কালোত্তর সাহিত্যেও তিনি স্রষ্টা।

মানুষের ভবিষ্যতের জন্যে যারা সংগ্রাম করে তিনি তাদের দলে। তাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন সোভিয়েটের বন্ধু। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম্ম। জাপানী ফ্যাশিজমের পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সীমাহীন ঘৃণা আর দুর্দান্ত প্রতিবাদ বহুদিন আগেই তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। আজ সেই প্রতিবাদকে সার্থক করেই আমরা জাতীয়তারও মর্য্যাদা রাখতে পারব।

মে দিবস উপলক্ষে ষ্ট্যালিনের ঘোষণা

"লালফৌজের অসামান্য সাফল্যের মধ্যে আমার দেশবাসিগণ মে দিবস প্রতিপালনের জন্য সমবেত হইতেছেন। স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান অভিযান ব্যর্থ হইবার পর হইতে লালফৌজ কার্য্যতঃ অবিরাম আক্রমণ চালাইতেছে।

সোভিয়েটের সমগ্র অধিবাসী এবং আমাদের সমগ্র দেশ যদি লালফৌজের পশ্চাতে থাকিয়া সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষের প্রথম প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে লালফৌজের এই সাফল্য হয়তো স্থায়ী হইতে পারিত না এবং হয়তো উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। শত্রুর সহিত সংগ্রামে

লালফৌজ অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েটের জনসাধারণও লালফৌজের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য প্রতিপালনে ত্রুটী করেন নাই। যুদ্ধের দরুণ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েটের জনসাধারণ বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র, গুলীবারুদ, সাজপোষাক, রসদসামগ্রী এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম উৎপাদন করিয়া এবং যথাসময়ে ঐ সকল দ্রব্য রণাঙ্গনে পৌঁছাইয়া দিবার কার্য্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাতে ফ্যাশিস্ত সংহতি বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে। হিটলারের রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ফিনিশ ও বুলগেরিয়ান মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে আজ ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। হিটলারের এইসব তাবেদারগণ—যাহাদের দেশ জার্মানী অধিকার করিয়াছে অথবা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে, জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়ার পক্ষে এই দুর্দৈব এড়াইবার একটিমাত্র পন্থা আছে। সে পন্থা হইতেছে, জার্মানীর সহিত যোগ ছিন্ন করা এবং যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো। কিন্তু এই সকল দেশের বর্তমান গবর্ণমেণ্টগুলি জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা। তবে এই সকল দেশের অধিবাসিগণ জার্মানীর দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিবার কার্যে উপযোগী করিয়া তুলিবে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ইহারা নিজেরা এই পথে যত অগ্রসর হইতে পারিবে গণতান্ত্রিক দেশগুলির ততই সহায়তা লাভ করিতে পারিবে।

এক্ষণে আমাদের কর্তব্য হইতেছে, সমগ্র দেশ হইতে ফ্যাসিস্ট শত্রুদিগকে বিতাড়ন করা এবং কৃষ্ণসাগর হইতে বারেনৎস সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্বত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র সীমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

তবে আমাদের দেশের সীমারেখা হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করিলেই আমাদের কর্তব্যের শেষ হইবে না। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের সময় আমাদের পোল ও চেকোশ্লোভাকদিগকে জার্মাণদের পরাধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিতে হইবে; পশ্চিম ইউরোপে আমাদের মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য জাতিগুলিকে হিটলার প্রভাবিত জার্মাণীর অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমারেখা হইতে জার্মাণ বাহিনীকে বিতাড়িত করার চেয়েও এই কাজ যে অধিকতর দুরূহ তাহা সুস্পষ্ট। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিমদিক হইতে আমাদের মিত্রপক্ষের সৈন্য-বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, একমাত্র এইরূপ যুগপৎ আঘাত হানিয়া হিটলার প্রভাবিত জার্মাণীকে চূর্ণ করা যাইতে পারে।

কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ঘাটে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমরা দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

যুদ্ধের খবর

বাংলা-আসামের বিপদ কাটে নাই

মাসাধিক কাল ধরিয়া খাস ভারতবর্ষের উপর জাপানী ফ্যাশিস্টদের আক্রমণ চলিতেছে। মণিপুর সড়কের বহু স্থানে জাঁকিয়া বসিয়া এবং বিষণপুর হইতে শিলচর যাইবার পথে মোতায়েন থাকিয়া ইম্ফলকে তাহারা এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছিল। কিন্তু ইম্ফল ও দিমাপুর দখল করার মতলব শত্রু হাঁসিল করিতে পারে নাই। যে কোহিমার অধিকাংশ জাপানীদের কবলে গিয়াছিল, সেখানে ধীরে ধীরে মিত্রশক্তি অগ্রসর হইতেছে, কোহিমার দক্ষিণে ও উত্তরে লড়াই চলিতেছে, জাপানীদের পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও কোহিমার অর্দ্ধেক পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ষা নামিবার পূর্ব্বে শত্রু এ অঞ্চলে যে একটা বড় দরের সাফল্য লাভ করিবে, তাহার সে আশা প্রতিদিনই কমিতেছে।

আত্মতুষ্টির কারণ নাই

কিন্তু মিত্রপক্ষেরও আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বসার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। লোকবল, অস্ত্রবল, বিমান-বলে মিত্রপক্ষ শত্রুর চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। চতুর্দ্দশ ভারতীয় বাহিনীর মত বাহাদুর ফৌজ মিত্রপক্ষে রহিয়াছে। মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট মজবুত করিয়া গড়া হইয়াছিল, সহজে জাপানী তাহাকে টলাইতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও যে জাপানীরা ইম্ফল সমভূমিতে পর্য্যন্ত নামিতে পারিয়াছে, ইম্ফলকে প্রায় অবরুদ্ধ করিয়াছে, কোহিমাকে একপ্রকার কবলিত করিয়া দিমাপুর রেলজংশনের দিকে আগাইয়াছে, বিষণপুর শিলচর রাস্তায় চাপিয়া বসিয়াছে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। 'শত্রু যেখান থেকে অভিযান শুরু করিয়াছিল, তাহাকে সেখানে ফেরৎ পাঠাইব' বলিয়া খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে যে সব বড়-কর্ত্তাজাতীয় লোক বেতার বাণী পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মতুষ্টির সামান্য মাত্র কারণ নাই।

আরাকানে মিত্রপক্ষ বুথিডং ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার নাকি কোন সামরিক গুরুত্ব নাই, কিন্তু পিছু হটার খবরে দুশ্চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। বঙ্গোপসাগরে জাপানী ডুবুরিজাহাজ ঘুরিতেছে। সুর্ম্মা উপত্যকার কোন স্থানে শত্রু সেদিন বোমা ফেলিয়াছে। সম্প্রতি কিছু সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও ইম্ফল ও দিমাপুরের বিপদ পুরা কাটিতে বিলম্ব আছে।

বর্ষার পূর্ব্বে জোরদার আক্রমণ চাই

এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকার কথা শুধু বাতুলেই বলিতে পারে। আর জাপানীরা যেখানে অভিযান শুরু করিয়াছিল, সেখানেই তাহাকে ফেরৎ পাঠানো হইবে বলিয়া বাংলার লাট দেশের তেমন বিপদ নাই জানাইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সে আশ্বাসেরও কোন মূল্য নাই। জাপানীদের শুধু খানিকটা খেদাইয়া যাওয়া যথেষ্ট নয়। শত্রু আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; চীনে হোনান্ অঞ্চলে সে আবার জোরে আক্রমণ চালাইতেছে। শত্রুর মতলব ভেস্তাইয়া দিতে হইলে আজ শুধু তাহাকে খানিকটা পিছু হটাইলে চলিবে না, তাহার শক্তি চূর্ণ করিতে হইবে, সর্ব্বত্র জোরদার আক্রমণ চালাইয়া শত্রুকে পিষিয়া মারিতে হইবে।

বর্ষা নামিলে শুধু শত্রুর নয়, মিত্রপক্ষেরও নানা অসুবিধা ঘটিবে। সুতরাং এখনই সময় নষ্ট না করিয়া যথার্থ ব্যাপক আক্রমণ যথাসম্ভব জোরে চালাইতে হইবে। জনগণের পূর্ণ ও সক্রিয় সমর্থন বিনা ইহা সম্ভব নয় জানিয়াও আজ সরকার আসামের কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিতেছে না। দেশরক্ষার জন্য দেশবাসীর কাছে শ্রীযুক্ত বরদলৈ প্রমুখ জাতীয় নেতাদের আবেদনকে সরকার শুধু নিজের কাজে খাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বারবার শিক্ষা পাইয়াও সরকারের এখনও চৈতন্য হয় নাই। মুরদ নাই, বড়াই আছে বলিয়া এতদিন জাপানের হাতে মিত্রপক্ষ প্রাচ্যদেশে একবার মার খাইয়াছে। আমাদের সোনার দেশ লইয়া যখন যুদ্ধ, তখন আর আমরা এই মনোভাবকে কিছুতেই বরদাস্ত করিব না।

নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

বরিশাল শহরে গত ৪ঠা হইতে ৭ই মে পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইবে।

নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

দেড়হাজার মহিলার সমাবেশ

সমাজজীবন পুনর্গঠনের আহ্বান

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ] ১৭ই মে, বুধবার, ১৯৪৪, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৩য় সংখ্যা

৬ই মে বরিশালে নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে দেড় হাজার মহিলার সমাবেশ হয়। বাংলার বিভিন্ন দল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়া মহিলাবৃন্দের উপস্থিতি এই সম্মেলনকে জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব্ব অভিযানে পরিণত করিয়াছিল। মহিলাদের এই অপূর্ব্ব ঐক্য-সমাবেশ বিধ্বস্ত ও বিপন্ন বাংলার জাতীয় জীবনে এক অভিনব ঘটনা।

বাংলার ২৫টি জেলা হইতে ৯৪ জন মহিলা এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে এক জন এবং কানপুর হইতে একজন মহিলা এই সম্মেলনে সৌহার্দ্দমূলক অভিনন্দন জানাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিনিগুলীর ভিতর ৪ জন ছিলেন দার্জ্জিলিং হইতে আগত গুর্খা মহিলা। বরিশাল জেলার ২৫টি বিভিন্ন এলাকা হইতে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন শোভাযাত্রায় ১২৫ জন প্রতিনিধি আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন। ইহাদের ভিতর অধিকাংশ ছিলেন কৃষক রমণী। বহু দূর দূরান্তর হইতে এই প্রতিনিধিনিগুলী যখন আসিতে থাকেন তখন পথে পথে মহিলা আত্মরক্ষার গানে ও জয়ধ্বনিতে লোকালয়ে লোকালয়ে সাড়া পড়িয়া যায়।

৪ঠা মে তারিখে জেলার বাহিরের প্রতিনিধি ও দর্শকগণ যখন বরিশাল সহরে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করেন তখন ১০০ মহিলার এক শোভাযাত্রা সহরের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা জাগায়। বাংলার মেয়েরা এত দূর দূর জেলা হইতে এমন সংগঠিত ভাবে আসিয়া একত্র হইতে পারে এই নিদর্শন সহরবাসীর মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। ৬ই মে প্রকাশ্য সমাবেশের সময় ৪০০ মহিলার শোভাযাত্রা বাহির হয়। গত একমাস ধরিয়া যখন সম্মেলনের আয়োজন হইতেছিল তখন সহরবাসীরা ভাবিতেছিলেন—মহিলাদের একটি সভা হইতেছে, কত বড় আর তাহা হইতে পারে! কিন্তু সম্মেলনে যখন নানাদিক হইতে শত শত মহিলা আসিতে থাকেন তখন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় সকলেই অবনত হন।

এতদিন সাধারণ নাগরিকদের ধারণা ছিল যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিষ্ঠান এবং একদল শিক্ষিতা তরুণী ইহার আশ্রয়ে পার্টির প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু সভাগৃহের বক্তৃতামঞ্চ সে ধারণা দূর করিয়া দেয়। এখানে ছিলেন ঝালকাঠি হইতে আগত ৭৩ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা নৃত্যময়ী দেবী। ঝালকাঠিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন

শ্রীযুক্তা নৃত্যময়ী দেবী

আন্দোলনে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। যৌবনে তিনি বাংলার নারী জাগরণের যে স্বপ্ন দেখিতেন আজ এই সম্মেলনে তিনি তাহার সাফল্যের সন্ধান পান, তাই তিনি তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে সম্মেলনে ছুটিয়া আসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই বক্তৃতামঞ্চে ছিলেন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেত্রী বৃদ্ধা অমিয়া দেবী। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের আন্দোলনের সময় হইতে তিনি স্বদেশী জাগরণের ঐতিহ্য বহন করিয়া আসিতেছেন। ইহার ভিতর ছিলেন কালনার কংগ্রেস নেত্রী নির্ম্মলাবালা সান্ন্যাল এবং মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্পাদক মৌলবী আবুল হাসেমের স্ত্রী। বরিশালের মৌলতলার রাঙ্গামা এবং আরও অনেক প্রাচীন মহিলার উপস্থিতিতে সমগ্র সম্মেলন গুরুত্ব লাভ করে।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা বাণী পাঠান তাঁহাদের ভিতর ছিলেন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুলসুম সায়ানি, মুসলিম লীগপন্থী মিসেস্ মোমিন, খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বাংলার কংগ্রেস নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা এবং নারী কল্যাণ আশ্রম। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন ব্রাহ্ম সেবিকা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস।

বরিশাল সহরে অশ্বিনীকুমার হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সহর, এই গৃহ এবং এই সম্মেলনের ভিতর এক আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক যোগাযোগ রহিয়াছে। এই সহর বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম হোতা স্বর্গীয় শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার দত্তের কর্ম্মক্ষেত্র। এই গৃহ তাঁহারই স্মৃতিরক্ষায় উৎসর্গীত। বঙ্গীয় সভ্যগার নব জাগরণের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে বলিয়া

নির্বাচিতা সভানেত্রীসহ শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে যাইতেছে

জাতীয় জাগরণের এই কীর্ত্তিসৌধে নবজাগ্রত মহিলা সম্মেলনে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মনে গভীর অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। সভায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার খ্যাতনামা কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃবর্গ, সহর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, কলেজের অধ্যক্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতাগণ এবং অন্যান্য বহুবিধ গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বাংলার বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন মতধারার এই অপূর্ব্ব সমাবেশ সমগ্র সম্মেলনটিকে মূল্যবান করিয়া তুলে। সম্মেলনের সমগ্র পারিবেশ এই অনুভূতি মনে জাগাইতেছিল যেন ১৯০৫ সাল হইতে যে নবযুগ ও নবসমাজ গঠনের ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহার সমগ্র প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি, যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুস্থ বাংলার জননী ও ভগিনীগণ ধ্বংসস্রোতের ভিতর নবজীবনের সমস্ত শক্তিকে রূপ দিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে সমবেত সমাবেশকে স্তব্ধ করিয়া নির্ব্বাচিতা সভানেত্রী হাজরা বেগম ঘোষনা করেন—ভারতের মহামান্য নেতা মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হইয়াছেন। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ সংবাদ সমবেত মহিলাবৃন্দকে এমনভাবে স্তব্ধ করিয়া দেয় যে তাঁহারা কয়েক মিনিট নিথর ও নিস্তব্ধ হইয়া যান। মুসলিম লীগের জনৈক নেতা বিস্মিত হইয়া একান্তে মন্তব্য করেন—এ কি, এত বড় একটা ঘটনায় কেহ হর্ষধ্বনি করিল না! কয়েক মিনিট পরেই সমাবেশের সম্বিৎ ফিরিয়া আসে এবং সমবেত কণ্ঠে গান্ধীজির জয়ধ্বনি উঠে।

অভ্যর্থনা সমিতির অভিনন্দন এবং সভানেত্রীর অভিভাষণ শেষ হইবার পর বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্মেলনের প্রতি শুভাশীষ জ্ঞাপন করেন, তাহার পর বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত করা হয় নারীর অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব। হিন্দু আইন সংশোধিত এবং বিধিবদ্ধ করিবার জন্য রাও কমিটির পুনর্নিয়োগ সমর্থন করা হয়, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে বহু বিবাহ নিষেধ করিয়া যে আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইবে, এই সম্মেলন তাহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ভারত সরকার খনির কাজে মেয়ে পুনর্নিয়োগ করিয়া বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিয়াছে বলিয়া এই সম্মেলন তাহার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়। পতিতাবৃত্তি নিরোধের জন্য নূর-মহম্মদ বঙ্গীয় আইন সভায় যে প্রস্তাব আনিতেছেন তাহার প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাইয়া ঘোষণা করা হয়—পতিতা নারীদের উদ্ধার করিয়া সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহাদের জন্য সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, যেসব দুর্বৃত্ত অসহায়া নারীদের লইয়া ব্যবসায় করিতেছে তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিরাশ্রয়া এবং দুঃস্থাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এক প্রস্তাবে ঘোষনা করা হয় "ভাঙ্গনের প্রতিরোধ করিয়া নিরাশ্রয়া ও দুঃস্থা নারীর সমাজ জীবন পুনর্গঠনই আজ বাংলার নারী সমাজের আত্মরক্ষার প্রধান কাজ।" জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়া কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করিয়া দুঃস্থাদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তাবের ভিতর সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন সমবেত মহিলাবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলেন—"আজ যে বোনেরা পতিতালয়ে আশ্রয় লইয়াছে তাহারা এক দিন আমাদেরই মত সতী নারী ছিল, একদিন তাহাদেরও বাড়ী ঘর ছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের আঘাতে তাহাদের সোনার সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ ভাঙ্গন সমগ্র সমাজের ভাঙ্গন। এই ভাঙ্গন যদি রোধ না করেন, এই ভাঙ্গন রোধ করিবার জন্য যদি কর্ম্মকেন্দ্র ও শিল্প-কুটিরের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় না করিতে পারেন তবে বৃথাই আপনারা আপনাদের সমাজ ও পবিত্রতার গর্ব্ব করেন"।

মণিকুন্তলা দেবীর এই আহ্বান সমবেত জনতার হৃদয় স্পর্শ করে। খাদ্য প্রস্তাবে দাবী করা হয় রেশনিং, মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান এবং সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব। রাজনৈতিক প্রস্তাবে দাবী করা হয় জাপ আক্রমণের প্রতিরোধ, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও জাতীয় ঐক্য। প্রকাশ্য সমাবেশের আগের দিন অর্থাৎ প্রতিনিধিদের সভায় এই সমস্ত প্রস্তাব লইয়া যখন আলোচনা হয় তখন মহিলা প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিতর দিয়া প্রমাণিত হয় যে বাংলার অগ্রণী মহিলাবৃন্দ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ভিতর যোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী হইয়াছেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাগৃহের বাহিরে লাউড স্পীকারের সামনে ৫০০ পথিক সব সময় নিস্তব্ধভাবে মহিলাদের বক্তৃতা শুনিয়া নারী সমাজের নবজাগরণের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন প্রস্তাব ও বিভিন্ন আলোচনার ভিতর সমবেত মহিলাবৃন্দ এই কথাই প্রমাণিত করেন যে নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কোন দলবিশেষের প্রচারক্ষেত্র নয়, যে সমস্যা সারা বাংলার সাধারণ সমস্যা, যে দুর্গতি বাংলায় ধ্বংসযজ্ঞ আনিয়াছে, তাহারই সমাধানের জন্য এই সমিতি বাংলার নারী সমাজের ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য উদ্‌গ্রীব। আমলাতন্ত্রের কুশাসন, বিদেশী দস্যুর আক্রমণ, স্বার্থপরদের হিংস্র জঘন্যতা, সামাজিক দুর্নীতি এই সমস্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এই সম্মেলন নিখিল ভারত মহিলা সভা এবং আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি নারীসঙ্ঘগুলিকে একতাবদ্ধ করিয়া জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাইয়াছে। এই সম্মেলনে যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাহার সভানেত্রী হন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, সম্পাদিকা হন মিসেস্ এলা রীড এবং সহসম্পাদিকা হন যুঁইফুল রায় এবং কনক মুখার্জ্জী। বরিশালের দেশভক্ত নরনারীগণ সকলেই এই সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সাহায্য করেন। এই সম্মেলন ভেদাভেদে বিচ্ছিন্ন বাংলার সমস্ত অংশের ভিতর যে ঐক্যের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাই বাংলার প্রতি এই সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ অবদান। দর্শকবৃন্দ সম্মেলনের সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া বলাবলি করিয়াছে—"আমাদের দেশের মেয়েরা এত বড় একটা সংগঠন পরিচালনা করিতে পারে তাহাও আগে ভাবি নাই।"

(শেষাংশ ২য় পৃঃ দেখুন)

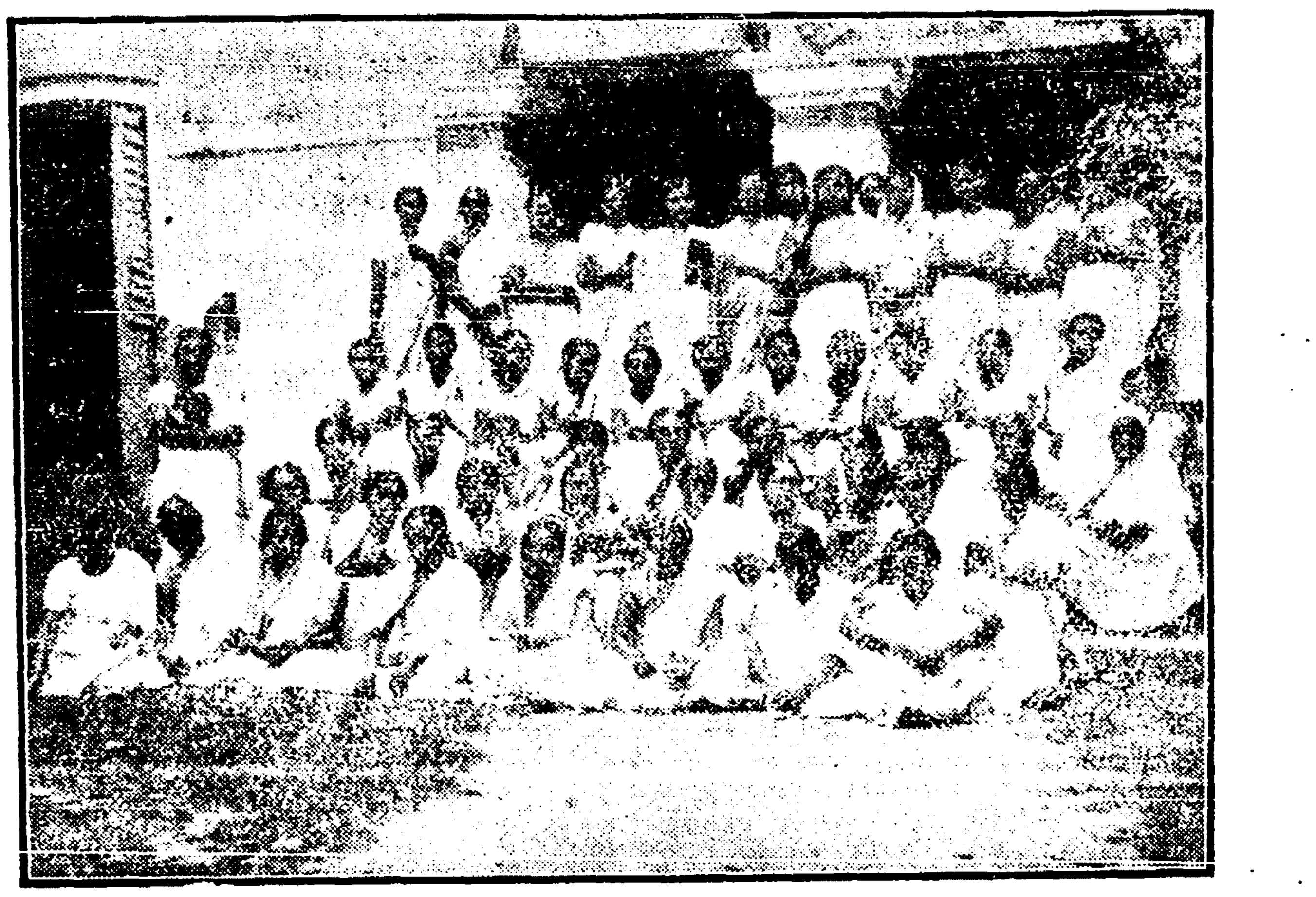

বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রতিনিধি দলের একাংশ

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ আন্দোলন কোথায় চলিয়াছে ?

সোমনাথ লাহিড়ী

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে যে-ভাবে আন্দোলন চলিয়াছে তাহাতে বাংলা দেশের আবহাওয়া আবার তীব্র সাম্প্রদায়িক কলহে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজির মুক্তিলাভের মত ঘটনাও এই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার নীচে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আন্দোলন যতই বাড়িতেছে ততই পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর আমলাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনো পক্ষেরই বিশেষ কোন মাথাব্যথা নাই। মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন কি করিয়া রোধ করা যায়—বিরোধী পক্ষের ইহাই একমাত্র ভাবনা। আর লীগ পক্ষেরও একমাত্র চিন্তা কি করিয়া হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পৃথক নির্বাচন পাশ করাইয়া লওয়া যায়। ফলে সারা বাংলায় আজ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অতি কদর্য্য ঝগড়া ও বিচ্ছেদ জাগিয়াছে। আর সেই ফাঁকে কাজ গুছাইয়া লইতেছে আমলাতন্ত্র—যাহারা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, বরং উভয়েরই বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-নীতির ধারক ও বাহক। আমলাতন্ত্র ঠিক এই আশাই করিয়াছিল যে বিল সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক কলহের অন্তরালে তাহারা আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সরকারী চাকুরে ও মনোনীত সদস্য দিয়া বোর্ডে শতকরা ৩৬ ভাগ আসন অধিকার করিয়া লইতে পারিবে। ঘটিতেছেও তাহাই।

শিক্ষার ঘাড়ের উপর আমলাতান্ত্রিক ভূত চাপিবার এই যে সম্ভাবনা ইহার জন্য লীগের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে—পৃথক নির্বাচনের আশায় অন্ধ হইয়া লীগ এই ভূতকে প্রশ্রয় দিতেছে। কিন্তু লীগের চেয়েও বেশী দায়িত্ব বিরোধী পক্ষের। কারণ লীগ পক্ষের তবু কিছু প্রকৃত সন্দেহ ও আশঙ্কার অজুহাত আছে। বর্ত্তমানে বাংলা-দেশে শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্ত্তৃত্ব হিন্দুদের হাতে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তো প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউয়ের মত পত্রিকাও বহুদিন ধরিয়া অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে যে উহা একটী হিন্দু পরিবার-বিশেষের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তি। এমন অবস্থায় হিন্দুরা যদি মাধ্যমিক শিক্ষার কর্ত্তৃত্বের উপর মুসলমানদের নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করিবার অন্তত সমান অধিকারও না দেন তো সেই ব্যর্থতায় মুসলমান নেতাদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলাইবার ভ্রান্তি ঘটিলে তাহা তবু বোঝা যায়। কিন্তু মুসলমানদের সমান প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কায় আঁতকাইয়া উঠিয়া হিন্দু নেতারা যখন উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা জাগাইয়া আমলা-তন্ত্রের দুরভিসন্ধিকেই পূর্ণ করিতে অন্ধভাবে অগ্রসর হন তখন তাহা বোঝা আরও কঠিন।

এসেম্বলি আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে হক-শ্যামাপ্রসাদ-সন্তোষবসু মন্ত্রীমণ্ডলী আগে যে-বিল তৈয়ারী করিয়াছিল তাহাতেও বর্ত্তমান বিলের মতই আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা ছিল, শুধু মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। আমলাতন্ত্রের শিক্ষা নীতির ফলেই আজ ভারতবর্ষ সমস্ত সভ্য দেশের মধ্যে শিক্ষায় বহু পশ্চাৎপদ। সেই আমলাতন্ত্রকে শিক্ষা কর্ত্তৃত্বের মোটা বখরা দিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ হিন্দু নেতাদের আপত্তি ছিল না, নিজের দেশের মুসলমান ভাইদের সমান বখরা দিতেই তাঁহাদের ছিল ঘোরতর আপত্তি। তাঁহাদের বর্ত্তমান তীব্র আন্দোলনও মুসলমানদের এই পৃথক নির্বাচনের উপরই বিষ উদ্গীরণ করিতেছে, আমলাতন্ত্রের বখরা সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় নীরব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটে ইয়োরোপীয়ান সদস্যরা এই জন্যই বোধহয় বিল-বিরোধীদের সঙ্গে ভোট দিয়াছেন। এই সব ইয়োরোপীয়ান সদস্যের অধিকাংশই আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক—আমলাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বে হাত পড়িতেছে দেখিলে তাঁহারা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন কিনা কে বলিতে পারে? হিন্দু নেতারা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে "জাতীয়" স্বার্থ রক্ষার যতই আওয়াজ উঠান আসলে তাঁহাদের প্রতিবাদও হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্যই; সেজন্যই তাঁহারা এই রবও তুলিয়াছেন যে অন্য কোন ব্যবস্থা যদি কিছুতেই না হয় তো অন্তত পক্ষে হিন্দু প্রভৃতির জন্য আলাদা বোর্ড এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা বোর্ড গঠন করা হোক। ইহাতেই তাঁহাদের জাতীয়তার খোলস হইতে সাম্প্রদায়িকতার আসল সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুদের অর্থে ও পরিশ্রমে যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বহু অংশ ও উহার জাতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে এখন মুসলমান কর্ত্তৃত্ব করিবে কেন এই যুক্তিও উঠিয়াছে। প্রথমত এ কথা মিথ্যা, কারণ মুসলমানেরা কর্ত্তৃত্ব চাহে নাই সমান ভাগ মাত্র দাবী করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোনো অগ্রসর সম্প্রদায় যদি জাতীয় শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে তাই বলিয়া সেই শিক্ষার উপর তাহার একচেটিয়া অধিকার থাকিতে হইবে—ইহা শুধু টাকার যুক্তি, ইহাতে গণতন্ত্রও নাই, জাতীয়তাও নাই। আর জাতীয় সংস্কৃতি স্থির করিবে কে? হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই বাঙ্গালী জাতি। উভয়ের সাধারণ এবং বিশেষ সংস্কৃতি দুই মিলাইয়াই জাতীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি গড়িয়া তোলার বিষয়ে মুসলমানেরা যতক্ষণ না সমান অধিকারের ভরসা পাইয়া পূর্ণ উৎসাহে সৃষ্টি ও সমন্বয়ে নামিতেছে ততক্ষণ ঐ সংস্কৃতি পূর্ণ জাতীয় সংস্কৃতি নয়, উহাতে হিন্দু সংস্কৃতিরই আধিপত্য থাকিতে বাধ্য। আজ সেই সংস্কৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে জাতীয় বলিয়া চালানো বা তাহার উপর মুসলমানের হস্তক্ষেপকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া অভিযোগ করা—ইহা আসলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনেরই প্রতিক্রিয়া নয় কি?

বাংলা দেশের হিন্দু নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা সুবিদিত। মুসলমানদের ন্যায্য সন্দেহ ও আশঙ্কার কথা ভাবিয়া জাতীয় কংগ্রেস পর্য্যন্ত যখন শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের বাঁটোয়ারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত মনে করে নাই তখনও বাংলার এই সব হিন্দু নেতা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় জাতীয় কংগ্রেসেরই বিরোধিতা করিয়াছেন, এমন কি গত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন। তাহার ফলে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতা আরও তীব্র হইয়াছে, বাংলার কংগ্রেস অন্যান্য প্রদেশের মত শক্তিশালী হইতে পারে নাই, এমন কি অনেক কংগ্রেস নেতার মনেও মুসলিম-বিদ্বেষ চাপিয়া বসিয়াছে। আমলাতন্ত্রই ইহাতে লাভবান হইয়াছে। আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে ন্যায্য বিক্ষোভও সেই ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতার পথেই পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলেও আমলাতন্ত্রই লাভবান হইবে, বাংলায় জাতীয়তার শক্তি আরও দুর্বল হইবে।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু একটী যুক্তি তুলিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মানার ফলে যখন সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়াছে তখন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে ঐরূপ নির্বাচন মানিলেও তো সাম্প্রদায়িকতাই বাড়িবে—সে জন্যই নাকি তিনি ইহার বিরোধী! এই আপাতসঙ্গত যুক্তির আড়ালে সত্য গোপন করার চেষ্টা রহিয়াছে। শাসনতন্ত্রে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক নির্বাচন হিন্দু নেতারা কোনো দিনই মানিয়া লন নাই, বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের সূচাগ্র মেদিনীও ছাড়িতে রাজি হন নাই। যে-প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাগাইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান বিলের বিরোধিতা করিতেছেন, ঠিক তেমনই উত্তেজনার সহিত তাঁহারা শাসনতন্ত্রে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করিয়াছেন, এমন কি আজও করিতেছেন। সুতরাং মানিয়া লওয়ার কথা সত্য নয়। মুসলমানদের সঙ্গে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে আপোষ করিয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করিতে তাঁহারা বরাবরই গররাজি। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন তো আমলাতন্ত্রকেই সাহায্য করিবে, সাম্প্রদায়িকতাও বাড়াইবে। বর্ত্তমান বিল লইয়া যে সাম্প্রদায়িক কলহ জাগিয়াছে সেই অবস্থায় এই বিল যদি পাশ হয় তো বিলের অন্যান্য ধারার মতই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিবে তাহা কে না বুঝে? আমলাতন্ত্র তো সেই ভরসায়ই বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে!

কিন্তু হিন্দু নেতারা যদি স্বেচ্ছায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার মানিয়া মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ করিতে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে অবস্থা একেবারে বদলাইয়া যাইত। হিন্দুরা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই সন্দেহ মুসলমানদের মন হইতে মিটিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভরসা পাইত যে হিন্দু নেতারা তাহাদের বন্ধু, তাঁহারা খুশী মনে শিক্ষার কর্ত্তৃত্বে সমান অধিকার দিতেছেন। ইহাতে আবহাওয়া হইতে সাম্প্রদায়িক বিষ দূর হইত, হিন্দু ও মুসলমানে প্রকৃত বন্ধুত্বের সূচনা হইত, দুজনেই একসঙ্গে মিলিয়া আমলাতন্ত্রের অপকৌশল ব্যর্থ করিতে পারিত।

প্রতিবাদ আন্দোলন এই পথে চলিলে শিক্ষা-বিলের পরাজয় অনিবার্য্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিবাদ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে মুসলমানদের জিদ আরও বাড়িয়া যাইবে এবং বিলটী খুব সম্ভব পাশ হইয়া যাইবে। শিক্ষার যাহা ক্ষতি তাহা তো হইবেই, উপরন্তু এই সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ-আন্দোলনের ফল-স্বরূপ বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা আরও তীব্র হইয়া উঠিবে।

সম্পাদকীয়

জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন

জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সম্মেলন ঘোষণা করিয়াছে যে ভারতের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার থাকিবে। জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এই ঘোষণা ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী এবং সময়োচিত হইয়াছে। এই ঘোষণার সঠিক মর্ম্ম যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে মুসলিম জাতি সমূহ স্বরাষ্ট্র গঠনের অধিকার পাইতে পারে এবং এই অধিকার স্বীকার করিলে কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য সহজসাধ্য হইবে। এই সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সম্মেলন লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছে। এইভাবে জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ জাতীয় ঐক্যের পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।

গান্ধীজির মুক্তি আজ ভারতের অচল অবস্থা অবসানের জন্য নূতন আশা এবং নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গান্ধীজি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সংগঠন এবং দেশ-রক্ষার আয়োজনে সমগ্র জাতিকে পরিচালনা করিবেন ইহাই আজ জনগণের আশা। এমন সময় জাতীয়তা-বাদী মুসলিম সম্মেলন ঐক্যের পথ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত করিবেন এই আশাই দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিখিল ভারত মুসলিম মজলিশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মুসলমানদের আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের ঘোষনা করার অর্থ ভেদের শক্তি বাড়ান। মুসলমান জনগণের অধিকাংশ মুসলিম লীগকেই তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে, স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমান ইহাই তাহাদের রণধ্বনি। অথচ এ অবস্থায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়াও জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ মুসলমান জনসাধারণকে লীগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা হইবে কাহার? যাহারা লীগকে ভেদ-পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের কবলে রাখিতে চায় তাহাদের; যাহারা লীগ এবং কংগ্রেসের ঐক্য চায় না, যাহারা জাতীয় ঐক্য পণ্ড করিতে চায় তাহাদের। জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ যদি বলিতেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা যদি ঘোষণা করিতেন যে কংগ্রেসই একমাত্র রাজ-নৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত হইত মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করিতে আহ্বান করা। অথচ সে আহ্বান তাঁহারা জানান নাই। মুসলিম লীগের মত তাঁহারাও বিশ্বাস করেন যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

তাঁহারা যদি বিশ্বাস করিতেন যে ভারতে শুধু এক অখণ্ড জাতি আছে, বিভিন্ন জাতি নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত হইত ভারতের বিভিন্ন অংশের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকার না করা। বিভিন্ন অংশের বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে মুসলিম লীগের মূল রাজনীতি অর্থাৎ বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকার সঙ্গত দাবী। মুসলিম লীগের মূল রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের মূল সংগঠননীতি তাঁহারা প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়াছেন অথচ ঘোষণা করিয়াছেন ভারতে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে। এরূপ ঘোষণার অর্থ ভেদের শক্তি বাড়ান, কংগ্রেস লীগ মীমাংসার পথে বাধা দৃঢ় করা। অবশ্য জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলন লীগকে আহ্বান করিয়াছেন কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে এবং এই ঐক্যের সুযোগ দিবার জন্য তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনে আপাততঃ বিরত থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এই ঘোষণা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁহারা সচেতন এবং তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কেও তাঁহারা একেবারে হতাশ নন। কিন্তু এই বিশ্বাস যখন তাঁহাদের মনে আসিয়াছে তখনও তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠনের ভয় দেখাইয়া মুসলমানদের মনে সংশয় এবং সন্দেহ বাড়াইতেছেন। এই সংশয় এবং সন্দেহ দূর করাই ঐক্যের পথ। ভয় দেখাইয়া রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তাহাতে ভেদই বাড়ে। মুসলিম লীগের মূলনীতির সারমর্ম্ম যখন গ্রহণ করিতে পরিয়াছেন তখন দ্বিধাহীন চিত্তে ঐক্যের পথ বাধামুক্ত করুন, বিরোধের পথ ছাড়িয়া মুস্লিম লীগকে সৌহার্দ্দের আহ্বান জানান। জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ আজ শুধু এই পথেই জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ সেবা করিতে পারেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগকেও আমরা আহ্বান করি সময়োচিত পন্থা গ্রহণ করিতে। আজ মুসলিম লীগের মূল দাবী কংগ্রেস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনে এই কথাই প্রমাণিত হয়। আজ মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের জন্য অগ্রণী হয় তাহা হইলে মুসলম দাবীর সংগ্রাম নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে। লীগ যদি কংগ্রেসের ভিতরকার এই পরিবর্ত্তন না দেখে, লীগ যদি এখনও সংশয়ান্বিতভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা হইলে সমগ্র ভারতের মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই বিদেশী আক্রমণকারীর পদতলে নিষ্পিষ্ট হইবে, সংকটের আঘাতে সমগ্র ভারত ধ্বংস হইবে। গান্ধীজির মুক্তির ভিতর দিয়া মুসলমান ও অমুসলমান সকলেরই জয়ের সম্ভাবনা আসিয়াছে।

নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গত এক বৎসর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইয়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আজ বাংলার একটি প্রধান গণসংগঠনে পরিণত হইয়াছে। আজ ইহার সভ্য সংখ্যা সাড়ে তেতাল্লিশ হাজার। বাংলার সাড়ে তেতাল্লিশ হাজার নারী এক সঙ্ঘে সমবেত হইয়া সমাজের ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে; আমলাতন্ত্রের রোষ, দুর্ব্বৃত্তদের ঘৃণ্য প্রচার, বিভেদকারীর জঘন্য আক্রমণ কিছুতেই এই সংগঠন দমিত হয় নাই, দিনের পর দিন এই সমিতি বৃহত্তর ঐক্যের পথে সগৌরবে অগ্রসর হইয়াছে। এই উজ্জ্বল কর্ম্মবিবরণী যখন শ্রীযুক্তা কমলা চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনে পেশ করিতে থাকেন তখন এই কথাই মনে জাগিয়াছে যে বাংলা মরিবে না, মরিতে পারে না; মৃত্যুর বিভীষিকা, দাসত্বের লাঞ্ছনা এবং দস্যুর আক্রমণ বাংলায় যে নবযুগের নূতন আলোক আনিয়াছে তাহা নৈরাশ্যের অন্ধকার দূর করিবে, দাসত্ব ও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও সভ্যতাকে জয়যুক্ত করিবে।

জননাট্যসংঘের প্রতি সুপ্রসিদ্ধ নট নরেশ মিত্রের অভিনন্দন

"রুশ দেশের মত আমাদের দেশকেও জীবন্ত হয়ে বাঁচতে হবে এবং সেই সংগ্রামে শিল্পী ও লেখকরা যে এইভাবে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিয়েছে তাতে আমি যথার্থ আনন্দ বোধ করছি। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করা যায় দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। একমাত্র দেশপ্রেমই এদের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতায় উন্নত করেছে। এদের তাই আমি আন্তরিক অভিনন্দন করি।"

গোহাটিতে জাপ-বিরোধী জন-সভার সংকল্প

জন-নেতাদের মুক্তির দাবী

২৮শে এপ্রিল গৌহাটীতে যে জাপ-বিরোধী জন-সভা হইয়াছে তাহাতে (১) আসামের কংগ্রেস-নেতা গোপীনাথ বরদলই, বসন্ত দাস, অরুণ চন্দ প্রভৃতির আবেদনে পূর্ণ সমর্থন জানান হয় এবং জাপ প্রতিরোধের জন্ত জনরক্ষা আন্দোলনে সমগ্র আসামবাসীকে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করা হয়। খাদ্য-সংকট আজকে আসামের জনসাধারনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, জনরক্ষা আন্দোলনের প্রধান কাজ হিসাবে খাদ্য বণ্টনের গলদ দুর করিবার জন্ত সকল দেশভক্ত দলকে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয়।

(২) আসামের রেলওয়ে মজুররা আজ দেশরক্ষার সব চেয়ে বড় শক্তি। তারা নিজেদের কাজে দৃঢ় থাকিয়া এই জরুরী সময়ে রেলওয়েকে চালাইয়া রাখিয়াছে। তাদের দেশপ্রেমের আদর্শকে এই সভা অভিনন্দন জানায় এবং তাদের দাবীকে সমর্থন করে।

(৩) জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়া জাতীয় গবমের্ণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়।

(৪) কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, আসাম জাতীয় মহাসভা, স্বতন্ত্র দল, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলকে মিলিত হইতে ডাক দেওয়া হয়।

আমলাতন্ত্র ভাবিতেছে জনসাধারণকে বাদ দিয়াই আসাম রক্ষা করিবে

জাপ-প্রতিরোধের জন্য আসামের জনগণ এই ভাবে সংঘবদ্ধ হইতেছে, আর আমলা-তন্ত্র কি করিতেছে? তারা জনগণের নেতা বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের এখনও জেলে আটকাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই ও অরুণকুমার চন্দের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া জন-আন্দোলনের কাজ হইতে তাঁদের বিরত রাখিয়াছে। মজুরদের নেতা কালীপ্রসন্ন দাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আসাম রক্ষা শুধু ফৌজের জোরেই হইবে না। খাদ্য সংকট দুর করিতে হইবে, জনসাধারনের মনে প্রতিরোধের সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমলা-তন্ত্রের কৃতিত্ব সেখানে কতটুকু? আসামের খাদ্য সংকটের দারুণ অবস্থাই তাহার প্রমাণ।

নওগাঁর অবস্থা

কোহিমা ফ্রণ্টের পাশেই নওগাঁ। যুদ্ধের সম্বন্ধে নানা গুজব শুনিয়া ও তার উপর খাদ্য সংকটে পড়িয়া লোকে আতঙ্কিত। লোকের মনে কি ভাবে হতাশার ভাব বাড়িতেছে তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গ্রামের চাষীরা একটী ছাত্র স্কোয়াডের কাছে বলিতেছে: 'বাবু, জাপানীরা কেমন তা জানি না, কিন্তু খাদ্যের অভাবে আমরা যে মারা যাই, এর প্রতিকার যারা করিতেছে না, তাদের বিশ্বাস করি কি করিয়া?' আর একজন চাষী বলিল: "বাবু, দেখুন এক পোয়া লবণের জন্য ২৫ মাইল দুর হইতে আমাকে কাজ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে, তাও এখানে আসিয়া শুনিলাম যে এখানে লবণ পাওয়া যাইবে না।" নওগাঁ বহুদিনের কংগ্রেস আন্দোলনের জেলা; কিন্তু এখানকার চাষীরও মনোবল খাদ্য সংকটের ফলে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

কাছাড়ের চা-মজুরদের পুরা রেশন এখনও জোটে না

প্রায় ২ লাখ চা-মজুর কাছাড়ে। এই বিরাট মজুর শ্রেণী কাজে দৃঢ় হইয়া না থাকিলে কাছাড়ের প্রতিরোধ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কিন্তু চা-বাগানের মালিকেরা এই অবস্থাতেও তাদের মুনাফার লোভ একটু কমাইয়া মজুরদের রেশনের ভাল ব্যবস্থা করে না। যারা কাজ করে তাদেরই শুধু রেশন দেওয়া হয় আর তাদের পোষ্যদের নির্ভর করিতে হয় চোরা বাজারের উপর। এসিস্ট্যাণ্ট লেবর কমিশনর রেশন সম্বন্ধে যা সুপারিশ করিয়া গিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাও মানে নাই।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা: ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

লড়াই-ফ্রন্টের পিছনে আসামের জনগণ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

★

কাছাড়ে জনরক্ষা কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠিত

২ বছর আগে যখন শিলচরের কোন কোন অঞ্চলে বোমা পড়িয়াছিল, তখন জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিয়াছিল চরম আতঙ্ক। কিন্তু আজ শিলচরের কাছেই যুদ্ধ হইতেছে, অথচ জনসাধারণ আজ আতঙ্কিত হওয়ার বদলে শিলচর ও কাছাড় জেলাকে অটুট রাখিবার চেষ্টায় রত। শিলচরের সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, লিবারেল, জাতীয়তাবাদী—সকলে মিলিয়াছে এই সংকটকে রুখিবার জন্য।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ডেপুটি কমিশনার সকল দলের প্রতিনিধিদের ডাকিয়া জনরক্ষা কমিটী-গঠনে তাঁদের সহযোগীতা চান। এই কমিটীর যুক্ত সভাপতি হন রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র দত্ত, এম, এল, সি এবং মিঃ এস, এন, মৈত্র আই সি-এস (ডেপুটী কমিশনর)। কাছাড়ের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র দেব কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কমিটীর মধ্যে আছেন জেলার মুস্লিম-লীগ নেতা নমর আলি বড় ভুঁইঞা এম-এল এ, কাছাড় জেলার ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সম্পাদক ও স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

জন-রক্ষা কমিটী শহরে লবণের রেশনিং-এর জন্য চেষ্টা করিতেছে। একটী ভলাণ্টিয়ার দল গঠিত হইয়াছে। খাদ্য বণ্টনের কাজ, এ আর-পি কর্ম্মীদের কাজে সহায়তা করা, লোক অপসারণের দরকার হইলে যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই সুশৃংখল ভাবে লোক অপসারণ করা যায় এই সমস্ত কাজের জন্য ভলাণ্টিয়ার বাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

★

●

লখিমপুরের আমলার দেশরক্ষার নমুনা

গত সপ্তাহের 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে যে ডিব্রুগড়ের সকল শ্রেণীর জন-নেতারা ডেপুটী কমিশনারের কাছে একটী মিলিত আবেদন জানাইয়াছিলেন যে জনপ্রতিনিধিদের একটী সভা ডাকিয়া জনরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করা হউক। এই আবেদনের জবাবে ১৭ই এপ্রিল তারিখে লখিমপুরের ডেপুটি কমিশনর জানাইয়াছেন তার মর্ম্ম এই:—ভাবনার কোনো কারণ নাই, লড়াই বেশ ভালই চলিতেছে, সৈন্যরা বেশ অভিজ্ঞ, তাদের উপর ভরসা রাখুন. তা হলেই চলিবে। খাদ্য পরিস্থিতি উন্নত হইয়াছে, শুধু মাত্র লবণেরই যা একটু অভাব। রেশনিংএর জন্য স্পেশাল ষ্টাফ্ নিয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং **কল্পিত দুর্ভাবনার কথা লইয়া সভা করায় কোনো লাভ নাই। লড়াইয়ের ফলে যে কষ্ট হইবেই, তা সহ্য করিবার জন্য সকলেই তৈরী। আপনারা সরকারী রেডিও ব্রডকাস্ট ও পাব্লিসিটি ভ্যানের প্রচার শুনুন—সব ঠিক হইয়া যাইবে।**

এই রকম অন্ধ এবং মূর্খ আমলাদের হাতে এখনও দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয় কেন? দেশরক্ষার জন্য দুর্ভাবনার দরকার নাই, জনসাধারণের কোনো চেষ্টার দরকার নাই, শুধু বসিয়া বসিয়া রেডিও ব্রডকাষ্ট শুনিলেই চলিবে—আজও এ কথা বলিয়া আসাম রক্ষা করিতে চায় যে, সে দেশরক্ষার বিরোধী। আসামের স্বার্থে, ভারতের স্বার্থে, মিত্রশক্তির স্বার্থে এই রকম আমলাকে অবিলম্বে দূর করা হউক।

●

= কালিপ্রসন্নের গ্রেপ্তার কিসের জন্য? =

লামডিং-এর মজুর নেতা কালিপ্রসন্নের নেতৃত্বে যে কো-অপারেটিভ ষ্টোর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বি এণ্ড এ মজুরদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। এই ষ্টোরের ফলে মুনাফালোভী মজুতদাররা অনেকটা কোনঠাসা হইয়া গিয়াছিল। রেলওয়ের গ্রেণ-শপে লবণ নাই। কালিপ্রসন্নের কো-অপারেটিভ ষ্টোর সরবরাহ বিভাগ হইতে নিয়মিত লবণ আনাইবার ব্যবস্থা করে। সরবরাহের ভিতরকার অনেক গলদও এই কো-অপারেটিভ ষ্টোর থাকার ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। কালিপ্রসন্নের গ্রেপ্তারে এই ষ্টোরটী প্রায় অচল হইয়া যাইবার জোগাড়। শুনা যায় কালিপ্রসন্নের গ্রেপ্তারের পিছনে মজুতদারদের কারসাজী আছে!

জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামের কবিদল

গত ফেব্রুয়ারী মাসে জিলা কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে জিলার অত্যন্ত জনপ্রিয় কবির দল 'জিলা কবি সমিতি' নামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। তারপর বিভিন্ন র‍্যালী, সভা ও সম্মেলনে তাঁরা যোগ দিয়া মজুতদারের বিরুদ্ধে—পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে—ঐক্যের জন্য চমৎকার গান রচনা ও নিজস্ব ভঙ্গীতে গান করিয়া উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৫শে তারিখ কবিদের সমিতির মাসিক সভা বসে। এই সভায় কবিরা তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গানগুলি পেশ করেন—তাতে কোন ভুল ত্রুটি থাকিলে শুদ্ধ করা হয়। ইহা ছাড়া, সমিতির নিয়ম শৃঙ্খলা কেমন পালিত হইতেছে তার আলোচনা করা হয়। এই তারিখে যত বেশী টাকাই দেওয়া হোক, কবিরা কিছুতেই গানের বায়না নিবে না ইহাই সমিতির সিদ্ধান্ত।

২৫শে এপ্রিলের সভা। জিলার শ্রেষ্ঠ কবি রমেশ শীল কবি-সমিতির সভাপতি। রমেশবাবুর পরই অন্যতম জনপ্রিয় কবি ফণী বড়ুয়া। সকলেই সভায় আসিয়াছেন। তাছাড়া গোবিন্দ দে, নিরঞ্জন দাস, রাই গোপাল সরকার, তারাচরণ দে প্রভৃতি কবিরাও সভায় উপস্থিত।

বর্ষা আসিবার আগেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাহায্যে রেশনিং, মজুতবিরোধী অভিযান, জাপবিরোধী আন্দোলন, সব অভিযানকে কেমনে আমরা সতেজ রাখিতে পারি, এই আলোচনার পর কবিদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া আসিল। কবিরা এই কবিগান দিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। অনেক কবি এক রাত্রেই ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। প্রায় কবিই মাসে ১০বার হইতে কমপক্ষে ৪বার পর্য্যন্ত বায়না পায়, টাকা কম হইলে অনেকে বায়না ফেরৎ দেয়।

কিন্তু দেশের এই সঙ্কটে তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রস্তাব করিলেন, সব কবি আগামী মে মাসে জিলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ করিয়া যে সব এলাকায় মজুতদারী আছে, সে সব এলাকায় দুইজনে এক এক দলে ভাগ হইয়া গান করিতে যাইবেন। তাঁদের সঙ্গে ৪।৫ জন দোহারী (যারা বাজায় এবং গান ধরে) যাইবে। তাদের মধ্যে এখনও দেশপ্রেমের চেতনা আসে নাই। এদের প্রতি-রাত্রে কমপক্ষে ১০৲ টাকা দিতে হইবে। কবিরা প্রস্তাব করিলেন এক এক দল দুই এলাকায় যাইবেন এবং দোহারীদের খরচ ছাড়া তাঁদের পরিবারের জন্য মাত্র ৭॥০ টাকার ব্যবস্থা করিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। মোট ২৫৲ টাকা লইয়া তাঁরা তাঁদের নূতন রচিত গানের দ্বারা জনগণের মধ্যে হতাশা দূর করিয়া তাদের দুর্ভিক্ষ ও জাপআক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিবেন। এতে তাঁদের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাকে এঁরা ক্ষতি মনে করিবেন না। বরং কবি রমেশ শীল প্রস্তাব করিলেন, জিলার যে ১০টি এলাকায় মে মাসে তাঁরা যাইবেন, তার মধ্যে রাঙ্গুনিয়া সবচেয়ে লোভী মজুতদারী এলাকা—ঐ মজুতদারদের বিরুদ্ধে জনগণকে একতাবদ্ধ করার জন্য দোহারী বাদ দিয়া সব কবির স্কোয়াড মিলিয়া রাঙ্গুনিয়াতে যাইবেন।

চট্টগ্রামের কবিদের এই চেতনা তথাকথিত শিল্পীদের আদর্শ হওয়া উচিত। আজ বাংলায় গায়ক, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, সাহিত্যিকের অভাব নাই কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিভা এমন ভাবে কয়জন দেশের সঙ্কট সমাধানে—স্বাধীনতার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন?

লবণের অভাবে আসামে হাহাকার

মুনাফালোভীরাই বুঝি আসাম রক্ষা করিবে!!

চোরাবাজারে লবণের দর ১৲ হইতে ২।০ সের। কণ্ট্রোল দর ৩।০ আনা হইতে ৬ আনা। কণ্ট্রোল দরে সামান্য মাত্র লবণ পাওয়া যায়, বাকী লবণ কিনিতে হয় চোরাবাজার হইতে।

লোকে লবণের অভাবে হাহাকার করিতেছে। দুষ্ট লোকে গুজব রটাইতেছে—জাপান আসিয়া লবণ দিবে! এক লবণ সংকটের সুযোগেই জাপ-প্রতিরোধের স্পৃহা এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

হঠাৎ লবণের এত অভাব কেন?

গত বছর অক্টোবর নভেম্বর মাসে যখন বাহির হইতে লবণ আমদানীর সুবিধা ছিল, তখন গবর্ণমেণ্ট আসামের দরকার অনুযায়ী লবণ আনে নাই। আজকে একে লবণের কমতি, তার উপর আসামের সাপ্লাই এজেন্সি ও লাইসেন্স প্রাপ্ত পাইকারী ব্যবসায়ীরা তাদের যে মজুত লবণ ছিল তা আগেই সব বিক্রয় করিয়া দিল। লোকেও ভাবিল লবণ বুঝি প্রচুর আছে। হিসাব করিয়া খরচ করিবার দরকার নাই। তারপরই জাপ-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে লবণের অভাব পুরা দস্তুর দেখা দিল। নানারকম গুজব উঠিতে লাগিল, 'রেলওয়ে বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে'। কারবারীরা যার যা লবণ ছিল রাতারাতি লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল।

মাল আমদানীর অসুবিধা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ জরুরী জিনিষ হিসাবে লবণ আনাইবার কোনো ব্যবস্থা করিল না। ষ্টীমার ও ট্রেণ যোগে বিশেষ ভাবে বে-সামরিক অধিবাসীর জন্য যে সমস্ত জিনিষ আসিয়াছে, তার মধ্যে লবণই নাই। তাছাড়া ষ্টেশনের সাইডিং-এ খালি ওয়াগণ পড়িয়া আছে তবু তার সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষ হুঁশিয়ার হইত, তা হইলে লবণ আনাইবার ব্যবস্থা কিছু না কিছু করিতে পারিত।

মজুত লবণ উদ্ধারে গাফিলতি

লবণের সরবরাহ কম তাতো বটেই, কিন্তু মজুত লবণ উদ্ধার করিলেও আজকের এই লবণ-দুর্ভিক্ষ হইতে লোকে বাঁচিতে পারিত। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদাররা লবণ থাকিতে লবণ বিক্রয় করে না। কো-অপারেটিভ দোকানগুলিও চোরাকারবার চালাইতেছে। সাপ্লাই অফিসাররা অনুগ্রহভাজন লোকদের 'স্পেশাল পারমিট' দিতেছে, অথচ সাধারণ লোক বরাদ্দ মতও লবণ পায় না।

অনেক জায়গায় এক মাসের প্রয়োজনের অর্দ্ধেক বা চার ভাগের তিন ভাগের মত লবণ সরকার সরবরাহ করিয়াছে, কিন্তু বণ্টনের অব্যবস্থার দরুণ তাও লোকে পাইতেছে না। নওগাঁতে মাসে ১৫ হাজার মণ লবণের দরকার। সরবরাহ হইয়াছে ৭ হাজার মণ। অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক। কিন্তু এই নওগাঁতেই কত গ্রাম একেবারেই লবণ পায় না। অনেক ব্যবসায়ীর হাতে প্রচুর ষ্টক থাকা সত্ত্বেও, তারা বলিতেছে, লবণ নাই।

সংকট রুখিতে জনগণের চেষ্টায় আমলাদের বাঁধা

আমলাদের হুকুমের ফাঁকেও যেখানে চোরাকারবার চলে, সেখানে একমাত্র জনসাধারণের চেষ্টা দ্বারাই মুনাফালোভী মজুতদার সায়েস্তা হয়। কিন্তু আমলাদের চোখ ফুটিয়াও ফোটে না। কাছাড়ে সহর জনরক্ষা কমিটী ও গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ষ্টোরগুলি লবণ বণ্টনের ভার লইতে আগাইয়া গেল। সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই কাজ করিতে চাহিল। কিন্তু সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট তাঁদের কাজে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না!

জরুরী নোটীশ

জনযুদ্ধে যে-সব রিপোর্ট কমরেডরা পাঠান—অনেক সময় তাতে জেলার নাম, ঘটনাস্থলের সঠিক পরিচয় এবং তারিখ ইত্যাদি থাকে না। ফলে, উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই, ভবিষ্যতে পরিষ্কার কাগজে এবং যথাসম্ভব সুন্দর হাতের লেখায় স্থান, জেলা, তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

সঃ জঃ

এই চট্টগ্রামকে বাঁচাইতে হইবে

মনোরঞ্জন সেন

গত বছর চট্টগ্রামেই সর্ব্বপ্রথম দুর্ভিক্ষ সুরু হয়। বাংলার অন্যান্য জিলাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার ছয় মাস আগেই চট্টগ্রাম দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। এবারও আবার গত বছরের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। আজ চট্টগ্রামের সীমান্তে যখন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণান্তকারী যুদ্ধ চলিতেছে, তখন চট্টগ্রামে আবার দেখা দিয়াছে খাদ্যাভাব।

বিশ লক্ষ মণ ধান মজুতদারের হাতে

চট্টগ্রামে এবার ফসল হইয়াছে ৭০ লক্ষ মণ অর্থাৎ সমস্ত জিলার ৮ মাসের খোরাক আর ঘাটতি হইয়াছে ৪ মাসের খোরাক ৩০ লক্ষ মণ। কিন্তু সরকারী ক্রয় নীতির দৌলতে ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ লক্ষ মণ শস্য জমা হইয়াছে জমিদার ও মহাজনদের হাতে। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে ক্রয়ের কোন তাগিদ দেখা যাইতেছে না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে সরকার এতদিনে মাত্র ৯ লক্ষ মণ চাউল কিনিয়াছেন। এই সামান্য চাউল দিয়া বর্ত্তমানের আংশিক রেশনিং ব্যবস্থাও চালু রাখা সম্ভব নয়। আমদানীর বিশেষ কোন ব্যবস্থাও হইতেছে না। ফলে গত তিন মাসে চাউলের দাম শতকরা প্রায় ৩০০ ভাগ বাড়িয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে যেখানে চাউলের দাম ছিল টাকায় ৩ সের, আজ সেখানে টাকায় সোয়া সেরের বেশী বিক্রয় হয় না।

চাউলের সঙ্গে সঙ্গে কুইনাইনও চোরাবাজারে জমা হইতেছে। প্রকাশ্য বাজারে কুইনাইন পাওয়াই যায় না, চোরাবাজারে একটি বড়ি বিক্রয় হয় ২৲ টাকায়, অন্যান্য ঔষধপত্রের অবস্থাও এই একই রকম। অথচ রোজই মহামারীতে অসংখ্য লোক মারা যাইতেছে। একমাত্র চিড়িঙ্গা ইউনিয়নে গড়ে দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা ১০০। গত ২১শে এপ্রিল তারিখে চিড়িঙ্গা ইউনিয়নের কাকাড়া গ্রামে ৪ ঘন্টার মধ্যে ২০ জন লোক মারা যায়।

কৃষিজীবনে সংকট

শুধু খাদ্য ও ঔষধের সংকট নয়, চট্টগ্রামের সমগ্র কৃষি জীবন আজ নূতন করিয়া বিপন্ন হইয়াছে। স্থানীয় লোকদের মতে সমস্ত জিলায় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। বীজধান, বলদ, লাঙ্গল ইত্যাদির অভাবে বহু চাষী চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে। পটিয়া, রাঙ্গুনীয়া প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতভাবে গো-মড়ক দেখা দিয়াছে। এক রাঙ্গুনীয়া থানায় চাষের জন্য অন্ততঃ ৪০০০ বলদ দরকার, কিন্তু সেখানে এর অর্দ্ধেক সংখ্যক বলদও নাই। আর যা আছে তার দামও ৪০০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা জোড়া। ইহার উপরে আবার জমিদাররা অগ্রিম খাজনা ছাড়া জমি দিতেছেন না এবং খাজনাও তিন গুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। 'কানি' পিছু অগ্রিম ৬০৲ টাকা হইতে ৮০৲ খাজনা দিয়া খুব কম চাষীই জমি নিতে পারে। ফলে অসংখ্য জমি অনাবাদি পড়িয়া আছে এবং গরীব চাষীরা তাহাদের জমি বন্ধক দিয়া ভাগ্যান্বেষে পথে বাহির হইয়া পড়িতেছে।

চট্টগ্রামের সর্ব্বত্রই আজ গত বছরের দৃশ্যের পুনরাভিনয় চলিতেছে। গরীবের বাড়ীতে সুরু হইয়াছে অনাহার ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদের বাড়ীতে আরম্ভ হইয়াছে অর্দ্ধাহার। ভাতের পরিবর্ত্তে অবার মিষ্টি আলু, খিচুরী ইত্যাদি খাওয়া সুরু হইয়াছে। গ্রামে ও সহরের রাস্তায় আবার কাঙ্গালীর মিছিল দেখা দিয়াছে, তাদের অধিকাংশই শিশু ও মেয়ে, ভাঙ্গা টিনের কৌটা হাতে লইয়া লক্ষ্যহীনভাবে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দুঃস্থরা দাস-মজুরে পরিণত হইল

রিলিফ কিচেনগুলি সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই এই দুঃস্থ জনতার অধিকাংশই আশ্রয় নিতেছে সরকারী 'লেবার কোরে।' কিন্তু সেখানেও আছে কনট্রাকটরদের জুলুম। তাহারা এই দুঃস্থ শ্রমিকদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়া তাহাদের সামান্য মাহিনা হইতে ৵০ হইতে ।০ আনা করিয়া কাটিয়া রাখে। কনট্রাকটারদের পারস্পারিক প্রতিযোগিতার মূল্যও এই হতভাগাদের দিতে হয়। জনৈক কনট্রাকটার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করিবার জন্য একদিন ১০০০ শ্রমিককে বেকার বসাইয়া রাখে, ফলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার কনট্রাক্ট সময়মত কাজ শেষ করিতে পারে না। সেই ১০০০ শ্রমিককে সেই দিন অবশ্য কোনই মজুরী দেওয়া হয় না।

এই দুঃস্থ শ্রমিকদের খাদ্য ও বাসস্থানের কোনই ব্যবস্থা নাই। সরকার বলে দায়িত্ব মিলিটারীর, মিলিটারী বলে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ফলে এই সামান্য মজুরী লইয়া তাহাদের নির্ভর করিতে হয় চোরাবাজারের উপর এবং রাত্রে ঘুমাইতে হয় রাস্তার পাশে, গাছের নীচে।

এই 'লেবার কোরে' ৩০ হাজার মেয়ে মজুর কাজ করে। তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। **কনট্রাকটারদের খেয়াল খুশীর উপর ইহাদের নির্ভর করিতে হয়।** ঘুষ, জুলুম তো চলেই, অনেক সময় ইহারা বেশ্যাবৃত্তি করিতেও বাধ্য হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাকরীটিও হারায়। এই রকম কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত অসংখ্য নারী আজ গ্রামের পথে পথে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে এবং সর্ব্বত্র সংক্রামন ছড়াইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই যৌনব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

দেশভক্তরা আগুয়ান

১৯৪৩ সালের দুর্ভাগ্যের হাত হইতে এ বছর চট্টগ্রামকে বাঁচাবার জন্য জিলার দেশভক্তরা আজ জাগ্রত।

পটিয়া, রাউজান, সাতকানিয়া, বোয়ালখালী প্রভৃতি ৭টি থানায় ও ১৪টি ইউনিয়নে ১ লক্ষ ১৫ হাজার লোক খাদ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়া সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছে,—মজুত উদ্ধার কর, চট্টগ্রামে ২০ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় কর ও বাহির হইতে ৩০ লক্ষ মণ আমদানী কর, গ্রামাঞ্চলে রেশনিং চালু কর এবং দুঃস্থদের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন কর। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী ও যামিনী বসু এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন।

এই আন্দোলনের ফলে পাঁচলাইস, ডাবলমুরিং ও বোয়ালখালী অঞ্চলের শতকরা ২০ জন এবং পটিয়ার ৮০০০ লোকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা হইয়াছে। অল্প সংখ্যায় হইলেও কোন কোন ইউনিয়নে দুঃস্থদের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা ১৫টি স্কোয়াডে গ্রামাঞ্চলে মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। সহরের সমস্ত বিশিষ্ট ডাক্তারদের লইয়া একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি তাহার ৪২টি শাখা-কেন্দ্র ও ২৫০ জন ডাক্তারের সাহায্যে গত তিন মাসে প্রায় ১ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে।

গত বৎসরের মত এ, আর, পি, কর্ম্মচারীরা এবারও তাঁহাদের দেশসেবার আগ্রহ বজায় রাখিয়াছেন। দোহাজারী, কক্সবাজার, চিড়িঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় ৬০,০০০ লোকের চিকিৎসা করিয়াছেন এবং রিলিফের জন্য ১২৫০০৲ টাকা তুলিয়াছেন।

জিলা কৃষক সভার নেতৃত্বে হালের বলদ, কৃষি ঋণ, বীজ ধান ইত্যাদির জন্য তুমুল আন্দোলনের ফলে সরকারী কৃষি বিভাগ কৃষক সভার হাতে ২৫০ মণ বীজ ধান দিতে রাজী হইয়াছে। ফটিকছরীতে কৃষকদের বহু পতিত জমি ছাড়িয়া দিয়াছে।

নারী সমিতির নেতৃত্বে দুঃস্থদের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র খুলিবার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। সরকার কয়েকটি ইউনিয়নে কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়াছেন। নারী সমিতি ৭টি কর্ম্মকেন্দ্র একটি শিশু হাসপাতাল পরিচালনা করেন। তাঁহারা এই সব কর্ম্মকেন্দ্রে ও হাসপাতালের জন্য জনসাধারণের কাছ হইতে চাঁদা তুলিতেছেন। হালিসহরে লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও নারীসমিতির কর্ম্মীগণ ৩০০৲ টাকা তোলেন। বহু মুসলমান মহিলা এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।

গত বছর চট্টগ্রাম হইতেই বাংলার অন্যত্র দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়াছিল। এই বছর আবার যাহাতে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার জন্য চট্টগ্রামের দেশভক্তরা সচেষ্ট।

● মহামারী সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা ●

১৮টী জেলায় কলেরা ও বসন্ত

চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, যশোহর, খুলনা, ২৪-পরগণা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হাওড়া, বগুড়া, রংপুর এবং মালদহে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বাংলা গবর্ণমেণ্ট উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি অস্থায়ী বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটি এবং নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়ায় বসন্তের প্রকোপের কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে।

ধ্বংসের মুখে কাইতলা গ্রাম

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কাইতলা ত্রিপুরা জিলার একটী সমৃদ্ধশালী ও জনপূর্ণ গ্রাম। লোকসংখ্যা ৫৬৬৩। খাদ্যাভাব এবং মহামারীতে ২২০০ লোক মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে শতকরা ৭০ জন কোন না কোন রোগে ভুগিতেছে। ফলে উপযুক্ত মজুরী দিয়াও মজুর পাওয়া যায় না। গো-মড়ক লাগিয়া শতকরা ৫০টী গরু মারা যাওয়ার ফলে প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে এখনও ফসল করা হয় নাই।

একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে গ্রামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "গ্রামের উপরে খোদার অভিশাপ পড়িয়াছে। গত বৎসর মরা মানুষের গন্ধে গ্রামে থাকা কষ্টসাধ্য ছিল। শিয়াল কুকুরে মানুষ টানিয়া খাইয়াছে। এই বৎসর গরুর পালা। গরু ও মজুরের অভাবে জমি খালি পড়িয়া আছে। গ্রামের জোতদারদেরও নিস্তার নাই। আর গ্রাম দিয়া কি হইবে।"

তথ্য নিয়া জানিতে পারিলাম খাদ্য সংকট ও মহামারীর সুযোগে গ্রামেব জোতদাররা অল্পমূল্যে বহু জমি ও বসতবাটী কিনিয়া নিয়াছে। ফলে শতকরা ত্রিশ জন লোক জমিহারা হইয়াছে।

এতবড় সংকটে সারা বৎসরে সরকার ২ সপ্তাহ মাত্র অখাদ্য খিচুড়ি বিতরণ করিয়াছে। তিন পাউণ্ড কুইনাইনও পাওয়া গিয়াছিল—কিন্তু উহাও চোরা বাজারে চলিয়া গিয়াছিল। অগৌণে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া দরকার নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য।

কতগুলি পরিবার ধ্বংসের মুখে গিয়াছে নিম্নে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল।

	বাড়ীর মালিকের নাম	লোকসংখ্যা	মৃত্যুসংখ্যা
১।	ব্রজেন্দ্র কৈবর্ত্ত	১১	৬
২।	কুলক কৈবর্ত্ত	৬	৪
৩।	পিতাম্বর কৈবর্ত্ত	৪	২
৪।	ব্রহ্মানন্দ নাথ	৯	৭
৫।	গৌর নাথ	৭	৫
৬।	রাজমোহন নাথ	৬	৩
৭।	হরকুমার নাথ	৬	৪
৮।	নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য	১৫	১১
৯।	রাধাচরণ সাধু	৫	৪
১০।	রুসমৎ আলী	১০	৭
১১।	হাফিজদ্দিন	৫	৪
১২।	আবদুল মোতালেব	৮	৭
১৩।	আশ্রাব আলী	১০	৮
*১৪।	মালীপাড়া	৫০	৪৯
*১৫।	দীবির পাড়	৫০	৪৫

কুমিল্লা, ১লা মে

নন্দিগ্রাম থানার চাষীদের দুরবস্থা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার নন্দিগ্রাম থানার পরিমাণ ১৪৪ বর্গ মাইল। গত ১৩৪৯ সালের ভাদ্র মাসে উক্ত থানার লোক সংখ্যা ছিল ১৫৮২৩৪ জন। বন্যা, মহামারী, খাদ্যাভাব প্রভৃতিতে লোক সংখ্যার গড়ে শতকরা ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষতঃ হলদী ও হুগলী নদী তীরবর্ত্তী গ্রাম সমুহে শতকরা ৩৫ জন মরিয়াছে। মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান করা সত্ত্বেও তাহার প্রকোপ বিশেষভাবে প্রশমিত হয় নাই।

এইরূপ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও গত নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের দিনে চাষীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যে ফসল উৎপন্ন করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বর্গাদারগণ ১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালের দাদনি ধান্যের মুনাফা ও আসলসহ আদায় করিয়া লইয়াছে। ফলে কৃষকেরা রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিয়াছে। তাই আজ শতকরা ৮০ জন চাষী নিঃস্ব।

১৩৫১ সালে ঐ সকল নিঃস্ব চাষীগণকে বলদ, বীজ-ধান ও খোরাকী ধান প্রভৃতি সাহায্য না করিলে এতদঞ্চলের বহু আবাদী জমি পতিত থাকিবে ও শস্য উৎপাদনের ব্যঘাত হইবে।

ঢাকায় ম্যালেরিয়ার নূতন আক্রমণ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাসের প্রথম পর্য্যন্ত ঢাকা জিলার সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া ধীরে ধীরে কমিতেছিল এবং ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭৫ জন কমিয়াছিল। **কিন্তু এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই বৃষ্টি পরার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে পুনরায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দেখা দিয়াছে।** অনেক যায়গায় দেখা যাইতেছে যে এই অসুখ টাইফয়েডে পরিণত হইতেছে।

মাণিকগঞ্জ মহকুমা

সমস্ত মহকুমায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ জনই আজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ঘিওর ও দৌলতপুর থানার ভবানীপুর, টুটিয়াম, চক, নীরপুর, ধামনর এবং খলসী ইউনিয়নে শতকরা ৭০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ভবানীপুর গ্রামের ৩০টি বাড়ীতে ২১০ জন বাসিন্দার মধ্যে ১৫৭ জন শয্যাশায়ী এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই রোগী আছে।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমা

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অবস্থাও একই রকম কিন্তু আক্রমণের হার মাণিকগঞ্জের মত বেশী নয়। তবে কোন কোন জায়গায় খুব তীব্রভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

ইছাপুরা ইউনিয়নের চম্পকদি গ্রামে একটি বাড়ীতে ১০ জনের মধ্যে ৮ জন জ্বরে শয্যাগত এবং আর একটি বাড়ীতে ৬ জনের মধ্যে ৩ জন শয্যাগত।

কাঠালতলা গ্রামে একটি বাড়ীতে ৪ জনের মধ্যে ৪ জনই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং আর একটি বাড়ীতে ৫ জনের মধ্যে ৪ জন জ্বরে শয্যাগত।

নারায়নগঞ্জের সুতাকলগুলিতেও শ্রমিকরা যথেষ্ট সংখ্যায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইতেছে।

গতবার হঠাৎ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ জনসাধারণের ভিতরে যে রকম নিরাশ এবং হতাশার ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল এবার ততখানি হয় নাই।

এতদিনের আন্দোলনের ফলে তাহারা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য একদিকে যেমন কুইনাইন আদায়ের আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে অন্যদিকে নিজেদের এলাকার ডাক্তারদের সংঘবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার পয়লা ইউনিয়নের কৃষক সমিতির কর্মীরা ইতিমধ্যেই ১০০টি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে ঔষধ দিয়াছে; ইহার মধ্যে ৬০ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ঢাকা, ৯ই মে

মহামারীর বিরুদ্ধে কৃষক সমিতি

বসন্ত-চিকিৎসার খরচ শতকরা ৯৯ ভাগ কমিল

সুধীর মুখার্জী

কৃষক যুবকের দেশপ্রেমের অতুলনীয় নিষ্ঠায় সর্ব্বদলীয় রিলিফ কমিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদলীয় প্রচেষ্টায় আমলাতন্ত্র জনসাধারণের উদ্যমের সাথে সহযোগীতায় আসিতেছে।

কিছুদিন আগে আমি রাজার হাটে বসন্তের কথা জানাইয়াছি। ইতিমধ্যে জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক মণ্ডলীর ও মহকুমা সম্পাদকগণের যুক্তবৈঠক হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা কৃষক সমিতি হইতে জেলায় সমস্ত কৃষক সমিতি ও দেশপ্রেমিক কৃষকের কাছে রাজার হাটের শোচনীয় দুরবস্থার সাহায্যের আবেদন জানান হইয়াছে। জেলার কৃষকগণ এই আবেদনে যোগ্য সাড়া দিতেছে। জেলা কৃষক সভার নেতৃত্বে একটি বৈদ্য স্কোয়াড রাজার হাটে বসন্ত চিকিৎসা সুরু করিয়া দিয়াছে।

গত নভেম্বর মাসে যখন আমরা মহামারীর গুরুত্ব বিষয়ে কিছু ধারণা করি এবং ঔষধের অভাব বুঝিতে পারি তখন আমরা কৃষক কর্ম্মীগণের দৃষ্টি এই দিকে ফেরাই এবং দেশীয় কবিরাজ ও গ্রাম্য চিকিৎসা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। ফলে কুড়িগ্রামে লীগ কর্ম্মী দানেশ মিঞার প্রস্তুত হেকিমি জ্বরের ঔষধ ও পেটের পীড়ার ঔষধ ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। ইহাতে উপকারও হইতে থাকে। তারপর তিস্তার কমরেড জ্যোতির্ম্ময় এই কাজে উৎসাহী হয়! সে কবিরাজী ছাত্র ছিল। নিজের চেষ্টায় সে ছাতিম হইতে জ্বরের ও পাচড়ার ঔষধ তৈয়ারী করিয়া বিতরণ করে।

ইতিমধ্যে কাঠালবাড়ীতে মেডিকেল রিলিফ আন্দোলনে জনসাধারণ বিশেষ অগ্রসর হয়। কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। ছাত্র শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটি এখানে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলে।

পিপলস্ রিলিফ কমিটি থেকে ডাঃ অমিয় বানার্জ্জী ও ডাঃ অনিল বানার্জ্জী আমাদের জেলাতে আসিয়া একটি যুক্ত রিলিফ কমিটি গঠন করেন এবং ২৫ জন ভলাণ্টিয়ারকে মহামারীর বিরুদ্ধে কি ভাবে লড়াই করিতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেন।

জানুয়ারী মাসে যখন বসন্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তখন প্রতিরোধের জন্য আমরা বৈদ্য সম্মেলন, বৈদ্য কমিটি ও চিকিৎসা সমবায়ের আওয়াজ তুলি। কমরেড হরিপদ গুহ লক্ষ্মীটারীতে এই আওয়াজ কার্য্যকরী করিয়া তোলেন। গঙ্গাচরা এলাকা গত দুর্ভিক্ষে ছারখার হইয়া যায়। জেলা সমিতি হইতে তখন 'লক্ষ্মীটারীকে রক্ষা কর' ধ্বনি লইয়া একটি স্কোয়াড বিভিন্ন বাড়তি এলাকায় ঘুরিয়া লক্ষ্মীটারী রিলিফ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। কৃষক সমিতির চেষ্টায় লক্ষ্মীটারীর অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। কিন্তু দারুণ বসন্ত গঙ্গাচরা এলাকাকে ধ্বংস করিতে থাকে। কোন ঔষধ নাই। লিম্প নাই। কবিরাজরা ঔষধ ও পরিচর্য্যার জন্য ইচ্ছামত টাকা আদায় করিতে থাকে। ফলে মৃত্যু স্রোত অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। লক্ষ্মীটারীর কৃষক সমিতি কমরেড হরিপদ গুহের নেতৃত্বে বসন্ত রোগের ঔষধের ফরমুলা সংগ্রহ করে এবং ঔষধ তৈয়ারী করিয়া বিতরণ সুরু করে। পিপলস্ রিলিফ কমিটির ভলাণ্টিয়ারগণ ৬টি কেন্দ্রে সেনিটারী বিভাগের সহযোগীতায় টিকা দিতে থাকে। এই কাজে বসন্তের গ্রাম্য কবিরাজ রাজকান্ত বর্ম্মন ও সীতারাম প্রভৃতি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হন এবং কৃষক সমিতির নেতৃত্বে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুরু করেন।

কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি বৈদ্য সম্মেলন ডাকা হয় এবং সেখানে একটি বৈদ্য কমিটি গঠিত হয়। **এই কমিটি এখন চিকিৎসা সমবায় গঠন করিয়া বসন্তের ঔষধ, তেল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেছে।** ফলে সাধারণ লোকের আজ বসন্ত চিকিৎসায় খরচ শতকরা ৯৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি রোগী ঔষধ ও সেবা পাইতেছে। লক্ষ্মীটারী কৃষক সমিতির এই গৌরবময় স্বদেশ সেবায় মুগ্ধ হইয়া পিপলস্ রিলিফ কমিটি এই কেন্দ্রে এক কালীন ৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছে।

'রাজার হাট রক্ষা কর' ধ্বনি জেলা কৃষক সমিতি হইতে দেওয়া হইলে লক্ষ্মীটারী কৃষক সমিতি তৎক্ষণাৎ একটি মেডিকেল স্কোয়াড ও আউস নিড়াবার জন্য একটি কিষাণ স্কোয়াড পাঠায়।

এই স্কোয়াড যখন ১লা মে রংপুর জনসভায় যোগদান করে তখন এবারের রংপুরের মে দিবস দেশপ্রেমের এক নূতন উজ্জ্বল আলোক তুলিয়া ধরে। সভাতে প্রায় ১০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়।

জেলা কৃষক সমিতি জেলা সর্ব্বদলীয় রিলিফ কমিটির পরিচালনায় রাজার হাটে রিলিফ কেন্দ্রে কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে। যেভাবে উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হইয়া এই বিপদজনক কাজে হস্তক্ষেপ করা দরকার অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। যতখানি ব্যাপক আকারে কাজ আরম্ভ করা দরকার তাহাও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জিলা কৃষক সমিতি সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও আরও তিনটি স্কোয়াডকে তিনটি বিপদজনক এলাকায় পাঠাইবার জন্য শিক্ষা দিয়াছে। দেশপ্রেমের এই জ্বলন্ত শিক্ষা জেলার চেহারা বদলাইয়া দিতেছে।

★ বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক সম্মেলন ★

কংগ্রেস ও লীগ কর্মীদের যোগদান

গত দুই সপ্তাহের ভিতর রাজসাহী, বর্ধমান, বাঁকুড়া মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় মহকুমা ও জেলা কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এবারকার এই সম্মেলনগুলির বিশেষত্ব এই যে এই সমস্ত সম্মেলনে কংগ্রেস ও লীগপন্থী কর্মিরা যোগদান করিয়া সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সাহায্য করেন। দ্বিতীয়তঃ এবার সম্মেলনগুলিতে বহু কৃষক কর্মি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন ও বহু কৃষক রমণীও যোগদান করেন।

রাজসাহী সম্মেলন হইয়াছে ২০শে ২১শে এপ্রিল তারিখে **নাটোর মহকুমার লালোর** গ্রামে। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মনসুর হবিব। সম্মেলনে পাঁচ হাজারের অধিক হিন্দুমুসলমান নরনারী যোগদান করেন। মুসলমান জনতাই ছিলেন অধিকাংশ। প্রতিনিধি বৈঠকেও দেখা যায় প্রতিনিধিদের মধ্যে লীগ কর্মি, কমিউনিস্ট কর্মি, লেবার পার্টির কর্মি, অদলীয় দেশপ্রেমিক প্রভৃতি সব স্তরের রাজনৈতিক মতাবলম্বী কর্মিই উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মৌঃ মাদার বক্স সম্মেলনে বক্তৃতা করেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র দেন। সম্মেলন জেলার কতকগুলি বাঁধ বাঁধা ও খাল কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ফসল বাড়ানোর নাচ ও গান, মজুতবিরোধী নাচ ও গান ইত্যাদি অনুষ্ঠান কৃষকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কৃষকগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সম্মেলনে যোগদান করেন।

বর্দ্ধমান জেলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে ২২-২৩শে এপ্রিল সদর মহকুমার **খাঘার শিমডোল** গ্রামে কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের দিন বৈকালে ঝড় উঠিয়া পড়ায় তাড়াতাড়ি সম্মেলনের কাজ শেষ করিতে হয়। ঝড় হওয়া সত্ত্বেও হাজার আড়াই কৃষক নরনারী প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগদান করেন।

মেদিনীপুরে **ঘাটাল মহকুমা সম্মেলন** হয় ২৫শে এপ্রিল **ঝাঁকরা** গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনসুর হবিবের সভাপতিত্বে। এই সম্মেলনেও স্থানীয় সমস্ত নেতৃস্থানীয় ও সত্যমুক্ত কংগ্রেস নেতাগণ ও শতাধিক কৃষক প্রতিনিধিও যোগদান করেন। ঘাটালের এই সম্মেলন সমস্ত দেশপ্রেমিক কর্মিদের ভিতর নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। সকলে মিলিত হইয়া দেশ বাঁচানোর কাজে আগাইবার চেষ্টা চেষ্টা দেখা দিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল পাত্রসায়ের থানার **হদলে নারায়ণপুর** গ্রামে। স্থানীয় একজন 'সংগ্রামপন্থি' কর্মী জমিদারদের সহিত মিলিত হইয়া সম্মেলন পণ্ড করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। বিষ্ণুপুর হইতে কয়েকজন পঞ্চম বাহিনীর লোকও আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইহাঁরা কৃষকদের সম্মেলনে যোগদান না করিতে ও সাহায্য না করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত ধীরেন সেনগুপ্ত ও একজন দেশপ্রেমিক জমিদার শ্রীযুত ইন্দুভূষণ মণ্ডল (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি) উহাদের কাজের বিরোধিতা করেন ও সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। ইহাদের চেষ্টায় ও কর্মিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাধাদানকারীরা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়। সম্মেলনে ২৫০০ হাজার হিন্দু মুসলমান কৃষক যোগদান করেন। সভায় বড়জোড়ার বৃদ্ধা কৃষক কর্মি শ্রীযুক্তা ননীবালা চ্যাটার্জির বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। প্রবল বাধা সত্ত্বেও এইভাবে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় স্থানীয় কৃষক ও কর্মিদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত সম্মেলনই জাপ দস্যুর আক্রমণকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানায় ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য গণআন্দোলন করিতে সমস্ত দল ও জনসাধারণকে আহ্বান জানায়।

★ "বাংলাকে বাঁচাবার জন্য সকলে এগিয়ে এস" ★

ভুলাভাই দেশাইর আহ্বান

কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই বাংলার সাহায্যে বাংলার সংস্কৃতি স্কোয়াডের নাচ ও অভিনয় দেখিয়া অভিভূত হইয়া উপরোক্ত এই আবেদন জানান। সেদিন (২১শে এপ্রিল) বাংলার স্কোয়াড প্রেস-প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে তাঁদের প্রোগ্রাম দেখান। এই বৈঠকে আসিয়াছেন বিশিষ্ট বিশিষ্ট সম্পাদক, লেখক, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, ফিল্ম ডিরেক্টর, প্রডিউসার প্রভৃতি। তাছাড়া ছিলেন ভুলাভাই দেশাই-এর মত কংগ্রেস নেতা, সোভিয়েট থেকে একজন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার, বৃটিশ নেভির কর্ম্মচারী। কয়েকজন লীগ কর্ম্মীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই স্কোয়াডের প্রোগ্রাম দেখিয়া অভিভূত হন। ভুলাভাই দেশাই সেইখানেই ২৫০৲ টাকা দেন! এই সভাতেই ৮০০৲ টাকা নগদ ওঠে এবং ২০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ২৩শে এপ্রিল বোম্বে ক্রনিক্‌ল্ পত্রিকায় এই 'শো' সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়: "প্রত্যেকটী নাচ ও গান ও নাটকের ভিতর দিয়া বাংলার দুরবস্থার বাস্তব ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে পরিপূর্ণ আর্টও বজায় আছে!"

* * * *

মজুর এলাকায় স্কোয়াডের শো। ৭টা এলাকায় শো হইল। ২২শে তারিখে পারেলে ৩ হাজার মজুর হাজির হইল। ফার্গুসন রোডে যেদিন 'শো' হইল সেদিন প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হইল। সিউড়ি, মদনপুরা প্রভৃতি জায়গাতেও মজুর এলাকায় শো হইল। মজুরেরা যার যা সাধ্য অর্থ সাহায্য করিল। উর্দ্দু দৈনিক ইনক্লাবের সম্পাদক দিলেন ৫১৲ টাকা। মহম্মদ ইব্রাহিম দিলেন ১০১৲ টাকা। কংগ্রেস নেতা ভোজপুরিয়া সকলকে আবেদন জানাইলেন বাংলাকে বাঁচাইতে।

* * * *

এক মাস আগেও বাংলার অসহায় মেয়েরা এই স্কোয়াডের একজন সভ্যকে সহানুভূতির সুরে বলিয়াছিল: "তোমরা শুধুই খাটছো, আমাদের জন্য কি আর করতে পারলে?"

কিন্তু এক মাসের মধ্যে এই স্কোয়াড সারা ভারতের দেশপ্রেমিকদের প্রাণে সাড়া আনিতে পারিয়াছে। আজ বাংলার জন্য ডাক দিয়াছে শুধু এই স্কোয়াড নয়, কংগ্রেস নেতা, মুস্লিম লীগ নেতা, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ!

সাহায্য পাঠাও—পিপল্‌স রিলিফ কমিটী, বেঙ্গল।

কালিম্পং-এর চিঠি [১২-৫-৪৪]

জনগণই খাদ্য বণ্টন করিতে পারে

মাত্র ২ মাস আগে কালিম্পং-এর খাদ্য-সংকটের চেহারা দেখিয়া যে কেউ শিহরিয়া উঠিত। আমদানী কম, তার উপর বণ্টনের কোনো বাঁধা ব্যবস্থা নাই। সাপ্লাই অফিসার দুই রকম পদ্ধতিতে জিনিষ সরবরাহ করেন। বিশিষ্ট লোকেরা সরাসরি সাপ্লাই অফিসারের কাছ হইতে পারমিট লইয়া থাকে, আর সাধারণ গরীব লোকেরা দু'একটী যে কণ্ট্রোল দোকান আছে সেখান থেকেই খরিদ করে। সরবরাহ কত আসিতেছে, কত অংশ কন্‌ট্রোল দোকান মারফৎ বিক্রয় হইতেছে, তার কোনো ঠিকানা নাই। কন্‌ট্রোল দোকানের সামনে কিউ-এর কোনো বালাই নাই। কারবারীরা খানিক বিক্রয় করিল, খানিক পুঁজি করিয়া চোরাবাজারে চালান দিল—ইহাই ছিল অবস্থা। হাজার হাজার লোক দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় ও তার অর্দ্ধেক জিনিষ না পাইয়া ফিরিয়া যায়।

কিন্তু এই চরম বিশৃঙ্খলা হইতেই আজ কালিম্পং-এর খাদ্য পরিস্থিতিতে আসিয়াছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা এবং ইহা ঘটিয়াছে জনসাধারণেরই হস্তক্ষেপের ফলে। জনসাধারণের চেষ্টা ধাপে ধাপে বাড়িয়াছে এবং জয়ী হইয়াছে।

২৪শে মার্চ্চ ৫০০ লোকের সহি করা গণ-দরখাস্ত ডেপুটী কমিশনরের কাছে পাঠান হইল কন্‌ট্রোল দোকানের দাবীতে। তার কোন ফল হইল না। ৬ই এপ্রিল আবার রিমাইণ্ডার পাঠান হইল।

৭ই এপ্রিল ৫ জনকে লইয়া ভলাণ্টিয়ার দল গঠিত হইল কন্‌ট্রোল দোকানের সামনে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য। ৭ দিনের মধ্যে ভলাণ্টিয়ার দলে ৭৫ জন কর্মী জুটিল। কিউ গঠন হইল। দোকানের বিক্রীর হিসাব রাখা হইল, মজুতদারী বন্ধ হইল। ভলাণ্টিয়াররা ব্যাজ লাগাইয়া নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ জানাইল তাহারা ভলাণ্টিয়ারদের দরকার মত সহযোগিতা দিবেন।

আরো ৭ দিন পরে ভলাণ্টিয়ার কমিটির পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান হইল:—(১) আরো বেশী কন্‌ট্রোল শপ খুলিতে হইবে (২) সরবরাহের পরিমাণ আগে হইতে জানাইতে হইবে। (৩) বিক্রীর সময় বাঁধিয়া দিতে হইবে। (৪) রেশনিং এর জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

৩।৪ দিনের মধ্যে ২।৩ টী জায়গায় ৬।৭টী দোকান খোলা হইল, লবণের বরাদ্দ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এবং ভলাণ্টিয়ার কমিটীকে অন্যান্য সুবিধাও দেওয়া হইল।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মেয়ে ভলাণ্টিয়ারও ৬।৭ জন আসিয়া জুটিল; আজ ভুটিয়া, গুর্খা, চীনা, বাঙ্গালী, মারোয়াড়ী সমস্ত শ্রেণীর লোকই ভলাণ্টিয়ারের কাজে সহযোগিতা করিতেছে।

১লা মে এস্ ডি-ও খাদ্য কমিটী গঠনের জন্য সভা ডাকিলেন। ভলাণ্টিয়ার কমিটী ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধিকে এই কমিটীতে লওয়া হইল। এই কমিটী রেশনিং-এর জন্য সেন্সাস লইতেছে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে আজ শুধু সহরেরই নয়, গ্রামের লোকও আসিয়াছে। সেন্সাসের কাজের প্রধান দায়িত্ব এই ভলাণ্টিয়াররাই পালন করিবে।

বোম্বে-র মেডিকেল স্কোয়াড

ডাঃ আর, এন কুপারের নেতৃত্বে বোম্বাইতে বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। ৮ জন মেডিকেল ছাত্র লইয়া এই কমিটির প্রথম মেডিকেল ইউনিট ডাঃ যদুর নেতৃত্বে বোম্বাই হইতে ১০ই মে রওনা হইবে। পিপলস্ রিলিফ কমিটির পরিচালিত কেন্দ্রগুলিতে এই মেডিকেল ইউনিট কাজ করিবে। এই কেন্দ্রগুলির ব্যয় ভার বর্ত্তমানে পিপলস্ রিলিফ কমিটিই বহন করিবে।

দ্বিতীয় মেডিকেল দল ১৫ই মে বোম্বাই হইতে রওনা হইবে। ইহার পর বোম্বাই রিলিফ কমিটি বাংলা দেশে সাহায্য দল প্রেরণ করিবে; এই উদ্দেশ্যে এই কমিটি বাংলার জন্য অর্থ ও ঔষধ সাহায্য সংগ্রহ করিতেছে। ডাঃ রামচন্দ্র রেড্ডিও ১২ই তারিখে মেডিকেল ইউনিটের সহিত রিলিফের কাজে কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট মাগগিভাতা কমিটির সুপারিশ

প্রত্যেককে প্রায় ৪৫৲ ভাতা দেওয়া উচিত

সরকারী কমিটিরই রায়, তবু সরকার মানেনা কেন ?

কলিকাতা ও আশেপাশের সমস্ত কারখানা অঞ্চলে মজুরদের দুরবস্থার একশেষ। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার মত সরকার পক্ষের কাগজই দিন কুড়ি আগে কলিকাতায় বাজার দরের হিসাব করিয়া দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে আড়াই গুণ। অথচ মজুরদের মাহিনা তো আড়াই গুণ বাড়ে নাই! নামমাত্র মাগগি ভাতা ও সস্তা রসদ দিয়া মালিক ও সরকার ঢাক পিটাইতেছে যে মজুরদের এখন আর নাকি বিশেষ কোন অভাব নাই।

কিন্তু মালিক ও সরকার পক্ষের এই অন্যায় প্রচারের হাঁড়ি এবার হাটের মধ্যেই ভাঙ্গিয়াছে। গত দুই বছর ধরিয়া সমস্ত মজুর দাবী করিতেছিল যে তাহাদের মাগগি ভাতা বাড়ানো দরকার কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য সরকার কমিটি বসাক। এ বিষয়ে পঞ্চাশ হাজার চটকল মজুরের সই করা দরখাস্তের কথা সকলেরই মনে আছে। মজুরদের এই বিরাট আন্দোলনের ফলে গত নভেম্বর মাসে সরকার একটি মাগগি ভাতা তদন্ত কমিটি বসাইতে বাধ্য হয়। উহাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের পাঁচ জন, মালিক পক্ষের দু'জন এবং মজুর পক্ষের দু'জন প্রতিনিধি ছিলেন! মজুরদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি। নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই তিন মাস ধরিয়া ঐ কমিটির বৈঠক হয়, সাক্ষীসাবুতও নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ঐ কমিটির রায় বাহির হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছে :—

১। সব চেয়ে কম মজুরি হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক ২৫০৲ মজুরি পর্য্যন্ত সকলেরই মাগগি ভাতা পাওয়া উচিত। জিনিষপত্রের দাম বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে মাগগি ভাতাও বাড়ানো বা কমানো উচিত।

২। মজুরের মাহিনা ১৫৲ টাকাই হোক বা ২৫০৲ টাকাই হোক সব মজুরের মাগগি ভাতাই এক সমান হওয়া উচিত। মজুরের বোনাস প্রভৃতি আলাদা, উহা মাগগি ভাতার মধ্যে ধরা চলিবে না।

৩। গবর্ণমেণ্টকে হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে যে প্রত্যেক অঞ্চলে সর্বনিম্ন মজুরি হইতে ২৫০৲ মজুরি পর্য্যন্ত সব মজুরির মোটামুটি গড় কত। এবং মোটামুটি খরচ যত বাড়িয়াছে সেই হিসাবে এই গড় মজুরির উপর প্রত্যেককে পুরা খরচ মেটানোর মত মাগগি ভাতা দিতে হইবে। গড় মজুরি কত গবর্ণমেণ্ট তাহা এখনও হিসাব করে নাই। তবে মনে হয় যে মাসিক ত্রিশ টাকাই গড় মজুরি ধরা হইবে। এখন খরচ বাড়িয়াছে আড়াই গুণ। কাজেই ত্রিশ টাকার আড়াইগুণ অর্থাৎ মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা হইবে মাগগি ভাতা। **সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মাগগি ভাতা তদন্ত কমিটির রায় যদি মালিক ও সরকার মানিয়া লয় তাহা হইলে যে মজুরের মাহিনা যতই হোক না কেন প্রত্যেক মজুরই বর্ত্তমানে মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা মাগগি ভাতা পাইবার অধিকারী।**

পঁয়তাল্লিশ টাকা মাগগি ভাতা তো দূরে থাক, উহার অর্দ্ধেকও অধিকাংশ মজুরই পায়না। আমরা পাশে একটী তালিকা দিলাম। শুধু নগদ মাগগি ভাতাই নয়, সস্তা রসদে বিভিন্ন শিল্পের মজুরদের মাসিক যে লাভ হয় তাহাও আমরা উহাতে ধরিয়াছি। উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বাংলা দেশের বড় বড় কারবারে মজুরেরা কত সামান্য মাগগি ভাতা পায়।

যে তদন্ত কমিটি পঁয়তাল্লিশ টাকার মত মাগগি ভাতার সুপারিশ করিয়াছে সেই কমিটিতে সরকার ও মালিক পক্ষই দলে ভারী ছিল। এহেন কমিটিকেও মানিতে হইয়াছে যে বর্তমানে মজুরদের এত বেশী মাগগি ভাতা পাওয়া উচিত। এখন সমস্ত লোকের সামনে সাফ প্রমাণ হইল মজুরদের মাগগি ভাতা বাড়াইবার দাবী কত ন্যায্য। সরকার এখনো কমিটির রায় মানিতে চাহিতেছে না। মজুর পক্ষের প্রতিনিধিরা দাবী করিয়াছিলেন সরকার আইন করিয়া দিক যে, সব মালিককে কমিটীর সুপারিশ মত মাগগি ভাতা দিতে হইবে। কিন্তু সরকার রাজি হয় নাই, কমিটির রায় পর্য্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে নাই। সরকারের এই টালবাহানা ভাঙ্গিতেই হইবে। পুরা মাগগি ভাতা আদায় করিতেই হইবে।

তাহার হাতিয়ার দুইটী সোজা জিনিষ। প্রথম মজুরদের একতা ও আন্দোলনকে আরও জবরদস্ত করিতে হইবে। সকলকে ইউনিয়নে যোগ দিতে হইবে। দিকে দিকে মাগগি ভাতা সম্মেলন ডাকিয়া হাজারে হাজারে, লাখে লাখে এই দাবী উঠাইতে হইবে যে—তদন্ত কমিটির সুপারিশ মত মাগগি ভাতা দেওয়া হোক। আর দ্বিতীয়তঃ দেশের সমস্ত মানুষকে এই দাবীর সমর্থনে টানিতে হইবে। তাহার উপায় দেশ-ভক্তি, প্রাণপণে দেশবাসীর সেবা করা। কারখানায় কারখানায় দেশবাসীর প্রয়োজনের জিনিষ তৈরী হইতেছে, দেশরক্ষার হাতিয়ার তৈয়ারী হইতেছে। প্রাণপণে খাটিয়া দেশবাসীর কাছে প্রমাণ কর যে তাহাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ তোমরা তৈয়ার করিয়া দিবে, হাতিয়ারের অভাবও মিটাইবে। তোমাদের একতার সঙ্গে দেশবাসীর সমর্থন মিলিলে মাগগি ভাতার ন্যায্য দাবী কেহ রুখিতে পারিবে না।

কোন কারখানায় কত মাগগি ভাতা

			বর্ত্তমান মাসিক মাগগি ভাতা	প্রাপ্ত রসদে মাসিক লাভ	মোট মাগগি ভাতা
১।	রেলওয়ে (কলিকাতা)		১৬৲	৬৸৶১০	২২৸৶১০
২।	ট্রামওয়ে		১০৲	৮৷৶১৫	১৮৷৶১৫
৩।	চটকল (রেশন এলাকায়)		৫৲	৫৶০	১০৶০
৪।	ইলেক্‌ট্রিক		৭৲	৮৷৶০	১৫৷৶০
৫।	কর্পোরেশন	৩৫৲ মাহিনা পর্য্যন্ত	৮৲	২৸৫	১০৸৫
		৩৫৲ টাকার উপর	১৪৲		১৬৸৫
৬।	পোর্ট ট্রাষ্ট (অঃ মিলিটারী শ্রমিক)	৩৫৲ মাহিনা পর্য্যন্ত	৮৲	রসদের জন্য মাসিক ক্ষতি পূরণ ৬৲	১৪৲
৭।	গ্যাস		৬৲	রসদের জন্য মাসিক ক্ষতি পূরণ ৯৷০	১৫৷০

কর্পোরেশনে মাগগি ভাতা বন্ধের উপক্রম

ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলারদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা

কলিকাতা কর্পোরেশনের মজুর ও কর্মচারীদের মাগগি ভাতা সম্বন্ধে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। লেবার কমিশনারের বিচার অনুসারে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ৩৫৲ পর্য্যন্ত মাহিনার মজুরেরা মাসিক ৮৲ টাকা এবং তাহার উপরের মাহিনাওয়ালারা মাসিক ১৪৲ টাকা মাগগি ভাতা পাইয়া আসিতেছিল। কর্পোরেশনের আথিক অবস্থা টানাটানি হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এই টাকাটা কর্পোরেশনকে ধার হিসাবে দিয়া আসিতেছিল। পরে কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গার্ণার সাহেব যে তদন্ত করেন তাহাতে তিনি বলেন কর্পোরেশনের সমস্ত মজুরকে এসেন্সিয়াল সার্ভিস না ধরিয়া উহাদের তিন ভাগে ভাগ করা উচিত যথা :—১। যাহারা সব চেয়ে এসেন্সিয়াল বা জরুরি যেমন পাম্পিং ষ্টেশন, কারখানা, ময়লা পরিষ্কার প্রভৃতির মজুর ২। যাহারা ইহার চেয়ে কম জরুরি অথচ বাদ দেওয়া যায় না এমন কাজ করে ৩। বর্ত্তমানে যে সব লোকের নিজস্ব কাজ নাই (ঐ সময়ে স্কুলগুলি বন্ধ হইয়া থাকায় স্কুল শিক্ষকদের সম্বন্ধেই এই ৩য় পর্য্যায় ধরা হইয়াছিল)। তাঁহার মতে শুধু প্রথম শ্রেণীর মাগগি ভাতার টাকাটা গবর্ণমেণ্টের ধার দেওয়া উচিত, বাকিটা কর্পোরেশনের দেওয়া উচিত। গার্ণার সাহেবের রিপোর্টের পর গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে চিঠি লেখে যে উপরোক্ত তিন ভাগে কত কত মজুর পরে তাহা আমাদের জানাও, এই খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা আর টাকা দিব না। কিন্তু কর্পোরেশন কিছুতেই এ খবর জানায় না, বলে যে আগে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত কর্পোরেশন মজুরকেই এসেন্সিয়াল মজুর বলিয়া ধরিয়াছে সুতরাং এখন আর নূতন করিয়া ভাগ করিবার কথা উঠে না। ফলে গত জানুয়ারী মাস হইতে আর গবর্ণমেণ্টের টাকা আসিতেছে না। এদিকে কর্পোরেশন আগে হইতেই এক প্রস্তাব পাশ করিয়া রাখিয়াছে যে যতদিন গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবে শুধু ততদিন পর্য্যন্তই মজুররা মাগগিভাতা পাইবে। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মাগগি ভাতা কর্পোরেশন দিয়াছে বটে, কিন্তু আর দেওয়া হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বিষয়টী গত বুধবারে সভায় আলোচনা হয়।

ঐ দিনের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কাউন্সিলর কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী। তিনি যাহা বলেন তাহার সার মর্ম এইরূপ :—

পুরাতন কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা এবং গার্ণার সাহেব নিজেও মনে করিয়াছেন যে মজুরদের এই সামান্য মাগগিভাতা দিয়াই যেন একেবারে দান ছত্র খুলিয়া দিয়াছেন! কিন্তু আসলে কর্পোরেশন মজুরেরা প্রায় কিছুই পায় না বলিলেই হয়। জিনিষপত্রের দাম আড়াই গুণ বাড়িয়াছে সে হিসাবে তাহাদের প্রায় ৪০।৪৫ টাকা ভাতা পাওয়া উচিত। নগদ ও সস্তা রসদের দামের লাভ মিলাইয়া তাহারা পায় মাত্র ১১৲ টাকা। রেল, ট্রাম, পোর্ট, গ্যাস প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় মজুরেরা ইহার বেশী ভাতা পায়। এই মাগগি ভাতা স্থির হইয়াছে ১৯৪২-এর নভেম্বরের অবস্থা হিসাবে। তখন সরকারী হিসাব মতেই জীবন ধারণের খরচার মান ছিল ১৮৪। এখন তাহা বাড়িয়া ২৫০-এ উঠিয়াছে। কিন্তু মজুরদের মাগগি ভাতা বাড়াইবার কথা ভাবাও কোন কাউন্সিলার প্রয়োজন মনে করেন নাই। পরে আবার তাঁহারা মাগগি ভাতা দিবার দায়িত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দিলে তবে দিব এই ধুয়া তুলিয়াছেন। মাগগি ভাতা না পাইয়া মজুরদের কাজে যদি ঢিলা পড়ে তাহাতে কর্পোরেশন ও শহরবাসীরই ক্ষতি হইবে। মজুরেরা কর্পোরেশনেরই কাজ করে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট টাকা দিক বা না দিক কর্পোরেশনকেই মাগগি ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে কোন অতি সাধারণ মালিকও এ দায়িত্ব পালন করে। কর্পোরেশন কাউন্সিলররা শুধু মালিকই নন, দেশভক্ত বলিয়াও দাবী করেন অথচ তাঁহাদেরই পক্ষে এ দায়িত্ব অস্বীকার করা এবং দেশবাসী শ্রমিকদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া—কি রকম দেশভক্তি তাহা বোঝা ভার। গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে সাহায্য আদায় করা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তাহারা যে লিষ্ট চাহিয়াছে সে লিষ্ট কৌশল করিয়া এড়াইয়া গেলেই কি গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবে? তাহাতে যে টাকা পাওয়া যাইবে না তাহা গত চার মাসে টাকা বন্ধ থাকা হইতেই বোঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইয়া টাকা আদায় হইবে না। লিষ্ট দিয়া সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে হইবে যে এসেন্সিয়াল হোক বা না হোক সব মজুরকেই তো কাজ করিতে হইবে সুতরাং মাগগি ভাতাও দিতে হইবে। কর্পোরেশনের হাতে টাকা নাই একথা বুঝাইতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট পুরা টাকাই নিশ্চয়ই দিবে। কর্পোরেশনের কাজ বন্ধ হোক ইহা গবর্ণমেণ্টও চাহিতে পারে না। কিন্তু যতদিন গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত না হইতেছে ততদিন দায়িত্ব কর্পোরেশনকেই লইতে হইবে ও মাগগিভাতা চালাইয়া যাইতে হইবে। আর যদিই গবর্ণমেণ্ট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে তখন কর্পোশনকেই টাকা জোগাড়ের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। উহা এমন খুব শক্তও নয়। সকলেই জানে যে কলিকাতায় ধনীদের সম্পত্তির দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক কম করিয়া ধরিয়া কম ট্যাক্স নেওয়া হয়। তাছাড়া কাউন্সিলার প্রভৃতি অনেক লোকের কাছে বহু টাকার ট্যাক্স বাকী পড়িয়া আছে। এই সব তদারক করিয়া আয় বাড়াইলে কর্পোরেশনের টাকার অভাব হইবে না।

সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে মেয়র স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন। ইতিমধ্যে কর্পোরেশনই মাগগি ভাতা দিতে থাকিবে।

সমস্ত কারখানার মজুর ও কর্মচারীদের

মাগগি ভাতা ও রেশনিং সম্মেলন

বৃহস্পতিবার ২৫শে মে : প্রতিনিধিদের বৈঠক
স্থান : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল, ৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীট
সভাপতি : সোমনাথ লাহিড়ী

রবিবার ২৮শে মে : মজুরদের বিরাট সভা

স্থান : শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সভাপতি : বঙ্কিম মুখার্জি

প্রধান দাবী : ১। গবর্ণমেণ্ট মাগগি ভাতা তদন্ত কমিটির রায় অনুসারে পুরা মাগগি ভাতা দিবার আইন পাশ করাইতে হইবে
২। আপাতত এখনি মাসিক ৩০৲ টাকা মাগগি ভাতা চাই
৩। মজুরদের জন্য হপ্তায় ৫।০ সের রেশন চাই

মাগগি ভাতা তদন্ত কমিটির রায় চালু করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করিতেছে না। মজুরদের রসদ বাড়াইবারও কোন চেষ্টা করিতেছে না। ইহার বিরুদ্ধে সমস্ত মজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জোর দাবী তুলিতে হইবে। ট্রাম, পোর্ট, কর্পোরেশন, গ্যাস, ইলেক্‌ট্রিক, মোটর, রেলওয়ে, রিক্সা, চটকল প্রভৃতি সমস্ত ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রথমে আলোচনা করিয়া প্রস্তাব স্থির করিবেন। পরে ২৮শে মে তারিখে ঐ সমস্ত কারবারের শ্রমিকরা আসিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ভরিয়া ফেলুন। মাগগি ভাতা ও রেশনের দাবী আদায় করিতেই হইবে।

২৮-শে মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে—সব মজুর জমা হোন!

ইয়োরোপে দেশে দেশে বিদ্রোহের মহড়া

লালফৌজ বিজয় দর্পে আগুয়ান

দ্বিতীয় ফ্রন্টের আঘাতে হিটলারের ধ্বংস অনিবার্য

জনযুদ্ধের ফৌজ

হিটলারের তথাকথিত 'দুর্ভেদ্য ইয়োরোপীয় দুর্গের' অভ্যন্তরে পদানত জনগণ দিনের পর দিন ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে যে অক্লান্ত লড়াই চালাইতেছে তাহা একদিকে যেমন অন্যান্য মুক্তিকামী জনগণের মনে অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতেছে, আবার অন্য দিকে তেমনি সম্মিলিত জাতিবর্গের সামরিক প্রচেষ্টাকেও ইহা বিরাট ভাবে সাহায্য করিতেছে। সেই দিক দিয়া হিটলার অধিকৃত দেশে দেশে এই নাৎসীবিরোধী সংগ্রামের গুরুত্ব যথেষ্ট। পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে আজ লালফৌজ হিটলারীদের তাড়া করিতেছে। সাথে সাথে নাৎসী কবলিত প্রত্যেকটি দেশেই আজ এই সংগ্রামের রূপ ভীষণ হইয়া উঠিতেছে।

যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তুত

মার্শাল তিতো—"দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার সাথে সাথেই যুগোশ্লাভ মুক্তিফৌজ যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত এলাকারই নাৎসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে সক্ষম হইবে।"

যুগোশ্লাভিয়ার সাধারণ লোক আজ উদগ্রীব, নাৎসীবাদকে ধ্বংস করার চরম লড়াইয়ের দিনে তাহারা পিছু থাকিতে রাজী নয়।

তাই মার্শাল তিতো পরিচালিত যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এই ফৌজের সংখ্যা ছয় লক্ষ। এই দুর্জ্জয়বাহিনী নাৎসীদের উপর ক্রমাগত আঘাত হানিয়া জার্ম্মানদের নাজেহাল করিতেছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে মুক্তিফৌজকে ধ্বংস করার জন্য জার্ম্মানরা যে ষষ্ঠ অভিযান চালাইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। জার্ম্মানরা তিতোর পতাকা অবনমিত করিতে পারে নাই। জার্ম্মান আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়াই যে মুক্তিফৌজ চুপচাপ করিয়া আছে তাহা নহে, তাহারা প্রতিআক্রমণ চালাইয়া বহু জনপদ হইতে ঘৃণিত নাৎসী বর্ব্বরদের উৎখাত করিয়াছে।

১৯৪৪ সালের ১৩ই মে রয়টার মার্শাল তিতোর হেড কোয়ার্টার্স হইতে খবর দিতেছে,—মেসিডোনিয়ায় জার্ম্মানদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সার্ভিয়াতে দেশভক্তরা সেরাজেভো-বেলগ্রেড রেললাইনের বহু স্থান দখল করিয়াছে এবং মোক্রাগোড়া নামে রেল ষ্টেশনটী উড়াইয়া দিয়াছে। সেরাজেভো-বেলগ্রেড রেললাইন গ্রীসের এথেন্স-সালোনিকার রেলপথের মতই গুরুত্বপূর্ণ চলাচল ব্যবস্থা। বলকানের দেশগুলিতে জার্ম্মাণ সৈন্যদের যাতায়াতের রাস্তাকে একের পর এক এমনিভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়ায় নাৎসী সমরনায়করা বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। আসন্ন দ্বিতীয় ফ্রন্টের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের এই কার্য্য-কলাপে সম্মিলিত জাতিগুলিকে আরও বলীয়ান করিয়া তুলিবে।

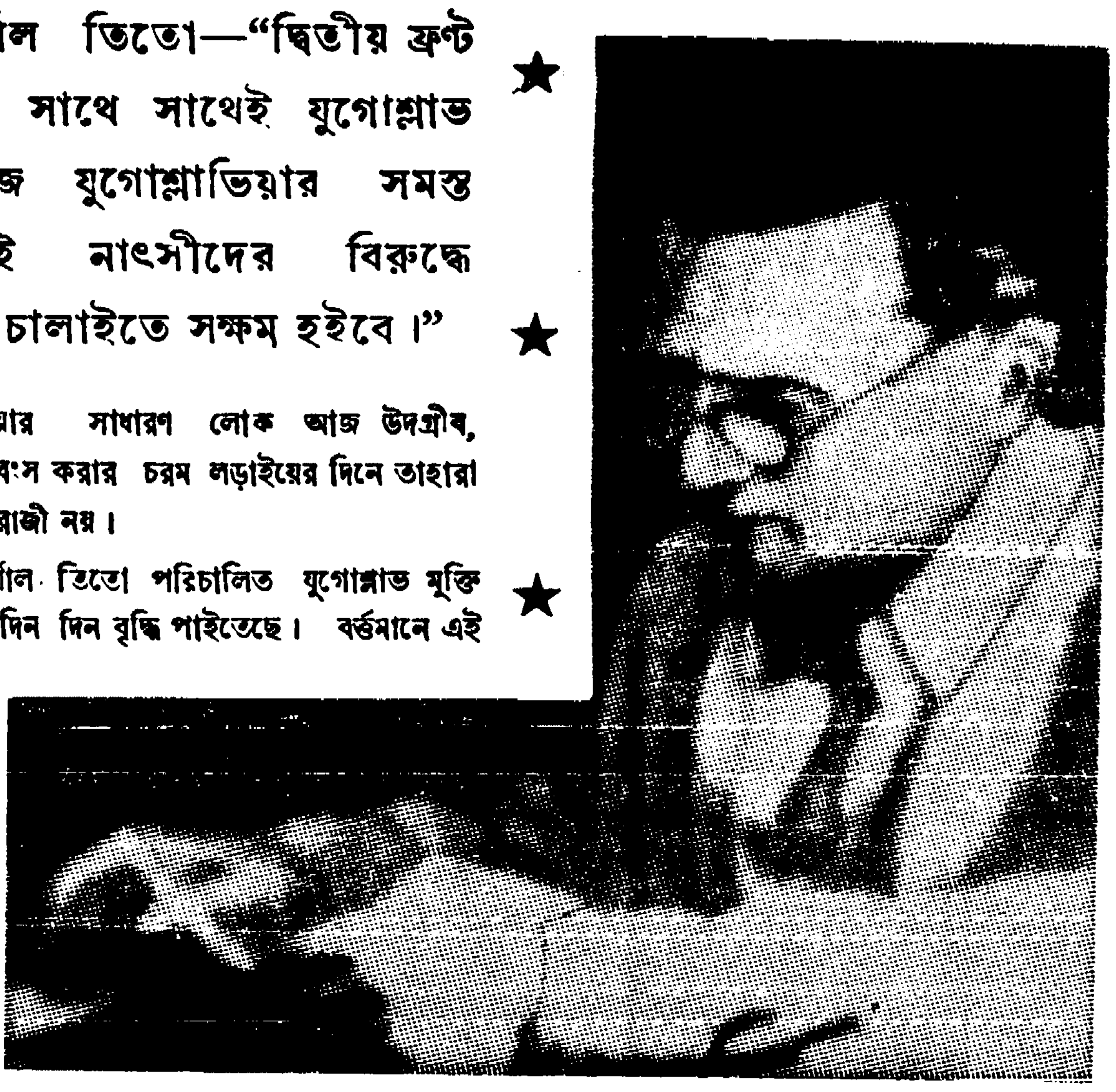

মার্শাল তিতো

গ্রীসে নাৎসীবিরোধী জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট

জার্ম্মান শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য গ্রীসে গড়িয়া উঠিয়াছে—'ইয়াম' অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত যে মুক্তিবাহিনী গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়া লড়াই করিয়া যাইতেছে তাহা 'ইলাস' নামে পরিচিত। ইলাসে আছে ৪০,০০০ নিয়মিত ফৌজ, আর এক লক্ষ রিজার্ভ। ইহা ছাড়াও আজ স্বাধীনতা লড়াইয়ের আহ্বানে গ্রীসের প্রত্যেক সহর হইতেই হাজারে হাজারে ফৌজ সংঘবদ্ধ করা যায়। কিন্তু বিশেষ করিয়া অস্ত্রের অভাবেই আজও ফৌজের সংখ্যা বাড়ান যাইতেছে না। এইরূপ বিভিন্ন রকমের অসুবিধাসত্ত্বেও গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য ইলাসের প্রত্যেকটি ফৌজ অতুলনীয় বীরত্বের সহিত লড়াই করিতেছে।

এথেন্স-সালোনিকা রেলপথ সামরিক দিক দিয়া জার্ম্মান লুণ্ঠনকারীদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়, সুতরাং এই রেলপথের চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য নাৎসী বড় কর্ত্তাদের সতর্ক দৃষ্টি। গ্রীসের দেশভক্তদের কাছে তাই সর্ব্বপ্রথম দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য জার্ম্মানদের যোগাযোগের এই গুরুত্ব পূর্ণ রেলপথকে অচল করিয়া দেওয়া।

গ্রীসের বীর গেরিলারা জার্ম্মান প্রভুত্বের পর হইতেই এই কাজে মন দিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে ইয়ামের পরিচালনায় দেশভক্তদের লৌহ দৃঢ় ঐক্য গড়িয়া উঠায় গেরিলাদের এই দিকে নাৎসীবিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজের পরিসর অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। রেলপথের চারিদিকে আছে পেইরা পর্ব্বতমালা, থেসালী উপত্যকা, ওলিম্পাস এবং পারনাসাস এলাকা। গেরিলারা এই সব কেন্দ্র হইতে সর্ব্ব সময়ের জন্যই জার্ম্মানদের চলাচলকে বার বার আঘাত হানিতেছে, ফলে জার্ম্মানরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, কি ভাবে গ্রীসে তাদের চলাচলের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যায়।

*   *   *   *

'ইয়াম' গ্রীসে নাৎসীবিরোধী জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতেছে এবং সাথে সাথে জার্ম্মান শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পতাকা উচু করিয়া রাখিয়াছে। একটি দিনের তরেও নাৎসীরা রেহাই পাইতেছে না। বিদেশী শাসনে জর্জ্জরিত বিদ্রোহী গ্রীস আজ জয়ের পথে পা বাড়াইয়াছে। সমস্ত পিণ্ডাস, পশ্চিম মেসেডোনিয়া, পেনোপোলিসের কতকাংশ, পশ্চিম থেসালী প্রভৃতি গ্রীসের অনেক অঞ্চলই আজ আর নাৎসী কবলে নাই।

গ্রীসে স্বাধীনতার লড়াই দিন দিন তীব্রতর হইতেছে। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চে ইয়াম জার্ম্মানদের এক ফতোয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ধর্ম্মঘট করার নির্দ্দেশ দেয়। এই ফতোয়াতে সমস্ত গ্রীসের শ্রমশক্তিতে জার্ম্মান সামরিক কাজে নিয়োজিত করার নির্দ্দেশ ছিল। জনপ্রিয় ইয়ামের আহ্বানে পুরাপুরিভাবেই গ্রীক জনসাধারণ সাড়া দেয়। দেশের কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়, সরকারী অফিস, আদালত প্রভৃতিও বাদ পড়ে না। আড়াই লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করিয়া এথেন্স ও পিরায়াস বন্দরে উপস্থিত। অনেকগুলি সরকারী দপ্তর শোভাযাত্রাকারীরা পোড়াইয়া দেয়। এই সরকারী দপ্তরগুলিই তাদের পরাধীনতার খুব পরিষ্কার নিদর্শন, তাই জনসাধারণের আক্রোশ ঐ গুলির উপর গিয়া পড়ে। দিনের পর দিন ইয়ামের নেতৃত্বে জার্ম্মান ফতোয়ায় বিরুদ্ধে আন্দোলন এত তীব্র হইয়া ওঠে যে অবশেষে জার্ম্মানরা তাহাদের ফতোয়া তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়। সুসংবদ্ধ এই ব্যাপক ফ্যাসিস্টবিরোধী লড়াই আজ গ্রীসের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতেছে।

রণধ্বনি মুখরিত ফ্রান্স

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পুণ্যভূমি এই ফ্রান্স। অথচ জার্ম্মাণ নাৎসীদের কবলে ইহা আজ দলিত, মথিত, নিগৃহীত। নাৎসীবাদ উৎখাত করার দিন আগতপ্রায়। ইতিহাসের সেই চরম মুহূর্ত্তের জন্য ফরাসী জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধ্বংসাত্মক কাজের তীব্রতা বিপুল বেগে বাড়াইতেছে। হটে-সাভয় এলাকায়ও তাহাদের প্রভুত্ব কয়েকটী পর্ব্বত অঞ্চলে কায়েম করিয়াছে। ফরাসী গেরিলারা কলকারখানা ও চলাচলের ব্যবস্থার উপর এমনভাবে দৃষ্টি দিয়াছে কেন? তার কারণ সুস্পষ্ট। আসন্ন দ্বিতীয় ফ্রন্টের তাগাদায় রোমেল, রুনষ্টেড প্রভৃতি নাৎসীরা চলাচল ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করিতে চায় এবং তারজন্যই দরকার কলকারখানায় উৎপাদন। নাৎসীদের সতর্ক দৃষ্টি ও শাসন উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণদের প্রস্তুতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে ফরাসী দেশপ্রেমিকরা তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

নাৎসী তাবেদার ভিসি সরকারই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে সম্মিলিত শক্তির বোমারু বিমান ফরাসী চলাচল ব্যবস্থার যে ক্ষতি করিয়াছে, ফরাসী গেরিলারা তার পাঁচ গুণ বেশী ক্ষতি করিয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ২২শে আগষ্টের মধ্যে গেরিলারা ১১৩৮ খানা ট্রেন ধ্বংস কিম্বা অকেজো করিয়া দিয়াছে।

সেপ্টেম্বরের ১লা হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত দেশভক্তরা একটি রেলপথের উপর ২৩৪টি ধ্বংসাত্মক কাজ চালাইয়াছে। উক্ত রেল লাইনটি গিয়াছে লিঁও হইতে হটে-সাভয়।

ব্রিঁয়ে জেলার ৩১টি কারখানা ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য উৎপাদন এক সপ্তাহ একদম বন্ধ থাকে। ১০,০০০ ফরাসী মজুরকে দিয়া এইসব কারখানায় নাৎসীরা যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম উৎপাদন করাইতে চেষ্টা করিত। মজুররা নাৎসীদের মনে প্রাণে ঘৃনা করে তাই কাজে ঢিলা দিতে তাহারা কোন দিনই কসুর করে নাই, তার উপর গেরিলাদের এই কাজে উৎপাদন তো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

*   *   *

ইতালীর সেলার্ণো সেতুমুখে যখন মিত্র শক্তির সহিত ফ্যাশিস্টদের জোর লড়াই চলিতেছিল, তখন জার্ম্মান সৈন্যদের রসদ আসিত দক্ষিণ ফরাসী হইতে। ফ্যাশিস্টদের এই সুবিধাকে বানচাল করিয়া দেওয়া দরকার। ফরাসী গেরিলারা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে জেনোয়া যে রেলপথ গিয়াছে সেই রেলপথে ৩০টি ইঞ্জিন এবং অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ১৪০ খানা গাড়ী গেরিলারা উড়াইয়া দেয়।

জার্ম্মানদের আক্রমণ ক্ষমতা এবং জার্ম্মানদের আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থার খোঁজ খবর আজ হুসিয়ারীর সহিত রাখা দরকার। ফরাসী গেরিলারা সেই দিক হইতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় ফ্রন্টের সাথে সাথে সমগ্র ফরাসী জাতি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে,—নাৎসীবাদের যা কিছু সব গুড়াইয়া দিবে।

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইতালী শুভদিনের প্রতীক্ষায়

ইতালীতে ফ্যাসিস্ট সর্দ্দার মুসোলিনীকে অনেকদিন হয় গদীচ্যুত করা হইয়াছে। অথচ হিটলারের দয়ায় সে আবার সেখানে জাঁকিয়া বসিতে চাহিতেছে। কিন্তু উত্তর ইতালীতে জার্ম্মান-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন আজ এমনভাবে দানা বাঁধিতেছে যাহাতে নাৎসী ও নাৎসী-তাবেদার মুসোলিনীকেও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মান প্রভুত্বের অবসান ঘটাইতে আজ ইতালীর সাচ্চা দেশভক্তের দল নূতন পর্য্যায়ে গেরিলা সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে। বহু ইতালীয়ান সেনা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমেত এই বাহিনীতে যোগ দিয়াছে ও দিতেছে। ফলে উত্তর পিডমণ্ট এলাকায় নাৎসীদের সাথে দেশভক্তদের তুমুল লড়াই চলিতেছে। ছোট খাট সংঘর্ষের তো কথাই নাই। টুরিনের পশ্চিমে একটি জেলা গেরিলারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়াছে। উত্তর লম্বার্ডি, লিগুরিয়া, দক্ষিণ বলাগনা প্রভৃতি অঞ্চলে গেরিলারা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। গেরিলারা বিভিন্ন স্থানে কাজ করা সত্বেও পরস্পরের সাথে সংযোগ রাখিয়াছে। মিলানে জার্ম্মান-বিরোধী যে কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ-কেন্দ্র আছে তাহার সাথে গেরিলা ইউনিটগুলির যোগাযোগ রহিয়াছে। সমগ্র উত্তর ইতালীতে আজ যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, দেশের সাধারণ লোক যে আর নাৎসীবাদ বরদাস্ত করিতে চায় না তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতালীর দৈনন্দিন ঘটনা হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠে। আজ মিলানে মজুরদের ধর্ম্মঘট, কাল টুরিনে জনসাধারণের ফ্যাশিস্টবিরোধী সমাবেশ—এমনি ঘটনা তো লাগিয়াই আছে। দ্বিতীয় ফ্রন্টের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন সমগ্র ইয়োরোপে দাবানল জ্বালাইবে তখন উত্তর ইতালীও এই দাবানলের হাত হইতে বাদ পড়িবে না। ইতালীর নিপীড়িত জনগণ আজ সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায়।

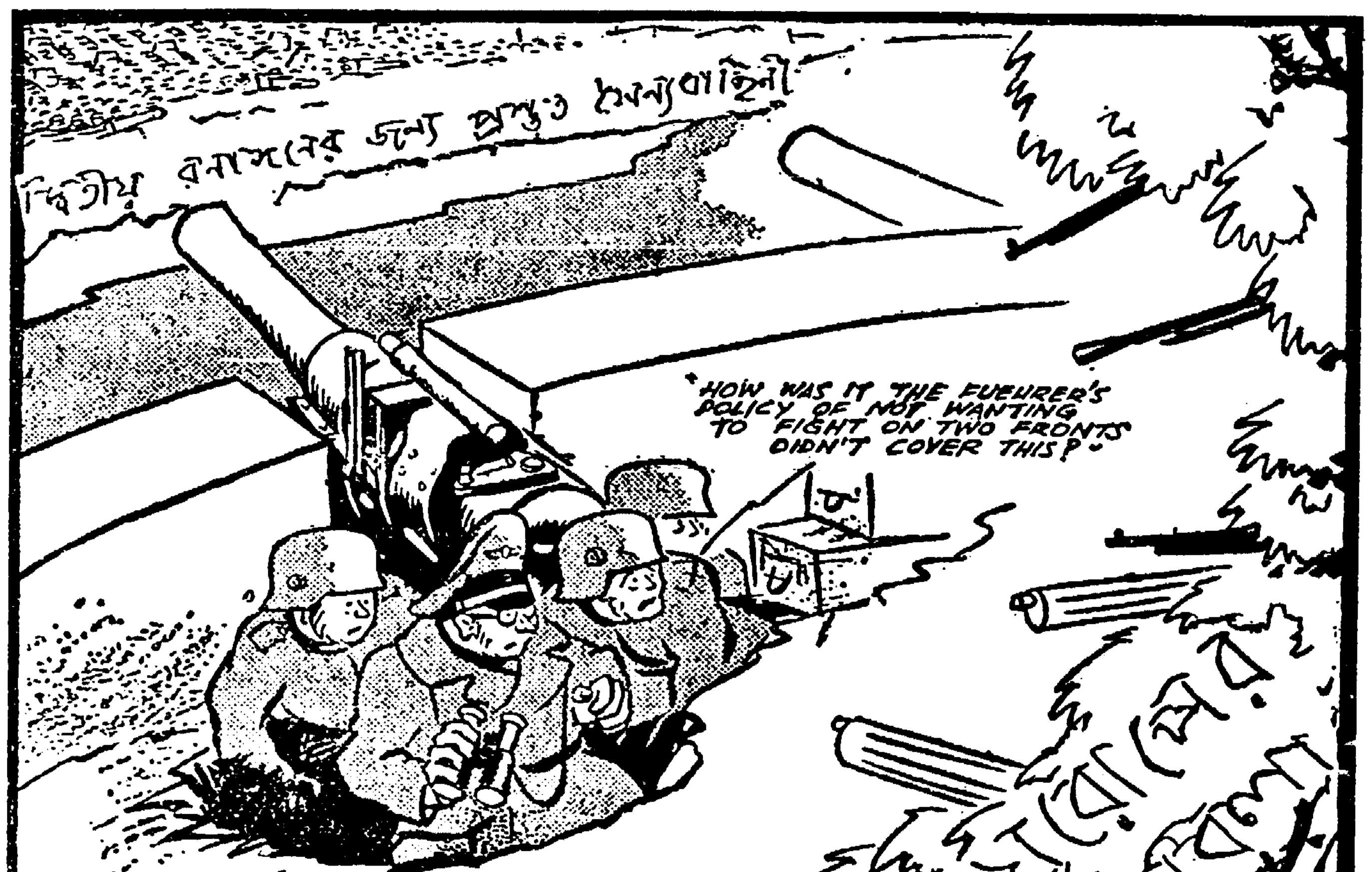

"ডেলী-ওয়ার্কার হইতে"

Regd. No. C. 2836

ভারতভূমি হইতে শত্রুকে উচ্ছেদ করো

ভারত সীমান্তে যুদ্ধের খবর একঘেয়ে ধরণেই চলিতেছে। জাপানী ফ্যাশিস্টদের মতলব যে হাঁসিল হইবে না, তাহা পরিষ্কার। ইম্ফল, বিষ্ণুপুর দখল করিব বলিয়া তাহারা যে আস্ফালন করিয়াছিল, সে আস্ফালন নিষ্ফল হইতে চলিতেছে। উত্তর বার্ম্মায় ষ্টিল্‌ওয়েল ও উইংগেটের যে বাহিনী রহিয়াছে, আকাশ দিয়া তাহাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে শত্রু ভণ্ডুল করিতে পারে নাই। বর্ষা নামিতে বিলম্ব নাই, আর নামিলে মণিপুর অভিযান এ যাত্রা স্থগিত থাকিতে বাধ্য।

সময় যে লাগিবে, একথা মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা বলিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে শত্রুর পিছনে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া মিত্রশক্তি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ট্রাকের মত প্রকাণ্ড বন্দর জাপানীরা সহজে ব্যবহার করিবার সাহস পাইতেছে না। কিন্তু এখনও মিত্রশক্তির আক্রমণে জাপানের আত্মরক্ষার গণ্ডীকে সঙ্কুচিত করিতে হয় নাই। জাপানকে হারাইতে হইলে বার্ম্মায় ও চীনে তাহাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়া মুহ্যমান করিতে হইবে।

কিন্তু চীনে জাপানীরা হোনান্ অঞ্চলে সাফল্যলাভ করিতেছে। ভারতবর্ষের মাটী আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রাণপণ চেষ্টা তাহারা করিতেছে। যুদ্ধে বড় দরের সাফল্য না পাইলেও জাপান যত বেশী সময় পায়, ততই তার সুবিধা।

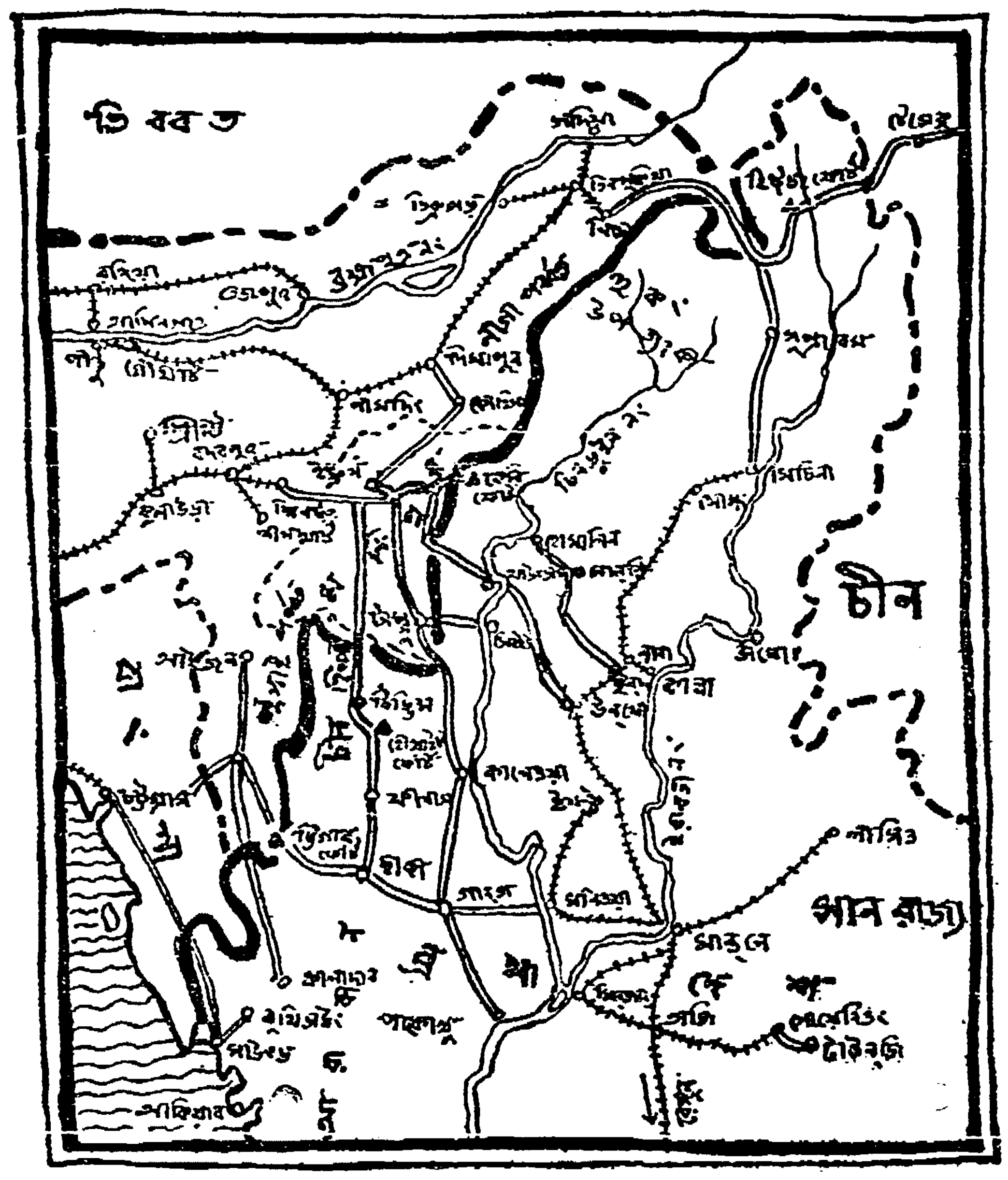

এখনও আক্রমণ হয় নাই

কিন্তু জাপানকে ঠেকাইয়া এবং কোথাও কোথাও হটাইয়া যাইতে থাকিলেও মিত্রশক্তি এখনও জাপানের বিরুদ্ধে জোরদার আক্রমণ আরম্ভই করিতে পারে নাই। এখনও জানা যায় যে পালেল, বিষণপুর, কোহিমার কাছে শত্রু থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণই করিতেছে, পারিয়া না উঠিলেও মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। চট্টগ্রামের অনতিদূরে সীমান্ত হইতে দশ মাইল তফাতে জাপানীরা পালেটোয়া দখল করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশে জাপানী শত্রু চল্লিশ মাইল ঢুকিয়া আসিয়াছে। তাহাকে একেবারে তাড়াইতে হইলে

তাই কালবিলম্ব না করিয়া জাপানী ফ্যাশিস্টের বিষদাঁত গুঁড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা চাই। গান্ধীজী আজ মুক্ত, অন্যান্য জাতীয় নেতারা আজ বাহিরে আসিয়া জাতীয় সরকার গঠন করিলে আমাদের বিপুল জনশক্তি লইয়া এখনই জাপানকে পর্য্যুদস্ত করার ব্যবস্থা হয়। পেশাদার যুদ্ধপরিচালকদের মগজে এই বোধটা আমাদেরই ঢুকাইয়া দিতে হইবে।

সেবাস্তোপোলে রক্তপতাকা উড়িতেছে

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেবাস্তোপোল বন্দর গত মঙ্গলবার লালফৌজের দখলে ফিরিয়াছে। ক্রাইমিয়া হইতে শত্রু একেবারে বিতাড়িত হইল। রুমেনিয়া ও অন্যান্য বলকান্ দেশের জনগণ লালফৌজের সাহায্যে আসন্ন মুক্তির আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১৯৪২ সালে আটমাস ধরিয়া তুমুল আক্রমণ করিয়া হিটলারীরা সেবাস্তোপোলের ভস্মস্তূপ অধিকার করিয়াছিল। সেবাস্তোপোলের অধিবাসী এবং লালফৌজ ও লাল নৌসেনা তখন যে অপূর্ব্ব বীরত্ব ও দেশপ্রেম দেখাইয়াছিল তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বন্দর দখল করিতে হিটলারকে হতাহতে তিনলক্ষ সৈন্য খোয়াইতে হইয়াছিল। শেষ পঁচিশ দিন পাঁচ লক্ষ যোদ্ধা আর অসংখ্য কামান, ট্যাঙ্ক আর এরোপ্লেন লইয়া মানষ্টাইন এই বীর নগর বহু কষ্টে দখল করিতে পারিয়াছিল।

শত্রুর দর্প চূর্ণ

তাহার পর হইতে সেবাস্তপোলকে কবলে রাখার জন্য শত্রু যে দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রণালী বানাইয়াছিল, অপর কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই তাহার তুলনা মেলে না। কিন্তু বিজয়ী লালফৌজের কাছে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। শত্রুর বিপুল আয়োজনকে করিয়া, শত্রুর দর্পকে খর্ব্ব করিয়া, লালফৌজ সেবাস্তপোল অধিকার করিয়াছে। শহরে, বন্দরে, ক্রাইমিয়ার সর্ব্বত্র আজ মুক্তির লাল নিশান উড়িতেছে।

এক সেবাস্তোপোলেই বিশ হাজার জার্ম্মাণ মরিয়াছে, চব্বিশ হাজার কয়েদী হইয়াছে। কয়েদীদের মধ্যে আছে দুইজন সেনাপতি। ক্রাইমিয়া পুনরধিকার করিবার সময় লালফৌজ শত্রুর ৬০ হাজারেরও বেশী লোক মারিয়াছে, ৫১,৫৮৭ জনকে বন্দী করিয়াছে।

সোভিয়েটের একজন প্রতিনিধি দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"সেবাস্তোপোলের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আমরা শপথ করিয়াছি যে হিটলারের রাজধানী বার্লিন পর্য্যন্ত আমরা না যাইয়া ক্ষান্ত হইব না।" হিটলারী পঙ্গপাল আজ তাই থরহরি কম্প অবস্থায় রহিয়াছে।

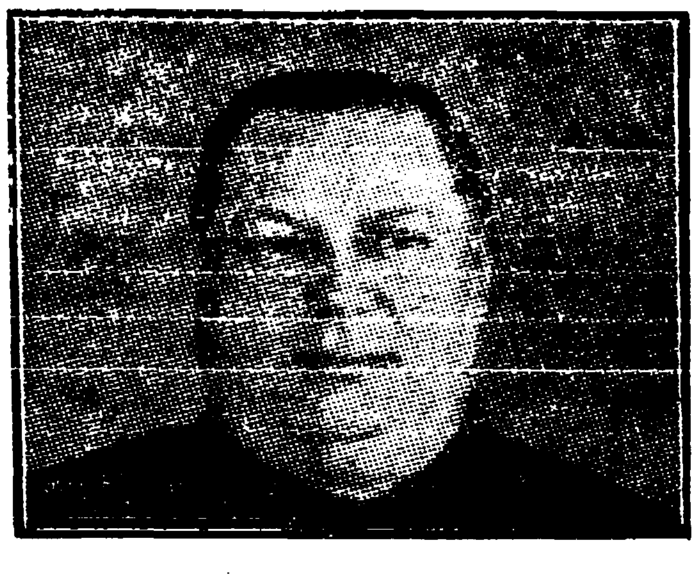

জেনারেল টলবুখিন

লালফৌজের জয়যাত্রা স্তব্ধ হয় নাই। নূতন বিরাট আক্রমণের আয়োজন বিপুল উৎসাহে চলিতেছে। সোভিয়েটের মিত্রেরা পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে পথকুকুরের মত হিটলারীরা আর পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে না।

মৃত্যু সংবাদ

দিনাজপুর জেলার আটোয়ারী থানার বালিয়া গ্রামের **কমরেড রজ সিং** গত ১২ই মার্চ নিমুনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। এই জেলার বিখ্যাত আধিয়ার আন্দোলনের সময় কমরেড সিং কৃষক আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন এবং অল্পদিনেই বালিয়ার কৃষক নেতা হিসাবে পরিচিত হন। গত দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফের কাজ ও লঙ্গরখানা পরিচালনার মধ্য দিয়া তিনি পার্টিসভ্যপদের গৌরব অর্জন করেন।

গত ১৩ই এপ্রিল দিনাজপুর জেলার লালপুর গ্রামের **কমরেড জয় রায়** 'সেপটীক' রোগে মারা যান। যে সমস্ত কৃষক যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফুলবাড়ীতে গত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন সফল হইয়াছে কমরেড জয় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কমরেড জয় পার্টির সভ্য এবং একটী ভলান্টিয়ার দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

রংপুরের লালমণির হাট থানায় মোগল হাট ইউনিয়নের কৃষক-কর্ম্মী **কমরেড দেবাই বর্ম্মণ ও তাঁহার স্ত্রী** বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন। কমরেড বর্ম্মণ স্থানীয় অঞ্চলের সেল্-সেক্রেটারী ছিলেন কৃষক সমিতির সুরু হইতেই তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার স্ত্রী মহিলা আন্দোলনে একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। পার্টির কাজে স্বামীকে তিনি সর্বদা সাহায্য করিতেন।

চট্টগ্রামের **কমরেড সাধন সেন** গত ২৩শে এপ্রিল এশিয়াটিক কলেরায় মারা গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ছাত্রকর্ম্মী হিসাবে তিনি ছাত্র ও জনসাধারণের প্রিয় ছিলেন। বে আইনী যুগে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসিয়া পরে পার্টি সভ্য হ'ন। ভলান্টিয়ার নেতা হিসাবে স্থানীয় পঞ্চমবাহিনীর কাছে তিনি ভয়ানক ভীতির বস্তু ছিলেন।

মৃত কমরেডদের সম্মানার্থে আমরা আমাদের পতাকা অবনমিত করিতেছি।

দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রতীক্ষায় বেলজিয়াম

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ক্ষুদ্র বেলজিয়াম, অথচ গেরিলা যোদ্ধাদের নিয়মিত সংখ্যাই ৬০,০০০। এই সব বীরদের একটি 'অবৈধ' সামরিক কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেলজিয়ামে কয়লা ও ইঞ্জিন অভাবে রেল চলাচল বেশীর ভাগ বন্ধ। সেখানে খাল প্রভৃতি দিয়া জল পথে যাতায়াতই জার্ম্মানরা সুরু করে। বেলজিয়ামের গেরিলারা তাই এই চলাচল ব্যবস্থাকেই আঘাতের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য হিসাবে নেয়। জার্ম্মান সমরযন্ত্রকে বিফল করায় সব চেয়ে বড় অস্ত্র যাতায়াত ব্যবস্থা বিকল করা। গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী, ফ্রান্স প্রত্যেক দেশ-গুলিতেই গেরিলা দেশভক্তদের প্রধান লক্ষ্য বস্তু—চলাচল ব্যবস্থা। বেলজিয়ামেও এই ব্যবস্থার উপরই আঘাতের পর আঘাত পড়ে। সম্প্রতি গেরিলারা ব্রুসেলস অঞ্চলে একটি খালের যাতায়াত ব্যবস্থা এমন বিকল করিয়া দিয়াছে যে ইহাতে দক্ষিণ বেলজিয়াম ও এন্টোয়ার্পের সাথে বেলজিয়ামের অন্যান্য এলাকার সংযোগ একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়।

আসন্ন দ্বিতীয় ফ্রন্টের সূচনার সাথে সাথে মিত্রশক্তির সৈন্যদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য বেলজিয়ামের গেরিলারা সমুদ্র তীরবর্ত্তী ফরাসী অঞ্চলের গেরিলাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

এই সব ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া ইয়োরোপের জনগণের হিটলার বিরোধিতা যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জনযুদ্ধের গতিবেগ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার ভিতরই আসন্ন ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টের কথা আজ সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে। সকল দেশের জনগণই আকুল আগ্রহে নাৎসীবিরোধী লড়াইয়ের চরম মুহূর্ত্তের কথাই ভাবিতেছে। জার্ম্মাণ কবলিত দেশে গেরিলা বীরদের স্বাধীনতা লড়াই যে গৌরবময় পর্য্যায়ে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে এটা আজ জোর করিয়াই বলা যায় যে ইয়োরোপে যে-মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইবে, সেই মুহূর্তে সমগ্র ইয়োরোপ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিবে আর সাথে সাথে সেই দাবানলে নাৎসীবাদ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টের উদ্যোগপর্ব শেষ হইল?

কবে, কোথায়, কেমন ভাবে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইবে, এই নিয়া জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই। সকল দেশের জনসাধারণ আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। ১৯৪২ হইতে যে দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই, আজ আর সেই দ্বিতীয় ফ্রন্টকে ঠেকাইবার ক্ষমতা অবশ্য কাহারও নাই। কিন্তু বিলম্ব আর জনগণের সহ্য হইতেছে না।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান সদলে বার বার জার্ম্মাণী ও হিটলারের পদানত অন্যান্য দেশে বোমা ফেলিতেছে। প্রায়ই সহস্রাধিক বিমান যাইয়া শত্রুর শক্তিক্ষয় করিতেছে, আয়োজন লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট শীঘ্রই খোলা হইবে বলিয়া সম্প্রতি বেতারে ইয়োরোপের জনসাধারণকে সাবধান করা হইয়াছে, রেলরাস্তা ও কলকারখানা অঞ্চল হইতে দূরে সরিতে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টের মহড়া ইতালীতে

স্টক্‌হল্‌ম্ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে জার্ম্মাণ জনসাধারণ দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট আসন্ন বলিয়া তুর্কী বা স্পেনের মত যে সব দেশ নিরপেক্ষ সাজিয়া জার্ম্মাণীকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন কয়েকটী ধাতু পাঠাইত, তাহারা জার্ম্মাণীর পরাজয় অনিবার্য্য বুঝিয়া সেই রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে।

ইতালীতে নূতন এক আক্রমণ মিত্রপক্ষ শুরু করিয়াছে, কিছুটা সাফল্যও লাভ করিয়াছে। এই উপলক্ষে সেনাপতি আলেকজান্দার এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা হইতে ইহাকে দ্বিতীয় ফ্রন্টের পূর্ব্বাভাস মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু ইতালী নয়, খাস পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে হইবে, হিটলারীদের ধ্বংস করিয়া মুক্তির নবযুগ তখনই দেখা দিতে পারিবে।

৩৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

বাংলার কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের কাছে খোলা চিঠি

আসাম ও যুক্তপ্রদেশের ডাকে আপনারা সাড়া দিবেন না ?

প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকুন   পূর্ণোদ্যমে আবার কাজে নামুন

দেশভক্ত সহকর্ম্মিগণ !

আসামের পর্ব্বত ও প্রান্তরে আর চট্টগ্রামের দ্বারপ্রান্তে জাপানী আক্রমণের তীব্রতা সমস্ত প্রদেশের দেশভক্তের চিত্তে ভারতের বিপদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও গভীর অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে। তাই আসাম, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, দিল্লী, মাদ্রাজ—অধিকাংশ প্রদেশের প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতা এতদিনের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বিপদ সম্বন্ধে দেশবাসীকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন, জাপানী আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা কর। কংগ্রেসের পুরানো প্রস্তাবে তো একথা ছিল, তবুও তাঁহারা আবার জোর দিয়া সে কথা বলিলেন কেন কারণ জাপানী বিপদ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুভূতি নূতন তীক্ষ্ণতা পাইল; তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে কংগ্রেসের জাতীয়তার আদর্শ লইয়া আবার সতেজ আন্দোলন না করিলে জাতি সে আদর্শ হারাইয়া বসিতে পারে।

কি কি করা হয় নাই

চট্টগ্রাম বাংলারই আপন অংশ; আসাম বাংলার প্রতিবেশী, তাহার অধিবাসীর অর্দ্ধেকেরও বেশী বাঙ্গালী। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতারা এতদিনেও এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে একটী কথাও বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথচ এই বাংলায়ই প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুসভা ও ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শহীনতা কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্ম্মকে অন্যান্য প্রদেশের চাইতেও অনেক বেশী দুর্বল করিয়াছে।

বিপদ ও দুর্ভোগ সকল দিক দিয়াই বাংলার চরম। ইহার বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় স্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মী ও নেতারা প্রাণপণে লড়িতেছেন তাহা আমরা জানি। তবুও এদেশে হিন্দুসভার প্রভাব বাড়িতেছে ও কংগ্রেসের প্রভাব কমিতেছে কেন? কারণ বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্রমবর্দ্ধমান আদর্শচ্যুতি। গভীর দুঃখের সঙ্গে সেই কথাটাই আমরা আজ বাংলার সমস্ত কংগ্রেসনেতা ও কর্ম্মীদের কাছে খোলাখুলি উপস্থিত করিতেছি—যাহাতে বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনায় দুর্বলতা দূর হয়, বাংলা কংগ্রেস আশু কর্ত্তব্যে অগ্রসর হয়, দেশবাসীর উপর কংগ্রেসের প্রভাব আরও দৃঢ় হয়। তবেই বাঙ্গালী বাঁচিবে।

দুর্ভিক্ষ

কংগ্রেস বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জনগণের মধ্যেও উহার যথেষ্ট প্রভাব। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর যে কোন দুঃখ ও বিপদে কংগ্রেস কর্ম্মীরাই সকলের আগে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেমন করিয়া হোক তাহাদিগকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু এবার যখন দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দশা এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে আসিল যাহা বাঙ্গালীর জীবনে কোনো দিন আসে নাই তখন কংগ্রেস নেতারা দুর্দ্দশা দূর করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন কি? সকলের আগে দাঁড়াইয়াছেন কি? অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশী প্রাদেশিক নেতা বাহিরে ছিলেন, জেল হইতেও ক্রমশ ক্রমশ অনেকে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকে রাজনীতিক হতাশায় ও লীগ বিরোধী তিক্ততায় তাঁহারা সেবাকার্য্য সম্বন্ধে প্রায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। এমন কি সেবাকার্য্যে গবর্ণমেণ্টেরই সুবিধা হইয়া যাইবে এই দেশদ্রোহী কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট বুলিও কেহ কেহ অন্ধের মত কিছুদিন আওড়াইলেন। সেজন্যই শ্যামাপ্রসাদ সুযোগ পাইয়া বেঙ্গল রিলিফ কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিলেন এবং সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়া দেশে অধিকতর ঐক্য আনিবার বদলে সেবাকার্য্যকেই তাঁহার লীগ বিরোধী দলাদলি তথা হিন্দু সংগঠনের কাজে অপব্যবহার করিতে পারিলেন। কংগ্রেস নেতারা কেহ কেহ শেষ পর্য্যন্ত শুধু নামেই রিলিফ কমিটিতে থাকিলেন—সেবাকার্য্যে তাঁহাদের এমন কিছু তৎপরতা দেখা গেল না। হায়দারাবাদ হইতে সরোজিনী দেবীর মর্ম্মস্পর্শী আবেদনও তাঁহাদিগকে বিশেষ কর্ম্মতৎপর করিতে পারিল না। প্রদেশে প্রদেশে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিবারণে কংগ্রেসী জনগণের অপূর্ব সাড়াও তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের নামে বিপুল উৎসাহে কাজে নামাইতে পারিল না। সেজন্যই শ্যামাপ্রসাদের পিছনে চলা ছাড়া তাঁহাদের গতি রহিল না। কাজেই লোকে কংগ্রেসকে ভুলিতে আরম্ভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠা পুনঃসঞ্জীবিত করিবার আর একটী সুযোগ আসিল। ইউ পি, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি প্রদেশে যখন এই সব নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়াই কংগ্রেসকে আবার জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু হইল—তখন বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতারা হিন্দুসভা ও ফরওয়ার্ড ব্লককে ময়দান ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ অকর্ম্মণ্যতার কোটরে বসিয়া থাকিলেন। ফলে হিন্দুসভা প্রভৃতির প্রভাব বাড়িবে এবং কংগ্রেসের প্রভাব কমিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

মহামারী

দুর্ভিক্ষের পর মহামারী দেখা দিল। প্রাদেশিক নেতারা প্রথমে নড়িলেন না। পরে কমিউনিস্টদের অনেক অনুনয়-বিনয় এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের বর্দ্ধমান প্রতিবাদে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকজন প্রাদেশিক-নেতা মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনে অগ্রণী হইলেন। এই রিলিফ কমিটি আজ বহু বাঙ্গালীকে মহামারী হইতে বাঁচাইতেছে, কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ সেবার আদর্শকে জীবন দিতেছে এবং তাহারই ফলে প্রদেশে প্রদেশে আবার বাংলার সাহায্যে অপূর্ব সাড়া জাগাইতেছে। কিন্তু তবুও হিন্দু সভার কোন কোন নেতার প্ররোচনায় এই কমিটিকে এখনই উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবও নিরাশাবাদী কংগ্রেস নেতাদের মুখ হইতে প্রায়ই বাহির হইতেছে। কংগ্রেস নেতারা এই ভাবে ভাবিতে থাকিলে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব কমিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

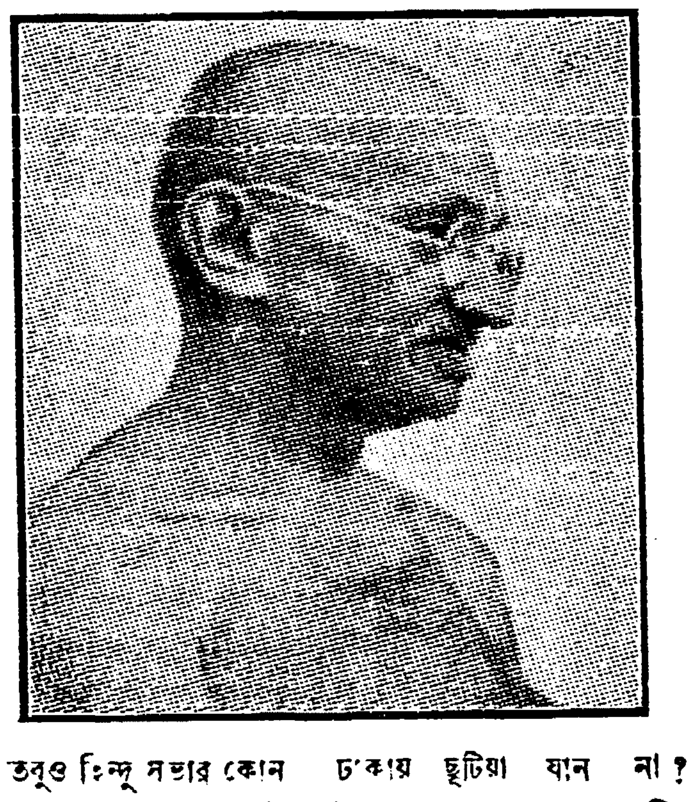

গান্ধিজীর মুক্তি

জাপানী আক্রমনের প্রত্যক্ষ বিপদ আসিল। সেই বিপদের তীব্রতার মধ্যেও বাংলার নেতারা যখন নীরব নিষ্ক্রিয়তায় শুধু দিন যাপনের গ্লানি বহিয়া চলিয়াছেন—তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার দীপ্ত সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিল, গান্ধীজি বাহিরে আসিলেন। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে ইহা নবজীবনের সঞ্চার করিল, রাজনীতিক কর্ম্মতৎপরতায় ও জনতার মধ্যে আন্দোলনে কংগ্রেস কর্ম্মীরা দিকে দিকে কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কারণ জনতার মনেও তো গান্ধীজির মুক্তি তেমনই বিপুল সাড়া জাগাইয়াছে—তাহাদিগকে কংগ্রেসের আদর্শে ও কর্ম্মে, উদ্দীপিত করিবার এই তো সময়! কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের নেতারা অসাড়। প্রায় তিন সপ্তাহ হইয়া গেল গান্ধীজি মুক্তি পাইয়াছেন। বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতারা সকলেই কলিকাতায় আছেন। কিন্তু এতদিনেও গান্ধীজির মুক্তি উপলক্ষে কলিকাতা শহরে একটী জনসভা পর্য্যন্ত তাঁহারা ডাকিয়া উঠিতে পারিলেন না! ইহার ফলে গান্ধীজির মুক্তি-সঞ্জাত উৎসাহও যে জনগণের মন হইতে নিভিয়া যাইবে এবং তাহারা কংগ্রেসকে ভুলিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

হিন্দু সভা বাড়ে ও কংগ্রেস কমে কেন

তিক্ততা, নিরাশা, কিছু হইবে না—এই সবই নাকি তাঁহাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকার কারণ। কিন্তু সব বিষয়ে তো তাঁহারা চুপ করিয়া থাকেন না! ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের লীগ মন্ত্রীত্ব বিরোধী জেদপন্থী আন্দোলনের সময় তো তাঁহারা উৎসাহে সাড়া দিয়াছেন। আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া হিন্দুর সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যে মুসলিম-বিরোধী 'সিভিল ওয়ারের' উত্তেজনা জাগাইতেছেন তাহাতে তো তাঁহারা সাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। এমন কি ১৪ই তারিখে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের শিক্ষা বিল বিরোধী সম্মেলনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা কিরণবাবু স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে সম্মেলন যে কোন সিদ্ধান্ত করিবে তাহাই তাঁহারা পূর্ণ শক্তিতে সমর্থন করিবেন। মুসলমানদের হইতে আলাদা বোর্ড গঠন করা এবং সিভিল ওয়ারের হুমকি ঘোষণা করা—এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই ঐ সম্মেলন গ্রহণ করিয়াছে। এই সব বিষয়ে প্রাদেশিক নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন কিরূপে? ইহার ফলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বাড়িবে ও কংগ্রেসী জাতীয়তার আদর্শ কমিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

গত দুই মাস ধরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ফলস্বরূপ আজ যখন ঢাকার রক্তাক্ত দাঙ্গা বাধিল — তখন কেন দাঙ্গা থামাইবার জন্য প্রাদেশিক নেতারা ঢাকায় ছুটিয়া যান না? যাহাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও বাড়িয়া দাঙ্গা অন্যত্র না ছড়াইতে পারে সেজন্য শিক্ষা বিল সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বা মুসলিমবিরোধী আন্দোলন থামাইয়া উহার প্রতিবাদ শুধু রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন না কেন? এসবদিকে শ্যামাপ্রসাদ পরিচালিত বিরোধী পক্ষ কর্ত্তৃক শুধু লীগকেই দাঙ্গার জন্য দায়ী করিবার অপচেষ্টাকে নীরবতার দ্বারা সমর্থন করিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াকেই আরও বিষাক্ত হইতে দিতেছেন না কি? ইহার পরে যদি লোকে হিন্দু সভায় যোগ দেয় ও কংগ্রেসের জাতীয়তা ভুলিয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যে কোনো কংগ্রেসকর্ম্মীই স্বীকার করিবেন যে আজ বাংলায় হিন্দু সভার প্রভাব বাড়িতেছে, কংগ্রেসের প্রভাব কমিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি কখনই ইহার কারণ হইতে পারে না। কংগ্রেসের জীবনে দমননীতি ইহার আগেও বারে বারে নিষ্ঠুর হানা দিয়াছে। তাহাতে সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সংগঠন শক্তি আহত হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব এক বিন্দুও কমে নাই, যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী মুক্ত থাকিয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতাও বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং নির্য্যাতন সহ্য করিয়া কংগ্রেস জনগণের মধ্যে আরও প্রিয় হইয়াছে, কংগ্রেসের রাজনীতি ও আদর্শের প্রভাব জনগণের মধ্যে আরও বিস্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এবার রাজনীতিক প্রভাবই কমিল কেন, অন্য দলের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি বাড়িতে পারিল কেন? কারণ বাংলা কংগ্রেসের নেতারা নিরাশ অবসন্নতায় অকর্ম্মণ্য বসিয়া থাকিয়াছেন, জনগণের দুর্ভোগ মোচনের সঙ্গে তাঁহাদের যেন সম্বন্ধই নাই। যখন উত্তেজিত হইয়া নড়িয়াছেন সে শুধু লীগ বিরোধী সংস্কারে। ফলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদই তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইয়া লইয়াছেন। নিজেদের ভ্রান্তিতে কংগ্রেসী পুণ্যের ফলই তাঁহারা আজ শ্যামাপ্রসাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং হিন্দু সভা উঠিবে ও কংগ্রেস পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বাঁচিবার সম্বল

কংগ্রেসী প্রভাব হয়তো আরও শীঘ্র লোপ পাইত। জেলায় জেলায় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা প্রাদেশিক নেতাদের মত বসিয়া থাকিতে পারেন নাই বলিয়াই তবু কংগ্রেস বাংলা দেশে বাঁচিয়া আছে। জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ তাঁহাদের—আপন আপন দ্বারপার্শ্বে যন্ত্রণা ও মৃত্যুর প্রাত্যহিক কাতরতা তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে দেয় নাই। সেবা ও সংগঠনে তাঁহাদের নামিতেই হইয়াছে—এবং তাহারই অনিবার্য্য অভিজ্ঞতাস্বরূপ ঐক্যের পথই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রাদেশিক নেতারা যখন লীগ বিরোধিতায় উন্মত্ত, কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করিও না বলিয়া যখন কোনো কোনো নেতা গোপন চিঠি পাঠাইতেছেন তখনও বাস্তব কাজের প্রয়োজন এবং দেশপ্রেমের সহজ বিশ্বাস জেলা নেতাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাংলার অধিকাংশ প্রধান জেলায় তাঁহারা শুধু কমিউনিস্টদের সঙ্গেই নয়, লীগের সঙ্গেও এক সঙ্গে ক্ষুধা ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। জনগণের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারাই দাবী করিয়াছেন যে সরকারী খাদ্য কমিটির সঙ্গেও সহযোগিতা করা দরকার—এবং নেতাদিগকে উহা মানাইয়া লইয়াছেন। হিন্দু সভার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বাড়িতেছে ইহার বেদনা তাঁহাদিগকেই সব চেয়ে ব্যথিত করিয়াছে। শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ সভায়ও দেখিলাম শুধু মফঃস্বলের প্রতিনিধিরাই তবু কিছু অনুভব করিতেছে যে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতায় কাজ করাই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। জাপানী আক্রমণও তাঁহাদিগকেই সকলের আগে চঞ্চল করিয়াছে, বাহিরের কংগ্রেস নেতাদের আহ্বান ও সম্মেলন দেখিয়া তাঁহারাও উৎসাহে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বাংলায়ও কিছু করা দরকার।

আজ গান্ধীজির মুক্তি জেলার স্বল্প-খ্যাত বা অখ্যাত নেতা ও কর্ম্মীদিগকেই সব চেয়ে আনন্দ দিয়াছে। তাঁহাদের মনেই সব চেয়ে বড় আশা জাগিয়াছে—এবার একটা মিটমাট হইবে, দেশভক্তদের কর্ম্মচাঞ্চল্য দেশে আবার নূতন জীবন জাগিবে! এ আশা সত্য, কিন্তু শুধু গান্ধীজীর একক চেষ্টায় এ আশা পূর্ণ হওয়া শক্ত। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিকূলতা এখনও পরাস্ত হয় নাই, আমলাতন্ত্র এখনও ক্ষমতা ছাড়িতে নারাজ। দেশের মধ্যেও কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য স্থাপনের পথে বাধা বিঘ্নের অন্ত নাই। এখনই যদি প্রত্যেক প্রদেশের প্রান্তে প্রান্তে আবার সুসংগঠিতভাবে কংগ্রেস কাজে না নামে, এখনই যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস দস্তুর মত পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়া সর্ব্বত্র জনগণের সেবা ও আন্দোলনে সর্বশক্তি ঢালিয়া না দেয় তবে কংগ্রেসের আদর্শ এবং প্রভাবও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, ঐক্য গড়িয়া উঠিবে না, সাম্রাজ্যবাদকেও নোয়ানো যাইবে না। গান্ধীজির মুক্তির মধ্য দিয়া আমরা জাতীয় সমাধান তথা জাতীয় দাবী পূরণের যে সম্ভাবনা পাইয়াছি তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতারা যদি এখন নিষ্ক্রিয় অপেক্ষা করেন কিংবা হিন্দু সভার বৃদ্ধিতে পরোক্ষে সাহায্য করেন তো এই ব্যর্থতাই আমরা ডাকিয়া আনিব।

বাঁচিবার পথ

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা এই কথা অনুভব করিয়াই প্রাদেশিক কর্ম্মী সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন ও কাজে নামিয়াছেন। গত ১৫ই এপ্রিল বোম্বাইয়ের সমস্ত প্রধান কংগ্রেস কর্ম্মীও (কমিউনিস্ট সহ) এমনি সম্মেলনে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বাংলা দেশের দুঃখ ও বিপদ আরও বেশী। অথচ প্রাদেশিক নেতাদের নিষ্ক্রিয়তায় আপনারা কি অন্ধভাবে বাংলার কংগ্রেসকে লোপ পাইতে দিবেন? মিটমাটের আশাকে সক্রিয় সমর্থন দ্বারা বাস্তব করিয়া তুলিবেন না? আবার জেলায় জেলায় দস্তুরমাফিক কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ করিবেন

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] ২৪শে মে, বুধবার, ১৯৪৪, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [দাম—ছ'পয়সা

সম্পাদকীয়

গান্ধীজির এক বছর আগের চিঠি

গত বছর এপ্রিল মাসের শেষে দিল্লীতে লীগের অধিবেশনে জিন্না সাহেব বলিয়াছিলেন, "এমন কি এখনও যদি গান্ধীজি পাকিস্তানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করিতে বাস্তবিক ইচ্ছা করেন তো সে ইচ্ছাকে আমিই সব চেয়ে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিব ......তিনি যদি মনস্থির করিয়া ফেলিয়া থাকেন তো সরাসরি আমার কাছে চিঠি লিখিতে বাধা কি ?"

জেলের ভিতরে খবরের কাগজে জিন্না সাহেবের এই বক্তৃতা পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই গান্ধীজি তাঁহাকে একটী চিঠি লেখেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে চিঠি জিন্না সাহেবকে দেয় না কিংবা প্রকাশও করেনা।

আজ এক বছর পরে বাহিরে আসিয়া গান্ধীজিই সে চিঠি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। চিঠি হইতে এই কথা বোঝা যায় যে পাকিস্তান সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করিয়াছেন কিনা তাহা তাঁহার পক্ষে আগে হইতেই বলিয়া দেওয়া শক্ত। তবে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় ভাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রশ্ন সমাধান করিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তাঁহার মনে হয় যে জিন্না সাহেবের সঙ্গে সরাসরি আলাপ ও আলোচনা হইলে এই সমাধান সহজ হইবে। সেজন্য জেলের ভিতর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিবার জন্য গান্ধীজি জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সে সময় গান্ধীজির সাক্ষাতের অনুরোধ ছাড়া চিঠির অন্য কথা যদিও গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করে নাই তাহা হইলেও চিঠির মর্ম বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না। এই লইয়া তখন তুমুল তুফান উঠিয়াছিল। কংগ্রেসী মহল বলিয়াছিলেন—এই তো গান্ধীজি জিন্না সাহেবের কথা রাখিয়াছেন, এখন জিন্না সাহেবের সাহস থাকে তো গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করুন। জিন্না বলিয়াছিলেন—গান্ধীজি পাকিস্তান বিরোধী মত বদলাইয়াছেন এমন কোন ইঙ্গিত নাই, এ অবস্থায় দেখা করিতে বলা মানে লীগকে খামোখা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াইয়ে লাগাইয়া দেওয়া।

এই বাদ বিতণ্ডার সারার্থ, নিজ নিজ কোট ছাড়ার কথা খোলাখুলি স্বীকার করিতে কোনো পক্ষই রাজি হন নাই। লীগ পক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে পাকিস্তানের নীতি মানিয়া লওয়ার সুস্পষ্ট ভরসা না পাইলে লীগ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিতে পারেনা। আর কংগ্রেস পক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার তাঁহারা খোলাখুলি স্বীকার করিবেন না কিন্তু তবুও লীগের মিটমাটে অগ্রসর হওয়া উচিত।

উভয় পক্ষই শুধু আনুষ্ঠানিক কথাবার্ত্তা এবং স্বীকার অস্বীকারের কথাই ভাবিয়াছিলেন। সেদিনের বাস্তব পরিস্থিতি কি সম্ভাবনা বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং কেমন করিয়া উভয়েই সে সম্ভাবনাকে সার্থক করিতে পারেন তাহা কেহই ভাবেন নাই।

পরিস্থিতি কি ছিল ? ভ্রান্ত সংগ্রামের ব্যর্থতা ও আত্মঘাতী ফল তখন কংগ্রেসী মহলকে ভাবাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠিক আড়াই মাস আগে গান্ধীজির উপবাস-সম্পর্কে চিঠিপত্র তাঁহাদের ভ্রান্তিকে আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

যে কংগ্রেসকর্ম্মীরা ঐক্য পরে আসিবে, আগে স্বাধীনতা চাই এই বলিয়া ভ্রান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা তখন বুঝিতেছেন যে লীগের সঙ্গে ঐক্য প্রয়োজন, নহিলে স্বাধীনতা আসিবে না! খাদ্য-আন্দোলনে তখন তাঁহারা সবে নামিতেছেন—সেখানকার অভিজ্ঞতা দেখাইতে সুরু করিয়াছে যে দেশবাসীর সেবাতেও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাই সব চেয়ে সাফল্য আনে। মোটমাট কংগ্রেসী মহলে লীগের সহিত ঐক্যের প্রয়োজন তখন স্বীকৃত হইয়াছে, উহার জন্য সামান্য আগ্রহ জাগিয়াছে—কিন্তু মুসলমানদের দাবী মানিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নারাজ, কার্য্যকরীভাবে কোনো বড় রকম ঐক্যের উদাহরণও তখন আসে নাই। অন্য দিকে, কংগ্রেস যখন বিদ্রোহ করিল তখন শুধু লীগকেই ক্ষমতা দাও না কেন—গবর্ণমেণ্টের কাছে এই দাবী যে গ্রাহ্য হইবে না লীগমহল তখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ হইলে তবেই ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা এ বোধ জাগিতেছে। গান্ধীজীর উপবাসের বেদনা মুসলিম জনসাধারণকেও চঞ্চল করিয়া লীগ ও কংগ্রেস পক্ষকে কিছুটা কাছে টানিয়াছে। কাজেই লীগ মহলেও ঐক্যের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে—কিন্তু পাকিস্তানের নীতি না মানিলে ঐক্যের পরে কংগ্রেস পক্ষ হয়ত ফাঁকি দিবে এ সন্দেহ পুরাপুরি আছে।

এই পরিস্থিতিতে ঐক্যের সম্ভাবনা এই অগাষ্টের চাইতে যে অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জিন্না গান্ধীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে ঐক্যের সম্ভাবনা আরও বাড়িত। গবর্ণমেণ্ট সম্ভবত দেখা করার অনুমতি দিত না। তখন জেলের বাহিরে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যই শুধু গবর্ণমেণ্টের বাধা ভাঙ্গিতে পারিত, লীগের মর্য্যাদাও বজায় থাকিত। কিন্তু সেই ঐক্যের একমাত্র গ্যারাণ্টি বাহিরের কংগ্রেসকর্ম্মী কর্ত্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করিবার ভরসা দেওয়া। দুঃখের কথা লীগ বা বাহিরের কংগ্রেসকর্ম্মী—কোনো পক্ষই এতখানি অগ্রসর হয় নাই। এক বছরের চরম দুর্দ্দশাই হিন্দু মুসলমান সমগ্র দেশবাসী তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

আজিকার পরিস্থিতি সেদিনের অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর সম্ভাবনায় পূর্ণ। দেশের প্রত্যেকেই আজ বোঝে যে লীগ ও কংগ্রেসের একতাবদ্ধ চেষ্টা ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না—এবং মুখে স্বীকার করুক বা না করুক সকলেই জানে যে জিন্না-গান্ধী সাক্ষাৎ ও মিটমাটের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আমলাতন্ত্র যে লীগেরও বিরোধী লীগ তাহার নূতন প্রমাণ পাইয়াছে পাঞ্জাবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে লীগ ও কংগ্রেস একসঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। জাপানী আক্রমণের বিপদ, খাদ্য সঙ্কটের ভয়াবহ রূপ আর এতদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কংগ্রেসী মহলে প্রায় অমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতেছে। যেমন করিয়াই হোক অচল অবস্থার অবসান করিতেই হইবে, দেশরক্ষাতেও অগ্রসর হইতে হইবে সেই বোধ দৃঢ় হইয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের জাতীয় ঐক্যই তাহার একমাত্র পথ সে-বোধ অনেক বাড়িয়াছে, যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতারা কংগ্রেস কর্ত্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকারের আংশিক প্রতিশ্রুতি আবার সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সভায়ও সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। তিক্ততা, সন্দেহ প্রভৃতি অনেক আছে বটে, কিন্তু ঐক্যের সম্ভাবনা ও বাস্তব দৃষ্টান্ত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আর সব চেয়ে বড় কথা গান্ধীজী মুক্ত হইয়াছেন। লীগ-কংগ্রেস সরাসরি আলোচনার কোনো বাধা নাই। আগের দিনের ভ্রান্তি দূর করিয়া আমরা যদি পরস্পরের দাবী মানিয়া মিলবার গভীর আগ্রহে দেশময় নূতন আশা ভরিয়া তুলিতে পারি তো গান্ধী-জিন্না মিটমাট কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

বলশেভিক পার্টির বিলোপ
বিনাসর্ত্তে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি ভারতীয় বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস ভারতীয় বলশেভিক পার্টিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, অনেক দিন যাবতই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহিত এক হইয়া যাওয়ার জন্য পার্টির মধ্যে আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের এক অংশের কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য বিরোধী, জাতীয় ঐক্য বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জ্জিত নীতির ফলে উহাতে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সভ্যরা যখন সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকেন তখন ঐ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা পার্টির বাহিরে গিয়া একই নামে আর একটি দল গঠন করে।

দ্বিতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করে, "পূর্ব্বেকার দোমনা ভাব ও ভুল বোঝার ফলে আমরা যে ভুলপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা সংশোধনের জন্য বলশেভিক পার্টিকে তুলিয়া দিলাম; আমাদের সভ্যদের নির্দ্দেশ দিতেছি যে তাহারা যেন বিনাসর্ত্তে এবং মনে কোন দ্বিধা না করিয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।"

বলশেভিক পার্টির সভ্যরা যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের প্রতি আস্থা রাখিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কাজের মধ্য দিয়া নিজেদের সংশোধন করিতে পারেন তবেই কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিবার মর্য্যাদা তাহারা লাভ করিবেন।

(১ম পৃঃ শেষাংশ)

না ? আইনের বাধা শুধু অজুহাত মাত্র—সকলেই জানে যে বর্ত্তমানে কংগ্রেস দস্তুরমত কাজ আরম্ভ করিলে কেহই বাধা দিবে না।

জেলায় জেলায় দেশভক্ত কর্মীদের আশা ও কর্মতৎপরতা আজ মুখর হইয়া উঠুক। প্রাদেশিক নেতাদের অনুরোধ করুন প্রাদেশিক কর্মী সম্মেলন ডাকিবার জন্য। সেখানে জাতীয়তার আদর্শ পুনরায় ঘোষণা করুন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসভাভিমুখী দুর্বলতা রোধেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। জেলায় জেলায় এখনি সম্মেলন আহ্বান করুন। জেলাব্যাপী ও প্রাদেশিক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া—সুসংবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে নামুন। শত্রুরা পরাস্ত হইবেই।

কয়লা সংকট বাড়িয়াই চলিয়াছে
উৎপাদন ও বণ্টনে অব্যবস্থা আর কতকাল চলিবে ?

'ক্যাপিট্যাল' পত্রিকার নয়াদিল্লীর সংবাদ দাতা জানাইতেছেন, "কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গেল যে কয়লার অবস্থা আবার উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতেছে। কয়লার উৎপাদন আশানুরূপ বাড়িতেছে না এবং কয়লার খনির শ্রমিকরা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। সবদিক বিবেচনা করিয়া মনে হইতেছে, কয়লার ব্যবহার আরও কমানো ছাড়া কোন উপায় নাই।"

কয়লার ব্যবহার কিভাবে কমানো হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। জামসেদপুর টাটা কারখানায় কয়লা সরবরাহ কমাইবার ফলে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ উৎপাদন কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। গত ১৫ই মে কুষ্টিয়া কাপড়ের কল কয়লার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন আগে বজবজে দুইটি চটকল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ। সোদপুর-পানিহাটি অঞ্চলের কাপড়ের কলে এবং অনেক চটকলে খবর লইয়া দেখা গেল, কয়লা সংকট খুব সঙ্গীন আকার ধারণ করিতেছে। বহু ছোটখাট কলকারখানা ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল কলকারখানার কয়লা নয়, রন্ধনের জন্য যে কয়লা দরকার হয়, তাহার সরবরাহও ভীষণভাবে কমিয়া যাইতেছে। কলিকাতার ও হাওড়ার নাগরিকদের যেখানে কমপক্ষে দৈনিক ৩৫ ওয়াগন কয়লা দরকার সেখানে গত ফেব্রুয়ারীতে এবং মার্চ্চ মাসে গড়ে মাত্র ২৮ এবং ২৬ ওয়াগন কয়লা আমদানী করা সম্ভব হয়। এপ্রিল এবং মে মাসে উহা কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেকে আসিয়া দাঁড়ায়। গবর্ণমেণ্ট নিজে ঠিক করিয়াছিলেন যে দৈনিক ৩০ ওয়াগন কয়লা আমদানী করা হইবে, কিন্তু তাহা তাহারা মোটেই কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই।

কয়লা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী অনেক পরিকল্পনা হইয়াছে, কিন্তু কোথাও সমস্যাটিকে সমগ্রভাবে দেখার চেষ্টা হয় নাই। ব্যবসায়ী মহলের বিশিষ্ট নেতা মিঃ এস, সি, ঘোষ একটি পুস্তিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, কয়লার প্রশ্নটি "কণ্ট্রোলের প্রশ্ন নয়, উৎপাদনের প্রশ্ন।" গত ১৫ই মে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনও অনেকটা ঐ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কণ্ট্রোলের বিরুদ্ধে তাহাদের ঐ মন্তব্য মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। কয়লার প্রশ্ন আসলে উৎপাদন, বণ্টন ও যানবাহনের ব্যবস্থা এই তিনটি প্রশ্নের সহিতই জড়িত। এবং এই তিনটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতায় সমভাবে কণ্ট্রোল ব্যবহার প্রয়োগ হইলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কয়লার খনি ছাড়িয়া মজুররা যে বাড়ী চলিয়া যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ খনি শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থার অভাব। তাহাদের মজুরী, মাগগীভাতা ও রেশন কম। অথচ, সরকার এই বিষয়ে এখনো মালিকদের উপর কোন চাপ দিতেছেন না। সুতরাং উৎপাদনের ব্যাপারেও প্রশ্ন কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া নয়, প্রশ্ন হইল মালিকদের মুনাফাবৃত্তিকে বাধা দেওয়ার কাজে উহা ব্যবহার করা এবং ঐ কাজে মজুর ও জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা। তারপর আসে যানবাহনের প্রশ্ন। সামরিক ও খাদ্য দ্রব্যের জন্য যানবাহনের উপর খুব চাপ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রেলের দুর্নীতির জন্য অনেক ওয়াগন যে পড়িয়া থাকে চিৎপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ খবর লইলেই তাহা জানা যায়। রেল-মজুর ও জনসাধারণের সহযোগিতায়ই ওয়াগণ চালু রাখা সম্ভবপর। বণ্টনের ব্যাপারে মাড়োয়ারী ব্যবসায় সমিতি সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রেশন কার্ডের মারফৎ রন্ধনের কয়লা বণ্টন করা হোক। ইহা খুবই ভাল প্রস্তাব। মিল ও কারখানার কয়লার বণ্টনও যদি রেশনিং-এর মূলনীতির ভিত্তিতে হয় এবং জনসাধারণের উপর তাহার খবরদারীর কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে কয়লার চোরা কারবার বন্ধ হইতে পারে। এ ব্যাপারে এখনই জনসাধারণের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এ, আর, পি-র উপর অন্যায় আঘাত
সর্ব্বত্র সস্পেণ্ড, বরখাস্ত ও হুমকীর হিড়িক

সম্প্রতি সমগ্র বাংলা দেশেই এ, আর, পি সংগঠনের দেশপ্রেমিকদের উপর একটা জবরদস্ত হামলা শুরু হইয়াছে। কলিকাতা শহরে বড়বাজার সাব এরিয়ার ষ্টাফ অফিসার শ্রীযুত মাধব মুন্সী, পোষ্ট ওয়ার্ডেন শ্রীযুত কালীপদ চৌধুরী, ইণ্টালী সব এরিয়ার পোষ্ট ওয়ার্ডেন শ্রীযুত তারিণী দত্ত, হরিদাস, টি, এন চাটার্জ্জী সন্তোষ দত্ত এবং আরও দুইজন, মাণিকতলার শ্রীযুত রমেন সেনগুপ্ত, টালিগঞ্জ সাব এরিয়ার শ্রীযুত নন্দী, হাওড়ার শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস এবং শ্রীযুত অশ্বথনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের শ্রীযুত নরেন রায় প্রভৃতি কর্ম্মীদের বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু কর্ম্মীকে সসপেণ্ড করা হইয়াছে এবং নানাপ্রকার হুমকী দেখানো হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ কি ? বরখাস্তের হুকুম হইতেই তাহা অনুমান করা যাইবে। শ্রীযুত মুন্সীকে বরখাস্ত করার কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ দেখানো হয় নাই। হাওড়ার মন্মথ দাসের বরখাস্ত পত্রে বলা হইয়াছে, "গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহাকে আর চাকুরীতে রাখা হইবে না।" হাওড়ার অপর কর্ম্মী শ্রীযুত অশ্বথ চাটার্জ্জীকে বলা হইয়াছে, "তিনি সরকারের অধীনে কাজ করার অনুপযুক্ত।" অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে এই কর্ম্মীটি যে বিভাগে কাজ করেন—উত্তম কাজের জন্য উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা একাধিক ক্ষেত্রে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য কর্ম্মীরাও তাহাদের কাজের জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে সুনাম ও ভালবাসা পাইয়াছেন। সুতরাং বরখাস্তের কারণ অন্যত্র। কিছুদিন যাবৎ এ, আর, পি কর্ম্মীদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা যাইতেছিল। এ, আর, পি কর্ম্মীরা অভাবের তাড়নায় কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। বঙ্গীয় আইন পরিষদে বাজেট আলোচনার সময় কংগ্রেস নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল এইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ, আর, পি কর্ম্মীরা যাহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তাহার জন্য আন্দোলন সুরু হয়। কলিকাতায় তাহারা একটি এসোসিয়েশনও গঠন করে।

ভূতপূর্ব্ব গোয়েন্দা প্রধানদের লইয়াই হইল এ, আর, পি-র বড় কর্ত্তার দল। তাহারা কর্ম্মী ও জনসাধারণের দেশপ্রেম কি ভাবে সহ্য করিবেন ? অবিলম্বে শুরু হইল আক্রমণ।

কিন্তু আক্রমণ সত্ত্বেও সম্প্রতি তাহারা তাহাদের উইকলী নোটে স্বীকার করিয়াছেন যে, "ন্যায্য এবং কল্পিত অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে এই আন্দোলন সুরু হয়। কর্ম্মীরা যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের বক্তব্য জানাইতে পারে তাহার জন্য ভিন্নভাবে নিয়ম কানুন তৈরী হইতেছে"। কেবল তাহাই নয়, সম্প্রতি কর্ম্মীদের ভাতা ৩৲ বাড়ানো হইয়াছে এবং কণ্ট্রোলার সাহেব নিজে প্রত্যেক সাব-এরিয়ায় যাইয়া কর্ম্মীদের জন্য দরদ প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু, এসোসিয়েশন বা জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা নিষিদ্ধ। কারণ তাহাতে বড় কর্ত্তাদের এ, আর, পির উপর পুলিশী রাজত্বে ঘা লাগিবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি কলিকাতার নাগরিকদের একাধিক সভায় জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের এই জুলুমের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, এবং এ, আর, পি সংগঠনের উপর খবরদারীর জন্য জননেতাদের লইয়া বে সরকারী বোর্ড-গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। জাপ বোমার হাত হইতে সহরবাসীকে রক্ষা করার ইহাই একমাত্র পথ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাই

ঢাকায় দাঙ্গা সৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছে

হিন্দু ও মুসলমানে আপোষ না হইলে দাঙ্গা সারা দেশে ছড়াইবে

বাংলা দেশের সমস্ত বড় শহরের মধ্যে ঢাকা শহরই বোধহয় অন্নকষ্টে সব চেয়ে বেশী ভুগিয়াছে। এত বড় শহর অথচ এখনও সেখানে পুরা রেশনিং চালু হয় নাই, এমনও অনেক দিন আসিয়াছে যখন শহরের বাজারে চাল পাওয়াই যায় না। কলিকাতার মতই সেখানে নরনারী অনাহারে পথে পথে মরিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মহামারীও ঢাকা শহরকে দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। হিন্দু, মুসলমান সমস্ত জনসাধারণেরই দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কিন্তু এই দুর্দ্দশা ঢাকার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে পরস্পর বিরোধী করিয়া তুলে নাই, বরং একত্র করিয়াছে। ঢাকা শহরের পুরাতন ইতিহাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কমলিন; হিন্দু ও মুসলমান কয়েকটী ষড়যন্ত্রকারী গুণ্ডার দল বারে বারে ঢাকায় দাঙ্গা উস্কাইয়াছে, জনসাধারণও অনেক সময় তাহাদের উত্তেজনায় ভুলিয়াছে। কিন্তু গত এক বছরের তীব্র দুর্দ্দশা হিন্দু ও মুসলমানকে অনেক কাছে টানিয়াছে। দুর্দ্দশার ফলে হিন্দুদের মধ্যে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী বিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গাবাজরা বিশেষ কোনো দাঙ্গা বাধাইতে পারে নাই। বরং কংগ্রেস কর্মী, লীগ কর্মী, কমিউনিষ্ট কর্মী এবং সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান প্রতিষ্ঠাবান লোক অনেকেই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ রিলিফ কমিটিতে যোগ দিয়াছেন। ঐ রিলিফ কমিটি শুধু সাহায্যই নয় আংশিক রেশনিং, কেরোসিন বিতরণ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছে, যথাসম্ভব সমস্ত জনসাধারণকে সাহায্য করিয়াছে।

ঢাকার জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইলে এই ঐক্যের আরও বিস্তীর্ণ প্রসারই ছিল একমাত্র পথ। এবং ঢাকার জনসাধারণ যদি তাহাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পথে চলিতে পারিত তাহা হইলে এই ঐক্য নিশ্চয়ই প্রসারিত হইত। কিন্তু সেই ঢাকা শহরেই আজ আবার বীভৎস দাঙ্গা বাধিয়াছে। অনেক লোক নিহত হইয়াছে, আরও বেশী লোক আহত হইয়াছে। জনসাধারণ উদ্বেগ ও আতঙ্কে দিন কাটাইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতেছে।

দাঙ্গাবাজ গুণ্ডারা এতদিন যে দাঙ্গা বাধাইবার সাহস পায় নাই আজ তাহারা হঠাৎ সে সাহস কোথায় পাইল? বাংলা দেশের হিন্দু মুসলমান প্রতিটী নরনারীকে সে কথা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া দেশের সবত্র যে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাগিয়াছে, আন্দোলনের নামে নেতাদের কাছ হইতে এই উত্তেজনা যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানি পাইয়াছে—তাহাই আজ দাঙ্গাবাজদিগকে সাহস দিয়াছে। তাহারা দেখিয়াছে যে বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের বেশীর ভাগের মধ্যেই পরস্পর-সন্দেহ ও বিদ্বেষ তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কাজেই দাঙ্গা বাধাইয়া দিতে পারিলে উহার বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সম্ভাবনা খুবই কম, বরং দু এক জায়গা হইতে তাহারা সমর্থনও পাইতে পারে। সেজন্যই তাহারা অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আজ নিরীহ হিন্দু ও মুসলমানের রক্তে ঢাকা শহরের প্রকাশ্য রাজপথ পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে, বাঙ্গালা জাতির মুখেও কলঙ্ক দাগিয়াছে। শুধু তাই নয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর একমাত্র প্রতিষেধক-রূপে ঢাকায় যেটুকু ঐক্য ও কর্মতৎপরতা জাগিয়াছে দাঙ্গাতে তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। দাঙ্গা একদিন থামিবে কিন্তু উহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও তিক্ততা বহুদিন বিষ ছড়াইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রতিরোধে কেহই আর অগ্রসর হইবে না।

ইহার দায়িত্ব লীগ পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ উভয়েরই। লীগ পক্ষের পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু সে দাবী যদি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এবং আমলাতান্ত্রিক বন্ধন হইতে মুক্তির ভিত্তিতে আসে তবেই সে দাবী প্রগতিশীল। কারণ শুধু সেই ভিত্তিতেই মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচন তাঁহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করে। আর এই ভিত্তিতে দাঁড়াইলেই কোন কোন হিন্দু নেতার সাম্প্রদায়িক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পৃথক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হিন্দু জনসাধারণের সমর্থন পাইবার সম্ভাবনা জাগে, তবেই সমগ্রভাবে শিক্ষার প্রসারও সম্ভব হয়। কিন্তু যেভাবে এই বিলের মধ্য দিয়া পৃথক নির্বাচন পাইবার চেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে সে পৃথক নির্বাচনে মুসলমানের শিক্ষাও স্বাধীন বিকাশ পাইবে না, আমলাতন্ত্রের বন্ধনে আরও পিছু হঠিয়া আসিবে। ইহার সব চেয়ে মারাত্মক ফল দাঁড়াইবে যে সাম্প্রদায়িকতা তীব্র হইয়া উঠিবে, হিন্দু ও মুসলমানের কলহে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থাই ছন্নছাড়া ও রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং বাংলার হিন্দু মুসলমান দুজনের জাতীয় প্রগতিই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও দাঙ্গায় ব্যাহত হইবে। ঢাকায় যাহা ঘটিয়াছে উহা তাহারই সূচনা।

বিরোধী পক্ষের আন্দোলন তো সরাসরিই মুসলমান-বিরোধী। যে কারণেই হোক বর্ত্তমানে মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় কম অগ্রসর, শিক্ষার যতটুকু কর্তৃত্ব তাহা হিন্দুদের হাতেই আছে, এবং মুসলমানদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার না থাকিলে তাঁহাদের সমান অধিকার অন্তত এ জীবনে আসিবে না। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এই কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কর্ত্তৃত্ব যদি না থাকে তাহা হইলে মুসলমানদের নিকট হইতে আলাদা হওয়াই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৪ই মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে তাঁহাদের যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের কংগ্রেসী মন হইতে এইজন্যই একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দলের নেতা কিরণ বাবু সামান্য প্রতিবাদও করেন নাই, এবং প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র বদল না করিয়া ভাষার সামান্য একটু মারপ্যাঁচেই নলিনাক্ষ বাবুর কংগ্রেসী বিবেকও শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানের নিজস্ব পৃথক নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের বিরোধিতা করিতে হইবে (অর্থাৎ বর্ত্তমান হিন্দু কর্তৃত্বের ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইবে) এবং তাহাতে মুসলমানেরা রাজি না হইলে মুসলমান হইতে আলাদা হইতে হইবে—এই উদ্দেশ্য সম্মেলন হইতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য দিকে দিকে হিন্দুদের রণসাজে সজ্জিত হইবার জন্য নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে যে হিন্দুর শিক্ষা বা জাতীয় উন্নতি দুইই বাড়িবে না, বরং কুৎসিত সাম্প্রদায়িক কলহে বাঙ্গালী জাতি তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতিও রুদ্ধ হইয়া যাইবে, দেশের সর্বনাশ হইবে—সে কথা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হিন্দু নেতারা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়াছেন—আমরা সিভিল ওয়ার বা ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিব। আজ ঢাকা শহরে তাহারই ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিন্দু নেতারা গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছেন বিল প্রত্যাহার কর নহিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবে ও এখন ঢাকার দাঙ্গা দেখাইয়া তাঁহারা অনেকে হয়ত পরম সাধুর মত বলিবেন, দেখ আমরা তো বলিয়াছিলাম এইরূপ ঘটিবে! যেন দাঙ্গা না-বাধা বা থামানো শুধু গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব, তাঁহাদের কোনো দায়িত্ব নাই! তাঁহারা যেভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন ও মুসলমানের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করিয়া মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক তীব্রতা সৃষ্টি করিতেছেন তাহাতেই দাঙ্গা বাধিবার জমি তৈয়ারী হইতেছে। তাঁহারা দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই সাম্প্রদায়িকতার জমিতেই সার দিয়া চলিবেন অথচ দাঙ্গা বাধিলে তখন শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের মুসলিম-বিরোধী দাবীই মানিয়া লইয়া দাঙ্গা থামাইতে হইবে ইহাই যদি যুক্তি হয় তাহা হইলে সকলেই তো নিজ নিজ দাবী মানাইবার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেই সব চেয়ে সহজ পথ বলিয়া মনে করিতে থাকিবে!

দায়িত্ব উভয়েরই—হিন্দু নেতাদেরও, মুসলিম নেতাদেরও। সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গার সর্বনাশ হইতে লোকসানও উভয়েরই। সেজন্যই অন্তত নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার খাতিরেও তাঁহাদের উভয়কে আপন আপন কোট ছাড়িয়া বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে ইহার সমাধান করিতে হইবে, দেশকেও বাঁচাইতে হইবে। স্বেচ্ছায় মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়া হিন্দুরা তাহা করিতে পারেন। হিন্দুদের সঙ্গে মিলিয়া আমলাতন্ত্রের অধীনতা হইতে শিক্ষাকে মুক্ত করিয়া ও উহাকে প্রশস্ত করিয়া মুসলমানেরা তাহা করিতে পারেন। এবং তাহা না করিলে দেশ বাঁচিবে না।

[ঢাকার সুবাদিয়া গ্রামের ফালানী ধোপার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পরিবার!]

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত

ঢাকায় কি দেখিলাম

বাড়ীঘর শূন্য—চারিদিকে কবরের সারি

[দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ক্ষত বিক্ষত ঢাকার কথা কে না জানে? এই ঢাকার গ্রাম্য জীবনের প্রকৃত ছবি আঁকিয়া আনিবার জন্য শিল্পী কমরেড মনী রায় কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকার কয়েকটী গ্রামে যান। তিনি যে সমস্ত ছবি আঁকিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে ঢাকার বর্ত্তমান অবস্থা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাঁর ছবিগুলি প্রকাশ করিব। তাঁর ডায়েরীর কয়েকটী অংশ নীচে দেওয়া হইল।]

গ্রাম না কবরস্থান!

৬ই এপ্রিল সকালবেলা সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রাম অভিমুখে রওনা হই। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মধ্যে এই গ্রামটী। শুনিয়াছিলাম যে এই অঞ্চলটীতেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সব চেয়ে বেশী ধাক্কা লাগিয়াছে। এক ঘণ্টা চলার পর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রামটী চিনিতে কষ্ট হইল না। সামনেই চোখে পড়িল ভাঙ্গা বাড়ী খালি পড়িয়া আছে আর চারিদিকে কবরের সারি। ইহা দেখিয়াই নতুন লোকেও গ্রামটীকে চিনিতে পারে।

গ্রামের ভিতরেও এই একই দৃশ্য। যে দিকে তাকাই কেবল কবর আর ভাঙ্গা বাড়ী। দু একটী বাড়ী চোখে পড়িল, যার উঠানের মধ্যেই কবর। এই কবরস্থানের মধ্যে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত দু একটী উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখা গেল। গত বারের অভাব ও এবারের ম্যালেরিয়া এই দুইয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া এরা বাঁচিয়া আছে—যেন গ্রামের স্মৃতি রক্ষার জন্য।

বসন্ত রোগের প্রতিরোধের জন্য কি হইতেছে?

গ্রামের বাজার যেখানে, সেই জায়গাটীতে গেলাম। প্রকাণ্ড একটী বটগাছের নীচে দেখি প্রায় দুইশত কঙ্কালের যেন মেলা বসিয়াছে। খোঁজ নিয়া জানিলাম, ইহাদের বসন্তের টিকা দিবার জন্য জড়ো করা হইয়াছে। টিকা দিলে ইহারা বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু মৃত্যু দেখিয়া দেখিয়া ইহাদের আশাভরসা এমন লোপ পাইয়া গিয়াছে যে টিকাও লইতে চায় না।

সরকারী টিকাদার বিরক্ত। তিনি ধমকাইয়া ও জবরদস্তি করিয়া টিকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাজারের একটা ভাঙ্গা ঘরে অনেক লোকের ভীড়। সেখান হইতে একটা হুঙ্কার শোনা গেল: "টিকা না দিলে কেউ খেতে পাবে না।" সেখানে গিয়া দেখি সকলেই টিকা দিয়াছে এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত। কেননা, তাদের তো লঙ্গরখানায় খাইয়াই বাঁচিতে হইবে।

আমরা এই সমস্ত অবুঝ লোকদের আস্তে আস্তে বুঝাইতে লাগিলাম—টিকা না দিলে কি সাংঘাতিক অবস্থা হইবে। টিকাদারের ধমকে যা হয় নাই, আমাদের বুঝানতে তা হইল। আপত্তি কমিল, অনেক লোক এমন কথাও বলিল: "আমরা কি জানতাম টিকার উপকারিতা কি?" একটী অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী মূর্ত্তি আগাইয়া আসিয়া বলিল: "দুদিন আগে যদি তোমাদের পেতাম, তবে আমার ৭টা ছেলে বেঘোরে মরত না!"

সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য মায়ের ব্যাকুল চেষ্টা!

পরের দিন আবার গ্রামে গেলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছি। একটী ভাঙ্গা ঘরের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল "কি দেখছ বাবা, সব গেছে!" একটী মেয়ে, তার পাশে একটী শিশু। মেয়েটী তার করুণ কাহিনী বলিতে লাগিল। মেয়েটীর স্বামী মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। ছেলেটীকে বাঁচাইবার জন্য মেয়েটী আবার বিবাহ করিল। পর পর ৩টী স্বামীই রোগে মারা গেল। ৪র্থ বার বিবাহ করিয়াও আজ মেয়েটী নিরুপায়। স্বামী ইহাদের খাওয়াইতে না পারিয়া ১৫ দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

মাণিকগঞ্জে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে

আমরা গত সপ্তাহে "জনযুদ্ধে" ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপের কথা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি আবার আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেখানে একটুও কমে নাই বরঞ্চ গত সপ্তাহের চেয়ে জ্বরের রোগীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ, সরকারী চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই। গ্রামে কুইনাইন পাওয়া যায় না। আবাসপুরে ও কুষ্টিয়ায় কৃষক সমিতির চেষ্টায় একটী মেডিকেল রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠান হইতে যে ঔষধ ও কুইনাইন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সাহায্যে এ পর্য্যন্ত মোট ১২ শত রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। কৃষক সমিতি হইতে ২৫০ জন পরিবারকে কলেরার ইনজেকশন দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই সমস্ত রিলিফ কমিটির হাতে মোটেই কুইনাইন ও ঔষধ নাই। সরকার হইতেও পাওয়া যাইতেছে না।

কৃষকের হস্তান্তরিত জমি ফেরত চাই

৩ মন ধানের পরিবর্ত্তে ২০০৲ দাবী !

আলিপুর, ১০ই মে

২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার ৭নং কালিকাতলা ইউনিয়নে প্রায় ১৫০০০ কৃষকের বাস। তন্মধ্যে ৮০০০ হাজার কৃষকই ভুমিহীন এবং ক্ষেত-মজুরী করাই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। বাকী কৃষকরা গত ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কয়েক মন ধানের বদলে তাদের জমি মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মহাজনরা ঐ জমি রেজিষ্ট্রি ও কিনিবার সময় প্রকৃত দামের বেশী টাকা লিখাইয়া নেয়। এখন কৃষকের এমন টাকা অথবা ধান নাই যে ঐ জমি ফেরত লইতে পারে। সেইজন্ত স্থানীয় কৃষকরা যাতে জমি চাষ করিবার অধিকার পায় এবং সরকারের নিকট হইতে কৃষি-ঋণ পায় তার ব্যবস্থার জন্ত গ্রামের কয়েকজন কৃষক-প্রতিনিধি জেলা ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করে এবং গণ দরখাস্ত ও ব্যক্তিগত দরখাস্ত পাঠায়। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনও নীরব। সরকারের এই ঔদাসীন্ত ও গরিমসি পুনরায় খাদ্যসংকট তীব্র করিয়া তুলিবে। বর্ত্তমান বৎসরে মহাজনরা জমি নিজেদের দখলে পাইয়াছে। অন্ত চাষীর সহিত মহাজন জমি চাষের বন্দোবস্ত করিতেছে। ফলে জমিচ্যুত চাষীর সহিত মহাজনের সাব্যস্ত চাষীর দাঙ্গা বাঁধিবার সূচনা দেখা দিয়াছে। ইহাতে গ্রামে যথেষ্ট অশান্তি সৃষ্টি হইবে। জমিচ্যুৎ কৃষকরা দুঃস্থে পরিণত হইবে।

লাইসেন্সহীন মহাজনরা কিভাবে কয়েক মন ধানের পরিবর্ত্তে কৃষকদের নিকট হইতে জমি কিনিয়া নেয় এবং বর্ত্তমানে মহাজনরা কিরূপ অন্তায় দাবী করিতেছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

মোট কয় বিঘা জমি চাষ করে	১৩৫০ সালে কত জমি বিক্রয় করিয়াছে	জমির মূল্য কত পাইয়াছে	কিরূপ দাবী মহাজন করিতেছে	চাষীর নাম	গ্রাম
৩ বিঘা	৩ বিঘা	তিন মন ধান	-২০০৲	জঙ্গী সর্দ্দার	মঠের দিঘী
৫ বিঘা	৩ বিঘা	সাড়ে চার মন ধান	২৭০৲	অখিন্দর সর্দ্দার	কেওরাতলা
৬ বিঘা	৪ বিঘা	আট মন ধান	৩৫০৲	গোপাল সর্দ্দার	মঠের দিঘী
১০ বিঘা	৯ বিঘা	চব্বিশ মন ধান	৫০০৲	মুরারীমোহন সিংহ	যোগেন্দ্র নগর
?	৪ বিঘা	ছয় মন ধান	৩০৫৲	দ্বারিকানাথ প্রামাণিক	যোগেন্দ্র নগর
৩ বিঘা	৩ বিঘা	পাঁচ মন ধান	২৩ মন ধান	গুণধর প্রামাণিক	মঠের দিঘী

এইভাবে কয়েক মন ধানের পরিবর্ত্তে হাজার হাজার চাষী জমিচ্যুত হইয়াছে।

যখন দুগ্ধাভাবে প্রতি জেলায় শিশু মরে

—কাউন্সিলাররা তখন ক্ষীর খাইতে চান !

শান্তিপুর :—এখানে দুধের দাম অত্যন্ত চড়া। বহু শিশু ও রোগী দুধের অভাবে মরিতেছে। **একটী মা তাহার সদ্যোজাত শিশুকে দুধ খাওয়াইতে পারিবে না দেখিয়া শিশুটীকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে।**

ফরিদপুর :—এখানে টেপাখোলা, গোয়াল-চামট, মাদারীপুর, পালং, দক্ষিণপাড়া, করবারগাঁও ও ইদিলপুর অঞ্চলে দুধ একেবারে দুষ্প্রাপ্য। অনেক রুগ্ন শিশু রিলিফ কেন্দ্রের কৌটার দুধ খাইয়া কোনো রকমে বাঁচিয়া আছে।

বরিশাল :—চাঁদসী, মুলাদি, মাউলতলা, কাঠারিয়া, বাকাই, শিকারপুর, গারুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে দুধের অত্যন্ত অভাব। রিলিফ কেন্দ্রে কৌটার দুধ বিলি হয়—বহু শিশুর তাহাই অবলম্বন। কিন্তু বেশীর ভাগই তাহাও পায়না।

খুলনা :—শোভনা গ্রামে পয়সা দিয়াও দুধ মিলিতেছে না। গরুর মড়ক বাড়িয়া চলিয়াছে। দেবীপুরেরও সেই অবস্থা। আরও অনেক গ্রামে দুধ একেবারেই পাওয়া যায় না।

তমলুক :—এখানে বার্লি ও মিশ্রির খুব দাম। দুধ একেবারেই পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বচিল্কা :—এখানে শিশুমঙ্গল সমিতিতে দুঃস্থ শিশুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বাজারে টাটকা দুধ একেবারেই পাওয়া যায়না।

২।৩ মাস আগে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে দুধের অভাব সম্বন্ধে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অফিসে যে সমস্ত রিপোর্ট আসিয়াছে তাহার মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটার সারমর্ম আমরা উপরে দিলাম। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই আজ এই অবস্থা, দুধের অভাবে শিশুমৃত্যু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

মড়কে গরু মরিতেছে, মিলিটারীতে গরু কাটিতেছে, যুদ্ধের বাজারে অনেকের হাতে পয়সা আসায় চড়া দামেই ক্ষীর, রাবড়ি, মিষ্টান্ন খাইতেছে। এই সব কারণেই গ্রামে গ্রামে দুধ—হয় পাওয়া যায়না নয়তো এমন দাম যে সাধারণ লোকে কিনিতে পারে না। সেজন্তই দুধের অভাবে বাংলার শিশু তথা ভবিষ্যৎ জনধারা প্রায় উজাড় হইতে চলিয়াছে।

ইহার জন্ত আমরা মড়ক নিবারণের চেষ্টা করিতে পারি, গবর্ণমেণ্টের কাছে গো-চিকিৎসার ব্যবস্থা দাবী করিতে পারি, দুগ্ধবতী গাভী কাটা বন্ধ হোক দাবী করিতে পারি। কিন্তু এসব দাবী পূরণ সময় সাপেক্ষ, পূরণ হইবে কিনা সেই ভরসায় বসিয়া থাকিলে শিশু মৃত্যু তো আর বসিয়া থকিবে না। আমরা এখনই শুধু নিজেদের চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগে কি করিতে পারি ? আমরা নিজেদের লোভ ত্যাগ করিয়া শিশুদের বাঁচাইতে পারি। শহরের বাজারে বাজারে প্রত্যহ হাজার হাজার মণ দুধ অপচয় হয়—ধনীর মুখরোচক মিষ্টান্ন, ক্ষীর, রাবড়ি প্রভৃতি বিলাসের আহারে। এই সব বিলাসের আহার যদি ধনীরা ছাড়িয়া দেন তো বহু দুধ বাঁচে, দুধের দাম পড়ে, দুধের অভাবে শিশু ও রোগীর মৃত্যুর হার অন্তত কিছুটা নামিয়া আসে। উহাতে মিষ্টান্নপ্রিয় ধনীদের কিছু অসুবিধা হইবে কিন্তু তাঁহারা উহাতে মরিবে না। আর হাজার হাজার শিশুর জীবন ও তাহাদের পিতামাতার আশীর্ব্বাদ তাঁহাদিগকে গৌরব দিবে।

কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের বেশীর ভাগ ধনী কাউন্সিলরই এই স্বার্থত্যাগে নারাজ। **গত বুধবার কর্পোরেশনের সভায় হেল্থ অফিসারের সুপারিশ ক্রমে প্রস্তাব আসিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হোক মিষ্টান্ন, ক্ষীর রাবড়ি প্রভৃতি বিলাস উপকরণে দুধ ব্যবহার যেন নিষিদ্ধ হয়। কর্পোরেশনের মাত্র কয়েকজন কাউন্সিলর ছাড়া বাকী সকলে এই প্রস্তাব এক বাক্যে নাকচ করিয়া দেন।**

এই সব কাউন্সিলর কেহ বা লীগপন্থী, কেহ বা হিন্দুসভা পন্থী, কেহ বা বাতিল কংগ্রেসপন্থী। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজেকে দেশপ্রেমিক বলিয়া জাহির করেন। যে-দেশপ্রেম মিষ্টান্ন-লোভের উর্দ্ধে উঠিতে পারিলনা, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী শিশুর মৃত্যুতেও যে-দেশপ্রেম লজ্জিত হইলনা—সে দেশপ্রেম যত শীঘ্র দুর হয় ততই দেশের মঙ্গল।

কলেরায় রেকর্ড-মৃত্যু

বেঙ্গল পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের বিবৃতি

কলিকাতা, ১৫ই মে

এই প্রদেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বেঙ্গল পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশন এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে হিসাব সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়, কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ববর্তী সমস্ত 'রেকর্ড' ছাড়াইয়া গিয়াছে। গত কয়েক মাস পূর্ববঙ্গে বসন্ত রোগে বহু লোক মারা গিয়াছে। এপ্রিল মাসে সারা বাঙ্গলায় বসন্ত ও কলেরা রোগে যথাক্রমে ৩৪২৫২ ও ৩৮৭৫ জন আক্রান্ত হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে কলেরায় আক্রান্তর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। ঐ মাসে মোট ৩১৪৫৯ জনের কলেরা হইয়াছে। সামরিকদিগের ও দুই হাজার অসামরিক চিকিৎসকের এবং অন্তান্ত প্রদেশের ও সামরিকগণের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। অস্থায়ী ও অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেঙ্গল পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশন তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞগণের ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণের জন্য এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে তাগিদ দিয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থায়ী কর্মচারী-দিগকে ঠিক জীবনধারণোপযোগী বেতন ও যথাযোগ্য রাহা খরচ দিবার জন্য এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে। প্রতিষেধক ও আরোগ্যমূলক যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত এসোসিয়েশন সুপারিশ করিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় তদনুযায়ী কার্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

বসন্ত মহামারীর প্রকোপে আর একটি সহর এলাকা

পাবনা মিউনিসিপ্যাল এলাকা বসন্ত সংক্রামক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মহামারী নিরোধের জন্য কতকগুলি সামরিক বিধি নিষেধ জারী করা হইয়াছে।

★ বাংলার সংকট রুখিতে সমবেত প্রচেষ্টা চাই ★

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা

লাহোর, ১৫ই মে

লাহোরের ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন,—"**কেবল মাত্র দলগত প্রচেষ্টায় বাঙ্গলায় বর্তমান বিপুল সংকট দূর হইবে না। বাঙ্গলার এই সংকট দুর করিতে হইলে সকলকে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।**

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই জটিল সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে। **তবু নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিতে পারি না।** এই সংকট-কালে প্রত্যেকেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়া মৃত্যু সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই।

আজ পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, বোম্বে, ইউ-পি ভারতের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জাতি বর্ণের সমস্ত বাধা ভাসিয়া ছাত্র সমাজ বাংলার এই দুর্দ্দশাকে রুখিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।"

[ঢাকার গুদনাইল গ্রামে পথের উপর বসন্ত রোগী]

কানি পিছু ১৬০৲ সেলামি

চট্টগ্রামের কৃষকের মর্ম্মন্তুদ উক্তি

জলদী, ৭ই মে

জমিদারেরা জমি লাগাইতেছে প্রতি কানি ১৬০৲ টাকায়। কোন কোন জমি ২০০৲ টাকার কমে জমিদাররা লাগাইতে অস্বীকার করিতেছে। গরীব কৃষকদের চাষ করা অসম্ভব হইতেছে। প্রশ্ন করায় একজন কৃষক বলে—'আমার পরিবারে ৭ জন লোক আছে। গত বৎসর সাত কানি জমি চাষ করিয়াছিলাম। কোন রকমে দুঃখ কষ্টে দিন কাটাইয়াছি। এইবার ২টা বলদই মারা গিয়াছে। গরু মরিবার সাথে সাথে আমরাও মরিয়াছি। গরু ক্রয় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। কাজেই না খাইয়া মরিতে হইবে। অনাহারে থাকিয়াও এখন বীজ ধান রাখিয়াছি, কিন্তু চাষ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। জমি পাইব কোথায় ? সাত কানি তো দূরের কথা, ১৬০৲ হইতে ১৭০৲ টাকা দিয়া এক কানি জমি নেওয়ার শক্তিও আমার নাই। সরকার কি আইন করিয়া জমি লাগানোর হার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিল না ?" গরীব চাষীদের জমি পাওয়ার বন্দোবস্ত না করিলে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এমনি প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা কম, তার উপর ইহারাও চলিয়া গেলে চাষের ভয়ানক ক্ষতি হইবে। **সুতরাং অবিলম্বে আইন করিয়া জমি লাগানোর সর্ব্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়া হউক।**

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

দেশরক্ষার আহ্বানে উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতা

স্বামী বিচিত্রানন্দের বিবৃতি

উড়িষ্যা কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির নেতা স্বামী বিচিত্রানন্দ দাস ১২ই মে তারিখে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

কংগ্রেসের আহ্বান সুস্পষ্ট। কোন বিদেশী শক্তির মারফৎ ভারত স্বাধীনতা লাভের আশা করিতে পারে না। বিদেশী আক্রমণকারীকে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিরোধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ১৯৪২ সালে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছিল এবং এখনো তাহা বলবৎ আছে।

বর্দ্ধমান শহর-খাদ্য-কমিটীর নির্ব্বাচন

খাদ্য আন্দোলনের নেতা ও কর্ম্মীদের উপর পূর্ণ আস্থা

(নিজস্ব সংবাদদাতার খবর) বর্দ্ধমান, ১২ই মে

১১ই মে বর্দ্ধমান শহরে খাদ্য-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এক বৎসর খাদ্য আন্দোলনের পর এইদিন শহর খাদ্য-কমিটীর জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশনে নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। ৫১টী মহল্লা কমিটী হইতে লোক সংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচিত ৬৭ জন প্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯ জন প্রতিনিধি মোট এই ৭৬ জন লইয়া জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি হইতে ৬ই মে'র মধ্যে এই সব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে শহরে এক বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে—যেরূপ বর্দ্ধমান সহরে কোন দিন কোন নির্ব্বাচনে দেখা যায় নাই। মজুতদার ও ভেদসৃষ্টি-কারীর দল নির্ব্বাচনের মারফৎ খাদ্য কমিটীর মধ্যে নিজেদের লোক পাঠাইয়া ইহাকে বিপথগামী করিবার ও ভাঙ্গিয়া দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে ও তাহার জন্য খাদ্যকমিটীর নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যত রকমের সম্ভব কুৎসা প্রচার করিয়াছে। কিন্তু জনগণ তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। ২।১টী মহল্লা ব্যতীত সমস্ত মহল্লা হইতেই প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ফুডকমিটীর কর্মীরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত প্রতিনিধিদের কিছুকে লইয়া একটী বিরোধী দল সৃষ্টির চেষ্টাও হইয়াছিল। কার্য্যকরী সমিতিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সকল অংশই যাহাতে প্রতিফলিত হয় তাহার জন্য কাউন্সিলের সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলীম লীগ ও খাদ্য কমিটীর বিশিষ্ট কর্মীরা মিলিত ও শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতির খসড়া প্রণয়নের জন্য সকলের সহিত আলোচনা করিয়া সম্ভবমত সব রকম চেষ্টা করিয়াছেন।

১১ই মে বৈকাল ৬টায় স্থানীয় সি. এম. এস. স্কুলে বিদায়ী ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মৌলভী গোলাম মোর্ত্তজার সভাপতিত্বে কাউন্সিলের সভা আরম্ভ হয়। ৭৬ জন সদস্যের মধ্যে ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় এস্-ডি-ও, জেলা খাদ্য কমিটীর সম্পাদক মৌলবী আবুল হাসেম, এম এল-এ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তৃতার পর বিদায়ী সেক্রেটারী কমরেড ভুজঙ্গ ভূষণ সেন বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। কার্য্য বিবরণীর মধ্যে তিনি বলেন—কেমন করিয়া বহু আন্দোলনের পর খাদ্য কমিটী আজ আটা, ময়দা, চিনি, কেরোসিন, লবণ, ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ প্রভৃতি কণ্ট্রোলের জিনিষ পাইবার ও বিলি করিবার ভার নিজের হাতে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে সরবরাহের ব্যাপারে বহু গোলমাল রহিয়াছে। ঠিকমত ও সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজনমত মাল পাওয়া যায় না। ১৫ দিন ধরিয়া সহরে কোন চিনি নাই। মার্চ মাসের চিনির ওয়াগান এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। কয়লা মাত্র ৬ ওয়াগান করিয়া মাসে আসিতেছে। অতএব নিয়মিত সরবরাহের জন্য খাদ্য কমিটীকে জোর আন্দোলন করিতে হইবে।

সম্পাদকের রিপোর্ট গৃহীত হইবার পর ২।১ জন সদস্য নানারকম আইনের অবান্তর প্রশ্ন তুলিয়া সভার কাজে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করেন, কিন্তু বাকী সমস্ত সদস্যের একতা তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে। অতঃপর নূতন কার্য্যকরী সমিতির জন্য পদাধিকারী ও সদস্য সহ মোট ২৫ জনের নাম প্রস্তাব করা হয়। কয়েকজন প্রতিনিধি প্রস্তাবটী তাঁহাদের মনঃপূত নহে বলিয়া মন্তব্য করেন এবং বারে বারে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা নূতন কাহারও নাম প্রস্তাব বা কোন সংশোধনী প্রস্তাব না করিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া যান্। ইহাদের সংখ্যা মাত্র ৬ জন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইঁহাদেরই নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে কার্য্যকরী সমিতিতে ২৫ জনের মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের মনোমত যে কোন ৯ জনের নাম দিন্ কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে পারেন নাই। অতঃপর প্রস্তাবিত সমিতিতে ডাঃ সত্য মৈত্রকে লইবার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং প্রস্তাবিত সমিতির একজন সদস্য তাঁহাকে স্থান দিবার জন্য নিজের নাম তুলিয়া নেন্। বিপুল উৎসাহের মধ্যে সমস্ত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পদাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি—জেলা জজ, সহ-সভাপতি মৌলভী গোলাম মোর্ত্তজা ও মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী, সাধারণ সম্পাদক কমরেড ভুজঙ্গ ভূষণ সেন, যুগ্ম সম্পাদক—সিটী লীগের সভাপতি সৈয়দ হেসামুল হক্ ও লালা অমিয় প্রকাশ নন্দে। সহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ ঘোষ, ডাঃ কবির আহম্মদ নায়েক ও লালা সুষমা প্রকাশ নন্দে। পুরাতন কমিটীর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ও সমস্ত সম্পাদকগণই নূতন কমিটীর পদাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। খাদ্য কমিটীর নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মজুতদার ও ভেদসৃষ্টিকারীরা যে কুৎসা প্রচার করিতেছিল জনগণ তাহার উপযুক্ত জবাব দিয়াছে।

সভাশেষের পূর্ব্বে নবনির্ব্বাচিত অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র কুমার চ্যাটার্জী বলেন যে তিনি এই প্রথম খাদ্য কমিটীর কাজে আসিয়াছেন, তিনি কোন পার্টির নহেন। তাঁহার মহল্লা তাঁহাকে পাঠাইয়াছে এবং কাউন্সিল তাঁহাকে সহ সভাপতি করিয়াছেন। তিনি খাদ্য কমিটীকে জোরদার ও সরকার হইতে উপযুক্ত সরবরাহ পাইবার জন্য সংগ্রাম করিবেন।

জাপ-হামলার বিরুদ্ধে মণিপুরী কৃষক

তাদের নেতা লালমোহনকে ফিরাইয়া আনিতে গ্রামবাসীরা এক হইল

সিলেট জেলার চা-বাগান এলাকার চারি পাশে মণিপুরী গ্রাম। এই সমস্ত গ্রামে কৃষক সভার শক্ত ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি মণিপুরী মেয়েরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও গড়িয়াছে—৫০০ সভ্য এই সমিতির। এই অঞ্চলের নেতা কমরেড লালমোহন রায়—ইনি কৃষক সভার কর্ম্মী। মণিপুরী মেয়েদের কাছে লালমোহন আজ সন্তানের মত, কারণ লালমোহন আজ মনিপুরীদের ধ্বংস ও জাপ-দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য লড়িতেছে।

কৃষক সভার বিরোধী জোতদার মহাজনের অন্ত নাই ; লালমোহনকে তারা সহ্য করিতে পারে না—তারা লালমোহনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ লইয়া পুলিশকে উস্কানী দেয়। তারা প্রচার করে—'জাপানী আসিতেছে মণিপুরীদের স্বাধীনতা দিতে।'

কিন্তু বাস্তব সত্য লোকের চোখ খুলিয়া দেয়। জাপানী বোমার আঘাত হইতে এই অঞ্চল রক্ষা পায় নাই। মণিপুরী ছেলে মেয়েদের বাঁচাইতে ছুটিয়া আসিয়া লালমোহন ৫ জন কৃষক-ভলাণ্টিয়ার লইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করিল। যারা এতদিন লালমোহনের বিরুদ্ধতা করিতেছিল তারা বুঝিল লালমোহনের পথই তাদের বাঁচিবার পথ। গ্রামের পঞ্চায়েত বলিল : "লালমোহন খারাপ লোক হইতে পারে না, সে যা বলিয়াছে, তা ঠিকই—জাপান আমাদের মুক্তিদাতা নয়, আমাদের নাশিতেই তারা আসিতেছে।"

পুলিশের নজর বোধ হয় দেশরক্ষার দিকে নয়। তাই তারা লালমোহনের উপর আদেশ জারী করিল—সেই এলাকা ছাড়িয়া যাইতে হইবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। আগুন নিভানোর প্রচার কাজ শেষ করিয়া লালমোহন ও কৃষক-ভলাণ্টিয়াররা ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোক তাদের অভ্যর্থনা করিল। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল কি করিয়া জাপ-বোমার হাত হইতে দেশরক্ষা করা যায়। গ্রামবাসীর মনে সাহস ও সংকল্প জাগিল। এই সময়েই লালমোহনের উপর পুলিশের হুকুমনামা জারী হইল।

কিন্তু এবার লালমোহনের বিরুদ্ধে আর একজনও গ্রামবাসী নাই। সকলেই চায় লালমোহন তাদের মধ্যে থাকিয়া গ্রাম রক্ষার কাজ করুক, তাদের পরিচালিত করুক। সকলেই চায় পুলিশের অন্যায় হুকুম প্রত্যাহার করা হউক। গ্রামের পঞ্চায়েৎ সকলকে একত্র করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল : "লালমোহনকে আমরা ফিরাইয়া আনিবই।" জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে সেই গ্রামের পক্ষ হইতে ইহার জন্য আবেদন করা হইতেছে।

———

কাছাড়ে জাপ-বিরোধী সমাবেশে

কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট ঐক্য

গত ১লা মে শিলচরে জাপ-বিরোধী ও জনরক্ষা সমাবেশে স্থানীয় জনসাধারণ এক নূতন অনুপ্রেরণা পাইয়াছে। এই সভায় কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের নেতারা একত্র হইয়া ঐক্যের আহ্বান দেন। জেলা লীগ সম্পাদক মৌঃ মকবীর আলি বি এল বলিলেন : "আজকের বিপদে কংগ্রেস-লীগ, ছোট বড় সবাই এক হইয়া না দাঁড়াইলে বাঁচিবার পথ থাকিবে না।" জেলার প্রবীন দেশসেবক কংগ্রেস-কর্ম্মী নাগেশ্বর মিশ্রও সকলকে একতাবদ্ধ হইয়া দেশরক্ষা করিতে ডাক দিলেন। সভার সভাপতি জেলার জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'সপ্তকের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক কুশীমোহন দাস বলিলেন : 'যদি দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য আমরা সংগঠন গড়িতে পারি, তবে দেশ হইতে শুধু জাপ-দস্যুই বিতাড়িত হইবে তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতাও আমরা কায়েম করিতে পারিব।'

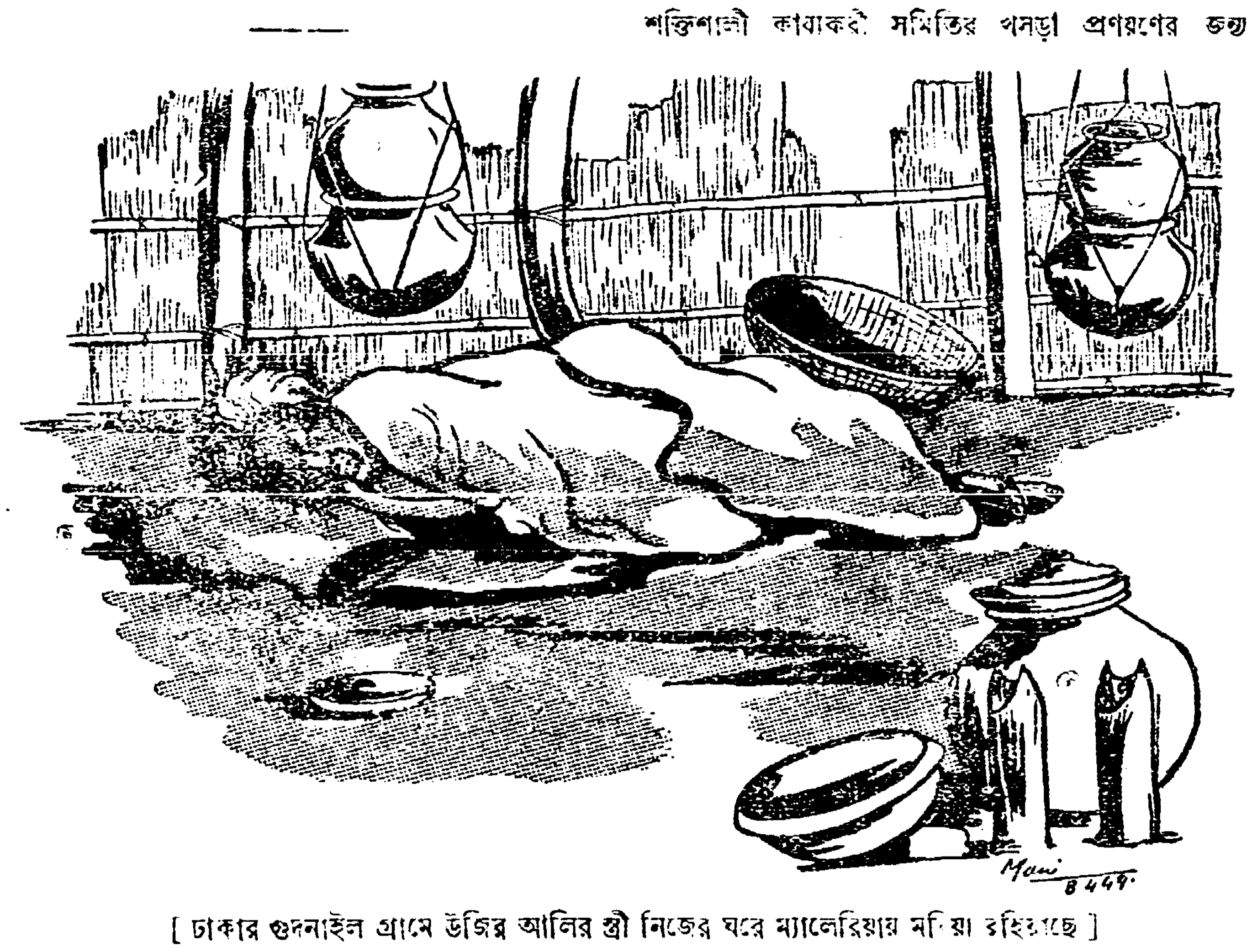

[ঢাকার গুদনাইল গ্রামে উজির আলির স্ত্রী নিজের ঘরে ম্যালেরিয়ায় মরিয়া রহিয়াছে]

মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

চট্টগ্রাম, ১৫ই মে

গত ১লা মে তারিখে বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেসন কমিটির পক্ষ হইতে চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু চট্টগ্রাম আসেন। তিনি জেলার ৪২টী মেডিকেল ইউনিটের প্রতিনিধিদের সহিত জেলা মেডিকেল রিলিফ কমিটির এক সভায় প্রায় ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আলোচনা করেন ও জেলার মহামারী রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। জেলার সরকারী ও বে-সরকারী রিলিফ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্ত্তাদের সাথেও তিনি মেডিকেল রিলিফ সম্পর্কে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতালের কাজ দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন।

মহামারীগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য ডাঃ বসু কাট্টলী ও ফতেয়াবাদ গমন করেন। কাট্টলী গ্রামটী মহামারীর কবলে পড়িয়া প্রায় ধ্বংশ হইতে চলিয়াছে। **অনেক বাড়ী এখন সম্পূর্ণ খালি, আসবাব পত্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ২।৩ দিন আগে সে সব বাড়ীর লোক কলেরা বা বসন্তে মরিয়াছে।**

এই গ্রামে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, চর্মরোগ ও যৌন রোগ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। গ্রামে একটী মেডিকেল রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে

(শেষাংশ ১ম কলমে দেখুন)

(২য় কলমের শেষাংশ)

বটে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই কারণ গ্রামবাসীর ধারণা এই মহামারী কিছুতেই প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। গ্রামের ধনীরাও নীরব ছিল। ডাঃ বসুর আবেদনে গ্রামের একজন ধনী ও গ্রামের মেডিকেল রিলিফ কমিটি ৫০০৲ টাকা এক পক্ষের মধ্যে দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে নিজেরা রোগ প্রতিরোধের জন্য গ্রামবাসীর সহায়তা করিবে।

ডাঃ বসু কাট্টলী ও ফতেয়াবাদে রিলিফ হাসপাতাল খুলিতে স্থির করিয়াছেন। ইহাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে মহামারীর বিরুদ্ধে সাড়া পড়িয়াছে।

গ্রাম বাঁচাইতে

কৃষক ও জমিদারের মিলিত প্রচেষ্টা

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া মহকুমার ১৭নং ইউনিয়নের কলাগাছিয়া ও চক দুর্গাপুর গ্রামের প্রজা ও জমিদারের মধ্যে বহুদিনের বিবাদ ছিল। গত ১৯২৭ হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই হাজা, শুকা ও বন্যার ফলে ফসল নষ্ট হইয়া যাইত। ১৯৪২ সনের বন্যা ও সাইক্লোনের ফলে প্রায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়। ফলে কৃষকদের জমিদারী-খাজানা নিয়মিত পুরাপুরি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৪২ সন হইতে জমিদাররা বাকী আদায়ের জন্য মকদ্দমা দায়ের করে। কৃষকদের পক্ষ হইয়া কৃষক সমিতি সমস্ত মকদ্দমা পরিচালনা করে। কিন্তু গত ৩০শে এপ্রিল তমলুকে কৃষক সমিতি ও জমিদারের মিলিত চেষ্টায় গ্রামরক্ষা ও গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই বিবাদের আপোষ মিমাংসা হয়।

মিমাংসার উল্লেখযোগ্য সর্ত্তগুলির মধ্যে আছে,—জমিদারগণ ১৩৪৯ সালের সম্পূর্ণ খাজানা বাদ দিবে। ইহা ছাড়া, জমিদারের হিসাবে মোট বাকী খাজানা হয় ২৫০০০৲ টাকা। কিন্তু, আগামী তিন মাসের মধ্যে ঐ টাকার পরিবর্ত্তে কৃষকদের ৫০০০৲ টাকা দিলেই বাকী আদায় মিটিয়া যাইবে। জমিদাররা গ্রামের ভেঁড়িবাঁধ নিজেদের ব্যয়ে বাঁধিয়া দিবে এবং গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটীর পুনঃনির্ম্মাণের জন্য কিছু টাকা দিবে। ইহাছাড়া, জল নিকাশের জন্য একটা পুল করিয়া দিবে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত গ্রামকে বাচাইতে কৃষক ও জমিদারের এই সম্মিলিত চেষ্টাই আজ প্রকৃত দেশপ্রেম।

দেশ রক্ষার জন্য রেলওয়ে চালু রাখিব

কলিকাতার বি, এণ্ড, এ রেল-শ্রমিকদের সম্মেলন

বি, এণ্ড, এ রেলওয়ের কলিকাতা কেন্দ্রের ৮০০ শ্রমিক গত ১৪ই মে বেলগাছিয়া মনোহর একাডেমী প্রাঙ্গনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া জাপ-আক্রমনের বিরুদ্ধে রেলগাড়ী চালু রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

বি, এণ্ড, এ রেলওয়ে ইউনিয়নের কলিকাতা শাখার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড বঙ্কিম

মুখার্জ্জী, এম, এল, এ। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "আজ জাপান আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করিয়াছে, এই আক্রমণ রুখিবার পক্ষে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বি, এণ্ড, এ রেলওয়ে; ইহাকে চালু রাখা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে বড় কাজ। জাপানী দস্যু এই জন্যই এই রেলপথ দখলের জন্য মরণ পণ করিতেছে।

সম্মেলনে জোনাল সিষ্টেমের বিরুদ্ধে, ৩০৲ টাকা মাগগীভাতার দাবীতে, সপ্তাহে ৫।০ সের ভাল চাউল-আটার দাবীতে, ৩০৲ নূনতম বেতন এবং অন্যান্য দাবীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বি, এণ্ড, এর রেলশ্রমিকদের বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানাইয়া এবং ইউনিয়নকে মানিয়া লইবার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রমিকদের একটি সংস্কৃতি বাহিনী সম্মেলনের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করে।

বিড়ি মজুরদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন

তামাকের ট্যাক্স তুলিয়া লও

গত ১২ই মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউট হলে সারা বাংলার লক্ষাধিক বিড়ি-মজুর ও দোকান-দারদের ৯০০ প্রতিনিধির এক বিরাট সম্মেলনে তামাকের উপর হইতে ট্যাক্স তুলিয়া লওয়ার দাবী ধ্বনিত হয়।

ইহা বাংলার বিড়ি কারিগর ও দোকানদারদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। বাংলার ছোট বড় সকল সহরের বিড়ি শ্রমিকদের সামনেই এক সমস্যা, এক বিপদ। প্রথমতঃ সুখার উপর সরকারী ট্যাক্স বসায় সুখার দর বহুগুণ বাড়িয়াছে এবং বহু রকমের হিসাবপত্র দাখিল ও ইনস্পেক্টর প্রভৃতির জুলুম বাড়িয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বিড়ি পাতার উপর কোন কন্ট্রোল ব্যবস্থা না থাকায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের অবাধ চোরাকারবারের ফলে উহার দর লড়াইয়ের আগের তুলনায় তিন চার গুণ হইয়াছে; তাহার উপর খাদ্যাভাব ও মহামারীতে সকলকে গ্রাস করিতেছে। এই অবস্থায় সকলে একত্রে বাঁচিবার পথ নির্দ্ধারণের জন্য মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মালদহ, ২৪ পরগণা, রাজসাহী, হুগলী, ময়মনসিংহ, খুলনা, রংপুর এবং কুমিল্লার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত হন। কলিকাতার ৫টি ওয়ার্ড কমিটির প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন।

সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা কমরেড হাজরা বেগম। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানায় ট্রাম, পোর্ট, রেলওয়ে প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব। ইহা ছাড়া, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, মহম্মদ ইসমাইল এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সম্মেলনে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "সারা দুনিয়ার জনগণ সোভিয়েটের অনুপ্রেরণায় ফ্যাসিস্তদের রুদ্ধে লড়াইয়ে আগাইয়া চলিয়াছে, স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। আমাদেরও কর্ত্তব্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য কায়েম করিয়া জাপ দুষমনের বিরুদ্ধে আগাইয়া চলা।" বিড়ি মজুর ও দোকানদারদের ইউনিয়নে যাহাতে মেয়ে মজুরদেরও গ্রহণ করা হয় তিনি তাহার জন্যও অনুরোধ জানান।

গান্ধীজীর মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় সরকার দাবী করিয়া, দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশকে রক্ষা করার দাবী জানাইয়া, তামাকের উপর হইতে ট্যাক্স তুলিয়া লইয়া বিড়ি পাতার উপর কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু করিতে অনুরোধ জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হয়।

সম্মেলনে বিড়ি শ্রমিকরা নিজেরাই সংস্কৃতিমূলক কার্য্যক্রমের ব্যবস্থা করে এবং বিড়ি শ্রমিক কমরেড জাকির হোসেনের লেখা একটি নাটিকা অভিনীত হয়। তুমুল উৎসাহের মধ্যে সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়।

রেশম শিল্পকে বাঁচাও

মালদা বাংলার সমস্ত রেশমের প্রায় এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন করে। রেশমের গুটির চাষ এবং 'খাটগাই' যন্ত্রে (চরকার মত যন্ত্র) রেশম তৈরীর ব্যবসা ঐ জেলার গ্রাম্য জীবনে একটী বিশেষ অর্থকরী পেশা। প্রায় আড়াই লাখ লোক এই ব্যবসা হইতে সংসার নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত গরীব এবং মাড়োয়ারী বা ধনীলোকের কাছে ঋণগ্রস্ত না হইয়া তাহারা কখনো কিছু করিতে পারে নাই। ফলে আজ সমস্ত রেশম শিল্প মুনাফাখোরদের হাতে। অথচ রেশম প্যারাসুটের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া যুদ্ধের জন্য দরকার। কাজেই সরকার নিজের সুবিধার জন্য গুটির দর মন প্রতি ৫৭৲ হইতে ৯৭৲ টাকা গুণানুসারে বাঁধিয়া দিল। এই দাম অবশ্য যুদ্ধের আগের দামের দ্বিগুণ, কিন্তু রেশম চাষী ও তাঁতিদের জীবন যাত্রার ব্যয় তো ৪ গুণ বাড়িয়াছে। তাই উৎপাদনের ব্যয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে মুর্শিদাবাদের মিলগুলি গত বৎসর ১৫০—১৮০৲ টাকা দাম দিতেছিল, কারণ তাহারা চোরাবাজারে ১২৫৲ টাকা সেরে রেশম বিক্রি করে। ফলে সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কানে ফল ফলে নাই। সরকার তখন ভারতরক্ষা আইনের বলে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করে যে গুটি চাষীরা খাটগাই মালিকদের কাছে গুটি বিক্রি করিতে পারিবে না এবং খাটগাই ওয়ালারাও কিনিতে পারিবে না। সরকারের আশা ছিল যে ইহার ফলে মাল বাজারে আসিবে। কিন্তু বাজারে এক অংশ রেশম ও আসে নাই। কারণ সরকারের নির্দ্ধারিত দরে চাষীদের মন প্রতি ৫০-৮০৲ টাকা লোকসান হয়। সরকারের এই নীতির ফলে সুবিধা হইল—মুনাফাখোরদের।

ভয় দেখাইয়া সুবিধা হইবে না বুঝিয়া সরকার পক্ষ হইতে চাষীদের সঙ্গে দাম সম্পর্কে আবার আপোষ আলোচনা হয় এবং ঠিক হয় যে সাময়িকভাবে ১০১৲ হইতে ১৩৫৲ টাকা দামে গুটির মন কেনা হইবে, কিন্তু সরকারী এজেন্টরা কেনা সুরু করিবার আগেই এ ব্যবস্থা উল্টাইয়া দেওয়া হয় এবং পুরাতন দামে কেনার নির্দ্দেশ আসে। ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এ বছরের গুটি নষ্ট হইবার সম্ভবনা দেখা দেয়। কারণ আর দুই তিন সপ্তাহ পড়িয়া থাকিলে সে গুলি নষ্ট হইবে, চাষীরা না খাইয়া মরিবে। সুযোগ বুঝিয়া চোরাবাজার-ও চুপ করিয়া আছে। তাহাদের আশা চাষীরা বিপদে পড়িয়া কম দামে বিক্রি করিতে বাধ্য হইবে। এক দিকে চাষীদের উপবাস এবং অপর দিকে প্যারাসুট তৈয়ারীর পথে বিঘ্ন, ইহাই হইল বর্ত্তমান অবস্থার ফল। সংকটের গুরুত্ব বুঝিয়া জেলার 'রেশম চাষী সমিতি'

(শেষাংশ ৪র্থ কলমে দেখুন)

গান্ধীজীর মুক্তিতে মজুরের আনন্দ

ফ্যাসি-বিরোধী সমস্ত বন্দী মুক্তির দাবী

গান্ধীজীর মুক্তিতে নারায়ণগঞ্জ মিল অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে প্রভূত আনন্দ এবং উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। মুক্তি সংবাদ পৌঁছিবামাত্র শ্রমিকরা ঠিক করিল ১॥০ ঘন্টা মিল বন্ধ রাখিয়া গান্ধীজীর মুক্তিতে আনন্দ উৎসব এবং তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া সভা করিবে।

১নং ঢাকেশ্বরী মিলে ম্যানেজারকে সভাপতি করিয়া প্রায় ৩০০০ হাজার শ্রমিক সভা করিল।

২নং ঢাকেশ্বরী মিলে মিল-ডিরেক্টর সূর্য কুমার বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া প্রায় ২০০০ হাজার শ্রমিক সভা করিল।

লক্ষ্মীনারায়ন মিলে মিল-ম্যানেজার সুনীল বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া ৫৫০ শত শ্রমিক সভা করিল।

চিত্তরঞ্জন মিলের শ্রমিকরা ম্যানেজারের নিকট ১ ঘন্টার জন্য ছুটী চাহিল, মালিক ছুটী দিল না, অথচ তাহারাই আবার বড় গলায় প্রচার করে দেশের অর্থে, দেশের স্বার্থে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে।

সমস্ত শ্রমিক সভাতে প্রতিজ্ঞা করিল—ফ্যাসী বিরোধী সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত করিব, খাদ্য সংকট, মহামারী এবং জাপানী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস লীগের ঐক্য গড়িয়া তুলিব এবং এই পথেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব।

সমস্ত কারখানার মজুর ও কর্মচারীদের মাগগি ভাতা ও রেশনিং সম্মেলন

বৃহস্পতিবার ২৫শে মে : প্রতিনিধিদের বৈঠক

স্থান : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল, ৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীট

সভাপতি : সোমনাথ লাহিড়ী

রবিবার ২৮শে মে :

মজুরদের বিরাট সভা

স্থান : শ্রেদ্ধানন্দ পার্ক

সভাপতি : বঙ্কিম মুখার্জি

প্রধান দাবী :

১। গবর্ণমেণ্ট মাগগি ভাতা তদন্ত কমিটির রায় অনুসারে পুরা মাগগি ভাতা দিবার আইন পাশ করাইতে হইবে

২। আপাতত এখনি মাসিক ৩০৲ টাকা মাগগি ভাতা চাই

৩। মজুরদের জন্য হপ্তায় ৫।০ রেশন চাই

২৮শে মে শ্রেদ্ধানন্দ পার্কে—

সব মজুর জমা হোন !

ট্রাম চলাচলের সুব্যবস্থার জন্য শ্রমিক ও নাগরিকদের মিলিত প্রচেষ্টা

ট্রাম চলাচলের উন্নতির জন্য সম্প্রতি ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে কলিকাতার নাগরিকরা তাহাতে অভূতপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছেন। গত ১৭ই মে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কাউন্সিলর শ্রীযুত যোগেন্দ্র লাল সাহা ট্রামযাত্রীদের দুর্ভোগের প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কোম্পানীর মনাফালোভী মনোবৃত্তির নিন্দা করেন। মেয়র সাহেব ঐ সম্পর্কে ট্রামওয়ে এডভাইসরী বোর্ডে আলোচনার আশ্বাস দেন।

ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিকট গেলে তাঁহারা খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাহাদের মধ্যে স্যার এফ, এ, রহমান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ, ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেন্ট মিঃ আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, এম, এল, এ, (কংগ্রেস), আব্দুল মজিদ, এম, এল, এ (লীগ), লাল মিঞা এম, এল, সি (লীগ), সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার (সাংবাদিক), ডাঃ এম, এন বসু (প্রিন্সিপ্যাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) মিঃ দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, কাউন্সিলর (মহাসভা), মিঃ সেলিম, কাউন্সিলর (লীগ), মিঃ শৈলেন্দ্র নাথ সিংহ, কাউন্সিলর (মহাসভা), ডাঃ ভূপেন বসু, কাউন্সিলর, মিঃ হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী, কাউন্সিলর, অধ্যাপক দুঃখ হরণ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন, :—

"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ট্রামশ্রমিক এবং তাহাদের ইউনিয়ন ট্রাম সার্ভিসের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। আমরা মনে করি যে যদি কোম্পানী শ্রমিকদের সহযোগীতায় মিলিতভাবে ট্রাম সার্ভিসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন তবে জনসাধারণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে ট্রাম কোম্পানী শ্রমিকদের যে বেতন ও মাগগী ভাতা দিয়া থাকেন তাহাতে শ্রমিকদের বর্ত্তমান খাটুনী খাটিয়া সুস্থ দেহে কাজ করা সম্ভব নয় বলিয়া আমরা মনে করি এবং পরিণামে যে ইহা সার্ভিস ভালভাবে চালু করিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের চারি সের রেশন বরাদ্দ তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের সওয়া পাঁচ সের বরাদ্দ, বেতন ও মাগগী ভাতা বৃদ্ধি হইলে ট্রাম সার্ভিসের উন্নতির পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবে। সুতরাং আমরা আশা করি যে ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপরোক্ত অবস্থাগুলি সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিবেন।

ইহা ব্যতীত আমরা ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে মাসিক টিকেটের মূল্য কম করিয়া ও অন্যান্য সুলভে যাতায়াতের সুবিধাগুলি যেমন, ট্রান্সফার, চিপ মিড ডে টিকেট ইত্যাদি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণকে আর্থিক কষ্ট হইতে রেহাই দেন।"

গত ১৪ই মে কালিঘাট ট্রাঙ্গুলার পার্কে এক জনসভা হয়। দক্ষিণ কলিকাতার জনসাধারণ ট্রাম শ্রমিকদের সহিত সৌহার্দ্দ ও সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

(১ম কলমের শেষাংশ)

কলিকাতায় একটী প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। বাংলা সরকারের ডিরেক্টর অব ইনডাষ্ট্রিজের সঙ্গে ইহাদের দেখা হইয়াছে। ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে সরকারী খরিদ্দার নিযুক্ত করিবার সময় এই সমিতির পরামর্শ বিবেচনা করা হইবে—এবং 'খাটগাই'র উপর গুটি কেনার যে নিষেধ ছিল তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে। খবর আসিয়াছে যে তাহারা আবার গুটি কিনিতে সক্ষম হইতেছে। কিন্তু আসল জিনিষই এখনো স্থির হয় নাই। গুটির মূল্য সরকার কি রেটে ধার্য্য করিবে তাহা অবিলম্বে স্থির করা দরকার। ডিরেক্টর মালদার স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের এই আপোষ আলোচনায় যোগ দিতে ডাকিয়াছেন। এই আপোষ আলোচনার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে চোরাবাজারকে দমন করিয়া ২॥০ লাখ বাংলার রেশম-চাষীকে অন্ন দেওয়া যাইবে কিনা, যুদ্ধের জন্য প্যারাসুট নির্ম্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে কিনা। বাংলায় আজ দুঃস্থদের জীবন পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করা হইতেছে অথচ এই রকম একটী প্রয়োজনীয় শিল্পকে এই অবস্থায় নষ্ট করিয়া দেওয়ার অর্থ হইল দুঃস্থদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা। সমস্ত বাংলা এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিশ্চয় রুখিয়া দাঁড়াইবে।

জনশক্তির আঘাতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে

ফরাসী ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সূচনা

২৬শে এপ্রিল আলজিয়ার্স হইতে 'ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি' ফরাসী ভারতের শাসনকর্তা পণ্ডিচেরীর গভর্ণরের নিকট 'মে-ডে' উপলক্ষে যে তার পাঠাইয়াছে তাহার সারমর্ম :—ফ্যাসিস্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে মজুর শ্রেণী আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়াছে। যাহাতে তাহারা উৎপাদন বাড়ানোর জন্ত যথাশক্তি নিয়োগ করিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ শুনা হউক ; উৎপাদন বাড়ানো সম্পর্কে তাহাদের পরিকল্পনা মিল মালিককে গ্রহণ করাইতে বাধ্য করা হউক এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে খোলাখুলি মিশিতে দেওয়া হউক। জাতীয় মুক্তি কমিটি মে ডে-এর সঙ্গে সরকারীভাবে নিজেকে যুক্ত করিতেছে।

পণ্ডিচেরীর পরের ঘটনা—৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে আট হাজার মজুর পণ্ডিচেরীর রাস্তায় লাল পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে ও সভায় সমবেত হইয়া দাবী করিতেছে তাহাদের বহিষ্কৃত নেতা সুব্বায়ার উপর হইতে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হউক। পণ্ডিচেরীর সমস্ত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান 'কম্বাটের' সভ্যদের বিরুদ্ধে পদচ্যুতি, ট্রান্সফার প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হউক এবং 'কম্বাট'কে কাজ করিতে দেওয়া হউক। আরও পরবর্ত্তী খবর—লিবারেশন কমিটির নির্দ্দেশ ও জনগণের চাপে গভর্ণর দোরাইরাজ নামক একজন শ্রমিক নেতার মারফৎ মাদ্রাজে সুব্বায়ারের নিকট খবর পাঠাইয়াছেন যে তিনি বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারেন যদি সুব্বায়ার তাহার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রচার কার্য্য বন্ধ করেন।

২০শে এপ্রিল গভর্ণর সুব্বায়াকে পণ্ডিচেরী হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন আর তাহার দশদিন পরে ৩০শে এপ্রিল তাঁহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিতে রাজী বলিয়া দূত পাঠাইতেছেন। ফরাসী লিবারেশন কমিটির সত্যকার প্রগতিশীলরূপ এবং পণ্ডিচেরীর জনগণের ঐক্য ও আন্দোলন আজ যে কত দূর শক্তিশালী ইহা না বুঝিলে এই ঘটনা দুইটীর পিছনের কারণ বোঝা যাইবে না।

প্রগতির প্রতীক ফরাসী লিবারেশন কমিটি

ফরাসী লিবারেশন কমিটি ফ্রান্সের মুক্তিকামী জনগণের সত্যকার প্রতিনিধিরূপে প্রতিদিন রূপান্তরিত হইতেছে। আজ বুঝিতে হইবে—ফ্রান্স আর সেই পুরাতন যুগের ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স নাই। ডালাদিয়ে, বনে, পেঁতা, লাভাল প্রভৃতি যে ভণ্ড সাম্রাজ্যবাদীর দল একদিন ফ্রান্সের শোষিত চাষী মজুরের উপর চরম শোষণ ও অত্যাচার চালাইয়াছিল যাহারা নিজের ক্ষুদ্র ধনিক স্বার্থ রক্ষার জন্ত ফ্রান্সকে হিটলারের বুটের তলায় সঁপিয়া দিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ জনগণ জাগ্রত হইয়া তাহাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। ফ্যাসিস্ট দাসত্ব ও নির্য্যাতন আজ ফ্রান্সের জনগণকে জাগ্রত করিয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের এই দাসত্বের জন্ত দায়ী তাহাদেরই দেশের ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ট দালালদের দল। তাই নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহারা যেমন একদিকে হিটলারী দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিতেছে তাহাদের দেশের ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের। ফ্রান্সের স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ প্রতিদিন ধ্বংস করিতেছে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সকে আর সেই ধ্বংসের ভিতরই জন্ম লইতেছে বিপ্লবী ফ্রান্স, প্যারী কম্যুনের ফ্রান্স। ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী জনগণ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে সত্যকার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের সঙ্গে তাহাদের হাত মিলাইতে হইবে। তাই দেখিতে পাই যে ফ্রান্সের এই মুক্তিকামী জনগণ ফ্যাসিস্ট দালালদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেছে যথা, পিসুর মৃত্যুদণ্ড, সিরিয়া ও লেবাননের জনগণের ; স্বাধীনতার দাবী, আফ্রিকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী, নারীর ভোটাধিকারের দাবী, পণ্ডিচেরীর মজুরদের দাবী সমর্থন করিতেছে। তাই দেখিতে পাই এক দিকে যেমন 'কম্বাট' গঠন করিয়া তাহারা নিজেদের দেশের সমস্ত স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই 'কম্বাট'কে বিস্তৃত করিতেছে উপনিবেশে সেখানকার প্রগতিশীল জনগণের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্ত।

'কম্বাট' তাই স্বাধীনতাকামী ফ্রান্স ও উপনিবেশের জনগণের একটী ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। 'কম্বাটের' প্রধান কেন্দ্র এখন এলজিয়ার্সে। 'কম্বাট' প্রতিদিন সংগ্রাম করিয়া 'লিবারেশন কমিটিকে' প্রগতিশীল করিতেছে। পণ্ডিচেরীর গভর্ণরের নিকট 'লিবারেশন কমিটি'র ২৬শে এপ্রিলের নির্দ্দেশ ইহারই প্রমাণ।

ফরাসী ভারতে 'কম্বাটের' জন্ম

জানুয়ারী মাসে আলজিয়ার্স হইতে আনিসিয়াম নামে কম্বাটের একজন প্রতিনিধি ফরাসী ভারতে 'কম্বাটে'র শাখা বিস্তারকল্পে পণ্ডিচেরীতে আসেন। তিনি পণ্ডিচেরীর ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রগতিশীল কুড়িটি প্রতিষ্ঠান ও দলের প্রতিনিধিদের সভা ডাকিয়া কম্বাট প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিচেরীর ১৫ হাজার মজুরের একচ্ছত্র নেতা কমরেড সুব্বায়াকে ইহার সভাপতি করা হয়। কম্বাটের মধ্যে ফ্রান্সের সত্যকার স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল কয়েকজন ইউরোপীয়ান রাজকর্ম্মচারী, হাইকোর্টের জজ, অধ্যাপক প্রভৃতি ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীও আছেন।

প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীর আঘাত

কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যদিও ফ্রান্স ও উত্তর আফ্রিকায় জনগণের সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীলদের একেবারে কোনঠাসা করিয়া ধরিয়াছে, আজও তাহারা ভারত তথা উপনিবেশের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত খবর জানে না, আজও বৃটীশ তথা ফরাসী আমলাতন্ত্রের চক্রান্তের ফলে সব খবর সেখানে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতেছে না। তাই উপনিবেশে যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা এতকাল প্রতিক্রিয়াশীল নীতির উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা আজও বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। তাই 'কম্বাট' গঠনকে ফরাসী আমলাতন্ত্র মোটেই সুনজরে দেখে নাই। কম্বাটের মধ্যে তাহার নাম রাখিবার চেষ্টা হইলে গভর্ণর পদত্যাগ করিয়াছেন এবং আলজিয়ার্সে যাইয়া কম্বাটের বিরুদ্ধে প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। গভর্ণরের আলজিয়ার্সে যাওয়ার পর সুব্বায়া পণ্ডিচেরী হইতে দ্য-গলের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে জনসাধারণের বক্তব্য জানাইবার জন্য আনিসিয়াম আলজিয়ার্সে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত গভর্ণরকে আটকাইয়া রাখা হউক। দ্য-গল তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু আনিসিয়ামের পৌঁছানোতে দেরী করার জন্ত পিছন হইতে কলকাটি নড়ে ; ফলে আনিসিয়াম পৌঁছানর পূর্ব্বেই গভর্ণর আলজিয়ার্স হইতে চলিয়া আসেন।

এদিকে কম্বাটের শক্তি বাড়িতেছে, কম্বাটের শাখা মাহে, কারিকালের দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। আমলাতন্ত্র অধীর হইয়া উঠিল—তাহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ধ্বংসের দিন আগত। আমলাতন্ত্র পাগলের মত কম্বাটের উপর আঘাত সুরু করিল—(১) সুব্বায়াকে বহিষ্কার করা হইল (২) কম্বাটের অন্তর্ভুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত বা ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করা হইল—সম্পাদক অধ্যাপক ল্যাম্বার্ট ও মিউনিসিপাল অফিসের কর্ত্তা তরুণামূর্ত্তিকে পদচ্যুত করা হইল—হেলথ অফিসার ডাক্তার সেন্ট-রোজ ও অর্থবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ তেতাকে (তাঁহার স্ত্রী কম্বাটের সভ্য) ইয়ানমে বদলী করা হইল এবং দুইজন বিচারপতিকে (কম্বাটের সভ্য) ভারতের বাহিরে বদলীর জন্ত আলজিয়ার্সে লেখা হইল। আমলাতন্ত্র আজ সোজাসুজি কম্বাটকে বে-আইনী করিতে পারে না, তাই ইহার সদস্যদের বহিষ্কার করিয়া, ট্রান্সফার করিয়া, পদচ্যুত করিয়া কম্বাটকে ভাঙ্গিয়া দিতে চায়।

আমলাতন্ত্র পিছু হঠিতেছে—তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী

আমলাতন্ত্রের এই দমননীতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কম্বাটের উপর আঘাতে, পণ্ডিচেরীর মজুর নেতা সুব্বায়ার উপর আঘাতে, অধ্যাপক ল্যাম্বার্টের উপর আঘাতে, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকালের সমস্ত মজুর, ছাত্র, জনগণ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহারা আজ বৃটীশ ভারতে ৯ই আগষ্টের ন্যায় কোন ধ্বংসমূলক কাজ সুরু করে নাই, তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিয়াছে—আমরা ফ্রান্সের স্বাধীনতা চাই, আমরা ফরাসী ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার চাই—আমরা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধে জয়লাভ করিতে চাই, আমাদের দেশরক্ষা করিতে চাই ; ইহার জন্ত সুব্বায়ার উপর হইতে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হোক, দমননীতি বন্ধ করা হোক, কম্বাটকে কাজ করিতে দেওয়া হোক।

পণ্ডিচেরীর জনগণ আজ ফ্রান্সের প্রগতিশীল জনগণের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে, ফ্রান্সের জনগণের আন্দোলন প্রতিদিন বৈপ্লবিক আকার ধারণ করিতেছে—পণ্ডিচেরীর জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। লিবারেশন কমিটি প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে কাজ করিতেছে—জনগণের বক্তব্য শোনার জন্ত আনিসিয়ামকে আহ্বান, ২৬শে এপ্রিল গভর্ণরের নিকট তার তাহারই প্রমাণ।

তাই পণ্ডিচেরীর মজুরদের শোভাযাত্রা, লিবারেশন কমিটির তার গভর্ণরকে বাধ্য করিতেছে তাহাকে দমননীতি প্রত্যাহারের দিকে আগাইতে।

ফরাসী চন্দননগর বাসী আজ নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। খাদ্য সংকট তাহাদের দারুণ ভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, সহরের সুষ্ঠু রেশনিং এবং এ, আর, পি ব্যবস্থা নাই, মজুরদের পুরা মাগগিভাতা দিবার ব্যবস্থা হয় নাই ; ইহার উপর চাপিয়াছে নব-প্রবর্ত্তিত হাউস্ ট্যাক্সের দু তিন বছরের দেয় করের বোঝা। জনসাধারণের নৈতিক শক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় চন্দননগরবাসীকে যদি তাহার দাবী দাওয়া আদায় করিতে হয় তবে পণ্ডিচেরী তথা ফ্রান্সের জনগণের সঙ্গে তাহাদের হাত মিলাইতে হইবে ; চন্দননগরবাসীকে ঘোষণা করিতে হইবে যে আমরাও ফ্রান্সের মুক্তি চাই, ফরাসীভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার চাই, হাউস ট্যাক্স কমান বা স্থগিত চাই।

চন্দননগরবাসীকে দাবী করিতে হইবে আমরা সুষ্ঠু রেশনিং ও এ, আর, পির ব্যবস্থা চাই বৃটীশ ভারতের সঙ্গে সমান দরে খাদ্য চাই। আর এই কাজ করার জন্ত সমস্ত প্রগতিশীল জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে—খাদ্যের জন্ত খাদ্য-কমিটি গড়িয়া আমলাতন্ত্রকে তাহার সহযোগীতা লইতে বাধ্য করিতে হইবে।

পণ্ডিচেরীর জনগণের সঙ্গে সমান তালে পা মিলাইয়া চলিলে চন্দননগরবাসীর জয় আজ অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতাকে আবর্জনা মুক্ত কর

শুধু সিদ্ধান্ত নয় বাস্তব কাজ চাই

কলিকাতার রাস্তাঘাট আজও পরিষ্কার হয় নাই। এখনও রাস্তায় রাস্তায় স্তুপিকৃত আবর্জনা জমিয়া থাকে। এই নোংরামির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কলিকাতার জনস্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমত বস্তী অঞ্চলেই রোগের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে ইহা বিস্তার লাভ করিয়া অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থায় স্বভাবতই চারিদিক হইতে কলিকাতা নগরীকে পরিচ্ছন্ন করিবার দাবী উঠিতে থাকে। ষ্টেটসম্যান পত্রিকাই বিশেষ করিয়া এই অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

সুখের বিষয় নূতন মেয়র শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার কলিকাতা সহরকে আবর্জনা মুক্ত করিবার জন্ত তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার উদ্যোগে কাজ কিছুটা আরম্ভও হয়। কর্পোরেশনের শ্রমিকগণ মেয়রের এই উদ্যোগে প্রশংসনীয় ভাবে সাড়া দেয়।

বাক্যুদ্ধে আবর্জনা দূর হয় না

কিন্তু এই সময়ে কর্পোরেশন ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এক বিরাট বাক্যুদ্ধ সুরু হইয়া যায়। অপরিচ্ছন্নতার জন্ত দায়ী কে? কর্পোরেশন, না বাংলা সরকার? মেয়র শ্রীযুত পোদ্দার বলেন যে কলিকাতার জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে অথচ আবর্জনা দূর করিবার জন্য আবশ্যকীয় মোটরগাড়ী, পেট্রোল প্রভৃতির নানাপ্রকার অসুবিধা বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের নিকট বারবার জানাইলেও বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। মেয়রের বিবৃতির উত্তরে বাংলা সরকার জানান যে, তাহাদের নাকি কোন দোষই নাই।

আসল কথা ইহাই যে, বাংলা সরকার কিংবা করপোরেশন কোনদিনই নাগরিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন নাই। বর্ত্তমানে মোটরগাড়ী, পেট্রোল প্রভৃতি ব্যাপারে যে অসুবিধা হইতেছে তাহা অতি সত্য। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত বাংলা সরকার কোনও তৎপরতা দেখান নাই। অন্যদিকে কর্পোরেশনের ভিতরকার দুর্নীতির কথাও কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কলিকাতাকে পরিচ্ছন্ন করিবার গুরুতর সমস্যা যখন চারিদিকে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইতে থাকে, যখন মেয়র এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইয়া উঠেন এবং যখন গরীব শ্রমিকরাও নগরীকে রক্ষার প্রশংসনীয় উদ্যম ও স্বার্থত্যাগের আদর্শে আগাইয়া আসে—তখন কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও হেলথ অফিসার বিনা নোটিশেই ছুটি নিয়া বাহিরে চলিয়া যান। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারীদের অপদার্থতার জন্যই আজ কলিকাতার নাগরিকদের জীবন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নাগরিকদিগকে রক্ষা কর

এসোসিয়েটেড প্রেস ২০শে মে তারিখের এক খবরে জানাইয়াছে যে কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে আবর্জনা অপসারণ সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ পূর্ণ সহযোগিতা সহকারে কাজ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এই সিদ্ধান্ত যাহাতে তড়িৎ গতিতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহাই আমরা চাই। সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর। বর্ষাকাল আসিতেছে, এখন আবর্জনা তাড়াতাড়ি অপসারিত না হইলে সমগ্র কলিকাতায় মহামারী এক ভীষণ বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা আশা করি মেয়র এই অতি জরুরী কাজটী আবার নূতন উদ্যম ও উৎসাহে আরম্ভ করিবেন। এর জন্য তাঁহাকে দৃঢ়হস্তে কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করিতে হইবে। এই কাজে শ্রমিকগণের উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্যও তাঁহার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে এবং কর্পোরেশনের শ্রমিকগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিবে না। কলিকাতার নাগরিকগণকেও নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্যই সর্ব্বতোভাবে এই কাজে সহযোগিতা করিতে হইবে। অবিলম্বে কলিকাতা নগরী আবর্জনা মুক্ত হইয়া উঠুক ইহাই আমরা চাই।

গান্ধিজীর মুক্তিতে কিষাণ কাউন্সিলের অভিনন্দন

গত ১৩ই, ১৪ই, ও ১৫ই মে তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার অফিসে প্রাদেশিক কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক হয়। নানাদিক দিয়া অধিবেশনটির খুব গুরুত্ব ছিল। মার্চ্চ মাসের ১লা ও ২রা তারিখে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয়। তারপর কার্য্যতঃ এইটিই প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক। ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি পরিষদের অন্যতম, মৈমনসিং-এর কমরেড মণি সিং সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বৈঠকে আলোচনার জন্য খাদ্য, জাপ আক্রমণ, ফসল বাড়াও, ভলাণ্টিয়ার বাহিনী সংগঠন ও পাট পরিস্থিতি সম্পর্কে ৫টি জরুরী প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত ছিল এবং তাহার এক একখানি নকল সভা আরম্ভের পূর্ব্বেই সদস্যদের দেওয়া হয়। সম্পাদক কমরেড মনসুর হবিব মৌখিক রিপোর্ট দেন ও কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায় কাজের পর্য্যালোচনা করেন। তারপর প্রস্তাবগুলির আলোচনা হয় এবং আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলি সংশোধিত হওয়ার পর ১৫ই তারিখে ঐগুলি গৃহীত হয়।

অধিবেশনের কয়েকদিন আগে মহাত্মাগান্ধী কারামুক্ত হন। কমরেড ভবানী সেন একটি প্রস্তাব তুলিয়া কারামুক্ত গান্ধীজীকে অভিনন্দন করেন এবং তিনি সুস্থ হইয়া জাতিকে জাপ প্রতিরোধ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও জাতীয় ঐক্যের পথে লইয়া যাইবেন এই আশা প্রকাশ করেন।

সবেমাত্র পৌঁছিল

১। মস্কো নিউজ

নং ৮৪,৮৬,৮৭,৮৯—১০১ (ডিসেম্বর, ১৯৪৩)

নং ১৮,১৪,১৬,১৮ ('৪৪-এর ১লা মার্চ পর্য্যন্ত)

সব সংখ্যা একত্রে—১৷৶০ আনা

২। ইণ্টার ন্যাশানেল লিটারেচর

নং ৮, ৯ এবং ১০ প্রতি সংখ্যা—১ টাকা

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিমিটেড,
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Regd. No. C. 2836

আসাম ও ব্রহ্মের যুদ্ধক্ষেত্র

মিচিনা দখলের যুদ্ধ

উত্তর ব্রহ্মের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাৎপর্য্যপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে। মিচিনা সহরের একাংশ এখন জেনারেল ষ্টিলওয়েলের সৈন্যবাহিনীর দখলে। মিত্র আমেরিকান ও চীনা ফৌজ এরোড্রোম দখল করিবার পর মিচিনা সহরের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। মিচিনা ও ভামোর ভিতর জাপদস্যুদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মিচিনার উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব হইতে মিত্র বাহিনী সহরের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতেছে। মিচিনার পতন আসন্ন!

এদিকে চীনের দক্ষিণ অংশে কুয়োমিনটাং বাহিনী সালুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা এখন জেনারেল ষ্টিলওয়েলের বাহিনী হইতে ৮০ মাইল দূরে। ইহারা বর্মারোডের উত্তর এবং দক্ষিণে প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। মিচিনা ও ভামোর মধ্যবর্ত্তী রণক্ষেত্রে জাপ দস্যু বাহিনী এই অভাবনীয় যোগাযোগের সম্ভাবনায় সত্য সত্যই বিপন্ন।

মিচিনা সহর উত্তর ব্রহ্মের একটি প্রধান সহর, রেলপথ যোগাযোগের একটি কেন্দ্রস্থল। মিচিনার এই অভিযান ব্রহ্মদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে।

কোহিমার মুক্তি

আসামের রণক্ষেত্রে কোহিমার পার্শ্ববর্ত্তী নাগাদের গ্রাম হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হইয়াছে। কোহিমার ভিতর ভারতীয় সৈন্য বাহিনী এখন জাপদের উৎখাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোহিমা-ডিমাপুর রাস্তা এখন মিত্র বাহিনীর প্রভাবের মধ্যে।

যুদ্ধক্ষেত্রের এই ঘটনাবলী ভারতের পক্ষে আশাজনক। কিন্তু সামরিক জয়লাভের এই কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমগ্র যুদ্ধের সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্ট থাকিলে বিপদ অতর্কিতে ঘোরতর হইয়া উঠিবে। জাপদস্যু এমন এক শত্রু যাহাকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ নাই।

বিপদ কোন্ দিকে

বিশেষতঃ ডিমাপুর এবং শিলচর রাস্তা হইতে জাপানী ফৌজকে এখনও উৎখাত করা হয় নাই। বর্ষা নামিলেও এই অঞ্চলে জাপানীদের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ডিমাপুর শিলচর অঞ্চলে জাপানীদের প্রভাব যদি বাড়ে তাহা হইলে কাছাড় জেলা বিপন্ন হইবে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধির ভিতর আসিয়া পড়িবে। ইম্ফল অঞ্চলে যুদ্ধ এখনও মন্থর গতিতে চলিতেছে। এখনও কোহিমার ভিতর এবং তাহার কাছাকাছি পাহাড় গুলিতে জাপশত্রুর ঘাঁটি রহিয়াছে। এতদিনেও যে শত্রুকে আসাম ফ্রন্ট হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই, এখনও যে শত্রু কোহিমা, ইম্ফল এবং ডিমাপুরের নিকট সদলবলে অবস্থান করিতেছে তাহাই যথেষ্ট বিপজ্জনক।

চীনের বিপর্য্যয়

এদিকে খাস চীনের ভিতর হোনান প্রদেশে জাপদস্যু বাহিনী নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। জাপদস্যুর এই অভিযানে হোনান প্রদেশের জাতীয় ফৌজ বিপন্ন, কুয়োমিন্টাং বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের অষ্টম রুট্ আর্ম্মির যোগ যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম। এই যুদ্ধে যদি জাপ সৈন্য বাহিনী বিজয়ী হয় তাহা হইলে সমগ্র চীন নূতন বিপদের সম্মুখীন হইবে, সমগ্র চীনের দেশরক্ষার ব্যবস্থা সাংঘাতিক ভাবে দুর্ব্বল হইবে।

চীনের এই নূতন দুর্ব্বলতার কারণ জাতীয় অনৈক্য। চীনের সীমান্ত গভর্ণমেন্ট এবং অষ্টম রুট্ আর্ম্মি জাপানকে পর্য্যুদস্ত করা সত্বেও কুয়োমিনটাং গভর্ণমেন্ট এই অঞ্চলের কমিউনিস্ট প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। কুয়োমিনটাংএর ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীল ভেদপন্থীরা অনবরত চিয়াংকাইশেককে গৃহযুদ্ধের জন্য উস্কাইয়া আসিতেছে এবং অষ্টম্ রুট আর্ম্মি ও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটনা করিয়া কুয়োমিন্টাং এর ভিতর ভ্রাতৃদ্রোহিতার বীজ ছড়াইয়া আসিতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে অষ্টম রুট্ আর্ম্মি প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায়ই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, কুয়োমিনটাং এর জাতীয় সরকার হইতে অস্ত্র সাহায্য তাহারা পায় না। বরং কুয়োমিন্টাং গভর্ণমেন্ট সৈন্য বাহিনীর একটি বিরাট্ অংশকে সীমান্ত প্রদেশে মোতায়েন রাখিয়াছে অষ্টম রুট্ আর্ম্মির উপর নজর রাখিবার জন্য, এই সৈন্য বাহিনী হোনান্ প্রদেশে জাপ প্রতিরোধের কাজে নিযুক্ত রাখিলে জাপানীদের আজ সাধ্য কি ছিল যে হোনান প্রদেশে প্রবেশ করে? ইদানিং চীন অনেক সামরিক জয়লাভ করা সত্বেও এবং জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বত্র বিষম আঘাত খাইবার পরও চীনের জাতীয় ঐক্য যেমনই একটু শিথিল হইয়াছে, অমনি জাপদস্যু একটা বড় রকমের জয়লাভ করিয়া সমগ্র চীনের স্বাধীনতা আবার বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

অচল অবস্থার অবসান চাই

চক্ষের উপর এই নিদর্শন হইতে সহজেই বুঝা যায় আসাম ব্রহ্মের দুই একটা সামান্য জয়ের ভিতর কত বড় বিপদ লুকাইয়া আছে। আজ এখন সমগ্র ব্রহ্ম হইতে জাপদের বিতাড়িত হইবার কথা, আজ এখন আসাম প্রান্তে জাপদের সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন যাইবার কথা, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি মিত্র বাহিনীর মন্থর গতি, মোটের উপর জাপদস্যু তাহার অধিকৃত অঞ্চলে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে।

যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হয় ততই দেশের ভিতরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্য্যোগ দেখা দেয়। বাংলার ভিতর দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও আত্মসংঘর্ষ দিনের পর দিন জাপদস্যুরই জয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছে। সীমান্তে যখন শত্রু সৈন্য দৃঢ় ভাবে অধিষ্ঠিত তখন বাংলার বিভিন্ন দল মাধ্যমিক শিক্ষাবিল উপলক্ষ করিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার চেয়ে আত্মঘাতী অন্ধতা আর বেশী কি হইতে পারে?

মিত্র বাহিনীও যুদ্ধ ক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। কোহিমা, ইম্ফল এবং ডিমাপুর হইতে বর্ষার আগেই যদি জাপানীদের সম্পূর্ণ হটান না যায় তাহা হইলে এ যুদ্ধ দীর্ঘ স্থায়ী হইবে এবং তাহার ফল আমাদের জাতীয় জীবনের উপর সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং কত তাড়াতাড়ি আসাম হইতে জাপানীদের তাড়ান যায় সেই সমস্যাই বড় সমস্যা। কিন্তু রাজনৈতিক অচল অবস্থা দ্রুত জয়লাভের পথে বাধা। আজ কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ জয়ের আহ্বান জানাইলে জাপানীদের সাধ্য কি যে আসাম প্রান্তে অবস্থান করে? যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে জনগণের ভিতর হতাশা ও পরাজয়ের মনোবৃত্তি দূর হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর রণকৃতিত্ব বাড়িবে। অথচ এখনও গভর্ণমেন্টের সেদিকে নজর নাই।

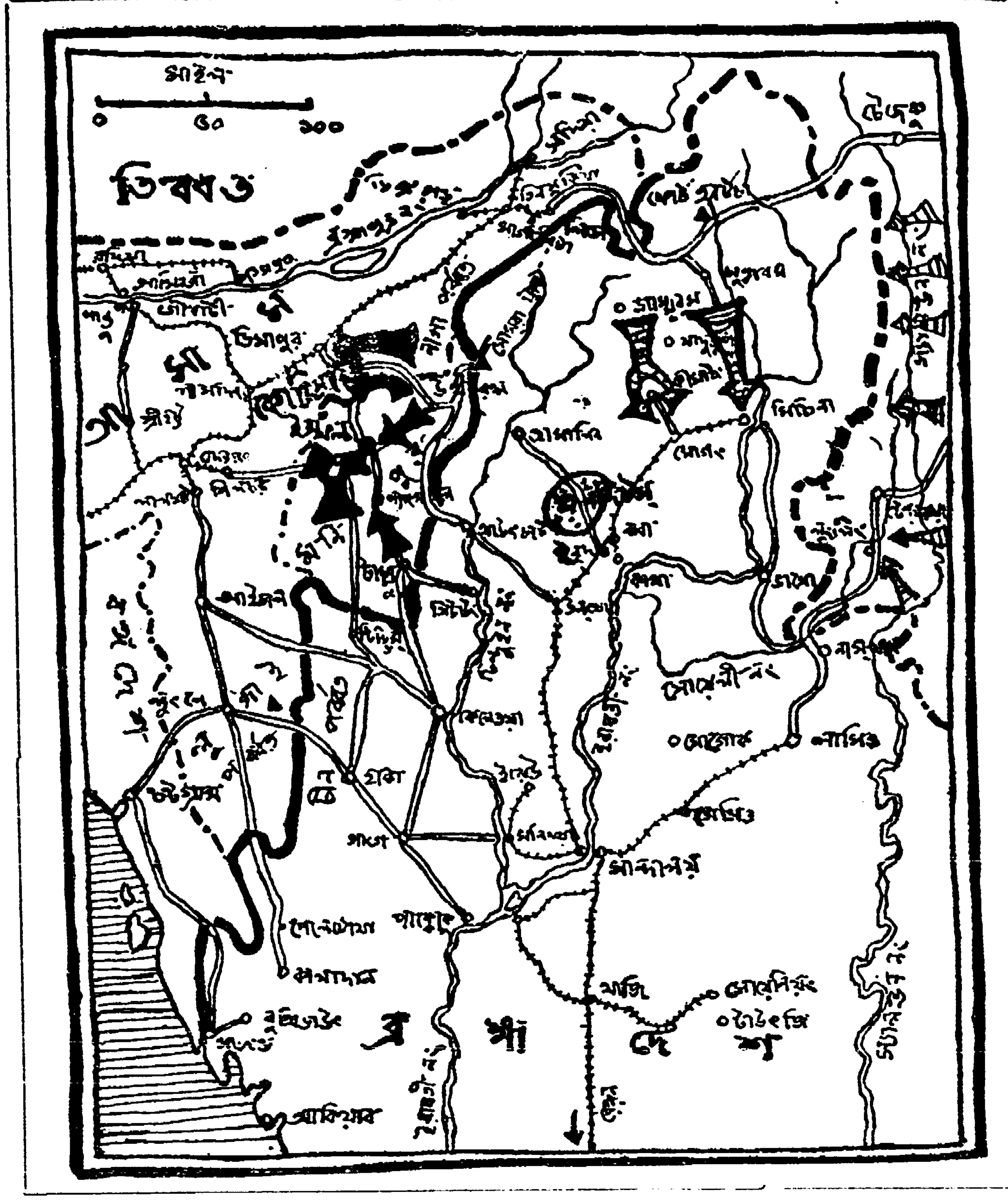

গান্ধীজীর মুক্তিলাভ নূতন সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ গভর্ণমেন্ট চলিতেছে আস্তে আস্তে, বহুদিন ব্যাপী মন্থর পরিবর্ত্তনের সূত্র ধরিয়া। অবিলম্বে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত কর, অবিলম্বে অচল অবস্থা তাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হও, অবিলম্বে আসাম প্রান্তে ব্যাপক প্রতি আক্রমণের ব্যবস্থা কর। এই নীতির পরিবর্ত্তে ধীর মন্থর গতি কেন দেখিতেছি? তাহার কারণ, আমলাতন্ত্রের সাম্রাজ্য নীতি। দেশে ও বিদেশে জনগণের চাপে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তায় আমলাতন্ত্র নূতন পথ ধরিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের ভিতর জাতীয় ঐক্য নাই, যেহেতু আমাদের ভিতর অচল অবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন নাই, তাই জনগণের চাপ অতি অল্প, তাই পরিবর্ত্তনও হইতেছে খুব ধীরে ধীরে, তাই যুদ্ধক্ষেত্রেও সামরিক অভিযানের গতি অত্যন্ত মন্থর।

ইতালীতে নাৎসীরা পিছু হটিতেছে

গত ১২ই মে হইতে মিত্র সৈন্য পুনরায় ইতালীতে অভিযান সুরু করিয়াছে। অভিযানের সাথে সাথেই জার্ম্মান সৈন্য কিছুটা হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুরক্ষিত, গুস্টভ লাইন মিত্র সৈন্যের আঘাতে চুরমার হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানদের হিটলার লাইনের অবস্থাও টলমল। অষ্টম ও পঞ্চম আর্মির বাহাদুর সৈন্যরা আজ বাধা সরাইয়া ইতালীতে ফ্যাসিস্ট দানবের কবর খুড়িতেছে। ১৪ই মে ফরাসী সৈন্যরা ক্যাসেল ফোর্ট অধিকার করিয়াছে। ১৮ই মে মিত্রশক্তি ক্যাসিনো দখল করিয়াছে। ক্যাসিনো লইয়া ইতালীতে বহুদিন যাবত লড়াই চলিয়াছে, জার্ম্মানরা মরিয়া হইয়া এখানে মিত্র সৈন্যের পথ আগলাইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু আজ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মিত্র সৈন্য আজ ঘৃণিত নাৎসীদের খেদাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ২০শে মে আমেরিকান সেনারা গায়েটা দখল করিয়াছে। ২১শে মে পিডমন্ট মিত্র সেনার অধিকারে আসিয়াছে। এই পিডমন্টেই কিছুদিন আগে স্বদেশ প্রেমিক ইতালীয় গেরিলারা জার্ম্মানদের নাস্তানাবুদ করিতেছিল। পিছন হইতে গেরিলাদের আক্রমণ, আবার সম্মুখে মিত্র বাহিনীর ধাক্কা, নাৎসীরা দাঁড়াইতে পারে নাই, পিডমন্ট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। তার পরের খবর আরও জোরালো—মিত্র সেনা কাও দখল করিয়াছে। ইতালীর অভিযানের এই সাফল্য দ্বিতীয় ফ্রন্ট ঘোষণার সাথে সাথে আরও ব্যাপক হইয়া পড়িবে। ইতালীর জনগণও আজ সেই শুভ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছে।

ঢাকার দাঙ্গা রুখিতে সকল দলের মিলিত আহ্বান

[নিজস্ব সংবাদদাতার তার, ঢাকা, ২৩শে মে

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তা আশালতা সেন (কংগ্রেস), মিঃ গিরীশ দাস (হিন্দু-মহাসভা), মিঃ সামসুল হক্, মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ ও মিঃ সলিম (লীগ), মিঃ কেশব ব্যানার্জ্জি (ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন) এবং মিঃ জ্ঞান চক্রবর্ত্তী (কমিউনিষ্ট পার্টি) এক যুক্ত আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে জানাইয়াছেন যে, দাঙ্গার ফলে শহরে শান্তির বিঘ্ন হইতেছে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যুর সমস্যা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। ঢাকা শহরের সমস্ত হিন্দুমুসলমান যাহাতে আপন আপন মহল্লায় শান্তির জন্য তৎপর হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন আবেদনে তাহাই জানানো হইয়াছে।

★ ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনে ★

এমেরীর বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট নেতা পামী দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সহকারী সভাপতি মিঃ রজনী পামি দত্ত বার্ম্মিংহামের অন্তর্গত স্পার্কব্রুক কেন্দ্র হইতে আগামী নির্ব্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতেছেন। এই কেন্দ্রের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ভারত সচিব মিঃ এমেরী। মিঃ পামি দত্ত বিলাতের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের ভিতর অন্যতম। রয়টারের প্রতিনিধি আগামী স্পার্কব্রুক নির্ব্বাচন সম্পর্কে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—এই নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃটেনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ভারতের সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত ২ বৎসর ধরিয়া কমিউনিস্ট পার্টি 'আমেরীকে সরাও' আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালাইয়া আসিতেছে। এবং স্থানীয় লেবর এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়াই আমাকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে দাঁড়া করান হইতেছে। লেবর, ট্রেডইউনিয়ন ও কো-অপারেটিভ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন গুলির এক যুক্তবোর্ডের মিটিংএ আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমর্থন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রে এই সব দলগুলির অন্য কোন প্রার্থী নাই। তেহেরান সম্মেলনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া আমরা এই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিয়াছি। সম্মিলিত শক্তির জয়, ফ্যাসিস্টবাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। মিঃ এমেরী এই কেন্দ্র হইতে ৯ বৎসর আগে ৯০০০ ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হন, তাহার পর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ যদি সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলি এক হইয়া এমেরীর বিরুদ্ধে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামে, তবে এটা নিঃসন্দেহ যে আমরা জয়ী হইবই।

জরুরী নোটিশ

কমরেড এজেন্ট,

বর্ত্তমান রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা অনেককে বাকীতে কাগজ দিতেছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের বেশী কাগজ বাকীতে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ কমরেডরা অনেকেই এক সপ্তাহের মধ্যে বাকী টাকা পাঠাইতেছেন না; বাকীতে কাগজ পাইলেই যে আমাদের টাকা পাঠাইবার দায়ীত্ব কমিয়া গেল তাহা নয়। বরং শীঘ্র শীঘ্র সে টাকা শোধ করা দরকার, এইরূপ দায়ীত্ব জ্ঞানের যেখানে অভাব সেখানে বাকীতে কাগজ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, তাই ভবিষ্যতে আর এক সপ্তাহের বেশী কাউকে বাকীতে কাগজ দেওয়া হইবে না। এবং যাদের বাকী পড়িয়া আছে তাহাদের আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাকী শোধ করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা কমিটিকে এ বিষয় নজর দিতে বলা হইতেছে। খোঁজ নিন আপনাদের কত বাকী এবং টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন নইলে অনেকেরই কাগজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

লাল সালাম — ম্যানেজার, জনযুদ্ধ

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] ৩১শে মে, বুধবার, ১৯৪৪, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [দাম—ছ'পয়সা

জাতীয় কংগ্রেস

হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতারও বিরোধী

নেতাদের মুসলিম-বিরোধিতা

কংগ্রেস আদর্শই ক্ষুণ্ণ করিবে না কি ?

গত্ কয়েক সপ্তাহের জীবনহানি, আতঙ্ক ও অসুবিধার মধ্যেই ঢাকার দাঙ্গা শেষ হইল না। এখন ঢাকার সমস্ত অধিবাসীকে উহার জন্ম আর্থিক দুর্ভোগও ভুগিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের উপর এক লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা বসিয়াছে।

আমরা এই জরিমানার তীব্র প্রতিবাদ করি। যাহারা নির্দোষী তাহাদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করাই আইনের কর্ত্তব্য। যে-আমলাতন্ত্র অক্ষম ও অপদার্থ শুধু সেই আমলাতন্ত্রই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া দোষী-নির্দ্দোষী সকলের ঘাড়ে নিজের অক্ষমতার বোঝা চাপাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বোঝা বহন করিতে জনসাধারণ বাধ্য হইবে কেন ?

দায়িত্ব কি শুধু ঢাকার ?

শুধু তাই নয়। ঢাকাবাসীদের উপর এই জবর-দস্তি জরিমানার আমরা আরও তীব্র প্রতিবাদ করি এই জন্ম যে, এবার দাঙ্গা বাধানোর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুধু ঢাকা শহর হইতেই আসে নাই, কাজেই সে উত্তেজনা দূর করিয়া দাঙ্গা থামানোর পূর্ণ ক্ষমতা বা দায়িত্বও ঢাকাবাসীদের হাতে ছিলনা। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপলক্ষ্যে লীগপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ দেশময় যে পরস্পর বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অন্ধভাবে ছড়াইয়া বেড়াইয়াছেন তাহার ধাক্কায়ই এবার ঢাকায় দাঙ্গা বাধিতে পারিয়াছে। সে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢাকাবাসী একলা দূর করিবে কিরূপে ?

এই উত্তেজনার সমাধান শুধু দেশের বিভিন্ন দলের নেতারাই করিতে পারেন। তাঁহারা যদি শিক্ষাবিল সম্বন্ধে একটা আপোষ রফায় আসিবার জন্ম আন্তরিক চেষ্টা করিতেন, কিংবা অন্ততপক্ষে বিল উপলক্ষ্যে মুসলিম-বিরোধী বা হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন না জাগিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেন, নিজ নিজ সমর্থক দৈনিকপত্রগুলির দৈনন্দিন সাম্প্রদায়িক আস্ফালন সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন—তাহা হইলে আজ ঢাকায় দাঙ্গা ঘটিতেই পারিতনা। কি লীগ পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ কেহই তাহা করেন নাই। আজ শুধু ঢাকাবাসীকেই তাহার দণ্ড দিতে হইবে কেন ? আর দুই পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খোরাক যদি এখনও প্রতিদিন সরবরাহ হইতে থাকে তবে দণ্ড দিলেও যে আবার দাঙ্গা বাধিবেনা তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? বরং ঢাকা ছাড়াইয়া উহা অন্যান্য স্থানেও পৌছিতে পারে।

কংগ্রেস কোথায় চলিয়াছে ?

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থামাইবার দিক হইতে কংগ্রেস নেতাদের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। কারণ কংগ্রেস কোনো সম্প্রদায় বা জাতি-বিশেষের প্রতিনিধি নয়, ভারতের সমস্ত জাতি ও তাহাদের স্বার্থ সমন্বয় করিয়া এক সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়াই কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেজন্মই কংগ্রেস মুসলমানদের ন্যায্য অভিযোগ কখনো প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই—নূতন শাসনতন্ত্র সরাসরি নাকচ করিলেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্ন সরাসরি বর্জ্জন করে নাই। এই কারণেই কংগ্রেসের রাজনীতিক প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশী। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যাহাতে বাড়ে এমন কোনো কাজ কংগ্রেস তো করিতেই পারে না, বরং দেশের সকলে আশা করে যে এইরূপ উত্তেজনা থামাইতে কংগ্রেসই সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইবে।

বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতারা সে আশা কতদূর পূর্ণ করিয়াছেন ?

গত ২৫শে মে, অর্থাৎ দাঙ্গা প্রায় থামিয়া যাইবার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত দাঙ্গা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ঢাকা শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দেশের কোন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি কখনই উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদিও ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান মুসলিম লীগ দলের মন্ত্রিমণ্ডলের সাম্প্রদায়িক কার্য্যাবলী এই অসন্তোষের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী, তথাপি রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা কি যে-কোন কারণেই অসন্তোষের সৃষ্টি হউক না কেন, কোন প্রকারেই লোকের জীবন লওয়া সমর্থন করা যায় না।......"

পরস্পর দোষারোপের ক্ষতি

কংগ্রেস সভানেত্রী দাঙ্গাকে অসন্তোষের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়াছেন এবং "এই অসন্তোষের" জন্ম মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন। তবে অসন্তোষের জন্ম রক্তারক্তি করাটা ঠিক নয় ইহাই তাঁহার মত। হিন্দু সাম্প্রদায়িক গুণ্ডারা আজ ঠিক এই অসন্তোষের যুক্তি তুলিয়াই লোককে সাম্প্রদায়িকতায় ক্ষেপাইতে পারিতেছে, হিন্দুদের লীগ-বিরোধী মনোভাবকেও দাঙ্গা উস্কানিতে কাজে লাগাইতে পারিতেছে। কংগ্রেস সভানেত্রীর যুক্তিতে তাহাদের উত্তেজনা ছড়ানোর কাজে আরও সুবিধা হইবে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? আর লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর দোষ যতই থাকুক মুসলমানেরা উহাকে আপনার জিনিষ বলিয়াই মনে করে। আর যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সেই মন্ত্রীমণ্ডলীকেই অসন্তোষ তথা দাঙ্গার জন্ম যদি তিনি প্রধানত দায়ী করেন—যাহা

> **পরস্পরের দোষ দিও না**
> **দাঙ্গা রুখিতে একত্র হও**

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মত সাম্প্রদায়িক নেতাও বলিতে সাহস করেন নাই তো তাহাতে মুসলমানদের উত্তেজনা আরও বাড়িয়াই যাইবে ইহাও কি কংগ্রেস সভানেত্রী ভাবিয়া দেখেন নাই ? এবং তাঁহার বিবৃতির ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যদি সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বা উত্তেজনার নূতন সমর্থন পায় তবে রক্তপাত বন্ধ করিতে তিনি যতই অনুরোধ করুন, রক্তপাতের আসল কারণ আরও জাগিয়া উঠিবে একথাও কি তাঁহার মনে আসে নাই ?

দাঙ্গা অসন্তোষের অভিব্যক্তি নয়, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে কয়েকজন গুণ্ডার কারসাজি। যে "যুগান্তর" পত্রিকা মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপলক্ষ্যে গত দুই মাস ধরিয়া মুসলিম দাবী বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাইতেছে, সেই যুগান্তরও গত ২৮শে মে সম্পাদকীয়তে ঢাকার দাঙ্গা সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "অনেকের ধারণা, সমাজের কোন বিশেষ স্তরের কতকগুলি লোক ইহাকে (অর্থাৎ দাঙ্গাকে, জঃ সঃ) একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধি ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে জীয়াইয়া রাখিয়া ইহারা মাঝে মাঝে গুণ্ডাগিরিতে প্রবৃত্ত হয়।"

কংগ্রেস সভানেত্রীর বিবৃতি এই পরস্পর সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে জীয়াইয়া রাখিতেই সাহায্য করিবে না কি ? পাইকারী জরিমানা আজ ঢাকার হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই আঘাত করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও চেষ্টাই এ জরিমানা রদ করিতে পারে। একে যদি অপরের উপর দোষারোপ করিতে থাকে তো সে ঐক্য কোথা হইতে আসিবে, জরিমানা কিরূপে বন্ধ হইবে ? কংগ্রেস সভানেত্রীর বিবৃতি জরিমানার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই বাধা সৃষ্টি করিতেছে না কি ?

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা

আমরা গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আজ বাংলার অনেক কংগ্রেস নেতার নিরপেক্ষ মনেও হিন্দুপন্থী সংস্কার সৃষ্টি করিতেছে। এসেম্বলিতে সেদিন যে হট্টগোল হইয়া গেল তাহার প্রধান কথা ছিল মন্ত্রী তুলসী গোস্বামীকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে না। কংগ্রেস নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালই সর্বপ্রথম একথা তুলিয়াছেন, পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ চ্যাটার্জি, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি উহা সমর্থন করিয়াছেন। লীগপক্ষ অর্থাৎ মুসলমানেরা বলুন, ইয়োরোপীয়ানরা বলুন, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি ছিলনা, কিন্তু হিন্দু মন্ত্রী তুলসীবাবু বিলের স্বপক্ষে বলিবেন ইহাতেই তাঁহাদের ঘোরতর আপত্তি। তুলসীবাবুর ভাল মন্দ আমরা বিচার করিতেছি না। কিন্তু নলিনাক্ষ বাবুদের কথার অর্থ হইল—কোনো হিন্দুর বিলের স্বপক্ষে কিছু বলা উচিত নয়। তাহার মানে এই দাঁড়ায় যে শুধু হিন্দুর দৃষ্টিতেই তাঁহারা বিলটী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহারই নাম সাম্প্রদায়িকতা এবং উহা কংগ্রেস আদর্শের বিরোধী। কয়েকদিন আগে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের সভায় মুসলমানদের হইতে আলাদা হিন্দু বোর্ড গঠনের কথায় নলিনাক্ষবাবুই মৃদু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কারণ তাঁহার কংগ্রেসী মনে উহা বাধিতেছিল। কিন্তু প্রতিবাদ আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক তীব্রতায় এই কংগ্রেসোচিত বোধও ক্রমশঃ একেবারে লোপ পাইতেছে, হিন্দুত্বই প্রাধান্য পাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়িবে বই কমিবে কেন ?

শিক্ষা ও রাজনীতি

শিক্ষা বিল সম্বন্ধে মুসলিম দাবীর তীব্র বিরোধিতা করার পক্ষে কংগ্রেস নেতারা এই যুক্তি দেন যে, আমরা শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অস্বীকার করি না বটে কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শিক্ষা কি শাসনতন্ত্র অর্থাৎ রাজনীতির আওতার বাহিরে ? মোটেই নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি যাহা কিছুই হোক না কেন সবই শেষ পর্য্যন্ত রাজনীতিক শক্তির দ্বারা ও সেই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যেখানে যেখানে শিক্ষার উপর হিন্দু বা জাতীয় কর্ত্তৃত্ব আছে সেখানে উহা হিন্দু বা জাতীয় রাজনীতিকেই পুষ্ট করে। রাজনীতিতে যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রাহ্য হয় তো শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রাহ্য করিতে হইবে, কারণ আমরা চাই বা না চাই বাঁটোয়ারা প্রাপ্ত রাজনীতিই শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রণ করিবে। শুধু শিক্ষা ব্যাপারে উহাকে বাধা দেওয়া কার্য্যকরী হইবে না—যতক্ষণ না উহার নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা বাঁটোয়ারাপ্রাপ্ত রাজনীতিকেও আমরা বাধা দিই। কিন্তু তাহা তো কংগ্রেস বিরোধী।

ইহার চেয়েও বড় কথা হইল : শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দাবীর বিরোধিতা করিতে গিয়া আমরা যে উত্তেজনা ছড়াইতেছি তাহা তো শিক্ষার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিতেছে না ! সেই উত্তেজনা সমস্ত বিষয়ে ছড়াইতেছে, দাঙ্গা বাধিতেছে, ঢাকাবাসীকে পাইকারী জরিমানা দিতে হইতেছে, দেশবাসীর সেবার জন্ম ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা বাধা পাইতেছে, হিন্দু ও মুসলমানে রাজনীতিক আপোষের সম্ভাবনা দূরে যাইতেছে। ফলে রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের আশাও চূর্ণ হইতেছে। শিক্ষাকে রক্ষা করিবার নামে যে উত্তেজনা আমরা জাগাইলাম তাহা যদি দেশবাসীর রাজনীতিক ভাগ্যকেই গুঁড়াইয়া চলিতে থাকে তো তাহা দেশের কাছে অভিশাপ স্বরূপ। আজ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নেতারা হয়তো তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু গান্ধীজির মুক্তির ফলে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় ক্ষমতার যে আশা জাগিয়াছে তাহা যদি এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় আহত হয়—তখন নেতারা নিজেদের মনের কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবেন ?

(৪র্থ কলমের শেষাংশ)

দেশবাসী সেই অনৈক্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি এই দুর্দশাই চিরস্থায়ী করিবে।

আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার কংগ্রেস যদি আরও স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করে, দেশভক্তেরা যদি দিকে দিকে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আন্দোলন করেন, গান্ধীজি যদি জিন্না সাহেবের সঙ্গে মিটমাটে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন তবেই দেশের ইতিহাসে রাজনীতির নূতন অধ্যায় শুরু হইবে। শুধু গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যাইতে পারে লীগের এই দুর্ব্বলতাও দূর হইবে। নূতন মিলিত শক্তির সামনে ওয়েভেলও নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইবেন।

> **ঢাকায় পাইকারী জরিমানার বিরুদ্ধে**
> **হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ উঠাও !**

সম্পাদকীয়

রাজনীতিক নিষ্পত্তি কোন পথে ?

গান্ধীজির ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ২৭শে মে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছে :

"...সকলের আগে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার নয়, সকলের আগে গান্ধী ওয়েভেল সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়াই সন্তোষজনক রাজনীতিক নিষ্পত্তির সম্ভাবনা খুঁজিতে হইবে। এই পটভূমিকায় পরবর্ত্তী প্রশ্ন হইবে হিন্দু-মুসলিম নিষ্পত্তির প্রশ্ন।"

অনেক কংগ্রেসী মহলে এইরূপ মতই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

তাঁহারা কি মনে করেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বা আমলাতন্ত্রের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? আমলাতন্ত্র কি ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া রাজনীতিক নিষ্পত্তির জন্ম উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে ?

তাঁহারা তাহা মনে করেননা, কোনো ভারতবাসীই মনে করে না। এ অবস্থায় গান্ধীজি যদি সর্বপ্রথম ওয়েভেলের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি খুঁজিতে যান তো ওয়েভেলের কাছ হইতে অতীত দিনের অনৈক্যের অজুহাত শুনিয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এবং সেই নূতন ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে যে হতাশা জাগিবে তাহা বহুদিনের জন্ম সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করিয়া দিবে। অচল অবস্থা চিরস্থায়ী হইবে।

গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরিবর্ত্তন **করাইতে হইবে**। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে গত ৫ বৎসরের দুঃখজনক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে কংগ্রেস বা লীগের একক চেষ্টায় সে পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। সেজন্মই কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য দেশের সম্মুখে একমাত্র পথ। এই ঐক্য দেশের মধ্যে যে প্রচণ্ড, নূতন শক্তির জন্ম দিবে শুধু সেই শক্তিই আমলাতন্ত্রকে নীতি পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিতে পারে।

গান্ধীজির মুক্তি দেশের কাছে এই সম্ভাবনা আনে নাই যে তিনি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে "সন্তোষজনক রাজনীতিক নিষ্পত্তি" করিয়া ফেলিতে পারিবেন—ইহার সম্ভাবনা থাকিলে আগেই তিনি তাহা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। গান্ধীজির মুক্তি এই সম্ভাবনাই আনিয়াছে যে তাঁহার অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতিক দক্ষতায় লীগের সঙ্গে মিটমাট সম্ভব হইবে এবং সেই মিটমাটই আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিক নিষ্পত্তিতে বাধ্য করিবে।

কংগ্রেস-লীগ মিটমাটের জন্ম গান্ধীজিকে উৎসাহিত করা এবং তাহার পথে সমস্ত বাধা দূর করিয়া দেওয়াই আজ প্রত্যেক দেশভক্তের প্রধান রাজনীতিক কর্ত্তব্য।

অমৃতবাজার লিখিয়াছে : "হিন্দু মুসলিম নিষ্পত্তি মানেই যে কংগ্রেস ও মিঃ জিন্নার মধ্যে নিষ্পত্তি এমন কোন কথা নাই।" আরও লিখিয়াছে, "...লর্ড ওয়েভেল যদি সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবী...মানিতে রাজি হন তো মিঃ জিন্নাও তাহা মানিবেন এবং তাঁহার সমস্ত গর্জ্জন অতীতে মিলাইয়া যাইবে।"

এই ধরণের উক্তিই কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথে সব চেয়ে বড় বাধা। আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাদাভাবেই নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে পারিব, এই ইঙ্গিত ঐক্যের বিরুদ্ধে লীগের সন্দেহকে দৃঢ়তর করে, ঐক্য আরও দূরে যায়। এবং তাঁহাতে ওয়েভেলের সঙ্গে নিষ্পত্তির সম্ভাবনাও কমে। কারণ লীগের বিরোধিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া ওয়েভেল আগের মতই অজুহাত দেখাইয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার নীতি কায়েম রাখিতে পারেন।

লীগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, কিম্বা তাহাকে আলাদা নিষ্পত্তির ভয় দেখাইয়া রাজনীতিক 'সমাধানের' চেষ্টা অতীতে ব্যর্থই হইয়াছে। আজ রাজনীতিক ক্ষমতাহীনতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কাতর যন্ত্রণায়

(শেষাংশ ৩য় কলমে দেখুন)

পৃথক নির্ব্বাচনের ঝগড়া কি আমলাতন্ত্রের হাতে শিক্ষাকে বলি দিবে ?

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়া গত একমাস যাবত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রপীড়িত বাংলাদেশের বুকের উপর এক জঘন্য সাম্প্রদায়িক কলহের ঝড় বহিতেছে। বিলের পৃথক নির্ব্বাচন কি করিয়া নাকচ করা যায়—ইহাই বিরোধী পক্ষের একমাত্র ভাবনা। আর লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও স্থির ধরিয়াছেন যে, হিন্দুদের শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পৃথক নির্ব্বাচন পাশ করাইয়া লইতেই হইবে। ফলে সারা বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের ভিতর ঝগড়া ও মনোমালিন্য বাড়িতেছে এবং এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদই নগ্ন কদর্য্যতায় প্রকাশ পাইয়াছে গত ২৫শে মে আইন সভা গৃহে কুৎসিৎ হট্টগোলের মধ্য দিয়া।

পৃথক নির্ব্বাচন লইয়া উভয় পক্ষ এত কাণ্ড করিতেছেন, অথচ এই প্রশ্নটা বাদ দিয়া বাকী ব্যাপারে কি লীগপক্ষ, কি বিরোধীপক্ষ কারুরই তো আপত্তি দেখা যায় না। সেখানে তাঁরা সকলেই সহজে একমত হইতে পারেন। মিঃ ফজলুল হক আইন পরিষদে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯৪২ সালে সেই বিলেই সামান্য অদল বদল করার পর তখনকার হক্ শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা গ্রহণ করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাহাতে রাজী হয়। বর্তমান বিলটিও সেই পুরাতন বিলেরই হুবহু নকল শুধু যুক্ত নির্ব্বাচনের স্থানে এখন পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জেনকিন্সের খসড়ায় নেতারা একমত !

এই বিলের খসড়ায় সামান্য অদল বদল করিয়াই তাঁরা রাজী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁরা ভাবিয়া দেখিবার দরকার মনে করেন নাই যে এই বিলের রচয়িতা কে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত ভূমিকা কি। ১৯৪০ সালে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার জেন্‌কিন্‌সই এই বিল রচনা করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররূপে মিঃ জেন্‌কিন্‌স্ বাংলার শিক্ষা জীবনে সমস্ত স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য কি করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সরকারী স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দমন করিবার জন্য তিনি ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ফতোয়া জারী করিয়াছেন। এই শিক্ষাবিল আসিয়াছে সেই জেনকিন্সের পক্ষ হইতে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনরের হাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার ভার দেওয়া, আর জেনকিন্সের হাতে বাংলার শিক্ষা জীবনের ভার দেওয়া—একই কথা। ইহাই তো এই শিক্ষাবিলের আসল রূপ।

এ সব বিষয় লইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, মিঃ ফজলুল হক অথবা স্যর নাজিমুদ্দিন টুঁ শব্দটী করেন নাই, এখনও করিতেছেন না। বরং, মিঃ ফজলুল হকের কথার সোজা অর্থ এই যে তিনি নিজে কিংবা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, কিংবা নাজিমুদ্দিন কেহই শিক্ষা ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নন।

বিলের এই সর্ব্বনাশা দিকটাকে শুধু তাঁরা নিজেরাই এড়াইয়া চলিতেছেন তা নয়, এমনভাবে তাঁরা প্রচার চালাইতেছেন যাতে সমস্ত লোকের দৃষ্টি এদিক হইতে সরিয়া আসে এবং একটী মাত্র প্রশ্নের (পৃথক নির্ব্বাচন) মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, যার ফল কিছুতেই হিন্দু মুসলমানের মীমাংসা হইত না দেওয়া অর্থাৎ শিক্ষা ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কায়েম রাখা।

মাধ্যমিক শিক্ষা কোন অবস্থায় ?

এর ফলে বাংলার ভবিষ্যত শিক্ষার অবস্থা কি দাঁড়াইবে? বিলের ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে গত কয়েক বৎসরে নাকি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শিক্ষার প্রসার হইয়াছে। অথচ ইহা যে নির্জলা মিথ্যা তাহা অন্য কয়েকটি সরকারী বিবরণেই প্রকাশ। ১৯৩৫ সালের ৭ই জুলাই তারিখের গভর্ণমেন্টের ২৫১৭ নং শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "শিক্ষার যে সব উন্নতি বহুদিন পূর্ব্বেই পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং বাস্তবক্ষেত্রে করা উচিত ছিল তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেও যে অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল তাহা ত হয়ই নাই বরং অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে।" বাংলা সরকার শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার তথ্যেও এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য আমাদের সরকারের কোনও মাথাব্যথাই নাই। শিক্ষা সম্বন্ধীয় ১৯৩৭ সালের পঞ্চম বার্ষিকী রিপোর্টে প্রকাশ, এক বৎসরে বাংলাদেশে ৩৫৪৯৬৩ জন স্কুলের ছাত্রের জন্য ১২,৫,২১৫৭৬৲ খরচ হয়। এর ভেতর মাত্র ১৭,৬৬১৭৭৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট তহবিল হইতে আসে! গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদের জন্য মাথা পিছু বাৎসরিক খরচ হয় ৫৫।৶০, আর সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ছাত্রদের মাথা পিছু খরচ হয় বছরে ৫।৶০। এর চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে বাংলাদেশের শতকরা ৫০টি স্কুল সরকার হইতে কোন সাহায্য পায় না। অন্যদিকে, ১৯৪১ সালে ৬৬টি ইয়োরোপীয় স্কুলের ১২,৩৭৫ জন ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রের জন্য খরচ হইয়াছে ৩৯,১১,৭৭৫৲, অর্থাৎ প্রতিটি ইংরাজ বা এংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রের জন্য বাৎসরিক ব্যয় হইয়াছে ৩০০৲!

ইহাই হইল মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা! মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের ভিতর দিয়া এ-হেন আমলাতন্ত্রের হাতেই বাংলার ছাত্রদের ভবিষ্যত তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। অথচ হক্ সাহেব, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, মিঃ নাজিমুদ্দিন সবাই নির্ব্বিবাদে এই বিপজ্জনক অবস্থা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলিম মীমাংসায় আপত্তি কেন ?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ অজুহাত তুলিয়াছেন যে, পৃথক নির্ব্বাচনে শিক্ষার ভিতর সাম্প্রদায়িকতা আমদানি হইবে। সাম্প্রদায়িকতা আমদানীর মানে কি? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কি বলিতে চান হিন্দু মুসলমানে মীমাংসার নামই সাম্প্রদায়িকতা? বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের যে কর্তৃত্ব তাহাতে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি বোর্ডে কখনও স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং পৃথক নির্ব্বাচনের আসল অর্থ শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের স্থান করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা মীমাংসা করা। এই মীমাংসা না হইলে শিক্ষা জীবনে মুসলমানরা চিরকালই পিছাইয়া থাকিবে এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলমান রেষারেষির বীজ কখনও লুপ্ত হইবে না। বাংলার জাতীয় রাজনৈতিক জীবন কখনই সুস্থ হইবে না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর আপত্তি কি এইখানেই?

গত কয়েক বৎসরে মুসলমান জগতে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহাতে এ আশঙ্কা ও অত্যন্ত অমূলক যে, পৃথক নির্ব্বাচনের সুযোগে বোর্ডে শুধুমাত্র সরকারের অনুগত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মুসলমানরাই নির্ব্বাচিত হইবেন। পৃথক ভোটের অধিকার পাইলে মুসলমানরাও শিক্ষার স্বার্থের প্রতি নজর রাখিয়াই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। সে অধিকার হইতে মুসলমানরা যত বেশী বঞ্চিত হইবেন, তত তাঁরা আশ্রয়ের জন্য আমলাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিবেন। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী একরোখা হইয়া যে এই বিল পাশ করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং ইহার মধ্যে সর্ব্বনাশা আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রতি উদাসীন, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিষাক্ত হাওয়া মুসলিম জনসাধারণের মনকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিয়েছে, তারাও এই বিরোধিতার মধ্যে হিন্দু কর্তৃত্বের চেষ্টাকেই বড় করিয়া দেখিয়া আমলাতন্ত্রের মতলবকে অজ্ঞাতসারে সমর্থন করিয়া ফেলিতেছে। ইহা কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয়ের পক্ষেই এক সর্ব্বনাশা পরিস্থিতি।

আমরা কি পৃথক নির্ব্বাচনের প্রশ্নে ঝগড়া করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দিয়া বাংলার জাতীয় জীবনে এক বৃহত্তম সর্ব্বনাশ আনিব? আজ পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে আপোষ করিয়া আমলাতন্ত্রের কারসাজির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইলেই বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যত রক্ষা পাইবে এবং শিক্ষার প্রগতি ও স্বাধীনতা সম্ভব হইবে। সেই উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের চেষ্টা নিয়োজিত হোক।

মাগগিভাতা ও রেশনিং সম্মেলন

১৫ হাজার মজুর সমাবেশে দাবী

এখনি ৩০৲ মাগগিভাতা ও ৫।০ সের রেশন চাই

রেশনিং ও মাগগিভাতার দাবী উপলক্ষে গত ২৮শে মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৫ হাজার মজুর সমাগম হয়। এত বড় সংঘবদ্ধ সভা বহুদিন কলিকাতায় হয় নাই। এই সভায় কলিকাতা ও আশে পাশের সমস্ত মজুর সংগঠন আসিয়াছিল। বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পোর্ট মজুর, বিড়ি মজুর, করপোরেশন মজুর প্রভৃতি ইউনিয়ন তাদের ইউনিয়নের নাম লেখা ফেষ্টুন ও লাল পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সভায় হাজির হইল। ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী হইতেও মজুরদের প্রতিনিধিরা আসিল। শুধু মজুররাই নয়। অনেক কারখানার কর্ম্মচারী ও অফিসের কেরাণীরাও মজুরদের সঙ্গে একযোগে রেশনিং ও মাগগি ভাতার দাবী জানাইতে সমবেত হইল।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সভাপতিত্বে সম্মেলন সুরু হইল। গান্ধীজির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক প্রচারের নিন্দা করিয়া দুইটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইল।

এই দাবী শুধু মজুরেরই নয়, সমস্ত লোকের

রেশনিং ও মাগগি ভাতার দাবী উত্থাপন করিয়া কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন: মাগগি ভাতার দাবী যে শুধু মজুরেরই দাবী তা নয়, ২০০ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা যাদের, সেই সমস্ত কর্ম্মচারীরও দাবী। এই দাবী মজুরদের আব্দার নয়, ইহা যে কোনো শ্রেণীর লোকের বিবেচনায় মানুষের বাঁচিবার জন্য অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত দাবী। সরকারী মাগগি ভাতা কমিটীর মধ্যে মজুরের প্রতিনিধির চেয়ে মিল মালিক ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিই বেশী ছিল। তাহারাই স্বীকার করিয়াছে যে জিনিষপত্রের দর যে ভাবে বাড়িয়াছে, তাতে ২০০ টাকা মাহিনা পর্য্যন্ত সকল মজুর ও কর্মচারীকে ৪৫ টাকা মাগগি ভাতা দেওয়া দরকার। ৪ সের রেশনে মজুরের পেট ভরে না, তা যে কোন লোকই জানে। চাই জীবন ধারণের জন্য তাদের দাবী ৫।০ সের রেশন। এই ন্যায্য দাবী হাসিল করিবার জন্যই আজকে মজুরের আন্দোলন। এই আন্দোলনের পিছনে সমস্ত দেশবাসীর সমর্থন না আসিয়া পারে না। যারা এই লড়াইয়ের দুর্দ্দশার মধ্যেও পরিশ্রম করিয়া দেশের কাজ কর্ম্ম চালু রাখিয়াছে, দেশবাসীর রসদ জুগাইয়াছে, তাদের জীবন ধারণের নূনতম ব্যবস্থাও করিতে চায় না 'এরূপ দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী কে থাকিতে পারে? কিন্তু তবু আজ সরকার এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে কেন? মিল মালিকের মুনাফালোভের কাছে সরকার নতি স্বীকার করিয়া মাগগি ভাতার সুপারিশ ধামা চাপা রাখে কেন? মজুর ৪ সের খাইয়াই জীবন ধারণ করুক—এই কথা বলার স্পর্দ্ধা আমলাতন্ত্রের হয় কেন? কারণ, রেশন ও মাগগি ভাতার আন্দোলন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যত ব্যাপক হওয়া দরকার, তত ব্যাপক এখনও হয় নাই। তাই আজকে কি মজুর, কি কেরাণী, কি কর্ম্মচারী সকলকে এই দাবীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, শুধু সভায় নহে, সংগঠনের মধ্যেও। সেই একতাকে আমলাতন্ত্র রুখিতে পারিবে না।

সোমনাথ লাহিড়ী ছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতেও এক একজন নেতা এই দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন

খোলা সম্মেলনের আগে ২৫শে মে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সমস্ত মজুর সংগঠনের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয়। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী সভাপতিত্ব করেন। ১৮ হাজার সভ্যের পক্ষ হইতে ৩৬০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণাল কান্তি বসু, মিঃ ডি, এন, মুখার্জি এম-এল-এ, বঙ্গীয় কৃষক সভা, বি, এন, আর মজুর ইউনিয়ন প্রভৃতির তরফ হইতে সম্মেলনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

কাগজ উৎপাদনে ঘাটতি !

চোরাবাজার আবার বাড়িবার সম্ভাবনা

জনসাধারণের কমিটি দ্বারা বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করো

"ক্যাপিটালের" সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে এবছর কাগজ উৎপাদন শত করা ৩০ ভাগ কম হইবার সম্ভাবনা। কাগজ কলগুলি কয়লার অভাবে পুরাদমে কাজ করিতে পারে না, তারই জন্য এই অবস্থা হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে ৩০ হাজার টন কাগজ এবার কম হইবে।

বে-সামরিক চাহিদার জন্য এখন পাওয়া যাইতেছে শতকরা ৩০ ভাগ কাগজ। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অত্যন্ত কম, তা বাজারে কাগজ সংকট দেখিয়াই বুঝা যায়। বড় বড় প্রকাশক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরা চেষ্টা করিয়া 'কোটা' পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু ছোট প্রকাশক ও সাধারণ লোকের ভাগ্যে কাগজ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ দরকার যাদের, তারা চোরাবাজার হইতে কাগজ কিনিয়া কাজ চালায়। উৎপাদনে শতকরা ৩০ ভাগ ঘাটতির মানে বে-সামরিক চাহিদার 'কোটা' আরো কম ধার্য্য হইবে, অর্থাৎ সাধারণ লোকের কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা আরো বাড়িবে এবং সাধারণ লোককে আরো বেশী করিয়া চোরাবাজারের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

"ক্যাপিটালের" সংবাদদাতা আশ্বাস দিতেছেন যে আমেরিকা হইতে ২০ হাজার টন কাগজ নাকি আসিতে পারে। ইহাও বলা হইয়াছে যে বে-সামরিক সরবরাহ দপ্তর নাকি বে-সামরিক চাহিদার জন্য ৩০ ভাগের স্থলে ৫০ ভাগ কাগজ দিবার কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু এই আশ্বাসের মূল্য কতটুকু? যেখানে উৎপাদনে ঘাটতি ঠেকাইবার কোনো বন্দোবস্ত হয় না, সেখানে বাহির হইতে আমদানীর উপর ভরসা কেমন করিয়া করিব? আর মোট উৎপাদনই কম হইলে বে-সামরিক চাহিদার জন্য বরাদ্দ বাড়িবে, এ সম্ভাবনা তো আরো কম। সুতরাং এরূপ স্তোকবাক্যের উপর ভরসা করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

কিন্তু চোরাবাজার বন্ধ করার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা কতটুকু হইতেছে? সরকার আজকাল একটু সতর্ক হইয়াছেন মাত্র, যাতে চোরাকারবারীরা সহজে কাজ করিতে না পারে। কিন্তু ইহা তো গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। যেখান হইতে চোরাবাজারের উৎপত্তি, সেখানে ঘা দিতে না পারিলে, চোরাবাজার বন্ধ হইবে না।

বড় বড় কারবারী ও প্রকাশকরা সরাসরি মিলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া কাগজ আনায়। সমস্ত বণ্টন-যন্ত্রটী তাহাদেরই হাতের মুঠার মধ্যে! অগণিত ছোট প্রকাশক ও ছোট-ব্যাবসায়ীদের ইহাদেরই কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বড়-কারবারীরা নিজেদের ইচ্ছামত চোরাবাজার সৃষ্টি যদি করে তবে তাহাকে কে ঠেকাইবে?

সুতরাং, বণ্টন কন্ট্রোলের আসল অর্থ—এই মিল কর্তৃপক্ষ হইতে সুরু করিয়া বড়-কারবারী ও বড়-প্রকাশকদের এই চক্রটীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। মিল-হইতে কাগজ পাইবার অধিকার প্রত্যেকেরই সমান ভাবে সাব্যস্ত করা ও তার উপর জনসাধারণের তত্ত্বাবধান রাখা—ইহাই হইবে চোরাকারবার বন্ধ করিবার নিশ্চিত উপায়।

আমরা জানিতে পারিলাম কাগজের ব্যবসায়ীরা লাইসেন্সড এজেণ্টের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। মিল-কর্তৃপক্ষরাও এই ব্যবস্থা চান। অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই তাঁদের চক্রটী আরো পাকা করিতে চান, যাহাতে ছোট কারবারী ও প্রকাশকরা আরো অসহায় হইয়া পড়ে। সম্প্রতি 'যুগান্তরে' একজন কাগজ-ব্যবসায়ী ও একজন বড় প্রকাশকের মধ্যে যে তুমুল বাদানুবাদ হইয়া গেল, তার মধ্যেও আমরা এই চক্র তৈরীর একটা প্রতিযোগিতার আভাস পাই। চোরাবারবার বন্ধ করিবার জন্য তাঁরা উভয়েই ব্যাকুল, অথচ তাঁদের বাদানুবাদের মধ্যে ছোট ব্যাবসায়ী বা প্রকাশকদের সুবিধা অসুবিধার কথা নাই, আছে শুধু পরস্পরকে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। ইহাতে চোরাকারবারের পথই আরো প্রশস্ত হইবে। বণ্টনের উপর জনসাধারণের পূর্ণ কন্ট্রোল ইহার একমাত্র প্রতিরোধক।

গান্ধীজির মুক্তিতে মুসলিম জনমত কোন দিকে?

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিপুল আগ্রহ

গান্ধীজির মুক্তি সমস্ত দেশবাসীর মনে আনিয়াছে আনন্দ ও আশা। শুধু কংগ্রেস মহলে নয়, লীগ মহলের কোন কোন অংশেও ইহা আজ সুস্পষ্ট। এই আশার বাস্তব ভিত্তি হইতেছে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা। দেশের অনেক বিশিষ্ট মুসলিম পত্রিকা ও লীগ নেতাদের কথার মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয়।

ইনক্লাব (বোম্বের দৈনিক সংবাদপত্র)

"আমরা আশা করি এই বিবৃতি সমূহ (মুসলিম লীগ নেতাদের) বিচার করিয়া গান্ধীজি তাঁর ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা ঠিক করিবেন। গান্ধীজির বোঝা উচিত যে হিন্দুদের মত মুসলমানরাও তাঁরই দিকে তাকাইয়া আছে। মীমাংসার পথে একটীমাত্র বাধা আছে; গান্ধীজি যদি সেই বাধাটী দূর করেন অর্থাৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বা পাকিস্তান মানিয়া লন, তা হইলে হিন্দু ও মুসলমান এখনিই এক হইবে।"

মনসুর (দিল্লীর সাপ্তাহিক পত্রিকা)

"গান্ধীজি যদি কংগ্রেস লীগ মীমাংসাকে তাঁর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন তবে, ভারতের স্বাধীনতা অনেক তাড়াতাড়ি আসিবে।"......(১৪ই মে)

আস্‌রে-ই-জাদিদ (কলিকাতার লীগ দৈনিক)

"গান্ধীজির মুক্তিতে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁর মুক্তিতে দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর জনসাধারণই আনন্দিত হইবে। মুসলিমদের প্রতি তাঁর মনোভাব যাই হোক না কেন, তিনি যে আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

মিঃ জি., এম, সৈয়দ (সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও লীগ-কাউন্সিল অফ এ্যাকশনের সভ্য)

"আমার নিশ্চিত ধারণা যে গান্ধীজি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিবেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া মুসলিমদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন।" (৯ই মে)

সৈয়দ আব্দুল রহমান (বাঙ্গালোর, নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের সভ্য)

"দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া গান্ধীজির মুক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেন না, তাঁর মুক্তি জিন্নার সহিত একটা মীমাংসা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। এবং জিন্নার মারফৎই সমস্ত মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে মিলন হইবে, যাহার ফলে বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান হইতে পারে।" (৮ই মে)

খালিক-উজ-জামান (নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য, তাঞ্জোর)

"বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেস যদি কোনো মীমাংসায় উপনীত হয়, তার অর্থ হইবে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করা। অন্য উপায় হইতেছে মুসলমানদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা;—ইহাদ্বারা এমন একটী অস্ত্র হাতে পাওয়া যাইবে যাহা উভয় সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাই আনিয়া দিবে। গান্ধীজি এখন মুক্ত হইয়াছেন, তিনি নিজেদের মধ্যে এই ঝগড়া বন্ধ করুন। এই ঝগড়াই স্বাধীনতার পথ আটকাইয়া রাখিয়াছে।" (২৩শে মে)

ডাঃ সৈয়দ নিয়ামতুল্লা (মাদ্রাজের মেয়র)

"গান্ধীজির মুক্তি যদিও দেরীতে হইয়াছে তবু ইহাতে দেশ এক বিরাট সংকটের হাত হইতে বাঁচিবে।...আমি আশা করি তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান করিবার পথ প্রস্তুত করিবেন। ইহাও আমি আশা করি যে দুইটি সম্প্রদায়েরই নেতা যখন বাহিরে রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করিবেন।" (৭ই মে)

সৈয়দ মহম্মদ পাদাশা (মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি)

"যদিও গান্ধীজিকে অসুস্থতার জন্যই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তা হইলেও আমি আশা করি যে তিনি দেশের অবস্থার মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবেন, যার ফলে বর্ত্তমান অচল অবস্থা ভাঙ্গিবে। হিন্দু মুসলিম সমস্যার মীমাংসা করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই উচিত এবং ইহার জন্য তিনি নিশ্চয়ই মুসলিমদের ন্যায্য দাবী অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করিবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু মুসলিম একতার বিরাট শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই শক্তিকে যদি সংগঠিত করা যায়, তা হইলে ভারতের স্বাধিকার নিশ্চয়ই আসিবে।" (১১ই মে)

বাংলায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্য

আজই গড়িয়া উঠিতে পারে

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলা বিপর্য্যস্ত, আসাম প্রান্ত দিয়া বাংলার বুকে শত্রুর হানা—তবু বাংলার ৬ কোটী হিন্দু মুসলমান নরনারীর মন হইতে আশার আলো মুছিয়া যায় নাই। কেন? কারণ, দুঃখের সঙ্গে লড়িতে গিয়া এই বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে হিন্দু মুসলিম একতার পথে আগাইয়াছে। কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মীরা বহুস্থানে হাত ধরাধরি করিয়া কাজ করিতেছে। তাতেই তাদের প্রাণে আসিয়াছে আশা ও শক্তি। গান্ধীজির মুক্তি তাই বাংলার কাছে ঐক্যের আরো বড় সম্ভাবনা বহন করিয়া আনিয়াছে। নিজেদের মন হইতে সন্দেহ ও সংশয় দূর করিয়া, কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মীরা আজকের এই সম্ভবনাকে বাস্তবে পরিণত করুন।

নোয়াখালীর লীগ জনমত

[নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র]

গান্ধীজির মুক্তির খবর যখন এখানে পৌছিল, সহরের লোকদের মুখেচোখে আনন্দের ছাপ। কয়েকজন বৃদ্ধ কংগ্রেসসেবী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এতদিনে তাঁদের আশার দিন ফিরিয়া আসিয়াছে।

লীগ মহলের নেতা ও কর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁরাও গান্ধীজির মুক্তির দিনকে আনন্দ ও জয়ের দিন বলিয়া মনে করিতেছেন। জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ গফরাম, এম, এল, এর সঙ্গে কথা হইল—তিনি গান্ধীজির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বলিলেন: উপর হইতে কোনো নির্দ্দেশ আসে নাই, গান্ধী মুক্তির সভায় কি করিয়া যাই?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কংগ্রেস লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আপনি কি মনে করিতেছেন? তিনি বলিলেন: আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তো এখনও স্বীকার করা হয় নাই—গান্ধীজি কি করেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: লীগ কি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিবে না? তার জবাবে তিনি বলিলেন: আমরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ জাতি, সে হিসাবে কংগ্রেস আমাদের বড় ভাই। যদি বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে হাত বাড়াইয়া দেয় আমরা সাগ্রহে সে হাত ধরিব।

আমি তখন ৭ই তারিখের 'আজাদের' দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আজাদে গান্ধীজীর মুক্তির খবর শেষের পাতায় যেন কমদামী খবর হিসাবে ছাপা হইয়াছে। গান্ধীজীর মুক্তি যে জনগণের জয় তা কি লীগ স্বীকার করে না?

তিনি বলিলেন: আজাদ তো সরকারীভাবে লীগের মুখপত্র নয়। অবশ্য আমি আজাদে এইভাবে খবর ছাপা সমর্থন করি না।

লীগের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধী মুক্তিতে বিপুল আনন্দ দেখা গেল। তাঁরা সকলেই আশা করিতেছেন যে শীঘ্রই একটা বিরাট কিছু ঘটিবে। কংগ্রেস লীগ মীমাংসা যে এইবার হইবে এই আশাই তাঁরা করিতেছেন।

মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ফেডারেশন একযোগে গান্ধীজি ও জিন্নার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে যে, তাঁরা যেন পাকিস্তান প্রশ্নে পরস্পরের সঙ্গে মীমাংসা করেন।

৭ই মে একটী বিরাট সভা হইল। মুসলিম, হিন্দু, লীগ, কংগ্রেস সকল রকমের লোকই সভায় আসিল। প্রায় ৮০০ লোকের সমাবেশ এই সভায়—এরূপ সভা এখানে অভূতপূর্ব্ব। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন হইতে ঘোষণা করিলেন যে, কংগ্রেসকে দেশরক্ষার বিরোধী যারা বলে তারা স্বার্থান্বেষী, কংগ্রেস জাপানকে রুখিতে চায় এবং সেই জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দাবী করে।

গান্ধী মুক্তিতে

চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সভা

১০ই মে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের এক সভায় গান্ধীজির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। সভাস্থানটি জাতীয় পতাকা, লাল পতাকা, গান্ধীজি, জহরলাল ও আজাদের ছবি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। শুধু স্থানীয় জনসাধারণই নয়, কয়েকজন বৃটিশ ও আফ্রিকান সৈনিকও উপস্থিত ছিল। সভাপতি জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী সকলকে গান্ধীজির পথে খাদ্য সমস্যা সমাধান ও জাপ-প্রতিরোধের জন্য সমবেত হইতে বলেন। সভায় জহরলাল, আজাদ প্রভৃতি নেতাদের ও চট্টগ্রামের বীর সন্তান অনন্ত, গণেশ প্রভৃতির মুক্তির দাবী করা হয়।

বরিশালের সভায়

কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট একত্র

৯ই মে বরিশালে টাউন হলে গান্ধী মুক্তি উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে যোগ দেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সরলকুমার দত্ত, প্যারীলাল রায়, প্রফুল্লকুমার বর্ম্মণ প্রভৃতি। স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। গত ২ বছরের মধ্যে বরিশালের কোন জনসভায় সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে এত অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই। টাউনহলের মধ্যে প্রায় ১৫০০ লোক জড় হইয়াছিল। বাহিরে আরো ৫০০ লোক লাউডস্পীকারের সামনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিয়াছে। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন।

———

সংবাদপত্রের সাধুতা!

(১) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

[যুদ্ধের পর হইতে জনসাধারণের খবরের কাগজ পড়িবার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সেজন্য জনসাধারণের মনের উপর দেশের সংবাদপত্রগুলির প্রভাবও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। যিনি যে খবরের কাগজ পড়েন তাহাতে প্রকাশিত সংবাদের উপরই সাধারণত তাঁহার মতামত গঠিত হয়, উহার রাজনীতিক বক্তব্যও তাঁহাকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র তাহার নিজস্ব মত স্পষ্ট ও সাধুভাবে ব্যক্ত করিয়া জনসাধারণকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করুক, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া দেখা যায় যে অনেক সংবাদপত্র তাহাদের প্রভাবের অন্যায় ও অসাধু সুযোগ গ্রহণ করে। সত্য সংবাদকে গোপন বা বিকৃত করিয়া, মাত্র অর্দ্ধসত্য প্রকাশ করিয়া, কিংবা মতামত প্রকাশে অন্যায় ভান করিয়া—ইহারা অসাধুভাবে সরল বিশ্বাসী জনসাধারণকে আপন মতে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে এইরূপ নমুনা আমরা মাসে মাসে তুলিয়া ধরিব—যাহাতে সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকদের এই ধরণের অসাধুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় এবং তাঁহারা ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন।—সম্পাদক, জনযুদ্ধ]

এক বছর আগে গান্ধীজি জেল হইতে জিন্না সাহেবকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিতে গিয়া কলিকাতার হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা লিখিয়াছে:—

(গান্ধীজি ঐ চিঠি লেখার) "মাত্র এক মাস আগে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্না সাহেব সভাপতির আসন হইতে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য মিঃ গান্ধী যদি এখন বাস্তবিক ইচ্ছুক হন তো আমিই তাহা সর্বাধিক আগ্রহে অভ্যর্থনা করিব। আমি আপনাদের বলিতে চাই যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই সেই দিনটী হইবে উজ্জ্বলতম দিন। ইহাই যদি মিঃ গান্ধীর ইচ্ছা হয় তো তাঁহার পক্ষে সোজাসুজি আমার কাছে চিঠি লিখিতে বাধা কি?...এই গবর্ণমেণ্ট যতই শক্তিশালী হোক, আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে আমার কাছে এই ধরণের চিঠি আসা বন্ধ করিবার সাহস গবর্ণমেণ্টের হইতে পারে। এইরূপ চিঠি আসিতে না দিলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে।..."

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯শে মে, ১৯৪৪

এক বছর আগে জিন্না সাহেবের উক্ত বক্তৃতা, যাহা ৭ই মে ১৯৪৩এর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল তাহা হইতে হিন্দুস্থানে প্রকাশিত অংশটুকুর হুবহু রিপোর্ট এইরূপ—

"পাকিস্তানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য মিঃ গান্ধী যদি এমন কি এখনও বাস্তবিক ইচ্ছুক হন তো আমিই তাহা সর্বাধিক আগ্রহে অভ্যর্থনা করিব। আমি আপনাদের বলিতে চাই যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই সেই দিনটী হইবে শ্রেষ্ঠতম দিন। মিঃ গান্ধী যদি মনস্থির করিয়া থাকেন তো তাঁহার পক্ষে সোজাসুজি আমার কাছে চিঠি লিখিতে বাধা কি? ...এদেশে এই গবর্ণমেণ্ট যতই শক্তিশালী হোক... আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে আমার কাছে এই ধরণের চিঠি আসা বন্ধ করিবার সাহস গবর্ণমেণ্টের হইতে পারে। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ করে তো তাহাতে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে।..."

—ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, ৭ই মে, ১৯৪৩

আমাদের মন্তব্য

জিন্নার বক্তৃতা সম্বন্ধে হিন্দুস্থান ও ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট মিলাইয়া পড়িলেই দেখা যাইবে যে ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্টের বড় হরফে মুদ্রিত কথাগুলি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছে। জিন্না সাহেব বলিয়াছিলেন যে, গান্ধীজি যদি পাকিস্তানের ভিত্তিতে আপোষ করিবার চিঠি তাঁহাকে লেখেন তবে গবর্ণমেণ্টে সে চিঠি বন্ধ করিলে গুরুতর ব্যাপার ঘটিবে—অর্থাৎ তখন লীগ কংগ্রেসের জন্য লড়িবে। কিন্তু বক্তৃতার যেখানে যেখানে এই পাকিস্তানের ভিত্তির উল্লেখ বা আভাস আছে হিন্দুস্থান তাহার প্রত্যেকটী জায়গাই বদলাইয়া দিয়াছে—যাহাতে লোকের ইহাই মনে হয় যে গান্ধীজি পাকিস্তান বাদ দিয়াও শুধুমাত্র আপোষের জন্য চিঠি লিখিলেই জিন্না সাহেব কংগ্রেসের জন্য লড়িতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং জিন্না সাহেব যখন তাহা করিলেন না তখন যিনিই হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকা পড়েন তিনিই ভাবিবেন জিন্না সাহেব মিথ্যাবাদী। পাকিস্তান বাদ দিয়াও জিন্না সাহেবের কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করা উচিত কিনা তাহা আলাদা প্রশ্ন, তাহা লইয়া হিন্দুস্থান যত খুশী মতামত ব্যক্ত করিতে পারে। কিন্তু জিন্না সাহেব ইহাতেই রাজি ছিলেন এই ধরণের মিথ্যা ইঙ্গিত ও মিথ্যা সংবাদ সাধারণ ন্যায় বিচারের দিক দিয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। জিন্না সাহেব সম্বন্ধে এই মিথ্যা উদ্ধৃতি আরও গর্হিত, কারণ তথাকথিত স্বদেশী সংবাদপত্রগুলি সাধারণতঃ জিন্নার বক্তৃতা একেবারেই ছাপে না—কাজেই উদ্ধৃতি ঠিক বা ভুল তাহা মিলাইয়া দেখিবার উপায়ও জনসাধারণের হাতের কাছে থাকে না।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা: ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪৸০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

রংপুর জেলায় নিদারুণ অবস্থা

হাটে বাজারে বসন্তের রোগী নির্ব্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়ায়

রংপুর জেলায় ম্যালেরিয়া, পাচড়া ও বসন্ত গুরুতরভাবে দেখা দিয়াছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলেই পাচড়ার দৌরাত্ম সব চেয়ে বেশী। অনেকগুলি গ্রামের শতকরা ৯৯ জনই এই রোগে ভুগিতেছে। কুড়িগ্রাম মহকুমার তিস্তা, রতিপুর, মধুরাম, হীরামাণিক, রাজারহাট প্রভৃতি এলাকায়ই রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিস্তা ও সদর মহকুমার শঙ্করদহ প্রভৃতি গ্রামে বহু লোক এই রোগের আক্রমণে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতাও বাড়িয়া চলিয়াছে। গাইবান্ধা মহকুমার রামচন্দ্রপুরে তথ্য নিয়া দেখা গেল শতকরা ৮০ জনই এই রোগে ভুগিতেছে। কুড়িগ্রাম মহকুমার অবস্থাও এইরূপ। কাঠালবাড়ী, বৈন্তের বাজার, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই রোগের আক্রমণ সাংঘাতিক রূপ নিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে আক্রমণের তীব্রতা খুবই বেশী ছিল, মার্চ্চ মাসে তীব্রতা কিছুটা কমিয়া যায় কিন্তু এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে রোগের বিস্তার আবার বাড়িতে থাকে।

ফেব্রুয়ারীতে কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা থানাতেই প্রথম ২।১টি করিয়া বসন্তের আক্রমণ সুরু হয়। মার্চে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়—সমস্ত জেলায় বসন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। বর্ত্তমানে এই রোগের প্রকোপ এতটুকুও কমে নাই—বরং ব্যাপকতা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বহু লোক রোগের আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে। কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার অবস্থাই খুব খারাপ। তবে নীলফামারী ও সদর মহকুমাতেও এই রোগ বিস্তার লাভ করিতেছে। তিস্তা, রতিপুর, মধুরাম, সিংদাবাড়ী, রাজার হাট, কাটালবাড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই বসন্তের আক্রমণ শুরু হইয়াছে। ফলে গ্রামগুলির সর্ব্বত্রই কবরে ভরিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল যে মৃতদেহ এদিক ওদিক ফেলিয়া দেওয়া হইত, শৃগাল ও শকুনীর জন্য মড়া রাখিয়া দেওয়া হইত। হাটে বাজারে বসন্ত রোগী নির্ব্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইত, এমন কি ট্রেনেও বসন্ত রোগী এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইত।

লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নেও বসন্তের মহামারী ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। মাঝিপাড়া গ্রামটি এই রোগের আক্রমণে একেবারে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। গৃহে গৃহে বসন্ত, কেহ কাহাকেও সাহায্য করিবার নাই। একজন বসন্তের রোগী দূরে এক স্থানে কেরোসিন আনিতে যায় —তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানায়, রোগী হইয়াও তাহাকে আসিতে হইয়াছে তাহার কারণ, তাহাকে কেরোসিন আনিয়া দেবার কেহ নাই অথচ কেরোসিন অভাবে তো আর দিন চলে না!

রোগ কি ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে

কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া নীচের তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই তথ্য দেখিলেই বোঝা যাইবে, গ্রামের পর গ্রামে রোগের আক্রমণে কি ভাবে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার মুখে :—

গ্রাম	কাহার বাড়ী	বাড়ীতে কয়জন লোক	বসন্তে আক্রান্ত সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
মধুরাম	বুচু	৩০	৩০	৩
”	তেরপা	৬	৩	২
”	রজনীকান্ত বর্ম্মণ	১৩	৩	×
রাজপুর	যজ্ঞেশ্বর বর্ম্মণ	১৩	৪	১
”	বালা চরণ বর্ম্মণ	৭	৩	১
তিস্তা	গুরু চরণ বর্ম্মণ	৩০	৩০	১১
”	রহিমুদ্দীন	৮	৪	১
শঙ্করদহ	সমরুদ্দী	১৩	১৩	১
”	সফীরুদ্দী	১০	১০	২
”	আসাফুল্লা	২০	২০	৩
”	পচা সেক	৩	৩	২
”	লালবিহারী	১০	২	১
গোকুণ্ডা	গনী মামুদ	১৮	১৮	৩
”	সলীউল্লা	৬	৬	৩
হীরা মাণিক	ময়চাঁদ বর্ম্মণ	১৩	৩	×

মহামারী রুখিতে জেলার সর্ব্বত্র

মেডিকেল রিলিফ কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে

ডাঃ অমিয় বানার্জি পিপলস্ রিলিফ কমিটির তরফ হইতে রংপুরে মেডিকেল ইউনিট নিয়া যান। তিনি মহামারী রুখিতে রংপুর জেলায় কিভাবে কাজ হইতেছে তাহার একটি বিবরণ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—“আমি রংপুর পৌছার ৪ দিন পরে আমাদের কাজের জন্য ঔষধ আসিয়া পৌছে। ইতিমধ্যে আমি শহরের ডাক্তারদের সাথে জেলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মিলিটারী মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন পি, কে, সেন বলেন যে জেলাবোর্ড হইতে ২০টি বেডযুক্ত যে ৩০টী হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তাহার কাজ খুবই মন্থরগতিতে চলিয়াছে তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট হইতে মেডিকেল ছাত্রদের যে স্কোয়াড করা হইয়াছে তাহার কাজও ভাল ভাবে চলিতেছে না। ডাঃ সেন আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। রংপুর জেলার ‘ইউনাইটেড মেডিকেল রিলিফ কমিটির’ নির্দ্দেশ অনুসারে আমি তিস্তা এলাকায় যাই। সেখানে গিয়া বুঝিতে পারিলাম এখানে অবিলম্বে মেডিকেল রিলিফ দরকার। তাই তিস্তা বাজারে একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলা হইল। গত ১লা এপ্রিল হইতে বৈন্তের বাজার কেন্দ্রটির সম্পূর্ণ ভার পিপলস্ রিলিফ কমিটি নিয়াছে। ডাঃ ঈশ্বর রায়কে কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত তিস্তা কেন্দ্রের রিলিফের তথ্য

মাস	কত রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে	পাঁচড়া	ম্যালেরিয়া	পেটের অসুখ	অন্যান্য
২৭শে——৩১শে মার্চ্চ	৪৮	২৭	৬	৩	১২
এপ্রিল	২০০৭	১০৬১	১৩০	১৪৩	৬৭৩

বৈন্তের বাজার এলাকায় পাঁচড়া কমিয়া যাইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী হইতে মেডিকেল রিলিফের যে কাজ হইতেছে তাহার জন্যই এই রোগের প্রকোপ কিছু উপশম হইয়াছে।

বৈন্তের বাজার কেন্দ্র হইতে রাজার হাট এলাকায় গত ২রা মে পিপলস্ রিলিফ কমিটির একটি মেডিকেল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী পাঠান হয়। বসন্তের আক্রমণ রুখিতে এই অঞ্চলে তখন জেলা কৃষক সমিতি হইতে একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। রংপুর ইউনাইটেড রিলিফ কমিটিও এই কেন্দ্রে যথেষ্ট সাহায্য পাঠাইয়াছে। পিপলস্ রিলিফ কমিটির ভলাণ্টিয়ার বাহিনীও কৃষক সমিতির রিলিফ কেন্দ্রে আসিয়া কাজ করে। এই সময়ে এই কেন্দ্রে ২২৪ জনকে কলেরার টীকা দেওয়া হয়

২৮৫ „ বসন্তের „ „ „

২০৬ জন বসন্ত রোগীকে চিকিৎসা করা হয়

১৪১৭ „ ম্যালেরিয়া „ „ „

৩১৮৯ „ পাঁচড়া „ „

৬৩৭ „ পেটের পীড়া „ „ „

১৫৯৯ „ অন্যান্য রোগ „ „ „

বাংলাকে মহামারী হইতে বাঁচা…

মেডিকেল রিলিফের জন্…

আমলাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াই খালাস!

বসন্তের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে

সাল	মাস	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা
১৯৪৩	নভেম্বর	২৬৬০
”	ডিসেম্বর	৭২৫৩
১৯৪৪	জানুয়ারী	২৩৩৯৪
”	ফেব্রুয়ারী	২৪৯৭৭
”	মার্চ	২৫২০৫
”	এপ্রিল	৩৪২৫২
	মোট	১১৭৭৪১

মহামারী সম্প…

নূতন …

কলিকাতা, ২২শে মে—… এক নোটিশে ঘোষণা করা হ… জেলায় বসন্তের আশঙ্কা দেখা… কলেরারও আশঙ্কা করা যাইতে… বাংলার গভর্ণর কয়েকটী বিধান …

অবিলম্বে কলেরা ও…

ফরিদপুরে

ফরিদপুর, ১৯শে মে—এখনও এই জেলায় কলেরা ও বসন্ত হইতেছে। ২৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলেরা ও বসন্তে যথাক্রমে ১১৬ ও ৪৭৯ জন আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে ৫৫ ও ১৩৭ জন মারা যায়। এই হিসাবের মধ্যে মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমা ও ৫টি থানার হিসাব ধরা হয় নাই।—এ, পি।

কুচবিহারে

কুচবিহার, ৩রা মে—এখানে বসন্ত রোগ মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় এবং এই রোগে বহু লোকের মৃত্যু হওয়ায় বাধ্যতামূলক টীকা গ্রহণ, লোকের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ছোঁয়াচ নিবারণ প্রভৃতি ব্যাপারে সরকার হইতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টে

শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহরূপ সম্প্রতি আসাম গভর্ণমেণ্টের এক প্রেস নোটে বিবৃত হইয়াছে। এই পল্লীর মোট জনসংখ্যা ৪২ হাজার। মোট মৃত্যুসংখ্যা হইতেছে ৪২২০। একমাত্র জ্বর রোগে মৃত্যুর সংখ্যাই ৩৩০৯।

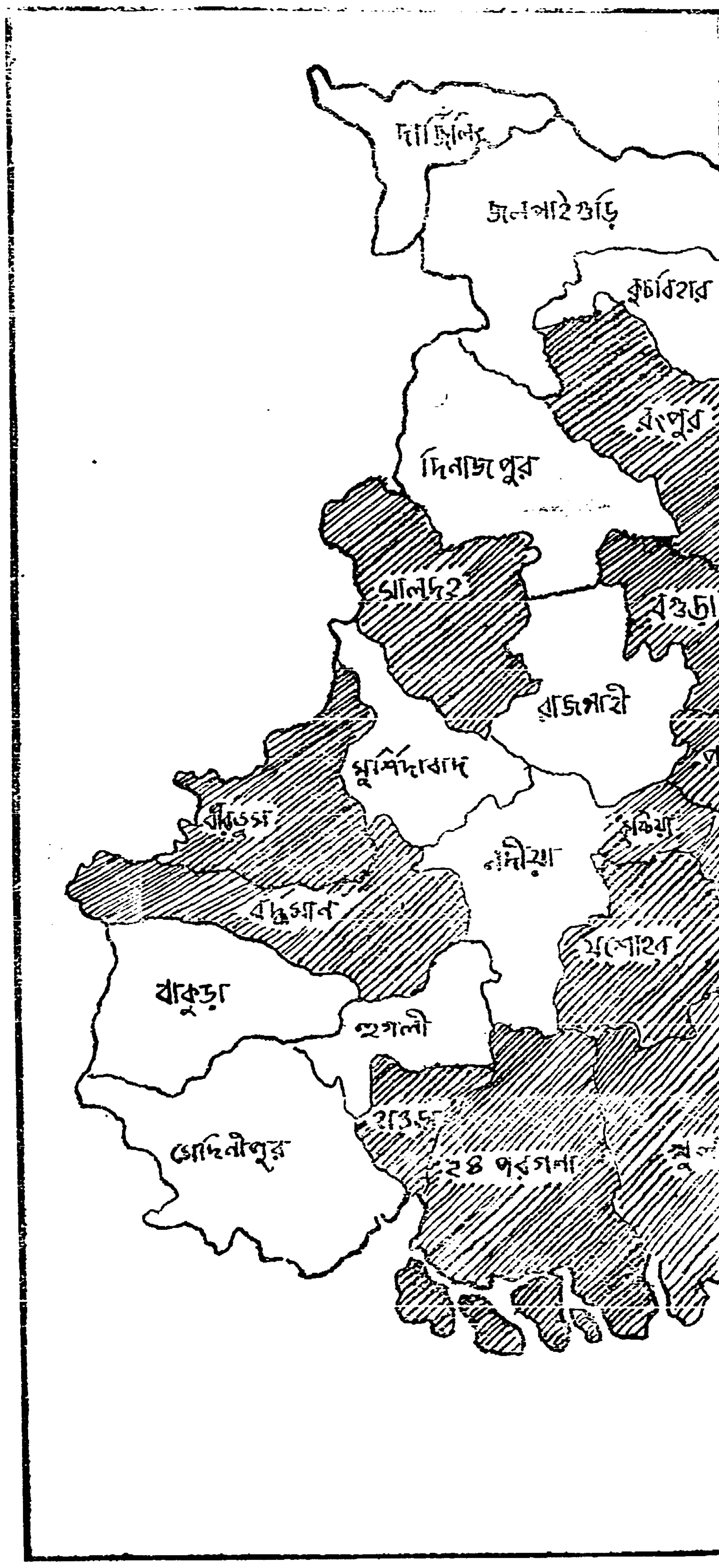

কলিকাতায় মৃত্যুর হিসাব

’৪৩-এর চেয়ে আড়াই গুণ বেশী

১৯৪৩ এবং ১৯৪৪-এর জানুয়ারী হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত মোট মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ১০৪০৩ এবং ২৫১০১। গত ২০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ১০৪৯ এবং ১০৭৬। পূর্ব্ব বৎসরে এই দুই সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৪৫৯ এবং ৫২৪।

কংগ্রেস-নেতা কির…

মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডি…

বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে একটী বিবৃতির জন্য শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে অনুরোধ জানান হইলে তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতিটী প্রকাশার্থে দেন।

সরকারী রিপোর্ট যাই হোক না কেন বা তাদের মনে যতই আত্মতুষ্টি থাকুক না কেন, এ কথা সত্য যে বাংলায় মহামারীর প্রকোপ এখনও ভয়ানক ভাবে চলিতেছে। খানিকটা বৃষ্টির অভাবে ও

...হইতে আপনি কি করিতেছেন?

...সর্ব্বত্র আন্দোলন করুন

কিন্তু দেশবাসী বসিয়া থাকিতে পারে না

...র্ক সরকারের
...ঘোষণা

...লিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ...হইয়াছে, পাবনা ও রংপুর ... যাইতেছে। পাবনা জেলায় ...ছে। রোগ দূরীকরণ কল্পে ...জারী করিয়াছেন। —এ, পি

কলেরা আবার বাড়িতেছে

সাল	মাস	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা
১৯৪৩	নভেম্বর	৩১৪৫৯
„	ডিসেম্বর	২০২৮৮
১৯৪৪	জানুয়ারী	১৮৬৯৩
„	ফেব্রুয়ারী	৪৮২৭
„	মার্চ	৫২৫
„	এপ্রিল	৫৯৮৩
	মোট	৯২৫০০

... বসন্তের টীকা নিন

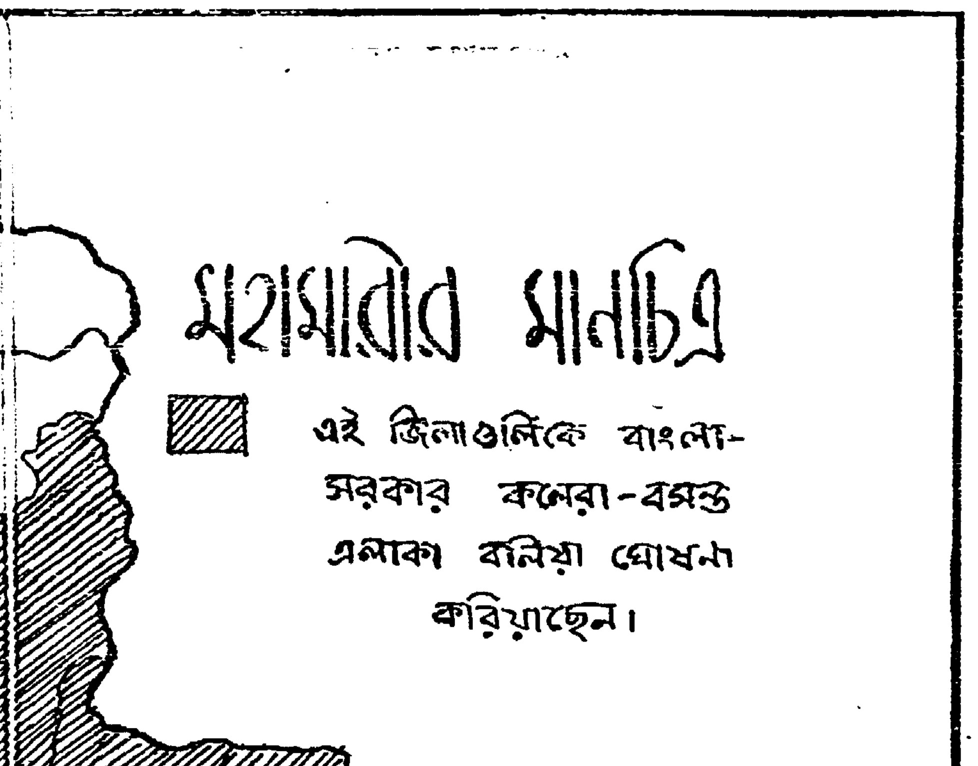

বাংলায় রিলিফ অভিযান

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্বাবধানে নিম্নলিখিত মেডিকেল রিলিফ-কেন্দ্রগুলি মহামারীর বিরুদ্ধে সারা বাংলায় কাজ করিতেছে—

জেলা	কেন্দ্রের সংখ্যা
২৪ পরগণা	৫
খুলনা	১
যশোহর	৩
নদীয়া	৩
মুর্শিদাবাদ	১
বাঁকুড়া	২
মেদিনীপুর	৮
বীরভুম	১
হাওড়া	১
হুগলী	২
বর্দ্ধমান	২
ঢাকা	১০
ফরিদপুর	৫
বরিশাল	৬
ময়মনসিংহ	৫
ত্রিপুরা	৬
চট্টগ্রাম	২
নোয়াখালি	২
রংপুর	২
বগুড়া	৩
দিনাজপুর	১
মোট	৭১

...শঙ্কর রায়ের উক্তি

...শন কমিটিকে সাহায্য পাঠান

খানিকটা কুইনাইনের অভাবে ও ঔষধপত্র খারাপ হওয়ার দরুণ মহামারী ক্রমশঃই খারাপ আকার ধারণ করিতেছে। এই অবস্থায় বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী যে সময়মত ও একতাবদ্ধভাবে এই মহামারীকে রুখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তার জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি আশা করি লোকজন, অর্থ ও ঔষধপত্রের জন্য তাঁরা যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহাতে সকলেই আন্তরিক-ভাবে সাড়া দিবেন।

কুমিল্লায় ম্যালেরিয়ার মহামারী

কুমিল্লা, ২৫শে মে—ত্রিপুরা জেলার চান্দিনা থানায় ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটির মেডিকেল ইউনিট গত ২ সপ্তাহ যাবৎ ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয়, টাইফয়েড ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ৫২১০টি রোগী চিকিৎসা করিয়াছে। রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। —ইউ, পি

———

ময়মনসিংহে ব্যাপক আক্রমণ

বারহাট্টা এলাকায় প্রতিটি কৃষক পরিবারে বসন্তের রোগী

ময়মনসিংহ জেলার ৫টি মহকুমার মধ্যে কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই মহামারীর প্রকোপ সব চেয়ে বেশী। **কিশোরগঞ্জ মহকুমায় লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ। ইহার ভিতর শতকরা ৭০ জনই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত।** বসন্তের আক্রমণে প্রচণ্ডতাও খুবই ভয়াবহ। সরকারী তথ্যাতে জানা যায় যে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি এই ২মাসে এই মহকুমায় ১১৯৪ জন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ৩৫৪ জন মারা গিয়াছে। সরকারী এই তথ্য অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় লোকদের মতে সরকারী সংখ্যার ৪ গুণ বেশী লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং মারা গিয়াছে। এই হিসাবে কমপক্ষে ৫০০০ লোক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ১৫০০ জন মারা গিয়াছে অর্থাৎ মহকুমার প্রতি ৩০০ জনের একজন বসন্তে আক্রান্ত এবং ৮০০ জনের একজন বসন্তে মারা গিয়াছে।

এই মহকুমার **তারাইল ও করিমগঞ্জ** থানাতেই রোগের উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সরকারী ও বে-সরকারী উভয় সূত্রেই জানা গিয়াছে যে তারাইলে শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। অথচ আক্রমণের এই তীব্রতা এখনও কমিতেছে না বরং ইহা বাড়ার দিকেই। **কাটিয়াদি** থানায় লোকসংখ্যা ১৪০,০০০। গত তিনমাসে মহামারিতে ৫৬০০ মারা গিয়াছে—অর্থাৎ লোক সংখ্যার শতকরা ৪ জন। গত মার্চ্চ মাসেই বসন্তে ২০০০ আক্রান্ত হইয়াছিল, ৪০০ মারা পড়িয়াছে। **এপ্রিল ও মে মাসে ম্যালেরিয়া ও বসন্তের আক্রমণ বাড়িয়া গিয়াছে।** এই অঞ্চলে মুমুরদীয়া একটি গ্রাম, প্রায় ৫০০০ লোকের বাস। একদিন গণনা করিয়া দেখা গেল ৩০০-র উপরে লোক বসন্তে শয্যাশায়ী।

নেত্রকোনা মহকুমার অবস্থাও খুবই শোচনীয়। **কেন্দুয়ায়** স্থানীয় ডাক্তার ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের মারফত জানা গেল শত করা ৯০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

বারহাট্টার কমিউনিষ্ট পার্টির ভলাণ্টিয়াররা মে-মাসের প্রথম সপ্তাহে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবারেই বসন্তের আক্রমণ হইয়াছে।

ধুসং-এ মার্চে কলেরা ও বসন্তের দারুন মহামারী দেখা দিয়াছিল।

সদর মহকুমার মুক্তলী, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় এপ্রিলের মাঝামাঝি পুনরায় ম্যালেরিয়া সুরু হইয়া গিয়াছিল কিন্তু কুইনাইন বিলি করিয়া রোগের ব্যাপকতা কিছুটা কমান গিয়াছে।

টাঙ্গাইল মহকুমার অবস্থাও খুবই ভয়াবহ। ম্যালেরিয়া প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। **এলেঙ্গা ইউনিয়নে** রিলিফ কমিটি যে তথ্য নিয়াছে তাহা এই,- জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এই চার মাসে—

কলেরায় মৃত্যু—২৩৩, ম্যালেরিয়ায়—১৬০, বসন্তে—১৮২, অন্যান্য রোগে—৯২।

অথচ, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এই ইউনিয়নে রোগের আক্রান্ত সংখ্যা—

কলেরায়—৬০, ম্যালেরিয়ায়—২৭৫, বসন্তে—১৯৮, কালাজ্বরে—১১০, অন্যান্য রোগে—১২৬।

জামালপুর মহকুমায়ও ম্যালেরিয়া ও বসন্তের আক্রমণ খুবই চলিয়াছে।

এই সমস্ত হিসাব হইতে এখন বলা যায় যে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় শতকরা ৬০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ হইতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তীব্রতর হইয়াছে—এর সাথে মেলিগ্নাণ্ট ম্যালেরিয়ার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের ভিতর কালাজ্বর মহামারীর আকারেই দেখা দিয়াছে।

মেডিকেল রিলিফের জন্য

ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠিত হইতেছে

ডাঃ অমর নাগ পিপলস্ রিলিফ কমিটি তরফ হইতে **ময়মনসিংহ জেলায়** মেডিকেল রিলিফ ইউনিট নিয়া গিয়াছেলেন। তিনি তাঁহার কাজের বিবরণ দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন—আমি প্রথমেই গিয়া চেষ্টা করি যাহাতে যুক্ত-ছাত্র-শিক্ষক-রিলিফ-কমিটির **জঙ্গলবাড়ী কেন্দ্রটী** ভালভাবে পুনর্গঠিত হয়। এই কাজ আরম্ভ করার জন্যই আমাকে 'ভলাণ্টিয়ার ট্রেনিং ক্যাম্প' খুলিতে হয়। **করিমগঞ্জে** এই ক্যাম্প খোলা হয় এবং ১৭ জন ভলাণ্টিয়ার এখানে মহামারীর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়িতে হইবে তাহার শিক্ষা পায়। তারপর এঁদের নিয়াই জঙ্গলবাড়ী কেন্দ্রটিতে নূতনভাবে মেডিকেল রিলিফের কাজ সুরু হয়। স্থানীয় ডাক্তারদের সাথে একত্র হইয়া সমগ্র থানাতেই যাহাতে মেডিকেল রিলিফের কাজ চালান যাইতে পারে তাহার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জঙ্গলবাড়ী কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে **জাফরাবাদ, কিরাটোন, গুজাদিয়া, ছত্রধরিয়া** প্রভৃতি গ্রামে শাখা কেন্দ্র খোলা হয়। এইসব কেন্দ্রে দৈনিক রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। জঙ্গল বাড়ীতে দৈনিক ১৫০, জাফরাবাদ ২০০ কিরাটোনে ২০০ রোগীর সমাগম হয়। ইহা ছাড়া সপ্তাহে যে দুই বার খোলা হয় তখন গুজাদিয়াতে ৩০০ ও ছত্রধরিয়াতে ২০০ রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

মে মাসের আগে পর্য্যন্ত এখানে কোন স্থায়ী ডাক্তার কাজ করেন নাই, কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পিপলস্ রিলিফ কমিটি হইতে ডাঃ গোষ্ঠবিহারী বক্সীকে সর্ব্বক্ষণের জন্য এই কেন্দ্রগুলিতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

কমরেড অপূর্ব্ব গোস্বামীর নেতৃত্বে **কাটিয়াদী থানায় বাণীগ্রামকে কেন্দ্র** করিয়া একটি রিলিফ স্কোয়াড কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

নেত্রকোনাতেও একটি ভলাণ্টিয়ার ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। এখানে ৯ জন ভলাণ্টিয়ার শিক্ষা নেয়। কংগ্রেস, মুসলেম লীগ, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ইউনিট এবং স্থানীয় ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্বে বি, এম, আর, সি, সির একটি নেত্রকোনা সাব ডিভিশন কমিটি তৈরী হয়। এই কমিটি ইতিমধ্যেই ২১ জন ভলাণ্টিয়ারকে ট্রেনিং দিয়াছে। কুইনাইন বিলি, মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান স্কোয়াড পাঠানো এবং ঔষধ ইত্যাদি কিনিবার জন্য টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে এই কমিটি উৎসাহের সহিত প্ল্যান করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। এই কমিটিরই উদ্যমে **বারহাট্টা থানার** নেতৃবৃন্দ ও ডাক্তারদের লইয়া একটী রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া **সেরপুরের** বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ডাক্তারদের সমাবেশে ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র নাগ এম, বি কে প্রেসিডেণ্ট করিয়া একটি সেরপুর থানা মেডিকেল রিলিফ কমিটি তৈরী হইয়াছে। মহামরী বিরোধী স্কোয়াড তৈরীর জন্য এই কমিটির উদ্যোগে ভলাণ্টিয়ার ট্রেনিং সুরু হইয়া গিয়াছে।

ভারতে কুইনাইনের অভাব

জরুরী ঔষধ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে

লণ্ডন, ২১শে মে—সোশ্যালিষ্ট মেডিকাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ এস, এফ, ফিজার্ড বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে কেবল চোরাবাজারে চড়াদামে কুইনাইন পাওয়া যায়, আর কোথাও কুইনাইন পাওয়া যায় না। বৃটেনে পেটেণ্ট ঔষধ তৈয়ারী বন্ধ করিয়া এখন ভারতে যে সব ঔষধের জরুরী প্রয়োজন সেগুলি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধির প্রকোপ দেখা গিয়াছে কেবল জনসাধারণের সাহায্যেই তাহার প্রতীকার সম্ভব। পুনরায় আলোচনা আরম্ভের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। অনুরূপ মর্ম্মে সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

———

মালিক, মজুতদার ও আমলার ষড়যন্ত্র রুখিতে

চা-মজুরের যুক্ত কমিটির দাবী

গত ১১ই মে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর এস, ডি, ও বুলিয়ন কোম্পানীর চা-বাগান ও শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিতে যায়। বুলিয়ন কোং প্রায় ১ মাস যাবত কোন কারণ না দেখাইয়া ৬টী বাগান বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ফলে শ্রমিকদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। দিন-মজুরী বা ভিক্ষা করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা পরিদর্শন করেন এবং **মালিক যে ৫ বেল কাপড় গোপনে মজুত করিয়াছিল তাহা হইতে ২ বেল কাপড় শ্রমিকদিগকে বিতরণ করিয়া দেয়।** ম্যাজিষ্ট্রেট রিলিফ দ্বারা শ্রমিকদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও বলে। বুলিয়ন কোং এই পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের কোন নির্দ্দেশ মানে নাই কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। ফলে, শ্রমিকদিগকে অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই ভাবে কাপড় বিলি করার পর হইতে মালিক শ্রমিকদিগকে জব্দ করিবার নানারূপ কৌশল খুঁজিতেছিল। গত ১৬ই মে তারিখে ডলু বাগানের ম্যানেজার কোম্পানীর মজুত প্রায় ৩০ মণ ধান গোপনে সরাইতেছিল। শ্রমিকগণ সেই ধান আটক করে এবং তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও থানায় সংবাদ দেয়। থানা এই সংবাদ গ্রহণ না করিয়া রেজিষ্ট্রারী করা চিঠি ফেরৎ পাঠায় এবং ২১শে মে তারিখে চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড বিভূতি দাস ও ১২ জন শ্রমিককে ৩৯৫ ধারায় লুটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়। তদন্তকারী দারোগা কমরেড বিভূতি দাস ও বার জন শ্রমিককে বাঁধিয়া বাজারে ঘুরায় এবং নানা অপমানকর গালাগালি করিতে থাকে এবং শ্রমিকদিগকে লুট করিয়াছে স্বীকার করিবার জন্য ভয় দেখাইতে থাকে।

এই মামলাতে স্থানীয় মজুতদাররা সাহায্য করিতেছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা এই অঞ্চলে বিরাট ভাবে মজুতবিরোধী আন্দোলন চালাইতেছিল। মজুতদারগণ চা-বাগান ম্যানেজারদের সাথে যোগ দিয়া এই অভিযান বন্ধ করিতে চায়। এই গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণহাটে আড়াইসেরের স্থলে টাকায় দেড় সের দরে চাউলের দর উঠিয়াছে।

আমলাতন্ত্র একদিকে রিলিফের প্রতিশ্রুতি দিতেছে অন্যদিকে মালিক ও মজুতদারদের সাহায্য করিতেছে। আমলাতন্ত্রের এই অকর্ম্মণ্যতা দূর করিবার জন্য চা-শ্রমিকগণ প্রত্যেক বাগানে সভা করিয়া দারোগার ব্যবহার ও গ্রেপ্তারের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, শ্রমিকদের মুক্তি ও বাগানরক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী যুক্তকমিটি দাবী করিতেছে।

রেশন ও মাহিনা বৃদ্ধির দাবী পূরণে

কর্পোরেশন শ্রমিক সভায় মেয়রের প্রতিশ্রুতি

'দেশপ্রেমিক শ্রমিক ও কর্ম্মচারী হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে কলিকাতা নগরীকে অধিকতর পরিষ্কৃত রাখিবার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিব'—করপোরেশনের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা গত ২২শে মে করপোরেশন প্রাঙ্গণে কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন উপলক্ষে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। বহুদূর হইতে টালা পাম্পিং ষ্টেশন, মোটর ভেহিকলস রিফিউজ প্লাটফরম, ইণ্টালী ওয়ার্কশপ, কনসারভেন্সী প্রভৃতি ডিপার্টমেণ্ট হইতে এবং নারী-শ্রমিকরাও সভায় যোগদান করে। কর্ম্মচারীদের মধ্যে শিক্ষক, জমাদার, পিয়ন প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিল। মাননীয় মেয়র ও বিভিন্নদলের কাউন্সিলরদের সম্মুখে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী-বৃন্দ নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানায়। শ্রমিকদের ৫।০ চাল ও আটার এবং সকলের মাহিনা বৃদ্ধি, মাগগি ভাতা (প্রিভিলেজ লিভ-এর সময়ের জন্যও) প্রভৃতি দাবী জানাইয়া তাহারা মেয়রকে যে মানপত্র দেয়—মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার তাহার উত্তরে জানান—গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে সাহায্য করুক আর নাই করুক করপোরেশন শ্রমিকদের বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। ভাল রেশনের জন্য ও আরও বেশী রেশনের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। মাহিনা বৃদ্ধির দাবী ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং অন্যান্য কাউন্সিলর বিশেষ করিয়া শ্রমিক কাউন্সিলরদের সাহায্যে ইহা পূরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে করপোরেশনের মধ্যে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা যে দুইজন নেতাকে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে পাইয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টায় তাহাদের সমস্ত দাবী নিশ্চয়ই আদায় হইবে এবং শ্রমিক কর্ম্মচারীদের উপর যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতিপালনে সমর্থ হইবে।"

শ্রীরাধানাথ দাস, ডাঃ এস চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্র নাথ সরকার, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীযুত ডাওয়ালকা প্রমুখ বিভিন্নদলের কাউন্সিলরদের পক্ষ হইতে শ্রীদেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কমরেড ইসমাইল আশ্বাস দেন যে শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য তাহারা অবশ্যই চেষ্টা করিবেন। সভাপতি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী শ্রমিকদিগকে এক ইউনিয়নে সংগঠিত হইতে অনুরোধ করেন।

★ রেল মজুরের দেশপ্রেম ★

গাড়ী মেরামত নিজেরাই করিল

সম্প্রতি বি, এণ্ড, এ রেলের চিৎপুর শাখার স্যানিটারী বিভাগের একখানা আবর্জ্জনা পরিষ্কারের গাড়ী মেরামত করিয়া রেল মজুররা রেলের কাজে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দরদ দেখাইয়াছে।

২২শে মে। স্যানিটারী ইনস্পেক্টর হুকুম করিলেন আবর্জ্জনা পরিষ্কারের যে গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা মেরামতের জন্য সৈদপুর কারখানায় পাঠানো হোক। কিন্তু মজুরদের পক্ষ হইতে কমরেড ঘুরেলাল বলিল, গাড়ীর সংখ্যা কম, সুতরাং ইহা সৈদপুর না পাঠাইয়া এখানেই মেরামত করার ব্যবস্থা হইতে পারে। স্যানিটারী ইন্‌স্পেকটর প্রথমে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু আই, ও, ডবলিউ বিভাগের মজুর নেতা কমরেড রামজী যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তিনি নিজে আগাইয়া আসিয়া গাড়ী মেরামতের কাজ হাতে লইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীখানা মেরামত হইয়া গেল; মজুর ও অফিসাররা কমরেড রামজীর দেশপ্রেমের প্রশংসা করিলেন, নিজেরা উৎসাহিত হইলেন।

কমরেড রামজী ও ঘুরেলাল বি, এণ্ড, এ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম মজুরনেতা।

ইছাপুরে ৮হাজার মজুরের দাবী

পুরা মাগগীভাতা ও রেশন চাই

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইছাপুরে রাজনৈতিক চেতনার কোনো প্রকাশ ছিল না। কিন্তু লোহাকারখানার মজুর ইউনিয়নের কাজ সুরু হওয়ার পর হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত মজুরের মধ্যে এক বিপুল সাড়া আসিল। ইউনিয়নে ক্রমশই বেশী মজুর আসিতে লাগিল। 'জনযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা' বিক্রি হইতে লাগিল। আজকের দিনে মজুররা তাদের কাজের ভিতর দিয়া যে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক পরিচয় দিতেছে, সেই ধারণা মজুরদের উৎসাহিত করিল। মাগগীভাতা ও রেশনের দাবীর আন্দোলনে তাদের বিশ্বাস আসিল।

তাই ২০শে মে এখানের মজুর সভায় এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল। ৮ হাজার মজুর হাজির হইয়াছে। লোহাকারখানার সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের মজুরা আসিয়াছে। তাদের সংগঠন ও একতাকে অভিনন্দন করিতে বেলঘরিয়া, জগদ্দল, গৌরীপুর প্রভৃতি জায়গা হইতে মজুররা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বাংলার মজুর আন্দোলনের এবং কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে সভা সুরু হইল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি নেতারা মজুরদের সমস্যার গুরুত্ব বুঝাইয়া সকলকে একতাবদ্ধভাবে পুরা মাগগী ভাতা ও পুরা রেশনের জন্য আন্দোলন করিতে বলেন।

ঢাকা রেলওয়ে মজুর-সম্মেলন

কাজ বাড়াইতে যুক্ত ট্রান্সপোর্ট কমিটি চাই

ঢাকায় ১৩ই ও ১৪ই মে বি, এণ্ড, এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ঢাকা শাখার বাৎসরিক সম্মেলন হয়। কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী সভাপতিত্ব করেন।

ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড জ্যোতি বসু তাঁর আসামের অভিজ্ঞতা এই সম্মেলনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে গৌহাটী, লামডিং, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় প্রভৃতি জায়গার রেল মজুরদের সভা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জায়গায় মজুরদের মধ্যে উৎসাহ তিনি দেখিয়াছেন। লড়াইয়ের জন্য মজুররা ঘাবড়াইয়া যায় নাই, বরং রেলওয়ে ভালভাবে চালু রাখিয়া সৈন্য ও রসদ চলাচলের সুবিধা করার উপর যে আজকে বাংলা ও ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে তা বুঝিয়া মজুররা দেশপ্রেমের প্রেরণা অনুভব করিতেছে। সেইজন্যই কোনো রকম গুজব বা মিথ্যা প্রচার রেলওয়ে মজুরদের একতা ও সংগঠনকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

সম্মেলনে গান্ধীজির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং ইহা যে একতা ও দেশরক্ষার শক্তিই বাড়াইবে তাহা ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে যুক্ত ট্রান্সপোর্ট কমিটির দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং এই প্রস্তাব করা হয় যে রেলওয়েকে আরো ভালভাবে চালাইতে গেলে মজুর ও মালিকের যুক্ত কমিটী দরকার। যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত দাবী করা হয়:—৩০ টাকা মাগগী ভাতা চাই, ৩ মাসের মজুত রসদের জন্য গ্রেণসপ ও তাহার উপর মজুরদের তত্ত্বাবধান, উপযুক্ত জলসরবরাহ, পুরান মজুরির হার প্রবর্ত্তন, ই।বি-এ-বি ও বি-ডি ষ্টাফের পার্থক্য লোপ, প্রভৃতি।

আর এক প্রস্তাবে আসামের রেলওয়ে মজুরদের দেশরক্ষার দৃঢ়তা ও সংগঠনের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

——বোম্বাইয়ে যা হইয়াছে——

কলিকাতায় তা কেন হইবে না ?

রেশনিং তত্ত্বাবধানে বে-সরকারী কমিটী

'(বোম্বাইয়ে) রেশনিং ব্যবস্থার সঙ্গে বে-সরকারী জনসাধারণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ব্যবসায়ী সংঘ, করপোরেশন, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি লইয়া একটী ফুড এডভাইসারী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীর কাছে দৈনন্দিন সমস্যাগুলি পেশ করা হয় ও পরামর্শ লওয়া হয়।···

প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটী করিয়া বে সরকারী কমিটী আছে—সেই কমিটী বণ্টন সম্পর্কে জন-স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে। সম্প্রতি ডাক্তারদের লইয়া আর একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে, যার কাজ হইবে খাদ্যের পুষ্টি বর্দ্ধন ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। এক বছরে কয়েকবার জিনিষের দরও কমান হইয়াছে।'

'ক্যাপিট্যাল', ১৮ই মে

বোম্বাইয়ে মন্ত্রী সভা নাই। ৯৩ ধারার বলে আমলারাই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। তা সত্ত্বেও সেখানে রেশনিং ভাল করিবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা লওয়া হইতেছে এবং তার সুফল লোকে ভোগ করিতেছে। বোম্বাইয়ে যা হইয়াছে, বাংলায় তার চেয়ে আরো ভাল ব্যবস্থা হইতে পারে। কেননা, এখানে আমলাদের হাতে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নয়, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভা এখানে রহিয়াছে, যাঁরা আমলাদের উপর খবরদারী করিয়া জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা ভালভাবেই করিতে পারেন। কিন্তু তবু এখানে এখনো সে ব্যবস্থা হয় না কেন? কারণ রেশনিং ভাল করার দিকে নজর না দিয়া মন্ত্রীসভার নজর পড়িতেছে দলগত প্রাধান্যের দিকে, এবং বিরোধী দলও সেই দিকেই মন্ত্রীসভাকে অনবরত উস্কাইতেছে। বাংলার কোটী কোটী লোকের ভাগ্য আমলাদের হাতে এইভাবে ছাড়িয়া দিয়া দলগত কলহ লইয়া মাতোয়ারা হওয়া কি দেশপ্রেম, না জনস্বার্থ রক্ষা?

কাপড়ের চোরাকারবারীরা জব্দ

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের নূতন টেক্সটাইল কন্‌ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট বোম্বাইয়ের কয়েকজন বড় বড় কারবারীর উপর ঘা দিয়াছে। আগে টেক্সটাইল কমিশনার চোরাকারবারের বিরুদ্ধে অনেকবার সতর্কতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয় নাই। ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে অনেকগুলি বহুদিনের পাইকারী ও খুচরা কাপড়ের কারবারীকে কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইল: কেনন', কন্‌ট্রোল দরে কাপড় পাওয়াই তাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৯ই মে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কনট্রোলার ও তাঁর দুইজন সহকারীর তত্ত্বাবধানে ৩৮ জন বড় বড় কাপড় ও সূতা ব্যবসায়ীর উপর ভারত রক্ষা আইনে এক হুকুম জারী করিয়া তাঁদের লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ও তাঁদের ষ্টক আটক করা হইল।

এই কারবারীরা নাকি চোরাবাজারে বেশী মুনাফায় কাপড় বিক্রি করিবার মতলবে ষ্টক লুকাইয়া রাখিয়াছিল। হুকুমজারী করিবার সময় সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া গেল, যাতে বুঝা যায় যে এক একজন অনেক বিভিন্ন নামে কারবার চালাইতেছে। একজন বিশিষ্ট কারবারীর বাড়ী হইতে ৬টী ভিন্ন ভিন্ন নামের লাইসেন্স পাওয়া গেল, আর একজনের কাছে পাওয়া গেল ৪টী লাইসেন্স, আর একজনের কাছে ৩টী। শোনা যায় যে চোরাকারবার করিতেছে এমন বহু কারবারীর এক বিরাট লিষ্ট প্রাদেশিক কনট্রোলারের হাতে আসিয়াছে। এমন কতগুলি মিলও আছে যারা ষ্টক আটকাইয়া রাখিয়া শুধু দালালদের কাছে তা বিক্রী করিতেছে।

'ক্যাপিট্যাল', ১৮ই মে

বাংলার চোরাকারবারীরা এখনও জব্দ হয় না কেন? বোম্বাইয়ের আমলা যা করিতে পারে, বাংলার মন্ত্রীসভাও কি তা পারে না?

পোর্টে এই অন্যায় বরখাস্ত বন্ধ কর

গত ২৫শে মে কলিকাতা পোর্টের জেটি বিভাগের ক্রেন ড্রাইভার কমরেড ইব্রাহিমকে কর্তৃপক্ষ কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়াছে।

কমরেড ইব্রাহিম গত ২৫ বছর পোর্টে কাজ করিয়া আসিতেছে। গত দুইটি বোমা পতনের সময়ই সে কাজ চালু রাখিবার জন্য মজুরদের উৎসাহিত করিয়াছে। সম্প্রতি ঘুষ লওয়ার ব্যাপারে নিঃ রস নামক একজন বিভাগীয় কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে এবং উহা সত্য প্রমাণ হইলে তাহাকে চাকুরী হইতে বিদায় দেওয়া হয়। ঘুষের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনেও ইব্রাহিম ছিল সকলের আগে। ইব্রাহিম কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা হিসাবে পোর্টের কাজ ভালভাবে চালু রাখিবার জন্য সর্ব্বদা দুর্নীতি ও অব্যবস্থার উপর কড়া নজর রাখে।

পোর্ট কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া পোর্টের কাজের উপর আঘাত করিয়াছে। সর্ব্বত্র মজুর শ্রেণীর মধ্য হইতে এই কাজের প্রতিবাদ ধ্বনিত হোক।

ট্রাম মজুরের সমর্থনে জনসভা

গত ২১শে মে পার্ক-সার্কাসে ট্রাম মজুরদের দাবীর সমর্থনে এক জনসভা হয়। ট্রামগাড়ীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া, মিড ডে ও ট্রান্সফার টিকিট বন্ধ করা—এই দুইটী কারণে ট্রাম যাত্রীদের প্রত্যক্ষভাবে অসুবিধা হইতেছে। তারই সঙ্গে মজুরদের উপযুক্ত মাগগী ভাতা ও ৫।০ সের রেশন না দেওয়া ও পরস্পরের ডিউটি চেঞ্জ বন্ধ করার ফলে মজুরদেরও কর্ম্মক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই সভায় ডাঃ এ,টি,এম মোয়াজ্জেম, মহম্মদ ইউনুস, পার্ক সার্কাস ফুড কমিটীর মুস্তাক আহমেদ প্রভৃতি মজুরদের দাবী সমর্থন করিয়া তাদের এই আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেন।

প্রাদেশিক সূতাকল ও বেলটিং মজুর সম্মেলন

আগামী ১০ই ও ১১ই জুন মাহেশে (শ্রীরামপুর) প্রথম প্রাদেশিক সূতাকল ও বেলটিং মজুর সম্মেলন হইবে।

আসাম হইতে

বর্ষার আগেই জাপ-দস্যুর উৎখাত চাই

ইম্ফল রণক্ষেত্রে জাপানীদের তৎপরতা

এই সপ্তাহের খবর মোটামুটি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইম্ফলের দিকে জাপানীদের তৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোহিমা-ডিমাপুর অঞ্চলে যখন তীব্র লড়াই চলিতেছিল, তখন ইম্ফল এলাকায় যুদ্ধের গতি কিছুটা মন্থর হইয়াছিল। কিন্তু তখনই একথা বোঝা গিয়াছিল যে জাপানীরা সব রকম চেষ্টা করিয়াই দেখিবে যেন এই অঞ্চলে তাহাদের আক্রমনোদ্যোগ বজায় থাকে। পরের খবরগুলিতেই তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

'যে কোন উপায়ে হউক ইম্ফল অধিকার কর'—এই আদেশ পালনের জন্য মরিয়া হইয়া কয়েকটা জাপ-বাহিনী বিষেনপুর-টিড্ডিম রোডে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এক ক্ষেত্রে তাহারা বিষেনপুর-টিড্ডিম রোডের পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হয় এবং ইম্ফলের ১০ মাইলের মধ্যেই আক্রমণ চালায়। অবশ্য তুমুল যুদ্ধের পর জাপানীদের কোনঠাসা করা হইয়াছে।

বিষেনপুর এলাকায় জাপানীদের পাণ্টা আক্রমণ

জাপ ৩৩শ ডিভিসন বিষেনপুর এলাকায় পাণ্টা আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ডিভিসনের সৈন্যেরাই নাকি জাপানীদের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত। আরও নূতন নূতন সৈন্য আসিয়া এই ডিভিসনের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। এইসব অঞ্চলে জাপানীরা বেশ ভাল ভাবে নিজেদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখিতে ও বাড়াইতে দৃঢ় সঙ্কল্প কারণ বর্ষা নামিলে এইসব পার্ব্বত্য অঞ্চলে চলাচলের জন্য পাকা পোক্ত বন্দোবস্ত দরকার। শত্রুরা সে বিষয়ে যে খুবই হুসিয়ার তাহা তাহাদের বর্ত্তমান আক্রমণগুলি হইতে বোঝা যায়। এই সম্পর্কে পর পর খবরগুলি এই—জাপানীরা বিমান ঘাঁটি ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সমন্বিত ইম্ফল নগরী অধিকারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পালেল-টামু রোড এলাকায় মিত্রপক্ষের রক্ষা ঘাঁটি গুলির উপর সোজাসুজি জাপানীরা আসিয়া হানা দেয় ও কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে। কিন্তু মিত্র বাহিনীর পাণ্টা আক্রমণে এই অঞ্চলে জাপানীরা সুবিধা করিতে পারে নাই। এই লড়াইয়ে বহু জাপ সৈন্য প্রাণ দিয়াছে। ৩১ নং মাইল ষ্টোনের নিকট ইম্ফল সমতলের দক্ষিণ-প্রবেশ মুখে জাপানীরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া পর্য্যুদস্ত হয়। টিড্ডিম শিলচর রোডের সংযোগস্থলে মিত্রপক্ষের ঘাঁটিগুলির উপরও জাপানীদের জোর আক্রমণ চলে; কিন্তু সেখানেও তাহারা সুবিধা করিতে পারে নাই।

কিন্তু মিত্রসেনা জাপানীদের পথরোধ করিতেছে

জাপানীদের কার্য্যতৎপরতা বৃদ্ধির মুখে মিত্রসেনাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুর সমস্ত আয়োজনে দারুন ভাবে বাধা দিতেছে। ইম্ফলের উত্তর-পশ্চিমে কাংলাটংবী গ্রাম হইতে জাপবাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। ফলে আরও ২।১টি স্থান হইতে উহাদিগকে সরিয়া যাইতে হইতেছে। মিত্রসেনারা আনুমানিক ২ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। টিড্ডিম সড়কে আমাদের যে সৈন্য শত্রুর পথরোধ করিয়া ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে, তাহারা পুনরায় শত্রুর প্রবল আক্রমণ ঠেকাইয়াছে। মিত্রবাহিনী কোহিমার দক্ষিণ-পূর্ব্বে জাপানীদের তিনটি পাহাড়িয়া ঘাঁটি দখল করে। বিষেনপুর অঞ্চলের মিত্রসেনারা একে একে জাপঘাঁটিগুলির উচ্ছেদ করিতেছে। এই অঞ্চলে প্রায় এক ব্যাটেলিয়ন জাপসৈন্য ধ্বংস হইয়াছে এবং উহাদের কমাণ্ডারও নিহত হইয়াছে। বিষেনপুরের ১২ মাইল দক্ষিণে জাপানীদের এক পাণ্টা আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পালেল-টামু রোডেও শত্রুর কয়েক দফা আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ইম্ফলের দক্ষিণে মৈরাং অবস্থিত। এখানেও তুমুল যুদ্ধের পর মৈরাং-এর দক্ষিণে একটি সুরক্ষিত জাপ-ঘাঁটি মিত্রসেনারা দখল করিয়াছে। কোহিমার উত্তরে একটি নাগা গ্রামের জন্য জাপানীরা প্রবল আক্রমণ চালায়, কিন্তু তাহারা সেখানে কোনরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

মিচিনা অঞ্চলের যুদ্ধ

জাপানীরা মিত্রবাহিনী অধিকৃত মিচিনার বিমান ঘাঁটির উপরও পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু চীনা ও মার্কিন বাহিনী উহাদিগকে হটাইয়া দেয়। শত্রুরা মিচিনার দক্ষিণপূর্ব্বে 'নামকোয়াই' রেলসেতুও দখলের জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা বার্থ হইয়াছে। চীনা সৈন্যরা মগাং নদীর পশ্চিমে ৫ মাইল আগাইয়া গিয়াছে। মিচিনা শহরের চারিদিকে মিত্রবাহিনীর লৌহবেষ্টনী ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গত ২৪শে মে তারিখ শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিমান-ঘাঁটি ও রেলপথ সংযোগকারী রাস্তার সংযোগস্থল চীনা বাহিনী অধিকার করিয়াছে। ২৭শে মে'র খবরে প্রকাশ ৩৮নং চীনাফৌজ কামাইংয়ের ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ওয়ারং দখল করিয়াছে। বহু জাপসৈন্য নিহত হইয়াছে এবং জাপানীদের বহু সমরসম্ভার হস্তগত হইয়াছে। জিগিউন হইতে অগ্রসর মিত্র-বাহিনী শহরের দিকে দেড় মাইল আগাইয়া গিয়াছে। ওয়ারং অধিকার করিয়া চীনা পল্টন প্রবল প্রতিরোধের মুখে আগাইয়া আসিতেছে। জিগিউন হইতে অগ্রসর জেনারেল ষ্টীল ওয়েলের বাহিনী বর্ত্তমানে মিচিনা হইতে এক মাইল দূরে রহিয়াছে। মিচিনার উত্তরে দুইটি পাণ্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

তবুও বিপদ কাটিয়া যায় নাই

মিচিনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র কোহিমা পালেল রণাঙ্গনে আক্রমনোদ্যোগ মিত্রপক্ষের হস্তে রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও জাপদস্যুরা এখনও এই সব দিকে বেশ তৎপর ও শক্তিশালীই আছে। এই সপ্তাহের খবরগুলি খুবই তাৎপর্য্য পূর্ণ। ইম্ফল ও বিষেনপুর এলাকায় তাহাদের আক্রমণ চলিয়াছে। নূতন সৈন্য সামন্তও তাহারা আমদানী করিয়াছে ও করিতেছে। মোট কথা ভারতের পূর্ব্বদিককার প্রবেশদ্বার বাংলা ও আসামের বিপদ তেমনি গুরুতর রহিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-দস্যুরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে বেশ শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। কোহিমা হইতে যদিও শত্রুসৈন্য বিতাড়িত হইয়াছে, তবু এখনও ডিমাপুর হইতে ইম্ফলে সরাসরি সাহায্য যাইতে পারিতেছে না। ইম্ফলের দক্ষিণে টামু রোডের পালেলে এবং টিড্ডিম রোডের বিষেণপুরে যে ভীষণ লড়াই চলিতেছে তাহার ফলাফলের উপরই ইম্ফলের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। ইম্ফলের ভবিষ্যতের সাথেই আবার জড়িত কাছাড় ও সমগ্র সুরমা উপত্যকার নিরাপত্তা। বিষেনপুর দিয়া শিলচরে যাইবার ভাল রাস্তা রহিয়াছে। সে রাস্তা হাতে না থাকিলে শিলচর এবং তাহার সাথে সংযুক্ত রেলচলাচলও অব্যাহত থাকিতে পারে না। সুতরাং বিষেণপুর এলাকায় যুদ্ধ আজ গুরুত্বের দিক দিয়া খুবই সাংঘাতিক। তাই কিছু কিছু সামরিক সাফল্যে আজ উৎফুল্ল হইলে চলিবে না। জাপ ফ্যাসিষ্টরা সম্পূর্ণরূপ উৎখাত না হইলে বিপদের সম্ভাবনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। ইম্ফল, বিষেনপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে যদি বর্ষার আগে শত্রুদের না তাড়ান যায় তবে ভবিষ্যতে জাপদের কাছ হইতে অনেক আশঙ্কার কারণ থাকিয়া যাইবে। সামরিক শক্তি প্রকৃত পক্ষে তখনই শক্তিশালী হইয়া উঠে যখন জনগনের সাথে তাহার নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আমাদের সরকার শুধু অস্ত্রবলেই যুদ্ধ জয় করিতে চায়—দেশের জনসাধারণের সদিচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করে না। আজ ফ্যাসিষ্টদস্যু উৎখাত করার পথ এ নয়—ফ্যাসিষ্টদস্যু উৎপাত করিতে হইলে আজ ভারতবর্ষে অচল অবস্থার সমাধান চাই—দেশের সমগ্র জনগণের ভিতর যুদ্ধ-জয় করার চেতনা আনা চাই।

ইতালীর যুদ্ধ নূতন পর্য্যায়ে

মিত্রসেনা ও জনবাহিনীর যুক্ত আঘাতে নাৎসীরা হটিতেছে

ইতালীতে যুদ্ধের গতি বেশ জোর হইয়া উঠিতেছে। পনের দিনের উপর হইল মিত্রসৈন্য জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে ইতালীতে নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টম আর্ম্মি ক্যাসিনো দখল করিয়া লিরি উপত্যকায় পন্টি-করভোও নাৎসীদের কাছ হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। লিরি উপত্যকার উভয় পার্শ্বে জার্ম্মাণরা বরাবর বিতাড়িত হইয়া চলিয়াছে। মিত্রপক্ষের প্রধান অগ্রগতির তোড়ে লিরি নদী যেখানে সেপ্রাণো সড়ক হইতে উত্তরে বাঁকিয়া গিয়াছে সেখানে জার্ম্মানরা রক্ষাব্যূহ রচনায় যেন বাধ্য হইতেছে। সেপ্রাণো সড়কের উপর অবস্থিত গিওভানি অধিকৃত হইয়াছে। ইহাতে ৮ম আর্ম্মির লিরি উপত্যকায় চলিবার সুবিধা হইল।

আরও দক্ষিণে ফরাসী সৈন্য এসপেরিয়া দখল করিয়া প্রচণ্ড বাধার ভিতর দিয়াও আগাইয়া চলিয়াছে। জার্ম্মান রক্ষাব্যূহের উত্তর ঘাটিতে তাহারা পিকো দখল করিয়াছে।

আমেরিকান পঞ্চম আর্ম্মি গায়েটা দখল করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আবার এদিকে গত ২৩শে মে মিত্রসৈন্য আনজিও সেতুমুখ হইতে নূতন একটি অভিযান সুরু করিয়াছে।

অষ্টম আর্ম্মির সাথে অবস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সংবাদে জানা যায় যে লিরি উপত্যকা হইতে জার্ম্মানরা বিশৃঙ্খলভাবে যে পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার গতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মেলফার অপর তীর হইতেও পশ্চাদপসরণ চলিতেছে।

অন্য আর একটি সংবাদে প্রকাশ আমেরিকান সৈন্যরা ভেলেত্রি হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে আছে এবং ভেলেত্রীর উপর ইতিমধ্যেই আক্রমণ সুরু হইয়াছে। ভেলেত্রী রোমের সম্মুখে একটি সুদৃঢ় রক্ষা ঘাঁটি।

মিত্রপক্ষের এই সাফল্য স্বীকার করিতে গিয়া জার্ম্মানদের রেডিও সমালোচক রিনহার্ডট আলব্রেক্ট বলিয়াছে—আমাদের শত্রুরা এই যুদ্ধে অসংখ্য ফৌজ ও যথেষ্ট পরিমাণে সমর সম্ভার ব্যবহার করিতেছে।

ইতালীতে মিত্রপক্ষের এই নূতন অভিযানের উদ্দেশ্য কি

ইতালীর এই নূতন অভিযানকে খুব বড় রকমের একটা বিরাট অভিযান বলিয়া ধরা যায় না। ইতালীতে হিটলারী সৈন্যরা যাহাতে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে এবং দ্বিতীয় রনাঙ্গন খোলার সাথে সাথে এদিক হইতে যাহাতে অন্যত্র জার্ম্মান সৈন্য না সরানো যায় এই অভিযানের একটি উদ্দেশ্য ইহাই। মিত্রসেনার এ উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই অভিযানের আর এক উদ্দেশ্য হইতেছে রোম দখল করা এবং আদ্রিয়াতিক উপকূলের আকোনার মত কয়েকটা নৌঘাঁটীতে প্রাধান্য স্থাপন করা। এই নৌঘাঁটি-গুলি যদি মিত্রসেনার দখলে আসে তবে টিটোর জন-বাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ রাখিতে পারিবে এবং বলকানের অন্যস্থানেও আক্রমণ চালানোর সুবিধা করিয়া নিতে পারিবে।

ছয় মাস আগে ক্যাসিনোর যুদ্ধ ও সাথে সাথে এনজিও সেতুমুখের লড়াইএ মিত্রসেনা কোন সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু এবারের আক্রমণে মিত্রসেনার সাফল্যের একটি শ্রেষ্ঠ কারণ ইতালীর স্বদেশ-প্রেমিক গেরিলাদের সাথে মিত্রবাহিনীর সম্পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কিছুদিন আগে এক খবরে জানা যায় যে ইতালীতে যে ২৫ ডিভিশন সৈন্য লড়াই করিতেছে তাহা হইতে ৬ ডিভিসন উত্তর ইতালীতে গেরিলাদের সাথে এবং ইতালীর সীমান্তে যুগোশ্লাভ গেরিলার সাথে লড়াই করিতেছে। যোগাযোগ স্থাপন ও যুদ্ধ পরিচালনার সুসংবদ্ধতাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা এই—জেনরেল আলেকজাণ্ডারের সেনা বাহিনীর ও ইতালীর সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি নিয়া একটি সংযুক্ত সামরিক কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে উত্তর ও মধ্য ইতালীর গেরিলা যোদ্ধাদের লড়াই সুসংবদ্ধ করা হইতেছে। স্বদেশ প্রেমিক ইতালীর এই জন-সেনাদের সাথে মিত্র সেনার সংযোগ রাজনৈতিক দিক দিয়া বিশেষ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গেরিলারা আজ জানে যে বর্ত্তমান ইতালীর সরকারের সাথে জনগণের প্রতিনিধিদের যোগ রহিয়াছে এবং ফ্যাসিষ্টদস্যুদের ধ্বংস করার কাজে আজ জনসাধারণই আগাইয়া আসিয়াছে। ইতালীর এই অভিযানের সাফল্য আজ এই দিক দিয়া বিচার করিতে হইবে।

মৃত্যু-সংবাদ

খুলনা জেলার শোভনা অঞ্চলের কমরেড কুঞ্জবিহারী গত ১১ই মে কলেরায় মারা গিয়াছেন। কৃষক আন্দোলনের ফলে শোভনা অঞ্চলের ঋষিদের মধ্যে জাগরণের সাড়া আসে। কমরেড কুঞ্জবিহারী এই ঋষিদের মধ্য হইতে আপন সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ধীরে ধীরে কৃষকসমিতি এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে আকৃষ্ট হ'ন। খাদ্য সংকট ও মহামারীর কবল হইতে আপন সম্প্রদায় ও স্থানীয় কৃষকদের রক্ষা করিতে তিনি মৃত্যুর পূর্বদিন পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।

ত্রিপুরা জেলার পয়ালগাছা ইউনিয়নের মইসার গ্রামের কমরেড আউব আলি বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি কৃষককর্মী ও পার্টিসভ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনটী নাবালক সন্তান ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার লক্ষ্মীবুড়া গ্রামের কমরেড হরুবালা রায় গত ৪ঠা মে কলেরায় মারা গিয়াছেন। তিনি মহিলা সমিতির উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এবং স্থানীয় হাজং, ডালু, বানাই, কোচ প্রভৃতি কৃষক মহিলাদের অত্যন্ত প্রিয় নেত্রী ছিলেন। গত দুই বৎসরে তিনি ৪০০ বৃদ্ধা, যুবতী ও বালিকাকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যা করেন। পার্টিকে শক্তিশালী করিবার জন্য গ্রামের মহিলাদের কাছ হইতে চাউল, টাকা-পয়সা সংগ্রহে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মৃত্যুকালে স্বামী, একপুত্র ও পুত্রবধু রাখিয়া গিয়াছেন।

গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুরের কমরেড মরাদজ্জামান বসন্তরোগে মারা গিয়াছেন। তিনি পার্টির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

বরিশালের উজিরপুর ইউনিয়নের শীকারপুর গ্রামের কমরেড যোগেশ গত ১৪ই মে ১৩ দিনের জ্বরে মারা গিয়াছেন। অতি অল্প সময়ে উজিরপুর তাঁতিদের মধ্যে তাঁতি সমিতি এবং তাঁত কেন্দ্র গঠনে তাঁহার কমিউনিষ্ট কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পার্টির সভ্য ছিলেন।

ফরিদপুরের নড়িয়া স্কুলছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও নেতা এবং কিশোর বাহিনীর সংগঠক কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মাত্র ১ দিনের ম্যালেরিয়া জ্বরে ১৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে। লেখাপড়ায় ক্লাসে সে সর্বদা প্রথম হইত। ছাত্র ও জনগণের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে ছাত্র শিক্ষক ও জনসাধারণের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল।

খুলনার মহেশ্বর পাশার কিশোর কমরেড শ্রীদাম দাস মাত্র একদিনের জ্বরে মারা গিয়াছে। লেখাপড়া ও খেলাধুলা দুটিতেই সে চৌকষ ছিল। সে কিশোরবাহিনীর একজন উৎসাহী সংগঠক ছিল।

কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার মহামারী আজ সারা বাংলাকে ছাইয়াছে। এই বিভীষিকার হাত হইতে বাংলাকে রক্ষা করা আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম। কমিউনিষ্ট পার্টি এই মহৎ প্রচেষ্টার পুরোভাগে,—তাই প্রত্যহই মহামারীর নিষ্ঠুর আঘাত পার্টি কমরেডদের উপর পড়িতেছে। শহীদ কমরেডদের স্মৃতিতে আমরা বজ্র-মুষ্টিতে মহামারী প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

মাদ্রাজ কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা

মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীরা ১০ই জুন মাদ্রাজ শহরে এক সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির ফলে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার এই সম্মেলনের অনুমতি দেন নাই। তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি এবং তামিলনাদ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত মথুরঙ্গ মুদালিয়ার এই সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছেন যে দেশের এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে সমস্ত ঘটনা নূতন ভাবে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু সেই কর্তৃপক্ষই আজ বিপরীত মনোভাব দেখাইতেছেন। গান্ধীজীর মুক্তির ফলে অন্তত গভর্ণমেন্টের দিক দিয়া কোন অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী সমস্ত নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারের দাবীতে আজ জনসাধারণকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

Regd. No. C. 2836

স্বাধীনতাকামী যুগোশ্লাভ জনবাহিনী

অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি মুক্তিকামী জনগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে

তিন বছর আগে যুগোশ্লাভিয়ার মুষ্টিমেয় কয়েক-জন দেশভক্ত নাৎসীআক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে সাহসী সংগ্রাম সুরু করিয়াছিল আজ তাহাই ৩ লক্ষ সৈন্যের এক সুসংবদ্ধ গণবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। এবং আজ টিটোর সেই জনবাহিনীর নেতৃত্বে সমস্ত যুগোশ্লাভ অধিবাসীরা স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে জীবন পণ করিয়া লড়াই করিতেছে। সেদিন ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না—শত্রু শিবির লুট করিয়াই ইহাদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে হইত—নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়িবার সাথে সাথে এখন তাহারা মিত্রপক্ষেরও সাহায্য পাইতেছে ও তাহাদের মর্য্যাদাও স্বীকৃত হইয়াছে।

জনযুদ্ধের পাতায় আমরা এই মুক্তি ফৌজের বিবরণী প্রকাশ করিয়া অধিকৃত ইয়োরোপের মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক কিছুটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাই এখন আমরা টিটোর জনবাহিনীর গঠনপ্রণালী ও ইহার সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

যুগোশ্লাভিয়ার এই গণবাহিনীর প্রধান সম্বল ছিল সেখানকার দেশভক্তদের অটুট মনোবল, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য দৃঢ়সংকল্প এবং কি জন্য তাহারা লড়িতেছে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা—অবশ্য জনযুদ্ধের ইহাই প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার। গেরিলা যোদ্ধাদের শিক্ষা আত্মবিশ্বাস ও সাহসের উৎস ছিল তাহারা নিজেরাই, তবে অস্ত্রশস্ত্র তাহারা যোগাড় করিয়া লইত শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিয়া।

টিটোর এই বাহিনী যুগোশ্লাভিয়ার তিন লক্ষ নাৎসী ফ্যাশিস্ট সৈন্যকে যুদ্ধরত রাখিয়াছে। তুলনামূলক হিসাবে ইহার সামরিক তাৎপর্য্য মিত্রপক্ষের পঞ্চম ও অষ্টমবাহিনীর ইটালীতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে বেশী বই কম নয়। তাহারা যুগোশ্লাভিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের অর্দ্ধেকের বেশী শত্রুকবলমুক্ত করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংগ্রাম কি শুধু যুগোশ্লাভিয়ার ভিতরেই সীমাবদ্ধ? মিত্রপক্ষের অন্যান্য রণাঙ্গনে টিটোর বাহিনীর সাহায্য কি কেবলমাত্র পরোক্ষ? না। মিত্রপক্ষের অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহারা প্রত্যক্ষ সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যায় যে টিউনিসিয়া অভিযানের সময়ে গেরিলা বাহিনী ২১৭ খানা সৈন্যবাহী জার্ম্মাণ ট্রেন ধ্বংস করে। ঐ ট্রেনে জার্ম্মাণী মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেছিল। সিসিলি অভিযানের সময়ে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী যখন মাত্র সাড়ে তিন ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিল—টিটোর বাহিনী তখন আড্রিয়াতিক উপকূলে ৭ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছিল। এই দুই অভিযান এবং বিশেষ করিয়া মিত্রপক্ষের ইটালী আক্রমণের সময়ে গেরিলাবাহিনী ১৬ হইতে ২০ ডিভিসন ইটালীর সৈন্যকে যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যথায় এই পরিমাণ শত্রুসৈন্য বৃটিশ ও আমেরিকার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, এবং তাহা হইলে মিত্রবাহিনীর অভিযানে যথেষ্ট বাধা আসিত। অথচ এই সময়ে মিত্রপক্ষের কোন সাহায্য তাহারা পায় নাই।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণী কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত গেরিলা সংগ্রাম দেখা দেয় টিটোর এই গণবাহিনী

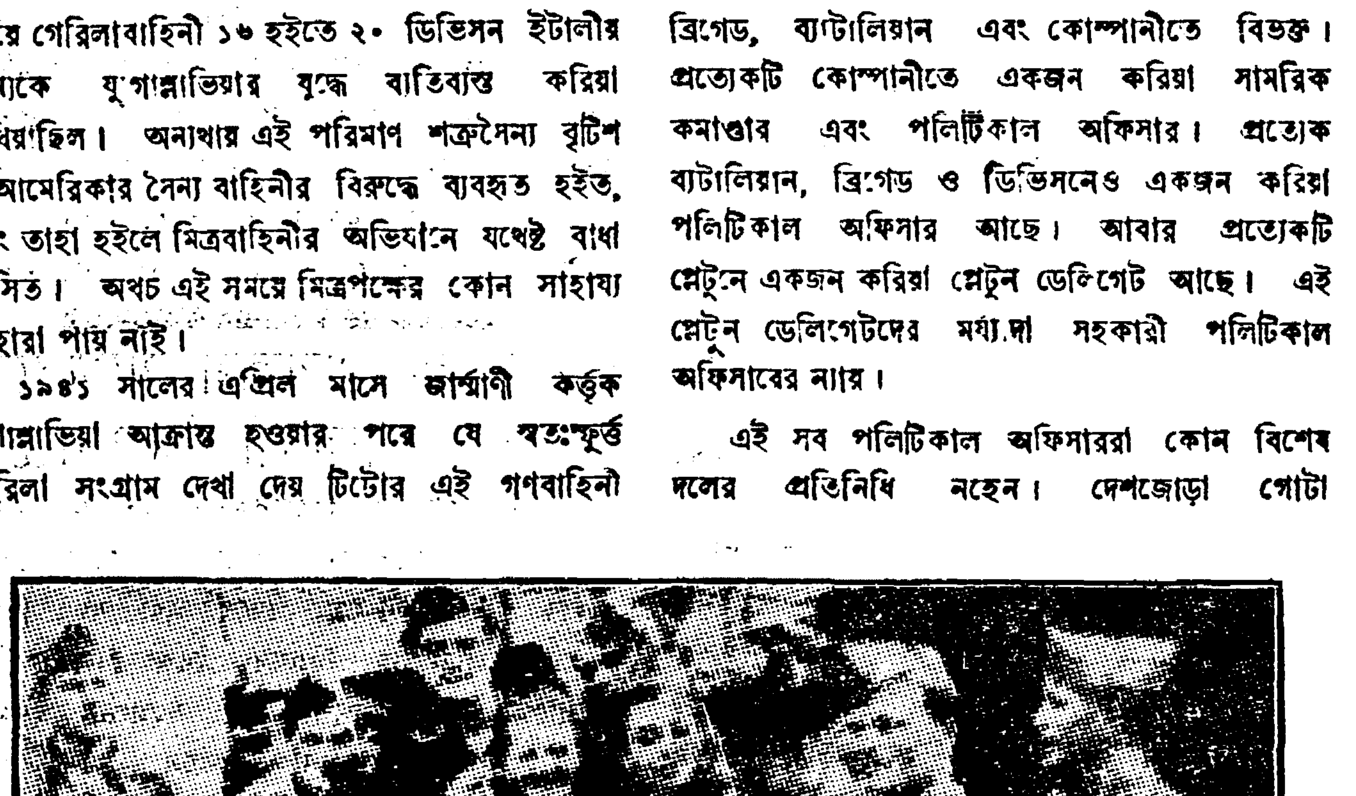

যুগোশ্লাভ জনবাহিনীর ফৌজ

তাহারই মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জার্ম্মাণ আক্রমণের ৭ দিনের মধ্যেই যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং দেশের গভর্ণমেন্ট বিশ্বাসঘাতক শাসকবর্গের চক্রান্তে দেশ হইতে পলাইয়া যাইয়া লণ্ডনে আশ্রয় নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার সৈনিক গেরিলা বাহিনী বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিতে থাকে। প্রথম দিকে তাহাদের বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইতেছিল—একের অন্যের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা ছিল না, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদিগকে লড়িতে হইত। ক্রমশঃ এই সংগ্রাম ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে লাগিল। প্রথম দিকে ইহা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিলেও প্রথম দিন হইতেই ইহা ফ্যাশিস্ট বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সংগ্রাম হিসাবেই পরিচালিত হইয়াছে। ইহাতে সার্ভ, ক্রোট, শ্লোভেনিস্, ম্যাসিডোনিয়ান, মণ্টিনেগ্রিন, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান—প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের যোগ দেওয়ার অধিকার আছে। ফ্যাশিস্ট নিধনে ইচ্ছুক এমন যে কোন লোকই ইহাতে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তিন বছর পরে যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজ সমস্ত জগতের সামনে জনযুদ্ধের গৌরব ও গর্ব্বের বস্তু।

দুনিয়ার অন্য যে কোন দেশের সেনাবাহিনী হইতে ইহার রূপ পৃথক, ইহা পুরুষ ও মেয়ে যোদ্ধার মিলিত বাহিনী—কোন কোন সৈন্যদলে মেয়ে যোদ্ধার সংখ্যা

যুগোশ্লাভ জনবাহিনীর মেয়ে যোদ্ধারা

শতকরা ২০ বা তাহার বেশী। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসে ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় মেয়েরা পুরুষেরই তুল্য, কোন কোন বাহিনীর মেয়ে কোম্পানী কমাণ্ডারও আছেন। এই বাহিনীতে মেয়েদের পুরুষের সহিত সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সমগ্র বাহিনীটি ১০টি আর্ম্মিকোরে বিভক্ত। এক একটি আর্ম্মিকোর আবার ডিভিসন, ব্রিগেড, ব্যাটালিয়ান এবং কোম্পানীতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি কোম্পানীতে একজন করিয়া সামরিক কমাণ্ডার এবং পলিটিকাল অফিসার। প্রত্যেক ব্যাটালিয়ান, ব্রিগেড ও ডিভিসনেও একজন করিয়া পলিটিকাল অফিসার আছে। আবার প্রত্যেকটি প্লেটুনে একজন করিয়া প্লেটুন ডেলিগেট আছে। এই প্লেটুন ডেলিগেটদের মর্য্যাদা সহকারী পলিটিকাল অফিসারের ন্যায়।

এই সব পলিটিকাল অফিসাররা কোন বিশেষ দলের প্রতিনিধি নহেন। দেশজোড়া গোটা আন্দোলনেরই তাহারা প্রতিনিধি। ইহাদের শতকরা ৭০ জনেরও বেশী যুদ্ধের আগে কোন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। প্লেটুন ডেলিগেটরা প্লেটুনের যোদ্ধাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন এবং এই সব প্লেটুন ডেলিগেটদের মধ্য হইতে কোম্পানী পলিটিকাল অফিসার নিযুক্ত হয়। এই সব ডেলিগেট এবং পলিটিকাল অফিসারদের প্রধান কাজ সাধারণ যোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের ঐক্য গড়িয়া তোলা। প্রত্যেকটি কোম্পানীতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মিটিং করিতে হয়। পলিটিকাল অফিসারই সাধারণতঃ সভাপতি হন। এই মিটিংএ সাধারণ যোদ্ধাদের অভিযোগ আলোচনা হয়—তাহার পর নিজেদের দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যার আলোচনা চলে, যুদ্ধের সময়ে পলিটিকাল অফিসারকেও সবাইর সাথে যুদ্ধ করিতে হয়।

যুদ্ধ চলার সময়ে তাহার চালনার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব কোম্পানী কমাণ্ডারের হাতে। প্রত্যেকটি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে এবং পরে মিটিং হয়। যুদ্ধের আগে প্রত্যেকটি কাজ কেন করা হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হয়, কি প্ল্যান অনুসারে যুদ্ধ চালাইতে হইবে এবং বৃহত্তর যুদ্ধনীতির সহিত তাহার সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য প্রভৃতি আলোচিত হয়। যুদ্ধের পরে আবার যুদ্ধপরিচালনা সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যদি কাহারও কোন কাজ এমন কি যদি কোম্পানীকে ভুলপথে চালিত করিয়াছে এমন ঘটনাও তখন তখনই শোধরাইবার ব্যবস্থা হয়। আলোচনার পরে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা সবাইকে আইনের ন্যায় মানিয়া চলিতে হয়—নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা মানা প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

প্রত্যেকটি কোম্পানীতে একটি করিয়া নির্ব্বাচিত সংস্কৃতি ও শিক্ষা কমিটি আছে। ইহারা সৈনিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রত্যেকটি সৈনিকের পক্ষে লেখা পড়া জানা বাধ্যতামূলক। লেখাপড়া না জানা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। শিক্ষা কমিটি সৈনিকদের শিক্ষার প্ল্যান গ্রহণ করে, পাঠ্য বিষয় ঠিক করে এবং পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস হইতে অস্ত্রশাস্ত্র সবই আছে। কোন কোন ব্রিগেডের নিজস্ব পত্রিকাও আছে। যোদ্ধাদের মধ্যে দেশ বিদেশের খবরের জন্য আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক দিন রেডিও মারফৎ খবর পাইয়াই তাহা বুলেটিন আকারে ছাপাইয়া প্রত্যেক ইউনিটে বিলি করিয়া দেওয়া হয়।

সৈনিকদের দুবেলা ঠিকমত খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে খাওয়ার জিনিষের খুবই অভাব। তাহাদের যথেষ্ট মাংস দেওয়া হয় কিন্তু রুটি এবং আলু খুবই কম। তেল জাতীয় কোন জিনিষ, চিনি বা কাফি মোটেই পাওয়া যায় না। জল ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন পানীয় নাই। যে সব অঞ্চলের ভিতর দিয়া সৈন্য বাহিনী চলাচল করে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই সাধারণতঃ সৈন্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। নাৎসী কবলমুক্ত গ্রামে মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা করার জন্য গ্রাম্য কমিটি নির্ব্বাচন করা হয়, এই সব কমিটির একটি কাজ হইতেছে গেরিলা বাহিনীর খাওয়ার ব্যবস্থা করা। গ্রামবাসীরা অনেক সময়ে নিজেরা না খাইয়াও সৈন্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

রণক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম হয়, তাহারা সুস্থ হইলে তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চলে লড়াইয়ের প্রয়োজনে গঠনমূলক কাজে দেওয়া হয়, সৈনিকদের কোন ভাতা বা বেতন নাই।

সৈনিকদের শিক্ষার জন্য প্রায় ১২টি সামরিক

মার্শাল টিটো

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে সব যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের শৌর্য্য, রণকৌশলে প্রতিভার পরিচয় দিয়া পদোন্নতি লাভ করেন তাহাদিগকে অফিসার হিসাবে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে কাহাকেও ২ মাসের বেশী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

এই গণবাহিনীর রণনীতি খুবই সোজা এবং পরিষ্কার। তাহাদের রণকৌশলের পিছনে দুটি নীতি রহিয়াছে: (১) শত্রুর হাতে কখনও আক্রমণের উদ্যোগ ছাড়িয়া দিওনা এবং (২) যে স্থানে আঘাত করিতে হইবে সে স্থানে শত্রুর তুলনায় নিজের সংখ্যাধিক্য রাখিতে হইবে। জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে কোথায় এবং কি ভাবে যুদ্ধ হইবে তাহা গেরিলা বাহিনীর নিজেদের সুবিধা অনুসারে ঠিক করিতে হইবে। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রে যুদ্ধ করিতে পছন্দ করে। রাত্রি কালে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা একটা সৈন্য বাহিনীর মনোবল ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রধান পরিচায়ক।

টিটোর রণকৌশলের অন্য দিক ইহাই যে, তিনি নাৎসী-ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে একই সময়ে দুটি সৈন্যদল ব্যবহার করিতে চান, একদল রেগুলার আর্ম্মি বা স্থায়ী সৈন্যদল একটা বিশেষ ফ্রণ্টে শত্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়িবে, অন্য দল শত্রুর পিছনে জনগণের মধ্যে থাকিয়া শত্রুকে বিব্রত রাখিবে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, আলবেনিয়া, ইটালী এবং বুলগেরিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণের সহিত নিজেদের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

বুলগার সরকারের ধূর্ত্তামীকে বরদাস্ত করিব না

সোভিয়েটের বিখ্যাত পত্রিকা 'ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাস' একটি প্রবন্ধে বুলগেরিয়ার সরকারের ফ্যাসিস্ট ঘেঁষা ধূর্ত্তামীকে শেষবারের মত সতর্ক করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে বুলগার সরকার যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে, তাহাতে সোভিয়েটের প্রতিনিধিদের পক্ষে বুলগেরিয়ায় থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। বুলগেরিয়ার সরকার জার্ম্মানীকে সাহায্য করিতেছে অথচ আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেছে। জার্ম্মানরা ওডেসা বন্দর হারাইবার পর কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী বুলগেরীয় বন্দরগুলিকে জার্ম্মান নৌঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে।

—সবেমাত্র পৌঁছিল—

১। মস্কো নিউজ—
৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯—১০১ (ডিসেম্বর '৪৩)
১—২৩ (এপ্রিল '৪৪)

২। ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচর—৮, ৯, ১০ ও ১১নং প্রতিসংখ্যা—১৲

৩। ডায়লেকটিক্যাল ও হিস্টরিক্যাল ম্যাটিরিয়লিজম—স্টালিন—।০

৪। ভি, এম, মলোটভ্ স্পিচ্ অন্ কনষ্টিটিউস্যানাল চেঞ্জ—৴০

৫। কৃষক সভা কি চায়— ।০

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৫৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] ৭ই জুন, বুধবার, ১৯৪৪, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [দাম ছ'পয়সা

গান্ধী-জয়াকর চিঠি

সংকট সমাধানের জন্য সমগ্র দেশ গান্ধীজির নির্দেশ চায়

সন্দেহ দূর করিয়া তিনি দেশকে পরিচালিত করুন

পি-সি-যোশী

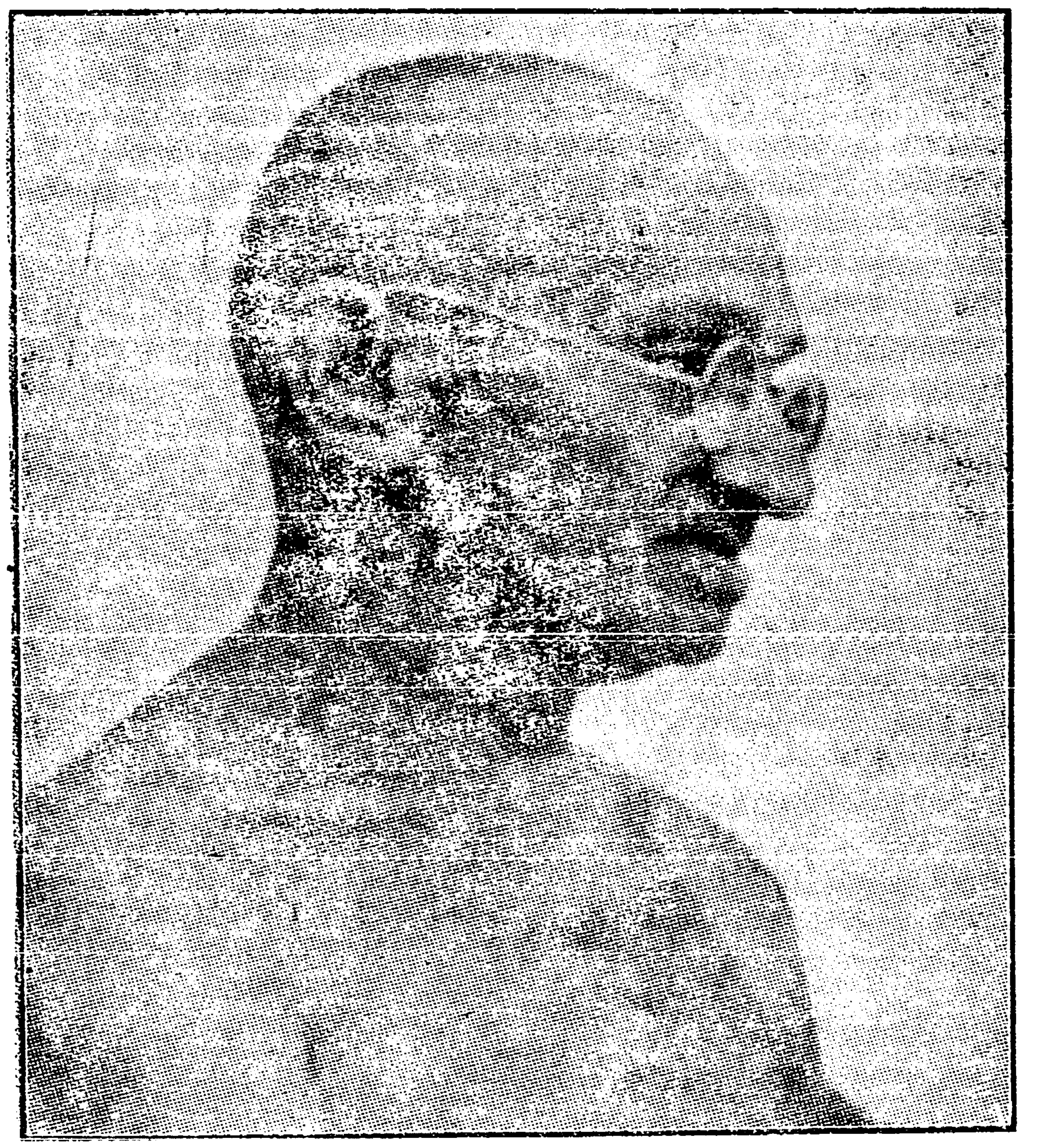

ডাঃ জয়াকরের কাছে লেখা গান্ধীজির চিঠি পড়িতে দুঃখ হয়। বোঝা যায় যে, দেশকে কি নির্দেশ দিবেন তাহা গান্ধীজি এখনও স্থির করিতে পারেন নাই, শুধু পথ খুঁজিতেছেন।

এই চিঠি কিরূপে প্রকাশিত হইল তাহা জানিবার জন্য আমি গান্ধীগ্রামে গিয়াছিলাম।

চিঠিটী প্রকাশ করা গান্ধীজির ইচ্ছা ছিল না। কংগ্রেস-বিরোধী ও হিন্দুসভাপন্থী মারাঠি সাপ্তাহিক "বিবিধবৃত্ত" ইহার বিকৃত বিবরণ প্রকাশ করে। ডাঃ জয়াকরের অন্তরঙ্গ মহল হইতেই শুধু চিঠিটি প্রকাশিত হইয়া পড়া সম্ভব। এই বিশ্বাসভঙ্গের ফলে গান্ধীগ্রামবাসীরা ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল মূল চিঠিট সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন।

গান্ধীজির সঙ্গে যাঁহারা আছেন তাঁহারা চিঠিটীতে বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা বলেন গান্ধীজির ব্যক্তিগত লেখার ধরণই এইরূপ। তাঁহারা আমাকে মনে করাইয়া দিলেন: মহাদেব দেশাই ও কস্তুরবার পীড়া ও মৃত্যুর সময়ে এবং তাহার পরেও গান্ধীজি কি যন্ত্রণাই না পাইয়াছেন! দীর্ঘ পনের বছরের সহকর্মী ও পরামর্শদাত্রী ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের অনুপস্থিতি তাঁহাকে আরও পীড়া দেয়!

গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "আমার মুক্তি সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিতেছেন জানিনা। আমি ইহাতে মোটেই খুসী নই, এমন কি লজ্জাও অনুভব করিতেছি। আমার অসুখ হওয়া উচিত হয় নাই। আমি অসুখে না পড়িতে চেষ্টাও করিয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হার মানিতে হইয়াছে।"—এই কথাগুলি পড়িলে কাহার হৃদয় না বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে?

কিন্তু আমরা আশা করি যে জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন। সমগ্র জাতি তাঁহার মুক্তিকে অভিনন্দিত করিয়াছে, সমগ্র জাতিই আজ নেতৃত্বের আশায় তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

শক্তি গান্ধীজীরই হাতে

"আমার বর্ত্তমান রোগ হইতে আরোগ্যের কথা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।"—জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা যদি এই ভাবে ভাবেন যে বিদেশী শাসকদের দয়ার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়—তো ইহার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কি হইতে পারে? যে বিরাট জাতীয় আন্দোলন তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে আন্দোলনের শীর্ষে তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার উপরোক্ত বক্তব্য সেই আন্দোলনের শক্তিকেই অস্বীকার করিতেছে। ১৯৪২-এর অগাষ্টে সোজা রাজনীতিক যুদ্ধে ম্যাক্সওয়েল কোম্পানী গান্ধীজিকে বাগে পাইয়াছিল। তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। জেলের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিবার পর তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান চালাইল। সে খেলার দিন আজ ফুরাইয়াছে। গান্ধীজি নিজে না চাহিলে তাঁহাকে আবার জেলে পাঠাইতে পারে—এ সাধ্য আজ কাহারও নাই। ইহাই রাজনীতিক বাস্তবতা এবং দেশের পক্ষেও ইহাই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। সেই সুযোগ হইল: রাজনীতিক সমস্যা-নিষ্পত্তির উদ্যোগ আজ গান্ধীজির হাতে।

গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "আর সরকার আমাকে গ্রেপ্তার না করিলে আমি কিই বা করিতে পারি? অগাষ্ট প্রস্তাব আমি প্রত্যাহার করিতে পারিনা। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন যে প্রস্তাবটী নিরীহ, তবে ইহার প্রয়োগ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ হইতে পারে। আমার কাছে ইহা শ্বাসপ্রশ্বাসের তুল্য।"

অগাষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিব কিনা ইহার উপরই অচল অবস্থার সমাধান নির্ভর করিতেছে এইভাবে ভাবিলে আমেরির কথাই গ্রহণ করিতে হয়। এবং তাহার ফলে আবার আমেরির হাতেই ধরা পড়িতে হয়।

কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন লোক যদি বাস্তবিকই কংগ্রেসের সহিত নিষ্পত্তি করিতে চায় তো সে কখনই এই জিদ ধরিবেনা যে আগে অগাষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হোক।

কোন পথে কংগ্রেসের শক্তি

কংগ্রেসের সামনে সমস্যা এই নয় যে হয় অগাষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে আর নয়তো অচল অবস্থাই মানিয়া লইতে হইবে। কংগ্রের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজি দেখিতে পাইতেছেন না যে অন্য পথ খোলা রহিয়াছে:

(১) প্রথম কথা হইল অগাষ্ট প্রস্তাবের মধ্যেই কংগ্রেসের যে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী নীতি নিহিত রহিয়াছে তাহা আবার স্পষ্ট করিয়া বলা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গান্ধীজি তাহা করিবেন। বৃটেনের প্রধান উদার-নীতিক দৈনিক "নিউজ ক্রনিকলের" সংবাদদাতা গান্ধীজির কাছে জানিতে চাহিয়াছিলেন—টটেনহামের কুখ্যাত পুস্তিকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি। গান্ধীজি বলিয়াছেন—"টটেনহামের প্রত্যেকটি অভিযোগের পুরাপুরি জবাব দিবার যুক্তি আমার আছে। আমি সুস্থ হওয়ার পর মুক্ত থাকিতে পারিলে এই সমস্ত বিষয়ে যাহা করা দরকার তাহা করিব।"

নিউজ ক্রনিকলের সংবাদদাতার মতে গান্ধীজি "এই সমস্ত অভিযোগে স্বভাবতই গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়াছেন। গান্ধীজিকে দেখিয়া মনে হইল তিনি নিজেকে, কংগ্রেসকে ও সারা দুনিয়ার মানুষকে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে পরিষ্কার করিয়া দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

গান্ধীজি যদি আমেরী কোম্পানীর মুখোস সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে প্রগতিশীল দুনিয়ার সম্পর্ক আবার দৃঢ় হইবে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল তারা কোনঠাসা হইয়া পড়িবে। বৃটেন ও ভারতে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য জনগণের চাপ সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

কংগ্রেসের গৃহীত অগাষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজির যে ব্যাখ্যা তাহাতে বোঝা যায় যে কংগ্রেস জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের শক্তিকেই বাড়াইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করিতে চাহিয়াছে ও কংগ্রেস "সংগ্রামে"র আহ্বান দেয় নাই। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক বলিয়া বেড়ায় যে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন কংগ্রেসই শুরু করিয়াছিল—গান্ধীজির বক্তব্য এই মিথ্যা প্রচারের মুখোস খুলিয়া দিবে। ইহাতে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিষ্কার হইবে। যে সব পঞ্চম বাহিনী কংগ্রেসের সংগঠন ও যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সাধারণ কংগ্রেসী দেশভক্তদের বিপথে চালাইয়াছিল তাহারা ইহাতে কোনঠাসা হইয়া পড়িবে।

জাপ-প্রতিরোধেই সেই শক্তির প্রয়োগ

(২) শুধু আর একবার কংগ্রেসের পলিসি ব্যক্ত করিলেই যথেষ্ট হইবে না। জাপানীরা আমাদের দেশ প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়াছে—তাহা প্রতিরোধের জন্য কাজ করিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। দেশের ভিতর জাপ বিরোধী অভিযান গান্ধীজি শুরু করিলে এক দিনের মধ্যে আমেরীর আসল প্রভু যারা সেই বৃটীশ জনসাধারণের মন হইতে সমস্ত দ্বিধা সংশয় মুছিয়া যাইবে। এবং আমাদের নিজেদের দেশের ভিতর জনগণের মনোবল ফিরিয়া আসিবে—সারা দেশময় দেশপ্রেমিক অভিযান পুনঃ সঞ্জীবিত হইবে।

(৩) ইহা আজকে বোঝা দরকার যে যদিও স্বাধীনতার জন্য নিজস্ব পছন্দমত পন্থা নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার প্রত্যেক দেশেরই আছে, তথাপি মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটী পর্য্যায়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াই এই পন্থা বাছিয়া লইতে হয়। জাপানী দস্যুরা যখন ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে তখন হিংসা বা অহিংসা যে নীতিতেই হউক আইন অমান্য আন্দোলন আর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চাপ হিসাবে কাজ করে না। তাহা শুধু জাপানী আক্রমণকারীদেরই প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে।

(৪) আজিকার অবস্থায় ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন নয়, কংগ্রেস লীগ ঐক্যই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অর্জন করিবার একমাত্র প্রকৃত পন্থা। কংগ্রেস ও লীগের জাপ বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন এক বিরাট দুর্দ্দমনীয় শক্তি সৃষ্টি করিবে যাহার ফলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

আজকে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিকে চাহিয়া গান্ধীজীকে লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী বিচার করিয়া দেখিতেই হইবে এবং কংগ্রেস লীগ একতার আন্দোলনকে পরিচালনা করিতে হইবে। গান্ধীজী আজকে মুক্ত, এই কাজে আগাইবার সুযোগও তাঁহারই হাতে। এই পথেই তিনি জাতিকে বর্ত্তমান সংকটের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।

গান্ধীজি হতাশ হইলে দেশবাসী কি করিবে!

কিন্তু গান্ধীজির এই চিঠি হইতে মনে হয় তিনি এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিতে তিনি এখনও নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। কিন্তু তাঁর চিঠি দেশবাসীর আশা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং জাতির শত্রুদেরই উৎসাহের খোরাক জোগাইয়াছে।

গান্ধীজির মুক্তির পর দেশবাসীর মনে আসিয়াছিল আশা ও আনন্দ, কেননা তারা ভাবিয়াছিল গান্ধীজি তাদের পথ দেখাইবেন। তাঁর চিঠি তাদের এই আশাকেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাই দেশবাসী আগে যতটা অসহায় হয় নাই, আজকে গান্ধীজির এই চিঠি তাদের তার চেয়েও বেশী অসহায় করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী নিজেই যখন জেলে ফিরিয়া যাইবার কথা ভাবেন, তখন আশা আর কোথায়? লোকে তাঁর চিঠি পড়িয়া এই কথাই ভাবিবে।

মুসলিম লীগের নেতারা গান্ধীজির মুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল। কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য খালিক-উজ-জামানের আবেদন বিশেষ অর্থপূর্ণ; কেননা তিনি জিন্নার একজন বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী। ২রা জুনের ওরিয়েণ্ট প্রেসের খবরে প্রকাশ যে গান্ধীজির এই চিঠিতে খালিক উজ-জামান বিশেষ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

গান্ধীজির মুক্তির পর জাপ-রেডিওর প্রচারে একটু হতাশা আসিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজির এই চিঠি

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইল

ফ্যাসিষ্টদের ধ্বংস আসন্ন

ইয়োরোপে গণমুক্তির সূচনা

লণ্ডন, ৬ই জুন,—একটি সরকারী ঘোষণায় জানানো হইয়াছে যে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইয়াছে।

জেনারেল আইজেনহাওয়ারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে যে বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে অদ্য সকালে মিত্রপক্ষের নৌবাহিনী প্রবল বিমানবহরের সাহায্যে ফরাসী দেশের উত্তর উপকূলে অবতরণ করিতেছে।

ইহার কিছু পূর্ব্বে জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী হইতে ঘোষণায় জানানো হয় যে সীননদীর মোহনায় মিত্রপক্ষের বিমানবাহী সৈন্য প্যারাসুটে নামানো হইতেছে!

নরম্যাণ্ডি উপদ্বীপের মাথায়ও পারাসুট যোগে সৈন্য অবতরণ করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী জার্ম্মান নিউজ এজেন্সীর খবর: লাহাভারের ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং সমগ্র উপকূলের ১২ মাইল ভিতরে কিয়ান এলাকার মিত্রপক্ষীয় আক্রমণকারী ফৌজের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। অদ্য সকালে যে সৈন্য অবতরণ করিয়া ছিল তাহাদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌছিতেছে।

সংবাদপত্রের সাধুতা!

(২) দৈনিক আজাদ

ঢাকার দাঙ্গা, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ইত্যাদি সম্বন্ধে ৩১ শে মে তারিখের জনযুদ্ধের একটী প্রবন্ধ ৩রা জুনের "আজাদ" পত্রিকায় প্রায় ২ কলম ভরিয়া ছাপানো হইয়াছে। উহার হেডিং হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখিলে মনে হইবে জনযুদ্ধের গোটা প্রবন্ধটী অবিকল ছাপানো হইয়াছে। উহার কোথাও একটী ডট বা ড্যাশ নাই, কোথাও বলা হয় নাই যে কোন অংশ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, বা বাদ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বলা হয় নাই যে প্রবন্ধের হেডিংটী জনযুদ্ধের নয় আজাদের নিজস্ব। প্রবন্ধের প্রথম চারটী প্যারা জনযুদ্ধে যেমন ছিল ও আজাদে যেমন বাহির হইয়াছে তাহা নীচে পাশা-পাশি ছাপিয়া দেওয়া হইল :—

জনযুদ্ধ

জাতীয় কংগ্রেস

হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতারও বিরোধী

নেতাদের মুসলিম-বিরোধিতা

কংগ্রেস আদর্শই ক্ষুণ্ণ করিবে না কি?

গত কয়েক সপ্তাহের জীবনহানি, আতঙ্ক ও অসুবিধার মধ্যেই ঢাকার দাঙ্গা শেষ হইল না। এখন ঢাকার সমস্ত অধিবাসীকে উহার জন্য আর্থিক দুর্ভোগও ভুগিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের উপর এক লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা বসিয়াছে।

আমরা এই জরিমানার তীব্র প্রতিবাদ করি। যাহারা নির্দোষী তাহাদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করাই আইনের কর্ত্তব্য। যে আমলাতন্ত্র অক্ষম ও অপদার্থ শুধু সেই আমলাতন্ত্রই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া দোষী-নির্দ্দোষী সকলের ঘাড়ে নিজের অক্ষমতার বোঝা চাপাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বোঝা বহন করিতে জনসাধারণ বাধ্য হইবে কেন?

দায়িত্ব কি শুধু ঢাকার?

শুধু তাই নয়। ঢাকাবাসীদের উপর এই জবরদস্তি জরিমানার আমরা আরও তীব্র প্রতিবাদ করি এই জন্য যে, এবার দাঙ্গা বাধানোর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুধু ঢাকা শহর হইতেই আসে নাই, কাজেই সে উত্তেজনা দুর করিয়া দাঙ্গা থামানোর পূর্ণ ক্ষমতা বা দায়িত্বও ঢাকাবাসীদের হাতে ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপলক্ষ্যে লীগপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ দেশময় যে পরস্পর বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অন্ধভাবে ছড়াইয়া বেড়াইয়াছেন তাহার ধাক্কায়ই এবার ঢাকায় দাঙ্গা বাধিতে পারিয়াছে। সে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢাকাবাসী একলা দুর করিবে কিরূপে?

এই উত্তেজনার সমাধান শুধু দেশের বিভিন্ন দলের নেতারাই করিতে পারেন। তাঁহারা যদি শিক্ষাবিল সম্বন্ধে একটা আপোষ রফায় আসিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন, কিম্বা অন্ততপক্ষে বিল উপলক্ষ্যে মুসলিম-বিরোধী বা হিন্দুবিরোধী আন্দোলন না জাগিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেন, নিজ নিজ সমর্থক দৈনিকপত্রগুলির দৈনন্দিন সাম্প্রদায়িক আস্ফালন সংযত কারতে চেষ্টা করিতেন—তাহা হইলে আজ ঢাকার দাঙ্গা ঘটিতেই পারিতনা। **কি লীগ পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ কেহই তাহা করেন নাই। আজ শুধু ঢাকাবাসীকেই তাহার দণ্ড দিতে হইবে কেন? আর দুই পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খোরাক যদি এখনও প্রতিদিন সরবরাহ হইতে থাকে তবে দণ্ড দিলেও যে আবার দাঙ্গা বাধিবেনা তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বরং ঢাকা ছাড়াইয়া উহা অন্যান্য স্থানেও পৌঁছিতে পারে।**

আজাদ

কংগ্রেসের আদর্শহীনতা ও মোসলেম বিরোধীতা

গত কয়েক সপ্তাহের জীবনহানি, আতঙ্ক ও অসুবিধার মধ্যেই ঢাকার দাঙ্গা শেষ হইল না। এখন ঢাকার সমস্ত অধিবাসীকে উহার জন্য আর্থিক দুর্ভোগও ভুগিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের উপর এক লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা বসিয়াছে।

দায়িত্ব কি শুধু ঢাকার?

এবার দাঙ্গা বাধানোর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুধু ঢাকা শহর হইতেই আসে নাই, কাজেই সে উত্তেজনা দুর করিয়া দাঙ্গা থামানোর পূর্ণ ক্ষমতা বা দায়িত্বও ঢাকাবাসীদের হাতে ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপলক্ষ্যে লীগপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ দেশময় যে পরস্পর বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অন্ধভাবে ছড়াইয়া বেড়াইয়াছেন তাহার ধাক্কায়ই এবার ঢাকায় দাঙ্গা বাধিতে পারিয়াছে। সে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢাকাবাসী একলা দুর করিবে কিরূপে?

এই উত্তেজনার সমাধান শুধু দেশের বিভিন্ন দলের নেতারাই করিতে পারেন। তাঁহারা যদি শিক্ষাবিল সম্বন্ধে একটা আপোষ রফায় আসিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন, কিংবা অন্ততঃপক্ষে বিল উপলক্ষ্যে মুসলিম-বিরোধী বা হিন্দু বিরোধী আন্দোলন না জাগিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেন, নিজ নিজ সমর্থক দৈনিকপত্রগুলির দৈনন্দিন সাম্প্রদায়িক আস্ফালন সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন—তাহা হইলে আজ ঢাকায় দাঙ্গা ঘটিতেই পারিতনা।

আমাদের মন্তব্য

আজাদ জনযুদ্ধের যে লেখাটুকু গোপন করিয়াছে ও হেডিংয়ের যে পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহাতে প্রবন্ধের সার মর্ম্মটী প্রায় উল্টা হইয়া যায়। ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে আমলাতন্ত্র যে তার দায়িত্ব পালন করিতে না পারিয়া জনসাধারণের ঘাড়ে তার অক্ষমতার বোঝা চাপাইয়াছে, জনযুদ্ধের এ অংশটুকু প্রবন্ধে না রাখিলে প্রবন্ধটী পড়িয়া লোকের এই ধারণাই হইবে যে পাইকারী জরিমানা বসাইয়া আমলাতন্ত্র কিছুই অন্যায় করে নাই, এই জরিমানা বুঝি জনসাধারণের প্রাপ্যই ছিল। আজাদ সেই ধারণাই সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আজাদ বাদ দিয়াছে সেই অংশটুকু যেখানে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে সাম্প্রদায়িক প্রচার বন্ধ করিবার দিক দিয়া কি লীগপক্ষ কি বিরোধী পক্ষ কেহই কিছু করে নাই। উপরের এক জায়গায় যেখানে খুব সাধারণভাবে লীগপক্ষ ও বিরোধী পক্ষের পরস্পর উত্তেজনা সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সে জায়গাটা ঠিক রাখিতে আজাদের আপত্তি হয নাই; কেননা, আজাদ হয়ত মনে করিয়াছে যে শেষের অংশটি বাদ দিলেই লীগের ও লীগ সমর্থক পত্রিকার উপর আর কোন বিশেষ দায়িত্ব আসে না, এবং তার ফলে প্রথম অংশটিও কমজোর হইয়া যায়।

এইভাবে কাট ছাট করিলে বাকী যাহা থাকে, তা তো সবই বাংলার কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সমালোচনা। সেই সমালোচনার উপরে যদি মনোমত হেড-লাইন দেওয়া যায় তা হইলে সহজেই সমস্ত প্রবন্ধটীকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একতরফা আক্রমণ হিসাবে দাঁড় করান যায়। আজাদ বোধ হয় তাই করিতে চাহিয়াছে, তাই প্রবন্ধটীকে এমনভাবে ছাপিয়াছে যাতে লোকে মনে করে যে প্রবন্ধের কিছু বাদ না দিয়া হুবহু ছাপা হইয়াছে।

হেড-লাইনের মধ্যেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। আমাদের হেড-লাইনের সোজা অর্থ এই যে, কংগ্রেসের আদর্শ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং সেই আদর্শ ঠিকই আছে. তাকে ক্ষুণ্ণ করা কোন কংগ্রেসসেবীর পক্ষে উচিত নয়। আজাদের হেড-লাইনের অর্থ ঠিক উল্টা, অর্থাৎ, কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতি হইয়াছে, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক হইয়া গিয়াছে। আমাদের হেড-লাইন পড়িয়া লোকের কংগ্রেস-আদর্শ সম্বন্ধে চেতনা ও দায়িত্ব বাড়ে; আজাদের হেড-লাইন লোকের কংগ্রেস-প্রীতিকে আঘাত দেয় ও তাকে উত্তেজিত করে।

আজাদ যদি নিজের মত সমর্থনের জন্য প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিত তাহা হইলে বিশেষ আপত্তি করা যাইত না। কিন্তু মতামতশূন্য ভাবে জনযুদ্ধের নামে গোটা প্রবন্ধটাই ছাপা, অথচ তাহার কিছু বাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা, পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে কিনা তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না করা অসাধু তো বটেই, সাধারণ সাংবাদিক ভদ্রতা-রীতিরও বিরোধী। আমরা বিশ্বাস করি আজাদ সম্পাদকের অজ্ঞাতসারেই কোন অতি-উৎসাহী কর্ম্মচারী এরূপ করিয়াছেন এবং আশা করি সম্পাদক মহাশয় ভবিষ্যতে এরূপ জিনিষের উপর কড়া নজর রাখিবেন।

শিক্ষা বিলের গলদ দূর করিতে সাম্প্রদায়িকতা নয়,

হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চাই

সাধারণ হিন্দু বা কংগ্রেসী খবরের কাগজ পড়িলে মনে হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদে দেশের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, তার মধ্যে একটী আওয়াজই উঠিতেছে: লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী সর্ব্বনাশ করিল, হিন্দুরা সামাল! নেতাদের প্রচারের ফলে অবশ্য অধিকাংশ লোকের মনেই এই রকম উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছে, সর্ব্বনাশটা আসলে কোথায় এবং কি ভাবে আসিতেছে এবং এই সর্ব্বনাশ ঠেকাইবার কার্য্যকরী উপায় কি তা এই উত্তেজনার ঝোঁকে ভাবিয়া দেখিবার অবসরই যেন কারুর নাই। কিন্তু তবু, এই উত্তেজনার জোয়ার ঠেলিয়া সুস্থ সবল চিন্তা যে এই বাংলারই বুকে জাগিতেছে এবং তা জাগিতেছে তাদেরই মধ্যে যাদের জীবন মাধ্যমিক শিক্ষার ভাল মন্দর সঙ্গেই জড়িত, সেই খবরটী আমরা সাধারণ কাগজে পাই না।

যখন শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতায় আসর গরম করিতেছেন, সেই সময়ই কলিকাতারই উপর ছাত্র-ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির ডাকে পার্কে পার্কে সভা হইয়াছে। সেই সভায় তিন চার হাজার পর্য্যন্ত লোক হইয়াছে। সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি আসিয়া ধীরভাবে বক্তৃতা শুনিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রত্যাহার দরকার, কেননা ইহাতে আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই সমান সুবিধা দিতে গেলে পৃথক নির্ব্বাচনে আপত্তি করা উচিত নহে, একটা মীমাংসা করাই উচিত—বক্তাদের এই কথা লোকে ধীরভাবে শুনিয়াছে ও সমর্থন করিয়াছে। ২০শে মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ৩ হাজার লোক হইয়াছিল, ২৩শে মের সভায় ৩৫০০, ১লা জুনের সভায় ৪ হাজার। ২৯শে মে হাজরা পার্কের সভায় ২৫০০ লোক হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ছোট সভা আরো হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলিম শিক্ষাব্রতীর মিলন

শুধু এই ধরণের সভা নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাবিলকে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের স্বার্থে কি ভাবে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তার জন্য সমস্ত মতের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে আলোচনারও একটী ব্যবস্থা কলিকাতাতেই হইতেছে। ছাত্র-ফেডারেশন এই কাজে অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁরা প্রথমে বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আবেদন করেন সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁদের মত প্রকাশ করিতে। ইহার ফলে অনেক অধ্যাপক ও শিক্ষকের স্বাক্ষরিত একটী আবেদন পত্র বাহির হয়। এই আবেদন পত্রে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে পৃথক নির্ব্বাচন লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার না করিয়া বরং একটী মীমাংসা করা উচিত। ইহার পরে শিক্ষাব্রতীদের সম্মেলন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসাবে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষকরা নাম দিতে রাজী হইয়াছেন। লীগপন্থী অধ্যাপকও এই প্রকার সম্মেলনে আগ্রহ দেখাইতেছেন। ছাত্র-ফেডারেশনের সঙ্গে মুসলিম ছাত্র লীগও এই কাজে সহযোগীতা করিতেছে।

শুধু কলিকাতাতেই নয়, হুগলীতেও অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মধ্যে এই ধরণের একটী আলোচনা বৈঠকে এই বিল সম্পর্কে সকল পক্ষের মতামত আলোচিত হয়। আজকের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় বিলের বিরোধী ও বিলের সমর্থক উভয়ে এক জায়গায় বসিয়া আলোচনা করিতেই পারে না। কিন্তু হুগলীতে তা সম্ভব হইয়াছে। কংগ্রেস মতাবলম্বী, হিন্দু মহাসভাপন্থী, লীগ সমর্থক অধ্যাপক ও শিক্ষকরা একত্র বসিয়া যে আলোচনা করেন, তাহাতে পরস্পরের প্রতি আক্রোশের চেয়ে শিক্ষাবিলের ভালমন্দর কথাই বেশী ছিল। তাঁরা ঠিক করিয়াছেন, তাঁরা আবার আলোচনা করিবেন এবং মীমাংসার ভিত্তি তৈরী করিতে চেষ্টা করিবেন।

সাম্প্রদায়িকতায় আমাদেরই শক্তি ক্ষয়

শিক্ষাবিলের আসল ত্রুটী সম্বন্ধে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও যে চেতনা আছে এবং তাহারাও যে এই বিল বদলাইতে চায়, তার পরিচয় জানিতে না দিয়া বরং চরম সাম্প্রদায়িকতার কথা বলিয়া মুসলিমদের তফাৎ করিবারই বেশী চেষ্টা আজকে হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী সভার যে রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি, তাহাতে তার চরম প্রকাশ দেখা গিয়াছে। ২৭শে মে কৃষ্ণনগরের সভায় মুসলিম ছাত্র লীগের ছাত্ররা হাজির হইয়াছিল বিলের প্রতিবাদ করিবারই জন্য। তাদের নেতা শিক্ষাবিলে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে মীমাংসা করিয়া সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে একযোগে দাঁড়াইবার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সভার সভাপতি ও অন্যান্য বক্তারা এমন ভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেন, যে শুধু মুসলিম ছাত্র নয়, অন্যান্য ছাত্ররাও বিরক্ত হইয়া উঠে। কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এই ঘটনার পর মত প্রকাশ করেন যে সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্রের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রের একযোগে সভা করা দরকার। হিন্দুমহাসভার একজন কর্ম্মীও এই মতে সমর্থন জানান। ২৬শে মে নবদ্বীপের একটী সভায় একজন নেতা নাকি এমন কথা বলেন যে, বিলটী প্রত্যাহার করানোর জন্য তাঁরা সরকারের কাছেও নতি স্বীকার করিতে রাজী, তবু লীগের সঙ্গে কোন আপোষ নাই। সভায় উপস্থিত ছাত্ররা এই ধরণের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠে।

সাম্প্রদায়িক ঝাঁঝের ফল কুষ্টিয়ায় চরমে উঠিল। হিন্দুমহাসভাপন্থীরা একদিকে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া আওয়াজ তুলিল: লীগ মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক; মুসলিম ছাত্ররাও একটী পাল্টা শোভাযাত্রা বাহির করিয়া আওয়াজ তুলিল: শ্যামাপ্রসাদ ধ্বংস হোক। দুইটী শোভাযাত্রার সংঘর্ষ হইবার উপক্রম, কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত উত্তেজনা দমিল, ও শান্তি রক্ষা হইল।

সাম্প্রদায়িক প্রচার আজকে এমনি ভাবে মুসলিমদের তফাৎ করিয়া দিতেছে। কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িক প্রচারের বদলে জনস্বার্থে বিলের ভাল মন্দ আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে হিন্দু ও মুসলিম একসঙ্গে যে দাঁড়াইতে পারে, তা উপরের খবরে আমরা দেখিয়াছি। শিক্ষাবিলকে প্রত্যাহার করাইবার আসল শক্তি সেইখানেই গড়িয়া উঠিতেছে। সে শক্তির বনিয়াদ হিন্দু-মুসলমানে ভেদ নয়, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য।

পৃথক নির্ব্বাচন সম্পর্কে

কংগ্রেসের আদর্শ

জিন্নার কাছে জহরলালের চিঠি, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৮, কলিকাতা :—

"জাতীয় ঐক্যের দিক দিয়া এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সহযোগিতার দিক দিয়া বিচার করিলে পৃথক নির্ব্বাচনের চেয়ে যুক্ত নির্ব্বাচনই ভাল, ইহা কংগ্রেসের অনেকদিনকার অভিমত। **কিন্তু অনিচ্ছুক দলের উপর যুক্ত নির্ব্বাচন জোর করিয়া চাপাইয়া দিলে তাতে যুক্ত নির্ব্বাচনের মুল্য আর থাকে না।** সুতরাং কংগ্রেসের পরিষ্কার ধারণা এই যে যাদের লইয়া যুক্ত নির্ব্বাচন তাদের রাজী হওয়ার উপরই যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রয়োগ নির্ভর করে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব এই নীতিই অনুসরণ করে। সম্প্রতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপারে বোম্বাই এসেম্ব্লিতে একটী বিল আসিয়াছিল, তাতে পৃথক নির্ব্বাচনে ব্যবস্থাই রাখা হইয়াছে, অবশ্য যদি নির্ব্বাচকরা যুক্ত নির্ব্বাচন করিতে চায়, তবে তাহা করিবার অধিকারও তাদের দেওয়া হইয়াছে।"

কংগ্রেস-আদর্শের চ্যুতি

৪ঠা জুন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় কংগ্রেস নেতা **শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় বলেন :—**

জাতীয় কংগ্রেস এবং কোন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী পৃথক নির্ব্বাচনকে মানিয়া লয় নাই। ভারত শাসন আইনের পৃথক নির্ব্বাচনকে তাহারা দেখাইয়াছে এমন একটী অভিশাপ রূপে যাহা জোর করিয়া তাহাদের উপর চাপান হইয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে যদিও আমরা উহা সহ্য করিয়াছি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুতেই আমরা উহা মানিয়া লইব না। (যুগান্তর, ৫ই জুন)

বাংলার খাদ্যাবস্থা কোন দিকে ?

কেসি ও সারওয়ার্দ্দীর আশার বাণী মিথ্যায় পরিণত

ঘাটতি অঞ্চল চাউল অভাবে শুকাইয়া মরিতেছে

সরকারের আত্মসন্তোষ

গত ২৯শে এপ্রিল বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসি বলিয়াছিলেন,—"এপ্রিল মাসে খাদ্যের অবস্থা ভালর দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিন মাস অপেক্ষা এপ্রিলে খাদ্যশস্য সংগ্রহের অবস্থা ভাল।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৪৪ সালে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না।" খাদ্য মন্ত্রী মিঃ সারওয়ার্দ্দীও ঘোষণা করিয়াছিলেন—"দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশংকা নাই। এ বৎসরে তার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই।"

এই সমস্ত আশার বাণী ঘোষণা করার এক মাস যাইতে না-যাইতে বাংলার বহু স্থানে চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। বহু অঞ্চলে গরীব জনসাধারণ এক মুষ্টি চাউল কিনিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এত উচ্চ মূল্যে ধান চাল খরিদ করিতে পারিতেছে না।

ঘাটতি অঞ্চলে দর বাড়িতেছে

১৬ই মে নোয়াখালীতে চাউলের দর ছিল ২১ টাকা হইতে ২৫ টাকার মধ্যে। আজাদ পত্রিকারই সংবাদ ১৫ই এপ্রিল নোয়াখালীতে চাউলের দাম ২০৲ টাকায় উঠিয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকায় ৩০শে এপ্রিলের সংবাদ এই জেলার মফঃস্বলে ২৩ টাকা মনে চাউল বিক্রয় হইতেছে। ৩০শে মে আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদে প্রকাশ সন্দীপে চাউলের দর ৩০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ১৮ই এপ্রিল চাঁদপুরে চাউলের দর ছিল ৩৫৲ টাকা। চট্টগ্রামের চৌধুরী হাটে ২৫শে এপ্রিল হইতে ৫ই মে পর্য্যন্ত দর বাড়িতে বাড়িতে ৩৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। ধেমশা, আমিরাবাদ ও খান্দাকিয়ায় ঐ সময় দর হইয়াছে ২৬৲ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত। ২৫শে এপ্রিল হইতে কক্সবাজারে চাউলের দর ১৲ টাকায় ১ সের।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মিঃ সারওয়ার্দ্দী সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"ঢাকায় প্রতি মাসে নয় লক্ষ মণ করিয়া সরবরাহ করা হইবে। তাহার ফলে জেলাবাসীর দুর্গতি দূর করা সম্ভব হইবে এবং চাউলের দরও যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।"

তাহার পর ঢাকায় চাউলের দরের অবস্থা কি হইল। ১২ই এপ্রিল হইতে কুকুটিয়ায় চাউলের দর উঠিল ২৬৲ টাকায়। নাগেরহাটে ২৫।২৬৲ টাকা, কাজির পাগলায় ২২৲ টাকা; আউশাহীতে ২১॥৹ টাকা। মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ১৭।১৮৲ টাকা। "আজাদে" ২রা মে'র সংবাদ মুন্সীগঞ্জে চাউলের দাম ২৩৲ টাকা, তাও অতি সামান্য পরিমাণে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। ঢাকায় চাউলের দাম ১৯।২০৲ টাকা! আনন্দ বাজার পত্রিকায় ২৬শে এপ্রিলের সংবাদ—বজ্রযোগিনীতে চাউলের দর ২৬৲ টাকায় উঠিয়াছে।

২৭শে এপ্রিল মিঃ সারওয়ার্দ্দী বলিয়াছিলেন—"বাড়তি অঞ্চলে চাউলের দর ১২।১৩৲ টাকা ও ঘাটতি অঞ্চলে তার চেয়ে ২৲ টাকা বেশী দর।"

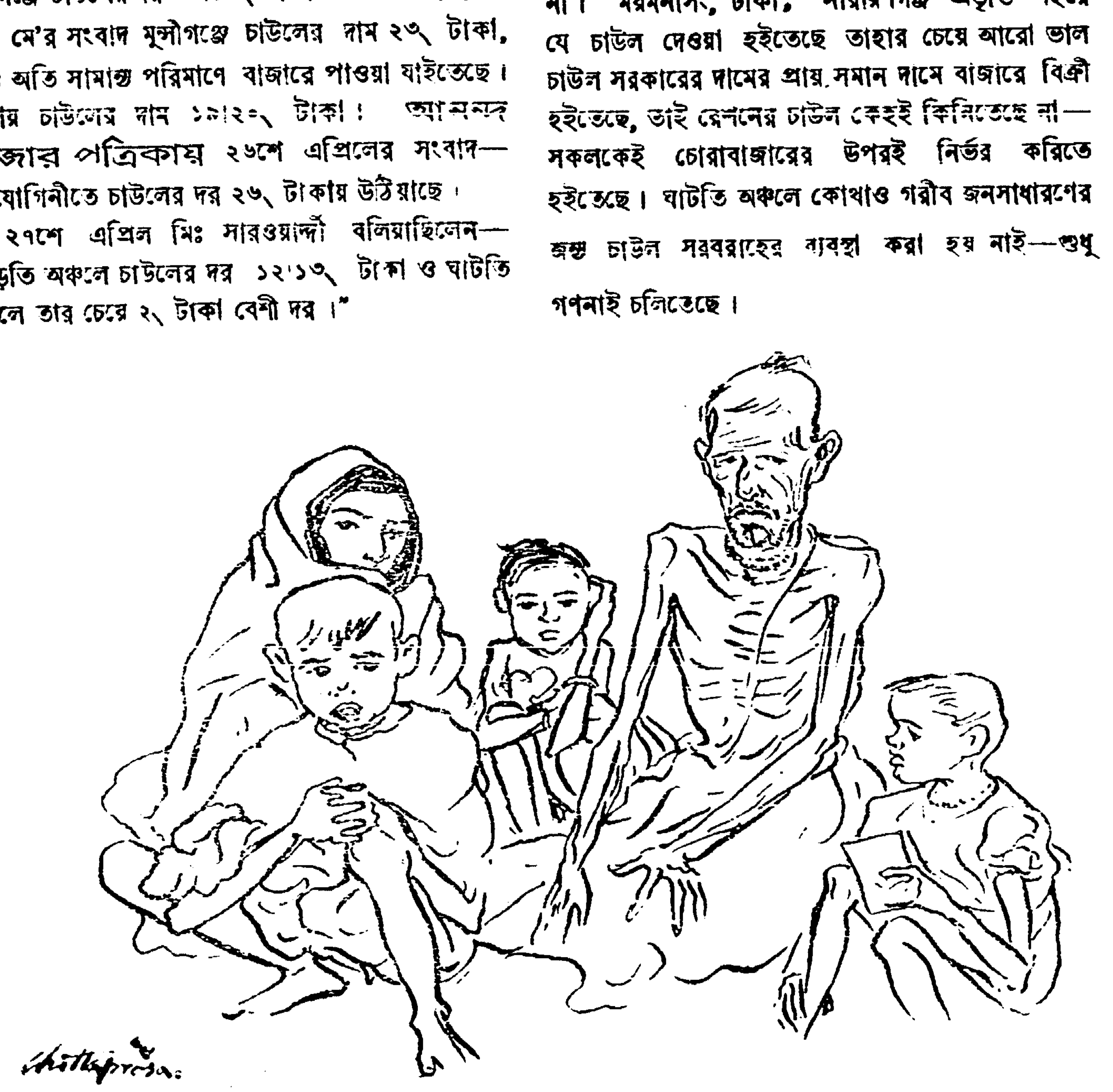

মেদিনীপুরের একটি দুঃস্থ পরিবার

কিন্তু সংবাদপত্রের দৈনন্দিন সংবাদে ও গ্রামাঞ্চল হইতে আমরা যে সব দর সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে কি দেখা যায়? ঘাটতি অঞ্চলে চাউলের দর ২২৲ হইতে ২৫৲ টাকার কম কোথাও নয়—উর্দ্ধে মূল্য উঠিয়াছে ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা (চট্টগ্রাম)।

সরকার ক্রয় ও সরবরাহে অক্ষম

শুধু মাত্র আশার কথা শুনাইলে ও 'ধীরে ধীরে চাউলের দর নিশ্চয়ই হ্রাস পাইবে' এইরূপ আত্মসন্তুষ্টি লইয়া বসিয়া থাকিলে দর কি করিয়া কমিবে? গবর্ণমেন্ট যদি উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে সরবরাহ হইতে পারে না এবং চোরাকারবারীদের দর চড়ানোর ষড়যন্ত্র ধ্বংস করা যায় না—ইহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। দুই একটী স্থানে গবর্ণমেন্ট ষ্টক হইতে কিছু কিছু চাউল বাজারে ছাড়িয়া দর কমাইবার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু বাংলায় এতগুলি ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় এবং শক্তিশালী মজুতদারদের বিরাট ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র তৃণের তুল্য।

কেসি সাহেবের দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে কি হইবে, আমরা কিন্তু সরকারী ক্রয় ব্যবস্থার কোনরূপ উন্নতিই দেখিতেছি না। দিনাজপুরের ১ কোটী মণ বাড়তি ধানের ভিতর ৫ লাখ মণ পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির চোরাব্যবসায়ীরা কিনিয়া ফেলিয়াছে। ৪৩টা চালের কল ৩৫ লক্ষ মণ কিনিয়াছে। আর বাকী ৬০ লক্ষ মণ জোতদারের ঘরে এখনো মজুত আছে। সরকার নাকি চালকলের মারফৎ কেনার ব্যবস্থা করিয়াছে কিন্তু এ চাল কোথাও যে সরবরাহ করা হইতেছে তাহার প্রমাণ নাই। মালদহ জেলায় ৪ লক্ষ মণ ক্রয় করার কথা কিন্তু ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ মণ কেনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে চালকলের মারফৎ নাকি ২ লক্ষ মণের কিছু বেশী কেনা হইয়াছে। চট্টগ্রামে ৩০ লক্ষ মণ ঘাটতি অথচ কেনা হইয়াছে মাত্র ১ লক্ষ মণ। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের জন্য ৬ লাখ মণ চাল কেনার কথা কিন্তু ২৯ হাজার মণের বেশী কেনা হয় নাই (১১-৫-৪৪)। ময়মনসিংএ ২০ লক্ষ মণের কিছু বেশী বাড়তি কিন্তু সরকার বড় জোর কিনিয়াছে ৪ লক্ষ মণ।

চালের দাম হ্রাস হইলে কিনিব এই আশায় বসিয়া থাকিয়া সরকারী এজেন্টরা অতিশয় মন্থর গতিতে কিনিতেছে। ফল হইয়াছে—রেশনীংএর জন্য প্রায় সব শহরেই গণনার কার্য্য—কোথাও বা কার্ড বিলি শেষ হইয়াছে কিন্তু সারা বাংলায় চট্টগ্রাম শহর ও দুই একটী স্থান ছাড়া আর কোথাও চাউল দেওয়া হইতেছে না। ময়মনসিং, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহরে যে চাউল দেওয়া হইতেছে তাহার চেয়ে আরো ভাল চাউল সরকারের দামের প্রায় সমান দামে বাজারে বিক্রী হইতেছে, তাই রেশনের চাউল কেহই কিনিতেছে না—সকলকেই চোরাবাজারের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। ঘাটতি অঞ্চলে কোথাও গরীব জনসাধারণের জন্য চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় নাই—শুধু গণনাই চলিতেছে।

চারিদিকে আবার হাহাকার

গরীব চাষীর ধান চাউল ফুরাইয়াছে। তাহারা মার্চ মাসের মধ্যেই সমস্ত কিছু বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ ঘাটতি অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকান বা ফুড কমিটিগুলি কোথাও চাউল সরবরাহ করিতেছে না। ফলে, সর্বত্রই অন্নাভাব দেখা দিতেছে। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাদের সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় মালদহ জেলায় শতকরা ৫০ জনের চোরাবাজারে ধান চাউল কিনিবার সঙ্গতি নাই। পাবনায় শতকরা ৬৫ জন কৃষকের ধান চাল নাই—তাহারাও কিনিতে পারিতেছে না। মেদিনীপুরে শতকরা ৩০ জন ও নদীয়ায় শতকরা ৪০ জন চাউল কিনিতে অক্ষম। বাড়তি জেলা বরিশালের গৌরনদীতে দুঃস্থের সংখ্যা বাড়িতেছে। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকায় নোয়াকান্দীতে ৫০ জন দুঃস্থ রহিয়াছে, রসিদাবাদে শতকরা ৪০ জনের খাদ্যাভাব, বাজিতপুরে শতকরা ৭০ জনের খাদ্য নাই। নেত্রকোণার দিগলপার গ্রামে ৫৪ ঘরের মধ্যে ২৬ ঘরে অন্ন নাই। চৈতন্য নগরে ৬৪টী পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫টী পরিবারের সারা বছরের ও ২৫টী পরিবারের আউশ পর্য্যন্ত চলিবে বাকী সকলের খাবার নাই। রংপুরের ~নোহালীপাড়া এলাকায় শতকরা ২৫ জন অনাহারী। মেদিনীপুরে পাঁশকুড়া থানায় ১৫ নং ইউনিয়নের একটী গ্রামে ১০০ ঘর লোকের মধ্যে ৩৫টী ঘরই দুবেলা না খাইয়া থাকিতেছে।

সরকারী ব্যর্থতার কারণ

খাদ্য সম্পর্কে বাংলায় এই নিদারুণ অবস্থার জন্য দায়ী সরকারের খাদ্যনীতি। আমন ক্রয়ের নীতি হাতে লইয়া তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন? ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দুই মাস সরকার ক্রয়-বোর্ড গঠন করিয়া ধান চালের দর কমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্যবসায়ীদের রেলে ২ মণ ও নৌকা গাড়ীতে ২০ মণ করিয়া রপ্তানীর হুকুম দিয়া দিলেন। মজুতদাররা সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে বহু চাল ধান সরাইয়া ফেলিল। তারপর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ দুই মাসে সরকারী এজেন্টরা কিনিতে সুরু করিল। তারা চাষীদের কাছে নিম্নতম বাঁধা মূল্যে চাল ধান কিনিতে লাগিলেন। গরীব চাষীরা প্রয়োজনের তাগিদে দরাদরি করার মত ক্ষমতা হারাইয়া চাল ধান বেচিয়া শেষ করিতে বাধ্য হইল। চোরা ব্যবসায়ীরা দুই চার আনা বেশী দরে সরকারী এজেন্টদের চেয়ে বেশী পরিমাণে কিনিতে লাগিল। দিনাজপুর ও ময়মনসিং প্রভৃতি বাড়তি অঞ্চল হইতে তখনও ২০ মণ করিয়া নৌকাযোগে ধান-চাল লওয়া আইন থাকিয়া গেল। বর্ত্তমানে অর্থাৎ এপ্রিল মে মাসে সরকার চাল ধান বেশী পরিমাণে কিনিতে অক্ষম হওয়ায় চালকলের সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। জমিদার, জোতদার, বড়-চাষী প্রভৃতি কেহই বিক্রয় করিতেছে না। বাজারে আসার ধান-চাল এখনো বহু পরিমাণে গ্রামে গ্রামে মজুত হইয়া রহিয়াছে—চোরা-ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে সরাইতেছে—সরকার বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতেছে।

জনগণের খাদ্য কমিটির বদলে

মজুতদারদের উপর নির্ভরতা কেন ?

জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া বাংলায় খাদ্যাবস্থার উন্নতি করা যায় না—একথা সরকার বহুবার ঘোষণা করিয়াছে। ফুড কমিটির নোটীশ ও সার্কুলারেও বারবার এসব কথার উল্লেখ থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগীতা ছাড়াই তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয় করিতে চাহেন। ফলে তাঁরা কিনিতে পারেন না—ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করাতো দূরের কথা। এদিকে সরকারের এজেন্টরা আবার স্থানে স্থানে কিনিয়া মজুত করিতেছে—সরকারী গুদামে খুব কম ধান-চালই আসিয়া মজুত হইতেছে। ফল দাঁড়াইয়াছে,—একদিকে চোরা মজুতদাররা কিনিয়া কিনিয়া বাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই ছোট ছোট মজুত করিয়া বসিয়াছে, অপরদিকে সরকারী এজেন্টরাও যাহা কিনিতেছে তাহার ভিতর দিয়া মুনাফাখোরী ব্যবসায় চালানর ফন্দি আঁটিতেছে। রেশনিং ও ঘাটতি অঞ্চলের কণ্ট্রোল দোকানে দিবার জন্য সরকার মোটেই চাল ধান হাতে পাইতেছে না। এই সব মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান করার ব্যাপারে সরকার একেবারে উদাসীন। আমাদের কর্মীরা মজুত বাহির করিলে উল্টা তাহাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়—চট্টগ্রামে চা-বাগানের চোরা-ধান ধরার সংবাদ গতবারে 'জনযুদ্ধে' দেখিয়াছেন। ময়মনসিং-এর নেত্রকোণা হইতে ২ লক্ষ মণ ধান-চাল সরারচর-ভৈরব দিয়া মজুতদাররা সরাইয়া ফেলিল—সরকারী কর্মচারীরা মোটেই নজর রাখে নাই। এই ভাবে গত বছরের খাদ্যাভাবের কারণগুলিকে জিয়াইয়া রাখিলে এবৎসরেও যে খাদ্যাভাব দেখা দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অথচ সারওয়ার্দী সাহেব বলেন—গত বছরের কারণগুলি এবারে বর্তমান নাই। দুই মাস আগে সারওয়ার্দী বলিয়াছিলেন—যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সরবরাহের আর কোনও বাধা থাকিবে না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা হইল কই? চোরাকারবারীরা তো বেশ রেল, নৌকা, গাড়ী সমস্তই বেশী দামে ও ঘুষ দিয়া দখল করিয়া বসিল। আর সরকারী এজেন্ট ও আমলারাই কিছু যানবাহন পাইতেছেন না? মুনাফাখোর ও মজুতদারীদের ঘুঁষ কারবার বন্ধ করিয়া সরকার নিজের যানবাহনের ব্যবস্থা করে না কেন? মজুতদারী ও মুনাফাখোরীদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে থাকিলে সরকার একটা না একটা বাঁধা প্রত্যেক সময়েই দেখিতে পাইবেন—আর তাহাই হইবে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহির অজুহাত।

জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য এপ্রিলের ভিতরই খাদ্য কমিটি পুনর্গঠন করিয়া পুরাদমে কাজ সুরু করার কথা। আজ পর্য্যন্ত সর্বত্র সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের হাতে ক্রয় ও বিতরণের ভার দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু, যেখানেই সর্বদলীয় কমিটি তৈয়ারী হইয়াছে সেইখানেই মজুতদারদের চাপে পড়িয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সেই সব কমিটি ভাঙ্গিয়া দিবার বা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে। নেত্রকোণায় সমস্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি নির্বাচিত হইয়া গেল—হিন্দু সভা, লীগ, কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস সকলে মিলিয়া ৬টী আসন ও সরকারী আমলারা ৩টী আসন পাইলেন। কিন্তু তারপরই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে—নির্বাচন নাকি নিয়মতন্ত্রের কিছুটা বিরোধী হইয়াছে! আর এই খানেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইষ্টার্ণ এজেন্সী নামে একটী মুনাফাখোরী প্রতিষ্ঠানের হাতে সমস্ত কিছু সরবরাহের ভার দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। সৈয়দপুরে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠিত হয় ও ৪২০০ লোককে রেশন কার্ডের সাহায্যে সমস্ত কিছু সরবরাহ করা হইতেছিল। স্থানীয় মজুতদাররা এস-ডি-ওকে প্রভাবিত করিয়া বে-আইনীভাবে নোটীশ দিয়া খাদ্য কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বহুস্থানে খাদ্য কমিটির ভিতরে সুদখোর ও কারবারীরা প্রাধান্য লাভ করিবার মতলবে জনসাধারণের সহিত দলাদলি ও মারামারি করিতেছে—এবার সরকারী আমলারা প্রায় স্থানেই এইসব ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করিতেছে। যশোহরে বে-আইনীভাবে খাদ্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে—জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এই লইয়া জোর প্রতিবাদ আন্দোলন চালাইতেছেন। সরকারী আইন কানুন ও নির্দ্দেশ মজুতদাররা কিছুতেই মানিবে না—আর অপদার্থ আমলারা তাহাদের সাজা দেওয়া তো দূরের কথা বহু স্থানে তাহাদেরই অধীনে জো-হুকুমের কাজ করিতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে জনসাধারণের সহযোগিতা লওয়া শুধু কথার কথাই থাকিয়া যাইবে। আসলে খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ মজুতদারীদেরই পথ নিষ্কটক করা হইবে।

একমাত্র পথ

যে শোচনীয় অবস্থা বাংলার বুকে নামিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিকারের একমাত্র পথ জনগণের খাদ্য কমিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়া ও মজুতদারীর সমস্ত ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিয়া স্থানীয় মজুত বাহির করা। সরকারের এই দুইটী নির্দ্দেশ খাতাপত্রে আছে—কিন্তু আমলারা অপদার্থ। তাহারা বাস্তবের সামনে অন্ধ থাকিতে চায়। জনসাধারণকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। তবেই আমরা ইহারই সুযোগে এখনও আমাদের দেশবাসীকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি।

বন্যা রুখিলে লক্ষ লক্ষ মণ ফসল বাঁচে

সোনার বাংলায় খাদ্যাভাব কেন হইবে ?

কৃষক সভার ডাকে বাংলার কৃষক বাঁধ বাঁধার কাজে লাগিল

ফসল বাড়াইবার কাজে বাংলার কৃষক সমিতিগুলির ভিতর আবার সাড়া পড়িয়াছে। আউষ বোনার সময় বীজ, গরু প্রভৃতির জন্য আন্দোলন, বিভিন্ন স্থানের কৃষক সমিতির চেষ্টায় বীজ, কৃষি ঋণ আদায় করিয়া বিলি, হাল ও বলদের অভাবে কোন কোন স্থানে গাঁতা প্রথায় চাষের প্রবর্তন হয়। গত ২/৩ মাস যাবত অনেক জেলায় বাঁধ বাঁধা, খাল কাটা প্রভৃতির কাজেও কৃষক সমিতিগুলি আগাইয়া আসে। এই সব দেশপ্রেমিক কাজে কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং অনেক কৃষক সংগঠনের ভিতর আসিতে থাকে। কোন কোন স্থানে দেশভক্ত কংগ্রেসকর্মীরাও এই কাজে সহযোগিতা করেন। ২৪ পরগণায় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের চেষ্টায় টেংরা খাল কাটার ব্যবস্থা হয়। এই কার্য্যে সরকারী সাহায্যও মেলে, বেঙ্গল রিলিফ কমিটিও অর্থ দিয়া সাহায্য করে। ইহা ছাড়া ঐ মহকুমারই মৈশামুড়ি অঞ্চলে গত ১০/১২ বৎসর যাবত জল নিকাষের অভাবে ৭৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। কৃষক সমিতির আহ্বানে গ্রামের লোক একত্র হইয়া ১ মাইল লম্বা, ৫ ফিট চওড়া ও ৪ ফিট গভীর একটি খাল খননের কাজ আরম্ভ করে। গত ১৪ই মে হইতে এই কাজ চলিতেছে। চট্টগ্রাম জেলার একজন কংগ্রেস নেতার সভাপতিত্বে কুমারিয়াতে খাল কাটা সমিতি গঠিত হয়।

ফসল বাড়াইতে গাঁতাপ্রথা

ফসল বাড়ানর প্রচেষ্টায় এইবার নদীয়া জেলা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ৩টি গ্রামের ৭৫টি পরিবার ৭টি দল গঠন করিয়া গাঁতা প্রথায় কাজ সুরু করিয়াছে। এই সব পরিবারের কাহারও কাহারও লাঙ্গল বা বলদ কিছুই নাই তবুও তাহারা গাঁতা-দলে স্থান পাইয়াছে। ইহার ফলে গাঁতা প্রথায় চাষ বিস্তার লাভ করিতেছে।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতেই কৃষক সমিতি আওয়াজ তোলে নবদ্বীপ মহকুমার সুতিবাঁধ ও জোকাই বাঁধ বাঁধার। নানারূপ প্রচার ও আন্দোলনের ফলে জোকাই বাঁধের কাজ সুরু হয় ১৯৪৪ সালের ৫ই মার্চ্চ এবং সুতি বাঁধের কাজ সুরু হয় ৩রা এপ্রিল।

জোকার বাঁধ লম্বায় ২॥০ মাইল, চওড়া ১২ ফিট ও উঁচুতে ৭ ফিট। এই বাঁধের ফলে ৪০০০ বিঘা জমি বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। বছরে ২৪০০০ মন ধান এবং ১৫০০০ মন রবি শস্য হইবে। জোকাই বাঁধের ফলে মোট ১৩টি গ্রামের সুবিধা হইবে এবং বহু পরিবার খাদ্য সংকটের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে। সুতির বাঁধ লম্বায় ৫ মাইল, চওড়ায় ১২ ফিট এবং উঁচুতে ৮½ ফট হইবে। এই বাঁধের ফলে ৭৫০০ বিঘা জমি বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ফসল পাওয়া যাইবে বছরে ৪৫০০০ মন ধান এবং ১৫০০০ মণ রবিশস্য। মোট ১৩টী গ্রাম এই বাঁধ বাঁধার ফলে সুবিধা পাইবে। ইহাতে দৈনিক গড়ে ২৫।৩০ জন ভলাণ্টিয়ার এবং ১৫।২০ জন মজুরী নিয়া কাজ করে। অবশ্য এরা পুরা মজুরী নেয় না। নিজেদের দু'বেলা খাওয়া জোটে এই পয়সাটাই নেয়। গদখালির জেলেরা বাঁধের ভলাণ্টিয়ার হিসাবে কাজ করে, এদের গ্রাম অবধি বান আসে না, তবুও এরা দেশপ্রেমের আহ্বানে কাজ করিয়া যাইতেছে।

কৃষকরাই ২০০০৲ টাকা দিল

বাঁধের কাজ প্রায় এক তৃতীয়াংশ শেষ হইয়াছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক জায়গাগুলির তিন চতুর্থাংশ বাঁধা হইয়াছে। কাজ আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি শেষ হইবে। বাঁধ ২টিতে খরচ পড়িবে ৬০০০৲। তার মধ্যে বাঁধ কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে যাহাদের জমি এই বাঁধের সুবিধা পাইবে তাহাদের কাছ হইতে বিঘা প্রতি আট আনা দিয়া ২০০০৲ টাকা উঠিবে। আর জমিদারদের ২০০০৲ টাকা দেওয়ার কথা। ১৯৪৪ সালের ২০শে এপ্রিল সরকার ২০০০৲ টাকা এই বাঁধের জন্য মঞ্জুর করিয়াছে, যদিও টাকা এখনও পৌঁছায় নি। জমিদারদের ও সরকারের টাকাটা যদি ঠিক মত পাওয়া যায়, তবে বাঁধ বাঁধার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

খোয়ের বাঁধ লম্বা ২॥০ মাইল, চওড়া ৪ হাত এবং উঁচুতে ৩ হাত হইবে। বাঁধের কাজ সুরু হইয়াছে ১০ই এপ্রিল। গড়ে দৈনিক ১৫ জন আধা মজুরী নিয়া কাজ করে। দুই দিন ৫০ জন ভলাণ্টিয়ার কাজ করিয়াছে এবং এখনও মাঝে মাঝে কিছু কিছু লোক বিনা পয়সায় কাজ করে। এই বাঁধের ফলে ৪৫০০ বিঘা জমি আবাদযোগ্য হইবে। বছরে ২৭০০০ মন ধান ও ৯০০০ মন রবিশস্য পাওয়া যাইবে। মোট ৮টী গ্রামের ৩০০০ হিন্দু মুসলমান এই বাঁধ দিয়া উপকৃত হইবে।

যশোহরে আড়ুয়ার খালের কমিটি ঐ কাজ সুরু করিয়া ১০ হাজার বিঘা জমি উদ্ধারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে (ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১৯শে এপ্রিলের 'জনযুদ্ধে' বাহির হইয়াছে)। ভুরভুরায় খাল ২ মাইল দীর্ঘ। ঐ খাল কাটার আয়োজন হইতেছে, তাহাতে প্রায় ৭০০০ বিঘা জমি উদ্ধার পাইবে।

সাড়ে চার লক্ষ মণ ধান রক্ষা

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার পাঁচথুপি গ্রামের কাছে সোনাপটলের বাঁধ। ময়ূরাক্ষীর বান প্রত্যেক বছরে এই অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। এই বাঁধটি লম্বায় ১ মাইল, চওড়ায় ৩০ ফিট ও উঁচুতে ১২ ফিট। বাঁধের ফলে প্রায় ৪০০০০ বিঘা জমি বানের হাত হইতে বাঁচিবে। বছরে ৪,৫০,০০০ মন ধান পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া রবি শস্য, আলু প্রভৃতিও এই জমিতে লাগান যাইতে পারে। ইহাতে দৈনিক গড়ে ২০০ লোক কাজ করে। বাঁধ কমিটির সম্পাদক স্থানীয় একজন জমিদার শ্রীযুত সুবোধ ঘোষ মল্লিক। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এই বাঁধ বাঁধার কাজ পুরাদমে চলিতেছে। এই বাঁধে ৮০টি গ্রামের লোকের সুবিধা হইবে। ইহাছাড়া হাতিশালা প্রভৃতি অন্যান্য বাঁধ বাঁধিয়া এই জেলায় মোট ১॥০ লক্ষ বিঘা জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা হইতেছে।

খুলনাতে কালিগঞ্জ হইতে আঠারবাঁকি পর্য্যন্ত ৩ মাইল দীর্ঘ বরোজল খালের বিলের মধ্য দিয়া একটি খাল কাটিবার কাজ সুরু হইয়াছে। এইভাবে বিলের জল নিকাশের বন্দোবস্ত হইলে প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার হইবে। ইহা দ্বারা প্রায় ১৭ হাজার লোক উপকৃত হইবে।

বগুড়াতে কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে পাচুলিয়া বিল খাল কাটা হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ২৫০০ বিঘা জমি উদ্ধার পাইবে।

রেলের জমি আবাদের পরিকল্পনা

পাবনাতেও আন্দোলনের ফলে রাউতাল মৌজার একটী খাল কাটার জন্য সরকার হইতে ২০০০ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৪ঠা মে হইতে কাজ সুরু হইয়াছে। ঐ খাল মুড়িদহ বড় খালের সহিত সংযুক্ত করা হইবে, ইহার ফলে প্রায় ৫০০ বিঘা জমি উদ্ধার হইবে।

পাবনাতে কৃষক সমিতি রেলওয়ের পার্শ্বস্থ জমি চাষের জন্য আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক, কৃষকসমিতির প্রতিনিধি, জেলা কৃষি অফিসার ও জেলার কৃষি ডেভালাপমেণ্ট অফিসারকে লইয়া এই জন্য একটী কৃষি উন্নতি পরিকল্পনা কমিটী গঠিত হইবে এবং রেল-জমি বিলি বন্দোবস্ত ইহার মারফৎ চলিবে। এই ভাবে প্রায় ২৪ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ রেলওয়ে জমি বন্দোবস্তের কথাবার্ত্তা প্রায় শেষ হইয়াছে।

হাওড়াতে মাশিলা খাল কাটার ব্যাপারে কৃষক সমিতির কর্মীরা অগ্রণী হয় এবং কাজ সুরু করে।

বরিশালে বাগধা-সাতলা বাঁধের কাজ সুরু হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ৯০০০ বিঘা জমি বাঁচিবে।

ফরিদপুরে কোড়কদীতে একটী খাল কাটিয়া হাজার হাজার বিঘা জমি বাঁচাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফরিদপুরে গোসাইরহাট ইউনিয়নে সরকার হইতে ৫০ টাকা আদায় করিয়া কৃষক সমিতি আধ মাইল লম্বা একটী খাল কাটা সুরু করিয়াছে।

ময়মনসিংহে বাজিতপুরের এক লক্ষ মণ ফসল বাড়ানোর জন্য দেড় মাইল লম্বা খাল কাটা হইয়াছে।

এই বাঁধ বাঁধা বা খাল কাটার কাজের অনেক স্থানে সরকার হইতেও সাহায্য আদায় হয়, তাহা ছাড়া অনেক স্থানে পিপলস্ রিলিফ কমিটিও সাহায্য করে, স্থানীয় কৃষকরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও কাজ করে, স্থানীয় ভাবেও চাঁদা সংগৃহীত হয়।

ঢাকাতে প্রসিদ্ধ আড়িয়ল বিল হইতে কচুরী ঠেকাইবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কাজ সফল হইলে হাজার হাজার মণ ধান ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিবে। ঐ জেলাতেই নামাপাড়ায় ৫০০ টাকা আদায় করিয়া একটী খাল কাটা সুরু হয়। ইহাতে প্রায় হাজার বিঘা জমি বাঁচিবে। কুকুটিয়া ইউনিয়নে আদায়ীকৃত কৃষিঋণ দিয়া বলদ খরিদ করিয়া সমবায় প্রথায় চাষ হইতেছে।

এই কাজ ছাড়া চট্টগ্রাম, নদীয়া, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় কৃষক সমিতির চেষ্টা ও তদারকে আউস বীজ আদায় হয় ও বিলি হয়। চট্টগ্রামে কর্তৃপক্ষ জেলা কৃষক সমিতির হাতে রিলিফের জন্য ১ হাজার মণ আমন বীজ বিলির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

জমি অনাবাদি থাকিতে দিব না

ফসল বাড়াইবার এই প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়া সারা বাংলায় আজ কৃষকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইবার ভার বাংলার কৃষক সমিতির হাতে। উপরের বিবরণ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃত ভাবে কৃষক আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝিয়া কাজ করিলে বাংলার কৃষক-শ্রেণীকে আজ তাহার কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায়, সুতরাং আজ কৃষক সমিতির কর্তব্য কৃষক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ফসল বাড়ানর কাজকে আরও বাড়াইয়া তোলা। প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের গত অধিবেশনে সারা জুন মাস ব্যাপী ফসল বাড়াইবার আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ কাজের জন্য বাংলার কৃষকসমিতি গুলিকে নির্দ্দেশ দিয়াছে। আমাদের প্রতিজ্ঞা হইবে বাংলায় এক টুকরা আবাদের জমিও খালি পড়িয়া থাকিবে না, ফসল বাড়াইয়া আমরা দেশকে খাদ্য জোগানর ভার লইব, উহার ভিতর দিয়া সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া দেশ রক্ষার কাজে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করিব।

মুর্শিদাবাদ সোনাপটলের বাঁধের কর্মী কৃষক ও কৃষক-ভলাণ্টিয়ারগণ

সরকার বলে ২ লক্ষ মণ লবণ জেলায় পাঠান হইয়াছে অথচ লবণের চোরাকারবার বাড়িতেছে কেন ?

অবিলম্বে লবণের রেশনিং চাই !

গত কয়েক মাস ধরিয়া বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এমন কি কলিকাতায়ও লবণের দারুন অভাব দেখা দিয়াছে। আমরা প্রায় প্রতিদিনই এ সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগের সংবাদ পাইতেছি। গত এক মাসে লবণের অভাব সম্পর্কে আমরা যে সব খবর পাইয়াছি তাহা এই :—বহরমপুর, ১লা মে—লবণ বাজারে কোন দোকানে পাওয়া যাইতেছে না। সাতক্ষিরা, ৭ই মে—এই শহরে তীব্রভাবে লবণের অভাব দেখা দিয়াছে। বিষ্ণুপুর, ৮ই মে—লবণের দারুন অভাব, দাম অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে। কধুরখিল (চট্টগ্রাম), ৮ই মে—লবণের দর ।০ আনা সের। খীবা (বীরভূম), ১৩ই মে—এখানে লবণের দর প্রতি সের বার আনা হইতে ১৲ টাকা। নুনের জন্য অধিকাংশ লোককে চোরাবাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। মুলাদী (বরিশাল), ১৬ই মে—প্রকাশ্য বাজারে লবণ মোটেই পাওয়া যায় না, চোরাবাজারে ১৲।১।০ সের। কুষ্টিয়া, ১৯শে মে—লবণ বাজারে পাওয়াই যায় না। রাজসাহী, ২০শে মে—বর্ত্তমানে শহরে লবণের অভাব দেখা যাইতেছে। বরিশাল, ২১শে মে—জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে লবণের দারুন অভাবের কথা জানা যাইতেছে। মেহেরপুর (নদীয়া), ২৪শে মে—এই মহকুমায় নুনের দারুন অভাব। আট আনা হইতে বার আনা সের। রামপুরহাট, ২৪শে মে—আজ প্রায় এক মাস হইল রামপুরহাট বাজারে লবণ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অভয়ানগর (যশোহর), ২৭শে মে—এপ্রিলের শেষাশেষি হইতে এখানে লবণ সংকট দেখা দেয়। লবণের সের আট আনা হইতে বার আনা। ঢাকা, ২৭শে মে—আট আনা সের দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। গাইবান্ধা, ২৯শে মে—প্রায় ১ মাস হইতে চলিল এখানে দারুন লবণ সংকট দেখা দিয়াছে, ১॥০।২৲ টাকা দিলে এক সের লবণ পাওয়া যায়।

এই খবরগুলি হইতে একটা জিনিষ দেখা যাইতেছে যে লবণ সংকট শুধু একটি জেলায়ই আবদ্ধ নয়, সমগ্র বাংলা দেশেরই এই সমস্যা। সম্প্রতি যুদ্ধ সীমান্তের আসাম হইতেও দারুণ লবণ সংকটের কথা জানা গিয়াছে। সুতরাং এই লবণ সংকট যে কোন বিশেষ স্থানে চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য বা অন্য কোন বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে হইতেছে তাহা নহে, ইহার পিছনে আছে অন্য কারণ। চোরাকারবারীরা মানুষের এই সাধারণ খাদ্য লবণ লইয়াও দুহাতে মুনাফা লুটিতেছে। লবণের সের এক টাকা, দেড় টাকা! গরীব লোকের ইহার চেয়ে আর কি অসুবিধা হইতে পারে?

১লা জুনের খবরের কাগজে জানা যায় যে মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১৯৭০০০ মণ লবণ পাঠান হইয়াছে এবং মার্চের মধ্য ভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ৮৫৯০০০ মণ লবণ মফঃস্বলে প্রেরিত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে যদি মে মাসের দুই সপ্তাহে ১৯৭০০০ মণ লবণ পাঠান হইয়া থাকে, তবে সে লবণ কোথায় গেল? আজ সমগ্র বাংলায় লবণের এই হাহাকার কেন? সামান্য লবণটুকুও আজ সাধারণ লোকের ভাগ্যে জুটিতেছে না কেন? গেল ২।৩ মাস ধরিয়া যখন লবণের চোরাকারবার পুরাদস্তুর চলিয়া আসিল, লবণের অভাবের জন্য লোক যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখনও বাংলা সরকার সাধারণ লোকের লবণ পাওয়ার কোন সুব্যবস্থা করেন নাই কেন? আজ বাংলার জনসাধারণ ইহার স্পষ্ট জবাব চায়। লবণ পাঠান হইতেছে, অথচ সাধারণ লোক সে লবণ পাইতেছে না, দেশের শত্রু চোরাকারবারীরা আজ মানুষের ক্ষুধার অন্ন বিস্বাদ করিয়া দিতেছে। ইহার প্রতিকারে সারা বাংলায় তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে। অবিলম্বে গ্রামে ও শহরে লবণের রেশনিং চাই এবং সর্ব্বত্র নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৭ লক্ষ মণ লবণ বাংলায় আনা চাই।

লবণ চোরের নাম গোপন কেন ?

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলিকাতায় দুইজন বড় লবণের মজুতদারকে ধরা হইয়াছে। ইঁহাদের নাম কোন কাগজে ছাপা হয় নাই। এ কথা কি সত্য যে ইঁহারা সরকারের পক্ষ হইতেই লবণ ব্যবসায়ের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন ?

গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের অভিযান

নবদ্বীপের গ্রামে শতকরা ৮০ জন দুঃস্থ

নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মনগর, উসিদপুর ও নিজামপুর এই তিনটী গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০। ইহার ভিতর মুসলমান আছে প্রায় ২০০। গত দুর্ভিক্ষের ফলে এই কয়েকটী গ্রামের শতকরা প্রায় ৮০ জন আজ দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে।

আর একটী গ্রাম—কুটীরপাড়া। ২৫ জন পরিবারের বাস, সকলেই দুঃস্থের সামিল। গ্রামে কারুর কোনো জমি নাই। মাত্র ২ জনের জমি আছে—২ বিঘা ও ৩ বিঘা করিয়া। এই জমিতে কোন ফসল হয় না। বানের জলে প্রত্যেক বছর এই জমির ফসল নষ্ট হইয়া যায়। বেশীর ভাগ বাড়ীর পুরুষরা অন্য জায়গায় খাটিতে চলিয়া গিয়াছে। মেয়ে ও শিশুরা অসহায়। ফলে এই গ্রামের মেয়েরা কুপথে চলিয়া গিয়া কোন রকমে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কৃষক সমিতি ইহাদের বাঁচিবার পথ দেখাইল

মেয়েদের সমাজ-জীবন এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে দিলে চলিবে না—কৃষক সমিতি এই পণ লইয়া কাজে লাগিল। প্রথমে মেয়েদের বুঝাইল, তারপর আশে পাশের গ্রামের ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই অঞ্চলে মেয়েদের ক্ষেতে কাজ করার রেওয়াজ নাই। কিন্তু কৃষক সমিতির প্রচারে বহু দিনের সংস্কার ভাঙ্গিল। ক্ষেতে ঘাস, আগাছা ইত্যাদি তোলার কাজে এই মেয়েরা লাগিয়াছে, মজুরী প্রায় রোজ ছয় আনা। গ্রামের ভাঙ্গন এইভাবে রোধ হইল।

উপরে উল্লিখিত ৩টী গ্রামে গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের জন্য কৃষক সমিতি পরিকল্পনা করিল। তিনটী গ্রাম লইয়া একটী কো-অপারেটিভ ষ্টোর গঠন করা হইল। ইহার উদ্যোগে একটী কুটীর-শিল্প কারখানা খোলা হইতেছে। একটী বড় চালাঘর ইতিমধ্যেই তৈরী হইয়াছে, সেখানে ২টি তাঁত বসান হইয়াছে। তাঁত ছাড়া ঢেঁকীর বন্দোবস্তও করা হইতেছে। মেয়ে ও পুরুষ ধান ভানা, ডাল ভাঙ্গা ও কাপড় বোনার কাজে লাগিবে। এই ব্যবস্থার পর গ্রাম হইতে লোক চলিয়া যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

ফরিদপুরের সরকারী ওয়ার্ক হাউসের অবস্থা

সরকার ওয়ার্ক হাউস খুলিতেছে, কিন্তু ওয়ার্ক হাউসে বিভিন্ন কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তনের ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। কোড়কদী হইতে কমরেড অনিল লাহিড়ী জানাইতেছেন: এখানকার ওয়ার্ক হাউসে কুটীর শিল্পের ব্যবস্থা ছিল না, কর্ত্তৃপক্ষও এ বিষয়ে মাথা ঘামায় নাই। স্থানীয় কৃষক কর্ম্মিগণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে দেখান যে তাঁত বসাইলে তাহাতে লাভ হইবে। গ্রামবাসীরা ৩টা তাঁতও এই ওয়ার্ক হাউসের জন্য দান করিল। কিন্তু তবু কর্ত্তৃপক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি ও একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে এই কাজ সুরু হইতেছে না।

ফরিদপুর শহরের জেলেরা

কমরেড নৃপেন রায় জানাইতেছেন:—শহরে প্রায় ১৫০ ঘর জেলের বাস। তারা গত অন্নসংকটে তাদের সমস্ত সম্বল হারাইয়াছে। আজ এমন অবস্থা যে তাদের সামান্য রোজগারেরও কোন পথ নাই। জলা জমা লইবার মত পয়সা তাদের নাই, জালের জন্য সূতাও তারা জোগাড় করিতে পারে না। এই ১৫০ ঘর জেলেকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাদের সমিতি হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাবী করা হইল যে, শহরের মধ্যে যে 'জলা' আছে তা সমিতির কাছে ইজারা দেওয়া হোক। জলার মালিক একজন লোককে জলার ইজারা দিয়াছিল। কিন্তু সমিতির দাবীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ইজারা ফিরাইয়া লইয়া সমিতির কাছেই ইজারা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সূতা ও আলকাতরাও জেলেরা পাইল। তাদের বাঁচিবার পথ আবার তৈরী হইল।

সমাজ জীবন পুনর্গঠন সপ্তাহ

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আবেদন

১০ই হইতে ১৭ই জুন সমাজ জীবন পুনর্গঠন সপ্তাহ সর্ব্বত্র পালন করিবার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছে:—

এই সপ্তাহে প্রত্যেক ইউনিয়নে ও গ্রামে নিরাশ্রয় নারীদের আশ্রয়স্থল ও তাহাদের উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র খোলার জন্য আন্দোলন চালান হইবে। তাছাড়া মহামারীর কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য মেডিকেল রিলিফের কাজ আরো বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করা হইবে। এই সপ্তাহের আন্দোলনের মধ্যে আজ অনাহার ও মহামারীর হাত হইতে বাংলার শিশুদের বাঁচাইবার জন্য এবং দুগ্ধ সরবরাহ ও উপযুক্ত সংখ্যায় শিশুসদন খুলিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই আন্দোলনের সাথে কৃষ্টি-প্রদর্শনী ও শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখান হইবে। প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলার প্রত্যেকটী মা বোনকে এই আন্দোলনে যোগ দিয়া বাংলার হতভাগ্য, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়া নারীদের বাঁচাইবার কাজে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

ফেনী বাজারে গণ্ডীপ্রথা বন্ধ করো!

ফেনী হইতে কমরেড কুমুদ দত্ত জানাইতেছেন যে, ফেনীবাজারের মালিক কিছুদিন হইতে বড় ছোট সমস্ত ব্যাপারীদের কাছ হইতে গণ্ডী আদায় করিতেছে। গ্রাম হইতে যারা সামান্য তরিতরকারী বাজারে লইয়া আসে, এই অন্যায় আদায়ের ফলে তাদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইতেছে। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ছোট ব্যাপারীরা এই বাজারে আসেই না। অধিকাংশ সময়ে ব্যাপারীরা গণ্ডীর ক্ষতিপূরণের জন্য জিনিষের দর চড়াইয়া দেয়। ফলে খরিদ্দারকেই ক্ষতির বোঝা বহিতে হয়। গণ্ডীপ্রথার ফলে এই বাজারের ডাকও বাড়িয়া যাইতেছে এবং ইজারাদাররা আরো জবরদস্তি সুরু করিয়াছে।

এই অন্যায় প্রথা বন্ধ করিবার জন্য জনসাধারণের তরফ হইতে দাবী উঠান হোক!

গ্রাম্য গরীবদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী পরিকল্পনা

কাগজে কলমে নয়—কাজে চাই

গ্রামের গরীবদের জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য দিবার নিম্নলিখিত সরকারী পরিকল্পনা বাংলা সরকারের একটী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইয়াছে:—

প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের তরফ হইতে একটী দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইবে। ইহাতে স্থানীয় লোকেরা যত চাঁদা দিবেন, সরকারী সাহায্যও তত পরিমাণ দেওয়া হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে চাঁদা তুলিয়া কাজ শুরু করিতে সময় লাগিবে, তাই সরকার ঠিক করিয়াছেন যে দরকার মত কতগুলি দুঃস্থ আশ্রম চালু রাখা হইবে। এই দুঃস্থ আশ্রমের মধ্যে থাকিবে মেয়েদের কেন্দ্র, শিশু কেন্দ্র, অক্ষম লোকদের কেন্দ্র, হাসপাতাল। সব চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত এলাকায় অন্ততঃ একটী করিয়া এরকম কেন্দ্র থাকিবে। মহকুমার কোন কেন্দ্রীয় অফিস হইতে এই সমস্ত কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করা হইবে। এক একটী হোমে কমপক্ষে ৫০০ লোকের থাকিবার ব্যবস্থা হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড যখন স্থানীয়ভাবে রিলিফের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, তখন এই দুঃস্থদের নিজেদের নিজেদের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। যারা শিল্প কেন্দ্রে কাজ করিয়াছে, তাদের প্রত্যেকের নামে দৈনিক দুই আনা হিসাবে জমা রাখা হইবে এবং তারা যখন গ্রামে ফিরিয়া যাইবে তখন তাদের সেই টাকা দেওয়া হইবে।

এই ব্যবস্থা ছাড়া, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও অনাথ সদন নির্ম্মাণের জন্যও টাকার বরাদ্দ হইয়াছে।

গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় যথা—মুচী, তাঁতী কুমার, জেলে, ছোট-দোকানদার প্রভৃতিকে কাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কিনিয়া দেওয়া হইবে। তাদের তৈরী জিনিষ বিক্রয় করিয়া ধীরে ধীরে কাঁচা মালের টাকা তুলিয়া লওয়া হইবে। সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের জন্যও বিশেষভাবে পরিকল্পনা করিয়াছে। ইহা ছাড়া বীজধান সরবরাহের জন্য ৫০ লাখ টাকা ও বলদের জন্য ৫০ লাখ টাকা ধার দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটী কাজে পরিণত করিবার জন্য সরকার নির্ভর করিতেছেন, কয়েকজন বড় কর্ম্মচারী ও ইউনিয়ন বোর্ডের উপর। জনসাধারণের সকল শ্রেণীর সহযোগিতায় গঠিত খাদ্য কমিটীকে সরকার বাদ দিতেছেন কেন? ইউনিয়ন বোর্ডের উপর উপর-ওয়ালাদের হুকুম চলিবে বলিয়া কি?

সেই জন্যই আজকে এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইবার জন্য জনসাধারণকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। গ্রামের লোকদের অবস্থার তথ্য নিয়া স্থানীয় পরিকল্পনা করিয়া সকলে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করুন, যাহাতে পরিকল্পনাটী আমলাতান্ত্রিক দপ্তরের মধ্যেই অন্তর্ধান না করে।

কলিকাতার কাপড় কোথায় লুকাইল

খুচরা বিক্রেতা ও ফুড কমিটির সাহায্যে চোরাবাজার রোখো

গত ২৭শে এপ্রিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের এক প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, কিছুদিন হইল পুলিশ বড় বাজারে ৩০।৩৫টি কাপড়ের দোকানে হানা দেয় এবং চোরা কারবারের অভিযোগে দোকানের মাল আটক করে। কিন্তু দোকানের মালিকরা পূর্ব্বেই অধিকাংশ মাল সরাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় বলিয়া যে মাল ধরা পড়ে তাহা খুবই সামান্য।

ঘটনাটি লইয়া আইন সভায় আর কোন আলোচনা হয় না। কিন্তু কলিকাতার বাজারে যাহারা কাপড় ক্রয় বিক্রয় করেন তাহারা লক্ষ্য করিতে থাকেন যে ঐ ঘটনার পর হইতে বাজার হইতে কাপড় একেবারেই উধাও হইতে চলিয়াছে।

ইহার কারণ কি? গবর্ণমেন্ট কাপড়ের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। মিলের খরচের উপর শতকরা বিশভাগ বেশী। এই বিশ ভাগের মধ্যে বাংলায় প্রস্তুত কাপড়ের জন্য এজেন্টেরা পাইবেন শতকরা চার ভাগ এবং খুচরা বিক্রেতা পাইবেন শতকরা ষোল ভাগ, আর বাহিরের কাপড়ের জন্য এজেন্ট এবং খুচরা বিক্রেতা পাইবেন সমান সমান। এজেন্ট বা পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের লাইসেন্স করিতে হয়,—একজনের লাইসেন্স ফি ১০৲, অপরের ৫৲। ইহাদের উপর খবরদারীর জন্য রাখা হইয়াছে একদল ইন্‌স্‌পেক্টর।

ইহা তো হইল সরকারী ব্যবস্থা। কিন্তু কাপড়ের বাজারে যাহা ঘটিতেছে তাহা কি? কাপড়ের বাজার কয়েকজন বড় বড় এজেন্টের একচেটিয়া। ইহাদের মধ্যে জয়সিং দাস দাগা [বাউড়িয়া মিল], বি, সি, নান [লাল মিলস], গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস্ [বঙ্গশ্রী মিলস্], হনুমান দাস রেখব চাঁদ [ইণ্ডিয়া কটন্ মিলস্] মণ্টুরাম টাপুরিয়া [আমেদাবাদ মিলস্], লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ [ঢাকেশ্বরী মিলস], ভোজ নাগরওয়ালা ব্রাদার্স [অরবিন্দ কেলিকো, অম্বিকা মিল্‌স] অন্যতম। ছোট ছোট দোকানদাররা ইহাদের নিকট হইতে বরাবর কাপড় ক্রয় করিতেন। কিন্তু এখন ইহারা বলিতেছেন কাপড় নাই। এখন এজেন্টরা নিজেদের খুশীমত দোকানদার বাছাই করিয়া কেবলমাত্র তাহাদেরই কিছু কিছু কাপড় সরবরাহ করিতেছেন। অনেক এজেন্ট, পাইকারী এবং খুচরা—উভয় বিক্রেতার লাইসেন্স করাইয়া শতকরা বিশভাগ মুনাফার পুরাটাই নিজে ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের খবর হইতে দেখা যায়, সেখানে একজন বিক্রেতাই বিভিন্ন নামে এমন কি ৬ খানা লাইসেন্স করাইতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

একদিকে কাপড় চোরাবাজারে গুদামজাত হইতেছে, অপরদিকে অগ্নিমূল্যে মফঃস্বলের ফড়িয়াদের মারফৎ কিছু কিছু বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এক জোড়া সাধারণ শাড়ীর চোরাবাজারের দাম সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যের তুলনায় ১৷০ বেশী, এক জোড়া মোহিনী মিলের শাড়ীর চোরাবাজারের দাম ২৷০ বেশী এবং এক জোড়া 'ফ্যান্সি' শাড়ীর চোরাবাজারের দাম কম পক্ষে ৪৷০ বেশী।

কেবল মিলের কাপড়ের ক্ষেত্রেই যে এরকম অবস্থা তাহা নয়। তাঁতের কাপড়, গামছা প্রভৃতির উপর সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহার ফলে, সূতার দর কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও গরীবের গামছা আর লুঙ্গীর দর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। চারমাস আগে যে লুঙ্গীর দাম ৩৲ ছিল, এখন তাহা ৬৷০ হইয়াছে, চৈত্র মাসেও যে গামছার জোড়া ১৷০ ছিল, তাহা এখন ১৸/০ হইয়াছে। সূতার বাজারে চোরাকারবারীর রাজত্ব চলিয়াছে।

ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে গরীব জনসাধারণ ও ছোট দোকানদার। মজুরদের ৩০টি পরিবারের হিসাব লইয়া দেখা গেল, গত ৬ মাসে মাত্র ১৭টি পরিবারের পক্ষে একখানা করিয়া গামছা ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে, ৯টি পরিবারের পক্ষে এক জোড়া ধুতি বা শাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে আর ৪টি পরিবারের পক্ষে ধুতি বা গামছা কিছুই কেনা সম্ভব হয় নাই।

একটি ছোট কাপড়ের দোকানদারের মুনাফার হিসাব লইয়া দেখা গেল, ১৯৩৯ সালে দৈনিক বিক্রির উপর যে মুনাফা উঠিত বর্ত্তমানে দৈনিক অনেক বেশী টাকার বিক্রিতেও তাহা হইতে বেশী মুনাফা হইতেছে না। তাহার অর্থ, তখন কাপড়ের চাহিদা ছিল চারপাঁচগুণ বেশী, কাপড় প্রতি মুনাফা ছিল ২।৩ পয়সা। এখন কাপড় প্রতি মুনাফা বেশী হইলেও চাহিদা ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর মালের অভাবে অনেক ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে হইতেছে।

খবর লইয়া জানা গেল, কলিকাতায় যে কাপড় আছে তাহাতে কলিকাতা কেন, সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণকে অন্ততঃ ৬ মাস ভালভাবে কাপড় সরবরাহ করা যায়। কিছুদিন আগেও বোম্বাই হইতে দুই জাহাজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। কিন্তু এই মালের অধিকাংশ আটক হইয়াছে কালাকার ষ্ট্রীট, তুলাপট্টী, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট এবং কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়ীর 'হাউস' বা চোরাগুদামে।

চোরাবাজার হইতে কাপড় বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন, সরবরাহের ব্যবস্থা বড় এজেন্টদের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া ভালভাবে কনট্রোল করা। খুচরা দোকানদারদের লাইসেন্স করার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু কাপড় সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। **প্রত্যেক দোকানদার যাহাতে কোটা হিসাবে সরবরাহ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা না হইলে চোরাকারবারীর বদমায়েশী ভাঙ্গা যাইবে না।** কলিকাতা পোষাক ও বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি ছোট দোকানদারদের পক্ষ হইতে এই দাবীই গবর্ণমেন্টের নিকট রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া কাপড়ের চোরাকারবার বন্ধ করার ব্যাপারে মহল্লা ফুড কমিটিরও সহযোগিতা গ্রহণ প্রয়োজন। সরকারী ইন্সপেক্টরদের তদারকীর মূল্য কতটুকু তাহা সকলেই জানেন। একমাত্র জনসাধারণের মজুদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে কাপড়ের চোরাগুদাম হইতে মাল বাহির হইতে পারে, গরীবের কাপড় লইয়া বড় বড় কাপড়ের কলওয়ালা ও এজেন্টদের ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হইতে পারে।

মিল-মালিকের পুত্র চোরা-কারবারী?

কুষ্টিয়ার বাজারে মোহিনী মিলের সাড়ী সমস্ত চোরাবাজারে চালান যায়। টেক্সটাইল সাব-ইন্সপেক্টার 'ন্যাশনাল এজেন্সী' নামক একটী দোকানে যান। এই দোকানটী মোহিনী মিলের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত গিরিজা চক্রবর্ত্তীর পুত্রের দোকান। দোকান হইতে বহু মিলের সাড়ী বাহির হইল। এই সমস্ত সাড়ীতে মে'মাসের তারিখ দেওয়া ছিল। গভর্ণমেন্টের সার্কুলার অনুযায়ী মিল হইতে যে কাপড় এজেন্টকে দেওয়া হইবে, তাহা গভর্ণমেন্টই নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন! এখনও 'মে' মাসের কাপড় কোনো এজেন্টকে দেওয়া হয় নাই, অথচ এই দোকানে তাহা পাওয়া গেল। তদন্তে আরো জানা গেল যে একজন পাইকারকে কন্‌ট্রোল রেটের চেয়ে বেশী রেটে এই দোকান হইতে কাপড় বিক্রয় করা হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে।

২৪ পরগণার কল-কারখানার মজুরদের হাল

রেশনিংএর নামে মালিকের মুনাফাবৃদ্ধি

রেশনিং-এ মজুরদের জন্তও সকলের মত ৫ সের রেশন সরকার ঠিক করিয়া দিয়াছে। বেশী মেহনত যারা করে তাহাদের বেশী খোরাক দরকার, তা সরকার স্বীকার করিতে রাজী নয়। অথচ আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বোম্বাইয়ের। সেখানে মজুরের জন্ত ৬ সের রেশন ঠিক হইয়াছে। অত দূরেও যাইতে হইবে না। এখানকারই মিলমালিকরা আগে কি পরিমাণ রেশন মজুরদের দিত? অধিকাংশ কারখানাতেই ৫ সেরের বেশী রেশন মজুরদের দেওয়া হইত। কোন কোন কারখানাতে আরো বেশী দেওয়া হইত। মজুরের খোরাক হিসাব করিয়াই নিশ্চয় এই পরিমাণ রেশন ঠিক হইয়াছিল। আজকে তাহাও সরকার মানিতে চায় না। ফলে, মালিকরাও সুবিধা পাইয়া যাইতেছে। তারাও আগেকার হিসাব ভুলিয়া ৪ সের হিসাবেই সস্তাদরে রেশন দিতেছে এবং বেশ কিছু টাকা বাঁচাইয়া লইতেছে।

৭ সেরের জায়গায় ৪ সের হইল কেন?

দমদম জেসপ কোম্পানী সস্তা দরে প্রত্যেক মজুরকে ৭ সের রেশন দিত। ১লা মে হইতে মাত্র ৪ সের রেশন সস্তাদরে দিবার নোটিশ দেওয়া হয়। অনেক প্রতিবাদের পর ২০ দিন পরে লেবার কমিশনার জানাইলেন যে, পোষ্য থাকিলে ৪ সের ছাড়া আরো ২ সের সস্তা দরে দেওয়া হইবে। যার পোষ্য নাই, সে ইচ্ছা করিলে বাকী ২ সের বজরা লইতে পারিবে। কিন্তু আগের তুলনায় কম রেশন পাওয়াতে ক্ষতিপূরণের কোন কথাই মালিক স্বীকার করিল না। মজুরদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন গেল। তিনিও স্বীকার করিলেন যে মজুররা আগে যে সুবিধা পাইত, তা বজায় রাখা দরকার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হইল না।

টিটাগড় ব্রিটানিয়া ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানাতেও আগে ৭ সের করিয়া রেশন সস্তাদরে দেওয়া হইত। এখন ৪ সেরের এক দানাও বেশী সস্তাদরে দিতে মালিক রাজী নয়।

শতকরা ৫০ জন রেশনকার্ড পায় নাই

প্রায় এক মাস হইল এই অঞ্চলে রেশনিং সুরু হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত রেশনকার্ডও সকলে পায় নাই। জেসপ কোম্পানীর প্রায় শতকরা ৫০ জন মজুর আজও রেশনকার্ড পায় নাই। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, রেশন-অফিসার প্রভৃতির কাছে দরবার করিয়াও এই ত্রুটী এখনও সংশোধন হয় নাই। কোম্পানী কার্ড বিলির ব্যাপারে ইউনিয়নের সহযোগিতা লইতে অস্বীকার করিল। ফলে মজুরদের নির্ভর করিতে হয় কর্ম্মচারীদের খেয়ালখুশীর উপর। **নৈহাটী এলাকায়** তাড়াতাড়ি রেশন কার্ড পাইতে হইলে ঘুষ দিতে হয়। কোন অভিযোগের দরখাস্ত রেশন-অফিসার নেন না। অফিসের সময় ১টা হইতে ৪টা হওয়ার ফলে অনেক সময়ে মজুরকে মিল কামাই করিতে হয়।

মিলের রেশন অখাদ্য কেন?

বজবজের মজুরদের ডেপুটেশন ম্যানেজারের কাছে রেশন-কার্ডের বে-বন্দোবস্তের কথা জানায়। ম্যানেজার নাকি বলেন যে, রেশনিং হইলে এই রকম তো হইবেই। **ওরিয়েণ্ট মিলের** ম্যানেজারের কাছেও মজুররা গিয়াছিল। তিনি নাকি সোজাসুজি বলেন, সরকারী রেশন কার্ড ফিরাইয়া দাও, তবে আমরা পোষ্যদেরও দিব। এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায় যে, মালিকরা সকলে রেশনিং হওয়াতে খুসী নয়। ইহার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। গত বছর মিল-কোম্পানীগুলি লাখ লাখ মণ চাল মজুত করিয়াছিল। সেই বস্তাপচা চালই আজকে মিলমালিক মজুরদের দিতে চায়। তাই তাদের আগ্রহ যে মজুররা সরকারী রেশন-কার্ড বাদ দিয়া পোষ্যসহ সকলে মালিকের কাছ হইতেই কিনুক। সংবাদদাতার খবরে জানা যায় যে, মজুর এলাকার পাব্লিক রেশন শপগুলির চাল ও তারই পাশে মিলের রেশনশপের চাল—এই দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। মজুরদের চালে ধান, ভুষি ও কাঁকর ভরা। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে মজুরদের মধ্যে এই জন্ত গত ৪ মাস যাবৎ প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। চাল খাইয়া শতকরা ১০ ভাগ মজুরের নানারকম পেটের অসুখ দেখা দিয়াছে।

চটকল মজুরের অবস্থা

গত ১০ মাস যাবৎ চটকলগুলির কাজ কমিয়া গিয়াছে। বজবজের মিলগুলি এখনও মাসে ১ সপ্তাহ বন্ধ থাকে। রেশনিং চালু হওয়ায় মজুররা আশা করিয়াছিল যে এবার তাদের পেটের অন্ন জুটিবে। কিন্তু মাগগিভাতা না বাড়ার ফলে রেশনিং-এও তাদের সুবিধা নাই। শুধু তাঁত ও সেলাই ঘরের মজুররা সপ্তাহে ৫।৬ টাকা রোজগার করে আর অন্ত মজুররা তো আরো কম পায়। অথচ তিনজন পোষ্যের রসদ জোগাইতে সপ্তাহে ৬॥০।৭৲ লাগে। অর্থাৎ **শতকরা ৮০ জন চটকল** মজুর তিন জন পোষ্যের রেশন কেনার মত হপ্তা পায় না। এই অবস্থাতেও মালিকের জবরদস্তির কমতি নাই। মাত্র ৪ সের রেশন সস্তাদরে মজুরকে দেওয়া হয়, তাও যদি একদিন কাজে কামাই হয় তবে সস্তা রেশন কাটিয়া লওয়া হয়।

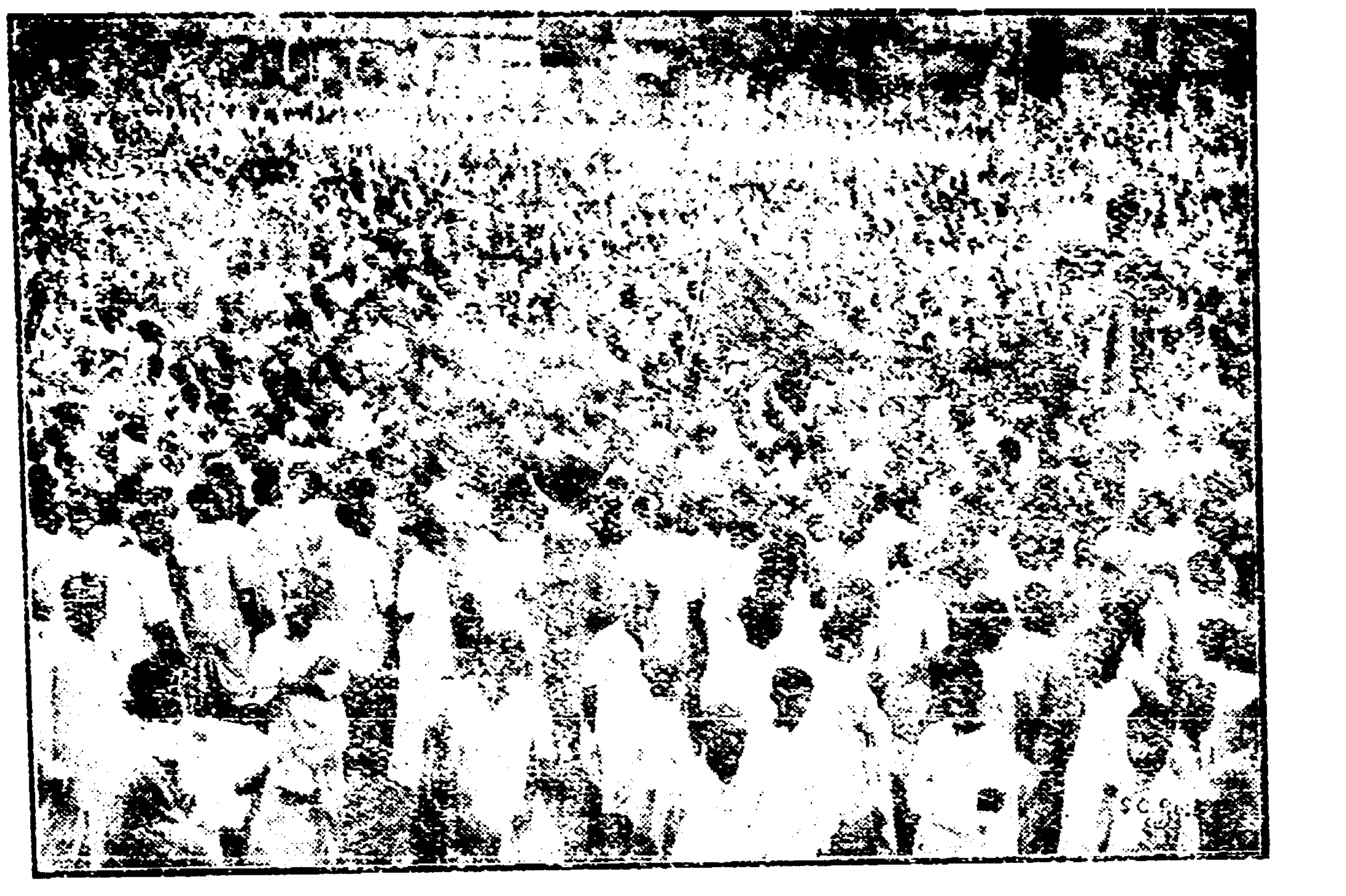

গত ২৮শে মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মাগগি ভাতা ও রেশনিং সম্মেলনের বিরাট মজুর সমাবেশের একটি অংশ

মজুরদের আন্দোলন

কিন্তু এত দুর্ভোগ সত্ত্বেও মজুররা রেশনিং বিরোধী হইয়া যায় নাই। তাতে মালিকদেরই ফন্দী জয়ী হইত। রেশনিং-এর গলদ দূর করিবার জন্ত, ৫।০ সের রেশনের দাবীতে এবং মাগগীভাতার দাবীতে ২৪ পরগণার মজুর সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতেছে। গত ২ মাসে **বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, বেলঘরিয়া, জগদ্দল, ইছাপুর, গৌরীপুর, কাঁচড়াপাড়া** প্রভৃতি অঞ্চলে মাগগীভাতা ও রেশনিং কনফারেন্সে ২০ হাজার মজুর জমায়েত হইয়াছে। কিছু কিছু দাবীও আদায় হইয়াছে, যেমন:—কাঁচড়াপাড়ায় ভাল রেশন, টেকস্‌ম্যাকোতে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের দ্বারা রেশন পরীক্ষা, বজরার বদলে ১ সের যবের আটা, এক পোয়ার বদলে আধসের তেল, জগদ্দলে ৩ দিন অনুপস্থিত থাকিলেও সস্তা রেশন কাটা যাইবে না—প্রভৃতি। কিন্তু আন্দোলন এখনও দুর্ব্বল, কারণ, অধিকাংশ মজুর এখনও ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয় নাই, মজুরের পিছনে এখনও দেশবাসীর সক্রিয় সমর্থন আসিয়া জোটে নাই। মজুর আন্দোলনের এই দুই অভাব আজ পূরণ করিতেই হইবে।

কয়লা সংকট দূর করার জন্য
মাগগি ভাতা ও রেশনের দাবীর জন্য
দেশবাসীর কাছে মজুরদের আবেদন

প্রায় ৩৫টী মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে একটী আবেদন পত্রে দেশবাসীকে জানান হইয়াছে যে, মজুররা কয়লা, মাগগীভাতা ও রেশনিং-এর জন্ত যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাহাতে সমস্ত দেশবাসীর সমর্থন একান্ত দরকার। **কয়লা সংকট দূর করা হউক, যাহাতে গৃহস্থের অসুবিধা দূর হয়, মিল কল-কারখানা আবার ভাল ভাবে চলে, দেশের উৎপাদনের বাধা দূর হয়। শ্রমিকের জন্য সওয়া পাঁচ সের সাপ্তাহিক রেশন ও প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর জন্য খরচ বৃদ্ধির অনুপাতে ষোল আনা ক্ষতি পূরণ বাবদ মাগগিভাতা চাই, যাহাতে এই সংকটের সময়ে পূর্ণশক্তিতে মজুররা দেশের উৎপাদন ও কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারে।** এই দাবীগুলি শুধু মজুরের নিজের জন্ত নয়—সমস্ত দেশের মঙ্গলের জন্ত। তাই আজকে সকল দেশবাসী মজুরের দাবীর সমর্থনে আওয়াজ তুলুন।

১৮ই জুন কলিকাতায় সারা বাংলার কল কারখানার মজুর প্রতিনিধিদের সম্মেলন হইবে। এই সম্মেলনের পিছনে শুধু মজুরের শক্তি নয়, সমস্ত দেশবাসীর শক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে।

মজুর দাবীর আবেদন পত্রে সকলে স্বাক্ষর করুন!

কয়লার অভাবে কল-কারখানার কাজে ক্ষতি

সুতাকল—নারায়ণগঞ্জ ও কুষ্টিয়ার সূতাকল ইতিপূর্ব্বে সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়াছিল।

চটকল—অধিকাংশ চটকলই মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে—ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি কারখানা সাময়িক বন্ধ হইয়াছিল।

লোহাকারখানা—গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিতেছেন যে ছোট কারখানাগুলিকে বন্ধ করিয়া শুধু বড় কারখানাই চালু রাখা হইবে। মিঃ কে-ডি-জালানের মতে ইহার ফলে লোহা-শিল্পের প্রায় শতকরা ৮৭টী ইউনিট বন্ধ হইয়া যাইবে! (ক্যাপিটাল, ১লা জুন)।

ক্যাম্পবেল হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার নমুনা কি এই?
বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হোক!

গত ৩১শে মে কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলার কমরেড মহম্মদ ইসমাইল ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ভিতর বে-বন্দোবস্ত ও কর্ত্তৃপক্ষের চরম দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে অবিলম্বে এই হাসপাতালের কাজ কর্ম্ম তদন্ত করিবার দাবী করেন। কমরেড ইসমাইল জানান যে, গত ১২ই মে আব্দুল মজিদ নামে একজন ট্রাম-মজুর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে ট্রাম কোম্পানীই ক্যাম্পবেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোনো বেড না দিয়া বাহিরে রৌদ্রে ২ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা হয়। শোনা যায় যে কর্ম্মচারীদের ঘুষ না দিলে নাকি রোগীর ভাগ্যে এই রকম দুর্দ্দশা হামেশাই হয়। আব্দুল মজিদ সেই দিনই শেষ রাত্রে মারা যায়। তার আত্মীয় স্বজন খবর পাইয়া পরের দিন যখন মৃতদেহ লইতে আসে তখন আবার কর্ম্মচারীদের হুমকীর বহর দেখা গেল। কর্ম্মচারীদের খুসী না করিলে মৃতদেহ লইয়া যাওয়াও নাকি অসম্ভব।

আর একটী শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনা কমরেড ইস্‌মাইল উল্লেখ করিলেন। জল তৃষ্ণায় কাতর একটী রোগী তার বেড হইতে চীৎকার করিয়াও কোনো নার্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না, শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই জল সংগ্রহ করিতে যায় এবং পড়িয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

মরণাপন্ন রোগীদের প্রতিও যেখানে এই রকম চরম উদাসীনতা দেখানো হয়, সেখানে সাধারণ ব্যবস্থায় যে আরো কত বেশী গলদ থাকিবে, তা তো জানা কথা। শোনা গেল যে, যারা ফ্রি বেডের রোগী, তারা ছারপোকার কামড়ে রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। অনুযোগ অভিযোগ করিয়াও নাকি ইহার কোনো প্রতিকার হয় নাই। তাছাড়া ঔষধের অভাবও কম কিছু নয়। খুব সাধারণ মিক্সচার যেগুলি সেইগুলিরই নাকি বেশী অভাব। তার ফলে সাধারণ রোগীরাই কষ্ট পায় বেশী।

কর্পোরেশনের সভায় এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করিলে মেয়র আশ্বাস দেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিবেন। তদন্ত কমিটী সম্বন্ধে মেয়র বলেন যে, কর্পোরেশনের তদন্ত করিবার অধিকার নাই। আমরা মনে করি, সরাসরি তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিবার অধিকার না থাকে, অন্তত তদন্তের জন্ত বে-সরকারী কমিটী নিয়োগ করিতে সরকারের উপর চাপ দিবার অধিকার নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের আছে। কলিকাতার নাগরিকদের প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই এতটুকু করিতে পারেন।

নিখিল বঙ্গ সূতাকল ও বেল্টিং মজুর সম্মেলন

আগামী ১০ই ও ১১ই জুন হুগলী জেলার মাহেশে কমরেড নেপাল নাগের সভাপতিত্বে সূতাকল ও বেল্টিং মজুরদের প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন হইবে। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, কুষ্টিয়া ও ঢাকার বিভিন্ন সূতাকল ও বেল্টিং কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধি আসিবেন। এই সম্মেলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পোষ্টার প্রদর্শনীও হইবে।

★

সরকারী মাগগি ভাতা কমিটি কি রায় দিল?
সরকার ও মালিকরা ঐ রায় মানে না কেন?
পূরা মাগগি ভাতা কিরূপে আদায় হইবে?

জানিতে হইলে—পড়ুন

মাগগী ভাতার জন্য লড়ো!

লেখক—সোমনাথ লাহিড়ী

দাম—দুই আনা

মাগগী ভাতা আন্দোলনে এই বই আপনার সব চেয়ে বড় হাতিয়ার

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

★

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: **বঙ্কিম মুখার্জি** এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা: ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

কমন্স সভায় চার্চিলের বক্তৃতা

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতি জিতিবে কিরূপে?

হিটলারী ফ্যাশিজমকে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য ইয়োরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্রের আয়োজন প্রায় শেষ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্রের আশঙ্কা হিটলারকে যেমন আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি মিত্রশক্তির দেশগুলিতে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল তাহাদের মনেও ভয় জাগাইয়াছে। মিত্র সেনাদল যখন দুর্মদ গতিতে ইয়োরোপে অগ্রসর হইবে আর হিটলার-অধিকৃত দেশগুলি হইতে স্বাধীনতাকামী জনতার পর জনতা আসিয়া যখন তাহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে তখন জনতা নিজেকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের আশা একেবারেই লোপ পাইবে—ইহাই প্রতিক্রিয়াশীল মহলের ভয়। তাই ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল মহল আবার কলরব তুলিয়াছে, শাসক শ্রেণীর উপর তাহাদের যে বিরাট প্রভাব তাহার সাহায্যে তাহারা ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল সম্প্রতি কমন্স সভায় পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এই অপ-প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট।

ফ্র্যাঙ্কোকে তোয়াজ

প্রথমত স্পেন ও উহার ফ্যাশিষ্ট শাসনকর্তা ফ্র্যাঙ্কো সম্বন্ধে। এক মাস আগে স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে চুক্তি হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক বলিয়া তিনি সমর্থন করেন, ফ্র্যাঙ্কো এতদিন ব্রিটেনের কি কি প্রচণ্ড উপকার করিয়াছে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, ইংলণ্ডে যাহারা ফ্র্যাঙ্কোকে ফ্যাশিষ্ট বলিয়া নিন্দা করে ও সন্দেহ করে তাহাদের ধমক দেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে যুদ্ধ বিরতির পর ভূমধ্যসাগরে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্কোর স্পেন যথেষ্ট সাহায্য করিবে। তিনি যে ভাবে বক্তৃতা করেন তাহাতে মনে হয় ফ্র্যাঙ্কো তাঁহাদের সব দাবী মানিয়া লইয়াছে, এবং ফ্র্যাঙ্কোর দিক হইতে যুদ্ধে অসুবিধা আনিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, বরং তাহার বন্ধুত্বই পাওয়া যাইবে।

ফ্র্যাঙ্কো সম্বন্ধে তাঁহার উচ্ছ্বাস ও বিবরণ হয় ভুল নয় মিথ্যা। হিটলারের পক্ষে স্পেন সরাসরি যুদ্ধে নামে নাই, তাহার প্রথম কারণ—দীর্ঘ ঘরোয়া যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেনের নূতন যুদ্ধে নামিবার সঙ্গতি ও শক্তি খুব অল্পই ছিল। দ্বিতীয় কারণ—স্পেনে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, অথচ হিটলার মুসোলিনী তাহাকে খাদ্য দিয়া সাহায্য করিতে তো পারেই না বরং তাহার কাছেই গোপনে কেনার চেষ্টা করে। খাদ্য কিনিবার জন্য ১৯৪১ সালেও স্পেন ব্রিটেনের কাছে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ধার পাইয়াছে, আর উত্তর আমেরিকার গমের চালানের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সরাসরি যুদ্ধে নামিলে ইহা বন্ধ হইয়া যাইবে এই ভয়েই স্পেন যুদ্ধে নামে নাই, কিন্তু নিরপেক্ষতার নামে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মাল লইয়া যতখানি হিটলারকে দেওয়া যায় তাহা দিয়াছে। আমেরিকার পেট্রোল হিটলারকে চালান দিয়াছে।

ফ্র্যাঙ্কো কি রকম বন্ধু!

ব্রিটেনের ফ্র্যাঙ্কো-তোষণ নীতিতে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিরক্ত ছিল। গত ২০শে জানুয়ারী আমেরিকা স্পেনকে পেট্রোল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার চারটী কারণ দেখানো হয়, যথা: (১) অনেকগুলি ইতালিয়ান (বাদলিও পক্ষের) যুদ্ধ-জাহাজ ও বাণিজ্য-জাহাজ স্প্যানিশ বন্দরে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে (২) যুদ্ধের দরকারী মাল মসলা যেমন উলফ্রাম জার্মানীকে সরবরাহ করা হইতেছে (৩) স্পেনে ও তাহার আফ্রিকান জমিদারিতে হিটলার পক্ষের চরেরা গুপ্ত কার্য্য চালাইবার সুযোগ পাইতেছে (৪) ব্লু ডিভিশনের কিছু অংশ তখনও লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

এই অভিযোগের পর মে মাসের গোড়ায় স্পেনের সঙ্গে ব্রিটেন ও আমেরিকার চুক্তি হয়। মিঃ চার্চিল তাঁহার বক্তৃতায় এই চুক্তিরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে ফ্র্যাঙ্কো নিরপেক্ষ তো আছেই, প্রায় বন্ধুই হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সেই চুক্তির সর্ত্ত কি কি? প্রথমত, কতকগুলি ইতালিয়ান বাণিজ্য জাহাজ মাত্র ছাড়িতে ফ্র্যাঙ্কো রাজি হইয়াছে—আসল যুদ্ধ জাহাজগুলির কথা পরে সালিশে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ততদিনে দ্বিতীয় ফ্রন্টের হেস্তনেস্ত কিছু একটা হইয়া যাইবে, যুদ্ধ-জাহাজগুলি মিত্রপক্ষ কাজে লাগাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, জুন পর্য্যন্ত মাসিক মাত্র ২০ টন এবং তাহার পর মাসিক মাত্র ৪০ টন করিয়া উলফ্রাম হিটলারকে দেওয়া হইবে। উহার বেশী নয়। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন যে উহা নাকি চলতি সরবরাহের ১০ পারসেণ্ট মাত্র। কিন্তু সরবরাহের সময় কি মিত্র পক্ষের তদন্ত কমিশন গিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবে যে সত্য সত্যই ৪০ টন যাইতেছে না ৪০০ টন যাইতেছে? এইরূপ কমিশনের কোন কথা প্রকাশিত চুক্তিতে নাই, সুতরাং এই চুক্তিও বৃথা। তৃতীয়ত—স্প্যানিশ আফ্রিকার তাঞ্জিয়ারে জার্মান দূতাবাস তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু স্পেনের সমস্ত শহর জার্মান চরে ভর্ত্তি। সোভিয়েট টাস এজেন্সি খবর দিয়াছে যে উত্তর স্পেনে যে সব গুপ্ত জার্মান বিমান ঘাঁটি আছে সেখানকার কর্মকর্ত্তারাই এই চরেদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া আছে। জার্মান কলকারখানায় খাটিবার জন্য স্প্যানিশ মজুর সংগ্রহ এখনও পুরাদমেই চলিয়াছে। রুশ রণক্ষেত্রে ব্লু ডিভিশন এখনও মোজুদ, শুধু তাহার নাম বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে—এ খবরও সোভিয়েট দিয়াছে। এই সমস্ত বন্ধ করার বিষয়ে তদন্ত করিবার ক্ষমতা মিত্রপক্ষের নাই, চুক্তি অনুসারে ফ্র্যাঙ্কোর কথাকেই তাঁহাদের সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু হিটলার, মুসোলিনি, তোজো, ফ্র্যাঙ্কো প্রভৃতি ফ্যাশিষ্ট নেতাদের কথার উপর কে ভরসা করিতে পারে? অথচ এই চুক্তিকেই পরম সন্তোষজনক ধরিয়া লইয়া চার্চিল ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষে প্রচুর ওকালতি করিয়াছেন।

চার্চিলের গদগদ ফ্র্যাঙ্কো-বন্দনার পরও স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গত ৩০শে মে বলিয়াছেন, "তাঁহার মতে স্পেন হইতে জার্মানীতে জাহাজযোগে মালপত্র রপ্তানি এখনও বিশেষ হ্রাস পায় নাই।"

সামুয়েল হোরের পুনরাগমন

স্পেনে ইংলণ্ডের দূত স্যর সামুয়েল হোর ছিলেন চেম্বারলেনের হিটলার তোষণ নীতির বড় পাণ্ডা, মিউনিক বিশ্বাসঘাতকতার তিনিও পরম সমর্থক। সেই সামুয়েল হোর আজ চার বছর পরে হঠাৎ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া বক্তৃতা করিতেছেন যে ইয়োরোপের কন্টিনেন্টে অনেকে শুধু ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়াই বসিয়া আছে। আর চার্চিল হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কোর মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তির একটা বড় প্রভাব খুঁজিয়া পাইতেছেন। হোর-বর্ণিত ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য হইতেই আসিবে ইয়োরোপের পদানত দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা—উহা সম্মিলিত জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ দ্বিতীয় ফ্রন্টের যুদ্ধেই অনৈক্য আনিবে। আর ফ্র্যাঙ্কো-তোষণ নীতিই সম্মিলিত জাতি, বিশেষ করিয়া পদানত দেশগুলির সন্দেহ জাগাইয়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে দুর্ব্বল করিবে। ইহাতে ফ্যাশিজমেরই লাভ, এবং ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাহাই চায়। চার্চিল তাঁহার বক্তৃতায় তাহাদিগকেই তোয়াজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফ্রান্স

ফরাসী দেশের ঐক্যবদ্ধ গোপন প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির সমর্থনে ফরাসী মুক্তি সংসদ ও উহার প্রতিনিধি পরিষদ বর্ত্তমানে সমস্ত স্বাধীনতাকামী ফরাসীর প্রতিনিধি স্থানীয়। যুদ্ধের দিক হইতেও সোভিয়েট, মার্কিন ও ইংলণ্ডের পরই ইহার গুরুত্ব ও শক্তি তাহা স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রান্সের মাটিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইহার গুরুত্ব আরও বাড়িবে, সমস্ত ফরাসী নরনারীকে একত্র রক্ষা করার ভারও ইহাকেই লইতে হইবে। এই গুরুত্ব অনুভব করিয়া ফরাসী মুক্তি সংসদ সম্প্রতি অস্থায়ী ফরাসী গবর্ণমেণ্টরূপে সংগঠিত হইয়াছে। ইটালিতে বাদোলিও গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া ব্রিটেন ও আমেরিকা নিজেদের সামরিক "আমগট" গবর্ণমেণ্ট চালানোর চেষ্টায় ইটালির জনসাধারণ কিরূপ বিমুখ হইয়াছিল ও ফ্যাশিষ্ট প্রতিরোধ সংগঠনে কত দেরী হইতেছিল সে অভিজ্ঞতা ফরাসী মুক্তি সংসদের আছে। দারলাঁ, জিরো প্রভৃতি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভিশি-অনুগামীদের প্রতি ব্রিটিশ ও মার্কিনের দুর্ব্বলতার ইতিহাসও তাহাদের চোখের সামনে—আসল ভিশি এলাকায় যুদ্ধ বাধিলে ফরাসী জনসাধারণ পাছে ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে সেই ভয়ে কোনো প্রচ্ছন্ন ভিশিপন্থীদের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন শাসক সম্প্রদায় যে আঁতাত করিয়া ফেলিবেন না তাহা কে বলিতে পারে? সেইজন্যই ফরাসী মুক্তি সংসদ এবার আগে হইতে সাবধান হইয়া অস্থায়ী ফরাসী গবর্ণমেণ্টরূপে আপনাকে সংগঠিত করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে মুক্তি সংসদের বিরাট কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে না পারিলেও চার্চিল তাঁহার বক্তৃতায় উহাকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টরূপে মানিতে রাজি হন নাই। ভবিষ্যতে ফ্রান্সে অন্য কাহারও সঙ্গে চুক্তির পথ খোলা রাখিবার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীলেরা চার্চিলকে এই ফাঁদে টানিয়া আনিয়াছে। ইহাতে আপাতত ভিশিপন্থীদেরই লাভ হইবে, ফ্রান্সে প্রতিরোধকারীদের উৎসাহেও কিছুটা হতাশা আসিবে।

গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড

গ্রীসের সব চেয়ে বড় প্রতিরোধ সংগঠন "জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট" (E. A. M.)। উহাতে কৃষক পার্টি, সোশ্যালিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি, শ্রমিক মহাসভা, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু দল একত্র হইয়াছে। ফ্র্যাঙ্ক পিটকারিনের রিপোর্ট মতে মার্চ মাসে উহার গেরিলা সৈন্যবাহিনীতে (E. L. A. S.) সশস্ত্র সৈন্য ছিল ৪০ হাজার, তা ছাড়া আরও ১ লক্ষ হাতিয়ারের অপেক্ষায় মৌজুদ ছিল। গ্রীসের প্রায় এক চতুর্থাংশ হইতে ইহারা ফ্যাশিষ্ট শত্রুদের তাড়াইতে পারিয়াছিল। ইহা ছাড়া কর্ণেল জেরভাস নামে একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের নেতৃত্বে এবং ব্রিটিশ অস্ত্রের সহায়তায় E. D. E. S. নামে আর একটী প্রতিরোধ দল গঠিত হইয়াছে। উহাদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র ১ হাজার হইতে তিন হাজার এবং দক্ষিণ এপিরাস প্রদেশের স্বল্প ভূখণ্ডেই উহাদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ জেতার পর এই কর্ণেলকে দিয়া মুক্তি ফৌজের প্রগতিশীল প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে এই আশায় প্রতিক্রিয়াশীলরা কর্ণেলকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যের উপরই জোর দেয়। চার্চিলও সেই ফাঁদে পড়িয়া এমনও বলিয়াছেন যে মুক্তি ফৌজের "অত্যাচারে" নাকি সমস্ত জনসাধারণ বিরূপ হইয়া গিয়াছে আর কর্ণেল জেরভাসের নাকি নিজ এলাকায় অখণ্ড প্রভাব। এমনি করিয়া প্রতিরোধের আসল বিরাট শক্তিকেই তিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মুক্তি ফৌজ, জেরভাস প্রভৃতি সকলের প্রতিনিধি লেবাননে একত্র হইয়া নূতন ঐক্যবদ্ধ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। কাজেই ইচ্ছা থাক বা না থাক চার্চিলকে তাহাই সমর্থন করিতে হইয়াছে। ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ঐক্য গড়িয়া উঠিলে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরাস্ত হইতে বাধ্য।

যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল তিতোর বিরুদ্ধে সার্বিয়ানদের অভিযোগের কথাও চার্চিল তুলিয়াছেন, কিন্তু মার্শাল তিতোর অতুলনীয় যুদ্ধোদ্যমের সম্মুখে তাঁহাকে বলিতেই হইয়াছে যে তিতোর সামরিক নেতৃত্বে ইহারা সকলে এক হোক তাহাই আমি চাই।

লণ্ডনস্থিত পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্টের প্রতি চার্চিল দরদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রুশিয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী ও সবল হস্ত সেখানে প্রহরী। কাজেই, কার্জন লাইন মানিলে জার্মানী হইতে কিছু ভূখণ্ড লইয়া পোল্যাণ্ডের ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে এবং সোভিয়েট ও পোল্যাণ্ডে একটা মিটমাট হওয়া দরকার—এই ধরণের মিষ্ট কথাই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে।

জাতি-সঙ্ঘের ভূত!

ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীলদের তুষ্ট করিবার জন্য তিনি যুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্সের মত আর একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের আভাসও দিয়াছেন। যে কয়টী বড় বড় রাষ্ট্র যুদ্ধে জয়ী হইবে তাহারাই নাকি বিশ্বশান্তি রক্ষার সংগঠন গড়িয়া তুলিবে। অর্থাৎ আবার সেই শক্তি-সাম্যের ((balance of power) খেলা খেলিয়া ব্রিটেন অন্তত ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে পারিবে—এই ভরসাই তিনি ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের কথা ছোট রাষ্ট্রগুলির মিত্রশক্তিতে যোগ দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। মে মাসের গোড়ায় "ওয়ার এণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস" নামে সোভিয়েটের প্রভাবশালী পত্রিকায় সোভিয়েটের ইতালীয় দূত বরিস ষ্টাইন এই জন্যই সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে আটলাণ্টিক সনদ উন্নত করিবার জন্য আরও আলোচনা দরকার, কিন্তু এমন কিছু বলা উচিত নয় যাহাতে নাজি জার্মানীর বা লণ্ডনস্থ প্রতিক্রিয়াশীল পোলিশ মহলের কিছু সাহায্য হয়। যাহাতে জার্মানীর তাঁবেদার দেশগুলিতে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ একত্রীভূত হইতে পারে এবং দেশগুলি জার্মানী হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কার্য্যকরী অংশ লইতে পারে—সে সম্বন্ধেই বিশেষ বিবেচনা করা উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। চার্চিলের বক্তৃতা ইহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

কোন্ নীতি জিতিতেছে

ইয়োরোপে জনযুদ্ধের দুর্গম গতিপথে একদিকে চার্চিলের পররাষ্ট্র নীতি, আর একদিকে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি। যুদ্ধ-সংগঠনের পক্ষে সোভিয়েট নীতিই সব চেয়ে বেশী সাফল্য আনে, সব চেয়ে বেশী ঐক্য আনে। তাই বক্তৃতা না করিয়াও সোভিয়েট নীতি জয়ী হইতে থাকে আর বড় বড় বক্তৃতা করিয়াও চার্চিল নীতি বারে বারে পরাস্ত হয়। সোভিয়েটকে বাদ দিয়া আলাদাভাবে নিজ নীতি চালাইবার চেষ্টা চার্চিল তুর্কীতে করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের মুখেই পরাভব মানিয়াছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েটের পরিদর্শিত তিতোকে সমর্থন করার নীতিই তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ফরাসী মুক্তি সংসদকে সোভিয়েটই প্রথম মানিয়া পথ দেখায়, আজ ইঙ্গ-মার্কিনকেও তাহা মানিতে হইতেছে। ইতালীতেও অ্যামগটের বিরুদ্ধে সোভিয়েটই বাদলিও প্রভৃতিকে সমর্থন করে, তাহার ফলে ঐক্যবদ্ধ গবর্ণমেণ্ট গড়িবার সূচনা হয়, আর আজ ব্রিটিশ মার্কিনকেও তাহাই মানিতে হইতেছে। গ্রীস সম্বন্ধেও সোভিয়েটের কথাই ফলিতেছে, ঐক্যও বাড়িতেছে; স্পেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, এমন কি জার্মানীর ক্ষেত্রেও এইরূপই ঘটিবে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের মনোভাব বা চার্চিলের তোষণ নীতি আসল কথা নয়। আসল কথা হইল দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবে কিনা, ইয়োরোপের দেশে দেশে জনসাধারণ ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িবার সুযোগ পাইবে কিনা। সে সম্বন্ধে না বলিবার ক্ষমতা চার্চিলেরও নাই। এবং তাহাই জনসাধারণকে জয় আনিয়া দিবে। দুর্গম যুদ্ধের গতিপথে যাহারা অকাতরে রক্ত ঢালিয়া দিবে, অক্লান্ত পরিশ্রমে যাহারা জিতিবার একমাত্র উপায়স্বরূপ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে প্রাণদান করিবে তাহাদের শক্তিই পররাষ্ট্র নীতিতেও জনতার স্বাধীনতার অবিনশ্বর ছাপ আঁকিবে। (৪।৬.৪৪)

রোমের মুক্তিতে সমগ্র ইতালীর ★ মুক্তি আসন্ন ★

ইতালীয় রণক্ষেত্র হইতে খুবই উৎসাহজনক খবর আসিয়াছে। মিত্র সেনা রোম অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। রোম সহরের উপকণ্ঠে লড়াই চলিতেছে। ইতালীর যুদ্ধের এই সাফল্য সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনগণের মনেই উৎসাহ জাগাইবে। রোম নগরী ইতালীয়দের বড় আদরের—বড় গর্ব্বের সহর। নাৎসীরা এতদিন সেই সহরকে অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ইতালীর সংস্কৃতি, ইতালীর সভ্যতা, ইতালীর যা কিছু গৌরবের সব কিছুরই কেন্দ্র এই রোম নগরী। তাই মদমত্ত নাৎসী ফৌজের সেই রোমকে পিষিয়া রাখার অর্থ সমগ্র ইতালীর প্রাণকেন্দ্রকে নিষ্পন্দ করিয়া রাখা। এখন রোমের স্বাধীনতার সাথে সাথে সমগ্র ইতালীতেও মুক্তির যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিবে, তাহার আঘাতে নাৎসীবাদ ধ্বংস হইবে, স্বাধীন ও মুক্ত ইতালী আবার পৃথিবীর জনগণের হাতে হাত মিলাইয়া জয় যাত্রার পথে আগাইয়া যাইবে।

সর্ব্বশেষ খবর পাওয়া গিয়াছে যে রোম নগরী হইতে নাৎসীদের সম্পূর্ণ তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

Regd. No. C. 2836

শিশু ও রোগীদের জন্য দুধ কোথায় ?

দুধের অপচয় ও বিলাসের খাদ্য ত্যাগ করুন

গাভী-হত্যা বন্ধ করান

বাংলায় প্রতি বছর গরু-মহিষ মরে প্রায় ২০ লক্ষ
অক্ষম হয় প্রায় ৫ লক্ষ

ক্ষতি পূরণের জন্য বছরে ২০-২৫ লক্ষ গোধন চাই
এবার সে টাকা দরিদ্র কৃষক কোথায় পাইবে ?
তাহার উপর গো মড়ক লাগিয়াছে,
মাংসের জন্য গাভী হত্যা চলিয়াছে,
ধনীদের মিষ্টান্ন ও ক্ষীরের লোভ বাড়িয়াছে

গো-মড়ক, গাভী হত্যা ও অসংযত লোভ সংবরণ করান।

শুধু কলিকাতার শিশুদের জন্য দৈনিক প্রায় ৬ হাজার মণ দুধ চাই—
(১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাথা পিছু আধ সের হিসাবে)
— সর্বশুদ্ধ মোট দুধের পরিমাণ মাত্র ৭ হাজার মণ
তবুও শিশুদের বঞ্চিত করিয়া ক্ষীর, মিষ্টান্ন, আইসক্রীম খাওয়া উচিত কি ?

যে কোন সময়ে কলিকাতা শহরের শতকরা মাত্র দশ ভাগ লোককে যদি অসুস্থ থাকে বলিয়া ধরা যায় তো কলিকাতার রোগী ও শিশুদের জন্যই মাথা পিছু আধ সের হিসাবে দৈনিক প্রায় সাড়ে ন' হাজার মণ দুধ দরকার। কিন্তু ধনী দরিদ্র, রোগী সুস্থ, শিশু বয়স্ক সকলের জন্য সব শুদ্ধ যে দুধ পাওয়া যায় তাহাও মাত্র ৭ হাজার মণ। তবে শিশু ও রোগীরা বাঁচিবে কিরূপে ?

সারা বাংলারও এই একই অবস্থা। কলিকাতায় তবু চড়া দাম দিতে পারিলে দুধ পাওয়া যায়, মফঃস্বলে অনেক জায়গায় একেবারে পাওয়াই যায় না। শান্তিপুর শহরে একটী মা সদ্যোজাত শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া বাঁচাইতে পারিবে না এই গভীর দুঃখে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

সামরিক প্রয়োজনে মাংসের জন্য গাভী হত্যা বৃদ্ধি, জেলায় জেলায় প্রচণ্ড গো মড়ক, মানুষের মতই পশুদেরও খাদ্যাভাব ও অখাদ্য আহারে বাধ্য হওয়া, সঙ্গতি সম্পন্নদের লালসায় দুধের অপচয় প্রভৃতি কারণেই দুধের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় এত কম। তাই দুধের দাম এত বাড়িতেছে। শিশু ও রোগী মরিতেছে।

দেশের শিশু ও রোগীদের বাঁচাইবার জন্য দেশবাসী এখনই কি করিতে পারেন ? গাভী হত্যা বন্ধ করা, গো মড়ক নিবারণ, নূতন গোধন আমদানী প্রভৃতি দাবীতে তাঁহারা আন্দোলন করিতে পারেন।

কিন্তু সে দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শিশুগুলিকে বাঁচাইতে আমরা কি করিব ? আমরা বিলাস মিষ্টান্ন ত্যাগ করিয়া দুধের অপচয় বাঁচাইতে পারি। মিষ্টান্ন লোভ মিটাইবার জন্য দত্তপুকুর হইতে ভারে ভারে ছানা আসে কিন্তু আশেপাশের গ্রামগুলিতে দুধের জন্য হাহাকার চলে !

গরীব ছেলে মেয়ে ও রোগীদের দুধের জন্য আমরা অর্থ সাহায্য করিতে পারি। কলিকাতায় বস্তিতে বস্তিতে হাজার হাজার শিশু দুধের অভাবে কাঁদিতেছে, কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের মত বিরাট প্রতিষ্ঠানও দৈনিক মাত্র দেড় হাজার শিশুকে বিনা মূল্যে এক পোয়া করিয়া দুধ দিতে পারে। দেশবাসী তাঁহাদের ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিলে দেড় লক্ষকে দেওয়াও মোটেই কঠিন নয়।

দুগ্ধ সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন, নিখিল ভারত মহিলা সঙ্ঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, রেড ক্রস সোসাইটী প্রভৃতি বহু সংগঠন অগ্রণী হইয়াছেন। আপনিও ইহাতে অগ্রসর হোন।

কলিকাতায় দুধের ভেজাল বাড়িতেছে

পরীক্ষিত নমুনা সম্বন্ধে কর্পোরেশনের রিপোর্ট

বৎসর	শতকরা ভেজাল
১৯৪১-৪২	৫১%
১৯৪২-৪৩	৬৫%

সরকার ও কর্পোরেশন হইতে ইহার ব্যবস্থা দাবী করুন।

কলিকাতা শহরের লোক সংখ্যা
২১ লক্ষ হইতে ৩১ লক্ষে উঠিয়াছে
কিন্তু দুধের রোজ যোগান
৮,২০০ মণ হইতে ৭,০০২ মণে নামিয়াছে, আরও দুধ আমদানীর ব্যবস্থা দাবী করুন।

বার্ণপুরে কোম্পানীর জুলুম

বার্ণপুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর শ্রমিকগণ অনেকদিন হইতে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইউনিয়ন গড়িবার পর এই চেষ্টার যথেষ্ট সফলতাও দেখা গিয়াছে। কোম্পানী কিন্তু ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জোর আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ভয় দেখাইয়া ইউনিয়নের মেম্বর না হইবার বণ্ডে সহি করান চলিতেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পূরণ দূরের কথা, সম্প্রতি মালিক খুশীমত দুটী ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছে ! ইরেক্টিং ডিপার্টমেণ্টের বহু শ্রমিককে অকারণ সাসপেণ্ড করিয়াছে এবং নেতৃ স্থানীয় দুইজন শ্রমিক কমরেড বেচু ও কমরেড অনিল মুখার্জিকে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করিয়াছে।

কোম্পানীর জুলুমের বিরুদ্ধে বার্ণপুরের শ্রমিকরা একত্র দাঁড়াইয়াছে। লেবর কমিশনর ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং মালিকের জবরদস্তীর বিরুদ্ধে এডজুডিকেশনের দাবী করা হইতেছে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের জয় অবশ্যম্ভাবী।

দেশদ্রোহীর হাতে কমিউনিষ্ট খুন

কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড সুনীল নাগ অন্ধকার রাত্রে পথের মধ্যে ডাণ্ডার আঘাতে আহত হইয়াছিলেন। গত ৩১শে মে হাসপাতালে তিনি মারা গিয়াছেন। কমরেড নাগের উপর আঘাত আকস্মিক নয়। ঢাকায় কমিউনিস্টদের কার্যাকলাপে বাধা দিবার জন্য বহুদিন হইতেই পঞ্চম-বাহিনীর লোক ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ইহারাই খাদ্য-আন্দোলনে অনবরত বাধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং সম্প্রতি মে-দিবস উপলক্ষে কমিউনিস্টদের কার্যাকলাপ পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সামনে কিছু করিতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত তারা গোপনে কমিউনিষ্টদের হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল।

দেশদ্রোহী জাপানী দালালদের হাতে কমরেড নাগের মৃত্যু আজ দেশবাসীকে সজাগ করিয়া তুলুক। তাহাদের ষড়যন্ত্রকে বিফল করার দায়িত্ব শুধু কমিউনিষ্টদের নয়, সমস্ত দেশবাসীর।

হিন্দু মুসলিম নেতাদের জিদে

সাম্প্রদায়িক কলহ কোথায় পৌঁছিতেছে

মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বলি

২০শে জ্যৈষ্ঠ মুসলিম নেতা মিঃ ফজলুর রহমান মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"কতিপয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু নেতা উস্কানী দিয়া যে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাতে মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।...... যদি বিলের বিরুদ্ধে বর্তমান পন্থায় আন্দোলন পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই বিলের মুসলমান ও অন্যান্য সমর্থকগণ প্রকৃত জনমত প্রকাশের জন্য সভা সমিতি করিয়া পাল্টা আন্দোলন পরিচালন করিতে বাধ্য হইবে।" (আজাদ পত্রিকা, ৩রা জুন)।

এই বিবৃতি প্রচারের নয় দিন পূর্বে বঙ্গীয় এসেমব্লীতে স্যার নাজিমুদ্দীন শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামীর বক্তৃতা দিবার সময় বিরোধী দলের প্রচণ্ড বাধার উত্তরে শাসাইয়া বলিয়াছেন—"অন্যান্য নেতা বক্তৃতা করিতে উঠিলে তাঁহার দলও তাঁহাদিগের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন।"

এই দুই জন লীগ নেতার কথায় একই সুর ধ্বনিত হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু-নেতারা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন, মুসলিম নেতারাও সারা বাংলার মুসলমানদের উত্তেজিত করিবেন। ইহাতে যে কি বিষময় ফল হইবে তাহা সকলেই জানেন। ফজলুর রহমান সাহেব বিবৃতিতেই বলিয়াছেন—"তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব মূলক সম্পর্ক বজায় থাকিবে কিনা আমি তাহা এতৎসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।" পাল্টা আন্দোলনের ফলে মুসলমান জনসাধারণেরও যে সমূহ ক্ষতি হইবে তাহা জানিয়া শুনিয়াই এই পথের আহ্বান তিনি কি করিয়া দিলেন ? লীগ নেতারা তাঁহাদের নিজস্ব সম্প্রদায়েরও যাহাতে সর্বনাশ হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কেন ? বিল পাশ করার আন্দোলন ও বিলের ধারা-গুলি মোটেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধ করিবে না। নামকোওয়াস্তে পৃথক নির্বাচনের প্রথা বিলের মধ্যে প্রবর্তন করিলেই তাহা মুসলমান সমাজের উপকারে লাগে না। বিলের ধারাগুলি একটী একটী করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রকৃত মুসলমান প্রতিনিধিরা বোর্ডে যাইতে পারিবেন না যাঁহারা বেশী সংখ্যায় যাইবেন তাঁহারা হয় বৃটীশ সরকারের প্রভুভক্ত চাকর আর না হয় তাঁহাদেরই মনোনীত ব্যক্তি। তাঁহারা মুসলমান-হিন্দু কাহারও স্বার্থের পরোয়া করেন না।

উভয় পক্ষই জন-বিরোধী তাণ্ডবে উন্মত্ত

তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে কোন মতে এই বিলটী পাশ করাইয়া লইবার প্রতিজ্ঞা লইয়া বিদ্বেষের বীজ তাঁহারাই নিজহাতে বপন করিয়াছেন। বিরোধী দলের নেতাদের সহিত মুসলমানদের দাবীর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আপোষের পরিবর্তে আমলাতন্ত্রের প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া লীগমন্ত্রীমণ্ডলী বাংলার শিক্ষা-জীবন বিধ্বস্ত করিবার উপযোগী শিক্ষা-বিল আনিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন,—এসেম্বলীতে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, খুব সহজেই বিল পাশ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে বিলের মধ্যে হিন্দু মুসলমান কোন সাম্প্রদায়েরই কল্যাণ হইতে পারে না তাহা পাশ করা অত্যন্ত দুরূহ।

বিলের আলোচনা যতই গভীর হইতেছে ততই হিন্দু মুসলমান শিক্ষাব্রতীরা ধীরে ধীরে বুঝিতেছেন যে—এই বিল সম্বন্ধে লড়াইএর ভিতর দিয়াই হিন্দু মুসলমান মরিতে বসিয়াছে। জঘন্য দলাদলি ও ঘৃণ্য রেষারেষি সুস্থ মস্তিষ্ক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। লীগ মন্ত্রীত্ব এই জন্য ধীরে ধীরে বিলের সমর্থন হারাইতেছেন। সুতরাং তাঁহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন।

এই ধরণের সাম্প্রদায়িক গ্লানি মোচনের জন্য বিল সম্পর্কে বোঝা পড়া না করিয়া মন্ত্রীত্ব পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়াইবার পথেই আগাইয়া আসিয়াছেন। তাই তাঁহারা বরিশালে হিন্দু মহাসভার একটী সম্মেলনও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ইহাঁরা হিন্দু নেতাদের সাথে সাথে যে পথ ধরিতেছেন তাহা বাংলার মুসলমান সমাজ ও সমগ্রভাবে বাংলাকে ধ্বংস করিবারই পথ। শিক্ষার মধ্যে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য কায়েম করার কথা একেবারে চাপিয়া রাখিয়া মুসলমানদের বুঝাইতেছেন যে তাঁহারা পৃথক নির্বাচন দিয়া তাহাদের কত বড় অধিকারই না আনিয়া দিতেছেন।

খাদ্যের ব্যবস্থা ও মহামারীর ঔষধ এ সমস্ত সমস্যাই তাঁহারা আপাততঃ শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছেন। খাদ্য সংকট গভীর হইতেছে, মজুতদারী আবার গত বছরের মতই কায়েম হইতেছে—এ সবের বিরুদ্ধে কোন অভিযান নাই।

প্রগতিশীল লীগনেতারা অগ্রসর হউন

লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দকে আগুয়ান হইতে হইবে। বিলের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্ধ থাকিলে চলিবে না। মুসলমানদের শিক্ষা, কৃষ্টি ও জাতীয়তার স্ফুরণের জন্য শিক্ষাজীবনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব কি প্রচণ্ড বাধা হইবে না ? বিলকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দু-মুসলমানের জীবনহানী ঘটুক ইহা কি আপনারা চান ? হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসসেবীদের কাছেও আমরা বলিয়াছি—মুসলমানদের অধিকার পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা জাতীয়তার আদর্শ নয়। লীগমন্ত্রীত্বকে কোন প্রকারে উৎখাত করিবার জন্য বাংলার জনসাধারণের খাদ্যাভাব, রোগ শোকের যন্ত্রণা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। খাদ্য ও রিলিফের কাজে লীগ ও মুসলমানদের সহিত যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বিলের উপলক্ষ্য নষ্ট করিয়া দিলে আমলাতন্ত্রই শক্তিশালী হইবে। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতারা পৃথক নির্বাচনের দাবীর জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু দেশপ্রেমিকদের কাছে গিয়া বুঝাইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা রাজী হইবেন। আপনারা অগ্রনী হইয়া তাঁহাদের সহিত বোঝাপড়া করিলে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ও বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

দেশ গান্ধীজীর কাছে পথের নির্দ্দেশ চায়

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পাইয়া তারা আবার উল্লসিত হইয়া উঠে। তারা জোর গলায় জানায় যে, গান্ধীজি এখনও 'কুইট ইণ্ডিয়া' নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেছেন এবং সেই নীতিই আজ কাজে পরিণত করিতেছে নেতাজী।

এই চিঠির উপর বিলাতের জনগণের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু এই চিঠিকে উপলক্ষ করিয়া কি রকম প্রচার হইবে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। নয়া দিল্লীর খবরেই তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়। নয়া দিল্লী হইতে সরকারী আমলারা রটাইতেছেন গান্ধীজিই নাকি রক্ষণশীল, তাঁহারা নন ! টাইম্স অব ইণ্ডিয়া মন্তব্য করিয়াছে, "মিঃ গান্ধী ব্রিটিশের প্রতি সেই পুরাতন ভয়ই দেখাইতেছেন যে দেশব্যাপী আইন অমান্য চলিবে এবং ব্রিটিশের উচিত এখনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া ভারতকে শূন্যে ছাড়িয়া দেওয়া।" গান্ধীজির মতামতকে ভ্রান্ত পথে লইয়া গোলমাল সৃষ্টির অভিযান এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে।

গান্ধীজির চিঠি পড়িয়া দেশভক্তের মন অন্ধকারে ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খুশী হইয়া ভাবিবে : এই তো অচল অবস্থা ঠিক বজায় রাখা যাইবে ! আর জাপানী আক্রমণকারীরা ভাবিবে যে ভারতের ভিতরে ঢুকিবার ভরসা এখনো আছে। গান্ধীজি প্রথম দফায় পরাজিত হইয়াছেন। আশার রশ্মি শুধু এই যে ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর দুর্দ্দশার হৃদয় বিদারক ছবি যতই তাঁহার চোখে পড়িবে, রাজনীতিক হতাশার গভীরতা যতই তিনি দেখিতে পাইবেন ততই অচল অবস্থা সমাধানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও তাঁহার মনে জাগিতে থাকিবে। গান্ধীজি যদি তাহা না পারেন তো গভীরতর দুঃখ ও লজ্জায় দেশবাসীকে নামিতে হইবে। আর যদি তিনি পারেন তো জাতীয় আন্দোলনের মহত্তম ও উজ্জ্বলতম সংগ্রাম লড়িবার সৌভাগ্যে প্রতি দেশভক্ত গৌরবান্বিত হইবেন।

৩৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

মহামারী প্রতিরোধে সাহায্যের জন্য ডাঃ বিধান রায়ের আবেদন

অন্তত দুই শত কেন্দ্রে মেডিকেল ইউনিট পাঠাইতে হইবে

মেডিকেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরিকল্পনা

আরো অর্থ, ঔষধ ও কর্মী চাই

জনযুদ্ধ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র
৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] ১৪ই জুন, বুধবার, ১৯৪৪, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [দাম ছ'পয়সা

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য যে আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে বাংলা দেশে ২ কোটী লোক মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছে। গত বৎসরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষেও যত লোক মরে নাই, বর্ত্তমান মহামারীতে বোধ হয় তাহার চেয়েও বেশী লোক মরিতেছে। ডাঃ রায়ের আবেদন ও বিবৃতির বিশদ বিবরণ আমরা অন্যত্র (পৃষ্ঠা ৩) ছাপিলাম।

তিনি বলিয়াছেন যে, রোগগ্রস্ত বাংলাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব শুধু গভর্ণমেণ্টেরই নয়, দেশবাসীরও বটে। মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি এখন পর্য্যন্ত ৭১টা চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিয়া প্রায় ১২ লক্ষ রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যৎসামান্য। অন্ততঃ দেড় হাজার কেন্দ্র খোলা দরকার। এত কেন্দ্রের উপযুক্ত টাকা, ঔষধ প্রভৃতি তো নাইই; ২০০ কেন্দ্র খুলিবার যে আশু পরিকল্পনা আছে তাহার উপযোগী টাকাও নাই। ২০০ কেন্দ্রের জন্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দরকার অথচ কমিটির হাতে এখন মাত্র কয়েক হাজার টাকা বাকী আছে।

বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন দলের পৃষ্ঠপোষিত যত রিলিফ সংগঠন আছে, এবং উহাদের বাহিরেও যে সব সেবা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার প্রায় সমস্তই এই কমিটিতে সম্মিলিত হইয়াছে। এই কমিটির কাজে সাহায্য করিলে শুধু রোগী সেবায়ই সাহায্য হইবে না, বাংলার জাতীয় ঐক্যও শক্তিশালী হইবে—সকল দিক দিয়া বাংলা বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে।

ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও তিনি এই ঐক্যবদ্ধ সেবায় যথেষ্ট সাড়া পাইতেছেন। তাঁহারা টাকা পাঠাইতেছেন, চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী পাঠাইতেছেন। কিন্তু বাংলা দেশ হইতে এখনি আরও প্রচুর সাহায্য চাই, কারণ ইহা বাঙ্গালীরই জীবন মরণের প্রশ্ন।

আমরা সমস্ত দেশবাসীর কাছে ডাঃ রায়ের আবেদন উপস্থিত করিতেছি। দুর্ভিক্ষের সময় যে-সব রিলিফ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল আমরা সকলের আগে সেগুলির কাছে আবেদন করিতেছি, কারণ তাহাদের প্রায় সকলেরই হাতে কিছু কিছু টাকা জমা আছে এবং তাহারাই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি সাহায্য করিতে পারে। আমরা জানিতে পারিলাম যে সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে এখনও প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, বেঙ্গল রিলিফ কমিটিতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা, মেয়র রিলিফ ফণ্ডে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা—এইরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখনও যথেষ্ট টাকা জমা আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা জমা টাকার অন্ততঃ কিছু অংশ এখনই ডাঃ রায়ের কমিটির হাতে দিন। তাহাতে তাঁহাদের নিজস্ব সেবাকার্য্যের গৌরবও বাড়িবে।

দেশভক্ত চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্রদের কাছে আমরা আবেদন করিতেছি যে চিকিৎসাকেন্দ্রের ভার লইবার জন্য তাঁহারা আগাইয়া আসুন। অন্তত ২।৩ মাস করিয়াও যদি তাঁহারা সেবা কার্য্যে যোগ দেন তাহাতে কমিটির কাজ যথেষ্ট প্রসার লাভ করে।

আর দেশবাসীর কাছে আবেদন—অর্থ ও ঔষধ যিনি যাহা পারেন তাহা দিয়াই এখনি কমিটিকে সাহায্য করুন। আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলে না, কারণ তাড়াতাড়ি রোধ করিতে না পারিলে এই মহামারী দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ভাবে বাঙ্গালীর জীবন পঙ্গু করিয়া দিবে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—**বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি**
৮৪।৩-এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

জয়ের পথ

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির পর দেশে যে নূতন আশা জাগিয়াছিল ধীরে ধীরে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। পার্লামেণ্টে আমেরী জবাব দিলেন গান্ধীজির মুক্তি অসুস্থতার জন্য এবং ইহার পিছনে কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। গান্ধীজি মিঃ জয়াকরের নিকট লিখিলেন—আমি আমার মুক্তির জন্য লজ্জিত। আমলাতন্ত্র দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছে—'এক ইঞ্চিও নামিব না,' আর ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা অসহায়ভাবে বলিতেছেন—আমি আর কী-ই বা করিতে পারি?

গান্ধীজির মন হইতে যে হতাশার আভাষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দ্বারা সমগ্র ভারতের মর্ম্মান্তিক বেদনার কাহিনীই ব্যক্ত হইতেছে। গান্ধীজি এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই, তিনি এখনও বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করিতেছেন। অচল অবস্থা অবসানের জন্য কোন পথ শ্রেয়ঃ তাহা নির্ব্বাচনের জন্য গান্ধীজিকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের।

জাপ শত্রুর আক্রমণে ভারত যখন বিপন্ন, আসামের নরনারীর মাথায় যখন ফ্যাশিস্ট দস্যুর আঘাত পড়িতেছে, বাংলা যখন দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষে এবং মহামারীর পর মহামারীতে বিলুপ্ত হইতে চলিল তখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা অচল অবস্থার অবসানই একমাত্র পথ—যে পথে ভারত গৌরবময় মুক্তি, শান্তি ও নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

কিন্তু কি করিয়া অচল অবস্থার অবসান হইবে? জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি লর্ড ওয়াভেলকে আবেদন জানাইতেছে। লর্ড ওয়াভেল যদি বুঝেন যে অতীতে গভর্ণমেণ্টেরই ভুল হইয়াছে, লর্ড ওয়াভেল যদি গান্ধীজির মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করেন তাহা হইলেই অচল অবস্থা দূর হয়—ইহাই সংবাদপত্র জগতের অভিমত। এই রকম মনোভাব দেশের পক্ষে আজ বিপজ্জনক। অচল অবস্থার অবসানের জন্য ওয়াভেলের কাছে আবেদন করিয়া কোন লাভ নাই, যুক্তি তর্কে বা অনুরোধ উপরোধে সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় কখনও বিগলিত হইবে না। অচল অবস্থায় আমলাতন্ত্রের কিছু কিছু অসুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর লাভ হইয়াছে তাহারই। আজ ওয়াভেলের দিকে তাকাইয়া থাকার অর্থ সমগ্র ভারতকে মহামন্বন্তর ও মহামৃত্যুর পথে ঠেলিয়া লইয়া চলা।

কারাগারের অভ্যন্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের চিন্তাস্রোত কোন পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ সৈয়দ মামুদের চিঠিতে। এই চিঠি তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার পুত্রের নিকট। (এই চিঠি অন্যত্র প্রকাশিত হইল।) জাপ আক্রমণের প্রতিরোধে সমগ্র ভারতের জনআন্দোলন গড়িয়া তোলা হউক, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ ও স্বার্থ সংঘাত আছে তাহা যেন কোনমতেই আমাদের জাপ প্রতিরোধের পন্থা হইতে বিচলিত না করে—ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও অভিমত এইরূপ, এবং এইমত যেন সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

অচল অবস্থার অবসান কোন পথে হইবে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে ডাঃ সৈয়দ মামুদের চিঠিতে। ৯ই অগাষ্টের পর হইতে কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোল—এই পথেই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, এই পথেই অচল অবস্থা অবসানের জন্য আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করা যাইবে।

(৩য় কলমে দেখুন)

কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য

ডাঃ সৈয়দ মামুদের চিঠি

"জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে।"

সম্প্রতি কংগ্রেসনেতা ডাঃ মামুদ তাঁর কমিউনিষ্ট পুত্র হবিবের কাছে একটী চিঠি লিখিয়াছেন, সেই চিঠিটী আমরা নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

[বিহারের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-মন্ত্রী ডাঃ মামুদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যতম সভ্য। ওয়ার্কিং কমিটীর অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে তিনি একই জেলের মধ্যে আছেন।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ও বিশেষ করিয়া জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যরা কি ভাবিতেছেন, সাধারণ দেশভক্তরা তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই চিঠি সেই বিষয়েই সকলকে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিবে।]

ডাঃ মামুদ লিখিতেছেন ঃ—

ভারতে জাপানী আক্রমণ হওয়াতে নিশ্চয়ই তুমি খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছ।

ইংরাজ ফৌজ এবার নিশ্চয়ই এই আক্রমণকে ভালভাবেই রুখিবার চেষ্টা করিবে—কেননা, আগের মত এবার তারা ততটা অপ্রস্তুত নয়। তবু এই অবস্থায় আমরাও যথেষ্ট বিচলিত হইয়াছি। কেননা, এই আক্রমণ যে ভারতে অভিযান করিবার উদ্দেশ্যে, তা বেশ বোঝা যায়।

জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি করা দরকার। দেশবাসীর মনোবল অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়া যে জাপ-আক্রমণ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকিব, তা মোটেই কাজের কথা নয়। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের বিরোধ যাই হোক না কেন, জাপানী আক্রমণের ব্যাপারে আমরা সকলেই এক।

এ সম্বন্ধে আমরা যা ভাবিতেছি তা তুমি অপরাপরকে বলিতে পার। কেননা, সরকার আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রচার করিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে অনেক ভুল ধারণা থাকিতে পারে। ★

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট……জার্ম্মাণ দুর্গ নির্ম্মাণ বিশারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত কারেলিয়ান প্রাচীর সোভিয়েট-সৈনারা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে এবং এই ভাঙ্গনের ভিতর দিয়া সোভিয়েট সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইতালীর ফ্রণ্ট……ইতালীতে পঞ্চম আর্ম্মি টাইবার নদীর পূর্ব্বতীরে রিয়েতির ১৭ মাইল পশ্চিমে ক্যাটালুপো দখল করিয়াছে।

(৪র্থ কলমের শেষাংশ)

আমাদের দাবী ওয়াভেলের কাছে নয়, গান্ধীজির কাছে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ যে পথের চিন্তা করিতেছেন গান্ধীজি সেই পথে জনগণকে ডাক দিলে দেশে আজ অভাবনীয় জাতীয় শক্তি জাগিয়া উঠিবে। আমাদের শক্তির উৎস জাতীয় ঐক্য। মুস্‌লিম প্রভৃতি জাতি সমূহের স্বরাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, লীগের বিভিন্ন নেতা আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া গান্ধীজির নিকট হইতে এই ইঙ্গিত প্রত্যাশা করিতেছেন। গান্ধীজি মনস্থির করিয়া অগ্রসর হইলে সাফল্য অনিবার্য্য।

ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের মুক্তিই আজ গান্ধীজিকে বল ও ভরসা দিতে পারে। তাই আজ সমগ্র ভারত তাঁহাদের মুক্তি চায়। কিন্তু ওয়াভেলের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাঁহাদের মুক্তি হইবে না, কংগ্রেস এবং লীগের নেতারা সমবেত ভাবে ডাঃ সৈয়দ মামুদের চিঠির মর্ম্ম অনুযায়ী গণ-আন্দোলন গড়িবার জন্য একতাবদ্ধ হউন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দাবী তুলুন কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। অন্ততঃ এইটুকু যদি আমরা করি, দেশে স্বদেশপ্রেমের অভাবনীয় নবজাগরণ সুরু হইবে, তাহার প্রভাব জাতীয় জয়ের পথ বাধামুক্ত করিবে। এ পথে জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাদোলিও পর্ব্বের অবসান

ইটালীতে জনগণের গভর্ণমেণ্ট—নূতন ইটালীর জন্ম

সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি সত্য প্রমাণিত

তিন মাস আগে যখন ইটালীর বদোলিও গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়া সোভিয়েটের ঘোষণা বাহির হইয়াছিল, তখন আমাদের দেশের অনেক লোক সোভিয়েটনীতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। তাদের প্রশ্ন ছিল : বাদোলিও গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া বাদোলিও ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদেরই প্রতিষ্ঠা ইটালীতে করিয়া দেওয়া হইল না কি ? তারা মন্তব্য করিয়াছিল : বৃটিশ ও আমেরিকা যা করিল না, তাও শেষকালে সোভিয়েট করিয়া বসিল ?

লোকে তখন বুঝে নাই যে, সোভিয়েট বদোলিও গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিল প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র অচল করিয়া জনগণের গভর্ণমেণ্টের পথ খোলসা করিবার জন্যই। আজকে বাস্তব ঘটনার ভিতর দিয়া তাই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ৯ই জুন রয়টার খবর দিতেছে :—

প্রিন্স উম্বার্টো ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী আইভানহো বোনোমিকে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে ভার দিয়াছেন। বোনোমি বলিয়াছেন যে নূতন মন্ত্রীরা এবার যে শপথ গ্রহণ করিবে তা মাতৃভূমির নামেই করিবে, রাজবংশের নামে নয়। মার্শাল বদোলিও রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেন। গতকল্য রাজনৈতিক নেতাদের এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বদোলিওর প্রতি অনাস্থা জানান হইয়াছে। সিনর বোনোমিকে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে ভার দেওয়ার কারণ এই যে, তিনি জাতীয় মুক্তি কমিটির সভাপতি।

শুধু বদোলিওর অপসারণ নয়, ইটালীর একতাবদ্ধ জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসিল—ইহাই আজকে ইটালীর নূতন পরিস্থিতি। ইটালীর জনগণ আজকে ফ্যাসিজমকে রুখিবার জন্য সমস্ত শক্তিকে এমনভাবে একত্র করিল, যাতে কোন ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী নীতি আর সেখানে টিকিতে পারিবে না। ইহা নূতন ইউরোপ গঠনের পথে ইটালীর দ্রুত পদক্ষেপ। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরা যে আবার ইহাতে আঁতকাইয়া উঠিবে, তাতে সন্দেহ নাই। বিদেশের প্রতিক্রিয়া এখনো আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু ষ্টেটস্‌ম্যানের মন্তব্য সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়াছে—বদোলিও-পর্ব্বের যবনিকাপাতে তাঁরা মোটেই খুসি হইতে পারেন নাই। তাঁরা টিপ্পনী কাটিয়া বলিয়াছেন যে, নূতন গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা যত ভালই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, তারা কি রকম কাজ করে, তার উপরই সব নির্ভর করে।

'এ্যামগট' কি চাহিয়াছিল ?

ফ্যাসিজমকে রুখিতে জণগণের পূর্ণ একতা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ইটালীর এই মুক্তি সম্ভব করিয়াছে। ইটালীর গত ১০ মাসের ইতিহাস এই একতারই সংগ্রাম।

যুদ্ধ-বিরতির পর মিত্রপক্ষ 'এ্যামগট' (অধিকৃত দেশের জন্য মিত্রপক্ষীয় সামরিক শাসন) গঠন করিয়া ইতালীর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব লইল। এই 'এ্যামগটে' বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাঙ্কার ও অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলদের প্রতিপত্তি। 'এ্যামগটের' নীতি ফ্যাসিষ্ট-প্রতিরোধের কাজে জনসাধারণকে মাথা তুলিতে না দেওয়া, যাতে লড়াই জিতিবার পর ইঙ্গ-আমেরিকান কর্তৃত্ব ইটালীর উপর বজায় থাকে। 'এ্যামগটের' প্রত্যেকটা কাজে তারই প্রমাণ। সিসিলি অধিকারের পর 'এ্যামগট' ফ্যাসিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হয় নাই। ইটালীতে নূতন নির্ব্বাচিত মেয়রকে বাতিল করিয়া 'এ্যামগট' ফ্যাসিষ্টপন্থী মেয়রকেই তার জায়গায় বসাইল। গত মার্চ্চ মাসে সেলান্টিনে নামক একজন বড় ধনিক ফ্যাসিষ্টপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য নেপল্‌সের বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইল। কিন্তু 'এ্যামগট' আবার তাকে একটা অজুহাত দেখাইয়া কাজে নিযুক্ত করিল।

'এ্যামগটের' এই ফ্যাসিষ্ট-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ইতালীর জনগণ আন্দোলন শুরু করিল। গত নভেম্বরে ইতালীর কমিউনিষ্ট নেতা আর্কোলি প্রাভদায় লিখিয়াছিলেন : 'এ্যামগটের' দ্বারা ইতালীর জনগণকে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না। জার্ম্মানদের হারাইবার জন্য সমস্ত দেশকে একতাবদ্ধ করাই এখানকার কাজ, কিরকম গভর্ণমেণ্ট হইবে, তা লইয়া তর্ক করা এখনকার কাজ নয়।

সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিতেও আওয়াজ তোলা হইল : 'এ্যামগটকে' বাতিল করা হউক, কেননা, 'এ্যামগট'-পুরানো ফ্যাসিষ্ট যন্ত্রকেই ইতালীতে কায়েম রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। মস্কোতে যে ত্রি-শক্তি সম্মেলন হইল তাহাতে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত লওয়া হইল : ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সমস্ত শ্রেণীর ইতালীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, রাষ্ট্রযন্ত্র হইতে ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট-সমর্থক সমস্ত লোকদের বিতাড়িত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটী মিত্র-পক্ষীয় কমিশন বসিল।

ইঙ্গ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নূতন চাল

তখন ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আবার চেষ্টা হইল কি করিয়া বদোলিও ও জনগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া 'এ্যামগটকে' বজায় রাখা যায়। বদোলিওকেও তারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজাকেও হাতে রাখিবার চেষ্টা করিল। বারি কংগ্রেস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করা হইল। তাদের চক্রান্ত খানিকটা সফলও হইল। কি রকমের গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে, তাই লইয়াই রাজা, বদোলিও ও জনসাধারণের মধ্যে ঝগড়া চলিতে লাগিল। বারি কংগ্রেসে ইতালীর জনগণের জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হইল, কিন্তু এই ঝগড়ার মধ্যেই এই কমিটির দৃষ্টি আবদ্ধ রহিল। এই রাষ্ট্রীয় অচল অবস্থায় চার্চ্চিল কোম্পানীরই সুবিধা হইল। চার্চিল পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন যে, যতদিন ইটালীতে যুদ্ধ চলিবে, ততদিন 'এ্যামগট' ছাড়া কাজ চলিতে পারে না।

বাদোলিও গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার এই চাল ব্যর্থ করিল

ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ইতালীর মুক্তির পথ গড়িয়া তুলিবার প্রথম উপায় হইল—'এ্যামগটের' বদলে ইটালীর নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। এই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেই ইতালীর জনগণের যোগসূত্র সম্ভব, এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইলে বদোলিওর উপর 'এ্যামগটের' কর্তৃত্ব লোপ পাইবে, বদোলিওকে দাঁড়াইতে হইবে ইটালীর জনগণের সাথে। ইটালীর জনগণের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ঐক্য যত ব্যাপক ও দৃঢ় হইবে, বদোলিও গভর্ণমেণ্টও তত প্রগতিশীল হইতে বাধ্য হইবে। বদোলিও-গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়া সোভিয়েট এই পথটাই ইটালীয় জনগণের সামনে খুলিয়া দিল। ইজভেস্টিয়ায় (৩০শে মার্চ্চ) লেখা হইল : বদোলিও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি কমিটীর মিলন এখনও হয় নাই, তাই অচল অবস্থা বজায় রহিয়াছে। ইহাতে হিটলারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়েই সব চেয়ে ক্ষতি হইবে।

বদোলিও গভর্ণমেণ্ট স্বীকারের প্রথম ফল হইল এই যে, জনগণের চাপ বদোলিওর উপর কার্য্যকরী হইল। বদোলিও স্বীকার করিল যে, রোম মুক্তির পরই রাজা আসন ত্যাগ করিবেন। ফ্যাসিষ্টদের তাড়াইবার কাজও বদোলিও সুরু করিল। নেপল্‌স্ হইতে ৬১০ জন ফ্যাসিষ্ট আমলাকে তাড়ান হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর জনগণের বিভিন্ন দলের মধ্যেও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী প্রশ্নে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তি তৈরী হইল। ইহারই ফল ফলিল নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনে। ২১শে এপ্রিল নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করা হইল। তাতে বদোলিও ও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি একত্র মিলিল। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জাতীয় ঐক্যের নীতির প্রথম জয় হইল।

লড়াইয়ে নূতন শক্তি

জাতীয় ঐক্যের বাস্তব ফল দেখা গেল লড়াই ফ্রণ্টে। উত্তর ইতালীতে জনগণের গেরিলা বাহিনী নূতন শক্তি পাইল। উত্তর ইতালীর কারখানাগুলিতে মজুররা সাবোতাজ করিয়া ফ্যাসিষ্টদের শক্তি ক্ষয় করিতে লাগিল। নূতন গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় জনগণের এই লড়াইয়ের সঙ্গে মিত্র ফৌজের লড়াইয়ের যোগসূত্র তৈরী হইল। এই নূতন গভর্ণমেণ্টের ভিতর দিয়া ইতালীর ফ্যাসিষ্টবিরোধী লড়াইয়ে সব চেয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবার সুযোগ ইতালীর জনগণ পাইল। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এখন আর প্রতিক্রিয়াশীলদের দাঁড়াইবার শক্তি নাই। তাই ক্রমশঃ বদোলিওর স্থানও সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল।

রোমের পতনে ইতালীর মুক্তির যে সূচনা গড়িয়া উঠিল তা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে জনগণের শক্তিকে আরো বাড়াইয়া দিল, প্রতিক্রিয়ার শেষ রেশটুকুও আর থাকিতে পারিল না। ৯ই জুনের রয়টারের খবরে তারই পরিচয়।

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সর্ব্বভারত সম্মেলন

শ্রীযুক্তা নাইডু নূতন সভানেত্রী

গত ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখে বোম্বাই শহরে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সর্ব্বভারত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন "বোম্বাই ক্রনিকলের" সম্পাদক বিখ্যাত দেশভক্ত সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শতাধিক প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যসংখ্যা ১১০০-এরও বেশী হইয়াছিল। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত কনভোকেশন হলে দুইদিন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে অন্তত ২০০০ নাগরিক সমবেত হন।

সমিতির কার্য্যক্রম সম্পর্কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বহু মনীষী তাঁহাদের বাণী প্রেরণ করেন। সোভিয়েটের বহুমুখী কৃতিত্ব ও লালফৌজের বিজয়বৈজয়ন্তী যে আজ সর্ব্বস্তরের মানুষের মনকে স্পর্শ করিয়াছে, এই বাণীগুলি ছিল তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। সকল দলের দেশভক্ত এবং চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্ববিভাগের প্রতিনিধিরাই অকুণ্ঠচিত্তে সোভিয়েটের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। সরকারী হুকুমে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এখন কোথাও বক্তৃতা করিতে পারেন না বলিয়া সোভিয়েট সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে যে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই সভায় পঠিত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অন্যান্য যেসব কংগ্রেসনেতা বাণী প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভুলাভাই দেশাই, রাজাগোপালাচারি, শ্রীপ্রকাশ, সম্পূর্ণানন্দ, ডক্টর ও শ্রীমতী সুব্বারায়ণ, গোপাল রেড্ডি, গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের নাম উল্লেখযোগ্য। লীগ নেতাদের মধ্যে ছিলেন নিখিল ভারত লীগ কাউন্সিলের সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান্‌ ও ঐ কাউন্সিলের সভ্য জাফর ইমাম, বাংলায় চৌধুরী মুয়াজ্জম হোসেন (লাল মিঞা), প্রভৃতি। লেখকদের মধ্যে ছিলেন কেরলপ্রদেশের বল্লাটোল, বাংলায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী, মহারাষ্ট্রের মামা ওয়ারেরকার। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন যামিনী রায় ও রবিশঙ্কর রাভেল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছিলেন ব্যাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর এচ্, জে, ভাবা। লিবারাল নেতাদের মধ্যে ছিলেন সার মহারাজ সিং। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পুনার অধ্যাপক কোসাম্বি, হায়দারাবাদের অধ্যাপক রাজিউদ্দীন সিদ্দীকি, আলিগড়ের অধ্যাপক হবিব, বোম্বাইয়ের অধ্যাপক জাধার প্রভৃতি ছিলেন। সোভিয়েট যে আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের মনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সম্মেলনের দুইদিনই কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমবেত সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি বক্তৃতা ও কয়েকটী বাছাই-করা বাণী পঠিত হইবার পর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রীর অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চিন্তা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, কিন্তু তিনি জানেন যে ভারতবর্ষ শুধু নিজের জন্য লড়িতেছে না, ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বজনের স্বাধীনতাকেই সম্ভব করিতে পারিবে। তাই সর্ব্ববিষয়ে সোভিয়েটের পথে চলা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ থাকিলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে সোভিয়েটের স্বাধীন নরনারীর অপূর্ব্ব বীরত্বের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন, এবং সোভিয়েট যে সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য্য জীবন-ব্যবস্থাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য সমগ্র

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্পোরেশনে নূতন চুরি ধরা পড়িল

রাস্তার আবর্জনা সাফ করাইবার জন্য বিশেষ কমিটি

কলিকাতার রাস্তায় জঞ্জাল সাফের জন্য যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের অনেক জঞ্জালও ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার আগে আমরা জানাইয়াছিলাম যে জঞ্জাল-সাফ আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও হেল্‌থ অফিসার দুজনেই ছুটী লইয়া চলিয়া যান। এমন জরুরি কাজে যে কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহারা অনুভব করেন নাই।

তাহার পর আরও অনেক ভারী ভারী গলদ বাহির হইয়াছে। ময়লা সরাইবার জন্য কর্পোরেশনের নিজস্ব লরী ছাড়াও কতকগুলি কন্‌ট্রাক্টরের লরী কাজ করে এবং তাহাদের কাজ বুঝিয়া লওয়ার ভার ডাঃ বি-এন-দে পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের উপর। সম্প্রতি চিড়িয়াঘাটা আবর্জনা কেন্দ্রে মেয়র মহাশয়ের হঠাৎ পরিদর্শনের ফলে এই বিভাগের গুরুতর ত্রুটী ধরা পড়িয়াছে। মেয়র দেখিতে পান যে কতকগুলি কন্‌ট্রাক্টরের লরি আসিয়াছে ও গিয়াছে বলিয়া হাজিরা বইতে লেখা আছে, কিন্তু সেগুলিকে সেই সময়ের মধ্যে আসিতে দেখা যায় না। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পায় যে উহার মধ্যে একটী লরি চাকাহীন অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া বসিয়া আছে এবং আর একটী লরি সকাল হইতে রাস্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। তবুও সেগুলি কাজ করিয়াছে বলিয়া হিসাব লেখা হইয়াছে এবং ধরা না পড়িলে কর্পোরেশনকে তাহার টাকাও দিতে হইত। তা ছাড়া প্রত্যেক লরীতে চার জন করিয়া মজুর দেওয়ার কথা কিন্তু কোনো লরীতেই তিন জনের বেশী মজুর দেখা যায় না। কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও অকর্মণ্যতা এবং কন্‌ট্রাক্টরদের বড়যন্ত্র এমনি করিয়াই কলিকাতার জনসাধারণের টাকা উড়াইতেছে এবং জনসাধারণকে আবর্জনা ও মহামারীর মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে।

গত ৫ই ও ৯ই জুন কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় এই বিষয়ে এবং শহর পরিষ্কার করা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে তুমুল আলোচনা হয়। শহর পরিষ্কার ও অনাচার দূর করা সম্বন্ধে আরও চেষ্টা ও তদন্ত হওয়া উচিত তাহাতে সকল কাউন্সিলর একমত হন। কিন্তু কাউন্সিলরদের মধ্যে কয়েকজন—কেহ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ লইয়া, কেহ কর্পোরেশনের পক্ষ লইয়া, কেহ ডাঃ দে'র পক্ষ লইয়া, কেহ অন্য কর্মচারীদের পক্ষ লইয়া ওকালতি করে। ইহার প্রতিবাদে কাউন্সিলর কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন যে কর্পোরেশনের সব ডিপার্টমেণ্টে প্রায় সর্ব্বত্রই অনাচার চলিয়াছে—এখন কাউন্সিলররা যদি কোন বিশেষ কর্মচারী বা দলের পক্ষে বা বিপক্ষে লড়িতে থাকেন তো কাউন্সিলরদের সেই ভেদের সুযোগ লইয়া অনাচার-সৃষ্টিকারীরাই টিকিয়া থাকিতে পারিবে। সকলে এক হইয়া অনাচার দূর করার কাজে কোমর বাঁধিতে হইবে—আবর্জনা সাফ সম্বন্ধেও বিস্তৃত পরিকল্পনা লইয়া পূর্ণোদ্যমে সমস্ত কর্পোরেশনকে কাজে নামাইতে হইবে।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে এক মাসের মধ্যে কন্‌ট্রাকটর লরি তুলিয়া দিতে হইবে। আবর্জনা সাফ করা বিষয়ে তদন্ত ও বিস্তৃত পরিকল্পনা দাখিল করিবার জন্য ১২ জন সভ্য লইয়া একটী বিশেষ কমিটি গঠিত হয়।

অতীতে কর্পোরেশনে অনেক কমিটি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কাউন্সিলরদের গাফিলতিতে কিংবা কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতায় কিংবা অন্যান্য কারণে অনেক সময়ে তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। আমরা আশা করি বর্ত্তমান কমিটি তাড়াতাড়ি ও সত্য সত্যই কাজ করিবে। ইহার জন্য জনসাধারণের দিক হইতেও সজাগ দৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

রোগীসেবার কাজে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বাংলা

মেডিকেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ৬ কোটী বাঙ্গালীর গৌরব

বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল ইউনিটের কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ

বাংলায় ২ কোটী লোক রোগাক্রান্ত

ডাঃ বিধান রায়ের বিবৃতি

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সমস্ত মেডিকেল রিলিফ প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করিয়া সংগঠিতভাবে রিলিফ কাজ চালানোর জন্য বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়। প্রায় প্রত্যেকটি রিলিফ প্রতিষ্ঠানই এই কমিটির সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত প্রদেশে ব্যাপকভাবে মেডিকেল রিলিফের কাজ চালাইতেছে। বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক **ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়** এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বি, সি, রায়ের বিবৃতির সারাংশ— বাংলাদেশের সর্ব্বত্র মহামারীতে খুব বেশী লোক মারা যাইতেছে। বাংলার এমন কোন জেলা নাই যেখানে লোকের মৃত্যু সংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায় নাই। গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলার ১৮টি জেলায় কলেরা ও বসন্ত মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে নিম্নলিখিত রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলি দলনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া কাজ করিতেছে—বেঙ্গল সিভিল প্রোটেকশন কমিটি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল মুসলীম লীগ রিলিফ কমিটি, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি, প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটি, ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স ইউনিট, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন রিলিফ কমিটি, নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি, বেঙ্গল উইমেনস ফুড কমিটি, মেয়র রিলিফ ফণ্ড, পিপলস্ রিলিফ কমিটি, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, শিক্ষক ও ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটি, ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি, পাঞ্জাব রিলিফ কমিটি, মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি।

মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ৭০টিরও বেশী সেবাব্রতীদল বাংলার বিভিন্ন স্থানে সেবা কার্য্য চালাইতেছে। **গত ৩ মাসে এই দলগুলি ১০ লক্ষেরও বেশী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে। কিন্তু রোগীর তুলনায় ইহা কিছুই নয়।** আমাদের ২ কোটিরও বেশী দেশবাসী আজ রোগে শয্যাশায়ী। **তাহাদের বাঁচাইবার দায়ীত্ব কেবল গভর্ণমেণ্টের নয়, আমাদেরও বটে।**

ঔষধের অভাব ঘটিয়াছে। এই পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ১২৪০০০ পাউণ্ড কুইনাইন দিয়াছেন। **কিন্তু প্রয়োজন অবিলম্বে কমপক্ষে ২৩০০০০ পাউণ্ড।** কুইনাইন বণ্টনের ব্যবস্থারও উন্নতি করিতে হইবে। **অর্থের প্রয়োজন সমাধিক।** আজ **যদি এই সহস্র সহস্র রোগীর জীবন রক্ষা করা না যায়, তবে বাংলায় চাষ করার লোকের অভাব ঘটিবে, বাংলার শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্রগুলি শ্মশানের মত হইয়া যাইবে।**

আমরা শত শত সেবাব্রতী দলকে যথোপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম দিয়া পল্লী অঞ্চলে পাঠাইতে চাই। আমরা এই বিরাট কার্য্যে আমাদিগকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

সেবাব্রতীদের হিসাবে দেখা যায় **প্রায় ২ কোটির বেশী লোক রোগাক্রান্ত হইয়াছে।** বসন্ত ভয়ানক ভাবে হইতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসে কলেরার প্রকোপ একটু কমিয়াছিল, এখন আবার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিবার লক্ষণ নাই, বরং কতগুলি জেলায় ইহার প্রকোপ বাড়িতেছে। **চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের** অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। সেখানের শতকরা ৭০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। **নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা ও মেদিনীপুরের** শতকরা ৫০ জনের বেশী ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। **অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক। ইহা বুঝিয়াই**

৫টী জেলায় মহামারীর প্রকোপ সম্পর্কে

ডাঃ বিজয় বসুর বিবরণ

বি, এম, আর, সি, সি-র ফিল্ড ইনস্‌পেক্টর ডাঃ বিজয় বসু এপ্রিলের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাংলায় মহামারী উপদ্রুত এলাকায় মেডিকেল রিলিফের কাজ পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্ট হইতে অবস্থার গুরুত্ব সহজেই ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি **বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে** পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিভিন্ন জেলা সম্পর্কে তাঁহার বিবরণের চুম্বক নীচে দেওয়া হইল:

বরিশাল

জেলার শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। কালাজ্বর, পাঁচড়া ও খাদ্যাভাবজনিত রোগে শতকরা ৯০ জন আক্রান্ত। মেডিকেল রিলিফের জন্য কুইনাইন ও গন্ধকের অত্যন্ত অভাব। সরকার হইতে মেডিকেল রিলিফের জন্য সমস্ত জেলায় মাত্র ৯০০ বেডের বন্দোবস্ত আছে। কলেরার প্রাদুর্ভাব আছে। ইহা ছাড়া ব্যাপক ভাবে যৌন ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়াছে। সদর, পটুয়াখালী ও ভোলা মহকুমাই সব চাইতে বেশী আক্রান্ত। **অবিলম্বে অন্ততঃ ১০টি কেন্দ্র খোলা দরকার। পিরোজপুরে** সকল দলের একটি রিলিফ কমিটি খোলা হইয়াছে এবং শহরে বি, এম, আর, সি, সি-র একটি শাখা খোলা হইয়াছে। **ভোলাতে** একটি সভায় স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতারা মেডিকেল রিলিফের কাজে সহযোগিতা জানাইয়াছেন।

নোয়াখালী

জেলার আক্রান্ত রোগীদের ভিতর শতকরা ৪৫ জন বসন্ত রোগে এবং ১০ জন ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে ভুগিতেছে। ইহা ছাড়া পাচড়া ও যৌন ব্যাধির প্রকোপও আছে। কুইনাইনের অভাব এবং গন্ধক একেবারে দুষ্প্রাপ্য। সমস্ত জেলার জন্য সরকার ৯০০ বেডের বন্দোবস্ত করিয়াছে। **ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ ২০টি কেন্দ্র অবিলম্বে খোলা চাই।**

কাটাখালি জেলেদের অঞ্চল, অথচ কাহারও জাল বা নৌকা নাই। শতকরা ৬০ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। বসন্তের আক্রমণ আছে। **কিন্তু মেডিকেল রিলিফের কোন বন্দোবস্তই নাই।** এখানথেকে সবচেয়ে নিকটে যে হাসপাতাল তাহার দূরত্ব ৭ মাইল। পি, আর, সি হইতে একটি মেডিকেল ইউনিট সম্প্রতি পাঠান হইয়াছে।

চট্টগ্রাম

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী, কলেরা ও বসন্ত একটু কমিয়াছে, কিন্তু পাচড়া ও যৌনব্যাধির মারাত্মক আক্রমণ সুরু হইয়াছে। সরকারী রিলিফ হাসপাতালের সংখ্যা ৪৬। তাহাতে ১০০০ বেড আছে। জেলা মেডিকেল রিলিফ কমিটির কাজের ধারা খুব প্রসংশনীয় বলিয়া **এখানে অবিলম্বে ২০টি কেন্দ্রের উপযোগী ঔষধ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পাঠাইলেই রিলিফের কাজ চালানো যাইবে।**

কাগথুলি গ্রামটি একবারে ধ্বংসের মুখে। প্রতি ঘরেই মৃত্যুর তাণ্ডব। **গত ৪ মাসে ২০০০ লোকসংখ্যা ৫০০ তে দাড়াইয়াছে। ফতেহাবাদে** শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত।

ত্রিপুরা

শতকরা ৬০ হইতে ৭০ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত—বসন্তরোগ কমিতেছে। কিন্তু কলেরার প্রকোপ খুবই। কিন্তু সরকার হইতে বন্দোবস্তের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। **জেলায় অন্ততঃ ৫টি কেন্দ্র খোলা দরকার।**

এক সময়ে **ব্রাহ্মণবাড়িয়া** খুবই স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শতকরা ৭০ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। নিঃস্ব হাসপাতালের অবস্থা খুবই শোচনীয়। **রাত্রে একজন বসন্ত রোগীকে একেবারে শিয়ালে টানিয়া নেয়।** এই অঞ্চলের তাঁতি, জেলে ও দিনমজুররাই মহামারীতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ

জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপক ম্যালেরিয়া। **কিশোরগঞ্জে** বসন্তের আক্রমণও খুবই বেশী। জেলায় আবার কলেরার আক্রমণ সুরু হইয়াছে। পাচড়া প্রায় প্রতি ঘরেই। **এই জেলায় অবিলম্বে অন্ততঃ ১২টি মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্র খোলা দরকার।** শহরের মেডিকেল রিলিফ কমিটির সাথে আলাপ আলোচনায় দেখা গেল, এই কমিটি বি, এম, আর, সি, সি-র সাথে একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত।

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

চিকিৎসার জন্য ১৫00 কেন্দ্র চাই

কি ভাবে বাংলা দেশের প্রচণ্ড মহামারীর আক্রমণ রোধা যায়, গত ৬ই জুন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার নিজের গৃহে কলিকাতার সাংবাদিকদের সহিত সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠক হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—

—যে সব জেলাগুলিতে মহামারী দেখা দিয়াছে তাহাদের সমষ্টিগত লোক সংখ্যা সাড়ে চার কোটির উপর।

—বি, ম, আর, সি, সি'র ৭১টি কেন্দ্রে আজ পর্য্যন্ত ১২৯৬০০০ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

—মহামারী রোধার ব্যাপক চিকিৎসা চালাইতে হইলে অন্ততঃ ১৫০০ কেন্দ্র খোলা দরকার।

—কিন্তু বি, এম, আর, সি, সি বর্ত্তমানে ঐ ৭১টি কেন্দ্র সমেত মাত্র ২০০ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিয়াছে।

—এই কেন্দ্রগুলির ব্যয় পড়িবে ৫৭০০০০৲ টাকা।

—ম্যালেরিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য চারি লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার, কিন্তু সরকারের বরাদ্দ মাত্র ১ লক্ষ পাউণ্ড।

এই বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন—বোম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে তিনি সম্প্রতি যে সফর করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখিয়াছেন যে ঐ সকল প্রদেশের জনসাধারণ বাংলাকে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। লণ্ডন, এডেন প্রভৃতি স্থান হইতেও সাহায্য পৌঁছিতেছে। জেলের বন্দীরা, কিশোর বাহিনীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত সাহায্য তহবিলে চাঁদা পাঠাইতেছে।

কিন্তু সাহায্যের আন্দোলন সফল করার জন্য যে পরিমাণ প্রচার করা দরকার সংবাদপত্রগুলি সেই পরিমাণ প্রচার করিতেছে না। অথচ সংবাদপত্রের প্রচার কার্য্য দ্বারাই বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

এই সব আলোচনা প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক ডাঃ রায়কে বলেন—সংবাদপত্রের দিক হইতেও অসুবিধা আছে, গভর্ণমেণ্ট সব সময় মহামারী সম্পর্কে কোন খবর প্রকাশ করিতে দেয় না। ডাঃ রায় ইহার জবাবে বলেন—**ইচ্ছা থাকিলেই উপায় করা যায়।** সরকার দুর্ভিক্ষ মহামারীর সংবাদ সব সময় প্রকাশ করিতে না দিলেও, বাংলা দেশের লোক যে এখনও সব শক্তি দিয়া মহামারী রুখিতে আগাইয়া আসে নাই, ইহা প্রকাশ করিতে কখনও আপত্তি করিতে পারে না। বাহির হইতে আমি যে পরিমাণ সাহায্য পাইতেছি, বাংলা হইতে তাহা পাই নাই। এটা সত্য যে বাংলার জনসাধারণের দেওয়ার শক্তি গত দুর্ভিক্ষে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সময়ে আবার অনেকে বড় লোকও হইয়াছেন। তাঁহারা আজ সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতেছেন না কেন? সুতরাং সাংবাদিকদের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ কাগজ মারফত এই সম্পর্কে আন্দোলন চালান। **আমার দৃঢ় ধারণা আছে আন্দোলন ও প্রচার চলিলে বাংলা দেশ হইতেও প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাইবে।**

রাজসাহীতে কলেরা ও বসন্ত

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে রাজসাহী জেলায় কলেরা ও বসন্তের আক্রমণ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সংগঠিতভাবে সেবা কার্য্য চালাইবার জন্য বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কমিটি যে সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে **১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত সেবা কার্য্য চালানো প্রয়োজন।** বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে মিলিটারী মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। **সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত অধিকাংশ নিঃস্বদের হাসপাতালের অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়।**

বোম্বের মেডিকেল স্কোয়াডকে বগুড়াবাসীর অভিনন্দন

বগুড়া জেলায় বোম্বে হইতে আগত মেডিক্যাল ছাত্রদের স্কোয়াডকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য গত ২১-৫-৪৪ তারিখে বগুড়া শহরে সর্ব্বদলের পক্ষ হইতে একটী সভা আহ্বান করা হয়। স্কোয়াডকে অভিনন্দন জানান বগুড়া জেলার প্রাচীন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুরেশ দাসগুপ্ত মহাশয়, মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ সিদ্দিকী এবং শিক্ষক ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ ননীগোপাল দেবদাস। স্কোয়াডের নেতা মিঃ অশোক নানাবতী ধন্যবাদ প্রদান করেন। স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য মিঃ ওমর হাসেম বলেন—"বাংলাকে রক্ষা করা আমাদের প্রাথমিক দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। বাংলাতে আশার আলো দেখা যাইতেছে—মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও শিক্ষক ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে।"

বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া

জমি ও জাতব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নিঃস্ব

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জনশূন্য গ্রাম, উচ্ছন্ন ভিটা

বিক্রমপুর পরগণা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র, সরোজিনী নাইডুর দেশ এই বিক্রমপুর। বিক্রমপুর বাংলার বহু কৃতী সন্তানের জন্মভূমি অতীতের ইতিহাস বিজড়িত এখানকার মাটি। স্বাধীনতা সংগ্রামে এখানকার শত শত যুবক আত্মবলি দিয়াছে, দেশপ্রেমের আহ্বান নিরক্ষর অন্তঃপুরে পর্যন্ত সাড়া জাগাইয়াছে।

...পথে আসিতে আসিতে বিক্রমপুরের এই গৌরবময় ঐতিহ্য স্মরণ করিতেছিলাম। রাস্তায় কচিৎ দু'একজন লোক চোখে পড়ে; পোড়া কাঠের মত শরীরে বসন্ত অথবা পাচড়ার দগ্ধ আঁচড়।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমাই বিক্রমপুর বলিয়া পরিচিত। গত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে এই মহকুমার ৯ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮০ হাজার লোক মরিয়া গিয়াছে। ইহাদের মৃতদেহের ভিড়ে খালনালার জলস্রোত রুদ্ধ হইয়াছিল। যার শরীরে শক্তি ছিল, সে মাঠে, নদী-নালায় মৃতদেহ টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। যার শরীরে কুলায় নাই, তার ঘরের উঠানে শিয়াল, শকুনিরা শবদেহ ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। লৌহজঙ্গের ব্যবসায়ীরা দুর্গন্ধে টিঁকিতে পারে নাই, পাইকারী কবর দেওয়াইবার জন্য বন্দরে ২ জন মাহিনা করা লোক রাখিয়াছিল।

অন্নাভাবে পঙ্গপালের মত লোক ঘরবাড়ীর মায়া কাটাইয়া আসামের পথে ছুটিয়াছিল। অনাহার ও রোগে মৃত্যুর হাত হইতে তাহারাও রেহাই পায় নাই। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত নিরুদ্দেশ ও নির্বংশ পরিবারের উচ্ছন্ন ভিটা পড়িয়া আছে। মুসলমান পাড়ায় বাড়ীর উঠানগুলি কবরে উঁচু হইয়া আছে। সন্ধ্যায় হিন্দুর বাড়ীতে শঙ্খ ধ্বনিত হয় না। পুরুষের অভাবে মেয়েরাই আজকাল বাজারহাট করে—সংকটের আঘাতে দীর্ঘদিনের সংস্কার গুঁড়াইয়া গিয়াছে।

ছেলেকে ফেলিয়া মা গণিকালয়ে

রাণীগাঁও এতিমখানায় গিয়াছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। একে একে সকলের জীবনের কাহিনী শুনিলাম—পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের মর্মকথা। লৌহজঙ্গ থানার কাজিরপাগলার মাধবের বাড়ী। মাধবের বাবা কালিচরণ ছুতার মিস্ত্রির কাজ করিত। বর্ষার আকালের সময় ভিটেমাটি বেচিয়া চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় যায়। কয়েকদিন পর কালিচরণের মৃত্যুর সংবাদ আসে। মাধবের মা বাপের কাছে চলিয়া যায়। বাপের বাড়ীর সংসারও অচল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ বাপ মেয়েকে ঘৃণ্য জীবিকার পথে ঠেলিয়া দেয়। চালের দাম ৮০৲ টাকায় উঠে। একার রোজগারে মা ছেলেকে খাওয়াইতে পারে না। মাধবের মা ঘোড়দৌড়ের বাজারে গণিকাপল্লীতে আশ্রয় নেয়। অন্নাভাবে মাধবের দাদুও যখন মারা যায়, তখন একা মাধব খাওয়ার লঙ্গরখানায় চলিয়া যায়। সেখান হইতে রুগ্ন কঙ্কালসার অবস্থায় তাহাকে রাণীগাঁও এতিমখানায় আনা হয়। কিছুদিন আগে মাধবের মা আসিয়াছিল। কুৎসিত ব্যাধিতে আজ সে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও তাহার আর স্থান নাই। তাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আগে ছেলেকে একবার শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিল।

আজিমুন্নেসার মুখে পোড়া দাগ

আজিমুন্নেসার গোটা মুখে আগুনে-পোড়া দাগ। কুমারভোগে তার বাড়ী। বিধবা মা অন্নাভাবের সময় আবার নিকা করে। আজিমুন্নেসা আর তার ছোট বোন সুকুরবানু মার নূতন সংসারে স্থান পায় না। তাদের গ্রামের এক প্রতিবেশী বোন দুটির ভার গ্রহণ করে। কিন্তু ভাতের অভাবে যখন সংসারে তীব্র হাহাকার দেখা দিল, তখন লোকটির মন হইতে দয়া-মায়া মুছিয়া গেল। একদিন লোকটি ক্ষুধার্ত আজিমুন্নেসাকে উনুনের মুখে চাপিয়া ধরিল। সুকুরবানুর চীৎকার শুনিয়া পাড়ার লোকজন আসিয়া শেষকালে তাদের রক্ষা করে। অসহায় ২টি বোন লঙ্গরখানায় আশ্রয় নেয়। আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, রাধাশ্যাম, মজিদ, হরিদাসী, আমিনা—এতিমখানার প্রত্যেকটি শিশু ও কিশোরের জীবনে এমনি সব করুণ ইতিহাস।

মুষ্টিমেয় হাতে গ্রামের সম্পদ

একদিকে গ্রামজীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের মুঠায় সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য। আমতলী গ্রামের অধিকাংশ জমিজমার মালিক আজ মনাই মাঝি। সংকটের আগে তার আড়তদারীর ব্যবসা ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ধানচালের কারবারে দুহাতে টাকা লুটিয়াছে। টঙ্গিবাড়ী বাজারের ৬টি দোকানেরই সে আজ মালিক। আব্দুল ব্যাপারী আগে দিনমজুরী করিয়া খাইত। তার দুটি ছেলে কাজিম আর আজিম মনাইয়ের নৌকায় কাজ করিত। আস্তে আস্তে স্বাধীনভাবে তারা ধান চালের ব্যবসা শুরু করিয়া দেয়। দুর্দিনে তাহাদের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। নেত্রাবতীর উপেন কর্মকারও আজ বহু জমিজমার মালিক।

গ্রামে যখন মহামারী

হাসাইলের বিক্রমাদিত্য পর্বত। গ্রামে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিল। মাঘ মাসে মহামারীতে পঞ্চসার গ্রাম যখন উজাড় হইতেছিল, তখন বিক্রমাদিত্য গেরুয়া রঙে কাপড়জামা ছোপাইয়া রাতারাতি দৈবচিকিৎসক বনিয়া যায়। সেখানে অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ঠকাইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। এখন আবার নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিক্রমাদিত্য আজ আর দৈবচিকিৎসক নয়। গেরুয়া ছাড়িয়া পুরানো হোমিওপ্যাথি ধরিয়াছে।

বিধ্বস্ত গ্রাম্য সমাজ

স্টিমারে আসিতে আসিতে জেলেদের বহু নৌকায় দেখিলাম ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড় বাহিতেছে। দুর্ভিক্ষের চোট জেলেদের উপর দিয়াই বেশী রকম গিয়াছে। কুমারভোগ ইউনিয়নের ১টি জেলেপাড়ায় ৫০টি ঘরের মধ্যে বর্তমানে আছে মাত্র ৩০টি ঘর। অর্ধেক লোকই মারা গিয়াছে। ৫।৭টি ঘরে মাত্র জাল

আছে। নৌকা একজনেরও নাই। নৌকা ভাড়া করিবারও সঙ্গতি নাই। ভাড়াও দেড়গুণ বাড়িয়াছে। দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডলের জেলেপাড়ায় ৩ ভাগের ২ ভাগ লোক মাত্র বাঁচিয়া আছে।

কুলির কাজে নমঃশূদ্র মেয়েরা

রাস্তার দুপাশে গাছে অজস্র গাব পাকিয়া আছে, এ দৃশ্য নাকি গ্রামের বৃদ্ধরাও কখনও দেখে নাই। বর্ষা আসিতেছে, নৌকা মেরামতের ইহাই সময়। গাবের আঠায় নৌকা মেরামত হয়। লোকের হাতে পয়সা নাই। ৩৲ টাকার নৌকার দাম এখন ৫০৲ টাকা। নূতন নৌকা কেনা দূরে থাক, ভাঙা নৌকা মেরামতও হয় না।

আগে মিস্ত্রিপাড়ায় ঢুকিলে হাতুড়ী ও নেহাইয়ের শব্দে পায়ের নীচে মাটি কাঁপিত। এখন মিস্ত্রিপাড়ায় ঢুকিতে আতঙ্ক হয়। দিনেন্দ্রপুরে জনশূন্য ভিটাগুলির উপর আজকাল শিয়াল ডাকে। দুর্ভিক্ষে মানুষজন মরিয়া গিয়াছে। অনেকে চাটগাঁ, লালমণিরহাট অঞ্চলে মিলিটারীতে কাজ করিতেছে। নৌকার কাঠের দাম ৫ গুণ বাড়িয়াছে। দু'আনার তারকাটার দাম এখন ৬৲ টাকা। ১০৲ টাকার করাতের দাম হইয়াছে এখন ৮০৲ টাকা। সমস্ত জিনিষপত্রের দামই ৪ গুণ হইতে ২৮ গুণ বাড়িয়াছে। নেত্রাবতী গ্রামের পার্শ্বনাথের কারখানায় আগে দিনরাত ১০।১২ জন লোক খাটিত; এখন যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রির অভাবে কারখানা প্রায় বন্ধ। ৬টি করাতের মধ্যে এখন ১ খানিও নাই। নমঃশূদ্র পাড়ার সমস্ত জমি জলের দামে মহাজনের হাতে চলিয়া গিয়াছে। প্রহ্লাদের ১৫ মণ ধানের ফসলশুদ্ধ ৫ গণ্ডা জমি মহাজনের কাছে ১৬৲ টাকায় ২ বছরের জন্য বিক্রি হইয়া আছে। পাড়ার মেয়েরা বাজারে ও ঘাটে কুলির কাজ করিয়া পেট চালাইতেছে।

ঋষি, ছুতার, ধোপা নিঃসম্বল

রাত্রে আর ঋষিপাড়া ঢাকের শব্দে মুখর হয় না। আগে চাটগাঁ, ময়মনসিং প্রভৃতি জায়গা হইতেও ঢাকের বায়না আসিত। আজকাল পূজাপার্বণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে বিবাহাদি সিকিভাগও হয় কিনা সন্দেহ। চামড়ার কাজ প্রায় বন্ধ। পাট ও পাল্লা তৈরীর কাজও আজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বেতের পণ ৩৲।৩॥০ টাকা। বাজারে ক্রেতা নাই। তাছাড়া, যানবাহনের অভাবে আসাম হইতে বেতের চালানও আসে না। ফরিদপুরের যে অঞ্চলে বেত পাওয়া যায় সেখানে ম্যালেরিয়া এত বেশী যে লোকে সেখানে যাইতে ভরসা পায় না।

টঙ্গিবাড়ী গ্রামের ঋষিপাড়া প্রায় সাফ হইয়া গিয়াছে। নৌকার কাঠে মৃতদেহ দাহ হইয়াছে। এখন নৌকার অভাবে বেতের আমদানী হয় না। বরলিয়া গ্রামের পাটিকর পাড়ায় ৩৪৫ জনের মধ্যে বর্তমানে আছে মাত্র ১৬১ জন। কনকসারে ৩০০ লোকের মধ্যে মারা গিয়াছে ১২৫ জন।

৫০৲ টাকার গাছের দাম এখন ১৫০৲।২০০৲ টাকা। জ্বালানি কাঠের দাম বেশী হওয়ায় গাছও এখন দুষ্প্রাপ্য। বরলিয়া গ্রামের ছুতার রাধাশ্যাম ২ দিন হইল কাঠের অভাবে বেকার বসিয়া আছে। গ্রামের দেবেন ধোপা জাতব্যবসা বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মাসে এখন ৫০টা কাপড়ও কাচার জন্য পায় না। দু'আনার সোডার দাম এখন পাঁচসিকা। সাবানের দরও পাঁচগুণ বাড়িয়াছে। দেবেন এখন বদলী খাটিয়া সংসার চালায়।

দুঃস্থ বারুই ও তাঁতী

গত দুর্ভিক্ষে পানের দর একেবারেই ছিল না। ফলে, অর্থাভাবে অযত্নে বহু বরজ নষ্ট হইয়া যায়। এখন ৮০ বিরা পানের দর ৪০৲।৫০৲ টাকা। কিন্তু অধিকাংশ বরজে পান নাই। জৈনসার ইউনিয়নের চামাদি গ্রামে ৬০০ বারুজীবীর বাস। ৩ ভাগের ১ ভাগ লোক বরজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া দিনমজুরী করিতেছে। দক্ষিণ চুড়াইনের যোগেন দে গত বর্ষায় কুমিল্লা শহরে ৫০৲ টাকায় তা'র মেয়েকে বিক্রি করিয়াছিল। দত্তদের ১০টি হিস্যার ৬টি হিস্যা আজ দিনমজুরে পরিণত।

কেরোসিনের অভাবে কাজ বন্ধ

কুমারভোগে তাঁতীদের সংখ্যা ৪ হাজার হইতে ৩ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। অর্ধেক মরিয়াছে, বাকি অর্ধেক দেশছাড়া। ৮০০ তাঁতের মধ্যে বর্তমানে আছে ৬০০। সূতার দাম ৫ গুণ ও রঙের দাম ২০ গুণ বাড়িয়াছে। রং ছোপানোর খরচ ২॥০ টাকার জায়গায় এখন হইয়াছে ৪০৲ টাকা। তেলের অভাবে রাত্রে কাজ হয় না। ফলে, ৩ ভাগের ২ ভাগ আয় কমিয়া গিয়াছে। গ্রামের বিধবারাই সূতা সাজানোর কাজ করে। ইহাদের সংখ্যা গত সংকটে বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দৈনিক ১০ ঘণ্টায় ইহাদের ২০ মাইল রাস্তা ঘুরিতে হয়। মজুরী মাত্র ।/০ । ।৶০ আনা।

হাটে বাজারে ঘুরিলে দেখা যায় পিতল কাঁসার দোকানে মাটির বাসন সাজানো। পিতল কাঁসার বিক্রী নাই। গত সংকটে গ্রামবাসী পিতল কাঁসা নিঃশেষে বেচিয়া মাটির বাসন সম্বল করিয়াছে। কিন্তু কুমারদের অবস্থা ভাল হয় নাই। মাটির দর দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। মাটি আনার মজুরী খরচ আগের তুলনায় ৪ গুণ বাড়িয়াছে। লাকড়িও দুর্মূল্য। কেরোসিনের অভাবে রাত্রে কাজ বন্ধ। দিঘলীর কেবল পালের বাড়ীতে ৪০ জনের মধ্যে ৩০ জন অন্নাভাবে মরিয়াছে।

আউশের ফসল অর্ধেক হইবে

বৃষ্টির জল পাইলে এতদিন নাকি পাটের ক্ষেত মানুষের মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। মাঠে ধান রৌদ্রে জ্বলিয়া যাইতেছে। খাল ও নালায় এদিকে জোয়ারের জল ছাপাইয়া শীঘ্রই ডাঙ্গায় উঠিবে। ধান ও পাটের ক্ষেত বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইবে। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকাইয়া কৃষক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মজুর, বলদ ও বীজধানের অভাবে এবার সিকিভাগ জমি মাত্র চাষ হইয়াছে। লোকাভাবে মাঠে নিড়ি দেওয়া হয় নাই। কচুরী পানার উপদ্রবে বহু জমির ফসল নষ্ট হইবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় আউশের ফসল এবার অর্ধেক হইবে কিনা সন্দেহ। গত সংকটে কৃষকের বহু জমি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সোনারং-টঙ্গিবাড়ীর পাশাপাশি ১১টি ইউনিয়নে অন্যবারের তুলনায় ১১ হাজারের বেশী জমি হাতছাড়া হইয়াছে। ধনী চাষী, ও প্রবাসী চাকুরীয়া ও বড় ব্যবসায়ীরা জলের দামে এই সমস্ত জমি হস্তগত করিয়াছে। অনেকেই জমিতে চাষ আবাদ করে নাই। শতকরা ১০।১৫ ভাগ জমি পতিত পড়িয়া আছে। পশ্চিম বিক্রমপুরে ধনী সাহেবদের এইরূপ বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নে দোগাছি গ্রামে ৪০টি হালের মধ্যে ৮ খানি হাল মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। মাওয়া গ্রামের ১০টি ঘরের অর্ধেক পরিবারের লাঙ্গল থাকা সত্ত্বেও বলদের অভাবে চাষ করিতে পারে না। কুকুটিয়া ইউনিয়নের নপাড়া গ্রামে ১৬টি পরিবারের মোট ১০ কানি জমি। অর্থাভাবে ৭ কানি জমির নিড়ি বন্ধ আছে।

নপাড়া গ্রামের আফজলের নিঃস্ব সংসারে শুধু তার বোন খাতুনী বাঁচিয়া ছিল। ১০।১৫ দিন হইল সে তার শেষ সম্বল পরণের কাপড়টি পর্যন্ত বেচিয়া শিলচরে চলিয়া গিয়াছে।

মধ্যবিত্তরাও রক্ষা পায় নাই

উত্তর আমতলীর একটি মধ্যবিত্ত পাড়া। আমাকে রিলিফের লোক ঠাওরাইয়া সকলে ঘিরিয়া ধরিল। একটি ক্ষুধার্ত বছরের কাছে ইহারা সমস্ত সংকোচ বলি দিয়াছে। বৃদ্ধ নিবারণ অসুখে পঙ্গু। মেয়ে প্রিয়বালা নারায়ণগঞ্জ সূতাকলের মজুর। তার একার রোজগারেই গোটা সংসার চলে। বিক্রমপুরের ভদ্রঘরের বহু মেয়ে গত সংকটে নারায়ণগঞ্জের মিলে কাজ নিয়াছে। কালিপদদের লোকশূন্য ভিটায় ভাঙা সিন্দুক পড়িয়া আছে। আউটশাহীর ৪০টি মধ্যবিত্ত পরিবারের রিলিফই একমাত্র সম্বল। আরও ১৩২টি পরিবারের আজ একান্তভাবে রিলিফ দরকার। আমতলী গ্রামের প্রসন্ন স্মৃতিভূষণের বিধবা পুত্রবধূ ২টি ছেলে লইয়া মুগুটি বাড়ীর ক্যানে গত সংকটে প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের মাথা গুঁজিবারও স্থান নাই। আবদুল্লাপুরে নাকি ভিক্ষায় কিছু পাওয়া যাইতে পারে। ছেলে দুটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেখানেই চলিয়া যাইবেন ঠিক করিয়াছেন।

(শেষাংশ ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুঃস্থ নারী সেবায়

৫০টী কেন্দ্র ও ৪০ লক্ষ টাকা চাই!

নারী সেবা সংঘকে সাহায্য করুন!

বাংলার অন্যতম প্রধান সমস্যা দুঃস্থ মেয়েদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে ফিরাইয়া আনিয়া সমাজ জীবনকে বাঁচান। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার সকল প্রতিষ্ঠানের মিলিত চেষ্টা, যাহাতে সকলের সামর্থ্য ও শক্তি একত্র করিয়া এই বিরাট কাজের জন্য কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই নারী-সেবা-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় যতগুলি প্রতিষ্ঠান রিলিফের কাজ করিতেছে, তার অধিকাংশের প্রতিনিধি নারী-সেবা-সঙ্ঘে আছে। সম্মিলিত ভাবে এরূপ একটী সংগঠন গড়িয়া তোলার ফলে এই কাজে সমস্ত জনসাধারণের সাহায্য পাওয়াও সম্ভব হইতেছে।

নারী-সেবা-সঙ্ঘের আবেদনে জানান হইয়াছে যে, মেয়েদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এখনি দুইটী কাজ দরকার—(১) দুঃস্থমেয়েদের আশ্রয় দেওয়া। (২) সম্বলহীন মেয়েদের শিল্প কাজ শিখানো। এই দুই উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় বহু আশ্রয়গৃহ ও শিল্পকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নারীসেবা সংঘ লইয়াছে। যেখানে মেয়েরা থাকিয়া কাজ শিখিতে পারিবে এবং যেখানে আসিয়া কাজ শিখিতে পারিবে—দুই রকম কেন্দ্রই খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ইতিপূর্ব্বেই অনেক জায়গায় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সেইগুলিকে আরো বাড়ান ও তত্ত্বাবধান করা নারী সেবা-সঙ্ঘের কাজ। সারা বাংলায় অন্ততঃ ৫০টী কেন্দ্র নারী-সেবা-সঙ্ঘ খুলিতে চায়। তার জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার দরকার। এই টাকার জন্য জনসাধারণের কাছে নারী-সেবা সঙ্ঘ আবেদন করিয়াছে। বাংলার সমাজ জীবনকে বাঁচাইবার এই মহৎ কাজে জনসাধারণ নিশ্চয়ই অকাতরে সাহায্য দিবেন।

কৃষক সমিতির চেষ্টায় নদীয়া জেলার একটী গ্রামে দুঃস্থ মেয়েরা জমির কাজে উৎসাহিত হইয়াছে। ইহার ফলে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ তৈরী হইল।

চট্টগ্রামে

চালের দর ৬০৲?

গত বুধবার বাংলার এসেম্ব্লি হাউসে চট্টগ্রামে চাউলের অগ্নিমূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সে প্রস্তাব আলোচনা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। খান বাহাদুর হাজী বদী আহমেদ চৌধুরীর কথায় জানা যায় যে চট্টগ্রামে চাউলের দর নাকি ৬০৲ টাকায় উঠিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থা যে অত্যন্ত সাংঘাতিক তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারই বা কি করিতেছেন, বিরোধী পক্ষই বা কি করিতেছেন? একদিনের হট্টগোলের মধ্যেই কি চট্টগ্রামের এই প্রচণ্ড খাদ্য সংকটের কথা শেষ হইল?

বাংলার খাদ্যাবস্থা কোন দিকে চলিয়াছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা গত সংখ্যায় জনযুদ্ধে লিখিয়াছি। ঘাটতি অঞ্চলে চাউলের দর বাড়িতেছে, ইহাই ঐ বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের চৌধুরীহাটে ২৫শে এপ্রিল হইতে ৫ই মে পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছিল ৩৫ টাকা। ২৫শে এপ্রিল কক্সবাজারে চাউলের দর ছিল ১৲ সের। যে কোন জেলার চেয়ে এই দর বেশী। কুতুবদিয়া হইতে ১০ই মের একটী খবরে আমরা জানিতে পারি যে এই অঞ্চলে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত চাউল থাকা সত্ত্বেও জমিহীন লোকেরা চোরাবাজারে ছাড়া চাউল পায় না। যাদের কাছে মজুত আছে, তারা বাজারে চাউল বিক্রয় করে না। মজুত উদ্ধারের চেষ্টাও সরকার বিশেষ করে না। এখানে যে খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহা জনসাধারণকে বাদ দিয়াই হইয়াছে। খাদ্য কমিটীও মজুত উদ্ধারের কোন চেষ্টা করে না।

এই অবস্থায় চোরাবাজারে চালের দর যে সাংঘাতিক ভাবে উঠিতেছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুতুবদিয়ায় ৪০ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার লোক খাদ্য সংকট ও মহামারীতে মারা গিয়াছে। গ্রামবাসীদের শতকরা ৬০ জন জমিহীন। এই সমস্ত লোকেরা আবার অনাহারের কবলে পড়িবে।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা: ছয় পয়সা

বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

১৪ই জুন, ১৯৪৪

বিভিন্ন নারী সমিতির চেষ্টায়

নানাস্থানে আশ্রয় কেন্দ্র ও শিশু সদন

নীচে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের কাজ কি ভাবে ও কতটুকু হইতেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণ সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তবু এই বিবরণ হইতেই বোঝা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় কাজ কত সামান্য। একমাত্র ফরিদপুর জেলা ছাড়া সরকারী কেন্দ্র অন্যজেলায় নামমাত্র, অনেক জেলাতে একেবারেই নাই। প্রত্যেক জেলাতেই স্থানীয় মেয়ে সংগঠনগুলি যথাসাধ্য অর্থসংগ্রহ করিয়া দুঃস্থকেন্দ্র, শিশুসদন প্রভৃতি খুলিয়াছেন। কিন্তু সব চেয়ে বেশী সংখ্যা যেখানে সেখানেও বড় জোর ১০০ জন সাহায্য পাইতেছে। দুঃস্থের সংখ্যা অনুপাতে ইহা কিছুই নয়। এই অভাব ঘুচাইতে হইলে যেমন সরকারী ওয়ার্কহাউস বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে, তেমনি জনসাধারণের নিজেদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য একত্র করিয়া যেখানেই সম্ভব আরো দুঃস্থ কেন্দ্র, শিল্পকুটীর, শিশুসদন প্রভৃতি খুলিতে হইবে। বাংলার নারীজাতিকে বাঁচাইবার দায়িত্ব আজ সকলেরই।

চট্টগ্রাম—৫টী সরকারী কেন্দ্র আছে, তাহাতে মোট ১৫০ জন থাকে।

ঢাকা—৩টী কেন্দ্র, তাহার মধ্যে দুইটীর খরচ গভর্ণমেন্ট হইতে দেওয়া হয় ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' দ্বারা পরিচালিত হয়। এই দুইটী কেন্দ্র কুকুটিয়া ও হাসারাতে। প্রত্যেকটীতে ২০।২৫ জন করিয়া দুঃস্থ থাকে। বাকী কেন্দ্রটী মানিকগঞ্জে। আত্মরক্ষা সমিতি টাকা তুলিয়া এই কেন্দ্র চালায়। ১২টী মেয়ে এখানে থাকে। আরো টাকার ব্যবস্থা না হইলে এই কেন্দ্র চলিবার সম্ভাবনা কম।

ঢাকা জেলায় আগে ২০।২৫টী চরকাকেন্দ্র ছিল কিন্তু তুলার অভাবে এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুলা যখন পাওয়া যায় মাঝে মাঝে কাজ চলে।

নরসিংদিতে একটী জালবোনা কেন্দ্রে ১২টী মেয়ে নিয়মিত কাজ করে। এখানে নলীমোড়া কেন্দ্রও একটা আছে। নারায়ণগঞ্জে মধ্যবিত্তদের জন্য তোয়ালে কেন্দ্র। ঢাকা তাঁতিবাজারে ২০টী দুঃস্থা মেয়েকে নানা হাতের কাজ শেখানো হয়। মুষ্টিভিক্ষা তুলিয়া ইহাদের মজুরী দেওয়া হয়।

নোয়াখালি:—পশ্চিমকুল, অশ্বদিয়া, খাহেত্তিখারী এই কয়টী জায়গায় সরকারী দুঃস্থ কেন্দ্র আছে। শিশুদের জন্যও একটী শিশুসদন আছে, তাতে ৫০টী শিশু থাকে। গাবুয়াতে নারী সেবা সঙ্ঘের তরফ হইতে ১০টী মেয়ে নিয়া একটী হোম খোলা হইয়াছে।

কুমিল্লা:—আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে একটী কর্ম্মকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট ১ হাজার টাকার সূতা ও একটী বাড়ী আত্মরক্ষা সমিতির হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই কর্ম্মকেন্দ্রে অনেকগুলি মেয়ে কাজ করে। মহিলা সম্মেলন হইতে একটী শিশুসদন চালান হয়। ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে সরকারের তরফ হইতে ১০০০ চরকা লইয়া টেষ্ট রিলিফের মত একটী চরকাকেন্দ্র চালান হইতেছে। আর একটী ধানভানা কেন্দ্রও গভর্ণমেন্ট খুলিয়াছে। তাতে ১০০ মেয়ে কাজ করে। কুমিল্লাতে একটী সরকারী দুঃস্থ কেন্দ্র আছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দও এখানে একটী শিশুসদন খুলিয়াছেন।

ফরিদপুর:—সমস্ত জেলায় ১০৪টী সরকারী 'ওয়ার্ক হাউস' আছে। ইহাতে ডালভাঙ্গা, শটী, হোগলা প্রভৃতির কাজ শেখানো হয়। প্রত্যেক মেয়ের নামে দৈনিক এক আনা করিয়া মজুরী জমা রাখা হয়। এই সমস্ত কেন্দ্রে ১০ হাজার দুঃস্থ রাতে দিনে থাকে ও ২০ হাজার শুধু কাজ করিয়া চলিয়া যায়। কোরকদি, কলারগাঁও, তুলাসার, ইদিলপুর, প্রভৃতি গ্রামের ওয়ার্ক হাউসগুলি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় চালানো হয়। মাদারীপুরে গভর্ণমেন্ট ৪০টী মেয়েকে পতিতাবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

ময়মনসিংহ:—নেত্রকোনায় একটী দুঃস্থ ক্যাম্প আছে, তাহাতে ৩০০ ছেলেমেয়ে ও শিশু থাকে। সেরপুরে একটা হোম খোলার চেষ্টা হইতেছে। নেত্রকোনায় ১৩টী মেয়ে বিক্রী হইয়াছে, তার মধ্যে ১০টী মুসলমান।

দিনাজপুর:—এখানে একটী কেন্দ্রে ৬০।৭০ জন মেয়েকে ডাল ভাঙ্গার কাজ দেওয়া হইয়াছে। একটী গ্রামে কুটীর শিল্পকেন্দ্র আছে। তাতে রেড়ির তেল, শটী, চটের থলে প্রভৃতির কাজ শিখানো হয়।

রাজসাহী:—আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে ১৭ জন ছেলে মেয়ে লইয়া একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এই কেন্দ্রের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছে।

পাবনা:—আতাইকুলা গ্রামে একটী হোম এবং একটী ওয়ার্ক হাউস রিলিফ কমিটী দ্বারা পরিচালিত হয়। ওয়ার্ক হাউসে ৯০টী ঢেঁকী দিয়া ১৮০ জন লোকে ধান ভানে। প্রত্যেকে আধসের চাল মজুরী পায়। ৩টী তাঁতে মেয়েরা কাপড় বোনে। ছেলেরা বাঁশের কাজ করে। এখানে ৫০০ তাঁত চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। পাবনাতে ৯০টী পরিবার প্রতি সপ্তাহে ২ মণ করিয়া ধান ভানে। এদের মণ প্রতি ২৷৷ সের চাল মজুরী দেওয়া হয়। এই কাজ আত্মরক্ষা সমিতি হইতেই চালানো হয়, কিন্তু অর্থ সাহায্য গভর্ণমেন্টই করে।

রংপুর:—রংপুর টাউন, নীলফামারী ও ডোমারে গভর্ণমেন্ট ৩টী দুঃস্থ ক্যাম্প করিয়াছে। আত্মরক্ষা সমিতি এই ক্যাম্প পরিচালনায় সাহায্য করে। গাইবান্ধায় মহিলা সমিতির চেষ্টায় একটী শিশুসদন খোলা হইয়াছে। এই জেলায় আরো সরকারী ওয়ার্ক হাউস দরকার।

বাঁকুড়া:—মহিলা-সম্মেলন ৭০টী শিশু নিয়া একটী শিশু-সদন খুলিয়াছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দের চেষ্টায় একটী কুটীর শিল্পকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সরকারী দুঃস্থ কেন্দ্র আছে একটী। এখানে ধান-ভানা, বাঁশের কাজ এবং তাঁত শেখানো হয়। সরকারী টেষ্ট রিলিফ কেন্দ্রও আছে।

খুলনা:—গভর্ণমেন্টের হাসপাতাল আছে। আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা নার্সিং করে। মহিলা সম্মেলনের একটী শিশুসদন আছে।

যশোহর:—মিলিত রিলিফ কমিটীর তরফ হইতে একটী দুঃস্থ ক্যাম্প চালানো হয়। ঠোঙ্গা, তোয়ালে, পাপোস্ প্রভৃতির কাজ শেখানো হয়। আত্মরক্ষা সমিতির কুটীর শিল্পের কেন্দ্র আছে ৯টা। ডাঃ জীবনরতন ধর এবং সমিতির মেয়েরা মিলিয়া একটী শিশু হাসপাতাল খুলিয়াছেন।

২৪ পরগণা:—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ২৪ পরগণায় এই দুঃস্থ কেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছে:—মহিলা খাদ্য কমিটীর তরফ হইতে জয়নগরে একটী—১০ জন থাকে, বারাসতে একটী—৭০ জন থাকে। ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলান্স ইউনিটের তরফ হইতে দুটী কুটীর শিল্পকেন্দ্র, ফলতায় একটী—১৪ জন কাজ করে, বসিরহাটে একটী—৩০ জন কাজ করে।

সরাসরি নারী সেবা সংঘ হইতে তোলায় ও তমলুকে এক একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বাংলার ৫৪টী মহকুমায় পুনর্গঠন দরকার

কিন্তু সরকারী চেষ্টা কতটুকু?

৩৩৩টী ওয়ার্ক হাউসে মাত্র ৫০০০০ লোক কাজ করে

সরকারী ওয়ার্ক হাউস বাড়াইতে আন্দোলন করুন!

সমস্ত সংগঠন এক হইয়া দুঃস্থ কেন্দ্র ও শিশু সদন খুলুন!

লীগনেতা মামদোতের নবাবের অভিমত

গান্ধী-জিন্না চুক্তির প্রয়োজন

লাহোর, ৩১শে মে—"দেশের পক্ষে এখন যাহা জরুরী প্রয়োজন, তাহা হইতেছে গান্ধী-জিন্না চুক্তি, অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আপোষ যাহা সকলেরই স্বার্থানুযায়ী।"—এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট মামদোতের নবাব উক্ত রূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে হিন্দুদের পাকিস্থান নীতি স্বীকৃতির উপরে এই আপোষ হওয়া উচিত। ইহাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান হইবে কারণ এই ধরণের মীমাংসার ফলে দুইটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ই স্ব স্ব আদর্শ ও জীবন দর্শনানুসারে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইবে। ইহার পরবর্ত্তী স্তরে পাকিস্তানের বিস্তারিত বিবরণ স্থিরিকৃত করা যাইতে পারে।

গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের মধ্যে রাজনৈতিক মীমাংসা সম্পর্কে তিনি কোনরূপ আভাষ পাইয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে নবাব সাহেব বলেন যে তিনি কোন প্রামাণ্য সংবাদ পান নাই তবে এই দুইজন নেতা যদি অদুর ভবিষ্যতে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া ফেলেন তাহা হইলে উহাতে তিনি বিস্মিত হইবেন না।

কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি কেন ?

আসানসোলে কয়লা-মজুরের হালচাল

কয়লার অভাবে যখন লোকের ঘর-সংসার অচল, কল-কারখানার কাজ অর্দ্ধেক বন্ধ, তখন কয়লা-খনির মধ্যে কি ঘটিতেছে, তা আসানসোলের কয়লা খনির কাজকর্ম্মের এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়। আসানসোলে গত বছর যে সরকারী রিলিফ কিচেন-গুলি খোলা হইয়াছিল, তাতে যারা খাইত তাদের অধিকাংশই হইতেছে খনি-মজুর ও তাদের পোষ্যবর্গ। ইহাদের অনেকে কাজ করিয়াও সকলের জন্ত খোরাক জুটাইতে পারিত না, তাই লঙ্গরখানায় আশ্রয় লইতে হইত। বহুদিন অর্দ্ধাহারে যারা অক্ষম হইয়া পড়িত, তারা কাজ ছাড়িয়া লঙ্গরখানায় আশ্রয় নিত। কর্ম্মক্ষম মজুরদের অনেকে শেষ পর্য্যন্ত চাষের কাজে ও মিলিটারী কেন্দ্রে কাজ করিতে চলিয়া গেল বেশী রোজগারের আশায়।

কয়লা-উৎপাদনে ঘাটতির কারণ হিসাবে সরকার ও খনি-মালিকরা মজুরের অভাবের কথা যে উল্লেখ করিয়াছেন, তা আসলে ইহাই। পুরুষ-মজুরদের অক্ষম করিয়া সরকার মেয়ে-মজুর লইয়া কাজ চালাইতে উৎসাহ দিয়াছে। তাই উৎপাদন-সমস্যার কোনো সমাধান হয় নাই।

উৎপাদন বৃদ্ধির পথে মালিকের বাধা

শুধু তাই নয়। অতিরিক্ত-মুনাফা-ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্ত মালিকরা যে ইচ্ছা করিয়াই উৎপাদন কমাইয়া দেয়, তারও নমুনা আসানসোলের খনিতে দেখা যায়। সোজাসুজি কাজ কমাইতে মালিকরা পারে না। তাই নানারকম কৌশল অবলম্বন করে। যে সব মেরামতের কাজ যুদ্ধের পূর্ব্বে ২ ঘণ্টায় শেষ হইত এখন তাহা ৭ ঘণ্টা লাগে। সমস্ত খাদেই টবের অভাব দেখা যায়। টবের অভাবে কয়লা কাটা হইবার পর পড়িয়া থাকে। যে সব টব আছে, তাও সুষ্ঠুভাবে বিলি করা হয় না। ইহার ফলে একজায়গায় মজুর কাজ করে ও আর এক জায়গায় মজুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেকার বসিয়া থাকে। তাছাড়া ট্রলি লাইন না বাড়ানর জন্ত ভিজামাটীর উপর ২০০।৩০০ গজ রাস্তা টব লইয়া আসিতে মজুরদের অযথা দেরী হয়। ইহা ছাড়া এখানকার সমস্ত খনিতেই যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরান, নূতন যন্ত্র আনিবার কোনো চেষ্টা মালিকের নাই। টব পড়িয়া গেলে তাহা উঠাইবার জন্ত এক রকম ক্রেমের বন্দোবস্ত আছে, যে কোনো লোহাকারখানায় তাহা তৈরী করা যায়। কোলিয়ারীর নিজের কারখানাতেও তা তৈরী হইতে পারে। কিন্তু এই ক্রেমের ব্যবস্থা একটী খাদ ছাড়া আর কোথাও নাই।

এই সমস্ত ছোট-খাটো বে-বন্দোবস্তের ফলে উৎপাদনে ঘাটতি বাড়িয়াই যাইতেছে। অথচ বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় খনিতে উৎপাদন হইতেছে।

সরকারী আইন মালিক কতটা মানে ?

কয়লা কনট্রোল বোর্ড হইবার পর খনি-মজুরদের মজুরী শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইবার নিয়ম হইল। মালিকরা এই নিয়ম না মানিয়া পারে না। কিন্তু অন্তদিক দিয়া মজুরদের ফাঁকী দিবার জন্ত মালিকরা নূতন মতলব ভাঁজিল। জামুরিয়া ফিল্ডের খাদগুলিতে দেখা গেল সমস্ত মজুরকে একবার ছাড়াইয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া ভর্ত্তি করা হইল। ইহার মানে কি ? মানে এই যে নূতন ভর্ত্তির সময় কোম্পানী আগেকার নিয়মের বদলে নূতন নিয়ম করিবে। তার ফল দেখা গেল রেশন ও কাপড়ের ব্যাপারে। মজুরদের পোষ্যদের রেশন দেওয়ার জন্ত আগে যে নিয়ম ছিল, তা বদল হইল। পোষ্যরা এখন আর সহজে রেশন পায় না। ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় সব খাদেই দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানী এইবার নিয়ম করিল যে, ৬ মাস কাজ করিলে বা ৬০ দিন বিনা কামাইয়ে কাজ করিলে কাপড় দেওয়া হইবে, নতুবা দেওয়া হইবে না। (ফলে, ২।৪ জন বাদে আর কেহই কাপড় পাইল না।) কাপড় গুদামে পচিতেছে, কিন্তু তবু মজুরদের দেওয়া হয় না।

নিয়ম আছে—যে-দিনই মজুর কাজ করিবে, সেই দিনের জন্তই সে নিম্নলিখিত হারে বোনাস পাইবে—পোষ্যহীন মজুর দুই আনা, একজন পোষ্য থাকিলে ৩ আনা, একাধিক পোষ্য থাকিলে ৫ আনা ও আধ সের চাল। মালিক এই নিয়ম সাধারণ ভাবে মানিল, কিন্তু রবিবারের কাজের জন্ত এই নিয়ম রাখিল না।

(যারা বেশী কাজ করে, তাদের বাড়তি কাজের জন্তও এই হারে বোনাস প্রাপ্য, কিন্তু অধিকাংশ খাদেই তা দেওয়া হয় না।) ইহাও নিয়ম হইয়াছে যে মজুরদের সস্তাদরে সঃ তৈল, লবণ, ডাল, মশলা, সাবান, বিড়ি প্রভৃতি দেওয়া হইবে। কিন্তু অধিকাংশ খাদে এখনও এ সব দ্রব্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে কোম্পানী দোকান খুলিয়াছে সেখানে স্থানীয় বাজার দরের চেয়ে বেশী দরে এই সব জিনিষ বিক্রি করা হয়।

স্ত্রী-মজুরদের পোষ্য-বোনাস দেওয়া হইতেছে না। ধাওরায় যারা থাকিবে না, তাদের পোষ্য-বোনাস দেওয়া হইবে না বলিয়া কোম্পানী হুকুম দিয়াছে, যদিও সরকারী সার্কুলারে এরূপ পার্থক্য করা হয় নাই।

সরকারী স্কীমের আসল উদ্দেশ্য মজুরদের মাগগী-ভাতা বাড়ান। কিন্তু যেভাবে মালিকরা স্কীমকে কাজে লাগাইতেছে তাহাতে মজুরদের এই আসল দাবীই মেটে না। তাই এই নূতন স্কীম চালু হওয়ার পরও মজুরদের কাজ করিবার আগ্রহ বাড়ে নাই। বিভিন্ন খাদ হইতে এখনও মজুর কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

মজুর সংগঠনই একমাত্র পথ

(এই অবস্থার মধ্যে মজুরদের সংগঠনকে জোরাল করিয়া তাদের অভাব অভিযোগের জন্ত আন্দোলন করা হইতেছে। বেঙ্গল কোল-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে এবং তার পরিচালনায় মজুরদের একতা বাড়িতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মালিকের আক্রোশও আসিয়া পড়িতেছে ইউনিয়নের উপর। ইউনিয়ের সভাপতি কমরেড বিজয় পাল ও অন্যতম নেতা কমরেড এ, কে, মহেন্দ্রকে খনি অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। খনি মজুরদের সভা করার অধিকারও দেওয়া হয় না। কিন্তু এই দমননীতি সত্ত্বেও ইউনিয়নের প্রতি মজুরদের আস্থা কমে নাই। আজকে সমস্ত মজুর শ্রেণীর সমর্থন এই ইউনিয়নের পিছনে আসা দরকার। কেননা, কয়লা-মজুরের অবস্থার উন্নতির উপর সমস্ত কল কারখানার মজুরের স্বার্থ, সমস্ত দেশবাসীর স্বার্থ নির্ভর করিতেছে।)

ইংলণ্ডে কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে ও ইহার সম্পাদক এন-এম-যোশী বিশ্ব-ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভারতের মজুর শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিবার জন্ত গিয়াছিলেন। পরে এই কংগ্রেস বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যোশী ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কমরেড ডাঙ্গে বিলাতের জনসাধারণের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্ত সেখানে যান। ৩১শে মে তিনি বিলাতে পৌছান। ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিলে কমরেড ডাঙ্গে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

আমি এই প্রথম ইংলণ্ডে আসিলাম। বৃটিশ ট্রেড-ইউনিয়ন কর্ম্মী ও ভারতীয় কর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুবই আনন্দিত। বিলাতে আমার আসার উদ্দেশ্যে ভারত সম্পর্কে বৃটেনের জনসাধারণের সঠিক মনোভাব জানা, যাহাতে ইহা আমি ভারতে গিয়া বলিতে পারি। ভারতে আমরা শুনিয়া থাকি যে বৃটেনের চেহারা নাকি বদলাইয়া গিয়াছে। আমি ইহা নিজের চোখে দেখিয়া যাইতে চাই এবং এই চেহারা-বদলের মানে কি—তা আমার দেশবাসীকে জানাইতে চাই। এখানে মজুর শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্ত কি রকম আইন তৈরী হইয়াছে এবং তার ফলে এখানে কি বিপুল পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তার পরিচয়ও আমি পাইতে চাই।

পোর্টে পৌছিয়াই কয়েকজনের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে বৃটিশ জনসাধারণ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শুধু হিট্‌লারীদের ধ্বংসের জন্তই নয়, জাপানীদের বিরুদ্ধেও জোরালো আক্রমণ করিবার জন্তও তারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চায়। ভারতের সমস্যা ও জাপানীর বিরুদ্ধে অভিযান উভয়কে তারা আলাদা মনে করে না। ভারতের সমস্যা আজকে এখানকার লোকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়াইয়াছে, ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকেও এই গুরুত্ব বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে।

কমরেড ডাঙ্গে বিলাতে পৌছিলে তাঁকে অনেক বিশিষ্ট লোকে অভ্যর্থনা করেন। ইণ্ডিয়া লীগের তরফ হইতে কৃষ্ণ মেনন, কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে বেন-ব্রাড্‌লে, ফ্রাঙ্ক জ্যাক্‌সন ও কে বুশাম্প প্রভৃতি তাঁকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

———

পার্টি পতাকা অবনমিত করিতেছে

কমরেড কমলা মহারাজ

২৪ পরগণার নৈহাটী-গৌরীপুরের মজুর-কমরেড—গৌরীপুর নদীয়া চটকল মজদুর ইউনিয়নের সহকারী-সভাপতি **কমরেড কমলা মহারাজ** গত ২৪শে মে ব্ল্যাকফিভারে মারা গিয়াছেন। বিগত ১৯৩৬-এর সাধারণ নির্বাচনের আন্দোলনের সময় তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং আপন শ্রেণীর সবল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহাকে অতি অল্পকালের মধ্যেই পার্টি সভ্যপদের গৌরবে ভূষিত করে। এই সময় চটকলে ব্যাপক ধর্মঘটে তিনি স্থানীয় অঞ্চলে মজুর-নেতা বলিয়া পরিচিত হ'ন। গৌরীপুরে পার্টি সংগঠন গড়িয়া তুলিতে তিনিই একমাত্র মজুর-কমরেড ছিলেন। অতীতে যে সমস্ত উপদলীয় চক্র (লেবার পার্টি, পানীনি গ্রুপ প্রভৃতি) পার্টিকে দুর্বল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাইয়াছে—কমরেড মহারাজ তাহাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালাইয়া পার্টির নীতি ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পার্টির ভিতরে ও বাহিরে সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত—ভালবাসিত। রোগশয্যায় কমরেড মহারাজ স্থানীয় কর্ম্মীদের কাছে পার্টির কাজের খুটিনাটি খবর—সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের খবরাখবর প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং বিপ্লবী সংগীত গায়ক কমরেডদের কাছ হইতে শুনিতে ভালবাসিতেন।

রংপুর জেলার সিংহীমারী গ্রামের **কমরেড মনোহরি বর্মন** গত ১৯শে মে বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন। পঞ্চগ্রামের **কমরেড রাজবর্মনও** বসন্তে মারা গিয়াছেন। গত গণ্ডী আন্দোলনে কমরেড মনোহরি ও কমরেড রাজবর্মনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষকদের ভিতর বিরাট জাগরণ আসিয়া ছিল। পঞ্চগ্রাম **ইউনিয়নের ছুবার-বাড়ী গ্রাম কৃষক সমিতির একটি ঘাঁটি। এখানে ৮৫ জন বসন্তে মারা গিয়াছেন। গত ছয় বৎসর ইঁহারা কৃষক সমিতির সভ্য ও ভলান্টিয়ার ছিলেন।**

কলিকাতা জিলা কমিটির নূতনবাজার সেলের **কমরেড শ্যামলাল** সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কমরেড শ্যামলাল বিড়ি মজুর ছিলেন এবং বহুদিন যাবৎ কংগ্রেসের কাজ করিতেছিলেন। ৯ই আগষ্টের 'সংগ্রামে' তিনি ঝাঁপাইয়া পরেন—কিন্তু পরে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ভুল নীতিতে তিনি আকৃষ্ট হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আপন আন্তরিকতা ও দক্ষতায় পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার নারায়ণপুর গ্রামের বিশিষ্ট কৃষককর্ম্মী **কমরেড মনোহর সোম** গত ৩০শে মে "বেসিলারি ডিসেণ্টি," রোগে মারা গিয়াছেন। রায়না থানার কৃষক আন্দোলনের শুরু হইতেই কমরেড সোম অক্লান্ত ভাবে কৃষক সমিতির মধ্যে কাজ করিয়া আসিতে ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মুড়রা ইউনিয়ন কৃষকসমিতি গড়িয়া ওঠে। কমরেড সোম পার্টিসভ্য এবং সেল-সেক্রেটারী ছিলেন।

পাবনার ছাত্রকর্ম্মী **কমরেড শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী** গত ৩১শে মে "ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার"-এ মারা গিয়াছেন। কমরেড চক্রবর্ত্তী প্রথমে পঞ্চমবাহিনীর রাজনীতি-ঘেঁষা ছিলেন কিন্তু পরে সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্রকর্ম্মীদের প্রভাবে কমিউনিষ্ট-নীতিতে বিশ্বাসী হ'ন। তিনি অল্পদিনেই ছাত্র আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গ্রামে পূজাপার্বণ ত' নাইই, শ্রাদ্ধাদির পাটাপাটও উঠিয়া গিয়াছে। শিল্পবাড়ীগুলিরও বেজায় দুঃস্থ অবস্থা। খইরা গ্রামে বৃদ্ধ যজমান রসরাজ দুঃখের ইতিবৃত্ত বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলেন।

ইস্কুল মাষ্টারদেরও আজ শোচনীয় অবস্থা। ছাত্রাভাবে চাঁপাতলা ও নপাড়ার ইস্কুল উঠিয়া গিয়াছে। টঙ্গিবাড়ীর ৬টি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে ১টি বন্ধ; বরুলিয়া স্কুলটিও বন্ধ হইবার অবস্থায়। সমস্ত স্কুলেই ছাত্রের হার প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। বর্ষায় ছাত্রের সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে। শিক্ষকদের মাহিনা ১০৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা। মাগগি ভাতা ২॥০ টাকা। তাও ৩।৪ মাসের মাহিনা পাওনা পড়িয়া আছে। হাই-স্কুলগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডও শেষ হইয়া গিয়াছে। সাহায্য না পাইলে একটি স্কুলকেও আর টিঁকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

ব্যাপক মহামারী ও আসন্ন সংকট

বসন্তের প্রকোপ কিছুটা কমার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে আবার দেখা দিতেছে। সোনারং-এর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৫ দিনের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৩০০ হইতে হাজারে উঠিয়াছে। প্রতি ইউনিয়নে শতকরা প্রায় ৫০ জনই ম্যালেরিয়ার রোগী। চোরা-বাজারে অগ্নিমূল্যে কুইনাইন কেনা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। ইহা ছাড়া শোথ, আমাশয়, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগ ত লাগিয়াই আছে। পাচড়ায় আক্রান্ত হয় নাই এমন লোক গ্রামাঞ্চলে খুব কমই আছে।

বর্ষা নামিবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে যে ভীষণ সংকট দেখা দিবে, গ্রামাঞ্চলে ঘুরিলে তার পূর্বাভাষ নজরে পড়ে। গত ১০।১২ দিনের মধ্যে মিষ্টি আলুর দর ৶০ আনা হইতে পাঁচ সিকায় উঠিয়াছে। বাজারে পাকা গাবেরও কাটতি বাড়িয়াছে। বদ্‌লী-কামলার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। জীবিকাচ্যুত এক বিরাট জনসঙ্ঘ একেবারে বেকার হইয়া পড়িবে। গ্রামের সিকিভাগ লোক আজ কপর্দকশূন্য। আমতলী ফুড কমিটির ৩৫০টি কার্ডের মধ্যে ৭০টি কার্ড গ্রাহক অভাবে পড়িয়া আছে। সস্তায় লবণ বিলি হওয়ার পূর্বে এইরূপ কার্ডের সংখ্যা ছিল ৯০। যাহাদের কার্ড আছে, তাহাদের অনেকেই অর্থাভাবে পূরা রেশন লইতে পারে না। সরকারের পরিকল্পিত সিকিভাগ রেশনিংএর ব্যবস্থায় এ সমস্যা মিটিবে না। একেই ত' এই সিকিভাগ লোকের পক্ষে কনট্রোলের বর্ত্তমান দরে চাল কেনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তার উপর বারো আনা লোককে চোরাবাজারের ভরসায় ছাড়িয়া দিলে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করা হইবে।

বাংলার ও বাংলার বাহিরের প্রদেশগুলি হইতে দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদল আসিয়া মহামারী আক্রান্ত এলাকাগুলিতে রোগের প্রতিরোধ ও রোগীর সেবার কাজ করিয়াছে। টঙ্গিবাড়ীর কৃষক স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছে—নিড়ির অভাবে একটি জমিও নষ্ট হইতে দিব না। মহিলা সমিতির কর্ম্মীরা ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স ইউনিটের ৩টি সাহায্যকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে চালাইতেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এই চেষ্টা আজও খুবই সামান্য।

ঢাকার ৩৬ লক্ষ অধিবাসীর আসন্ন বিপদের কথা মনে রাখিয়া গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠন, রেশনিং ও খাদ্যের জন্ত জনগণের ক্ষীণ আন্দোলনকে দ্রুত কদমে বাড়াইতে হইবে। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বে সমস্ত দেশ-প্রেমিকের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংকট রোধ করিতে হইবে। সমগ্র জাতির কলঙ্ক মোচনের ইহাই একমাত্র পথ।

———

হিটলারের ধ্বংসের শেষ পালা সুরু

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের লড়াই-এ অগ্রগতি

ফ্রান্সে গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা, সোভিয়েটের নূতন আক্রমণ

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইয়াছে। সমগ্র দুনিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণের দাবী আজ জয়যুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলায় হিটলার ধ্বংসের শেষ পর্য্যায় সুরু হইল। এতদিন হিটলারকে মার খাইতে হইয়াছিল শুধু সোভিয়েট ফ্রণ্টে। মিত্রশক্তির সমস্ত চাপ চারিদিক হইতে হিটলারের উপর চাপিয়া বসে নাই, তাই হিটলার মাথা বাঁচাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। অধিকৃত ইউরোপের জাগ্রত গণ-বাহিনীর আঘাতকে হিটলার তাই উপেক্ষা করিবার জোর পাইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার সাথে সাথে অবস্থা বদলাইয়া গেল। পশ্চিমের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েটের নূতন আক্রমণ সুরু হইল। তারই সঙ্গে হিটলারের পায়ের নীচের জমিও আবার জোরে কাঁপিয়া উঠিতেছে। শুধু যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রুমানিয়াই নয়, ফ্রান্সের গেরিলা বাহিনীও তৎপর হইয়াছে।

লড়াইয়ের অগ্রগতি

৬ই জুন সকাল বেলা মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী ৪০০০ হাজার জাহাজের এক বিরাট বহরের সাহায্যে ফরাসী দেশের উত্তর উপকূলে নরম্যাণ্ডি অঞ্চলের লা'হাভার হইতে শেরবুর্গ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল ব্যাপী স্থানে অবতরণ করিয়াছে। ডি, এন, বি নামক জার্ম্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর যে মিত্রপক্ষের বাহিনী উপকূল ভাগে অবতরণের সাথে সাথে অন্ততঃ ৪ ডিভিশন ইঙ্গ মার্কিন সৈন্য বিমান ও প্যারাশুটের সাহায্যে জার্ম্মান ব্যূহের পিছনে নামিয়াছে। ইসিগনি, ক্যারেন ও রুয়েন অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। সর্ব্বশেষ খবর যে মিত্র সেনাবাহিনী ইসিগনি, ট্রেভিয়েস, লিসন ও টিলি-সুর-মুলেস দখল করিয়াছে।

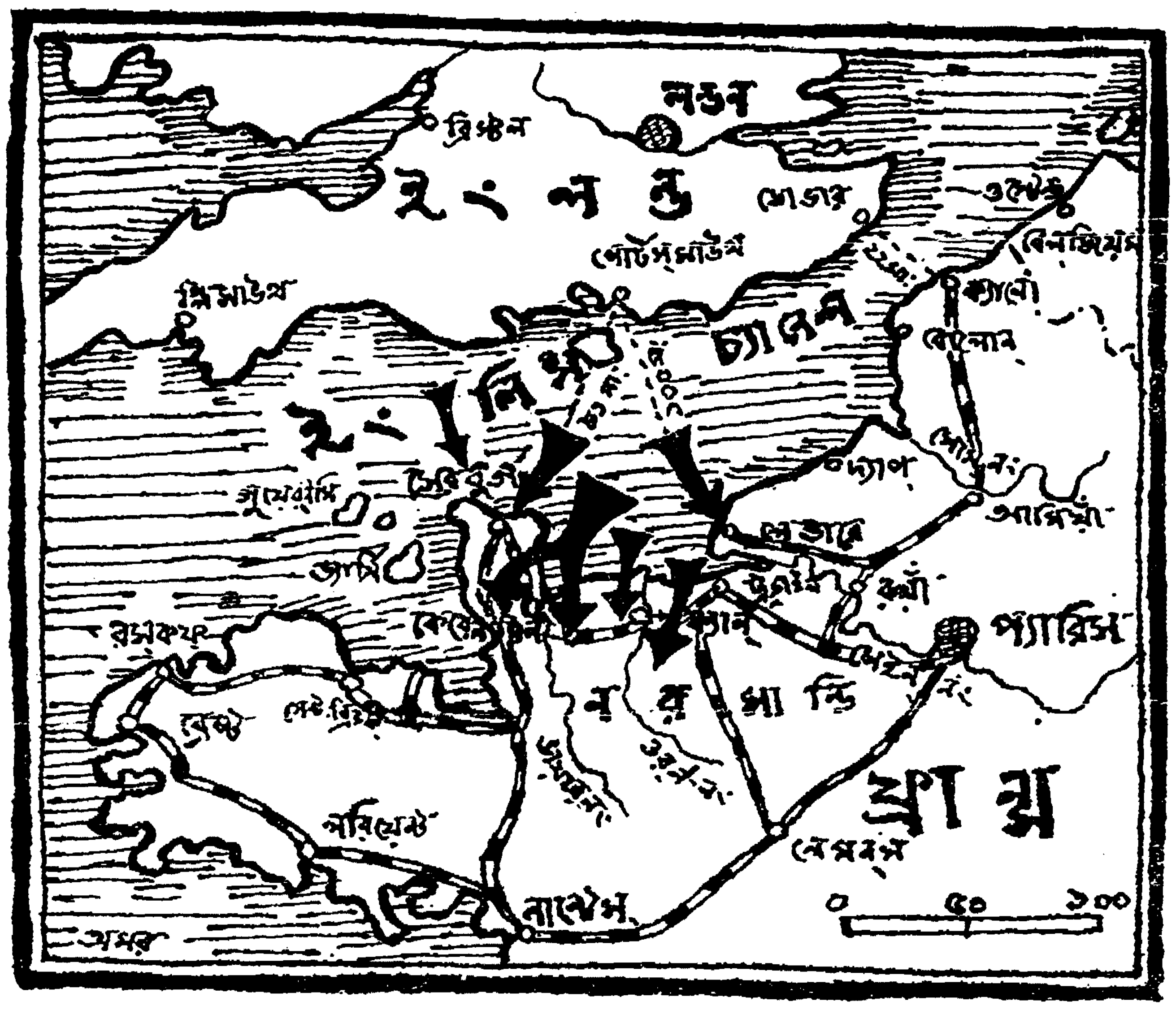

সমস্ত খবর হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে বহু আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় ফ্রণ্টের লড়াইয়ের গতিবেগ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে এবং ইহা শুধু যে একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তা নয়। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে এই রণাঙ্গন শীঘ্রই বিস্তৃত হইবে। মস্কোর ১১ই জুনের একটি ঘোষণায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে সোভিয়েট সেনাও কারেলিয়ায় একটি নূতন অভিযানে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ আগাইয়া গিয়াছে, এবং টেরিজোকী সমেত ৮০টি জনপদ দখল করিয়াছে। ইতালীর খবরও খুবই ভাল। মিত্র সেনার গতি অপ্রতিহতই রহিয়াছে। পেস্কারা প্রভৃতি অনেক গুলি বড় বড় শহর হইতে নাৎসীদের তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রান্সের মুক্তিকামী জনগণ

ফ্রান্সের জনসাধারণ কখনই হিটলারের দাসত্ব মানিয়া লয় নাই। ফ্রান্সের পতনের পর হইতেই দেশভক্ত গেরিলাদল জার্ম্মান গোলামীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া আসিয়াছে, এবং আজ তাহারা একটা সুসংবদ্ধ গণবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এতদিন এই চরম মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ছিল। অধীর আগ্রহে তাহারা মিত্রপক্ষের নেতাদের কাছে এই আবেদনই জানাইয়াছে—"দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল, এ সম্বন্ধে দ্বিধা করিয়া সময় নষ্ট করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" এই মুক্তি বাহিনীর ৩ জন অফিসার এক বিশেষ কাজে আলজিয়ার্সে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মত যে মিত্র-বাহিনীর ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণের সাথে সাথে ফরাসী গেরিলাবাহিনী জার্ম্মান লাইনের পিছনে আঘাত সুরু করিয়া দিবে এবং অন্ততঃ পক্ষে ১০ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে। ফ্রান্সের পরবর্ত্তী সংবাদগুলি হইতে তাহার পূর্ণ আভাষই পাওয়া যাইতেছে। গেরিলাবাহিনী তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। স্পেনের ইরুন হইতে ১১ই জুনের এক খবরে প্রকাশ ফরাসী দেশভক্তরা টলুজ, লিমোজেজ এবং হারবেস শহরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাছাড়া অন্যান্য অনেক স্থানেই জার্ম্মান লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে গেরিলাবাহিনী কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

ফ্রান্সের জনসাধারণ নিজেদের মুক্তির জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া এতটা প্রস্তুত যে যে-সমস্ত ফরাসী এলাকা নাৎসী কবল মুক্ত হইবে, সেখানে ইতালীর ন্যায় মিত্রপক্ষীয় সামরিক শাসন 'এ্যামগটের' রাজত্ব কায়েম করিতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমর্থ হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী কর্ডেল হাল ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে শত্রু কবল মুক্ত হওয়ার পরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ ফরাসী অধিবাসীরাই পরিচালনা করিবে। ফরাসী মুক্তি সংসদই এ ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। কিন্তু যাহাতে ফরাসী জাতীয় মুক্তি সংসদের হাতে নাৎসী কবল মুক্ত এলাকাগুলির শাসনভার না যায় প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনও তাহার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, যে বিপুল গণশক্তি আজকে লড়াইয়ের গতিপথ অধিকার করিয়া লইয়াছে, তার সামনে প্রতিক্রিয়া-শীলদের চাল কয়দিন টিকিবে? ইতালীতে এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে, ফ্রান্সে আরো সহজে ব্যর্থ হইবে।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার

লড়াই তো শুধু পশ্চিম ইয়োরোপে নয়—একদিকে মুক্তিকামী লালফৌজের নূতন আক্রমণ ও অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর আক্রমণের সাথে সমগ্র অধিকৃত ইয়োরোপের জনগণের ফ্যাশিস্ট দস্যুদের ও তাহাদের ভাড়াটিয়া দালালদের বিরুদ্ধে এতদিনের অত্যাচারের দেনা পাওনা মিটাইতে প্রকাশ্য অভ্যুত্থান—ইউরোপে ইহা জনগণেরই জয়ের পথ খুলিয়া দিতেছে।

আসাম-ব্রহ্ম ফ্রণ্টের লড়াই

কোহিমার পতন ও ইম্ফলের যুদ্ধ

৭ই জুন কোহিমা অঞ্চল হইতে জাপানীদের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে আসাম ফ্রণ্টের যুদ্ধে এক নূতন অধ্যায় আনিয়াছে। ডিমাপুর-ইম্ফল রাস্তায় আরাদুরা পর্ব্বতপৃষ্ঠ জাপানীরা প্রচণ্ডভাবে রক্ষা করিতেছিল। এতদিন সেখানে তাহাদের শক্তি প্রবল ছিল। মিত্রশক্তি আরাদুরা পর্বতপৃষ্ঠ দখল করিয়াছে, সেখানে এখনো একটী ঘাঁটি হইতে জাপানীরা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। কোহিমার দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভিসওয়েমার কিছু উত্তরে, ইম্ফলের ১৪ মাইল উত্তরে এবং কাংলাটনবীর বড় রাস্তার প্রায় ৭০ মাইল পর্য্যন্ত জাপ সৈন্যরা নিজ শক্তি লইয়া বসিয়া আছে।

মিত্রসৈন্যের তৎপরতা

মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য ইম্ফলে বিমান-যোগে সাহায্য পাঠান। জাপানীরা কোহিমা দখলে রাখিয়া ইহার দক্ষিণ সড়কের মারফৎ ইম্ফলে যাহাতে মণিপুর সড়ক বাহিয়া মিত্রপক্ষের সৈন্য প্রেরণ সম্ভব না হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল।

এ-পি এর যুদ্ধ সংবাদদাতা মানকেকার জানাইতে-ছেন,—মণিপুর সড়ক হইতে জাপ-সৈন্যদের বিতাড়ন ও ইম্ফলের সহিত রাস্তার যোগাযোগ স্থাপন করার প্রচেষ্টা স্বভাবতই অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতেছে।

১২ই জুনের সংবাদে দেখা যায়, জেসামী সড়কের উপর জাপানীদের প্রতিআক্রমণ ব্যাহত করা হইয়াছে। মিত্র সৈন্যগণ আরাদুরা পর্ব্বতপৃষ্ঠ দখল করার পর কোহিমার পূর্বদিকে ২৪ মাইল দূরে জাপ-আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে। কিদিমার ৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে ভিসওয়েমার নিকটও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ইম্ফলের ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। মডবাংএর চতুর্দ্দিকে শত্রুরা প্রতি-আক্রমণ চালাইতেছে। ইম্ফল-উখরুল সড়ক অঞ্চলে শত্রুপক্ষ রাত্রিকালে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। বিষেণপুরের ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একস্থানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। বিষেণপুর অঞ্চলে মিত্রপক্ষের টহলদার সৈন্যগণ শিলচর-গামী সড়কে খুব তৎপরতা দেখাইতেছে।

জাপ বাহিনীর প্রবল আক্রমণ

কোহিমা হইতে বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাপানীরা এই অগ্রগতিকে প্রতি পদে বাধা দিতেছে। এই বাধাদানকে শত্রুদের পৃষ্ঠ-রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ডিমাপুর লেডো রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিতে ও ইম্ফলের চমৎকার ঘাঁটিগুলি দখল করিতে জাপানীরা অভূতপূর্ব চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু তাহারা প্রায় ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য্য হইতেছে।

উত্তর ব্রহ্মে স্টিলওয়েলের বাহিনী

পূর্বে আশা হইয়াছিল মিচিকানা খুব শীঘ্রই দখল করা হইবে। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কাণ্ডির হেডকোয়ার্টারের রিপোর্ট হইতে জানা যায়—"মোগং দখল করিতে না পারিলে মিচিকানা লইয়া কিছুই হইবে না" কারণ মিচিকানার সহিত জাপানীদের রেলের সংযোগ কাটিয়া ফেলিতে হইলে মোগং-এ ঘাঁটি করা চাই। বর্ষার জন্য ষ্টিলওয়েলের প্রধান বাহিনীর কাজ কিছু ঢিলা পড়িয়াছে। কামেংএর ১৪ মাইল উত্তর-পূর্বে ওয়ারং দখল করা হইয়াছে। কামেং মোগং এর ২৫ মাইল উত্তরে। কামেং এখনও দখল করিতে হইবে। জাপানীরা এ অঞ্চলে এখনও সৈন্য শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পাইতেছে—অর্থাৎ মিত্রবাহিনীর বেষ্টনী তৈরী করা সম্পূর্ণ হয় নাই। ষ্টিলওয়েল বাহিনী মিচিকানায় বিমানক্ষেত্রের উত্তর অঞ্চলে অগ্রসর হইয়াছে। চীনাসৈন্যরা শহরের ভিতর একটী নূতন ঘাঁটি দখল করিয়াছে। সেনাপতি লেনট্যাংএর চিন্দিৎরা মিচিকানার ২ মাইল উত্তর-পূর্বে মৈন্নার নিকট গোলা গ্রাম দখল করিয়াছে। মিত্রবাহিনী শহরের উপর ৪টী ঘাঁটি হইতে জাপানীদের তাড়াইয়াছে। ষ্টিলওয়েলের বাহিনী ঘোরতর যুদ্ধের ফলে এক এক ইঞ্চি করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বর্ষারম্ভের ফলে ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া যে বিশ্বাস অনেকের হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

আরাকানের যুদ্ধ

টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া হইতে জানা যায়—মিত্রপক্ষের কমাণ্ড আরাকান হইতে ৫ম ডিভিসনকে বিমানযোগে ইম্ফলে আনিয়াছে। পুরাতন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই বাহিনীকে আরাকান হইতে সরানর ফলে বুথিডং হইতে সরিয়া আসিতে হইতেছে। ইহার ফলে জাপানীরা কালাদান ও কালাপাঞ্জিন হইতে মিত্র সৈন্যদের উপর চাপ দিতে পারিতেছে এবং চট্টগ্রামের সীমান্তে কক্সবাজারের দক্ষিণে মিত্রসৈন্যদের দিকে আগাইতে পারিতেছে। কিছুদিন আগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল কক্সবাজারের ৮ মাইল দূরে ডালেমের ১০ মাইল পশ্চিমে জাপানীদের একটী প্রতি আক্রমণকে প্রতিহত করা হইয়াছে। ডালেমে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটী রাস্তায় সংগম স্থল। ইহাতে বুঝা যায় যে, আরাকানের যুদ্ধ ভারতের খুবই নিকটে হইতেছে।

শুধু প্রতিরোধ নয়, প্ল্যান করিয়া দ্রুত অগ্রসর হওয়া চাই

'হিন্দুর' যুদ্ধ সংবাদদাতা টি, জি, নারায়ণ জানাইয়া-ছেন—ক্রমাগত বর্ষা হওয়া সত্ত্বেও আসামব্রহ্ম রণক্ষেত্রে জাপানীরা যুদ্ধের গতি বিন্দুমাত্র শিথিল করে নাই। সারা বর্ষাকাল ধরিয়া তাহারা প্রত্যেকটী ঘাঁটিতে আঁটিয়া বসিয়া থাকিবে ইহাই মনে হইতেছে। চিন্দুইন নদীর পারে প্রধান ঘাঁটির সহিত জাপানীদের যোগাযোগের রাস্তা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু তাহারা সব সময়ের উপযোগী রাস্তাঘাট তৈরী করিতে পারে, কৃত্রিম কায়দায় যোগাযোগের ব্যবস্থা চালাইতে পারে। মিত্র-পক্ষের বিমানবহর বর্ষা সত্ত্বেও আসামব্রহ্ম রণক্ষেত্রে জাপানীদের যোগাযোগের রাস্তার উপর বেশ ভাল ভাবেই আঘাত করিতেছে।

"হিন্দুর" সংবাদে প্রকাশ, জনৈক সামরিক মুখপাত্র মে মাসের ঘটনাবলীর আলোচনায় বলিয়াছেন—"বর্ষা পুরাদমে নামিলে বিমান বহরের কাজ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে বিশেষতঃ বিমান বহরের তৃতীয় টি-এ-ফোর্সের কিছুটা শক্তি শিথিল হইয়া পড়িবে। এখনো বুঝা যাইতেছে না, উত্তর ব্রহ্ম, মণিপুর ও দক্ষিণ অঞ্চল এই তিনটীর কোন স্থানে জাপানীরা খুব বেশী শক্তি ও সৈন্য সমাবেশ করিবে।"

উভয় পক্ষেই ঘোরতর লড়াই চলিতেছে। বর্ষার মধ্যে কে কোন্ মূল ঘাঁটি দখল করিয়া রাখিবে তাহা লইয়া প্রবল সংগ্রাম হইতেছে। ইম্ফল ও মিচিকানায় লড়াই কোনপক্ষই শিথিল হইতে দেয় নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষকে জাপানীদের প্রত্যেক অঞ্চলের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তুমুল অভিযান চালান প্রয়োজন। একটী রণাঙ্গনকে কিছুটা দুর্বল করিয়া অন্যত্র শক্তি বাড়াইবার পরিকল্পনা করায় সুফল হইবে না। প্রত্যেকটী রণাঙ্গনকেই শক্তিশালী করিয়া জাপসৈন্যদের সর্বত্রই পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে। চতুর্দ্দিক হইতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া দরকার। ১২-৬-৪৪

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের শেষ খবর

মিত্রবাহিনী কারেন্তান দখল করিয়াছে। কারেন্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন। এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মানদের হাত হইতে চারি শত হইতে পাঁচ শত বর্গ মাইল স্থান দখল করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মিত্রসেনার তটব্যূহ ৬০ মাইল বিস্তৃত এবং উহা গভীরতম স্থানে ১৮ মাইল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ১৩-৬-৪৪

Regd. No. C. 2836

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে

হিন্দু মুসলমান শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রদের মিলিত ঘোষণা

৯ই জুন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্রলীগের সভ্যদের এক মিলিত সভায় এই মেমোরাণ্ডাম উপস্থিত করা হয় ও আলোচিত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলকে উপলক্ষ করে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে বাংলার শিক্ষাজীবনের, বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার, প্রকৃত সমস্যার কথা চাপা পড়ে গেছে। সুতরাং সেই মূল সমস্যাগুলির দিকে দেশবাসীর বিশেষতঃ শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

১। সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক উন্নতির দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাব্রতীদের অকুণ্ঠ দানে, শিক্ষকদের মহান আত্মত্যাগে, দেশবাসীর যত্নে। যতটুকু ব্যবস্থা আজ আছে সেটা গড়ে উঠেছে এরই ফলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও আবার দেশবাসীর মনে এই প্রগতির ইচ্ছাকে শক্তিশালী করেছে।

কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা বরাবরই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখে এসেছেন নিরীহ কেরানী আর অনুগত কর্ম্মচারী সৃষ্টির এক কারখানা হিসাবে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতীয় অগ্রগতির এই স্রোতকে তাঁরা কখনই সুচক্ষে দেখেন নি।

গত দশ বৎসরে, সরকারের নিজস্ব রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থা এক পা-ও অগ্রসর হয় নি, বরং ১৯৩২-১৯৩৭ সালে বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের সংখ্যা কমেছে। এই কয়েক বছরে সরকার সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের জন্য খরচ করেছেন মাথাপিছু মাসে আট আনারও কম। বাংলা দেশে শতকরা প্রায় ৬০টা মাধ্যমিক স্কুল কোন সরকারী সাহায্যই পায় না। ইউরোপীয়ান স্কুলের ছাত্রদের জন্য সরকারের ব্যয় মাথাপিছু মাসে ৩৫৷৷০।

অথচ এই সময়েই শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পরপর কয়েকটা বিপজ্জনক সার্কুলার এবং বিলের সাহায্যে শিক্ষক এবং ছাত্রদের সরকারী নীতির নাগপাশে বাঁধবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন।

এই সমস্ত ষড়যন্ত্রকে যদি সুরুতেই ব্যর্থ করা না যায়, সরকারকে যদি বাধ্য করা না যায় শিক্ষার প্রসার এবং উন্নতির ব্যবস্থা করতে, তবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ত' হবেই না বরঞ্চ ভেঙে পড়বে।

সে অবস্থায় কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা।

সেই জন্য আমরা মনে করি যে যাঁরা জনসাধারণের স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা চান তাঁদের প্রত্যেকের মিলিত চেষ্টা হওয়া দরকার যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রধান কর্তৃত্ব শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবকদের হাতেই থাকে।

২। গত এক বৎসরে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ডতম আঘাত এনেছে। অগণিত স্কুল উঠে গেছে, সহস্র সহস্র ছাত্র লেখা পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, শত শত শিক্ষক তাঁদের মহান আদর্শ ত্যাগ করে টাকার জন্য অন্য জীবিকা গ্রহণ করেছেন। গত বৎসরের ঘটনাচক্র এ বছরে আরও ভীষণ রূপ নিয়ে দেখা দেবার সম্ভাবনা দিন দিন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এই নূতন আক্রমণে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশ, সে মক্তবই হোক আর টোলই হোক, মাদ্রাসাই হোক আর স্কুলই হোক, আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সর্ব্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার কাজে সরকার অমার্জ্জনীয় উদাসীনতা দেখিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের জনমতও এই চরম বিপদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয় নি। শিক্ষা এবং সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় আমাদের দায়িত্বশীল নেতা এবং সংগঠনদেরও যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে।

আমরা মনে করি যে প্রত্যেকটী শিক্ষাব্রতী শিক্ষক ও ছাত্রের আজ প্রথম এবং প্রধান কাজ এই সর্ব্বনাশের বিরুদ্ধে চরম চেষ্টার জন্য জনমতকে জাগরিত করা এবং সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করা।

৩। শিক্ষাজীবনকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করতে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে জনসাধারণের আয়ত্বে এনে তার সর্ব্বাঙ্গীন বিস্তার এবং উন্নতি করতে যাঁরা চান তাঁদের প্রত্যেককে আজ একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে, কারণ পৃথকভাবে কারও স্বার্থই সিদ্ধ হতে পারে না।

আর যারা এই মহান কর্ত্তব্য পালনের জন্য সাথে চলবেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই শিক্ষাজীবন পুনর্গঠনে এবং পরিচালনায় সমান অধিকার দিতে হবে। শিক্ষা জীবনে প্রত্যেকটী সম্প্রদায়, এবং মতকে সমান সুযোগ দিতে হবে কারণ আজ আমাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা নিয়ে ভাগাভাগি নয়, কর্ত্তব্যপালনের সহযোগিতা। **নিজস্ব স্বাধীন মতানুযায়ী শিক্ষা লাভ করার সুযোগ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করানো সম্ভব। এই কথা মনে রাখলে প্রত্যেকটী সম্প্রদায়ের পৃথক ভাবে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।**

৪। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে আমরা ঘোষণা করছি যে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু বর্ত্তমানে আইন-পরিষদে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা চলছে সেটী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। আমরা মনে করি যে প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারী এবং সরকার মনোনীত সভ্যদের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটাই বিলের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ। আমরা মনে করি যে ধ্বংসপ্রায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও বিস্তারের কোন পরিকল্পনা না থাকাই বিলটীর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা।

সুতরাং, আমরা দাবী করছি যে প্রস্তাবিত বিলটীকে নিম্নলিখিত ভাবে সংশোধিত করা হোক—

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংশাসিত হবে। একমাত্র আইনসভার নীতিগত নির্দ্দেশই বোর্ডের উপর প্রযোজ্য হবে।

(খ) বোর্ডের সভাপতি বোর্ডের সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন।

(গ) বোর্ডে সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকার মনোনীত সভ্যের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের বেশী কিছুতেই না হয় এবং এই সংখ্যার মধ্যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদ্বয় ও ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন নিশ্চয়ই থাকবেন।

(ঘ) সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যা কমার অনুপাতে জনস্বার্থের (শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, প্রভৃতি) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ান হোক।

(ঙ) বোর্ডের গঠননীতির মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সালিশী বোর্ডের পাকা ব্যবস্থা করা হোক।

(চ) বোর্ডের জন্য বরাদ্দ টাকা ২৫ লক্ষ থেকে এক কোটী করা হোক।

(ছ) ইউরোপীয়ন ও দেশীয় ছাত্রদের জন্য মাথা পিছু সরকারী ব্যয় সমান করা হোক।

(জ) সরকারী বে-সরকারী সমস্ত স্কুলে শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন বেঁধে দেওয়া হোক এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে অসচ্ছল স্কুলগুলিতে বিশেষ সাহায্যের বরাদ্দ করা হোক।

আমাদের সবচেয়ে বড় দাবী এই যে বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও বিস্তার সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত একটী কমিশন সরকার এখনই নিয়োগ করুন। এই কমিশনের অভিমত পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে একটী আইন হিসাবে সেই অভিমতকে আইন সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হোক। বর্ত্তমান বিল অনুযায়ী গঠিত বোর্ড সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের শিক্ষা জীবনের প্রত্যেকটী অংশ যদি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই কর্ত্তব্যে একমত হন তবেই আমাদের প্রতিনিধিরা সমস্ত সমস্যা সমাধান করার মত শক্তি পাবেন। আর যদি সাম্প্রদায়িক দাবী এবং অধিকারের অসার বিবাদে আমরা ডুবে থাকি তবে বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার নিশ্চিত ধ্বংস হবে। পৃথক বা যুক্ত কোনো নির্ব্বাচন ব্যবস্থাই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

স্বাক্ষরকারী ঃ

আব্দুল ওয়াসেক—নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ। অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য—সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন আনোয়ার হোসেন—সম্পাদক, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ। আবুল কালাম শামসুদ্দিন—সম্পাদক, 'আজাদ'। হীরেন মুখার্জ্জী অধ্যাপক—রিপন কলেজ। বুদ্ধদেব বসু (ঐ), বিষ্ণু দে (ঐ), বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ঐ), বিনয় সরকার অধ্যাপক—সিটি কলেজ, সত্য সেনগুপ্ত (ঐ), বিভূতিভূষণ চৌধুরী (ঐ), করুণাময় মুখার্জ্জী অধ্যাপক—বঙ্গবাসী কলেজ, নীরেন্দ্র নাথ রায় (ঐ), নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (ঐ), সরোজ আচার্য অধ্যাপক—উইমেন্স্ কলেজ, সন্তোষ বসু (ঐ) সুধাংশু বসু অধ্যাপক—বিদ্যাসাগর কলেজ। শৈলজা রায়, (ঐ), প্রভাসচন্দ্র ঘোষ (ঐ), নরহরি কবিরাজ (ঐ), এ, বি, এম্ হবিবুল্লাহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রেণু চক্রবর্ত্তী (ঐ), অধ্যক্ষ, জন কেলাস, স্কটিশচার্চ কলেজ। অধ্যাপক এস্, সি, বিশ্বাস (ঐ) এস, সি, দত্ত (ঐ) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। আবুল মনসুর আহ্‌মদ, পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। সমর সেন, দিল্লী কমার্শিয়াল কলেজ। সুশীলকুমার দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নীরোদ মুখার্জ্জী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিল চক্রবর্ত্তী (ঐ)। নুরুল আনোয়ার সম্পাদক ২৪ পরগণা জিলা মুসলিম ছাত্র লীগ। মুজিবর রহমান খাঁ "আজাদ"। কাজী মহম্মদ ইদ্রিস সম্পাদক পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। সামসুল হুদা চৌধুরী সহ-সভাপতি, আলিগড় ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন। প্রণতি দে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কমলা গার্লস্‌হাই স্কুল। হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদক "পরিচয়"। গোপাল হালদার, গোলাম কুদ্দুস সম্পাদক, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আনোয়ার হোসেন সহ-সম্পাদক, নিখিল বঙ্গমুসলিম ছাত্র লীগ। রণজিৎ গুহ সম্পাদক, কলিকাতা সিটি ছাত্র ফেডারেশন।

কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লি সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিয়াছেন, 'এই গণ পরিষদ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মন হইতে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য এই পরিষদ যদি মনে করে তাহা হইলে পরিষদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন **পৃথক নির্ব্বাচনের** দ্বারাও হইতে পারে—আমি এই মতই ব্যক্ত করিয়াছি।' (১৯৩৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর লিখিত প্রবন্ধ 'রিয়ালিটি এণ্ড মিথ' হইতে।)

নজরুল জন্মবার্ষিকী

গত ২৫শে মে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের উদ্যোগে মহাবোধি সোসাইটি হলে নজরুল জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নজরুলের গান ও কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ এই সভায় নজরুলের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নিপীড়িত মানুষ ও সামাজিক বাস্তবের প্রতি নজরুলের ছিল প্রবল পক্ষপাত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নজরুলই আমাদের জনগণের প্রথম কবি। নজরুলের কাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামেরই গাথা। মুজিবর রহমান নজরুলকে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী বিরাট প্রতিভা বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁর কাব্যেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে। সভায় বহু শিল্পী সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

নূতন বই

প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

দাম ।৵০

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা

সোভিয়েট সুহৃৎ সম্মেলন

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মানবজাতির হইয়া লড়িতেছে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া লড়িতেছে না, তাহা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

কার্য বিবরণী পেশ করা হইবার পর ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের স্রষ্টা এন, এম, জোশী, সিংহল সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির প্রতিনিধি ষ্ট্যান্‌লি মেণ্ডিস্, প্রগতিলেখকসংঘ ও জননাট্যসংঘের প্রতিনিধি খাজা আহাম্মদ আব্বাস, কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে বি, টি, রণদীবে, অধ্যাপক মিস্ নানাবতী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, সকল দেশভক্তেরই যে আজ সমিতির কাজে সাহায্য করা প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া বলেন।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে "ইউক্রেনের যুদ্ধ" নামে একটী সোভিয়েট ফিল্‌ম্ দেখানো হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রস্তাবাদি আলোচিত হয়, সমিতির কানুন সম্পর্কে এক খসড়া গৃহীত হয় ও নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত হয়। নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভানেত্রী পদে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে পাওয়ার সংবাদে সম্মেলনে বিপুল উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। সহসভাপতিদের মধ্যে আছেন কেরলের কবিশ্রেষ্ঠ বল্লাটোল, বোম্বাইয়ের সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেল্‌ভি, বাংলার ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাদ্রাজ "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক কে শ্রীনিবাসন্। মুসলিম লীগের একজন সর্ব্বপরিচিত নেতাকেও সহসভাপতি হিসাবে পাওয়া যাইবে শুনা যায়, কিন্তু এখনও পাকা খবর আসে নাই। সাধারণ সম্পাদক হন আর, এম, জাম্বেকর; হীরেন মুখার্জি ও অধ্যাপক জুনান্‌কর (আহমদাবাদ) যুগ্মসম্পাদক এবং মহেন্দ্র শান্তিলাল কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।

৪ঠা জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় সকল প্রদেশের সংস্কৃতি নায়করা মিলিয়া সোভিয়েটের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলার কিশোরদের প্রতি

দুধের আন্দোলন চালাও

গত এক বছরে সারা বাংলায় কত শিশু ও কিশোর মরেছে জানো? ১৩ লক্ষ। বাংলার জেলায় জেলায় কিশোর বাহিনী এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়েছে। তাই কিশোর বাহিনী আজ কিশোরদের সেরা সংগঠন। আজ আবার নূতন সংকট দেখা দিয়েছে। দুধের **অভাবে হাজার হাজার শিশু ও কিশোর আজ মৃত্যুর পথে। এদের বাঁচাবার জন্যে বাংলায় এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ছোট ছোট ভাই বোন ও নিজেদের বিপদের কথা মনে রেখে কিশোরদের আজ এক হ'য়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, কিশোরদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে এক করতে হবে।** বাপ, মা, অভিভাবক, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেককে এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] ২১শে জুন, বুধবার, ১৯৪৪, ৭ই আষাঢ়, ১৩৫১ [দাম ছ'পয়সা

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র

গত শুক্রবার (১৬ই জুন) আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিরাশী বছর আগে, যখন বাংলা দেশ অনেক বিষয়ে অনগ্রসর ছিল, সেই অতীতেই আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অতীতের আবহাওয়ার মধ্যেও অতুল সাহসে ভবিষ্যতকে তিনি প্রগতি বলেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাই প্রথম জীবন থেকেই হিন্দু সমাজের প্রাচীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারকের সংগ্রাম তিনি সুরু করেছিলেন; জমিদারী জীবনযাত্রা প্রথার আরাম, অনাচার ও অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের গণ্ডীতে আবদ্ধ বাঙ্গালীকে তিনি শিল্প বিকাশের নতুন পথ ধরবার সাহস দিয়েছিলেন; পৃথিবীর কবিতা ও সাহিত্য শিক্ষার নতুন কল্পলোক থেকে তিনি দৃঢ় হস্তে বাঙ্গালীর মুখ ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সৃজনের দিকে।

ভবিষ্যত একের নয়, ভবিষ্যত বহুর এ উপলব্ধিও তাঁর ছিল। তাই নিজে খুব বড় বৈজ্ঞানিক হব এ লোভ সংবরণ ক'রে বহু বৈজ্ঞানিক তৈরী করবার শিক্ষা-পরিকল্পনায় তিনি সর্বশক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁর মনকে কারও চেয়ে কম নাড়া দেয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতীর যা নিজস্ব শক্তি আছে তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারলে ভারতীয় জাতীয়তার শক্তিই বাড়বে, বাঙ্গালীও আত্মনির্ভরশীল হবে। তাই বাঙ্গালীর জাতিগত দুর্বলতাকে যেমন তিনি নিষ্করুণভাবে বারে বারে আঘাত করেছেন, জাতি হিসাবে বাঙ্গালীকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেও চেষ্টার তিনি কখনো ত্রুটী করেননি।

ভবিষ্যতের প্রগতি আর সমষ্টিগত মঙ্গল—এই দুই পথে তাঁর চিন্তা অগ্রসর হয়েছিল বলে সোভিয়েট দেশে মানুষের সমষ্টিগত প্রগতির দৃষ্টান্ত তাঁর মনকে টেনেছিল। সোভিয়েটের উপর হিটলারের আক্রমণ যখন এই প্রগতিকেই আক্রমণ করল তখন দেশের বড় বড় নেতাদের মধ্যে আচার্য্যই সকলের আগে এগিয়ে এসেছিলেন এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিস্ট পার্টি তার পতাকা অবনমিত করছে।

যুদ্ধের শেষ খবর

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—নরম্যাণ্ডি উপকূলের বৃটিশ সেনা পুনরায় **টিলি** শহরের একাংশ দখল করিয়াছে, শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হইতেছে।

শেরবুর্গ বন্দর হইতে আমেরিকান সেনারা মাত্র ৮ মাইল দূরে আছে। মিত্রসেনা শেরবুর্গ উপদ্বীপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

মণ্টবুর্গ সহর পুনরায় জার্ম্মানরা দখল করিয়াছে।

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজ কেরেলিয়ান ফ্রণ্টের সর্ব্বশেষ ফিনিশ রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া **ভাইবুর্গের** উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ফ্রণ্টের লালফৌজের নায়ক জেনারেল গভোরভকে মার্শাল উপাধি দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে মার্শাল গভোরভই ১৯৪০ সালের ম্যানারহিম লাইন চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—এলবা দ্বীপের অধিকাংশই এখন মিত্র সেনার হাতে। **পোর্টো ফেরাইও** নামক শহরটি ফরাসী সেনারা দখল করিয়াছে। অষ্টম আর্ম্মি মধ্য ইতালীর পেরুগিয়া শহরের বহির্ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পঞ্চম আর্ম্মি গ্রোসেটো হইতে ১০ মাইল উত্তরে পৌঁছিয়াছে।

যুগোশ্লাভ ফ্রণ্ট—মার্শাল টিটোর হেড কোয়ার্টার হইতে খবর দেওয়া হইয়াছে যে পশ্চিম বসনিয়ায় জার্ম্মানরা যে অভিযান চালাইয়াছিল তাহাতে তাহাদের ৮০০০ সেনা মারা গিয়াছে। **কর্ডুন ও বানিজা** নামক ক্রোটিয়ার ২টি প্রদেশ হইতে জার্ম্মানদিগকে সম্পূর্ণভাবে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চীন ও ব্রহ্ম ফ্রণ্ট—বার্ম্মা শড়কের লুংলিং শহরটি চীনাসেনারা ছাড়িয়া দিয়াছে। চীনাসেনা ও চিন্দিৎরা **মোগাউং**-এর আরও নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইম্ফল রোডের ২০ মাইল স্থান হইতে জাপানীদের তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেশবন্ধু আমাদের কি শিখাইয়াছেন

১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু তিথি। সমস্ত বাঙ্গালী এই দিন শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় তাঁহার মৃত্যুহীন স্মৃতিকে স্মরণ করে।

দেশবন্ধুর রাজনীতিক জীবন বহু দিন ব্যাপী ছিল না। জীবনের অপরাহ্নে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর সে অপরাহ্নের আলো ফুরাইতে না ফুরাইতেই মৃত্যুর অকাল-রাত্রি তাঁহাকে অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল।

কিন্তু এই স্বল্প পরিসর কর্মজীবনেই তিনি বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে অবিনশ্বর ছাপ আঁকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কতদিন গেল কিন্তু আজও বাংলা দেশে কোন নেতা তাঁহার সমান মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিলেন না।

তিনি দেশভক্ত ছিলেন, দাতা ছিলেন, কর্মী ও নেতা ছিলেন। কিন্তু এমন তো অনেকেই ছিলেন, আজও অনেকেই আছেন। এই সব সাধারণ গুণ ছাড়াও তাঁহার রাজনীতি ও কর্মতৎপরতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ছিল যাহা দেশকে বিশেষ সাফল্যের পথ দেখাইয়াছে?

গান্ধীজির নেতৃত্ব ও নির্দ্দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়া কংগ্রেস সর্বপ্রথম বিরাট জাতীয় গণ প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইল, সমস্ত জনসাধারণও স্বাধীনতার জন্য দুর্দম গণ-সংগ্রামে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। কিন্তু সেই সংগ্রামের স্বাভাবিক দুরন্ত অগ্রগতিই আবার আপোষ-পন্থায় বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এই ভয়ে ১৯২২ সালে বর্দোলি প্রস্তাবে এই সংগ্রামকে রোধ করার ব্যবস্থা হইল। ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্রগতিকে অগ্রসর করাইতে পারে, ততখানি শক্তি ও চেতনা গণ আন্দোলনের মধ্যে তখনও আসে নাই। কাজেই গান্ধীজির রাশ টানের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন মুষড়াইয়া পড়িল, গণ আন্দোলনের উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল, দেশের মধ্যে ব্যর্থতা ও নিরাশার প্রতিক্রিয়ায় রাজনীতিক জীবনই স্তব্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা জাগিল। গান্ধীজির অনুগামী নো-চেঞ্জারের দল চরকা, সূতাকাটা, গণসংযোগহীন সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কাজের ভিতরে নিরাশার সান্ত্বনা খুঁজিতে গেলেন, তাহাতে রাজনীতির দৈনন্দিন প্রবাহে আরও ভাঁটা পড়িল।

এ অবস্থায় গণ-সংগ্রাম তখনই আরম্ভ করা যায় না, অথচ রাজনীতিক জীবনেও গতি চাঞ্চল্য আনা দরকার। দেশবন্ধুর 'আধ্যাত্মিক' সংস্কারমুক্ত আধুনিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীই ইহার উপায় বাহির করিল। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ অনাবৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কাউন্সিলের ভিতর পার্লামেণ্টারি আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহারই ভিত্তিতে বাহিরের আন্দোলন জনসাধারণের মনে আবার সাড়া জাগাইতে লাগিল। দেশের রাজনীতিক শক্তি যখন সাময়িকভাবে পিছু হটিয়াছে তখন পার্লামেণ্টারি আন্দোলন কিরূপে সেই শক্তিকে আবার অগ্রসর করাইতে পারে তাহার নমুনা দেশবন্ধু দেখাইয়াছিলেন। সেজন্যই কংগ্রেস পরে তাঁহার কর্মপন্থাই গ্রহণ করে। এবং কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের মধ্যে তিনি ও পণ্ডিত মতিলালই সর্ব্বপ্রথম (১৯২৪) ঘোষণা করেন যে "দেশময় শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠনগুলিকে সাহায্য করিয়া আমাদের কংগ্রেসের কাজকে পূর্ণতা দিতে হইবে।" তাঁহাদের এই পন্থাও কংগ্রেস পরে গ্রহণ করে।

১৯২০-২১-২২এর আন্দোলন মুসলমান জনসাধারণকে সর্বপ্রথম সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে টানিয়া আনিয়াছিল। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন জাগিল তেমনি হিন্দুদের তুলনায় তাঁহাদের পশ্চাৎপদ অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার উপলব্ধিও জাগিল। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মুসলিম জাতিগুলি স্বাধীন ভারতের মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল; সারা ভারতের সমস্ত মুসলমান নিজেদের আর্থিক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিগত বিকাশের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। মুসলিম জাতি তথা মুসলমানদের এই চেতনা ও বিকাশ জাতীয় আন্দোলন হইতেই জন্মিয়াছে এবং উহাকে বিশেষ অধিকার ও সাহায্য দিয়া বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে ও সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সমান করিয়া লইতে পারিলে ভারতের জাতীয় বিকাশই প্রচণ্ডরূপে অগ্রসর হইয়া যাইবে—দুর্ভাগ্যক্রমে এই উপলব্ধি গান্ধীজি প্রমুখ নেতাদের মনে তখন আসিল না। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদের সূত্রপাত হইল এবং তাহা সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই পুষ্ট করিল। ১৯২২ সালে মুলতানে এবং ১৯২৩ সালে বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধিল।

মুসলমানের বিশেষ অধিকার স্বীকার করিয়া হিন্দু মুসলিম ঐক্য গঠন ছাড়া দেশের অগ্রগতি যে আর সম্ভব নয় তাহা দেশবন্ধু বুঝিতে পারিলেন। কায়েমী হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থের হাজার কুৎসা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পদে পদে মুসলমানদের অধিকার স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহারই ফলে তিনি কাউন্সিলে বার বার আমলাতন্ত্রকে হারাইতে পারিলেন, কর্পোরেশনে দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন, অল্প কিছুদিনের জন্য বাংলা দেশে ঐক্যের ও অগ্রগতির এক নূতন অধ্যায় দেখা দিল। ১৯২৪ সালে দিল্লী, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট প্রভৃতি ভারতের প্রায় সর্বত্র যখন তুমুল দাঙ্গা বাধিল তখন অন্তত সাময়িকভাবে বাংলা দেশ উহা হইতে খানিকটা পরিমাণে বাঁচিতে পারিল।

মুসলমানের বিশেষ অধিকার স্বীকৃতির উপরই বর্ত্তমান দিনে হিন্দু মুসলিম ঐক্য তথা দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে—দেশবন্ধুর এই উপলব্ধি সারা ভারতে সমগ্র কংগ্রেসের স্পষ্ট উপলব্ধিতে পরিণত হয় নাই। বাংলা দেশেও হিন্দু কায়েমী স্বার্থের চাপ বারে বারে দেশবন্ধুকে বাধা দিয়াছে, তাঁহার চুক্তি ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়াছে। এই ব্যর্থতাই হয়তো তাঁহাকে দেশের ভিতরকার শক্তির উপর কিছু কিছু ভরসা হারাইতে বাধ্য করিয়াছে, এই নিরাশায়ই হয়তো তিনি শেষ জীবনে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে "প্রতিদানমূলক সহযোগিতার" কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্য না গড়িতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

দেশবন্ধুর রাজনীতিক বৈশিষ্ট্য ও আংশিক সাফল্য এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠারই শিক্ষা দেয়। তাঁহার জীবন-কালে ও মৃত্যুর পর এই শিক্ষাকে আমরা অবহেলাই করিয়াছি তাই স্বাধীনতা হইতে আজও আমরা এতদূর। আজ নূতন পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষা যদি আমরা প্রয়োগ করিতে পারি তবেই আমরা বাঁচিব।

আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং

ইংলণ্ড ভারতের খাতক

বিলাতের সরকারের নিকট ভারতবাসীর পাওনা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ১৩০০ কোটি টাকা। ইংলণ্ডের নিকট আমাদের দেনা আছে মাত্র ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলাতের কাছে আমাদের জাতীয় দেনা ছিল ৩৫ কোটি পাউণ্ড। ঐ সময় আমাদের পাওনা ছিল ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড। দেনা পাওনার হিসাব করিলে দেখা যায় যে যুদ্ধের আগে আমাদের নীট্ দেনা ছিল সাড়ে চৌত্রিশ কোটি পাউণ্ড আর এখন নীট্ পাওনা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ যুদ্ধের আগে ভারত ছিল ইংলণ্ডের খাতক, এখন ইংলণ্ড ভারতের খাতক। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত মনে হয়, পরাধীন ভারত হইল কিনা তাহার মনিবের পাওনাদার! অথচ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে ঠিক তাহাই।

যুদ্ধের খরচ

কেমন করিয়া এত বড় একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল? ভারতের সীমান্তে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার জন্য ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ হইতে অনেক মালমসল্লা কিনিয়া থাকেন, এবং ভারতবর্ষের সৈন্য-সামন্তদের জন্য বেতনও ভারতবর্ষেই দিতে হয়। এই সব খরচের জন্য যে টাকা লাগে তাহা ভারতসরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হয় এবং সেই টাকাটা ইংলণ্ডের কাছে ভারতসরকারের পাওনা হয়। ইংলণ্ডের রাজ-সরকার ঐ পরিমিত ষ্টার্লিং ভারতের নামে ওখানে জমা করিতেছেন। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভারতের পাওনা বাড়িয়াছে, পুরাতন দেনা শোধ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মুস্কিল

আমাদের দেশের তহবিল হইতে যে টাকা আমরা বিলাতের সরকারকে ধার দিয়াছি তাহার পরিমাণ এই ভাবে ১০০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং ছাড়াইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইবার সময় এই পরিমাণ আরও বাড়িবে। এই সমস্ত ষ্টার্লিং যদি ভারতকে শোধ দিতে হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হইতে পারে—এই ভয়ই আজকাল ইংরেজ পুঁজিপতিদের প্রধান ভয়। এক সঙ্গে এত ষ্টার্লিং যদি চাহিবামাত্র বিদেশে পাঠাইতে হয় তাহা হইলে তাহার ফলাফল ইংলণ্ডে হইবে নিম্নরূপ :—

(১) ব্রিটিশ রাজসরকারের বজেটে একটা মোটা অংশ দেনাশোধের জন্য রাখিতে হইবে, তাহাতে বজেট ঘাট্‌তির সম্ভাবনা।

(২) যখন তখন ষ্টার্লিং সরবরাহ করিতে হইলে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ষ্টার্লিংএর দাম খুব কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষে টাকার সরবরাহ বেশী হইবার জন্য পণ্যের বাজারে যাহা ঘটিতেছে ইংলণ্ডেও পণ্যের বাজারে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা।

(৩) ইংরেজ পুঁজিপতিদের লগ্নী মূলধনের মূল্য কমিয়া যাইবে।

এক কথা বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে আজ ভারতে যুদ্ধ খরচের বাবত অসংখ্য নোট প্রকাশের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়াছে, অনুরূপ সংকট দেখা দিবে বিলাতে। ইংলণ্ডে এ অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে মাত্র এক উপায়ে - ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা যদি নিজেদের মুনাফা কমাইয়া দেয় এবং তাহাদের মুনাফার একটি মোটা অংশ যদি ব্রিটিশ সরকারের নিকট রিজার্ভ রাখে এবং ব্রিটিশ সরকার যদি ঐ রিজার্ভ হইতে ভারতীয় দেনা শোধের জন্য ষ্টার্লিংএর মূল্য ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা করে।

ইংরেজ পুঁজিপতিদের মতলব

কিন্তু ইংরেজ পুঁজিপতিরা স্বভাবতঃই তাহা চায় না। নিজেদের ঐশ্বর্য্য কমিয়া যাইবে ইহা তাহারা কিরূপে সহ্য করিবে? তাই তাহাদের মতলব এই যে ভারতের দেনা শোধ করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। সোজাসুজি তাহারা একথা বলিতে পারে না যে এই দেনা আমরা শোধ করিব না, তাই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রকারান্তরে সেই কথা তাহারা বলিতেছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীন্‌স এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক; তাঁহারা বলিতে চান—ভারতের পাওনা ইংলণ্ডেই জমা থাক, ভারতবাসী ইংলণ্ড হইতে খুব বেশী পরিমাণে বস্তুসামগ্রী খরিদ করুক, অর্থাৎ ভারতবাসীকে ষ্টার্লিং না দিয়া বিলাতী পণ্য দেওয়া হউক। তাহার মানে এই যে ভারতবর্ষে শিল্প-বিস্তারের অনুকূল যে মূলধন ইংলণ্ডে জমিয়াছে তাহা এমন কায়দায় দেওয়া হইল যাহাতে ভারতের শিল্পবিস্তার আরও কমে এবং খুব সস্তায় খুব বেশী পরিমাণ বিলাতী জিনিষ ভারতের বাজারে চলে।

আমরা যতদিন ইংলণ্ডের কাছে দায়িক ছিলাম ততদিন আমাদের শিল্পবিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা যখন পাওনাদার হইলাম তখনও ঠিক তাহাই ঘটিবে। আমরা খাতকই হই আর পাওনাদারই হই পরাধীনতার মূল্য আমাদের দিতেই হইবে।

ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা একটি যুক্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে এতগুলি ষ্টার্লিং যদি ভারত-বাসীকে এক সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতে অসম্ভব রকমে মুদ্রাস্ফীতি হইবে এবং মুদ্রা-স্ফীতির ফলে জিনিষ পত্রের দুর্ম্মূল্যতা ও দুর্ভিক্ষ আরও বাড়িবে।

এ যুক্তি যেমনই হাস্যস্কর তেমনই অন্তঃসার শূন্য। ভারতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দুর্ম্মূল্যতা এবং দুর্ভিক্ষ এই জন্যই দেখা দিয়াছে যে উৎপাদন বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই, জনগণের সংগতি বাড়াইবার কোন বন্দোবস্ত নাই অথচ মুদ্রাস্ফীতি আছে। তাই অল্প জিনিষের উপর বেশী টাকা দিয়া কিনিবার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে দেখা দিয়াছে চোরাবাজারের মজুত এবং সেই সঙ্গে দুর্ম্মূল্যতা ও দুর্ভিক্ষ। আমাদের ষ্টার্লিং আমাদের চাহিবামাত্র দিতে হইবে, আমরা তাহাদ্বারা ভারতে কৃষি ও শিল্পবিস্তারের ব্যবস্থা করিব, আমরা তাহাদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলিকে গড়িয়া তুলিব। প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহার ফলে বাড়িবে, দাম তাহার ফলে কমিবে।

জাতীয় কংগ্রেস যখন ঘোষণা করিয়াছিল যে ভারতের বিদেশী ঋণ ভারতবাসীকে শোষণ করিবার জন্যই জমিয়াছে কাজেই বিদেশী ঋণ পরিশোধের সময় ভারতবাসী অন্যান্য ঋণ বাতিল করিয়া দিবে। এই ঘোষণার পর ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা সুর তুলিয়াছিলেন যে কংগ্রেস ভারতের ঋণ অস্বীকার করিতেছে, কি সর্ব্বনাশা দুর্নীতির কথা। আর আজ যখনই ভারতবাসী পাওনাদার এবং ইংলণ্ডের পুঁজিপতিরা ভারতের খাতক তখন সেই "সর্ব্বনাশা দুর্নীতিই" নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত জয়ের খরচের জন্য যে টাকা ভারতবাসীর ঘাড়ে ঋণ হিসাবে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে টাকা এখন শোধ হইয়া গিয়াছে। এখন পণ্যবিনিময়ের ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত ভাবে যে ষ্টার্লিং ভারতবাসীর পাওনা হইয়াছে তাহা কোন অজুহাতে আট্‌কাইয়া রাখা চলিবে না।

ভারতীয় দাবী

ভারতের সর্ব্বশ্রেণী এবং সর্ব্বদল ইংরেজ পুঁজি-পতিদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। আমরা আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং কড়ায় গণ্ডায় নগদ বুঝিয়া লইতে চাই, এবং আমরাই যখন পাওনাদার তখন আমরা যেভাবে যখন পাইতে চাই ঠিক সেই ভাবেই দিতে হইবে—ইহাই হইল ভারতের জাতীয় দাবী।

এই দাবী যদি আদায় করিতে হয় তাহা হইলে অবিলম্বে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই—রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান চাই। ভারতীয় পুঁজিপতিরা একথা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে অচল অবস্থা চলিতে থাকিলে ইংলণ্ড এই দেনা অস্বীকার করিতে পারে, তাই তাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা রফা করিতে ব্যস্ত। তাই গান্ধীজীর মুক্তির জন্য বিরলা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, টাটা প্রভৃতি পুঁজিপতিরা ওয়াভেলকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দাবী করা সত্ত্বেও সার আরদেশির দালালকে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগ দিতে অনুমতি দিয়াছেন।

দুই দলে পাল্লা

এখন ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং লইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে পাল্লা চলিয়াছে। ভাইসরয় ভাবিতেছেন এই ১০০ কোটি ষ্টার্লিং হাতে লইয়া, ইহা বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইয়া ভারতীয় পুঁজিপতিদের সাহায্যে ভারতের জাতীয় দাবী নরম করাইতে হইবে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভাবিতেছেন অবিলম্বে আপোষের পথ ধরিয়া সরকারের নিকট সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন মতে এই ১০০ কোটি ষ্টার্লিং হাত করিতে হইবে। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সার আরদেশির দালালের নিয়োগ লইয়া এইভাবে বেশ মজার খেলা চলিতেছে। ভাইসরয় ভাবিতেছেন—আমি জিতিলাম, ভারতীয় ক্রোড়পতিদের সহযোগিতা আদায় করিলাম। বিরলা, টাটা প্রভৃতি ক্রোড়পতিরা ভাবিতেছে—আমরা জিতিলাম, সরকারের মনোভাব এইবার হয়ত নরম হইবে। কিন্তু সরকার সহজে নরম হইবার পাত্র নয় ইহাও তাঁহারা জানেন—তাই শ্রীযুক্ত বিরলা গান্ধীজীর নিকট আপোষ মীমাংসার পথ ধরিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

ওয়াভেলের নীতি হইল—অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে, অথচ রাজনৈতিক দাবী পূরণ করিব না। বিরলা ও টাটাদের দল সেই ফাঁদেই পা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই তাঁহারা আপোষ মীমাংসার কথা তুলিয়াছেন, অচল অবস্থা অবসান করিতে চাহিতেছেন, গান্ধীজীকে ওয়াভেলের নিকট যাইতে বলিতেছেন কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁহারা নীরব।

জাতীয় সুযোগ

অথচ জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার অভাবনীয় সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য, গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেবের সাক্ষাৎ। লীগের সঙ্গে মীমাংসা না করিয়া গান্ধীজী যদি ওয়াভেলের কাছে যান তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইবে।

১০০ কোটি ষ্টার্লিং আমাদের ন্যায্য পাওনা, আমরা তাহা ফেরত চাই। এই অর্থ দিয়া ভারতের শিল্প বিস্তারের ব্যবস্থা হউক, ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা উন্নত করা হউক, ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি ও গ্রাম্য শিল্প গড়িয়া তোলা হউক। এই ১০০ কোটি ষ্টার্লিং বিলাতে জমিয়াছে আর সেই খরচ ভারতে নোট ছাপাইয়া চালান হইয়াছে অথচ শিল্প বিস্তারের ব্যবস্থা হয় নাই। মাসের পর মাস বিলাতে ষ্টার্লিং জমিয়াছে আর মাসের পর

(শেষাংশ ৮ম পৃঃ দেখুন)

সম্পাদকীয়

কৈফিয়ৎ নয়
অন্নাভাবের প্রতিকার চাই

গত ১৫ই জুন বাংলার এসেম্বলীতে খাঁ বাহাদুর হাজী বাদী আমেদ চৌধুরী একটী মুলতুবী প্রস্তাব তুলিয়া বলেন—চট্টগ্রাম বিভাগে অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে চাউলের দাম অন্যান্য জেলার তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পিপলস্ ওয়ারে প্রকাশিত একজন কমিউনিষ্ট সংগঠকের রিপোর্ট উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর একজন বক্তা বলেন "সকলেরই পক্ষে গভীর লজ্জার কথা যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৩০,০০০ হিন্দু মুসলমান নারী ক্ষুধার জ্বালায় পাতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। নোয়াখালী জেলায় চাউলের দর প্রতিমণ ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা, লবণ ৫৫৲ সরিষার তৈল ৬০৲ মণ ও কেরোসিন তৈল পাঁচসিকা সের দরে বিক্রয় হইতেছে।"

১৭ই জুন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের 'নারী সেবা-সংঘের' একটী সভায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা বলিয়াছেন—"অন্নাভাব ও মহামারীর বাস্তব অবস্থা আমি চট্টগ্রামে দেখিয়াছি। কিন্তু বাংলার বহু জেলাতেই চট্টগ্রামের ভয়াবহ সংকটাপন্ন অবস্থাই দেখা দিতেছে।"

চট্টগ্রামে তো অন্নাভাব সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। এই জুন মাসেই চাউলের দাম উঠিয়াছে ৫০৲ টাকা। অন্যান্য ঘাটতি জেলাতেও ২২৲ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা চাউলের মণ।

সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এসেম্বলীতে যে জবাব দিয়াছেন তাহাতেও তিনি চট্টগ্রামের শোচনীয় অবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন "সরকারের হাতে ঘাটতি অঞ্চলকে খাওয়াইবার পক্ষে যথেষ্ট চাউল মজুত আছে।" "কিন্তু সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে ২টী ষ্টীমার পাওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রামে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।" তিনি স্বীকার করিয়াছেন—"চট্টগ্রামে একটী শ্রেণীর লোক বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গৃহস্থদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।" "চট্টগ্রামে যে ৬৪৩টী লংগরখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা আবার খোলা হইবে।"

তিনি আরো আশার বাণী দিয়াছেন—"আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।" তাঁহার আশার কথা ও সদম্ভ ঘোষণা আমরা বহুবার শুনিয়াছি; কিন্তু এ সবের কিছুই তিনি কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখনো তিনি কত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। গত সাত মাস ধরিয়া পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা হইয়াছে তবু আজও তিনি বলেন, জোত-দাররা ধান আটকাইয়া রাখিতেছে, যানবাহনের অসুবিধা দূর হইল না।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর প্রশ্নের জবাবে তিনি ষ্টকের হিসাব দিতে পারেন নাই। কারণ যে সমস্ত ব্যবসায়ীকে লইয়া তাঁহার ক্রয়বোর্ড তাঁহাদের কাছ হইতে তিনি এখনো সমগ্র হিসাব নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। নতুবা যে যথেষ্ট মজুত সরকারের হাতে আছে তাহা প্রকাশ করিলে কাহার ক্ষতি হয়? বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়া এসেম্বলীতে কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে কিন্তু তাহাতে তো আর সংকটের সমাধান হয় না।

সরকারের হাতে যথেষ্ট মজুত থাকিতে পারে কিন্তু সারা বাংলায় যে ১ কোটী ৫ লক্ষ পরিবারকে রেশন কার্ড বিলি করা হইয়াছে (যদিও প্রয়োজন আড়াই কোটী রেশন কার্ডের) তাহারা রেশনের চাউল পাইতেছে না কেন? বহু জায়গায় রেশনের চাউল দেওয়া হইতেছে কিন্তু চাউল খারাপ হওয়ার জন্য এবং চোরা বাজারে কম দাম থাকায় লোকে সরকারী দোকান হইতে চাউল লইতেছে না। সরকারী গুদামের ও মজুতদারদের গত বারের খারাপ চাউল রেশন শপ ও কন্‌ট্রোল দোকানের মারফৎ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কোন আমলাই তাহাতে বাধা দিতেছে না।

তারপর মিঃ সুরাবর্দ্দী যানবাহনের অসুবিধার কথা বলিয়াছেন। হাজার হাজার মণ ধান-চাল মুনাফা-খোররা নৌকা ও গাড়ীযোগে চালান করিতেছে, আর সরকার পক্ষই যানবাহন পাইতেছে না; সরাইল ও ভৈরব দিয়া ২ লক্ষ মণ চাউল ধান নেত্রকোণা হইতে মজুতদাররা সরাইয়া ফেলিবার জন্য নৌকা পাইল আর চট্টগ্রামের জন্য মিঃ সুরাবর্দ্দী কোন যানবাহন পাইলেন না—আশ্চর্য্য যুক্তি!

আসল কথা হইতেছে—মিঃ সুরাবর্দ্দী আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা ছাড়িতে পারিতেছেন না। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন ৫৪৬৩২ টী গ্রাম্য ফুড কমিটি হইয়াছে। (আনন্দবাজার, ১৯শে জুন) এই সব কমিটীতে যদি সত্য সত্যই স্থানীয় জনপ্রিয় লোকরা স্থান পায় ও ফুড কমিটীর কাজের ক্ষমতা যদি জন-সাধারণের হাতে দেওয়া হয় তাহা হইলে জোতদার বা ধনীদের গুদামে এখনো যে হাজার হাজার মণ ধান-চাল জমা আছে তাহা নিশ্চয়ই বাহির হইত এবং ঘাটতি অঞ্চলের দুর্দশা ঘুচিত। চট্টগ্রামে ২০,০০০,০০ মণ চাউল এখনো জোতদার ও ধনীদের ঘরে জমা আছে—সরকার কিনিতে পারে নাই। ফুড কমিটিগুলি যদি জনসাধারণের নিজস্ব কমিটি হইত তাহা হইলে তাহাদের আবেদনে এই সব জোতদার নিশ্চয়ই সাড়া দিত। মজুতদার ব্যবসায়ী ও আমলাদের সাহায্যে খাদ্য সংকট প্রতিরোধ করার ভরসা মিঃ সুরাবর্দ্দীকে ছাড়িতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে তিনি সত্যকার জনপ্রিয় মন্ত্রী হইতে পারিতেন। তাহা হইলে আর এসেম্বলীতে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য কসরৎ করিয়া সময় ও শক্তি অপব্যয় করিতে হইত না।

চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলায় ঘাটতি অঞ্চলকে বাঁচাইবার এখনো সুযোগ আছে, সময় আছে। মিঃ সুরাবর্দ্দীকে খাদ্যকমিটিগুলির মধ্যে আমলাদের দুর্নীতি ও মজুতদারদের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে কড়া নজর দিতে হইবে। জনগণের কমিটির হাতে স্থানীয় মজুত বাহির করিয়া সরকারী গুদামের পরিচালনায় কর্ত্তৃত্ব ভার দিতে হইবে। তাহা হইলেই সরকারের খাদ্য-কমিটির গুদামগুলি খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—স্থানীয় যানবাহন মজুতদারদের মুনাফালোলুপ হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জনসাধারণের খাদ্য বিতরণের কাজে লাগিবে।

বাগেরহাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়

৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি

কৃষক সমিতির শান্তি-বাহিনীর চেষ্টায় দাঙ্গা প্রশমিত

বিধ্বস্ত অঞ্চলে রিলিফের মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িকতা কেন ?

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় ২৮শে হইতে ২৭শে মে তিন দিন ধরিয়া ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গেল। এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় স্থানীয় হিন্দু মুসলমান গৃহস্থদের প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। ৫ই জুন বঙ্গীয় এসেম্বলীর আলোচনায় জানা যায় এই দাঙ্গার ফলে প্রায় তিনশত বাড়ী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। (মিঃ মুস্তাগসওয়াল হকের হিসাব মত, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, ৬ই জুন, ১৯৪৪)।

খুলনা জেলা কৃষক সমিতির কর্মীরা এই অঞ্চলে ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলে গা শিহরিয়া উঠে। পোড়া বাড়ীর পোড়া ভিতগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল টিনের বাড়ীগুলির টিন কয়খানি পড়িয়া আছে। গৃহস্থদের শস্য, আসবাবপত্র ইত্যাদি কিছুই রক্ষা পায় নাই। চারিদিকে কেবল পোড়া ছাই আর ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী। ভাঙ্গা ও পোড়া বাড়ীগুলি জনশূন্য। দুই একখানি বাড়ীতে সাময়িকভাবে চালা তুলিয়া যাহারা একটু অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিয়াছে তাহারাই মাত্র এখনো গ্রামে টিকিয়া আছে। বাকী সব গ্রামান্তরে গিয়া বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। দুই একটি গৃহ দেখা গেল, কেহ কেহ আধপোড়া ধান বাছিয়া বাছিয়া কোনমতে জীবন ধারণের উপায় বাহির করিতেছে। ভিক্ষাবৃত্তি বা রিলিফের সাহায্য ছাড়া অধিকাংশেরই বাঁচার কোনও উপায় নাই।

এদিকে চাষের মরশুম পড়িয়া গিয়াছে। দাঙ্গায় অনেক গরু বাছুর হারাইয়াছে, লুট হইয়াছে। এই অঞ্চলে এখনো প্রায় ৬০০ বিঘা জমি চাষ করা বা বোনা বাকী রহিয়াছে। বীজ, লাঙ্গল, বলদ সবই এদের গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সমস্ত জনসাধারণ ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়িয়া একেবারে মুসড়িয়া পড়িয়াছে। আতংক এখনো কাটে নাই। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস এখনো বেশ দেখা যায়। বড়বাড়িয়ার জনৈক মুসলমান কৃষক আলোচনার সময় বলিল,—"অনেক মেহনৎ করে খাবার দুটো ধান ঘরে তুলেছিলাম—তাও দাঙ্গায় গেল পুড়ে। ভিক্ষা করে কদিন বাঁচব? দাঙ্গা কি কেউ চায়?"

দাঙ্গায় ক্ষতির পরিমাণ

কৃষক সমিতির কর্মীরা দাঙ্গা অঞ্চলে গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এবং লোক জনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করিয়া ক্ষতির যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বর্ণনা নীচে দেওয়া হইল।

ইহা ছাড়া, যে সব বাড়ী লুট হইয়াছে তাহার ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। এই হিসাব সংগ্রহ এখনও শেষ হয় নাই। বড়বাড়িয়া পশ্চিম পাড়ায় ৩০ হাজারেরও বেশী টাকার জিনিসপত্র লুঠ হইয়াছে। গোলার মুসলমান পল্লীতে ১৫টী বাড়ী লুঠ হইয়াছে।

দাঙ্গার সূত্রপাত

চিতলমারী বাজার হইতে ৮ মাইল দূরে বাগুড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামের কালী বিশ্বাস একজন সঙ্গতিপন্ন জোতদার। একজন নমশূদ্রকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তিনি সেই গ্রামেরই কৃষক কাসেম মোল্লার নয়টী লাঠিয়াল পুত্রকে দুই বিঘা জমি লাখেরাজ দিয়া পোষণ করিতেন। এ বছর কালীবাবুর সহিত তাঁহার বিরোধী নমশূদ্রটীর আপোষ হইয়া যায়। ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে স্থানীয় মুসলমানদের অনুরোধে কাসেম মোল্লা কালীবাবুর পরিবর্তে একজন মুসলমান প্রার্থীকে সমর্থন করেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া কালীবাবু এবারকার আউশ-আমন চাষের সময় উক্ত লাখেরাজ জমি নিজেই চাষ করেন।

গত ২৫শে মে কালীবাবুর কৃষানরা জমি চাষ করার সময় কাসেম মোল্লার ছেলেরা তাহাদের তাড়া করে।

এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল

ইহার পর কালীবাবু স্থানীয় হিন্দুনেতাদের সহিত যুক্তিপরামর্শ করিতে যান।

ঐ দিনই ও পরবর্তী ২ দিন ধরিয়া চিতলমারী, চরবালিয়ারী, সন্তোষপুর, খোপাখালি, হিজলা, কলাতলা, শিবপুর, কোদালিয়া প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ ইউনিয়নগুলি ও মধুমতীর অপরপারে ফরিদপুর জেলায় শ্রীরামকান্দি ও ডেমাডাঙ্গা হইতে হিন্দু-মুসলমান লাঠিয়াল জমায়েত হয়।'

বড়বাড়িয়া গ্রাম হইতে ৭।৮ মাইল দূরে বরিশাল জেলায় লড়া গ্রামে একটি হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন চলিতেছিল। সম্মেলনের তারিখ ছিল ৩রা ও ৪ঠা জুন।

দুই বৎসর পূর্বে এই অঞ্চল হইতে আড়াই মাইল দূরে গঙ্গাচন্না প্রভৃতি গ্রামে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল। প্রতিবৎসরই মধুমতীর চর লইয়া দুই একটা ছোটখাট দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে বহু মুসলমান ও নমশূদ্র বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ভাবের কিছুটা অভাব দেখা যায়।

এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষাবিল লইয়া একজন নমশূদ্রনেতা পক্ষে ও অন্য একদল বিপক্ষে প্রচার করিতে ছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার মিলাইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িতে থাকে।

(এসেম্ব্লী বক্তৃতা ৫ই জুন)

খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতায় মন্ত্রীদের নিকট সংবাদ পাঠান—ফরিদপুর জেলার ২ হাজার লোক নদীপার হইয়া এই অঞ্চলের দিকে আসিতেছে।

(হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড ৬ই জুন)

মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এই গুরুতর অবস্থার সংবাদ পাইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত পরামর্শ করিতে যান। কিন্তু কোন সুফল হইল না।

২রা জুন হইতে ১৪ দিনের জন্য এই অঞ্চলে সম্মেলন ও সভাসমিতি নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থামাইবার পক্ষে হিন্দু সম্মেলন বন্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

কৃষক সমিতি দাঙ্গা ছড়াইতে দেয় নাই

এই অঞ্চলে কৃষকসমিতির কোন সংগঠন নাই। ৩ মাইল দূরে একটী কৃষক সমিতি আছে।

এখানে লবণ ১৲ টাকা সের, সরিষার তৈল ১৮৷৹ আনা সের, কেরোসীন ১৲ টাকা সের। সব জিনিষেরই চোরাবাজার চলে। গবর্ণমেন্ট পরিকল্পিত খাদ্যকমিটিগুলি এ অঞ্চলে এখনো গঠিত হয় নাই।

এখানকার হিন্দু-জনসাধারণ হিন্দু মহাসভার প্রভাবে। কংগ্রেসের কোন কাজ এখানে ছিল না। এ অঞ্চলের লোকেরা কণ্ট্রোল-বিরোধী, স্বাধীন ব্যবসায় ও চোরাবাজারের উপর তাহারা নির্ভর করে। মুসলমানদের মধ্যে লীগ সমর্থক আছে—কিন্তু লীগের সংগঠন না থাকায় প্রভাব ব্যাপক নয়। শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম ছাত্রলীগের সমর্থক ও সভ্য আছে।

দাঙ্গার খবর পাইয়া জেলা কৃষক সমিতি খুলনা জেলায় দুইজন কৃষক নেতা কমরেড **অনিল দাসগুপ্ত** ও **কুমুদ রাণাকে** শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিতে নির্দেশ দেয়।

তাঁহারা ২টী স্কোয়াডে বিভক্ত হইয়া চিতলমারী বাজারের পার্শ্ববর্তী ১২টী গ্রামে শান্তির জন্য প্রচারে বাহির হন। ২৮শে মে ১৩টী গ্রাম হইতে ২৫০ জন হিন্দু-মুসলমান মাতব্বর ও জনসাধারণ চিতলমারী হাই স্কুলে সমবেত হন। হিন্দুদের পক্ষ হইতে শ্রী নগরবাসী বিশ্বাস ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে রমজান তালুকদার শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া নিজ-নিজ গ্রামে শান্তি রক্ষার জন্য টহল দিবেন স্থির হইল। আড়ুয়াবর্ণী গ্রামে দাঙ্গার আশংকা থাকায় এই সভার পর প্রধান শিক্ষক ও ভূতপূর্ব কংগ্রেসকর্ম্মী তারাপ্রসন্ন বাবু, রমজান তালুকদার, লীগের সভ্য মোশাবের বিশ্বাস ও কৃষক সমিতির নেতা কুমুদ রাণা ও আরো কয়েকজন মাতব্বর হিন্দু ও মুসলমান লইয়া একটী শান্তি স্কোয়াড গঠিত হয়। সভার শেষে এই স্কোয়াড আড়ুয়াবর্ণী গ্রামে প্রচারে যায়—গ্রামবাসীদের মধ্যে শান্তিরক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ২৮শে মে রবিবার হইতে আর কোথাও দাঙ্গা ছড়াইতে পারে নাই।

কৃষক সমিতির ১৪।১৫ জন সব সময়ের কর্মী স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের সাহায্যে শান্তি প্রচার বাহিনী গঠন করিয়া প্রতিদিনই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি করিতে থাকেন, ৪ঠা হইতে ৬ই জুন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অনিল দাসগুপ্ত ও কুমুদ রাণা দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ক্ষতির হিসাব সংগ্রহ করিতে থাকেন।

রিলিফ, না সাম্প্রদায়িকতা জীয়ানোর চেষ্টা ?

খুলনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে সব গ্রাম পুড়িয়াছে, লুঠ হইয়াছে এবং নানাভাবে গৃহস্থরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই সব গ্রামে রিলিফ দিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে মন্ত্রী যোগেশ মণ্ডল দশ হাজার টাকা কিছু কাপড় লইয়া মোল্লাহাট গিয়াছিলেন। "তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের রিলিফ ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই সেখানে যান" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩রা জুন)।

সরকারপক্ষ ৩টি মুসলিম ও ২টি হিন্দু বিধ্বস্ত পল্লী রিলিফ কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা লইয়াছে। ইতিমধ্যেই বড়বাড়িয়া পশ্চিম পাড়ায় রিলিফ কমিটিটী গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িকভাবে রিলিফ দিবে

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও রিলিফের জন্য চার হাজার টাকা ও কিছু চাউল কাপড় পাঠাইয়াছেন।

"ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী, অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ও ডাঃ স্বর্ণকমল রায়কে খুলনা জেলায় গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার এলাকায় হিন্দুদিগের সেবাকার্য্যের জন্য ১০০ মণ চাউল, ৪০০ খানি কাপড় ও নগদ ৪০০৲ টাকা দিয়া বড়বাড়িয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।" (যুগান্তর ১৪ই জুন)।

নেতাদের পক্ষ হইতে যদি সম্প্রদায়গত ভাবে দাঙ্গা অঞ্চলে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে জন-সাধারণের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে, না উত্তেজনা আরো বাড়িবে? হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াইতে পারিলেই আমাদের সমাজদেহের এই দুষ্ট ক্ষতকে নষ্ট করা যায়। দাঙ্গার পরে যদি রিলিফের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য গড়িয়া না তোলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাব কিছুতেই কাটিবে না।

ঐক্যবদ্ধ রিলিফের ব্যবস্থা চাই

স্থানীয় মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীগণ কৃষক সমিতির কর্মীদের সহিত রিলিফ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা একত্রে রিলিফের কাজ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুমহাসভার কর্মী শুধু মাত্র হিন্দুদেরই রিলিফ দিবেন বলিয়াছেন।

সার্কেল অফিসার কিছু চাল, লবণ, চিনি, দুধ, কাপড় ও কুইনাইন বড়বাড়িয়া মুসলমান পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় রিলিফ কেন্দ্রে ভাগ করিয়া দেন। ৫ই মে ঐ পাড়ায় ৩৯টী পরিবারের ১০০ লোকের ৬ বেলার জন্য ১৫৷০ মণ চাল দেন। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন ছিল ৯৷০ মণ।

সার্কেল অফিসার কৃষক কর্মীদের বলিয়াছেন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ রিলিফের চেষ্টা করিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভাল হইতে পারে। আমরা ইহাতে সহযোগিতা করিব।

হিন্দু মুসলমানের প্রতিষ্ঠানকেগুলিকে একযোগে এই বিধ্বস্ত ৩০০ বাড়ীর পরিবারকে বাঁচাইতেই হইবে। রিলিফের কাজ এখানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলিলে এই সমস্ত হিন্দু-মুসলমান গৃহস্থদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। বিভিন্ন গ্রামে শান্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই রিলিফ কার্য্যও উভয় সম্প্রদায়কে একযোগেই চালাইতে হইবে। এই কাজে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলিবে না। এই সমস্ত গ্রামের লোকদের যত শীঘ্র স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে তত তাড়াতাড়ি উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য কাটিয়া যাইবে।

দশ পনের হাজার টাকায় এই বিরাট রিলিফ কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানকে এই রিলিফের জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। নতুবা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু মুসলমান এই অঞ্চলে ছন্নছাড়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে স্থানীয় জনসাধারণের আতংক কিছুতেই কমিবে না। শান্তিরক্ষায় প্রথম ও প্রধান কর্তব্য অবিলম্বে এই বিধ্বস্ত গ্রামগুলিকে পুনর্গঠিত করা। এ কাজে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা করিলে চলিবে না—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আপ্রাণ চেষ্টায় তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব কাজে একযোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

যে গ্রামগুলি পুড়িয়াছে তাহার ক্ষতির আনুমানিক হিসাব

	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	এই সব পরিবারের লোক সংখ্যা	দগ্ধ গৃহের সংখ্যা	হারান গরুবাছুরের সংখ্যা
চরলাটিমা (হিন্দুপল্লী)	২৩	১৪২	৭১	৩৯
বড়ঝাড়িয়া (পশ্চিম পাড়া) হিন্দুপল্লী	৩৯	২০০	৭৫	১২
ঐ (মুসলমান পাড়া)	২১০	১০০০	৪০০	৭০
মোট	২৭২	১৩৪২	৫৪৬	১২১

টাকার হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ

	গৃহাদি	আসবাবাদি	শস্যাদি	গবাদি	খড়	মোট
চরলাটিমা	১৮৪৭০	৭৭২৫	১৩১৮৫	৩০৭৫	১৮৫০	৪৪,৩০৫
বড়বাড়িয়া (পশ্চিম)	১৮৪৯৬	১১৬৭৪	২৫৯২৯	১০৯৭	২৪৩৯	৫৯,৬৩৫
ঐ (মুসলমান পাড়া)	৬০,০০০	৬০,০০০	১০০,০০০	৫০০০	৫০০০	২,৩০,০০০
মোট	৯৬,৯৬৬	৭৯,৩৯৯	১,৩৯,১১৪	৯,১৭৯	৯,২৮৯	৩,৩৩,৯৪০

আসামকে বাঁচাইতেই হইবে

(নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট)

আর্থিক অরাজকতা

গৌহাটি শহরে নামিলেই বুঝা যায় যে যুদ্ধ সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। সারা ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতির কথা শুনা যায় তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এইখানে। যে দোকানেই ঢুকুন আর যে জিনিষই কিনিতে চান শুধু মোটা হিসাব। নুন, কেরাসীন, তেল, চিনি সব জিনিষেরই দাম চড়িতে চড়িতে বাজার একেবারে আগুণ হইয়া উঠিয়াছে। চিনির সের দুই টাকা, এমন কি গুড়ও টাকা টাকা সের। দুধের সের টাকা টাকা। সরিষার তেলের দর সরকার ৩৫৲ টাকা মণ বাঁধিয়া দিয়াছিল, কারবারীদের চাপে সে দর সরকারই শেষ পর্য্যন্ত ৫৫৲ টাকায় তুলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু বাজারে সরিষার তেল কিনিতে হয় ৭৫৲ টাকা মণ দরে। গ্রামের কৃষকদের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে অসহনীয়। দিনের পর দিন জীবন ধারণের ব্যায় এত অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে যে তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অসহায়ের মত তাহারা ভাবিতেছে আমাদের আর নিস্তার নাই। শহরের মধ্যবিত্তদেরও শেষ কপর্দ্দক ফুরাইয়া আসিতেছে, এবং সকলেই ভাবিতেছে আজ ত কোনমতে দিন গেল, ইহার পর অদৃষ্টে কি আছে?

লবন উধাও

নুনের ব্যাপারই রীতিমত একটা কেলেঙ্কারী এবং গোলযোগের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামের নাগরিক জীবনে কি ঘটিতেছে এবং ঘটিবে তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে নুন। কেহ ভাবিতে পারেন কি যে ৮৲ টাকা করিয়া নুনের সের হইতে পারে? গল্প নয়, সত্য সত্যই জোরহাটে ৮৲ টাকা করিয়া নুনের সের বিক্রয় হয়, ভাগ্যবানে তাহা পায়, অপরে পায় না। গ্রামাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ৩৲ হইতে ৫৲ নুনের সের, অবশ্য শহরে দাম কিছুটা কম, গ্রামের চাষীকে আধমণ ধানের বদলে এক সের নুন কিনিতে হয়, শহরের মজুরকে ৩ দিনের মজুরী দিতে হয় এক সের নুনের জন্য। নুনের দুর্ভিক্ষ গ্রামাঞ্চলে ভীষণ দুর্য্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। ডিব্রুগড় মহকুমায় নাহারকাট্টা এবং টিংখং গ্রামের লোকেরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ নুন অভাবে কাটাইয়াছে। এই অভাব গ্রামবাসীদের মনোবল এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে যে স্বদেশভক্তদের জাপ-বিরোধী প্রচার বাহিনী যখন গ্রামে যায় তখন কৃষকেরা একবাক্যে তাহাদের কাছে এই কথাই বলে—"জাপ আসুক আর যেই আসুক, নুন চাই।"

মজুতদারের প্রভাব

আজ নুনের ব্যাপারে যাহা ঘটিতেছে কাল প্রত্যেকটী প্রয়োজনীয় পণ্য লইয়া সেই ব্যাপারই ঘটিবে কারণ আসামে আজ অতিরিক্ত মুনাফাখোর মজুতদারের অসামান্ত প্রভাব। নুন সঙ্কট আরম্ভ হইবার আগে আসাম গভর্ণমেণ্টের কাছে ২ লক্ষ মণ নুন মজুত ছিল। বাংলা দেশে যখন নুনের দর চড়িতে আরম্ভ করে ঠিক সেই সময় আসাম গভর্ণমেণ্ট বড় বড় ব্যবসায়ীর নিকট নুন বিক্রী করিয়া গুদাম পরিস্কার করিতে আরম্ভ করে, সরকারী গুদাম যেই খালি হইয়া আসিল নুনের বাজারেও অমনি আগুন লাগিয়া গেল।

আমলাতন্ত্রের উপর মজুতদারের কি অসীম প্রভাব একটা উদাহরণ দিলেই তাহা পরিস্কার হইবে। ধুবড়ীতে জনৈক খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর গুদামে নুন মজুত ছিল। সরবরাহ বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারী সংবাদ পাইয়া সেই গুদামে হানা দেন এবং সেখান হইতে ২০০ বস্তা নুন বাহির হয়। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ী তাহার পর শিলং পর্য্যন্ত ধাওয়া করেন। কয়েকদিন পর জানা গেল এই ব্যবসায়ীটি সরকারের নুন ক্রয়ের এজেণ্ট হইয়াছেন এবং যে কর্ম্মচারীটি স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহার গুদামে খানাতল্লাসী করাইয়াছিলেন তিনি বদলী হইয়াছেন।

সরকার নুন, তেল, চিনি, আটা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয় এবং সরবরাহের ভার আসাম সাপ্লাই সিণ্ডিকেট নামে একটি ব্যবসায়ী সংঘের উপর ভার দিয়াছেন। এই ব্যবসায়ী সঙ্ঘে আছেন এমন সব খ্যাতনামা পাইকার যাহারা অতিরিক্ত মুনাফাখোর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই সিণ্ডিকেটের কোন কোন অংশীদার নাকি অগ্রণী হইয়া রেশনিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লার পুত্র নিজেই এই সিণ্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং শুনা যায় যে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং খাদ্য রেশনিংএর বিরোধী।

চাউল ছাড়া অন্যান্য সামগ্রীর রেশনিংএর একটা প্রস্তাব সরকারী মহলে বহুদিন হইতেই আছে, বিভিন্ন শহরে রেশনিংএর জন্য বার বার লোক গণনাও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রেশনিং প্রবর্ত্তনের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় না।

মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি, আমলাতন্ত্র এবং মজুতদার এই ত্রিশক্তি মিলিয়া আসামের জনসাধারণের ভাগ্যে মহা-দুর্য্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে এতদিনেও রেশনিং প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহা কল্পনারও অতীত। যানবাহনের উপর চাপ এই অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী, সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য স্বভাবতঃই এখানে দেখা দিবে, এ অবস্থায়ও যদি রেশনিং প্রবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সামগ্রীরই নুনের মত অবস্থা হইতে বাধ্য। সত্য বটে সমবায় সমিতির মারফৎ পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সমগ্র আসামে যে কয়েকটি সমবায় সমিতি আছে তাহার সরবরাহ মহাসমুদ্রে বারিবিন্দু পাতের মত যৎকিঞ্চিৎ।

ধান ও চাউল

আসাম উদ্বৃত্ত প্রদেশ। বাজারে উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ মণ। কিন্তু আসাম গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়াছে মাত্র ২০ লক্ষ মণ। এই বিশ লক্ষ মণ হইতে সরকারকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোটা দিতে হইবে, মিলিটারী এবং চা-বাগানকে সরবরাহ করিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে আসামের শহর ও গ্রামবাসীদের জন্য বাঁধাদরে খাদ্য সরবরাহের কোন মতলবই সরকারের নাই। সরকারের ধারণা, শুধু সরকার কেন সাধারণ লোকেরও ধারণা আসামে চাউল প্রচুর আছে সুতরাং সরকারী সরবরাহের কোন প্রয়োজনীয়তা এখানে নাই। অথচ এত প্রাচুর্য্য সত্বেও চাউলের দর এখানে প্রতি মণ ১৬ টাকা হইতে ১৮ টাকা। নুন যে ভাবে চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে, চাউলও সেই ভাবে চোরাবাজারে চলিয়া যাইতে পারে। চাউল এখানে যেমন প্রচুর, তেমনি মজুতদারের প্রতিপত্তিও প্রচুর। যুদ্ধক্ষেত্রের এত নিকটে যে মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্যবস্তুর রেশনিং না করিয়া মজুতদারের সদিচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেয় সে মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু যে জনগণের প্রতি মমতাহীন তাই নয়, যুদ্ধ সম্পর্কেও সে হয় অজ্ঞ অথবা উদাসীন।

দমননীতির আঘাত

মণিপুরে যখন জাপশত্রুর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলিতেছে, কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিবার জন্য জাপশত্রু যখন প্রাণপণে লড়িতেছে তখন আসামের জনসাধারণকে জাপ প্রতিরোধে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, অভাবে ও দুর্ভিক্ষে যাহাতে তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া না যায় সে চেষ্টাও গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে নাই। বরং যাহারা জনসাধারণকে দেশরক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাদের উপরই দমননীতির আঘাত পড়িতেছে। লামডিংএর রেল শ্রমিকদের জনপ্রিয় নেতা কমরেড কালীপ্রসন্ন দাশ স্বগৃহে অন্তরীণ হইয়াছেন। কমরেড চঞ্চল শর্ম্মা ও ভূপতি চক্রবর্ত্তী আজও কারারুদ্ধ। আসাম ও সুর্ম্মা ভ্যালীর ১০ জন কমিউনিস্ট কর্ম্মী আজও অন্তরীণ আছেন। মণিপুরের প্রজামণ্ডলের নেতা ইরাবত সিং মণিপুরবাসীকে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন, আর সেই জনপ্রিয় ইরাবত সিংএর উপরই বাহির হইয়াছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র আসামের কংগ্রেস জনগণকে আহ্বান করিয়াছেন জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে কিন্তু তাঁহার উপর রহিয়াছে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ।

আসাম কোন্ পথে

অথচ গৃহ বিবাদে আসামের জাতীয় জীবন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগ, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান সারাভারতেই আছে। কিন্তু আসামে আছে তাহার উপর আসামী বাঙ্গালীর সংঘর্ষ। জমাজমিতে লাইন প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায় বাঙ্গালীরা জমি কিনিয়া বসবাস করিতে পারে না। অথচ আসামের বহু জমি পতিত রহিয়াছে। এই জমি আসামী চাষীও পাইতেছে না, বাঙ্গালীও পাইতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গের বহু কৃষক দুর্ভিক্ষে উৎপীড়িত হইয়া আসামের দ্বারস্থ হইয়াছিল, আজ তাহারাও সেখানে জমি পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। জমি পাইবার অধিকার লইয়া আসামী ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে মনোমালিন্য রহিয়াছে তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে।

আসাম কি বর্মার পথে যাইবে? অর্থনৈতিক অরাজকতা, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা এবং পঞ্চমবাহিনীর প্রভাব এই যে কয় শক্তি মিলিয়া বর্মার পতন ঘটাইয়াছিল তাহার সমস্তই আসামে বর্ত্তমান। আসামকে বাঁচাইতেই হইবে, আসামের পতন ঘটিলে সমগ্রভারত বিপদাপন্ন হইবে। আশার কথা এই যে সীমান্তে সৈন্যবাহিনীর মনোবল এখনও দৃঢ় আছে, এবং কংগ্রেস অগ্রণী হইয়া জাপ-বিরোধী অভিযানে নামিয়াছে। কিন্তু আসামের মজুতদারের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য গড়িতে না পারিলে দেশবাসীর মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আসামে যাহাতে দুর্ভিক্ষ না হয়, আসামের ভিতর যাহাতে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ দেখা না দেয় তাহার জন্য ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র ভারত যদি আসামের পিছনে দাঁড়ায়, আসামে অবস্থার পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হইবে। সমগ্র ভারতকে আসামের জন্য একতাবদ্ধভাবে দাবী করিতে হইবে—আসামের সর্ব্বত্র সরবরাহের সুবন্দোবস্ত বা রেশনিং চাই, আসামের স্বদেশসেবকদের পূর্ণমুক্তি চাই।

কর্পোরেশন মজুরদের ডবল জিত

ইনক্রিমেণ্ট আবার চালু : মাগগি ভাতা বন্ধ হইবে না

কলিকাতা কর্পোরেশনের মজুর ও কর্মচারীদের সম্প্রতি দুইটী বিষয়ে জিত হইয়াছে। শ্রমিক-কাউন্সিলর কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইলের অক্লান্ত চেষ্টা, শ্রমিকদের আন্দোলন এবং অন্যান্য কাউন্সিলর ও মেয়র মহাশয়ের সহানুভূতিতে এত শীঘ্র ইহা সম্ভব হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের টাকা দেয় না বলিয়া কর্পোরেশন-শ্রমিকদের সামান্য মাগগি ভাতাও বন্ধ করিবার কথা উঠিয়াছিল এ খবর 'জনযুদ্ধে' আগেই বাহির হইয়াছে। কমরেড লাহিড়ী ও ইসমাইল এই দারুণ বিপদের প্রতি সমস্ত কাউন্সিলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্পোরেশনের সমস্ত মজুর ও অন্য সব কয়টী ইউনিয়নকে দলাদলি ভুলিয়া এই বিপদের বিরুদ্ধে এক যোগে আন্দোলন করিতে ডাক দেয়। কিন্তু এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা প্রথমে নাম সই করিয়া এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দিবার কথা দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত এক সঙ্গে লড়িতে রাজি হন না। কর্ত্তৃপক্ষের ধমকেই তাঁহারা সরিয়া পড়েন কিনা তাহা তাঁহারাই জানেন। যাই হোক তাঁহাদের বাদ দিয়াই আন্দোলন চলিতে থাকে, মেয়র মহাশয় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করেন। শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কাছে টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং গত ৭ই জুন মেয়র মহাশয় ঘোষণা করেন যে মাগগি ভাতা বন্ধ হইবে না।

মাগগি ভাতার সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেণ্ট বন্ধের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হয়। গত মার্চ মাসে কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্ত ক্রমে সমস্ত মজুর ও কর্মচারীদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে নব-নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মনে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। গত ১৩ই জুন কর্পোরেশন সভায় প্রায় সমস্ত কাউন্সিলর একবাক্যে প্রস্তাব পাশ করেন যে ইনক্রিমেণ্ট আবার চালু করা হইবে। কাউন্সিলর ফণী ব্রহ্ম ও দেবেন্দ্র মুখার্জি—মাত্র এই দুইজন ইহার বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য হয়।

তারপর গত ১৪ই জুন পলতা, টালা প্রভৃতির মজুরদিগকে অত্যন্ত খারাপ রসদ দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কমরেড সোমনাথ লাহিড়া কর্পোরেশনে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। মেয়র মহাশয় নিজেও স্বীকার করেন যে এই রসদ মানুষের অখাদ্য। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলেন যে মাত্র ৪ সের পরিমাণ রসদ মেহনতকারী মজুরদের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং যে রসদ দেওয়া হয় তাহার অনেকখানিই অখাদ্য—এ কথা তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনেকবার জানাইয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তখন সমস্ত কাউন্সিলরদের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে মেয়র মহাশয় সরাসরি লাট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

মাত্র দুই মাস হইল নূতন কর্পোরেশন বসিয়াছে। ইহারই মধ্যে মজুরেরা ও কর্মচারীরা কাউন্সিলরদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া দুইটী প্রধান দাবী আদায় করিতে পারিয়াছে তাহার কারণ তাহারা আন্দোলনের নূতন কায়দা শিখিতেছে, তাহাদের মধ্যে নূতন দায়িত্ব বোধও জাগিতেছে। এখন মজুরেরা বুঝিতেছে যে শহরবাসীর সেবায় তাহারা যত বেশী পরিশ্রম করিবে এবং নিজেদের ঐক্য যত বাড়াইবে ততই তাহাদের দাবীর পিছনে শহরবাসী তথা কাউন্সিলরদের সমর্থন পাওয়া যাইবে। মাগগি ভাতা বাড়ানো, রসদের পরিমাণ বাড়ানো ইত্যাদি দাবীও তাহারা এই পথেই আদায় করিতে পারিবে।

কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য

লীগ নেতাদের আগ্রহ

পাঞ্জাবে

লাহোর সিটি মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট নবাবজাদা রশিদ আলি খানের বিবৃতি (লাহোর, ১৩ই জুন) :—

লীগ-কংগ্রেস আপোষই ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়। আমরা, লীগপন্থীগণ আশা করি, গান্ধীজী তাঁহার অগাধ বাস্তব বুদ্ধি লইয়া সময়োপযোগী কাজ করিবেন এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জিন্নার সহিত আপোষের জন্য যত্নবান হইবেন। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে নীতি হিসাবে যদি পাকিস্তান দাবী স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মোসলেম লীগ আপোষ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক রহিয়াছে। যুদ্ধকালে এই নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য আমরা চাপ দিব না। পাকিস্তান দাবী একবার স্বীকৃত হইলে উহার খুটিনাটি সম্পর্কে আপোষ রফা হইতে পারে।

বাংলায়

কলিকাতা মোসলেম লীগের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সভ্য মিঃ মোহাম্মদ সোলেমান ভাওদা গান্ধীজীর কাছে একটী চিঠি লিখিয়াছেন; তার অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত করা হইল :—

আমার বিশ্বাস…যে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে মোসলেম লীগই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান। আমার আরও বিশ্বাস, আপনার সত্যানুসন্ধিৎসা বলে উপলব্ধি করিবেন যে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ও সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষা কবচের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতিই হিন্দু ও মুসলমানের খাঁটী মিলন স্থাপনের একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। অনেক সরল লোক বিশ্বাস করেন যে, একটী স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানদের এই অধিকারটী শুধু মানিয়া লইলেই অনেকখানি সন্দেহের অপনোদন হইবে এবং সদ্ভাব সৃষ্টি করিবে।…আমরা আশা করি, আপনি সাহস সঞ্চয় করিয়া মুসলমানদের এই দাবী স্বীকার করিবেন। মুসলমান ও হিন্দুগণ বৈদেশিক শক্তির নিকট হইতে স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য একতাবদ্ধ হইবে। * * মুসলমানদের মধ্য হইতে জবরদস্তি ও সন্দেহের আশঙ্কা দূর করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও ভারতবাসীর খাঁটি বন্ধুত্বের পথ সুগম করিয়া তুলুন। আসুন, আমরা আপোষের সহিত আমাদের গৃহ বিবাদ মিটাইয়া ফেলি এবং আন্তর্জাতিক কুসীদজীবী ও অর্থোপাসকদের পরিকল্পিত রাষ্ট্রগঠনে বাধা দেওয়ার জন্য একতাবদ্ধ হই।

১৪ই জুন—'আজাদ'

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এস, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা

বার্ষিক ৪।০, ৬ মাস ২।০, ৩ মাস ১।০

মফঃস্বলে লবণের দর ১৲ হইতে ২৲

৩ মাস আগে লবণ রেশনিং-এর ঘোষণা

এখনও কাজে পরিণত হয় না কেন ?

আমরা ৭ই জুনের 'জনযুদ্ধে' বাংলার জেলায় জেলায় লবণের দুষ্প্রাপ্যতার কথা এবং ইহার অভাবে সাধারণ লোকের যে দারুণ অসুবিধা হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তারপরও ১৫ দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে অবস্থার যে কোন উন্নতি হইয়াছে মনে হয় না। গত ১৫ দিনে আমরা অন্ততঃ দশ বারটি জায়গা হইতে প্রকাশ্য বাজারে লবণের ভীষণ অনটনের জন্য গরীব লোকদের যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও লবণের অভাব সম্বন্ধে প্রায় প্রতিদিনই খবর বাহির হইতেছে। ময়মনসিংহ জেলার তারাগঞ্জ বাজার হইতে একজন কৃষক নেতা আমাদের লিখিয়াছেন—"লবণের সংকট চতুর্দ্দিকেই তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে লবণ এক রকম পাওয়াই যায় না। আর এত বেশী দামে গরীবদের পক্ষে ইহা ক্রয় করা অসম্ভব। কন্‌ট্রোল দোকানগুলিতে লবণ নাই।" ঐ জেলায়ই গত ৭ই জুন রামচন্দ্র-কুড়া ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সেখানে সমবেত কৃষককর্ম্মী ও প্রতিনিধিরা লবণের অভাবে কি ভাবে গ্রামের লোক কষ্ট পাইতেছে, তাহা নিয়া আলোচনা করেন। ঐ অঞ্চলের অনেক পরিবার একদম বিনা লবণে দিন কাটাইতেছে। এই ইউনিয়নে প্রতি সপ্তাহে লবণ দরকার ২৫/০ মণ, কিন্তু কনট্রোলে মাত্র ২/০ মণ লবণ আসে। সম্মেলনে উপস্থিত সব কৃষক এক হইয়া দাবী করেন—লবণের এই সংকট অবিলম্বে দূর করা হউক। রংপুরের কুড়িগ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, স্থানীয় লোক লবণ অভাবে খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছে, আবার লবণ সংকট দেখা দিয়াছে লবণের সের ১৲ হইতে ১৷৷০। পাবনার লাহিড়ী মোহনপুর হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদ দিতেছেন যে লবণের সের ৸৶০ আনা। ইহা ছাড়া কৃষ্ণনগর হইতে ২রা জুন ইউ, পির যে খবর বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, মফঃস্বলে লবণ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া খবর আসিতেছে। যুদ্ধ সীমান্তের আসাম ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এই সংকটের হাত হইতে বাদ পড়ে নাই। চট্টগ্রাম হইতে ১৪ই জুন ইউ, পি যে খবর দিয়াছে তাহাতে জানা যায় লবণ প্রতি সের এক টাকা হইতে দুই টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। আসামের সুনামগঞ্জ হইতে ৮ই জুন যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে সুনামগঞ্জ বিভাগীয় কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত ১০০০ কৃষক দাবী করিয়াছেন, লবণের চোরাকারবার অবিলম্বে বন্ধ করা হউক। লবণ বাজারে আছে কিন্তু মজুতদারদের ষড়যন্ত্রে তাহা ১৲।২৲ সের দরে পাওয়া যায়।

চারিদিক হইতে লবণের অভাবের খবর আসিতেছে, অথচ ১৪ই জুন নয়াদিল্লী হইতে জানানো হইয়াছে—গত সপ্তাহে সমুদ্রপথে কলিকাতায় প্রায় ২৯০০০ টন লবণ আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মে মাসের মাঝামাঝি হইতে এ পর্য্যন্ত যে লবণ আমদানি হইল তাহা মোট প্রায় ৬৭০০০ টন হইবে। লবণ নিয়মিত আমদানি হইতেছে, এ সংবাদ মাঝে মাঝে সরকারী ফতোয়ায় জানা যায়, কিন্তু আশ্চর্য্য যে গ্রামের ও মফঃস্বলের শহরগুলির সাধারণ লোক সে সরবরাহের কোন সুবিধাই পাইতেছে না। তাহারা 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই', সুতরাং আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—যে লবণ আমদানি হইতেছে সে লবণ যায় কোথায়? কাহার খপ্পরে পড়িতেছে? সরকার সে খোঁজ রাখেন কি? আজ চোরা-বাজারে কেন লবণ বিক্রয় হইতেছে? চোরাকারবারের এ সুযোগ এখনও কেন দেওয়া হইতেছে? অথচ গত ২৩শে মার্চ্চ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় অতি সত্বর লবণের রেশনিং আরম্ভ হইবে এবং ক্রমশঃ তাহা বাংলার জেলাগুলিতে চালু হইবে। আজ ৩ মাস পুরা হইতে চলিল। কিন্তু সরকারের সে ঘোষণা এখনও বলবৎ হইল না কেন? বাংলার শাসনকর্ত্তারা চোরাব্যবসায়ীদের হাতে এখন পর্য্যন্ত লবণ যাইতে দিয়া জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা করিতেছেন। অবিলম্বে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। জনগণ আগাইয়া আসুন—সংঘবদ্ধ হইয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন লবণ নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় করার জন্য এবং লোকানুসারে লবণ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার জন্য। জনগণ যদি এক হইয়া এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা না করে, তবে দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও জনগণের অসুবিধা দূর করিবে না। তাই সর্ব্বত্র আজ আওয়াজ তুলুন—লবণের রেশনিং চাই—শহরে ও গ্রামে সরবরাহের পাকা বন্দোবস্ত চাই, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বরাদ্দ মত লবণ আমদানি চাই।

লবণের চোরাকারবারী ধৃত

[নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র]

গত শনিবার ১০-৬-৪৪ তারিখে মধ্যাহ্নে রংপুর জেলার সৈয়দপুর থানার এক গ্রামে ব্যবসায়ী বদ্রীদাস আগরওয়ালার (১ নং) নিকট হইতে প্রতি বস্তা ৫০৲ টাকা দরে ৮ বস্তা লবণ চোরাই ভাবে কিনিয়া ফরমান আলি ও ধনেৎউল্ল৷ নামে দুই ব্যক্তি দিনাজপুর এলাকায় লইয়া যাইতেছিল। সন্দেহ ক্রমে গাড়ী শুদ্ধ লবণ ও গ্রাহকগণকে সৈয়দপুর থানায় আনা হয়। সিভিকগার্ড ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় এই মাল ধরা হয়। থানায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ব্রজেন কুণ্ডু ও শরত সেন এবং লীগ-নেতা জিকরুল হোসেন প্রভৃতির সম্মুখে গ্রাহকগণ উক্ত ঘটনা স্বীকার করে। দারোগা সাহেব প্রকৃত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিয়া ডায়েরী লিখিয়া লন।

এই অঞ্চলে যথেষ্ট লবণ আমদানী থাকা সত্বেও সাধারণ লোক কণ্ট্রোল মারফত সামান্য লবণই পাইয়া থাকে। অথচ চোরাবাজারে এখনও ১৲ পর্যন্ত সের বিক্রি হইতেছে। চোরা কারবারীদের কঠোর শাস্তি হয় ইহাই স্থানীয় জনসাধারণের ইচ্ছা ও দাবী।

লবণের ডেলিভারী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

কলিকাতা, ১৪ই জুন—বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে বাংলার বাহিরের কোন স্থান হইতে বাংলায় কোনও রেলওয়ে ও ষ্টীমার ষ্টেশনে আড়াই মণের অধিক কোনও লবণের চালান আসিলে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কিম্বা তাহার পক্ষ হইতে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্ম্মচারীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহা ডেলিভারী দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা অনুযায়ী এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। ইউ, পি

রংপুরে বসন্তে মৃত্যুর হিসাব

রংপুর জেলায় বসন্ত মহামারী এই বৎসর কি ভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিতেছে তাহা আমরা গত কয়েক সপ্তাহের 'জনযুদ্ধে' কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা বসন্ত রোগে এই জেলার একটি অসম্পূর্ণ মৃত্যুর খতিয়ান পাইয়াছি। গত ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের সাথে ১৯৪৪ সালের হিসাব তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে রংপুর জেলা বসন্তের আক্রমণে কি ভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

১৯৪২ সালে ১৫৪ বসন্তে মারা গিয়াছে (আমাদের সংবাদ দাতার হিসাব মত)।

১৯৪৩ " ২০৫৪ বসন্তে আক্রান্ত হয় ও ৫৫৪ জনের মৃত্যু হয়।

১৯৪৪	আক্রান্ত	মৃত্যু	(ডি, বি, রেকর্ড হইতে)
জানুয়ারী	২১৩২	৬১৮	
ফেব্রুয়ারী	২০৮১	৪৮৯	
মার্চ	২৪৪৩	৬৬৫	
এপ্রিল	৪১৪৮	১২৪০	
মে	১৯৭৯	৮২০	(ডি, বি রেকর্ড হইতে)

[২৯টি থানার মধ্যে ২৫টি থানায় প্রায় ৮০০টি গ্রাম এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে]

মহামারীর কবলে কৃষক সংগঠন

কি ভাবে কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন কৃষক সমিতি এবারকার বসন্তের মহামারীতে আঘাত পাইয়াছে তাহা নীচের খবরগুলি হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

কুড়িগ্রাম

দেশালয় গ্রামের কৃষক সমিতির সভাপতি মারা গিয়াছে।

সিংহমারী গ্রামের কৃষককর্ম্মী গ্রুপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মী সংখ্যা ছিল ৭ জন।

পঞ্চগ্রামের গণ্ডি আন্দোলনের সময়কার প্রায় ৮৫ জন ভলাণ্টিয়ার মারা গিয়াছেন। এঁদের নেতা রাজচন্দ্র বর্ম্মণ মারা গিয়াছেন।

ফুলগাছে (যোগলহাট ইউনিয়নে) কৃষক আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এখানকার নেতা দেবাই ও তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছেন।

তিস্তার গণ্ডি আন্দোলনের জেলফেরত ভাদু ও আর দু জন মারা গিয়াছেন।

সদর

লক্ষ্মীটারী কিষান আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাঁটি। এবারকার এই মহামারী ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। কোলকোন্দরেও ঐ একই অবস্থা। ইহাছাড়া বদরগঞ্জ, মধুপুর, রাধানগর প্রভৃতি ঘাঁটিগুলিও ব্যাপকভাবে আক্রান্ত।

নীলফামারী

সোহালী কৃষক আন্দোলনের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে ২৫ ঘর লোকের ভিতর ৩৭ জন মারা গিয়াছে।

মেদিনীপুরকে বাঁচাইতে এক হও

পাঁশকুড়ার গ্রামে ১০০ ঘরের মধ্যে ৩৫ ঘরে খাবার নাই

গত বছর মেদিনীপুর জেলায় ৫০ হাজার লোক অনাহার ও মহামারীতে মরিয়াছে। তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার লোকের একমাত্র সম্বল ছিল লঙ্গরখানা। শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়া, শতকরা ৩০ জন কলেরা ও বসন্তে এবং শতকরা ৬০ জন শোথে ভুগিয়াছে। গত বছরের এই অবস্থা সামলাইয়া না উঠিতেই আবার মেদিনীপুরে অনাহার দেখা দিয়াছে। বীজ ধান ও বলদের অভাবে এবার ৩০ ভাগ আউষ জমিতে ফসল হয় নাই। আমন ধান যা হইয়াছিল, তারও অধিকাংশ মহাজনের ঘরে। বর্ত্তমানে শতকরা ১০ জন কৃষকের ঘরে ধান একেবারে নাই। পাঁশকুড়া থানার ১৫ নং ইউনিয়নে একটী গ্রামে ১০০ ঘরের মধ্যে ৩৫ ঘরে কোনো খাবার নাই। কলাগাছিয়া গ্রামে শতকরা ৫০ জন না খাইয়া আছে। শতকরা ৫০ জনের বস্ত্র নাই। ইহার উপর বসন্ত, ম্যালেরিয়া আবার ছড়াইতেছে। দুধের অভাবে শিশু মৃত্যু বাড়িতেছে।

এই অবস্থাতেও ঘাটাল ও তমলুকের বহু হাট হইতে নিয়মিত ধান-চাল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী খরিদের কোনো ব্যবস্থা নাই। সরকার নাকি বলে: মেদিনীপুরে যথেষ্ট ধান হইয়াছে, ষ্টক করার প্রয়োজন নাই। এই কারণেই শহর অঞ্চলে বা তমলুক, কাঁথি ইত্যাদি ঘাটতি অঞ্চলেও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার কোনো চেষ্টা এখনও দেখা যাইতেছে না। শুধু তাই নয়, বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সরকার এতই অন্ধ যে, এই সময়েই গত বছরের দেওয়া ঋণের একাংশ কৃষকের কাছ হইতে আদায় করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য সার্টিফিকেট জারীও চলিতেছে।

গত দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের একটী করুণ দৃশ্য

সংকট রুখিতে জেলা কংগ্রেস সম্পাদকের আহ্বান

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত চারু চন্দ্র মহান্তি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মেদিনীপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নূতনভাবে দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহস্থের গৃহে আজ ধান নাই, ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ...এরূপ অবস্থায় এ বৎসর দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার কল্পে আমরা কি করিতে পারি সে বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। ...বর্ত্তমানে স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্ম্মিগণ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকগণ মেদিনীপুর শহরে একটি জেলা খাদ্য সম্মিলনী আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।...দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রোধ করিবার কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করিয়া খাদ্য সংকট হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে হইলে কি কংগ্রেস, কি হিন্দু মহাসভা, কি কমিউনিস্ট, কি লীগপন্থী, কি দলসংস্রবহীন দেশ-দরদী ব্যক্তিগণ সকলেরই একতার প্রয়োজন।

সূতাকল ও বেল্টিং মজুরের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন

মজুরের দেশপ্রেমিক নীতিতে দেশপ্রেমিক মালিক ও জনসাধারণের সমর্থন

গত ১১ই জুন হুগলী জেলার মাহেশে সূতাকল ও বেল্টিং মজুরের প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত শ্রমিকনেতা কমরেড নেপাল নাগ। ঢাকা, কুষ্টিয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়ার প্রায় প্রত্যেকটি মিল হইতে ৮ হাজার সংঘবদ্ধ সূতাকল ও বেল্টিং মজুরের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের মজুর আন্দোলনে সূতাকল মজুরদের শক্তি এখনও পুরা সংগঠিত হয় নাই। কিন্তু তবু তাদের অল্পদিনকার আন্দোলনের পিছনেই এক গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ঢাকা, মাহেশ, কুষ্টিয়া প্রভৃতির মজুররা দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নিজেদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়াছে। উৎপাদন বাড়াইবার দেশপ্রেমিক দায়িত্ব প্রথম সূতাকল মজুররাই কাজে দেখাইয়াছে। ঢাকার যোগেশ সরকার ও সতীশ কর উৎপাদন বাড়াইবার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন। কয়লা সংকট দূর করার জন্য ঢাকার সূতাকল মজুররাই সবচেয়ে বেশী সংগ্রাম করিয়াছে।

মাহেশের সম্মেলনে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাঁহারা মজুরের এই দেশপ্রেমিক সংকল্প বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। সম্মেলনের আহ্বানে সূতাকল মজুরদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা স্কোয়াড ও গেট মিটিং মারফৎ শুধু মজুরদের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের মধ্যেও সম্মেলনের সংবাদ প্রচার করিয়াছে, সম্মেলনের জন্য সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছে। কুষ্ঠিয়ার মজুররা জনসাধারণের কাছ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ৪৬৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছে। লীগের সম্পাদক ৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন; কংগ্রেসের সভাপতি তাহাদের মেমোরেণ্ডামে সহি দিয়াছেন। ঢাকার মিল-মালিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট দিনের আগেই পাওনা মজুরী মিটাইয়া দিয়াছেন। হুগলীর বেঙ্গল-বেল্টিং-এর কর্তৃপক্ষ সম্মেলনে ১০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। বঙ্গেশ্বরী মিলের মালিকও সাহায্য করিয়াছেন। সূতাকল মজুর তাহাদের সম্মেলনের পিছনে সমস্ত দেশভক্ত জনসাধারণ, এমন কি মালিকেরও সমর্থন আদায় করিয়াছে।

প্রকাশ্য সম্মেলনে ৫ হাজার মজুরের সম্মুখে রক্তপতাকা উত্তোলন করিয়া কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী বলেন, এই পতাকা শুধু মজুরের নয়, সমগ্র মুক্তিকামী মানুষের। শ্রমিকশ্রেণী আজ দুনিয়ার মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইতেছে। ভারতবর্ষের মজুরশ্রেণী ৩ বছর আগে হইতে দেশরক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের যে সংকল্প ও আহ্বান জানাইয়া আসিতেছে, তাহাই আজ দেশের নেতাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড শিশির গাঙ্গুলী বাংলার মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামপুরের সূতাকল মজুরদের গৌরবময় ভূমিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন, মজুর তার দেশপ্রেম ও সঙ্ঘশক্তির জোরে দেশরক্ষার পথে সকল বাঁধা যে চূর্ণ করিতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা বার বার পাইয়াছি। তিনি স্থানীয় মজুরদের ২টি জয়ের কথা ঘোষণা করেন। বঙ্গলক্ষ্মীর যে ১৪ জন মজুরের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল, মিলমালিক তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। বেঙ্গল বেল্টিং-এর কর্তৃপক্ষ শতকরা ৯০৲ টাকা মাহিনা বাড়াইতে রাজী হইয়াছেন। এই জয়ের সংবাদে সভায় প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক কমরেড মিরাজকর ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসু এবং পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রাদেশিক মজুর ইউনিয়ন, জি আই পি রেলমজুর ইউনিয়ন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা, কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা ও দিল্লী কমিটি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান হইতে এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া যে সমস্ত চিঠি আসে তাহা প্রকাশ্য সম্মেলনে পঠিত হয়।

সভাপতি কমরেড নেপাল নাগ বলেন, ভারতবর্ষে সূতাকল মজুররাই রাজনৈতিক চেতনা লইয়া প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। বাংলা দেশেও সূতাকল মজুররা এই ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সূতাকল মজুররা ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে দেশরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে, উৎপাদন-সম্মেলনের মধ্য দিয়া তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সক্রিয় ভাবে আগাইয়াছে। তাহারা পঞ্চমবাহিনীর উৎপাদন ধ্বংসের নীতিকে পরাস্ত করিয়া মজুর শ্রেণীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। দেশপ্রেমিক নীতিকে জয়যুক্ত করার জন্যই আজ মজুরদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাবী জানাইতে হইবে। জনসাধারণের সমর্থনে ও ষোল আনা সংঘশক্তির জোরে মজুরের দাবী আদায় হইবে। উৎপাদনের পথে এবং মজুরের স্বার্থে মালিক ও আমলাতন্ত্রের প্রতিটি আঘাত রুখিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

ইহার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড রণেন সেন মজুরদের মাগগিভাতা ও গ্রেগরী কমিশনের সুপারিশ, রেশনিং, কয়লা সংকট, নূনতম মজুরীর হার বৃদ্ধি, যুক্ত উৎপাদন কমিটি ও কাপড়ের কণ্ট্রোল বোর্ড সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিখ্যাত শ্রমিকনেতা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, মজুরদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

মাহেশ সম্মেলনে মজুর জমায়েতের একাংশ

দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানাইয়া একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। মাগগিভাতা, কয়লা সংকট, রেশনিং, উৎপাদন, নূনতম মজুরী, টেক্সটাইল কণ্ট্রোলবোর্ডে শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়োগ, যুক্ত উৎপাদন কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর মৃণাল চক্রবর্তী, রোশন আলি, গোপাল দত্ত, শ্যামলাল প্রভৃতি মজুর নেতারা বক্তৃতা করেন।

সভার মাঝে মাঝে ও সম্মেলনের শেষে সঙ্গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ গানই মজুরদের লেখা। কুষ্টিয়ার সূতাকল মজুরদের জারীগান ও নারায়ণগঞ্জ মজুরদের দেশপ্রেমিক গানগুলি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধর্মঘটের বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত নাটকটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্থানীয় সূতাকল মজুররাই এই নাটক অভিনয় করেন। কমরেড মানিক মণ্ডল ও হরিপদ কুশারীর গানে সকলে মুগ্ধ হন।

সরকারের মালিক-তোষণ নীতি

আইন সংশোধন হয় মালিকের হাতে মজুর দলনের ক্ষমতা দিবার জন্য!

ভারত রক্ষা আইনের মধ্যে একটী অংশ আছে (৮১ ধারা) যেটা মজুর ও উৎপাদন সম্পর্কে। এই আইনটীর উদ্দেশ্য হইতেছে শিল্পে অযথা ব্যাঘাত যাতে না হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ যাতে লওয়া যায়, তারই ব্যবস্থা করা। মালিক ও মজুর উভয়েরই উপর প্রয়োগ করিবার জন্য এই সমস্ত আইন হইয়াছে। মালিকের মুনাফালোভের হাত হইতে মজুরকে বাঁচাইবার জন্য সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা নাই, তা আমরা জানি। তবু লড়াইয়ের স্বার্থে মালিকের উপরও যে খানিকটা আইনের বাঁধন আসিল, তা মন্দের ভাল। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত আইনের প্রয়োগ মালিকের উপর কতটুকু হইয়াছে? এই সময়ের মধ্যেই মজুরের উপর মালিকের শোষণ ও জুলুম সবচেয়ে বেশী বাড়িয়াছে, অথচ আইন থাকিতেও সে আইনের প্রয়োগ অধিকাংশ সময়েই এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। সরকারের এই মালিক-তোষণ নীতি ক্রমশই আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আইনের মধ্যে মালিকের উপর যতটুকু বাধ্য বাধকতা ছিল, আইনের সংশোধন দ্বারা সেটুকু হইতেও মালিককে রেহাই দেওয়া হইতেছে; ফলে আইনেরই সাহায্য লইয়া মালিক মজুরকে দমন করিবার নিত্য নূতন সুযোগ পাইতেছে।

টেকনিক্যাল•পারসোন্যাল অর্ডিনান্সের সংশোধন কেন?

কিছুদিন আগে টেকনিকাল পারসোন্যাল অর্ডিনান্সের যে সংশোধন হইয়াছে, তার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, অন্যত্র বেশী মজুরী পাইলেও মজুর সেই কাজে যাইতে পারিবে না এবং মালিকও মজুরকে বেশী মজুরী দিতে বাধ্য হইবে না। শুধু তাই নয়, এতদিন নিয়ম ছিল, **মালিক মজুরকে ছাঁটাই করিবার পূর্ব্বে ট্রাইবুন্যালের মত লইবে। আইন সংশোধনের ফলে মালিক মজুর ছাঁটাই সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বময় ক্ষমতা পাইল।** সংশোধনে বলা হইয়াছে যে বিশৃঙ্খল আচরণ, অবাধ্যতা ইত্যাদি কারণ থাকিলে মালিক শ্রমিককে ট্রাইবুন্যালের মত না লইয়াও কর্মচ্যুত করিতে পারিবেন। শ্রমিকের কর্মত্যাগের ক্ষমতা থাকিল না; বেশী বেতন পাইবার সম্ভাবনা দূর হইল, উপরন্তু তাহাকে প্রায় হাত পা বাঁধিয়া প্রভুর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বিশৃঙ্খল আচরণ বা অবাধ্যতা ইত্যাদি তথাকথিত অপরাধ এমনই যে এই অজুহাতে মালিক যাহাকে ইচ্ছা তাড়াইতে পারে, ইউনিয়ন কর্মীদের সাজা দিতে পারে।

বার্ণপুরের মালিক বেপরোয়া

এবং হইতেছেও তাহাই। **আসানসোল বার্ণপুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ কোম্পানীর** শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ। মালিক তাই তাহাদের উপর খড়্গ হস্ত। ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড অনিল মুখার্জ্জী ও অন্যতম কর্মী বেচুসিং ও অন্যান্য কয়েকজন শ্রমিক কর্মচ্যুত হইল কতকগুলি অজুহাতে। আসল কারণ তাহারা ইউনিয়ন গড়িতেছিল, উৎপাদন বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এবং শুধু তাহাই নহে, কারখানার কর্তৃপক্ষ কয়েক ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকদের কাছ হইতে জবরদস্তি করিয়া এই মর্মে সই লইয়াছে যে তাহারা লালঝাণ্ডা ইউনিয়নে সভ্য থাকিবে না, অন্য একটি ইউনিয়নে (দালাল) যোগ দিবে। সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা লেবার কমিশনার ও টেকনিক্যাল সার্ভিস ট্রাইবুন্যালের সভাপতির কাছে জানান সত্ত্বেও কোন জবাব নাই। এমন কি ইহার পরেও পান্নালাল নামে আর একজন শ্রমিক ও ইউনিয়ন-কর্মী বিনা কারণেই কারখানা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

হাওড়ায় দেশপ্রেমিক শ্রমিক বরখাস্ত

হাওড়া বার্ণ কারখানায় পঞ্চমবাহিনী গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি ও তাহাদের অসন্তোষের সুযোগে ষ্ট্রাইক লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। **কমরেড ফটিক বেরা** একজন দেশপ্রেমিক শ্রমিক; সে পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়িয়াছে এবং উৎপাদন বাড়াইবার দিকে শ্রমিকদের উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যেহেতু সে দেশপ্রেমিক—দালাল নয়, সেই হেতু আজ পাঁচদিন হইল হঠাৎ তাহাকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। লেবার কমিশনার ও ট্রাইবুন্যালের সভাপতির কাছে লিখিয়াও ফল হয় নাই। ঘুঘুড়ীর ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়ার কারখানা হইতেও ইউনিয়ন-কর্মীদের বিতাড়ন করা হইতেছে।

কয়লা-খনি মজুরের উপর জুলুমের পথ তৈরী হইল

সম্প্রতি ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মজুর যোগাড় করা ও কাজে লাগান সম্পর্কে ভারত রক্ষা আইনের ৮১ ধারা প্রয়োগ করা চলিবে। এই ঘোষণা শুনিয়াই মালিকরা খুসী হইয়া উঠিয়াছে। ১৫ই জুনের 'ক্যাপিটালে' লেখা হইয়াছে: **সরকারের ওয়েল ফেয়ার স্কীমের (মজুরদের মঙ্গল বিধান) ফলেও তো কয়লা খনিতে মজুর পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। মালিকরা এই স্কীমের উপর বিশেষ ভরসাও কোনদিন করে নাই। একটু আধটু জবরদস্তি না করিলে শুধু মালিকের সদিচ্ছা দ্বারা কয়লা উৎপাদনে উন্নতি হইতে পারে না। এবার আশা করা যায় যে কয়লা-খনির উন্নতি হইবে।**

মজুরদের সুবিধা না দিয়া শুধু জবরদস্তি করিয়াই যে কাজ চালান দরকার—এই কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আজকে মালিকরা পাইতেছে। সরকারের মালিক-তোষণ নীতির ইহাই ফল। এই আইনের ফাঁক দিয়া মজুরের উপর মালিকের জুলুমের রাস্তা পাকা হইল।

চা-বাগান বন্ধ

অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া মালিক উৎপাদন পণ্ড করিতেছে, অথচ সরকার চুপ করিয়া আছে। **চট্টগ্রামের ৫টী চা-বাগানের মজুরদের অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার নিজেই এক 'এওয়ার্ড' জারী করে। মালিক সেই 'এওয়ার্ডকে' অগ্রাহ্য করিয়া চা-বাগান বন্ধ করিয়া দিল। ইহার জন্য মালিকের উপর কোনো শাস্তি বিধান করা হইল না।**

যে উদ্দেশ্যে ভারত রক্ষা আইনের মজুর ও উৎপাদন সংক্রান্ত ধারাটী করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যই আজকে সরকারের এই মালিক-তোষণ নীতির ফলে পণ্ড হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ইহাতে উৎপাদন বাড়িতেছে না, উৎপাদন ধ্বংস হইতেছে। ভারত রক্ষা জোরাল হইতেছে না, ভারত রক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী ও দেশবাসীর তরফ হইতে এই শ্রমিক-বিরোধী ব্যবস্থাগুলির প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে!

২২শে জুন বিশ্ব-মুক্তি যুদ্ধের সূচনা

সোভিয়েটের নেতৃত্বে দুনিয়ার জনগণের মুক্তি অভিযান

বিশ্বের জনশক্তির মিলিত জয় দ্বিতীয় ফ্রন্ট

ঠিক তিন বৎসর আগে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অতর্কিতে সোভিয়েটকে আক্রমণ করে। তখনকার দিনে এই আক্রমণের গুরুত্ব এবং ইহা পৃথিবীর যে কি বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে তাহা প্রত্যেক দেশের মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল লোক ছাড়া আর কেহই ভাল ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন এই আক্রমণ হইতে দুইটি বিষয় খুবই পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। **প্রথমতঃ** হিটলার তাহার বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণরূপ দিবার জন্যই এই আক্রমণ সুরু করে। **দ্বিতীয়তঃ** এই আক্রমণের ফলে ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সাথে বৃটেন ও মার্কিনের স্থায়ী যোগাযোগ স্থাপন হয়। তাই ২২শে জুন যেমন একদিকে পৃথিবীর জনগণকে বিপদের ইঙ্গিত দিয়াছিল, তেমনি আবার অন্য দিকে সোভিয়েটের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের জনগণের সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়িয়া ওঠার ভিত রচনা করিয়া দিয়াছিল।

ষ্টালিনের ঘোষণা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে

১৯৪১ সালের জার্ম্মান দস্যুদের আক্রমণের কিছুদিন পরেই ৩রা জুলাই রেডিও যোগে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন—"ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধ মনে করিলে চলিবে না। এই যুদ্ধ দুইটী ফৌজের যুদ্ধ নয়। এই মহাযুদ্ধ একদিকে সোভিয়েট জনসাধারণ ও অন্য দিকে জার্ম্মান শক্তি। ফ্যাসিষ্ট নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের দেশ রক্ষার এই জাতীয় যুদ্ধের লক্ষ্য আমাদের দেশের উপর হইতে বিপদ দূর করাই শুধু নয় জার্ম্মান ফ্যাসিজমের চাকার তলে নিষ্পেষিত ইয়োরোপের জনসাধারণকে সাহায্য করাই ইহার লক্ষ্য। এই মহাযুদ্ধে হিটলারী কুশাসন শৃঙ্খলিত জার্ম্মান জনগণসহ ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণকে আমরা মিত্ররূপে পাইব। আমাদের দেশের স্বাধীনতার এই যুদ্ধ ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের সাথে এক হইয়া মিলিয়া যাইবে। **ইহা হইবে হিটলারী ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর দাসত্ব ও দাসত্বভীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জনগণের যুক্তফ্রণ্ট।"**

আক্রান্ত সোভিয়েটের শক্তি সম্বন্ধে মিথ্যা সন্দেহ

সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হওয়ার আগে হিটলার সমগ্র ইয়োরোপে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহাতে প্রায় সবাই মনে করিত হিটলারী সেনা অপারেজয়, হিটলারী রণনীতি শ্রেষ্ঠ—তাই হিটলারকে রোধ করা যাইবে না। পশ্চিম ইয়োরোপে ফ্রান্সের মত প্রবল পরাক্রান্ত দেশ হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাতে হিটলারকে রুখিবার শক্তি যে কাহারও থাকিতে পারে, তাহা অনেকেই ভাবিতেই পারে নাই। চাষী মজুরের নিজ হাতে গড়া রাষ্ট্র সোভিয়েটের সামনে যে কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল, সে পরীক্ষায় সোভিয়েট উত্তীর্ণ হইবে না বলিয়াই অনেকে মনে করিল। হিটলারীরা বিপুল শক্তি ক্ষয় করিয়াও প্রথম যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সোভিয়েট দেশও যে হিটলারী সেনা বিদ্যুৎবেগে জয় করিবে ইহাই লোকের ধারণা হইল। মোট কথা সোভিয়েটের সামরিক শক্তির উপর তখন অনেকেই কটাক্ষ করিয়াছিল।

সোভিয়েটের লালফৌজ প্রমাণ করিল—জার্ম্মান বাহিনী অপরাজেয় নয়

সেদিনকার লোকের সেই অবিশ্বাস ও সন্দেহকে দূর করিয়াছিল সোভিয়েটের লালফৌজ। কিছুদিন যুদ্ধের পরেই এটা প্রমাণ হইল যে লালফৌজ **হিটলারী দ্রুতগতি যুদ্ধ-কৌশলকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।** হিটলার সোভিয়েটের যত জমিই দখল করুক না কেন, লালফৌজ তাহার একটি লক্ষ্যও পূর্ণ করিতে দেয় নাই।

প্রথম বৎসর হিটলারের লক্ষ্য ছিল আকস্মিক ভাবে মস্কো দখল করিয়া সোভিয়েটের আত্মরক্ষা পণ্ড করিয়া দেওয়া এবং লালফৌজকে ছত্রভঙ্গ করা। কিন্তু মস্কোর দ্বারদেশ হইতেই হিটলারকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় বৎসর হিটলারের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ককেশাস অঞ্চল দখল করিয়া মধ্য প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই লক্ষ্য পূরণ করিবার জন্য তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভরোনেজ দখল করিয়া ডন হইতে ভলগা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া, কিন্তু হিটলারের দস্যুবাহিনী ভরোনেজ দখল করিতে পারে নাই। ভরোনেজ দখল করিতে অসমর্থ হইয়া হিটলারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল শীতের আগেই ষ্টালিনগ্রাদ দখল করা। কিন্তু ষ্টালিনগ্রাদের লড়াই-ই আনিয়া দিল হিটলারের পরাজয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূচনা।

তৃতীয় বৎসর হিটলার চাহিয়াছিল কোন একটি সঙ্কুচিত ফ্রণ্টে বিপুলবেগে আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট ব্যূহ চূর্ণ করিয়া আগাইয়া যাইবে এবং সোভিয়েটের বিরাট আক্রমণ উদ্দেশ্যকে ঘায়েল করিবে। ৫ই জুলাই ওরেল, কুর্স্ক ও বিয়েলগোরদে এই আক্রমণ সুরু হইয়াছিল, কিন্তু দুর্দ্দমনীয় লালফৌজ গোড়ায়ই এই আক্রমণকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

দুনিয়ার ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণ ফ্রণ্টের নেতা সোভিয়েট

লালফৌজের অসীম বীরত্ব যেমন আস্তে আস্তে পৃথিবীর জনগণের মনে দুর্জ্জয় আশা জাগাইয়াছে, জার্ম্মান বাহিনীর 'অপরাজেয়তার' কাহিনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তেমনি আবার অন্য দিকে এই মুক্তিযুদ্ধ সুরু হইবার পর থেকেই সোভিয়েটের নির্ভুল নীতি তাহাকে এই জনযুদ্ধের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের গোড়ায় অনেকেই যেমন সোভিয়েটের পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি তাহারা ইহাও মনে করিত যে চার্চিল, রুজভেল্ট প্রভৃতি ঝুনো সাম্রাজ্যবাদীদের পাল্লায় পড়িয়া সোভিয়েটের লক্ষ্য যে পৃথিবীর জনগণের স্বাধীনতা, তাহতে ভাঁটা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সোভিয়েট আদর্শের সাথে যাহারা পরিচিত তাহারা স্থির জানিত সোভিয়েট কখনও আদর্শচ্যুত হইবে না, হইতে পারে না। ষ্টালিনের ১৯৪১ সালের ৬ই নভেম্বরের একটি বক্তৃতা হইতেই একথা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। সেই বক্তৃতায় ষ্টালিন বলিয়াছেন—"**ইয়োরোপের দেশ বা জাতিগুলিই হউক কি ইরাণ সহ এশিয়ার দেশ বা জাতিগুলিই হউক, কোন পরদেশ গ্রাস করা বা পরজাতিকে গোলাম করা আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়।**" ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে ষ্টালিন যে কথা বলিয়াছিলেন,

মার্শাল গভোরভ

তারপর ঘটনার পর ঘটনায় তাহাই ভাল ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের শত বাধা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রত্যেকটি স্তরে সোভিয়েটের নেতৃত্বে জনসাধারণের আশা, আকাঙ্খাই সার্থক হইয়া উঠিতেছে, আর পিছু হটিতেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কলা কৌশল।

তেহরানের ঘোষণাই ইহা প্রমাণ করে

ইরাণের রাজধানী তেহরানে ষ্টালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যত ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিচিত হইবে। যে সব লোক মনে করিত যে চার্চিল ও রুজভেল্টের সাথে আলোচনায় আসিয়া ষ্টালিন সোভিয়েটনীতি বজায় রাখিতে পারিবেন না তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিটলারীরা আশা করিয়াছিল যে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিনের মনোমালিন্য ঘটিবে। ফ্যাসিষ্টদের ধ্বংসের জন্য বহু দিন হইতেই সোভিয়েট চাহিয়াছিল যাহাতে মিত্রশক্তি অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলে। বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যেই যে বিভীষণ দল **দ্বিতীয় ফ্রণ্ট** ভেস্তাইয়া দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল তেহরান হইতে নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত বিবৃতিই তাহাদের সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার সিদ্ধান্ত ছাড়াও যুদ্ধ শেষ হইবার পর শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে মিত্ররাষ্ট্র সমূহের ঐক্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও তেহরান সম্মেলনে পাওয়া যায়। "পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা চাই"—এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে চার্চিল-রুজভেল্টকে যে সহি দিতে হইয়াছে তাহার মূল্য খুবই বেশী। যুদ্ধজয় ও যুদ্ধের পরে সুসভ্য সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আজ জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে যে অগ্রাহ্য করা চলিবে না—তাহাই ষ্টালিনের নেতৃত্বে, চার্চিল ও রুজভেল্ট তেহরানে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

তেহরান-ঘোষণা ও লালফৌজের জয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের নূতন পর্য্যায় সুরু

তেহরানের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত এবং সাথে সাথে লালফৌজের অবিরাম অগ্রগতি স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে দারুণ উৎসাহ জাগাইয়াছে। অধিকৃত ইউরোপের জনগণের শক্তি যে দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা অতি বড় সন্দেহবাদীরাও অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। পর পর ঘটনায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। চেক রাষ্ট্রপতি বেনেশ চেক জনগণ ও সোভিয়েট জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে সোভিয়েটের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর করিয়াছেন। যুগোশ্লাভ দেশভক্তরা মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে এবং সোভিয়েট ইহাকে স্বীকারও করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ ও মার্কিন সরকার এখনও সোজাসুজি ইহাকে স্বীকার না করিলেও **বাস্তবভাবে** যুগোশ্লাভ জনগণের নেতা তিতোকেই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ফ্রান্সের জাতীয় মুক্তি কমিটিকে সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েটই মানিয়া লয়। এই মুক্তি কমিটিই বর্ত্তমানে সমস্ত দেশভক্ত নরনারীর হিটলার বিরোধী লড়াইয়ে প্রতিনিধি ফরাসী স্থানীয়। ইতালীর বদলিও সরকারকে স্বীকার করিবার পর হইতে বর্ত্তমানে ইতালীতে যথার্থ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতিই জনগণের স্বার্থরক্ষার নীতি এবং জনগণ আজ আগাইয়া আসিয়া আপন হস্তেই ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধ পরিচালনায় ভার গ্রহণ করিতেছে। লণ্ডনস্থিত পলাতক পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টের প্রতি চার্চিল প্রভৃতির দরদ থাকিলেও পোলাণ্ডের ব্যাপারে সোভিয়েটের ন্যায়সঙ্গত দাবী পোলিশ জনসাধারণ আজ মানিয়া লইয়াছে, তাই আজ সোভিয়েটের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল পোলিশ সরকারকে মিটমাট করিয়া লওয়ার জন্য চার্চিলকেও চাপ দিতে হইতেছে।

শুধু তাই নয়, আজ বিজয়ী লালফৌজের হাতে হাত মিলাইয়া পোলিশ, চেক, ফরাসী ও যুগোশ্লাভ বাহিনী নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। ফ্যাসিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত যুদ্ধ শুধু যে পরস্পরের

কমরেড ষ্টালিন

মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বই গড়িয়া তুলিবে তাহা নহে, ভবিষ্যতে তাহাদের প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ইহাতে আগাইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর দিবসে ষ্টালিন বলিয়াছেন—"লালফৌজের বিজয় কেবল সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রণ্টের অবস্থা বদলায় নাই, সমগ্র বিশ্ব যুদ্ধের গতিকে বদলাইয়াছে ইহার ফল দুনিয়া ব্যাপী হইয়াছে।…শত্রুর উপর চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য মিলিত জাতিগুলি আজ একত্র আঘাত হানিতে বদ্ধপরিকর।"

গণশক্তির জয়, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেই হইল

হিটলারের পায়ের নীচে ইয়োরোপের বিশাল মাটি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। গত ৬ই জুন মিত্রশক্তি বিপুল বেগে ফরাসী উপকূলের নরম্যাণ্ডি অঞ্চলে নামিয়া পড়িয়াছে। ষ্টালিন দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'মিত্ররাষ্ট্র সমূহের পশ্চিমদিক হইতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেই হইবে।' ষ্টালিন বুঝিয়াছিলেন যুদ্ধের মোড় এমনভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে যে প্রতিক্রিয়াশীলদের শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খুলিয়া উপায় নাই—এবং হইয়াছেও তাই। নাৎসীদস্যুর মুঠা থেকে আজ নিজেদের স্বদেশ ছিনাইয়া নিবার প্রতিজ্ঞায় ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ফ্যাশিস্টবিরোধী জনগণের বলদৃপ্ত হাত আগাইয়া আসিতেছে। যে সব বিশ্বাসঘাতকের দল আজ হিটলারের তাঁবেদার, নিজেদের গা বাঁচাইবার জন্য একদিন যখন ইহারা আপন আপন দেশকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই—আজ মুক্তিকামী ইয়োরোপের মানুষ ঘৃণার আগুণে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নিতেছে। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র আজ বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। দেশভক্তরা আজ হিটলারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উঁচু করিয়া ধরিয়াছে। নরম্যাণ্ডি উপকূলের মিত্রসেনা আজ বিদ্রোহী ফরাসী জনসাধারণকে তাহাদের মিত্ররূপে পাইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, পোলাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি দেশের জনগণও চরম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েটের প্রচণ্ড নূতন অভিযান সুরু হইয়াছে। ইতালীতে ফ্যাশিস্টরা আর মিত্রবাহিনীর পথ রোধ করিতে পারিতেছে না। হিটলারের দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাকারে আজ বড় রকমের ফাটল দেখা দিয়াছে। প্রাচীরের ভিতর থেকে অধিকৃত ইয়োরোপের নির্য্যাতিত জনগণ আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে, আর সেই সাথে চলিয়াছে সোভিয়েট রণক্ষেত্রে, ফরাসীর উপকূলে এবং ইতালীর জার্ম্মাণ ব্যূহের উপর একযোগে প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতের গতিবেগ বাড়িয়াই চলিবে—ফ্যাশিস্ট দস্যুকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত ইহার গতিরোধ করা কোন প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

★ গণ-শক্তির এই জয়যাত্রা ভারতের সামনেও নূতন সম্ভাবনার পথ খুলিয়া দিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত এখানেও দুর্ব্বল হইয়া উঠিতেছে। তাই ভারতের রাষ্ট্র নেতা মহাত্মা গান্ধীকে আর জেলের মধ্যে আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। অনশন সত্ত্বেও গান্ধীজীকে ছাড়া হইবেনা—আমেরির এই সদম্ভ উক্তি আজ কোথায়? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে পড়িয়া সাম্রাজ্যবাদীদের আর সে শক্তি নাই যে কোথাও সোজাসুজি জনগণকে অস্বীকার করে। কিন্তু যেমন ইউরোপের চাকা ঘুরাইয়াছে ইউরোপের জনগণ, তেমনি ভারতের চাকা ঘুরাইতে হইবে ভারতেরই জনগণকে। ফ্যাশিষ্ট প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য গঠনের যে বিপুল সম্ভাবনা আমাদের সামনে তাকে কাজে পরিণত করাই আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সোভিয়েট তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছে, ইউরোপের জনগণ তাদের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর, আমরা ভারতবাসীও আমাদের দায়িত্ব পালন করিয়া দুনিয়ার শেষ মুক্তি সংগ্রামে আমাদের অবদান দিব।

Regd. No. C. 2836

আসাম ব্রহ্ম যুদ্ধ ফ্রণ্ট

১৩ই জুন—ইম্ফল উখরুল রাস্তার ১৮ মাইল স্টৌনের কাছে যে সমস্ত স্থান মিত্রশক্তি হারাইয়াছিল তাহা পুনর্দখল করিয়াছে। মিচিকানার ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে রাধাপুরের উত্তরে একটী আমেরিকান ইউনিট শত্রুসৈন্যদের ভীষণভাবে ঘায়েল করে।

১৪ই জুন—কোহিমা থেকে যে বাহিনী অগ্রসর হইতেছে সেনানী রাস্তার উপর কোহিমার ২৪ মাইল পূর্বে জাপানীদের প্রতিরোধ বাহিনীকে জখম করে।

সালউইন থেকে একটী চীনাবাহিনী ও মিচিকানার চারিদিকে উত্তর ব্রহ্মে অপর চীনা বাহিনী এই দুই বাহিনী ভামোর সংযোগস্থলে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

১৫ই জুন—কাংলাটনটী থেকে একটী মিত্রবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

১৬ জুন—ইম্ফলের ২১ মাইলের কাছাকাছি মিত্রবাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। চীনাবাহিনী ক্যামেং-এর দিকে জোর চাপ দিতেছে। থারশম ও মণিপুর সড়কের সংযোগ স্থল হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে কোহিমা সড়কের উপর মাওসংসাং বৃটীশ পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে। এখানে জাপানীরা ঘোরতর ভাবে বাধা দিবে কারণ ভারতে মালপত্র ও রসদ পাঠাইবার পক্ষে জাপানীদের ইহাই প্রধান পথ।

গত সপ্তাহের লড়াইএর ফল

কোহিমা ইম্ফল রোডের আর মাত্র ৪৮ মাইল জাপানীদের হাতে আছে। টুকেমা ও থারাসোমের রাস্তা ধরিয়া মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি উখরুলের দক্ষিণের রাস্তায় জাপানীদের প্রধান ঘাঁটিকে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলিয়াছে। জলেকাদায় রাস্তা খুব পিচ্ছিল হইয়াছে। এখানে লড়াই করা খুব শক্ত কাজ। চিন্দিটরা শুরখাইওয়া দখল করার পর মগং এর দিকে আক্রমণ চালাইতেছে ও অপর দিকে চীনা বাহিনী পারেন্টু দখল করিয়া মগংএর দিকে আগাইতেছে—এই দুই বাহিনী আর ১ মাইল অগ্রসর হইলেই মিলিত হইবে। মিচিকানার দক্ষিণে ওয়েনমো ফেরীর তিনটী জায়গায় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাপ-সৈন্য মাটি কামড়াইয়া আছে

গত সপ্তাহে ব্রহ্ম ফ্রণ্টের সমস্ত খণ্ডেই প্রবল লড়াই চলিয়াছে। গত ২।৩ দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে কতকগুলি অঞ্চল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বিষেণপুর অঞ্চলে জলকাদায় মিত্র বাহিনীর অগ্রগতি কিছুটা আটকাইয়া গিয়াছে।

টি, জি, নারায়ণ বলিতেছেন—জাপানীরা মিত্রবাহিনীর অগ্রসর শক্তির সম্মুখে প্রবল বাধা দিতে ছাড়ে নাই—তাহাদের উদ্দেশ্য যেখানে পারে আঁটিয়া থাকিয়া জোর লড়াই চালাইবে। ইম্ফল অঞ্চল হইতে শত্রু পক্ষের সরিয়া যাইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তাহারা নিজেদের শক্তি সংহত করিয়া সুদৃঢ় ঘাঁটি করিবার সন্ধানে ঘুরিতেছে। ভিস্ওয়েমার নিকটে মিত্রবাহিনীকে শত্রুপক্ষের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

মে মাসের লড়াইয়ে জাপানীরা ৭,০০০ সৈন্য হারাইয়াছে। তার মধ্যে ইম্ফল অঞ্চলে ৩০০, কোহিমায় ২,১০০, আরাকানে ১২০০ ও চিন্দিংদের আঘাতের ফলে ১৮০ জন জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে। বৎসরের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত মোট ২১,৩৫০ জন জাপ সৈন্য ব্রহ্ম ফ্রণ্টের লড়াইএ মরিয়াছে। এই ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও জাপ শক্তি বিন্দুমাত্র আশা ছাড়ে নাই।

ভারতের মাটীতে বসিয়া থাকিবার জন্য তাহারা দিমাপুর লেডো রেলপথ কাটিয়া দিবে এবং ইম্ফলের ঘাঁটি দখলে রাখিবে—ইহাই জাপানীদের লক্ষ্য।

উভয় পক্ষই বর্ষার জলকাদা উপেক্ষা করিয়া লড়াই চালাইতেছে। এমতাবস্থায় মিত্রপক্ষের অগ্রগতি তিলমাত্র ঢিলা করিলে জাপসৈন্যদের খুবই সুবিধা হইয়া যাইবে। একন্য মিত্রশক্তির অগ্রগতির জন্য দুর্ব্বর্ষ প্রেরণা সৃষ্টি করা দরকার। ভারতীয় জনগণের শক্তি ও সমর্থন ছাড়া এই ঘোর বিপদে মিত্রবাহিনীর আশা ভরসা জোগাইবার আর কি মোক্ষম শক্তি আছে? দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পর দুনিয়ার কাছে ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন।

√ ৫।০ রেশন ও ৩০৲ মাগগি ভাতার দাবীতে

সারা বাংলার মজুর প্রতিনিধি সম্মেলন

—সমস্ত দেশবাসীর সমর্থন সংহত করিবার সংকল্প—

কয়লা সংকট দূর করিবার জন্য ও ৫।০ সের রেশন ও ৩০৲ মাগগিভাতার দাবীতে বাংলার মজুর অনেকদিন আগেই আওয়াজ তুলিয়াছে। কারখানায় কারখানায় সভা হইয়াছে, মজুররা সমবেত ভাবে দাবী জানাইয়াছে—কিন্তু কি মালিক, কি আমলাতন্ত্র কেহই মজুরের দাবীতে কান দেয় নাই। বরং আমলাতন্ত্র হুমকী চালাইতেছে যে রেশনের ব্যাপার লইয়া আর বেশী গোলমাল করিলে তা বরদাস্ত করা হইবে না। যেন ৫।০ সের রেশনের দাবী মজুরের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দাবী! কিন্তু এই দাবী যে আজ মজুরের বাঁচার অত্যন্ত স্বাভাবিক দাবী, এবং এই দাবী উঠিতেছে শুধু কয়েকটী জায়গার মজুরের তরফ হইতে নয়, সমগ্র বাংলার মজুরের তরফ হইতে এবং তারই সঙ্গে অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্য হইতেও এই দাবীর প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, তা আমলাতন্ত্র চোখ চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করে না।

১৮ই জুন কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সারা বাংলার মজুর প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হইল, সংঘবদ্ধ মজুরদের পাশে কলিকাতার নাগরিক প্রতিনিধিরাও কেহ কেহ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কর্পোরেশনের দুইজন কাউন্সিলার—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী শেঠ ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র সাউ—ইঁহারা মজুর দাবীর প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানান। সম্মেলন হইতে একটী কমিটী গঠিত হয় মজুরের দাবী সম্বলিত মেমোরাণ্ডাম সরকারের কাছে দাখিল করিবার জন্য—এই কমিটীতে মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ডাঃ মালেক, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সত্যেন্দ্র মজুমদার, মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী লালমিঞা, কর্পোরেশন কাউন্সিলার মদনমোহন বর্ম্মন থাকিতে রাজী হইয়াছেন। মজুরের দাবীর পিছনে এমনিভাবেই আজ জনমত জাগ্রত হইতেছে।

মজুরের দাবী দেশরক্ষারই দাবী

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-কারী সম্পাদক কমরেড শান্তা ভালেরাওর সভানেত্রীত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মজুরের দাবীর উপর যে মূল প্রস্তাব তা উত্থাপন করিয়া কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন যে, মজুরের এই দাবী যে দেশরক্ষারই দাবী, নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্র তা বুঝিতে পারে না। তাই আমলাতন্ত্র মালিকদের সঙ্গে একজোট হইয়া অনবরত মজুরের এই ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করিতেছে। যে সময়ে লড়াইয়ের প্রয়োজনে অন্যান্য দেশের উৎপাদন দ্বিগুণ তিন গুণ বাড়িতেছে, সেই সময়ই এদেশে উৎপাদনে ঘাটতি হইতেছে। মজুরদের ভর-পেট খাইতে না দিলে কয়লা উৎপাদনও বাড়িতে পারে না, কল-কারখানাও ভাল চলিতে পারে না। উৎপাদন বাড়ানোর এই আসল উপায়টীই বাদ দিয়া আমলাতন্ত্র মালিককে ঘুষ দিয়া কাজ সারিতে চেষ্টা করিতেছে।

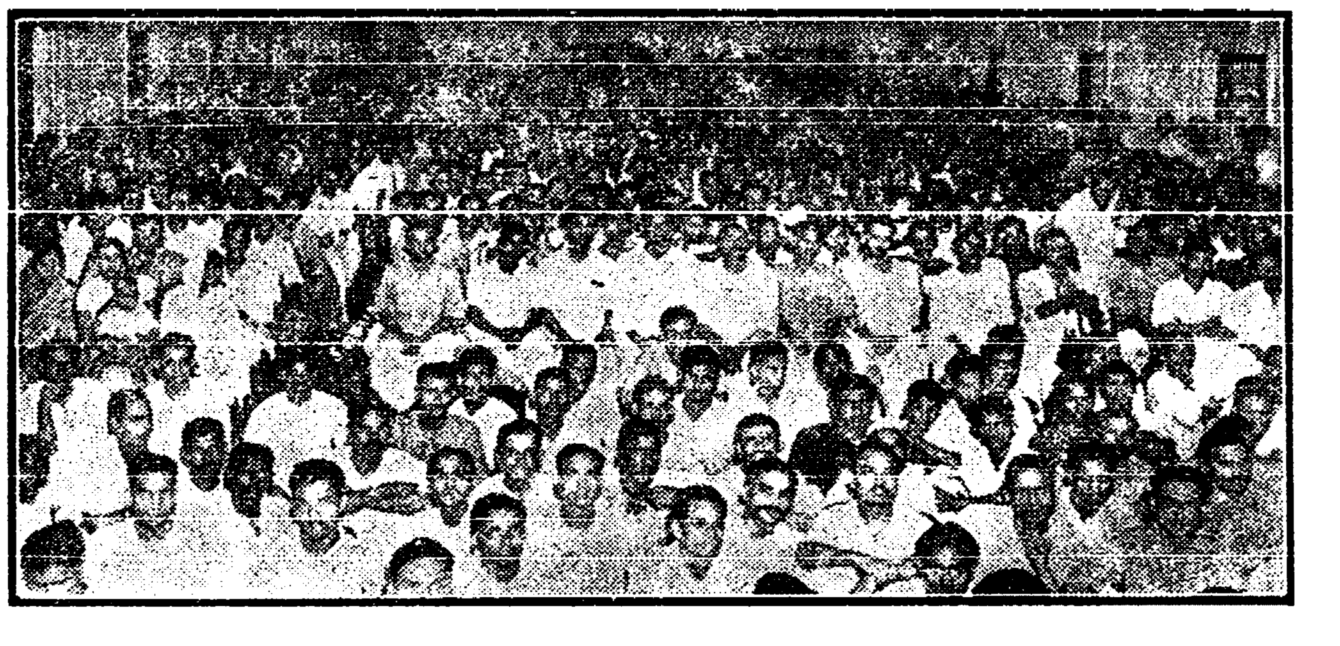

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে মজুর প্রতিনিধি সম্মেলনে বিরাট সমাবেশ

তাই, আজ এক বছর ধরিয়া কিছুতেই কয়লা সংকট ঘোচে না, কলকারখানার কাজও বাড়ে না, দেশবাসীর প্রয়োজনের জিনিষও বেশী তৈরী হয় না। উপরন্তু দিনের পর দিন অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। আজকে সারা বাংলার মজুরদের প্রতিনিধিদের জমায়েত এই গুরুতর অবস্থাই সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেছে। মজুবরা অগ্রণী হইয়া যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছে, ইহাকে সমস্ত দেশবাসীর শক্তিতে শক্তিমান করিতে হইবে। সেই বিরাট আন্দোলনের ধাক্কায় আমলাতন্ত্রের মূর্খামী ভাঙ্গিবেই।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে বিভিন্ন মজুর সংগঠনের পক্ষ হইতে এক একজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। তারপরে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সম্বন্ধে আর একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবের উপর কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী বক্তৃতা করেন।

তা আমলাতন্ত্র, মালিক সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া এই সত্যকে চিনাইয়া দিবে।

৪৬টি সংগঠনের মজুর প্রতিনিধি এই সম্মেলনে হাজির হইয়াছে। এই ৪৬টী কারখানার মধ্যে চটকল, সূতাকল, লোহা কারখানা, রেলওয়ে, ট্রান্সপোর্ট কয়লা খনি সকল ব্যাপারের মজুরই আছে। ঢাকা হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত বিভিন্ন জায়গার মজুর প্রতিনিধি আসিয়াছে। ৫০ হাজার সংঘবদ্ধ মজুরের ১৫০০ প্রতিনিধির এই সম্মেলন বাংলার মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে অভিনব। কয়লা সংকট দূর করার দাবী, ৫।০ সের রেশন ও ৩০৲ মাগগিভাতার দাবী যে আজ মজুরের কত জরুরী দাবী, তা এই সম্মেলনের চেহারার মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। প্রতিনিধি ছাড়া আরো ৩০০০ মজুর এই সম্মেলনে হাজির হইয়াছে।

এই সম্মেলন একদিনের জমায়েত নয়। এই সম্মেলনের উদ্যোগ সুরু হয় মজুর দাবীর এক আবেদনে সমস্ত জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহের ভিতর দিয়া। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই আবেদনের পিছনে বিপুল সমর্থন লাভ করিতে মজুররা সক্ষম হইল। শুধু মাত্র ২৪ পরগণা জেলাতেই ১২ দিনে ৩০ হাজার স্বাক্ষর পাওয়া গেল।

কলিকাতার ট্রাম মজুররা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর নেতাদের সমর্থন লাভ করিয়াছে এই আবেদনের পিছনে। হাওড়ার মজুররা কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা নেতাদের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন পত্র বাহির করিয়াছে। ১৮ই জুনের এই সম্মেলনে

ছাত্রকর্ম্মী সম্মেলন

কলিকাতায় বিরাট সমাবেশ

ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে ১০০ জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় ছাত্রকর্ম্মী গত ১১ই জুন হইতে ১৫ই জুন কলিকাতায় এক সম্মেলনে সমবেত হন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৫ই জুন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সভায় ১৫০০ ছাত্র ও ১০০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। ছুটীর মধ্যে ছাত্রফেডারেশনের সভায় এমন বিপুল সমাবেশ এই প্রথম। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন লক্ষ্ণৌবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলনের মূল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সভায় পেশ-করেন বঙ্গীয় ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। গান্ধীজির মুক্তির পর হইতে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিয়া তিনি বলেন "গান্ধীজি দিনের পর দিন অসহায় বোধ করিতে থাকিবেন, জিন্নাসাহেবের নীরবতাও বজায় থাকিবে, যদি না কংগ্রেস ও লীগপন্থী দেশপ্রেমিকরা ঘোষণা করেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে গান্ধীজিন্না আপোষের পিছনে তাহাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।"

নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রশান্ত সান্যাল বিভিন্ন প্রদেশে "বাংলাকে বাঁচাও" আন্দোলনের বিবরণ দিয়া বলেন" গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ছাত্ররা বাংলার বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানের কাছে নগদ ৫০,০০০৲ টাকা ও ৫০০০৲ টাকার ঔষধ পাঠাইয়াছে। গত দুই মাসে মেডিকেল ছাত্রদের ২০টী স্কোয়াড বাহির হইতে আসিয়া প্রায় ৪০,০০০ রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে।

অধ্যাপক ধূর্জ্জটীপ্রসাদ তাঁর অভিভাষণে বলেন—"ভারতের ছাত্ররা বাংলার সাহায্যে যে রিলিফ আন্দোলন চালাইয়াছে আমি তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বাংলার দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া তাহারা শুধু এই রিলিফ পাঠায় নাই, গভীর ভাবে সমস্যাটিকে বুঝিবার চেষ্টাও করিয়াছে। তাই রিলিফের সঙ্গে সঙ্গে মজুতবিরোধী আন্দোলন, রেশনিং চালুকরার চেষ্টাও তাহারা করিয়াছে। ছাত্ররা এই সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে বুঝিয়াছে বলিয়াই দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস ও লীগের মিলিত চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছে। এই জন্যই আজ দেশের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়াইয়াছে।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও সভায় বক্তৃতাকরেন এবং কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক বিবিধ নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হয়।

★ আসামে ★

বাংলার ছাত্র সংস্কৃতি বাহিনী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের একটি সাংস্কৃতিক বাহিনী গত ৮ই জুন ডিব্রুগড়ে পৌঁছিয়াছেন। ওয়াই-এম সি-এ হল এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তাঁহারা ২টি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ওয়াই-এম-সি-এ হলের অনুষ্ঠানে বহু সামরিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, মজুর, মহিলা ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সভায় সহস্রাধিক লোক হইয়াছিল। ডিব্রুগড় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষেশ্বর বড়ুয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রেলওয়ে ওয়ার্কশপের সভায় ১৫০০ মজুর ও রেলকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বাংলাকে বাঁচানোর জন্য যখন যানবাহন চালু রাখার আবেদন জানানো হইল, তখন সভায় বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। রিলিফের জন্য সভাস্থলেই ৮০৲ টাকা ও ১টি সোনার আংটি সাহায্য পাওয়া যায়। ওয়াই-এম-সি-এ হলে প্রত্যেকে বাংলার ছাত্রদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং সভায় টিকিট বাদেও দর্শকদের কাছ হইতে ২৩৯৲ টাকা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও একজন সামরিক কর্মচারীর একটি সোনার আংটি ও জনৈক মহিলার একটি রূপার বালা নিলাম করা হয়। নিলামে ২২১৲ টাকা পাওয়া যায়। এই প্রদর্শনী ২টি স্থানীয় সর্ব্বদলীয় পিপল্‌স রিলিফ কমিটি ও রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বার বার গ্রামাঞ্চলের কৃষক এলাকা হইতে আহ্বান আসা সত্ত্বেও সময়াভাবের জন্য ছাত্রদের এই দলটিকে শিলং-এ চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাস ভারতে মুদ্রাস্ফীতি করা হইয়াছে, অথচ উৎপাদন তদনুরূপ বাড়ে নাই। তাহারই ফলে এখানে দেখা দিয়াছে অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি, চোরাবাজার এবং দুর্ভিক্ষ। ইহার ফলে মজুতদারের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, ৬৫ লক্ষ লোক দুঃস্থ হইয়াছে। মৃত্যু ও মহামারীর বিনিময়ে ১০০ কোটি ষ্টার্লিং আমাদের পাওনা হইয়াছে, এই অর্থ ব্রিটিশ সরকারেরও নয়, বিরলা টাটাদেরও নয়, এই অর্থ তাহাদেরই ন্যায্য পাওনা যাহারা গত দুই বৎসর ধরিয়া সংকটের আঘাতে উদ্বাস্ত ও নির্ব্বংশ হইয়াছে। সেই জনগণের কল্যাণেই এই অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

টাটা এবং বিরলাদের দল যে পথ ধরিয়াছেন সে পথে শোচনীয় ব্যর্থতা আসিবে। জাতীয় ঐক্যই একমাত্র অস্ত্র যে অস্ত্রে সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হইবে। আজ আমাদের কত শক্তি। আমরা ইংলণ্ডের কাছে ১০০ কোটি ষ্টার্লিংএর পাওনাদার, আজ আমাদের জাতীয় দাবী ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণের দাবী, আজ দুনিয়ায় সর্ব্বত্র জনগণই জয়পত্রযাত্রী। আজ যদি মুসলিম প্রভৃতি জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বরাষ্ট্র গঠনের অধিকার মানিয়া লইয়া একতাবদ্ধ হই, ব্রিটিশ সরকারের সাধ্য নাই যে আমাদের জাতীয় দাবী সে প্রত্যাখ্যান করে।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] ২৮শে জুন, বুধবার, '৪৪, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫১ [দাম ছ' পয়সা

গান্ধী-ওয়াভেল পত্রালাপ

পি, সি, যোশী

গান্ধী-ওয়াভেল পত্রালাপ প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধী-লিনলিথগো পত্রালাপ যে বিষয় লইয়া হইয়াছিল, এই পত্রালাপও হইয়াছে সেই বিষয়েই এবং ইহার ফলাফলও দাঁড়াইয়াছে একই রকম। কিন্তু এই পত্রালাপের মধ্যে সেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা ইহাই যে, লিনলিথগোকে নাড়াইতে না পারিয়া গান্ধীজি হাল ছাড়িয়া দেন নাই—লিনলিথগো চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজি প্রথম সুযোগেই নূতন বড়লাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন।

গান্ধীজি লিখিলেন, "ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে আমি 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি।"

গান্ধী-ওয়াভেল পত্রাবলী হইতে একটী জিনিষ জলের মত পরিষ্কার হইয়া যায়, তা হইতেছে এই যে, গান্ধীজি অচল অবস্থা হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর প্রত্যেকটী চিঠির মধ্যে আগাগোড়া একটী সূত্র—সেটা হইতেছে মীমাংসার পথ খুঁজিয়া বাহির করা। যে সমস্ত বিষয়ে লোকের মনে মতভেদ সেই সমস্ত বিষয়েই কংগ্রেসের আসল নীতি কি তা তিনি এবারের চিঠিগুলির মধ্য দিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। লিনলিথগোর কাছে লেখা চিঠির চেয়ে আরো বেশী পরিষ্কার ভাষায় এবার তা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস কি চাহিয়াছিল

ভারতবাসীর সহায়তা বাদ দিয়াই এই লড়াই জিতিতে পারা যাইবে—এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে গান্ধীজি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁর এই কথা শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য, বৃটিশ জাতিরও বন্ধু ও সেবক হিসাবে।

"এই আত্ম-তুষ্টি বৃটেন, ভারত এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই ক্ষতিকর—বৃটিশ জাতির কর্ণধার যাঁরা এখনও তাঁরা নিজেদের মনকে যাচাই করিয়া দেখুন।"

কংগ্রেসের নীতি যে স্পষ্টভাবেই ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী, তাও তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন :—

"বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ও ভারতে তাদের শাসন যন্ত্রকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, তবু আমরা বৃটিশের বন্ধু। আপনারা যদি আমাদের বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন যে, নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাপানীবাদ ও এই ধরণের যে কোন বাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরাই আপনাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিতে পারি।"

'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব যে কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ঘোষণার বিরোধী নয়, তাও গান্ধীজি বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাবের ভিতর দিয়া ভারতের জাতীয় দাবীই প্রকাশ করা হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে ভারত যাতে কার্য্যকরীভাবে অংশ নিতে পারে এবং দুনিয়ার স্বাধীনতার লড়াই লড়িবার ভিতর দিয়া নিজস্ব স্বাধীনতার লড়াইও যে ভারত লড়িতেছে এ বিষয়ে যাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারে তার জন্যই তাদের ঐ দাবী।

"প্রকৃত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার মানেই হইতেছে ভারতবাসীর দাবী পূরণ হওয়া। ভারত-ত্যাগ-কর কথার মধ্যে এই দাবীটাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজেদের ইচ্ছামত ইহার যে অর্থ করিয়াছে, সেরূপ জঘন্য উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নাই। বৃটিশের প্রতি এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি গভীর বন্ধুত্বের ভাব লইয়াই এই দাবী আমরা করিয়াছি।"

লর্ড ওয়াভেল দেখাইয়াছেন যে ঐ প্রস্তাবের কি সর্ব্বনাশা ফল ফলিয়াছে। তার জবাবে গান্ধীজী বলিয়াছেন : "সরকারী পুস্তিকার যে জবাব আমি দিয়াছি তাতে আমি সব কথাই ভাল করিয়া বলিয়াছি। সেই কথাই আবার আমি জোরের সঙ্গে বলিতে চাই। **আমার ও ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের বক্তৃতাগুলি ভাল ভাবে বিচার করিয়া দেখার আগে পর্য্যন্ত যদি গভর্ণমেণ্ট তাদের ব্যবস্থা অবলম্বন স্থগিত রাখিত, তা হইলে আজ ইতিহাসের গতি অন্য রকম হইয়া যাইত।**"

কোন পথে সমাধান

গান্ধীজী শুধু কংগ্রেসের আসল নীতি ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংকটের সমাধানের পথও তিনি বাত্‌লাইয়াছেন। লিন্‌লিথগোর কথার চেয়ে ওয়াভেলের কথা যে অন্য রকম তা তিনি ওয়াভেলকে স্পষ্ট জানাইতেছেন :

"আপনার বক্তৃতা পড়িয়া আমি দেখিতেছি যে, আপনি ভারত-ত্যাগ-কর প্রস্তাবের রচয়িতাদের সমাজ-বিরোধী লোক বলিয়া মনে করেন না। তাঁরা যে উদার-চেতা লোক তা আপনি বিশ্বাস করেন। তাই যদি হয়, তবে তাঁদের সঙ্গে সেইভাবেই ব্যবহার করুন, তাঁদের প্রস্তাবের তাঁরা যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাই মানিয়া লউন—তাতে আপনার ভুল করিবার কোন আশঙ্কা নাই।"

আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার না হইলে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া মুস্কিল—ওয়াভেলের এই কথার জবাবে গান্ধীজী দেখাইতেছেন যে তাঁর মুস্কিল কিন্তু আরো বেশী। তিনি বলিতেছেন :

"উচুদরের সৈনিক ও কাজের লোক হইয়াও আপনি এই কথা বলিতেছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। যে প্রস্তাব বহু লোকের সম্মিলিত আলোচনার মধ্য দিয়া গৃহীত হইয়াছে, একজনের ইচ্ছায় তা কেমন করিয়া প্রত্যাহার করা যায়? সম্মিলিত ভাবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা সঠিকভাবে প্রত্যাহার করিতে গেলেও সম্মিলিত আলোচনার দরকার।"

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী দেখাইতেছেন, এই মুস্কিলের সহজ সমাধান কি। তিনি ওয়াভেলকে দেখা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অন্ততঃ নেতাদের একসঙ্গে পরামর্শ করিবার সুযোগ দিতে বলিয়াছেন। যে কংগ্রেস নেতাদের যোগ্যতা ও উদারতা ওয়াভেল স্বীকার করিয়াছেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করিয়াই তাঁদের নীতিকে ওয়াভেল কেমন করিয়া ভুল বলিতে পারেন? গান্ধীজী তাই ওয়াভেলকে বলিতেছেন : "আগাখাঁর প্রাসাদে একবার আসিয়া আপনার বন্দীদের মনের সত্যিকার কথা জানিতে চেষ্টা করিবেন কি?" তাও যদি না হয়, তবে গান্ধীজীর শেষ অনুরোধ : "আমাকে ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করিতে দিতে আপনার আপত্তি কি?"

এই সমস্ত চিঠিপত্র পড়িয়া যে-কোনো সাচ্চা লোকের মনে এই ধারণাই হইবে, যে, গান্ধীজীর মনে এই স্থির বিশ্বাস ছিল যে যদি ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করিতে আসেন, অথবা যদি ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের একসঙ্গে মিলিবার সুযোগ দেন, তা হইলে অচল অবস্থার সমাধানের পথ নিশ্চয়ই বাহির হইবে।

কংগ্রেসের নামের অপব্যবহার

কিন্তু ভাইসরয়ই আবার ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবের কথা তুলিয়া সে পথ বন্ধ করিয়া দিল :—"আপনাদের প্রস্তাবের ফলে যে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইবেই, আপনার মত বুদ্ধিমান লোকও ইহা বুঝিল না, তা কি হইতে পারে?"

গান্ধীজী ইহার জবাবে পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন যে দেশব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে, তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই। "প্রস্তাবে আমাদের দাবী আদায়ের জন্য আমরা যে নির্দ্দেশ দিয়াছি, তাতে হিংসার কথা নাই, আছে আত্মনিগ্রহেরই কথা। **কংগ্রেসসেবীই হোক আর যে কেহই হোক এই নীতির বিরোধী কাজ যে করিয়াছে, কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়া কাজ করার কোন অধিকার তার ছিল না।**" এই বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব যে গভর্ণমেণ্টের তাও গান্ধীজী জানাইয়াছেন : "কংগ্রেস নেতাদের তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করার পরেই যা ঘটিল তার সমস্ত দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টেরই—কেননা, সংকট ডাকিয়া আনিল তারাই, প্রস্তাবের রচয়িতারা নয়।"

গান্ধীজি তাঁর চিঠির শুরুতেই বলিয়াছেন : "বাহিরে লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনাহারে, তখন এই জেলের মধ্যে বসিয়া থাকিতে মোটেই আমার আনন্দ হয় না।" ওয়াভেলের মনোভাব জানিতে পারার পর সেই জন্যই গান্ধীজির মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। ওয়াভেলের কাছে শেষ চিঠিতে তিনি গভীর দুঃখে লিখিলেন :

"আজকের ভারতবর্ষ ৪০ কোটী লোকের একটী বিরাট কারাগার স্বরূপ। আপনিই ইহার রক্ষক। সরকারী জেলখানাগুলি এই বড় জেলখানারই মধ্যে। চিঠিতে আপনার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তার পরে আমিও আপনার কথা মতই বলিব যে আমার মত লোকের পক্ষে জেলখানায় থাকাই সঙ্গত। যতক্ষণ না গভর্ণমেণ্টের নীতি ও মনের পরিবর্তন হইতেছে, ততক্ষণ আপনার বন্দী হইয়া থাকিতে আমি খুসীই হইব।"

অচল-অবস্থা বজায় রাখার নীতি

গান্ধিজীর সমস্ত আশা এইভাবে ভাঙ্গিয়া গেল কেন? গান্ধিজী চেষ্টা করিলেন যাতে লিনলিথগোর ভুল শুধরাইয়া লইয়া ওয়াভেল অচল অবস্থা সমাধানের জন্য নূতন নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু ওয়াভেল কি করিলেন? তিনি লিন্‌লিথগোর কথারই পরিষ্কার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ওয়াভেল জানাইলেন, এসেম্বলি বক্তৃতাটাই হইতেছে তাঁর বক্তব্য। তিনি জানাইলেন : অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিবার আছে, এবং সেগুলি সবই অরাজনৈতিক। অর্থাৎ সহযোগিতার পথ হইতে পারে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীকে কার্যাতঃ অস্বীকার করিয়া। অথচ জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীর কারণই হইতেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়ে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা, যার ফলে দেশবাসীর মন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল তা মনে করেন না; তিনি মনে করেন, আগে সহযোগিতা হউক, তার পরে রাজনীতিক মীমাংসা হইবে।

সোজা কথায় বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, লর্ড লিন্‌লিথগো চাহিয়াছিলেন কংগ্রেসকে একেবারে ধ্বংস করিতে; আর লর্ড ওয়াভেল সেইটা আর একটু ঘুরাইয়া করিতে চাহেন—অর্থাৎ তিনি কংগ্রেসকেই আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছেন।

সমস্ত পত্রালাপের মধ্য হইতে এই মূল উদ্দেশ্যই বাহির হইয়া পড়ে যে, লিনলিথগোর মতই ওয়াভেলও চান যে লড়াই যতদিন চলিবে ততদিন অচল অবস্থাই বজায় থাকুক। এই নীতি বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের ও ভারতে তাদের এজেন্টদের বিবেচনা-প্রসূত রাজনীতি। কেননা, তারা জানে যে ভারতের সঙ্গে এখন মীমাংসা করিলে ভারতবর্ষ তাদের হাতে আর থাকে না। লড়াইয়ের সময়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন মানে স্বাধীন দুনিয়ায় স্বাধীন ভারতের রাস্তা খোলসা করা। এই প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখিতেছে যে ইউরোপের মুক্তিতে তাদের আর কোনো সুবিধা নাই, তাই যতদিন পারা যায় ভারতবর্ষকে হাতে রাখিতে তারা চায় এবং সেই জন্যই এখানে অচল-অবস্থা রাখিবার চেষ্টা তারা করিতেছে।

জিন্নাকে জয় করুন !

অদলীয় ও লিবারাল নেতারা এখনও ভাবিতেছেন যে কি করিয়া একটা যাদুমন্ত্রের মত উপায় বাহির করা যায়, যার দ্বারা অচল অবস্থার অবসান হইতে পারে। গান্ধী-ওয়াভেল পত্রাবলীর পর তাঁদের মোহ নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ওয়াভেলের কাছে গান্ধীজী সফলতার সন্ধান পাইলেন না, কিন্তু তাতেই তাঁর কাজ শেষ হইল না। যতদিন তিনি বন্দী ছিলেন, ততদিন তাঁর নিজের কিছু করিবার উপায় ছিল না, তাঁকে নির্ভর করিতে হইত তাঁর রক্ষকের উপর। কিন্তু এখন তিনি মুক্ত; তাঁর নিজেরই ভক্ত দেশবাসীর মাঝখানে জাতির শীর্ষস্থানে তাঁর যোগ্য আসনে আবার তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র দেশই আজ অচল অবস্থার বিরোধী, সমগ্র দেশই আজ ব্যাকুল ভাবে চাহিতেছে—গান্ধীজি পথ দেখান।

কাজে আগাইবার সুযোগ এখন গান্ধীজীরই হাতে। জেলের ভিতর হইতে তিনি শুধু তাঁর আটককারীদের কাছেই আবেদন করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন বাহিরে থাকার ফলে তিনি আমাদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে পারেন, সমস্ত দেশবাসীকে পরিচালনা করিতে পারেন।

লিনলিথগোর মত ওয়াভেলও ভারতবাসীর অনৈক্যের অজুহাত দেখাইতেছেন। আমাদের জাতীয় মর্য্যাদার দিকে চাহিয়া আজ গান্ধীজী ওয়াভেলের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন, জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলুন, কংগ্রেস ও লীগের মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করুন।

মহাত্মাজীর প্রসারিত হস্ত ওয়াভেল হেলায় সরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু জিন্না তা করিবেন না। যদি গান্ধীজী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে মীমাংসা করিবার জন্য মনস্থির করেন, তা হইলে জিন্না তাঁকে সাদরে বরণ করিয়া লইবেন।

এদেশ আমাদেরই, আমাদেরই জাতীয় দাবী আদায়ের জন্য আমরা কেন এক হইতে পারিব না?

যতদিন ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য থাকিবে ততদিনই চার্চ্চিল, আমেরি ও ওয়াভেল সম্মিলিত জাতির জনগণের মনে সন্দেহ জাগাইয়া রাখিতে পারিবে। আমরা এক হইলে সম্মিলিত জনগণকে আর কি দিয়া ধোঁকা দিবে?

ওয়াভেল জিন্নার পাকীস্থানও মানে নাই, গান্ধীজীর জাতীয় গভর্ণমেণ্টও মানে নাই। গান্ধী-জিন্না মিলন হইলে ওয়াভেলের দাঁড়াইবার স্থান কোথায় থাকিবে? ঐক্যবদ্ধ ভারত তখন মিলিত জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার শক্তি পাইবে।

ওয়াভেলের কাছ হইতে গান্ধীজী পাইয়াছেন বিফলতা, কিন্তু জিন্নার কাছ হইতে তিনি পাইবেন আশা—জিন্নাকে জয় করাই তাঁর এখন কাজ

যুদ্ধের শেষ খবর

ইতালীয় ফ্রণ্ট—মিত্রসেনার পঞ্চম আর্ম্মি পিয়ানবিনো অধিকার করিয়াছে। এপর্য্যন্ত এই অভিযানে ২৪০০০ হাজারের উপর শত্রু-সেনা বন্দী হইয়াছে।

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজ ভিটেবস্ক দখল করিয়াছে। এই স্থানে জার্ম্মানদের ৫ ডিভিসন সেনা আটকা পড়িয়াছে। বব্রুইস্ক অঞ্চলে জার্ম্মানদের রক্ষা ব্যূহ সোভিয়েট সেনা ভেদ করিয়াছে।

সম্পাদকীয়

কাগজ সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারী হুকুম

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত ভারত সরকার হঠাৎ হুকুম জারি করিয়াছে যাহারাই ভারতে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহার করে তাহাদের কাগজ খরচ শতকরা ৭০ ভাগ কমাইয়া দিতে হইবে। শুধু দৈনিক ও ২।৪টি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং গবর্ণমেণ্টের প্রিয় দু চার জন ব্যবসায়ী ছাড়া ভারতে আর সকলকেই ভারতীয় কাগজ ব্যবহার করিতে হয়। এই হুকুমের ফলে সমস্ত সাপ্তাহিক, অর্দ্ধ-সপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাকে কাগজের পৃষ্ঠা সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ কমাইয়া দিতে হইবে, সমস্ত পুস্তক প্রকাশক ও ছাপাখানা, সমস্ত খাতা পত্রের প্রস্তুতকারী প্রভৃতিকেও কাগজের পরিমাণ ৭০ ভাগ কমাইতে হইবে। তা ছাড়া আরও হুকুম হইয়াছে যে, জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য কেহ বিজ্ঞাপন ছাপিতে পারিবে না, অন্যান্য বিষয়ের ইস্তাহারেও মাসে ৫০ পাউণ্ডের বেশী কাগজ খরচ করা চলিবে না—ইত্যাদি।

এই হুকুমের ফলে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যেরই প্রচণ্ড ক্ষতি হইবে, কাগজ লইয়া যাহাদের কারবার তাহারা তো প্রায় মরিতে বসিবে, রাজনীতিক ও অন্যান্য প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। ছাপাখানা, বইয়ের দোকান, সংবাদপত্র প্রভৃতিতে অর্দ্ধেকের বেশী কর্মচারী ছাঁটাই হইবে। দেশের মধ্যে একটা প্রচণ্ড গোলমালের অবস্থা সৃষ্টি হইবে, প্রত্যেক দেশবাসীকেই ইহার ক্ষতি অল্প বিস্তর ভুগিতে হইবে।

অথচ আমলাতন্ত্র এই ক্ষতিজনক হুকুমের কারণ পর্য্যন্ত কাহাকেও জানায় নাই, যাহারা ইহার দ্বারা ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই, এমন কি এরূপ ওলটপালট ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে কাহাকেও আগে হইতে সাবধান করে নাই কিংবা একদিন সময়ও দেয় নাই—হঠাৎ ১২ই জুন হুকুম জারি করিয়াছে যে সেই দিন হইতেই এই হুকুম তামিল করিতে হইবে।

এই নির্বোধ, ক্ষতিজনক ও স্বেচ্ছাচারী হুকুম রদ করাইতেই হইবে। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে ইহার প্রতিবাদ উঠিয়াছে—সেই প্রতিবাদের মধ্যে প্রত্যেককে টানিয়া আনিতে হইবে। হিন্দু মুসলমান সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত মতামতের জনসাধারণকে এক করিয়া জবরদস্ত প্রতিবাদ উঠাইতে পারিলে এই আদেশের সংশোধন নিশ্চয়ই করানো যাইবে।

বাংলার আইন সভার লজ্জাজনক পরিণতি

গৃহ যুদ্ধের একটি অধ্যায়

গত ২৩শে জুন আইন সভায় অত্যন্ত হট্টগোলের ভিতর মাননীয় স্পীকার মহোদয় ঘোষণা করেন যে অত্যকার অধিবেশন শেষ হইলে বর্ত্তমান অধিবেশন সমাপ্ত করিবার জন্য গভর্ণর এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই ঘটনায় সারাদেশে এক চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী স্থির করিয়াছিলেন যে এবারকার অধিবেশনেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পূর্ণরূপে পাশ করান হইবে, বিরোধীদল একের পর এক অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ অধিবেশন বন্ধ হইবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। ব্যাপারটা হঠাৎ দাঁড়াইল এইরকম যে গভর্ণর আইন সভার সদস্যদিগকে ঘর হইতে তাড়াইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এবারকার আইনসভার এই কলঙ্কময় পরিণতি কেন হইল?

পাঁচ মাসের অধিবেশন

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৫ মাস আইন সভার অধিবেশন চলিয়াছে। এই ৫ মাসে মোট ৮৬টি অধিবেশন হইয়াছে। আইন সভার প্রতিদিনকার অধিবেশনে সদস্যদের বেতন, এলাউন্স প্রভৃতি লইয়া প্রায় ৫০০০ টাকা খরচ হয়, এই ভাবে এবারকার অধিবেশনে প্রায় সওয়া চার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। সওয়া চার লক্ষ টাকা উদরস্থ করিয়া আইন সভার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কাছে যাইয়া কি কৈফিয়ৎ দিবেন? ৫ মাস ধরিয়া বাংলার জনগণের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন? সওয়া চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে লজ্জা এবং কলঙ্ক লইয়া তাঁহারা কেন ঘরে ফিরিলেন তাহার কৈফিয়ৎ কি? এ কৈফিয়ৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থকদেরও দিতে হইবে, বিরোধীদেরও দিতে হইবে।

এই সুদীর্ঘ অধিবেশনে বাজেট গৃহীত হইয়াছে কিন্তু বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ৮৬টি অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ২ দিন খাদ্য সমস্যা লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু সে আলোচনায় খাদ্যের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, ভেদই বাড়িয়াছে। ২৩ দিন ধরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা হইয়াছে এবং বিলের প্রাথমিক আলোচনাও শেষ হইয়াছে কিন্তু বাংলার শিক্ষাজগতের দুর্য্যোগ কাটাইবার কোন ব্যবস্থা তাহাতে হয় নাই।

১লা ফেব্রুয়ারী যখন আইন সভার অধিবেশন প্রথম আরম্ভ হয় তখন বাংলার জনগণ এই আশাই করিয়াছিল যে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতার পর এ বৎসর আইন সভার বিভিন্ন দল ভেদ এবং সংঘর্ষ ছাড়িয়া ঐক্যের পথ ধরিবেন, গৃহযুদ্ধ ছাড়িয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথে অগ্রসর হইবেন। গত পাঁচমাস বাংলার দিকে দিকে জনগণের এই ধ্বনিই উঠিয়াছে—বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব চাই, সকল দলের ঐক্য চাই। কিন্তু সে ধ্বনি আইন সভাকে একটুও প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই, বরং তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের সম্বল হইতে সওয়া চারিলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টিই এবারকার আইন সভার অধিবেশনের বিশেষ কৃতিত্ব। ইহার জন্য দায়ী কে? মন্ত্রীরা বলিতেছেন বিরোধীদল দায়ী, বিরোধী দলগুলি বলিতেছে মন্ত্রীদল দায়ী। আসল কথা—দায়ী উভয়েই, উভয় পক্ষই জনগণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে যখন দেখা গেল বিরোধীদল কিছুতেই আইন সভার কাজ স্বাভাবিক ভাবে চলিতে দিবেন না, এবং মন্ত্রী-মণ্ডলীর সমর্থকরাও বিরুদ্ধ দলে চলিয়া যাইতেছেন, অনাস্থা প্রস্তাবের পর অনাস্থা প্রস্তাব আসিতেছে এবং মন্ত্রীদের ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে তখনই গভর্ণর আইন সভার অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত করিয়া দিলেন।

মন্ত্রীমণ্ডলী কি করিয়াছেন?

এবারকার অধিবেশনে মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান কীর্ত্তি মাধ্যমিক শিক্ষাবিল, এই বিল বাংলার নিতান্ত দুঃসময়ে আত্মঘাতী সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়াছে। শিক্ষার বিস্তার কি ভাবে হইবে, সংকটের আঘাতে লুপ্তপ্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি ভাবে বাঁচান হইবে এবং বিপন্ন শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য কতখানি সম্পদ ও সম্বল দেওয়া হইবে তাহার আভাষ মাত্রও প্রস্তাবিত শিক্ষাবিলে নাই, বরং আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াইবার ব্যবস্থাই হইয়াছে। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শিক্ষাবোর্ডে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থা লইয়াই যত হাতাহাতি সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু শিক্ষার সংকট ও সম্পদ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা নীরব, শুধুমাত্র পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থায় তাহা মুসলমানদের কোন কল্যাণ সাধন করিবে না। সেই বিল শেষ পর্য্যন্ত স্থগিতই রহিল অথচ শেষ পর্য্যন্তও মন্ত্রীমণ্ডলী এমন কথা বলিলেন না—আসুন আমরা সকল দল মিলিতভাবে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করি এবং যতক্ষণ না আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা হয় ততক্ষণ নিষ্ফল তর্কবিতর্ক বন্ধ করি। মন্ত্রীমণ্ডলী অবশ্য ভাবিয়াছিলেন যে নিছক সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে এই বিল পাশ করাইয়া লইব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সংখ্যা গরিষ্ঠতাই কি বিপন্ন হইয়া পড়িল না?

এবারকার অধিবেশন চলিতে চলিতে দুই দুইটি জেলায় (রংপুর এবং হাওড়া) স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিষ্ঠান ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি খারিজ করা হইয়াছে, নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে জেলাবোর্ডের সততা সম্পর্কে আবেদন না জানাইয়া আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার পর সার নাজিমুদ্দিন বাংলায় সভাসমিতির অধিকার প্রসারিত করিয়াছিলেন কিন্তু এবারকার অধিবেশন চালাইবার মধ্যে তাঁহারা সভাসমিতির উপর ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের উপর নূতন করিয়া কণ্ঠরোধের আয়োজন করিয়াছেন। সংবাদপত্রের উপর পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের কথা লিখিতে পারিবে না, কলিকাতার হলের ভিতর সভা করিবার জন্য একাধিক মামলা দায়ের হইয়াছে এবং কয়েকটি স্থানে সভাসমিতি বন্ধেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার ঘাটতি এলাকায় এবং দুর্গত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংকট যে বাড়িতেছে তাহা অস্বীকার করিয়া লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী প্রচার করিতেছেন যে সংকট কমিয়াছে।

এইভাবে গত পাঁচ মাসে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের দিকে বেশী ঝুকিয়াছেন, ভেদ ও সংঘর্ষ বাড়াইয়াছেন, জনগণের দুর্য্যোগ সম্পর্কে অমার্জনীয় অবহেলা দেখাইয়াছেন।

তাহারই ফলে আইন সভায় তাঁহাদের সমর্থকদের সংখ্যা কমিয়াছে; বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় দেখা গেল তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধীদের মাত্র ১৩ ভোটের পার্থক্য। মন্ত্রীরা হয়ত বলিবেন যে সমর্থকেরা ঘুষ খাইয়া বিরোধী দলে যোগ দিয়াছে। এ কথার উত্তরে আমাদের দুইটি কথা বলিবার আছে—

প্রথমতঃ, তাহাই যদি সত্য হয় তবে কোন্ সাহসে তাহারা ঘুষ খাইয়া বিরোধীদলে যায়? যদি মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণের কল্যাণজনক পথে ঐক্যবুদ্ধির কাজে সহায়তা করিতেন তাহা হইলে কি তাহারা দল ছাড়িতে সাহস পাইত?

দ্বিতীয়তঃ, যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা এতই ফাঁকা যে টাকার লোভে সমর্থকেরা দল ছাড়িয়া চলিয়া যায় সেই সংখ্যা গরিষ্ঠতার বড়াই না করিয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথে অগ্রসর হইলে লীগের ক্ষতি হয় কি কিছু?

যে পথ মন্ত্রীমণ্ডলী ধরিয়াছেন সে পথ দিনের পর দিন তাঁহাদিগকে আমলাতন্ত্রের কুক্ষির ভিতর আরও বেশী বেশী ঠেলিয়া দিতেছে। এখন তাহারা একান্তভাবে ইউরোপীয় ভোটের উপর নির্ভরশীল। শেষ পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গভর্ণরকে বর্ত্তমান অধিবেশন বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এইভাবে আমলাতন্ত্রের সহায়তায় কি লীগের গৌরব বাড়িবে? সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব তুলিলেই লীগের নেতারা বলেন যে হকের দলের সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করিলে লীগের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আমলাতন্ত্রের স্মরণাপন্ন হওয়া, ইউরোপীয় দলের উপর নির্ভরশীল হওয়া—ইহাই কি লীগের গৌরব বাড়াইবার পথ? আমরা বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি যে সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথেই লীগের প্রভাব এবং গৌরব বাড়িবে, তাহার বিপরীত পথে লীগ-ধ্বংসকারীদের ক্ষমতাই বাড়িতেছে।

বিরোধী দল কোন্ পথে

গত পাঁচ মাস ধরিয়া বিরোধীদলগুলি আইন সভায় উন্মাদাগারের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবিলে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে ইহা তাঁহাদের নিকট এমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বাভাবিক ভাবে তর্কবিতর্ক পরিচালনার ধৈর্য্য তাঁহাদের ছিল না। যতক্ষণ মন্ত্রীমণ্ডলীর সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিশ্চিত ছিল ততক্ষণ তাঁহাদের নীতি ছিল এই যে হৈ চৈ হট্টগোল করিয়া আলোচনা পণ্ড করিতে হইবে। এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আইন সভায় এমন আচরণ করিয়াছেন যে সৈয়দ নৌশের আলির মত নিরপেক্ষ এবং সকল দলের শ্রদ্ধাভাজন স্পীকারও তাঁহাদের চার জন নেতাকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মনে এই আশা জাগিল যে আমরা বোধহয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিলেও করিতে পারি, সেই মুহূর্ত্তে আইন সভার প্রতি তাঁহাদের মর্য্যাদাবোধ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং গভর্ণর আইন সভা হঠাৎ বন্ধ করিয়া কনষ্টিটিউসানের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আন্দোলন উঠাইয়াছেন। মন্ত্রীপক্ষের সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই তাই আইন সভার কাজ বন্ধ করিবার জন্য বিরোধী দল যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছে, মন্ত্রীসভাও তেমনি বিরোধীদলের সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ্য করিতে না পারিয়া যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই। লক্ষ্য এবং অস্ত্র উভয় পক্ষেরই একই ধরণের।

এই বাংলার আইন সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এক সময়ে সগৌরবে আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন আর আজ গভর্ণর বিরোধীপক্ষকে এক রকম গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন। দেশবন্ধুর দেশের আইনসভার এমন কলঙ্কজনক পরিণতি কেন হইল? দেশবন্ধু যে নীতি নিয়াছিলেন তাহা হইতেছে হিন্দু মুসলমান মিলনের নীতি, এই নীতি অনুসারে তিনি হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট করিয়া আইন সভার বিরোধীদলের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান বিরোধী দল সমূহ সে পথ ছাড়িয়া মুসলিম লীগকে জব্দ করার পথ ধরিয়াছেন, মুসলিম দাবী সম্পর্কে আপোষবিহীন সংগ্রামের রাস্তা নিয়াছেন। তাই দেশবন্ধু আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন আর বর্ত্তমান বিরোধী দলগুলি আইন সভা হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়াছেন। অতদূর যাইতে হইবে না—এবার কেন্দ্রীয় আইন সভায় শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই কি করিয়াছেন দেখুন। লীগের সাথে হাত মিলাইয়া তিনি কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়াছেন, রেলের মাশুল বৃদ্ধি স্থগিত করিয়াছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সৌহার্দ্দ্য বাড়াইয়াছেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস, মহাসভা ও কৃষকপ্রজাদল মিলিতভাবে ঠিক তাহার বিপরীত কাজ করিয়াছেন।

আজ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এক সঙ্গে গভর্ণর কর্ত্তৃক আইন সভার অধিবেশন বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মাধ্যমিক শিক্ষাবিল যখন পাশ হইতেছিল তখন কি তাঁহারাই গভর্ণর কেসির কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান নাই? গভর্ণরের কার্য্য আমরা সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে গণতন্ত্র ও গণদাবীর প্রতি, আইন সভার মর্য্যাদার প্রতি মন্ত্রীপক্ষের মায়া যতখানি, বিরোধীরা তাহার চেয়ে বেশী মায়া দেখাইতেছেন না। যে পক্ষ যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ হন তখনই আইন সভার সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে তুচ্ছ করিয়া গভর্ণরের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন আরম্ভ করেন। এই নিন্দনীয় মনোবৃত্তি সকলকেই ছাড়িতে হইবে, এই নিন্দনীয় মনোবৃত্তিই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইয়াছে।

এখন কোন্ পথে?

হক সাহেব "ক্রম ওয়েলের" মত আইন সভায় গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর সমস্ত বিরোধীদলগুলি একমত হইয়া এই গৃহযুদ্ধের প্রথম ধাপ স্বরূপ এক যুক্ত বিবৃতি বাহির করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে গবর্ণরের নিকট দাবী করা হইয়াছে—হয় নাজিমুদ্দিনকে তাড়াও অথবা আইন সভার অধিবেশন আবার বসাও। মন্ত্রীপক্ষ এবং বিরোধীদল উভয়েরই নিকট আমাদের আবেদন যে সমগ্র ভারত যখন বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য একতাবদ্ধ তখন আপনারা আর বাংলাকে হত্যা করিবার জন্য গৃহযুদ্ধ বাড়াইবেন না। জনগণের সম্মুখে মৃত্যুর অসংখ্য রাস্তা খোলা আছে, পরিশ্রম করিয়া আর একটা রাস্তা তৈরী করিবার আবশ্যকতা নাই। বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং বাংলার মহামারী বন্ধ করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমস্ত দল একতাবদ্ধভাবে টাকা পাঠাইতেছে, ডাক্তার পাঠাইতেছে, জনমত সজ্ঞবদ্ধ করিতেছে, আর বাংলার আইন সভার সমস্ত দল গৃহযুদ্ধের আয়োজন করিতেছে—বাঙ্গালীর হুঁস কবে হইবে? কেলেঙ্কারী যতদূর হইয়াছে ঐ পর্য্যন্ত থাক, এবার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘোষণা করুন, অন্ততঃ এই শেষ মুহূর্ত্তেও সকল দল মিলিত হইয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে একতার পথ ধরুন। কংগ্রেস এসেম্ব্লী পার্টির কাছে আমাদের আবেদন—বাংলার "ক্রমওয়েলের" গৃহযুদ্ধের পথ ছাড়িয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের জন্য দেশবন্ধুর ঐক্য নীতি অনুসরণ করুন, লীগের কাছে আমাদের আবেদন পাঞ্জাবের কথা স্মরণ করিয়া আমলাতন্ত্রের মোহ এবং অনিশ্চিত সংখ্যা গরিষ্ঠতার মোহ ছাড়িয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথে অগ্রসর হউন।

উভয় পক্ষ এই ভাবে আত্মঘাতী পথ না ছাড়িলে বাংলার ভাগ্যে আছে ৯৩ ধারার শাসন, ৯৩ ধারার আঘাতে লীগ এবং কংগ্রেস উভয়ই নিষ্পিষ্ট হইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আঘাতে বাংলার চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

সোভিয়েট জার্ম্মাণ ফ্রন্ট

ভিটেবস্ক অঞ্চলে লালফৌজের নূতন অভিযান

সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষ শুরু হইবার সাথে সাথেই লালফৌজ আবার আর একটি নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। এই আক্রমণের প্রথম আঘাত পড়িয়াছে হোয়াইট রাশিয়ায় ভিটেবস্কের উপর। আক্রমণের প্রারম্ভেই রুশ সেনা অমিতবিক্রমে জার্ম্মাণ রক্ষাব্যূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। লালফৌজ অপ্রতিহতগতিতে ভিটেবস্ককে দুইদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে ভিটেবস্কে অবস্থিত জার্ম্মাণ সেনার আর পালাইবার পথ রহিল না। এই ভিটেবস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের এক শ্রেষ্ঠ সামরিক ঘাঁটি, ইহাকে ধরিয়া রাখার জন্য জার্ম্মাণরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, ইহার আশে পাশে বাধাদানের অজস্র ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে; কারণ ভিটেবস্ক রক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে জার্ম্মাণরা আর কতদিন হোয়াইট রুশিয়ায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে।

ভিটেবস্ক ঘিরিয়া ফেলা ছাড়াও সোভিয়েট সেনা ওরসা এবং মঘিলেভের দিকে আক্রমণ চালাইয়া আগাইয়া গিয়াছে। এই সব শক্ত ঘাঁটিগুলিও যে আর বেশী সময় লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাতকে এড়াইতে পারিবে মনে হয় না। ভিটেবস্ক, ওরসা, মঘিলেভ প্রভৃতি স্থান নাৎসী কবল হইতে মুক্ত করার সাথে সাথে একদিকে সোভিয়েট ভূমিতে জার্ম্মাণদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক শহরের উপরই লালফৌজের চাপ বাড়িবে, আবার অন্যদিকে সোভিয়েট বালটিক রাষ্ট্রগুলির পথও ইহাতে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং মরিয়া হইয়া জার্ম্মাণরা এই অঞ্চলে লালফৌজকে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া রয়টার ২৫শে জুন যে সংবাদ দিয়াছে তাহাতে এটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে এবারকার লালফৌজের এই আক্রমণের বেগ এত প্রচণ্ড যে কোন অবস্থায়ই জার্ম্মাণ সৈন্য ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের
মেডিক্যাল স্কোয়াডের সম্বর্দ্ধনা

[নিজস্ব সংবাদদাতা]

২১শে জুন বুধবার সাড়ে ৬টার সময় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে হাজির হইলাম। মনের মধ্যে তখন এসেম্‌ব্লির ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের দলাদলি হানাহানি ঠিক যেদিন লাটসভায় চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছে, সেইদিনই বি, পি, এস্. এফ ও মুসলিম ষ্টুডেন্টস্ লীগের জয়েন্ট বোর্ড মাদ্রাজ মেডিক্যাল স্কোয়াড ও পাঞ্জাব মেডিক্যাল মিশনকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্ম সভা ডাকিয়াছে। মনে একটু আশঙ্কা ছিল, লাটসভার তীব্র দলাদলী মেডিক্যাল রিলিফের ঐক্য-সংগঠনকে আঘাত করিবে না তো? সভার দু'তিনটী বক্তৃতা শুনিবার পর সে আশঙ্কা দূর হইল। সভাতে মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব ক'টী প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। সকলেরই বক্তৃতায় ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইল। বাংলার মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সম্পাদক, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সভার সামনে বাংলার মহামারীর গোটা ছবি তুলিয়া ধরিলেন। সম্মিলিত রিলিফ-চেষ্টার উপযোগীতার কথা বলিলেন এবং এই চেষ্টার সঙ্গে ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্ম তাঁহার অন্তরের দীপ্ত বাসনার সঙ্গে যোগসূত্রও তিনি দেখাইলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি জানাইলেন যে বাংলার দুই কোটী রোগীর মধ্যে বাংলার মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সমগ্র চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত দশ এগারো লক্ষ মাত্র রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। সভার উদ্যোক্তা ছাত্র প্রতিষ্ঠান দুইটীর প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করিলেন। তারপঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে মিসেস্ এলা রীড, পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটীর অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মাদ্রাজ স্কোয়াডের নেতা ডাঃ চেঙ্গাপ্পা, পাঞ্জাব মেডিক্যাল ছাত্রমিশনের নেতা মিঃ মিনহীস এবং সবশেষে সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। সকলের বক্তৃতায় আশার সুর ও ঐক্যের চেতনা। সকলের মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে বাংলাকে রক্ষা করিয়া আমরা ভারতকে রক্ষা করিতেছি, আমাদের স্বাধীনতার সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনা করিতেছি।

বহুদিনের চেষ্টার ফলে মেডিক্যাল রিলিফের ক্ষেত্রে এই সম্মিলিত চেষ্টা সম্ভব হইয়াছে। প্রথম ছিল রিলিফ সম্পর্কে হতাশা, তারপর হতাশা কাটাইয়া রিলিফ সংগঠন গড়িয়া উঠিল কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে,—দলীয় ও উপদলীয় চেতনা অনেকেই তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপর সর্বপ্রথম ছাত্র শিক্ষকদের মিলিত সংগঠন গড়িয়া উঠিল এবং বাংলায় ও অন্যান্য অনেক প্রদেশে নিখিল ভারত ছাত্র সভা ও মুসলীম ছাত্র লীগের সংযুক্ত রিলিফ সংগঠন দেখা দিল। সর্বশেষে বাংলাদেশে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এবং সব কয়টী রিলিফ সংগঠনের সহযোগিতায় মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী গঠিত হইয়াছে।

গত বছর দুর্ভিক্ষের তীব্রতার সময়ে যেমন সব প্রদেশ অর্থ সাহায্য করিয়াছে, বর্ত্তমানে মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও বাংলার আহ্বানে বাইরের সব প্রদেশ টাকা, ঔষধ ও মেডিক্যাল ভলাণ্টিয়ার পাঠাইয়াছে। বিহার, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব সব জায়গা হইতে মেডিক্যাল ছাত্ররা আসিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বাহির হইতে ১১০ জন মেডিক্যাল ভলাণ্টিয়ার আসিয়াছেন এবং তাঁহারা সব শুদ্ধ বিশ হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। ইঁহারা মহামারী বিধ্বস্ত গ্রামের মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করিয়াছেন, গ্রামের মধ্যে দৈনিক মৃত্যু ছাড়াও নৈতিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়াছেন, আবার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়া নুতন গ্রাম্য সমাজের জন্মের সম্ভাবনাও ইঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলার আহ্বান বহন করিয়া নিজের প্রদেশ হইতে অধিকতর সাহায্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন।

কর্পোরেশন প্রাঙ্গণে কিশোর জমায়েত

দুধের আন্দোলনে কলিকাতার কিশোর

দুধের অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু মৃত্যু মুখে

ডাঃ বিধান রায় সম্প্রতি বলিয়াছেন, মাথা পিছু ৩ ছটাক করিয়া ধরিলেও কলিকাতায় দুধের প্রয়োজন প্রত্যহ ১৯ হাজার মণ। কলিকাতার লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ হইতে ৩১ লক্ষ হইয়াছে অথচ দুধের আমদানী ৮ হাজার হইতেও নামিয়া মাত্র ৭ হাজার মণে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাছাড়া, এই দুর্দিনে দশ আনা বারো আনা সের দরে জল মেশানো দুধ কিনিয়া ছেলেমেয়েদের ক'জন খাওয়াইতে পারে? তাই দুধের অভাবে কলিকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ শিশু আজ মরণের মুখে। জীবনীশক্তি ক্ষীণ হওয়ার ফলে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিন্দুমাত্র শক্তিও তাহাদের শরীরে নাই।

দুধের অভাব কেন, দুধ যায় কোথায়?

বাংলা দেশে প্রতি বছর ২০ লক্ষ গরু মরে, ৫ লক্ষ গরুর দুধ দিবার শক্তি থাকে না। প্রতি বছর অন্য সব প্রদেশ হইতে দুগ্ধবতী গরু আনিয়া দুধের এই অভাব মিটানো হইত। কিন্তু ১০০৲ টাকার গরুর দাম আজ ৬৫০৲ টাকা; গরু রাখার খরচও পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে। খড়ের দাম যেখানে আগে ছিল ৩॥০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা আজ তার দাম ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা। একে ত' যানবাহনের অভাবে গরুর আমদানী নাই, তার উপর গরু পালন করাই ত' দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই গরীব গোয়ালারা গরু বিক্রি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। কালিদাস সিংহ লেনের একটি খাটালে গিয়া দেখিলাম, ৬০টি গরুর মধ্যে এখন মাত্র ১৫টিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। খাটালগুলির যা নোংরা অবস্থা, তাহাতে গরুগুলি সহজেই মারাত্মক রোগে পড়ে এবং দুধ দিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়।

ইহা ছাড়াও, মাংসের জন্য গরু জবাই আরেকটি প্রধান সমস্যা। মিলিটারীর প্রয়োজনে গরু জবাইয়ের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা আজই বন্ধ না করিতে পারিলে, বাংলার লক্ষ লক্ষ শিশু দুগ্ধাভাবে শুকাইয়া মরিবে।

৭ হাজার মণ দুধের একটি মোটা অংশ যায় মিষ্টির দোকানে ও ছানাপট্টিতে। এক দ্বারিক ঘোষের দোকানেই ত' দৈনিক ১৪ মণ দই, ২৮ মণ রাবড়ী ও ১৫ মণ ছানা তৈরী হয়। গঙ্গারামের দোকানে রোজ ৩০ মণ দইয়ের কাটতি। একদিকে শহরের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এক ফোটা দুধের অভাবে দিন দিন শুকাইয়া মরিতেছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় লোকের নির্লজ্জ রসনাবিলাস অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পাড়ায় পাড়ায় কিশোর আন্দোলন

কলিকাতার লক্ষ লক্ষ শিশুকে দুগ্ধাভাবে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানোর জন্য কলিকাতার কিশোর বাহিনী আগাইয়া আসিল। দুধের দাবী করিয়া এক ইস্তাহারে কিশোররা পাড়ায় পাড়ায় তাহাদের বাপ-মার কাছ হইতে হাজারে হাজারে সই যোগাড় করিল। বেলেঘাটা, চোরবাগান, বড় বাজার, নতুন বাজার, ফার্ণ রোড প্রভৃতি অঞ্চলে কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হইল। পিপলস রিলিফ কমিটির কাছ হইতে সোয়াবিন সংগ্রহ করিয়া বৌবাজার, বড় বাজার, বেলেঘাটা, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, সাহানগর, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড প্রভৃতি পাড়ায় তাহারা দুধ বিলির কাজ শুরু করিয়া দিল।

২১শে জুন ৫ হাজার নাগরিকের সহিযুক্ত দাবীর মেমোরাণ্ডাম লইয়া বিভিন্ন পাড়া হইতে দলে দলে কিশোর বাহিনী কর্পোরেশনে আসিয়া জমায়েত হয়। আশে পাশে রাস্তায় সাড়া পড়িয়া গেল। এ দৃশ্য কলিকাতার ইহাই প্রথম। প্রায় পাঁচশত কিশোরের এই সুসংযত সমাবেশ সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিল। কর্পোরেশন সভাভঙ্গের পর কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দিলাল পোদ্দার এবং কাউন্সিলারদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ, সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল কিশোরদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিশোরদের আন্দোলনের প্রশংসা করিয়া মেয়র বলেন: 'কর্পোরেশনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তোমরা সরকারের কাছে দাবী জানাও। আমরা ১ হাজার শিশুকে দুধ দেবার যে ব্যবস্থা করেছি, তার সংখ্যা আরো ১ হাজার বাড়িয়ে দেব।' মেয়রের এই প্রতিশ্রুতির পর বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তোলার প্রতিজ্ঞা লইয়া কিশোররা মিছিল করিয়া নিজেদের পাড়ায় ফিরিয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্বর্দ্ধিত মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের মেডিক্যাল স্কোয়াড

রিলিফ কর্মীর চিঠি ★

বাংলার রিলিফে মাদ্রাজ স্কোয়াড

(নীচের চিঠিটি লিখিয়াছেন মাদ্রাজ স্কোয়াডের এস, রামানুজম। এই স্কোয়াডটি রংপুর জেলার গোকুণ্ডা মহকুমার অন্তর্গত তিস্তা অঞ্চলে মেডিকেল রিলিফের কাজ করিতেছে।)

২৯শে এপ্রিল থেকে আমরা এই কেন্দ্রে ২ জন ভলাণ্টিয়ারের সাহায্যে কাজ শুরু করি। সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্য্যন্ত আমাদের ডিস্‌পেন্সারী রোজ খোলা থাকে। জরুরী ডাক পেলে সব সময়ই আমরা বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করে থাকি। গত ১২ই মে পর্যন্ত আমাদের হাতে ওষুধ পত্র প্রায় কিছুই ছিল না; রোগী ছিল অফুরন্ত! যাদের অস্ত্রোপচার করা দরকার, তাদের চিকিৎসার জন্ম এমন কি এণ্টিসেপ্‌টিক লোশন পর্যন্ত আমাদের ছিল না। যাই হ'ক ১২ই মে নাগাদ ডাঃ এন, কে, দত্তের মারফৎ অনেকগুলি নতুন ওষুধপত্র এসে প'ড়ল; ডিস্‌পেন্সারীর অবস্থা অনেকটা ফিরে গেল বটে, কিন্তু আশানুরূপ নয়।

দৈনিক রোগী আসে ৫০ জন। সবাই গরীব। পাশের গ্রাম থেকেও অনেকে দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে আসে।…

এখানে যারা আসে প্রত্যেকেই দুর্বল, শরীরে ভিটামিনের অভাব—বিশেষ ক'রে ভিটামিন 'এ'। তাই এইটুকু একটি গ্রামে প্রায় লোকেরই চোখে একটা না একটা রোগ দেখতে পাওয়া যায়। তিস্তার লোকসংখ্যা শুনলাম ১৫০০; সবাই কৃষক। সপ্তাহে ২ দিন হাট বার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে লঙ্গরখানা খোলা ছিল—যারা এখানে খাওয়া পেত, সবাই কৃষক।

রোগের হিসাব নিতে ও টীকা দেবার কাজে গ্রামের মধ্যে ঢুকেছি; দেখি এমন একটাও বাড়ী নেই যেখানে অন্তত একজন বসন্তে শয্যাগত নয়। প্রত্যেকটি পরিবারেই বসন্তে মৃত্যু আজ মামুলি ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবুও অন্ধ নিরক্ষর কৃষক বসন্তের টীকায় অবিশ্বাসী। তাই গ্রামের মধ্যে সন্ধ্যায় আমরা যখন টীকা দেবার জন্ম বেড়োতাম, একদিনে কখনই আমরা ১০ জনের বেশী লোককে টীকা দিতে পারিনি। আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের অন্যান্য কাজের দরুণ এবং রিলিফের অন্যান্য কাজে আমরাও ব্যস্ত থাকায় টীকা দেবার কাজ খুব ভাল ভাবে চালাতে পারিনি। তাছাড়াও সব থেকে অসুবিধা ছিল, টীকা দেবার ছুরি আর লিম্পের অভাব। ডাঃ দত্ত এখানে আসার পর থেকে আমরা এই কাজ আরও জোর দিয়ে, আরো ভালভাবে চালাবো ঠিক করেছি। টীকা দেবার ২টি ছুরি আমরা শীঘ্রই পাবো।

কুড়িগ্রাম শহর এখান থেকে ১৫ মাইল দূরে। ১লা মে আমরা এক আমন্ত্রণে সেখানে যাই। আমরা শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করি—তাঁরা একে অপরের নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু রিলিফের কাজে সবাই সমান উদাসীন। আলোচনার পর বিকালে সভা। স্থানীয় কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতি এই সভার উদ্যোক্তা। সভায় আমরা ঐক্যবদ্ধ রিলিফের জন্য আহ্বান জানাই। সভার শেষে সাহায্যের আবেদনে ৫০৲ টাকা ওঠে। পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রাম রাজারহাট। এখানে বসন্তে ১ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। এই টাকা সেখানকার সাহায্যে ব্যায় হবে। এই সভাতেই কুড়িগ্রামে এক রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

১০ই মে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা আবার আমন্ত্রণ পাই। রাজার-হাটের রিলিফের জন্য এই অনুষ্ঠানে ১০০৲ টাকা ওঠে। এই টাকাতে রাজারহাটে বসন্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য কবিরাজদের সাহায্যে একটি রিলিফ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

তিস্তা, ১৩-৫-৪৪ এস, রামানুজম্

মাদারীপুরে শতকরা ৯০ জন
চোরাবাজারে চাউল কিনিতে বাধ্য হয়
অথচ সরকার রেশনিং চালু করে না

২০ লক্ষ মন চাউল ষ্টক্ করিয়া পুরাপুরি রেশনিং চাই

মাদারীপুর মহকুমার লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ। গত বছরের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেড় লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। সরকারি ইস্তাহারেও স্বীকৃত হইয়াছে যে গত বছর বাংলার যে সমস্ত স্থানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সবচেয়ে বেশী দেখা দিয়াছিল মাদারীপুর তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এবার সরকার আত্মসন্তুষ্টিতে মশগুল। বার বার দেশবাসীকে এই কথাই শুনাইতেছে যে এবার আর খাদ্যসংকটের ভয় নাই। কিন্তু ফরিদপুরবাসী—বিশেষ করিয়া মাদারীপুরবাসীর নিকট এবার খাদ্যসংকট হইবে কি হইবে না তাহা আর আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। **মাদারীপুরে আবার দারুণ খাদ্য সংকট শুরু হইয়া গিয়াছে।** এবং শীঘ্রই তার তীব্রতা চরমে পৌছাইবে ইহাই বাস্তব অবস্থা।

এই মহকুমার উৎপন্ন ফসলে ৪।৫ মাসের খোরাকী হইতে পারে, বাকী সময়ের জন্য এই মহকুমাকে প্রধানতঃ বরিশালের উপর নির্ভর করিতে হয়। সরকার যদি বরিশাল হইতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ মণ চাউল আনিয়া সমগ্র মহকুমায় পুরা রেশনিং চালু করিতেন তবেই চোরাকারবার বন্ধ হইত, খাদ্যসংকট প্রতিরোধ করা যাইত। কিন্তু সরকার কি করিতেছে?

এক সপ্তাহে চাউলের দাম ১৭৲ হইতে ২২৲

সরকার মাদারীপুর শহরে চিকন্দিতে এবং দু একটি ইউনিয়নে নামে মাত্র রেশনিং চালু করিয়াছে। প্রত্যেক জায়গায় অখাদ্য চাউল দেওয়া হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সাবালককে প্রতি সপ্তাহে মাত্র দেড় সের চাউল দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই শতকরা দশজন লোকেও রেশনের দোকান হইতে চাউল কিনে না, শতকরা নব্বই জন চোরাবাজারে চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। চোরাকারবারিরাও ইহারই সুযোগে চাউলের দাম বাড়াইয়া নিতেছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে চাউলের দাম ১৭৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা হইয়াছে। এবং এই দামও দিনের পর দিন বাড়িতেছে। এই দাম অধিকাংশ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। **তাই এখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শতকরা দশজন একবেলার বেশী খাইতে পায় না, শতকরা ৪০ জন অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। গরীব কৃষক ও গ্রাম্য কারিগরদের অবস্থা আরও খারাপ।** মে মাসের শেষ সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় এই মহকুমায় ২০ হাজার নারী ও শিশু ৫৬টি সরকারি ওয়ার্ক হাউসে আশ্রয় লইয়াছে। আরও বহু দুঃস্থ প্রতিদিন প্রত্যেকটি ওয়ার্ক হাউসে ভর্তি হইতে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ভিক্ষাই তাহাদের একমাত্র সম্বল। ইহা ছাড়াও পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার জন্য ৩টি সরকারি আবাস আছে। এই আবাসে **জানুয়ারী মাসে অনাথের সংখ্যা ছিল ৮০, আর মে'র শেষ সপ্তাহে হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১২৫।** শুনা যাইতেছে শীঘ্রই ওয়ার্ক হাউসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সরকার বলে খাদ্যসংকট নাই। কিন্তু ওয়ার্কহাউস প্রমাণ করে খাদ্যসংকট আছে। তাই কি ওয়ার্কহাউস বন্ধ করিয়া দেখাইতে হইবে যে সংকট নাই? ওয়ার্কহাউস বন্ধ করিয়া দিলে এই ২০ হাজার দুঃস্থের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সরকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এ বছর সংকটের তীব্রতার অপর কারণ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম গত বছর চেয়ে অনেক বেশী। সরকারি সরবরাহের কেরসিন দ্বারা সপ্তাহে দুদিনের প্রয়োজনও মিটে না। চোরাবাজারে কেরসিনের মূল্য ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা সের। সরকারি ষ্টকের অভাবে চিনি সরবরাহ ১ মাস যাবত বন্ধ আছে। নিকৃষ্টতম গুড়ের দাম ৷৷৷০ বার আনা। লবণের দাম প্রতি সের ১৲ টাকা। সরিষার তৈল প্রতি সের ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা। এই সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করিবার দিকেও বিশেষ কোনই প্রচেষ্টা নাই।

বেশ্যালয় হইতে ১৮টি মেয়ে উদ্ধার

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে সামাজিক মর্যাদা বোধ, নৈতিক চেতনা লোপ পাইতে বসিয়াছে। অভাবের তাড়নায় গ্রাম্য-শিল্পীদের ঘরের মহিলারা দেহ বিক্রী করিতে বাধ্য হইতেছে। এমন কি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের বহু মেয়ে ও মহিলা অভিভাবকদের জ্ঞাতসারে এবং অনুমতি নিয়া দেহবিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কত মেয়ে বিক্রয় হইয়াছে তাহার প্রমাণ একমাত্র মাদারীপুর পতিতালয় হইতে ১৮টি মেয়েকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মহকুমায় মাত্র ৪।৫ মাসের খোরাকী হয়। আগামীবারে ফসল আরও অনেক কম হইবে। কারণ গরু ও টাকার অভাবে অনেক জমি দেরীতে চাষ হইয়াছে, টাকার অভাবে অধিকাংশ জমিই নিড়ান সম্ভব হইতেছে না। ফলে বিঘা প্রতি ধান উৎপন্ন হইবে অনেক কম। এখনো সরকার হইতে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করিলে অনেক ফসল রক্ষা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু সেই দিকেও সরকারের কোনই চেষ্টা নাই। তাই ২।১ মাসের মধ্যেই সঙ্কটের তীব্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। সরকার ঘোষণা করিয়াই খালাস। কিন্তু জনসাধারণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা খাদ্যসংকট ও মহামারীর প্রতিরোধ করিতেই হইবে। নতুবা মাদারীপুর এবার শ্মশানে পরিণত হইবে।

———

নারায়ণগঞ্জে সঙ্কটের সূচনা
সমস্ত শহরবাসীর দাবী—পূরা রেশনিং

নারায়ণগঞ্জে আবার গ্রাম হইতে শত শত বুভুক্ষু মহিলা ও শিশু শহরে রিলিফের জন্য জমা হইতেছে। শহরের অবস্থাও শোচনীয়। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য রেশনের দোকানগুলি বন্ধ থাকায় জনসাধারণের চোরাবাজারের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

তাই নারায়ণগঞ্জের সমস্ত দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এক-যুক্ত-বিবৃতি বাহির করে। ইহাতে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা সমিতি, হোসিয়ারী ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, দোকান কর্ম্মচারী সমিতি, রেশন ডিলার্স এসোসিয়েশন, টি ষ্টল এসোসিয়েশন, মিষ্টি ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন, বার ও মোক্তার এসোসিয়েশন, মহাজন সমিতি, খাদ্য কমিটী, মারোয়ারী রিলিফ কমিটী, মুসলিম ছাত্র লীগ, ফুড কমিটী সবাই যোগদান করে। একটী রেশনিং পক্ষ ঘোষণা করিয়া (১লা হইতে ১০ই পর্য্যন্ত) প্রতি এ, আর, পি পোষ্ট এলাকায় সভা করিয়া পোষ্ট-কমিটী গঠন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠান হয়। ১১ই স্থানীয় হাই স্কুলের প্রাঙ্গনে এক সভা হয়। সভায় তিনটী প্রস্তাব—(১) পুরা রেশনিং চালু করা (২) শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী (৩) গান্ধিজীর মুক্তিতে অভিনন্দন সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় বক্তৃতাকালে স্থানীয় মুসলিম্ লীগের সর্ব্বসময়ের কর্ম্মী মিঃ আমির আলি বলেন যে—রেশনিং চালু করিতে হইলে সকল শ্রেণীর একতা প্রয়োজন।...আমাদের সকল সমস্যা দূর হইতে পারে একমাত্র কংগ্রেস-লীগের একতায়। সে একতা আমাদের স্বাধীনতাও আনিবে।

স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন বলেন যে—একতা ভিন্ন আমরা যত কিছুই করি না কেন তাহাতে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি দুর করিতে পারিব না। তাই আমার অনুরোধ আজ সকলের বাঁচার জন্য আমরা যেন দলাদলি ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হই।

———

বাংলার চাষীদের প্রতি
৪ঠা হইতে ১০ই জুলাই
গ্রামে গ্রামে একতা গড়িয়া তোলো!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা বাংলার কৃষকদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে আমন ফসল বাড়ানোর অভিযান চালাইতে। গতবার আমন খুব বেশী উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া কলিকাতা অঞ্চলের প্রায় ৫৬ লক্ষ লোকের খাদ্য রেশন বাংলার বাহির হইতে আসিতেছে। কিন্তু এবারকার অবস্থা অন্যরূপ। বাংলার বাহিরে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে এবার খাদ্য সংকট তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপর কেরালায় খাদ্য সংকট তো লাগিয়াই আছে। ১৯৪৫ সালের জন্য বাংলার বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহের আশা করা অনুচিত। বাংলার ফসলের উপরই বাংলাকে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু বাংলার ফসলের অবস্থা কি? গতবারের আমনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত আছে। কিন্তু এই প্রাচুর্য্য স্বাভাবিক অবস্থা নয়। স্বাভাবিক অবস্থা কি, তাহা এবারের আউষ ফসলের অবস্থা হইতেই বুঝা যায়।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় চাউলের দর

গ্রাম	প্রতি টাকায় কয় সের
ধলঘাট	১ সের ২ ছটাক
পটিয়া	১ সের ২ ছটাক
দিয়াকুল	১ সের ১ ছটাক
বরমা	১ সের ৪ ছটাক
রতনপুর	১ সের ৪ ছটাক
হাসেমপুর	১ সের ১ ছটাক
উত্তর সামুরা	১ সের
দক্ষিণ সামুরা	১ সের ৪ ছটাক

পটিয়া একটি ঘাটতি এলাকা, এই থানার লোক-সংখ্যা ২০৭০০০। এই লোক সংখ্যার শতকরা ৬০ জন এবারকার খাদ্য সংকটের আবর্ত্তে পরিয়াছে।

মাত্র কয়েকটী জেলার কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট। **চট্টগ্রামে শতকরা ২৫ ভাগ জমি এবার অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। মেদিনীপুরের খবরে প্রকাশ যে, দুইটী মহকুমায় তিনভাগের একভাগ জমিতে ফসল হয় নাই। বগুড়া জেলায় শতকরা ২৫ ভাগ জমিতে আউষ চাষ হয় নাই। ঢাকা জেলাতেও শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে চাষ হয় নাই। যশোহরের একটী অঞ্চলের খবর, সেখানে অর্দ্ধেক জমিতে আউষের চাষ হইয়াছে। সমগ্রভাবে বাংলার অবস্থা হিসাব করিলে দাঁড়ায় এই যে, এবার আউষ ফসলের মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ ফসল হইয়াছে।**

আউষ ফসলে বাংলার লোকের মাত্র ২ মাসের খোরাক হয়, বাকী সমস্তই নির্ভর করে আমনের উপর। সুতরাং আমন ফসলের চাষও যদি আউষের অনুপাতেই কম হয়, তবে সারা বাংলাকে আবার এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে।

চোরাকারবারীর সুযোগ

গত বছর প্রচণ্ড খাদ্য সংকট যখন লক্ষ লক্ষ লোককে নিরন্ন করিয়াছে, তখনই আমরা দেখিয়াছি চোরাকারবারীর টাকার থলি ভরিয়া উঠিয়াছে। গত বছরের দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় কৃষকদের শতকরা ৩০ জন জমিজমা হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ৫৪টী মহকুমায় প্রায় ৫০ হাজার গ্রামে দুঃস্থ সমস্যা প্রবল। সমস্ত বাংলার প্রায় ৬৫ লক্ষ নরনারী এইভাবে আজ দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। এই নিঃসম্বল লোকের ক্ষুধার সুযোগ লইয়াই চোরাকারবারী মুনাফা বাড়াইয়াছে। ফসলের কমতি হইলে, এই সমস্ত লোকের খাদ্য জুটিবার পথ তো পুরাপুরি বন্ধ হইয়া যাইবেই, উপরন্তু নূতন নূতন শ্রেণী যারা মজুতদারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তারাও মজুতদারের দাস হইবে।

বাংলার সমস্ত শহরাঞ্চলে রেশনিং চালু করার দাবী করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও সব জায়গায় রেশনিং হয় নাই। রেশনিং এর জন্য যে ৫ কোটী মণ চাউল দরকার সরকার তা খরিদ করিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা এখনো করে নাই। চোরাকারবারীরা সরকারকে অনবরত ফাঁকি দিতেছে। যথেষ্ট ফসল সত্ত্বেও আজ যখন এই অবস্থা, তখন ফসল কম হইলে চোরাকারবারীর একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়া সরকার পড়িবে। অর্থাৎ রেশনিং-এর সরবরাহ করিবার কোনো ক্ষমতা সরকারের থাকিবে না, রেশনিং আপনা হইতেই বান্চাল হইয়া যাইবে। শুধু গ্রামের কৃষক নয়, শহরের লোককেও অনাহারের কবলে পড়িতে হইবে।

ফসল বাড়াইতে বাংলার কৃষক

তাই আজকে ফসল বাড়ান শুধু খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্যই নয়, চোরাকারবারীর পথ বন্ধ করিবার জন্য, লক্ষ লক্ষ গরীবকে বাঁচাইবার জন্য। কৃষক সভার ডাকে বাংলার কৃষক অনেক দিন আগেই ফসল বাড়াইবার আন্দোলনে আগুয়ান হইয়াছে। এই আন্দোলন শুধু কৃষকের অন্নের সম্ভাবনা জুটাইয়াছে তা নয়, বহু ধ্বংসোন্মুখ কৃষক সমাজকে জীবনের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কৃষকের কাজের পরিমাণ হয়ত সামান্য, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই বাংলার গ্রামে গ্রামে নূতন আশার স্পন্দন দেখা দিয়াছে।

গত ২।৩ মাসের মধ্যে ২২টী জেলায় প্রত্যক্ষ ভাবে ফসল বাড়াইবার কাজ হইয়াছে। তার মধ্যে বাঁধ বাঁধা ও খালকাটার কাজ হইয়াছে ১২টী জেলায়। **এই ১২টী জেলায় বাঁধ বাঁধার ফলে প্রায় ২ লাখ বিঘা জমির ফসল এবার বন্যার হাত হইতে বাঁচিবে। অর্থাৎ প্রায় ১৫ লাখ মণ ধান এবার বাড়তি হইবে।**

বাঁধ বাঁধার ফলে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮০টী গ্রামের লোক খাইয়া বাঁচিবার সুবিধা পাইল। নবদ্বীপের একটী বাঁধের ফলে **১৩টী** গ্রামের লোক এবং আর একটীর ফলে **৩ হাজার** লোক এবার ফসল পাইবে। খুলনার বাঁধের ফলে **১৭ হাজার** গ্রামবাসীর জীবন রক্ষা হইবে। প্রত্যেক জায়গাতেই এমনি ভাবে অনেক ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম বাঁচিবার পথ পাইল।

গ্রামে গ্রামে একতার ডাক

এই কাজের ভিতর দিয়া গ্রামে গ্রামে পহুঁছিল একতার ডাক। অন্ন সংকটের ফলে মানুষের মধ্যে যে স্বার্থপরতা আসিয়া জুটিয়াছিল, তা এই আন্দোলনের জোয়ারে ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে। তাই আমরা দেখি বাঁধ বাঁধার কাজে গ্রামের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগিল। এক একটী বাঁধ আধ

মাইল হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত লম্বা। কিন্তু তবু কাজ পড়িয়া রহিল না। কৃষকরা ভলাণ্টিয়ার হইয়া বিনা মজুরীতে কাজ করিয়াছে। **নবদ্বীপে** সুতির বাঁধ বাঁধিতে গদখালি গ্রামের জেলেরাও আসিয়া কাজে লাগিল, অথচ গদখালির গ্রামের লোক এই বাঁধের উপর নির্ভর করে না। **যশোহরে** বিরাট বাঁধ বাঁধিতে প্রতিদিন প্রায় ৪০০।৫০০ স্বেচ্ছাসেবক কৃষক কাজ করিয়াছে। কৃষকের এই একতার ফলেই অন্যান্য শ্রেণীর লোকও কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যশোহরের বাঁধ বাঁধিতে জমিদাররাও টাকা দিয়াছেন। ২৪ পরগণা, খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলায় কংগ্রেস কর্ম্মীরাও কৃষকের সঙ্গে কাজে নামিয়াছে। নদীয়ার বাঁধের জন্য প্রত্যেক কৃষক মাথা পিছু আট আনা চাঁদা ঠিক করিয়াছে। ময়মনসিংহের দেড় মাইল লম্বা খাল কাটার খরচের জন্য সরকারের কাছ হইতে কিছুই পাওয়া

কৃষক সভার আহ্বান

ই ফসল বাড়াও সপ্তাহ

যৌথ প্রথায় চাষ শুরু করো !

গেলনা। কৃষকরা নিজেরাই ১০০০ টাকা তুলিয়া কাজ শুরু করিল।

এই সমস্ত বাঁধবাঁধা ও খালকাটার কাজে সরকার চীরকাল যেমন অবহেলা দেখাইয়া আসিয়াছে, আজও তেমনি বিশেষ মাথা ঘামায় নাই। **কিন্তু সরকারের অবহেলার খেসারত স্বরূপ লক্ষ লক্ষ জীবন যাইবে— বাংলার দেশপ্রেমিক কৃষক তাহা হইতে দেয় নাই।** যখন সাধারণ লোকে কিছু করা যাইবে না বলিয়া বসিয়া আছে, তখন দেখি কৃষক তার দুর্ব্বল হাতে কোদাল ধরিয়া ২ লাখ বিঘা জমি বাঁচাইল।

বীজ-হাল-বলদের সমস্যা

কিন্তু এখনও আসল সমস্যা আমাদের সামনে রহিয়াছে। পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করিতে হইবে, তা তো বটেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা চাষীর চাষের ক্ষমতা ফিরাইয়া আনা। বাঁধবাধা বা খাল কাটার অভাবে জমি যে পতিত হইয়া পড়িয়া আছে, সে সমস্যা সর্ব্বত্র নয়। কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে চাষীর চাষের ক্ষমতা আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গত বছরের দুর্ভিক্ষে **বাংলার চাষীর শতকরা ৩০ জন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।** ইহাদের কাহারও জমি, ঘর বাড়ী সব গিয়াছে। আর কারুর জমি থাকিলেও বীজ ধান, হাল, বলদ গিয়াছে। জমি থাকিতেও আজ তারা চাষ করিবে কি করিয়া ?

দু-একটী জেলার খবর দেখিলেই জানা যাইবে বীজধান, বলদ ও লাঙ্গলের অভাব কত সাংঘাতিক। চট্টগ্রামের সংবাদদাতা ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন : **বীজধান, বলদ, লাঙ্গল ইত্যাদির অভাবে বহু চাষী চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে। এক রাঙ্গুনীয়া থানায় চাষের জন্য অন্ততঃ ৪ হাজার বলদ দরকার, কিন্তু সেখানে তার অর্দ্ধেক সংখ্যক বলদও নাই।**

আউষ চাষের সময় যে সমস্ত রিপোর্ট আসিয়াছিল, তার কয়েকটী খবর উদ্ধৃত করিতেছি :—

মালদহ জেলার ২টী গ্রামে ৩০টী হাল বন্ধ হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার চিতোষী গ্রামে বড় বড় মাঠে হাল দেখা যায় না। মাঠ অনাবাদী পড়িয়া আছে।

নোয়াখালী জেলার একটী গ্রামে চাষের বলদের অভাবে আউষ চাষ একেবারে বন্ধ।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ঘিওর হাটের হিসাবে দেখা যায়, **৫২ হাজার** গরু বিক্রয় হইয়াছে।

যশোহর জেলার নলডাঙ্গায় শুধু মাত্র লাঙ্গল ও বীজ ধানের অভাবে চাষ অর্দ্ধেক হইয়াছে।

এই অবস্থার উপর আরো বিপদ আসিল গো-মড়কের সূত্রপাতে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে গো-মড়কে বাংলার ৪ ভাগের ১ ভাগ গরু মরিয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছে যে, গত বছরের তুলনায় এখানে গো-মড়ক অন্তত ৩ গুণ বাড়িয়াছে। সদর দক্ষিণ, সদর উত্তর এবং চাঁদপুর মহকুমার **অন্তত ৫০টী গ্রামের** মধ্যে ব্যাপকভাবে গো-মড়ক ছড়াইয়াছে। প্রত্যেক মাসে শতকরা ২টী গরু মরিতেছে।

সরকারী সাহায্যের নমুনা !

চাষীর এই প্রধান প্রয়োজন বীজধান, বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতির অভাব মিটাইতে সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছে কতটুকু ? মার্চ্চ মাসে বাংলা সরকার ঘোষণা করিলেন যে, আউষ বীজের জন্য **৩০ হাজার মণ** আউষ বীজ সরকার কিনিবার ও বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই সময়েরই হিসাব হইতে দেখা যায় যে সমস্ত আউষ জমিতে ফসল ফলাইতে গেলে অন্ততঃ ১ লক্ষ মণ বীজধান দরকার। সম্প্রতি সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৪২০০০ মণ আমন বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। যেখানে শুধু আউষের জন্যই ১ লক্ষ মণ বীজ দরকার ছিল, সেখানে ১॥০ লক্ষ মণ আমন বীজে কি হইবে ?

> ### ফসল বাড়াও সপ্তাহে কৃষক সভার কার্য্যসূচী
>
> **এই সপ্তাহে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দিবস, ফসল বাড়াও দিবস, কৃষক দাবী দিবস, কৃষক সমিতি দিবস, গ্রাম পুনর্গঠন দিবস, মেডিক্যাল রিলিফ দিবস এবং গ্রাম্য রেশনিং দিবস পালন কর।**
>
> —যৌথ প্রথায় চাষ, বীজ সংগ্রহ, গরু লাঙ্গলের ব্যবস্থা কর।
>
> —মিলিত আবেদন করিয়া জোতদার প্রভৃতি মালিকের নিকট হইতে পতিত জমি লও।

বলদের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইবে মার্চ্চ মাসেই সরকার এই ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ জেলা হইতেই খবর পাওয়া যায় যে, যেখানে একটা বলদের জন্য ৩০০৲ টাকা দরকার, সেখানে মাত্র ১০।২০ টাকা দিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইতেছে।

সরকারের কৃষিঋণ দেওয়ার নমুনাও এই রকম। **ঢাকা** জেলার কুকুটিয়া ইউনিয়নে যেখানে **২৪৫০০৲ টাকা** কৃষিঋণের প্রয়োজন ছিল, সেখানে সরকার ঋণ দিয়াছে মাত্র **১৫০০ টাকা।** এই ঋণ না পাওয়ার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বীজধানের মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ কেনা হইয়াছে। **পর্য্যাপ্ত কৃষিঋণ দেওয়া দূরে থাক, এই অবস্থাতেই সরকার কৃষিঋণ আদায় করিবার জন্য সর্ব্বত্র কৃষকদের উপর চাপ দিতেছে।** মেদিনীপুর জেলার খবর গত সংখ্যার 'জনযুদ্ধে'ই বাহির হইয়াছে। অন্যান্য জেলা হইতেও কৃষিঋণ আদায়ের খবর আসিতেছে। এমন কি জানুয়ারী মাসে, যখন খাদ্য সংকট পূরাদস্তুর ছিল, তখনই মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে কৃষিঋণ আদায় করিবার খবর পাওয়া গিয়াছিল।

সমবায় প্রথায় চাষ করিয়া হাল-বলদের সমস্যা মিটাও !

খাদ্য-ফসল বাড়ানর জন্য বড় বড় ইস্তাহারই সরকার ছাপিতে পারে ; কিন্তু তার কাজের নমুনা এই রকমই ! বাংলার ৬ কোটী লোককে খাদ্যাভাব হইতে বাঁচাইতে গেলে কৃষি কার্য্যের জন্য কি বিপুল সাহায্য দরকার তার হিসাব পর্যন্ত করার দরকার সরকারী আমলারা মনে করে না।

কিন্তু আমলাদের অন্ধতা ও অক্ষমতার জন্য বাংলা ধ্বংস হইবে কৃষক ও দেশবাসী তা হইতে দিবে না। ফসল বাড়ানর প্রতিজ্ঞা আজ কৃষি-জীবনে যে একতা গড়িয়া তুলিতেছে তার কাছে হাল বলদের বাধাও ছোট হইয়া যাইতেছে এ দৃষ্টান্ত আমরা চোখের সামনে দেখিতেছি। হাল-বলদের জন্য সরকারের কাছে টাকা চাহিয়াও পাওয়া যায় না, কিন্তু তাতেও কৃষক ঘাবড়ায় নাই। **নদীয়ার** ৩টী গ্রামের ৭৫টী পরিবার ৭টী দল গঠন করিয়া যৌথ প্রথায় চাষ সুরু করিয়াছে। ইহাদের কারুর লাঙ্গল নাই, কারুর বলদ নাই। কিন্তু পরস্পরের বলদ-লাঙ্গল একত্র করিয়া তারা চাষ করিয়া দেখাইল—বলদ-লাঙ্গলের ক্ষতি হইলেও চাষী মরিবে না।

ঢাকার কুকুটিয়া ইউনিয়নে বলদের জন্য চাষীরা সরকার হইতে যে কৃষিঋণ পাইল, তা মোটেই যথেষ্ট নয়। সকলের বলদ ইহাতে জোটে না। কিন্তু চাষীরা নিজের নিজের জন্য আলাদা বলদ না কিনিয়া সমস্ত টাকা একত্র করিয়া যে বলদ কিনিল, তার দ্বারা তারা যৌথ প্রথায় চাষ করিল।

বর্দ্ধমানে কয়েকটা গ্রামে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে চাষীরা সামান্য কিছু জমি সমবায় প্রথায় চাষ করা সুরু করিয়াছে।

৩টী জেলায় যা হইয়াছে, তা যদি সারা বাংলায় সুরু করা যায়, তবে হাল-বলদের সমস্যার এখনকার মত খানিকটা সমাধান হইতে পারে। ইহাতে কৃষকের প্রাণে ভরসা বাড়িবে, সরকারের কাছ হইতে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ আদায় করিবার পথও প্রশস্ত হইবে।

এখনও আমন ফসল বাড়াইবার সময় আছে। তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ৪ঠা জুলাই হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত আমন ফসল বাড়াও সপ্তাহ পালন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। শুধু কৃষক নয়, দেশের প্রতি মমতা সম্পন্ন প্রত্যেকের এই সপ্তাহ সফল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের উপর নির্ভর কর, ফসল বাড়াইবার জন্য কৃষকের একতা গড়ো, কংগ্রেস ও লীগের একতা গড়িয়া তোল— ইহাই ফসল বাড়াও সপ্তাহে সারা বাংলার মিলিত আওয়াজ হউক।

সমাজ জীবন পুনর্গঠন সপ্তাহে

বাংলার নারী সমাজ

ঐক্যের পতাকা উচু করিয়া ধরিয়াছে

গত ১৪ই জুন হইতে ২০শে জুন সারা বাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে **সমাজ জীবন পুনর্গঠন সপ্তাহ** পালিত হয়। যে সময় সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও আত্মকলহে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, যে সময় ৩৫ লক্ষ দেশবাসীর কবরের উপর দাঁড়াইয়া অন্ধ আক্রোশে একে অপরের উপর বিষোদ্গার করিতেছে, সেই সময় বাংলার নারীসমাজ ঐক্যের পতাকা উঁচু করিয়া দেশসেবার কাজে আগাইয়া আসিয়াছে। এই সপ্তাহ সেই জয়যাত্রারই ঘোষণা।

১৪ই জুন কলিকাতায় 'গান্ধী দিবসে'র সভায় সভানেত্রীত্ব করেন জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। তিনি বলেন, ভারতের নারীসমাজ আজ যেটুকু স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে আছে মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণা। কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শোভা হুই ও প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী শ্রীযুক্তা যুঁইফুল রায় এই সভায় বক্তৃতা করেন। **১৫ই জুন বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন দিবস** উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতি ও প্রচারের মধ্য দিয়া দেশব্যাপী মহামারীর নূতন সংকট সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন হইতে বলা হয় এবং ইহা রোধ করার জন্য বাংলার ঐক্যবদ্ধ মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। **দক্ষিণ কলিকাতায়** তীর্থপতি স্কুলের সভায় কেন্দ্রীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্তের স্ত্রী সভানেত্রীত্ব করেন। এই সভায় ডাঃ বি-কে-বসু বিভিন্ন জেলায় মহামারীর গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন পি-বি-মুখার্জির সভাপতিত্বে বেলতলা স্কুল গৃহে একটি সভা হয়। সভাপতি মহাশয় মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সমবেত মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন। তিনি আরও বলেন আজ সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নয়, প্রত্যেককে তার দেশপ্রেমিক কর্তব্য পালন করিতে হইবে। কমরেড মণিকুন্তলা সেন এই সভায় বিভিন্ন জেলায় মহামারী সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। **মধ্য কলিকাতায়** কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী কমিটির কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। **উত্তর কলিকাতায়** বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্তা বি-এন-বসুর সভানেত্রীত্বে যে সভা হয়, তাহাতে বি-এম-আর-সি-সির পক্ষ হইতে মেজর বর্ধন বক্তৃতা করেন।

১৭ই জুন **নারী সেবাসঙ্ঘের** পক্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সভানেত্রীত্বে এক সভা হয়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস-আর-দাশ, শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোরিয়া, শ্রীযুক্ত সারোগী, মেজর বর্ধন, অধ্যক্ষ বি-এম-সেন ও তাঁহার স্ত্রী, শ্রীযুক্তা এলা রীড প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী সভায় নারী সেবাসঙ্ঘের কাজের বিবরণ দেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, সমাজজীবন পুনর্গঠনের এই জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য ১৮টি প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট কাজে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে মিলিতে হইবে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির টালিগঞ্জ শাখা তাহাদের সংগৃহীত ৭৫৲ টাকার একটি তোড়া এই সভায় নারী সেবা সঙ্ঘকে দান করে। শ্রীযুক্ত সারোগী নারী সেবা সঙ্ঘকে ১০১৲ টাকা দান করেন।

মজুতদারের বিরুদ্ধে কৃষক ভলাণ্টিয়ারদের সজাগ দৃষ্টি

একদিনে ৩000 মণ চাউল আটক

ঘাট্‌তি এলাকা **গৌরনদীতে (বরিশাল)** খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। কৃষকের ঘরের চাউল প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। **ইতিমধ্যেই ভাতের ফেন খাইয়া জীবন ধারণের চেষ্টা চলিতেছে।**

গৌরনদীর অবস্থা যখন এই, তখন একমাত্র পালদ্দির খাল দিয়াই সপ্তাহে ৪০,০০০ হইতে ৫০,০০০ মন চাউল ও ধান ঢাকা ও ফরিদপুরের গোপন গুদাম গুলিতে চলিয়া গিয়াছে। অথচ এই ধান ও চাউল রক্ষা করিবার জন্য পুলিশ ঘাটি বসিয়াছে। ২৪ ঘণ্টা পাহাড়াও চলে, কিন্তু ধান চাউল বোঝাই নৌকা তাহারা পায় না।

গৌরনদী, বন্দর এবং চাঁদসী প্রভৃতি গ্রামগুলিতে চোরাকারবারের নানারূপ কারসাজি বন্ধ করিবার জন্য চাঁদসী কৃষক সমিতি একটি ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তোলে। এই বাহিনীও খাল পাহাড়া দিতে সুরু করে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর এই দেশপ্রেমিক চোরাকারবার-বিরোধী কাজে অসৎ মহাজনদের মুনাফার উপর হাত পড়ে, ফলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া লোকজন পাঠাইয়া একদিন রাতে ভলাণ্টিয়ারদের আক্রমন করে এবং বলে নৌকা আটকাইতে দেওয়া হইবে না। যখন এই হৈ হল্লা চলিতেছে, তখনই প্রায় ২৫০খানার মত নৌকা খালে আসিয়া ঢোকে। কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়াররাও নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া জলে ঝাপাইয়া পড়ে ও নৌকা গুলি আটক করিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে আরও ভলাণ্টিয়ার আসে। ভয়ে হাঙ্গামাকারীর দল পালায়। **এই দিনে ৫৬ খানি নৌকার ৩০০০ মণ চাউল আটক পড়ে।** নৌকা পুলিশ ও সিভিল সাপ্লাই ইনস্‌পেক্টরের হেফাজতে রাখা হয়। ধান চাউল উঠান হইলে হিসাব করিয়া দেখা যায় ২১ খানা নৌকার মাল পুলিশের হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িয়াছে।

মাণিকগঞ্জ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় হইতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১২টী কেন্দ্রে এ পর্যন্ত মোট ১৪০ মণ দুধ, ম্যালেরিয়া গ্রস্তদের কুইনাইন ট্যাবলেট ২০ হাজার, ৫ শত কাপড়, ২ শত কম্বল ও ১ শত জামা বিতরণ করে। গত দুর্ভিক্ষের ফলে এই মহকুমায় ৩০ হাজার শিশু ও নারী নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এই দুঃস্থা মহিলারা যাহাতে নিজেরা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গামছা ও সতরঞ্চি তৈরী করার কয়েকটী তাঁত বসাইয়াছে। কিন্তু সূতার অভাবে উহা ভাল ভাবে চলিতেছে না। ফ্রেণ্ডস্‌ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট এই সমিতি মারফৎ এই মহকুমায় শিশুদের জন্য ৪টী লঙ্গরখানা চালাইতেছে। ইহাতে ৩ শত শিশু প্রত্যহ একবেলা আহার পায়। মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় এই সমিতি ১ শত দুঃস্থ মহিলার জন্য ২০ খানা ঘর তৈরী করিয়াছে।

একতা ও দেশপ্রেম মালিকের বিষদাঁত ভাঙ্গিতেছে

সরকারী এডজুডিকেশনে মজুরের দাবী স্বীকৃত

কক্স এণ্ড কিং কারখানায়

গত ১৮ই মার্চ্চ কক্স এণ্ড কিং কারখানার ৯৭ জন ড্রাইভারকে কোম্পানীর হুকুম অমান্য করার অপরাধে ছাঁটাই করা হয়। হুকুমটি ছিল এই যে তাহাদিগকে কেবল ড্রাইভারী নয় অয়েলিং এবং গ্রিজিংএর কাজও করিতে হইবে। এতদিন ঐ কাজের জন্য ভিন্ন লোক নিযুক্ত ছিল সুতরাং শ্রমিকরা জানায় যে উহা ড্রাইভারদের কাজ নয়।

মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে। তাহারা জানায় যে ড্রাইভারের অভাবে লরী চলাচল বন্ধ থাকিলে তাহাতে খাদ্য ও রণসম্ভার চলাচলে বিঘ্ন হইবে এবং দেশরক্ষার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কোম্পানী ছাঁটাই মজুরদের মধ্য হইতে ৮৫ জনকে পুনর্নিয়োগ করিতে স্বীকার করে।

মজুরদের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ফলে ১৭ই মে গবর্ণমেণ্ট বাকী ১২ জনের মামলা এবং মজুরদের অন্যান্য দাবী এডজুডিকেশনে দিতে রাজী হন। গত ১২ই জুন এডজুডিকেশনের রায় বাহির হইয়াছে। তাহাতে মজুরদের প্রত্যেকটি দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। ১২ জন বরখাস্ত মজুরের পুনর্নিয়োগ এবং ১৮ই মার্চ্চ হইতে বেতন মঞ্জুর হইয়াছে, অয়েলিং এবং গ্রিজিংএর কাজ হইতে ড্রাইভারদের রেহাই দেওয়া হইয়াছে, দুপুরে ৪৫ মিনিট টিফিনের সময় দেওয়া হইয়াছে, রবিবারের জন্য ৩৲ ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে, আরো কল পায়খানার ব্যবস্থা করার হুকুম হইয়াছে। এই আদেশ চারমাস কাল বলবতী থাকিবে। ইউনিয়নের এই জয়লাভে মজুরদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ব্রুকবণ্ড চায়ের কারখানায়

গত ২৫শে মার্চ্চ ব্রুকবণ্ড কারখানার মালিক মজুরদের শক্তিশালী ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড মহাবীরকে বিনা কারণে জবাব দেয়।

ব্রুকবণ্ডের শ্রমিকরা শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য, সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য চায়ের উৎপাদন চালু রাখিয়াছে; তাহাদের দেশপ্রেমিক জনসেবা গত দুর্ভিক্ষের সময় শত শত নিরাশ্রয়ের জীবন রক্ষা করিয়াছে; জাপ বিমানের হামলার মধ্যেও কারখানা চালু রাখিয়াছে। ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য মালিকদের ধর্ম্মঘটে উস্কানী কখনো সফল হয় নাই।

মহাবীরের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে মজুরদের জোরদার আন্দোলন গবর্ণমেণ্টকে এডজুডিকশনের আদেশ জারী করিতে বাধ্য করিল। এডজুডিকেটর রায় দিলেন যে মহাবীরকে অন্যায় ও অসঙ্গতভাবে ছাঁটাই করা হইয়াছে, তাহাকে পুরো বেতন সহ কাজে বহাল করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সমস্ত মজুরের জন্য প্রভিডেণ্ড ফণ্ড, সাইরেন-ভাতা প্রভৃতি দাবী পূরণ করিতে হইবে।

স্ত্যাক্সবী কারখানায়

স্ত্যাক্সবী এণ্ড ফারমার লোহা কারখানায় মালিক এবং গবর্ণমেণ্ট মজুরদের ধর্ম্মঘটের পথে ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য সমস্ত কল কারখানার শ্রমিক তাহাদের দাবীর পেছনে দাঁড়াইবার ফলে গবর্ণমেণ্ট এডজুডিকেশনের আদেশ জারী করেন। শ্রমিকদের দাবীর মধ্যে রেশন, মাগগিভাতা এবং বোনাসের দাবীই সর্ব্বপ্রধান। এই এডজুডিকেশনের উপর বাংলার সমস্ত মজুরের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। মজুরদের মাগগিভাতার সঙ্গত দাবী সম্পর্কে গ্রেগরী কমিটি স্বীকার করা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। এক্ষণে এডজুডিকেশন এই দাবীর উপরে যে রায় দিবে তাহার প্রতি সরকারী মনোভাব কি হইবে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ট্রাম ও পোর্ট শ্রমিকের আন্দোলন

কলিকাতার ট্রাম ও পোর্ট শ্রমিকরা বর্ত্তমানে এডজুডিকেশনের দাবীর উপর আন্দোলন শুরু করিয়াছে। তাহাদের এই দাবীতে প্রত্যেকটি শ্রমিকের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট গরীমসী করিতেছেন। ফলে, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দিতেছে, উৎপাদনে ক্ষতি হইতেছে। ভারতরক্ষা আইনের যে ধারা অনুসারে [(৮১ (ক)] এই এডজুডিকেশনের হুকুম হয় তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মঘট এড়াইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইল। অথচ, সরকারী আমলাদের ছোটবড় সকলেই যে দৃষ্টি লইয়া এই ধারাটি প্রয়োগ করেন তাহাতে ধর্ম্মঘট এড়ানো নয়, ধর্ম্মঘট ডাকিয়া আনা হয়। অবিলম্বে এই নীতির অবসান না ঘটিলে শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিবে। কেবলমাত্র মজুরদের দেশপ্রেমিক একতা এবং জনসাধারণের হস্তক্ষেপ এই সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে।

বেপরোয়া মজুর ছাঁটাই আরম্ভ

ইউনিয়ন ভাঙ্গিবার কাজে মালিকের হাতে নূতন অস্ত্র

সম্প্রতি কলকারখানার মালিকদের স্বার্থে টেকনিক্যাল সার্ভিস অর্ডিনান্সের যে সংশোধন হইয়াছে, তাহার ফলে সমস্ত কলকারখানায় বে-পরোয়া মজুর ছাঁটাই শুরু হইয়াছে।

অর্ডিনান্সের সংশোধনের ফলে, যদিও মজুরদের অন্যত্র বেশী মজুরী পাইলেও কাজ ছাড়িয়া যাইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, মালিকদের যে কোন অজুহাতে মজুর ছাঁটাইয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। (১) অস্থায়ী চাকুরী (২) চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়া (৩) নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ হওয়া (৪) অসুস্থতা (৫) বিশৃঙ্খল বা অবাধ্য আচরণ এবং (৬) বিরুদ্ধ পুলিশ রিপোর্ট—ইহার যে কোন একটি অজুহাতে মালিকরা অনায়াসে মজুর ছাঁটাই করিবার অধিকার লাভ করায় বর্ত্তমানে উৎপাদনের উপর এক নূতন সংকট আসিয়া পড়িয়াছে।

টালিগঞ্জের মৌজী কোম্পানী গত ৮ই জুন ২২ জন শ্রমিককে জানাইয়াছেন, 'কাজ কম' বলিয়া তাহাদের ছাঁটাই করা হইল। অথচ এই সকল শ্রমিকের মধ্যে অনেকে বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিয়াছে, অনেক সময় কাজ ঢিলা থাকিলেও তখন ছাঁটাইয়ের কোন প্রশ্ন আসে নাই।

স্যাবক্রম্বী একটি লোহা কারখানা। এখানে রেলওয়ের এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হয়। এখানে দুই সপ্তাহ হইল দুইজন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাহাদের বলা হইয়াছে যে, যে কাজের জন্য তাহাদের লওয়া হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ একথা সত্য নয় যে তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য লওয়া হইয়াছিল। তাহারা গত দুই বৎসর কোম্পানীর বিভিন্ন ডিপার্টে কাজ করিয়া আসিয়াছে। হাওড়া শালকিয়ার ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া কোম্পানী গত ২৩শে মে শরৎ পাত্র নামক একজন মজুরকে সংশোধিত আইনের নজীর দেখাইয়া ছাঁটাই করে। মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসও একটি লোহা কারখানা। এখানে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক দরকারী জিনিষ তৈরী হয়। এখানে সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ৩০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়াছে। এলেনবেরী একটি মোটরলরী মেরামতের কারখানা। এখানে কিছুদিন আগে প্রায় ৭০ জন মজুর ছাঁটাই করা হয়। ইউনিয়নের চেষ্টায় তাহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ জনের পুনর্নিয়োগ সম্ভব হইয়াছে। বেলিয়াঘাটা লক্ষ্মী জুটমিলে দুইজন টার্ণারকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। পোর্টের মজুর নেতা ক্রেন-ড্রাইভার ইব্রাহিমকে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা হইয়াছে। ইহা মজুর ছাঁটাইয়ের মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহাদের ছাঁটাই করা হইতেছে তাহারা মজুর ইউনিয়নের নেতা এবং কর্ম্মি। এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে লেবার কমিশনার এবং ন্যাশন্যাল সার্ভিস ট্রাইব্যুন্যালের নিকট আবেদন করিয়াও বিশেষ কোন প্রতিকার পাওয়া যাইতেছে না। টেকনিক্যাল পারসোন্যাল অর্ডিনান্সের সংশোধন সমগ্র মজুর আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। ইহা মজুরদের ধর্ম্মঘটে প্ররোচিত করিয়া কেবলমাত্র বিভেদ সৃষ্টিকারীদের সুযোগ করিয়া দিতেছে। ইহা সংগঠিত মজুর আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজে মালিকদের হাতে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্রুকবণ্ড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক কমরেড মহাবীর সাহু এবং ক্ষিতীশ নন্দী

গরীবের বিড়ির দাম বাড়ানো চলিবে না

বাংলার সমস্ত বিড়ি শ্রমিক ও ছোট দোকানদাররা কিছুদিন ধরিয়া জোর আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে যে, বিড়ির মশলা 'শুখা ও পাতার' দাম কন্ট্রোল করা হোক, তামাকুর উপর হইতে ট্যাক্স উঠাইয়া লওয়া হোক। তাহা হইলেই বড় বড় মহাজনদের মুনাফাখোরী বন্ধ হইবে, বিড়ি-শিল্প ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, গরীব জনস্বার্থের খাতিরে বিড়ির দামও কমানো যাইবে।

কিন্তু মহাজনরা সব সময়েই এই আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। কিছুদিন হইল কলিকাতায় রাজাবাজারে বড় মহাজনরা বিড়ির দাম বাড়াইয়া ২ পয়সায় ৮টা হইতে ৭টা করে। ইউনিয়ন হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। মহাজনদের দালালরা মজুরদের বেশী মজুরীর লোভ দেখাইয়া ষ্ট্রাইকের প্ররোচনা দেয়। কিন্তু ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা বুঝিতে পারে যে ইহা তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মহাজনদের চাল। বিড়ির দাম বাড়াইবার পর মুহূর্ত্তেই তাহারা শুখার দাম বাড়াইয়া বেশী মুনাফা লুটিবে। ফলে ছোট দোকানদার ও মজুরদের কাহারও লাভ হইবে না।

মজুররা বর্ত্তমানে এই ভিত্তিতে জোর আন্দোলন করিতেছে। বড় মহাজনদের দোকান বয়কট করা হইয়াছে। অনেক দোকানদার আবার দুই পয়সায় ৮টা বিড়ি বিক্রী আরম্ভ করিয়াছে।

কয়লা, রেশন ও মাগগিভাতার দাবীতে

বিরাট শ্রমিক সমাবেশ

২রা জুলাই, রবিবার, বেলা ২টা

স্থান—ওয়েলিংটন স্কোয়ার

—কয়লার অভাব দূর করিবার জন্য

—৩০৲ মাগগিভাতা ও সস্তায় ৫।০ সের ভাল রেশনের জন্য

বাংলার প্রতি জেলায় মজুর শ্রেণী বড় বড় সভা ও সম্মেলন করিয়াছে, হাজার হাজার সহি সংগ্রহ করিয়াছে, জনসাধারণ ও জননেতাদের সমর্থন লাভ করিয়াছে।

আগামী ২রা জুলাই কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার মজুরদের বিরাট সমাবেশ। এই সমাবেশের শক্তি আমলাতন্ত্র ও মালিকদের শেষ বাধাটুকু চূড়মার করিয়া দিবে। বৈঠক, সভা ও সহি তোলার মধ্য দিয়া এই বিরাট সমাবেশের জন্য প্রত্যেকটি মজুরকে প্রস্তুত করুন।

জামসেদপুর শ্রমিকের দাবী

মাগগিভাতা, রেশন ও কয়লা সংকটের সমাধান চাই

গত ১৭ই জুন জামসেদপুর গোলমুড়ী ময়দানে টিনপ্লেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রায় ২০০০ শ্রমিকের এক সভা হয়। বিহার প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট কমরেড হাদী হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আগামী ৩রা জুলাই হইতে জামসেদপুরে রেশনিং চালু হইতেছে। মজুরদের জন্য অতিরিক্ত রেশন এবং বাজরা চালু করার পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে দাবী জানাইয়া এবং কয়লা সংকটের সমাধানের জন্য খনি শ্রমিকদের অতিরিক্ত বেতন, ভাতা প্রভৃতির দাবী সমর্থন করিয়া কমরেড ফিরোজ খাঁ, বারীণ দে প্রমুখ শ্রমিক নেতা বক্তৃতা করেন। টিনপ্লেট কোম্পানী এবং শ্রমিকদের বিরোধ মিমাংসার জন্য এবং শ্রমিকদের শতকরা ১২৷৷০ টাকা বেতন বৃদ্ধি, মাগগিভাতা প্রভৃতির দাবীর উপর বিচার করিবার জন্য 'এডজুডিকেশন' দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বিহার প্রাদেশিক ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল বারির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভার কাজ শেষ হয়।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা

বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১।০

মিত্র সেনার হাতে নাৎসীরা বিপর্য্যস্ত

দ্য'গলকে মানিয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্টের গতিবেগ বাড়াও

শেরবুর্গ দখলের গুরুত্ব

নরম্যাণ্ডি উপকূলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর শেরবুর্গ মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। কয়েক দিন ধরিয়া এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরটির জন্য জার্ম্মাণ হূনদের সাথে মিত্রসেনার তুমুল লড়াই চলিতেছিল। জার্ম্মাণরা ক্ষতির পরোয়া না করিয়াই যতক্ষণ সম্ভব এই স্থানটিকে নিজেদের দখলে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কারণ মিত্রসেনা যদি শেরবুর্গ অধিকার করে তবে সামরিক দিক দিয়া ইহার ফল সুদূর প্রসারী হইবে। আরও সৈন্য, আরও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম অক্লেশে ফরাসীদেশে আসিয়া পৌছিতে পারিবে, ফলে মিত্রসেনা তাহাদের আক্রমণোদ্যোগকে খুবই মজবুত করিবে—অবিলম্বে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য মিত্রসেনা প্রস্তুত হইবে। শেরবুর্গ দখলের আর একটা দিক আছে। নাৎসীকবলমুক্ত শেরবুর্গ আজকের দিনে বিদ্রোহী ফরাসী জনসাধারণের মনে দারুণ উৎসাহ জাগাইবে, সমগ্র ফরাসীদেশে দেশপ্রেমের বন্যা বহিয়া যাইবে। যে সব দেশভক্তের দল আজ ফরাসী দেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া নিজেদের মাতৃভূমিকে জার্ম্মাণ গোলামীর হাত হইতে মুক্ত করিতে প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইতেছে, তাহারা নিজেদের সেই দুঃখ কষ্ট বরণ করাকে সার্থক মনে করিবে যখন দেখিবে ফ্রান্সের একটি প্রধান নগরী আজ আর জার্ম্মাণদের কবলে নাই। এই সাফল্য তাহাদের দেশপ্রেমিক কাজে নূতন প্রেরণা জাগাইবে।

শেরবুর্গ অঞ্চলের সাফল্য ছাড়াও মিত্রসেনা আবার টিলি দখল করিয়া আরও ৩ মাইল স্থান আগাইয়া গিয়াছে।

নাৎসীকবলমুক্ত অঞ্চলের ভার ফরাসী কমিটির হাতে দিতে দেরী কেন?

মিত্রসেনা ফরাসী দেশে অবতরণের পর থেকে এখন পর্য্যন্ত তাহারা যাহা করিতে পারিয়াছে সামরিক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহা সন্তোষজনকই বলিতে হইবে। তটভূমিতে তাহারা তাহাদের অধিকার যথেষ্ট দৃঢ় করিয়াছে, বেয়ো, টিলি, মণ্টবুর্গ, কারেন্তান এমন কি শেরবুর্গের মত বৃহৎ বন্দর পর্য্যন্ত তাহাদের দখলে আসিয়াছে—অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে মিত্রসেনা এখন অনায়াসে ফরাসী দেশের অভ্যন্তরে আরও বৃহৎ অভিযান চালানোর পথ পরিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই সাফল্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই কারণ মিত্রশক্তি এখন পর্য্যন্ত ফরাসী দেশের নাৎসীকবলমুক্ত অঞ্চলগুলির শাসনভার বর্ত্তমানে কাহার হাতে থাকিবে এ সম্পর্কে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটির নেতা দ্য'গলের সাথে কোনরূপ মীমাংসা করে নাই। বরং চার্চিল এ সমস্যাটি এখন পর্য্যন্ত এড়াইয়া চলিতেছেন। মার্কিন সরকারও এ সম্পর্কে যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে না। এই সমস্যা লইয়া দ্য'গলের সাথে আজও যে ইংরেজ ও মার্কিন সরকার কোনরূপ মীমাংসায় আসিতেছে না ইহাতে এই সব দেশের জনসাধারণের মনেও অসন্তোষ জাগিয়া উঠিতেছে। বৃটেনের গোঁড়া রক্ষণশীল কাগজ 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পর্য্যন্ত সরকারী নীতিতে চটিয়া গিয়াছে। ইহার মন্তব্য খুবই স্পষ্ট—ফরাসীদেশকে ফরাসীদেশের মতই দেখিতে হইবে, ইতালীর মত ইহাকে দেখিলে চলিবে না। 'দি টাইমস্' পত্রিকা এই ব্যাপারে ইঙ্গ-আমেরিকান অসামঞ্জস্যের উপর দারুণ কশাঘাত হানিয়াছে। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে'রও ঐ একই সুর। অর্থাং বৃটেনের বিভিন্ন খবরের কাগজগুলি বেশ পরিষ্কারভাবে ফরাসী সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গ আমেরিকান অসঙ্গতির যবনিকা টানিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছে।

ফরাসী জনসাধারণের মত

এই সম্পর্কে ফরাসী দেশের জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের মতও খুব স্পষ্ট। গত ১০ই জুনের একটি খবরে প্রকাশ যে বেয়ো মুক্তি কমিটি এক প্রস্তাবে এই দাবী জানাইয়াছে যে "খাস ফ্রান্সে প্রথম শত্রুকবলমুক্ত এলাকা বেয়ো জেলার শাসনভার জেনারেল দ্য'গলের নেতৃত্বাধীনে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করুন।"

প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা পেরী ক্লডিয়াস গত ১৮ই জুন আলজিয়ার্সে এক বক্তৃতায় বলেন—আজকের দিনে একমাত্র ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনেই নাৎসীকবলমুক্ত ফরাসী অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা চলিতে পারে।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পতন অবশ্যম্ভাবী

মিত্র সেনা ফরাসী দেশে অবতরণের পর হইতে সমগ্র ফরাসী দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মিত্রসেনার সামরিক ইস্তাহারগুলিও ইহা স্বীকার করিয়াছে। দেশপ্রেমিক এই নাৎসী-বিরোধী অভ্যুত্থানকে আরও শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আজ চাই দ্য'গলের নেতৃত্বে পরিচালিত অস্থায়ী সরকারকে মানিয়া লইয়া নাৎসীকবলমুক্ত অঞ্চলের শাসনভার এই সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। ফরাসী জনসাধারণ এবং দ্য'গলের পরিচালিত অস্থায়ী সরকার আজ কোন দ্বিধা সঙ্কোচ না রাখিয়াই এই সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য জোর গলায় বলিয়া দিয়াছে। তাহাদের নিজেদের

ফরাসী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের নেতা দ্য'গল

দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেরাই গ্রহণ করিবে, তাহাদের সার্ব্বভৌমত্বের উপর অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ তাহারা বরদাস্ত করিবেনা। সুতরাং এ অবস্থায় এই ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের গড়িমসী করার কোন পথ বা অছিলা নাই, তাই ফরাসী জনসাধারণকে এখনই জানাইয়া দেওয়া হউক যে তাহাদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় দ্য'গল সরকারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং মুক্ত এলাকাগুলিতে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন না করিয়া দ্য'গল সরকারের হাতেই তাহার শাসন ভার ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাতে ফরাসী দেশভক্তরা উৎসাহ পাইবে, ফলে ফরাসীর অভ্যন্তরে জনযুদ্ধের গতিবেগ বাড়িয়াই চলিবে—নাৎসী বাহিনী উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পথ পাইবে না।

(৪ র্থ কলমের শেষাংশ)

কোয়ালিশন। দুইয়েরই মধ্যে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দল আছে। আমেরিকানদের বহুদিনের ঐতিহ্য হিসাবে যে কেহ এই দুইটি পার্টির যে-কোনটীতে যোগদান করিতে পারে। আমরা আমাদের "পার্টি" নাম তুলিয়া দিয়া আমেরিকার স্বাধীন ভোটার জনসাধারণের বিরাট প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেছি। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীকে এই ভাবে ব্যাপক আকারে রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে হইবে। শ্রমিকদের সমস্ত সংগঠিত প্রচেষ্টা যাহাতে কার্য্যকরী ভাবে রাজনৈতিক-কর্মপদ্ধতি সফল করিতে পারে তাহার জন্য সকলকে ব্যাপক ও বিরাট আকারে অগ্রসর হইতে হইবে। আমেরিকার কমিউনিস্টদের লক্ষ্য জাতীয় ঐক্যের জন্য দুইটী প্রধান পার্টির প্রগতিশীল শক্তিকে জোরদার করা। তবেই ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভ ও ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষা সম্ভব। তাই ব্রাউডারের নেতৃত্বে আমেরিকার কমিউনিস্টরা যাহা করিতেছে তাহার উদ্দেশ্য হইল: আমেরিকার শ্রমিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ডেমক্রাটিক প্রার্থী রুজভেল্টের বিজয়লাভ। এবং তাহারই সাহায্যে বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের ঐক্যকে সুনিশ্চিত রূপ দেওয়া হইল আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় কর্ত্তব্য।

মার্কিণ জনগণের জয়ের পথ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্টদের নীতি

কমিউনিস্ট সংগঠন তুলিয়া দেওয়া হয় নাই

যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন গত মে মাসে হইয়া গিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পার্টির ন্যাশন্যাল কমিটি বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে উপস্থিত কমিটির ২৮ জন সভ্যের সকলেই ভোট দেন এবং পার্টির অন্তর্ভুক্ত ২০০টী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতারাও ইহা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করেন। মে মাসের জাতীয় সম্মেলনেও ইহা গৃহীত হয়।

আমেরিকার কমিউনিস্টদের বর্তমান কার্য্যপদ্ধতি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে একটী বিরাট পরিবর্তনই এই প্রস্তাবে ঘোষিত হইয়াছে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্ল ব্রাউডার এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া একটী রিপোর্ট পেশ করেন।

দূর হইতে মনে হয় এই প্রস্তাবের দ্বারা আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং এ সম্পর্কে বহু জল্পনা ও গুজবের মধ্য দিয়া দুনিয়ার সর্বত্রই এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

"পার্টি তুলিয়া দিবার প্রশ্ন মোটেই উঠে নাই। আমেরিকার জাতীয় কর্ত্তব্যগুলি কার্য্যকরীভাবে সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান কর্মপদ্ধতির উপযোগী সংগঠনের পরিবর্তন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। 'পার্টি' কথাটী বদলাইয়া 'আমেরিকান কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়েশন' নাম দেওয়া হইয়াছে। কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'নিউইয়র্ক ডেলী ওয়ার্কার'-এর প্রকাশ ও বিক্রয় ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হইয়াছে। কমিউনিস্টদের দৈনন্দিন অভিযান চালাইবার সমস্ত প্রশ্নকে লেনিনবাদের ভিত্তিতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" (বিলাতের "ডেলী ওয়ার্কারে" প্রকাশিত উইলিয়াম রাষ্টের প্রশ্নোত্তর)।

অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত কমিউনিস্ট সংগঠনের মূল পার্থক্য ইহাই যে,—কমিউনিস্টরা কোনও একটী নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বাস্তব আবস্থার উপযোগী করিয়া তাহাদের কার্য্যের নীতি স্থির করে। অর্থাৎ, কমিউনিস্টরা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মনীতিরও পরিবর্তন সাধন করে অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সোশ্যালিজমের প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হইতে তাহারা কখনোই সরিয়া যায় না।

আমেরিকার জাতীয় সমস্যা

তেহেরাণ সম্মেলনে স্টালিন, চার্চিল, ও রুজভেল্ট একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন—"যুদ্ধের জয়ের জন্য আমরা একত্র কাজ করিব এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে শান্তির জন্য আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করিব।" এই সম্মিলিত শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যতীত দেশে দেশে পুনরায় মহাযুদ্ধ বাধিবার আশংকা থাকিয়া যাইবে। তেহেরাণ সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমেরিকার কমিউনিস্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে তেহেরাণ সম্মেলন বৃটেন, সোভিয়েট ও আমেরিকার যুক্ত বৈঠকে যুদ্ধজয় ও শান্তিরক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করার জন্য শক্তি সঞ্চিত হইতেছে।…যাহারা এই ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাদের নাম বলিয়া সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়টীই আমাদের দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিতেছে, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া ১৯৪৪ সনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন চলিবে—অন্য সমস্ত প্রশ্ন দেখা দিবে।…এই প্রশ্নের উপরই আমাদের দেশের রাজনৈতিক বা শ্রেণী স্বার্থের সব কিছু সমস্যারই সমাধান হইবে। (আর্ল ব্রাউডারের সম্পাদনায় প্রকাশিত "দি কমিউনিস্ট" এর জানুয়ারী সংখ্যা, ১৯৪৪)।

আমেরিকার ভিতরে একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনে আমেরিকার "নিউইয়র্ক টাইমস" বলিতেছে "মস্কোর চুক্তি কি এখনো বহাল থাকিবে—রাশিয়ানদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে।"

আমেরিকার পুঁজিপতিদের একটা শক্তিশালী অংশ ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে এই ত্রিশক্তির মিলিত প্রচেষ্টাকে খর্ব করিবার জন্য "স্বাধীন কারবার"-এর (Free Enterprise) প্রশ্নকে বড় করিয়া ধরিতেছে। ১৯৪৪ সালের নির্বাচনে তাহারা শিল্পে বাণিজ্যে স্বাধীনতার **প্রশ্নকে মূল সমস্যা হিসাবে প্রচার করিয়া ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল শিবিরের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানর চেষ্টা করিতেছে।** আমেরিকায় এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি আছে বলিয়াই বৃটেনের মত সেখানে মুনাফা লাভের উপর যুদ্ধগত সময়ের বিধি নিষেধ এখনো চালু হইতে পায় নাই। আমেরিকায় বৃটেনের মত গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে আইন করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নির্দ্ধারণ করা এখনো সম্ভব হয় নাই, শিল্প বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্র কণ্ট্রোল স্থাপিক হয় নাই।

বৃটেনের সহিত সোভিয়েটের যে গভীর ও ঘনিষ্ট সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে আমেরিকার সহিত এখনো সেরূপ মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টি হয় নাই। রুজভেল্টের যুদ্ধজয়ের নীতিতে বাধা দিবার জন্য আমেরিকার একশ্রেণী পুঁজিপতি ঘোর বিরোধিতা করিতেছে। এই ফ্যাশিস্ট মনোভাবাপন্ন অংশটি বেশ সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয় চাই

এই সমস্ত সমস্যা প্রণিধান করিয়া কমিউনিস্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার বলিয়াছেন—

সেনাপতি আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গনে এঙ্গলো-আমেরিকান সৈন্যদের শক্তি ১৯৪৪ সালেই হিটলারবাদ ধ্বংসের উপযোগী সামরিক শক্তির জোয়ার আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক শক্তি একাকী তাহার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিতে পারে না। তাহার পশ্চাতে প্রত্যেকটী দেশের জনসাধারণের দ্বিধাহীন সমর্থন থাকা চাই। বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত মৈত্রী এই সামরিক শক্তির পিছনে দৃঢ়ভাবে বর্তমান থাকা চাই। আমেরিকার কথা ভাবিলে বলিতে হয়—এই বিষয়ে এখনো গভীর বিপদের আশংকা রহিয়াছে।

যুদ্ধজয় ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশে গণতান্ত্রিক শিবিরকে সংহত করিতেই হইবে। সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে এই শিবিরে একত্রিত করিতে হইবে। এই শিবিরের মধ্যে নিশ্চয়ই কমিউনিস্টরাও আছে ও থাকিবে।

আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন এখনো খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। শ্রমিকদের ভিতর সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য দৃঢ়মূল হয় নাই। আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমূল পরিবর্তনের মনোভাব এখনো সৃষ্টি হয় নাই।

স্বাধীন কারবারের অধিকার, না সমাজতন্ত্রবাদ—এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তেহেরাণ-বিরোধী শক্তিকে আমেরিকার কমিউনিস্টরা বলশালী করিতে চাহে না। ব্যাঙ্ক, রেলপথ, কয়লা ও লৌহ-শিল্প প্রভৃতিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সমস্যা সামনে আনিলে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিদেরই সাহায্য করা হইবে। কারণ আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলন ও প্রগতিশীল জনসাধারণের শক্তি এখনো এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে বিপুল সমর্থন দেয় না। সুতরাং আমেরিকায় যুদ্ধজয়ের ও শান্তিরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্যের কর্মসূচীতে এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত হইবে না।

কিন্তু নিগ্রোদের অধিকার, বংশ-জাতি-বর্ণ বৈষম্যের অবসান, কমিউনিস্ট বিরোধী আইন কানুনের নাকচ প্রভৃতি বিষয়ে আমেরিকার কমিউনিস্টরা বিন্দুমাত্র জমি ছাড়িবে না। সৈন্য, নাবিক, নৌ-ব্যবসায়ী প্রভৃতি এক কোটী লোকের ভোটাধিকারের জন্য গণতন্ত্রের লড়াই একদিনের জন্যও ছাড়া চলিবে না। তেহেরানের ঐক্যবদ্ধ চুক্তির জয়ের জন্য আমেরিকার ব্যাপক গণতান্ত্রিক সম্মিলিত ফ্রণ্টের বিজয় অভিযানকে আমাদের সফল করিতেই হইবে। কমিউনিস্টরা এই মিলিত ফ্রণ্টের ভিতর একটী ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

গণতন্ত্র ও প্রগতির জয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোল

এই সব ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে কমিউনিস্টরা পার্টি হিসাবে আগামী নির্বাচনে তাহাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করাইতে পারে না। বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বাধ্য না হইলে তাহারা স্বাধীন-প্রার্থী খাড়া করিবে না। আমেরিকায় রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটদের দুইটী বৃহৎ পার্টি আছে। দুইটী পার্টিই বিভিন্ন দলের

(শেষাংশ ২য় কলমে দেখুন)

Regd. No. C. 2836

বাংলার বুকে দেশদ্রোহীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র দেশভক্ত খুন—দেশসেবিকার অপমান

দেশবাসী ! শক্ত হাতে ইহার জবাব দাও

জনসাধারণের ঘৃণায় দেশদ্রোহিতা ধ্বংস হোক

গত ২১শে জুন কলিকাতা সংস্করণ 'যুগান্তর' পত্রিকায় "ফরোয়ার্ড ব্লক ও সি, এস, পি পন্থীদের গুণ্ডামি" শিরোনামা দিয়া নিম্নলিখিত খবরটী প্রকাশিত হইয়াছে : "গত ১৩ই জুন গাইবান্ধা সহরে প্রায় ৫০ জন ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থী ও সি, এস, পি পন্থী ৬ জন কমিউনিস্ট কর্মীর উপর প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ চালায়। বহুদিন হইল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মারপিট চলিতেছিল। ঐ দিন ব্যাপার চরমে উঠে এবং প্রায় ৫০ জন লোক স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ঘেরাও করে। ঐ সময়ে ৬ জন কমিউনিস্ট কর্মী কাজ শেষে অফিস হইতে বাহির হইলে রাস্তার উপর ডাণ্ডা, হাণ্টার ও সাইকেলের চেন লইয়া ঐ ৫০ জন হঠাৎ আক্রমণ চালায়, ফলে ১ জন কমিউনিস্ট কর্মী আহত হইয়াছে। ফরওয়ার্ড ব্লক পন্থীদের মধ্যেও একজন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি, এস, পি পন্থীরা এখন নিজেদের কংগ্রেস পন্থী বলিয়া প্রচার করিতেছে।"

কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর দেশদ্রোহীদের এইরূপ কাপুরুষোচিত নিষ্ঠুর আক্রমণ কিছুদিন ধরিয়াই বাংলার বিভিন্ন স্থানে হামেশাই ঘটিতেছে।

গত ২রা মে রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাজসাহী সহরে ২৫ জন সি, এস, পি, আর, এস, পি ও ফরোয়ার্ড ব্লক পন্থী গুণ্ডা লোহার ডাণ্ডা ও লাঠি নিয়া অকস্মাৎ স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করিয়া পাঁচজন কমিউনিস্ট কর্মীকে গুরুতর ভাবে আহত করে ও অফিস লুঠ করিয়া টাকাপয়সা ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়া যায়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা সহরের কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড সুনীল নাগ রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন আর, এস পি ও ফরোয়ার্ডব্লকের গুণ্ডারা চোরের মত তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লোহার ডাণ্ডা দিয়া তাঁহার মাথায় আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে কমরেড নাগ ৩১শে মে হাসপাতালে মারা যান।

জুন মাসের প্রথম দিকে নীলফামারীতে (রংপুর) সি, এস, পি ও ফরোয়ার্ড ব্লক পন্থীরা কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। এই সময়েই রংপুর সহরে কমিউনিস্ট কর্মী কমরেড মণি সান্যাল যখন পার্টির কাজ শেষ করিয়া দুপুরে একা একা বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন কয়েকজন ফরোয়ার্ডব্লকপন্থী গুণ্ডা তাঁহাকে অকস্মাৎ ঘিরিয়া ফেলিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে।

দেশ সেবিকাদের অপমান

শুধু এই প্রকার কাপুরুষোচিত গুণ্ডামিই নয়—এই দেশদ্রোহী গুণ্ডার দল বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কমিউনিস্ট মেয়ে কর্মীদের বিরুদ্ধে, জঘন্য ও অশ্লীল কুৎসা প্রচারের জেহাদ চালাইয়াছে। নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতেও ইহারা জানে না। কলিকাতার রাস্তায় দেশপ্রেমিকা আত্মরক্ষা কর্মীকে একা পাইয়া অপমান, জেলায় হস্তলিখিত কুৎসিত ইস্তাহার ও কার্টুন মারফত দেশসেবিকা কমিউনিস্ট মেয়ে কর্মীদের নামে ইতরামিপূর্ণ প্রচার—কোন কিছুতেই ইহাদের বাধে না। রাজসাহীর ফরোয়ার্ডব্লক পন্থীরা "হিন্দু রঞ্জিকা" নামে স্থানীয় একটি পত্রিকার স্তম্ভে সেখানকার মেয়ে কর্মীদের নামে যে সব মিথ্যা মন্তব্য করিয়াছিল তাহা একমাত্র সমাজের ঘৃণ্যতম জীবের পক্ষেই সম্ভব।

গত ২২ শে জুন রাত্রিতে রাজসাহী সহরের প্রায় ২০।২৫ জন ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর, এস, পি পন্থী স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী ও স্থানীয় গার্লস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহ সরস্বতীর বাড়ীতে চড়াও হইয়া নানারূপ অশ্লীল ভাষায় চীৎকার ও হৈহল্লা করিতে থাকে। এই কুৎসিত ঘটনায় সমস্ত বাংলার সম্মুখে লজ্জায় রাজসাহীবাসীদের মাথা নীচু হইয়াছে! যারা এই অসভ্য বর্ব্বরতার জন্য দায়ী, যারা নারীর সম্মান ও সামাজিক ভদ্রতা এই ভাবে পদদলিত করে তাহাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজসাহীবাসীর ঘৃণা জাগ্রত হউক।

মহিলা কর্মীদের এইরূপ অবমাননার বিরুদ্ধেই বাংলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা এক বিবৃতিতে আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীদের স্বার্থত্যাগ ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "কিছুদিন পর্য্যন্ত সমিতির কর্মীদের বিরুদ্ধে ইস্তাহার, পুস্তক, কার্টুন প্রভৃতি মারফত কুৎসা রটাইবার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিছু দিন পূর্বে কলিকাতার রাস্তায় আত্মরক্ষা সমিতির ২ জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে অপমান করিবার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। এই প্রকার গুণ্ডামি কেবলমাত্র কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ নহে। প্রদেশের সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর ইহা বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। রাজসাহীর দৃষ্টান্তই ইহার চরম নিদর্শন।......শ্লীলতা বা আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান-হীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রিকার (গত ৩রা জ্যৈষ্ঠের) সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভিতর দিয়া।"

এই আক্রমণের কারণ কি

কমিউনিস্টদের উপর এই আক্রমণ কেন? কেন আজ দেশদ্রোহীরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের জেহাদ চালাইয়াছে? যে সব কমিউনিস্ট কর্মী গুণ্ডাদের চোরাগুপ্তা আক্রমণে আহত হইয়াছেন, যে তরুণ কমিউনিস্ট দেশকর্মী ঢাকায় গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাঁহাদের উপর বিশ্বাসঘাতক গুণ্ডাদের এই আক্রোশের কারণ কি?

এই দেশদ্রোহী গুণ্ডারা জাপানের পক্ষপাতী। ফরোয়ার্ড ব্লক গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী এক ইস্তাহারে বলে "নেতাজী বোসের নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিফৌজ তাহাদের মিত্রশক্তি অপরাজেয় জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছে।... হে বাংলার জনগণ, তোমরা বিদ্রোহ কর, নেতাজী বোসের সেনাবাহিনীকে তোমরা সাহায্য কর।" এই ঘৃণ্য জাপানী দালালরা বাঙ্গালীর দেশপ্রেমকে অপমান করিতে সাহস করে! গোলামির শিকল গলায় পরাইবার জন্য যে সৈন্যদল আসিতেছে তাহাকে ইহারা অভ্যর্থনা করিতে বলে!

এই দেশদ্রোহীর দল চায় দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথ খুলিয়া দিতে। তাই শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ২৫শে জানুয়ারী দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে ধ্বংস-কার্য্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও সি, এস, পির মুখপত্র 'ইনক্লাবের' ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় সি, এস, পি নেতা রামমনোহর লোহিয়া ধ্বংস কার্য্য চালাইবার প্ররোচনা দিয়াছে।

এই দেশদ্রোহীর দল খাদ্য সমস্যার সমাধান চায় না—সংকট আরও বাড়াইতে চায়। তাই এরা দুর্ভিক্ষের সময় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে বুভুক্ষিতদের লুঠতরাজে উস্কাইতে। আর এস পি তার 'যুদ্ধ-থিসীস' লিখিয়াছে যে এই লুঠতরাজের পথেই বাংলার স্বাধীনতা আসিবে! ইহারা চায় জনগণ খাদ্যের অভাবে শুকাইয়া মরুক। তাই ইহারা রেশনিং এর বিরোধী। যে লোভী মজুতদার জনগণের চাউল চুরি করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণ হত্যা করিয়াছে বাংলার ৯০ হাজার গ্রামে ক্ষুধিতের আর্তনাদ সৃষ্টি করিয়াছে—এই দেশদ্রোহীদল বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় সেই মজুতদারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া পুনরায় বাংলায় মৃত্যুর বন্যা ডাকিয়া আনিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি ইহাদের এই দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি খাদ্যের জন্য দিকে দিকে জনগণের একতা গড়িয়া তুলিতেছে। কমিউনিস্ট কর্মীরা ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে, দেশরক্ষার জন্য আন্দোলন করিতেছে। কমিউনিস্ট কর্মীরা মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যের জন্য অনমনীয় ভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশপ্রেমের রাস্তা নিয়াছে—তাই জাপানী দালাল এই দেশদ্রোহীদের প্রতি কমিউনিস্টদের এত আক্রোশ। এই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরী দলগুলি আজ অনুভব করিতেছে যে তাহাদের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আসামের কংগ্রেস নেতা, যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসসেবীরা জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণকে আহ্বান জানাইয়াছেন। দেশবরেণ্য নেতা গান্ধীজি নিজে আজ ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছেন। গান্ধীজি ঘোষণা করিয়াছেন ৯ই আগষ্টের পর দেশে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই, কংগ্রেস কোন 'সংগ্রাম' আরম্ভ করে নাই।

কংগ্রেস নেতাদের এই সব ঘোষণাতে এই দেশদ্রোহীরা প্রমাদ গণিয়াছে। ইহারা দেখিতেছে যে এতদিন সরকারী আমলাতন্ত্রের দমননীতিতে বিক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিক জনগণকে প্ররোচনা দিবার যে সুযোগ ছিল তাহা আজ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেশদ্রোহীরা দেখিতেছে যে তাহাদের পায়ের তলায় মাটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সরিয়া যাইতেছে। ইহারা বুঝিতেছে যে দেশপ্রেমিকের শিবিরে আর স্থান নাই। তাই ইহারা গুণ্ডা বদমাসদের সঙ্গে দল পাকাইয়া দেশসেবিকাদের অপমান, কমিউনিস্টদের প্রাণে মারিয়া পৈশাচিক প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে।

বাঙ্গালীর দেশপ্রেম এদের দগ্ধ করুক

প্রত্যেক দেশপ্রাণ ব্যক্তির আজ বোঝা উচিত যে দেশদ্রোহী গুণ্ডাদের এই আক্রমণ শুধু কমিউনিস্টদের উপরে আক্রমণ নয়, দেশের স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট পদলেহীদের জেহাদ, এ আক্রমণ সভ্যতা ও প্রগতির বিরুদ্ধে বর্ব্বরতার অভিযান। ঢাকার যে তরুণ বীর গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হইয়াছেন—দেশরক্ষার জন্যই সে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়াছে। যে আত্মত্যাগী মেয়ে কর্মীরা বাংলার দুঃস্থা নারীদের রক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই ত আজ এই বর্ব্বরদের হাতে অপমানিত হইতেছেন। এর চেয়ে লজ্জা বাংলার পক্ষে আর কি হইতে পারে? এখনও বাংলার স্বদেশপ্রেমের তলোয়ার এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঝলসিয়া উঠিবে না?

দুঃখের বিষয় এই যে কংগ্রেস সেবীরা আজও এই দেশদ্রোহীদের জাতির পরম শত্রু বলিয়া মনে করেন না। এ কথা সত্য যে কংগ্রেস সেবীরা সি, এস, পি, আর, এস পি এবং ফরোয়ার্ড-ব্লকের রাজনীতিকে পছন্দ করেন না—কিন্তু এদের গুণ্ডামি ও অপকর্মকে আজও কংগ্রেসীরাও প্রকাশ্যে নিন্দা করেন না বা এদের বিরুদ্ধে সচেষ্টভাবে জনমত জাগ্রত করেন না। সেই জন্যই এই দেশদ্রোহী গুপ্তঘাতকের দলের এই গুণ্ডামি আজও চলিতেছে।

কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর এই গুণ্ডামি ও হত্যার প্রতিশোধ কমিউনিষ্ট পার্টি নিজ বাহু বলে নিতে পারে। যাহারা দেশের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিতে ভয় পায় না, নিদারুণ দমন নীতি, জেল, গোপন জীবন যাপনের অশেষ দুঃখ কষ্ট যাহাদের দেশপ্রেমকে ম্লান করিতে পারে নাই, মৃত্যুসম সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যাহারা নির্ভয়ে লড়াই চালাইতেছে—সেইরূপ দশহাজার বীর সৈনিক আজ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির রক্তপতাকাতলে সমবেত। মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী জাপানী অনুচরকে কমিউনিস্ট পার্টি অনায়াসে পতঙ্গের মত পিষিয়া মারিতে পারে।

কিন্তু কমিউনিস্টরা প্রতিশোধের এই পথ গ্রহণ করে নাই। এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধ জাগাইয়া তোলাই ইহাদের ধ্বংসের প্রশস্ত পথ। কমিউনিস্ট পার্টি সে পথই গ্রহণ করিয়াছে।

আজ দুনিয়ার দিকে দিকে স্বাধীনতাকামী জনগণ ফ্যাসিস্ট দানবের উপর মরণ আঘাত হানিতেছে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রেও আজ নূতন যুগের সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস লীগের ঐক্য, আসাম ও যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষার আহ্বান, গান্ধীজির মুক্তি—এ সবই আজ রাজনীতিক যুগ পরিবর্ত্তনের সংকেত আনিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকেও ফ্যাসিস্ট পদলেহী এই বিশ্বাসঘাতক দলগুলির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিতে হইবে।

প্রত্যেক দেশভক্ত সময় থাকিতে সচেতন হউন। চোখের সামনে দেশকর্মীদের উপর আক্রমণ দেখিয়া মৌন থাকিবেন না। আপনার মৌনতায় দেশদ্রোহীদের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিবে—ইহারা সমগ্র জাতির সর্ব্বনাশ করিবে। আপনাদের স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্য রক্ষা করুন। ইহাদের প্রত্যেকটি গুণ্ডামির বিরুদ্ধে আপনি শির উঁচু করিয়া দাঁড়ান, ইহাদের প্রত্যেকটি অপকর্ম্মকে আপনি প্রকাশ্যে নিন্দা করুন—ইহাদের দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সচেষ্টভাবে জনমতকে জাগ্রত করুন। সমস্ত দেশবাসীর ঘৃণায় ইহাদের দগ্ধ করুন—ইহাদের সমাজের বুক হইতে মুছিয়া ফেলুন।

আসাম-ব্রহ্ম যুদ্ধফ্রণ্ট

আসাম

২২শে জুন এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ডি, আর, মানকেকার জানাইতেছেন—**মণিপুর সড়ক খোলা হইয়াছে।** ১২ সপ্তাহের পর মালপত্র লইয়া কতগুলি গাড়ী ইম্ফল অভিমুখে রওনা হইয়াছে। উত্তর এলাকা হইতে একদল মিত্র সেনা ২০ ঘণ্টায় ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইম্ফলের টহলদার সৈন্যদের সহিত **মিলিত হইয়াছে!** এই দুই দলের মাঝখানে পড়িয়া জাপানীদের হাজার দুই সৈন্যের একটি দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

২৩শে জুনের খবরে প্রকাশ বিষেণপুর খণ্ডে জাপানীরা শিলচর সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত করিতে এবং এখানে মাইন পাতিতে সমর্থ হইয়াছে।

২৪শে জুনের খবর—ইম্ফল হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী লিতানের দক্ষিণে উখরুল সড়কে জাপানীদের সহিত মিত্র সেনার সংঘর্ষ হইয়াছে। এই সংঘর্ষে বহু জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং জাপানীদের বহু সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

২৫শে জুনের খবরে জানা যায় যে মিত্রসেনা ইম্ফল অঞ্চলে জাপসৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

এই সপ্তাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খবর **কোহিমা-ইম্ফল সড়ক হইতে জাপানীদের তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে** এবং এখন বিনা বাধায় ইতিমধ্যেই ডিমাপুর হইতে রাস্তা দিয়া ইম্ফলে সাহায্য পাঠান হইতেছে। মিত্র সেনার এই সাফল্যের বাহাদুরী আছে। কিন্তু **শত্রু এখনও দক্ষিণে** তৎপর! বিষেণপুর অঞ্চলে এখন জাপদস্যুরা আনাগোনা করিতেছে এবং সুবিধা পাইলেই আমাদের সেনার উপর হামলা করিতেছে, রাস্তাগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে ইত্যাদি। ইহা ছাড়া জাপানীরা পালেল ও বিষেণপুর অঞ্চলে আরও সৈন্য ও যুদ্ধের সরঞ্জাম আনিতেছে। এই দারুণ বর্ষায়ও এই সব রাস্তা তাহাদের অধিকারে আছে। অবশ্য ইম্ফল উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে মিত্র সেনাও এখন প্রচুর সৈন্য ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বেশী পরিমাণ আনিতে পারিবে এবং সেইজন্য যুদ্ধের গতি ঠিক যে আগের মত থাকিবে মনে হয় না।

ব্রহ্ম

উত্তর ব্রহ্মে মিত্রসেনার একটি বড় রকমের জয় হইয়াছে। ২২নং চীনা ডিভিশন কমাইং শহর দখল করিয়াছে। এই শহরটি উত্তর ব্রহ্মতে জাপানীদের একটি বড় ঘাঁটি ছিল। ইহা ছাড়া মিত্রসেনা মগাউং শহরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

মিত্র সেনা যদি খুব তাড়াতাড়ি মগাউং অধিকার করিতে পারে তবে মিচিনাতে জাপানীদের রেলওয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং সেই অংশ মিত্র সেনার দখলে চলিয়া আসিবে। ইহাতে মিচিনা দখলের সুবিধা করিয়া দিবে। মিচিনার ভিতরে এখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। দিনরাত্র সকল সময়ই সংঘর্ষ লাগিয়া আছে। সুতরাং মগাউংএ মিত্র সেনার অগ্রগতি যদি আরও সাফল্য লাভ করে এবং মগাউং যদি তাহাদের অধিকারে আসে, তবে ইহাই মিত্রসেনাকে মিচিনা দখলের যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

ম্যাক্সিম গোর্কীর মৃত্যু-বার্ষিকী

গত ১৮ই জুন রবিবার ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের উদ্যোগে খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক কেন্দ্রে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতি শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গোর্কি সাহিত্যিকগণের পক্ষে একটা নূতন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পথ-প্রদর্শক যার নাম সাম্যমুখীন বাস্তববোধ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আপন করাই গোর্কির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। গোর্কি যখন সোভিয়েট শিল্পী সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিপ্রতিভাকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বিকশিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছিলেন ঠিক তখনই ফ্যাশিস্ট দালালরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির কণ্টক হিসাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] ৫ই জুলাই, বুধবার, '৪৪, ২১শে আষাঢ়, '৫১ [দাম ছ' পয়সা

সুহরাবর্দি নিজ মুখেই স্বীকার করিলেন

সরকারী আমন ক্রয় নীতিতে আর কোন আশা নাই।

সকল দল মিলাইয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি চাই

ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য কি ভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করা যায় সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য বাংলা সরকার একটী খাদ্য পরামর্শ কমিটি গঠন করিয়াছে। খাদ্য মন্ত্রী মিঃ সুহরাবর্দী এই বিষয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার রিপোর্টারের কাছে গত ২৯শে জুন স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাড়তি অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক সরবরাহের সম্ভাবনা" "শেষই হইয়া গিয়াছে বলা চলে।" সুতরাং যে উদ্বৃত্ত শস্য পাওয়া সম্ভব "গবর্ণমেণ্টকেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।" "বর্ত্তমানে স্বেচ্ছামূলক বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার উপর ভরসা করিলে মুস্কিল দূর না হইতে পারে। সুতরাং যাহাতে বাংলার সমস্ত খাদ্যশস্য একত্র করিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে তাহার উপায় সম্বন্ধেই উক্ত কমিটি সুপারিশ করিবে।"

মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষার মারপ্যাঁচ ছাড়িয়া দিয়া বিবৃতির আসল কথাটী ভাবিয়া দেখিলে বাংলা দেশের অধিবাসীদের উদ্বেগের আর সীমা থাকেনা। আমরা যতদূর বুঝি, সুহরাবর্দীর বক্তব্যের অর্থ হইল: গত ডিসেম্বর মাসে বাংলা সরকার ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য-সরবরাহের জন্য যে আমন ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ফল হইবে না ইহা সুহরাবর্দীই নিজের মুখে স্বীকার করিতেছেন। সেই পরিকল্পনা মতে কয়েকজন চাউল ব্যবসায়ীকে লইয়া সরকার একটী ক্রয়-বোর্ড গঠন করিয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে বোর্ডের এজেণ্টরা বাঁধা দরে ধান-চাল কিনিবে, লোকে স্বেচ্ছায় যাহা বেচিবে তাহাই কিনিবে এবং জেলার মধ্যে ব্যবসায়ীদের "স্বাধীন" বাণিজ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করিবে না। কয়েকটী জেলার মধ্যে আদানপ্রদান এবং অন্যত্র ধান-চাল সরাইবার ব্যাপারেও ব্যবসায়ীদিগকে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। দেশের লোকের খাদ্যের জন্য ধান-চালের কারবারীদের উপরই প্রধানত ভরসা করিবার এই যে নীতি ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ উঠিলেও সরকার তখন ভাবিয়াছিল যে এবার এত ধান-চাল হইয়াছে যে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ক্রয়বোর্ডের এজেণ্টরা ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজন মত সবটা ধান-চালই কিনিতে পারিবে।

সরকারের আত্মসন্তুষ্টি বাঙ্গালীর দুঃখ বাড়াইয়াছে

এই ভরসায়ই বাংলা সরকার ফুড কমিটিগুলির উপর আমন ক্রয় করিবার ভার দিতে রাজি হয় নাই, আমন ক্রয় বিষয়ে জনসাধারণ বা বিভিন্ন দলের সহযোগিতার চেষ্টা করে নাই, ব্যবসাদার ও আমলাতন্ত্রকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়াছে।

এই ভরসায়ই বাংলার গভর্ণর কেসি সাহেব ১লা এপ্রিল বলিয়াছিলেন, "১৯৪৪ সালে যাহাতে আবার দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থায় সফল হওয়া বিষয়ে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প, আমরা সফল হইবই।" উহার প্রায় এক মাস পরে ২৯ শে এপ্রিল দিল্লী সংবাদিক বৈঠকে তিনি আরও উৎফুল্ল ভাবে বলিয়াছিলেন, "এপ্রিল মাসের মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা শুধু ভালর দিকেই, কারণ এপ্রিল মাসে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চের চেয়ে বেশী পরিমাণেই আমরা আমন ক্রয় করিতে পারিয়াছি।"

সরকারী নীতিতে আমন সংগ্রহ করিয়া বাংলাকে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের দুর্ভাবনা হইতে বাঁচানো সম্পর্কে লাট সাহেবের এই আত্মসন্তুষ্ট আশাবাদিতার পর দুই মাস যাইতে না যাইতেই তাঁহার খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন: ক্রয় বোর্ড দ্বারা পুরানো নীতিতে আর কিনিবার আশা নাই, ঘাটতি অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবেও আর ধান-চাল যাইবার আশা নাই—এখন গবর্ণমেণ্টকেই উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে!

এবং এই স্বীকৃতি কখন বাহির হইল? যখন সরকারী গেজেটই মানিতেছে যে প্রায় প্রত্যেক ঘাটতি অঞ্চলে চালের দর চড়িতেছে। যখন চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি এলাকায় প্রায় দুর্ভিক্ষের আতঙ্কই নামিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ যখন ঘাটতি অঞ্চলে অভাব প্রচণ্ড রকম বাড়িতেছে অথচ বাড়তি অঞ্চলে কিনিবার সম্ভাবনা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অন্নাভাব রুখিতে মজুত বাহির কর

আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পাঁচ মাসই বাংলা দেশে ধান-চাল সম্বন্ধে সব চেয়ে টানাটানির সময়, স্বাভাবিক অবস্থায়ই এই কয় মাস বহু লোককে অনাহারী বা অর্দ্ধাহারী থাকিতে হয়। এই সময়েই সরকারী আমন ক্রয় পরিকল্পনায় ব্যর্থতার স্বীকৃতি দুর্ভিক্ষ রোধের সম্ভাবনাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিল, ১৯৪৪-এর শেষে আবার ১৯৪৩-এর দুঃস্বপ্ন আগাইয়া আসিল।

এখন দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ রোধের একমাত্র উপায় সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী কঠোর মজুত বিরোধী অভিযান। বিভিন্ন স্থানে চালের কলগুলিতে কত চাল জমা আছে, সে সমস্ত চাল সরকার পাইয়াছে কিনা সে খবর সরকার চাপিয়া রাখিয়াছে। এখনি সে খবর জানাইতে হইবে এবং সেই সব চাল সম্ভবমত ঘাটতি অঞ্চলে পাঠাইতে হইবে। বাড়তি অঞ্চল হইতে চাল পাঠাইবার জন্য যানবাহনের আরও ভাল ব্যবস্থা করিবার জন্য সামরিক বিভাগের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে হইবে।

কিন্তু তাহা কবে হইবে, হইবে কিনা কে জানে? যতদূর সম্ভব বাঁচিবার ও বাঁচাইবার একমাত্র আশু কার্য্যকরী উপায় হইল প্রত্যেক অঞ্চলে কঠোর মজুত-বিরোধী অভিযান এবং সেই অভিযানে বাহির করা চাল সকলের আগে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনেই বিতরণ করা।

মন্ত্রীমণ্ডলার দুর্বলতার সুযোগে আমলা-তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িয়াছে

তাহার উপর গত ১লা জুলাই আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রেস নোট হইতে জানা যায়, উত্তর বঙ্গ হইতে হাজার হাজার টন চাল ফৌজের প্রয়োজনে আসামে চালান যাইতেছে। ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, বাংলা হইতে ফৌজের জন্য চাল কেনা হইবে না, বাহিরেও চালান দেওয়া হইবে না। এখন বাংলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী নিজের ভ্রান্ত নীতি ও দুর্বলতায় আমলাতন্ত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের মধ্যে অনেক পরিমাণে সমর্থন হারাইতেছে। সেই জন্য আমলাতন্ত্র আজ আবার বাংলা হইতে চাল চালান দিবার সাহস পাইতেছে।

অবশ্য বাংলা সরকার বলিতেছে যে ঐ চাল ধার হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আসাম সরকার সে কথা উল্লেখও করে নাই। গত বারেও চাল ও আটা আমদানী রপ্তানী প্রভৃতির বিষয় লইয়া বাংলা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, আসাম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি বাহির হইয়াছে, কিন্তু কাহার কথা ঠিক তাহা স্থির হয় নাই। এবং বিবৃতিতে যাহাই থাকুক খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী কাতারে কাতারে মরিয়াছে। এবারেও যে কথা কাটাকাটির আড়ালে চালের দেনা শোধ দেওয়ার ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া যাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী এখন দুর্বল, কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলার গভর্ণরের সম্মতি লইয়া তবেই তাহাকে খাদ্যনীতি স্থির করিতে হয়—সুতরাং কিসের জোরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী দেনার চাল আদায় করিবার ভরসা রাখে? এবং ভবিষ্যতে যে আবার "ধার" দিতে বাধ্য হইবে না তাহারই বা গ্যারাণ্টি কোথায়?

জনসাধারণ তথা বিভিন্ন দল এক সঙ্গে মিলিয়া তুমুল আন্দোলন না তুলিলে চাল চালান বন্ধ হইবেনা, যান বাহনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থায়ও কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা যাইবে না। মজুত-বিরোধী অভিযানের সাফল্যও জনসাধারণ তথা বিভিন্ন দলের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতার উপরই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে।

কিন্তু নিজেদের অতীত আমন ক্রয় নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করা সত্ত্বেও এবং রাজনৈতিক দলাদলিতে নিজেরাই আমলাতন্ত্রের হাতে পড়িতেছেন ইহা দেখা সত্ত্বেও মন্ত্রীমণ্ডলীর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হইয়াছে বা সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ব্যবসায়ী ও আমলাদের লইয়া যে ক্রয় বোর্ড ও ক্রয় নীতি তাহা দ্বারা আর কিছু আশা নাই ইহা সুহরাবর্দীই স্বীকার করিতেছেন অথচ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহারা যে নূতন খাদ্য-পরামর্শ কমিটি গঠন করিলেন তাহার মোট চার জন সভ্যের মধ্যে দুইজন সরকারী আমলা, তৃতীয় জন 'স্বনামধন্য' চাউল কারবারী মিঃ ইস্পাহানি এবং চতুর্থ জন ডাঃ নরেন লাহা। এই চতুর্থ ডাঃ লাহাও বোধ হয় কোন না কোন চালের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। যদি তা নাও হন তো তিনি একা দুজন আমলা ও একজন কারবারীর মধ্যে আলাদা কিছুই করিতে পারিবেন না। যে কারবারী ও আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা করার ফলে আজ সুহরাবর্দীকে আমন সংগ্রহের নূতন উপায় খুঁজিতে হইতেছে সেই আমলাতন্ত্র ও কারবারীই আবার কি নূতন উপায় বাৎলাইবে?

প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি বাঁচার একমাত্র পথ

দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ হইতে বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ জনসাধারণের মনে বিশ্বাস সঞ্চার করা, মজুত না করিতে ও স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে ও বিপক্ষে যে তিক্ত রাজনীতিক বিরোধ চলিয়াছে তাহা দূর করিয়া প্রদেশগতভাবে সমস্ত দলের মধ্যে অন্তত খাদ্যনীতি ও খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে আপোষ ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নহিলে উহা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কাজে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকেই আগাইয়া আসিতে হইবে কারণ প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদের। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি গঠন করিতে হইবে, উহার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে, একটা সাধারণ খাদ্য-সংগ্রহ নীতির উপর সমস্ত বিরোধের অবসান করিতে হইবে। তবেই জনসাধারণের মনে ভরসা আসিবে; আর বিভিন্ন দলের উপর খাদ্য-সংগ্রহের দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহারা সকলেই খাদ্যসংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন।

সম্পাদকীয়

জাতির ঐক্যই গান্ধীজির ভরসা

গান্ধীজি অচল অবস্থার সমাধানের জন্য বড়লাটের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ভারতের আমলাতন্ত্রের ইতিহাসে কোন নূতন কথা নয়।

ভারতের প্রতি কুৎসা রটনায় হোতা টটেনহাম গান্ধীজির বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিল তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর গান্ধীজি নিজেই দিয়াছিলেন বারো মাস আগে। তাহাও এতদিন এই আমলাতন্ত্রই চাপিয়া রাখিয়াছিল। গত বছর গান্ধীজির উপবাস শুরু হওয়ার তিন দিন পরে টটেনহামের মিথ্যা অভিযোগগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছিল। গান্ধীজি লিখিয়াছেন,—'ডাক্তারদের মতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াই ইহা প্রকাশ করা হইয়াছিল।'

গান্ধীজির সুযুক্তিপূর্ণ চিঠিগুলি আমলাতন্ত্রের মতলব ফাঁস করিয়া দিয়াছে।

গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'আমি যত প্রেস-বিবৃতি দিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিষ্কার করিয়াছি যে এক মুহূর্তের জন্যও জার্মাণী ও জাপান যুদ্ধে জিতুক আমি তাহা চাহি নাই। বৃটেন ও মিত্রশক্তির পক্ষে যদিও বা কখন এই বিপদ আসে তাহার কারণ ইহাই হইবে—ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটজনক মুহূর্তেও অত্যন্ত বদ জিদের বশে বৃটেন সাম্রাজ্যতান্ত্রিক মনোভাব পরিত্যাগ করিতে ছাড়ে নাই। ভারতকে স্বাধীনতা দিলে ভারত বার্মা রোড আবার খুলিয়া দিবে এবং রুশ, চীন ও সমগ্রভাবে মিত্রশক্তির সাফল্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।'

গান্ধীজির চিঠিতেই প্রকাশ তাঁহার 'ভারত-ত্যাগ' ধ্বনির মূল কথা ছিল—ভারতকে সমস্ত পার্টির মিলনে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে দিলে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত মিত্রশক্তির সাফল্যের একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হইবে। ইহাই হইত গণতন্ত্রের সত্যকার প্রকাশ। ভারতে এমন একটিও রাজনৈতিক পার্টি নাই যে পরিপূর্ণভাবে নাৎসী-বিরোধী, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ও জাপান-বিরোধী নহে।

তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—'কোন আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই, আমি কোন আন্দোলনের নির্দ্দেশও পাঠাই নাই।' যে সব হিংসাত্মক কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার জন্য আমরা দায়ী নই। গ্রেপ্তার না হইলে আমার প্রথম কাজই হইত গবর্ণমেণ্টের সহিত বোঝাপড়া করা এবং দ্বিতীয় কাজ হইত সমস্ত প্রকার ধ্বংসাত্মক গোলমাল এড়াইবার চেষ্টা করা। গান্ধীজির নির্দেশ হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য টটেনহাম অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির সার্কুলার প্রভৃতি যে-সব লেখা প্রকাশ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে গান্ধীজি কিছুই জানিতেন না। তাহার খণ্ডনে গান্ধীজি জানাইয়াছেন,—"জনসাধারণের কাছে এই কাজের (ধ্বংসাত্মক) কথা আনা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ তাহারা অহিংসভাবে ইহা করিতে পারে না।"

কংগ্রেস-সোসালিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকীরা ধ্বংসমূলক কাজগুলিকে গান্ধীজিরই নির্দ্দেশ বলিয়া এতদিন চালাইয়াছিল আজ গান্ধীজির এইসব পত্রাবলীই তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। গান্ধীজির চিঠিপত্র চাপিয়া রাখিয়া আমলাতন্ত্রই ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকারীদের সাহায্য করিয়াছে, মিত্রশক্তির দৌর্ব্বল্য বাড়াইয়াছে।

এক বছর আগেই এই সব চিঠিপত্র গান্ধীজি সরকারকে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ট[illegible]হাম উদ্ধত সুরে বলিয়াছিল,—এই সব অভিযোগ [illegible]র্কে আপনার মন্তব্য চাওয়া হয় নাই। গান্ধীজি যখন লিখিয়াছিলেন,—লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিতেছে, এ অবস্থায় আমাদের শুধু সন্দেহবশে আটকাইয়া রাখা কত গর্হিত তাহা চিন্তাই করা যায় না। তিনি চাহিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া সকলের অভিমত গ্রহণ করিব। সরকার তাহা শুনে নাই। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হউক। আমলাতন্ত্র ইহাও এখনো করে নাই।

এই সব ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, একটীর পর একটী করিয়া গান্ধীজির সমস্ত কথা উদ্ধত আমলাতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজও সে তাহাই করিয়াছে—গান্ধীজির সহিত ওয়াভেল দেখা করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু জনগণের শক্তি আজ সেই আমলাতন্ত্রকে কাবু করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছে। তাই তাঁহার মুক্তি হইতে শুরু করিয়া গান্ধীজির সমস্ত বক্তব্য পর্য্যন্ত ভারতের জনগণের পক্ষে চাকা ঘুরাইয়া নিতেছে।

মহারাষ্ট্র কংগ্রেস-কর্মীদের সভায় ভারতের শোচনীয় খাদ্যাবস্থা কার্য্যকরীভাবে দূর করিবার জন্য গান্ধীজি জাতীয় গবর্ণমেণ্টকেই একমাত্র রাস্তা হিসাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ওয়াভেল এমনি এমনি কিছুতেই দিবে না। জাতির ঐক্যবদ্ধ দাবী ছাড়া ইহা অসম্ভব।

এখন আমরা আশা করি গান্ধীজি এই উদ্ধত ও অন্ধ আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ভারতের অন্য প্রধান প্রতিষ্ঠান লীগ ও জিন্নার সহিত বোঝাপড়া করিবেন। তখনই আমেরি-লিংলিথগো-টটেনহামের কারসাজি ব্যর্থ হইবে। ভারতের ও মিত্রশক্তির জয়লাভের সুদিন ঘনাইয়া আসিবে।

এখনকার জরুরী বই!

বাংলায় কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা

দাম—৵০ আনা

সোমনাথ লাহিড়ী ও বঙ্কিম মুখার্জী

(ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড)

ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী

বিশিষ্ট নেতৃবর্গের বিবৃতি

ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্ট, বৃটেনের জনসাধারণ এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষের ২৭ জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতি একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতি এখনও গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে। খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি যেরূপ পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে যথাসময়ে ভারতবর্ষে সেইরূপ পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে সম্মত হন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত নেতৃবর্গ বৃটিশ পার্লামেন্ট, জনসাধারণ ও সম্মিলিত জাতিসমূহকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকা আমেরির মনোভাব সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য করিয়াছে। 'ডেলি হেরাল্ড' বলিয়াছে, গত বছর আমেরি ভারতের দুর্ভিক্ষের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপরই সব দায়িত্ব চাপাইয়াছিল; ইহাতে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত তো হয়ই নাই, বরং বৃটেনেরই নাম খারাপ হইয়াছে। আমেরির পদ্ধতিতে ভারতের দুর্ভিক্ষ দূর হইতে পারে না—নূতন কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে তার কৈফিয়ৎ পার্লামেণ্টে হাজির করা হউক। এই বিবৃতির উপর 'ডেলি হেরাল্ড' যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া পার্লামেণ্টকে এ সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য দাবী জানাইয়াছে।

এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে:—

"ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ জনসাধারণের মনে যে আত্মপ্রসাদের ভাব আছে, বাঙ্গলার শোচনীয় দুর্গতির রূঢ় আঘাতে সেই আত্মপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া গত বৎসর বৃটিশ জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিল যে, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ এবং ভারতবর্ষের খাদ্যনীতির অব্যবস্থার জন্য দায়ী কে? যে নীতির সহিত ৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য বিজড়িত, সেই নীতি সম্পর্কে প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত দায়িত্ব ভারতসচিবের হস্তে ন্যস্ত হইলেও তিনি যখন ভারত সরকারকে এই জন্য দায়ী করিলেন, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কেহই সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অবাধ্যতা প্রদর্শন করায় ভারত সরকার আবার বলিলেন যে, তাহাদেরও অবস্থা আয়ত্তে আনিবার উপায় নাই। ভারতের এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ প্রাথমিক অবস্থায় যেরূপভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের আনন্দিত হইবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। নানারূপ ভুলভ্রান্তি এবং পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা (ইহার ফলে বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে) করিবার পর অবশেষে ভারত সরকার খাদ্যনীতি নির্দ্ধারণ কমিটির প্রধান সুপারিশ অনুযায়ী একটি নিখিল ভারতীয় খাদ্যনীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া তদ্বারা একটি সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ঐ কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। ভারত সরকার এই সমস্ত সুপারিশ মানিয়া লইবার পর ৯ মাস অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত কমিটি যেরূপ পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার কোন লক্ষণই এখন পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। **ভারতবর্ষের খাদ্য-পরিস্থিতি এখনও গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে। অধিকাংশ ঘাটতি অঞ্চলে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা যাইতেছে।** ঐ সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণ খুব অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। স্বাভাবিকভাবে সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায়, সেনা বিভাগের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এবার যে ভাল গম জন্মিবে না তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারায় মনে হইতেছে যে, আগামী কয়েক মাসে দেশের অবস্থা অত্যন্ত নিদারুণ হইবে। ইহার পর যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও হ্রাস পায়, তাহা হইলে মাদ্রাজের মালাবার ও রামনাদ জেলায়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মফঃস্বলে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। ইহার ফলে দেশের সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে দুর্দশার সৃষ্টি হইবে। ভারতের জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ গভর্ণমেণ্টকে এই কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, যদি বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে গম আমদানী করা হয়, তাহা হইলে অতীতে যে দুর্দৈবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি নিবারিত হইতে এবং প্রাচ্যে মিত্রপক্ষের প্রধান ঘাঁটির নিরাপত্তা রক্ষিত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহার কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, একটি সুচিন্তিত আমদানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কাজ হইতেছে না, তাহার কারণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার অভাব নহে, পরন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভার ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গণের আশু প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আমরা ৪০ কোটি নরনারীর কল্যাণ ও প্রধান আক্রমণঘাঁটির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে পূর্ব্বোক্ত অবস্থার প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্ট, জনসাধারণ ও সম্মিলিত জাতি সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে যথাসময়ে খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারণ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য আমদানী করেন, তজ্জন্য ইঁহারা যেন ব্যবস্থা করেন। আমরা একাগ্রভাবে এই আশা ও প্রার্থনা করি যে, ভারতবর্ষ যেন পুনরায় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত না হয়। যদি গত বৎসরের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে তজ্জন্য লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষই দায়ী হইবেন। এই দেশের সামরিক এবং অসামরিক কার্যকলাপ পরিচালনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁহারাই দায়ী।"

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন:—

মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনী, ডাঃ আরুণ্ডেল, শ্রীযুক্ত জি, ডি, বিড়লা, স্যার সুলতান চিনয়, শ্রীযুক্ত বি, দাস, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ এম আর জয়াকর, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শ্রীযুক্ত এন এম জোশী, শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাই, শ্রীযুক্ত হোসেন ভাই এ লালজী, স্যার রোস্তম মাসানী, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা, স্যার হোমী মোদী, শ্রীযুক্ত কে এম মুন্সী, স্যার মুথিয়া চেট্টিয়ার, শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী, স্যার এস রাধাকৃষ্ণণ, ডাঃ বি, সি, রায়, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, স্যার শ্রীরাম ও স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস।

উড়িষ্যায় ৯৩ ধারা প্রয়োগ

মন্ত্রিত্ব সংকটের ফলে আমলাতন্ত্রের হাতে জনস্বার্থ বলি

কয়েকদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যার মন্ত্রিসভার সংকটের সময় কমরেড পি, সি, জোশী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

"মন্ত্রিসভার মধ্যে মতানৈক্যের ফলে উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার অন্যতম সহযোগী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোদাবরীশ মিশ্র ভিতরে থাকিয়া ফ্যাশিস্টবিরোধী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তির বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে যদি নূতন করিয়া নির্বাচন হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস একাদিক্রমে সমস্ত আসন দখল করিয়া বসিবে ও তাঁহার নিজের একাধিক কেলেঙ্কারী ফাঁস হইয়া পড়িবে—এই ভয়ে শ্রীযুক্ত মিশ্র ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নির্বাচন যাহাতে পুনরায় না হয়, তার চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত মিশ্র নিজে একজন মার্কামারা কংগ্রেসদ্রোহী, পরে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকেও ভিড়িয়াছিলেন; বর্ত্তমানে রায়পন্থীরা 'জনগণ'র মন্ত্রী বলিয়া তাঁহার নামে ঢাক পিটাইয়া বেড়ায়। এইরূপ যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি তাঁহাকে মন্ত্রিসভা হইতে সরানো হয়, তাহা হইলে যাহাতে 'জনগণের মন্ত্রণাদাতা'দের লইয়া (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মিশ্র ও তাঁহার স্বগোত্রদের লইয়া) গবর্ণর-রাজ কায়েম হইতে পারে, তার জন্য শ্রীযুক্ত মিশ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

ফ্যাসিস্টবিরোধী বন্দীমুক্তি ও খাদ্যসংগ্রহের কাজে জনসমর্থন আদায়—এই দুই নীতি অব্যাহতভাবে চালানোর জন্য পার্লাকিমেডীর রাজা নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

৯৩-ধারা প্রবর্ত্তিত হইলে উড়িষ্যার সর্বনাশ ঘটিবে। ইহার ফলে একদিকে কংগ্রেসকর্মীদের মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে, অন্যদিকে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া দেখা দিবে। এই সর্বনাশ রোধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মুক্তি দিতে হইবে, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে—আমাদের এই প্রস্তাবে পার্লাকিমেডীর রাজা যদি স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তাঁহার মন্ত্রিসভাকে আমরা সমর্থন করিব। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি যে তিনি পালন করিবেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে।

পার্লাকিমেডীর রাজার সম্মুখে আজ একটি মাত্র সিধা পথ খোলা আছে—কংগ্রেসনেতাদের মধ্যে যাঁহারা জেলের ভিতরে ও যাঁহারা বাহিরে আছেন, তাঁহাদের সকলের সহিত দেখা করিয়া খোলাখুলিভাবে তাঁহাকে কথা বলিতে হইবে এবং সেইসঙ্গে কথা দিতে হইবে যে, কংগ্রেস যখন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চাহিবে, তখন পদত্যাগ করিতে তিনি রাজী থাকিবেন। ইতিমধ্যে দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে, গান্ধীজীর পরামর্শ লইতে হইবে। পার্লাকিমেডীর রাজা যদি উড়িষ্যার জনগণের স্বার্থের অনুকূল পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উড়িষ্যার কংগ্রেসকর্মীদের সমর্থন অথবা সদিচ্ছাপূর্ণ নিরপেক্ষতা লাভ করিবেন। আমাদের পার্টি তবেই তাঁহার মন্ত্রিসভাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিবে।"

* * *

কমরেড জোশী যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। উড়িষ্যায় গভর্ণর সাহেব ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া শাসনের সমস্ত ভার আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

উড়িষ্যার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির নেতা স্বামী বিচিত্রানন্দ দাস বলিয়াছেন যে ৯৩ ধারা প্রযুক্ত হওয়ায় ভালই হইয়াছে; কংগ্রেসকে জেলে পুরিয়া সরকার সংখ্যা-লঘিষ্ঠদলের মন্ত্রিত্ব স্থাপন করিয়া যে ধাপ্পাবাজি সৃষ্টি করিয়াছিল এবার তাহার অবসান হইল। আমলাতন্ত্রকে এখন নিজের নগ্ন স্বরূপেই রাজত্ব করিতে হইবে।

কিন্তু আমলাতন্ত্রের নগ্ন স্বরূপে যে রাজত্ব তাহাতে কি উড়িষ্যাবাসীর কোন লাভ আছে? তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা কি তাহাতে লাঘব হইবে? আমলাতন্ত্র জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই বিচিত্রানন্দ তাহার বিরোধিতা করেন; সেই আমলাতন্ত্র ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ হইলে জনগণের স্বার্থ আরও বিপন্ন হইবে না কি? কংগ্রেস যদি মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে পারিত তাহা হইলে উড়িষ্যার জনগণের দুঃখ নিশ্চয়ই লাঘব হইত। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিত্বে না আসিলে আমলাতন্ত্রেরই রাজত্ব করা উচিত—এ যুক্তির ফলে আমলাতন্ত্রের বাহিরে বিভিন্ন দলের মধ্যে আমলাতন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধে যেখানে যতটুকু শক্তি ও সম্ভাবনা তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হয় না কি? আমলাতন্ত্রের নগ্ন স্বরূপের কথা আজ দেশের কোন্ লোকটী জানে না? সেই স্বরূপ নগ্ন করার অজুহাতে জনসাধারণকে আমলাতন্ত্রের হাতেই ঠেলিয়া দিলে শুধু জনসাধারণের দুর্দ্দশাই বাড়িবে।

এই কথা বুঝিয়াই উড়িষ্যার কয়েকজন কংগ্রেস এম,এল,এ ও কমিউনিস্ট এম,এল,এ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসী বন্দীমুক্তি, খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে এবং কংগ্রেসের সকলে যখন বাহিরে আসিবেন তখন কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার কথা দিলে তাহারা পার্লাকিমেদী কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিত্ব গঠনে সাহায্য করিবেন। ইহাতে কংগ্রেসেরই শক্তি বাড়িত। বোধহয় সেই ভয়েই গভর্ণর সাহেব তাড়াতাড়ি পার্লাকিমেদীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতারা পার্লাকিমেদী মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে আসিতে রাজি না হইলেও পার্লাকিমেদীর প্রতিদ্বন্দ্বী ও কংগ্রেস ত্যাগী গোদাবরীশ মিশ্রকে তাঁহারা কেহই সমর্থন করেন নাই। কিন্তু বাংলা দেশের "স্বদেশ" সংবাদপত্রগুলি কিছু না বুঝিয়াই পরোক্ষে গোদাবরীশ মিশ্রকে সমর্থন করিতেছে। ইহার ফলে গোদাবরীশ মিশ্রের কংগ্রেস-বিরোধিতা ও আমলাতন্ত্র-প্রিয়তাই প্রশ্রয় পাইতেছে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি খারিজ সম্পর্কে

কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির যুক্ত বিবৃতি

"বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী খারিজ করার আদেশ দেওয়ার ফলে হাওড়া শহরবাসীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা আজ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং জনসাধারণও এ বিষয়ে কংগ্রেসের নিকট হইতে নির্দ্দেশ আশা করিতেছে। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষাকারী হিসাবে আমরা কংগ্রেসের তরফ হইতে আমলাতন্ত্র কর্ত্তৃক শহরবাসীর অত্যন্ত সাধারণ নাগরিক অধিকার খর্ব্ব করার কাযকে তীব্রভাবে নিন্দা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন মহাশয় অধিকসংখ্যক কমিশনারদের মত বরাবর অস্বীকার করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারম্যানের পদ হইতে ইস্তফা না দিয়া এবং একই সময়ে একই ব্যক্তি যে চেয়ারম্যান ও মন্ত্রীপরিষদের সভ্য থাকিতে পারেন না, এই সাধারণ রীতিটুকুও সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া তিনিই সরকার কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যালিটি খারিজের আদেশ আহ্বান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল তহবিল নষ্ট করা ও যথেচ্ছ ব্যবহার করার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করিয়া মামলা রুজু করিবার উদ্দেশ্যে তিন জন আহ্বায়ক যখন গত ১২ই জুন কমিশনারদের সভা ডাকেন তখনই অবস্থা চরমে পৌঁছায়। শ্রীযুক্ত পাইন মহাশয়কে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার পরিবর্ত্তে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য আগাইয়া আসিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি খারিজ করার আদেশ দিলেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যকলাপ এমন কোন বিরুদ্ধ সমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে না, তাহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট শত্রু আক্রমণের সময় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদির অজুহাতে ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করিলেন। আমরা বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যায়। একমাত্র সমগ্র জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান কর্ত্তৃত্বাধীনের মধ্য দিয়াই এক দেশের দেশরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভব। কি অপরাধের জন্য শহরবাসী, করদাতা ও নির্ব্বাচকগণ তাঁহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন কি বিরোধীদলের কমিশনারগণও জনসাধারণের উপর আস্থা রাখিয়া সব কথা তুলিয়া ধরেন নাই। ফলে জনসাধারণের অগোচরে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যকলাপের মধ্যে দুর্নীতি ও বে-বন্দোবস্ত দিনের পর দিন ধরিয়া চলিয়াছে এবং এক কুৎসিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

শহরবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর এই নির্লজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি, শঠতা, ও কু-আচারের বিরুদ্ধে ও নিম্নোক্ত দাবী আদায়ের জন্য কংগ্রেসের নামে আমরা হাওড়ার শহরবাসী ও কমিশনারদের একতাবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি:—

(১) অনতিবিলম্বে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করা হউক।

(২) শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করুন।

(৩) বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে নূতন কমিশনার নির্ব্বাচন করা হউক।

(৪) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হউক এবং নির্ব্বাচনে দলগত প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বন্ধ করার জন্য নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী সংশোধন করা হউক।

(৫) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে একটি মিউনিসিপ্যাল দল গঠন করা হউক।"

(স্বাঃ) শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি; শ্রীবিভূপদ ভট্টাচার্য্য সভাপতি, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল পার্টি; সমর মুখার্জী সম্পাদক, হাওড়া জেলা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

আসামের জনগণের মাঝে বাংলার ছাত্রবাহিনী

অরুণ দাসগুপ্ত : অজিত রায়

গত মার্চ্চ মাসের শেষের দিক। সারা বাংলায় খাদ্য সংকটের করাল ছায়া আবার ঘনিয়ে আসছে। সোনার বাংলা সংকটের আবর্ত্তে তলিয়ে যাবার উপক্রম।

এই সংকট মূহূর্ত্তে জাপদস্যু আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের পবিত্র মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফ্যাসিস্ট দস্যুরা ভেবেছিল মালয় ও বার্মার মত এখানেও তাদের দুর্জয়বাহিনী অনায়াসেই আসাম, বাংলা অধিকার করবে।

কিন্তু ভারত মালয়ও নয়, বার্মাও নয়। তাই দেশের বিপদের সম্ভাবনায় দেশভক্তদের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হলো দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার আহ্বান।

আসামের নেতা বরদলই উদাত্ত স্বরে আহ্বান জানালেন শত্রুর বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। সেই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হ'ল জহরলালের প্রদেশ থেকে। আমাদের প্রাণেও নূতন প্রেরণার সঞ্চার হ'ল। আমরা সঙ্কল্প নিলাম আগামী গ্রীষ্মাবকাশে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের দেশপ্রেমিক প্রচার বাহিনী যাবে অসমীয়া ভাইদের কাছে—মাতৃভূমির শত্রুর বিরুদ্ধে আসাম-বাংলার মৈত্রীর বাণী নিয়ে। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুতি চলল। কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও হরিপদ কুশারী নূতন গান ও নাচের পরিকল্পনা করলেন; কিশোর-কবি সুকান্ত নাট্য রচনার ভার নিলেন। গোটা বাংলাদেশ বাছাই করে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনা থেকে শিল্পী সংগ্রহ হ'ল। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য এগিয়ে এলেন প্রয়োজনায় সাহায্য করতে।

নেতৃবর্গ ও অধ্যাপকবৃন্দ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত হীরেন মুখার্জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত-বিবৃতিতে বল্লেন :

"জাপ-আক্রমণের মুখে আসামবাসীর দৃঢ় বীরত্বকে আমরা অভিনন্দন জানাই।......ছাত্রদের **এই দেশপ্রেমিক প্রচার বাহিনী আজ সমগ্র বাংলার জনসাধারণের মৈত্রীর বাণী আসামে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—** যাতে আপনাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুকে বিতাড়িত করে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।'

আসাম-বাংলা মৈত্রীবন্ধন

নেতৃবর্গের আশীর্বাদ ও জন্মভূমি রক্ষার অদম্য সংকল্প নিয়ে গত ২৮শে মে কলিকাতা থেকে রওনা হয়ে গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, ডিব্রুগড়, শিলং, সিলেট ও শিলচর ঘুরে আমরা ২৭শে জুন কলিকাতায় ফিরে আসি। আসামের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় দশ হাজার জনসাধারণের কাছে আমরা পৌঁছে দিয়েছি দেশরক্ষার বাণী—আসামের সঙ্গে বাংলার ঐক্যের বাণী—

"ঐ কোহিমা, ঐ মণিপুর
আমার দেশের সীমা রে......"

সর্ব্বত্রই হিন্দু-মুসলমান, অসমীয়া, বাঙালী, কংগ্রেস ও লীগ-ভক্ত জনসাধারণের সাথে বহু সংখ্যক ভারতীয়, বৃটিশ, আমেরিকান ও নিগ্রো সৈন্য ও অফিসার আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। "বাংলার ডাকে" সব জায়গায় সকলের কাছ থেকেই বিরাট সাড়া পেয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শনী দিয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল। তা' সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের শেষে যখন আমরা বাংলার জন্য সাহায্যের আবেদন করেছি, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের প্রায় সকলেই যথাসাধ্য দান করেছেন। এই ভাবে আমরা মোট প্রায় ২৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করেছি এবং আরও ৪০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

আমাদের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সব জায়গাতেই ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছে। হল, দৃশ্যপট, ইত্যাদির ব্যবস্থা থেকে সুরু করে প্রচার ও টিকেট-বিক্রয় ইত্যাদি কাজে অসমীয়া ও বাঙালী যুব-সংগঠন সমূহ, কংগ্রেস ও লীগ কর্মীরা, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সবরকমে আমাদের সাহায্য করেছেন।

কংগ্রেস-লীগের ঐক্যবদ্ধ অভিনন্দন "শত্রু এদের কাছে পরাস্ত হবেই।"

নওগাঁতে কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত মহী বড়া ও লীগ-নেতা মোঃ সামাদ পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান দেখেন এবং পর পর আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত বড়া বলেন "আজ কংগ্রেসের কণ্ঠ নিরুদ্ধ। বাংলার এই প্রচার বাহিনী কংগ্রেসের বাণী ও নির্দ্দেশ বহন করে যে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালন করছেন, তার জন্য সারা দেশ এদের অভিনন্দন জানাবে।" তার পরেই লীগ-নেতা সামাদ সাহেব বলেন—"বাংলার যে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য এরা এঁকেছেন তা ফোটোগ্রাফের মত সকলের হৃদয়ে আঁকা থাকবে।... আজকের সংকটে এঁরা যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন, হিন্দু মুসলমান সকলেই যেন সেই পথে অগ্রসর হয়—এই আমার অনুরোধ।"

সিলেটে আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আসাম ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাস। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন "জাপানী আক্রমণ, বাংলার দুর্ভিক্ষ, আসামের দৈনন্দিন সমস্যা এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্য, যে-সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা রোজই ভাবি অথচ কিছুই করিনা বাংলার এই ছাত্র-বাহিনী তারই প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।...'সোনার বাংলা' গানটি শুনে স্বদেশী যুগের কথা মনে পড়ে গেল।...স্বদেশী যুগের মতই ছাত্রেরা আবার দেশ জাগাবার কাজে বেরিয়েছে : জাপানই হোক আর যেই হোক এদের কাছে পরাস্ত হবেই।"

তেজপুরে আমাদের অনুষ্ঠানে অভিভূত হয়ে শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে কয়েকজন মোট ৪০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

মেয়েদের দান, শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

ডিব্রুগড়ে প্রথম অনুষ্ঠানে খুচরো টাকা পয়সার সাথে মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায় একটি রূপোর চুড়ি ও একটি সোনার আংটী। এ দুটি জিনিষ নিলাম করা হয়। যথাক্রমে ৫৲ ও ২৫৲ থেকে সুরু করে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে ১০১৲ ও ১২০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহা ডিব্রুগড়ের অভিজ্ঞতায় প্রথম "স্বদেশী" নিলাম।

ডিব্রুগড়ের মহিলারা রাত্রির জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি ; তাঁরা পরদিন দল বেঁধে প্রায় পচিশ জন আমাদের ডেরাতে উপস্থিত হন। অনুরোধ করলেন 'স্বদেশী' গান শোনাতে। গানের পর তাঁদের কাছে অর্থ সাহায্য চাওয়া হ'ল। এর জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে আসেন নি, তবুও ১৫৲ উঠল।

ডিব্রুগড়ে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে। কারখানাটি 'সংরক্ষিত' অঞ্চল। জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু শ্রমিকদের "বাংলা রিলিফ কমিটির" প্রচেষ্টায় অনুমতি পাওয়া গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে শ্রমিকেরা শূন্য মাঠের মধ্যে কাঠের মঞ্চ করে, রঙিন শাড়ী ও পর্দ্দা দিয়ে চমৎকার রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলল। অধিকাংশ শ্রমিকই বাঙালী এবং চট্টগ্রামবাসী। "চট্টগ্রামের সীমান্ত রক্ষার জন্য এবং খাদ্য সংকট রোধ করার জন্য রেলগাড়ী চালু রাখ"—এই আহ্বানে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল। যখন আমরা অনুষ্ঠান শেষে অর্থের জন্য আবেদন জানালাম, তখন চট্টগ্রামবাসী শ্রমিকেরা সমস্বরে আওয়াজ তুলল "দে, দে, বাক্‌গুন দে" অর্থাৎ যা আছে সবই দাও। একজন অসমীয়া শ্রমিক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে সকলের হাতে ভাগ করে দিল এবং আমরা থলি নিয়ে দাঁড়াতেই সেই সব কচি কচি হাত এগিয়ে এল—বাংলার বুভুক্ষু জনগণের সাহায্যে। এই ভাবে এক আনা দু'আনার খুচরোতে মোট ৮১৲ সংগৃহীত হল। এর প্রত্যেকটি আনি দু'য়ানি শ্রমিকদের রেল চালু রাখার প্রতিশ্রুতিরই প্রতীক।

সৈনিকদের সৌভ্রাতৃত্ব

শিলংএ ১৩ জন বৃটিশ সৈন্য আমাদের অনুষ্ঠানের টিকেট কিনে রেখেছিলেন, কিন্তু তারিখ ভুল করে ঠিক দিনে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। পরের দিন তাদের তিনজন খোঁজ নিতে নিতে একজন স্থানীয় কর্ম্মীর বাড়ীতে আমাদের পাকড়াও করেন। ঘণ্টা দুয়েক 'জলসা' হল—আমরা বাংলায় ও তাঁরা ইংরেজীতে। যাবার সময় তাঁরা ২৫৲ দিয়ে গেলেন। বেশী দিতে পারলেন না বলে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন।

ডিব্রুগড়ে আমেরিকান সৈন্যরা তাদের সিনেমা-শো বন্ধ রেখে আমাদের হলটী ছেড়ে দেন। আলোর গণ্ডগোল হ'চ্ছে দেখে একজন নিগ্রো সৈন্য লাফ দিয়ে স্টেজে উঠে ঠিক করে দিয়ে গেলেন।

খাদ্য সংকট জনগণের মনোবল ভাঙ্গছে

আজ আসাম ও বাংলার ভাগ্য ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। আসামের রণক্ষেত্রে বাংলার ভাগ্যও রচিত হচ্ছে। আসামের মাটি থেকে জাপানকে বিতাড়িত করতে হবে, তার জন্য আসামবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা চাই। কিন্তু আশঙ্কার কথা—আসামে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের আভাষ দেখা যাচ্ছে।

গত মার্চ্চ মাসে, যখন জাপানীরা মণিপুরে প্রবেশ করে, ঠিক সেই মূহূর্ত্তে তীব্র লবণ-সংকট জনসাধারণের মনোবলকে ভীষণভাবে আঘাত করে। সরকারী গুদাম হ'তে ২ লক্ষ মণ লবণ দ্রুত মজুতদারের গহ্বরে আশ্রয় নেয় এবং চতুর্দ্দিকে লবণের জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

এক সের লবণের দর ২৲ থেকে ৮৲ পর্য্যন্ত উঠে যায়। সম্প্রতি নূতন স্টক আমদানীর ফলে শহরগুলিতে কিছুটা অভাব ঘুচেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আজও অনেক জায়গাতেই লবণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য।

লবণের সংকট আজ চালের বাজারে প্রসারিত হ'তে চলছে। শহরগুলিতে রেশনিং, চা-বাগান, রেলওয়ে প্রভৃতির মজুরদের সরবরাহ এবং ভারত সরকারের কোটা পূরণের জন্য আসাম সরকারের মোট ৬০ লক্ষ মণ চাল কিনবার পরিকল্পনা ছিল। এই ক্রয়ের জন্য সরকার জনসাধারণের কোন সহযোগিতা না নিয়ে ষ্টীল ব্রাদার্স নামে বার্মার এক বিলাতী কোম্পানীকে এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। এই কোম্পানী আবার দেশীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাব-এজেণ্ট নিযুক্ত করে। এই সব সাবএজেণ্টরা বাজারে উদ্বৃত্ত মোট ১ কোটী মণেরও উপর চাউলের মধ্যে অধিকাংশ নিজেরা হস্তগত করে। ষ্টীল ব্রাদার্স মারফৎ সরকারী স্টকে জমা হয় মাত্র ২০ লক্ষ মণ। ফলে, রেশনিং প্রভৃতি সকল পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাচ্ছে। চালের দর ক্রমশঃ চড়তে চড়তে ১৬৲ থেকে ১৯৲ এসে দাঁড়িয়েছে। গত ২রা জুন 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' প্রকাশিত সরকারী প্রেস নোটে একটু ঘুরিয়ে সরকারের চাল সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতাই স্বীকার করা হয়েছে।

আসামের সর্বত্র যতগুলি শহরে আমরা ঘুরেছি, কোথাও আলু ছাড়া অন্য কোন তরকারীর মুখ দেখি নি। মাছের উপর আইনতঃ কণ্ট্রোল থাকার ফলে প্রকাশ্য বাজারে মাছ প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে—যদি বা কিছু আসে, তবে সেখানে রীতিমত দাঙ্গা সুরু হয়। দুধ ডিম প্রভৃতি সবই দুষ্প্রাপ্য। ফলে পুষ্টিকর খাদ্য-অভাবে মুষ্টিমেয় লক্ষপতি বাদে গোটা আসামবাসীরই জীবনীশক্তি ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং রোগ ব্যাধি ক্রমশঃ মহামারীর রূপ নিচ্ছে। বানিয়াচঙ্গ ত' বাংলারই প্রতিচ্ছবি। তা'ছাড়া ক মগঞ্জ মহকুমায় ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেখা দিচ্ছে। ডিব্রুগড়কে সরকারী ভাবেই ম্যালেরিয়া অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নওগাঁতে এক রকমের মারাত্মক জ্বর দেখা দিয়েছে যাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মারা যায়। লবণের অভাবে ব্যাপক শোত রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আসামের ভরসা—কংগ্রেস ও লীগ

আমলাতন্ত্র এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের মুখে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু দেশপ্রেমিক কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

বাংলা ও বানিয়াচঙ্গের মেডিক্যাল রিলিফের জন্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ থেকে সুরু করে সকল কংগ্রেস লীগ নেতারা এগিয়ে আসেন। ডিব্রুগড়ের মেডিক্যাল ছাত্ররা সমভাবেই বাংলা ও আসামে স্কোয়াড পাঠান। শ্রীযুক্ত বরদলৈ আমাদের সাথে আলাপে বলেন যে আসামের মেডিক্যাল রিলিফের জন্য তিনি একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করবেন।

শত শত কংগ্রেস কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে সেবাদল গঠন করে লবণ-সংকট ও মহামারী থেকে দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসছেন।

মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে আসামে খুবই দুর্ব্বল। তার জন্যই মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্ব আমলাতন্ত্র, শ্বেতাঙ্গ চাবাগান-মালিক ও মজুতদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলছেন। কিন্তু লীগের মধ্যে আজ নূতন কর্ম্মোদ্যমের সূচনা দেখা যাচ্ছে। লবণ সংকট সুরু হতেই প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মোঃ আব্দুল হামিদ খাঁ আসাম সরকারের নিকট একটি মেমোরাণ্ডাম পাঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমবেতভাবে লবণ সংকট সমাধানের চেষ্টা করতে অধস্তন লীগ কমিটিগুলিকে নির্দ্দেশ দেন।

ডিব্রুগড়ের লীগ নেতা সৈয়দুদ্দিন সাহেব পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সভাপতি এবং সেণ্ট্রাল ফুড কমিটির সম্পাদক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। নওগাঁর লীগ নেতা সামাদ সাহেব নিজে তিনটী মৌজার ৩০,০০০ জনসাধারণকে সংগঠিত করে ৬০০ মণ লবণ সংগ্রহ করেন।

আসামের মুসলিম ছাত্র লীগের বহু কর্ম্মী বানিয়াচঙ্গ অঞ্চলে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বাংলার সীমান্ত আজ কোহিমা ও ইম্ফল। বাংলায় নূতন করে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় নেমে আসবে কিনা তা নির্ভর করে আসামবাসী দৃঢ়তা নিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াবে কিনা, ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনীকে ভরসা যোগাবে কিনা। তাই আজ সবার উপরে প্রয়োজন আসামের খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্য সারা দেশব্যাপী জনগণের তুমুল আন্দোলন, প্রয়োজন—আসাম ও বাংলার জনসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য।

বাংলার ছাত্রদের এই স্কোয়াড আসাম ও বাংলার মধ্যে এই সেতু রচনার ভিত্তি গড়েছে। প্রত্যেকটী দেশপ্রেমিক বাঙালী একে শক্তিশালী করুন—বাড়িয়ে তুলুন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ গান্ধীজির নিকট আমাদের যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে পরিচয়পত্র দিয়েছেন। আসাম-বাংলার অবস্থা তাঁকে জানানোর জন্য তাই নিয়ে আমরা গান্ধীজীর কাছে যাব। গান্ধী জিন্নার নেতৃত্বে আসাম-বাংলার পেছনে প্রতিটি ভারতবাসী দাঁড়াক—এই আমাদের আবেদন।

রংপুরে কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন

অচল অবস্থা অবসানের জন্য কার্য্যক্রম গ্রহণ

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা শীঘ্রই এক ঘরোয়া সম্মেলনে মিলিত হইবেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন জেলাতে সেখানকার কর্মীরা নিজেদের সম্মেলন করিয়া তাঁদের মতামত ঠিক করিতেছেন।

গত ২৪শে জুন গাইবান্ধা শহরে রংপুর জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন হইয়াছে। বহুদিন পরে এই সম্মেলনের ভিতর দিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ১০০ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সমস্ত দলের কর্মীরাই ইহার মধ্যে ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা মৌলভী মহীউদ্দিন খাঁ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত, বলরাম সাহা, সূর্য্যকান্ত বিশ্বাস, দৌলত উন্নেছা খাতুন প্রভৃতি ও বিশিষ্ট কমিউনিস্ট-কর্ম্মী মনিকৃষ্ণ সেন, শঙ্কর রায়, সুধীর মুখার্জ্জী প্রভৃতি সকলেরই ঐক্য এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল। জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অসুস্থতার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া একটী পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

এই সম্মেলনে যে আলোচনা হয়, তার মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সকলেরই মতৈক্য ঘটে। এই সম্মেলন মত প্রকাশ করে যে, আমেরী ও সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা ৮ই আগষ্ট প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্মেলন হইতে ইহাও ঘোষণা করা হয় যে অচল অবস্থার অবসান করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইতেছে :—(১) আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কংগ্রেসের প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা (২) অচল অবস্থার কুফলের বিরুদ্ধে দেশময় সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করা। সকল দলের মিলিত ফুড কমিটি গঠন, রেশনিং প্রবর্ত্তন, মজুত উদ্ধার প্রভৃতির উপরও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য যে ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তাঁদের মধ্যেও সকল দলের লোকই আছেন—মঃ মহিউদ্দীন খাঁ, মনিকৃষ্ণ সেন, বলরাম সাহা, নরেশ চৌধুরী ও সুধীর মুখার্জ্জী।

/চা-মজুরদের উপর মালিকের নূতন হামলা

চট্টগ্রামের ৬টী চা-বাগান বন্ধ অথচ সরকার চুপচাপ !

চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় ২৫টি চা-বাগানে ১২০০০ শ্রমিক কাজ করে। চা শ্রমিকগণ এখনও পর্যন্ত পুরানো যুগের দাস-প্রথায় শোষিত হয়। মালিক ও ম্যানেজার তাহাদের সঙ্গে কৃতদাসের মত ব্যবহার করে। কোন শ্রমিক ম্যানেজারের হুকুম ব্যতীত বাগান ত্যাগ করিতে পারে না, বাহিরের লোকের সাথে মেসামেশা বা কোন সম্পর্ক রাখিতে পারে না। এমন কি, বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠান ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রমিকগণ কোন দোষ করিলে বা ম্যানেজারের কাছে অন্যায় মনে হইলে তাহার শাস্তি বেতমারা, জরিমানা, বরখাস্ত ও বিনা বেতনে খাটাইয়া নেওয়া ইত্যাদি। এড়াইবার জন্য অনেককে বাগান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।

অত্যাচারের জবাবে শ্রমিক সংগঠন

এই বর্ব্বরতা ও অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য শ্রমিকগণ **'চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন'** সংগঠন করিয়াছে। এই সংগঠনের পিছনে শ্রমিক ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের বিরাট ত্যাগ ও নির্ভীকতা রহিয়াছে। মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা চারিদিকে পাহারা দিতেছে। সেই পাহারা এড়াইয়া গভীর রাতে হালদা নদী সাঁতরাইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া শীতে ও বর্ষায় বস্তীতে গিয়াছে। উপবাস ও অনিদ্রায় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। এই নির্ভীকতার ফলে অনেকেই ইউনিয়নের সভ্য হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন একজন ইউনিয়নের উৎসাহী সভ্য। তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলে আদু আর হোসিয়া তিনজনেরই বসন্ত। কালীপ্রসন্ন এদের নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত। ঘরে খাওয়ারও কিছুই নাই।

গত সংকটের সময়

গত বৎসর শ্রমিকরা যে অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বুলিয়ন কোম্পানীর ৫টী বাগানে ৬৮জন শ্রমিক না খাইয়া মারা গিয়াছে। অনাহারের দরুণ অনেকে বাগান ত্যাগ করিয়া রাস্তার ধারে, জঙ্গলের মধ্যে বা গ্রামবাসীদের গোয়ালের মধ্যে মরিয়া পড়িয়াছিল। ম্যানেজারদের অত্যাচারের দরুণ প্রকাশ্যে বাগান ছাড়িতে পারে নাই, রাত্রে গোপনে বাগান ত্যাগ করিয়াছে। কেবলমাত্র বুলিয়ন কোংর বাগান হইতে ৩০০ শ্রমিকেরও বেশী বাগান ছাড়িয়াছে। দাঁতমারা ও নেপচুন বাগানে মেয়ে-শ্রমিকরা কাপড়ের অভাবে কলাপাতা পরিয়াছে, দলে দলে ভিক্ষা করিয়াছে। সুজানগর বাগানে একজন শ্রমিক তিনদিন উপবাসের পর ক্ষুধার জ্বালায় কচি বাঁশের ডগা খাইবার সময় মারা যায়।

মালিকের অন্যায় জুলুম ও দেশদ্রোহিতা

সংকটের পূর্ব্বেই মালিকদিগকে মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে খাদ্যভাণ্ডার খোলার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল, এমন কি, ইউনিয়ন ধান বিক্রেতা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়াছিল। মালিক তবুও ধান কিনে নাই। এ সম্পর্কে মালিকের মনোভাব অনেকটা এই রকম যে, চট্টগ্রাম জাপানীদের দখলে যাইবে সুতরাং একপয়সাও খরচ করিলে লোকসান। অথচ, ইউনিয়নকে জব্দ করিবার জন্য নানারকম ফন্দি করিয়াছে। ইউনিয়ন-সংগঠক নগেন দে'কে রাত্রে ফিরিবার পথে গুণ্ডা দিয়া আক্রমণ করে। কৈয়াছাড়া বাগানের শিবচরণ ও রামচন্দ্রকে মিথ্যা চুরির অভিযোগে তাড়াইয়া দেয়। নুরজ্জমান ও চন্দ্র মোহনকে ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য বরখাস্ত করে। মজুরদের স্বার্থ-বিরোধী রক্ষীদল গঠন করিবার জন্য কেরাণী হরনাথ চন্দকে বরখাস্ত করে। বারমালিয়া চা বাগানের ম্যানেজার ৫জন শ্রমিককে ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার জন্য বরখাস্ত করে। চিকিৎসার দায়ীত্ব জনসাধারণ ও শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন পরিচিত ও আদৃত হইয়াছে। ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে শ্রমিকরা যেমন সংগঠিত হইয়াছে, স্থানীয় কৃষকরাও কৃষক সমিতি করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। চা শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা শ্রমিক-মন্ত্রী, লেবর-কমিশনার ও জনসাধারণ জানিতে পারিয়াছে। আন্দোলনের ফলে লেবর কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ হইতে ৪ বার তদন্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বার তদন্তে শ্রমিকদের পক্ষে রায় হইয়াছে। পাতা ওজনে চুরি ও নানারকম জুলুম বন্ধ হইয়াছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর ইউনিয়নের দাবী অনুযায়ী সরকারী 'এওয়ার্ড' জারী হইয়াছে।

আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা

গভর্ণমেণ্ট মালিকের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে বহু তদন্ত করিয়াছে, 'এওয়ার্ড' জারী করিয়াছে, কিন্তু মালিক তাহা মানে নাই। অথচ ইহার বিরুদ্ধে সরকার আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। শ্রমিকরা আগাইয়া যাইয়া মালিকের প্রত্যেকটি আঘাতকে প্রতিরোধ করিয়াছে কিন্তু সরকার শ্রমিকদের এই উদ্যোগকে কাজে লাগানো তো দূরের কথা সব সময় ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। পুলিশের লোক শ্রমিক ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছে ও ভয় দেখাইয়াছে। গত ২১শে মে তারিখে ইউনিয়নের ১২ জন উৎসাহী কর্ম্মী ও ইউনিয়নের সম্পাদককে মালিকের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত ১৯শে জুন চট্টগ্রাম শহরে উপবাসী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য এক সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। আমলাতন্ত্রের এই মনোভাব মালিকের সাহস বাড়াইতেছে।

মালিকের নূতন আক্রমণ

• গভর্ণমেণ্টের বাটোয়ারার বিরুদ্ধে গত ১৬ই এপ্রিল হইতে দাঁতমারা, কৈয়াছড়া, নেপচুন, চন্দ্রনগর, ডলু, কৈয়াহ্নকিয়া প্রভৃতি ৬টি বাগান বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে ৯০০ শ্রমিক একদম বেকার হয়। গত বছর অনেকে বাগান ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের যাইবার পথ নাই। মেয়ে-মজুর, রোগী ও বালকরা এখন পাহাড়ী কচু, লতাপাতা, কাঁচা চা-পাতা সিদ্ধ খাইয়া বাঁচিয়া আছে। যাহারা সুস্থ এবং গ্রামে দিন-মজুরীতে যাইতেছিল, তাহারা এখন আর যাইতে পারে না, কারণ পাহাড় অঞ্চলে অত্যধিক বর্ষার রাস্তা ঘাট ডুবিয়া গিয়াছে। তাই তীব্রভাবে অনাহার সুরু হইয়াছে। শ্রমিকরা বলিতেছে এই বর্ষায় অন্ততঃ ১০০ মজুর মরিবে।

মহামারীর কবলে

উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে মহামারী দেখা দিয়াছে আরও তীব্রভাবে। দাঁতমারা বাগানে ৬০% শ্রমিক বসন্তে আক্রান্ত। সাধারণতঃ শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়া ও ২৪ জন চর্ম্মরোগে ভুগিতেছে। ক্রমশঃ শোথরোগ বাড়িতেছে। ইতিমধ্যেই অনেকে রিলিফ হাসপাতালে আশ্রয় নিয়াছে।

শ্রমিকদের আত্মনির্ভরশীলতার আন্দোলন

কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের উপর শ্রমিকগণ নির্ভর করে নাই। ইউনিয়ন এই পর্য্যন্ত ৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া মামলার জন্য ব্যয় করিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা উঠাইয়া উপবাসী শ্রমিকদের দিয়াছে। দাঁতমারা বাগানে কোম্পানীর কাঠ বিক্রী করিয়া ম্যানেজারকে বাকী তিন সপ্তাহের মধ্যে ১ সপ্তাহের বেতন মিটাইয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে। দাঁতমারা বাগানে প্রায় ৮ দ্রোণ অনাবাদী জমি নিজেরা আবাদ করিয়াছে। যাহাদের একদিনের খাবার আছে, তাহারা অর্দ্ধেক রুগ্নদের ভাগ করিয়া দিয়াছে। শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাছে জানানো হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি সংবাদপত্রে এ বিষয় বিবৃতি দিয়াছেন এবং ৫০০৲ টাকা রিলিফের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

সরকারী ও বেসরকারী রিলিফ যদিও প্রয়োজন কিন্তু ইহাতে সমস্যা সমাধান হইতে পারে না। কেবল মাত্র শ্রমিকদের রক্ষা করা নয়, উৎপাদনের প্রশ্নও এই ক্ষেত্রে জড়িত। চা বর্ত্তমানে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যানবাহনের অসুবিধার জন্য চট্টগ্রামে প্রয়োজন মত চা-আমদানী হয় না, এবং দামও অত্যধিক। এই অবস্থায় ৬টি বাগান বন্ধ হওয়ার অর্থ চা উৎপাদন কমিয়া যাওয়া। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ইউনিয়ন জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে **যতদিন মালিক বাগান চালু না করে, ততদিন গভর্ণমেণ্ট নিজের দায়ীত্বে বাগান চালু রাখুক।** কিন্তু, আজ পর্য্যন্ত জেলা কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন মতামত দেয় নাই।

চট্টগ্রামের চা-শ্রমিকরা সরকারের নিকট দাবী করিয়াছে:—(১) অবিলম্বে সরকারী কর্ত্তৃত্বে বুলিয়ন কোংর বাগানগুলি চালু করা হোক; (২) অথবা মালিককে সরকারী বাঁটোয়ারা মানিয়া নিয়া বাগান চালু করিতে বাধ্য করা হোক; (৩) বাগান চালু না হওয়া পর্য্যন্ত রিলিফের ব্যবস্থা চাই; (৪) সরকারী বাঁটোয়ারা না মানিবার জন্য ও বিনা নোটিশে বাগান বন্ধ এবং তিন সপ্তাহের মজুরী না দেওয়ার জন্য বুলিয়ন কোং ও ম্যানেজারগণকে অভিযুক্ত করা হোক; (৫) শ্রমিক ও ইউনিয়ন সম্পাদকের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করা হোক এবং (৬) চা বাগান শ্রমিকদের দাস প্রথা হইতে মুক্ত করিবার জন্য মালিকদিগকে (বাংলা দেশের সমস্ত চা মালিক) ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে মানিতে ও ইহার সহিত সহযোগীতা করিতে আইন প্রণয়ন করা হোক।

দারুণ খাদ্য সংকটের মুখে পাবনা

দেশপ্রেমিকরা সজাগ হও

সুধীন মৈত্র

পাবনা একটী ঘাটতি অঞ্চল। গত বৎসর জেলায় খাদ্যের অভাব, খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও বিলি ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এবং সরকারের দেউলিয়া খাদ্যনীতির ফলে জেলার উপর দিয়া যে মৃত্যু ও মহামারীর স্রোত বহিয়া যায় তাহাতে সমগ্র জেলায় অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষের উপর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবার আমন ধান প্রচুর হওয়ায় লোকের মনে বিরাট আশার সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু গত বৎসরের মত এবারও কৃষকদের হাত হইতে ধান চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই জেলায় পুনরায় খাদ্য সংকটের করাল ছায়া দেখা যাইতেছে।

আমন ও রবিশস্য

১৯৪৩-৪৪ সনে সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৫১৩৬০০ একর জমিতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছিল। সরকারী মতে একর প্রতি ১২ মণ, পাট নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মতে ১৬ মণ এবং কৃষি বিভাগের মতে একর প্রতি ২০ মণ ধান হইয়াছে। একর প্রতি ২০ মণ হিসাবে ধরিলে ১০২৭২০০০ মণ ধান অর্থাৎ ৬৭ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইবার কথা। কিন্তু মহামারী, শ্রমসংকট ও গোসংকটের ফলে প্রায় ৪ লক্ষ মণের মত চাউল ক্ষেতেই নষ্ট হইয়াছে। ঢাকার মহাজনেরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করিয়া উদ্বৃত্ত অঞ্চল **চাটমোহর ও তারাশ** থানা হইতে ১১ লক্ষ মণের উপর চাউল জেলার বাহিরে কিনিয়া লইয়া গিয়াছে এবং বিছনের জন্য চার লক্ষ মণ মজুত করা হইবে। তাহা হইলে নষ্ট, বাহিরে রপ্তানি ও বিছন-বাদ দিলে মোট উৎপন্ন আমনের ভিতর ৪৮ লক্ষ মণ চাউল জেলাবাসীর ব্যবহার উপযোগী ছিল। কিন্তু আমন উঠিবার এই কয়েক মাসের ভিতরই জেলায় শতকরা ৮০ জন লোকের হাতে ধান চাউল নাই—তাহাদের বাজারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইতেছে। এই ৮০%-এর ভিতর কৃষক এবং গত সংকটের চাপে যে সমস্ত শ্রমজীবিশ্রেণী নিজেদের ব্যবসা ইত্যাদি নষ্ট করিয়াছিল তাহারাই প্রধান।

রবিশস্য জেলায় উৎপন্ন হইয়াছিল প্রায় ৭ লক্ষ মণ। আজ আমন এবং রবিশস্য উভয়ই শতকরা ঐ ৮০ জন লোকের হাতে নাই। ধান চাউলের দরও ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাজারে ধান চাউল আসে কোথা হইতে ?

সাধারণ কৃষকের হাতে ধান চাউল নাই—তাহাদের কিনিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। বড় বড় মহাজনরাও বাজারে ধান চাউল লইয়া আসে না। পাশের জেলা বগুড়া বাড়তি অঞ্চল কিন্তু বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী ধান চাউল বাহিরে রপ্তানী নিষেধ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চোরাবাজারের কারবারীরা ঘুষ দিয়া বগুড়া জেলা হইতে ধান চাউল বাহিরে লইয়া আসিয়া চড়াদামে পাবনা জেলায় বিক্রয় করে।

ছোট ছোট জোতদার এবং ফরিয়ারা বাজারে ধান আমদানী করে যাহা লোকের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। কাজেই এই ফরিয়াদের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সমস্ত লোককে থাকিতে হইতেছে। **সিরাজগঞ্জ ও পাবনা** শহরের জন্য ফরিয়ারা প্রতিদিনের চাউল প্রতিদিন আমদানী করে। ঐ শহর দুইটীর অধিবাসীর জীবন ইহাদের উপর নির্ভর করে। যদি ২ দিন ইহারা চাউল আমদানী বন্ধ করিয়া রাখে তবে শহরবাসীর অনাহারে থাকিতে হইবে।

ধান চাউল গেল কোথায় ?

সমস্ত জেলায় এবার মহাজনরা ধান চাউল বিশেষ মজুত করে নাই। ধান চাউল আটক পড়িয়াছে জোতদার ও জমিদারদের নিকট। গত বৎসর ধান চাউলের চড়া বাজার দেখিয়া জোতদার ও জমিদাররা এবার মহাজনে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ জোতদাররা ধান আটক করিয়াছে এবং বাজারে ছাড়িতেছে না এই জন্যে যে চাষীদের হাত হইতে যখন ধান চাউল বাহির হইয়া যাইবে তখন তাহারা অতি উচ্চ সুদে ধান কর্জ্জ দিয়া টাকা হিসাবে লিখাইয়া লইবে এবং আউষ ধান যখন উঠিবে তখন ঐ টাকার পরিমাণ ধান লইয়া তাহাদের দেনা শোধ করাইয়া লইবে। তাহাতে তাহারা একমণ ধান কর্জ্জ দিয়া চার মণেরও উপর সুদ আদায় করিতে পারিবে।

আগামী আউষ ধানের অবস্থা কি ?

সরকারী হিসাব অনুযায়ী গত বৎসর ৩২০০০০ একর জমিতে আউষ ধানের আবাদ হইয়াছিল এবং তাহাতে ২৩ লক্ষ মণ আউষ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। এ বৎসর বৃষ্টি সময়মত না হওয়ার জন্য গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে কম চাষ হইয়াছে। এবং যে সমস্ত জমিতে প্রথম বৃষ্টিতে বুনানি হইয়াছিল তাহা পরে অনাবৃষ্টির ফলে প্রায় পুড়িয়া গিয়াছে। শতকরা যে ৫০ ভাগ জমিতে চাষ হইয়াছে তাহাও আউষ বুনানির সময়ের তুলনায় অতি বিলম্বে। ফলে জমিতে আউষ ধান আধ হাত, তিনপোয়া হাত না

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলায় চোরাকারবারীর রাজত্ব

চাল-তেল-লবণ সবই চোর গুদামে—তাই দাম আগুন

আমাদের চট্টগ্রামের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

চট্টগ্রামে খাদ্য অবস্থা খারাপের দিকেই যাইতেছে। চাউলের দাম এখনও খুব বেশী এবং বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠিতেছে। কয়েকটী জায়গার চাউলের বাজার দর এইরূপ :—

বোয়াখালী থানায়—৩২৲ হইতে ৩৭৲ মণ
রাওজান থানায়—৩২৲ হইতে ৪০৲ মণ
পটিয়া থানায়—৩২৲ হইতে ৪০৲ মণ

এই থানাগুলি ঘাটতি এলাকা। বাড়তি অঞ্চলে দর আর একটু কম, কিন্তু তবু কন্‌ট্রোল দরের চেয়ে অনেক বেশী। রাঙ্গুনিয়া থানার দর ২৬৲ মণ, ফটিকছড়ি থানার দর ২৬৲ হইতে ২৮৲ মণ।

সাধারণ লোকে, এমন কি সরকারী আমলারাও মনে করিতেছেন যে বর্ষা বেশী হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাম আরো বাড়িবে।

কুতুবদিয়া হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বর্ত্তমানে এখানে টাকায় দেড় সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে।

অন্যান্য জায়গার বর্ত্তমান চাউলের দর সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যাইতেছে যে কন্‌ট্রোল দর কাজে আসিতেছে না তো বটেই, কোনো কোনো জায়গায় আবার দর বাড়িতেছে।

কুড়িগ্রামের ২৪শে জুনের খবর :—গত সপ্তাহে চাউলের দর ১১॥০ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। এ সপ্তাহে ১৫৲ হইতে ১৬৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

শান্তিপুরের ২৭শে জুনের খবর :—গত সপ্তাহে চাউলের দর ছিল ১৪॥০ হইতে ১৫॥০, এখন দর উঠিয়াছে ১৬॥০ হইতে ১৮৲ পর্য্যন্ত। খোলাবাজারে চাউল একেবারে পাওয়া যায় না।

সিরাজগঞ্জের ২৬শে জুনের খবর :—শহরে, তালগাছি হাট ও শলপ হাটে চাউলের দর ২০৲ মণ উঠিয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং অঞ্চলের খবর :—এখানে চাউল প্রতিমণ ১৭৲ হইতে ১৮৲ বিক্রী হইতেছে। এখানেও খোলা বাজারে চাউল পাওয়া যায় না।

লবণ পুরাদস্তুর চোরাকারবারীর হাতে

লবণ সংকটেরও খবর আসিতেছে সমস্ত জেলা হইতেই। সরকার জেলায় জেলায় লবণ সরবরাহ করিতেছে ইহা আমরা শুনিতেছি, তবে কোনো জায়গায় কন্‌ট্রোল দরে লবণ পাওয়া যায় না কেন? ২৪ পরগণার গ্রামে লবণের দর ১৲ সের। ময়মনসিংহে ১॥০ হইতে ২৲ সের, খুলনায় ৸৵০ হইতে ১৲ সের, সিরাজগঞ্জের গ্রামে ২৲ হইতে ২॥০ সের।

কন্‌ট্রোল দোকানের তামাসা!

শুধু লবণই নয়, কেরসিন, চিনি, কাপড়, কিছুই গ্রামবাসীরা কন্‌ট্রোল দরে পায় না। কন্‌ট্রোল দোকান রহিয়াছে, তাতে অতি সামান্য জিনিষই কন্‌ট্রোল দরে বিক্রী হয়, আর বাকী সমস্তই বিক্রী হয় চোরাবাজারের দরে। কুড়িগ্রামের ছিনাই ইউনিয়নে কন্‌ট্রোল দোকান থাকিতেও লোকে জিনিষ পায় না। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার শোভনা ইউনিয়নে কন্‌ট্রোল দামে জিনিষ বিক্রী করার জন্য দুইজন ব্যবসাদার আছে। তা সত্ত্বেও সেখানে কন্‌ট্রোল দরে আটা, চিনি, কেরসিন, লবণ কিছুই পাওয়া যায় না। কেরসিন প্রতি সের ১৲ হইতে ১॥০ টাকা বিক্রী হইতেছে, চিনি ২৲ সের, সরিষার তেল ১৷৵০ সের, কাপড় প্রতি জোড় ১২৲ এবং সাড়ী ১৪৲। ঐ ব্যবসাদাররা খুসীমত নিজেদের অনুগত ব্যক্তিদের যথেষ্ট পরিমাণ জিনিষ সরবরাহ করে। আর জনসাধারণকে যাইতে হয় চোরাবাজারে।

জনগণের খাদ্যকমিটীর হাতেই মজুতদার জব্দ

১000 মণ লবণ উদ্ধার

সরকার কন্‌ট্রোলের আদেশ দিয়াই খালাস। কন্‌ট্রোলের জিনিষ লইয়া চোরাকারবারী কি করিতেছে, তা সরকার দেখে না। লবণের অভাবে চারিদিকে হাহাকার চলিয়াছে, এই সময়েই সিলেট জেলার তিনটী জায়গা হইতে প্রচুর মজুত লবণ উদ্ধার হইল। কালীগঞ্জের মহেন্দ্র দাস ও করিমগঞ্জের এক কারবারীর ২২৫ বস্তা লবণ ধরা পড়িল। কালীগঞ্জের আর একটী জায়গা হইতে ১০০০ মণ লবণ উদ্ধার হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদের চোখ এড়াইয়াই এই মজুত হইয়াছিল। স্থানীয় জনরক্ষা সমিতির কর্মীদের চেষ্টায় এই মজুত বাহির হইল।

তা ছাড়াও এখানে ৮০ টিন সরিষার তেল একজন কারবারীর গুদাম হইতে বাহির হইল। কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেটের ও তাদের একজন এজেণ্টের গুদাম হইতে প্রায় ৩৫০ মণ লবণ বাহির হইল।

বর্দ্ধমানের খবরে প্রকাশ যে মে ও জুনের মাঝামাঝি পর্যান্ত দেড় মাসে ৯০০ টিন কেরসিন তেল, ২৬৭ বস্তা লবণ, ৫০ বস্তা চিনি মজুতদারের হাত হইতে উদ্ধার হইয়াছে। এই মজুত উদ্ধার করিয়াছে খাদ্য কমিটীরই কর্মীরা।

মজুতদারের নূতন ফিকির

খাদ্য কমিটীই আজ মজুতদারের যম। তাই মজুতদাররাও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে খাদ্য কমিটীগুলিকে নিজেদের হাতের মুঠায় রাখিতে। যেখানে তারা সফল হইতেছে সেখানে অতি সহজে তাদের চোরাকারবার চলে। বর্দ্ধমান হইতে খবর পাওয়া গেল যে, বাঘার ইউনিয়নের খাদ্য কমিটীতে একজন বড় ব্যবসায়ীর প্রতিপত্তি সেই ব্যবসায়ী খাদ্য কমিটীর কাছ হইতে পারমিট লইয়া খোলাখুলি ভাবে তার চোরাকারবার চালাইতেছে। এই ব্যবসায়ীকে একদিন ২১ টিন কেরসিন গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে দেখা গেল। এই তেল কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে জবাব পাওয়া গেল যে, ইহা পারমিটের তেল, বাঘার ইউনিয়নের জন্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরে বাঘার ইউনিয়নে খোঁজ করিয়া দেখা গেল, সেই তেল সেখানে বিক্রী হয় নাই, উধাও হইয়া গিয়াছে।

খাদ্য কমিটী সম্বন্ধে আমলাদের মনোভাব

মজুতদারের এই সমস্ত ফিকির বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটী গঠন। কাগজে কলমে সরকার খাদ্য কমিটী গঠনের নিয়ম ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কাজে করিতেছে ঠিক উল্টা। জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটী গঠনে বহু জায়গায় বাধা আসিতেছে।

২৪ পরগণা জেলার আলিপুর মহকুমার খাদ্য কমিটীগুলির মধ্যে কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের লইতে মহকুমা হাকিম অস্বীকার করিয়াছে। অথচ অধিকাংশ জায়গায় যেখানে মজুতদার ও চোরাকারবারীরা গ্রাম্য ও ইউনিয়ন খাদ্য কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদক হইয়া বসিয়াছে, সেগুলিকে এক কথায় সরকার মানিয়া লইতেছে।

রংপুরের ছিনাই ইউনিয়নের খাদ্য কমিটী প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা দখল করিয়া বসিয়া আছে এবং খাদ্য বণ্টনের কোনো ব্যবস্থা করিতেছে না। জনসাধারণ দাবী করিয়াছে এই খাদ্য কমিটীকে বাতিল করিয়া নূতন খাদ্য কমিটী গঠন করা হোক। ২২শে জুন তারা এক ডেপুটেশন লইয়া যায় মহকুমা খাদ্য কমিটীর কাছে। সার্কেল অফিসারের উপর তদন্ত করিবার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু সার্কেল অফিসার এখনও চুপচাপ! কাঁঠালবাড়ী খাদ্য কমিটীর অবস্থাও এই রকম।

> ### খাদ্যকমিটী কি নামে—না, কাজে?
>
> বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, বাংলায় সবশুদ্ধ ৫৪৬৩২টী গ্রাম্য খাদ্য কমিটী এবং ৫৪১৬টী ইউনিয়ন খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত জায়গাতেই খাদ্যকমিটী রহিয়াছে। এতগুলি খাদ্য কমিটীতে যদি সত্যিকার জনসাধারণের প্রতিনিধিরা থাকে এবং মজুত উদ্ধার, খাদ্য বণ্টন প্রভৃতি কাজের জন্য এই কমিটীগুলির উপর ভার থাকে তবে এখনও চোরাকারবার চলে কেন?

চাটগাঁর একটী গ্রামে…রজনী ম্যালেরিয়ায় ও বসন্তে ভুগছে, ছয়টি ছেলে মেয়ে নিয়ে উপবাস করছে, এই বর্ষায় ঘরে থাকতেও পারবে না।

ময়মনসিংহের খবরে প্রকাশ যে নেত্রকোণা ও সদরের এস-ডি-ও খাদ্য কমিটীর হাতে রেশনের ভার না দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের উপরই ভার দিবার মনস্থ করিয়াছে।

এইভাবে ক্রমশঃই খাদ্য কমিটীকে পিছনে ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছে। ইতিপূর্বে গ্রাম পুনর্গঠন সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছিল যে ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে সব ভার দেওয়া হইবে। খাদ্য কমিটীর নামও সে ইস্তাহারে উচ্চারণ করা হয় নাই। তার ফলে স্থানীয় আমলারা জোর পাইতেছে। মজুতদারও এই সুযোগে আমলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং খাদ্য কমিটীকে উপেক্ষা করিয়া আমলাদেরই সাহায্যে নিজদের চোরাকারবারের পথ করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বাংলার সর্ব্বত্র মজুতদারের রাজত্ব হইবে। রেশনিং কখনই কাজে আসিবে না, কন্‌ট্রোলও বানচাল হইবে। তার আভাষ এখনই অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। **শহরে ও গ্রামে সমস্ত লোকে এক হইয়া খাদ্য কমিটীকে সক্রিয় করুন, খাদ্য কমিটীর হাতে খাদ্য-বণ্টনের ভার পাইবার জন্য আন্দোলন করুন, মজুতদারী ষড়যন্ত্র ও আমলাদের স্বার্থ অচল করুন।**

দারুণ খাদ্য সংকটের মুখে পাবনা

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হইতেই বর্ষার জল আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জলে ঐ সমস্ত আউষ জমির অন্ততঃপক্ষে ৭৫ ভাগ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার অর্থ যদি আউষ ধান এবার গত বৎসরের মত উৎকৃষ্টরূপে ফলে তাহা হইলেও মাত্র ৩।৪ লাখ মণের বেশী কখনই হইবে না। ফলে, যে আউষ ধানে জেলার কয়েক মাসের খাদ্যের অভাব পূরণ হইত এবার তাহাতে এক মাসও চলিবে না।

ইহার পরিণতি কোথায়

আজ এই জেলার লোকের জন্য বৎসরে ৭২ লক্ষ মণ প্রয়োজন। যদি গত আমন ধান উঠিবার পর হইতে আগামী আমন ধান উঠা পর্য্যন্ত হিসাব করা যায় তবে জেলায় চাউল ব্যবহার উপযোগী থাকে আমন ৪৮ লক্ষ মণ ও আগামী আউষ ৩ লক্ষ মণ—মোট ৫১ লক্ষ মণ। ইহাতে সমগ্র জেলার চাউলের প্রয়োজনের তুলনায় ২১ লক্ষ মণ ঘাটতি পড়িবে। এই পরিমাণ ঘাটতি পড়িলেও সংকট যত বিলম্বে দেখা দিবার কথা তাহার চেয়ে অনেক আগেই খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। জোতদারদের মজুতদার পরিণত হইবার ফলে জেলার যে শতকরা ৮০ জনের হাতে খাদ্য নাই তাহাদের এক বিরাট অংশের গত বৎসরের সংকটের ফলে ক্রয় ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। এবারও তাহারাই সংকটের প্রথম শীকার। অনাহার, অর্দ্ধাহার ও মৃত্যু ব্যাপকভাবে দেড় মাস, দুই মাস পূর্ব্বেই দেখা দিত কিন্তু জেলায় আম প্রচুর ফলায় ইহারা তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। আম শেষ হইবার সাথে সাথেই ইহাদের অনাহার আরম্ভ হইবে—ইহাদের জীবনধারণের আর অন্য কোনও উপায়ই নাই।

আত্ম-সন্তুষ্ট সরকার ও তাহার দেউলিয়া খাদ্যনীতি

সরকারের পরিকল্পনা ছিল যে পাবনার জন্য এক লক্ষ মণ এবং সিরাজগঞ্জের জন্য ২ লক্ষ মণ চাউল মজুত করা। এই চাউল শহরে রেশনিংএর জন্য এবং প্রয়োজন হইলে গ্রামাঞ্চলেও ব্যবহারে আসিবে। সেদিন পর্য্যন্তও পাবনায় মাত্র প্রায় আট হাজার মণ ও সিরাজগঞ্জে প্রায় ২৫ হাজার মণ চাউলের বেশী মজুত করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে কিছু ধান জেলায় আমদানী করিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য।

খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই, জেলা সিভিল সাপ্লাই অফিসার ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় দেখা গেল যে তাঁরা স্বীকারই করেন না যে এ জেলায় বেশী ঘাটতি পড়িবে। যা করিবার তাঁরাই করিবেন, আমাদের ব্যস্ত হইবার দরকার নাই, ইহাই হইল তাঁদের বক্তব্য। তাঁরা যে চোরাকারবারীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবেন না, তাও প্রকারান্তরে তাঁরা স্বীকার করিলেন।

যেখানে ১ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে এবং এখনও যেখানে ২১ লক্ষ মণ চাউলের ঘাটতি, সেই জেলার কর্ত্তৃপক্ষের এই দায়িত্বহীনতা অমার্জ্জনীয়। মজুতদারের হাতে লোকের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়া এই আমলারা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছে। নিয়ম রক্ষা হিসাবে এখানে স্থানীয় তিনজন মহাজনকে তিন হাজার, তিন হাজার ও চার হাজার হিসাবে মোট দশ হাজার মণ ধান মালদহ হইতে ক্রয় করিবার অনুমতি দেয় কিন্তু তাহাদের ভিতর দুইজন যানবাহন ইত্যাদি নানা অসুবিধার জন্য ধান আনিতে অস্বীকার করে আর অবশিষ্ট একজন অস্বীকার না করিলেও এখনও কোনও ধান আনে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করে নাই।

দেশকর্ম্মীরা কোথায়?

যেখানে কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব এইরকম, সেখানে পাবনা বাঁচিতে পারে একমাত্র দেশবাসীর একতাবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা।

পাবনা জেলার অধিবাসীদের ভিতর শতকরা ৭৫ জন মুসলমান। মুসলিম লীগই জেলায় মুসলমানদের গণ-প্রতিষ্ঠান। গত সংকটে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান অথচ মুসলিম লীগ যতটা সক্রিয় হওয়া উচিৎ ছিল তাহা তাহারা হয় নাই।

আজ যদি মুসলিম জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও অন্যান্য দেশভক্ত কর্ম্মীদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া কাজে নামিত, তা হইলে খাদ্য-সংকটকে উপেক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা আমলারা দেখাইতে পারিত না।

তাই জেলার ১২ লক্ষ মুসলমান জেলাবাসীর নামে আমরা তাহাদের ডাক দিতেছি যে দারুন খাদ্য সংকট রুখিবার জন্য কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিতভাবে লড়িয়া জেলার মুসলমান অধিবাসীদের উপর তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করুন।

কংগ্রেস কর্ম্মীদেরও আমরা ডাক দিয়া বলিতেছি, তাঁদের আগামী সম্মেলন হইতে তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন,—পাবনাকে বাঁচাইতে হইবে।

● বাংলায় কি দেখিলাম ●

আগ্রা মেডিকেল স্কোয়াডের বিবরণ

(আগ্রা মেডিকেল স্কোয়াডের শ্রীযুক্ত রুক্সেয় রাঘব বাংলা দেশে স্কোয়াডের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। তাহার আংশিক মর্ম্মানুবাদ আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম।)

…ঢাকার নারায়ণগঞ্জে আমরা তখনও আমাদের ডিস্পেন্সারীটা ভালভাবে গুছাইয়া তুলিতে পারি নাই। কতকগুলি লোক আবার রটাইয়া দিল—আমরা নাকি গভর্ণমেণ্টের লোক, মানুষ মারিতে আসিয়াছি। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ যখন শুনিল, আমরা ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি, বাংলার সেবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি—তখন তাহাদের অবিশ্বাস দূর হইল। দলে দলে রোগী আমাদের ডিস্পেন্সারীতে ভিড় করিতে লাগিল।

…গোদনাইল গ্রামে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রামবাসী ধুঁকিতেছে। তাহারা আজ সর্ব্বস্বান্ত, রোজগারের ক্ষমতাও হারাইয়াছে। গ্রামে আমরা বসন্তের টিকা দিতে গিয়াছি, একজন বলিল, জ্বরে ভুগিয়া শরীরে হাড় ক'খানাই শুধু আস্ত আছে—বসন্তের গুটি উঠারও আর জায়গা নাই। শতকরা ৮০ জন লোকের গায়ে পাচড়া। রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা নাই—মাছির মত লোক মরিতেছে। জেলেপাড়ার সাড়ে ৬ শত লোকের মধ্যে রোগে ও অনাহারে মরিয়াছে ২ শত লোক। গ্রামের অনেকেরই আজ উপবাস ছাড়া গতি নাই। একটি বাড়ী দেখিলাম তালাবন্ধ পড়িয়া আছে—উঠানে গোটা পরিবারের কবর।

…৫৭টি গ্রাম লইয়া সোনারগাঁও পরগণা। লোকসংখ্যা ১০ হাজার। এমন একটিও বাড়ী নাই যেখানে অন্তত একজন ম্যালেরিয়ার রোগী না আছে। **এখানে আমাদের স্কোয়াডের সুরজ প্রসাদ সাকসেনা ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্যে ২ দিনে ৫৯৮ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।** এখানকার স্থানীয় ডাক্তারেরা তাঁহার কাজে নানা ভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থানীয় দু'একজন বড়লোক স্কোয়াডের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজবও রটাইয়া ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা স্কোয়াডের কাজ বন্ধ করিতে পারেন নাই।

এখানে দুই দুইটি চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী আছে—কিন্তু গড়ে খুব বেশী হইলেও ৫০ জন রোগী আসে। লোকের মন আজ দুঃখের চাপে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। বেদনার অনুভূতি পর্য্যন্ত ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। আমাদের কাছে আসিয়া যে লোকটি তার ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ দিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র শোকের প্রকাশ নাই।

…সিদ্ধিরগঞ্জ যাইবার পথে ৫০০-রও বেশী কবর দুধারে চোখে পড়িল। অনেক জায়গায় ৪।৫ জনকেও একসাথে কবর দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কফনও জোটে নাই। রহমতের বাড়ীতে ২৫ জন লোক ছিল। এখন ৫ জনে ঠেকিয়াছে। গ্রামের একটি লোকেরও ভাল স্বাস্থ্য নজরে পড়িল না। একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়াছিল; পায়ের নীচের মাটি দেখাইয়া বলিল, 'আমার বাপজানের কবর।' গ্রামের ৩ শত দুঃস্থ লোক আজ দেশ ছাড়া। গ্রামের ১৫ আনা লোককে আজ মিষ্টি আলু কিনিয়া ভাতের অভাব মিটাইতে হয়।

কলাবাগানের কাছে ৩০ জন মৃতের কবর দেখিলাম। ম্যালেরিয়া ও বসন্তে ইহারা প্রাণ দিয়াছে। গ্রামের দুপাশে চালাহীন ঘর পড়িয়া আছে। টিন বিক্রি হইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার দুর্বল শরীরে হাটে গিয়া টিন বেচিতে পারে নাই, তাদের ঘরে টিনের চালা দেখিলাম। আদু মিঞার ২৯ জনের সংসার আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন। ৮টি ঘর দেখিলাম যেখানে একটি লোকও বাঁচিয়া নাই। গোটা গ্রামে ধ্বংসের ভগ্নস্তূপ।

নারায়ণগঞ্জে আমাদের স্কোয়াড মোট ১০৮৮ জন ম্যালেরিয়া রোগী ও ৯৪৮ জন পাচড়ার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে; ২৫ মাইল জায়গায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা রোগীদের দেখিয়াছে।

…চট্টগ্রাম আসিয়াছি। কাতোলি গ্রামের জেলেপাড়ায় ২ হাজার লোকের মধ্যে দেড় হাজার লোক মারা গিয়াছে। একটি জেলে দেখিলাম পায়ে ঘা হওয়ায় বেকার বসিয়া আছে। লোকটি মিলিটারীতে কুলির কাজ করিত। অধিকাংশ ঘরেই জাল নাই; পাড়ার কারুরই নৌকা নাই। পাড়ায় যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহারা সবাই কুলির কাজ করিতেছে।

…সমুদ্রতীরে দেখিলাম অসংখ্য মাথার খুলি ও কঙ্কাল পড়িয়া আছে। নোয়াপাড়া, ফটিকছড়ি, কক্সবাজার, জ্যৈষ্ঠপুর, বোয়ালখালি, কুয়েপাড়া—প্রত্যেকটি গ্রামে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় রোগের দুরন্ত প্রকোপ। গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে লোক শহরে শস্তায় রেশনের জন্য ভিড় করিতেছে। গ্রাম্য ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার প্রচণ্ড আঘাতে আজ মধ্যবিত্তের জীবনও বিপন্ন। চর্ম্মরোগ ও যৌনব্যাধি ছড়াইয়া পড়িতেছে। চা বাগানের কুলিদেরও আজ শোচনীয় অবস্থা। বাগান বন্ধ হইবার পরে তাহারা আজ মৃত্যুর মুখে। বিশেষ করিয়া উদ্বৃত্ত এলাকায় চুরি ডাকাতি সংখ্যায় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

… এই ধ্বংসের মধ্যেও বাংলাদেশ মরে নাই। আমরা যেখানে গিয়াছি দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণের সংকল্প লক্ষ্য করিয়াছি। বাংলার রোগার্ত জনসাধারণ আমাদের সাহচর্যে ভরসা পাইয়াছে। আমাদের স্কোয়াড আগ্রাবাসীর একতার প্রতিনিধি। আগ্রা ও বাংলার মধ্যে আমরা একতার সেতু রচনা করিয়াছি।

চট্টগ্রাম নারানহাটের ফজলুর রহমান। বয়স বিশ বছর; পিতৃমাতৃহীন। প্রথমে ম্যালেরিয়ায়—এখন কালাজ্বরে ভুগিতেছে।

শতকরা ৯0 জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত

মহামারীর কবলে করিমগঞ্জের রিলিফ সংগঠন

ময়মনসিংহ জেলার **করিমগঞ্জে** আবার ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হইয়াছে। এই থানার শতকরা ৯০ জন লোক আজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহাদের সকলেই প্রায় পুরানো রোগী। রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা আর ইহাদের শরীরে নাই। বার বার রোগাক্রান্ত হইবার ফলে ইহাদের স্বাস্থ্য বলিতে আর কিছু নাই। তার উপর ঔষধ পথ্য কিনিবার সঙ্গতি শেষ হইয়াছে।

কয়েকটি গ্রামের মহামারীর অবস্থা

গ্রামের নাম	বর্ত্তমান লোক সংখ্যা	আক্রান্তের সংখ্যা
আয়েলা	৬৯০	৫৭১
চাতোল	১৯৮	১৬৮
বিলপাড়া	৪৪৩	৩৮১
চানপুর	৫৯৯	৫৩৬
সাত্রাদরিয়া	৮০৮	৭৩৩
হাত্রাপাড়া	১৫০৪	১১৭৮

করিমগঞ্জ থানার ২৯টি গ্রামের আজ এই ভয়াবহ অবস্থা। রোগের জন্য লোকাভাবে বহু গ্রামে রোগীর হিসাব নেওয়া সম্ভব হইতেছেনা। **যাহারা গ্রামের রিলিফ-কর্মী, তাহারাও আজ ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িতেছে।**

এখনও পর্য্যন্ত কুইনাইন কিছু কিছু বিলি হইবার ফলে মৃত্যুহার বাড়িতে পারে নাই। কিন্তু কুইনাইনের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিলে মৃত্যুস্রোত রোধ করা যাইবে না। শুধু ঔষধই নয়, রোগীদের আজ পথ্যের একান্ত প্রয়োজন। পথ্যের অভাবে যা' তা' খাওয়ার ফলে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

জঙ্গলবাড়ীকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া পিপল্স্ রিলিফ কমিটির একটি মেডিকেল ইউনিট করিমগঞ্জ থানার ৪টি পৃথক্ কেন্দ্রে কাজ করিতেছে। কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের **জঙ্গলবাড়ী**, গুজাদিয়া ইউনিয়নের **রামগঞ্জবাজার**, করিমগঞ্জ ইউনিয়নের **কিরাতন** ও জাফরাবাদ ইউনিয়নের **জাফরাবাদ** গ্রামে এই কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কিশোরগঞ্জের এস-ডি-ওর কাছ হইতে পাওয়া ৬০ পাউণ্ড কুইনাইন এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি হইতে বিলি করা হইয়াছে। পৃথক্ কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় শিক্ষিত ভলাণ্টিয়াররা ঔষধ বিতরণের কাজ করিয়া থাকেন। স্থানীয় ডাক্তাররাও এই কাজে সাহায্য করিয়া থাকেন। জঙ্গলবাড়ীর প্রধান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পিপল্স্ রিলিফ কমিটির ডাঃ গোষ্ঠ বক্সী স্থায়ীভাবে থাকিয়া রোগীদের দেখাশোনা করেন। স্থানীয় কেন্দ্রগুলি সপ্তাহে ৫ হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকে। এই সমস্ত কেন্দ্রে দৈনিক ১ হাজার লোকের জন্য ২ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্থানীয় কেন্দ্রে গ্রামের চিকিৎসক ও জনসাধারণের সাহায্যে একটি করিয়া মেডিকেল রিলিফ কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

মেদিনীপুরে মেডিকেল রিলিফ ও গ্রাম্যজীবনের পুনর্গঠন

সম্প্রতি পিপল্স্ রিলিফ কমিটীর ডাঃ **সুবল বেরা** মেদিনীপুরের মহামারী অঞ্চলে রিলিফ কাজ করিতেছেন। তিনি মহিষাদল ও সুতাহাটায় মহামারীর প্রকোপ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধানের ফল জানাইতেছেন। মহিষাদল থানার ১১নং ইউনিয়নের মসুবিয়া গ্রামে তিনি একটী পাড়ায় ১২টী পরিবারের খবর লন। ১২টী পরিবারের ৬৪টী জন লোকের মধ্যে ৪৮ জন অসুস্থ। অর্থাৎ অসুস্থতার হার হইতেছে শতকরা পঁচাত্তর। সুতাহাটা থানার ৭নং ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে ১২টী পরিবারের ৫২ জন লোকের মধ্যে ৩০ জন অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬০ জন অসুস্থ। ঐ থানারই ১২নং ইউনিয়নের হাতিবেরিয়া গ্রামে ১২টী পরিবারের খবরে প্রকাশ পায় যে সর্বসমেত ৯৪ জনের মধ্যে ৯০ জন অর্থাৎ শতকরা ৯৬ জনই অসুস্থ। অসুখের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপই সব চাইতে বেশী।

মেদিনীপুর স্বভাবতঃই আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুর! ১৯৪২ সালের ঝড় ও প্লাবনের নিষ্ঠুর কাহিনী আমাদের স্মরণ আছে বলিয়া মেদিনীপুর দেশবাসী সকলের চিন্তাভাবনার বিষয়। ইহার উপর গত বছরের দুর্ভিক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী মহামারী মেদিনীপুরকে বিশেষতঃ কাঁথী ও তমলুক মহকুমাকে একেবারে উজাড় করিয়া দিতেছে। কাঁথী ও তমলুকের বেশীর ভাগ জায়গায় সমস্যা কেবল রোগের চিকিৎসা নয়,—পথ্য নাই, সাধারণের খাবার সংস্থান নাই, বর্ষা ও শীত হইতে বাঁচিবার মত ঘরের আশ্রয় নাই।

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী মেদিনীপুরকে রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। পিপল্স্ রিলিফ কমিটীর একটী ইউনিট তাঁহাদেরই প্রেরণায় তমলুকের পাঁশকুড়া থানায় কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ডাঃ বেরাই সেই ইউনিটের সঙ্গে আছেন। এখন প্রয়োজন মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে ইউনিট পাঠানো এবং স্থানীয় উদ্যমের ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়িয়া তোলা। পাঁশকুড়া অঞ্চলে ডাঃ বেরার প্রেরণায় ইতিমধ্যেই রোগ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় উদ্যোগ আয়োজনের সাড়া জাগিয়াছে।

বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলে এখন মহামারী, খাদ্যসঙ্কট ও গ্রাম পুনর্গঠনের সমস্যার সমগ্রভাবে সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। কাঁথী ও তমলুক মহকুমায় রামকৃষ্ণ মিশন, বেঙ্গল রিলিফ কমিটী প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী সংগঠন মারফৎ ব্যাপক রিলিফের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু একটী সামগ্রিক দৃষ্টি ও দরদের অভাবে এই সব চেষ্টায় ফল নেহাৎ সাময়িক হইয়াছে। সমস্ত রিলিফ প্রচেষ্টাকে গ্রাম্যজীবনের পুনর্গঠনের লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে স্বাবলম্বনের মনোভাব ও আন্দোলন ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ডাঃ বেরার অল্পদিনের কাজ এই পথেই সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে।

মৃত্যু-সংবাদ

ত্রিপুরা জিলার বিশিষ্ট কৃষক-কর্মী এবং কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা-সংগঠক **কমরেড নগেন্দ্র চৌধুরী** গত ৩১শে মে ৩২ বৎসর বয়সে হাঁপানী রোগে মারা গিয়াছেন। অক্লান্ত কাজ ও মধুর ব্যবহারে কমরেড চৌধুরী স্থানীয় এলাকার জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পার্টি অফিসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ত্রিপুরার জয়শ্রী গ্রামের **কমরেড ইয়াকুব আলী** গত ১১ই জুন ক্ষয় রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি কৃষক-কর্মী ও পার্টি-সভ্য ছিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার করিমগঞ্জ ইউনিয়নের কৃষক সমিতির উৎসাহী কর্মী **কমরেড হিমাংশু বিশ্বাস** মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে গত ১৪ই জুন ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছেন। গত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে কমরেড বিশ্বাস প্রাণপাত লড়িয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট থানার ডাহাপাড়া গ্রামের তরুণী মহিলাকর্মী **কমরেড শিমলা বর্মনী** গত ৩১শে মে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন। গানের প্রচার বাহিনীর উৎসাহী কর্মী হিসাবে কমরেড বর্মণী স্থানীয় অঞ্চলে মহিলাদের ভিতর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

মৃত কমরেডদের সম্মানার্থে পার্টি তাহার পতাকা অবনমিত করিতেছে।

ইহাদের রক্ষা করো

খুলনার অভয়নগর। ১০ই জুন আত্মরক্ষা সমিতির বৈঠকে দুঃস্থ মেয়েরা একে একে উঠিয়া দাঁড়ায়, নিজেদের করুণ জীবনের বৃত্তান্ত বলিতে থাকে। দিনমজুর আজগরের বুড়ী মা পরণের ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখাইয়া বলে, 'একটা বিহিত করো নইলে ইজ্জৎ ত' আর থাকে না।'

কাঙ্গালের মেয়ে সমিতির সভায় আসিয়াছে এই প্রথম। তার স্বামী বছর খানেক হইল সেই যে মিলিটারীতে কাজ নিয়াছে, তার আর কোন পাত্তা নাই। সভার এক কোন হইতে ছুটু বিবি উঠিয়া আসে। তারও স্বামী অনেকদিন হইতে নিখোঁজ। গ্রামে খাটুনি খাটিয়া যাহা পায়, তাহাতেই দুটি ছেলেকে লইয়া তাহার পেট চালাইতে হয়। গ্রামের লোকের হাতে আজ আর মুনিষ খাটাইবার পয়সা নাই। আজ ও কাল পুরা দুবেলা তাহাদের পেটে কিছুই পড়ে নাই।

আরো অন্যান্য দুঃস্থ মেয়েদের তথ্য সংগ্রহের পর, সভায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে বাঁচাইবার সংকল্প গ্রহণ করিল। খাদ্যের জন্য দল বাঁধিয়া তাহারা আন্দোলন করিবে। ছুটু বিবি ও তার দুই ছেলের জন্য সভাস্থলেই মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা হইল।

ইতিহাসের বৃহত্তম সামরিক পরাজয়

হোয়াইট রাশিয়ায় লালফৌজের দুর্নিবার অগ্রগতি

গত ২৯শে জুন রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মস্কো হইতে জানাইয়াছেন—সোভিয়েট সামরিক মহলের মতানুসারে হোয়াইট রাশিয়ায় জার্ম্মাণরা যেরূপ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা ইতিহাসে এক বৃহত্তম সামরিক পরাজয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। একজন সোভিয়েট সমরনায়ক এই সম্পর্কে সাংবাদিকদের নিকট বলেন "পৃথিবীর কোন সেনাদলই এরূপ ভাবে পরাজিত হয় নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন আমরা ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের প্রতিশোধ লইতেছি। কিন্তু ব্যাপার তাহা নহে।

জেনারেল মেরেৎস্কভ

জার্ম্মাণ সেনাদলের ভাগ্যে এখন যাহা ঘটিতেছে, আমাদিগকে তাহার ১০ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয় নাই।"

পরাজিত জার্ম্মাণ সৈন্য আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না

গত সপ্তাহে আমরা জানাইয়াছিলাম হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণ ঘাঁটি ভিটেবস্ক নগরী আবার লালফৌজের হাতে আসিয়াছে। ভিটেবস্ক নগরীর পতন সামরিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাঁটি হাতছাড়া হওয়াতে জার্ম্মাণরা আর কোথাও দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহাদের সমস্ত রক্ষাব্যূহ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই কয়েক দিনের মধ্যেই জলোবিন, ওরশা, মঘিলেভ, বব্রুইস্ক, বরিসভ, লেপেল, ডিসনা, প্লটস্ক প্রভৃতি সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলি লালফৌজ পলায়মান নাৎসীদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। ইহার পর ৩রা জুলাই যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক সহর যে কোন মুহূর্ত্তে আবার লালফৌজের হাতে আসিতে পারে এবং মিনস্ক সহর হইতে রেল দিয়া জার্ম্মাণদের পালাইবার সমস্ত পথই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লালফৌজ ঝড়ের বেগে মিনস্কের দিক আগাইয়া আসিতেছে, তাহারা সহর হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে রহিয়াছে। সোভিয়েট গোলান্দাজদের বড় বড় কামানের গোলাবর্ষণের শব্দ এখন মিনস্ক সহর হইতে শোনা যাইতেছে।

জার্ম্মাণদের ক্ষতির পরিমাণ

২৩শে জুন হইতে ২৭শে জুনের মধ্যে তৃতীয় হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টে ৩২ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত ও ২০ হাজার বন্দী হইয়াছে। ২৪শে হইতে ২৯শে জুনের মধ্যে প্রথম হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টে ৫০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত ও ২৩ হাজার বন্দী হইয়াছে এবং দ্বিতীয় হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টে ৩০ হাজার জার্ম্মাণ নিহত ও ৩ হাজারেরও উপর বন্দী হইয়াছে। ইহার পর আর একদিনের যুদ্ধেও একজন সেনাপতিসহ আবার ২ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহা ছাড়া জার্ম্মাণদের প্রচুর সমরোপকরণ নষ্ট হইয়াছে বা লালফৌজের দখলে আসিয়াছে। সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তবুও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নাৎসী বাহিনী এক দারুণ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লালফৌজের দুর্দ্দম গতিবেগকে সংহত করার শক্তি আর তাহাদের নাই।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মাভিযানে জার্ম্মাণ সৈন্যরা মিনস্ক, স্মলেনস্ক ও মস্কোর ইতিহাস বিখ্যাত পথ ধরিয়া মিনস্ক ও স্মলেনস্ক দখল করিয়াছিল এবং মস্কো জয় করিতে গিয়াছিল। সেই জয় লাভের চেষ্টা লালফৌজ অমিতবিক্রমে ব্যর্থ করিয়াছে। তিন বৎসর পরে আজ যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে। মস্কো ও স্মলেনস্ক নাৎসীদের নাগালের একদম বাইরে চলিয়া গিয়াছে, মিনস্ক সহরও তাহারা আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। মিনস্ক একদিকে যেমন হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী আবার অন্যদিকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশনও বটে। ভিলনা-গোমেল এবং ওয়ারস-স্মোলেনস্ক রেল লাইনের উপর অবস্থিত এই সহরটি হাতছাড়া হওয়ার সাথে সাথে লালফৌজের এইদিক হইতে খাস পোলাণ্ডে ঢুকিবার রাস্তা একদম পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহাছাড়া সোভিয়েট বলটিক রাষ্ট্রগুলিও আজ অধীর আগ্রহে অগ্রগামী লালফৌজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের মুক্তির দিন আসন্ন হইয়া উঠিল।

লালফৌজের আঘাতে ফিনিশ ফ্যাসিস্টরা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না

ফিনল্যাণ্ডেও মার্শাল গভোরভ ও জেনারেল মেরেৎস্কভের অভিযানে নিত্য নূতন সাফল্য আনিয়া দিতেছে। ভইবুর্গ দখলের পরও ফিনল্যাণ্ডে লালফৌজের আক্রমণ এতটুকু শিথিল হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

জেনারেল মেরেৎস্কভ ল্যাডোগা হ্রদ ও ওনেগার হ্রদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে বিরাট সাঁড়াশী আক্রমণ চালাইয়া ফিনিশ আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং কেরেলিয়ান অঞ্চলে মার্শাল গভোরভ হেলসিঙ্কির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে একজন জার্ম্মাণ সামরিক সমালোচক পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে উত্তর দিকে রুশ সেনারা ফিনদের হটাইয়া দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ম্যানারহাইমের অধীনে এখন যে সব বাছা বাছা সৈন্য রহিয়াছে সোভিয়েট সেনারা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য স্থানে স্থানে কোমর পর্য্যন্ত কাদা ভাঙ্গিয়া বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে।

জেনারেল মেরেৎস্কভের বাহিনীও নাৎসীদের বিশ্রাম দিতেছে না। ২৯শে জুনের খবরে প্রকাশ মার্শাল স্টালিন বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জেনারেল মেরেৎস্কভের প্রতি তাঁহার আদেশে বলিয়াছেন যে, কারেলিয়ান রণাঙ্গনের সৈন্যগণ ফিনিশ কারেলিয়ান সাধারণতন্ত্রের রাজধানী পেট্রোজাভোডস্ক অধিকার করিয়াছে। কোণ্ডাকতো সহর ও রেলষ্টেশনও অধিকৃত হইয়াছে।

সোভিয়েটের এই বীর বিক্রম ফিনিশ মহলে দারুণ চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যেই সন্ধির প্রস্তাবের কথা শোনা যাইতেছে। সোভিয়েটের এই আক্রমণের বেগ যতই বাড়িতে থাকিবে ততই ফিনল্যাণ্ডে যাহারা

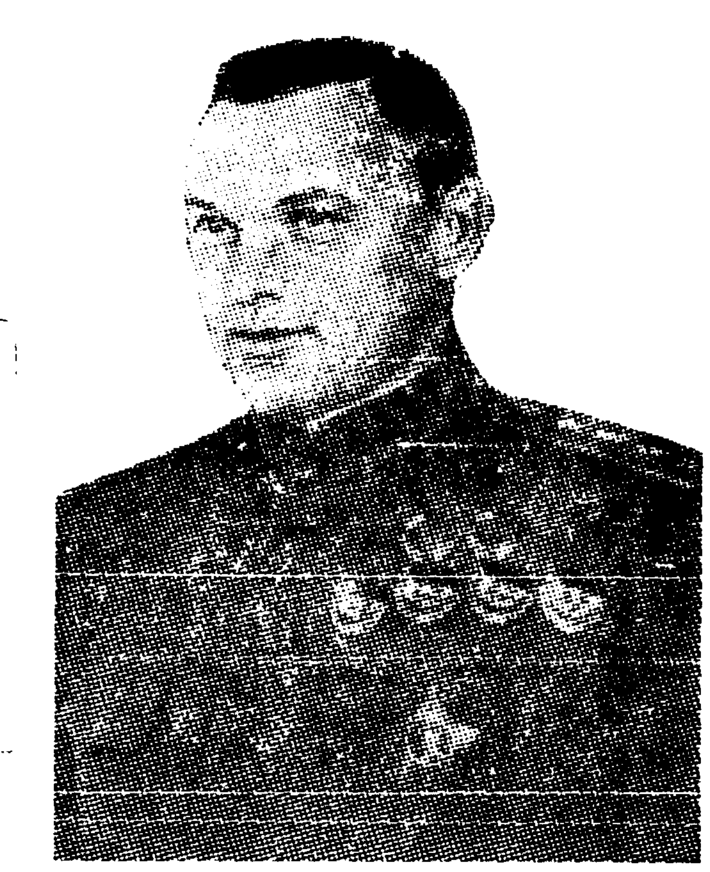

মার্শাল রকোসভস্কী

সোভিয়েটের সহিত চুক্তি চান তাঁহাদের শক্তিও বাড়িতে থাকিবে।

অবশ্য এখনও ফিনল্যাণ্ডে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিপত্তি যথেষ্টই আছে। ম্যানারহাইমের দল শান্তি প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ শান্তি হইলে তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ফিনিশ রাজনীতিতে স্থান পাইবে না। সুতরাং এই দলের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াই সোভিয়েট-ফিনিশ শান্তির ভিত গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকের দিনের লালফৌজের অভিযানের সাফল্য ও সমগ্র অধিকৃত ইয়োরোপের জনগণের জাগরণ ফিনিশ জনসাধারণের মনে সাহস আনিয়া দিতেছে এবং জনসাধারণের মনে শান্তির ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাই লালফৌজের জয় ব্যাপক হওয়ার সাথে সাথে এবং মিত্রশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্যের আঘাতে প্রতিক্রিয়াশীল ফিনিশ ফ্যাসিষ্টরা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই এবং ফিনিশ জনগণ সোভিয়েটের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেই।

জেনারেল রকোসভস্কীর মার্শাল পদ লাভ

লণ্ডন, ৩০শে জুন—মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, জেনারেল রকোসভস্কী মার্শাল পদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি প্রথম হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টের লালফৌজের নেতা। তাঁহার বয়স এখন মাত্র ৪২ বৎসর।

মার্শাল গভোরভ

লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্টের লালফৌজের সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক লিওনিড এ গভোরভ সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্ত্তৃক গত ১৮ই জুন মার্শালপদে উন্নীত হইয়াছেন। মার্শাল গভোরভের বয়স ৪৭ বৎসর। তিনি লাল-ফৌজের গোলান্দাজ বিভাগেই সর্ব্ব প্রথম সামরিক কাজ আরম্ভ করেন। এবারকার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে তিনি সামরিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪১ সালের শরৎকালে মস্কো-মিনস্ক সড়কে যখন প্রথম যুদ্ধ চলিতেছিল তিনি সেই সময়ে এই অঞ্চল রক্ষার ভার পান। সোভিয়েট রাজধানী মস্কোকে রক্ষা করার দিক দিয়া এই অঞ্চলের গুরুত্ব খুবই বেশী, মার্শাল গভোরভ তখন জেনারেল ছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ যন্ত্রবাহিনীর পথরোধ করিবার জন্য এই অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর কামান দিয়া এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ গড়িয়া তুলিলেন যাহার উপর জার্ম্মাণরা বার বার আঘাত করিয়াও কোনরূপ ফাটল ধরাইতে সক্ষম হয় নাই।

মস্কোর দ্বারদেশ হইতে যখন জার্ম্মাণদের তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় জার্ম্মাণদের হাত হইতে গভোরভের সেনাবাহিনী মোজাইস্ক সহর দখল করে। মোজাইস্কেই তখন জার্ম্মাণদের হেড কোয়ার্টার ছিল। ইহা ছাড়া তিনি তখন বরোডিনোও দখল করেন। এই বরোডিনোতেই ১৮১২ সালের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। তাঁহার সেই সাফল্যই তাঁহাকে স্মোলেনস্ক সড়কের দিকে আগাইতে সাহায্য করে।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে গভোরভকে লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্টের অধিনায়ক করা হয়। ১৯৪২ সাল ব্যাপী তিনি লেনিনগ্রাদ নগরীর রক্ষা ব্যূহ খুবই দৃঢ় করেন। জার্ম্মাণরা শত চেষ্টা করিয়াও সোভিয়েটের গোলান্দাজ বাহিনীকে হটাইতে পারে নাই।

ভলখভ ফ্রণ্টের সেনাদের সাথে এক হইয়া গভোরভের সেনাদল জার্ম্মাণদের লেনিনগ্রাদ বেষ্টনীর ভিতর ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে ফাটল আনে। ইহাতেই জেনারেল গভোরভ প্রথম শ্রেণীর 'অর্ডার অব সুভোরভ' লাভ করেন। ঠিক একবৎসর পর লেনিনগ্রাদের অবরোধ উন্মোচন করিয়া তিনি জার্ম্মাণদের নারভা ও স্কভের দিকে ঠেলিয়া নিয়া যান। ইহার জন্য তিনি দ্বিতীয়বারও এই সম্মান লাভ করেন।

যুদ্ধে কি অনুপাতে ব্যাপক ভাবে গোলাগুলি ব্যবহার করা যায়, এই বিষয়ে মার্শাল গভোরভ খুবই

দক্ষ। এবার কারেলিয়ান যোজকের সাফল্যে গভোরভের এই দক্ষতা ভাল ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

গভোরভের স্টাফ অফিসাররা বলেন যে প্রথম দৃষ্টিতে গভোরভকে খুব শান্ত ও চাপা স্বভাবের লোক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি খুবই আমুদে স্বভাবের লোক, তাঁহার ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় সবাইকে মুগ্ধ হইতে হয়।

গভোরভ খুবই পরিশ্রমী, বড় বড় অভিযানের সময় তিনি হেড কোয়ার্টারেই থাকেন। তিনি তাঁহার অভিযানের পরিকল্পনা খুবই নিখুঁত ভাবে করেন। তাঁহার স্টাফ অফিসাররা তাঁহার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন—গভোরভ নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে যতটা পরিষ্কার, মনে হয় শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি ততটা অভিজ্ঞ। (টাস্)

★ এই যুদ্ধজয়ের পথেই ★

ফরাসী ভারতের শৃঙ্খল টুটিতেছে

আলজিয়ার্স হইতে 'ফ্রেঞ্চ ন্যাশন্যাল কমিটী অব্ লিবারেশন' তথা দ্য-গলের নূতন গভর্ণমেণ্ট ফরাসী ভারতের কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়াছে: '**ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠান 'কম্বাট'-কে কাজ করিতে দাও, বাধা নিষেধের দ্বারা ইহার কাজকে ব্যাহত করিও না।**'

আরও শুনা যাইতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে নাকি 'কম্বাটের' সভাপতি পণ্ডিচেরীর বিখ্যাত জননেতা ভি-সুব্বায়ার উপর হইতে কর্ত্তৃপক্ষের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার ও 'কম্বাটের' সম্পাদক পণ্ডিচেরীর বিশিষ্ট অধ্যাপক সারাভান কোম্বারকে কলেজে পুনর্নিয়োগের আদেশও আসিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে 'জনযুদ্ধের' একটী প্রবন্ধে 'কম্বাটের' উদ্ভব এবং ইহার উপর ফরাসী ভারতের আমলাতন্ত্রের আঘাতের কথা বিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে।

পণ্ডিচেরী গভর্ণমেণ্ট পণ্ডিচেরী হইতে সুব্বায়াকে বহিষ্কার করিল। অধ্যাপক সারাভানকে পদচ্যুত করা হইল। 'কম্বাটের' অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের উপর হামলা সুরু হইল। ফরাসী ভারতের জনসাধারণের মনে তখন আসিয়াছিল গভীর হতাশা। লোকে ভাবিয়াছিল, ফরাসী মুক্তি সংসদের ঘোষিত উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, উপনিবেশিক জনগণের মুক্তির কথা এই সংসদ চিন্তা করে না।

কিন্তু ফরাসী ভারতের লোকেরা শুধু হতাশা লইয়াই বসিয়া থাকে নাই, তারা এমনভাবে আন্দোলন করিয়াছে যাতে মুক্তি সংসদই শক্তিশালী হয় এবং তারই সঙ্গে তাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে, চন্দননগর প্রভৃতি ফরাসী ভারতের বিভিন্ন জায়গা হইতে নাগরিক, ছাত্র, মহিলা, মধ্যবিত্ত, মজুর, চাষী সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হাজার হাজার গণস্বাক্ষর সহ মেমোরাণ্ডাম আলজিয়ার্স লিবারেশন কমিটির কাছে পাঠাইয়াছে।

জনগণের এই ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংহতিকেই তো লিবারেশন কমিটি গড়িয়া তুলিতে চায়। তাই ফরাসী ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল আমলাদের কাছে লিবারেশন কমিটির নির্দ্দেশ আসিল যে 'মে দিবস' পালনে কোন বাধা দেওয়া চলিবে না।

লিবারেশন কমিটী অস্থায়ী ফরাসী গভর্ণমেণ্টরূপে স্বীকৃত হইবার পর ঔপনিবেশিক জনগণের অধিকার আরো স্পষ্টভাবে স্বীকার করিবার সুবিধা পাইল। 'কম্বাট' সম্বন্ধে নির্দ্দেশই ইহার প্রমাণ।

ফরাসী ভারতে আমলারা উপরওয়ালার কাছ হইতে দমননীতি চালাইতেই চিরকাল উৎসাহ পাইয়াছে, এই ধরণের হুকুম তাদের কাছে প্রথম। সুতরাং, এই নির্দ্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভারতে রাজনীতির চাকা ঘুরিয়া গেল। জনগণের অগ্রগতির কাছে প্রতিক্রিয়াশীল আমলাদের চক্রান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

১৪ই জুলাই জন-প্রতিনিধি সম্মেলন

সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভারতের জনগণের আন্দোলন নূতন শক্তি পাইল। যে অধিকার তারা পাইয়াছে, সে অধিকারকে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে, আরো গণ-অধিকার আদায় করিতে হইবে, এই কাজে সমস্ত ফরাসী ভারতকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী ১৪ই জুলাই 'বাস্তিল দিবসে' পণ্ডিচেরীতে সমগ্র ফরাসী ভারতের জন-প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন করা ঠিক হইয়াছে। চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি জায়গাতেও আলাদা আলাদা সম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে। ফরাসী ভারতের জনগণ জয়ের পথ দেখিতে পাইয়াছে—সেই পথে তারা পাইয়াছে সমস্ত মুক্তিকামী ফরাসী জনগণকে, মিত্রশক্তির জনগণকে।

Regd. No. C. 2836

বাংলায় কমিউনিষ্টদের উপর দমননীতির চোট

এক বছর আগে বাংলায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা যতটুকু ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজ দেখা যাইতেছে আস্তে আস্তে আবার তা নষ্ট করিবার জন্ম আমলাতন্ত্র যেন বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই দমননীতি বেশী করিয়া চালানো হইতেছে কমিউনিস্টদেরই উপর। যারা দেশরক্ষার কাজে আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতার মুখোস খুলিয়া ধরে, জনসাধারণকে যারা খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্ম সংগঠিত করে।

গত দুই তিন মাসের ঘটনাতেই তাহার পরিচয় :—

২রা জুলাই কলিকাতায় যে রেশনিং সমাবেশ করা হইয়াছিল, তার অনুমতি পত্রে কলিকাতার পুলিশ কমিশনর জানাইলেন যে, **বেশী রেশন সম্বন্ধে মজুরদের উত্তেজিত করা চলিবে না।**

জুন মাসে খিদিরপুরের একটী সভার অনুমতি প্রসঙ্গে এই সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছিল যে, ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা চলিবে না।

জাতীয় সপ্তাহের সভা সম্পর্কে এই সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল যে গান্ধীমুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ চলিবে না।

কলিকাতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

৬ই এপ্রিল খিদিরপুরে একটী ঘরোয়া সভা করার জন্ম কমরেড জুড়ন গাঙ্গুলী, জলী কাউল, অজিত মিত্র, রাম সুরত সিং, মহাবীর সাহা, সুবোধ মুখার্জ্জী ও বনমালী মজুমদার—এই ৭ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহাদের মামলা এখনো চলিতেছে।

উত্তর কলিকাতার কমরেড ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার মামলাও চলিতেছে।

গতমাসের শেষ দিকে **হুগলী জেলার** বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড শিশির গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার মামলা চলিতেছে।

নদীয়ার কমরেড বিমল পালকে ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বহুদিন বিচারাধীন রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৫শে এপ্রিল **আসানসোলের** কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিজয় পাল, রমেশ চন্দ্র দে, মোহন ও স্থানীয় ৮ জন কমরেডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

তার কিছু দিন পরে **বর্দ্ধমানের** বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সতর্কতা জ্ঞাপক নোটিশ জারী করে যে, ভবিষ্যতে তিনি যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, তা হইলে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে দেওয়া হইবে।

মে মাসে **আসানসোলের** কমিউনিস্ট-কর্ম্মী কমরেড শিবপ্রসাদ দত্তের উপর সতর্কতা জ্ঞাপক নোটিশ জারী করা হয়।

রায়না থানার কমরেড মনোরঞ্জন সোম খাদ্য ফসল বাড়াও আন্দোলনের জন্ম কাজ করিতেছিলেন, তাঁকে লুট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২ মাস পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সন্তোষ মণ্ডল ও বানোয়ারী ঘোষকে ৩৮ (ক) ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ৫০৲ টাকা জরিমানা করা হয়। **বাঁকুড়ার** কমরেড প্রনথ ঘোষকে এই ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ১০০৲ টাকা জরিমানা করা হয়।

৫ই এপ্রিল **বরিশালের** কমরেড বেণু দাসগুপ্ত, কালিপদ দাস ও কানাই পতিতুণ্ডিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই মে ইহাদের তিন জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু কালিপদ দাসকে জামিন দেওয়া হয় নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের গদি বাঁচাইবার জন্ম আমলাদের উপরে যত বেশী ভরসা করিতেছেন, আমলাদের জবরদস্তি ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। মন্ত্রীমণ্ডলী কি মনে করেন, এমনি করিয়াই বাংলার খাদ্য সংকট দূর হইবে, বাংলা জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইবে?

৩000 কমিউনিষ্ট কর্মী অসুস্থ

ইঁহাদের বাঁচাইতে রেড-এড সপ্তাহ পালন কর

দেশের সংকট প্রতিরোধের জন্য কমিউনিস্ট কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে—এই আওয়াজ লইয়া ৮ মাস হইল আমরা কাজে নামিয়াছি। প্রাদেশিক হাঁসপাতালে এ পর্য্যন্ত ১৫০০ রোগীকে আউট-ডোরে চিকিৎসা করা হইয়াছে ও ১০৫ জনকে বিশ্রামাগারে ভর্ত্তি করিয়া নিরাময় করা হইয়াছে। বিভিন্ন জেলার কমরেডদের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশ পাঠাইতে ও প্রাদেশিক হাসপাতালের ব্যয় বহন করিতে এ পর্য্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির তহবিল হইতে ১৭১৫০৲ টাকা খরচ হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৭০০০৲ টাকা ও বাংলার ভিতর হইতে ৪১২১৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতার উপর পার্টি সদস্যের ভিতর হইতে নিয়মিত বাক্স আদায়ে ২৫০৲ টাকা উঠিয়াছে।

এখনও প্রায় ৩০০০ কর্মী অসুস্থ। ১৫০ জন কর্মী যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। ইঁহাদের জন্য আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।

রেড-এড কমিটি আবেদন করিতেছে—জুলাই মাসে বিভিন্ন জেলায় রেড-এড ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহের অভিযান চালাইতে হইবে। এই আবেদনে সাড়া দিয়া কলিকাতা জিলাকমিটী জুলাইএর প্রথমেই 'রেড-এড ফাণ্ড সপ্তাহ' পালন করিতেছে। তাঁহারা ৩০০০৲ টাকা তুলিবার প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন। প্রত্যেক জেলাতেই জুলাইএর ভিতর এই অভিযান চালাইতে হইবে। সংগৃহীত অর্থের একটী প্রয়োজনীয় অংশ জেলার ভিতরে চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য রাখা হইবে। বাকী অংশ প্রাদেশিক রেড-এড-কমিটীর তহবিলে আসিবে। প্রত্যেক জেলাই এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে বদ্ধপরিকর হউন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেড-এড কমিটি
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

যুদ্ধের শেষ খবর

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—জেনারেল আইজেন হাওয়ারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে শেরবুর্গ অঞ্চলে জার্ম্মানদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাধা দানও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে।

নরম্যাণ্ডিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আর্ম্মি ২০ মাইল ব্যাপী এক নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে।

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজ হোয়াইট রাশিয়ান রাজধানী মিনস্ক সহর অধিকার করিয়াছে। মিনস্ক অধিকার করাতে জার্ম্মাণদের ২ লক্ষ সৈন্য ঘেরাও হইয়াছে।

লালফৌজ পোলটস্ক সহরে জার্ম্মাণদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছে।

আসাম ব্রহ্ম ফ্রণ্ট—মিত্রসেনা জাপানীদের শক্ত ঘাঁটি। উখরুলকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে। পালেল অঞ্চলে জাপানীদের সাথে তুমুল লড়াই চলিতেছে। ৪।৭।৪৪

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪।০, ৬ মাস ২।০, ৩ মাস ১।০

বিরাট মজুর সমাবেশে দাবী রেশনিং-মাগগিভাতা-কয়লা চাই

গণদাবীতে ৮০ হাজার স্বাক্ষর — সমস্ত দেশবাসীর সমর্থন

২রা জুলাই রবিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দুপুর ২টা হইতে দলে দলে মজুরের মিছিল আসিয়া জমা হইতে লাগিল। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি, সূতাকল, ২৪ পরগণার গৌরীপুর ও বজবজের চটকল, টেক্সম্যাকো, ইছাপুর হাওড়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের মজুররা হাজারে হাজারে সভায় আসিয়াছে। কলিকাতার বাস, ট্রাম, মোটর ট্রান্সপোর্ট, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস, কর্পোরেশনের মজুররাও সভায় আসিয়াছে। প্রত্যেক ইউনিয়নের সঙ্গে তাহাদের নিজস্ব ফেষ্টুন। ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধতায় কলিকাতার বুকে সাড়া জাগিয়াছে। কলিকাতার পথে পথে ইহারা দেশপ্রেমিক সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। সভা সুরু হইবার পরও একটির পর একটি শোভাযাত্রা স্রোতের মত সভায় আসিয়াছে।

পতাকা উত্তোলন ও পতাকা অভিবাদনের পর বিপুল ধ্বনির মধ্যে সভার কাজ সুরু হয়। কমরেড আবদুল মোমিন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

গত ১৮ই জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বাংলার ৪৬টি সংগঠনের ৫০ হাজার সংঘবদ্ধ মজুরের দেড় হাজার প্রতিনিধির যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে কয়লা সংকট দূর করার জন্ম এবং ৫।০ সের রেশন ও ৩০৲ টাকা মাগগীভাতার জন্ম মজুরের দাবী ধ্বনিত হয়। এই দাবীর পক্ষে ৮০ হাজার গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে। তাহারই সমর্থনে ২রা জুলাইয়ের এই বিরাট শ্রমিক সমাবেশ।

শ্রমিকের জীবননির্বাহের ব্যয় আড়াই গুণ বাড়িয়াছে—কিন্তু মাগগীভাতা সে তুলনায় মোটেই বাড়ে নাই। সরকারী তদন্ত কমিটি ৩০৲ টাকা মাগগীভাতা বাড়ানোর রায় দিয়াছে কিন্তু তাহা এখনও চালু করা হয় নাই। জেলের কয়েদীরা পর্য্যন্ত ৭ ঘণ্টা খাটিয়া সপ্তাহে ৫।০ সের রেশন পাইতে পারে, আর মজুরশ্রেণী, যাহারা দেশরক্ষার যুদ্ধে জাতির মেরুদণ্ড, তাহাদের ৫।০ সের রেশনের দাবীতে সরকারের আপত্তি। কয়লার অভাবে দেশবাসীর দুর্দশার সীমা নাই, কলকারখানা বন্ধ হইতেছে। বর্ত্তমানে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, চটকলের ১৫-১৬ হাজার তাঁত শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে; ইহার ফলে ৬০ হইতে ৮০ হাজার মজুর বেকার হইয়া পড়িবে। কয়েকদিন আগে কয়লা কণ্ট্রোল বোর্ড হইতে বলা হইয়াছে যে, খনির মজুরদের মাহিনা বাড়াইয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে কাজ বাড়ে না। কিন্তু মূর্খ আমলাতন্ত্র বোঝে না, উৎপাদনের আসল শক্তি মজুরের দেশপ্রেমিক সংগঠন। খনির মালিকেরা খনিমজুরদের জন্ম এক একটা জেলখানা বানাইয়া রাখিয়াছে। মালিক তাহাদের উপর নানাভাবে শোষণ ও অত্যাচার চালায়। খনিমজুরের মাগগীভাতা মজুরীর উপর আসলে নামমাত্র বাড়িয়াছে। পরিবারের জন্য বোনাস পাইতে হইলে খনিমজুরদের নানারূপ অসম্মান ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয়। এই অবস্থায় আপনা আপনি উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে—এরূপ কল্পনা করাও মূর্খামি। অথচ নিজেদের জোরদার ইউনিয়ন থাকায় গিরিডি মজুররা শতকরা ২৫ ভাগ কয়লার উৎপাদন বাড়াইয়াছে।

রেশন, মাগগীভাতা ও কয়লা সংকট সমাধানের দাবী উত্থাপন করিয়া কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, মজুরদের এই দাবী আজ সমগ্র দেশের দাবী। দেশের মধ্যে আবার যে খাদ্য সংকট দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে, তাহা রোধ করার দায়িত্ব দেশের মজুর শ্রেণীকে গ্রহণ করিতে হইবে। মজুর যদি আজ দেশরক্ষার কাজে ও দেশবাসীকে বাঁচাইবার কাজে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশবাসী তাহার পিছনে দাঁড়াইবে। সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তির দুর্দমনীয় বন্যায় সমস্ত বাধা খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

কমরেড রণেন সেন তাঁহার বক্তৃতায় খনিমজুরদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করেন এবং কয়লা সংকট দূর করার জন্য খনিমজুরদের সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা দাবী করেন।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী বলেন, মজুরদের এই দাবী তাহাদের দেশপ্রেমিক দাবী। মজুররা দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে পিছপাও নয়; তাহারা গত সংকটের সময় নিজেরা না খাইয়া হাজার হাজার দেশবাসীকে ক্ষুধায় অন্ন যোগাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, খাদ্য সংকট রোধ করার জন্য মজুরের এই ন্যায্য দাবী মানিতে হইবে। মজুরকে প্রাণে মারিয়া মালিকের পকেট ভর্তি করিলে উৎপাদন পণ্ড হইবে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে। কাজেই মজুরের এই দাবীর পিছনে সমস্ত দেশবাসীকে টানিতে হইবে।

ইহার পর কমরেড ঈরশাদ, কমরেড মোল্লা, কমরেড সাদেমালি, কমরেড মহম্মদ ইসমাইল, সভাপতি কমরেড আব্দুল মোমিন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় কমরেড গঙ্গা, কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ও কয়েকজন বিড়ি ও চটকল মজুরের গানে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে।

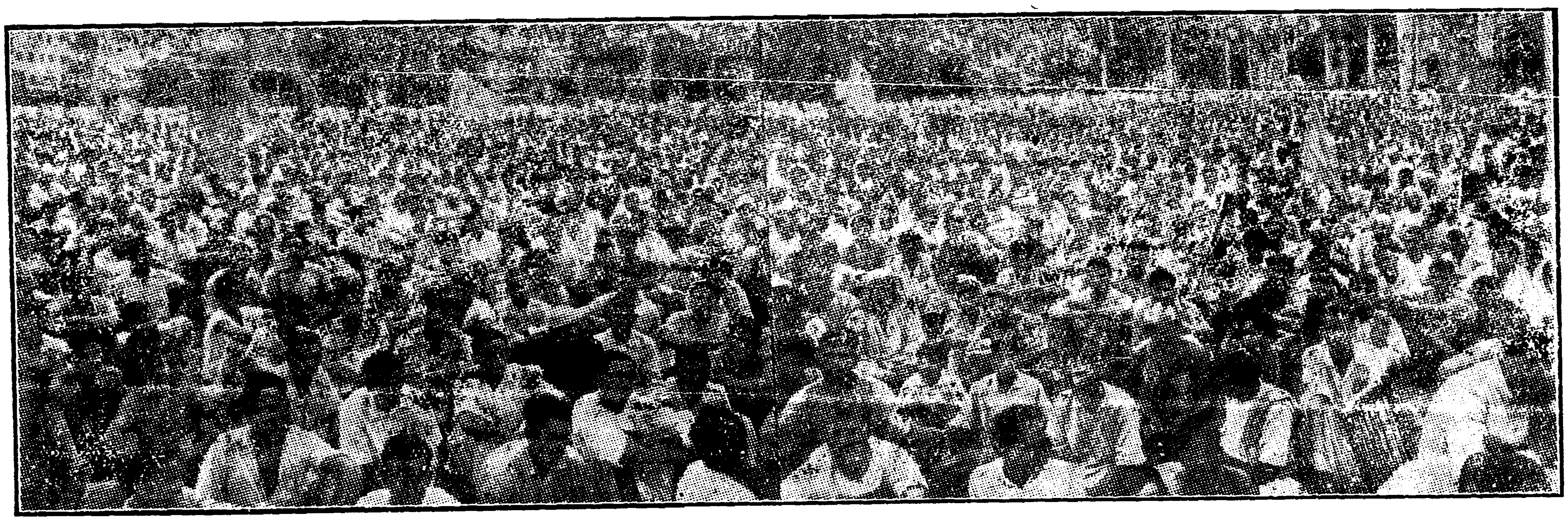

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] ১২ই জুলাই, বুধবার, '৪৪, ২৮শে আষাঢ়, '৫১ [দাম ছ' পয়সা

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য গান্ধীজির আগ্রহ

রাজাজি ও জিন্না সাহেবের পত্রালোচনা

কংগ্রেস-লীগ আপোষের জন্য রাজাজি ও জিন্না সাহেবের আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গঠনের অগ্রগতি-পথে নূতন ও উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করিল।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজির উপবাসের সময় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি তাঁহার সহিত দেখা করেন। সেই সময় লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের ভিত্তি হিসাবে তিনি গান্ধীজির কাছে কয়েকটী সর্ত্ত উপস্থিত করেন। গান্ধীজি সেই সর্ত্তে রাজি হন। তখন রাজাজি সেই সর্ত্তগুলি জিন্না সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দেন। অবশ্য ঐ সর্ত্ত যে গান্ধীজি অনুমোদন করিয়াছেন সে কথা তখন জিন্না সাহেবকে বলা হয় নাই। জিন্না সাহেব এই সর্ত্ত সম্বন্ধে নিজের মতামত দিতে রাজি হন না, তবে বলেন যে তিনি সর্ত্তগুলি লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রাজাজি মনে করেন যে জিন্না সাহেবের স্পষ্ট সমর্থন না থাকিলে ঐ সর্ত্ত লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করিয়া কোন লাভ নাই। সুতরাং তখনকার মত বিষয়টী ঐখানেই চাপা পড়িয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজিকে জিন্না সাহেবের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করিতে দিবে না দেখিয়া এই বৎসর এপ্রিল মাসে রাজাজি আবার জিন্না সাহেবের কাছে চিঠি লেখেন যে তিনি গান্ধীজির সম্মতি-ক্রমেই ও গান্ধীজির পক্ষ হইতেই আপোষের সর্ত্তগুলি উপস্থিত করিতেছেন।

নিষ্পত্তির সর্ত্ত

(১) স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নে যে সমস্ত সর্ত্ত বর্ণিত হইতেছে সেই সমস্ত সর্ত্তাধীনে মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিতেছে এবং স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অবসর কালের জন্য একটী সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনে কংগ্রেসের সহযোগিতা করিতে সম্মত আছে।

(২) যুদ্ধের পর উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের যে সকল পরস্পর সংলগ্ন জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেইগুলি স্থির করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হইবে। এইভাবে নির্দ্ধারিত অঞ্চল গুলিতে সমস্ত পূর্ণবয়স্কদের গণভোট দ্বারা বা ঐরূপ কোনো ব্যবহারিক ভিত্তিতে গণভোট দ্বারা স্থির করা হইবে যে অঞ্চলগুলি হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কি না। অধিকাংশ অধিবাসীই যদি স্থির করে যে তাহারা হিন্দুস্থান হইতে স্বতন্ত্র এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিবে তাহা হইলে তাহাই হইবে। অবশ্য সীমান্তের জেলা-গুলিকে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন একটীতে যোগ দিবার অধিকার দেওয়া হইবে।

(৩) গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে সকল দল নিজ নিজ মতামতের স্বপক্ষে প্রচার করিতে পারিবে।

(৪) যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনই স্থির হয় তাহা হইলে দেশরক্ষা, বাণিজ্য, যান-বাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পারস্পরিক নিষ্পত্তি হইবে।

(৫) ভারত শাসনের জন্য ব্রিটেন যখন পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে, কেবল তখনই এই সকল সর্ত্ত প্রযুক্ত হইবে।

এই সর্ত্তে কংগ্রেস ও লীগের আপোষে জিন্না সাহেব সম্মত হইলে তিনি লীগকে ইহাতে রাজি করাইবার চেষ্টা করিবেন এবং গান্ধীজি কংগ্রেসকে ইহাতে রাজি করাইবার চেষ্টা করিবেন ইহাও সর্ত্তের মধ্যে ছিল।

জিন্না প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই

গান্ধীজির কারামুক্তির পর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিয়া ৩০শে জুন তারিখে রাজাজি আবার জিন্না সাহেবকে তার করেন যে পূর্ব্ববর্ণিত সর্ত্তে এখনও গান্ধীজির সম্মতি আছে। ঐ সর্ত্ত ও জিন্না সাহেব যে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সে কথা এখন তিনি সাধারণের কাছে প্রকাশ করিবার অনুমতি চান। এবং প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার অনুরোধও তিনি জিন্না সাহেবকে জানান।

তাহার জবাবে জিন্না সাহেব ২রা জুলাই তারিখে রাজাজিকে তার করেন :—

> "...আমি সর্ত্তগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি এই ভুল বর্ণনা অনুচিত ও আশ্চর্য্যজনক। সত্য ঘটনা এইরূপ : যদিও সর্ত্তগুলিতে কোন অদলবদলের অবকাশ দেওয়া হয় নাই, তবুও উহা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে তাহা করিতে দিতে রাজি হন নাই। সেজন্যই আর কিছু করা হয় নাই। আমার মনোভাব ছিল যে, উক্ত সর্ত্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কোনো কিছুরই দায়িত্ব আমি ব্যক্তিগতভাবে লইতে পারি না। আজও আমার সেই মনোভাবই রহিয়াছে। এমন কি এখনও যদি গান্ধীজি সোজাসুজি আমার কাছে প্রস্তাব পাঠান তো আমি উহা লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইহাতে রাজাজি জানান গান্ধীজি এখন আবার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছেন। তাঁহার মতের প্রভাবে খুবই সম্ভব প্রস্তাবটী কংগ্রেস কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইতে পারে। জিন্না সাহেব যদি এই প্রস্তাবে নিজস্ব সমর্থন না দেন তো উহা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করিয়া লাভ হইবে না। সেজন্য তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিগত আলোচনার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন জনসাধারণকে জানানো দরকার। তাই এ বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন।

জিন্নার পক্ষে বাধা কি

শুধু ফর্ম্যাল বা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচার করিলে জিন্না সাহেবের কথা খানিকটা ঠিক। রাজাজির মারফৎ গান্ধীজি আপোষের জন্য যে সর্ত্ত পেশ করিয়াছেন তাহা কংগ্রেসের পূর্ব্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। বোম্বাইয়ে ৮ই আগষ্ট প্রস্তাবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু দুজনেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের দিল্লী সিদ্ধান্ত এখনও বজায় আছে। সেই প্রস্তাবের সার মর্ম ইহাই ছিল যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যদি আলাদা হইতে চায় তো কংগ্রেস কখনই তাহাদিগকে একই রাষ্ট্রের মধ্যে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবে না। গান্ধীজি জিন্না সাহেবের সঙ্গে আপোষের

আপোষের সম্ভাবনা শেষ হয় নাই
উহার স্বুবর্ণ স্বুযোগ আসিয়াছে
গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ চাই

সর্ত্তে এই নীতি অনুসারেই প্রস্তাব করিয়াছেন যে উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের **সমস্ত** (অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান) অধিবাসী ভোট দিয়া আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে অধিকার মানিয়া লওয়া হইবে। ইহাতে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, শুধু উহাকে আরও স্পষ্ট ও আপোষের উপযোগী করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। সে হিসাবে গান্ধীজির পক্ষে এই প্রস্তাব করা সহজ ও স্বাভাবিক।

কিন্তু লীগের গৃহীত প্রস্তাবে আছে যে, ঐ সব অঞ্চলের শুধু মুসলিম অধিবাসীরাই গণভোট দ্বারা স্থির করিবে যে অঞ্চলগুলি আলাদা হইবে কিনা। এ হিসাবে, গান্ধীজির প্রস্তাবে রাজি হইতে হইলে জিন্নাকে লীগের গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করিতে হয়। বোধহয় সেজন্যই তিনি অনুযোগ করিয়াছেন, "সর্ত্তগুলিতে কোন অদলবদলের অবকাশ দেওয়া হয় নাই" এবং বলিয়াছেন যে তিনি "ব্যক্তিগত-ভাবে সর্ত্তগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের দায়িত্ব লইতে পারেন না" কিন্তু "লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে সেগুলি পেশ করিতে প্রস্তুত আছেন।" লীগ বা জিন্না সাহেব পাকিস্তান বলিতে যাহা চাহিয়া আসিয়াছেন, গান্ধীজির প্রস্তাবে তাহার সবটা নাই—এই কারণে জিন্না সাহেব আপোষ আপত্তি তুলিলে তাহার আনুষ্ঠানিক যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

বাধা বড় না দেশ বড়

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান দুঃসহ অবস্থার দিক হইতে এই অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু? অচল অবস্থার গুরুভার আজ আরও কঠিনরূপে দেশবাসীর জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে; হিন্দু মুসলিম অনৈক্যের সুযোগে ব্রিটিশ শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপ হিন্দু মুসলমান উভয়েরই রাজনৈতিক ভাগ্যকে গুঁড়াইয়া সমভূমি করিয়া দিতেছে—অথচ ইহার বিরুদ্ধে কি কংগ্রেস কি লীগ কোন প্রতিষ্ঠানের একক চেষ্টাই হিন্দু বা মুসলমানের অধিকারকে এতটুকু প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। পীড়িত ভারতের সমগ্র জীবন আকুলভাবে দাবী করিতেছে—গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে আপোষ হোক, আমাদের দেশের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হোক, আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এতদিনের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলি। অনুষ্ঠানের প্রতি মমতা যদি সেই আকুল দাবীকেই ব্যর্থ করিয়া দেয় তো সে অনুষ্ঠান কাহার উপকারে আসিবে?

পাকিস্তান দাবী পরিপূরণের দিক হইতেও এই অনুষ্ঠানের মূল্য কোথায়? কংগ্রেসের কাছ হইতে এই দাবীর সারাংশ পূরণের প্রতিশ্রুতি ও ভরসা পাইতে হইলে কিছুটা আপোষ করিতে হইবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষা তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রসর হইতে হইবে। সে পথে না গিয়া লীগের একক চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে এই দাবী কতটুকু আদায় হইয়াছে? পাকিস্তানের বদলে ভারতের ভৌগলিক ঐক্যের ইতিহাসই জিন্না সাহেবকে শুনিতে হইয়াছে, এক চুল ক্ষমতাও মুসলমানদের হাতে হস্তান্তর হয় নাই, এমন কি পাঞ্জাবে লীগের উপরই আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের আঘাত আসিয়াছে। লীগের প্রস্তাবের প্রত্যেকটী ধারার প্রতি জিদ যদি লীগকে এই ঐক্যহীন পৃথক পথে চলিতেই বাধ্য করিতে থাকে তবে পাকিস্তানের সমস্ত সম্ভাবনাই তো নিঃশেষ হইয়া যাইবে!

গান্ধীজি কতখানি আগাইয়াছেন!

রাজাজির প্রস্তাবের মধ্যে লীগের দাবীতে কতটুকু বাদ পড়িয়াছে তাহা বড় কথা নয়; সকলের বড় কথা ইহাই যে, ঐ প্রস্তাব লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষের পথে অগ্রগতি সূচনা করিতেছে কিনা, অতীতের কলহ, সন্দেহ ও নিরাশার আবহাওয়ায় আশা ও মিলনের নূতন বাতাস বহিয়া আনিতেছে কিনা। এ কথা নিঃসন্দেহ যে প্রস্তাবটী কংগ্রেসকে লীগের অত্যন্ত নিকটে আনিয়াছে। গান্ধীজি আগষ্ট প্রস্তাবের মাত্র ১২ দিন আগে বলিয়াছিলেন "পাকিস্তানের দাবীতে যদি জিন্নাজির দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে অখণ্ড ভারতের দাবীতে আমার তেমনি দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেজন্যই (কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে—জঃ সঃ) এই অচল অবস্থা"। কিন্তু অচল অবস্থার দুর্দশা ও রাজনৈতিক বাস্তব-বোধ গান্ধীজিকে অল্পদিনের মধ্যেই ঐক্যের এমন গভীর অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে যে উপবাসের সময় হইতেই **তিনি পাকিস্তান দাবীর প্রকৃত ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইয়াছেন, আজ জেলের বাহিরে আসিয়াও সে কথা পুনরায় সমর্থন করিতেছেন, রাজাজি মারফৎ আপোষের চেষ্টা করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী পূর্ণ হইবার পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল আবহাওয়া, ইহার চেয়ে বড় গ্যারাণ্টি আর কি হইতে পারে?**

"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকা ব্যাকুল হইয়া লিখিয়াছে—আমরা রাজাজির সর্ত্তগুলির পূর্ণ বিরোধিতা করি। বাংলার হিন্দু সভার মাতব্বরেরা গান্ধীজির প্রস্তাবকে 'দুরভিসন্ধিমূলক চাল' বলিয়া এখনই তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। রাজাজির প্রস্তাব হিন্দু বনিয়াদী স্বার্থের কোটরে কোটরে এমনই আতঙ্ক জাগাইতেছে। গান্ধীজি যে লীগের একেবারে কাছে আসিয়াছেন ইহাই তাহার বড় প্রমাণ নয় কি!

গান্ধীজি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও গণভোটের অধিকার দিতে চাহিয়াছেন—ইহা তাহাদের গণতান্ত্রিক ও জরুরি অধিকার নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহাদের বিরোধিতায় গণভোটের সময় আলাদা হইবার অধিকারই হয়তো পূর্ণ হইবে না—মুসলমানদের এই যে ভয় ইহাও আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়া দূর করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। ঐক্যের যে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় পাকিস্তানের সীমানা এমন করিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় যাহাতে বহু পরিমাণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উহাতে মুসলমানের আলাদা হইবার ইচ্ছা পূর্ণ ভরসা পাইতে পারে।

এখন জিন্নাকে আগাইতে হইবে

আপোষ ও ঐক্যের আগ্রহ শুধু কংগ্রেস পক্ষ হইতেই আসিতেছে না। গান্ধীজির মুক্তির পর হইতে লীগের বিভিন্ন মহলেও বারে বারে এই আশা উচ্চারিত হইতেছে, লীগের বিভিন্ন নেতা আপোষের জন্য উদগ্রীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সেজন্যই, রাজাজির সর্ত্তে যদিও লীগের প্রস্তাবের সঙ্গে পার্থক্য আছে তবুও জিন্না সাহেব উহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু উহা যথেষ্ট নয়। এখন জিন্নাকেই আগাইয়া আসিয়া গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, খুঁটিনাটি বিরোধ মিটাইয়া লইতে হইবে, আপোষের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিয়া তুলিতে হইবে।

রাজাজি—জিন্না পত্রাবলী সম্বন্ধে বাংলার প্রধান লীগ দৈনিক "আজাদ" মন্তব্য করিয়াছে :

> "...গান্ধীজি পাকিস্তানের ভিত্তি মানিয়া লইয়াছেন, রাজাজির পত্রের এই কথাটা সত্যই একটা বিরাট আশার সংবাদ বহিয়া আনিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, খুটিনাটি মতভেদ ও বিতর্কের অবসান নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। তখন সমস্যার সমাধান হইতে দেরী হইবে না। কারণ এতদিনে এর ভিত্তভূমির সন্ধান যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন সে-ভিত্তির উপরে মীমাংসার সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারিবে না, এত বড় নিরাশাবাদী আমরা নহি।"

আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, নিপীড়িত, ক্ষমতাবঞ্চিত দেশবাসীর কাছে ইহাই একমাত্র কথা, হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে ইহাই একমাত্র কথা। রাজাজি কর্ত্তৃক পত্রাবলী প্রকাশের মধ্য দিয়া মীমাংসার আশা শেষ হয় নাই, উহার উজ্জ্বলতম সম্ভাবনা দেশের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। সমস্ত দেশবাসী আজ মীমাংসার বিপুল সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দাবী করিতেছে—জিন্না সাহেব গান্ধীজির সহিত দেখা করুন, অচল অবস্থা সমাধানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আলোচনা করুন, সমস্ত দেশবাসীর ঐকান্তিক আগ্রহই তাহাদিগকে সমাধানের পথ দেখাইয়া দিবে।

কমরেড মনোরঞ্জন সেন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ

চট্টগ্রামে সভা সমিতি বন্ধ, খাদ্যের বদলে দমননীতি

চট্টগ্রাম হইতে খবর আসিয়াছে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনোরঞ্জন সেন ৪ঠা জুলাই ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কমরেড মনোরঞ্জন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সংগঠকরূপে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় কাজ করিতেছিলেন। গত ৩রা জুলাই চট্টগ্রাম শহরে মিঃ সুরাবর্দ্দিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য যে জনসভা হয় সেই সভায় কমরেড সেন চট্টগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তার পর দিনই ধলঘাটে তিনি যখন কমিউনিস্ট কর্মীদের একটি শিক্ষাশিবির পরিচালনা করিতেছিলেন তখন গ্রেপ্তার হন।

এরপর ৭ই জুলাই কোতোয়ালী থানার অফিসার-ইন্‌চার্জ কমিউনিস্ট পার্টির উপর এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, এস্, ডি, ওর অনুমতি ছাড়া কোন সভা করা যাইবে না এবং সভার জন্য ৭ দিন পূর্ব্বে দরখাস্ত দিতে হইবে।

মনোরঞ্জনের প্রবন্ধই পরিষদের সদস্যদের চোখ খুলিল

কমরেড মনোরঞ্জন অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হইলেন কেন? অকস্মাৎ সভা ইত্যাদি বা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কেন? "পিপলস্ ওয়ারের" গত ২৮শে মে'র সংখ্যায় চট্টগ্রামের খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে মনোরঞ্জন সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধকে ভিত্তি করিয়াই গত ১৫ই জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় খাঁ বাহাদুর হাজী বাদী আহমেদ চৌধুরী চট্টগ্রাম বিভাগে অন্নাভাবের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দিও সঙ্কটের কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী জেলা—সেইজন্য চট্টগ্রামে দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। তিনি স্বীকার করেন "চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর লোক বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।" সঙ্কটের কারণ সম্বন্ধে তিনি যানবাহনের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, শীঘ্রই চট্টগ্রামের অবস্থা উন্নত হইবে।

এরপর ২রা জুলাই মিঃ সুরাবর্দ্দি চট্টগ্রাম যান এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকার সংবাদদাতার নিকট যে বিবৃতি দেন তাহাতেও বলেন "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষত যাহাদের মাসিক আয় বাঁধাধরা, তাহারা খুবই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে।"

এই সব ঘটনা পরম্পরায় ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, কমরেড মনোরঞ্জন সেনের প্রবন্ধ চট্টগ্রামের সঙ্কটের বাস্তব চিত্র জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিল এবং তাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এ দিক দিয়া কমরেড মনোরঞ্জনের প্রবন্ধ খাদ্য সংকট সমাধানে সহায়কই হইয়াছিল। এর পূর্ব্বে বাংলার গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী, এমন কি মিঃ সুরাবর্দ্দিও বার বার বলিয়াছেন যে, বাংলায় এ-বৎসর কোনও খাদ্যসঙ্কটের আশঙ্কা নাই। কমরেড সেনের প্রবন্ধ তাঁহাদের এই আশার বাণী ও আত্মসন্তুষ্টির ভাবকে রূঢ় বাস্তবতা দ্বারা চুরমার করিয়া কঠোর সত্য দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। এ ভাবে আমলাতন্ত্রের চালবাজি ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই কি কমরেড সেনের উপর দমননীতির এই আঘাত? আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়েই কি সভা সমিতি বন্ধ করা হইল?

মুসলিম লীগও সঙ্কট স্বীকার করে

চট্টগ্রামের খাদ্যসংকটের তীব্রতা আজ আর গোপন করিবার উপায় নাই। এই পত্রিকার অন্যত্র আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল তাহাতে সেখানকার সংকটের বাস্তব চিত্রের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। শুধু আমরাই নই—অন্যান্য রাজনৈতিক দল, এমন কি চট্টগ্রামের মুসলিম্ লীগও সঙ্কটকে স্বীকার করিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি ও খান বাহাদুর জালালুদ্দিন আহমদ-এর চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে সেখানকার মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে যে ইস্তাহার দেওয়া হয় তাহার কিছুটা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। "দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত চট্টগ্রাম পরিদর্শনে মাননীয় হোসেন সহীদ ছোহরওয়ার্দ্দী ও খান বাহাদুর জালালুদ্দিন আহমদ......৩রা জুলাই সোমবার বিকাল ৫ ঘটিকায় মোছলেম হলে এক বিরাট জনসভা হইবে। চট্টগ্রামে বর্ত্তমানে যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও গোমড়ক দেখা দিয়াছে জনসাধারণ স্ব স্ব এলাকায় অভাব অভিযোগাদি মন্ত্রীযুগল সমীপে পেশ করিতে দলে দলে সভায় যোগদান করিবেন। নিবেদক—চট্টগ্রাম জেলা মোছলেম লীগের পক্ষে—এ, কে, এম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সেক্রেটারী, জেলা মোছলেম লীগ।" "কক্স বাজার মহকুমার ছাত্রবৃন্দ" মন্ত্রীদ্বয়কে যে মানপত্র দান করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে "গরীব জনসাধারণ দলে দলে সামরিক কাজে যোগদান করিতেছে এবং গ্রাম্য অঞ্চলে কোন রেশনিং নাই সেইজন্যই টাকায় ৩ পোয়া করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে।" ১০ই জুলাই কলিকাতায় "পিপলস্ রিলিফ কমিটির" উদ্যোগে 'চট্টগ্রাম দিবস' পালিত হইয়াছে। এই 'দিবস'উপলক্ষে যে আবেদন পত্র প্রচারিত হয় তাহাতেও চট্টগ্রামের দারুণ খাদ্যসংকটের উল্লেখ আছে। এবং এই আবেদন পত্রে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত স্বাক্ষর করিয়াছেন লীগনেতা হবিবুল্লাহ বাহার এম্, এল, সি, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা) এম্ এল সি।

সুরাবর্দ্দি সাহেবের জবাব কি?

চট্টগ্রামের খাদ্য অবস্থা আজ সত্য সত্যই ভয়াবহ। এই অবস্থাকে মিথ্যা প্রচার কিংবা দমননীতির প্রয়োগ দ্বারা রোধ করা যায় না। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা করাই রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কমিউনিষ্ট পার্টি সেই পথেই চলিতেছে। চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট কর্মীরা সঙ্কটের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও নিরলসভাবে মজুত-বিরোধী, রেশনিং ও ফসল বাড়াও আন্দোলন চালাইতেছে। সেখানকার জেলা খাদ্য কমিটি ও বিভিন্ন গ্রাম্য খাদ্য কমিটিগুলির ভিতর কমিউনিষ্ট কর্মীদের কাজের অবদান কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে আজও লাখ লাখ মণ চাল লুক্কায়িত আছে। এই মজুত যাহাতে বাহির করা যায় তাহার জন্য কমিউনিস্টরা সভা সমিতি করিয়া প্রচার চালাইতেছিল। সভা সমিতি বন্ধ হওয়াতে মজুতদারদের অবাধ লুণ্ঠনের পথই কি পরিষ্কার হইবে না? চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে রেশনিং-এর সফলতার জন্য জনগণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা সে চেষ্টাই করিতেছিল। কমিউনিস্ট নেতার গ্রেপ্তারে কি সে আন্দোলনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না?

মিঃ সুরাবর্দ্দি তাঁহার খাদ্যনীতির সফলতা দেখিতে চান। চট্টগ্রামের সঙ্কট সমাধানের জন্যও তিনি চেষ্টা করিতেছেন। অন্ততঃ বার বার তিনি ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ যে কমুনিষ্টরা সঙ্কট সমাধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে সেই কমিউনিস্টদের নেতাকেই তাঁহার চট্টগ্রামে উপস্থিতির সময়েই গ্রেপ্তার করা হইল কেন? তিনি যদি আমলাতন্ত্রের এই উদ্ধত দমননীতিকে রোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত খাদ্যনীতি ধ্বসিয়া পড়িবে এবং দেশে যে নিদারুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে তাহার জন্য তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে।

আমলাতন্ত্র সঙ্কটের বাস্তব চিত্রকে গোপন রাখিতে পারে কিংবা দমননীতির ডাণ্ডা দ্বারা সঙ্কট সমাধানে জনগণের প্রচেষ্টাকে দমন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে। তাহাতে সঙ্কটের তীব্রতা বাড়িবে বই কমিবে না। তাই আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকেই একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে চট্টগ্রাম বিভাগে গত বৎসরের দুরবস্থার পুনরভিনয় না হয়। চট্টগ্রাম বাংলার সীমান্ত। এখানে খাদ্যসংকটের প্রচণ্ডতা সমস্ত দেশের দেশরক্ষার ব্যবস্থাকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

চট্টগ্রামে যাহাতে আর কোন মজুত লুক্কায়িত না থাকে—যাহাতে বাড়তি জেলা হইতে চাউল চালান হয় তাহার জন্য সারা বাংলা দেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। চট্টগ্রামের কমুনিষ্ট কর্মীদের উপর এবং সাধারণ ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর আমলাতন্ত্র যে আঘাত হানিতেছে তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একযোগে দণ্ডায়মান হউক। বাংলার প্রত্যেকটি নগর ও গ্রাম হইতে ধ্বনি উঠুক যে কমরেড মনোরঞ্জনের মুক্তি চাই—চট্টগ্রামে সভাসমিতির অবাধ অধিকার চাই।

৫।০ সের রেশন দাবীতে সরকারী বাধা

মজুরদিগকে ষ্ট্রাইকে ফাঁসাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র?

৪ সের চাল-আটার রেশনে মেহনতকারী মজুরদের পেট ভরে না বলিয়া তাহারা রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় হইতেই ৫।০ সের রেশনের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাদের রেশন বাড়ানো দূরে থাক সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একটা প্রেস নোট জারি করিয়াছে যে ৪ সের রেশনই মজুরদের পক্ষে যথেষ্ট। ঐ নোটে আরও শাসানো হইয়াছে: "রেশনিং সম্বন্ধে ষ্ট্রাইকে উত্তেজিত করিলে বা সাহায্য করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের স্থির নির্দ্ধারিত নীতির উপর আক্রমণ বলিয়াই ধরা হইবে। প্রাদেশিক সরকারের খাদ্য ব্যবস্থায় জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করার চেষ্টা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে ইহার বিরুদ্ধেও সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।"

গত ২রা জুলাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মাগগীভাতা ও রেশনিং সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য অনুমতি চাহিলে বোধহয় উপরোক্ত প্রেস নোটের উৎসাহেই পুলিশ কমিশনার হুকুম দেন যে, "গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত রেশনের পরিমাণ কম এই অভিযোগে কোন উত্তেজনা বা আন্দোলন" যেন সভায় না করা হয়।

অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার যদি কাহাকেও ধরিয়া আনিতে বলে তো পুলিশ কমিশনার তাহাকে বাঁধিয়া আনেন। রেশনিংয়ের উপর ষ্ট্রাইকে উত্তেজিত করিলে তবেই প্রাদেশিক সরকারের আপত্তি, কিন্তু রেশনের পরিমাণ কম এই অভিযোগে শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত আন্দোলন করিলেও পুলিশ কমিশনারের আপত্তি!

যখন প্রথম রেশনিং চালু হইয়াছিল তখন কোনো আন্দোলন ব্যতিরেকে আপনা আপনিই মজুরেরা কোনো কোনো জায়গায় ষ্ট্রাইক করে—কারণ, কম রেশনের কঠোর ও আকস্মিক আঘাত তাহাদিগকে ভাবিতে সুযোগ দেয় নাই যে, ষ্ট্রাইকের ফলে রেশনিংয়ের গলদের বদলে অতি প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থাই বিপন্ন হইতেছে, তাহার উপর দেশের উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যেখানে মজুরেরা কম সঙ্ঘবদ্ধ ও কম সচেতন সেখানেই বেশী ষ্ট্রাইক হইয়াছে। পরে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর শ্রেণীর পক্ষ হইতে কমিউনিষ্ট পার্টিই তাহাদিগকে ষ্ট্রাইক হইতে ফিরাইয়াছে, একতাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সাহায্যে রেশন বাড়াইবার দাবীকে অগ্রসর করাইয়াছে। আজ সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া পুলিশ কমিশনারই মজুরদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, অসন্তোষ প্রকাশের পথ না পাইয়া তাহারা যাহাতে আবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অশান্তি ও ষ্ট্রাইকের পথ ধরে পরোক্ষে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। চটকল মালিক, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিক প্রভৃতি অনেক দিন ধরিয়া এই জন্যই সরকারকে উস্কাইয়া আসিতেছে সে খবর আমরা আগেই জানাইয়াছি।

কিন্তু এই প্ররোচনা সত্ত্বেও রেশন বাড়াইবার জন্য মজুররা ষ্ট্রাইক করিবে না। রেশনিংয়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আজ কলিকাতা ও শহরতলীর অধিকাংশ মজুরকে একত্র করিয়াছে, এক লাখেরও বেশী মজুর রেশন বাড়ানো, মাগগিভাতা বাড়ানো প্রভৃতি দাবীর দরখাস্তে সই দিয়াছে, আরও দিবে। তাহাদের এই একতা তাহাদের দাবীকে এত জোরদার করিয়াছে যে আজ তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হইতে ষ্ট্রাইকের নিষ্ফল ও আত্মঘাতী পথে সরাইয়া দিবার অপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে—কারণ ষ্ট্রাইক হইলেই জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়, পুলিশও তাহাদের সংগঠন ও একতাকে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার সুযোগ পায়। উহাতে তাহাদের রেশনের দাবীও বিফল হইয়া যায়। কিন্তু কলিকাতা ও শহরতলীর মজুরেরা এখন আর অতীত দিনের মত অচেতন ও অসংগঠিত নয় যে, নিষ্ফল ষ্ট্রাইকের ষড়যন্ত্রে পা দিবে। তাহারা রেশনিংয়ের শান্তিপূর্ণ দাবীতে আরও বেশী একতাবদ্ধ হইবে এবং সেই একতার জোরেই ৫।০ সের রেশন আদায় করিবে।

মজুরদের যে আরও বেশী রেশন দরকার এ কথা শুধু মজুরেরাই নয়, দেশের অন্য সকলেও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১৮ই জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান এক্সিকিউটিভ অফিসার কর্পোরেশনের সভায় স্বীকার করেন যে বর্ত্তমান রেশনের পরিমাণ মজুরদের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। কংগ্রেস পন্থীর সংবাদপত্রগুলি সকলেই বেশী রেশনের দাবী সমর্থন করিয়াছে। লীগ পক্ষের প্রধান দৈনিক পত্র "আজাদ" ৪ঠা জুন লিখিয়াছে, "কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ক্রমাগত কর্ত্তৃপক্ষকে জানানো হইতেছে যে, চাউল এবং আটা সপ্তাহে ৪ সেরের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শ্রমিকদের জন্য ইহা যথেষ্ট নহে।...কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন!" মজুরদের পক্ষে জনমতের এই অভিব্যক্তিতে ঘাবড়াইয়াই পুলিশ কমিশনার এখন কোনো রকমে গায়ের জোরে (অর্থাৎ আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া) এই দাবীকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

জেলের আইন অনুসারে কয়েদীদের মধ্যে যাহারা শক্ত মেহনত করে তাহারা সপ্তাহে ৫।০ সের রেশন পায়। অথচ ইহাদের ৭-৭॥০ ঘণ্টার বেশী খাটিতে হয় না, মজুরদের প্রায়ই আরও বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। দুর্ভিক্ষ হইলে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের কাজে লাগাইয়া যে খয়রাতি খাদ্য দিবার আইন আছে সে অনুসারে শক্ত মেহনতকারীরা সপ্তাহে ৭ সের চাল ও কম মেহনতকারীরা ৫।০ সের চাল পাইতে বাধ্য। কারখানার মজুরেরা কি কয়েদী বা দুর্ভিক্ষগ্রস্তেরও অধম?

কথা উঠিয়াছে তাহারা বাড়তি খোরাকের জন্য বাজরা খাইলেই পারে। বাজরা পাইবার জন্য মজুরেরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু জীবনে কখনও তাহারা বাজরা খায় নাই, তাহার উপর আটা বা চালের চাইতে বাজরা হজম করা শক্ত ইহা ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। সহ্য করিতে পারে না ও অসুখ হইয়া পড়ে বলিয়াই বাংলার মজুর বাজরা খাইতে পারিতেছে না—বাজরা খাইয়া অসুখ করিয়া তাহারা কাজ কামাই করুক ইহাই কি সরকার চায়? বোম্বাইয়ের জনসাধারণ বাজরা নিয়মিত খায়, তবুও বোম্বাইয়ের জেলে বাজরার পরিমাণ কমাইয়া কয়েদীদিগকে হপ্তায় মাত্র দুদিন দেওয়া হইয়াছিল—কারণ তাহারা পর্য্যন্ত ইহা বেশী সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তবে বাংলার মজুর উহা কিরূপে হজম করিবে?

পুরা রেশনের অভাবে মজুরেরা বাধ্য হইয়া চোরাবাজারে চাল কিনিতেছে, সেজন্যই গ্রামের লোকেরা কলিকাতায় লুকাইয়া চাল বিক্রী করিতে আসিয়া দলে দলে ধরা পড়িতেছে।

আমরা আশা করি যে সরকার মজুরদের উপর চোখ রাঙ্গানোর বদলে তাহাদের রেশনের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করিবে।

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—ভিলনার সহিত বাহিরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। বিয়ালিষ্টক ও গ্রড্‌নোর দিকে লালফৌজ অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। জার্ম্মান সীমান্ত হইতে তাহারা আর মাত্র ৬০ মাইল দূরে রহিয়াছে। লালফৌজের এবারকার এই অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ১৪ জন জার্ম্মান জেনারেলকে বন্দী করা হইয়াছে।

আসাম ব্রহ্ম ফ্রণ্ট—উখরুল গ্রামে সমস্ত জাপানী ঘাঁটিকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। বার্ম্মা সড়কের সহর লুংলিং আবার পূব দিক হইতে চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

প্রশান্তসাগর ফ্রণ্ট—মেরিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের সইপান সম্পূর্ণভাবে মিত্র সেনার দখলে আসিয়াছে। এই স্থান জাপানের একটি বড় সামরিক ঘাঁটি ছিল।

গুয়াম দ্বীপের উপর আমেরিকান বিমান বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—অষ্টম আর্ম্মি অগ্রবর্ত্তী দল উর্ব্বাটাইডের ৮ মাইল উত্তর পূবে আসিয়া পৌছিয়াছে। পঞ্চম আর্ম্মি ভলতেরা অধিকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—বৃটিশ সেনা মেসনিল ও ব্রিতেভিল সুর ওঁদো অধিকার করিয়াছে। আমেরিকান সেনা সেইনতেনী অধিকার করিয়াছে।

লবণের সংকট চরমে উঠিয়াছে

জেলে কয়েদীর ভাগ্যে যতটুকু জোটে বাইরের লোক তার অর্দ্ধেকও পায় না

বাংলার জেলায় জেলায় লবণের অভাবে বহুদিন হইতেই হাহাকার সুরু হইয়াছে। প্রায় এক বৎসরের উপর হইল লবণের অভাবে শহর ও গ্রামের সাধারণ লোক দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে অভাবের তীব্রতা তো কমেই নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ অবস্থা এমন ভীষণ হইয়াছে যে গ্রাম হইতে গৃহস্থঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া লবণের জন্য শহরে আসিতেছে, সমস্ত দিন তীব্র রোদে দাড়ানো সত্ত্বেও একটুও লবণ যোগাড় করিতে না পারিয়া অবসন্ন দেহে আবার নিজেদের গাঁয়ে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। **টাঙ্গাইল** (ময়মনসিংহ) হইতে গত ৪ঠা জুলাই কমরেড বল্লভী বক্সী তার করিয়া আমাদের জানাইয়াছেন যে বহু দূরের গ্রাম হইতেও হাজার হাজার লোক শহরে আসিয়া জড়ো হইতেছে লবণের জন্য, অথচ কোথায় লবণ? আমাদের **ফরিদপুরের** সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—লবণের অভাবে লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। **ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ীর** খবর—প্রকাশ্য হাটে লবণ ২॥০ হইতে ৩ টাকা সের বিক্রী হয়। লবণের দারুন সংকট সম্পর্কে আমরা আরও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু খবর পাইয়াছি এবং নিত্য পাইতেছি।

সরকার মাঝে মাঝে প্রেস নোট মারফত খবর দেন—বাংলার মফঃস্বলে এত এত মন লবণ পাঠান হইয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। গত ৫ই জুনের 'বেঙ্গল উইকলীতে' প্রকাশ করা হইয়াছে—এই বৎসরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে বাংলার জেলাগুলিতে ১২৭০০০ মণ পাঠান হইয়াছে। এই হিসাব মত বাংলার প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি (কলিকাতা বাদ দিয়া) লোকের জন্য প্রতিদিন প্রত্যেকের খাতে এক ছটাকের **পাঁচ ভাগের এক ভাগের কম লবণ পড়ে।** এই হিসাব মত একজনের জন্য যাহা পড়িতেছে তাহা এত কম যে সাধারণ ভাবেও ব্যবহার করিলে ইহাতে কিছুই হয় না। অথচ সরকার জেলখানার কয়েদীর জন্য প্রতিদিন প্রত্যেকের খাতে **আধ ছটাক লবণ** দিয়া থাকে। জেলখানায় যে লবণ দেওয়া হয় তাহাতেও কয়েদীদের সঙ্কুলান হয় না, যদিও তাহাদের একত্র অনেক লোকের পাকের সুবিধাটি আছে। অথচ সাধারণ লোকের জন্য যে হারে লবণ সরবরাহ করা হইতেছে, তা কয়েদীর খোরাকের চেয়েও কম। কয়েদীর বেলায় আধ ছটাক বরাদ্দ থাকিলেও বাইরের সাধারণ পরিবারের লোকের ঠিক তাহাতে চলিতে চায় না। গাঁয়ের লোকের হাল বলদ আছে, অনেকের দুধের গরুও আছে। লবণ ছাড়া এদেরও চলেনা। সুতরাং লবণ অভাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে দারুণ সংকট ঘনাইয়া আসিতেছে।

এই লবণ সংকটে দুইটী জিনিষ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে,—সরকারী সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য এবং যে লবণ মফঃস্বলে পাঠান হইতেছে তাহাও **সবখানি** জনসাধারণ পাইতেছে না, অনেকাংশই চোরাকারবারীদের খপ্পরে পড়িতেছে। আমরা এমন বহু সংবাদ পাইয়াছি যাহাতে জানা যায় যে শত শত মন লবণ দেশপ্রেমিকদের চেষ্টায় মজুতদারদের হাত হইতে বাহির হইয়াছে।

সরবরাহ কম হইলেও যদি এই সমস্ত মজুত লবণ চোরাকারবারীর হাত হইতে উদ্ধার করা হয় তা হইলে তবু অভাব খানিকটা মিটে। সরকার ফতোয়া জারীর দিকে বেশী নজর না দিয়া মজুত লবণের উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন, লবণের রেশনিং চালু করিয়া চোরাকারবারের পথ বন্ধ করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হইতে কত লবণ পাওয়া যাইতেছে, তা সরকার খোলাখুলি জানান; তা হইলে চোরাকারবার কোথায় চলিতেছে, তা জনসাধারণই বুঝিতে পারিবে এবং তাকে বন্ধ করিতে পারিবে।

চোরাকারবারীদের হাতে লবণ

●

কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন গত ৪ঠা জুলাই **রংপুর** হইতে জানাইতেছেন:—সরকারী লবণের গুদাম হইতে লবণ চোরাবাজারে বিক্রী হইতেছে সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ৪০ বস্তা লবণের হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। সদর মহকুমা খাদ্য কমিটির যুগ্ম-সম্পাদকের উপস্থিতিতে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া উহা জানিতে পারেন।

★

কমরেড জলধর পাল **ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ী** হইতে জানাইতেছেন:—২৮,৬,৪৪ তারিখ রাত্রে ২॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় চোরাকারবারী প্রহ্লাদচন্দ্র পাল পূর্ব্বধলা থানার গোয়াতলা বাজার হইতে নৌকা পথে ১৪ বস্তা লবণ ও ২ বস্তা চিনি আমদানী করে। নৌকা নদীর ঘাটে ভিরাইয়া যখন লবণ ও চিনি গুদামে তুলিতে থাকে তখন কমিউনিস্ট কর্মীরা তাহা আটক করে। আটক করিয়া দেখা গেল ১০ বস্তা লবণ গোষ্ঠ বিহারী কুণ্ডের গুদামে কাপাসের তূলার খাঁচার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছে এবং বাকী নৌকায়। এই অবস্থায় আটক করিয়া ফুড কমিটির সভ্য ও জুট অফিসারকে সংবাদ দেওয়া হয়, তারপর, থানার দারোগা দ্বারা লবণ ও চিনি আটক করা হয়। উক্ত চোরাকারবারীকে থানায় জবানবন্দী নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পাইলেই মামলা রুজু করা হইবে।

★

শ্রীহট্টের বালাগঞ্জ জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় জানাইতেছেন:—

গত ১২ই জুন বালাগঞ্জ জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ফেচুগঞ্জে ১০০০/ হাজার মণ লবণ ধরা হইয়াছে। থানার অফিসারগণ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, খবর পাইয়াও লবণ ধরার ব্যবস্থা করেন নাই। ডেপুটি কমিশনারকে খবর দেওয়ার পর ঐ লবণ ধরা পরে। আগেও ঠিক এই ভাবে বালাগঞ্জ ঘাট ছাড়াইয়া আসার পর ফেচুগঞ্জে ৪৪৮/মণ সাপ্লাই ইনস্পেক্টার কর্ত্তৃক ধৃত হয়। এই সব লবণ বিলির জন্য ডেপুটি কমিশনারের কাছে গেলে পর তিনি জানান যে ইহা অবিলম্বেই বিলি করা হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পরে জানান যে এই লবণের মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই লবণ বিলি হইবে না। লোকে আজ তিন মাস যাবৎ লবণ পাইতেছেনা আর ১৪৪৮/ মণ লবণ অতিরিক্ত হাতে থাকা সত্ত্বেও আইনের ফাঁকে জনসাধারণের এই অসুবিধা সৃষ্টি করা হইতেছে। ২১।৬।৪৪

কলিকাতায় আবার দুঃস্থের দল

সরকার ইহার প্রতিকারের জন্য কি করিতেছে?

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের একটী খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি রাজস্ব সচিবের সভাপতিত্বে কলিকাতা, ২৪ পরগণা প্রভৃতির বড় বড় আমলাদের ও রেলের কর্ত্তৃপক্ষের একটী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সেই সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল এই যে, পার্শ্ববর্ত্তী জেলা হইতে সম্প্রতি বিস্তর লোক বিনা টিকিটে কলিকাতায় আসিয়া জুটিতেছে, তার ফলে কলিকাতার দুর্গতদের মধ্যে রিলিফের কার্য্য পরিচালনার পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে, সুতরাং ইহার প্রতিকার দরকার।

বাহির হইতে কারা বিনা টিকিটে কলিকাতায় আসিয়া জুটিতেছে, তা প্রচার বিভাগ স্পষ্ট করিয়া বলে নাই। ইহারা যে সখের যাত্রী নয়, তা যে কোনো লোকই বুঝিতে পারে। গত বছরে যারা হাজারে হাজারে কলিকাতায় দু-মুঠি অন্নের জন্য আসিয়া জুটিয়াছিল, এবার অল্প হইলেও সেই রকম লোকই আসিতেছে। কলিকাতাবাসী গৃহস্থের দুয়ারে আবার দু'চার জন করিয়া অন্নের কাঙ্গালের চীৎকার শোনা যাইতেছে। অর্থাৎ কলিকাতায় আবার দুঃস্থের সমাগম সুরু হইয়াছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকাও স্বীকার করিয়াছে যে দুঃস্থ সমস্যা আবার দেখা দিতেছে।

ইহার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার নিশ্চয়ই। কিন্তু রাজস্ব সচিব যে সম্মেলন করিলেন, তাহাতে এই সমস্যার প্রতিকারের চেষ্টা হইয়াছে, না সমস্যাটাকে কোন রকমে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাই আমরা জিজ্ঞাসা করি।

প্রথমতঃ, এই সব লোকেরা যে দুঃস্থ হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে, সে কথাটার উপর সম্মেলন বিশেষ জোর দেয় নাই। তাই কি করিয়া দুঃস্থ সমস্যা ঘোচান যায়, সেই চিন্তার চেয়ে সম্মেলন বেশী করিয়া ভাবিয়াছে কি করিয়া দুঃস্থদের জবরদস্তি কলিকাতা হইতে ভাগান যায়। সম্মেলনে ঠিক করিয়াছে যে যাহাতে এই সব লোকেরা বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়িতে না পারে তার জন্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং হোম গার্ডের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা করিতে হইবে। কলিকাতার লঙ্গরখানায় আরো কড়াকড়ি করা ও ভবঘুরে আইন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার, ইহাও সম্মেলন সুপারিশ করিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা দুঃস্থের ভীড় হইতে বাঁচিবে। কিন্তু তাতেই তো আর সমস্যার সমাধান হইল না। কলিকাতার বদলে নিজেদের গ্রামে গ্রামে দুঃস্থরা ধুঁকিয়া মরিবে। যতক্ষণ না প্রত্যেক দুর্গত অঞ্চলে দুঃস্থদের সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, ততক্ষণ এই কড়াকড়ি অযথা জুলুমের বহরই বাড়াইবে, সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করিবেনা।

সম্মেলন এ কথাটাও অবশ্য বলিয়াছে যে দুর্গত অঞ্চলে আরো সাহায্য দেওয়া দরকার এবং ওয়ার্ক হাউসও আরো খোলা দরকার। কিন্তু এই রকম সাধারণ ঘোষণা আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। আরো ওয়ার্ক-হাউস খোলার প্রয়োজনটা যদি জরুরী বলিয়া এবং দুঃস্থ-সমস্যা সমাধানের কার্য্যকরী উপায় বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, তবে তার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা এই সম্মেলন হইতে করা যাইতে পারিত না কি? কিন্তু সেদিকে যে রাজস্ব সচিব বা আমলাদের বিশেষ দৃষ্টি নাই, তা বিভিন্ন জেলার ওয়ার্ক হাউসের অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যায়। ২৪ পরগণা, হাওড়া হইতেই বেশী দুঃস্থ কলিকাতায় আসে—অথচ এই দুইটী জেলায় সামান্য কয়েকটী মাত্র ওয়ার্ক-হাউস আছে। ওয়ার্ক-হাউস বাড়ান দূরে থাক, এই সময়েই ফরিদপুরের একটী ওয়ার্ক-হাউস বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

আসলে, রাজস্ব সচিব ও এই আমলারা চাহিয়াছেন কোন রকমে কলিকাতায় যেন ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে না হয়। কেননা, তাহা হইলেই তাঁদের অর্দ্ধেক দায়িত্ব কাটিয়া যাইবে।

এই দায়িত্বহীনতাই দুঃস্থের সমস্যাকে আরো বড় করিয়া তুলিবে। যে কাজটী মন্ত্রীমণ্ডলী ও আমলারা এড়াইয়া যাইতেছে, সেই কাজটীরই জন্য আজ জনসাধারণকে জোর আন্দোলন করিতে হইবে—**জেলায় জেলায় ওয়ার্ক-হাউস বাড়াইতে হইবে, দুঃস্থদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, তবেই দুঃস্থের ভীড় কমিবে।**

নোয়াখালীর চিঠি

রেশনিং পণ্ড করিতে আমলাদের চক্রান্ত

খাদ্য কমিটির যোগাযোগে রেশনিং চালু করিতে আন্দোলন

গত ২৬শে জুন কল্যাণ হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য নোয়াখালি হইতে জানাইতেছেন:—

মিউনিসিপ্যাল রেশনিং ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের জুলুম এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রেশনিং চালু করার জন্য যেসব খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে তাতে প্রত্যেক দল যোগ দিয়াছে এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রত্যেক দলের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের ও প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি ৩ দিনের আলোচনার পর এক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং যাদের আয়ত্বে রাখিতে পারিবেন তেমন দোকানদারের একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। শহরের ১৬।১৭ হাজার লোকের মধ্যে বণ্টন করার জন্য তাঁরা ৩০ জন খুচরা ও ৬ জন পাইকারী দোকানদারকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এদের অনেকের নাকি লাইসেন্স নাই। লাইসেন্স জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মঞ্জুর করিতে পারেন। এটা সামান্য একটা মামুলী প্রশ্ন। এই তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটীতে কর্ত্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে অনুমোদিতও হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হঠাৎ ডিগ্‌বাজী

অথচ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রাতারাতি মত পরিবর্ত্তন করেন। সিভিল সাপ্লাই অফিস তাঁর মাথায় লাইসেন্সের মামুলী প্রশ্নটা ঢুকাইয়া দেয়।

আসল ব্যাপার এটা নয়। স্থানীয় আমলাদের মনমত একটা তালিকা কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এইসব দোকানদারদের ভিতর অনেকে চোরাকারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় কমিটি এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে গ্রহণ করে। স্থানীয় আমলাতন্ত্রের গররাজী হওয়ার ইহাই প্রকৃত অজুহাত। এ কারণেই কমিটির যোগাযোগে রেশনিং প্রবর্ত্তন করিতে তাঁহারা নারাজ। এদিকে কমিটিগুলি কিন্তু রেশনিং চালু করার প্রাথমিক সব ব্যাবস্থা ঠিক করিয়া বসিয়া আছে।

আমলাতন্ত্র গররাজি, জনগণকে এড়াইয়া চলিতে চায়

আসল মৎলব—সভ্যগণ যেন ইস্তফা দেন এবং এর ফলে যেন রেশনিং ব্যর্থ হয়। যেসব গণসংগঠন আজ মুনাফাখোরদের সজোরে আঘাত করিতে প্রস্তুত—যাঁরা জনগণের রেশন ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে অগ্রসর—উহাদের হটাইয়া দেবার ইহাই শেষ প্রচেষ্টা।

কিন্তু আমাদের কমিটিগুলি হটিবে না। তাঁরা জানেন, এই চোরাবাজার আমলাতন্ত্রের একটা খুঁটী। তাঁদের তালিকাখানা গ্রহণ করার জন্য আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করাইতে পারিলে জনগণের একটা প্রকৃত জয় হইবে। তাই কেন্দ্রীয় কমিটি পুনরায় প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটির মত চান। প্রত্যেকটা কমিটি এককণ্ঠে আবার ঐ তালিকা অনুমোদন করিয়া পাঠান এবং জেলা-কর্ত্তৃপক্ষকে লাইসেন্স মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানান। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটি জেলাকর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই ব্যাপার পুনর্বিবেচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

জনসাধারণের প্রতিবাদ

শহরের জনগণ আমলাতন্ত্রের এই জুলুমের প্রতিবাদে আগাইয়া আসে। সারাদিনের অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ২৪শে জুন শনিবার নবীন উকিল শ্রীনরহরি সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৪৫০ লোকের এক জনসভায় কমিটির কাজে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। **সভায় লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আমলাতান্ত্রিক কারসাজির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দেন।** আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি। প্রস্তাবে বলা হয়—ফুড কমিটির কার্য্যে জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা আ , আমলাতন্ত্রের কাজে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে একটী সর্বদলীয় ডেপুটেশন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবটী সমর্থন করিতে উঠিয়া জেলা লীগের সহ-সভাপতি মৌঃ মহাম্মদ সেকান্দর সাহেব বলেন, "গত ৩ দিন যাবৎ কমিউনিস্ট যুবকগণ এই ব্যাপার নিয়া যে তুমুল উদ্দীপনামূলক আন্দোলন করিয়াছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। যেসব কমিটিগুলিতে জনগণের নেতারা মিলিত হইয়াছেন, উহার পেছনে জনগণ নিশ্চয় সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে।" জেলার বিশিষ্ট দুইজন কংগ্রেস নেতা, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রস্তাব সমর্থনে বলেন, "যে পর্য্যন্ত আমলাতান্ত্রিক আস্ফালন বন্ধ না হয় ততদিন জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।" কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হইতে শ্রীযুক্ত অসিত রঞ্জন ঘোষ প্রস্তাবের পক্ষে বলেন। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের এই আন্দোলন জয়লাভ করিবেই।

মহামারী সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা

৮টি জেলায় বসন্তের প্রকোপ

কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং জলপাইগুড়ী জেলাতে বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাংলা সরকার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি অস্থায়ী বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

চট্টগ্রামে শতকরা ৩০ জন অর্দ্ধাহারে

অথচ, লক্ষ লক্ষ মণ চাল আজও মজুতদারের ঘরে

চট্টগ্রাম শহরে ও সারা জেলায় চাউলের দর অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। গত সংখ্যায় আমরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চাউলের দর সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছি। স্থানীয় কৃষক কর্মীদের খবরে প্রকাশ, জেলার শতকরা ৩০ জন লোক এখন হইতে একবেলা অনাহারে দিন কাটাইতেছে; আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে শতকরা ৫৫ জন কৃষকের ঘরে এক কণা খাদ্য থাকিবে না।

প্রায় ৩ লক্ষ লোক কুলির কাজ করিতেছে

খাদ্য সংকটের ফলে দুঃস্থ গ্রামবাসীরা দলে দলে মিলিটারীতে কুলির কাজ নিয়াছে। **ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ হইবে।** ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক মেয়ে মজুর আছে। ঘুঁষের দৌরাত্মে মেয়ে কুলিরা দিনে ||৵০|৶০ আনার বেশী রোজগার করিতে পারে না। এই স্বল্প মজুরীতে বাজারের চড়া দরে দুবেলা সংসার নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই পেটের দায়ে চট্টগ্রামের অসংখ্য মেয়ে কুলি আজ দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে।

মজুত চাল উদ্ধারের ব্যবস্থা কই?

এবার জেলায় ৭০ লক্ষ মণ আমনের ফসল হইয়াছিল। কাজেই এই পরিমাণ চালে চট্টগ্রামের ২০ লক্ষ অধিবাসীর বড় জোর ৮ মাস চলিতে পারে। আমন ধান উঠার পর ৭ মাস কাটিয়া গিয়াছে—কাজেই **জেলার সীমানার ভিতরে নিশ্চয়ই এখনও বিশ লক্ষ লোকের এক মাসের খোরাকী চাল মজুত আছে।** তাছাড়া গত ছয় মাস যাবৎ শহরের ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য রেশন প্রথা চালু আছে। রেশনের চাল সমস্তই বাহির হইতে আসে। কাজেই ইহার ফলে গত ৬ মাসে **১ লক্ষ ১৩ হাজার মণ চাল** বাঁচিয়াছে। এই ফসলের অধিকাংশই আজ জমিদার ও জোতদারদের হাতে। **কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ মণ মজুত চাল উদ্ধারের জন্য সরকার হইতে আজ পর্যন্ত কোনই চেষ্টা হয় নাই। সরকার মাত্র ৭৪ হাজার মণ ধান এপর্যন্ত আটক করিয়াই খালাস।**

সরকারী স্টক

সরকারী কর্তৃপক্ষ উদ্বৃত্ত চাল খরিদ করিয়া স্থানীয় ভাবে মজুত করার কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই—হয়ত তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। ইহার ফলে অবাধে মজুতদারী চলিয়াছে। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলির হাটে বাজারে যথেষ্ট ধানচাল আসিয়াছিল। কিন্তু সরকার এই সময় হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। কাজেই **গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা এই সমস্ত ধান চাল তখন প্রচুরভাবে কিনিয়া রাখে।** এখন তাহারাই ধানচাল আটকাইয়া রাখিয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতেছে। **সরকারের মজুত ষ্টক কি পরিমাণ আছে, তাহা জনসাধারণ জানে না।** গত মে মাসে খাদ্য কমিটির এক মিটিংয়ে জানা যায়, একদিন শহরে সরকারী গুদামে মাত্র ৫ হাজার মণ চাল মজুত ছিল—অথচ শহরের ৭৫ হাজার লোকের জন্য তখন রেশন প্রথা চালু হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, **জেলায় সরকারের আমদানী আশাপ্রদ নয়।**

রেশনিং

চট্টগ্রাম শহরের ৭৫ হাজার লোকের জন্য রেশনিং চালু হইয়াছে। সরকার হইতে গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিংয়েরও উদ্যোগ চলিয়াছে।

যাহাদের চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে হয় না অথবা যাহারা চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে অপারগ তাহারা সকলের আগে রেশনিংয়ের সুবিধা পাইবে।

সরকার হইতে পিপ্‌লস ফুড কমিটিকে এই শ্রেণীর লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা হয়। এই তালিকা হইতে দেখা যায়, গ্রামের শতকরা ২০ জনই এই শ্রেণীতে পড়ে। গ্রামে পূর্ব নির্ধারিত শতকরা ২০ জনের রেশন প্রথাই জোর করিয়া বজায় রাখার জন্য সরকার হইতে নির্দেশ হয় যে, **পরিবার পিছু মাত্র ২ জন লোক রেশন পাইবে।**

রেশনিংয়ের গলদ

গ্রামের শতকরা ৫৫ জনের আজ রেশনের প্রয়োজন। কিন্তু শতকরা মাত্র ২০ জনের জন্য রেশন প্রথা বরাদ্দ হওয়ায়, বাকি শতকরা ৩৫ জনের আজ চোরাবাজার একমাত্র ভরসা;—ইহারা অর্ধাহারে আজ দিন কাটাইতেছে। দোকানদাররা স্বভাবতই গ্রামের এক একজন অর্থবান লোক। ইহাদের অধিকাংশই মুনাফাখোর। যেখানে ফুড কমিটিগুলি দুর্বল ও মজুতদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে মজুতদারদের দুর্নীতির অন্ত নাই—তাহারা খারাপ চাল ত' দেয়ই তাছাড়া, কন্‌ট্রোল অপেক্ষা বেশী দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করে। শহরেও রেশনের চাল মাঝে মাঝে খুবই খারাপ হয়। ইহার বিরুদ্ধে শহরবাসীর আপত্তির ফলে **সরকার শহরের এই খারাপ চাল গ্রামাঞ্চলে চালান দিতে সুরু করিয়াছে!**

ফুড কমিটিগুলি তেমন জোরদার না হওয়ার ফলে খাদ্যব্যবস্থার এই সমস্ত দুর্নীতি দূর হইতেছে না। ফলে বহু জায়গায় জনসাধারণ এই সমস্ত ফুড কমিটির বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। জনসাধারণের এই অসন্তোষের আরেকটি কারণ, কাহারা সকলের আগে রেশনের সুবিধা পাইবে সে সম্বন্ধে সরকার কোন বাঁধাবাঁধি নীতি সাব্যস্ত করে নাই। ফুড কমিটির তালিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে।

শুধু অর্ধেক লোকের রেশনেই যথেষ্ট নয়

গ্রামের অর্ধেক লোকের রেশনপ্রথায়ও সমস্যা মিটিবে না। রেশনের দরে খাদ্যদ্রব্য কেনারও ক্ষমতা অনেকের নাই। **কিছু লোকের জন্য শস্তায় ও কিছু লোকের জন্য মাগ্‌না খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।** চট্টগ্রাম জেলায় সরকার হইতে ১১৮টি ওয়ার্ক হাউস খোলা হইয়াছে। যাহারা এখানে খাটে পুরা খোরাকী পায় না; অনভিজ্ঞ লোক কাজ পায় না। রেশনের দোকানদাররাই আসলে অনেক ওয়ার্কহাউসের মাতব্বর। ইহাদের অনেকে ওয়ার্কহাউসের বরাদ্দ খাদ্য হইতে বেশ কিছু আত্মসাৎ করে ও দুঃস্থদের উপর দুর্ব্যবহার করে। ফলে অনেক সময় দারুণ অভাবগ্রস্ত লোকও ওয়ার্কহাউসে আসিতে চায় না। ওয়ার্কহাউসে দুঃস্থদের ভিড় না হওয়ায় স্থানীয় আমলারা সংকট সম্বন্ধে আরও উদাসীন হইবার ছুতা পাইয়াছে। সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি গোপন সার্কুলারে জানাইয়াছেন, ওয়ার্কহাউসে সরকার হইতে যাহা খরচ হয়, তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ যদি ওয়ার্কহাউস হইতে উঠিয়া না আসে, তাহা হইলে ওয়ার্কহাউস বন্ধ করিয়া তাহার বদলে লঙ্গরখানা খোলা হইবে।

সরকারও সংকটের গুরুত্ব স্বীকার করিতেছে

সরকার যে খাদ্যসংকটের গুরুত্ব স্বীকার করিতেছে, তাহা লঙ্গরখানা খোলার এই প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায়। জেলা ফুড কমিটির এক মিটিংয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই "চট্টগ্রাম দুর্ভিক্ষ দিবস' পালনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই দিবস **সম্প্রতি পালিতও হইয়াছে।**

মজুর, বীজধান ও গরুর অভাবে এবার আউশের ফসল শতকরা ১৫ ভাগেরও কম হইবে।

উপরের তথ্যগুলি হইতে বোঝা যায়, চট্টগ্রামে এক ভয়াবহ খাদ্যসংকট নামিয়া আসিতেছে। ইহার লক্ষণগুলি আজ খুব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে।

চট্টগ্রামকে বাঁচাও

চট্টগ্রাম শহরে এবং ফটিকছড়ি, রাওজান ও পটিয়া থানার বহু অঞ্চলে খাদ্য কমিটির মধ্যে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দল আজ মিলিত হইয়া খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করিতেছে; মজুতদারীর চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া জনগণ নিজেদের শক্তিতে খাদ্য আদায় করিতেছে। চট্টগ্রামের কৃষক গত বছরের দুর্ভিক্ষে দলে দলে নিঃশেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম মরে নাই। দুর্বল শরীরে তাহারা মাঠে মাঠে ফসল বাড়াইয়াছে।

চট্টগ্রামকে আমরা যদি দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচাইতে পারি, বাংলা রক্ষা পাইবে। বাংলার প্রত্যেক দেশপ্রেমিক চট্টগ্রামকে বাঁচানোর শপথ নিন।

এখন তো কয়লা আনার ওয়াগনের অভাব নাই

তবু কয়লার দুঃখ দূর হয় না কেন?

ভারতে উৎপন্ন কয়লার চার ভাগের তিন ভাগ বাংলার বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা ও বিহারের মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমায় উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের দূরত্ব কলিকাতা হইতে মাত্র দেড়শত মাইল। কলিকাতার সহিত এই অঞ্চলের যানবাহনের ব্যবস্থাও খুব ভাল। বাংলার এত কাছে খনি-অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও বাংলায় কয়লার অভাব দূর হয় না কেন?

গত বছরের জানুয়ারী মাস হইতে কয়লাভাব দেখা যায় এবং আগষ্ট মাস হইতে বাংলার শিল্পগুলি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে চটকলগুলি এক সপ্তাহ করিয়া বন্ধ থাকিয়াছে। ৮০ ওয়াগণের জায়গায় ৩২।৩৪ ওয়াগণের বেশী কয়লা চটকলে আসে নাই। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মার্কিনী অর্ডার শেষ করিবার কথা ছিল, কিন্তু মার্চ্চ-এপ্রিলের আগে চটকলগুলি সে অর্ডার ডেলিভারি দিতে পারে নাই। গত বছর ঢাকেশ্বরী মিল দুই মাস ও কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল একমাস একেবারে বন্ধ ছিল।

কয়লা কনট্রোল বোর্ড বসিবার পর সরকার সকলকে আশ্বাস দিয়াছিল, এবার কয়লার দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু দুঃখ তো ঘুচেই নাই, বরং দুঃখ আরো বাড়িয়াছে। কলিকাতায় সাধারণ অবস্থায় ১০০ ওয়াগণ কয়লা দৈনিক আসিত। এখন আসিতেছে মাত্র ৪০ ওয়াগণ। সরকার হাল ছাড়িয়া দিয়া লোককে বলিতেছেন, "কাঠ ব্যবহার করিয়া কাজ চালাও।" কারখানার অবস্থাও তথৈবচ। ছোটখাট অনেক লোহা কারখানা উঠিয়া গেল। সরকার কৈফিয়ৎ দিলেন—ছোট কারখানায় লাভ নাই। চটকলও উঠিবার সম্ভাবনা। ৬ই জুলাইয়ের 'ক্যাপিটাল' বলিতেছে—চটকলে কয়লার অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে, আরো অনেকগুলি মিল বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাগজকলে পয়দা কমিয়াছে। ইলেকট্রিকের পয়দাও কমিয়াছে।

এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?

কয়লার উৎপাদন কমিবার সর্বপ্রধান কারণ হইল—অন্যান্য শিল্পের মজুরদের তুলনায় খনি মজুরদের হাল অনেক বেশী জঘন্য। যুদ্ধের অগ্নিমূল্যের বাজারে তাহাদের কয়লা কাটিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। অথচ অন্যান্য শিল্পে, এমন কি চাষবাসেও বর্তমান দিনে কয়লা-কাটার চাইতে অনেক বেশী রোজগারের সুবিধা আছে। সেজন্যই খনি মজুররা দলে দলে খনি ছাড়িয়া অন্য শিল্পে চলিয়া গিয়াছে, মিলিটারীর কাজে লাগিয়াছে, কিংবা চাষের সময় গ্রামে গিয়াছে। সেজন্যই কয়লার উৎপাদন এত কমিয়াছে।

খনি মজুরের সম্বন্ধে সরকার চিরকাল অবহেলা দেখাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে খনি-মালিকরা মজুরদের জানোয়ারের মত খাটাইয়া লইয়াছে। গত বছর নভেম্বর মাসে খনি মজুরদের বেতন ও অন্যান্য ব্যবস্থা কি রকম ছিল, তা দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। মিস্ত্রী বাদে অন্যান্য মজুররা দৈনিক ৬ আনা, ৮ আনা ও ১০ আনা হারে মজুরী ও টাকায় সাড়ে তিন আনা মাগগি ভাতা পাইত। সপ্তাহে প্রত্যেক মজুরকে টাকায় ৬ সের করিয়া রেশন দেওয়া হইত; পোষ্য থাকিলে আরো ১৩ সের রেশন দেওয়া হইত।

অর্থাৎ সপ্তাহে গড়ে ৬ দিন কাজ করিলে মজুরদের মজুরী মিলিত গড়ে ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা। কিন্তু এত অল্প পয়সায় ৬ দিন মজুরী করিবার সামর্থ্য কোন মজুরেরই ছিল না—৩।৪ দিনের বেশী কেহই কাজ করিতে পারিত না। অর্থাৎ, **সপ্তাহে তাদের ২৲ হইতে ৩৲ টাকার বেশী রোজগার হইত না।** সুতরাং মজুররা খনি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আর মালিকরা সস্তায় মেয়ে মজুর নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইবার মতলব করিল। সেপ্টেম্বর মাসে সরকারও নির্লজ্জের মত তাতে সায় দিয়া মেয়ে মজুর নিয়োগের মজুরের জন্য অর্ডিনান্স জারী করিলেন!

নূতন আইনে মজুররা পাইল কি

কিন্তু তাতেও যখন কয়লার ঘাটতি বন্ধ হইল না এবং তার ফলে দেশের মধ্যে যখন তুমুল আন্দোলন সুরু হইল, তখন সরকারের টনক একটু নড়িল। গত ডিসেম্বরে সরকারী তদন্ত কমিটীগুলি মজুরদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং তাদের মজুরীও জীবন ধারণের অনুপযোগী। পয়দা বাড়ানর খাতিরে সরকার মজুরের আর্থিক উন্নতির জন্য কিছু করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু সরকার যে সুবিধা মজুরকে দিল, তা আগের তুলনায় কতটুকু?

ধানবাদ সম্মেলনে ঠিক হইল মজুরকে যুদ্ধের পূর্ব্বের মজুরীর উপর টাকায় আট আনা মাগগিভাতা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ আগে গড়পড়তা মজুরের দৈনিক আয় ছিল সাড়ে নয় আনা, এখন হইল ১২ আনা। অর্থাৎ সপ্তাহে মাত্র ১০ আনা বৃদ্ধি।

রেশন সম্বন্ধে ঠিক হইল যে, প্রত্যেক মজুর সপ্তাহে ৪ সের রেশন পাইবে; তার মধ্যে ২ সের চাউল। চাউল প্রতিসের ৬ আনা ও আটা ৫ আনা মূল্যে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক মজুর বরাদ্দের চার ভাগের এক ভাগ ডাল পাইবে (টাকায় ৬ সের হিসাবে)। আরো ঠিক হইল যে, **হাজিরার সময়** প্রত্যেক মজুর আধ সের করিয়া চাউল বিনামূল্যে পাইবে। মোট হিসাব করিলে দেখা যায় এখন মজুর পাইবে—মোট ১ টাকা ৬ আনায় ৭ সের রেশন। এই জায়গায় আগে ছিল টাকায় ৬ সের রেশন।

ইহা ছাড়া কাজে হাজির থাকিলে প্রত্যেক মজুরকে অতিরিক্ত ২ আনা দৈনিক বোনাস হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। একজন পোষ্য থাকিলে মজুর পাইবে ২ আনার জায়গায় ৩ আনা ও একাধিক পোষ্য থাকিলে পাইবে ৫ আনা।

এই সমস্ত হিসাব জুড়িয়া দেখা যায় যে, রেশনে এখন মজুর ঠকিতেছে ৩।৪ আনা, আর মজুরী হিসাবে বেশী পাইতেছে ১২ আনা বোনাস আর ১০ আনা মাগগিভাতা—মোট ১ টাকা ৬ আনা। **সুতরাং আগের উপার্জ্জনের চেয়ে তার বাড়তি উপার্জ্জন হইতেছে সপ্তাহে মাত্র ১ টাকা দুই-তিন আনা।**

আগের তুলনায় জিনিষ পত্রের দর আড়াই গুণ বাড়িয়াছে, ইহা নিজ মুখে স্বীকার করিয়াই কমিটী খানমজুরদের জন্য **মাসে মাত্র ৪।৫ টাকা বাড়াইয়া** দেখাইলেন আমরা অনেক কিছু করিলাম। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য মিল মালিককে দোকান খুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু লড়াইয়ের আগের দরে যে জিনিষ দেওয়া হইবে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহাতেও দরবৃদ্ধির কোনো প্রতিকার হইতেছে না।

উৎপাদন বাড়ার নমুনা!

সরকারী আদেশনামা তো বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করা হইল। কিন্তু কয়লার উৎপাদন বাড়িল কি?

কয়েকটী কয়লা খনির মাসিক উৎপাদন কতটা বাড়িয়াছে তার হিসাব দেখা যাক:—

	যুদ্ধ-পূর্ব্বের উৎপাদন	গত বছর	এখন
টার্নার মরিসনের শ্রীপুর খনি	৩৫,০০০ টন	১৮,০০০ টন	২০,০০০ টন
এণ্ড্রু ইয়ুলের বেঙ্গল কোল কোং (৭, ৮ খনি)	২৮,০০০ টন	২৬,০০০ টন	১৩,০০০ টন
,, ১২নং খনি	৭,৫০০ টন	১১,০০০ টন	১৪,০০০ টন
,, ২নং খনি	৫০,০০০ টন	২০,০০০ টন	২১,০০০ টন
আপকারের চরণপুর খনি	৭,৫০০ টন	৬,৫০০ টন	৬,৫০০ টন
এইচ নাগ কোং ইষ্ট বরাবনী খনি	২০,০০০ টন	১২,০০০ টন	১৩,৫০০ টন

শুধু খনি মজুরই কয়লার অভাব মিটাইতে পারে

বেশী মজুরী ও সংগঠনের স্বাধীনতা দাও

অর্থাৎ, যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় উৎপাদন গত বছরে ছিল প্রায় অর্দ্ধেক, আজ গত বছরের চেয়ে সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং, অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই। বিভিন্ন কারখানায় ইহার ফলে কয়লা-বরাদ্দ কতটা কমিয়াছে তারও কিছু হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

এই বৎসরে ভারতের সূতাকলগুলির জন্য বরাদ্দ কয়লা হইতে মাসিক ৩৬,০০০ টন কয়লা কমান হইয়াছে।

টাটা কারখানার জন্য ২৬,০০০ টন কয়লা কম দেওয়া ঠিক হইয়াছে।

বাংলার চটকলগুলিতে সাপ্তাহিক কয়লা বরাদ্দ ৮০ ওয়াগন হইতে ৪০ ওয়াগনে দাঁড়াইয়াছে। এখন আরো কম কয়লা পাওয়া যাইবে তার আভাষ গত সপ্তাহের 'ক্যাপিটাল' জানাইয়াছে।

মালিকদের নূতন অজুহাত

ইহার সুযোগ লইয়া মালিকরা আজ নূতন ধূয়া তুলিয়াছে, তারা বলিতেছে—মজুরী বাড়াইলেই যে কাজ বাড়ে তা কোন কাজের কথা নয়। কয়লা-কনট্রোল বোর্ডে সম্প্রতি যে আলোচনা হইয়াছে তাতে মালিকরা বলিয়াছে যে, মজুরদের সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও মজুররা কাজে কামাই করিতেছে।

কিন্তু মালিকদের নিজেদের দেওয়া হিসাব হইতেই উল্টা প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬ই জুলাই 'ক্যাপিটালে' ঝরিয়া কয়লা খনির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, গত বছর ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মজুরের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার, এই বছরের ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত সংখ্যা হইতেছে ১০৪,৭০০। এই সময়েই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মজুরী ও ভাতা বেশী দেওয়া হইয়াছে, তাই এই সময়েই মজুর বাড়িয়াছে। কিন্তু উপরেই আমরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছি যে মাসে ৪।৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধিতে কোনো মজুরের দিন চলে না। সরকারী আইনের চমকপ্রদ ঘোষণায় প্রথমটা মজুরেরা উৎসাহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাদের পেট ভরে না দেখিয়া আবার তারা কাজ ছাড়িতে লাগিল। তাই ফেব্রুয়ারীর পরে মজুর সংখ্যা আবার কমিল তাও 'ক্যাপিট্যালের' খবরে প্রকাশ। ঝরিয়ায় ফেব্রুয়ারী মাসে মজুর সংখ্যা ছিল ১০৭০০০, এপ্রিলে দাঁড়াইল ১০১০০০।

কিন্তু আসল অবস্থাটার দিকে দৃষ্টি না দিয়া সরকার খাপ্পা হইয়া মজুরের উপর জবরদস্তি করিয়া ও মালিককে সন্তুষ্ট করিয়া পয়দা বাড়াইতে চাহিলেন। মালিককে বাড়তি টন পিছু চার আনা বকশিস দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। খনিমুখ হইতে বাহিরে কয়লা সরবরাহ, অর্ডার সংগ্রহ, বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে খনি মালিককে বাঁচাইয়া দিয়া এই সমস্ত জিনিষের পুরা দায়িত্ব সরকার নিজেই লইলেন। ওয়াগনেরও অভাব হইতেছে না। তবুও মালিকরা তেমন পয়দা বাড়ায়না দেখিয়া ছোট বড় খনির কোটা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল এবং কোটা পূরণ করিতে না পারিলে খনি সরকারী কর্তৃত্বে চলিয়া যাইবে, এই ভয় দেখানো হইল। কিন্তু কোন মালিকই কোটা পূরণ করিতেছে না, তবুও সরকারী ভয় দেখানো কাগজে কলমেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ মজুরের বেলায় জবরদস্তি মজুর নিয়োগের জন্য ৮১ ধারা প্রয়োগ করা হইল।

আইন ফাঁকি দিতে মজুরদের উপর মালিকের যথেচ্ছাচার

এদিকে মালিক সরকারী আইনকে যথেচ্ছ ফাঁকি দিতে লাগিল। মজুরীর ৪।৫ টাকাও সকল শ্রমিকের ভাগ্যে জুটিল না। মাগ্‌গিভাতার কি হইল?

যাহারা কয়লা কাটে ও যাহারা ট্রলি চালায় তাহারা ছাড়া অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মচারী কেহই টাকায় আট আনা মাগগী ভাতা পায় না। ধানবাদ সম্মেলনের ঠিক পরই অনেক কোম্পানী পুরাতন খাতার পরিবর্ত্তে নূতন খাতা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে যে মজুরের আগে বেতন ছিল ৮ আনা সেখানে দেখাইয়াছে ৬ আনা। সুতরাং ৮ আনার উপর মাগগী ভাতা ৪ আনা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এখন দিতেছে ৬ আনার উপর মাগগী ভাতা তিন আনা—মোট ৯ আনা। সুতরাং ধানবাদের আগের তুলনায় কোন লাভই হইল না বরং কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের লোকসানই হইতেছে।

বোনাস—মাইনার্স ও ট্রামার্স ছাড়া দৈনিক ২ আনা হাজরী বোনাস অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মচারী পায় না। এই বোনাস দিবার বেলায়ও অনেক চাতুরীর আশ্রয় খনির ম্যানেজারগণ লইয়া থাকেন। যথা দূরের মজুররা অনেকস্থলে দূরে থাকে সেই অজুহাতে দৈনিক ২ আনা বোনাস দেওয়া হয় না অথচ কাছে থাকিবার ব্যবস্থাও ম্যানেজার সাহেবরা করেন না। অনেক সময় বয়স্ক পোষ্য ও শিশু থাকিলে প্রত্যেক দিন হাজরীর উপর যথাক্রমে যে ৩ আনা ও ৫ আনা বোনাস দিবার কথা তাহাও দেওয়া হয় না। ম্যানেজার সাহেব প্রমান করিবার চেষ্টায় থাকেন যে মজুরের কোন পোষ্য নাই। স্ত্রী পোষ্য থাকিলে মজুরকে প্রমাণ করিতে বলা হয় যে ঐ স্ত্রী তাহার সত্যই বিবাহিতা স্ত্রী ইত্যাদি। ধাওড়ার (বস্তির) বাহিরে ধাওরায় স্থানাভাব বশতঃ যে শ্রমিক একা বা সপরিবারে থাকে তাহাকে ২ আনা বা ৩ আনা বা ৫ আনা বোনাস সাধারণতঃ দেওয়া হয়। এক কথায় ৩ আনা ও ৫ আনা বোনাসের অধিকারী হইলেও তা পাওয়া দুষ্কর। বোনাসের ব্যবস্থা প্রত্যেক হাজিরীর উপর অথচ অনেক খনিতে সপ্তাহে ৪.৫ দিন হাজিরী না দিলে কোন বোনাসই দেওয়া হয় না।

হাজিরীর জন্য বিনামূল্যে দৈনিক আধসের রেশনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে মাইনার্স ও ট্রামার্স ব্যতীত কেহই পায় না। মাইনার্স ট্রামার্সকেও অনেক সময় সপ্তাহে ৪.৫ দিন কাজ না করিলে আধসের রেশন দেওয়া হয় না। অন্যান্য মজুর ও কর্মচারিগণ হাজিরীর জন্য বোনাস ও বিনামূল্যে আধসের চাউলের পরিবর্ত্তে মোটের উপর সপ্তাহে এক টাকায় ৬ সের চাউল পাইয়া থাকে।

কমিটির সিদ্ধান্ত মত সর্ব্বত্র সস্তা দোকান খোলা হয় নাই বা দোকান থাকিলেও তাহাতে সব জিনিষ পাওয়া যায় না, কখনও কখনও জিনিষ পাওয়া গেলেও সস্তায় হয় না। অল্প কয়েকটি খনিতেই ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ আনা হইয়াছে ও অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া হইতেছে।

খনির ভিতরকার অবস্থা

শুধু মজুরীতে ফাঁকি নয়, খনির ভিতরে কাজকর্ম্মের অবস্থাও মালিকরা এমন করিয়া রাখিয়াছে, যাতে উৎপাদন বেশী হইতেই পারে না। খনির অভ্যন্তরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা অনেক খনিতেই নাই। খনিতে প্রায়ই জল জমিয়া কাজের বিঘ্ন ঘটে। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই। টাবের অভাবে কাটা কয়লাও অনেক সময় পড়িয়া থাকে। অধিকাংশ খনিতেই কয়লা কাটিবার যন্ত্র কম। খনির ভিতরে যথেষ্ট ট্রলী বা পিট (খনিমুখ) নাই। উপরোক্ত ছোট বড় বেবন্দোবস্তের ফলে কয়লা উৎপাদন কম হয়। মালিকরা দেখিতেছে এখন উৎপাদন বাড়াইবার অনুপাতে তাদের লাভ বেশী হয় না, তাই তারা কাজকর্ম্মের উন্নতি করিবার দিকেও উদাসীন।

খনির বাহিরে শ্রমিকের জীবনযাপনের জন্য মালিক যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে তা যে কোন কারখানার তুলনায় জঘন্য।

স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা কাগজে কলমেই আছে। বর্ষায় ম্যালেরিয়া ও আমাশয়, গ্রীষ্মে কলেরা প্রতি বৎসরের ঘটনা। এক বাঁকশিমুলিয়ার খনি অঞ্চলে বর্ষায় শতকরা ৮০ জন মজুর ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া কামাই করে। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ খনিতে কাজ করিতে আসে। তাহার জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সন্ধ্যার পর স্ত্রী পুরুষ তাড়ি ও মদের আশ্রয় লয়—সমস্ত দিনের পরিশ্রম লাঘবের চেষ্টায়। দারিদ্র ও অশিক্ষায় সামাজিক জীবন তাহাদের শেষ হইয়াছে।

মালিকরা অজুহাত দেয়, শুধু মজুরীতেই কাজ হয় না, শিক্ষা চাই ('ক্যাপিটাল', ৬ই জুলাই)। সত্য কথা, এই রকম অবস্থায় যে মজুররা পড়িয়া আছে, তারা মজুরী পাইলেও সব সময়ে কাজে উৎসাহ দেখাইতে পারে না। শিক্ষা একান্ত জরুরী। কিন্তু সে শিক্ষা তো রাজভক্তি বা মালিক-তোষণ নয়, সে শিক্ষা হইতেছে দেশপ্রেমের শিক্ষা, যা হইতে পারে একমাত্র মজুর সংগঠনের ভিতর দিয়া। সরকার ও

(৬ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুরাবর্দী বর্দ্ধমানের কোটা দিতে অক্ষম

জনগণের খাদ্যকমিটিগুলি সরবরাহের অভাবে শুকাইতেছে

মজুতদার ও বিভেদকারীরা সুবিধাই পাইল !

হরেকৃষ্ণ কোঙার

সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া বর্দ্ধমান জেলা খাদ্য কমিটি গঠিত। সদর ও কাটোয়া মহকুমা খাদ্য কমিটি দুইটিও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। আসানসোল ও কালনা মহকুমার কমিটি দুইটী আমলাদের হাতের মুঠায়।

খাদ্যকমিটির মারফৎ সারা জেলায় কোটা বিলি হয়

কয়েক মাস হইতে বর্দ্ধমান জেলার সমস্ত ইউনিয়নে কনট্রোলের জিনিসপত্র বিলির ভার খাদ্য কমিটিগুলি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। জনগণের নির্দ্ধারিত জেলা খাদ্যকমিটি, ২টী মহকুমা কমিটি, বর্দ্ধমান শহর কমিটি ও বহু ইউনিয়ন কমিটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মালপত্র বিলির ব্যবস্থা করিতেছে। যে পরিমাণ মালপত্র বর্দ্ধমান জেলায় সরবরাহের জন্য পাওয়া যায় তাহা পুরাপুরি জনসাধারণের হাতেই পৌছায়। মজুতদার বা মুনাফাখোররা ইহার ভিতরে বিশেষ কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। খাদ্যকমিটিগুলির কাজের ফলে জনসাধারণের মধ্যে মজুতবিরোধী মনোভাব সাধারণভাবে দৃষ্ট হইয়াছে। গত মে মাসে প্রায় ৯০০ টীন কেরাসীন তেল, মে ও জুন মাসে ৪০০ বস্তা লবণ চোরাবাজার হইতে উদ্ধার করিয়া জনগণের মধ্যে কনট্রোল দরে বিক্রয় করা হইয়াছে।

কিন্তু সরকারী সরবরাহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একে কম সরবরাহ তাহাতে আবার মজুত করা কোটার পরিমাণ ঠিক সময় মত দেওয়া হয় না। তাহার ফলে আজও বর্দ্ধমান শহরে পুরা রেশনিং চালু করা সম্ভব হয় নাই। চোরাকারবারীর দল ও তাহাদের বন্ধুরা খাদ্যকমিটি-বিরোধী আন্দোলন করিতেছে। জনসাধারণের মনে খাদ্য কমিটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছে।

চিনি, লবণ, খইল ও তৈলের অভাব

বর্দ্ধমান জেলায়, বিশেষ করিয়া সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় লবণ, খইল, কেরোসিন, চিনি, গুড় প্রভৃতি জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির অভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। জনসাধারণ ও খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন করা সত্ত্বেও সরকার হইতে এই সব দ্রব্যগুলির নিয়মিত সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। সারষার তেল ও খইল সরবরাহের কোন দায়িত্ব সরকার আজ পর্য্যন্ত লন নাই। ফলে সারষার তেলের দর বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে ১৷৷০ টাকা সেরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খইলের বস্তার দাম হইয়াছে ১৬৷৷০ টাকার বেশী। অথচ চাষের সময় জমিতে সার দিবার জন্য ও গরুকে খাওয়াইবার জন্য খইলের প্রয়োজন খুব বেশী। এপ্রেল মাস হইতে লবণের সঙ্কট বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে লবণের তীব্র হাহাকার দেখা দিয়াছে। চোরাবাজারে লবণ ৫০ আনা সের দরে বিক্রী হইতেছে। অথচ সরকার হইতে অতি সামান্য পরিমাণ লবণ দেওয়া হইতেছে। যেখানে **সারা জেলায় মাসে প্রায় ৫০,০০০/০ মণ লবণের প্রয়োজন সেখানে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র ৪০,০০০/০ মণ লবণের কোটা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।** তাহার মধ্যে জেলায় পৌছিয়াছে মাত্র অর্দ্ধেক এবং সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায় জেলার সরবরাহ বিভাগ এই অর্দ্ধেকেরও পুরা অংশ বিলির জন্য খাদ্য কমিটির হাতে দেন নাই। লবণ না পাওয়ায় বিশেষ করিয়া চাষের ক্ষতি হইতেছে। চাষের জন্য বর্দ্ধমান জেলাকে বহুলাংশে বাহিরের সাঁওতাল মজুরের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু লবণের সরবরাহ না থাকায় তাহারা আসিতে চাহিতেছে না। বাজারে গুড়ের দাম ৷৷৵০৷৫০ আনা সের, অথচ সরকার হইতে মোটেই গুড় দেওয়া হইতেছে না। কেরোসিন দেওয়া হইতেছে নামমাত্র। সদর মহকুমায় ১টী সংসার মাসে গড়ে পৌনে এক বোতলও কেরোসিন পায় না। কাটোয়া ও কালনায় অবস্থা আরও শোচনীয়। চিনি ও ময়দার অবস্থা একই রকম। যেখানে গুড়ের দাম ৷৷৵০৷৫০ আনা, সেখানে চিনির খাদ্য কোটা অত্যন্ত কম। এবং যে কোটা ধার্য্য আছে তাহাও ঠিকমত পাওয়া যায় না। যেখানে সদর মহকুমায় মাসে মাত্র ২০০০ বস্তা চিনি আসিবার কথা, সেখানে এপ্রিল মাসে এক বস্তাও চিনি আসে নাই, মে মাসে আসিয়াছে মাত্র অর্দ্ধেকের মত, জুন মাসেও তাই। ময়দা গ্রামাঞ্চলের জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। সহরের জন্য যাহা করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত কম।

দুঃস্থ অঞ্চলের জন্য ১৪ লক্ষ মণ চাউল প্রয়োজন

চাউলের অবস্থা:—বন্যাঅঞ্চলের ২।১টী ইউনিয়ন ব্যতীত চাউলের অভাব এখনও দেখা দেয় নাই। স্বাভাবিক বৎসরে বর্দ্ধমান জেলায় প্রায় ১৮০ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বসমেত জেলায় প্রয়োজন হয় প্রায় ১৭০ লক্ষ মণ। গত বৎসর জেলায় প্রায় ৪০০ বর্গমাইল স্থানে বন্যার জন্য ধান হয় নাই; তাছাড়া প্রতি বৎসর জেলায় পুরাতন ধান বহু স্টক থাকে। এবার তাহা নাই। তাই এবার উৎপন্ন ধানের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের উৎপন্ন ধান হইতে সরকার আজ পর্য্যন্ত মাত্র ১০ লক্ষ মণ চাউল কিনিয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে প্রায় ২৷৷০ লক্ষ মণ আসানসোল মহকুমায় পাঠান হইয়াছে। ৬০ হাজার মণ দেওয়া হইয়াছে নদীয়া জেলাকে এবং ১ লক্ষ মণ বিশেষ রিজার্ভ হিসাবে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে। অর্থাৎ, জেলায় সরকারী স্টক আছে মাত্র ৬ লক্ষ মণ। ইস্পাহানী কোম্পানী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ছাড়পত্র লইয়া ৫০ হাজার মণ ধান জেলা হইতে বাঁকুড়ায় চালকলগুলির জন্য লইয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া বহু ধান চোরাবাজার মারফৎ নদীয়া ও হুগলী জেলায় চালান হইয়াছে।

শোনা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয়গভর্ণমেণ্ট **আসানসোল মহকুমার জন্য নেপাল হইতে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।** এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইলে বর্দ্ধমান জেলার মজুত ধান হইতে জেলার প্রয়োজন ঠিকমত চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ৪ শত বর্গমাইল পরিমিত **বন্যা অঞ্চলের প্রায় ৪ লক্ষ অধিবাসীর জন্য গত বৎসর মোটেই ধান হয় নাই।** এখনও পর্য্যন্ত তাহারা কোনমতে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে ধান কিনিয়া লইয়া চালাইতেছে। বর্ষার পরই চাউলের সঙ্কট দেখা দিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। ইহাদের বাঁচাইতে হইলে অধিকাংশকে কণ্ট্রোল দরে ও কিছু লোককে বিনামূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে হইবে। আগামী ৬ মাসের জন্য ইহাদের প্রয়োজন হইবে প্রায় ১০ লক্ষ মণ চাউল; ৩ মাসের জন্য বর্দ্ধমান, কালনা ও কাটোয়ার শহরবাসীদের জন্য লাগিবে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র চাষীদের হাতে ধান আর নাই। চাষের সময় তাহারা জোতদারদের নিকট হইতে চাউল পাইবে আশা করা যায়। তাহার পর তাহাদিগকে কণ্ট্রোল চাউল দিতে হইবে। এইরূপ প্রায় ১৷৷০ লক্ষ লোকের ৩ মাসের জন্য লাগিবে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল। মোট লাগিবে ১৪ লক্ষ মণ চাউল; **অথচ সরকারের স্টকে রহিয়াছে মাত্র ৬ লক্ষ মণ!**

খাদ্য কমিটির প্রতিনিধিদের নিকট সুরাবর্দী কি বলিলেন?

সরবরাহের উপরোক্ত অব্যবস্থার ফলে জেলাবাসীর মধ্যে একদিকে দুর্দ্দশা ও অন্যদিকে চাঞ্চল্য বাড়িতেছে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাহা জানাইয়া সরবরাহের ব্যবস্থা দাবী করিবার জন্য গত ২৯শে জুন জেলা, মহকুমা ও শহর খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেবের সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং সঙ্গে ছিলেন প্রাদেশিক মুসলীম লীগের ও জেলা ফুড কমিটির সম্পাদক মৌলভী আবুল হাসেম, জেলা ফুড কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রনবেশ্বর সরকার, জেলা বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত তারাপদ পাল, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, প্রাদেশিক মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের সহ-

(৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারী জীবন পুনর্গঠনে সাহায্য করো
নারী সেবা সংঘ ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির যুক্ত অভিযান

গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের ঝঞ্ঝায় বাংলার গ্রাম্য সমাজ-জীবনে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে প্রতিরোধ করাই আজ একটি বিরাট সমস্যা। বাংলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে গৃহহীন আশ্রয়হীন নারী পুরুষদের করুণ কাহিনী প্রতিনিয়তই আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিতেছে।

দুঃস্থ মেয়েদের মর্ম্মন্তুদ জীবনকাহিনী

চট্টগ্রাম জেলায় দুঃস্থের সংখ্যা এখনও প্রায় ১ লাখ। ইহাদের ভিতর নারীর সংখ্যাই অধিক। পেটের ক্ষুধার জ্বালায় ইহারা আজ লজ্জাসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া মাটিকাটা, রাস্তা বাঁধানো প্রভৃতি কাজে যোগ দিয়া কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেছে। যে দুর্ভাগাদের এই কাজ জোটে নাই কিংবা শারীরিক সামর্থের অভাবে এই কাজ করিতে পারে না তাহারা নিজেদের দেহবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। চট্টগ্রামের কত হাজার মেয়ে যে এইভাবে গ্লানিকর জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার সংখ্যা আজও নির্ণয় করা যায় নাই।

ঢাকা জেলায় মেয়ে বিক্রয় ক্রমেই বাড়িতেছে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বালীগাঁও গ্রাম হইতে একদল মেয়েকে পতিতালয়ে বিক্রয় করিবার জন্য তালতলায় লইয়া আসা হয়। স্থানীয় লোকেরা খবর পাইয়া তাহাদেরকে পুনরায় স্বগৃহে পাঠাইয়া দেয়। বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম বজ্রযোগিনী হইতে ১৮টী মেয়ে বিক্রির খবর পাওয়া যায়। মাণিকগঞ্জে এক বৃদ্ধ পিতা দিনের পর দিন অনশনে কাটাইয়া তাহার ২২ বৎসর বয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করিয়া দেয়।

হুগলী জেলায় পেয়ারাপুর গ্রামের একটি দরিদ্র পাড়ায় ৩০টী পরিবারের ভিতর ২৯টী পরিবারই দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া জীবনধারণের আর কোন সংস্থানই এদের নাই। কিছুদিন পূর্বে এই গ্রামের চাঁদুনে নামে একজন কৃষকের স্ত্রী অনাহারে মারা যায়। অনাহারে শোকে ক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদুনে তাহার বয়স্থা মেয়েকে গঙ্গার ওপারে নিয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ নিয়া একটি তালগাছে উঠিতে গিয়া পড়িয়া মারা যায়।

বগুড়া জেলার একটি গ্রামে ৩১ ঘর জেলের বসতির ভিতর মাত্র ৩ জন কর্মক্ষম পুরুষ জীবিত আছে। বাকী সবই মেয়ে কিংবা শিশু। এদের দুরবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়।

খুলনার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন কর্মী লিখিয়াছেন যে ঘাটভোগ গ্রামে তিনি একটি মহিলা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় প্রায় ৫০ জন গরীব মেয়ে যোগদান করে। তাহাদের পরণের কাপড়ের অবস্থা এইরূপ ছিল যে ঐ মহিলা-কর্মীও তাহাদের দিকে তাকাইতে লজ্জাবোধ করিতেছিলেন।

এই সামান্য কয়টি কাহিনীই আমরা উল্লেখ করিলাম। লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও এইরূপ কত মর্মন্তুদ ঘটনা যে ঘটিতেছে—বাংলার কত হাজার নারী যে পতিতালয়ের অন্ধকারে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে—কত বাপ মা যে নিজের মেয়েকে অসৎপথে পাঠাইয়া তিলে তিলে দগ্ধ হইতেছে—কত শিশু যে তিলে তিলে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে তাহার হিসাব কে রাখে?

আমলাতন্ত্রের চেষ্টা কতটুকু?

এই ভয়াবহ অবস্থা আমলাতন্ত্রও অস্বীকার করিতে পারে নাই। গত জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে বঙ্গীয় সরকার এক প্রেস নোটে জানান যে সরকার নারীদের এই দুরবস্থার রিপোর্ট পাইতেছেন এবং তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন। এরপরও সরকার স্বীকার করিয়াছে যে বাংলায় ৫৪টী মহকুমায় পুনর্গঠন দরকার। কিন্তু সরকারী চেষ্টা কতটুকু? সারা বাংলায় সরকার ৩০৩টী ওয়ার্কহাউস খুলিয়াছে—তাহাতে মাত্র ৫০০০ নরনারী কাজ করে। অথচ বাংলাদেশে দুঃস্থের সংখ্যা এখনও প্রায় ৩০ লাখ। যে সব ওয়ার্কহাউস চলিতেছে তাহার পরিচালনার ব্যবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। চট্টগ্রাম জেলার রাওজান, পটিয়া প্রভৃতি কয়েকটি জায়গার খবর আমরা পাইয়াছি; সেখানে ওয়ার্কহাউসে যারা সুস্থ এবং কাজে দক্ষ শুধু তাদেরকেই ভর্ত্তি করা হয়। যারা অসমর্থ কিংবা কাজে অপটু ওয়ার্কহাউসে তাদের কোন স্থান নাই। খাওয়া দেওয়া হয় প্রতিদিনে ৬ ছটাক চাল বজরায় মিশাইয়া। এ সব কারণে অনেক ওয়ার্ক হাউসে স্থান শূন্য পড়িয়া আছে অন্যদিকে, হাজার হাজার দুঃস্থা নারী অনন্যোপায় হইয়া পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

মহিলা প্রতিষ্ঠানের পতাকার নীচে মেয়েদের ঐক্য

বাংলার মেয়েরা যে এইভাবে ক্ষুধার তাড়নায় নিজেদের মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিতেছে—রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের বাংলার হাজার হাজার মেয়ে যে এখনও 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালীর মুখেই কলঙ্কের গভীর কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী তাহার দেশপ্রেম ভোলে নাই—বাঙ্গালী ভোলে নাই যে বাংলার দুঃস্থদেরকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই। তাই ১৮টী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত শক্তিতে বাংলায় যে 'নারী সেবাসঙ্ঘ' স্থাপিত হইয়াছে তার পক্ষ হইতে (১) দুঃস্থ মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া ও (২) সম্বলহীন মেয়েদের শিল্প-কাজ শেখানোর উদ্দেশ্যে সারা প্রদেশে বহু আশ্রয়কেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। এরজন্য চাই ৪০ লাখ টাকা। এই টাকা সংগ্রহের জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। গত ২৬শে জুন অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় 'নারী সেবাসঙ্ঘ পতাকা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিবসে প্রায় ১০০ মেয়ে ও পুরুষ কর্মী কলিকাতার রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, অফিসে ও বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া প্রায় ২০০০৲ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও ১০ই জুন হইতে ১৭ই জুন পর্য্যন্ত সারা বাংলায় 'সমাজ জীবন নর্গঠন সপ্তাহ' পালন করিয়াছে। এই সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মেয়ে-কর্মীরা ১০০টী বৈঠক, ৫০টী জনসভা, ও ১৫০০০ ইস্তাহার দ্বারা জনগণকে আহ্বান জানাইয়াছে সমাজের বুক হইতে এই কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলিতে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঢাকা শহরে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন ও মুস্লিম লীগের কর্মীরা এই কাজে আত্মরক্ষা সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেস-নেত্রী শ্রীযুক্তা কিরণ রুদ্র আত্মরক্ষা সমিতির সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। যশোহর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলারা এই কাজে সাহায্য করিতেছেন। হুগলী জেলায় মেয়ে-কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় আত্মরক্ষা সমিতি ও শিক্ষক-ছাত্র-যুক্ত-রিলিফ-কমিটি একযোগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডেপুটেশনে গিয়া ১৪০০৲ আদায় করে ও তাহা দুঃস্থদের ভিতর বিতরণ করে। সেখানে বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠান মিলিয়া একটি কমিটিও গঠন করে। হাওড়াতেও অনুরূপ একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এই মহান্ পরিকল্পনায় সমবেত সাহায্য চাই

নারী সেবা সংঘ ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলার দুঃস্থদেরকে সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে উদ্যম ও আদর্শ দেখাইতেছে তাহাতে প্রত্যেকটি বাঙ্গালীরই সাহায্য ও সমর্থন জানাইতে হইবে। জেলায় জেলায় যাহাতে দুঃস্থাগার, শিল্পকেন্দ্র, শিশুসদন ও কর্মকেন্দ্র খোলা হয় এবং নারী সেবা সংঘ ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পরিকল্পনা যাতে বাস্তবে পরিণত হয় তার জন্য প্রত্যেক জেলায় সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থও আজ বাংলাকে যোগাইতে হইবে। অতীতে কংগ্রেসের ডাকে বাংলার জনগণ লাখ লাখ টাকা দান করিয়াছে। আজ বিপন্ন মাতৃজাতি আহ্বান জানাইয়াছে—এই আহ্বানে বাংলা হইতে নিশ্চয়ই লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ হইবে।

সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছে সেই পরিকল্পনা যাহাতে তাড়াতাড়ি ভালভাবে কার্য্যকরী হয় তার জন্যও চাই সকল দলের মিলিত প্রচেষ্টা, মিলিত আন্দোলন। যেখানে যেখানে সরকারী ওয়ার্ক হাউস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সব স্থানের দেশপ্রেমিকদের কর্ত্তব্য সেই ওয়ার্কহাউস যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য প্রচেষ্টা করা।

বাংলার হাজার হাজার দুঃস্থা নারী আজ কলঙ্কিত জীবনের দুঃসহভারে যে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে—বাংলার শত শত কচি শিশু আজ যেভাবে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে সেই দুর্যোগ আজ সমস্ত বাঙ্গালীকে একত্র করুক। সমাজের ভাঙ্গনকে রোধ করিবার জন্য বাংলার সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠান আজ মিলিতভাবে অগ্রসর হউক।

তবুও কয়লার দুঃখ দূর হয় না কেন?

(৫ম পৃষ্ঠা হইতে)

মালিক উভয়েই সেখানে যত রকমে সম্ভব বাধা দিতেছে।

ইউনিয়ন গঠনের বিরুদ্ধে মালিকের অভিযান

১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট অনুযায়ী খনি মজুরেরও ইউনিয়ন গড়িবার অধিকার আছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোনও শক্তিশালী ইউনিয়ন খনি মজুরের গড়িয়া উঠে নাই কেন? প্রধান কারণ ইউনিয়ন গড়িবার অধিকার আছে কাগজে কলমে। ইউনিয়ন গড়িতে গেলেই তাহাকে যে বাধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা দূর করিবার মত মনোবলই তাহার নাই।

এক একটি খনির চারিধারে কয়েকটি গ্রাম খনি মালিকের সম্পত্তি। সেখানে বাহিরের লোকের টুঁশব্দ চলে না। খনির দরওয়ান বা ভাড়াটে গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। বাহিরের লোক যদি বা মালিকের বাধা সত্ত্বেও টিকিয়া যায় শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় পুলিশ তাহাকে এলাকা হইতে বাহির করিয়া দেয়। বেঙ্গল কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে বরাকরে একটি ইউনিয়নের সভাপতি বিজয় পাল ও কর্মী মাহেন্দ্রের উপর সম্প্রতি পুলিশ খনি এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া নোটিশ জারী করিয়াছে। মালিকের জমিদারীর মধ্যে ইউনিয়ন-আফিস করা যায় না, জমিদারীর বাহিরেও কোন ভদ্রলোক তাহার ঘর ইউনিয়নকে ভাড়া দিতে সাহস করিবে না, কেন না মালিক প্রভূত ক্ষমতাশালী, তাহাকে ঘাঁটান ঠিক নয়। ইউনিয়নের সভ্য হইলে শ্রমিকের চাকুরী বাঁচান দায়। গত বৎসর বরাকরের ভিক্টোরিয়া ওয়েষ্ট কোলিয়ারীর কয়েকজন শ্রমিক ইউনিয়ন সভ্য হইবার অপরাধে বরখাস্ত হয়। বাহিরের কোন ইউনিয়ন সংগঠক খনি এলাকায় গেলে সব সময় পুলিশের দ্বারা অনুসৃত হয়। এক কথায় ইউনিয়ন গড়া সেখানে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর সমস্ত আসানসোল ও ধানবাদ এলাকায় শ্রমিক সভার অনুমতি পাওয়া দুষ্কর।

কয়লা সংকট দূর করার পথ কি?

ইহাই মালিক ও সরকারের নীতি। মজুরকে যতটা সম্ভব কম মজুরী দিয়া, মালিককে সন্তুষ্ট করিয়া ও মজুর সংগঠনের পথ আটকাইয়া তবু সরকার ভাবিতেছে তার হাতে এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যার দ্বারা কয়লা সংকট দূর হইবে। কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে যে কিছু হয় না, তার প্রমাণ হাতে হাতে দেখা যাইতেছে; কয়লা কনট্রোল বোর্ডের আলোচনাই সার হইতেছে—কাজে কিছু হইতেছে না।

কয়লা তুলিবে মজুর—সেই মজুরকে বাদ দিয়া কয়লা উৎপাদন বাড়িতে পারে না। ইহার জন্য চাই শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। উপযুক্ত মাগগিভাতা, বোনাস, রেশন ইত্যাদি। কমপক্ষে ধানবাদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পুরাপুরি সকলের জন্য কার্যকরী হইলেও অবস্থা একটু ভাল হয়।

ইহার জন্য আজ দেশময় আন্দোলন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দাবী করিতে হইবে:—শ্রমিকের সভা ও ইউনিয়ন করিবার অবাধ অধিকার; খনির অভ্যন্তরীন গলদ ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য সরকার কর্তৃক মালিকের উপর চাপ দেওয়া; খনির ভিতরে ও বাহিরে উৎপাদন ও মজুরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মালিক, সরকার ও ইউনিয়নের সহযোগীতা; মজুরের জন্য ওয়েলফেয়ার মূলক ব্যবস্থা চাই। শিক্ষা ও স্বাস্থের জন্য মালিক ও সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টা হওয়া দরকার এবং এবিষয়েও ইউনিয়নের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

সুরাবর্দ্দী বর্দ্ধমানের কোটা দিতে অক্ষম

(৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সভাপতি ও জেলা হিন্দু মহাসভার ডাঃ সত্যচরণ মৈত্র, জেলা লীগের সম্পাদক মৌলভী আলি হোসেন, বর্দ্ধমান মহকুমা খাদ্য কমিটীর সম্পাদক কমরেড সাহেদুল্লাহ ও যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য রায় এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার।

প্রতিনিধিদল জেলার সরবরাহ সম্বন্ধে জেলা ও শহর খাদ্য কমিটীর পক্ষ হইতে দুইটী স্মারকপত্র সরবরাহ-মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন এবং সরবরাহের বিভিন্ন বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। আলোচনার মধ্যে মন্ত্রীমহাশয় সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নততর করা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ভরসা দিতে পারিলেন না বরং তাঁহার কথার মধ্য দিয়া প্রধানতঃ অক্ষমতা ও অসহায়ের ভাবই ফুটিয়া উঠিল। একমাত্র লবণের সরবরাহ বৃদ্ধির তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রত্যেক জেলাকে লোক সংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু মাসে ⁄৷০ আধ সের হিসাবে এবং তদতিরিক্ত শতকরা ১০ ভাগ—মোট এই পরিমাণ লবণ প্রতিমাসে তিনি সরবরাহ করিতে পারিবেন। কেরোসিন সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃই বলিলেন যে **বিদেশী কোম্পানী-গুলিকে তিনি চেষ্টা করিয়াও কনট্রোল করিতে পারিতেছেন না।** কোম্পানীগুলির নিকট হইতে বারে বারে মালের হিসাব চাহিয়াও তিনি তিনবারে তিন রকম সংখ্যা পাইয়াছেন। বাংলার বাহির হইতে যে মাল আমদানী হয় সে সম্বন্ধে তিনি যে পরিমাণ মাল পাইবেন। তাহা বিভিন্ন জেলায় লোক সংখ্যা অনুপাতে ভাগ করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। শহরে রেশনিং প্রবর্ত্তনের জন্য যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ও ন্যূনতম মালের প্রয়োজন তাহার সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি এইটুকু মাত্র বলিলেন যে সরবরাহ যাহাতে নিয়মিত হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন এবং সরবরাহ বৃদ্ধি সম্বন্ধেও চেষ্টা করিবেন।

বাংলা দেশ যখন ঘোরতর খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তখন সরবরাহ সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর এই অক্ষমতা ও হতাশার মনোভাব দেশের অবস্থা ভয়াবহ করিয়া তুলিবে। বর্দ্ধমানের এই অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে একদলীয় মন্ত্রীত্বের দুর্ব্বলতা দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আইন সভায় বিভিন্ন দলের মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য যে মন্ত্রীমণ্ডলীকে ইউরোপীয়ান ভোট ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহার পক্ষে বিদেশী কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়া ন্যূনতম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে না। তাই বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য অবিলম্বে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা ও প্রাদেশিক ফুড কমিটী গঠনের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটী ও বঙ্গীয় কৃষক কাউন্সিলের সভা

আগামী ২১শে, ২২শে জুলাই বঙ্গীয় কৃষক কাউন্সিলের অধিবেশন এবং ২২শে, ২৩শে, ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির সভা ২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানার মহিরামপুর গ্রামে হইবে। সমস্ত সভ্যকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

উভয় অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রস্তাবাদির আলোচনা হইবে। ইহা ব্যতীত ঐ সময়ে একটী প্রদর্শনী এবং ২৪শে জুলাই বৈকালে কৃষক ও মজুর সমাবেশ হইবে।

মনসুর হবিব
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতা হইতে মহিরামপুর বাস ও ট্রেণযোগে যাইতে হইবে। প্রত্যেক কমরেড বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিতে অন্যথা করিবেন না। দৈনিক খোরাকী খরচ পাঁচ আনা পড়িবে।

সোভিয়েট বাহিনীর বিরাট সাফল্য

১৫ দিনে পাঁচ লক্ষ জার্ম্মান হতাহত বা বন্দী

লালফৌজের দুর্ব্বার অভিযানের মুখে হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্কের পতন হইয়াছে। মিনস্কের উত্তর ও দক্ষিণ এবং সম্ভবতঃ সম্মুখ ভাগ ধরিয়া সোভিয়েট বাহিনী নাৎসী সৈন্যের উপর আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাহাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলে সাঁড়াশীর চাপে পড়িয়া ২ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্যের পলায়ন পথ রুদ্ধ হইয়াছে। মিনস্কের পতনের পর বিজয়ী লালফৌজের অগ্রগতি এতটুকুও কমে নাই। আজ আর জার্ম্মান সৈন্যের কোন বাধা দানই কাজে আসিতেছে না—সব কিছু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সোভিয়েট সৈন্য বিভিন্ন দিক দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

জার্ম্মানদের আত্মসমর্পণ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে লালফৌজের বিরাম বিহীন অগ্রগতির মুখে জার্ম্মানদের ব্যাটালিয়ানের পর ব্যাটালিয়ান সৈন্য আত্মসমর্পণ করিতেছে। প্রত্যেক চৌমাথার মোড়ে সোভিয়েট অফিসাররা আত্মসমর্পণকারী জার্ম্মানদের আস্তানার ঠিকানা লেখা স্লিপ দিতেছেন। আর তাহারা রক্ষী ছাড়াই বড় বড় দলে সেই ঠিকানা মত নিজেরাই চলিয়া যাইতেছে। 'রেড ষ্টার' জানাইতেছে জার্ম্মানদের ডজন ডজন ডিভিশন সৈন্য নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ত্যাগ করিতেছে। জার্ম্মানদের এই বিপর্য্যয় প্রকৃতই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

ইহাছাড়া আরও ৫০ ডিভিশন জার্ম্মান সৈন্য বেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জার্ম্মান সেনাপতি লিণ্ডম্যান এই বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক। লিণ্ডম্যানের এই বিপুল বাহিনী পলটস্ক-এর পশ্চিম হইতে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল দীর্ঘ ও ১২০ মাইল প্রশস্ত রণাঙ্গনে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। বর্শা ফলকের ন্যায় আগুয়ান লালফৌজ এখন রিগা হইতে ২০০ মাইলের কম দূরে রহিয়াছে এবং নার্ভা অঞ্চলের লিণ্ডম্যানের সৈন্য মাত্র ২৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ জার্ম্মানরা নার্ভা ব্যূহ হইতে বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়া ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

ভিলনা দখলের যুদ্ধ চলিতেছে

জেনারেল চেরণিয়াখভস্কির বাহিনী শত্রুর সমস্ত বাধা ধ্বংস করিয়া এখন ভিলনার উপকণ্ঠে লড়াই করিতেছে। সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভিলনার অভ্যন্তরেই লালফৌজ শত্রুদের সহিত হাতাহাতি লড়াই চালাইতেছে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে জার্ম্মানদের হাত হইতে ভিলনার মুক্তি সংবাদ আসিতে পারে। নানা দিক দিয়া ভিলনার গুরুত্ব খুবই বেশী। সোভিয়েট বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি হইতে জার্ম্মান সৈন্যের পলায়নের যে ১৩০ মাইল ফাঁক খোলা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ভিলনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মান ঘাঁটি। ভিলনা দখল হইলে জার্ম্মানদের দশা খুবই সঙ্গীন হইবে।

লালফৌজের দখলে বারানোভিচি, কোভেল, লিডা প্রভৃতি শক্ত ঘাঁটি

৫ই জুলাইয়ের জার্ম্মান নিউজ এজেন্সীর খবরে জানা যায়—কোভেল সহর লালফৌজের হাতে আসিয়াছে।

৮ই জুলাইয়ের খবরে জানা যায় বারানোভিচি লালফৌজ দখল করিয়াছে। মিনস্ক হইতে ব্রেষ্টলিটভস্ক গামী রেলপথের ইহা একটি খুব সুরক্ষিত ঘাঁটি। ইহা লালফৌজের দখলে আসাতে ব্রেষ্টলিটভস্ক ও বিয়ালিষ্টকের পথ উন্মুক্ত হইল।

মার্শাল ষ্টালিন ৯ই জুলাইয়ের এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে লালফৌজ লিডা দখল করিয়াছে। ভিলনা-বারানোভিচ হইয়া যে দীর্ঘ রেল পথ চলিয়া গিয়াছে লিডা তাহারই ভিতর একটি সুরক্ষিত রেল জংশন। এই ঘাঁটির সাথে বিয়ালিষ্টকের রেল সংযোগ রহিয়াছে।

এই সব সাফল্যের উল্লেখ করিয়া রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে লালফৌজ বিদ্যুৎ গতিতে পশ্চিমাভিমুখে পূর্ব্বপ্রুসিয়া ও বাল্টিক অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে, ফলে রুশ রণাঙ্গনে লালফৌজের দুইটি প্রধান বাহু বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রথম বাহুটি এখন সরাসরি কোনিগসবুর্গ ও ওয়ারশগামী রেলপথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভিলনা ও ডভিনস্ক-রিগা রেলপথের পার্শ্বে অবস্থিত ল্যাটভিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় বাহুটি আরও দক্ষিণে মিনস্ক-ব্রেষ্টলিটভস্ক রেলপথ ও লুনা-ওয়ারশ রেল লাইনকে বেষ্টন করিতেছে।

পনর দিনে পাঁচ লক্ষ জার্ম্মান হতাহত

গত পনর দিন যাবত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া লালফৌজ বার্লিনের দিকে ১৫০ মাইল আগাইয়াছে। এই সময় তাহারা ১ লক্ষ জার্ম্মান সেনা বন্দী করিয়াছে ও জলাভূমিতে আচ্ছন্ন ১ লক্ষ ৮০ হাজার জার্ম্মানকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আড়াই হইতে তিন লক্ষ জার্ম্মান জখম হইয়াছে। সুতরাং কম পক্ষে এই কয়েক দিনে পাঁচ লক্ষ জার্ম্মান সেনা হতাহত বা বন্দী হইয়াছে। লালফৌজের এই চমকপ্রদ সাফল্যে একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নাৎসী বাহিনী অপেক্ষা লালফৌজ আজ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, তাই জার্ম্মান সেনা এখন আর কোথায়ও সোভিয়েট সেনার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না, সর্ব্বত্রই তাহাদের পরাজয়ের গ্লানি মাথা পাতিয়া নিতে হইতেছে।

ভারতের বিপদ কাটে নাই

তিন মাস ধরিয়া লড়াইয়ের পর জাপানীরা ইম্ফল অঞ্চলে পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে, এতদিন ইম্ফলকে একরকম ঘিরিয়া রাখিয়াও এ যাত্রা তাহাদের মতলব হাসিল হইল না। কোহিমা হইতে শত্রু বিতাড়িত, উখরুল অঞ্চল হইতেও তাহারা পলাইতেছে। ১৫০০০ সৈন্য লইয়া শত্রু এখানে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ২১০০০ মরিয়াছে, বন্দীও নিতান্ত কম হয় নাই। মিত্রপক্ষে হতাহতের সংখ্যা ১৮০০০। বড় দরেরই একটা অভিযান জাপানী ফ্যাশিস্ট করিয়াছিল।

সৈন্যদের উদ্দেশে সেনাপতি মুতাগুচির এক বাণী মিত্রবাহিনীর হাতে পড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে কোহিমা পরিত্যাগে শত্রুর পরিতাপের অন্ত ছিল না, কিন্তু আবার ফিরিয়া আক্রমণের ফলে সম্রাটের মানরক্ষা করিতেও যে শত্রু পিছপাও হইবে না, একথা বাণীতে আছে। উখরুল পর্য্যন্ত জাপানীদের সরবরাহ ব্যবস্থা নাকি বেশ ভাল। বিষনপুর ও পালেল অঞ্চলে শত্রু এখনও জাঁকিয়া রহিয়াছে, দক্ষিণ হইতে আবার ইম্ফলের দিকে ও বিষণপুর হইতে শিলচরের দিকে আক্রমণের ক্ষমতা এখনও শত্রুর রহিয়া গিয়াছে। তাই কোহিমা-উখরুলে শত্রুর পরাজয়ে আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবারও কোন কারণ নাই।

সাবাস চীন

উত্তর বার্ম্মাতে জেনারল ষ্টিলওয়েলের সৈন্য মোগং দখল করিয়া একটা বড়দরের সাফল্য লাভ করিয়াছে, মিচিনা দখল করিবার সুযোগ আসিয়াছে। চীনে সাহায্য পাঠাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে রাস্তা যাহাতে শীঘ্রই খোলা যায়, তাহার ব্যবস্থা চটপট দরকার। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সপ্তম বার্ষিকী (৭ই জুলাই) উপলক্ষে চীনা সৈন্য হুনান প্রদেশে শত্রুকে পরাজিত করিয়া চমৎকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মার্কিন বোমারুরা সম্প্রতি কয়েকবার যাইয়া খাস জাপানে বোমা ফেলিয়া আসিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের অবস্থা পূর্ব্বের মত জোরদার নয়, মিত্রশক্তির ধাক্কা সামলাইতে শত্রু কিছুটা বিব্রত হইতেছে। চীনকে যথেষ্ট সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া, এবং ভারতবর্ষ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত শত্রুকে খেদাইয়া, যথাসম্ভব শীঘ্র যুদ্ধজয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া গিয়াছে।

উত্তর ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি

হিটলারের প্রচার বাগীশ গোয়েবেল্‌স্ আবার আর্ত্তনাদ করিয়াছে, "জার্ম্মানীকে আজ চরম বিপদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে।" সত্যই আজ হিটলার জার্ম্মানীর বিপদ ঘনাইয়াছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে মিত্রবাহিনীর দুরন্ত ধ্বংস জার্ম্মানী হইতে আর বেশী নয়। বাহাদুর লালফৌজের জয়জয়কার আজ সর্ব্বত্র; উত্তর ইতালীতে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলকে শত্রু ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছে; ফ্রান্সে নর্ম্মাণ্ডি অঞ্চলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য অগ্রসর হইতেছে, দলে দলে শত্রুসেনা তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। হিটলারীদের বিপদ সঙ্গীন হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের জনগণ বহুগুণ উৎসাহ লইয়া ফ্যাশিস্টনিধনে লাগিয়াছে।

হিটলারী সেনাপতি রমেল ও রুণ্ডস্টেডটের মধ্যে মতান্তরের খবর লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু প্রচণ্ড প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও রমেল মিত্রবাহিনীকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। শেরবুর্গ উপদ্বীপের পশ্চিমে জার্ম্মানরা পাল্টা আক্রমণ করা সত্ত্বেও সেখানে মার্কিন সৈন্যদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি নর্ম্মাণ্ডিতে দুইটী রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ স্থান—কাঁয়া এবং লা হেই—মিত্রশক্তির দখলে আসিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল যে অন্তত ৫০,০০০ জার্ম্মান বন্দী হইয়াছে। ফ্যাশিস্ট সৈন্যের মনোবল যে ভাঙিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব ইউরোপে লালফৌজ যে বিদ্যুৎবেগে আগাইতেছে, তাহাতে জার্ম্মান বন্দীরা নাকি বলিতেছে যে শরৎকাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হইতে বাধ্য।

শান্তির ফানুস ফাঁসিয়া গেল

স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া, মাঝে মাঝে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবনে মোকাবিলা করিয়া প্রাণপণে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা নাকি শত্রুপক্ষ করিতেছে। জাম্‌ফেল হোর-জাতীয় কয়েকজন ফ্যাশিস্টদের চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্ভাবনায় ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও তাহাদের হাতে আজ যুদ্ধ চালনার চাবিকাঠি নাই। চার্চিল সাহেব ফ্রাঙ্কোর তারিফ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়া যথেষ্ট সমালোচনা তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে। জনসাধারণ কিছুতেই ফ্যাশিস্টদের ফাঁদে পা দিতে রাজী নয়। শত্রুর চরম পরাজয় না ঘটা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সংকল্প আজ কেহ ভাঙিতে পারিবে না।

হাওয়াই বোমার উপদ্রব

ফ্যাশিস্ট শত্রু মাঝে মাঝে শান্তির ফানুস উড়াইয়া মিত্রশক্তিকে ভড়কাইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ঝাঁকে ঝাঁকে হাওয়াই বোমা পাঠাইয়া যেখানে সেখানে সেগুলি ফেলিয়া ব্রিটেনের জনসাধারণকে ভয় পাওয়াইবারও চেষ্টা করিতেছে! এই চালকহীন এরোপ্লেন গুলিকে হাওয়াই বোমা বলা চলে; যেখানে সেখানে পড়িয়া মানুষ মারিবে ও বেসামরিক জীবনের ক্ষতি করিবে জানিয়াই ফ্যাশিস্ট বর্ব্বরেরা এগুলি পাঠাইতেছে। ইতিমধ্যে ইহার ফলে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য লোক মারা গিয়াছেন। ৬ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত ২,৭৫২ জন এইভাবে মরিয়াছে, পার্লামেণ্টে চার্চিলের বক্তৃতায় এ কথা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু চার্চিল বেশ জোর করিয়া বলিয়াছেন যে এই হাওয়াই বোমা যেখানে সেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ ঘটাইলেও ইহাতে ফ্রান্সে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চালানো ব্যাপারে সামান্য মাত্র গাফিলি হইবে না, লণ্ডনের বিপদ বাড়িলেও মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট অন্যত্র হইতেই যুদ্ধ চালাইয়া ফ্যাশিস্টদের দফা রফা করিবার ব্যবস্থা করিবে। চালকহীন বিমান যেখানে বানানো হয়, সেখানে বোমা ফেলিয়া ও অন্যান্য উপায়েও মুস্কিলের আসান করা হইবে।

ডেনমার্কে বিদ্রোহের আগুন

দেশে দেশে ইউরোপের জনশক্তি আজ জাগিয়া উঠিয়া বর্ব্বরদের ফ্যাশিষ্ট অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। পদানত দেশগুলির মধ্যে জার্ম্মানরা ডেনমার্ককে আদর্শ বলিয়া প্রচার করিত। সেই ছোট্ট দেশের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা নাৎসিশাসনে খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে বলিয়াই শুনা যাইত। কিন্তু ডেনমার্কে আজ আগুন লাগিয়া গিয়াছে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিরাট হরতাল চলিয়াছে, প্রায়ই দেশভক্তদের সঙ্গে জার্ম্মান সেনার সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। সেখানে ৯ লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে আর ঐ ধর্ম্মঘট অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বে-আইনী স্বাধীনতা সংঘের প্রচার পত্র সর্ব্বত্র, আর বহুস্থানে মিত্রশক্তির পতাকা উড়িতেছে। জার্ম্মানদের হাতে বহু লোক হতাহত হওয়া সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় ডেনমার্ক ফ্যাশিস্ট শত্রুকে খেদাইবার প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় সফল হইয়াছে।

জনশক্তি সর্ব্বত্র জাগিয়াছে

যুগোস্লাভিয়াতে তিতোর বীর বাহিনীর কথা বলা প্রয়োজন নাই। মার্শাল জুকভ কার্পেথিয়ান পাহাড় অঞ্চলে আক্রমণ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে চেকোস্লোভাক দেশভক্তদের প্রতিরোধ বাড়িয়াছে, পোল্যাণ্ডের জনগণ তো লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্য প্রস্তুত। উত্তর ইতালীতে জার্ম্মান দৌরাত্ম্য নির্ম্মূল করার জন্য জনশক্তি রহিয়াছে।

ফ্রান্সের এক অঞ্চলে দশদিনে ২৪ বার শত্রুর রেল উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চল হইতে জার্ম্মানদের একেবারে তাড়ানো হইয়াছে। নর্ম্মাণ্ডির যুদ্ধে শত্রু ক্রমেই ঘায়েল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগযুগব্যাপী মুক্তি সাধনার স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া ফরাসী জনশক্তি আবার দুনিয়ায় চমক লাগাইবে। ফরাসীদের জাতীয় দিবস হইল ১৪ই জুলাই; ঐ দিন সারা ফ্রান্সে নূতন আশা উদ্দীপনায় ফ্যাশিস্ট ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা প্রতি দেশভক্ত নূতন করিয়া লইবে।

ইংলণ্ডের জনমত

ভারতের অচল অবস্থার অবসান চাই

হিন্দু পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা গত ৩০শে জুন সংবাদ দিয়াছেন যে 'হাউস অব কমন্সের' বিভিন্ন দলের সদস্যরা বর্ত্তমানে ভারতের অচল অবস্থা সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অচল অবস্থা সমাধানের জন্য 'ইণ্ডিয়া লীগে'র স্মারকপত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতে মিঃ ক্লেমেণ্ট ডেভিস রক্ষণশীলদলের সদস্য স্যার ষ্টানলে রীডকে আমন্ত্রণ করাতে স্যার ষ্টানলে বলেন—এইরূপ আলোচনা চালানো খুবই ভাল। বাস্তবভাবে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য যে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে স্যার স্টানলি রীড আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের স্যার জন ওয়ার্ডল মিলনেও এই মতের পরিপোষক বলিয়া জানা গিয়াছে।

লণ্ডন, ৩০শে জুন—লিভারপুলে উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লীগ ফর ফ্রিডমের এক সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে ভারতবর্ষের কংগ্রেস নেতাদের এখনও বন্দী অবস্থায় রাখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালানোর জন্য সুবিধা দানের দাবী বৃটিশ ও ভারত সরকারের কাছে জানানো হয়। ইহা ছাড়া বড়লাটকে গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

লণ্ডন, ৪ঠা জুলাই—ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ ফ্রেণার ব্রকওয়ে এক অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বড়লাট মহাত্মার সহিত দেখা করিতে অসম্মত হওয়াকে যুদ্ধের বৃহত্তম পরাজয় বলা চলে। তিনি বলেন—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজীকে হিটলারের সমপর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। তাঁহার হিটলারের সহিত আলোচনা চালাইতে যেমন অসম্মতি, গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালাইতেও তেমনি অসম্মতি—ইহা রাজনীতিজ্ঞতা নহে। স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তিদের নিকট বড়লাটের সিদ্ধান্তকে যুদ্ধের বৃহত্তম পরাজয় বলা চলে। সর্ব্বশেষে তিনি বলেন—ভারতকে বা সাম্রাজ্যকে অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি দিতে অসম্মত হইলে, ইয়োরোপকে মুক্তি দানের মূল্য কি?

অমৃতবাজার পত্রিকার লণ্ডনস্থ অফিস হইতে গত ২৮শে জুন যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে গান্ধী-ওয়াভেল সাক্ষাতের সম্ভাবনায় 'হাউস অব কমন্সের' সদস্যদের ভিতর খুবই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অনেকে একথাও বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর মুক্তির পর ভারতবর্ষ হইতে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খবর। ঘটনার গতি দেখিয়া সংবাদদাতা ইহাও মনে করেন যে শীঘ্রই মহাত্মাজী, পণ্ডিত নেহেরু, মৌলানা আজাদ ও শ্রীযুক্তা নাইডু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ আলাপ করিবার সুযোগ পাইবেন এবং মিঃ ক্রিপস্ পুনরায় শান্তির দৌত্য নিয়া ভারতে আসিতে পারেন।

হাওড়া কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন

কংগ্রেসকে বাঁচাইতে দেশবাসীর সেবা করো

মহাত্মাজির মুক্তি ও পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ার ফলে কংগ্রেস কর্ম্মীরা নূতনভাবে ভাবিতে সুরু করিয়াছেন। দীর্ঘ দুই বৎসরের নৈরাশ্য ও অবসাদ কাটাইয়া ভারতের প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে আবার নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সভা সমিতি ও সম্মেলনের মধ্য দিয়া কংগ্রেস গঠনকে জীয়াইয়া তুলিবার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। বাংলার পক্ষে ইহা এক নূতন আশার কথা। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত বাংলার কংগ্রেস যদি আবার জীবন্ত হইয়া জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তা হইলে বাংলা এই সংকট হইতে বাঁচিবার নূতন উৎসাহ পাইবে।

গত ৮ই ও ৯ই জুলাই তারিখে হাওড়া জেলা কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন এই দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মীরই এবং সেখানে যে সকলেই এক এবং সেই একতার পথেই যে আজ কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারা যাইবে সেটাই এই সম্মেলনে প্রকাশ পাইল। ১১৮ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি জেলার সমস্ত কেন্দ্র হইতে আসিয়াছেন। একদিকে জেলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালোবরণ ঘোষ ও পুলিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া সকল মতাবলম্বী তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা সমবেত হইয়াছেন। অপর দিকে আসিয়াছেন বিখ্যাত প্রাদেশিক নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, বি, পি, সি, সির সম্পাদক কমলকৃষ্ণ রায়, বীরভূমের মিহিরলাল চাটার্জী, বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সুযোগ্য সম্পাদক অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, মেদিনীপুরের সদ্যমুক্ত কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেন ও বি, পি, সি, সির ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুল মোমিন প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সভায় ৯টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহার মধ্যে একটী প্রস্তাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেবা করার জন্য সকল কংগ্রেসসেবীদের আহ্বান করিয়া বলা হয়—'অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রিলিফের কাজ কোন অবস্থাতেই কার্য্যকরী হয় না সুতরাং কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত জেলা কংগ্রেস-সেবাসমিতির মারফৎ রিলিফ আন্দোলন চালাইবার জন্য সমস্ত রিলিফ কর্ম্মী ও প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করা যাইতেছে।" অপর একটী প্রধান প্রস্তাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির সমস্যা সম্পর্কিত কংগ্রেসের দিল্লী প্রস্তাবের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দেশপ্রেমিককে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করা হয়।

সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া সকল কংগ্রেসকর্ম্মিগণকে অবিলম্বে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া কংগ্রেস সংগঠনকে পুনরায় নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের উপরই সমাগত নেতৃবৃন্দ একে একে বক্তৃতা করেন। কি স্থানীয় কর্ম্মী, কি প্রাদেশিক নেতা সকলের বক্তৃতার মধ্যেই বিভিন্ন ভাবে এই দৃঢ় সংকল্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে অতীত কর্ম্মচাঞ্চল্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে—জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সাথে কংগ্রেস সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবের উপর শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ রায় বলেন "মহাত্মাজীর মুক্তির সাথে সাথে আজ আবার দিন আসিয়াছে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিবার। প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীকে স্বাধীনতার বাণী নিয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। তবেই আজিকার নৈরাশ্য ও অবসাদের অবসান সম্ভব।" শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী বলেন "সম্মেলনের সবচাইতে বড় লাভ এই যে, বহুদিন পর সকলেই খোলাখুলিভাবে এক সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া সকলের চেষ্টায় যাহাতে কংগ্রেসকে পুনর্গঠন করা যায় সে সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার আসল উপায়—জনগণের জীবনের সকল প্রকার সংকট সমাধানে অগ্রণী হওয়া। অহিংসা, জাতীয় ঐক্য ও সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ—কংগ্রেসের এই মূলনীতি রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়া বিচার করিতে হইবে।

সভায় জনতার মধ্যে তুমুল উৎসাহের ভাব দেখা যায় অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বক্তৃতায়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন "কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে জনসাধারণের সেবা করিতে হইবে। আজিকার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত বাংলায় এই সেবার কাজই প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর প্রধান কর্ত্তব্য। প্রায় তিন বছর আগে মহাত্মাজী কংগ্রেস সেবীদের 'আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আন্দোলন' করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে আমরা অনেকাংশে প্রতিরোধ করিতে পারিতাম।" বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজকুমার বাবু এইমতও প্রকাশ করেন যে, যেখানে জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের কাজের সুযোগ আছে সেখানে সরকারী ফুড কমিটীতেও যোগদান করা উচিৎ। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন "এ বিষয়ে গান্ধীজির নির্দ্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীর কর্ত্তব্য।" তিনি আরও বলেন যে "দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রতিরোধের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আজ সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি প্রয়োজন।" এই মুক্তি আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে চালাইবার জন্য উপস্থিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুরোধ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসমাবেশে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হয়। সমর মুখার্জ্জী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন

পাকিস্তানের দাবী কেন ও কিসের জন্য

১লা ও ২রা জুলাই ইসলামিয়া কলেজে পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই বছর আগে 'আজাদ' পত্রিকাকে ভিত্তি করিয়া কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলমান পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী স্থাপন করেন এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান ও অ-মুসলমান সমাজকে পাকিস্তানের সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তাহারই ফল স্বরূপ তাহারা মুসলমান ও অমুসলমান সমাজের কাছে যে সাড়া পাইয়াছেন তাহার ভিত্তিতে এই সম্মেলন হইতে পারিয়াছে।

পাকিস্তানের ভিত্তি কিসের উপর ?

এই সম্মেলনে যাহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন তাহার মধ্যে আছেন আবুল মনসুর আহমদ, আবুলকালাম সামসুদ্দিন, মুজিবর রহমান খাঁ প্রভৃতি। ইহাদের অভিভাষণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানকে — সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাসী করাইবার ব্যাকুল আগ্রহ। 'আজাদ' সম্পাদক আবুলকালাম সামসুদ্দিন তাহার বক্তৃতায় বলেন যে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নহে—কারণ তাহারা মুসলমানের অতীত জিনিষ ফিরাইয়া আনিতে চান না—অতীতের যাহা কিছু ভাল তাহারই ভিত্তিতে নূতন ভবিষ্যত গড়িবার আন্দোলন ইহা। এবং স্বাধীনতাই হইবে সেই ভবিষ্যতের প্রধান স্তম্ভ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান নূতন সৃষ্টি না করিয়া ভারবাহী পশুর মত আচরণ করিয়াছে। ফলে বাংলার সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। কাজেই আজ মুসলমানের কাজ হইল তাহার দায়িত্ব যথারীতি সুসম্পন্ন করা। সম্মেলনের সভাপতি আবুল মনসুর আহম্মদ বলেন যে পূর্ব্ব-পাকিস্তান কথাটা ব্যবহার করার অর্থ হইল এই যে তাহারা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করেন। কাজেই যাহারা ভাবেন সমস্ত ভারতের মুসলমান এক জাতি হিসাবে গণ্য হইবার দাবী করিতেছে তাহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী। মুসলমানদের পাকিস্তানে যাহারা ইংরেজের দাসত্ব দেখিতে পায় তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া আবুল মনসুর বলেন, "২।৪ টা চাকুরী দিয়ে দুটো স্কুল কলেজ খুলে আর আইন সভায় দু'দশটা প্রস্তাব পাশ করে বঞ্চিত মুসলমান জাতিকে বাঁচান যায় না, এদের মুক্তি আনতে হলে চাই সর্ব্বগ্রাসী বিপ্লব।"

একতাবদ্ধ ভারত গড়িবার পথ

প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক মৌলবী আবুল হাসেম এই সম্মেলনকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া বলেন যে **কংগ্রেস এতকাল ধরিয়া সগৌরবে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে চালনা করিয়াছে বলিয়াই আজ পাকিস্তানের দাবী আমাদের মনে জাগরুক হইতে পারিয়াছে। অথচ কংগ্রেসই আজ সেই বিষয়ে নিস্তব্ধ বলিয়া চারিদিকে এত হতাশা।...সোভিয়েটের আদর্শ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, কেবল পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিলেই অখণ্ড হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।**

শাখা সম্মেলনের আলোচনা

এই সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের বক্তৃতাতেও এই সুর। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সভার সভাপতি মুজিবর রহমান খাঁ তাহার অভিভাষনে বাংলা ও আসামের হিন্দু ও মুসলমানকে স্ব স্ব সংস্কৃতির প্রতি সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন ও অন্যান্য সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। অর্থনৈতিক শাখার সভাপতি অধ্যাপক আবদুস সালেম ভারতের পটভূমিতে বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করার জন্য সমাজতান্ত্রিক প্ল্যানিংএর পক্ষে আহ্বান জানাইয়াছেন—নিখিল ভারতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠনের পরিকল্পনা দিয়াছেন এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া হিন্দু মুসলমানের একত্র হইবার আবেদন জানাইয়াছেন। ইতিহাস শাখার সভাপতি আবদুল মৌদুদ ইতিহাসের সাহায্যে দেখাইয়াছেন, কি ভাবে দীর্ঘ কাল ধরিয়া বাঙ্গালীরা জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র বৃদ্ধি পাইতেছিল; বাংলার পুরাতত্ত্ব ঘাঁটিয়া বাঙ্গালী জাতির নূতন ইতিহাস রচনা করিবার জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের আবেদন জানান।

এই সম্মেলনের সঙ্গীত ও শিল্পশাখার বিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক সুশোভন সরকার সভাপতিত্ব করেন। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম কৃষক সমাজের অবদান সম্পর্কে মনোরঞ্জনবাবু একটী সুচিন্তিত ভাষণ দেন এবং সুশোভন বাবু বর্ত্তমান জগতের চারিটী ভাব ধারা: ফ্যাশিজম বিরোধীতা, সমাজতন্ত্রবাদের জয় যাত্রা, সমস্ত দেশের স্বাধীনতা স্পৃহার জাগরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবীর মধ্যেকার যোগাযোগ দেখাইয়া পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষণ দেন।

সম্মেলনের মধ্যে ময়মনসিংহের পল্লী-শিল্পীদের দ্বারা একটী জলসা হয় এবং নাটিকা অভিনীত হয়। হলঘরের মধ্যে মহম্মদআলি ও ইকবালের ফটোর পাশাপাশি ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবি। বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহের বিরাট জনতার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য, দেশের স্বাধীনতার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও বাংলার হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক এক সঙ্গে নূতন বাংলা গড়িবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছিল।

চীন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক

ইতিহাসের স্মরণীয় দিন ৭ই জুলাই

৭ই জুলাই চীনের জাতীয় প্রতিরোধ দিবস। সাত বছর আগে চীনের মানুষ জাপানের সাম্রাজ্যলোভের সামনে জাতীয় ঐক্যের যে প্রাচীর তুলিয়াছিল, আজও তাহা পরাক্রান্ত জাপান লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। এই ঐক্যই আজ চীনের মহাস্ত্র! ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই তাই চীনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

দীর্ঘ ৭ বছর ধরিয়া চীনের লক্ষ লক্ষ বীর দেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। জায়গার পর জায়গা জাপান গ্রাস করিয়াছে। চীন তবু আজও অপরাজেয়। শত্রুর কাছে নতজানু হইয়া চীন দাসত্বের বিনিময়ে শান্তি ভিক্ষা করে নাই। জাপান আগাইয়াছে, কিন্তু পিছনে নদীনালা, অরণ্য, পর্বত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে ঘৃণার অগ্নিবান।

তবু পরাক্রান্ত জাপান আজও চীনের মাটি হইতে উৎখাত হয় নাই। বছরের পর বছর চীন খালি হাতে শত্রুকে রুখিয়াছে। চীনের সমরসম্ভার চাই। মিত্র-শক্তির আঘাতে জাপানের হার আজ অনিবার্য; কিন্তু সেই পরাজয় আসন্ন করার জন্য চীনের হাতে বল যোগাইতে হইবে।

চীনের বিপদ্ আজও কাটে নাই। খাস চীনে জাপবিরোধী যুদ্ধের গতিবেগ আজ মন্থর। চীনের বিপুল জনবল আজও অসংগঠিত। দেশের সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগানোর অর্থনৈতিক আয়োজন আজও অসম্পূর্ণ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভেদ আনিয়া চীনের প্রতিরোধ শক্তিকে দুর্বল করিতেছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুওমিংটাঙের আক্রমণ—জাতীয় এই অনৈক্যই জাপানকে চীনের বুকে নূতন আক্রমণের সাহস দিয়াছে;—প্রতিরোধ শক্তিকে বিপন্ন করিতেছে।

বাহিরের সাহায্য চীনে প্রেরণের জন্য বার্মা সড়ক শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করিতে হইবে। চীন ও ভারতের ভাগ্য আজ একসূত্রে গাঁথা। চীন এতদিন জাপানী শত্রুকে প্রতিহত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছে। ভারতের সীমান্ত রক্ষায় চীনের সৈনিক প্রাণ দিয়াছে। আজ চীনের বিপদে ভারতবাসীকেও আগাইয়া আসিতে হইবে। জাপানী দস্যুকে বার্মা সড়ক হইতে তাড়াইয়া চীনে সাহায্য প্রেরণের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। জাপ ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধতা চীনের শক্তিকে সংহত করিবে। জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যের আঘাত চীনের ভিতরকার সমস্ত ভেদ-চেষ্টা গুঁড়াইয়া দিবে। চীনের ৪৫ কোটি ও ভারতের ৪০ কোটি জনগণের ঐক্যে পরাধীনতার নাগপাশ চূর্ণ হইবে।

★ গান্ধীজির মুক্তিতে ★

চীনের কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং

মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি সম্পর্কে গত ৭ই মে ইয়েনান হইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুং নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন:—

'স্বাস্থ্যহানির জন্য মহাত্মা গান্ধী দুই বছর পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত দুই বছর ধরিয়া ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের জনগণ সমানে তাঁহার মুক্তি দাবী করিয়া আসিতেছিল। আমরা তাঁহার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করি। আজ ভারতের সামরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানীদের হটাইতে হইলে ও ফ্যাশিস্টদের পরাস্ত করিতে হইলে ভারতের জনগণকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে যুদ্ধায়োজনের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে এবং ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র দিতে হইবে। গান্ধীজীর মুক্তি আজ নব যুগের সূচনা করুক।—অচল অবস্থার অবসান করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গান্ধীজী দ্রুত নিরাময় হইয়া এই পথে নেতৃত্ব দিন, ইহাই আমরা কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষেরও উচিত নেহরুপ্রমুখ ফ্যাশিস্টবিরোধী জননেতাদের মুক্তির মধ্য দিয়া অচল অবস্থার অবসান করা। গত দুই বছরের অচল অবস্থায় কাহারও কোন লাভ হয় নাই; বরং, ইহার ফলে হতাশা বাড়িয়াছে। এই অবস্থা আর কোনক্রমেই চলিতে দেওয়া উচিত হইবে না।'

—এলায়েড লেবর নিউজ, নিউ ইয়র্ক

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত

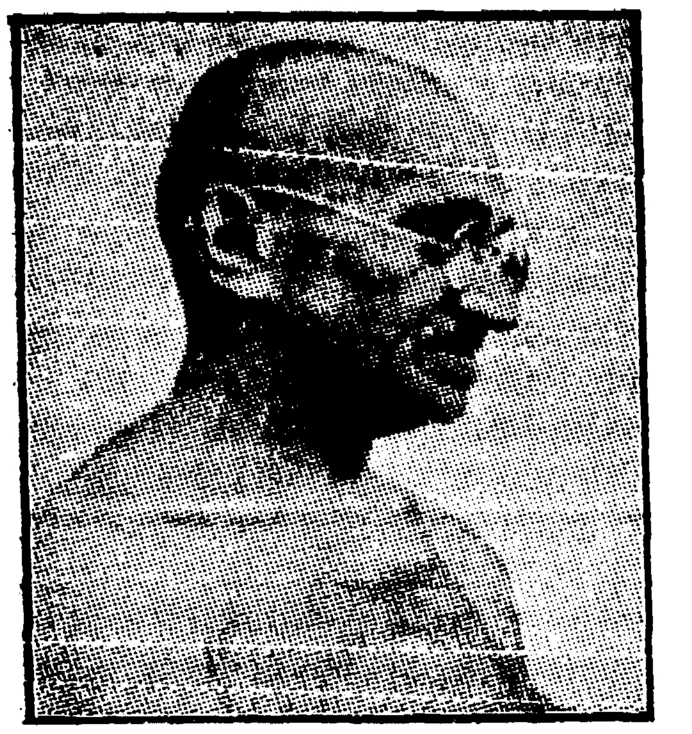

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] ১৯শে জুলাই, বুধবার, '৪৪, ৩রা শ্রাবণ '৫১ [দাম ছ' পয়সা

গান্ধীজীর পথ নির্দ্দেশ

কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা হইলে

আজ ভারতের মুক্তি কে ঠেকাইবে ?

[জি, অধিকারী]

এই সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইতেছে গান্ধীজীর সঙ্গে লণ্ডনের "নিউজ ক্রনিকেলের" সংবাদদাতা মিঃ গিলডারের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। এই সংবাদ সংক্ষিপ্ত ভাবে বিলাতে পাঠানো হইয়াছে এবং এদেশের সমস্ত সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের মারফত গান্ধীজী তাঁহার দ্বিতীয় রাজনৈতিক ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ঘোষণা ভারতের নূতন সম্ভাবনার পথ ভাল ভাবেই খুলিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে রাজাজীর আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর প্রস্তাব গান্ধীজী প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়াছেন এবং রাজাজীর প্রস্তাব ও গান্ধীজীর বিবৃতি একত্রে দেখিলে মনে হয় যেন এইবার অচল অবস্থার শেষ প্রান্তে আসা গিয়াছে।

গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে দেখা করিবার অনুরোধ করিলে ওয়াভেল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে "ভারতত্যাগের' প্রস্তাবের প্রতি গান্ধীজীর অবিচলিত নিষ্ঠাই এই প্রত্যাখ্যানের হেতু"। কেননা ওয়াভেল আশংকা করেন যে "এই প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত নয় এবং অবিলম্বে কার্য্যকরী হইতেও পারে না।"

কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটি অযৌক্তিক ও অবাস্তব? সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিবার ভয়? না, যুদ্ধের মধ্যে অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজের দাবীর ভয়?

গান্ধীজীর বিবৃতি হইতে

(১) ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত পরামর্শ না করিয়া গান্ধিজী নিজে কিছুই করিতে পারিবেন না।

(২) যদি বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী তাঁহাকে বলিবেন যে, মিত্রপক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করাই তাঁহার সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য নহে।

(৩) পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অভিপ্রায় তাঁহার নাই। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। তিনি দেশকে ১৯৪২ সালের অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না।

(৪) গত ২ বৎসরে আন্তর্জাতিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত পরিস্থিতি নূতন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

(৫) অসামরিক শাসন ব্যবস্থায় পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই সম্প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

(৬) জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে গান্ধীজি কংগ্রেসকে তাহার সহিত সহযোগীতা করিতে পরামর্শ দিবেন।

(৭) স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত হইলে তিনি সম্ভবত কংগ্রেসের পরামর্শদাতার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

সরকারের সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রালাপের ভিতর এই দুই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর গান্ধীজী ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গিল্ডারের মারফৎ গান্ধীজী এই উত্তরগুলি এমনি সোজাসুজি, সুস্পষ্টরূপে ও অভ্রান্ত ভাষায় দিলেন—যাহা দুনিয়ার সর্ব্বত্র সমস্ত সৎ ও স্বাধীনতা প্রিয় গণতান্ত্রিক ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধীরা সহজেই বুঝিতে পারিবে এবং প্রশংসা করিবে।

আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান

প্রথমতঃ গান্ধীজী বলিয়াছেন যে আজিকার দিনে আইন অমান্য আন্দোলন করিবার কোন ইচ্ছাই তাঁহার নাই বা জনগণের উপর তাঁহার যে প্রভাব আছে তাহার জোরেও তিনি আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিতে চান না। তিনি সরকারকে বিব্রত করিতে চান না।...তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "আমি দেশকে ১৯৪২ সালের অবস্থায় ফিরাইতে পারি না।"

এই সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আগষ্ট প্রস্তাব অকেজো হইয়া গিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে ওয়াভেল ও তাহার আমলারা অচল অবস্থা চালু রাখিবার জন্য তাহাদের যুক্তিকে এই ভাবে দাঁড় করায়: "গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহ তাঁহার প্রাণবায়ু স্বরূপ, কাজেই আমরা কি করিয়া বলি যে তিনি আবার সত্যাগ্রহ করিবেন না?"

যুদ্ধের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন পুনর্ব্বার সুরু করিবার কোন ইচ্ছাই নাই—এই প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা গান্ধীজী অচল অবস্থা বজায়কারীদের যুক্তিকে একেবারে খোঁড়া করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাদেরই নহে, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সোশালিষ্টদের মত জাপ-পন্থীদের আবার একবার ধ্বংস কার্য্যে লাগিবার স্বপ্ন ও অচল অবস্থা চলিতে থাকিলে আবার আগুন জ্বলিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস—সবই গান্ধীজী বানচাল করিয়া দিয়াছেন।

গত আড়াই বছরে দেখা গিয়াছে যে আমাদের জাতীয় শক্তিগুলি ধ্বংস হইতেছে, জাতীয় আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত এবং সারা দেশে হতাশা। এই অভিজ্ঞতা গান্ধীজী কত দ্রুত লাভ করিতেছেন তাহা তাঁহার স্পষ্টোক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়।

১৯৪৪ সাল—১৯৪২ সাল নহে

দ্বিতীয়তঃ—গান্ধীজী খোলাখুলি বলিয়াছেন যে এ দাবী যুদ্ধের মধ্যেই আপোষের জন্য ভারতের বর্ত্তমান দাবী পূর্ণ স্বরাজ চাই:

"১৯৪২ সালে তিনি যাহা দাবী করিয়া ছিলেন আজকের দাবীর সঙ্গে তাহার পার্থক্য আছে। আজ বেসামরিক শাসন কার্য্যের জন্য পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতীয় সরকার হইলেই ভারত খুসী হইবে। ১৯৪২ সালে এ অবস্থা ছিল না। আজ কেন্দ্রীয় পরিষদে জনগণের নির্ব্বাচিত যে সমস্ত সদস্য আছে তাহাদের পছন্দমত লোকের দ্বারা জাতীয় সরকার গঠিত হইবে। যুদ্ধের পরেই যাহাতে ভারত স্বাধীন হইতে পারে এই মর্ম্মে ঘোষণা করিতে হইবে।"

সামরিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা চাপিয়া বসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই গান্ধীজী এই কার্য্যকরী প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন। গান্ধীজী বরং একটু বেশী অগ্রসর হইয়াই বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সামরিক কার্য্যকলাপ তো কোন রকমেই বাধাপ্রাপ্ত হইবে না বরং যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে দেশের মধ্যেকার সমস্যা সমাধান দেশের নেতাদের দ্বারা জাতীয় সরকার-ই কেবল করিতে পারে।

গান্ধীজী পরিষ্কার বলিয়াছেন যে জাতীয় সরকার বড়লাটের অধীনে কাজ করিবে, বড়লাট গঠনতান্ত্রিক শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন এবং ভারতীয় ও বৃটিশ সেনাদের সম্পূর্ণরূপে পরিচালনার অধিকার বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির উপর ন্যস্ত রহিবে। প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী সম্পর্কে গান্ধীজী বলিতে চাহিয়াছেন যে এই মন্ত্রী দেশরক্ষার ব্যাপারে বাস্তবিকই উৎসুক থাকিবে এবং নীতি নির্দ্ধারণ করিবার কাজে মূল্যবান সাহায্য দিতে পারিবে। এখন একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষেই কেবল বলিতে পারে যে এই রূপ জাতীয় সরকার কার্য্যকরী হইবে না, বা যুক্তিসঙ্গত নয়। [২য় পৃঃ দেখুন

সম্পাদকীয়

বাংলার জনসাধারণ
গান্ধীজির সমর্থনে অগ্রসর হও !

লীগের সঙ্গে আপোষ এবং যুদ্ধ সমর্থনে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে রাজাজি ও গান্ধীজি যে দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যুগান্তকারী। কিন্তু উহা সফল হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। যে বাধা আমাদের নিজেদের ভিতর হইতেই আসিতেছে, সকলের আগে সেগুলিকেই দূর করিতে হইবে।

প্রথম, 'হিন্দু সভার বাধা। শ্যামাপ্রসাদ বাবু গান্ধীজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন: ..."ভারতের সর্ব্বত্র জনমতের অভিব্যক্তির দ্বারা সুস্পষ্টরূপে এইরূপ ঘোষণা করিতে হইবে যে জিন্না অথবা রাজাগোপালাচারী মার্কা পাকিস্তানের আত্মঘাতী নীতির ভিত্তিতে কোন রাজনীতিক মীমাংসা কদাচ গ্রহণযোগ্য হইবে না।" ইহাদের আসল ভয় যে রাজাজির প্রস্তাবের ভিত্তিতে হয়তো "রাজনীতিক মীমাংসা" হইয়া যাইবে; হিন্দু মুসলিম মীমাংসারই ইঁহারা বিরোধী; কারণ, বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গেলে হিন্দু সভার অস্তিত্বই তো লোপ পায়। সেজন্যই ব্রিটিশের অধীনে বর্ত্তমান দুঃসহ অচল অবস্থা ও দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাও বরং ভাল কিন্তু "পাকিস্তান নীতির ভিত্তিতে রাজনীতিক মীমাংসা" বা বন্ধনমুক্তি কিছুতেই নয়! সর্বভারতীয় হিন্দু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে ইঁহারা মুসলিম জাতিগুলিকে জোর করিয়াই অধীনে রাখিতে চান এবং এই জবরদস্তিকেই ভারতের অখণ্ড ঐক্য বলিয়া চালাইতে চান।

বাংলা দেশের হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তথা কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাস্তবিকই মীমাংসার জন্য আগ্রহশীল, কিন্তু হিন্দু সভার প্রচারে ঘাবড়াইয়া গিয়া প্রশ্ন করেন—বাংলা দেশ বা বাংলা দেশের অংশবিশেষ ভারতবর্ষ হইতে আলাদা হইয়া যাইবে ইহা আমরা কেমন করিয়া মানি, এই বিচ্ছেদকে আমরা কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্যের আদর্শ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করি?

* আলাদা হইতেই হইবে এমন কথা তো গান্ধীজি বা রাজাজি বলেন নাই। আজ জাতীয় আন্দোলনে তথা ক্ষমতা-দখলের সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে নাই। আপোষ হইতে হইলে রাজাজির প্রস্তাব সেই হিন্দু-মুসলমান তথা কংগ্রেস-লীগকে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্য এখনই একসঙ্গে চেষ্টায় নামাইতেছে, অর্থাৎ বিচ্ছেদকে আজই ঐক্যে পরিণত করিতেছে। আর এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ভারত স্বাধীন হইলে তাহার পরই আলাদা হইবার কথা আসিতে পারে। হিন্দু মুসলমানের যে-বিরাট ঐক্য ও মিলিত পরিশ্রম ভারতকে স্বাধীন করিবে সেই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ঐক্য ও পরস্পর বিশ্বাস আরও দৃঢ় সংবদ্ধ হইবে, স্বাধীনতার পর আলাদা হইবার প্রয়োজনই হয়তো কেহ অনুভব করিবে না। আর যদি করেও তো বর্ত্তমান মিলিত দাসত্বের অপেক্ষা পৃথক স্বাধীনতাও হাজার গুণে ভাল নয় কি? মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে গণতন্ত্রসম্মত স্বাধীনতা ব্রিটিশ দাসত্বের অপেক্ষা শ্রেয় নয় কি?

তৃতীয় বাধা আসিতেছে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট, সুভাষপন্থী প্রভৃতি জাপ-পক্ষপাতী দল হইতে। গান্ধীজি কর্ত্তৃক আইন অমান্য নিষেধ, যুদ্ধ সমর্থনের সাময়িক গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ইত্যাদিতে তাহারা দেখিতেছে যে জাপানীর পক্ষ লইয়া দেশের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করার সমস্ত আশা মিলাইয়া গেল; তাই অতি আক্রোশে তাহারা চীৎকার করিতেছে—গান্ধীজি বিশ্বাসঘাতক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছেন ইত্যাদি। ইহাদের বক্তৃতাকে বামপন্থী ভাবিয়া কোন কোন কংগ্রেসকর্মী ভ্রান্ত হইতে পারেন। সেজন্য বলিতে হয়: দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেশের সমস্ত ভাবস্তুকেই পঙ্গু করিতেছে তাহা গান্ধীজি বুঝিয়াছেন; ইহাও বুঝিয়াছেন যে ইহার প্রতিরোধের জন্য যেখানে যতটুকু ক্ষমতা পাওয়া যায় তাহাই দখল করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে তবেই দেশ বাঁচিবে। সেজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে "জনগণের দুর্দশা আয়ত্তে আনিবার" জন্য "বে-সামরিক ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই"। জনগণকেই যদি আমরা বাঁচাইতে না পারি তো পূর্ণ স্বাধীনতা আনিবে কে?

আর "বিশ্বাসের ভিত্তিতে" দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ এইরূপ সাময়িক গবর্ণমেণ্টও যে পৃথিবীর প্রগতিশীল জনমতের সহায়তায় আপন ক্ষমতার পরিধি ক্রমশই বিস্তার করিয়া চলিবে তাহা তিনি বুঝিয়াছেন; সেজন্যই বলিয়াছেন, "যুদ্ধকালে ইহাই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সামিল হইবে।" ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে আত্মসমর্পণ নয়—নিজেদের ঐক্য ও দেশরক্ষা-মূলক সংগ্রামের ভিত্তিতে পৃথিবীর জাগ্রত জনমতের সঙ্গে একত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া।

চতুর্থ ও সব চেয়ে বড় বাধা হইল কংগ্রেস মহলের সন্দেহ—জিন্না কিছুতেই মিটমাট করিবেন না, জিন্না সাম্রাজ্যবাদের অনুচর মাত্র ইত্যাদি। ইহার জবাবে গান্ধীজি নিজেই বলিয়াছেন, "রাজাজির ফর্মুলা সম্পর্কে কায়দে আজম বা মুসলিম লীগ কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।......আমার পক্ষ হইতে আমি দেশী ও বিদেশী প্রশ্নকর্ত্তাদের একটুকু অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন মুসলিম লীগ কোন অভিমত দিবার আগেই সে অভিমত কি হইবে তাহা ধরিয়া না লন।"

লীগ কি করিবে তাহা বহু পরিমাণে আমাদের উপরই নির্ভর করে। কংগ্রেসের মত এত দীর্ঘদিনের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা বা সংগ্রামলব্ধ দূরদৃষ্টি লীগের নাই, সংখ্যাল্প বলিয়া লীগের সন্দেহও কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই সেখানে দুর্বলতা বা ভ্রান্তির অবকাশ যথেষ্ট আছে। লীগ কিছু করিবে না করিবে না বলিয়া যদি আমরা চীৎকার করিতে থাকি, কিংবা লীগকে বাদ দিয়াই ওয়াভেলের সঙ্গে আপোষ হইয়া যাইবে এই মরীচিকার পিছনে ছুটিতে থাকি—তাহা হইলে লীগের সন্দেহ ও দুর্বলতা আমরাই বাড়াইয়া দিব, লীগ ভাবিবে রাজাজির প্রস্তাব লীগকে বে-কায়দায় ফেলিবার চাল মাত্র। তাহাতে লীগের সঙ্গে আপোষ হইবে না, ওয়াভেলের কাছ হইতে ক্ষমতা আদায়ের আশা মরীচিকাই থাকিয়া যাইবে।

শুধু বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই আপোষ সম্ভব। সেই আবহাওয়া কংগ্রেসপন্থী জনসাধারণকেই সৃষ্টি করিতে হইবে। বিনা দ্বিধায় রাজাজি ও গান্ধীজির প্রস্তাবের সমর্থনে প্রত্যেককে আগাইয়া আসিয়া দেশময় বিরাট সাড়া তুলিতে হইবে। সাহস করিয়া হিন্দুসভাপন্থী ভেদনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে! জনসমাবেশের পর জনসমাবেশে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, লীগের প্রতি বন্ধুত্বের আহ্বান জানাইতে হইবে। তবেই বাংলা দেশ গান্ধীজির উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে।

বাংলার বিপদ কি কাটিয়াছে ?

গভর্ণর কেসি ও আমেরির আশ্বাস কতটুকু সত্য ?

গত ১০ই জুলাই বাংলার খাদ্য অবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণর কেসি এক বেতার বক্তৃতায় জনসাধারণকে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, **"আমরা বিপদ প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছি।"** ১৩ই জুলাই বিলাতের হাউস অফ কমন্সে আমেরি সাহেব এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছেন, **"দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা আবার যাহাতে লোককে সহিতে না হয়, তারজন্য যা কিছু সম্ভব করা হইতেছে।"** আমলাতন্ত্রের বড় কর্ত্তাদের এই কথা শুনিয়া মনে হয়, বুঝি বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার আর কোন কারণ নাই, সব ঠিক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই স্তোকবাক্য কাহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ? বাংলার ৬ কোটী লোক প্রতিদিন খাদ্য সংকটে যে ভাবে পীড়িত হইতেছে, তাদের সে-যন্ত্রণা কি আমেরি ও কেসির স্তোক বাক্যেই দূর হইবে ?

কেসি বলিয়াছেন, "আগামী আমন ধান না উঠা পর্য্যন্ত বিপদ যাহাতে না আসে, তারজন্য ন্যূনতম যে পরিমাণ চাল খরিদ করা দরকার তা আমরা করিয়াছি।"

● যারা ধান চাল মজুত করিয়া বাজার দর বাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে, তাদের উদ্দেশ করিয়া কেসি বলিয়াছেন—তারা মনে করিয়াছিল যে আমাদের ক্রয়-নীতি ব্যর্থ হইবে এবং চালের দর বাড়িবে; তাদের এই আশা নষ্ট হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো নষ্ট হইবে।

সরকারী ক্রয় কি যথেষ্ট ?

সরকার কত পরিমাণ চাল খরিদ করিয়াছেন, তা কাহারও জানা নাই। খরিদ করিতেছি, ভাবনা নাই—এ কথা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত সরকারের তরফ হইতে খরিদের কোন হিসাব জনসাধারণকে জানান হয় নাই। কিন্তু ভাবনা নাই, এ কথা হাজার বার বলিলেও লোকে দেখিতেছে যে, ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে; কেন না, সরকারী খরিদ যে যথেষ্ট নয়, হাতে হাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের রেশনিং ছাড়া, আর কোথাও পুরা রেশনিং এখনও হয় নাই। যে চট্টগ্রামে খাদ্য সংকট সবচেয়ে সাংঘাতিক, সেখানেও যে শতকরা ১০ জনের বেশী লোককে রেশন দিবার ব্যবস্থা হয় নাই, এ কথা সুরাবর্দ্দী সাহেব অনেক দিন আগে নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন। মফঃস্বলের অনেক জায়গায় রেশনকার্ডে লেখা থাকে, সরবরাহ আসিলে তবে রেশন দেওয়া হইবে, অর্থাৎ সরবরাহের কোন গ্যারাণ্টি নাই, সরবরাহের উপযুক্ত ষ্টক সরকারের হাতে নাই। বাংলার সমস্ত শহরে রেশনিং করিতে ৫ কোটী মণ চাল দরকার—আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি অন্ততঃ ৫ কোটী মণ চাল খরিদ করা হইয়া থাকে তা হইলে শহরাঞ্চলে এখনও আধা রেশনিং চলিতেছে কেন বা অনেক জায়গায় রেশনিং চালু না করিয়াই এখনও সরকার চুপ করিয়া আছে কেন ?

চালের দর কি কমিতেছে ?

চালের দর বাড়াইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া কেসি সাহেব বড় গলায় ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—ব্যর্থ হইয়াছে কোথায় ? এই সংখ্যারই 'জনযুদ্ধে' কয়েকটী জেলার বর্তমান চালের দর প্রকাশিত হইয়াছে। কনট্রোল দরের চেয়ে বেশী দরই শুধু নয়, সপ্তাহে সপ্তাহে এখনও দর বাড়িতেছে। 'চট্টগ্রাম সপ্তাহ' সম্পর্কে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট জননেতার যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাতে বলা হইয়াছে যে চট্টগ্রামে চালের দর ৪০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সুরাবর্দ্দী সাহেব নিজেও বলিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের একটী অঞ্চলে চালের দর ২০৲ মণ। অর্থাৎ সমস্ত জায়গাতেই চোরাকারবারীরা অবাধে ব্যাপার চালাইতেছে।

যদি সরকারী ক্রয় যথেষ্ট হইত এবং তার দ্বারা রেশনিং ও কন্‌ট্রোলশপ চালু হইত, তবে এই চোরাকারবারীদের দন্ত চূর্ণ হইত। কিন্তু আজকে ইহারাই কেসির দন্ত চূর্ণ করিতেছে। কয়েকদিন আগে মাদারীপুরের খবরে প্রকাশ যে, শতকরা ৯০ জনকে চোরাবাজারের দ্বারস্থ হইতে হয়। সরকারী ক্রয়নীতির সার্থকতার নমুনা তো ইহাই! কেসি সাহেব বলিয়াছেন, "ছোটখাট কয়েকটী জায়গায় যানবাহনের অসুবিধার জন্য কিছু মুস্কিল হইতেছে।" ছোটখাট জায়গা বলিয়া কেসি সাহেব সমস্যাটীকে এখন ছোট করিয়া দিতেছেন, কিন্তু কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যানবাহনের অসুবিধাটাই মন্ত্রীমণ্ডলী সবচেয়ে বড় অসুবিধা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখনও বিভিন্ন জেলায় সরকারী ষ্টকের অধিকাংশ চাল গুদামে পড়িয়া পচিতে দেখা যায়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ দেয়—যানবাহনের অসুবিধা। ঘাটতি অঞ্চলগুলি চালের অভাবে শুকাইয়া মরিতেছে, অথচ যানবাহনের অসুবিধা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা নাই। তবে কি দেখিয়া কেসি সাহেব বলেন: বিপদ কাটিয়া গিয়াছে ?

মহামারী কি বন্ধ হইয়াছে ?

মহামারী সম্বন্ধে কেসি সাহেব যা বলিয়াছেন, তাতে মনে হয় বুঝি মহামারীর উৎপাতটা এমন সাংঘাতিক কিছু নয়।" "কলেরা অন্য বছরের তুলনায় কম, বসন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ম্যালেরিয়াটাই যা একটা সমস্যা!" অন্য বছরের তুলনায় এ বছর মহামারী বেশী হইলেও গত বছরের মত নয়—এটাই কেসি সাহেবের বক্তব্য। তাই কেসি সাহেব বলিতেছেন যে, সরকার যথেষ্ট কুইনাইনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কোন চিন্তার কারণ নাই।

মহামারী বিধ্বস্ত বাংলার বুকে বসিয়া আজ কেসি সাহেব এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই ডাঃ বিধান রায়ের যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাতে বাংলার মহামারীর যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাতে শুধু অবস্থার গুরুত্বই প্রকাশ হইয়াছে তা নয়, সরকারী ব্যবস্থা যে কত কম তাও প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ রায় বলিয়াছেন: **বাংলার ২ কোটী লোক মহামারীতে আক্রান্ত।** ম্যালেরিয়ার জন্য কমপক্ষে ২৩০০০০ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত দিয়াছে ১২৪০০০ পাউণ্ড।

সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলিয়াছেন "বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, মিলিটারী মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত অধিকাংশ নিঃস্বদের হাসপাতালের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়।"

'জনযুদ্ধের' এই সংখ্যাতেই ময়মনসিংহের সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া মহামারীর খবর প্রকাশিত হইয়াছে। এই জেলায় ৪০ লক্ষ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। জেলার মেডিকেল অফিসারই বলিতেছেন যে, **যেখানে প্রতিমাসে ৩৫০০ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার, সেখানে সরকার মাত্র ২০০ পাউণ্ড দিতেছে। কুইনাইনের অভাবে রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।** কয়েকটি জেলায় বসন্তের প্রকোপ যে আবার বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তা, সরকারী গেজেটেই বলা হইয়াছে।

পুনর্গঠনের সমস্যা

কেসি সাহেব বাংলাকে পুনর্গঠন করিবার ভরসা দিয়াছেন; চাষের উন্নতির জন্য, গ্রাম্য শিল্পজীবীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য, ওয়ার্ক হাউস প্রভৃতির জন্য কত কি করা হইতেছে, তার হিসাব দিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার পরিমাণ কতটুকু ? ইতিপূর্ব্বে 'জনযুদ্ধে' হিসাব দেখান হইয়াছে যে, সরকার আমনের জন্য যে ১।০ লক্ষ মণ বীজ ধান দিতেছে, তাতে কিছুই হইবে না। বলদ, হাল প্রভৃতির জন্য যে ঋণ দেওয়া হইতেছে, তাও নামমাত্র। অথচ বীজ ধান, লাঙ্গল বলদের অভাবে আউষ চাষ অর্দ্ধেক হয় নাই, আমনও হয়ত অর্দ্ধেক হইবে না। ওয়ার্ক হাউস সম্পর্কে ফরিদপুরের খবরে প্রমাণ যে এখনও আরো অনেক ওয়ার্ক হাউস ও শিল্প আয়োজন দরকার। যথেষ্ট ওয়ার্ক হাউস ও দুঃস্থ-আবাস না থাকার দরুণ আবার দুঃস্থরা শহরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা ৮ই জুলাই মন্তব্য করিয়াছে যে, গ্রামে খাদ্য ব্যবস্থা না হইলে সহরে দুঃস্থের আগমন বন্ধ করা যাইবে না।

মজুরদের কথা বাদ কেন ?

মজুরদের সম্পর্কে কেসি সাহেব কিছুই বলেন নাই। বলিতে গেলে বোধ হয়, বিপদ কাটিয়া যাইবার ভরসা দেওয়া আর হয় না! কয়লার অভাবে বাংলার কল কারখানাগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম। শুধু মজুরই নয়, সাধারণ শহরবাসীর জীবনও কয়লার অভাবে দুর্বিসহ হইয়াছে। চটকলে আবার ১৬ হাজার মজুর বেকার হইবার উপক্রম। অল্প রেশনে মজুরদের কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে, তার ফলে উৎপাদনে ঘাটতি হইতেছে। ইহা কি বাংলার বিপদ নয় ?

গেজেটে প্রকাশিত চাউলের দরে

সরকারের বিপদ

কলিকাতা গেজেটে ধান ও চাউলের যে মূল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সরকার নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার ফলে বাংলা সরকার বেশ একটু অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছেন। চোরাবাজারের মূল্য প্রকাশের জন্য প্রেরণ না করিতে সরকার সমস্ত জেলা অফিসারদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অফিসারদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন "নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল কদাচিৎ পাওয়া যায়"—এই কথাই লিখিয়া জানান।

(যুগান্তর, ১৬ই জুলাই)

বিপদ কাটিবে কি করিয়া

গত বছরের চেয়ে এবছর দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে সরকার একটু বেশী চেষ্টা করিতেছে, সত্য কথা, কি—

(অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন)

গান্ধীজীর পথ নির্দ্দেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তৃতীয়তঃ গিলডারের মারফৎ গান্ধীজী বড়লাটকে জানাইতেছেন যে পূর্ব্বোক্ত ভিত্তিতেই তিনি সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাইতে চান। কিন্তু আজ প্রকৃত আপোষ আলোচনা চালাইবার কোন অধিকারই তাঁহার নাই। আগষ্ট প্রস্তাবেও এই কথাই ছিল যে তিনি প্রথম আপোষ আলোচনা সুরু করিবেন এবং অকৃতকার্য্য হইবার পর তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তখন সত্যাগ্রহ করিবেন।

কিন্তু তাঁহার গ্রেফতারের সঙ্গেই আগষ্ট প্রস্তাবের এই অধিকার তাঁহার লোপ পাইয়াছে। মুক্তিতে সে-অধিকার ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই। এই জন্যই তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে দেখা করিতে চান; তিনি জানিতে চান যে "তাঁহার মুক্তির পর যে সব ব্যাপার তিনি জানিতে পারিয়াছেন—তাহা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনেই বা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে"। ১৯৪২ সালে সরকার যে আপোষের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহাই যাহাতে গান্ধীজী আবার ধরিতে পারেন সেই জন্যই ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজী দেখা করিতে চাহিতেছেন।

এই কথাই আজ গান্ধীজী গিলডারের মারফৎ বড়লাট ও সমস্ত দুনিয়ার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে তিনটী প্রস্তাব পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা গেল তাহাতে ওয়াভেলের আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই।

দুইটী বিপরীত পরিকল্পনা

ওয়াভেলের বড়কর্ত্তারা অর্থাৎ বিলাতের গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়—আমেরি, লিনলিথগো ও চার্চ্চিল স্থির করিয়াছে কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে হইবে, চিরকাল অচল অবস্থা বজায় রাখিতে হইবে এবং যুদ্ধ কেবল সামরিক শক্তি বলেই জেতা যাইবে। কিন্তু লিনলিথগোর নিকট হইতে শাসনভার লইয়া ওয়াভেল দেখিয়াছেন যে ভারত দুর্ভিক্ষ পীড়িত, মহামারীর প্রকোপে জর্জ্জরিত, উৎপাদন ও যানবাহনের ব্যাপারে বিপর্য্যস্ত। ওয়াভেল শীঘ্রই বুঝিল যে কেবল সামরিক উপায়ে ভারতের এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করা যাইবেনা। গান্ধীজীর সঙ্গে পত্রালাপের মধ্যে ওয়াভেল গান্ধীজীকে বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক সমস্যাকে আপাততঃ ধামাচাপা দিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য গান্ধীজীর যদি কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা থাকে তো তাহা গান্ধীজী উত্থাপন করিতে পারেন। গান্ধীজী ইহার যে কার্য্যকরী উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কাহারো কিছু জবাব দিবার নাই:

"বেসামরিক শাসন ভার যদি বৃটেশের হাত হইতে ভারতবাসীর হাতে না আসে তাহা হইলে খাদ্য অবস্থা ভাল করা ও লোকের দুর্দ্দশা লাঘব করা সম্ভব হইবেনা।"

অচল অবস্থা জীয়াইয়া রাখা এবং তাহার ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থাকে বিপদাপন্ন করার যে পরিকল্পনা ওয়াভেল করিয়াছেন—তাহার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ও জাতীয় সরকার গঠনের কার্য্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অচল অবস্থা অবসানের পরিকল্পনা খাড় করাইয়াছে।

আমেরির দিন ফুরাইয়াছে

গিলডারের মারফত প্রস্তাবে এবং কংগ্রেস-লীগ আপোষের জন্য রাজাজীর প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া গান্ধীজী ভারতের অচলঅবস্থা অবসানের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

কংগ্রেসকে যাহারা জাপ-পন্থী ও পরাজয় বাদী বলিয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে সেই আমেরি-লিনলিথগোর দলবলের ষড়যন্ত্রকে গান্ধীজী চরম আঘাত হানিয়াছেন।

ভারতের সমর্থনে আমেরিকা ও বৃটেনের যে সকল প্রগতিশীল শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে তাহারা গান্ধীজীর এই সর্ব্বশেষ দুইটী চেষ্টায় মহাউৎসাহিত হইব। এতদিন ধরিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ভারত-বিরোধী প্রচার বৃটেন ও আমেরিকার সাধারণ জনগণকে যে ভাবে প্রতারিত করিতেছিল—এই বার তাহার মুখোস তাহারা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির দাবী বৃটেনে এইবার যে ভাবে ধ্বনিত হইবে তাহাতে আমেরির দলবলের তন্দ্রা টুটিয়া যাইবে।

জিন্নার কাছে লিখুন

কিন্তু এযুদ্ধে এখনো জয়ী হওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র বর্ত্তমানে কায়দামত সুরু করা গিয়াছে। অচল অবস্থা বজায়কারী সাম্রাজ্যবাদ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। এখন কেবল তাহাদের আত্মরক্ষার প্রথম ব্যূহকে ভেদ করা হইয়াছে। প্রথম চোটের এই জয়লাভকে চূড়ান্ত জয়লাভে পরিণত করিতে হইবে। শত্রুপক্ষ এখন কি করে তাহা দেখিবার জন্য হাত গুটাইয়া থাকা মারাত্মক হইবে। আমাদের আক্রমণের পরবর্ত্তী ধাপ হইতেছে এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের যে প্রস্তাব গান্ধীজী মানিয়াছেন—তাহাকে ভিত্তি করিয়া আপোষ আলোচনা যাহাতে আরো অগ্রসর হয় এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে যাহাতে এই প্রস্তাব বিবেচিত হয় তাহার জন্য গান্ধীজীকে জিন্নাসাহেবের কাছে পত্র লিখিতে হইবে। বড়ই হউক ছোটই হউক ভারতের এই দুর্দ্দিনে কোন পার্টির পক্ষেই আজ শুধু আত্মসম্মান লইয়া বসিয়া থাকার সময় নাই।—আজ যে সমস্ত দেশভক্ত দল অচল অবস্থার সমাধান চায়, খাদ্যের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সরকার চায়—তাহাদের অবিলম্বে একত্র হইতে হইবে।

লীগের সুযোগ

মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগের আজ একথা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে আমাদের দেশের বুকে সকল সম্প্রদায়ের উপর যে বিপদের বোঝা চাপিয়া বসিয়াছে তাহাকে চূড়ান্ত আঘাত করিতে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ও সর্ব্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের সকলের জন্মভূমির স্বাধীনতার পথে ইহা একটী বিশিষ্ট অধ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বোঝা দরকার যে গান্ধীজী এমন একটী প্রস্তাবে সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সে প্রস্তাবের ক্রটী থাকিলেও তাহাতে পাকিস্তানের সারবস্তু ও পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা হইয়াছে। কাজেই মুসলীম লীগের পক্ষে আজ এমনি একটী শুভ মুহুর্ত্ত উপস্থিত যখন ভারতের সকলের স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিয়া সে নিজের উদ্দেশ্যও সফল করিতে পারে।

৩০শে জুলাই লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিতেছে। এই বৈঠকে লীগকে মিথ্যা সম্মানের মোহ পরিত্যাগ করিয়া রাজাজীর প্রস্তাব গান্ধীজী কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়ার ব্যাপারকে তাহার আদর্শের বিরাট জয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং রাজাজী-গান্ধীজীর উপর তাহারা একহাত লইয়াছে এই ধারণার প্রকাশ না করিয়া বরং যাহাতে আপোষের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব আসে সেই ভাবেই মত প্রকাশ করিতে হইবে। গান্ধীজীর এই প্রগতিকামী কর্ম্মপন্থাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আজ সমস্ত লীগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির দাবীতে লীগকে যোগ দিতে হইবে।

ভারতের দ্বিতীয় দেশপ্রেমিক দল হিসাবে মুসলীম লীগের সামনে আজ গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত। ক্ষুদ্র সংস্কার ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়া অচল অবস্থা সমাধানের জন্য আজ লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে একত্র হইবার জন্য উদ্যোগী হউক। আজিকার এই সংকট মুহূর্ত্তে পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে আপোষ সুনিশ্চিত।

———

আমলাতন্ত্রের আত্মসন্তুষ্টির জবাব

কলিকাতায় চট্টগ্রাম সাহায্য দিবস

"পিপল্‌স ওয়ার" পত্রিকায় কমরেড মনোরঞ্জন সেনের প্রবন্ধ এবং বাংলার আইন সভার বিতর্কের পর সারা বাংলার দৃষ্টি চট্টগ্রামের উপর পড়ে। সময় থাকিতে প্রতিকারের জন্য 'পিপল্‌স রিলিফ কমিটী' ১০ই জুলাই 'চট্টগ্রাম সাহায্য দিবসে'র অনুষ্ঠান করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই জন্য একটী যুক্ত-আবেদন প্রকাশিত হয়—তাহাতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন আইন সভা ও আইন-পরিষদের কংগ্রেসী ও লীগ সভ্যেরা যথা, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, জে, সি, গুপ্ত এবং লাল মিঞা, নূর আহম্মদ প্রভৃতি। ইঁহারা ছাড়াও আরও অনেক আইনসভার সভ্য এবং জন-নেতা ইহাতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করেন যে চট্টগ্রামের বহুস্থানে চাউলের দাম ৪০, টাকা মণ হইয়াছে, অনাহারের বিভীষিকা ঘোর বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। উদ্যোক্তারা স্থির করেন যে চট্টগ্রামের সাহায্যের জন্য ১০ই জুলাই সারাদিন কলিকাতার রাস্তায় অর্থসংগ্রহ করা হইবে এবং সন্ধ্যায় টিকিট করিয়া শ্রীরঙ্গম্‌ নাট্যমঞ্চে গণনাট্যসংঘের শিল্পীরা গান-নাচ-আবৃত্তির অভিনয় দেখাইবেন।

১০ই জুলাই তারিখে নানা ঘটনার যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। সকালে জানা গেল যে রাস্তায় অর্থসংগ্রহের জন্য পুলিশের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। তারপরই সকালের কাগজে মিঃ সুরাবর্দীর বিবৃতিতে পড়া গেল যে চট্টগ্রামের অবস্থা উন্নত হইতেছে। সকালেই কলিকাতাবাসী চট্টগ্রামের বন্ধুদের কাছে শুনা গেল যে কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামের বিখ্যাত রিলিফকর্মী ও "পিপল্‌স ওয়ারে"র লেখক কমরেড মনোরঞ্জন সেন ভারতরক্ষা আইনে আটক হইয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা বাংলার লাট মিঃ কেসি ফলাও করিয়া বলিলেন যে বাংলা দেশের সব ঠিক হইয়া গেল বলিয়া। বসন্ত আয়ত্তে আসিয়াছে, ম্যালেরিয়ার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, খাদ্যের জন্যও ন্যূনতম ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। স্বাধীন ইংলণ্ডে যুদ্ধের মধ্যেই মিঃ চার্চিল দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলেন,

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা

"প্যানিকের" তোয়াক্কা করেন না, তার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করাও হয় না। আর এদেশে দেশের দুরবস্থার কথা বলিয়া কমরেড মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার হইতে হয় এবং সদাশয় শাসনকর্তারা দেশের দুরবস্থার আসল খবর চাপিয়া শুধু স্তোক দেন। সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ঐ দিনের অনুষ্ঠানে প্রধানা অতিথি শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তার নিকট চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থার সঠিক খবর পাইলেন—ব্যাপক মহামারী ও অনাহারের বাস্তব চিত্র সকলের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল।

একদিকে মিঃ কেসি'র ফলাও বক্তৃতা আর অপর দিকে গণনাট্যসংঘের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের সবই আগেও দেখিয়াছি। তবে এবার দেখিলাম দর্শকমণ্ডলী নূতন, কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক,—শিক্ষাব্রতী, ব্যবসায়ী, কংগ্রেস নেতা, লীগ নেতাকে দেখিলাম। বাস্তব অবস্থার ভীষণতা হইতে যাঁহারা দূরে থাকিতে চান, তাঁদেরই সংখ্যা বেশী। 'জবানবন্দী' অভিনয়ে দেখিলাম, পাশের ভদ্রমহিলা কাঁদিতেছেন, দুসীট পরে এক বয়স্ক ভদ্রলোক রুমাল বাহির করিলেন। 'জবানবন্দী' নাটক শুধু একটা করুণ ব্যাপারই নয়, শুধু অতীতের ঘটনার একটা হৃদয়বিদারক ছবিই নয়। সামনের সারিতে কলিকাতার একজন খ্যাতনামা লোক পাশের একজনকে বলিতেছেন শুনিলাম,—এ অবস্থা তো চলে যায় নি, এখনও আছে। আবার আসছে। দৈহিক মৃত্যু, নৈতিক অধঃপতন, ভাঙ্গা সংসার, গ্রামের এই বাস্তব চিত্র জবানবন্দীর নাটকের মারফৎ কেসি'র স্তোকবাক্য ব্যর্থ করিল এবং বাংলার ভদ্রসমাজের আত্মপ্রবঞ্চনা অভ্যাসকে দারুণভাবে আঘাত করিল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঠিক এই কথাই মনে হইল যে তাঁহারা বাংলার বাস্তব অবস্থা হইতে কেসি'র মতই চোখ বুঁজিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন,—আজ সমগ্র গ্রামময়-বাংলা তাঁদের ছোট স্বার্থবোধে আঘাত করিয়াছে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছে, তাঁদের স্বার্থপর আত্মতুষ্টিকে ছাপাইয়া মানবতার আবেদন আনিয়াছে। 'জবানবন্দী'র পরে পানু পালের 'মহামারী-নৃত্য' এক অদ্ভুত দৃশ্য। এতখানি ভীষণতা ও বাস্তবতা সহ্য করা খুব শক্ত। তাই দর্শকমণ্ডলী প্রশংসায় মুখর হয় নাই বরং মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল।

তারপর 'নবজীবনের গান'। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত গ্রাম্যসমাজ বাঁচিতে চায়, তাদের আবেদন লইয়া তাহারা বাংলার সমগ্র জনগণের সম্মুখে হাজির। তাদের অনাহার ও মহামারী হইতে বাঁচাইতে হইবে, তাদের নৈতিক মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে হইবে, আশা ভরসায় তাদের বুক ভরিয়া দিতে হইবে, নবজীবন গড়িতে হইবে। বাংলার গণজীবনের এই বিরাট সমস্যা পর পর গানের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। জবানবন্দীর ভাঙ্গা গ্রাম মানবতার কাছে সত্য সত্যই যে সাহায্য চায়, 'নবজীবনের গান' তাহারই গীতিরূপ। দর্শকদের ভিতর হইতে এবার আড়ষ্টভাব অনেক অংশে চলিয়া গেল। সব শেষে "মধু বংশীর গলি" নামক আবৃত্তি। শিল্পী শম্ভু মিত্র আবৃত্তির যাদুকর। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সামাজিক জীবনের ছবি চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। নীচতা, দীনতা, হীনতা—কুৎসা, কলহ, আত্মরতি—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র দীনতা নীচতা ছাপাইয়া উঠে আশার সুর, পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের দোলা গায়ে আসিয়া লাগে, আমরা জাগিয়া উঠি, উৎসাহিত হই, উদ্দীপ্ত হই। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী 'জবানবন্দী' ও 'মহামারী নৃত্যের' আঘাতের মুহ্যমান অবস্থা হইতে মুক্ত হয়, নিজেদের মর্য্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া পায়, উৎসাহে-প্রশংসায় হল মুখর হইয়া উঠে। স্তোকবাক্য নয়, বাংলার সমগ্র সংকট জানিয়া বুঝিয়া প্রতিকারে অগ্রসর হইতে হইবে,—আমার মনে হয় যে অনুষ্ঠানে হাজির দর্শকদের মধ্যে এই মনোভাবই প্রবল হইয়াছে।

অনাহার ও রোগে ক্লিষ্ট চট্টগ্রামের কৃষক
শিল্পী ঃ—সোমনাথ হোর

গ্রামে গ্রামে ফসল বাড়ানোর অভিযান

খাল কাটা, বাঁধ বাধা ও পতিত জমি চাষের আন্দোলন

খাল সংস্কারে আড়াই হাজার মণ ফসল রক্ষা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার ২নং ইউনিয়নের মুজাপুর খালটি এতদিন সংস্কার অভাবে পড়িয়া থাকায় গঠরা, বুড়ারী প্রভৃতি ১৬।১৭টী মৌজার **প্রায় ১২ হাজার বিঘার ফসল** প্রতিবার হাজিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। ফলে, এই অঞ্চলের শতকরা ৩০ জন কৃষক জমিজমা বেচিয়া আজ নিঃস্ব। বাকী যাহাদের জমিজমা আছে, তাহাদেরও খাজনা ও দেনার দায়ে জমিজমা হারাইবার দশা। এই অবস্থায় গত চৈত্র মাসের শেষে স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ৬০।৭০ জন কৃষক ভলান্টিয়ার ৩ মাইল লম্বা ঐ খালের কাজ শুরু করিয়া দেয়। ইহারা ১ মাসের পরিশ্রমে ৩ ভাগের ১ ভাগ সংস্কার করিয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫০০ বিঘা জমির জল নিকাশ হইবে ও তার ফলে **২ হাজার মণ ধান রক্ষা পাইবে**। গঠরা গ্রামের কৃষকরা অপর একটি খালের জল নিকাশ করিয়া **৫০০ মণ ধান রক্ষা করিয়াছে**। ফসল রক্ষার এই কাজে একদিকে কৃষকদের মধ্যে সমিতির জোর বাড়িয়াছে, অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের টনকও কিছুটা নড়িয়াছে। মহকুমা হাকিম মুজাপুর খালের সংস্কার সমাধা করার জন্য ১৭ হাজার টাকা সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গ্রামের জমিদাররাও কৃষকদের সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন।

বাঁধ বাধায় সাড়ে ২২ হাজার বিঘা জমির ফসল রক্ষা

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার কাসারবান্ধী ও শ্রীপতিপুর-গাজেড্ডার দুই দুইটি বাঁধ বাঁধার ফলে ৩টি গ্রামের ২ হাজার অধিবাসীর **২০ হাজার বিঘা জমির ফসল রক্ষা পাইবে**। অন্যান্য বছর এই জমি জলে ডুবিয়া যাইত। সাড়ে ৪ শত কৃষক বাঁধ দুটির জন্য ১ বেলা খাটিয়া দিয়াছে। শ্রীপতিপুর বাঁধের কাজে মুর্শিদাবাদের নবাব নিজেই ৭৫০, টাকা সাহায্য দিয়াছেন ও কাসারবান্ধী বাঁধের জন্য ৩৫০, টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

বীরভূম জেলার লাভপুর থানার একটি ইউনিয়ন ঠিবা। কুয়ে নদীর ভাঙ্গার মুখে এখানে একটি বাঁধ আছে। ভাঙ্গার মুখে জল উঠার ফলে ফি বছর প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইত। গত বছর ইহার ফলে ঠিবা গ্রামের ৮০টি বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ে। এবার কৃষক সমিতির চেষ্টায় পাশাপাশি ৩টি গ্রামের কৃষকরা জোট বাঁধিয়া বাঁধটির সংস্কার করে। এই কাজে পঞ্চমবাহিনী-ঘেঁষা লোকজন নানা ভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গ্রামবাসীদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া তাহারাও বাঁধের কাজে অংশ লইতে বাধ্য হয়। এই বাঁধ সংস্কারের ফলে **আড়াই হাজার বিঘা জমির ফসল রক্ষা পাইবে।**

পতিত জমি চাষে কৃষকদের উদ্যম

মাত্র কিছুদিন হইল **নদীয়া** জেলার মেহেরপুর মহকুমার গাড়াডোব ইউনিয়নে কৃষক সমিতির গোড়াপত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই অঞ্চলের উৎসাহী কৃষকরা ইতিমধ্যেই ৮০জন কৃষকের একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়িয়া আমন ফসল বাড়ানোর অভিযান শুরু করিয়া দিয়াছে। প্রথমে ইহারা ২ বিঘা পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই দৃষ্টান্তে আশেপাশের গ্রামেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলার চণ্ডিপাট গ্রামের কৃষকরা সমিতির নেতৃত্বে পৌনে ২ বিঘা পতিত জমিতে চাষ শুরু করিয়া দিয়াছে। যাহার বলদ আছে সে বলদ আনিয়া দিতেছে—যাহার বলদ নাই সে গতরে খাটিয়া দিতেছে। গ্রামের এক কৃষক সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে। এই অবস্থায় চাষ করা নাকি আচার বিরুদ্ধ। সমিতির ডাকে সেও থাকিতে পারে নাই। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার দূরে ঠেলিয়া সে জানাইয়া দিল, সমিতির কাজে দোষ নাই।

গাঁতা প্রথায় ধান কাটার আন্দোলন

ঢাকা জেলার আমিরাবাদ ও রহিমাবাদ অঞ্চলে আউশ ধান কাটা ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। কিন্তু মাঠের ধান মাঠে পড়িয়া আছে—লোকাভাবে কাটা হয় না। এই দুই অঞ্চলেই অর্দ্ধেকের বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। একদিকে জলে ধান ডুবিয়া যাইতেছে, কৃষক সমিতি আওয়াজ উঠাইল, সবাই মিলিয়া ধান কাটো, এক দানা ধানও যেন নষ্ট না হয়। বৃদ্ধ কৃষককর্মী মজিবর রহমানের নেতৃত্বে কৃষকদের একটি স্কোয়াড ধানকাটার কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। আশেপাশে অন্যান্য গ্রামেও সমিতির প্রচারের ফলে গাঁতা প্রথায় ধান কাটার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মাদারীপুরে কো-অপারেটিভ আন্দোলন

গ্রামবাসীদের যাহাতে তেল, লবণের জন্য চোরাবাজারের খপ্পরে না পড়িতে হয়, যাহাতে সকলে কণ্ট্রোল দরে জিনিসপত্র পায় তার জন্য **মাদারীপুরের** কৃষক সমিতি গ্রামে গ্রামে সমবায় গড়ার কাজে লাগিয়াছে। মাদারীপুর মহকুমার লক্ষাধিক লোক গত দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। আজ যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহারা যাহাতে পুনরায় মৃত্যুর মুখের গ্রাস না হয়, কো-অপারেটিভ আন্দোলনে তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই হাজরাপুর, টোমচর, কালিনগর, বরানগর ও দুধখালি গ্রামে কো-অপারেটিভ গড়িয়া উঠিয়াছে ও প্রচুর শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামেও এই ধরনের সমবায় গঠনের চেষ্টা চলিতেছে।

খাস জমি ফেরতের আন্দোলন

খুলনা জেলার শোভনা অঞ্চলে ১০।১২ বছর যাবৎ বাঁধবন্দীর অভাবে ফসল না হওয়ায় কৃষকেরা ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদার পক্ষ হইতেও ইহার পূর্ব্বে বাঁধবন্দীর কোন চেষ্টা হয় নাই। ১৯৪২ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কঠোর পরিশ্রম করিয়া সমিতির নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষকরা বাঁধ দেয় ও নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও কিছি পরিমাণ জমিতে ফসল ফলায়। দীর্ঘ দিনের পতিত জমিতে ফসল হইতে দেখিয়া জমিদারপক্ষ লাঠিয়াল পাঠাইয়া জমি দখলের ব্যবস্থা করেন। ইহার পর কৃষক সমিতির চেষ্টায় স্থানীয় কৃষকদের সহিত জমিদারপক্ষের একটি আপোষ মীমাংসা হয়। কিন্তু গত এপ্রিল মাসে জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে জমিদারপক্ষের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করানোর পর হইতে জমিদারপক্ষ কৃষকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকে ও পূর্ব্বেকার মিটমাটের সর্ত্তাবলী উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ২৯শে জুন কৃষক সমিতির প্রতিনিধিরা জমিদারের নায়েবের সহিত তাঁহার মহলে দেখা করেন কিন্তু তিনি পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কোনরূপ সর্ত্তে মীমাংসা করিতে রাজী হন না। জমিদার ইতিমধ্যে ২০ জনের একদল লাঠিয়াল আবার অঞ্চলে মোতায়েন করিয়াছেন ও কৃষকদের মধ্যে বিভেদের প্ররোচনা ছড়াইতেছেন। চাষ আবাদের সময় এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় কৃষকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে মিটমাট না হইলে চাষের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে ও শত শত কৃষকের অন্নাভাব দেখা দিবে।

কৃষকের দেশপ্রেম জমিদারকেও জয় করিল

মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হুড়িনান গ্রামের কৃষকরা সমিতির নেতৃত্বে জমিদার শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁহাদের সকলের অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাহার প্রতিকার দাবী করে। গত ২২শে জুন কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লন: খাল খননের জন্য ৩৫০, টাকা দিবেন। ইহাতে ৪০০ বিঘা জমির ফসল ভাল হইবে। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের বাকি বকেয়া খাজনা মাপ করিবেন। ১৩৪৯ সালের খাজনা হইতে সকলেই রেহাই পাইবে। ১৩৪৯-এর খাজনা বাদে বাকি-খাজনা ৪ বছরের কিস্তিতে আদায় হইবে।

কৃষক সমিতি শুধু কৃষকদেরই স্বার্থ দেখে না। দেশের সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের জন্য আজ তাহার লড়াই। কৃষকের স্বদেশপ্রেম আজ সংঘবদ্ধতার জোরে জমিদারকেও দেশের হিতার্থে টানিতেছে। কৃষক শুধু জমিদারের কাছে নিজেদের দাবীই জানায় নাই—সর্ব্বসাধারণের একটি রাস্তা মেরামতের জন্য ২ হাজার টাকা, ৫।৬ মাসের মধ্যে পানীয় জলের একটি টিউবওয়েল, স্থানীয় ইউ, পি স্কুলের শিক্ষকদের ভাতা হিসাবে নগদ ৬০, টাকা ও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যে বাৎসরিক ১৮০, টাকার প্রতিশ্রুতি জমিদারের কাছ হইতে দেশপ্রেমিক কৃষকরা আদায় করিয়াছে।

চাউলের দর কি কমিতেছে ?

১৬৲ মণের চাউল 4 দিনের মধ্যে ২০৲

বাংলার লাট কেসি সাহেব ১০ই জুলাই বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে ধান চাউলের মূল্য কমাইবার নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছে; সরকারের ধানচাউল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে না এবং ইহার ফলে ধানচাউলের দর আবার বাড়িবে—এই ধারণা যারা করেন, তারা ভুল করিবেন। কেসি সাহেবের কথা শুনিতে ভাল, কিন্তু সত্যই কি চাউলের দর কমিতেছে? সরকারী কন্ট্রোল দর ১৩৷৷০ কিন্তু কয়জন লোকের ভাগ্যে এই দামে চাল মেলে?

শান্তিপুর হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

গত ২১শে জুন হইতে বাজারে চাল পাওয়া যাইতেছে না। চোরাবাজারে ২১শে জুনের পর ১৫৷৷০ হইতে ১৬.০ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছে। **কিন্তু গত ৩৷৪ দিন হইল চালের দর বাড়িয়া ২০৲ উঠিয়াছে।** রানাঘাট মহকুমায় প্রায় সব জায়গায় চাল উধাও হইয়া গিয়াছে।

মালদহের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন জায়গায় চালের দর ছিল ১২৷৷০ টাকা। আর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে চালের দর উঠিয়াছে ১৭৲ টাকা। বিভিন্ন হাটে আমদানী প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। যে ভাবে চালের দর বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই চালের দর **টাকায় একসের দেড়সের উঠিবে।** গত সপ্তাহে **মিল্কি ইউনিয়নে গোঁসাইহাটে ২০৲ মণ দরে চাল বিক্রী হইয়াছে।**

উত্তর বাখরগঞ্জ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে চালের দর উঠিয়াছে ১৭৲।১৮৲ মণ।

২৪ পরগণা জেলার বারাসত হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১৯শে হইতে ২৩শে জুনের মধ্যে বারাসত শহরের হাটে চাল বিক্রি হইয়াছে **১৮৲ হইতে ১৯৲ মণ দরে। নীলগঞ্জ** হাটেও এই দর।

চিংড়িপোতা ইউনিয়নের সেনপুকুর গ্রামে একটী দোকানদার **১৯৲ মণ দরে** প্রকাশ্য-ভাবে চাল বিক্রি করিতেছে।

সিরাজগঞ্জের ৮ই জুলাই-এর খবর :—
এখানে ২০৲ মণ দরে চাল বিক্রয় হইতেছে।

মালদহের চাল মজুতদারের হাতে

তবু কর্ত্তৃপক্ষ রেশনিং চালু করিতে চায় না!

মে মাসের শেষ সপ্তাহে মালদহ টাউন-ফুড-কমিটীর চেয়ারম্যান জেলার সাবজজ বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটীর সম্মিলিত বৈঠকে দম্ভভরে জানাইয়াছিলেন যে, এ জেলায় খাদ্য শস্যের প্রাচুর্য্য এত যে, চাউলের রেশনিংয়ের এখানে কোন দরকার নাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই বহুবার ঐ সুরে কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্যের নমুনাটা কি রকম? অন্যত্র প্রকাশিত খবরে মালদহের চাউলের দরবৃদ্ধির হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে মণ পিছু ৫৲ টাকা দরবৃদ্ধি সহজ কথা নয়। খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্যের সমস্তটাই মজুতদারের করায়ত্ত না হইলে এই রকম দরবৃদ্ধি হইতে পারে না।

প্রতি বছরই বর্ষার সময় চাউলের দর একটু বাড়ে কিন্তু এ বছরের দরবৃদ্ধি অস্বাভাবিক। ধান-চাউলের অধিকাংশ জোতদারের ঘরে। এখন বাজারে যা আসিবে তা এই জোতদারদের ঘর হইতে। তারা অল্প অল্প করিয়া আমদানী করিয়া বাজার চড়াইয়া দিয়াছে।

বাজার দর ঠিক থাকিতে পারে, যদি সরকারের হাতে চাউলের ষ্টক থাকে এবং সেই ষ্টক বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু যেখানে ৪ লক্ষ মণ চাউল কেনার কথা ছিল, সেখানে সরকার কিনিয়াছে আড়াই লক্ষ মণের বেশী নয়। এখন কেনা এক রকম বন্ধ। এই আড়াই লক্ষ মণের কিছু কিছু অংশ মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় চালান গিয়াছে। বাকী প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল লইয়া সরকার বসিয়া আছে। এই চাউল দ্বারা গ্রামে ও শহরে রেশনিং হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ রেশনিং করিতে নারাজ।

এদিকে মালদহের আউষ অঞ্চলের শতকরা ৯০জন লোককেই চাউলের জন্য বাজারের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এবারের রবিশস্যে এই অঞ্চলের লোকের ২ মাসের বেশী খোরাক জোগাইবে না। বাকী দুই তিন মাস, অর্থাৎ আউষ পর্য্যন্ত তাদের চাউল কিনিয়া খাইতে হইবে। আমের সময় বলিয়া এখন অনাহারের বিভীষিকা দেখা যায় নাই; কিন্তু আম ফুরাইলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। এবারে আউষ আবাদ হইয়াছে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে। আমন অঞ্চলের অবস্থাও শোচনীয়। এই অঞ্চলে শতকরা ৬০জন আধিয়ার। তাদের ঘরের ধান ফুরাইয়াছে। এখন কর্জ্জ না করিলে উপায় নাই। শতকরা ২০জন ক্ষেত-মজুরের অবস্থা সঙ্গীন। তাদের বাজারের ভরসায় থাকিতে হয়।

এই অবস্থা; অথচ এই জেলার আমন ধানের শতকরা ৫৫ ভাগ এখনও মজুতদারের ঘরে মজুত আছে বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়ী-মজুতদার খুব বেশী কিনিতে পারে নাই। অনুমান ৩ লক্ষ মণ চাউল তাদের কাছে মজুত আছে এবং অবৈধভাবে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে প্রায় দেড়লক্ষ মণ। মজুতদাররা বাজার দখল করিয়া বসিয়া আছে। যদি তারা দুই-এক হাটে বিক্রি বন্ধ করিয়া দেয় তা হইলে লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে। ফড়িয়ারা ইহাদের কাছ হইতে চাউল কিনিয়া শহরে নিয়া গিয়া যথেচ্ছ দরে বিক্রী করিতেছে।

এই রকম অবস্থা চোখে দেখিয়াও যে কর্ত্তৃপক্ষ ভাবেন, রেশনিং দরকার নাই সে কর্ত্তৃপক্ষের নীতি জনগণকে খাদ্য দেওয়া নয়, মজুতদার ও চোরাকারবারীকেই পুষ্ট করা।

বগুড়া দোগাছি ফুড কমিটিতে চোরাকারবারির রাজত্ব

রেশন থাকিতেও রেশন বিলি হয় না

বগুড়া জেলার জয়পুরহাট থানার অন্তর্গত দোগাছি ইউনিয়নের ফুড কমিটীর সভ্যরা অধিকাংশই চোরা-বাজারের মহাজন। তারা 'ফুড কমিটী' গঠন করিয়াছে জনগণের খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থার জন্য নয়, নিজেদের চোরাকারবারের সুবিধার জন্য। গ্রামের লোকেরা গ্রাম্য-ফুড-কমিটী গঠন করিয়া তার প্রতিনিধি লইয়া ইউনিয়ন-ফুড-কমিটী গঠন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী হয় নাই। এই 'ফুড কমিটী'কেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এই 'ফুড কমিটী' করিতেছে কি? এক মাসের রেশন লবণ, চিনি, কেরসিন প্রভৃতি 'ফুড কমিটী'র হাতে মজুত হইয়াছে। অথচ গরীব চাষীরা একমাস যাবত রেশন পাইতেছে না। প্রাপ্য রেশন না পাইয়া চাষীরা স্থানীয় হাটে ১৲।১।০ সের দরে লবণ কিনিতে বাধ্য হইতেছে। যে ফুড কমিটী রেশন আটকাইয়া চোরাকারবারীকে সাহায্য করে, অবিলম্বে সেই ফুড কমিটী বাতিল করিয়া দিয়া নুতন ভাবে কমিটী গঠন করা হউক—ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবী করি। বাংলা সরকার প্রেস নোটে যে সাড়ে পাঁচ হাজার ইউনিয়ন ফুড কমিটীর কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তার কতগুলির মধ্যে এই রকম কর্ত্তৃপক্ষ-পুষ্ট চোরাকারবারী আশ্রয় লইয়াছে, তার অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

———

দুঃস্থ সমস্যা আবার বাড়িতেছে

বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গ্রাম হইতে বিনা টিকিটে যারা কলিকাতায় আসে, তারা দুঃস্থ নয়। তারা চোরাকারবারীদের সাহায্য করিতে আসে। সরকারের এই কথা বলার অর্থ কি দুঃস্থ সমস্যা আর নাই, তাহাই প্রমাণ করা?

কিন্তু কলিকাতার কতগুলি অঞ্চল ঘুরিয়া দেখিলে ও হাসপাতালের রিপোর্ট হইতে দুঃস্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া যায়, সেগুলি কি মিথ্যা? এই সব দুঃস্থ কোথা হইতে আসিল?

১২ই জুলাই-এর 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কলিকাতায় দুঃস্থ সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবরটী প্রকাশ করিয়াছে :—

জুন মাসের শেষ পক্ষে কলিকাতার হাসপাতালে ২৫৩ জন দুঃস্থকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, তার মধ্যে ৬৬ জন মারা গিয়াছে। তার পরের হিসাব :—

তারিখ	হাসপাতালে ভর্ত্তি	মৃত্যু
জুলাই ১লা	১১	×
„ ২রা	৯	২
„ ৩রা	৭	২
„ ৪ঠা	১৮	২
„ ৫ই	১৭	৭
„ ৬ই	২১	৪
„ ৭ই	৩৩	৮
„ ৮ই	১৫	৫
„ ৯ই	৩০	১
„ ১০ই	১৬	৪
	১৭৭	৩৫

শুধু কলিকাতায় নয়, দুঃস্থ সমস্যা মফঃস্বলেও ধীরে ধীরে আবার দেখা দিতেছে। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, **কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বরিশাল প্রভৃতি শহরে** আবার দুঃস্থরা আসিতে শুরু করিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রস্তাব

গত ৫ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভা[য়] একটী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গ্রাম হইতে দুঃস্থ[রা] আবার কলিকাতায় আসিতেছে। তাদের আসা ব[ন্ধ] করিতে হইলে মফঃস্বলের গ্রামে ও কলিকাতার আশ[-] পাশের অঞ্চলে সস্তার লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

গভর্ণর কো

'আমরা প্রায় বিপ

বিপদ কাটিয়া যা

কিন্তু বিপদ

কলিকাতায় আবার দুঃস্থের আ

অন্নদানের সময় কত দুঃস্থ আসিয়া জু

দুঃস্থরা কলিকাতার বাসিন্দা নয়, খাদ্যা

আসিয়া জুটিয়াছে।

বোম্বায়ে দুধের ব্যবস্থা হইতে পারে বাংলায় হয় না কেন?

বোম্বায়ে ছোট ছেলেদের দুধের অভাব মিটাইবার জন্য করপোরেশন সচেষ্ট হইয়াছে। আগামী ১৫ই জুলাই হইতে একটী পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪০০০ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছেলেকে ছুটীর দিন ছাড়া প্রত্যেক দিনে ৬ আউন্স করিয়া দুধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সব ছেলের পুষ্টির অভাব শুধু তাদেরই জন্য এই বন্দোবস্ত।

আর একটী পরিকল্পনা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনায় ঠিক করা হইয়াছে যে, দুই বছরের কম শিশুদের প্রতিদিন ৬ পয়সা দামে ৮ আউন্স দুধ দেওয়া হইবে। সবশুদ্ধ ৬৫০০০ শিশুকে এই ভাবে দুধ দেওয়া হইবে।

(১৩ই জুলাইয়ের 'ক্যাপিটেল' হইতে)

বোম্বায়ের চেয়ে বাংলায় দুধ-সমস্যা আরো প্রবল। কিন্তু বোম্বায়ে যা হইতেছে, বাংলায় তা কেন হয় না?

চটকলের কয়লা আরো কমিল!

১৩ই জুলাইয়ের 'ক্যাপিটাল' জানাইতেছে :—

চটকলের কয়লা সরবরাহে আরো ঘাট্‌তি হইয়াছে। গত সপ্তাহে দৈনিক ২৮ ওয়াগন করিয়া কয়লা আসিয়াছে। অথচ চটকলের প্রয়োজন দৈনিক প্রায় ৭৫ ওয়াগন। এই ঘাট্‌তির ফলে চালক মিলগুলি (ফষ্টার মিল) ছাড়া বাষ্প-চালিত আর সব মিলই অকেজো হইয়া বসিয়া আছে।

শুধু কয়লা উৎপাদনে কমতি নয়, ওয়াগনেরও অভাব

গত সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' কয়লা উৎপাদনের কমতির কারণ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। গত বছরের চেয়ে উৎপাদন বিশেষ কিছু বাড়ে নাই, সেইজন্যই কয়লা সংকট দূর হইতেছে না। কিন্তু শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ কয়লা উৎপাদন হইতেছে, তাও ঠিক সময়ে সরবরাহ করিবার মত ওয়াগনের ব্যবস্থা হইতেছে না।

নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই তা বুঝা যায় :—

বাংলা ও বিহারের জন্য শু[ধু] কয়লা সরবরাহ করিতে মাসে ২৬০০[টী] ওয়াগন ধার্য্য হইয়াছিল। কি[ন্তু] আজকে সারা ভারতেই মাসে মা[ত্র] ৩০০০ ওয়াগন ব্যবহার কর[া] হইতেছে।

সারা ভারতের জন্য ওয়াগনের সংখ্যা ছিল ৭৩১০[…] সুতরাং দেখা যাইতেছে এখন অর্দ্ধেকেরও কম ওয়াগ[ন] দিয়া সারা দেশের কাজ চালানো হইতেছে। সুতরা[ং] বাংলা ও বিহারের সরবরাহেও যে ওয়াগনের বিশে[ষ] কমতি হইয়াছে তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

জার্ম্মাণ সীমান্তের দ্বারদেশে
অপ্রতিহত গতিতে লালফৌজ

লালফৌজের আক্রমণের গতি

লালফৌজ প্রবল বন্যার মত জার্ম্মাণীর অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই সোভিয়েটের এবারকার গ্রীষ্মাভিযানের ব্যাপকতা পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। রুশসেনার চারিটী বৃহৎ দল ল্যাটভিয়ার সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া লুবনিনের চাবিকাঠি কোভেলের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। উত্তরে জেনারেল বাগ্রামিয়ানের সেনাদলের উপরকার বাহু ল্যাটভিয়া হইয়া বাল্টিক সাগরের তীরের দিকে ধাইয়া চলিয়াছে। এই ফ্রন্টের একদিনেরই লড়াইয়ে লালফৌজ ৩২ মাইল আগাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইহাই অগ্রগতির সব চেয়ে দ্রুত রেকর্ড। এইস্থানে লালফৌজের লক্ষ্য পস্কভ হইতে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে সব জার্ম্মাণ সেনা রহিয়াছে তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করা। জেনারেল বাগ্রামিয়ানের সেনাদলের নিম্ন বাহু ইতিমধ্যেই লিথুয়ানিয়ায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং কভনো-ডিভিনস্ক নামক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

ঠিক ইহার দক্ষিণে জেনারেল চের্ণিয়াখভস্কির সেনাদল ভিলনা দখল করিয়াছে এবং জেনারেল বাগ্রামিয়ানের একটি সেনাদলের সহিত সংযোগ রাখিয়া লিথুয়ানিয়ার রাজধানী কভনোর দখলের লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে। এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য খাস

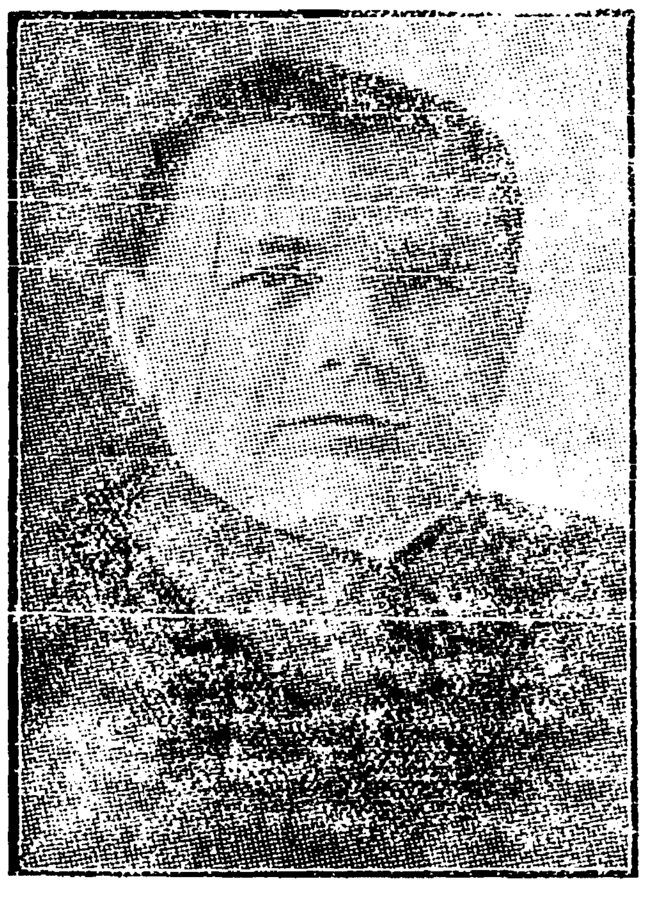

জেনারেল এরমেঙ্কো

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত সহর কণিসবুর্গ দখল করিয়া জার্ম্মাণ পূর্বপ্রুসিয়ায় রক্ষাব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়া। এই সহরের বিপদ যে ঘনাইয়া আসিতেছে, লালফৌজের অপ্রতিহত গতিবেগের মুখে কনিসবুর্গের পতন যে আসন্ন হইয়া আসিতেছে তাহা রয়টারের সর্ব্বশেষ খবর হইতেই বুঝা যাইতেছে। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কণিসবুর্গের সমস্ত কলকারখানা প্রভৃতি স্থানান্তরিত করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

আরও নীচের দিকে জেনারল চের্ণিয়াখভস্কির সেনাদলের দক্ষিণ বাহু লিডা দখল করিয়া গ্রদনো-বিয়ালিস্টক-ব্রেষ্টলিটভস্ক লাইন পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ১৫ই জুলাইয়ের জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে জানা যায় যে গ্রদনো ইতিমধ্যেই লালফৌজের দখলে আসিয়াছে। গ্রদনো পূর্ব্ব প্রুসিয়ার সীমান্ত হইতে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন ও বিভিন্ন ভাল ভাল রাস্তার সংযোগস্থল। মধ্য পোলাণ্ড, বিশেষতঃ ওয়ারসকে রক্ষা করার জন্য ইহাই ছিল উত্তর দিককার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি। ইহার সাথে সাথে আরও দক্ষিণে জেনারেল জাখারভ ও মার্শাল রকোসভস্কির দুইটি শক্তিশালী সেনাদল ওয়ারস রক্ষার নাচেকার ঘাঁটি বিয়ালিস্টক ব্রেষ্টলিটভস্ক লাইন চুরমার করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। জেনারেল জাখারভের সেনাদল লিডা ও বারানোভিচের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতেছে এবং মার্শাল রকোসভস্কির সেনাদল বারানোভিচ হইতে কোভেলের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় আঘাত হানিতেছে। বারেনোভিচ দখল করার পর ইহার ৮০ মাইল পশ্চিমে শ্লোনিম, লুমিনেটস্, পিনস্ক প্রভৃতি অঞ্চলেও লাল পতাকা উড়িতেছে। কোভেলও কয়েকদিন আগেই লালফৌজের হাতে আসিয়াছে।

১৫ই জুলাইয়ের জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর খবর' রুশসেনা তার্ণাপোল ও লুটস্কের মধ্যে বড় রকমের আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। মনে হইতেছে লভোভ দখল করাই এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য।

ইহা ছাড়া গত ১২ই জুলাই মার্শাল স্টালিন জেনারেল এরেমেঙ্কোর উদ্দেশ্যে যে ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় লালফৌজ দ্বিতীয় বাল্টিক রণাঙ্গনে ২০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নভোসকলনিকির পশ্চিমে ও উত্তর পশ্চিমে এই আক্রমণ আরম্ভ হয়। সোভিয়েট সৈন্যরা ৯০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনে ২০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ রেলষ্টেশন ও সহর ইদ্রিৎসা দখল করা হইয়াছে।

হিটলারের আতঙ্ক

গত ১৩ই জুলাই জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী হইতে বলা হইয়াছে—'অবস্থা সঙ্কটজনক। সবই বুঝি যায়। রুশবাহিনী প্রবল স্রোতের মত পবিত্র জার্ম্মাণ ভূমিতে প্রবেশের উপক্রম করিয়াছে……।' লালফৌজের অমিতবিক্রমে নাৎসীরা যে ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপরের খবর হইতেই স্পষ্ট। হিটলার আর সোজা হইয়া কোথায়ও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তাহার বড় সাধের ভরা তরী ডুবিয়া যায় যায়, তাই এখন আর লুকাচুরি না করিয়া আস্তে আস্তে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জার্ম্মাণ জনসাধারণের কাছে জানাইতেছে। উগ্র 'দেশপ্রেমের' উদ্দীপনা দিয়া পলায়মান জার্ম্মাণ সেনাকে আর যে জীয়াইয়া তোলা অসম্ভব এটা হিটলার ও তাহার চররা জানে বলিয়াই আজ চালাকি করিয়া এদিক সেদিক হইতে 'শান্তি প্রস্তাবের' ধূয়া ফ্যাসিস্টরা ধীরে ধীরে ছড়াইতেছে। যুদ্ধরত দেশগুলির জনসাধারণ ফ্যাসিস্টদের অমানুষিক বর্ব্বরতা, উদগ্র লালসা ও পৈশাচিকতার কথা ভোলে নাই বা ভুলিতেও পারিবে না। তাই এই জঘন্য হিটলারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের আগে যাহারা শান্তির প্রস্তাবে সায় দিবে, বিপ্লবী জনসাধারণের ঘৃণার আগুনে তাহারা পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টের লড়াই
নরম্যাণ্ডির যুদ্ধে রোমেলের ট্যাঙ্কবাহিনীর পরাজয়

নরম্যাণ্ডিতে যুদ্ধের গতি

গত ১৪ই জুলাই ইটারভিলের দক্ষিণে অর্ণি ও ওডোঁ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে নাৎসী জেনারেল রোমেল নরম্যাণ্ডি রণাঙ্গনের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক অভিযান চালাইয়া ব্যর্থ হয়, মিত্র গোলন্দাজ সৈন্যরা তাহার এই ট্যাঙ্ক সমূহকে চূর্ণ করিয়া দেয়।

১৫ই জুলাই জেনারেল আইসেনহাওয়ারের হেড কোয়ার্টাসের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে শেরবুর্গ উপদ্বীপে মিত্রসৈন্যরা আরও কিছুটা স্থান দখল করিয়াছে। লেসের পশ্চিমে টহলদারী মিত্রসৈন্যরা সাঁৎ-জার্ম্মাণ-সুর-য়ের মধ্য দিয়া সামান্য মাত্র বাধা পাইয়া মেজিয়ার অভিমুখে আগাইয়া যায়। তাহারা বুভে ও লা-গার্ডেনারিস অধিকার করিয়া লেসের কাছাকাছি আসিয়াছে।

১৬ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, আমেরিকান সৈন্যদল লেসে সহরের পূর্বদিকে আরে নদী অতিক্রম করিয়াছে। কানাডিয়ান সৈন্যদল কাঁয়ের দিক দিয়া অর্ণি নদী পার হইয়া গিয়াছে।

আক্রমণের সে তীব্র গতিবেগ কোথায়?

প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল মিত্রপক্ষ ফরাসী উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। অবতরণের ব্যাপকতা ও চমৎকার সাফল্যে স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে এক নূতন আশা জাগাইয়াছে। সবাই মনে করিতেছে মিত্রপক্ষ তাহার বিপুল শক্তি দিয়া, তাহার জনবল ও সমর সম্ভার দিয়া ফরাসী দেশ হইতে নাৎসীদের এবার তাড়াতাড়ি উৎখাত করিতে পারিবে, অবতরণের পর ইতালীতে যে ঢিমা-তেতালা লড়াই চলিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি আর এখানে হইবে না। এতদিনে নরম্যাণ্ডিতে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন হইয়া গিয়াছে। শেরবুর্গ, কাঁয়ে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এখন মিত্রসেনার হাতে। সুতরাং জার্ম্মাণবাহিনীকে পিছনে হটাইবার গতিবেগ এখন গজের পর্য্যায় হইতে মাইলে নিয়া যাওয়া দরকার। প্রসঙ্গক্রমে এটা বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট সেনা এই জার্ম্মাণদেরই সাথে লড়াই চালাইয়া তাহাদের একটির পর একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি কাড়িয়া নিতেছে এবং দৈনিক গড়ে ২০ মাইল আগাইয়া যাইতেছে। কোন কোন দিন তাহারা ৩০ মাইলের উপরও জার্ম্মাণ সৈন্যকে খেদাইয়া নিয়াছে। তার তুলনায় নরম্যাণ্ডিতে আজ মিত্রসেনার অগ্রগতি কতটুকু! মিত্রসেনা যখন প্রথম নরম্যাণ্ডিতে নামে, তখন এটা অনেকেই আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় ফ্রন্টের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল শুধু এক নরম্যাণ্ডিই হইবে না—বিভিন্ন দিক হইতে দ্বিতীয় ফ্রন্টের কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। তখনকার দিনে রয়টারের খবরগুলিতেও যেন কিছুটা সেই আভাষই ছিল, আজ দেড় মাসের ব্যবধানে লোকের মনে প্রশ্ন জমিতেছে—অগণিত জনবল এবং প্রচুর সমরসম্ভার থাকা সত্ত্বেও আর কোনস্থান হইতে এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর উপর আঘাত হানা হইতেছে না কেন? পূর্বদিকে লালফৌজ জার্ম্মাণদিগকে এক রকম তাড়াইয়াই নিতেছে, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। ইতালীতেও নাৎসীরা সহরের পর সহর ছাড়িয়া দিতেছে। সুতরাং জার্ম্মাণদের এই পলায়মান অবস্থাকে আরও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন দিক হইতে নাৎসীদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিতে হইবে, যেন নাৎসীরা শ্বাস ফেলিতেও সময় না পায়।

দ্য গলকে মানিয়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ওয়াশিংটনের ১১ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট জানাইয়াছেন যে, **আমেরিকা ফরাসী মুক্তি সংসদকেই নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত ফ্রান্সের জার্ম্মাণ কবলমুক্ত অঞ্চলগুলির সরকার ও প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।** অস্থায়ী ফরাসী সরকারকে মানিয়া লওয়ার এই সিদ্ধান্ত অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা ইতালীতে 'এ্যামগটের' কর্ত্তৃত্বের নমুনা দেখিয়াছি। সেই শাসনে দেশের জনসাধারণ যে সর্ব্বান্তঃকরণে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়িবার প্রেরণা পায় না সে কথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। তাই দ্যগল সরকারকে মানিয়া লওয়াতে ফরাসীর দেশভক্তরা এখন আরও উৎসাহ পাইবে, প্রাণপণ শক্তিতে নাৎসী নিধনে প্রবৃত্ত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। কারণ দেখা গিয়াছে দ্বিতীয় ফ্রন্টের লড়াই সুরু হইবার সাথে সাথেই ফরাসী দেশভক্তরা কি দারুণভাবে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে। অনেক স্থানেই রেল চলাচলের উপর আঘাত হানা হইয়াছে, অনেক সেতু ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে—ফরাসীর অভ্যন্তরে জার্ম্মাণদের আজ টিঁকিয়া থাকাই দায়! ইহার উপর আজ যখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ফরাসী মুক্তি সংসদকেই অস্থায়ী ফরাসী সরকার বলিয়া মানিয়া লইলেন, তখন ফরাসী জনসাধারণ নব বলে বলীয়ান হইয়া আরও উৎসাহের সহিত জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগাইয়া আসিবে।

বীর চীনকে সাহায্য করো

চীন-জাপান যুদ্ধের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে মরণজয়ী চীনের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদেশের মুক্তিকামী জনগণ নূতন অনুপ্রেরণা পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বুঝিয়াছে যে শুধু 'সাবাস চীনা ভাই' বলিয়া দূর হইতে চীনকে তারিফ করিলেই চলিবে না। যে সঙ্কটের মধ্য দিয়া এতদিন স্বাধীন চীন লড়িতেছে, যে সঙ্কট আজ সত্যই ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে, সে সঙ্কট সমাধানে চীনকে অবিলম্বে সাহায্য করা সকল ফ্যাশিষ্টবিরোধীরই একটা প্রধান কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে ফল যে বিষময় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীনের অবস্থা গুরুতর কেন?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেস্ সম্প্রতি চীন দেশে গিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের সঙ্গে চীন সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি বলিয়াছেন যে চীনের অবস্থা "অত্যন্ত গুরুতর"। শুধু ইহাই নয় চীন দিবস উপলক্ষে চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা চিয়াংকাইশেক্ বলিয়াছেন যে চরম বিজয়লাভ পর্য্যন্ত চীন লড়িয়া যাইতে প্রতিশ্রুত, কিন্তু একথা গোপন করা চলে না যে জাপানী শত্রু সম্প্রতি আক্রমণ চালাইয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে এবং "অবস্থা সত্যই গুরুতর"।

অনেকেরই একটা ধারণা হইয়াছে যে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তেমন জোরে চালাইতেছে না; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জাপান দরকার মাফিক লড়াই চীনে যথেষ্টই চালাইতেছে। গত বৎসর পশ্চিম হুনানে এবং চাংতে অবরোধের সময় চীনা আর জাপানীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, গত সাত বৎসরে তেমন যুদ্ধ কমই হইয়াছে। এই বৎসর হোনান্ প্রদেশে নিদারুণ যুদ্ধ চলিয়াছে; চাংশার মত শহর জাপানীদের কবলে পড়িয়াছে। বার্ম্মা-য়ুনান্ যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকানদের সহিত মিলিয়া চীনা সৈন্য যুদ্ধে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও শত্রুর দর্পচূর্ণ এখনও হয় নাই। উত্তরে পিকিং হইতে দক্ষিণে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত সমস্ত রেলপথ দখল করিয়া জাপানী ফাশিস্টরা পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহাদের বিরাট সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দ্রুত সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য লড়িয়া চলিতেছে। উত্তর বার্ম্মা ও আসামে একযোগে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ চালাইয়া শত্রু চেষ্টা করিতেছে যাহাতে মিত্রশক্তি চীনের সহিত স্থলপথে যোগাযোগের রাস্তা খুলিতে না পারে।

ফ্যাশিস্ট ফাঁদে চীন পা দিবে না

কেবল লড়াই চালাইয়াই চতুর শত্রু সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে নাই। চীনের লৌহদৃঢ় জাতীয় ঐক্যে যখনই ফাটল ধরার চিহ্ন দেখা দিয়াছে, যখনই চীনের একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক দেশের কল্যাণের কথা ভুলিয়া কম্যুনিস্টদলনের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে তখনই জাপান তাহার তাঁবেদার ওয়াংচিং ওয়াইয়ের মত বিশ্বাসঘাতকদের লাগাইয়া শান্তির ফানুস উড়াইয়াছে। ফ্যাশিস্ট শত্রু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে চীনের মিত্রেরা যখন চীনকে সাহায্য পাঠাইতে অপারগ, আর চীনের কম্যুনিস্টরা যখন শয়তান, তখন জাপানের সঙ্গে মেলাই হইল বুদ্ধিমানের কাজ।

ফ্যাসিস্টদের এই ফাঁদে চীন যে কিছুতেই পা দিয়া বসিবে না, চীনের গৌরবময় জাতীয় ঐক্য তাহার প্রমাণ। ইয়োরোপের যুদ্ধ যতই সমাপ্তির দিকে যাইতেছে, ততই ফ্যাশিস্ট জাপানেরও দিন ঘনাইতেছে। কিন্তু চার্চিল যে বলিয়াছেন যে পশ্চিমে বিজয় ঘটিলেই চীনকে সর্ব্বশক্তি দিয়া সাহায্য করা হইবে, তাহা যথেষ্ট নয়। এখনই অবিলম্বে চীনকে উপযুক্ত সাহায্য পাঠাইবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

অবিলম্বে সাহায্য চাই

আমেরিকার ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেস্ চীনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর জানিয়াও চুংকিঙে এক বক্তৃতায় বলেন যে চীন, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ১৯৪৪ সালেই যুদ্ধ শেষ করার আশা যথেষ্ট রহিয়াছে। এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে তো এখনই চীনে পর্য্যাপ্ত সাহায্য পাঠাইবার আসল ব্যবস্থা না করার কোন অর্থ হয় না।

মারিয়ানার কাছে জাপানী নৌবাহিনী দারুণ মার খাইয়াছে, জলে ও আকাশে শত্রুর চেয়ে মিত্রপক্ষের শক্তি আজ বেশী, খাস জাপানে বোমা ফেলা জোরে শুরু করিয়া দেওয়া আজ খুব একটা শক্ত কাজ নয়।

ভারতে জাতীয় সরকার চাই

কিন্তু জাপান যেমন সামরিক কৌশল ছাড়া রাজনৈতিক কৌশল দিয়া কেল্লাফতে করার চেষ্টা করিতেছে, তেমনই মিত্রশক্তিকেও কেবল সামরিক কৌশলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। চীনের জাতীয় ঐক্য যাহাতে অটুট থাকে, সেজন্য যথাসম্ভব শীঘ্র যথেষ্ট পরিমাণে হাতিয়ার পাঠাইয়া সেখানকার দেশভক্তদের মনোবল যাহাতে কিছুতেই ভাঙিয়া না পড়ে, সেদিকে দেখিতে হইবে। আর ভারতবর্ষ হইতে নূতন রাস্তা চটপট বানাইতে হইলে, কিম্বা বার্ম্মা রোড খুলিয়া চীনের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে অবিলম্বে চাই ভারতবর্ষে অচল রাজনৈতিক অবস্থার সমাধান। ভারতে জাতীয় সরকার স্থাপিত হইলে সুপ্তোত্থিত সিংহের মত কেশর আন্দোলিত করিয়া ভারতের জনশক্তি অগ্রসর হইবে, বার্ম্মার জনগণও তখন ফ্যাশিস্টবিরোধী সংগ্রামে নামিবার অনুপ্রেরণা পাইবে, ফ্যাশিস্ট শত্রু পলাইবার পথ পাইবে না।

ফরিদপুরের 'ওয়ার্ক হাউসের' অবস্থা

একমাসে দুঃস্থের সংখ্যা ৩০০ হইতে ৮০০

বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুর জেলাতেই সরকারী ওয়ার্ক হাউসের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ১০৫ টা ওয়ার্ক হাউস এই জেলায়। ওয়ার্ক হাউসের সংখ্যা হইতেই বুঝা যায় যে ফরিদপুরে দুঃস্থ সমস্যা কি সাংঘাতিক। দুঃস্থ সমস্যার সমাধান হইয়াছে -এই কথা সরকার জোর গলায় বলিয়া থাকে। এ কথাও বলা হইয়া থাকে যে 'ওয়ার্ক হাউসে' দুঃস্থ আসে না এবং দুঃস্থ আসে না বলিয়া অনেক ওয়ার্ক হাউস বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু ফরিদপুরের ওয়ার্ক হাউসের বিবরণ হইতে উল্টা প্রমাণই পাওয়া যায়।

আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

পালং-এর ওয়ার্ক হাউসে একমাস আগে দুঃস্থের সংখ্যা ছিল ৩০০, এখন সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০০। এই ওয়ার্ক হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বলেন, "ইহাতেও স্থান সংকুলান হয় না। প্রতিদিন শত শত অনাথা ফিরিয়া যায়। অনেককে আবার বিনা ভর্ত্তিতেই অন্যদের ভাগ হইতে কিছু কিছু চাল, ডাল, বাজরা দেওয়া হয়।"

এই থানায় প্রায় ১০টা ওয়ার্ক হাউস থাকা সত্ত্বেও কাগদীবালু চড়া প্রভৃতি গ্রামের তাঁতিরা ও কাঁসারী-পাড়ার মেয়েরা বলিয়াছে যে যদি তাদের গ্রামে ওয়ার্ক হাউস খোলা না হয় তবে তাদের বাঁচিবার উপায় থাকিবে না। এখনই অনেক পরিবারে এক বেলার বেশী খাওয়া জোটে না। অথচ এদের মত গৃহস্থ বধুদের পক্ষে প্রতিদিন দুইবেলা ৪।৫ মাইল হাঁটিয়া গ্রামান্তরের ওয়ার্ক হাউসে যাওয়া সম্ভব নয়।

দুঃস্থ কারা

এই অঞ্চলের যারা দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে, তারা অধিকাংশ গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পী শ্রেণীর। পালং ওয়ার্ক হাউসের ৬০০ দুঃস্থা স্ত্রীলোকের মধ্যে ৪৫০ জন হিন্দু কারিগর সম্প্রদায়ের।

পালং-এর দুঃস্থ হাসপাতালের শিশুবিভাগে ১৫টী শিশুর মধ্যে ৯টী যুগী পরিবার ভুক্ত। এই অঞ্চলের যুগীরা আগে তাঁত চালাইয়া দিন গুজরান করিত, এখন দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন, "শিশুদের সাথে মায়েরাও হাসপাতালে রহিয়াছে। রুগী ভাল হইলেও মায়েরা হাসপাতাল ছাড়িতে চায় না, বলে, ছাড়িয়া যাইবে কোথায়, খাইবেই বা কি?

ওয়ার্ক হাউসের অবস্থা

পালং ওয়ার্ক হাউসে ৮০০ স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র ৪টী ঢেঁকি ও ৪টী জাঁতার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে আর কয়জন কাজ করিতে পারে? ফলে ওয়ার্ক হাউসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। কোনরূপ লাভ-জনক শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে, সেই আয় দিয়া আরো অনেক দুঃস্থার খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা হইয়া যায়। কিন্তু সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের নজর নাই।

ওয়ার্ক হাউসের খাওয়ার বন্দোবস্ত অত্যন্ত জঘন্য। এত নিকৃষ্ট চাউল ও বজরা খাইতে দেওয়া হয় যে তা কোন লোক হজম করিতে পারে না। ওয়ার্ক হাউসের সকলেই কোন না কোন রোগে ভুগিতেছে। যে কোন ওয়ার্ক হাউসে শতকরা ৪০ জনের ম্যালেরিয়া।

মাদারীপুরের ওয়ার্ক হাউসে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মেয়েদের উপর অযথা জুলুম করা হয়। ভয়ে অনেক মেয়ে ওয়ার্ক হাউসে যাইতেই চায় না।

বলিয়াছেন ঃ

কাটাইয়া উঠিয়াছি'

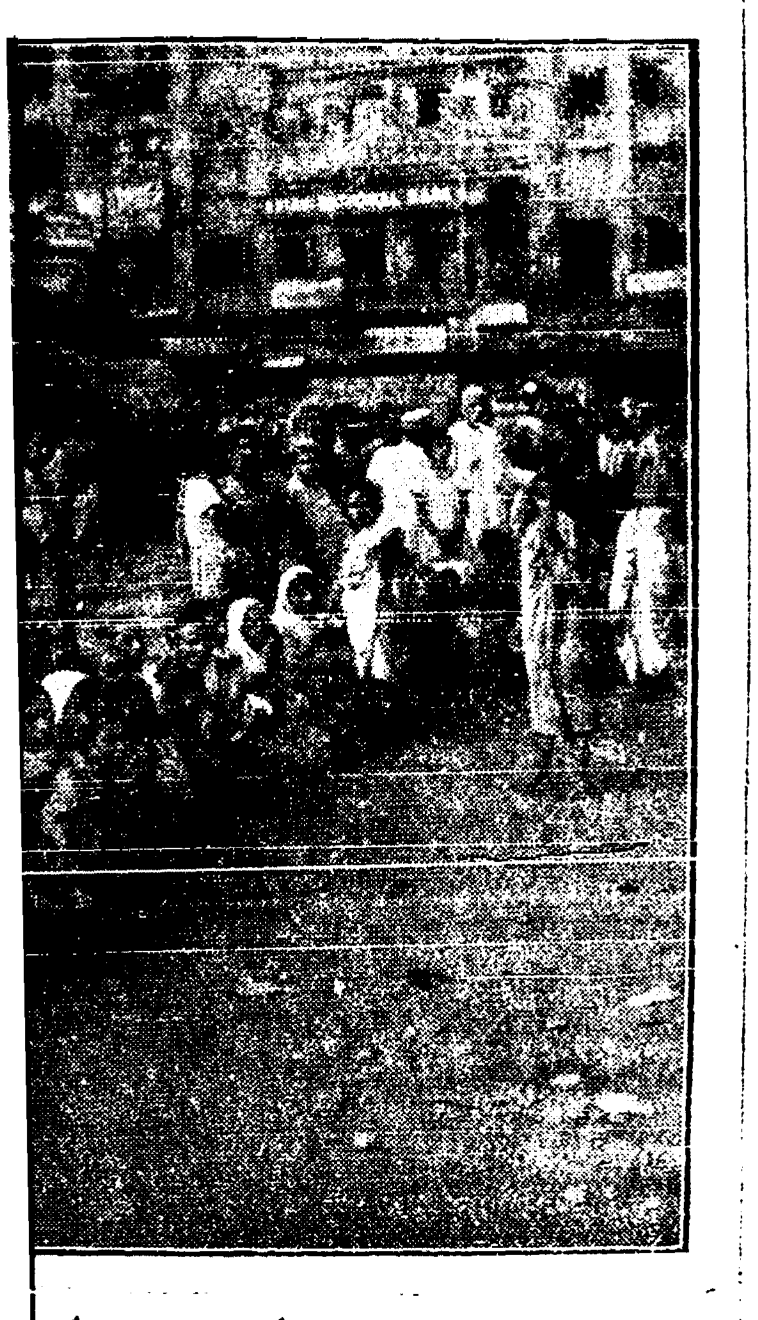

ইহা সকলেই চায়

কাটিয়াছে কি ?

নন সুরু হইয়াছে। বড়বাজার অঞ্চলে

তাহাই এই ছবিতে দেখা যাইতেছে। এই

বের তাড়নায় বাহির হইতে তারা এখানে

নীলফামারীতে রোগ ও মৃত্যুর ছবি

পাঞ্জাব মেডিকেল স্কোয়াডের নেতা মিঃ মিনহাসের বিবৃতি

সম্প্রতি পাঞ্জাব মেডিকেল ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা মিঃ করিমবক্স মিনহাস রংপুর জেলার বড়ভিটা কেন্দ্রের কাজ দেখিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্ট হইতে মহামারীর করুণ ও ভয়াবহ ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

"মালাবার নামক গ্রামে ১৪টী পরিবার সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে খবর লওয়া হয়। তিনটী পরিবার একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং পাঁচটীতে মাত্র একজন করিয়া লোক কাঁদিবার জন্য বাঁচিয়া আছে। ভগ্ন জনমানবহীন কুটীরগুলি—একদিন যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নির্জ্জন কুটীরগুলির পাশ দিয়া যাইবার সময় বিত্তহীন জীবনের আর্ত্তনাদ, রোগ-শোক-অনাহার ও মৃত্যুর গোটা ছবি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহা মরণোন্মুখ মানবতার ডাক কিন্তু ইহার শব্দ কতদুর পৌঁছাইতেছে, কে জানে!

"কুটীরে ঢুকিলে দেখা যায় মাটীর উপরে উলঙ্গ মনুষ্যমূর্ত্তি, উঠিবার শক্তি নাই। কথা বলিতেও পারে না, খাইবারও বুঝি শক্তি নাই যদিও অবশ্য খাওয়া তাহাদের জুটে না। ছাদ বহিয়া বৃষ্টির জল পড়ে এবং তাহাতে ভিজিয়া তারা কাঁপে। মাটীর উপাধান, নিভান চুলা, ভাঙ্গা মাটীর হাঁড়িকুড়ি,—এরা চীৎকার করিয়া নিজেদের কাহিনী বলিতে পারিলে একটা গোটা মহাদেশও টলিয়া উঠিত।

"আমি একটী কুটীরে ঢুকিলাম। ভিতরটা অন্ধকার। এককোণে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নারীমূর্ত্তি চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিল। বৃদ্ধা আমার দিকে চাহিল। তাহার চোখে ছাড়া আর কোথাও জীবনের লক্ষণ নাই। তাহার শরীর শীর্ণ, রোগে বিবশ, ঠাণ্ডা, উলঙ্গ। এই নারী পাঁচ পুত্র ও আটটী কন্যার মাতা ছিল। একে একে ইহার সব এবং স্বামীটীও কলেরায় মারা গিয়াছে। এখন সে তাহার নিজের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত নতভাবে বাহিরে আসিলাম। মনে মনে বিস্মিত হইতেছিলাম যে এখনও এই নারী বাঁচিয়া আছে আর আমার গলায় কান্না ঠেলিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধা চারদিন কিছুই খায় নাই।

"দুর্ভিক্ষ এবং তারপর মহামারী সব চাইতে বেশী সংখ্যায় শিশুদের মারিয়াছে, বয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুসংখ্যা তারপরেই, স্ত্রীলোকই অপেক্ষাকৃত কম মারা গিয়াছে।"

বর্ষার সাথে সাথে আবার ম্যালেরিয়া

আটটী জেলায় বসন্ত ছড়াইবার সম্ভাবনা

ময়মনসিংহে 40 লক্ষ ম্যালেরিয়া গ্রস্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ময়মনসিংহ, ১২ই জুলাই

সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় আবার ম্যালেরিয়া প্রচণ্ডভাবে সুরু হইয়াছে। নেত্রকোণা মহকুমার কেন্দুয়া, আটপাড়া, নেত্রোকোণা এবং বরহাট্টা থানা, কিশোরগঞ্জ মহকুমার কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, তারাইল, কটিয়াদি, কুলিয়ারচর এবং বাজিতপুর থানা, সদর মহকুমার নন্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ এবং ফুলপুর থানা, জামালপুর মহকুমার জামালপুর ও সেরপুর থানা এবং সমস্ত টাঙ্গাইল মহকুমায় শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী লোক ভীষণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। জেলার সরকারী মেডিকেল কর্ত্তৃপক্ষের সাথে দেখা করিয়া জানা গিয়াছে যে জেলায় প্রতি মাসে তিন হাজার পাঁচ শত পাউণ্ড কুইনাইন প্রয়োজন অথচ সরকার জেলায় প্রতিমাসে মাত্র ২০০ পাউণ্ড কুইনাইন দিতেছে। আজ কোন কনট্রোল দোকান হইতে কুইনাইন দেওয়া হয় না—মেডিকেল রিলিফকেন্দ্রগুলি কুইনাইন অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ৪০ লক্ষ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন অভাবে আস্তে আস্তে মরণের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।

গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব

আটপাড়া থানা (ময়মনসিংহ)

গ্রাম	লোকসংখ্যা	ম্যালেরিয়া আক্রান্ত
হুতারপুর	৮০০	৬০০
কিষানপারা	২০০	১৫৫
আরাগাও	৩০০	১০০
কৃষ্ণাপুর	৫৫০	২৫০
জলহুকা	১০০	৪০
রামেশ্বরপুর	৭০০	৪৫০
বিচরাকান্দা	১৫০০	১০০০
যাদবপুর	৭০০	৫০০
মাদল	৫০	৪০
বিষ্ণুপুর	৬০০	৩০০
বানিয়াজান	৭০০	৩৫০
খাগড়া	৮৫০	৫০০
দাড়িয়াবাক্সা	২২৫	১৮০
দেহুরা	৪০০	১৮০
জালালপুর	৫০	৪০

ঢাকায় ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ

(সংবাদদাতার খবর)

ঢাকা, ১১ই জুলাই

বর্ষা আরম্ভ হইবার সাথে সাথে জেলার বহুস্থানে ম্যালেরিয়া খুব ব্যাপকভাবে দেখা দিতেছে। মানিক-গঞ্জে প্রায় শতকরা ৫০ জন জ্বরে আক্রান্ত, নারায়ণ-গঞ্জ মহকুমায় সোণারগাঁয়ে শতকরা ৫০ জনের উপর।

একটি ইউনিয়নে ২০ দিনে ২০০০ ম্যালেরিয়া রোগী

রংপুরের কাশীরাম বেলপুকুর ইউনিয়নে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপ নিয়াছে। স্থানীয় রিলিফ হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ হক বলেন যে গত জুন মাসের প্রথম ২০ দিনের মধ্যে তিনি অন্ততঃ ২০০০ ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন।

চাঁদপুরে ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে

চাদপুর, ১২ই জুলাই

বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। কুইনাইনের অভাবে রিলিফের কাজে দারুন অসুবিধা হইতেছে। (ইউ, পি)

আটটি জেলায় বসন্তের প্রকোপ

গত সপ্তাহে বসন্তের মহামারী সম্পর্কে কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে বাংলায় ৮টি জেলায় বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মাদারীপুরে বসন্ত

জেলা বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর ও কালকিনি থানাতে এখনও বসন্ত মহামারী রূপেই রহিয়াছে। মাদারীপুর থানার শিলারচর, খেওয়াজপুর, কুলিয়া এবং বাহাদুরপুর ইউনিয়নগুলিই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত।

মহামারীর ব্যাপকতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

তিস্তা ক্যাম্প, (রংপুর) ২৭শে জুন

গোকুণ্ডা ইউনিয়নে ইউনিয়নবোর্ডের হিসাবে বসন্তে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ১০০০। তন্মধ্যে ৮৫০ জন মরিয়াছে।

রাজপুর ইউনিয়নের মধুগ্রাম মৌজায় ১০০ জনের বেশী লোক বসন্তে মারা গিয়াছে। রাজপুর মৌজায় নুতন ভাবে বসন্তের আক্রমন সুরু হইয়াছে।

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ এখনও ব্যাপক

লক্ষ্ণৌ হইতে যে মেডিকেল স্কোয়াড বাংলায় রিলিফের কাজ করার জন্য আসিয়াছিলেন তাহারা ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পতিহাল, পানাসয়া, দুনাহ প্রভৃতি স্থানে মেডিকেল রিলিফের কাজ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া বাংলার মহামারী সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে বাংলায় মহামারীর প্রকোপ এখনও কমে নাই। অনেক স্থানে ইহার প্রচণ্ডতা যথেষ্টই আছে। তাহারা যে সব কেন্দ্রে কাজ করিয়াছেন সেখানে বসন্ত, ম্যালেরিয়া, আমাসা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও যথেষ্টই আছে।

শিক্ষার সংকটের চিত্র

মিঃ মিনহাস এই অঞ্চলেরই বড়ডোমা গ্রামের ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্কুলের উপর মহামারীর আঘাতের ছবি দেখা যায়।

১৯৪৩ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৫ জন
গড়ে হাজিরা ছিল ৮১ „
অনুপস্থিতির কারণ কলেরা ও কলেরায় মৃত্যু।
১৯৪৪ সালে ছাত্র সংখ্যা হইল ৭৬ জন
গড়ে হাজিরা ২১ জন

অনুপস্থিতির কারণ রোগ ছাড়াও কাপড়ের অভাব, অনাহার এবং মাঠে কাজ। উপস্থিত ২১ জন ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন রোগে ভুগিতেছে এবং অনেকেই একাধিক রোগে ভুগিতেছে।

রোগ ভোগের হিসাব

এই অঞ্চলে খোস পাঁচড়া আছে শতকরা ৮০ জনের
ম্যালেরিয়া আছে শতকরা ৮০ জনের
রক্তাল্পতা " " ৭৫ জনের
আমাশা ও অন্যান্য পেটের রোগ " ৫০ জনের

শতকরা পাঁচজন লোক উপযুক্ত পরিমাণ খাইতে পায়, শতকরা ৬২ জন কম খায়, বাকী শতকরা ৩৩ জন যাহা খায় তাহা অত্যন্ত কম।

নালিতাবাড়ীর প্রতি গ্রামে আবার কলেরা শুরু হইয়াছে

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

তারাগঞ্জ বাজার (ময়মনসিংহ),
৩রা জুলাই

বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ী অঞ্চলে প্রতি গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড় অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রাম হইতেই মৃত্যুর ও রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ট্রাম শ্রমিকের জন্য

দাবী বিচারের এডজুডিকেশন বসিল

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ট্রাম শ্রমিকদের "এডজুডিকেশনের" দাবী মানিয়া লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইউনিয়নকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদের দাবীগুলির উপর বিচারের ভার কলিকাতার চীফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, গুপ্তের উপর দেওয়া হইল। যে সমস্ত দাবীর উপর বিচার হইবে তাহা হইলঃ (১) বিভিন্ন বিভাগের ন্যুনতম বেতন, (২) টাইমটেবিল, (৩) সস্তা রেশনের স্থলে ক্ষতিপূরণ, (৪) ক্যাণ্টিন, (৫) চেঞ্জ ডিউটি, (৬) ছুটি, (৭) পি, ডবলিউ বিভাগের জন্য স্থায়ী চাকুরী ও গ্রেড, (৮) ৩ মাসের অগ্রিম বেতনের সুদ লওয়ার প্রশ্ন এবং (৯) মাগগীভাতা বৃদ্ধি।

ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষে ইহা একটি বড় রকমের জিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, গবর্ণমেণ্ট কোন ধর্ম্মঘট বা বিরোধ সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত 'এডজুডিকেশনের' প্রয়োজন স্বীকার করেন না। ধর্ম্মঘট বা বিরোধ সৃষ্টির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এডজুডিকেশন আদায় হইলেও মজুরদের একতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কোম্পানী ও গবর্ণমেণ্টের আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা কঠিন হয়। তাহা ছাড়া, ধর্ম্মঘট করিয়াও এডজুডিকেশন পাওয়া যায় নাই, এমন নজীরেরও অভাব নাই। ট্রাম শ্রমিকই গত দুই বছরে কমপক্ষে ৩ বার ধর্মঘট করিয়াছে কিন্তু কোন বারই এডজুডিকেশন আদায় করিতে পারে নাই।

এবারও ট্রাম-কোম্পানী বা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে এই এডজুডিকেশনের হুকুম হয় নাই। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ট্রাম-শ্রমিক বাংলার শ্রমিক শ্রেণীকে গত দুই বছরে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, দেশসেবার পথ দেখাইয়াছে। গত দুইমাস যাবৎ সারা বাংলায় শুরু হইয়াছে মাগগীভাতার জন্য গ্রেগরী কমিটির সিদ্ধান্তের উপর তুমুল আন্দোলন ও বেশী রেশন ও কয়লা সংকট দূর করার দাবীর উপর জনসমর্থন সংগ্রহ। এই দাবীর উপর কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪ পরগণার বিরাট মজুরশ্রেণী বড় বড় সভা করিয়াছে—শ্রমিক সমাবেশ করিয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী জনমত গঠিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে শ্রমিকদের দাবী সমর্থিত হইয়াছে, কর্পোরেশন ও আইনসভার কয়েকজন নেতাও শ্রমিকদের দাবী লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতিরিক্ত রেশনের জন্য কর্পোরেশন প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। মালিক ও গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক ও জনসাধারণের চাপ অনুভব করিয়াছেন।

> ### ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের
> #### বার্ষিক সম্মেলন।
> বোম্বাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও বোম্বাই সূতাকল শ্রমিকদের বিখ্যাত নেতা এস, এম, মিরাজকর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। **১৯শে জুলাই**—বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা, স্থান—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল, সন্ধ্যা—৬টা। **২০শে জুলাই**—প্রকাশ্য অধিবেশন, স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, সন্ধ্যা—৬টা। **২১শে জুলাই**—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, সন্ধ্যা—৬টা।

তাহা ছাড়া, ট্রাম-শ্রমিক কেবল নিজেদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে আন্দোলন করিয়াছে তাহাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাহারা ৪ হাজার সহি সংগ্রহ করিয়াছে; কালীঘাট, পার্কসার্কাস এলাকায় জনসাধারণের সহিত একযোগে জনসভা করিয়াছে, লীগ-সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ, কংগ্রেসনেতা মিঃ জে,সি, গুপ্ত এবং আরও শতাধিক বিশিষ্ট নাগরিকের নিকট হইতে সমর্থন পাইয়াছে। ট্রাম চলাচলের উন্নতির জন্য তাহাদের আগ্রহ কলিকাতার নাগরিকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছে; কর্পোরেশনের সভায় কোম্পানীর মুনাফাখোর নীতি নিন্দিত হইয়াছে।

ট্রাম শ্রমিকদের জয়লাভের ইহাই আসল কারণ। যে সময়ে দেশনেতারা আত্মকলহে মগ্ন, আইন সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়া আমলাতন্ত্র সর্ব্বেসর্ব্বা, সেই সময়ে ট্রাম-শ্রমিকদের এই জয় খুবই উল্লেখযোগ্য। নিজেদের ন্যায্য দাবী এবং সম্মিলিত শক্তির উপরে দাঁড়াইয়া ট্রাম-শ্রমিক বাংলার সমস্ত শ্রমিককে পথ দেখাইল।

দেশ ইঁহাদের হারাইল

ময়মনসিংহ জেলার কালাপাড়া গ্রামের **কমরেড ইন্দ্রমোহন সরকার, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাদের বাড়ীর আরও ৪** জন কলেরায় মারা গিয়াছেন। কমরেড ইন্দ্র ২ বৎসর কৃষক সমিতির কাজের মধ্য দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। মধ্যনকুড়ার **কমরেড যোগেন্দ্র সরকারও** কলেরায় মারা গিয়াছেন। ৩ বৎসর কৃষক সমিতির কাজের মধ্য দিয়া তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। বারহাট্টা ছাত্র ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সম্পাদক **কমরেড হেমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** যক্ষ্মারোগে সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। তিনিই বারহাট্টা ছাত্র ফেডারেশন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুপারীর **কমরেড ধীরেন্দ্র লাল রায়** সম্প্রতি যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন। তিনি স্থানীয় যুবক সমিতির সংগঠক ছিলেন। সিংহেরবাংলার কৃষক-**কমরেড হৃদয় শুক্লদাস** ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছেন। কমরেড শুক্লদাস স্থানীয় কৃষকদের প্রিয় নেতা ছিলেন। স্বল্পাগলির **কমরেড হেমন্ত সরকার** ট্রেণ হইতে পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছেন। স্থানীয় কৃষক সমিতি কমরেড হেমন্তের চেষ্টাতেই প্রথম গড়িয়া উঠে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছাত্রকর্মী **কমরেড রাধানাথ ভট্টাচার্য** সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। গত বৎসর খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া তিনি পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

ত্রিপুরা জেলার পেচাড়হর গ্রামের কমিউনিস্ট-সভ্য **কমরেড শরৎচন্দ্র দেব** যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন। এই জেলার বিখ্যাত আধিয়ার আন্দোলনের মধ্য দিয়া কমরেড শরৎ দেব কৃষকনেতা হিসাবে জনপ্রিয় হন। দুর্গাপুর গ্রামের **কমরেড রাজমোহন শর্মা ও তাঁহার স্ত্রী ভানু ক্ষত্রাণি** ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছেন। এই গ্রামের **কমরেড ব্রজেন্দ্র পাল** বসন্তরোগে মারা যান।

কলিকাতার ইলেকট্রীক মজদুর ইউনিয়নের **কমরেড মহাবীর** গত ৬ই জুলাই মারা গিয়াছেন। তিনি ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান ও উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।—মৃত কমরেডদের সম্মানার্থে পার্টি তাহার পতাকা অবনমিত করিতেছে।

চটকল মজুরের নূতন সংকট

মাসে প্রায় ১৬ হাজার টন করিয়া কমিবে এবং প্রায় ৫০ হাজার চটকল মজুরের কাজ যাইবে।

কয়লার অভাবের অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট বাংলাদেশের চটকল মালিকদের কাছে সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছে যে চটের উৎপাদন-ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করিয়া নূতন ভাবে গঠিত হোক এবং যে-সব মিলে বেশী কয়লা খরচ হয় সে সব মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক। ইয়োরোপীয়ান চটকল মালিকদের মুখপত্র "ক্যাপিটাল" কাগজ ২৯শে জুন লিখিয়াছে যে "১৫ হাজার হইতে ১৬ হাজার তাঁত এই কাজ বন্ধের হুকুমে পড়িবে।"

অবশ্য বাকী মিলগুলিতে ডবল শিফট চালাইয়া উৎপাদনের ক্ষতি যথা সম্ভব পূরণ করিবার কথা আলোচিত হইতেছে। কিন্তু উহাতে ক্ষতির সামান্য অংশই পূরণ হইতে পারে। কারণ, মালিকদের পরস্পর রেষারেষি আছে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ক্ষতিপূরণ লইয়া ঝগড়া আছে, উৎপাদন ব্যবস্থার গলদ ও অন্যান্য সরঞ্জামের কিছু কিছু অভাবও আছে।

তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যে বর্ত্তমান দিনে এক জায়গার মজুরদের আর এক জায়গার মিলে লইয়া গিয়া ডবল শিফট চালানো যায় না, কারণ নূতন মজুরদের থাকিতে দিবার মত স্থান কোনো অঞ্চলেই নাই। এ কথা 'ক্যাপিট্যাল'ও স্বীকার করিয়াছে। সে জন্য অল্প কয়েক জায়গায় ছাড়া বহু জায়গায়ই ডবল শিফট চালানো যাইবে না। ইহার উপর 'ক্যাপিট্যাল' আরও সংবাদ দিতেছে যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অন্য কাজের জন্যও অনেকগুলি মিল দখল করিবার নোটিশ জারি করিয়াছে। ইহাতে চটের উৎপাদন আরও কমিবে।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব দুইটী যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে নূতন ডবল শিফটের কাজ ইত্যাদি ধরিয়াও প্রায় হাজার দশেক লুম বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। **তাহার অর্থ চটের উৎপাদন প্রতি মাসে প্রায় ১৬ হাজার টন করিয়া কমিবে এবং প্রায় ৫০ হাজার চটকল মজুরের কাজ যাইবে।**

বোমার বিপদ যে কমে নাই তাহা সম্প্রতি ব্ল্যাক-আউটের কড়াকড়ি হইতে বোঝা যায়। কিন্তু এই সময়েই মাসে ১৬ হাজার টন করিয়া চটের উৎপাদন কমার মানে বোমা হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান হাতিয়ারেরই অভাব। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনে মার্কিণ, রুশিয়া প্রভৃতি হইতে চটের যে চাহিদা আসিতেছিল তাহার অনেকখানিই মিটানো যাইবে না। আর যখন অধিকাংশ শিল্পেই কয়লার অভাবে কাজ কমিতেছে তখন হঠাৎ ৫০ হাজার চটকল মজুরের জবাব মানে উহাদিগকে নিশ্চিত অনাহার ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া।

অন্যান্য শিল্পেও কয়লার অভাবে অনেক সময় কাজ কম হইতেছে, মজুরের রোজগার কমিতেছে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কম তৈয়ারী হওয়ায় দেশবাসীকে চড়া দাম দিতে হইতেছে। রান্নার জন্য কয়লার ভাবনায়ও ঘরে ঘরে গৃহস্থ পাগল হইতেছে।

এই সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হইল কয়লার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খনি মজুরকে উৎসাহিত করা। চটকল মজুরের ভবিষ্যত আজ খনি মজুরের হাতে। দেশবাসীর আত্মরক্ষা আজ খনি মজুরের হাতে। তাই নিজেদের প্রয়োজনেই সমস্ত চটকল মজুর, সমস্ত দেশবাসীকে আগাইয়া আসিয়া খনি মজুরের উৎপাদনের দাবী মিটাইবার জন্য খনি-মালিক ও সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে। এবং চটকল মজুরকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব লইতে হইবে, কারণ তাহাদের ভবিষ্যতই সব চেয়ে বিপন্ন।

মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং মজুরদের উপর

মালিক ও পুলিশের জুলুম

মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস কলিকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটি লোহা-কারখানা। এখানে প্রায় ১ হাজার মজুর কাজ করে। অযথা মারধর, কম মজুরী, সামান্য কারণে ছাঁটাই, যন্ত্রপাতি অসাবধানে ভাঙ্গিয়া গেলে অসম্ভব জরিমানা আদায়, মালিকের তরফ হইতে এই ধরণের জুলুম ত হামেশা লাগিয়াই আছে।

গত এপ্রিল মাসে এখানে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। কারখানার মালিক ম্যানেজারের মারফৎ ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য চেষ্টার কসুর করে নাই। ৫ই মে ফোরম্যানের মারপিটের বিরুদ্ধে মালিকের কাছে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য চ্যানেল ডিপার্টমেণ্টের ৬৩ জন মজুর বরখাস্ত হয়। কারখানায় তুমুল আন্দোলনের চাপে ইউনিয়নের ৪ জন নেতা বাদে বাকি সকলকে মালিক কাজে নিতে বাধ্য হয়। মালিক আবার যখন ফার্ণেস ডিপার্টমেণ্টের ১৩ জন মজুরকে ওভারটাইম না করার অজুহাতে জবাব দেয়, তখন মজুররা দলবদ্ধ হইয়া আন্দোলন চালায়। ফলে, লেবর কমিশনর এই ব্যাপারে মালিক ও মজুরদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দুজন কনসিলিয়েশন অফিসার নিযুক্ত করেন। ইহার পর একদিন ইউনিয়নের সেক্রেটারী হরিদাস মালাকরকে ডাকাইয়া জেনারেল ম্যানেজার অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করিলে মজুররা জেনারেল ম্যানেজারের নামে ইউনিয়নের মানহানির মামলা রুজু করে।

ইউনিয়নের জোর দেখিয়া মালিক এবার মজুরদের দমাইবার জন্য পুলিশের সাহায্য নেয়। ইউনিয়নের দু'জন কর্ম্মী কালিপদ ঘোষাল ও সুধীর ভট্টাচার্যকে পুলিশ যথাক্রমে ২৭শে জুন ও ১লা জুলাই মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য তাঁহারা ছাড়া পান।

৩রা জুলাই ইউনিয়নের ২ জন কর্মী কমরেড ঠাকুরদাস ও কমরেড কালিপদ যখন এডজুডিকেশনের দরখাস্তের উপর মজুরদের সহি সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের হাত হইতে কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সহিশুদ্ধ কাগজ কাড়িয়া লন।

৬ই জুলাই ইউনিয়নের সেক্রেটারী যখন কারখানার গেট হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ১ জন মজুরের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন স্থানীয় ফাঁড়ির হেড কনস্টেবল আসিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলে। কমরেড মালাকর যাইতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে তখন কনস্টেবলটি মারিতে মারিতে কারখানার ভিতরে লইয়া যায় ও সেখান হইতে আহত অবস্থায় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ হাসপাতালে পাঠায়। জামীনে তিনি খালাস হইয়াছেন।

ইউনিয়নের উপর মালিকের এই আঘাত রুখিবার জন্য মায়া কারখানার সমস্ত মজুরকে আজ ইউনিয়নের মধ্যে একজোট হইতে হইবে। ইউনিয়নের জোর দেখিয়া মালিক আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত মজুর যদি আজ ইউনিয়নের ঝাণ্ডার নীচে এক হয়, মালিকের শক্তি কাবু হইতে কতক্ষণ! তবেই মজুরের দেশপ্রেমিক উৎপাদন নীতির জয় হইবে, দেশবাসীর সমর্থনে মজুর তার দাবী আদায় করিতে পারিবে।

কর্পোরেশনে ৫।০ সের রেশনের প্রস্তাব

সরকারকে রেশন বাড়ানর অনুরোধ সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত

গত ১২ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলার কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটী উত্থাপন করেনঃ—

(ক) বাংলার মজুরদের এবং বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের মজুরদের পক্ষে চাল ও আটায় যে ৪ সের রেশন দেওয়া হয় তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। কেননা, চাল ও আটাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানান হউক যে কর্পোরেশনের সমস্ত মজুর ও তাদের পোষ্যদের জন্য চাল ও আটার বরাদ্দ **আর এক ইউনিট বাড়াইয়া দেওয়া হউক।**

(খ) কলিকাতায় ও আশেপাশের শিল্প-বহুল অঞ্চলে যে সব জায়গায় রেশন চালু হইয়াছে সেখানে চাল ও আটার যে দর ধার্য্য হইয়াছে তাহা খুবই বেশী। লড়াইয়ের আগের দরের তুলনায় এখনকার দর প্রায় ৪ গুণ। গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জেলার পাইকারদের জন্য চালের যে উচ্চতম দর ধার্য্য করিয়াছে, রেশনের চালের দর তার চেয়েও বেশী। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক যে **রেশন অঞ্চলের চাল ও আটার দর কমান হউক।**

মজুরদের এই দাবীকে যে কেহই অন্যায় দাবী মনে করে না, তাহা এই প্রস্তাবের উপর কর্পোরেশনে যে আলোচনা হয়, তাহাতেই পরিষ্কার হইয়া উঠে। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সকল দলের কাউন্সিলাররা এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। এমন কি ইউরোপীয় সভ্যরাও ইহাতে আপত্তি জানাইতে পারেন নাই। মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে মজুরের রেশন কম হইতেছে, একথা লইয়া হৈচৈ করা চলিবে না। বাংলা সরকারের এই হুমকী সত্ত্বেও মুসলিম লীগ কাউন্সিলাররাও এই প্রস্তাব দুইটী সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন নাই। **সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়।**

বাংলা সরকারের এখন জবাব কি? জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সকলে মিলিয়া এক বাক্যে যে দাবীকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন, সে দাবী যে মজুরদের অন্যায় আব্দার নয়, তা বুঝিবার মত বুদ্ধি আশা করি এখন সরকারী আমলাদের হইবে। আমরা আশাকরি কর্পোরেশনের এই প্রস্তাবের উপর সরকার গুরুত্ব দিবেন। কর্পোরেশন কাউন্সিলারদের কাছেও আমাদের অনুরোধ—তাঁরা যেন শুধু প্রস্তাব পাশ করিয়াই চুপ করিয়া না থাকেন; এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব—যার উপর মজুরের জীবন নির্ভর করিতেছে, তা কাজে পরিণত করার জন্য মজুরের আন্দোলনে শক্তি জোগান।

Regd. No. C. 2836

গান্ধিজীর বিরুদ্ধে হিন্দু-সভার জেহাদ

প্রথম পর্বেই শ্যামাপ্রসাদ নাজেহাল

গত ২ বৎসর ধরিয়া হিন্দু মহাসভা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বেশ আসর জমাইয়াছে। বাংলার সাধারণ কংগ্রেসভক্ত ও দেশসেবকদের মনে মুসলিম লীগের সম্বন্ধে অনেক সংশয় ও সন্দেহ বিত্তমান। লীগমন্ত্রীমণ্ডলীও খাত্ত প্রভৃতি ব্যাপারে সব সময় জনগণের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই—তাহাতে সেই সংশয় ও সন্দেহ বৃদ্ধিই পাইয়াছে। এই সুযোগে হিন্দুমহাসভা লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেশসেবকদের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বাংলার কংগ্রেসও এই সময়ে দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই, বরং লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর বিরোধিতায় অন্ধ হইয়া তাঁহারাও মহাসভার সঙ্গে একযোগে অভিযান চালান। ফলে, কংগ্রেসভক্তদের মনে মহাসভাপ্রীতি বাড়িয়াই চলে এবং বাংলার কংগ্রেস অনেকাংশে দুর্ব্বল হইয়া যায়।

ঘটনা পরম্পরায় মহাসভা আপাত দৃষ্টিতে একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ একজন জাতীয় নেতা হিসাবে বাংলার বুকে বিরাজ করিতে থাকেন।

মহাসভার মুখোস ফাঁস

কিন্তু মহাসভার এই ছদ্ম আবরণ আজ আর টিঁকিতেছে না। গান্ধীজির মুক্তির পর কংগ্রেসসেবীদের মনে নূতন করিয়া সাড়া জাগাইয়াছে। গান্ধীজি রাজাজির মারফত লীগের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাবে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐক্যের সম্ভাবনায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস বড় হইলে, দেশ ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইলে সাম্রাজ্যবাদের শাসনদণ্ড খসিয়া পড়ে এবং হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতার পুঁজি আর থাকে না।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কংগ্রেস বিরোধীতার আয়োজন

সাভারকর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হুঙ্কার করিতেছেন এবং বাংলার সাভারকর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার জন্য ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে হিন্দুসভার উদ্যোগে **"রাজাগোপাল আচারীর প্রস্তাবের নিন্দা" করিবার উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করেন।**

দেশসেবকগণও বসিয়া থাকেন নাই। গান্ধীজি-রাজাজি প্রস্তাব তাঁহাদের মনে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন আশা জাগাইয়া তোলে। তাঁহারা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই জঘন্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক কংগ্রেস-সেবী ও কমিউনিস্ট কর্মী সভাস্থলে সমবেত হন।

মুখে তাঁহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সুস্পষ্ট ছবি—কংগ্রেসের পতাকাকে অবনমিত হইতে দিব না। উপস্থিত জনতার ভিতর কতিপয় কংগ্রেস কর্মীর স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহার বিলি হয়। তাহাতে গান্ধী রাজাজি প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জনগণকে মহাসভার দেশদ্রোহীতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানান হয়। এই ইস্তাহার উপস্থিত জনতার ভিতর প্রচুর উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে।

হিন্দু মহাসভার যে-সব সংগঠকেরা সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণেন এবং সভা আদৌ করিবেন কিনা সে সম্বন্ধে নিজেদের ভিতর আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহারা নাকি বিভিন্ন কুস্তির ও লাঠিখেলার আখড়ায় ভলান্টিয়ারের জন্য বারবার টেলিফোন করেন। উদ্দেশ্য হয়ত ছিল যে জোর করিয়া কংগ্রেস বিরোধী প্রস্তাব পাশ করাইবেন। কিন্তু 'ভলান্টিয়াররা' সভাস্থলে আসেন নাই।

কংগ্রেস বিরোধী শ্যামাপ্রসাদের সভা হইতে পলায়ন

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলে সভা আরম্ভ হইল। যথারীতি সভাপতি নির্ব্বাচন না করিয়াই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে সভাপতির আসনে বসান হইল। উদ্যোক্তারা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁদের সভাপতি নির্ব্বাচন সকলের মনোনীত নাও হইতে পারে। এক একজন করিয়া ছয়জন বক্তা বক্তৃতা করিবার চেষ্টা করিলেন। দু'একজন বক্তা গান্ধীজির প্রশংসা করিয়া ও নিজদের কংগ্রেসী বলিয়া আসর মাতাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁদের কংগ্রেস বিরোধী রূপ ফুটিয়া উঠে। "কংগ্রেস কী জয়" "গান্ধীজি কী জয়" "হিন্দু মুসলমান এক হও" "গান্ধী-রাজাজি প্রস্তাব মানিয়া নেও" "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি তুমুল ধ্বনিতে কংগ্রেস বিরোধীদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নষ্ট হইয়া যায়। এন, সি চাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার সুলভ বাক্যচ্ছটায় বলিতে চেষ্টা করেন যে বাঙলার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও নাকি রাজাজি প্রস্তাব পছন্দ করেন না। শ্রীযুত চাটার্জির এই মন্তব্যে শ্রোতৃমণ্ডলী একবাক্যে প্রতিবাদ করে। তবু এন, সি চাটার্জি চীৎকার করিয়া বলিতে চেষ্টা করেন "আমরা রাজাজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিব।" কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী তার জবাব দিল :— "হিন্দুমহাসভা চাই না" "কংগ্রেস কী জয়"। শ্রীযুক্ত চাটার্জি আর বক্তৃতা দিতে পারিলেন না। তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন কংগ্রেস সেবী কিছু বলিবার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে বলিতে না দিয়া সভাপতি বক্তৃতা করিতে সুরু করেন। যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ গত দু' বৎসর যাবৎ বাংলার বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবা মাত্র তুমুল অভিনন্দন ধ্বনি পাইয়াছেন—আজ সেই শ্যামাপ্রসাদই দাঁড়াইবা মাত্র জনতা গর্জিয়া উঠিল "হিন্দুমহাসভা চাই না" "শ্যামাপ্রসাদকে চাই না—গান্ধীজিকে চাই" "কংগ্রেস কী জয়" "হিন্দুমুসলমান এক হও" "বন্দে মাতরম্"। প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনির মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের কংগ্রেসদ্রোহীতা কেহই সহ্য করিতে রাজী নয়। এতদিন শ্যামাপ্রসাদ অনৈক্যের বাণী তুলিয়া বাংলার দেশপ্রেমকে অপমানিত করিতেছিলেন—আজ সেই দেশপ্রেমের পুঞ্জীভূত ঘৃণা শ্যামাপ্রসাদের মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে কাহার আবেদনে জানি না, পুলিশ হলগৃহে প্রবেশ করে। কয়েকজন কর্মী শ্যামাপ্রসাদের সামনে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করেন—পুলিশ তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া দেয়—সাম্রাজ্যবাদের কঠোর হস্ত শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে আসিয়া দাঁড়ায়! কিন্তু তবুও শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে পারিলেন না। শ্যামাপ্রসাদ তখন সভা শেষ করিয়া চলিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও তাঁহাকে অনুসরণ করে।

শ্যামাপ্রসাদের প্রস্থানের পর জনতা সেখানেই আর এক সভা করে—এবং গান্ধীজি রাজাজি প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

> **গান্ধীজির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ**
>
> "রাজাজীর প্রস্তাব মানিয়া লইয়া তিনি (গান্ধীজি) দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ-সাধন তো করেনই নাই, বরং যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে দেশের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতিই হইয়াছে।"
>
> (১৮ই জুলাই-এর বিবৃতি)

বাংলার নেতা কে? গান্ধীজি না শ্যামাপ্রসাদ?

শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার কংগ্রেস বিরোধী অভিযানের প্রথম পর্বেই নাজেহাল হইয়াছেন। কলিকাতার দেশপ্রেমিক ও ছাত্রমহল এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহারা রাস্তায় ঘাটে কলেজে হোষ্টেলে বলাবলি করিয়াছে "শ্যামাপ্রসাদ বাবু এবার শিক্ষা পাইয়াছেন" "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কি কেউ যেতে পারে?" সত্যিই বাংলার জনগণ কংগ্রেসের সেবক। মহাসভা এতদিন সেই কংগ্রেসকেই দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গান্ধীজির অনশনের সময়ে সাভারকর মহামান্য নেতার মুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাই বড়লাট তাঁহার পিট চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন ভারতের ভৌগলিক ঐক্য রক্ষা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে মহাসভা কংগ্রেস লীগের ঐক্যবদ্ধ দাবীর বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করিয়াছিল। কস্তুরবা স্মৃতি তহবিলে অর্থ দান না করিতে সাভারকর "হিন্দু"দের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আজ মহাসভা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ তুলিয়া গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিযান জানাইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকিয়া আবার পাঁয়তারা ভাঁজিতেছেন। কংগ্রেস সেবকগণের আজ এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহাদের বাছিয়া লইতে হইবে কোন পথে তাঁহারা চলিবেন। গান্ধীজি কর্তৃক প্রদর্শিত ঐক্যের পথে? না, শ্যামাপ্রসাদের অনৈক্য ও পরাধীনতার পথে? আজ গান্ধীজিকে চাই—না সাভারকর শ্যামাপ্রসাদকে চাই? বিপ্লবী বাংলার কণ্ঠ হইতে এর উত্তর দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হউক।

গান্ধীজীর প্রস্তাবে আপত্তি কাহাদের

হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের মন্তব্য

প্রত্যেক দায়িত্বসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে কংগ্রেস লীগ একতার সর্ত্ত হিসাবে যে দিন মিঃ জিন্না পাকিস্তানের দাবী তুলিয়াছেন, সে দিন হইতেই **মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই** হিন্দুস্থানের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।

(সাভারকরের বিবৃতি, ১৪ই জুলাই)

প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র 'স্পেকটেটরের' মন্তব্য

মুসলিমদের সঙ্গে মীমাংসার জন্য গান্ধীজী রাজাজী-মারফৎ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে স্পেক্টেটার সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তার কারণ, "এই প্রস্তাবে এমন কথা আছে, যার অর্থ এই যে, লড়াই চলিতে থাকা কালেই অর্থাৎ এখনই, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাত হইতে সাময়িক গভর্ণমেন্টের হাতে ক্ষমতা আসুক।"

হিন্দু সভার পথ—বৃটিশ দাসত্বের পথ

শ্রীযুত রাজগোপালাচারীর বিবৃতি

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

'গান্ধীজি যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এই ব্যাপারে একমাত্র হিন্দু মহাসভা ছাড়া আর সকলেই অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহা আশার কথা। মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ যে বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। এই ব্যাপার নূতন নহে। **মহাসভার মতে চলিলে অচল অবস্থার অবসান হওয়া দূরে থাকুক, চিরকালের মত আমাদের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব ঝাঁকিয়া থাকিবে!** আসল প্রশ্ন এই যে, একদিকে পরাধীনতা এবং দিল্লী ও হোয়াইট হলের শাসন ও অন্যদিকে অচল অবস্থা দূর করার বর্তমান প্রস্তাব—ইহার মধ্যে কোনটি আমাদের কাম্য। কংগ্রেস ও লীগ যদি বর্তমান প্রস্তাব অথবা যে কোন একটি পরিকল্পনায় একমত হইতে পারে তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদ বা বৃটিশ টোরীর দল—কাহারও সাধ্য নাই ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রতিহত করে।

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজ লিথুয়ানিয়ার রাজধানী কভনো সহরের ১৪ মাইলের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—আমেরিকান টহলদারী সৈন্য প্রসিদ্ধ লেগহর্ণ বন্দর হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে রহিয়াছে।

আসামব্রহ্ম ফ্রণ্ট—বিষেনপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে শত্রু জাপানী ঘাঁটি নিংথাউখং মিত্রসেনা দখল করিয়াছে।

অচল অবস্থা ভাঙ্গিবার ইহাই সুযোগ

ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের বিবৃতি

'নিউজ ক্রনিকল'-এর সংবাদদাতার কাছে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া **সার হোমি মোদি, জি ডি বিরলা, সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জে সি শীতলবাদ প্রভৃতি** ভারতের কয়েকজন শিল্পনায়ক এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

'আমরা মনে করি যে, ইহার ফলে অবস্থার জটিলতা এতটা কাটিয়া গিয়াছে যে, এখন বড়লাটের উচিত তাঁহার নীতি পুনর্বিবেচনা করা। আপোষের সূত্র আবিষ্কারের এই সুযোগ নষ্ট না করার জন্য আমরা বড়লাটকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থার এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, আমরা ইহাও মনে করি যে, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের আর আটক রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা আশা করি তাঁহাদের যথাশীঘ্র মুক্তি দেওয়া হইবে।'

বাংলার বিপদ কি কাটিয়াছে?

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সেই চেষ্টা দ্বারা বাংলার দুর্ভিক্ষ রোধ করা যায় না। গত বছরের দুর্ভিক্ষ বাংলাকে যে ভাবে পঙ্গু করিয়াছে, তাহাতে তাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে, সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতা লইয়া সরকারকে কাজ করিতে হইবে। সে চেষ্টা কি হইতেছে? আমন ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা লওয়া হইতেছে কি? খাদ্য বণ্টনের জন্য খাদ্য কমিটীর সহিত সহযোগিতা করা হইতেছে কি? মূল চেষ্টা বাদ দিয়া শুধু আমলাদের উপর নির্ভর করিয়া কেসি সাহেব 'বিপদ কাটাইবার' স্বপ্ন দেখিতে পারেন, কিন্তু বিপদ সত্যই তাতে কাটিবে না।

বাংলার দুর্ভিক্ষ আজকে দেশ বিদেশের জনমতকে উদ্বেলিত করিয়াছে। আমেরি অনবরত প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইতেছেন। যতদিন ভারতে অচল অবস্থা জারী থাকিবে, ততদিন বাংলার ও ভারতের এই অবস্থা কাটিতে পারে না। ইহা সকলের কাছেই আজ বাস্তব সত্য হিসাবে দেখা দিয়াছে এবং তারই জন্য আমলাতন্ত্রের উপর চতুর্দ্দিক হইতে চাপ আসিতেছে। সেই জন্যই আজকে আমলাতন্ত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন—অবস্থা এমন কিছু জটিল নয়। কিন্তু জাগ্রত জনমতের কাছে আমলাতন্ত্রের এই চাতুর্য্য কতদিন টিকিবে?

কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেনের মৃত্যুতে

মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেনের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। গত ৯ই জুলাই আন্দুলে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে তিনি গিয়াছিলেন। সম্মেলনে বক্তৃতা দিবার সময় হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন এবং পরের দিন তিনি মারা যান। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে শুধু মেদিনীপুরেই নয়, সারা বাংলাতেই তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জেল হইতে বাহির হওয়ার পর মেদিনীপুরে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা একজন যোগ্য কর্ম্মী হারাইল।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

লীগের উপর আমলাতন্ত্রের চাপ

দলাদলিতে লীগই সুনাম হারাইতে বাধ্য হইতেছে

ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীত্ব লীগের প্রতিষ্ঠাই বাড়াইবে

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপার

অন্ত দেশভক্ত দলগুলিকে ক্ষমতার অংশ না দিয়া নিজেদের দলের হাতেই মন্ত্রীত্ব রাখিবার জিদে আইন পরিষদে লীগ পক্ষকে এমন অনেক কাজ করিতে হইতেছে যাহাতে তাঁহাদেরই দুর্ণাম রটিতেছে। অন্ততম মন্ত্রী মিঃ বরদা পাইনের সুবিধার জন্ম তাঁহারা বেপরোয়া হুকুম দিলেন যে হাওড়া মিউনিসিপালিটি খারিজ করা হইল। ইহার দ্বারা হাওড়ার হিন্দু মুসলমান সমস্ত জনসাধারণেরই নাগরিক অধিকার তাঁহারা কাড়িয়া লইলেন। তাঁহারা অজুহাত দিয়াছিলেন যে যুদ্ধের প্রয়োজনে হাওড়া মিউপ্যালিটির কাজকর্ম অব্যাহত রাখিবার জন্মই মিউনিসিপ্যালিটি তুলিয়া দেওয়া হইল। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হইলে গত ১৯শে জুলাই হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ রায় দিয়াছে যে, "মিঃ পাইনকে মামলা হইতে বাঁচাইবার আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্যেই (হাওড়া মিউনিসিপালিটি খারিজের) হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। শত্রু আক্রমণাশঙ্কা হইতে হাওড়া মিউনিসিপালিটির জরুরি কাজকর্ম চালু রাখার সঙ্গে ঐ হুকুমের কোন সম্বন্ধই ছিল না।" এখন শুধু হিন্দু জনসাধারণই নয়, মুসলমান জনসাধারণও বুঝিবে যে দলগত স্বার্থের খাতিরে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী এইরূপ অন্যায়েরও প্রশ্রয় দিয়া থাকে। ইহাতে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী তথা লীগেরই প্রতিষ্ঠা কমিয়া যাইবেনা কি?

তাঁহাদেরই মত দেশভক্ত অন্যান্য দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলী গড়িতে তাঁহারা এখনও রাজি নন, ফলে ঐ সব দলের বিরোধিতা হইতে নিজেদের মন্ত্রীত্ব টিকাইবার জন্ম তাঁহাদের ইয়োরোপীয়ান দল তথা চিরস্থায়ী আমলাতন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহারা যে ক্রমশই বেশী করিয়া আমলাতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতির খপ্পরে গিয়া পড়িতেছেন ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না।

সিভিলিয়ান নিয়োগ

সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটী অতি-বিখ্যাত অঙ্গ হইল সিভিলিয়ান কর্মচারী দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পরিচালনা করা। যুদ্ধের দিনে নূতন নূতন বিভাগ খোলা হইতেছে, বহু নূতন হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয় কর্মচারী বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব পাইতেছে—উহাতেই চিরস্থায়ী আমলাতন্ত্রের আতঙ্ক জাগিয়াছে যে তাহাদের "নীতি" বুঝি দুর্বল হইয়া যায়। তাই সেই তাহারা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে বাগে পাইয়াছে অমনি নূতন সিভিলিয়ান কর্মচারী নিয়োগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এমন কি বে-সামরিক সিভিলিয়ান এখন যথেষ্ট পাওয়া যায়না বলিয়া তাহারা হুকুম দিয়াছে যে সৈন্যদল হইতে লোক আনাইয়া এই সব পদে নিয়োগ করিতে হইবে। গত ১৯শে জুলাই কাউন্সিলে স্যর নাজিমুদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ ৬১ জন নূতন ও বাহিরের লোককে তাঁহারা নিয়োগ করিয়াছেন, আরও একশো জন সামরিক কর্মচারীকে শীঘ্রই নিয়োগ করা হইবে। অফিস পরিচালনায় বা বে সামরিক ব্যাপারে এই সব কর্মচারীদের এমন কি অদ্ভুত যোগ্যতা আছে যে ইহাদেরই নিয়োগ করিতে হইবে? তাও আবার ইহাদের মধ্যে অনেকেই (বোধ হয় অধিকাংশই) বাঙ্গালী বা ভারতবাসী নয়। ব্যবসায়, চাকুরী বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন লোক আছেন—তাঁহাদের না ডাকিয়া ইঁহাদের লইয়া আসার অর্থই হইল সাম্রাজ্যবাদী নীতির ইস্পাত কাঠামোকে আরও শক্ত করা! ভবিষ্যতে ইহাদেরই হাতে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনেক ঘা খাইতে হইবে। আমলাতন্ত্রের তথা ইয়োরোপীয়ানদের চাপেই যে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী এরূপভাবে বাঙ্গালী ও ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানদের যোগ্যতা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিবে। ইহাতে লীগের প্রতিষ্ঠা কমিয়া যাইবেনা কি?

হিন্দু ও মুসলমান মজুরদের মধ্যে রেশন বৃদ্ধি দাবীর জোর বাড়িতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ পুঁজিপতির দল অনেক দিন ধরিয়াই লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর চাপ দিয়া আসিতেছে যে এ আন্দোলন বন্ধ কর। অন্তত মুসলমান মজুরের মুখের দিকে চাহিয়াও লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলী এতদিন এ আব্দারকে প্রশ্রয় দেয় নাই। কিন্তু যে দিন পরিষদে ইয়োরোপীয়ান ভোটে মন্ত্রীমণ্ডলীকে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইল তাহার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পুলিশের হুকুম জারি হইল—রেশন বৃদ্ধির দাবী করা চলিবেনা। ইয়োরোপীয়ান সমর্থনের এই মূল্যই লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে দিতে হইল। অন্য মজুরের কথা ছাড়িয়া দিলাম, অন্তত মুসলমান মজুরের মনেও ইহাতে লীগের উপর বিতৃষ্ণা আসিবে না কি, লীগের প্রতিষ্ঠা কমিবেনা কি?

দিনের পর দিন এরূপ উদাহরণ বাড়িয়াই চলিবে। তাহাতে লীগের প্রতিপত্তিই খর্ব হইবে। তাহার চেয়ে, খানিকটা দলগত স্বার্থ বিসর্জন করিয়াও জন-কল্যানের বৃহত্তর স্বার্থে সমস্ত দেশভক্ত দলগুলিকে এক করিয়া ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা ভাল নয় কি?

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা] ২৬শে জুলাই, বুধবার, '৪৪, ১০ই শ্রাবণ '৫১ [দাম ছ' পয়সা

গান্ধীজী কি বলিয়াছেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিচক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া জাতির পক্ষে এক দারুণ অগ্রগতির সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মনে তাঁহার নির্দেশিত পন্থা সম্পর্কে বহু সংশয় ও দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে। গান্ধীজির এই যুগান্তকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যাঁহারা দাঁড়াইতেছেন তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য গান্ধীজি অসুস্থ শরীরেও প্রতিদিনই বিবৃতি দিতেছেন, নানারূপ প্রশ্নের জবাব দিতেছেন গত সপ্তাহে বিবৃতিগুলি তাহারই নিদর্শন।

নৈরাশ্য বর্জন কর

ভারতের ভিতরে দেশসেবীদের মধ্যে যে সমস্ত সন্দেহ উঠিতেছে তাহার নিরসনের জন্ম গান্ধীজি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। গত ১৯শে জুলাই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রস্তাবাবলী নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার অনুরোধ জানাইয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে পরাজয়ের মনোভাব কখনো স্থান পায় নাই। অনেক কংগ্রেসকর্মী যে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন এ কথা তিনি জানেন কিন্তু তাঁহাদের নৈরাশ্য ক্ষণস্থায়ী। আমাদের জয়লাভ অর্থাৎ ভারত যে স্বাধীন হইবে ইহা সুনিশ্চিত।" এই বিবৃতিতেই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"আমার অভিমত গৃহীত হইলে জগতে শান্তির সূচনা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং বিরুদ্ধ সমালোচনা, ধৈর্য্যহারা কংগ্রেস-সেবীদের ক্রোধ অথবা এমন কি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত হইলে কখনও শান্তি পাইতাম না।"

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার জবাব

ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের জন্ম গান্ধীজির প্রস্তাবের প্রতি বক্রোক্তি করিয়া বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্রে নানা ধরণের মন্তব্য করা হইতেছে। দুনিয়ায় এই সমস্ত স্বার্থান্ধ জঘন্য মনোভাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজি কয়েকটী প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। ২১শে জুলাই তিনি বলিয়াছেন,—"আমার প্রস্তাবে উহার (পৃথিবীতে সমস্ত গণতন্ত্রের জন্যই বৃটেন প্রভৃতি শক্তিগুলি যে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করিতেছে তাহার—জঃ সঃ) সত্যতার অগ্নি পরীক্ষা হইবে। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, বৃটেন যদি আন্তরিকভাবে উহা গ্রহণ করে তাহা হইলে যুদ্ধের গতি অবিলম্বে ঘুরিয়া যাইবে এবং আক্রমণকারী শক্তিসমূহের পরাজয় ঘটিবে ও পৃথিবীর শোষিত জাতিসমূহের হৃদয় আশায় পূর্ণ হইবে। আপনারা দেখিতেছেন যে, আমি কোন সামান্য বিষয়ের জন্ম সংগ্রাম করিতেছি না।" তাঁহার নিকট বিলাত হইতে প্রশ্ন আসে: "আপনার সহিত সাক্ষাতকারের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর লণ্ডনে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, আপনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের যোগদানের পক্ষপাতী; এই ধারণার সহিত আপনি একমত?" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন -"হাঁ"।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মণিপুরী নেতা ইরাবৎ সিং গ্রেপ্তার

১৯শে জুলাই এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছে যে শিলচর মহকুমার একটী গ্রামে মণিপুর রাজ্যের প্রজামণ্ডলের সভাপতি ও কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ইরাবৎ সিংকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মণিপুরীদের একচ্ছত্র নেতা ইরাবৎ সিং মণিপুর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত ছিলেন। জাপানী হামলার মুখে মণিপুরের চরম বিপদের সময়ও এই নেতাকে মণিপুরবাসীর মধ্যে আসিতে দেওয়া হয় নাই। তারই সুযোগ লইয়া জাপানীরা ইরাবৎ সিং-এর নামে ইস্তাহার ছাপাইয়া মণিপুরীদের ধোঁকা দেয় যে, ইরাবৎ সিং জাপানের পক্ষে। ইরাবৎ সিং শত্রুর এই ঘৃণ্য প্রচারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন, মণিপুরবাসীকে জাপানীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য ডাক দেন। মণিপুরে প্রবেশাধিকার না পাইয়াও শিলচরের মণিপুরীদের সংগঠিত করিবার কাজে তিনি ব্রতী হন।

এই জনপ্রিয় নেতাকে আজকে জেলের মধ্যে আটকাইয়া রাখার অর্থ মণিপুরবাসীদের মন হইতে জাপ-প্রতিরোধের উৎসাহ ও শক্তি কাড়িয়া লওয়া। আমলাতন্ত্রের এই মূর্খামীর আমরা প্রতিবাদ করি। ইরাবৎ সিং-এর মুক্তির জন্য আজ সমস্ত মণিপুর, সমস্ত আসাম ও সমস্ত দেশ সমস্বরে আওয়াজ তুলুক!

সম্পাদকীয়

লীগ-মন্ত্রীদের প্রতি

"আমরা ইহা বারবার পরিষ্কার বলিয়াছি; লর্ড ওয়েভল যে কাজ (অর্থাৎ যুদ্ধ জয়ের কাজ জঃ সঃ) করিতে চান তাহার জন্ম আমরা সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছি; আমরা শুধু ইহাই চাহিয়াছি যে সে হস্তকে বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তরূপে গ্রহণ করা হোক, গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বে আমাদিগকে প্রকৃতই অংশ দেওয়া হোক এবং যুদ্ধ জিতিবার পর তাহার ফলাফলেও আমাদিগকে প্রকৃত অংশ দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক। **কিন্তু ইহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।**" (করাচী লীগ অধিবেশনে জিন্না সাহেবের বক্তৃতা—ডিসেম্বর, ১৯৪৩)।

শাসন কর্তৃত্বে আলাদাভাবে অংশ লাভ করিবার জন্ম লীগ যতবার চেষ্টা করিয়াছে তাহার এই পরিনতিই ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বারই লীগের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদিগকেও এবং তাহাদের প্রতিনিধি লীগকেও দাসত্বের গ্লানি ও অক্ষমতা বহিয়া চলিতে হইয়াছে।

কংগ্রেসকে জেলে বন্ধ করিবার পর লীগের প্রতি আমলাতন্ত্রের ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। লীগের মূল রাজনীতিক ভিত্তিকেই তাহারা আক্রমণ করিয়াছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কাহিনী প্রচার করিয়াছে, বাংলার দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে, খিজির হায়াতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া পাঞ্জাবে লীগ-সংগঠনকেই ধূলিসাৎ করিয়া দিবার জন্ম আজও চেষ্টা চালাইতেছে।

এ সব কথা লীগ কর্মীরা জানেন। তাঁহারা অনেকেই বোঝেন যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতা তথা পাকিস্তান আদায় করিতে হইলে সকলের আগে কংগ্রেসকে পাকিস্তানে রাজি করানো দরকার এবং কংগ্রেস ও লীগ একতাবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিলে তবেই উহা পাওয়া যাইবে। রাজাজির প্রস্তাবের মধ্য দিয়া কংগ্রেসী মহল এদিকে অনেকখানি আগাইয়াছে তাহা তাঁহারা বোঝেন। সেজন্য রাজাজির প্রস্তাবে তাঁহারা অনেকেই সাড়া দিয়াছেন। কোনো কোনো রক্ষণশীল কংগ্রেস মহল হইতে রাজাজির প্রস্তাব উপলক্ষে জিন্না সাহেব ও লীগকে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা সত্বেও লীগ মহল মোটের উপরে উহাতে উত্তেজিত হন নাই, মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে তাহাই ভাবিতেছেন।

কিন্তু এই ভাবনা যদি বাস্তব কাজ ও মীমাংসা-আলোচনায় রূপ না পায় তো এই ভাবনার কোন মূল্য নাই। তাঁহাদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে কংগ্রেসের ভিতরে এবং দেশের হিন্দু জনসাধারণের ভিতরে (বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে) রাজাজির প্রস্তাব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লীগ মহল যদি নিজেদের কথায় ও কাজে সেই সন্দেহ দুর করিতে সাহায্য না করেন তাহা হইলে শুধু গান্ধীজির চেষ্টাতেও মীমাংসা হইয়া যাওয়া বড় সহজ নয়। বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কি ঘটিয়াছিল তাহা মনে করিলেই ইহা বোঝা যাইবে।

হিন্দু জনসাধারণের মনে সন্দেহ দুর হইয়া মীমাংসা তখনই সহজ হইবে যখন তাহারা দেখিবে যে, লীগ যেমন উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের মুসলমানদের আলাদা হইবার অধিকার চায় তেমনই সেই অঞ্চল ভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অধিকারও অক্ষুন্ন রাখিতে চায়। লীগ যদি মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলে শুধু মুসলিম গণভোটের দাবী তুলিয়া রাজাজির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে হিন্দুরা ভাবিবে যে আলাদা হইবার সিদ্ধান্ত মুসলমানেরা জোর করিয়াই আর সকলের উপর চাপাইতে চায়। ঠিক যে কারণে আজ মুসলমানেরা কংগ্রেসকে সন্দেহ করে ঠিক সেই কারণেই তখন এই সব অঞ্চলের হিন্দুরা লীগকে সন্দেহ করিবে। তাহাতে মীমাংসা তো হইবেই না এবং রেষারেষি বাড়িয়া যাইবে।

আবার লীগ যদি বলে যে, পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতেও শুধু মুসলিম গণভোটেই স্থির করিতে হইবে, যে তাহারা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যাইবে কিনা, তাহা হইলে লীগ যে আত্মনিয়ন্ত্রনের নীতির জন্ম লড়িতেছে সেই নীতি হইতেই তাহারা এই বিরাট হিন্দু জন-সংখ্যাকে বঞ্চিত করিবে। উহাতে লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির নৈতিক ভিত্তিই নষ্ট হইয়া যাইবে, মীমাংসা সুদুরপরাহত হইবে। বোধ হয় এই কথা বুঝিতে পারিয়াই ১৯৪২ সালে জিন্না সাহেব 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলিয়াছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য হইল যে সকল স্থানে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দু হইতে **অনেক বেশী** সেই সকল স্থানকে একটী বা কয়েকটী পৃথক শাসনাধীন প্রদেশে পরিণত করা।" (বড় হরফ আমাদের)

হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিশ্বাস তথা সন্দেহ-নিরসনের উপরই লীগ বলো, জনতা, পাকিস্তান সব কিছু নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে গান্ধীজি নিজের কোট ছাড়িয়া যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন। এখন লীগ যদি নিজের কোট একেবারে আঁকড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাতে কোট আঁকড়ানোই সার হইবে—যাহার জন্ম কোট, সেই পাকিস্তান ও ক্ষমতালাভের আশা একেবারে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। কারণ গান্ধীজি এতখানি অগ্রসর হওয়ার পরও যদি লীগ অগ্রসর না হয় তাহাতে কংগ্রেসপন্থী জনসাধারণের মনে এমন গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে যে গান্ধীজিও আর বহুকাল পর্যান্ত লীগের সহিত ঐক্যের কথা বলিতে সাহস করিবেন না।

রাজাজির সর্ত এখনই পুরাপুরি মানিয়া লও একথা লীগকে কেহই বলিতেছেনা। কি হিন্দু কি মুসলমান সমস্ত প্রগতিকামী জনসাধারণ লীগের কাছে আজ ইহাই আশা করে যে তুচ্ছ মর্য্যাদার খাতিরে, কিম্বা গান্ধীজি নিজে কেন লেখেন নাই এইরূপ সামান্য অজুহাতে কিম্বা লীগের দাবী পুরাপুরি মানা হয় নাই এইরূপ একতরফা জিদে লীগ বসিয়া থাকিবেন না। তাহারা আশা করে যে দেশের খাতিরে এবং পাকিস্তানেরই প্রকৃত ব্যগ্রতায় লীগ রাজাজির প্রস্তাবকে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিবে এবং সাহস করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইবে। এই আশা পূর্ণ করিতে পারার উপরই শুধু দেশের ভবিষ্যতই নয়, লীগের ভবিষ্যতও নির্ভর করিতেছে।

গান্ধীজীর সমর্থনে বিদেশের জনমত

বৃটেনে বিপুল আগ্রহ

ইণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণ মেনন এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—

"গান্ধীজীর প্রস্তাবে অচল অবস্থার সমাধানের পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি বৃঃ গভর্ণমেন্ট এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।"

ওয়েলসের মেয়েদের দাবী :—এক হাজারের উপর মেয়ে একটা গণ দরখাস্ত হাউস অফ কমন্সে পাঠাইয়াছে। এই দরখাস্তে দাবী করা হইয়াছে যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে আপোষ আলোচনা চালাক।

ডেলি হেরাল্ড

গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে 'ডেলি হেরাল্ড' বলিয়াছে : "এই প্রস্তাবের সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই অনেক সমালোচনা করিবে এবং আগামী বিতর্কের সময় আমরা সেই সব সমালোচনা শুনিব। কিন্তু সমালোচনা হইলেও গঠনমূলক সমালোচনা হওয়াই দরকার। গভর্ণমেন্ট যদি শুধু 'না' বলিয়াই ক্ষান্ত হয়, তা ভুল হইবে। গভর্ণমেন্টের উচিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নূতন করিয়া কথাবার্ত্তা বলার ব্যবস্থা করা।"

ডেলি হেরাল্ড আরো বলিয়াছে : গান্ধীজীর মুক্তিতে রাজনীতিক আবহাওয়া অনেক পরিমাণে ভাল হইয়াছে এবং লোকের মনে এই আশা জাগিয়াছে যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এবার নূতন কিছু করিবে যাতে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই। গভর্ণমেন্ট এই চিরাচরিত নীতি লইয়া বসিয়া আছে যে, 'ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করা ভারতবাসীরই কাজ' এবং যতদিন সে মীমাংসা না হইতেছে ততদিন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে শাসন চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নাই।'

আমেরির সম্বন্ধে ডেলি হেরাল্ড কঠোর মন্তব্য করিয়াছে : 'আমেরি যে সমস্ত ঘোষণা করিয়াছেন, তাতে শুধু প্ররোচনাই দেওয়া হইয়াছে।'

পার্লামেণ্ট সদস্যদের সমর্থন

অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গান্ধীজীর সাম্প্রতিক ঘোষণাকে পার্লামেণ্ট সদস্যরা খুব কার্য্যকরী বলিয়া মনে করিতেছেন।

মিঃ এভালিন ওরাকডেন বলেন : "বৃঃ গভর্ণমেন্টের পক্ষে অচল অবস্থা অবসানের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। প্রথম কাজ হিসাবে গভর্ণমেন্টের উচিত কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া।"

মিঃ ডেভিড গ্রেনফেল বলেন : "গান্ধীজীর প্ল্যান আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। এই প্ল্যান যাতে কার্য্যকরী হয়, তার জন্ত ইহাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা গভর্ণমেন্টের ন্যূনতম কর্ত্তব্য।"

মিঃ সোরেনসেন বলেন : "শুধু আত্মসম্মান লইয়াই বসিয়া থাকিতে যে মহাত্মাজী চান না, তার প্রমাণ মহাত্মাজী আর একবার দিলেন। তাঁর প্ল্যানে গভর্ণমেন্ট একটা সুবর্ণ সুযোগ পাইল, এই সুযোগ হারান গভর্ণমেন্টের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত নয়। **একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টই ভারতের দুরবস্থা ঘুচাইতে পারে।**"

মিঃ এ্যালেক্স গ্লোন বলেন : "গভর্ণমেন্টের উচিত প্ল্যানটা ভালভাবে বিবেচনা করা। বিলাতের বা দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই প্ল্যানকে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করে তবে তাহা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে চরম মূর্খতাই হইবে।"

'রেনল্ডস নিউজে' মিঃ ব্রেল্‌সফোর্ড লিখিয়াছেন : মিঃ গান্ধীর প্রস্তাবাবলী খুব সোজা এবং কাজের মত, মিঃ জিন্নার ইহাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।...আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, আমরা ভারতে জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে চাই এ কথা যদি আমেরি বা ওয়াভেল জানাইয়া দেন, তা হইলে মুসলিম লীগ ইহাতে আর বাধা দিবে না।"

নিউজ ক্রনিক্‌ল সংবাদদাতা মিঃ গেল্‌ডার

'গ্রেট বৃটেন এণ্ড দি ইষ্ট' নামক একটী পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, গান্ধীজীই নাকি ভারতে অচল অবস্থা অবসানের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই সমালোচনার কড়া জবাব হিসাবে মিঃ গেল্‌ডার 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে একটী চিঠি লেখেন। তাহাতে মিঃ গেল্‌ডার বলিয়াছেন যে, এই কথা আগাগোড়া মিথ্যা, **গান্ধীজী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে মীমাংসার আগ্রহ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।** এই কাগজ লিখিয়াছে যে, সংবাদদাতারা, বিশেষতঃ আমেরিকান সংবাদদাতারা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে চায় নাই। মিঃ গেল্‌ডার ইহার জবাবে বলিতেছেন : 'এই কথায় গান্ধীজীর উপর যতটা কটাক্ষ করা হইয়াছে, তার চেয়ে বেশী কটাক্ষ করা হইয়াছে বৃটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্র-সেবীদের উপর।'

ডেলী ওয়ার্কার

"গান্ধীজী গভর্ণমেন্টের সমস্ত আপত্তির নিরসন করিয়াছেন। এখনও যদি গান্ধী বড়লাট সাক্ষাৎকারের পক্ষে অন্তরায় থাকে অথবা অন্যান্য আটক কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত গান্ধীজীর আলাপ আলোচনার বিষয়ে বাধা রহিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, গভর্ণমেন্টের এই আপত্তিটা একটা ছুতা মাত্র, মীমাংসার জন্ত গভর্ণমেন্টের বিন্দু মাত্র আগ্রহ নাই।"

আমেরিকা

গান্ধীজির প্রস্তাবে আমেরিকার রাজনাতিক মহল অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

'ফরেন এফেয়ার্স কমিটীর' চেয়ারম্যান মিঃ ব্লুম বলেন : "ঠিক পথেই গান্ধীজী চলিয়াছেন।"

'টেরিটারিজ কমিটীর চেয়ারম্যান বলেন : গান্ধীজীর প্রস্তাবে ভারতকে অচল অবস্থা সমাধানের দিকে অনেক দূর আগাইয়া দিয়াছে।

রিপাবলিকান সিনেটার গেরাও নী :—"যে সমস্যাটা ভারতে সবচেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল, তার একটা সমাধানের পথ খোলা হইল, ইহা আনন্দের কথা।"

ডেমোক্রাটিক পার্টির সিনেটর ডেনিস শাভেজ :—"ভারতের সমস্যা ভারতকেই সমাধান করিতে হইবে। তারা সমাধানের যে কোন পথ বাহির করুক না কেন, তাহাতে আমার সমর্থন আছে।"

নিউ ইয়র্কের 'সান' পত্রিকা বলিয়াছে : "গান্ধীজীর ফর্ম্মুলাটা শুনিতে যত সহজ কাজে তত সহজ নয়। অনেক জায়গাতেই হিন্দু ও মুসলিম একত্রে আছে, তাতে কিছু অসুবিধা হইবে। কিন্তু যদি গান্ধীজীর ফর্ম্মুলা অনুযায়ী একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তা হইলে অন্যান্য ব্যাপার ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা আগাইয়া আসুন !

বড়বাজারের কংগ্রেসসেবীদের সভা

গত ২৩শে জুলাই কলিকাতার হিন্দী নাট্য পরিষদ গৃহে বড়বাজারের বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের এক সভায় বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়। এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া ও শ্রীযুক্ত বসন্ত লাল মুরারকা—ইঁহারা দুইজনই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্য। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত মিশ্র, মদনলাল মিশ্র, এস, অগ্নিহোত্রী—ইঁহারা বড়বাজার জেলা কমিটীর সভ্য। অন্যান্য কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়ও ছিলেন।

এই সভায় গান্ধীজীর সাম্প্রতিক বিবৃতি ও রাজাজীর ফর্ম্মুলা আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়। এই সভায় ইহাও ঠিক হয় যে গান্ধীজীর সমর্থনে জনমত সংগঠিত করার জন্ত প্রচার আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কংগ্রেসসেবীদের লইয়া যুক্ত আলোচনা করার কথাও উঠে। কলিকাতায় প্রচারের জন্ত এই সভা শীঘ্রই একটী জনসভা অহ্বানের সিদ্ধান্ত লইয়াছে।

হাওড়ায় জনসভা

২৩শে জুলাই শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে কংগ্রেস নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর সভাপতিত্বে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া এক সভা হয়। সেই সভায় জাতীয় সরকার গঠনের প্রথম সর্ত্ত হিসাবে অবিলম্বে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিবার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীহট্টে জনসভা

২০শে জুলাই এক জনসভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর প্রস্তাবানুযায়ী মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে যাহাতে সাক্ষাৎ হয় এজন্য আন্দোলন চালাইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রংপুরের কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান

গান্ধীজীর সমর্থনে রংপুরের কংগ্রেস নেতা **শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মহীউদ্দিন খাঁ, জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মনিকৃষ্ণ সেন ও শঙ্করনাথ রায়ের** স্বাক্ষরে একটী ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :

মহাত্মাজী সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা প্রচার ব্যর্থ করে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতিকে ভেঙ্গে ফেলবার, অচল অবস্থা দূর করবার জয় নিশান জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ শঙ্কিত হয়েছে। হিন্দুমহাসভাও গান্ধীজীর বিরোধীতা করতে নেমেছে। কিন্তু বাংলা কখনো বিপথে পরিচালিত হইয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

গান্ধীজীর কাছে তার

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গান্ধীজীর কাছে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—

মহাত্মা গান্ধী, পাঁচগণি

আপনার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জানাইতেছি। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে আমাদের পরিচালনা করুন। রংপুর, ১৯, ৭, ৪৪

কিরণশঙ্করের কাছে দাবী

রংপুর হইতে জিতেন বাবু শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন :—

রংপুর, ১৯-৭-৪৪

প্রিয় কিরণবাবু,

আজকের কাগজে প্রকাশ যে আপনি পাঁচগণিতে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন। মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিবার আগে আপনার উচিত এই প্রদেশের কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মীর সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা।

স্বাঃ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গান্ধীজী কি বলিয়াছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেশসেবীদের কর্তব্য

পূর্ব্বের এক বিবৃতিতে গান্ধীজি বলিয়াছেন,—"কংগ্রেসের নামে কেহ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারেন না এবং সে আন্দোলন কোনদিন আরম্ভ করাও হয় নাই। এমন কি আমিও ব্যক্তিগতভাবে বর্তমানে উহা আরম্ভ করিতে পারি না।" "তবে আমার পন্থার অনুমোদন দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, কংগ্রেসের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত থাকিবে।" সিন্ধুর স্বরাষ্ট্র সচিবের উক্তির (গান্ধীজির মুক্তির পর ধংসাত্মক আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে—জঃ সঃ) প্রতিবাদে মহাত্মাজী ২৩শে জুলাই বলিয়াছেন,—"আমি বরাবরই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আমি ধ্বংসাত্মক বা অনুরূপ কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।" "যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, আইন অমান্যই হইতেছে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন (যাহা আমি স্বীকার করি না) তাহা হইলেও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি তাহা করিতে পারে না।"

"কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে যে সকল কাজকর্মে বাধা ছিল না—যথা, মাসিক পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, জনসভা ও অনুরূপ কাজ কর্ম—তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই কর্ত্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।"

কংগ্রেস-লীগ আপোষ চাই

গত ২২শে জুলাই গান্ধীজির সমবেত প্রার্থনার শেষে একটী উগ্র হিন্দু প্রতিষ্ঠানের দশ জন যুবক বেটনের সহিত কৃষ্ণ পতাকা বাঁধিয়া কংগ্রেস-বিরোধী ধ্বনি করিতে থাকে। একজন যুবক গান্ধীজিকে প্রশ্ন করে—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে সকল বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ও তাঁহার নাম জড়িত আছে তাহা সত্য কিনা এবং তাহা তিনি সমর্থন করিয়াছে কিনা। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেন—"হ্যাঁ, উহা সত্য ও উহাতে আমার সমর্থন আছে।" বিলাত হইতে তাঁহার নিকট প্রশ্ন আসিয়াছে,—"মিঃ জিন্নার সহিত আপনার শেষ পত্রালাপ সম্পর্কে এখানে এইরূপ অর্থ করা হইতেছে যে, উহা দ্বারা আপনি পাকিস্থান মানিয়া লইয়াছেন। ইহা কি ঠিক?" উত্তরে গান্ধীজি বলিয়াছেন,—"মিঃ রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার পন্থা সূচিত হইতেছে। ইহাকে পাকিস্থানই বলা হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

১৬ই জুলাই রাজাজী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"মিঃ জিন্নার সহিত আপোষের প্রস্তাবের পিছনে গান্ধীজির সমর্থন আছে কি না এবং ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া করা হইয়াছে কিনা এ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। এই সমস্ত মনোভাব অত্যন্ত ঘৃণার্হ।" "মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি তোলার অর্থ হিন্দু মুসলমানের ভিতর পরস্পর অবিশ্বাসের মনোভাব জীয়াইয়া রাখা, এবং ভারতের উপর বৃটীশের প্রভুত্ব বাঁচাইয়া রাখা।" "লীগ ও কংগ্রেস যদি এই প্রস্তাবে বা অনুরূপ কিছু সমর্থন করে তাহা হইলে বৃটীশ রক্ষণশীল এমন কি সাম্রাজ্যবাদ ভারতের স্বাধীনতার দাবী অর্জনে বাধা দিতে পারিবে না।" "এই সমস্ত বিরোধিতা হিন্দু মহাসভার নেতাদের নিকট হইতে আসিতেছে এবং ইহা মোটেই নতুন কিছু নয়।"

গান্ধীজীর মুক্তিতে চীনের কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র

গান্ধীজীর মুক্তিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্র "সিনহুয়ার বাও" নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—ভারত তাহার স্বাধীনতার জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রামে দুনিয়ার সর্ব্বত্র জনগণ তাহাদের সমর্থন জানাইয়াছে। চীনের জনগণ বিশেষ করিয়া সহানুভূতি জানাইয়াছে কারণ চীনের জনগণ ভারতের জনগণকে ভাই বলিয়া মনে করে। ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্তি সংগ্রামে চীন আজ অত্যন্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা হইল এই যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী জিনিষ জনগণের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য। ভারতের জনগণের সংগ্রামের অতীত অভিজ্ঞতা এই একই কথা বলে। বর্ত্তমানে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলে অপর পক্ষ সহজেই বলিতে সুযোগ পায় যে ঐক্যের অভাবে ভারত নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদিও এই যুক্তি ছলনা মাত্র তথাপি একথা সত্য যে ভারতে ঐক্য নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসের ঘোষণায় একথা পরিস্কার বলা আছে যে কংগ্রেস ভারতের সমগ্র জনসাধারণের স্বাধীনতা চায়। কাজেই স্বাধীন ভারতে মুসলীম জনসাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন মঞ্জুর করা হইবে না তাহার কারণ আমরা বুঝি না। অনৈক্য যদি বজায় থাকে তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যত অন্ধকার হইবে। গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব অবিলম্বে দেখা করিয়া কংগ্রেস ও লীগের বিরোধ মিটাইয়া লউন—ইহার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেছি।

গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাবে
জনমত কোন দিকে
বিভিন্ন সংবাদপত্রের মন্তব্য
কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য সকলেই ব্যগ্র

হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌

দিল্লীর জাতীয়তাবাদী দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমস রাজাজীর প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছে :" আমরা নিশ্চিত জানি যে রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থনে দেশের সমস্ত মুসলমান সাড়া দিবে এবং বর্ত্তমানের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসানের উপায় উদ্ভাবন করিবে। কেননা, এই দ্বন্দ্বের ফলে তৃতীয় পক্ষই শক্তিশালী হইয়া ভারতকে গোলাম করিয়া রাখিবার সুবিধা পাইতেছে।" (১২ই জুলাই)

নিউজ ক্রনিক্‌লের প্রতিনিধির কাছে গান্ধীজীর বিবৃতি প্রকাশ হইবার পর হিন্দুস্থান টাইমস্‌ লিখিতেছেঃ

"এই বিবৃতির সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম একতার ফর্ম্মুলাটী যুক্ত করিয়া এমন একটী প্ল্যান তৈরী হইল, যাহা দ্বারা সত্যই অচল অবস্থার সমাধান হইতে পারে।

…… …… …… গান্ধীজীর এই সমস্ত প্রস্তাবের পিছনে শক্তি জোগাইবার দায়িত্ব জনসাধারণের। জনসাধারণের উচিত পূর্ণ উৎসাহে গান্ধীজীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ান।" (১৪ই জুলাই)

যুগান্তর

রাজাজার প্রস্তাবকে মিঃ জিন্না যে মানিয়া লন নাই, ইহাতে 'যুগান্তর' বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু রাজাজীর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 'যুগান্তর' দৃঢ় সমর্থন জানাইয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে 'যুগান্তর' লিখিয়াছে :—

"যে বৈপ্লবিক শক্তি জনসাধারণের মধ্যে লুক্কায়িত, সেই শক্তির বোধন করিতে হইলে জনসাধারণের অধিকার রক্ষার মূল নীতি স্বীকার করিতে হইবে। **বিশেষভাবে মুসলিম জনগণের সংশয় ও আশঙ্কা দূর করিয়া তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে হইবে।** এজন্য যদি বৃহৎ হিন্দু সমাজের কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। কেন না, সীমাবদ্ধ ত্যাগের দ্বারা অপরিমিত রাষ্ট্রীয় শক্তি সমগ্র ভারতবাসীর হাতে আসিবে।" (১২ই জুলাই)

যারা কংগ্রেস ও লীগের মীমাংসার এই চেষ্টার বিরোধিতা করিতেছে, তাদের উদ্দেশ করিয়া 'যুগান্তর' বলিয়াছে :

"দেশের এই দুর্দ্দিনে অচল অবস্থার ভয়াবহ পাষাণ চাপের মুখে 'আনন্দবাজার' কংগ্রেস ও লীগের মিলনের বিরোধীতা করিয়া পরোক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।"……

"মুসলমানের দারিদ্র্য ও পরাধীনতার সঙ্গে হিন্দুর অন্নাভাব ও বন্ধন দশার কোনই তফাৎ নাই। এই দুর্গতি হইতে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া মুক্তি নাই। **গান্ধীজী ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, মিঃ জিন্নার নিকট প্রেরিত সর্ত্ত উহারই প্রমাণ। ইহা তোষণ-নীতি নহে, ইহা** বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের **শোষণনীতি হইতে অসহায় ভারতবর্ষের ত্রানলাভের আন্তরিক চেষ্টা।**" (১২ই জুলাই)

অমৃতবাজার পত্রিকা

অমৃতবাজার পত্রিকাও গান্ধী-রাজাজীর সমালোচকদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে :—

"গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হইতেছে তা অর্থহীন এবং তার কোন ভিত্তিই নাই।" (১৬ই জুলাই)

"সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলার ফলে রাজাগোপালাচারীর ফর্ম্মুলার মধ্যে আসল জিনিষ যেটা সেটাই আজকে লোকের নজরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। **ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব এই ফর্ম্মুলার মধ্যে আছে, ইহাই সবচেয়ে বড় কাজের জিনিষ। সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রকে যদি অচল করিতে হয় তবে কংগ্রেস-লীগের এই যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করিবার দায়িত্ব সমস্ত প্রগতিশীল দলকেই লইতে হইবে।**" (১৮ই জুলাই)

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস এই মত প্রকাশ করিয়াছে যে কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য রাজাজী যে ফর্ম্মুলা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হিন্দু

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ দৈনিক 'হিন্দু' রাজাজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন মন্তব্য করে নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবে যে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এই প্রস্তাবের পরে জিন্না সাহেবের চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কোন অর্থ হয় না, এ কথা এই সংবাদপত্র স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে।

ফ্রী প্রেস

রাজাজীর প্রস্তাবে জিন্না সাহেব সমর্থন জানান নাই, ইহাতে ফ্রী-প্রেস বিক্ষুব্ধভাবে মন্তব্য করিতেছে : মিঃ জিন্না রাজাজীর প্রস্তাবকে ওয়ার্কিং কমিটীতে উত্থাপন করিতে চাহিয়াছেন সুতরাং প্রস্তাবটী জিন্না প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচার করিলে তা বলা যায় না। কিন্তু জিন্না নিজে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাইতে আপত্তি করিয়াছেন, ইহাতে মনে হয় যে প্রস্তাব গৃহীত হইবার কোন আশা নাই।

তেজ বাহাদুর সাপ্রু

তেজ বাহাদুর সাপ্রু গান্ধী রাজাজীর প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : "যুক্তিসঙ্গত সর্ত্তে একটী মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টাকে ভারতের অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম যে অভিনন্দিত করিবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" সাপ্রু রাজাজীর প্রস্তাবের সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাতে মীমাংসার প্রচেষ্টা আগাইয়া যায় তার জন্য আরো কতগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : (১) ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের মুক্তি দেওয়া অথবা অন্ততপক্ষে তাঁহাদের সহিত গান্ধীজীর দেখা করিতে দেওয়া অবিলম্বে উচিত। (২) গান্ধীজীকে বড়লাটের সহিত দেখা করিতে দেওয়া উচিত। (৩) গান্ধীজীর উচিত জিন্নার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করা। ইহা ছাড়া যাহাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যা লঘিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়ই মীমাংসার দিকে কার্য্যকরী ভাবে আগাইয়া যায়, তার জন্য গান্ধীজীর কি করা উচিত তাও সাপ্রু বলিয়াছেন। শেষকালে সাপ্রু বলিয়াছেন : ভারত গভর্ণমেণ্ট সাধিয়া আসিয়া আমাদের দাবী পূরণ করিবে এরূপ মনে করা ভুল; আমাদের কাজ আমাদেরই করিতে হইবে।

মুসলিম লীগ নেতা লারি

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভ্য মিঃ লারি কাউন্সিলের সভায় উত্থাপনের জন্য একটী প্রস্তাব দিয়াছেন। সেই প্রস্তাবে তিনি বলিয়াছেন যে, **কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার দিক দিয়া রাজাজীর প্রস্তাব আশার আলো জ্বালাইয়াছে।** মিঃ লারী রাজাজীর প্রস্তাবের সম্পর্কে কতগুলি সর্ত্ত দিয়া বিষয়টী কাউন্সিলকে বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন।

কাউন্সিলের আর একজন সদস্য মিঃ ফারুক এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

আপত্তি কাহাদের!
বড়লাটের শাসনপরিষদের সভ্য ডাঃ খারে

গান্ধী রাজাজীর প্রস্তাবে ডাঃ খারে রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ দেশবাসী ইহার বিরোধিতা করিবে, কেননা ইহা দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর। বড়লাটের মুক্তির দোহাই দিয়া তিনি বলিতেছেন, বড়লাটও ভারতের অখণ্ডতার উপর জোর দিয়াছেন। ডাঃ খারে শেষ কালে বলিতেছেন : কংগ্রেসপন্থী খবরের কাগজগুলি গান্ধীজীর পক্ষে প্রচার চালাইয়াছে। একটী পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন চলিতেছে ভারতীয় 'কুইসলিং' (দেশদ্রোহী) লইয়া। যদি বর্ত্তমান একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যরা কুইসলিং হয়, **তবে গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে তাহাতেও সেই রকম কুইসলিংই থাকিবে।**

গদিচ্যুত হইবার ভয়েই বোধ হয় ডাঃ খারের এই উষ্মা!

হিন্দুমহাসভার সভাপতি সাভারকর

"অবশেষে গান্ধীজী পরিকল্পিত ও রাজাজী প্রচারিত আমাদের ভারতীয় জাতি হইতে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হইবার ও উহাদের খুসীমত স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যাধিকার সত্য সত্যই স্বীকৃত হইল।…

আজ প্রত্যেক হিন্দু-সংগঠনীর এবং প্রকৃত জাতীয়তাভাবাপন্ন ভারতীয়ের কর্ত্তব্য দুর্জ্জয় সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তায় এই প্রস্তাবের নিন্দা করা। ………… এই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত প্রাদেশিক হিন্দুসভাকে উহাদের অধীন জেলা ও স্থানীয় হিন্দু সভাগুলিকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, উহারা যেন ১৯৪৪'এর আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ "অখণ্ড হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান বিরোধী সপ্তাহ" রূপে উদ্‌যাপন করে।"

(২০শে জুলাই, এ-পি)

বাংলার হিন্দু মহাসভা

গত ১৬ই জুলাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কাউন্সিলের সভায় রাজাজীর প্রস্তাবের বিরোধিতার জন্য সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সভা ঠিক করিয়াছে যে সমস্ত দলের হিন্দুদের লইয়া একটী সম্মেলন করা হইবে।

দৈনিক বসুমতী

হিন্দু মহাসভাপন্থী দৈনিক বসুমতী খোলাখুলি ভাবে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করিয়াছে। ১৫ই জুলাইয়ের বসুমতীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হইয়াছে :—

"তিনি (গান্ধীজী) যদি কংগ্রেসের অনুমোদনের অপেক্ষাও না রাখিয়া মিষ্টার রাজাগোপালাচারীর মারফতে মিঃ জিন্নাকে মীমাংসার সর্ত্ত প্রদান করেন তবে তাঁহার কাজও যে গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী হইবে, তা বলিতেই হইবে। হয়ত তিনি আর দেশের কামনার সহিত আপনার মনোভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।……

…তিনি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, তাঁহার কার্য্যেও তিনি ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধনের অধিকার পাইতে পারেন না।"

লীগ-পন্থী সংবাদপত্রের সাড়া

দৈনিক আজাদ

১৮ই জুলাইয়ের আজাদে রাজাজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"ভারতীয় সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া ইহাকে একটী পরম আনন্দ সংবাদ বলিয়া অভিহিত করিলে মোটেই ভুল করা হয় না। কারণ যে লীগ-কংগ্রেসের আপোষের ব্যাপারে এক ভিত্তিভূমির কোনো খোঁজ ছিল না—মনে হইয়াছিল এই ভিত্তিভূমি বুঝি আর পাওয়া যাইবে না—তাহাই এতদিনে পাওয়া গিয়াছে।…

তবু আমরা নিরাশ হই নাই। পাকিস্থানের ভিত্তি মানিয়া লইয়াছেন, রাজাজীর পত্রের এই কথাটি সত্যই একটা বিরাট আশার সংবাদ বহিয়া আনিয়াছে। **আমাদের বিশ্বাস, খুঁটি-নাটি মতভেদ ও বিতর্কের অবসান নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। তখন সমস্যার সমাধান হইতে দেরী হইবে না।**"

১৯শে জুলাই-এর আজাদে বলা হইয়াছে :—

"আমরা একথা বলিতেছি না যে, লীগ-কংগ্রেস মীমাংসার সমস্ত বাধা বিঘ্ন ইতিমধ্যেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি, বাধা-বিঘ্ন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে।……আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু একটু করিয়া মুক্তি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই শুভলক্ষণকে আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি।"

মিঃ জিন্নার দৈনিক ডন

মিঃ জিন্নাও পরোক্ষভাবে বলিতেছেন যে, রাজাজীর প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া যে ধারণা সাধারণ লোক করিয়াছে, তাহা সত্য নয়। জিন্নার দৈনিক 'ডন' ১০ই জুলাই লিখিয়াছে :—গান্ধীজীর নামে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তা মিঃ জিন্না প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—এই মর্ম্মে যে ধারণা করা হইতেছে, তাতে বিন্দুমাত্র সত্য নাই। আপোষের দরজা মিঃ জিন্না বন্ধ তো করেনই নাই, বরং তিনি এই প্রস্তাব মুসলিম-লীগ ওয়ার্কিং কমিটীতে পেশ করিবার দায়িত্ব লইতে চাহিয়াছেন। বিষয়টীর গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে মিঃ জিন্নার এই দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য গান্ধীজীও দাবী করিয়াছেন যে তাঁর সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের আলোচনা করিতে দেওয়া হউক।…মিঃ জিন্নাও মনে করেন যে গান্ধীজীর কাছ হইতে যে প্রস্তাব আসিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটীর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার আগে তিনি কোন চরম সিদ্ধান্ত জানাইতে পারেন না।

লাহোরের লীগপন্থী সংবাদপত্র

লাহোরের 'জমিদার' ও 'এহ্‌শান'—লীগপন্থী এই দুইটী সংবাদপত্র রাজাজীর প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এই পত্রিকা দুইটীতে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, মুসলীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় এই প্রস্তাবের যথোচিত আলোচনা হওয়া উচিত। 'জমিদার' বলিয়াছে যে, 'গণভোট' সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। 'এহ্‌শান' বলিয়াছে যে, **কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সমর্থন লইয়া গান্ধীজীর উচিত জিন্নার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্ত্তা চালান এবং জিন্নারও উচিত আগাইয়া গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সহযোগিতা করা।**

জন-সভায় গান্ধীজীকে সমর্থন

ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থন

১৮ই জুলাই কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটী সভায় গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন জানান হয়। ২০০০ ছাত্র এই সভায় উপস্থিত ছিল, তার মাত্র ১৭ জন বিপক্ষে ভোট দিয়াছিল। এই সভাতেই বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজী রাজাজী সমর্থিত ঐক্য প্রচেষ্টাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানান হয়। ছাত্র-ফেডারেশন সমস্ত জেলা কমিটীকে গান্ধীজীর সমর্থনে সভা ডাকিতে ও রাজাজীর ফর্ম্মুলার সমর্থনে আলোচনা চালাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছে।

কলিকাতা ও বর্দ্ধমানে

১৯শে জুলাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও ৩ হাজার লোকের এক সভায় গান্ধীজীকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৭ই জুলাই বর্দ্ধমান টাউন হলে জেলা কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির উদ্যোগে এবং বহু লীগ-কর্ম্মীর উপস্থিতিতে এক জনসভায় গান্ধীজি-রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন জানাইয়া মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

মহিলা আঃ সমিতির সমর্থন

২০শে জুলাই শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তার সভানেত্রীত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক কমিটীর একটী সভায় এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও অচল অবস্থার সমাধানের জন্য মহাত্মাজী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাকে নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সমর্থন ও অভিনন্দন জানাইতেছে। আত্মরক্ষা সমিতি বাংলার নারী সমাজকে এই আহ্বান জানাইতেছে যে, যাহাতে অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তজ্জন্য গান্ধীজীর পথে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করুন।

দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত দেশবন্ধুর বিক্রমপুর

১৯৪৪ সালের সমস্যায় নূতনত্ব

ফণি গুহ

বিক্রমপুরে অন্নাভাব

অল্প কয়েকদিন পূর্বে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় লৌহজঙ্গ ও শ্রীনগর থানার কয়েকটী অঞ্চলে যাই।

লীগ, কংগ্রেস, কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতির কর্ম্মীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, এ অঞ্চলের শতকরা ৪০ জন লোক অর্দ্ধাহারে আছে। কোন কোন গ্রামে (যেমন কাজির পাগলা, কুকুটিয়া) শতকরা ৬০ জনও হইবে। এক বেলা ভাত ও এক বেলা মিষ্টি আলু এবং কেউ বা একদিন পর একদিন ভাত খাইয়া আছে। গত এক মাসে মিষ্টি আলুর দর ।৶০ মণ হইতে ১৷৶০ মণ হইয়াছে। শতকরা দশ জন একদম নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা বাড়ী, বাজার ও বন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুধের অভাবে শিশুরা মরিতে সুরু করিয়াছে। কুমার ভোগ ইউনিয়নের মৌছা গ্রামে গত ১৫ দিনে ৪ জন শিশু (১ বৎসরের নিম্নে) মিষ্টি আলু খাইয়া মারা গিয়াছে। ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স ইউনিট্ হইতে পরিচালিত মাওয়া ও কুমারভোগের শিশুসদন দু'টিতে গত এক মাসে ৬০ জনের স্থানে ১০০ জন শিশু হইয়াছে। কুমার ভোগের শিশুসদনে দেখিলাম মৌছা গ্রামের খাতুনা বিবি তাহার ৩ বৎসরের শিশুকে খিচুড়ি না দিয়া নিজেই খাইতে সুরু করিয়াছে। একজন মহিলা সমিতির কর্ম্মী আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করাতে খাতুনাবিবি লজ্জায় জড় সড় হইয়া বলিলেন "বাবু, তিন দিন যাবৎ না খাইয়া আছি।" মুহূর্ত্তের মধ্যে গত বারের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি সামনে ভাসিতে লাগিল। ভাবিলাম—আবার সেই দুর্ভিক্ষ।

বিক্রমপুরের দুঃস্থরা কলিকাতায়

গ্রাম ছাড়িয়া সকলে যাইতে সুরু করিয়াছে। গত জুন মাসে মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়ন হইতে প্রায় ১৫০০ লোক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে মহিলাই বেশী। জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড জিতেন ঘোষ বলিলেন—**কলিকাতা হইতে ইতিমধ্যে এই মহকুমার ৩০ জন দুঃস্থকে গ্রেপ্তার করিয়া এই মহকুমাতেই চালান দিয়াছে।** রিলিফ কর্ম্মী কমরেড সুশীল চক্রবর্ত্তী বলিলেন—মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়ন হইতে ৩০ জন মহিলা ক্ষুধার জ্বালায় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য কলিকাতা যাইতেছিল; কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা ইহাদিগকে এই পথ হইতে বিরত করিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য কাজ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

১৯৪৩ সালের সাথে এবারকার সমস্যার পার্থক্য

বর্তমানে চাউলের দাম ১৭৲ হইতে ১৮৷৷০ টাকা মণ। কিন্তু শতকরা ৫০ জন লোক এই দামে চাউল কিনিতে পারে না। **কাজিরপাগলা ফুড কমিটির আহম্মদ খাঁ বলিলেন "গত বৎসর ৮০৲ মণ দরে চাউল বিক্রী হওয়াতে যে অবস্থা হইয়াছিল এবার ১৭৲—১৮৷৷০ টাকাতেই সে অবস্থা দাঁড়াইবে।"** কারণ, লোকে গতবার ঘরের সকল পুঁজি বিক্রি করিয়াছে। তাছাড়া এবার লবণ, তৈল, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। গত বারে চাউলের দাম এই সময় বর্তমান বছর অপেক্ষা দেড় গুণ বেশী ছিল; কিন্তু জ্বালানি কাঠ, লবণ, তৈল, তামাক ইত্যাদি অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র এবার গত বছরের তুলনায় ৪ গুণ হইতে ১৬ গুণ দামে বিক্রী হইতেছে।

	১৯৪৩ (জুন-জুলাই)	১৯৪৪ (জুন-জুলাই)
চাউল	২৫৲ — ৩৫৲ মণ	১৬৲ — ১৮৷৷০ মণ।
লবণ	৶০ সের	২৲ — ২৷৷০ সের।
সরিষার তৈল	৷৷৶০ — ৸০ সের	১৷৷৶০ সের।
জ্বালানি কাঠ	১।০ — ১৷৷০ মণ	২৲ — ৩৲ মণ।
তামাক	৸০ — ৸৶০ সের	২৷৷০ — ৪৲ সের।
গুড়	।৶০ — ।৶০ সের	৷৷৶০ — ৸০ সের।

সরকার হইতে জুন মাসে মাওয়া খাদ্য কমিটিকে ৭৮ মণ লবণ দিয়াছিল; কিন্তু জুলাই মাসে দিয়াছে মাত্র ৮ মণ। এ ভাবেই খাদ্য কমিটির কোটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে চোরাবাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। গোয়ারিমান্দ্রা গ্রামের ঋষি পাড়াতে গত ১৫ দিন যাবৎ লবণ না পাওয়াতে সোডা দিয়া কাজ চালাইতেছে।

খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাবে মহামারী ছড়াইতেছে

তাহার উপর আবার মহামারী। এই অঞ্চলের শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত। কোন কোন গ্রামে (যেমন জশিলদা, সুরদিয়া প্রভৃতি) শতকরা ৬০ জনও হইবে। কেন ও মিষ্টি আলু খাওয়াতে শোথ রোগ পুনরায় শুরু হইয়াছে। ফলে, যদিবা কোথাও কাজ মিলে শারীরিক শক্তির অভাবে অধিকাংশ লোকই কাজ করিতে পারে না। তাছাড়া বর্ষার সাথে সাথে কৃষি কাজও কমিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য বৎসর এসময় অনেকে নৌকা চালাইয়া উপার্জ্জন করিত। কিন্তু গত সঙ্কটের ফলে অনেকে নৌকা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। মাওয়া গ্রামে গত বৎসর ৩০ খানা নৌকা চালাইয়া কয়েকটি পরিবার তাহাদের সংসার চালাইত, কিন্তু এবার সেখানে আছে মাত্র ৫ খানা নৌকা। প্রতি গ্রামের অবস্থাই এইরূপ। এমনি করিয়াই দুর্ভিক্ষ সারা মহকুমাকে গ্রাস করিতে সুরু করিয়াছে।

বিদ্যালয়গুলির অবস্থা

গত সঙ্কটের ফলে ৪টি বিদ্যালয় সারা মহকুমাতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যেগুলি আছে সেগুলির অবস্থাও শোচনীয়। শ্রীনগর থানার কুকুটিয়া বিদ্যালয়টির অবস্থা:—

	তিন বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা	গত বৎসর	বর্তমানে
ছাত্র সংখ্যা	৩০০	১৫০	৭৫
শিক্ষক সংখ্যা	৮ (গ্রাজুয়েট)	৪ (গ্রাজুয়েট)	×

আবার এই ৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০ জন ফ্রি ও হাফ্ ফ্রিতে পড়ে, শিক্ষকরা গড়ে ১৫৲ করিয়া বেতন পান। সরকারী তহবিল হইতে মাত্র ১০০৲ মাসে দেওয়া হয়। প্রায় সবগুলি বিদ্যালয়ের অবস্থাই এইরূপ। উপযুক্ত অর্থের অভাবে স্যার জগদীশের বিক্রমপুর আজ অন্ধকারের গহ্বরে চলিয়াছে। অথচ আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়া বিভিন্ন দল আত্মকলহে ব্যস্ত।

মজুতদারের সুযোগ

স্থানীয় মহকুমা হাকিম কারসাজি করিয়া খাদ্য কমিটিগুলি সরকারী কর্ম্মচারী ও তাহার তাঁবেদার লোকদের নিয়া পরিচালিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। মহকুমা হাকিম প্রতিটি খাদ্য কমিটিকে সার্কুলার দিয়াছিল—১লা জুলাই হইতে পুরা রেশনিং চালু করিবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহা হয় নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ সরকারের নিকট বর্ত্তমানে যে 'ষ্টক' আছে তাহা দ্বারা মহকুমাবাসীর এক মাসের বেশী চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ গত ১৩ই জুলাই মুন্সীগঞ্জ অনুষ্ঠিত মহকুমা খাদ্য ও রিলিফ কর্মী সম্মেলন হইতে জানা যায় মহকুমা খাদ্য কমিটির সাথে পরামর্শ না করিয়া নিজ পুসীমত সরবরাহ বিভাগের মারফৎ চাউল বিলি হইতেছে। ফলে বহু চাউল চোরাবাজার চলিয়া যাইতেছে। এক মাস পূর্ব্বে ব্যবসাদারদের মারফৎ প্রায় ১ লক্ষ মণ চাউল বাজারে ছাড়ে। তাহা হইতে মজুতদাররা হাজার হাজার মণ চাউল চট্টগ্রাম, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে চালান দেয়। লবণের জন্য চারিদিকে হাহাকার। অথচ লৌহজঙ্গ থানাতে জোর গুজব হইলদা, দিঘলী, কাজিরপাগলা, মাওয়া, কান্দিরপার অঞ্চলে বহু শত মণ লবণ মজুত আছে। এবং কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী ইহা জানিয়াও নীরব আছেন। অথচ জনসাধারণের সহযোগিতায় মজুতবিরোধী অভিযান চালানোর কোন লক্ষণই মহকুমা হাকিমের পক্ষ হইতে দেখা যাইতেছে না।

অনাহারে শিশু মরিতে সুরু করিয়াছে। অথচ সরকার হইতে সকল দুগ্ধ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এমন কি সরকার হইতে পরিচালিত ২০টি অনাথ আশ্রম বন্ধ করিবার জন্য মহকুমা হাকিম প্রাথমিক নির্দ্দেশ দিয়াছে। তিনমাস যাবৎ সরকারী পরিচালিত জরুরী হাসপাতালগুলিতে কোন টাকা দেওয়া হয় না।

বিক্রমপুরকে রক্ষা করার জন্য সারা বাংলায় আন্দোলন চাই

খাদ্য কমিটি মারফৎ শতকরা ৫০জন লোককে ৮৲ মণ দরে চাউল দিতে হইবে। অবিলম্বে লঙ্গরখানা ও দুগ্ধ বিতরণের কেন্দ্রগুলি খুলিতে হইবে। খাদ্য কমিটি ও বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় অবিলম্বে মহকুমা-ব্যাপী পুনর্গঠনের কাজ সুরু করিতে হইবে। খাদ্য কমিটিগুলি জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়া যাহাতে গঠিত হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রধান দাবীগুলির ভিত্তিতে সমস্ত দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। ১৬ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অবনীভূষণ রুদ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্টপার্টি প্রভৃতি দলগুলির সহযোগীতায় খাদ্য ও রিলিফকর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কৃষক সমিতি এ পর্য্যন্ত লৌহজঙ্গ ও শ্রীনগর থানাতে প্রায় ১০০ কানি জমি কচুরী পানা হইতে রক্ষা করিয়াছে। মহিলা সমিতি হইতে ৪টি কুটির-শিল্প কেন্দ্র খুলিয়া প্রায় ৫০ জন মহিলাকে আত্ম-নির্ভরশীল করার চেষ্টা করিতেছে।

আজ দেশবন্ধুর বিক্রমপুরকে রক্ষা করিবার জন্য সারা বাংলাদেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সুরু হউক।

বাংলার কাপড় যায় কোথায় ?

কলিকাতার একটি চোরাগুদামেই ৫ লাখ টাকার কাপড়

১৩ই জুলাই টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের এক সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ থ্যাকার্সে বলেন যে, বাংলায় কাপড়ের অভাব হইবার কোন কারণ নাই, কেননা যথেষ্ট কাপড় বাংলায় পাঠান হইতেছে। তিনি হিসাব দিয়াছেন যে, সে পর্য্যন্ত ৫ মাসে বাংলায় এত কাপড় পাঠান হইয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক লোকের ভাগে বছরে ১২ গজ হিসাবে কাপড় পড়িতে পারে। মিঃ থ্যাকার্সে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "এত প্রচুর কাপড় কি হাওয়ায় মিলাইয়া গেল!"

কিন্তু কাপড়ের স্তূপ কোথায় মিলাইয়া যায় তা কি মিঃ থ্যাকার্সের জানা নাই! বোম্বাইয়ে কাপড় লইয়া কি রকম জুয়াচুরী চলিয়াছিল, তা কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্যরা ভাল করিয়াই জানেন। কলিকাতাতেও তাই হইতেছে, ইহা অনুমান করা কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষে একটুও দুঃসাধ্য নয়।

১৯শে তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশ **কলিকাতার বড় বাজারের একটী গুদাম তল্লাসী করিয়া পুলিশ ৫ লাখ টাকার কাপড় উদ্ধার করে।** এত কাপড় যদি চোরাগুদামে আটক পড়িয়া থাকে, তবে বাংলায় কাপড়ের অভাব হইবে না কেন? এ রকম মজুত আরো থাকা সম্ভব।

কাপড়ের কন্ট্রোল থাকা সত্ত্বেও চোরাগুদামে এত কাপড় যায় কি করিয়া? সে দিকে কন্ট্রোল বোর্ডের দৃষ্টি আসিয়াছে কি?

ক্যানেল থাকিতেও

সময়মত চাষের জল পাওয়া যায় না

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সভার সহঃ সভাপতি কমরেড **বিপদ বারণ রায়ের বিবৃতি**:—

আমি নবস্থা ইউনিয়নের কেওট, নবস্থা, হেরগ্রাম, পলসা, শালিগ্রাম, চাকুন্দি, বোড়শো—বস্তুল ইউনিয়নের ফরিদপুর, বাকলসা, কোরুরী কুড়মুন ইউনিয়নের সড্যা, সিংপাড়া, বলগনা—গোবিন্দপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর, রামনগর, শুহারী ঘুরিয়া দেখিলাম যে আষাঢ়ের সামান্য বৃষ্টিতেই চাষীরা সাধ্যমত কাদায় চাষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কয়েক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় ও ক্যানেল কর্তৃপক্ষ ১১।৭।৪৪ তারিখ পর্য্যন্ত জমিতে জল না দেওয়ায় আগামী ফসলের সমূহ ক্ষতি হইল। কারণ কাদায় চাষ দেওয়ার পর অথবা কাদা হইয়া যদি শুকাইয়া যায় তাহা হইলে সে বৎসর জমিতে অর্দ্ধেকের বেশী ফসল হয় না। চাষীরা আশা করিয়াছিল বৃষ্টি না হইলে ক্যানেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জল ছাড়িবে। ক্যানেল কর্তৃপক্ষ ক্যানেল হওয়ার সময় ১৫ই জুন জমিতে জল দিবেন প্রকাশ করেন। গত ৩ বৎসর ধরিয়া ১৫ই জুন পরিবর্ত্তন করিয়া ১লা জুলাই করেন। ১লা জুলাই কিছু পরিমাণ জল দিয়া পুনরায় ১২ই জুলাই নাগাদ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, জমিতে অর্দ্ধেকের বেশী ফসল হইবে দ্বতীয়তঃ সময়ে জল পাইলে চাষীরা জমি চাষ করিবার অধিক সময় পাইত। এ বৎসর অল্প সংখ্যক দুর্বল বলদ ও অল্পসংখ্যক দুর্বল মজুর লইয়াই চাষীকে চাষ করিতে হইবে। সমস্ত জমি চাষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সরকার ফসল বাড়াও বলিয়া বড় বড় পোষ্টার দিতেছেন এবং গ্রামে গ্রামে ফসল বাড়াইবার জন্যও প্রচার করিতেছেন; ঠিক সেই সময় ক্যানেল কর্তৃপক্ষের অসীম ঔদাসীন্যই ফসল বাড়ানোর কাজে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

ক্যানেল কর্ম্মচারীরা নাকি বলিতেছেন—বাঁধ ভাঙ্গার কারণে জল দিতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার জন্য সাবধান হন নাই কেন? বাঁধ ভাঙাই কি সত্য? না ইহার পশ্চাতে অন্য কারণ আছে?

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায়

বরিশালে দুঃস্থাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন

জনৈক আত্মরক্ষাকর্মী

দুঃস্থা অসহায় নারীদের সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যা লইয়া আমরা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে ৪।৫ মাস আন্দোলন করিতেছি। কংগ্রেস এবং অন্যান্য নেতাদের সহযোগীতায় আমরা এই কাজে অগ্রসর হইতেছিলাম। সমাজ জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা সপ্তাহে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভার সমর্থন পাই। দুঃস্থা নারীদের সাহায্যের আবেদন সহ এই নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত ইস্তাহার বাহির হয় এবং ইহার উপর অর্থ সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে। নিখিল বঙ্গ নারী সম্মেলনের সাথেও এই সমস্যার ভিত্তিতে ভাল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে—কিছুটা কাজের যোগাযোগও ঘটিয়াছে।

মে মাসের শেষদিকে বরিশালে একটি দুঃস্থ নিবাস খোলা হয়। এখন সেখানে মহিলা ও শিশুসহ ৫০ জন থাকিতেছেন। ৮ই জুলাই আত্মরক্ষা পরিচালিত কর্ম্মকেন্দ্র ও দুঃস্থ নিবাস—নারী-কল্যাণ-ভবন উদ্বোধন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস উদ্বোধন করিয়াছেন। সহরের নেতৃবৃন্দা এবং নেতৃবৃন্দ এই উদ্বোধনে যোগ দান করে। এই সঙ্গে একটী 'আত্মরক্ষা ষ্টলও' খোলা হয়—জিলার বিভিন্ন কেন্দ্রের তৈরী জিনিষ এই ষ্টলে বিক্রয় করা হইবে। কর্ম্মকেন্দ্রে ৩০ জন মহিলা কাজ করিতে আরম্ভ করে। ২ খানা তাঁত, বাঁশের কাজ, সূতাকাটা, ঝাটা, ঝাড়ন, হোগলা ইত্যাদির কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

"নারী কল্যাণ ভবনে" ডাল ভাঙ্গা, সূতাকাটা, ঝাটা তৈরী, হোগলা প্রভৃতির কাজ চলে। ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তেরচর হচালি, গাড়ুরিয়া, পটুয়াখালি, বিরপাশা, লাকুটিয়া, গোবিন্দপুর প্রভৃতি এলাকায় কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ধানভাঙ্গা, তাঁতের কাজ, বাঁশের কাজ, লাঠি তৈরী ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় হইয়া থাকে। ১৫।২০ জন দুঃস্থা নারী এই সব কেন্দ্রে কাজ করে।

আমরা এই কাজের প্রারম্ভে পিপলস্ রিলিফ কমিটি হইতে ৫০০৲, ভাগ্যকুলের কুমার শ্রীযুত বি, কে, রায়ের কাছ হইতে ৩০০৲ এবং সরকারী সাহায্য হইতে ১০০০৲ টাকা পাইয়াছি।

কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা সকলের সহযোগীতায় আমরা দুঃস্থা নারীর সমাজ জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রসর হইতেছি।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১।০

উত্তর বাখরগঞ্জে দারুণ খাদ্যাভাব

দুর্ভিক্ষ ঠেকাইতে জনসাধারণের চেষ্টা

বাখরগঞ্জ জেলা বাড়তি জেলা। কিন্তু এই জেলার মধ্যে উত্তর বাখরগঞ্জ অঞ্চলই প্রধান ঘাটতি এলাকা। এখানে সমস্ত বৎসরের প্রয়োজনের মাত্র ছ'মাসের খাদ্য উৎপন্ন হয়। গৌরনদী, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ ও মুলাদি এই ৬টি থানা নিয়া উত্তর বাখরগঞ্জ গঠিত। ইহার প্রত্যেকটি থানাতেই লোকসংখ্যা সাধারণভাবে অন্যান্য থানার তুলনায় বেশী। ছয়টি থানার মোট লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ।

গত বৎসরের দারুণ খাদ্য সংকট ও মহামারীতে এই অঞ্চল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে—সাধারণ লোক অনেক মরিয়াছে, অনেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়াছে এবং অনেকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই বৎসরও ইতিমধ্যেই গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জ থানার অনেকগুলি জায়গায় দারুণ খাদ্য সংকট শুরু হইয়াছে।

গৌরনদী থানার জোব্বারপাড় ও বাগধা অঞ্চলের একটি প্রকাণ্ড অংশ মিঠা আলু খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। জায়গায় জায়গায় ফেন খাইতে সুরু করিয়াছে। উজিরপুর থানার অন্তর্গত সাতলাবিলের অবস্থাও খুবই খারাপ। খাদ্যাভাব ব্যতীত এইসব অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়া সুরু হইয়াছে।

'উত্তর বাখরগঞ্জকে বাঁচাও' আন্দোলন

'উত্তর বাখরগঞ্জকে বাঁচাও' আন্দোলনে ঐ এলাকায় কৃষক সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও ছাত্র-ফেডারেশন প্রথম হইতে কাজ সুরু করে। যে সমস্যা প্রথমেই ভীষণ ভাবে দেখা দেয় তাহা হইল চাউলের অভাব ও জেলার বাহিরে গোপনে চাউল রপ্তানী। কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়াররা রাত্রে পাহাড়া দিয়া লক্ষ্য করে যে প্রকাণ্ড বড় বড় নৌকা বোঝাই চাউল পটুয়াখালি হইতে মীরেরহাট হইয়া গৌরনদীর খাল দিয়া ঢাকা অথবা ফরিদপুরের দিকে যাইতেছে। ইহারা সবাই চোরাকারবারী। গৌরনদী বন্দরে চাউল নাই, আশেপাশের অঞ্চলে চাউল পাওয়া যায় না অথচ এত চাউল গৌরনদীর বুকের উপর দিয়া চোরা কারবারে চলিয়া যাইতেছে। হাটে বাজারে পোষ্টার, পথসভা ও জনসমাবেশ মারফৎ ইহার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা হয় এবং ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানানো হয়। স্থানীয় কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়ারদের সহযোগীতায় রাত্রে পাহাড়া দিতে অনেকে আগাইয়া আসে। ইহার পর কৃষক সমিতি ও অন্যান্য ভলাণ্টিয়ারদের পাহাড়া সুরু হয়। প্রতিদিন রাত্রেই নৌকা আটক হইতে থাকে। স্থানীয় সিভিল সাপ্লাই অফিসার ও থানার কর্ম্মচারীরা শেষ পর্য্যন্ত জনমতের চাপে পড়িয়া ভলাণ্টিয়ারদের সাথে সহযোগীতা করিতে বাধ্য হয়। ফলে কিছু কিছু আটক চাউল জনসাধারণের ভিতর বিক্রি হইতে থাকে।

বরিশাল সহরে কমরেড নুটু ব্যানার্জির নেতৃত্বে ৬ জন কর্ম্মী লইয়া একটি কৃষ্টি স্কোয়াড গঠিত হয়। উত্তর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে এই স্কোয়াড প্রচারে বাহির হইয়াছে। এই স্কোয়াড গান, নাটক, পোষ্টার ইত্যাদির সাহায্যে উত্তর বাখরগঞ্জের দারুণ খাদ্য সংকটের ছবি ও স্থানীয় সমস্যা এবং তাহা প্রতিকারের উপায় জনসাধারণের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেছে।

চাঁদসিতে কর্ম্মনিবাস খুলিল

দুস্থ নারী ও শিশুকে আশ্রয় দিবার জন্যই চাঁদসিতে একটি দুঃস্থ কর্ম্মনিবাস করা হইয়াছে। সেখানকার বাসিন্দা আজ ৬৫ জন—সন্তান সন্ততিসহ ২৫ জন নারী ও ১৫ জন পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকার একটি বৃহৎ পরিবার। মায়েরা কাজ করে আর ছেলেমেয়েদের জন্য উঠিয়াছে পাঠশালাঘর। কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। প্রত্যহই ১০।১৫ জন কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইতেছে—তাহাদের জন্য স্থান নাই।

যাহারা আসিতেছে ও ফিরিয়া যাইতেছে তাহারা শুধু এই ইউনিয়নেরই বাসিন্দা নহে—পাশাপাশি ইউনিয়ন গৈলা, রত্নিহার, বাকাল, বাখি সব এলাকা হইতেই। কিন্তু গতবারের ১৫টি লঙ্গরখানার ভার একটি কর্ম্মকেন্দ্র কেমন করিয়া লইবে?

এই কাজের দায়িত্ব নিয়াছেন এখানকার সব দল—ইউনিয়নবোর্ড, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কৃষক সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ভূতপূর্ব্ব বি, পি, সি, সি'র সভ্য, কমিউনিস্ট কর্ম্মী ডাঃ নলিনী দাস ইহা গড়িয়া তুলিবার প্রধান সংগঠক।

দুইশ' বছর আগে ব্রিটিশ আমলের প্রথম অধ্যায় হইতে চাঁদসির বিখ্যাত ক্ষত-চিকিৎসার জন্য যে হাসপাতাল ঘরগুলি দাড়াইয়া আছে, তাহারই পাশাপাশি দাড় করান হইয়াছে ব্রিটিশ শাসনের শেষ যুগের সামাজিক ক্ষতগুলিকে চিকিৎসার জন্য দুঃস্থ-নিবাস।

বিভিন্ন দলের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলে মিলিয়া টাকা তুলিয়া প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই মাস পূর্ব্বে সেইদিন ৫।৭ জন দুঃস্থা নারী ও শিশুকে লইয়াই কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। জিলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পাঠাইয়াছে কাপড়, ঘরে ঘরে তৈরী করা জামা প্যাণ্ট ও শিশু ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য দুধ। হাটে বাজারে ও ঘরে ঘরে তোলা হইয়াছে ধান চাউল।

কিন্তু বাসিন্দার সংখ্যা বাড়িবার সাথে সমস্যা দাড়াইয়াছে বহু রকমের।

ডাঃ দাস বলিলেন যে মূলধনের অভাবে কর্ম্মীদের কাজ শিখাইয়া আর বাড়াইতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমানে দৈনিক আয় ৪।৫৲ টাকা কিন্তু দৈনিক ব্যয় কুড়ি টাকা।

কাজ শিখাইয়া আয় বাড়াইবার জন্য মূলধন, আরও বেশীকে স্থান দিবার ব্যবস্থা ও প্রাত্যহিক খরচ—সব গুলিই বড় বড় প্রশ্ন।

কিন্তু কেহই দমিবার পাত্র নহে। ফসল উঠিলেই কৃষক সমিতি ধান তুলিবে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আজই টাকা প্রয়োজন।

চাঁদসি ইউনিয়নের মধ্যেই গৌরনদী বড় বন্দর। ধনী মহাজনরা লাভও করিয়াছেন প্রচুর। তাহাদের দান আজও আসিয়া পৌছে নাই। বরিশাল সহরে উত্তর বাখরগঞ্জের দুর্ভিক্ষ রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন দলের মিলিত সাহায্য কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষক সমিতির সংস্কৃতি স্কোয়াড উত্তর বাখরগঞ্জের মা-বোনদের দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র লইয়া বাড়তি এলাকা পটুয়াখালি গিয়াছে সাহায্য আদায়ের জন্য। সরকারকেও আজ টাকা দিতে হইবে।

গত বছরের দুর্ভিক্ষের শিক্ষা ও সংগঠন এই বছর লড়াইয়ের বড় হাতিয়ার।

সেই হাতিয়ারই আজ সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া এই সকল দুঃস্থ-কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার পথ সৃষ্টি করিয়া দিবে। কর্ম্মকর্ত্তাগণের শক্তিও তাহাই। সেই শক্তিই দেশ ও সমাজকে বাঁচাইবে।

উদ্বৃত্ত আসামে বাংলার চাউল কেন?

ক্রয়-নীতি সফল করিতে সরকার কি করিতেছে?

গত ২৪শে জুন আসাম গভর্ণমেণ্টের এক প্রেস নোটে বলা হয় "উত্তর বঙ্গ হইতে হাজার হাজার মণ চাউল আসাম ভ্যালীতে আমদানী করা হইতেছে।... যাহাদের ঘরে উদ্বৃত্ত চাউল আছে তাহারা যতদিন সেই চাউল ন্যায্য দরে বাজারে না ছাড়িবেন ততদিন পর্য্যন্তই বাহির হইতে চাউল আনান হইবে।"

আসাম উদ্বৃত্ত প্রদেশ। এ বৎসর বাজারে উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ মণ। এত চাউল আসামের অভ্যন্তরেই উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও আসাম সরকার বাংলাদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতেছেন কেন? আসাম সরকার অবশ্য নিজের প্রেস নোটে স্বীকার করিয়াছেন যে যাহাদের ঘরে উদ্বৃত্ত চাউল আছে তাহারা সেই চাউল বাজারে ছাড়িতেছে না। এর সোজা মানে এই যে, আসাম সরকারের খাদ্য-সংগ্রহ-পরিকল্পনা একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে, মজুতদাররা নিজেদের খুসীমতই চাউল আটকাইয়া রাখিতেছে।

গত আমন ও শালি ধান উঠিবার পর আসাম সরকার খাদ্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া "ষ্টীল ব্রাদার্স," "সুরমাভ্যালী সিণ্ডিকেট" ও "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট" নামে তিনটি বড় বড় কোম্পানীকে চাউল কিনিবার ভার প্রদান করে। এই কোম্পানীগুলি অনেক সাব-এজেণ্ট নিযুক্ত করে। গত বৎসর যাহারা চাউল ও অন্যান্য জিনিষের চোরা-কারবারের দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল সাধারণতঃ তাহারাই সাব-এজেণ্ট নিযুক্ত হয়।

আসামে তখন চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল ১৯৲ ও ১৯৷৷০। কিন্তু এই সাব্‌-এজেণ্টের গোষ্ঠী সরকারী ছাড়পত্র পাইয়া দরিদ্র কৃষকদের নিকট হইতে ছলে বলে কৌশলে ১১৲।১২৲ দরে চাউল ক্রয় করিতে থাকে। ধনী-কৃষক, জোতদার ও গ্রাম্য মহাজনরা অধিকাংশ ফসলের অধিকারী—তাহারা কম দামে চাউল বিক্রয় করিতে রাজী হয় না। কাজেই শুধু গরীব-কৃষকদের নিকট হইতে কম দামে যে চাউল সংগৃহীত হয় তাহার পরিমাণ স্বভাবতই খুবই কম। অথচ অতিলোভী এজেণ্ট ও সাব-এজেণ্টরা এই চাউলই গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্ব্বোচ্চ মূল্যে (১৯৲ ও ১৯৷৷০) বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা করে। এজেণ্টরা কি ভাবে গরীব-কৃষক ও গভর্ণমেণ্টকে ঠকাইয়া প্রচুর টাকা লুটিতেছে অথচ ক্রয়ের একটা মোটা অংশ গোপনে গুদামজাত করিয়া সরকারী ষ্টকেও যথেষ্ট চাউল জমা দিতেছে না তাহার এক বিবরণ সিলেটের বিখ্যাত সংবাদপত্র "জনশক্তিতে" ৭ই জুন তারিখে প্রচারিত হয়।

এ ছাড়া সরকারী এজেণ্টরা দূর দুরান্তরের গ্রাম হইতে চাউল ক্রয় করে নাই! কেন না তাহাতে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়! বোরো অঞ্চলের কৃষকগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত চাউল কিনিয়া নিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বারম্বার অনুরোধ করে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও সরকারী এজেণ্ট সেখানে চাউল খরিদ করিবার জন্য যায় নাই। এই উদ্বৃত্ত চাউল স্বভাবতই চোরা-কারবারীদের গুদামজাত হইবে।

এই ভাবে সরকারী এজেণ্টদের দুর্নীতি ও মজুতদারদের ষড়যন্ত্র উদ্বৃত্ত-প্রদেশ আসামেও খাদ্যাভাব ঘটাইতেছে। সরকার খাদ্য সংগ্রহের জন্য জনগণের খাদ্যকমিটির সহযোগিতা না নিয়া লোভী বড় ব্যবসাদারদের উপর নির্ভর করিয়াছিল। তাহারাই আজ সরকারের সব পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিতেছে। সরকারী ষ্টকে চাউল নাই অন্যদিকে মজুতদারদের মজুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকার এখন আতঙ্কিত হইয়া বাংলা হইতে চাউল আমদানী করিতেছে।

কিন্তু বাংলাদেশ হইতে চাউল আনাইয়া আসামের সঙ্কট দূর হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলা কখনই বাইরে চাউল পাঠাইতে পারে না। তাছাড়া আসামের ভিতরই এত চাউল মজুত থাকিতে বাংলাদেশ হইতে চাউল আনানই বা হইবে কেন?

গভর্ণমেণ্ট এখন বেশী দামের লোভ দেখাইয়া মজুতদারদের চাউল কিনিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইবে না—বরং মজুতদাররাই আসকারা পাইবে। অথবা গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের ঘর হইতে জোর করিয়া ধান সংগ্রহ করিবার পন্থা গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে সারা প্রদেশে অশান্তি নিশ্চিত এবং সংকটের সমাধানের চেয়ে সংকট আরও হাজার গুণ বাড়িয়া যাইবে।

আসাম সীমান্ত প্রদেশ। এখানকার খাদ্য সংকটে আজ সারা দেশে ভীষণ বিপর্য্যয় নামিয়া আসিবে। তাই আসাম সরকারের উচিত জনগণের খাদ্য কমিটি-গুলিকে মানিয়া নিয়া তাহার মারফত মজুতবিরোধী অভিযান চালাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ ষ্টক সংগ্রহ করা। এ পথেই আসামের সংকট সমাধান হইবে।

মেদিনীপুরে জেলা খাদ্য সম্মেলন

ঐক্যবদ্ধ জেলা খাদ্য কমিটি গঠন

মেদিনীপুর জেলার ৫০ হাজার লোক গত বার অনাহার ও মহামারীতে প্রাণ হারাইয়াছে। সমাজ, সংসার সব কিছু ভাঙিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার কৃষক অভাবে পড়িয়া জমি বেচিয়াছে। এবার বীজধান, হালের গরু ও জমির অভাবে চাষ আবাদ শতকরা ২৫ ভাগও ভাল করিয়া হয় নাই। শতকরা ৩০ জন কৃষকের ঘরেও আজ ধান নাই। এবারও অধিকাংশ ধান-চাল মজুতদার গোলায় পুরিয়াছে। প্রয়োজনমত চাল কিনিয়া স্থানীয়ভাবে মজুত ও বরাদ্দ প্রথায় বিলি করার ব্যবস্থা সরকার আজও করিতে পারে নাই। ফলে, চোরাবাজার পুরাদমে চলিয়াছে। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার কোথাও কোথাও চালের দর এখন ২০৲ টাকায় উঠিয়াছে।

ইহার ফলে যে সংকট ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা রোধ করার জন্য গত ২রা জুলাই মেদিনীপুরের বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠান ও খাদ্যকমিটির প্রতিনিধিরা এক জেলা খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। যানবাহনের নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও দূর দূর গ্রামাঞ্চল হইতে শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে আসিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রতিনিধিদের চোখেমুখে আসন্ন সংকটের উদ্বেগ; সংকট সমাধানের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল। শহরের উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীরাও সম্মেলনে যোগ দেন।

সভাগৃহ বিভিন্ন চিত্র ও পোস্টারে সজ্জিত। অন্নাভাব ও মহামারী সম্পর্কে নানা ঘটনা ও তথ্য সমাবেশে সকলের সামনে আসন্ন সংকটের রূপ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সংকট দূর করার নিশানাও দেখানো হইয়াছে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলার প্রবীণ কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বসু। সভার প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মাইতি বলেন, গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতেই আজ জেলায় খাদ্য সংকট নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চালের দর বাড়িতেছে। জনগণের খাদ্য কমিটিগুলি যদি সক্রিয় হয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি সহযোগিতা গড়িয়া উঠে তাহা হইলে সংকট আমরা নিশ্চয়ই রোধ করিতে পারিব।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, দেশব্যাপী এই খাদ্য সংকট সমাধানে দায়িত্ব আমাদের নিজেদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় আমরা কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। ইহার পর কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সরোজ রায় মিলিতভাবে জনগণের খাদ্য আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, জনগণের সহিত সরকারের অসহযোগ নীতির ফলে সংকট জটিল হইয়াছে। আজ জনগণের সমবেত চেষ্টা ও মিলিত চাপই সরকারী নীতির পরিবর্তন করিতে পারে। ইহার পর বর্তমান খাদ্য সংকটে খাদ্য কমিটিগুলির কর্তব্য, কংগ্রেস নেতাদের ও ফ্যাশিস্টবিরোধী বন্দীদের মুক্তি, জেলার সর্বদলের মিলিত খাদ্য কমিটি, শিক্ষা-সংকট ও তাহার সমাধান, রোগ ও মহামারী ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিকালে প্রকাশ্য অধিবেশনে কাঁথীর কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আসন্ন খাদ্য সংকটের সূচনা ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে। জনগণের মিলিত চেষ্টাই আজ খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ইহার জন্য গ্রাম্য ও ইউনিয়ন খাদ্য কমিটিগুলির দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। জেলার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ফকির মহম্মদ বলেন, খাদ্য সংকট সমাধান ও জাপানী দস্যুদের হাত হইতে দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির আজ বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের সক্রিয় আন্দোলনই আজ এই পথের বাধা দূর করিতে পারে। কমরেড সরোজ রায় জেলা খাদ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টই ঘুষখোর!

২০শে জুলাই, ইউ পি-র খবরে প্রকাশ:—

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ডাল খরিদ করিবার জন্য মিঃ ফজলুল মেহদী নামক এক ব্যক্তি বাংলা গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি একজন ঔষধের ব্যবসাদারের কাছ হইতে বে-আইনী ঘুষ লওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং বিচারে তাহার ২০০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাস জেল দেওয়া হইয়াছে।

বিখ্যাত শ্রমিক-নেতা কমরেড মিরাজকরের সভাপতিত্বে

ট্রাম ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২০শে জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বোম্বাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি, নিখিল ভারত ট্রেঃ ইঃ কংগ্রেসের সহঃ সম্পাদক, কমরেড এস, এস, মিরাজকর।

সভামঞ্চে দুই পাশে মহাত্মা গান্ধী ও লীগ-নেতা জিন্নার ছবি দেখা যাইতেছিল। হলের পাশে বারান্দাতে কতকগুলি ছবির দ্বারা দেখান হইয়াছিল ট্রাম ইউনিয়নের গৌরবময় ইতিহাস। কেমন করিয়া ট্রাম শ্রমিকরা ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করে, তারপর নোনাপুকুর শ্রমিকরা আগাইয়া আসিয়া ইউনিয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, জাতীয় আন্দোলনের নেতা জহরলাল নেহেরু ট্রাম শ্রমিকদের দেশভক্তির জন্য তাহাদের অভিনন্দন জানান। তারপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিধিনিষেধ, কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার, বহিস্কার প্রভৃতির মধ্যেও কেমন করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকরা তাহাদের আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখে, কেমন করিয়া জনযুদ্ধের যুগে নোনাপুকুরের সহিত ট্রাফিক শ্রমিকরাও আগাইয়া আসিয়া আজিকার মত সাড়ে ৪ হাজার শ্রমিকের বিরাট শক্তিশালী ইউনিয়ন সংগঠন করে, জাপ-বোমার মধ্যে ট্রাম গাড়ী চালু রাখিয়া সমস্ত দেশের শ্রমিকদের এক রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় ইত্যাদি বিষয় কতকগুলি ছবির মধ্যে দেখান হয়।

প্রতি বৎসরই ট্রাম শ্রমিকরা উৎসাহের সহিত তাহাদের বার্ষিক সম্মেলন করিয়া আসিতেছে। এ বছরও সম্মেলনের কয়েকদিন আগে হইতেই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায় অভূতপুর্ব্ব উৎসাহ। এই সম্মেলনের কয়েকদিন আগে ট্রাম শ্রমিকরা এ্যাডজুডিকেশনের দাবী আদায় করে। এসেন্সিয়াল সার্ভিসের শ্রমিকদের এত বড় জয় ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। এ্যাডজুডিকেশনের বিচার সামনে রহিয়াছে। তাহার উপর কলিকাতার ট্রামগাড়ীতে যাতায়াতের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে। কোম্পানীর এজেন্ট সাহেব সেদিন বিবৃতিতে প্রায় জানাইয়া দিয়াছেন যে ইহার প্রতীকার তাহাদের অসাধ্য। ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিজ্ঞা হইল ট্রাম সার্ভিসকে আরও উন্নত করিবে। তাহাদের সেকসন ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে আরও শক্তিশালী করিবে—ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত মজুরকে লইয়া আসিবে—এই সব সঙ্কল্প নিবার জন্যই এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট।

কমরেড মিরজাকর প্রথমে ট্রাম শ্রমিকনেতা ও শহীদ কমরেড বসীরের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ৩ হাজার শ্রমিক দাঁড়াইয়া তাহাদের পরলোকগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইল। কমরেড বসীরের ফটোতে কমরেড ইসমাইল মালা দিলেন।

তারপর বিভিন্ন জননেতা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আগত অভিনন্দন বাণী দেওয়া হইল। বাণী পাঠাইয়াছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ হইতে কমরেড শান্তা ভালেরাও, বোম্বাই ট্রাম শ্রমিকদের ইউনিয়ন, পিপলস রিলিফ কমিটি, বোম্বাইয়ের গিরনী কামগর ইউনিয়ন, বঃ প্রাঃ ট্রেঃ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসু, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা জে, সি, গুপ্ত, দিল্লীর শপ এসিষ্ট্যাণ্ট ফেডারেশনের সভাপতি প্রভৃতি। সকলেই তাহাদের বাণীতে ট্রাম শ্রমিকদের দেশসেবা—বোমার সময় তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া অভিনন্দন জানান ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত, বঙ্গীয় কাউন্সিলের ডেপুটী স্পীকার খান বাহাদুর আব্দ ল হামিদ চৌধুরী, রিক্সা ইউনিয়নের তরফ হইতে মিহির বসু, বিড়ি ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বসারত হোসেন এবং বাস ইউনিয়নের পক্ষ হইতে সমর গুপ্ত প্রভৃতি। ডাঃ ভূপেন দত্ত বলিলেন "আপনারা চেষ্টা করুন, যাহাতে ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনের হাতে যায়। আপনারা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই পারিবেন।"

খান বাহাদুর আব্দুল হামিদ চৌধুরী তাহার ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ বক্তৃতায় বলিলেন "এই সহরের ট্রামযাত্রীদের যে সব সুবিধা ছিল, তাহা রক্ষা করা আপনাদের কার্য্যসূচীতে লিপিবদ্ধ আছে। যদি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া আপনারা কাজ করেন তবে দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ মন্দাকিনীর ধারার মত আপনাদের উপর বর্ষিত হইবে।" তাহার বক্তৃতার সময় মুহুর্মুহু ধ্বনি ওঠে—'হিন্দু মুসলিম এক হোক', 'কংগ্রেস লীগ এক হও'।

কমরেড মিরাজকর তাহার সভাপতির বক্তৃতায় ইউরোপের দেশে দেশে জনজাগরণ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কয়েক বছর হতাশার পর গান্ধীজীর মুক্তি ও নেতৃত্বে নূতন আশার কথা বলেন। তিনি বলেন, দুনিয়ার লোকের ঐক্যের সঙ্গে ভারতেও ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। রাজাজীর প্রস্তাব তাহারই সমর্থন করে। বাংলাদেশে এই ঐক্য ছিল না বলিয়াই গত দুর্ভিক্ষে এত লোক মরিয়াছে। আজও ঐক্য নাই বলিয়া আবার সংকট আসিতেছে।

তারপর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথায় তিনি ট্রাম শ্রমিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমি করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বহু ট্রাম ইউনিয়ন দেখিয়াছি কিন্তু আপনাদের মত এরূপ সংঘবদ্ধ ট্রাম শ্রমিক কোথায়ও দেখি নাই। আপনারা জাপানীর বোমার মধ্যেও ট্রাম চালু রাখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের মজুরদের এক নূতন প্রেরণা, নূতন পথ দেখাইয়াছেন।

ইহার পর তিনি বাংলাদেশের এ্যাডজুডিকেশন আইনের সমালোচনা করিয়া বলেন "আমি কখনও এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার শুনি নাই যে শ্রমিকরা এ্যাডজুডিকেশনের দাবীর উপর আলোচনা বা আন্দোলন করিতে পারিবে না। আমি বলিতে চাই—ট্রাম শ্রমিকদের প্রত্যেকটী দাবী ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত। তিনিও তাহার বক্তৃতায় কর্পোরেশনকে ট্রাম কোম্পানী হাতে লইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহার পর তিনি বলেন, বাংলাদেশের মজুরদের মাগগীভাতা অনেক কম। আমাদের সমস্ত দাবী আজিকার দিনে নূতন অবস্থায় নূতন উপায়ে লড়াই করিয়া আদায় করিতে হইবে।

কমরেড গোপাল আচার্য সম্পাদকীয় রিপোর্ট পাঠ করেন। ইহার পর এ্যাডজুডিকেশনের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাজনৈতিক প্রস্তাবে ট্রাম শ্রমিকরা লালফৌজকে অভিনন্দন জানায়। গান্ধীজীর মুক্তিতে আনন্দপ্রকাশ, রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী করা হয়। কমরেড লাহিড়ী তাহার বক্তৃতায় বলেন যে ট্রাম শ্রমিকরা দুই বছর আগে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কংগ্রেস-লীগের ঐক্যের যে ধ্বনি উঠাইয়াছিল—আজ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা তাহাই সমর্থন করিতেছে।

সভার মাঝে কালিঘাটের কণ্ডাক্টর মনমোহন নাগের "করমেরি যুগ এসেছে" ও নোনাপুকুর স্কোয়াডের "তুলে ধর লাল পতাকা" গান উৎসাহের সৃষ্টি করে।

ছাত্র-আন্দোলনের উপর আঘাত

মিটিংয়ের অভিযোগে স্কুলের সাহায্য বন্ধ

নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ি স্কুলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টরের কাছ হইতে এক নোটিশ আসিয়াছে। এই নোটিশে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ঐ স্কুলে নাকি রাজনৈতিক সভাসমিতি হয় ও সম্প্রতি কমিউনিস্টপার্টি নাকি ঐ স্কুলে সভা করিয়াছিল। এই অপরাধে বিভাগীয় স্কুল-ইনসপেক্টর সোনাইমুড়ি স্কুলে বর্ত্তমানে সরকারী সাহায্য বাতিল করিয়া দিয়াছেন ও যতদিন পর্য্যন্ত না জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ হইতে স্কুল সম্বন্ধে অনুকূল রিপোর্ট পাওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকিবে বলিয়া স্কুল-ইনসপেক্টর নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

সোনাইমুড়ি স্কুল নোয়াখালি জেলার একটি পুরাতন স্কুল। গত ১৯ বছর ধরিয়া এই স্কুলটি সরকারী সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটে স্কুলের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। শিক্ষকরা স্কুল হইতে যা বেতন পান, তাহাতে তাঁহাদের সংসার চলে না। শতকরা ২০জন ছাত্র অসুস্থতার জন্য স্কুলে উপস্থিত হইতে পারে না। কাগজ ও কেরোসিন অনটনের ফলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারায় অর্দ্ধেকেরও বেশী ছাত্র টার্মিনাল পরীক্ষা দিত পারে নাই। নোয়াখালি জেলার সমস্ত স্কুলেরই আজ এমনি অবস্থা। এই সময় সরকারী সাহায্য বন্ধ করার অর্থ স্কুলটিকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া।

আমরা যতদুর জানি, বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টরের অভিযোগ মিথ্যা; কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি হইতে কোনদিন ঐ স্কুলে সভা ডাকা হয় নাই। একমাত্র স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনই এখানে মিটিং করিয়া থাকে। শিক্ষা-জীবন জোড়া লাগানোর জন্য, রিলিফের কাজে শিক্ষক ও ছাত্রদের একজোট করার জন্য আজ সারা বাংলায় ছাত্র ফেডারেশন একান্তভাবে আন্দোলন করিতেছে। আমলাতন্ত্র আজ স্কুলগুলিতে বেশী সাহায্য দেওয়া দূরে থাকুক ছুতানাতায় সেই সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতেছে। আর তারই জন্য আজ ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন ও কর্মীদের উপর আঘাত হানিতে আমলাতন্ত্র অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া একদিকে স্কুলের শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষদের ভয় প্রদর্শন ও অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলিয়াছে। আমলাতন্ত্রের এই অপ-চেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হউক। ছাত্রদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করিয়া কখনই শিক্ষা জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে আজ যখন বাংলার ছাত্র সমাজ ভগ্নপ্রায় শিক্ষা ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িতে সুরু করিয়াছে, তখনই এই আক্রমণ শিক্ষা জীবনকে দুর্বল করিবে। মিলিত হইয়া এই আঘাত রুখিতে হইবে।

'জনযুদ্ধ' পড়া বারণ

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বাতানল হাইস্কুলের জনৈক ছাত্র আমাদের কাছে জানাইতেছেন যে, স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র নিয়মিতভাবে 'জনযুদ্ধ' কেনে, তাহাদের উপর স্থানীয় পুলিশ ও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ প্রায়ই তাহাদের পিছনে লাগে ও উত্যক্ত করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার সহকারী এই সমস্ত ছেলেদের অভিভাবকদের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা কেনা বন্ধ না করিলে উহাদের স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে: কারণ, তা না হইলে স্কুলের সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে অভিভাবকদের মনে বেশ কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

বাংলার শিক্ষা-জীবনে আজ যে সংকট দেখা দিয়াছে, সে সংকট 'জনযুদ্ধে' বার বার প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই সংকট দূর করার জন্য 'জনযুদ্ধ' পথের নির্দেশ দিয়াছে। যাঁহারা আজ ছাত্রদের এই পত্রিকা পাঠের জন্য অযথা বিড়ম্বনা করিতেছেন, তাঁহাদের এই অপ-চেষ্টায় শিক্ষার সংকটই বাড়িবে। আজ বাংলাদেশ যখন সব কিছু হারাইতে বসিয়াছে, তখন আমলাতন্ত্রের হুমকিতে ছাত্রদের দেশপ্রেমিক আন্দোলনে বাধা দিলে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে—এ কথা বুঝিবার মত বিবেকবুদ্ধিও কি তাঁহাদের নাই?

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের কর্ম্মচারীদের অভিযোগ

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি এই অফিসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বোনাস, মাগগী-ভাতা, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় লইয়া অত্যন্ত বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। এই কোম্পানীর ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে, কাজও অনেক বাড়িয়াছে; কিন্তু কর্ম্মচারীদের বেতন বা বোনাস বৃদ্ধি করা হয় নাই। কর্ম্মচারিগণ কয়েকটী গণ-দরখাস্ত করিয়া তাদের দাবী জানাইয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই কোম্পানী বাংলার একটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কর্ম্মচারীদের প্রতি যতটা সহানুভূতিশীল হইয়া থাকে, এই কোম্পানীর কাছ হইতে সেটুকু সহানুভূতিও কর্ম্মচারীরা পায় না।

বিলাতের একটী কারখানায়

ইংলণ্ডের মিডল্‌সেক্সের একটি কারখানা। মেয়ে মজুররা যাহাতে পুরুষ মজুরদের সমান মজুরী পায়, তার জন্য 'সমান কাজ, সমান মজুরী' এই দাবীতে মজুররা আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছে। তাহারা পুরানো একটি গানের সুরে এক গান বানাইয়াছে। যখনই কারখানার এক ডিরেক্টার কারখানার ভিতরে আসে, তখনই সমস্ত মজুর সমস্বরে গান গাহিতে সুরু করে। এই গানটি হইতেছে তাদের দাবীর একটি শ্লোগান; ধর্মঘট এড়াইয়া দাবী আদায়ের ইহা এক অভিনব হাতিয়ার।

কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের উপস্থিতিতে

ময়মনসিংহে কমিউনিষ্ট কর্মীদের বিরাট সমাবেশ

গত ৮ই জুলাই ময়মনসিংহ সহরে মহাকালী পাঠশালার হলঘরে সহরের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও কর্মীদের এক সভা হয়। সহরের আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতেও কমিউনিষ্ট কর্মীরা ও সহরের রেলশ্রমিকরা এই সভায় যোগ দেয়।

জিলার কমিউনিষ্ট-নেতা কমরেড সুনির্মল সেন রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। কমরেড পবিত্র রায় 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ও কমরেড আলতাবালী পঞ্চমবাহিনী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই সভায় কয়েকজন শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্মী পার্টির সভ্যপদ পান এবং পার্টি-শপথ গ্রহণ করেন।

পরদিন ৯ই জুলাই রবিবার টাউন কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ১৫০০ লোকের এই সমাবেশ সমগ্র সহরে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, শ্রমিক, মহিলা এই সমাবেশে যোগদান করে।

সকাল ৮টায় সকলে স্থানীয় 'ছায়াবাণী' সিনেমা হলে আসিয়া সমবেত হইতে থাকে। দোকানদার, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত সকলের মিলিত সমাবেশের সামনে জিলা পার্টির সেক্রেটারী কমরেড মণি সিংহ রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময় ২০০ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা আসিয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তাহারা আড়াই মাইল দূর হইতে যাত্রা করিয়া নানা প্রকার বিপ্লবী ধ্বনি করিতে করিতে সহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ও সভায় যোগদান করে। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের যোগদানে সভার গাম্ভীর্য আরো বাড়িয়া যায় ও কর্মীদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। লাল পতাকা উত্তোলনের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। কমরেড আলতাবআলী সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের 'হিংসা উন্মত্ত নিপীড়িত পৃথিবী' গানখানি গাহিবার পর কমরেড সুনির্মল সেন বক্তৃতা করেন। জাতীয় অচল অবস্থা, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ, আসন্ন ভীষণ খাদ্য সংকট, মহামারী প্রভৃতি সমস্যাগুলি ও তাহাদের সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং সমস্ত রকম হতাশা কাটাইয়া উঠিয়া একতা-বদ্ধ ভাবে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আগাইতে আহ্বান জানান। কমরেড মণি সিংহ শ্রমিকদের উদ্দেশে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। পার্টি ফাণ্ডে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সমবেত জন-সাধারণের নিকট আবেদন করা হয়। এই আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। সভা-স্থলেই নগদ ২০৯।/০ আনা, ১টি সোনার লকেট, ১টি আংটি, ৩টি সোনার চুড়ি পাওয়া যায়। একজন রিক্সাওয়ালা তাহার একদিনের উপার্জিত টাকা পার্টির জন্য দিয়া দেয়। সভাস্থলে আরো ৩০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সভা শেষ হয়।

পতাকা অবনমিত করিতেছি

রংপুর জেলার তিস্তার জনপ্রিয় কৃষক-কর্ম্মী কমরেড উপেন বর্মন গত ৩০শে জুন বসন্তরোগে মারা গিয়াছেন। পার্টির গোপন যুগে তিনি পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। আমলাতান্ত্রিক উপদ্রব ও পারিবারিক দুর্দশার মধ্যেও পার্টির প্রতি কমরেড বর্মনের অবিচলিত নিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয় ছিল।

করিমগঞ্জের কৃষক-কর্মী কমরেড হিমাংশু ও কমরেড সোরাব আলি যথাক্রমে গত ৭ই ও ১৪ই জুন ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। এই উৎসাহী কর্মীদের মৃত্যুতে করিমগঞ্জের কৃষক সংগঠনে দারুণ আঘাত লাগিল।

ময়মনসিংহের টঙ্ক মহকুমার কৃষক সমিতির এলাকাধীন মাইজপাড়া ইউনিয়নের কৃষক-মেয়ে কমরেড সুজনেশ্বরী (১৩) সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। কিশোরবাহিনীতে সর্বক্ষণের কাজের জন্য তার পিতা তাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সুজনেশ্বরী এই এলাকার কিশোরদের প্রিয় নেতা ছিল।

মৃত কমরেডদের সম্মানার্থে পার্টি তাহার পতাকা অবনমিত করিতেছে।

মুক্তির পথে ফরাসী ভারত

জনমতের চাপে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ব্যর্থ হইতেছে

ফরাসী ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ

একদিকে ফরাসী ভারতের ফ্যাশিস্টবিরোধী গণ আন্দোলন ও অন্যদিকে ফরাসী মুক্তি সংসদ, এই দুইয়ের মিলিত চাপে ফরাসী ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—ইহার সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করিয়াছি। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আরেকটি জয়ের সংবাদ আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালে দালাদিয়েরর গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য যে আইন পাশ করিয়াছিল, দ্য'গলের নূতন অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু ফরাসী ভারতের কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি জীয়াইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছিল। 'কম্বাটে'র সভাপতি কমরেড সুব্বিয়ার বহিষ্কার ও ফ্যাশিস্টবিরোধী অধ্যাপক লাম্বার্ট সারাভানের পদচ্যুতির আদেশ সহজে তুলিয়া লওয়া হয় নাই। ফরাসী চন্দননগরে সভাসমিতির অধিকার দেওয়া হইতেছে না।

গত ২রা জুলাই পণ্ডিচেরীতে ৩ হাজার শ্রমিকের এক জনসভায় এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। এই সভা দ্য'গলের সরকারকে সমর্থন জানাইয়াছে এবং বৃটেন ও আমেরিকাকে দ্য'গলের সরকার মানিয়া লইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে। ইহা ছাড়া আগামী ৬ই আগস্ট পণ্ডিচেরীতে ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের একটি বিরাট ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন করিবার আয়োজন হইতেছে।

গণ-আন্দোলন ও ফরাসী মুক্তি সংসদ

ফরাসী ভারতের গবর্ণর বনভিনের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের কথা জানিতে পারিয়া ফরাসী মুক্তি সংসদ তাঁহাকে আলজিয়ার্সে ডাকিয়া পাঠায়। ফরাসী ভারতের জনগণের পক্ষ হইতে মিঃ আদিশিয়াম ও মিঃ জীবরত্নমও আহুত হন। মিঃ বনভিন আগেভাগে আলজিয়ার্সে উপস্থিত হইয়া এই দুইজন প্রতিনিধির নামে কুৎসা রটাইবার চেষ্টা করেন এবং কমরেড সুব্বিয়া সম্বন্ধে প্রচার করেন যে কমরেড সুব্বিয়া নাকি বৃটিশ ভারতে একজন নামকরা ডাকাত ছিলেন এবং ফরাসী ভারতে উপদ্রব করার জন্য লুকাইয়া আসিয়াছেন। এইরূপ লোককে 'কম্বাট'-এর সভাপতি করা হইয়াছে বলিয়া বনভিন মিঃ আদিশিয়ামের উপর দোষ দেন।

মিঃ জীবরত্নম ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া এই সমস্ত মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ জানান ও বনভিনের কুশাসন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলেন। আসল ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ফরাসী ভারতের গবর্ণমেন্টের কাছে কড়া আদেশ জারী করেন। বনভিনকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা অবিলম্বে দরকার কিনা জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ জীবরত্নম জানান, গবর্ণর যদি তাহার নীতির পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আর সরাইবার প্রয়োজন নাই। ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে কমরেড সুব্বিয়ার উপর হইতে বহিষ্কার আদেশ উঠাইবার জন্য ঔপনিবেশিক মন্ত্রী নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'কম্বাটে'র একটি কমিটী বিচার বিবেচনার পর বনভিনের অভিযোগের জবাবে কমরেড সুব্বিয়াকে ফরাসী ভারতের 'নাগরিক অধিকার সম্পন্ন' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। মিঃ জীবরত্নম ও মিঃ আদেশিয়াম 'কম্বাটে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ফরাসী ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেন। মিঃ জীবরত্নম কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। আলজিয়ার্স স্থিত 'কম্বাটে'র সভাপতি রেনে কাপিটাত ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া ফরাসী ভারতের দাবীদাওয়ার বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন।

ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মতৎপরতা

জীবরত্নমের সঙ্গে ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতার আঁদ্রে মার্তির দেখা হয়। আঁদ্রে মার্তিকে জীবরত্নম ফরাসীভারতের কথা জানান। আঁদ্রে মার্তি বলেন যে 'পিপলস্ ওয়ার' কাগজ ও তাহাদের তারের সংবাদ তিনি পাইয়া থাকেন। আঁদ্রে মার্তি নিজে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার সেক্রেটারীর সঙ্গে জীবরত্নমের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সময় জীবরত্নম বুঝিতে পারেন যে তিনি ইতিমধ্যে যাহার যাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং যে যে বিষয়ে কথা বলিয়াছেন তাহা আঁদ্রে মার্তি সবই জানেন। ইহাতে তিনি অবাক হইয়া যান। জীবরত্নমের ধারণা কম্যুনিষ্ট পার্টি ওখানে প্রত্যেকটী লোকের সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে। জীবরত্নম নিজে একজন উদারনৈতিক মতাবলম্বী লোক তবু তাহার ধারণা জন্মিয়াছে যে দ্বিতীয় ফ্রন্টের আক্রমণ যতই শক্তিশালী হইবে ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীও ততই আত্ম প্রকাশ করিতে থাকিবে। তাহার ধারণা যে ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টিই জনসাধারণের অধিকাংশের বিশ্বাস ভাজন এবং স্বাধীন ফরাসী সোভিয়েট ফরাসী হইয়া যাইবে। আলজিয়ার্সে বসিয়া জীবরত্নম দেখিয়াছেন যে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রাণপণে ক্ষমতালাভের চেষ্টায় আছে, দ্বিতীয় ফ্রন্টের নামে ফরাসীভারতের আন্দোলনকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ফরাসীর জাগ্রত জনগণ ও ফরাসী ভারতের জাগ্রত ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জনগণ প্রতিক্রিয়াশীলতার এই শেষ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবে এই বিশ্বাস জীবরত্নম বহন করিয়া আনিয়াছেন।

চীনের বিপজ্জনক অবস্থা

গণতন্ত্র বিরোধীদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত

সম্প্রতি আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালেস চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া চীনের অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। মিঃ রুজভেল্টের একটি বক্তৃতাতেও ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়া গিয়াছে।

এক কথায় রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া চীনের অভ্যন্তরে আজ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। চীনের সব থেকে বড় দল কুয়োমিংটাং-এর কয়েকজন নেতার মধ্যে এখনও জাপানকে তোষণের মনোভাব এত বেশী এবং অপর পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ এত প্রবল যে তাঁহারা প্রাণপণে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করিতেছেন। ইহার ফলেই আজ আমরা দেখিতে পাই কমিউনিস্টদের বর্ডার এলাকায় ৫ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা নাকি চীনের সেরা ফৌজ। সোভিয়েট জনগণের মুখপত্র 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী' পত্রিকায় বলা হইয়াছে, চীনে ৩০ লক্ষ লোকের বিরাট বাহিনী আজ বিশাল চীনদেশে জাপানীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আর যুগোস্লাভিয়ার অপ্রশস্ত ভূভাগে মার্শাল টিটোর ৩ লক্ষ লোকের বাহিনী যন্ত্রসজ্জিত পরাক্রান্ত জার্মাণদের ক্রমাগত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইতেছে। চীন তাহার জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতেছে না। আজ যদি যুদ্ধ জয়ের জন্য চীনের সমস্ত সম্পদ নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে অস্ত্রের জন্য মিত্রপক্ষের মুখের দিকে চীনকে আর তাকাইয়া থাকিতে হইত না।

কয়েকমাস আগে চিয়াংকাইশেকের 'চীনের ভবিষ্যৎ' নামক পুস্তকটি উপলক্ষ করিয়া দেশবিদেশে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারাই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহারাই এই গ্রন্থটিকে একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। এই আন্দোলনের ফলে এই পুস্তকটির ইংরাজী অনুবাদ হইতে পারে নাই। চিয়াংকাইশেক এই গ্রন্থে শুধু যে উদারনীতি ও কমিউনিজমের নিন্দা করিয়াছেন ও চীনের ইতিহাস বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাই নহে—তিনি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা জঙ্গী-ফ্যাশিজম ও নয়া স্বেচ্ছাতন্ত্রের জয়গান গাহিয়াছেন।

সম্প্রতি কুয়োমিংটাংয়ের এক বৈঠকে সান ইয়াৎ-সেনের পুত্র ডাঃ সান-ফো গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কুয়োমিংটাংয়ের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। চুংকিংয়ের কঠোর সেন্সার সত্ত্বেও বিদেশে তাঁহার বক্তৃতার যতটুকু অংশ পৌঁছাইয়াছে, আমরা তাহার সারাংশ তুলিয়া দিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন, 'সান ইয়াৎ সেনের তিনটি গণতান্ত্রিক নীতি সত্যিকার কাজে পরিণত করিতে হইলে কুয়োমিংটাংকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কুয়োমিংটাং নূতনভাবে গঠিত হইবার পর ২০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার কাজকর্মে গণতন্ত্রের নাম গন্ধও নাই। কুয়োমিংটাংয়ের ভিতরে অথবা বাহিরে সমালোচনা দণ্ডনীয়। কুয়োমিংটাং চীনের ৪৫ কোটি জনসাধারণের শতকরা ১ জন লোকেরও নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়—কিন্তু তবুও ইহা নিজেকে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিয়া মনে করে। কুয়োমিংটাংকে আজ এই অসহিষ্ণুতার নীতি পরিহার করিতেই হইবে।

সর্বসাধারণ দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীগুলিরও নির্বাচনের সহিত সংস্রব নাই। প্রাদেশিক সভার একজন সদস্যও প্রদেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয় নাই। আজ চীন দেশে একটি দলের সর্বময় কর্তৃত্বের ফলে ও সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও সভাসমিতির উপর কঠোর বিধিনিষেধের ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকার জনসাধারণ কুয়োমিংটাংয়ের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে। কুয়োমিংটাংয়ের গণতন্ত্র বিরোধী নীতির ফলে এমন কি বিদেশের ধনিকশ্রেণীর মুখপত্রগুলিও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পড়িতেছে।'

আশা করি ডাঃ সান-ফোর এই সমালোচনায় কুয়োমিংটাংয়ের কর্তাদের চোখ খুলিবে। আজও জাপানী দুষমনরা হেংইয়াং শহর গ্রাস করার জন্য উদ্যত হইয়া ছুটিয়াছে। চীনের পুঞ্জীভূত শক্তি আজ জাপানী শয়তানদের যাহাতে দেশ হইতে উৎখাত করিতে পারে, তাহার জন্য জাতীয় ঐক্যের নীরন্ধ্র প্রাচীর গড়িয়া উঠুক, গৃহবিবাদ ধ্বংস হউক। আমরা ভারতবাসীরাও ৪০ কোটির ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া চীনবাসীর ঐক্যের মনোবল গড়িয়া তুলিব। ভারত ও চীনের মৈত্রী এই পথেই অটুট থাকিবে।

মুক্তির পথে ইতালী

ঠিক এক বৎসর পূর্বে আমেরিকান বাহিনী ইতালীর পাদদেশে সিসিলি দ্বীপের রাজধানী পালের্মো দখল করিয়াছিল। তাহার পর অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। যতদিন সম্ভব সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রবাহিনী যেন কচ্ছপগতিতে যুদ্ধ করিয়াছিল; পুনরধিকৃত অঞ্চলে সামরিক শাসন বাহাল রাখার চেষ্টা চলিয়াছিল; ইতালিয়ান সরকারকে স্বীকার না করিয়া, ইতালীর জনগণের দাবী কাণে না তুলিয়া, কেবল সামরিক উপায়ে যুদ্ধজয়ের কথা মিত্রপক্ষের অনেকেই বলিতেছিলেন।

লড়াইয়ের চেহারা বদলাইয়াছে

সেদিন আজ আর নাই। সোভিয়েটের আগ্রহে সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর ইতালিয়ানদের বুকের উপর হইতে মিত্রপক্ষকে সরাইতে হইয়াছে। ইতালিয়ান সরকারকে স্বীকার করার পর তাহা সকল দলের প্রকৃত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছে; মুসোলিনির পৃষ্ঠপোষক রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ও পুরানো বন্ধু বাদোগ্লিয়াকে অবসর লইতে হইয়াছে। ইতালীর জনশক্তি যথাসাধ্য মিত্রপক্ষের অগ্রগতিকে আজ সাহায্য করিতেছে, সারা ইতালীর মুক্তির দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কমিশন ঘোষণা করিয়াছে যে ২০শে জুলাই তারিখে ইতালিয়ান সরকারের হাতে পাঁচটী প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং রোম সমেত আরও তিনটী প্রদেশ ১৫ই আগষ্ট হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে ইতালিয়ান সরকারের শাসনে দেড় কোটী অধিবাসী—দেশের একতৃতীয়াংশ থাকিবে।

জনজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রগতির হার বাড়িয়া চলিয়াছে। রোম দখল করিবার পূর্বে যে অচল অবস্থা আসিয়াছিল, রোমের দক্ষিণে মিত্রপক্ষের যেন কাদায় হাঁটু বসিয়া গিয়াছিল, সেদিন আর নাই।

সম্প্রতি ইতালিয়ান রণক্ষেত্র হইতে খুবই ভাল খবর আসিয়াছে। আর্ণো নদী ধরিয়া পঞ্চম বাহিনী যে অভিযান চালাইয়াছে, তাহার ফলে ইতালীর একটা প্রধান বন্দর লেগহর্ণ মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে। অষ্টম বাহিনীর পোলিশ সিপাহীরা আনকোনা বন্দর ও শহর দখল করিয়াছে। আর্ণো নদীর উত্তরে মিত্রবাহিনী বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাস বিখ্যাত পিসা শহর প্রায় মিত্রশক্তির হাতের মুঠির মধ্যে আসিয়াছে। ইতালীর শ্রেষ্ঠ শহরগুলির অন্যতম, ইয়োরোপের শিল্পকলায় এক প্রধান কেন্দ্র, ফ্লোরেন্সের দিকে মিত্রবাহিনী চলিয়াছে। প্রায় আড়াই মাসের যুদ্ধে ত্রিশ হাজারেরও বেশী শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে।

উত্তর ইতালীর জনজাগরণ

হিটলারী মার্শাল কেসেলরিং যেভাবে উত্তর ইতালীতে যুদ্ধ ব্যাপার জার্ম্মাণ কর্তৃত্ব কায়েম করিতেছে, তাহাতে মুসোলিনির সর্দ্দার পাণ্ডা গ্রাৎসিয়ানি পর্য্যন্ত চটিয়া কাজে ইস্তফা দিয়াছে। ইতালীয় জনশক্তির কেন্দ্র হইল উত্তরে—মিলান, জেনোয়ার মত শহরে শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ ক্রমেই উগ্রতর হইতেছে। জেনোয়ার কাছে জার্ম্মাণদের গুলি চালাইয়া ক্রুদ্ধ জনতাকে ভাঙিয়া দিতে হইয়াছে। উত্তর ইতালীর নানাস্থানে কারখানায় কারখানায় ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আয়োজন চলিতেছে।

ইতালীর নূতন প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা ফ্যাশিস্ট আঞ্জুমানগুলির ধ্বংসাবশেষকে চূর্ণ করিয়া ফ্যাশিস্ট আমলে যাহারা জাঁকাইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। যুদ্ধের গতি আজ সর্ব্বত্র যে বেগে চলিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই সমগ্র ইতালী ফ্যাশিস্টকবলমুক্ত হইবে, নবজাগ্রত জনসাধারণ স্বেচ্ছায় নিজেদের নূতন শাসনবিধি বাছিয়া লইবে।

'বাংলার দুর্ভিক্ষ মিটাইতে একযোগে কাজ কর'

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ডাক

যুগান্তরের প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন:

বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে এবং হাসপাতালে দুঃস্থদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। বাংলায় দুর্ভিক্ষের জের এখনও চলিতেছে। এখন হইতে যদি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। এই বিরাট কর্ত্তব্য সমাধানের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। (যুগান্তর, ২৫শে জুলাই)

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—সোভিয়েট সেনা প্রকাণ্ড জার্ম্মাণ ঘাঁটি লুবলিন সহর দখল করিয়াছে। লুবলিন ছিল ওয়ারশ রক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। লভোভ সহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। সিডলিস ও ইয়ারোস্লাভ লালফৌজ দখল করিয়াছে। সিডলিস ওয়ারশ যাইবার রাস্তায় ও ইয়ারোস্লাভ দক্ষিণ পোলাণ্ডের প্রকাণ্ড ঘাঁটি ক্রাকো যাইবার রাস্তায়। পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশর দিকে লালফৌজ ধাইয়া চলিয়াছে। তিন দিক হইতেই অভিযান সুরু হইয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—মন্টিটের দক্ষিণে বৃটিশ সেনা তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—আমেরিকান সৈন্য ম্যারিনা ডি পিসা দখল করিয়াছে। পিসা হইতে ইহা ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বন্দর। মিত্রসেনা ফ্লোরেন্স সহর হইতে আর মাত্র ১২ মাইল দূরে আছে। ৮ম আর্ম্মি টেরানিউভা সহরটি দখল করিয়াছে।

প্যাসিফিক ফ্রণ্ট—মিত্রসেনা ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ান দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

চোরাকারবারী জব্দ হইতেছে

নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে চাউলের দর কমতির মুখে

কমরেড রণধীর দাসগুপ্ত জানাইতেছেন:—

চট্টগ্রামে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে চাউলের দর ছিল ৩২৲ মণ। গ্রামে শতকরা ১০ জন লোকের জন্য রেশনিং চালু হওয়া সত্ত্বেও চাউলের দাম বাড়িতেছিল।

কিন্তু রেশনিং বাড়াইতে হইবে এই আন্দোলনের ফলে এখন পটিয়া প্রভৃতি থানায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ জনের রেশনিং চালু হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দামও কমিয়া ২৭৲ মণ হইয়াছে।

নোয়াখালী হইতেও খবর পাওয়া গিয়াছে:

সহরে রেশনিং চালু করার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। রেশনিং-এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ কৃষকের মনে ভরসা আসিয়াছে যে ব্যবসায়ীরা ধান চাউলের কারবার ইচ্ছামত চালাইতে পারিবে না। কাজেই ধান চাউলের দাম বাড়ার সম্ভাবনা নাই। এই চিন্তা করিয়া কৃষকরাও যার যা ধান ছিল, বাজারে ছাড়িতেছে। ইহারই ফলে ধান-চালের দর কমিতেছে। বর্ত্তমানে চাউলের দর ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা মণ।

এই দুই জেলার খবরে ইহাই প্রমাণ হয় যে, চোরাবাজারের পথ বন্ধ হইলে চাউলের দর কমিবেই। রেশনিং দ্বারাই চোরাবাজারকে জব্দ করা যায়, তাই যেখানেই রেশনিং ব্যাপক হইতেছে, সেখানেই চাউলের দর কমতির মুখে। সরকার এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা লাভ করুন।

Regd. No. C. 2836

খাস জার্ম্মাণীতে হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

রেডিওতে নাৎসীবাদ ধ্বংস করিবার উদাত্ত আহ্বান

২০শে জুলাই জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী হইতে জানানো হইয়াছে যে আজ উগ্র বিস্ফোরক বোমা ফেলিয়া হিটলারকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। হিটলারের সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন আহত হইয়াছে। হিটলার বাঁচিয়া গিয়াছে।

তারপর ২১শে জুলাইয়ের খবর—জার্ম্মানীতে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। হিটলার এক বক্তৃতায় বলিয়াছে যে যাহারা এই ষড়যন্ত্রের জন্ত দায়ী জার্ম্মানীতে ১৯১৮ সালের অবস্থা সৃষ্টি করাই ছিল তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ষড়যন্ত্রকারিগণ একদল নাৎসী সামরিক কর্মচারী। জেনারেল বেক অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী।

সেইদিন আবার নিজেকে জার্ম্মান সমর বিভাগের অফিসার বলিয়া পরিচয় দিয়া একজন অফিসার ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট বেতারে তাহার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তাহার ঘোষনায় বলা হইয়াছে, **জার্ম্মান অফিসারদের দুষ্কার্য্যের জন্য হিটলারই দায়ী।** তিনি তাঁহার সহযোগীদের প্রশ্ন করেন—'আপনারা কি গেষ্টাপোর নোংরামী সহ্য করিবেন। অস্ত্রশস্ত্র দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে সজাগ হইয়া আপনাদের ভিতরকার অনৈক্য মিটাইয়া ফেলুন।'

ইহাছাড়া মাঝে মাঝে অন্যান্য বেতার কেন্দ্র হইতেও জার্ম্মান সরকারী ঘোষণায় মাঝে মাঝে শোনা যায়—হিটলারের পতন চাই।

২২শে জুলাইয়ের সংবাদ—মাদ্রিদ হইতে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে বলা হইয়াছে যে জার্ম্মান দুতাবাস কর্তৃক প্রচারিত বিবৃতিতে দক্ষিণ জার্ম্মানীতে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া জানা যায়। এই স্থানে কয়েকদল সৈন্য বিদ্রোহ করিয়াছে।

আনকারা হইতে ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের সংবাদদাতা জানাইতেছেন "জোর গুজব হিটলার গ্রেপ্তার হইয়াছেন"।

জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীর রেডিও হইতে আজ রাত্রিতে বলা হইয়াছে—জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের একটী 'ষড়যন্ত্রকারী দল' বার্লিনের সরকারী গৃহগুলি দখলের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ডাঃ গোয়েবেলস্ উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

বৃটিশ বেতারের ষ্টকহলমস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন—সামরিক ক্ষেত্রে হিটলারের বিরোধী দলের নেতারা জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে কোন স্থানে সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ফিল্ড-মার্শাল কাইটেল, ব্রাউশিচ ও বক। বহু সেনাপতি বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। জার্ম্মানীর অনেকগুলি সহরের রাজপথে সৈন্য দল ও এস, এস, বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা

মস্কো রেডিও ২২শে জুলাই এক গুপ্ত জার্ম্মান রেডিও কেন্দ্র কর্তৃক ঘোষিত নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচার করিয়াছে:—জার্ম্মান সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার-দিগকে লইয়া এক নূতন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর কয়েকটি অঞ্চল উহার শাসনাধীনে। ঐ সকল অঞ্চলের সমস্ত নাৎসী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফন কাইটেল, কর্ণেল জেনারেল ফ্রম, জেনারেল ব্রাউশিচ, জেনারেল হালডের এবং জেনারেল) ফন বক নূতন গভর্ণমেণ্টে রহিয়াছেন।

হিটলারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান

২১শে জুলাই জার্ম্মানীর সমস্ত রেডিও কেন্দ্র বন্ধ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একজন ঘোষনাকারী বলেন—'আপনারা রেডিও সেট ছাড়িয়া যাইবেন না।' তারপর নীচের আবেদন জানানো হয়—কমরেডগণ, প্রতিরোধ কারী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের আদেশ-ক্রমে আমি ঘোষণা করিতেছি যে কর্ণেল ষ্টাউফেনবার্গ আদেশ পালন করিয়াছেন এবং নাৎসী গভর্ণমেণ্টের উপর প্রথম আঘাত হানিয়াছেন। প্রথম কাজ অর্থাৎ হিটলারের জীবন নাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ফন ষ্টাউফেনবার্গ মারা গিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ কাজ চলিতেছে। আমরা জার্ম্মান অফিসারগণ হিটলার ও তাহার দলের বিরুদ্ধে নির্ম্মম ও দ্বিধাহীন ভাবে সংগ্রাম চালাইতেছি। **এই পাপ শাসন ব্যবস্থার চুড়ান্ত অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালাইব।**

কমরেডগণ, ফন ষ্টাউফেনবার্গের মৃত্যু আমাদের প্রতি সমস্ত শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিবার আহ্বান—আমাদের প্রতি হিটলারের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার আহ্বান। আজ হিটলার ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, জার্ম্মান অফিসার শ্রেণীর যে অংশ ভদ্র ও সাধু সেই অংশ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। আজ আর সে ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে জার্ম্মান অফিসারগণ তাহার বিরোধী প্রতিরোধের আয়োজন করিতেছেন। সে যদি এখন এই প্রতি-রোধের যুদ্ধকে অচল করিবার চেষ্টা করে এবং বিশ্বাস-ঘাতক ও ধ্বংসকারীদের এক ক্ষুদ্র দলের কথা বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চিত ভাবে জানিয়া রাখুক যে জার্ম্মানীতে একাধিক ষ্টাউফেনবার্গ আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা শতাধিক, হাজার হাজার।

হে হিটলার, জার্ম্মান অফিসারদিগকে একে একে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। কমরেডগণ, এখন প্রত্যেক অফিসারকে বলিতে হইবে তিনি কোন পক্ষে যাইবেন। **যে যেখানেই থাকুন না কেন আমি তাঁহাদিগকে হিটলার বা তাহার অনুচরদের আদেশ আর পালন না করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।** এখন প্রত্যেক অফিসারের কর্ত্তব্য গেষ্টাপোকে অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরোধ করা। তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের পরিচালকের আদেশ ব্যতীত অপর কোন আদেশ পালন করিবেন না। প্রতিরোধ আন্দোলনের তথাকথিত ব্যর্থতা সম্বন্ধে নাৎসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত সমস্ত সংবাদ মিথ্যা। **প্রতিরোধ চলিতেছে।** জার্ম্মান অফিসারগণ, জার্ম্মানী বিপন্ন—যে শাসন চাহে যে জার্ম্মান অধিকৃত দেশগুলিতে, অসামরিক অধিবাসীদিগকে, নারী ও শিশুকে গুলী করিয়া হত্যা করা হউক, অযথা জার্ম্মান সৈন্যের জীবন বলি দেওয়া হউক, কোন জার্ম্মান অফিসার সেই শাসনের পক্ষে যোগ দিলে ঘৃণা অর্জন করিবেন। **আমরা এই শাসনের বিলোপ ঘটাইব।** এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত কোন ত্যাগই বড় নয়।

আমরা একত্র দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। এখন আমাদের পিতৃভূমিকে নাৎসী বিভীষিকা হইতে মুক্ত করিতে হইবে বলিয়া আমরা এইরূপ একত্র থাকিব। হে হিটলার, তুমি আমাদের সহকর্মী যে অফিসারদের হত্যা করিয়াছ তাহাদের মৃত্যুতে আমরা ভয় পাইয়া নিরস্ত হইব না।

স্বাধীন জার্ম্মানীর বেতার কেন্দ্র হইতে গত রবিবারের আহ্বান

জার্ম্মান অফিসারগণের উদ্দেশ্যে ২৩শে জুলাই বেতারে ঘোষণা করা হয়—কমরেডগণ, আপনাদের ভিতর হইতে ষ্টাউফেনবার্গের মত বীর আসিয়াছে। হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনারা অগ্রণী সৈনিক হউন। আপনাদের সেনাদের আপনারা এই হিটলার বিরোধী যুদ্ধে পরিচালনা করুন জার্ম্মান সেনাদলের প্রভুত্ব হিটলার, হিমলার, গুদেরিয়ান গোয়েবলস ও গোয়েরিং-এর মত লোকদের হাত হইতে কাড়িয়া লউন, এই সংগ্রামে এক হইয়া দাড়ান। হিটলার ও তাহার সঙ্গীদের ধ্বংস করিতেই হইবে।

২৩শে জুলাইয়ের খবর: হিটলার তাহার প্রধানস্থ সমস্ত ফ্রণ্টের সমর নায়কদের একটি বৈঠক ডাকিয়াছে। জার্ম্মান সৈন্যদের মধ্যে এই গোলমাল কি ভাবে রোধ করা যায় বৈঠকে তাহাই আলোচনা হইবে।

বিদেশস্থিত সমস্ত খবর হইতে জানা গিয়াছে মিউনিক, ষ্টাটগার্ট, ড্রেসডেন, লিনজ এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য স্থানের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বিদ্রোহ করিয়াছেন এবং অনেক সৈন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। অবশ্য তুমুল গৃহ যুদ্ধের কথা সমর্থিত হয় নাই।

হিটলারী ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য্য

উপরোক্ত খবরগুলি হইতে এটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরে দারুণ গোলযোগ সুরু হইয়াছে। হিটলারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ সেনা বাহিনীর একদল নামজাদা অধিনায়ক প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ খবরও পাওয়া গিয়াছে যে জার্ম্মাণীর একটা অংশ হিটলার বিরোধীদের অধিকারে আছে এবং তাঁহারা একটা নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জেনারেল কাইটেল, ব্রাউশিচ প্রভৃতি হিটলারবিরোধী সেনাপতিরা এখনও নিরাপদেই আছেন। হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিস্তারের জন্য, নাৎসী শাসন ও নেতাদের উচ্ছেদের জন্য, ষ্টাউফেনবুর্গের হত্যার প্রতিশোধের জন্য হাজার হাজার জার্ম্মাণ সৈন্যের নিকট রেডিওযোগে একটি দেশপ্রেমিক আহ্বান জানানো হইয়াছে।

লালফৌজের দুর্ব্বার অগ্রগতি ও অন্যান্য ফ্রণ্টে মিত্রবাহিনীর সাফল্যে ইয়োরোপে হিটলারের 'দুর্ভেদ্য দুর্গের' প্রাকার ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। হিটলারের যে সামরিক যন্ত্র জার্ম্মাণী ও হিটলার পদানত ইয়োরোপে ভীতির বস্তু ছিল আজ তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। নাৎসী সমর যন্ত্র যে দ্রুত বিকল হইয়া যাইতেছে হিটলারের বিরুদ্ধে সমর নায়কদের এই বিদ্রোহ তাহারই আভাষ—ইহা জার্ম্মাণীর নিশ্চিত পরাজয়ের ও হিটলারবাদ ধ্বংসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। নাৎসী কুশাসনে জর্জ্জরিত জার্ম্মাণ জনগণ আজ যে আর হিটলারকে বরদাস্ত করিবে না, এই বিদ্রোহে তাহারও ছাপ রহিয়াছে। ইতিহাসের এই চরম সন্ধিক্ষণে হিটলারী ব্যবস্থাকে নির্ম্মূল করিতে মিত্র-শক্তির আরও জোর ও ব্যাপক আঘাত হানিতে হইবে; তবেই জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ হিটলারবিরোধী সংগ্রাম দ্রুত শক্তিশালী হইয়া মুমূর্ষু হিটলারবাদকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

হিটলারের স্বপ্ন উল্টা ফলিল

মস্কো হইতে ১৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ২০ জন জার্ম্মাণ জেনারেল ৫৭০০০ জার্ম্মাণ সৈন্যকে রেড স্কোয়ারের ভিতর দিয়া 'মার্চ্চ' করাইয়া বন্দীশালার দিকে নিয়া গিয়াছে। তিন বৎসর আগে হিটলার চাহিয়াছিল তাহার বিজয়ী সৈন্য রেড স্কোয়ারে 'মার্চ্চ' করিবে, আর আজ তিন বৎসরে পরে তাহারা সেখান দিয়াই মার্চ্চ করিয়া গিয়াছে, তবে বিজয়ী বীর হিসাবে নয়, হতমান বন্দী ফৌজ হিসাবে।

জার্ম্মাণীর অভিমুখে লালফৌজ

এ সপ্তাহেও রুশ অগ্রগতির দুর্দ্দমনীয়তা এতটুকুও ব্যাহত হয় নাই। এই ফ্রণ্টের গত তিন সপ্তাহের যুদ্ধ খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিলে লালফৌজের বর্ত্তমান দুর্ব্বার গতির নিশানা খুবই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক সহর লালফৌজের অধিকারে আসার পর তাহাদের পক্ষে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আগাইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মিনস্কের পর দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পিনস্কে ও উত্তর-পশ্চিমদিকে ভিলনায় আবার লালপতাকা উড়িতেছে। পিনস্ক দখলের দ্বারা প্রিপেট জলাভূমিতে জার্ম্মানদের আত্মরক্ষার একটি বড় ঘাঁটি নষ্ট হইয়া গেল। ইহার সহিত রেলপথে ব্রেষ্টলিটভস্ক সহরের যোগ আছে—তাই আজ ব্রেষ্টলিটভস্ককে রক্ষা করা জার্ম্মাণদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ব্রেষ্টলিটভস্ক যে কোন মুহূর্ত্তে লালফৌজের হাতে আসিতে পারে। সোভিয়েট বাহিনী বর্ত্তমানে বিপুলবেগে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার দিকে ধাইয়া চলিয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রদনো সহর দখল করিয়াছে। গ্রদনো—বিয়ালিষ্টক ও ভিলনার মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব-প্রুশিয়া হইতে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে। লালফৌজ মাত্র দুই দিনের যুদ্ধে গ্রদনো সহর বিপযস্ত জার্ম্মানবাহিনীর হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। গ্রদনো মধ্য পোলাণ্ডের রাস্তা ও রেলপথ যোগাযোগের সঙ্গমস্থল সুতরাং এই দিককার এই অভিযানে একদিকে পোলাণ্ড ও অন্যদিকে বালটিক্ রাষ্ট্রের সীমানায় পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার বিশেষ বিপদ দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সীমানায় ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এবং লালফৌজ অগষ্টোভোতে পৌছিয়াছে। অগষ্টোভো পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে মাত্র ৮ মাইল দূরে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়া ও লিথুয়ানিয়া রাজ্যের মধ্যে নিয়েমেন নদী। নিয়েমেন নদীর সুযোগ লইয়া জার্ম্মাণরা যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাও লালফৌজের লৌহদৃঢ় আঘাতে চূর্ণমার হইয়া যাইতেছে।

পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস অভিমুখে রুশ অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য উত্তরে ছিল গ্রদনো আর দক্ষিণে ছিল বিয়ালিষ্টক ও ব্রেষ্টলিটভস্ক। মার্শাল রকোসভস্কী যখন ব্রেষ্টলিটভস্কের দিকে তাঁহার বজ্রদৃপ্ত বাহু বাড়াইয়াছেন তখন পলায়মান বিশৃঙ্খল নাৎসী বাহিনীকে পিছু হটিতে হইবেই। ২২শে জুলাইয়ের খবরে জানা যায়, মার্শাল রকোসভস্কী দুই দিক হইতে ওয়ারসর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাহার এক দল সৈন্য ব্রেষ্টলিটভস্কের উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে অপর একদল সৈন্য বুগ নদী অঞ্চলে জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়া দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। লালফৌজ যদি এই গতিতে আগাইয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে আগামী এক মাসের মধ্যে তাহারা ব্রেসলাউ, ওপেলন প্রভৃতি হিটলারের পূর্ব্বাঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলির উপর আঘাত হানিতে পারিবে।

আরও দক্ষিণে দক্ষিণ-পোলাণ্ডে হিটলারের প্রধান ঘাঁটি লুভোভ সহর দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মার্শাল কনিয়েভের ট্যাঙ্ক ও গোলান্দাজবাহিনী ভীষণ বেগে জার্ম্মাণ ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণরা মরিয়া হইয়া বাধা দিতেছে, কিন্তু রুশ সেনার দাপটে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে।

তোজো গদিচ্যুত

মুসোলিনি তো বহুদিনই কুপোকাৎ হইয়াছে; হিটলারের অবস্থা সঙ্গীন; আর এদিকে তোজোকে সরাইয়া জাপানী ফ্যাশিস্টরা নূতন করিয়া তোড়জোড় করিতেছে।

মিত্রপক্ষের হাতে বেশ কিছু মার খাইয়া জাপানীরা অবশ্য খানিকটা ঘায়েল হইয়াছে; মার্কিন নৌবাহিনীর কাছে মারিয়ানা অঞ্চলে বার বার পরাজয়ই হইল প্রথমে নৌসেনানায়ক শিমাদা ও তাহার পর তো তোজোর পদচ্যুতির কারণ। কিন্তু বাঘের মত কোরিয়ার উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া যাহার নাম, সেই কোইসো হইল নূতন প্রধান মন্ত্রী। সোভিয়েটকে আক্রমণ করার স্পর্দ্ধা ইহাদের আজ নাই বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিতালি কায়েম করিয়া লড়াই চালানো ইহাদের মতলব। বে-গতিক দেখিলে মিটমাটের কথা চালানো যাহাতে আবার অসম্ভব হইয়া না পড়ে, সেজন্য য়োনাইয়ের মত নরমপন্থী বলিয়া পরিচিত দুই একজনকে মন্ত্রি সভায় লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদেশের জনসাধারণ চায় ফ্যাশিজমের ধ্বংস; জাপানের কাছ হইতে তাই বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ আদায় করিতেই হইবে।

বিখ্যাত সোভিয়েট পত্রিক 'প্রাভদা' পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের আলোচনা করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে এবারকার অভিযানে লালফৌজ জার্ম্মাণদের সৈন্যদলের এক চতুর্থাংশকে ঘায়েল করিয়াছে।

সোভিয়েট বাল্টিকের মুক্তি আসন্ন

অষ্ট্রভ দখলকারী লালফৌজ দ্রুত আগাইয়া গিয়া অষ্ট্রভ-দভিনস্ক সড়কে পৌছিয়াছে। ২৩শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ লালফৌজ সুরক্ষিত জার্ম্মাণ ঘাঁটি পস্কভও দখল করিয়াছে। এস্তোনিয়া ও উত্তর ল্যাটভিয়ার প্রবেশের পথে অষ্ট্রভ ও পস্কভ ছিল নাৎসীদের শেষ ভরসা। এই দুইটী শক্ত ঘাঁটি আজ লালফৌজের হাতে আসাতে জার্ম্মাণরা এখন আর যে এ অঞ্চলে টিঁকিতেই পারিবে না তাহার প্রমাণ সর্ব্বশেষ সোভিয়েট অগ্রগতির খবর হইতেই বুঝা যায়। এক সপ্তাহ আগে জেনারেল এরমেঙ্কোর দ্বিতীয় বাল্টিক আর্ম্মি জেনারেল বাগ্রেমিয়ানোর প্রথম বাল্টিক আর্ম্মির সহযোগে রিগা এবং বাল্টিক সাগরের তীরের দিকে অভিযান সুরু করিয়াছিল। ইতিমধ্যেই ইঁহারা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন এবং রিগা পুনরধিকারের লড়াইয়ের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হইয়াছে। জার্ম্মাণদের সৈন্য অপসারণের রিগা সর্ব্বশেষ বন্দর। ইহা ব্যতীত ফিনল্যাণ্ডে যাইবার ইহাই সবচেয়ে সোজা পথ। তাহা ছাড়া রিগা যাহাদের অধিকারে থাকিবে তাহারাই বাল্টিক সাগরে প্রভুত্ব করিতে পারিবে।

সোভিয়েটের সীমানা পার হইয়া আজ লাল-ফৌজকে পলায়মান আহত নাৎসী দানবকে ধাওয়া করিতে হইবে। বর্ব্বর শত্রুর পতন আসন্ন বলিয়াই তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। হিটলারবাদের ধ্বংস-স্তুপের উপর নয়া-দুনিয়া বনিয়াদ গড়ার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব লালফৌজের উপর পড়িয়াছে, তাহার সাফল্য না হওয়াপর্য্যন্ত নাৎসীবাদের উপর আঘাত থামিবে না, থামিতে পারে না।

৫৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা] ২রা অগাষ্ট, বুধবার, '৪৪, ১৭ই শ্রাবণ '৫১ [দাম ছ' পয়সা

"ডেলি ওয়ার্কারের" প্রতিনিধির সহিত গান্ধীজি

অচল অবস্থার সমাধান করিতেই হইবে

"অগাষ্ট প্রস্তাবের যে অংশে জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করা হইলে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন করার কর্ত্তৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল, প্রস্তাবটীকে এখন সেই অংশটুকু বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।"

লণ্ডনের "ডেলি ওয়ার্কার" পত্রিকার ভারতস্থ বিশেষ সংবাদদাতা মোহন কুমার মঙ্গলমের সহিত গত ২৮শে জুলাই মহাত্মা গান্ধীর যে বিশেষ আলোচনা হয় তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি এই কথা বলিয়াছেন। আলোচনার মর্ম নীচে দেওয়া হইল।

গান্ধীজিকে প্রশ্ন করা হয়,—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের যুদ্ধব্যবস্থায় কি পরিমাণ পরিবর্ত্তন আসিবে? ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রকৃতি কি ধরণের হইবে?

মহাত্মাজী বলেন যে এ প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর প্রয়োজন। মিত্রশক্তির সংগ্রামে নৈতিক বল জোগানই গান্ধীজির প্রস্তাবের ভিত্তি। তিনি বলেন,—"মিত্রশক্তি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করিতেছে, সুতরাং দুনিয়ার সমস্ত শোষিত জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ভারতের স্বাধীনতার দাবী সোজাসুজি মানিয়া লওয়ার পর আমার প্রস্তাবিত গণ্ডী অনুযায়ী দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধোদ্দেশ্যের প্রকৃতি বদলাইয়া যাইবে এবং মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যকে অক্ষশক্তির মতলব হইতে পৃথক করা যাইবে।" গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইবে তাহার বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে তিনি এখন যাইবেন না। মোট কথা, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া যাইবে এবং তিনি জোর দিয়া বলেন নিশ্চয়ই ইহার পরিবর্ত্তন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক সমস্ত কিছুই হইবে। কিন্তু যাহাই হোক, গান্ধীজি তাঁহার প্রস্তাব খাঁটি নৈতিক ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া চান। তিনি এই প্রশ্নের আলোচনা শেষ করিয়া বলেন,—"আমার দৃঢ় ধারণা যে আমার প্রস্তাব সম্মানজনক আপোষের কথাবার্ত্তা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির ভিত্তি রচনা করিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও খুঁটিনাটি ব্যাপারের সিদ্ধান্ত পরে হইবে। আমি ইচ্ছা করিয়াই সেগুলি এখন ফেলিয়া রাখিয়াছি।"

তারপর গান্ধীজিকে প্রশ্ন করা হয় যে বিলাতের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজি এখনো 'ভারত ত্যাগের' প্রস্তাব আঁকড়াইয়া আছেন এই বলিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। তাহারা অগাষ্ট প্রস্তাবের জ্বলন্ত ফ্যাসিজম-বিরোধিতা ও দেশপ্রেমের লক্ষ্য সম্পর্কে বৃটেনের জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখিবার জন্য ঘটনার অপব্যবহার করিতেছে। এই প্রস্তাব নির্দ্দোষ বলিয়া মহাত্মা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আরো পরিস্কার করা দরকার। ইহার উত্তরে গান্ধীজি বলেন,—"সমগ্র প্রস্তাবটি মহৎ। 'ভারত-ত্যাগের' দাবী ভারতের স্বাভাবিক রণ ধ্বনি। প্রস্তাবের যে অংশে জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করা হইলে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন করার কর্তৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল তাহাই হইল বিষের হুল। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই বলিয়াছি যে আমার সে দায়িত্বের অবসান হইয়াছে। আর তাহা না হইলেও বর্তমানে আমি ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন করিতে পারি না। **সুতরাং অগাষ্ট প্রস্তাবটিকে এখন সেই অংশটুকু বাদ দিয়া ধরিতে হইবে। এবং তাহার পর এই প্রস্তাবের একটী কথারও বিরুদ্ধে কাহার কি বলিবার আছে সে সম্বন্ধে আমি চ্যালেঞ্জ করিতেছি।** ভারতের মাটির উপর মিত্রশক্তির যুদ্ধ চলিতে থাকিবে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের সঙ্গে 'ভারতত্যাগের' ধ্বনি একত্র পড়িলে ইহার একমাত্র অর্থ ইহাই হয়—যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় পৃথিবীর শোষিত দেশগুলির মুক্তি তবে যুদ্ধ চলার সময়েই ভারতে বৃটিশ শাসনের শেষ হওয়া উচিত।"

গান্ধীজিকে বলা হয় যে বিলাতের রক্ষণশীল মহল হইতে দারুণভাবে প্রচার করা হইতেছে—গান্ধীজির দাবী মানিয়া লইলে ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির ক্ষতি হইবে। গান্ধীজি জবাবে বলেন,—"এ সবের উত্তর রাজাজীর প্রস্তাবে আছে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে রাজাজীর প্রস্তাবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা-লঘিষ্ঠদেরও সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা চিন্তা করা হইয়াছে। যদি এই প্রস্তাবে কোন ছিদ্র থাকে তাহা পারস্পরিক আলোচনার সময় মিটিয়া যাইবে। এবং এই সমস্ত আলোচনা চূড়ান্ত আপোষের পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইবে।"

গান্ধীজির সহিত আলোচনায় মোটামুটি এই কথা-গুলি পরিষ্কার হইয়াছে:—

(১) ভারত ও মিত্রশক্তির জন্য আমাদের দেশের নেতা গান্ধীজি অতি দ্রুত ভারত-সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যগ্র।

(২) বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কাছে তিনি যে প্রস্তাব

করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতের সংখ্যা লঘিষ্ঠদের দাবী ও অধিকারের প্রতি ন্যায় বিচার অবশ্যই আছে।

(৩) গান্ধীজি কথাবার্ত্তার মধ্যে খুব পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মী ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি গান্ধীজির অচল অবস্থা সমাধানের উদ্দেশ্য সফল করিতে অতিমাত্রায় সাহায্য করিবে।

(৪) বর্তমান অচল অবস্থার সমাধানের জন্য গান্ধীজির তরফ হইতে আপ্রাণ চেষ্টা চলিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমাধানের সাথে সাথে খাদ্য-সংকট ও জনগণের দৈন্য সমস্ত কিছুরই মীমাংসা হইয়া যাইবে। বৃটীশ জনসাধারণকে দেখিতে হইবে যেন তাহাদের গবর্ণমেণ্ট আমেরীর অন্তঃসারশূন্য নেতিবাচক বিবৃতির পশ্চাতে না দাঁড়ায়, যেন বৃটেনের গবর্ণমেণ্ট ভারতের অচল অবস্থা সমাধান করিয়া এসিয়ার যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য সত্যই কোন প্রত্যক্ষ ও কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করে এবং ইহারই ফলে ভারত ও বৃটেনের সম্পর্কের এক নূতন অধ্যায় সুরু হইবে।

বাজার দর কত বাড়িয়াছে

মাছ	১৯৪১ (এপ্রিল)	১৯৪৪ (এপ্রিল)	শতকরা মূল্যবৃদ্ধি	১৯৪৪ (জুলাই)	শতকরা মূল্যবৃদ্ধির হার
রুই, কাৎলা	‖৵০	২৲	৩২০%	২৷৵০	৪৪০%
ইলিশ	‖০	১৷৵০	৩৫০%	২‖০	৫০০%
বাগদা চিংড়ি	‖৵০	২৲	৩২০	২‖৵০	৪২০%
অন্যান্য মাছ	৷৵০	১‖০	২০০	১৷৵০	২৩৩%
তরিতরকারি					
আলু	⁄১০	।⁄০	৩৩৩	।৶০	৭৩৩%
বেগুন	৶০	।⁄০	২৫০	‖⁄০	৪৫০%
ঢ্যাঁড়স	⁄১০	‖০	৪৩৩	‖০	৫৩৩%
কাঁচা লঙ্কা	।০	‖০	২০০	‖০	২০০%
কুমড়ার ফালি	⁄১০	×	×	৵০	৪০০
পেঁয়াজ	৵০	×	×	‖০	৪০০%

উপরে কলিকাতার বাজার দরের হিসাব দেওয়া হইল। এই হিসাব 'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু কলিকাতায় নয়, মফঃস্বলের সহরেও প্রায় এই হারেই বাজার দর বাড়িয়াছে। গরীব লোক দূরে থাকুক, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষেও এই দরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সংসার নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একেই তো অর্থাভাবে কোনো পরিবারের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য কেনা সম্ভব নয়, তাহার উপর মাছ ও তরিতরকারিও যদি অগ্নিমূল্য হয় তা হইলে সহরময় রোগ ও মহামারী দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িবে।

বাজার দর কমাইবার জন্য সরকার কি করিতেছে? শুধু চালানী জিনিষের অভাবেই যে দর বাড়িতেছে তা নয়। গ্রামে রেশনিং নাই, কন্ট্রোল দরে জিনিষ মেলে না, মুনাফালোভী চোরাব্যবসায়ীর হাতে তেল নুন কাপড় প্রভৃতির জন্য গরীব চাষীদের সর্ব্বস্ব ঢালিতে হয়। এই অবস্থায় চাষীর চাষের দ্রব্যের দর কমিবে কি করিয়া? গ্রামে রেশনিং চালু করা হোক, কন্ট্রোল দরে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হোক, খাদ্য কমিটীর হাতে বণ্টন-ব্যবস্থার ভার দেওয়া হোক—চাষীর স্বাভাবিক জীবন ফিরাইয়া আনা হোক—বাজার দর কমাইবার ইহাই পথ।

সম্পাদকীয়

বাংলার কংগ্রেস কোন পথে

গান্ধীজী নিজে জিন্নার কাছে সাক্ষাতের জন্য চিঠি লিখিয়াছেন, জিন্নাও সম্মতি জানাইয়া উত্তর দিয়াছেন। লীগ কাউন্সিলের মিটিং জিন্নাকে আপোষ মীমাংসা চালাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছে। মুসলিমদের আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকার এবং ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে এই দুই নেতার মধ্যে এখন আলোচনা চলিবে। অচল অবস্থা অবসানের আশায় সমগ্র ভারত আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কংগ্রেস এবং লীগের ভেদই এমেরী ও ওয়াভেলের হাতের প্রধান অস্ত্র, আজ ভারতের দুই নেতা অগ্রসর হইয়াছেন সেই অস্ত্র এমেরী ও ওয়া-ভেলের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে।

এই ঐক্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভিযান সুরু করিয়াছেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব বাঙ্গালী হিন্দুর সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে ইহাই শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তব্য। হিন্দু মহাসভার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে রাজাজীর এ প্রস্তাবে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে, আর "কৃষ্টি, সভ্যতা, জাতীয় ঐতিহ্য বিসর্জ্জন দিয়া যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা না পাইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না।"

আসল কথা এই যে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর লক্ষ্য নয় ভারতের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পাই বা না পাই, অচল অবস্থা দূর হউক বা না হউক, মুসলিম লীগের সঙ্গে ঐক্য চাই না, ইহাই তাঁহার নীতি। ইহাই হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা।

কিন্তু যাঁহারা অচল অবস্থা অবসান করিতে চান, যাঁহাদের প্রধান কাম্য ভারতের স্বাধীনতা তাঁহারা গান্ধীজীর প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত তাঁহার বিবৃতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশের কোন অংশকে জোর করিয়া ঐক্যবদ্ধ করা গণতন্ত্র নয় উহা হিটলারতন্ত্র। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির অন্যতম নেতা সীতারাম শাকসেরিয়া প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করিয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু যেন আমাদের আর হিন্দুত্ব শিখাইতে না আসেন। হুগলী জেলার সদর মহকুমার কংগ্রেস কর্ম্মিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে গান্ধীজীর প্রস্তাব ও মতামত তাঁহারা সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া, আরও কয়েকটি জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মী সম্মেলন জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাবের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে।

কিন্তু কিরণশঙ্কর বাবু প্রভৃতি কয়েকজন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা গান্ধীজীকে সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মনে হয় ত এই সন্দেহই প্রবল যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রস্তাব বাঙ্গালার হিন্দু মানিয়া লইবে না। এ বিশ্বাসও হয়ত তাঁহাদের নাই যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য বাংলার কল্যাণ সাধন করিবে। তাই আজ গান্ধীজীর সমর্থনে দাঁড়াইতে ইঁহোরা ইতস্ততঃ করেন এবং শ্যামা প্রসাদবাবুর গান্ধী বিরোধী অভিযানকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেন!

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য বাঙ্গালার হিন্দুকেই সবচেয়ে বেশী লাভবান করিবে। অচল অবস্থাই বাংলায় দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, কংগ্রেস এবং লীগের ভেদাভেদই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়াইয়াছে। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য আজ বাংলারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎ সফল হইলে বাংলার ভেদাভেদ দূর হইবে। রাজনৈতিক অচল অবস্থায় লাভবান্ হইয়াছে আমলাতন্ত্র, ভেদপন্থী মহাসভা এবং চোরাকারবারী ব্যবসায়িগণ। আজ ইহারাই গান্ধীজীর প্রস্তাবে সবচেয়ে আতঙ্কিত। যাহারা অচল অবস্থা চালু রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ হাসিল করিতে চায়, স্বাধীনতা কিংবা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রধান কাম্য নয়। তাহারা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরুদ্ধে যতই চীৎকার করুক না কেন প্রত্যেকটি স্বদেশসেবক বাঙ্গালী গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে তাহাদের উপেক্ষাই করিবে।

তাই আজ কিরণ বাবুর মত কংগ্রেস নেতাদের আগাইয়া আসিতে হইবে গান্ধীজীর ঐক্য প্রস্তাবের সমর্থনে। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কি করিতেছেন?

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা জাগাইয়া গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছেন আর কিরণ বাবুরা কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপদেশ

(দ্বিতীয় কলমে দেখুন)

(চতুর্থ কলমের শেষাংশ)

দিয়াছেন—চুপ কর, কোন মতামত প্রকাশ করিও না!

ইহার ফলে বাংলার কংগ্রেস আত্মহত্যার পথে চলে নাই কি? মহাসভার কাছে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়াই কি কিরণ বাবুর মতে কংগ্রেসের সেবা! কিরণবাবু এ পথ ধরিলে কংগ্রেসের ঐক্য নষ্ট হইবে, কংগ্রেস দুর্ব্বল হইবে, শক্তিশালী হইবে কংগ্রেস-বিরোধী মহাসভা।

বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসুন, গান্ধীজীকে সমর্থন করিতে দ্বিধা কেন? জাতীয় ঐক্যের অমোঘ অস্ত্রে আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিবার জন্য গান্ধীজী অগ্রসর হইয়াছেন, এ সংগ্রামে বাঙ্গালী কখনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। বাংলা চিরদিন আগে আগে চলিয়াছে, আজ কেন সে অগ্রগামীদের পিছনে টানিয়া ধরিবে? স্বাধীনতার নূতন সম্ভাবনা সম্মুখে উপস্থিত; আসুন বাংলার সমগ্র কংগ্রেসকে একতাবদ্ধ করিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জয়ধ্বনি তুলি।

সুরাবর্দী বলেনঃ "দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ কমিউনিষ্টদের অভিসন্ধি মূলক প্রচার!" —অথচ আবার দুঃস্থের ভিড় কেন?

বাংলার উচ্চতর আইন সভায় খাদ্যমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি স্বীকার করিয়াছেন যে চট্টগ্রামে চাউলের দাম মণ প্রতি ৩০ টাকা হইতে ৩২ টাকা, অথচ এই কথা বলার অপরাধে চট্টগ্রামের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মনোরঞ্জন সেনকে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের এক সভায় সুরাবর্দ্দি সাহেব ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের কথা কমিউনিষ্টরা নিজেদের দলগত প্রতিষ্ঠার খাতিরে প্রচার করিতেছে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের দমন করিলে দুর্ভিক্ষ দমন করা যাইবে না, দুর্ভিক্ষ নাই বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইলেই দুর্গত বাংলায় সুখের স্বর্গ নামিয়া আসিবে না। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেককেই আজ প্রকৃত তথ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। তথ্যকে অস্বীকার করিলেই তথ্যের অন্তর্দ্ধান ঘটে না।

কলিকাতায় দুঃস্থবাহিনী

কলিকাতা সহরে এখন আড়াই হাজার দুঃস্থ উপস্থিত। গত বছর এমন সময় হাজার হাজার দুঃস্থ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করিয়া ফিরিত, এবার সে অবস্থা নাই। তাহার কারণ কি এই যে এবার দেশে দুর্গতি নাই? দুঃস্থরা কলিকাতায় আসিলেই তাহাদের সরাইয়া লইবার জন্য যে সরকারী ব্যবস্থা আছে সেইজন্য তাহাদের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় না কিন্তু সরকারী তথ্য হইতেই জানা যায় যে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় দুঃস্থের সংখ্যা ২৫২৮। ৩১শে মে'র পর দুঃস্থেরা সংখ্যায় ৪৪৫ জন বাড়িয়াছে। মে মাস হইতে প্রতি সপ্তাহে উহাদের সংখ্যা নিম্নলিখিত হারে কমিতেছে ও বাড়িতেছেঃ—৩১শে মে—২০৮৩, ৭ই জুন—২,০১৫, ১৪ই জুন ২,২৭৪, ২১শে জুন ২৩৬১, ৩০শে জুন—২৪০২, ৭ই জুলাই ২৬১৫, ১৪ই জুলাই—২৬০৩, ২১শে জুলাই ২৫২৮।

শুধু কলিকাতায় নয়, বাংলার বিভিন্ন সহরে গ্রামাঞ্চল হইতে দুঃস্থেরা আসিয়া হাজির হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মফঃস্বলের একটি উদাহরণ

গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থদের সংখ্যা কিভাবে বাড়িতেছে তাহার এক উদাহরণ পাওয়া যায় মাদারিপুর কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির সহঃ সম্পাদকের বিবৃতি হইতে। তিনি বলিতেছেন "গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮০ জন ভূমিহীন চাষী এবং অন্যান্য গরীব, তাহারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর চাপে শেষ সম্বল পর্য্যন্ত বেচিয়া দিয়াছে, এখন তাহাদের অধিকাংশই নিঃসম্বল।" "কৃষির সংকট উপস্থিত, গ্রাম্যশিল্প ধ্বংসের পথে, বহু লোক তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।" মাদারীপুর বাংলার একটি ঘাট্‌তি অঞ্চল, অধিকাংশ ঘাট্‌তি অঞ্চলেই মাদারীপুরের মত অবস্থা।

বিগত দুর্ভিক্ষের জের

গত বছরের তুলনায় দুঃস্থদের সংখ্যা এ বছর অনেক কম কিন্তু তাই বলিয়া সমস্যা এ বছর কম নয় বরং গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী। গত বছর ১ কোটি লোক দুঃস্থ হইয়াছিল তাহাদের ভিতর ৬৫ লক্ষ মারা গিয়াছে, কিন্তু বাকি ৩৫ লক্ষ এখনও দুঃস্থ অবস্থায় বাঁচিয়া আছে। এ বৎসর আমন ধান উঠিবার সময় তাহাদের অনেকেই গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহারা এখনও স্বজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বাংলার ৪৩টি মহকুমায় প্রায় ৪৪০০০ গ্রামে তাহারা ছড়াইয়া রহিয়াছে। মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক সাব-কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই ৪৪ হাজার গ্রামের শতকরা ১০জন একেবারেই দুঃস্থ, আরও ১০জন নানারকম সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

সরকার হইতে ৩৩৩টি শ্রমকেন্দ্র খুলিয়া ৫০,০০০ দুঃস্থের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এ ব্যবস্থায় সমস্ত দুঃস্থদের শতকরা ১ জনেরও উপায় হয় নাই। ইহার উপর আবার সহরে সহরে দিগ্বিদিক হইতে নূতন দুস্থ আসিতেছে।

গত বছর শতকরা ৩০ জন কৃষক জমিজমা বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, এবার কৃষকদের শতকরা ৬০ জন ধান চাউল বেচিয়া ফেলিয়াছে। গ্রাম্য কৃষি এবং গ্রাম্য শিল্প সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। দুঃস্থদের শতকরা ৪৮ জন ক্ষেতমজুর, ২৫ জন কৃষক, ৬॥০ জন জেলে, ৭ জন গরীব দোকানদার, বাকি ১৩॥০ জন অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ী। এই তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে অর্দ্ধেক বাংলার কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে, সর্ব্বস্বান্তদের একটা নূতন শ্রেণী তৈরী হইতেছে। এই দুর্গতির চাপে সভ্যতার স্থানে আদিম বর্ব্বরতার পুনর্জন্ম ঘটিতেছে।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন তাহার শতাংশের এক অংশও এখনও আরম্ভ হয় নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া দেশের কৃষি ও কুটির-শিল্প গঠন আরম্ভ করিলে তবেই এই বিরাট দুঃস্থ বাহিনী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহার আগে দরকার দেশের খাদ্য-সরবরাহ এমনভাবে চালু করা যাহাতে নূতন দুঃস্থ তৈরী না হয়, বরং অধিকাংশ জনসাধারণের হাতে এমন উদ্বৃত্ত থাকে যাহা দ্বারা দুঃস্থেরা প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু বিপদ এই যে অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। দুঃস্থেরা প্রতিপালিত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমাগত নূতন দুঃস্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র খাদ্যবস্তুর দাম এত অতিরিক্ত যে তাহার চাপে গৃহস্থরাও দুঃস্থতার সম্মুখীন হইতেছে।

ধান চাউলের দাম

উদ্বৃত্ত জেলার জন্য ১৩৸০ এবং ঘাটতি জেলার জন্য ১৪৸০ এই হারে সরকার চাউলের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই দরে দুঃস্থদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা দুরাশা মাত্র, বরং গরীব কারিগর, ক্ষেতমজুর এবং গরীব মধ্যবিত্তরা কোনমতে জীবনধারণ করিতে সক্ষম, দুঃস্থদের সাহায্য করা তো দূরের কথা। কিন্তু এই দর ঘাটতি অঞ্চলের কোথাও চালু হয় নাই। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি ১২টি উদ্বৃত্ত জেলায় প্রতি মণ চাউল ১২ টাকা হইতে ১৩ টাকার ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু অপর ১৪টি জেলায় চাউলের দর সর্ব্বোচ্চ বাঁধাদরের চাইতে বেশী; পূর্ব্ববঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলে এই দর গত ৬ মাসে কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হিসাব হইতেই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়।

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত সর্ব্বনিম্ন দরের বিবরণ
(গড়পড়তা হিসাব)

	জানুয়ারী	জুন
চট্টগ্রাম	১৭৶০	২১৸০
নোয়াখালী	১৭৶০	২১৶০
ফরিদপুর	১৫।৵০	১৬৶০

অন্যান্য জেলাগুলিতে গত কয়েক মাসে দর কিছু কমিয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত স্থানে বর্তমান বাজার দর কণ্ট্রোল দরের উপরে—

নদীয়া ১৫৲, হাওড়া ১৫॥/০, ঢাকা ১৫৲, ২৪ পরগণা ১৫৲। কলিকাতা গেজেটের প্রকাশিত দরের চেয়ে স্থানীয় বাজার দর অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশী।

বাঁচিবার পথ সর্ব্বদলীয় ঐক্য

নদীয়া জেলার কয়েকটি স্থানের বাজার দর দেওয়া গেল:—

	জুন	জুলাই
ব্রাহ্মণগড়	১৫॥৵০	১৬।০
বামনপুকুর	১৬॥০	১৮৲
শান্তিপুর	১৭॥০	১৯৲
চক্‌দা	১৮৲	২০৲

এই বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে উদ্বৃত্ত অঞ্চলে কণ্ট্রোল দর চালু আছে কিন্তু অধিকাংশ ঘাটতি অঞ্চলে চাউল চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে এবং চোরাবাজারের দরে অধিকাংশ লোকের খাদ্য পাওয়া অসম্ভব। চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে চাউলের দর প্রতি মণ ৪০৲ টাকায় উঠিয়াছিল, তাহার পর সরকারী সরবরাহ যাইবার ফলে দর কমিয়া ২৫ টাকায় নামিয়াছে। ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে কণ্ট্রোল দর কমান দূরে থাকুক, কণ্ট্রোল চালু করাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে নূতন নূতন লোক দুঃস্থ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, গরীব শ্রেণীগুলি দুর্ভিক্ষের আঘাত অনুভব করিতেছে। এ বৎসর দুর্ভিক্ষ নাই বলিয়া সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন কিন্তু ঘাটতি অঞ্চলে প্রায় ২॥০ কোটি লোকের বাস, এই ২॥০ কোটি লোক দুর্ভিক্ষই অনুভব করিতেছে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু

এবার শুধু চাউল নয়; নুন, চিনি, তেল, মাছ, তরিতরকারী প্রত্যেক জিনিষই বাংলার সর্ব্বত্র গত বৎসরের চেয়েও দ্বিগুণ, তিন গুণ দামে বিক্রী হইতেছে। মফঃস্বলে নুনের সের ১৲ ও ১।০, সরিষার তেল ২৲, ২॥০, দুধ আট আনা হইতে ১ টাকা, মাছ তরীতরকারী একপ্রকার অমিল। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এই সমস্ত জিনিষেরই এখনকার চেয়ে যথেষ্ট কম দর ছিল। এবার সমস্ত জিনিষের দাম অতিরিক্ত হওয়ায় এবং

ভবানী সেন

সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ১টি পরিবারের ব্যয় তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গরীব গৃহস্থরা তাহার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই সব জিনিষ বাঁধাদরে বিক্রী করিবার জন্য কোন কোন অঞ্চলে রেশনিংএর ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু রেশনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অর্দ্ধেকও সরবরাহ করা হয় না। কাজেই কণ্ট্রোল দরে প্রয়োজনীয় জিনিষ পায় খুব কম লোকেই। অথচ দেখা গিয়াছে যে পুরা রেশনিং চালু হইলেই চোরাবাজার সায়েস্তা হয়। অবিলম্বে বাংলার সমস্ত সহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে পুরা রেশনিং চাই।

গত বছর ও এবছর

গত বছর এমন সময় বাংলার বাজার হইতে চাউল উধাও হইয়া গিয়াছিল, এ বছর তাহা হয় নাই এবং তিনটি কারণে তাহা হইতে পারে না।

প্রথমতঃ—এবার আমন ধান পর্য্যাপ্ত পরিমানে ফলিয়াছে দ্বিতীয়তঃ—সরকারী এজেণ্টরাও পর্য্যাপ্ত পরিমানে খরিদ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ—কলিকাতা এবং সহরতলীতে ভালভাবে রেশনিং চালু হওয়ায় ৪০ লক্ষ নরনারীর ব্যবস্থা হইয়াছে, বাজারের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

কিন্তু অবস্থা গুরুতর হইয়াছে চারটি কারণে;—

প্রথমতঃ—সরকারী এজেণ্টরা ঘাট্‌তি জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রিজার্ভ তৈরী করিতে পারে নাই। উত্তর বঙ্গের উদ্বৃত্ত অঞ্চলেই সরকারী খরিদ বেশী হইয়াছে, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ঘাট্‌তি এলকায় সংকট সবচেয়ে বেশী।

দ্বিতীয়তঃ—যানবাহনের অবস্থা এবার গতবারের চেয়েও সঙ্গীন্; সরকার উত্তর বঙ্গ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইতে পারিতেছে না।

তৃতীয়তঃ—চাউল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সারা বাংলায় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে শুধু কৃষক ও কারিগর শ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত পর্য্যন্ত দুঃস্থতার সীমায় আসিয়া পৌছিতেছে। গত বছর যাহারা দুঃস্থদের খাওয়াইয়াছে এবছর তাহাদের অধিকাংশই নিজেরা সংসার চালাইতে অক্ষম।

চতুর্থতঃ—অভাব এবং দুঃস্থতা মহামারীর মাত্রা বাড়াইয়াছে। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এযাবত তিন তিনবার সাংঘাতিক রকমে মহামারী দেখা দিয়াছে, একবার ফেব্রুয়ারী মাসে, দ্বিতীয়বার এপ্রিল মাসে, তৃতীয়বার জুন মাসে। বাংলার ২ কোটি এই মহামারীতে আহত হইয়াছে, এখন আবার ম্যালেরিয়ায় পড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে স্থানে স্থানে এক এক গ্রামে শতকরা আশী নব্বই জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। ডাক্তার এবং ঔষধের খরচ অবস্থাপন্ন পরিবার গুলিকেও সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে।

এই সমস্ত দুর্য্যোগের ফলে গ্রামগুলি উজাড় হইতে বসিল: কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অস্বাভাবিক ভাবে আহত; স্বাভাবিক বাণিজ্যও এখন নাই; সরকারী নিয়ন্ত্রিত সরবরাহও নাই; প্রত্যেক গৃহস্থকেই খানিকটা নির্ভর করিতে হয় চোরাবাজারের উপর খানিকটা নির্ভর করিতে হয় সরকারী রেশনের উপর। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী রেশন কোথাও অর্দ্ধেক, কোথাও দশ ভাগের এক ভাগ। একমাত্র কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ শিল্প অঞ্চলেই মোটামুটি ভালভাবে রেশনিং চালু হইয়াছে, কিন্তু মফঃস্বলের গ্রামাঞ্চলে চলিতেছে অর্থনৈতিক অরাজকতা, প্রত্যেকটি গৃহস্থের জীবনযাত্রা একদম অনিশ্চিত। এ অবস্থা যদি চলিতে থাকে তবে সমাজ সভ্যতা ভাঙ্গিয়া তছনছ হইবে। অভিধানে যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলে তাহা না ঘটিলেও বিগত দুর্ভিক্ষে যে ভাঙ্গন সুরু হইয়াছিল তাহা আজ আরও ব্যাপক হইয়াছে।

চাউলের কল ও যানবাহন

মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু যানবাহনের ব্যবস্থার উপরই দোষারোপ করিতেছেন কিন্তু সত্য সত্যই যথেষ্ট পরিমাণে চাউল তাহারা পাইয়াছেন কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তথ্য প্রকাশ করিতেছেন না। বাংলাদেশে ৪৫০টি চাউলের কল আছে, এই কলগুলিতে বছরে মোট ৩॥০ কোটি মণ চাউল তৈরী হয়। সরকারী ব্যবস্থায় এই কলগুলি ইচ্ছামত চাউল কিনিবার অধিকার পাইয়াছে এবং পূর্ণ মাত্রায় তাহাদের কাজও চলিতেছে।

বাংলার সমস্ত সহরগুলিতে রেশনিং চালানো এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে সম্পূর্ণ সরবরাহ চালাইতে হইলে এই ৩॥ কোটি মণ চাউল চাই। এই সমস্ত চাউল সরকারের হস্তগত হয় নাই এবং এ সম্পর্কে সরকার নীরব আছেন। সরকার হয়ত আনুমানিক ১॥ কোটি মণ চাউল সংগ্রহ করিয়া ভাবিতেছেন ইহাই যথেষ্ট, আউষের সময় আসিতেছে সুতরাং সম্পূর্ণ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা হইবে না। কিন্তু এই ধারণা ভুল। পূর্ব্ববঙ্গের দুঃস্থ অঞ্চলগুলিতে এবার আউষ অনেক কম হইবে, সুতরাং চাউলের কলের সমস্ত চাউল দখল করিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা চাই।

ঘাটতি অঞ্চলে রিজার্ভ তৈরী না করাতেই সরকারী খাদ্যনীতির আংশিক ব্যর্থতা সূচিত হইতেছে। কাজেই এখন যানবাহনই সবচেয়ে জরুরী বিষয়, উত্তরবঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে চাউল সরবরাহ করিবার উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। রেলগাড়ীর অভাব হইলে নৌকার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সরকার হইতে নৌকা মেরামত এবং নৌকা তৈরীর আয়োজন হইতেছে সত্য কিন্তু এ আয়োজন শেষ হইতে কি ১৯৪৫ সাল আসিয়া পড়িবে না? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গত এক বৎসরের ভিতর যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মান করিয়া সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে আর বাংলার পূর্ব্ববঙ্গের নদী নালা গুলি নৌকা দিয়া ভর্ত্তি করা গেল না—ইহা কি সরকারী ব্যবস্থার চরম দৈন্য নয়?

মাল সংগ্রহ এবং যানবাহনের ব্যবস্থা এই দুই ব্যাপারেই মন্ত্রীমণ্ডলী নির্ভর করিতেছেন বেতনভোগী সরকারী আমলাদের উপর। তাহার ফলে চাউলের কলের চাল কোথায় যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই এবং যানবাহনের ব্যবস্থা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং রেলওয়ে বোর্ড এই তিনের ভিতর কলহে পর্য্যবসিত হইতেছে। শুধু আমলাদের সাহায্যে চাউলের কলের চাউল পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ চাউল-কলের অধিকাংশ মালিক হিন্দু এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। যানবাহন তৈরী করিতে যে আয়োজন দরকার তাহাতে জাতির সমগ্র শক্তি নিযুক্ত না করিলে সাফল্য অসম্ভব। ঘাট্‌তি জেলার জমিদার ও জোতদারদের নিকট হইতে মজুত মাল সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু সমস্ত দলের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন তাহা যে অসম্ভব তা গত বৎসরের মজুত বিরোধী অভিযানই প্রমাণ করিয়াছে।

কাজেই আজ মন্ত্রীমণ্ডলীর উচিত অগ্রণী হইয়া সমস্ত দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। একমাত্র সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভাই দেশের সমস্ত রকমের উৎপন্ন পণ্য সংগ্রহ করিয়া, উপযুক্ত যান বাহন তৈরী করিয়া তাহা সর্ব্বত্র সরবরাহ করিতে পারে, একদলীয় মন্ত্রীসভা তাহা পারে না। মন্ত্রীমণ্ডলীর সামনে এখন দুই পথ খোলা আছে—এক পথ, সরকারী আমলা এবং ব্যবসাদারদের উপর নির্ভর করা। এই পথ অবলম্বন করার ফলে চাউল, চিনি, নুন, কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি সমস্তই চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে, সরকারী গুদামে যাহা আছে তাহাও যানবাহনের অভাবে বিলি হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পথ, সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া উপযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা করার পথ। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা না থাকার জন্য খাদ্যকমিটিগুলিও বহু ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান না হইয়া সুবিধাবাদীদের লাভের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অথচ ভাল খাদ্যকমিটি যেখানেই আছে সেখানেই সরবরাহের ব্যবস্থা ভালভাবে হইয়া থাকে।

চোরাবাজারের বিরুদ্ধে ঐক্য চাই

সারা বাংলায় সরকার ৬ কোটি লোকের ভিতর ১ কোটি পাঁচ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড বিলি করিয়াছেন, তাহাও আধাআধি রেশনের ব্যবস্থায়। সুতরাং অগণিত জনসাধারণের উপর চোরাবাজারের আধিপত্য চলিতেছে। জাতীয় ঐক্যের পথ ছাড়িয়া চলার অর্থ চোরাবাজারের সঙ্গে রফা করা, আর তাহারই ফলে আজ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থন কমিয়াছে, মন্ত্রীত্ব বিপন্ন হইয়াছে, ক্ষমতা বাড়িয়াছে ভেদপন্থীদের। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথেই বাংলাকে বাঁচাইতে পারে এবং লীগকেও শক্তিশালী করিতে পারে, নতুবা চোরাকারবারীদের আঘাতেই মন্ত্রীত্ব বান্‌চাল হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমশ বাড়িতেছে

এই সময়ই সরকার বিনামূল্যে কুইনাইন দেওয়া বন্ধ করিল

কয়েকদিন আগে গবর্ণমেণ্ট প্রেস নোটে বলা হইয়াছে : **ম্যালেরিয়া আবার বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তর ও মধ্যবঙ্গের কতকাংশে ভীষণভাবে ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে।**

ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে, অথচ এই সময়ই সরকার বিনামূল্যে কুইনাইন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সভারা জানাইতেছেন যে, ১০ই জুলাই ডিরেক্টার অফ্ পাবলিক হেল্থ এক সার্কুলারে জানাইতেছেন যে, **কোনো প্রতিষ্ঠানকেই আর বিনা মূল্যে কুইনাইন দেওয়া হইবে না।**

ইহার ফলে মেডিক্যাল রিলিফ কো অর্ডিনেশন কমিটীর অনেক কেন্দ্রেই কুইনাইন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল বিনামূল্যে কুইনাইন পাওয়ার ভরসায়। এখন এইসব কেন্দ্রে ম্যালেরিয়া রোগীরা ঔষধ পাইতেছে না।

গত ২৭শে জুলাই মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর এক সভায় এই অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আবার বিনামূল্যে কুইনাইন সরবরাহ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

ঘোনতোগ গ্রামের স্কুলে শতকরা ৩৫ জন ছাত্র ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী।

মেদিনীপুরের গ্রামে শতকরা ৯0 জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত

মেদিনীপুরের কয়েকটী গ্রামের কতকগুলি পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। **হাতিবেরিয়া** গ্রামে কয়েকটী পরিবারে ৯৪ জন লোকের মধ্যে ৯০ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। **ভবানীপুর** গ্রামে ৫২টী লোকের মধ্যে ৩০ জনের ম্যালেরিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৮0 জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত

মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি জানাইতেছেন যে তাঁদের কাছে সম্প্রতি টেলিগ্রাম যোগে পূর্ব্ববঙ্গের ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার খবর আসিতেছে। **ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং ঢাকা** জেলায় শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জেন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা সামলাইতে গেলে **মাসে অন্ততঃ ৩৫০০ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার, কিন্তু তাঁর কাছে ২০০ পাউণ্ডের বেশী নাই।**

ত্রিপুরার অবস্থা

পিপলস্ রিলিফ কমিটীর সংগঠক ডাঃ অমিয় ব্যানার্জী ত্রিপুরায় রিলিফের কাজে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন :—

ইলিয়টগঞ্জ গ্রামে শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, অথচ এখানে কুইনিন একেবারেই পাওয়া যায় না। এখানে ৫০টী বেডের একটী হাসপাতাল আছে, কিন্তু হাসপাতালে কুইনিন নাই। **সুরনন্দী** গ্রামে ১০টী পরিবারের ৭০ জন লোকের মধ্যে ৬০ জনই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। **বাসকাইট** গ্রামে একটী হাইস্কুল আছে, ১৫০ জন ছেলের মধ্যে ১১০ জন পরীক্ষা দিতেছে। বাকী সব ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। **কৃষ্ণপুর** গ্রামে ৮টী পরিবারে ৬৫ জন লোকের মধ্যে ৫৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। **পাহাড়পুর** গ্রামে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই জ্বর। মজুরের অভাবে বাহির হইতে মজুর আনাইয়া ক্ষেতের কাজ করান হইতেছে।

নেত্রকোনা

নেত্রকোনার রিলিফ কেন্দ্রের সেক্রেটারী ১৮ই জুলাই পিপল্স্ রিলিফ কমিটীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইতেছেন যে সমস্ত নেত্রকোণা মৃত্যু কবলে। কেন্দুয়া ও আটপাড়ায় শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

আটপাড়া থানার ১৯টী গ্রামে রোগীর হিসাব লওয়া হইয়াছে। ৯১১৩ লোকের মধ্যে ৫১৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। মারা গিয়াছে ৬২১ জন। কেন্দুয়া থানার ১১টী গ্রামে ৩৫৩৫ লোকের মধ্যে ২৩৪৮ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। মারা গিয়াছে ২৫৩ জন। এখানকার স্কুলে ৩০০ ছাত্রের মধ্যে ১৫০ জন স্কুলে উপস্থিত থাকে। প্রাইমারী স্কুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

খুলনা

২২শে জুলাই খুলনা হইতে যে রিপোর্ট আসিয়াছে তাতে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমশ বাড়িতেছে। **ফুলতলা** ইউনিয়নে ম্যালেরিয়ার কয়েক মাসের হিসাব লওয়া হইয়াছে। মে মাসে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩০১, জুন মাসে হইয়াছে ১৪১১ এবং জুলাই মাসে হইয়াছে ১৭৩৯। **নলধা ও মশুরিয়া** গ্রামে ৬৪ জন লোকের মধ্যে ৪৮ জনের ম্যালেরিয়া। **চণ্ডিপুর** গ্রামে ৫৪ জনের মধ্যে ২৬ জনের ম্যালেরিয়া।

কিশোরগঞ্জে ভয়াবহ অবস্থা

করিমগঞ্জ থানার **গুজাদিয়া** ইউনিয়নের প্রত্যেকটী গ্রামের খবর লওয়া হইয়াছে। এই ইউনিয়নে ২৫ টী গ্রাম, লোকসংখ্যা ১৩৭৮০ জন। তার মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ৮৩১৯ জন এবং কালাজ্বরে আক্রান্ত ৫৪৯ জন।

কিশোরগঞ্জ থানায় ১৬টী গ্রামে ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী শতকরা ৮০ জন।

২৮শে জুলাই করিমগঞ্জ হইতে তার আসিয়াছে যে, **শতকরা** ১০০ জন **ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।**

বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, হোসেনপুর এই তিনটী থানার হিসাবেও দেখা যায় **শতকরা** ৮০ জন ম্যালেরিয়া গ্রস্ত।

রংপুরঃ— ১৪ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে শতকরা ৯০ জনের ম্যালেরিয়া রোগ হইয়াছে।

চট্টগ্রামঃ— ফতেহাবাদের একটী খবরে প্রকাশ শতকরা ৫৭ জনের ম্যালেরিয়া।

সিলেট :- ২৫শে জুলাইয়ের ইউ-পির খবর— এখানে শতকরা ৭০ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত।

কলিকাতায় দুঃস্থের ভীড় বাড়িতেছে

গ্রামাঞ্চলে রেশনিং ও লঙ্গরখানা চাই

কলিকাতায় দুঃস্থের ভীড় কমে নাই। কলিকাতা শহরে ৪টি সরকারী দুঃস্থাবাসে ৩১শে মে তারিখে দুঃস্থদের সংখ্যা ছিল ২০৮৩; ২১শে জুলাই ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ২,৫৪৮ হইয়াছে। ইহাদের সকলকেই কলিকাতার রাস্তায় পাওয়া গিয়াছে। ১লা জুলাই হইতে ২৪শে জুলাইয়ের মধ্যে হাসপাতালে ৪৭৬ জন দুঃস্থ ভর্ত্তি হইয়াছিল: এই সময়ের মধ্যে দুঃস্থদের মৃত্যুহার ১০৫। নিঃস্বদের মৃত্যুহার : ২রা জুলাই হইতে ২২শে জুলাই পর্যন্ত ৪৩৭।

গতবার কলিকাতার দেড় লক্ষ দুঃস্থের মধ্যে শতকরা ৭৯.১ ভাগ ছিল ২৪ পরগণার। এবারও সেই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই জেলায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে চালের দর ১৯৲।২০৲ মণ হইয়াছে। ডায়মণ্ড-হারবারে ৭ই জুলাই ২৫৲ দরে চাল বিক্রি হইয়াছে। তাও চাল আবার দুষ্প্রাপ্য। সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে শতকরা ৬০ জন হইতে ৮০ জনই কৃষি-মজুর। দিন ॥৶০ হইতে ৸০ ইহারা মজুরী পায়। কাজের অভাবে সপ্তাহে ২।৩ দিন ইহাদের একেবারে উপবাসী থাকিতে হয়। অনেকেই বুনো শাক খাইতে সুরু করিয়াছে। জেলার উত্তর অঞ্চলেও গরীব চাষীদের আজ একই হাল। ইহাদের রুজিরোজগারের পথ আজ বন্ধ। বর্ষার জন্য নুন তৈরী বন্ধ; ধানভানার জন্য ধান পাওয়া যায় না। ফলে, দুঃস্থদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বারাসত মহকুমার বহু মুসলমান ঘরের মেয়ে পর্দা ও সমাজ ছাড়িয়া ভিখারী হইতে বাধ্য হইয়াছে। বজবজের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে ২৫০ শত হিন্দু ও মুসলমান মেয়ে ।৶০ মজুরীতে ক্ষেত-মজুর হিসাবে কাজ করিতেছে। মোটের উপর এই জেলার উত্তর অঞ্চলে ইতিমধ্যেই শতকরা ৪০ জন সপ্তাহে ২।৩ দিন উপবাসে কাটাইতেছে। অথচ এবিষয়ে সরকারের এখনও চরম আত্মসন্তুষ্টির ভাব। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কৃষক সমিতি হইতে গ্রাম্য রেশনিং ও রিলিফ কিচেনের দাবী জানাইলে, তিনি জবাবে বলেন, সাপ্লাইয়ের ঠিক নাই, কাজেই রেশনিং কবে হইবে বলা যায় না; তাছাড়া এবার বহু ধান হইয়াছে, ভাবনার কারণ নাই। অথচ কলিকাতায় চোখের উপর দুঃস্থের ভীড় বাড়িতেছে। পুলিশ ও হোমগার্ড বসাইয়া সমস্যা মিটিবে না গত কয়েক সপ্তাহে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে।

ফরোয়ার্ডব্লক গুণ্ডার হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত

কমরেড ভানু মজুমদার

গত ২৬শে জুলাই সন্ধ্যাবেলায় ময়মনসিংহ শহরের কএকজন কমিউনিস্ট কর্মী যখন 'ফণী দিবস' উপলক্ষে প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ফরোয়ার্ড ব্লকের ৪ জন গুণ্ডা হঠাৎ পিছন হইতে ছোরা দিয়া কমরেড ভানু মজুমদারকে নৃশংস ভাবে আঘাত করে। আঘাতের ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। কমরেড বিজন রায়ও গুণ্ডাদের হাতে গুরুতরভাবে আহত হন। ২৭শে জুলাই কমরেড ভানু মজুমদারের মৃতদেহ লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক প্রচারকার্য চলে। এই হত্যাকাণ্ডে শহরের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান ও বার লাইব্রেরীর মধ্যে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার ভাব দেখা যায়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের একাধিক কর্মী দেশীয় ফ্যাশিস্টদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াছেন। আমরা জানি, এই সমস্ত শহীদদের মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না। আজ ফ্যাশিজমের চরম পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভারতের অচল অবস্থা দূর হইয়া নূতন অরুণোদয় আসন্ন। পঞ্চমবাহিনীর পায়ের নীচের মাটি আজ তাই আল্‌গা হইতে বসিয়াছে। আজ তাহারা মরীয়া হইয়া কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত হানিতেছে।

কিন্তু আমরা ইহাও জানি, শুধু কমিউনিস্ট নয়, সমস্ত দেশ ভক্তের ঘৃণা আজ ইহাদের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিতেছে। গান্ধীজীর দৃপ্ত আহ্বানে আজ কংগ্রেস সেবীরা ইহাদের দেশের শত্রু বলিয়া চিনিয়াছে। হিন্দু ও মুসলিম দেশভক্তদের ঐক্যের শক্তি ইহাদেরই মাথায় বজ্রাঘাত হানিয়া ইহাদের ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। শুধু কর্মীদের কাছেই নয়, সমস্ত দেশবাসীর কাছেই ইহাদের দেশদ্রোহিতা উন্মুক্ত। দেশদ্রোহিতা যতই মরীয়া হোক তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতার বুকের উপর বেশ্যালয়!

ক্ষমতা থাকিতেও পুলিশ কমিশনর উহা সরায় না কেন ?

কলিকাতার ভদ্রপল্লীর মধ্যে আজকাল বেশ্যালয় এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সাধারণ লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বৎসর আগেই ইহা লইয়া কিছু কিছু চড়িবার হইয়াছিল। কলিকাতার মেট্রো-পলিটান এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তারপরে কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লিতে ও বাংলা আইন সভাতেও এই বিষয় হইয়া আলোচনা হইয়াছিল। তখন শুধু মিলিটারীর উপরই দোষ দেওয়া হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে আইন সভাতে স্যর নাজিমুদ্দিন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, বেশ্যালয় যাতে না বাড়ে তার জন্য দুর্নীতি নিরোধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হইতে দেখা গেল না। বরং, যেন ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটীর গুরুত্ব এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে।

গত ২৩শে মে বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের সেক্রেটারী কতগুলি রাস্তার নাম দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ চাহেন এই রাস্তাগুলিকে কর্পোরেশন যেন 'প্রধান রাস্তা' বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই চিঠি হইতে মনে হয় যে, যতক্ষণ না কর্পোরেশন 'প্রধান রাস্তা' ঘোষণা করিতেছেন, ততক্ষণ বুঝি গভর্ণমেণ্টের করিবার আর কিছু নাই, বেশ্যালয় উঠাইবার আইন সঙ্গত ক্ষমতাও বুঝি গভর্ণমেণ্টের নাই! এবং এই জন্যই বুঝি বেশ্যালয় উঠাইবার কাজ আটকাইয়া ছিল!

কিন্তু দুর্নীতি-নিরোধ আইনে কলিকাতার পুলিশ কমিশনরকে পরিষ্কার এই ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, সাধারণের চলাফেরার জায়গায় দুর্নীতি মূলক কাজ হইলে তা আইন সঙ্গত ভাবে উঠাইয়া দিতে পুলিশ কমিশনর পারেন। কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারও গভর্ণমেণ্টের পত্রের জবাবে সেই আইনের কথা উল্লেখ করেন এবং জানান যে ঘোর প্যাঁচ করিয়া দেরী না করিয়া পুলিশ কমিশনর তাঁর আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এখুনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন, না কর্পোরেশন তার কাজ করুক!

কর্পোরেশন তার কাজ করিয়াছে। লিষ্ট মাফিক রাস্তাগুলিকে 'প্রধান রাস্তা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, এই রাস্তাগুলির বেশ্যালয় সরাইবার জন্যও বলিয়াছে। কিন্তু তা হইলেই যে পুলিশ কমিশনর তাঁর কাজ করিবেন তার ভরসা কি? যে লিষ্ট গভর্ণমেণ্ট পাঠাইয়াছে, **তার মধ্যে ১২টী রাস্তা** (বহুবাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ প্রভৃতি) **আগে হইতে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষিত ছিল।** তা সত্ত্বেও এত দিন কাটিয়া গেল, এই সব রাস্তা হইতে বেশ্যালয় সরাইবার কোনো চেষ্টা পুলিশ কমিশনর করেন নাই। ইহার কি অজুহাত পুলিশ কমিশনর দেখাইবেন? আজকে কর্পোরেশনকে কর্ত্তব্য করিবার জন্য চাপ দিতে গিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের এই ফাঁকীই ধরা পড়িয়া গেল।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনরের ক্ষমতার দাপট শুধু রাজনীতিক ব্যাপারেই দেখা যায়। অথচ সমাজের বুকে এই যে দুর্নীতি চলিতেছে, যার ফলে কলিকাতার গৃহস্থ নাগরিকদের প্রচণ্ড অসুবিধা হইতেছে, মেয়েদের চলাফেরা বিপজ্জনক হইতেছে, তার জন্য পুলিশ কমিশনরের আইন শুধু কাগজে কলমে থাকিয়া যায়! আমরা দাবী করি, এখনি তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সমস্ত রাস্তা হইতে বেশ্যালয় সরাইয়া দিন। মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আমরা দাবী করি, তাঁরা পুলিশ কমিশনরকে এ কাজ করিতে বাধ্য করুন।

কুইনাইন কোথায় ?

চোরাবাজারে কুইনাইনের দাম ৮০০৲ পাউণ্ড

সরকার রিলিফ সংগঠনকে বিনা পয়সায় কুইনাইন দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। এখন অধিকাংশ লোককে বাজারে কুইনাইন খরিদ করিতে যাইতে হইবে। কিন্তু বাজারে কুইনাইনের দর কি? সমস্ত কুইনাইন চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে এবং চোরাবাজারের দর প্রতিদিন বাড়িতেছে।

ত্রিপুরা হইতে খবর আসিয়াছে যে কুইনাইন **প্রতি পাউণ্ড ৮০০৲** দামে বিক্রী হইতেছে। একটী বড়ি ॥০ আনা।

খুলনার **ঘাটভোগের** খবর :—কুইনিন সালফেট এক বড়ির দাম ৮ আনা। চার দাগ কুইনাইন মিক্সচারের দাম ২৲। কুইনিন বাই-হাইড্রোক্লোর প্রতি বড়ি ১৲ টাকায় বিক্রি হইতেছে।

সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে **কুইনিন সরবরাহ বাড়ান হইয়াছে।** কিন্তু কুইনাইনের দুষ্প্রাপ্যতা কি রকম তার খবর মফস্বল হইতে প্রতিনিয়ত আসিতেছে।

কিশোরগঞ্জ গুজাদিয়া ইউনিয়নে **দৈনিক ২ পাউণ্ড** কুইনিন দরকার, সেখানে দেওয়া হইতেছে **সপ্তাহে ১ পাউণ্ড।**

ত্রিপুরা কৃষ্ণপুরে কুইনিনের অভাবে শুধু এলকেলি মিকশ্চার দেওয়া হইতেছে। ইলিয়টগঞ্জের হাসপাতালে **কুইনাইন একেবারেই নাই।**

গান্ধীজির সমর্থনে বাংলার জেলায় জেলায় বিপুল সাড়া

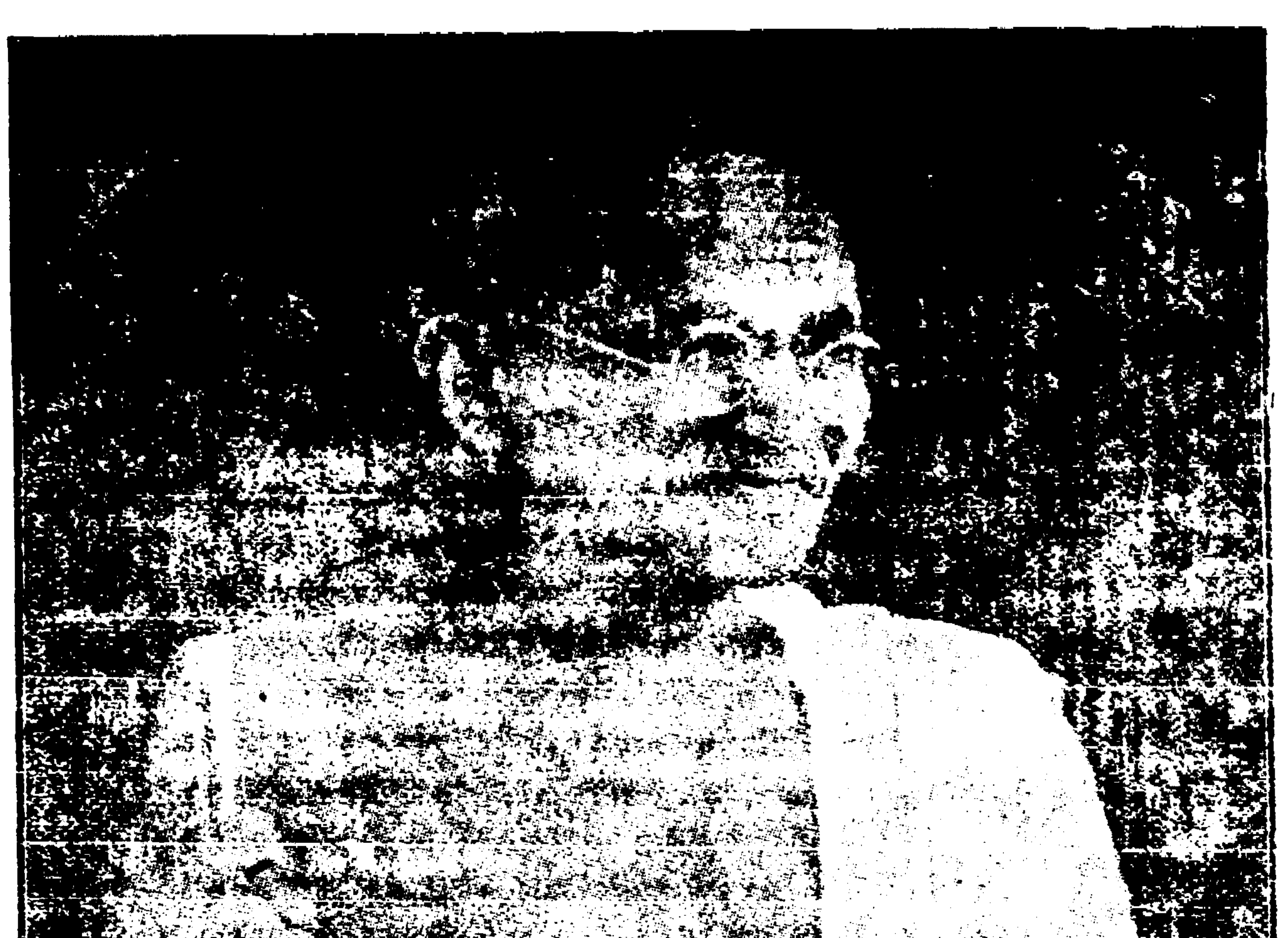

কলিকাতায় ছাত্রদের বিপুল সাড়া

কলিকাতার ছাত্ররা গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থনে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে। সিটি কলেজের সমস্ত মুসলিম ছাত্র সহি দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৬০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ হইয়াছে। বিভিন্ন কলেজে এই প্রস্তাবের উপর সভা করিয়া সমর্থন জানান হইয়েছে। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালও সমর্থন জানাইয়াছেন। ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সমর্থন দূরে থাক তাদের নিজেদের মধ্যেই ভাঙ্গন লাগিয়াছে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইহাদের একজন নেতা গান্ধীজীর সমর্থনে স্বাক্ষর দিয়াছে।

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের সহ-সভাপতি **মিঃ সামসুল হুদা চৌধুরী** একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যে, রাজাজীর ফর্ম্মুলা কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার সহায়ক। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাঁরা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ বন্ধ করিয়া নেতাদের মীমাংসায় সাহায্য করেন।

দিনাজপুরে

গত ১৮ই জুলাই এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জেলা মুসলিম লীগ সেক্রেটারী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্যতম সহ সেক্রেটারী **মৌলভী রহিমদ্দীন আহম্মদ** বলেন :—"মুসলিম লীগ ও জিন্না সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া গান্ধীজী ঠিকই করিয়াছেন। রাজাজীর ফর্ম্মুলা যদিও সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লীগের দাবী স্বীকার করে না, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথে বিরাট একধাপ অগ্রগতি।"

নারায়ণগঞ্জে গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থিত

৩০শে জুলাই নারায়ণগঞ্জের পাবলিক লাইব্রেরীতে এক বিরাট সভা হয়। গান্ধীজীকে সমর্থন জানাইয়া এই সভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ আমির আলি ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দত্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই সভা হিন্দু মহাসভার ভেদমূলক প্রচারের তীব্র নিন্দা করে।

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহ, ২৯শে জুলাই : জনযুদ্ধের নিজস্ব-সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ময়মনসিংহের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভায় গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করা হইয়াছে এবং সভার এই মত শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের কাছে জানান হইয়াছে।

বড়বাজারের কংগ্রেস কর্মীদের সভা

৩০শে জুলাই শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত বসন্ত লাল মুরারকা গান্ধীজীর সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন : "হিন্দু মুসলমানের মীমাংসায় সেই শক্তি সৃষ্টি হইবে, যে শক্তি দুনিয়ায় একমাত্র সোভিয়েট রুশের আছে।" মিঃ যোশী বলেন, "কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা আজ স্বাধীনতা আন্দোলনের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার।" শ্রীযুক্ত সাকসেরিয়া বলেন, "আজ হিন্দু সভার পথ দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে চরম গ্লানি এবং লজ্জার প্রকাশ—এই পথ বন্ধ হোক।"

হুগলী কংগ্রেস-কর্মী সম্মেলন

গত ২২শে জুলাই বেলমুড়ি গ্রামে শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হুগলী সদর মহকুমা কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

গান্ধীজী সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৯শে জুলাই)

শ্রীরামপুর :—৩০শে জুলাই শ্রীরামপুরে এক জনসভায় গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থিত হয়। সভার পরে এক শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে।

যশোহরে সকল দলের সমর্থন

যশোহরের কংগ্রেস সভাপতি জনযুদ্ধের সংবাদদাতার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন : "একতার জন্য এই ধরণের চেষ্টা ভালই। কংগ্রেস-সেবী হিসবে আমাদের উচিত এই চেষ্টাকে সমর্থন করা।"

জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌলভী হাবিবর রহমান বলিয়াছেন, "কংগ্রেস লীগ একতার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে গান্ধী রাজাজীর ফর্ম্মুলা গ্রহণযোগ্য। মিঃ জিন্নার উচিত ওয়ার্কীং কমিটীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এখনি গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান।"

জেলা মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা মৌলভী মহশারাফ হোসেন বলিয়াছেন, "গান্ধী রাজাজীর ফর্ম্মুলা এবং প্রেস প্রতিনিধির কাছে গান্ধীজীর বিবৃতি এই দুইটীর পর সমস্ত জিনিষই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। এখন মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগকে আগাইয়া আসিতেই হইবে।"

হিন্দু মহাসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দু মুখার্জ্জী হিন্দু মহাসভার ভেদ চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে মহাসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : 'রাজাজীর ফর্ম্মুলা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য।' কৃষক প্রজা পার্টির নেতা আব্দুল খালেক বলিয়াছেন : "গান্ধীজীকে আমি অভিনন্দিত করি, আমি আশা করি তাঁর প্রস্তাবে নিশ্চয়ই ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইবে।" যশোহরে এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজীকে সমর্থন জানান হয়।

গান্ধী-জিন্না সা

মহাত্মা গান্ধী কায়েদে আ
জানাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার
কায়েদে আজম ইহার উত্তরে মহা
দেখা করার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে

সর্ব্বশেষ যে খবর পাও
আগামী ৮ই আগষ্ট বোম্বাইতে গান্ধী
লাহোর মুসলীম লীগের ক
সহিত আলোচনা চালাইবার জ
ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ইহ
"আপনারা প্রার্থনা করুন ও আ
করুন, ইহাই আমি চাই। ঈশ্বর
মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি।'

মহাত্মা গান্ধী

কমন্সে মিঃ আমেরীর বক্তৃতা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ফর্ম্মুলা কোন ক্রমেই ব্যহত হইবে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন, এক পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানের ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের দিকে সমস্ত দল বিশেষ ভাবে নজর দিতে পারিবে।

কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা এখনই জরুরী

মিঃ ভুলাভাই দেশাইর বিবৃতি

২৮শে জুলাই শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত হইল :—

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা মীংমাসা হওয়ার প্রয়োজন যে খুবই বেশী, তা আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। আজকের পরিবর্ত্তনশীল যুগে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এই দুই সংগঠনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। কেন্দ্রীয় পরিষদের গত বাজেট অধিবেশনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ প্রত্যেক প্রশ্নকে এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিবার ফলে একযোগে কাজ করিতে পারিয়াছিল। এরূপ ঘটনা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। ঐ সময়েই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মীমাংসা হইলে শুধু যে একটা প্রচণ্ড বাধা দূর হইবে তাহাই নহে, এই মীমাংসার ফলে দেশের মধ্যে এখন যে হতাশা ছড়াইয়া রহিয়াছে, তা দূর হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে আসিবে নূতন আশা এবং জাতির মুক্তির জন্য নূতন কর্ম্মোদ্যোগ জাগিবে, জাতি গঠনের সুযোগ আসিবে। বহুদিন ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ থাকার ফলে অযথা অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, যে শক্তি সত্যিকার কাজে লাগান যাইত। এই সন্দেহের আব্‌হাওয়া কাটিয়া গিয়া তার জায়গায় আজকে এক সহযোগিতার আব্‌হাওয়া গড়িয়া উঠিবে। এই আব্‌হাওয়ার মধ্যেই ভবিষ্যত দুনিয়ায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা সম্ভব হইবে।

মুক্তি পাইয়াই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার গভীর দূরদৃষ্টি বশতঃ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন এবং এই প্রশ্নটী যাহাতে সাধারণ আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তজ্জন্য তিনি

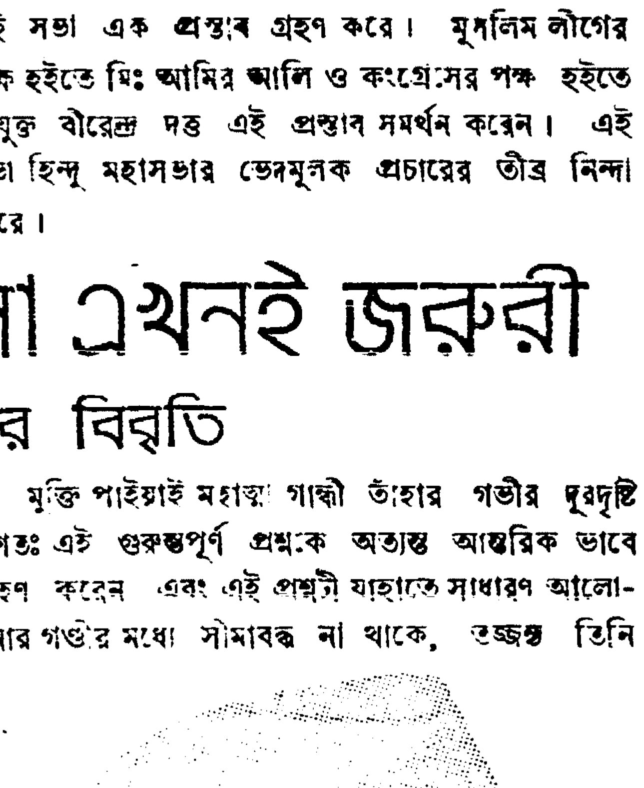

নিজেই স্পষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। লীগ ঐ প্রস্তাবগুলিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিবে সত্য, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই ইহা বিচার করিবেন।

গান্ধীজীর প্রস্তাব ভা

ভারতে স্থায়ী ঐ

কংগ্রেস-নেতা সতীশ

'এলায়েড লেবার নিউজের' সংবাদদাতা বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি গান্ধী-রাজাজী ফর্ম্মুলা সম্পর্কে বলেন :

"সাম্প্রদায়িক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য গান্ধীজী যে রাজাজীর প্রস্তাব পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে গান্ধীজীর এই সমর্থন ভারতের ঐক্যের নীতির সহিত সামঞ্জস্য হীন। **কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্যই গান্ধীজী রাজাজীর ফর্ম্মুলাকে সমর্থন করিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে যদি সন্দেহ থাকিয়া যায়, তা হইলে প্রকৃত ঐক্য কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। সন্দেহ দুর করিতে পারিলেই স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। জাতির একটা অংশ যদি অপর সকলের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িতে চায়, তবে তাদের সে অধিকার দিতে কোনো প্রকৃত সত্যাগ্রহী আপত্তি করিতে পারে না।**

মুসলিমরাও যদি পৃথক হইবার অধিকার চায়, তা হইলে তাদের জোর করিয়া একত্র রাখিবার কথা কোন গণতান্ত্রিক ব্যক্তি বলিতে পারে না।…কিন্তু পৃথক হইবার অধিকার স্বীকার করিবার পর একত্র থাকিবার সুবিধা ও প্রয়োজন আমরা মুসলমানদের বুঝাইব। **তাদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়ার ভিতর দিয়াই আমরা তাদের হৃদয় জয় করিয়া স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে করিতে পারিব।**

অনেকে ভয় দেখাইতেছে যে, এই প্রস্তাবে ভারতকে এখনি খণ্ডিত করা হইতেছে, কিন্তু এই প্রস্তাবের কোন জায়গাতেই ভারত-খণ্ডিত করিবার কথা নাই। স্বাধীন

অচল অবস্থা দূর করিতে কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা চাই

চাঁদপুরে

গত ২৬শে জুলাই এখানে এক জনসভায় গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থিত হয়। স্থানীয় লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিলে তাঁহারা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সমর্থন করেন।

...কাত সফল হোক

...ম জিন্নার কাছে এক চিঠি লিখিয়া ... জিন্নার) সাথে দেখা করিতে চান। ...জীকে তাঁহার বোম্বাইয়ের বাড়ীতে ...ন।

...ঁয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ...ী-জিন্না সাক্ষাতকার হইবে।

...াউন্সিল অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর ...্য কায়েদে আজম জিন্নার উপর পূর্ণ ...র উত্তরে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, ...মার উপর আপনাদের আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, আমরা যেন সম্মানজনক

কায়েদে আজম জিন্না

"হিন্দু ও মুসলমান যদি নিজেদের মধ্যে মিটমাট না করিতে পারে ও ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে, তাহা হইলে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কোনই আশা নাই। আমরা যদি একসাথে মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদের, ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে গ্রেট বৃটেনের শাসকবর্গের অনিচ্ছুক হাত হইতে জোর করিয়া স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে পারি।" (লাহোর লীগ কাউন্সিলে বক্তৃতা)

...ত-বিভাগের জন্য নয় ...্য প্রতিষ্ঠার জন্য

...দাশগুপ্তের আবেদন

ভারতেই পৃথক হইবার অধিকার দেওয়া হইতেছে এবং পৃথক হওয়া না হওয়াও নির্ণয় হইবে গণভোটে।"

স্বাধীন ভারতে যে মুসলিমরা আলাদা হইতে পারিবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, "স্বাধীন ভারতে তৃতীয় পক্ষ না থাকার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসও দূর হইবে। এবং মুসলিম ভাইদের দেশপ্রেমের উপর আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে একত্র থাকার সকলেরই সুবিধা দেখিলে তাঁরা আর পৃথক হইবার কথা বলিবেন না। আমাদের নিজেদের দেশপ্রেমের উপরও আমাদের এইটুকু বিশ্বাস থাকা দরকার যে, আমরাও মুসলিম ভাইদের একতাবদ্ধভাবে ও শান্তিতে থাকিবার সুবিধা বুঝাইতে পারিব।"

তিনি বলেন যে, ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রস্তাবের পার্থক্য এইখানেই যে, ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দাস করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, আর গান্ধীজীর প্রস্তাব জাতির সমস্ত শক্তিকে মিলিত করিয়া, স্বাধীনতার সংগ্রামে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছেন।

গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধীদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন,... অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে আরো পৃথক করিয়া দিবে। আমাদের দাসত্ব কায়েম রাখিতে সাহায্য করিবে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের যে নীতি ছিল, তাকে বাংলায় কার্যকরী করিতে পারে নাই—ইহার জন্য দুঃখ করিয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলেন যে, "এবার আমরা সে ভুল করিব না। সমস্ত ভেদাভেদ দূর করিয়া আমরা এক হইয়া দাঁড়াইব, পরস্পরের সন্দেহ দূর করিব এবং এই পণ লইয়াই আমরা গান্ধীজীর এই মহান প্রচেষ্টার শক্তি জোগাইব।

কলিকাতার আইনজীবীদের বিবৃতি

গান্ধী-রাজাজী প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ৫১ জন ব্যারিষ্টার একটী বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা বলিয়াছেন যে, দেশের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করার জন্য কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা একান্ত জরুরী। গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাবে খুঁটিনাটি লইয়া অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে মীমাংসার ভিত্তি রচনা করিয়াছে, তাতে কোনো সন্দেহই নাই। এবং তাই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালানো দরকার। হিন্দু মুসলিমের মধ্যে প্রীতির আবহাওয়া গড়িয়া উঠিলেই এই আলোচনা হইতে পারে। তাই ইঁহারা দেশবাসীর কাছে আবেদন করিয়াছেন যেন তাঁরা কি গান্ধীজী, কি জিন্না সাহেব কাহারও বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়া বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি না করেন।

স্বাক্ষরকারীর মধ্যে আছেন জে-সি-গুপ্ত, পি-সি ঘোষ, জে-সি-মৈত্র, পি-বি-মুখার্জী, এস-সি-চৌধুরী সৈয়দ মহবুব মোরসেদ, সৈয়দ এস-এ-মাসুদ, এস-পি-মিত্র প্রভৃতি। এই বিবৃতির নকল গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নাকে পাঠান হইয়াছে।

রংপুরে

২২শে জুলাই জেলা কংগ্রেস কমিটীর আহ্বানে এবং সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মৌঃ মহাতবউদ্দিন খাঁর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তাহাতে গান্ধীজি রাজাজী ফর্ম্মুলার প্রতি আস্থা-জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই সভায় সদর মহকুমা লীগ সভাপতি মৌঃ বদিরউদ্দিন আহমদ, বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সভ্য মৌঃ আবুল হোসেন, জিলা মুস্লিম ছাত্র-লীগের সভাপতি মৌঃ মহাম্মদ মহসীন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

নিলফামারী: ২৭ শে জুলাই রাজাজীর পরিকল্পনাকে সমর্থন করিয়া এখান হইতে মহাত্মাজীর কাছে একটী তার করা হইয়াছে। এই তার করিয়াছেন স্থানীয় ১০ জন উকিল, তার মধ্যে ৫ জন মুসলমান।

এখানকার মহকুমা লীগ রাজাজীর পরিকল্পনা সমর্থন করিতেছে।

নদীয়ার কংগ্রেস নেতার সমর্থন

নদীয়ার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত হরিপদ চ্যাটার্জ্জি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, গান্ধীজীর সাম্প্রতিক প্রস্তাব সমগ্র রাজনৈতিক মহলে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। গান্ধীজী আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছেন।

ভবানীপুর মুসলিম-লীগ সভার সমর্থন

২৭শে জুলাই ভবানীপুর (কলিকাতা) মুসলিম লীগের সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ঃ

এতদিন ধরিয়া রাজনৈতিক অচল অবস্থা চালু থাকার ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় এই সভা মনে করে যে, রাজাগোপালাচারী ও গান্ধীজীর সমর্থন লইয়া যে প্রস্তাব কায়েদে আজমের কাছে পাঠাইয়াছেন, মুসলিম লীগ ওয়ার্কীং কমিটীর সভা ডাকিয়া তাহা বিবেচনা করা উচিত। যুদ্ধ চলিতে থাকা কালেই এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে যাহাতে মিলিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তার জন্য কংগ্রেস লীগের একতা গড়িয়া তোলার পন্থা নির্দ্ধারণ করা দরকার এবং এই কাজ তাড়াতাড়ি আগাইবার জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

কলিকাতায় জনসভা

২৮শে জুলাই হাজরা পার্কে ২৫০০ লোকের এক জনসভায় গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন জানান হয়।

২৯শে জুলাই দেশবন্ধু পার্কে ৭০০ লোকের এক সভায় উক্ত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাংলার ছাত্রদের কাছে গান্ধীজীর বাণী

"তোমাদের সমস্ত মহৎ কাজের জন্য অজস্র আশীর্ব্বাদ"

"তোমাদের সমস্ত মহৎকাজের জন্য আমার অজস্র আশীর্ব্বাদ জেনো।...আমার এই বাণী তোমাদের মাঝে বৃহত্তর কার্য্যোদ্যম জাগিয়ে তুলুক"—পাঁচগনি থেকে গান্ধীজির এই বাণী বয়ে নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-

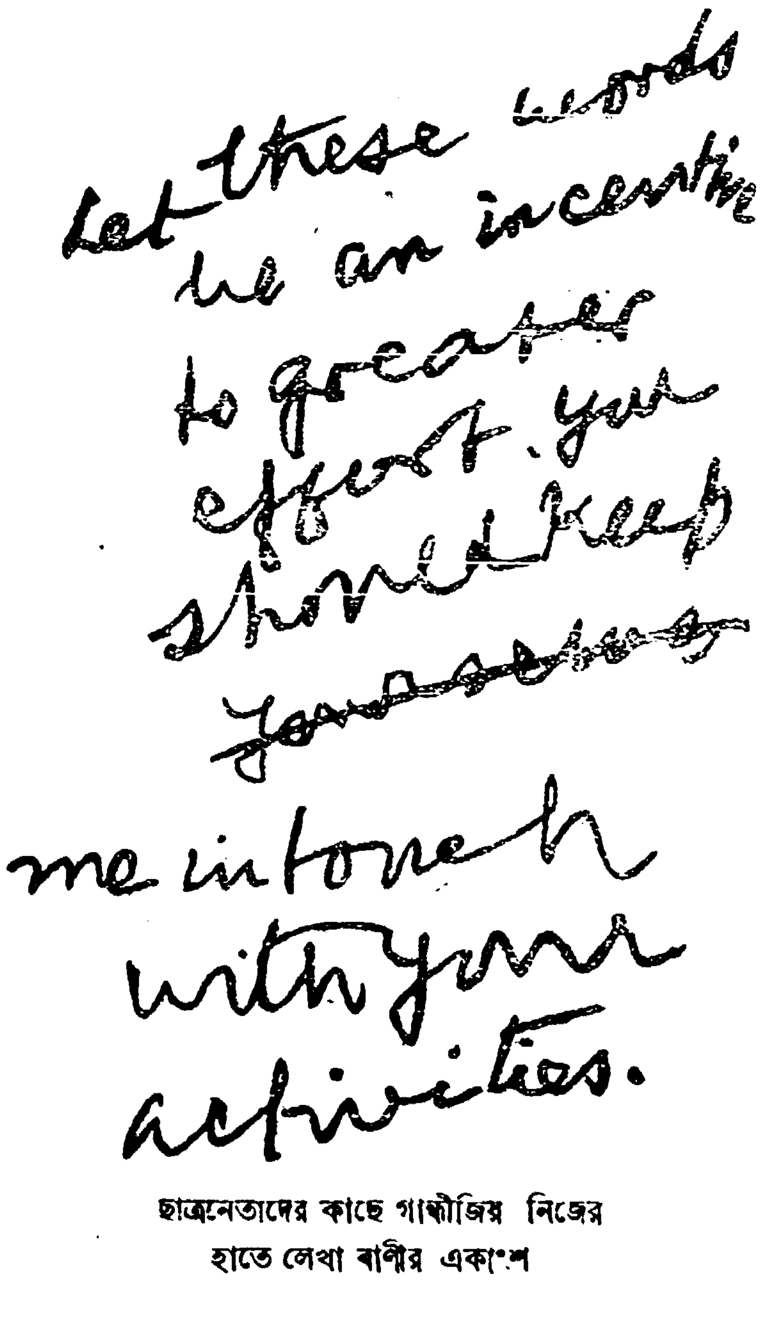

ছাত্রনেতাদের কাছে গান্ধীজির নিজের হাতে লেখা বাণীর একাংশ

ফেডারেশনের সহঃ সভাপতি অজিত রায় ও সংগঠন-সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত ফিরে এসেছে।

আসামের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বরদলৈর নির্দ্দেশে আসামের অবস্থা এরা গান্ধীজির কাছে পেশ করে।

বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের ও সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের আনাগোনায় পাঁচগনির 'দিলখুসা' কর্ম-মুখর। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে ২ দিনে ৪০ মিনিটের জন্য গান্ধীজির সাক্ষাৎ এরা পায়।

১৪ই জুলাই সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি বলেন, "আসামের রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই আমি পড়েছি। ওতে বক্তব্য খুবই প্রাঞ্জল।" শ্রীযুত বরদলৈকে তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও সেবাগ্রামে আসামের একজন কংগ্রেস নেতাকে যাবার আহ্বান জানান।

গান্ধীজিকে সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর তাঁকে বাংলার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এর থেকে বাঁচবার পথ নির্দ্দেশ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত সমাজচ্যুত নারী ও গৃহহারা শিশুদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজেই মাত্র কস্তুরবা স্মৃতি তহবিলকে অমর কোরে রাখার আবেদন জানান হয়।

বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা কিভাবে যুক্ত রিলিফের কাজে অগ্রণী হয়েছে তা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

"আমরা বাংলার প্রতিটী ছাত্রকে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যের প্রস্তাবের পক্ষে আনার জন্য জীবনপণ করবো—" এই প্রতিশ্রুতিকে সফল করার জন্য বাণী চাইলে তিনি বলেন, "কোন বাণী ছাড়াই তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ও কাজের মধ্যে দিয়েই জয়ী হবে।"

"ও কাগজগুলো আমার জন্য রেখে যাও—আমি সব পড়বো," ছাত্রনেতারা তাঁকে "দি ষ্টুডেণ্ট" কাগজ ছাত্রদের কর্মধারার বিবরণ দেখায়। কলকাতার ৭ই জুলাইতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের জন্য ইনষ্টিটুটের ছাত্রসভার ছবিটী তিনি আকৃষ্ট হয়ে দেখেন।

"বর্তমানে কংগ্রেসের আদর্শ বলতে আমরা জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, চোরাকারবারীর হাত থেকে জনসাধারণের আত্মরক্ষা, দুর্গত দেশবাসীর সেবা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধন করা বলেই বুঝেছি। এই আদর্শকেই বাংলা ও আসামের ছাত্ররা যথাসাধ্য কাজে পরিণত করেছে" ছাত্রদের এই কর্মধারা নির্ভুল মনে করলে ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর আশীর্বাণী চাওয়া হয়। তিনি হাসি-মুখে লিখে দেন—"তোমাদের সমস্ত মহৎকাজের জন্য আমার অজস্র আশীর্ব্বাদ জেনো। প্রত্যেক মহৎকাজকেই আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ করতে শেখ। অনলস প্রচেষ্টা ছাড়া মহামানবের আশীর্বাণীও নিরর্থক। আশীর্বাদ লাভ করে কর্মীরা অনেক সময় মনে করেন যে তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমার এই বাণী তোমাদের মাঝে বৃহত্তর কর্মোদ্যম জাগিয়ে তুলুক।

"তোমাদের কাজের সাথে আমার যোগাযোগ রেখো" এই শেষ কথা বলে তিনি তাদের বিদায় দেন।

সূতাকল শ্রমিকদের সমর্থনে মধ্যবিত্ত

কুষ্টিয়ায় শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনে গান্ধীজির ঐক্য-প্রস্তাব সমর্থিত

গত ১৬ই জুলাই কুষ্টিয়া যতীন্দ্র মোহন হলে মোহিনী মিল সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এক হাজারের শ্রমিক-সভায় সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় ২০০ লোক যোগদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মীবৃন্দ ও কিছু মহিলাও ছিলেন। কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি বসু সম্মেলনকে অভিনন্দিত করিয়া বাণী পাঠান। শ্রমিকদের ৫।০ সের রেশনিং ও ৩০৲ টাকা মাগগীভাতার দাবীতে এবং কয়েকটী স্থানীয় অভাব অভিযোগের উপর সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গান্ধীজি ও রাজাজীর লীগ-কংগ্রেস ঐক্যের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য গণ-আন্দোলন সুরু করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়, চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট-নেতা মনোরঞ্জন সেনের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার দাবী জানান হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পুত্রের দোকানই চোরগুদাম

মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর পুত্রের দোকানে কাপড়ের চোরাকারবার চলিতেছিল। সম্প্রতি তাহা ধরা পড়িয়াছে কিন্তু সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে টালবাহনা করিতেছে। শ্রমিকদের এই সম্মেলনে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়—দাবী করা হয়, অবিলম্বে যথাযথ তদন্তের পর তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হউক।

সম্মেলনের সভাপতি কমরেড আব্দুল মোমিন এবং নিত্যানন্দ চৌধুরী, অমৃতেন্দু মুখার্জী, রোওশেন আলি প্রভৃতি শ্রমিক-নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কমরেড ধীরেন্দ্র দাশগুপ্তকে সভাপতি ও কমরেড প্রফুল্ল রায় চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া ২৩ জন সভ্যকে লইয়া নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। একজন লীগ-নেতা কৃষ্টি অনুষ্ঠানে কমরেড গারিশের লেখা একটী জারী গান শুনিয়া তাঁহাকে একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দেন।

জরুরী নোটিশ

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারকার 'জনযুদ্ধ' বাহির হইতে একদিন দেরী হইল!

ম্যানেজার, 'জনযুদ্ধ'

মালিককে আরো ঘুষ দিবার বন্দোবস্ত

কয়লার উৎপাদন বাড়াইতে সরকারের নূতন প্ল্যান

২৭শে জুলাইয়ের 'ক্যাপিটালে' প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট কয়লা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আবার একটা নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন।

(১) আগে খনি মালিকরা কয়লার যে দাম পাইত, এখন তার চেয়ে কিছু বেশী দাম পাইবে।

(২) খনি মালিকদের ইনকাম-ট্যাক্স হিসাব করিবার সময়, ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আগের চেয়ে আরো ৫০% বেশী খরচ বাদ দেওয়া হইবে।

(৩) বাহির হইতে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইবে।

(৪) মজুরদের মজুরী কিছু বাড়াইয়া তাদের কাজে টিকাইয়া রাখা হইবে।

(৫) অন্য জায়গা হইতে মজুর আমদানী করা যাইবে।

এই ৫ দফা ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম দুই দফা হইল মালিককে সন্তুষ্ট করার উপায়। মালিককে ঘুষ দিবার কথাটাই কর্তৃপক্ষ ভাল বুঝিয়াছেন। কিন্তু মজুরের জন্য সামান্য মজুরী বৃদ্ধির কথা উঠিতেই অনেকে প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। 'ক্যাপিটালই' বলিতেছে যে, স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার মজুরী বৃদ্ধিতে আপত্তি করিয়াছেন। আরো অনেকে নাকি বলিয়াছেন যে, মজুরী বাড়াইলে মজুররা কামাই সুরু করিবে।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

স্যাক্সবি কারখানার এডজুডিকেশন

অবিলম্বে গ্রেগরী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করো

স্যাক্সবি কারখানার মজুরদের মজুরী, মাগগীভাতা প্রভৃতির দাবী বিচার করিবার যে এ্যাডজুডিকেশন বসিয়াছিল, তাহার রায় প্রকাশ হইয়াছে। এই রায় অনুসারে মজুররা নিম্নলিখিত সুবিধা পাইল:—(১) সাধারণ মজুরদের মজুরী ১৭৲ টাকা হইতে ২০৲ হইল (২) বালক-মজুরদের মজুরী ১৬৲ করা হইল। (৩) অসুস্থতার কারণে প্রত্যেক মজুর ১৫ দিন পুরা বেতনে ছুটী পাইবে। (৪) ১ বছরের চাকুরী হইলেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা পাইবে। (৫) কারখানার ভিতরে মজুররা সভা করিতে পারিবে।

এই রায়ের ফলে মজুররা কিছু সুবিধা পাইল সত্য কিন্তু মজুরদের মূল দাবীই ইহাতে স্বীকার করা হয় নাই। মাগগীভাতা সম্বন্ধে রায়ে বলা হইয়াছে যে অন্যান্য কারখানার যখন মাগগীভাতা বেশী নয়, তখন এই কারখানাতেও বেশী দেওয়া যাইতে পারে না। কারখানার মালিকরা যদি একজোট হইয়া এক রকম মাগগীভাতা ঠিক করিয়া রাখে, তা হইলে সেটাই কি ন্যায্য হইয়া যাইবে? তা হইলে গ্রেগরী কমিটীর খোরাকীর খরচ বৃদ্ধির হিসাব করিয়া দেখানর মূল্য কি? আমরা দাবী করি, গ্রেগরী কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ করা হউক। তা হইলে মাগগীভাতা সম্বন্ধে মজুরের দাবীর ন্যায্যতা অস্বীকার করার কোন যুক্তি টিকিতে পারিবে না।

এই রায়ে সাধারন মজুরের মজুরী বাড়ান হইল, কিন্তু দক্ষ (স্কীল্ড) মজুরের মজুরী যেমন ছিল তেমনি রাখা হইল। অর্থাৎ, সব মজুরই এখন ২০৲ টাকা মজুরী পাইবে। তা হইলে দক্ষ মজুর, সাধারণ মজুরে তফাৎটা আর রহিল কোথায়?

নোয়াখালী-সংবাদ

শিক্ষাজীবনে গুরুতর সংকট

নোয়াখালী জেলার হাইস্কুলগুলির দুরবস্থা

গ্রামের এবং মফঃস্বল সহরের হাইস্কুলগুলিই দেশের শিক্ষাজীবনের মূলভিত্তি, কিন্তু এই মূলভিত্তিতেই আজ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। নানা কারণে স্কুলগুলির ছাত্র-সংখ্যা অসম্ভব রকমে কমিয়া গিয়াছে; দারুণ অভাবের তাড়নায় শিক্ষক-সমাজ স্কুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

নোয়াখালী জেলায় ৪৫টি হাইস্কুল ছিল। ৩টি স্কুল সংকটের প্রথম আঘাতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আরও ৪টি স্কুল শিক্ষকের অভাবে অচল। জেলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের মতে বাকীগুলিরও গড়ে অন্ততঃ ২ জন করিয়া শিক্ষকের অভাব, তাই সেগুলি কোন রকমে চলিতেছে। অরুণ স্কুলে ২ জন শিক্ষক চলিয়া গিয়াছেন, ২ জন যাওয়ার মুখে। কল্যান স্কুলে ১ জন চলিয়া গিয়াছে, ১ জন অসুস্থ। আমিরাবাদ স্কুলে ২ জন মারা গিয়াছেন, ১ জন চলিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাবুপুরে ৩ জন, দশঘরিয়ায় ২ জন, চাটসিনে ৩ জন এবং মঙ্গলকান্দি স্কুল হইতে ৪ জন শিক্ষক চলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য স্কুলগুলিরও অল্পবিস্তর এই একই অবস্থা। ছাত্রের সংখ্যা মাঝে মাঝে একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। কাগজেকলমে এখন কিছু বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু ছাত্রদের উপস্থিতি এখনও স্বাভাবিক পর্য্যায়ে ওঠে নাই। যেমন আমিরাবাদে ১৫০ জন ছাত্রের ভিতর ৮০।৯০ জন উপস্থিত থাকে। দশঘরিয়া স্কুলে ৩০০ ছাত্রের মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী উপস্থিত থাকে। বাবুপুরে অনেক ছাত্রই অনুপস্থিত থাকে। খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে ছাত্রদের না আসার কারণ রোগের প্রাদুর্ভাব, বইয়ের অভাব, বেতন বাকী ইত্যাদি। অথচ শিক্ষাজীবনের এই দারুণ সংকট রোধ করিবার জন্য কোন কিছু করিলে আমলাতন্ত্র খড়্গ খাপ্পা হয়। শিক্ষাজীবনের এই বিপর্য্যয় কি ভাবে ঠেকান যায়, কি ভাবে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর ঐক্য গড়া যায় সোনাইমুড়ী স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে এই সম্পর্কে একটি সভা হইয়াছিল। ব্যস্, এই সভার অজুহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। বোম্বাই হইতে আগত মেডিকেল ইউনিটকে অভ্যর্থনার জন্য অরুণ স্কুলের মাঠে এক সভার আয়োজন হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সভা হওয়ার অপরাধে স্কুলের সম্পাদককে জানান যে যদি এই ধরণের রাজনৈতিক সভার অনুমতি দেওয়া হয় তবে ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্কুলের সাথে কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। যাহারা অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া মহামারী-গ্রস্ত বাংলার নরনারীর চিকিৎসার ভার নিয়াছেন তাহাদের অভ্যর্থনা করা আমলাতন্ত্রের কাছে অপরাধ!

একদিকে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট, অন্যদিকে আবার আমলাতন্ত্রের এইরূপ আঘাত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা সৃষ্টি করিতেছে এবং শিক্ষা-সংকটকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে।

নোয়াখালীর তাঁতীদের দুরবস্থা

(নিজস্ব সংবাদদাতার চিঠি)

নোয়াখালী জেলায় তাঁতী-সম্প্রদায় কি শোচনীয় অবস্থায় পৌছিয়াছে সম্প্রতি আমরা ৭টি গ্রামের তাঁতীদের যে সঠিক তথ্য নিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। এই ৭টি গ্রামের তথ্য হইতেই সারা নোয়াখালী জেলায় তাঁতীদের মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে নোয়াখালী জেলায় ২১ লক্ষ লোক ছিল তন্মধ্যে তাঁতীই ছিল ১ লক্ষ। এই ১ লক্ষ তাঁতী যুদ্ধের পূর্ব্বে ও দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে আসামে ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় আমাদের ইজ্জৎ বাঁচাইত।

২১ লক্ষ লোকের ভিতর ১৪৮০৯ খাটী তাঁতীই দুঃস্থ হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া আমরা হারাইয়াছি ৩২৬২ জন খাটী তাঁতীকে। খাটি তাঁতী ছাড়া পরিবারের অন্য লোককে ধরা হইলে এই সংখ্যা আরও বেশী হইবে।

সংকটের আগে ২৩৬৩০ খানা তাঁত চলিত। সেই সংখ্যা কমিয়া বর্ত্তমানে ১৮৪৪৪ হইয়াছে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁতীরা খোয়াইয়াছে ৫১৮৬ খানা তাঁত। তাই লোক মরিয়া যাহারা অবশিষ্ট আছে তাহাদের ২৮৮৯ খানা তাঁতের প্রয়োজন। এই ৭ টি গ্রামের মধ্যে এমনও পাওয়া গিয়াছে যাহারা তাঁত, জমি, বাড়ীঘর প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বিক্রী করিয়া সমাজকে অভিশাপ দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে তাঁতীদের প্রত্যেক সপ্তাহে ২০ ২২৲ টাকার সূতায় ১৲ টাকা মহাজনকে বেশী দিতে হয়। এবং প্রতি সপ্তাহে চোরাবাজার হইতে কেরোসিন ১।১।০ দিয়া এক বোতল কিনিয়া ব্যবসায় চালাইতে হয়।

এই ভাবে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বর্ত্তমানে তাঁতীরা ১৪৭৬৩৪৲ টাকায় প্রতি সপ্তাহে সূতার মহাজনকে ও কেরোসিনের চোরাবাজারে ৬২৪৪৪৲ অর্থদণ্ড দিয়া ৫১৪০৭ জোড়া দশ গজি কাপড় তৈরী করিতে পারে। আমরা তথ্য লইতে গেলে তাঁতীরা আমাদের বলে, বাবু! আমাদের কেরোসিনের চোরাবাজার হইতে বাঁচান।

বর্ত্তমানে তাঁতীরা যদি তাহাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি ও কেরোসিন তৈল পায় তবে এখনকার চেয়ে **প্রতি সপ্তাহে ৬৬৩৭১ জোড়া দশ-গজি কাপড় বেশী করিতে পারে।**

নারায়ণগঞ্জ শ্রমিক ইউনিয়নে গুণ্ডার উৎপাত

ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মালিক ও সরকারী কর্ম্মচারীরা একজোট

কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ঢাকা জেলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মৃণাল চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করে। পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন।

কয়েক দিন পরে ১০ই জুলাই চিত্তরঞ্জন মিল কমিটির সম্পাদক শ্রমিক ব্যারাকের জলের ব্যবস্থা, ৭ দিন ৪০ খানা তাঁত বন্ধ থাকায় ক্ষতিপূরণ ও ৩০৲ টাকা মাগগীভাতার দাবী নিয়া ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশনে যান। ফিরিবার পথে "চিত্তরঞ্জন ডিফেন্স কোরের" লোকেরা তাহাকে আক্রমণ করে। শ্রমিকরা সংবাদ পাইয়া তাড়া করে ও গুণ্ডারা পলাইয়া যায়। রাত্রি ৩টার সময় কতকগুলি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক মদ খাইয়া ইউনিয়ন অফিস আক্রমণ করে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আর-এস-পির লোক ও মিলের বন্দুকধারী দারোয়ানও ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের তাড়া খাইয়া সকলেই পলায়ন করে।

তারপর আমলাতন্ত্রের কর্মচারীরা ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার সুরু করিল। ইউনিয়নের সম্পাদক সুনীল রায়, এবং কার্ত্তিক রায়, রমণী গোস্বামী ও বিজয় বিশ্বাস এই চার জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রমিকরা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য দলে দলে ইউনিয়নে যোগ দিতেছে এবং চিত্তরঞ্জন ও ঢাকেশ্বরী ডিফেন্স কোরের বিরুদ্ধে গণ-সহি আদায় করিতেছে।

ডিব্রুগড়ে রেলমজুর সম্মেলন

বি, এণ্ড, এ রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের ডিব্রুগড় শাখার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এখানকার শ্রমিকরা জোর পরিশ্রম করিয়া ভাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন তিন গুণ বাড়াইয়াছে। এই সম্মেলনে সাধারণ শ্রমিকদের যোগদান নিষেধ করিয়া কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করিয়াছিল। ডেপুটি কমিশনার ইউনিয়নের সভাসমিতি করার অনুমতি দেন না। জাপানী আক্রমণের মুখে দেশরক্ষার জন্য রেলশ্রমিকদের সংগঠন গড়িয়া সংঘবদ্ধ করার দাবীতে সমস্ত দল ও শ্রেণীকে মিলাইয়া জোর আন্দোলন করিবার আহ্বান জানাইয়া সম্মেলন হইতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতার খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের দাবী

গত ২৫শে জুলাই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কলিকাতার খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলন হয়। কলিকাতার প্রায় ৩০০০ খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের অবস্থা আজ শোচনীয়। কাপড় কন্ট্রোল-বোর্ড বলিয়াছেন, কলিকাতায় প্রচুর কাপড় আসিতেছে; কিন্তু তবু এই খুচরা ব্যবসায়ীরা কাপড় পায় না। কাজেই লোকেও কাপড় পায় না। শুধু বড় পাইকারদের কাপড় আমদানীর অধিকার থাকায় আজকে ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের গোলাম হইয়া পড়িতেছে। কন্ট্রোল দরে কাপড় তারা সহজে পায় না। এদিকে লাখ লাখ টাকার কাপড় বড় পাইকারের গুদাম হইতে চোরাবাজারে উধাও হইতেছে।

এই সম্মেলনে দাবী করিয়াছে যে, পাইকার-বিক্রেতাদের কাছ হইতে খুচরা-ব্যবসায়ীরা যাহাতে প্রয়োজনরূপ কাপড় পাইতে পারেন, তজ্জন্য প্রাদেশিক টেকস্টাইল কন্ট্রোলার ব্যবস্থা করুন। ইহা শুধু খুচরা ব্যবসায়ীদেরই অসুবিধা দূর করিবে তা নয়, জনসাধারণের কাপড় পাইবার অসুবিধাও ইহাতে কমিয়া যাইবে। কেন না, এই উপায়ে চোরাকারবার বন্ধ হইবে।

'জনযুদ্ধ' পাঠক ও গ্রাহকদের প্রতি

সরকার কাগজ সংক্ষেপের যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তার ফলে আমরা 'জনযুদ্ধের' মোট প্রচার সংখ্যার উপযুক্ত কাগজ এখন হইতে পাইব না। বাধ্য হইয়া আমাদের প্রচার সংখ্যা কমাইতে হইবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সংখ্যা কমিলেও জনযুদ্ধের পাঠক কমিবে না। আমরা 'জনযুদ্ধে'র গ্রাহক ও পাঠকদের কাছে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁদের প্রত্যেককে যদিও আমরা কাগজ সরবরাহ করিতে না পারি, তা হইলেও তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় একটী কাগজে একাধিক পাঠকের কাজ চালাইয়া লইবেন। এই উপায়ে 'জনযুদ্ধ'কে ব্যবহার করিলে কাগজ সংক্ষেপের ফলেও আমাদের পাঠক সংখ্যা কমিবে তো না-ই, বরং পাঠক সংখ্যা নিয়মিত বাড়াইয়া যাইবার চেষ্টাই আমরা করিতে পারিব।

ম্যানেজার, 'জনযুদ্ধ'

হুঁশিয়ার হও !

(গত ৩০শে জুলাইর 'পিপল্‌স্ ওয়ারের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অনুবাদ)

কংগ্রেস-সোশালিস্ট, ফরোয়ার্ডব্লকপন্থী ও তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গদের রাজনৈতিক স্বপ্ন গান্ধিজী গুঁড়াইয়া দিয়াছেন। গেলডারের সহিত সাক্ষাৎকারে অচল অবস্থার বিরুদ্ধে ও আপোষের স্বপক্ষে তাঁহার বিজ্ঞ উক্তি উহাদের বুলিকে অর্থাৎ 'অচল অবস্থা বজায় রাখার অর্থ জাতীয় সম্মান অক্ষুন্ন রাখা' এবং 'আপোষের চেষ্টা করা মানে বৃটিশের কাছে আত্মবিক্রয় করা'—এই নীতিকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিয়াছে। ইহারা বলিত যে পাকিস্তানের অর্থ বৃটিশ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষকে বল্কান রাষ্ট্রগুলির মত নানা ভাগে বিভক্ত করা এবং তাহাদের মতে লীগ ছিল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক একটী সাম্প্রদায়িক সংগঠন। কিন্তু লীগের দাবী মানিয়া লীগের সঙ্গে আপোষের জন্য প্রকাশ্য ভাবে গান্ধীজি যে ব্যগ্রতা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উহাদের নিন্দাবাদ আজ চূড়ান্ত মূর্খতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এই সকল জাতীয়তা-বিরোধী দলগুলি বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের পুরাতন বুলি লইয়া তাহারা আর জনগণের সামনে হাজির হইতে পারিবে না। অবশ্য আজ প্রকাশ্য ভাবে গান্ধিজীর বিরোধীতা করিবার সাহসও তাদের নাই। কাজেই আজ তাহারা গান্ধীজির পন্থাকে ওয়াভেল ও জিন্নার মুখোস খুলিবার পন্থা বলিয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছে। তাহারা নিজেরাই বৃটিশ ও মুসলীম বিরোধী সংস্কারে অন্ধ এবং তাহারই সুযোগ তাহারা জনসাধারণের উপর লইবার চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধিজীর বিবৃতি গুলিকে তাহারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে তাহা তাহাদের পরাজয়সূচক মনোভাবের পরিচয় দেয়। তাহারা এমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন যে তাহারা একথা বুঝিতে পারেনা যে গান্ধিজী সম্পর্কে তাহাদের ব্যাখ্যা গান্ধিজীকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক নেতা রূপে প্রমাণ করায় না বরং তাঁহাকে একটা পাকা চানক্যের মত এমনি একটি রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে দাঁড় করায়—যাঁর অচল অবস্থা সমাধানের কোন আশা নাই, যিনি জাতীয় ঐক্য গঠনে বিশ্বাস করেন না এবং যিনি কেবল নিজের চাতুর্য্য দেখাইতেই ব্যস্ত। ইতিহাসে চাকা আটকাইয়া যাইবে অথবা ভুলপথে চলিবে ইহারই উপর তাহারা তাহাদের মৃত প্রায় ভরসাকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহারা সমস্যাগুলি লইয়া কেবল বাজে কথা বলিয়া বা বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত নাই; যাহাতে অচল অবস্থা চালু থাকে তাহার জন্য ঘটনার গতিকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য আজ তাহারা ব্যস্ত। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তাহাদের মহাউৎসবের দিন—এবং তারপর প্রতি বৎসরের ঐ দিনে জনগণের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে উত্তেজিত করিয়া ঐ দিন তাহারা উৎসব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই বৎসরেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে জাতির এই তিক্ত স্মৃতির দিন তাহাদের পক্ষে সুযোগ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এই দিনে কি করা যায় তাহা স্থির করিতে তাহারা ব্যস্ত।

তাহারা অনেক কষ্টে এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছে যে যতদিন কমুনিষ্টরা বাঁচিয়া আছে—ততদিন শ্রমিকশ্রেণীকে ধর্ম্মঘটে উস্কানো চলিবে না। ৯ই আগষ্টে কারখানার মালিকেরা যাহাতে কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করে তাহার জন্য তাহারা কোন কোন মালিকের সঙ্গে কথা বলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা এখনো ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হরতালের জন্য প্রচার সুরু করে নাই—কিন্তু এই সম্পর্কে কতখানি সম্ভাবনা আছে তাহা তাহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছে। দেশ-ভক্ত ছাত্র সাধারণ এক সময়ে তাহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে—তাই আজ কংগ্রেস-ভক্ত ছাত্রেরা কম্যুনিষ্ট-ছাত্রদের সঙ্গে এক যোগে গান্ধিজীর নেতৃত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছে এবং মহা উৎসাহে সমর্থন জানাইতেছে। গান্ধিজী অন্য এক প্রসঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন যে ১৯৪৪ সাল ১৯৪২ সাল নহে এবং এই সকল উত্তেজনাকারীদের কলা-কৌশল আর খাটিবে না—এ কথাটা উহারাও জানে।

শ্রমিকশ্রেণীকে বা ছাত্র সাধারণকে ধর্ম্মঘটের জন্য সমাবেশ করা যাইবে—এমন আশা তাহারা বড় একটা করে না, কিন্তু তাহারা একেবারে হাল ছাড়িয়াও বসিয়া নাই। বোম্বাইতে তাহারা কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবীদের ধরিয়া ৯ই আগষ্ট পতাকা উত্তোলন উৎসব করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা জানে যে ইহাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হইবে এবং তাহারা গান্ধিজীকে দেখাইতে পারিবে যে বৃটিশের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই এবং তাঁহার পক্ষে এখন জেলে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

গান্ধিজী সরকারের কাছে অনুরোধ করিয়াছেন যে সরকার যেন কংগ্রেসের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ কাজকর্ম্মে বাধা না দেয় এবং তিনি কংগ্রেসসেবীদেরও সক্রিয় হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন! শয়তান যেমন ভগবানের দোহাই পাড়ে তেমনি কংগ্রেস সোশালিষ্টরাও ৯ই আগষ্ট কিছু করিবার জন্য গান্ধিজীর উক্তি আওড়াইতেছে।

চিন্তাশীল দেশভক্ত মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে যে কাজ ৯ই আগষ্টে করিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাহা করার অর্থ—গান্ধিজীর আপোষের পথে বাধা দেওয়া এবং অচল অবস্থা চালু রাখিবার জন্য আমেরির ফাঁদে পড়া।

কোন স্থানের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের টানিয়া আনিতে না পারিলে কংগ্রেস সোশালিষ্ট বা বসুপন্থী বিশেষ গুরুতর কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ উহারা সংখ্যায় অতি নগন্য। কিন্তু আজিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেরই যথাসাধ্য হুঁসিয়ার থাকা দরকার যাহাতে এই উত্তেজনাকারীদের পরিকল্পনা সফল না হয় এবং ৯ই আগষ্টে শান্তি বজায় থাকে।

ইতালীর দেশভক্ত গেরিলারা ইতালিয়ান ফ্যাসিস্টদের ধরিয়া আনিতেছে

[রেডিও ফটোগ্রাফ হইতে—ইউ এস ও ডব্লিউ আই-এর সৌজন্যে]

ফ্যাসিষ্টদের হিসাব নিকাশের দিন আগত

ইতালী মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য কাউন্ট স্ফোরজা ঘোষণা করিয়াছেন যে আগষ্ট মাসের শেষে ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের প্রধান দলের বিচার সুরু হইবে।

গান্ধীজির কংগ্রেস-লীগ মিলন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন
ফসল বাড়াইবার সঙ্কল্প

প্রাদেশিক কৃষক কমিটির অধিবেশন

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির এই সভা মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস-লীগ মিলন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং এই প্রচেষ্টা সফল করিবার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের মুক্তির দাবীকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিতেছে।"

"বাংলার কৃষি-ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিরামহীন ভাবে খাদ্য ফসল বাড়ানোর আন্দোলন চালাইয়া বাংলাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে যে, ফসল বাড়ানোর জন্য সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়া একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠিত করা হউক। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই কমিটির হাতে সরকার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দেওয়া হউক।"

২৪পরগণার ফলতা থানার মহীরামপুর গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয়।

২২শে ও ২৩শে জুলাই তারিখ সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপে বি, পি, কে, সির বৈঠক চলে। বাঁকুড়া ছাড়া অন্য সব জেলার প্রতিনিধিরাই সভায় উপস্থিত। গত ছয় মাসে সারা বাংলাদেশে কৃষক সভার নেতৃত্বে কি করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা চাষ বাড়ান হইয়াছে এবং কি করিয়া এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া কৃষক সভার নূতন সভা-সংখ্যা ৪০,০০০এ দাঁড়াইয়াছে—সম্পাদকের রিপোর্টে তাহার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস-লীগ মিলনের প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিবার ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির আন্দোলন চালাইবার প্রস্তাব তুমুল জয়ধ্বনির ভিতর গৃহীত হয়। লাল-ফৌজ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গনকে অভিনন্দন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষক সভার কাজ, খাবার ফসল বাড়ান, খাদ্য সংকট ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং কৃষক সভার জন্য ১৫০০৲ সংগ্রহ—এই ছয়টি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

২৩শে সকালে পোষ্টার ও শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন হয় এবং দুই দিনে প্রায় ৪ হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখেন।

২৪শে জুলাই গণ-সমাবেশের দিন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলিতেই ছিল। তবুও বেলা ২টা হইতেই দলে দলে লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিল। ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী নিশ্চিন্দিপাড় হইতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া ২০০ কৃষক নরনারী জাতীয় পতাকা ও লাল-ঝাণ্ডা হাতে জয়ধ্বনি দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পর পর আরও ৩।৪ টী ছোট ছোট মিছিল আসিয়া জমায়েত হইল। প্রায় ৩০ জন কংগ্রেস-ভক্ত জাতীয় পতাকা হাতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মনে তাঁহাদের কৃষক সমিতির নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। তাঁহারা শুনিতে আসিয়াছিলেন কৃষক নেতারা কি বলেন।

বেলা ৫ টার সময় স্কুল প্রাঙ্গন ও গৃহ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল। ২৫০০ জনতার সমাবেশ। এর ভেতর ছিল কৃষক, কংগ্রেস-ভক্ত, লীগ-ভক্ত আর সমগ্র জনতার এক তৃতীয়াংশ মেয়ে।

৬॥০ টার সময় প্রবীন কংগ্রেসী ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কৃষক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার দে'র সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। কমরেড ভবানী সেন গান্ধীজির কংগ্রেস-লীগের মিলন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলাই গান্ধীজির প্রচেষ্টার সফলতা হইতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবে। কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায় ও আবদুল রেজ্জাখ খাঁ চোরাবাজার কি করিয়া বাংলার জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করিতেছে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভার কাজ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় গণ নাট্য সমিতির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু হয়।

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজ ওয়ারশর মাত্র ৬ মাইল দূরে রহিয়াছে এবং ল্যাটভিয়ায় মিতাউ অধিকার করিয়াছে। ইহা ৫টী রেলপথের সংযোগ স্থল এবং এস্তোনিয়া ও ল্যাটভিয়া হইতে জার্ম্মাণদের পালাইবার শেষ রেলপথ। লালফৌজ রিগা উপসাগর

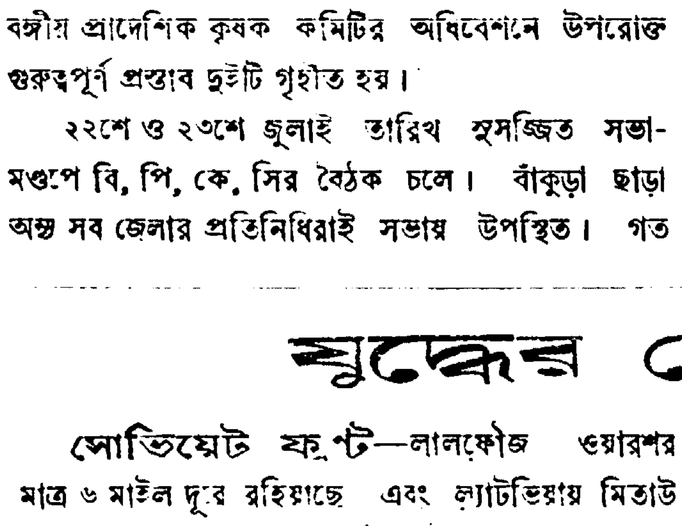

কারপেথিয়ান গিরিপথে মার্শাল কনিয়েভ

হইতে আর মাত্র ৮ মাইল দূরে আছে। মার্শাল ষ্টালিন ১লা আগষ্টের একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে তৃতীয় হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টে লালফৌজের এক নূতন আক্রমণ সুরু হইয়াছে। গ্রদনোর পশ্চিমে সোভিয়েট কামানগুলি পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় জার্ম্মান-ব্যূহে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করিতেছে। ৩১শে জুলাইয়ের মস্কো রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সোভিয়েট বাহিনী কারপেথিয়ান গিরিপথে কিছুটা পথ আগাইয়া গিয়াছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—ফ্লোরেন্সের জন্য প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। মিত্রবাহিনী সহরের মাত্র ৪ মাইল দূরে আছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—১লা আগষ্টের খবর নর্ম্যাণ্ডিতে ক্যানাডিয়ান সৈন্যরা তিলি-লা ক্যাম্প ছাড়িয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণরা এই সেক্টরে প্রচণ্ড তুমুল আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

আসাম-ব্রহ্ম-ফ্রণ্ট—টামু হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে জাপানীদের ঘাঁটি আছে তাহার উপর আক্রমণ চালান হইতেছে। ইম্ফল সমতল ক্ষেত্রে আর একটিও জাপানী নাই। ৩১শে জুলাই রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, টিডডিম সড়কে জাপানী আত্মরক্ষা বাহিনীকে নির্ম্মূল করা হইয়াছে। চীন-বাহিনী মিচিনার দক্ষিণাংশে নগরের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

ওয়ারশর উপকণ্ঠে মার্শাল রকোসভস্কি

চীন ফ্রণ্ট—আমেরিকান জঙ্গী বিমান সর্ব্ব প্রথম মাঞ্চুরিয়াতে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। মুকডেন ও আসানে এই বোমা ফেলা হইয়াছে। মুকডেন মাঞ্চুরিয়ার বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও আসান মুকডেন হইতে ৫৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

Regd. No. C. 2836

লালফৌজের গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে

ওয়ারশ, রিগা ও পূর্ব্ব প্রুশিয়ার প্রবেশদ্বারে তুমুল লড়াই

লালফৌজ উদ্দামগতিতে ওয়ারস দখলের চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও হতমান হিটলারী ফৌজ আজ শুধু পিছনেই হটিতেছে না, সোভিয়েট বাহিনীর আঘাতে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। মদোন্মত্ত হিটলার একদিন যাহাদের ভরসায় দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আজ তাহার সেই 'অপরাজেয় বাহিনী' দলে দলে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া লালফৌজের হাতে ধরা দিতেছে, সমগ্র রুশ-জার্ম্মাণ ফ্রণ্টে জার্ম্মাণ সমর-যন্ত্র দারুণ বিপর্য্যয়ের মুখে।

এ সপ্তাহের সোভিয়েট-জার্ম্মাণ ফ্রণ্টের খবর আলোচনা করিলে সহজেই বোঝা যায় যে বল্টিক অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণদের বিতাড়িত করিবার জন্য এবং পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় ও ওয়ারশতে পৌঁছিবার জন্য তিনটি খণ্ডে তুমুল সংগ্রাম চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। লালফৌজের অবিরাম আঘাতে ইতিমধ্যেই এই তিনটি অঞ্চলে জার্ম্মাণদের বিপদ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

লালফৌজের এক সপ্তাহের সাফল্যের খতিয়ান

গত এক সপ্তাহের ভিতর লালফৌজ এস্তোনিয়ার বিখ্যাত ঘাঁটি নার্ভা, লিথুয়ানিয়ায় প্রকাণ্ড রেলজংশন শাভলি ও রাজধানী কভনো, গুরুত্বপূর্ণ সহর বিয়ালিস্টক, ব্রেষ্টলিটভস্ক, ডেব্‌লিন, লভভ, প্রেসমিসিল ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রবেশ দ্বারে জার্ম্মাণদের সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ স্টানিস্লাভোভ দখল করিয়াছে।

ওয়ারসর ২০ মাইলের মধ্যে লালফৌজ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২৯শে জুলাই মস্কো হইতে জানাইতেছেন, সোভিয়েটের ট্যাঙ্কবহর আজ ওয়ারসর দক্ষিণপূর্বে সহরের ২০ মাইলের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছে এবং সোভিয়েটের বড় বড় শক্তিশালী কামান সহরের বাহিরকার রক্ষা-ব্যূহে দারুণ আঘাত

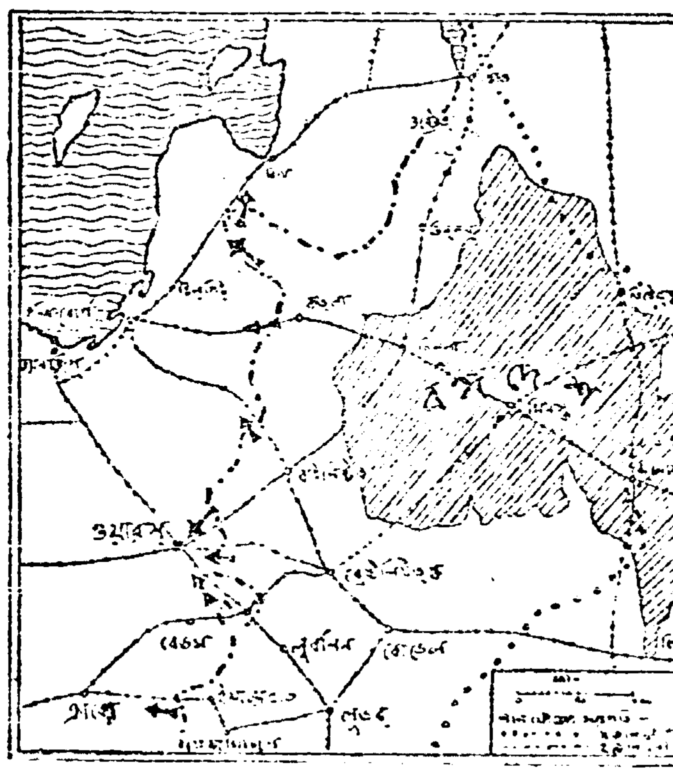

হানিতেছে। মার্শাল রকোসভস্কীর সেনাবাহিনী এই অঞ্চলে তাহাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া ৩০ মাইলব্যাপী এলাকা জুড়িয়া ওয়ারসর দিকে ধাইয়া চলিয়াছে। 'গ্লোব এজেন্সীর' সংবাদদাতা বলিতেছেন, ১৯৩৯ সালে জার্ম্মাণরা এক মাস অবরোধের পর ওয়ারস দখল করিয়াছিল। এবার আর এক মাসের প্রয়োজন হইবে না।

তিন ডিভিশান জার্ম্মাণ সৈন্য পরিবেষ্টিত

২৮শে জুলাইয়ের সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে ব্রেষ্টলিটভস্কের পশ্চিমে তিন ডিভিশন জার্ম্মান সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। লভভে ৮ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং সাড়ে তিন হাজার বন্দী হইয়াছে। সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে পরিবেষ্টিত জার্ম্মাণ সৈন্য শত চেষ্টা করিয়াও বেষ্টনীর মুখ ভাঙ্গিতে পারে নাই। লালফৌজ আস্তে আস্তে তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে। ইহা ছাড়া মস্কো রেডিও হইতে জানান হইয়াছে তৃতীয় হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রণ্টে এক মাসে নিহত বা বন্দী জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা ১৬১২৭৭ জন।

আরও দক্ষিণে

পোলাণ্ডের আর একটি বৃহৎ জার্ম্মাণ ঘাঁটি ক্রাকাও আজ লালফৌজের নাগালের ভিতর আসিয়াছে। লুবলিন দখল করার পর লালফৌজের একটি প্রকাণ্ড শক্তিশালী দল ক্রাকাও দখলের জন্য দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। এই ফ্রণ্টের সংবাদদাতারা মনে করিতেছেন যে ক্রাকাওতেও নাৎসীবাহিনীর বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। আবার ইহারই নীচে মার্শাল কনিয়েভের প্রথম ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মি স্টানিস্লাভোভের দক্ষিণ পশ্চিমে হিটলারের তাবেদার হাঙ্গেরীয় সৈন্যদের সাথে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতেছে। এই সেক্টরে লালফৌজ ইতিমধ্যেই বিখ্যাত জার্ম্মাণ ঘাঁটি প্রেজমিসিল দখল করিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড় পত্রে বলা হইয়াছে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের সানুদেশে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি স্টানিস্লাভোভের অধিকারে লড়াইয়ে লালফৌজের নিখুঁত সামরিক কৌশল ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিধ্বস্ত শত্রুসৈন্যদল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমে পলায়ন করিতেছে।

রিগা দখল আসন্ন

গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম জেনারেল এরমেঙ্কোর দ্বিতীয় বাল্‌টিক বাহিনী জেনারেল বাগ্রামিয়ানের প্রথম বাল্‌টিক বাহিনীর সহযোগে রিগার দিকে দুর্ম্মদ গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষ খবরে জানা যায় যে তাহারা রিগা হইতে আর মাত্র ২০ মাইল দূরে। এবং যে বেগে সোভিয়েট বাহিনী আগাইতেছে তাহাতে ল্যাটভিয়ার প্রসিদ্ধ নৌঘাঁটি রিগা যে অতি শীঘ্রই শত্রুকবলমুক্ত হইবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

☆ দ্বিতীয় ফ্রণ্টের লড়াই ☆

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী ৩১শে জুলাই সংবাদ দিতেছে মার্কিন সৈন্য গ্রানভিল অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রেভিয়-কভরাসেস সড়কও বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

রয়টারের ৩১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ—বৃটিশ বাহিনী কাঁনা ছাড়াইয়া দক্ষিণের দিকে তিন মাইল আগাইয়া গিয়াছে।

ফরাসী দেশভক্তরাও জোর আঘাত হানিতেছে

নির্ভরযোগ্য ফরাসী সূত্র হইতে ৩১শে জুলাই জানিতে পারা গেল, জার্ম্মাণ সৈন্যদের জন্য কতকগুলি ভারী ট্যাঙ্ক লইয়া ১২ খানি ট্রেণ নর্ম্মাণ্ডিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক ফরাসী বাহিনী ঐ সমরসম্ভারগুলি আর জার্ম্মাণদের নিকট পৌঁছাইতে দেয় নাই। পথিমধ্যেই উহা ধ্বংস করা হইয়াছে। ২৪শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ প্যারিসের জার্ম্মাণ সামরিক গভর্ণর অটো ফন ষ্টুলপনাগেলকে দেশভক্তরা হত্যা করিয়াছে।

মার্শাল তিতোর আহ্বান

মার্শাল তিতো যুগোশ্লোভ মুক্তি-ফৌজের প্রত্যেকটি ইউনিটকে যুগোশ্লোভিয়ার জার্ম্মাণ ঘাঁটিগুলির উপর অবিলম্বে আঘাত হানিতে আদেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন—যুগোশ্লোভ জাতীয় মুক্তি ফৌজকে ধ্বংস করিবার জন্য জার্ম্মাণরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবে তাহারা তাহাদের সৈন্যদের, তাহাদের দালাল পাভেলিচ, নেডিচ ও মিহাইলোভিচ প্রভৃতি পঞ্চম-বাহিনীদের এবং জার্ম্মাণ জনগণকে পরাজয়ের মনোবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আজ যখন লালফৌজ ও ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্রবাহিনীর শেষ ও চরম আঘাত আসন্ন তখন নাৎসীদের এই চেষ্টা আরও বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি তাই আদেশ দিতেছি যে জাতীয় মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর প্রত্যেকটি ইউনিট যুদ্ধক্ষেত্রের যেখানেই জার্ম্মাণ ফৌজের আড্ডা, সামরিক চলাচলের পথ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দেখিবে সেখানেই যেন চূড়ান্ত আঘাত হানে।

যুগোশ্লোভ ফ্রণ্টের সর্ব্বশেষ খবর

স্বাধীন যুগোশ্লোভ রেডিওর সংবাদে প্রকাশ মার্শাল তিতোর হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে ডালমেশিয়ার উপকূলবর্ত্তী তিনটি দ্বীপে সৈন্য নামানোর সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। সৈন্য অবতরণের সময় ৭০ জনেরও অধিক জার্ম্মাণ সৈন্যকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এবং অনুমান ৮০ জনকে বন্দী করা হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরভাগে সিবেনিক বন্দরের পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণদের সুদৃঢ় ঘাঁটি রিবনিক অধিকৃত হইয়াছে।

মুক্তির পথে পোলাণ্ড

সোভিয়েটের ঘোষণা—পোলিশ জনগণই পোলাণ্ডের মালিক

লালফৌজের পোলিশ এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে লণ্ডনে অবস্থিত পলাতক পোলিশ গভর্ণমেণ্ট হৈ-চৈ সুরু করিয়া দিয়াছে। বৃটেনের প্রতিক্রীয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরদের মধ্যেও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পলাতক পোলিশ গভর্ণমেণ্টের হৈ-চৈ ও কাজের পিছনে তাহাদেরই প্রচার ও সমর্থন রহিয়াছে।

এদিকে পোলিশ জাতীয়-মুক্তি কমিটি শত্রু কবল মুক্ত এলাকায় বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পোল্যাণ্ডের অংশ বিশেষ দখল বা পোলিশ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার কোন সংকল্প তাহাদের থাকিতে পারে না কারণ পোল্যাণ্ডের এলাকায় কি শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে উহা সম্পূর্ণরূপে পোলিশ জনসাধারণের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে এবং পোল্যাণ্ডের মিত্র জনসাধারণকে জার্ম্মান কবল হইতে মুক্ত করায় আগ্রহেই লালফৌজ পোল্যাণ্ডের এলাকায় সংগ্রাম চালাইতেছে।

পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির পক্ষ হইতে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে পোলিশ জাতীয় পরিষদই পোল্যাণ্ডের একমাত্র আইন সঙ্গত কর্তৃত্বের অধিকারী। দেশত্যাগী পোলিশ গভর্ণমেণ্ট হিটলারী দস্যুদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বরাবর ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং পোল্যাণ্ডকে এক নূতন বিপর্য্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। পোল্যাণ্ডের জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মুক্তি কমিটি ১৯২১ সালের ১৭ই মার্চ্চের রচিত শাসনতন্ত্র অনুসারে কাজ চালাইয়া যাইতেছে, একমাত্র উহাই আইন-সঙ্গত ভাবে রচিত শাসনতন্ত্র। গণপরিষদ নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত শাসনতন্ত্রের নীতিই মানিয়া চলা হইবে। পোলিশ ভূমি পোল্যাণ্ড পাইবে,—ইউক্রেনিয়ান, হোয়াইট রাশিয়ান ও লিথুয়ানিয়ান ভূমি যথাক্রমে সোভিয়েট ইউক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার হাতে যাইবে। পোল্যাণ্ডে অবস্থিত ফ্যাসিষ্টদল ও সংগঠনগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করা হইবে, ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করা হইবে। জাতীয় সম্পত্তি, বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহনের ব্যবস্থা ও বন সম্পত্তি রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হইবে। অবস্থা স্বাভাবিক হইলে সম্পত্তি ক্রমশঃ পূর্ব্ব মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কথা তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন। জার্ম্মানদের দখলে যে সব ভূ-সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার যে সব ভূ সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত জমিজমা লইয়া একটা ভূমি-তহবিল গঠন করা হইবে। যাহাদের ভূমি নেওয়া হইবে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করা হইবে। যে সকল চাষীর অংশে জমি কম আছে বা যে সকল চাষীকে বৃহৎ পরিবার পোষণ করিতে হয় তাহাদিগকে উক্ত তহবিল হইতে জমি দেওয়া হইবে। এইভাবে যাহাদের জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা তাহাদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটিকে স্বীকার করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উহার সহিত যে চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছে তাহার দশটি দফার প্রধান কয়েকটি এইরূপ: যুদ্ধ অঞ্চলে সোভিয়েট কম্যাণ্ডার-ইন-চীফই সর্ব্বোচ্চ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন; শত্রু কবল মুক্ত অঞ্চলগুলিতে পোলিশ শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং পোলিশ কমিটি ঐ অঞ্চলের বে-সামরিক শাসন পরিচালনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে—পোল সৈন্যদের সম্বন্ধে পোলিশ সামরিক আইন বলবৎ হইবে।

লণ্ডনে পলাতক পোলিশ গভর্ণমেণ্ট এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তকদের ক্ষমতালোভী মুষ্টিমেয় বাহিরের লোক বলিয়া এক বিবৃতি দিয়াছে।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের চরম দুর্দ্দিনে এই গভর্ণমেণ্টের ধুরন্ধররা পোল্যাণ্ডের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণভয়ে লণ্ডনে পলাইয়া যাইয়া আশ্রয় নেয়। আর যাহাদের তাহারা ক্ষমতালোভী মুষ্টিমেয় লোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে তাহারা পোলিশ জনসাধারণের বিপদের দিনে তাহাদের পাশে থাকিয়া নানা লাঞ্ছনা ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়া জার্ম্মান দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া আসিয়াছেন। এই পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির অধীনে ১ লক্ষ সুসংহত সশস্ত্র বাহিনী আজ লালফৌজের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইঁহাদেরই অধিনায়কত্বে লক্ষ লক্ষ বীর পোলিশ সন্তান গেরিলা বাহিনীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জার্ম্মান লাইনের পেছনে দস্যুকে আঘাত করিতেছে। কিছু আগে পর্য্যন্তও লণ্ডনে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে পুষ্ট পলাতক এই প্রতিক্রীয়াশীল গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বিষোদ্গার করিয়াছে এবং পোল্যাণ্ডে অবস্থিত তাহাদের গুপ্ত সংগঠনের মারফৎ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদেরই সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু আমেরিকা, বৃটেন ও দুনিয়ার অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল জনসাধারণকে আজ আর প্রতারিত করা চলিবে না। যুগোশ্লাভিয়ায়, ইটালীতে ও ফ্রান্সে প্রতিক্রীয়াশীলদের চাল ব্যর্থ হইয়াছে—পোল্যাণ্ডেও তাহাদের অন্যথা হইবে না।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা] ৯ই আগাস্ট, বুধবার, '৪৪, ২৪শে শ্রাবণ '৫১ [দাম ছ' পয়সা

রবীন্দ্রনাথ স্মরণে

তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনই একদিনে রবীন্দ্রনাথের গৌরবদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মরণজয়ী; যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসী এই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিবে, তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে।

জগৎকবিসভায় রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও আমরা গর্ব করি। দুনিয়ার দরবারে যাঁহারা আমাদের এই সুপ্রাচীন, দুঃখাবনত দেশকে আবার সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী।

কিন্তু কেবল মহাকবি বলিয়াই আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতেছি না। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়াই আজ তাঁহাকে আমরা স্মরণ করিতেছি না।

বর্ত্তমান যুগে অন্য দেশেও সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাট প্রতিভার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। কিন্তু গোর্কি ও রলাঁকে বাদ দিলে দেখা যায় যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই আজিকার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষকে পথের নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের চন্দ্রচ্ছায়ায় কিম্বা সাহিত্য সৃষ্টির কল্পলোকে আশ্রয় লইয়াছেন, উটপাখী যেমন বালিতে মাথা গুঁজিয়া ভাবে যে ঝড় তাহাকে স্পর্শ করিবে না, তেমনই সমাজজীবনের সহস্র সমস্যাকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে কখনও নিজেকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন; ভারতের নিরন্ন, চিরলাঞ্ছিত জনতার দুঃখ তাঁহার বুকে যেন শেলের মত বিঁধিয়াছিল।

১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন যুবক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার লেখনী হইতে কত কবিতা ও গান যে জাতীয় জীবনে নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯১৯ সালে সাম্রাজ্যবাদ যখন পঞ্জাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, রবীন্দ্রনাথ তখন 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়লাটকে যে পত্র লেখেন, দেশবাসী তাহা ভুলিবে না। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজ শাসনের তারিফ করিয়া অথচ ভারতবর্ষের বন্ধু সাজিয়া মিস্ র‍্যাথবোন্ যাহা বলেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের তেজোদৃপ্ত বিবৃতি দেশ কখনও ভুলিবে না।

বহুজাতি মিলিয়া ভারতের যে বিশিষ্ট সত্তা, তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য মুক্তি যে কত প্রয়োজন, অনবদ্য ভাষায় তিনি তাহা বলিয়াছেন। মুক্তির সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিয়া দুনিয়াকে চমৎকৃত করিবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল।

ঐক্যের মন্ত্রবাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল :—

"মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির, একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি দাঁড়াবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।"

মুক্তির অন্বেষণে "ভজন পূজন সাধন আরাধনা" লইয়া থাকিতে তিনি চান্ নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল "যেথায় মাটী ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারোমাস।" নিশ্চল, নির্বীর্য্য, আত্মঅবিশ্বাসকে তিনি কশাঘাত করিয়াছিলেন :

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এক সময় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে মানবপ্রেম প্রচারের ফলে সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু ক্রমে তাঁহার মতে পরিবর্ত্তন আসে। "অত্যাচারীর বক্ষে বসিয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি" যে কত সুখ আছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের কদর্য্য দমননীতি দেখিয়া তিনি তাই বলিয়াছিলেন :—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি
বেসেছ ভালো?"

সাম্রাজ্যবাদেরই জঘন্যতম সংস্করণ হিসাবে ফ্যাশিজম্ যখন দেখা দিল, তখন জাপানী কবির শত কৌশল সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কম্বুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :—

"মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী,
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন"

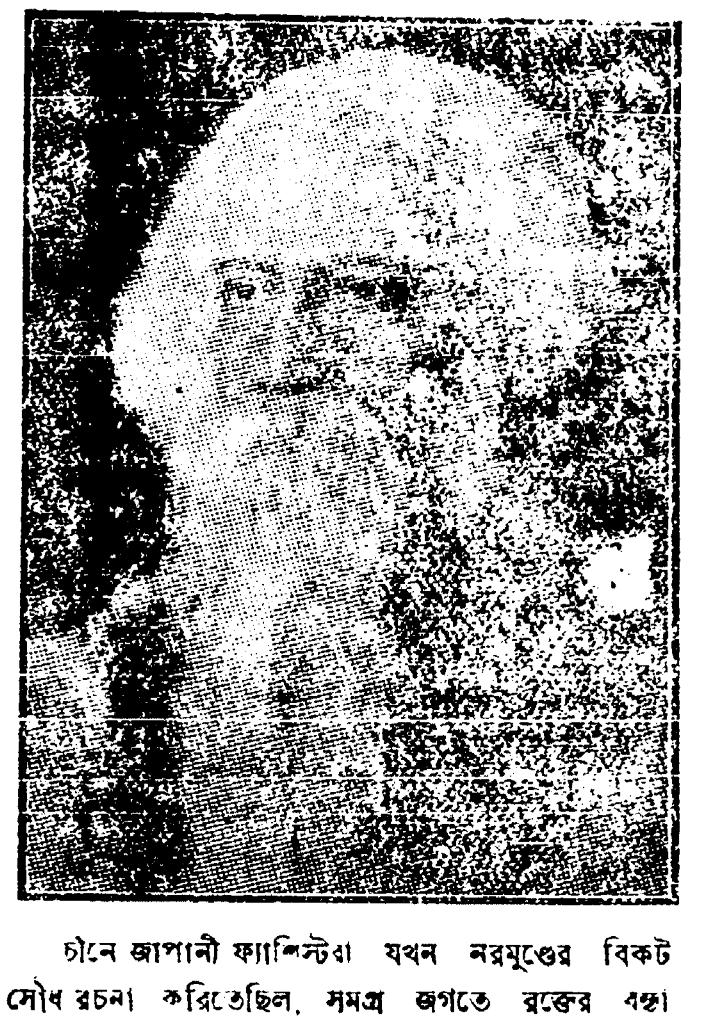

চীনে জাপানী ফ্যাশিস্টরা যখন নরমুণ্ডের বিকট সৌধ রচনা করিতেছিল, সমগ্র জগতে রক্তের বন্যা বহাইয়া ফ্যাশিস্ট দুঃশাসন চাপাইবার চেষ্টা যখন দেখা দিল, তখন আমাদের কবি আহ্বান দিলেন :

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ত্তমানযুগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মুক্তিপথযাত্রায় একজন নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জনগণের অপরাজেয় শক্তিতে ভরসা ছিল আমাদের কবির। তাই শেষ রচনাবলীতে তিনি বলিয়াছিলেন যে দুনিয়াকে যাহারা নানাভাবে মেহনৎ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদেরই নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তাই সোভিয়েট দেশে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ রাজ রোষ অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে সংকোচ করেন নাই যে মজুর-কৃষকদের রাজ্যেই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। তাই মৃত্যুশয্যাতেও তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে সোভিয়েটের যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন, বলিতেন যে সোভিয়েট নিশ্চয়ই জিতিবে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে দেশবাসী পরম শ্রদ্ধায় তাঁহার অতুল অবদানের কথা স্মরণ করিতেছে।

৯ই আগষ্টে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ

১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিতেছেন :—

"১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট আমার এই ইচ্ছাই ছিল যে, আমি শান্তিপূর্ণভাবে দেশের অবস্থা তলাইয়া দেখিব এবং মীমাংসার জন্য কথাবার্ত্তা সুরু করিব। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বা অদৃষ্ট অন্যরূপ ঘটাইল। গভর্ণমেণ্টও যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তেমনি কিছু লোকও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ধ্বংসমূলক কাজ সুরু হইল এবং এই রকম অনেক কিছু কাজই করা হইল কংগ্রেসের বা আমার নামে।"

* * * *

এইবারের ৯ই আগষ্টে জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গান্ধীজী নির্দ্দেশ দিতেছেন যে তিনি যে চৌদ্দদফা কার্য্যতালিকা দিয়াছেন, তাহা পুরাপুরি বা আংশিক ভাবে পালন করাই ৯ই আগষ্টের কাজ হইবে।

গান্ধীজীর চৌদ্দ দফা কাজ :—

(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ
(৩) মাদক দ্রব্য বর্জ্জন (৪) খদ্দর প্রচার
(৫) গ্রাম্য শিল্প প্রচার (৬) গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা
(৭) শিক্ষা প্রচার (৮) প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা
(৯) নারী জাতির উন্নতি (১০) অনুন্নত জাতির সেবা
(১১) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার (১২) রাষ্ট্র ভাষা প্রচার
(১৩) মাতৃ ভাষার প্রতি প্রীতি (১৪) অর্থনৈতিক সাম্য সংস্থাপন।

—৫ই অগাষ্টের বিবৃতি।

সম্পাদকীয়

মজুরদের দাবী

বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে মজুরদের জীবনধারণের খরচা আড়াইগুণ হইতে তিনগুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের লোভের কাছে গবর্ণমেণ্ট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়াই তাহারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই, দাম এতদূর চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু খরচা বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরদের উপযুক্ত মাগ্‌গিভাতা দিয়া বাঁচাইতে সরকার নিজেও নারাজ, মালিকদিগকেও বাধ্য করিতে রাজি নয়। গবর্ণমেণ্ট নিজের প্রয়োজনে ও অক্ষমতায়ই অসংখ্য কাগজের টাকা বানাইয়া টাকা সস্তা করিয়া দিয়াছে, জিনিষপত্রের দর চড়াইয়া দিয়াছে—অথচ সেই গবর্ণমেণ্ট টাকা বাড়িয়া যাইবে এই অজুহাত দিয়া মজুরদের মাগ্‌গিভাতা কমাইবার চেষ্টা করে। এমন কি সরকার নিযুক্ত গ্রেগরী কমিটিই সুপারিশ করিল যে মজুরদের খরচা বৃদ্ধি অনুপাতে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় এরূপ মাগ্‌গিভাতা দেওয়া উচিত—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই সুপারিশ আজও জনসাধারণকে জানিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই।

যুদ্ধকালীন কারখানার কাজ বাড়িয়াছে, মজুরদের পরিশ্রম যুদ্ধের আগের চাইতে প্রচণ্ড রকম বাড়িয়াছে। নূতন নূতন রকমের কাজ করিয়া তাহাদের কাজের দক্ষতাও অনেক বাড়িয়াছে। অন্যপক্ষে শিল্পপতিরা যুদ্ধের বাজারে প্রচুর লাভ পিটিয়াছে, ব্যবসার বিস্তার করিয়াছে, ভবিষ্যত মুনাফার আরও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের আগে ভারতের মজুরদের যে অতি অল্প ও অমানুষিক মজুরির হার ছিল বর্ত্তমানেও তাহাই আছে। গবর্ণমেণ্ট ও মালিকশ্রেণী ইহা বাড়াইবার সমস্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়েভেল সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া চুণোপুঁটি পর্য্যন্ত সকলেই খুব বাজার সরগরম করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধ যে শেষ হইয়া আসিল, জাতীয় সরকার কায়েম না হইলে উহার পরে বেকারীর যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে, মজুর পরিবারের মাথা পিছু আয় কমিয়া আসিয়া মজুর মরিতে বসিবে—এই সব কথা ভাবিয়া এখন মজুরদের মূল মজুরির হার বাড়ানো সম্বন্ধে কেহ উচ্চবাচ্যও করেন না। অথচ বিলাতে যেখানে খরচা মাত্র শতকরা ১০ হইতে ২৪ ভাগ বাড়িয়াছে সেখানে এই যুদ্ধের সময়ের মধ্যেই মজুরেরা শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত মূল মজুরির হার বাড়াইয়া লইতে পারিয়াছে।

সরকার মজুরকে উপযুক্ত মাগ্‌গিভাতা দিয়া বাঁচাইতে রাজি নয়, উপরন্তু বেশী মাহিনার কাজ জুটাইয়া বাঁচিবার যে মামুলি অধিকার মজুরদের এতদিন ছিল তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। টেকনিক্যাল পার্সোনেল অর্ডিন্যান্স অনুসারে হুকুম জারি হইয়াছে যে পটু বা অর্দ্ধপটু কারিগরেরা যত অল্প মাহিনায় যেখানেই কাজ করুক সে কাজ ছাড়িয়া অন্যত্র বেশী মাহিনার চাকুরী করিতে পারিবে না; কিন্তু মালিক ইচ্ছা করিলেই অবাধ্যতা প্রভৃতির অজুহাত দিয়া তাহাকে তাড়াইতে পারিবে—মালিকের বিচারের উপর কোন কথা চলিবে না।

মজুররা যাহাতে সরকার ও মালিকদের এই নীতি বদলাইয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে সেজন্য সমস্ত কারবারের মজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গত সপ্তাহ হইতে জোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। মজুর শ্রেণীই ভারতবর্ষে দেশরক্ষার ও সেজন্য পণ্য উৎপাদনে অগ্রণী। আমরা আশাকরি—এই দেশরক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যদিয়া যে ঐক্যের শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়াছে সেই ঐক্যকেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পতাকাতলে আরও শক্তিশালী করিয়া নিজেদের দাবীও তাহারা আদায় করিবে।

দুর্গতকে বাঁচাইতে বিহারে কংগ্রেস-লীগ মিলন

বাংলা কি পিছাইয়া থাকিবে ?

২রা আগষ্ট ইউনাইটেড প্রেস খবর দিতেছে যে, উত্তর বিহারে হাজার হাজার কলেরাক্রান্ত লোককে সাহায্য দিবার জন্য বিহার প্রদেশের কংগ্রেসসেবীরা তৎপর হইয়াছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন যাতে অর্থসংগ্রহের জন্য সমস্ত দল মিলিয়া আবেদন বাহির করা যায়। **এই উদ্দেশ্যে বিহারের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খাঁ বাহাদুর ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করেন। প্রকাশ যে, খাঁ বাহাদুর যুক্ত আবেদন বাহির করিতে রাজী হইয়াছেন।**

দুর্গত দেশবাসীকে বাঁচাইতে আজকে বিহারে কংগ্রেস ও লীগ মিলিত হইয়াছে। বিহারের চেয়ে বাংলার দুর্গতি শতগুণ বেশী। বিহারের চেয়ে বাংলায় কংগ্রেস ও লীগের জনসেবার কাজের সুযোগ ও সুবিধাও বেশী। কেননা, এখানে লীগের হাতে মন্ত্রিত্ব, কংগ্রেসও আইন পরিষদে রহিয়াছে। কংগ্রেস-লীগ মিলিত হইলে একদিনে আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা চূর্ণ হইয়া যাইত, লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচাইতে পারা যাইত। লীগের প্রতি কংগ্রেসের সন্দেহ, কংগ্রেসের প্রতি লীগের অবিশ্বাস—ইহারই ফলে বাংলা এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর মূল্য দিয়া শুধু আমলাতন্ত্রকে বলীয়ান করিয়াছে। বিহারের দৃষ্টান্ত হইতে বাংলার কংগ্রেস ও লীগ শিক্ষালাভ করুক।

যুদ্ধের শেষ-খবর

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—আমেরিকান সেনা প্যারিস হইতে ১৩৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। ব্রিটানীর উত্তর উপকূলে মিত্রসেনা সেণ্ট ব্রিউক দখল করিয়াছে। ইহা ছাড়া তাহারা লান্ভাল ও মেয়িনী অধিকার করে। এ পর্য্যন্ত ব্রিটানীতে ১৩৩০০ জার্ম্মাণ সেনা বন্দী ও ৩৪০০ মারা গিয়াছে।

লালফৌজ যে খাস জার্ম্মানীতে ঢুকিয়াছে এই খবর দিয়া একটি ইস্তাহার ৪ লক্ষ কপি দ্বিতীয় ফ্রণ্টের জার্ম্মান সেনাদের কাছে বিমান মারফৎ ছড়ানো হইয়াছে।

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—পূর্ব্ব-প্রুসিয়ান সীমানায় লালফৌজ জার্ম্মান লাইন আরও কয়েক মাইল পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে। জার্ম্মানরা অনবরত নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। কারপেথিয়ান সেক্টরে লালফৌজ ড্রোহোভিকস্ দখল করিয়াছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—ফ্লোরেন্সের দক্ষিণ পূর্ব্বে বৃটিশ সেনা আগাইয়া যাইতেছে। ফ্লোরেন্স সহরের ভিতর ফ্যাসিষ্টবিরোধী জনগণ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতেছে।

বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে জিন্নাকে বন্দী কর!

গান্ধীজির প্রস্তাবে বিপুল সমর্থন জাগিতেছে

আসুন আমরা ৯ই অগাষ্টের নূতন কর্ত্তব্য পালন করি !

৯ই আগষ্ট "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য হইল পরস্পর-সদিচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের ভাব প্রকাশ করার উপযোগী ব্যবস্থা করা। হিন্দু ও মুসলমানেরা একসঙ্গে প্রার্থনার ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, ভগবান কায়দে আজমকে ও আমাকে যেন এমন জ্ঞান দেন যাহাতে আমরা ভারতের স্বার্থে সর্ব্বসম্মত নিষ্পত্তিতে পৌছিতে পারি।"

মহাত্মা গান্ধী—৫ই আগষ্ট

"সংবাদপত্রগুলির কাছে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কাছে আমি আবেদন করিতেছি তাঁহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিন, সমস্ত উত্তম সহকারে বন্ধুত্বের আবহাওয়া ও সদিচ্ছা গড়িয়া তুলুন এবং আমাদের সুযোগ দিন যাহাতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুটী বিরাট জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি—এবং তাহাতেই আমাদের হৃদয়ের কামনা পূর্ণ হইতে পারে, দুটী জাতিই স্বাধীনতা পাইতে পারে।…

আমরা দুইজন (অর্থাৎ জিন্না ও গান্ধী) কাহারও শত্রু নই এবং আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল এই দেশের সমস্ত শ্রেণীর জনগণের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করা।"

মিঃ জিন্না ৫ই অগাষ্ট

গান্ধীজি জানেন যে লীগের সঙ্গে নিষ্পত্তির পরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ক্ষমতা ছাড়িতে বাধ্য হইতে পারে, তাহার আগে নয়। তাই কমন্স আলোচনায় তাঁহার সাময়িক গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নাকচ হওয়ার পরও তিনি "জোর দিয়া বলেন যে…উহাতে তাঁহার সাম্প্রদায়িক মিটমাটের প্রস্তাব মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।…বরং এক হিসাবে বলা চলে যে রাজনীতিক অচল অবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এখন সমস্ত দলই সাম্প্রদায়িক সমাধানের প্রশ্নে মনোনিবেশ করিতে পারিবে।" (৩০শে জুলাই সাক্ষাতের বিবরণ—এ, পি কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।

বাঙ্গালীর মনের আশা

স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে চেষ্টা করিতে পারিবে বলিয়াই গান্ধীজি ও রাজাজি লীগের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই আপোষে বাস্তবিকই জিন্না সাহেব রাজি হইবেন কি না সে বিষয়ে অনেক বাঙ্গালী হিন্দুর মনে সন্দেহ আছে, কিন্তু এরূপ আপোষ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা নাই তাহা তাঁহারা প্রায় সকলেই বোঝেন। সেজন্যই যে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে এককালে তুমুল তুফান উঠিয়াছিল, কংগ্রেসকর্মীরা পর্যন্ত কংগ্রেসের অনুশাসন ভঙ্গ করিয়াছিলেন—আর যে বাঙ্গালী হিন্দু গত দুই বৎসর ধরিয়া শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে লীগ-বিরোধী উত্তেজনাকেই একমাত্র রাজনীতি বলিয়া জানিয়াছিলেন—সেই মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যেও এবার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও গান্ধীজির বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রচণ্ড ঝড় তুলিতে পারেন নাই।

ক্ষমতাবঞ্চিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মহামারীবিধ্বস্ত বাঙ্গালীর মনে বহুদিন পরে আজ আশা জাগিতেছে—হয়তো এবার আপোষের ফলে আমরা ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিব! গত দুই বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় হিন্দু-বাঙ্গালী আরও দেখিয়াছে যে লীগের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ঝগড়ার যত যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকুক—সেই সন্দেহ ও তিক্ত কলহ তাহাদিগকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতার পথে একচুলও অগ্রসর করাইতে পারে নাই, শুধু বিপদের পর বিপদ আসিয়া বাংলার জীবনকে খান্ খান্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লীগ তথা মুসলিম বাংলার সঙ্গে আরও তিক্ত কলহ, আরও প্রচণ্ড রেষারেষি ছাড়া প্রাদেশিক হিন্দু নেতারা তাহাদিগকে পরিত্রাণের কোনো পথ দেখাইতে পারেন নাই। আজ গান্ধীজি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব রাজনীতিক দক্ষতায় "অসম্ভব" আপোষও হয়তো সম্ভব হইয়া যাইবে একথা অতি বড় অবিশ্বাসীর মনেও জাগিতেছে—বাঙ্গালী অনুভব করিতে আরম্ভ করিতেছে যে এবার কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদ সে আশার বিরোধী

পাকিস্তান সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর মনে অনেক ন্যায্য সন্দেহ আছে। কিন্তু তবুও লীগের সঙ্গে আপোষ প্রস্তাবের মূলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের এই সম্ভাবনা জড়িত আছে বলিয়াই বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কংগ্রেসকর্মীরা আগের দিনের মত শ্যামাপ্রসাদের পিছনে দাঁড়াইতে পারেন নাই। কারণ শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দুসভা মিটমাটেরই বিরোধী—মিটমাট না হওয়ার ফলে স্বাধীনতা যদি না পাওয়া যায় তাহাতেও তাঁহাদের ক্ষতি নাই। শ্যামাপ্রসাদ বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "…জিন্না অথবা রাজাগোপালচারী মার্কা পাকিস্তানের আত্মঘাতী নীতির ভিত্তিতে কোন রাজনীতিক মীমাংসা কদাচ গ্রহণযোগ্য হইবে না।" আর ইহারই জের টানিয়া বঙ্গীয় হিন্দুসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক "হিন্দুস্থান" পত্রিকা লিখিয়াছে, "…তিনি (রাজাজি) যেন তেন প্রকারেণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠা করিয়া 'অচল অবস্থা' ঘুচাইতে বদ্ধপরিকর।… হিন্দু মহাসভা তাহা কিছুতেই হইতে দিতে পারে না। এজন্য যদি তথাকথিত রাষ্ট্রীয় 'স্বাধীনতা' কিছুদিন বিলম্বিত হয়, আমাদের আপত্তি নাই।"

গান্ধীজির আপোষ প্রস্তাব স্বাধীনতা আন্দোলনকেই শক্তিশালী করিবার জন্য; আর ক্ষুদ্র সন্দেহের তাড়নায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে তাহা স্বাধীনতা আন্দোলনেরই পরিপন্থী হইবে—এ দুটী কথা বাংলা দেশের অনেকে বুঝিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা দ্বিধাহীনভাবে গান্ধীজির সমর্থনে আগাইয়া আসিতেছেন। নিরলস ও অনাড়ম্বর জনকল্যাণের মধ্য দিয়া যে সব কংগ্রেসকর্মী বাংলায় কংগ্রেসের পতাকা বহন করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় **সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত** তাঁহাদের প্রধান। তিনি ছাত্রদের কাছে বলিয়াছেন, "এ কথা বলাই বাহুল্য যে দীর্ঘকাল দাসত্বের পাপে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মরিয়াছে। তাই গান্ধীজি আজ দাসত্ব ঘুচাইবার কাজ শুরু করিয়াছেন।……একদল আছে যাহারা বিভেদ চায় এবং গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু তাহারা কখনও সফল হইতে পারিবে না—কেননা তাহারা জনসাধারণের অন্তরের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছে।"

হিন্দুসভার অন্দর মহলেও ভাঙ্গন

ঠিক এইজন্যই শ্যামাপ্রসাদ বাবু আজ নিজের বিশেষ মহলেও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতেছেন। ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতি সঙ্গতিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই হিন্দুসভার সব চেয়ে বড় সমর্থক। অথচ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ক্লাব হইতে ৫১ জন ব্যারিষ্টার রাজাজির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, ঝগড়াঝাটি বন্ধ করিয়া বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় আপোষের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিয়া তুলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার পক্ষে আর ৫১ জন ব্যারিষ্টারও পাইবেন কিনা সন্দেহ। প্রকাশ যে হিন্দুসভার সম্পাদকের পুত্রও গান্ধী-রাজাজি প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। এ-পির গুপ্তচরদের কাছে সংবাদ পাইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু নাকি সম্পাদক দ্বারা তাঁহার পুত্রকে শাসন করাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল হয় নাই!

আইন সভার মধ্যে "সংগ্রামকারী" শ্যামাপ্রসাদ বাবু সেই সব কংগ্রেসকর্মীকেই ভাল করিয়া জানেন যাঁহাদের বেশীর ভাগ আইন সভার ভিতরে। তাই শ্যামাপ্রসাদ বাবু শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়কে ধরিয়া "বাংলার কংগ্রেসকর্মীদের" একটী বৈঠক করাইলেন—এবং ইঁহারা প্রস্তাব পাশ করিলেন যে "বাংলার কংগ্রেসকর্মীরা" গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করে না।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের বিপুল সমর্থন

কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধিতা যে-শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু-সভার সাংগঠনিক ভিত্তি তাঁহারা বোধহয় জানেন না যে কংগ্রেসের আসল অস্তিত্ব আইন সভার বাহিরেই। আইন সভার সভ্য হন বা না হন হাজার হাজার নিরলস নেতা ও কর্মীর জনআন্দোলনেই কংগ্রেসের ভিত্তি। এইরূপ বহু কংগ্রেসকর্মী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা গত ৩রা জুলাই শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন ডাকেন। সেখানে সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব পাশ হয়: "…ভারতের বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে এবং স্বাধীনতার ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হইবে এই আশায় গান্ধীজি কর্ত্তৃক অবলম্বিত পন্থায় আমরা আমাদের পূর্ণ সমর্থন এবং গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানাইতেছি।" এই সভায় অন্যান্যের মধ্যে শ্রীমতী চারুপ্রভা সেন, শ্রীসুকুমার দত্ত, (এম, এল, এ) রতনমণি চাটার্জি, সুধীরচন্দ্র লাহা, জিতেন্দ্র মোহন দত্ত, সীতারাম সাকসেরিয়া, বসন্তলাল মুরারকা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায় গান্ধীজিকে সমর্থন করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।

রংপুর, নদীয়া, মৈমনসিংহ, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত কংগ্রেসকর্মী একবাক্যে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। নদীয়ার শ্রীযুক্ত হরিপদ চ্যাটার্জি এম, এল, এ ও কলিকাতার জে, সি, গুপ্ত (কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির চীফ হুইপ) গান্ধীজির সমর্থনে বিবৃতি দিয়াছেন।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকার মাণিকগঞ্জের অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী সভায় একত্র হইয়া গান্ধীজির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন।

কুমিল্লার শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল রায়, শরৎ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা ঘরোয়া বৈঠকে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

শোনা গেল যে বাংলা কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা জেল হইতে বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করা উচিত।

হক সাহেব এবং কৃষক প্রজাও!

সম্প্রতি রংপুরের এক জনসভায় শ্যামাপ্রসাদকে সব চেয়ে বেশী তাজ্জব বনিতে হইয়াছে। লীগের সঙ্গে লড়িবার জন্য তাঁহার বহুদিনের বিশ্বস্ত সাথী হক সাহেব। তাঁহাকে লইয়া শ্যামাপ্রসাদ রংপুরের জনসভায় হাজির হইয়া গান্ধীজির প্রস্তাবের খুব নিন্দা করিলেন, বলিলেন উহা "পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ" কিন্তু তাঁহার পরে হক সাহেব উঠিয়া ঘোষণা করিলেন তিনিও পাকিস্তানের সমর্থক, লাহোর লীগ-কন্‌ফারেন্সে পাকিস্তান প্রস্তাব তিনিই তুলিয়াছিলেন। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদকে খুশী করিবার জন্য তিনি একটু ইতস্তত করিয়া একথাও বলিলেন যে বাংলা দেশে পাকিস্তান পরিকল্পনা কতখানি প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের পাকিস্তান-বিরোধী আগুনের উপর তিনি প্রথমেই যে জল ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে সে আগুন আর জ্বলিল না।

মিঃ শামসুদ্দীন, হুমায়ুন কবীর প্রভৃতি পরিচালিত কৃষকপ্রজা দলই শ্যামাপ্রসাদের লীগ-বিরোধী সংগ্রামে মুসলিম পঞ্চমবাহিনী। কিরণ শঙ্কর প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাও এই ধরণের "জাতীয়তাবাদী" মুসলমানদের মায়ায় লীগের সঙ্গে হাত মিলাইতে রাজি হ'ন না। এহেন নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির কার্য্যকরী সমিতিও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে: "…মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে আমরা সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। মিঃ জিন্নাই এতদিন স্বাধীনতার পথে কণ্টক হইয়া রহিয়াছেন। আজ তিনি যদি সত্যই ভারতের স্বাধীনতার দাবী করেন তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের দাবীকে এড়াইবার কোন অজুহাতই পাইবে না।". (যুগান্তর, ৭ই আগষ্ট)।

বাংলা দেশের লোকের মনে এই বিশ্বাসই আছে যে গান্ধী জিন্না একত্রে স্বাধীনতার দাবী করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহা এড়াইতে পারিবে না। সেজন্যই তাহারা বেশী বেশী করিয়া গান্ধীজির প্রস্তাবের সমর্থনে আগাইয়া আসিতেছে, শ্যামাপ্রসাদের সমর্থন বাড়িতেছে না।

ভ্রান্ত সন্দেহ

কিন্তু কিরণবাবু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতার মতই অনেক বাঙ্গালীর মনে এখনও সন্দেহ আছে। সে সন্দেহের প্রথম কথা হইল—মিটমাট ভালই, কিন্তু জিন্নার কি আর মিটমাটের ইচ্ছা আছে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি একটা অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িবেন! শ্যামাপ্রসাদ বাবুদের দলও এই কথাই সর্বত্র প্রচার করিয়া লোকের উৎসাহ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। লীগের বিভিন্ন মহলে আপোষের ইচ্ছা কি উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা ইহার আগে লীগপন্থী পত্রিকাগুলি হইতে তুলিয়া দেখাইয়াছি। এবার লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন ও অন্যান্য নেতাদের মতামত দিতেছি:—

লীগ মহলে কি বিপুল সাড়া

লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য খান বাহাদুর করামৎ আলি এম, এল, এ (পাঞ্জাব) বলেন: "আমার দৃঢ় মত এই যে মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে আপোষ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা…যদি এরূপ আপোষ হইয়া যায়—এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে হইবেই—তো ভারতের সব কিছুই বদলাইয়া যাইবে, আমরা ভারতের স্বাধীনতার এত কাছে পৌছিব যাহা কখনও পৌছাই নাই।"

ওয়ার্কিং কমিটির আর একজন সভ্য ও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সর্দার ঔরংজেব খান বলেন: "আগামী গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের পরিণতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই খুব আশান্বিত।"

সর্দার আবদুর রব নিস্তার বলেন: "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষের সম্ভাবনা এত উজ্জ্বল আর কোনো দিন হয় নাই।"

লীগের মুখপত্র 'ডন' আরও একজন ওয়ার্কিং কমিটি সভ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছে, তিনি বলেন: "আপোষের মধ্য দিয়া আমাদের সকলেরই লাভ। এই পরম মুহূর্ত্তে হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই উচিত বিরোধের উপর জোর না দিয়া যতখানি নিজেদের মধ্যে মিল আছে তাহার উপরে জোর দেওয়া।

বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব ইসমাইল বলেন: "আমরা শ্রান্ত, পীড়িত—যদি আমরা আপোষ না করি তো দাসত্বই চিরস্থায়ী হইবে।"

সাহাবুদ্দীন এবং নাজিমুদ্দীনও?

বাংলার বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ খাজা সাহাবুদ্দীন বলিয়াছেন, "ভারতের এই দুটী প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে আশু, সম্মানজনক ও স্থায়ী মীমাংসার সম্ভাবনায় প্রত্যেকেই আনন্দিত—কারণ ইহা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে না।"

এখন শোনা যাইতেছে যে, রাজাজির প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া মাত্র বাংলার প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন মুসলিম সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বিচার করা উচিত—কারণ ইহাতে আপোষের সম্ভাবনা অত্যন্ত নিকট হইয়াছে। তাহাতে বাংলা দেশেরই সবচেয়ে বেশী লাভ কারণ হিন্দু মুসলমান আপোষ ছাড়া বাংলাদেশ বাঁচিতে পারে না।

আপনার ও আমার কর্ত্তব্য

লীগ মহলে দিকে দিকে এমনি উৎসাহ ও সদিচ্ছা জাগিয়াছে। জিন্না সাহেবের সাধ্য কি এই উৎসাহ উপেক্ষা করেন! আমরা মনে করি যে জিন্না সাহেব তাঁহার লাহোর বক্তৃতায় ও তাহার পরে প্রেস কনফারেন্সে সেই উৎসাহেই নিজেও সাড়া দিয়াছেন। কিন্তু তবুও যদি কেহ মনে করেন যে সেই উৎসাহকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপোষ ভাঙ্গিয়া দিবার ইচ্ছা জিন্না সাহেবের আছে—তাহা হইলে বলিতে হয় যে সে ক্ষমতা আর এখন তাঁহার নাই।

কিন্তু সে কথা লইয়া গবেষণা করিবার সময় আজ নয়। আমাদের নিজ নিজ এলাকায় হিন্দু ও মুসলমানকে আমরা এই আপোষের পিছনে যত বেশী একত্র করিতে পারিব, তাহাদের বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছা যত বেশী বাড়াইয়া তুলিতে পারিব—নেতাদের আপোষ প্রচেষ্টাও তত বেশী সাফল্য মণ্ডিত হইবে। ৯ই আগষ্টের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিনে, আসুন আমরা সেই কাজেই মন প্রাণ ঢালিয়া দিই, বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে মুসলিম ভাইকে ও জিন্না সাহেবকে বন্দী করি!

শহীদ স্মরণে

কমরেড উষা পাঠক

গত ২৩শে জুলাই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে কমরেড উষা পাঠক মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হইয়াছিল মাত্র ২২। এই বয়সের মধ্যেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে নিজেকে একজন যোগ্য কর্মী হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পার্টির কাজ করিয়াও তিনি সংসারে বৃদ্ধা মাতার সাহায্য করিতেন। শুধু পার্টিই নয়, তাঁর গুণমুগ্ধ বহু মেয়ে ও আজ তাঁর অভাব অনুভব করিতেছে।

সুরাবর্দ্দীর দপ্তরের হিসাবে কি প্রকৃত খাদ্য-অবস্থা বোঝা যায় ?

২রা আগষ্টের দৈনিক খবরের কাগজ গুলিতে বাংলা সরকারের সরবরাহ বিভাগের তৈরী বিভিন্ন জেলার চাউলের দরের এক ছক প্রকাশিত হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগ বলিতেছেন, 'এই বছরের হিসাবে ধরিলে আমরা বিপদ প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছি।" কারণ,

এই ছকে দেখানো হইয়াছে যে,

(১) গত বছরের তুলনায় দর অনেক কম, মোটা-মুটি অধিকাংশ জেলার গড়পড়তা দর ১৫৲ টাকার কাছাকাছি।

(২) দরের উঠা-নামা এবার অনেক কম।

কিন্তু, এই দুইটী লক্ষণ হইতেই বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া চলেনা। কারণ,

(১) ১৫।১৭৲ টাকা দরেও চাউল কিনিবার সামর্থ্য আজকে অধিকাংশ লোকের নাই। গত বছরের দুর্ভিক্ষ বাংলাকে এমনভাবে পঙ্গু করিয়াছে, যে দর আরো অনেক পরিমাণে না কমিলে লোকের ক্রয়-ক্ষমতার সীমার মধ্যে আসিবে না।

(২) গড়পড়তা দর কম হইলেও অধিকাংশ জেলার বিভিন্ন অংশে দর বিভিন্ন রকমের। বাড়তি অঞ্চলে অর্থাৎ যেখান হইতে মহাজনরা কেনে সেখানে দর কম, ঘাটতি অঞ্চলে অর্থাৎ মহাজনরা যেখানে বিক্রয় করে সেখানে দর বেশী। অর্থাৎ চাউল এখনও চোরাকারবারীর আয়ত্তের মধ্যে।

(৩) বাড়তি জেলাগুলিতে কন্‌ট্রোল দর অনেকটা কাজে আসিয়াছে, কিন্তু ঘাটতি জেলাগুলিতে কন্‌ট্রোলের চেয়ে দর অনেক বেশী। (সরকারী ছক হইতেই বুঝা যায়)

(৪) বাড়তি অঞ্চলে দরের গতি প্রায় ঠিক আছে, কিন্তু ঘাটতি জেলাগুলিতে দরের গতি বাড়ার দিকে। (সরকারী ছক হইতেই বুঝা যায়)

সরকারী ছকের গড়পড়তা হিসাবে সমস্ত জায়গার অবস্থা যে বোঝা যায় না, তার প্রমাণ দেখুন :—

জুলাইয়ে কয়েকটী জায়গার চাউলের দর

(সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও আমাদের সংবাদদাতার কাছ হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট হইতে)

বাড়তি জেলা

জেলা	স্থান	তারিখ	দর
বরিশাল	উত্তর বাখরগঞ্জ	জুলাই	১৮৲
বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	২১শে জুলাই	১৬৲
মালদহ	বালিয়া নবাবগঞ্জ	১৫ই জুলাই	১৫৲
মেদিনীপুর	মহিষবাথান	১০ই জুলাই	১৮৸০
বর্দ্ধমান	সহর	২৬শে জুলাই	২০৲
রংপুর	,,	১৪ই জুলাই	১৮৲
,,	ফুলছড়ি	৯ই জুলাই	২০৲
,,	,,	১৪ই ,,	২২৲
যশোহর	যশোহর	৩০শে জুলাই	১৬॥০
খুলনা	সাতক্ষিরা	২০শে জুলাই	১৭৲
ময়মনসিংহ	সরিষাবাড়ি	১৬ই জুলাই	১৮৲
মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর	১০ই জুলাই	১৫৲

ঘাটতি জেলা

জেলা	স্থান	তারিখ	দর
হাওড়া	আমতা	২১শে জুলাই	২২৲
নদীয়া	শান্তিপুর	জুলাই	২০৲
ঢাকা	ঢাকা	২৭শে জুলাই	১৯৲
পাবনা	সিরাজগঞ্জ	৮ই জুলাই	২০৲
ফরিদপুর	গোপালগঞ্জ	১২ই জুলাই	১৮৲
চট্টগ্রাম	পটিয়া	জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৭৲
নোয়াখালী		জুলাই	১৮৲
২৪ পরগণা	ডায়মণ্ডহারবার	৭ই জুলাই	২৫৲

সরকারী হিসাবেই ঘাটতি জেলার দর কোন দিকে ?

(সরকারী ছকের শেষ মাসের হিসাব হইতে গৃহীত)

জুন মাসের ৪ সপ্তাহ

	প্রথম সপ্তাহ	২য়	৩য়	৪র্থ
হাওড়া	১৫৲	১৫৲	১৬৲	১৬৲ *
নোয়াখালি	২৩৲	২৫৲	২১৲	২০৲
নদীয়া	১৪৲	১৫৲	১৫৲	১৫৲ *
ঢাকা	১৬॥০	১৫৲	১৫৲	১৫৲
পাবনা	১৬॥০	১৬৲	১৬৲	১৭৲ *
ফরিদপুর	১৭৲	১৬॥০	১৬৲	১৮৲ *
চট্টগ্রাম	৩০৲	২৫৲	৩৫৲	৩৪৲
২৪ পরগণা	১৩৲	১৪৲	১৫৲	১৫৲ *
হুগলী	১৪৲	১২॥০	১৪৲	১৫৲ *
ত্রিপুরা	১৬॥০	১৭॥০	১৭৲	১৬॥০
দার্জ্জিলিং	১৩৲	১৪৲	১৩॥০	১৪৲

(* এই জেলাগুলিতে দর বাড়তির দিকে)

তাই, সমস্ত সহরে ও গ্রামে রেশনিং চাই! রেশনিং-এর উপযুক্ত চাল সরকার খরিদ করুক! তাহা হইলেই অবস্থা আশাজনক হইতে পারে।

"আমলাতন্ত্র দুর্ভিক্ষ দমনে অসমর্থ"

ভারত সম্পর্কে আমেরির শেষ-বিবৃতির জবাবে 'ডেলী ওয়ার্কারে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য

লণ্ডন, ৩রা আগষ্ট—'ডেলী ওয়ার্কারে' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে বর্তমান সময়ে ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা হইলে গণতান্ত্রিক জগতে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইবে। আমাদের যুদ্ধরত জাতিসমূহের মনোবল বৃদ্ধি পাইবে এবং মিঃ গান্ধী যাহাদিগকে সত্য সত্যই জগতের শোষিত জাতি বর্ণনা করিয়াছেন, আফ্রিকা ও এশিয়ায় সেই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমাদের স্বার্থে সংঘবদ্ধ হইবে।

কমন্স সভায় মিঃ আমেরির শেষ বিবৃতি উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "স্বায়ত্ত শাসনে দেশ যে উন্নতিমূলক পরিকল্পনা করিতে সমর্থ, স্বাধীনতা ভিন্ন ভারত এরূপ পরিকল্পনা করিয়া তাহার আর্থিক দুর্গতি মোচন করিতে সক্ষম হইবে না।

'রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ভারতের উন্নতির ও ঐশ্বর্য্যের যোগান,' এই সত্য ব্যক্ত করিয়া 'ডেলী ওয়ার্কার-পত্রে মন্তব্য করা হইয়াছে—"যে আমলাতন্ত্র ভারতের দুর্ভিক্ষ দমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহারা কোন যাদুমন্ত্র বলে ভারতে ঐশ্বর্য্যের ও উন্নতির অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে না।'

৪১জন বৃটিশ বৈমানিকের দাবী

ভারতের অচল অবস্থার অবসান চাই

লণ্ডন, ৩রা আগষ্ট—বৃটিশ বিমান বাহিনীর ৪১ জন বৈমানিক, ভারতের বর্তমান অচল অবস্থার অবসান-কল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইয়া লণ্ডনের 'ডেলী ওয়ার্কার' পত্রিকায় এক পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রে বলা হইয়াছে—

"ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা উপেক্ষিত হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ইহা হইলে অন্যান্য সম্মিলিত জাতির ন্যায় ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রকৃত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমবেত হইতে পারিত।'

তাঁহারা আরও বলেন, 'দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি পুনরায় ক্লিষ্ট ভারতবাসীকে আতঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কারণে, সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত আমরা, ভারতে গণপ্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অক্ষমতাকে জাপানী ফ্যাশিস্টবাদের উচ্ছেদসাধনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করি।'

চোরা-কারবার

ফুলবাড়ী হইতে কমরেড কালী সরকার জানাইতেছেন :

এখানকার আব্দুল রসিদ মৌলভী নামক এক ব্যক্তি পারমিট লইয়া কেরসিনের দোকান করে। ওজন দেয় ৮/০ ছটাক, দাম আদায় করে আট আনা। মহীপুরের ভলাণ্টিয়ারদের সাথে তার বচসা হয়। মৌলভী সাহেব বলেন, "এই দরে বিক্রয় করার হুকুম আমার আছে।" ভলাণ্টিয়াররা ২৬ বোতল তেলসহ থানায় হাজির হয়। কিন্তু দারোগা সাহেব এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দরকার মনে করেন না।

ভলাণ্টিয়াররা তাহাতে না দমিয়া রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়। একদিন একগাড়ী লবণ ধরা পড়িল। গাড়ীতে ১১ বস্তা লবণ ছিল। জুট অফিসার ও দারোগাকে খবর দেওয়া হয়। দারোগা মাল আটক করেন। কিন্তু পরে সে লবণ জনসাধারণ পাইল না, চোরাবাজারে বিক্রয় হইয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে ঐ ব্যবসায়ীরই আর একটী গাড়ী ভলাণ্টিয়ারদের হাতে ধরা পড়ে। তাতে ৫০ টিন কেরসিন তেল ছিল। এই তেলও থানায় জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও এই তেল জনসাধারণ পায় নাই। দারোগা সাহেব বলেন : "এনকোয়ারী করিতেছি।"

কেমন করিয়া চলে

আরো কয়েক দিন পরে নদীপথে দুইটী নৌকা ভলাণ্টিয়াররা ধরে। স্থানীয় কয়েকজন মহাজন তাঁদের পারমিট দেখাইলেন। কিন্তু এই মৌলভী সাহেব কিছুতেই পারমিট দেখাইতে রাজী হইলেন না। একজন বিশিষ্ট ডাক্তারও ভলাণ্টিয়ারদের সাথে ছিল। ১৫০ জন ভলাণ্টিয়ার সারারাত্রি নৌকা পাহারা দেয়। পরদিন দারোগা নৌকা আটক করে। কিন্তু তার কয়েকদিন পরে ডাক্তারবাবু ও খাদ্য কমিটীর ১০।১২ জন ভলাণ্টিয়ারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাটী পুলিশের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে। চোরাকারবারীর সম্বন্ধে চুপচাপ থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত যখন পুলিশ আর পার পাইল না, এখন খাদ্যকমিটীর উপরই হামলা সুরু করিল। পুলিশ বোধ হয় ভাবিয়াছে খাদ্যকমিটীর ভলাণ্টিয়ারদের আটকাইতে পারিলে চোরাকারবারীর সঙ্গে দহরম মহরম করার আর অসুবিধা হইবে না। স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই আজ খাদ্য কমিটীর পিছনে দাঁড়াইয়াছে।

ফরিদপুরে জুট-অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ফরিদপুর জেলার কৃষক সমিতির নেতা কমরেড শ্যামেন ভট্টাচার্য্য ২রা জুলাই তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটী দরখাস্তে নালিয়া গ্রামের জুট-অফিসারের সম্পর্কে এক অভিযোগ আনিয়াছেন। কোরকদীতে একটী খাল খননের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, সে টাকা সব ব্যয় হয় নাই, অথচ উক্ত জুট-অফিসার সমস্ত টাকা ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়াছেন—ইহাই হইতেছে অভিযোগ। উক্ত দরখাস্তে বলা হইয়াছে যে, শ্যামেন বাবু যখন জুট অফিসারের কাছে খরচ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন জুট-অফিসার নাকি তাঁহাকে ৩০০৲ ঘুষ দিতে চাহিয়াছিলেন। ২৯শে জুন তারিখে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে এইখানে খরচ হইয়াছে প্রায় ৮৫০ টাকা, অথচ হিসাব দেখান হইয়াছে ১৭৪৫৲ টাকা।

এই দরখাস্তের পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এখন পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

বিভিন্ন জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

মৈমনসিংহ হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন :

সুন্দরগঞ্জ থানাতে ব্যাপক ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। ভাটী বোচাগাড়ী ইউনিয়নে ২২টী পরিবারের মোট ৮৮ জন লোকের মধ্যে ৬৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কুইনাইন অভাবে ইহাদের কোনো চিকিৎসা হইতেছে না। চোরাবাজারে ৸০ আনা দিয়া একটী বড়ী কিনিয়া চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

বরিশালের গৌরনদী হইতে কমরেড জ্যোতি দাসগুপ্ত জানাইতেছেন :—

গৌরনদী আউটডোর হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। ১৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে রোগীর সংখ্যা ৭৬৬। ২৪শে জুন ৮৮৭; ১লা জুলাই রোগীর সংখ্যা উঠিয়াছে ১০১০ জনে।

৬ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে গৌরনদী ইনডোর হাসপাতালে ২০টী বেডের সবগুলিই ভর্ত্তি। পাঁচ সাত জন রোগী স্থান না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৩০শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, সমগ্র জেলায় ম্যালেরিয়ার মহামারীর প্রকোপ সুরু হইয়াছে; ইহার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন দলের নেতারা মিলিত হইয়া জেলা মেডিক্যাল রিলিফ কমিটী গঠন করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের মাওয়া এলাকায় শতকরা ৫০ জনের ম্যালেরিয়া। অথচ কুইনাইন সরবরাহ হইতেছে না।

ঔষধের দর জানান !

যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার প্রকৃত দরের হিসাব প্রতি সপ্তাহে আমাদের কাছে পাঠান।

জঃ সঃ

চারিদিকে লবণের অভাব

এখনও ১৸০ সের লবণ বিক্রয় হইতেছে

কামারজানীর খবর—এখানে লবণের চোরাবাজার অবাধে চলিতেছে। প্রকাশ্যে লবণের সের ১৸০ টাকা বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন ব্যবসায়ীর গুদামে লবণ মজুত থাকিতেও গ্রামবাসী সপ্তাহব্যাপী লবণ পাইতেছে না।

রংপুরের কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভেলাবাড়ী ও সাপটীবাড়ী ইউনিয়ন কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়ারগণ ১১ বস্তা লবণ চোরাকারবারীর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

সুন্দরগঞ্জ থানায় লবণের দর ১৸০ সের।

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন : লবণ সংকট এত তীব্র যে গ্রামাঞ্চল হইতে হাজার হাজার লোক সহরে লবণ কিনিতে আসিতেছে। টাঙ্গাইল সহরে কিছু কিছু লবণ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে একেবারেই পাওয়া যায় না।

দিনাজপুর হইতে সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ফুলবাড়ীতে লবণ বিক্রয় হয় ১।১০ সের।

বিক্রমপুরের মাওয়া এলাকায় লবণের দর ১৲।১০ সের।

কলিকাতায় দুঃস্থের অবস্থা

জুলাই মাসের কলিকাতার হাসপাতালে যে সব দুঃস্থকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, তার একটী হিসাব ২রা আগষ্টে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক এক সপ্তাহের হিসাব আমরা নীচে দিলাম।

১ম সপ্তাহে……১১৬ মৃত্যু…২৫

২য় সপ্তাহে……১৫০ মৃত্যু…৩১

৩য় সপ্তাহে……১৩৩ মৃত্যু…৪০

৪র্থ সপ্তাহে……১৯২ মৃত্যু…৪২

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এ, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১০

ছাত্রদের কাছে সতীশ দাসগুপ্তের বাণী

"গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধীতা জনগণের অন্তরের স্বাধীনতা আকাঙ্খারই বিরোধীতা"

(অরুণ দাসগুপ্ত)

১লা আগষ্ট আমি শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করি। পাঁচগণিতে গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমি তাঁহাকে জানাই এবং গান্ধীজি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে আশীর্ব্বাদ-পত্র দিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখাই। এই সঙ্গে তাঁহাকে জানাই যে রাজাজীর প্রস্তাবের পক্ষে ছাত্রফেডারেশন আন্দোলন সুরু করিয়াছে। তিনি ছাত্রদের বৈঠকে বা সম্মেলনে উপস্থিত হইবেন বলিয়া রাজী হইলেন।

গান্ধীজি ভারত ও বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য নিন্দিত হইতেছেন এই কথা বলিলে তিনি উত্তর দেন:

"ভারতবর্ষ গান্ধী, জিন্না বা সাভারকরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ভারতবর্ষ চল্লিশ কোটী জনসাধারণের। বাংলা ৬ কোটী জনসাধারণের তাই শেষ সিদ্ধান্ত জনগণেরই হাতে। কাজেই গান্ধীজি ভারত বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন কিনা তাহা জনসাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করে। গান্ধীজি নিজেই সমস্ত সমস্যাটা জনসাধারণের অর্থাৎ গণভোটের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আসল সমস্যাটাই ইহা নয়। আসল কথা এই যে দাঙ্গা করা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের যে অন্য কোন সম্পর্ক আছে একথা আমরা ভাবিতেই পারি না। হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের উভয়ের ত্যাগে, উদারতার ও সদিচ্ছার উপরেই যে জাতি গড়া সম্ভব এ কথা আমাদের আজ ধারণায়ও আসে না। কারণ আমরা আমাদের অতীত ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য যে উদারতা ও সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি আমরা বর্ত্তমান অবস্থাকে ঠিক মত দেখিতে পারি না তাই আমরা দেখি যে সাম্রাজ্যবাদী-শাসন আমাদিগের মনোভাবকে দাসসুলভ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাই অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা হইতে অপমানকর ব্যাপার হইতেছে এই যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎও ভুলিতে বসিয়াছি। দাসসুলভ মনোভাব ত্যাগ করিতে না পারায় আমরা ভাবি যে স্বাধীনতা পাইবার পরেও বোধ করি রক্তারক্তি হইতে পারে। স্বাধীনতার স্বাদ পাইলে সমস্ত প্রকার ক্ষুদ্রতা দূর হইবে—এ কথা অস্বীকার করা মানে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া, সাম্রাজ্যবাদকে চিরকালের জন্য বাঁচাইয়া রাখা।

সর্ব্বত্রই হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের কথা শুনি। কিন্তু ইহাই কি কেবল সত্য? আমাদের অতীত ইতিহাস এবং আমাদের বর্ত্তমান গ্রামগুলির অভিজ্ঞতা কি অন্য কথা বলে না?

জাতির সকলের মধ্যে যে কর্ম্মহীনতা দেখা দিয়াছে তাহা ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে। গত বৎসরে তোমরা রিলিফ কাজ সুরু করিয়াছিলে কিন্তু যথেষ্ট করিতে পারিয়াছিলে কি? শত শত ছাত্ররা কি আত্মত্যাগের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রিলিফে যোগ দিয়াছিল? তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ—তোমাদের উৎসাহ, আত্মত্যাগের আদর্শ ও সেবাকার্য্য বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিস্তৃত হওয়া উচিৎ ছিল।

আমাদের আত্মত্যাগ, উদারতা ও সদিচ্ছার ঐতিহ্যকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি—জাতির স্বার্থে তাহাদের আজ বাঁচাইয়া তোল। প্রত্যেকটী জিনিষের সার বস্তু বুঝিতে শেখ। হাল্কা লোকের মত কেবল হিন্দু মুসলমানের বাহ্যিক অনৈক্যের রূপ দেখিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না।

ছাত্রদের সঙ্গে জনগণের সঙ্গেও সম্পর্ক নাই কারণ তাহারা আজ জনগণকে শিখাইতে যায়, শিখিতে যায় না। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্যদলের ছাত্ররা যদি এক হয় এবং তাহার পর এক হইবার জন্য অন্যদের কাছে যায় তাহা হইলে আমি অত্যন্ত খুসী হইব। জনগণের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হাজারে হাজারে যাইয়া তাহাদিগকে সেবা করিতে হইবে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে দীর্ঘকাল দাসত্বের পাপে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মরিয়াছে। তাই গান্ধীজি আজ দাসত্ব ঘুচাইবার কাজ সুরু করিয়াছেন। কাজেই তোমরা যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

একদল আছে যাহারা বিচ্ছেদ চায় এবং গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধীতা করে। কিন্তু তাহারা কখনও সফল হইতে পারিবে না—কেন না, তাহারা জনসাধারণের অন্তরের স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছে। কাজেই ঘটনার চাপে বিরোধীরা সরিয়া পড়িবে।

ছাত্রদের কাছে এই কথাও লইয়া যাও। বড় বড় বক্তৃতা দিতে আমার ইচ্ছা নাই। কাজেই তোমরা ছোট ছোট বৈঠক ও সম্মেলন কর যেখানে গিয়া আমি আমার হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত করিতে পারি এবং তোমাদের কাছে আমি যাহা চাই—তাহা বলিতে পারি।"

সারা ভারতের সমর্থন

নাগপুর কংগ্রেসীদের সমর্থন

নাগপুর, ২৫শে জুলাই—মিঃ আপ্পাজী গান্ধী, মিঃ বি এম ম্যাণ্ডজী, মিঃ ভায়াজী সহস্র বুদ্ধ, মিঃ এ বি বর্দ্ধন এবং ডাঃ ভজে সম্মিলিত ভাবে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—

"জনসাধারণ ইতিমধ্যেই অবহিত হইয়াছেন যে, গান্ধীজীর মুক্তির ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তৎসম্পর্কে মুক্তিপ্রাপ্ত কংগ্রেস কর্মীরা ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনার জন্য যে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল নাগপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাও নাকচ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক আমরা আনন্দের সহিত গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি আমাদের অটুট আস্থা জ্ঞাপন করিতেছি এবং গান্ধীজী সর্ব্বশেষ যে প্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন তাহাও সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা আরও আশা এবং বিশ্বাস রাখি যে মুসলিম লীগ রাজাজী ও গান্ধীজী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফর্ম্মুলা গ্রহণ করিবেন—কারণ ভারতের সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের পক্ষে উক্ত ফর্ম্মুলা অতিশয় যুক্তি সঙ্গত এবং উহা গৃহীত হইলে ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হইবে।"

নাগপুর, ৩১শে জুলাই—গত রাত্রে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রেস কর্মচারী সমিতির সভায় রাজাজী ও গান্ধীজীর আপোষ প্রচেষ্টার সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এলাহাবাদে কংগ্রেসীদের সমর্থন

এলাহাবাদ, ২রা আগষ্ট—এলাহাবাদের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গান্ধীজীর বর্ত্তমান নীতির গুরুত্ব

শ্রীযুত এন, এম, যোশীর বিবৃতি

বোম্বাই, ৩০শে জুলাই—পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় বিতর্কের উপর মন্তব্য করিয়া শ্রীযুত এন, এম, যোশী বলেন যে, ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মীমাংসার পথে গান্ধীজীর বর্ত্তমান অনুকূল মনোভাবের গুরুত্বটা যদি আমরা উপলব্ধি করি এবং বর্ত্তমানে তিনি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলি তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও বৃটেনের জনসাধারণের চাপে পড়িয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই বর্ত্তমান বিরোধী মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। ইউ, পি

অন্ধ্র কংগ্রেসসেবীদের সমর্থন

বেজওয়াদা, ৩রা অগাষ্ট—আইন সভায় অনধ্র কংগ্রেসী দলের যে সকল সদস্য আছেন তাঁহাদের ও অন্যান্য নেতৃবর্গের অদ্য যে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তাহা নিষিদ্ধ করিয়া গুণ্টুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত রাত্রে উক্ত সভার আহ্বায়কদের উপর আদেশ জারী করেন। নেতৃবর্গ সভা না করার সিদ্ধান্ত করেন ও একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়—মহাত্মাগান্ধী সম্প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকটে যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আমরা অনধ্র কংগ্রেসের কর্ম্মিগণ সম্পূর্ণ একমত। তিনি যে হিন্দু মুসলীম সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তাঁহার নেতৃত্বেও আমাদের পূর্ব্ববৎ আস্থা আছে।

বাংলার সকল শ্রেণীর জনমত

গান্ধীজীর পিছনে

গান্ধীজীর প্রতি বাংলার কংগ্রেসসেবীদের সমর্থন

গত ৩রা আগষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের এক সম্মেলনে গান্ধীজীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের ভিতর দিয়া হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে সংশয় দূর হইয়া যাইবে। সুতরাং সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য—বৃহত্তর ঐক্যের জন্য গান্ধীজী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কংগ্রেসসেবীরা পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে।

এই সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁর মধ্যে শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র দত্ত, সীতারাম সাকসেরিয়া, বসন্তলাল মুরারকা, সুকুমার দত্ত, রতনমনি চাটার্জি, সুধীর লাহা প্রভৃতি ছিলেন।

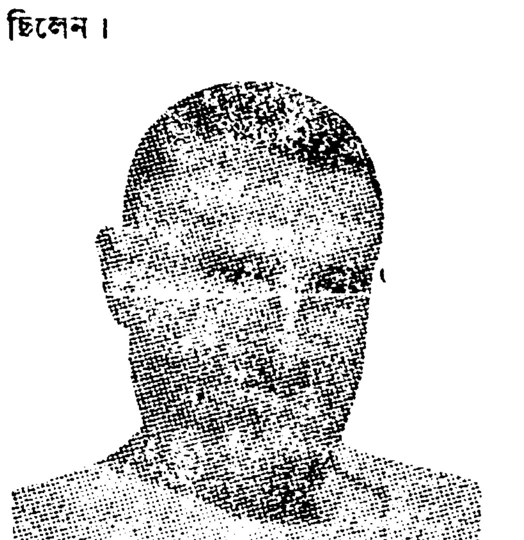

আবদুল গফুর খাঁ

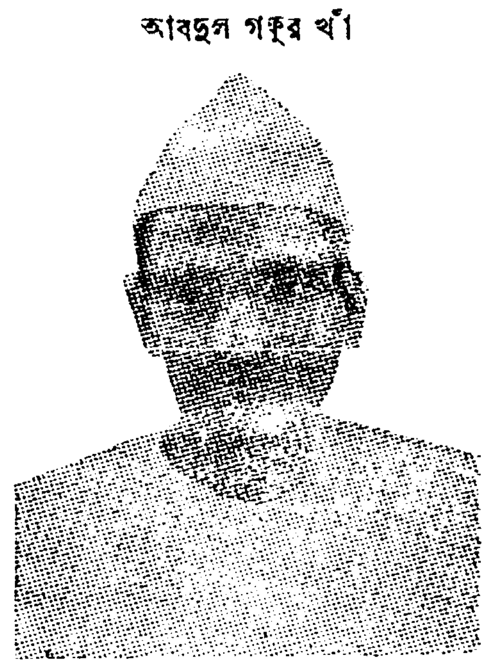

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

বরিশালে

গত ২৮শে জুলাই কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং কমরেড অমিয় দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে গান্ধীজী ও রাজাজীর প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্থানীয় টাউন হলে বরিশালের নাগরিকদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০০০ লোক এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় গান্ধীজী কর্ত্তৃক অনুমোদিত রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

কুষ্টিয়ায়

গত ৩০শে জুলাই রবিবার স্থানীয় যতীন্দ্রমোহন হলে কুষ্টিয়ার কংগ্রেসসেবিগণের উদ্যোগে এক জনসভা হইয়াছে। কুষ্টিয়ার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বিশ্বাস বি-এল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাতে উকিল, মোক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, ছাত্র, মহিলা, কৃষক এবং শ্রমিক দলে দলে যোগ দিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে লীগের নিকট রাজাজী মারফৎ গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য "ফরমূলাকে" সমর্থন করিয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

মেহেরপুরে (নদীয়া)

গত ৩১শে জুলাই শ্রীযুত মাধবেন্দু মোহান্তের সভাপতিত্বে এক জনসভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকার রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়।

মালদহে

গত ২৬শে জুলাই বৈকাল ৩ ঘটিকার সময় গান্ধী ধর্ম্মশালায় মালদহ জেলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভূপেন ঝা-র সভাপতিত্বে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য মিঃ জিন্নার নিকট রাজাগোপাল আচারিয়া যে প্রস্তাব পাঠান উহা সমর্থন করিয়া এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস ওয়া
সভ্যদের

মৌলানা আজাদ

নয়া দিল্লী হইতে ৪ঠা আগষ্ট ইউ-
বিশেষতঃ ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যের মুক্তি
করিতেছেন।

ওয়াকিবহাল মহলের জল্পনা কল্পনা যা
ও আমেরি ইচ্ছা করিয়া কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি
হইতে আদায় করিতে হইবে। অচল অবস্থা
জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সমস্ত দেশ সমস্বরে যদি
অস্বীকার করার ক্ষমতা আমেরী বা ওয়াভেলের

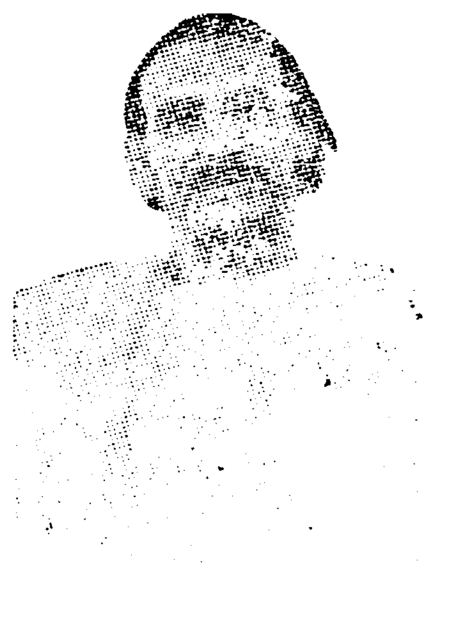

আচার্য্য কৃপালনী

সমগ্র দেশ
এই দাবী

শ্রমিক সভায় গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন

গত ২৭শে জুলাই এলেনব্যারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ১৫০০ শ্রমিকের এক প্রতিনিধি মুলক সভায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য গান্ধীজী অনুমোদিত রাজাজীর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গত ২৮শে জুলাই কলিকাতা করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভায় কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য গান্ধীজী রাজাজী প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ২৭শে জুলাই পার্কসার্কাস ট্রাম শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় কমরেড কিষন দাসগুপ্ত আনিত হিন্দু মুসলমানে ঐক্যের জন্য গান্ধীজী রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন জানান হয়।

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের দিকে

দেশ চাহিয়া আছে

ডোমারে (রংপুর)

৩০শে জুলাই—ডোমারে নীলফামারী মহকুমার কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি সম্মেলনে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী রাজাজী প্রস্তাব সমর্থন করা হয়। এবং এই প্রস্তাব আরও জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

মেদিনীপুরে

মেদিনীপুর, ৩১শে জুলাই—গান্ধীজী রাজাজীর ফরমুলায় সমর্থন জানাইয়া আজ জেলা কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষ হইতে গান্ধী ও জিনার নিকট তার করা হইয়াছে।

মেটিয়াবুরুজে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্টদের মিলিত সভা

গত ২৮শে জুলাই মেটিয়াবুরুজে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মিলিত উদ্যোগে এক সভায় গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান হয়। সভায় প্রায় ২০০০ লোক সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় লীগ-নেতা ডাঃ থাবির সভাপতিত্ব করেন। হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া কয়েকজন লীগ-নেতা বক্তৃতা করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির ও কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাও সভায় বক্তৃতা করেন।

[illegible]কিং কমিটীর মুক্তি চাই!

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

[illegible]প জানাইয়াছে যে, কংগ্রেস নেতাদের [illegible]র সম্পর্কে নাকি ভারত সরকার বিবেচনা

[illegible]াই হউক না কেন, আমরা জানি ওয়াভেল [illegible] কথনই দিবে না, মুক্তি তাদের কাছ [illegible] সমাধানের জন্য ও কংগ্রেস লীগ ঐক্যের [illegible] নেতাদের মুক্তি দাবী করে, তবে সে দাবী [illegible] নাই।

শঙ্কররাও দেও

[illegible] সমস্বরে [illegible]ক রিতেছে

গত ২৪শে জুলাই সিলেট কাছার চা বাগানের মজদুর ইউনিয়নের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় গান্ধীজীর বর্ত্তমান ঐক্য নীতির সমর্থন জানাইয়া তাঁহার নিকট একটি তার পাঠান হয়।

গত ১৯শে জুলাই ২৪ পরগণা জেলায় ইছাপুর লোহা কারখানার মজদুর ইউনিয়নের কার্য্যকরী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গান্ধীজী রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থন জানান হয় এবং অবিলম্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দাবী করা হয়।

গত ৩১শে জুলাই বালীগঞ্জের ভাত্তিয়া আয়রন ও ষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ও ম্যাকিণ্টস বার্ণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির এক যুক্তসভায় গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া, অবিলম্বে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সাক্ষাতের অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

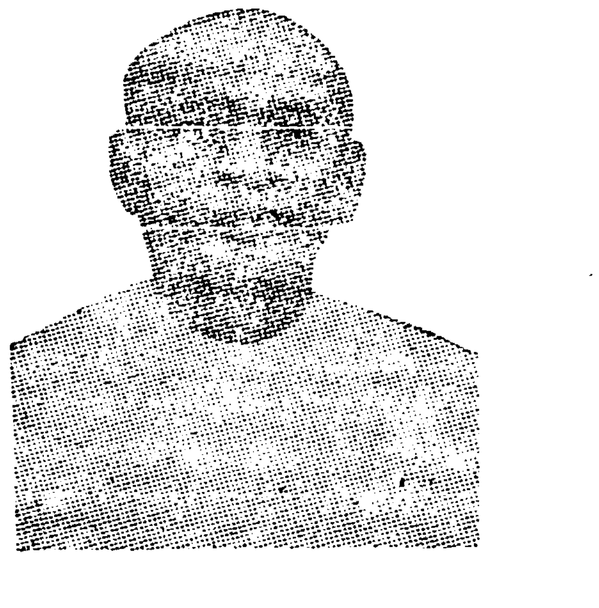

বল্লভভাই প্যাটেল

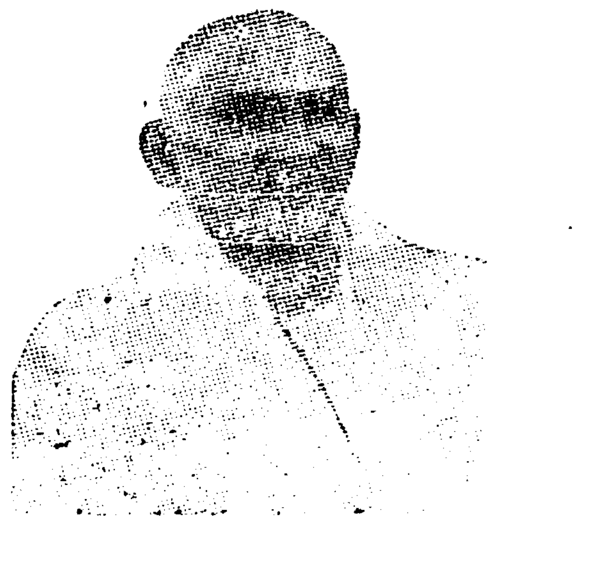

পট্টভী সীতারামিয়া

গত ৩০শে জুলাই সকাল ৮টায় হুগলী জেলা সূতাকল ও বেল্টিং মজদুর ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় গান্ধীজী ও রাজাজীর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

রাজসাহীতে

রাজসাহী, ৩১শে জুলাই—গত ২৬শে জুলাই বুধবার বৈকাল ৬॥০ টায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে শ্রীযুত অমলেন্দু বাগচীর সভাপতিত্বে রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থনে একটি সভা রাজসাহী ভুবন মোহন পার্কে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

হাওড়ায় ছাত্রদের সমর্থন

হাওড়া জেলা ছাত্রফেডারেশন ও মৌরী স্কুল ছাত্র-ফেডারেশনের পক্ষ হইতে গত ২৫শে ও ২৮শে জুলাই ছাত্রদের দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবীর ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ মীমাংসার জন্য গান্ধীজী রাজাজীর মারফত যে প্রস্তাব আনিয়াছেন তজ্জন্য গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানাইয়া এবং লীগের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৮শে ও ২৯শে জুলাই হাওড়া বেলিলিয়াস এবং শিবপুর দীনবন্ধু স্কুলে ছাত্রদের অপর দুইটী সভায় অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভাটপাড়া ছাত্রফেডারেশন

৩০শে জুলাই রবিবার ভাটপাড়া ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে ভাটপাড়া স্কুল হলে ছাত্র ও নাগরিক বৃন্দের একটি সভায় গান্ধী-রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

কলিকাতায় ঐক্যের সাড়া

কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মিলিত সভায় কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার আহ্বান

"আমি আশা করি দেশের এই দুরবস্থায় কংগ্রেস-লীগ আপোষ সম্ভাবনার যে আশার আলো দেখা দিয়াছে সেটি আরও উজ্জ্বলতর হইবে এবং আমাদের সকল সন্দেহের অবসান করিয়া লীগ কংগ্রেস মিলিত হইবে।"

—গত ২রা আগষ্ট পার্ক সার্কাসের জনসভায় বাংলার ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি স্পীকার খান্ বাহাদুর আব্দুল হামিদ চৌধুরী উক্ত সভার সভাপতি স্বরূপ এই কথা ঘোষণা করেন।

কয়েকজন কংগ্রেস-নেতা, লীগ নেতা এবং কমিউনিস্ট নেতার মিলিত উদ্যোগে এই সভা আহুত হইয়াছিল। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়—তাতে পার্ক সার্কাসের দেড় হাজার ব্যক্তি ইতিপূর্বেই সহি দিয়াছিলেন। সভায় ১৫০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাদের ভিতর শতকরা ৭৫ জন মুসলমান।

এই সভার সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়া-ছিলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত এবং লীগ নেতা এবং শ্রমমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন। এই সভায় বক্তৃতা করেন চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, সনি গুপ্ত এবং ভবানী সেন। এই সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন মৌলবী মহম্মদ খয়রুল আনাম খাঁ, ডাঃ এম, এ, মালেক, মিঃ মুজিবর রহমান।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁহার বক্তৃতায় কংগ্রেস লীগ ঐক্যের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া মুসলমানদিগকে স্বাধীনতার পথে আহ্বান করেন। "কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য সম্ভাবনা দেশে যে নূতন আশার আলোক জ্বালিয়াছে দেশের সর্ব্বত্র তাহা স্বাধীনতার নবজাগরণ সৃষ্টি করিবে।" মিঃ হুদা চৌধুরীর এই উক্তি সমবেত জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে অভিনন্দিত হয়। সভায় সব চেয়ে বেশী উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় লাল মিঞা সাহেবের একটি কথায়—"মুসলমান গোলাম হইবার জন্য জন্মায় নাই, পাকিস্তানের দাবী বিদেশী গোলামীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের জেহাদ।"

প্রত্যেক বক্তাই রাজাজীর প্রস্তাবকে আপোষ আলোচনার সুযোগ্য ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে মহাসভার যুদ্ধ ঘোষণাকে নিন্দা করেন। মিঃ হুদা চৌধুরী এবং সাধন গুপ্ত যখন বলেন যে 'মহাসভার আন্দোলন সারা ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধ-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে, বাংলার নামে কথা বলিবার কোন অধিকার মহাসভার নাই,' তখন সমবেত জনতা করতালি দ্বারা এই উক্তির প্রতি তাহাদের আন্তরিক সমর্থন জানায়। বক্তাদের বক্তৃতার ভিতর দিয়া একটি কথা খুব বড় করিয়া ফুটিয়া উঠে যে রাজাজীর প্রস্তাব বা গান্ধী-জিন্না আপোষ বাংলাকেই সবচেয়ে বেশী লাভবান করিবে কারণ, অচল অবস্থা বাংলারই সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। সমবেত নাগরিকদের স্পন্দনে এই কথাটিই সবচেয়ে বেশী অভিনন্দিত হইয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"এই সভা মহাত্মাজী এবং কায়েদে আজমের আসন্ন সাক্ষাৎকারের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এই সভা বিশ্বাস করে যে তাঁহাদের সাক্ষাতের ফলে শীঘ্রই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে অচল অবস্থার সমাধান হইবে।"

এই প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠে—কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই।

গান্ধীজীর সমর্থনে কলিকাতার সকল শ্রেণী

রাজাজীর প্রস্তাবের পিছনে বাংলার লেখক ও শিল্পী

গত ২৯শে ও ৩০শে তারিখে ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অফিসে সংঘের একটী সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবকে তাঁহাদের আপোষ চেষ্টার পিছনে সমর্থন জানাইয়া তার পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়াও প্রস্তাব হয়,—সমস্ত লেখক ও শিল্পীদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটী চিঠি গান্ধি-জিন্না সাক্ষাতকারের আগে উভয় নেতাকে পাঠানো হইবে।

বহরমপুরে

গত ১লা আগষ্ট এক সভায় গান্ধীজীর আপোষ প্রচেষ্টার সমর্থন করা হইয়াছে। কংগ্রেস সেবী, কমিউনিস্ট ও বহু মুসলমান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভাপন্থী কয়েকজন লোক গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় সমর্থন সূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

সালকিয়ায়

২৯শে জুলাই বৈকালে ৬॥ টায় সালকিয়ার স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী, ছাত্র কর্মী, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ঘুষুড়ী চটকল মজদুর ইউনিয়ন ও বেঙ্গল হোসিয়ারী ইউনিয়নের উদ্যোগে সালকিয়া জটাধারী পার্কে এক সভা হয়। সভায় প্রায় ৫০০ ছাত্র, মজুর ও স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সমর মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। সভায় গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা

গত ১লা আগষ্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রফেডারেশনের এক সাধারণ সভায় গান্ধী-রাজাজী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে গান্ধী রাজাজী ফরমূলা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের যে সম্ভাবনাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে তাহার পিছনে ছাত্রদের পূর্ণ সমর্থন গড়িয়া তোলা চাই। সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উপরোক্ত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বালিগঞ্জ শাখা গত ২৭শে জুলাই একটি সাধারণ মহিলা সভায় কংগ্রেস লীগ মীমাংসায় গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন এবং অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কাহারা

সাভারকর

আমেরির কাছে দরবার!

বোম্বাই, ২৭শে জুলাই—হিন্দু মহাসভার সভাপতি মিঃ সাভারকর হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে গান্ধীজীর প্রস্তাবের নিন্দা করিয়া মিঃ আমেরীর নিকট তার করিয়াছেন। এই মর্ম্মে আর একটি তার আমেরিকান নিউজ এজেন্সীকে পাঠান হইয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদ

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতে আপত্তি!

হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুনা বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধীকে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে এবং মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে অনুরোধ করেন।

হিন্দুসভার মুখপত্র 'হিন্দুস্থান'

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই না!

... তিনি (রাজাজী) যেন তেন প্রকারেন ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়া 'অচল অবস্থা' ঘুচাইতে বদ্ধপরিকর!......হিন্দু মহাসভা তাহা কিছুতেই হইতে দিতে পারে না। এজন্য যদি তথাকথিত রাষ্ট্রীয় 'স্বাধীনতা' কিছু দিন বিলম্বিত হয়, আমাদের আপত্তি নাই।

(হিন্দু মহাসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থানের' ২৭শে জুলাইএর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে),

ট্রামওয়ে মজুরদের অবস্থা

কলিকাতা ট্রামওয়ে মজুরদের দাবী বিচারের জন্ম এ্যাডজুডিকেশন বসিয়াছে। এ্যাডজুডিকেশনের কাছে মজুর ইউনিয়নের তরফ হইতে একটী বিবৃতি দাখিল করা হইয়াছে। সেই বিবৃতিতে মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব তথ্য দেওয়া হইয়াছে, তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

ট্রামওয়ে কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাব

বছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা
১৯৪২	৮০৪,১২৪১ টাকা	৪৯৩,৮৫৪০ টাকা	৩০৯,২৭০১ টাকা
১৯৪৩	১,২১০,৪৪৬১ টাকা	৬৫৫,৮০২৩ টাকা	৫৫৪,৬৪৩৮ টাকা
১৯৪৪ (প্রথম ৬ মাসে)	৬৩৫,৯১৯৭ টাকা	৩৫৮,৪৮৯৭ টাকা	২৭৭,৪৩০০ টাকা

মালিকের মুনাফার হার বাড়িয়াই যাইতেছে

কিন্তু মজুররা পাইতেছে কি?

ট্রামওয়ে মজুরের গড়পড়তা মজুরী হিসাব করিলে দাঁড়ায় ২৫৲ মাসিক। যুদ্ধের পূর্ব্বকার তুলনায় মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ১৭৪ টাকা। এই মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে ২৫৲ মজুরীর জায়গায় এখন মজুরী হওয়া উচিত ৬৮৷৷০। অর্থাৎ ২৫৲ টাকার উপরে মজুরের মাগগীভাতা পাওয়া উচিত ৪৩৷৷০। কিন্তু মজুররা পাইতেছে কি?

মাগগীভাতা হিসাবে মজুররা পাইতেছে মাসিক ১০৲।

কোম্পানী বলে, মজুরকে সস্তাদরে রেশনও দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু রেশনে মজুরদের সুবিধা হইতেছে কতটুকু?

সপ্তাহে মজুরের রেশন	কন্‌ট্রোলে বাজার দর	কোম্পানীর দর
চাল—/২৷৷০	১ টা-৩ পাই	৮ আ-১৷৷ পাই
আটা—/১৷৷০	৭ আ-৬ পাই	৫ আ
ডাল—/২	১২ আ	৫ আ
সঃ তেল—/৷৷০	১০ আ	৩ আ-৩ পাই
লবণ—/৷৷০	১ আ-৪৷৷ পাই	-৯ পাই
মশলা—/৷০	৫ আ	১ আ-৯ পাই
	৩ টা-৪ আ-১৷৷ পাই	১টা-৭আ-১০৷৷ পাই

অর্থাৎ দরের সুবিধা বাবদ মজুর সাপ্তাহিক পাইতেছে ১ টা-১২ আ-৩ পাই। যার পোষ্য আছে সে আরো /২৷৷০ সের চাল ও /১৷৷০ আটা বাবদ আরো সুবিধা পাইতেছে ১০ আ-৭৷৷ পাই। মাসিক হিসাবে পোষ্য-হীন মজুর দরের সুবিধা বাবদ পাইতেছে ৭ টা-১ আ-৬ পাই। আর পোষ্য যার আছে সে পাইতেছে ৯ টা-৭ আ-৬ পাই।

সুতরাং মূল্য বৃদ্ধির জন্ম মজুর পাইতেছে:—

পোষ্যহীন মজুর……১০ টাকা মাগগীভাতা + ৭ টাকা ১ আনা ৬ পাই = ১৭ টা-১ আ-৬ পাই

অন্যান্য মজুর……১০ টাকা মাগগীভাতা + ৯ টা-৭ আ-৬ পা = ১৯-৭ আ-৬ পাই।

ন্যায্য পাওনা ৪৩৷৷০, মজুর পাইতেছে ১৯৷৷০।

মজুতদারের কবলে আসামের আমলাতন্ত্র
নামেই রেশনিং, চোরাবাজার সর্ব্বেসর্ব্বা

আমলাতান্ত্রিক খাদ্যপরিকল্পনা

সরকারী ঘোষণার দীর্ঘ ৭ মাস পর গত জুন মাসে আসাম সরকার প্রথমে শ্রীহট্ট ও পরে জোড়হাট, ধুবড়ী তেজপুর ও নওগাঁয় রেশনিং চালু করিয়াছে। এখনও শিলং, ডিব্রুগড় ও গৌহাটির মত প্রধান শহরগুলিতে রেশন প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই।

গত ৮ই জুলাই আসাম সরকার এক প্রেসনোটে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকাররা চাল কিনিতে পারিবে এবং সরকারী এজেন্টদের কাছ হইতেই যে কিনিতে হইবে, এরূপ কোন বাধাবাধকতা ইহাদের থাকিবে না। তাছাড়া খরিদ্দাররা যাহাতে নিজেদের রুচি অনুযায়ী চাল রেশনের দোকান ছাড়াও কিনিতে পারে তার জন্ম পৃথক পারমিটেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থাৎ, জনসাধারণকে খুশি করার নামে সরকার তাহার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টায় আছে। তাই চালের জন্ম লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকারদের জিম্মায় সরকার জনসাধারণকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ খরিদ্দারদের জন্ম পারমিটের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীন বাণিজ্যের পথ সরকার খোলসা করিয়া দিতেছে। এবং সরকারের এই পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিতা গ্রহণের নামগন্ধও নাই।

মজুতদারেরই জয়

শ্রীহট্টে এক সপ্তাহ রেশনিং চলিতে না চলিতেই স্থানীয় সাপ্লাই বিভাগ ঘোষণা করিল: 'রেশনদ্রব্য ক্রয় করা না করা ক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' সেই সময়ই নুনের বরাদ্দ মাথাপিছু আধসের হইতে ১ পোয়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, চিনি মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণের সিকিভাগ পাওয়া যাইতেছে। শতকরা ৮০ জন লোক রেশনের দোকান হইতে চাল কেনে না। ইহার উপর পাইকার ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রেতার দল স্বাধীনভাবে ধান চাল কিনিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। চোরাকারবারীরা রেশনের দোকানগুলির উপর টেক্কা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেশনের দোকানে খেসারীর ডাল ৷৷/০ সের, বাজারে উহার দর ৵০ আনা। ধুব্বড়ীতে যখন রেশনের দোকানে ১৭৲ টাকা চালের মণ, খোলা বাজারে চালের দর তখন ১৫৷৷০ টাকা। জোড়হাটে রেশনের চাল মুখেই দেওয়া যায় না। আটা প্রভৃতি রেশনদ্রব্য বহুদিন পর্যন্ত রেশনের দোকানে মিলে নাই। তাছাড়া ডাল ও অন্যান্য রেশনদ্রব্য একেবারে মানুষের অখাদ্য।

অসাধু আমলার দল

কাজেই এই সমস্ত কারণে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। আসামে মজুতদাররাই আজ প্রায় সর্বেসর্বা। সরকারী ক্রয়নীতি ইহারা বানচাল করিয়াছে। বাংলার ৩০ হাজার মণ চাল সম্বন্ধে যে প্রেসনোট কিছুদিন আগে আসাম সরকার প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এ সমস্তই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। একথা আজ সকলেই জানে, আসামে রেশনিংয়ের উপযুক্ত স্টক নাই।

সরকারী আমলাদের সাহায্যেই মজুতদাররা এই ক্ষমতা পাইয়াছে। সকলেই মনে করে ডিব্রুগড়ের সাপ্লাই অফিসার মিঃ ওমরুদ্দিন স্থানীয় মজুতদারদের সহায়ক। ডিব্রুগড় হইতে বদলী হইবার পর শোনা যাইতেছে, তিনি নাকি ছুটি লইয়া ডিব্রুগড়ে ফিরিয়া আসিবেন ও রেশনিং যাহাতে না হয় তার জন্ম স্থানীয় মজুতদারদের সহিত একযোগে চেষ্টা করিবেন। গৌহাটির এসিস্টান্ট সাপ্লাই অফিসার নাকি খারাপ চালের অজুহাতে রেশনিংয়ের বিরুদ্ধতা করিতে কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত বরদলইকে অনুরোধ জানান। এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে মজুতদাররা ডাল, চিনি ও অন্যান্য রেশনদ্রব্য লইয়া ব্যবসা শুরু করিয়া দিয়াছে।

স্থানীয় আমলারা কোন অবস্থাতেই জনসাধারণের সহযোগিতা লইতে রাজী নন। ডিব্রুগড়ে মাথা গুন্তির ব্যাপারে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। আমলাতন্ত্র সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে সভা ডাকার জন্ম মজুতদারদের অবাধ অধিকার। অথচ শ্রীহট্টের কমিউনিস্ট পার্টি রেশনিংয়ের সমর্থনে সভা ডাকার অনুমতি পায় নাই।

ইহার উপর আছে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা। জোড়হাটে ১৭ হাজার লোকের জন্য রেশনের দোকান মাত্র ২৭টি। ইংরাজিতে কার্ড লেখা হওয়ার ফলে ইংরাজী-না-জানা সাধারণ লোকের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা হইতেছে। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া মজুতদাররা জনসাধারণের মধ্যে কন্‌ট্রোল ও রেশনিং-বিরোধী প্রচার চালাইতেছে। তেজপুরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিজে কন্‌ট্রোল উঠানোর পক্ষে মজুতদারদের সমর্থন করিতেছেন। ধুব্বড়ীর উকিল মহলেও এইরূপ জনস্বার্থবিরোধী মনোভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে।

অন্যদিকে আশার কথা আসামের কংগ্রেস ও লীগ-নেতারা সরকারী ক্রয় ও রেশনিংয়ের স্বপক্ষে নিজেদের মত সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদলই রেশনিং প্রবর্তনে বিলম্বের জন্য গবর্ণমেন্টকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাইলে সরকারী ক্রয়ে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই।

মজুতদারদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য আজ এই দেশভক্তদের উপরই আসামের ভবিষ্যৎ।

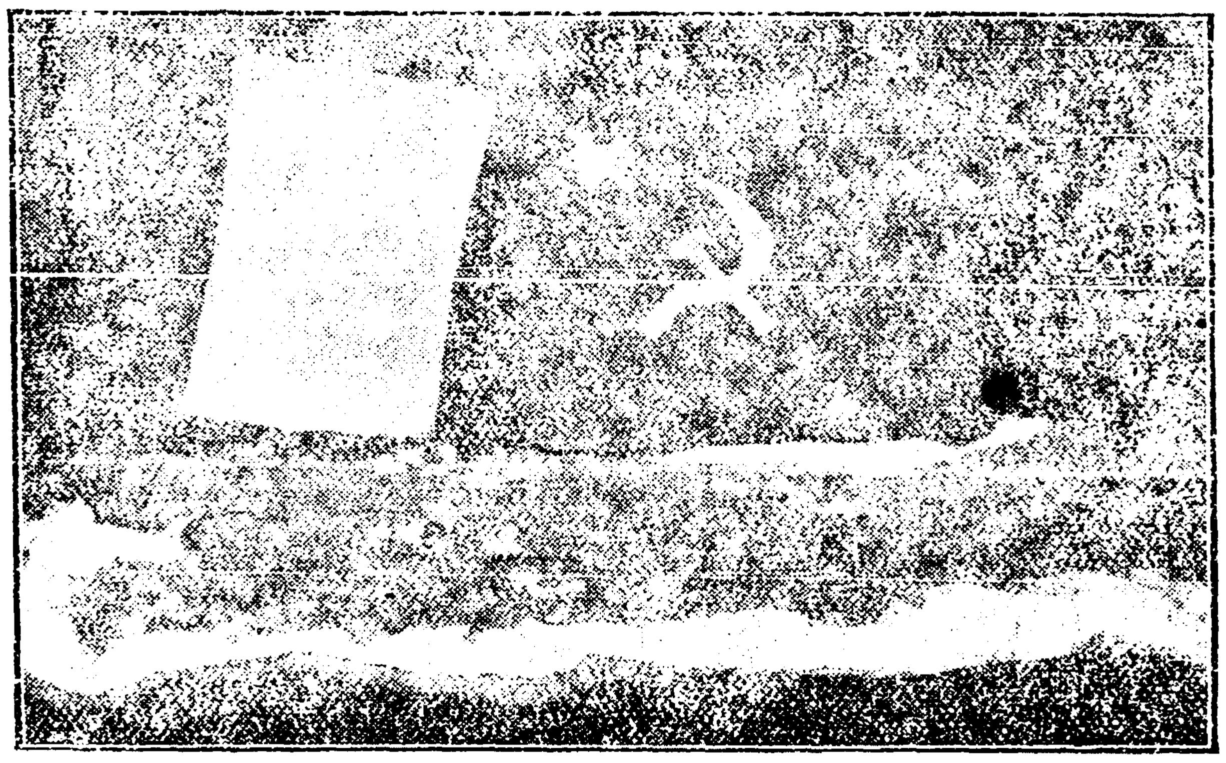

মৈমনসিংহে দেশদ্রোহীদের হাতে নিহত কমরেড ভানু মজুমদার
(ইঁহার মৃত্যুর খবর গত সংখ্যার জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে)

ফসল বাড়াও আন্দোলনে কৃষকের সাড়া

বৃদ্ধ কৃষক বলে: আমার জমির বদলে ১৭টা গ্রামের লোক বাঁচুক

২০টি নূতন খালে ২৪ হাজার লোকের খোরাক

যশোহর জেলার কেশবপুর থানা ঘাটতি এলাকা। প্রতি বছর জল নিকাশের অভাবে বড়িয়া খালি অঞ্চলের বিলগুলিতে ৪ হাজার বিঘা জমিতে ফসল হয় না ও ৬ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়া যায়। এবার তাই কৃষক সমিতির আহ্বানে সরফরাবাদ ও মির্জাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া ভদ্রা নদী হইতে একটি খাল কাটার জন্ম স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। জেলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও কৃষককর্মীরা আসিয়া হাজির হইলেন। ক্যাম্প করিয়া কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। দৈনিক ১৫০ হইতে ২০০ কৃষক নামমাত্র মজুরীতে আপ্রাণ খাটিয়া ২১০০ ফুট লম্বা, ১২ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর এই খালের কাজ শেষ করিয়াছে। ৩০ জন কৃষক ভলাণ্টিয়ার বিনা মজুরীতে খাটিয়া দিয়াছেন।

সরফরাবাদ ও মির্জাপুরে এই খাল কাটা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে রক্ষা পাইয়াছে ৫।৬ মাইল দূরের কড়িয়াখালি অঞ্চলের ফসল। ১৭টি প্রতিবেশী গ্রামের কৃষকদের বাঁচাইবার জন্ম জমি দিয়াছেন মির্জাপুরের খোদাবক্স মিঞা, সরফরাবাদের আমির আলি, সরিতুল্লা ও হারাণ মিঞা।

১০ই জুলাই কাজ শুরু হইল। মির্জাপুরের খোদাবক্স মিঞার জমিতে এবার প্রচুর ধান হইয়াছে। এই ধানের জমির উপর দিয়াই ভদ্রা নদীর খাল কাটা হইবে। সেদিন সকাল হইতে খোদাবক্স মিঞার ৮০ বছরের বৃদ্ধ বাপ জমির ধান স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। খাল কাটা হইতে লাগিল। বৃদ্ধের দু-চোখে জলের ধারা নামিল; মুখে দৃঢ়তার ছাপ। বৃদ্ধ বলিলেন, 'আমার সামান্য জমির বদলে ১৭টি গ্রামের লোক বাঁচবে। ধান গেছে, তাতেও আমার দুঃখ নেই।'

সরফরাবাদের আমির আলির মোট ৫ বিঘা জমি। সে তার ১ বিঘা জমি খালের জন্ম দিল।

কৃষকের এই স্বদেশপ্রেম ৫ মাইল দূরে মধ্যকুল গ্রামেও সাড়া জাগায়। এই গ্রামের পাশে টেপোর বিলে ২০ হাজার বিঘা জমির ধান বৃষ্টিতে ডুবিয়া যায়। ভদ্রার খাল কাটিতে দেখিয়া এখানকার কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী একত্রে ঠিক করে ৩০০ হাত লম্বা, ৭ হাত চওড়া ও ৬ হাত গভীর একটি খাল কাটিবে। ১ সপ্তাহের মধ্যে ৬ শত কৃষকের চেষ্টায় এই খাল কাটা শেষ হইয়াছে। ইহারা বিনা মজুরীতে কাজ করিয়াছে। এই খাল কাটার ফলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ ধান বাঁচিয়াছে ও ১৮ হাজার লোকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। মিলিত আন্দোলনের ফলে সরকারের কাছ হইতে ৩৫০৲ টাকা আদায় হইয়াছে ও আরও ৬৫০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। পিপলস্ রিলিফ কমিটি ১ হাজার টাকা এই কাজে সাহায্য করিয়াছেন।

গত ২৮শে জুলাই ভদ্রা খালের পাড়ে ৫ শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে বিদ্যানন্দ স্কুল প্রাঙ্গণে ফসল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সমাবেশ হয়।

পতিত জমি চাষ ও কচুরিপানা ধ্বংস

২৪ পরগণার আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত মঠেরদিঘার কৃষক-কর্মীরা স্থানীয় জোতদারের কাছ হইতে ৮ বিঘা জমি ভাগে লইয়াছেন। কৃষক সমিতির তহবিলের জন্ম তাঁহারা বিনা মজুরীতে কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মাত্র ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে চাষের কাজ শেষ করিতে দেখিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন বলাবলি করিতে থাকে, 'গাঁতা প্রথায় চাষ করিলে অল্প সময়ে বেশী জমি আবাদ হবে, আবার হাল বলদের জন্ম মহাজন, সুদখোরের কবলেও পড়তে হবে না।'

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মহিষামুড়ির খালটি মজিয়া গিয়াছিল। এবার কৃষক সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় কৃষকরা ১ মাইল দীর্ঘ এই খালটি সংস্কার করিয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৩ হাজার মণ অতিরিক্ত ধান হইবে।

নদীয়া জেলার গাড়াডোব ও শ্যামপুর ইউনিয়নের কৃষক কর্মীরা ১০ই জুলাই এক সভা করিয়া ফসল বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে ২ বিঘা পতিত জমি চাষের মধ্য দিয়া এই কাজ শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহার ফলে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঢাকা জেলার কুমারভোগ ইউনিয়নের কৃষক সমিতি ও ফুড কমিটির চেষ্টায় ফসল রক্ষার কাজ শুরু হইয়াছে। ১৩ই জুলাই হইতে স্থানীয় কর্মীদের চেষ্টায় কচুরীপানা ধ্বংস করা হইতেছে। একদিনের চেষ্টাতেই ৪০ কানি জমির ধান রক্ষা পাইবে ও ৪৫০ মণ ধান বেশী হইবে।

খালের জন্য মঞ্জুরী টাকা পড়িয়া থাকিল

রাজশাহীর পেজেন্টস ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান এম, এ সাত্তার জানাইতেছেন: শুনা যায় সরকার নাকি সেচ কার্য্যের জন্ম দেড় কোটি টাকা অর্থের বরাদ্দ করিয়াছেন। আমরা নাটোর মহকুমার গুরুদাসপুর থানার একটি খাল কাটিতে চাহিয়াছিলাম। ইহার ফলে অন্ততঃ ৭ হাজার বিঘা জমিতে ভাল ফসল হইত। জনসাধারণের তাগিদের ফলে এপ্রিল মাসে সরকার ইহার জন্ম ৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করে। কিন্তু স্থানীয় আমলার দল আজ পর্যন্ত এই খাল কাটিলেন না। এস, ডি, ও বলিলেন, তাঁহার নাকি সময় নাই।

খাস জার্ম্মানীতে লালফৌজ

সর্ব্বত্রই হিটলারের পরাজয়ের সূচনা

...যাহারা হিটলার ও তাহার অনুচরদের ন্যায় মূর্খ একমাত্র তাহারাই ইহা বুঝিতে অক্ষম যে নাৎসী সৈন্যদের পিছনে তাহাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের জনগণই নহে, খাস জার্ম্মানীও একটা আগ্নেয়গিরি হিসাবে রহিয়াছে। ইহার অভ্যুত্থানের আগুনে হিটলারী দানব কবরস্থ হইবে।......

(১৯৪১ সালের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে ষ্টালিনের বক্তৃতা)

পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে লালফৌজ

এ সপ্তাহের সোভিয়েট ফ্রন্টের যুদ্ধের খবর খতাইয়া দেখিলে এটা মনে হইবেই যে লালফৌজ তাহার ঐতিহাসিক অগ্রগমনের পথে কোন বাধাকেই পরোয়া করিতেছেনা।

জার্ম্মাণ ফ্রন্টের যুদ্ধের মোড় একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে—রুশসেনা আজ পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মান 'নিউজ এজেন্সীর' সংবাদেও প্রকাশ, লালফৌজ খাস জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিয়াছে। ভীরবালেনের উত্তর-পূর্ব্বে জার্ম্মান সীমানার অভ্যন্তরে নাৎসীবাহিনীর সাথে সোভিয়েট সেনার তুমুল লড়াই চলিতেছে। ষ্টকহলম্ হইতে আর একটি খবরে বলা হইয়াছে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার ভূখণ্ডে সুভালকির চতুর্দ্দিকে ভীষণ সংগ্রাম হইতেছে।

জার্ম্মাণ সেনার এক বিরাট কবরখানা রচিত হইতেছে

লালফৌজের এই চমকপ্রদ সাফল্য শুধু একটি 'সেক্টরেই' সীমাবদ্ধ নাই। মস্কো রেডিওতে ৪ঠা আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েটের ট্যাঙ্ক বহর ক্ষুদ্র ক্রেকাস সহর দখল করিয়া বাল্টিক সাগর তীরে পৌছিয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলের জার্ম্মাণসেনার পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সোভিয়েট সেনার এই বিরাট জয় বহু সংখ্যক জার্ম্মান সৈন্যকে বেড়াজালে ঘিরিয়া ফেলে। স্থল পথে পালাইবার পথ বন্ধ হওয়াতে আতঙ্কগ্রস্থ হিটলারী ফৌজ জাহাজে চড়িয়া এই অঞ্চল ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু লাল নৌবহর ও বিমানবহর তাহাদের এই প্রচেষ্টায় দারুন বাধা দিতেছে। খবরগুলি হইতে এটা স্পষ্ট ভাবেই ফুটিয়া ওঠে যে এই অঞ্চলের পরিবেষ্টিত জার্ম্মান সৈন্যের বেশীর ভাগই হয় বন্দী হইবে নয় লালফৌজের হাতে প্রান দিবে।

এই সম্পর্কে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর ক্রোড়পত্রে জার্ম্মান উত্তর বাহিনীর সম্প্রতি নিযুক্ত অধিনায়ক কর্ণেল জেনারেল সের্ণার-এর সৈন্যদের প্রতি এক আদেশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত আদেশে জার্ম্মান সেনাদের বলা হইয়াছে, যে কোন রকমে মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। এই আদেশ হইতে বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধরত জার্ম্মানবাহিনীর মনোবলের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। **ঐ অঞ্চলে জার্ম্মান সেনারা দলত্যাগ করিতেছে এবং যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেছে।** জার্ম্মান জেনারেল তথায় সেনাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিবার আদেশ দিয়াছে। তাহারা নিশ্চয় মাটি আঁকড়াইয়া থাকিবে তবে সে যেরূপ ভাবিতেছে সে ভাবে নয়। **কারণ এই অঞ্চলটি জার্ম্মানদের এক বিরাট কবরখানায় পরিণত হইতেছে।**

ওয়ারশতে নাৎসীদের উপর পোলিশ দেশপ্রেমিকদের জোর আঘাত

মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল রকোসভস্কীর বাহিনীর পুরোবর্ত্তী সেনা দল ওয়ারশ নগরীর উপকণ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং এখানকার যুদ্ধ চরমপর্য্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাছাড়া সোভিয়েট সেনার আর একটি শক্তিশালী অংশে ইতিমধ্যেই ওয়ারশর পাশ কাটাইয়া আগাইয়া গিয়াছে।

আবার ইহার সাথে সাথে রুশ সেনার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগে যুদ্ধরত পোলিশ দেশভক্ত গেরিলা বাহিনী এখন ওয়ারশর রাস্তায় রাস্তায় হিটলারীদের ধ্বংসের জন্য মেসিনগানের গুলি ছুড়িতেছে।

সামরিক দিক হইতে এবং মর্য্যাদার দিক দিয়া ওয়ারশর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। হিটলার ইহা জানা সত্ত্বেও ওয়ারশকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। সম্মুখ দিক হইতে মার্শাল রকোসভস্কীর আক্রমন এবং পার্শ্বদেশ হইতে অন্যান্য রুশ বাহিনীর তৎপরতা ওয়ারশ মুক্তি আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

ইহা ছাড়া আর একটি খবরে জানা যায় যে বিয়ালিষ্টকের পশ্চিমে রুশ বাহিনীর এক বিপুল অভিযান সুরু হইয়াছে। ভিশ্চলা নদীর পশ্চিম তীরস্থ সেতুমুখ হইতে ৪টি নূতন পদাতিক ডিভিশন ও কয়েকটি ট্যাঙ্ক বাহিনী ওয়ারশর দক্ষিণে বড় রকমের এক আক্রমণ চালাইয়াছে।

দক্ষিণ পোলাণ্ডেও জার্ম্মানদের বিপদ ঘনীভূত

আরও দক্ষিণে মার্শাল কনিয়েভের সেনাদল বিপুল বেগে ক্রাকাও অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। লালফৌজের ঐ বাহিনী সহর হইতে ৭০ মাইলেরও কম দূরে রহিয়াছে।

৫ই আগষ্ট মার্শাল ষ্টালিনের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে লালফৌজ ষ্ট্রুজ নদী পার হইয়া ষ্ট্রুজ সহর দখল করিয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন এবং কারপেথিয়ান পর্ব্বত মালার দিকে যে সকল পথ গিয়াছে তাহার পাশে অবস্থিত জার্ম্মানদের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি।

১০০০ মাইল ফ্রন্টব্যাপী তীব্র লড়াই

উপরের খবরগুলি হইতে দেখা যায় যে কারপেথিয়ান পর্ব্বতমালার পাদদেশ হইতে বাল্টিকের তীর পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ১০০০ মাইল ফ্রন্টে লালফৌজের তীব্র আক্রমনোদ্যম এতটুকুও শিথিল হয় নাই বরঞ্চ ইহার গতি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জুনের ২৩শে তারিখ সোভিয়েটের এই অভিযান সুরু হয়। একটানা ৪৫ দিনব্যাপী এই অভিযানে লালফৌজ ৪৩০ মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সত্য সত্যই পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে অতুলনীয়। বিলাতের 'ইভিনিং নিউজের' সামরিক সংবাদদাতা জেনারেল ডগলাস ব্রাউন রিগ ইহার সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—সোভিয়েট সেনার মত এরূপ বিজয়ের গৌরব পৃথিবীতে আর কোন সেনাদলই দাবী করিতে পারে না—সকল রকম বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, কোথায়ও এতটুকু হোচট না খাইয়া অবিরাম এই যে অগ্রগতি ইহা সত্যই মানুষের মনে বিস্ময় জন্মায়। জার্ম্মানদের ক্ষতির পরিমাণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"২৫ জন জার্ম্মাণ সেনাপতিকে ইতিমধ্যেই এই অভিযানে বন্দী করা হইয়াছে এবং সাড়ে সাত লক্ষ জার্ম্মাণ সেনা হয় বন্দী বা আহত হইয়াছে নয় মারা গিয়াছে। আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে যেরূপ গতিতে লালফৌজ আগাইতেছে যদি তাহা অব্যাহত থাকে তবে অক্টোবর মাসের প্রথম দিকেই লালফৌজ বার্লিনে পৌছিবে।

লালফৌজ যেরূপ বিপুল শক্তির অধিকারী তাহাতে 'ইভিনিং নিউজের' সংবাদদাতার কথার সত্যতা দিনের পর দিন বেশ পরিষ্কারভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে। লালফৌজের বর্ত্তমান শক্তি সম্পর্কে সোভিয়েট সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া'র মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে—"লালফৌজ যখন কুর্স্কে ভনরুডকে এবং কিয়েভে মানষ্টাইনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় তাহা অপেক্ষা তাহারা এখন সংখ্যায়, অস্ত্রে এবং সংগঠনে বহু গুণে শক্তিশালী।"

জার্ম্মান রক্ষাব্যুহের সীমারেখা মুছিয়া যাইতেছে

জার্ম্মাণীর ৩৫০ ডিভিশন সেনার মধ্যে ২০০ ডিভিশন আজ সোভিয়েট সীমান্তে লালফৌজের হাতে অবিরাম মার খাইতেছে। রণক্ষেত্রের যেদিকেই চাওয়া যায়, সেই এক চিত্র—জার্ম্মাণরা বিপর্য্যস্ত হইয়া পিছু হটিতেছে, লালফৌজের আক্রমণের জোয়ারে সব

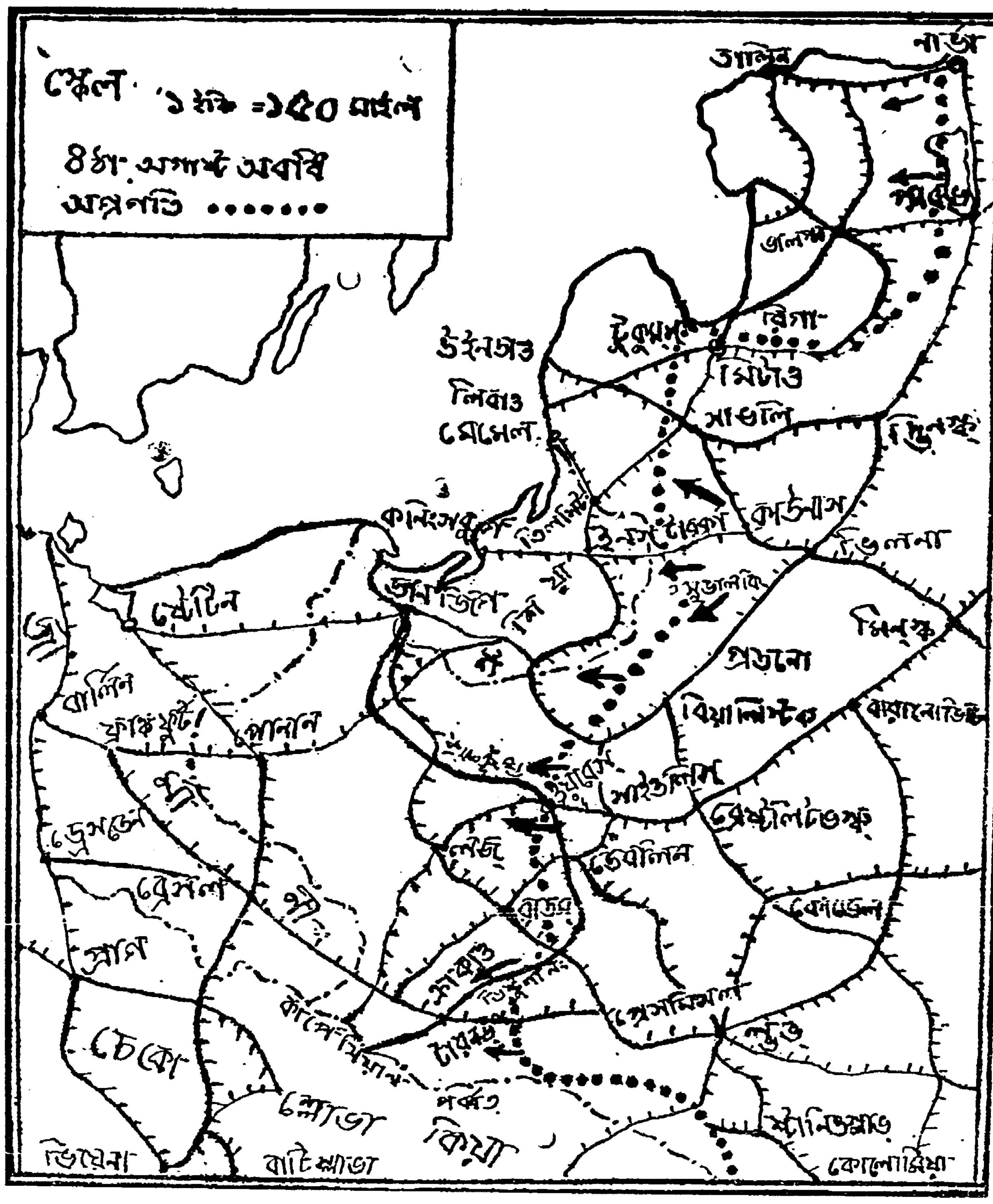

কিছু ভাসিয়া যাইতেছে। এই আক্রমণের গোড়ার দিকে ভিটেবস্কের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের হার হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নাৎসীবাহিনী কোথায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। গেল সপ্তাহে যে জার্ম্মাণ লাইন ছিল, এ সপ্তাহে তাহার চিহ্নও নাই, আশেপাশে, এদিক ওদিক সর্ব্বত্রই লাল নিশান উড়িতেছে, আবার সামনের সপ্তাহেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার ঘটিবে। লালফৌজের রণনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও জনগণের দেশপ্রেমের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মার্শাল স্টালিন ১৯৪৩ সালের নভেম্বর দিবসে সোভিয়েট নরনারীকে উদাত্ত স্বরে আহ্বান দিয়াছিলেন—'শত্রুকে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় দেওয়া চলিবে না, তাই আমাদের সবশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে উহাকে শেষ করিবার জন্য। সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ আগামী লড়াইয়ের সমস্ত বিপদের কথা ভাল করিয়া জানে। কিন্তু একথাও আজ **পরিষ্কার যে জয়ের দিন খুবই সন্নিকট।** যুদ্ধের আজ এই অবস্থায় সোভিয়েট ভূমি হইতে আক্রমণকারীদের খেদাইয়া দেওয়া এবং ইয়োরোপের "নূতন শাসন ব্যবস্থার" ধ্বংস ঘটানোই একমাত্র প্রশ্ন। আমরা শীঘ্রই ইউক্রেন, বাইলোরাশিয়া, লেনিনগ্রাদ ও কালিনিন অঞ্চল হইতে শত্রুদের একেবারে তাড়াইব এবং ক্রাইমিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, মোলদাভিয়া ও কারেলো ফিনিশ গণতন্ত্রের জনগণকে জার্ম্মাণ প্রভুদের হাত হইতে উদ্ধার করিব।'

স্টালিনের প্রায় এক বৎসর আগের ঘোষণা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে। সোভিয়েট ভূমি আজ প্রায় শত্রু কবলমুক্ত—হিটলারের 'নূতন শাসন ব্যবস্থার' আজ মৃত্যুর ঘন্টা শোনা যাইতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টে আঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি

সম্প্রতি সোভিয়েট সংবাদপত্র "ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাসে" বলা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট এখনও যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই, সুতরাং বিলম্ব না করিয়া এখনই পশ্চিম ইয়োরোপে শত্রুকে তুমুল আঘাত হানিবার ব্যবস্থা হউক। গত কয়েকদিনের খবর দেখিয়া মনে হয় যে শীঘ্রই ফ্রান্সে শত্রুর অবস্থা সত্যই সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। নর্ম্মাণ্ডি হইতে ব্রিটানি প্রদেশে এখন লড়াই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যুদ্ধের বেগও বাড়িয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশভক্তদের অভ্যুত্থানের সুযোগ বাড়িতেছে।

গত দুই মাসে ফ্রান্সে মোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত বা বন্দী হইয়াছে। প্রধান লড়াই এখন চলিতেছে ব্রিটানি প্রদেশে। এখানে বহু বন্দর রহিয়াছে, সেগুলি মিত্রপক্ষের হাতে পড়িলে সেখানে নূতন নূতন সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ নামানো সহজ হইবে, এবং বিশেষ করিয়া লোরিয়েণ্ট বন্দরে শত্রুর যে একটা সব চেয়ে বড় সাবমেরিন ঘাঁটি রহিয়াছে, সেটা তাহার হাতছাড়া হইবে।

ব্রিটানিতে জোর কদমে লড়াই

ব্রিটানির যুদ্ধে আমেরিকানরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে বিপুলবেগে অগ্রসর হইয়া তাহারা ঐ প্রদেশের প্রধান শহর রেনেস্ দখল করে। তাহার পর উত্তরে সাঁ মালো বন্দর প্রায় মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে। পূর্ব্বদিকে দ্রুত অভিযান চালাইয়া আমেরিকানরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ব্রেস্তে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে স্যানাজেয়ার বন্দরের ১৫ মাইলের মধ্যেও তাহারা পৌছিয়া গিয়াছে, লোরিয়েণ্ট হইতে ইহার দূরত্ব অল্প। লোয়ার নদী তীরে আমেরিকানরা এখন হাজির হইয়াছে। এই নদীর উপর নান্তেস্ বলিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহরটী শীঘ্রই দখল হইবে আশা করা যায়।

রেনেস্ শহরকে অনেকগুলি বড় রাস্তার চৌমাথা বলা চলে। ব্রিটানির সমুদ্রকূল মিত্রশক্তির দখলে আসিলে নূতন সৈন্য নামাইয়া এই সব রাস্তা দিয়া প্যারিসের দিকে পাঠানো সহজ হইবে। তাই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সম্বন্ধে সব চেয়ে টাটকা এই খবরগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

প্যারিসে জার্ম্মানরা তটস্থ

ফরাসী দেশভক্তেরা যে শত্রুর নিপাত ঘটাইবার জন্য উন্মুক্ত তাহার প্রমাণ রোজই আসিতেছে। ব্রিটানিতে দক্ষিণ উপকূলে ভাণে শহরটী ফরাসী গেরিলাদেরই দখলে ছিল। খাস প্যারিস শহরে জার্ম্মাণরা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করিতেছে, বিদ্রোহের ভয়ে তাহারা নাকি তটস্থ হইয়া রহিয়াছে। বিস্তর ফরাসী মিত্রপক্ষের শিবিরে তথ্য ও সংবাদ লইয়া আসিতেছে। শেরবুর্গের এক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার একজন ফরাসী কণ্ট্র্যাক্টর গত চার বৎসর ধরিয়া বাহিরে শত্রুর হুকুম তামিল করিয়া চলিয়াও মনে মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। মিত্রপক্ষকে তিনি শহরের একটা বড় ম্যাপ দেন এবং যেখানে যেখানে জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষা ঘাঁটি ছিল তাহার বিশদ বর্ণনা জানান। শেরবুর্গকে শত্রু কবল হইতে মুক্ত করায় এই দেশভক্তের দান কম নয়।

Regd. No. C. 2836

লাহোরে লীগ কাউন্সিলের সভা

কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার আশা ও আগ্রহ

জনযুদ্ধের বিশেষ প্রতিনিধি।

মুসলিম লীগের সভা আগেও অনেক হইয়াছে, কিন্তু এই সভায় যেরকম আশা উদ্দীপনা ও কংগ্রেসের প্রতি ভ্রাতৃত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ রকম আর কখনও দেখা যায় নাই। মিঃ জিন্না তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই, লীগ কমিটীর সভার এক দিন আগে আমার সহিত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের দেখা হইল। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল যে, রাজাজী যখন জিন্নার কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন তখন যদিও তাঁরা নানা রকম বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তবু তাঁরা মনে করেন যে গান্ধীজীর প্রস্তাবে একটী আলোচনার ভিত্তি রচিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে যে নিজেদের জায়গায় মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, তার সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সন্দেহই নাই। একজন সভ্য আমাকে বলিলেন: "আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমাদের গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালানো উচিত।"

পরের দিন সকালে রেডিওতে খবর পাওয়া গেল যে, গান্ধীজী নিজেই জিন্নার কাছে লিখিয়াছেন। এই দিনই লীগ ওয়ার্কীং কমিটীর সভা বসিবার কথা। অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হইয়া উঠিল। সকলেরই মনের ভাব এই যে, গান্ধী-জিন্না দেখা হওয়ার পথে আর কোনো বাধা নাই। মামদোতভিল, যেখানে লীগ ওয়ার্কীং কমিটীর সভা হইয়াছে, সেখানে কি হইতেছে জানিবার জন্য লোকে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ওয়ার্কীং কমিটীর সভার অবসরের সময় সভ্যদের কথা বার্ত্তা হইতে মনে হইল যে সমস্ত সভ্যই মীমাংসার পক্ষে। যাঁরা রাজাজীর প্রস্তাবকে যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই তাঁদের নাকি জিন্না রীতিমত ধমকাইয়াছেন। জিন্না তাঁর সহকর্মীদের কাছ হইতে কার্য্যকরী পরামর্শই চাহিয়াছেন। কমিটী অফ এ্যাকশনের সভাপতি নবাব ইসমাইলের সঙ্গে এক বন্ধুর দেখা হইলে, তিনি বলেন, "কংগ্রেস লীগ মীমাংসা চোখের সামনে দেখা যাইতেছে।"

৩০শে তারিখে বরকত আলি হলে লীগ কাউন্সিলের সভা বসিল। ছোট হলে লোক ধরে না। দেশের সমস্ত জায়গা হইতে ১২৫ জন সভ্য আসিয়াছেন। মিঃ জিন্না তাঁর লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রথমাংশে যে সমালোচনামূলক সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা সভার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না। বোধ হয় জিন্না নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিলেন: "খোলাখুলি ভাবে আমার মত ব্যক্ত করিতে গিয়া যদি আমি কারুর মনে আঘাত দিয়া থাকি, তার জন্য আমি দুঃখিত।" কিন্তু জিন্না যখন বলিলেন: হিন্দু মুসলমান মীমাংসা দ্বারা একটা যুক্ত ফ্রন্ট গঠন না করিলে অনিচ্ছুক ব্রিটিশ শাসকের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনা অসম্ভব, তখন সমস্ত সভা তাঁকে অভিনন্দিত করিল। শেষ কালে জিন্না যখন বলিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হউক, তখন সমস্ত সভার মধ্যে একটা স্বস্তির ভাব দেখা গেল।

হল হইতে বাহির হইয়া আমি মৌলভী আবুল হাসেমকে ধরিলাম। তিনি বলিলেন, "জিন্নার বক্তৃতার প্রথমাংশ অত কড়া না হইলেই ভাল হইত। যাই হোক সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে গান্ধী জিন্না দেখা হইতেছে।" আরো অনেক লীগ নেতা জিন্নার সমালোচনা মূলক মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁরা বলিলেন, "অবশ্য হিন্দুমনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রের কঠোর সমালোচনাই জিন্নার উত্তেজনার খোরাক জোগাইয়াছে।"

জিন্নার নেতৃত্বের উপর লীগ মহলের বিশ্বাস যেমন অটুট আছে, তেমনি ঐক্যের প্রতি আগ্রহও সকলের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—ইহা এই সভায় বেশ পরিস্ফুট হইল। সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার আওরঙ্গজেব, যিনি কয়েকদিন আগেই গান্ধীজী ও রাজাজীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তিনিও আজকে বলিতেছেন: "গান্ধী জিন্না সাক্ষাতের যে সুফল ফলিবে, সে বিষয়ে আমাদের আশা আছে।" আব্দুল রব নিস্তার বলেন: "কংগ্রেস-লীগের মীমাংসার সম্ভাবনা আজকে যত উজ্জ্বল, এরকম আর কখনও হয় নাই।" ইঁহারা দুজনই ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য। ইঁহাদের কথা হইতেই বুঝা যায় ওয়ার্কিং কমিটীর সাধারণ মনোভাব কি।

সাধারণ মুসলিম জনমত আরো বেশী আশা করে। জিন্না ও লীগ গান্ধীজীর প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া এখনি অচল অবস্থার অবসান করুক ইহাই তারা চায়। বাংলার লীগের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে স্যর নাজিমুদ্দিন আবুল হাসেম, ইস্পাহানী প্রভৃতির কথায়। পাঞ্জাবের মত ব্যক্ত হইয়াছে মামদতের নবাব, সৌকত হায়াত, ভালাটানা, বসির আহমদ প্রভৃতির কথায়। যুক্ত প্রদেশের মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইসমাইল, রিফওয়াউল্লাহ প্রভৃতি। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক নেতারাই চাহেন মীমাংসা হউক।

আমি দেখিলাম যে লীগের অনেকেই রাজাজীর ফর্ম্মুলার খুঁটিনাটি ও ইহার আসল মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। মুসলিমদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই এবং মুসলিম অঞ্চলের কথা না বলিয়া জেলার কথা বলা হইয়াছে—প্রস্তাবের এই দুইটী বিষয় দেখিয়াই তাঁরা ইহাকে সমালোচনা করিয়াছেন। মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের নীতি গণভোটের দ্বারা স্বীকৃত হইবে—একথাও প্রস্তাবে বলা হয় নাই। এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা গান্ধী-জিন্নার কথাবার্ত্তার দ্বারা যদি হইয়া যায়, তা হইলে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট লইয়া বা অন্য কোন প্রশ্ন লইয়া কিছু আটকাইবে না, ইহাই অধিকাংশ লীগনেতা মনে করেন।

মীমাংসার জন্য এই আশা ও আগ্রহটাই এবারের লীগ কাউন্সিলের সভার বিশেষত্ব। গান্ধীজীর প্রস্তাবের ফলে লীগের এই অগ্রগতি আজ আমাদের চোখে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিতেছে।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে ইতালীর জনগণকে আহ্বান

ইতালীয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও ইতালীয়ান গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী কমরেড টগলিয়াটি রেডিও যোগে উত্তর ও মধ্য ইতালীর জনসাধারণের কাছে এই আবেদন করিয়াছেন—

"আমাদের সামনে গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত। আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনের ভার আমাদেরই উপর। মিত্রশক্তির সৈন্য বাহিনী নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে অভিযান চালাইয়া যাইতেছে। এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অল্প সংখ্যক ইতালীয়ান সৈন্যও আজ বীরবিক্রমে আগাইয়া চলিয়াছে। এই অভিযানকে সফল করিতে দেশভক্ত ইতালীয়ানদেরও অবিলম্বে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে।

ইতালীর জনসাধারণের সামনে আছে গ্যারীবল্ডীর স্বাধীনতার লড়াইয়ের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। আজ আমাদের চরম যুদ্ধের জন্য তৈরী হইতে হইবে। দেশের মুক্তির জন্য আমাদের আজ সব কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। ইতালীকে স্বাধীন করিতেই হইবে এবং সে গুরুভার ইতালীয়ানদেরই বহন করিতে হইবে।

আপনারা সবাই স্বাধীনতার এই যুদ্ধে যোগ দিন। শত্রুকে একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ইতালী গোলামের দেশ নয়। যাহারা আজ সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়াও স্বাধীনতা চায়, ইতালী সেই দেশ-প্রেমিকদেরই জন্মভূমি।"

(১৯৪৪ সালের ১লা জুনের 'ডেলীওয়ার্কার' হইতে)

জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য

আরও জোরদার আক্রমণ চাই

গত কয়েকদিনের মধ্যে বার্ম্মা ফ্রণ্টে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিত্রশক্তি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। ৩রা আগষ্ট জেনারেল ষ্টীলওয়েলের নেতৃত্বে চীনা ও আমেরিকান সৈন্যদের চরম আঘাতের ফলে মিচিনা অধিকৃত হইয়াছে। গত মে মাস হইতে "যে কোন মুহূর্ত্তে" মিচিনার পতন আশা করা যাইতেছিল। এখন মিচিনা দখল হওয়ার ফলে জাপানীরা উত্তর ব্রহ্মে তাহাদের রেল, নদী ও সড়কের একটি প্রধান যোগাযোগস্থল হারাইল। অপরপক্ষে, মিত্রশক্তি চীনের সহিত বিমান বা স্থলপথে যোগাযোগের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হস্তগত করিল। মিত্রশক্তির দ্বিতীয় জয়লাভ হইতেছে, কাবা উপত্যকায় টামু দখল। এই ঘাঁটিটি ইম্ফল হইতে ৫০ মাইল দূরে এবং টামু—টিডিম সড়কের সৈন্য চলাচলের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইহা মিত্রশক্তির দখলে আসার ফলে কাবা উপত্যকা হইতে জাপানীদের সম্পূর্ণরূপ বিতাড়নে অনেকটা সুবিধা হইল। তৃতীয়তঃ, চীনা সৈন্যরা টেংচুং সহরটি দখল করিয়া উত্তরব্রহ্মে ব্যাপক অভিযানের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিতেছে। এখন তাহারা সহজেই জেনারেল ষ্টীলওয়েলের সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইয়া বর্ম্মারোড উদ্ধারের লড়াইকে জয়যুক্ত করিতে পারিবে। টেংচুং মিচিনা হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

কিন্তু এতগুলি জয়লাভ সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে এখানে যুদ্ধ খুবই মন্দগতিতে চলিয়াছে। মিচিনা দখলের বিলম্বকে সমর্থন করিতে যাইয়া কলোম্বর একজন সময় সংবাদদাতা কিছুদিন আগেও মন্তব্য করিয়াছিলেন, "অবশ্য সমস্ত শক্তি লইয়া প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিলে ইহা খুবই সম্ভব যে একদিনে মিচিনা দখল হইয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে অনেক লোকক্ষয় হইত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সময়ের এমন কোন তাগিদ নাই যে এত ক্ষতিস্বীকার যুক্তিযুক্ত হইবে।"

সম্প্রতি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় তাহার যুদ্ধ বিবৃতিতে ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সৈন্যদের প্রশংসা করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে কুইবেকে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহা হইল, চীনের সহিত বিমানপথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য উত্তরব্রহ্মে অভিযানের সিদ্ধান্ত। এবং সেই অভিযানকে কার্য্যকরী করিতে যাইয়া তাহাদের পাণ্টা জাপ-অভিযানের মুখোমুখী হইতে হয়। মিঃ চার্চ্চিল গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, জাপানের ভারত আক্রমণ আরও এক বছরের জন্য ঠেকান গিয়াছে এবং হিটলারের পতনের পর জাপানকে পরাজিত করিতে তিনি আগে যত সময় লাগিবে মনে করিয়াছিলেন এখন দেখিতেছেন, সম্ভবতঃ তাহা হইতে কম সময় লাগিবে। এই কথায় পাণ্টা আক্রমণের মনোভাব নাই, কেবল আত্মরক্ষার মনোভাব।

অথচ জাপানের অভ্যন্তরে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সম্প্রতি জাপানী মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়াছে। তোজোর স্থান দখল করিয়াছে আরও উগ্র দক্ষিণপন্থী নেতা জেনারেল কোইসো। জাপানের সমরকর্ত্তাও অধিক সংঘবদ্ধতার সহিত জাপানের সমস্ত শক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্য নূতন করিয়া পরিকল্পনা করিতেছে। জাপানের সমর নেতাদের বর্ত্তমানে একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে, একদিকে যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করার জন্য যে রণকৌশল প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করা, এবং অপরদিকে, দেশবাসীর শক্তিকে সামগ্রিক সামরিক সমাবেশের নামে আরও বেশী শৃংখলিত করা। গত মার্চ্চ মাসের "ওয়ার এ্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস" নামক সোভিয়েট পত্রিকার একজন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "জয়ের আশা যত কমিয়া আসিতেছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা ততই রাজনৈতিক চালবাজির উপর বেশী জোর দিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য হইল, একদিকে, যে সমস্ত স্থান তাহারা দখল করিয়াছে সেখানে নিজেদের ভিত্তি দৃঢ় করা এবং অপরদিকে, তথাকথিত শান্তি-প্রস্তাবের জন্য আবহাওয়া সৃষ্টি করা।" সামরিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে জাপান এখন যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতেই চাহে। চীনে পেকিং-ক্যাণ্টন রেলপথের উপর দখলের জন্য প্রাণপণ লড়াই এবং ব্রহ্মদেশে আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক লড়াই তাহার প্রমাণ করে। মিত্রশক্তি যদি ব্রহ্মদেশ উদ্ধারের জন্য আক্রমণাত্মক নীতি লইয়া লড়াই করিতে প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে জাপানী-দস্যুদের রাজনীতিই জয়যুক্ত হইবে। মিঃ চার্চ্চিলের আত্ম-সন্তুষ্টি ও আত্মপ্রশংসা ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের প্রধান রাজনীতি, মিঃ চার্চ্চিল আর কতদিন তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সপ্তাহ

গত ৩০শে জুলাই হইতে এক সপ্তাহব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সপ্তাহে প্রত্যেক কারখানার মজুর ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহ, মজুর দাবীর প্রচার প্রভৃতির জন্য বস্তিতে বস্তিতে বৈঠক ও সভা করে।

গত ৫ই আগষ্ট এই সপ্তাহের শেষ দিনে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক মজুর জমায়েত হয়। কলিকাতা ও আশেপাশের ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে বহু মজুর এই সভায় যোগদান করে।

প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি বসু সভাপতিত্ব করেন। সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত, তাহাতে বলা হয় যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় শতকরা ৩০০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অনেক কারখানায় এখনও নামমাত্র মাগগীভাতা দেওয়া হইতেছে। চটকল মজুরদের মাগগীভাতা মাত্র ৫৲ এবং কোন কোন কারখানার মজুরদের বড় জোর ৮৲।১০৲ দেওয়া হয়। খুশীমত কম মাগগীভাতা দিবার যে নীতি সরকার চালাইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই নিন্দা করিবেন। এই সভা সরকারের কাছে এই দাবী জানায় যে খরচ বৃদ্ধির অনুপাতে মাগগীভাতা দিতে মালিকদের বাধ্য করা হোক।

সভাপতি বক্তৃতায় বলেন যে, সরকার লেবার ফেডারেশনকে হাজার হাজার টাকা সাহায্য করিতে পারে, আর মজুরদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাদের মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারে না। লড়াইয়ের বাজারে মালিকরা প্রচুর মুনাফা লুটিতেছে, মজুরের মজুরী ও ভাতা বাড়াইবার জন্য তাদের বাধ্য করা কেন হইবে না?

পুলিশ অহেতুক মামলা করে কেন?

৩ মাস পূর্ব্বে কলিকাতার এক জনসভায় আপত্তি-জনক বক্তৃতা দিবার অভিযোগে উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড হৃষি বন্দোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মামলায় বিচারক তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। রায়ে বিচারক বলিয়াছেন যে, তাঁর বক্তৃতা সমগ্রভাবে বিচার করিলে আপত্তিজনক মোটেই নয়।

সম্প্রতি আরো যতগুলি রাজনীতিক মামলায় দেখা গিয়াছে যে, পুলিশের অভিযোগ টেঁকে নাই। বরং, অহেতুক বাড়াবাড়ি করিবার জন্য পুলিশের উপরই বিচারক কড়া মন্তব্য করিয়াছেন।

এই সমস্ত মামলা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আইনে ব্যক্তি স্বাধীনতা যতটুকু স্বীকৃত হয়, কলিকাতার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাও স্বীকার করিতে রাজী নয়। পুলিশের মামলা রুজু করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া, এমন সব মামলা রুজু করিবে যাহা আইনে টেঁকসই নয়—এইরূপ অনবরত হইতে থাকিলে আইনের মর্য্যাদা কোথায় থাকে? আমরা আশা করি, মন্ত্রীমণ্ডলীর নজর এই দিকে পড়িবে। কেননা, ইহাতে তাঁদেরই উপরে লোকের আস্থা কমিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক
ছাত্রফেডারেশন

কার্য্যকরী সমিতির জরুরী বৈঠক।

কলিকাতা, ১২, ১৩, ১৪ই আগষ্ট।

কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ছাড়াও প্রত্যেক জেলা হইতে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে হইবে।

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
সাধারণ সম্পাদক।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জি দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা] ১৬ই আগষ্ট, বুধবার, '৪৪, ৩১শে শ্রাবণ '৫১ [দাম ছয় পয়সা

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়

সর্ব্বত্র যখন ঐক্যের সাড়া তখন তাঁর 'বঙ্গভঙ্গের' ভয়!

কিরণ বাবু এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী গান্ধীজীর কাছে গিয়াছিলেন "বঙ্গভঙ্গ" রোধ করিতে। রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্গদেশ খণ্ড খণ্ড হইবে, বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা। কিরণ বাবু দাবী করিয়াছেন যে বাংলার কংগ্রেসসেবিগণ গান্ধীজীর প্রচেষ্টার বিরোধী।

কিরণ বাবুর সন্দেহের উত্তর দিয়াছেন বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। শ্রীযুত সতীশ দাস গুপ্ত, মিহির চাটার্জ্জি প্রভৃতি ২০ জন কংগ্রেস নেতা ঘোষণা করিয়াছেন "কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমরা রাজাজীর প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কংগ্রেসসেবীগণ অথবা অধিকাংশ কংগ্রেসসেবী এই প্রস্তাবের বিরোধী বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, আমরা অসঙ্কোচে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি।" শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, প্রিয় রঞ্জন সেন প্রভৃতি নেতৃবর্গ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন "এই (গান্ধী-জিন্না) আলোচনার ফলে হিন্দু বাংলাকে অসহায় করিয়া মুসলিম বাংলার অনুকম্পার প্রতি ঠেলিয়া দেওয়া হইবে তাহা নয়, বরং ইহার ফলে সুনির্দ্দিষ্ট পৃথক পৃথক সীমানায় থাকিয়া সাধারণ কল্যাণের জন্য উভয়ে একযোগে কাজ করিবে। আমরা আশা করি এই আলাপ আলোচনার ফলে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পবিত্র প্রভাবে বর্ত্তমান আত্মকলহের অবসান ঘটিবে।" কংগ্রেস কর্ম্মিদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী সুবোধ রঞ্জন রায় বলিয়াছেন "পরাধীনতার তীব্র জ্বালা যাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন তাঁহাদের নিকট পাকিস্থান কি হিন্দুস্থান বড় কথা নয়, বর্ত্তমান অবস্থায় আরও দীর্ঘ দিন থাকিতে হইলে এইরূপ সহস্র সহস্র পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের উদ্ভব হইবে।" বাংলার সমস্ত স্থান হইতে অধিকাংশ কংগ্রেস-সেবী কর্ত্তৃক এই অনুভূতিই ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা স্বাধীনতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার জন্য ইহাই কি কিরণ বাবুর বিশ্বাস?

কিরণ বাবুর মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে কংগ্রেসসেবিগণের মনে নয়, মহাসভা-পন্থীদের মনে। হিন্দুমহাসভার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' ২৭শে জুলাই তারিখে লিখিয়াছে—"ভারতের 'স্বাধীনতা', জাতির স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি আনিবার জন্যই তিনি (রাজাজী) দেশমাতৃকাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে চাহেন। হায় স্বাধীনতা! এই নাম লইয়া জগতে যত মহাপাপ সম্পাদিত হইয়াছে এত বোধ হয় অন্য কিছুর জন্য হয় নাই।" তাহার পর "যাহারা হাজার বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সত্ত্বেও নিজেদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা যথা সাধ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। আর কৃষ্টি, সভ্যতা, জাতীয় ঐতিহ্য বিসর্জ্জন দিয়ে যে 'স্বাধীনতা' পাওয়া যায়, তাহা না পাইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না।" কিরণ বাবু কি এই মতের ভিতর তাঁহার নিজ অনুভূতির ছায়া দেখিতে পাইতেছেন? এই মত তাহাদেরই মত স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহাদের কোন অবদান নাই, যাহারা দাসত্বের ভিতর কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পায়।

কিরণ বাবু ভাবিতেছেন মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট, তাহার সঙ্গে এই আপোষ প্রচেষ্টায় লাভ কি? রাজাজীর প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করিয়া বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দৈনিক পত্রিকা আজাদে ১০শে জুলাই লিখিত হইয়াছে—"দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু একটু করিয়া মুক্তি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই শুভলক্ষণকে আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি।" উক্ত পত্রিকা ১৫ই আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছে "ভারতবর্ষ সেদিকে তাকাইয়া আছে এই আশা লইয়া যে দুই নেতার (গান্ধী ও জিন্নার) আপোষের ফলে তার পরাধীনতার দুঃখ রজনীর অবসান ঘোষিত হইতে যাইতেছে—সে অতঃপর আজাদীর প্রথম অরুণালোক শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।" "কাজেই বোম্বাই এবং ১৯৪৪ সালের আগষ্ট ইতিহাসে স্মরণীয় হইতে যাইতেছে। মুক্তিকামী ভারতবাসী আশা করে এই স্থানে এবং এই দিনে তার আজাদীর প্রাথমিক সনদ রচিত হইতে যাইতেছে।" এই আহ্বান স্বাধীনতার জন্য ঐক্যের আহ্বান। লীগপন্থীর এই অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে কংগ্রেস-পন্থীর অনুভূতির। ইহাই গান্ধীজীর ঐক্য-প্রচেষ্টার প্রাথমিক আভাষ।

কিন্তু তবু কিরণ বাবুর মনে জাগিতেছে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কথা। সুরেন্দ্রনাথ সেদিন বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য লর্ড কার্জ্জনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। কিরণ বাবু কি মনে করেন যে শ্যামাপ্রসাদবাবু সেই ঐতিহ্য লইয়াই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুকে যদি ভাবিতে হয় আজিকার সুরেন্দ্রনাথ তাহা হইলে গান্ধীজীকে ভাবিতে হয় আজিকার লর্ড কার্জ্জন। এই অসত্যই কি কিরণবাবুর অনুভূতি?

বঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা লর্ড কার্জ্জন চাহিয়াছিল বাংলার জাতীয় শিবিরে রাজনৈতিক ভেদ সৃষ্টি করিতে। ভৌগলিক বিভাগ ছিল তার উপলক্ষ মাত্র। আর আজ ভৌগলিক ঐক্যের ভিতরই রাজনৈতিক আত্মকলহ আমাদের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়াছে, গান্ধীজী মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লইয়া স্বাধীনতার পথের বাধা দূর করিতে যাইতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের ঐতিহ্য তিনিই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন নূতন যুগের নূতন অবস্থায় রাজনীতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে। এই ঐক্যের ফলে স্বাধীনতার যুদ্ধ জয়যুক্ত হইবে, ভৌগলিক ভেদ যদি আপাততঃ হয়ও তবে স্বাধীনতার সংযুক্ত সংগ্রামের ফলে তাহা সাময়িক হইতে বাধ্য, বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংস করা নয়, তাহাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই এই আপোষ প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

কিরণ বাবু গান্ধীজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিরণ বাবুকে আহ্বান করিয়াছিলেন সমবেত ভাবে গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ আলোচনা করিয়া বাংলার কংগ্রেসকে সজীব করিয়া তুলতে। কিরণ বাবু কি এই **এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন?** কিরণ বাবু এখনও বাংলায় কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন আহ্বান করিতে রাজী হন নাই, তাঁহার অবিশ্বাসী মন তাঁহাকে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে,কিরণ বাবু আজ স্বাধীনতাসেবিগণের মনোভাবের প্রতিনিবিম্ব না করিয়া মহাসভা পন্থীদের আতঙ্ক দ্বারা প্রভাবিত হইবেন ইহা কি সম্ভব? ইহা কি তাঁহার পক্ষে বঙ্গ ভঙ্গ রোধ না কংগ্রেসে ভেদ সৃষ্টি?

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালীর জীবন ধারণ সমস্যা

কলিকাতার ট্রামওয়ে মজুরদের মাগ্গী-ভাতা প্রভৃতি দাবীর ন্যায্যতা বিচার করিবার জন্য যে এ্যাড্জুডিকেশন বসিয়াছে, তাহার কাছে মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে খাই-খরচের একটী হিসাব দাখিল করা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখান হইয়াছে যে, ৪ জন বয়স্কের একটী পরিবারে শুধু খাওয়ার খরচই লাগে মাসে প্রায় ৮০ টাকা।

এই হিসাব হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আজকে অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে জীবন-ধারণোপযোগী খরচ বহন করা কত দূর দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কয়টী পরিবার শুধু খাওয়ার জন্য ৮০৲ ব্যয় করিতে পারে? গরীব শ্রেণীর লোকেরা পরণের কাপড়, চিকিৎসার ঔষধ সমস্ত কিছু বাদ দিয়া শুধু নূন ভাত যোগাড় করিতে গিয়াও পারিয়া উঠিতেছে না। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি দেহের পুষ্টির বিনিময়ে কোনরকমে তার সামাজিক মর্য্যাদা বজায় রাখিতেছে। তাহারই ফলে চারিদিক রোগ ও মহামারী।

বাংলার খাদ্য-অবস্থা এখনো এই পর্য্যায়ে রহিয়াছে। কিন্তু খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী সে কথা ভাবিতে চান না। চাউলের দর কিছু কমাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বড়াই করিয়া বলিতেছেন যে, বিপদকে তিনি সামলাইয়াছেন। ৯ই আগষ্ট সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে তিনি বলেন, "খাদ্য-অবস্থা সম্বন্ধে অনেক লোক ভীতির সঞ্চার করিতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের কথা।"

কিন্তু চাউলের দর কমিলেও স্বাভাবিক দরের পর্য্যায়ে আসে নাই এবং তার উপর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষের দর দিনের পর দিন আগুন হইয়া উঠিতেছে—সুতরাং সমগ্রভাবে বাংলার খাদ্য-অবস্থার বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। জনসাধারণের সোরগোলের ফলে চাউলের সরবরাহ সম্বন্ধে সুরাবর্দ্দী সাহেব একটু তৎপর হইয়াছেন, একথা সত্য। চাউলের দর তাহাতেই কমিয়াছে। কিন্তু শুধু চাউলের খানিকটা দর কমানর দ্বারাই বাঙ্গালীর জীবনধারণের সমস্যা আজ ঘুচিবে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে চোরাকারবার চলিতেছে, তাহাকে দমন করিতে হইবে; যাহাতে চাউল, তেল, কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ পর্য্যন্ত সব জিনিষই ন্যায্য দরে লোকে কিনিতে পারে। তারই সঙ্গে, যে সব গরীব শ্রেণী আজ দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কর্ম্মক্ষম করিয়া সমাজে স্থান করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তারা পূর্ব্বকার মত রোজগার করিতে পারে। এই সমস্ত কিছুরই উপর বাঙ্গালীর জীবনধারণ সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। আত্মতুষ্টির বদলে সর্ব্বত্র সকলের মিলিত প্রচেষ্টাই ইহার জন্য দরকার।

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট

জার্ম্মানরা **ওসোউইক** ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সুদৃঢ় ঘাঁটিটি পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমানা হইতে মাত্র ১৮ মাইল দূরে, ইহার উত্তরে **গনিয়াজও** লালফৌজ দখল করিয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার উপর আক্রমণ চালানতে বিব্রাজা নদী ছাড়া লালফৌজের কোন বাধাই রহিল না। এবং ইতিমধ্যেই খবর আসিয়াছে, লাল-ফৌজ বিব্রাজা নদীও একস্থানে অতিক্রম করিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

খবর আসিয়াছে ফরাসীর দক্ষিণ উপকূলে মিত্রবাহিনী অবতরণ করিয়াছে।

ভারত সমস্যা সমাধানের জন্য

ষ্ট্যালিন রুজভেল্ট চার্চ্চিলের সাক্ষাতের সম্ভাবনা

লণ্ডনের ১২ই আগষ্টের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি মস্কোর 'প্রাভদা' পত্রিকায় আমেরিকা হইতে প্রেরিত একটী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মিঃ রুজভেল্ট শীঘ্রই মিঃ চার্চ্চিলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং 'আতলান্তিক সনদ' অনুযায়ী ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিবেন। মঃ ষ্টালিন হয়তো প্রস্তাবিত রুজভেল্ট-চার্চ্চিল বৈঠকে যোগদান করিবেন।

(১৩ই আগষ্টের 'আনন্দবাজার')

কংগ্রেসের গায়ে কলঙ্ক লেপনে সি, এস্, পি-র প্রচেষ্টা

মহাত্মা গান্ধী পরাধীন ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে প্রয়াস করিতেছেন কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। সি, এস, পির কর্মীরা প্রচার করিতেছে "গান্ধীজী দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। কংগ্রেস ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের বৈপ্লবিক ভূমিকা শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ কংগ্রেসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে।" সঙ্গে সঙ্গে সি, এস্, পি অরুণা আসফ আলী সম্পাদিত তাহাদের বে-আইনী পত্রিকা "ইন্‌ক্লাব" পুনরায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি "ইন্‌ক্লাবের" এপ্রিল-মে-জুনের ত্রৈমাসিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই পত্রিকাতে সি, এস, পি যে কার্য্যতালিকা উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে তাহাদের কংগ্রেসবিরোধী রূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

সি, এস্, পির কার্য্যক্রম

আইন অমান্য

"জনগণের সহিত আমাদের সংগঠনের যোগাযোগ রাখিতে হইবে। প্রচার ও প্রত্যক্ষ কাজ—এই পন্থাদ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তৃতীয় পন্থা হইল গঠনমূলক কাজ।"…

"প্রত্যক্ষ কাজদ্বারা বৃটিশ শাসনের আইন অমান্য করিতে হইবে। এই আইন অমান্য সত্যাগ্রহীদের মিছিল, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া সভা, ধর্ম্মঘট, লবণ তৈরী, ধ্বংস কার্য্য, শাসনকার্য্যে ব্যাঘাত, খাদ্য লুঠ…প্রভৃতি যে কোন রূপেই করা যাইতে পারে।"

"আইন অমান্য শুধু মাত্র উৎকৃষ্ট প্রচার কার্য্য নয়। ইহা আমাদের সংগ্রামের অভিব্যক্তি এবং সংগ্রামকে জীবন্ত রাখিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। **আইন অমান্যকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া গণ-আইন অমান্য আন্দোলনে পরিণত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"**

ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা সৃষ্টি কর

"কর্ণাটকে যে ভাবে এইরূপ আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে তাহা এখনই সর্ব্বত্র চালু করা যায় না। কিন্তু **বিশেষভাবে শিক্ষিত ছোট ছোট দল চূড়ান্ত সময়ে আঘাত করিবার জন্য সামরিক লক্ষ্য বস্তু সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।** যেখানে সম্ভব সেখানেই এই কাজের জন্য ছোট ছোট দল গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ঐ দলগুলিকে রাজনীতিতে ও প্রত্যক্ষ কাজে শিক্ষিত করিতে হইবে।"

"এই (খাদ্য) সংকট গ্রামে ও সহরে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। খাদ্যশস্য বিক্রয় ও চালান বন্ধ করাই গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজ।"…

"প্রচার ও ব্যক্তিগত সংযোগ দ্বারা সহরে ও নগরে ক্ষুধার জ্বালাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পরিণত করিতে হইবে। কেননা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই জনগণকে ভূখা রাখিয়াছে। অভাবগ্রস্ত প্রত্যেকটি সহরে ও নগরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ক্ষুধিত জনগণ বিদ্রোহ করে ও যেস্থানে খাদ্য পাইবে সেখান হইতেই তাহা কাড়িয়া নেয়। **গ্রামে ও সহরে উভয় স্থানেই ভূখ মিছিল ও খাদ্য লুঠ প্রতিদিনের ব্যাপার করিয়া তোলা চাই।"**

গান্ধিজীর কার্যক্রম

আইন অমান্য আন্দোলন নিষিদ্ধ

"আমি আপনাকে একথা বলিতে পারি যে, **আজ আমার আইন অমান্য করার ইচ্ছা নাই।** আমি দেশকে ১৯৪২-এ পিছাইয়া লইয়া যাইতে পারি না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা যায় না।" (গেল্ডারের নিকট গান্ধিজীর বিবৃতি।)

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখন গণ-আইন অমান্য আন্দোলন করা যাইতে পারে না।…কাজেই আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, বোম্বাই ছাড়া আর কোথাও যেন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা না হয়।" (৯ই আগষ্ট সম্বন্ধে গান্ধিজীর নির্দ্দেশ)

"আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইংরাজের ভারত ত্যাগের প্রস্তাবের ফলে গণ-আন্দোলনের বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, কিম্বা উহা পরিকল্পিত হয় নাই।…গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি আন্দোলন আরম্ভ করি নাই।" (১০ই জুলাই ১৯৪৩)।

ধ্বংসকার্য্য জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর

"আমি কিংবা অপর কোন কংগ্রেস নেতা কখনও কোন হিংসার কথা চিন্তা করেন নাই। **আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, কোন কংগ্রেসকর্মী যদি কোন প্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি তাহার মধ্যে থাকিব না।"** কোনও হিংসাত্মক আন্দোলন সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসকর্মীগণ বা অপরাপর লোকেরা যাহা কিছু হিংসার অনুষ্ঠান করিয়াছে কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।…"

(১৫ই জুলাই, ১৯৪৩)

"ধ্বংসকার্য্য, কিংবা যে কোন প্রকারের বিনাশাত্মক কাজই হিংসামূলক। যদিও এই সব কাজ সাময়িক ভাবে জনগণকে উৎসাহিত করিয়াছিল—কিন্তু **ইহা যে সমগ্রভাবে দেশের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই।** গঠনমূলক কাজের (গান্ধিজীর ১৪ দফা কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) উপরই আমি সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি।"

গত প্রায় ২ বৎসর যাবত সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেসের নেতাদিগকে কারাগারে বন্ধ করিয়া কংগ্রেসের নামে জঘন্য কুৎসা প্রচার চালাইতেছিল। কংগ্রেস "ধ্বংসকার্য্য করিয়াছে", কংগ্রেস গণ-আইন অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে"—এই সব মিথ্যা প্রচার দ্বারা বৃটীশ সাম্যাজ্যবাদ কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছিল। গান্ধিজী মুক্তির পর সেই সব প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া কংগ্রেসকে মিথ্যাকলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সমস্ত দুনিয়ার লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে কাজ ব্যর্থ হইয়াছে, আজ সি, এস্ পি সেই কাজ হাতে তুলিয়া নিয়াছে। তাহারা কংগ্রেসের নামে নূতন কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিতেছে। 'ইনক্লাবে' তাহারা যে কার্য্যক্রম প্রকাশ করিয়াছে—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই 'ইনক্লাব'-কে তাহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ডিরেক্টরের প্রকাশিত মুখপত্ররূপে ঘোষণা করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে যে তাহাদের জঘন্য কার্য্যক্রম কংগ্রেসেরই অনুমোদিত। আজ সারা দেশের কংগ্রেসসেবীগণকে সি, এস্ পি-র এই দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

কলিকাতার রেশনিং-এ এখনো মজুতদারের প্রভাব !

৭ মাসের উপর হইল কলিকাতায় রেশনিং চালু হইয়াছে। এই কয়েকমাসের মধ্যে রেশনিং ব্যবস্থা আগের চেয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা সত্য। সম্প্রতি চিনির বরাদ্দ বাড়াইয়া প্রত্যেকের জন্য সপ্তাহে চার ছটাকের জায়গায় ছয় ছটাক করা হইয়াছে। লবণের রেশনিং সুরু হওয়ায় একটা বড় অভাব লোকের ঘুচিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া রেশনিংএর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের ভরসা যেমন বাড়িতেছে তেমনি রেশনিং এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে।

কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যই রেশনিং নয়। কোন রকমে বরাদ্দমত জিনিষ পাইলেই লোকের চলে না। খাদ্যদ্রব্য ভাল না হইলে, রেশনিং-এ লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। মাঝে চাউল ভাল হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন হইল রেশন-দোকানে এমন কদর্য্য চাউল দেওয়া হইতেছে, যা অধিকাংশ লোকের পক্ষে খাওয়া কষ্টসাধ্য। সরবরাহ বিভাগ বলিয়াছেন, খারাপ চাউলের ষ্টক তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু একসঙ্গে ষ্টক সাফ করিতে গিয়া লোকের যে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, সে চিন্তা কি সরবরাহ বিভাগ করেন না!

সম্প্রতি রেশনিং বিভাগ হইতে জানানো হইয়াছে যে, কলিকাতার রেশন বরাদ্দে এখন হইতে গমের পরিমাণ কমাইয়া তাহার স্থানে গমজাত দ্রব্য দেওয়া হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত একখানা ব্যক্তিগত রেশন কার্ডের সাহায্যে গম অথবা আটা, ময়দা প্রভৃতি গমজাত দ্রব্য, অথবা দুইয়ে মিলাইয়া সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত লওয়া যাইত। এখন তাহার স্থানে একখানা কার্ডে এক সেরের বেশী গম পাওয়া যাইবে না।

কলিকাতায় যে নমুনার আটা, ময়দা সরবরাহ করা হইতেছিল তাহা মানুষের অখাদ্য। আটা ময়দার নমুনা খারাপ বলিয়া তাহার সম্পর্কে অনেক আন্দোলন ও অভিযোগ করিয়াও যখন কোন ফল হয় নাই, তখন জনসাধারণের মধ্যে গমজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে গম লইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। গম ভাঙ্গাইয়া লইতে যে অতিরিক্ত খরচ ও অসুবিধা আছে তাহা সত্ত্বেও গমের কাট্‌তি ক্রমশঃ বেশী হইতে থাকে।

আসল কথা হইল, চাউল, আটা প্রভৃতি ক্রয় ও সরবরাহ হইতেছে প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায়। অসাধু ব্যবসায়ীরা নানা রকমের ভেজাল মিশাইয়া উহাকে মানুষের অখাদ্য করিয়া তোলে। আটা, ময়দার তুলনায় গমের মধ্যে ভেজাল মিশানো কিছুটা কঠিন বলিয়াই কি গমের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা হইতেছে? এই সিদ্ধান্তের ফলে অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্যে ভেজাল মিশানোকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইল। রেশন শপ হইতে যে ডাল সরবরাহ করা হয় তাহারও একই অবস্থা। অথচ ঐ খারাপ ডাল খরিদ্দারদের উপর চাপাইবার জন্য এক অভিনব ফন্দী বাহির করা হইয়াছে। শোনা যায় রেশনিংয়ের তত্ত্বাবধান কর্ত্তৃপক্ষের [ডি, এস, এর] নাকি এক গোপন সার্কুলারে দোকানের ম্যানেজারদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা লবণ লইতে আসিবে, তাহাদের যেন ডাল না লইলে লবণ সরবরাহ করা না হয়। বাজারে লবণ দুর্লভ, সুতরাং ডাল খারাপ হইলেও খরিদ্দাররা লবণ লইবার তাগিদে ডাল লইতে বাধ্য হইবে। অসাধু ব্যবসায়ী এবং মজুদদারের হাতে পড়িয়া খাদ্য খারাপ হইতেছে এবং তাহাই জনসাধারণের উপর চাপাইবার এই জবরদস্তিমূলক চেষ্টাকে মজুদদারের তোষণনীতি ছাড়া আর কি বলা যায়।

সরবরাহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ গোড়া হইতেই মজুদারদের উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়াই আজ মজুতদার নিজদের সুবিধামত ব্যবস্থা চালু করিতেছে।

আজকে মফস্বলেও রেশনিং অল্প বিস্তর চালু হইতেছে। সুতরাং মজুতদাররা এখন নানাভাবে সরকারকে চাপ দিবে যাতে রেশনিং ব্যবস্থার মধ্যেই তাদের প্রতিপত্তি বজায় থাকে। তাই আজকে সরবরাহের উপর জনসাধারণের তত্ত্বাবধান একান্ত জরুরী। সরকার ষ্টক সম্বন্ধে সমস্ত হিসাব জনসাধারণকে জানান। জনসাধারণ সরবরাহের উপর নজর রাখিলে রেশনিং-এ এইরকম গলদ কখনই হইতে পারিবে না।

★ ফ্লোরেন্স নগরী নাৎসী কবলমুক্ত ★

ইতালীয়ান ফ্রন্টে মিত্রবাহিনীর খুব বড় এক সাফল্যের খবর আসিয়াছে। ১২ই আগষ্টের ইস্তাহারে জানা যায় যে বিখ্যাত **ফ্লোরেন্স নগরী** আজ জার্ম্মান কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কাসিনো অধিকৃত হওয়ার পর হইতে ফ্লোরেন্সে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত মিত্রবাহিনী মোট ৫০ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে এবং নাৎসীদের বিরুদ্ধে ইতালীতে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে অন্যান্য সৈন্যের পাশাপাশি ভারতীয় সৈন্যরা বিপুল বীরত্ব ও কৃতিত্বের সহিত লড়াই চালাইয়া যাইতেছে।

লেগহর্ণ ও আনকোনা বন্দর মিত্রসেনার হাতে আসাতে এই দুই বন্দর দিয়া জেনারেল আলেকজান্দারের সেনাদলের জন্য প্রচুর সমরোপকরণ আসিতেছে। ইতালীতে মিত্রসেনা আজ নাৎসীদের উপর আরও জোর আঘাতের জন্য প্রস্তুত।

আবার এদিকে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও আমেরিকার কয়েকজন সমরনায়কের ইতালীতে আসার সাথে হিটলারের বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন ফ্রন্টে আরও জোর কদমে লড়াই চলিবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কথা উঠিয়াছে, হয় ফ্রান্সের দক্ষিণদিক হইতে জার্ম্মান দস্যুদের উপর অভিযান চালান হইবে নতুবা বলকানে হিটলারদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হইবে। চারিদিক হইতে আজ আওয়াজ উঠিতেছে—নাৎসীবাদ ধ্বংসের এই চরম মুহূর্ত্তে শত্রুকে কোনরূপ অবসর দেওয়া হইবে না। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ—তিন দিক হইতে শত্রুর টুঁটি টিপিবার সময় আসিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কি ঘটিতেছে

টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ থ্যাকার্সে বলিয়াছেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় অনেক বেশী কাপড় সরবরাহ করা হইতেছে। টেক্সটাইল বোর্ড হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মে মাস পর্য্যন্ত ৫ মাসে ৭০ হাজার বেল কাপড় বাংলায় পাঠান হইয়াছে। তা ছাড়া সারা ভারতের জন্য যে ৯০০০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, তার মধ্যে ১৯০০ লক্ষ গজই বাংলার জন্য। ১০০০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ইতিমধ্যেই বাংলায় পাঠান হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিলে বাংলার প্রতি লোক বছরে ১২ গজ কাপড় পাইতেছে।

টেক্সটাইল বোর্ডের এই হিসাব সত্ত্বেও, আসলে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার বাজারে কাপড় মিলে না। গত ৬ মাস ধরিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কাপড় সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ খুচরা দোকানে কাপড় পাওয়াই যায় না, যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেও কন্ট্রোল দরের চেয়ে বেশী দাম দিয়া খরিদ করিতে হয়। এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, ষ্ট্যাম্প দেওয়া দরের উপরে ৫৲ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দর দোকানদার দাবী করিয়াছে।

বণ্টন ব্যবস্থার গলদ কোনখানে

বর্ত্তমান বণ্টন ব্যবস্থায় পাইকার-ব্যবসায়ীরা সরাসরি মিল হইতে কাপড় আনে এবং তারপর তাহারা খুচরা-ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করে। মিল হইতে পাইকাররা যে দরে কাপড় পায়, তার উপর শতকরা ২০ টাকা লাভে খুচরা বিক্রয় হইবে ইহাই নিয়ম। এই ২০ টাকা মুনাফা পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়। যে মিল হইতে কাপড় আনা হইতেছে সে মিল যদি ১০০ মাইলের মধ্যে হয়, তবে খুচরা ব্যবসায়ী শতকরা ১০ টাকা মুনাফা পাইবে, আর তা না হইলে শতকরা ৪ টাকা পাইবে।

কিন্তু আজকে অধিকাংশ খুচরা ব্যবসায়ী এই নিয়মের সুবিধা পাইতেছে না। তার কারণ, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নিয়ম করা হইয়াছে যে, পাইকারদের সঙ্গে যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা গত তিন বৎসর ধরিয়া কারবার করিতেছে, শুধু তাদেরই পাইকার কাপড় সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই নিয়মের মধ্যে অধিকাংশ খুচরা-ব্যবসায়ীরাই পড়ে না। এতদিন যে নিয়মে কারবার চলিত, তাতে মধ্যবর্ত্তী পাইকারদের মারফৎ খুচরা ব্যবসায়ীরা মাল খরিদ করিত। পাইকারদের সঙ্গে তাদের সরাসরি কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কাজেই পাইকার তাদের কাপড় দিতে এখন বাধ্য নয়। যে কয়েকজন বাঁধা খুচরা-ব্যবসায়ী পাইকারদের হাতে আছে, শুধু তাদেরই তারা কনট্রোলের নিয়মে কাপড় দেয়।

এইজন্যই আজকে কলিকাতায় যত কাপড় পাইকাররা আমদানী করে, তার শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ কয়েকজন বাঁধা খুচরা ব্যবসায়ী পায় আর বাকী ৭৫ ভাগ কাপড় পাইকাররা ইচ্ছামত যেখানে সুবিধা এবং যতদরে সুবিধা বিক্রয় করে।

পাইকারদের কারসাজী

পাইকাররা তাদের এই চোরাকারবারে মধ্যবর্ত্তী পাইকারদের হাতে পাইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী পাইকারদের কেহ খুচরা ব্যবসায়ী হইয়া গিয়াছে, আর বেশী অংশই পাইকারদের কমিশন এজেণ্ট হিসাবে চোরাকারবারে কাপড় চালান দেয়। **কলিকাতায় খুচরা ব্যবসায়ীর নামে যে ২৫ ভাগ কাপড় থাকে, তারও সমস্ত খোলাবাজারে আসে না। পাইকাররাই বেনামীতে অনেক খুচরা কারবারের ব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং সেখান হইতে চোরাবাজারে চালান দেওয়া হয়।** কলিকাতার কয়েকটী অঞ্চল হইতে এই রকম ভুয়া খুচরা-ব্যবসায়ীর লাইসেন্স পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। কিন্তু তাদের মামলা শেষ পর্যন্ত ধামা চাপা দেওয়া হইল।

কিছুদিন আগে যে ৫ লক্ষ টাকার কাপড় ধরা পড়িয়াছে, তাও এই রকম 'খুচরা-ব্যবসায়ী'র গুদাম হইতে। 'ন্যাশনাল এজেন্সি' নামে আর একটা দোকান হইতে পুলিশ যে কাপড় উদ্ধার করিয়াছে তা হইতেছে মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পুত্রের নামে। 'খুচরা-ব্যবসায়ীর' নাম করিয়া এই ভাবে অবাধে চোরা-বাজার চলিতেছে।

কলিকাতার প্রায় ৩০০০ খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের একটী এসোসিয়েশন গড়িয়া উঠিয়াছে। এসোসিয়েশনের মারফৎ যদি খুচরা-ব্যবসায়ীদের কাপড় দেওয়া হয়, তা হইলে এই সব চোরা-কারবার বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু সেইজন্যই বোধহয় পাইকাররা এই এসোসিয়েশনের উপর মহা খাপ্পা। তারা বলিয়াছে এই এসোসিয়েশনের কোন সভ্যকে তারা কাপড় দিবে না। পাইকাররা একটী লোকদেখানো খুচরা-ব্যবসায়ী সংঘ গড়িয়াছে, যার নাম হইতেছে বেঙ্গল টেক্সটাইল ডিলার্স এসোসিয়েশন। ইহার সভাপতি হইতেছেন বৈজনাথ বিজানওয়ালা। শোনা যায় ইনি একাধারে পাইকার ও খুচরা-ব্যবসায় সকল কাজই করেন বিভিন্ন লোকের নামে। এই এসোসিয়েশনের সভ্য হইলে তবেই তাকে কাপড় দেওয়া হইবে পাইকাররা নাকি এই নিয়ম করিয়াছে। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে পাইকাররা খুচরা-ব্যবসায়ের নামে চোরা-কারবার যাতে আরো ভাল চলে তার পথ পাকা করিতেছে।

কলিকাতার কাপড় ব্যবসায়ের অবস্থা এইরূপ। ইহার ফল শুধু কলিকাতাতেই নয় মফঃস্বলেও গিয়া পৌঁছিতেছে। এখান হইতে বড় পাইকাররা মফঃস্বলের বাজার দখল করিতেছে এবং সেখানকার খুচরা ব্যবসায়ীদের হটাইয়া দিতেছে। সম্প্রতি বরিশাল হইতে একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় কাপড় কিনিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন: ওখানে কাপড় একেবারে পাওয়া যায় না।

আজকে কলিকাতার খুচরা-ব্যবসায়ীরা পাইকারদের ষড়যন্ত্র অচল করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছে। তারা দাবী তুলিয়াছে যে, সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা-ব্যবসায়ীদের কনট্রোল দামে কাপড় দিতে পাইকারদের বাধ্য করা হোক। শুধু কলিকাতার ব্যবসায়ীই নয় মফঃস্বলের সমস্ত খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীরাও যদি এই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয় ও জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করে, তবে কাপড়ের চোরা বাজার বন্ধ হইবেই।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত

রেশনিং ও সরবরাহের উন্নতিতেই চাউলের দর কমে

গত মে-জুন মাসে বাংলা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটিতে থাকে। সমস্ত জেলায় বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, উত্তর-বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চাউলের দাম হু হু করিয়া বাড়িতে থাকে।

চাউলের দামের এই অবস্থার বর্ত্তমানে উন্নতি হইয়াছে। জুলাই মাসে চট্টগ্রামে এক চালানে দেড়লাখ মণ চাউল প্রেরিত হয় এবং ঘাটতি গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪০ জনের রেশনিং প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার পর চট্টগ্রামের চাউলের দর ২১।২২ টাকার নামিয়া আসিয়াছে। পটিয়া থানায় জুন মাসে চাউলের দর ছিল ২৭৲।২৮৲ টাকা। এখন সেখানকার দাম ১৭৷৵০। রাঙ্গুনিয়া থানা চট্টগ্রামের ভিতর উদ্বৃত্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলে রেশনিং চালু হয় নাই। কিন্তু ঘাটতি অঞ্চলে রেশনিং হওয়াতে সেস্থানেও চাউলের দাম ২২৲ হইতে কমিয়া ১৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

নোয়াখালী জেলায় জুন মাসে চাউলের দাম ছিল ২১৲।২২৲ টাকা। গভর্ণমেন্টের সরবরাহের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। সম্প্রতি কন্ট্রোল দোকান হইতে কিছু কিছু চাউল সরবরাহ হইতেছে। এখন নোয়াখালীতে চাউলের দাম ১৫৲ হইতে ১৭৲।

ঢাকা জেলায় দু'মাস আগে চাউলের দাম ছিল ২১৲ হইতে ২৫৲। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঢাকা জেলায় ৭ লাখ মণ চাউল ষ্টক করিয়াছে এবং জায়গায় জায়গায় কণ্ট্রোল দোকান হইতে চাউল দেওয়া হয়। এর ফলে আমন চাউলের দাম কমিয়া উর্দ্ধে ২১৲ ও নীচে ১৭৲ হইয়াছে। আউষ চাউলের দাম ১১৲।১২৲।

উত্তর-বাখরগঞ্জ ঘাটতি এলাকা। এর উপর সেখান হইতে চোরাকারবারীরা চাউল চালান দিত। ফলে জুন মাসে চাউলের দাম ১৯৲ উঠে। এই স্থানে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানেও দাম বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে আন্দোলনের ফলে সরকার উত্তর-বাখরগঞ্জ হইতে চাউল চালান বন্ধ করিতে চেষ্টা করে এবং সেখানে ৪ হাজার মণ চাউল পাঠায়। তখন চাউলের দাম কমিতে থাকে। বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জে চাউলের দাম ১৩৷৹।

এ ছাড়া, বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতে যেমন, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে চাউলের দাম বর্ত্তমানে ১১৲।১২৲।

কিন্তু নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি এখনও অবনতির দিকে। নবদ্বীপে জুন মাসে দাম ছিল ১৫৲—এখন সেখানের দর ১৭।০, শান্তিপুরে চাউলের দাম ১৭৷৹ হইতে ১৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। চাকদহে চাউল ১৮৲ হইতে ২০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই সব জেলাগুলিতে এখনও সরবরাহের কোন ভাল ব্যবস্থা হয় নাই।

উপরের তথ্য সমূহ এ-কথাই প্রমাণ করে যে, যে-সব স্থানে সরকার চাউল সরবরাহ করিয়াছে সেখানেই চোরাকারবারীরা জব্দ হয়, চাউলের দামও কমে। অপরদিকে, একথাও বোঝা যাইতেছে যে, যখন যে জায়গায় চাউলের দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে, সরকার সেখানেই কিছু কিছু চাউল পাঠাইয়াছে। কিন্তু একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সারাদেশে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে না। সেইজন্যই কোন কোন স্থানে দাম কমিলেও কোন কোন জেলার দাম বৃদ্ধির দিকে। নূতন আউস উঠাতে চাউলের দাম কমিতে সাহায্য করিয়াছে! এই আউষ যদি এখন মজুতদারেরা হস্তগত করে, তাহা হইলে দু' তিন মাস পরে পুনরায় সংকট সৃষ্টি হইতে পারে। কাজেই সরকার যদি আত্মসন্তুষ্টিতে তৃপ্ত না হইয়া জেলায় জেলায় উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করিতে থাকে এবং রেশনিং করিয়া সরবরাহের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে বাংলদেশের চাউলের অভাব হওয়ার আর কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

কিন্তু চাউলের দাম কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও লবণ, কেরোসিন, চিনি কাপড় প্রভৃতি জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা আজ বাঙ্গালীর জীবনে নূতন সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব জিনিষ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই সংকটও দূর হইবে। যে বিরাট জনসংঘের আজ এগার বার টাকায়ও চাউল কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি নাই, এই সঙ্গে তাহাদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করাও অবশ্য প্রয়োজন।

খাদ্য-কমিটীর চেষ্টায়

নারায়ণগঞ্জে কাপড়ের রেশনিং

নারায়ণগঞ্জ পূর্ব্ববঙ্গের সূতা ও কাপড় কেনা বেচার একটা বড় কেন্দ্র। টেক্সটাইল কন্ট্রোল অর্ডার জারি হওয়ার পর হইতে বাজারে সূতা ও কাপড় পাওয়া যাইতেছিল না। সূতার অভাবে নারায়ণগঞ্জের দুই লক্ষ তাঁতির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। স্থানীয় সূতা-ব্যবসায়ীরা প্রথমে খাদ্যকমিটীর সহিত সহযোগিতা করিতে চাহে নাই! তখন খাদ্য কমিটী চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে কলিকাতা হইতে সূতা আনাইয়া তাঁতিদের দেওয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে সহযোগিতা করিলেন। খাদ্য-কমিটী কর্ত্তৃক প্রেরিত ব্যবসায়ীদের ৮০০ বেল সূতা টেক্সটাইল কমিশনর মঞ্জুর করিলেন। ইহার পর সূতা ব্যবসায়ীরাও সংঘবদ্ধভাবে খাদ্যকমিটীর সহিত সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসিলেন। এখন খাদ্য-কমিটী বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সূতা ও কাপড়ের 'কোটা' ঠিক করিয়া দিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে একজন ব্যবসায়ীকে খাদ্যকমিটী অনুমতি পত্র দিতেছে। তাহার কাছেই পাইকার সূতা বিক্রয় করিবে।

সূতা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের পর কাপড়ের রেশনিং সম্বন্ধেও খাদ্যকমিটী তৎপর হইল। একজন বড় কাপড় ব্যবসায়ী খাদ্যকমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাপড় বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন। খাদ্যকমিটী স্থির করিল তিন মাসে মাথাপিছু ৫ গজ ধূতি, সাড়ি বা জামার কাপড় দেওয়া হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে 'কুপন' দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। একজন ব্যবসায়ী রাজী হওয়ায় অন্যান্য ব্যবসায়ীও রেশনিং ব্যবস্থায় কাপড় বিক্রয়ে রাজী হইতেছে। সহরের ৬৫ হাজার লোকের কাপড়ের চাহিদাই রেশনিং ব্যবস্থার দ্বারা আংশিক মিটান যাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে নারায়ণগঞ্জের লোকে এখন আশ্বস্ত হইতেছে যে, কাপড়ের চোরা কারবার আর চলিতে পারিবে না।

"আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কথা"

আসামের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বারদলইর বক্তৃতা

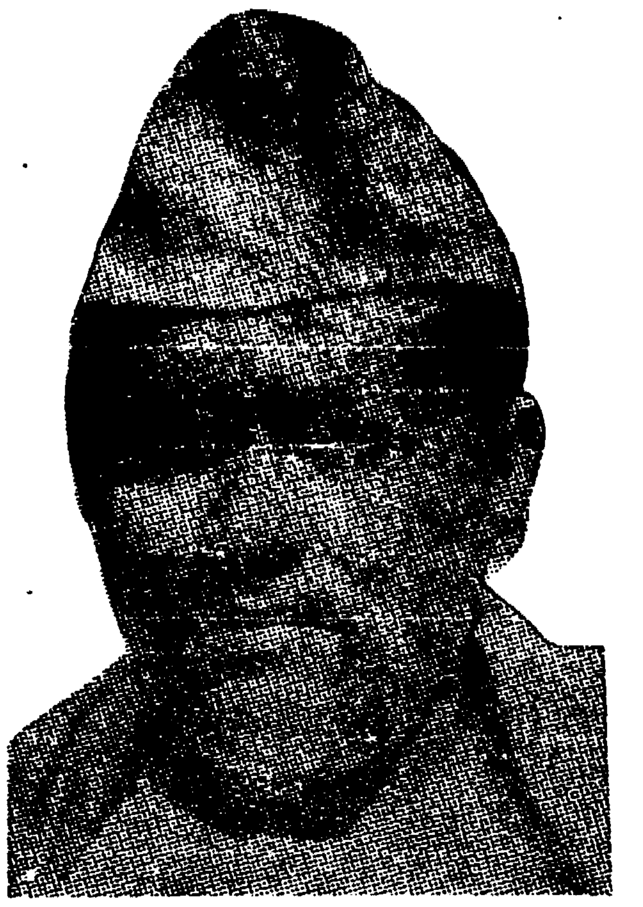

৭ই আগষ্ট গৌহাটী কটন্ কলেজ সোসাইটীর উদ্যোগে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বর্দ্দোলই বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, **গান্ধিজী যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাই একমাত্র পথ এবং বিপ্লবী পথ। যারা মনে করেন গান্ধিজী জিন্নাকে খুসী করিতেছেন, তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নীতিটাই বুঝিতে পারেন নাই। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার মীমাংসার সর্ত্ত নহে। জাতির স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করাই ইহার মূল কথা। সমগ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য যখন আমরা লড়িতেছি, তখন দেশের কোন একটী অংশের স্বাধীনতা আমরা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি?**

গান্ধীজীর পিছনে আসাম

গৌহাটি

২৯শে জুলাই গৌহাটীতে এক বিরাট জনসভায় গান্ধিজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ও আপোষের জন্য গান্ধিজী ও জিন্না উভয়কেই অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুসলিম লীগ সমর্থক মৌলভী হেরাসত উল্লাহ্। এই সভার উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত বার্দ্দোলই একটী বাণী পাঠান।

বড়পেটা

গত ৫ই আগষ্ট বড়পেটার অন্তর্গত **তারাবাড়ী-অঞ্চলে** মুসলীম লীগের বিদ্যালয়ে এক বিরাট সভা হয়। উপস্থিত লোকের মধ্যে শত করা ৩০ জন হিন্দু। আসাম প্রাদেশিক মুসলীমলীগের সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ খান সমাবেশে সভাপতিত্ব করে না। মৌলানা সাহেব রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে কংগ্রেস-লীগ আপোষের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। সভার শেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ৭ই আগষ্ট **হালাপাকুড়ি গ্রামে** মৌলানা আবদুল হামিদ খানের সভাপতিত্বে আরেকটি সভা হয়। মৌলানা সাহেব, কংগ্রেস নেতা বিশ্বনাথ দাস, জেলা-লীগ সম্পাদক কাজিমুদ্দিন ও কমিউনিষ্ট-কর্ম্মী কমরেড প্রাণেশ বিশ্বাস রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ আপোষের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা দেন।

কংগ্রেস লীগ মিলনের জন্য যে প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহা সমর্থন করিয়া **বড়পেটা মাধব চৌধুরী কলেজের** ছাত্রগণ গান্ধীজীর কাছে ৭ই আগষ্ট একটি তার পাঠাইয়াছেন।

শ্রীহট্ট

শ্রীহট্ট, ১০ আগষ্ট---সহরের নিকটস্থ তুকের বাজারে অনুষ্ঠিত নিখিল আসাম মৎস্যজীবী সম্মিলনে হিন্দু-মুসলমান আপোষ রফার জন্য আসন্ন গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নাগপুরের সমর্থন

নাগপুর, ১০ই আগষ্ট---স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান ও পার্শি সম্প্রদায়ের ৭৬ জন এডভোকেট ও উকীলদের এক সভায় রাজাজীর ফরমূলা সমর্থন-পূর্ব্বক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিয়া অচল অবস্থা সমাধানে সাহায্য করুন

বৃটেনের নিকট আইনষ্টাইন, পার্ল বাক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদন

নিউইয়র্ক, ৭ই আগষ্ট :—ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগ কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তির জন্য এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

লর্ড হ্যালিফাক্সের নিকট এই আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে এবং ইহাতে মিঃ লুই ব্রমফিল্ড, মিস পার্ল বাক্, মিঃ জন চাইল্ডস (নিউইয়র্কের লিবারাল পার্টির চেয়ারম্যান), ডাঃ এলবার্ট আইনষ্টাইন, মিঃ লুই ফিসার, মিঃ জন গান্থার, ডাঃ ফ্রাঙ্ক কিংডম (গ্রন্থকার ও সমালোচক), ম্যাক্স লার্নার, আপটন সিনক্লেয়ার, বিশপ ফ্র্যান্সিস জে ম্যাকোনেল, শিল্পী জে ও ডেভিডসন, শ্রমিক-নেতা ভিক্টর জে রয়থার, প্রফেসর উইলিয়াম আর্ণেষ্ট হকিং, "দি নেশন"-এর সম্পাদিকা ফ্রেডা কার্চওয়ে, মিঃ ম্যাথিউ উল (মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেণ্ট) প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, গ্রন্থকার, সমালোচক, যাজক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ সমেত ১১০ জন আমেরিকান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও উহার সহস্র সহস্র সভ্যকে বিনাবিচারে আটক করিবার পর দুই বৎসর অতীত হইল। কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে ফ্যাসিষ্টবাদের বিরোধিতা এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠা দ্বারা সাধারণ্যে সুপরিচিত। এই ব্যাপক গ্রেপ্তারের দ্বারা সমস্যার কোনই সমাধান হয় নাই। বরং ইহাতে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে তিক্ত বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্ব-স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্তরিকভাবে ভারতীয়দের যোগদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করিবেন যে, ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের ক্রমাগত আটক রাখার ফলে আমাদের বিঘোষিত সমরাদর্শ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হইতেছে। রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের আশায় গান্ধীজী মুক্তির পর কতকগুলি দূরপ্রসারী প্রস্তাব দিয়াছেন। এই সকল প্রস্তাব যতদূর সম্ভব কার্যে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্য ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমানে কারারুদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মিঃ গান্ধীকে পরামর্শ করার সুযোগ দিলে সুবিধা হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নেতৃবৃন্দের মুক্তি দ্বারা ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য বৃটেনের আন্তরিক অভিপ্রায় সুপ্রমাণিত হইবে। ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা হইলে মিত্রশক্তি যে শুধু যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হইবেন, তাহা নহে, চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনও ইহাতে সহজ হইবে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আবেদন

লণ্ডন, ৭ই আগষ্ট :—পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ক্লিমেণ্ট ডেভিস ভারতীয় নেতৃবন্দের মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ওয়েলসের আড়াই হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পেশ করিয়াছেন। নারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্যোগেই আবেদনটি করা হয়।

"বাংলা ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করে"

কিরণশঙ্কর রায়ের প্রতিবাদে জে, সি, গুপ্তের বিবৃতি

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট—সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধনকল্পে গান্ধী-রাজাজী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ফরমূলায় বাঙলার সমর্থন নাই এই মর্মে পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ কিরণশঙ্কর রায় সম্প্রতি পাটনা হইতে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন উহার প্রতিবাদে বাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ জে, সি, গুপ্ত নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"পাটনা হইতে মিঃ কিরণশঙ্কর রায় গান্ধী-রাজাজী ফরমূলা সম্পর্কে যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে বাঙলার তরফ হইতে একমাত্র কম্যুনিষ্টগণ ব্যতীত অপর কেহই হিন্দু-মুসলমান আপোষ রফার ভিত্তি স্বরূপ প্রদত্ত ফরমূলাটি সমর্থন করেন নাই।

প্রথমতঃ শুধু মাত্র কম্যুনিষ্টগণই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতেছেন এই সিদ্ধান্তে তিনি কিভাবে উপনীত হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। আমরা জানি **বড়বাজার, হুগলি, ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা, হাওড়া ও নদীয়ার কংগ্রেস কর্ম্মিগণ** একান্তভাবে গান্ধীজীর প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া হিন্দু সমাজের একটা বৃহৎ অংশ বিশেষ জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে দেশের বর্ত্তমান শ্রান্ত অবসাদ দূরীভূত করার পক্ষে উহাই একমাত্র পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ বাঙলাকে অন্যায় ভাবে বিভক্ত করা হইবে বলিয়া মিঃ রায় যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাস্তবে পরিণত নাও হইতে পারে। দীর্ঘ দিনের পারিবারিক অবিশ্বাস দূরীভূত করিয়া ফরমূলাটি যে স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সহায়ক হইবে এই বিষয়টি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

বাস্তবপক্ষে ইতিমধ্যেই বাংলার বহু অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সদিচ্ছার ভাব বৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যদি উভয় সম্প্রদায়কেই কোনরূপ সুবিধা প্রদান, অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তবে তাহাতে কার্পণ্য প্রকাশ আদৌ সমীচীন হইবে না।"

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ফর্মূলাটির গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনাকালে গান্ধীজীর উপর আস্থা জ্ঞাপনের প্রশ্নই বড় হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াও মিঃ রায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এবম্বিধ অভিমত তাঁহার মুখে শুনিতে পাইব বলিয়া আমি মোটেই আশা করি নাই। মিঃ রায় বিশেষভাবে অবহিত আছেন যে, প্রয়োজন বোধে বহু ক্ষেত্রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর মতের বিরোধিতা করিয়াছেন।"

ফর্মূলাটি সম্পর্কে প্রকৃতই যাহাদের কোনরূপ ভয় বা আশঙ্কা রহিয়াছে উপসংহারে তাঁহাদের আমি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা তৎসমুদয় স্ব স্ব নেতা বা উভয় নেতার নিকট উপস্থাপিত করুন। আমার বিশ্বাস, তদবিষয়ে তাঁহারা যথাযোগ্য ভাবেই বিবেচনা করিবেন। কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও সম্মানজনক শর্ত্তে আপোষ রফা সাধন সম্ভব নয় ইত্যাদি কাল্পনিক ধারণা সাধারণের কাছে প্রকাশ করিয়া নেতাদ্বয়ের ঐক্য আলোচনাকে ব্যাহত করা আজ আমাদের পক্ষে উচিত নয়।

—এ, পি

নদীয়া জেলার কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতি

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় রাজাজীর প্রস্তাবে বাংলার কমিউনিষ্টদের ছাড়া আর কাহারও সমর্থন নাই বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। বাংলায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাই; সুতরাং বাংলার সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীদের নামে কিরণ বাবু কথা বলিতে পারেন না। তাছাড়া বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসকর্ম্মীরা রাজাজীর প্রস্তাবে ও গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন।

এলাহাবাদে কংগ্রেস লীগের যুক্তসভা

৯ই আগষ্ট এলাহাবাদের 'স্বরাজ ভবনে' কংগ্রেস, লীগ, ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কর্ম্মীদের এক যুক্ত সভায় গান্ধী-জিন্না মীমাংসার চেষ্টাকে অভিনন্দিত করা হয়। এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা উত্থাপন করেন ডাঃ কাটজু (কংগ্রেস) ও সমর্থন করেন মিঃ লারি (লীগ কাউন্সিলের সদস্য) ও মিঃ সুন্দর লাল এই সভায় এই আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস ও লীগ এই দুই সংগঠনের মিলনে আজকে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান হইবে ও স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে!

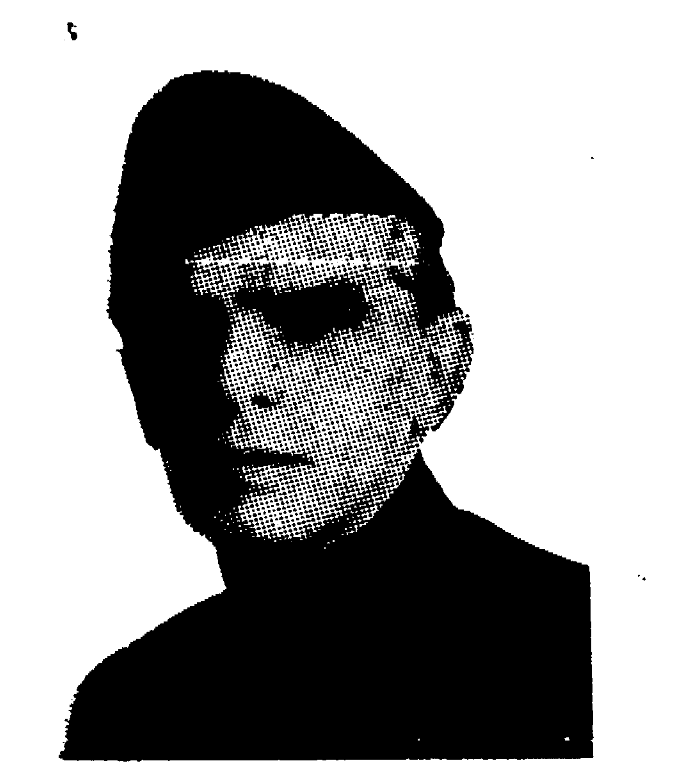

১৯শে আগষ্ট গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার

জানা গিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী ১৯শে আগষ্ট বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ওয়ার্দ্ধাগঞ্জ, ৯ই আগষ্ট—সেবাগ্রামে ৯ই আগষ্ট দিবস পালন উপলক্ষে অপরাহ্নে ৬০ মিনিট কাল সকলে মিলিয়া সূতা কাটা হয়। উহার উদ্বোধন করিতে গিয়া গান্ধিজী বলেন, **"অন্যান্য দিন হইতে আজকের দিন পৃথক। আজকের দিনে আপনারা প্রার্থনা করিবেন ভারতের স্বার্থে একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার বুদ্ধি দিয়া ভগবান যেন কায়েদে আজম ও আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। আপনারা সূতা কাটিতে কাটিতে ক্রমাগত এই প্রার্থনা করুন।"**

গত ৩০শে জুলাই লাহোরে লীগ অধিবেশনে কায়দে আজম জিন্না বলেন :—

'...আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন ও আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভগবানের কৃপা হইলে আমরা সম্মানজনক আপোষ রফায় উপনীত হইতেও পারি।'

বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাদের বিবৃতি

রাজাজীর প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন

কলিকাতা ১২ই আগষ্ট :—বাঙ্গলার কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা নিম্নলিখিত বিবৃতিটী দিয়াছেন :—গত ২।৩ দিন যাবৎ শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের নামে সংবাদ-পত্রাদিতে বিভিন্ন প্রকারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও আমাদের ধারণা এই যে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে বিতণ্ডামূলক কোনও বিষয় উত্থাপিত হইবে না, তথাপি উক্ত কারণে আমাদিগকে সংবাদপত্রে এই বিবৃতিটী প্রচার করিতে হইতেছে।

"কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমরা রাজাজীর প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কংগ্রেসসেবীগণ অথবা অধিকাংশ কংগ্রেসসেবী এই প্রস্তাবের বিরোধী বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, আমরা অসঙ্কোচে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর এখনো নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় এবং কংগ্রেসের বহুসংখ্যক সদস্য এখনো কারারুদ্ধ থাকায় কোনও কংগ্রেসসেবী দল কংগ্রেসের নামে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সন্তোষজনকভাবে সমাধান হউক এবং প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকার সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন :—

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, জে, এম দত্ত, মিহির চ্যাটার্জি, শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ, শচীন মিত্র, ডি এন মুখার্জি, এম এল এ সুকুমার দত্ত এম এল এ, রাধানাথ দাস এম এল এ, নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি, রতনমণি চাটার্জি, সাধন মিত্র, ননীগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চারুপ্রভা সেন, সৌরেন বসু, বীরেন গুহ, জিতেন সরকার, অধ্যাপক সুধীর লাহা, শক্তিপদ মল্লিক, প্রিয়রঞ্জন সেন, জ্যোতিষচন্দ্র রায় এবং অনাথনাথ বসু।

চট্টগ্রাম

গত ৬ই আগষ্ট হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি জনসভায় এক প্রস্তাবে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারকে অভিনন্দিত করিয়া কংগ্রেস লীগ মীমাংসার জন্য আশা প্রকাশ করা হয় এবং সকলকে, বিশেষ করিয়া, ছাত্রদের রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থনে আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ করা হয়। জেলা মুসলীম লীগের সম্পাদক মিঃ মোহাম্মদ ফজলুল কাদের চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

নোয়াখালী

গত ২৮শে জুলাই কংগ্রেস, মুসলিমলীগ, মুসলিম ছাত্র লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে চৌমোহানীতে এক জনসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পাঁচশতের উপর হিন্দু মুসলমান যোগ দেন।

ঢাকা

গত ৪ঠা আগষ্ট করোনেশন পার্কে প্রায় ৭০০ হিন্দু মুসলমানের এক জনসভায় অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টার সমর্থন করিয়া গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করা হয় এবং হিন্দুমহাসভার ঐক্য বিরোধী কার্য্যকলাপের নিন্দা করা হয়। অবিলম্বে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করিয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নেত্রকোণা

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ধরের নেতৃত্বে নেত্রকোণা কংগ্রেস কমিটির ২০জন সদস্য ৮ই আগষ্ট এক বৈঠকে সম্মিলিত হন। তাঁহারা কংগ্রেসের সংহতি রাখার জন্য সুদৃঢ় অভিমত ও গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য স্থাপন ও অচল অবস্থা নিরসনের জন্য গান্ধীজি যে প্রচেষ্টা চালাইতেছেন তাহাও সমর্থন করা হয়। ৯ই আগষ্ট ঐক্য দিবস উদযাপনের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা লীগ নেতা ও কর্ম্মীদের গৃহে গৃহে যাইয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং গান্ধী-জিন্না আলোচনার সাফল্যার্থে সমবেত প্রার্থনার জন্য তাঁহারা সম্মত হন।

দিনাজপুর

ঠাকুরগাঁ মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি, আটোয়ারী, ঠাকুরগাঁ ও রাণীশঙ্কাইল থানায় গত সপ্তাহে রাজাজীর ফরমুলাকে সমর্থন করিয়া ৮টী বড় সভা হইয়াছে। প্রত্যেক সভায় স্থানীয় লীগ ও কংগ্রেসপন্থী জোতদাররা উপস্থিত ছিল।

রংপুর

গত ৩১শে জুলাই, **রংপুর** পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে ৩০০০ লোকের একটি বিরাট জনসমাবেশে গান্ধীজির ঐক্য প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। প্রায় ১০০০ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক পতাকা ও নানাবিধ পোষ্টার সমেত দূর দূরান্তের গ্রাম হইতেও এই সমাবেশে যোগ দেয়। জেলার বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন সভার সভাপতিত্ব করেন। সভায় জেলার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সদর মহকুমা লীগের প্রেসিডেন্ট মৌঃ নাসিরুদ্দীন আহম্মদ এবং জেলা লীগের সম্পাদক মহম্মদ ওয়েইস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া

গত ২রা আগষ্ট **বগুড়া** জেলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কংগ্রেস-লীগ আপোষের দাবী জানাইয়া এক সভা হয়। সভায় ৪০০ ছাত্র ও নাগরিক যোগ দেন। সভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া এবং কংগ্রেস-লীগ মৈত্রীর জন্য আগ্রহ জানাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত।

১লা আগষ্ট বগুড়া কলেজে ২০০ ছাত্রের এক সভায় বিনাপ্রতিবাদে অনুরূপ প্রস্তাব পাশ হয়।

জলপাইগুড়ী

জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে গত ১০ই আগষ্ট একটি জনসভায় অচল অবস্থা সমাধানের জন্য অবিলম্বে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গান্ধীজী ও জিন্নাসাহেবের ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইয়া এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থা আছে ইহা ঘোষণা করিয়া আর একটি প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে।

পাবনা

জেলা কংগ্রেস, জেলা মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্রফেডারেশন, কিষাণ সভা ও মুসলিম ছাত্র-লীগ—এই সাতটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে **পাবনা সহরে** গত ৮ই আগষ্ট এক জনসভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ৮ই আগষ্ট শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ আপোষ সাধনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়।

যশোহর

গত ২রা আগষ্ট বুধবার যশোহর কলেজে ছাত্রদের এক সভা হয়। গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৪ পরগণা

২৪ পরগণায় মুসলিম ছাত্রলীগের সংগঠনকারী সৈয়দ মহম্মদ আলি একটি বিবৃতিতে বলেন যে, দুইটী মহান জাতির দুই নেতা আজ মিলনের পথে চলিয়াছেন। আমি ইহার সাফল্য কামনা করিতেছি। ইহাও আশ্বাস দিতেছি যে এই মিলন প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে বাংলার ছাত্রসমাজও যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

ডোমজুর (হাওড়া)

গত ৫ই আগষ্ট ডোমজুর বাজারে সন্ধ্যা ৮ টায় স্থানীয় প্রবীণ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মহাত্মা গান্ধী ও রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থনে এক বিরাট সমাবেশ হয়। সভায় রাজাজীর ও গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

বাঁকুড়া

গত ১লা আগষ্ট ছাত্রকর্মী অজিত সিংহের সভাপতিত্বে নিউ মেস প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ছাত্রদের এক সভা হয়। সভায় গান্ধীজী-রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঁকুড়া বিড়ি কারিগর ইউনিয়নের গত ৫ই আগষ্টের এক সাধারণ সভায় গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে।

নবদ্বীপ (নদীয়া)

গত ৩১শে জুলাই কংগ্রেসকর্ম্মী তিনকড়ি বাগচীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় রাজাজীর প্রস্তাব ও গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার ১৮ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী একটী যুক্ত বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে তাঁহারা গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিতেছেন এবং কংগ্রেস-লীগ মিলনের ভিত্তিতে অচল অবস্থা সমাধানের চেষ্টাকে সমর্থন করিতেছেন। স্বাক্ষরকারীর মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মহান্তি, জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নটেন্দ্র নাথ দাস, রঘুনাথ মাইতি (কাঁথি) সুধীকৃষ্ণ দাস (সদর), মহেন্দ্র নাথ মহান্তি (ঝাড়গ্রাম), ডাঃ যতীশ ঘোষ (ঘাটাল) প্রভৃতি আছেন।

দার্জ্জিলিং

দার্জ্জিলিং জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত শিউমঙ্গল শর্ম্মা দার্জ্জিলিং জেলার সকল কংগ্রেসসেবীকে গান্ধীজীর সমর্থনে আহ্বান করিয়াছেন।

চটকলের সংকট কি স্থায়ী হইবে!

মালিক নিজেদের মুনাফা ঠিক রাখিতে ব্যস্ত!

বেকার মজুররা কি করিবে?

চটকল শিল্পের সংকট যে স্থায়ী হইতে চলিল, তার লক্ষণ দেখা দিতেছে। ১০ই আগষ্টের 'ক্যাপিটালে' মন্তব্য করা হইয়াছে: "খুব কমপক্ষে বলিতে গেলে এখনও কয়েক মাস চটকল ও অন্যান্য কলে কয়লার অভাব থাকিয়াই যাইবে।"

কয়লার অভাবে চটকলের কাজ বন্ধ হইয়াছে, তা ছাড়াও সরকার মিলিটারীর কাজের জন্য যে সব চটকল হাতে লইয়াছে, তারও অধিকাংশ মজুর বেকার। 'ক্যাপিটালের' হিসাবে এইভাবে ২৬টি কারখানার কাজ বন্ধ হইয়াছে।

কয়লার অভাব দূর করিয়া চটকল সংকট ঘুচানো হউক, এতদিন চটকল মালিকরা এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। আজকে হাল ছাড়িয়া মালিকরা চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া এই অবস্থাতেও তাদের ব্যবসায় ও মুনাফা ঠিক রাখা যায়। তাই 'চটকল মালিক সংঘ' সরকারের কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে। ১০ই আগষ্টের 'ক্যাপিটালে' বলা হইয়াছে, "সরকার ও চটকল-মালিক-সংঘ উভয়েই একমত হইয়াছেন যে, চালু-মিল ও বন্ধ-মিল সব মিলেই যাহাতে উন্নত প্রণালীর কাজের ফললাভ করিতে পারে এবং মুনাফা করার ক্ষমতা যাতে সকলেরই হয় তারজন্য মালিক ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করা দরকার।" এই উদ্দেশ্যে একটী তহবিল গঠন করা হইতেছে। এই তহবিলে প্রত্যেক চালু মিল কাজের ঘণ্টার হিসাবে একটা নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিবে। যে সমস্ত মিল মিলিটারীর জন্য লওয়া হইয়াছে তার জন্য সরকার যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তারও একটা অংশ এই তহবিলে চাঁদা হিসাবে দিবে। এই ভাবে যে তহবিল হইবে তাহা দ্বারা বন্ধ মিলগুলিতে নিম্নলিখিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে:—মজুররা পাইবে সপ্তাহে ৪৷০ টাকা, মিল-মালিক হপ্তা রেশনের বাবদ যে টাকা খরচ করে তা এই তহবিল হইতে দেওয়া হইবে এবং কাজ বন্ধের জন্য মিলের মুনাফার যে ক্ষতি হইতেছে, তাও কিছু পূরণ করা হইবে।

মিল মালিকদের এই পরিকল্পনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, এখন তারা নিজেদের ব্যবসায় সামলাইতে ব্যস্ত। সরকারও যখন তাদের সঙ্গে 'একমত' হইয়াছেন, তখন এই সংকট যে স্থায়ী হইতে চলিল, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এই সংকটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে মজুররা। তাহাদের কি মিলমালিকের দয়ার দান ৪৷০ টাকা হপ্তা পাইয়াই দিন কাটাইতে হইবে? এ সম্বন্ধে মিল মালিক বা সরকার কেহই বিশেষ মাথা ঘামাইতেছেন না। কোন রকম একটা ব্যবস্থা করিয়াই তাঁরা খালাস। মজুর ও জনসাধারণ যদি এ বিষয়ে সজাগ না হয়, তাহা হইলে সরকারের উদাসীনতা কাটিবে না।

শহীদ স্মরণে

কমরেড রঞ্জিৎ গুহ

কমরেড রঞ্জিৎ গুহের অকাল মৃত্যুতে আমরা লাল পতাকা অবনমিত করছি। দীর্ঘকাল আগে বর্দ্ধমানে ছাত্র আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কমরেড রঞ্জিৎ পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির বে-আইনী অবস্থায় রঞ্জিতের উপর গৌরীপুর-নৈহাটী ইউনিয়ন গড়ে তুলবার দায়িত্ব পড়ে—তাঁরই সফল প্রচেষ্টায় এখানে পার্টির শক্ত ঘাঁটী তৈরী হয় এবং রঞ্জিতের নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠ শ্রমিকরা পার্টির ভিতর সমবেত হন।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কঠিন পরিশ্রমে রঞ্জিতের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তবুও কাজের আকর্ষণে সেই অবস্থাতেই তিনি আসানসোল শ্রমিকদের মধ্যে কাজে নেমে যান। সেইখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতার আনা হয়েছিল। তার পর-দিনই তিনি হাসপাতালে মারা যান।

ঢাকায় ১২ লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া

অথচ চিকিৎসার অব্যবস্থা, কুইনাইনের অভাব সর্ব্বত্র

বাংলাদেশে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ম্যালেরিয়া শুরু হয়। কিন্তু বিধ্বস্ত ঢাকাতে ইতি-মধ্যেই ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে,—সমগ্র জিলাতে ১২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। একমাত্র মুন্সিগঞ্জ মহকুমাতেই ৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় কর্ম্মশক্তিহীন।

সিদ্ধিরগঞ্জের গত বছরের ধ্বংসের কাহিনী আজ সারাদেশের লোক জানে। গত বছরের ধ্বংসের মধ্যেও সিদ্ধিরগঞ্জের ৫০০ অধিবাসী বাঁচিয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহার প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। অথচ কিছু-দিন হয় সেখানকার সরকারী ডাক্তারখানাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহেশ্বরদীতে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দৈনিক সেখানে ১০।১২ মাইল দূর হইতেও ৪০০।৫০০ রোগী আসে। কিন্তু কুইনাইনের অভাবে কাজ সেখানে অচল। সেখানে কুইনাইন প্রয়োজন মাসে কমপক্ষে ১৫ পাউণ্ড। সরকার আগে সেই কেন্দ্রে মাসে ৫ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন দিতেন। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ৫ পাউণ্ডকে কমাইয়া ৩ পাউণ্ড করা হইয়াছে।

মাধবদী হাসপাতালে প্রয়োজন ২০ পাউণ্ড কুইনাইন। সরকার সেখানে দেন ১০ পাউণ্ড। ফলে হাসপাতাল মাসে ১০।১২ দিন বন্ধ থাকে।

পশ্চিম-বিক্রমপুরে হাসপাতালে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে চিরতার জল দেওয়া রীতিতে দাঁড়াইয়াছে।

সরকারী চিকিৎসার এই অব্যবস্থায় হাস-পাতালগুলি রোগীদের কাছে বিভীষিকাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন রোগী সহজে হাসপাতালে যাইতে চায় না। ইহার উপরে বহু জায়গাতেই ডাক্তার, নার্স ও স্থানীয় হোমড়া-চোমড়ারা হাসপাতালের কর্ত্তৃত্বের জন্য দলাদলিতে ব্যস্ত, রোগীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাহাদের বিশেষ হইয়া উঠে না।

সরকারের এই হৃদয়হীন অব্যবস্থা রোগের ব্যাপকতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। গত বছরের দুর্ভিক্ষ-মহামারী বিধ্বস্ত ঢাকায় আবার নূতন ধ্বংসের সূচনা হইতেছে।

গ্রামাঞ্চলের জীবনীশক্তিহীন কৃষককুলের শতকরা ৭৫ জনই রোগাক্রান্ত। ক্ষেতের দিকে সামান্য নজর দিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

রহিমাবাদে প্রায় প্রত্যেকটি কৃষকই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। ক্ষেতের পাকা ধান কাটিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। এই অবস্থায় কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সুস্থ কৃষকগণ 'গাঁতাপ্রথায়' ফসল রক্ষার কাজে অগ্রণী হইল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তাহারাও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

গোয়ালীমান্দার কৃষকরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের ছেলেদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করে। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে স্কুলটি বন্ধ,—ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

আজ কুইনাইনের অভাবে ঘাটতি জিলা ঢাকার ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হইতেছে, কুইনাইনের অভাবে নিরক্ষর কৃষকসন্তান শিক্ষার সামান্য সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতেছে।

৩০০০ পাউণ্ডের জায়গায় ৪০০ পাউণ্ড কুইনাইনে কি হইবে?

সরকার পক্ষে এখন পর্য্যন্ত মহামারী প্রতিরোধকল্পে বিশেষ কোন উদ্যোগ নাই। সমস্ত জিলায় ৬০।৭০টি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে ১২,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়া আক্রান্ত সেখানে ৬০।৭০টি সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র শুধু মাত্র লোকদেখান ব্যবস্থা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। সমগ্র জিলার ১২ লক্ষ রুগ্ন অধিবাসীর জন্য প্রয়োজন ৩০০০ পাউণ্ড কুইনাইন, অথচ সেখানে আছে মাত্র ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ, ১২ লক্ষ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের জন্য সামান্য কুইনাইনেরও কোন ব্যবস্থা নাই।

সরকারের এই সামান্য রিলিফ ব্যবস্থাও বহু গলদপূর্ণ। সমস্ত জিলা ম্যালেরিয়ায় উৎসন্নে যাইতেছে অথচ জিলার একটী হাস-পাতালেও রোগীদের মশারীর ব্যবস্থা নাই।

মুন্সিগঞ্জ সহরের হাসপাতালে বেড্-প্রতি দুইজন রোগী রাখা হয়। প্রত্যেক রোগীকে রোগ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে একই পথ্য খাইতে হয়। ঔষধপত্রের অবস্থা আরও শোচনীয়। এমন কি 'গ্লুকোজ'-ইনজেকশনের মত একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধও পাওয়া যায় না।

বজ্রযোগিনী হাসপাতালে রোগীদের পথ্য পান্তাভাত। এই সুপথ্যটি খাইতে সবাই বাধ্য কারণ না খাইলে অনাহারে থাকিতে হয়।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

নারায়ণগঞ্জে চিকিৎসকদল

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের ৭০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৪০,০০০ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাহার উপরে টাইফয়েড ও কালাজ্বর নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে।

সোনারগাঁয়ের এই অবস্থায় স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি সম্মিলিত আন্দোলন সুরু করিল। আন্দো-লনের ফলে সরকার কিছু কুইনাইন দিলেন, কিন্তু অতি সামান্য। স্থানীয় কর্ম্মীদের আবেদনে বি, এম, আর, সি, সি একটি চিকিৎ-সক দল সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন।

এই চিকিৎসক দলের অভ্যর্থনা উপলক্ষে বিধ্বস্ত সোনারগাঁয়েও নূতন উৎসাহের সাড়া পড়িল। স্থানীয় কর্ম্মীদের উদ্যোগে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ভলাণ্টিয়ার দল গঠিত হইল।

গ্রামের এই ভলাণ্টিয়াররা ডাক্তারদের সঙ্গে একমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে এবং তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এক মাসে গ্রামে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৭০ জন হইতে কমিয়া ৫৫ জনে দাঁড়ায়।

কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারাই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে;—কাজ করিবে কে?

হিটলারের নূতন চাল

সোভিয়েট দৃষ্টিতে ইউরোপীয় যুদ্ধ পরিস্থিতি

[সোভিয়েট সংবাদপত্র 'ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাস' এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ]

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে সোভিয়েট-জার্ম্মান সীমান্তে লাঃ ফৌজের আক্রমণ যুদ্ধের সাধারণ অবস্থার বাস্তব পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনার দিক হইতে বিচার করিলে লালফৌজের বর্ত্তমান আক্রমণের কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ জার্ম্মানীর তীব্র প্রতিরোধ এবং সমর নায়কদের সীমান্ত সামলাইবার প্রাণপণ চেষ্টা স্বত্বেও লালফৌজ দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদেশী সমালোচকরা বলিতেছেন যে, লালফৌজের বিদ্যুৎগতি হিটলারের পোলাণ্ড ও ফ্রান্স জয়ের ব্লিৎস্‌ক্রিগ্‌ গতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের ইতিহাসে লালফৌজের এই অতুলনীয় বিক্রমের পিছনে রহিয়াছে ষ্টালিনের বিচক্ষণ রণকৌশল, যাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আজ আর কাহারো সন্দেহ নাই; আরো রহিয়াছে সোভিয়েটের পদস্থ সমরনেতাদের উপযুক্ত সেনাপতিত্ব, নিম্নপদস্থ নেতা ও সাধারণ ফৌজের বীরত্ব ও নিপুণতা। লালফৌজ আজ কেবল নিজদেশ শত্রুমুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নাই—আজ সে যে পরিমাণে শত্রুর লোক ও সম্পদ ক্ষয় করিতেছে তাহা আগে কখনো দেখা যায় নাই।

সোভিয়েট ফ্রণ্ট, জার্ম্মান বাহিনীর কবর

বাইলো-রাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার মাঠঘাট ও বনজঙ্গল আজ অনেকগুলি জার্ম্মানবাহিনীর কবরে পরিণত হইয়াছে। ২৫টী সেনাপতি সহ হাজার হাজার জার্ম্মান বন্দী হইয়াছে এবং যাহারা বন্দী হইতে চাহে নাই যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে—তাহাদের সংখ্যা বন্দীর সংখ্যা হইতে অনেক বেশী। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও জার্ম্মান সৈন্যেরা প্রায়ই মরীয়া অবস্থায় লড়াই চালাইয়া যায়। কিন্তু হিটলারের কড়া আদেশ অথবা জার্ম্মান সৈন্যের হিংস্র প্রতিরোধ—কোন কিছুই সোভিয়েট আক্রমণের প্রবল বন্যাকে রোধ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মান ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীকে নিজদেশ হইতে তাড়াইবার মহান কর্ত্তব্যে আজ লালফৌজ জার্ম্মান দেশের অত্যন্ত নিকটে পৌছিয়াছে। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে যুদ্ধ যেমন ডন নদীর তীরে চলিতেছিল বা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে যুদ্ধ যেমন মিয়াসে চলিতেছিল—এবারের গ্রীষ্মে তাহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ পশ্চিম ডিভ্‌না ও নীমেনের কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। হিটলার ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়াছিল।—আজ এই প্রথম ফ্যাশিষ্ট পশুর নিজ আস্তানায় সেই আগুন সোজাসুজি আগাইয়াছে। এই ঘটনার গুরুত্ব কোনরকমেই ছোট করিয়া দেখা চলেনা। বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ যে, সোভিয়েট ফৌজ যতই জার্ম্মানীর সীমান্তে অগ্রসর হইতেছে—ততই জার্ম্মানরা প্রাণপণে পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় আত্মরক্ষাব্যূহ তৈয়ারী করিতেছে। হিটলারের জার্ম্মানী একদিন সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের তাণ্ডব সুরু করিয়া দিয়াছিল, আজ হিটলারের নিজ দেশেই সেই তাণ্ডব সুরু হইবার আর বেশী দেরী নাই।

পশ্চিমে ইংরাজ ও আমেরিকার আঘাত

তৃতীয়তঃ, লালফৌজের এই আক্রমণের সমসাময়িক কালেই—বৃটিশ ও আমেরিকার মিত্রফৌজ উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ করিয়াছে; যুদ্ধের ইতিহাসে ইহারও তুলনা নাই। এই অবতরণের পর ইউরোপ মহাদেশে ইহারা বেশ ভাল ভাবেই ঘাঁটি দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন শেরবুর্গ ও কায়েঁ মিত্রশক্তির অধিকারে আসার পর পশ্চিম ইউরোপে হিটলারের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাহাদের দ্রুত কর্ম্মতৎপর হওয়ার সকল রকম সুবিধা-জনক অবস্থাই বর্ত্তমান। দক্ষিণে ইতালী হইতে মিত্রশক্তি দৃঢ় ভাবে জার্ম্মান বাহিনীকে হটাইয়া দিতেছে। তেহেরাণ সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছিল যে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে অবিরত ও প্রবলতর আঘাত আমাদের সাধারণ শত্রুর উপর হানিতে হইবে—বর্ত্তমানে আমাদের মিত্রশক্তি সেই সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করিতে সুরু করিয়াছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে আক্রমণ চলিতে থাকিলে জার্ম্মাণ সমরনেতারা পূর্ব্ব সীমান্তের ভগ্নব্যূহ জোড়া দিবার জন্য সহজে ফৌজ আনাইতে পারিবে না এবং একথা বলাই বাহুল্য যে লালফৌজের প্রবল আঘাতের সামনে হিটলার পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে পশ্চিম বা দক্ষিণে সৈন্য সরাইবার কল্পনাও করিতে পারে না।

যুদ্ধের এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের এই উক্তি যথার্থ যে যুদ্ধ আজ নূতন পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। শত্রুকে আজ এক অতল গহ্বরের সামনে টানিয়া আনা হইয়াছে; এখন কেবল তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিলেই হয়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে যুদ্ধের শেষ অবস্থায় ফ্যাশিষ্ট পশু নিজ বিবরে আসিতে বাধ্য হইয়া হিংস্রতর ভাবেই প্রতিরোধ করিবে। নাৎসী বদমায়েসরা জানে যে কোনরূপ ক্ষমা তাহাদের মিলিবে না। নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাহারা আরো লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে নিজেদের সঙ্গে কবরে টানিতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘযুদ্ধে যে সব দুর্ব্বিপাক ও ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া থাকে, যত লোক কমপক্ষে মরে, তাহার বেশী যেন আর না ক্ষয় হয়—তাহা দেখিতে হইলে মাত্র একটী উপায় আছে। এই উপায় সকলেই জানে; ইহা হইল যুদ্ধকে সংক্ষেপ করা, শত্রু যাহাতে অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় তাহার জন্য সমস্ত সময়োচিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা।

সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই

অবস্থা সুস্থির চিত্তে বিচার করিয়া সোভিয়েট জনগণ বুঝিতেছে যে হিটলারী জার্ম্মানীর পরাজয়ের দিন পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে; কিন্তু এই জয় লাভ করিতে হইলে মিত্রশক্তির প্রধান বাহিনীর দ্বারা শত্রুকে তীব্র ও সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে হইবে।

হিটলারের প্রধান বাহিনী গত তিন বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সীমান্তে আটকাইয়া ছিল; লালফৌজ ইহাকেই আঘাত করিয়া যুদ্ধ যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় এবং শত্রু দ্রুত পরাজিত হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম হইতে হিটলারের বাহিনীর উপর কি ভাবে আঘাত আসিবে তাহারই উপর যুদ্ধের গতি অনেকখানি নির্ভর করিবে।

লণ্ডন টাইমস্ কাগজের সামরিক সংবাদদাতা সিরিল ফলস্ সম্প্রতি রয়েল এম্পায়ার সোসাইটির এক সভায় বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া যখন বলিলেন যে **পশ্চিম যুদ্ধ সীমান্ত বলিয়া উল্লেখ করিবার মত** এখনো কিছু কারণ ঘটে নাই তখন তাঁহার মতে সায় না দিয়া পারা যায় না। তিনি বলেন যে, যখন আমাদের পশ্চিম সীমান্তে নিঃসংকোচে বলিবার মত যুদ্ধ ফ্রণ্ট হইবে···তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে জয়ের সোজা রাস্তা আমাদের সামনে উপস্থিত।

দুই ফ্রণ্টের সাঁড়াশী কলে পড়িলে জার্ম্মানীরা নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল টেঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। পূর্ব্বে আজ যেমন আঘাত পড়িতেছে, তেমনি আঘাত তাহাদের পশ্চিমে পড়িলে জার্ম্মাণরা শীঘ্রই পরাজিত হইবে। হিটলারীদের গর্ব্ব ছিল যে তাহারা কখনো মিত্রবাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপে অবতরণ করিতে দিবে না। কিন্তু উত্তর ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর চমকপ্রদ অবতরণ আজ হিটলারীদের সে মিথ্যা গর্ব্বের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে। সকলের কাছেই এ কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, আজ আর জার্ম্মাণরা মিত্রবাহিনীকে ফরাসীতে নামিয়া ঘাঁটি গাড়িতে বাধা দিতে পারে না। এবং এ কথা আরো প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে লালফৌজের আজিকার এই প্রবল আক্রমণের ফলে আমাদের বৃটেন ও আমেরিকার মিত্রবাহিনীকর্ত্তৃক পশ্চিম ইউরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বাধা দিবার ক্ষমতাও হিটলারের নাই।

হিটলারের উদ্দেশ্য যুদ্ধকে দীর্ঘ করা

নাৎসী দুঃসাহসিকেরা এখনো বলিয়া থাকে যে তাহারা পশ্চিমেই যাহা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লইবে—কিন্তু এই মূর্খ বাচালতা কেবল অজ্ঞ লোকেদেরই প্রতারিত করিতে পারে—অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে মিত্রদেশগুলি বা নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় অফিসে এখনো এমন লোক আছে যাহারা জার্ম্মাণরা "পশ্চিমের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করিতে পারে কি না—" ইহা লইয়া গবেষণা করে।

আসল কথা হইতেছে এই যে নাৎসীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল কি করিয়া নিজের গায়ে কোনরকম আঁচড় না খাইয়া পার পাওয়া যায়। সমস্যার মিটমাট নয়, আজ তাহারা উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এবং এইজন্য তাহারা যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার চিরাচরিত পথই অবলম্বন করিয়াছে।

শত্রুর দেশ হইতে যত রকম সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—তাহা হইতে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। সুইডেনের লেখক ভেনগোল্ড বহুদিন পরে সম্প্রতি জার্ম্মাণী হইতে ফিরিয়াছেন,—ইনি একজন বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষক। ইনি বলিয়াছেন যে জার্ম্মন সমরনেতারা বিজয়ের সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়াছে। হিটলারীদের বর্ত্তমানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "জার্ম্মানরা তাহাদের সমস্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা পাল্টাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল না হারিয়া সমানে সমানে যুদ্ধ শেষ করা। সেইজন্য তাহারা যতদিন সম্ভব যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়; এমন কি পশ্চিম ইউরোপের অধিকৃত দেশগুলিকে কবলে রাখিবার ইচ্ছাও জার্ম্মান সমর নেতাদের নাই; কিন্তু তাহারা যথাসম্ভব ধীরে ধীরে সরিয়া আসিতে চায়। জার্ম্মান সমর নেতারা ভাবিতেছে যে আরো কয়েক বৎসর যদি তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে সকলেই যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং যুদ্ধ সমানে সমানে শেষ হইবে।"

হিটলারী দেউলিয়াদের ইহাই হইল জঘন্য পরিকল্পনা। তাহারা এখনো আশা করিতেছে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তার জন্য মিত্রপক্ষ শত্রুকে দ্রুত পরাজিত করিতে অগ্রসর হইবে না। তাহারা তাই রণক্লান্তির উপর ভরসা করিয়া আছে—কেননা দীর্ঘকাল যুদ্ধের ক্লান্তির ফলে তাহারা হয়তো মিত্রশক্তির হাতে যথোপযুক্ত শাস্তি হইতে অব্যাহতি এবং নূতন দস্যুতামূলক যুদ্ধের জন্য সময় পাইতে পারে। এই পরিকল্পনাকে চিরকালের মত ফাঁসাইয়া দিতে হইবে। মিত্রশক্তির প্রধান বাহিনীকে দ্রুত যুদ্ধে লাগাইয়া যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করা এবং শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া এই পরিকল্পনাকে বানচাল করিতে হইবে।

—টাসের সৌজন্যে—

● ফ্রান্সে হিটলারীদের বিপদ ●

কমরেড ষ্টালিন দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আসল দ্বিতীয় ফ্রণ্ট পশ্চিম ইউরোপে খুলিলে কমপক্ষে ৬০টী জার্ম্মান ডিভিশন ও হিটলারের তাঁবেদারী দেশগুলির ২০টী ডিভিশনকে সেখানে মিত্রসেনার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এখন উত্তর ফ্রান্সে এরূপ প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু মিত্রসেনার গতিবেগ বেশ বাড়িয়াছে।

তাই উত্তর আফ্রিকা হইতে অস্থায়ী ফরাসী সরকার বেতারে জানাইয়াছে যে, যেখানে এখন যুদ্ধ চলিতেছে তাহার দক্ষিণে আঁরোটা জেলায় যেন অবিলম্বে ফরাসী দেশভক্তেরা জার্ম্মান শত্রুর নিপাত ঘটাইবার কাজে নামিয়া পড়ে। জেনারল মোণ্টগোমারীর এক বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, লক্ষাধিক শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে, বহুশত গ্রাম ও শহর শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সে অনেক জার্ম্মান সৈন্য ঘেরাও হওয়ার উপক্রম হইতেছে।

ব্রেস্ত ও লেরিয়েণ্ট বন্দর এখনও শত্রুর হাতছাড়া হয় নাই। জাহাজে চড়িয়া পলায়নের পথ তাই শত্রুর একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু এখানে শত্রুকে আর বেশীদিন টিঁকিতে হইবে না। মিত্রসেনা লোয়ার নদী পার হইয়াছে, আঁজের ও নাত্ত্‌ শহর দখল করিয়াছে। আমেরিকান সেনা লেমাঁ দখল করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শার্ত্র্‌ শহরের দিকে চলিয়াছে, এখান হইতে রাজধানী প্যারিসের দূরত্ব একশত মাইলেরও কম। উত্তর ব্রিটানিতে সাঁ্যমালো বন্দর মিত্রশক্তির হাতে; এ অঞ্চলে একমাত্র দিনার শত্রুর দখলে। উত্তর নর্ম্মাণ্ডিতে কায়াঁর দক্ষিণ হইতে ব্রিটিশ বাহিনী প্যারিসের দিকে আগাইতেছে। শত্রু বিনাযুদ্ধে জমি ছাড়িয়া দেয় নাই বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। ভির্‌ অঞ্চলে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ভীষণ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত মিত্রসেনা কয়েকবার হাত বদলাইবার পর মর্ত্ত্যাঁ ও তাহার দক্ষিণে সুরদেভাল দখল করিয়াছে। আলাঁসঁ বলিয়া যে স্থানেযুদ্ধ চলিতেছে, সেখানে জয়লাভের পর মিত্রপক্ষের সাঁড়াশী আক্রমণ শার্ত্র্‌ হইয়া প্যারিসে পৌছিবার চেষ্টা হইবে। উত্তরে শত্রুসেনাকে ছিন্নভিন্ন করা ও পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করাই হইল এখন মিত্রসেনার উদ্দেশ্য।

Regd. No. C. 2836

সর্ব্বত্রই লালফৌজের বিজয়ী অভিযান

বালটিক অঞ্চলে ৩০ ডিভিশন নাৎসী ফৌজ পরিবেষ্টিত

১৩ই আগষ্ট যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় মার্সাল রকোসভস্কীর সেনাদল সিডলিসের উত্তরে বুগ নদী অতিক্রম করিয়া জেনারেল জাখারভের দক্ষিণ বাহুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল ব্যাপী ফ্রন্টে ইহাদের মিলিতশক্তি জার্ম্মানীর এই দিককার রক্ষা ব্যূহ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার উত্তর দিক দিয়া জেনারেল বাগ্রামিয়ান ও জেনারেল চের্নিয়াখোভস্কি ও দক্ষিণ দিক দিয়া জেনারেল জাখারভ ও মার্সাল রকোসভস্কীর সেনাদল আজ হিটলারের পূর্ব্ব প্রুশিয়া ধরিয়া রাখার ইচ্ছাকে গুড়াইয়া দিতে উদ্যত। জার্মান সামরিক সংবাদদাতা কর্ণেল ফন ওলবার্গ এই ঘোর বিপদ অনুমান করিয়া দারুণ ত্রাসে বলিয়া ফেলিয়াছে—আমাদের অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়িতেছে।

ওয়ারশ দখলের জন্য নূতন আক্রমণ

সর্ব্বশেষ সোভিয়েট সংবাদে জানা যায়—শত্রুপক্ষ তাহাদের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ব্যূহে থাকিয়া প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে। বিশেষ করিয়া বড় বড় সড়কের জন্য প্রবল যুদ্ধ হইতেছে। প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া লালফৌজ সকোলবাদনিয়াস্কি দখল করিয়াছে। হিটলার ওয়ারশ-র মুক্তিকে যতদিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে সেই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু লালফৌজের বর্ত্তমান আক্রমণোদ্যোগ ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্য তাহার এ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। দিনের পর দিন একটির পর একটি নূতন বিপদ আসিয়া হিটলারকে নাস্তনাবুদ করিতেছে। লালফৌজ যখন এই জীবন মরণ লড়াইয়ে ব্যাপৃত তখনও কিন্তু লণ্ডনের 'পলাতক পোলিশ সরকার' তাহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইতে একটুও ইতস্তত করিতেছে না। তাহারা তাহাদের রেডিও মারফৎ প্রচার করিতেছে যে ওয়ারশতে যে বিদ্রোহ সুরু হইয়াছে, তাহার সহিত সোভিয়েট বাহিনীর যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা সোভিয়েটের কাছ হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইতেছে না। সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'টাস' ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছে যে লণ্ডনস্থিত একদল প্রবাসী পোলিশ অধিবাসীরাই এই

রিগা দখলে উদ্যত

জেনারল এরমেঙ্কো

বিদ্রোহের মূলে অথচ তাহাদের এতটুকু চেষ্টা নাই যে সোভিয়েটের সহিত এক হইয়া এই অভিযান চালনা করে। 'টাসে'র এই খবর 'পলাতক পোলিশ সরকারে'র মুখোস আর একবার খুলিয়া দিল। পোলিশ জনসাধারণের প্রতিনিধি পোল জাতীয় মুক্তি কমিটির সহযোগে সোভিয়েটের অপরাজেয় বাহিনী আজ যে নাৎসীবিরোধী লড়াই চালাইতেছে ও স্বাধীন পোলাণ্ডের ভিত রচনায় আপনাদের রক্ত ঢালিয়া যে আদর্শের আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছে, কুৎসাকারী দেশদ্রোহী কাপুরুষ ফ্যাসিষ্ট তাঁবেদারদের জঘন্য ষড়যন্ত্র আজ সেই আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে।

লালফৌজ দক্ষিণ জার্ম্মানীর ৮০ মাইলের মধ্যে

মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যেরা সাইলেসিয়ার ৮০ মাইলেরও কম দূরে রহিয়াছে। সাল্‌ডোমায়ার্স অঞ্চলে শিশ্চূলা ব্যূহের ফাটলের মধ্য দিয়া সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও কামানবহর বিপুল বেগে অগ্রসর হইতেছে। আরও দক্ষিণে কার্পেথিয়ান রণাঙ্গনে লালফৌজের সহিত হাঙ্গেরীয়ান বাহিনীর তুমুল লড়াই সুরু হইয়াছে

মার্শাল ষ্টালিন ৮ই আগষ্টের একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন পোলাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র বোরিশ্লাভ অধিকৃত হইয়াছে। ইহা চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরে।

মার্শাল কনিয়েভের উদ্দেশে প্রেরিত মার্শাল ষ্টালিনের অপর আর এক ঘোষণায় প্রকাশ, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র ও শিল্পপ্রধান সহর সাম্বর অধিকৃত হইয়াছে।

গত রাত্রে সম্বর অধিকার হওয়ার পর মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিকে আরও ১৮ মাইল অগ্রসর হইয়া দবরো মিল দখল করিয়াছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজের আক্রমণের গুরুত্ব

প্লোবের সমর সংবাদদাতার মতে হিটলারীরা যদিও পূর্ব্ব-প্রুশিয়া অভিমুখে লালফৌজের অভিযানকেই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, তথাপি রুশ সীমান্তের অতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সংবাদ লভোভের ঠিক দক্ষিণ দিকের অঞ্চল হইতে আসিতেছে।

জার্ম্মানদের উত্তর রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর মধ্যকার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া লভোভ দখল লালফৌজের রণনৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লভোভের ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী ও হাঙ্গারীয়ান-চেকোশ্লোভাক-সোভিয়েট সীমান্তের মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত সাম্বর অধিকারে হিটলারের কবলিত তাঁবেদার

পূর্ব্ব প্রুশিয়ার দক্ষিণ দ্বারে

মার্শাল রকোসভস্কি

হাঙ্গারী ও রুমানিয়াকে বিপন্ন করিবার জন্য ব্যাপক অভিযানের উদ্যোগ পর্ব্ব সূচিত হইতেছে।

কার্পেথিয়ান গিরিবর্ত্ম রক্ষা করার পক্ষে সম্বর হইল বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি। ইহার দখল লালফৌজের আক্রমণকে আরও ব্যাপক করিয়া দেওয়ার সুযোগ করিয়া দিল।

দক্ষিণ জার্ম্মানী অভিমুখে

মার্শাল কনিয়েভ

"বার্লিনের দিকে আগাইয়া চলো"

'সোভিয়েট ওয়ার নিউজে' উপরোক্ত শিরোনামার একটি প্রবন্ধে বিখ্যাত সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গ একস্থানে লিখিয়াছেন—আমরা জানি নাৎসীদের কাছে ভাল কথার কোন দাম নাই; তাই ঘোষণাপত্র নয়, গুলিগোলাই আমাদের হাতিয়ার। নাৎসী জার্ম্মানী আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাই আজ আমাদের পায়ে অসহ্য বিদ্যুৎগতি।

আমরা তাদের সংহার চাই। কারণ আমরা চাই নিরুপদ্রব জীবন। ইহাই আজ আমাদের অভিযানের সত্যকার অর্থ ও প্রেরণা। এবারকার লড়াই যুদ্ধের চতুর্থবারের গ্রীষ্মকালীন লড়াই। পঞ্চমবারের গ্রীষ্মকালীন লড়াইয়ে যেন আর যাইতে না হয়। আমরা অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখের দিকে ধাইয়া চলিয়াছি—খাস জার্ম্মানীর সীমান্ত আমাদের মুঠায়। আমাদের অগ্রগমনের দ্রুত পদক্ষেপ নূতন যুগেরই সূচনা আনিয়া দিবে।

আজ এই লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যুদ্ধরত সোভিয়েটের মনের কথা। নাৎসীবাদকে ক্ষমা নয়, ক্ষমা করা যাইতে পারে না। নাৎসীবাদের ধ্বংসস্তূপের উপরই পৃথিবীর নূতন বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে হইবে—যতদিন ইহা না হয়, লড়াই ততদিন চলিবে, দরকার হয় বার্লিনের বুকের উপরই, না হয় তারও দূরে হিটলারী দানবের কবর রচিত হইবে।

লালফৌজ এই লক্ষ্য নিয়াই চলিয়াছে

বাল্টিক অঞ্চলে যে ৩০-৩৫ ডিভিশন জার্ম্মানসেনা পরিবেষ্টিত হইয়াছে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য করিয়া তুলিতে লালফৌজ কঠিন আঘাত হানিতেছে। ইহার জন্য সোভিয়েট বাহিনীর প্রথম লক্ষ্য হইতেছে ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার মধ্যে নাৎসী বাহিনীর সংযোগ ছিন্ন করিয়া দেওয়া। এই এলাকায় জার্ম্মান বাহিনীর সুদৃঢ় ঘাঁটি ভালকা আজ জেনারেল মাসলেনিকভের নাগালের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহার সেনাবাহিনী এই বিখ্যাত রেল জংশনের মাত্র ৪৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। আরও নীচে জেনারেল এরমেঙ্কোর বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে রিগার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

ইহার দক্ষিণে জেনারেল বাগ্রামিয়ান লিবাউয়ে অবস্থিত নাৎসী বাহিনীকে নির্ম্মূল করার জন্য জোর সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন। এই অঞ্চলের নাৎসীবাহিনীর সহিত পূর্ব্ব প্রুশিয়ার জার্ম্মানদের সাথে যোগাযোগ আছে। তাই জেনারেল বাগ্রামিয়ানের চেষ্টা পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সাথে ইহাদের বিচ্ছিন্ন করা।

পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় লড়াই

১০ই আগষ্ট রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় ব্যাপক অভিযানের জন্য লালফৌজের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জেনারেল চের্নিয়াখোভস্কী কাউনাসের আশে পাশে শত্রুসৈন্য নির্ম্মূল করার কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে এবং জার্ম্মান সীমান্তের মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁহার প্রধান বাহিনী সন্নিবেশ করিতেছেন।

'রেডষ্টার' পত্রিকায় ইলিয়া এরেনবুর্গ লিখিয়াছেন, লালফৌজ শীঘ্রই টিলসিটে ও কোনিসবার্গে পৌছিবে।

দিকে দিকে জাপানীরা নাজেহাল

জাপানী ফ্যাশিষ্টরা যে ক্রমেই যুদ্ধে নাজেহাল হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে বার্ম্মা রণক্ষেত্রে ২৭০০০ জাপানী মরিয়াছে, অন্ততঃ ২৪০০০ জখম হইয়াছে। বিমানহানার ফলে যাহারা হতাহত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এই হিসাবে নাই।

উত্তর বার্ম্মাতে সারা মিচিনা এলাকা এখন মিত্রশক্তির হাতে। চীনারা ইহার পূর্ব্বে ইরাবতী নদীতীরে ওয়েংমে বলিয়া স্থানটী কাড়িয়া লইয়াছে। মোগঙের দক্ষিণে টাউংনি মিত্রশক্তি দখল করিয়াছে, এবং আরও কয়েকটী গ্রাম লওয়ার ফলে পনরো মাইল রেলরাস্তা এখন মিত্রপক্ষের হাতে। ভামোর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ সহজ করবার জন্য আমেরিকান বিমানবাহিনী অবিশ্রাম বোমা ফেলিয়া শত্রুর ঘাটি ভাঙিতেছে।

মণিপুর যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর শত্রুকে তাড়া করা হইতেছে। টিডিম সড়ক দিয়া মিত্রসেনা ইম্ফলের ৫০।৬০ মাইল দক্ষিণে পোঁছিয়া গিয়াছে। দশ দিন হইল টামু গ্রামটী মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। কাব উপত্যকা ও চিন্দউইন নদী অঞ্চলে পলায়মান শত্রুকে মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। আরাকান অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য খবর নাই।

চীনে সাহায্য পাঠাইতে হইবে

উত্তর বার্ম্মাতে মিত্রশক্তির জয়লাভের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। চীনকে সাহায্য করিতে হইলে অবিলম্বে ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা খুলিতেই হইবে। আজ বিশেষ করিয়া চীনকে সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। কারণ দক্ষিণ চীনে হ্যাঙ্কাও-ক্যান্টন রেলপথের উপর গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন ও রাস্তার কেন্দ্র হেংইয়াং জাপানীরা দখল করিয়াছে। জাপানীরা এখানে প্রাণপণে লড়িয়াছিল; ২০০০০ চীনা সৈন্য অবরুদ্ধ অবস্থায় অটল বিক্রমে লড়ার ফলে প্রায় ৫০,০০০ জাপানী প্রাণ হারাইলেও শত্রু হেংইয়াং দখল করিতে পারিয়াছে। চীনকে আজ পর্য্যাপ্ত সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে।

আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে ফ্যাশিষ্ট জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটাইতেই হইবে। এ কাজের জন্য আমেরিকা যে প্রস্তুত, এবং চীন বা এশিয়ার অন্য কোথাও আমেরিকা যে নিজের রাজ্য বিস্তার করিতে চায় না, তাহা তিনি বলিয়াছেন। যুদ্ধে জাপানের চরম পরাজয় ঘটাইতে আমেরিকানরা কিছুকাল চেষ্টার ক্রটী করে নাই।

জাপান আক্রমণ অসম্ভব নয়

নিউগিনি হইতে জাপানীদের হয়তো পাত্তাড়ি গুটাইতে হইবে। গুয়াম দ্বীপ সম্পূর্ণ আমেরিকানদের হাতে আসিয়াছে। ফিলিপাইন্সের উপর আমেরিকানরা বোমা ফেলিয়াছে; জাপানীরা বলে যে, শীঘ্রই সেখানে তাহারা আক্রমণ করিবে। সুমাত্রা ও জাপানী দখলের অন্যান্য বহু স্থানে বোমা ফেলা হইয়াছে। এমনকি খাস জাপানে নাগাসাকি বন্দরের উপর আমেরিকান বিমানবাহিনী হানা দিয়াছে।

জাপ প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলিয়াছে যে মিত্রপক্ষের জাপান আক্রমণ অসম্ভব নয়। রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে, দশ লক্ষাধিক আমেরিকান প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে রহিয়াছে। ইয়োরোপে বা প্রাচ্য মহাদেশে যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, সে বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে গররাজী হইয়াছেন। শত্রু দুর্ব্বল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ একেবারেই নাই। কিন্তু যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ফ্যাশিষ্টদের নিপাত ঘটাইতেই হইবে। চীনে যথেষ্ট সাহায্য পাঠাইলে; ভারতে রাজনৈতিক অচল অবস্থায় সমাধান করিলে, নূতন অনুপ্রেরণায় যুদ্ধ চলিবে, ফ্যাশিষ্ট শত্রু ধ্বংস হইবে।

ক্রটী স্বীকার

গত সংখ্যার জনযুদ্ধে ২য় পৃষ্ঠার প্রবন্ধের ২ কলমে একস্থানে "এ-পির গুপ্তচরদের কাছে সংবাদ পাইয়া..." এরূপ একটী মন্তব্য ভুলবশতঃ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আমরা ক্রটী স্বীকার করিতেছি।

জনযুদ্ধ সম্পাদক

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯ বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা] ২৩শে আগষ্ট, বুধবার, '৪৪, ৭ই ভাদ্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

লর্ড ওয়াভেলের উত্তরে
কংগ্রেস ও লীগের অভিযান
কলিকাতায় ১৫০০০ লোকের সমাবেশ

ওয়াভেল গান্ধীজীর শেষ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কংগ্রেসলীগ ঐক্য হইলেই কি আর সে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দিবে? লীগ কি কখনও স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে? গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেব একত্রভাবে ভারত তথা বাংলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে চাহিতেছেন ইহা কি আমাদের দেশের পক্ষে পরম অকল্যাণকর নয়? এই সমস্ত সন্দেহে যখন বাঙ্গালীর মন ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় কলিকাতায় এই অপূর্ব্ব জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৯শে আগষ্ট বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধী-জিন্না আপোষের সমর্থন উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন সার নাজিমুদ্দিন, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী মৌলবী আবুল হাশেম প্রভৃতি লীগ নেতৃবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত, সীতারাম শাকসেরিয়া প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত আনন্দীলাল পোদ্দার। কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদের সমবেত আহ্বানে এমন জনসভা কলিকাতায় গত ২০ বছরের মধ্যে কখনও হয় নাই। সারাদিন মেঘবৃষ্টি সত্ত্বেও ১৫০০০ নরনারী এই সভায় সমবেত হইয়া ওয়াভেলের প্রত্যাখ্যান এবং সন্দেহবাদীদের আশঙ্কার সমুচিত উত্তর দিয়াছে। এ ছবি বঙ্গভঙ্গের ছবি নয়, বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে ঐক্যের অপূর্ব্ব নবজাগরণের ছবি। কংগ্রেস পতাকা, লীগ পতাকা এবং রক্তপতাকা লইয়া দলে দলে মিছিল আসিয়া যখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন বক্তৃতামঞ্চের দিকে তাকাইয়া দেখি কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। পার্কের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক বাড়ীর ছাদে স্থানীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাগণ সমবেত হইয়া তখন অপূর্ব্ব ঐক্য সমাবেশের এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতেছেন। বাঙ্গালীর সন্দেহ দোলায়িত মন তখন আশায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

সভার আরম্ভেই শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত বলেন—"গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে বড়লাট আমাদের জাতীয় দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আজ এই প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিবার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হইতে হইবে।" শ্রীযুত জে, সি, গুপ্তের পরই উঠেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌলবী আবুল হাশেম। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উক্তি হইল—"লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণার ফলে সমগ্রদেশে এক গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয়দের আশা গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই ঐক্যের জোরেই আমরা ইংরেজের অনিচ্ছুক হাত হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া আনিব।" সমবেত জনতা তখন হর্ষধ্বনি দ্বারা এই উক্তির প্রতি অভিনন্দন জানায়। কংগ্রেস নেতা এবং লীগ নেতার মুখে এই একই ভাষা, একই ভাবের অভিব্যক্তি প্রত্যেক শ্রোতার মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন সম্ভাবনা জাগাইয়া তোলে।

বড় বাজারের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বসন্ত লাল মুরারকা বলেন—"গান্ধীজী মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়া স্বাধীনতার জন্য ঐক্য গঠন করিতেছেন। আমাদের মুসলমান ভাইরা যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় তবে আমরা অহিংসাবাদী হিসাবে তাহাদের সে ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে পারি না। ভাইয়ের বাঞ্ছিত দাবী পূরণ করিয়া আমরা একতাবদ্ধ হইব, একতাই জাতির শক্তি বাড়াইবে।" এই উক্তির উত্তর দেন লীগনেতা হবিবুল্লা বাহার। তিনি বলেন—"হিন্দুরা ভারত ব্যবচ্ছেদ এবং বঙ্গভঙ্গের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। ভারত ব্যবচ্ছেদ হইবে কিনা তাহা তাঁহাদের উপরই নির্ভর করে। মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী যদি তাঁহারা মানিয়া নেন, তাহা হইলে এমন দিন আসিবে যখন ভারতের দশ কোটি মুসলমান বলিবে—'আমরা কোন্ দুঃখে পৃথক হইয়া যাইব?' তখন সোভিয়েট রুষিয়া যেভাবে অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আমরাও সেইভাবে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করিব।" কোথায় রহিল শ্যামাপ্রসাদ বাবুর প্রচারিত ভয় আর কিরণবাবুর সন্দেহ! আজ এই সভায় কংগ্রেসনেতা এবং লীগনেতা একে অপরকে আশ্বস্ত করিতেছেন, একে অপরের বিরুদ্ধে দাবী না তুলিয়া একে অপরের দাবী মানিয়া লইতেছেন! কংগ্রেসনেতা বলিতেছেন পাকিস্তানের কথা আর লীগনেতা বলিতেছেন অখণ্ড হিন্দুস্তানের কথা।

কলিকাতার লীগ সেক্রেটারী মহম্মদ ওসমান বলিলেন—"মুসলমান কি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে পিছু হটে? হিন্দুর সাথে লড়াই করিয়া আমরা রক্ত দিয়াছি, এখন হইতে হিন্দুর সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতার জন্য রক্তদান করিব।" মনে মনে ভাবিলাম ইহার পরও কি সন্দেহবাদীরা বলিবে যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য হইলেই বা স্বাধীনতা আসিবে, কেমন করিয়া? ওয়াভেলের কি সাধ্য আছে এই সমবেত শক্তির দাবী প্রত্যাখ্যান করে?

গান্ধী-জিন্না আপোষ যে জাতীয় পরাজয় নয়, সেই কথা ঘোষণা করিয়া কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি বলেন—"দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ যে জনজাগরণ, সেই জনজাগরণই আজ ভারতের সর্ব্বসাধারণের মনে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যের আকুল আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে, জনগণের উদ্বেলিত আবেগের বন্যাই আজ গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবকে ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের জয় অনিবার্য্য।"

সভায় বিপুল উৎসাহের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার সারমর্ম্ম এই একটি কথায় প্রকাশিত হইয়াছে—মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে গান্ধীজিন্নার এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়া ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য গড়িয়া উঠুক এবং আসল জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হই, ইহাই প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কাম্য।"

সভার শেষে লীগনেতা মৌলবী আবুল হাশেম সভাপতি শ্রীযুত আনন্দীলাল পোদ্দারকে লীগের পক্ষ হইতে মাল্যদান করেন। বাংলার

(অবশিষ্টাংশ ৮ম পৃঃ দেখুন)

সম্পাদকীয়
খাদ্যের জন্য ঐক্য

গান্ধীজি বড়লাটের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এখনি বে-সামরিক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক। লর্ড ওয়াভেল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে গান্ধীজি যে বিবৃতি দেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন যে, গুরুতর খাদ্যসমস্যা দূর করিবার একমাত্র উপায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত জিন্না সাহেবের আপোষ সংঘটিত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই প্রত্যাখ্যানও বদলাইয়া দেওয়া যায়। অর্থাৎ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন ও খাদ্যসমস্যার সমাধান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মর্জির উপর নির্ভর করে না, কংগ্রেস ও লীগের বন্ধুত্বের শক্তিতে তাহা আদায় করা যায় ইহাই গান্ধীজির অভিমত।

সর্ব-ভারতীয় খাদ্য-সংকট সমাধান কংগ্রেস ও লীগের সর্বভারতীয় ঐক্য ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। তেমনই স্থানীয় বা প্রাদেশিক সংকট সমাধানের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা কংগ্রেস ও লীগের স্থানীয় বা প্রাদেশিক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিবে। বাংলা দেশে এখনও কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য গঠিত হয় নাই। তাই একদিকে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে বাংলায় আর অন্নের দুঃখ নাই; অন্যদিকে কংগ্রেস মহল প্রাণপণে প্রচার করিয়া আসিতেছে যে, লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে সরাইতে না পারিলে অন্ন কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

দুটীর কোনটীই ঠিক নয়। সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী সাহেবের হিসাব মতই বাংলার অধিকাংশ জায়গায় চালের দর ১৪॥০ হইতে ১৬॥০ টাকা। যে দেশে অধিকাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে সে দেশে চালের এই দর দুর্ভিক্ষেরই সামিল। আর এই দর কমাইতে হইলে একমাত্র উপায় বাড়তি অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে চাল পাঠানোর যানবাহনের ব্যবস্থা করা, তবেই স্থানীয় মজুতদারের দরবৃদ্ধির বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। যানবাহনের কর্ত্তা চিরস্থায়ী আমলাতন্ত্র; লীগকে সরাইলেই উহাদের শক্তি কমে না, বরং লীগ ও কংগ্রেসের ঝগড়ার সুযোগে উহারা আরও চিরস্থায়ী হইয়া বসে।

গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থনের উপলক্ষে বাংলায় কংগ্রেসের একটী দ্রুতবর্দ্ধমান অংশ লীগের সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বন্ধুত্ব এখনই খাদ্য-সংকট সমাধানের বাস্তব প্রচেষ্টায় সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হোক, প্রাদেশিক ভিত্তিতে সংকট-সমাধানে অগ্রসর হোক। বিহারে মহামারী-প্রতিরোধে কংগ্রেস ও লীগ যে-ঐক্যের আদর্শ দেখাইয়াছে, খাদ্যের ব্যাপারে বাংলা তাহারই অনুসরণ করুক। যানবাহন সরবরাহে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা সেই ঐক্যের আঘাতেই চূর্ণ হইবে, খাদ্য সহজলভ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাদেশিক ঐক্য সর্বভারতীয় ঐক্যেও নূতন প্রেরণা যোগাইবে। তাহাতে বাংলাও বাঁচিবে, ভারতও বাঁচিবে।

গান্ধী-জিন্না আপোষ সমর্থনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসমাবেশ

ট্রামের ভিড় কি কিছুই কমানো যায় না ?

আরও ৫0 হাজার হইতে ২ লক্ষ যাত্রীর ব্যবস্থা নিশ্চয় সম্ভব

কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। অথচ কলিকাতায় যানবাহনের সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। ১৯৩১ সালে যতগুলি ট্রামে দৈনিক প্রায় ৩ লক্ষ লোক যাতায়াত করিত, বর্ত্তমানে প্রায় ততগুলি ট্রামেই দৈনিক ৮ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। তেমনি বাস প্রভৃতিতেও। সুতরাং গাড়ীতে ঠেলাঠেলি ও মারামারি, সময়মত যানবাহনের অভাব, হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি দুর্ভোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর বক্তব্য

ট্রামের কথা ধরা যাক। সম্প্রতি (১৬ই আগষ্ট) ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে ট্রাম কোম্পানীর বক্তব্য বাহির হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার প্রধান উপায় হইল নূতন ট্রাম আমদানী করা। কিন্তু তাহার নাকি কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা—১৯৪২ সালে মাত্র ৩০খানি ট্রামের জন্য বিলাতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ১৯৪৫ সালের আগে পাওয়া যাইবে না! কোম্পানীর দ্বিতীয় বক্তব্য হইল: অফিস প্রভৃতি খোলার সময় সকাল ৯-১৫ হইতে ১০-৪৫ পর্য্যন্ত এবং ছুটীর সময় বিকাল ৪-৪৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত, এই দুই সময়েই ট্রামে সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়। অন্তত আধাআধি পরিমাণ অফিস খুলিবার ও বন্ধ করিবার সময় যদি আগাইয়া আনিয়া ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত করা হয় তাহা হইলে এই ভিড় আর একটু বেশী সময়ে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, ফলে ভিড় কিছু কম হয়, কিছু বেশী লোক ট্রামে চড়িতে পায়। এই দুটী বক্তব্য ছাড়া ট্রাম কোম্পানী আর কিছু উপায় বাৎলাইতে পারে নাই।

এখনি অল্প কিছু করা যায়

নূতন ট্রাম আমদানীর দিকে গবর্ণমেণ্ট একটু সুনজর দিলে তবেই যানবাহন সমস্যা ভালভাবে দূর হয়। কিন্তু তাহা কবে হইবে ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। এখনি গাড়ীর সংখ্যা বা গাড়ীর যাত্রী-বহনের ক্ষমতা যতটুকু বাড়ানো যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়। কারণ একখানি গাড়ী বাড়াইতে পারিলেও তাহাতে লোকের যথেষ্ট লাভ, উহাতে দৈনিক প্রায় ২৫০০ যাত্রী যাতায়াত করিতে পারে।

কিন্তু কোম্পানী সে বিষয়ে জনসাধারণকে কিছু জানায় নাই। অথচ এবিষয়ে এখনি কিছুটা করা সম্ভব।

অন্তত ১৫টী ট্রাম বাড়ানো সম্ভব

প্রথম—ট্রামের সংখ্যা বাড়ানো। কোম্পানীর হাওড়া ও নিমতলা সেক্সনে মোট প্রায় ৩০খানা ট্রামে মাত্র একখানি করিয়া গাড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক ট্রামে যদি কলিকাতার মত দুখানি করিয়া গাড়ী লাগানো যায়, তবে ১৫খানি গাড়ীতেই হাওড়া ও নিমতলার বর্ত্তমান যাত্রী সংখ্যা বহন করা চলে। উহাতে হাওড়া ও নিমতলায় গাড়ী পাইতে বর্ত্তমানের অপেক্ষা একটু দেরী হইবে বটে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার কেহই বাদ পড়িবে না। ঐ সেক্সনে সুবিধা আরও একটু বাড়াইবার জন্য যদি আরও ৫টা ট্রাম ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবুও অন্তত ১০খানি ট্রাম কলিকাতায় কাজে লাগানো যায়। ১০খানি ট্রাম কলিকাতায় দৈনিক প্রায় ২৫ হাজার যাত্রী বহন করিতে পারে।

অবশ্য ইহার জন্য ৩০খানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী বানাইতে হইবে। অনেকগুলি চালু গাড়ী মোটরের অভাবে কোম্পানীর ঘরে অকেজো জমিয়া আছে—সেগুলি এই কাজে লাগানো যায়। নূতনও বানানো যায়। গাড়ীর বডি কোম্পানীর কারখানায়ই তৈয়ারী হয়। চাকা বার্ণ, জেসপ বা টাটা বা অন্য কোন লোহা-কারখানা অনায়াসে বানাইয়া দিতে পারে। যে এয়ার-ব্রেক দরকার তাহা কোম্পানীর ঘরে যথেষ্ট মৌজুদ আছে। সুতরাং গাড়ী বানাইবার কোনই অসুবিধা নাই।

প্রতি ট্রামে তিনখানি গাড়ী

দ্বিতীয়, নূতন ধরণের ট্রামগুলিতে বর্ত্তমান দুখানি গাড়ীর জায়গায় তিনখানি করিয়া গাড়ী লাগানো যায়। কোম্পানীর বেশীর ভাগ মোটরই ৫০ হইতে ৬০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন। উহাতে তিনখানি গাড়ী অনায়াসেই টানা যায়। অবশ্য উহাতে ট্রামের বেগ কিছুটা কমিয়া যাইবে। মোড় ঘুরিবার সময় একটু সাবধানও হইতে হইবে। কিন্তু তবুও দৈনিক মোট

যাত্রী-বহনের ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়িবে। অন্তত ১০০ ট্রামেও যদি তৃতীয় গাড়ী জোড়া যায় তো দৈনিক আরও প্রায় সওয়া লক্ষ যাত্রী বহন করা চলে।

যাত্রার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাড়ি দিবার মোট সময় কিছুটা কমাইতে পারিলে প্রত্যেক ট্রাম দিনে ২৭।২৮ বারের বদলে ২৯।৩০ বার পাড়ি দিতে পারে। তাহাতে সারা দিনে বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বেশী যাত্রী বহন করা চলে। তা ছাড়া তিনটী গাড়ী লাগাইলে ট্রামের বেগ কমিবার যে অসুবিধা তাহাও ইহাতে খানিকটা দূর হইতে পারে। উহার একটী উপায় হইল: বর্ত্তমানে এক রুটে যতগুলি থামিবার জায়গা আছে তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া। তাহাতে অনেকটা সময় বাঁচিবে। কলিকাতা শহরে থামিবার জায়গাগুলি খুব কাছাকাছি, বোম্বাই শহরে ইহার তুলনায় বোধহয় অর্দ্ধেকেরও কম। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

অফিস ছাড়া অন্য সময়েও ভিড়

ট্রামের ভিড় শুধু অফিসের সময়ই নয়, সকাল ৭টা হইতে রাত ১০টা পর্য্যন্ত প্রায় সমানেই লাগিয়া থাকে। তবে অফিসের সময় জানালা দিয়া ঢুকিতে হয় আর অন্য অধিকাংশ সময়ে দরজার ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিতে হয়—তফাৎ শুধু এইটুকু। এমন কি রাত্রের শেষ দিকের গাড়ীগুলিতে পর্য্যন্ত গায়ের জোরে ছাড়া ঢুকিবার উপায় থাকে না। কাজেই অফিসের সময় তো বটেই, দিনে রাতে যে কোনো সময়েই গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনেক বেশী লোক ট্রামে যাতায়াত করিতে পারে, একটু সুস্থির হইয়াও চলিতে পারে।

কিন্তু ভিড় কমাইয়া লোককে একটু সুবিধা দিবার বিষয়ে কোম্পানীর আগ্রহ নাই। মোট প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কিছুটা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি করিয়া গাড়ীকেও ডিপোতে বসাইয়া দিতে থাকে, ফলে ভিড় প্রায় সমানই থাকিয়া যায়। ষ্টেটস্‌ম্যানে কোম্পানীর নিজস্ব বিবৃতি হইতে দেখা যায়—চৌরঙ্গী সেক্সনে একদিন ৫-১৫ হইতে ৫-৪৫ পর্য্যন্ত মোট যাত্রী ছিল ৩৫৫৯ আর গাড়ী পিছু যাত্রী ছিল ১৩৭ জন। তাহার পরের আধঘণ্টা ৫-৪৫ হইতে ৬-১৫ পর্য্যন্ত মোট যাত্রী ছিল ৩৩৫৩ আর গাড়ী পিছু যাত্রী ছিল ১৪০ জন। অর্থাৎ দ্বিতীয় আধ ঘণ্টায় মোট যাত্রী কমিয়াছে বটে, কিন্তু গাড়ী পিছু ভিড় বাড়িয়াই গিয়াছে। ইহার অর্থ—আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোম্পানী ২খানি গাড়ী বসাইয়া দিয়াছে, তাহাতে যে ভিড় আরও বাড়িবে সে কথা গ্রাহ্য করে নাই।

এই ভিড় কমানো যায়

সন্ধ্যা বা রাত যতই আগায়, কোম্পানী

[শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ফসল বাড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছে ?

সরকারী বরাদ্দ টাকা কৃষককে দাও

ফসল বাড়াইবার জন্য বাংলা সরকার ১। কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। অথচ হাজা মজা নদীর সংস্কারের কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। খাল কাটা ও বাঁধ বাঁধার কাজে এই টাকা ব্যায় করিলেও ফসল অনেক বাড়িত। সরকারী হিসাব অনুসারে এ বছর মাত্র ৪ লক্ষ টাকা সরকার খরচ করিয়াছেন। উহার মধ্যে মাত্র ৩০০০০ টাকা বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা নিজ উদ্যোগে খাল কাটা ও বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি কাজের জন্য আদায় করিতে পারিয়াছে। ঐ ৩০ হাজার টাকার মধ্যে হাওড়া জেলায় উত্তর ঝাপরদার বাঁধ এবং মাশিলার খাল কাটার জন্য আদায় হইয়াছে ১৫০০০ টাকা, নদীয়া জেলার সুতির বাঁধ বাঁধার কাজে ২০০০ টাকা, মুর্শিদাবাদ জেলায় শোনাপটল, শ্রীপতিপুর এবং হাতিশালার বাঁধ বাঁধার কাজে ২৫০০ টাকা, ফরিদপুর জেলার কোরকদি বাঁধে ১৫০০ টাকা, ঢাকা জেলায় মুন্সিগঞ্জে কচুরি পানা ধ্বংসের কাজে ৪০০ টাকা ময়মনসিংহে বাজিতপুর খাল ৫০০ টাকা, চট্টগ্রামে কুতুবদিয়া খাল ২০০ টাকা, বগুড়ায় পাঁচুলিয়ায় খাল ২৫৫০ টাকা, পাবনায় ২০০০ টাকা এবং বরিশালে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মারফৎ সাঁতলা বাগধা বাঁধে ৪০০০ টাকা। এইসব খাল ও বাঁধের স্কীম করিয়াই গভর্ণমেণ্ট এতকাল বসিয়াছিল। এবার কৃষক সমিতির আন্দোলনে স্থানীয় গ্রামবাসীগণ বাঁধ কমিটি ও খাল কমিটি গঠন করিয়া সরকারী অর্থ আদায় করিয়াছে এবং তাহা ছাড়াও কৃষক সমিতি ৮৯ হাজার টাকা জনগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া খালকাটা ও বাঁধ বাঁধার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। সরকার আমলাদের হাত দিয়া ৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মাত্র ১।০ লক্ষ একর জমিতে ফসল বৃদ্ধি করিয়াছে আর সরকারী বরাদ্দের যে ৩০ হাজার টাকা গ্রামবাসীদের খাল কমিটি ও বাঁধ কমিটির হাত দিয়া খরচ হইয়াছে তাহাদ্বারা ১ লক্ষাধিক একর পতিত জমি উদ্ধার হইয়াছে। জনগণের হাতে সরকারী তহবিলের বরাদ্দ টাকা খরচ করিতে দিলেই তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয়। এখনও ফসল বাড়াইবার জন্য বরাদ্দ বহু অর্থ সরকারী তহবিলে জমা রহিয়াছে, ঐ টাকা বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জনগণের কমিটির মারফৎ জমিতে সেচের জন্য খরচ করা হউক।

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনায় সারা বাংলা

হুগলী জেলার কংগ্রেসসেবীরা

গত ৯ই আগষ্ট হুগলী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে শ্রীরামপুর কালীতলা ময়দানে এক জনসভা হয়। হুগলী জেলার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস-লীগ আপোষ আলোচনার জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টা এবং রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সভার এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, এ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য হিন্দুদের যদি কিছু ত্যাগ স্বীকারও করিতে হয় তার জন্য সকলের প্রস্তুত হইতে হইবে—এই সমস্যার মীমাংসা হইলে আমাদের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী।

দার্জ্জিলিং-এর গুর্খা সম্প্রদায়

দার্জ্জিলিঙের গুর্খা সম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্নার কাছে এক স্মারকলিপিতে তাঁহাদের ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইয়াছে। সেই স্মারকলিপিতে গুর্খা সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ-রক্ষার দাবীও জানানো হয়। এই স্মারক লিপিতে যাহারা সই দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন—জি, এল, সুব্বা, নিখিল ভারত গুর্খা লীগের সহকারী-সম্পাদক; ডি, সিংহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার; রতনলাল, গুর্খা লীগের সহকারী সভাপতি; কে জারিং, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার; মনু সিংহ, আর্য্য সমাজের প্রতিনিধি; সূর্য্যমতি, সভানেত্রী জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি।

বালীর সভায় কংগ্রেস ও লীগ নেতা

গত ১৫ই আগষ্ট বালী স্কুল ময়দানে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত-র সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। এই সভার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেন্ট লীগ-নেতা আবদুল হামিদ চৌধুরী, ছাত্র-ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুত সাধন গুপ্ত প্রভৃতি গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতকারের সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

২৪ পরগণার কংগ্রেস কর্ম্মীরা

২৪ পরগণার নিম্নলিখিত কংগ্রেস কর্ম্মীগণ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, তাঁরা কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি সমর্থন করেন না। তাঁরা আন্তরিক ভাবে গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের সফলতা কামনা করেন। স্বাক্ষরকারী:—ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র রায়, দুর্গাপদ ঘোষ, পীযূষমাধব চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ চক্রবর্ত্তী, বিমল নিয়োগী, মুরারীশরণ চক্রবর্ত্তী, তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী, অরুণ চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়।

দিনাজপুর

গত ১৬ই আগষ্ট কংগ্রেস ময়দানে মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেনের সভাপতিত্বে হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট সমাবেশ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্রমোহন সেন, লীগনেতা রহিমুদ্দিন আহম্মদ, মুসলীম ছাত্র লীগের নূরুল হক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

গান্ধীজীর সমর্থনে কলিকাতা কর্পোরেশন

১৬ই আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না যে হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সাফল্য কামনা করা হইতেছে। এই প্রস্তাবের উপর বহুক্ষণ আলোচনা হয়। কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু ৩২-১৪ ভোটে মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। মেয়র মহাশয় বলেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরও গান্ধীজীর উপর পূর্ণ আস্থা আছে।

কলিকাতার মহিলারা

গত ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্নে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মহিলাসাধারণের এক সভায় গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার আসন্ন সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, বেগম হামিদা মোমিন, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী প্রভৃতি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় বিরাট জনসভা কংগ্রেস ও লীগ নেতার বক্তৃতা

"আজ এই সভা দেখে আমার ২৫ বছর আগের কথা মনে পড়ছে। সেদিন ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ। আমরা হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে নাখোদা মসজিদে সভা করে আমাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতাম। আজ মনে হচ্ছে সেদিনের চেয়েও বড় ঐক্য আসন্ন।"

গত ১৬ই আগষ্ট ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন কর্ত্তৃক আহূত এক জন সভায় বড়বাজারের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত সীতারাম সাক্সেরিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। গত খিলাফৎ আন্দোলনের পরে একই সভায় কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের এইরূপ সমাবেশ, হিন্দু-মুসলমান জনতার ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য আকুল আগ্রহ কখনও এরূপ ভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইতিপূর্ব্বে কখনও মুসলমান জনতার মুখে 'গান্ধীজি কী জয়,' হিন্দুজনতার মুখে 'কায়েদে আজম জিন্না জিন্দাবাদ' এবং উভয়ের মুখে 'স্বাধীন ভারত কী জয়' ধ্বনি ধ্বনিত হয় নাই।

সভায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত, জে, সি, গুপ্ত, সীতারাম সাক্সেরিয়া, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লীগ-নেতা মৌলভী আবুলহাসেম, লাল মিঞা, মুসলীম ছাত্রলীগ নেতা মিঃ এক্রাম, সামসুল হুদা চৌধুরী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। লীগ-নেতা স্যার নাজিমুদ্দিন, ও কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন মুখার্জ্জি বাণী পাঠাইয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সাফল্য কামনা করেন।

প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক মৌলভী আবুল হাসেম বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "আমি বিশ্বাস করি হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতার আন্দোলন সার্থক হতে পারে না। সেই ঐক্য যে আজ এত শীঘ্র এসেছে, অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা আজ যে এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার জন্য আমরা ধন্য। জিন্না সাহেব আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে-কোন ভাবেই হোক এই ঐক্য ঘটাতেই হবে—গান্ধীজিও আজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

অনেকের ধারণা গান্ধীজি কর্ত্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার লীগের কাছে কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ। পরাজয় বা আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। গান্ধীজির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এই কঠিন বাস্তবই শুধু স্বীকার করা হয়েছে যে দুই সম্প্রদায়ের মিলন ছাড়া কারুরই মুক্তির পথ নেই।

পাকিস্তান হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার ভেদনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পাকিস্তান সকলের স্বাধীনতার জন্য মিলিত সংগ্রামের অঙ্গীকার।

বাংলার কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত বলেন: "লীগের সঙ্গে আপোষ স্বাধীনতার জন্য—চাকুরী ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য নয়, আপোষের ভিত্তিই স্বাধীনতা। গান্ধীজি ও কংগ্রেস মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করেছেন কারণ কোন স্বাধীনতাকামীই এই অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না। আজ যাঁরা রব তুলেছেন 'ভারতকে বিভক্ত করা হচ্ছে, বাংলার সর্ব্বনাশ হোল,' আসলে তাঁরাই ভারতকে খণ্ডিত ও বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতি নয়। বাংলার আজ ঐক্যের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে সমস্ত দেশ ভেঙ্গে পড়ছে, অখণ্ড ভারতের পতাকা কি উড়বে সেই শ্মশানে?"

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মিঃ সামসুল হুদা চৌধুরী বলেন: "পাকিস্তানের সারমর্ম স্বাধীনতা। কংগ্রেসেরও লক্ষ্য স্বাধীনতা। সুতরাং কংগ্রেস ও লীগের মিলন অনিবার্য্য। কংগ্রেস আজ পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করে নিয়েছে। আমার হিন্দু ছাত্রবন্ধুদের কাছে আমরা কথা দিচ্ছি কংগ্রেস লীগ আপোষের চেষ্টায়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে মুসলমান ছাত্ররা চিরদিন একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে লড়বে।"

শ্রীযুক্ত সীতারাম সাক্সেরিয়া, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মুসলিম ছাত্র লীগের মিঃ এক্রাম-এর বক্তৃতার পর প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসান ও দুর্ভিক্ষ-মহামারীর হাত হইতে দেশকে বাঁচাইয়া স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের মিলন চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র সংসদের নেতা শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গান্ধী-জিন্না চুক্তিই গভর্ণমেণ্টকে মত বদলাইতে বাধ্য করিবে

"......অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে এই সঙ্কটকালে কায়েদে আজম জিন্না অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং চিকিৎসকদের উপদেশ অনুসারে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। বড়লাটের পত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে দৃঢ় অস্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মধ্যে একটা আন্তরিক যুক্তিসঙ্গত চুক্তির জোরেই উহা পাল্টাইতে পারে। আমরা সকলেই যেন প্রার্থনা করি যে, কায়েদে আজম সুস্থ হইয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিতে পারেন এবং ঈশ্বরের প্রেরণায় আমরা এক উচিত সমাধানে পৌছিতে পারি......"

(মহাত্মা গান্ধী, ১৮ই আগষ্টের বিবৃতি)

মজুর সভায়

সর্ব্বত্র মজুরদের সভাতেও গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন করা হইতেছে। সবশুদ্ধ ৪৬টী ইউনিয়নে এরূপ সভা হইয়াছে।

গত ৩১শে জুলাই **কাঁচড়াপাড়া** রেলওয়ে মজুরদের এক সাধারণ সভা হয়।

ঢাকাতে বি এণ্ড এ রেলওয়ে ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতি প্রস্তাবের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। জেলা টেক্সটাইল ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৯ই আগষ্ট এক সভায় গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন করা হয়।

কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ হইতে গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবকে তার করিয়া সমর্থন জানান হইয়াছে।

মাদারীপুরে সকল দল

গত ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, ছাত্র-ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে এক জনসভায় আগামী গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ময়মনসিংহ

গত ১৩ই আগষ্ট বিপিন পার্কে ময়মনসিংহ সহরবাসীদের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় উকীল শ্রীযুত দেবেন ভট্টাচার্য্য। গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাইয়া এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যদের মুক্তি দাবী করিয়া এই সভায় দুইটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গত ১২ই আগষ্ট **নেত্রকোণায়** দশ হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। মাননীয় মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন এবং প্রাদেশিক লীগ-নেতা রেজাই করিম কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সমর্থনে বক্তৃতা করেন; সমবেত জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে ইহার সমর্থন জানায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সমর্থন

১৮ই আগষ্ট **ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়** এক জনসভায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দত্ত (এ-আই-সি-সির সভ্য) প্রভৃতি গান্ধীজীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

কচুরীপানা ধ্বংস করিয়া

ঢাকায় দেড় লক্ষ মণ ধান রক্ষা হইল

কচুরীপানা পূর্ববঙ্গের বিশেষতঃ ঢাকা জেলার একটী বিরাট সমস্যা। কচুরীপানা কিভাবে মাঠের ফসল ধ্বংস করে তাহা গণ-সংগীত রচয়িতা শ্রীযুক্ত সত্যেন সেনের "কচুরীতোলা" গানের ভাষায় ফুটিয়া ওঠে: "ধানের ক্ষেতে সিন্দ কাইট্যা হায় করতে আইলি ধান চুরি"। কচুরীর হাত থেকে ফসলরক্ষার সাফল্য নির্ভর করে একমাত্র গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে সুনির্দ্দিষ্ট পরিচালনার উপর। কিন্তু সে আশায় অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বসিয়া থাকিলে বাংলার কৃষকের চলে না। প্রতি বছর বর্ষার স্রোতের সঙ্গে ধানের ক্ষেতে ঢুকিয়া এই কচুরী ঢাকা জেলার ফসলের প্রভূত ক্ষতি করে। কৃষকরা তাহা নীরবে দেখিবে আর সহ্য করিবে ইহা তো হইতে পারে না। তাই কৃষক সমিতির উদ্যোগে তাহারা আগাইয়া আসে নিজেদের পরিশ্রমের ফসল বাঁচাইতে।

শ্রীনগরের খাল মাঠের বুক চিড়িয়া গোয়ালীমান্দ্রা গিয়াছে। খালে কচুরী থরে থরে সাজান। আর তাহার দুই দিকে ধান-ক্ষেত। এবার মাঠের মধ্যে কচুরী ঢুকিয়া তিন হাজার বিঘার জমির ধান নষ্ট করিয়া দিল। জেলা কৃষক সমিতি আওয়াজ উঠাইল—'ফসলরক্ষা সপ্তাহ' পালন করিয়া কচুরীপানা ধ্বংস করিতে হইবে। দলে দলে কৃষকরা সমবেত হইতে লাগিল। আমনরক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা ৯টি বড় জনসভা ও ২২৫টি বৈঠক করিল। ১৮ হাজার কৃষকের কানে ফসল বাঁচানো ডাক গিয়া পৌঁছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমদের নিকট ২৫টি ডেপুটেশান কৃষকরা পাঠাইল—কচুরীপানা উদ্ধারের কাজে সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে। কুমারভোগ ও কুকুটিয়ার জন্য তাহারা ৩০০৲ টাকা পাইল। পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি জানাইল—ঢাকার কৃষকদের ২ হাজার টাকা পাঠান হইতেছে।

কৃষকদের মন আশায় ভরিয়া উঠিল। "কচুরীতোলা"র গানের তালে তালে তাহাদের বুক উৎসাহে ফুলিয়া উঠে:

গামছা পিন্দ্যা কোমর বাইন্ধ্যা
আয়রে ফালাই কচুরী।
আমাগো টানের ভর সইবো না,
খাটবো না জারিজুরী।
ওরে মাইন্‌কা কই গেলি,
সবাই মিল্যা আয় ঠেলি।
ওরে কাসেম কই গেলি,
সবাই মিল্যা আয় ঠেলি।
রুশিয়া জার্ম্মানীর মতন
আমরাও আয় লড়াই করি।
বাংলাদেশের চাষী আমরা
ফসল বাড়াই ভাই,
ধান বাঁচাইতে, দেশ বাঁচাইতে
দল বাইন্ধ্যা দাঁড়াই।
কচুরীর বংশ নাশ করিতে
জাগ্‌রে তামান দেশ জুড়ি।...
—ইত্যাদি

রোয়াইল কৃষক সমিতির আহ্বানে দলে দলে কৃষকরা বাহিনীতে নাম লিখাইল। বিনা মজুরীতে কচুরী পরিষ্কার করিয়া তাহারা ১২০০ বিঘা জমির ফসল বাঁচাইয়া দিল। গ্রামটী ছিল পঞ্চম বাহিনীর ঘাঁটি। কিন্তু এই কয়দিনে কৃষকদের কাজের উৎসাহ দেখিয়া বহু মধ্যবিত্ত কৃষকসমিতির সমর্থক হইয়া দাঁড়াইল। মহিষাসুর ইউনিয়নের একজন মধ্যবিত্ত ৩০৲ টাকা চাঁদা দিল। মহিষাসুরেও ৩০০ বিঘা জমি রক্ষা পাইল। এই ভাবে সর্ব্বত্রই কচুরী ধ্বংসের বিরাট প্রচেষ্টা কৃষকরা হাতে লইল: কুকুটীয়া ইউনিয়নে ৩০০ বিঘা, কুমারভোগে ১৮০ বিঘা, টঙ্গিবাড়ীতে ২২৫ বিঘা, চাঁপাতলীতে ২১০ বিঘা জমি হইতে কচুরী সাফ হইয়া গেল।

কৃষকদের এই কর্ম্মোদ্যোগ দেখিয়া সমস্ত শ্রেণী ও দল মুগ্ধ হইয়া গেল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সকলে কৃষকদের সহিত মিলিত হইয়া "ফসলরক্ষা কমিটি" গঠন করিল। পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির ২ হাজার টাকা পাইয়া তাহারা কাজ সুরু করিয়া দিল। কমিটির পরিকল্পনায় ১২,৮৫০ বিঘার কচুরীপানা সাফ করিতে হইবে। কাজ এখনো চলিতেছে।

বিভিন্ন স্থানের ফসল রক্ষা কাজের ভিতর দিয়া ঢাকায় কৃষকবাহিনীর ৫০০ ভলান্টিয়ার বিনা মজুরীতে দিনরাত পরিশ্রম করিতেছে। এই কাজের ফলে ঢাকায় একুনে দেড় লক্ষ মণ ধান বাঁচিয়া গেল।

বাঁধ বাঁধার কাজ সমানে চলিতেছে

মালদহ, রাজসাহী, খুলনার কৃষক কোমর বাঁধিয়াছে

মালদহ জেলায় কলিগ্রাম, মতিহারপুর ও চাচল ইউনিয়নের কৃষক সমিতির উদ্যোগে তিনটি বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। কালভাসার বাঁধ ৮০ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড়া, ৪ হাত উঁচু; নুরগঞ্জেরটী ১০ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া আর ৩ হাত উঁচু। গুড়গুড়ির বাঁধ ৬ হাত লম্বা, ৫ হাত উঁচু ও ৮ হাত চওড়া। এই অঞ্চলের জমিতে জল পাইলে প্রচুর আমন হয়। বড় বড় নদীর মুখ কাটান ও বড় বাঁধ বাঁধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ৬০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। কিন্তু এই অঞ্চলের দাঁড়া বাঁধার জন্য সামান্য অর্থ হইতেও কৃষকরা বঞ্চিত হয়। কৃষকরা নিজেদের চেষ্টায় ২০০ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিয়া এই তিনটি বাঁধ বাঁধিয়া ফেলিল। চারিদিকে কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ—১৭,০০০ বিঘা জমির ফসল বাঁচিয়া গেল। দলে দলে কৃষক সমিতির সভ্য হইতে লাগিল। এই অভিযানের মধ্য দিয়া ৭০০ নূতন সভ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষকদের সংঘবদ্ধতা ও উৎসাহের সামনে চাচল রাজষ্টেটের দাঁড়া কাটিয়া দিবার তদন্ত কমিশন সুরু হইয়া গেল। রাজ-কমিশনের বাধা চূর্ণ করিয়াই কৃষকরা থামে নাই। তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু চাঁদা আদায় করিয়াও ছাড়িয়াছে। কমিশন বুঝিয়া গেল যে, এই কাজের ফলে সকলের স্বার্থ রক্ষা হইয়াছে।

রাজসাহী জেলায় পিপরুল, সেনতাপ লক্ষীকূলের ২০০ কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া দুইটী দাঁড়া কাটিয়াছে। দাঁড়া দুইটী ৮০ গজ লম্বা ২॥০ হাত গভীর। ইহার ফলে বড়ানই নদী হইতে জল মাঠে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৫০০০ বিঘা জমির ধান বাঁচিবার আশা করা যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কিছু অর্থ ব্যয় না করিলে মাঠে জল প্রবেশের পাকা ব্যবস্থা হইতে পারে না।

খুলনা জেলায় বাড়ুলী, কাটিপাড়া, বাঁকা ইউনিয়নের একটী বাঁধ গত বছর ভাঙিয়া যায়। কৃষক সমিতির শত চেষ্টাতেও তাহা রুখিতে পারা যায় নাই। এ বছর প্রথম হইতেই এই বাঁধ বাঁধার চেষ্টা সুরু হয়। ইহার ফলে ২৫০০ বিঘা জমি চাষ যোগ্য হয়—৫০০ পরিবার বাঁচিতে পারিবে। এই অঞ্চলের ৩১০০ লোককে তিনমাস ধরিয়া অন্নসত্রে ১ বেলা খাইয়া কাটাইতে হইয়াছে। কৃষক সমিতি প্রতিজ্ঞা করে এবার তাহাদের অন্নাভাবে মরিতে দিবে না। কিন্তু জমির জল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিলে ধান বাঁচিবে না। "বাক্স-কলে"র জন্য অর্থ চাই। খাদ্যমন্ত্রী ও হাকিমের কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্য গণ-দরখাস্ত পাঠান হয়। সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের কাছে ডেপুটেশানও যায়। কিন্তু প্রথম দিকে স্থানীয় মধ্যবিত্ত মহল সমিতিকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের ভিতর দিয়া তাঁহারা বিরোধিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষকরা নিরুৎসাহ না হইয়া দিনের পর দিন সকল দলের ঐক্যের জন্য আন্দোলন চালাইয়া যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন, লীগ মনোভাবাপন্ন মুসলমান সভ্যরা কৃষকদের সমর্থন করিতে আগাইয়া আসেন। শেষে সকলের চেষ্টার ফলে **সরকার বাঁধ বাঁধা ও বাক্সকলের জন্য ৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করে।** সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সহিত মিলিত চেষ্টার ফলে জেলার কৃষি-বিভাগ হইতে কৃষকরা ৩০০ মন আমন বীজধানের ঋণ-সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। এই অর্থ ও বীজ-ধান কোন চরে কি ভাবে বিলি করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড ও কৃষকদের যুক্তসভা ও যুক্ত কমিটী গঠনের চেষ্টা হইতেছে।

বাংলায় ফসল বৃদ্ধি

গভর্ণমেন্টের পরিচালনা ও জনসাধারণের পরিচালনার তফাৎ

	বাংলা গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছে	কৃষক সভা কি করিয়াছে
অতিরিক্ত জমি আবাদ	১,৫০,০০০ একর	১,০৮,০০০ একর
ফসলের পরিমাণ	১৫,৫০,০০০ মণ ধান	২৭,০০,০০০ মণ ধান
মোট আনুমানিক ব্যয়	৪,০০,০০০ টাকা	১,১০,০০০ টাকা

কৃষক সভা একাজে কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে

গভর্ণমেণ্ট সাহায্য	৩০,০০০৲ টাকা
পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি	১০,০০০৲ টাকা
স্থানীয় আদায়	৭০,০০০৲ টাকা
ইহা ছাড়া, স্বেচ্ছাসেবক মারফত বিনা মজুরীতে কাজের মূল্য	৪০,০০০৲ টাকা
	১,৫০,০০০৲ টাকা

১লা সেপ্টেম্বর নিঃ ভাঃ কৃষক দিবস

সারা দুনিয়ায় জনসাধারণের শিবিরে একতা প্রতিদিন শক্তিশালী হইতেছে এবং সেই একতার মধ্য দিয়া দেশে দেশে জনগণের স্বাধীনতা কায়েম হইতেছে। আমাদের দেশেও আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে; কংগ্রেস ও লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্না দেশকে মিলিত করিয়া জাতীয় সরকার কায়েম করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। কৃষক সভার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এ বৎসর বাংলার কৃষকেরা ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে ফসল বাড়াইয়াছে, বহু গ্রামে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়াছে, সারা বাংলায় খাদ্য কমিটি মারফৎ রেশনিং-এর দিকে অগ্রসর হইতেছে, মজুতদার ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতেছে।

আমাদের এইসব লড়াইএর চূড়ান্ত সফলতা আনিতে হইবে—এই সংকল্প লইয়া কৃষক-দিবসে হাজারে হাজারে জমায়েত হউন। (ক) ঐ দিন নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী হইবে:—প্রতি সহরে, গঞ্জে, ইউনিয়নে—প্রতি গ্রামে নিজ নিজ কৃষক সমিতির অফিসে ও প্রত্যেক সদস্যের বাটীতে পতাকা উত্তোলন করুন। (খ) সমস্ত দিন কৃষক সমিতির সদস্য সংগ্রহ করুন। (গ) প্রতি এলাকায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও স্থানীয় নেতাদের নিকট যাইয়া কৃষক সমিতির আদর্শ প্রচার ও ব্যাখ্যা করুন এবং (ঘ) জেলা কৃষক সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত স্থানগুলিতে জনসভা করুন। (ঙ) সমস্ত কাজের সাথে সাথে ফসল বাড়ানো, রিলিফ, মেডিক্যাল রিলিফ, ও গ্রাম পুনর্গঠন বা ইহার মধ্যে স্থানীয় প্রয়োজন বোধে যে কোন কাজের জন্য অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করুন।

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ হইবে কৃষক সভার মঞ্চে দেশপ্রেমিকদের ঐক্য-বদ্ধ করা, দেশপ্রেমিকদের কাছে কৃষক সভা সম্পর্কে প্রচার করা ও সমস্ত কৃষককে কৃষক সমিতির মধ্যে আনা।

মনসুর হবিব
সাধারণ সম্পাদক,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ সপ্তাহ

বেঙ্গল সিভিল প্রটেক্শন কমিটি (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত), মুসলীম লীগ রিলিফ কমিটি, পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে ২০শে আগষ্ট হইতে ২৬শে আগষ্ট 'মেডিকেল রিলিফ সপ্তাহ' পালন করা হইবে।

২৬শে আগষ্ট তারিখ সর্ব্বত্র নিখিল বঙ্গ মেডিকেল রিলিফ দিবসের অনুষ্ঠান করুন।

বাংলার ৪৪টী মহকুমায় পুনর্গঠন দরকার

কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা কতটুকু ?

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃস্থ নরনারীকে সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে বাংলা সরকার এ পর্য্যন্ত অনেক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, সরকারী কর্মকেন্দ্র খোলা প্রভৃতি অনেক পরিকল্পনার কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ?

কর্মকেন্দ্র না, দুর্নীতির কেন্দ্র ?

বাংলাদেশের যেসব জেলা দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহার ভিতর ফরিদপুর অন্যতম। এই জেলায় ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ১০৫টী সরকারী কর্মকেন্দ্র খোলা হয়। বর্তমানে এই সব কর্মকেন্দ্রের অনেকগুলিকেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি এখনও আছে সেগুলির পরিচালনার ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ।

সম্প্রতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বিশিষ্ট কর্মী প্রফেসর রেণু চক্রবর্তী ফরিদপুরের টেপাখোলা সরকারী কর্মকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "টেপাখোলা কর্মকেন্দ্রে ৪ শত হিন্দু ও ২ শত মুসলমান নারী ও শিশু আছে। কিন্তু সেখানে শৃঙ্খলা বলিয়া কোন বস্তুর বালাই নাই। মেয়েদের মাথার চুলের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, তাহাদের চুলে বহুদিন যাবত তৈলস্পর্শ হয় নাই। শতকরা ৬০।৭০ জন মেয়ের পরিধানেই শতধা ছিন্ন জরাজীর্ণ কাপড়। বস্ত্রের অভাব সম্বন্ধে সকলেই অভিযোগ জানাইল। প্রতিদিন ৮ ছটাক করিয়া খাদ্য পাইবার ব্যবস্থা কাগজে পত্রে আছে। কিন্তু এই ৮ ছটাক খাদ্য কাহারও ভাগ্যেই জোটে না। অনেক মেয়ে আমাদের বলিল, "বাবুরা" (পরিচালকগণ) তাহাদের প্রায়ই মার ধর করে। "বাবুরা" অবশ্য ইহা অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই একজন কর্মচারী একটি লাঠি হাতে কয়েকজন নারী ও শিশুকে শাসাইতেছিল।

"মেয়েদেরকে দিয়া কাজ করাইবারও কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। ৪০০ কার্যক্ষম মেয়ের ভিতর একজন মেয়েকেই আমরা গম পিষিতে দেখিলাম। আর চার পাঁচ জন মাত্র রান্নাবান্নার কাজ করিতেছে। খাওয়ার জায়গারও কোনও বন্দোবস্ত নাই। যে যেখানে খুসী বসিয়া ভাত খায়। তাহাতে সারা বাড়ীটা একটা কদর্য্য নোংরামিতে ভরিয়া উঠে। শিশুদের স্কুলের জন্য একটি ঘরও আছে। কিন্তু আমরা বেলা ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়াও লেখাপড়ার কোনও চিহ্নই দেখিলাম না।

"সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে নারীদের দুঃস্থাগার পরিচালনা করার জন্য কোন মেয়ে কর্মকর্তা নাই। সবাই পুরুষ। এতে নাকি নানা প্রকার দুর্নীতি চলিতেছে—সে কথাও শুনিলাম। মারধরের ভয়ে মেয়েরা মন খুলিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের কথাও বলিতে সাহস পায় না। এ কর্মকেন্দ্রের পরিচালনা যে কত দুর্নীতিপূর্ণ তাহা একটি ঘটনাতেই প্রমাণ হইয়া গেল। আমরা চলিয়া আসার ২ ঘণ্টা পরেই আমাদের বাড়ীতে কর্ম-কেন্দ্রের ১৫ জন নারী আসিয়া উপস্থিত। আমাদের নিকট অভাব অভিযোগের কথা বলার জন্যেই নাকি "বাবুরা" তাহাদের বাহির করিয়া দিয়াছে।"

দুঃস্থের ভীড় বাড়ে অথচ কর্মকেন্দ্রের সংখ্যা কমে

এই টেপাখোলা কর্মকেন্দ্রেই তিন মাস আগে দুঃস্থার সংখ্যা ছিল ২০০।২৫০। এখন সেখানে ৬০০ দুঃস্থা বাস করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কনক মুখার্জ্জি সম্প্রতি ফরিদপুরের কর্মকেন্দ্রগুলিতে কি করিয়া দুঃস্থের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহার বিবরণ পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "গাদারীপুর ওয়ার্ক হাউসের সবাই মেয়ে। ওয়ার্ক হাউসের কর্মচারী রেজেষ্ট্রারি খাতা দেখিয়া জানা গেল জানুয়ারী মাসে ৪৮ জন দুঃস্থা নিয়া কর্মকেন্দ্র খোলা হয়। সে মাসের শেষের দিকে সংখ্যা ছিল ৫৪৪, এখন (৭.৮.৪৪) দুঃস্থার সংখ্যা ১২৫৫। রোজই নূতন নূতন দুঃস্থা আসিয়া এখানে আশ্রয় নিতেছে। মাসখানেক আগে ১৬০ জনকে কিছু কিছু কাজ দেওয়া হইত। এখন কাহারও কোন কাজ নাই—কেননা সরকার টাকা মঞ্জুর করিতেছে না !

"পালংএর দুঃস্থ কেন্দ্রটী জুলাই মাসের মাঝামাঝি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে তখন ৫০০ দুঃস্থ বাস করিত। দক্ষিণপাড়া গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি কর্মকেন্দ্র চলিতেছে। এখানে ১২১ জন নারী ও ৯১ জন শিশুর বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকেই ঢেঁকির কাজ, তাঁতের কাজ কিংবা অন্যান্য কাজ করে। সরকার হইতে এদের খাওয়ার রেশন দিত। সরকার নোটীশ দিয়াছে যে আগামী মাস হইতে সেই রেশন আর দেওয়া হইবে না। তখন এই কর্মকেন্দ্র বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা। রামভদ্রপুর ও কোরকদীতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা যে কর্মকেন্দ্র চালাইতেছিলেন তাহার সরকারী রেশনও শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।"

ঢাকা জেলার কর্মকেন্দ্রগুলির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। সেখানেও খাদ্য সরবরাহের কোন স্থিরতা কিংবা সঠিক কোনও পরিমাপ নাই। যে-সব দুঃস্থারা কর্মকেন্দ্রে থাকে তাহাদের মশারী দেওয়া হয় না। ফলে, কর্মকেন্দ্রগুলি ম্যালেরিয়ার ডিপোতে পরিণত হইতেছে। এর উপর আবার সরকার বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থাবাস তুলিয়া দিতেছে এবং সেগুলিকে সহরে কিংবা সহরের আশে পাশে কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। গ্রামের দুঃস্থাবাস থাকাতে স্থানীয় লোকেরা তাহার তত্ত্বাবধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। কিন্তু সহরে যদি দুঃস্থাবাস কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই সরকারের মাইনে করা কর্মচারীদের সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে থাকিবে। এতে অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হইতেই পারে না। দুঃস্থদেরকে নিজেদের গ্রাম বা এলাকা হইতে উপড়াইয়া আনিয়া সহরে কেন্দ্রীভূত করার স্বার্থকতাই বা কি তাহা আমরা বুঝিলাম না। দুঃস্থদের নিজেদের গ্রামে, নিজেদের বাড়ীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই সমাজজীবন পুনর্গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এদের নিয়ে সহরে জড়ো করিলে সমাজ জীবন পুনর্গঠন হইতে পারে না।

গ্রামে গ্রামে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেগুলি যাহাতে স্থানীয় জনগণের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করাই সরকারের কর্তব্য। নইলে বাংলা দেশের সঙ্কটের সমাধান হইবে না।

কলেরার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিহার

কংগ্রেস ও লীগের মিলনে রিলিফ আন্দোলনে নূতন শক্তি

বিহারের কলেরা-মহামারীর সম্বন্ধে বিহার সরকারের যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত ৪৪ হাজার লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। কিন্তু অবস্থা যে আরো বেশী সাংঘাতিক তা বিভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারীদের নিজেদের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। ১৪ই জুন মজফ্‌ফরপুরে জেলা-বোর্ডের বিশিষ্ট অফিসাররা বলিয়াছেন যে সরকার প্রদত্ত সংখ্যা প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যার অর্দ্ধেক। তিরহুত মহামারী রিলিফ কমিটীর এক সভায় (১৫ই জুন) বলা হয় যে, যে সব কলেরা রোগী বাঁচিয়াছে তাদের সংখ্যা হইবে ১৮ হাজার। ৪ ভাগের ৩ ভাগ লোকই কলেরায় মরিয়াছে, ইহা সকলেরই ধারণা সুতরাং এই হিসাবে দেখিলে ৫৪ হাজার লোক ১৫ই জুন পর্য্যন্ত মারা গিয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সরকারী সংখ্যা হইতেছে ২৫ হাজার।

এক একটা অঞ্চলের হিসাব হইতেও দেখা গিয়াছে যে সরকারী তথ্য প্রকৃত অবস্থার তুলনায় অনেক কম। দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনি মহকুমায় ৫৪টী গ্রামে মহামারী ছড়াইয়াছে বলিয়া সরকার হিসাব দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের হিসাবে গ্রামের সংখ্যা হয় ১২০টী। মোটামুটী বিভিন্ন সূত্রের খবর মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত কলেরায় আক্রান্ত লোক সংখ্যা হইবে ১ লাখ ৮০ হাজার এবং মৃত্যু সংখ্যা হইবে ১ লাখ ৩৫ হাজার।

সরকার দুই মাস আগে হইতে বলিতে-ছিলেন যে বৃষ্টি সুরু হইলেই কলেরা কমিবে। কয়েকটী জায়গায় কমিয়াছে বটে, কিন্তু সারাণ, পাটনা, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, গয়া, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলায় কলেরা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়াছে।

সরকারী ব্যবস্থার নমুনা !

মহামারী প্রতিরোধ করিবার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই সরকার করিয়াছেন। ইনজেকসন, ঔষধ, কুয়া-সংস্কার সমস্তই করিবার জন্য সরকারী ডাক্তারদের উপর ভার দেওয়া আছে। কিন্তু কাজ কতটুকু হইতেছে, তা দু একটা নমুনা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সারাণ জেলার একটী থানার হেল্‌থ্‌-ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, এই থানার ৮০টী গ্রামের মধ্যে প্রায় ৭০টী গ্রামে কলেরা ছড়াইয়াছে। কিন্তু জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১৫টী গ্রামে কলেরা প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ত্রিহুত মহামারী-রিলিফ কমিটীটী সরকারী কর্ম্মচারীদের করায়ত্ত। প্রচুর টাকা এই কমিটীর হাতে আসিয়াছে। এই টাকা দিয়া রোগাক্রান্তদের পথ্য বিলি করিবার কথা শোনা গিয়াছিল। কিন্তু এখন পথ্য যা দেওয়া হইতেছে, তার অধিকাংশই বিক্রয় করা হইতেছে, বিনামূল্যে দেওয়া হইতেছে না। রোগাক্রান্তদের কাপড় দিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার মাত্র ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়।

জন-নেতারা অগ্রসর

কিন্তু বিহারের জননেতারা এইরূপ সরকারী ব্যবস্থার উপর ভরসা না করিয়া জনসেবার কাজে নামিয়া গিয়াছেন। জেল হইতে বাহির হইয়া কংগ্রেস নেতা অনুগ্রহ নারায়ণ সিং ১৮ই জুলাই এক বিবৃতিতে বলিলেন : "আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব আর লোকে মরিবে—ইহা হইতে পারে না।"

ছাত্র ও শিক্ষকদের যুক্ত রিলিফ কমিটীর সভাপতি মিঃ পি-আর-দাস ও মুস্‌লিম লীগ সভাপতি মিঃ ইসমাইল—ইহারাও রিলিফের জন্য আবেদন জানাইলেন।

ক্রমশঃ যুক্ত রিলিফ কার্য্য সুরু হইতে লাগিল। ছাত্র শিক্ষকদের রিলিফ কমিটীর সঙ্গে উত্তর বিহার রিলিফ কমিটীর একযোগে কাজ চলিতে লাগিল। মেডিকেল ছাত্রদের লইয়া ১০টী স্কোয়াড মহামারী অঞ্চলে পাঠান হইল। সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গায় সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানদের মিলাইয়া একটী মিলিত কমিটী গঠিত হইয়াছে।

১৩ই আগষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতি-নিধিদের একটা সভা ডাকেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিং সভাপতিত্ব করেন। সভায় একটী কো-অর্ডিনেটিং রিলিফ কমিটী গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ভাবে তাহার কার্য্য-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয় :—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ—সভাপতি। শ্রীকৃষ্ণ সিং—অস্থায়ী সভাপতি। অনুগ্রহ নারায়ণ সিং—সাধারণ সম্পাদক। জাফর ইমাম (মুসলিম লীগ) ও সিংহেশ্বর প্রসাদ—যুক্ত সম্পাদক ইত্যাদি। এই সভায় সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে রাজেন্দ্র প্রসাদের মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐক্যের পথে এই সভা বিহারবাসীর প্রাণে এক নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে।

বিহারের জন্য বাংলার মেডিক্যাল রিলিফ স্কোয়াড

পিপ্‌লস্‌ রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইতে বিহারের মহামারী বিধ্বস্ত জনগণের সাহায্যের জন্য একটী স্কোয়াড পাঠান হইতেছে। ডাঃ নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কোয়াডের নেতৃত্ব করিবেন।

বাহির হইয়াছে
ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীর লেখা
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি
বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন
তুষার চট্টোপাধ্যায়
দাম ছয় আনা
ছাপা হইতেছে
এঙ্গেল্‌স্‌-এর
পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র
প্রামাণ্য অনুবাদ করিয়াছেন
রেবতী বর্ম্মণ
আসিয়াছে
MOSCOW NEWS—
One anna per Copy
International Literature—
One rupee per Copy
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্‌
১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ফ্রাঙ্কোর দিন ফুরাইয়াছে

ফ্যাশিষ্ট ফ্রাঙ্কো 'নিরপেক্ষতা'র মুখোস লইয়া গা-বাঁচাইবার চেষ্টায় আছে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত তাহার কুখ্যাত 'ব্লু ডিভিশন' ও 'স্প্যানিশ লিজিয়নে'র খবর ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে। তাছাড়া হিটলারকে যুদ্ধের মালমশলা যোগানের ব্যাপারে ফ্রাঙ্কোর কীর্তিকলাপ সকলেই জানে। সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, উড়ন্ত বোমার অংশবিশেষ নাকি স্পেন দেশেই তৈরী। অথচ কিছুদিন আগেও চার্চিলের মুখে শয়তান ফ্রাঙ্কোর স্তুতি শোনা গিয়াছে। চার্চিলের এই নির্লজ্জ উক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনমত তুমুল প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সারা দুনিয়ার জনগণ জানাইয়া দিয়াছে, ফ্রাঙ্কো প্রভৃতি হিটলারের প্রসাদপুষ্ট জীবেরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কোনরূপ ক্ষমা লাভ করিবে না।

স্পেনের অভ্যন্তরে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে রিপাব্লিকান, সোশালিষ্ট, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন দল আজ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচ বছর পূর্বে স্পেনের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু স্পেনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবসান হয় নাই। মাদ্রিদের ভ্যাল্লেকাস প্রভৃতি জেলায় ফ্রাঙ্কোপন্থী ফ্যালাঞ্জিষ্টরা রাস্তায় সন্ধ্যার পর কম লোকে হাঁটা নিরাপদ মনে করে না। 'ব্লু ডিভিশনে'র সৈনিক পরিবারের লোকজন এই জেলা হইতে প্রাণভয়ে অন্যত্র পালাইয়া গিয়াছে। মাদ্রিদের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি সিটিতে কোন ফ্যালাঞ্জিষ্ট সন্ধ্যার পর শহরে প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের বহু অংশ এই সমস্ত গোপন গণতন্ত্রী বাহিনীর দখলে। অন্যান্য কতকগুলি অংশে গোপন দলগুলি অনেকটা বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা করিতে পারে। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনের এই সমস্ত গোপন দলগুলি সকলে মিলিয়া 'সুপ্রীম জুন্টা অব ন্যাশনাল ইউনিয়ন' গঠন করে। এই 'সুপ্রীম জুন্টা' হইতে এক ঘোষণায় বলা হয়, 'ফ্রাঙ্কোর শাসন স্পেনের মৃত্যুর সামিল।' এই ঘোষণাপত্রে ফ্যালাঞ্জিষ্টদের (ফ্রাঙ্কোর ফ্যাশিষ্ট দল) বিরুদ্ধে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী স্পেনবাসীকে আহ্বান জানানো হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ধর্ম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রত্যেকের জন্য জীবিকা ও অন্নের সংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচী 'সুপ্রীম জুন্টা' হইতে ঘোষণা করা হয়। হিটলারের কাছে ফ্রাঙ্কোর সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করা, ফ্যালাঞ্জিষ্ট সংগঠন ভাঙ্গিয়া দেওয়া, ফ্যালাঞ্জিষ্ট পাণ্ডা ও জার্মান মাতব্বরদের উচ্ছেদ করা—ইহাই আজ মুক্তিকামী স্পেনবাসীর মূলমন্ত্র।

সোভিয়েট সরকার কর্তৃক রাহুলজীর স্ত্রী সম্মানিত

কমিউনিষ্ট ও কিষাণ নেতা মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্ত্রী একজন সোভিয়েট নারী। তাঁহার নাম এলেনা স্মারটোলনা সাংকৃত্যায়ন। ইনি 'সোভিয়েট এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সে'-এর একজন কর্মী। সম্প্রতি সোভিয়েট-সরকার ইঁহাকে 'মেডেল অব ভিক্টরী' নামক সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। লেনিনগ্রাদ নগরীর দীর্ঘ অবরোধের সময় এই বীর রমণীর দেশপ্রেমিক কার্য্যকলাপের জন্য এই সম্মান তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে জাগ্রত ইউরোপ

ফরাসী মুক্তি বাহিনী আজ হিটলারের আতঙ্ক

নাৎসী কবলমুক্ত রুমানিয়ায়

১৯৪০ সালে হিটলারের পদলেহী এন্টোনেস্কু রুমানিয়ার শ্রমিক আন্দোলন দমন করিতে সুরু করে ও শ্রমিকনেতাদের জন্য কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের ব্যবস্থা হয়; কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে এই সমস্ত শ্রমিক নেতাদের অনেককেই হত্যা করা হইয়াছে।

এবছর ৭ই এপ্রিল যখন লাল ফৌজ বোটোসানি শহরে প্রবেশ করে, তখন সমগ্র শহরবাসী লালফৌজকে অভিনন্দন জানায়। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানাইয়া দিল, রুমানিয়ার আইন কানুন অথবা রুমানিয়ার রাজনীতিতে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ করার কোনই ইচ্ছা নাই। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। দেখিতে দেখিতে ২,৮০০ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হইল। এন্টোনেস্কু যে আইনসঙ্গত অধিকার হইতে এতদিন বোটোসানির শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছিল, লালফৌজের বিজয়ে রুমানিয়ানরা আবার সেই অধিকার লাভ করিল। ৭টি স্বতন্ত্র শ্রমিক ইউনিয়ন লইয়া বোটোসানির ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিল খেলাধূলা, সঙ্গীত, পাঠাগার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তা ছাড়া অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের সাহায্যার্থে অর্থভাণ্ডার খোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিকদের মজুরী প্রায় দেড়গুণ বাড়ানো হইয়াছে। সপ্তাহে ছয় দিনের বেশী শ্রমিকদের কাজ করিতে হয় না। বোটোসানির শ্রমিকরা এন্টোনেস্কুর অত্যাচারী শাসনের পর আজ লালফৌজের বিজয়ের মধ্য দিয়া এই প্রথম প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাইতেছে। লালফৌজ বোটোসানিকে জার্মান কবলমুক্ত করিয়াছে। আর বোটোসানির মজুররা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়া মুক্তির পথে আগাইয়াছে। তাহারা আজ ফ্যাশিষ্ট জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। পুরানো দাসত্বের দিন তাহারা আর কিছুতেই ফিরিতে দেবেনা।

ফরাসী মুক্তি আন্দোলন

পশ্চিম ইউরোপে মিত্রবাহিনীর অবতরণের একমাস পূর্বে ফ্রান্সের গোপনকেন্দ্র মিত্রবাহিনীর কাছে জানাইয়াছিল, 'ফরাসী জনসাধারণ চরম দিনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া আছে। মুক্তিসংগ্রামে ফরাসী জাতি প্রাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া লড়িবে। নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে মিত্রবাহিনীর অবতরণের কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্রান্সে যে ব্যাপক ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ দেখা গিয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায় ফরাসী গোপনকেন্দ্র তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে।

জাতীয় প্রতিরোধ কাউন্সিল ফ্রান্সের এই গোপন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল; ১৯৪৩ সালের মে মাসে বিভিন্ন মুক্তিকামী দলের ঐক্যবদ্ধতায় এই কাউন্সিল গঠিত হয়। রেল-লাইন ধ্বংস করা, কলকারখানা ও বিদ্যুৎগৃহ বোমার সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া, জার্মানদের সরবরাহ বানচাল করা, জার্মান ফ্যাশিষ্ট ও ফরাসী দেশদ্রোহীদের হত্যা করার প্রচুর খবর ফ্রান্সের গোপনকেন্দ্র হইতে লণ্ডন ও আলজিয়ার্সে পৌঁছিয়াছে। অধিকৃত ফ্রান্সের কোন কোন রেলপথ জার্মানরা মাসের পর মাস ফরাসী দেশপ্রেমিকদের দৌরাত্ম্যে ব্যবহার করিতেই পারে নাই। জার্মান অধিকৃত কলকারখানাগুলিতে প্রায়ই ধর্মঘট লাগিয়া থাকার দরুন উৎপাদনে দারুণ বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই ফরাসী মুক্তিবাহিনী আজ লক্ষ লক্ষ ফরাসী সৈনিক লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়াও হাজার হাজার ফরাসী নরনারী জার্মান অধিকৃত কলকারখানা, রেলওয়ে ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধ্বংসমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত আছে। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে দিনের বেলায় অফিসে বা কলকারখানায় ধ্বংসমূলক কাজকর্ম সারিয়া রাত্রে আবার গেরিলা দলের সহিত যোগ দেয়। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ দেশপ্রেমিকদের গোপন আশ্রয়দাতা হিসাবে ও অন্যান্য সাহায্যের মধ্য দিয়া ফ্যাশিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে।

আজ ফরাসী মুক্তি সংগ্রাম এত জোরালো হইয়া উঠিয়াছে যে, ফ্যাশিষ্টদের দালাল ভিসি গবর্ণমেণ্টও ১৯৪৩ সালের এক রিপোর্টে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, আজ প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন ফরাসীই বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। বিদেশী রেডিও-র। (অর্থাৎ, মিত্রপক্ষের) নির্দেশের সুরে তাহাদের চিন্তা-ভাবনা বাঁধা। ডি' গল ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায় এবং পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া গোপন ইস্তাহারগুলি বিলি হইয়া যায়। সরকারী ঘোষণাগুলিতে জনসাধারণ ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করে না। জনসাধারণ এ বিষয়ে একরকম স্থিরবিশ্বাসী যে, মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিবেই।'

জার্ম্মানরা এই ফরাসী মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে আড়াই লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে। এই মুক্তি আন্দোলনে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ফরাসী নরনারী প্রাণ দিয়াছে। নর্ম্যাণ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণের ১ মাস আগে পর্যন্ত ৪ লক্ষ ফরাসী নরনারী নাৎসী কারাগারে বন্দী ছিল। প্রায় পূরা ১ বছর প্রতি মাসে ফরাসী মুক্তি আন্দোলনের ৫ শত সৈনিককে জার্মানরা প্রাণদণ্ড দিয়াছে। ফরাসী জনগণের এই মহান্ আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হইবে না।

('এলায়েড লেবার নিউজ' হইতে)

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার নবযুগের সূচনা করিবে

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐক্য প্রচেষ্টায় সাড়া

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ, ৯ই আগষ্ট—মহাজন সভার উদ্যোগে গত ৯ই আগষ্ট স্থানীয় গোখ্‌লে হলে এক জনসভা ডাকা হয়। কংগ্রেস ও লীগের বহুলোক সভায় যোগদান করেন। মাদ্রাজের মেয়র সৈয়দ নেয়ামতুল্লা সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাগৃহের প্রবেশদ্বারে কংগ্রেস ও লীগ পতাকা সম্মিলিতভাবে উড্ডীন করা হয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে উহার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ও আসন্ন গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার জয়যুক্ত হইবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯ই আগষ্ট পতাকা উত্তোলন উৎসব উপলক্ষে সহরের বহু কলেজ ও হোষ্টেলে সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনার্থে গান্ধীজীর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য নীরবে প্রার্থনা করা হয়।

পুরী

গত ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় এখানে পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্রের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মীদের এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ

৮ই আগষ্ট স্থানীয় ছাত্রদের এক সভায় আসন্ন গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্যার্থে প্রার্থনা করা হয়।

ইলোর

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্যার্থ সমবেত ভাবে প্রার্থনার জন্য গত ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যায় স্থানীয় মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস কমিটীর সম্মিলিত উদ্যোগে এক জনসভা হয়।

নয়াদিল্লী

৯ই আগষ্ট একটি জনসভায় কংগ্রেসলীগ ঐক্য স্থাপনের জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়। স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণ হিন্দু মুসলমান আপোষের প্রয়োজনীয়তা সমর্থনপূর্ব্বক সভায় বাণী প্রেরণ করেন।

ফিরোজপুর

গত ১৫ই আগষ্ট ফিরোজপুরের কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এক সভায় রাজাজীর পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ফিরোজপুর কংগ্রেসের সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নাগপুর

নাগপুর, ১০ই আগষ্ট—স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান ও পার্শি সম্প্রদায়ের ৭৬ জন এডভোকেট ও উকীলদের এক সভায় রাজাজীর ফরমূলা সমর্থনপূর্ব্বক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মাদুরা

মাদুরার ছাত্রসমিতির ও মাদুরা কলেজের ও স্থানীয় আমেরিকান কলেজের ছাত্রগণ মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার নিকট তার করিয়া তাঁহাদের আসন্ন সাক্ষাৎকারের সাফল্য সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন।

বাঙ্গালোর

৯ই আগষ্ট উপলক্ষে বাঙ্গালোর সিটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রগণ এক সভায় মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কামনা ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: **বঙ্কিম মুখার্জি,** এম, এল, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

আজ ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য

কি উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্টরা অস্থায়ী ফরাসী গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছে

আঁন্দ্রে মার্তি

(১৯৪৪ সালে ১১ই এপ্রিল আলজিয়ার্সে কমিউনিষ্টদের এক সভায় আঁদ্রে মার্তি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট)

ফরাসী কমিউনিষ্টপার্টির ইতিহাসে এই প্রথম ফরাসী কমিউনিষ্টরা অস্থায়ী ফরাসী সরকারে প্রবেশ করিয়াছে; ইহাতে বর্তমান অবস্থার গুরুত্বই প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ আগামী কয়েক সপ্তাহে ফরাসী জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তাহার সঙ্গে জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান হইবে, কারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া জাতীয় মুক্তি অসম্ভব—আর না হয় বর্ত্তমান অচল অবস্থা চলিলে আমাদের জাতির নিষ্পেষিত হইয়া যাওয়া ও অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী দাসত্ব শৃংখলে শৃংখলিত থাকার আশঙ্কা।

কমিউনিষ্টরা দেশকে রক্ষা করিবার জন্য, শত্রুর নানারকমের ছল চাতুরীর বিরুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে, পঞ্চম বাহিনীর ও অচল অবস্থা বজায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সংগ্রামের জন্য গভর্ণমেণ্টে স্থান লইয়াছে।

যে সমস্ত ফরাসী শক্তি আমাদের দেশের মুক্তির জন্য কার্য্যকরীভাবে লড়িতে চায় তাহাদের সমবেত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া ফ্রান্সের স্বার্থে আমরা গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছি।

আমরা আমাদেরই নির্দ্ধারিত সময়ে গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছি। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ফরাসী মুক্তি কমিটিগুলির ঐক্যের আদর্শে অবিলম্বে

ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতা গ্রেনিয়ার

আলজিয়ার্সে একটি সরকার গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

এই সরকারে অংশ গ্রহণ করিতে আমাদের যে দেরী হইয়াছে তাহা আমাদের দোষে নহে। সরকারে স্থান গ্রহণের বিষয়ে নভেম্বর মাসে যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, বিলো ও গ্রেনিয়ের তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। সেই সময়ে কমিউনিষ্টদের সরকারে নেওয়ার বিরুদ্ধে যাহারা আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, জাতীয় মুক্তি সংসদের সভাপতিই মন্ত্রী বাছিয়া লইতে পারিবেন। উত্তর আফ্রিকার মেজ কারী কারাগারে যে সকল কমিউনিষ্ট ডেপুটিরা কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের সরকারে ঢুকিতে বাধা দেওয়াই এ যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল। ভিসিপন্থীরা যেমন প্রতিরোধকারী কমিউনিষ্ট ও অন্যান্যদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে, পূর্বোক্ত বন্দী কমিউনিষ্টদের উপর সন্দেহ সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও সেই ভিসিপন্থী চেষ্টারই নামান্তর। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে প্রতিনিধি দল এখানে আসে তাহারা পার্টির প্রস্তাব উত্থাপন করে। ছ গল মেজ কারী কারাগারের বন্দী কমিউনিষ্ট বিলোকে মন্ত্রীসভায় নিতে স্বীকৃত হওয়ায় পার্টিও ফ্রান্সে অভ্যন্তর হইতে গ্রেনিয়েরকে আনিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পার্টি কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট কার্য্যসূচীর ভিত্তিতেই আমরা সরকারে স্থান গ্রহণ করিয়াছি। এই ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্টে প্রবেশ করা কেবল আমাদের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের দুইজন সদস্য ব্যক্তি হিসাবে গবর্ণমেণ্টে স্থান নাই, জনগণের প্রতিনিধিরা যে সকল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—সেই সব নিয়ম মানিবার জন্য পার্টির নির্দ্দেশ লইয়া আমাদের প্রতিনিধিরা গবর্ণমেণ্টে গিয়াছেন। তাঁহাদের সরকারে অংশ গ্রহণ করার অর্থ সমগ্র কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন সরকারের পিছনে যুক্ত করা। কাজেই এই ব্যাপারে সরকারের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, কি ভাবে স্বাধীনতা মিলিবে সে সম্পর্কে পার্টি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে। ফরাসী দেশে বিপুল কর্মোদ্যমের মধ্যে পার্টি দেখাইয়া দিয়াছে যে, অবিরত ও ক্রমান্বয়ে বিরাট বিদ্রোহমূলক কাজের মধ্য দিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি ও এইভাবে জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে দ্রুততর করার জন্য সর্বস্ব পণ করাই আজিকার প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় ঐক্য সম্পর্কেও পার্টির ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন একটি সংবাদপত্র লিখিয়াছে, জাতীয় ফ্রন্ট নাকি এইবার গঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উক্তিতে দুই রকমের ভুল আছে। প্রথমত গবর্ণমেণ্টে কমিউনিষ্টদের প্রবেশ না করা এতদিন ফ্রান্সে জাতীয় ফ্রন্ট গড়িয়া না ওঠার কারণ নয়। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় মুক্তি সংসদ আজো পর্য্যন্ত জাতীয় ঐক্যের গভর্ণমেণ্ট হইয়া উঠে নাই। এই কমিটিতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সহিত প্যারী কমিটির ব্যক্তিবর্গের তুলনা করিলে বোঝা যাইবে যে, এই গভর্ণমেণ্টকে জাতীয় ঐক্যের গবর্ণমেণ্ট করিয়া তুলিতে এখনো কত পরিশ্রম প্রয়োজন। ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট পার্টির যে বিরাট প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে, তাহার তুলনায় গবর্ণমেণ্টে তাহার অতি সামান্য সংখ্যার প্রতিনিধিত্বের কথা বাদ দিলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও কোন প্রতিনিধিত্ব এই সরকারে পায় নাই।

অথচ জার্মানদের হাতে ফ্রান্সে যাহারা প্রাণ বলি দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জনই শ্রমিক শ্রেণীর। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, ফরাসী দেশের জাতীয় ফ্রন্ট দলের কোন প্রতিনিধিকে এই সরকারে নেওয়া হয় নাই। অথচ এই সংগঠন ফরাসী দেশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিরোধকারী সংগঠন। সাহায্যকারী বাহিনীসহ সৈন্য ও গেরিলা বাহিনীতে তাহাদের অস্ত্র ও জনবল উত্তর আফ্রিকায় সংগৃহীত নূতন ফরাসীবাহিনীর তুলনায় নেহাৎ কম নয়। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে ঐক্যবদ্ধ যুব সংঘের কোন প্রতিনিধিত্ব নাই। অথচ সমস্ত যুবশক্তি এই সংঘের মধ্যে সংগঠিত। ইহারা জার্মানদের তাঁবে কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। অর্থাৎ ইহারাই হইল ফরাসী দেশে নূতন ফরাসী বাহিনীর প্রধান অংশ।

এই সমস্ত সত্ত্বেও অস্থায়ী সরকারে কমিউনিষ্টরা প্রবেশ করিবার ফলে সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে। ভিসি পন্থীদের চীৎকারেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। হিটলারী পশুরা যদি কেঁউ কেঁউ শুরু করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহারা ঠিক জায়গায় ঘা খাইয়াছে।

মিথ্যা আশার পরিবর্তে কঠোর শ্রম চাই

একথা ভুলিলে চলিবেনা যে, হিটলার-ফ্যাসিজম এখনো দৃঢ় ও ক্ষমতাশালী শত্রু। ইহাকে নির্মূল করিবার জন্য কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন।

শত্রু ধূর্ত্ত এবং তাহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রতারণাপূর্ণ আপোষের দ্বারা বা দারলাঁতন্ত্র খাড়া করিয়া তাহার হিংস্র শাসন বজায় রাখা। জাতীয়তা বিরোধী ব্যবসায়ী সংঘগুলিকে টিকিয়া থাকিতে দিবার নামেও সে ইহা করিতে পারে। প্রতিরোধকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এবং এমন কি আলজিয়ার্সেও কমিউনিষ্ট বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়া সেই সম্ভাব্য বিপদের গুরুত্বই প্রকাশ পাইতেছে।

তাহা ছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিনিধিবর্গের তরফ হইতে ১৯শে মার্চ্চ এতিয়ে ফাজোঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে "এখনো ব্যবসায়ী সংঘের অনেক দালাল বিভিন্ন মন্ত্রীদের অফিসের আশে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। গবর্ণমেণ্টে কমিউনিষ্টদের প্রবেশ ঠেকাইতে না পারিয়া তাহারা এখন কমিউনিষ্টদের গলায় ফাঁস লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ফ্রান্সকে জার্মাণ কবল-মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার সময় বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে সেই সম্পর্কে গণপরিষদের গত অধিবেশনের পরেই যে অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে—তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই আদেশটীর দ্বারা একটী "ফরাসী অ্যামগট" গঠন করা হইয়াছে; ফলে খুব অল্পসংখ্যক লোক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইবে, তাহারাই কেবল সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবে এবং ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। অবরোধের সময় ইহারা যথেচ্ছ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে এবং এখন হইতে বাহিরে থাকিয়াই সামরিক প্রতিরোধকারী সংগঠনগুলি মারফৎ তাহারা আদেশ জারী করিতে পারিবে। এই আদেশের ফলে যে অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই সঙ্গত। কারণ প্রতিরোধকারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের পরামর্শ না লইয়া এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে গণপরিষদের মঞ্জুরী ঘোষণা করায় জাতীয় সর্বময় ক্ষমতার হানি হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে, জাতীয় সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের এখনো কোন মীমাংসা হয় নাই। জানুয়ারী মাসে গণপরিষদের অধিবেশনে পার্টির নামে বিলো ঘোষণা করেন যে, ১৯১৮ সালে যেমন ক্লেমাসঁ ও ফসের দ্বারা বে-সামরিক ও সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব পৃথকভাবে গৃহীত হইয়াছিল, সেই গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করিয়া আমাদেরও একজন দেশরক্ষা সচিব ও অন্য একজন প্রধান সেনাপতি থাকা দরকার।

ইহা ছাড়া পঞ্চমবাহিনীও যথাসময়ে মাথা চাড়া দিয়াছে। কমিউনিষ্টরা সরকারে প্রবেশ করিবার চারদিন পরেই বড় বড় উপনিবেশিক জমিদারেরা সরকারকে ভয় দেখাইতে সুরু করে। অথচ ইহারাই ভিসি রাজত্বের দুই বছরে সমানে শত্রুকে মাল সরবরাহ করিয়া প্রচুর মুনাফা করিয়াছে। এবং ইহারাই আজ আমাদের খাদ্য সমস্যা জটিল করার জন্য দায়ী।

—কাজেই কমিউনিষ্টরা সরকারে ঢুকিয়াছে বলিয়া ফরাসীর স্বাধীনতার পথে সমস্ত বাধা লুপ্ত হইবে একথা মনে করা বিপজ্জনক হইবে—কিন্তু জাতীয় মুক্তি সংসদ এখনো প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের সরকার হয় নাই বলিয়া—তাহার মধ্যে কোন কাজ করা যাইবে না—এ কথা ভাবাও ভুল।

কারণ এ সব ত্রুটী সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে প্রতিরোধকারী জাতীয় কাউনসিলের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। যখন এই কাউনসিল গঠিত হয় তখন সশস্ত্র সংগ্রামকে ব্যাপক করিবার বিষয়ে এই কাউনসিলের দোমনা ভাব ছিল—কিন্তু আজ এই কাউনসিল সশস্ত্র সংগ্রামকে তাহার কাজের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছে।

কমিউনিষ্টদের নূতন কাজ

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ফরাসীতে অবস্থিত আমাদের কমিটি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যে কার্য্যসূচী প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই ভিত্তিতে জনসাধারণ যাহাতে অবিরত চেষ্টা করে, তারই আহ্বানস্বরূপ কম্যুনিষ্টরা অস্থায়ী ফরাসী সরকারে প্রবেশ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসূচীর ১১ লক্ষ কপি গেষ্টাপোর চোখে ধূলি দিয়া বিলি হইয়াছিল। এই কার্য্যসূচীতে পরিষ্কার ভাবে আদর্শ বলা হইয়াছে: ১। ফরাসী ভূমিকে একেবারে শত্রু-বিমুক্ত করা, ২। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া, ৩। জনগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছামত সরকার গঠন করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চিত করা।

অচল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, শুধু যুদ্ধ—ইহাই হইল আমাদের কার্য্যসূচীর ভিত্তি।

—"ওয়ার্ল্ড নিউজ এণ্ড ভিউজ" হইতে

প্যারিসে স্বাধীনতার লড়াই

১৯৪৩ সালের নভেম্বরে প্যারী মুক্তি কমিটি ২০টী দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ইহার মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি, সোশালিষ্ট পার্টি, র‍্যাডিকাল সোশ্যালিষ্ট, ক্রিশ্চিয়ান ডেমক্র্যাট, রিপাব্লিকান সোশ্যালিষ্ট, যুবসংঘ, নারীসংঘ, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ক্রিশ্চিয়ান ভ্রাতৃসংঘ, সৈন্য ও গেরিলাবাহিনী, জাতীয় ফ্রন্ট, সেবাসমিতি, বেসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীদের সংঘ প্রভৃতিদের চূড়ান্ত ভোট দিবার অধিকার ছিল—এবং প্যারিস সহরের ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উপদেশমূলক ভোটও রহিয়াছে। ইহার আদর্শ: দেশ স্বাধীন করা, পূর্ণ স্বরাজ আয়ত্ত করা, জাতীয় ইচ্ছা মানিয়া নেওয়া এবং বিশ্বাসঘাতককের সাজা দেওয়া

Regd. No. C. 2836

ওয়ারশ ও পূর্ব্বপ্রুশিয়ায় তুমুল যুদ্ধ

প্রথম ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে

এক মাসে ১ লক্ষ 40 হাজার নাৎসী সৈন্য নিহত

গত ১৮ই আগষ্ট রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মস্কো হইতে জানাইয়াছেন—খাস জার্ম্মান এলাকায় যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। লালফৌজ কর্তৃক পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সীমান্ত ভেদের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু জেনারেল চেনিয়া-কোভোস্কির সৈন্য দল জার্ম্মান সীমান্তে প্রবেশ করিয়া নূতন ইতিহাস রচনা করিতে চলিয়াছে।

ঐ দিনই সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে 'গ্রেটার জার্ম্মানী' নামে দুর্দ্ধর্ষ এস, এস ট্যাঙ্ক বহরের অবশিষ্টগুলি এক্ষনে পলায়ন করিতেছে। এই ট্যাঙ্ক বহরের একশত ট্যাঙ্ক একদিনে ধ্বংস হয়। জার্ম্মান মৃতদেহে সেসুপ নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। পলায়নপর জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ গ্রাম সমূহের ভস্মরাশির মধ্য দিয়া সোভিয়েট ট্যাঙ্কগুলি অগ্রসর হইতেছে, সম্মুখ ভাগে প্রউইট প্রভৃতি যে সব গ্রাম ও সহর রহিয়াছে তাহাও আগুনে ভস্মীভূত হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে সোভিয়েট অগ্রগতির পথে জার্ম্মানরা পোড়ামাটির একটি বেষ্টনি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। জনৈক সোভিয়েট সমরনায়ক বলেন—এখন উহারা যত ইচ্ছা ভস্মীভূত করুক, কারণ এখন যা কিছু ভস্মীভূত করিবে তাহা উহাদেরই জিনিষ, আমাদের নয়।

গত সপ্তাহে আমরা পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার লড়াইয়ের আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছিলাম যে এখানে দক্ষিণ দিক হইতে লালফৌজ জেনারেল জাখারভ ও মার্শাল রকোসভস্কীর নেতৃত্বে এবং উত্তর দিক হইতে জেনারেল চেনিয়াকোভস্কী ও জেনারেল বাগ্রামিয়ানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই তুমুল লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

আজ কয়েকদিনের ব্যবধানে লালফৌজ তাহাদের অবস্থার আরও উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যুদ্ধের তীব্রতা ও জার্ম্মান প্রতিরোধের চেষ্টা ভীষণ উগ্র হইলেও সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগমন কিছুতেই প্রতিহত হইতেছে না। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় সীমান্তের অনুমান দশ মাইল পূর্ব্বে ভিল্কো-ভিসকিস জার্ম্মানরা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং মারিয়ামপোলের উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজ পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সীমান্তে পৌছিয়াছে। জেনারেল জাখা-রভের আর্ম্মি গ্রুপের নূতন নূতন সৈন্যদল বিয়েব্রজা নদীব্যূহ ভেদ করার পর জার্ম্মান সীমান্ত পর্য্যন্ত শেষ কয়েক মাইল পথে দ্রুত আগাইয়া গিয়াছে। মার্শাল ষ্টালিনের ১৬ই আগষ্টের ঘোষণায় জানা গিয়াছে যে পূর্ব্ব প্রুসিয়ার প্রবেশ পথে সুদৃঢ় জার্ম্মান ঘাঁটি ও সহর ওসোউইক অধিকৃত হইয়াছে।

ওয়ারসর লড়াই

পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার লড়াইয়ের সমান তালে তাল রাখিয়া লালফৌজ ওয়ারস দখলের জন্যও চরম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

১৯শে আগষ্টের একটি জার্ম্মান সংবাদে জানা যায় যে সোভিয়েট বাহিনী অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বিমানের সহায়তায় ওয়ারসর উত্তর-পূর্ব্বে এক নূতন আক্রমণ শুরু করিয়া দিয়াছে. ওয়ারশ'র উপকণ্ঠে হাতাহাতি সংগ্রাম চলিতেছে এবং এই অঞ্চলের গ্রামগুলি বারংবার হাত বদল হইতেছে।

জার্ম্মান সমর সংবাদদাতা ফন্ হ্যমার বলিয়াছে—ওয়ারশ'র পূর্ব্ব ও উত্তরে জার্ম্মানব্যূহ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অঞ্চলে আরও সরাইয়া আনা হইয়াছে।

এই অঞ্চল হইতে সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে এক দল লালফৌজ ইতিমধ্যেই ওয়ারশর পাশ কাটাইয়া আগাইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বপ্রুসিয়ার ও ওয়ারশ'র লড়াই আজ তীব্র হইতে ভীষণ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। হিটলার-বাহিনী শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে যদি কিছুদিনের জন্যও এই দুই অঞ্চলে লালফৌজকে প্রতিরোধ করা যায়। কারণ তাহারা জানে যে এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর তাহাদের ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

বিখ্যাত সমর সমালোচক ম্যাক্স ওয়ার্থ একস্থানে মন্তব্য করিয়াছেন যে **প্যারিসের উত্তর-পশ্চিমে, ও য়ারশর চতুষ্পার্শ্বে ও পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার নিকট সন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান নাৎসী বাহিনীর পরাজয় হইলেই হিটলারের সমর-যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে।** এই দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ের ভীষণতা দেখিয়া একথাই মনে হয় যে কিছুদিনের জন্য টিঁকিয়া থাকিতে হইলেও এই অঞ্চলে লালফৌজকে ঠেকান দরকার এবং হিটলার তাই মরিয়া হইয়া আদেশ দিয়াছে যে, যে কোন রকমে সোভিয়েট সেনার অগ্রগমনে বাধা দাও।

বাল্টিকে অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীকে উদ্ধারের জন্য দারুণ চেষ্টা

লিথুয়ানিয়ায় জার্ম্মান বাহিনী সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিয়া বাল্টিকে অবরুদ্ধ জার্ম্মান বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য সিয়াউলিয়াই অঞ্চলে এক প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। তিনটী জার্ম্মান ট্যাঙ্ক বহর সোভিয়েট যোগাযোগ কেন্দ্রের বহির্ব্যূহে বারংবার আক্রমণ চলাইতেছে। ক্ষুদ্র একটি 'সেক্টরেই' একশতটি ট্যাঙ্ক দিয়া আক্রমণ চালানো হইয়াছে। তাই বাল্‌টিক রণক্ষেত্রের যুদ্ধের এক নূতন পর্য্যায় শুরু হইয়াছে। সমুদ্র পথে সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী করিয়া শেষ পর্য্যন্ত লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় টিঁকিয়া থাকিতে জার্ম্মানদের দৃঢ়সংকল্প রহিয়াছে, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধ সত্ত্বেও রুশ আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

দক্ষিণ পোলাণ্ডে মার্শাল কনিয়েভ বাহিনীর সাফল্য

১৫ই আগষ্টের সোভিয়েটের বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, ১৩ই জুলাই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দক্ষিণ পোলাণ্ডে মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যদের হাতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার জার্ম্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে। ১৮ই আগষ্ট মার্শাল কনিয়েভের নিকট মার্শাল ষ্টালিনের এক হুকুম নামায় ঘোষিত হইয়াছে—প্রথম ইউক্রেন রণাঙ্গনের সৈন্যদল সান্দোমিয়েরেজ অঞ্চলে ভিশ্চুলা নদী পার হইয়া তুমুল যুদ্ধ চালাইবার পর ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং নদীর পশ্চিম তীরে তাহাদের সেতুমুখ ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করে ও আজ ১৮ই আগষ্ট ভিশ্চুলার পশ্চিমতীরে জার্ম্মানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সান্দোমিয়েরেজ সহরটি আক্রমণ করিয়া দখল করে। এই সহরটি ভিশ্চুলা নদী তীরে লুবলিনের ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

কংগ্রেস-লীগ অভিযান

(১ম পৃঃ শেষাংশ)

হিন্দুমুসলমানের রাজনৈতিক মিলনের প্রতীক হিসাবে সভান্তের এই ঘটনা বঙ্গভঙ্গের ভয় চূর্ণ করিয়া দেয়। এই দিনে ঠিক এই সময়ে শ্যাম পার্কে ২০০ শ্রোতা লইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু যখন গান্ধী-জিন্না আপোষের ফলাফল হিসাবে বঙ্গভঙ্গের বিভীষিকা বুঝাইতেছিলেন, তখন তিনি বোধ হয় ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, ঠিক ঐ সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৫০০০ নাগরিক সমবেতভাবে বাংলার স্বাধীনতার ও অখণ্ড ঐক্যের ভিত্তিই সুদৃঢ় করিতেছিল।

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রসেনার অবতরণ

শত্রুর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন

ফ্রান্সের দক্ষিণ কূলে নামিয়া মিত্রবাহিনী হাজার বর্গ মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়িয়া শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। এতদিনে যেন আসল দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া উঠিতেছে।

এই অঞ্চলে শত্রু বিশেষ বাধা দিতে পারে নাই। তুলঁ ফ্রান্সের একটী প্রধান বন্দর; মিত্রসেনা প্রায় ইহার শহরতলীতে পৌছিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় বন্দর মার্সাই হইতে মিত্রসেনা মাত্র আঠারো মাইল তফাতে রহিয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের যুদ্ধে একজন জার্ম্মান সেনাপতি বন্দী হইয়াছে; তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জানায় যে, হিটলার ও তাহার পার্শ্বচরেরা ধরিয়া বাঁধিয়া সকলকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, নহিলে আজ সকলেই বুঝিতেছে যে, জার্ম্মানীর জিতিবার কোন আশা নাই।

প্যারিসের পতন আসন্ন

উত্তর ফ্রান্সে লড়াইয়ের গতিক এমন যে সেখানে শত্রুর অবস্থা দিন দিন যারপর নাই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। সুইডেন হইতে খবর আসিয়াছে যে, আমেরিকান সৈন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের শহরতলীতে লড়িতেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে প্যারিসের পতন ঘটিতে পারে। জার্ম্মানরাই বলিতেছে যে, প্যারিসে জার্ম্মান দূত আবেৎস্ দলবলে পাততাড়ি গুটাইয়া পলাইয়াছে। শত্রু পলাইবার সময় এই ইতিহাসবিশ্রুত শহরের অসংখ্য সৌধমালা ধ্বংস করিবে কি না, ইহাই এখন অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতেছে।

নর্ম্মান্দির যুদ্ধে শত্রুর হতাহত ও বন্দীসংখ্যা চারি লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। লামাঁ হইয়া শাত্রঁ ও অর্লেয়াঁ পর্য্যন্ত মিত্রসেনা প্রায় দখল করিয়াছে। উত্তর হইতে কিছু সৈন্য সেখানে স্থানান্তরিত করিতে গিয়া শত্রুপক্ষ বিপদে পড়িয়াছে, ফালেজে শত্রুপক্ষের অনেকে ঘেরাও হইয়া পড়ার আশঙ্কায় এখনও রহিয়াছে। সেন্ নদীর পূর্ব্বে প্যারাশুট করিয়া বহু মিত্রসেনা নামিয়াছে। এছাড়া স্থলযুদ্ধ করিয়াও অনেকে নদী পার হইয়াছে। প্যারিসে শত্রুকে আর বেশীদিন টিঁকিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না।

ফরাসী দেশভক্তদের উৎসাহ

দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে যে দ্রুতগতিতে মিত্রসেনা অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে তিনশো মাইল ব্যবধান কাটাইতে তাহাদের বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না। মিত্রশক্তির সাফল্যে ফরাসী দেশভক্তদের দায়িত্ব কম নয়। ইতিমধ্যেই ফরাসী দেশভক্তদের ভিশি শহরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সংবাদ আসিয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে যেখানে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার নিকটে স্পেনের সীমান্তের কাছে দেশভক্তরা সংগ্রাম চালাইতেছে।

'দেশদ্রোহীদের কিছুতেই পলাইয়া যাইতে দিও না' বলিয়া বেতারবাণী ফ্রান্সে প্রচার করা হইয়াছে; মিত্রসেনাকে দেশভক্তেরা যাহাতে সাহায্য করে, সেজন্যও আবেদন করা হইয়াছে। মিত্রসেনার অগ্রগতিতে সারাদেশে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। সুইস্ সীমান্তের কাছে দেশভক্তদের দাবাইবার জন্য নূতন নূতন জার্ম্মান সৈন্য আনিয়াও পারিয়া উঠিতেছে না। ফ্রান্সের বহু স্থান হইতে শত্রুকে সরিয়া আসিতে হইবে।

যুদ্ধজয়ের উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ

হাওয়াই বোমা পাঠাইয়া অসংখ্য বাসগৃহ নষ্ট করিয়া ও বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটাইয়া শত্রু ব্রিটেনের মনোবল ভাঙ্গিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐভাবে কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতির মনোবল নষ্ট করা যায় না। বরং জার্ম্মানীরই মনোবল ভাঙ্গিবার লক্ষণের অভাব নাই। সুইডেনে বেজায় গুজব যে স্বয়ং গোয়েরিং হিটলারবিরোধী চক্রান্তে জড়িত হওয়ার সন্দেহে নিজগৃহে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। ইতালীতে জার্ম্মানরা পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া নিরুৎসাহভাবে লড়িতেছে, চোখ-কান বুজিয়া ফ্লোরেন্সের মত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহরের উপর গোলা ফেলিতেছে। জিতিবার আশা আর তাহারা রাখে না। শুনা যাইতেছে মিত্রসেনা শীঘ্রই আলবেনিয়ার উপকূলে নামিতে পারে।

ট্রামের ভিড় কি কিছুই কমানো যায় না?

(২য় পৃঃ শেষাংশ)

ততই আরও বেশী গাড়ী বসাইয়া দেয়—ফলে ভিড় প্রায় সমানই থাকে। তেমনই সকালে অফিস টাইম শেষ হওয়া মাত্র বিকাল পর্য্যন্ত অনেকগুলি গাড়ী বসাইয়া রাখা হয়। কিছুটা গাড়ী বসানো দরকার, নহিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য। কিন্তু আরও কিছু গাড়ী অনায়াসেই চালানো যায়। তা ছাড়া অফিস টাইমে গাড়ীগুলি ২ হইতে ৫ মিনিট অন্তর ছাড়ে আর যখন অফিস টাইম নয় তখন গাড়ীগুলি ৫ হইতে ১০ মিনিট অন্তর ছাড়ে অথচ ভিড় এই পরিমাণে কমে না। অন্য সময়েও গাড়ীগুলি ছাড়িবার সময় আর একটু ঘন ঘন করিলে প্রত্যেক গাড়ীর মোট পাড়ির সংখ্যা বাড়িয়া যায়, অনেক বেশী লোক চড়িতে পারে বা সুস্থির হইয়া চলিতে পারে। কোম্পানীর প্রস্তাবমত কলিকাতায় অফিস-কাছারি খুলিবার ও বন্ধ হইবার সময় আরও খানিকটা ছড়াইয়া দিলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী-গুলি এইরূপ ঘন ঘন ছাড়িলে অফিসের লোকেরাও ইহার সুবিধা পাইতে পারিবে। কিন্তু গাড়ী ঘন ঘন না ছাড়িয়া শুধু অফিসের সময় ছড়াইয়া দিলে যাত্রীদের বর্ত্তমান অবস্থার অপেক্ষা বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না।

অবশ্য থামিবার জায়গা কমাইয়া কিংবা গাড়ী আরও ঘন ঘন ছাড়িয়া মোট গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইলে গাড়ীর কণ্ডাক্টর প্রভৃতির খাটুনি বর্ত্তমানের অপেক্ষা বাড়িবে। এমনিই তো ১৯৩৯-এর অপেক্ষা ডবলেরও বেশী প্যাসে-ঞ্জার সামলাইতে তাহাদের খাটুনি ডবলেরও বেশী বাড়িয়াছে। তা ছাড়া মিলিটারী লরী প্রভৃতির ধাক্কায় একসিডেন্ট প্রচণ্ড রকম বাড়িয়া শ্রমিকদের ঝুকি অনেক বাড়িয়াছে তাহা গত মার্চ মাসে কোম্পানীই কর্পোরেশনের কাছে চিঠিতে জানাইয়াছিল। ইহার উপর আরও খাটুনি বাড়িলে তাহাদের কাজের সময়-কমাইতে হইবে, নূতন কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই বাড়তি খরচা বহন করা কোম্পানীর পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। ১৯৪২ সালে কোম্পানীর বাৎসরিক লাভ হইয়াছিল ৩০৯২৭০১ টাকা। আর ১৯৪৪-এর প্রথম পাঁচ মাসেই লাভ দাঁড়াইয়াছে ২৭৭৪৩০০ টাকা। অর্থাৎ লাভ ডবলেরও বেশী বাড়িয়াছে। ইহার কিছু অংশ যাত্রীদের জন্য খরচ করা তো খুবই উচিত। তা ছাড়া এই ব্যবস্থায় যাত্রী আরও বাড়িবে, কোম্পানীর আমদানীও বাড়িবে—বাড়তি খরচ হয় তো সবটাই মিটিয়া যাইবে।

কোম্পানী যেসব তথ্য জনসাধারণকে জানায় না, সেই সব তথ্যই আমরা জন-সাধারণের কাছে উপস্থিত করিলাম। আমাদের প্রস্তাবগুলি কাজে লাগাইলে ট্রামে দৈনিক আরও ৫০ হাজার হইতে ২ লক্ষ পর্য্যন্ত যাত্রী চলাচলের নূতন ব্যবস্থা হইতে পারে।

৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা ও শহরতলীতে

মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি কি করুণ!

আপনার অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন

তিনটী সাধারণ ছাপোষা পরিবারের আয়-ব্যয়

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা] ৩০শে আগষ্ট, বুধবার, '৪৪, ১৪ই ভাদ্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

কলিকাতা ও শহরতলীতে চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তের জীবনধারণ সমস্যা একেবারে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সম্প্রতি কলিকাতার কোন একটী অফিসের ১২ জন কর্মচারীর মাসিক আয়-ব্যয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। তাহার ভিতর হইতে একেবারে খারাপ, একটু ভাল এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এইরূপ তিনটী পরিবারের বিবরণ নীচে দিলাম। মাসিক ৫০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত মাহিনার সমস্ত শিক্ষিত চাকুরীজীবী বাঙ্গালীই উহার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থার করুণ ছবি খুঁজিয়া পাইবেন। যুদ্ধের আগের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন।

সরকারী রেশনে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু মাথা পিছু যে পরিমাণে বরাদ্দ হইয়াছে একজন লোকের অন্তত ততটা পাওয়া দরকার আমরা ইহা ধরিয়াই স্থির করিয়াছি পরিবারগুলির মাসিক কত খাদ্যবস্তু খাওয়া **উচিত** (তালিকাগুলির ২য় সারি দেখুন)। সরকারী হিসাব মত ১২ বছর হইতে উর্দ্ধ বয়স্কদের পুরা রেশন ধরা হইয়াছে এবং দুগ্ধপোষ্য ছাড়া অন্যদের আধা রেশন ধরা হইয়াছে। আর যে সব খাদ্যবস্তু সরকারী রেশন তালিকায় নাই তাহার মাথা পিছু খরচের পরিমাণ আমরা জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের বরাদ্দের সঙ্গে সমান ধরিয়াছি। তেল, কয়লা প্রভৃতি দু একটী জিনিষ আন্দাজে, ধরিয়াছি। এ হিসাবে প্রত্যেক বয়স্ক লোকের খাদ্যবস্তুর উচিত বরাদ্দের সাপ্তাহিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে :—

(১) চাল, আটা—৪ সের (২) ডাল—১ সের (৩) চিনি—দেড় পোয়া, (৪) আলু—৭ ছটাক, (৫) অন্য সব্জি—৭ ছটাক (৬) মাছ—সাড়ে তিন ছটাক, (৭) সরিষার তৈল—আধসের (মাসিক), (৮) দুধ—১টী শিশুর জন্য দৈনিক ১ পোয়া ও চায়ের জন্য ১ পোয়া।

যুদ্ধের আগের দর সরকারী সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট বা ষ্টেট সম্যান পত্রিকার হিসাব হইতে লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান দরও ঐ ভাবেই লওয়া হইয়াছে। কাপড়, ঔষধ, তামাক, দেশলাই, লবণ প্রভৃতির কোন খরচ ধরা হয় নাই। তবুও অবস্থা কি ভয়াবহ দেখুন !

১নং পরিবার :—৪ জন ১২ বছরের উর্দ্ধে, ২জন ১২ বছরের কম, ১জন দুগ্ধপোষ্য। মাসিক আয় ৬৪৲ টাকা

জিনিষ	গোটা পরিবারের উচিত বরাদ্দ	যুদ্ধের আগে দর	যুদ্ধের আগে মোট দাম	বর্ত্তমান দর	বর্ত্তমান মোট দাম	এখন বাস্তবিক যেভাবে খরচ করেন
চাল-আটা	২ মণ ৬ সের	৪।৵৭॥ মণ	৯।৶১৫	১৬।০ মণ	৩৪৸৶০	} ৪৫৲
ডাল	২১ সের	৵৪ পাই সের	৩/০	॥০ সের	১০॥০	
চিনি	৮ সের	।১০ সের	২।০	।৶০ সের	৩॥০	
সরিষার তৈল	২॥০ সের	।৵১০ সের	১৻৫	১।০ সের	৩৵০	৫৲
দুধ	একজন শিশুর ১৫ সের	।০ সের	৩৸০	॥/০ সের	৮।৶০	১০৲
বাজার: আলু	৯॥০ সের	/১০ সের	৸৵৫	৸৵০ সের	৮।/০	} ১০৲
বাজার: অন্য সব্জী	৯॥০ সের	/১০ সের	৸৵৫	॥০ সের	৪৸০	
বাজার: মাছ	৪৸০ সের	॥/০ সের	২॥৵১৫	২৲ সের	৯॥০	
কয়লা	৩ মণ	॥০ মণ	১॥০	২৲ মণ	৬৲	} ৮৲
কেরসিন	৪ বোতল (বড়)	/১৫ বোতল	।৶০	॥০ বোতল	২৲	
			২৫৸৶৫		৯১/০	
ট্রেণভাড়া						২।০
ধোপা নাপিত						৪৲
কাপড়—? স্কুলের মাহিনা—? চা—?						৪৲
					মোট	৮৪।০
					মাসিক দেনা—	২০।০

মন্তব্য: যুদ্ধের আগে যে খাদ্য খাইতে ইহার ২৬৲ লাগিত এখন তাহার দাম ৯১৲। সেজন্য ইহারা খাওয়া একদম কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু ডাল, ভাত ও ডাঁটা চচ্চড়ি খান। আলু, মাছ, চা, তামাক প্রভৃতি একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতেও কুলায় না বলিয়া ছেলেদের স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। তবুও প্রতিমাসে দেনা দাঁড়ায় ২০।০।

২নং পরিবার :—৩ জন ১২ বছরের উর্দ্ধে, ২ জন ছোট, দুগ্ধপোষ্য নাই। মাসিক আয় ৭০৲

	গোটা পরিবারের উচিত বরাদ্দ	যুদ্ধের আগে মোট দাম	বর্ত্তমান মোট দাম	এখন বাস্তবিক যে ভাবে খরচ করেন
চাল-আটা	১ মণ ২৯ সের	৭॥/৫	২৮৻১০	} ৩০৲
ডাল	১৭ সের	২।৶১৫	৮॥০	
চিনি	৬॥ সের	১৸/১৫	২৸/১০	
সঃ তৈল	২ সের	৸/০	২॥০	৫৲
দুধ (চায়ের)	৭॥ সের	১৸৵০	৪৶১০	৫৲
আলু	৭॥ সের	॥৶৫	৬॥/০	} ১০৲
অন্য শব্জী	৭॥ সের	॥৵৫	৩৸০	
মাছ	৩৸ সের	২/১৫	৭॥০	
চা	২ পাউণ্ড	১৲	২৲	২৲
কয়লা	২॥ মণ	১॥০	৫৲	৫৲
কেরোসিন	৪ বোতল	।৶০	২৲	২৲
		২১৲	৭২৸৵১০	
ট্রাম	—	?	?	২৲
বাড়ীভাড়া	—	?	?	১৫৲
ধোপা-নাপিত	—	?	?	৪৲
কাপড় ? স্কুলের মাহিনা ইত্যাদি ?			মোট	৮০৲
			দেনা—	১০৲

মন্তব্য

যুদ্ধের আগে যে খাদ্যে ২১৲ লাগিত এখন তাহাতে ৭৩৲ লাগে। কাজেই ইনি চাল-ডাল খাওয়ার পরিমাণই কমাইয়া আধা-উপবাসী থাকেন। মেয়েটীকে স্কুল ছাড়াইয়া দিয়াছেন, ছেলের মাহিনা ছ'মাস বাকী পড়িয়াছে। আলু ও মাছ একেবারে ছাড়িয়াছেন। স্ত্রীর গহনা ভাঙ্গিয়া ঘাটতি পূরা করিতেছিলেন, এখন তাহাও শেষ হইয়াছে।

৩নং পরিবার :—৪জন ১২বছরের উর্দ্ধে ; শিশু নাই। মাসিক আয় ৮০৲

গোটা পরিবারের উচিত বরাদ্দ	উহার দাম (যুদ্ধের আগে)	উহার দাম (বর্ত্তমানে)	এখন বাস্তবিক কিসে কত খরচ করেন
১ মণ ২৯ সের	৭॥/৫	২৮৻১০	} ৪০৲
১৭ সের	২।৶১৫	৮॥০	
৬ সের	১৸/৫	২৸/১০	
২ সের	৸/০	২॥০	
৭॥ সের	১৸৵০	৪৶১০	১০৲
৭॥ "	॥৶৫	৬॥/	} ২০৲
৭॥ "	॥৶৫	৩৸০	
/৩৸"	২/১৫	৭॥০	
২ পাউণ্ড	১৲	২৲	২৲
৩ মণ	১॥০	৬৲	৬৲
৪ বোতল (বড়)	।৶০	২৲	২৲
	২১৻১০	৭৩৸৵১০	
ট্রাম এবং ট্রেণভাড়া			৩৸০
স্কুল (দুই ছেলে ও প্রাইভেট টিউটর)			১৮৲
ধোপা-নাপিত			৩৲
		মোট	১০৪৸০
		মাসিক দেনা—	২৪৸০

মন্তব্য

ইহার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা, সৌভাগ্যক্রমে পোষ্যও কম এবং পৈত্রিক ভিটায় থাকেন বলিয়া বাড়ীভাড়া লাগেনা। সেজন্য তিনি এখনও ভাত, ডাল, চচ্চড়ির উপর মাছের ঝোলও খাইয়া থাকেন এবং ছেলেদের মাষ্টারকে এখনও তাড়ান নাই। তবুও ইহাকে মাসে ২৫৲ দেনা করিতে হয়— কাপড়, সিগারেট প্রভৃতির খরচ না ধরিয়াই।

সম্পাদকীয়

ঐক্যের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রের আঘাত

বাংলা সরকার সম্প্রতি হুকুম জারি করিয়াছে, সারা বাংলা দেশে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন সভা সমিতি, মিছিল প্রভৃতি করা চলিবে না।

এক বছরেরও আগে লীগ মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কলিকাতা প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাংলা দেশের অন্য সব জায়গায় সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা রদ করা হইয়াছিল। ইহা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। সভাসমিতির এই স্বাধীনতার সুযোগে কেহ দেশরক্ষার অসাধারণ বিরোধিতা করিয়াছে এমন অভিযোগও খুব বেশী ওঠে নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সভাসমিতির অধিকার হইতে যুদ্ধের কোন ক্ষতি হয় নাই।

বরং অবস্থা উন্নত হইয়াছে। ভারত তথা সারা পৃথিবীতেই ফ্যাশিষ্টবিরোধী যুদ্ধ সফলভাবে অগ্রসর হইতেছে। হিটলারের অমানুষিক পাশবিকতায় যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, আজ মিত্র জাতিসমূহের বিজয় অভিযান তাহাদিগকেই সকল রকম স্বাধীনতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আর স্বাধীনতার আশা পাইয়া ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি সর্ব্বত্র জনগণের বিরাট অভ্যুত্থান ফ্যাশিষ্টবিরোধী যুদ্ধকেই আরও সফল করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশেও দেশভক্তদের ভ্রান্ত উত্তেজনা বহুদিন শান্ত হইয়া গিয়াছে। মুক্তির পর গান্ধীজি যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যাপক আইন অমান্য বা ধ্বংসমূলক সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ফ্যাশিষ্ট বিরোধ আদর্শে পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়াছেন তাহাতেও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া দেশরক্ষার অনেক বেশী অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আশা এই সম্ভাবনাকেই আরও সুদৃঢ় করিতেছে।

কিন্তু তবুও এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হঠাৎ এই আক্রমণ আরম্ভ হইল কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মধ্যেই নিজেদের অবলুপ্তির ছায়া দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরি-ওয়েভ্‌ল হইতে এন, এন, সরকার-শ্যামাপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের বাংলায় আজ ঐক্যের অপূর্ব্ব জোয়ার উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে কংগ্রেস ও লীগের মিলিত জনসমাবেশ হইতে রণধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে—দেশকে স্বাধীন করিবার জন্যই আমরা ঐক্য চাই। এই মহান ঐক্যে দেশরক্ষা নিশ্চিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতাও নিশ্চিত হয়। তাই সন্ত্রস্ত আমলাতন্ত্র সেই জনসমাবেশ ও উৎসাহের কণ্ঠরোধ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইবার জন্য আকুল আঘাত হানিয়াছে।

(শেষাংশ ২য় পৃঃ দেখুন)

গান্ধীজী যখন চান কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য

বাংলার কংগ্রেস সেবীরা কি তখন কংগ্রেসে ভেদ বাড়াইবেন ?

[ভবানী সেন]

খাদিপন্থীদের সিদ্ধান্ত

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে খাদিপন্থী কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক দলগত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"কংগ্রেসকর্ম্মী অন্য কোন রাজনৈতিক সংস্থার সদস্য হইতে বা তৎপ্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে পারেন না, একথা মনে করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী অন্য সংস্থায় যোগ দিয়াছেন তাঁহারা কংগ্রেস কর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না, ইহাই আমাদের অভিমত। অপর রাজনৈতিক সংস্থাভুক্ত লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত সভায় আমাদের মতাবলম্বী কর্ম্মীরা যোগ দিলে বর্ত্তমান অবস্থায় লোকে বিভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব এবংবিধ সভায় তাঁহারা যোগ দিবেন না বা এরূপ সংস্থার সহিত যুক্ত হইয়া সভার আয়োজন করিবেন না।"

কমিউনিষ্টদের লক্ষ্য করিয়াই নাকি এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই প্রস্তাবের অর্থ সরল ভাষায় দাঁড়ায় এই—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একত্র ভাবে কোন সভাসমিতি করা হইবে না, কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস কর্মী হিসাবে গণ্য করা চলিবেনা। এই সভায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে প্রস্তাবের এই অর্থই উক্ত সভা গ্রহণ করিয়াছে।

যদিও প্রস্তাবের ভিতর এই কথা আছে যে "যাঁহারা আমাদের সহিত একমত পোষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের জন্য উপরোক্ত নীতি সমীচিন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি" তাহা হইলেও ইহাকে শুধু মাত্র একটা দলগত মত বলিয়া উপেক্ষা করা চলেনা, কারণ খাদীপন্থী কংগ্রেস কর্মীরা বাংলার কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী অংশ, তাঁহারা সকলেই একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী এবং বাংলার কংগ্রেসের শক্তি ও ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহাদের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া প্রশ্নটি শুধুমাত্র কমিউনিষ্টদের অধিকারগত প্রশ্ন নয়, ইহার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের শক্তি ও দায়িত্বের কথা।

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ

গান্ধীজী যখন ঘোষণা করিলেন যে রাজাজীর ফরমুলার ভিত্তিতে জিন্না সাহেবের সঙ্গে তিনি কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য মীমাংসা করিতে প্রস্তুত, বাংলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই সময় হইতেই গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন আরম্ভ করেন। এ অবস্থায় শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় গান্ধীজীর সপক্ষে আন্দোলনে নামা দূরে থাকুক, তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদকেই সমর্থন করিয়াছেন, কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলন ডাকিতে অস্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার স্বমতাবলম্বীদের লইয়া দলগত ভাবে গান্ধীজীর পন্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে কাজ কংগ্রেসের বাহিরে করিতেছেন, কিরণবাবু সেই কাজ কংগ্রেসের ভিতর করিতেছেন।

জনগণের সংযুক্ত অভিযান

এ অবস্থায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত তাঁহার বাড়ীতে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে কিরণবাবুকেও আহ্বান করা হইয়াছিল তাঁহার মতামত বলিবার জন্য। কিন্তু তিনি তাহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী কংগ্রেসসেবীরা ছিলেন। আলোচনার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে গান্ধীজির ঐক্য প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য বাংলার জনমত সৃষ্টি করা আমাদেরই কাজ, হিন্দুমহাসভা এই প্রচেষ্টা পণ্ড করিবার জন্য যে অভিযান চালাইতেছে তাহা ব্যর্থ করিতে হইবে। কাজেই তাঁহারা স্থির করেন যে যাঁহারা কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রচেষ্টার পক্ষপাতী সেই সমস্ত দলের ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে গণআন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিষ্টদের সমবেত প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বড় বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত সভায় লীগনেতারা স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্যের সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন, শ্রীযুত সীতারাম সাকসেরিয়া, বসন্তলাল মুরারকা প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সমস্ত সভায় যোগদান করিয়া জনমত উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। হাজার হাজার লোক এই সমস্ত সভায় আসিয়া অনুভব করিয়াছে যে বাংলায় হিন্দুমুসলমান ঐক্যের এক নবযুগ উদীয়মান, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন পর্য্যায় উপস্থিত। মহাসভার বিরোধিতা ইহাতে খর্ব্ব হইয়া যায়, সুতরাং স্বভাবতঃই শ্যামাপ্রসাদবাবু এই যুক্ত-অভিযান পছন্দ করিতে পারেন নাই। আমলাতন্ত্রও আতঙ্কিত হইয়া বাংলায় সভা সমিতি বন্ধ করিয়া নূতন আদেশ জারী করিয়াছে।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সংযুক্ত অভিযানে যোগ দেওয়ায় উৎসাহিত হইয়াছে মুস্‌লিম লীগ্। তাই মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের সঙ্গে এই আন্দোলনে সহযোগিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, এবং এমন সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে যে কংগ্রেস যদি একতাবদ্ধভাবে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হয় তাহা হইলে বঙ্গীয় লীগ হয়ত এ বিষয়ে বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে একটি মীমাংসায় আসিতে পারে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে খাদিপন্থীগণ সংযুক্ত অভিযানের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া শ্যামাপ্রসাদবাবুর অভিযান সফল করিবার পন্থা নয় কি ?

কংগ্রেসের পন্থা কোন্‌টি ?

খাদিপন্থীদের সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের অনুসৃত পন্থার বিরোধী। কংগ্রেস একটী গণপ্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের ভিতর বিভিন্ন মতাবলম্বী কর্ম্মীরা স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত ভাবে যোগদান করায় কংগ্রেস শক্তিশালী হইয়াছে, কংগ্রেস একটি ব্যাপক গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেস গান্ধীবাদী, সোশালিষ্ট, কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য মতাবলম্বী সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের যুক্তপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্নৌ কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেসের গণসংযোগ বাড়াইবার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করিতে হইবে, এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে।" এই অভিভাষণে পণ্ডিত নেহেরু অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থাকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। ফৈজপুর কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের অভিভাষণে শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও বলেন "কংগ্রেসের ভিতরই সকল রকম রাজনৈতিক মত প্রতিফলিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কংগ্রেস অত্যন্ত ব্যাপক এবং গণতান্ত্রিক, ইহার ভিতর প্রত্যেকেই তাহার স্বমত উপস্থিত করিতে পারে।" ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত নেহেরু বলেন—"কংগ্রেসের ভিতর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের ভিতর মতবাদের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা সমবেত ভাবে কাজ করিয়াছে তাহার ফলে কংগ্রেসের শক্তি বাড়িয়াছে।" কিষাণসভা কংগ্রেস হইতে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা, এই সংস্থার সভ্যগণ কংগ্রেসেরও সভ্য হইয়া থাকে এবং কিষাণসভার নেতাদের অনেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে আছেন। কংগ্রেস কিষাণসভার সভ্য হওয়া বন্ধ করিবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"কংগ্রেস কিষাণসভার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে নাই। যে সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী কিষাণসভায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে আপত্তিজনক কাজেই যোগ দিতে নিষেধ করা হইয়াছে।" (হিতবাদী, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭)। অন্য রাজনৈতিক সংস্থার সভ্য হইলেই যে কংগ্রেসের সভ্য হওয়ার অধিকার চলিয়া যায় না তাহার প্রমাণ—কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির সদস্য এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আছেন। ৮ই আগষ্ট এ, আই, সি, সির বম্বে অধিবেশন উক্ত কমিটির শেষ অধিবেশন—ঐ অধিবেশনে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য কমরেড সরদেশাই ও সাজ্জাদ জহীর প্রভৃতি সক্রিয় ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, মূল প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন আইন সঙ্গত হইয়াছে এবং উক্ত কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্যভাবেই কমিউনিষ্ট হিসাবে আত্মপরিচয় দিতেন।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে "যে সব কংগ্রেস কর্ম্মী অন্য সংস্থায় যোগ দিয়াছেন তাঁহারা কংগ্রেস কর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না"—এরূপ নীতি কংগ্রেসের কখনও ছিল না।

কংগ্রেসের ঐক্য চাই

বাংলার কংগ্রেস আজ শতধা বিভক্ত। কিরণ বাবুর মত এক জন কংগ্রেস নেতা স্বতন্ত্রভাবে নিজ দল লইয়া গান্ধীজীর নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন। কংগ্রেসের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রুপ তাহার নিজ নিজ মত ও পথ লইয়া চলিতেছে, কংগ্রেসের সাংগঠনিক ঐক্য কোথায় ? এদিকে শ্যামাপ্রসাদবাবু গান্ধীজীর নীতিকে জনগণের ভিতর অপ্রিয় করিবার অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। বসুদলের একটি প্রভাবশালী অংশ গান্ধীজীর পন্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, বি-পি-সি-সি আইন সঙ্গত ভাবে কাজ করিতে অক্ষম। এ অবস্থায় কংগ্রেসের ঐক্য স্থাপনই আজ একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মীর দায়িত্ব। অথচ খাদিপন্থীরা কংগ্রেসের ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া কংগ্রেসকে কাটিয়া ছোট করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সংযুক্ত অভিযানের আহ্বান না দিয়া উহা বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা কি গান্ধীজীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার পন্থা নয় ? খাদিপন্থীরা যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহাতে লীগ ভাবিবে—বাংলার কংগ্রেস গান্ধী-জিন্না মিলন সফল করিতে আগ্রহান্বিত নয় এবং মহাসভা বলিবে—গান্ধী-জিন্নার সমর্থনে যে গণঅভিযান হইতেছে উহার পিছনে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ভক্তদের সমর্থন নাই। অর্থাৎ গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টা যাহারা ব্যর্থ করিতে চায় তাহারাই ইহাতে সবল হইবে এবং যাহারা তাহার সাফল্য চায় তাহারাই দুর্ব্বল হইবে। ইহাই কি খাদিপন্থীদের লক্ষ্য ?

গান্ধীজী যখন কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত তখন কি খাদিপন্থীরা কংগ্রেসের ঐক্য ধ্বংস করিবেন ? বিভিন্ন মতবাদীদের ঐক্যই কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছে, আজ সেই ঐক্য ধ্বংস করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে খাদিপন্থীদের মতের অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে—কিন্তু মূল বিষয়ে আমরা আজ একমত—ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে হইবে, কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার অনুচরবর্গকে পরাস্ত করিতে হইবে। এই মূলগত ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত সন্দেহ বিসর্জ্জন করিয়া আসুন আমরা আজ বাংলার কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করি, গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সংযুক্ত অভিযান পরিচালনা করি। তাহা যদি না করি তাহা হইলে মহাসভার আক্রমণে কংগ্রেস ঘোরতর ভাবে দুর্ব্বল হইবে, যাহারা জাতীয় ঐক্য পণ্ড করিতে চায় তাহাদেরই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, আমলাতন্ত্রের অভিসন্ধিই সফল হইবে। বাংলার একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবীগণ কি আজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দলগত মনোভাবের উর্দ্ধে উঠিবেন না ?

যুদ্ধের শেষ খবর

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—লালফৌজের অশ্বারোহী-বাহিনী হাঙ্গেরীর সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। গালাৎস সহর লালফৌজ অধিকার করিয়াছে। দানিয়ুবের তীরে ইহা একটি বড় বন্দর ও রেল জংশন।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—৮ম আর্ম্মি ফানোর উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে।

আসাম-ব্রহ্ম ফ্রণ্ট—মিত্রবাহিনী চিন্দুইন হইতে ৪ মাইল দূরে পৌছিয়াছে। মিত্রপক্ষের অগ্রগামী বাহিনী পিনব'র উপকণ্ঠে পৌছিয়াছে।

[১ম পৃঃ সম্পাদকীয়ের শেষাংশ]

যে ঐক্যের প্রথম উচ্ছাসই প্রতিক্রিয়ার কোটরে কোটরে এমন ত্রাস জাগাইয়াছে সেই ঐক্যের বিপুলতর পরিণতিই তাহাদের আঘাতকেও চূর্ণ করিবে। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর আজও শক্তি নাই আমলাতন্ত্রের হুকুম রদ করে। কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ যখন গর্জ্জন করিয়া উঠিবে তখন মন্ত্রীমণ্ডলী শক্তিলাভ করিবে। হুকুম রদ হইবে।

ঐক্য প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করা

বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের দায়িত্ব

কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্র রায়ের আবেদন

বাংলার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা বগুড়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় সম্প্রতি যশোহরের বোয়ালিয়া গ্রামে অন্তরীণ আছেন। তাঁহার সঙ্গে নদীয়ার কয়েকজন কর্ম্মী দেখা করিয়া গান্ধী-রাজাজী প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত জানিতে চাহেন। তিনি এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থনই শুধু জানাইয়াছেন, তা নয়, নদীয়ার কর্ম্মীরা কংগ্রেস-কর্ম্মীদের প্রতি এক আবেদন পত্র প্রকাশ করিতেছেন, এই আবেদন পত্রে প্রথম স্বাক্ষরকারী হিসাবে তিনিই নাম দিয়াছেন। এই আবেদনে বলা হইয়াছে, গান্ধীজীর সমর্থিত রাজাজীর প্রস্তাব বাংলার কংগ্রেস-লীগ তথা সমগ্র হিন্দু-মুসলমানের একতার সুযোগ দিয়াছে। সুতরাং বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হইল এই ঐক্য প্রচেষ্টা সমর্থন করা, ইহাকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করা।

নদীয়ার অন্যান্য অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী এই আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর মধ্য দিয়া কংগ্রেসই কথা বলিতেছে

সিলেট জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবী এবং 'জনশক্তি' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে অন্তরীণাবস্থায় অসুস্থ হইয়া আছেন। ১২ই আগষ্ট তিনি সহ-কর্ম্মীদের কাছে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন: "মহাত্মাজী যদিও বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবের সমর্থন তাঁহার ব্যক্তিগত সমর্থন, তথাপি এ কথা বলিতে পারি, তাঁহার মধ্য দিয়া এই ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসই কথা বলিতেছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতের বৃহত্তর শক্তি সংহত হইবে।"

গান্ধী জিন্না আলোচনা সফল হইলে ভারতে এক অভিনব জাগরণের সূচনা হইবে

নোয়াখালীর কংগ্রেস-নেতা **শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সুর, এম্-এল-এ** গত ১৪ই আগষ্ট একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়া হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের যে ফর্ম্মূলা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন—ঐ ফর্ম্মূলা আমি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছি। সরকারী কংগ্রেস দলভুক্ত **এই জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত এই ফর্ম্মূলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা সকলেই একমত হইয়াছি** এবং আমাদের মতামত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সরকারী কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছি। আমি বিশ্বাস করি গান্ধী-জিন্না আলোচনা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এক অভিনব জাগরণের সূচনা হইবে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অচিরেই জয়যুক্ত হইবে।

"প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য দিয়াও ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে"

ডাঃ আবদুল লতিফের বিবৃতি

ডাঃ আবদুল লতিফ হায়দ্রাবাদ হইতে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজাজীর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া গান্ধীজী ও জিন্না যে সময়ে আলোচনা করিতে যাইতেছেন, সেই সময়ে বিরুদ্ধ প্রচার করিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে পণ্ড করা উচিত নহে। যাঁরা এই মীমাংসা পছন্দ করিতেছেন না তাঁদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন: **"বড়লাট গান্ধীজীকে শেষ চিঠিতে যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, তার জবাব দিতে হইলে এই ঐক্য ছাড়া আর কি পথ আছে?"**

ডাঃ লতিফ বলেন যে, কংগ্রেস-লীগ মীমাংসায় অন্যান্য রাজনীতিক দলের স্বার্থ যাহাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না উভয়েরই নজর আছে।

তিনি বলেন: রাজাজীর ফর্ম্মূলা ভারতের ঐক্যকে আরো স্থায়ী করিবারই জন্য। সমগ্র দেশের ও প্রত্যেক অংশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপরই এই ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। মুসলিম অঞ্চলের স্বাধীনতার মানেই যে তাদের পৃথক হইয়া যাওয়া ত নয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক কারণে সকলের সমান স্বার্থে সকলে মিলিত হইবেই। **গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার দায়িত্ব সেইখানেই। এমন পদ্ধতি তাঁদের রচনা করিতে হইবে যাতে, প্রত্যেক ইউনিটের স্বাধীনতা সত্বেও ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় থাকিবে।**

"মনের বিচ্ছেদ ভৌগোলিক বিচ্ছেদের চেয়েও মারাত্মক"

নড়াইলের হিন্দুমহাসভা নেতার বিবৃতি

নড়াইলের হিন্দু-মহাসভার ও বার-এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৭ই আগষ্ট একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন: "মনের বিচ্ছেদ ভৌগলিক বিচ্ছেদের চেয়েও মারাত্মক। বিশ্বাসের দ্বারাই বিশ্বাস পাওয়া যায়, অবিশ্বাস ভেদকেই চিরস্থায়ী করে। এইজন্যই আমরা গান্ধীজীর কায়েদে আজমের সঙ্গে মীমাংসা করার চেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: **বঙ্কিম মুখার্জি**, এম, এল, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

গান্ধী-জিন্না মিলন সম্পর্কে

দেশভক্তদের সন্দেহের জবাবে শ্রীযুত বাড়দলই

আসামের কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বাড়দলই সম্প্রতি 'জনযুদ্ধে'র প্রতিনিধির নিকট গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্নের জবাবে যাহা বলিয়াছেন, তার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

গান্ধীজী যাহাই দাবী করুন না কেন, আমেরী ও চার্চ্চিল কিছুতেই রাজী হইবে না—এই প্রশ্নের জবাবে বারদলই বলেন: "তা হইলেও, যে অবস্থা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতায় রাজী হইতে পারে, সেই অবস্থার সৃষ্টি করাই তো আমাদের কাজ এবং সেই কাজের সর্ব্বপ্রধান হইতেছে হিন্দু-মুসলমান একতা। পৃথিবীর জনমত ভারতের পক্ষে, এই অবস্থায় ভারত একতাবদ্ধ হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গান্ধীজীর দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব।"

জিন্নাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া গান্ধীজী কি হিন্দুর স্বার্থ বলি দিতেছেন?—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা কংগ্রেসেরই নীতি। শুধু ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকেই স্বতন্ত্র জাতির লক্ষণ বলিয়া কংগ্রেস মনে করে না, তা সত্য; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি ধর্ম্মটাই জাতির বড় বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠে, তা হইলেই কি তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিতে হইবে?"

অনেকের ধারণা জিন্না সাহেব যে রাজাজীর প্রস্তাবে রাজী হইবেন না, ইহা জানিয়া শুনিয়াই মহাত্মাজী জিন্নার সাথে দেখা করিতেছেন, যাতে জিন্নার স্বরূপ লোকের কাছে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রশ্নের জবাবে বাড়দলই বলেন, "দেশের দুই মহান নেতার আন্তরিকতা সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ আমার মোটেই নাই। আমি জানি, বিশ্বাসের দ্বারাই বিশ্বাস অর্জ্জন করা যায়। রাজাজীর প্রস্তাবে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইবে না, মহাত্মাজী জানেন যে এই পথে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই হইবে। পৃথক হইয়াও যদি ইহাতে তৃতীয় পক্ষকে হটাইতে পারা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। কেননা, স্বাধীনতা লাভের পর দেশরক্ষা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতির স্বার্থে উভয় আবার এক হইবেই।"

কংগ্রেস-সেবীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাড়দলই বলেন যে, গান্ধীজীর কাজের সফলতার জন্য প্রত্যেককে হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য প্রচার করিতে হইবে, কংগ্রেস-সেবীরা করিতেছেও তাই। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধেও কংগ্রেস-সেবীদের সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে।

ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হইবেই

গান্ধীজীর কাছে কুমিল্লার এ আই-সি-সি সভ্য শ্রীযুত শরৎ চক্রবর্ত্তীর তার

১৪ই আগষ্ট কুমিল্লার বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা, এ-আই-সি-সি সভ্য শ্রীযুক্ত শরৎ চক্রবর্ত্তী গান্ধীজীর কাছে তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীই রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার রায়ও কুমিল্লা সহরের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। তিনি বলেন যে ত্রিপুরা জেলার প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীই গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। **শ্রীযুক্ত উপেন ঘোষ** বলেন: ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখি যে আমরা দিন দিন দূরে সরিয়া গিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আপোষ করা উচিত

সিলেট জেলা কংগ্রেসকর্ম্মীরা

সিলেট জেলা কংগ্রেসের ২৫ জন সভ্য ও কার্য্যপরিচালক ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করিয়া গান্ধীজীর কাছে তার পাঠাইয়াছেন।

শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, এ-আই-সি-সি সভ্য (সিলেট জেলা) গান্ধী রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ির কংগ্রেসকর্ম্মীরা

শ্রীযুক্ত বীরাজমোহন সেন, সভাপতি, জলপাইগুড় কংগ্রেস কমিটী, শ্রীতিনিধান রায়, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, নরেন রায় চৌধুরী, সহ-সভাপতি, শচীন্দ্র নিয়োগী, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক প্রভৃতি কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতির প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ও গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়াছেন।

হিন্দুমহাসভা কর্ম্মীর পদত্যাগ

হিজলী হিন্দুমহাসভার সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রনাথ পাল বরিশাল জেলা হিন্দু মহাসভার সম্পাদকের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। রাজাজীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দুমহাসভার আন্দোলনের প্রতিবাদে এই পদত্যাগ করেন।

"কংগ্রেস-লীগ একতা না হইলে জাতীয় সরকার কায়েম হইতে পারে না"

ফরিদপুরের মুসলিম লীগ নেতা মৌঃ গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এম-এল-এ এক বিবৃতিতে বলেন: "ভারতে আজ চরম দারিদ্র্য অনাহার। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট না হইলে জাতীয় সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কংগ্রেস-লীগ একতা না হইলে বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত হইতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করা যাইবে না। তাই আমি রাজাজীর প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্থায়ী হইতে বাধ্য

মুসলিম ছাত্রনেতার মন্তব্য

রাজসাহীতে ৭ই আগষ্ট এক ছাত্র সভায় মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা আতাবুর রহমান বলেন: "যদি গান্ধী জিন্না আপোষ বিফল হয়, তবে পৃথিবীর সামনে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। কংগ্রেস লীগ ঐক্য স্থায়ী হইতে বাধ্য, কারণ ইহা শুধু দুইজন নেতার ঐক্য নয়—ইহার পিছনে কোটী কোটী লোকের সমাবেশ হইবে।— আমরা আজ হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে মিলিত হই নাই। আমরা একই দেশের বাসিন্দা হিসাবে মিলিত হইয়াছি। পাকিস্তান আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করিবে না। আমাদের মধ্যে ইস্পাতের ঐক্য সৃষ্টি হইবে।"

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহক সম্বন্ধে চিঠি পত্র বা টাকা পয়সা পাঠাইতে হইলে গ্রাহক নং বা পুরাতন গ্রাহক কিনা স্পষ্ট উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাগজ পাইতে গোলমাল হওয়া সম্ভব।

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

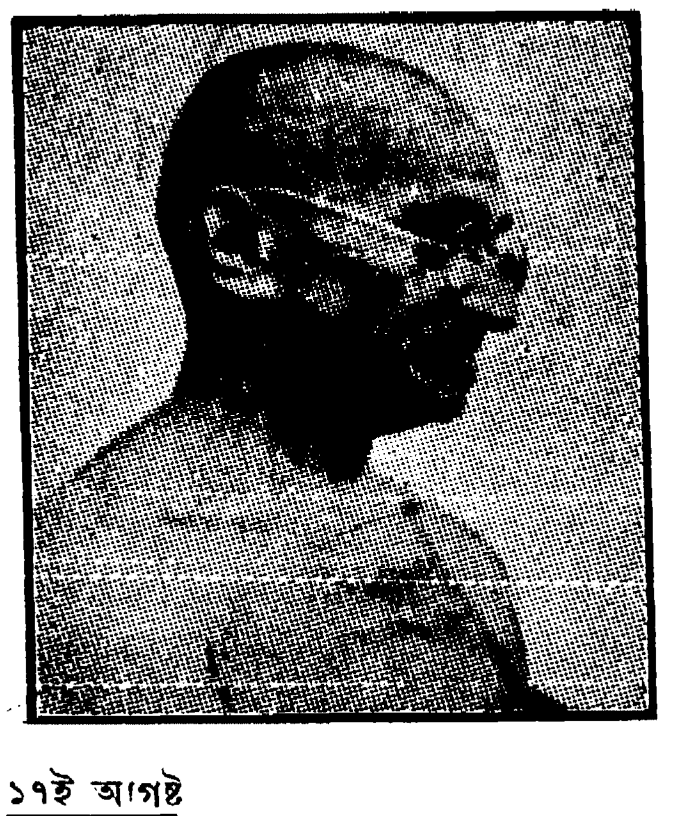

সারা বাংলা গান্ধী-জিন্না ঐক্যের পিছনে গত এক সপ্তাহের সমর্থন-আন্দোলন

১৭ই আগষ্ট

মুন্সিগঞ্জ

কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মিলিত উদ্যোগে এক সভা হয়। মহকুমা মুসলীম লীগ সম্পাদক মৌলভী মহম্মদ আবদুল হাকিম এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে সভায় তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠান। কংগ্রেস লীগ ঐক্য কামনা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঘরিসার

মুসলীম লীগ ও কমিউনিষ্ট কর্মীদের মিলিত চেষ্টায় ঘরিসার বাজারে এক জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মৌলবী আলি মহম্মদ খাঁ।

মল্লারপুর

স্থানীয় বাজারে কংগ্রেসকর্ম্মী ও অন্যান্য জনসাধারণের এক সভায় গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করা হয়।

ফুলবাড়ী

স্থানীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতির মিলিত উদ্যোগে 'গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ সপ্তাহে'র শেষ দিন ১৭ই আগষ্ট এক বিরাট সভা হয়। মুসলীম লীগ নেতা আবু তাহের ইহার সভাপতিত্ব করেন।

কলিকাতা

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত সীতারাম সাকসেরিয়ার সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক সভা হয়। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া সভায় প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

বদরগঞ্জ

স্থানীয় স্কুলে ছাত্রফেডারেশন, মুসলীম ছাত্র লীগ ও শিক্ষকদের এক মিলিত সভায় ঐক্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করা হয়।

কোয়েপাড়া

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় গান্ধী-জিন্নার সাক্ষাতকারের সাফল্য কামনা করা হয়।

১৮ই আগষ্ট

কৃষ্ণনগর

কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মুসলীম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গনে জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত গোবিন্দপদ দত্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। বিখ্যাত লীগ নেতা মৌলভী এ, কে, জহুরুদ্দীন কংগ্রেস-লীগ মিলিত পতাকা উত্তোলন করেন।

নগরী

নগরী (বীরভূম) ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে ইউনিয়নের জনসাধারণের এক সভা হয়। সভায় অনেক কংগ্রেসকর্মী ও কিছু লীগপন্থী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।

বাঘুটিয়া

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত কালিপদ ঘোষের সভাপতিত্বে গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনায় এক সভা হয়।

নড়াইল

মহকুমা হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুসভা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক হয়। লীগের পক্ষ হইতে আলি আমেদ, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কালীপদ মুখার্জী, হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে জ্যোতিষ মুখার্জী, জাতীয়তাবাদী মুসলীমদের পক্ষ হইতে আবদুল মালেক ও কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে অজিত গাঙ্গুলী বৈঠকে বক্তৃতা করেন।

বদরগঞ্জ

স্থানীয় কংগ্রেস আফিসে এক সভায় জিন্না সাহেবের শীঘ্র রোগমুক্তির কামনা করা হয়।

শ্রীরামপুর

কালীতলা ময়দানে গান্ধী জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া এক সভা হয়।

নেত্রকোনা

এখানকার যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান ছাত্র তাহাদের নিজ নিজ স্কুলে সমবেত হইয়া আপোষ আলোচনার বিষয়ে দৃঢ় আস্থা জানাইয়াছে।

১৯শে আগষ্ট

খুলনা

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে একটি জনসভায় রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের সমর্থনে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভৌমিক একটি বক্তৃতা করেন।

রংপুর

জেলা কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে এক বিরাট ঐক্য সমাবেশ হয়। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও মহতাব উদ্দীন খাঁ এবং মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে জেলা লীগ সম্পাদক মৌলবী ওয়ায়েছ মিঞা, প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল সভ্য মিঃ আবুল হোসেন প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীযুত ভবতারণ লাহিড়ী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তাগাছা

স্থানীয় লীগ সম্পাদক মজিদ মিঞার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট নেতাগণ রাজাজীর ঐক্য প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান।

ময়মনসিংহ

এক হাজার লোকের এক বিরাট সমাবেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়।

লালোর

কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক-সমিতির উদ্যোগে এখানে নাটোরের সিংড়া থানার জনসাধারণের এক সভা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন লীগনেতা মহম্মদ মুন্সী আবদুল খাঁ। ভূতপূর্ব বি, পি, সি, সি সদস্য কালিদাস সান্যাল, নরেন দাস, গোপাল সরখেল প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

হুগলী

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সরোজ বন্দোপাধ্যায়, লীগনেতা আফ্রা সাহেব প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে

মহিলাদের তার

যশোহরের রাজঘাট, জাকরপুর, ডুগিলহাট প্রভৃতি গ্রামের মহিলাদের তরফ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্নাকে আপোষ আলোচনার সমর্থন জানাইয়া তার করা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীদের সমর্থন

বহরমপুর সহরের ব্যবসায়ীদের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি গান্ধীজীর নিকট পাঠান হইয়াছে। ঐ জেলার **বেলডাঙ্গার** ব্যবসায়ীরাও অনুরূপ একটি স্মারকলিপি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

উকীলদের তার

বারাসত মহকুমা বার লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রীযুত মণিভূষণ মুখার্জ্জির নেতৃত্বে স্থানীয় উকিলরা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়া তার পাঠাইয়াছে।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা

উক্ত স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করিয়া উভয় নেতার কাছে তার পাঠাইয়াছে।

কলিকাতার বিজলী শ্রমিক

বিজলী শ্রমিকদের তরফ হইতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া এবং কংগ্রেস-লীগ একতার পিছনে সমর্থন জানাইয়া দুইটি তার পাঠান হইয়াছে।

মাগুরার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

মাগুরার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতারা ঐক্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া ৬টি তার প্রেরণ করিয়াছেন।

বনগ্রাম মহকুমার সমর্থন

বনগ্রাম মহকুমার প্রায় সমস্ত রাজনৈতিকদল ও সম্প্রদায় ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইয়াছে। ইতিমধ্যেই দুইটী জনসভায় বিপুল উৎসাহের সহিত এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব্ব ন

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত

কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য গান্ধীজী-র সাড়া দিয়াছে। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ হইবে বাংলার জেলায় জেলায় হিন্দু-মুসলমান জনস সাফল্য কামনা করিতেছে। এই সমস্ত হিন্দু মুসলমান মিলনের এক অভূতপূর্ব্ব আ লীগ নেতা ও কর্মীগণ একই সভায় মিলিত দাবী জোর গলায় উচ্চারণ করিতেছে—গান্ধী প্রচার করিতেছেন। এই ঐক্য বাংলায় ই বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও আমলাতন্ত্র শাি উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতেছে।

গান্ধীজীর প্রস্তাবের ফলে 'বঙ্গ ভঙ্গ' আজকের ঐক্যবদ্ধ বাংলাই তাদের অপ-প্রচা

১৯শে আগষ্ট কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিরাট স

দৌলতপুর

ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলীম ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছাত্রদের এক সভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করা হয়।

আড়িয়াল

স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত অবিনাশ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে আড়িয়াল স্কুলে ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে এক সভা হয়।

মালদহ

জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সভ্যদের লইয়া এক বড় সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারাই উপস্থিত ছিলেন। গান্ধী-জিন্না মিলন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জলপাইগুড়ী

কংগ্রেস ও লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত প্রীতিনিধান রায় ও লীগ নেতারা সভায় বক্তৃতা করেন।

যশোহর

মুসলীম ছাত্র-লীগ ও ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার পর একটি সভায় কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত জীবনরতন ধর, মুসলীম লীগ-নেতা মিঃ আবদুল হাই প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বাংলায় ঐক্যের
ব জাগরণ

বাঙ্গালী বাঁচিবার পথে

জাজী প্রস্তাবের সমর্থনে বাংলা বিপুলভাবে
, এই কথা জানার পর আরো উৎসাহে
ধারণ একত্র সভা করিয়া এই সাক্ষাতের
জনসভার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই আজ
ন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। কংগ্রেস ও
হইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য একই
-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্যের জন্য একত্র
ৃপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। আজ মহামারী
িত বাংলার কাছে এই ঐক্যই আশা ও

হইবে বলিয়া যারা প্রচার করিতেছেন,
ের সবচেয়ে বড় জবাব।

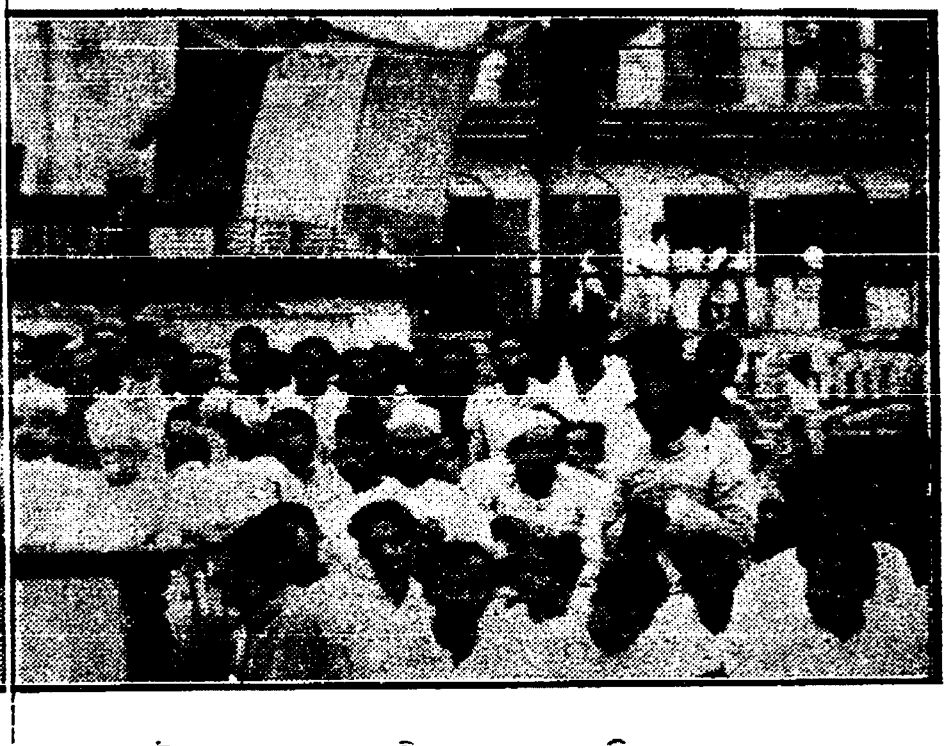

ায় মঞ্চের উপর কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মিলন

জেলায় জেলায় কংগ্রেস ও লীগের মিলিত উদ্যোগে জনসভা

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরে জেলার ৪৩ জন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী এক সভায় মিলিত হন। সভাপতিত্ব করেন নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ। প্রথমে মেদিনীপুর রিলিফকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তারপরে একটী প্রস্তাবে গান্ধীজী-রাজাজীর ফর্ম্মুলার সমর্থন স্থাপন করা হয়।

ময়মনসিংহ

সহরের ৩০০ মজুরের এক সভায় কংগ্রেস-লীগ আপোষ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

রংপুর

সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মৌলবী মহতাবউদ্দীন খাঁর সভাপতিত্বে সদর মহকুমা কর্ম্মী সম্মেলনে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করা হয়।

মুলাদী

মুলাদির (বরিশাল) প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত ভবেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। মুসলীম লীগ নেতা মফিজুল হক, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ যশোদা কুণ্ডু ও কমরেড কালীপদ দাস বক্তৃতা করেন।

মাহেশ

গান্ধী জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া মাহেশ ময়দানে এক জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

২০শে আগষ্ট

হাওড়া

কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে শীল-বাজারে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীযুত বসন্তলাল মুরারকা। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত, প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক মিঃ আবুল হাসেম, কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও ছাত্র নেতা শ্রীযুত সাধন গুপ্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কর্মীদের গুস্করায় আহুত সম্মেলনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান মিলন প্রচেষ্টায় সমর্থন করা হয়।

কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ২৪-পরগণার কংগ্রেস কর্মীদের এক সম্মেলন হয়। ইহাতে কংগ্রেস নেতা জে, সি, গুপ্ত; কে, পি, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। গান্ধী-জিন্না আলোচনার সাফল্য কামনা করিয়া বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নারায়ণগঞ্জ

পুরোভাগে কংগ্রেস, লীগ ও লাল পতাকা লইয়া সহস্রাধিক লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে দেড়হাজার লোকের এক সভায় জেলা লীগ সংগঠক সামসুল হক্ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

২১শে আগষ্ট

ময়মনসিংহ

জেলা ছাত্র কর্ম্মী সম্মেলন উপলক্ষে প্রায় দেড়হাজার ছাত্রের একটি সমাবেশে কংগ্রেসের শ্রীযুত প্রবীর বসু, লীগ নেতা মীর আবদুল মতীন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সমাবেশে মিঃ জিন্নার আরোগ্য কামনা ও গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২২শে আগষ্ট

কেশবপুর

স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সাহার সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। সভায় লীগনেতা মৌলবী মুন্সী আবদুল্লা ও কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড অধীর ধর বক্তৃতা করেন।

টাঙ্গাইল

কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে সহরে এক জনসভায় স্থানীয় মুসলীম লীগ নেতা মৌলভী এরাদত খাঁ, কমরেড যতীন বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কুমুদিনী কলেজের প্রায় ৪০ জন ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রফেডারেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৮০০ লোকের এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থন করা হয়। সন্তোষ হাই স্কুলের ছাত্রদের এক সভায়ও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

খুলনা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থানীয় গান্ধী পার্কে আগামী গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সাফল্য কামনা করিয়া একটী জনসভা হয়। সহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক—ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এম, বি, সভায় সভাপতিত্ব করেন। লীগ নেতা সৈয়দ আলী আমেদ, কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

কাশীপুর, কলিকাতা

বসাক বাগানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কাঁঠালবাড়ী

কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

২৩শে আগষ্ট

গান্ধীজীর সমর্থনে ৩০ হাজার ছাত্র

২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতির ভিতর দিয়া ৩০ হাজার ছাত্র গান্ধীজীর প্রস্তাবে সমর্থন জানাইয়াছে।

২৪শে আগষ্ট

ময়মনসিংহ

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী ঘোষের সভানেত্রীত্বে ছায়াবাণী হলে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় গান্ধী-জিন্নার ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

কলিকাতা

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কয়েকটী জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক ঘরোয়া সম্মেলন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি জায়গা হইতে প্রায় ২০০জন কর্ম্মী ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। আরো ৫০ জন কর্ম্মী চিঠিতে তাঁদের সমর্থন জানাইয়াছেন। রাজাজীর প্রস্তাবের পর ইহাই বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের সব চেয়ে বড় প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন।

গান্ধী-জিন্না আপোষের সাফল্য কামনায়

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানে ও বিভিন্ন তারিখে সভা ও বৈঠক হইয়া গিয়াছে:—

ময়মনসিংহ (ছাত্রসভা, ১৬ই আগষ্ট), চৌমুহনী (জনসভা, ৭ই আগষ্ট), ঠাকুরগাঁ (কৃষকসভা, ১১ই আগষ্ট), দিনাজপুর (মুসলীম ছাত্রসম্মেলন, ১২ই আগষ্ট), বাগেরহাট (ছাত্রসভা, ১৫ই আগষ্ট), কোন্নগর (ছাত্রসভা, ১২ই আগষ্ট) তিস্তা (জনসভা, ৯ই আগষ্ট), বড়বাড়ী (জনসভা, ৯ই আগষ্ট), ঢাকা (সুতাকল মজুর, ৯ই আগষ্ট), ধীপুর (মহিলাসভা, ৯ই আগষ্ট), গেণ্ডারিয়া, ঢাকা (মহিলাসভা, ১১ই আগষ্ট), তাঁতিবাজার, ঢাকা (মহিলাসভা, ১২ই আগষ্ট), উয়ারী—ঢাকা (মহিলাসভা, ১৩ই আগষ্ট), নারায়ণগঞ্জ (মহিলাসভা, ১৪ই আগষ্ট), মুন্সীগঞ্জ (মহিলা-সভা, ১৫ই আগষ্ট), অভয়নগর (মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ১৬ই আগষ্ট), মুন্সীগঞ্জ (ছাত্রসভা, ৮ই আগষ্ট), নোয়াখালী (কৃষক সম্মেলন, ১৪ই আগষ্ট), খুলনা (মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ৭ই আগষ্ট), মাচুয়াডাঙ্গা (মহিলা-সভা, ১২ই আগষ্ট), তমলুক (কৃষক-সমিতি, ৩০শে জুলাই), ঠাকুরগাঁ (জনসভা, ১৪ই আগষ্ট), নালিতাবাড়ী (জনসভা, ১২ই আগষ্ট), শ্রীরামপুর (জনসভা, ১৫ই আগষ্ট), মুক্তগাছা (জনসভা, ৯ই আগষ্ট), তারাটি (ছাত্রসভা, ১১ই আগষ্ট), ভদ্রেশ্বর (জনসভা ১৩ই আগষ্ট), হাওড়া (কৃষক সমিতি, ৫ই আগষ্ট), বহরমপুর (ছাত্রসভা, কুমার হোষ্টেল, সৈদাবাদ হার্ডিং স্কুল, ৯ই আগষ্ট ও ১১ই আগষ্ট), কেন্দুয়া (জনসভা, ১১ই আগষ্ট), মুক্তাগাছা (জনসভা, ৮ই আগষ্ট), শান্তিপুর (জনসভা, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট), জলপাইগুড়ী (জনসভা ৯ই এবং ১০ই আগষ্ট), বেহালা, (জনসভা ১৪ই আগষ্ট), দক্ষিণপাড়া (জনসভা, ১৩ই আগষ্ট), দক্ষিণ পাড়া (মহিলা সভা, ১৩ই আগষ্ট), বালীগঞ্জ, কলিকাতা (জনসভা, ১৪ই আগষ্ট), কেদার চাঁদপুর (জনসভা, ১৬ই আগষ্ট), চন্দননগর (মহিলাসভা—৫টি, ৯ই আগষ্ট), রাজসাহী (মুস্লিম ছাত্রসম্মেলন, ১৪ই আগষ্ট), করিমগঞ্জ (জনসভা, ৮ই আগষ্ট), সিলেট (ছাত্রসভা ও জনসভা, ৮-১০ই আগষ্ট)।

ইউনাইটেড ফ্রণ্ট!

গান্ধী-জিন্নার মীমাংসার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়াছেন যাঁরা

স্যার এন্-এন্-সরকার

(বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব আইন-সদস্য)

"গান্ধী-জিন্না চুক্তি হোক আর না হোক, যুদ্ধের সময়ে গভর্ণমেণ্টের কোন মূল পরিবর্ত্তন হইবে না" (১৯শে আগষ্ট অমৃতবাজারের প্রবন্ধ)

এম্-এন্-রায়

"এই দুই ব্যক্তির দেখা সাক্ষাতের ফলাফলের উপর বিশেষ আশা করা যায় না। আমি বরং ভাইসরয়কেই অনুরোধ করিব, যা করিবার তিনিই করুন! (১৯শে আগষ্টের বিবৃতি)

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

"আমরা গান্ধীজীকে অনুরোধ করি যে তিনি আজকে যে পথে পা দিয়াছেন, সে পথ হইতে সরিয়া আসুন……" (১৯শে আগষ্টের বক্তৃতা, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড)

বাংলায় বস্ত্রাভাবের রহস্য

বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন কিভাবে কমিতেছে

বাংলায় বস্ত্রের অভাব দারুণভাবে দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের আগে কাপড়ের দাম যাহা ছিল এখন তাহা তিন চার গুণ বাড়িয়াছে। ইহার কারণ একদিকে মিলের প্রস্তুত কাপড় চোরা-বাজারে চলিয়া যাইতেছে, অপরদিকে টেক্সটাইল মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বস্ত্র উৎপাদন কমাইয়া দিতেছে। বাংলা ও আসামে বৎসরে মোট ৯৩ কোটী গজ কাপড় লাগে। তাহার মধ্যে বাংলার কাপড় কলগুলিতে ২২ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। দুই প্রদেশের তাঁত শিল্প হইতে ১৮॥০ কোটী গজ তৈরী হইত। বাকী ৫২॥০ কোটী গজ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিন্তু টেক্সটাইল এডভাইসারী কমিটির সম্প্রতি একটী সভায় জানা যায় যে এই কাপড়ের অর্দ্ধেকও বাংলায় আসিয়া পৌঁছিতেছে না। তাহার উপর নিয়ম হইয়াছে যে ১৯৪০-৪২ সালে যে সব ব্যবসায়ী বস্ত্র-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল শুধু তাহারাই মিল-কাপড় পাইবে। তাই ১৬ই আগষ্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছে যে ঘাট্‌তি পূরণের জন্য অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের নিকট কাপড় আমদানী করিতে হয়। এইখানেই চোরাবাজারের উদ্ভব হইয়াছে। অথচ বাংলায় বস্ত্র-উৎপাদন বাড়াইবার কোন প্রচেষ্টা নাই। উপরন্তু বলা হইতেছে যুদ্ধের আগে লোক পিছু বছরে ১৬ গজ কাপড় লাগিত, এখন ১২ গজেই চালাইতে হইবে। ভারতবর্ষে এত কাপড়ের কল থাকা সত্ত্বেও, দেশের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও লোকে কেন বস্ত্রাভাব সহ্য করিবে? ২৪শে আগষ্টের "ক্যাপিটাল" পত্রিকায় বলা হইয়াছে, ৪,৫০০,০০০ বেল ভারতীয় তুলা পাওয়া যাইবে, কিন্তু বস্ত্রশিল্পগুলি এবছরে ৪,১০০,০০০ বেলের বেশী এই তুলা ক্রয় করিবে না। কারণ মিলগুলি কয়লা পায় না, পাকা ও দক্ষ কারিগর পাওয়া যায় না এবং সম্প্রতি মিলগুলিতে মিহি ও ভাল কাপড় তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া তাহারা ভারতীয় তুলা কিনিতে চায় না। একদিকে সূতা সরবরাহের অভাবে গ্রামের তাঁত শিল্পগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অপর দিকে মিলগুলিও তুলা কিনিতেছে না। তবে এত ভারতীয় তুলা কি শুধু অকারণে মজুত থাকিবে, না নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে? ঢাকার মিলগুলিতে বস্ত্র উৎপাদনের অবস্থা শুনিলে বুঝা যাইবে—বস্ত্রাভাবের জন্য দায়ী কাহারা। ঢাকা জেলা টেক্সটাইল ইন্‌ডাষ্ট্রির সংবাদদাতা যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন সংকটের অবস্থা বুঝা যাইবে।

বস্ত্র-উৎপাদন হ্রাসের মতলব

ঢাকা জেলার ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি ছয়টী মিলে যুদ্ধের আগে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত হইত। আর আজ সেখানে হয় মাত্র ৯৫ হাজার গজ। ঢাকা জেলায় ৩১ লক্ষ লোককে মাথাপিছু ১২ গজ কাপড় যোগাইতে হইলে এই সব মিলগুলির মাত্র ৫৪ দিনের উৎপাদনই যথেষ্ট। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সহিত বর্ত্তমান উৎপাদনের তুলনা করিলে দেখা যায় যে দৈনিক ২২৫ জন লোকের কাপড় কম তৈরী হইতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী মিলে গড়ে বাৎসরিক আয় হইত ৭ লক্ষ টাকার মত। আর গত বৎসর আয় হইয়াছে ৩৬ লক্ষ টাকা। চিত্তরঞ্জন মিলে কখনো দুইলক্ষের বেশী আয় হইত না, আর গত বছর ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই টাকায় বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি ও মজুরদের অবস্থার উন্নতি করা তো দূরের কথা—উৎপাদন হ্রাস করার দিকেই এই সব মিল কর্ত্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

যন্ত্রপাতির অবস্থা

কার্ডিং ডিপার্টমেণ্টের কার্ড মেশিনের কাটা তারগুলি অত্যন্ত দরকারী, এই তার ভাঙ্গিয়া গেলে তুলা ধুনাই করিয়া তাহার ভিতর হইতে আঁশ বাহির করা যায় না, আঁশের সঙ্গে অনেক আবর্জনা থাকিয়া যায়। স্পিনিং মেশিনের রুলার, বল—এই দুইটী অংশের সাহায্যে সূতা পাক দিয়া শক্ত করিতে হয়। এই অংশ দুটীর জীবনী শক্তি অনেক মিলেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ঢাকা কটন মিলে প্রায় ১০০০ এর মত টাকু অচল হইয়া পড়িয়া আছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি মেরামত বা নূতন করিয়া কেনার দিকে মালিকদের কোন লক্ষ্য নাই। অথচ বেশী দাম দিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট ফ্যাক্টরী হইতে খারাপ ববিন, মাকু প্রভৃতি মাল ক্রয় করা হইতেছে। শুনা যায় যে, এই সব মাল সরবরাহকারী এজেণ্টগণ বা তাহাদের ফ্যাক্টরীগুলি কোনও না কোনও ডিরেক্টর বা বড় অংশীদারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মেশিনের অনেক ভারী অংশ আমাদের দেশের যে কোন ওয়ার্কশপেই (এমন কি ঢাকেশ্বরী মিলেই) তৈয়ারী করা যায়, অথচ তাহা না করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, চিত্তরঞ্জন মিল অনেক সময় ৩।৪ দিন করিয়া বন্ধ রাখা হয়।

মিলের কয়লার ব্যবসা ও অপচয়

মাঝে মাঝে কয়লার অভাবে আজকাল সত্যই উৎপাদনের ক্ষতি হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে কারখানাগুলিতে কয়লার সাথে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হয়। এই স্বল্প পরিমাণ কয়লার ভিতর কিছু অংশ লইয়া আবার ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকদিন আগে সংবাদ পাওয়া গেল যে ঢাকা মিলের একজন কর্ম্মকর্ত্তা ঢাকার কোন গ্ল্যাস ফ্যাক্টরীর নিকট কিছু কয়লা বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। ফলে, কয়লার অভাবে উপযুক্ত পরিমাণে ষ্টীম হইতেছে না, দুই তিনটী ডিপার্টমেণ্টের কাজ মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যখন মিলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা মজুত থাকে তখনো বয়লারে অল্প পরিমাণ কয়লার সাথে বেশী পরিমাণ জ্বালানী কাঠ জোগান দেয়, ফলে বয়লারগুলির জীবনী শক্তি কমিয়া যাইতেছে। আর লাকড়ী কিনিবার জন্য হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করা হইতেছে। ঢাকেশ্বরী মিলের বড় বড় কর্ম্মচারীরাই আবার এই লাকড়ী সরবরাহের ভার নেন। মাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই নাকি এই ব্যবসায়ে ২৬,০০০৲ টাকার কোন হিসাব দিতে পারে নাই। ঢাকা মিলের কয়েক গাঁইট তুলা ও আমগাছ তলায় রাখিয়া বৃষ্টিতে নষ্ট করা হইতেছে—শ্রমিকদের হস্তক্ষেপের ফলে তুলার গাঁটগুলি গুদামে ওঠে। আর অন্যদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ মিলে তখনই তুলার অভাবে মিল বন্ধ করা হয়।

মাষ্টার মিস্ত্রীর অভাব?

ঢাকেশ্বরী মিলের যে কোন ডিপার্টমেণ্টের মাষ্টার অফিসার কোন না কোন ডিরেক্টারের আত্মীয়। তাহাদের অনেকে আবার সাধারণ মিস্ত্রীদের মত কাজও জানে না। নানা কারণে ও কর্ত্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ ভাল মাষ্টার মিস্ত্রীগুলি আর মিলে নাই। প্রত্যেকটী মিলেই সম্প্রতি ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ান শুরু হইয়াছে। কয়েকদিন হইল ঢাকেশ্বরী মিলে ৩০০ এর উপর শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে—অজুহাত, মিলের মালিকদের লাভ হইতেছে না (গত বছর এই মিলেই পূর্ব্বের চেয়ে ৫ গুণ মুনাফা হইয়াছে)। কাপড়ের কণ্ট্রোল বাতিল করার মতলবেই ইহারা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে মিলে বেশী কাপড় প্রস্তুত না হয়।

কণ্ট্রোল আইন ফাঁকি দিয়া বস্ত্র ব্যবসায়

বাংলার মিল মালিকরা সকলেই একস্বরে প্রকাশ্যে চীৎকার করিতেছে, ১৯৪২এর পর বস্ত্র ব্যবসায়ের এজেণ্টদের বাদ দেওয়ার আইন অন্যায়। আবার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে গত দুই বৎসরে যে সমস্ত নামে নতুন এজেন্সী খোলা হইয়াছে তাহা হয় কোন ডিরেক্টরের বেনামীতে আর না হয় তাঁদের কোন আত্মীয়ের নামে। এই সব নতুন আত্মীয় স্বজন এজেণ্টগুলির মারফৎ কাপড় ও কাঁচা মালের চোরা কারবার চালানো যত সহজ, অনেক পুরাতন এজেণ্টের মারফৎ তাহা সম্ভব হইত না। গত বছর ঢাকেশ্বরী মিলের ডিরেক্টরগণ পারিবারিক ব্যবহারের জন্য মিল হইতে উৎপাদন মূল্যে ২০০ গাঁইট অর্থাৎ ৪০০০০ জোড়া কাপড় পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কাপড় কি তাঁহাদের পরিবারের লোকজনই শুধু ব্যবহার করিয়াছে? সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী মিলের ৬৩ গাইট সূতা চোরা কারবারে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। সূতার সোল-এজেণ্ট একজন প্রভাবশালী ডিরেক্টরের ভাই। নারায়ণগঞ্জে তিনি অল্প দিন হইতে এই কাজ শুরু করিয়াছেন। ১৮৲ টাকা সূতার দর ফটকা বাজারে ৫৩৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে এবং একাজে বহু নিরীহ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এমন কি মাষ্টার পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বান্ত হয়। ফলে হস্তচালিত তাঁত-শিল্প লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়! শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণের যুক্ত আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি এই ফটকা বাজার বন্ধ হইয়াছে। এইভাবে মালিকরা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে মিলের জন্য খরিদ করা কয়লা, তুলা প্রভৃতি লইয়া চোরাকারবার চালাইতেছেন। ফলে তাহাদের মুনাফা বেশী হইতেছে সত্য, কিন্তু বস্ত্র উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

মিলের মালিকরা এই ভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য বাংলার গৌরবময় বস্ত্র শিল্পগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। মিলের কাজ ও উৎপাদন নষ্ট করার মতলব থাকার ফলেই আজ তাহারা আবার নূতন করিয়া শ্রমিকদের উপর জোর জবরদস্তি, ছাঁটাই, বেতন হ্রাস ও গুণ্ডা দ্বারা ইউনিয়ন ধ্বংসের পালা শুরু করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই বাংলার বস্ত্রাভাব আরো বাড়াইয়া তুলিতেছে।

টেক্সটাইল এডভাইসারী বোর্ডে লক্ষপতি ধনিকরা!

ইঁহারাই চোরাবাজার বন্ধ করিবেন?

বাংলার কাপড়ের বাজারে চোরাকারবারীর প্রতিপত্তি বন্ধ করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে। প্রাদেশিক টেক্সটাইল কনট্রোলার বলিতেছিলেন যে শীঘ্রই একটী পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হইবে, তাহা হইলেই ব্যবসাদার ও জনসাধারণের স্বার্থে বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে। সেই পরামর্শ-দাতা বোর্ড এতদিনে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বোর্ডে কাদের নেওয়া হইয়াছে? বাংলার ৪৫ হাজার খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীর বা অগণিত খরিদ্দারদের প্রতিনিধি ইহাতে অতি সামান্য। এই বোর্ডে যাঁদের প্রতিপত্তি, তাঁরা হইতেছেন লক্ষপতি ধনিক কাপড় ব্যবসায়ী।

বোর্ডের ২৩ জন সভ্যের মধ্যে ১০ জনের পরিচয় দেখুন!

১। মিঃ এস, সি, রায়:—ঢাকেশ্বরী মিলের ডাইরেক্টর।

২। বৈজলাল ভিওয়ানিওয়ালা:—ঢাকেশ্বরী মিলের এজেণ্ট। এইরূপ শোনা গিয়াছে যে বেশী মুনাফা লইবার জন্য তাঁর লাইসেন্স একবার বাতিল করা হইয়াছিল।

৩। বি-কে-বিড়লা:—কেশোরাম কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৪। বি-এম-বাগরি:—কেশোরাম কটন-মিলের বিক্রয় বিভাগের ম্যানেজার। পাইকার হইয়াও ইনি নাকি নিজেই খুচরা দোকান করার পারমিট লইয়াছেন।

৫। এস-সি-নাওন:—বাংলার সবচেয়ে বড় গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টার—লালমিলের এজেণ্ট—কলিকাতার সবচেয়ে বেশী কোটা ইনিই পান।

৬। আর-এন-ভোজনগরওয়ালা:—প্রায় ১৮টী মিলের এজেণ্ট—এই সব মিলের কাপড় চোরাবাজারে প্রায়ই দেখা যায়।

৭। এম-আর-জয়পুরিয়া:—কলিকাতার একজন বড় ধনিক ব্যবসায়ী—আনন্দ কটন মিলের মালিক—আরো অনেক মিলের এজেণ্ট। শোনা যায় যে, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে তাঁর যে লাইসেন্স ছিল, তা সরকার বাতিল করিয়াছেন।

৮। এইচ্-কে-ঝাজারিয়া:—কলিকাতার সবচেয়ে বড় সূতা ব্যবসায়ী।

৯। এম-এল-সা:—মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং সেল্‌স্ এজেণ্ট। চোরাবাজারে এই মিলের কাপড়ই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

১০। মহম্মদ ওসমান:—কলিকাতার তোয়ালে ব্যবসায়ী।

এই বোর্ড গঠন হইয়াছে জনসাধারণের অগোচরে। লক্ষ লক্ষ খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে যখন চোরাবাজারের পথ বন্ধ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবী উঠিয়াছে, তখন টেক্সটাইল কনট্রোলার বড় ব্যবসায়ীদের হাতে কনট্রোলের ভার আরো ভাল করিয়া তুলিয়া দিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা কাপড় উৎপাদন ও বণ্টনের গোড়ায় বসিয়া আছেন তাঁদের দ্বারাই কি চোরাকারবার বন্ধ হইবে?

বাহির হইয়াছে

সোভিয়েট নেতা

ষ্টালিন, মলোটব, ভরোশিলভ্
ও টিমোশেঙ্কোর সংক্ষিপ্ত জীবনী

দাম পাঁচ আনা

THE PEASANT WAR IN GERMANY
by Friedrich Engels
Price—One rupee & eight annas

ছাপা হইতেছে

এঙ্গেল্‌স্-এর বিখ্যাত পুস্তক

সমাজতন্ত্রবাদ—
কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক

রেবতী বর্ম্মণের প্রামাণিক বঙ্গানুবাদ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্
১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণী লালফৌজ

রুমানিয়ায় হিটলার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

৫ দিনে ১ লক্ষ সৈন্য নিহত ও ১ লক্ষ ৪ হাজার বন্দী

বাল্টিক অঞ্চলে তুমুল লড়াই

২২শে আগষ্ট মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে বাল্টিক রণাঙ্গনে একটি বৃহত্তম সংঘর্ষ চলিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের সাথে ইহার তুলনা চলে। জার্ম্মানরা অনুমান আড়াই-লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। জার্ম্মান কমাণ্ড অন্ততঃ পক্ষে সাময়িকভাবে সোভিয়েট অভিযানের গতি ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর একটি খবরে প্রকাশ যে রিগা উপসাগরের দক্ষিণে মিতাউ ও উত্তর লিথুয়ানিয়ার শাভলী সহরের চতুষ্পার্শে এক ভীষণ লড়াই চলিতেছে। টুকুমসে জার্ম্মান আর্ম্মি প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কিছুটা সাময়িক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু ইহার কিছুটা উত্তরে লালফৌজ রিগার দিকে অগ্রসর হইয়া বাল্টিক অঞ্চলে অবরুদ্ধ জার্ম্মান বাহিনীকে দৃঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই রণাঙ্গন হইতে সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে শাভলীর উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামে জার্ম্মানরা ক্লান্ত, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

২৩শে আগষ্টের সংবাদে জানা যায় উপরোক্ত রণাঙ্গনের আরও উত্তরে বাল্টিক সাগর ও পেইপাস হ্রদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে জেনারেল মাসলিনিকভ এক ব্যাপক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে। পরের সোভিয়েট ইস্তাহারের খবর, লালফৌজ তার্তু-ভালকা রেলপথ ও রাজপথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

মার্শাল ষ্টালিন ২৫শে আগষ্ট এক ঘোষণায় প্রকাশ করিয়াছেন যে লালফৌজ এস্তোনিয়ার বিখ্যাত সহর ও রেল জংশন তার্তু দখল করিয়াছে। তার্তু দখল করিয়া জেনারেল মাসলিনিকভের সৈন্যেরা জার্ম্মানদের হাত হইতে এস্তোনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাব্যূহের ধ্বংস সাধন করিল। ইহার পর লালফৌজ এই অঞ্চলে এলভা প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান দখল করে।

লালফৌজ পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে

'ইজভেস্তিয়ায়' প্রকাশিত একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বেতারে বলা হইয়াছে, "পূর্ব্ব প্রুশিয়াস্থিত জার্ম্মানদের উপর একমাত্র সোভিয়েট কামান শ্রেণীই গোলাবর্ষণ করিতেছে না—আমাদের রক্ষী সৈন্যেরাও এখন পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।"

মস্কো বেতারেও ঘোষিত হইয়াছে যে লালফৌজ এক্ষনে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করিতেছে।

জার্ম্মান সমর সংবাদদাতা ফন হামার খবর দিতেছে যে ২৩শে আগষ্ট রাত্রে বিয়ালিষ্টকের পশ্চিমে সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের প্রত্যাশিত ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে। জার্ম্মানরা পিছু হটিয়া তাহাদের প্রধান আত্মরক্ষা ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই রণাঙ্গনে মার্শাল রকোসভস্কীর সৈন্যেরা যে আক্রমণে লিপ্ত আছে তাহার ফল খুব সুদূর প্রসারী হওয়া সম্ভব। তাঁহার সৈন্যদল সমস্ত পূর্ব্ব প্রুশিয়ার পাশ কাটাইয়া 'পোলিশ কোরিডোর' দিয়া ডানজিগে পৌছার জন্যও চেষ্টা করিতে পারে। ইহা যদি সম্ভব হয় তবে সমস্ত পূর্ব্ব প্রুশিয়া ও বাল্টিকের অগণিত জার্ম্মান সৈন্য ও সমর সম্ভার লালফৌজের সাঁড়াশীর ভিতর পড়িয়া ধ্বংস হইবে। ওয়ারশ-বিয়ালিষ্টক রেলপথের বিপরীত দুই দিক দিয়া মার্শাল রকোসভস্কীর সৈন্য ও জেনারেল জাখারভের সৈন্য তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে—তাঁহাদের ব্যবধান আর মাত্র ৩০ মাইল।

ওয়ারশ'র পূর্বে নূতন আক্রমণ

২৬শে আগষ্ট রাত্রে জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী জানাইতেছে যে, লালফৌজ ১২ হইতে ১৪ ডিভিসন পদাতিক বাহিনী ও কয়েকটি ট্যাংকের (সম্ভবতঃ মোট দেড় লক্ষ সৈন্য) লইয়া ওয়ারশ'র পূর্ব্বে ৪৫ হইতে ৫০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গন জুড়িয়া এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে।

খাস ওয়ারশ'র প্রবেশ পথে প্রাগার পূর্ব্ব উপকণ্ঠে দিনরাত্র প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। 'ইজভেস্তিয়ার' একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানরা এই স্থানে ইতালী হইতে একটি ও অন্যান্য রণাঙ্গন হইতে দুইটি ট্যাঙ্ক ডিভিসন ও রিজার্ভ সৈন্যদল আমদানী করিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে এখানকার যুদ্ধের সংবাদে জানাইয়াছে যে জার্ম্মান আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিয়া লালফৌজ পাণ্টা আক্রমণ চালায়।

রুমানিয়া অঞ্চলে

বিজয়ী লালফৌজ ১৯শে আগষ্ট হইতে আবার নূতন করিয়া রুমানিয়ার দিকে জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এই অল্প কয়েকদিনের ভিতর সেই অঞ্চলে যে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহাতে এই ফ্রন্টে যুদ্ধের গতির মোড় একদম ঘুরিয়া গিয়াছে। এই এলাকার ২১ দিন যুদ্ধের পরই জার্ম্মানরা যাসি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রুমানিয়ার বৃহত্তম সহরের মধ্যে যাসি অন্যতম। তার পরের খবর লালফৌজ গালাৎসের ফাটলে দুইদিক হইতে ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে দানিয়ুব বদ্বীপের ৫০ মাইলেরও কম দূরে যুদ্ধ চলিতেছে। জেনারেল মালিনভস্কী ও জেনারেল টলবুখিনের প্রচণ্ড আক্রমণে যাসির দক্ষিণ হইতে একারমানের পশ্চিম পর্য্যন্ত এক্সিস বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মার্শাল ষ্টালিন ২৪শে আগষ্ট এক হুকুম নামায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তৃতীয়- ইউক্রেনিয়ান রণাঙ্গনের সৈন্যেরা অভিযান চালাইয়া নীষ্টার নদীর দক্ষিণাঞ্চলে জার্ম্মানদের গুরুত্বপূর্ণ আত্মরক্ষা ঘাঁটি একারম্যান ও বেণ্ডারী অধিকার করিয়াছে। রাত্রের আর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে লালফৌজ বেসারাবিয়ার রাজধানী কিসিনেভ দখল করিয়াছে।

১২ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য আটক

২৫শে আগষ্ট সোভিয়েট ইস্তাহারে জানানো হইয়াছে যে কিসিনেভের দক্ষিণ পশ্চিমে ১২ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য ঘেরাও হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরের খবর যে কিসিনেভে অবরুদ্ধ জার্ম্মান সৈন্যেরা বেষ্টনী-ভেদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একস্থানে ৫ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য প্রুথ নদীর সংযোগ স্থলে পৌঁছিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রুশ লৌহ বেষ্টনী ভেদ করিতে ব্যর্থকাম হয়। সমগ্র রণাঙ্গন জার্ম্মান মৃতদেহ ও পরিত্যক্ত রণসম্ভারে ভরিয়া গিয়াছে।

৫ দিনে একলক্ষ জার্ম্মান সৈন্য নিহত

২৭শে আগষ্ট তারিখে সোভিয়েট ইস্তাহারে এক চমৎকার সাফল্যের বিবরণ বাহির হইয়াছে। লালফৌজ ৫ দিনে ১ লক্ষ ৬ শত জার্ম্মান সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে এবং ১ লক্ষ ৪ হাজার বন্দী করিয়াছে। সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা বৃহত্তম না হইলেও লালফৌজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। ষ্টালিনগ্রাদের ইতিহাস বিশ্রুত পরাজয়ের পর জার্ম্মান সমর নায়কগণের আজ পর্য্যন্ত এত বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইহা ছাড়া সোভিয়েট বাহিনী রুমানিয়ায় জার্ম্মানদের নানাস্থানেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। ইসমাইল নামক বিখ্যাত সহর আজ সোভিয়েটের হাতে। চারিদিকে জার্ম্মান রক্ষা ব্যূহের ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া লালফৌজ প্রবল বন্যার মত আগাইয়া চলিয়াছে, কোন বাধাই তাহাদের পথ রোধ করিতে পারিতেছে না।

মুক্তি সংগ্রামরত লালফৌজ

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের ইতিহাস খতাইয়া দেখিলে একটা জিনিষ চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে যে লালফৌজ তাহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য নিয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়াই আছে। আজ হয়ত ফিনল্যাণ্ডের দিকে বিপুল অভিযান সুরু হইল, সেখানকার শত্রুব্যূহ যখন ছিন্নভিন্ন হইতে চলিয়াছে, তখন দেখা যায় যে আবার মধ্য রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনী 'সামাল' 'সামাল' রব তুলিয়াছে—লালফৌজ বিপুল উদ্যমে আর এক আক্রমণ সুরু করিয়াছে। লালফৌজের এই আক্রমণ ক্ষমতাই তাহার অফুরন্ত শক্তির পরিচায়ক। সোভিয়েট রণনীতির গোড়ার কথাই হইতেছে তাঁহাদের নিজেদের শক্তি সব চেয়ে কম খরচ করিয়া শত্রুকে ঘায়েল করা। নাৎসী সমরযন্ত্র যখন পৃথিবীকে তাক লাগাইতে ব্যস্ত, লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য যখন নাৎসী সমরযন্ত্রের ক্ষুধা মিটাইতে অকারণে নিজেদের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে, হিটলারের দপ্তর খোরাক যোগাইতে যখন সমগ্র জার্ম্মানীর যৌবন স্তিমিত তখন সেই ধ্বংস স্তূপকে সামনে রাখিয়াই সোভিয়েট নায়করা নিজেদের দেশবাসীকে দেশপ্রেমের আহ্বানে সংহত করিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে সব কিছু দিয়াই লড়াই করিয়াছে, কিন্তু অযথা লোকক্ষয়কে এড়াইয়া সুশৃঙ্খলভাবে দেশের শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে—পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া জনগণের অফুরন্ত বলিষ্ঠ কর্ম্মোদ্যমকে নাৎসী দানবকে ধ্বংস করিতে সুসংবদ্ধ করিয়াছে। তাই আজ সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রন্টের লড়াইয়ের গতিতে সোভিয়েটের অদ্ভুত আক্রমণোদ্যোগ দেখা যায়—লালফৌজ আজ জয়ের পর জয়ের ইতিহাস রচনা করিতেছে—পলায়মান নাৎসী দানব আজ আর কোথায়ও দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

★ স্বাধীন প্যারিস জিন্দাবাদ ★

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, বিপ্লবের জয়পতাকা সগর্ব্বে বহন করিয়া যে দেশ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সকল দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে, সেই ফ্রান্সের ললাট হইতে পরাধীনতার কালিমা আজ অপসৃত হইতেছে। হিটলারীদের পদানত থাকিয়া পঞ্চাশ মাস ব্যাপী নরকভোগের অবসান আজ আসন্ন। প্যারিস নগরীর মুক্তিতে আজ ইহাই সূচিত হইতেছে।

১৯৪০ সালের ১৪ই জুন তারিখে হিটলারের মদমত্ত সেনা প্যারিস দখল করে। তাহার পর চার বৎসর ধরিয়া ফরাসী দেশপ্রেমিকদের অসহ্য যন্ত্রণা ভুগিতে হইয়াছে। মাসের পর মাস তাই তাহারা আকুল আগ্রহে দ্বিতীয় ফ্রন্টের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। এই সম্প্রতি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর হইতে ফরাসী দেশভক্তেরা প্রচণ্ড উৎসাহে শত্রুর উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য লাগিয়াছে। ইতিহাসবিশ্রুত প্যারিসে, বিপ্লবের বহু স্মৃতি-বিজড়িত প্যারিসের রাজপথে তাই বিপুল জন-অভ্যুত্থান হইল, মিত্রশক্তির সহায়তায় তাহারা বর্ব্বর ফ্যাশিষ্টদের ধ্বংস করিল।

বিপুল জনজাগরণ

চারদিন ধরিয়া ৫০,০০০ ফরাসী দেশভক্ত লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নাগরিকের সাহায্য লইয়া পথে পথে লড়িয়াছিল। পুলিশের প্রধান আড্ডা কাড়িয়া লইয়া তাহারা জার্ম্মানদের হার মানিতে বাধ্য করে, দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্যারিসের মুক্তিসংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়ে।

প্যারিস শুধু যে কেবল ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত রাজধানী, তাহা নয়। প্যারিস হইল ফ্রান্সের মর্ম্মস্থল। যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র ফ্রান্স প্যারিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে, প্যারিসের অধিবাসীদের বিপ্লবী কার্য্যক্রমকে সানন্দে মানিয়া লইয়াছে।

বিপ্লবের মহাতীর্থ প্যারিস

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব সে দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া দুনিয়াকে চমৎকৃত করে। প্যারিসের নাগরিকেরা স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া ছিল সেই বিপ্লবে অগ্রণী। ফরাসী বিপ্লব বিশ্বরাষ্ট্রনীতির নূতন একস্তর প্রবর্ত্তন করে।

১৮৩০ এবং ১৮৪৮-৪৯ সালে প্যারিসে বিপ্লব আরম্ভ হইয়া ইয়োরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুক্তিকামী দেশের মধ্যে ফ্রান্স ছিল সত্যই সকলের সেরা।

সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম পরীক্ষাও ঘটে ফ্রান্সদেশে। ১৮৪৮ সালের পর হইতে প্যারিস ও লিয় শহরের শ্রমিকরা ছিল সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রাণ। প্যারিসের জনগণ প্রথম সেই সাম্যবাদের জন্য সংগ্রাম করে, অত্যাচারীর গুলীর সামনে বুক পাতিয়া শহীদ হয়, প্রত্যেক মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করে নাই।

সোভিয়েটের প্রথম আভাস প্যারিস 'কম্যুন'

১৮৭১ সালে যখন জার্ম্মানদের কাছে ফরাসী সরকার আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন হাজার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া প্যারিসের বীর নরনারী তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ('কম্যুন') স্থাপন করে। জার্ম্মান শত্রু আর ফরাসী পুঁজিদার মিলিয়া এই মহাবীরদের পিষিয়া মারে, জঘন্য অত্যাচার করিয়া সাম্যবাদী প্যারিসকে ভাঙিয়া দেয়। প্যারিসের এই বীরদের সম্পর্কে মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন একটা ঝড়ের মত আসিয়া ত্রিভুবনকে কম্পমান করিয়াছিলেন।

প্যারিস 'কম্যুন' হইল সোভিয়েটের প্রথম আভাষ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লব রুশদেশে ঘটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাই বিপ্লবীদের তীর্থস্থান ছিল প্যারিস।

জনগণের হাতে ভবিষ্যৎ

সেই প্যারিস আজ মুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে মার্সাই, লিয়ঁ, বোর্দো, তুলঁ, গ্রেণোবল্ প্রভৃতি বিখ্যাত শহরের মুক্তিসংবাদ আসিতেছে। সুইটসারলাণ্ড ও ইতালীর সীমান্তের কাছে ফরাসী দেশভক্তেরা লড়িতেছে, মিত্রবাহিনী প্রতিদিনই অগ্রসর হইতেছে।

হিটলারী দুঃশাসনকে ফ্রান্সের জনগণ কখনও মানিয়া লয় নাই। দেশদ্রোহীদের হাতে শাসনভার ছিল বলিয়াই চার বৎসর পূর্ব্বে হিটলারের হাতে ফ্রান্সকে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্যাশিষ্টদের প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান হইয়াও ফরাসীদের মুক্তি প্রচেষ্টা কখনও লুপ্ত হয় নাই।

ফরাসী কমিউনিষ্টদের অবদান

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের কানে অক্লান্ত সংগ্রামের ডাক পাঠাইয়া দেয়। হাজারে হাজারে ফরাসী কমিউনিষ্ট তাই প্রাণ দিয়াছে, গাব্রিয়েল পেরি, পিয়ের সেমার, জঁ্যা কাথলা প্রভৃতি কমিউনিষ্ট নেতার নাম তাই আজ অমর হইয়া রহিয়াছে। মিত্রপক্ষ হইতে যখন বেতারে পরামর্শ গিয়াছে যে ফরাসীরা যেন চুপচাপ থাকে, যতদিন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা না হয় তত দিন হাত পা গুটাইয়া থাকে, তখন কমিউনিষ্টরা দেশকে জাগাইয়া রাগে, শত্রুকে মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই।

পেতাঁ, লাভাল প্রভৃতি দেশদ্রোহীর দল আজ ইতিহাসের জঞ্জালের মধ্যে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে। সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইয়া যেমন কেশর আন্দোলিত করে, নব জাগ্রত ফ্রান্স আজ তেমনিই আবার মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইয়োরোপের জনসমুদ্রে আজ যে জোয়ার আসিয়াছে তাহার ধাক্কায় তুচ্ছ তৃণের মত ফ্যাশিজমের ভেলা ভাসিয়া যাইবে।

Regd. No. C. 2836

বঙ্গীয় মেডিক্যাল রিলিফ সপ্তাহ

মহামারী হইতে বাংলাকে বাঁচাইবার ডাক

কলিকাতায় অভুতপূর্ব্ব সাড়া

দুর্ভিক্ষের পর মহামারীর প্রচণ্ড আক্রমণ যখন বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন ডাঃ বিধান রায়ের নেতৃত্বে বাংলার ১৯টী রিলিফ সংগঠন মিলিয়া **মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী** গঠন করিয়া মহামারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সুরু করে। এই কমিটী হইতে যেমন জেলায় জেলায় ডাক্তার দল পাঠাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়, তেমনি ঔষধপত্রের সরকারী ব্যবস্থাকেও এই কমিটীর মারফৎ অনেক পরিমাণে জনসাধারণের কাজে লাগান হয়। কিন্তু মহামারী রুখিতে গেলে যে বিপুল চেষ্টা

৩ কোটি বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ার কবলে

২৮শে আগষ্ট ডাঃ বিধান রায়ের মন্তব্য

দরকার, তার অতি সামান্যই এখনো পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই কমিটী সারা বাংলায় ১৫০০টী মেডিক্যাল ইউনিট গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হইয়াছে মাত্র ৮০টী ইউনিট। মহামারীর প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, অথচ সম্বলের অভাবে বহু জায়গায় সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। জনসাধারণের সাহায্য দ্বারা মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর এই অভাবকে পূরণ করিবার দায়িত্ব লইয়া বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশান কমিটী, মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটী, পিপলস্ রিলিফ কমিটী, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্রদের সংযুক্ত বোর্ড এবং আরো কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের মিলিত চেষ্টায় ২০শে আগষ্ট হইতে ২৮শে আগষ্ট কলিকাতায় মেডিক্যাল রিলিফ সপ্তাহ পালন করা হয়। ইহার জন্য যে আবেদন পত্র প্রকাশ করা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, সৈয়দ নৌশের আলি, মৃণালকান্তি বসু, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, লালমিঞা প্রভৃতি স্বাক্ষর করেন। এই সপ্তাহ পালনের ভিতর দিয়া কলিকাতায় এক নূতন সাড়া দেখা দিয়াছে। সকল শ্রেণীর জনসাধারণ এই সপ্তাহে যে সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব।

২০শে আগষ্ট সপ্তাহের উদ্বোধন হয় বিজলী সিনেমা হাউসে একটী চ্যারিটী শো দ্বারা। শ্রীযুক্ত বীজন ভট্টাচার্য্যের বিখ্যাত নাটক 'জবানবন্দী' এই দিন অভিনীত হয়। কলিকাতায় এই নাটকের অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। তবু দুর্ভিক্ষের জলন্ত কাহিনী দেখিবার জন্য এবারও হাজারে হাজারে লোক আসিল। কংগ্রেসনেত্রী **শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত** প্রধান অতিথিরূপে এই অভিনয় কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

তারপরের দুই দিন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। স্কটিশচার্চ্চ ও আশুতোষ কলেজ, এই দুই জায়গায় দুইটী বড় সভা হইল। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে সভাপতিত্ব করিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা **শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু**। অধ্যক্ষ কেলাস সাহেব সভায় বক্তৃতা করিলেন। আশুতোষ কলেজে **শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে** সভা হইল।

২৩শে আগষ্ট পতাকা দিবসে কলিকাতায় এক নূতন সাড়া দেখা দিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪৫০টী কর্ম্মী ১৫০টী বাক্স লইয়া দলে দলে কলিকাতায় সর্ব্বত্র মেডিক্যাল রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহে বাহির হইলেন। রাস্তায়, ট্রামে, অফিসে, বাড়ীতে সর্ব্বত্র ডাক্তার, ছাত্র, মেয়ে, মজুর সকলেই সারাদিন চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। সারা দিনে ৩৪০০৲ টাকা সংগৃহীত হইল।

তার পরে তিন দিন সভা। ২৪শে আগষ্ট **ডাঃবিধান রায়ের** সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে মেডিক্যাল রিলিফ সম্মেলন হইল। কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তারদের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ **ডাঃ ইউ-পি বোস, ডাঃ এ-সি উকীল,** কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের **ক্যাপ্টেন এস-কে বোস, ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রভৃতি অনেকেই এই সম্মেলনে আসিলেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল স্কুল, কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতির ছাত্ররা ও হাউস-সার্জ্জনরাও যোগ দিলেন। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার কাজে সকল শ্রেণীর চিকিৎসাবিদদের এরূপ সম্মেলন এই প্রথম। এই সম্মেলনে ঔষধ সরবরাহে সরকারী অব্যবস্থা দূর করার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেডিকেল রিলিফের জন্য

২৩শে আগষ্ট ৩৪০০৲ সংগ্রহ

২৫শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হইল। লক্ষ্ণৌএর বাঙ্গালী রিলিফ কমিটীর সম্পাদক ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করিলেন। মহামারীর বিরুদ্ধে সকলের সম্বল ও চেষ্টাকে একত্রিত করার প্রয়োজন আজ সকলেই গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই নেতারা এই সম্মেলনে আসিয়া তাঁদের মতামত ব্যক্ত করিলেন।

শেষ দিন, ২৬শে আগষ্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসমাবেশ। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সভানেত্রীত্ব করিবার কথাছিল, কিন্তু তাঁর কন্যার অসুখের জন্য তিনি আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সম্পাদক অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় আবেদন জানান হয় যে, বাংলাকে মহামারীর হাত হইতে বাঁচাইতে গেলে জনসাধারণের আরো সাহায্য দরকার। এই সপ্তাহে কলিকাতার নাগরিকরা যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মীদের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সকল শ্রেণীর জনসাধারণের যে একতা এই সপ্তাহের কাজে প্রকাশ পাইয়াছে; তা রিলিফের কাজে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে।

বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য

হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের মিলিত অভিযান

ছাত্র যুক্ত রিলিফ বোর্ডের উদ্যোগে ১লা হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষাকে বাঁচাও সপ্তাহ'

এই অভিযানকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন বাংলার নিম্নলিখিত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা :

ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রেভাঃ জন কেলাস (অধ্যক্ষ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ), হিরণকুমার সান্যাল—সম্পাদক "পরিচয়", বুদ্ধদেব বসু (রিপন কলেজ), বিষ্ণু দে (রিপন কলেজ), প্রণতি দে, সরোজ আচার্য্য (উইমেন্স্ কলেজ), মহিবুল হাসান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এস্ পি বিশ্বাস (স্কটিশচার্চ্চ কলেজ), এস জে রহমান (সিটি কলেজ), শান্তিরঞ্জন সেন (সিটি কলেজ), তারকনাথ চ্যাটার্জ্জি (সিটি কলেজ), দেবপ্রসাদ গুহ (সিটি কলেজ)।

যুক্ত রিলিফ বোর্ডের হাতে এই কাজের জন্য এখনই ৬২০০০ টাকা চাই।

রুমানিয়ায় স্বাধীনতার পতাকা উড়িল

দুই বছর আট মাস যুদ্ধের পর রুমানিয়া ফ্যাসিষ্ট শিবির হইতে খসিয়া পড়িল। ফ্যাসিষ্ট সাকরেদ এণ্টনিস্কু গবর্ণমেণ্টের পতন হইল এবং তাহার স্থান দখল করিল—ন্যাশন্যাল, কৃষক, লিবারেল, কামউনিষ্ট ও সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর এণ্টনিস্কু রাজপ্রাসাদে বন্দী হইল, জার্ম্মান দস্যুদের হাত হইতে বুখারেষ্ট সহর মুক্ত হইল। বুখারেষ্ট রেডিও হইতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান আসিল, "দেশের আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া জার্ম্মানী রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। জার্ম্মান দখল হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য রুমানিয়ার যেখানে যে জার্ম্মান ফৌজ রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ কর।" জাতীয় মুক্তিকামী রুমানিয়ানদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল সোভিয়েটের লালফৌজ। লাল ফৌজ ৫ দিনের যুদ্ধে এক লক্ষ জার্ম্মান সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করিল। ১ লক্ষ ৪ হাজার সৈন্যকে বন্দী করিল। ষ্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর জার্ম্মানদের এত বড় পরাজয় আর কোথাও হয় নাই।

বল্কানের রাষ্ট্রগুলিতে ফ্যাসিষ্টরা যে সকল বাসা বাঁধিয়াছিল, রুমানিয়াই ছিল তাহার মধ্যে সবচেয়ে মজবুত। সেই রুমানিয়ার জনসাধারণই আজ জার্ম্মান দস্যুর বিরুদ্ধে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ইহার কারণ কি?

রুমানিয়ার দস্যু নায়ক এণ্টনিস্কু দেশকে জার্ম্মানীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৪৩ সালে রুমানিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ খাদ্য জার্ম্মানীতে প্রেরিত হয়। হিটলারের আদেশে রুমানিয়ার চাষীর সমস্ত পশম, তুলা, চামড়া, চিনি প্রভৃতি জার্ম্মানীতে চালান হয়। রুমানিয়ার কারখানা, কয়লার খনি প্রভৃতির উপর জার্ম্মান কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা হইতেও বড় সম্পদ রুমানিয়ার লক্ষ লক্ষ নওজোয়ানকে রুশ রণাঙ্গনে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে নির্ব্বিচারে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ক্রিমিয়া, নীপারের পার এবং ইউক্রেন লক্ষ লক্ষ রুমানিয়ানের কবরভূমিতে পরিণত হয়।

কৃষিপ্রধান রুমানিয়ায় বরাবরই বিদেশী মূলধনের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে। শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাহাদের নেতারা অপরাপর শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে চলিয়াছে। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী কৃষকদল ন্যাশন্যাল পেজেণ্ট পার্টি ও লিবারেল পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া রাজা কেরোল ফ্যাসিষ্ট দলের অভ্যুদয়ে সাহায্য করিয়াছে। ১৯২১ সাল হইতে কাল পর্য্যন্তও কমিউনিষ্ট পার্টি বরাবরই ছিল বেআইনী। অশেষ পুলিশ নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া তাহারা কাজ করিয়া আসিয়াছে। আইনসঙ্গত সমাজতন্ত্রী হিসাবে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ইউনাইটেড সোস্যালিষ্ট পার্টি থাকিলেও তাহারা কোন সময়েই তেমন জোরদার হইতে পারে নাই।

১৯৪০ সালে হিটলার "ভিয়েনা এওয়ার্ডের" নামে রুমানিয়ার বৃহত্তম অংশ ট্রান্সিলভানিয়াকে হাঙ্গারীর হাতে তুলিয়া দিল, সমগ্র রুমানিয়াকে জার্ম্মান শক্তির তাঁবেদার করিয়া তুলিল। ইহাতে রুমানিয়ার জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এণ্টনিস্কুর দস্যুনীতির ভয়াবহ পরিণতি বুঝিতে পারিল। যুদ্ধের গতি তাহাদের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করিল। এবছর ২রা এপ্রিল কমরেড মলোটভ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিলেন, "লাল ফৌজ জার্ম্মান ও তাহাদের দোসর রুমানিয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া প্রুত নদী অতিক্রম করিয়া রুমানিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। লালফৌজের অধিনায়করা সোভিয়েট বাহিনীকে আদেশ করিয়াছে, শত্রু নিশ্চিহ্ন এবং আত্মসমর্পণ না করিতে তাহারা যেন না থামে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার ইহাও ঘোষণা করিতেছে যে, রুমানিয়ার কোন স্থান দখল করা বা রুমানিয়ার বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সোভিয়েটের উদ্দেশ্য নয়।"

সোভিয়েটের এই ঘোষণা রুমানিয়ার দেশপ্রেমিকদের চোখ খুলিয়া দিল। তাহারই ফলে তাহারা জার্ম্মান দস্যুদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া আজ স্বাধীনতার পতাকা উঁচু করিল।

লালফৌজের জয়যাত্রা, দ্বিতীয় ফ্রণ্টে মিত্রশক্তির জয় যাত্রা, ফরাসী দেশে জনগণের অভ্যুদয় কেবল রুমানিয়ান নয় বুলগারদের মধ্যেও আশার সঞ্চার করিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জার্ম্মান সৈন্য বুলগেরিয়ায় আছে বুলগার সরকার তাহাদের নিরস্ত্র করা শুরু করিয়া দিয়াছে। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া হইতে বুলগার সৈন্যদের অপসারণের কথাও চলিতেছে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় জার্ম্মান দস্যুদের এই পরাজয় গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিফৌজকে সাহায্য করিবে। বল্কানের রণক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্টদের চরম পরাজয় আসন্ন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা] ৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, '৪৪, ২১শে ভাদ্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

বাংলা কি ঐক্যের সুযোগ হারাইবে ?

[ভবানী সেন]

ঐক্যের জন্য লীগের প্রস্তাব

বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মহল হইতে জানিতে পারিলাম যে মুসলিম লীগের বঙ্গীয় শাখার কোন দায়িত্বশীল নেতা শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায়ের নিকট একটি প্রস্তাব দিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাংলার কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া। সংবাদ এইরূপ যে কংগ্রেস যদি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লয়, তাহা হইলে মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বঙ্গীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব মানিয়া লইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কিরণ বাবুর পক্ষ হইতে কোন উত্তর লীগ-নেতারা এখনও পান নাই। কিরণ বাবুও এ বিষয়ে কংগ্রেস-সেবীদের কোন পরামর্শ সভা আহ্বান করেন নাই। লীগের প্রস্তাব তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন।

গান্ধীজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিরণ বাবু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই কথাই ব্যক্ত করেন যে রাজাজীর প্রস্তাব অনুসারে কোন চুক্তি হইলে বাংলা দেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, বঙ্গভঙ্গ যাহাতে না হয় তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। বাংলার ঐক্য যদি তাঁহার কাম্য হয় তাহা হইলে লীগ সে পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। কিরণ বাবু এখনও নিশ্চেষ্ট কেন? লীগের নিকট হইতে কোন প্রস্তাব পাইয়া থাকিলে তাঁহার উচিত কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লীগের সঙ্গে আলোচনা চালান।

কিরণ বাবুর অপকৌশল

কিন্তু কিরণ বাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন। গান্ধীজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটা সম্মেলন পর্য্যন্ত ডাকিলেন না। কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার যে দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া তিনি কংগ্রেস-বিরোধীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। কমার্সিয়াল মিউজিয়মে ঠাকুরপন্থী এবং ফরওয়ার্ড ব্লক পন্থীগণ পরিচালিত বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের এক সভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। অথচ কংগ্রেসসেবীদের কোন সভায় তিনি যোগদান পর্য্যন্ত করেন না। কিরণ বাবু হয়ত বলিবেন যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে এক মত তাহাদের সভা-সমিতিতে যোগদান করিবার ব্যক্তিগত অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি শুধু একজন ব্যক্তিমাত্র নহেন, তিনি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী হওয়ার পর তিনিই সর্ব্বসাধারণের কাছে কংগ্রেসের মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় আলোচনা করিয়া তিনি বাংলার কংগ্রেসম্যানদের নীতি ও পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনিই কংগ্রেসের মুখপাত্র এই বিশ্বাসে লীগের নেতৃবৃন্দ তাঁহার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকেন। আজ তিনি যদি বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন একতাবদ্ধ মত নির্দ্ধারণের দায়িত্ব লইতে অস্বীকার করিয়া শুধু তাঁহার স্বমতাবলম্বীদের লইয়া দলগতভাবে চলেন তাহা হইলে স্বভাবতই বাংলার কংগ্রেসকে পিছন হইতে ছুরি মারা হয়।

গত দুই বৎসর কংগ্রেসের স্বাভাবিক কাজ অনেক ছিল বলিয়া বাংলার কংগ্রেসসেবীরা কিরণ বাবুর নির্দ্দেশকেই কংগ্রেসের নির্দ্দেশ বলিয়া মানিয়াছেন। আজ সেই অচল অবস্থার সুযোগ লইয়া কিরণ বাবু তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজের খেয়ালমত চলিতে পারেন না। যাহারা তাঁহাকে অনেক দিয়াছে তাঁহারা তাঁহার নিকট অনেক প্রত্যাশা করে।

ভারত স্বাধীন হউক এবং বাংলাদেশ অখণ্ড থাকুক ইহা সমস্ত বাঙ্গালীর কাম্য। এ অবস্থায় লীগ যদি বাংলার ব্যাপারে আপোষ মীমাংসার জন্য অগ্রণী হয় তবে তাহা উপেক্ষা করা বাংলার প্রতি দায়িত্বহীনতা। লীগের প্রস্তাব-সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কিরণ বাবু কংগ্রেস-বিরোধী ও লীগ-বিরোধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত করায় অখণ্ড বঙ্গের সম্ভাবনাই দূরে সরিয়া চলিল। লীগের মধ্যে এখন এই সন্দেহ জাগিতেছে যে বাংলার কংগ্রেস লীগের সঙ্গে ঐক্য চায় না। ইহার পর লীগ যদি কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারাইয়া উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করে তাহা হইলে কিরণ বাবুই বঙ্গভঙ্গের জন্য দায়ী হইবেন।

লীগ ঐক্য চায়, মহাসভা চায় ভেদ

বঙ্গীয় কংগ্রেসের এক দিকে মহাসভা অন্য দিকে লীগ। মহাসভা কংগ্রেসকে ভয় দেখাইতেছে লীগের সঙ্গে ঐক্যের পথে চলিলে বঙ্গভঙ্গ হইবে, বাংলার কৃষ্টি বিনষ্ট হইবে আর লীগ বাংলার কংগ্রেসকে ডাকিতেছে বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য মিলনের পথে। মহাসভার প্রতি কিরণবাবুর মোহ তাঁহাকে বিপথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাংলার দিকে দিকে গান্ধী-জিন্না আপোষের পক্ষে কংগ্রেস-সেবীদের বিপুল সমর্থন ঘোষিত হইয়াছে, জাতীয় ঐক্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত অভিযান চলিতেছে তাহাতে উৎসাহিত হইয়া লীগ আজ বাংলার ঐক্যের জন্য উদ্গ্রীব, এ অবস্থায় কিরণ বাবুর কি উচিত ছিল না অন্ততঃ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় লীগের প্রস্তাব উপস্থিত করা এবং অন্ততঃপক্ষে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির পক্ষ হইতে লীগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানো?

বাংলার লীগ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছে কিন্তু বাংলার কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ অবস্থায় সুতরাং মীমাংসা করিবে কে? কিরণ বাবু তাঁহার দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, লীগকেও আপোষ মীমাংসা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। অথচ তিনি প্রচার করিতেছেন যে রাজাজীর প্রস্তাবে বাংলা দেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, বঙ্গভঙ্গের সম্ভাবনার মর্ম্মপীড়ায় তিনি কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গান্ধীজী যখন ভারতের কংগ্রেস এবং লীগের ব্যবধান দূর করিবার জন্য অগ্রণী, কিরণ বাবু কি তখন বাংলার কংগ্রেস ও লীগের ব্যবধান দৃঢ় করিবেন? কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিতে গিয়া তিনি কংগ্রেসেরই ভেদ বাড়াইয়াছেন, কংগ্রেসকে কতকগুলি দলগত চক্রে পরিণত করিয়াছেন। এ পথ কি বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করিবার পথ না বাংলাকে শতখণ্ডে খণ্ডিত করিবার পথ?

বাংলায় আপোষের ভিত্তি

বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর নিম্নলিখিত মর্ম্মে আপোষ হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং সুর্ম্মা উপত্যকা লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। ঐ যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি আইন সভা থাকিবে, একটিতে সমস্ত সাবালকদের ভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে, অন্যটিতে মুসলমান ও অমুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচনে সমানসমান প্রতিনিধি থাকিবে। অমুসলমানদের প্রতিনিধিদের ভিতর তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধিদের স্থান বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইবে। আইন প্রণয়নের জন্য উভয় সভারই সমান অধিকার থাকিবে। ভারত যতদিন এক অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত না হয় ততদিন বঙ্গীয় রাষ্ট্র অন্যান্য ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে। এই রাষ্ট্রের প্রথম ঘোষণা হইবে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রত্যেক ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির স্বাধীন ও সমান অধিকার এবং শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী।

আমরা যতদূর জানি বাংলার কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর উল্লিখিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালাইলে মিলন সম্ভব। ৯ই সেপ্টেম্বর জিন্না সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা আরম্ভ হইবে। তাহার আগে যদি বাংলার কংগ্রেস ও বাংলার লীগ উল্লিখিত মর্ম্মে চুক্তি করে, তাহা হইলে গান্ধী জিন্না আপোষ কত সহজ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড বাংলার ভিত্তি রচিত হয়। এই মিলনের ফলে নূতন বাংলার অভ্যুদয় হইবে, বাঙ্গালী স্বাধীনতা, সুখ ও সম্পদের পথ দেখিতে পাইবে কিন্তু মিলনের এই সুযোগ যদি আজ আমরা হারাই তাহা হইলে ১৯৪৩ সালের দুর্য্যোগ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বার বার ঘটিবে।

★ যুদ্ধের শেষ খবর ★

সোভিয়েট ফ্রণ্ট—জার্ম্মান সংবাদে প্রকাশ যে লালফৌজ বুলগেরিয়ার এলাকার মধ্যে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং সোভিয়েটের অন্যান্য যুদ্ধবিরতি সর্ত্ত গ্রহণে রাজী হইয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ ও প্রসিদ্ধ সহর এণ্টওয়ারপ মিত্রসেনার দখলে আসিয়াছে।

মিত্র সেনা হলাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। জার্ম্মানরা হলাণ্ড ও বেলজিয়ামে বিশৃঙ্খল ভাবে হটিয়া যাইতেছে এবং খাস জার্ম্মাণীতে গিয়া ঢুকিতেছে।

ইতালীয় ফ্রণ্ট—অষ্টম আর্ম্মির সৈন্যদল বিধ্বস্ত 'গথিক লাইনে'র মধ্য দিয়া ১২ মাইলের অধিক অগ্রসর হইয়াছে।

সম্পাদকীয়

সুরেন্দ্র ঘোষের মুক্তি চাই

কংগ্রেস-লীগ মিলন প্রচেষ্টা আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে রকম সদ্ভাব বেড়ে উঠছে সেরকম বহুদিন দেখা যায় নি। বাংলায় কংগ্রেসের সমস্ত দল মিলে পূর্ণ শক্তিতে যদি সদ্ভাব বাড়ানোর চেষ্টায় লাগেন তাহলে মিলন-প্রচেষ্টা আরও দ্রুত সফল হয়। কিন্তু দুঃখের কথা বাংলা কংগ্রেসের কিরণ বাবু প্রভৃতি মিলনের বিরোধিতা করছেন। খাদিপন্থী যারা সমর্থন করছেন তাঁরাও মিলনের স্বপক্ষে আন্দোলন করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী নয়। তার ফলে জনসাধারণের আগ্রহ সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সদ্ভাব দ্রুত বাড়তে পারছে না, বাংলার সমস্যা আগের মতই ঘোরালো থেকে যাবার দুর্ভাবনা জাগছে।

বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ বিনা বিচারে বন্দী। তিনি বাইরে থাকলে বাংলার কংগ্রেসকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত করতে পারতেন, দলাদলি এবং ঝগড়াঝাটিও দূর করতে পারতেন। শোনা যায় যে তিনি গান্ধীজির মিলন প্রস্তাব সমর্থন করেন। এমন সময়ে তাঁর বাইরে আসা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাতে হিন্দু-মুসলিম সদ্ভাব বাড়বে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে বাংলা এক হয়ে দাঁড়াতে পারবে, আমলাতন্ত্রের হাত থেকে শক্তিও ছিনিয়ে আনতে পারবে।

হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত বাঙ্গালী একবাক্যে তাঁর মুক্তি দাবী করুন।

বাংলার কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হোক

বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে সুযোগ আসিয়াছে এ সুযোগ আমরা হারাইব না। গান্ধী-জিন্না আলোচনার মুহূর্তে সমগ্র ভারত বাংলার দিকে তাকাইয়া আছে, কংগ্রেস নেতারা আসুন—বাংলার কংগ্রেসকে একতাবদ্ধ করিয়া বাংলার লীগের সঙ্গে আমরা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করি। এ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথম উপায় বাংলার কংগ্রেসের অন্তর্গত বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংযুক্ত বৈঠক। আসুন এই সংযুক্ত বৈঠকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে উহা অনুমোদিত করাইয়া লই এবং সেই অনুসারে লীগের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাই।

লোকে নর্দ্দামার পচা খাদ্য তুলিয়া খায়

অথচ সরকারই হাজার হাজার মণ খাদ্য নষ্ট করে

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সরকারের ষ্টককরা হাজার হাজার মণ খাদ্যদ্রব্য পচিয়া গিয়াছে। এই পচা খাদ্য নিকটবর্ত্তী জলাভূমিতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫ই সেপ্টেম্বরের সরকারী বিবৃতিতেই স্বীকার করা হইয়াছে যে ১৭ হাজার মণ খাদ্য নষ্ট হইয়াছে।

সমস্ত সংবাদপত্রে এই অপচয়ের খবর বাহির হইয়াছে—পচা খাদ্যদ্রব্যের দুর্গন্ধে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সংবাদটীর এইখানেই শেষ নয়।

হাওড়া সিটি খাদ্য কমিটির সম্পাদক জানাইতেছেন—নলপুর, বাউড়িয়া, আবাদা, বাগনান প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলের গ্রাম হইতে দুঃস্থ নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় এই সব পচা খাদ্য কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে এই সব অঞ্চলে শীঘ্রই মহামারী ছড়াইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের রিপোর্টারের সংবাদ,—এই পচা খাদ্য গবাদি পশুকে খাওয়ান হইবে বলিয়া কণ্ট্রাক্টাররা কিনিয়া লইয়াছে। ইহা যে রেশনের দোকানে বা গ্রামের মুদী দোকানে মানুষের ব্যবহারের জন্যই বিক্রয় হইবে না তাহার গ্যারাণ্টি কোথায়? হাওড়ার কোন কোন লোক আমাদের কাছে অভিযোগ করেন যে সম্প্রতি রেশন দোকানের খাদ্যের নমুনা আর এই পচা খাদ্যের নমুনায় বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সরকার তো মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য পরীক্ষককে রেশনের নমুনা দিতে নারাজ। তবে উপরোক্ত অভিযোগের পরীক্ষা কিরূপে হইবে?

লীগনেতা নবাব ইসমাইল খাঁর উক্তি

কংগ্রেসসেবীরা হিন্দু সভার অপপ্রচারের জবাব দিন

"হিন্দু মহাসভা যে ঐক্য-বিরোধী অভিযান চালাইতেছে তাহাতে উত্তেজিত না হইবার জন্য আমি মুসলমানদের অনুরোধ করিতেছি। কংগ্রেস সেবীরাও যেন মহাসভার চ্যালেঞ্জ

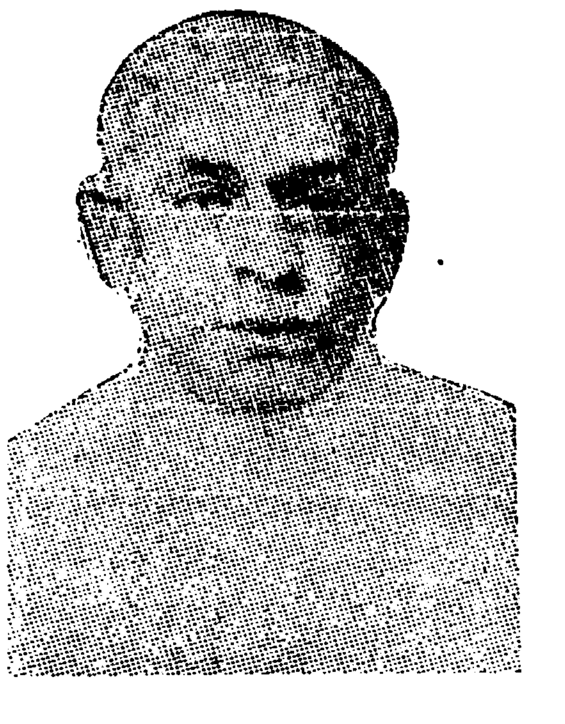

নবাব ইসমাইল খাঁ

গ্রহণ করিয়া দেখাইয়া দেন যে গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লীগের সঙ্গে আপোষ করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন ইহার পিছনে সমগ্র হিন্দু ভারতের সমর্থন রহিয়াছে। আমরা যেন কিছুতেই আমাদের পথ হইতে বিচ্যুত না হই।"

'পিপলস্ ওয়ারের' প্রতিনিধি সাকিক্ আহমদ নাথভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে মুসলিম লীগের সর্ব্বভারতীয় কাউন্সিল অব এ্যাকসানের্ ও যুক্ত প্রদেশের লীগের সভাপতি নবাব ইস্মাইল খাঁ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গান্ধীজির অস্থায়ী সরকারের দাবীর প্রত্যুত্তরে বড়লাট যে চিঠি দিয়াছেন তাহার অছিলা নিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি জিন্না-গান্ধী সাক্ষাৎকার পরিত্যাগের কথা বলিতেছে তাহাদের জবাবে নবাব সাহেব বলেন "এই ঐক্যের জোরে আমরা আমাদের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব। এই ঐক্যের দ্বারা আমরা আমেরিকা, বৃটেন, সোভিয়েট প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীল শক্তির সহায়তায় আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় শক্তিমান হইয়া উঠিব।"

জিন্না-গান্ধীর আসন্ন সাক্ষাৎকারের আলোচনা প্রসঙ্গে নবাব সাহেব বলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক জটিল সমস্যা রহিয়াছে বটে। কিন্তু পারস্পারিক শুভেচ্ছা ও ঐক্যের আগ্রহ দ্বারা এই দুই মহান নেতার প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত না হইবার কোন কারণই নাই। পাকিস্তান নীতির বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্ন সমাধা হইয়া গেলে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে কোনও সমস্যা উঠিবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অধীর হইয়া ঐক্য প্রচেষ্টায় বাধা না জন্মাইতে কায়েদে আজম যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহার সম্মান রক্ষা করিবার জন্যও নবাব সাহেব কংগ্রেসসেবী ও লীগভক্তদের অনুরোধ করেন। যে সব বিবৃতি কিংবা সংবাদপত্রের মন্তব্য এই দুই নেতার অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে সেগুলিকে তিনি অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া অভিহিত করেন।

'পিপলস্ ওয়ারের' প্রতিনিধি তখন কলেরার বিরুদ্ধে বিহারের সর্ব্বদলীয় ঐক্য সম্বন্ধে নবাব সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নবাব সাহেব উত্তর দেন "জনগণের সেবা ও জনগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য দুই সম্প্রদায়ের (হিন্দু মুসলমান) ভিতর যে সম্মিলিত কার্য্যপন্থাই গ্রহণ করা হউক তাহাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাইব। কারণ ইহাই তাহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব।

যুক্ত প্রদেশের খাদ্যের সংকটজনক অবস্থা এবং কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারীর উল্লেখ করিয়া নবাব সাহেব উক্তি করেন "জনগণকে উপবাস ও রোগের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যুক্ত প্রদেশেরও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হউক ইহাই আমি কামনা করি।"

এর পর তিনি মিউনিসিপালিটির আসন্ন নির্ব্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের পক্ষে যেমন লীগ প্রার্থীদের বিরোধিতা করা উচিত হইবে না, তেমনি লীগেরও কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থন হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, জন-গণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়াই মিউনিসিপালিটির কাজ পরিচালনা হওয়া দরকার। ইহার জন্য কংগ্রেস-লীগের বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধ কাজ অপরিহার্য্য। শুধু এভাবেই সরকারকে জন-গণের প্রতিনিধিদের কথা শুনিতে বাধ্য করা যায়।

লীগভক্তদের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে নবাব ইসমাইল এই মত প্রকাশ করেন যে, মুসলিম-দের বাণী, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা (পাকিস্তান) এবং স্বাধীন দুনিয়ায় স্বাধীন ভারত ও জন-গণের সেবা—এই কয়টি আদর্শ প্রদেশের ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়া এবং প্রত্যেকটী মুসল-মানকে আজ জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন।

সমস্ত কথার শেষে নবাব সাহেব সমগ্র **ভারত ও মুসলমানদের স্বাধীনতার একমাত্র অস্ত্র যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য** —ইহাতে তাঁহার দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করেন। কায়েদে-আজম ও মহাত্মাজীকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সমস্ত জনগণ ও সংবাদপত্রকে আবেদন জানান।

গান্ধী-জিন্নার চেয়ে বৃটিশ আমলা আমাদের স্বার্থ ভাল বুঝে!

টমসনকে লীগনেতাদের কড়া জবাব

সম্প্রতি প্রফেসর এডওয়ার্ড টমসন বিলাতের "স্পেক্টেটারে" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে—মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্না বাংলা ও পাঞ্জাবের কি জানে? পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্ত্তী মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল এবং বাংলায় পাকিস্তান দাবী করিবার অধিকার যেমন মিঃ জিন্নার নাই, তেমনি মিঃ গান্ধীরও এই দাবীতে সম্মত হওয়ার অধিকার নাই। তাঁহার মতে গান্ধী-জিন্নার মত দুইজন বাইরের লোকের আপোষে জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের পাকিস্তান দিলে ফল কি হইবে তাহা জেলায় জেলায় যে-সব বৃটিশ অফিসার আছেন তাঁরাই ভাল বুঝেন।

বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহঃ সভাপতি মিঃ কে আনাম খান, লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সম্পাদক মিঃ এ, এম, মালেক, বাংলার কোয়ালিশন পার্টির যুগ্মসম্পাদক মিঃ আবদুল করিম ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে টমসনের জবাব দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন,—বর্ত্তমানে ভারতের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব জঘন্য প্রচারকার্য্য বিলাতে চলিতেছে টমসনের লেখা তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার বক্তব্য সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্না "বাহিরের লোক"! আর প্রফেসরের স্বদেশবাসী চার্চিল ও আমেরি বোধ হয় ভারতীয়দের দেশের লোক? প্রফেসর ভ্রান্তি ও মরীচিকা মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, না, ভারতের হিন্দু-মুসলিম আপোষে বিলাতের যে সব ঝানু রক্ষণশীলরা আতংকিত হইয়াছেন তাঁহাদেরই ওকালতী করিতেছেন? এই সব ঘৃণ্য ইংরাজদের অসহনীয় ধৃষ্টতা সত্ত্বেও ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চলিবেই।

[বাংলাদেশে থাকার সময় এই অধ্যাপক টমসন রবীন্দ্রনাথের লেখার তারিফ করিতে গিয়া যে ভুল পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন তার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথকে হিমসিম খাইতে হইয়াছিল। তিনি আবার বাংলা ও পাঞ্জাবের জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছেন! অন্ধ তাঁবেদারী ও নিলর্জ্জ মিথ্যাভাষণের একটা সীমা থাকা উচিত। জঃ সঃ]

গান্ধী-জিন্না মিলনের পিছনে

বাংলাকে সর্বাগ্রে দাঁড়াইতে হইবে

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির প্রস্তাবে লীগ নেতার সমর্থন

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক

আমরা আসন্ন গান্ধী জিন্না সাক্ষাতকারের সাফল্য কামনা করি। কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রস্তাব বাঙ্গলার প্রতিটী অধিবাসী সমর্থন করে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলা দেশের কংগ্রেস লীগ নেতাদের মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরে খাদ্যসংকট ও মহামারী দূরীভূত হইবে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ও বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য বাংলা দেশকেই আজ অগ্রণী হইয়া গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের আপোষের পশ্চাতে পূর্ণ সমর্থন লইয়া দাঁড়াইতে হইবে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটী বিরাট জনসভায় কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা শাখার সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন উপরিউক্ত মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী প্রাণ হারাইয়াছে—বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে অসংখ্য শ্মশান ও গোরস্তান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের যদি কথা বলিবার শক্তি থাকিত তবে গান্ধী-জিন্না আপোষের প্রাক্কালে তাহারা আওয়াজ তুলিত—হায়, তোমরা আর একটা বছর আগে যদি মিলিতে পারিতে তাহা হইলে আমরা আরো কয়েকটা বছর দুনিয়ার সুখদুঃখ দেখিয়া যাইতাম। লীগ-সম্পাদক আবুল হাসেম এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন,—বাংলা তথা ভারত বিভক্ত হইবে কি ঐক্যবদ্ধ থাকিবে এই যুক্ত-তর্ক আজ কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে আজাদ ভারত। পরাধীন আবুল হাসেম স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন-তন্ত্রের কি বলিতে পারে? আজ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দু-মুসলমান আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—ইহাই আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা। সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী প্রস্তাবটী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর বাংলায় জনগণের নিকট উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান,—দুনিয়ার জনগণ আজ বিশ্বের সমস্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহারাই আমা-দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, চার্চিল-আমেরী ওয়াভেল নয়। আপনারা জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ফাশিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করিবার দৃঢ়-সংকল্প লইয়া তাহাদের সহিত হাত মিলান। কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, নবেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। জাতীয় নেতাদের মুক্তি বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের মুক্তি দাবী করিয়া মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠিতে থাকে। গ্যাস কোম্পানীর শ্রমিকের একটী দল হিন্দীভাষায় গান্ধী-জিন্না ঐক্যের গান করেন। সভার শেষে "নূতন পথে চল, গণ-মুক্তির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আর এদিক ওদিক তাকাস্ না" গানটী সকলের মনে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার করে।

হাজরা পার্ক

২রা সেপ্টেম্বর হাজরা পার্কের জনসভা। স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগকর্মীরা মিলিতভাবে সভা আহ্বান করে, দক্ষিণ কলিকাতার সকলের মত যে দেশবন্ধুর পরে হাজরা পার্কে এরকম জনসভা আর হয় নাই। আজকাল গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের ব্যাপার লইয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই জানিতে-বুঝিতে চায়। আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ একটানা ঐক্যবিরোধী প্রচার আর লোকে গিলিতে চাহিতেছে না—আজকালকার সভায় তাই লোকে উৎসুক ও জিজ্ঞাসার মনোভাব নিয়া আসে। অচল অবস্থা কেমন করিয়া অবসান করা যায়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ কি, বঙ্গ বিভাগ হইবে কি না এই সব আজ সকলকে আন্দোলিত করিতেছে। জনসভার পাঁচ হাজার নাগরিক তাহাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব পাইয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠিল। কমরেড ভবানী সেনের বক্তৃতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কেমন করিয়া আমাদের বাংলাদেশকে আবার সোনার বাংলায় পরিণত করিতে পারিব, কংগ্রেস-সেবক বুঝিল যে তাহার প্রতিবেশী লীগভক্ত স্বাধীনভারত চায় এবং স্বাধীনভারতে স্বতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে শিক্ষায় সম্পদে সর্বোন্নত করিবারই স্বপ্ন দেখে, লীগও বুঝিল যে বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে মিলন হইলে বাংলাকে বাঁচান যায় এবং স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করা যায়। কমরেড ভবানী সেন যখন বক্তৃতার শেষে আবেদন করিলেন যে এবারকার দুর্গাপূজা ও ঈদকে হিন্দুমুসলমান মিলন ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উৎসব হিসাবে পালন করা চাই, তখন সমগ্র জনতা উৎসাহমুখর হইয়া উঠিল। তারপর কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতা। ভারতবর্ষের ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গোটা ছবি সকলের চোখের সামনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভারতের অগণিত জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে আমেরী, ওয়াভেল, আম্বেদকর, মানবরায় এবং হিন্দুমহাসভার ধুরন্ধরেরা। এদের কৌশল আবার দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিতে চায়, কংগ্রেস-লীগের ঐক্য-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে চায়। বঙ্কিমবাবু জনসভার সামনে সাক্ষীর মঞ্চে ভারতের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান জগতের ঘটনাগুলিকে আনিয়া হাজির করিলেন। জনতা দেখিল যে তাহাদের সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়ের পিছনে সাম্রাজ্য-বাদের একটা বিরাট চক্রান্ত রহিয়াছে। জনতা উপলব্ধি করিল, যদি আজ ৪০ কোটী ভারতবাসী কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বনিয়াদের উপর দাঁড়ায় তবে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য বাকী পৃথিবীর ১৬০ কোটী লোকের প্রতীক্ষা সার্থক হইবে—তবেই যুদ্ধশেষে সকল দেশে মুক্তি ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে! সভায় সমাগত জনতা বর্ত্তমান সমস্যার উপর পি, সি, জোশীর পুস্তিকা "গান্ধী-জিন্না আপোষের পথ" ৪০০ কপি আগ্রহের সঙ্গে ক্রয় করে। গান্ধী-জিন্নার সাক্ষাৎকারের সাফল্যের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধী-জিন্নার সাক্ষাত

কংগ্রেস লীগ ঐক্যের আহবানে মজুর, ছাত্র, মহিলা ও শিল্পীরা আগুয়ান

মহিলাদের সভা

মালদহ

স্থানীয় মুসলীম লীগ সম্পাদকের স্ত্রী **মিসেস** এ, জে, বেগমের সভানেত্রীত্বে শহরে **একটি সভায়** কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রচেষ্টার **সমর্থনে** প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সেই **মর্মে** গান্ধীজীর নিকট তার পাঠান হয়।

শ্রীহট্ট

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, কংগ্রেস মহিলা সংঘ ও মুসলীম মহিলা সংঘের যুক্ত উদ্যোগে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সফল কামনা করিয়া সহরে একটি সভা হয়।

ফরিদপুর

এই জেলায় **বামচাড়া, কালাগাঁও ছুইপুর ও মাদারীপুরে** গান্ধী-জিন্না ঐক্য প্রস্তাব সমর্থনে সভা হয়। সহরের সভায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের নেত্রীগণ যোগদান করেন।

ঢাকা

গত ১১ই আগষ্ট হইতে ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত এই জেলার বিভিন্ন স্থানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে মোট ৯টি মহিলাসভায় অন্ততঃ ১০০০ মহিলাদের উপস্থিতিতে গান্ধীজীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করা হয়।

ময়মনসিংহ

এই জেলার হালুয়াহাটি গ্রামে ঐক্য-প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইয়া মহিলাদের এক সভা হয়। বহু কৃষক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি স্থানীয় অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার সমর্থনে সভা করিয়াছে। গাইবান্ধায়ও মহিলাদের অনুরূপ একটি সভা হইয়া গিয়াছে।

পাবনা

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সমর্থন করিয়া গণ-সহি সংগ্রহ করে, ৫টি পাড়ায় মহিলাদের মিটিং করিয়া ঐ মর্মে প্রস্তাব পাশ করে।

খুলনা

জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ভানু দেবীর সভানেত্রীত্বে এই জেলায় নৈহাটীতে মুসলীম মহিলাদের এক সভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া প্রস্তাব পাশ করা হয়।

ইহা ছাড়া **বগুড়া, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, যশোহর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী** প্রভৃতি জেলায় এই সম্পর্কে বহু মহিলা সভা হইয়া গিয়াছে।

শ্রমিকদের সমর্থন

ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সমর্থন

২৯শে আগষ্ট শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক সভায় হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বর্দ্ধমানের বি, কে এণ্ড এ, কে রেল-ওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এক সভায় রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

ময়মনসিংহের বাজিতপুর বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

ছাত্রদের সাড়া

চাঁদপুর

স্থানীয় মুসলীম ইনষ্টিটিউটে মুসলীম ছাত্রদের এক বিরাট সভায় গান্ধী-জিন্না ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়।

চট্টগ্রাম

হাবিলাসদ্বীপে হিন্দুমুসলমান ছাত্রদের উদ্যোগে এক সভায় গান্ধী-জিন্না মিলনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ফতেয়াবাদেও অনুরূপ এক সভা হয়।

বরিশাল

বি, এম, কলেজে জেলা ছাত্রফেডারেশন ও মুসলীম ছাত্র লীগের যুক্ত উদ্যোগে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ছাত্রদের এক সভায় ঐক্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা হয়।

মাদারীপুর

কংগ্রেস লীগ ঐক্যের সমর্থনে বহু ছাত্রের সহি দিয়া এক স্মারকলিপি গান্ধীজীর নিকট পাঠান হইয়াছে।

লেখক ও শিল্পীদের বিবৃতি

রাজাজীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গান্ধী-জিন্না আপোষের শুভ কামনা করিয়া ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ যে বিবৃতি প্রকাশ করে—তাহাতে বাংলার নিম্নলিখিত বিশিষ্ট শিল্পীরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

লেখক :—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, হিরণ সান্যাল, সত্যেন মজুমদার, সওকৎ ওসমান, আবু সৈয়দ আইয়ুব, আবুল মনসুর আহমদ, মুজিবুর রহমান খাঁ, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, গোপাল হালদার, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখার্জ্জী, পি-নাগ।

চিত্রশিল্পী :—যামিনী রায়, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, পি-গুপ্ত, বি-মজুমদার, গোবর্দ্ধন আশ, পানাপ্পা, ত্রিভঙ্গ রায়, সুর্য্য রায়, বি-রায়, লালমোহন রায়।

নাট্যশিল্পী :—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নরেশ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য ও শম্ভু মিত্র।

গায়ক :—দেবব্রত বিশ্বাস ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জেলায় জেলায় জনসভা

ভোলা

মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত চুনীলাল সেন গুপ্ত, সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্তা সরযুবালা সেন, শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি স্থানীয় কংগ্রেস নেতাগণ রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ইহা-ছাড়া ভোলার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বদেশী বাজার

—যে জান সন্ধান!

১৯শে আগষ্ট মেয়রের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৫ হাজার লোকের বিরাট সভায় গান্ধী-জিন্না মিলন প্রচেষ্টা সমর্থন করা হ'ল। বেশ কিছু দিনের মধ্যে কলকাতা শহরে এত বড় সভা আর হয়নি।

অথচ 'স্বদেশী' খবরের কাগজে মিটিংয়ের বিবরণ পড়ে দেখি সব কাগজই অতি সাধারণ-ভাবে এবং অত্যন্ত বাজে জায়গায় সামান্য একটু খবর দিয়েছে—কোনো কাগজেই সিকি কলমের বেশী নয়। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড খবরটীর জন্যে মোট জায়গা দিয়েছে প্রায় ৫৷৹ ইঞ্চি, আনন্দবাজার—৭৷৹ ইঞ্চি, অমৃতবাজার—৭৷৹ ইঞ্চি, যুগান্তর—পৌনে ৮ ইঞ্চি।

ঐ একই দিনে শ্যামপার্কে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর গান্ধীবিরোধী সভা হয়েছিল, তাও দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বেশী হলে ৪০০ লোক হবে—তাও উপস্থিত লোকেরা শ্যামা-প্রসাদ বাবুর গান্ধীবিরোধী ও লীগবিরোধী বিষোদ্গার শুনছিল অতি নিরুৎসাহভাবে। কিন্তু 'স্বদেশী' খবরের কাগজগুলি খুলে দেখি ২ কলাম জুড়ে কি ঘটা করে সেই মিটিংয়ের বিবরণ! যেন কলকাতা শহরে সেদিন ঐ সভাই ছিল প্রধান ব্যাপার। হিন্দুস্থান দিয়েছে ৩০", আনন্দবাজার—২২", অমৃতবাজার—৩০", যুগান্তর ২৮"।

যে সব কাগজ কংগ্রেসের ভেদপন্থীদেরই বরাবর বাড়িয়ে এসেছে তারা যে আজ কংগ্রেস-ধ্বংসকারী শ্যামাপ্রসাদকেই নূতন অবতার হিসাবে তুলে ধরবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যে সব কাগজ বরাবর কংগ্রেসকে সমর্থন করে তাদেরও যখন প্রায় এক অবস্থা তখন স্বভাবতই মনে হ'ল ব্যাপার কি? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন অদৃশ্য হস্তের লীলা চলেছে!

গূঢ় রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন হ'ল বাংলার এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথোপকথনে—অন্য এক সূত্রে। তাঁকে বলছিলাম 'কিরণ বাবু কংগ্রেসের প্রতি এত অনুগত, তাঁকে যদি আমরা সবাই মিলে ধরি তাহলে কি তিনি আপোষ প্রস্তাবের বিরোধিতা ছাড়বেন না?' কংগ্রেস নেতা হেসে বল্লেন—মশাই চক্রীর চক্র! কিরণ বাবু তো উপলক্ষ্য মাত্র। দেখছেন না খবরের কাগজগুলোর পর্য্যন্ত সুর বদলানোর কি রকম চেষ্টা চলছে?

তাঁর কাছে শুনলাম আসল চক্রী হলেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি ইনশিওরেন্স জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা, কংগ্রেস থেকে যিনি এককালে বিতাড়িত এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারলে বিড়লা প্রভৃতির সমর্থনে তিনি বিলাতে ভারতীয় শিল্প মিশনের ডেলিগেশনে স্থান পান, তাতে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি আরও বাড়ে। আবার লীগের সঙ্গে আপোষ-বিরোধী আন্দোলন উস্কাতে পারলে আমলাতন্ত্র ভেদ-নীতিতে নিরঙ্কুশ হয়ে সুখে রাজত্ব করতে পারে এবং তার পুরস্কার স্বরূপ ডেলিগেশনে স্থান এবং ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি দুইয়ের সমর্থন এদিক থেকেও পাওয়া যায়। তাই তিনি একদিকে কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য মহাত্মাজীর কাছে তদ্বির করছেন, আর একদিকে কিরণবাবু, সংবাদপত্র প্রভৃতিকে শ্যামাপ্রসাদ-সমর্থনে উৎসাহ জুগিয়ে আমলা-তন্ত্রকে খুশী করছেন।

ইনি নাকি সম্প্রতি কিরণবাবু ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটী স্বদেশী কাগজের মালিকদের কাছে দরবার করেন—যাতে গান্ধীজির প্রস্তাবের পক্ষের খবরগুলি ছাপা না হয় এবং মতামতও সেই ভাবেই লেখা হয়। তার পরেই এই ব্যাপার! কাগজের সম্পাদকেরা অবশ্য এর বিরুদ্ধে লড়ছেন। বিশেষ করে যে সব কাগজ বরাবর নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সমর্থক সেগুলিঃ সম্পাদকদের প্রশংসনীয় চেষ্টায় মন্তব্যে গান্ধীজিকে সমর্থনের সুর এখনও বজায় আছে, সংবাদ সম্বন্ধেও টাগ অফ ওয়ার চলছে। মালিকরাও গূঢ় ব্যক্তিটীর কথায় একেবারে চলতে পারেন নি।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্তের সভা-পতিত্বে খাদিপন্থীদের যে সভায় কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে একযোগে গান্ধীজির সমর্থনে আন্দোলন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তার পিছনেও নাকি এই রহস্যময় ব্যক্তির অদৃশ্য হস্ত কিছুটা খেলা করেছে। সতীশ বাবু প্রভৃতি খাঁটি গান্ধী সমর্থকরা অবশ্য নিজেদের বিশ্বাস মতই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে বাজি মাৎ হয়েছে এই গান্ধী-বিরোধীদেরই। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সম্মিলিত সভাসমিতির ফল দেখে এবং গান্ধীজির সমর্থনে কমিউনিষ্টদের প্রচার কার্য্যের সাফল্য দেখে এই গোপন ব্যক্তিটী খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায়ই খাদিপন্থীদের সভায় কোন কোন লোক এই কমিউনিষ্ট বর্জন ও সম্মিলিত আন্দোলন বর্জন প্রস্তাবে উৎসাহিত হন—গান্ধী-সমর্থক খাঁটি খাদিপন্থীরা সরল বিশ্বাসে তাঁদের ফাঁদেই পা দিয়েছেন। বর্জন প্রস্তাব কমিউনিষ্টদের রাজনীতি ও স্বতন্ত্র সংগঠনশক্তিকে আঘাত করতে পারবে না, আঘাত করবে গান্ধীজির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের ও মিলনের আন্দোলনকেই। তাতে শ্যামা-প্রসাদ বাবু তথা এই গোপন ব্যক্তিটীই লাভবান হবেন।

মাদারীপুর

কংগ্রেস লীগ মিলনের জন্য রাজাজীর প্রস্তাব ও গান্ধীজীর সমর্থন প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে **১৫০০০ নরনারীর উপস্থিতিতে ৪৩টি জনসভায় এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করা হয়।**

ইহা ছাড়া **চাঁদপুর, বরিশালের গ্রামে গ্রামে, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঠাকুরগাঁ, মেহেরপুর,** প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস ও লীগের মিলিত সভায় আসন্ন গান্ধী-জিন্না আলোচনার সাফল্য কামনা করা হইয়াছে।

মুসলিম লীগ

খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন এম, এল, এর সভাপতিত্বে ঢাকা মুসলীম লীগের কার্য্য-করী সমিতির এক সভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলীম লীগের এক সভায় ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করা হয়।

হুগলী জেলাবোর্ড

গত ২৫শে আগষ্ট হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্যদের সাধারণ সভায় গান্ধীজীর ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

লক্ষ লক্ষ দুস্থ বাঙ্গালীর পল্লীজীবন

এখনও পুনর্গঠিত হইল না

প্রায় এক লক্ষ দুস্থের ব্যবস্থা ছিল, নতুন স্কীমে তার সিকি ভাগও হইবেনা

সম্প্রতি সরকার দুঃস্থদের রিলিফ ও পুনর্গঠন বিভাগ হইতে একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে,—"গত দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত বা বর্ত্তমানেও সংকটে রহিয়াছে, এমন প্রত্যেকটী মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে'পুওর হাউস', মেয়েদের হোম ও অস্থায়ী শিশুসদন চলিতেছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে (১) ওয়ার্ক হাউস (২) দুঃস্থদের জন্য হোম ও (৩) পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য সদন—এই তিনটী মিলাইয়া এক একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হইবে। পুরুষ, নারী ও শিশু সকলকে ধরিয়া এই সব প্রতিষ্ঠানে ২৫০ হইতে ৫০০ জনের বেশী রাখা হইবে না। সারা প্রদেশে এইভাবের ৬০টী প্রতিষ্ঠান খোলা হইবে...। জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষমতা লাভ করিলেই এই সব দুঃস্থকে নিজ নিজ গ্রামে ফেরৎ পাঠান হইবে।" এই পরিকল্পনার দ্বারা সারা বাংলায় মাত্র ২৪,০০০ দুঃস্থের ব্যবস্থা হইতে পারে। অথচ গত ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সারা বাংলায় ৩৩৩টী ওয়ার্ক হাউস ছিল—তাহার সংখ্যা বাড়িয়া বর্ত্তমানে ৪৫০এর বেশী হইয়াছিল। এই ধরণের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানে গড়ে ২০০ দুঃস্থ আশ্রয় পাইবার জন্য আসিতেছিল—অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় প্রায় ৯০,০০০ দুঃস্থ কোনরূপ সংস্থান পাইতে পারিত। আর আজ নূতন ব্যবস্থার ফলে তাহার সংখ্যা চারভাগের এক-ভাগে দাঁড়াইল। এই ব্যবস্থার যে আরো বিষময় ফল আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে 'জনযুদ্ধে' লিখিয়াছি—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হওয়ার ফলে সরকারী কর্ম্মচারীদের দাপট বাড়িবে, জনসাধারণের দেখাশুনা করার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে, সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে দুঃস্থরা শহরে বা কেন্দ্রীয় হাউসে আসিতে পারিবে না বা চাহিবে না—নানারূপ দুর্নীতি বাড়িতেই থাকিবে। শহরের ও বন্দরের দুয়ারে দুয়ারে তাহারা অন্ন দাও অন্ন দাও বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। আরো আশংকার ব্যাপার এই যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভাল ব্যবস্থা করিবার আগেই পল্লীর স্থানীয় ওয়ার্ক হাউসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, আর সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে স্থানীয় ইউ নিয়ন বোর্ডগুলিও অবলুপ্ত ওয়ার্ক হাউসের দুঃস্থদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না বা করিতেছে না।

গত বছরের ৬৫ লক্ষ দুঃস্থকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজ কি এতই সহজ? জনসাধারণের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া কয়েকজন আমলার হাতে স্কীমের খসড়া ও অর্থ দিয়া দিলেই এই বিরাট দুঃস্থ নরনারীর সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? তাহা হয় না বলিয়াই বিভিন্ন স্থান হইতে আমরা আবার প্রতিদিনই দুঃস্থ জীবনের করুণ কাহিনীর সংবাদ পাইতেছি।

ঢাকা শহরের আত্মরক্ষা সমিতির কর্মী কুমারী ডলি বসু লিখিতেছেন,—"গত বছরের সংকটের জের আমরা আবার দেখিতে পাইতেছি শহরের পথে ঘাটে। রাস্তায় দুঃস্থের ভিড়। ইহাদের ভিতর পুরুষ নাই বলিলেই চলে। গত বৎসরের মত এবারও কঙ্কাল-সার উলঙ্গ নারী ও শিশু দেখিতে পাইতেছি। রাস্তার দুই পাশে আবার এক মুঠা ভাতের জন্য চীৎকার শুরু হইয়াছে। ভদ্রলোক দেখিলেই তাহারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় পয়সার জন্য। নদীর ওপার হইতে দলে দলে মেয়েরা নৌকায় করিয়া শহরে আসিতেছে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে।

"কয়েকদিন আগে নয়াগঞ্জ পাড়া দিয়া যাইতেছি, দেখিলাম রাস্তার একপাশে একটী বুড়ী শুইয়া হাঁপাইতেছে। সে বলিল, ২।৩ দিন খাইতে পায় নাই, রাস্তা চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া যায়। গেণ্ডারিয়া পাড়ায় একটী মা পেটের ক্ষুধার জ্বালা সহ করিতে না পারিয়া তার ২টী শিশু বিক্রয় করিবার

দুগ্ধাভাবে হাজার হাজার শিশুর করুণ ক্রন্দন

ব্যবস্থা করিয়াছিল—আমাদের সমিতির এক কর্মীর প্রচেষ্টায় এই শিশু বিক্রয় বন্ধ করা গিয়াছে।

"দুঃস্থা নারী ও শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিলাম, একমাত্র তাঁতীবাজার এলাকাতেই দুঃস্থা মেয়ের সংখ্যা এইরূপ: কাঁসারী মহিলা—৪০০, বসাক মহিলা—৪৫, সূত্রধর মহিলা—৩০, গোয়াল মহিলা—২০, সাহা মহিলা—১২, কায়স্থ মহিলা—২৫ জন। ইহারা কেহ কেহ পেটের দায়ে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শহরের বিভিন্ন পাড়া হইতে শোনা যাইতেছে, মেয়েরা পেটের দায়ে মিলিটারীর সঙ্গে মেলামেশা করিতেছে।"

করিমগঞ্জ (ময়মনসিং) হইতে আবদুল রজ্জাক জানাইতেছেন, "গত ২৯শে শ্রাবণ বিকালে একটী লোক প্রকাশ্য বাজারে আহমদের এক নির্জন গৃহে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। লোকটী পূর্ব হইতেই দুঃস্থে পরিণত হইয়াছিল।"

বিক্রমপুরের সংবাদদাতা রাধাবল্লভ সাহা জানাইতেছেন—"গত ৭ দিনে এক জগলনিয়া গ্রাম হইতেই অন্ততঃ ৩০ জন দুঃস্থ কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে।"

ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হিরণবালা রায় সংবাদ দিয়াছেন,—"মাওয়া গ্রামে অনাহারে ১২টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দুধের অভাবে এখানে ৪টী শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। মাণিকগঞ্জ শহরে দুস্থা মেয়ে ও শিশুর ভিড় জমিতেছে। একমাত্র সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রাম হইতে ২৫টী মহিলা নারায়ণগঞ্জ সহরে চলিয়া আসিয়াছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামকুল হইতে ২২০ জন মহিলা রামকৃষ্ণ মিশনের দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। তাহারা বর্ষা পড়ার পর হইতে ভিক্ষার অসুবিধা ও ছোট ছোট কাজের অভাবে আবার দুঃস্থের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নৈতিক চরিত্রের অবনতি বন্ধ হইতেছে না। ক্রমেই বাড়িতেছে। বজ্রযোগিনী গ্রামের সংবাদ, কয়েকটী পরিবার পেটের দায়ে পারিবারিক জীবনে

জনগণের সাহায্য বাদ দিয়া আমলাদের হাতে সমাজ গঠনের ভার

বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। এ অঞ্চলে—চাপাতলী, টঙ্গীবাড়ী, মাওয়া, পুরাপাড়া প্রভৃতি স্থানে এ পর্য্যন্ত মোট ১০৫ জন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা গৃহ-ত্যাগিনী হইয়াছে। তেজগাঁয়ে ৭০টীর মধ্যে ২৫টী নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের মহিলারা প্রকাশ্যেই সৈন্যদের নিকট দেহ বিক্রয় করিতেছে। পেটের জ্বালা তাহাদের অধঃপতনের চরম সীমায় আনিয়া দিয়াছে—তাহারা বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠাইয়া সৈন্যদের ডাকাইয়া আনিতেছে।"

অথচ ওয়ার্কহাউস উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে

চিকাইদ (চট্টগ্রাম) হইতে শ্রীযুক্তা বিনোদা ঘোষ লিখিয়াছেন,—সরকার নাকি নোটীশ দিয়াছে এখানকার ওয়ার্কহাউস তুলিয়া দেওয়া হইবে। আমরা আতংকিত হইয়া উঠিলাম। জিলা নারী সমিতির সংগঠিকা শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা চৌধুরীকে আনাইয়া একটী সভা করিলাম। ঠিক হইল কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশান পাঠাইয়া সরকারের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে হইবে। সাধারণ মহিলাদের ও স্থানীয় লোকদের মনের আতংক কিছুটা কমিল। ওয়ার্ক হাউসে ৪০জন মেয়ে কর্মী কাজ করে। তাহা ছাড়া আরো অনেক মেয়ে কাজ করিবার জন্য আসিতেছে।"

নারী সেবা-সংঘের কাজে ঢাকা গিয়া শ্রীযুক্তা বেলা লাহিড়ী সংবাদ পাঠাইয়াছেন,—"মাণিক-গঞ্জের সরকারী দুস্থাগার দেখিতে গেলাম। হোম না বলিয়া ইহাকে জীবন্ত নরককুণ্ড বলা চলে। ঘরের ভিতর অসম্ভব দুর্গন্ধ। দেখাশোনা করার জন্য কোন লোক নাই। একজন রান্নার লোক আছে—সেও আবার ঠিকমত খাইতে দেয় না। ৫ ছটাক বরাদ্দ, তারা প্রত্যেকে পায় তার অর্দ্ধেকেরও কম। ২খানা কাপড় বরাদ্দ, দেওয়া হয় ১খানা। প্রত্যেকের গায়ে ঘা আর চুলকানী, বিছানাপত্র নাই। পরিচালক কমিটিটা জীবনেও বসে নাই।"

"নারায়ণগঞ্জের ওপারে বন্দর নামে একটী জায়গা আছে। সেখানে একটী সরকারী হোম আছে। ঘরে জানালা বলিয়া কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাইলাম না। চারিদিকে ও উপরে ইটের স্তূপ। সূর্য্যদেব ত্রিসীমানায় প্রবেশ করেন না। সামনে জঙ্গল। কাহারো কাছে মশারী নাই। বিছানা তো কেউ চোখেই দেখে নাই। অথচ সরকারের বরাদ্দ প্রত্যেককে মশারী ও বিছানা দিতে হইবে। এক বছর ধরিয়া এই হোমটী চলিতেছে—তবু এখনো ইহার ব্যবস্থার এতটুকু উন্নতি হয় নাই। এস, ডি, ও-'র কাছে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কাপড়-বিছানা বাহির করিতে পারিলাম না।

প্রকৃত পুনর্গঠনের পথ

"অথচ নারায়ণগঞ্জে গিয়া দেখিলাম অন্য ছবি। ঢাকার কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, কিরণবালা রুদ্র প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া হোম ও শিশু-সদনে গেলাম। খালের পারে একটী বড় ঘরে ৮০ জন দুঃস্থকে রাখা হইয়াছে। মেয়েরা কাপড়-জামা পড়িয়া আছে, বেশ পরিষ্কার। খাওয়া এরা পেট ভরিয়াই পায়। একমাত্র এখানেই দেখিলাম ইহারা মহিলা সমিতির সাহায্য সব সময়েই লইয়া থাকেন। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ফলেই হোমের চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। মেয়েরা হোগলা তৈরী করিতেছে, গম ভাঙ্গিতেছে, নিজেরাই পালা করিয়া রান্না করিতেছে, ঘর-দুয়ার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করিতেছে। ১টী করিয়া প্রত্যেকের বিছানা, ১টী মশারি ও বালিশ আছে। সরকারী হাসপাতাল ও শিশুসদনের ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার। সকালে দুধ, দুপুর ও রাত্রে ভাত তরকারী ডাল, সপ্তাহে ১ দিন করিয়া মাছ তাহারা পায়। লেখাপড়া ও শেলাইএর কাজ শিখানো হইতেছে। এই সব শিশুকে বেশীর ভাগই রাস্তা, ডাষ্টবিন ও ময়লার গাড়ী হইতে কুড়াইয়া আনা হইয়াছিল—এখন তাহারা সত্যই মানুষের সমাজ কি তাহার আভাস পাইতে সুরু করিয়াছে।"

শত শত মা-বোনের সংসার ছারখার হইল
আর স্থানীয় কর্মকেন্দ্র বন্ধ হইতেছে

জী ব নে র

গ্রামের ভিতর আগে ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। আজ রোগে পঙ্গু। ন'জন সংসারের লোক পড়োসীদের ভিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল। এই ন'জনের নামে রেশনকার্ড ভুক্ত করা হই-য়াছে। — এই ভাবে ৫% গ্রামবাসীর রেশনের দ্রব্য চোরাবাজারে যায়—কারণ এদের ক্রয় ক্ষমতা নাই। এদের রোগমুক্তি ও জীবিকা-অর্জ্জনের ব্যবস্থা কি হইবে না?

— হালিসহর, চট্টগ্রাম

অনশন, বসন্ত, ম্যালেরিয়ার এক গিয়াছে। একটা বালিকা আর মাথার উপর ভগ্ন জীর্ণ কুটীরটাও বা তাদের জন্য শিশুসদন?

এক সের নুনের জন্য এক মণ ধান

লবণের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু গ্রামের সাধারণ লোক এখনও ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার কৃষক ও জনসাধারণের কাছ হইতে আমরা অনেকগুলি চিঠি পাইয়াছি ও দৈনিক সংবাদপত্র হইতে কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা এখানে সেই সব সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ময়মনসিংহ—ঘোষগাঁও হইতে কৃষক-কর্মী নিকুঞ্জ চৌধুরী ৩০শে জুলাই তারিখ লিখিয়াছেন, শতকরা ২৫।৩০ ভাগ কৃষকই লবণ ছাড়া ভাত খাইতেছে। গত সপ্তাহে ২।৩ টাকা সের দরে যে লবণ পাওয়া যাইতেছিল, আজ তাহাও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে আউস ধান প্রতি মণ ৩।৪৲ টাকা। চোরাবাজারে **১ মণ ধান দিয়া এক সের লবণ খাইতে হয়।** সাধারণ কৃষক ও ক্ষেত-মজুর তাহা কিনিবে কি করিয়া? "জেলার গ্রামাঞ্চলে গত একমাস হইতে বাজারে লবণ একেবারেই পাওয়া যায় না। চোরাবাজারে ৪৲ টাকা সের দরে লবণ বিক্রী হয়।" (ইউ, পি, ২১শে আগষ্ট)

দিনাজপুর—বংশীহারীর রমণ চন্দ্র শর্ম্মণ একজন সাধারণ কৃষক। তিনি সম্প্রতি লিখিয়াছেন, এই থানায় লবণের অভাব এত যে ১৲ হইতে ১।০ টাকা দিলেও লবণ পাওয়া যায় না। হরিরামপুর হাটে আর একজন কৃষক আমাকে বলে 'নুন কুন্টি পাই, কনট্রোল দোকান ত খুলে নাই। হামরা আট দিন তে নুনের বস্তা ধুই ধুই খাই।'

রংপুর—পঞ্চগ্রাম হইতে সুধরঞ্জন দে ও বিপিনচন্দ্র রায় ঈশ্বর লিখিয়াছেন—এই ইউনিয়নে লবণের অভাব খুবই বাড়িয়াছে। লবণের অভাবে অনেকে গুড় দিয়া ভাত খায়। ফুড কমিটির কাছে লবণ নাই অথচ চোরা বাজারে ১-১।০ টাকা সের দরে লবণ বিক্রী হইতেছে।

ঢাকা—টোক হইতে গত ১৮ই আগষ্ট সন্তোষ চৌধুরী জানাইতেছেন, টোক ইউনিয়নে প্রায় একমাস যাবত ভীষণ লবণ-সমস্যা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে অনিয়মিত ভাবে একমাসে মাথা পিছু একপোয়া লবণ পাওয়া যাইত। এখন তাহাও বন্ধ। এদিকে চোরা বাজারে ১ টাকা দেড় টাকা সের দরে লবণ বিক্রি হইতেছে।

বগুড়া—লবণের সরবরাহ খুবই কম হইতেছে। গত জুলাই মাসে ১৫টি ইউনিয়নে একদম লবণ সরবরাহ হয় নাই। (ইউ, পি, ২১শে আগষ্ট)

উপরের চিঠি-গুলি ও খবর হইতেই এটা পরিষ্কার যে পল্লীবাংলায় লবণের অভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, মানুষের দিন চলাই ভার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার জনসাধারণের কথার রেওয়াজ 'নুনভাত'। সাধারণ লোকের ভাতের সাথে আর কিছু না হইলেও নুন পাইলেই সুখদুঃখের ভিতর তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। না হইলে শুধু ভাত যে খাওয়া যায় না। বাংলা দেশে নুনের এই অভাব ত হঠাৎ আসে নাই, প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল বাংলা দেশে লবণ সংকট দেখা দিয়াছে। গোড়ার দিকে সুহ্‌রোয়ার্দ্দী সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন—নুনের রেশন হইবে সুতরাং আর কোন অসুবিধা হইবে না। তাহা ছাড়া সরবরাহ নিয়মিত করা হইবেই। অবশ্য জন্য প্রতি সপ্তাহে এত লবণ পাঠান হইয়াছে ইত্যাদি। এই প্রচার দেখিয়া মনে হয়, লবণ সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে। অথচ পল্লীগ্রামে লবণের অভাবে দেশের সাধারণ লোক কি অসুবিধাই না ভোগ করিতেছে! যেখানে লবণ অভাবে লোকে ভাত খাইতে পারিতেছে না, সেখানেই আবার চোরাকারবার পুরা দমে চলিতেছে। ১৫ই আগষ্ট ঢাকার টোক ইউনিয়ন ফুড কমিটি, কৃষক সমিতি প্রভৃতির ভলান্টিয়াররা চোরাবাজার হইতে ২৪ বস্তা (মোট ৪১ মণ) লবণ উদ্ধার করে। অন্যান্য স্থান হইতেও এরূপ খবর আসিতেছে।

সরবরাহ কম হইলেও যদি এই সময় মজুত নুন চোরাব্যবসায়ীরদের হাত হইতে উদ্ধার করা হয় তবুও মানুষের অভাব খানিকটা মিটে। কর্ত্তৃপক্ষ বার বার শুধু ফিরিস্তি বাহির করার দিকেই নজর না দিয়া

লবণের অভাব মিটাইতে
চোরাবাজার বন্ধকর রেশনিং চালুকর

লবণের এই ব্যাপারে ভারত সরকারের দায়িত্বও যথেষ্ট। কিন্তু দায়িত্বের গাফিলতি যে কোথায় হইতেছে বাংলা সরকার তা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই। মাঝে মাঝে প্রেস নোটে প্রচার করিয়া থাকে মফঃস্বলের যাহাতে লবণের চোরাকারবার একদম বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা করুন। সাথে সাথে রেশনিং চালু করিয়া চোরাকারবার বন্ধ করুন।

বস্ত্রাভাবে বাঙ্গালী সমাজে হাহাকার

পূজা আসিতেছে। লোকের কাপড়ের চাহিদা এই সময়েই বাড়ে। অথচ বাজার খুঁজিয়া লোকে কাপড় পায় না। সুতরাং পূজার চাহিদা মিটাইবার জন্য আরো কাপড় সরবরাহ করা দরকার—ইহা জনসাধারণের ও ব্যবসাদার উভয়েরই দাবী। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের টেকস্‌টাইল কমিশনর মিঃ ভেলোডি প্রাদেশিক টেকস্‌টাইল এডভাইসারি

একে কাপড় কম তাতে চোরা বাজার

বোর্ডের সভায় বলিয়াছেন যে, পূজা ও ঈদের জন্য বাংলায় কাপড়ের আরো কিছু সরবরাহ পাঠান হইবে। কিন্তু তাহা কতটুক?

আর শুধু কাপড়ের সরবরাহ বাড়িলেই কি লোকে কাপড় পাইবে? কয়েক দিন পূর্ব্বে জনযুদ্ধে এক প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কি ঘটিতেছে। পূজার বাজারে বণ্টনের অব্যবস্থা আগেকার মতই থাকিলে লোকের কাপড়ের অভাব ঘুচিবে না। **বণ্টনের সুব্যবস্থার দিকে সকলেরই নজর কম।** টেকস্‌টাইল কমিশনর মিঃ ভেলোডি বাংলায় আসার পর মিল মালিক ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা কাপড়ের আরও সরবরাহ বাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু সে কাপড় যাহাতে চোরাবাজারে না যায় তাহার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না।

মিল মালিকরা ও চেম্বার অফ কমার্স

বঙ্গীয় মিল ওনার্স এসোসিয়েশন মিঃ ভেলোডিকে বলেন যে পূজা ও ঈদের জন্য ৩৫ হাজার বেল বিশেষ কোটা ধার্য্য করা হউক।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সও পূজা এবং ঈদের জন্য কাপড়ের সরবরাহ বাড়াইতে অনুরোধ জানান। কাপড়ের বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা বলেন যে, চলতি ব্যবসায়ের ভিতর দিয়াই কাপড় বিক্রয় হওয়া দরকার। শাদা কথায় ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে বর্ত্তমানে যে-চোরাবাজার চলিতেছে তাহা চলিতে থাকুক।

খুচরা ব্যবসায়ীদের আন্দোলন

২৯শে আগষ্ট কলিকাতার খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের (২৬০০ সভ্য) সভায় এই সমিতির সম্পাদক মিঃ বি আগরওয়ালা বলেন যে, এ প্রদেশে কাপড়ের অভাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ীরা যত বড় করিয়া দেখাইতেছে বস্তুতঃ অভাব তত বেশী নহে। যাহাদিগকে বস্ত্র সরবরাহ করা হয় তাহারা এবং পাইকারী ব্যবসায়ীরাই বাংলার বস্ত্র সংকটের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। **খুচরা** ব্যবসায়ীগণের মধ্যে পাইকাররা যদি সমভাবে বস্ত্র বণ্টন করে, তবেই বস্ত্রের মূল্যের সমতা রক্ষিত হইবে। পাইকারদের সেরূপ আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। বহু খুচরা দোকানদারের দোকানে মাল নাই, কিন্তু কোন কোন কেন্দ্রে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের গুদাম মালে ভর্ত্তি। সম্মেলন বর্ত্তমান বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে।

প্রাদেশিক টেক্সটাইল কনট্রোলার মিঃ জোস খুচরা ব্যবসায়ীদের ডেপুটেশনের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, যে পূজার সময় যে বাড়তি কোটা দেওয়া হইবে তাহার কিছু অংশ খুচরা ব্যবসায়ী সংঘের হাতে দিবেন।

মিঃ ভেলোডি ২রা সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে নিজেই বলিয়াছেন কলিকাতায় কাপড়ের চোরাকারবার চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতেই হইবে।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে পাইকারী ব্যবসাদার ও মিল মালিকরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন পূজার বাজারের কাপড়ের সমস্তটা করায়ত্ত করিতে। খুচরা ব্যবসায়ীদের আজ জনসাধারণের সহিত দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহাদের কোন কোন দোকানও সুবিধা পাইলেই খরিদ্দারকে ঠকায়। ইহা একদম বন্ধ করিতে পারিলেই তাঁহারা জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাইবেন। তবেই কাপড়ের চোরাবাজার বন্ধ হইতে পারে।

অ প মা ন

ধীবর পরিবারের ৮ জন লোক মারা একটী শিশু পড়িয়া আছে—তাদের আছে। কে দিবে তাদের দুধ, কোথায়

—কাট্টলী, চট্টগ্রাম

একটী ধীবরের স্ত্রীর শোথ ও ম্যালেরিয়া হইয়াছে। দুস্থাগারে বা হাসপাতালে সে স্থান পায় নাই। সে পূর্বে খুব পরিশ্রমী মেয়ে ছিল। শরীর সুস্থ হইলে সে নানা ধরণের কুটীর-শিল্পের কাজ করিতে পারিবে। সরকারের স্থানীয় হাসপাতাল ও ওয়ার্ক হাউস সঙ্কুচিত করার ইহাই কি কি কারণ?

—কাট্টলী, চট্টগ্রাম

—এরাই আমাদের দেশবাসী

রংপুরে দুর্নীতি ও মহামারীর তাণ্ডব

বসন্তে ছয় মাসে বার হাজার লোকের মৃত্যু

রংপুর জেলার অধিবাসী সংখ্যা ৩০ লক্ষ। সরল সবল কৃষকের জেলা রংপুর চিরকালই নিজের খাদ্য নিজে উৎপন্ন করিয়া থাকে। সাধারণত রংপুরে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে তাহার ঘাটতি হয় না, বাড়তিও থাকে না; সেজন্যই সরকারী হিসাবে এই জেলাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ জেলা বলিয়া ধরা হইয়াছে। তবুও গত দুর্ভিক্ষ যখন সারা বাংলাদেশকে ছারখার করিয়াছিল, তখন রংপুরের নীলফামারী মহকুমাতেই প্রায় ৩৭ হাজার লোক অনাহারে ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহরূপ আজ হয়ত আর নাই, কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলস্বরূপ যে অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে রংপুরের অধিবাসীদের জীবনে সঙ্কট নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে।

মজুতদারের নিকট সরকারের পরাজয়

গত বৎসর এ জেলায় আমন ধান বাড়তিই ফলিয়াছিল। বাজারের উদ্বৃত্ত ধান যদি সরকার কিনিয়া জনগণের মধ্যে বিতরণ করিত তাহা হইলে রংপুরে খাদ্যের অভাব হইত না। সরকার পরিকল্পনাও করিয়াছিল এজন্য ৯।১০ লাখ মণ চাউল কিনিবে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে সরকার ৫।৬ লাখ মণের বেশী কিনিতে পারে নাই। এর ভিতর হইতে আবার ১,৩৫,০০০ মণ চাউল আসামে পাঠান হয়। তাই বর্ত্তমানে সৈয়দপুরে সরকারী গুদামে ৩।৪ লাখ মণের বেশী ধান চাউল মজুত নাই বলিয়াই মনে হয়। এই অল্প ষ্টকে সরকার সহরে রেশনিং প্রবর্ত্তন করিতেও সক্ষম হয় নাই। অথচ সরকার যখন জেলার ভিতর ১২।০ দরে চাউল কিনিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন মহাজনগণ কিছু বেশী দাম দিয়া অনেক চাউল হস্তগত করে। ডোমারে সাধারণ মহাজনগণ যখন ক্রয় করে ১,২৮,০০০ মণ, তখন সরকারী ক্রয় হয় মাত্র ৪০,০০০ মণ এবং জেলার বাইরে দাম বেশী থাকায় অনেক চাউল রপ্তানি হইয়া যায়—সরকার তাহা রোধ করিতে পারে নাই। এখনো মজুতদারদের ঘরে যে চাউল লুকান আছে তাহা উদ্ধার করিবার চেষ্টাও সরকারের নাই। সরকারী হিসাব মতই ডোমারে বিভিন্ন জোতদার ও মজুতদারের হাতে প্রায় এক লাখ মণ ধান মজুত আছে। ইহা বাইরে চলিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা। কিন্তু সরকার এখনও এই মজুত কিনিয়া নিতেছে না।

এর ফলে জুন মাসে জেলার বহুস্থানেই চাউলের দাম অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। গাইবান্ধাতে প্রতিমণ চাউল ১৯৲ ও ফুলছরীতে ২৪৲ পর্য্যন্ত দাম উঠে। এখন আউস চাউল বাজারে আসার ফলে দাম কমিয়া ১০৲-১৫৲ টাকা হইয়াছে। কিন্তু কুড়িগ্রামে চাউল এখনও দুষ্প্রাপ্য। গরু ও বীজের অভাব এবং মহামারীর জন্য আউষের ফলন ভাল হয় নাই। সরকারও বাজারের উদ্বৃত্ত আউষ কিনিবার চেষ্টা করিতেছে না। কাজেই চাউলের কম দাম যে কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা যায় না।

এখনও অনাহারে ছেলে বিক্রি

কিন্তু চাউলের দাম কিছুটা কমা সত্বেও জনগণের জীবনে নূতন ধরণের সংকট দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময় জনগণ তাহাদের পুঁজিপাতি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কোনও প্রকারে প্রাণ রক্ষা করে। সর্ব্বস্বান্ত জনগণের এবার ১০৲ | ১২৲ টাকায়ও চাউল কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি নাই। কাজেই অনাহার অর্দ্ধাহার এখনও শেষ হয় নাই। সিংহমারী অঞ্চলের সর্ব্বদাস নামে একজন কৃষক উপবাসের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া এবং নিজের চোখের সামনে স্ত্রীপুত্রকন্যার মৃত্যু দেখিবার বিভীষিকায় ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা এখন মৃত্যুপথের যাত্রী!

দেবালয়ের একটি পরিবার কিছুদিন যাবতই অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতেছিল। অবস্থা সহ্যের অতীত হওয়ায় পরিবারের কর্ত্তা চুরি করিতে আরম্ভ করে। একদিন চুরি করিতে যাইয়া সে হোমগার্ডের হাতে ধরা পড়ে। তাহার স্ত্রীপুত্র এখন দুঃস্থ অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ছিনাই গ্রামের পোল্লা সেখ অনাহারের জ্বালায় পাগল হইয়া তাহার ছেলেকে বড়বাড়ী হাটে ৭ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিয়াছে।

মধ্যবিত্তর জীবনেও নূতন সংকট

এই ত গেল সঙ্গতিবিহীন কৃষকদের জীবনকাহিনী। যাহাদের কিছুটা সঙ্গতি আছে, মাছ তরিতরকারির দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাদের জীবনযাত্রাও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

রংপুর আলুর জন্য বিখ্যাত। গত বৎসর আগষ্টমাসে আলুর সের ছিল চার আনা। এখন আলুর সের আট আনা। অন্যান্য কয়েকটি জিনিষের মূল্যের তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

	১৯৪৩এর আগষ্ট	১৯৪৪এর আগষ্ট
মাছ	১৲ সের	৩৲ সের
ঝিঙ্গা	/০ সের	৶০ „
মশুর ডাল	।/০ „	৸০ „
জ্বালানি কাঠ	।০ এক বোঝা	৸০ এক বোঝা

এই মূল্য-তালিকা হইতেই বোঝা যায় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার খরচ অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। চাউলের দর কমিলেও, তাহাদের জীবনের সংকট দূর হয় নাই। দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তীকালে সেই সংকট নূতন ভাবে তাহাদের জীবনকে আঘাত করিতেছে।

দুধের অভাবে শিশুমৃত্যু

দুধ পাওয়াই দুষ্কর। যাহা পাওয়া যায় তার দাম প্রতি সের ৵০ হইতে ১৲। এই উচ্চমূল্যে দুধ কিনিবার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ধনী ছাড়া আর কারও নাই। কাজেই, রংপুরের ভবিষ্যত—অগণিত শিশু আজ দুগ্ধাভাবে শুকাইতেছে। সম্প্রতি রংপুর সহরের 'ধাপ', মুচিপট্টি প্রভৃতি কয়েকটি পাড়ায় কয়েকজন শিশু পথ্যের অভাবে মারা গিয়াছে। দুধের অভাবে মায়েরা শিশুদের চাল বাটিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এর ফলে শিশুদের ভিতর আমাশয় ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া এক ভীষণ সামাজিক দুর্যোগ সৃষ্ট হইতেছে।

ফুড কমিটি ভাঙ্গিবার ষড়যন্ত্র

গ্রামে গ্রামে যে সব ফুড-কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার হাতে লবণ কেরোসিন প্রভৃতি সরবরাহের ভার দেওয়া হয়। অনেকস্থানে চোরাকারবারীরাই এই ফুড-কমিটি দখল করিয়া বসিয়াছে। একেই ত লবণের সরবরাহ কম—তায় আবার চোরাকারবারীদের দৌলতে যেটুকু লবণ সরবরাহ হয় তাহাও জনগণের নিকট পৌছায় না। বড়বাড়ী খাদ্য-কমিটির তত্ত্বাবধানে যে সব লবণের ব্যবসায়ী (ডিলার) আছে তাহাদের অনেকেই প্রকাশ্যেই চোরাকারবারী। সরকারী কর্ম্মচারীদের চোখের সামনেই এসব ঘটনা ঘটে অথচ তাহারা নির্ব্বিকার! নীলফামারীর অন্তর্গত খলিসা-চাপানীর জনসাধারণ একজন ব্যবসায়ীর ৭৫ ব্যাগ মজুত লবণ ধরে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী অজ্ঞাতকারণে সেই লবণ আবার সেই ব্যবসায়ীকেই দিয়া দেয়। এই ভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতার ও চোরাবাজারের দৌলতে রংপুরের সাধারণ জনগণ সামান্য নুন-ভাত হইতেও বঞ্চিত হইতেছে।

যে-সব ফুড কমিটি দেশসেবকদের চেষ্টায় ভাল কাজ করিতেছিল, তাহাও আজ সরকারী কর্ম্মচারীদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। বড়ভিটা-খাদ্য-কমিটি বহুদিন যাবত নিরলস ভাবে জনগণের সেবা করিতেছে। সেই খাদ্য কমিটিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য স্থানীয় সার্কেল অফিসার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সৈয়দপুরে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট পার্টির তীব্র বিরোধিতা সত্বেও সার্কেল অফিসার সেখানকার খাদ্য-কমিটি ভাঙ্গিয়া নিজের মনোমত লোক নিয়া নূতন কমিটি গঠন করিয়াছে। ইহাই আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থার নমুনা!

ম্যালেরিয়া ও পাঁচড়ায় কৃষকের কর্ম্মশক্তি হ্রাস

লবণের দুর্ভিক্ষ, দুধের অভাব, মাছ তরকারির দাম বাড়া প্রভৃতির অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে মহামারীর পূর্ণ তাণ্ডব আজও সারা রংপুরে চলিতেছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাস হইতে রংপুরে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া ও বসন্ত আরম্ভ হয়। জেলা বোর্ডের হিসাব মত ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয়মাসে রংপুর জেলায় বসন্তে প্রায় ১২,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৪২ সালে এই সময়ে বসন্তে মারা গিয়াছিল ১২২ জন। বসন্তের প্রকোপ এখন কমিয়াছে বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া দাবানলের মত ছড়াইয়া পরিতেছে। নীলফামারী সহরের পাড়ায় পাড়ায় ম্যালেরিয়া অথচ কুইনাইন পাওয়া যায় না। বড়ভিটা ইউনিয়নে সাড়ে দশ হাজার লোকের ভিতর দেড় হাজার লোকই জ্বরে শয্যাশায়ী।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সারা কৃষককুলই খুজলি ও পাঁচড়ায় কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এই ভাবে চোরাবাজারের ষড়যন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতায় সারা রংপুর জেলা আজ এক বিষম সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের যে গৌরবময় ঐতিহ্য রংপুর স্থাপন করিয়াছিল তাহা আজও রংপুর ভোলে নাই। সংকটের আঘাতে তাহারা মুহ্যমান হয় নাই। পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সাহায্যে স্থানীয় জনগণ তিস্তা, বৈদ্যেরবাজার প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যহ শত শত রোগীকে ঔষধ জোগাইতেছে। সুদূর বেরার হইতে আগত কৃষক সভার একদল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুরে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিয়া প্রতিদিন ৩০০ শতের অধিক লোকের চিকিৎসা করিয়াছে। ফুড কমিটির অনাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন স্থানে স্থানে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। জনগণের এই প্রচেষ্টাই রংপুরকে সংকট ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবে।

সংবাদ সংগ্রহ

বাংলার বিভিন্ন জেলা

গত ২৬শে আগষ্ট নওগাঁতে (রাজসাহী) কতিপয় লোক কমিউনিষ্ট কর্ম্মী গোপাল সরখেলকে মারধর করে। (আনন্দবাজার)

বার্ম্মা প্রত্যাগত কলিকাতার কমিউনিষ্ট কর্ম্মী সাধন বানার্জ্জিকে তুলাসারে (ফরিদপুর) গত ২৩শে আগষ্ট বিরোধী দলের সাত আট জন মিলিয়া আঘাত করে। (ইউ, পি)

* * *

খিদিরপুরের কমঃ জুড়ন গাঙ্গুলী ও আরো পাঁচজন কমিউনিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে জাতীয় সপ্তাহ পালন উপলক্ষে যে মামলা আনা হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে বন্যার তাণ্ডব

পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার এলাকায় একশত গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। চেতুয়া সার্কিট বাঁধ ভাঙ্গায় ঘাটাল মহকুমারও বহু অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। বর্দ্ধমানে দামোদর, অজয়, বাঁকা ও খরি নদীর বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাঠের শস্য নষ্ট হইয়াছে। গুস্করা অঞ্চলে ৬৪টী গ্রাম ও নাটু ইউনিয়নের বহু পল্লী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর এলাকায় চালাঘর, কিছু লোক ও গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ২৬শে দারকেশ্বরের বন্যায় হুগলী জেলার আরামবাগে দশটী ইউনিয়নের বহু গ্রাম প্লাবিত হয়। মাঠের আমন একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরকারের তরফ হইতে দামোদরের বন্যার গুরুত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করা হইয়াছে। অথচ বন্যার ফলে বহু চালা ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, বহু জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায়, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সময়োপযোগী ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অবিলম্বে এইসব অঞ্চলের জন্য সাহায্য পাঠান প্রয়োজন।

শ্রমিক জগৎ

কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফল ভোগ করিবে শ্রমিক!

টেক্সম্যাকো কারখানায় ১৯২ জন শ্রমিক বরখাস্ত

টেক্সম্যাকো কারখানার মেসিনশপের ১৯২ জন শ্রমিককে গত ২৪শে আগষ্ট বিনা কারণে জবাব দেওয়া হইয়াছে। মেসিনশপের শ্রমিকরাই এই কারখানায় তাদের শক্তিশালী ইউনিয়নের নেতৃত্বে এতদিন উৎপাদন বৃদ্ধির উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। এরূপ শোনা যাইতেছে যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও ত্রুটীর ফলে কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতেই উপরন্তন কর্ত্তৃপক্ষ এই অন্যায় বরখাস্তের আশ্রয় লইয়াছে।

ইউনিয়নের নেতৃত্বে বরখাস্ত শ্রমিকদের উপর এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছে। লেবার ট্রিবিউন্যালের নিকট বিষয়টী পেশ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ বা নূতন কাজের ব্যবস্থা হয় নাই। কারখানা কর্ত্তৃপক্ষের বিনাকারণে এতগুলি শ্রমিককে বেকার করার অন্যায় জুলুমের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি।

লেখক : পল ফ্যারাডে

যুগোশ্লাভিয়ায় জাতি সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জাতির সমান অধিকার ও সংযুক্ত রাষ্ট্র

মার্শাল টিটো দেশের স্বাধীনতার জন্য যুগোশ্লোভিয়ায় সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতি-সমস্যা-সমাধানের জন্য কি করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

মুক্তি-সংগ্রামের সাথে সাথে জাতি-সমস্যার সমাধান

গত ডিসেম্বরে জাতীয় মুক্তি পরিষদ (কাউন্সিল) যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতি-সমস্যার সমাধান করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। যুগোশ্লাভিয়ার ভিতকার ছয়টা জাতির নাম: সার্ব, ক্রোট, বোসনীয়-মুসলিম, শ্লোভেনীস্, মন্টেনেগ্রিণ ও ম্যাসিডোনিয়া-বাসী। দেশের ভিতরের এই ছয়টী উপজাতির (ন্যাশন্যাল গ্রুপ) প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়া নতুন যুগোশ্লাভিয়া গঠন করার জন্যই এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাবসম্মত অধিকার শুধু কাগজে-কলমেই রাখা হয় নাই। বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে ইহাদের প্রত্যেকেই অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং মুক্তি-পরিষদের ভিতর ইহাদের সকলেরই প্রতিনিধি রহিয়াছে।

ইহার পূর্বে যুগোশ্লাভিয়ার এই বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ সার্ব ও ক্রোটদের ভিতর পরস্পর সম্পর্কের সমস্যা কখনোই সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। মনে হইত, এই জাতি-সমস্যার বুঝি ভবিষ্যতে কখনও সমাধান হইবে না। সার্ব ও ক্রোটদের মধ্যে অনবরত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলাদলি ঝগড়াঝাটি লাগিয়াই ছিল। উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ ও লেখকরা এই সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐক্য-বদ্ধ যুগোশ্লাভিয়া গঠনকে তাঁহারা অলীক কল্পনা বলিয়া মনে করিতেন।

জাতিগুলির অসম উন্নতির কারণ

ইঁহাদের হতাশার যুক্তি ছিল এই রূপ। সার্ব ও ক্রোট উভয়েই একই বংশ সম্ভূত, তাহারা একই ভাষাভাষী। কিন্তু তাহারা রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের দিক দিয়া বরাবরই বিচ্ছিন্ন থাকিয়াছে। দশম শতাব্দীতে ইউরোপ যখন সম্পূর্ণরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল—কেহ রোমান ক্যাথলিকের দিকে গেল, আবার কেহবা গেল পূর্বদেশীয় অর্থডক্স (গোঁড়া) গির্জ্জার দলে। ক্রোটরা প্রথম দলে যোগ দিল, রোমের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, ভাষায় ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার করিতে থাকে। সার্বরা দ্বিতীয় দলে গেল, কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে ঝুঁকে ও সিরিলিক (রুশীয়) অক্ষর ব্যবহার শুরু করে। এই ভাবে সার্ব ও ক্রোটরা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ক্রোটরা ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়ে। তাহারা ভিয়েনা ও বুডাপেষ্টের সভ্যতার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিল। এদিকে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সার্বরা তুরস্কের অধীনে থাকিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহারা পশ্চিমের সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে, ক্রোটরা সার্বদের বর্ত্তমান নিরক্ষর অর্দ্ধ-সভ্যতার সহিত নিজেদের পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঘনিষ্ঠতার তুলনা করিতে থাকে। আর সার্বরা তুরস্কের হাত হইতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তাহাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সহিত ভিয়েনা ও বুডাপেষ্টের নিকট ক্রোটদের বর্ত্তমান বশ্যতা ও দাসত্বের পার্থক্য দেখিতে পাইল। ১৯১৮ সালে সার্ব ও ক্রোটদের সর্বপ্রথম একটী রাষ্ট্রের মধ্যে আনা হয়। ফল হইল, উভয়ের ভিতর অনবরত সংঘর্ষ ও আপোষের অভাব।

এই অচল অবস্থার জন্য সাধারণতঃ সার্বদের উপর দোষারোপ করা হয়। ক্রোটরা সংখ্যায় ৪০ লক্ষ আর সার্বরা ৬৫ লক্ষ। এদিকে রাজধানীটী সার্বদের আবার রাজবংশও সার্ব। তাই নতুন যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব করিবার পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল সার্ব রাজনীতিবিদদের মোটেই অসুবিধা হইত না। যুগশ্লাভ রাষ্ট্রটীকে তাহারা বর্দ্ধিত সার্বিয়ার রাষ্ট্র রূপেই দেখিত। ক্রোটদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহারা কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র চালাইতে সফল হইল। সামরিক পুলিশ, সরকারী দপ্তর প্রভৃতির অধিকাংশ পদই সার্বরা দখল করিয়া বসিল। ক্রোটদের বিদ্যালয়-গুলিকে অর্থ-সাহায্য না দিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল। লাভজনক মোটা মোটা সরকারী-কাজের কনট্রাক্ট শুধু সার্বদেরই দেওয়া হইত, ক্রোট ব্যবসায়ীরা একটীও পাইত না। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতায় উন্নত ক্রোটরাই শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থায় বেশী দক্ষ ছিল।

দেশসেবীরা প্রথমে ইহা বুঝে নাই

প্রথমদিকে পুরাতন "দেশভক্ত" ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দলগুলি সার্ব একাধিপত্যের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিরই সমর্থক ছিল। এই সমস্ত দল সব সময়েই সার্ব র‍্যাডিকেল পার্টি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। তাহারা সর্বদাই সার্বদের বিস্তার লাভের জন্য লড়িত। ১৯১২ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধে তাহারা সাফল্যের সহিত লড়াই করিয়াছিল। ১৯১৪ সালে সারাজেভো হত্যাকাণ্ডের সাহায্যে তাহারা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সহিত যুদ্ধ বাধায়। ১৯১৮ সালে তাহারা আশা করিয়াছিল যুগোশ্লাভ রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া সমগ্র বলকানের উপর সার্বদের 'মহান' রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, "নতুন যুবক"দের একটী বিরাট দল নিখিল সার্ব নীতি (প্যান-সার্ব) সমর্থন করিতেছিল। সার্ব একাধিপত্য ও রাজবংশের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত পুরস্কার দিতে তাহারা প্রস্তুত হইল। কাহাকে ম্যাসিডোনিয়ায় জমি দখলের পুরস্কার, কাহাকেও বা উন্নতিশীল বেলগ্রেডের জমিদারী, আবার কাহাকেও সরকারী তহবিলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়াইয়া বিনাপরিশ্রমে বেতন পাওয়ার রাজকীয় পদ দেওয়া হইল। এই ধরণের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও পরাশ্রিত-মনোবৃত্তির 'মহান' সার্ব ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন মিহাইলোভিচ এবং পিটারের নির্বাসিত মন্ত্রীদল।

স্বভাবতই নিখিল সার্ব নীতির (প্যান সার্ব) বিরোধিতা দানা বাঁধিতে লাগিল ক্রোট কৃষক পার্টিকে ঘিরিয়া। তাই বিলাতের কোন কোন লোক সার্বদের প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্রোটদের প্রগতিশীল বলে। এই মনোভাবের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়: গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ক্রোটরা সবসময়েই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, পিটার তাঁহার সমস্ত ক্রোট -মন্ত্রীদের বিতারিত করিয়াছেন এবং মার্শাল টিটোর অধিকাংশ সামরিক সাফল্য ক্রোটদের অঞ্চলেই হইয়াছে। সার্বদের উপর দোষারোপ ও ক্রোটদের প্রশংসা করার এই সহজ মনোভাব একদেশদর্শী ও অযৌক্তিক। ইহাতে জার্মানদের প্রচারেরই সুবিধা হয়। ইহাই জার্মানরা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সার্বদের উত্তেজিত করিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি পরিষদ এই ধরণের প্রচার ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া দুই-ই আছে

প্রথমতঃ এইরূপ সহজভাবে বুঝিলে সার্ব জন-সাধারণের প্রগতি ও গণতন্ত্রের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা হয়। অথচ ইহারাই তুরস্কের প্রভুত্ব খতম করিতে প্রথমে আগায়। বলকানের জনসাধারণের মধ্যে ইহারাই বাহিরের সাহায্য ছাড়া মুক্তির এই লড়াই চালাইয়াছিল। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি বলকানের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জার্ম্মাণ রাজকুমারদের গদিতে বসাইয়াছিল। একমাত্র সার্বরাই নিজেদের শক্তির জোরে স্বদেশের রাজবংশকে গদিতে রাখিয়া যদিও প্রাচীন তবু একটী গণতান্ত্রিক সোশ্যাল-পেজাণ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সার্বদের এই সবল জাতীয় বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রভাব চলিয়া আসিয়াছে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত এই প্রভাব বেশ শক্তিশালী ছিল। এই ঘটনা হইতেই লেনিন সেই সময় বলিয়াছিলেন: সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের ভিতর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্বদের সংগ্রামেই একমাত্র সত্যকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীজ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, মনে রাখা দরকার যে ১৯৩৪ সালের ২৭শে মার্চ্চ যুগোশ্লোভিয়া যখন হিটলারকে তুচ্ছ করিয়াছিল তখনও এই সার্বরাই হিটলার বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব করে। যুগোশ্লাভ জার্ম্মাণীর দখলে যাওয়ার পর প্রথম নয় মাস দেশভক্ত-যোদ্ধার দল সার্বিয়া থেকেই খুব বেশী সমর্থন পাইয়াছিল।

সমস্ত ক্রোট রাজনীতিক মতবাদকে মজ্জাগত-ভাবে প্রগতিশীল বলিয়া আখ্যা দেওয়াও ঠিক তেমনই অবাস্তব। ক্রোটদের ভিতরেও তিনটী প্রতিক্রিয়া-শীল মনোভাব দেখা যায়। (১) ইহাদের উদ্দেশ্য, শুধু ক্রোট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক প্রভুদের একটী বাছাই করা অংশের জন্য শাসন ক্ষমতার ভাগ আদায় করা। এজন্য সার্ব একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া শাসকদের চাপ দিতে হইবে। ইহারা একটী বহু-জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চায় না। আরেকটী মত, (২) ভ্যাটিক্যানের অঙ্গুলি নির্দেশে পরিচালিত রোমান ক্যাথলিক গোষ্ঠীর তরফ হইতে ক্রোটকৃষকদের উপর সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল ও শোষণমূলক ক্রোট-বাজকীয় প্রভুত্ব চাপাইয়া দিতে হইবে। এজন্য সার্ব-আধিপত্যের (বিশেষতঃ অর্থডক্স প্রভুত্বের) বিরুদ্ধে ক্রোটদের অসন্তোষকে কাজে লাগাও। (৩) জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফ্যাসিজমের সাহায্যে যুগোশ্লাভিয়ার অনৈক্য জিয়াইয়া রাখার ফ্যাসিষ্ট-সুলভ আন্দোলন চালান তৃতীয় দলটীর উদ্দেশ্য। এ জন্য যুগোশ্লোভিয়ার জাতীয় সংগ্রামকে ইহারা ব্যবহার করে।

ক্রোটদের আন্দোলনের ভিতর এই তিনটী রাজনৈতিক ভাবধারাও বর্ত্তমান ছিল। ১৯৪১ সালে ক্রোট-সৈন্যরা ও স্থানীয় নেতারা যে ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল, ইহাতে বুঝা যায় যে ক্রোটদের ভিতর এই সব ভাবধারার প্রভাব ছিল। ইহারই জন্য বিভীষণ প্যাভেলিচের ক্রোট রাজত্ব প্রথমদিকে কিছুটা সমর্থন পায়। ইহার আরও প্রমাণ মিলিবে। পলায়িত ক্রোট নেতাদের দায়িত্বহীন ষড়যন্ত্র সকলেই জানে। পিটারের বৃহত্তর-সার্বীয় মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া জনসাধারণের সমর্থন অর্জ্জন করার চেষ্টা করিতে তাহারা ছাড়ে নাই। অথচ মার্শাল টিটোর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাও তাহারা এড়াইয়া চলিয়াছে।

দুই প্রধান সম্প্রদায়ের আপোষেই দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান

এর থেকে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়, সার্ব ও ক্রোট উভয় সম্প্রদায়েরই ভিতরকার প্রগতিশীল ধারার উপর ভিত্তি করিয়া যুগোশ্লোভিয়ার সত্যকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে চালাইতে হইবে। এই দুইটী উপজাতির প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন নিখিল সার্বনীতির অন্ধ দেশহিতৈ-ষিতাকে চূর্ণ করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি ক্রোট যাজকীয়-ফ্যাশিষ্টদের অনৈক্যের নীতিকে পরাস্ত করিতে হইবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রোট ও সার্বদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিয়া আসিয়াছে তাহার মীমাংসা একবার হইয়া গেলে নূতন যুগোশ্লোভ যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য ৪টী উপজাতির সমস্যা সমাধান করা অত সহজ ব্যাপার হইবে। শ্লোভেনীস্, মন্টিনেগ্রিণ, ম্যাসিডোনিয়াবাসী ও বোসনিয়ার মুসলিম প্রভৃতি উপজাতির বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান সার্ব ও ক্রোটদের মধ্যে পারস্পারিক আপোষের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সার্ব ও ক্রোটরা ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করিতেছে তাহার ভিতর দিয়াই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদৃঢ় মিলন হইবেই। ইহাই হইবে অন্যান্য উপজাতি (ন্যাশন্যাল ইউনিট) গুলির সমস্ত সমস্যা সমাধানের গ্যারাণ্টি।

—ওয়ার্ল্ড নিউজ এণ্ড ভিউজ হইতে

পলাতক পোলিশ শাসনকর্ত্তারা ফ্যাশিষ্ট শাসনতন্ত্র চান

লণ্ডনে আশ্রয় প্রাপ্ত পোলিশ শাসনকর্ত্তাদের পক্ষ থেকে সোভিয়েটের কাছে যে নূতন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে কমিউনিষ্ট প্রভৃতি দলের কিছু কিছু প্রতিনিধি নিয়ে তাঁরা তাঁদের গবর্ণমেণ্ট "পুনর্গঠন" করতে রাজি আছেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে যে শাসনতন্ত্র তৈরী হয়েছিল সে অনুসারেই কাজ চলবে—যতদিন না পোলিশ ডায়েট (পার্লামেণ্ট) তার পরিবর্ত্তন করে। সোভিয়েট-স্থিত পোলিশ দেশভক্তদের "মুক্তি সংসদ" দাবী করেছিলেন যে ১৯২১ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে গবর্ণমেণ্ট গঠন করলে তবেই পোলিশ জাতি মুক্তির ভরসা পাবে। কিন্তু লণ্ডনস্থিত শাসনকর্ত্তারা ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রই চান।

এই দুই শাসনতন্ত্রের মধ্যে কি তফাৎ সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংবাদে প্রকাশ:

"১৯২১ সালের শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের উপরই চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব। জনসাধারণের শাসনযন্ত্র হ'ল সেইম ও সেনেট, সভাপতি ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্বাধীন আদালত। কিন্তু ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রে চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে নেই, আছে সভাপতির হাতে। রাষ্ট্রের অবিমিশ্র কর্ত্তৃত্ব তাঁর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। ব্যক্তিগত ইচ্ছায় অনেক কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর আছে যেমন, কারা কারা সভাপতি পদের প্রার্থী হবে তা তিনি স্থির করেন, প্রধান মন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সেনাপতি, জজ, সেনেটর সভা—এ সবই তিনি নিয়োগ বা পদচ্যুত করতে পারেন। সেইম ও সেনেট তিনি বন্ধ করে দিতে পারেন! ১৯৩৫এর শাসনতন্ত্র অনুসারে সভাপতির দায়িত্ব শুধু "ঈশ্বর ও ইতিহাসের কাছে।" ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে "সাধারণের হিতের জন্য যে নাগরিকের কাজের যতখানি মূল্য ও চেষ্টা" সেই হিসাবেই জনস্বার্থের ব্যাপারে তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করার অধিকার স্থির হবে—এবং এই অধিকার স্থির করা সম্পূর্ণরূপে সভাপতির ইচ্ছাধীন। ১৯২১-এর শাসনতন্ত্রে সকলের ভোটের অধিকার ছিল—এবং সোজাসুজি সকলে সমান ভোট দিত, গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রে এ সব অধিকার উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব ও আয়ব্যয় সম্বন্ধে আইন উত্থাপিত করবার অধিকার সেইমের (আইন পরিষদের) নেই। সুতরাং ট্যাক্স বসানো এবং খরচ উভয়ের উপরই সভাপতির যথেচ্ছ ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতা। ১৯২১-এর শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার ধারা ছিল যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, লোকের চিঠি পত্রের গোপনীয়তা মানা হবে, সভাসমিতির অধিকার থাকবে, গণতান্ত্রিকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে, বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রে এ সবই লুপ্ত হয়েছে।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১।৯।৪৪)

লণ্ডনস্থ পোলিশ শাসনকর্ত্তাদের প্রস্তাবিত এই ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে হিটলারের ফ্যাশিষ্ট শাসনতন্ত্রের বিশেষ কোন তফাৎ আছে কি? সোভিয়েটের লালফৌজ আর পোলাণ্ডের দেশপ্রেমিক সৈন্যদল ও গেরিলা যোদ্ধাকে কি অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে যাতে লণ্ডনের পোলিশ কর্ত্তারা পোল্যাণ্ডে এই ফ্যাশিষ্ট শাসন চালু করতে পারেন!

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

Regd. No. C. 2836

রুমানিয়ায় নাৎসীদের চরম দুর্গতি

লক্ষ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত, প্রতিরোধের ক্ষমতাও লুপ্ত

মস্কো হইতে ১লা সেপ্টেম্বর রয়টারের বিশেষ সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে, লালফৌজের আজ দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের মুক্তি আন্দোলনকারীদের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জেনারেল পেট্রভের চতুর্থ ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মি কার্পেথিয়ানের মধ্য দিয়া হাঙ্গেরী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে এবং জেনারেল মালিনভস্কীর সৈন্যেরা কয়েকদিনের মধ্যেই যুগোশ্লাভ সীমান্তে পৌছিবে মনে হয়। অন্যান্য সোভিয়েট সৈন্যদল বুখারেস্তের পশ্চিমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জার্মাণ সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। অভিযান আরম্ভের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে আজ কোন কোন স্থানে জার্মাণদের প্রতিরোধ একেবারেই নাই। রুমানিয়ার নূতন নূতন সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বহর আমদানী করা হইতেছে। জেনারেল মালিনভস্কী ও জেনারেল টলবুখিনের সৈন্যেরা এত বড় জয়ের পরও একদম রণক্লান্ত হয় নাই—তাহারা অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়েই লড়াই চালাইতেছে।

রুমানিয়ায় জার্মান ফৌজের চরমদুর্গতি

অল্প কয়েকদিনের ভিতর লালফৌজ এই ফ্রন্টে শত্রুর হাত হইতে কৃষ্ণসাগরের বিখ্যাত বন্দর কনষ্টাঞ্জা, রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ত, প্রসিদ্ধ তেলের খনি প্লোয়েস্তি,গিরগুই প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। তাহা ছাড়া ৩রা সেপ্টেম্বরের সোভিয়েটের একটি বিশেষ ইস্তাহারে জানা যায় যে রুমানিয়ার অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ১২ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মি ২০৮৪০০ নাৎসী সৈন্য বন্দী করিয়াছে, তৃতীয় ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মি ১১০০০০ সৈন্য ধ্বংস এবং ১০০২০০ সৈন্য বন্দী করিয়াছে। লালফৌজ আজ সমগ্র মলদাভিয়ান সোভিয়েট রিপাব্লিক নাৎসী কবল মুক্ত করিয়াছে এবং তাহারা বর্ত্তমানে বুলগেরিয়ার সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে।

ওয়ারশ রণাঙ্গনে জার্মানদের শেষ কামড়

রুমানিয়াতে জার্ম্মানদের দারুণ বিপর্য্যয় হওয়া সত্ত্বেও পোলাণ্ড ও পূর্ব্ব প্রসিয়ায় তাহারা মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। কারণ নাৎসী সর্দ্দার হিটলার ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোরা জানে যে তাহাদের আর অল্প কিছু দিন টিকিয়া থাকিতে হইলেও এই শেষ রক্ষা ব্যূহ যে কোন রকমে ধরিয়া রাখিতে হইবে। আজ তাহাদের সেই চেষ্টা। অজস্র জার্ম্মান সৈন্য লালফৌজের হাতে প্রাণ দিতেছে, হিটলার আবার নূতন নূতন জার্ম্মান সৈন্য আনাইয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে তাহার বাঁচিবার এই ব্যর্থ প্রয়াসে অকারণ যে লোক ক্ষয় হইতেছে, জার্ম্মান নওজোয়ানদের হিটলারী সমর যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে যে ভাবে রক্ত ঢালিয়া দিতে হইতেছে, জার্মানীর সাধারণ লোক কিন্তু এ বর্ব্বরতা কখনও বেশীদিন বরদাস্ত করিবে না, নিজেদের হাতেই নাৎসী দানবের টুঁটি টিপিয়া ধরিবে।

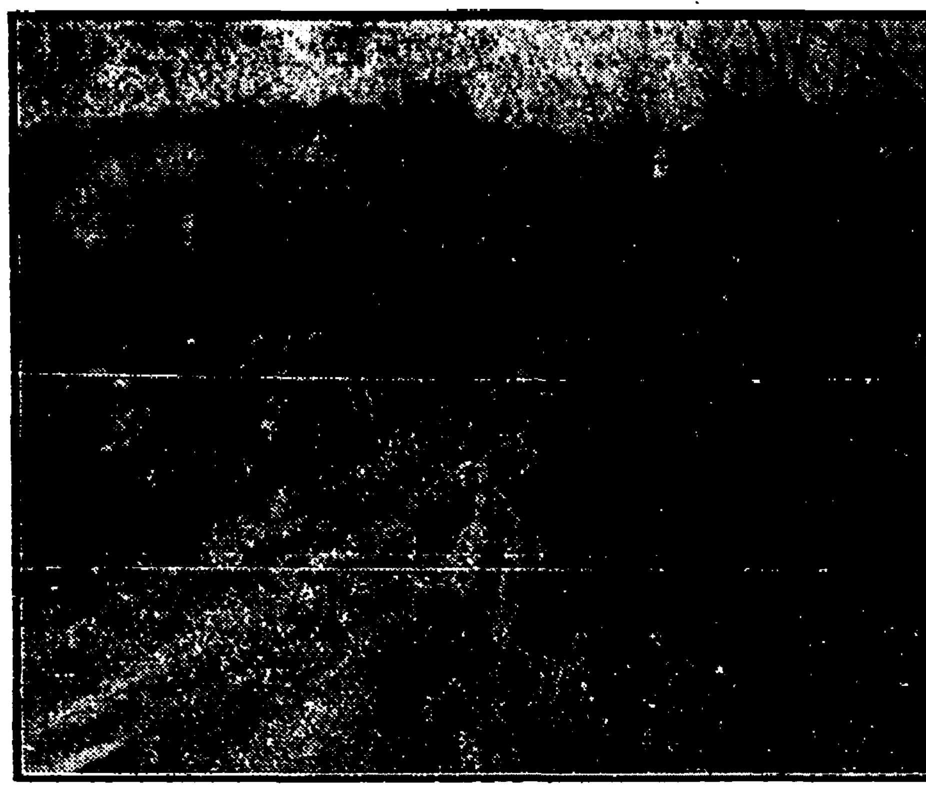

রুমানিয়ায় প্রবেশের পর স্থানীয় অধিবাসীরা লালফৌজকে সানন্দ সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে
—টাসের সৌজন্যে

শত্রুকে শ্বাস ফেলার সময় দিও না

ওয়ারশতে জার্ম্মানদের এই তীব্র বাধা দান সত্ত্বেও শত্রুকে কি ভাবে ঘায়েল করিতে হয় লালফৌজ তাহা ভাল করিয়াই জানে তাই ওয়ারশ হইতে জার্ম্মানদের পাল্টা অভিযান চালাইবার প্রচেষ্টা কখনও পাল্টা আক্রমণের স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন। সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে জার্ম্মান বাহিনী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ভিশ্চুলা নদীর দক্ষিণ তীরে ওয়ারশর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট সেনা একটি উচ্চস্থান হইতে জার্ম্মানদিগকে বিতারিত করিয়াছে। ঐ স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য জার্ম্মানরা বারংবার চেষ্টা করে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ওয়ারশর ১২ মাইল উত্তরে সুদৃঢ় জার্ম্মান ঘাঁটি রাডজিমিন লালফৌজের হাতে আসিয়াছে।

মুক্তির দিন আগতপ্রায়

রুমানিয়ার মুক্তি, বুলগেরিয়ার ও ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ বিরতির সংকল্প, হাঙ্গেরীর শাসকবর্গের টলটলায়মান ভাব—এসব ঘটনার ভিতর দিয়া আজ একথা সঠিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে হিটলারের অবস্থা আজ খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে,ইয়োরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতালোভীর দল আজ প্রায় অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, দেশে দেশে জনগণ আজ দৃঢ়পদক্ষেপে দুর্ব্বার বেগে আগাইয়া আসিতেছে। তাই আজ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই এক নূতন পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। মুক্তির দিন সমাগত।

মিত্রবাহিনী বার্ম্মার ভিতর লড়িতেছে

পূর্ব্ব মহাদেশে ফ্যাশিষ্ট জাপানকেও যে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তাহার লক্ষণ দিন দিন পরিস্ফুট হইতেছে। জাপানীরা বার্ম্মাকে পুরাপুরি দখল না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত সেদেশে মিত্রপক্ষের কোন জোর ছিল না। কিন্তু আজ প্রায় ২০,০০০ বর্গমাইল, অর্থাৎ সারা দেশের এক-দশমাংশ মিত্রশক্তির অধিকারে। চীনা ও মার্কিন সৈন্য লইয়া জেনারেল ষ্টিলওয়েলের বাহিনী যেখানে রহিয়াছে, তাহার মাত্র ষাট মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম চীনে খাস চীনা সৈন্য মজুদ আছে। মণিপুর ও বার্ম্মার লড়াইতে পাঁচটা জাপানী ডিভিশন ঘায়েল হইয়াছে।

মিত্রবাহিনী এখন বার্ম্মার ভিতর লড়িতেছে। টামু ও টিডিম হইতে মৌলাক ও কালেওয়ার দিকে আক্রমণ চলিতেছে। পঙশান হইতে লাশিয়োর দিকে, মিচিনা ও তাহার বিপরীত দিক হইতে ভামো যাইবার রাস্তার দিকে, এবং মোগং হইতে খাস শ্যামোর দিকে প্রধান আক্রমণের গতি।

আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানপোত মিলিয়া জাপানের বোনিন্ দ্বীপগুলির উপর বোমা ফেলিতেছে। ফিলিপাইন্স্ আক্রমণের তোড়জোড় বেশ চলিতেছে। জাপানীরাই খবর দিয়াছে যে বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত বড় শহর হইতে ছোট ছেলেমেয়েদের সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

চীনে সাহায্য পাঠাইয়া দেওয়া আজ সবচেয়ে গুরুতর একটা কাজ। ভারত হইতে চীনে যাইবার রাস্তা বানাইবার কাজ অনেকটা আগাইয়াছে। আর খবর বাহির হইয়াছে যে এরোপ্লেনে যত মাল চীনে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বে রঙ্গুন হইয়া বার্ম্মারোড দিয়া যত মাল যাইত, তাহার চেয়ে অনেক বেশী।

পোল্যাণ্ড, বাল্টিক দেশ, রুমানিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে মিত্রবাহিনীর অভিযান সে সব দেশের অধিবাসীকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আনিয়া দিতেছে, তাই সেখানকার অধিবাসীদের বিপুল অভ্যুত্থানে মিত্রবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সে তুলনায় বর্ম্মায় মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি নগণ্য। বর্ম্মায় মিত্রশক্তির অভিযান যদি বর্ম্মাবাসীকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আনিয়া দিত তাহা হইলে মিত্রবাহিনী এতদিন রেঙ্গুন পার হইয়া যাইত।

পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ নাই বলিলেও চলে

প্রায় বিনাবাধায় মিত্রসেনার বেলজিয়াম, হলাণ্ড ও জার্ম্মানীতে প্রবেশ

মিত্র সেনা প্যারিস দখলের এক সপ্তাহ পরেই বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ দখল করিয়াছে, আট দিন পরে হল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। আর একটি খবরে প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই জার্ম্মানীর সীমান্ত ভেদ করিয়া মিত্রসেনার ট্যাঙ্ক বহর আগাইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সেও ঠিক ঐ একই অবস্থা। অবতরণের দুই সপ্তাহ পরই মিত্রসেনা ইতালী সীমান্তও অতিক্রম করিয়াছে। পশ্চিম সীমান্তে হিটলার বাহিনী প্রায় যুদ্ধ না করিয়াই পলাইতেছে।

অত্যাচারের বালুচরের উপর হিটলার যে অট্টালিকা বানাইয়াছিল, আজ তাহার ভিৎ খসিয়া পড়িতেছে। তাই যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন হিটলারীরা আর বেতার বক্তৃতায় পর্য্যন্ত আস্ফালন করিতে পারে নাই। শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের ঘরদুয়ার বাচাইতে হইবে বলিয়া তাহারা আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর অবসন্ন জার্ম্মানদের স্তোকবাক্য দিতেছে যে আবার কোন একদিন যুদ্ধ করিয়া আজিকার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে হইবে।

সমগ্র ফ্রান্স প্রায় মুক্ত

৬ই জুন দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আরম্ভ হয়; সেদিন থেকে ২৫শে আগষ্টের মধ্যে ফ্রান্সে জার্ম্মানদের মোট চার লক্ষেরও বেশী সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ বা বন্দী হইয়াছে। অর্থাৎ শত্রুর কুড়ি ডিভিশনের মত পদাতিক সৈন্য হতাহত বা বন্দী হইয়াছে।

ব্রিটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারি সর্ব্বোচ্চ সামরিক সম্মান পাইয়াছেন, তাঁহাকে ফীলড্-মার্শাল পদবী দেওয়া হইয়াছে। নর্ম্মান্দিতে মিত্রবাহিনীর ইনি নেতা ছিলেন, শত্রুর সপ্তম বাহিনীকে এখানে আটকাইয়া রাখার ফলে প্যারিসের মুক্তি ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়াছিল। মণ্টগোমারির সঙ্গে মার্কিন-সেনানায়কদের মনোমালিন্যের গুজব প্রধান সেনাপতি আইজেনহাওয়ার অস্বীকার করিয়াছেন।

বেলজিয়মের ভিতর লড়াই

উত্তরে রুয়াঁ, আমিয়াঁ, আরাস্ প্রভৃতি ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান মিত্রশক্তি দখল করিয়াছে। জার্ম্মানরা যে কিভাবে পলাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে ক্যানেডিয়ান সৈন্য বিনাযুদ্ধে দিয়েপ্ বন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া ভার্দুনের লড়াই বিখ্যাত হইয়াছিল; এবার ফরাসী দেশভক্ত সৈন্যদল ভার্দুন দখল করিয়া লইয়াছে। যে মাজিনো লাইনে ফরাসীদের দেশরক্ষা-দুর্গগুলি ছিল, মার্কিন ট্যাঙ্কবাহিনী সে লাইন-পার হইয়াছে। জার্ম্মানদের আত্মরক্ষাব্যূহ জিগ্‌ফ্রিড্ লাইনের পিছনে শত্রু পলাইয়া লড়ে কি না দেখা যাইবে।

হিটলার পদানত বেলজিয়মের মুক্তি আজ আসন্ন। বেলজিয়মের রাজধানী হইতে অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্য মাত্র ৪৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। বেলজিয়ান দেশভক্তেরা অত্যাচারী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে কিছুকাল ধরিয়া রীতিমত সংগ্রাম করিতেছে। বেলজিয়মের দেশভক্তদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সেনাপতি আইজেনহাওয়ার উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন হলাণ্ডের দেশভক্তদের সংগঠনকেও মিত্রশক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ফরাসী ও বেলজিয়ান দেশভক্তদের সংগ্রাম

দক্ষিণ ফ্রান্সে ফরাসী দেশভক্তেরা বিপুল উৎসাহে শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতেছে। স্পেনের সীমান্তের কাছে নারবন, বেজিয়ের ও মঁপেলিয়ের মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে। জার্ম্মানরা রোন্ নদীর উপত্যকা দিয়া চট্‌পট্ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় লাগিয়াছে। লিয়ঁ, গ্রেনোব্‌ল, মঁতেলিমার প্রভৃতি শত্রুর হস্তচ্যুত হওয়ায়, তাহার বিপদ বাড়িয়াছে। সুইজারল্যান্ডের সীমান্তের কাছে ফরাসী দেশভক্তেরা মরভীইয়ার দখল করিয়াছে, ইতালীর কাছে ক্লেরমঁ-ফেরাঁ, তারার, বুর্গসাঁ-মোরিস্ প্রভৃতি স্থান কাড়িয়া লইয়াছে। নীস্ শহরের উত্তর-পূর্ব্বে ভেঁতিমিগ্‌লিয়া পার হইয়া মিত্রসেনা ইতালী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ফরাসীদেশের সর্বত্র স্বাধীনতার পতাকা উড়িতে বিলম্ব হইবে না। ফরাসী মুক্তিসংসদের প্রধান কেন্দ্র উত্তর আফ্রিকার আলজিয়ার্স হইতে খাস প্যারিসে গিয়া স্থাপিত হইতেছে।

বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাকের ঘোষণা

আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়া লীগের অনারারী প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিয়া পার্লবাক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন :—আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগে আমার যোগদানের কারণ এই যে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, পৃথিবীর সর্বত্র কৃষ্ণাঙ্গ জাতিসমূহের কাছে ভারতবর্ষই বিশ্বগণতন্ত্রের পরীক্ষাস্থল। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই স্বাধীনতা ঘোষণা করা চলে।

গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গ মুখে যাহা বলেন, কাজে তাহা করিবেন কি না, সেদিকে চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, এমন কি ইউরোপেরও কোটি কোটি নরনারী সাগ্রহে তাকাইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আমাদের কার্য্যের দ্বারাই হয় গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিবে, নয় ব্যর্থ হইবে। ইণ্ডিয়া লীগ ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিয়া যাইবে।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্
১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
মস্কো হইতে আসিয়াছে
MOSCOW NEWS
সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত ইংরেজী কাগজ
প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা
International Literature
English Monthly—One rupee per Copy
—বাহির হইয়াছে—
THE PEASANT WAR IN GERMANY
by Friedrich Engels
One rupee & eight annas a copy
পি, সি, জোশীর লেখা
গান্ধী-জিন্না আপোষের পথ
দাম দুই আনা মাত্র

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

মিলনের পূর্ব্বক্ষণে গান্ধীজির বাণী

সারা বিশ্ব আমাদের দিকে চাহিয়া আছে

১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনার পর প্রার্থনায় সমবেত জনতার নিকট গান্ধীজি বলেন যে তাঁহাদের দুজনের উপর কিরূপ গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা জানেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদের আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে এবং যাহাতে কোনও বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত না হইয়া সমগ্র ভারতেরই স্বার্থ-রক্ষিত হয় সেইরূপ একটী মীমাংসার জন্যই তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে তাঁহারা মীমাংসা না করিয়া ফিরিলে, "কোটি কোটি ভারতবাসীর আশা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আজ সমগ্র বিশ্বের সর্বহারা শোষিত জনগণ আমাদের মুখের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছে।"

জিন্না—"ব্যর্থতায় জ্ঞানের পরাভব"

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেন যে, কায়েদে আজম তাঁহাকে বলিয়াছেন, "মীমাংসা না করিয়াই যদি আমাদের বিদায় লইতে হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের জ্ঞান-চক্ষু আজও উন্মীলিত হয় নাই।"

শুভ কামনায়

রাজাগোপালাচারি

"হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া আসুন আমরা আলোচনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি। আলোচনা সফল হইলে ভারতের ইতিহাস নূতন পথ ধরিবে।" (এ,পি)

পাঞ্জাব কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন

১০ই সেপ্টেম্বর অমৃতসরে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডাঃ কিচলুর সভাপতিত্বে পাঞ্জাব প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"পাঞ্জাবের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের এই সম্মেলন পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের আপোষ করিয়া রাজনীতিক অচল অবস্থা ভাঙ্গিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিতেছেন এই সম্মেলন তাহাতে দ্বিধাহীন সমর্থন জানাইতেছে। এই সম্মেলন বিশ্বাস করে যে গান্ধী-জিন্না আপোষের ফলে পরস্পর-বিশ্বাস ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে, সাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরস্পর-নির্ভরতা সৃষ্টি হইবে এবং সংখ্যাল্পরা সকলেই রাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতিগত অধিকারের পরিপূর্ণ ভরসা পাইবে।…" এ, পি,

বিহারের কংগ্রেস ও লীগ

ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ, লীগ এম, এল, এ জাফর ইমাম প্রভৃতি প্রদেশের বহু কংগ্রেস ও লীগ নেতা ৬ই সেপ্টেম্বর এক সঙ্গে বিবৃতি দিয়াছেন:—

"আমাদের দেশের ইতিহাসের এই পরম মুহূর্তে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্যের পূর্ণ সাফল্য কামনায় গভীর প্রার্থনা উচ্চারণ করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। … নেতৃদ্বয়ের পরস্পর-আলোচনায় যে নিষ্পত্তিই গৃহীত হোক, তাহা যে শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণও গ্রহণ করিবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে; তাহার ফলে সমস্ত বিরোধ মিটিবার পথ সুগম হইবে এবং সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে।"

[হিন্দু পত্রিকা]

স্যর নাজিমুদ্দীন

১২ই সেপ্টেম্বর বেতারের সংবাদ ঘোষণায় প্রকাশ, স্যর নাজিমুদ্দীন জিন্না সাহেবকে তার করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন তিনি যেন আপোষের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন প্রভৃতির সমর্থন

এলাহাবাদ ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন আবেদন করিয়াছিল ৯ই সেপ্টেম্বর "ঐক্য দিবস" রূপে প্রতিপালিত হোক। ইউ,পি এসেম্বলির ভূতপূর্ব্ব স্পীকার ও বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, ডাঃ তারাচাঁদ; লীগ নেতা জেড, এচ, লারি প্রভৃতি এই আবেদন সমর্থন করিয়াছেন। [হিন্দু"]

কারাগারের মধ্যে যাহারা

স্বাধীনতার দিন গণিতেছে

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে রাজবন্দী শ্রীসত্যেন্দ্র মজুমদার (ইনি ৭বৎসর মেয়াদ পুরা খাটিবার পরও মুক্তি পান নাই) লিখিয়াছেন: "অচল অবস্থা দূর করার জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এখানকার অপরাপর রাজবন্দীদের মধ্যে কংগ্রেসী বন্দীদের মতামত যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহারা গান্ধীজীর প্রচেষ্টা ও গান্ধী রাজাজী ফরমুলাকে সমর্থন করেন।"

মনপ্রাণ দিয়ে কামনা করছে, গান্ধী জিন্না আলোচনা সফল হোক, আমরা মহাশক্তির দুর্জয় তেজে অগ্রসর হই। সমস্ত নরনারীর আশা ও ভাগ্য যে আলোচনার উপর নির্ভর করছে, কোনো নেতা কি সে আলোচনাকে ব্যর্থ হতে দিতে পারেন!

তারপর পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিকামী মানুষ। তারাও আজ মৃত্যুর রক্তাক্ত পথে। কিন্তু তাদের মৃত্যু নিষ্ফল নয়, স্বাধীন মানুষের নবজীবনেরই তারা জন্ম দিচ্ছে। আমাদের ঐক্য ও নবজীবন এই মৃত্যুহীন সংগ্রামেই যোগ দেবে। আমাদের নবলব্ধ শক্তি আর পৃথিবীর মানুষের শক্তি যে বিরাট ঐক্য রচনা করবে তার সামনে জরাজীর্ণ সাম্রাজ্যবাদ কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে?

সম্পাদকীয়

সফল হোক

গান্ধীজি জিন্না সাহেবের কাছে পৌছেছেন। আন্তরিক বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় ঐক্যের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত দেশ এই দিনের প্রতীক্ষায় ছিল।

দুঃখ ও মৃত্যুর নিষ্ঠুর পথ আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। ক্ষমতাবঞ্চিত আমরা, প্রাত্যহিক ব্যর্থতার মুহূর্ত্ত আক্রোশে নিজেদের ভাগ্যকেই প্রতিদিন বঞ্চনা করেছি। মৃত্যু ও বঞ্চনাকে পরাস্ত করবার যে-শক্তি ছিল আমাদেরই মধ্যে, ক্ষুদ্র স্বার্থ বা সন্দেহের ভেদবুদ্ধিতে সেই শক্তিকেই আমরা ঐক্যবদ্ধ করে তুলিনি। তার ফলে আজও আমাদের মনে সংশয়: ঐক্য হবে কি? ঐক্য হলেই কি সাম্রাজ্যবাদ নামবে?

ঐক্য হতেই হবে। কারণ অন্য কোন পথ নেই। অন্য সমস্ত পথের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছে আমাদের সেই সব লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, অপমৃত্যুর হাত থেকে যাদের আমরা রক্ষা করতে পারিনি।

সে মৃত্যুকে নিষ্ফল হতে দেবনা। তার কঠোর অভিজ্ঞতা আমাদের জীবন-পথের শিক্ষা এনে দিয়েছে। তাই সারা দেশ আজ সমস্ত

(পাশে ৩য় কলমে দেখুন)

অচল অবস্থার তালা ভাঙ্গো

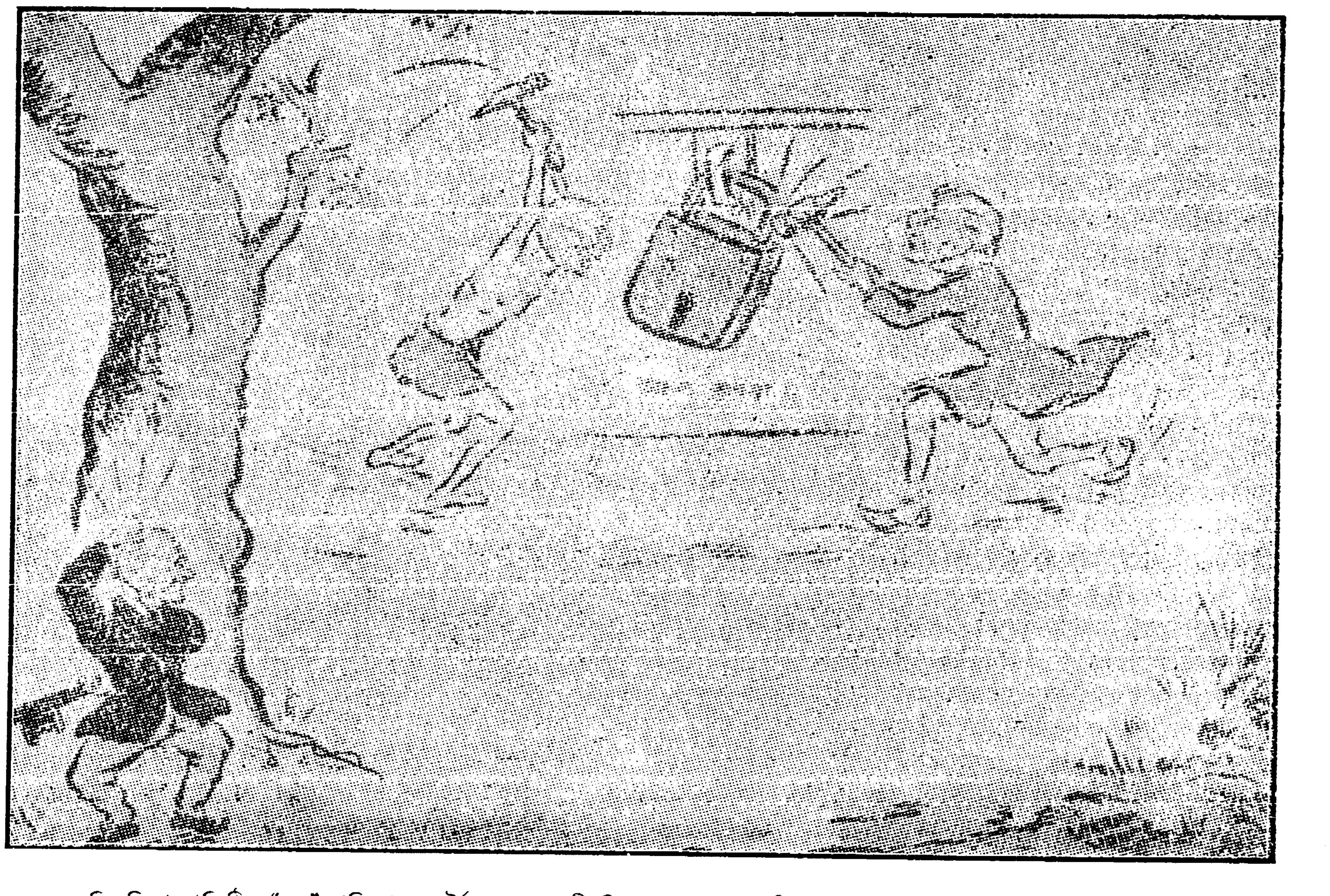

মিঃ জিন্না প্রতিষ্ঠিত "ডন" পত্রিকার কার্টুন। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতকে লীগ মহল এই ভাবেই অভিনন্দিত করিতেছে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২০শ সংখ্যা] ১৩ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, '৪৪, ২৮শে ভাদ্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

জলন্ধর ও দিল্লীর শিখ নেতৃবৃন্দ

জলন্ধর জেলার শিখ-নেতা সর্দার উজাগর সিং রাজাজির আপোষ প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া বলিয়াছেন যে এ জেলার শিখেরা গত ২৫ বছর ধরিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলেই সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন। [ইউ পি]

দিল্লী প্রদেশের জাতীয়তাবাদী শিখেরা গত ৮ই সেপ্টেম্বর শীষগঞ্জ গুরুদ্বারায় সভা করিয়া রাজাজির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন এবং আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থও নিশ্চয়ই বিবেচিত হইবে। [ডন]

শ্রীহট্টের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির স্বাধিকার স্বীকারই কংগ্রেস লীগ মিলনের ভিত্তি। আমি আশা করি মহাত্মাজী ও জিন্নাজীর আলোচনায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সফল চুক্তি হইবে।"

রাজভক্তের শিবিরে হিন্দু মহাসভা

জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দু মহাসভার অভিযানকে স্বাধীনতার শত্রুতা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৯ই আগষ্ট বলিয়াছেন—"হিন্দুমহাসভা মনে করে রাজাজীর প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তার সর্ব্বনাশ করিবে, ইহা ভেদ-শক্তি বাড়াইয়া জাতীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনাই পিছাইয়া দিবে। এই জন্যই মহাসভা রাজাজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছে, কোন রকম সাম্প্রদায়িক কারণে নয়।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবু দেশের লোককে বুঝাইতে চান যে, স্বাধীনতার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই হিন্দুমহাসভা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিতেছে। কিন্তু সমগ্র মহাসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমেরীর মতই কুৎসিত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে এবং মহাসভার নেতারা নামজাদা খয়েরখাঁদের সঙ্গে একত্র হইয়া জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে। স্বাধীনতার নাম ব্যবহার শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ভণ্ডামী মাত্র।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাভারকর

১৪ই আগষ্ট তারিখে সাভারকর সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের তিনটি পাপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—কংগ্রেসের প্রথম পাপ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরই মিত্রশক্তির যুদ্ধকে গণতন্ত্রের যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা, দ্বিতীয় পাপ লর্ড লিন্‌লিথগোর নিকট আপোষের কথাবার্ত্তা। ভাবটা এই যে কংগ্রেসই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আর মহাসভাই বিপ্লবী সংগ্রামের পথগামী। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেছেন—"কংগ্রেসের তৃতীয় পাপ হইল…১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের আত্মঘাতী প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটি যেমন সময়ের অনুপযোগী তেমনই বিকৃতবুদ্ধি-প্রসূত এবং আত্মবিরোধী। এই প্রস্তাব অনুসারে তাঁহারা আবার এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া তাহার নাম দিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ।…"

এমেরী কংগ্রেসের নামে যে অপবাদ রটনা করিতেছে বীর সাভারকর অসীম বীরত্বের সঙ্গে সেই অপবাদই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, যদিও গান্ধীজী বার বার ঘোষণা করিয়াছেন ৯ই আগষ্টের সংগ্রাম কংগ্রেস আরম্ভ করে নাই। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, মিত্রশক্তির যুদ্ধে সহানুভূতি এসবও পাপ, আবার যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রাম তাহাও পাপ! অথচ পুণ্য যে কি তাহা তিমির গর্ভে অদৃশ্য আছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু মহিশূরে ভারতের জাতীয়তা এবং ভারতীয় স্বাধীনতার জয়ঢাক পিটাইবার পরমুহূর্ত্তে তাঁহার নেতা সাভারকর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ চালাইয়াছেন। এই দুই নেতা মিলিয়া বলিতেছেন—

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর, মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতি জানান অন্যায় অথচ ৯ই আগষ্টের যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামও পাপ। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মহাসভার নেতারা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ রাজভক্ত বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে মিলিত ভাবে "স্বাধীনতার" ফ্রণ্ট গঠন করিয়াছেন।

রাজভক্তদের যুক্ত ফ্রণ্ট

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এক যুক্তবিবৃতিতে ভারতবিভাগের বিষময় ফলের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—"ভারত বিভাগের ভিত্তিতে আপোষ হইলে যে স্বাধীনতার জন্য এই আপোষ সেই স্বাধীনতাই বিপন্ন হইবে।"

স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে কি করিয়া সে চিন্তা তাঁহারা করিতেছেন না. স্বাধীনতা পাইবার পর উহা রক্ষা করা যাইবে কিনা এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির এবং সেই জন্যই রাজাজীর প্রস্তাবে তাঁহাদের আপত্তি। এই বিবৃতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিতেছেন যে গান্ধী-জিন্না আপোষে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা দূর হইবে না, যেন তাঁহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন; মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে না. যেন তাঁহারাই মুসলমান স্বার্থের মুখপাত্র; বাংলাদেশ ভূগোল হইতে মুছিয়া যাইবে, যেন তাঁহারা জানেন না যে বাংলার ঐক্য স্থাপনে মুসলিম লীগের আগ্রহ কম নয়। বিলাতের রক্ষণশীলদের টাইমস্ পত্রিকা গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেবকে ঠিক এই সব কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ভারতীয় রাজভক্তদের সঙ্গে একত্র হইয়া শ্যামাপ্রসাদের দল যাহা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে টাইমসের মন্তব্যের হুবহু মিল। "জাতীয়তা", "স্বাধীনতা" প্রভৃতি কথার চটক ভেদ করিয়া এই যে সাদৃশ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে ইহা কি বিনা কারণে?

উক্ত বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরকারী নির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সভায় বলিয়াছেন—"যাঁহারা গান্ধী-জিন্না চুক্তির ভয়ে ভীত আমি তাঁহাদের দলে নই। ….. মিঃ জিন্না এখনও এমন দাবী করেন নাই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এখনই দিতে হইবে, কেন্দ্রীয় আইন সভায় হিন্দু-মুসলমান সমান সমান অংশ হইবে—এই দাবীর বিরুদ্ধেই আমাদের উদ্বেগ।"

ভারতের স্বাধীনতা, ভারত রক্ষা, ভারত ব্যবচ্ছেদ কোনটিই শেষ পর্য্যন্ত টিকিতেছে না কারণ স্বাধীনতা কামী এবং ভারতের ঐক্য পন্থী স্বদেশ সেবকরা অগণিত সংখ্যায় গান্ধী-জিন্না মিলন সমর্থন করিতেছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য সংখ্যার তারতম্য কংগ্রেস লীগের একতার বিরুদ্ধে মোক্ষম যুক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই যুক্তিই মহাসভার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ এই যুক্তিই রাজভক্ত ক্রীতদাসদের মিলিত ফ্রণ্ট সুদৃঢ় করিতে সবচেয়ে সাহায্য করিবে।

মহেশ্বর দয়াল বলিয়াছেন যে রাজাজীর প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব তিনি এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবু জিন্নার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাই যদি হয় তবে আজ সে প্রস্তাবে তাঁহারা এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন কেন? তাহার কারণ কি এই নয় যে, সে-সময় গান্ধীজী কারারুদ্ধ, গান্ধীজীর অবর্ত্তমানে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জিন্না আপোষ করিলে কংগ্রেসের নাম মুছিয়া দেওয়া সহজ হইত, আর আজ গান্ধীজীর চেষ্টায় কংগ্রেসই শক্তিশালী হইতে চলিল! অর্থাৎ কংগ্রেসকে বিলুপ্ত করার পথে যদি ভারত বিভাগ কাজে লাগে তবে তাহা ভাল, আর তাহা না লইলে ভারত বিভাগ মন্দ।

ইহার পর যদি শুনি যে, গান্ধীজী এবং জিন্নাসাহেব উভয়েই অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহাসভা দাবী করিতেছে মুসলমান মেজরিটির বাংলায় আমরা থাকিব না, বাংলা পৃথক করিয়া দাও—তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন যে পথ প্রশস্ত সেই পথই মহাসভার পথ।

জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যে শিবির সাজাইতেছে, মহাসভা আছে তাহারই ভিতর। মহাসভাই সাম্রাজ্যবাদের শেষ ভরসা।

শহীদ স্মরণে

গত ২রা সেপ্টেম্বর **কমরেড কালী সোম** যক্ষা রোগে মারা গিয়াছেন। কমরেড সোমের বাড়ী ঢাকা জিলার টঙ্গিবাড়ী গ্রামে। ১৬।১৭ বছর বয়সেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন।—১৯৩৫ সালে ট্রাম কোম্পানীতে

ট্রামের বীর মজুর কমরেড কালী সোম

চাকুরী লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তখনকার দুর্বল ট্রাম ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কালিঘাট সেক্‌সনে ট্রাম-শ্রমিকদের জন্য ৩টা মেস্ স্থাপিত হয় এবং এই মেস্‌গুলিই ছিল ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার শক্ত ঘাটি। ১৯৩৭ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে তিনি ও তাঁহার পরিবার পার্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯৪২ সালে ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টকে ইউনিয়নের ভিতরে টানিয়া আনিতে তাঁহার দান ছিল প্রচুর। তারপর ৯ই আগষ্টের আত্মঘাতী "সংগ্রামের" আঘাত হইতে ট্রাম-মজুরদের দেশরক্ষার দেশপ্রেমিক নীতিতে অবিচলিত রাখিয়া ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে কমরেড সোমের আপ্রাণ চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ১৯৪৩ সালে কমরেড সোম পার্টি-সভ্যপদের মর্য্যাদা লাভ করেন।—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

বীর খাটে ছোরাসহ গ্রেপ্তার

৮ই সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত পাকিস্তান বিরোধী ফ্রণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত খাটেকে অদ্য…গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। (এ, পি) শ্রীযুক্ত খাটের নিকট একখানি ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

(আনন্দবাজারের নিজস্ব সংবাদ দাতা)

খারাপ চাল খাইয়া লোক মরুক—
—সরকারের মাথা ব্যথা কি!

কলিকাতা শহরে বরাদ্দ চাল-আটা ক্রমশ সরেশ হওয়া দূরে থাক অবস্থা দিন দিন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে—মজুর, ভদ্রলোক, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই প্রায় অখাদ্য চাল খাইতে বাধ্য হইতেছে। শহরময় ইহা লইয়া দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য কাগজের সমালোচনা সরকার হয়তো রাজনৈতিক দলাদলি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে, সেজন্য আমরা এ সম্বন্ধে দৈনিক **"আজাদ"** পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতেই অবস্থাটা বোঝা যাইবে :—

"কলিকাতায় রেশনিং অদ্য হইতে ত্রয়োত্রিংশৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইল গত দুই সপ্তাহ হইতে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশনিংএর চাউল সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে, তাহাতে আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

"বর্ত্তমানে যে চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহা এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর যে মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত নহে। একেতো মোটা দুষ্পাচ্য, তাহার উপর পাথরের কুঁচি, ইটের গুঁড়া, ঘাসের বীচি ইত্যাদি মিশান। আহারে বসিয়া প্রথম গ্রাস মুখে দিতেই, খাদ্যের প্রতি খাদকের একটি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু না খাইয়াও উপায় নাই। ভাতো বাঙ্গালী ভাত না হইলে বাঁচে না, রেশনিংএর চাউল ছাড়া কলিকাতার বুকে বসিয়া অন্য কোন প্রকারের চাউল সংগ্রহ করার উপায় তাহাদের নাই। তাই একদিকে তাহাকে ক্ষুধার তাড়নায় অন্য দিকে 'জান বাঁচান ফরজের' জন্য তাহাকে উহা গলাধঃকরণই (চিবাইয়া খাওয়া সম্ভবপর নহে) করিতে হয়।

"এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য ব্যবহারের ফলে শহরে রোগের আধিক্য দেখা দিয়াছে। প্রায় বাড়ীতেই দু' একজন করিয়া পেটের অসুখে ভুগিতেছে। রক্তামাশয়ও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিলম্বে যদি ইহার প্রতিকার না হয়, তবে এই সমস্ত রোগ শহরে ব্যাপকভাবে দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়

"কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারের তরফ হইতে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয় যে, ভবিষ্যতে আর যাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল আমদানী না হইতে পারে, সেদিকে তাঁহারা বিশেষ সজাগ হইয়াছেন। তবে যে সমস্ত খারাপ চাউল মওজুদ আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাও প্রায় দুই মাস পূর্ব্বের কথা। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যেও যদি সেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল নিঃশেষ না হইয়া থাকে, তবে কবে যে তাহা শেষ হইবে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লোকে খাইতে পারুক আর নাই পারুক, তাঁহারা তো আর তাঁহাদের কথার খেলাফ করিতে পারেন না। তাঁহারা সুষ্ঠ ভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন, শাসন যন্ত্রের চাকা চালু থাকিবেই। রেশনিং চালু তাঁহারা রাখিবেনই, খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে বড় কথা নয়।

"কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সভায় মিঃ সুধীর রায় চৌধুরী বলিয়াছেন, রেশনিংএর দোকানের খাদ্য পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেরা পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কর্পোরেশনকে তাঁহাদের সহযোগিতায় কার্য্য করিতে দিতে নারাজ বলিয়া মিঃ রায় চৌধুরী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করিতে সরকার সম্মতি দিউন আর নাই দিউন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। আমরা চাই শহরের অধিবাসীবৃন্দের দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হউক, তাহারা মানুষের মতো দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইয়া দিন গুজরাণ করুক। একটী কথা আমরা সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই : রেশনিংএর খাদ্য পরীক্ষার জন্য ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে, অথচ খাদ্যের শ্রেণীর (quality) কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? মানুষের খাওয়ার উপযোগী চাউল সরবরাহ করিতে সরকার যদি সক্ষম না হন, তাহা হইলে খাদ্য বিতরণের সমস্ত ক্ষমতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার কোনো মানে হয় না। তাঁহারা অবিলম্বে যদি এ বিষয়ে অবহিত না হন, তবে ইহাতে শুধু পয়সাই খরচ হইবে তাহা নহে; পয়সা খরচ করিয়া শহরে পীড়ার প্রসার করাই হইবে। মোট কথা এই অসহ অবস্থার পরিবর্ত্তন অবিলম্বে হওয়া উচিত।"

ভারত সরকারই কলিকাতায় রেশনের মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। সম্প্রতি স্বয়ং লর্ড ওয়েভল খাদ্য বিষয়ে কমিটি গঠন করিয়াছেন ও নিজে তাহার সভাপতি হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের লইয়া যে গুপ্ত বৈঠক হইয়া গেল সেখানেও নাকি এ বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হইয়াছে। মিলিটারি ভাইসরয় ওয়েভলের আধা-মিলিটারি গভর্ণর কেসি নিজেই নাকি আই-সি-এস-তন্ত্র মারফৎ বাংলায় খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে প্রভুত্ব করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষের দিনে আমলাতন্ত্রই ঠিক করিয়াছিল যে লোক মরে মরুক কিন্তু অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয় বলিয়া জোর প্রচার চালাইয়া যাও। আজও সেই আমলাতান্ত্রিক ত্র্যহস্পর্শই স্থির করিয়াছে, চাল খারাপ হোক কিন্তু কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগকে উহা পরীক্ষা করিতে দিওনা! পরীক্ষা করিতে দিলে চাল কত খারাপ তাহা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ হইয়া যাইবে, ইহাই কি তাঁহাদের ভয়?

কিন্তু কলিকাতার সমস্ত শ্রেণীর লোক যে দুঃখ ভুগিতেছে ও যাহার প্রতিবাদে সকল মতের জনসাধারণই একত্রিত হইতেছে—সে দুঃখের প্রমাণ আমলাতন্ত্রের ইস্পাত-কাঠামো ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া আসিবে।

বোম্বাই প্রাদেশিক পিপ্‌লস্ ফুড কাউন্‌সিলের উদ্যম

গত ২১শে আগষ্ট প্রাদেশিক পিপ্‌লস্ ফুড কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের নিকট এক স্মারকলিপিতে খাদ্যব্যবস্থার কতকগুলি ব্যাপারের উন্নতির জন্য কয়েকটী দাবী জানাইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের বহু স্থানে বরাদ্দ শহর অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম ছিল। আগষ্ট মাস হইতে সরকার গ্রামাঞ্চলের বরাদ্দ বাড়াইয়া বয়স্কদের মাথাপিছু ৩৫ তোলা খাদ্যের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে।

জনগণের খাদ্য কমিটিই বাঙ্গলাকে বাঁচাইতে পারে

শহরে ও গ্রামে খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য কণ্ট্রোল দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, রিলিফ, ফসল বাড়ানো প্রভৃতি কাজের উদ্দেশ্যে বাংলায় হাজার হাজার খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। আজ এই সব কমিটির অবস্থা কি? আমলারা জনগণের অধিকার কতটুকু মানিতেছে? খাদ্য কমিটির ভিতর দুর্নীতি কি করিয়া প্রবেশ করিল? দেশবাসীরা কি এই দুর্নীতি দূর করিয়া জনগণকে বাঁচাইতে পারে না?

আন্দোলনের ফলে সুব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকসমিতি ও সূতাকল ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং সহরের বিশিষ্ট লোকদের লইয়া খাদ্য কমিটি আছে। এক বৎসর ধরিয়া এ-আর-পি এলাকার ৬৫০০০ লোকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চলিতেছে। খাদ্য কমিটির আন্দোলনের ফলে শহরের সমস্ত ব্যবসায়ী, রেশন বিক্রেতা সকলেই সংঘবদ্ধ হইয়া ঘোষণা করে—দুর্নীতির সাহায্যে ব্যবসা করার রীতি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। মিষ্টি ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী এমনকি ধোপারা পর্য্যন্ত সংঘবদ্ধ হইয়া কমিটী গঠন করে। এস-ডি-ও ও আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া খাদ্য-কমিটি রেশনীং এর পুরা দায়িত্ব গ্রহণ করে।

খাদ্য কমিটির শক্তি দুর্জ্জয়

বর্ত্তমানে মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে দুই সের চাউল; তিন ছটাক তেল, লবণ ও চিনি দেওয়া হইইতেছে। যে বাড়ীতে বিজলী বাতি আছে তাহার জন্য মাসিক ১ পাঁইট ও যাহাদের বিজলী নাই তাহাদের বাড়ী পিছু ৪ পাঁইট কেরোসিন তৈল সরবরাহ করা হয়। কয়লাও খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে রেশনীং প্রথায় বিলি হয়। সম্প্রতি খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে বস্ত্র রেশনীংএর ব্যবস্থা হইতেছে। শতকরা ৭৫ জনের ১৬৷০ টাকা দরে চাউল কিনিবার ক্ষমতা নাই, তাই খাদ্য কমিটি ১০৲ টাকা দরে চাউল দিবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। এস-ডি-ও খাদ্য কমিটির নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—১০৲ টাকা দরে চাউল দিবার ব্যবস্থার জন্য উপরে লিখিতেছেন। বর্ত্তমানে ৫৩টী রেশন বিক্রেতার প্রত্যেকের নামে পারমিট না কাটিয়া তাহাদের সংঘের সম্পাদকের নামে একটী পারমিট দেওয়া হয়—তিনি দোকানের বরাদ্দ অনুযায়ী মাল ভাগ করিয়া দেন। কোন বিক্রেতা যদি কিছু অন্যায় বা দুর্নীতি মূলক আচরণ করে তাহা হইলে এসোসিয়েশনে তাহার প্রকাশ্য বিচার হয়।

ইহার বিরুদ্ধে কাহাদের ষড়যন্ত্র

মুর্শিদাবাদ জেলায় কেদার-চাঁদপুর গ্রামে স্থানীয় কোন এক জমিদারের বাড়ীতে খাদ্য কমিটির জিনিষপত্র বিক্রয় হইত। রেশন কার্ড লইয়া গেলে জনসাধারণ ঠিক ওজন অনুসারে জিনিষ পাইত না, অনেককে ফিরিয়া আসিতে হইত। জমিদারের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইত না। গত ১৪ই আগষ্ট খাদ্য কমিটির কাজের আলোচনার জন্য ৩০০ লোকের এক সভায় প্রবল প্রতিবাদ জানান হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়—জমিদারের বাড়ী হইতে উঠাইয়া আনিয়া গ্রামের মাঝখানে কনট্রোল দোকান স্থাপন করিতে হইবে। সেই অনুসারে গ্রামের মধ্যস্থলে এখন দোকান চলিতেছে।

কমিটির ভিতর চোরাকারবারী

খুলনা জেলায় সম্প্রতি শোভনা ইউনিয়ন ফুড কমিটির যুক্ত সম্পাদক স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত পিযুষ কান্তি কর ফুড কমিটির সাধারণ সভায় চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডিলারদের জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করা হয়। একজন কারবারী (ডিলার) কণ্ট্রোলের মাল বহুদিন যাবৎ চোরাবাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল। ইউনিয়ন কমিটি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে এই ইউনিয়নের রিজার্ভ লিষ্ট হইতে আর একজন ডিলারকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ফুলতলা বাজারে ১ মাস পূর্বে লবণের দাম ছিল ১৲ টাকা সের। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় কণ্ট্রোল দোকান হইতে লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় বর্ত্তমানে ।০ আনা সেরে বিক্রয় হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার রায়নার শ্রীযুক্ত কালীপদ মণ্ডল জানাইতেছেন, কিছুদিন যাবৎ রায়না এলাকায় ব্যবসাদাররা প্রচুর পরিমাণ লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষ গোপনে আমদানী করিয়া চোরাবাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে রায়না বাজারের একজন ব্যবসায়ীর ৪৪ বস্তা লবণ ধরা হয়। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্ত মাল ফুড কমিটিকে কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে অনুমতি দেয়। ২০শে জুলাই বাজারের তিনজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ১১৩ টীন কেরোসিন ধরা হয়। পরে তাহারা খাদ্য কমিটির কতিপয় সভ্য ও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সহায়তায় এই মাল বিক্রয় করিয়া দেয়। রাত্রে আমদানীর সময় ধরা পরার পর স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা কোনরূপ সাহায্য না করার জন্যই এই কেরোসিন চোরাবাজারে বিক্রয় হইয়া গেল।

আমলারাই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছে

ফরিদপুর জেলায় ডিঙ্গামানিক খাদ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন,—কণ্ট্রোল দোকানের ব্যবসায়ী (ডিলার) নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে খাদ্য কমিটির কোন হাত নাই। আমাদের কমিটি হইতে সুপারিশ করা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনকে ডিলার নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সার্কেল অফিসার তাঁহার কেরাণীর ভাইকে ডিলার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ভাবে খাদ্য কমিটিকে শুধু কাগজ পত্রেই রাখা হইতেছে। গত ৬ মাসের মধ্যে একটুও চিনি সরবরাহ করা হয় নাই, অথচ মহাজনরা ২৲ টাকা সেরে যে চিনি দিতে পারিতেছে তাহা তাহারা পাইল কোথা হইতে?

বাঁকুড়া জেলায় পাত্রসায়ের ফুড্‌রেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী সংবাদ পাঠাইয়াছেন—উক্ত থানার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পঞ্চানন চন্দ্রর দোকান হইতে স্থানীয় পুলিশ ১৮ টীন কেরোসিন তেল বাহির করে। উক্ত ব্যবসায়ী এই কেরোসিন বহুদিন যাবৎ ২ টাকা সের দরে বিক্রয় করিতেছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমার এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাহার বিচার গত ছয় মাস যাবৎ চলিতেছিল। এই মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর জেরা করা হয়। ১০ই আগষ্ট এই ব্যবসায়ী বেকসুর মুক্তি পাইয়াছে!

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানার লালপুর মহদীপুরের খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়াররা গত জুলাই মাসে ১৪৭ টীন কেরোসীন তেল বোঝাই দুইটী নৌকা আটক করে। পরে স্থানীয় পুলিশ ইউনিয়ন ফুড কমিটির সম্পাদক ডাঃ গণেন সরকার, লালপুর কমিটির সম্পাদক কমলাকান্ত ও অম্রবাড়ী কমিটির সভাপতি রজিবুদ্দীন মুন্সী এবং খাদ্যকমিটীর কয়েকজন ভলাণ্টিয়ারকে ৩টী ধারায় গ্রেপ্তার করে।

প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি চাই

ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজনের গুদাম তল্লাসী করিয়া বালুরঘাট সার্কেল অফিসার ২৫০ টীন কেরোসিন বাহির করে। তখন এই ব্যবসায়ী রামলালের জরিমানাও করা হয়। আর আজ নৌকায় কেরোসিন ধরা পড়িল। অথচ চোরা ব্যবসায়ীরাই পরিত্রাণ পাইয়া গেল। এদিকে খাদ্য-কমিটির সভ্য ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হইল। ইহাতে সমগ্র অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীপদ আচার্য্য লিখিতেছেন,—গত মে মাসে ঘাটাল মহকুমার শ্রীযুক্ত সতীশ মাইতি, উপেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি স্থানীয় খাদ্যকমিটির কতিপয় সভ্য একদিন রাত্রিতে চোরাবাজারের আমদানী ৪ গাড়ী কেরোসিন তেল আটক করে। গত ৪ঠা জুলাই হঠাৎ স্থানীয় ৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হইল। স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর হইতে ৬৪৮ জন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খাদ্য-কমিটির কর্মীদের এই ভাবে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে গণ-সহি মারফৎ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন।

জনগণকেই বাদ দিবার চেষ্টা

জলপাইগুড়ি জেলায় পচাগড় হইতে শ্রীযুত হরপ্রসাদ ঘোষ জানাইতেছেন,—নতুন সরকারী আইন অনুসারে ফুড কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বার বার দিন ধার্য্য করিয়া গ্রামে আসেন না। ৪র্থবার তিনি আসেন ও মাগেদ্বারিকামারী ইউনিয়ন ফুড কমিটি গঠন করিতে চান। মাত্র ১৩ জন লোক উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে ১১ জনই শ্রীযুক্ত নগেন ঝাঁকে সম্পাদক করিবার প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তারা রাগ করিয়া চলিয়া যান, সভা হয় না। নির্বাচিত খাদ্য কমিটি গঠন না হওয়া সত্বেও উক্ত নগেন ঝাঁর নিকট ইউনিয়নের রেশন কার্ড, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদির পারমিট আসিতেছে। রেশন লিষ্টে বহু পরিবারের নামই উঠে না. জিনিস বিক্রয়ের সময় নানা ধরণের দুর্নীতি চলে।

ময়মনসিং হইতে শ্রীযুক্ত ললিত সরকার জানাইতেছেন,—হালুয়া ঘাট থানার জনসাধারণকে না জানাইয়াই খাদ্যকমিটি গঠন করা হইয়াছে। ঘোষগাওতেও এই একই অবস্থা। **রংপুর জেলায়** সৈয়দপুরে কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত খাদ্য-কমিটীকে কর্তৃপক্ষ নাকচ করিয়া দিয়াছে।

সরবরাহের স্বল্পতা ও অব্যবস্থা

এই সমস্ত সংবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় আমলা ও চোরাকাবারীরা খাদ্য-কমিটিগুলির ভিতর জনসাধারণের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যাহা কিছু সরবরাহ হয় তাহার একটা মোটা অংশ চোরাবাজারে চলিয়া যায়। ইহার উপর আছে, সরবরাহের স্বল্পতা, কোন খাদ্যকমিটিই প্রয়োজনের উপযুক্ত মালপত্র পাইতেছে না। রাজসাহী জেলার সদরে ১০ হাজার মণ চিনির প্রয়োজন, অথচ ১৩০০ ব্যাগের বেশী সরবরাহ হয় না, প্রয়োজনীয় ৫০০০ টীন কেরোসিনের স্থলে পাওয়া যায় ১৩৫৬ টীন, ১০,০০০ মণ লবণের স্থলে মাত্র ২৫০৫ ব্যাগ দেওয়া হয়। হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল, ডোমজুড় ও আন্দুল অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকান পিছু ২০০০ মণ চাউলের দরকার অথচ দুই মাস যাবৎ এই সব দোকান মাত্র ৫০০ মণ করিয়া পাইতেছে। বর্দ্ধমান জেলায় শহর, ঘাটতি ও বন্যার্ত্ত অঞ্চলের জন্য ১৪ লক্ষ মণ চাউল লাগিবে, অথচ সরকারী ষ্টকে আছে মাত্র ৬ লক্ষ মণ। সারওয়ার্দ্দী সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধিদের জানাইয়া দিয়াছেন, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতি করা সম্ভব নয়। একদিকে এইভাবে চাউলের সরবরাহের অভাব আর অন্যদিকে শিবপুর (হাওড়া), যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইলাম খাদ্য অপচয় হইতেছে। আবার, যাহাদের ক্রয় ক্ষমতা নাই কমদরে ও বিনামূল্যে তাহাদের চাউল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নাই। ফলে. মুন্সীগঞ্জে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার মণ চাউল ষ্টকে আছে অথচ ইহার শতকরা ৫০ ভাগ কখনই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। যে সব খাদ্যকমিটির অধীন বহু নিঃস্ব ও দুস্থ পরিবার আছে তাহারা বরাদ্দ মত চাউল কিনিতে পারে না।

আইনকানুন শুধু কাগজে-পত্রেই

সরকারের কাগজপত্রে সব কিছুই আছে। ১৯শে জুনের রিপোর্টে সরকার বলিয়াছে, ৫৪৬৩২টী গ্রাম্য ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। ৩০শে আগষ্টের সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে ১ কোটী ২০ লক্ষ রেশনকার্ড বিলি হইয়াছে। ৮৯টী শহরে ইতিমধ্যেই রেশনিংএর মালপত্র সরবরাহ হইতেছে। দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলার সর্বত্রই খাদ্য কমিটি গঠনের কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সর্বত্রই জনগণের প্রতিনিধিদের কমিটি হইতে বাদ দিবার চেষ্টা চলিতেছে। আইনে খাদ্যকমিটিকে চোরাবাজার ও মজুত বিরোধী অভিযান চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে অথচ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহু স্থানে কমিটীর সভ্য ও কর্ম্মীদের এই কাজের জন্য নানা অজুহাতে গ্রেপ্তার করিতেছে। আইনে বলা হইয়াছে, উপযুক্ত বিক্রেতা স্থির করিবার দায়িত্ব খাদ্য কমিটির অথচ স্থানীয় আমলারা মর্জিমত জনসাধারণের অপ্রিয় ব্যবসায়ীকে পারমিট দিতেছে।

কংগ্রেসসেবীদের দায়িত্ব

খাদ্যকমিটিগুলির গত দেড় বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা এই যে, কোন জেলার বা অঞ্চলের সমস্ত দেশসেবী সংগঠন মিলিত ভাবে খাদ্যকমিটার কাজ চালাইতে পারিলে স্থানীয় আমলা ও চোরা ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা যায়। চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় সমস্ত দলের এমন কি শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির প্রতিনিধি জেলা খাদ্য কমিটিতে আছেন। কিন্তু জেলার প্রতিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতারা একাজে কোথাও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন নাই। ফলে দেশের ভিতর দুর্নীতির সীমা নাই। বাংলায় খাদ্য আইন ভাঙ্গায় সাজা পাইয়াছে ৯০০ লোক—ভারতের সব প্রদেশের উপরে উঠিয়াছে বাংলা। আর কত যে ধরা পড়ে নাই তাহার তো ইয়ত্তা নাই। অথচ এই বাংলারই সবচেয়ে বেশী খাদ্যসংকট।

যেখানেই কংগ্রেসসেবীরা স্থানীয় খাদ্যকমিটীর কাজ পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সেইখানেই জনসাধারণের ভিতর সরবরাহ ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। খাদ্যকমিটীগুলি হইতে দেশসেবীরা তফাৎ থাকিলে খাদ্য কমিটির মধ্যে আমলা ও মুনাফাখোরদের দুর্নীতির চাপে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। খাদ্য কমিটীগুলির রিপোর্ট হইতে একথা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজিও সম্প্রতি বলিয়াছেন—ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও উদ্যোগ প্রয়োগের অবকাশ থাকিলে জনসাধারণকে বাঁচাইবার কাজে আমলাদের সহিত সংস্পর্শ রাখা কংগ্রেসসেবীদের অনুচিত কাজ হইবে না। দেশসেবা ও জনসেবা যেসব কংগ্রেস-কর্ম্মীদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার এই সুযোগ কখনই ছাড়িতে পারেন না।

প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি গড়িতে হইবে

সমস্ত দেশসেবকদের মধ্যে এই চেতনা ও বিশ্বাস আসিলে সকল দলের মিলিত প্রাদেশিক খাদ্যকমিটি গঠনের পথে কোন বাধাই থাকিবে না। আর এই প্রাদেশিক কমিটি সুগঠিত হইলে সারা বাংলায় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ, বিক্রয় ও বিতরণের সুবন্দোবস্ত হইতে একদিনও বিলম্ব হইবে না। দেশসেবীদের আজ তাই সরকারী খাদ্য কমিটির প্রতি দুঃসমার্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা যোগ দিলে ইহার ভিতর দিয়া বস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যাদি বণ্টন, ফসল বাড়ানো, পুনর্গঠন, রিলিফ প্রভৃতি সমস্ত কাজই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে—বাঙ্গালীর পঙ্গু সমাজ আবার পুনর্জীবন লাভ করিবে।

রাজভক্তের শিবিরে হিন্দু মহাসভা

জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দু মহাসভার অভিযানকে স্বাধীনতার শত্রুতা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৯ই আগষ্ট বলিয়াছেন—"হিন্দুমহাসভা মনে করে রাজাজীর প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তার সর্ব্বনাশ করিবে, ইহা ভেদ-শক্তি বাড়াইয়া জাতীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনাই পিছাইয়া দিবে। এই জন্যই মহাসভা রাজাজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছে, কোন রকম সাম্প্রদায়িক কারণে নয়।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবু দেশের লোককে বুঝাইতে চান যে, স্বাধীনতার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই হিন্দুমহাসভা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিতেছে। কিন্তু সমগ্র মহাসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমেরীর মতই কুৎসিত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে এবং মহাসভার নেতারা নামজাদা খয়েরখাঁদের সঙ্গে একত্র হইয়া জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে। স্বাধীনতার নাম ব্যবহার শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ভণ্ডামী মাত্র।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাভারকর

১৪ই আগষ্ট তারিখে সাভারকর সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের তিনটি পাপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—কংগ্রেসের প্রথম পাপ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরই মিত্রশক্তির যুদ্ধকে গণতন্ত্রের যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা, দ্বিতীয় পাপ লর্ড লিন্‌লিথগোর নিকট আপোষের কথাবার্ত্তা। ভাবটা এই যে কংগ্রেসই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আর মহাসভাই বিপ্লবী সংগ্রামের পথগামী। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেছেন—"কংগ্রেসের তৃতীয় পাপ হইল…১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের আত্মঘাতী প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটি যেমন সময়ের অনুপযোগী তেমনই বিকৃতবুদ্ধি-প্রসূত এবং আত্মবিরোধী। এই প্রস্তাব অনুসারে তাঁহারা আবার এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া তাহার নাম দিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ।…"

এমেরী কংগ্রেসের নামে যে অপবাদ রটনা করিতেছে বীর সাভারকর অসীম বীরত্বের সঙ্গে সেই অপবাদই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, যদিও গান্ধীজী বার বার ঘোষণা করিয়াছেন ৯ই আগষ্টের সংগ্রাম কংগ্রেস আরম্ভ করে নাই। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, মিত্রশক্তির যুদ্ধে সহানুভূতি এসবও পাপ, আবার যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রাম তাহাও পাপ! অথচ পুণ্য যে কি তাহা তিমির গর্ভে অদৃশ্য আছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু মহিসুরে ভারতের জাতীয়তা এবং ভারতীয় স্বাধীনতার জয়ঢাক পিটাইবার পরমুহূর্ত্তে তাঁহার নেতা সাভারকর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ চালাইয়াছেন। এই দুই নেতা মিলিয়া বলিতেছেন—

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর, মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতি জানান অন্যায় অথচ ৯ই আগষ্টের যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামও পাপ। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য মহাসভার নেতারা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ রাজভক্ত বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে মিলিত ভাবে "স্বাধীনতার" ফ্রন্ট গঠন করিয়াছেন।

রাজভক্তদের যুক্ত ফ্রন্ট

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এক যুক্তবিবৃতিতে ভারতবিভাগের বিষময় ফলের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—

"ভারত বিভাগের ভিত্তিতে আপোষ হইলে যে স্বাধীনতার জন্য এই আপোষ সেই স্বাধীনতাই বিপন্ন হইবে।"

স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে কি করিয়া সে চিন্তা তাঁহারা করিতেছেন না. স্বাধীনতা পাইবার পর উহা রক্ষা করা যাইবে কিনা এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির এবং সেই জন্যই রাজাজীর প্রস্তাবে তাঁহাদের আপত্তি। এই বিবৃতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিতেছেন যে গান্ধী-জিন্না আপোষে সংখ্যালঘিষ্টদের সমস্যা দূর হইবে না, যেন তাঁহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন; মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে না. যেন তাঁহারাই মুসলমান স্বার্থের মুখপাত্র; বাংলাদেশ ভূগোল হইতে মুছিয়া যাইবে, যেন তাঁহারা জানেন না যে বাংলার ঐক্য স্থাপনে মুসলিম লীগের আগ্রহ কম নয়। বিলাতের রক্ষণশীলদের টাইমস্ পত্রিকা গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেবকে ঠিক এই সব কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ভারতীয় রাজভক্তদের সঙ্গে একত্র হইয়া শ্যামাপ্রসাদের দল যাহা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে টাইমসের মন্তব্যের হুবহু মিল। "জাতীয়তা", "স্বাধীনতা" প্রভৃতি কথার চটক ভেদ করিয়া এই যে সাদৃশ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে ইহা কি বিনা কারণে?

উক্ত বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরকারী নির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সভায় বলিয়াছেন—"যাঁহারা গান্ধী-জিন্না চুক্তির ভয়ে ভীত আমি তাঁহাদের দলে নই। ….. মিঃ জিন্না এখনও এমন দাবী করেন নাই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এখনই দিতে হইবে, কেন্দ্রীয় আইন সভায় হিন্দু-মুসলমান সমান সমান অংশ হইবে—এই দাবীর বিরুদ্ধেই আমাদের উদ্বেগ।"

ভারতের স্বাধীনতা, ভারত রক্ষা, ভারত ব্যবচ্ছেদ কোনটিই শেষ পর্য্যন্ত টিকিতেছে না কারণ স্বাধীনতা কামী এবং ভারতের ঐক্য পন্থী স্বদেশ সেবকরা অগণিত সংখ্যায় গান্ধী-জিন্না মিলন সমর্থন করিতেছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য সংখ্যার তারতম্য কংগ্রেস লীগের একতার বিরুদ্ধে মোক্ষম যুক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই যুক্তিই মহাসভার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ এই যুক্তিই রাজভক্ত ক্রীতদাসদের মিলিত ফ্রন্ট সুদৃঢ় করিতে সবচেয়ে সাহায্য করিবে।

মহেশ্বর দয়াল বলিয়াছেন যে রাজাজীর প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব তিনি এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবু জিন্নার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাই যদি হয় তবে আজ সে প্রস্তাবে তাঁহারা এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন কেন? তাহার কারণ কি এই নয় যে, সে-সময় গান্ধীজী কারারুদ্ধ, গান্ধীজীর অবর্ত্তমানে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জিন্না আপোষ করিলে কংগ্রেসের নাম মুছিয়া দেওয়া সহজ হইত, আর আজ গান্ধীজীর চেষ্টায় কংগ্রেসই শক্তিশালী হইতে চলিল! অর্থাৎ কংগ্রেসকে বিলুপ্ত করার পথে যদি ভারত বিভাগ কাজে লাগে তবে তাহা ভাল, আর তাহা না লইলে ভারত বিভাগ মন্দ।

ইহার পর যদি শুনি যে, গান্ধীজী এবং জিন্নাসাহেব উভয়েই অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহাসভা দাবী করিতেছে মুসলমান মেজরিটির বাংলায় আমরা থাকিব না, বাংলা পৃথক করিয়া দাও—তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন যে পথ প্রশস্ত সেই পথই মহাসভার পথ।

জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যে শিবির সাজাইতেছে, মহাসভা আছে তাহারই ভিতর। মহাসভাই সাম্রাজ্যবাদের শেষ ভরসা।

বোম্বাই প্রাদেশিক পিপ্‌লস্ ফুড কাউন্‌সিলের উদ্যম

গত ২১শে আগষ্ট প্রাদেশিক পিপ্‌লস্ ফুড কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের নিকট এক স্মারকলিপিতে খাদ্যব্যবস্থার কতকগুলি ব্যাপারের উন্নতির জন্য কয়েকটী দাবী জানাইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের বহু স্থানে বরাদ্দ শহর অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম ছিল। আগষ্ট মাস হইতে সরকার গ্রামাঞ্চলের বরাদ্দ বাড়াইয়া বয়স্কদের মাথাপিছু ৩৫ তোলা খাদ্যের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে।

শহীদ স্মরণে

গত ২রা সেপ্টেম্বর **কমরেড কালী সোম** যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়াছেন। কমরেড সোমের বাড়ী ঢাকা জিলার টঙ্গিবাড়ী গ্রামে। ১৬।১৭ বছর বয়সেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন।—১৯৩৫ সালে ট্রাম কোম্পানীতে

ট্রামের বীর মজুর কমরেড কালী সোম

চাকুরী লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তখনকার দুর্বল ট্রাম ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কালিঘাট সেক্‌সনে ট্রাম-শ্রমিকদের জন্য ৩টা মেস্ স্থাপিত হয় এবং এই মেস্‌গুলিই ছিল ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার শক্ত ঘাটি। ১৯৩৭ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে তিনি ও তাঁহার পরিবার পার্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯৪২ সালে ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টকে ইউনিয়নের ভিতরে টানিয়া আনিতে তাঁহার দান ছিল প্রচুর। তারপর ৯ই আগষ্টের আত্মঘাতী "সংগ্রামের" আঘাত হইতে ট্রাম-মজুরদের দেশরক্ষার দেশপ্রেমিক নীতিতে অবিচলিত রাখিয়া ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে কমরেড সোমের আপ্রাণ চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ১৯৪৩ সালে কমরেড সোম পার্টি-সভ্যপদের মর্য্যাদা লাভ করেন।—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

খারাপ চাল খাইয়া লোক মরুক— —সরকারের মাথা ব্যথা কি!

কলিকাতা শহরে বরাদ্দ চাল-আটা ক্রমশ সরেশ হওয়া দূরে থাক অবস্থা দিন দিন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে—মজুর, ভদ্রলোক, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই প্রায় অখাদ্য চাল খাইতে বাধ্য হইতেছে। শহরময় ইহা লইয়া দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য কাগজের সমালোচনা সরকার হয়তো রাজনৈতিক দলাদলি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে, সেজন্য আমরা এ সম্বন্ধে দৈনিক **"আজাদ"** পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতেই অবস্থাটা বোঝা যাইবে :—

"কলিকাতায় রেশনিং অদ্য হইতে ত্রয়োত্রিংশৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইল গত দুই সপ্তাহ হইতে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশনিংএর চাউল সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে, তাহাতে আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

"বর্ত্তমানে যে চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহা এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর যে মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত নহে। একেতো মোটা দুষ্পাচ্য, তাহার উপর পাথরের কুচি, ইটের গুঁড়া, ঘাসের বীচি ইত্যাদি মিশান। আহারে বসিয়া প্রথম গ্রাস মুখে দিতেই, খাদ্যের প্রতি খাদকের একটি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু না খাইয়াও উপায় নাই। ভাতো বাঙ্গালী ভাত না হইলে বাঁচে না, রেশনিংএর চাউল ছাড়া কলিকাতার বুকে বসিয়া অন্য কোন প্রকারের চাউল সংগ্রহ করার উপায় তাহাদের নাই। তাই একদিকে তাহাকে ক্ষুধার তাড়নায় অন্য দিকে 'জান বাঁচান ফরজের' জন্য তাহাকে উহা গলাধঃকরণই (চিবাইয়া খাওয়া সম্ভবপর নহে) করিতে হয়।

"এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য ব্যবহারের ফলে শহরে রোগের আধিক্য দেখা দিয়াছে। প্রায় বাড়ীতেই দু' একজন করিয়া পেটের অসুখে ভুগিতেছে। রক্তামাশায়ও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিলম্বে যদি ইহার প্রতিকার না হয়, তবে এই সমস্ত রোগ শহরে ব্যাপকভাবে দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়

"কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারের তরফ হইতে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয় যে, ভবিষ্যতে আর যাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল আমদানী না হইতে পারে, সেদিকে তাঁহারা বিশেষ সজাগ হইয়াছেন। তবে যে সমস্ত খারাপ চাউল মওজুদ আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাও প্রায় দুই মাস পূর্ব্বের কথা। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যেও যদি সেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল নিঃশেষ না হইয়া থাকে, তবে কবে যে তাহা শেষ হইবে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লোকে খাইতে পারুক আর নাই পারুক, তাঁহারা তো আর তাঁহাদের কথার খেলাফ করিতে পারেন না। তাঁহারা সুষ্ঠ ভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন, শাসন যন্ত্রের চাকা চালু থাকিবেই। রেশনিং চালু তাঁহারা রাখিবেনই, খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে বড় কথা নয়।

"কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সভায় মিঃ সুধীর রায় চৌধুরী বলিয়াছেন, রেশনিংএর দোকানের খাদ্য পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেরা পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কর্পোরেশনকে তাঁহাদের সহযোগিতায় কার্য্য করিতে দিতে নারাজ বলিয়া মিঃ রায় চৌধুরী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করিতে সরকার সম্মতি দিউন আর নাই দিউন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। আমরা চাই শহরের অধিবাসীবৃন্দের দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হউক, তাহারা মানুষের মতো দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইয়া দিন গুজরাণ করুক। একটী কথা আমরা সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই : রেশনিংএর খাদ্য পরীক্ষার জন্য ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে, অথচ খাদ্যের শ্রেণীর (quality) কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? মানুষের খাওয়ার উপযোগী চাউল সরবরাহ করিতে সরকার যদি সক্ষম না হন, তাহা হইলে খাদ্য বিতরণের সমস্ত ক্ষমতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার কোনো মানে হয় না। তাঁহারা অবিলম্বে যদি এ বিষয়ে অবহিত না হন, তবে ইহাতে শুধু পয়সাই খরচ হইবে তাহা নহে; পয়সা খরচ করিয়া শহরে পীড়ার প্রসার করাই হইবে। মোট কথা এই অসহ অবস্থার পরিবর্ত্তন অবিলম্বে হওয়া উচিত।"

ভারত সরকারই কলিকাতায় রেশনের মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। সম্প্রতি স্বয়ং লর্ড ওয়েভল খাদ্য বিষয়ে কমিটি গঠন করিয়াছেন ও নিজে তাহার সভাপতি হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের লইয়া যে গুপ্ত বৈঠক হইয়া গেল সেখানেও নাকি এ বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হইয়াছে। মিলিটারি ভাইসরয় ওয়েভলের আধা-মিলিটারি গভর্ণর কেসি নিজেই নাকি আই-সি-এস-তন্ত্র মারফৎ বাংলায় খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে প্রভুত্ব করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষের দিনে আমলাতন্ত্রই ঠিক করিয়াছিল যে লোক মরে মরুক কিন্তু অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয় বলিয়া জোর প্রচার চালাইয়া যাও। আজও সেই আমলাতান্ত্রিক ত্র্যহস্পর্শই স্থির করিয়াছে, চাল খারাপ হোক কিন্তু কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগকে উহা পরীক্ষা করিতে দিওনা! পরীক্ষা করিতে দিলে চাল কত খারাপ তাহা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ হইয়া যাইবে, ইহাই কি তাঁহাদের ভয়?

কিন্তু কলিকাতার সমস্ত শ্রেণীর লোক যে দুঃখ ভুগিতেছে ও যাহার প্রতিবাদে সকল মতের জনসাধারণই একত্রিত হইতেছে—সে দুঃখের প্রমাণ আমলাতন্ত্রের ইস্পাত-কাঠামো ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া আসিবে।

বীর থাটে ছোরাসহ গ্রেপ্তার

৮ই সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত পাকিস্তান বিরোধী ফ্রণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত থাটেকে অদ্য…গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। (এ, পি) শ্রীযুক্ত থাটের নিকট একখানি ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

(আনন্দবাজারের নিজস্ব সংবাদ দাতা)

জনগণের খাদ্য কমিটিই
বাঙ্গলাকে বাঁচাইতে পারে

শহরে ও গ্রামে খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য কণ্ট্রোল দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, রিলিফ, ফসল বাড়ানো প্রভৃতি কাজের উদ্দেশ্যে বাংলায় হাজার হাজার খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। আজ এই সব কমিটির অবস্থা কি? আমলারা জনগণের অধিকার কতটুকু মানিতেছে? খাদ্য কমিটির ভিতর দুর্নীতি কি করিয়া প্রবেশ করিল? দেশবাসীরা কি এই দুর্নীতি দূর করিয়া জনগণকে বাঁচাইতে পারে না?

আন্দোলনের ফলে সুব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকসমিতি ও সূতাকল ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং সহরের বিশিষ্ট লোকদের লইয়া খাদ্য কমিটি আছে। এক বৎসর ধরিয়া এ-আর-পি এলাকার ৬৫০০০ লোকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চলিতেছে। খাদ্য কমিটির আন্দোলনের ফলে শহরের সমস্ত ব্যবসায়ী, রেশন বিক্রেতা সকলেই সংঘবদ্ধ হইয়া ঘোষণা করে—দুর্নীতির সাহায্যে ব্যবসা করার রীতি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। মিষ্টি ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী এমনকি ধোপারা পর্য্যন্ত সংঘবদ্ধ হইয়া কমিটী গঠন করে। এস-ডি-ও ও আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া খাদ্য-কমিটি রেশনীং এর পুরা দায়িত্ব গ্রহণ করে।

খাদ্য কমিটির শক্তি দুর্জ্জয়

বর্ত্তমানে মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে দুই সের চাউল, তিন ছটাক তেল, লবণ ও চিনি দেওয়া হইইতেছে। যে বাড়ীতে বিজলী বাতি আছে তাহার জন্য মাসিক ১ পাঁইট ও যাহাদের বিজলী নাই তাহাদের বাড়ী পিছু ৪ পাঁইট কেরোসিন তৈল সরবরাহ করা হয়। কয়লাও খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে রেশনীং প্রথায় বিলি হয়। সম্প্রতি খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে বস্ত্র রেশনীংএর ব্যবস্থা হইতেছে। শতকরা ৭৫ জনের ১৬৷০ টাকা দরে চাউল কিনিবার ক্ষমতা নাই, তাই খাদ্য কমিটি ১০৲ টাকা দরে চাউল দিবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। এস-ডি-ও খাদ্য কমিটির নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—১০৲ টাকা দরে চাউল দিবার ব্যবস্থার জন্য উপরে লিখিতেছেন। বর্ত্তমানে ৫৩টী রেশন বিক্রেতার প্রত্যেকের নামে পারমিট না কাটিয়া তাহাদের সংঘের সম্পাদকের নামে একটী পারমিট দেওয়া হয়—তিনি দোকানের বরাদ্দ অনুযায়ী মাল ভাগ করিয়া দেন। কোন বিক্রেতা যদি কিছু অন্যায় বা দুর্নীতি মূলক আচরণ করে তাহা হইলে এসোসিয়েশনে তাহার প্রকাশ্য বিচার হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কেদার-চাঁদপুর গ্রামে স্থানীয় কোন এক জমিদারের বাড়ীতে খাদ্য কমিটির জিনিষপত্র বিক্রয় হইত। রেশন কার্ড লইয়া গেলে জনসাধারণ ঠিক ওজন অনুসারে জিনিষ পাইত না, অনেককে ফিরিয়া আসিতে হইত। জমিদারের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইত না। গত ১৪ই আগষ্ট খাদ্য কমিটির কাজের আলোচনার জন্য ৩০০ লোকের এক সভায় প্রবল প্রতিবাদ জানান হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়—জমিদারের বাড়ী হইতে উঠাইয়া আনিয়া গ্রামের মাঝখানে কনট্রোল দোকান স্থাপন করিতে হইবে। সেই অনুসারে গ্রামের মধ্যস্থলে এখন দোকান চলিতেছে।

কমিটির ভিতর চোরাকারবারী

খুলনা জেলায় সম্প্রতি শোভনা ইউনিয়ন ফুড কমিটির যুক্ত সম্পাদক স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত পিযুষ কান্তি কর ফুড কমিটির সাধারণ সভায় চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডিলারদের জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করা হয়। একজন কারবারী (ডিলার) কণ্ট্রোলের মাল বহুদিন যাবৎ চোরাবাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল। ইউনিয়ন কমিটি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে এই ইউনিয়নের রিজার্ভ লিষ্ট হইতে আর একজন ডিলারকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ফুলতলা বাজারে ১ মাস পূর্ব্বে লবণের দাম ছিল ১৲ টাকা সের। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় কণ্ট্রোল দোকান হইতে লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় বর্ত্তমানে ।০ আনা সেরে বিক্রয় হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার রায়নার শ্রীযুক্ত কালীপদ মণ্ডল জানাইতেছেন, কিছুদিন যাবৎ রায়না এলাকায় ব্যবসাদাররা প্রচুর পরিমাণ লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষ গোপনে আমদানী করিয়া চোরাবাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে রায়না বাজারের একজন ব্যবসায়ীর ৪৪ বস্তা লবণ ধরা হয়। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্ত মাল ফুড কমিটিকে কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে অনুমতি দেয়। ২০শে জুলাই বাজারের তিনজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ১১৩ টীন কেরোসিন ধরা হয়। পরে তাহারা খাদ্য কমিটির কতিপয় সভ্য ও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সহায়তায় এই মাল বিক্রয় করিয়া দেয়। রাত্রে আমদানীর সময় ধরা পরার পর স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা কোনরূপ সাহায্য না করার জন্যই এই কেরোসিন চোরাবাজারে বিক্রয় হইয়া গেল।

আমলারাই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছে

ফরিদপুর জেলায় ডিঙ্গামাণিক খাদ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন,—কণ্ট্রোল দোকানের ব্যবসায়ী (ডিলার) নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে খাদ্য কমিটির কোন হাত নাই। আমাদের কমিটি হইতে সুপারিশ করা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনকে ডিলার নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সার্কেল অফিসার তাঁহার কেরাণীর ভাইকে ডিলার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ভাবে খাদ্য কমিটিকে শুধু কাগজ পত্রেই রাখা হইতেছে। গত ৬ মাসের মধ্যে একটুও চিনি সরবরাহ করা হয় নাই, অথচ মহাজনরা ২৲ টাকা সেরে যে চিনি দিতে পারিতেছে তাহা তাহারা পাইল কোথা হইতে?

বাঁকুড়া জেলায় পাত্রসায়ের ফুড রেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী সংবাদ পাঠাইয়াছেন—উক্ত থানার বিখ্যাত ব্যবসায়ী পঞ্চানন চন্দ্রর দোকান হইতে স্থানীয় পুলিশ ১৮ টীন কেরোসিন তেল বাহির করে। উক্ত ব্যবসায়ী এই কেরোসিন বহুদিন যাবৎ ২ টাকা সের দরে বিক্রয় করিতেছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমার এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাহার বিচার গত ছয় মাস যাবৎ চলিতেছিল। এই মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর জেরা করা হয়। ১০ই আগষ্ট এই ব্যবসায়ী বেকসুর মুক্তি পাইয়াছে।

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানার লালপুর মহলীপুরের খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়াররা গত জুলাই মাসে ১৪৭ টীন কেরোসীন তেল বোঝাই দুইটী নৌকা আটক করে। পরে স্থানীয় পুলিশ ইউনিয়ন ফুড কমিটির সম্পাদক ডাঃ গণেন সরকার, লালপুর কমিটির সম্পাদক কমলাকান্ত ও অম্রবাড়ী কমিটির সভাপতি রজিবুদ্দীন মুন্সী এবং খাদ্যকমিটির কয়েকজন ভলাণ্টিয়ারকে ৭টী ধারায় গ্রেপ্তার করে। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজনের গুদাম তল্লাসী করিয়া বালুরঘাট সার্কেল অফিসার ২৫০টীন কেরোসিন বাহির করে। তখন এই ব্যবসায়ী রামলালের জরিমানাও করা হয়। আর আজ নৌকায় কেরোসিন ধরা পড়িল। অথচ চোরা ব্যবসায়ীরাই পরিত্রাণ পাইয়া গেল। এদিকে খাদ্যকমিটির সভ্য ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হইল। ইহাতে সমগ্র অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীপদ আচার্য্য লিখিতেছেন,—গত মে মাসে ঘাটাল মহকুমায় শ্রীযুক্ত সতীশ মাইতি, উপেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি স্থানীয় খাদ্যকমিটির কতিপয় সভ্য একদিন রাত্রিতে চোরাবাজারের আমদানী ৪ গাড়ী কেরোসিন তেল আটক করে। গত ৪ঠা জুলাই হঠাৎ স্থানীয় ৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হইল। স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর হইতে ৬৪৮ জন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খাদ্য-কমিটির কর্মীদের এই ভাবে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে গণ-সহি মারফৎ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন।

জনগণকেই বাদ দিবার চেষ্টা

জলপাইগুড়ি জেলায় পচাগড় হইতে শ্রীযুত হরপ্রসাদ ঘোষ জানাইতেছেন,—নতুন সরকারী আইন অনুসারে ফুড কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বার বার দিন ধার্য্য করিয়া গ্রামে আসেন না। ৪র্থবার তিনি আসেন ও মাগেদ্বারিকামারী ইউনিয়ন ফুড কমিটি গঠন করিতে চান। মাত্র ১৩ জন লোক উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে ১১ জনই শ্রীযুক্ত নগেন ঝাঁকে সম্পাদক করিবার প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তারা রাগ করিয়া চলিয়া যান, সভা হয় না। নির্বাচিত খাদ্য কমিটি গঠন না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত নগেন ঝাঁর নিকট ইউনিয়নের রেশন কার্ড, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদির পারমিট আসিতেছে। রেশন লিষ্টে বহু পরিবারের নামই উঠে না, জিনিস বিক্রয়ের সময় নানা ধরণের দুর্নীতি চলে।

ময়মনসিং হইতে শ্রীযুক্ত ললিত সরকার জানাইতেছেন,—হালুয়া ঘাট থানার জনসাধারণকে না জানাইয়াই খাদ্যকমিটি গঠন করা হইয়াছে। ঘোবরাওতেও এই একই অবস্থা। **রংপুর জেলায়** সৈয়দপুরে কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত খাদ্য-কমিটীকে কর্ত্তৃপক্ষ নাকচ করিয়া দিয়াছে।

ইহার বিরুদ্ধে কাহাদের ষড়যন্ত্র

সরবরাহের স্বল্পতা ও অব্যবস্থা

এই সমস্ত সংবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় আমলা ও চোরাকারবারীরা খাদ্য-কমিটিগুলির ভিতর জনসাধারণের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যাহা কিছু সরবরাহ হয় তাহার একটা মোটা অংশ চোরাবাজারে চলিয়া যায়। ইহার উপর আছে, সরবরাহের স্বল্পতা, কোন খাদ্যকমিটিই প্রয়োজনের উপযুক্ত মালপত্র পাইতেছে না। রাজসাহী জেলার সদরে ১০ হাজার মণ চিনির প্রয়োজন, অথচ ১৩০০ ব্যাগের বেশী সরবরাহ হয় না, প্রয়োজনীয় ৫০০০ টীন কেরোসিনের স্থলে পাওয়া যায় ১৩৩৬ টীন, ১০,০০০ মণ লবণের স্থলে মাত্র ২৫২৫ ব্যাগ দেওয়া হয়। হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল, ডোমজুড় ও আন্দুল অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকান পিছু ২০০০ মণ চাউলের দরকার অথচ দুই মাস যাবৎ এই সব দোকান মাত্র ৫০০ মণ করিয়া পাইতেছে। বর্দ্ধমান জেলায় শহর, ঘাটতি ও বন্যার্ত্ত অঞ্চলের জন্য ১৪ লক্ষ মণ চাউল লাগিবে, অথচ সরকারী ষ্টকে আছে মাত্র ৬ লক্ষ মণ। সারওয়ার্দ্দী সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধিদের জানাইয়া দিয়াছেন, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতি করা সম্ভব নয়। একদিকে এইভাবে চাউলের সরবরাহের অভাব আর অন্যদিকে শিবপুর (হাওড়া), যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইলাম খাদ্য অপচয় হইতেছে। আবার, যাহাদের ক্রয় ক্ষমতা নাই কমদরে ও বিনামূল্যে তাহাদের চাউল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নাই। ফলে মুন্সীগঞ্জে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার মণ চাউল ষ্টকে আছে অথচ ইহার শতকরা ৫০ ভাগ কখনই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। যে সব খাদ্যকমিটির অধীন বহু নিঃস্ব ও দুস্থ পরিবার আছে তাহারা বরাদ্দ মত চাউল কিনিতে পারে না।

আইনকানুন শুধু কাগজে-পত্রেই

সরকারের কাগজপত্রে সব কিছুই আছে। ১৯শে জুনের রিপোর্টে সরকার বলিয়াছে, ৫৪৬৩২টী গ্রাম্য ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। ৩০শে আগষ্টের সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে ১ কোটী ২০ লক্ষ রেশনকার্ড বিলি হইয়াছে। ৮৯টী শহরে ইতিমধ্যেই রেশনিংএর মালপত্র সরবরাহ হইতেছে। দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলার সর্ব্বত্রই খাদ্য কমিটি গঠনের কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই জনগণের প্রতিনিধিদের কমিটি হইতে বাদ দিবার চেষ্টা চলিতেছে। আইনে খাদ্যকমিটিকে চোরাবাজার ও মজুত বিরোধী অভিযান চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে অথচ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বহু স্থানে কমিটীর সভ্য ও কর্ম্মীদের এই কাজের জন্য নানা অজুহাতে গ্রেপ্তার করিতেছে। আইনে বলা হইয়াছে, উপযুক্ত বিক্রেতা স্থির করিবার দায়িত্ব খাদ্য কমিটির অথচ স্থানীয় আমলারা মর্জিমত জনসাধারণের অপ্রিয় ব্যবসায়ীকে পারমিট দিতেছে।

কংগ্রেসসেবীদের দায়িত্ব

খাদ্যকমিটিগুলির গত দেড় বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা এই যে, কোন জেলার বা অঞ্চলের সমস্ত দেশসেবী সংগঠন মিলিত ভাবে খাদ্যকমিটীর কাজ চালাইতে পারিলে স্থানীয় আমলা ও চোরা ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা যায়। চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় সমস্ত দলের এমন কি শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির প্রতিনিধি জেলা খাদ্য কমিটিতে আছেন। কিন্তু জেলার প্রতিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতারা একাজে কোথাও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন নাই। ফলে দেশের ভিতর দুর্নীতির সীমা নাই। বাংলায় খাদ্য আইন ভাঙ্গায় সাজা পাইয়াছে ৯০০ লোক—ভারতের সব প্রদেশের উপরে উঠিয়াছে বাংলা। আর কত যে ধরা পড়ে নাই তাহার তো ইয়ত্তা নাই। অথচ এই বাংলারই সবচেয়ে বেশী খাদ্যসংকট।

যেখানেই কংগ্রেসসেবীরা স্থানীয় খাদ্যকমিটির কাজ পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সেইখানেই জনসাধারণের ভিতর সরবরাহ ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। খাদ্যকমিটীগুলি হইতে দেশসেবীরা তফাৎ থাকিলে খাদ্য কমিটির মধ্যে আমলা ও মুনাফাখোরদের দুর্নীতির চাপে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। খাদ্য কমিটীগুলির রিপোর্ট হইতে একথা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজিও সম্প্রতি বলিয়াছেন—ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও উদ্যোগ প্রয়োগের অবকাশ থাকিলে জনসাধারণকে বাঁচাইবার কাজে আমলাদের সহিত সংস্পর্শ রাখা কংগ্রেসসেবীদের অনুচিত কাজ হইবে না। দেশসেবা ও জনসেবা যেসব কংগ্রেস-কর্ম্মীদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার এই সুযোগ কখনই ছাড়িতে পারেন না।

প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি চাই

প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি গড়িতে হইবে

সমস্ত দেশসেবকদের মধ্যে এই চেতনা ও বিশ্বাস আসিলে সকল দলের মিলিত প্রাদেশিক খাদ্যকমিটি গঠনের পথে কোন বাধাই থাকিবে না। আর এই প্রাদেশিক কমিটি সুগঠিত হইলে সারা বাংলায় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ, বিক্রয় ও বিতরণের সুবন্দোবস্ত হইতে একদিনও বিলম্ব হইবে না। দেশসেবীদের আজ তাই সরকারী খাদ্য কমিটির প্রতি ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা যোগ দিলে ইহার ভিতর দিয়া বস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যাদি বণ্টন, ফসল বাড়ানো, পুনর্গঠন, রিলিফ প্রভৃতি সমস্ত কাজই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে—বাঙ্গালীর পঙ্গু সমাজ আবার পুনর্জীবন লাভ করিবে।

বাংলা দেশে চাষ-আবাদের দুরবস্থা

আমন ফসলের কি হইবে?

সমগ্র বাংলা দেশের জীবন মরণ নির্ভর করে আমন চাষের ভাল মন্দের উপর। সেই আমন চাষের মরশুম প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। জেলায় জেলায় কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজ নিজ জমিতে ফসল ফলাইতে চাষে নামিয়া গিয়াছে। কারণ এই চাষের সাফল্যের উপরই তাহাদের ভবিষ্যত। কিন্তু চাষ সুরু করিতে গিয়াই কৃষকরা কি দেখিতেছে? অজস্র বাধাবিঘ্ন। এই অগণিত বাধার উজান ঠেলিয়াও তাহারা আগাইতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে কই? চাষের হাল আছে ত গরু নাই, কৃষিঋণ পাইলে হয়ত এই ধাক্কা সামলান যাইত, কিন্তু কোথায় কৃষিঋণ? আবার স্থানে স্থানে কৃষিঋণ যাহা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ এত কম যে কৃষকরা তাহাকে পরিহাস বলিয়া মনে করে। চাষ করিতে ক্ষেত-মজুরের দরকার। ক্ষেত-মজুর পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে—মহামারীতে, অনশনে কৃষকদের প্রাণশক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাই এ কাজের লোক মিলিতেছে না। কোন কোন স্থানে আবার অন্যান্য কাজে এই ক্ষেত-মজুরদের নিয়োগ করিয়া এ কাজে তাহাদের অভাব ঘটাইয়াছে। জল আমন চাষের প্রাণ, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে কোন কোন স্থানে চাষের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়াছে। ফলে কৃষকদের মনে শঙ্কা জাগিয়াছে, আমন ধান যত হইতে পারিত তাহা হয়ত এবার হইবে না, কারণ জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিতেছে।

হালের গরু ও জলের অভাব

ঢাকা জেলায় নরসিংদি থানায় যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয়, তাহার অনেক কম জমিতে এবার চাষ হইবে কারণ হালের গরুর দারুণ অভাব। ১০টি পরিবারের মধ্যে ৫টি পরিবারের গরুই নাই। চাষের মজুর পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ মজুর ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। চাষ করিতে প্রচুর বৃষ্টির দরকার, অথচ এ অঞ্চলে বৃষ্টি কম হইয়াছে। **রংপুর জেলায় ডোমার অঞ্চলে** গত একমাস পর্যন্ত বৃষ্টির অভাব, তাহার ফল হইয়াছে এই যে আজ পর্যন্ত মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জমিতে আমন বোনা হইয়াছে। **মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা থানায়** লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। কৃষির উপরই স্থানীয় লোকদের সব কিছু নির্ভর করে। কিন্তু স্থানীয় সেবাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ সিংহের মতে "বর্ত্তমান বৎসরে থানার মধ্যে কোন কোন ইউনিয়নে অর্দ্ধেক জমি, কোন কোন ইউনিয়নে ছয় আনি জমি বৃষ্টির অভাবে আবাদ হয় নাই। এই থানায় কৃষিকার্য্যের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত বাঁধ বা পুকুর নাই বলিলেই হয়।"

ক্ষেত-মজুরের অভাব তার উপর কৃষিঋণও পাওয়া যাইতেছে না

গত বৎসর দামোদর ও অজয়ের বন্যায় **বর্দ্ধমান জেলায়** প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত হয়। প্রায় ৬০টি ইউনিয়নের ছয় শতাধিক গ্রামের চার লক্ষাধিক কৃষক বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বৎসর এই সব অঞ্চলে চাষের অবস্থাও খুব খারাপ। কৃষকদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে সরকার হইতে পর্য্যাপ্ত কৃষিঋণ ও বীজধান সাহায্য না পাইলে যে এখানে চাষ সম্ভব নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সরকার হইতে এক রকম কিছুই করা হয় নাই। আমন চাষের সময়ও শেষ হইতে চলিয়াছে, এখনও কোনরূপ কৃষিঋণ দেওয়া হয় নাই। একে ক্ষেত-মজুরের অভাব, তার উপর সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় বন্যা অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ চাষই হয় নাই। বিজুড় ইউনিয়নে প্রায় ৭৫ ভাগ জমি পড়িয়া আছে। এখনই পর্য্যাপ্ত সাহায্য না পাইলে অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে চাষ করাই কৃষকদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে।

তিন মাসে ত্রিশ জোড়া গরু মৃত

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানায় কাঁজিহাল ইউনিয়নে গত বৎসরের শেষ দিক হইতেই ভীষণ ভাবে গোমড়ক সুরু হয়। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিনমাসে গাই গরু ও বাছুর ছাড়া হালের গরু ও মহিষ মারা গিয়াছে ৩০ জোড়া। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে ৪২০ বিঘা ধানের জমি পতিত থাকিবে। পশু চিকিৎসার এবং গরু ক্রয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করার জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। আন্দোলনের ফলে সার্কেল-অফিসার আসিয়া তদন্ত করেন এবং সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া যান। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্তই—টাকা ও অন্যান্য সাহায্য এখনও আসিল না। এদিকে ধান চাষের মরশুম প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অবশ্য কৃষক সমিতির চেষ্টায় দলবদ্ধ ভাবে জমি চাষ সুরু হইয়াছে, তাহাতেও সব জমি চাষ হওয়া সম্ভব নয়। **খুলনা জেলায় কুমুরিয়া থানায়** সমস্যা দেখা দিয়াছে অন্য আর এক দিক দিয়া। সেখানে কৃষকের ঘরে ধান আছে, কিন্তু ক্রয় করার লোকের অভাবে ঘরের ধান ঘরেই পড়িয়া আছে। টাকার অভাবে কৃষকরা দারুণ অসুবিধায় পড়িয়াছে। চাষের সময় সাধারণতঃ প্রত্যেকটি কৃষক তাহার উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া কৃষির খরচ জোগায়। অথচ ধান কেনার লোক পাওয়া যাইতেছে না। সরকারের এজেণ্ট খুব অল্প ধানই ক্রয় করিয়াছে। পরে আসিয়া আরও ধান কিনিবে এই আশ্বাস দিয়া গেলেও এ পর্য্যন্ত কোন এজেণ্টই আসে নাই।

জমির সার ও খইলের অগ্নিমূল্য

বর্দ্ধমান জেলার রায়না, খণ্ডঘোষ থানার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ও কাটোয়া এলাকায় বৃষ্টির অভাবে চাষের অবস্থা শোচনীয়। তাহার উপর জেলার সর্ব্বত্র চাষের প্রয়োজনীয় সার ও খইল এবং কৃষকদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী, অথচ সরকার হইতে কম দামে এগুলি সরবরাহ করা হইতেছে না। এই সমস্ত কারণে সমগ্র জেলায় চাষের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।

মজুর অভাবে কি ভাবে চাষের ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ এই জেলারই **ক্যানেল অঞ্চল** হইতে পাওয়া গিয়াছে। চাষের জন্য সারা জেলাকে, বিশেষ করিয়া ক্যানেল অঞ্চলকে বাহিরের সাঁওতাল মজুরের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মজুরের অভাবে এবার চাষ খুব কম হইয়াছে। স্থানীয় কৃষকরা অনেকে রোগে দুর্ব্বল হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা, দুমকা প্রভৃতি স্থান হইতে বেশী মজুর আসিত। এবার বিহার গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় খুব সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়াছে। অথচ চাষের সময়ও শেষ হইতে চলিয়াছে। মজুরের অভাবে চাষের কিরূপ ক্ষতি করিয়াছে তাহা নীচের হিসাব হইতে বোঝা যাইবে। এই হিসাব ১লা আগষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রাম	ইউনিয়ন	চাষীর নাম	জমির পরিমাণ	লাঙ্গল	কত জমিতে চাষ হইয়াছে
সিংহপাড়া	কুড়মুন	দ্বিজপদ পাল	৬০/০ বিঘা	৩	৪/০ বিঘা
"	"	পশুপতি পাল	৯০/০ "	৩	৫/০ "
কুড়মুন	"	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০/০ "	৬	×
সড্যা	"	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	৬০/০ "	২	৫/০ "
"	"	গোবর্দ্ধন রায়	৩৬/০ "	২	২/০ "
দেবগ্রাম	"	ননীগোপাল দত্ত	৯৩/০ "	৪	৪/০ "
বনসনা		ভাগবত কুণ্ডু	১৭৫/০ "	৮	৩৫/০ "
"	"	এককড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫/০ "	১	পাঁচ কাঠা
বলগনা	বণ্ডুল	মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়	৬৮/০ "	২	চৌদ্দ কাঠা
চন্দ্রহাটী	রায়না	ভূতনাথ পাল	১০০/০ "	৪	×

গ্রামে গ্রামে কত জমি এবার অনাবাদী পড়িয়া আছে!

জনগণ কংগ্রেস ও কলিকাতায় ঐ

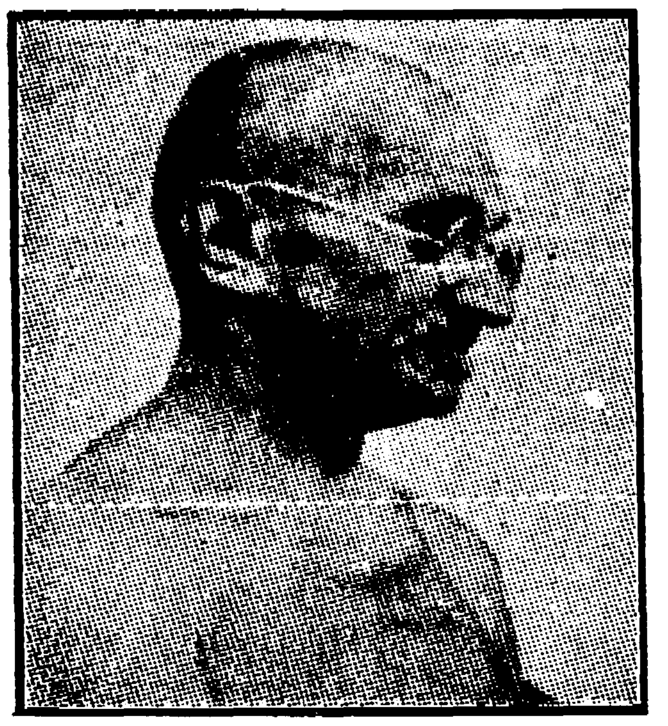

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার, রাজাজীর প্রস্তাব সম্পর্কে জনমতের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মোট চার-পাঁচ কলামের বেশী হইবে না। জনসাধারণ যে সত্যসত্যই কংগ্রেস-লীগের ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সর্ব্বত্র জনসভা করিতেছে—এ সংবাদ দৈনিক কাগজগুলিতে মোটেই স্থান পায় না।

কাশীপুরে

গত ১লা এবং ২রা সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও হাজরা পার্কে যে দুইটি বিরাট জনসমাবেশ হয় তাহার সংবাদ গত সপ্তাহের 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে। ৩রা সেপ্টেম্বর কাশীপুর ও এণ্টালী এলাকায় জনসভা হয়। জনসভার আয়োজনে আগাইয়া আসেন কংগ্রেস ও লীগ নেতারা। সারাদিন বৃষ্টি হওয়া সত্বেও কাশীপুরে সভা হইল এবং সভাপতিত্ব করিলেন স্থানীয় লীগের সভাপতি মুন্সী মহম্মদ ইসা খাঁ, বক্তৃতা করিলেন, কংগ্রেসনেতা সর্ব্বনারায়ণ সিং, সুবেদার সিং, মুরলীধর শর্ম্মা, লীগনেতা মিঃ মহিউদ্দীন এবং কম্যুনিষ্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রভৃতি। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভিত্তিতে এই ধরণের জনসভা ১৯২০ সালের পরে এই প্রথম। আশা করি আমাদের এই মিলন স্থায়ী হইবে এবং আমরাও স্বাধীনতার পথে আগাইয়া যাইতে পারিব।

এণ্টালীতে

এণ্টালীর জনসভায় সভাপতিত্ব করিলেন স্থানীয় কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত অমিয় দাশগুপ্ত। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন লীগনেতা মহম্মদ সত্তার, কংগ্রেসনেতা উপেন গুপ্ত এবং কম্যুনিষ্ট নেতা সুধীন ধর। কংগ্রেস ও লীগনেতাদের বক্তৃতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল আশার সুর, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ঐক্যের সংকল্প। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ট্রামওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা হইল। শ্রমিক-বক্তারা বলিলেন, জাতীয় ঐক্যের অভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দেশের শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ। তাহাদেরই আজ কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িবার কাজে

ঐক্যপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের আগ্রহ

গত ১৯শে আগষ্ট কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে নববিধান ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের একটি প্রতিনিধিমূলক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ভারতবর্ষের দুই মহান নেতার ঐক্য প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। চেয়ারম্যান ডাঃ বি-সি-ঘোষ মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার নিকট গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে এক সুদীর্ঘ চিঠি দিয়াছেন।

জীবনসংগ্রামে মৃত্যু বাংলা

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

মোল্লারহাট থানার বড়বাড়িয়া অঞ্চল কয়েক মাস পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়। এখন সে স্থানটি ম্যালেরিয়ার আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জুলাই মাসে বড়বাড়িয়া গ্রামের ৪৩টি বাড়ীর তথ্য নিয়া জানা যায় যে গড়ে প্রতি ৫ জনের একটি পরিবারে ৪ জনই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এবং তার মধ্যে একজনের অবস্থা মারাত্মক। পাশের হাড়িয়ারঘোষ গ্রামে একটি বাড়ীতে একদিন অসুস্থ মায়ের নিকট শায়িত দু'বৎসরের একটি শিশুকে শিয়ালে টানিয়া নিয়া গিয়া একখানা পা চিবাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে। বাড়ীতে ৪।৫ জন লোক ছিল। কিন্তু সবাই ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। উঠিয়া গিয়া সময়মত শিশুটিকে রক্ষা করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

বগুড়া জেলার ফরঙ্গা গাঁয়ের পাটনীপাড়া ও মাছবাড়ী গ্রামের জেলেপাড়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপে নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে।

মৈমনসিং জেলার জামালপুর মহকুমার সেরপুর, নখলা ও নালিতাবাড়ী থানার কয়েকটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। সেরপুর থানার ধলা, পাকুড়িয়া, গাজিরখামার ইউনিয়নে গত ২ মাসে ৫০০ হইতে ৬০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। নেত্রকোনার কাইলাটি ইউনিয়নে ১০হাজারের অধিক লোকের বাস। তার ভিতর প্রায় ৪ হাজার লোকই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার আরিয়ল-বালিগাঁও ইউনিয়নের আরিয়ল গ্রামের শতকরা প্রায় ৪৫ জন লোকই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। স্কুলের ছাত্রদের ভিতর ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা শতকরা ৩৫ জনের কম নয়। স্থানীয় মেয়েদের স্কুলের ১২৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪০ জনই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

কুইনাইনও পাওয়া যায় না

ম্যালেরিয়ার এই প্রচণ্ড আক্রমণকে রোধ করিবার জন্য যে ঔষধপত্রের প্রয়োজন তাহাও আজ পাওয়া যাইতেছে না। মোল্লারহাটের বড়বাড়িয়া

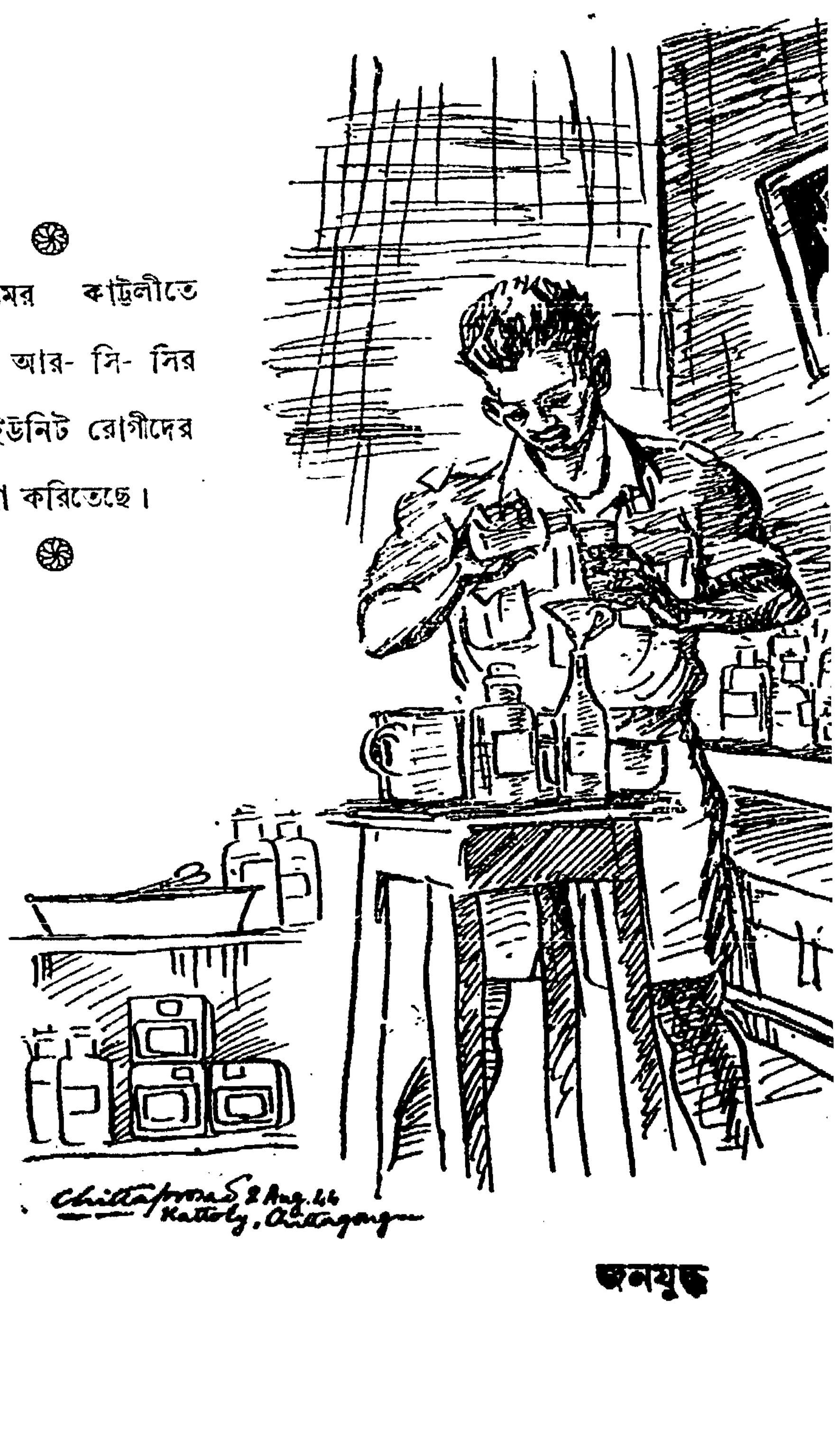

চট্টগ্রামের কাট্টুলীতে বি-এম- আর- সি- সির একটী ইউনিট রোগীদের চিকিৎসা করিতেছে।

লীগের আপোষ চায়
ঐক্য সমাবেশ

সবচেয়ে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। সভায় বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

বিডন স্কোয়ারে

৬ই সেপ্টেম্বর উত্তর কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় সহস্রাধিক জনসমাগম হয়। বক্তারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইলে বাংলার মুসলমান ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বাংলার জন্য দাঁড়াইবে এবং বাংলার জীবনে সত্যি-কারের ঐক্যবোধ জাগ্রত হইবে, জাতীয়তার উন্মেষ হইবে। প্রত্যেকটি সভায় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সাফল্য কামনা করিয়া এবং কংগ্রেসনেতাদের মুক্তি, **বিহারের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ—বাংলার শ্রীযুত**

কলিকাতায় ডাক্তারদের সমর্থন

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করিয়া কলিকাতার ৫০ জন ডাক্তার একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ডাক্তারদের ভিতর ডাঃ এ, সি, উকীল, ডাঃ উমেশ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ জে, সি, ব্যানার্জি, ডাঃ এ, সি, ঘোষ, ডাঃ মধু পালিত, ডাঃ বিমল চাটার্জ্জী, ডাঃ লুৎফর রহমান প্রভৃতির সমর্থন আছে।

সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের মুক্তি দাবী করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়।

কেবল জনসভার মধ্যেই বিপুল সমর্থনের শেষ নয়। এই এক সপ্তাহে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ৪০০ পথ-সভা করা হয় এবং তাহাতে কমপক্ষে ৩০ হাজার লোক কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বাণী খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে। কাশীপুর এলাকায় সভার সাফল্যের জন্য স্থানীয় দোকানদার মহল হইতে ৬৬৲ টাকা সংগৃহীত হয়। এণ্টালী অঞ্চলে শ্রমিক, দোকানদার, পাড়ার মধ্যবিত্তদের মধ্য হইতে ৬৫৷০ টাকা সংগৃহীত হয়। ১২ হাজার ইস্তাহার ঘরে ঘরে ঐক্যের বাণী বহন করিয়া লইয়া যায়। দুই হাজার কপি "আপোসের পথ" তাহাদের মনের সকল সন্দেহের জবাব দেয়।

এই সপ্তাহে ঐক্য-বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ বাবুর দলকে কলিকাতার কোথাও সভাসমিতি করিতে দেখা যায় নাই। জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের আগ্রহ যতই বাড়িতেছে বিরোধী দলগুলি ততই সভাসমিতি না ডাকিয়া কেবলমাত্র সংবাদপত্রগুলির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজেদের কাজ হাসিল করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, ঐক্য-আন্দোলন সংবাদপত্রের অন্ধকার ভেদ করিয়া কলিকাতার নাগরিকের প্রাণে আশার আলো সঞ্চার করিতে শুরু করিয়াছে।

...-মহামারীর বিরুদ্ধে
...জনগণ

অঞ্চলে ৮ মাইলের মধ্যে একটিও সরকারী বা বে-সরকারী চিকিৎসালয় ছিল না। এক একটি কুই-নাইনের বড়ি বার আনা দরে বিক্রয় হয়। ৯ই আগষ্ট হইতে সেখানে একটি রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়। কিন্তু তিন দিন পরই ঔষধের অভাবে ডাক্তাররা ফিরিয়া আসেন।

মৈমনসিংহের সেরপুর রিলিফ কমিটিকে সরকার ১০ পাউণ্ড কুইনাইন দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর দেওয়া হইবে না বলিয়া জানান হইয়াছে। ঢাকা জেলার আরিয়ল গ্রামেও কুইনাইনের বিরাট অভাব। এক একটি বড়ি আট আনা দরে বিক্রয় হয়।

রিলিফের কাজে সাম্প্রদায়িকতার অবসান

এই ত বাংলার গ্রামের অবস্থা! রোগে শোকে বাংলার পল্লীজীবন আজ দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত। এই দুঃসময়ে শ্রীযুত বি, সি, রায়ের নেতৃত্বে **বি,এম, আর,সি,সি,** একতা ও জনসেবার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহাতে চারিদিকে দেশসেবার চেতনা নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। মোল্লারহাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। যে রিলিফ দেওয়া হইতেছিল তাহার ভিতরও ছিল সাম্প্রদায়িকতা। এই অবস্থায় কৃষক সমিতির কর্মীরা জনগণকে রোগের বিরুদ্ধে এক হইবার বাণী শুনাইতে লাগিল। কর্মীদের প্রচার ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে স্থানীয় জননেতারা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিতেছে। ১১ই আগষ্ট শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ মালাকারের বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান নেতারা একত্র হইয়া সম্মিলিত-রিলিফ-কমিটি গঠনের কথা আলোচনা করেন। সেই দিনই তাঁহারা মাইজোরা হাটে সার্কেল অফিসারের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সেদিন ছিল হাটবার। হাটে উপস্থিত জনতা বহুদিন পর হিন্দু-মুসলমান নেতাদের একত্রে দেখিয়া প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করে। ১৩ই আগষ্ট উভয় সম্প্রদায়ের জন-গণের মিলিত সভায় একটি সম্মিলিত-রিলিফ-কমিটি গঠিত হয়। পর দিনই ঐ কমিটি পিপল্স্ রিলিফ কমিটি হইতে প্রাপ্ত সাহায্যাদি অসাম্প্রদায়িক ভাবে বিতরণ করেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে। হাটেবাজারে আবার লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্কুলগৃহ ছেলেদের কলরবে আবার মুখর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু মুসলমান একে অপরের পাড়ায় যাতায়াত ও আলাপ করিতে শুরু করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বিষ ছড়াইয়াছিল—রিলিফের কাজ তাহা দূর করিয়া দিতেছে।

জনগণের দান

চট্টগ্রামেও জনসাধারণ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে গত ৮ই হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত জিলা মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির উদ্যোগে একটি মেডিক্যাল রিলিফ সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। ঐ সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন ও অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ফতেয়াবাদ মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির উদ্যোগে আহূত জনসভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সাহা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। আরও ১১০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সভাস্থলেই ৬৩৯৲ টাকা আদায় হয়। জেলা মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির চেষ্টায় কুইনাইন বিক্রয়ের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কমিটির সহিত আলোচনার পর সিভিল সার্জ্জন জেলার সকল ডাক্তারকেই কুইনাইন ও মেপাক্রিন বিক্রয়ের জন্য দেন। ইহার ফলে ইতিমধ্যেই কুইনাইনের চোরাবাজারের দর ৪০০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকায় নামিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ মহলে নূতন সাড়া

বেরার কিষাণসভার তরফ হইতে একদল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বাংলায় আসেন। ইঁহারা রংপুরের রামচন্দ্রপুরে একমাস কাজ করিয়া ৮৭৬৪জন রোগীকে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতার বিভিন্ন কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া একটি আয়ুর্ব্বেদীয় রিলিফ কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর ফলে গত ৭ই সেপ্টেম্বর মহাবোধি সোসাইটি হলে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতার কবিরাজদের এক সভায় বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এই ভাবেই বাংলার জনগণ আজ মহামারী ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। এই একতা ও এই চেতনাই বাংলাকে রক্ষা করিবে। তবে, এখনও চাই প্রচুর অর্থ ও বহুসংখ্যক ভলাণ্টিয়ার।

প্রথমে মরে সামাজিক জীবন---
---মৃত্যু আসে তারপর

(চিত্ত প্রসাদ)

চাটগাঁ শহর। আর আশেপাশের গ্রাম। কুৎসিত ব্যাধির ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে।

কাউকে ছাড়েনি। একটী ছোট জেলে পাড়া থেকে বি এম আর সি সির ডাক্তারদের কাছে কুৎসিত যৌন ব্যধিগ্রস্ত এসেছে—পাড়ার শতকরা ত্রিশ জন! আমার সামনে এক মুখ ঘা নিয়ে লজ্জা-বেদনায় চোখ নত করে দাঁড়িয়েছিল বছর বাইশের একটী মুসলমান বৌ। কি করবে বল? স্বামী শয্যাশায়ী, সন্তানটীও নেহাৎ ছেলেমানুষ—কুলি খাটতে রাস্তায় নামতে হয়েছিল। সেখান থেকে জীবনের রাস্তায় নামতে হ'ল আরও নীচে!

বছর বারোর একটী ছোট মেয়ে, বেচারীর জিভ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে, সারা শরীর জড় হয়ে গেছে, লালা ঝরছে কস বেয়ে। ... উপুড় হয়ে পড়ে আছে আর একটী জেলে-যুবক।...একজন চার ছেলের বাপ চাষীকে দেখলাম—সে জানেনা কি করে তার ঐ অসুখ হ'ল—সরল, অজ্ঞ বিশ্বাসে ভাবছে বোধহয় চায়ের দোকান থেকে ছোঁয়াচ লেগে গেছে। যেখানে মেয়েদের রক্ষা করা হবেনা সেখানে কেউই রক্ষা পাবে না, এ কথা তো কেউ তাকে জানায়নি!

দুর্ভিক্ষের সময় পুরুষ মরেছে অনেক বেশী, কিংবা একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মেয়েরা শেষ পর্য্যন্ত ঘর আঁকড়ে থেকেছে, অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করে বলে টিঁকেছেও বেশী দিন, শেষকালে একেবারে খিচুড়ির সত্রে এসে জুটেছে। তাই তাদের মৃত্যুযাত্রাও হয়েছে দীর্ঘতর।

মাইলের পর মাইল লম্বা মিলিটারির নতুন পথ তৈরী হচ্ছে। প্রত্যেক মাইলের দু পাশের গ্রাম থেকে ঐ সব মেয়েরাই ভেঙ্গে এসেছে কুলি খাটতে—সংখ্যায় হাজার হাজার। বড়রা রোজ পায় বার আনা, আর ছোটরা আট আনা। অথচ আমি যখন গেলাম তখন (জুলাই) ও অঞ্চলে চালের দর এক টাকা সের।

তাই মৃত্যুযাত্রা দীর্ঘতর—প্রথমে মরছে তাদের সামাজিক জীবন, ইজ্জত, নারীত্ব। ছেঁড়া কাপড় বা কাঁথা জড়িয়ে তারা কাজ করে—কিন্তু তার মধ্যেই মাঝে মাঝে দেখা যায় উজ্জ্বল রঙ্গীন শাড়ী—ওদেরই বোন বা বধূ! তারা এখন সিগ্রেট খায়, চায়ের দোকানের আশে পাশে ঘোরে শিকারের সন্ধানে। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা আর যুদ্ধের সস্তা টাকা মিলে জীবনের এই অপমান সৃষ্টি করেছে। যারা এখনো রঙ্গীন শাড়ী পরেনি, তারাও একদিন পরবে। কিংবা হয়তো ছেঁড়া কাঁথার কৌলীন্যও তাদের বাঁচাতে পারবেনা—লালসা আর ক্ষুধার ষড়যন্ত্র থেকে। তারপরে হাসপাতালে। সামাজিক জীবনের অপমৃত্যু তাদের দৈহিক জীবনকেও সংক্ষিপ্ত করে আনবে।

তারা থাকে কুলি ব্যারাকে। এক বছর আগে যারা ছিল চাষীর মেয়ে, ক্ষেতমজুরের বৌ, যারা ছিল সাম্পানের মাঝির মা-বোন, যারা পাটি বুনত, জাল বুনত, ধান ভানত, চিড়ে কুটত, ক্ষেতি করত তরি-তরকারীর—তারাই এসে জমেছে। এক বছর আগে ব্যারাকে ছিল হাজার, এখন পাঁচশো। বাকী পাঁচশো কোথায় গেল কেউ তার খবর দিতে পারে না—কেউ বলে মরে গেছে, কেউ বলে ফিরে গেছে।

এক পাদ্রী সাহেব কন্ট্রাক্টর। তাঁর কৃশ্চান বিধানে এক এক কামরায় দশ, পনের, বিশ জন অবধি—মেয়ে-মরদ, সুস্থ-রোগী সব এক সঙ্গে। কুৎসিত ব্যধিগ্রস্ত বাছতে গেলে প্রায় ব্যারাকই উজাড় হয়ে যাবে। অসুখ হলে মাঝে মাঝে কুইনাইন মিক্শ্চার। বেশী অসুখ হলে—পথে।

গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি, মায়া মমতা—এখনও মাঝে মাঝে গুঞ্জরণ করে। এক মুসলিম জননী বলছিল—'রোজার দিন বাবু, একখানা সাফ কাপড় নেই যে নমাজ পড়তে যাই।' ওদের অনেকে নিজেদের রোজগারের ভাগ দিয়ে কর্মক্ষমতাহীনদের বাঁচিয়ে রাখে।

চাটিগায় সামান্য কয়েকটা 'ওয়ার্ক-হাউস'ও আছে। ব্যারাকের সঙ্গে তফাৎ শুধু এই যে এরা কাজ শেষে ঘরে ফিরে যায়। এখানে ওরা মাছ ধরা জাল বোনে, দর্মা বোনে—পায় মাত্র ছ'ছটাক চাল। নিজের জন্য আর যত সন্তানই থাক শুধু আর ছ'ছটাক। কোথাও দু আনা পয়সা দেয়, কোথাও দেয়না। তবুও নারীত্বের মমতা ওদের এখানে বেঁধে রেখেছে। কুলি খাটতে গেলে ইজ্জত খোয়াতে হবে, তার চেয়ে এই কম রোজগার এও ভাল।

পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে মৃত্যুযাত্রার পথ তারা অতিক্রম করছে। তবুও মাঝে মাঝে জীবনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে। সুহরাবর্দী সাহেব শফরে গেলে আহ্নগরের ধনীরা তাঁকে ভূরিভোজন করান। খবর পেয়ে ছ'সাত মাইল দূরের আমীরাবাদ গ্রামের মেয়ে মাজেদা খাতুন সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ভূখ মিছিল করে মন্ত্রী সন্দর্শনে রওনা হয়। অবশ্য চিরাচরিত স্তোকবাক্য শুনেই ফিরে আসতে হয়।

মৃত্যুর পথকে এরাই একদিন জীবনের দিকে ঘুরিয়ে দেবে।

শ্রমিক জগৎ

মন্ত্রীদের কাছে শ্রমিকদের দাবী

গত ৩১শে আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নের তরফ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ও সুধীন্দ্র প্রামাণিকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বাংলা সরকারের শ্রম-মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে দেখা করিয়া নিম্নলিখিত দাবী পেশ করেন:— (১) ৩০৲ মাগ্‌গী ভাতা, (২) মজুরী বৃদ্ধি (৩) সপ্তাহে ৫।০ সের রেশন (৪) চটকল মজুরদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য তদন্ত কমিটী (৫) মজুর-বিরোধী আইনের প্রত্যাহার (৬) বোম্বাইয়ের মত এখানেও বিরোধ-মীমাংসার আদালতের (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্ট) ব্যবস্থা (৭) প্রত্যেক শিল্পের জন্য এ্যাডজুডিকেশন আদালত।

শ্রম-মন্ত্রী এই সমস্ত দাবীর উপর যে মত প্রকাশ করেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কোন কিছু করিবার দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে চান। মাগ্‌গীভাতা সম্বন্ধে শ্রম-মন্ত্রী বলেন যে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত। **কিন্তু কেন্দ্রীয় সকরারেরই তৈরী গ্রেগরী কমিটীর সুপারিশ** এখনও সাধারণ্যে **প্রকাশিত হয় না কেন?** রেশন বাড়ান ও চটকল মজুরের অবস্থার অনুসন্ধান সম্বন্ধে শ্রম-মন্ত্রী কোনই জবাব দিলেন না। মজুরী বাড়ান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন।

প্রতিনিধি দল চটকল মজুরের দাবী বিচারের জন্য এ্যাডজুডিকেশন বসাইতে বলেন। এ বিষয়েও মন্ত্রীসাহেব কেন্দ্রীয় সরকারের দোহাই দিয়া দায়িত্ব এড়াইয়া যান। উপরন্তু চটকল বন্ধ হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তার সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে তিনি বলেন যে চটকল-মালিকদের সঙ্গে এখনও এ বিষয়ে কোন কথা হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে সরকার সমস্ত বিষয়ে মালিক-দেরই মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

বিভিন্ন কারখানার দাবী দাওয়া লইয়া আদালত বসানর কথা উঠিলে মন্ত্রীসাহেব বলেন যে ইউনিয়নের তরফ হইতে ন্যায্য দাবী তৈরী করিতে পারিলে আরো আদালতের বন্দোবস্ত সরকার করিবেন।

টেক্‌নিক্যাল অর্ডিনান্সের সংশোধনে মজুরদের অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মন্ত্রীসাহেব বলেন যে ইহাও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, প্রাদেশিক সরকার এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিতে পারে না।

মোটের উপর শ্রম-মন্ত্রী বাংলার শ্রমিক সমাজের ভালমন্দর দায়িত্ব হাতে লইয়াও আজ বলিতেছেন যে তাঁর করার কিছুই নাই, যা কিছু করিবার কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন। শ্রম-মন্ত্রীর মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হওয়া লজ্জার কথা। বাংলার মজুরের অবস্থার উন্নতি করা দরকার ইহা যদি তিনি সত্যিই বুঝেন, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই কথা জোরের সঙ্গে উত্থাপন করা তাঁরই কাজ।

লোহা কারখানায় জুলুম

বার্ণপুরের ওয়াগন কোম্পানীতে যে ওয়াগন এখন তৈরী হয় তা আগের চেয়ে কম। সরকার ঠিক করিয়াছে আমেরিকা হইতে ২০ হাজার ওয়াগন অর্ডার দিয়া আনাইবে। এই ওয়াগন কবে আসিবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। কিন্তু **এখানকার মজুররা তাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে গত এক বছর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া কামারশালা, স্প্রীং প্রভৃতি ডিপার্টমেন্টে যথাক্রমে শতকরা ২০০ ভাগ ও ১১৫ ভাগ উৎপাদন বাড়াইয়াছে।** ইউনিয়নের তরফ হইতে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কাছে একটা পরিকল্পনা মারফৎ দাখিল করে। তাহারা দেখাইল, পূর্ব্বের মত দৈনিক ৮টী ওয়াগন তো তৈরী হইতেই পারে, এমন কি চেষ্টা করিলে আরো ৯টী বেশী হয়।

এই পরিকল্পনা পাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রতিনিধি কারখানা পরিদর্শন করেন এবং রোজ ৭টী ওয়াগন তৈরী করার নির্দ্দেশ দেন। ইহা বার্ণপুরের মজুরেরই জয়।

অথচ, দক্ষ রিভেটর ও ইউনিয়ন কর্ম্মী 'বেচু'কে বিনা কারণে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মজুরী, রেশন প্রভৃতি ব্যাপারেও গোলমাল চলিতেছে। মিস্ত্রীদের উপযুক্ত মাহিনা দেওয়া হয় না।

বার্ণপুর সহরে ইউনিয়নের কর্মীদের প্রবেশ নিষেধ করা হইয়াছে। জনসভার অনুমতি পাওয়া যায় না। ইউনিয়নের কর্মী হইলেই কারিগরদের ছাটাই করা হয়।

শ্রীরামপুরে মজুরদের জয়

গত মে মাস হইতে অস্বাভাবিক অল্প বেতন পাওয়ার জন্য শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ধাঙর ও মেথরদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। মজুরদের তরফ হইতে দরখাস্ত দেওয়া সত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করেন না। তখন মজুর ইউনিয়ন সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে তাহাদের দাবী উত্থাপন করে ও সমর্থনের জন্য আবেদন জানায়। জন-সাধারণের সমর্থনের ফলে মজুরদের দাবী কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইয়াছে।

বি-এন রেলের মজুরদের দাবী

গত ২২শে আগষ্ট বি-এন-রেলওয়ে মজুরদের তরফ হইতে গ্রেগরী কমিটীর রায় কাজে পরিণত করার জন্য প্রথম দরখাস্ত এজেন্ট, জেনারেল ম্যানেজার ও রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারীর কাছে পেশ করা হয়। এই দরখাস্তে ৯০০০ স্বাক্ষর দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্তে দাবী করা হইয়াছে যে, মাগগীভাতা বাড়াইতে হইবে, জোনাল প্রথা ও মাগগী ভাতার তারতম্য দূর করিয়া সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্রুকবণ্ড কারখানার শ্রমিক সম্মেলন

খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরী হলে ১৭ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টায় ২য় বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। সভাপতি **সোমনাথ লাহিড়ী**

ছাত্র আন্দোলন

চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র-সম্মেলন

গত ২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট কত্তুরখিল হাইস্কুল প্রাঙ্গনে **চট্টগ্রামের জেলা ছাত্রসম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৩৩টী হাইস্কুলের ১৭৫০ জন সভ্যের পক্ষ হইতে ২০০ ছাত্রছাত্রীর এতবড় প্রতি-নিধি সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। অধিবেশন উপলক্ষে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ ছাত্র, শিক্ষক ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস-লীগ একতার সংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত দৃঢ় সঙ্কল্প এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট ছিল। ফতেয়াবাদের শিক্ষক শ্রীযুত রুক্মিণীকান্ত দাস ৫০ জন ছাত্রকে নিজে পরি-চালনা করিয়া এই সম্মেলনে নিয়া আসেন। গান্ধী-জিন্না মিলনের সম্ভাবনায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যক্ষসহ জেলার বিভিন্ন হাইস্কুলের ১৭ জন প্রধান শিক্ষক এক যুক্ত-আবেদনে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বাংলার ছাত্রনেতা অন্নদা ভট্টাচার্য্য ও উদ্বোধন করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কত্তুরখিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—দেশের স্বাধীনতার জন্য চট্টগ্রামের শিক্ষকরা যে কোন সর্ত্তে কংগ্রেস-লীগ মিলন সমর্থন করিবে। সম্মেলনের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেস-লীগ মিলনকে অবশ্য-ম্ভাবী করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

ছাত্রদের নিকট গান্ধীজির নির্দ্দেশ

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন কর

সম্প্রতি একজন ছাত্র গান্ধীজির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। "বোম্বে ক্রনিকেল" হইতে উদ্ধৃত কয়েকটা দফা দেওয়া হইল:

ছাত্রদের ঐক্য চাইঃ "সদভিপ্রায় প্রণোদিত মতান্তর থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের অভিমত ও মতবাদ থাকা সত্বেও একটা সাধারণ আদর্শে ছাত্রদের সম্মিলিত হওয়া উচিত। সমস্ত কলহের অবসান করিয়া ছাত্রদের একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে (প্ল্যাটফর্মে) মিলিত হওয়া উচিত।"

বন্দীদের মুক্তি চাইঃ "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে ছাত্ররা আগাইয়া আসিতে পারে।"

রিলিফের কাজ চাইঃ "দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা মোচনের বিশেষ কর্ত্তব্যটি ছাত্রদের সমস্ত সময় ও উদ্যম দিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।"

বোম্বাই ছাত্রদের ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন

৩রা সেপ্টেম্বর বোম্বাইএ একটি ছাত্র সভায় গান্ধীজির নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জাতীয় সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা হিসাবে গান্ধী-জিন্নার আপোষের সাফল্য কামনা করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৯৪ জন ও বিপক্ষে ২৩ জন মাত্র ভোট দেয়।

নিখিল ভারত কিসাণ দিবস

নিখিল ভারত কৃষক সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১লা সেপ্টেম্বর বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে কিষাণ দিবস পালিত হইয়াছে। **সিউড়ীতে** এই দিবস পালন উপলক্ষে সমগ্র সহরে স্কোয়াড দ্বারা প্রচার চালান হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ শরৎ চন্দ্র মুখার্জী কৃষক সভাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন— কৃষক সভার রাজনীতি দেশপ্রেমিক রাজনীতি। লীগ-সভাপতি কৃষক দিবসের সাফল্য কামনা করেন। হিন্দুসভার সভাপতি ডাঃ কালীগতি ব্যানার্জ্জী এক টাকা চাঁদা দিয়া অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানান। সিউড়ীর মত স্থানে ২০০ লোকের এক সভা ইতি-পূর্ব্বে খুবই কম দেখা গিয়াছে। **নোয়াখালী** জেলা কৃষকসমিতির অফিসে কৃষক দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন কৃষক-নেতা কমরেড ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়চৌধুরী। লক্ষ্মীগঞ্জের অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন স্থানীয় নেতা মহম্মদ আনছরউদ্দীন। **ময়মনসিংহের** নালিতাবাড়ী এলাকায় ৮টী কেন্দ্রে প্রত্যেকটি অফিসে ও ১০০ কর্ম্মীর বাড়ীতে রক্ত-পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২০টী স্কোয়াড সারা-দিন প্রচার করে এবং ২০টী বৈঠক-সভা হয়। কেও-য়াটখালী স্কুলগৃহে মসজিদের ইমাম সাহেবের সভা-পতিত্বে বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের এক সভায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্যে "মোনাজাত" করা হয়। **দিনাজপুর সহরে** ৫০০ লোকের এক সভায় কৃষক-দিবস পালিত হয়। এই সভার অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের সাফল্য কামনা করা হয়। **রংপুর জেলায়** সিন্দুরমতি গ্রামে এক উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া কৃষক দিবস পালিত হয়। গ্রামের ৭৫ জন মেয়ে পুরুষ ইহাতে যোগ দেয়। **চট্টগ্রাম জেলায়** সর্ব্বত্র সভাসমিতি করা হয়। সহরের লালদিঘির পাড়ে ৫০০ লোকের এক সভা হয়। সভায় লীগনেতা নূরুন্নেছা চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

সংবাদ সংগ্রহ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ

মহামারীর কবলে সারা ভারত

পাঞ্জাবঃ গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আড়াই মাসে কলেরায় ১,৬২৩ জন আক্রান্ত ও ৭৮৯ জন মারা গিয়াছে বলিয়া পাবলিক হেলথ ডিরেক্টর জানাইয়াছে। লাহোর, অমৃতসর, রঘুনাথগড়, জলন্ধর, ওয়াজিরা-বাদ, শিকার, হিসার, রোহ্‌টাক, গুজরাণওয়ালা ও রাওয়ালপিণ্ডি জিলা ও সহরে মহামারীর প্রকোপ বাড়িয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশঃ গত ২১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই এক সপ্তাহে কলেরায় ৩,৪৫৪ জন আক্রান্ত ও ১,৫৪৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ১৭ই জুলাই হইতে ২১শে আগষ্টের মধ্যে কলেরায় ৮,৬০০ জন আক্রান্ত ও ৩,২০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট দপ্তর খবর দিতেছে।

বিহারঃ কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে মহামারীর প্রতি-রোধ কল্পে পাটনায় এক সম্মেলন হইয়াছিল। এই সভাতেই কো-অর্ডিনেটিং রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। বিহার কংগ্রেসের অন্যতম নেতা অনুগ্রহ নারায়ণ সিং এই কমিটির সম্পাদক হিসাবে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে একমাত্র দারভাঙ্গা জিলাতেই **দুই লক্ষ লোক** মারাত্মক রকমের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কালাজ্বর ও পেটের অসুখে বহু লোক ভুগিতেছে।

বিহারের কংগ্রেস বন্দীরা ঐক্য প্রস্তাব সমর্থন করেন

পাটনা (বিহার)ঃ বিহার প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারী ও এ, আই, সি, সি'র সভ্য সত্য নারায়ণ সিং জেল হইতে মুক্তি প্রাপ্তির পর বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে হাজারি বাগের সমস্ত কংগ্রেস বন্দীরা গান্ধীজির নেতৃত্বে আস্থা আছে ও তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করে।

গবর্ণমেণ্টের হিসাবেই গত ৭ মাসে বিহারে কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৮ হাজার এবং অন্যান্য ব্যাধিতে মরিয়াছে ২,২৮০০০।

বিহার গবর্ণমেণ্ট এক প্রেসনোটে মহামারীর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য কোন কমিটি বর্ত্তমানে নিয়োগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। সমস্ত রিলিফ-সংগঠনগুলি যাহারা মহামারী এলাকায় কাজ করিতেছে তাহাদের উপদেশ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক স্পেশাল কমিশনার নিয়োগ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিহারের অন্যতম কংগ্রেসী নেতা সত্যনারায়ণ সিংকে গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের খবরে প্রকাশ তাহার নিজ জিলা দারভাঙ্গায় মহামারীর প্রকোপ অত্যন্ত বাড়ায় রিলিফের কাজের জন্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শুধু বিহারের জনসাধারণ নয় সারা ভারতের জনগণ বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা রাজেন্দ্র বাবুর মুক্তি মহামারীর প্রকোপ হইতে দেশবাসীকে বাচাইবার জন্যই চাহিতেছে।

ইন্দোর প্রজামণ্ডলের জিত

ইন্দোর প্রজামণ্ডল ব্যবস্থাপক সভায় ২৫টি আসন অধিকার করিয়াছে। মাত্র ৭টি আসনে অন্যান্যেরা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইন্দোর প্রজা-মণ্ডল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিভূ। গত ১৯৪২এর আগষ্ট হইতে ইহা বেআইনী বলিয়া গণ্য এবং সভা, শোভাযাত্রা ও সংবাদপত্রে প্রচার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত আছে।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : **বঙ্কিম মুখার্জি**, এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

এই সপ্তাহের যুদ্ধ

পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে লালফৌজ

হিটলার জার্ম্মাণীর মেয়াদ আর বেশীদিন নাই। যে সাঁড়াশী আক্রমণকে তাহারা যমের মত ভয় করিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে একযোগে সেই প্রচণ্ড সাঁড়াশী আক্রমণ নরিয়া জাঁতার কলের মধ্যে হিটলারী দুঃশাসনকে পিষিয়া মারার ব্যবস্থা প্রতিদিনই আগাইয়া চলিতেছে। হিটলারের মুখে আর রা নাই; থাকিয়া থাকিয়া প্রচারবাগীশ গোয়েবেল্স্ শুধু মরিয়া সুরে কাঁদুনি গাহিতেছে। যে দেশবাসীকে এতদিন সে বার বার জগৎ-জয়ের প্রলোভন দেখাইতেছিল, সেই দেশবাসীরই কাছে আজ আর্ত্তকণ্ঠে জানাইতেছে যে 'গেরিলা' যুদ্ধ করিয়া পিতৃভূমিকে বাঁচাইতে না পারিলে উপায় নাই।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা পশ্চিম ইয়োরোপের চেয়ে পূর্ব্বেই অনেক বেশী। লালফৌজকে ঠেকাইয়া রাখাই হইল শত্রুর সব চেয়ে জরুরী কাজ। কিন্তু কিছুতেই আর খাস জার্ম্মাণীর ভিতর লালফৌজের প্রবেশকে শত্রু আট্কাইতে পারিল না। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থানে লালফৌজ ঢুকিয়াছে, বহু শত্রুকে পাকড়াও করিয়া আনিয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েটকে জানাইয়াছে যে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে যে সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্য আছে, তাহারা সরিয়া যাইবে। ঐ দিনের মধ্যে তাহারা দূর না হইলে লালফৌজ যাইয়া শত্রুর গলা টিপিয়া খেদাইয়া দিবে কিম্বা আটক করিয়া রাখিবে। ফিনলাণ্ড এতদিন হিটলারের তাঁবেদারী করিয়া আজ ঠেকিয়া শিখিতেছে।

বিয়ালিষ্টক হইতে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার দিকে, এবং আগেকার দিনে জার্ম্মাণীর অন্যান্য অঞ্চল ও পূর্ব্ব প্রুশিয়ার মধ্যে যে এককালি জমি পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স-র উত্তর পূর্ব্বে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। আরও দক্ষিণে ক্রাকোভ্ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর দিকেও আক্রমণের আয়োজন চলিতেছে।

কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা পার হইয়া হাঙ্গেরীর দিকে সেনাপতি মালিনোভ্স্কির নেতৃত্বে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণীর শিকল ছিঁড়িয়া রুমানিয়া এখন লালফৌজের সাহায্যে প্রায় সমগ্র দেশকেই শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে। হাঙ্গেরী এখনও হিটলারের পদলেহন বন্ধ করে নাই, তাই লালফৌজ রুমানিয়ার সৈন্যদলকে সঙ্গে লইয়া হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়াছে। রুমানিয়ার কবল হইতে লালফৌজ বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা ফিরাইয়া লইয়াছে; সোভিয়েট মোল্দাভিয়া আবার সোভিয়েট পরিবারে মিলিত হইল।

লালফৌজ দক্ষিণ রুমানিয়া দিয়া যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। মার্শাল তিতোর বীরবাহিনীর সঙ্গে শীঘ্রই তাহার পুরাপুরি সংযোগ ঘটিবে। ক্রোয়াট্ সৈন্য ফ্যাশিষ্ট অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সার্ব্বরাও হাত মিলাইয়াছে। কৃষ্ণসাগরে জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর আর অস্তিত্ব নাই; গ্রীসে যেসব জার্ম্মাণ রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন। গ্রীস দেশভক্তের দল তুর্কীর সীমান্তের কাছাকাছি পর্য্যন্ত সুসংগঠিত হইয়া আছে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গণে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও হিটলারীরা আজ কিছুতেই পার পাইতেছে না। লালফৌজের আঘাতে তাহারা আজ সত্যই মুহ্যমান।

পশ্চিমে হিটলারী ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িল

পশ্চিম ইয়োরোপে একেবারে অভেদ্য দুর্গ করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া সেদিন পর্য্যন্ত হিটলারীরা কতই না দেমাক দেখাইয়াছিল। কিন্তু বানের মুখে মাটীর ঘরের মত শত্রুর আত্মরক্ষার কেন্দ্রগুলি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। লালফৌজ যেমন পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় ঢুকিয়া নাৎসি-পিতৃভূমির মহিমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তেমনই আমেরিকান তৃতীয় বাহিনী জারব্রুকেনের কাছে লড়িতেছে, আসল জার্ম্মানীতে তাহার কয়েকটা দল প্রবেশও করিয়াছে। অছিলা খুঁজিয়া বাহির করার জন্য মাথা ঘামাইয়া ঘামাইয়া গোয়েবেল্সের এদিকে প্রাণান্ত! প্রকাণ্ড হাওয়াজাহাজে চড়িয়া জাপানে পলাইবার মতলব নাকি তাই হিটলারী সর্দ্দার পাণ্ডাদের মগজে ঢুকিয়াছে।

ফ্রান্সে, বেলজিয়মে শত্রু নাজেহাল

দক্ষিণ ফ্রান্সে ফরাসী দেশভক্তেরা মিত্র শক্তির সহায়তায় শত্রুকে নির্ম্মূল করিতেছে। আল্পসের গিরিবর্ত্ম দিয়া তাহারা ইতালীতে প্রবেশ করিয়াছে। ভূমধ্যসাগর কূল ধরিয়া মিত্রবাহিনী উত্তর ইতালীতে জেনোয়া শহরের দিকে আক্রমণ চালাইতেছে। স্পেন সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায় ফরাশী দেশভক্তেরা লড়িতেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০০০ শত্রু বন্দী হইয়াছে।

উত্তরে লড়াই আরও জোরে চলিতেছে। ইংলিশ চ্যানেলের ধারে যে সব বড় বড় বন্দর রহিয়াছে, সেগুলি ছিনাইয়া লইবার লড়াইয়ে শত্রুর অবস্থা কাহিল। বেলজিয়মের প্রকাণ্ড বন্দর ও শহর অ্যাণ্ট্ওয়ার্প, অষ্টেণ্ড্ প্রভৃতি এখন মিত্রপক্ষের হাতে। বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্স্ শহরকে মুক্ত করিয়া মিত্রসেনা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। লিয়েজ, নামুর, শার্লরোয়া প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গা থেকে শত্রু বিতাড়িত। অ্যালবার্ট খাল আর ম্যজ ও মোজেল্ নদীর ধার বাহিয়া শত্রু আত্মরক্ষায় ব্যস্ত; এখানে যেদিন সে হারিবে, সেদিন ঐ অঞ্চল হইতে জার্মানী আক্রমণ সহজ হইয়া যাইবে।

চরম আক্রমণের দিন আসন্ন

পশ্চিম দিক থেকে জার্মানী আক্রমণের তুমুল উদ্যোগ চলিতেছে কয়েকটী জায়গায়। অ্যাণ্ট ওয়ার্প হইতে হলাণ্ড অভিমুখে, নামুর হইতে আখেনের দিকে, জারব্রুকেনের দিকে, বিখ্যাত দুর্গ স্ত্রাস্বুর্গের দিকে, আর সুইটসারলাণ্ডের উত্তরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বেলফোর্ট অভিমুখে, মিত্রবাহিনী আক্রমণের জন্য পা বাড়াইয়া রহিয়াছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে আখেন হইতে মিত্র সেনা মাত্র আট মাইল দূরে রহিয়াছে। এই আখেন্ (বা এক্স-লা-শাপেল্) প্রাচীন জার্মানীর রাজধানী ছিল, সুরক্ষিত এক দুর্গ এখানে আছে। এই অঞ্চলে শত্রুর প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

পশ্চিম হইতে চরম আঘাত দিবার জন্য মিত্র সেনা আজ উদ্যত। ইয়োরোপের সর্বদেশে জনজাগরণের ফলে অদূর ভবিষ্যত শত্রু নিপাত আজ নিশ্চিত! শান্তির ফানুস উড়াইয়া কিম্বা মিত্রশক্তিবৃন্দের মধ্যে কলহ লাগাইয়া যাহারা ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের সহায়তা করার আশা রাখে, শীঘ্রই তাহারা সমুচিত শিক্ষা পাইবে।

—দে দৌড়........

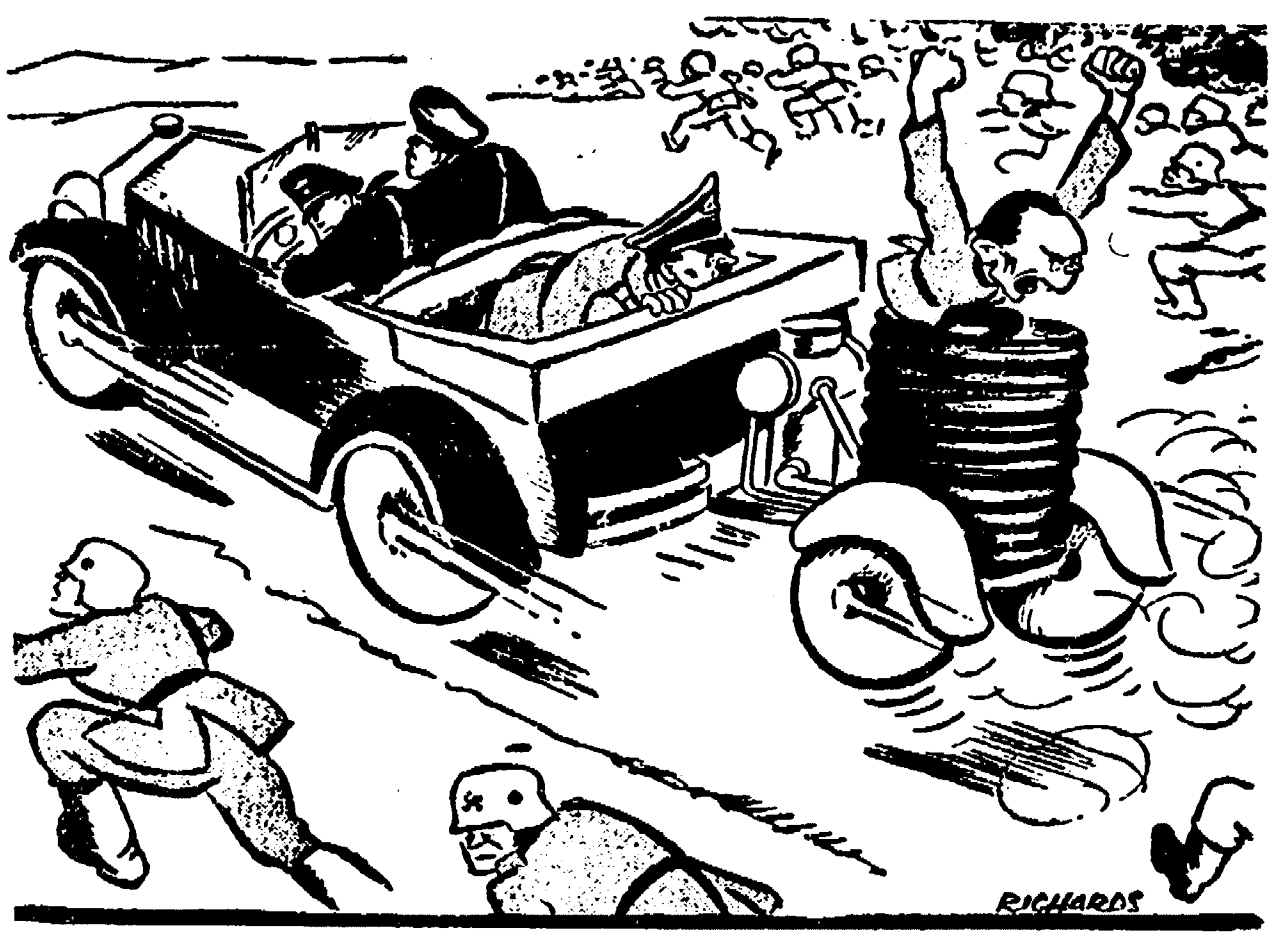

'...........প্রয়েস্তির তৈল নাই বা পেলাম—
আমার বচন-গ্যাস তো আছে........' —গোয়েবল্স

হল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রাম

ডাচ্ কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্য প্রচেষ্টা

নেদারল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা সম্প্রতি হলাণ্ডের জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন, —শত্রুর কাজ পণ্ড করার জন্য সাবতাজ চালাইয়া যাও, মিত্রবাহিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য কর। ইঙ্গিত পাওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত গোপনে কাজ চালাও।

প্রধানমন্ত্রী গারব্র্যাণ্ডি ৬ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিয়াছেন,—হল্যাণ্ডের অবরুদ্ধ অবস্থা খুব অল্প সময়ের জন্যই বহাল থাকিবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে নেদারলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেন—খুব শীঘ্রই রাণীর ১৯৪২ সালের ঘোষণা অনুসারে একটী গোল টেবিল বৈঠকে ডাচ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার প্রশ্ন মীমাংসিত হইবে।

নেদারল্যাণ্ডের দেশভক্তরা যে সব বীরত্বপূর্ণ ষ্ট্রাইক ও সাবতাজ চালাইয়া আসিতেছেন তাহার কাহিনী অপূর্ব। জার্মাণ-শক্তির বিরুদ্ধে দেশসেবী গেরিলাদের সংগ্রাম এত প্রচণ্ড যে এক বৎসর পূর্বে রাইখ (জার্মাণরাষ্ট্র) কমিসার সিস-ইনকোয়ার্টকে হুকুম জারী করিতে হইয়াছিল—ডাচ দেশভক্তদের খাদ্য না দিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।

হল্যাণ্ডের প্রতিরোধ আন্দোলন

হল্যাণ্ডে প্রায় ৪০টী খবরের কাগজ ও অসংখ্য স্থানীয় বুলেটীন বেআইনীভাবে প্রকাশিত হয়। কাগজগুলির প্রচার সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও উপর; এই ক্ষুদ্র দেশে একা কমিউনিষ্ট পার্টি হইতেই ৪টী কাগজ প্রকাশিত হয়ঃ দি ট্রুম, স্পার্ক, সিগন্যাল ও খনির শ্রমিকদের জন্য গ্লুক অব্।

হিটলারী দস্যুদের উৎখাতের জন্য হল্যাণ্ডেও বিভিন্ন দলের প্রতিরোধ আন্দোলন কখনো থামে নাই। এই দেশসেবকদের বিভিন্ন দলকে একত্র করিবার প্রচেষ্টা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলিতে থাকিলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত সমস্যারই গণতান্ত্রিক উপায়ে তাড়াতাড়ি সমাধান হইয়া যায়। দক্ষিণপন্থীদের কয়েকটী "প্রতিরোধ দল" শুধু নামেই, কাজ তাহারা কিছুই করে না।

জাতির মিলিত ফ্রণ্ট চাই

এই সব স্বদেশভক্তদের গোপন সংগ্রামশীল দলগুলির একটী মিলিত ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিবার জন্য হল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টি বহুবার বৃহত্তর ঐক্যের আওয়াজ তুলিয়াছে। আজ হল্যাণ্ডের মুক্তির দিনে তাই কমিউনিষ্ট পার্টি দেশের ভিতর দুর্ভেদ্য ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছেঃ

"জার্ম্মান সৈন্যরা যখন পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিবে তখন তাহাদের ধ্বংসকার্য্যের প্রলয় তাণ্ডব প্রতিরোধ করিবে কে? হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইবে কাহারা? যানবাহনের ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে কে জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহ করিবে? এই ধ্বংসকারী যুদ্ধের জন্য যাহারা অপরাধী তাহাদের কঠোর শাস্তিবিধান করিতে হইবে; আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষের নিকট এই নরহত্যাকারীদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে কে? বেসামরিক অধিবাসীদের মেডিকেল রিলিফের ব্যবস্থা কে করিবে?" দেশভক্তদের নিকট কমিউনিষ্ট পার্টির ইহাই প্রশ্ন। জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় ফ্রণ্ট গঠন করিতে না পারিলে এই সব সমস্যার সমাধান হইবে কি করিয়া? দেশের সম্পদ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা পাইবে কি করিয়া?

ঐক্যের এই আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের দাবানল যাহারা জ্বালাইয়াছে তাহাদের শাস্তির জন্য কয়েকটী বাস্তব প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছে।

হল্যাণ্ড প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলে নাই

চার বৎসর ধরিয়া বাহিরে বসিয়া থাকার ফলে লণ্ডনস্থ নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশের জনগণের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সংযোগ শিথিল হওয়ার কুফল হইতে তাহারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহারা জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি কমই নজর দিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রভাব বেশ বাড়াইয়া তোলা হইতেছে।

এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সত্বেও প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাব সবক্ষেত্রেই ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। জার্মান আক্রমণকারীদের এই চরম সংকট মুহূর্ত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র নেদারল্যাণ্ডের জনসাধারণ ও দেশভক্তদের সম্মিলিত ফ্রণ্ট মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

এই সপ্তাহের নূতন বই

সমাজতন্ত্রবাদ

(কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক)

এঙ্গেল্স্—অনুবাদক রেবতী বর্ম্মণ ৮৵০

পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য ৮৹

ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী

(পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

রামধনু

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা ৩৲

অনুবাদক—সুসাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সোভিয়েট নেতা

ষ্টালিন, মলোটব, ভরোশিলভ্ ও টিমশেঙ্কো ।৴০

MOSCOW NEWS

প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা

International Literature

English Monthly—One rupee per Copy

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

Regd. No. C. 2836

বুলগেরিয়াও নাৎসী-বিরোধী শিবিরে

বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্টনেতা ডিমিট্রভ

"... লালফৌজের দুর্জ্জয় আঘাতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরাট ফাটল ধরিয়াছে। শুধু তাই নয়, সেগুলি একে একে টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়াও পড়িতেছে। হিটলারের বন্ধুভাবাপন্ন রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ফিনিশ এবং বুলগেরিয়ান শাসকবর্গের মনে আজ ভয় ও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড এবং বুলগেরিয়ার পক্ষে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিবার মাত্র একটি পথ খোলা আছে—সে পথ, জার্ম্মানীর সাথে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে অবসর লওয়া। ..."—১৯৪৪ সালের মে-ডেতে ষ্টালিন।

সোভিয়েটের নেতা ষ্টালিনের এই ঘোষণা খুবই স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। কথার ঘোরপ্যাচ এর ভিতর নাই—হিটলারী কুশাসনের জগদ্দল পাথর ঠেলিয়া এই সব রাষ্ট্রগুলি কি ভাবে মুক্তির পথ বাছিয়া নিতে পারে, ষ্টালিনের ঘোষণা সেই পথেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

অত্যাচারিত ইউরোপ আজ ধীরে ধীরে নূতন জন্ম লাভ করিতেছে। নির্ম্মম অত্যাচারী বৈদেশিক প্রভূত্বের বিরুদ্ধে জনগণের এই অভিযানে আজ সম্ভাবনা ও সাফল্যের নব নব স্তর দেখা দিতেছে। মুক্তি ও প্রগতির পথে ইতিহাস আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বুলগেরিয়া নূতন পথে পা বাড়াইয়াছে

লালফৌজ মার্শাল মালিনভস্কী ও জেনারেল টলবুখিনের নেতৃত্বে জার্ম্মানদের 'রুমানীয়' দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। কিছুদিন পরেই রুমানিয়ান সরকার জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—হিটলারের তাঁবেদার কুচক্রী এণ্টনেস্কু রুমানিয়া হইতে পালাইয়া যায়। বহুকাল পরে রুমানীয় জনসাধারণ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে—লালফৌজের হাতে হাত মিলাইয়া সভ্যতার শত্রু নাৎসী-বাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুনে প্রকাশ্য-ভাবেই ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বুলগার সরকার তখন পর্য্যন্ত নামেমাত্র নিরপেক্ষ, কাজে কিন্তু জার্মান সমরযন্ত্রেরই তাঁবেদার। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে তাই বিখ্যাত সোভিয়েট-সংবাদপত্র 'ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কীং ক্লাস' তখনকার বুলগার সরকারের আসল রূপ খুলিয়া ধরে। তখন ইহাতে লেখা হয়—'জার্মানরা বুলগেরিয়াকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবেই ব্যবহার করিতেছে।"

রুমানিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের পতনের পর বুলগার সরকার প্রমাদ গণে। তখন ছলে, বলে, কৌশলে তাহারা প্রমাণ করিতে চায়, লালফৌজের সাথে তাহাদের কোন বিরোধ নাই—সোভিয়েট সরকার তাহাদের বন্ধু। মিত্রশক্তির সাথে যুদ্ধবিরতির চেষ্টাও করিতে থাকে। বুলগার সরকারের এই চেষ্টার সাথে সাথেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। নূতন মন্ত্রীসভা জার্ম্মনীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখায় সোভিয়েট বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সোভিয়েট নেতা মলোটভ খোলাখুলি বলেন—গত ৩ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বুলগার সরকার জার্মানদের সাহায্য করিতেছে। এখনও সে জার্মানীর সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ করে নাই সুতরাং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া সোভিয়েটের কোন উপায় নাই।

সোভিয়েটের যুদ্ধ ঘোষণার পর লালফৌজ বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

লালফৌজের ঘোষণা

লালফৌজের বুলগেরিয়ায় প্রবেশের সাথে সাথে জেনারেল টলবুখিন সোভিয়েটের তরফ থেকে বুলগার জনসাধারণের নিকট রেডিও যোগে যে ঘোষণা প্রচার করেন তাহাতে সোভিয়েটের মনোভাব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে। লালফৌজের ঘোষণায় আছে, তাহারা বুলগেরীয় সৈন্য বা জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে না। লালফৌজের একমাত্র কাজ জার্ম্মানদের উৎখাত করা। সুতরাং বুলগার সরকারের কর্ত্তব্য হইতেছে অবিলম্বে জার্ম্মানদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া মিত্রশক্তির সাথে যোগ দেওয়া।

ইহার পর তড়িৎবেগে ঘটনার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ৯ই সেপ্টেম্বর সোফিয়া রেডিওতে ঘোষণা করা হয়, মিঃ কিমন জর্জ্জি-য়েভের নেতৃত্বে এক নূতন বুলগার মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা আদেশ দিয়াছে যে সোভিয়েট সেনার বিরুদ্ধে যেন কোন কিছু না করা হয়। শুধু তাই নয়—জার্ম্মানীর সাথে বুলগার সরকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

ঐ দিন রাত্রেই সোভিয়েট সরকারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে "বুলগেরিয়ান গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধ বিরতির প্রার্থনা করায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আজ বেলা ১০টার সময় বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছে।..."

নূতন বুলগার সরকারের সিদ্ধান্ত

ক্ষমতা হাতে লইয়াই নূতন মন্ত্রীসভা রিজেণ্ট প্রিন্স সিরিল ও মিশকুকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে "অদ্য (৯ই সেপ্টেম্বর) হইতে দেশের শাসন ব্যবস্থানুযায়ী রাজনৈতিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জনগণের বিরুদ্ধে যে সব আইন ও আদেশ বলবৎ ছিল তাহা বাতিল করা হইবে।"

বুলগেরিয়ার পূর্ব্ব ইতিহাস

১৯৩৯ সালে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন বুলগেরিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে চায়। কিন্তু নাৎসীরা তখন দেশের পর দেশ জয় করিয়া প্রায় সমগ্র ইয়োরোপই দখল করে। বুলগেরিয়া হিটলারের হাত হইতে রেহাই পাইবার আশায় নাৎসী তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহারই কিছু আগে সোভিয়েট সরকার বুলগেরিয়ার সাথে একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজা বরিস জনগণের উপর সোভিয়েটের প্রাধান্য বাড়িবে এই ভয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

বুলগার জনগণের নাৎসী বিরোধিতা

বুলগেরিয়ার মজুর শ্রেণী নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রাণ-শক্তি। রেল মজুবরা ভার নেয় সমগ্র দেশ-ব্যাপী বে-আইনী ইস্তাহার তাহারা ছড়াইবে। সহরে সহরে 'ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' শার্খা আছে। গত মহাযুদ্ধের কিছু পর হইতে বুলগেরিয়ার এই মজুর সংহতি গড়িয়া ওঠে এবং বিশ্ববিখ্যাত কমিউনিষ্ট-নেতা ডিমিট্রভ এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের শাসকবর্গের দারুণ নিপীড়নের মধ্য দিয়া এ সংগঠন দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যখনই সংগ্রামে জনগণ আগাইয়া গিয়াছে, এই মজুর সংগঠনই তখন তাহাদের নেতৃত্ব নিয়াছে। তাই হিটলারের অগণিত বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যখন বুলগার অধিবাসীরা নিজেদের সব কিছু ঢালিয়া দেয়, তখন সেই লড়াইয়ের পুরো-ভাগে দাঁড়াইয়া বুলগেরিয়ার মজুর শ্রেণী কত না নির্যাতন সহ্য করিয়া নিজেদের প্রতিরোধের পতাকা উঁচু করিয়া রাখিয়াছে।

বুলগেরিয়ায় কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবেই জার্ম্মানদের কাছে শস্য বেচিতে অস্বীকার করে। তাহাদের বলিষ্ঠ মনোভাবের তখন-কার প্রতিচ্ছবি একজন কৃষকের কথায়ই বেশ ভাল ভাবে ফুটিয়া ওঠে—"আমরা আমাদের শস্য পুড়িয়ে ফেলব, না খেয়ে মরব, তবুও জার্ম্মান দস্যুদের এক দানাও দেবো না।"

ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলন এমন ভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল যে একমাত্র সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই ৭০০ ছেলে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়।

বুলগার জনসাধারণের এই নাৎসী বিরোধীতা তাই আজ দেশের জাতীয় জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। নাৎসীবাদ ও সিরিলের প্রভূত্বের ধ্বংস-স্তূপের উপর আজ বুলগেরিয়ার জনগণের জয়ধ্বজা উড়িতেছে। হিটলারের পায়ের নীচের বিশাল বলকানের মাটি আজ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। নাৎসীদস্যুর কবল থেকে রুমানিয়া আজ নিজকে মুক্ত করিয়াছে। বুলগেরিয়ার জনসাধারণও হৃত স্বদেশ ছিনাইয়া নিবার সংকল্পে বলীয়ান হইয়া তাহাদের বলদৃপ্ত হাত বাড়াইয়াছে। হিটলারের তাঁবেদার ক্লীবের দল আজ পলায়মান—দেশের মুক্তি-কামী জনগণ ঘৃণার আগুনে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেছে। ইতিহাসের সেই শুভ মুহূর্ত্ত আজ উপস্থিত। দেশের পর দেশ আজ হিটলারী শৃঙ্খলের বাঁধন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, গোটা ইউরোপের জনগণ আজ নাৎসীবাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে—সমগ্র দুনিয়া আজ তাই স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত।

জনযুদ্ধের বিশেষ সংখ্যা

"জনযুদ্ধের" আগামী সংখ্যা ২০শে সেপ্টেম্বরের পরিবর্ত্তে **২২শে সেপ্টেম্বর** বাহির হইবে। এই সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠার **বিশেষ সংখ্যা** হইবে। দাম হইবে দুই আনা।

এজেণ্টরা এই হিসাবে কাগজ ডেলিভারী লইবেন। এই সংখ্যা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কে কত কপি বেশী লইবেন তাহা জানাইবেন। নতুবা বেশী কাগজ দেওয়া সম্ভব হইবে না। তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যা ৪ঠা অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

ওয়ার্সয় সাহায্য দেওয়া হয় নাই কেন

প্যারাসুট-নিক্ষিপ্ত সাহায্য জার্ম্মানদের হাতেই পড়ে

লণ্ডনে যে পলাতক পোলিশ সরকার আশ্রয় লইয়া থাকিয়া নানাভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই ভণ্ডের দল আজ পোলাণ্ডের মুক্তির নামে মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিতেছে যে সোভিয়েটের গাফি-লতির দরুণ ওয়ার্স-তে যে জন-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হইয়া গেল। তাহারা আজ ওয়ার্স সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করিতেছে এবং বৃটেনস্থিত অনেক ভূতপূর্ব্ব ফ্যাশিষ্ট-বন্ধু কাগজ তাহাই ফলাও করিয়া ছাপাইতেছে অথচ সেখানকার অভ্যুত্থান আরম্ভ করার পূর্বে সোভিয়েটকে কিম্বা অন্য কোন মিত্রশক্তিকে ঘুণাক্ষরে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। প্রথম হইতেই ইহার অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী ছিল; পরাজয় অব্যর্থ জানিয়াও এ অভ্যুত্থান ঘটাইল কাহারা?

অভ্যুত্থান সম্পর্কে হুকুম আসিয়াছিল সোভি-য়েটের পরম শত্রু, ইহুদীবিরোধী সেনাপতি সস্-নোভস্কির কাছ থেকে। এই সেনাপতিপ্রবর এখনও লণ্ডনের পলাতক পোলিশ সরকারের এক-জন পাণ্ডা, ঐ সরকারের সৈন্যবাহিনীর নায়ক। এক বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটাই সোভিয়েটের কুৎসায় শতমুখ হইয়াছিল; লালফৌজ হাজার পোলিশ যোদ্ধাকে মারিয়া কবর দিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছিল। এবার তাহার মতলব ছিল নূতন করিয়া সোভিয়েট বিদ্বেষের বিষ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া, আর সোভিয়েটের সঙ্গে মিটমাট লইয়া তাহারই দলের প্রধান মন্ত্রী মিকো-লাইকৃজিকের প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দেওয়া।

সস্নোভস্কির মতলব যে একেবারে হাঁসিল হয় নাই তাহা নয়।

ফ্যাশিষ্টদের পুরাণো বন্ধু হিসাবে বিলাতে যে সব কাগজ ছিল, তাহাদের মধ্যে "অবজারভার" ও "ডেলি টেলিগ্রাফ" সোভিয়েটকে নিন্দা করার সুযোগ পাইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল। সোভিয়েট কেন ওয়ার্স-র দুঃসাহসী দেশভক্তদের সাহায্য করিল না বলিয়া তাহারা হৈ চৈ করিল। এমন কি লেবর পার্টির কাগজ "ডেলি হেরাল্ড" আর প্রগতিবাদী বলিয়া পরিচিত সাংবাদিক ভার্ণন বার্টলেট সেই ধুয়া তুলিয়া প্রচার করিলেন যে ওয়ার্সতে সাহায্য পাঠাইতে সোভিয়েট ব্রিটিশ ও মার্কিনদের বাধা দিয়াছে; সোভিয়েটভূমিতে তাহাদের বিমানঘাঁটি বানাইতে দেয় নাই।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগ একেবারে মিথ্যা। বার্টলেটের টিপ্পনী সম্বন্ধে "ডেলি ওয়ার্কার" জানাইয়াছে যে সরকারী ওয়াকিবহাল মহলে প্রকাশ যে ব্রিটিশ পক্ষ হইতে বিমানঘাঁটি ব্যবহারের জন্য কোন অনুরোধ সোভি-য়েটকে করা হয় নাই।

সোভিয়েটের সহায়তা লইয়া পোলাণ্ডের যে মুক্তিসংসদ কাজ করিতেছে, তাহার সৈন্যবাহিনীর নায়ক রোলা-জিমিয়েস্কি এ বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়া-ছেন, তাহা অধিকাংশ সংবাদপত্রে ভাল করিয়া প্রকাশ হইতে দেওয়া হয় নাই। "হিন্দুর" সংবাদ-দাতাই একথা জানাইতেছেন।

সেনাপতি জিমিয়েস্কির বিবৃতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তিনি বলিয়াছেন যে অসময়ে অভ্যুত্থান আরম্ভ করার ফলে দেখা গিয়াছে যে ওয়ার্স শহরে যাহা কিছু প্যারাশুটে করিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা জার্ম্মানদের হাতেই পড়িয়াছে। বিদ্রোহীদের দখলে মাত্র কয়েকটী আলাদা আলাদা বাড়ী রহিয়াছে। জার্ম্মানদের দখল আরও যখন কঠোর ছিল, তখনই ওয়ার্স-র শহরতলীতে যে সব জায়গায় ব্রিটিশেরা সরবরাহ পাঠাইতে পারিয়াছিল, সেই সব জায়গা সম্বন্ধে খবর চাওয়া সত্ত্বেও যাহারা অভ্যুত্থান পরি-চালনা করিতেছে, তাহারা কোনও খবর পাঠায় নাই।

ইহাই হইল ওয়ার্স-র কাহিনী। প্রচ্ছন্ন ফ্যাশিষ্ট সস্নোভস্কি হঠাৎ মিত্রপক্ষের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করিয়া অভ্যুত্থানের হুকুম দেয়। চক্রান্ত করিয়া এই দুর্বৃত্ত ওয়ার্স শহরে দুই লক্ষ নিঃসহায় পোলিশ দেশভক্তের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

বিশেষ সংখ্যা

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা] ২২শে সেপ্টেম্বর, '৪৪, শুক্রবার, ৬ই আশ্বিন '৫১ [দাম দুই আনা

এই আশ্বিনে

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল ;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
শোকাচ্ছন্ন প'ড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখ।

রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে—
বন্দরে বাজায় ডঙ্কা,
চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে ;
চোখে তার অমূর্বর
অন্ধকার ঢাকা।
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।

উপবাস-রুক্ষ হাড়ে
শিহরিত বজ্র কান পাতে।
উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ কাঁপে ;
রুষ্ট রুক্ষ মেঘে কাঁপে
কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ।

পৃথিবী প্রস্তুত।
দিকে দিকে জয়োদ্ধত
জীবনের উদ্দাম ঘোষণা।
দুহাতে ছড়ায় স্বর্ণ
প্রাচুর্যের মুঠো মুঠো সোনা।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখী
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে পাখা মেলে।

অবরুদ্ধ তরুশাখা
চঞ্চল হাওয়ায় মাথা কোটে,
দুরন্ত মনের ইচ্ছা
আরক্তিম ফুল হ'য়ে ফোটে।

মরা গাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার !
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

আগত দিনের স্বপ্ন
স্বর্ণের ললাটে।
আদিগন্ত চষে' ফেলা মাঠে
আগন্তুক অঙ্কুরিত পদচিহ্ন আঁকে,
অরণ্যের ডালে ডালে
বাহুবন্ধে বেঁধে দেয় পর্ণচূড় রাখী।
আলাপে মুখর হয় পাখী।

পরাক্রান্ত শত্রু আছে,
মুখোসের অন্তরালে শানায় সে নখ,
জীবনযাত্রার পথে হানে সে কন্টক।
পায়ে তার মৃত্যু বাঁধা,
লোভ তার বাঁধানো সড়ক।

ক্ষমা নেই—
পথ আজো কঙ্কালবন্ধুর।
ক্ষমা নেই—
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছো
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
কাঁধে-কাঁধ সান্নিধ্যে দাঁড়াও,
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও :
শৃংখলের কলঙ্কমোচন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুনীল জানা

সম্পাদকীয়

ঈদ ও পূজার মন্ত্র

পূজা ও ঈদের মাস হিন্দু-মুসলমানের বাংলায় উৎসবের মাস। মাঠে মাঠে বাড়ন্ত ধানগাছগুলিতে সতেজ জীবনের উৎসব, আর তাহারই শীর্ষে শীর্ষে বাঙ্গালীরও জীবনের আশ্বাস। তাই বাঙ্গালী আনন্দ করে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির দুই প্রাচীন স্মৃতিধারা তাহাদের জীবনধারার সঙ্গে মিলিত হয়। নিমন্ত্রণের অমায়িকতা ও নববস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা তাহাদের মনকে আরও শুভ্রতা দেয়। ঈদের মুবারকবাদ আর বিজয়ার আলিঙ্গনে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও প্রীতি ও ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

আজ সেদিন নাই। উৎসবের বাঁশী আনন্দে বাজিতে গিয়াও অতীত বৎসরের লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর বেদনায় সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়। পর্বের শোভাযাত্রা পথের মধ্যে মহামারীর শবযাত্রা দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। মাঠে মাঠে জীবিত কঙ্কালেরা ফসলের পরিচর্যায় শীর্ণ হস্ত বৃথাই প্রসারিত করে।

পূজা ও ঈদের কাপড় নাই, জুতা নাই, মাছ নাই, মিষ্টান্ন নাই। উৎসবের আলোক স্তিমিত, আতস বাজির বর্ণচ্ছটা নিষ্প্রভ। সমস্ত বায়ুমণ্ডলই যেন অভাবের বেদনায় ভারাক্রান্ত।

কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর মন মরে নাই। মৃত্যুর অন্ধকার পথের মধ্যেও সে জীবনের নূতন মন্ত্র শুনিয়াছে, সেই মন্ত্র দিয়াই সে আবার জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিবে।

সে মন্ত্র পূজা ও ঈদের মিলনের মন্ত্র, প্রীতি ও ভালবাসার মঙ্গল গান। পূজা ও ঈদ বাঙ্গালীর মনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে সুর আনিয়া দিল, আজ ভারতের আর এক প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান দুটী মানুষের আন্তরিক আলোচনায়ও সেই সুরই বাজিয়া উঠিতেছে।

মাঠের ফসলের মতই বাঙ্গালী আজ উহারই মধ্যে জীবনের আশ্বাসের মহাস্তোত্র শুনিতেছে। সে বাঙ্গালীর মৃত্যু নাই।

আলোচনার ভবিষ্যতে গান্ধীজির আশা

জিন্না ও গান্ধীর ঈদ অভিনন্দন

বোম্বাই ১৯শে সেপ্টেম্বর। সান্ধ্য প্রার্থনার পর গান্ধীজি আগামী ঈদ উপলক্ষে একটী বাণী দেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন : সকলের নিকট তাঁহার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তাঁহারা যেন হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইহা তাঁহাদের প্রত্যেকের ন্যূনতম কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেকেই ইহা করিতে পারেন। তাঁহারা মনে-প্রাণে এক হইতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতা মিলিবে এই কথায় কেহ কি অবিশ্বাস করেন ? তিনি ভারতে ফিরিয়া আসা অবধি এই সত্যই প্রচার করিতেছেন। কিন্তু অলস ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে স্বাধীনতা আপনা হইতে তাহাদের হাতে আসিবে না। একথা বুঝিতে পারিলে আরও অনেক বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন :—

তাঁহারা বন্ধুভাবে যে আলোচনা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয়। আলোচনার ধারা সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিবার উপায় তাঁহার নাই। **কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন বিনা আশায় তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন না।** যে দিন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, কোন আশা নাই, সেইদিনই সে কথা প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। ঈশ্বর তাঁহাদের যাহাতে সঠিক পথে পরিচালিত করেন সেজন্য তাঁহারা যেন ঈদের দিন প্রার্থনা করেন।

জিন্না

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর অগ্নিপরীক্ষায়

স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত

বোম্বাই ১৯শে সেপ্টেম্বর। সমস্ত মুসলমানের প্রতি ঈদ মুবারক জানাইয়া জিন্না সাহেব একটী বাণী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"... গত বৎসরে আমার ঈদ অভিভাষণের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে বীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের শক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে ভারতের সমস্ত মুসলমান আজ এক হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা যে-কোন আত্মত্যাগে প্রস্তুত।

"... সারা পৃথিবী, বিশেষ করিয়া ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবী এবং ভারতের মুসলিম জাতি সঙ্কটাপন্ন সময়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে তাহা আপনারা জানেন। আমাদের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

"ইহা অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। কিন্তু রমজানের মাসে যে-দৃঢ়তা আপনারা দেখাইয়াছেন সেই দৃঢ়তা লইয়াই আসুন আমরা এই অতি শুভদিনে আবার প্রতিজ্ঞা করি যে, **যতদিন না আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতেছি ও আমাদের লক্ষ্যস্থল পাকিস্তানে পৌঁছিতেছি ততদিন কোন চেষ্টার ত্রুটী করিব না, কোন স্বার্থত্যাগেই পরাঙ্মুখ হইব না।**

"বিশেষ করিয়া এই মুহূর্তে আপনাদের বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা ও জাতীয় সংগঠনের কাজকে তীব্রতর করা যে কতবড় প্রয়োজন তাহা বলিয়া বোঝানো যায় না। প্রত্যেক মুসলমান আপন জনগণের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবে, ইসলাম ইহাই আশা করে। আমাদের জাতিকে সম্পূর্ণরূপে সঙ্ঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য আপনারা মুসলিম লীগের সমর্থনে যথাসাধ্য ও আন্তরিক চেষ্টা করিবেন ইহাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন। ..."

দেশ ভক্তের শিবিরে মুসলিম লীগ

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, মিঃ এম, এ, জিন্নার আগ্রহেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ; এই জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন "হিন্দুমুসলমান মিলনের দূত"।

১৯১৫ সালে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের বাৎসরিক অধিবেশন হয় বম্বে শহরে, উভয় অধিবেশনই ভারতীয় শাসন সংস্কারের দাবী গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হাত হইতে ক্ষমতা আনিবার জন্য ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর এক চুক্তি হয়, এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী মানিয়া লয় আর লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে শাসন সংস্কারের দাবী করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ঐ বৎসরই তাহাদের সমবেত দাবী উপস্থিত করা হয় বৃটিশ সরকারের নিকট। ইহাই হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা। ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সচিব মিঃ মন্টেগু ঘোষণা করেন—ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাই আমাদের লক্ষ্য। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মিঃ জিন্না জাতীয় দাবী সমর্থনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—"৩০ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধিদের কার্য্যাবলীর চরম বিচার কর্ত্তা হইবে আমলাতন্ত্র ইহার চেয়ে অসার উক্তি আর কি হইতে পারে আমি কল্পনা করিতে পারি না। আমরা সমবেতভাবে শাসন সংস্কারের জন্য যে স্কীম তৈয়ারী করিয়াছি তাহাতে দোষ ত্রুটি যাহাই থাক, আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমবেতভাবে তাহা সমর্থন করি।"

খিলাফৎ

১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ঘটনা ভারতীয় জনগণের ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক ঘটনা দমন নীতি চালাইবার জন্য রৌলট্ এক্ট এবং জালিয়ান ওয়ালাবাগের অত্যাচার, অন্য ঘটনা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্ত্তৃক তুরস্ক বিভাগ। রৌলট্ এক্টের প্রতিবাদে জিন্না সাহেব কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বরাজ ও খিলাফতের জন্য অহিংস অসহযোগের পন্থা অবলম্বন করে। ১৯২০ সালে মুসলিম লীগও কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পন্থা মানিয়া লয় এবং লীগের সংগ্রামপন্থীদের লইয়া কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গঠন করে।

১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের যে ভিত্তি রচিত হইয়াছিল ১৯২০ সালে তাহা কংগ্রেস-খিলাফতের মিলিত গণ অভিযানে পরিণত হয়। তখন যেখানেই ছিল কংগ্রেস কমিটি সেই খানেই একই ঘরে থাকিত খিলাফৎ কমিটি, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দমন নীতির আঘাত বরণ করিয়া লইত। বাংলার মৌলানা আক্রাম খাঁ, আবুল মনসুর প্রভৃতি যাঁহারা আজ লীগের নেতা, তাঁহারা তখন ছিলেন কংগ্রেসের এবং খিলাফতের নেতা।

কিছুদূরে অগ্রসর হইবার পর ১৯২২ সালে এই গণআন্দোলনের গতি স্তব্ধ হইয়া যায়, চৌরী চৌরার জনগণের অভ্যুত্থানকে হিংসা মনে করিয়া গান্ধীজী সংগ্রাম থামাইয়া দেন, এদিকে তুরস্কের জাতীয় বিপ্লবে খিলাফতের সমস্যাও চলিয়া যায়। গণআন্দোলনে তখন ভাটা পড়ে, দেশময় একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

দেশবন্ধুর ঐক্য

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু দাশ অনুভব করেন যে—আইন সভার ভিতরে গিয়া আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিতে হইবে, শাসনতন্ত্র অচল করিয়া জাতীয় সংগ্রাম পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। এই সময় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়। এই স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে বাংলার লীগ নেতাদের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে ভারতবাসী স্বাধীনতা পাইলে বাংলায় সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানেরা পাইবে যেহেতু সংখ্যায় তাহারা গরিষ্ঠ। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনে এই চুক্তি বিপুল সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। লক্ষ্ণৌ এবং খিলাফতের জাতীয় ঐক্যের ঐতিহ্যকে নূতন ভাবে বরণ করিয়া দেশবন্ধু দাশ বাংলার আমলাতন্ত্রকে বার বার পরাস্ত করেন, বাংলার আইন সভায় শাসন সংস্কারের ফাঁকি নগ্ন হইয়া পড়ে, সারা বাংলায় খিলাফৎ যুগের মত নূতন স্বদেশী জাগরণের বন্যাস্রোত প্রবাহিত হয়। আজ যাঁহারা বাংলায় লীগের নেতা তাঁহারা সে সময় দেশবন্ধু দাশের সাথী এবং স্বরাজ্য পার্টির উৎসাহী সমর্থক। উদাহরণস্বরূপ আক্রাম খাঁ এবং সোহরওয়ার্দি সাহেবের নাম করা যাইতে পারে।

হিন্দু-মুসলমানের এই সমবেত অভিযানে আমলাতন্ত্র শঙ্কিত হইয়া উঠে। আমলাতন্ত্র দেশবন্ধুর প্যাক্টকে চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্র ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সহযোগে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি ভাঙ্গিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। ক্লাইভষ্ট্রীট্ হইতে এই সময় অজস্র অর্থবৃষ্টি হয় কাগজে কাগজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাড়াইবার জন্য। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য্য হয়, দাঙ্গা সুরু হয় তাহার আগেই অর্থাৎ মে এবং জুন মাসে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধীরা চাহিয়াছিল দাঙ্গা বাধাইয়া দেশবন্ধুর চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে যাহাতে সাধারণ নির্ব্বাচনে খয়েরখাঁরা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে পারে। ১৯২৬ সালের সংঘর্ষের সময় কংগ্রেস এবং লীগ নেতা সকলেই উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া ঐক্যের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। উত্তেজনায় দেশবন্ধুর নীতি এমনভাবে বিলুপ্ত হয় যে সুভাষ বসু কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে হঠাৎ মিউনিসিপাল মার্কেটে পীরের সমাধি সরাইবার হুকুম দিয়া বসেন। সুভাসের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে সোহরওয়ার্দি সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান নেতা কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া পড়েন। ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ই বিজয়ী হয়।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে

কিন্তু মুসলিম লীগ তথাপি জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে যায় নাই। জনগণের ভিতর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি এমন ভাবে দিনের পর দিন দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের সাধ্য ছিল না তাহা ভাঙ্গে। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় জিন্নার উপস্থিতিতে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন কংগ্রেসের মত সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহম্মদ শফি প্রভৃতি সরকার ভক্ত নেতারা তখন লীগের ভিতর জিন্নার বিরুদ্ধে দল পাকাইতে আরম্ভ করেন এবং লাহোরে পাল্টা লীগ সম্মেলনের আহ্বান করিয়া সাইমন কমিশন সমর্থনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু জিন্না সাহেব মহম্মদ শফির প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের মত সাইমন কমিশন বর্জ্জনের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। কংগ্রেস,লীগ ও শ্রমিক-কৃষক দল একযোগে যে জাতীয় ঐক্য সমাবেশ সেদিন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অকেজো হইয়া যায়. সমগ্র ভারতের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে ভীত হইয়া ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য নূতন শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১২ বৎসর আগে কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মণ্টেগু এমনি এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ১২ বৎসরের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামে সেই প্রতিশ্রুতির ফাঁকি অচল হওয়ায় ১৯২৯ সালে ভারতবাসীর অধিকার প্রসারিত করিবার নূতন প্রতিশ্রুতি আসে।

কংগ্রেস-লীগ সংঘর্ষ

১৯২৭-১৯২৮ সালে দেখা দিল নূতন সঙ্কট। এই সময় এমন দুইটি ঘটনা ঘটে যাহা ভারতে ও বাংলায় লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঠেলিয়া দেয়। (১) বাংলার আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন উপস্থিত হয়। এই আইনে কৃষক প্রজারা জমিতে গাছ কাটা ও পুকুর কাটার অধিকার পায় কিন্তু তাহার চেয়েও বড় অধিকার পায় জমিদারেরা। প্রজা জমি বিক্রী করিলে জমিদারকে তাহা কিনিয়া লইবার প্রথম অধিকার দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে কৃষককে জমি হস্তান্তরিত করিবার স্বাধীন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভিতর সুভাষ বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি নেতারা জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবলভাবে প্রজাস্বত্ব আইন সমর্থন করায় আইন সভার কংগ্রেসদল কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে জমিদারদের পক্ষে ভোট দেয়। এই ঘটনা আক্রাম খাঁ প্রভৃতি জনপ্রিয় মুসলমান নেতাদের বিচলিত করিয়া তুলে।

(২) ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের উদ্যোগে সর্ব্বদলীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল ১৯১৬ সালের মত সরকারের নিকট ভারতীয় শাসন সংস্কারের জন্য একটি সর্ব্বদলীয় প্রস্তাব উপস্থিত করা। এই সভায় জিন্না যে চৌদ্দ দফা দাবী উপস্থিত করেন তাহার মধ্যে প্রধান ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা আর বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের জন্য অবশিষ্ট ক্ষমতা। জিন্না যুক্ত নির্ব্বাচন মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতারা তখন প্রদেশের জন্য অবশিষ্ট ক্ষমতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার ফলেই লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটে, ১৯২৮ সালে কলিকাতার টাউন হলের লীগ সভায় জিন্না এই বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া বিচলিত হইয়া পড়েন।

১৯১৯ সালে যে মুসলমান নেতারা কারাবরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ১৯৩০ সালে তাঁহাদের অনেকে সরিয়া রহিলেন। ১৯২৮ সালের বিচ্ছেদ না ঘটিলে ১৯৩০ সালে ভারতীয় ইতিহাস নূতন ভাবে রচিত হইত। ১৯৩৫ সালে নূতন ভারত শাসন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই স্বতন্ত্র ভাবে নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

১৯৩৬ সালে জিন্না কলিকাতায় আসিয়া কৃষক প্রজাদলকে আহ্বান করেন লীগ গঠন করিতে। তিন দিন যাবৎ তিনি স্যার নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি তদানীন্তন সরকার ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন না, কৃষকপ্রজা নেতাদের অনুরোধ করেন লীগকে সরকারভক্তদের প্রভাবে ঠেলিয়া না দিতে। কলিকাতায় এক সভায় তখন বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'মুসলমানদের ভিতর যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা একতাবদ্ধ হউক ; হিন্দুদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব।' কিন্তু কৃষকপ্রজারা তখন লীগ গঠন করিতে অস্বীকার করায় বাংলার লীগে স্যার নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি নেতা হইয়া দাঁড়ান। দশ বৎসর আগেও এই বাংলায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মিলিত ফ্রন্ট ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায়।

১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ এই দুই বৎসর কংগ্রেস এবং লীগের ব্যবধান বাড়িতেই থাকে। আইন সভার ভিতরে ও বাহিরে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে, কিন্তু লীগের সঙ্গে ঐক্যের পথ না নেওয়ায় লীগের লড়াই চলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সময় লীগের অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করিয়া ঘোরতর লীগ বিরোধী হুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন—"এই আন্দোলন চলিত না যদি না অসন্তোষের প্রকৃত কারণ থাকিত বা প্রকৃত আঘাতের অনুভূতি থাকিত। কারণটা কাল্পনিক হইতে পারে কিন্তু অসন্তোষটা বাস্তব ছিল।"—(মুসলিম পলিটিক্স, ২৮ পৃষ্ঠা)। হুমায়ুন কবীর নিজেই বলিয়াছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক গোহত্যার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন প্রয়োগ এবং বিদ্যামন্দির পরিকল্পনায় হিন্দু সংস্কৃতি মুসলমানদের উপর চালাইবার চেষ্টায় মুসলমান জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

পূর্ণ স্বাধীনতা ও পাকিস্তান

১৯৪০ সালে লীগ পূর্ণ স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই পাকিস্তানের সারমর্ম্ম। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই অধিকার ন্যায্য অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কংগ্রেস এবং লীগ আজ বড় কাছাকাছি আসিয়াছে, ১৯২৮ সালের পর এত কাছাকাছি এই দুইটি প্রতিষ্ঠান আর কখনও ছিল না। কিন্তু তবু ক্রীপস্ মিশনের সম্মুখে কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধভাবে অগ্রসর হয় নাই। ১৯১৬ সালে, ১৯২০ সালে এবং ১৯২৭ সালে কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারই ফলে তখন সাম্রাজ্যবাদ হয় দুর্ব্বল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস এবং লীগের বিপুল ব্যবধান, ভারতবাসীর ভাগ্যে আনিয়াছে বিরাট পরাজয়। এই পরাজয়ের অভিজ্ঞতা গান্ধীজি এবং জিন্না সাহেবকে ঐক্যের অভিমুখী করিয়াছে। ইহার পিছনে রহিয়াছে—ভারতের ৪০ কোটি হিন্দুমুসলমানের স্বাধীনতার আকাঙ্খা।

লেখক : ভবানী সেন

নূতন ঐক্যের পথে

ঐক্যের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে লীগের অবরুদ্ধ স্বদেশ প্রেমের স্রোত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন জনসভায় মৌলবী আবুল হাসেম, হবিবুল্লা বাহার, মহম্মদ ওসমান প্রভৃতি লীগনেতারা ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমান পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। খয়রুল আনাম খাঁ সাহেব এবং আবুল হাসেম সাহেব প্রভৃতি লীগ নেতারা কংগ্রেসনেতাদের মুক্তির দাবী সমর্থন করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, মুসলমান জনতাকে এই দাবীর জন্য আন্দোলন করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার সমর্থকরাই আজ এই জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিতেছে। গান্ধীজি এবং জিন্নার প্রচেষ্টা সফল হইলে স্বাধীনতার জন্য স্বদেশভক্তের শিবিরই জয়যুক্ত হইবে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্য। ১৯২৭ সালের পর আমরা সে ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের প্রচেষ্টা সফল হইলে ১৬ বৎসরের বিস্মৃত জাতীয় ঐতিহ্যই ফিরিয়া আসিবে, পরাস্ত হইবে সাম্রাজ্যবাদ।

আলোচনা

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

(সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রতি নিমন্ত্রণ

কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে কংগ্রেসে থাকিতে দেওয়া উচিত নয় বলিয়া এক শ্রেণীর কংগ্রেসপন্থী সম্প্রতি ধূয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের নিজস্ব বক্তব্য ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের যুগান্তর পত্রিকায় সোমনাথ লাহিড়ীর চিঠি মারফৎ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্ম্মীকে এ বিষয়ে মতামত দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি—পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক সুযুক্তিমূলক ও সংক্ষিপ্ত হইলেই আমরা তাহা জনযুদ্ধে প্রকাশ করিব।

বাংলার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিম্নলিখিত প্রবন্ধ এই আলোচনার আরম্ভ।—জঃ সঃ

বিদেশী ভাবধারার প্রভাব

ফরাসী-বিপ্লব, রুশো, ভলতেয়ার ও পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য চিন্তানায়কগণ অপেক্ষা ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও নীতিবাদের মিলিত মিশ্রিত ভাবাবেগ বহুল নবজাতীয়তাবাদের ঋষি ম্যাৎসিনীই ভারতীয় চিন্তার উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ম্যাৎসিনী ও গারিবল্ডীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিগত শতাব্দীর চতুর্থপাদে সুরেন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ভারতে তথা বাঙ্গালায় নবজাতীয়তাবাদের অগ্রদূত বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ সকলেই ম্যাৎসিনীর ভাবধারা অঞ্জলি-ভরিয়া পান করিয়াছেন। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ১৯০৯ সালে জাতীয় দলের (চরমপন্থী) আবির্ভাবের প্রেরণা ছিল, ম্যাৎসিনী অনুপ্রাণিত ইয়োরোপের জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম।

যাঁহারা বলেন, কমিউনিজম বিদেশী আদর্শ তাঁহারা ভুলিয়া যান জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জাতীয়তার ভাব ইয়োরোপ হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মডারেটগণ যেমন মিল-বেন্থাম প্রভাবিত বৃটিশ উদারনৈতিক দল হইতে ভাবরস আহরণ করিয়াছিলেন, জাতীয়তাবাদীরাও তেমনিভাবে ইয়োরোপের নবজাতীয় আন্দোলন হইতে ভাবধারা আহরণ করিয়াছেন। ইয়োরোপের ধনতন্ত্র তখন পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা—মার্কস, এঙ্গেল্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী অল্প লোকের শ্রবণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিগত মহাযুদ্ধের পর, রুষ বিপ্লব এবং ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মম শোষণের প্রতিক্রিয়ায়, ইয়োরোপে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া যখন সমাজতন্ত্রবাদ প্রবল হইল, তখন ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র আত্মরক্ষার জন্য ফ্যাশিবাদ আবিষ্কার করিল। ভারতের রাজনীতিতেও এই দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিল। এবং কংগ্রেসেও তাহার প্রভাব দেখা দিল। গান্ধীজী তাঁহার অতুলনীয় নেতৃত্বের দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন। ভারতের সম্মুখে মু J সমস্যা—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই এক লক্ষ্যে স্বদেশের স্বাধীনতাকামী মাত্রেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ক্রমে মাথা তুলিল, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ ঐ সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃথক অস্তিত্ব মানিয়া লইলেন।

কংগ্রেস ও মতবাদের দ্বন্দ্ব

কিন্তু কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রবাদের আধিক্য দেখিয়া কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী নেতারা শঙ্কিত ও বিরক্ত হইলেন। বৃটিশ-বিদ্বেষী, মুসোলিনী ও হিটলারের তর্জ্জন গর্জ্জন জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণীর অনেকের হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার তুলিল। ফ্যাশিস্ত আদর্শের অনুশীলন ও প্রচার চলিল। ১৯৩৪-এর নূতন শাসনতন্ত্রের শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায়—কমিউনিষ্টরা যেমন কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমীস্বার্থের শোষণের বিরুদ্ধে কিছুটা সংগঠিত করিয়া তুলিলেন, তেমনিভাবে প্রচ্ছন্ন ফ্যাশিস্তরা মধ্যশ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে সমর্থন বাড়াইয়া লইলেন। ১৯৩৯ সালের কংগ্রেসী রাজনীতিতে ফ্যাশিস্ত প্রবণতা অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা পরিণামে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ ও ফরোয়ার্ড ব্লক রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

জওহরলালের উক্তি

গান্ধি-পন্থী জাতীয়তাবাদীরা চরম নরম কোনপ্রকার সমাজতন্ত্রবাদ বরদাস্ত করিতে পারেন না। ক্রমবর্দ্ধিত কমিউনিষ্টপার্টি জাতীয় কংগ্রেসে প্রবল না হইতে পারে, সেজন্য বহুতর নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিন বৎসর একাদিক্রমে কংগ্রেসের সদস্য না হইলে কেহ নির্ব্বাচিত পদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না, এই অযৌক্তিক ধারাটি হইতেই নেতৃবৃন্দের মনোভাব বুঝা যায়।

"আমি সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করি বলিয়া কার্য্যকরী সমিতির আমার সহকর্ম্মীরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যে ভাবে আমার প্রচার কার্য্য সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে উহা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভীত করিয়া তুলিয়াছি এবং আমার কার্য্যপ্রণালীকে এখন আর নির্দ্দোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহকর্ম্মী সমাজতন্ত্রী নহেন; কিন্তু আমি সর্ব্বদাই ইহা মনে করি যে, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেসকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কার্য্যকরী সমিতির কোন কোন সদস্য আমার এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া মনে করেন না, এ কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি তাঁহাদের অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলিতেছি বলিয়া তাঁহারা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের মধ্যে যাহাতে আমি সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি।' তাহা বর্জ্জন করিতে পারি না।"

জওহরলালের আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত এই অংশ পাঠ করিলে নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুগামীদের মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সমাজতন্ত্রী জওহরলালের যখন এই দশা, তখন কমিউনিষ্টদের প্রতি বিরোধিতা কত গভীর সহজেই অনুমেয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর এবং গান্ধীজী কংগ্রেস ও রাজনীতি ছাড়িয়া হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করিবার পর, কংগ্রেসে দুইটি দল দেখা গেল, একদল আইন সভার মধ্যে নিছক নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যপ্রণালীর দিকে ঝুঁকিলেন, আর একদল সমাজতান্ত্রিক ভাবে চিন্তা করিলেন। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিলেও, কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে কঠোরভাবে দমন করিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন আসন্ন হইল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া মতভেদ হেতু বাঙ্গলার উচ্চমধ্যশ্রেণীর রুষ্ট কংগ্রেসপন্থীরা বিদ্রোহ করিয়া 'কংগ্রেস জাতীয়দল' গড়িল। কংগ্রেসের নেতারা নির্ব্বাচনে ধনী সম্প্রদায়ের সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইলেন। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কার্য্যকরী সমিতি সহসা একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করিলেন,—"ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং শ্রেণী-সংঘর্ষের শিথিল আলোচনা হইতেছে দেখিয়া" এতদ্বারা কংগ্রেসপন্থীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, করাচী সিদ্ধান্তে "সঙ্গত কারণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, অথবা ইহা শ্রেণী-সংঘর্ষেরও অনুমোদন করে না। কার্য্যকরী সমিতির আরও অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্তিকরণ অথবা শ্রেণী-সংঘর্ষ কংগ্রেসের অহিংসানীতির বিরোধী।" বলাবাহুল্য নবগঠিত 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল'কে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কংগ্রেসের ভিতরে বাহিরে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারে নেতারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরা কংগ্রেসে দুই দুই বার জওহরলাল রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে অভিভাষণে এবং তাঁহার প্রচার কার্য্যে আন্তর্জ্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ স্বতন্ত্র দৃষ্টি লইয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিচার করিতে লাগিল। এই সময় জওহরলালের সমর্থন ও অনুমোদনের ফলে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের নেতারা কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করিলেন, নেতারা জওহরলালের প্রভাবে ইঁহাদের দু'একজনকে কার্য্যকরী সমিতিতে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা নিজেদের মার্কসপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতেন, এ কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কমিউনিষ্ট সদস্যরাও গান্ধীপন্থী এবং নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী হইতে পৃথক বামপন্থী দলের মধ্যেই ছিলেন। ইহা ছাড়া বহু কমিউনিষ্ট কর্ম্মী জিলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন এবং ১৯৩৫-৪২ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর খানা (এলাহাবাদ) বিশিষ্ট কমিউনিষ্টগণই দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ কি?

মহাযুদ্ধের গতিপথে জার্ম্মানীর সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত সোভিয়েটের সন্ধি হইবার পর, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কমিউনিষ্ট-পার্টি সম্পর্কে নীতির আংশিক পরিবর্ত্তন হইল, কানাডা ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল। তাহার কয়েক সপ্তাহ পরেই ১৯৪২এর আগষ্টে বোম্বাই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। এই অধিবেশনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে এগার কি বারজন সদস্য আগষ্ট প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মূলক অংশে আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমগ্র প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির বা দলের স্বাধীনভাবে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিবার অধিকার আছে।

গত ২৪শে আগষ্ট বাঙ্গালার দুই শত খাদি-কর্ম্মী তথা কংগ্রেসসেবী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগের নিজেদের কংগ্রেসসেবী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, উহাদের সহিত আমরা এক সাধারণ উদ্দেশ্যেও জনসভায় মিলিত হইব না। ঐ প্রস্তাবের উপর আলোক সম্পাত করিয়া কর্ম্মীসম্মেলনের একজন অন্যতম আহ্বায়ক সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন যে উক্ত প্রস্তাব শুধু কমিউনিষ্টদেরই বিরুদ্ধে করা হইয়াছে: (১) তাহারা গত দুই বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের মুখ্য সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন অথচ নিজেদের কংগ্রেসসেবী বলিয়া জনসাধারণের নিকট আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। (২) কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মিত্রশক্তি সমূহ ও জগৎবাসীর নিকট ঘোষণা করিয়াছে যে এই যুদ্ধ ভারতবাসীর যুদ্ধ নহে, সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ; আর ঐ গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কমিউনিষ্টরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসসোসালিষ্টদের কংগ্রেসের নামে জালিয়াতি

যুক্তপ্রদেশের কতিপয় কংগ্রেস কর্ম্মীও এক ঘরোয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগীতা করা হইবে না, এবং তাঁহাদের নাম কংগ্রেসের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই মতের সমর্থক, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "মতবাদের অনৈক্য এবং ১৯৪২এর ৯ই আগষ্টের ঘটনার পর কম্যুনিষ্টরা যে মনোভাব দেখাইয়াছে, তাহাতে কারামুক্ত কংগ্রেসপন্থীরা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতে পারেন না।"

কথাটা খুলিয়া বলাই ভাল। ৯ই আগষ্টের পর ফরোয়ার্ডব্লক ও কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত প্ল্যান অনুসারে কংগ্রেসের নাম জাল করিয়া যে ধ্বংসমূলক কার্য্য তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং যাহা নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে বহু সরলপ্রাণ কংগ্রেসসেবীকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, কম্যুনিষ্টরা তাহাতে যোগদান করে নাই এবং উহা কংগ্রেসের আন্দোলন নহে, ইহা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। খাদি-কর্ম্মী ও কংগ্রেস সোসালিষ্টের ইহাই অভিযোগ। বোম্বাই প্রস্তাবে সত্যাগ্রহের সংঘর্ষ পরিচালনের ভার গান্ধিজীর উপর অর্পণ করা হইয়াছিল, তিনি ব্যতীত আর কাহারও উহা পরিচালনের কোন অধিকার ছিল না। গান্ধিজী এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার পরও, যে আন্দোলন কংগ্রেসের বিনা সমর্থন ও বিনা অনুমোদনে হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য কম্যুনিষ্টদের দায়ী করার অযৌক্তিকতা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কম্যুনিষ্টরা তখন বলিয়াছে যে, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের জন্য মূঢ় আমলাতান্ত্রিক নীতিই দায়ী। গান্ধিজীও বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে তাহাই বলিয়াছিলেন।

কমিউনিষ্টরাই কংগ্রেসের অনুকূলে জনমত গঠন করিয়াছে

অনেক অলীক পরিবাদ রটনা এবং ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ এক শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই দুই বৎসর কাল ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টিই কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—জাতীয় গভর্ণমেণ্ট জাতীয় স্বাধীনতার দাবী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির অনুকূলে জনমত গঠন করিয়াছে। লীগ-কংগ্রেস মিলনের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির অক্লান্ত প্রচার কার্য্যেই আজ গান্ধী-জিন্না মিলনকে সম্ভব করিতেছে,—এজন্য অনেকে রুষ্ট হইলেও কম্যুনিষ্টগণ গর্ব্ব বোধই করিয়া থাকে। আগষ্ট পরবর্ত্তী হাঙ্গামাগুলির দায়ীত্ব কংগ্রেসের নহে, একথা গান্ধিজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, বিহারের শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আসামের শ্রীগোপীনাথ বরদলই স্পষ্ট করিয়া বলা সত্ত্বেও খাদি-কর্ম্মী ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীর মন প্রশান্ত হয় নাই।

খাদিকর্ম্মীর দ্বিতীয় অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। কংগ্রেস কোন প্রস্তাবেই বর্ত্তমান যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে নাই। এই শ্রেণীর প্রস্তাবগুলির রচয়িতা জওহরলাল এত নির্ব্বোধ নহেন যে, চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিবেন। কংগ্রেস তাহার বিভিন্ন প্রস্তাবে জাতীয় স্বাধীনতার সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিনিধিমূলক অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্টের মারফৎ এই ফাশিস্তবিরোধী যুদ্ধে সরিক হইতে চাহিয়াছে। কমিউনিষ্টরা এই যুদ্ধকে চীন ও সোভিয়েটের দিক হইতে জনযুদ্ধ বলিয়াছে এবং জাপবিরোধী সংগ্রামে ভারতের প্রতিরোধকে তীব্র করিবার জন্য ইহাকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করিবার দাবী করিয়াছে। উভয় দাবীই পূর্ণ হয় নাই। কেননা, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কংগ্রেসপন্থী মাত্রেই জানেন ও বুঝেন যে জাতীয় ঐক্য ব্যতীত অনিচ্ছুক ও প্রকৃতি-কৃপণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে বর্ত্তমান যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করিতে বাধ্য করা সম্ভব নহে।

কমিউনিষ্টদিগকে কংগ্রেসবিরোধী প্রমাণ করিবার মূল ভিত্তিহীন; এবং রাজনৈতিক মতভেদ, ঈর্ষা ও অসূয়া প্রসূত। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক কংগ্রেসের মধ্যে প্রত্যেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলেরই মিলিত হইবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। এই কারণেই জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী বা অংশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার ভিত্তিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে; তবে এক এক

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলার শ্রমিকের দাবী ও দায়িত্ব

লেখক ঃ
সরোজ মুখার্জী

শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা

বাংলার বিভিন্ন শিল্প ও কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খল চলিতেছে। কয়লার অভাবে কারখানার কাজ বন্ধ, মজুর ছাঁটাই লাগিয়াই আছে। মজুরদের উপযুক্ত পরিমাণে মাগগীভাতা দেওয়া হইতেছে না। রেশনের চাউল, আটা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ কম—রেশনের মালপত্র অত্যন্ত খারাপ। শ্রমিকদের সভা-সমিতি করার অধিকার ক্রমাগতই খর্ব করা হইতেছে।

চটকলে কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে ১৬ হাজার তাঁত বন্ধ হইতে চলিয়াছে। প্রায় ৮০ হাজার চটকল মজুর বেকারে পরিণত হইবে। নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের ছাঁটাই চলিতেছে. এক মাস পূর্ব্বে প্রায় ২০০ জন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

শ্রমিকদের মাগগীভাতা এখনো গড়ে ১৮ টাকার উপরে উঠে নাই। অথচ শ্রমিকের খাই-খরচা গড়ে প্রায় শতকরা ৩০০ ভাগ বাড়িয়াছে। ফলে ট্রাম, চটকল, লোহা-কারখানা প্রভৃতির শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে—অনুপস্থিতির হার বাড়িয়া যাইতেছে, শারীরিক পুষ্টির অভাবে মহামারীর প্রকোপ শ্রমিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

লোহা-কারখানার কোন কোন সপ ও ডিপার্টমেণ্ট তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। আসানসোল অঞ্চলে শ্রমিকদের সভা-সমিতি করার উপায় নাই। কয়লা খনির শ্রমিকদের দুরবস্থার সীমা নাই। মাগগীভাতা, বোনাস প্রভৃতি লইয়া কয়লা-শ্রমিকদের কোথাও ৬।৭ টাকার বেশী রোজগার বাড়ে নাই। কয়লা খনির শ্রমিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে কিছুই নাই—সংগঠন গড়িবার, সভা করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। জামুড়িয়া, বরাকর প্রভৃতি স্থানে সভা করা একেবারে নিষিদ্ধ।

রেলশ্রমিকদের জোন হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে খাই-খরচা বৃদ্ধির অনুপাতে রেল-মজুররা উপযুক্ত মাগগীভাতা পাইতেছে না। নিম্ন-স্তরের রেলশ্রমিকদের ১২।১৩ টাকা বেতনেও দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়।

সাধারণভাবে বাংলার শ্রমিকদের শতকরা ৮০ জন ২০ টাকার কম মাসিক বেতন পায় এবং ১০ টাকার কম মাগগীভাতা পায়।

বাংলার শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা

শিল্প	বেতন	২৫ টাকার কম বেতন	মাগগীভাতার পরিমাণ
জুট	গড়ে ২২৲	শতকরা ৭০ জন	গড়ে ৫৲
সূতাকল (বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন রকম রেট)			
নারায়ণগঞ্জ উইভীং	—	৯০ জন	৬—১৮৲
ঢাকেশ্বরী ১ নং—	২০৲		১৫৲
২ নং—	২৫৲		১৫৲
চিত্তরঞ্জন—	২২৲		১৩৲
লক্ষীনারায়ণ—	২২৲		১০৲
লোহাকারখানা	২৫৲	৩০ জন	৫৲—১২৲
রেলওয়ে			
বি এণ্ড এ (উচ্চস্তর)	৫০৲		এ জোন—১৪৲ (২॥লক্ষ)
(নিম্ন স্তর)	১৮৲		বি জোন—১১৲ (৫০ হাজার)
			সি জোন—৮৲
জরুরী শিল্প			
ট্রাম	২৫৲	৬০ জন	১০৲
বিজলী	২০৲	৭৫ জন	৭৲
গ্যাস	১৭৲	৯০ জন	৬৲
করপোরেশন	১৫৲	৮০ জন	৮৲—১৪৲
পোর্ট	২১৲	৬০ জন	৮৲
ডক ষ্টিভিডোর	৩১৲	৫ জন	১৫৲
বার্ড কোঃ	১৫৲	৯৫ জন	?

আন্দোলনের ফল

বর্ত্তমান যুগে বাংলার শ্রমিক প্রধানত উৎপাদন বৃদ্ধির পথে ইউনিয়ন সংগঠন ও সমাবেশ করার মধ্য দিয়াই আন্দোলন চালাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বিচার করিলে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জ টেকসম্যাকো প্রভৃতি দুই একটা জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা উৎপাদন বাড়ানোর প্রত্যক্ষ কাজ করিয়াছি। ট্রাম ও রেলওয়ে যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখা বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের গৌরবময় কাহিনী। বার্ণপুর, গেষ্টকিন-উইলিয়ামস্ প্রভৃতি লোহা-কারখানা, বি-এণ্ড-রেল ওয়ার্কশপ প্রভৃতি স্থানে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশী কিছু করিতে না পারিলেও মজুরের অনুপস্থিতি বহু পরিমাণে কমান গিয়াছে। সমগ্রভাবে আন্দোলনের ফলে কোথাও ব্যাপক ষ্ট্রাইক হয় নাই বলা চলে, সূতাকল ও রেলে উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বানে শ্রমিকরা উৎসাহ দেখাইয়াছে প্রচুর। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে ষ্ট্রাইককারী দলগুলি শ্রমিকদের উপর মোটেই প্রভাব ছড়াইতে পারে নাই।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাংলার শ্রমিক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় সংগঠনের মধ্যে আসিয়াছে। ৭ বছর আগে ৫ থেকে ১০ হাজারের বেশী শ্রমিক ইউনিয়নের ভিতর আসে নাই, আর বর্ত্তমানে ৫০ হাজারের বেশী শ্রমিক প্রায় ৬০টী ইউনিয়নে সংগঠিত হইয়াছে।

৫০ হাজার চটকল শ্রমিকের সংগঠিত দাবীর ফলে তাহারা "গ্রেগরী মাগগীভাতা কমিটি" বসাইতে পারিয়াছিল। চারিদিকে রেশনীং-এর আন্দোলন করিয়া মজুররা এই বছরের প্রথমেই শিল্প এলাকায় রেশনীং চালু করাইতে সক্ষম হইয়াছে। কিছু কিছু চটকল এলাকার রেশনীং হইতে বেশ দেরী হইলেও ঢাকা, কুষ্টিয়া, সৈয়দপুর ও কয়েকটী রেলওয়ে কেন্দ্র ছাড়া সমস্ত শিল্প অঞ্চলে রেশনীং হইয়াছে।

মাগগীভাতার আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় শ্রমিকরা উপযুক্ত পরিমাণে না হইলেও সর্ব্বত্রই ভাতা পাইয়াছে।

বিভিন্ন কারখানায় আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য এডজুডিকেশন কোর্ট বসিতেছে। কয়েকটী ইউনিয়নের বিচার শেষ হইয়াছে; প্রত্যেকটীতেই কিছু না কিছু দাবী তাহারা আদায় করিতে পারিয়াছে। টাম, ভাভিয়া ও ইণ্ডিয়া ফ্যানে বিচার বা রায়দান এখনও শেষ হয় নাই।

এডজুডিকেশনের ফলে কি কি দাবী পাওয়া গিয়াছে

ব্রুকবণ্ড ঃ ইউনিয়ন নেতা মহাবীর শার পুনর্বহাল, বারো আনা সাইরেন ভাতা, সিগ্রেট শ্রমিকদের জন্যও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড।

স্যাকস্‌বী ঃ সাধারণ মজুরদের ন্যূনতম বেতন ১৭ টাকা হইতে ২০ টাকায় বৃদ্ধি, অ্যাপ্রেন্টীসদের শুরু বেতন ১২ টাকা হইতে ১৬ টাকায় বৃদ্ধি, শিক্ষার সময় ৫ বৎসরের বদলে ২ বছর, তিন বছরের স্থলে ১ বছর হইলেই চাকরী পাকা, ১৫ দিনের পুরা-বেতনের ছুটী, কারখানার মধ্যে সভা করিবার অধিকার।

রসা ডিষ্টিলারী ঃ মাগগীভাতা ৫ টাকা হইতে বাড়িয়া ৯ টাকা, পূর্ব্বে কোন রেশনই ছিল না এখন ৬ টাকার সস্তা-রেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মটর ট্রান্সপোর্ট ঃ ড্রাইভারদের তেল-দেওয়া, ঘষামাজার কাজ করিতে হইবে না, ১২ জন কর্ম্মচ্যুত শ্রমিককে পুনর্বহাল, ৪৫ মিনিটের টিফিনের ছুটী, ৩ টাকা রবিবারের ভাতা, ইত্যাদি।

ইণ্ডিয়ান মেশিনটুল ঃ ৯ টাকা মাগগীভাতা, সস্তাদরের রেশনের ব্যবস্থা, তিন দিন বন্ধের বেতন, ৬ জন কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকের পুনর্বহাল।

শ্রমিকদের সমস্যা

গত দুই বৎসর আন্দোলনের ভিতর দিয়া শ্রমিকদের অনেক দাবী দাওয়া পাওয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু তাহারা এখনো ৩০ টাকা মাগগীভাতা পায় নাই। তাহাদের ৫।০ সের রেশন ও ভাল খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা হয় নাই। আসানসোলে লোহা ও কয়লা অঞ্চলে মজুর সংগঠন ও সভা করার অধিকার পায় নাই। জিনিষের দাম বাড়ার অনুসারে শ্রমিকের আসল বেতন বাড়ে নাই। এই সব দাবী দাওয়া আদায় করিতে তাহারা কেন সমর্থ হয় নাই তাহা শ্রমিকের কাছে আজ একটী বড় প্রশ্ন।

চটকলের মালিকরা উৎপাদন কম হইলেও আপত্তি করে না। গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে ক্ষতি-পূরণ পাইয়া মুনাফার অংশ ঠিক রাখিতে পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় সরবরাহ মন্ত্রী জানাইয়া দিয়াছেন,—কয়লাভাবে জুট-মিলের উৎপাদন কমিলেও আমরা কিছুই করিতে পারি না। যে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হইবে তাহাদের সপ্তাহে ।১০ আনা খোরাকী ও সস্তা রেশন দেওয়া হইবে—যাহাদের কোন কাজে লাগান যাইবে না তাহাদের ৮ সপ্তাহের বেতন দিয়া ক্ষতি-পূরণ করা হইবে। ইহাতে শ্রমিকদের কি হইবে ?

রেল শ্রমিকদের জোনাল প্রথায় ভাতা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সকলকে ৩০ টাকা মাগগীভাতা দেওয়ার দাবী এখনো অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। গ্রেণশপের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার জন্য শ্রমিক ও কর্ত্তৃপক্ষের যুক্ত কমিটি গঠিত হইতেছে না। ই-বি, এ-বি, বি-ডি প্রভৃতি বিভিন্ন রেলের ষ্টাফের ব্যবস্থার তারতম্য এখনো তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা ও অন্যান্য জায়গার রেল-মজুরদের ফ্রি কোয়াটারের ব্যবস্থা হয় নাই।

এইখানেই দেখা যায়, মিল-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের প্রভাব গবর্ণমেণ্টের উপর কত বেশী। দেশের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির প্রভাব না থাকিলে ইহাই স্বাভাবিক। জুট মালিকরা বাংলা সরকার ও আমলাতন্ত্রের উপর নিজেদের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছে। তাই শ্রমিকদের দাবী কেহই ভাবে না। এ্যাডজুডিকেশনেও শ্রমিকদের দাবী ন্যায়-সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হয় না। যত বেশী দিন যাইতেছে আমলাতন্ত্র ও সরকার নিজেদের স্বেচ্ছা-চারিতা বাড়াইয়া তুলিতেছে—মিটীং শোভাযাত্রা করার অধিকার একেবারে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

তাই এই সমস্ত দাবীর জন্য শ্রমিকদের আন্দোলন করিতে হয়—জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই, কংগ্রেস-লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা সরকারী ক্ষমতা দখল করা চাই। তবেই মিল মালিকদের জারীজুরী ভাঙ্গিয়া যাইবে—শ্রমিকরা কারখানার দাবীগুলি অনায়াসেই আদায় করিতে পারিবে।

শ্রমিকের ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য

শুধু শ্রমিকদের শ্রেণী দাবী, কারখানার দাবীর জন্যই যে শ্রমিকদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে শ্রমিকরা দেশের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিপ্লবী—নূতন শোষনহীন সমাজ গঠনের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্ম-কৌশল তাহারাই আয়ত্ত করিতে পারে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সঠিক পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। ১৯৩৭ সালে নতুন আইন প্রবর্ত্তনের পর শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র আন্দোলনের জোরে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাড়িয়াছিল, শ্রমিক ও কৃষকরা ছোট ছোট বহু দাবীদাওয়া আদায় করিয়াছিল। সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরই শ্রমিকরা ষ্ট্রাইক ও সংগ্রাম করিয়া জাতিকে যুদ্ধবিরোধী মতবাদে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সোভিয়েট যুদ্ধে নামিবার পর হইতে দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণের মুক্তির পথ পরিষ্কার হওয়ার কথা শ্রমিকরা জাতির সামনে ধরিয়া তুলিয়াছে। শ্রমিকই জাতীয় ঐক্য—কংগ্রেস ও লীগের মিলন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশকে স্বাধীনতার আন্দোলনের নূতন পথে পা বাড়াইতে আহ্বান করিয়াছে। আজ সেই সুদিনের স্পষ্ট আলো আমাদের সম্মুখে ঝলক দিতেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণী তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সাফল্য অর্জ্জন করিতে আজ সক্ষম। কংগ্রেস ও লীগ জনসাধারণের দুইটী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মিলন সফল করিতে পারিলে জাতি নূতন জীবন পাইবে। ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ জাতীয় সরকার গঠনের পথে দ্রুতপদে আগাইবে। ইহার ফলে প্রদেশে ও কেন্দ্রে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর জনসাধারণের প্রতিনিধিদের প্রভাব বাড়িবে—শ্রমিকদের আন্দোলনে নিজস্ব দৈনন্দিন দাবী তো আদায় হইবেই—সমগ্র দেশ স্বাধীনতার অনিবার্য্য পথে পা ফেলিবে। শ্রমিকরা তাই কংগ্রেস-লীগের মিলন আন্দোলনে সব চেয়ে বেশী উৎসাহী, সবচেয়ে বেশী অগ্রণী—একথা ভুলিলে চলিবে না।

বিলাতের ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য

১৯৪২ সালে ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য সংখ্যা ১৯৪১ সাল অপেক্ষা শতকরা ৯·৭ ভাগ বাড়িয়াছে। গত বৎসরে মেয়ে মজুররাই বেশী সংখ্যায় ইউনিয়নের সভ্য হইয়াছে—পুরুষ সভ্যের বৃদ্ধি ৬·৯ ভাগ, মেয়ে সভ্যের বৃদ্ধি ২১·৪ ভাগ। ১৯২০ সালের ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য সংখ্যা বিলাতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী হইয়াছিল—বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় সেই সংখ্যায় পৌছাইয়াছে।

	পুরুষ হাজার	মেয়ে হাজার	মোট হাজার
১৯২৮	৪০,১১	৭,৯৫	৪৮,০৬
১৯৩৯	৫২,৫৮	৯,৭৩	৬২,৩১
১৯৪১	৫৭,১৯	১৩,৭৪	৭০,৯৩
১৯৪২	৬১,১৩	১৬,৬৮	৭৭,৮১

উৎপাদন বৃদ্ধি করার ফলে বিলাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি

[সর্বত্রই কারখানায় কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত-উৎপাদন কমিটি গঠিত হইয়াছে! শ্রম-মন্ত্রীর হিসাব মত ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসের বেতনের তুলনায় ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের বেতন কত ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে ও ১৯৪৩ জুলাইএর প্রথম সপ্তাহে গড়ে কত বেতন পাইয়াছে তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।]

শিল্প	শ্রমিকদের গড় বেতন শিঃ পেঃ	বর্ত্তমানে বেতন বৃদ্ধির হার শতকরা
লোহা, খনি ইঃ	৯১ ৭	৬২
কেমিক্যাল	৯০-১	৬৪
মেটাল, ইঞ্জিনীয়ারীং	১০৮-৩	৮১
সূতাকল	৬৪-২	৭০
কাঠের কাজ	৭৯-৪	৫৫
যানবাহন (রেলছাড়া)	৯৫-০	৪৫
জরুরী শিল্প	৮০-১	৩৪
সরকারী শিল্প	১০৭-৫	৫২
রেলওয়ে ট্রাফিক ("টাইমস"এর মতে)		৫০

নূতন বৃটেন গঠনের অভিযান

আজ বিলাতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা দেশের লোক ও গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। সামাজিক বীমার বীভারীজ রিপোর্ট, জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্কট ও আথওয়ার্ট রিপোর্ট, ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল সার্ভিস ও শিক্ষা সম্পর্কে হোয়াইট পেপার প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিকল্পনা আজ গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন। এই সমস্ত প্ল্যানের মধ্যে বহু গলদ আছে সত্য, তবু ইহারই ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল বৃটেন অঙ্কুরিত হইতেছে। প্রবল জন আন্দোলনের চাপে এই সমস্ত পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইবে—প্ল্যানগুলিকে কাজে পরিণত করা হইবে।

এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বৃটেনে প্রায় ১ লক্ষ কমিউনিষ্ট কর্ম্মী প্রচার ও সংগঠনের কাজ করিতেছে। কি কি কার্য্যপদ্ধতি লইয়া বৃটেনের অধিবাসীরা বর্ত্তমান আন্দোলন চালাইতেছে তাহার জবাব পাইবার জন্য "ডেলি ওয়ার্কার" "লেবার মন্থলী" ও বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংকলন করিয়া নীচের লেখাটী প্রস্তুত করা হইল।

জনগণ কেন লড়িতেছে

বৃটেনের ভিতর এমন শক্তি এখনো আছে যাহারা জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার ইচ্ছাকে পণ্ড করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। গত বারেও বলা হইয়াছিল—এই যুদ্ধের ভিতর দিয়া দুনিয়ার যুদ্ধ একেবারে শেষ করা হইল। কিন্তু তারপর বিভিন্ন দেশের অর্থলোভী শ্রেণী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ বাড়াইবার জন্য আবার যুদ্ধ বাধাইল। মিউনিকের কুচক্রীরা বৃটেনকে প্রায় ফ্যাসিষ্টদের হাতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

সেই কুচক্রীর দল এখনো বৃটেনে আছে। কিন্তু এবার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জনসাধারণ অনেক কিছু শিখিয়াছে, বুঝিয়াছে। তাহারা আজ আত্মবিশ্বাসে অটুট। তাহাদের শক্তি আজ দুর্দ্দমনীয়। লোকধ্বংসী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র আর তাহারা ঘটিতে দিবে না। দেশ বা কলোনি কেনাবেচার মধ্যে আর ব্রিটেনকে যাইতে দিবেনা।

যুদ্ধ জয়ের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকা—এই তিনটী বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি থাকিবে। ইহাও সত্য যে চীনও মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখনো চীন পরিপূর্ণ অবয়বে দাঁড়ায় নাই। বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ ঐ তিনটী বৃহৎ শক্তির সহযোগিতার উপরই নির্ভর করিবে। এই সহযোগিতার পথ সহজ নয়।

আমেরিকায় এক শ্রেণীর লোক বৃটেন-বিরোধী মনোভাব ছড়াইতেছে। ত্রিশক্তির মস্কো চুক্তি পণ্ড করিবার জন্য, আমেরিকা ও বৃটেনের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রুজভেল্টের নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। দুনিয়ার সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতিতে আমেরিকা যাহাতে নাম না লিখায় তাহার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বড় বড় শিল্পপতিরা ইহার পিছনে আছে। আমেরিকায় ট্রাষ্ট-রাজনীতিবিদরা প্রায়ই বৃটীশবিরোধী প্রচারের সহিত সোভিয়েট বিরোধিতাকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লয়। বৃটেন ও সোভিয়েটের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীভাব ও এই দুইটী রাষ্ট্রের যুক্ত শক্তিকে তাহারা যমের মত ভয় করে, একথা তো মিথ্যা নয়। বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কুড়ি বৎসরের চুক্তি যতদিন কার্যতঃ চালু থাকিবে ততদিন ইহাদের মিলিত শক্তি হইবে দুর্জ্জয়। কোন রাষ্ট্রেরই ক্ষমতা থাকিবে না এই মিলিত শক্তি দুইটির একটীকেও কিনিয়া অধীন করিয়া রাখে। বৃটেন ও সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে ইহাদের কাহারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও কোন রাষ্ট্রের সাহস হইবে না। এই মৈত্রী যাহারা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা সমগ্র বৃটেনের শত্রু।

বৃটেনের সহিত সোভিয়েটের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বিরোধিতাই আসিতে পারে না। সোভিয়েটের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম নহে। সোশ্যালিষ্ট দেশ হিসাবে সোভিয়েট মুনাফার জন্য মাল উৎপাদন করিয়া বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা করে না। সোভিয়েট নিজ দেশের বিধ্বস্ত অংশগুলি পুনর্গঠিত করার জন্য বিশ্বের বাজার হইতে ক্রয় করিতেই থাকিবে—বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যে সে বিন্দুমাত্র ভাগ বসাইবে না। ইহাতে বরং বৃটেনের রপ্তানী-সমস্যার সমাধানই হইবে।

বৃটেনের গবর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। দেশের ভিতর এখনো এমন লোক আছে যাহারা ইহার বিরোধিতা করিতেছে এবং করিবে। এই সব লোকই পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সমস্যা লইয়া একটা গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিবে। বৃটেনের ভিতরকার এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ধ্বংস করিতে না পারিলে ইংরাজ জনসাধারণের শান্তি নাই, যুদ্ধ জয় লাভ করিলেও তাহার সুফল লাভে উহারা বঞ্চিত থাকিবে।

সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হইবে। ভারত ও উপনিবেশ গুলিকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। বিদেশের সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত এই মৈত্রী বন্ধনই বৃটেনের জনসাধারণকে বাঁচাইবে। দুনিয়ার সমস্ত দেশের সহিত সৌহার্দ্দ্য ও সখ্যতা স্থাপন করিতে পারিলে বৃটেনের আপামর জনসাধারণের সুখ ও শান্তি হইবে।

আন্তর্জাতিক নীতি

১। দুনিয়াব্যাপী নিরাপত্তা ব্যবস্থা (জার্মানীর পুনরায় আক্রমণ বন্ধ করিবার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা)।

২। সমাজ পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক (মালপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের বাজার নির্দ্দিষ্ট করা সহ) নির্দ্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

৩। যন্ত্রপাতিতে উন্নত দেশগুলির পক্ষ হইতে শিক্ষা ও যন্ত্রপাতিতে অনুন্নত দেশগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও একই পর্য্যায়ে উন্নীত করায় সাহায্য।

৪। **ভারতের স্বাধীনতা** ও ঔপনিবেশিক জাতিগুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব স্বায়ত্তশাসন দেওয়া। এই সব দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সাহায্য।

৫। সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার পরিমাপ উচ্চতর করা।

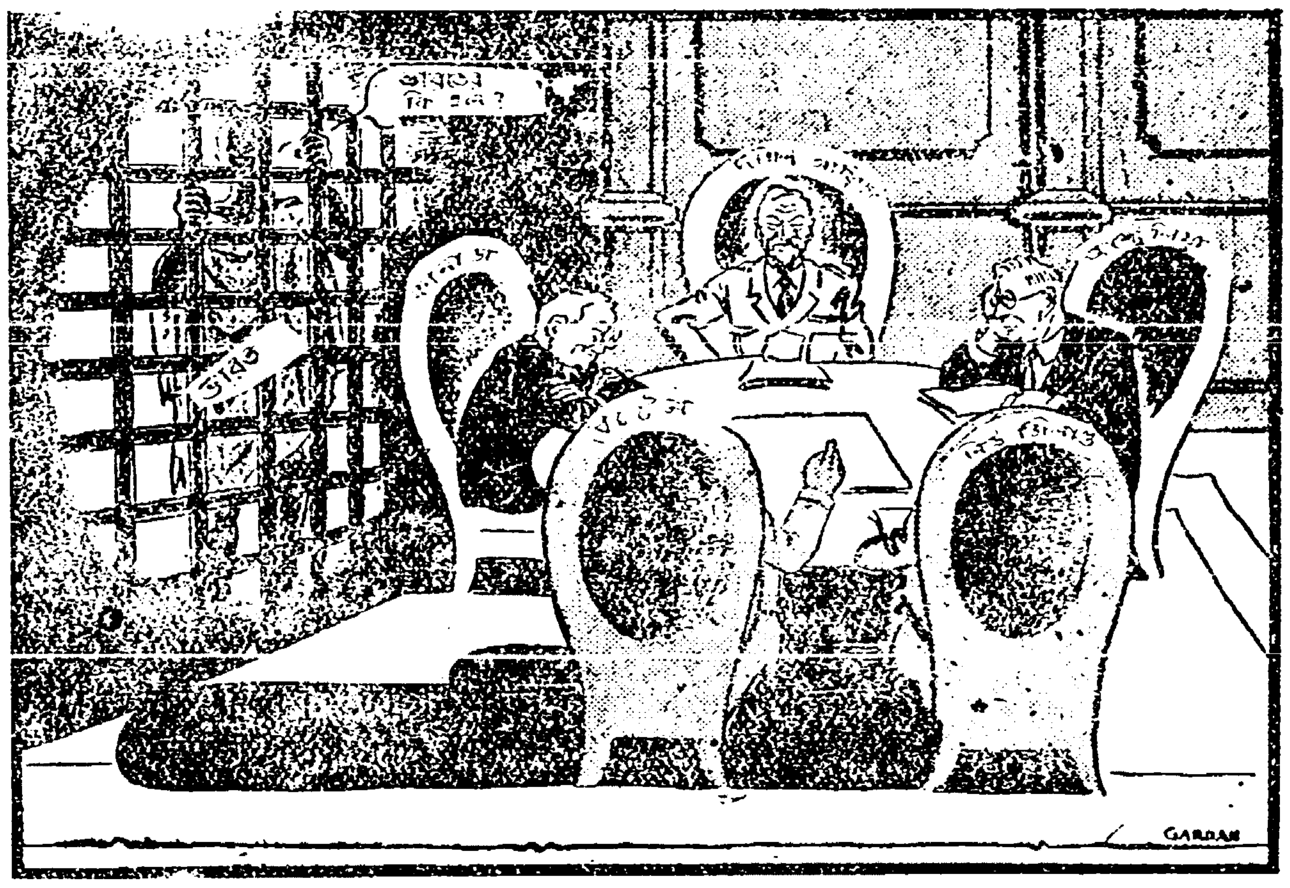

বিলাতের একটী দৈনিক কাগজের কার্টুন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটেনের জনগণ আন্দোলন করিতেছে।

পূর্ণ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট চাই

বৃটেনের গবর্ণমেন্টকে গণতান্ত্রিক করিতে হইলে পার্লামেণ্টের নির্বাচনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিতে হইবেঃ (১) সমানসংখ্যক ভোটারের প্রতিনিধি সংখ্যাও সমান হইবে। বর্ত্তমানের প্রত্যেকটী প্রার্থীর কনষ্টিটুয়েনসীর পরিবর্ত্তে সিঙ্গল্ ট্রান্সফারেবল্ ভোট দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা চালু করিলে প্রত্যেক ভোটদাতার পার্লামেণ্টে-ক্ষমতায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) এই একই কারণে ইউনিভারসিটি, ব্যবসায়-ভোট ও আসনের প্রয়োজন নাই। (৩) সিভিল সার্ভিস, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকিবে না। (৪) ১৮ বৎসর বয়সে সকলেই ভোট দিবে এবং জনসাধারণের কাছে গবর্ণমেণ্ট ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ঘন ঘন জবাবদিহি করিতে হইবে। (৫) প্রত্যেকটী পার্লামেণ্টের জীবন তিন বৎসরের বেশী স্থায়ী হইবে না। (৬) সকলের সমান সুবিধা দিবার জন্য ১৫০ পাউণ্ড ডিপজিট রাখার আইন রদ করিতে হইবে, নির্বাচনব্যায় বরাদ্দ কমাইতে হইবে। সকলের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্বাচনের সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। (৭) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগগুলিকেও পার্লামেণ্টের নিয়মানুযায়ী ভোট ও নির্বাচন প্রথায় চালাইতে হইবে।

সমাজের নব পরিকল্পনা

যুদ্ধের পরে বৃটেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়—শিল্পবাণিজ্যের একাধিপত্য মনোপলিগুলির স্বার্থ রক্ষা, না বৃটেনের সাধারণ অধিবাসীদের সুখ ও সাচ্ছন্দ্য। জনসাধারণের প্রয়োজনকেই একচেটিয়া কারবারীদের স্বার্থের আগে দেখিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতেছে, যুদ্ধের পরে তেমনি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় মালপত্র প্রস্তুত করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাই বর্ত্তমানের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা তখনো থাকিবে। উৎপাদনের ব্যবস্থায় যুদ্ধের মাল তৈরীর স্থানে লোকের দরকারী জিনিষপত্র তৈরী হইবে। তাহার জন্য বর্ত্তমানের এই উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদনে প্রাচুর্য্য দেখা দিবে।

ইহা যাহারা চায় না তাহারাই ধুয়া তুলিয়াছে—যুদ্ধ শেষ হইলেই শিল্প-বাণিজ্যের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া লইতে হইবে। জনসাধারণের স্বার্থের যাহারা প্রতিনিধি তাহাদের লইয়া গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিক্রিয়াশীল মতলব ধ্বংস করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ও রাষ্ট্র-কণ্ট্রোল রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

এই উদ্দেশ্যেই মূল বিষয়গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। শিল্প পরিকল্পনার মধ্যে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিয়া কারখানার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে-হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়, বাড়ী নির্ম্মাণ, খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতির উপর প্রথম নজর দিতে হইবে। রাষ্ট্র পরিচালিত যুদ্ধের কারখানাগুলিকে শান্তির সময়কার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় পরিণত করিতে হইবে। যে সব নতুন কারখানায় মানুষের দরকারী জিনিষপত্র তৈরী হইবে তাহাদের রাষ্ট্র হইতে সাহায্য করিতে হইবে। শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য শান্তির সময় উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব সংগঠিত করিতে হইবে।

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইলেই অস্ত্রশস্ত্রের অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের ছাঁটাই না করিয়া তাহাদের শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন মূল শিল্প, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় কারখানার কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। অন্ততঃ ৪০ লক্ষ নূতন বাড়ী তৈরী করা প্রয়োজন। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নূতন যন্ত্রপাতি ও নূতন উপায় বাহির করিয়া কাজে লাগানো ছাড়া পথ নাই। কণ্ট্রোল না করিলে ব্যক্তিগত কারবারীরা মুনাফা লাভের জন্য উৎপাদনে বিশৃংখলা আনিয়ে দিবে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া জিনিষপত্রের দাম ঠিক করিয়া দিতে হইবে, কি ধরণের জিনিষ ক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিকদের এই সব পরিকল্পনার অংশ গ্রহণ করিতে সুযোগ দিতে হইবে। কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা রাষ্ট্র হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। মুনাফার সীমা নির্দ্ধারণ করা থাকিবে, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর ব্যবস্থা স্থির হইবে! জনসাধারণ যাহাতে কিনিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জিনিষপত্রের দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে। এক কথায় জিনিষপত্র উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য দস্তুরমত পরিকল্পনা করিতে হইবে এবং এই পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বার্থ সবার উপরে থাকিবে। পরিকল্পনার মধ্যে শুধু কারখানার মালিক নয় শ্রমিকদের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইলেও একচেটিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের (মনোপলি) একেবারে শেষ হইতেছে না। সোশালিজম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বহু শিল্প ও কারখানায় এই মূলধনতন্ত্র থাকিতেছে। মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা থাকিলে জিনিষপত্রের দাম ও মুনাফার উপর রাষ্ট্র নজর রাখিতে পারিবে। ছোট ছোট কারবারীদের স্বার্থ রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে। জরুরী শিল্পে রাষ্ট্রের কড়া কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

সংগঠিত শ্রমিক ও তাহাদের ইউনিয়নের সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্র এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিবে না। খনি, রেলওয়ে, কারখানা ও কৃষি শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দিলে স্বার্থান্ধ কারবারীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সমস্ত বৃটেনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিতে রাষ্ট্র সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। যুদ্ধের পর ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে

এই পথে চলিলেই শ্রেণী আধিপত্য দূরীভূত হইবে—কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্য, উৎপাদনের উপায় প্রভৃতিতে একটী শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বের অবসান হইবে—সমস্ত দেশে সোশালিজম প্রতিষ্ঠার দিকে বৃটেন অগ্রসর হইতে থাকিবে। যাহারাই বিশ্বে শান্তি ও প্রগতি চায়, তাহারা সকলেই এই নীতি ও কাজ সমর্থন না করিয়া পারে না।

বৃটেনের আভ্যন্তরীন নীতি

১। প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কণ্ট্রোল চালু রাখা, কণ্ট্রোল ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তির বৃদ্ধি, জনসাধারণের ক্ষমতা বাড়ানো।

২। জমি, কয়লা, বিদ্যুৎ, যানবাহন, লোহা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। যুদ্ধ কালের মত শান্তির সময়ও একই ভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য সংগঠন। শান্তির সময় জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইবেঃ বাসের বাড়ী দিবার দ্রুত ব্যবস্থা; উচ্চ বেতন ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মান বাড়ানোর জন্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দ্রুত ব্যবস্থা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক সার্ভিসের প্রসার। মূল শিল্পগুলির জন্য নূতনভাবে যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম দেওয়া—আধুনিক কায়দায় কারখানায় যন্ত্রাদি স্থাপন।

চীনের জাতী

অপ্রতুল সাহায্য

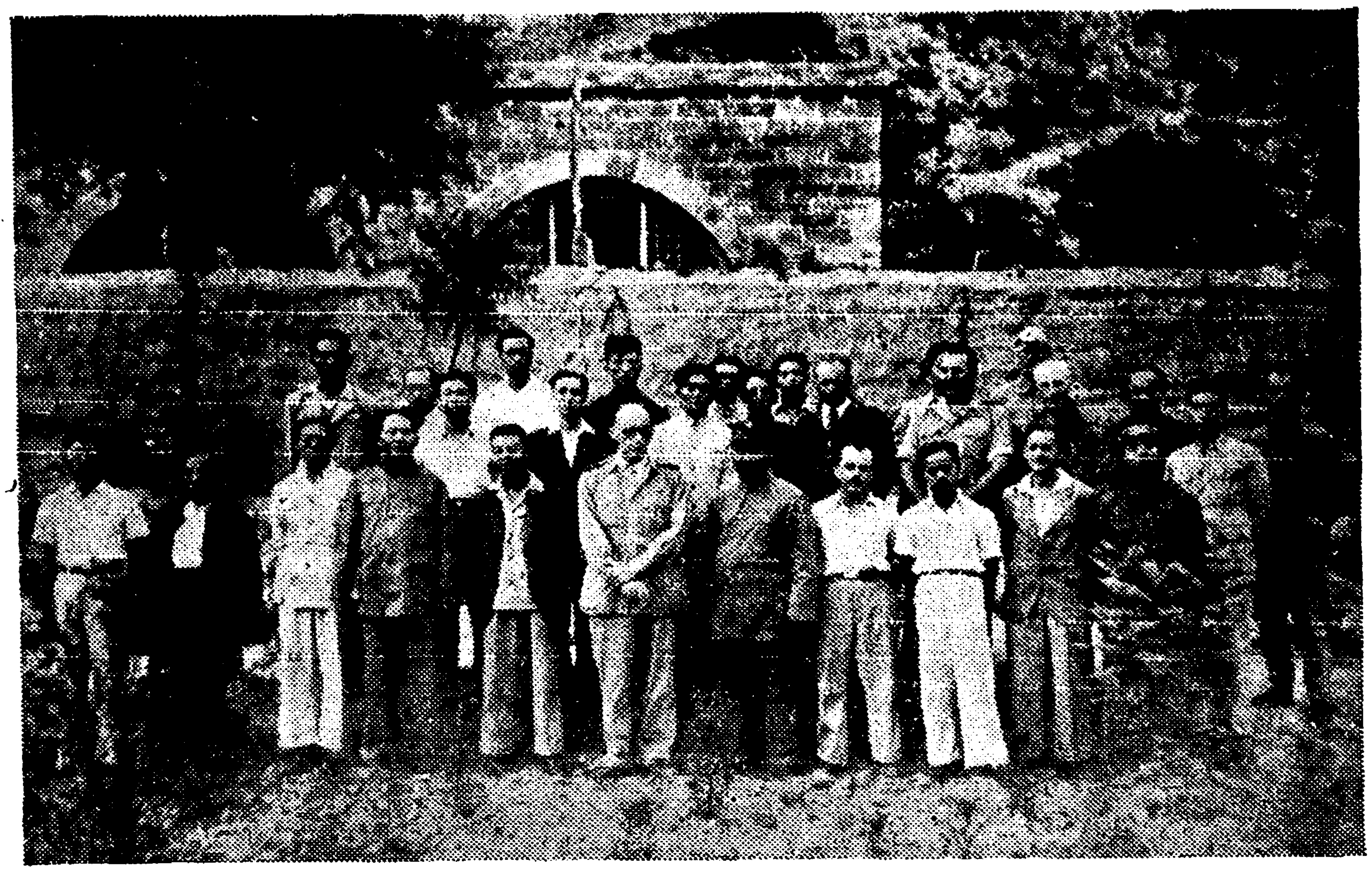

বৈদেশিক সাংবাদিক-দের সাথে চীনের কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। ১ম সারির বাঁদিক হইতে ৪র্থ—মাওসেতুং, ৭ম—চু'তে ; পিছনের সারির ডান দিক হইতে ২য়—চাও-এন-লাই।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর চীনের গণ-পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বয়ং মার্শাল চিয়াং-কাইশেক প্রকাশ করেন, **"গত ছয় মাস যে আমাদের সামরিক বিপর্য্যয় সহিতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—কিংবা যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের প্রতিরোধ যে সঙ্কটসঙ্কুল হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না।"**

তাহার পর গত ১৪ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চীন সম্বন্ধে চার্চিল ও রুজভেল্টের কুয়েবেক কনফারেন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছে, "এপ্রিলের শেষের দিক হইতে জাপান চীনের উত্তর হইতে দক্ষিণে একটা বেষ্টনী রচিবার চেষ্টা করিতেছে এবং **এই চেষ্টায় তাহারা বিপজ্জনক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে।"**

স্পষ্টই বোঝা যায় চীনের জাতীয় প্রতিরোধে একটা সঙ্কটজনক অবস্থা আসিয়াছে। উহার কারণ কি? আমেরিকার বিখ্যাত "লাইফ" নামক পত্রিকার রিপোর্টার থিওডোর হোয়াইট প্রায় ৫ বৎসর চীনে থাকিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের পর গত ১লা মে (১৯৪৪) একটী বিশেষ প্রবন্ধে চীনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে চীনের অবস্থা বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও অন্যান্য তথ্য হইতে আমরা চীনের বর্ত্তমান অবস্থা ও সমস্যার বিবরণ দিতেছি।

কতটুকু মাল চলাচল করে

চীনে বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রথম কারণ চীনের অবরুদ্ধ অবস্থা। ১৯৪২-এর বসন্তকালে বর্মা রোড হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী বিষয়ে চীনকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। থিওডোর হোয়াইট লিখিতেছেন, "বর্মা রোড বন্ধ হইবার সময় আন্দাজ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে চীনের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার মালবাহী মোটর-ট্রাক চালু অবস্থায় আছে। উহার দু'বছর পরে এখন বোধ হয় হাজার পাঁচেক ট্রাক নিয়মিত চলিতে পারে। অন্যগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

তিনি বলিতেছেন যে ট্রাকের সংখ্যা এইরূপ মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষের সময় (যেমন সম্প্রতি হোনান বা কোয়াংটুং প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল) খাদ্য চলাচল বা লোক-অপসারণ সম্ভব হয় না, কাঁচা মাল সহজে কারখানায় পৌছাইয়া দেওয়া যায় না, বিভিন্ন প্রদেশের উপর ও বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সেনাপতিদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব কমিয়া আসিতে থাকে, দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থিক লেন দেন ব্যবস্থাও পঙ্গু হইয়া পড়িতে থাকে। প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া তিনি লিখিতেছেন যে চীনের সব চেয়ে কর্মব্যস্ত রাস্তায়ও দৈনিক মাত্র ১২৫ খানি গাড়ী চলে। চুংকিংগামী তিনটী প্রধান পথের একটীতে দৈনিক গড়ে ৬০ খানি গাড়ী গিয়াছে। যানবাহনের অভাবে ও শিল্পের অভাবে চীনা সৈন্যদের কত কষ্ট ভুগিতে হয়, কিরূপ অসম্ভব অবস্থায় যুদ্ধ করিতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

সৈন্যদের দুরবস্থা

"চীনের সৈন্যদল পদব্রজেই যুদ্ধযাত্রা করে। ডিভিজনের পর ডিভিজন ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলে। পাহাড় পর্বতের বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ধানক্ষেত মাড়াইয়া এই সব উপযুক্ত পরিচ্ছদহীন, পাদুকাহীন, অর্দ্ধ উপবাসী সৈনিকের দীর্ঘযাত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন শুধু তাঁহারাই জানেন দুর্দশা কাহাকে বলে। কোনো কোনো পথে খাদ্য সরবরাহের কোনই ব্যবস্থা নাই এবং সৈন্যদের কখনও কখনও সারাদিন উপবাসীই থাকিতে হয়। খাদ্যের জন্য সৈনিকরা হয়তো কম্বলই বিক্রয় করিয়া দেয় এবং পাহাড়ে শীতের মধ্যে পরস্পর জড়াজড়ি শুইয়া রাত কাটায়। দীর্ঘ যাত্রাপথে কত লোক মারা যায় কিন্তু সাহায্যের উপায় নাই। একটী সৈন্যবাহিনীর কথা আমি জানি—তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছনের কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে ৫০০ মাইল হাঁটিয়া চলিয়াছিল—পথেই তাহাদের শতকরা ৩০ ভাগ মারা যায়। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পর একজন আমেরিকান ডাক্তার তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে শতকরা ১৫ জনই যক্ষ্মাগ্রস্ত। ......চীনা সৈন্য যে যুদ্ধে টিঁকিয়া আছে ইহাই বড় গৌরবের কথা।...

"অবরোধের আরও প্রত্যক্ষ এবং সমান ক্ষতিকর ফল আছে। চীনে তামার অভাব, ইস্পাত-এলয়ের অভাব, বিদ্যুৎ-উৎপাদনী সরঞ্জামের অভাব।...মেশিনগান ও রাইফেলের গুলির সংখ্যা এত কম যে এই সামান্য ভাণ্ডারে ভরসা করিয়া পাশ্চাত্যের কোন সেনাপতিই সৈন্যদলকে যুদ্ধে পাঠাইত না।"

মিত্রপক্ষের সাহায্যের নমুনা

বর্ত্তমানে বিমানপথ ছাড়া চীনে অস্ত্রশস্ত্র, পণ্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাইবার অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। বিমানপথে সাহায্য সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শোনা যায় কিন্তু তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু? মার্কিন-বাহিনীর "এয়ার ট্রান্সপোর্ট কম্যাণ্ডের" অধিনায়ক কর্ণেল লুথার হ্যারিস গত ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক বেতারে বলিয়াছেন যে হিমালয় পার হইয়া "ভারত ও চীনে সরবরাহ যোগান দেওয়াই সব চেয়ে শক্ত ব্যাপার। তবুও সম্প্রতি কোনো এক মাসের মধ্যে বিমান-সরবরাহ বিভাগ (হিমালয়ের) কুঁজের উপর দিয়া ৪৫০০ বার বিমান-পাড়ির ব্যবস্থা করিয়াছে।" পাড়ি মানে যাওয়া-আসা দুইই। যদি ধরা যায় যে প্রত্যেক পাড়ির মালই চীনে পৌছিয়াছে তাহা হইলে মাসে ২২৫০ বার চীনে মাল সরবরাহ হইয়াছে। খুব বেশী করিয়া ধরিলেও একটী বিমানে না হয় ১০ টন করিয়াই মাল পৌছাইয়াছে ধরিলাম। তাহা হইলে কর্ণেল লুথারের বক্তব্যের শাদা অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে মাসে মাত্র ২২,৫০০ টন মাল চীনে পৌছায়। যে দেশে প্রায় এক কোটী সৈন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং যুদ্ধ করা প্রয়োজন সে দেশে এই মাল কি কাজে লাগিবে?

চীনের এই দুর্বলতা জানে বলিয়াই জাপান আজও বর্মা রোড আঁকড়িয়া বসিয়া আছে এবং চীনের যে দুই একটী বন্দর তাহাদের অনধিকৃত ছিল সম্প্রতি তাহাও দখল করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়েনচো বন্দর দখল করিয়াছে, এখন শুধু ফুচো বাকী রহিল।

মুদ্রাস্ফীতি, মজুতদারী, দুর্নীতি

চীন যুদ্ধের দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ আভ্যন্তরীণ। প্রথমত মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা। জাপানের কাছে চীন তাহার অধিকাংশ শিল্পই হারাইয়াছে, মিত্রপক্ষও শিল্প পুনর্গঠনে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে নাই, সুতরাং শিল্পের লাভ হইতে যুদ্ধের খরচ নির্বাহ করার উপায় নাই। যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য চীন সরকার এলোপাতাড়ি নোট ছাপাইয়া চলিয়াছে। থিওডোর হোয়াইট বলিতেছেন যে মাত্র ১৯৪৩ সালেই "প্রায় ৪ হাজার কোটী চীনা টাকা (ডলার) ছাপানো হইয়াছে। এ বৎসর আরও বেশী হইবে।" (ভারতে যুদ্ধের কয় বৎসর মিলিয়া মোট প্রায় ৯০০ কোটী টাকা মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে—তাহাতেই আমাদের কিরূপ ভুগিতে হইতেছে!)

ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি, মজুতদারী, দুর্নীতি, ঘুষ প্রভৃতি দেশকে ছাইয়া ফেলিতেছে। শহরে শহরে খাদ্যাভাবের হাহাকার চলিয়াছে। বাহির হইতে চীনে পণ্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বাড়াইবার উপরই এই সমস্যার সমাধান প্রধানত নির্ভর করে।

গণতান্ত্রিক অধিকার নাই

চীন যুদ্ধে দুরবস্থার আভ্যন্তরীণ দ্বিতীয় কারণ হইল দেশের ভিতর গণতন্ত্রের অভাব। গত ১২ই জুন কয়েকজন আমেরিকান ও বিদেশী সংবাদদাতা চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মাওৎসে তুংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য বর্ত্তমানে তাঁহাদের আপোষ-আলোচনা চলিতেছে, সেই কারণে তিনি ঐ বিষয়ে এখন কোন মন্তব্য করিতে রাজী হন না। তিনি তাঁহাদের বলেন :

"ইয়োরোপে এখন যুদ্ধের চুড়ান্ত পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে, চীনেও সেই পর্য্যায় শীঘ্রই আসিবে। কিন্তু যুদ্ধকে অগ্রসর করাইবার জন্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন চীনে তাহার অভাব।...আমাদের ঐক্য চাই, ঐক্য করিতেই হইবেই, কিন্তু সে ঐক্য গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

কুয়োমিণ্টাংয়ের দমননীতি

কমিউনিষ্ট এলাকা ছাড়া চীনের অন্য সর্বত্রই কুয়োমিনটাং পার্টির একচ্ছত্র প্রভুত্ব। থিওডোর হোয়াইট লিখিতেছেন : "চীনের রাজনীতি বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে শাসন পরিচালনার যন্ত্র একটী মাত্র পার্টির হাতে।...চুংকিংয়ে বাস করিলেই বোঝা যায় লোকের ব্যক্তিগত জীবনের

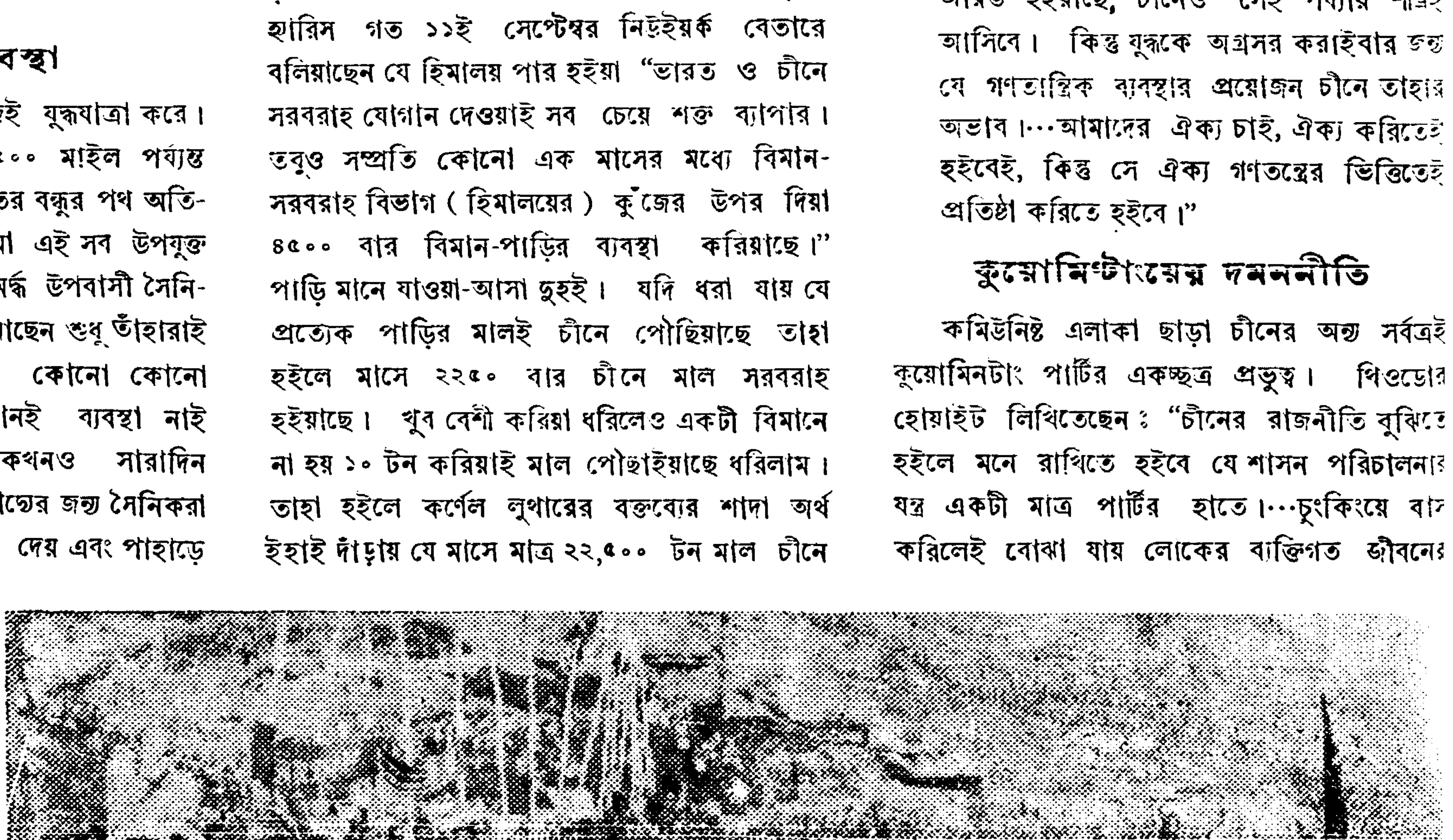

চীনের কমিউনিষ্ট এলাকায় একটী জনসভা। জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির (

...য় সংগ্রামের অবস্থা ও সমস্যা

● আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ● গণতন্ত্রের অভাব

উপর এই পার্টির বোঝা কতখানি। লেখক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রনির্ম্মাতা প্রভৃতি যাঁহারাই জনসাধারণের কথাকে ভাষা দিতে পারেন তাঁহাদের উপর সেন্সরের পাহারা। গল্পগুজব এবং সরকার ও সংবাদ-এজেন্সীগুলির বিবৃতির উপরই সংবাদপত্র চালাইতে হয়। দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, অবরোধ, বৈদেশিক সম্বন্ধ বা রাষ্ট্রনায়কদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি চীনের কোনো গুরুতর সমস্যাই প্রকাশ্যে সমালোচনা করার উপায় নাই।...১৯৪৩এর শীতকালে "তা কুং পাও" (চীনের বৃহত্তম সংবাদপত্র) কাগজে হোনান দুর্ভিক্ষের বিবরণ বাহির হয়। দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গী দুর্নীতি, অত্যাচার ও অকর্ম্মণ্যতার কথা তাহাতে তোলাই হয় নাই। তবুও তৎক্ষণাৎ তিনদিনের জন্য ঐ কাগজের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।...চীনে শুধু একটী নয় দুইটী গুপ্ত পুলিশ বিভাগ আছে।...তাহাদের গুপ্তচর ও দালাল সর্বত্র। যে কোনো কাল্পনিক অভিযোগে লোককে গ্রেপ্তার করিয়া জেল বা বন্দীশিবিরে রাখিয়া দেওয়া যায়।

কুয়োমিণ্টাংয়ের ভিতরেও গণতন্ত্র নাই

"...কুয়োমিণ্টাংয়ের কর্তৃত্ব উহার কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির হাতে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ উঁহাদেরই কাজ। সমস্ত পার্টি চক্র (সেল) হইতে পার্টি কংগ্রেসে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তাঁহাদের ভিতর হইতেই এই কার্য্যকরী সমিতির সভ্য বাছাই করা হয়। ১৯৩৫ সাল হইতে আর পার্টি কংগ্রেসের জন্য কোন নির্বাচন হয় নাই। সুতরাং ৯ বছর আগে, আধুনিক চীন ইতিহাসের অতি প্রতিক্রিয়াশীল যুগে যে-লোকগুলি নির্বাচিত হইয়াছিলেন—বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাদেরই সৃষ্টি। তখন যেসব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কিছু অংশ ওয়াং চেং উইয়ের সঙ্গে জাপানের দলেও ভিড়িয়া গিয়াছেন।

"১৯৩৫-এর নির্বাচনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কুয়োমিণ্টাংয়ের সভ্যসংখ্যা প্রায় চারগুণ বাড়িয়াছে।...(এই নূতন সভ্যদের) কাহারও ভোটের অধিকার নাই; পার্টি সিদ্ধান্তে মতামত দিবার উপায় নাই।...

"যুদ্ধের গোটা যুগ ধরিয়া শিক্ষার মান সঙ্কটজনক ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। বিপর্য্যয়ের আঘাতে খানিকটা, কিন্তু শিক্ষাগত স্বাধীনতার বিকৃতিতেও খানিকটা। শিক্ষকেরা ক্লাসে জাতীয় সমস্যা আলোচনা করিতে পারেন না; উপর হইতে যে সব উপদেশ আসে তাহাই তাঁহাদের পাখীপড়ার মত উগরাইয়া যাইতে হয়।...

কমিউনিষ্ট এলাকা

বাহিরে যে সমস্ত খবর যায় কেন্দ্রীয় সরকার তাহা হইতে "উত্তরে কমিউনিষ্ট বাহিনীগুলির কার্য্যকলাপের বিবরণ একেবারে কাটিয়া দেন।... কমিউনিষ্ট সৈন্যদলগুলির কৃতিত্বের কথা ছোট করিয়া দিবার জন্য জাতীয়তাবাদীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সৈন্যদলে কয়েক লক্ষ সৈন্য আছে; শানটুং, হোপি, শানসি, উত্তর কিয়াংসু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলিতে তাহারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। বাহির হইতে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে, তবুও জাপানী সৈন্যনিবাস ও রেলওয়েগুলির চারিদিক ঘিরিয়া তাহারা জনসাধারণকে লইয়া প্রতিরোধের জাল গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় জাপানীদের কাছে কাড়িয়া লওয়া অথবা ঘরে তৈয়ারী করা।

"...কমিউনিষ্ট সৈন্যদলগুলির জন্য প্রেরিত চিকিৎসার সরঞ্জাম পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পাহারাদারেরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। (কমিউনিষ্ট) অষ্টম বাহিনীতে স্বাস্থ্যের অবস্থা কেন্দ্রীয় এলাকার মতই খারাপ, অথচ তাহাদের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি অনেক কম। কমিউনিষ্টদের কেন্দ্রীয় হাসপাতালে এবার শীতকালে মাত্র এক সেট অপারেশনের যন্ত্র ছিল, তাও সম্পূর্ণ নয়। কশাইয়ের ছুরি ও ছুতারের করাত দিয়া তাহারা অস্ত্র-চিকিৎসা চালায়, গৃহিনীদের সেলাইয়ের সূঁচ হইতে সার্জিক্যাল সূঁচ বানাইয়া লয়, কাঁচি, ছুরি, ফর্সেপ প্রভৃতি স্থানীয়ভাবে তৈয়ারী করিয়া লয়।"

চীনের জাতীয় প্রতিরোধের অবস্থা ও সমস্যা এইগুলিই। ভারত ও ব্রহ্মের গণতান্ত্রিক অধিকার

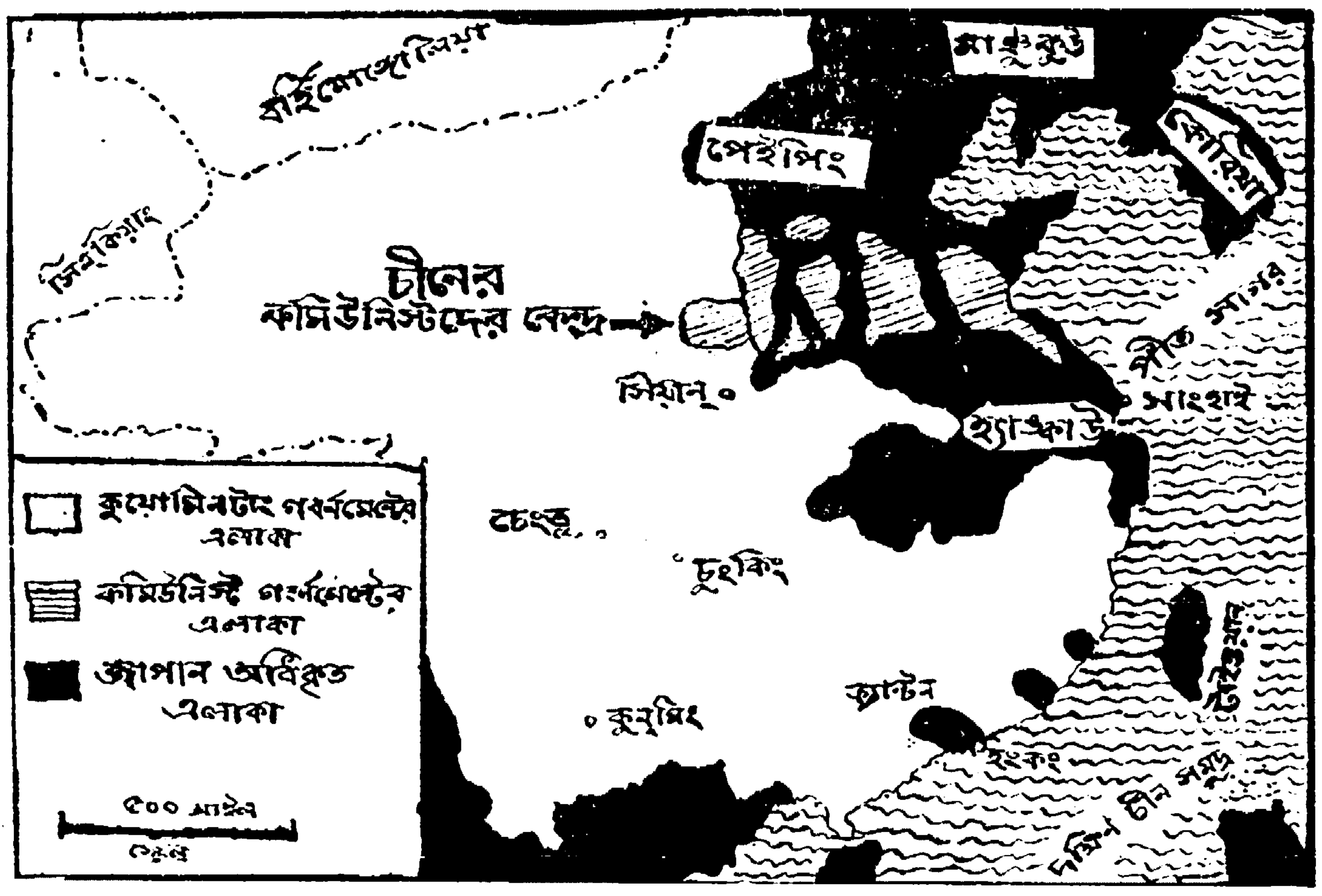

চীনের বর্ত্তমান মানচিত্র

স্বীকার করিয়া ভারতীয় ও বর্মীদের প্রচণ্ড প্রেরণা ও কর্ম্মক্ষমতা লইয়া বর্মার যুদ্ধে অগ্রসর হইলে মিত্রপক্ষ অতি শীঘ্রই বর্মার যুদ্ধ জিতিতে পারে। তাহাতে বর্মা রোড উন্মুক্ত হয়, চীনের প্রতিরোধ ক্ষমতা হাজার গুণ বাড়িয়া যায়। আর চীনের মধ্যে কুয়োমিনটাং যদি জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেয় তো সেখানকার দেশদ্রোহীরা পরাস্ত হয়, সমস্ত চীনবাসীর মনে আশা ও সংগ্রামের নূতন উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠে, চূড়ান্ত সংগ্রামের পর্য্যায়ে চীনের চুড়ান্ত জয়লাভ অবধারিত হইয়া উঠে।

> এই প্রবন্ধ ছাপিতে যাওয়ার পরে খবর পাওয়া গেল চীনের কুয়োমিণ্টাং সরকার নাকি রাজি হইয়াছে যে, কমিউনিষ্ট এলাকাগুলি মানিয়া লওয়া হইবে। ঐ সব এলাকার উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইবে এবং কমিউনিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে বাড়াইয়া ১০ ডিভিসনে পরিণত করা হইবে। প্রস্তাবের বিশেষ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে মনে হয় কুয়োমিণ্টাং এখন গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন কিছুটা অনুভব করিতেছে।

★ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানী শাসন ★

উৎপাদন হ্রাস : জনগণের বিদ্রোহ

[চীনের কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র "সিন-হুয়ের পাও" (৮ই আগষ্ট, ১৯৪৪) হইতে গৃহীত]

জাপ শাসনের নমুনা

জাপ ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার আগে বার্ম্মা, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশগুলি ছিল খুবই সম্পদশালী। কিন্তু আজ জাপ-সামরিক শাসনের অধীনে এই সব দেশের অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

এই দেশগুলি জাপানীরা জয় করার আগে রবার-শিল্পই ছিল এই সব দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যুদ্ধের আগে রবারের বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৩৫ কোটি মণ। তন্মধ্যে মালয় ও ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের উৎপাদন ছিল ২৮ কোটি মণের বেশী। বাকী অংশ ফরাসী ইন্দো-চীন ও থাইল্যাণ্ডে উৎপন্ন হইত। ইয়োরোপ ও আমেরিকায়ই ইহার বেশী কাটতি ছিল। যুদ্ধের আগে উৎপাদনের মাত্র শতকরা ৬ ভাগ জাপান কিনিত। কিন্তু আজ জাপানের দখলে আসার পর মালয়, ডাচ ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশের রবার সম্পদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উৎপাদন নাই বলিলেই চলে। ফলে এই শিল্পের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানই আজ বন্ধ এবং যে দশলক্ষ মজুর ইহাতে কাজ করিত তাহারা বেকার।

যুদ্ধের আগে জাভা ও ফিলিপাইন ছিল চিনির জন্য বিখ্যাত। লক্ষ লক্ষ মণ চিনি এদেশে উৎপন্ন হইত। তন্মধ্যে উৎপন্ন মালের শতকরা ৭৫ ভাগ যাইত ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে। ফিলিপাইনের উৎপন্ন মালের শতকরা ৯০ ভাগই আমেরিকায় যাইত। সুতরাং এই সব দেশে রপ্তানী বন্ধ হওয়ার ফলে এই শিল্প একেবারে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। মাঝখানে জাপানীরা চেষ্টা করিয়াছিল চিনি হইতে মদ তৈয়ার করিতে। কিন্তু তাহাতে আর কত পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হইতে পারে? তাই আজ চিনি শিল্পের ২০ লক্ষ মজুর ফিলিপাইনে বেকার ও জাভার ৩০ লক্ষ মজুর কাজের অভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতেছে।

চাউলের ব্যাপারেও ঠিক ঐ একই অবস্থা। পৃথিবীর ভিতর চাউল উৎপাদনের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বার্ম্মা। বৎসরে সেখানে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হয় এবং তাহার ভিতর শতকরা ৬০ ভাগই বাহিরে চালান যাইত। এখন অবস্থা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কৃষকদের আজ হয় চাউল নামমাত্র দামে জাপানীদের কাছে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে, নতুবা তাহাদের গোলায় ইহা পচিয়া যাইতেছে। বার্ম্মায় এত চাউল অথচ জাপ-অধিকৃত মালয়ে ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে খাদ্যের দারুণ অনটন, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিন কাটায়। জাপানী শাসনকর্ত্তারা বড় বড় বুলি আওড়াইয়া বলিয়া থাকে —'পরাধীন এশিয়াবাসীদের রক্ষার জন্যই এই অভিযান'। কিন্তু যখন তাহাদেরই অধিকৃত দেশের একস্থানে দারুণ খাদ্যাভাব এবং অন্য স্থানে প্রচুর খাদ্য মিলিতেছে, তখন সেই খাদ্যদ্রব্য চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যাভাব না মিটাইবার অর্থ কি?

অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ

আজ জাপ-অধিকৃত দেশগুলির অভ্যন্তরে দারুণ অশান্তি দেখা দিয়াছে। অত্যাচার, নিপীড়ন, সাথে সাথে বস্ত্রাভাব, খাদ্যের অনটন প্রভৃতিতে দেশের সাধারণ লোক মরিয়া হইয়া জাপ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

ভাষার ব্যবধান, গোত্রের পার্থক্য, শ্রেণীর বৈষম্য প্রভৃতি কোন কিছুই জনগণের প্রচেষ্টাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই। ডাচ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরাই চীনাদের সাথে, বার্ম্মার জনসাধারণের সাথে, এমন কি সেলিবেস, বর্ণিয়ো প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীদের সাথে আজ একজোট হইয়া ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে।

রয়াল ডাচ পেট্রোল কোম্পানীর তেলের খনিগুলি হইতে জাপানীরা তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় পেট্রোল পায়। এখানকার জাপবিরোধী গেরিলারা তেলের খনিগুলিকে অনেকস্থানে অচল করিয়া দিয়াছে। জাপানীরা মাঝে মাঝে সেগুলি মেরামত করে, কিন্তু পরের মূহূর্ত্তে গেরিলারা আবার তাহাকে অচল করে। সুমাত্রা, জাভা, সেলিবেস, বর্ণিয়ো, ডাচ নিউগিনি প্রভৃতি দেশের জাপবিরোধী গেরিলাবাহিনীর কার্য্যকলাপ জাপানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখন পর্য্যন্ত মিত্রবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। ফলে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঔষধ ও ডাক্তারী জিনিষপত্রের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

মালয়ে চীনা দেশভক্তদের ঘাঁটি খুবই মজবুত এবং এদের সংগঠনও যথেষ্ট ব্যাপক। যখনই জাপানীরা মালয় অধিকার করে তখনই এই দেশভক্তের দল সাধারণ চীনা অধিবাসীদের ভিতর কাজ সুরু করিয়া দেয়। তাই অতি তাড়াতাড়ি এখানে গড়িয়া উঠিল এক বিরাট গেরিলাবাহিনী। আস্তে আস্তে এই বাহিনীতে যোগ দিতে লাগিল স্থানীয় ইংরাজরা, ভারতবাসীরা এবং মালয়ের অধিবাসীরা। অসম্পূর্ণ খবর হইতে জানা গিয়াছে বর্ত্তমানে কোটা, জোহল এবং অন্যান্য স্থানে ১৫টি গেরিলাবাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাইয়া যাইতেছে। তাহাদের নিজস্ব সংবাদপত্রও আছে। তাহারা দেশের যে এলাকায়ই থাকুক না কেন সর্ব্বত্রই তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের এই প্রতিরোধ সংগ্রামের সমর্থকও করিয়া তোলে। এই গেরিলাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের মধ্যে অনেকেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী করার সাথে সাথে জাপানী শাসকদের নির্মমতা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার, গির্জ্জা ও মন্দির ধ্বংস করা প্রভৃতি কাজ জাপানীরা নিষ্ঠুরভাবে চালাইয়া যাইতেছে। ফলে, জাপ বিরোধী গণফ্রণ্টে সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক আসিয়া দানা বাঁধিতেছে। জাপ অধিকৃত এলাকায় আজ গেরিলাবাহিনীর কাজ সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাই জাপানী শাসকবর্গও এ সমস্যাকে আজ ভয়ের চোখেই দেখিতেছে।

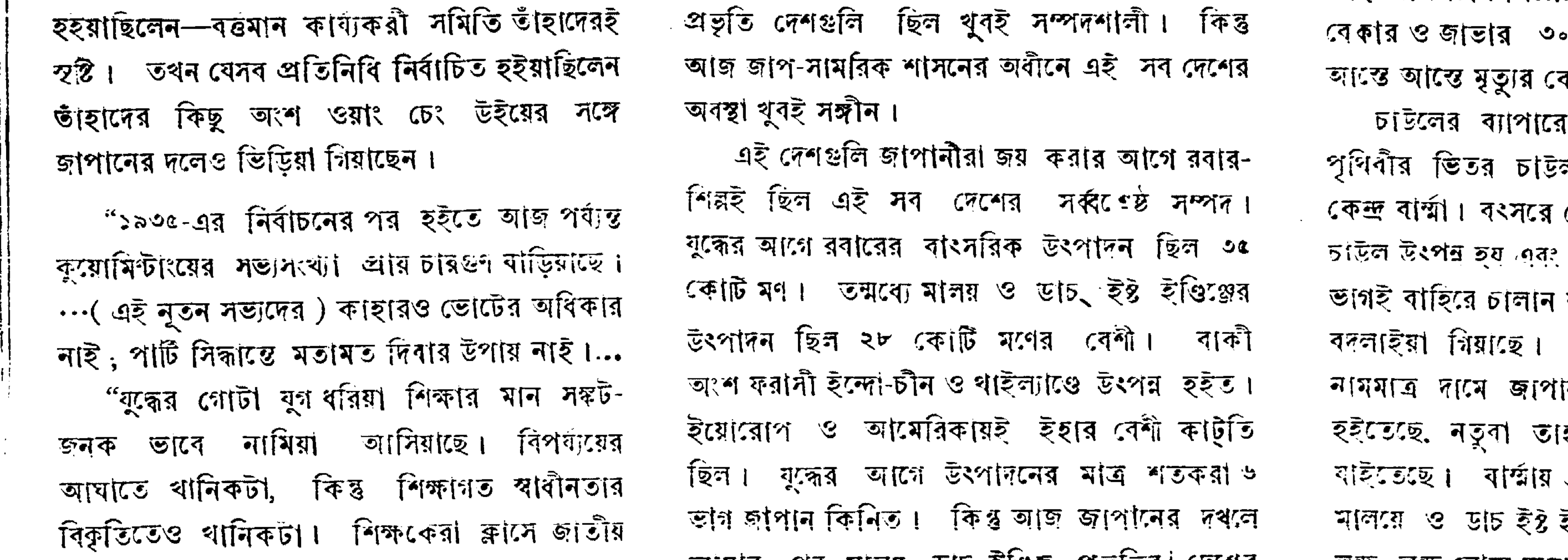

...নতা'ওকানো (বামদিকের দণ্ডায়মান লম্বা ব্যক্তির বামে তৃতীয় ব্যক্তি) বক্তৃতা করিতেছেন।

লেখক ঃ
আইভর মণ্টেগু

জার্মানীর ভবিষ্যৎ

১৯১৮ ও ১৯৪৪-এর পার্থক্য

যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোশালিষ্ট ও লিবারল মহলে চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে।

তেহেরান সম্মেলনে যে তিন প্রধান শক্তি সমবেত হইয়াছিল সেই ব্রিটিশ, সোভিয়েট ও আমেরিকান সরকারের মতলব লইয়া কেহ কেহ আশঙ্কা অনুভব করিতেছে। অন্য দেশের মত জার্ম্মানীর প্রতিও সুবিচার না হইলে ভবিষ্যতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আর এক যুদ্ধের বীজ বপন ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করে।

আতলান্তিক ঘোষণা অনুযায়ী বিজয়ী কিম্বা পরাজিত দুনিয়ার সকল জাতিকেই সমান অধিকার দিবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহারা আজ শঙ্কিত, তাহাদের মত এই যে যুদ্ধের শেষ গোলা ছোড়া হইবার পর তখনই জার্ম্মানীকে ঐ অধিকার দিলেই আবার শান্তিভঙ্গের কারণ থাকিবে না।

বর্ত্তমান জার্ম্মানীর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতা আছে বলিয়াই এই মত প্রচলিত রহিয়াছে।

১৯১৮ সালের সঙ্গে ১৯৪৪ সালের প্রভেদ আছে। ইতিহাসে কখনও ঘটনার অবিকল পুনরাবৃত্তি হয় না। ১৯১৮ সালে জার্ম্মানী অক্লেশে গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিবার পক্ষে তৈয়ার ছিল, তখন মিত্রপক্ষের প্রগতি-বিরোধীরাই বাধা দিয়াছিল। কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে কেবল হিটলারের অনাচার সরাইতে পারিলে আজই জার্ম্মানী গণতান্ত্রিক হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান জার্ম্মানীর প্রকৃত স্বরূপ

জার্ম্মানীর তরুণ সম্প্রদায়কে আজ হিটলারীরা জঘন্যভাবে বিকৃত করিয়াছে। কেবল যে তরুণ সম্প্রদায়েরই এ দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহা নয়। জার্ম্মানীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। রুশিয়া ও অন্যান্য অধিকৃত দেশে নাৎসি যোদ্ধারা যে কাণ্ড করিয়াছে এবং জার্ম্মানীর মধ্যে সাধারণ নাগরিকরা রুশ বন্দীদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এখন যাহা কিছু লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষ দেখিবে যে জার্ম্মানীর সমাজ বহুদিন নীতি-বিচ্যুত থাকিয়া যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নানারকম আজগুবি, সমাজ ও মানবতার বিরোধী, নির্ব্বোধ মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে এবং না মরিলে যাহাদের স্বভাব যায় না তেমনি যে সব নাৎসী আছে তাহারা প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাইয়া দেশে আবার একটা গেরিলা আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টায় আছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া তখনই আত্মসমর্পণ করিতে তাহারা রাজী নয়।

ইহাই হইল জার্ম্মান সমস্যার প্রধান কথা। অন্যদেশে জার্ম্মানী হইতে এই ছোঁয়াচে রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, আবার নূতন করিয়া পররাজ্য গ্রাসের চেষ্টা যাহাতে না হয় অন্তত আগামী দুই পুরুষ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে শান্তিতে বাস করিতে পারে—ইহাই আজিকার সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের বিকৃত মতবাদ

এইভাবে বাস্তবিক যাহা ঘটিতেছে, তাহা মানিয়া লওয়া "ভ্যান্সিটার্টবাদ" একেবারেই নয়। ভ্যান্সিটার্টের মতে "জার্ম্মান চরিত্রেই" একটা বিশ্রী দোষ আছে। ভ্যান্সিটার্টের মতে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা ভুলিয়া যায় যে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান রূপ কদর্য্য হওয়ার দায়িত্ব কয়েকটা শ্রেণী ও তাহাদের কার্য্যক্রমের উপর পড়িবে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে এক সময় বিলাতের লক্ষপতিরা, আর ইঙ্গ-জার্ম্মান মৈত্রীসভার রক্ষণশীল সদস্যেরা আনন্দে হিটলারের রক্তাক্ত হস্ত মর্দ্দন করিয়াছিল। তাহারা ভুলিয়া যায় যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হত্যা করার জন্য দায়ী কেবল হিটলার নয়, চেম্বারলেনও সে পাপের ভাগী। তাহারা ভ্যান্সিটার্টের বুলি আওড়াইয়া অন্যান্য অহমিকাসর্ব্বস্ব জাতি কর্ত্তৃক জার্ম্মানীর শোষণ চায়।

কিন্তু "ভ্যান্সিটার্টবাদের" মত কিম্বা তাহার চেয়েও মারাত্মক আর এক বিপদ রহিয়াছে। পূর্ব্ব-ইয়োরোপ হইতে সোভিয়েটের গণতান্ত্রিক প্রভাবের প্রসার বন্ধ করার মতলবে একটা শক্তিশালী, ধনতন্ত্রবাদী, জমিদার-পুঁজিদার পরিচালিত রাষ্ট্র হিসাবে মাঝ রাস্তায় জার্ম্মানীকে পুনর্গঠন করার যে জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, তাহাই হইল বিপদের কথা।

বৃটেনে ও আমেরিকায় যে মিউনিক-ওয়ালার দল বাস্তবিকই ফ্যাশিজমের বন্ধু, তাহারা এখনও নিজেদের কর্ত্তৃত্বের স্বপ্ন দেখে। আর মুস্কিল হইল এই যে বামপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা, তিলমাত্র দুরভিসন্ধি না লইয়া এখনই জার্ম্মানীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার কথা বলিতেছেন, জার্ম্মানী হইতে ফ্যাশিজম্ একেবারে নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ইয়োরোপের শান্তি ব্যবস্থার কথা না ভাবিয়া এখনই ঐরূপ দাবী করিতেছেন, তাঁহারা সোজাসুজি ঐ কুচক্রীদের হাতে গিয়া পড়িতেছেন।

এই বামপন্থীরা ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির সময় ঠিক এই রকম একটা ভুল করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়া ও সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে ফলাফল কি হইবে না ভাবিয়া নাৎসিরোগগ্রস্ত সুদেতেন জার্ম্মানদের "আত্মনিয়ন্ত্রণের" দাবী বেমালুম মানিয়া লইয়াছিলেন।

মিত্রশক্তির দায়িত্ব

মিত্রপক্ষের অনেক কাজ রহিয়াছে।

প্রথমত, ইয়োরোপকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে জার্ম্মানীর পক্ষে আবার দেশজয় করার জন্য যুদ্ধে নামা পাগলামির নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়, সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে যুদ্ধ যাহাতে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জার্ম্মানীর মধ্যে মার্জ্জিতরুচি যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রভাব ও শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আর বর্ব্বরের দল ক্রমেই নিরাশ হইবে, দেশের লোকের কাছে সমস্ত কদর হারাইবে।

গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানী কেমন করিয়া পররাজ্যগ্রাসপটু যুদ্ধযন্ত্র নূতন করিয়া বানাইতে পারিয়াছিল? কারণ হইল এই যে বিজয়ী মিত্রপক্ষ তখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীকেই শক্তিশালী করিয়াছিল। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষের জার্ম্মানী সুযোগ লইয়া একবার ইহার, একবার উহার সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছিল।

কিন্তু বিশবৎসর ধরিয়া ব্রিটেন ও সোভিয়েটের মধ্যে সহযোগিতা চলিবে বলিয়া যে চুক্তি রহিয়াছে, তাহার আবহাওয়াতে জার্ম্মানী আগেকার কাণ্ড আর করিতে পারিবে না।

তেমনই আবার গত যুদ্ধের পর জার্ম্মানী তাহার প্রতিবেশীদের রাজ্যলোভ দেখাইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে পারিয়াছিল। তাই হিটলার টেশেনের লোভ দেখাইয়া পোলাণ্ডের শাসকদের হাত করিয়াছিল, কার্পেথো যুক্রেনের লোভ দেখাইয়া হাঙ্গেরীকে, সালোনিকার প্রতিশ্রুতি দিয়া বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লোভিয়ার বড় কর্ত্তাদের দলে টানিয়াছিল।

কিন্তু এই যুদ্ধের পর নূতন ইয়োরোপে জার্ম্মানীর পাশাপাশি সকল রাষ্ট্রকে শক্তিশালী, অর্থনীতি ব্যাপারে আত্মনির্ভর, শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক এবং সোভিয়েটের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতেই হইবে।

শক্তিশালী পোলাণ্ডই জার্মানীকে শান্তির পথে অবিচলিত রাখিবে

স্বাধীন, শক্তিশালী পোলাণ্ড নিতান্ত দরকার। নহিলে পোলাণ্ড মজবুৎ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। পোলাণ্ড যদি পূর্ব্বে যে সব অঞ্চল ন্যায়তঃ সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে প্রভুত্ব করে, এবং যদি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির জন্য পূর্ব্ব প্রাশিয়ার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহা জার্ম্মানীরই পোষ্য হইয়া থাকিবে, আর আবার যুদ্ধকামী জার্ম্মাণী খাড়া করাইতে লাগিয়া যাইবে।

এইজন্য পোলাণ্ডকে জার্ম্মাণী হইতে কিছু জমি ছিনাইয়া সমুদ্রতীরে কতকটা জায়গা আর শিল্প ও কাঁচামালের জন্য পশ্চিমে কতকটা জায়গা দেওয়া দরকার। পোলাণ্ডের পূর্ব্বে যে সব অঞ্চল লণ্ডনের পলাতক পোলিশ 'সরকার" দাবী করে, সেগুলি জোর করিয়া সোভিয়েট যুক্রেন ও শ্বেতরাশিয়া হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। অপরপক্ষে জার্ম্মাণীর কাছ থেকে যে সব অঞ্চল লইয়া পোলাণ্ডকে দেওয়া উচিত সেগুলি এককালে খাস পোলাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, বহুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা আক্রমণ করিয়া সেখানে জাঁকিয়া বসিয়া সেটাকে জার্ম্মাণ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ঐ সব অঞ্চলে বড় বড় জার্ম্মান জমিদাররা জার্ম্মানীর উপর একটা অভিশাপের মত চাপিয়া বসে। তাহারা চিরকাল গণতন্ত্রের প্রসারকে বাধা দিয়াছে। পূর্বদিকে জার্ম্মান "সাম্রাজ্য বিস্তারের" পাণ্ডা হইয়া আছে।

এই অভিশাপ দূর করিতে পারিলে জার্ম্মানীর পক্ষেই শান্তিতে থাকা সম্ভব হইবে। তাই এই অঞ্চলগুলি ছিনাইয়া লইলে শুধু অন্য দেশ নয়, জার্ম্মানীরও স্বার্থকে সাহায্য করা হইবে।

তেমনই জার্ম্মানীর পশ্চিম সীমান্তে এক শক্তি-শালী, নবজাগ্রত ফ্রান্স বিশেষ প্রয়োজন।

অপরাধীদের সাজা ও লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ চাই

জমি হাত বদল করার চেয়ে বদমায়েসদের সায়েস্তা করার কাজ কম জরুরী নয়। দুইটা জিনিষ রীতিমত দরকার; এ যুদ্ধে যাহারা প্রধান অপরাধী তাহাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা এবং হিটলার অন্য দেশে যে লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য্য চালাইয়াছে, তাহার অন্তত আংশিক ক্ষতিপূরণ।

পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধে বিজয়ীরা প্রতিশোধ লইবার জন্য বিজিত দেশ শোষণের যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার সহিত এ প্রস্তাবের কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই।

ফ্যাশিষ্টদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, এবং অপরাধের অনিবার্য্য ফল হিসাবে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলে ফ্যাশিষ্ট বদমায়েসদের দুষ্কর্ম্ম একেবারে জাহির হইয়া পড়িবে। নীতি ও সামাজিক বিধির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে।

সোভিয়েট অর্থনীতিক ভার্গা ক্ষতিপূরণের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ। কলকব্জা এক দেশ হইতে অন্য দেশে পাঠাইতে হইবে। কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করার জন্য শ্রমিকও পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ইহা প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নয়। কেবল যে সব দেশ ফ্যাশিষ্টরা লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, সেখানে যাহাতে অন্তত জার্ম্মানীর মতই তাড়াতাড়ি পুনর্গঠন সমাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

ইঙ্গ-সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃত্ব জার্ম্মানীর কল্যাণই আনিবে

এই কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ করিতে হইলে বেশ কিছুকাল ধরিয়া কতকগুলি অঞ্চলে সামরিক অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব রাখিতে হইবে। যুদ্ধ থামিল বলিয়া বাঁশী বজিলেই মিত্রপক্ষের কাজ শেষ হইবে না। আবার যাহাতে আমাদের সন্তানেরা যুদ্ধে নামিতে বাধ্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে করিতে হইবে।

নাৎসি শাসকদের পথ জার্ম্মান জাতিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে?

আতলান্তিক ঘোষণায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কতদিন পরে জার্ম্মানীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা চলিবে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে "বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক জাতি সংসদে" যোগদান জার্ম্মানী কতদিনে করিতে পারিবে, তাহারই উপরে সব কিছু নির্ভর করিতেছে।

কোন কোন ভাবালু বলিয়া থাকেন যে এরূপ ব্যবস্থাতে জার্ম্মানদের আত্মসম্মানবোধ তাহাদিগকে আবার নাৎসিবাদের পক্ষে ঠেলিবে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ লোক যাঁহারা, তাঁহারা জানেন যে জার্ম্মানীর পুনর্জন্ম খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। জার্ম্মাণ গণতান্ত্রিকরা যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের সময় যেমন নাৎসীবাদকে নির্মূল করার কাজে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন এখনও তেমনই প্রস্তুত থাকিবেন।

এখনও পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকান বড় কর্ত্তারা জার্ম্মান গণতান্ত্রিকদের প্রতি খুবই বিমুখ। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মাণদের যুদ্ধে বন্দী করার পর তাহা-দিগকে নাৎসী বন্দীদের সঙ্গে ও তাহাদের প্রভাবিত অবস্থায় রাখিতেছে। সোভিয়েটে ব্যবস্থা অন্য-ধরণের। সেখানে বন্দীদের মধ্যে "স্বাধীন জার্ম্মাণী" আন্দোলন বাড়িতে দেওয়ার ফলে নাৎসিদের সম্পর্কে অনেকেরই চোখ খুলিয়া যাইতেছে।

কেবল এই ভাবেই বাস্তবিক ফ্যাশিজ্‌মের বিলোপ ঘটানো যাইবে, এবং আবার নিজেদের দেশকে পূর্ব্বেকার উচ্চাসনে বসাইতে জার্ম্মানদের যথার্থ সাহায্য করা হইবে।

কিন্তু একবারও ভুলিলে চলিবে না যে ইঙ্গ-সোভিয়েট সহযোগিতা বিনা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে ব্রিটেনকে প্রকৃত গণতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রমিক দল ও সমস্ত প্রগতিবাদীরা সে গণতন্ত্র পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিবে। যুদ্ধের পর যে সব আন্তর্জাতিক সমস্যা উঠিবে, সেগুলি সমাধানের ইহাই হইল চাবিকাঠি।

—আমেরিকার "দি ওয়ার্কার" হইতে।

জনযুদ্ধের পরবর্ত্তী সংখ্যা ৪ঠা অক্টোবর বাহির হইবে।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি, এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১৷০

সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থাই বাংলাকে শস্যশ্যামলা করিবে

লেখক ঃ খোকা রায়

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা

১২ই আগষ্ট এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিয়াছে "দামোদর নদের বানে (বর্দ্ধমান জেলার) রায়না থানার বোরো, বালাঘর, পুর্ব্ব ধামাস, তিয়ান্দুল মধুবন মুলতানবাদ প্রভৃতি গ্রামের মাঠের শস্য প্রভূতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

"দামোদর, অজয়, বাঁকা ও খড়ি নদীর বন্যায় (বর্দ্ধমানের) অনেক সহর ও গ্রামের মাটির ঘর ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। ...অজয় নদের বানে ভেদিয়া বেরেন্দা, উকলা, পলাইগ্রাম এবং শুদ্‌কাবা প্রভৃতি ইউনিয়নের ৮৫টী গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে।" (হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড—৩১ আগষ্ট)

২রা সেপ্টেম্বরের 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশ "২৬শে আগষ্ট তারিখে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার দ্বারকেশ্বর নদীতে বান ডাকিয়া ১০টী ইউনিয়নের অনেক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে।... প্রায় ১০০ বর্গমাইল জমি জলের নীচে। অধিকাংশ মাটির ঘরেরই প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেক ঘর পড়িয়া গিয়াছে।"

ইউ পি-র ২৯শে আগষ্টের খবর "কোশাম্বতী নদীর বাঁধ তমলুক মহকুমার (মেদিনীপুর) প্রতাপপুর ও বাজগতিলার নিকট দু' জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।...মেদিনীপুর রিলিফ কমিটির সভাপতি কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কমিটির সভ্য সরোজ রায়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন —পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার একশত গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। এখনই রিলিফের প্রয়োজন।"

অন্যদিকে জলাভাব

এই বন্যার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য জেলা হইতে আবার জলাভাবের দরুণ ফসলের সঙ্কটের খবরও আসিতেছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের ২৮শে আগষ্টের খবর "পাবনায় বিল ও নদীগুলিতে প্রায় জল নাই। এখানে এই সময় এরকম ব্যাপার কোন বৎসর দেখা যায় নাই। এই জলাভাবের দরুণ আউস ও আমন ধান ভাল হওয়ার আশা খুব কম। জলের অভাবে পাট 'জাগ' দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে।"

"বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) অনাবৃষ্টির দরুণ চাষের কাজের খুব ক্ষতি হইতেছে। ধানের চারা জলের অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। সমস্ত গ্রাম্য অঞ্চল শুক্‌না পড়িয়া রহিয়াছে।" (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩ই আগষ্ট)

"মৈমনসিংহে দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টি ও নদীর জল অস্বাভাবিকরূপে নামিয়া যাওয়াতে আমন ফসলের ভবিষ্যৎ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।" (অমৃতবাজার—২৭শে আগষ্ট)

ঐ তারিখের 'অমৃতবাজারেরই' খবর—"রংপুরে জলাভাবের জন্য আমন ফসলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।"

মাদারীপুর হইতেও 'অমৃতবাজারে'র নিজস্ব সংবাদদাতা ৪ঠা সেপ্টেম্বর খবর দিয়াছেন 'এখন জল এতদূর নীচে নামিয়া গিয়াছে যে এই মহকুমার বহু স্থানে আমনের চারাগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। সমগ্রভাবে বিচার করিলে আমন ফসলের অবস্থা খারাপ। পাটের অবস্থাও সেইরূপ। জলের অভাবে পাট 'ভিজান' সম্ভব হইতেছে না।"

জলপাইগুড়ি, ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতারাও খবর দিয়াছেন যে জলের অভাবে আমন ফসলের প্রভূত ক্ষতি হইবার আশঙ্কা।

মূল সমস্যা একই

মনে হয় প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। কোন কোন জায়গায় বন্যার প্লাবনে ঘর বাড়ী খেত খামার ভাসিয়া যাইতেছে, আর কোন কোন অঞ্চলে জলের অভাবে মাঠের ধান শুকাইয়া বাংলার খাদ্যের ভবিষ্যত আশঙ্কাজনক করিয়া তুলিয়াছে।

এই অবস্থা যে কেবলমাত্র এ-বৎসরই ঘটিতেছে তাহা নয়। প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলার কিছু কিছু শস্য এভাবে মারা যায় এবং মাঝে মাঝে ইহা যখন প্রকট হইয়া উঠে তখন যানবাহনের অভাব, মজুতদারী প্রভৃতি ঘটিতে থাকিলে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া বাংলাকে গ্রাস করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এরূপ হয় কেন? কেনই বা বাংলার কৃষকের পরিশ্রমের ফল এবং বাঙ্গালীর খাবার এরূপ ভাবে নষ্ট হয়। অনেকে—বিশেষ করিয়া সরকার পক্ষীয় লোকেরা হয়ত বলিবেন যে, প্রকৃতির উপর তো মানুষের কোন হাত নাই। অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভোগ হইবেই।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই? অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হইলেই কি সব দেশে ফসল মারা যায়? কৈ, স্বাধীন সভ্য দেশে তো এরূপ হয় না।

সোভিয়েট রুশ ক্যারেলিয়া ক্যানেল, ভলগা ক্যানেল ও অন্যান্য অনেক খাল কাটিয়া, বাঁধ বাঁধিয়া লাখ লাখ বিঘা অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করিয়াছে। আর নীপারের বাঁধ তো ছিল মানুষের কর্ম্মশক্তির এক অদ্ভুত ইতিহাস। আমেরিকার মিসিসিপি ও ঈজিপ্টের নীল নদের বাঁধ দেখাইয়াছে যে মানুষের শক্তি দ্বারা কৃষির অনেক উন্নতি করা যায়—অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হইলেই ফসল মারা যায় না।

পরাধীন দেশে সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলার জন্য ইহা হয় না। দামোদরের বন্যা ভাল করিয়া বাঁধ বাঁধিলেই রোধ করা যায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা এক পরিকল্পনা দিয়াছিলেন কিন্তু সরকার তাহা গ্রহণ করে নাই।

অতি বৃষ্টি হইলে জল বাহির করিয়া দিবার, নদীর বাধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া কিংবা জল জমাইয়া রাখিয়া অনাবৃষ্টির সময় তাহা ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে একদিকে বন্যা ও অন্যদিকে জলাভাবে ফসল মারা যাইত না। এই সব বন্দোবস্ত অর্থাৎ উপযোগী সেচ ব্যবস্থা নাই বলিয়াই বাংলায় আজ এই সংকট।

মাত্র ২ লাখ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং কৃষি কার্য্যের জন্য জল অত্যাবশ্যকীয়। এই জল সেচের অবস্থা কিরূপ?

বিখ্যাত কমিউনিষ্ট মনীষী রজনী পাম দত্ত ভারত সম্বন্ধে তাঁহার "ইণ্ডিয়া টুডে" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "সরকারী হিসাব থেকেই দেখা যায় ভারতে যত চাষের জমি আছে তার শতকরা মোট ১৮ ভাগে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে এবং তার মধ্যে মাত্র ১১ ভাগ সরকারী ব্যবস্থায় জল পায়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ২৭ কোটী ৯০ লাখ একর জমির মধ্যে ৫ কোটী ১০ লাখ একর জমিতে এই ব্যবস্থা ছিল—এর মধ্যে আবার মাত্র ৩ কোটী ১০ একর জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল পায়।"

এই হিসাব সারা ভারতের। বাংলার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্যার আজিজুল হক্ কৃষক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার "ম্যান্ বিহাইণ্ড দি প্লাও" বইয়ে লিখিয়াছেন "১৯৩৬-৩৭ সালে মোট ২ কোটী ৪৫ লক্ষ আবাদী জমির মধ্যে মাত্র ২ লাখ একর জমি গভর্ণমেন্টের সেচ ব্যবস্থা হইতে জল পায়। ...এর ভেতর ১,৪৬, ৪৫৬ একর বর্দ্ধমানে এবং ৩৮,৪২৫ একর মেদিনীপুরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুরের সেচ ব্যবস্থা আরও অনেক কম এবং দিন দিন ইহা কমিয়া যাইতেছে। সেচ বিভাগের তথ্য হইতেই জানা যায় যে ১৯২০-২১ সালে মেদিনীপুরে ৯১ হাজার একর জমি সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাইত। ১৯৩৪-৩৫ সালে ইহা কমিয়া ১০,৯৪১ একরে দাঁড়াইয়াছে।"

সেচের অব্যবস্থা সম্বন্ধে 'সেচ বিভাগের কমিটি' ১৯৩০ সালে লিখিয়াছিল "মধ্য বাংলার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী এবং জনসংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। জমিগুলি ক্রমে চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।"

১৯৪০-৪১ সালের কৃষি সম্বন্ধীয় সরকারী তথ্যে প্রকাশ যে, ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রংপুর এই ছয়টি জেলায় সরকারী সেচ ব্যবস্থার কোন সুবিধা নাই। ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি —এই ৮টী জেলার কোনও সংবাদ নাকি পাওয়া যায় না!

সেচের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যই বাংলার কৃষককে ফসলের ভালমন্দের জন্য আকাশের দিকে অসহায়ের মত তাকাইয়া থাকিতে হয়। পরিমিত বৃষ্টি হইলে ফসল ভাল হয়—আর 'নসিব' মন্দ হইলে কৃষকের ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে।

এত জমি তবু ফসলের ঘাটতি

এই ভাবে বাংলার কৃষিকে প্রধানতঃ বৃষ্টির খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই বাংলার ফসলের পরিমাণ বাড়ে না— এবং উৎপাদনের নিশ্চয়তা নাই। ফসল উৎপাদনের ঘাটতি লাগিয়াই থাকে।

বাংলা দেশে বৎসরে ৩০ কোটী মণ চাউল প্রয়োজন। কিন্তু কদাচিৎ এই পরিমাণ ফসল বাংলায় উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসরই বাংলা দেশে গড়ে প্রায় ৫ কোটী মণ চাউল কম উৎপন্ন হয়। এর ফলে অর্দ্ধাহার ও অনাহার গরীব বাঙ্গালীর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অথচ বাংলাদেশের সব আবাদযোগ্য জমি চাষ হয় না। আবাদ হইতে পারে এমন জমির পরিমাণ ৫ কোটী একরের উপর। ১৯৪২-৪৩ সালে এর অর্দ্ধেক অর্থাৎ আড়াই কোটী একরের কিছু বেশী জমির চাষ হইয়াছিল। নালা, খাল, বিল প্রভৃতি মজিয়া যাওয়াতে ৩৫ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমি আজকাল পতিত থাকে। এই খালবিলগুলির কিছুটা সংস্কার করিলেই এই ৩৫ লক্ষ একর জমিতে এখনই সোনার ফসল ফলিতে পারে এবং ইহাতে বৎসরে ৫ কোটী মণের উপর ধান জন্মাইতে পারে।

ফসল বাড়ান যায়

এ কাজ যে করা যায়, এবং কাজটা যে খুব কঠিন কিছু নয় তাহা বাংলার কৃষক সভা হাতে কলমে দেখাইয়া দিয়াছে। গত বৎসর কৃষক সভার উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় বাঁধ বাঁধা, খাল কাটা প্রভৃতি কাজে ১ লাখ একর জমিতে ফসল উৎপাদন বাড়িয়াছে। কৃষক সভার কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে, ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিয়াছে, চাঁদা তুলিয়াছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ সাহায্য নিয়া বাঁধ বাঁধিয়াছে, খাল করিয়াছে। কোন কোন স্থানে সরকারকেও বাধ্য করিয়াছে এই কাজে অর্থ দিতে। এইভাবে জনগণের উদ্যোগেই ১ লক্ষ একর জমিতে ফসল বাড়িয়াছে।

এই জ্বলন্ত প্রমাণের পর কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, বাংলার সেচ ব্যবস্থা উন্নত করা যায় না—এবং ফসল উৎপাদন বাড়ান যায় না। গত বৎসর বাংলা সরকারও ফসল বাড়াইবার কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বহু আমলা খাটাইয়া ৪ লাখ টাকা খরচ করিয়া বাংলা সরকার মাত্র সোয়া লাখ একর জমির ফসল বাড়াইয়াছে।

সেচের উন্নতির জন্য চাই জনতার সংহতি

বাংলাদেশে স্বাভাবিক কারণে ফসলের সঙ্কট হইবার কোনও কারণ থাকে না— যদি বাংলার সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। ইহা আজ আমাদের জীবনের একটি প্রধান সমস্যা।

বর্ত্তমানে বন্যা ও জলাভাবের দরুণ যে সংকট দেখা দিয়াছে তার প্রতিকারের জন্য স্থানীয় জনগণকে নিজের উদ্যোগে বাঁধ বাঁধা খাল কাটা প্রভৃতি কাজ দ্বারা আমন ফসলকে রক্ষা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জেলার সরকারকে চাপ দিতে হইবে যাহাতে এই কাজে সরকার সাহায্য করে।

ইহাই হইল আগামী সালের সঙ্কট রুখিবার উপায়। তারপর এই সমস্যার মূল সমাধানের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন জেলার ও প্রাদেশিক সরকারকে নদী খাল বিল সংস্কার, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা প্রভৃতির একটি উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে এবং তার জন্য উপযুক্ত অর্থ মঞ্জুর করিতে বাধ্য করা। ইহার জন্য চাই সারা বাংলায় শক্তিশালী গণআন্দোলন।

পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দরকার পরিকল্পনা কাজে প্রয়োগ করিবার জন্য জনগণের সহযোগিতা। জনগণেরর সহযোগিতা ব্যতীত এই কাজ কখনই সমাধা হইতে পারে না। সেচ ব্যবস্থা উন্নত করিবার কাজে জনগণের সহযোগিতা নিয়া সরকারকে অগ্রসর হইবার জন্য ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের স্বরাজ্য দল বাংলার আইন সভায় দাবী তুলিয়াছিল জনগণের প্রতিনিধি নিয়া একটি কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন সেচ বোর্ড গঠন করা হউক। গভর্ণমেণ্ট তখন সে কথা কানে তোলে নাই।

আজ কৃষক সভা আবার দাবী তুলিয়াছে "সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাদেশিক ফসল বাড়ান কমিটি গঠিত হউক।" বাংলার প্রাণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির এই দাবী—সমস্ত বাঙ্গালীর দাবী—ইহা বাংলার জাতীয় দাবী। কংগ্রেস একদিন এই দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। আজ কংগ্রেসের কর্তব্য এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। লীগ বাংলার মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেই মুসলমানদের বেশীর ভাগই চাষী। তাই লীগের কর্তব্য এই দাবী আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করা।

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দলের বিশেষ কার্য্যক্রমে জোর দিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র। কংগ্রেস একটি স্থায়ী সর্ব্বদলের কংগ্রেস, ইহার মধ্যে পরস্পরকে আবৃত করিয়া বহুদল অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিশ্বাসের সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ এবং গান্ধিজীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সকলে ঐক্য বদ্ধ।

সকলে ঐক্যবদ্ধ হইলেই কংগ্রেসের গৌরব বাড়িবে

এখনও জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারাগারে, কংগ্রেস অবৈধ। কংগ্রেসপন্থী কম্যুনিষ্টগণ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করিয়াছেন, কি পোষকতা করিতেছেন, সে বিচার করিবে জনসাধারণ এবং বৈধ-কংগ্রেস। নিরপেক্ষ কংগ্রেসসেবী মাত্রেই দেখিতেছেন, কমিউনিষ্টরা দুর্গত জনসাধারণের পক্ষ হইতে খাদ্য, ঔষধ ও আশ্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য সেবা ও প্রচার-কার্য্য করিতেছে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীকে জনগণের মধ্যে প্রবল করিতেছে। জগতের স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সহিত ভারতে মুক্তি সংগ্রামকে এক করিয়া দেখিতেছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যের জন্য আন্দোলন করিতেছে। কংগ্রেস ও গান্ধীজীরও ইহাই লক্ষ্য। অতএব কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্টদের স্থান কোথায়, তাহা প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক কংগ্রেসপন্থীর নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে।

এই সংকটের দিনে জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক কংগ্রেসনিষ্ঠ বাঙ্গালী মাত্রেরই কংগ্রেসীকেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। অতীতের দলাদলির কলঙ্ক মলিন কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটুক—বাঙ্গলার সকলদলের কংগ্রেসপন্থীরা তাঁহাদের মিলিত শক্তি লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের সংগ্রামের গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করুন।

সাহিত্য পরিচয়

- সোভিয়েট সাহিত্য
- মাসিক সাহিত্য
- ঐক্য ও জাতিসমস্যা
- কিশোর-বিজ্ঞান

সোভিয়েট গল্পসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের বাজারে অচিন্ত্যবাবু সুপরিচিত। রাজনীতির প্রতি বা সোভিয়েটের প্রতি তিনি কখনো বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যায় নি। তবু তাঁর মত সাহিত্যিকও যখন সোভিয়েট গল্প সাহিত্যের অনুবাদে হাত দিলেন তখন বেশ বোঝা গেল যে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জমেছে—অর্থাৎ এর বাজার দর হয়েছে। আনন্দের কথা; আর অচিন্ত্যবাবুর মত ভাল ভাষা-শিল্পী যখন অনুবাদ করছেন তখন অনুবাদ স্বাভাবিক বাংলা রূপ পেয়ে বাঙ্গালীর মনে সহজ হয়ে বসবে এ আশাও হ'ল।

কিন্তু একটু নাম হলেই অনেক লেখক ভাবেন তাঁরা প্রথম শ্রেণীর লেখক, সুতরাং লেখার ধরণের মধ্যে একটা নিজস্ব কোনো অদ্ভূত ঢং ঢোকাতেই হবে। বর্ত্তমান অনুবাদে অচিন্ত্যবাবুও সেই ঢংয়ের ফাঁদে পড়েছেন। ফলে অনুবাদটা হয়েছে না বাংলা না ইংরেজী, একটা অদ্ভুত খিচুড়ী। প্রথম গল্প থেকেই অনুবাদের ভাষার কয়েক লাইন নমুনা এইরকম: "ভ্ল্যাডিমির পনিজোফ্স্কি, আগে যে ছিলো একজন সামরিক কর্মচারী, এখন এক পুরোনো জিনিষের দোকানে মাল এগিয়ে দেয়, বলে, অলগা সকালে চা খায়না, খায় ফরাসী মদ, তাও একশোর মধ্যে বাট যার অনুপাত।" সারা বইটীতেই বাংলা ভাষা এবং রুশিয়ান গল্পগুলির এইভাবে শ্রাদ্ধ করা হয়েছে।

বইটী পড়বার আগে আনন্দবাজার,প্রবাসী, মায় শনিবারের চিঠি পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার মুরুব্বিস্থানীয় সমস্ত কাগজে এর উচ্ছসিত প্রশংসা পড়েছিলাম—অচিন্ত্যবাবুর অনুবাদের অপরূপতায় সোভিয়েট সাহিত্যই যেন ধন্য হয়েছে এম্নি সুর! বুঝতে না পেরে কাগজগুলো আর একবার খুল্লাম। চোখে পড়ল, যুদ্ধের বাজারে অগ্নিমূল্য বিজ্ঞাপনের দিনেও কাগজগুলির প্রায় গোটা কলম বা পৃষ্ঠা জুড়ে অচিন্ত্যবাবুর প্রকাশকদের বিরাট বিজ্ঞাপন। তারিফের কারণ বুঝতে বাকী রইলনা। শুধু মনে হ'ল—কল্লোল-কালিকলম-বুদ্ধ-অচিন্ত্যের জন্মশত্রু হে "শনিবারের চিঠি", তুমিও!

বইয়ের প্রথম ন' পৃষ্ঠা জুড়ে অচিন্ত্যবাবু সোভিয়েট গল্প সাহিত্যের ইতিহাস, রাজনীতি, প্রবণতা, ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে একটী মুখবন্ধ লিখেছেন। পড়ে প্রথমে অভিভূত হয়ে গেলাম—অচিন্ত্যবাবু এত পণ্ডিত, সোভিয়েট গল্প সম্বন্ধে এত ভেবেছেন! শুধু তাই নয়, এত সোভিয়েট লেখকের লেখা পড়েছেন (যখন তাদের সমালোচনা করেছেন তখন তাদের বইগুলো পড়েই সমালোচনা করেছেন নিশ্চয়) যা আমি পড়া তো দূরে থাক কোন কোনটার নামও শুনিনি! অভিভূতের ভাবটা যখন কাটল তখন মনে হ'ল যে ঠিক এই সব বইয়ের প্রায় এই ধরণের সমালোচনা যেন কোথায় দেখেছি। চেষ্টা করে মন থেকে বার করলাম—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Slavonic Stuidies-এ রুশ সাহিত্যের অধ্যাপক Gleb Struve, ইনি বিলাতী ধনী শ্রেণীর মনোমত ক'রে সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, অর্থাৎ সোভিয়েট সাহিত্যকে একটু পিঠ চোকার ছলনার মধ্যে দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রচার করেন যে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের আওতায় সোভিয়েট সাহিত্যিকের স্বাধীনতা নেই (যার উল্টো মানে এই দাঁড়ায় যে বিলাতী ধনিক শাসনতন্ত্রে লেখকদের স্বাধীনতা আছে)। অচিন্ত্যবাবু বাঙ্গালী লেখকসুলভ উপায়ে এই Glebo Struve-র Russian Literature" নামে বই থেকে তাঁর মতামত ও বিবরণ সবই সংগ্রহ করেছেন। তার ফলে এমন সব বই সম্বন্ধেও মতামত দিতে পেরেছেন যা এদেশের বাজারে কখনো আয়ত্তে দেখিনি। এখানে স্থান নেই, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক অচিন্ত্যবাবুর বইয়ের ৮ ক—৯ ক পৃষ্ঠা আর Struve-র বইয়ের ৮ম অধ্যায় মিলিয়ে পড়লে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারবেন।

Struve-র অনুপ্রেরণা থেকেই বোধ হয় তাঁর সঙ্কলনের মধ্যে প্রধানত সেই সব সোভিয়েট গল্পই স্থান পেয়েছে যা সোভিয়েট সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ত্রুটী-দুর্বলতার satire বা সমালোচনা। (অবশ্য এইগুলো থেকেই অচিন্ত্যবাবুর দেখতে পাওয়া উচিত ছিল সোভিয়েট সাহিত্যিক কি প্রচুর স্বাধীনতা পায় —সরকার বা জনসাধারণের খরচায় তাদেরই দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করার বই লিখতে)। এরেনবুর্গ, শলোকভ, ফ্যাডেভ প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের লেখা তাঁর সঙ্কলনে বাদ পড়েছে। এবং যুদ্ধের যুগে যে চমৎকার গল্পসাহিত্য গড়ে উঠেছে তাও প্রায় সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। অথচ আধুনিক সোভিয়েট গল্পের এ একটা বিশিষ্ট দিক—দেশপ্রেম কি ক'রে সাহিত্যে পরিণত হয় তার শ্রেষ্ঠ নমুনা।

যাঁরা সোভিয়েট গল্প-সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছবি দেখতে চান বা তার প্রকৃত গতি বুঝতে চান তাঁদের কাছে অচিন্ত্যবাবুর সঙ্কলন ও মতামত বিশেষ কাজে লাগবেনা।

সোভিয়েটের গল্প সংগ্রহ: সুধী প্রধান প্রভৃতি অনূদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ। এক টাকা।

শলোকভ, অ্যালেক্সি টলষ্টয়, টিখোনভ, ওয়াসিলেউস্কা প্রভৃতি সাতজন লেখকের লেখা যুদ্ধকালীন রুশ সাহিত্যের তেরটী গল্প। দেশপ্রেম আর নাৎসি শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণাকে অভিব্যক্তি দেবার মধ্যে দিয়ে রুশিয়ায় যে নতুন গল্পসাহিত্য গড়ে উঠেছে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। অনুবাদ মন্দ হয়নি।

মাসিক সাহিত্য

পরিচয়: মাসিক পত্র, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫১। প্রতি সংখ্যা ছ' আনা, বার্ষিক ৪৷৷০ টাকা। সম্পাদক: হিরণকুমার সান্যাল ও গোপাল হালদার।

পরিচয় বাংলাদেশে সুপরিচিত মাসিক পত্র, বাংলা সাহিত্যে তার যে-কিছু দান আছে তা কেউই অস্বীকার করেন না। এককালে পরিচয়ের হয়তো কিছুটা অভিজাত্য-গর্কও ছিল; সেজন্যেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত হলেও ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। এবার থেকে পরিচয় নতুন ভঙ্গী নিল এই কথা সম্পাদকেরা জানিয়েছেন।

কথাটা সত্য। এই সংখ্যায় বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম পরিচয়ে সমাজ বোধ এসেছে এবং সে বোধ সাধারণের সঙ্গে সহানুভূতির সুরেই বাজছে। উগ্র মতামত প্রচার না করলেও এই সহানুভূতির সুরই তাকে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।

গল্প, কবিতা প্রভৃতিতে না হোক অন্তত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে পুরানো পরিচয় একটা দৃষ্টান্ত রেখেছিল। নতুন পরিচয়ে তা বাদ পড়েনি, ৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৩ পৃষ্ঠাই এই জন্যে দেওয়া হয়েছে। এবং সমালোচনাগুলি সুচিন্তিত। রঙ্গীন হালদারের "বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা" ভাল লাগল।

গল্প, কবিতা ইত্যাদিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এসেছে বটে কিন্তু সেগুলির ভেতরে সাহিত্যের দিক দিয়ে বা টেকনিকের দিক দিয়ে কোন নতুনত্ব পেলাম না। প্রেমচন্দের গল্পের অনেক তারিফ শুনেছিলাম, কিন্তু "পৌষের রাত" মনে কোন দাগ দিল না। "ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাসের যুগ" প্রবন্ধে উপন্যাসের যুগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই। বিষ্ণু দের কবিতা সহজ হয়েছে কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতা হয়নি। ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটী ও সাইজ বেশ হাতসই।

ঐক্য ও জাতি সমস্যা

(১) সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি: গঙ্গাধর অধিকারী। দাম ছ' আনা। **(২) গান্ধী-জিন্না আপোষের পথ**—পি, সি, জোশী, দাম দুই আনা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে ভারতবাসী যখন জাতি-সমস্যার সমাধানের জন্যে গুরুতর চেষ্টা করছে তখন এই বই দুটীই তাদের বিশেষ কাজে লাগবে। পৃথিবীর মধ্যে এক সোভিয়েট রুশই এ সমস্যার পূর্ণ সমাধান করতে পেরেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির প্রশ্ন ও সমস্যা কি ছিল এবং কেন ছিল, বিভিন্ন সময়ে তার মধ্যে কি কি নতুন অবস্থা এল, কমিউনিষ্টরা কি করে সকলের মনোমত-ভাবে সমস্যার সমাধান করল, সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৮০টী জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার পেয়েও কি জন্যে একতাবদ্ধ হ'ল—এ সমস্ত কথা ডাঃ অধিকারীর বইটীতে চমৎকার ভাবে বোঝানো হয়েছে। মাত্র ৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যে এত বেশী বস্তু সাধারণত পাওয়া যায় না।

গান্ধী-জিন্না আপোষ কিংবা মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার—এর পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা প্রায় সকলেই মতামত দিয়ে থাকি। কিন্তু সে শুধু ভাসাভাসা ইচ্ছা, কথা বা যুক্তি। ঠিক কি কি জিনিষের ওপর এই আপোষ নির্ভর করছে, আলোচনার মধ্যে কোন্ কোন্ মুস্কিল আসবে এবং সে মুস্কিল আসান হতে পারে কি উপায়ে, পাকিস্তানের মানচিত্র কি ভাবে টানলে মুসলিম অধিকার বজায় থাকে অথচ ঐক্যের সম্ভাবনা আরও নিকট হয়, ঐক্যের শত্রুরা কে এবং তাদের কি করে হারাতে হবে—এই রকম প্রত্যক্ষ ও স্থূল প্রশ্নের দৃষ্টিতে সমস্যাটাকে আমরা এখনো বিচার করিনি। জোশী তাই করেছেন, এবং সে জন্যেই ঐক্য আন্দোলনে তাঁর পুস্তিকাটা ধারালো তলোয়ারের কাজ করবে। দাম অদ্ভুত সস্তা, ৩২ পৃষ্ঠা মাত্র দু আনা।

কিশোর-বিজ্ঞান

মানুষ কি করে বড় হ'ল: মিখাইল ইলিনের অনুবাদ করেছেন গিরীন চক্রবর্ত্তী। পূরবী পাবলিশার্স। দাম দেড় টাকা।

শিশুদের জন্য লেখা ইলিনের বিজ্ঞানের বইগুলি পৃথিবীবিখ্যাত। বনমানুষের যুগ থেকে আরম্ভ করে দাস প্রথার শেষ পর্য্যন্ত মানুষের জীবন বিবর্ত্তনের কাহিনী আছে এই বইটীতে। এমনিতেই ইলিনের লেখা গল্পের চেয়েও মনোরম তার ওপর অনুবাদও চমৎকার হয়েছে। অবিশ্যি আমাদের দেশের ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষা এত কম যে দু চার জায়গায় হয়তো বুঝতে পারবে না, তাদের বাপদাদাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বাপদাদারাও সে পরিশ্রম সার্থক হবে, তাঁরা নিজেরাই একবার বইটা ধরলে আর ছাড়তে পারবেন না।

—সো, ল

দেশবিদেশের রাজনীতি ও সাহিত্য — নূতন বইগুলির খবর পাইয়াছেন?

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্

১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রামের গরীবদের প্রতি

লেনিনের ১৯০৩ সালে লেখা "টু দি রুরাল্ পুওর"এর বাংলা তর্জমা। ইহার সহিত ১৯২০ সালে "কমিউনিস্ট ইন্টার ন্যাশনাল"এর দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য লেখা "কৃষক সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া"ও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র বাংলা তর্জমা করিয়াছেন। কৃষকদের সমস্যা ও আন্দোলনকে রাজনীতিকভাবে বুঝিবার পক্ষে অপরিহার্য্য পুস্তক।

১১৭ পৃষ্ঠা, **দাম মাত্র এক টাকা**

পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য

ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত

নামেই পুস্তকের পরিচয়। কমিউনিস্টরা এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে পাইবেন। মূল ইংরেজি পুস্তকের পুরা তর্জমা তো ইহাতে আছেই, তাহা ছাড়া পি,সি,জোশীর হালে লেখা প্রবন্ধের মোক্ষম অংশও পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

দাম মাত্র বার আনা

রামধনু (উপন্যাস)

মূল লেখিকা—ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা

অনুবাদক—সুসাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

লেখিকার "রেইনবো" নামক উপন্যাসের বাংলা তর্জমা। সোভিয়েট ইউনিয়নে নাৎসী আক্রমণ ও অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লইয়া উপন্যাসখানা লেখা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসাবে ইহা ষ্টালিন পুরস্কার লাভ করিয়াছে! ইহার ইংরেজি তর্জমা ভারতবর্ষে হাজারে হাজারে বিক্রয় হইয়াছে। **দাম তিন টাকা**

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট্ (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস

অনুবাদক—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই পুস্তকের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ৬৪০ পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম এই বাজারে কমপক্ষে ছয় টাকা হওয়া উচিত ছিল। শুধু প্রচারের উদ্দেশ্যে দাম কম করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান মূল্য তিন টাকা চার আনা।

(সরকারী অর্ডার অনুযায়ী কমিশন বাড়ানোর দরুণ চার আনা দাম বাড়িল।)

সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক

মূল লেখক—ফ্রেড্রিশ এঙ্গেল্স্

অনুবাদক—রেবতী বর্ম্মণ

আমরা মার্কসীয় সিদ্ধান্তের মূল পুস্তকগুলির বাংলা তর্জমা করাইতেছি। মার্কসীয় সিদ্ধান্ত ইংরেজি জানা লোকেদের ভিতরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে উহা বাংলা জানা লোকেদেরও আয়ত্তে আসিয়া যায় তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই পুস্তকখানা মার্কসীয় মতবাদের একখানা মূল পুস্তক।

দাম মাত্র চৌদ্দ আনা

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মূল লেখক—জোসেফ ষ্টালিন

অনুবাদক—"মার্কসীয় দর্শন" প্রণেতা সরোজ আচার্য্য। ষ্টালিন যে-পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন তাহার আবার কি পরিচয় দিব?

দাম মাত্র ছয় আনা

ইয়োরোপের যুদ্ধ

গণ-মুক্তির শঙ্খনিনাদ

নিরঞ্জন সেন

লালফৌজের অপ্রতিহত গতি

মস্কো হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা সোভিয়েট-জার্ম্মান সীমান্তের যুদ্ধের যে মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় এই রণাঙ্গণে চারিটি স্থান হইতে জার্ম্মানদের বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই স্থানগুলি হইল (১) পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সীমান্তের লোমজার নিকট (২) ওয়ারশতে (৩) কার্পেথিয়ান অঞ্চলে এবং (৪) পশ্চিম ট্রানসিলভানিয়াতে হাঙ্গেরীর অভিমুখে। সোভিয়েট কামানশ্রেণী এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তবর্ত্তী হিটলারের "শীতকালীন ব্যূহের" উপর প্রবল গোলা বর্ষণ করিতেছে। ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়ারশ'র যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করিতেছে।

পূর্ব্ব-রণাঙ্গণের চরম যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে দানিয়ুব পর্য্যন্ত ছয় শত মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সমূহে ১৬ই রাত্রে লালফৌজ ও জার্ম্মান-সেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। সোভিয়েট-সেনা তেত্রা এলাকায় জার্ম্মান আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে মার্শাল মালিনভস্কীর দ্বিতীয় ইউক্রেনিয়ান বাহিনীর সৈন্যরা যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

ভিশ্চুলা ও বুগ নদীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলের সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি হইতে জার্ম্মানদের বিতারিত করা হইতেছে। মার্শাল ষ্টালিন তাঁহার বিশেষ একটি ঘোষণায় প্রাগা অধিকারের সংবাদ দিতে গিয়া জানাইয়াছেন; প্রাগা-দখলকারী লালফৌজের সাথে লেঃ জেনারেল বেরলিংয়ের অধীনে দেশভক্ত ১ম পোলিশ বাহিনীও লড়াই করিয়াছে। ওয়ারশ'র পূর্ব্ব উপকণ্ঠে প্রাগা দখলের যুদ্ধে চারিদিনে ৮০ হাজার হিটলারী সৈন্য নিহত হইয়াছে।

মার্শাল টলবুখিনের তৃতীয় ইউক্রেনিয়ান বাহিনী বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। রুমানিয়ান রণাঙ্গণে ট্রানসিলভানিয়ান আল্পস্ পার হইয়া রুশরা ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষিপ্রগতি সোভিয়েট সৈন্যদলগুলি এই ব্যূহ-ভেদ কাজে লাগাইতেছে। সোভিয়েট দূরপাল্লার বোমারু-বিমানবাহিনী হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্টের উপর ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। মার্শাল টিটোর সৈন্যবাহিনী ও লালফৌজের মধ্যে সংযোগ হইয়াছে। উত্তর দিকে অভিযান চালাইবার ফলে মার্শাল টিটোর সেনারা নেগোটিন্ দখল করিয়াছে এবং তাহাদের ব্যূহের বামপার্শ্বের সহিত রুশদের মিলন হইয়াছে।

ইহার ফলে বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়ার জার্ম্মান ডিভিশনগুলি এখন সম্পূর্ণভাবে আটক হইয়াছে। উত্তর দিকে পলায়ন করিয়া তাহারা আর জার্ম্মানীর ভিতরকার যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে না।

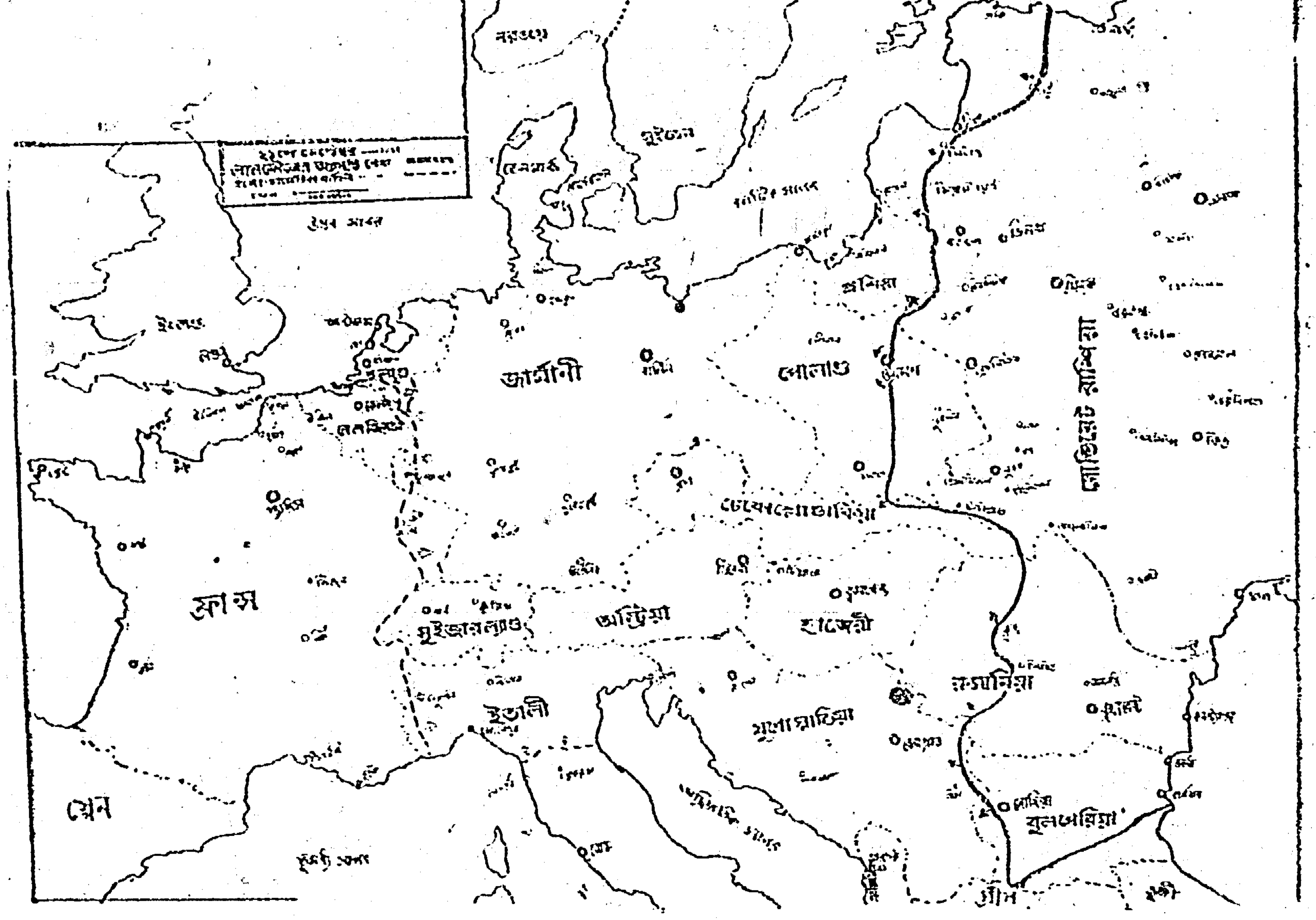

ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধ

খাস জার্ম্মান 'পিতৃভূমি'র সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। হিটলার বাহিনী আস্তে আস্তে সিগফ্রিড লাইনে আশ্রয় নিতেছে। আলবার্ট ক্যানেল হইতে ন্যান্সী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া মিত্রসেনা জার্ম্মান-বাহিনীর উপর হাতুড়ী পিটিতেছে। লুকসেমবুর্গ ও জার্ম্মান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জেনারেল হজের নেতৃত্বে আমেরিকান সেনা রাইখের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। সারব্রুকেনে সীগফ্রিড লাইন অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে। আবার এদিকে হল্যাণ্ডে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল ইতিমধ্যেই টিলবুর্গ, আইণ্ডহফেন এবং ঈসনভেগেন নামক তিনটি সহর দখল করিয়াছে। আবার এদিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণের পর হইতে সপ্তম আর্ম্মির হাতে ৮২ হাজার জার্ম্মান সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

জার্ম্মান নাৎসীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিন আজ সমাগত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্বে লালফৌজ এবং পশ্চিমে মিত্রবাহিনী ইয়োরোপের মুক্তিকামী দেশভক্তদের সহযোগিতায় নাৎসী পশুকে ইঁদুরের জাঁতা কলে ফেলিয়া পিষিয়া মারিতে উদ্যত। এই নাৎসী বিরোধী চরম সংগ্রামের উত্তরোত্তর সাফল্যে ফরাসী বাহিনীর কৃতিত্ব যথেষ্টই। দেশভক্ত ফরাসী বীরদের 'প্রতিরোধ বাহিনী'গুলি ইতিমধ্যেই ফরাসী সেনাদের সাথে এক হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের নেতা মঃ জর্জ্জ বিদোল অস্থায়ী ফরাসী সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী হইয়াছেন। ফ্যাসিজমের চরম বিপর্য্যয়ের দিনে মিত্রপক্ষের যে সব মুখোসধারী দুষমণ জনগণের ঐক্য ভাঙ্গিয়া তাহাদের জয়ের দিন পিছাইয়া দিতে চাহিতেছে, জাগ্রত জনশক্তি আজ তাহাদের সব ষড়যন্ত্রকেই পিষিয়া মারিতেছে।

বল্কান অঞ্চলে নাৎসীদের কব্জা আজ শিথিল হইয়া গিয়াছে। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গ্রীসের মুক্তিকামী জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আজ গ্রীসের মন্ত্রীসভার ভিতরে দায়িত্ব নিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি বাড়াইয়া দিয়াছেন। ফিনল্যাণ্ডের নূতন মন্ত্রীসভা সোভিয়েটের বন্ধুত্বে মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। আজ ফিনল্যাণ্ড তার প্রকৃত শত্রু নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছে। পোলাণ্ডের মুক্তিবাহিনীর সেনারা লালফৌজের সাথে সহযোগে স্বাধীন পোলাণ্ডের ভিত রচনায় প্রাণ দিতেছে। ইতালীয় জনসাধারণ ও তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় গভর্ণমেণ্ট আজ ফ্যাসিষ্টদের উচ্ছেদে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে—এক কথায় বলিতে গেলে সমগ্র ইয়োরোপে আজ গণশক্তির জয় জয়কার ঘোষিত হইতেছে।

দেশে দেশে জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

বুলগেরিয়ার জাতীয় সরকারে কমিউনিষ্ট মন্ত্রী

বুলগেরিয়ার জনসাধারন কি ভাবে নাৎসী দানবের বিরুদ্ধে লড়িতেছে সে সংবাদ গত সংখ্যায় জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সেদিন **গত ৯ই সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ায় জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল।**

সমস্ত ফ্যাশিষ্ট বিরোধী দেশভক্তের সম্মিলিত "পিতৃভূমির ফ্রণ্ট" (ফাদারল্যাণ্ড ফ্রণ্ট) নূতন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী রিপাব্লিকান আর্মি অফিসারদের নেতা জর্জিয়েভ। তাঁহার সহযোগী মন্ত্রী হিসাবে দুই জনের মধ্যে একজন আছেন কমিউনিষ্ট নেতা আই-ভ্যানফ। দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রভৃতির কর্ত্তা—তিনিও একজন কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্ট নেতা টোডোর প্যাভলফ ও কো-অপারেটিভ্ আন্দোলনের অধ্যাপক প্রতিষ্ঠাতা গ্যানেফ এই দুইজন সভ্য লইয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ রিজেন্সি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। যুদ্ধের জরুরী অবস্থা যতদিন না মিটে ততদিনের জন্য এই অস্থায়ী কাউন্সিল কাজ করিবে।

'পিতৃভূমি ফ্রণ্টের' নেতৃত্ব করে কমিউনিষ্টদের ওয়ার্কার্স পার্টি। ১৯৩২ সালে এই পার্টি সোফিয়ার মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছিল। প্রবল নির্য্যাতন ও দমনের যুগে ১৯৪০ সালেও এই পার্টি বুলগেরিয়ার পার্লামেণ্টে ৭ জন ডেপুটী পাঠাইতে সক্ষম হয়। সে সময় শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পুরস্কার ছিল গ্রেপ্তার, নিপীড়ন এমন কি মৃত্যুদণ্ড।

১৯৪১ সালে ওয়ার্কার্স পার্টি কৃষকদের পার্টি, (অ্যাগ্রেরিয়ান) ডেমক্রাট ও রিপাবলিকান আর্মি অফিসার-লীগ (১৯৩৫ হইতে এই দলের নেতাদের গোপনে থাকিতে হয়) সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মাণবিরোধী ফ্রণ্ট তৈরী করে।

রুমানিয়া গবর্ণমেণ্টে জনপ্রতিনিধি

রুমানিয়ার শাসন ক্ষমতা হইতে আণ্টোনেস্কুকে একেবারে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সদলবলে আজ বন্দী। ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা দখল করিয়াছে। রুমানিয়ার শ্রমিক আন্দোলন বুলগেরিয়ার চেয়ে দুর্ব্বল। তাই ১৯৪৩ সালে গঠিত দেশভক্ত ফ্রণ্টে লিবারেল ও কৃষক পার্টির প্রতিনিধির স্থান নাই।

১৯৪৪-এর জুনমাসে দেশভক্ত ফ্রণ্ট ও অপরাপর সমস্ত ফ্যাশিষ্ট বিরোধী দলের ন্যাশন্যাল ডেমক্রেটিক ব্লক গঠিত হয়। **আগষ্ট মাসে যখন সোভিয়েট অগ্রগতি শুরু হইল** তখন ন্যাশন্যাল ডেমক্রেটিক ব্লক রাজাকে দলে ভিড়াইয়া লয়, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। কয়েকজন আর্মি অফিসারের সহযোগে **রুমানিয়ায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে।**

নূতন গবর্ণমেণ্টে কমিউনিষ্ট নেতা লুক্রেটিউ পেট্রাস্কানু ষ্টেটের মন্ত্রী, তিনি বিচার বিভাগেরও সচিব। গবর্ণমেণ্টের ভিতর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব। মস্কোতে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য যে মিশন গিয়াছে তাহাতেও তিনিই নেতৃত্ব করিতেছেন। তিনি আগেও রুমানিয়া পার্লামেণ্টে ডেপুটী ছিলেন কিন্তু তাঁহাকে কখনো নিজের আসনে বসিতেই দেওয়া হয় নাই।

ফরাসী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে নাৎসী পদলেহী দারলাঁকে গুলি করিয়া মারা হয়। দারুণ সংগ্রামের পর জিরো ও দ্যগলেকে ১৯৪৩ সালের মে মাসে "ফ্রান্স মুক্তি কমিটি"র যুক্ত সভাপতি করা হয়।

গঠিত হইয়াই এই কমিটি ঘোষণা করে: প্রথম, ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে। নাৎসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত সশস্ত্র দলগুলিকে "ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সৈন্য দলে" (এফ-এফ আই) একত্রিত করিয়া ফরাসীদের আর্মির অংশ হিসাবে মানিয়া লওয়া হইবে।

দ্বিতীয়, ফরাসী গোপন প্রতিরোধ দলগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। তাহার জন্য (কনসালটেটিভ এসেম্বলী) পরামর্শ সভা গঠন করা হইল। এই এসেম্বলীর অর্দ্ধেক সভ্যই ছিল গোপন দলগুলির প্রতিনিধি। এই সভার আইন করার ক্ষমতা না থাকিলেও ইহার প্রভাব এত বাড়িতে থাকে যে ইহার কোন সিদ্ধান্তই মুক্তি-সংসদ অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই।

মুক্তি সংসদের পরিকল্পনা খুব প্রগতিশীল না হইলেও, ফ্রান্সের ঐ পরামর্শ সভার জোরেই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী সংবাদ পত্রগুলিই ফ্রান্সের আইন সঙ্গত পত্র হইবে।

প্যারিসে মিত্র-বাহিনী প্রবেশ করার পূর্ব্বাহ্নেই গোপন সংবাদপত্রগুলি বড় বড় ছাপাখানা দখল করে। জেনারেল লেক্ল্যার্কের সশস্ত্র বাহিনী ঝটিকাবেগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের স্বাধীন সংবাদপত্রগুলির হকাররা রাস্তায় রাস্তায় প্রথম সংখ্যাগুলি বিক্রয় করিতে শুরু করিয়া দেয়।

১৪ খানি দৈনিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ভিতর—**কমিউনিষ্টদের মুখপত্র "লুমানিতে" এর বিক্রয় সংখ্যা—২ লক্ষ।** সোশ্যালিষ্টদের মুখপত্র "ল্য পপুলেয়ার"-এর বিক্রয় এক লক্ষ ৬০ হাজার। আর বাকী ১২ খানি দৈনিকের মোট বিক্রয় সংখ্যা এক লক্ষ ২০ হাজার।

৫ বৎসর আগে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে দালাদিয়ার ও রেণোর দল "লুমানিতে"র প্রকাশ বে-আইনী ঘোষণা করে। তথাপি কমিউনিষ্টদের এই দৈনিক কোন দিন বন্ধ হয় নাই।

'লুমানিতে' ঔপনিবেশিক দেশগুলির অধিকারের জন্য সব সময় লড়িয়া আসিতেছে, ১৯২৩-২৭ সালের মরোক্কোর জনসাধারণের উপর পাশবীয় নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে পণ্ডিচেরীর ষ্ট্রাইককারীদের সমর্থনে সংগ্রাম করিয়াছে।

আজ 'লুমানিতে' প্রকাশের স্বাধীনতা পাইয়া ফ্রান্সের মুক্তির নূতন অধ্যায় সুরু করিয়া দিল।

সংশোধন

১০ পৃষ্ঠায় "সাহিত্য পরিচয়ে" সোভিয়েট গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যে বইটির সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার নাম "আধুনিক সোভিয়েট গল্প"।

অনুবাদক—অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত। নামটি ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছে।

Regd. No. C. 2836

চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা

কধুরখিল থেকে কাদা ভেঙে কবিদর্শনে গোমদণ্ডী চলেছি।

চাটগাঁর মানুষের হৃদয় জয় করা কবি রমেশ শীল। মন্ত্রমুগ্ধ জনতা স্তব্ধ বিস্ময়ে গান শোনে। রোমাঞ্চিত আবেগে ভাবপ্রবণেরা সংজ্ঞা হারায়।

ঘরে ঢুকতেই দেয়ালে বিচিত্র হরফে লেখা অগণিত নাম আমাদের স্বাগত জানায়। ইতিপূর্বে এখানে যারাই এসেছে, তারাই অপটু হাতের স্বাক্ষর রেখে গেছে। কবির প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা দেয়ালের মানপত্রে খোদাই ক'রে রেখেছে।

গ্রাম্য কবি। গ্রামবাসীর আশাআকাঙ্খা আনন্দবেদনার বহুরূপী প্রকাশ তার গানে। হাজার হাজার মানুষের সামনে সে প্রত্যক্ষ।

ঘরের মেঝেতে একপাশে গাদাকরা শুকনো খড়। এখানে ওখানে আটপৌরে জীবনের স্থুল গৃহস্থালি। দারিদ্র্যের অসঙ্কোচ প্রকাশ। বাইরে শেওলার শতধা ডোবা। বাতাসে বৃষ্টিপচা গন্ধ। দুপাশে জটলাবদ্ধ জঙ্গলে আকাশের অজ্ঞাতবাস।

ঘরে বাইরে কোথাও কাব্যের সমারোহ নেই। অবাক্ হ'লাম। গানের উৎস তবে কোথায়?

নিতান্ত সাদাসিধে, সহজ মানুষ এই রমেশ শীল। চেহারার মধ্যে কোথাও কবিত্বের ঘোষণা নেই। মুখে বার্দ্ধক্যের বলীরেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দুটি উজ্জ্বল চোখ সর্বদা হাসিতে বিস্ফারিত।

'তখন আমি ২২ বছরের যুবক। সদরঘাটে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় কবিগানের এক আসর বসেছে। গায়ক ছিলেন চিন্তাহরণ ও সোহনবাদী কবিওয়ালা। গান শুনে মাথায় খেয়াল চাপ্‌লো। কবি হ'তে হবে। তারপর দিন নেই, রাত নেই পথে পথে মনে মনে মিল দিয়ে পদ তৈরী ক'রতে লাগলাম। মাথায় কেবল শুয়ে ব'সে ঐ এক চিন্তা, এক ভাবনা।

'তখন সবে মাত্র দেশে রেল লাইন বসেছে। বিদেশীরা জায়গার পর জায়গা দেশের লোকের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে। নদীর দুধারে বিদেশী কারবার ফেঁপে উঠছে। তখনই আমি প্রথম গান বানাই। পরের বছর পূজার সময় শহরে দু'জন নামকরা কবিওয়ালা গান ধরেছে। হঠাৎ একজনের গলা বন্ধ হ'য়ে যায়। বায়না করা গান; কাজেই পালা পূরা না ক'রতে পারলে বেচারা কবিওয়ালাদের গুনাগার দিতে হয়। শেষকালে আমার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর উপরোধে আমাকেই উঠতে হ'ল। সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান কখনও করিনি। তারও পর শহর জায়গা, উঠে দেখি পায়ে কাঁপুনি ধরেছে। পাল্টাপাল্টি গালাগালি চললো। রাগে আমারও সাহস হ'য়ে গেল। সেদিন গানের পর আমার নাম লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়'লো। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। গানের ব্যবসা শুরু ক'রে দিলাম।

'বেশ কিছুকাল পর লোকের কাছে শুনলাম মাঝভাণ্ডারে একজন পীর আছেন। সেখানে গান দিয়ে সমস্ত উপাসনা হয়। চট্টগ্রামের নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সুরে সেখানে গান গাওয়া হয়। দীর্ঘ ৭ বছর আমি এখানে কাটাই।'

এই ৭ বছর রমেশ শীলের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ। বিশেষ ক'রে চাটগাঁর মুসলমানদের মধ্যে এই সময় থেকে তাঁর গানের অসামান্য প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। পুরাণ ও কোরাণের ধর্মমূলক আখ্যানকে উপলক্ষ ক'রে জীবনের স্বাদ, পথের ইঙ্গিত।

সমাজের অসঙ্গতি, অবিচার কবিচিত্তকে আঘাত করেছে। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে গ্রাম্য সমাজে যখন ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তখন সমাজের এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রমেশ শীলের কণ্ঠ বজ্রনাদে ধ্বনিত হয়েছে।

গ্রাম্য কবি। শহরের পুঁথিপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কম। তবু লোকের মুখে মুখে জনগণের অভ্যুত্থানের খবর পৌঁছায়। কবি-কল্পনায় বিদ্যুৎস্পর্শ হয়। বঙ্গভঙ্গের যুগে তাই রমেশ শীলের গান গ্রামের কবিআসরে স্বাধীনতার উন্মাদনা আনে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ, কবির গানে জনচিত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়।

শুনি-প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কবিকণ্ঠে সংকটের গান:

'৫ গজ্জ ধুতি ৭৲ টাকা
দেহ টেঁকা হয়েছে কঠিন।
রমেশ কয়, আঁধারে মরি
পাই না কেরোসিন।'

চট্টগ্রামে যখন সন্ত্রাসবাদের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো, তখন পুলিশের অত্যাচারে পুরা দু' বছর কবিগান বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু গানের উৎস শুকায়নি ও স্বদেশপ্রেমিক বীরদের জীবন-কাহিনী নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছে। পুলিশের অগোচরে এ গান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এ গান নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে লোকের মুখে মুখে বেঁচে আছে। সূর্য্য সেন, কল্পনা দত্ত, পাহাড়তলী, জালালাবাদ এ গানের নায়ক। গ্রামের সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এই বীরত্বগাথার অজ্ঞাত-নামা কবি!

এরপর দীর্ঘ দিন চট্টগ্রামের কবিগানে ভাঁটা পড়ে। নিছক অশ্লীলতা ও ব্যক্তিগত গালাগালির অধঃপথে কবিগান নেমে আসে। শক্তিশালী কবিওয়ালারা এর ফলে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েন। কবিগান প্রায় ধ্বংস হ'য়ে যেতে বসে।

৫ বছর আগে কবি রমেশ শীল সমস্ত কবিনায়কদের ডেকে ২২ জন কবির সাহায্যে কবি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা সংকল্প নিলেন কবিরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে এই রুচিবিকারের হাত থেকে কবিগানকে রক্ষা করবেন। কবিগানে পরিবর্ত্তন এল।

'১৯৪২ সাল। মুন্সিরহাটে হঠাৎ একটি যুবক আমার হাতে একটি কাগজ দিল। 'জনযুদ্ধ'। বাড়ীতে গিয়ে আগাগোড়া পড়লাম। দেশের কথা ঠিক এভাবে কখনও জানার সুযোগ হয় নি। নতুন ভাবে গান লেখায় ভেতর থেকে সাড়া পেলাম। ঠিক করি, কবিগান দিয়ে আমরা চট্টগ্রামের মানুষকে জাগাবো। তার পরই আমরা জেলা কবি সমিতি গঠন করি।'

বৃদ্ধ কবির চোখে মুখে দেখলাম নূতন উদ্দীপনা।

লাম্বুরহাটে ঘুরে ঘুরে সেদিনকার হাটের দর জানছি। একজন ব'লল, 'দেখা ক'রবেন ফণী বড়ুয়ার সঙ্গে?'

আগেই ফণী বড়ুয়ার নাম শুনেছি। 'দেশ জ্ব'লে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে, তবুও দেশ জাগিল না কেনে'—এ দুটি লাইন অনেককেই গুন্‌গুন্ ক'রতে শুনেছি।

ঘড়ি সারাবার দোকান। একটা লোক নীচু হ'য়ে হাতুড়ি ঠুকছে। আলাপে জানলাম ইনিই ফণী বড়ুয়া। বয়স বেশী নয়; মুখে সর্বদা একটা লাজুক ভাব। কিন্তু দেহে মনে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। একে হাটবার, তার ওপর খরিদ্দারের ভিড়। তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হ'ল।

ছোটতেই ফণী বড়ুয়ার বাবা মারা যায়। ইস্কুলে পড়ার সুযোগ হয় নি। তারপর দীর্ঘ দিন কাটে এক বৌদ্ধ মঠে। বুজরুকি দেখে গেরুয়ারও বৈরাগ্য আসে। বার্মায় কিছুদিন নিষ্ফল ভাগ্যান্বেষণে কাটে। দেশে ফিরে কবিগানে ঝোঁক হয়। শুধু কবি গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ অসম্ভব। তাই দোকান না চালিয়ে উপায় নেই।

ফণী বড়ুয়া ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'যদি ঘাড়ে সংসার না থাকত, শুধু গান গেয়ে দেশ জাগিয়ে বেড়াতাম। তাছাড়া ছেলেটার ওপর একটা অন্ধ মায়া জন্মে গেছে। সংসারের কথা না ভেবে পারি না। রোজগারের মানুষ ত আমি একা।'

আমার মনে হ'ল, মানুষের প্রতি মানুষের মধুর সম্পর্কের প্রতি এই গভীর ভালবাসাই ফণী বড়ুয়াকে দেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়েছে। এই অনুরাগই তার কবিগানের অন্তর্নিহিত আবেগ।

৯ই জুলাই। চট্টগ্রাম শহরে হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট মিলন সভা। সভাশেষে কবিগানের আয়োজন হয়েছে।

কবিগান আরম্ভ হ'ল। রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া মূল গায়েন। গান শুনতে শহর ভেঙে লোক এসেছে। একটার পর একটা অবিশ্রান্ত গান হ'চ্ছে। কবি কিম্বা শ্রোতা কারো ক্লান্তি নেই। কথা ও সুর অনর্গল একটি লক্ষ্যে ছুটেছে—৪০ কোটি মানুষের বজ্র কঠিন মৈত্রী।

জনতার চোখে ভেসে উঠছে, বিড়ম্বিত চট্টগ্রামের ছবি, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা। মৃত্যুকরুণ মুখগুলি, নিঃস্ব জনসঙ্ঘের অবিরাম পদধ্বনি—শহরের সেই অবাঞ্ছিত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত সামনে এসে দাঁড়ায়। মা-বোনের আত্মবিক্রয়ের হৃদয়হীন কাহিনী শরীর কণ্টকিত করে।

পট বদলায়। আত্মবিস্মৃত মানুষ আবেগে উঠে দাঁড়ায়। চট্টগ্রামের মানুষ মরবে না। শৃঙ্খলের ষড়যন্ত্রকে ভাই ভাই এক হ'য়ে চূর্ণ করবে। দস্যুর দন্ত ভেঙে দেবে। চট্টগ্রামের অতীত কি শেখায়?

গান্ধী-জিন্নার নামোল্লেখে জনতা বজ্রনাদে ফেটে পড়ে। হিন্দুমুসলমান আজ এই প্রথম মিলনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে, উন্মত্ত বারুদ পেয়েছে আগুনের স্পর্শ।

গান শেষ হয়। সভা ভেঙেও ভাঙতে চায় না। কবিদের ভিড় ক'রে জনতা দাঁড়ায়।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অনন্ত সিং

কঠিন রোগের উদ্বেগজনক সংবাদ

আমরা খবর পাইলাম ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম নেতা যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত অনন্ত সিংহ গুরুতর হাপানী রোগে গত তিন মাস যাবত শয্যাগত। তিনি নাকি প্রায়ই অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং ডাক্তারদের আশঙ্কা যে ঐরূপ অবস্থা তাঁহার জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁহার ওজনও নাকি ১৫০ পাউণ্ড হইতে কমিয়া ১১৫ পাউণ্ড হইয়াছে। অনন্ত সিংহ-এর স্বাস্থ্যভঙ্গের খবরে তাঁহার দেশবাসী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে। আমরা সরকারের কাছ হইতে এখনি জানিতে চাই তাঁহার স্বাস্থ্যের সঠিক অবস্থা কি?

অনন্ত সিংহ বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের জনসাধারণ তাঁহার নাম শুনিলেই উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত বাংলা দেশ তাঁহাদের মুক্তির দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমলাতন্ত্র জনমতের কোন তোয়াক্কাই রাখে নাই; তাই ইঁহারা একাদিক্রমে ১৫ বৎসর জেল খাটার পরও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া দিনের পর দিন গুনিতেছেন।

অনন্তের সহকর্মী আনন্দ গুপ্তও এই বন্দীদশায়ই হাপানী রোগে প্রায় মর মর হইয়াছিলেন কিন্তু আমলাতন্ত্র তাঁহাকে মুক্তি দিতে চাহে নাই, একবার মুক্তি দিয়াও আবার বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সিউড়ীতে অন্তরীণ করিয়া রাখিয়াছে। যে আনন্দ গুপ্ত একদিন অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তির আদর্শ ছিলেন তিনিই আজ চিররুগ্ন অকালবৃদ্ধ, দিনের পর দিন মর্ফিন বিষের ইঞ্জেকশন লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছেন।

অনন্ত সিংহকেও কি তিলে তিলে মৃত্যুর সেই সুদীর্ঘ যন্ত্রণাই ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে? আমরা সরকারের কাছে দাবী করিতেছি—অবিলম্বে অনন্ত সিংহের রোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হোক, মেডিকেল কলেজে আনিয়া চিকিৎসা করা হোক এবং অবিলম্বে মুক্তি দিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

বাংলায় ১৯২১ ফিরিয়া আসিল

জেলায় জেলায় কংগ্রেস ও লীগ-নেতার মিলিত অভিযান

বাংলা দেশে নূতন যুগ আসিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত ও আবুল হাশেম একসঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সফরে বাহির হইয়াছেন—হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অভিযানকে শক্তিশালী করিবার জন্য ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁহারা ঢাকা শহরে উপস্থিত হন।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-কলঙ্কিত ঢাকা। তাহার উপর ঐক্যের অভিযান পণ্ড করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের প্রাণান্ত চেষ্টা। ৮ই তারিখে কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত জনসভা হইবার কথা তাহার আগেই ৭ই তারিখে ঐক্য-বিরোধী হরতাল করিবার জন্য হিন্দু নেতারা ইস্তাহার বাহির করিলেন। কিন্তু ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারী মাত্র তিন জন লোকই তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন; তিন জনই হিন্দুসভার। তাহার মধ্যে একজন আবার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিলেন, এমনই দেশভক্ত! কাজেই হরতাল বিশেষ সফল হইল না।

৮ই তারিখে করোনেশন পার্কে ৩০ হাজার হিন্দু মুসলমানের বিরাট জনসভা, ঢাকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে অপূর্ব্ব। প্রোফেসর অতুল সেন, এম্-এল্-এ ঐক্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, জে, সি, গুপ্ত ও আবুল হাশেম বক্তৃতা করিলেন, সমস্ত জনতা হর্ষধ্বনি করিল।

আগের দিন নারায়ণগঞ্জের সভায় আবুল হাশেম যখন ঘোষণা করিলেন, "পাকিস্তান স্বাধীনতার দাবীকেই পূর্ণ করিয়া তুলিবে, অখণ্ড ভারতকেও নিশ্চয় করিয়া তুলিবে, কারণ ভারতের সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই ভারতকে অখণ্ড করিয়া গড়া যায়—" তখন স্থানীয় উকিল সভার হিন্দু মাতব্বরেরা পর্য্যন্ত মন্তব্য করিলেন, পাকিস্তানের এই অর্থ তো আমাদের জানিতে দেওয়া হয় নাই!

পরদিন ময়মনসিংহ শহরে জনসভা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি সত্বেও ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় ৫০০ শ্রোতা উপস্থিত, তাহার মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ঐক্যের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দাবী করা হইল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করিয়া মৈমনসিংহের আপনার জন ও বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষের মুক্তি চাই। যখন সকলকে চমকিত করিয়া স্থানীয় লীগের নেতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন—মুক্তি এই পথেই।

[বারান্তরে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইবে।]

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

গান্ধী-জিন্না পুনরালোচনার জন্য কংগ্রেস-লীগ মহলে ব্যগ্রতা

ওয়ার্কিং কমিটি সভ্যদের মুক্তির পক্ষে

লীগমন্ত্রী তমিজুদ্দীন খাঁ

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভারতবাসীর মনে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে বিশেষ কোন তিক্ততা সৃষ্টি হয় নাই, এবং যাঁহারা ঐক্য সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই পুনরালোচনার জন্য ব্যগ্র। এবারকার মত আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসী, লীগ ও নিরপেক্ষ মহলের মতামত দিলাম :—

কংগ্রেসী মহল

শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ গ্যাডগিল বলেন, "নেতৃদ্বয়ের পক্ষে আলোচনায় একত্র হইতে দীর্ঘ দুই বৎসর লাগিয়াছিল—এখন আবার একত্র হইতে মাত্র দুই মাস লাগিবে। ... আমি আশা ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছিনা—তাও দূর ভবিষ্যতে নয়, অচিরেই ; সুতরাং প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইল এরূপ অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করা যাহাতে আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হয় কারণ তাহাই এই মুহূর্ত্তের চরম প্রয়োজন।"

খান আলি গুল খাঁ

সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি খান আলি গুল খাঁ বলিয়াছেন : "গান্ধী-জিন্না আলোচনা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ভারতের সকল দেশভক্তই দুঃখ পাইবে। কিন্তু আমি মনে করি প্রাত ব্যর্থতাই সাফল্যের সূচনা। উভয় নেতা যতখানিতে একমত হইয়াছেন তাহা লইয়াই আপাতত আরম্ভ করা উচিত। ইতিমধ্যে আসুন আমরা তাঁহাদের মতভেদের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি—কারণ, ঐক্যের চাবি ছাড়া স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বার খোলা যাইতে পারে না।"

গোপালনারায়ণ সাক্সেনা

যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্মীদের কেন্দ্রীয় কমিটীর কনভেনর শ্রীযুক্ত গোপালনারায়ণ সাক্সেনা "পিপল্‌স ওয়ারের" কাছে বিবৃতি দিয়াছেন :—

"গান্ধী-জিন্না আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বিষয়টী লইয়া ব্যাপকভাবে শিক্ষা-প্রচার ও আন্দোলন চালানো দরকার। ক্রমবৃদ্ধির পথে বিভিন্ন জাতি তাহাদের নিজ নিজ বাসভূমে সার্বভৌমত্ব দাবী করিতেছে—এই ভাবেই প্রশ্নটী সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করা উচিত। সমস্ত ভারতবাসী এক জাতি কিংবা সমস্ত ভারতবাসী দুই জাতি—এই দুটী মতের ভ্রান্তিই বোঝা প্রয়োজন। শুধু "দুই জাতির" মতকেই আক্রমণ করিলে হিন্দু মহাসভার কাজই হাসিল হইবে। কংগ্রেসপন্থীর মত যাহাতে রাজাজির ফর্মুলা হইতেও পিছাইয়া না পড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করাই সকলের আগে প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতিকে সার্বভৌম অধিকার দিবার স্বপক্ষে কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষের মতামত সংহত করুন।"

বোম্বাই ক্রনিকল

ক্রনিকল জিন্না সাহেবের মনোভাবকেই আলোচনার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে। আরও বলে, "আমরা এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে গান্ধীজির প্রস্তাবের প্রকৃত আন্তরিকতা মুসলমানেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে এবং সম্মানজনক আপোষ সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহও বুঝিতে পারিবে।"

দৈনিক হিন্দু

মাদ্রাজের দৈনিক 'হিন্দু' মিঃ জিন্নার মনোভাবকেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়া লিখিয়াছে, "তবুও স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র শক্তিকে সংহত করিবার জন্য বন্ধুত্বমূলক আপোষ নিষ্পত্তি যে অপরিহার্য্য সর্ত্ত তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে এবং আমরা আশা করিয়া থাকিব যে বর্ত্তমান তিক্ততাকে বাড়াইবার মত কেহ কিছু বলিবেনা, যাহাতে ভবিষ্যত আরও কঠিন না হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকা

"গান্ধীজির মতই আমরাও আশা করি ব্যাপারটী এখানেই শেষ হইয়া যাইবে না, অদূর ভবিষ্যতে আলোচনা আবার সুরু হইবে। নেতৃদ্বয় যাহা পারেন করিয়াছেন। এখন জনমতকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" (২৯শে সেপ্টেম্বর)

দৈনিক যুগান্তর

এই ব্যর্থতার সংবাদে হিন্দু-মুস্লিম মিলন প্রত্যাশী ও ভারতের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক নর-নারীই গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্য বোধ করিবেন।...যাঁহারা গান্ধীজির হাতে হিন্দুস্থানের সর্বনাশ ঘটিবে বলিয়া আতঙ্কিত হইয়া দেশব্যাপী তোলপাড় করিতেছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং তাঁহারা ইহাও দেখিতেছেন যে, অনেক হিন্দুর চেয়েই গান্ধীজি মূল বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন।...(২৯শে সেপ্টেম্বর)

লীগ মহল

তমিজুদ্দীন খাঁ

বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ বিবৃতিতে বলিয়াছেন : "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দেওয়া বিষয়ে আর কোনো কারণেই দেরী করা উচিত নয় ; আমার জলন্ত আশা আছে যে ইহারা মুক্তি পাইলে অতি শীঘ্র আবার আলোচনা আরম্ভ হইবে এবং ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাহার ফল আরও সন্তোষজনক হইবে।"

খাজা সাহাবুদ্দীন

বাংলার শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ শাহাবুদ্দীন বলেন, "ভারতের সমস্ত দেশভক্ত এবং বিদেশে আমাদের দরদীগণ আলোচনা ভঙ্গে নিশ্চয়ই মর্মাহত হইয়াছেন।" তিনি আশা প্রকাশ করেন যে চেষ্টা এখানেই শেষ হইবেনা।

দৈনিক ডন

জিন্না সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'ডন' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে, "আলোচনা ভঙ্গকে একেবারে দেউলিয়ার দরখাস্তরূপে না দেখিয়া মামলার একটী অধ্যায়রূপেই আমরা দেখিব।...পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ধারণাসম্পন্ন সমালোচকদিগকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা যেন দোষারোপ হইতে বিরত থাকেন এবং গান্ধী-জিন্না পত্রালাপে প্রকাশিত জরুরি বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করেন।" (২৯ সেপ্টেম্বর)

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২২শ সংখ্যা] ৪ঠা অক্টোবর, '৪৪, বুধবার, ১৮ই আশ্বিন '৫১ [দাম ছয় পয়সা

সম্পাদকীয়

গান্ধীজির জয়!

২রা অক্টোবর গান্ধীজির জীবনে ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইল। সেদিন সারা ভারত তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য দিয়াছে।

গান্ধীজির জীবনেতিহাস আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই ইতিহাস। সংস্কারপন্থী অল্পসংখ্যক লোকের আবেদন ও নিবেদনের দপ্তররূপে যে কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছিল, গান্ধীজিই সর্ব্বপ্রথম সেই কংগ্রেসকে ভারতের সমস্ত নরনারীর দেশভক্তি ও আত্মমর্য্যাদার স্পর্দ্ধিত প্রতিজ্ঞারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্বরাজের জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথ ধরিয়া সেদিন হইতেই কংগ্রেস ভারতের লক্ষ-কোটী মানুষের আশা ও সংগ্রামের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। সেই পথে আমরা আজও চলিয়াছি।

দুঃখ, আত্মত্যাগ, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন ও ঐক্যের সে বন্ধুর পথে আমরা নব নব শক্তি অর্জন করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু পথের বৃহত্তম বাধা আজও দূর হয় নাই। খিলাফৎ আর অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট ঐক্যের শীর্ষে দাঁড়াইয়াও ১৯২১ সালে গান্ধীজি প্রশ্ন করিয়াছিলেন : "এখানে এমন কে আছে যে সাহস করিয়া বলিতে পারে—হাঁ, হিন্দু মুস্লিম ঐক্য আজ ভারতীয় জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে ?"

তারপর দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর গান্ধীজি সেই প্রশ্নেরই সমাধানের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। সম্প্রতিকার শেষ চেষ্টায় সাফল্য না আসিলেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বলিয়াছেন যে জিন্না সাহেব তথা মুসলমানদের সঙ্গে "আপোষ-আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় নাই শুধু অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী হইয়াছে।"

এই প্রশ্ন সমাধানে প্রত্যেক দেশভক্তের সাহায্য ও স্বার্থত্যাগই গান্ধীজির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। কারণ উহাতেই গান্ধীজির জীবনের ব্রত সার্থক হইবে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে।

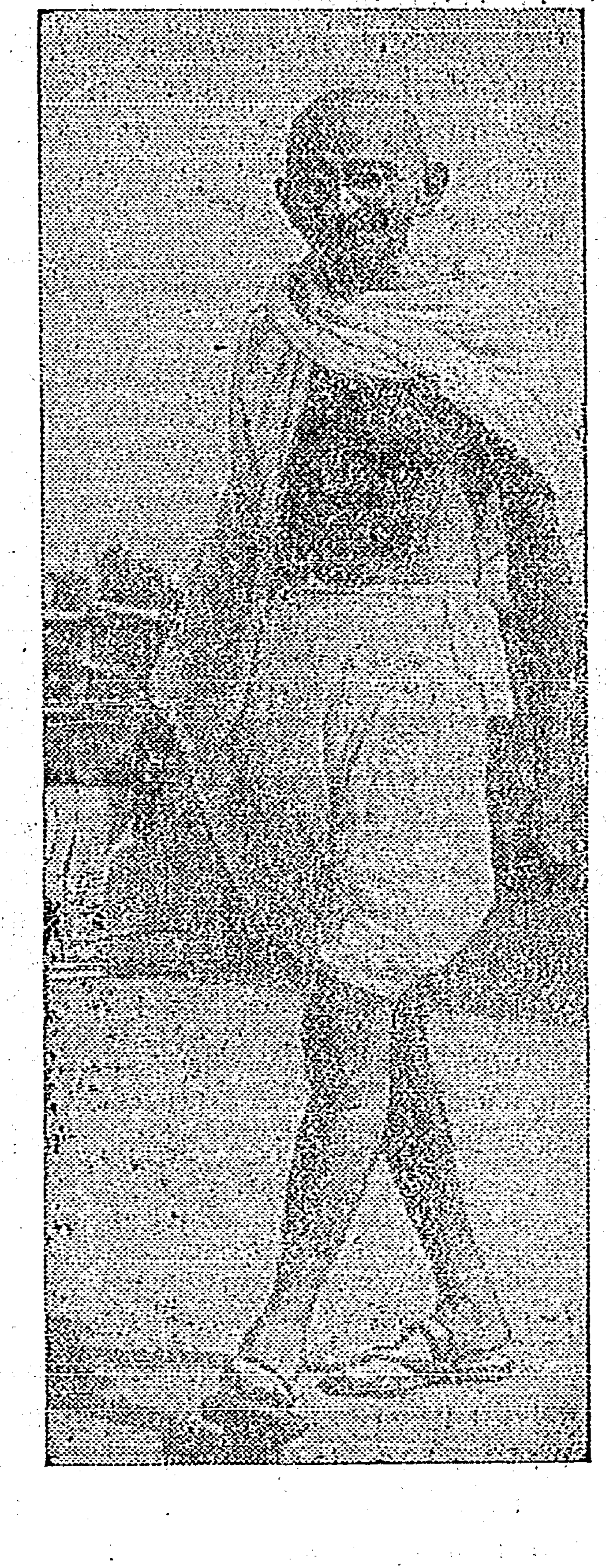

মর্ণিং নিউজ

"বোম্বাই আলোচনায় অনেক জিনিষ পরিস্কার হইয়াছে।...এই অবস্থায় বিষয়টী ছাড়িয়া দিলে ভুল হইবে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে স্বমতে না আনিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু উদ্ভূত সমস্যাটী পরিস্কার। আর একবার চেষ্টা করার দাম আছে এবং এই দুই ভাগ্য-নিয়ন্তার কাছে আমাদের সশ্রদ্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা আবার চেষ্টা করুন যতক্ষণ না শেষ সাফল্য আসে।" (২৯ সেপ্টেম্বর)

আজাদ

"...তবু আমরা নিরাশ হই নাই।...আমরা আশা করিয়া থাকিব, আবার তাঁদের মধ্যে আলোচনা হইবে এবং পরিণামে সে আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"(২৮ সেপ্টেম্বর)

দল-নিরপেক্ষ

ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলন

উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ও সম্পাদক একটি যুক্ত বিবৃতিতে গান্ধী-জিন্না আলোচনা ভঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধী সকলের গণভোট চাহিয়াছিলেন আর জিন্না সাহেব শুধু মুসলমানদের গণভোট চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে গান্ধীজির মতই অধিকতর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু জিন্না সাহেবের এ কথা ঠিক যে তৃতীয় পক্ষ ভারত ত্যাগ করিবার আগেই সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু-মুস্লিম নিষ্পত্তির জন্য আবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করেন। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৩০ সেপ্টেম্বর)

এন, এম্, জোশী

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এন, এম, জোশী পুণায় জি, আই, পি রেলওয়ে শ্রমিকদের নিকট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে গান্ধী-জিন্না

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহাত্মাজি ঃ

"আলোচনা অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্ধ মাত্র"

কায়দে আজম ঃ

"আশা করি ইহাই চেষ্টার শেষ নয়"

৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের মধ্যে কংগ্রেস-লীগ আপোষের জন্য যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। এই খবর ঘোষণা করিতে গিয়া মিঃ জিন্না বলেন ঃ—

"দীর্ঘ পত্রালাপ ও আলোচনাক্রমে আমি গান্ধীজির কাছে মুসলিম পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর সব কিছু সকল দিক হইতে উপস্থিত করি। আমরা সাধারণভাবে পক্ষে বিপক্ষে সমস্তই আলোচনা করি। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গান্ধীজিকে আমার মতে আনার চেষ্টায় আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তবুও আমরা আশা করি যে জনসাধারণ তিক্ত মনোভাব লইবেন না এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ইহাই আমাদের চেষ্টার শেষ নয়।"

২৮শে তারিখ সাংবাদিক বৈঠকে গান্ধীজি বলেন ঃ—

"গভীর দুঃখের বিষয় যে আমরা একমত হইতে পারি নাই। আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়া শুধু কথার কথা। উহা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছে। আমরা দুজনেই এখন জনসাধারণকে সব কথা জানাইব ও পরস্পরের বক্তব্য উপস্থিত করিব। তাহার মধ্যে যদি উগ্রতা না থাকে এবং জনসাধারণ যদি সহযোগিতা করে তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে যাহা সমাধানের অযোগ্য মনে হইতেছে, অতি শীঘ্রই তাহার সমাধান হইতে পারে।"

গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের আলোচনা তাঁহাদের পত্রাবলী মারফৎ সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউজ ক্রনিকল্ পত্রিকার সংবাদদাতার কাছে গান্ধীজি বলেন যে আলোচনার দিনগুলি বৃথা ব্যয় হয় নাই, মিঃ জিন্না যে সৎ লোক সে বিষয়ে গান্ধীজির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি আশা করেন পুনরায় তাঁহারা মিলিত হইবেন এবং ইতিমধ্যে জনসাধারণের উচিত অবস্থাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদের উপর জনমতের চাপ দেওয়া।

মতভেদের কারণ

এই প্রসঙ্গে প্রভেদের কারণ সম্বন্ধে গান্ধীজি নিজের মতামত দেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—

আলোচনার ফলে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের অবসান হইল না কেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন, "আমি দুই জাতির ভিত্তি গ্রহণ করিতে পারি নাই। মিঃ জিন্নার দাবীই ছিল তাই। তিনি অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, সমগ্র পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামকে সার্ব্বভৌম ও সম্পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্তান বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে চান।"

আরও প্রকাশ পায় যে, মিঃ জিন্না গণভোটের দ্বারা জনসাধারণের অভিমত না জানিয়াই গান্ধীজীকে উক্ত অংশগুলিকে ভারত হইতে পৃথকীকরণে স্বীকৃত হইতে বলেন। তিনি রাজাজীর ফরমুলা বাতিল করিয়া দেন।

গান্ধীজী পাকিস্তান বলিয়া কি মানিয়া লইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কি ভিত্তিতে আপোষের আশা আছে জিজ্ঞাসা করা হইলে গান্ধীজী পরিষ্কারভাবে বলেন, "আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি যে মিঃ জিন্নার আন্তরিকতায় আমি বিশ্বাস করি। তবে আমার মনে হয় যে, ভারতবর্ষকে অস্বাভাবিকভাবে বিভক্ত করিয়া তিনি মুসলমান জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধন করিবেন এই চিত্তবিভ্রম তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার প্রস্তাব এই ছিল যে, গণভোট দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলসমূহের সার্ব্বভৌম শাসনের ব্যবস্থা করা চলিত। কিন্তু হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন থাকা উচিত। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার, দেশরক্ষা, যোগপথাদি সম্পর্কে একটা সাধারণ নীতি ও কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভারতের উভয় অংশের কল্যাণের জন্যই ইহা একান্ত প্রয়োজন।"

"এই ব্যবস্থাদ্বারা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ হইবে না, কারণ তাহাদিগকে কোনপ্রকারে হিন্দুদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে না। এইরূপ বিভাগের দ্বারা জাতির মধ্যে একটা কৃত্রিম বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইত না, কারণ ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন ভারতের সমস্ত অধিবাসীই একই বংশোদ্ভব এবং সকলেই ভারতীয়।"

গান্ধীজী বলেন "দুঃখের বিষয় মিঃ জিন্না ইহার কোনটিই স্বীকার করিবেন না এবং আমাকে তিনি দুই জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে বলেন।"

তারপর মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "আপনি যেভাবে বিভাগের কথা বলিয়াছেন মিঃ জিন্না যদি তাহাতে সম্মত হইতেন কিন্তু গণভোট না লইবার কিংবা কেবলমাত্র মুসলমানদের গণভোট লইবার জিদ ধরিতেন তাহা হইলে আপনি কি তাহাতে আপোষ করিতে রাজী হইতেন?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন "কখনই না। কি করিয়া আমি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে তাহাদের নিজেদের মতামত ঘোষণার সুযোগ না দিয়া আমার ব্যক্তিগত বা অন্য কোন অধিকারের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারি?"

ফিলিপ্‌সের পর সাম্‌নার ওয়েল্‌স

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার সেক্রেটারী সাম্‌নার ওয়েল্‌স লিখিয়াছেন—

'স্পষ্টত দেখিতে গেলে বলিতে হয়, মীমাংসার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের জনগণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা।'

তিনি আরও বলিতেছেন,

'যাহারা বিদেশী শাসনে শৃঙ্খলিত তাহাদের কথা তো বাদই দিলাম, আজ সুদূর প্রাচ্যের স্বাধীন সমস্ত জনগণ ভারতীয় নেতাদের আশাআকাঙ্খার প্রতি শুধু যে ঐকান্তিক সহানুভূতিসম্পন্ন তাহাই নহে—পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আটলাণ্টিক সনদে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থাই হইবে সেই নীতির অগ্নিপরীক্ষা।

ওয়েলসের-এর বই নিউইয়র্ক হইতে ১৯শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মিঃ ফিলিপসের মতই তাঁহার উক্তিও এতদিন পরে তবে ভারতে পৌঁছিতে পারিয়াছে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা-ভঙ্গে

কমরেড পি, সি, জোশীর বিবৃতি

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড পি, সি, যোশী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা জাতীয় দুর্ঘটনা। শ্বেত আমলাতন্ত্রের খুসীর অন্ত নাই। আমাদের বিদেশী বন্ধুরা বিষন্ন। চার্চিল ও আমেরী যখন বলিবে যে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতারা নিজেরাই যখন নিজেদের ভিতর আপোষ করিতে পারে না তখন ভারতের সাথে আপোষ কি ভাবে সম্ভব, ইহার উত্তরে বিদেশী বন্ধুরাই বা আপোষের জন্য কি ভাবে চাপ দিবে? আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ বিষাদে অভিভূত। তাদের সামনে চরম হতাশা। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতারা নিজেরাই যখন মিলিতে পারিলেন না এবং দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তখন জনসাধারণ দৈনন্দিন দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে একত্র হইবার আশা ভরসা কোথায় পাইবে?

ব্যর্থতার দায়িত্ব কার তা আলোচনা করা শুধু নিষ্ফলই নয়, ইহাতে বিভেদসৃষ্টি হইবে। পরস্পরের মাথা ভাঙ্গারই সামিল হইবে।

চিঠিগুলি হইতে স্পষ্ট দেখা যায় গান্ধীজি ও জিন্না সাহেব পরস্পরকে নিজ মতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইহাতে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক। গান্ধী ও জিন্না উভয়েই আমাদের জাতীয় জীবনের মহত্ব ও প্রাণশক্তির প্রতীক। তাঁহাদের মতবাদ যে বিভিন্ন তা সুবিদিত। এই পার্থক্যের ভিতর হইতেই একটি মিলিত জাতীয় কার্য্যসূচী বাহির করিতে পারিলে তবেই কংগ্রেস-লীগের মিলিত ফ্রণ্ট সম্ভব হইত। তাঁহারা নিজেরাই বলিয়াছেন, সমান্তরাল পথে তাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন।

শেষ বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, আবার মিলিবার আশা তাঁহারা রাখেন। তাঁহারা আজ বন্ধুভাবে মিলিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরকে আগের চেয়ে অনেক ভালভাবে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা কোথায় একমত হইতে পারিতেছেন না তাহাও আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বিষাদের মাঝে এই সব ঘটনার তাৎপর্য্য ভুলিলে চলিবে না।

জিন্না সাহেব তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই কারণ তিনি যেভাবে পাকিস্তান বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোন অ-মুসলমানের নিকট তাহার বিশেষ কোন তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু তিনি লাহোর প্রস্তাবের কার্য্যকরী দিক আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। প্রথমতঃ, পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় রাষ্ট্রের গণপরিষদের পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রের সীমানা ঠিক হইতে পারিবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে লীগের দাবী মিটাইবার জন্য গান্ধীজি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারত কয়েকটি ইউনিটের সমষ্টি হইবে। এই ভাবেই তিনি পৃথক পাকিস্তান মানিতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় রাজী হইবার আগে গণভোট দ্বারা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মত জানিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। উভয় রাষ্ট্রের সমস্বার্থ কে দেখিবে তাহাও তিনি আগেই ঠিক করিতে চাহিয়াছিলেন। জিন্না দেখিলেন ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বই অস্বীকার করা হইতেছে। তাই তিনি গান্ধীজির ফরমূলায় রাজী হইলেন না।

গান্ধী ও জিন্নার এই পার্থক্যের মাধ্যেই আবার ভবিষ্যৎ সমাধানের বীজ নিহিত আছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যেমন গোটা ভারতের জন্য স্বাধীনতার অধিকার দাবী করিতেছে, নিজ বাসভূমে স্বাধীন হইবার জন্য মুসলিম জাতিগুলিরও যে তেমনি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীই পাকিস্তানের দাবী—ইহা যদি লীগ নেতৃত্ব পরিষ্কার বুঝাইতে না পারেন তাহা হইলে কংগ্রেস ও দেশের অন্য সকলের কাছে পাকিস্তান স্বীকৃত হইবার কোন আশা নাই। এই বিষয়ে পরিষ্কার হইতে হইবে যে, পূর্ণবয়স্কের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণপরিষদের প্রতিনিধিরাই এই অধিকার কার্য্যকরী করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের সমস্ত জনসাধারণই ঠিক করিবে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে কি সম্বন্ধ হইবে। কয়েকটি মূল বিষয়ে সহযোগিতার কথা জিন্না নিজেই বলিয়াছেন। পাকিস্তানের জনসাধারণই শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়িবে—এই বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হইলে কোন সাচ্চা ভারতবাসীই পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করিবে না। হোয়াইট হল হইতে আমদানী পাকিস্তান নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইবে না, বা মুসলামনদের ইচ্ছামত ইহার সীমানা নির্দ্ধারণও হইবে না।

স্বাধীন ভারত যে স্বাধীন রাষ্ট্রমণ্ডলীর সমষ্টি, ইহার পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রমণ্ডলীর সার্ব্বভৌমত্ব সংকুচিত করিবার সমস্ত দাবী ত্যাগ করিতে হইবে। গান্ধীজি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতারা যদি সাহসে এবং আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ইহা মানিয়া না লন তাহা হইলে যুদ্ধের সময় জাতীয় সরকার গঠনের কোন সম্ভাবনাই নাই। আমাদের মুসলিম ভাইদের সম্বন্ধে ভয় করিবার কিছুই নাই, তা সে পাঠান, বেলুচী, সিন্ধী, বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবীই হোক। স্বাধীনতা আদায়ের জন্য তাহাদের সুদৃঢ় হস্তের প্রয়োজন। আমাদের এ বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে যখন তাহারা নিজেরাই স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিবে তখন তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না বা সমস্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না। স্বাধীন ভারতের আদর্শের প্রতি মুসলিম ভাইদের বিশ্বাসের উপর আস্থা ও জনসাধারণের সার্ব্বভৌম ইচ্ছা কার্য্যকরী করা হিসাবে গণতন্ত্র স্বীকার করিলে মুসলিম দাবীর ন্যায্যতা সুস্পষ্ট হইবে, যদিও মুসলিম নেতারা তাহাদের নিজ দাবী পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ঠিক পরেই উপাসনার সময় গান্ধীজী বলিয়াছেন আবার তাঁহাদের মিলন ঘটাইতে পারে জনসাধারণ ও পত্রিকাগুলি। কংগ্রেস লীগ একতার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি কঠোর প্রয়াস করিয়াছে। এইবার তাহারা আরও প্রাণপণে একতার জন্য চেষ্টা করিবে। আমরা সকলের নিকট আবেদন করিতেছি, যে সব বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে সে বিষয়ে সবাই যেন আরও গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিতে এই মতভেদ দূরের চেষ্টা করেন। গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত কাজের অনুমতি দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিতেছে, ইহার প্রতিকার আশু প্রয়োজন। আমাদের পৃথক ও সম আদর্শলাভের জন্য আসুন একসাথে চিন্তা করি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ক্লিষ্ট জনসাধারণের জন্য আসুন একসাথে কাজ করি। আর্ত্ত দেশবাসীর সেবায় আসুন, আমরা হাত মেলাই। দেশের দুই মহান্ নেতার মিলন আমরা নিশ্চয় সার্থক করিয়া তুলিব। তাঁহারা দুইজন এক সাথে ভারতের মুক্তিবাহিনীকে পথ দেখাইবেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনার ব্যর্থতায় হতাশ হইবার কারণ নাই। হিন্দু ও মুসলমানেরা একদিন না একদিন মিলিত হইবেই এবং বর্ত্তমান প্রভুদের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবেই। তিনি বলেন, ঐক্য সাধন করা অত্যন্ত জরুরি এবং ঐক্য সাধন করিতেই হইবে—তা সে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি মানিয়াই হোক বা অন্য কোন উপায়েই হোক। তিনি আরও বলেন যে, এই ঐক্যসাধনে মজুরদের বিরাটরূপে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস স্থানান্তরিত

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের হেড কোয়ার্টার ১লা অক্টোবর ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পার্টির বিভিন্ন দপ্তরের ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ

পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অফিস... ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা (দোতলা)
পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ পত্রিকার অফিস ... ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা (নীচের তালা)
পার্টির কলিকাতা জিলা কমিটির অফিস... ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট (৪ তলা)
[বিঃ দ্রঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট তেতলার পূর্ব ঠিকানাতেই আছে।]

বাংলার ছাত্রজীবনে সংকট

[অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য]

রাজনীতিক উৎসাহের অভাব

গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি বিতর্কসভার আয়োজন হয়। সভা সুরু হইবার সময় সহসা পুলিশ জোর করিয়া হলে প্রবেশ করিতে চাহে। উদ্যোক্তারা সভা স্থগিত রাখেন। ঘটনাটি ছোট হইলেও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাঙ্গনে বছরের পর বছর হাজার হাজার ছাত্রের রাজনৈতিক জমায়েৎ হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পার হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে কখনও সাহস পায় নাই। পুলিশের এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চালানর জন্য ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে অন্যান্য সমস্ত ছাত্রপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন জানান হয়। কিন্তু কোন সাড়া মিলিল না। এমন কি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাও চিরদিনের মত ছাত্রদের সভাসমিতির এই মৌলিক অধিকারকে বিসর্জ্জন দিতে রাজী. কিন্তু সমস্ত ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের সাথে মিলিয়া অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নামিতে নারাজ।

অথচ অতীতে এমন ছিল না। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের সব চাইতে গৌরবময় যুগের সৃষ্টি ছাত্রদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে। ১৯৪০ এর জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মাসের পর মাস কলিকাতার পথে পথে হাজার হাজার ছাত্র তাদের মিলিত শক্তির জোরে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে জোর করিয়া বজায় রাখিয়াছিল। ছাত্র সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা তৎকালীন ডি, আই, পির তরফ হইতে করা হয় তাহা গেজেটের ঘোষণাতেই শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হয়। রাজনৈতিক মতভেদ বা আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব সেদিনও ছিল। কিন্তু নিজেদের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখার সংগ্রামে একসাথে লড়িতে সেদিন ছাত্র-কর্ম্মীরা দ্বিধা করে নাই।

কলেজের মধ্যে পুলিশ

শুধু পুলিশের হাত হইতে নিজেদের অধিকারকে বজায় রাখার সংগ্রামে নয়। সে সময় দিনের পর দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সভাসমিতির অধিকার প্রসারিত করার জন্যও যে কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পিছনে বাংলার ছাত্র সমাজ সমবেতভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘটের কথা হয়ত আজও অনেকে ভুলিতে পারেন নাই। অধ্যক্ষ ক্যামেরণ সাহেব আপত্তি তুলিলেন কলেজের মধ্যে রাজনৈতিক জমায়েৎ হইতে দিবেন না। প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিল। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের ২৫ হাজার ছাত্রের সমর্থনের জোরে স্কটিশের ছাত্ররা তিন মাস ব্যাপী আন্দোলনের পর এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

মনে পড়ে তখনকার বিদ্যাসাগর কলেজের একটি ঘটনা। ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীরা এক দিন বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল শেষ মুহূর্ত্তে আপত্তি জানান যে বাহিরের লোককে তিনি কলেজের ভিতরে আনিতে দিতে পারেন না। প্রিন্সিপ্যালের এই কড়া হুকুম মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাত্রদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। সেদিনই বিপুল উত্তেজনার মধ্যে কলেজের সকল মতাবলম্বী ছাত্রদের এক বিরাট সভা দাবী জানাইল "সত্যেন বাবুকে আনিতে দিতে হইবে।" প্রিন্সিপ্যাল রাজী হইলেন, পরের দিন হাজার ছাত্রের সভায় সত্যেনবাবু বক্তৃতা করিলেন। আর আজ বিদ্যাসাগরে বাহিরের বক্তার বক্তৃতা দূরে থাক, ছাত্রদের তরফ হইতে রাজনৈতিক পোষ্টার দেওয়ার অধিকারও কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে।

মেয়েদের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র

এমনিভাবে দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়াছে, কোথাও কোন প্রতিবাদ নাই। এক বছর আগেও বেথুন কলেজের মেয়েরা কলেজের মধ্যে রাজনৈতিক সভাসমিতি করিয়াছে। আর এখন কলেজের নামে ছাত্রীরা বাইরেও কোন রিলিফের কাজ করিতে পারে না। কলিকাতার কোন মেয়ে কলেজে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে টেররিষ্টযুগের হাউস সিষ্টেমের মত খবরদারী সমস্ত ছাত্রীদের উপর চালু করা হইয়াছে। মেয়েরা প্রিন্সিপ্যালের কার্ড নিয়া তবে কলেজের বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। দারোয়ান আবার সেই কার্ড পরীক্ষা করিয়া দেয়। ইহা হইতে অপমানজনক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? আরও বিস্ময়ের কথা—মেয়েরা যে শুধু প্রতিবাদ করে না তাহাই নয়, প্রিন্সিপ্যালের অনুচর একদল ছাত্রী রহিয়াছে যাহারা "আন্দোলনকারী" গোলমেলে মেয়েদের উপর নজর রাখে, গোপন খবর সংগ্রহ করিয়া দেয়। যখন কারণে অকারণে প্রিন্সিপ্যাল মেয়েদের কমনরুমে আসিয়া খবরদারী করেন তখন প্রিন্সিপ্যাল-সমর্থক এই 'ভালোমেয়ের' দল মুখ টিপিয়া হাসে।

নৈতিক পতন

শুধু কলেজ বা স্কুলের মধ্যে নয়। ছাত্রজীবনের চারিদিকেই আজ এই ভাঙন দেখা দিয়াছে। ছোট ছোট স্কুলের ছেলে। বয়সোচিত অমলিন মন এখন হইতেই বিকৃতির পথে চলিয়াছে। ব্যাপক ঔদ্ধত্য ও শৃঙ্খলাহীনতার প্রমাণ আজ সর্ব্বত্র। রাজশাহীর সংবাদে প্রকাশ যে কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় স্থানীয় ম্যাট্রীকুলেশন পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনাভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। "কারণ, পরীক্ষার্থীগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা আক্রান্ত ও অপমানিত হইবার জন্য শিক্ষকেরা পরীক্ষার সময় তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছেন না" (যুগান্তর ১৭ই সেপ্টেম্বর)। ইহা কেবল রাজশাহীর ঘটনা নয়, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছে।

স্কুলের ছাত্রদের আচরণ সম্বন্ধে চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলাম। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন. "ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন যদি আপনারা বন্ধ করিতে পারেন তবে ভবিষ্যতের সুস্থ ও সবল সমাজ সৃষ্টিতে ছাত্রফেডারেশনের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে"। একটু বিস্মিত হইলাম, এই নৈতিক পতনের শোচনীয় রূপ তখনও আমার কাছে স্পষ্ট ছিলনা। -তার কয়েকদিন পর···। সেপ্টেম্বরের শেষে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলাম ট্রেণের জন্য। প্ল্যাটফর্মের উপর দেখিলাম দুইটী আট-নয় বছরের ছেলে, মুখে সিগ্রেট বিভিন্নভাবে কায়দা করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছে। আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা অশ্লীল ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিয়া রসিকতায় ঢলিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই মনে হয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বড় বিশ্রী লাগিল, অবাকও হইলাম। কৌতুহল হইল আলাপ করিব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাব জমাইয়া ফেলিলাম। ছেলে দুটীরই বাড়ী পটীয়ায়। গত বছর দুর্ভিক্ষের সময় প্রাইমারী স্কুল ছাড়িয়া দেয়। এখন সৈন্যদের কাছে মেয়েদের সন্ধান দেয়। কাঁচা টাকা তাতে বেশ উপায় হয়। পরিজনকে সাহায্যও করা চলে। আজ আসিয়াছিল শহরে বেড়াইতে, খানিকটা আমোদ স্ফূর্ত্তি করিতে।

সংস্কৃতির প্রেরণা নাই

এই সেদিনও ছাত্রদের সৃজনী প্রতিভা প্রকাশের হাতিয়ার ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্কসভা, চিত্র প্রদর্শনী ও কলেজ ম্যাগাজীনগুলি। এসবের মধ্য দিয়াই দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল ভাবধারা ও ঘটনাবলীর সহিত ছাত্ররা নিবিড় যোগাযোগ রাখিত। একমাত্র ১৯৩৯ ৪০ সালে বাংলাদেশে ১১টি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান, রাজনীতি হইতে সুরু করিয়া প্রগতিসাহিত্য পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই এই সম্মেলনগুলিতে আলোচিত হইত। পণ্ডিত নেহেরু হইতে সুরু করিয়া ডাঃ মেঘনাদ সাহা পর্য্যন্ত বিখ্যাত নেতা ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সম্মেলনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫ হাজারের মত ছাত্র একবছরের সম্মেলনগুলিতে যোগ দেয়। এখন তুলনা করুন ১৯৪৩ সালের সাথে। সারা বছরে বাংলার কোথাও একটিও সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল না। আগে কলেজ ম্যাগাজিনগুলি ছিল ছাত্র ও শিক্ষকদের মতামত ও প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র। সাধারণতঃ সকল কলেজে বছরে তিনবার ম্যাগাজিন বাহির হয়। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিটি ও বেথুন কলেজে একখানিও ম্যাগাজিন বাহির হয় নাই। যতদূর জানি এক স্কটিশ ছাড়া অন্য কোন কলেজেই বোধ হয় একখানির বেশী প্রকাশিত হয় নাই। অর্থাভাবের অজুহাত ঠিক নয়। ছাত্রসংখ্যা কলিকাতার সমস্ত কলেজেই বাড়তির দিকে। কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে কাগজ মিলেনা একথাও নিতান্ত বাজে।

বিকৃত রুচি

ছাত্রসমাজের রুচিও ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও জঘন্য হইতেছে। সাহিত্যের নামে ও সংস্কৃতির অজুহাতে বিকৃত রুচির পরিচয় আজ চারিদিকে। প্রগতি ও জাতীয়তার নামে সংকীর্ণ দলাদলির প্রকাশই যেন আজিকার রেওয়াজ। কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুত সজনী দাস ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। বিষয় "বাংলা কোন পথে"। বক্তৃতার মধ্যে ভাষার প্রচ্ছন্নতার আড়ালে কিন্তু ফুটিয়া উঠিল হিন্দুসভা মার্কা সাম্প্রদায়িকতা আর কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ। এই সেদিনও সজনীবাবুই ছিলেন রাজনীতিবর্জ্জিত "নিছক সাহিত্য"পন্থীদের মুখপাত্র। অথচ এই সভায় তিনি অম্লানবদনে জাতীয় সাহিত্যের দোহাই দিয়া সাহিত্যে প্রগতির বিরোধিতা করিলেন। বলিলেন, বিদেশী ভাবধারাই নাকি আমাদের জাতীয়তাবোধ নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাঁহার মনে রহিল না যে বিদেশের অনেক কিছু ভাল জিনিষকে আমাদের জাতীয় ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াই আমাদের এতদিনের জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি এতখানি অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে যখন ভারত তথা প্রত্যেক দেশের জীবন সমগ্র পৃথিবীর জীবনের উপর প্রতিদিন বেশী করিয়া নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে, তখন বিদেশী ভাবধারা তো আমাদিগকে বেশী করিয়া প্রভাবিত করিবেই!

কলেজীয় বিদ্যার শেষ স্তরে উপস্থিত পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্রদের রুচির একটি নমুনা দিই। আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি জলসার আয়োজন হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী। অনুষ্ঠানের তৃতীয় সূচীতে একটি নাচ সুরু হইল। নাচের পটভূমিকায় গান সুরু হইল—"নাচো নাচো প্যারে মনকী মোর।" তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার অতি হাল্কা ও সাধারণ গান। সংস্কৃতির নতুন অনুশীলনে যাহারা পথ দেখাইবে, নিম্নস্তরের সিনেমাই আজ তাহাদিগকে সংস্কৃতির প্রেরণা যোগাইতেছে!

উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর মনেও তার উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি দেখা গেল। সস্তা সিনেমার মতই শীষ আর পা-ঠোকাঠুকিতে হল ভরিয়া উঠিল। দর্শকের আসন হইতে অধিকাংশ অধ্যাপক ও বিশিষ্ট দর্শকরা একে একে উঠিয়া গেলেন।

আমাদের জীবনের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, যুদ্ধের দুর্ভোগ আজও চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখ দুর্দ্দশা অতীতেও ছিল; তখনকার দিনে দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িলে সংগ্রামশীলতা, জাতীয়তাবোধ, প্রগতিশীল চেতনা প্রভৃতি কমিত না, বরং বাড়িয়াই যাইত। কিন্তু এবারে রাজনীতিক ব্যর্থতা ও হতাশা এত ব্যাপক ও প্রচণ্ড যে তাহার ফলে রাজনীতি-বোধই অনেক পরিমাণে লোপ পাইতেছে। জাতীয়তা-বাদী রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মধ্যে কোনো আশার সুর নাই। উহা তরুণ মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় তাহারা রাজনীতিকে বুঝিতেছে দলাদলি রূপে, দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল আশাবাদী চিন্তা-ধারাকে মনে করিতেছে তাহাদের জাতীয়তার বিরোধী এবং এই সমস্ত মিলাইয়া তাহাদের মন অত্যন্ত খেলো, অরাজনীতিক ও মামুলি উত্তেজনার মধ্যে পলায়নের পথ খুঁজিতেছে। সমস্যা এড়াইয়া পলাইবার প্রবৃত্তিই আবার সাধারণভাবে দায়িত্বজ্ঞান, রুচিজ্ঞান, মর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সব কিছুরই প্রতি মমতা কমাইয়া দিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কুটিরশিল্প প্রদর্শনী

১৭ই হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কুটীর শিল্প প্রদর্শনী হইল। কর্পোরেশনের একটা ছোট অপরিষ্কার গৃহে এই প্রদর্শনী, বিশেষ জাঁক জমক নাই, কিন্তু তবু এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলনের একটা ছবি লোকে দেখিতে পাইয়াছে। প্রদর্শনী দেখিয়া আসিয়া অনেকেই বলিল: মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যে এত কাজ করে তা জানতাম না।

এই প্রদর্শনীটী অন্যান্য প্রদর্শনীর মত সংগৃহীত কুটীরশিল্প লইয়া নহে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিরই বিভিন্ন কুটীর শিল্পকেন্দ্রে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিরই মেয়েরা যে সব হাতের কাজ করিয়া দিন গুজরান করে, সেই সব জিনিষই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূচী শিল্প, তাঁতের সাড়ী, গামছা, মাদুর, চুপড়ী, সাজী, পা-পোষ, পুতুল, চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ. আচার, জেলী, খাবার প্রভৃতি জিনিষ লইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রের মেয়েরা নিজ নিজ ষ্টল খুলিয়াছে। আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মী ও সাধারণ মেয়ে উভয়েই ষ্টলে বসিয়া এই সব জিনিষ বিক্রী করিতেছেন।

সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে পড়ে কাগজের ষ্টলটী। হাতে তৈরী কাগজ এখানে বিক্রয় হইতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলার বহু জায়গায় এই কাগজ কেন্দ্র খুলিয়া একাধারে দুঃস্থ মেয়েদের উপার্জ্জনের পথ করিয়া দিতেছে ও কাগজের অভাব মিটাইতেছে, তার একটা জীবন্ত ছবি এখানে দেখা গেল। একটী জায়গায় কলিকাতার কাগজ-কেন্দ্রে যারা কাজ করে সেই গরীব মেয়েরা হাতে কলমে কাগজ তৈরী করিয়া দেখাইতেছে।

প্রদর্শনীর অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষা সমিতির কার্য্যধারার একটী ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চায়ের ও খাবারের ষ্টল। মেয়েরা নিজেরাই চা ও খাবার তৈরী করিতেছে, পরিবেষণও করিতেছে। কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই।

এই ভাবেই আত্মরক্ষার মেয়েরা সমাজ জীবনের শৃঙ্খলারক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি ফিরাইতেছে।

তিন দিনের এই ছোট প্রদর্শনীটী দেখিতে কলিকাতার সকল শ্রেণীর লোকই আসিয়াছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মিসেস সামসুন্নাহার মামুদ। দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী। শেষদিনে মহিলা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিধান রায়। তিনি এই প্রদর্শনী দেখিয়া প্রশংসা করিয়া বলেন: বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ৪০ হাজার মেয়ে এই সব কাজের জন্য দরকার।

বাংলার কিশোরবাহিনীর শারদোৎসব

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার কিশোর বাহিনীর শারদীয় উৎসব ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের একমাত্র কিশোর সংগঠন "মুকুল মেলার" প্রতিনিধিরাও সভায় যোগ দিয়া কিশোর বাহিনীর সভ্যদের ঈদমোবারকের প্রীতি ও অভিনন্দন জানান। সভায় "মুকুল মেলার" পক্ষ হইতে "বাগবান" ও আনীস চৌধুরী এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ও কিশোর আন্দোলনের নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য বক্তৃতা করেন।

কিশোরবাহিনীর প্রতি

কিশোরবাহিনীর নতুন কার্ড অনেকদিন ছাপা হয়েছে। যারা এখনও পাওনি তারা এক্ষুণি মাথা পিছু এক আনা ক'রে পাঠিয়ে দাও।

—সম্পাদক, কিশোরবাহিনী

মহামারী ও ঔষধ-বিলির অবস্থা কি ?

[**পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী**]

পিপলস রিলিফ কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ব্ববঙ্গের মহামারীগ্রস্ত গ্রামাঞ্চল,—ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার মহামারীর অবস্থা ও বেসরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র দেখতে যাই। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গার সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র এবং সরকারী ও বেসরকারী দুস্থনিবাস দেখবার সুযোগ হয়। সরকারী কর্ম্মচারী ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়।

বেসরকারী ও সরকারী ব্যবস্থায় পার্থক্য

মুন্সীগঞ্জ থেকে সুরু। নৌকায় চ'ড়ে কয়েক মাইল দূরে মহাকালী গ্রামে যেতে হবে। সেইখানে বঙ্গীয় জনরক্ষা কমিটীর চিকিসাকেন্দ্র। যাবার পথে আমরা একটী বেসরকারী অনাথশিশুদের আশ্রম, সরকারী দুস্থদের (এফ-আর-ই) হাসপাতাল এবং কাটাখালির দুস্থ মেয়ে ও অনাথ শিশুদের সরকারী আশ্রম দেখলাম। অনাথ শিশুদের বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের অদ্ভুত পার্থক্য নজরে না পড়েই পারে না। মুন্সীগঞ্জের বেসরকারী ব্যবস্থার মধ্যে শিশুরা দিব্য গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট, মুখগুলি হাসিখুশী। আর কাটাখালির সরকারী ব্যবস্থায় ক্ষীণ শিশুরা মুখে সংসারভ্রষ্ট আতঙ্কের ছাপ নিয়ে চুপচাপ রয়েছে। মুন্সীগঞ্জের আশ্রম স্থানাভাব সত্ত্বেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কাটাখালিতে নোংরা ময়লা দুস্থতার সার্টিফিকেটের মত প্রকট। খবর নিয়ে জানলাম যে মাথাপিছু খরচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কম। তবু সেখানে ছেলেরা পেট ভরে খায়, খেলাধূলা করে, লেখাপড়া, গান ও হাতের কাজ শেখে; এবং হাসতে পারে। মুন্সীগঞ্জের দুস্থদের জন্য হাসপাতাল দেখলাম। ১৫০ জনের হাসপাতালে ১৮৫ জনকে, গড়ে রোজ ১০-১৫ জনকে ভর্ত্তি না ক'রে ফিরিয়ে দিতে হয়। হাসপাতালের বাড়ীগুলিতে আলো হাওয়া আছে তবে বড্ড ভিড়। সালফারঘটিত ঔষধের অভাব। বেসরকারী তদারকের কোন ব্যবস্থা নাই এবং পাবলিকের অল্প বিস্তর অভিযোগ আছে।

তারপরে মহাকালী গ্রামে পৌঁছলাম। ফেব্রুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৯০০০ লোক দেখা হ'য়েছে। চিকিৎসাকেন্দ্রের এলাকার মধ্যে লোকসংখ্যা চোদ্দ হাজার হ'বে। আর ৩৯,০০০ রোগীর মধ্যে শতকরা ৭০টী হচ্ছে ম্যালেরিয়া। পুরো মাত্রা কুইনিন না দিতে পারায় ম্যালেরিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মুন্সীগঞ্জের মহকুমা কর্তৃপক্ষ ঔষধ দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত নারাজ এবং এই জন্য চিকিৎসার কাজে ব্যাঘাত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে চিকিৎসাকেন্দ্রে আমাদের সামনেই ২৫০ জন রোগীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা কিছু কমেছে। তার কারণ মূলতঃ বর্ষার জন্য যাতায়াতের অসুবিধা এবং রমজানের দিনে মুসলমানদের উপবাস।

ডাক্তারদের অভিমত যে এই অঞ্চলে বর্ষার পরে দারুণ ম্যালেরিয়া ও কলেরা দেখা দেবে।

আশা নেই, ভরসা নেই

আগের দিন বিকালে আমরা নৌকায় ক'রে পল্লী অঞ্চল দেখতে বেরিয়েছিলাম। **একটি পল্লীর কথা,—নাম হাজিপাড়া। ২০০ পরিবারের বাস। ঐখানে প্রতি সাতজনে ২ জন মারা গিয়েছে, ১ জন বিদেশ গিয়েছে এবং বাকী সব অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে। ১০ জনের একটি বড়ো পরিবারে মাত্র ৬ জনের ম্যালেরিয়া হয়নি।**

সরকারী ডিস্পেন্সারীর ঔষধ খেয়ে ম্যালেরিয়া সারে না এই কথা বলে গ্রামের লোকেরা দাবী করল যে, মহাকালী কেন্দ্র যেন কিছুতেই উঠিয়ে দেওয়া না হয়।

মহাকালী আগেকার দিনের বিক্রমপুরের স্মৃতিকে পীড়া দেয়। সংগঠন নেই, আশা ভরসা নেই। শিক্ষিতরা গ্রাম ছেড়ে গিয়েছেন,—মহামারী ও দুস্থতার মধ্যে গ্রামবাসীরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জে ফিরে এসে সহরের নেতাদের সঙ্গে বার লাইব্রেরীতে সাক্ষাতকার হয়। গত বৎসর এঁরা দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে খুব ভালো রিলিফ করেছিলেন কিন্তু এবার মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে হতাশ হ'য়ে পড়েছেন।

মুন্সীগঞ্জ থেকে চাঁদপুর। এখানকার কংগ্রেস নেতা উপেনবাবুর বাড়ীতে উঠেছিলাম। ৬১ বছর বয়সেও অদ্ভুতকর্ম্মা। চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম এবং মহকুমার মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল।

সর্ব্বজ্ঞ অফিসার

মহকুমা হাকিম বেসরকারী মেডিকেল রিলিফের প্রতি বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন। মহকুমা মেডিকেল অফিসার নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ব'লে প্রতিপন্ন করলেন। তিনি অবস্থা আয়ত্বে এনে ফেলেছেন ব'লে জানালেন। তাঁর অধীনে আটটী অচিকিৎসক মেডিকেল স্কোয়াড ঘুরে ঘুরে মেপাক্রিন বিলি করে। সহর থেকে ২৫ মাইল দূরে নৌকাযোগে আমরা মতলব থানার মধ্যে খিদিরপুর গ্রামে গেলাম। মহকুমা মেডিকেল অফিসারের অবস্থা আয়ত্বে আনবার নমুনা চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। খিদিরপুর কেন্দ্রে প্রতিদিন ৫০০ রোগী দেখা হয়—দেখতে পারলে রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১০০০ হ'তে পারে। আমরা যেদিন ছিলাম, সেদিন রোগীর সংখ্যা হয় ৫০৩ জন। ১০ মাইল পর্য্যন্ত দূর থেকে লোক আসে, -কাছাকাছি সরকারী বা আধা সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর লোকের কোনই আস্থা নেই।

খিদিরপুর থেকে চাঁদপুর এবং চাঁদপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রিলিফ কর্ম্মী ও সরকারী মহলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল। এখানকার মেডিকেল অফিসার কাজের সুন্দর পদ্ধতি করেছেন —জায়গায় জায়গায় বেসরকারী কর্ম্মীদের সহযোগিতায় মেপাক্রিন বিলি করেন এবং তার ফল খুব ভাল হ'য়েছে। স্থানীয় রিলিফ কর্ম্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ কর্ম্ম চ'লে।

কুইনাইন কোথায় ?

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ। পরের দিন সকালে নীলগঞ্জের কাছে মাঝখাপন গ্রামে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছলাম। মাঝখাপন কেন্দ্র আর আগেকার দুটী কেন্দ্রে কি অদ্ভুত পার্থক্য। এখানে সব ব্যাপারে সংগঠন ও শৃংখলার ছাপ। রোগীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বা ব'সে আছে। চীৎকার-হট্টগোল-ঠেলাঠেলি নাই। ডাক্তার বাবু ৬৪৫ জন রোগীর ব্যবস্থা দিলেন। এই কেন্দ্রে মার্চ্চ মাস থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪৮,৭০৪ জন রোগী দেখা হ'য়েছে। **জেলা কর্ত্তৃপক্ষের কল্যাণে কুইনিনের অভাবে ৪২ দিন কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হ'য়েছে।** কুইনিন সরবরাহ কম হওয়ার দরুণ প্রতি রোগী গড়ে পুরোমাত্রা ৯০ গ্রেণের জায়গায় সাড়ে বারো গ্রেণ করে কুইনিন পেয়েছে। এই এলাকায় শতকরা ২৫ জন রোগীর কালাজ্বর আছে।

জনসাধারণের চেষ্টা ও সরকারী সহযোগিতা

মহাকালী বা খিদিরপুর আর এই মাঝখাপন,—অদ্ভুত পার্থক্য। এখানে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিত্য নিয়মিত কাজ করে, এখানকার লোকজন কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য তৈরী। এখানকার লোক ম্যালেরিয়া প্রতিকার কল্পে কুইনিন খাওয়া ছাড়াও ম্যালেরিয়া নষ্ট করবার আন্দোলন এবং গ্রাম পুনর্গঠনের আন্দোলনের চেতনা দ্বারাও উদ্বুদ্ধ।

সন্ধ্যার দিকে কিশোরগঞ্জে এক রিলিফের জনসভায় এসে পৌঁছলাম। কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাংলায় মহামারীগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে একটী অত্যন্ত পীড়িত এলাকা। কিন্তু এখানকার রিলিফ কর্ম্মীরা ছয়টি থানার গ্রামগুলির বিস্তারিত খবর রাখেন, প্রাদেশিক ও জেলা কর্তৃপক্ষের মহামারী সংক্রান্ত অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এঁরাই সবচাইতে বেশী তথ্য দিয়েছেন এবং এখানেই মহামারীর বিরুদ্ধে স্থানীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা রিলিফ কর্ম্মীদের সহযোগিতায় কাজ করাই পছন্দ করেন।

এর পরে আঠারোবাড়ী থেকে ৮ মাইল দূরে পায়ে হাঁটা পথে মাসকা কেন্দ্রে পৌঁছলাম। **চিকিৎসাকেন্দ্র সেদিন বন্ধ। কারণ জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ঔষধ সম্পর্কে হাতটান করেছেন।** বিকালে দশখানি গ্রামের মুরুব্বি লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল। চিকিৎসাকেন্দ্র তাঁদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। পাশের গ্রাম সান্দিকোণায় ইউনিয়ন বোর্ডের চিকিৎসাকেন্দ্রে লোক যেতেই চায় না,—ঐ জায়গায় ডাক্তার বাবুর সামনেই লোকে নালিশ করল যে সেখানকার ঔষধ খেয়ে জ্বর ছাড়তো না।

ভবিষ্যৎ কোথায় ?

মাসকা থেকে ময়মনসিংহ শহর। আমার সঙ্গী ডাঃ বিজয় বসুর কাছে জানলাম যে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব কিছুটা বদলেছে। বিকালে জেলাবোর্ড অফিসে শহরের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। ম্যালেরিয়া শীঘ্রই তীব্রতর হ'বে, কলেরা আসতেও এক মাসের বেশী সময় নেই। সংগঠন এবং ঔষধের ব্যবস্থা কোথায়? দুস্থদের জন্য গ্রাম পুনর্গঠনের তোড়জোড় কোথায়? উপস্থিত সকলেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রেই আলোচনা করলেন।

* * *

পূর্ববঙ্গের তিনটী জেলায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, স্থানীয় জননেতা ও রিলিফ কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। ফিরেই লাটসাহেব মিঃ কেসির বক্তৃতা দেখলাম। চাঁদপুরের সর্বজ্ঞ মেডিকেল অফিসারের কথা মনে পড়ল। মহাকালীর ধারে হাজিপাড়ার চিত্র চোখে ভেসে উঠল। খিদিরপুর চিকিৎসাকেন্দ্রে আরো যে পাঁচশো লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি, তাদের কথা মনে পড়লো। মাসকার কেন্দ্রে

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দেখুন)

মরিলেও দুঃস্থের সংখ্যা কমিত !!

কেসি সাহেব বলেছেন: "জেলাগুলির বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, যে-সব লোককে কোন না কোন রকমের সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন তাদের সংখ্যা সম্প্রতি কিছু কমেছে। এটা উৎসাহের কথা।"

দুঃস্থের সংখ্যা কি ভাবে কমানো হয়েছে তার বিবরণ আমরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কনক মুখার্জির রিপোর্ট থেকে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন:

গত ৪ঠা আগষ্ট ফরিদপুর জেলার বালুচড়া-তুলাসার গ্রামে যাই। ৫০ জন দুঃস্থা মেয়ে দল বেঁধে আমাদের কাছে এসে জানালো যে, তারা তুলাসার গ্রামের ওয়ার্কহাউসে কাজ করতো। প্রায় ১৫ দিন আগে সরকারী রেশন বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার দরুণ ঐ ওয়ার্কহাউসটি উঠে গেছে। এখন তারা নিরুপায়।...

শোনা গেল, এই মাদারীপুর মহকুমায় গত সপ্তাহে পালং ও রামভদ্রপুরের ওয়ার্কহাউস বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। শেষদিনে সেখানে যথাক্রমে ৫০০ ও ৩০০ দুঃস্থ ছিল। পালং-এর পথে ভিক্ষুকের ভিড় কিছু বেশী দেখলাম। তারাই নাকি আগে ঐ ওয়ার্কহাউসে ছিল।...

১৬ই আগষ্ট ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের ওয়ার্কহাউসে যাই। সেখানে ৬০ জন দুঃস্থ মেয়ে তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ওয়ার্কহাউসে আছে। আমরা যেতেই তারা অসহায়ের মত এসে বল্লে যে, পরশু দিনই ওদের ওয়ার্কহাউসটি বন্ধ ক'রে দেবার নোটিশ পড়েছে। তারা এখন কোথায় যায়? তারা আমাদের অনুরোধ ক'রল যে, আমরা যেন তাদের হ'য়ে ওয়ার্কহাউস না তুলবার জন্য সরকারকে বুঝিয়ে বলি ইত্যাদি।'

মরে গেলে দুঃস্থের সংখ্যা যে একেবারে কমে যেতে পারে, একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

● বাংলার লাটে

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বাংলার গভর্ণর মিঃ
সম্বন্ধে বেতার বক্তৃতা করেন। কার্ত্তিক শেষ হও
বলিয়া তিনি বক্তৃতায় যে-ছবি আঁকিয়াছেন তাহ
চালের দাম এখন যে ভাবে নামিতেছে তাহা দেখিয়া
চিরকালের প্রথা অনুযায়ী কিছুটা সঞ্চয় হাতে জমা
বলিতেছেন: "নভেম্বর মাসে নূতন আমন ধান
স্বভাবসিদ্ধ পারিবারিক জমার অবস্থা ফিরিয়া আস

তাঁহার মতে "সাহায্যপ্রার্থী দুঃস্থের সংখ্যা"
কোন উদ্বেগের কারণ নাই"। দুঃস্থদের বাঁচাইবার
প্রস্তুত" এবং আগের চেয়েও অনেক "ব্যাপক ব্যব
হইয়াছে, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধের পরিমাণ
সাজা হইয়াছে"।

"আমন ধান গতবারের মত অত বেশী" আশা
হইয়া থাকে তাহার চেয়ে কম হইবার কোন আশঙ্কা

লাটসাহেবের এই আশার ছবিতে বিশ্বাস করি
হইয়াছে তাহা সকলেই জানে। দুর্ভিক্ষের সময়
—এখন অত লোক না খাইয়া বা মহামারীতে মরি
নাই! বিপদের দুর্ভাবনা সম্পূর্ণ কাটিয়াছে কিন
ফিরিয়া যাইতে পারিব কিনা—ইহাই বাঙ্গালীর কা
ছবি আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম। উহা হইতেই
ছবি আত্ম-প্রতারণা কিনা।

মহামারী ও ঔ

ডাঃ বিধান র

মিঃ কেসি তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে বাংলা দেশের কয়েকটী অংশে মহামারীরূপে ম্যালেরিয়া সম্প্রতি আবার দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে অন্যান্য রোগের তুলনায় ম্যালেরিয়ার শতকরা হার এইরূপ:

মে	৬৯·৩%
জুন	৬৪·৬%
জুলাই	৬৬·২%
অগাষ্ট	৭৫·৩%
সেপ্টেম্বর (প্রথমার্দ্ধ)	৮১·২%

এই হিসাব হইতে তিনি বলিতেছেন যে
ম্যালেরিয়া সম্প্রতি **আবার** দেখা দিয়াছে লাটসাহেবে
এ কথা ঠিক নয়। ম্যালেরিয়া ছিলই, উহা আরও
বাড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে এত ব্যাপক হইয়াছে যে
অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন, আত্মসন্তোষও ত্যাগ করা
প্রয়োজন। তাঁহার মতে "সারা বাংলাই আজ
ম্যালেরিয়ার কবলে এবং দ্বিধাহীনভাবে একথা
সকলকে জানানো দরকার।" আমেরিকান ফ্রেণ্ডস
সার্ভিসের ডাঃ লঙ্গশোরের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন
কমিটির পরিদর্শক ডাঃ বি, কে, বসু উত্তর ও পূর্ব্ব
বঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়া যে-রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতেও
এই অভিমতই বজায় থাকে।

যুদ্ধের আগে সারা ভারতে যত ম্যালেরিয়ার
ঔষধ খরচ হইত বর্ত্তমানে শুধু বাংলা দেশেই তাহার
চেয়ে বেশী ঔষধ পাওয়া যায়—এইকথা বলিয়া মিঃ
কেসি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে
ডাঃ রায় বলিতেছেন যে প্রধানত মেপাক্রিন ও
কুইনাক্রিন নামে ম্যালেরিয়ার ঔষধ বর্ত্তমানে বেশী
পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের আগে
সারা ভারতে এই সব ঔষধ যে পরিমাণে লাগিত
এখন শুধু বাংলা দেশেই তাহার চেয়ে অনেক বেশী
পরিমাণ প্রয়োজন। অধিকাংশ জেলায়ই কুইনাইন
সরবরাহ অত্যন্ত কম এবং বাকী জেলায় পাওয়াই
যায় না।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জেলার সদরে
সিভিল সার্জনই কুইনাইন বণ্টন করেন এবং এইরূপ
নিয়ম হইয়াছে যে মজুদ কুইনাইন একেবারে
ফুরাইয়া না গেলে নতুন মাল দেওয়া হইবে না।
ইহার ফলে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য
কুইনাইন পাইতে যথেষ্ট দেরী হয়। উদাহরণ স্বরূপ
যশোহরের খৈসালের ডাক্তারখানায় নূতন কুইনাইন
না পাওয়া পর্য্যন্ত ৮ দিন চিকিৎসা বন্ধ রাখিতে
হইয়াছিল এবং মেদিনীপুর জেলার একটী কেন্দ্রে
তমলুক হইতে এক পাউণ্ড মাত্র কুইনাইন আনাইবা

র আত্মপ্রতারণা ●

কসি বাংলা দেশের খাদ্য, মহামারী, নিঃস্বতা প্রভৃতি
ার আগেই সোনার বাংলা প্রায় ফিরিয়া আসিতেছে
তে চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়ে। ধান-
াঁহার মনে হইয়াছে বাংলার লক্ষ লক্ষ চাষী এবার
াই তাহার পর নূতন ফসল কাটিতে নামিবে। তিনি
াটিবার আগেই বাংলার লক্ষ-কোটী চাষীর ঘরে ঘরে
ুচিত বলিয়াই মনে হইতেছে।"
কি "কমিয়া গিয়াছে" এবং তাহাদের সম্বন্ধে "বিশেষ
জন্য গবর্ণমেণ্ট সংগঠন নাকি এখন "সম্পূর্ণরূপে
করিবার পক্ষে উপযুক্ত।" মহামারীর অবস্থা উন্নত
প্রচুর বাড়ানো হইয়াছে। বিলি ব্যবস্থাও "চালিয়া

করা যায় না বটে কিন্তু "সাধারণত যে পরিমাণ
দেখা যাইতেছেনা"—ইহাও তিনি বলিয়াছেন।
ত পারিলে বাঙ্গালী সুখী হইত। অবস্থা কিছুটা উন্নত
ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে
হে না তাহা প্রমাণ করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব
অদূর ভবিষ্যতে আমরা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অবস্থায়
আজ জীবন-মরণের প্রশ্ন। তাহারই বিভিন্ন বাস্তব
বাঙ্গালী বিচার করিতে পারিবে কেসি সাহেবের

ষধের দুরবস্থা
য়ের বিবৃতি

ব্যবস্থা করিবার জন্য পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে ৪৬৲ টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে প্রত্যেক এলাকায় যাহাতে কুইনাইন পৌছায় সিভিল সার্জনেরই সে ব্যবস্থা করা উচিত।

ঔষধের লাইসেন্স দিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতেও মফঃস্বলে ঔষধের অভাব ঘটিতেছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় বেসরকারী রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলির কমিটিতে দায়িত্বশীল লোক থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পক্ষে এই সব ঔষধের লাইসেন্স পাওয়া ঢের বেশী শক্ত; অথচ যে সব ব্যক্তির কাজকর্ম্ম পরীক্ষা করা অনেক বেশী মুস্কিল তাঁহারা সহজেই লাইসেন্স পান। সেজন্যই চোরাকারবার এত ঘন ঘন দেখা যায়।

মহামারী প্রতিরোধের জন্য লাটসাহেব কোন কার্য্যপদ্ধতি দেন নাই বলিয়া ডাঃ রায় হতাশা প্রকাশ করেন। কার্য্যপদ্ধতি না থাকায় কি সরকারী মহল কি বে-সরকারী মহল সর্বত্রই আত্মসন্তোষের ভাব সৃষ্টি হইতে পারে। উহার ফলে ১৯৪৩-এর মতে এবারও ধারণা জন্মিতে পারে যে যেহেতু বাংলা দেশে মহামারীকে আয়ত্তের মধ্যে আনা গিয়াছে, উহার প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে সুতরাং বাংলাকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই।

"এই বিপদের বিরুদ্ধে সাবধান হইতে হইবে কারণ রিপোর্ট হইতেই দেখা যাইতেছে যে মহামারী আয়ত্তে আসে নাই, বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধের পরিমাণও যথেষ্ট নয়।"

কেসি সাহেব অনুযোগ করিয়াছিলেন যে যে সব বিখ্যাত লোক বাহির হইতে বাংলায় আসিয়া অল্প কিছু দেখিয়া বাংলার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন তাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন ঃ—

"রাজ কর্মচারীরা শুধু ভাল দিকটাই দেখাইতে ব্যগ্র। এই সব কর্মচারী লাটসাহেবের জন্য যে সব সাজানো পরিদর্শনের (Conducted tours) ব্যবস্থা করেন তাহা হইতে লাটসাহেব যতটুকু দেখিতে ও বুঝিতে পান তাহা পণ্ডিত কুঞ্জরু বা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের দেখা ও বোঝা হইতে আলাদা হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ইঁহারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, ভারতের প্রত্যেকটী রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমি আশা করি তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকিবেন। বাংলার দুর্দ্দশা ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঘটিতে পারে; আমাদের বিরাট মহাদেশে কোন ভারতীয়ের পক্ষেই এই সমস্ত দুঃখজনক ব্যাপার দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নয়।"

স্বচ্ছলতার নমুনা!

[মিঃ কেসি বলিয়াছেন, "ধরিতে গেলে এখন সারা প্রদেশেই চালের দাম একরূপ আছে, নীচে নামিবার খানিকটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে এবার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর "এই তিন মাস বাস্তবিক কোনো কষ্ট না করিয়াই আমরা পার হইতে পারিব!" নীচের যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইল সেগুলি বোধ হয় কষ্ট নয়!]

চাউলের দরবৃদ্ধি

জিয়াগঞ্জ, ২০শে সেপ্টেম্বর—জিয়াগঞ্জ বাজারে নূতন আউস চাউলের দর প্রতি মণ প্রায় সাড়ে আট টাকায় নামিয়াছিল কিন্তু সরকারী এজেণ্টগণ বাজারে চাউল খরিদ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা)। **ঢাকা,** ১৯শে সেপ্টেম্বর—সরেস চাউলের দর ২১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে (আনন্দবাজার, ২০।৯।৪১।

বাংলার স্বচ্ছলতা দিল্লীতেও পৌঁছিয়াছে

নয়াদিল্লী, ৩০শে সেপ্টেম্বর—"ভবঘুরে" এই অভিযোগে দিল্লীর পুলিশ আজ ৩৫ জন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে—তাহাদের পুলিশ হাজতে রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়।

বাংলা হইতে আগত অনেক দুঃস্থ স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুকে দিল্লীর রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি করিতে দেখা যাইতেছে। (ইউ. পির খবর)

মাদারীপুরে চাউলের দর বৃদ্ধি

৪ঠা সেপ্টেম্বর—বালাম চাউলের দর গত দুই সপ্তাহে ৩।৪ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। মাদারীপুরে চাউলের দর ১৮৲ টাকা—মফঃস্বল অঞ্চলে প্রতিমণ ১৯।২০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। (এ-পি)

হাওড়ার গ্রামে খাদ্যাভাব

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ব্যানার্জী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—

"স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে অল্প পরিমাণ চাউল দোকানদারদের মারফৎ বিক্রয়ের জন্য ছাড়িয়াছে, তাহা এতই খারাপ যে গরীব লোকেরা বাধ্য হইয়া তাহা খাইয়া উদরাময়, আমাশয় ও নানারূপ অসুখে ভুগিতেছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও আমাশয়ে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গিয়াছে।

উপরন্তু, সরকারী সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হওয়ার জন্য চোরাবাজার পুরাদমে চলিতেছে। বিভিন্ন স্থানে চাউলের দাম বিভিন্ন রকমের—২২৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় প্রতিমণ চাউল বিক্রয় হয়। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা ভাল চাউল কণ্ট্রোল দরে ক্রয় করিবার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অযোগ্য এবং তাহারা গোপনে চোরাবাজারে উৎসাহ দান করিতেছে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৬।৯।৪৪)

একদিকে অপচয়—
—আর একদিকে মৃত্যু

● মৃত্যু ●

"১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার হাসপাতালে ১০ জন নিঃস্ব রোগী মারা গিয়াছে এবং ৫১ জন নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহাতে ১লা হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইল ১৩২ আর মোট নতুন ভর্ত্তির সংখ্যা হইল ৫৫৯ জন। গত মাসের ঠিক একই সময়ের ভিতর ৬৮ জনের মৃত্যু হয় ও ৪২১ জন নূতন ভর্ত্তি হইয়াছিল।"

(ষ্টেটস্‌ম্যান—১৭।৯।৪৪)

পটুয়াখালিতে খাদ্যাভাব

কয়েকদিন যাবৎ খাদ্যজিনিষের মূল্যনিয়ন্ত্রণ হুকুম জারী হইলে বাজার হইতে ঐ সকল জিনিষ উধাও হইয়াছে। ফলে, বে-সরকারী নাগরিকদের জীবনযাত্রা একেবারে অচল অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সিভিকগার্ড ও পুলিশ একত্রে শহরের উপকণ্ঠে সরবরাহকারীদের ধরিয়া যাহা কিছু পাইতেছে তাহা তাহাদের খুসীমতন ভাগ বণ্টন করিয়া দিতেছে। সাধারণতঃ সরকারী কর্মচারীগণ ও কতিপয় ভাগ্যবান কিছু কিছু পাইতেছেন। তাহা ভিন্ন অন্যান্য সকলের জীবনযাত্রা ভয়াবহ হইয়াছে। উপবাসে থাকিবার মতন অবস্থা হইয়াছে। (আনন্দবাজার, ১৩-৯-৪৪)

লোকের ক্রয় ক্ষমতা নাই

১লা সেপ্টেম্বর—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বেলের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা খাদ্য কমিটির এক সভায় সরকারী গুদাম হইতে যে চাউল সরবরাহ করা হয় তাহার দর ১৪৸৵০ হইতে ১০ টাকায় কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহার কারণ স্বরূপ প্রস্তাবে বলা হয়, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা এতই কমিয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বাঁধা দরে তাহারা চাউল কিনিতে অক্ষম। (এ-পি)।

বর্দ্ধমানে দুর্গতদের সমাবেশ

কয়েক মাস পরে সম্প্রতি আবার বর্দ্ধমান সহরে দুর্গতদের সমাবেশ দেখা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও শিশু। সম্ভবতঃ বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে তাহারা আসিতেছে।

(আনন্দবাজার—১৩-৯-৪৪)

ঘাটালে দুর্গতি

মেদিনীপুর জেলা রিলিফ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন,—দাসপুর ও ঘাটাল থানার কয়েকটী ইউনিয়নে মাস কয়েক ধরিয়া খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ না করিলে যাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই, তাহাদের মোটামুটি সংখ্যা ৬০০০। (আনন্দবাজার, ১৬।৯।৪৪)

● অপচয় ●

কলিকাতায়

"মানুষের অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত ৭৫ হাজার মণের অধিক আটা এবং ৭১ হাজার মণ ময়দা কলিকাতায় সরকারী ষ্টকিষ্টদের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। সহরের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিকট সম্প্রতি বাংলা সরকার যে চিঠি দিয়াছেন, তাহাতেই এই খবর প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত আটা ও ময়দা মানুষের অখাদ্য হইলেও উহা মাড় ও ধেতসার প্রভৃতি হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য। ঐসব প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত দ্রব্যের কি দর দিতে প্রস্তুত আছেন তাহা সরকারের তরফ হইতে জানিতে চাওয়া হইয়াছে।" (অমৃতবাজার, ১৭।৯।৪৪)

খুলনায়

"খুলনা রেলওয়ে কলোনীর সম্মুখে রেল কোম্পানীর জমির উপর সিভিল সাপ্লাইয়ের কত শত আটা ও চাউলের বস্তা যে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইগুলি যে শুধু খাইবারই অনুপযোগী হইয়াছে তাহা নয়, পচিয়া তাহা হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে।"

(আনন্দবাজার, ১৭।৯।৪৪)

নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-যশোরে

বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও যশোহরের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ খাদ্যবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন এবং এই বস্তু যাহাতে জনসাধারণের উদরস্থ না হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। (আনন্দবাজার, ১৬-৯-৪৪)

কুমিল্লায়

পুরানবাজার মহাজন সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন—প্রভূত পরিমাণ আটা ডাল সরকারী গুদামে মজুত আছে। ঐ সকল জিনিষ বদ্ধ ও স্যাঁতসেতে গুদামে মাসাধিককাল থাকিলেই উহা খাদ্য স্বরূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ঐ দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কনট্রোল দোকানদারগণ সরকারী গুদাম হইতে পচা ও অখাদ্য আটা ডাল আনিয়া জনসাধারণকে লইতে বাধ্য করে। (আনন্দবাজার, ১৬।৯।৪৪)

বর্দ্ধমানে

বর্দ্ধমান খাদ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রণবেশ্বর সরকার ১৪ই সেপ্টেম্বর জানাইয়াছেন—বর্দ্ধমানের কর্ত্তৃপক্ষ মানুষের অখাদ্য আনুমানিক ১৬,০০০ মণ আটা শহরের ব্যবসাদারদের নিকট ৩৸০ মণ দরে বিক্রয় করিয়াছেন। ব্যবসাদাররা সেই আটা ৭।৮৲ টাকা মণ দরে বাজারে ছাড়িয়াছে। যে সমস্ত চাকিওয়ালা কণ্ট্রোল-গম পিশাই করে তাহারা ঐ পচা আটা লইয়া খাটী আটার সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

মেদিনীপুরে

১৮ই সেপ্টেম্বর—কাঁথি থানার অন্তর্গত ভাইটগড় সরকারী গুদামে প্রায় ২০০ বস্তা আটা ও চাউল পচিয়া এমন ভাবে নষ্ট হইয়াছে যে তাহা একেবারে অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর সহরেও কতিপয় গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া আনিয়া বহু আটা **পোড়ানো** হইয়াছে। ইহা নাকি সরকারী আদেশক্রমে হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

(আনন্দবাজার, ২১-৯-৪৪)

ইহারই নাম সরকারী সুব্যবস্থা!!

কেসি সাহেবের মতে, সরকারী সংগঠন নাকি বেশ মজবুত। তাছাড়া, বিস্তৃত পরিকল্পনা মত কাজ করার ক্ষমতাও নাকি এই সংগঠনের আছে।

কনক মুখার্জী তাঁর বিবরণে লিখছেন ঃ

'১লা আগষ্ট ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা অঞ্চলের ওয়ার্কহাউসে যাই। সেখানে দুঃস্থের সংখ্যা বেড়ে ৫৭০ এ দাঁড়িয়েছে। সকলেই প্রায় মেয়ে। তাদের মধ্যে ২৫০ জন ওয়ার্কহাউসেই থাকে। বাকি সবাই বাইরে থেকে আসে। এখানে ১০।১২ জন সরকারী কর্মচারীর হাতেই সমস্ত ব্যবস্থার ভার। মেয়েরা নানা অভাব অভিযোগের কথা জানালো। দেখলাম যে, মাপা পাত্রে রোজ তাদের যে ডাল আর ভাত দেওয়া হয়, তাতে তাদের পেট ভরে না। ক্বচিৎ কখনো একটা তরকারী পাতে পড়ে। সপ্তাহে ২ দিন মাছ দেবার কথা আছে, কিন্তু তাও নাকি সকলে পায় না।

জানতে পারলাম যে, আগে এই ওয়ার্কহাউসগুলিতে মাথা পিছু দৈনিক ৮ ছটাক খাদ্য রেশন ছিল; আর এখন তা কমিয়ে ৬ ছটাক বরাদ্দ হয়েছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আগে আগে সকালে চিঁড়ে বা ভাত দেবার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু অত খাওয়ার ফলে নাকি দেখা গেছে, সকলের পেটের অসুখ করে। তাই সকালের খাবার এখন বন্ধ আছে।

দুঃস্থ মেয়েরা হাবেভাবে ওখানকার 'বাবু'দের নামে অনেক নালিশই জানালো। খোঁজ ক'রে জানলাম, ঐ মেয়েদের সঙ্গে দুর্নীতির জন্য এমন কি ২ জন সিভিক গার্ডকে সরকার গ্রেপ্তার ক'রতে বাধ্য হয়েছে। এরকম দুর্নীতির সংবাদ নাকি এ জেলার ইদিলপুরের ওয়ার্কহাউস থেকেও পাওয়া গিয়েছে শুনলাম।'

[৪র্থ পৃষ্ঠার পর]

কুইনিন নেই বলে শিশি হাতে দলে দলে লোক ফিরে যাওয়ার চিত্র চোখে ভেসে উঠল। মুন্সীগঞ্জের বেসরকারী শিশুসদনের হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুসী ছেলেগুলির পাশে কাটাখালির সরকারী প্রতিষ্ঠানের শীর্ণ ম্লান মুখ শিশুদের ছবি দেখতে পেলাম। বাংলার গ্রামে গ্রামে জীবন থেকে উৎখাত লক্ষ লক্ষ ভ্রাম্যমান নিঃস্ব লোক যদি রেডিয়োতে কান পেতে মিঃ কেসির বক্তৃতা শুনতে পেতো, তাহলে তারা যে কি বলতো তাই ভাবি!

প্রায় অর্দ্ধেক চটকল বন্ধ

কয়লা সমস্যা না মিটাইলে এই সংকট ঘুচিবে না

আব্দুল মোমিন

আজকে বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক চটকল কয়লার অভাবে ও সরকারী কারণে বন্ধ এবং তার ফলে প্রায় ৮০ হাজার মজুর বেকার অবস্থায়। এই সংকট ঘুচাইবার জন্য চটকল মজুর বহুদিন হইতে আন্দোলন চালাইতেছে, কিন্তু কি মিল-মালিক, কি সরকার কাহারও এই সংকট দূর করিবার জন্য বিশেষ মাথা ব্যথা দেখা যাইতেছে না। কয়লা পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং বিজলী চালিত কারখানাগুলিই চালু থাক—সরকার ও মালিকে এই বিষয়ে রফা হইয়া গিয়াছে। যাহাতে চটকল মালিকদের সকলেরই মুনাফার হার সমান হয়, তার জন্য তারা প্ল্যান

মজুরী ও মুনাফার কত তফাৎ !

১৯১৪-১৮ সালে চটকলগুলির মালিকেরা ৪০০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছিল।

১৯১৮ সালে এক গৌরীপুর জুট মিলের হিসাবেই দেখা যায় যে, যেখানে একজন শ্রমিক গড়ে বছরে ২০০ টাকা রোজগার করেছে, সেখানে মালিক প্রতি মজুরের পরিশ্রমের ফলে বছরে ১৩০০০ হাজার টাকা লাভ করেছে।

করিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু ৮০ হাজার মজুরের জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থাও যে দরকার, সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চট ও থলিয়ার চাহিদা বাড়িয়া গেল, মালিকরা গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে কোটী কোটী গজ চট সরবরাহের অর্ডার পাইল। এই অর্ডার মাফিক পয়দা করিবার জন্য চটকলে এখন কাজের ঘণ্টা বাড়াইবার দরকার হইল এবং তাই সরকারও আইন করিল যে সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ হইতে পারিবে। কিন্তু তারপরই আসিল যুদ্ধের জটিল অবস্থা, জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া গেল—তখন মালিকরা আবার পয়দা কমাইবার জন্য কখন কাজের ঘণ্টা কমাইতে লাগিল, কখনও তাঁত বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। অর্থাৎ এখন হইতেই মজুরদের অনিশ্চিত অবস্থা সুরু হইল, চটকল মালিকরা নিজেদের লাভের খাতিরেই ইচ্ছামত ব্যবস্থার অদলবদল করিতে লাগিল।

১৯৪৩ সালে মার্চ মাসে আমেরিকা হইতে ১২ কোটী গজ চট সরবরাহের অর্ডার আসিল। তখন হঠাৎ আবার ৫৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে মিলগুলিতে ৬০ ঘণ্টা কাজ শুরু হইল। যে তাঁতগুলি বন্ধ ছিল, সেগুলিও আবার চলিল। মে মাসে এই অর্ডার অনুযায়ী পয়দা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কাজের ঘণ্টা কমিয়া ৫৪ ঘণ্টা হইল এবং শতকরা ১০ খানি তাঁত বন্ধ হইল।

আবার জুন মাসে আমেরিকা হইতে ৭০ কোটী গজ চট সরবরাহের অর্ডার আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতেও প্রচুর অর্ডার আসিল। কিন্তু এবার এত অর্ডার সত্ত্বেও কাজ বাড়িল না তো বটেই বরং কাজ কমিল। কয়লা সংকট ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে।

কয়লা সংকটের ফল

যুদ্ধের গুরুত্ব অনুসারে শিল্পের বিপর্য্যয় আসিতে পারে আশঙ্কা করিয়া মজুররা আওয়াজ তুলিয়াছিল—মিলগুলিকে দুর্য্যোগের ভিতরও চালু রাখিবার জন্য কয়লা সঞ্চয় কর। ১৯৪২ সালে 'গ্র্যাডি কমিশন'ও এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছিল যে কয়লা সংকট হইতে মিলগুলিকে বাঁচাইবার জন্য বিজলী প্রবর্ত্তন করা দরকার। মিল মালিকরা সাময়িক লাভের মোহে পরামর্শ গ্রহণ করে নাই।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রায় ১০ হাজার তাঁত বন্ধ হইল এবং তাহার ফলে প্রায় ৫০ হাজার মজুর বেকার হইল।

এই সংকট মালিকের মুনাফা লোভেও আঘাত করিল, সরকারী অর্ডার সরবরাহেও অসুবিধা ঘটাইল। তাই তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবার আশায় তিন মাস পরে সরকার প্রতিশ্রুতি দিল চটকলগুলিতে দৈনিক ৭৫ ওয়াগন কয়লা সরবরাহ করা হইবে। সমস্ত চটকলের জন্য দৈনিক কয়লার প্রয়োজন হয় ৮২ ওয়াগন, সুতরাং ৭৫ ওয়াগনে কাজ চালাইতে গিয়া অনেক কারখানায় মাসে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ **তিন মাস ৫০ হাজার মজুর বেকার থাকিবার পর যে ব্যবস্থা হইল তাতে মজুরের মাসে এক সপ্তাহ বেকারত্ব কায়েম হইয়া রহিল।**

কিন্তু সরকারের এই প্রতিশ্রুতিও শেষপর্য্যন্ত থাকিল না। খনির পয়দা বাড়াইতে ও যানবাহনের সমস্যা মিটাইতে অক্ষম হইয়া সরকার ৭৫ ওয়াগন কয়লাও সরবরাহ করিতে পারিল না। **সরবরাহ কমিতে কমিতে এই বছরের মে মাসে দাঁড়াইল ৪২ ওয়াগন। জুন মাসে তা আরও কমিয়া দাঁড়াইল মাত্র ২৬ ওয়াগন।**

শেষ উপায়—মিল বন্ধ !

কয়লা সংকট দূর করিতে না পারিয়া সরকার শেষ উপায় লইল—যে সমস্ত মিল বিজলীতে চলে ও যে গুলি অল্প কয়লায় চলে শুধু সেই গুলি চালু রাখিয়া আর সব মিল বন্ধ করিয়া দিবার পরিকল্পনা করিল। **১৮টী মিল এইভাবে ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় ৭৪ হাজার মজুর বেকার হইয়াছে।** সরকারী পরিকল্পনা কাজে পরিণত

মজুরের সঙ্কট আর মালিকের মুনাফা

৪১'-'৪২ সালে মাত্র ৬০টী মিলের নীট লাভের পরিমাণ ৮,৯৭,৬৪,৩৩৩ টাকা। '৪৩ সালের ২৯টী মিলের হিসাবে তাদের গচ্ছিত মূলধনের পরিমাণ ২০,৯৯,১৬,৩৮৪ টাকা—সেই বছরেই নীট লাভ হয়েছে ১,০৮,৯৪,২১১ টাকা।

৪১'-'৪২ সালে যে লাভ হয়েছিল শোনা যায় ৪২'-'৪৩ সালে লাভ হয়েছে তার দেড়গুণ অর্থাৎ প্রায় ১৪ কোটী টাকা।

হইলে সবশুদ্ধ ৮০ হাজার মজুর বেকার হইবে। তা ছাড়া মিলিটারী বিভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত ১৬টী মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তারও একাংশ মজুর বেকার অবস্থায় রহিয়াছে।

চটকল মজুরের সংকট এমনিভাবেই আজ স্থায়ী সংকটে দাঁড়াইয়া গেল।

মালিকদের প্ল্যান

মালিকরা এখন নিজেদের ব্যবসায় সামলাইতেই ব্যস্ত, মজুরদের দিকে দেখিবার অবসর তাদের নাই। মালিকরা এক জোট হইয়া প্ল্যান করিয়াছে, যে সমস্ত মিল বন্ধ থাকিবে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য একটা যুক্ত-তহবিল তৈরী করা হইবে।

ইহাও নাকি মালিকরা ঠিক করিয়াছে, যে সব মিল চালু থাকিবে সেগুলিকে ডবল সিফ্‌ট চালাইয়া পূরা উৎপাদন করাইবে।

মজুরদের অবস্থা কি ?

কিন্তু এই প্ল্যানে মজুরের অবস্থা কি ফিরিবে ? চালু মিলে ডবল সিফ্‌ট কাজ হওয়া সত্ত্বেও নূতন মজুরদের থাকিতে দিবার মত স্থান না থাকায় এই ৮০ হাজার মজুরের অল্প অংশই ডবল সিফ্‌টের কাজ লইতে পারিবে। স্থানীয় অঞ্চল হইতে ডবল সিফ্‌টের জন্য সহজেই নূতন লোক জুটিতে পারে, সুতরাং মালিকের লোকসানের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে ৮০ হাজার মজুর বেকার হইয়া রহিল, তাহাদের বেকারত্ব ইহাতে ঘুচিবে না। সপ্তাহে ৪।০ টাকা ভাতার উপর নির্ভর করিয়া এই বেকার মজুরদের ক্রমশঃ দুঃস্থের অবস্থায় পরিণত হইতে হইবে।

কয়লা সংকট দূর কর

চটকল মজুরের এই সংকটকে চটকল মালিক বা সরকার উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। কয়লা-সংকট দূর না হইলে চটকল শিল্পের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের যে কোন সম্ভাবনা নাই, তা চোখের সামনে দেখিয়াও কি মিল-মালিক, কি সরকার কাহারও তরফ হইতে কয়লাখনির মজুরদের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা নাই। বরং কয়লাখনি সম্পর্কে সরকারী বোর্ড যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে খনি মালিকদের ঘুস দেওয়ারই ব্যবস্থা হইয়াছে, খনি মজুরদের মজুরীবৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আজ চটকল মজুর ও সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া সেই মূল সমস্যাকে আঘাত করিতে হইবে, তা না হইলে চটকল মজুরের এই সংকট ঘুচিবার পথ খুলিবে না।

চটকল বন্ধ হওয়ায় সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে চটকল মজুর। সুতরাং মালিক ও সরকারের ক্ষতিপূরণের যে প্ল্যান তাহাতে মজুরদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাই সকলের আগে করিতে হইবে।

অপরের চোখে কমিউনিষ্ট

অন্যতম কংগ্রেসী পত্র দিল্লীর প্রসিদ্ধ দৈনিক 'হিন্দুস্থান টাইমস্'-এর বিশেষ সংবাদদাতা বোম্বাইএ গান্ধী জিন্না আলোচনা সম্পর্কে ২০শে সেপ্টেম্বর যে বিবরণী পাঠাইয়াছেন, তাহাতে কমিউনিষ্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার্স সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

'কমিউনিষ্টরা বলিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারা গান্ধী-জিন্না আলাপ আলোচনার জন্য অনবরত আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্রিকার প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে জিন্নাভবনে আসাযাওয়া করিতেছেন এবং অন্যান্য সাংবাদিকের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। কাজেই কমিউনিষ্ট পার্টির হেড-কোয়ার্টার্স দেখিবার লোভ আমরা কয়েকজন সংবরণ করিতে পারিলাম না। রাজনীতির তফাৎ থাকিলেও, কমিউনিষ্টদের 'বেরাদারি' সম্পর্কে বোম্বাইয়ের লোক ত' উচ্ছ্বসিত। তাহাদের বাসস্থল যে সত্যিই দেখিবার মত এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডের উপর অনেকগুলি কমিউনিষ্ট একত্রে থাকেন, তাঁহাদের বাড়ীটার নাম 'রাজভুবন'। কাছেই তাঁহাদের নিখুঁত একটি ছাপাখানা। এখান হইতে 'পিপলস্ ওয়ার', পার্টির অন্যান্য পত্রিকা ও অনবরত তাঁহাদের পুস্তিকাবলী ছাপা হইয়া থাকে। খাওয়া দাওয়া সব একসঙ্গে বসিয়া হয়। তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা দেখিয়া জাহাজের খালাসী লস্করদের কথা মনে পড়িয়া গেল—বিশেষ করিয়া, জাহাজ ঘাটে ভিড়িলে তাহারা ডকের উপর বসিয়া যে ভাবে খাওয়া দাওয়া করে। ঘরের মধ্যে লোককে একসঙ্গে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতে হয়। স্থানাভাবের দরুণ অনেককে অন্য কোথাও থাকিতে হয়। ফ্যাসিষ্টদের ভাষায় বলিতে গেলে ইঁহাদের সমস্যাটা 'লেবেন শ্রাম্' বা শ্বাস ফেলিবার জায়গার। ইঁহাদের মধ্যে মহিলা সভ্যও কিছু কিছু আছেন—বিবাহিতদের জন্য থাকিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঘরের প্রাচীরে একাধিক ছবি ও মানচিত্র—ইহার মধ্য দিয়া মার্ক্সবাদী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ দেখানো হইয়াছে। ইহারা সকলেই খদ্দর পরার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিয়া থাকেন। কংগ্রেসের প্রতি ইঁহারা বন্ধু ভাবাপন্ন এবং গান্ধীজির প্রতি ইঁহাদের ভালবাসা অকৃত্রিম। ইঁহাদের লাইব্রেরীটি বেশ ভাল; তবে ইচ্ছা থাকিলেও পুলিশের আশঙ্কায় ইঁহারা লাইব্রেরীতে ইচ্ছানুরূপ বই রাখিতে পারেন না। ইঁহাদের বইয়ের একটি সুদৃশ্য দোকানও আছে—সহজ ও চিত্তগ্রাহীভাবে মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন করিতে হইলে যে কেউ এখান হইতে বই কিনিতে পারে।' (হিন্দুস্থান টাইমস্)

সংবাদ-সংগ্রহ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ

জলন্ধরের কৃষক

জলন্ধরে ২৩শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে কমরেড আছাঁড় সিং ছিনা বলেন যে, দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য পাঞ্জাবের কৃষকদের বেশি পরিমাণে ফসল বাড়াইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

সভাপতি আরও বলেন যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগের ঐক্যই ভারতকে স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইতে পারে।

বোম্বাইতে দশ হাজার কংগ্রেস সভ্য

১৯৪২ সালে আগষ্ট প্রস্তাবের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তাহার সমস্ত শাখা প্রশাখা বে-আইনী ঘোষিত করে। মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে মুক্তি লাভের পর এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম চালু করিতে বলেন। সেই অনুসারে বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১ লক্ষ সভ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ১৯৪২ সালে বোম্বাই কংগ্রেসের ২৫ হাজার সভ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে দশ দিনের মধ্যেই ১০ হাজার কংগ্রেস সভ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

সীমান্তের লালকোর্ত্তা

গত ৭ঠা সেপ্টেম্বর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লাল কোর্ত্তার স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পেশোয়ারে এক সভা হয়। সভায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ হাকিম আবদুল জলিল নদভী বলেন যে, মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট সংগঠন হিসাবে খোদাই খিদমদগার ও লাল কোর্ত্তা বা রেড শার্ট কংগ্রেসের দুর্ব্বলতার কারণ না হইয়া শক্তি যোগাইয়া আসিতেছে।

এই সভায় সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খানের মুক্তি দাবী করা হয়।

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন

উজ্জয়িনীতে গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশন গত ১৭ই সেপ্টেম্বর হইয়া গিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেক এলাকা হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ২৫০ জন এবং কৃষক ও মজুর সমেত ১০,০০০ জনসাধারণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে। বোম্বাইএর মেয়র ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সভাপতি মিঃ টি এন গোখলে তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন ও বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে দেশীয় রাজ্যে জনগণের দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

যুক্তপ্রদেশ

বন্যায় ক্ষতি ঃ—প্রাদেশিক কৃষক সভায় সেক্রেটারী মিঃ হর্ষদেও মালভিয়া এক বিবৃতিতে বলেন, বন্যায় গঙ্গার দুই পার্শ্বে কৃষিজমির ও ফসলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে বহু কৃষক গৃহহারা ও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। সরকারের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া তিনি এখনি সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনের কথা বলেন।

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট ঃ—যুক্ত প্রান্তীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্মেলনে কেন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা মিঃ সম্পূর্ণানন্দ কিছুদিন আগে বেনারস হইতে এক বিবৃতি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব বৈদেশিক দপ্তরের সম্পাদক ও কমিউনিষ্ট নেতা ডাঃ জেড্ এ আহম্মদ ইহার জবাবে বলেন, এইভাবে কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস সভা হইতে বাদ দেওয়া কংগ্রেস নীতি ও গঠনতন্ত্রের বিরোধী। কমিউনিষ্ট হিসাবেই এ আই সি সি র সভায় তাঁহারা গত বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কে আগে বার্লিনে পৌঁছায়

হীরেন মুখার্জ্জী

বার্লিন অভিমুখে লালফৌজ

কয়েকদিন আগে লালফৌজের নামজাদা কাগজ "রেড ষ্টারে" প্রকাশ হয় যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে বার্লিনের দিকে মিত্রবাহিনী এখন অগ্রসর হইতেছে, লালফৌজ রহিয়াছে বার্লিন হইতে ৩১৬ মাইল দূরে, আর ইংরেজ ও আমেরিকানরা আছে ৩২৮ মাইল দূরে। গত দশদিনে এই দূরত্ব কিছু কমিয়াছে। হিটলারশাসনের কেন্দ্রস্থলের দিকে মিত্রবাহিনীর অভিযানকে শত্রু আর ঠেকাইতে পারিতেছে না। খাস জার্ম্মাণীকে লইয়াই আজ লড়াই চলিতেছে বলিয়া শত্রু থরহরি কম্পমান অবস্থায় রহিয়াছে।

শত্রু প্রাণপণে লড়িতেছে

কিন্তু বুনো জানোয়ার জখম হইলে যেমন মরিয়া হইয়া লড়িতে থাকে, হিটলারী দুর্বৃত্তেরা আজ পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়াও প্রাণপণে লড়িতেছে। তাহাদের বেতার বক্তৃতায় আর পুরাণো জাঁকের সুর শোনা যায় না বটে, কিন্তু কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিব না বলিয়া তাহারা চেঁচাইতেছে, দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে মিত্রশক্তি যখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিনা রণে ক্ষান্ত হইবে না, তখন যেমন করিয়া হউক, লড়িয়া যাইতেই হইবে। তাই ভিস্‌চুলা নদীর কাছে লালফৌজকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের এত উদ্যম, তাই পশ্চিমে জিগ্‌ফ্রিড লাইনে মিত্রবাহিনীকে বাধা দিবার জন্য তাহাদের এত ব্যগ্রতা। কোন উপায়ে যদি তাহারা মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি থামাইতে পারে, কোনক্রমে যদি তাহারা একটা মিটমাট বাগাইতে পারে, ইহাই আজ হিটলারীদের শেষ ভরসা। তাই মরিয়াও না মরিবার জন্য তাহাদের এমন আগ্রহ।

লাটভিয়া ও এস্তোনিয়াকে মুক্ত করার কাজ লালফৌজ প্রায় সাঙ্গ করিয়াছে। বাল্‌টিক সাগরের নিকটে গভীর জঙ্গল ও জলাভূমিতে শত্রু আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়াও দিন দিন উৎখাত হইতেছে। লাটভিয়ার রাজধানী রিগা লালফৌজের দখলে আসিতে বিশেষ বিলম্ব হইবার কথা নয়। শীঘ্রই আর সমগ্র সোভিয়েটভূমির তিলার্দ্ধ স্থানেও শত্রুর অস্তিত্ব থাকিবে না।

নানাদিকে লালফৌজের আক্রমণ

খাস জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ব প্রাশিয়া প্রদেশের ভি[illegible]স্কিস্, শাকেন প্রভৃতি স্থানে লালফৌজ প্রবেশ [illegible]রিয়াছে। শত্রুপক্ষই খবর দিতেছে যে শীঘ্রই নূতন এক বড়দরের সোভিয়েট আক্রমণ আরম্ভ হইবে। লালফৌজ নানাদিকেই আক্রমণ করিতেছে। পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সর উপর অবিরাম সোভিয়েট কামানের গোলা পড়িতেছে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা পার হইয়া লালফৌজ চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর বড়দরের লড়াই চালাইবার উপক্রম করিতেছে। সোভিয়েট ও রুমানিয়ান সৈন্য হাঙ্গেরীর মধ্যে ঢুকিয়া মাকো প্রভৃতি জায়গা দখল করিয়াছে, রাজধানী বুডাপেষ্ট হইতে একশো মাইলের ভিতর পৌঁছিয়াছে। মার্শাল তিতোর সম্মতি ও সহযোগিতা লইয়া লালফৌজ যুগোশ্লাভিয়ায় ঢুকিয়াছে, রাজধানী বেলগ্রেডের কাছাকাছি রহিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার দেশভক্তেরা যেন হিটলারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এখনই আরম্ভ করেন বলিয়া মস্কো বেতার আহ্বান জানাইয়াছে।

ইয়োরোপের সর্ব্বত্র আজ জনগণের মধ্যে 'সাজ, সাজ' রব উঠিয়াছে। পূর্ব্বে লালফৌজ ও পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাহায্য লইয়া তাহারা হিটলারীদের দলন করিবে, এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে, এবং নিজস্ব মনোমত শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিবে।

পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর সাফল্য

পশ্চিম ইয়োরোপে স্থানে স্থানে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও ফ্যাশিষ্টদের অবস্থা ক্রমেই রীতিমত কাহিল হইয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সের উত্তর উপকূল হইতে আর জার্ম্মান কামান গোলা ছুঁড়িতে পারিবে না। কালে বন্দরে নাৎসী সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শুধু বন্দরগুলিতেই ৮২০০০ জার্ম্মান বন্দী হইয়াছে।

ইঙ্গমার্কিন বাহিনী উত্তরে হল্যাণ্ডের সীমানা হইতে দক্ষিণে সুইটসারল্যাণ্ডের সীমানা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে তাহারা জার্ম্মান ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। জার্ম্মানীর মধ্যে অধিকৃত অঞ্চলগুলি হইতে এখনই ফ্যাশিজমের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে হইবে বলিয়া মিত্রসেনাপতি আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন।

জার্ম্মানী ও হল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে মিত্রবাহিনী বিশেষ চাপ দিয়াছিল, এখনও এই অঞ্চলে প্রধান যুদ্ধ চলিতেছে। এখানে এরোপ্লেন করিয়া একটা বৃটিশ সৈন্যদল আর্নহেমে নামানো হয়। জার্ম্মানরা প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ চালায় বলিয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধ করার পর এই সৈন্যদলকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেনাপতি ডেম্পসি সীমান্ত ধরিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া যান। মাজ নদীতীরে দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মানীর ভাগ্য এখানে অনেক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইবে বলিয়া যুদ্ধ খুবই জোরে চলিবে, শত্রু যে মরিয়া হইয়া লড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণে বেলফোর্টের কাছেও শত্রু কিছুতেই মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না।

পিছু হটা চলিবে না বলিয়া ফ্যাশিষ্ট বড়কর্ত্তারা হুকুম দিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব, পশ্চিম দুইদিকের চাপে শত্রুকে পিষিয়া মরিতে হইবে। শত্রু প্রতিরোধের চরম চেষ্টা করিবে জানিয়াই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইয়াছে। কিন্তু হিটলারীদের শেষ আশার আলোটী পর্য্যন্ত আজ নিভিয়া যাইতেছে।

ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্টরা পার পাইবে না

যুদ্ধ সম্পর্কে সম্প্রতি পার্লামেন্টে মিষ্টার চার্চ্চিল এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। মিত্রশক্তি যে ফ্যাশিজম ধ্বংসের সংকল্পে সম্পূর্ণ একমত, তাহা তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর এবং বিশেষত নর্ম্যান্ডির যুদ্ধ লইয়া মিত্রপক্ষ যে গর্ব্ববোধ করিতে পারে, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধের প্রধান বোঝা যে লালফৌজকে বহিতে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

ফিনলাণ্ড ও রুমেনিয়াকে সোভিয়েট শান্তির যে সর্ত্ত দিয়াছিল, তাহা লইয়া কোথাও কোথাও কথা উঠিয়াছে। আমাদের দেশেও কোন কোন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে ঐ সর্ত্তকে অত্যন্ত কঠোর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার চার্চ্চিলকেও বলিতে হইয়াছে যে ঐ সর্ত্তগুলি সোভিয়েটের উদার তারই পরিচয় দেয়।

শান্তির সর্ত্ত কি কঠোর হইয়াছে ?

ফিনলাণ্ডের শাসকরা বাধ্য হইয়া সোভিয়েটের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিয়াছে। সেদিন পর্য্যন্ত যাহারা হিটলারের হুকুমবরদারী করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত যাহারা পঁচিশবৎসর ধরিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইয়াছে, যাহারা হিটলারের তাঁবেদার হিসাবে সোভিয়েটভূমি আক্রমণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা যে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে সোভিয়েটের সর্ত্ত মানে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ সোভিয়েট বিরোধীদেরই জবরদস্ত সর্দ্দার মানারহাইম এখনও ফিনলাণ্ডের নায়ক। সুতরাং তাহারা নিতান্তই বেকায়দায় পড়িয়া পুরাণো মনিব হিটলারের বিরুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে।

এখনও ফিনলাণ্ডের জনসাধারণ এতদিনকার পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বোঝা নামাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। তাই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই সোভিয়েট এমন সর্ত্তে রাজী হইয়াছে, যাহাতে ফিনলাণ্ডের শাসকদের পক্ষে আবার সোভিয়েটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা সহজ না হয়। ফিনলাণ্ডকে অত্যন্ত কঠোর সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা কথা তুলিতেছেন, তাঁহারা তাই একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিতেছেন।

পোলাণ্ড সম্পর্কে সোভিয়েটের সংকল্প

পোলাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুতা যাহাতে কায়েম হয়, মিষ্টার চার্চ্চিল সে আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পোলাণ্ডকে লইয়া সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। চার্চ্চিল স্বীকার করিয়াছেন যে পোলাণ্ড সম্বন্ধে সোভিয়েট ও ব্রিটিশ সরকার যে একেবারে একমত, তাহা বলা চলে না। কিন্তু শীঘ্রই যে একমত হইতে হইবে, তাহার লক্ষণও পরিষ্কার।

লণ্ডনে যে তথাকথিত পোলিশ সরকার রহিয়াছে, চার্চ্চিল সাহেব তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সমর্থিত পোলিশ মুক্তি সংসদের একটা মিটমাট হয় তাহা সোভিয়েট চায়। সোভিয়েট বিরোধীরাই এ ব্যাপারে ক্রমাগত বাধা দিয়া চলিতেছে।

মিটমাট না হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ১৯৩৩ সালের ফ্যাশিষ্ট-ঘেঁষা শাসনতন্ত্রকে পরিহার করিয়া ১৯২১ সালের গণতান্ত্রিক কানুন গ্রহণ করার আপত্তিকে বরদাস্ত করা উচিত নয়। আর সোভিয়েটের শত্রু সস্‌ক্সোভ্‌স্কিকে তাড়াইয়া জেনারেল বরকে বসাইবার যে সিদ্ধান্ত, তাহাও বদ্‌লানো উচিত। সোভিয়েট জানাইয়াছে যে অসময়ে ওয়ার্স শহরে অভ্যুত্থানের আদেশ দিয়া যে সেনাপতি অন্তত দুই লক্ষ লোকের প্রাণনাশের জন্য দায়ী, তাহাকে পোলাণ্ডের প্রধান সেনাপতি পদে বসানো চলিবে না। সস্‌ক্সোভ্‌স্কিকে তাড়াইয়া বরকে বসানো যেন দার্লা খুন হওয়ার পর জিরোকে খাড়া করার মত কাণ্ড। কিন্তু সেবার যেমন ফরাসী মুক্তিসংসদ ও দ্যগোল্‌কে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় নাই, এবারও তেমনই পোলিশ দেশভক্তদের দাবী ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না।

বেলজিয়ামের নবগঠিত গবর্ণমেণ্ট

২৬শে সেপ্টেম্বরের রেডিও-র সংবাদে প্রকাশ, বেলজিয়ামে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এই গবর্ণমেণ্টে ১৯ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭ জন ক্যাথলিক, ৫ জন সোশালিষ্ট, ৩ জন উদারপন্থী, ২ জন অদলীয় এবং **২ জন কমিউনিষ্ট** স্থান পাইয়াছেন।

মন্ত্রিপদে প্রতিরোধ আন্দোলনের ৯জন নেতা

ফরাসী মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

জেনারেল দ্যগলের নেতৃত্বে জাতীয় সর্বসম্মতির ভিত্তিতে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। গণপরিষদ যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই মন্ত্রীসভা কাজ করিবে। নূতন মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে ৯জন জার্ম্মান-অধিকৃত ফ্রান্সে গুপ্তআন্দোলনের সহিত লিপ্ত ছিলেন এবং ১৩ জন আল্‌জিয়ার্সস্থিত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের সদস্য ছিলেন।

রেনে ম্যাসিগ্‌লি লণ্ডনে দূত হিসাবে নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহার স্থলে প্রতিরোধ কাউন্সিলের সভাপতি জর্জ বিদল্ নূতন পররাষ্ট্রসচিব হইলেন। উত্তর ফ্রান্সের শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক নেতা অগাষ্টিন লরিয়ে ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিউনিষ্ট ফার্ণাণ্ড গ্রেণিয়ের-এর স্থলে ফরাসী গেরিলাবাহিনীর সংগঠক ও কমিউনিষ্ট ডেপুটি চার্লস্ টিলঁ বিমানদপ্তরে বহাল হইয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমত, নাৎসীদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ভিসি সরকারের কাছ হইতে ফ্রান্স শাসনের জন্য নাৎসীরা বিপুল অর্থ পাইয়াছিল. তাহার দ্বারা তাহারা ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত শিল্প কারখানা কিনিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই মন্ত্রীসভার বিধানের ফলে মৌলিক সমস্ত শিল্পের উপর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ, এই সমস্ত শিল্প কারখানার মালিকদের অধিকাংশই নাৎসীদের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহাদের হাতে আর শিল্প কারখানার মালিকানা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

দ্বিতীয়ত, যাহারা দেশদ্রোহিতা করিয়াছে ও নাৎসীদের সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহাদের বিচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়ত, বে-আইনী সংবাদপত্রগুলিকে বৈধ করা হইয়াছে। জার্ম্মানদের তাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ছাপাখানাগুলি ইহাদেরই হাতে আসিয়াছে।

নূতন ফ্রান্সের পরিকল্পনা

জার্ম্মান অধিকৃত ফ্রান্সে যে সমস্ত গুপ্ত প্রতিরোধ সংগঠনগুলি সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া নাৎসী নাগপাশকে চূর্ণ করিয়াছে, তাহারা ফরাসী জনগণের স্বার্থে নূতন ফ্রান্স গঠনের একটি যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে। আটটি মুখ্য প্রস্তাব এই পরিকল্পনায় আছে—

১। যাহারা ফ্রান্সের লজ্জাকর আত্মসমর্পণের জন্য দায়ী এবং নাৎসী শাসকদের যাহারা সহায়তা করিয়াছে, ব্যক্তি নির্বিশেষে তাহাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

২। দেশদ্রোহীদের বিচারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

৩। দেশদ্রোহী ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকজনের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা হিতসাধনী প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

৪। চোরাকারবারীদের কারাদণ্ড দিতে হইবে।

৫। সরকারী দপ্তরগুলিতে দ্রুত সংস্কারমূলক ব্যবস্থা চাই। কাজের পদ্ধতি উন্নত করিতে হইবে এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কর্মচারীদের ছাঁটাই করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগ, অর্থ বিভাগ, কূটবিভাগ ষ্টেটকাউন্সিল প্রভৃতি দপ্তর সম্পর্কে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে।

৬। জাতীয় অর্থনীতিতে যাহাতে শ্রমিকরা অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য এডমিনিষ্ট্রেশন কমিটিগুলিতে তাহাদের স্থান দিতে হইবে।

৭। বিজলী কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা, খনি, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশেষ করিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিকে অবিলম্বে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

৮। ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

আমাদের এই বইগুলির খবর পাইয়াছেন ?

সোভিয়েট কৃষক

লেখক—ধরণী গোস্বামী

নামেই পুস্তকখানার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। **দাম দশ আনা মাত্র।**

সমাজতন্ত্রবাদ
কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক

মূল লেখক—ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্

অনুবাদক—রেবতী বর্ম্মণ

মার্ক্সবাদের গোড়াকার কিতাব। **দাম চৌদ্দ আনা মাত্র।**

পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য

ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত

পরিশিষ্টে পি, সি, জোশীর এই বিষয়ে লেখা বহু প্রশংসিত প্রবন্ধটির শেষাংশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যার তালিকাও ইহাতে আছে। **দাম বার আনা মাত্র।**

আমাদের দোকানে পাওয়া যায়ঃ আধুনিক সাহিত্যের মাসিকপত্র **পরিচয়** ঃ প্রতিসংখ্যা ।৵০ আনা। পরিচয় অফিস ঃ ৪৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটেও পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্

রাজনীতিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ মার্ক্স-লেনিনবাদী সাহিত্যের প্রকাশক ও বিক্রেতা

১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Regd. No. C. 2836

পূজার কাপড়ের রহস্যময় কেলেঙ্কারি

১১ হাজার গাঁট জমা সত্ত্বেও লোকে ঘুরিয়া মরিল

এখনো ৭০০০ গাঁট সরকারের হাতে—তবু দর চড়ে কেন ?

এবার ঈদ ও পূজার উৎসবে বাঙ্গালী নূতন কাপড়ে সাজিতে পারে নাই। অনেক চেঁচামেচির পর কলিকাতা শহরে সামান্য কিছু বাড়তি কাপড়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, মফঃস্বলে একেবারে হয় নাই বলিলেই হয়। কণ্ট্রোল দরে অধিকাংশ জায়গায়ই কাপড় পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কলিকাতার বাজারে চোরাবাজারের দর সামান্য কিছুটা নামিয়াছিল, কিন্তু পূজা শেষ হইতে না হইতেই দর আবার চড়িতে সুরু করিয়াছে। কয়েক রকম কাপড়ের দরের নমুনা এইরূপ :—

		কণ্ট্রোল দাম	পূজার সময়ের দাম	এখনকার দাম
মোহিনী মিল এম এম ৫১নং ধুতি জোড়া		৬৷৵০	৮৲	৮।০
ঐ এম ১৫৯ নং শাড়ী	„	৮৷৵০	১১৷০	১২৲
বাসন্তী মিল ১০ × ৪৮″ ধুতি	„	৮৴০	৯।০	১০৲
অরবিন্দ মিল "সেনগুপ্ত" ধুতি	„	৯৸/০	১৩।০	১৪৲

অথচ পূজার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও বস্ত্র "উপদেষ্টা" কমিটি যে ১১ হাজার গাঁট কাপড় পাইয়াছিল তাহার অধিকাংশই (প্রায় ৭।৮ হাজার গাঁট) নাকি বিলি করিতে "পারা যায় নাই", এখনো জমিয়া রহিয়াছে। ঈদ ও পূজার বাজারে লোকে কাপড় কিনিবার চেষ্টায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইল তবুও এত কাপড় বিলি হইল না কেন ? আর এত কাপড় জমা থাকা সত্ত্বেও এখন দর চড়িতেছে কেন ? সেই খবরই আমরা দেশবাসীকে জানাইতেছি।

একদিকে বড় বড় মালিক, পাইকার বা মজুতদার কাপড় আটকাইয়া রাখিতেছে, অন্যদিকে আমলাতন্ত্র হয় তাহাদিগকে ধরিতে অনিচ্ছুক নয়তো অক্ষম—ইহাই হইল বাংলা দেশে কাপড়ের অভাব ও দুর্মূল্যতার প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট অনেক আড়ম্বর করিয়া গত বছরের শেষেই একটী প্রাদেশিক বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কমিটি বসাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের কাজের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল যখন ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৪ জন বড় বড় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াও অজ্ঞাত কারণে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণ বা খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতায় মজুত মাল বাহির করিবার কোন পরিকল্পনা নিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না জনকয়েক মাহিনা-করা গোয়েন্দা দিয়াই কিস্তি মাৎ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম কিস্তি ডুবিয়া গেল—কি গূঢ় কারণে তাহা তাঁহারাই জানেন !

বড় বড় মজুতদার, কাপড়ওয়ালা, মিলওয়ালা প্রভৃতি তাঁহাদের কণ্ট্রোল ব্যবস্থাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি প্রাদেশিক বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ড "পুনর্গঠিত" হইল। জনকয়েক লোক দেখানো সভ্য ছাড়া বোর্ডের বাকী প্রায় সমস্ত সভ্যই হইলেন—কলিকাতা বা বাংলার সব চেয়ে বড় বড় মিল-মালিক ও ব্যবসায়ী। যাঁহাদের হাতে কাপড় থাকায় কাপড়ের কষ্ট বাড়িয়াই চলিয়াছে তাঁহারাই নাকি জনসাধারণের স্বার্থে কাপড় বিলি নিয়ন্ত্রণ করিবেন ! বোর্ডের সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় নিজেই ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডিরেক্টর। তিনি আড়ম্বরে ঘোষণা করিলেন, "কাপড় বিলিতে সাহায্য করিবার জন্য খরিদ্দারদের প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক জায়গায় কমিটি গঠন করা হইবে।" কিন্তু সভাপতিরূপে পাকা হইয়া বসিবার পর খরিদ্দারদের আর কোন খোঁজ লওয়া হইল না, কমিটি গঠন করা তো দূরে থাক।

খুচরা ব্যবসায়ীরা মিল-মালিক ও পাইকারদের কাছে খরিদ্দারের প্রয়োজন মত মাল পান না। তাঁহারা জনসাধারণের শরণাপন্ন হইলেন, মিঃ আগরওয়ালের নেতৃত্বে তাঁহারা "খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি" গঠন করিয়া জনসভার পর জনসভায় মিল-

লেখক : ভূপেশ গুপ্ত

মালিক ও ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের অক্ষমতার কথা জানাইলেন। জে, সি, গুপ্ত, আবুল হাশেম, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতি কংগ্রেস ও লীগ নেতা তাঁহাদের সমর্থন করিলেন। তাঁহারা নিখিল ভারত বস্ত্র কণ্ট্রোলার মিঃ ভেলডির সঙ্গে দেখা করিয়া ঈদ ও পূজার সময় বাহির হইতে আরও চার হাজার গাঁট কাপড় পাঠাইতে রাজি করাইলেন। পাইকার ও মজুতদারেরা তাঁহাদের যথেষ্ট ধমক দিয়াছিলেন, অনেক সময় এই সব খুচরা দোকানে কাপড় দেওয়াই বন্ধ হইয়াছিল, এমন কি কিছু খুচরা ব্যবসায়ীকে হাত করিয়া পাল্টা সংগঠন ও দলাদলির সাহায্যে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। মিঃ ভিওয়ানিওয়ালা নামে একজন বড় পাইকার এইরূপ একটী প্রতিদ্বন্দ্বী "খুচরা" সমিতির সভাপতিও হইয়াছিলেন। অবশ্য এসব কিছুতেই খুচরা ব্যবসায়ীরা দমেন নাই।

কলিকাতায় খুচরা কাপড় ব্যবসায়ীদের সম্মেলন

ও বাহির হইতে আমদানী ৪ হাজার, মোট ১১ হাজার গাঁট পূজার কাপড় দোকানদারদের মধ্যে বিলি করিবার জন্য সরকার একটা সাময়িক বোর্ড গঠন করিল। প্রথমে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও পরে আমি সেই বোর্ডে ছিলাম। ১০ই সেপ্টেম্বর বিনা প্রতিবাদে স্থির হইল যে কলিকাতার প্রত্যেক খুচরা ব্যবসায়ীকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া কয়েক হাজার গাঁট কলিকাতায় বিক্রয় হইবে। কিন্তু ২০শে তারিখে তথাকথিত উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সুরেশ রায় আমাদের অজ্ঞাতেই এই সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিয়া ঘোষণা করিলেন যে মাত্র ২০০ হইতে ৫০০ দোকানদার মারফৎ সব কাপড় বিলি করা হইবে। সুরেশ বাবু বলিলেন, সুহ্রাবর্দি সাহেবের কথায় এরূপ করা হইয়াছে, সুহ্রাবর্দি বলিলেন তিনি ইহার কিছুই জানেন না।

তাঁহাদের লুকোচুরির আড়ালে বড় বড় ব্যবসাদারেরা আবার অধিকাংশ কাপড় হাত করিয়া লইল। বড় কারবারীরা, এমন কি এরূপ বড় কারবারী যাহাকে অতীতে মজুতদারীর জন্য সাজা পাইতে হইয়াছে—সেরূপ কারবারীও ২৫ হইতে ৫০ গাঁট করিয়া পাইল। অনেক সময় ৫।১০ গাঁটের অনুমতিপ্রাপ্ত খুচরা কারবারী "স্বেচ্ছা-দানকারী" কারবারীর কাছ হইতে মাল আনিতে গেলে কোন না কোন অজুহাতে মালই পায় নাই।

মফঃস্বলের ব্যাপার আরও শোচনীয়। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ মাল পাঠানোর কোন ব্যবস্থা তো করেই নাই, ব্যবস্থা করা যায় না বলিয়া আর সকলকেও চেষ্টা হইতে থামাইয়াছে। ডাঃ সান্যাল আপনা হইতে বি এণ্ড এ রেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়া ১০ দিনের জন্য প্রত্যহ ৭টী করিয়া ওয়াগনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তবুও বাহিরে কাপড় পাঠানো বিষয়ে কণ্ট্রোলারের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। অথচ এদিকে বাহিরের কাপড় হাওড়ায় আসিয়া ঢের হইয়া পড়িয়া থাকিল। অনেক বড় বড় কারবারী নিজ নিজ মাল খালাসই করিতে চাহিল না। গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলে সে কাপড় কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য করাইতে পারে—এই ভয়েই খালাস করিল না কিনা কে বলিতে পারে ?

এমনি ভাবে, হাতের কাছে ১১ হাজার গাঁট কাপড় থাকা সত্ত্বেও মজুতদারদের ষড়যন্ত্র, বড় বড় কারবারীদের স্বার্থপরতা আর আমলাতন্ত্রের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তায় বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের অধিকাংশই ঈদ ও পূজার দিনে ভাল করিয়া নূতন কাপড় জোগাড় করিতে পারিল না, ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিল না।

জনসাধারণের আন্দোলনেই ঈদ ও পূজার জন্য অন্ততঃ ১১ হাজার গাঁট আদায় হইয়াছিল। আমি খবর পাইয়াছি যে তাহার মধ্যে ৭।৮ হাজার গাঁট বিলিই হয় নাই, এখনও গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। অথচ এখনই বাজারে দর চড়িতেছে। তাহার অর্থ মজুতদার আরও ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে এবং আমলাতন্ত্রকে কাবু করিয়া ফেলিতেছে। এই ৭ হাজার গাঁট কণ্ট্রোল দামে এখনই বাজারে ছাড়িবার জন্য খুচরা ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে একসঙ্গে আন্দোলন করিতে হইবে।

সরকারী গুপ্ত সিদ্ধান্ত ফাঁসিল কিরূপে

কিন্তু মাত্র ৪ হাজার গাঁটে সারা বাংলার ঈদ ও পূজার প্রয়োজন কতটুকু মিটিবে ? আবার আন্দোলন জাগিল—একথা স্বীকার করিতে হয় যে কয়েকজন কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস নেতার চেষ্টায়ই এ আন্দোলন আরও জোর বাঁধিয়া উঠে। মন্ত্রীরা প্রমাদ গণিলেন, আমলাতন্ত্রের পর্য্যন্ত অল্প টনক নড়িল। মজুতদারদের খোশামোদ করিয়া কাপড় পাওয়া যাইবে না সকলেই মানিতে বাধ্য হইলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট অফিসের হোমরা-চোমরাদের গোপন বৈঠকে স্থির হইল যে ১৬ই তারিখ সারা কলিকাতা ছাঁকিয়া সমস্ত কাপড় গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমাইয়া ফেলা (freeze) হইবে। সব কারবারীই সমস্ত মাল কণ্ট্রোল দরে ছাড়িতে বাধ্য হইবে। **কিন্তু গুপ্তকথা কিরূপে ফাঁস হইল তাহা আমলাতন্ত্রই জানে—১২ই তারিখ হইতে মজুতদার মহলে মুখে মুখে এই খানাতল্লাসের কথা—সারা বাজারে মাল সরাইবার ও "ব্যবস্থা" করিবার দ্রুত চাঞ্চল্য। আমলাতন্ত্র কোনো কারণ না দেখাইয়াই মাল জমা করিবার পরিকল্পনা ত্যাগ করিল।** এই "ত্যাগের" পিছনে মজুতদার ও মিলমালিকদের চাপ ছিল কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। মোট কথা মজুতদার বাঁচিয়া গেল—লোকেও কাপড় পাইবে না তাহাতে প্রায় নিশ্চিত হইল।

মুখরক্ষার জন্য আমলাতন্ত্র ঘোষণা করিল যে মজুতদারেরা "নিজের ইচ্ছায়ই" ৭০০০ গাঁট কাপড় ছাড়িতে রাজি হইয়াছে। বড়বাজারের গুদামগুলিতে কাপড় নাই বলিয়াই তো এতদিন শুনিতেছিলাম, রাতারাতি ৭ হাজার গাঁট কোথা হইতে আসিল ? ভাল করিয়া ছাঁকিলে আরও কত ৭ হাজার গাঁট হয়তো বাহির হইত—সমস্ত বাঙ্গালীর কাপড়ই তো ওখানে ! কিন্তু আমলাতন্ত্রের রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপ আর মজুতদারের কারসাজির মধ্যেই তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। ৭ হাজার গাঁট "স্বেচ্ছায়" দিয়া হয়তো চোরাকারবারের জন্য ৭০ হাজার গাঁট বাঁচিয়া গিয়াছে !

যে ৭ হাজার গাঁট "স্বেচ্ছায়" জমা হইল তাহার অধিকাংশই আবার মোটা কাপড় যাহা ভদ্র বাঙ্গালীর কোন প্রয়োজন নাই। ইহাও শোনা যায় যে, বড় বড় পাইকারেরা স্বেচ্ছায় বিশেষ কিছু দেয় নাই, চুনোপুঁটীদেরই দিতে হইয়াছে।

কেলেঙ্কারির এখানেই শেষ নয়। ঐ ৭ হাজার

রুজভেল্টের নিকট চিয়াং-কাইশেকের চিঠি

★ ভারতীয় সমস্যার সমাধান চাই ★

১৯৪২-এর জুলাই মাসে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট-এর নিকট ভারতীয় সমস্যার বিষয়ে লেখেন। এই চিঠি বহুকাল আগেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ ২ বৎসর ধরিয়া এই খবরটি ভারতের সরকারী দপ্তর হইতে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার' এই সংবাদটি ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশ করিয়াছে। এই চিঠির মর্মার্থ নীচে দেওয়া হইল :

'ভারতবাসী ন্যায়বিচার ও সমানাধিকার দাবী করে। যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের পক্ষ সমর্থন করুক—ইহা তাহারা বহুদিন হইতেই আশা করে। আপনার সমক্ষে এ সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করিতেছি।

'জাতীয় স্বাধীনতা লাভই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যুক্তির অপেক্ষা ভাবাবেগই প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রকে তাহারা প্রীতির চোখে দেখিয়া থাকে। ন্যায় বিচার যে আছে এই বিশ্বাস ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করার জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের আগাইয়া আসা উচিত।

'এই যুদ্ধে ভারতের জনগণের অংশ গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় তাহারা ব্রিটিশের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, সম্মিলিত মিত্র জাতিবর্গের প্রতিও সেই একই মনোভাব পোষণ করিবে। এই অবস্থা খুবই মর্মান্তিক হইবে এবং ইহাতে ক্ষতি একা বৃটেনেরই নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মান যদি অটুট রাখিতে হয়, তবে নিজের স্বার্থের খাতিরেই বৃটেনের উচিত এই অবস্থার মূল কারণগুলি দূর করা। ইহার জন্য বৃটেনের পক্ষ হইতে সৎসাহস, সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিকতার বিশেষ প্রয়োজন। যদি এই অবস্থার প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিবে এবং বৃটিশের পক্ষ হইতে জোর করিয়া বর্ত্তমান ঔপনিবেশিক শাসন চাপাইয়া রাখার ফলে অশান্তি ও গোলযোগের সূত্রপাত হইবে। অত্যাচার যত প্রবল হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়াও প্রবলতর আকারে দেখা দিবে।

'মানব কল্যাণের জন্য ও মিত্র জাতিবর্গের সুনাম রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে একটি যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে বলিবে—ইহাই আমি আশা করি।

'আমাদের যুদ্ধের অভিপ্রায় ও সমবেত স্বার্থের খাতিরেই এ ব্যাপারে আমাকে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।'

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
অফিস : ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা] ১১ই অক্টোবর, '৪৪, বুধবার, ২৫শে আশ্বিন '৫১ [দাম ছয় পয়সা

শুধু দুঃখপ্রকাশে ব্যর্থতা মিটিবেনা

গান্ধী-জিন্না আপোষের চাবিকাঠি বাংলার দেশভক্তদেরই হাতে

কংগ্রেসকর্মীরা নীরব কেন ?

সোমনাথ লাহিড়ী

গান্ধী-জিন্না আলোচনার সূচনায় অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসী মহলে যতটা সাড়া পড়িয়াছিল ও সমর্থন পাওয়া গিয়াছিল বাংলা দেশে ততটা হয় নাই। কোনো কোনো নেতা সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু অনেকেই নীরব ছিলেন বা বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলার কংগ্রেসী তথা লীগ জনসাধারণ উৎসাহেই সাড়া দিয়াছিল। মুসলমানপ্রধান বাংলায় লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কিংবা লীগ কিছুই নয় এইরূপ ভাণ করিয়া যে বাঙ্গালীর জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারেনা বহুদিনব্যাপী ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসী মহল একথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অন্য পক্ষে ৮ বছরের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় লীগ মহল ও উহার নেতারাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত না মিলাইলে প্রকৃত ক্ষমতা নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যাইতেছে, পাকিস্তানেরও স্বীকৃতি মিলিতেছে না।

সেজন্যও বটে, গান্ধীজির রাজনীতিক প্রভাবেও বটে, বাংলায় জনসাধারণের উৎসাহ জাগিয়াছিল। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের তর্জন গর্জনও সে উৎসাহ বিশেষ নষ্ট করিতে পারে নাই। জনসাধারণের উৎসাহের প্রেরণায় কংগ্রেসকর্মীদের এক অংশ পর্য্যন্ত আগ্রহে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। বাংলার দিকে দিকে কংগ্রেস ও লীগনেতাদের মিলিত সভাসমিতি ও শুভেচ্ছায় জনমন যে ভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল ততখানি অন্যান্য প্রদেশেও দেখা যায় নাই।

পুনরালোচনায় সকলের আগ্রহ

তাই গান্ধী জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইবার সংবাদে বাংলার লীগ মহল ও কংগ্রেসী জনসাধারণ আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল। লীগ পক্ষের প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র ও নেতা এই ব্যর্থতাকে শেষ ব্যর্থতা বলিয়া মানিতে পারেন নাই। পুনরায় গান্ধী জিন্না আলোচনার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতারা নীরব থাকিয়াছেন বটে কিন্তু অমৃতবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্র জনসাধারণের ভাব প্রকাশ না করিয়া পারে নাই, পুনরালোচনার জন্য তাহারাও প্রথম দিকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। এ কথা সত্য যে কংগ্রেসী কাগজগুলি মিঃ জিন্নাকেই আলোচনাভঙ্গের জন্য দায়ী করিয়াছে এবং লীগপন্থী কাগজগুলি গান্ধীজিকে দায়ী করিয়াছে। তবুও আলোচনার মধ্যে তিক্ততা আসে নাই। কংগ্রেসী মহলে এটুকু রাজনীতিক বোধও থাকিয়াছে যে গান্ধী-রাজাজী প্রস্তাব শুধু লীগকে লোভ দেখাইবার জন্যই আবিষ্কার নাই, উহা হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা সমাধানের পথে কংগ্রেসের অগ্রগতিরই সোপান।

ঐক্যের সম্ভাবনায় যাহারা আশঙ্কিত হইয়াছিল যে এবার বুঝি তাহাদের ভেদপন্থী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় তাহারা ইতিমধ্যে গলা ছাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ খুশী হইয়া ঘোষণা করিলেন, "রাজাজীর ফর্মুলা বা ঐ ধরণের সমস্ত প্রস্তাবকেই এখন ভাল করিয়া চিরদিনের মত কবর দিতে হইবে।" হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিখিল, রাজাজীর প্রস্তাব "ভারতের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করার মত বিপজ্জনক চাল। জিন্না সাহেব উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং আমরা আশাকরি এই প্রস্তাবের কথা আর শুনিতে হইবেনা।" মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জি মহাশয় প্রায় মুসলমানদিগকেই জাতীয় জীবন হইতে তাড়াইবার প্রস্তাব করিয়া লিখিলেন, "যাহারা ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হোক।"

ভেদপন্থীদের আসল বক্তব্য

স্বাধীনতার শক্তি অর্জনে ইঁহাদের আগ্রহ নাই, কংগ্রেসের প্রতিও শ্রদ্ধা নাই, তাই ঐক্যের ব্যর্থতায় এত আনন্দ। ইঁহাদের আসল মনের কথা প্রকাশ করিলেন সাভারকর ও হিন্দু সভা ওয়ার্কিং কমিটি। বীর সাভারকার বলিলেন, "...ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—ভারতীয় জাতিকে সংহত করিবার জন্যই যাহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল—সেই কংগ্রেসই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আপন অস্তিত্বের যুক্তির প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।" অর্থাৎ অন্য সব কথার আড়ালে কংগ্রেস-বিরোধিতাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কংগ্রেস জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক সুতরাং সকলে হিন্দুসভায় এসো, ইহাই মনের কথা। আর হিন্দুসভা ওয়ার্কিং কমিটি ৬ই অক্টোবরের প্রস্তাবে বলিল, "...হিন্দু মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি আবার ঘোষণা করিতেছে যে ভারত এক ও অবিভাজ্য জাতি এবং কমিটি সম্মিলিত জাতিগুলির কাছে আহ্বান জানাইতেছে যে এইরূপ জাতি হিসাবে ভারতের অধিকার সম্পর্কে তাহারা দ্বিধাহীন ঘোষণা প্রকাশ করুক।...ব্রিটেন যদি ভারতের উচিত ও ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ না করে তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক, দলগত বা অন্য কোন অজুহাতে ভারতের শৃঙ্খল মোচন করানো বিষয়ে ব্রিটেনকে দেরী করিতে দেওয়া অন্যান্য মিত্রজাতিগুলির পক্ষে উচিত নয়...।" এই বলিয়া প্রস্তাবের খসড়া তাঁহারা রুজভেল্ট, চার্চিল, ষ্টালিন ও চাং কাই-শেকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অর্থাৎ হিন্দুসভার ভারতবর্ষ এতই এক ও অবিভক্ত জাতি যে সে-জাতির শক্তিতে ভারতের দাবী মিটাইবার ভরসা হিন্দুসভার নাই—হয় ব্রিটেন দিক আর নয়তো মিত্রপক্ষের অন্যান্য জাতি ব্রিটেনকে বাধ্য করুক!

অমৃতবাজার, যুগান্তর ও আজাদ

কিন্তু ইঁহাদের প্রচার ও উল্লাসের এই আসল দিকটা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া কংগ্রেসী কাগজগুলি সোজাসুজি ইঁহাদের অপপ্রচারের জবাব দিতে পারিল না। কংগ্রেসকর্মীদের নীরবতার ফলে এই অপপ্রচার আরও খোলা ময়দান পাইল। তাহাতে কংগ্রেসী কাগজগুলি যেন একটু কোণঠাসা হইয়া শুধু আত্মরক্ষার মত করিয়া কথা বলিতে লাগিল। জিন্না ও গান্ধীর আলোচনা ভঙ্গে কোথায় আপোষের নূতন সূত্র খুঁজিয়া দিয়া সে আলোচনা জোড়া লাগাইবে, না যুগান্তর লিখিল "যাঁহারা গান্ধীজীর হাতে হিন্দুস্থানের সর্বনাশ ঘটিবে বলিয়া আতঙ্কিত হইয়া দেশব্যাপী তোলপাড় করিতেছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং তাঁহারা ইহাও দেখিতেছেন যে অনেক হিন্দুর চেয়েই গান্ধীজী মূল বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন।" যেন শুধু হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই গান্ধীজি আলোচনায় গিয়াছিলেন এবং "তোলপাড়কারী" হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন তফাৎ নাই! যুগান্তর জিন্না সাহেবকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়াও ইঙ্গিত করিল। আর অমৃতবাজার ৩রা অক্টোবর এক ফিরিস্তি দাখিল করিয়া দেখাইল যে জিন্না সাহেব বৎসরের পর বৎসর আপোষ আলোচনার ভিতর দিয়া শুধু নিজের দাবী বাড়াইয়াই লইয়াছেন কিন্তু, কখনও আপোষ করেন নাই; এবং এবারও তাহাই হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপেই তিনি এরূপ করেন সে ইঙ্গিতও আছে। তাহা হইলে শ্যামাপ্রসাদের কথাই তো ঠিক মানিতে হয় যে গান্ধীজি আপোষ-আলোচনায় গিয়া অন্যায় করিয়াছেন এবং এখন রাজাজি প্রস্তাব প্রভৃতি সব বাতিল করা উচিত! তবে অমৃতবাজার গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ সমর্থন করিয়াছিল কেন, পুনরালোচনার আগ্রহই বা প্রকাশ করিয়াছে কেন?

ইহার প্রতিক্রিয়ায় লীগপন্থী আজাদও গান্ধীজি 'ন্যাকামি' করিতেছেন, মুসলমান প্রভৃতি জাতিকে "ন্যায্য দাবী-দাওয়া হইতে বঞ্চিত করিবার কৌশল" করিতেছেন ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিল।

তর্ক নয় বাস্তব দৃষ্টি চাই

অথচ দুই পক্ষই মনে মনে বিশ্বাস করে যে আবার গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ না হইলে মিটমাট হইবেনা এবং মিটমাট না হইলে স্বাধীনতা বা পাকিস্তান কিছুই হইবে না। কিন্তু আবার সাক্ষাতে তখনই কোন ফল হওয়া সম্ভব যখন দুই পক্ষই এবার যতখানি আগাইয়াছেন তাহার চেয়ে আরও খানিকটা আগাইবেন, পরস্পরের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও খানিকটা কাছে নামাইয়া আনিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিবেন। এখন যদি দুই পক্ষের সমর্থকেরা শুধু অপর পক্ষকে গালিই দিতে থাকেন, এবং যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাই শেষ ও চিরস্থায়ী বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে দুপক্ষেরই কাছে পুনরালোচনা একেবারেই অসম্ভব হইবে।

গান্ধীজি বা জিন্না সাহেব পরস্পরের মত খণ্ডনে যা কিছু বলিয়াছেন তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করিবার চেষ্টায় লাভ নাই। আমাদের এই বাংলা দেশ সম্বন্ধেই যেখানে মতান্তর উঠিয়াছে সে বিষয়ে আমরা বাংলার কংগ্রেস ও লীগ কর্মী কতখানি সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাঁহাদের পুনরালোচনা সফল করিতে পারি ইহাই এখন একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। এবং তাহা করিতে গেলেই দেখিতে পাইব অনেক বিষয়েই মীমাংসা সহজ ও পরস্পরের স্বার্থের অনুকূল

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

কাপড়ের হাহাকারের জন্য দায়ী কে ?

৬ই অক্টোবর বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব বস্ত্র সমস্যার উপর আহুত এক সম্মেলনে বলিয়াছেন —টেক্সটাইল কমিশনার জানাইয়াছেন বাংলা গবর্ণমেন্টকে প্রতি মাসে ২১,৭৫০ গাঁট কাপড় দেওয়া যাইতে পারিবে। প্রতি গাঁটে ১৫০০ গজ কাপড় থাকে বলা হয়। ইহা অতিরঞ্জিত, প্রকৃতপক্ষে প্রতি গাঁটে থাকে ১১৫০ গজ কাপড়।"

ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত মাথাপিছু ১২ গজ কে টা ধরিলে ছয় কোটী বাঙ্গালীর জন্য মোট ৭২ কোটী গজ কাপড় দরকার। আজাদ পত্রিকার সম্পাদকের হিসাবমত বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য দেওয়া হইয়াছে মাত্র সওয়া তিন কোটী গজ অর্থাৎ বাংলার প্রাপ্য কোটার শতকরা সাড়ে চারভাগ মাত্র। বঙ্গীয় কাউন্সিলে প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রতি মাসে ৪২০০০ গাঁট বাংলায় পাঠাইতে হইবে ও ৩১০০০ গাঁটের একটী বিশেষ কোটা দিয়া বাংলার সঙ্গীন ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে।

যে পরিমাণ বস্ত্র বাংলায় আছে তাহার অধিকাংশই সরকার ও মজুতদারদের গোদামেই লুকানো। গত সংখ্যা জনযুদ্ধে আমরা একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি পূজার সময় বড় বড় মজুতদারেরা বোধ হয় ধরা পড়িবার ভয়ে 'স্বেচ্ছায়' ৮০০০ গাঁট কাপড় বাহির করিয়া দিয়াছিল। তল্লাস করিয়া ছাঁকিলে ইঁহাদের কাছ হইতে আরও অনেক বেশী বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুরাবর্দ্দী সাহেব বলিয়াছেন—গবর্ণমেণ্টের সামনে দুইটী পথ খোলা আছে: চোরাবাজারের বিপদ মাথায় লইয়া সাধারণ ব্যবসায়ের ভিতর বস্ত্র বিলির ব্যবস্থা চালাইতে হইবে, আর না হয় গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত ষ্টক হাতে করিয়া বিতরণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র বিতরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী স্কীম স্থির করিয়াছে। কিন্তু সরকারী বণ্টনের পরিকল্পনা কি তাহা মোটেই বুঝা যাইতেছে না। আজাদের সম্পাদক ঠিকই বলিয়াছেন এই ব্যাপারে সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা যেন তাঁহারাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। দশ মাস আগে একটি প্রাদেশিক বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কমিটি বসান হইয়াছিল—কিন্তু এই কমিটি কিছুই করিতে পারে নাই। কাপড়ের মজুত বন্ধ হয় নাই, চড়াদামে কাপড়ের চোরাবাজার পুরাদমেই চলিতেছে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য মোটেই ভাঙ্গে নাই। বরং বিতরণ কমিটিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের বাদ দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে আর বড় বড় বস্ত্র মজুতদারেরা অফুরন্ত সুযোগ পাইতেছে।

সম্প্রতি বস্ত্র-বিতরণের ব্যবস্থায় দেখা যায় যে ব্যবসায়ীদের অ্যাসোসিয়েসনের মারফৎ কাপড়ের কোটা বিলি হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন খুচরা ব্যবসায়ীদের সমিতির কিছুটা সুবিধা হইল অপরদিকে তেমনি বড় বড় ব্যবসায়ীদের তৈরী ভুঁইফোঁড় অ্যাসোসিয়েসনকে সুযোগ দেওয়া হইল। ইহার ফাঁক দিয়া মজুতদারেরা যথেষ্ট কাপড় ষ্টক করিতে পারিবে এবং ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অনেক প্রকৃত ব্যবসায়ী পারিয়া উঠিতে নাজেহাল হইয়া যাইবে।

অবিলম্বে বস্ত্র ব্যবসায়ের এই সব গলদ দূর করিবার জন্য জনসাধারণের ও সাধু ব্যবসায়ীদের বেসরকারী প্রতিনিধিদের উপর বস্ত্র বিতরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ইহাদেরই সহযোগিতায় সরকারকে হাজার হাজার গাঁট মজুত বস্ত্র বাহির করিবার জন্য অবিলম্বে বিরাট অভিযান চালাইতে হইবে।

গান্ধী-জিন্না মীমাংসার উপায়

[এবার সময় ও স্থানাভাবে গান্ধী-জিন্না মীমাংসার উপায় সম্বন্ধে পি, সি, জোশীর প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এখানে উহার কয়েকটী মূল কথা সংক্ষেপে দেওয়া হইল। পুস্তিকা আকারে গোটা প্রবন্ধটী শীঘ্রই বাহির করা হইবে।]

গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেব আন্তরিকতার সঙ্গে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। উভয়েরই বিশ্বাস যে এই প্রচেষ্টাই শেষ প্রচেষ্টা নয়, এবং উভয়েরই ইচ্ছা যে এই ঐক্যের জন্য দেশবাসীর মধ্যে আন্দোলন চলিতে থাকুক। দেশভক্তের ভিতর সাধারণ আকাঙ্খা এই যে গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেবের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে আর একবার আলাপ আলোচনা আরম্ভ হওয়া উচিত। তাই আজ চিন্তা করা প্রয়োজন কেন এই ঐক্যের চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং কংগ্রেস ও লীগের মতামত কোন্ পথে পরিবর্ত্তিত হইলে সফল ঐক্য প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে।

জিন্না সাহেব বলেন, গান্ধীজী লীগের লাহোর প্রস্তাব মানিয়া লন নাই এবং যতক্ষণ গান্ধীজী উহা না মানিবেন ততক্ষণ মিলন অসম্ভব। গান্ধীজী বলেন, রাজাজীর প্রস্তাবে লীগের লাহোর প্রস্তাবের সারমর্ম্মকেই রূপদান করা হইয়াছে, জিন্না যতক্ষণ তাহা না বুঝিবেন ততক্ষণ মিলন হইতে পারে না। উভয়েরই বক্তব্যের ভিতর খাঁটি সত্য আছে, আবার ভুলও রহিয়াছে।

মুসলমানেরা এক জাতি?

ভারতীয় মুসলমানেরা সকলেই এক জাতি এই মতবাদের উপর লীগের লাহোর প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না যে শুধুমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতির সংজ্ঞা রচিত হইতে পারে। গান্ধীজীর বিশ্বাস ভারতবাসী সকলেই একজাতি। প্রকৃত সত্য এই যে ভারতবাসী সকলেই এক জাতি নহে আবার ভারতের সমস্ত মুসলমানেরাও এক জাতি নহে। ভারতবর্ষ বহু জাতির সাধারণ মাতৃভূমি—তাহার ভিতর কতকগুলি জাতি প্রধানতঃ হিন্দু এবং কতকগুলি জাতি প্রধানতঃ মুসলমান। সিন্ধু, বেলুচি, পাঠান প্রভৃতি জাতি প্রধানতঃ মুসলমান, আবার মারাঠি মালয়ালী প্রভৃতি জাতি প্রধানতঃ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতীয় জাতিতত্ত্বের এই প্রকৃত সত্য স্বীকার করিলে গান্ধী এবং জিন্নাসাহেবের পার্থক্য দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সত্য স্বীকার না করিয়াও গান্ধীজী এইটুকু মানিয়া লইয়াছেন যে বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে এবং এই প্রত্যেক অংশই পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী। আবার লীগের প্রস্তাবও মানিয়া লইয়াছে যে পাকিস্তানের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে এবং প্রত্যেক অংশই পাকিস্তানের ভিতর স্বায়ত্বশাসন পাইবার অধিকারী। কাজেই জাতিতত্ত্বের সংজ্ঞা মিলনের পথে দুর্ভেদ্য বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিতে পারে না। তথাপি ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল না কেন?

জিন্নার প্রস্তাব ও গান্ধীজীর প্রস্তাব

জিন্না সাহেব গান্ধীজীর নিকট যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই রূপ—(১) মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। (২) এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস এবং লীগের যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হইবে। (৩) ভারতের কোন্ কোন্ অংশ কোন্ রাষ্ট্রের ভিতর থাকিবে তাহা কংগ্রেস এবং লীগের মীমাংসা দ্বারা ঠিক হইবে। (৪) এই দুই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র নির্দ্ধারণের জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কমিটি হইবে। (৫) দুই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরস্পরের ভিতরকার সম্বন্ধ নিরূপণ করিবে।

গান্ধীজী জিন্নাসাহেবের নিকট যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

(১) ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান সকলের স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ হইতে হইবে, এই একতার জন্য তিনি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লইতেছেন।

(২) ভারতের যে যে অংশ হিন্দুস্থান হইতে পৃথক করা হইবে সেই সেই অংশের সর্ব্বসাধারণের গণভোট দ্বারা পৃথক হইবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(৩) দেশরক্ষা প্রভৃতি যে যে বিষয়ে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান উভয়েরই সাধারণ স্বার্থ রহিয়াছে সেই সেই বিষয় একযোগে পরিচালনার জন্য এখনই একটা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না দেখা দেয়।

গান্ধীজীর বিশ্বাস যে লীগ প্রস্তাবের সারমর্ম্ম ইহাতে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু জিন্না সাহেবের সন্দেহ যে গান্ধীজী সর্ব্বভারতীয় ঐক্য এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় গণভোটের প্রধান স্থান দিয়াছেন সুতরাং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ইহাতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। জিন্নার দাবী যে গান্ধীজী মুসলমানদের স্বরাষ্ট্রগঠনের দাবীকে বিনা সর্ত্তে মানিয়া লউন আর সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাহার পর হইবে। কিন্তু গান্ধীজী জিন্না সাহেবের এই দাবী পূরণ করিতে পারেন নাই কারণ তাঁহার সন্দেহ যে গণভোট ও সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের স্বীকৃতি যদি না করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র খর্ব্ব হয়।

গান্ধীজী বিনাসর্ত্তে মুসলমানদের স্বরাষ্ট্র গঠনের দাবী মানেন নাই, জিন্নাসাহেবও বিনাসর্ত্তে সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য এবং গণভোট দ্বারা পাকিস্তানের সীমা ও গণতন্ত্র নির্দ্ধারণে রাজী নন। এই জন্যই এবারকার ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

তফাৎ কোথায়

গান্ধীজীর প্রস্তাবের মূলকথা যে গণতন্ত্র—জিন্না-সাহেব যতক্ষণ তাহা না বুঝিতেছেন এবং না মানি-তেছেন ততক্ষণ মিলন প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে না। আবার জিন্নাসাহেবের প্রস্তাবের মূলকথা যে মুসলমান-দের স্বাধীনতা—এ বিশ্বাস যতক্ষণ গান্ধীজীর না হইতেছে ততক্ষণ তিনি ও জিন্নাসাহেবের দাবী গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

সমস্যা সমাধানের উপায়

গান্ধীজীকে বুঝিতে হইবে যে (১) মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে রহিয়াছে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খা (২) মুসলিম লীগ যে আন্দোলন পরি-চালনা করিতেছে তাহার লক্ষ্য নিজেদের বাসভূমিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার লাভ অর্থাৎ গান্ধীজী যখনই বুঝিবেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই অংশ হইল মুসলমানদের পাকিস্তানের সংগ্রাম। গান্ধীজী যখনই উহা বুঝিবেন তখনই তিনি সর্ব্বাগ্রে মুসলমানদের স্বরাষ্ট্র গঠনের দাবী বিনাসর্ত্তে মানিতে পারিবেন। কিন্তু জিন্নাসাহেব এই কথাটিই গান্ধীজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। মুসলমানরা একজাতি কিনা এই বিষয় লইয়াই তিনি আইনজীবীর মত তর্ক করিয়াছেন কিন্তু এরূপ তর্কে কোন কংগ্রেসকর্ম্মীই বুঝিতে পারিবেন না যে পাকিস্তানের দাবী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার দাবীরই অংশ।

জিন্না সাহেবকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে পাকিস্তানের গঠন প্রণালী এবং সীমানা সেই-অংশের সমগ্র জনসাধারণের গণভোট দ্বারা ঠিক করিতে হইবে, ইহাই গণতন্ত্রের নীতি। গান্ধীজীও জিন্না সাহেবকে এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি দার্শনিকের মত সমগ্র ভারত একজাতি কিনা তাহা লইয়া তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ তর্কে কোন লীগপন্থী বুঝিতে পারিবে না যে গান্ধীজীর প্রস্তাবের মূলকথা গণতন্ত্র। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের ঐক্য সম্বন্ধে জিন্না সাহেব যতটুকু বলিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসসেবীদের মন হইতে গৃহযুদ্ধের ভয় ঘুচিবে না, সমগ্র ভারতের ঐক্য কি ভাবে রক্ষিত হইবে সে-কথা জিন্নাসাহেবকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।

কংগ্রেসসেবীরা বুঝুন যে—লীগের পাকিস্তান দাবী মুসলমানদের ন্যায্য দাবী, ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ নয়; লীগপন্থীরা বুঝুন যে—গান্ধীজী পাকিস্তানের জন্য যে সর্ত্ত আরোপ করিতে চাহেন উহার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য, উহার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা নয়।

ঐক্যের চুক্তি

এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের দাবীর মর্ম্মকথা বুঝিলে নিম্নলিখিত ভাবে ঐক্যের চুক্তি হইতে পারে—

(১) সমগ্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে—এই ঐক্যের লক্ষ্য উভয় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সফল করা, কোন প্রতিষ্ঠানই স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবে না।

(২) লীগের লাহোর প্রস্তাবে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী রহিয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া হইবে, অর্থাৎ মুসলিম জাতি সমূহের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার বিনা সর্ত্তে স্বীকৃত হইবে।

(৩) পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গঠনতন্ত্র রচনার জন্য লীগ প্রস্তাব বর্ণিত মুসলমান অঞ্চলগুলিতে সমগ্র সাবালক জনসাধারণের ভোটে গণপরিষদ আহ্বান করা হইবে, তাহার সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত হইবে। কংগ্রেস এবং লীগের মীমাংসা দ্বারা পাকি-স্তানের ও হিন্দুস্তানের সীমানা নির্দ্ধারিত হইবে।

(৪) স্বাধীনতা, দেশরক্ষা, অর্থনৈতিক পুনঃ-সংগঠন এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে সহ-যোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। কংগ্রেস এবং লীগ এখনই এ বিষয়ে একটা চুক্তি করিয়া লইতে পারে, পরে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রদ্বারা উহা গ্রহণ করাইয়া লইবে।

কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্যের জন্য এই ভিত্তিই আপোষ মীমাংসার প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত। দেশবাসী একথা উপলব্ধি করিতে পারিলে গান্ধীজী এবং জিন্না সাহব আবার পরস্পর ঐক্য প্রচেষ্টায় মিলিত হইতে পারিবেন এবং কংগ্রেস ও লীগ সমবেত ভাবে আমাদের স্বাধীন হিন্দুস্থান ও স্বাধীন পাকি-স্তানের পথে পরিচালিত করিতে পারিবে।

কংগ্রেসকর্মীরা নীরব কেন?

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বঙ্গভঙ্গ না পূর্ণবঙ্গ?

রাজাজির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু বাংলা তথা কংগ্রেসী মহলের প্রধান আপত্তি ছিল যে উহা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিতেছে। কিন্তু গান্ধী-জিন্না আলোচনায় জিন্না সাহেব তো সে ভাবে ভাগ না করিয়া সমগ্র বাংলা দেশই দাবী করিলেন। তবে এখন আবার রাজাজির মত জেলাগত ভাবে বাংলাকে দুভাগ করিবার জন্য কংগ্রেস মহল ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

প্রাদেশিক মন্ত্রীত্বের সামান্য সংখ্যাধিক্যের টাল-মাটালের ফলে অনেক মুসলিম লীগপন্থীই মনে করিয়াছেন যে পাকিস্তানের এলাকায় হিন্দুদের সংখ্যা যদি মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম না হয় তো প্রভাবশীল হিন্দুরা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে। তবে তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর হিন্দুসংখ্যাধিক আসাম উপত্যকা, কলিকাতা, ২৪ পরগণা এবং বর্দ্ধমান বিভাগ পাইবার জন্য জিন্না সাহেবকে সমর্থন করিয়া নিজেদের প্রয়োজনেরই পরিপন্থী হইতেছেন কেন?

আসলে কংগ্রেসীরা চান যে বাঙ্গালী এক দেশ হইয়াই থাকুক, হিন্দু বাঙ্গালীদের গণতান্ত্রিক অধিকার অব্যাহত থাকুক। আর লীগপন্থীরা চান যে পশ্চিম বাংলার সম্পদ লইয়া পূর্ব পাকিস্তান একটী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হোক অথচ সেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা ও সংখ্যাধিক্যের স্বাভাবিক সুবিধা বিপন্ন না হয়।

পূর্ণবঙ্গ আপোষের সর্ত্ত

স্বভাবতই বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পর আপোষের মধ্য দিয়াই শুধু উভয়ের উপরোক্ত স্বার্থ যথা-সম্ভব পূরণ হইতে পারে। লীগ যদি স্বীকার করে যে স্বাধীন বাংলায় সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার থাকিবে তাহা হইলে কংগ্রেস পক্ষীয়েরা সহজেই বাঙ্গলা ভাষাভাষী সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতীয় এলাকা লইয়া একটী রাষ্ট্র গঠনে রাজি হইবেন। আর মুসলমানদের অমতেই তাঁহারা যাহাতে হিন্দুস্তানে চলিয়া যাইতে না পারেন সে জন্য স্বাধীন বাংলায় গণপরিষদ ছাড়াও সমান সংখ্যক হিন্দু মুসলমান লইয়া একটী সম্প্রদায়-পরিষদ গঠন করা যাইতে পারে যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ সংখ্যাধিক্য না হইলে অন্য কোন রাষ্ট্রে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত ব সাম্প্রদায়িক কোনো ব্যাপারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিবে না। উহাতে হিন্দুরাও ভরসা পাইবেন যে, তাঁহাদের অমতে বাংলা হিন্দুস্তান-বিরোধী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবে না। এই ভরসা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ভরসা পাইলে হিন্দুরাও এ বিষয়ে জোর দিবেন না যে আলাদা হওয়ার আগে সকলের ভোট লইতেই হইবে। কারণ গণতান্ত্রিক বাংলা রাষ্ট্র হিন্দুস্থানে যোগ দিবে কিনা সে বিষয়ে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

কংগ্রেসী মহল ইহার বিরোধী নয়

কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়া যে তিক্ততা সৃষ্টি হইতেছে তাহা সত্ত্বেও দুই পক্ষই অন্য পক্ষের সন্দেহ দূর করার কথা এখনো ভাবিতেছে ইহাই সব চেয়ে আশার কথা। কংগ্রেস মহলের সব চেয়ে বড় ভয় হইল : দেশরক্ষা প্রভৃতি বিষয় একটা কেন্দ্রীয় গবর্ণ-মেণ্টের হাতে না থাকিলে বিদেশী আক্রমণাশঙ্কা হইতে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের নব-অর্জিত স্বাধীনতা কিরূপে নিশ্চিন্ত হইবে? কিন্তু তবুও লীগের ন্যায্য সন্দেহ স্মরণ করিয়া অমৃতবাজার লিখিয়াছে মিঃ জিন্না যদি সন্দেহ করেন "এরূপ গবর্ণমেণ্টে হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকিবে তবে রুশিয়ান ধরণের কোন শাসনতন্ত্র দ্বারা এ সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে।" রুশিয়ান গবর্ণমেণ্ট যুক্ত রাষ্ট্র বটে, কিন্তু তাহাতে যুক্ত হওয়া না হওয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা, তাহাদের একেবারে আলাদা হইবার অধিকার শাসনতন্ত্রের মধ্যেই স্বীকৃত। কংগ্রেসী মহল যদি এই ভাবে মুসলিম অঞ্চলগুলির অধিকার স্বীকার করিতে অগ্রসর হন তবে মতবিরোধের প্রধান কারণই মিটিয়া যায়।

যুগান্তর যখন জিন্নাকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া ইঙ্গিত করিল তখনও আজাদ লিখিয়াছে যে, কংগ্রেস ও গান্ধীজীর একমাত্র কাম্য হিন্দুরাজ; "তবুও আমরা কংগ্রেস বা গান্ধীজীকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া কখনো মনে করি নাই—এখনো করি না।...যেহেতু হিন্দু ভারতের এঁরা সত্যকার প্রতিনিধিস্থানীয়, তাই একমাত্র ইঁহাদের সাথেই মুছলমানদের...আপোষ করিতে হইবে—নতুবা ভারতের বা হিন্দু মুছলমানের স্বাধীনতালাভের উপায় নাই।'

মুসলিম লীগ মহল, বিশেষ করিয়া বাংলার লীগ মহল যে ১৯৩৭-৩৮-এর লীগ আর নাই, উহার ভিতরে যে এইরূপ পরিবর্ত্তন আসিতেছে এই কথা বাংলার কংগ্রেসী মহল যত শীঘ্র বুঝিতে পারিবেন তত শীঘ্র আপোষের সম্ভবনা নিকট হইবে। বাংলার লীগ মন্ত্রী তমিজুদ্দীন খাঁ বলিয়াছেন যে "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দেওয়া বিষয়ে আর কোন কারণেই দেরী করা উচিত নয়" কারণ ইঁহারা মুক্তি পাইলেই গান্ধী-জিন্না আলোচনা আবার সুরু হইবে ও সফল হইবে। প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মী উভয়কেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—'আসুন আমরা একসঙ্গে বসিয়া বাংলার ঐক্যের প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি বিচার করি।...আজ আমরা বাংলার সমস্যা সমাধান করিয়া নিজেদের সাহায্য করিতে পারিলে নেতাদের সাহায্য করা হইবে।"

ইহাই আজিকার আহ্বান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলাইয়া সারা বাংলার সকলের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি যদি এই আহ্বানের পিছনে থাকে তবেই ইহা কংগ্রেস মহলে সাড়া জাগাইবে, বাংলার প্রশ্ন সমাধান হইবে। লীগের ভিতর হইতে এই স্বীকৃতি বাহির হইয়া আসুক।

সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসকর্মীরা জনমত সংগঠনে অগ্রসর হইয়াছেন—যাহাতে সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বিশেষ করিয়া বাংলারই জীবন মরণের প্রশ্ন তখনও বাংলার কংগ্রেসকর্মীরা নীরব আছেন। এই নীরবতা ভাঙিতে হইবে। ভেদপন্থীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গান্ধীজির প্রস্তাবের সমর্থনে জনমত অটুট রাখিতে হইবে, লীগের সাথে বন্ধুত্বমূলক আলোচনার ভিতর দিয়া ঐ প্রস্তাবকে আরও পরিপূর্ণ ও প্রত্যক্ষভাবে আপোষের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। গত এক মাসে যে সম্মিলিত আন্দোলনে বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নূতন আবহাওয়া আসিয়াছিল তাহা বজায় রাখিতে হইবে, অন্নাভাব ও রোগ নিবারণের মিলিত চেষ্টায় উহাকে আরও সার্থক করিতে হইবে। তবেই গান্ধীজি ও জিন্না সাহেব আবার সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

গান্ধী-জিন্না মতভেদ কি খুব বেশী ?

[আবুল মনসুর আহ্‌মদ বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকদের অগ্রণী। রাজনীতিক নেতা হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। এক সময় তিনি কৃষক প্রজা সমিতির প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন এবং বহুদিন দৈনিক কৃষক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে তিনি মুসলিম লীগপন্থী—পূর্ব্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটীরও তিনি নেতা। তাঁহার ইংরাজীতে লেখা পাণ্ডুলিপি হইতে আমরা সংক্ষেপে বাংলায় অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতেছি। গান্ধী জিন্না মতভেদের সমস্যা সমাধানের আলোচনায় তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গী (যদিও ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত) যথেষ্ট সাহায্য করিবে।—জঃ সঃ]

লেখক :
আবুল মনসুর আহ্‌মদ

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়া দেশের কাছে বিরাট দুর্ভাগ্য স্বরূপ। নেতৃদ্বয় আশা দিয়াছেন বটে যে তাঁহারা ভবিষ্যতে আবার মিলিতে পারেন—কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশকে অবিলম্বে স্বাধীন করিবার আগ্রহে যে-সব দেশভক্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে ইহা স্বল্প সান্ত্বনা। তা ছাড়া শুধু ঐক্য-বিরোধীরাই নয়, যাঁহারা সেদিন পর্য্যন্তও নেতৃদ্বয়ের সাক্ষাতকার সমর্থন করিতেছিলেন ও উহার উপর অনেক আশা পোষণ করিতেছিলেন তাঁহারাও আপন আপন নেতাকে সমর্থন করিতে গিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। এই প্রতিক্রিয়া দুঃখজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অনিবার্য্য।

তবে এই প্রতিক্রিয়া হইতে একটী কথা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে—হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে গান্ধীজি বা কংগ্রেস লীগকে বাদ দিতে পারেন না, আবার জিন্না সাহেব বা লীগ কংগ্রেসকে বাদ দিতে পারেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাত্মাজির চিঠির দু একটী কথাকে ইহার বিপরীত ইঙ্গিত রূপেও দেখানো যায়, কিন্তু আমরা আশা রাখি যে নেতৃদ্বয়ের কাহারও মনেই প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ভ্রান্তি নাই।

পুনরালোচনার উপরই স্বাধীনতা নির্ভর করে

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতার কোন পথ নাই ; সুতরাং দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে মহাত্মাজি ও কায়দে আজমের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। রাজনীতিক মতামত নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশভক্তকেই এই কঠোর সত্য ভালভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। কাজেই এমন কিছু বলা বা করা চলিবেনা যাহাতে গান্ধী-জিন্না পুনরালোচনায় ব্যাঘাত বা বিলম্ব ঘটিতে পারে। আলোচনার ব্যর্থতা এমন ভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে যাহাতে নেতৃদ্বয়ের পক্ষে সমস্যা সমাধানে সাহায্য হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নেতৃদ্বয়ের কাছে আমরা শ্রদ্ধাসহকারে নিবেদন করিতেছি যে আলোচনার পদ্ধতি ঠিক হয় নাই ; ৯ই হইতে ২২শে পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বেশীর ভাগ সময় পর্য্যন্তই তাঁহারা আলোচ্য বিষয়গুলি ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার জন্য গান্ধীজিই প্রধানত দায়ী। নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্পন্ন দুইটী বিরাট রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মিলন ক্ষেত্ররূপে আলোচনাকে তিনি পরিচালিত করেন নাই ; দুইজন মহৎ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পরস্পরকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা রূপেই তিনি উহা চালাইয়াছেন। প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার অভিযোগের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কায়দে আজম অবশ্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে আলোচনা পথভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু তবুও মহাত্মাজির প্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

আলোচনা কিরূপে চলা উচিত

ইহা দুঃখের কথা। ইহারই ফলে আলোচনা ব্যর্থ হওয়া অবধারিত ছিল। পরস্পরকে স্বমতে আনা আলোচনার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। পরস্পরের বাঞ্ছিত ধারণা বা আদর্শ উৎপাটিত না করিয়াও কিরূপে পরস্পরের মধ্যে সম্মতির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় ইহাই ছিল আলোচনার উদ্দেশ্য। চার্চিল ও ষ্টালিন যদি পরস্পরকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা লইয়া আরম্ভ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে চুক্তি সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের মত মনুষ্য চরিত্র বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চয়ই জানেন যে পরস্পরের মুলনীতিকে আক্রমণ করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে সে আলোচনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সম্মতির সূত্র খুঁজিয়া আরম্ভ করিলে সে সূত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই যাইতে থাকে এবং অবশেষে একদিন আশ্চর্য্য হইয়া মানিতে হয় যে সুরুতে যাহা মূল নীতি মনে হইয়াছিল তাহা হয়তো আর সেরূপ মনে হইতেছে না।

বিচার্য্য বিষয় ছিল : কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধীজি মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব মানিতে পারেন কি না। মহাত্মাজি বলিতেছেন তিনি উহার সারমর্ম মানিয়া লইয়াছেন। কায়দে আজম বলিতেছেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিই হইল "দুই জাতির নীতি" এবং গান্ধীজি যখন সেই নীতি মানেন নাই তখন লাহোর প্রস্তাবও মানেন নাই। দুই জনেই চিঠিতে বিষয়টী সাফ করেন নাই। তাঁহাদের কথার সময় ইহা সাফ হইয়াছিল কিনা জানার উপায় নাই। লাহোর প্রস্তাব যদি প্রকৃতই "দুই জাতি" নীতির উপর রচিত হইয়া থাকে (কায়দে আজম তাহাই বলিতেছেন এবং গান্ধীজিও তাহা মানিতেছেন), তবে গান্ধীজি লাহোর প্রস্তাব মানার পরও আবার তাঁহাকে দুই জাতির নীতিও মানাইবার জন্য কায়দে আজম চেষ্টা করিতেছেন কেন ? আর গান্ধীজি যখন নিজেই বলিতেছেন যে লাহোর প্রস্তাব দুই জাতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত তখন লাহোর প্রস্তাব মানিয়াও দুই জাতি নীতি মানিতে তাঁহার আপত্তি কেন ? দুইজনেই তো বুঝিতে পারিতেছেন যে লাহোর প্রস্তাব বা দুই জাতি নীতি—ইহার একটী মানিলেই অপরটিও মানা হইল।

গণভোট সম্বন্ধে পার্থক্যের সমাধান

নেতারা হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে দুই জাতির প্রশ্ন সমাধান না করিলে গণভোটের প্রশ্ন সমাধান হয় না। আমার মনে হয় যে এইখানেই তাঁহারা বিচার্য্য বিষয়ের সম্মুখীন হইতে অপারগ হইয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের বক্তব্য ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহাদের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নাই। মহাত্মাজির একথা ঠিক যে, সীমানা-নির্দ্ধারিত পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলির ভিতরে কোনো গণ-ভোট লইতে হইলে তাহা শুধু মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। কায়দে আজমও ঠিকই বলিয়াছেন যে পৃথক হইবার প্রশ্নে শুধু মুসলমানদেরই গণভোট লওয়া হইবে এইখানেই দুজনে দুজনের বক্তব্য ধরিতে পারেন নাই।

লীগ কখনই বলে না যে অমুসলমানেরা পৃথক হইতে চায় লীগ শুধু বলে যে মুসলমানেরা পৃথক হইতে চায়। কংগ্রেস এবং হিন্দুরা যদি একথা না মানেন, তবে গণভোট লইয়া পরীক্ষা করা যায় লীগের কথা সত্য কিনা। স্বভাবতই সে গণভোট মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা গান্ধীজির বোঝা উচিত ছিল। আবার কায়দে আজমের এ কথা মানা উচিত ছিল যে স্বাধীন ও আলাদা হইবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলির ভিতরে কোন বিষয়ে গণভোট লইতে হইলে ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিচারে সে গণভোট কখনই শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

সমাধানের কর্মপদ্ধতি

সুতরাং কংগ্রেস যদি লাহোর প্রস্তাব মানে তবে নিম্নলিখিত কর্ম্মপদ্ধতিই যে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত তাহা উভয়েরই বোঝা উচিত ছিল :—

(১) কংগ্রেস যদি এখনই স্বীকার না করে যে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানেরা পাকিস্তান চায় তাহা হইলে এই বিষয়ের উপর সারা ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত মুসলমানদের গণভোট লইয়া তাহা স্থির করিতে হইবে।

(২) গণভোটের সিদ্ধান্ত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে কংগ্রেস-স্বীকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রদেশগুলিতে অবশিষ্ট ক্ষমতার সর্ত্তেই লীগ ও মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

(৩) গণভোটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে হইলে তৎক্ষণাৎ কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিতভাবে একটি কমিশন বসাইয়া লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সীমানা নির্দ্ধারণ করিবে।

(৪) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়া সেগুলি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইবামাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটী গণভোটের ব্যবস্থা করা হইবে (প্রয়োজন বোধ করিলে হিন্দুস্তানেও এরূপ গণভোট লওয়া যাইতে পারে)। এই গণভোটের বিচার্য্য বিষয় হইবে যে, রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্ব্বভৌমত্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একটীমাত্র কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে (ইউনিয়ন) যোগ দিবে, না একাধিক কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গঠন করিবে। রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ গণপরিষদও এই গণভোটেই নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। স্বভাবতই পাকিস্তানের মধ্যে এই গণভোট লওয়ার ব্যাপারে উহা শুধু মুসলমানদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, তেমনই হিন্দুস্তানের বেলায় শুধু হিন্দুদের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

দেখা যাইতেছে, মহাত্মাজি ও কায়দে আজমের পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। রাজাজির মত কেহ যদি ইহা নেতৃদ্বয়ের দৃষ্টিগোচর করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পুনরালোচনার দিন অতি নিকটে আসিবে নিশ্চয়ই বলা যায়।

সাময়িক গবর্নমেণ্ট

গণভোটের সমস্যা এইরূপে মীমাংসা হইয়া গেলে কেন্দ্রে বা প্রদেশে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বিশেষ কোন মুশ্‌কিল উঠিবে না। কংগ্রেস ও লীগের ভিতর সমান মর্য্যাদায় কোয়ালিশনের ভিত্তিতে ঐ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে।

কায়দে আজম হয়তো সাময়িক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে শতকরা ৫০টী আসন দাবী করিয়াছেন। লীগের পক্ষে ইহা জরুরি দাবী কারণ এই গবর্ণমেণ্টই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার সর্ত্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবে। এই গবর্ণমেণ্টে লীগের সমান অংশ না থাকিলে স্বভাবতই সন্দেহ উঠিতে পারে যে পাকিস্তান হয়তো বিফল করিয়া দেওয়া হইবে।

কায়দে আজম যদি এই দাবী "দুই জাতি" নীতির ভিত্তিতে তুলিয়া থাকেন তাহা হইলে আগেকার গোলমাল আবার এখানে উঠিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমার নিবেদন যে ইহার জন্য ঐরূপ কোন নীতির দোহাই দিবার প্রয়োজন নাই। সাময়িক গভর্ণমেণ্ট বেশী দিনের জন্য নয়। বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে ক্ষমতা আদায় করিয়া তাহা জনগণের হাতে তুলিয়া দিবার যন্ত্ররূপেই কংগ্রেস ও লীগ এই গবর্ণমেণ্টে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং দুইটী বিরাট সংগ্রামশীল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান রূপেই তাহারা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সমান হইবে। জনসংখ্যা অনুসারে সেখানে প্রতিনিধিত্ব চলেনা ; সাময়িক সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রে ও প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিই হওয়া দরকার।

ঐক্যের পর ক্ষমতা আদায়

কংগ্রেস লীগ মীমাংসা হইবামাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোলমালই ছিলনা। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজেই নিজের দেউলিয়ার দরখাস্ত পেশ করিবেনা তাহা সকলেই জানে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সব চেয়ে বড় কথাই হইল যে ব্রিটিশের সম্মতি অসম্মতির উপর এই ঐক্যের সাফল্য নির্ভর করে না। রাজাজি বলিয়াছেন, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ফলে এমন এক ভূমিকম্প উপস্থিত হইবে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী সৌধ ধ্বসিয়া পড়িবে। এ বিষয়ে আমরা তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। বাস্তবিক, এই ঐক্যের ফলে ১৯২১ সালের আন্দোলনের অপেক্ষাও অনেক দৃঢ় ও বিস্তীর্ণ গণজাগরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করিতে কিছু দেরী বা কিছু মুস্কিল হইতে পারে, কিন্তু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই সহজ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি তখন সমস্ত কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তি দিবে এবং প্রত্যেকটী প্রাদেশিক পরিষদ হইতে কংগ্রেস-লীগ দাবীর ঐক্যতান মুখরিত হইয়া উঠিবে। এই দাবী ওঠার আগে, সঙ্গে সঙ্গে ও পরে সারা ভারত ব্যাপিয়া জনসমাবেশের পর জনসমাবেশ ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করিবে। ইহার ফলে জনগণের মধ্যে যে-বিরাট উৎসাহ জাগিবে তাহার মধ্য দিয়া কিরূপে ক্ষমতা আদায় হইবে তাহা আন্দাজ করা মোটেই শক্ত নয়।

আমি আশা করি সমস্ত দেশভক্তই অতীত ব্যর্থতার তিক্ততায় রোদন ও কটূক্তি না করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ভরসা লইয়া এই সমস্ত বিষয়ের উপরই জোর দিবেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস স্থানান্তরিত

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের হেড কোয়ার্টার ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পার্টির বিভিন্ন দপ্তরের বর্ত্তমান ঠিকানা নিম্নরূপ :

পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অফিস... ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা (দোতলা)
(ক্যাম্পবেল হাসপাতালের বিপরীত দিকে)

পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ পত্রিকার অফিস ... ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা (নীচের তালা)

পার্টির কলিকাতা জিলা কমিটির অফিস... ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট (৪ তলা)

[বিঃ দ্রঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট তেতলার পূর্ব ঠিকানাতেই আছে।]

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
অফিস : ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১৷০

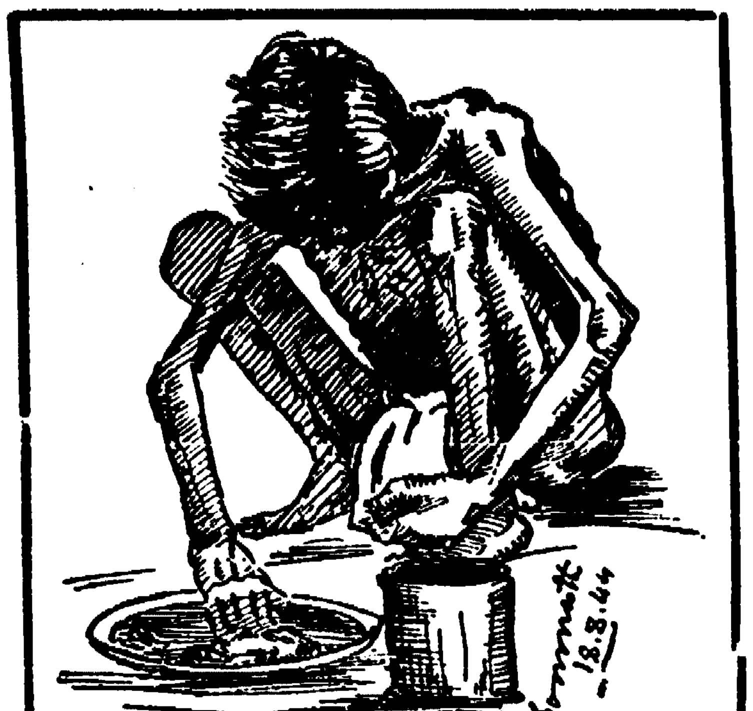

চট্টগ্রামের রাস্তায়

চট্টগ্রামের রাস্তায় লোকটির সঙ্গে দেখা। বহুদিন পর ভাতের আস্বাদ পাইয়াছে। সংকটে তাহার আত্মীয় পরিজন সকলেই মরিয়াছে। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষাই আজ ইহার একমাত্র সম্বল। **শিল্পী ঃ সোমনাথ হোড়**

●

১১ দিন উপবাসে মৃত্যু

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর **চট্টগ্রাম** হইতে অনাহারে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর একটি সংবাদ আসিয়াছে। সাতকানিয়া থানার আঁধারমাণিক গ্রামের সত্যভামা একজন দুঃস্থা দিনমজুর। কিছুদিন হইতে কাজের অভাবে তাহাকে বেকার থাকিতে হয়। জীবিকার অন্য কোনরূপ সংস্থান না থাকায় সত্যভামা ও তাহার ৮ বৎসরের মেয়েকে উপবাসে থাকিতে হয়। ১১ দিন ক্রমান্বয়ে অনাহারে থাকার ফলে মেয়েটির মৃত্যু হয়। (অমৃতবাজার, ৩-১০-৪৪)

নেত্রকোণার চিঠি
লঙ্গরখানা বন্ধ, দুস্থের দল পথে পথে

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা হইতে শচীন চক্রবর্তী ১৩ই সেপ্টেম্বরের এক পত্রে জানাইতেছেন ঃ

নিরাশ্রয় দুঃস্থরা আবার এখানে পথে পথে ভিড় করিতেছে। তাহাদের মৃতদেহ আবার শিয়াল-কুকুরে খাইতেছে।

কয়েকদিন আগে একজন পঙ্গু দুঃস্থ বারহাট্টার এক দোকানের বারান্দায় রাত্রে আশ্রয় নেয়। পরদিন দেখা যায়, লোকটির হাড় ক'খানা বাদে আর সমস্তই শিয়ালে খাইয়াছে। নেত্রকোণা শহরের বড়বাজারেও কয়েকদিন আগে একজন দুঃস্থ মুসলমানের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

অথচ নেত্রকোণা শহরের দুঃস্থ শিবিরটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকেই ভিক্ষা সম্বল করিয়া এখানে ওখানে চলিয়া গিয়াছে। শহরে একদল নিরাশ্রয় দুঃস্থ থাকিয়া গিয়াছে—ইহাদের অধিকাংশই মেয়ে। পাড়ায় পাড়ায় বাসন মাজিয়া জল টানিয়া ইহারা কিছু কিছু রোজগার করে বটে, তবে শোনা যায় ইহাদের অনেকেই অভাবের জ্বালায় দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারও এই সংকট হইতে রক্ষা পায় নাই।

মহকুমা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী রাখাল বর্মণ। ইস্কুলে প্রথম শ্রেণীর ফার্ষ্ট বয়। গতবার রাখালের সমগ্র পরিবার লঙ্গরখানায় খাইয়াই বাঁচিয়া ছিল। আজ আর লঙ্গরখানা নাই। কয়েক মাস যাবৎ রিলিফও বন্ধ। আজ তাহাদের দাঁতে কুটা কাটারও সংস্থান নাই।

বারহাট্টার এক চক্রবর্তী পরিবার। অভাবে পড়িয়া গত বার গোটা পরিবার লঙ্গরখানা সম্বল করিয়াছিল। বাড়ীর কর্তা লঙ্গরখানাতেই মরিয়াছেন। দুই ছেলে জীবিকার খোঁজে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। নিরুপায় সংসারে একটি মাত্র ছেলে লইয়া গৃহকর্ত্রী অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন।

—গ্রামে গ্রামে সংকটের যে শতসহস্র ছবি আছে, তাহারই কয়েকটি এখানে তুলিয়া ধরিলাম। ইহার উপর সরকারী অব্যবস্থায় জনগণের সামান্যতম সুবিধার পথও রুদ্ধ।

কলমাকান্দা থানার এক খবরে প্রকাশ, কৈলাটি ইউনিয়ন ফুড কমিটিতে সরকারী আমলাদের প্রভাবই বেশী। গ্রাম্য কমিটিগুলির সহিত তাহারা কোন সহযোগিতাই করে না। ফলে ইউনিয়ন ফুড কমিটিতে দুর্নীতির অন্ত নাই। রেশন কার্ড আজ পর্যন্ত বিলি হওয়া দূরে থাকুক ইউনিয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৯০/ মণ লবণের কোটার মধ্যে নাকি ৮০/ মণেরই হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। শোনা যায়, কুইনাইন বিলির ছাড়পত্র যাহার নামে, সে লোকেরই নাকি অস্তিত্ব নাই।

শান্তিপুরে
৩ হাজার লোক নিঃস্ব

নদীয়া জেলার শান্তিপুর হইতে একজন সংবাদদাতা জানাইতেছেন ঃ

শান্তিপুর শহরে দুঃস্থের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এখনই অন্ততঃ ৩ হাজার দুঃস্থের জন্য খয়রাতী খোল একান্ত প্রয়োজন। রক্ত আমাশয় ও টাইফয়েড রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াইতেছে। অথচ এই অবস্থার প্রতীকারে সরকারের বিশেষ গা নাই।

আমলাতন্ত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ফুড কমিটি খাড়া করিয়াছে, তাহার আপাদমস্তক গলদে ভরা। এক একটি ওয়ার্ডে ৬।৭ হাজার মানুষ পিছু ৩।৪টি কণ্ট্রোলের দোকান। ফলে শহরবাসীর দুর্গতির সীমা নাই। অনেককে কাজ কামাই করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কণ্ট্রোল দোকানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। শহরে আটা, ডাল না থাকা সত্বেও ষ্টক আনার ব্যবস্থা হয় না। কেরোসিনের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা রাত্রিতে পড়িতে পারে না। ইহা ছাড়া, ফুড-কমিটির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব, রেশারেশি ও অন্যান্য দুর্নীতিরও অভাব নাই। স্থানীয় আমলাতন্ত্র চোরাকারবারকে বিশেষভাবে প্রশ্রয় দেয়। সম্প্রতি একজন সিভিক গার্ড একজন চোরাকারবারীকে ধরিয়া ফেলে; এই ঘটনার পর তাহার উপরওয়ালা তাহাকে নাকি রাত্রের পাহারা হইতে কৌশলে সরাইয়া দিয়াছে।

এরাই একদিন মসলিন বুনিত

(অনিল মুখাজী)

ঢাকার তাঁতশিল্প

ঢাকা জিলা হস্তচালিত বয়নশিল্পের একটি সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র—ঢাকাই জামদানী ও ডেমরাই সাড়ী নামীয় মিহি ও দামী কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড়, থান, লুঙ্গী, মশারীর নেট প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাপড় এখানে তৈয়ার হয় এবং তাহা বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় হয়। পাঁচটি বড় কাপড়ের হাটকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ৩০,০০০ তাঁত চলে এবং গড়ে সপ্তাহে ১৪ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ার হয়। এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৪০,০০০ পরিবার এবং জিলার মোট লোকসংখ্যার একটি বড় অংশ, প্রায় শতকরা ৬ ভাগ এই হস্তচালিত বয়নশিল্পের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

এমন একদিন ছিল যখন গ্রামের মধ্যে এই তাঁতীরা (মুসলমান তাঁতীদিগকে গ্রামে কারিগর বলে, হিন্দুদিগকে যুগী) ছিল সব চাইতে বেশী সঙ্গতি-সম্পন্ন। ঢাকাই বসাকরা উন্নত ধরণের কাপড় তৈয়ার করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। তাঁতীদের বাড়ী ঘর খাওয়া দাওয়া সব কিছুই একটু বিশেষ ধরণের। কিন্তু গত দেড় বৎসরের দুর্ভিক্ষ এবং বিশেষভাবে মহামারী এই সমাজকে ভীষণভাবে আঘাত দেয়। বহু কারিগর যন্ত্রপাতি, বাড়ী ঘর সব কিছু বিক্রয় করিয়া শেষ পর্যন্ত দুঃস্থ পথের ভিখারীতে পরিণত হইয়াছে, অনেকে মারা গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রাম এবং বিক্রমপুরের যশিলদা ও সুরদিয়া গ্রাম মৃত্যু ও মহামারীর বিভীষিকাময় ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত এবং এই তিনটি গ্রামই কারিগরদের গ্রাম।

সূতার অভাব

নিজেদের অশেষ চেষ্টার ফলে এই শিল্পিগণ আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিতেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদের উপর আবার এক নূতন আঘাত আসিয়াছে।

কোথাও ন্যায্য দরে উপযুক্ত পরিমাণ সূতা পাওয়া যায় না—চোরাবাজারের দর কণ্ট্রোল দরের দুই গুণ হইতে তিন গুণ পর্যান্ত; অথচ এই দরে সূতা কিনিয়া কাপড় তৈয়ার করিলে যে খরচ পড়ে তাহাতে কাপড় বিক্রয় হয় না। পশ্চিম বিক্রমপুরের যশিলদা, রাণীগাঁও, কয়কিরতন, নরীশা, ঝাপুটিয়া, কুকুটিয়া, সিন্দুরদী, রানা, সুরাদীয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে এই বয়নশিল্পের উপর নির্ভরশীল। এখানকার অবস্থা বুঝিবার জন্য আমি সম্প্রতি কয়েকটি গ্রাম যাই। কুমারভোগ ইউনিয়নে কয়েকটি বাড়ীতে কারিগরদের খোঁজ করিয়া দেখি তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁত বন্ধ করিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছে। হেতুলিয়াতে এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল—আজকাল নদীতে মাছ মিলে, দরও বেশ, এদিকে গত হাটে কাপড়ে কাহারও কারবার হয় নাই; তাই আমাদের গ্রামের অনেকে নদীতে (নিকটেই পদ্মা নদী) গিয়াছে। এখন তো না হয় মাছ ধরিয়া দুই দিন চলিল, কিন্তু আর কয়টা দিন পরে যে কী হইবে বাবু! আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম—দেশে বস্ত্রের জন্য হাহাকার, দক্ষ শিল্পীর অভাব, আর এইভাবে দক্ষতার অমর্য্যাদা! শুধু পরাধীন ভারতেই বুঝি ইহা সম্ভব!

চোরাবাজারে চড়া দাম

মান্দ্রাহাট বিক্রমপুরের সব চাইতে বড় কাপড়ের হাট, সপ্তাহে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার কাজ-কারবার হয়। তখন পূজা সম্মুখে, কিন্তু কাপড়ের বাজারে কোন কর্ম্মচাঞ্চল্যই নাই। একজন কারিগরের হাতে দেখি কিছু সূতা, মনটাও খুশী-খুশী। কত দরে কিনিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে সে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম্ম এই—যে যাহাই বলুক না কেন, বড়বাবু (অর্থাৎ এই অঞ্চলের তিন জন একচেটিয়া সূতা ও রং ব্যবসায়ীদের অন্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হরিআনন্দ পোদ্দার) গরীব-দিগকে খুব দয়া করেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে গত দুই হাটে ৩৭৲ বাণ্ডিল দরে সূতা (সাদা) কিনিয়া কারিগররা একেবারেই ব্যবসা করিতে পারে নাই, তাই এই হাটে মুনাফা ছাড়িয়া দিয়া ৩০৲ দরে সূতা দিয়াছেন। আরও প্রশ্ন করিয়া জানিলাম ক্যাশমেমোতে নাকি বাণ্ডিলের দর লেখা হয় ১৯॥০, অর্থাৎ কণ্ট্রোল দর। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের ৩,০০০ তাঁতী এই হরিআনন্দ পোদ্দার এবং এরূপ আরও দুইজন একচেটিয়া মহাজনের দয়ার উপরই বাঁচিয়া আছে! তাহাদের এক কথা, সূতাই পাওয়া যায় না, তার আবার কণ্ট্রোল দর! কী ভাবে যে তাহাদিগকে সূতা সংগ্রহ করিতে হয় সে খবর তো আর সাধারণ লোক রাখে না, ইত্যাদি। সর্বত্রই অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে এইরূপই। নারায়ণগঞ্জের বাবুরহাট—জেলার মধ্যে সেরা কাপড়ের হাট। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ব্যবসায়ী আসিয়া হাজির হয়। সপ্তাহে ৮ লক্ষ টাকার কাজ কারবার। সেই অঞ্চলের ৮,০০০ তাঁতী হাহাকার করিতেছে। কণ্ট্রোলে যে সূতা দেওয়া হয় তাহাতে তাহাদের মাসে একদিনের কাজ হয় মাত্র।

রাত্রির কাজ বন্ধ

তারপর কেরোসিন। তাঁতীদের রাত্রিতেই কাজ হয় ভাল, নিরিবিলির কাজ। তাছাড়া, শুধু দিনে কাজ করিয়া আর সংসার চালান যায় না! পূর্বে তাঁতীদের গ্রামগুলিতে সারা রাত্রি খট্ খট্ আওয়াজ হইত, কেহ কাজ শেষ করিত রাত্রি বারটাতে, কেহবা দুইটাতে, আবার কেহ কেহ দুইটাতে কাজ সুরু করিত—এই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু আজকাল রাত্রের কাজ একেবারেই বন্ধ। সপ্তাহে কেরোসিন দরকার /৪, কিন্তু ১।৹ কি ২৲ দরে কেরোসিন কিনিয়া কাজ কেমনে চালাইবে? তাহাতে লোকসানই হয়। তাঁতীরা প্রমাদ গণিতেছে। সাত শত কারিগরের গ্রাম যশিলদা, এখন আছে দুই শত—এরাও কি টিকিবে?

তাঁতীদের বাঁচার চেষ্টা

পশ্চিম বিক্রমপুরে কুমারভোগ ইউনিয়নে ৫০০ তাঁত, ৬০০ তাঁতী, পরিবারসহ এরা ৩,৫০০। এরা এক সমিতি গড়িয়াছে—প্রত্যেকে তাহার সভ্য। এদের সভাতে ঠিক হইয়াছে, সমিতি হইতে কো-অপারেটিভ চালান হইবে—সপ্তাহে ১০ বেইল সূতা এবং উপযুক্ত পরিমাণ রং ও কেরোসিন চাই। এজন্য তাহারা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিমের নিকট প্রতিনিধি পাঠায়। সকলেই বুঝিয়াছে এই ব্যবস্থাতেই তাহারা বাঁচিতে পারে—তাই আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড খাদ্য কমিটি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি লোকের সক্রিয় সমর্থন আদায় করিতে হইবে। কুকুটিয়া ইউনিয়নে ৪৫০ তাঁত, ৫০০ তাঁতী, পরিবার সহ ২,৬০০। সভা হইয়াছে—কুমারভোগের মত তাহারাও সমিতি গড়িবে। ঢাকা শহরের বসাকরাও আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে রাজী নয়, বেশ কয়েকটা বৈঠক হইয়া গেল, শহরের সকল বয়নশিল্পীদের একত্র করিয়া একটি জমায়েত করিতে হইবে, সমিতি গড়িতে হইবে।

সমস্যা বিরাট এবং তাহা শুধু এদের একার নয়, সকলেরই। দেশব্যাপী সকলের মিলিত চেষ্টার দ্বারা সূতার বাজারে চোরাকারবার বন্ধ করিতে হইবে। বিবৃত্তি সর্বস্ব আমলাতান্ত্রিক সরকারকে সক্রিয় নীতি গ্রহণে বাধ্য করিতে হইবে। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমরা বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি। এখনও কেবল সরকারী বিবৃতির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে অচিরেই বস্ত্রশিল্পে এক ভয়াবহ সঙ্কট উপস্থিত হইবে—শিল্প ও শিল্পী দুইই আমরা হারাইব।

আগামী চাষের অবস্থা সঙ্গীন

গোমড়ক রুখিবার চেষ্টা কই ?

৩ মাসে ১৫৩টি হালের গরু মৃত

চট্টগ্রাম জেলার জলদী গ্রাম হইতে উমেশ দাস জানাইতেছেন :

বাঁশখালী থানায় এবার ব্যাপক গোমড়ক সুরু হইয়াছে। একমাত্র জলদী ইউনিয়নে গাইগরু ও বাছুর ছাড়া শুধু হালের গরু মরিয়াছে আষাঢ় হইতে তারা এই ৩ মাসে ১৫৩টি। ইহার উপর খুঁড়ি পীড়ায় কৃষকরা আক্রান্ত হওয়ার ফলে চাষ অচলপ্রায় হইয়াছে। জোয়ালের এক পাশে একটি গরু ও অন্যপাশে মজুর দিয়া এবং গরুর অভাবে মজুরে লাঙল টানিয়াই এই থানার বহু জমি চাষ হইতেছে। এমন ব্যাপার চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। মজুর ও বলদের অভাবে এবং নিয়মিত বৃষ্টি না হওয়ার জন্য শতকরা ২০ ভাগ জমিতে আউষ চাষ হয় নাই। যাহাও বা চাষ হইয়াছে, এবার ধান ফলিয়াছে অনেক কম। আমনের বেলায়ও বর্তমানে সেই সংকটই দেখা দিয়াছে। একে ত' বৃষ্টি নাই, তার উপর ৩৲ টাকা মজুরী দিয়াও মজুর পাওয়া দায় হইয়াছে। তাছাড়া প্রায় মজুরই রোগে পঙ্গু। ব্যাপক দুর্দশা সত্ত্বেও এই ইউনিয়নে সরকার মাত্র ১৬০০৲ টাকা কৃষিঋণ দিয়াছে। পর্যাপ্ত সাহায্য না পাইলে চাষের সমস্যা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিবে।

কাঁফিহালে গোমরক

এ বৎসরের প্রথমদিকে ফুলবাড়ী থানার কাঁফিহাল ইউনিয়নে যে গোমরক সুরু হয়, তাহাতে প্রায় অর্দ্ধেক গোমহিষ মারা যায়। কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে সরকারী একজন পশু-চিকিৎসক আসেন এবং গোমরক সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর গরু খরিদের জন্য সরকারী টাকাও মঞ্জুর হয়। কিন্তু আবাদ শেষ হইল, অথচ আজ পর্যন্ত কৃষকদের হাতে সে টাকা পৌঁছায় নাই। সার্কেল অফিসার এখন টাকা দিতে নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিতেছেন। এদিকে আবার উক্ত ইউনিয়নে প্রচণ্ড আকারে গোমরক দেখা দিয়াছে। আমড়া গ্রামের এক মুসলমান জোতদারের ৬টি হালের গরুর মধ্যে ৫টি মরিয়াছে। ফলে প্রায় ৭০ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ১০ বিঘা জমিতে সে রোয়া দিতে পারিয়াছে।

কলিকাতায়

দুঃস্থের মৃত্যুহার বাড়িতেছে

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার হাসপাতালে ১১ জন দুঃস্থের মৃত্যু হয় ও নূতন ২১ জন দুঃস্থ ঐ দিন হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১ মাসে হাসপাতালে ২৬০ জন দুঃস্থের মৃত্যু হইয়াছে ও নূতন ভর্তির সংখ্যা ৯৯২। আগষ্ট মাসে মৃত্যুর ও নূতন ভর্তির হার যথাক্রমে ১৫৮ ও ৯২ ছিল।

বীজ আর খইলের অগ্নিমূল্য

বাঁকুড়া হইতে উদয় ভানু ঘোষ জানাইতেছেন : যুদ্ধের আগে ৯/০ মণ ধান বিক্রি করিয়া কৃষকরা ২/০ মণ খইল পাইত। দুর্মূল্যতার দরুণ বর্তমানে তাহারা ৯/০ মণ ধানে ৯/০ মণ খইলও পায় না। সালফেট্ সারের সের পিছু দর যুদ্ধের পূর্বে ছিল /১০ পয়সা। বর্তমানে ইহার দর সের পিছু ৯৶০ পর্যন্ত হইয়াছে। ৶০ আনা তোলা যে বীজ আগে বিক্রয় হইত এখন তাহার দর ৩৲ টাকায় উঠিয়াছে। কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে সারের দর বর্তমানে সরকার হইতে প্রতি সের ।০ আনায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে বাঁধা মূল্যে খইল ও বীজ সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা না হইলে চাষের সমূহ ক্ষতি হইবে।

নীলফামারীর চিঠি

শতকরা ৬০ জনের খাবার নেই

রংপুর জেলার নীলফামারী হইতে অনিল দেব জানাইতেছেন :

নীলফামারী মহকুমায় ৬ লক্ষ লোকের বাস। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে গতবার এই মহকুমার ১ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

এই মহকুমার সহস্র সহস্র অধিবাসী আজও এই ধ্বংসের জের টানিয়া চলিয়াছে। শতকরা ৬০ জনের ঘরে খাবার নাই। বড়ভিটা ও ডিমলার নাউতারা ইউনিয়ন হইতে ইতিমধ্যেই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। নীলফামারী শহরে এবং বড়ভিটা ও ডোমার বন্দরে আবার দুঃস্থেরা ভিড় করিতেছে। শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলি হইতে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের দিকে বহু দুঃস্থ যাইতে শুরু করিয়াছে।

সরকারী হিসাবে নীলফামারী বাড়তি ধানের এলাকা। অথচ অস্বাভাবিক রপ্তানির ফলে এবার গোটা মহকুমায় ২ লক্ষাধিক মণ ধানের ঘাটতি হইবে মনে হয়। আগামী ৩ মাসেই সারা মহকুমার জন্য সাড়ে ৬ লক্ষ মণের উপর ধানের প্রয়োজন। আউষের আবাদ এবার অর্দ্ধেক হইয়াছে। এখানকার জোতদারদের মুঠাতেই আনুমানিক ৫ লক্ষ মণ ধান মজুত আছে।

আমলাতন্ত্র এই বিপদ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। মাছ তরীতরকারীর দর ত' আগুন। মধ্যবিত্তের সঙ্গতিতেও আজ আর কুলাইতেছে না। তাছাড়া জ্বালানির অভাবে অনেকের বাড়ীতে চাল থাকিতেও উনুনে হাঁড়ি চড়ে না।

লবণ ও দুধের দুর্ভিক্ষে মহামারী ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়ভিটা, নোহালী ও কৈমারী ইউনিয়নে শতকরা ৬০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কুইনাইনের একটি বড়ি ।০ আনা। ডাক্তারের দক্ষিণা ৩৲ টাকার কম নয়।

বস্ত্রাভাবে অধিকাংশ গ্রামে কৃষক মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না। শহরে প্রকাশ্যে কাপড়ের চোরাবাজার চলিতেছে।

শিক্ষাজীবনেরও আজ ভাঙাচোরা অবস্থা। ডিমলার হাইস্কুলের প্রায় বন্ধ হইবার দশা। কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে হেডমাষ্টার নাই। প্রাইমারী স্কুলগুলিতে ছাত্রের হার অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। ছাত্রের বেতন দিতে না পারায় বহু শিক্ষক বাধ্য হইয়া শিক্ষকতা ছাড়িয়াছেন।

মৈমনসিংহের পাহাড়ী হাজং

৭৫ একর জমিতে যৌথপ্রথায় চাষ

(মণি সিংহ)

তবু তাহারা সোণা ফলায়

গারো পাহাড়ের নীচে মৈমনসিংহের ছোট গ্রাম লেঙ্গুরা। অধিবাসীরা পাহাড়ী হাজং শ্রেণী। দীর্ঘকাল ধরিয়াই তাহাদের উপর চলিতেছিল শোষণের জবরদস্তি জুলুম। টাকায় খাজনা না নিয়া জমিদাররা নেয় টঙ্ক ধান। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের খাজনা দিতে হয় অনেকগুণ বেশী। শিক্ষার ব্যবস্থা সেই অঞ্চলে নাই বলিলেই চলে, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, রাস্তাঘাটও নাই। দুর্গম অঞ্চলে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া পাহাড়ের নীচে তবু তাহারা সোণা ফলায়। সারা মৈমনসিংহের তাহারা অন্ন যোগায়—অথচ সংস্থান ও সম্পদ বলিতে তাদের কিছুই নাই।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে

অত্যাচার তাহারা এতকাল মুখ বুজিয়াই সহ্য করিয়াছে। তারপর তাদের মধ্যে গেল কৃষক সমিতির বাণী। অধিকার বোধ তাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সুরু হইল টঙ্ক আন্দোলন। হাজার হাজার হাজং কৃষক সে আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্রমে সমস্ত সুসং পরগণায় সে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। বঞ্চিত ও অবহেলিত হাজংরা পাইল নূতন আশার বাণী, নূতন কর্ম্মের প্রেরণা—সংগঠনও গড়িয়া উঠিল।

কিসের উৎসব

...সেদিন জল কাদা ভাঙ্গিয়া লেঙ্গুড়া গ্রামে গিয়া যখন পৌঁছিলাম, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গাঁয়ের পাশে ক্ষেতের ধারে দেখিলাম লালঝাণ্ডা উড়িতেছে। হাজং ছেলেমেয়েরা গান ধরিয়াছে। বৃষ্টির দিনে যেন তাদের বর্ষামঙ্গল উৎসব। কাছে যাইতে সকলে বজ্রমুষ্টিতে অভিবাদন জানাইল। বলিলাম 'কিসের উৎসব ?' জবাব আসিল 'ফসল বাড়ানোর।'

যৌথ প্রথায় চাষ চলিতেছে। প্রায় ২৫টি হাল একসাথে কাজ করিতেছে। কৃষক মেয়েরা ধানের চারা লাগাইতেছে, মুখে তাদের লাল ঝাণ্ডার জয়গান। যৌথ কাজের উন্মাদনা দেখিলাম।

মেয়েরাও পুরুষের পাশে

প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, শুধু এক গ্রামেই নয়, ৮টি গ্রামে যৌথ প্রথায় কাজ চলিতেছে! এই দৃষ্টান্ত আরও দূর দূর গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ পর্যন্ত মোট ২৭৭টি লাঙ্গল ২১৪ জন পুরুষ এবং ৬০ জন মহিলা ভলাণ্টিয়ার মোট ৯৮৮ মজুরের কাজ করিয়াছে (এই অঞ্চলে পুরুষরা রোয়া লাগায় না—তাহারা হাল চাষ করে, জমি পাঁচ করে, তারপর মহিলারা রোয়া লাগায়)। এ পর্যন্ত মোট ৭৫ একর জমি যৌথপ্রথায় চাষ হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বাড়ী হইতেই ভলাণ্টিয়ার আসিয়াছে।

কাজ হয় অনেক বেশী

এ বছর বর্ষা আসিয়াছে অনেক দেরীতে। অনেকেরই হাল গরু নাই, তার উপর লোকের অভাব। কাজেই এভাবে চাষ না হইলে বহু জমি পতিত থাকিত। যতগুলি হাল আছে, ততগুলি দলে ভাগ করা হয়। কোন দিন কার ক্ষেত চাষ করা হইবে তা আগে হইতেই ঠিক করা হয়। আগের তুলনায় এভাবে দৈনিক কাজ হয় অনেক বেশী। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা ভলাণ্টিয়ারদের একবেলা খাইতেও দেয়—কিন্তু ভলাণ্টিয়ার ত' সকলেই, কাজেই মজুরীর কোন প্রশ্নই নাই। অনুন্নত হাজং কৃষকের দেশপ্রেম আজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

নিজেদের মেডিকেল স্কোয়াড

এ অঞ্চলে অসুখ এখন খুব বেশী নাই। পেটের ব্যারামই বেশী। পি, আর, সির, ডাক্তারের কাছে শিক্ষা পাইয়া কৃষকরা নিজেরাই নিজেদের মেডিকেল স্কোয়াড বানাইয়াছে। এই স্কোয়াড একমাসে ১৫০ জনকে কলেরার টিকা দিয়াছে। সমিতির পয়সায় কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধও কেনা হইয়াছে। ইহার ফলও বেশ ভালই দেখা যাইতেছে।

আউষ উঠিবার আগে এখানে হাহাকার পড়িয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বাঁচিয়াছে। ৫টি গ্রামে মোট ৪৪০ মণ ধান ধর্ম্মগোলা হইতে দেওয়া হইয়াছে এছাড়া সকলে মিলিয়া কিছু ধার কর্জ্জ করিয়াও দেওয়া হয়। এখন অবশ্য ধান চাউলের অভাব নাই কিন্তু অন্যান্য জিনিষতো পাওয়াই যায় না। আন্দোলনের ফলে লেঙ্গুরা ইউনিয়নে তবু কিছুটা লবণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য ইউনিয়নে লবণ নাই—ঘোষগাঁও অঞ্চলে ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা প্রতি সের লবণ দর। কাপড় তো একেবারে মিলে না। সূতা পাইলে এখানকার লোক নিজের কাপড় নিজেরাই বানাইয়া লইতে পারে।

যার যা আছে

অল্পদিনের মধ্যেই এখানে আবার হাহাকার উঠিবে, কৃষকের ঘরে ধান চাউল নিঃশেষ হইবে। মহাজনরাও এবার আর ধার দিতে চাহিবেনা। তাই হাজংরা এখন হইতেই ইহার বিহিত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যার যেটুকু আছে, যে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই যেন সকলে মিলিয়া মিশিয়া ভাগযোগ করিয়া খাইতে পারে তার চেষ্টা চলিতেছে।

আত্মবিশ্বাসে অটল

কমরেড ললিত সরকারের বাড়ীতে এখন সমিতির অফিস। ললিত তার যথাসর্বস্ব পার্টিকে দিয়াছে। মাঠের কাজ শেষ করিয়া কৃষক কর্মীর দল অফিসে জমা হইয়াছে। তাহাদের ঘর্মাক্ত চোখে মুখে উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাস।

ঢাকা মেডিকেল রিলিফ সংগঠনের দাবী

মহামারী সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত কমিশনের নিকট ঢাকা জেলা মেডিকেল রিলিফ অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ হইতে যে মেমোরাণ্ডাম উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, **ঢাকা জেলার ২০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছে।** ইহার জন্য মেমোরাণ্ডামে প্রতি মাসে হাজার পাউণ্ড কুইনাইন দাবী করা হইয়াছে। জরুরী সরকারী হাসপাতালগুলিতে দুর্নীতি ও ঔষধের চোরা কারবার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত হাসপাতালের উপর বেসরকারী তত্ত্বাবধানের জন্যও ঐ মেমোরাণ্ডামে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মহামারীর কবলে বাংলা

...ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মগরা গ্রাম। আবদুল রশিদের পরিবারে একটি ছোট্ট শিশু ছাড়া আর সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী। মগরা গ্রামে এমনি শত শত পরিবার আজ মহামারীর কবলে। ১৫ দিনের মধ্যে জ্বর হয় নাই, এমন লোক এসব অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। রোয়ার সময় চলিয়া যায়, অথচ এখনও শতকরা ৫০ ভাগ জমিই আবাদ হয় নাই। অন্যান্য বৎসর কৃষকরা স্নান খাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ এবার জ্বরের চোটে তাহারা দিনে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। রিলিফ সংগঠনগুলি রোগীর সেবায় প্রাণপণে খাটিলে কি হইবে—কুইনাইন একেবারে অমিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ নামমাত্র কিছু কুইনাইন দিয়াছে। বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কুইনাইন যোগাড় করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী রিলিফ হাসপাতালগুলিও সপ্তাহে ২।৩ দিন কুইনাইন অভাবে বন্ধ থাকে।

শিল্পী— মণি রায়

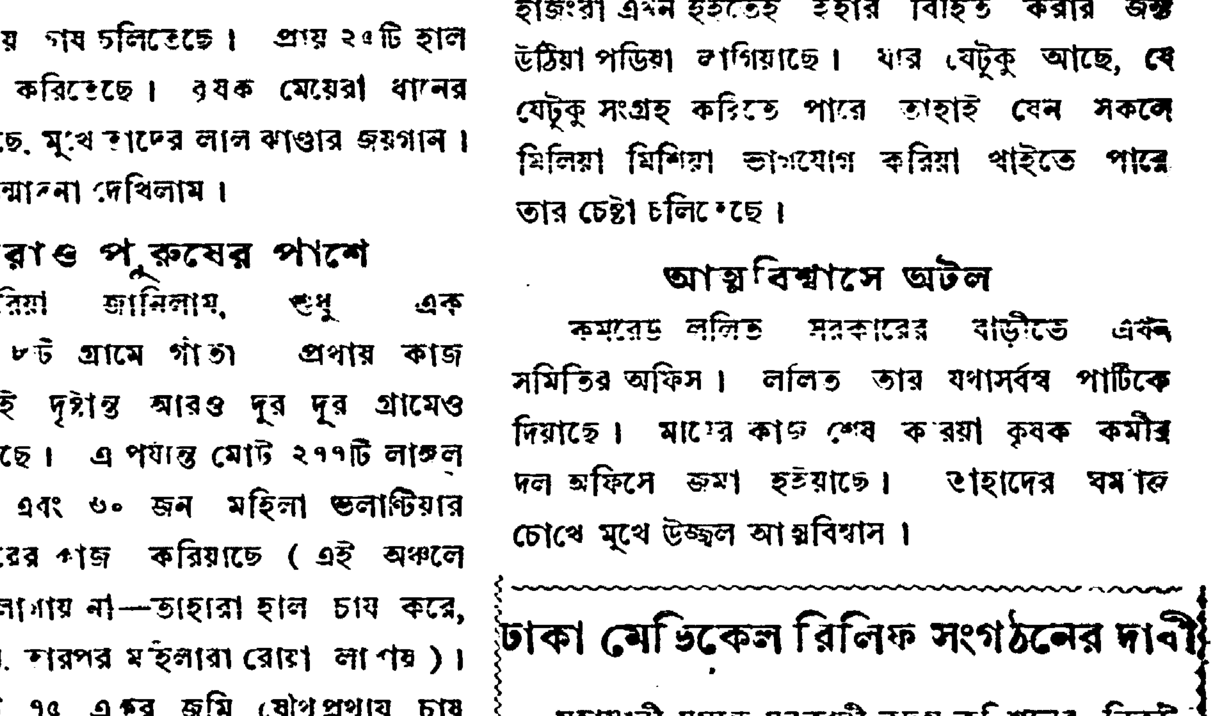

শ্রমিক জগৎ

শ্বেতাঙ্গ মালিকদের সহিত পুলিশ একজোট

ইউনিয়ন-কর্মীদের লাঞ্ছনা

খিদিরপুর ব্রেথওয়েট মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড সিতাংশু মজুমদার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

"গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পুলিশ খিদিরপুরে শ্রমিক-কর্ম্মীদের উপর অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য শুরু করিয়াছে। গত পূজা ও ঈদের সময় ব্রেথওয়েট সোহা কারখানার শ্রমিকরা বোনাসের জন্য আন্দোলন করে। কিছুদিন পরেই রেশন ওজনে কম দেওয়ার ব্যাপারে কোম্পানীর রেশন সপের লোক হাতে-নাতে ধরা পড়ে। শ্রমিকদের এই সমস্ত আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া কোম্পানী পুলিশের সহিত ষড়যন্ত্র করে। তাহার পর হইতে ইউনিয়নের সংগঠকরা কোন শ্রমিকের সহিত আলাপ করিলেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার ও হয়রাণ করিতে শুরু করিয়াছে। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর এইভাবে দুইজন সংগঠককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হুঁসিয়ার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইউনিয়নের আইনসংগত কাজের উপর হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে পুলিশকে এমনভাবে খোলাখুলি শ্বেতাঙ্গ মালিকদের ইঙ্গিতে চলিতে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলী অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শ্রমিক আন্দোলনের আইনসংগত অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখুন : এই দাবীর উপর সর্ব্বত্রই আন্দোলন সৃষ্টি করা দরকার।"

ট্রাম সালিশীর রায় এখনই চাই

কোম্পানীর ধর্ম্মঘট উস্কানি বন্ধ কর

অনেকদিনের আন্দোলনের ফলে ট্রাম শ্রমিকদের মূল দাবী দাওয়ার উপর গবর্ণমেণ্ট এডজুডিকেশন কোর্ট বসাইতে বাধ্য হইয়াছে। দুই মাস হইল কোর্টের তদন্ত শেষ হইয়াছে, কিন্তু সরকারী আমলারা কোর্টের সিদ্ধান্ত এখনো প্রকাশ করিতেছে না।

এদিকে এডজুডিকেশনের সিদ্ধান্ত হইতে শ্রমিকরা লাভবান হইতে পারে এই আশঙ্কায় কোম্পানী এখনই একটা গোলমাল সৃষ্টি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রতি বছর পূজা ও ঈদের সময় এক মাসের টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়. গত বছর উহা বোনাস হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এবার উহা ঈদের আগে অগ্রিম হিসাবেও দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা। সম্প্রতি ইউনিয়নের তিনজন বিশিষ্ট কর্মীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং একজন কর্মীকে 'সসপেণ্ড' করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রমিকরা উত্তেজনার বশে একবার ধর্ম্মঘট করিলেই তাহাদের এডজুডিকেশনের ফলাফল হইতে বঞ্চিত করা যাইবে—ইহাই কোম্পানীর ভরসা। গবর্ণমেন্টের ঔদাসীন্য এবং এডজুডিকেশনের রায় প্রকাশে ঢিলামী কোম্পানীকে এই কাজে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে।

কিন্তু ট্রাম শ্রমিকদের সংগঠিত একতা কোন উস্কানীতে নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাহারা গত ৫ই অক্টোবর একটি গণ-ডেপুটেশনে লেবার কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে। লেবার কমিশনারের দপ্তর হইতে জানানো হয় যে, এডজুডিকেশনের রায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং বরখাস্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে লেবার কমিশনার এসেন্সিয়াল সার্ভিস (মেণ্টেনান্স) অর্ডিনান্স অনুসারে তদন্ত শুরু করিবেন।

ট্রাম কোম্পানীর কার্য্যকলাপ কলিকাতার নাগরিক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কলিকাতা কর্পোরেশন এবং নাগরিকদের পক্ষ হইতে সর্ব্বত্র প্রতিবাদ ঘোষিত হোক।

পোর্ট মজুরদের আন্দোলনের সাফল্য

অ-মিলিটারী মজুরদের জন্য সস্তা রসদ

জাপ-বোমার মধ্যেও পোর্টের কাজ চালু রাখিয়া কলিকাতার জনগণের জীবনকে পোর্ট শ্রমিক রক্ষা করিয়াছে। এই দেশপ্রেমিক পোর্ট শ্রমিকদের আন্দোলন ও সংগঠনের চাপে সম্প্রতি পোর্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কয়েকটি দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

এতদিন কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নকে স্বীকার করিলেও সব সময়ে ইউনিয়নের ডেপুটেশন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইত না। এক্ষণে প্রতি ১৫ দিনে একটি ডেপুটেশন গ্রহণ করিতে তাহারা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে পোর্টের প্রত্যেক বিভাগের ছোট বড় প্রত্যেকটি অভিযোগ লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত লড়িবার সুযোগ অনেক বাড়িয়াছে।

ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন মাগ্‌গীভাতার দাবী লইয়া পোর্টের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনা করেন। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত শ্রমিক ডি, আই ইউনিটে নাই তাহাদের মাগ্‌গীভাতা যে খুবই কম তাহা দেখানো হয়। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে তাহাদের সস্তা রেশন হিসাবে মাগ্‌গীভাতা বাড়ানো হইল। এতদিন তাহারা সরকারী দরে রেশন ক্রয় করিত, এক্ষণে তাহারা ৵১০ পয়সা সের চাল এবং /১৫ পয়সা সের আটা পাইবে। ইহার ফলে তাহাদের প্রায় ৫ টাকা মাগ্‌গীভাতা বাড়িল।

ওভার টাইম কাজের মজুরীর রেট লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহার ফলে পি, ডবলিউ ক্রেন-খালাসী প্রভৃতি অনেক বিভাগে রেট বাড়াইয়া প্রায় দ্বিগুণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকদের ছুটি এবং গ্রেড প্রভৃতি সম্পর্কে নয়া ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। পোর্ট শ্রমিকদের সংগঠন ও একতা আরো বাড়াইতে পারিলে তাহারা কলিকাতার অন্যান্য শ্রমিকদের জয়ের পথ দেখাইতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

শহীদ স্মরণে

মেদিনীপুরে

গত ১০ই সেপ্টেম্বর **মেদিনীপুরের** কমিউনিষ্ট কর্মী কমরেড **গোষ্ঠবিহারী ঘোষ** মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে জণ্ডিস্ রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি ১৯২৯ সাল হইতে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কৃষক সমিতির উৎসাহী কর্মী হিসাবে পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও সভাপদ অর্জন করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়াছেন।

যশোরে

গত ৬ই সেপ্টেম্বর **যশোরের** শত্রুজিতপুরের তরুণ ছাত্রকর্মী কমরেড **অজিত অধিকারী** আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে মারা গিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

গ্রামে গ্রামে অভাবের তাড়না

রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হইয়াছে। ফুলছড়ি থানার কালিগঞ্জ, কঞ্চিপাড়া উড়িয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে, সুন্দরগঞ্জ থানার বেলকা, ভাটি বোবাগাড়ি ও কামারজানি ইউনিয়নে এবং গাইবান্ধা থানার রামচন্দ্রপুর, বোয়ালী, গদিয়াখালী, মনোহরপুর প্রভৃতি ইউনিয়নে ম্যালেরিয়ায় প্রতি মাসে মৃত্যুর হার প্রতি ইউনিয়নে ৪০ হইতে ৭০। স্থানীয় এজেণ্টরা শহরে চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে কুইনাইন বিক্রি করিতেছে। বৃষ্টির ফলে আমন আবাদের যে সুযোগ দেখা গিয়াছিল জ্বরের জন্য কৃষকরা তাহার কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। ফলে, আবাদ এবার সিকি ভাগ কম হইবে বলিয়া মনে হয়। এই মহকুমার সর্বত্র দুধের সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুগ্ধ বিতরণের কেন্দ্রগুলিও আপাতত বন্ধ। কাজেই শিশুরা দুধের অভাবে মরিতে বসিয়াছে। অথচ মিঠাইয়ের দোকানগুলি আগের মতই চলিতেছে এবং লালমণিরহাট অঞ্চলে ছানা চালান দেওয়াও বন্ধ হয় নাই। শহরে দুধের দর ।৵০ আনার বাঁধা আছে। কিন্তু মিষ্টির দোকানদাররা ও ছানার কারবারীরা গ্রামাঞ্চলে লোক পাঠাইয়া অবাধে ॥০-॥৵০ আনা দরে দুধ কিনিতেছে।

লবণের অভাব

ময়মনসিংহের টঙ্ক এলাকা ও আড়াপাড়া, ঢাকার মাওয়া ও দিনাজপুরের পতিরাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কণ্ট্রোল মূল্যে লবণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। আড়াপাড়ায় মজুতদাররা ৪৲ টাকা সের দরে চোরাবাজারে লবণ বেচিতেছে। কণ্ট্রোলের দোকানে যেটুকু লবণ আসিতেছে তাহার অধিকাংশই নাকি চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে।

সংবাদ-সংগ্রহ

বাংলার বিভিন্ন জেলায়

কাজলপুরে কিশোর সমাবেশ

সম্প্রতি **ঢাকার** কাজলপুরে ৭৬ জন কিশোর কিশোরী সমবেত হইয়া নূতন বছরের জন্য কুকুটিয়া ইউনিয়নে কিশোর বাহিনী গঠন করিয়াছে। মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে প্রফুল্ল মুখার্জী কিশোরদের অভিনন্দন দেন। ৫ জন বালক বালিকাকে লইয়া একটী সভাপতিমণ্ডলী হইয়াছে। বীণা চাটার্জী সম্পাদিকা ও লীল মুখার্জী সহঃসম্পাদিকা হইয়াছে। গত বছর এই বাহিনী পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের দুগ্ধ বার্লি বিতরণ করিয়া মিল্ক ক্যান্টিন পরিচালনা করিয়াছে—ম্যালেরিয়ার কুইনাইন বিলি করিয়াছে, কচুরী নষ্ট করার কাজেও তাহাদের একটী বাহিনী কাজ করিয়াছিল।

গাছবাড়িয়ায় "জনযুদ্ধ" সম্মেলন

চট্টগ্রাম জেলার গাছবাড়িয়ার জনযুদ্ধের ক্রেতা, পাঠক ও সহানুভূতিশীল লোকদের লইয়া একটি জলসা হইয়া গিয়াছে। গান, ম্যাজিক, কেরিকেচার এবং সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা হয়। 'জনযুদ্ধ' বাংলার জনসাধারণের জীবনে কত বড় একটী সঙ্গী তাহা বর্ণনা করিয়া আলোচনা হয়। একটী 'জনযুদ্ধে'র পাঠচক্র গঠিত হয়।

সরকারী ব্যবস্থার নমুনা

রংপুরের ডোমার বোগাগাড়ী ইউনিয়নে শতকরা ৩০ জন কৃষকের হাল ও বলদ নাই। কৃষি সাহায্য বিভাগ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে গড়ে ১টী ইউনিয়নে ১খানা করিয়া লাঙ্গল হইতেছে। আর যে ২।৩ জোড়া বলদের জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও খয়রাৎ নয়, কর্জ্জা। অথচ মোটা বেতনে নূতন নূতন অফিসারদের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট খোলা হইয়াছে।

গ্রামের চিঠি

ইহারই নাম আমলাতন্ত্র...

মহাশয়, গত ১৪।৯।৪৪ আমি রাউজান থানার সার্কেল অফিসারের ১১।৯।৪৪ ইং তাং পারমিট অনুযায়ী ৮/ মণ চাউল এবং ২/ মণ চাউল চিকদাইর নারী সমিতি পরিচালিত ওয়ার্ক হাউসে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু পথের মধ্যে ফয়াতলীহাটে চিকদাইর বিটের মুন্সী, কনষ্টেবল ও চিকদাইর নিবাসী মুন্সী তোরাবদ্দিনের পুত্র মুন্সী মফজ্জল রহমান যোগাযোগে চাউল আটকাইয়া ৬টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত কাসামিঞা প্রভৃতি দিন মজুরকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তারপর বিটের মুন্সী একজন সিপাহী লইয়া জোর করিয়া আমার ঘর তদন্ত করিতে চান।

তখন আমি তাহাকে বলিলাম, 'আপনি আমার ঘর তদন্ত করুন, আমি সার্কেল অফিসারের নিকট টেলিগ্রাম করিবার জন্য যাইতেছি। এই বলিয়া আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলে তাহারাও অন্য দিকে চলিয়া যায়। তারপর আমি ফয়াতলী হাটে আসিয়া চিকদাইর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল মজুমদারকে নারী সমিতির পক্ষ হইতে সংবাদ দিয়া চাউল ডাল গুলি বুঝাইয়া দিয়া আসি। আমি একজন সরকারী ওয়ার্ক হাউসের পরিচালক এবং চিকদাইর ইউনিয়ন ফুড-কমিটির যুগ্মসম্পাদক। অবশ্য যদি পুলিশের হাতে আমাদের হয়রান হইতে হয় তাহা হইলে রিলিফের কাজ আমরা কি করিয়া করিব?

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনিবার জন্য আপনার পত্রিকায় এই চিঠিখানা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি,

আহাম্মদ মিঞা চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য

ডাঃ সৈয়দ মামুদের বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ

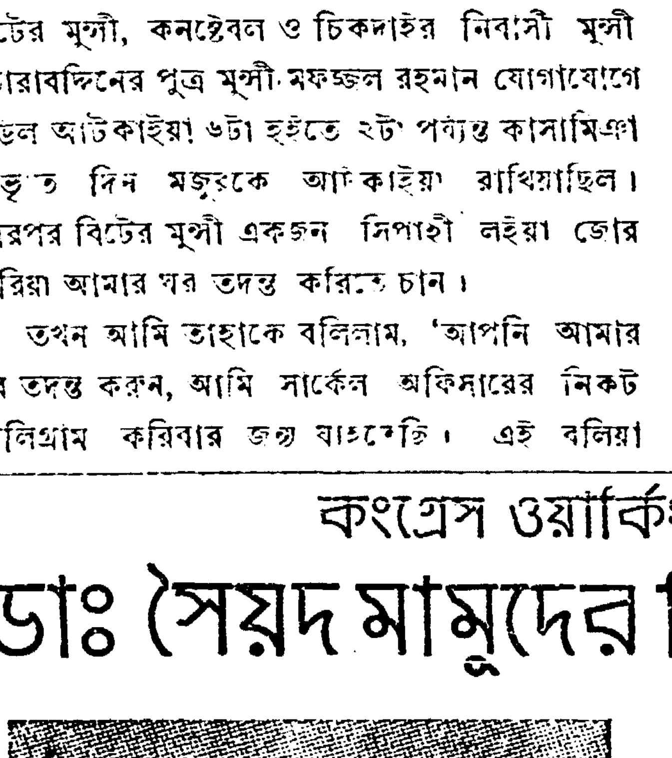

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সভ্য ডাঃ সৈয়দ মামুদ আমেদনগর ফোর্ট হইতে বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বোম্বাই পৌছিয়া তিনি সংবাদপত্রের মারফৎ দেশের সমস্ত সহকর্মীদের কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন জানান। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, কংগ্রেস সভাপতির এ পর্যান্ত ৪২ পাউণ্ড এবং পণ্ডিত জহরলালের ১৪ পাউণ্ড ওজন কমিয়াছে।

বোম্বাই পৌছিবার পথে পুনায় ডাঃ মামুদ কয়েকজন ছাত্রের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, **প্রকৃত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আজ ছাত্রদের সমস্ত কর্মক্ষমতা নিয়োগ করা প্রয়োজন।**

ডাঃ মামুদ বোম্বাইতে ২।৩ দিন থাকিয়া ওয়ার্দ্ধা রওনা হইবেন।

চীনে কমিউনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং মতভেদের আসল কারণ

গণপরিষদে কমিউনিষ্ট প্রতিনিধির বক্তৃতা

মীমাংসার্থে কমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত

জাপানের নূতন আক্রমণে চীনের প্রতিরোধে যে গুরুতর সঙ্কট আসিয়াছে এবং চীনের কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট দলের দৃঢ়তর ঐক্যই যে এই আক্রমণকে পরাস্ত করিবার প্রধান উপায় সে কথা লইয়া এখন মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশেই আন্দোলন উঠিয়াছে। গত চার মাস ব্যাপী কমিউনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং আপোষ-আলোচনা সম্পর্কে জেনারেল চ্যাং কাই শেক ১৬ই সেপ্টেম্বর চীনের গণপরিষদে এক বক্তৃতায় কুওমিণ্টাং কর্তৃক উপস্থাপিত আপোষের সর্তগুলি সমর্থন করেন। সেই সর্তগুলি সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তাহার আগের দিন কমিউনিষ্ট প্রতিনিধি লিন চু হান যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে সর্তগুলি কিরূপ। লিন চু হানের বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়া নীচে দেওয়া হইল (ইহা ভারতের কোন কাগজে বাহির হয় নাই)।

চীনের কমিউনিষ্ট নেতা মা-ও সে-তুং

কুওমিণ্টাংয়ের সঙ্গে আমাদের আলোচনা যদিও বন্ধুভাবেই চলিতেছে কিন্তু দুঃখের কথা যে চার মাস আলোচনার পরও কোন নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় নাই।

প্রথম কথা—গণতন্ত্র

কুওমিণ্টাংয়ের কাছে আমাদের প্রথম অনুরোধ ছিল যে দেশের সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোক। জাপান শক্তিশালী জাতি, তাহারা আমাদিগকে হারাইবার জন্ত মরিয়া হইয়া শেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা চীনের ৪৫ কোটী জনসাধারণ যদি সম্পূর্ণরূপে সংহত ও একত্রিত হই তবে জাপানের সঙ্গে সহজেই লড়িতে পারি। কিন্তু কি উপায়ে সেই সংহতি ও ঐক্য আসিবে? শুধু পূর্ণ গণতন্ত্রের সাহায্যেই তাহা সংগঠিত করা যায়। যুদ্ধের শুরু হইতেই আমরা এই আবেদন জানাইতেছি, বর্ত্তমান আলোচনার গোড়াতেও জানাইয়াছি।

৭বৎসরে কমিউনিষ্টরা কিরূপ লড়িয়াছে

তারপর কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট পার্টির সম্বন্ধগত অমীমাংসিত কয়েকটী সমস্যার কথা তোলা হয়। সেই সমস্যাগুলি বিচার করিতে হইলে কয়েক বছর আগের কথা হইতে শুরু করিতে হইবে। যুদ্ধারম্ভের সময় উত্তর শেন্সিতে লাল ফৌজে ৮০,০০০ সৈন্য ছিল, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে তাহা ৪৫,০০০ সৈন্যের তিনটী ডিভিশনে পরিণত করা হয়। শত্রুরা যখন সমগ্র হোপে প্রদেশ ও সান্সি প্রদেশের কতকাংশ দখল করে তখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই সৈন্যদলকে হুকুম দেয় যে শত্রুর পিছনে গিয়া জাপানী সৈন্য ও দেশদ্রোহী ওয়াং চেং উই গবর্ণমেণ্টের সৈন্য উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই কর। উক্ত ১৮ গ্রুপ আর্মি (পুর্বতন লাল ফৌজ) খুব ভালভাবেই এই কাজ সম্পন্ন করে। আজ পর্যন্ত অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৮ গ্রুপ আর্মি ও নূতন ৪র্থ আর্মি শত্রু অধিকৃত এলাকায় বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা শান্‌সি, হোপে, চাহার, জেহল, সুইইউয়ান, লিআওনিয়েন, শানটুং, হোনান, কিয়াংসু, আনহোই, চেকিয়াং, হুপে ও ক্যাণ্টনে শত্রুদের আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে, বার বার ঠেকাইয়াছে এবং বহুস্থানে বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চেং উইয়ের গবর্ণমেণ্ট ও সংগঠনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে এবং এই সব এলাকার বহু অংশ আবার জাতীয় পতাকার নীচে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাদের আর্মির সৈন্যসংখ্যাও বাড়িয়া ৪,৭৭,০০০ দাঁড়াইয়াছে। তা ছাড়া জনসাধারণের মধ্যেও প্রায় ২২ লক্ষ সৈন্যের বিভিন্ন জনবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। মোট মাট ১৫টী জাপ-বিরোধী এলাকা সুসংগঠিত হইয়াছে, তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটী ৮০ লক্ষ। সেখানে জনসাধারণের নিজস্ব নির্বাচিত গবর্ণমেণ্ট কায়েম হইয়াছে। আমরা আশা করি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলি স্বীকার করিয়া লইবে এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে।

আমরা চাই যে গবর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশভক্ত পার্টিকে আইনসঙ্গত অস্তিত্বের সুবিধা দিবে। আমরা আরও চাই যে সীমানার ঐ সমস্ত এলাকার উপর হইতে সকল রকম সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইবে এবং সেখানকার অধিবাসীদিগকে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হইবে।

কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট প্রস্তাবের পার্থক্য

আমাদের প্রস্তাব পাওয়ার পর কুয়োমিণ্টাং সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ চ্যাং ও মিঃ ওয়াং শেষ প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব ও আমাদের প্রস্তাবে প্রচুর তফাৎ রহিয়াছে।

প্রথম, সামরিক ব্যাপার। জাপানীর বিরুদ্ধে লড়াই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন যথেষ্ট শক্তি ও সৈন্য সংগ্রহ করার কথা খুবই প্রয়োজনীয়। আমি আগেই বলিয়াছি, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য চীনে শত্রুর লাইনের পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ৪,৭৭,০০০ নিয়মিত সৈন্য ও ২২ লক্ষ জন-সৈন্য রহিয়াছে। গত ৭ বৎসর ধরিয়া তাহারা আক্রমণকারী জাপ সৈন্যের একটা বড় অংশকে আটকাইয়া রাখিয়াছে এবং আসন্ন জাপ-বিরোধী অভিযানে তাহারা অগ্রদলের অংশ গ্রহণ করিবে। বাস্তব শক্তি অনুসারে তাহাদের ৪৭টী ডিভিশন হয় (চীনে এক ডিভিশনে ৮ হইতে ১০ হাজার সৈন্য থাকে)—এবং এই ৪৭টী ডিভিশনই যুদ্ধ প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবুও একটা মিটমাট করিবার জন্য আমরা একেবারে ১৬ ডিভিশন পর্য্যন্ত নামিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মাত্র ১০ ডিভিশন দিতে রাজি।

দেশভক্ত যোদ্ধারা কি বশ্যতা স্বীকার করিবে?

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গবর্ণমেণ্টের বক্তব্যে আরও বলা হইতেছে, পুনর্গঠনের পর আর যত সৈন্য ও বাহিনী বাকী থাকিবে (অর্থাৎ ১০ ডিভিশন বাদ দিয়া বাকী সব) তাহাদিগকে "নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।" জাপানী এলাকার ভিতরে যেসব জাপ-বিরোধী সশস্ত্র সৈন্যদল জেনারেল চ্যাং কাই শেকেরই গণ-অভ্যুত্থানের আবেদনক্রমে সংগঠিত হইয়া যথাসাধ্য লড়িতেছে, শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নাই, আজ তাহাদিগকেই "নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিবার" অর্থ হইবে যে জাপানী লাইনের পিছনে লোকে যেন আর নিজেদের দেশরক্ষার জন্য লড়াই না করে, জাপানী কবলমুক্ত এলাকাগুলি যেন আবার জাপানীদের হাতে চলিয়া যায়। ইহা নিশ্চয়ই ভুল।

নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রগুলিকে স্বীকার কর

তারপর ঐ সব এলাকার জাপানী শাসনমুক্ত ও জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গবর্ণমেণ্টগুলির বিষয় সম্বন্ধে মতবিরোধের কথা ধরুন। এগুলি পূর্ণ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট, দেশদ্রোহীরা ছাড়া অন্য সমস্ত জনসাধারণ ও গণসংগঠন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এইরূপ গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে ও প্রতিরোধ পরিচালিত করিতে সর্বাধিক উপযুক্ত। [বিঃ দ্রঃ এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়। গণপরিষদের কতক অংশ নির্বাচিত বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পরিচালনায় বা আইন প্রণয়নে গণ-পরিষদের কোন অধিকার বা ক্ষমতা নাই। জঃ সঃ] কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনেই এই সব নির্বাচিত গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু কুওমিণ্টাং এগুলিকে বাতিল করিয়া দিতে চাহিতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার দিক হইতে ইহা ভাবাও যায় না।

বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোথায়?

রাজনৈতিক পার্টিগুলির স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট বলে যে সেন্সরের কড়াকড়ি কমানো হইয়াছে—কিন্তু আমরা সম্প্রতি শত্রুর বিরুদ্ধে যে কয়টী সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহার একটীও প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপারেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই, এমন কি নূতন ৪র্থ আর্মির সেনাপতি জেনারল ইয়ে-তিনের মত অ-কমিউনিষ্ট বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

কমিউনিষ্ট এলাকায় পূর্ণ গণতন্ত্র

বহু বৎসর আগে আমরা যে ৪ দফা প্রতিজ্ঞার সর্ত করিয়াছিলাম তাহা নাকি আমরা ভঙ্গ করিয়াছি ইহাও কুয়োমিণ্টাং প্রতিনিধিদের অভিযোগ। ঐ প্রতিজ্ঞার প্রথম কথা ছিল যে কমিউনিষ্ট পার্টি ডাঃ সান ইয়াং সেনের জনসাধারণের ত্রি-নীতি পূরণের চেষ্টা করিবে। প্রথম নীতি জাতীয়তা যে আমরা পূর্ণ করিয়াছি তাহা আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

মার্শাল চ্যাং কাই শেক

দেখিলে ও সীমানার গবর্ণমেণ্টে বিভিন্ন জাতির সমান প্রতিজ্ঞা দেখিলেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় নীতি গণতন্ত্র। আমাদের এলাকায় আমরা জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সেখানকার গবর্ণমেণ্টেও ভোটাধিকার বিষয়ে আমরা কমিউনিষ্ট, কুওমিণ্টাং এবং নিরপেক্ষ এই তিন দলকে সমান ভাগ ও সমান অধিকার দিয়াছি। ইহা গণতন্ত্র নীতির পূর্ণ প্রতিপালন। তৃতীয় নীতি জনসাধারণের জীবিকা সংস্থানের নীতি। আমাদের এলাকায় সৈন্যবাহিনী ও শাসনকর্মচারীদের মধ্যে যে উৎপাদন আন্দোলন আমরা পরিচালনা করিয়াছি তাহার ফলে ইহারা জনসাধারণের উৎপাদন কাজে পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করে—ইহা হইতেই বোঝা যায় জনগণের জীবিকা সংস্থান নীতি আমরা কতখানি মানিয়াছি। শস্যের উপর খাজনার পরিমাণ গত বৎসর ছিল মাত্র ২০ লক্ষ টন, এ বৎসর আরও কমাইয়া ১৬ লক্ষ টন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্ত ছিল: "কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যমূলক সকল রকম সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও কমিউনিষ্ট অভিযান ছাড়িতে এবং জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।" গত ৭ বৎসর ধরিয়া আমরা এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি। জমিদার ও কৃষকের সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা কৃষকের খাজনা ও সুদ নিয়মিত ভাবে দিবার ব্যবস্থা করি অন্তদিকে তাহাদের বোঝা কমাইবার জন্য খাজনা ও সুদের পরিমাণ কমাইয়া দিই। ব্যক্তিগত কারবারকে আমরা উৎসাহ দিই আবার সমবায় সমিতি গড়িয়া গবর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তিগত কারবারের সামঞ্জস্য বিধান করি। কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার মত কিছুই আমরা করি নাই।

তৃতীয় সর্ত ছিল: "বর্তমান সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিয়া গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ঐক্যবদ্ধ হয়।" আমরা প্রত্যেকটী জাপ-বিরোধী এলাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা পাণ্টা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট খাড়া করি নাই, আমরা শুধু চাই যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সীমানা এলাকা ও অন্যান্য এলাকার এই সমস্ত জনসাধারণ-নির্ব্বাচিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে স্বীকার করিয়া নিজের আয়ত্তে আনুক। ঐক্য আমরাও চাই কিন্তু তাহা গণতান্ত্রিক ঐক্য হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় সরকার ও চিয়াং-কাইশেকের পক্ষে

চতুর্থ সর্ত ছিল: "লালফৌজের নাম ও সংগঠন তুলিয়া দিয়া জাতীয় বাহিনীর মধ্যে সামরিক কমিশনের নিয়ন্ত্রণে উহাকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" আমরা যে সে কাজ করিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। শত্রু এলাকার পিছনে আমাদের সংগ্রামের বিবরণই ইহা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও গত কয়েক বৎসরের ভিতর আমাদের সৈন্যদল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী বুলেট বা একটী পয়সাও পায় নাই তবুও আমরা অসমসাহসে শত্রুর সঙ্গে লড়িয়া আসিতেছি। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও জেনারেলিসিমো চ্যাং কাইশেকের পক্ষেই আমরা।

জাপানীরা আজ মরিয়া হইয়া আক্রমণ করিয়াছে। মিত্রপক্ষের কাছে সাহায্যের আশায় বসিয়া না থাকিয়া এখনই আমাদের নিজেদের চেষ্টায় সমস্ত জনগণকে সংহত করিতে হইবে। তবেই শত্রুর অভিযান আমরা রোধ করিতে পারিব এবং আমাদের মিত্রপক্ষের আসন্ন অভিযানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিব।

[কমিউনিষ্ট পক্ষ হইতে লিন চু হানের উপরোক্ত বক্তৃতা এবং কুয়োমিণ্টাংয়ের পক্ষ হইতে জেনারেল চ্যাং চি চুনের বক্তৃতা শুনিবার পর গণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে কাউন্সিল হইতে পাঁচজন সভ্যের একটী প্রতিনিধি দলকে কমিউনিষ্ট কেন্দ্র য়েনানে পাঠানো হইবে। তাঁহারা সেখানে পরিস্থিতি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে দুই দলের মধ্যে আপোষে সাহায্য করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।

এই প্রতিনিধি পাঁচজনই নির্দ্দিষ্ট কোন দলের সহিত যুক্ত নন। মোটের উপর তাঁহাদিগকে দক্ষিণপন্থী বলা চলে, কমিউনিষ্টদের প্রতি তাঁহাদের কখনও কোন সহানুভূতি ছিলনা। কিন্তু চীনের এই ধরণের উদারনীতিক ও বুদ্ধিজীবিরাও বর্তমানে জনসাধারণের মতই বুঝিতে আরম্ভ করিতেছেন যে জাপানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঐক্য প্রয়োজন এবং সে জন্য কুয়োমিণ্টাং কমিউনিষ্ট সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান দরকার। ইহাদের নেতা মিঃ ওয়াং গণপরিষদে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি এই শ্রেণীর লোকের মতই প্রতিফলিত করেন। তিনি বলেন যে আর দেরী না করিয়া সারা দেশময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সাফল্যের জন্য প্রতিরোধের যা-কিছু শক্তি যেখানে আছে সে সবই কাজে লাগানো দরকার যাহাতে বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে ঝগড়া না হয় ইত্যাদি। কমিউনিষ্টরাও ইহাই চায়। আমরা আশা করি তৃতীয় পক্ষের চেষ্টায় কুয়োমিণ্টাং-কমিউনিষ্ট সমস্যার শীঘ্রই সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে এবং চীন তাহার পূর্ণশক্তি দিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে পারিবে।

জঃ সঃ।]

Regd. No. C. 2836

মস্কোতে পুনরায় ত্রিশক্তি বৈঠক

ফ্যাসিজমকে চরম আঘাতের আয়োজন

এই সপ্তাহের সব চেয়ে জোর খবর হইল ষ্টালিন, রুজভেন্ট ও চার্চ্চিলের শীঘ্রই মোলাকাৎ হইবার কথা। যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে এই তিন জননায়কদের সাক্ষাৎকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশে দেশে জনতার অগ্রগতি

ফ্যাশিষ্টরা যে সব দেশ নিজেদের তাঁবে পাকড়াইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ফ্রান্স আর ইতালী হইল সকলের সেরা। ফ্রান্স আজ ফ্যাশিষ্ট শিকল ছিঁড়িয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। হিটলারের শিখণ্ডী পেত্যাঁ-ফেরার; ফ্রান্সের জনগণের আদালতে তাহার বিচার হইবে বলিয়া পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। পেত্যাঁ, লাভাল প্রভৃতি দেশদ্রোহীর জায়গায় গুগোল্‌ এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা ফ্রান্সের শাসনভার লইয়াছেন। যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল হিটলার ও তার চরদের চক্ষুশূল, সেই পার্টির দুইজন আজ মন্ত্রিসভায়।

ইতালী ছিল ফ্যাশিষ্টদের পীঠস্থান। কিন্তু পালের গোদা মুসোলিনি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার পর হইতে সে দেশের জনসাধারণ অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে ইস্তফা দিতে হইয়াছে, বাদোলিয়োকে নূতন মন্ত্রিসভার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, কম্যুনিষ্টদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে হইয়াছে।

যুগোশ্লোভিয়াতে মার্শাল তিতোর সঙ্গে হাত মিলাইয়া লালফৌজ শত্রুদলনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে পলাতক রাজবংশ বা মন্ত্রিসভার আজ যুগোশ্লাভিয়ার ভাগ্যনির্দ্ধারণে কোন হাত নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেশ সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। পোলাণ্ডের পলাতক মন্ত্রিসভা লণ্ডনে বসিয়া ফতোয়া ছাড়ুক, সস্‌ঙ্কোভস্কি ও বরের মত দেশদ্রোহী সেনাপতির পক্ষ লইয়া সোভিয়েটের শত্রুরা যতই বাক্‌বিস্তার করুক, পোলাণ্ডের জনগণই সোভিয়েটের সহায়তা লইয়া দেশের ভবিষ্যৎ স্থির করিবে।

বলকান দেশগুলিতে হিটলার বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু আজ রুমানিয়া হইতে ফ্যাশিষ্টরা বিতাড়িত, নূতন সরকারে কমিউনিষ্ট, সোশালিষ্ট, লিবারল, সকলে আছেন। যে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম হইতে বে-আইনী ছিল, সেখানে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বুলগেরিয়াতেও কমিউনিষ্টদের যন্ত্রণার সীমা ছিল না, সেখানে মন্ত্রিসভার কমিউনিষ্টরাই আজ প্রধান। গ্রীসে বড় দরের পরিবর্ত্তন আসন্ন; মন্ত্রিসভা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়া হইতেছে।

নূতন এক ইয়োরোপের উদ্ভব আমাদের চোখের সম্মুখে আজ ঘটিতেছে। আর তাই কমরেড ষ্টালিনের সঙ্গে মিত্রনেতাদের সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব এত বেশী।

[সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ মিঃ চার্চিল ও মিঃ ইডেন মস্কোতে পৌছিয়াছেন। মার্শাল ষ্টালিন ও মঃ মালাটভের সহিত তাহাদের আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটে যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত মিঃ হারিম্যান রুজভেল্টের প্রতিনিধি হিসাবে বৈঠকে যোগ দিয়াছেন।]

লালফৌজের নূতন আক্রমণ আসিতেছে

মস্কো বেতার জানাইয়াছে যে সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে যে স্তব্ধতার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা হইল বিপুল একটা ঝটিকারই পূর্ব্বাভাস।

ওদিকে জার্ম্মাণরা খবর দিয়াছে যে কার্পেথিয়ান পাহাড় দিয়া পোলাণ্ড হইতে শ্লোভাকিয়াতে ঢুকিবার জন্য চারলক্ষ সোভিয়েট সেনা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

লালফৌজ লাটভিয়া এস্তোনিয়ার যুদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। লিথুয়ানিয়া আর পূর্ব্ব প্রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি জার্ম্মান সৈন্য যে নাস্তানাবুদ হইতেছে, তাহা জার্ম্মানরাই স্বীকার করিয়াছে। বাল্টিক দেশগুলির কাছে যে সব দ্বীপ আছে, সেগুলিও একে একে লালফৌজের দখলে আসিতেছে।

মার্শাল তিতোর বাহিনীর সঙ্গে মিলিয়া লালফৌজ যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের পূর্ব্বে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে লড়িতেছে। হাঙ্গেরীর মধ্যে লালফৌজ ঢুকিয়া রাজধানী বুডাপেষ্টের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, দুইদিক হইতে হাঙ্গেরী আক্রমণ করা হইয়াছে। তিতোর সৈন্তেরাও হাঙ্গেরীর সীমান্তে পৌছিয়াছে অষ্ট্রিয়ার 'মুক্তি ফ্রণ্টের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

নূতন ইয়োরোপের উদ্ভব আসন্ন

দ্বিতীয় ফ্রণ্টে মিত্রসেনা স্থানে স্থানে জিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন ভেদ করিয়া অল্প অল্প অগ্রসর হইয়াছে। আবার হঠাৎ আর্নেমের উত্তরে জার্ম্মানদের প্রতিরোধ-শক্তি ভাঙিয়া গিয়াছে। আমেরিকান ট্যাঙ্ক আর পদাতিক আগাইয়া চলিয়াছে। শত্রু ক্রমশঃই ঝিমাইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ওয়ারশ'র বিদ্রোহে মতলব কি ছিল

ওয়ারশ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা যে জঘন্য সোভিয়েট বিরোধী প্রচার সুরু করিয়াছিল আজ সেই সম্পর্কে সব ঘটনা প্রকাশ পাওয়াতে এই সব প্রতারকদের চাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ওয়ারশর এই বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য কি তাহাও পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই বিদ্রোহ সম্পর্কে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী টাস খবর দিতেছে—'লণ্ডনের যে সব পোলিশ অধিবাসীরা এই বিদ্রোহের উস্কানী দিয়াছে **তাহারা ইচ্ছা করিয়াই এই বিদ্রোহকে সোভিয়েট সামরিক কার্য্য কলাপের সাথে যুক্ত করিতে চাহে নাই।'**

'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রে মিঃ ষ্টিফান লিটায়ারও খোলাখুলি ভাবে এই বিদ্রোহের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উদ্যোক্তাদের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহারা সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে কোন কিছু না জানাইয়াই ইহা **অসময়ে** সুরু করিয়াছে।

ইহারা সোভিয়েটকে না জানাইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল এই আশায় যে সোভিয়েটই তো ওয়ারশকে মুক্ত করিবে, ইতিমধ্যে অল্প কিছু করিয়া যদি সে কৃতিত্বের তারিফটা নিজেদের নামে টানিয়া লওয়া যায় তবে পলাতক গবর্ণমেণ্টের একাধিপত্যের জন্য পোলাণ্ড দাবী করা যাইবে।

আর যদি লালফৌজের ওয়ারশ পৌছিতে দেরী হয় তখন অনায়াসেই জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া সেনাপতিরা বাঁচিতে পারিবেন অথচ দোষটা সোভিয়েটের ঘাড়ে চাপানো যাইবে। সাচ্চা বিদ্রোহীরা মরিবে বটে কিন্তু তাহাতে পলাতক শাসকশ্রেণীর কি আসে যায়?

হইয়াছেও তাই। ওয়ারশর রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণরা শক্ত বাধা দিতেছে, ফলে সস্তায় বাজী মাৎ করিয়া কুচক্রীদের ওয়ারশ জয়ের গৌরব পাওয়ার আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে। তাই চারিদিক হইতে ইহাদের দালালরা চীৎকার তুলিয়াছে—সোভিয়েট এই বিদ্রোহের সাহায্য ত করেই নাই, বরং এই বিদ্রোহ পরাভূত হউক ইহাই চাহিয়াছে।

কিন্তু পলাতক পোলিশ সরকারের অনুগ্রহভাজন সস্‌নকোয়াস্কী, বোর, মণ্টার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েটের উপর যে কালিমা লেপন করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহাতে তাহারা নিজেরাই ধরা পড়িয়াছে।

এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ যে খবর আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় লণ্ডনস্থিত পোল সরকারের তাবেদার তথাকথিত "হোম আর্ম্মির" সেনাপতি কর্ণেল মণ্টারের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা **জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদের নিকট বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।**

এই "হোম আর্ম্মির" মধ্যে যেসব প্রকৃত দেশভক্ত যোদ্ধা রহিয়াছে তাহারা মণ্টারের আত্মসমর্পণের আদেশ উপেক্ষা করিতেছে এবং পোলিশ মুক্তি কমিটির যোদ্ধাদের সহিত একত্র হইয়া লালফৌজের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই "হোম আর্ম্মির" প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজেরাই বিদ্রোহীদের দাবাইয়া দিতেছে এবং চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ইহারা কেহই লালফৌজের সাথে যুক্ত হইতে না পারে। নাৎসীদের হাতে পড়ুক সেও ভাল, কিন্তু লালফৌজের সাথে বন্ধুত্ব নয়! পোলিশ মুক্তি কমিটির সভাপতি মেরোওস্কী বলেন—অসময়ে এই বিদ্রোহ সুরু করিবার জন্য জেনারল বোরই প্রধান অপরাধী। পোলিশ মুক্তি কমিটি তাহাকে ধরিতে পারিলে, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহার বিচার হইবে এবং তাহাকে তাহার কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

জেনারেল বোরের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে এর আগেও একবার 'ডেলী ওয়ার্কার' একটি খবর দিয়াছে। খবরটীতে প্রকাশ যে বোর নামে একজন জেনারেল তাহার এক হুকুমনামায় আদেশ দিয়াছে যে দেশভক্ত গেরিলা বাহিনীকে ও তাহাদের নেতাদের ধ্বংস করা হউক অর্থাৎ জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া এখন নিজের স্বদেশবাসী নাৎসী বিরোধী যুদ্ধরত বীরদেরই ধ্বংস করা হউক। অবশ্য তখন পলাতক পোলিশ সরকার জোর গলায় বলিয়াছিল তাহাদের সংশ্রবে বোর নামক কোন জেনারলই পোলাণ্ডে নাই। কিন্তু আজ কয়েক মাস ব্যবধানে জেনারেল বোর আসিয়া উপস্থিত, শুধু উপস্থিত নয়, বিদ্রোহের নেতা, পরবর্ত্তী কালে আবার পলাতক সরকারের প্রধান সেনাপতি! এই সম্পর্কে মস্কো রেডিও হইতে ৭ই অক্টোবর সোভিয়েট লেখক মঁসিয়ে ত্রিসারিণের একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে লেখক বলিয়াছেন—সস্‌নকোয়াস্কী দ্বারা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ওয়ারশতে যে বিদ্রোহের সূচনা করা হইয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই ওয়ারশ বিদ্রোহের 'নেতা' জেনারল বোর বিদ্রোহের সময় ওয়ারশতে একবারের জন্যও যায় নাই এবং যেরূপ দায়িত্বহীন-ভাবে এই বিদ্রোহ সুরু করিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবেই ইহার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

যে সব বিদ্রোহীরা জার্ম্মানদের হাতে না পড়িয়া লালফৌজের সাথে মিশিতে চাহিয়াছিল জেনারেল বোর তাহাদের একটুকুও সাহায্য করেন নাই। এই অন্যায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেখেলার জন্য যাহারা দায়ী জনমতের সামনে একদিন তাহাদের বিচার হইবেই।

সোভিয়েটকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া যাহারা অসময়ে এই দায়িত্বহীন বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল পোলাণ্ডের জনগণ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, তাই হয়ত ইহার বুঝিতে পারিয়া ইহার অন্যতম কুচক্রী নায়ক বোর স্বেচ্ছায় আজ নাৎসীদের হাতে ধরা দিয়া জনমতের আদালতের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

পশ্চিমে শত্রুর বিপদ

বার্লিনের হিসাবে প্রকাশ যে আর্নহেম হইতে আল্‌পস্‌ পাহাড় পর্য্যন্ত ৩০০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে দুই পক্ষের ত্রিশলক্ষ সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। পশ্চিমে তাই জার্ম্মানীকে একযোগে নানাস্থানে লড়িতে হইতেছে। এখনও মরিয়া হইয়া লড়ার ক্ষমতা শত্রু হারায় নাই বলিয়াই একেবারে রণে ভঙ্গ দেয় নাই। কিন্তু বেশীদিন যে শত্রুর আর মেয়াদ নাই তাহা স্পষ্ট। হাজারে হাজারে জার্ম্মান মিত্রসেনার হাতে ধরা দিয়াছে। এখনও নিমভেগেনের কাছে ব্রিটিশ সেনা এবং আণ্টওয়ার্পের উত্তরে ক্যানেডিয়ানদের সঙ্গে শত্রু পাল্লা দিতে পারিতেছে না। মার্কিন সেনা নানাস্থানে খাস জার্ম্মানীর মধ্যে ঢুকিয়াছে।

বিমান আক্রমণের পরিমাণ সম্প্রতি খুবই বাড়ানো হইয়াছে। একদিনে পাঁচহাজার এরোপ্লেন গিয়া জার্ম্মানীর বহুস্থানে বোমা ফেলিতেছে। ওদিকে গ্রীস ও আলবেনিয়াতে মিত্রসেনা নামিয়াছে।

মস্কো বেতার যে ব্যাপক আক্রমণের কথা বলিয়াছে, সে আক্রমণের ধাক্কা আর হিটলারীরা সামলাইতে পারিবে না। জনগণের নূতন ইয়োরোপ আজ যুদ্ধের ঝঞ্ঝনার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতেছে।

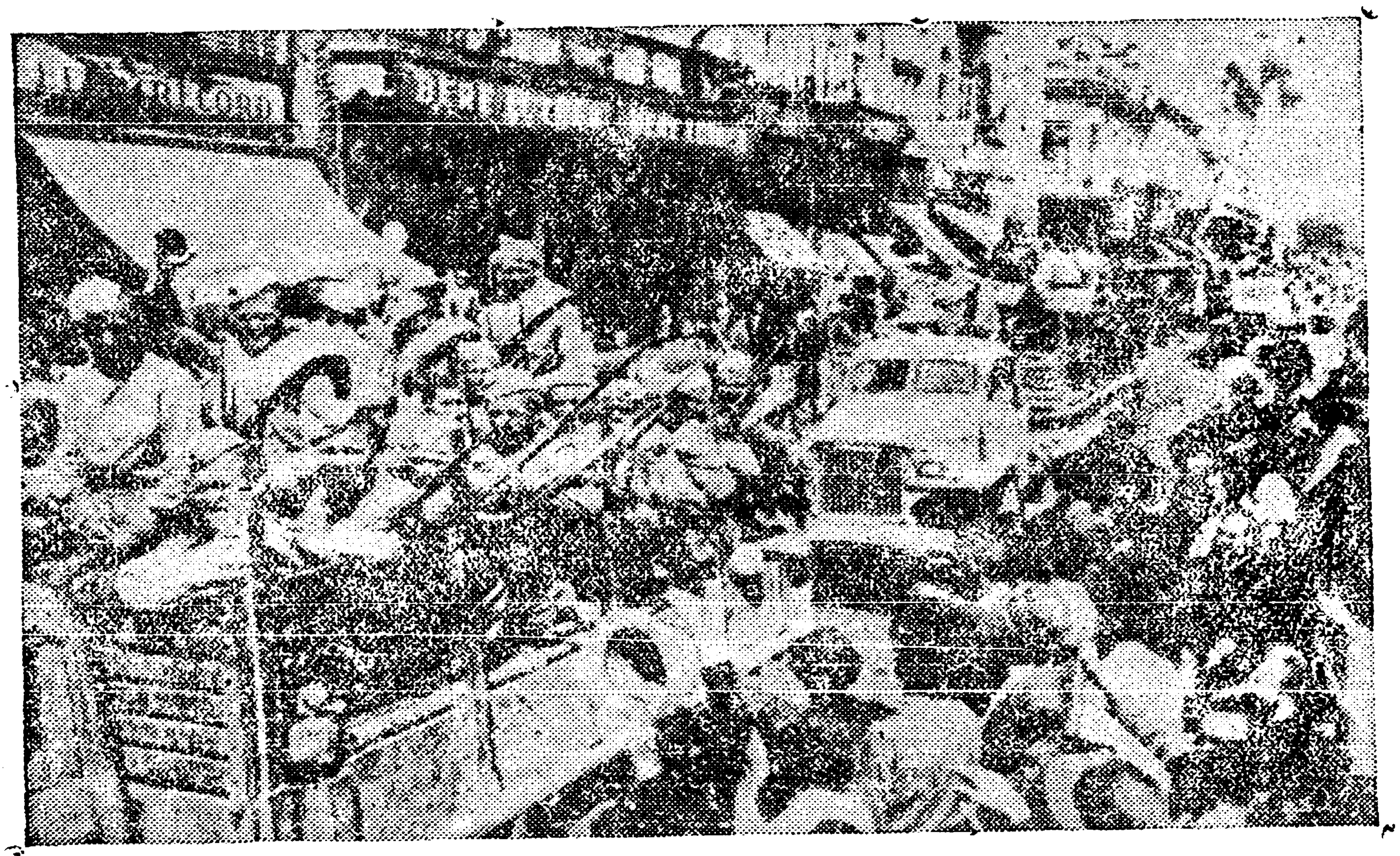

(ইউ, এস, ও, ডব্লু, আই) রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট অধিকারের পর লালফৌজ শহরের রাস্তায় অভিনন্দিত হইতেছে

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা] ১৮ই অক্টোবর, '৪৪, বুধবার, ১লা কার্ত্তিক, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

পরস্পরের প্রতি কটূক্তি ঐক্যের সম্ভাবনাকে দূরে সরাইবে

কংগ্রেস-লীগ সম্প্রীতি রক্ষা কর

গান্ধী-জিন্নার মতপার্থক্যের সদ্ভাবপূর্ণ বিচার চাই

ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সমস্ত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য গান্ধী-জিন্না আলোচনা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্নার পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সময় যে মতভেদ দেখা গিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া উভয়েই প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতভেদের প্রশ্নগুলি সমস্ত দেশভক্ত সুস্থ ও সবল দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিলে মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে—ইহাই যে-কোন স্বাধীনতাকামীর স্বাভাবিক মনের কথা।

পার্থক্য আরো বাড়ান হইতেছে

কিন্তু, বর্ত্তমানে যে ধরণের বাদ প্রতিবাদ ও যুক্তিতর্ক সংবাদপত্রের মারফৎ প্রচারিত হইতেছে তাহা পড়িলে মনে হয় গান্ধী-জিন্না উভয়ের কেহই মিলন চান নাই। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় সে জন্যই যেন তাঁহারা পরস্পরের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন!

১২ই অক্টোবর "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে"র সম্পাদকীয়তে লেখা হইয়াছে,—"রাজা গোপালাচারী এখনও তাঁহার ফরমুলা (প্রস্তাব) ধরিয়া আছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত। তাঁহার বুঝা উচিত যে, তাঁহার প্রস্তাবে ও সেবিষয়ে তাঁহার কার্য্য কলাপে দেশের অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছে।"

১৩ই অক্টোবর "অমৃতবাজার পত্রিকায়" সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে,—হিন্দুদের কাগুজে মেজরিটীতে জিন্না সাহেব আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আছেন এবং সেজন্যই তিনি মুসলিমদের জন্য সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী করিতেছেন।

এইরূপ লেখা ও হিন্দুমহাসভার কুৎসিত প্রচারের ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া "আজাদ" পত্রিকাও গান্ধীজির প্রতি কটূক্তি করিয়া সম্প্রতি এক সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছে,—"এরূপে ফাঁকি দিবার ও অন্যকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য যে ব্যক্তি আলোচনা চালাইতে গিয়াছিলেন, আপোষ মীমাংসার জন্য তাঁর কতটুকু আগ্রহ আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

পুনরালোচনা চায় না কাহারা?

এই ধরণের মন্তব্য করিলে জনসাধারণের মধ্যে যে কুফল দেখা দিবে তাহাতে আসলে কাহাদের লাভ হইবে? যাহারা সত্য সত্যই হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগের মিলন চাহে না ইহাতে তাহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হিন্দু মহাসভার নেতারা আলোচনার এই সাময়িক ব্যর্থতায় অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন! গান্ধী জিন্নার মতভেদকে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য বিরোধী প্রচারের অস্ত্র হিসাবে তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন। দিল্লীর এক সংবাদ হইতে দেখা যায় হিন্দু মহাসভা পন্থীরা মন্তব্য করিয়াছেন,—"পাকিস্তান স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া এখন আমরা গান্ধীজির স্বরূপ সহজেই প্রকাশ করিয়া দিতে পারি। এই জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।"

পাঞ্জাবের আকালী নেতা সর্দ্দার গিয়ানী কর্ত্তার সিং ও মাষ্টার তারা সিং অমৃতসরের সম্প্রতি একটী সভায় বলিয়াছেন, "আমরা এখন প্রকাশ্যভাবে বৃটিশের সহিত যোগ দিয়া শিখপন্থের সেবা করিব"! (ট্রিবিউনে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গোরক্ষপুরের হিন্দু-সম্মেলনে বলিয়াছেন,—গান্ধীজির এই অভিপ্রায় (মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা চালাইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা জঃ সঃ) জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্টকে দুর্বল ও জনসাধারণকে হতবুদ্ধি করে।"

ঐক্যপন্থীরা বিভেদকারীদের সাহায্য করেন কেন?

হিন্দু-মহাসভা ও অন্যান্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য বিরোধীদের প্রচেষ্টাকে কংগ্রেসের দেশভক্ত ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার কসুর নাই। রাজাজীর বক্তব্য সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে "আনন্দবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছে—"রাজাজী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে লাহোর প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে ফাঁদের তুল্য।" অথচ তাঁহাদের কাগজেই রাজাজীর বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আছে,—"তাঁহারা (মুসলীম লীগ) যাহা দাবী করিতেছেন, প্রস্তাবে (রাজাজীর প্রস্তাব) মূলতঃ তাহাই দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসার ইহাই প্রকৃত পন্থা কিনা তদ্বিষয়ে তিনি মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করেন।"

সংবাদপত্রের মন্তব্য এমন স্তরে নামিয়াছে তাহাতে মনে হয় গান্ধীজি-রাজাজির বিবৃতি ও কথাবার্ত্তার সহিত বিভেদকারী হিন্দুমহাসভা পন্থীদের কোন পার্থক্য আর নাই! আনন্দবাজারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যুগান্তর, অমৃতবাজার, আজাদ প্রভৃতি যেসব পত্রিকা আলোচনার সময় ঐক্যের জন্য এত ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহারাও আজ গান্ধী-জিন্নার মতপার্থক্যকে তিক্ত বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়ায় লইয়া যাইতেছেন কেন? ইহাতে ঐক্যের শক্তিকে বিভেদের দিকেই ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যে ব্যগ্র সৎ দেশভক্তের বুদ্ধিতে গান্ধী-জিন্নার মতামতের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কংগ্রেস ও লীগ দেশভক্তদের কর্ত্তব্য

মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না উভয়েই যুক্তবিবৃতিতে বলিয়াছিলেন,—জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইবে এমন কোন কাজ কেহই করিবেন না। তাঁহাদের ঐক্য প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার প্রতি সন্দিহান হইয়া সংবাদপত্র ও বিভিন্ন নেতা যেভাবে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য বাড়াইয়া তুলিতেছে তাহাতে দেশের মঙ্গলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় সৃষ্টি হইবে।

যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রকৃতই কংগ্রেস-লীগের ঐক্য চান তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বোম্বাই, ইউ, পি, ও বাংলার বহু কংগ্রেস ও লীগ নেতা বিবৃতি দিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাও দেশপাণ্ডে ২১শে সেপ্টেম্বর জেল হইতে মুক্তিলাভের পর বাহিরে আসিয়াই বলিয়াছেন—"নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইতেছে যাহাতে গান্ধী-জিন্নার মধ্যে আবার আলোচনা সুরু হয় তাহার জন্য দেশে সৌহার্দমূলক আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই পথে বাধা দিবে। এই বাধা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র পথ,—সমস্ত প্রগতিশীলদের লৌহদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা।"

বাংলার লীগ সম্পাদক মৌঃ আবুল হাসেম ও কংগ্রেস নেতা জে, সি, গুপ্তও ঐক্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য কুৎসিৎ গালাগালি ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার পরিত্যাগ করিয়া মিলনের আবহাওয়ার জন্য সকলকে আবেদন জানাইয়াছেন।

গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেব আলোচনার মধ্যে যে সব সমস্যা দেখিতে পাইয়াছেন সেই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যই কংগ্রেস ও লীগের প্রগতিশীল দেশভক্তদের সচেষ্ট হইতে হইবে। যাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের ভিতর বিভেদ ও পরস্পরের দূরত্ব বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে হইবে। সদ্ভাবের ও সম্প্রীতির সঙ্গে সমস্যার আলোচনা চালাইবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের সাফল্যের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস আনিয়া দিতে হইবে। সাময়িক আশাভঙ্গের সুযোগে বিভেদকারীরা ঐক্যের সম্ভাবনাকে চিরতরে নষ্ট করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কোন দেশভক্তই স্বাধীনতা-বিরোধী এই অপপ্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারে না, সে এই চেষ্টার অবসান চায়।

সারা বাংলায় সভা সমিতির অবাধ অধিকার চাই

কলিকাতা ঢাকা মেদিনীপুর বাদ কেন

বাংলায় বিনা অনুমতিতে সভাসমিতি করিতে পারা যাইবে না, এই মর্ম্মে গত ২৪শে আগষ্ট বাংলা সরকারের যে বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছিল, তাহার উপর গত ৯ই অক্টোবর আইন সভায় আলোচনা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন যে, এই বিজ্ঞপ্তির ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। ২৪শে আগষ্টের পূর্ব্বে যেমন কলিকাতা, ঢাকা ও মেদিনীপুর বাদে অন্য সমস্ত জায়গায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে সভা করা যাইত, ২৪শে আগষ্টের পরেও তা করিবার কোনো বাধা নাই। এই বিজ্ঞপ্তি নাকি শুধু আইনগত কোন ফাঁক পূরণ করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণায় লোকে আশ্বস্ত হইবে। কেন না, এই বিজ্ঞপ্তি শুধু আইনগত অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেওয়া হইলেও গত দেড় মাস ধরিয়া লোকে তা জানে না, তাদের তা জানানও হয় নাই। বরং লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া অতি-উৎসাহী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন জায়গায় রীতিমত বাধাও দিয়াছেন।

মন্ত্রীমণ্ডলী এ সব কথা একেবারে জানিতেন না, তা নয়। কেননা এই বিষয় লইয়া অনেক দরবার হইয়া গিয়াছে। জনমতও পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সভা-সমিতির উপর এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তা সত্ত্বেও বাংলা সরকারের টনক নড়ে নাই। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার যতটুকু অধিকার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী সাহস করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সেটুকুও নষ্ট করিবার জন্য আমলাতন্ত্র সচেষ্ট ছিল। মন্ত্রীমণ্ডলী যে আমলাতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই, তাহাতে আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

কিন্তু, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য সব চেয়ে বেশী, সেইখানেই আমলাতন্ত্রের নীতির পিছনে মন্ত্রীমণ্ডলী এখনও সমর্থন জুগাইয়া যাইতেছেন। স্যর নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, কলিকাতা ও মেদিনীপুরে কড়াকড়ি শিথিল করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কলিকাতা সম্পর্কে তিনি যুক্তি দিয়াছেন, ভারত রক্ষা আইন লঙ্ঘন রোধ করার জন্য পুলিশ কমিশনার নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিতে চান। এই ক্ষমতার প্রয়োগ কেমন ভাবে হয়, তাহা তো আমরা গত কয়েক মাসে দেখিয়াছি। পুলিশের পক্ষ হইতে সভা-সমিতি সংক্রান্ত যতগুলি মামলা আনা হইয়াছে, তার অধিকাংশই ফাঁসিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য জায়গায় যখন সভার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে তখন কলিকাতা, মেদিনীপুর ও ঢাকার এমন কি অবস্থা হইল যে সেখানে সে অধিকার দেওয়া যায় না। তার কোন যুক্তি নাই। স্যর নাজিমুদ্দিন সে রকম কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা রদ করিবার জন্য জনসাধারণের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইবেন।

সম্পাদকীয়

রাও বিল সমর্থন কর

সংবাদপত্রে দেখিলাম যে লেডি এন্ এন্ সরকার রাও বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রাও বিলকে আরও অগ্রসর করিবার কোন দাবী ইঁহাদের নাই। রাও বিল হিন্দু নারীদের অবস্থার যত কমই উন্নতি দাবী করুক না কেন, ততটুকুতেই ইঁহাদের আপত্তি।

রাও বিল হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া হিন্দু নারীর জন্য মানুষের অত্যন্ত ন্যায্য অধিকার দাবী করিয়াছে। এই দাবীর একটী দিক নারীর সম্পত্তির অধিকার এবং অপর দিকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ব্যাপারে হিন্দু স্ত্রীলোকের অধিকার লইয়া।

হিন্দু নারীর জন্য সম্পত্তির দাবীতে ভাই-বোনের সমান উত্তরাধিকার দাবী করা হয় নাই। বোন ভাইয়ের অর্দ্ধাংশ মাত্র পাইবে। জমির উপর পুত্র ছাড়া কন্যার অধিকার দাবী করা হয় নাই। বিধবা স্ত্রীর জন্য জীবনস্বত্বের স্থানে ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার দাবী করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বিলে পিতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু স্ত্রীলোককে ভিখারিণী কিংবা আশ্রিতা হওয়ার দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার দাবী মাত্র করা হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলার সকল লোকই নারীকে এই দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইতে চান।

অপরদিকে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রস্তাব। একই সময় একাধিক স্ত্রী ও স্বামী থাকা, পাত্র ও পাত্রী জড় বা পাগল হইলে বিবাহ, নিকট আত্মীয় বা পিণ্ডাধিকারী হইলে বিবাহ এবং কন্যার ষোল বছর বয়সের পূর্ব্বে পিতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহ সম্পর্কে একটী সর্বভারতীয় হিন্দু আইন করা হইতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের সর্ত্তগুলিও একেবারে শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান তাঁহাদেরই বা আতঙ্কের কি আছে? নষ্ট, মৃত, ক্লীব, নিরুদ্দেশ, চরিত্রহীন, চিররুগ্ন, ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত সর্ত্তের গণ্ডী রাওবিল মোটেই ছাড়াইয়া যায় নাই। রাও বিল দাবী করে যে স্বামীস্ত্রীর একজন কেহ দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগী হইলে, ৭ বছরের বেশী সময় পাগল, নিরুদ্দেশ বা যৌন ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে এবং উপপতি বা উপপত্নী থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা চলিবে। রাও বিল ব্যভিচার বাড়াইতে চায় না, গোপন ও প্রকাশ্য ব্যভিচারের শেষ করিতে চায় এবং হিন্দু শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যেই থাকিয়া তাহা করিতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলার সকল লোক উল্লিখিত অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন করিবেন।

সংবাদপত্রে বা সভাসমিতি করিয়া যাহারা রাও বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহারা হয় রাও বিল কি তাহা মোটেই জানেন না কিংবা সর্ব অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার বাহন হওয়াই নিজেদের ব্রত বলিয়া মনে করেন। ইহাদের প্রতিবাদের আর্ত্তনাদ ডুবাইয়া দেশের সর্বত্র রাও বিলের জন্য বিপুল ও ব্যাপক সমর্থন গড়িয়া তোলা চাই।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ

অফিস : ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

হিন্দুর উত্তরাধিকার ও বিবাহ

লেখক : শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার

১

হিন্দু সমাজের উত্তরাধিকার ও বিবাহ সম্পর্কে একটা সর্ব্বজনীন বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য রাও কমিটি যে বিলের খসড়া রচনা করিয়াছেন, তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু আন্দোলন হইতেছে। যাঁহারা বিরুদ্ধতা করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি বা কুযুক্তি এই—

(১) বাঙ্গলার দায়ভাগনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার প্রথা পরিবর্ত্তিত হইলে, অর্থাৎ বিধবা পত্নী, বিধবা পুত্রবধু এবং কন্যাদের সম্পত্তির অংশ দিলে পারিবারিক জীবন অশান্তিসঙ্কুল হইবে; সম্পত্তি ভাগ হইলে দারিদ্র্য বাড়িবে।

(২) নারীজাতি প্রগল্ভা অল্পবুদ্ধি—স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে জীবনস্বত্বের পরিবর্ত্তে পূর্ণ অধিকার পাইলে তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিবে, ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—এই ভারতের হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র এক ব্যবহারশাস্ত্র প্রচলিত নহে। দায়ভাগ, মিতাক্ষরা বা ব্যবহারময়ুখে উত্তরাধিকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। ধনসম্পত্তি কেবলমাত্র পুরুষদের হাতে আনিবার জন্য যাঁহারা ব্যবহার-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের ব্যবস্থা নানা বিকৃত আকারে বৃটিশ-যুগে আইনে পরিণত হইয়াছে তাঁহারা দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর লোক। প্রাচীন আর্য্য সমাজের ধন বণ্টন ও উত্তরাধিকার প্রথা তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই স্বীকার করেন নাই। পাঠান ও মোগলযুগের সমাজ ব্যবস্থায় হয়তো ইহার কিছু উপযোগিতা ছিল। কিন্তু গোষ্ঠীগত জীবন-যাত্রা এমন কি পরবর্ত্তীকালের যৌথপরিবার প্রথা লুপ্ত হইবার পর,—বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অর্থনৈতিক অবস্থা ও বৃত্তিবৈচিত্র্যের ফলে—জীমূতবাহনের দায়ভাগের জের টানিয়া চলিতে গিয়া বাঙ্গলার হিন্দুসমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বেশী। দীর্ঘ চার শতাব্দী বাঙ্গলার সম্পত্তি ও সম্বলহীনা নারীরা যে লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্গতি ভোগ করিতেছে, পরাধীন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাহার তুলনা নাই। জমিদার বা লক্ষপতির বিধবা পত্নীকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, এ দৃশ্য বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার হৃষিকেশ পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ভ্রমণ করিয়াছেন, কাহারও মনে এ প্রশ্ন জাগিয়াছে কি, কেন অনাথা নারীদের শতকরা ৯৮ জন বাঙ্গালী? ইহারা কেন পিতৃকুল শ্বশুরকুলে আশ্রয় পায় নাই? কেন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু কৃষক ও বৃত্তিজীবী পরিবারের বিধবারা, মুসলমান গৃহস্থের নিকট আশ্রয় লয়? ইহা জীমূতবাহনের কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির ধ্বজা হাতে যাঁহারা সম্পত্তির সামান্য অংশ কন্যা বা বিধবা পুত্রবধূকে দিবার বিরোধিতা করিতেছেন,—তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহা বাঙ্গালী হিন্দুর লজ্জা ও অপকীর্তি তাহাই তাঁহারা গৌরবের বলিয়া মনে করিতেছেন। তারপর সম্পত্তি ভাগের কথা। ৪।৫ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইলে তাহা ভাগ হইয়া যায়। কন্যারা ভাগ পাইলেই সম্পত্তির সর্ব্বনাশ, ইহাও যদি যুক্তি হয়, তবে তাহার অবশ্য উত্তর নাই। কন্যারা নগদ টাকা, কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতির ভাগ পুত্র অপেক্ষা অর্দ্ধেক পাইবে এবং বসতবাটি ছাড়া, কৃষিজমীতে ভাগ পাইবে না। বসতবাটির সামান্য অংশ, অধিকাংশ স্থলেই ভগ্নী দাবী করিবে না, যদি দাবী করে তাহা হইলেও সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতারই তাহা কিনিবার অধিকার থাকিবে। মধ্যশ্রেণীতে আজ অবিবাহিতা সাবালিকা কন্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতা ভরণ-পোষণ করিতে এমন কি গৃহে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে, সমাজ বা আইন তাহাকে আশ্রয় দিবার কোন ব্যবস্থাই করে নাই। অতএব এই আইন বর্ত্তমান পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, এই সামান্য সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত সভ্য দেশে ইহা বহুদিন প্রচলিত।

দ্বিতীয় কুযুক্তির উত্তর দিতে ঘৃণা হয়। ইংরাজী শিক্ষিত ইয়োরোপীয় আদব কায়দায় অভ্যস্ত ব্যারিষ্টার সাহেবেরা যখন, সনাতনী সাজিয়া, আমাদের জননী জায়া ভগ্নীদের বুদ্ধি, চরিত্র ও প্রকৃতির উপর কটাক্ষ করেন তখন লজ্জায় আরক্তিম ও মূক হওয়া ছাড়া ভদ্রব্যক্তির আর কিই বা করিবার আছে।

উত্তরাধিকার বিল অপেক্ষা প্রস্তাবিত বিবাহ প্রথার সংস্কারের বিরুদ্ধেই রক্ষণশীল সনাতনীদের প্রতিবাদ কিছু মুখর। এই প্রতিবাদটা হিন্দুসমাজের বৃহৎ অংশ হইতে আসিতেছে না। কন্যাদায়ে পীড়িত ও বিপন্ন নিম্নমধ্যশ্রেণী বৈবাহিক আদান-প্রদানের পরিধি বিস্তৃত হইবে এই আশায় বরং উহা সমর্থন করিতেছে। কলিকাতার ইঙ্গবঙ্গ ধনী সমাজের দিক হইতেই প্রতিবাদ অধিক তীব্র। এই মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির প্ররোচনায় তাহাদের মাতা ও স্ত্রীরা মিলিয়া ড্রয়িংরুমে চটকদার সভা করিতেছেন এবং বড় বড় নেত্রীর নাম দেখিয়া সংবাদপত্রেও উহা হিন্দু নারীদের মত বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঋষিবাক্যের দোহাই যাঁহারা পাড়িতেছেন, এবং বিবাহ ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব আসন্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই বিলটি পড়েন নাই; অথবা পড়িয়াও গরজের খাতিরে সত্যের অপলাপ করিতেছেন। রাও-কমিটি কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ প্রদেশের দিক হইতে নহে, সমগ্র ভারতের দিক হইতেই সংস্কার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাঁরা আইনজ্ঞ এবং শাস্ত্রও ঘাটিয়াছেন প্রচুর। রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের সহিত বর্ত্তমান সামাজিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া ইহাঁরা প্রস্তাব করিয়াছেন,—

(১) আনুষ্ঠানিক বিবাহের মত "সিভিল-ম্যারেজ"ও বিধিবদ্ধ হিন্দুবিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বিবাহের সময় বর বা কন্যার পূর্ব্ববিবাহিত জীবিত স্ত্রী বা স্বামী থাকিবে না।

(৩) বর বা কন্যা পাগল বা জড়বুদ্ধি হইলে বিবাহ হইবে না।

(৪) বর বা কন্যা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয় হইবে না।

(৫) একে অপরের সপিণ্ডা হইবে না।

(৬) কন্যা ষোল বৎসর বয়সের কম হইলে অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন হইবে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু-সমাজে একই বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তন করিবার এই প্রশংসনীয় চেষ্টা সমাজ-কল্যাণকামী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রগতিশীল সংস্কারকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলেও মন্দের ভাল হিসাবে ইহা সমর্থন করিতেছেন। কেননা তাঁহারা জানেন, শাস্ত্রবাক্য ঋষিদের নির্দ্দেশ অপেক্ষাও দেশাচার ও লোকাচার অধিকতর প্রবল।

বহু বিবাহের বিরুদ্ধে রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর বহু আন্দোলন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিদ্যাসাগর যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার পর বহু বিবাহ নিরোধের জন্য তাঁহার উৎসাহ মন্দীভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচির পরিবর্ত্তনে বহু বিবাহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ঈশান মুখোপাধ্যায় ৯৫টি কুলীন কুমারীকে বিবাহ করিয়া অনেক কুলীনের কুল রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর বিবাহ-ব্যবসায়ী বর্ত্তমান সমাজে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক বিবাহের পরিবর্ত্তে বহু বিবাহ করিবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজ নিশ্চয়ই হিন্দু পুরুষেরা ধর্ম্মের দোহাই পাড়িবেন না।

আনুষ্ঠানিক বিবাহের অন্যান্য সর্ত্তগুলি শাস্ত্রবাক্য বা যুক্তির বিরোধী নহে। আপত্তির প্রধান কারণ হইতেছে, আমাদের মানসিক জড়ত্ব এবং সমাজকে সমগ্র ভাবে বিচার করিবার অক্ষমতা। বহু শ্রেণী ও শাখায় বিভক্ত হিন্দু সমাজের এক এক অংশ নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর দিক হইতে বিচার করিতেছেন। অসবর্ণ বিবাহ ও আনুষ্ঠানিক বিবাহের ভেদ লুপ্ত হইলে—এবং ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ ও নারীরা আইন-নির্দ্দিষ্ট বাধা বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে বিবাহ করিবার সুযোগ পাইলে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে এ আশঙ্কা অমূলক। আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যারা অধিক সংখ্যায় অসবর্ণ বিবাহ করিতেছে, আমরা শাস্ত্র, কুলাচার, দেশাচারের দণ্ড তুলিয়া তাহা ঠেকাইতে পারিতেছি না। বৈবাহিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ এবং কৃত্রিম হওয়ার ফলেই বাংলার হিন্দু সমাজ ক্ষয়িষ্ণু। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে সমাজের কল্যাণই হইবে। বর্ত্তমান বিলে এক জাতি বা বর্ণের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকিবে, এমন নির্দ্দেশ নাই, স্বগোত্র বা অসবর্ণ বিবাহও হইতে পারিবে। রক্ষণশীলদের আপত্তি এই খানে, কিন্তু আজ দেখা প্রয়োজন তাঁহাদের ভঙ্গুর রক্ষণশীলতা, প্রাচীন লোকাচার রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বহু নারী ও পুরুষ ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের জটিল জীবনযাত্রা ও বৃত্তি বৈচিত্র্যের ফলে, বহু নারী স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছেন, অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির যুবক যুবতী প্রাচীন বা প্রচলিত প্রথার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। এই সকল কারণেই সংস্কারের প্রয়োজন। হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশে বর্ত্তমান বৈবাহিক আদান প্রদানের সঙ্কীর্ণতার ফলে যে সকল জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে,—বহু বিলম্বে তাহার প্রতিকার চিন্তা করিয়াই এই বিল উপস্থিত করা হইয়াছে। অন্ধ ও কূপমণ্ডুক ছাড়া, সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই ইহা সমর্থন করিবেন।

রাও বিলের স্বপক্ষে

বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠানের যুক্তকমিটির বিবৃতি

[হিন্দু নারীর বিবাহ বিল ও সম্পত্তির অধিকার বিলের সমর্থনে আন্দোলন চালাইবার জন্য এ-আই-ডবলু-সি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি কয়েকটী নারী প্রতিষ্ঠানের একটী **যুক্তকমিটি** গঠিত হইয়াছে। এই যুক্তকমিটির উদ্যোগে সারা বাংলায় রাও বিলের সমর্থনে নারী ও পুরুষদের সভা-সমিতি ও গণ-সহি সংগ্রহের কাজ চলিতেছে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে কয়েকটী সভা হইয়া গিয়াছে। রাও কমিটির নিকট আবেদন জানাইয়া বহু সহিও সংগৃহীত হইতেছে।

এই যুক্ত কমিটি বিস্তৃত বিবৃতিতে বিলের সমর্থনে বাংলার নারী সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাহ-বিধি সম্পর্কে এই বিবৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।—জঃ সঃ]

বর্ত্তমান সমাজে বহু লোকেই অনুভব করতে পারছেন, হিন্দু বিবাহ পদ্ধতিতে এত কড়াকড়ি এবং গণ্ডী বদ্ধ নিয়ম কানুন থাকার ফলে বাধ্য হয়ে বিবাহের জন্য বহু হিন্দুকে হিন্দুসমাজের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। এতে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে না—ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে। স্বগোত্র বিবাহেও একই যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। বিবাহ ব্যাপারকে গণ্ডী টেনে টেনে এত সঙ্কীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ করা হয়েছে যে, অবিলম্বে সমাজের কল্যাণের মুক্তি প্রয়োজন।

বিবাহ নাকচ ও বিচ্ছেদ

বিবাহ নাকচের কারণ :—

(১) বিবাহের সময়ে এবং মোকদ্দমার সময়ে বর বা কনের কেহ যদি ক্লীব থাকে।

(২) পাত্র পাত্রীর সম্পর্কে যদি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত নিকট আত্মীয়তা প্রমাণিত হয়।

(৩) আনুষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতি যদি পরস্পর পিণ্ড সম্পর্কিত হয়।

(৪) বিবাহের সময়ে যদি কেহ পাগল বা জড় বলে প্রমাণিত হয়।

(৫) বিবাহের সময়ে পাত্র পাত্রীর যদি পূর্ব্ব বিবাহিত স্ত্রী বা স্বামী জীবিত বলে প্রমাণিত হয়।

(৬) যদি জোর করে বা ছলনা করে বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি আদায় করা হয়ে থাকে।

বিবাহের সময়ে পাত্র পাত্রী যদি পূর্ব্ব স্বামী বা স্ত্রী মৃত বলে নিঃসংশয় থাকে, পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে যদি একে অপরকে গ্রহণ করে তারপরে পূর্ব্ব স্বামী বা স্ত্রী জীবিত প্রমাণ হলে পরবর্ত্তী বিবাহ নাকচ হয়ে গেলেও সন্তান-সন্ততি আইনাধিকার পাবে। পাগল বা জড়ত্বের জন্য বিবাহ নাকচ হলেও সন্তান-সন্ততি আইনাধিকার পাবে।

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ

নিম্ন কারণগুলির কোনটি বর্ত্তমান থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা চলবে :—

(ক) ৭ বৎসর পর্য্যন্ত যদি কেহ পাগল থাকে।

(খ) কেহ যদি নিরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অবশ্য আবেদনকারী বা আবেদনকারিণীর সংস্পর্শে রোগাক্রান্ত হলে আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

(গ) ৭ বৎসরের উর্দ্ধে নিরুদ্দেশ থাকলে।

(ঘ) হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে কেউ যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে।

(ঙ) অন্যূন ৭ বৎসর যৌন ব্যাধিগ্রস্ত হলে—অবশ্য দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারিণীর সংস্পর্শে হলে চলবে না।

(চ) স্বামী বা স্ত্রীর কারও উপপত্নী বা উপপতি থাকলে।

উপরোক্ত অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে, সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলন হচ্ছে—উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোনক্রমেই সমর্থন করবার জন্য নয়। হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্যই—ধ্বংসের জন্য এ বিধি প্রবর্ত্তিত হচ্ছে না।

প্রাচীন হিন্দু আইনে পুরুষের বহু বিবাহে সম্মতি ছিল—কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়নি বলেই সাধারণতঃ লোকের ধারণা। শাস্ত্রের কয়েকটি বচন এবং তার ভুল ব্যাখ্যার ফলেই এ ভুল ধারণা এ পর্য্যন্ত চলে এসেছে।

অবশ্য বেদের কোন কোন বচনে উল্লেখ রয়েছে, পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিবাহ করতে পারবে কিন্তু নারীকে কোন সময়ে কোন কারণেই সে অধিকার দেওয়া হয় নি। স্বামী মৃত বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় গেলেও নয়। কিন্তু কাত্যায়ন, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রকারের বচনে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, স্বামী নষ্ট, মৃত, ক্লীব, নিরুদ্দেশ, কুলশীলহীন, চরিত্রহীন, চিররুগ্ন ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত হলে সে কন্যাকে পুনরায় অলঙ্কারে সজ্জিত করে বিবাহ দিবে। শাস্ত্রকার নারদ মনুর ভাষ্যকার বলে বিদিত। সুতরাং তাঁর ভাষ্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ অবশ্য মনুর নির্দ্দিষ্ট স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্বন্ধে বিশ্বস্ততার দোহাই দিয়ে পুনর্ব্বিবাহকে কোনকালেই স্বীকার করতে রাজী হন না। বিশ্বস্ততার অভাব ঘটলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে কিন্তু পুনর্বিবাহ সমর্থন করেন না। কিন্তু মনুর গ্রন্থেও অবিকল নারদ রচিত রচনাটিও পাওয়া যায়। পরাশরকে কেহ কেহ মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন; মনুর ন্যায়ই হিন্দুশাস্ত্রকার হিসাবে পরাশরের প্রসিদ্ধি। অবশ্য কারো মতে পরাশর কলিযুগের শাস্ত্রকার। যাই হোক, পরাশরের বচনে পরিষ্কার—স্বামী নষ্ট, মৃত, বিকলাঙ্গ, নিখোঁজ, কিম্বা সন্ন্যাসী হলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহের অধিকার পাবে বলে উল্লেখ রয়েছে।

বেদের সমসাময়িক মহাভারতের আদিপর্ব্বে বা বিবাহপর্ব্বে পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিষেধ নেই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণের নির্দ্দেশ রয়েছে।

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণের জন্য হিন্দু বিবাহ আইনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ বিধি না দিয়ে সমাজকে কড়া শাসনে রাখতে গেলে সমাজেরই ক্ষতি।

এই ক্ষতিকারক সমাজ শাসন অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এই প্রগতির ব্যবস্থায় হিন্দু শাস্ত্রকে অতিক্রম করা বা উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছেনা, বরং শাস্ত্রসম্মত বিধি মেনে চলা হয় না বলেই সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করছে।—তাই শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ-বিধিকে অবিলম্বে হিন্দু আইনভুক্ত করা প্রয়োজন।

দেশপ্রেম অবসাদ জানে না

আসুন আমরা আগে বাংলার ঐক্য গড়িয়া তুলি

বাংলার কংগ্রেস নেতা

জে, সি, গুপ্তের বিবৃতি

গান্ধী-জিন্না আলোচনাভঙ্গে তীব্র নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই আলোচনার ভিতর দিয়াই পূর্ণ জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের মতামত যে সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং কংগ্রেস-লীগ মিলনের জন্য সর্বসাধারণের যে আগ্রহ দেখা

দিয়াছে—গত ৩ মাসের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনে এই দুটিই সব থেকে বড় সাফল্য। যখন দেশ জুড়িয়া হতাশা ও অচল অবস্থা, তখন এই সাফল্য বড় কম নয়। যাহাতে অবিলম্বে একটি ন্যায়সঙ্গত আপোষরফা আমরা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি, তাহার জন্য এই সাফল্যকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া আমাদেরই কর্তব্য।

কংগ্রেস ও লীগের সম্মুখে উপস্থিত কর্তব্য কি, তাহা উভয় নেতাই পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণ যাহাতে আলোচনা, বিতর্কের মধ্য দিয়া মীমাংসায় পৌছাইতে পারে এবং এই ভাবে উভয় পক্ষের মোটামুটি প্রস্তাবগুলি যাহাতে বিশেষ রূপ পাইতে পারে—স্পষ্টত তাহার জন্যই গান্ধী-জিন্নার সম্পূর্ণ পত্রাবলী সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্র ও দেশবাসীর কাছে এই বিষয়টি গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। দুই নেতার পত্রালাপের মধ্য দিয়া যে সমস্ত প্রশ্ন উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে আমাদের নিজ নিজ মহলে যদি আলাপ আলোচনা হয়, তাহা হইলেই আমরা উভয়ে আমাদের আদর্শের প্রতি ও আমাদের নেতাদের প্রতি সমানভাবে সুবিচার করিতে পারিব—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রেস ও লীগ কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া এই আলোচনা চালানো যাইতে পারে, তাহার জন্য পরস্পরের প্রতি আক্রমণের মনোভাব সর্বতোভাবে দূর করিতে হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশেম যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। যাহাতে সমগ্র দেশের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়া শুনিয়া কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় আপোষ আলোচনা শুরু করিতে পারেন, তাহার জন্যই যে প্রশ্নে আসিয়া নেতৃদ্বয় আমাদের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা পরিহার করিয়াছেন, —কংগ্রেস ও লীগ কর্মীদের উচিত এই মুহূর্তে একত্রে সেই বিষয়ে আলোচনা করা। ইহার জন্য মিঃ হাশেম যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহার সহিত আমিও আমার কণ্ঠ মিলাইতে চাই। গান্ধী-জিন্না আলোচনা বর্তমানে যেটুকু সময়ের জন্য স্থগিত হইয়াছে, সে সময়টুকু কিছুতেই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উভয়ের স্বাধীনতার জন্য উপস্থিত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বাংলার লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ ও রোগাক্রান্ত মানুষকে বাঁচাইতে হইলে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে একত্রিত হওয়া সব থেকে বেশী প্রয়োজন। আজ বাংলার এই আর্ত জনসঙ্ঘ প্রত্যেক দেশভক্তকে প্রতিনিয়ত মনে করাইয়া দিতেছে যে, এই অগণিত মানুষকে জীবন দান করিতে হইলে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলিবে না।

বঙ্গীয় লীগের সম্পাদক

আবুল হাশেমের বিবৃতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাসেম একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় উভয়ের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছিল তাহাতে একটী বিষয় বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়—দুই জন নেতাই পরস্পরের অভিমত খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই সমস্ত বোঝাপড়ার প্রাথমিক প্রয়োজন। আজ আমাদের সামনে যে জটিল সমস্যা উপস্থিত, তাহার সমাধানে পরস্পরের এই স্পষ্ট অভিমতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এখন আমাদের কর্তব্য খুঁটীনাটী বিষয়ের উপর পারস্পরিক আপোষের উপায় স্থির করিয়া আমাদের নেতৃদ্বয়কে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মূল প্রশ্ন সমাধানে সাহায্য করা। কংগ্রেস ও লীগের সভ্যদের উচিত—নিজ নিজ অঞ্চলে এই প্রশ্নের কি সমাধান হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পরস্পরের ভিতর আলোচনা চালান। এইভাবে চলিলে শুধু যে আমাদের ভিতর পারস্পরিক ঝগড়াঝাটি ও গালিগালাজের অবসান করিবে তাহা নহে, ইহার ফলে আমাদের নেতৃদ্বয় বাস্তব ন্যায়সঙ্গত সমাধানে পৌছিতে পারিবেন।

আমি কায়েদে আজম জিন্নার দেশপ্রেমিক সতর্ক বাণীটী আবার উচ্চারণ করিতেছি—যতদিন আমরা নিজেরা উভয়ের ভিতর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, ততদিন তৃতীয় পক্ষের মর্জির উপর আমাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ বর্তমান আছে বলিয়া আমরা মিলিতে পারিতেছি না—শুধু এই কথা বলিতে থাকিলে আমরা সাম্রাজ্যবাদের অপরাজেয়তাকেই স্বীকার করিব। সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার সম্মুখে আমাদের অসহায় ভাবের কথা বলিয়া ঢাক বাজাইবে আর আমরা পরাধীনতার শিকল চিরদিন নিজেদের গলায় ঝুলাইয়া রাখিব। বাংলাদেশের জনসাধারণ

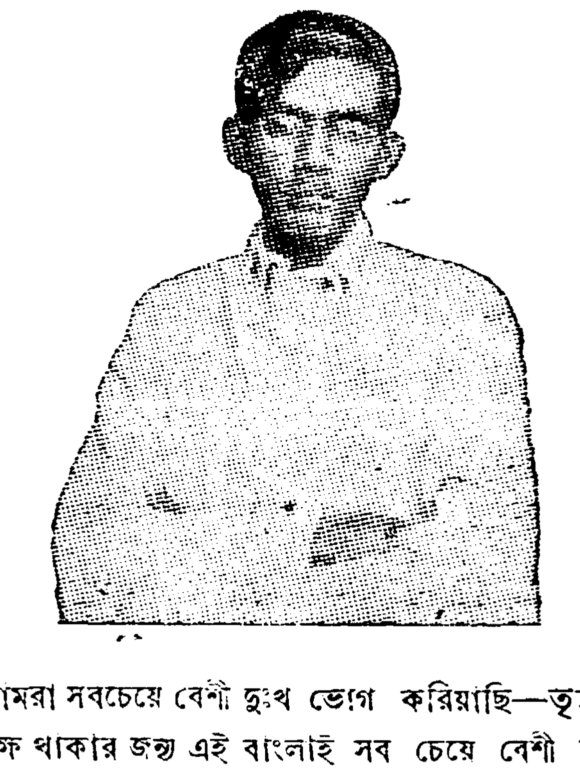

আমরা সবচেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করিয়াছি—তৃতীয় পক্ষ থাকার জন্য এই বাংলাই সব চেয়ে বেশী দিন হইল এই দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে। এখন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবায় সময় আসিয়াছে। এবং আমি কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের ভাইদের নিকট আবেদন করিতেছি—আসুন আমরা একসঙ্গে বসিয়া বাংলায় ঐক্যের প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি বিচার করি। আমি একথায় বিশ্বাস করিতে চাহি না যে বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব প্রতিভা দিয়া বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। আজ আমরা বাংলার সমস্যা সমাধান করিয়া নিজেদের সাহায্য করিতে পারিলে নেতাদের সাহায্য করা হইবে।"

আবার গান্ধী-জিন্নার সাক্ষাৎ চাই

ময়মনসিংহ, ১৩ই অক্টোবর।—**জামালপুরে** গত ৬ই অক্টোবর স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মী সভায় যোগদান করেন। কংগ্রেস নেতা মিঃ মোহাঃ তছীরউদ্দীন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গান্ধীজী ও কায়েদে আজম, উভয় নেতাকে পুনরায় আলোচনায় আত্মনিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর উদ্যোগে

প্রথম রাজনৈতিক সাহিত্য সম্মেলন

গত ১০ই ও ১১ই অক্টোবর **ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর** উদ্যোগে কলিকাতায় রাজনৈতিক সাহিত্যের একটি প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুধু বাংলা দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সাহিত্যের এই ধরণের সম্মেলন এই প্রথম।

বাংলা দেশের ২৩ টি জেলা হইতে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। ১০ই অক্টোবর গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে যে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়, তাহাতে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক সাহিত্য বিক্রির স্থানীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী মুনাফা করার প্রতিষ্ঠান নয়; এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার ও সাম্যবাদের বাণী প্রচার করা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী সেই লক্ষ্যে কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তিনি বর্ণনা করেন। বিকালের অধিবেশনে ভবানী সেন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বাংলা দেশে আজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, সেই সংকট হইতে জাতিকে রক্ষার দায়িত্ব আজ লেখক ও পাঠক উভয়েরই। কোন্ ভাষা গণসাহিত্যের বাহন হইবে, সে সম্বন্ধে সোমনাথ লাহিড়ী আলোচনা করেন।

১১ই অক্টোবর ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভানেতৃত্বে প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রঙ্গীন হালদার, আবুল মনসুর আহ্মদ, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, জয়নুল আবেদীন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশে ও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সাহিত্য প্রচারের চার্ট এবং একটি সোভিয়েট চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে হীরেন মুখার্জী বলেন, রুশ দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই বিপ্লবী রাজনৈতিক সাহিত্য প্রসার লাভ করিয়াছে। সোভিয়েটের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড সোভিয়েটের ব্যাপক গণশিক্ষা। জারশাসিত সমগ্র রাশিয়ায় এককালে শিক্ষিতের যে হার ছিল, বিপ্লবের পর শুধু কিরঘিজ রিপাবলিকেই ১৯৪১ সালে শিক্ষিতের সংখ্যা তাহার আড়াই গুণ। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় মাত্র ৮০৮ টি সংবাদপত্র ছিল, ১৯৩৯ সালে সোভিয়েটে তাহার সংখ্যা ৯০০০। ১৯১৩ সালে সংবাদ পত্রের বিক্রয় ছিল দৈনিক ২৭ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ। লেনিন বলিতেন, সত্যিকার কমিউনিষ্ট হইতে হইলে যুগে যুগে মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ তাই পুরাতন শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা গ্রন্থের চাহিদা এত বেশী।

বাংলায় জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি কি ভাবে জাতীয় সাহিত্য বাড়িয়া উঠিয়াছে গোপাল হালদার তাহা বর্ণনা করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যেও স্তরভেদ আসিয়াছে। রাজনৈতিক সাহিত্য আজ বাংলার জনগণকে পথের নির্দেশ দিতেছে। আজ তাই সাহিত্যিকরা সেই পথে আকৃষ্ট হইতেছেন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজ প্রগতিশীল সাহিত্যিক জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য বাস্তবমুখী হইতেছেন। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যে রূপদান করিতে হইবে।

ভবানী সেন বলেন, এই সম্মেলনকে অনেকে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর বিজ্ঞাপন মনে করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন মনে করিলেও ক্ষতি নাই। ইহা এক অভিনব বিজ্ঞাপন। মার্ক্সবাদী সাহিত্যের প্রচারই রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার সংস্কৃতি সংকট দূর করিতে হইলে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার চাই।

সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, আজ সাহিত্যিককে গ্রাম্য স্বল্পশিক্ষিতের কাছে ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনের বলিষ্ঠ ভাষায় আজ সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতে হইবে। তবেই সাহিত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, মার্ক্সবাদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক শোষণ নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের জবাব। আজ তাই ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর রাজনৈতিক সাহিত্য প্রচারের আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়।

বিভিন্ন প্রদেশের খবর

উড়িষ্যায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ

উড়িষ্যা, বাড়তি প্রদেশ। গবর্ণমেণ্ট ১,৮০,০০০ টন চাউল খরিদ করিয়া অন্যান্য ঘাটতি প্রদেশের প্রয়োজনে ৮৪,০০০ টন এবং বাকী প্রায় ১ লাখ টন বাড়তি চাউল কম মূল্যে গরীবদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া এক প্ল্যান করিয়াছিল। কিন্তু ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত মাত্র ১ লাখ ৭ হাজার টন খরিদ করিতে পারিয়াছে। অথচ ইতিমধ্যেই ৩৯ হাজার টন বাহিরে চালান গিয়াছে ও আরও ৩৫ হাজার টন পাঠাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইহার অর্থ হইল মাত্র ৩৩,০০০ টন উড়িষ্যার জন্য রহিয়া গেল।

ইহার পর গোলযোগ সুরু হইয়াছে বিলির ব্যবস্থা লইয়া। জন-প্রতিষ্ঠানের মারফত বিলির ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিল। চোরা ব্যবসায়ী ও গুদামজাতকারীদের হাতে বাজার চলিয়া গেল। হু হু করিয়া দাম বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোল দাম যখন মণ পিছু ১০। টাকা, তখন চাউল কটকে ১৩৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

ইহার উপর বন্যায় হাজার হাজার একর শস্যক্ষেত নষ্ট হইয়াছে।

সমস্ত প্রকারের বাহিরের চালান এখনি বন্ধ করা দরকার। উড়িষ্যায় দুঃস্থদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দরকার। লীগ বা কংগ্রেস সকলেই এ কাজে আগাইয়া আসিলে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে।

মাদ্রাজে চাউলের অভাব

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এক প্রেসনোটে জানাইয়াছে যে, এই প্রদেশে চাউলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এমন কি বাড়তি এলাকাতেও অত্যন্ত সামান্যই চাউল আছে। জনসাধারণের (কৃষকের) নিকট হইতে আর স্বেচ্ছায় চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বাহির হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানানো হইয়াছে। অথচ এখনও জনসাধারণের সহযোগিতা লওয়া হইতেছে না। বলপ্রয়োগে চাউল বাহির করিবার জন্য সরকারী নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম গোদাবরী জিলায় বন্যাতে যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের ২,৪৩০৲ টাকা সাহায্য হইতেই ভালো বুঝা যায়।

বোম্বাইয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সভা

বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৩৫ জন ছাত্র-নেতা নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির সভাতে যোগদানের জন্য সমবেত হইয়াছেন। ৭ই হইতে ১২ই পর্যান্ত সভা হইবার কথা আছে। বিশদ বিবরণ পরে বাহির হইবে।

ইন্দোরে প্রজামণ্ডল

ইন্দোরে প্রজা মণ্ডলের পরিষদ নির্ব্বাচনে জয়ের কথা পূর্ব্বেই "জনযুদ্ধে" পড়িয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে ইহা বেআইনী ঘোষিত ছিল।

আন্দোলনের চাপে হোলকারের মহারাজা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আগ্রায় কৃষক সম্মেলন

ডাঃ জেড আহম্মদ আগ্রার কৃষক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন, "জাতীয় একতা গঠিত না হইলে অচল অবস্থা দূর করিয়া দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির সাথে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে পারিব না।

এই সম্মেলনে জাতীয় একতার উপর জোর দিয়া পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার দাবী করা হয়।

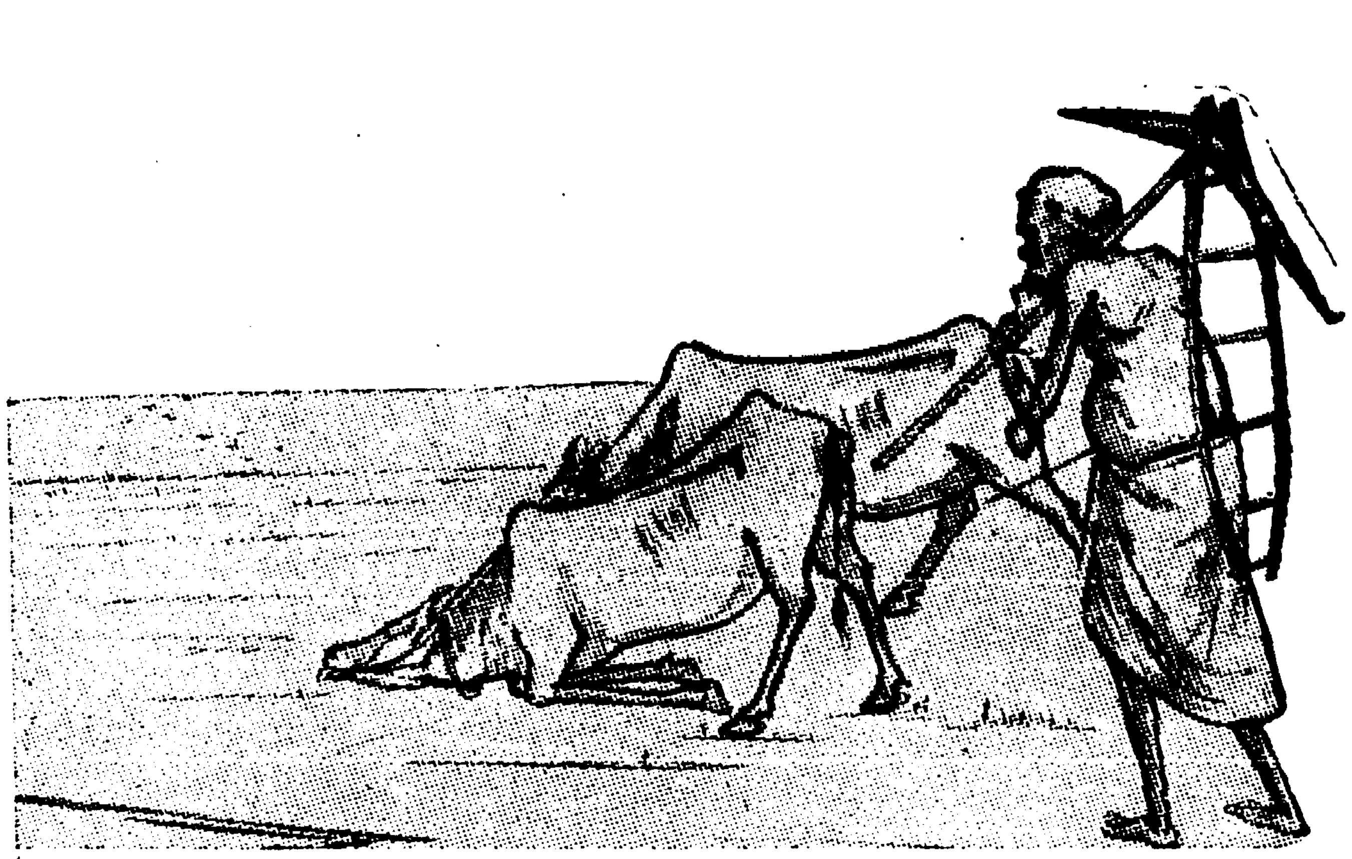

বাংলার সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন
ক্ষেতখামার, বাড়ীঘরের কি শোচনীয় দৃশ্য !

কলিকাতা শহরে এখনও রাস্তার ফুটপাতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দুস্থের আশ্রয় দেখা যায়। প্রতি সপ্তাহে তাহারা মরিতেছে। গত সপ্তাহে মরিয়াছে ৩৪ জন দুস্থ। মফঃস্বলের অবস্থা যে কত ভয়ানক তাহা কল্পনা করা কঠিন।

গ্রামের চেহারা

একটি গ্রামের চেহারা ও অবস্থা দেখিলেই সারা বাংলার অবস্থা আমাদের কাছে পরিষ্কার হইবে। হাওড়ার কৃষক সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক সেনাপতি জানাইতেছেন,গত ৪।১০।৪৪ তারিখে হাওড়া জেলার সদর মহকুমার ঝাপরদহা ইউনিয়নের **কদমতলা** গ্রামে গিয়াছিলাম। গ্রামটীতে ৩১টি পরিবার। ৪৫ জন পুরুষ, ৪০ জন স্ত্রীলোক, ৫০ জন বালক বালিকা—মোট ১৩৫ জন লোক আছে। ইহাদের ৩৯ জন রোজগার করিতে পারে। তাদের মধ্যে ১০ জন একেবারে ভূমিহীন—বাড়ী ঘর দুয়ার নাই। ২১ জন দিনমজুর, ৬ জন ভাগচাষী আর ২ জন মাত্র কৃষক যাহাদের জমি লাঙ্গল গরু আছে। ৩১টি পরিবারের ৩২ বিঘা ধানীজমি, ১২ বিঘা ভাঙ্গা জমি, ৯ বিঘা কোর্দা জমি—সবশুদ্ধ মোট ৫৩ বিঘা জমি আছে। তাহারা ৭৭ বিঘা জমি ভাগে চাষ করে। ৩১টি পরিবারের সবশুদ্ধ ১৯টি বলদ ও ১১টি গরু আছে।

বণ্টনের ব্যবস্থা শোচনীয়

কলিকাতা সহরে, চট্টগ্রাম সহরে ও অন্যান্য কয়েকটী সহরে রেশনিং চালু হইয়াছে। গ্রাম এলেকায় গ্রাম্য রেশনিংএর নীতি সরকার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইতেছে না। চট্টগ্রাম জেলার মফঃস্বলে শতকরা ৩০ ভাগ লোকের জন্য রেশনিং হইয়াছে অন্যান্য জেলায় ফুড কমিটি মারফত রেশনিংএর বিধান স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু কার্য্যতঃ ফুড কমিটি দুর্নীতিতে ভরা, চোরাকারবারীর মুঠার মধ্যে। গ্রাম্য-রেশনিংও অচল, সরবরাহ ভয়ানক কম। চোরাকারবারীর প্রায় সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রাজত্ব। ফলে মূল্য ও দ্রব্যসঙ্কটে দুর্ভিক্ষে ঘায়েল জনসাধারণ মৃতপ্রায়।

হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দুলাল মাঝি জানাইতেছেন, "গত ৪।১০।৪৪ তারিখে জগদীশপুর ইউনিয়নে **বাইগাছি** গ্রামে যাই। ২২০টি পরিবারে মোট ৮৩৮ জনের বাস। ২৫টি পরিবারের অবস্থা ভাল, তাঁহারা কৃষক নহেন—মধ্যবিত্ত। অবশিষ্ট ১৯৫টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪টি সম্পন্ন চাষী, ৯৫টী গরীব চাষী, ৯৬টী পরিবারের লোক চাষের কাজও করে মজুরের কাজও করে। ইহাদের ৬০ জন একেবারেই দিনমজুর। তাহাদের মধ্যে আবার ৫০ জন স্ত্রীলোক। ৮৩৮ জন লোকের মধ্যে ৫৫১ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী, ২টি পরিবারে ৮ জন এখনও বসন্ত রোগে ভুগিতেছে—প্রায় ২০০ লোকের পেটের পীড়া। ৪৬ জন গত একবছরের মধ্যে মরিয়াছে। চাষের গুরুতর সঙ্কট হইয়াছে—মজুর ও বলদের অভাবে। স্ত্রীলোকেরাও নিড়ানোর কাজ করিতেছে, তবুও এখন নিড়ানো শেষ হয় নাই; লোকে স্বর নিয়াও নিড়াইতেছে। বলদের অভাব উৎপাদনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে বাইগাছির পদ দাশের একজোড়া বলদ ছিল। একটি মারা গেলে সে ঋণ সংগ্রহ করিয়া গরু কিনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অত ঋণ পাইল না। অন্য উপায় না দেখিয়া একটি গরু একদিকে আর লাঙ্গলের অন্যদিকে পদ দাশ নিজেকে জুড়িয়া দিল। এমনি করিয়া পদ তাহার জমিতে ফসল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চাষীরা কসুর করিতেছে না। তথাপি বাইগাছির মধ্যে এবার ২৫০০ বিঘার মধ্যে ৫০০ বিঘা জমিতে চাষ হইবে না। দেরীতে বৃষ্টি হওয়ায়, জল বাহির হইবার ব্যবস্থা না থাকায়, গরুর অভাবে মজুর না পাওয়ায় এই ৫০০ বিঘা ভাল জমির ফসল নষ্ট হইল। তাছাড়া লাঙ্গল, দা, কুড়াল প্রভৃতিরও অভাব; গতবার দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেকে এগুলি বেচিয়া ফেলিয়াছিল, আর কিনিতে পারে নাই।" এই বিবরণের মধ্যে গ্রামের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শতকরা ৫ জনের মাত্র জমি আছে, ১০ জন দুঃস্থ, ৮০ জন ভাগচাষী বা খেত-মজুর। মহামারীতে শতকরা ৬৮ জন শয্যাশায়ী, বলদ গরু যন্ত্রপাতির অভাব; কৃষিব্যবস্থা অচল—৫ ভাগের একভাগ আবাদী জমি পতিত। কেমন করিয়া এই গ্রামের লোকে রক্ষা হইবে!

সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় এই একই চেহারা। উপরের হিসাবে দেখা যায়—শতকরা ১০জন লোক দুস্থ। দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ি লক্ষ কৃষক পরিবার অর্থাৎ এককোটী লোক পেটের জ্বালায় ক্রমশঃ সব খোয়াইয়া অবশেষে পথে আসিয়া দাড়াইয়াছিল। অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায়ের মতে অন্ততঃ ৩৫ লাখ লোককে সেই সময়েই আমরা হারাইয়াছি। তাহাদের শতকরা ৪৭-২ জন ছিল ক্ষেতমজুর, ২৫ জন ছিল গরীব চাষী। অবশিষ্ট ষাট পঁয়ষট্টি লাখ লোক গ্রামে ফিরিয়াছে। তাহারা কাজ করিতে চায়—সাধারণ মানুষের মত বাঁচিতে চায়—লাঙ্গল গরু, জোত জমি চায়। মজুর পারিবারিক জীবন ফিরিয়া পাইতে চায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের পর প্রায় একবছর যাইতেছে আজও তাহারা কিছুই পায় নাই। আজও ষাটলাখ জীবন্ত প্রেতের দীর্ঘশ্বাস বাংলার ৯০,০০০ গ্রামকে অভিশপ্ত করিতেছে।

৩ কোটী লোক রোগে আক্রান্ত

১৩৫০ সালে মন্বন্তর যাহা করিয়াছে, ১৩৫১ সালে মহামারী তাহাই করিতেছে। মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেদিনও বলিয়াছেন,"বাংলার ৩ কোটী লোক মহামারীর কবলে"। সরকারী হিসাবেই বাংলার ১৮টি জিলায় মহামারীর ঢেউ চলিয়াছে।

দেড় কোটী কৃষকের জমি নাই

বৃটিশ শাসনের আমলে নূতন ভূমি ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-নীতি কায়েম হওয়ার সময় হইতেই কৃষকেরা ক্রমবর্দ্ধমান হারে জমিতে নিঃস্বত্ব হইতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের আঘাতে আকস্মিক স্বত্বলোপের সহিত তাহার কোন তুলনাই হয় না। তাই ভূমিহীনের সংখ্যা এই কয়েকমাসে বহুগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক মুখার্জ্জির হিসাবমত শত করা ১৭ জন লোক একেবারে গৃহহীন ও আরও শতকরা ১৩ জন লোক আংশিক গৃহহীন হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর এই তিনমাসে রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার ১১, ৯১৫ খানি জমি হস্তান্তরের দলিল রেজেষ্ট্রী হয়। সেখানে ১৯৪২ সালের গোটা বছরে ৪,৩৬৮ খানি দলিল হয়; অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় ১১ গুণ বেশী দলিল হইয়াছে। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে সাধারণতঃ দিনে ১০।১৫ খানা দলিল হইত। দুর্ভিক্ষের সময় সেখানে দিনে ১৫০ হইতে ১৯৫ খানি দলিল রেজেষ্টারী হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০টি জেলার তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফলে প্রকাশিত হইয়াছে, যে, শতকরা ২৫ হইতে ৩০ জন চাষী দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাদের জমি বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ নোয়াখালি জেলাতে তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে দেখাইয়াছেন, শতকরা ৩০ জন চাষী গত বৎসর তাহাদের জমি হারাইয়াছে। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক নীহার সরকার বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি স্থানে তথ্যসংগ্রহের ভিত্তিতে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেখানে ৫১-৬ জন কৃষক তাহাদের জমি গত বৎসর বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। এ সম্পর্কে সঠিক সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয় নাই; তবে ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে গত দুর্ভিক্ষের সময় অন্ততঃ **দেড়কোটী কৃষক তাহাদের ভূমি হারাইয়াছে।**

গ্রামশিল্প কি আর আছে ?

জেলে মালো, তাঁতি জোলা, কামার প্রভৃতি গ্রামের শিল্পীরা উৎসন্ন গিয়াছে। অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "ঢাকার মত কয়েকটি স্থানে ১৯৪৩ সালেব দুর্ভিক্ষের সময়ে ধীবরেরা তাহাদের নৌকা ও জাল বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; আবার নদীয়ার মত কয়েকটি স্থানে জলকরের খাজনা না দিতে পারায় তাহাদের জলকরের স্বত্ব লুপ্ত হয়।" সূতা ও টাকার অভাবে ও ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁতীদের অবস্থাও ঐরূপ হইয়াছে। লোহের সাংঘাতিক দাম ও দারুণ অভাবের ফলে কর্ম্মকারেরা দুঃস্থ হইয়া গিয়াছে। যশোহরের দুঃস্থাগারে একটি কর্ম্মকার বলিয়াছে, "দুর্ভিক্ষের মধ্যে আমার কামারশালা গিয়াছে, পরিবারের আর সকলেই মারা গিয়াছে, শুধু আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" **বাংলার অর্দ্ধকোটী কারিগরেরা আজ এই পথে।**

পঞ্চাশের মন্বন্তরে
সমাজ পুনর্গঠনের
[**ক্রমওবিলে**

দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলা দেশে ক্ষতির গুরুত্ব ও পরিমাণ সরকার প্রকাশ করে নাই। পণ্ডিতেরা এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, রিলিফ সংগঠনগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছে। বিভিন্ন সংগঠন এসম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। সে যাহাই হোক, বিলাত হইতে শুরু করিয়া ভারত ও বাংলার সরকার সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে—দুর্ভিক্ষে বাংলা বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। যে মন্বন্তরী দুর্ভিক্ষ বাংলার সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে জনমতের চাপে তাহার তদন্তের জন্য কমিশন বসাইতেও সরকার বাধ্য হইয়াছে।

ইহাই কি সরকারী পরিকল্পনা ?

বাংলার সমাজ শোচনীয়ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দুঃস্থ নিরাশ্রয় বাঙ্গালীকে আবার সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এই আওয়াজ সকলেরই মুখে ধ্বনিত হইতেছে। পুনর্গঠনের জন্য যে জন-আন্দোলন বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই জোরে সরকারকে যাহোক একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গত বৎসর হইতেই এই আন্দোলন চলিতেছে তাই মন্ত্রীমণ্ডলী পুনর্গঠন সমস্যা সমাধানের জন্য একটী সাব-কমিটিও নিয়োগ করিয়াছে। সেই কমিটি এক গোপনীয় রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে শোনা যায়।

সংবাদপত্র হইতে যতদূর জানা যায় সরকারী পরিকল্পনার মর্ম্ম এইরূপ ছিল :—

(১) বাংলায় যা তাঁতি এলেকায় দুস্থ মেয়েদের কুটীরশিল্প ও গ্রামশিল্পে নিযুক্ত করিবার জন্য 'ওয়ার্ক হাউস' বা কর্মশালা স্থাপিত হইবে।

(২) গ্রাম্য কারিগরদের লোহা, সূতা প্রভৃতি সরবরাহের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) কৃষকদের গো-ঋণ, কৃষিঋণ, বীজধান প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে।

(৪) অপসারিত নৌকা অথবা তাহার স্থলে নূতন নৌকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৫) ফসল বাড়াইবার জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হইবে।

(৬) হস্তান্তরিত জমি ফেরতের জন্য ও পতিত জমি চাষ করাইবার জন্য আইন প্রণীত হইবে।

(৭) এই সব ঋণ বা সাহায্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ ইউনিয়ন মারফত বিতরণ করিবেন।

এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকার এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—

(১) ১ লাখ ২০ হাজার দুঃস্থের জন্য "ওয়ার্ক-হাউস্" বা কর্ম্মশালা স্থাপন করিতে হইবে।

(২) সেচের উন্নতির জন্য ছোট ছোট কাজ ও অপেক্ষাকৃত বড় খাল,বাঁধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বৎসরই বর্ষার আগে এই কাজ করিতে হইবে। এই জন্য ১ কোটী টাকা বরাদ্দ হয়।

(৩) গো-ঋণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, কৃষি-

বাংলার সমস্যা

[অধ্যাপক করুণাময় মুখার্জী ফরিদপুর জেলায় রাঙ্গালা, গ্রেদা, ঈশান গোপালপুর, তাম্বুলখানা ও বেতবেড়িয়া এই ৫টি গ্রামে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা হইতে ইহাই পাওয়া গিয়াছে।]

	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	প্রতি পরিবারের গড় লোকসংখ্যা	বলদ	গরু	বাছুর	ঘোড়া	বাড়ীর সংখ্যা
১লা জানুয়ারী, ১৯৪৩	৫৯২	২৯১৫	৪.৯	৬৪৭	৩৬১	২৯৫	.৯	৫৯২
১লা জানুয়ারী, ১৯৪৪	৫০২	২২৬৫	৪.৫	৩৫৯	১৩৩	২৪৪	৩	৪৮৯
এক বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হইয়াছে	৯০	৬৫০	.৪	২৮৮	১২৮	৭১	৬	১০৩

এক বৎসরে যে ৬৫০ জন ধ্বংস

স্বাভাবিক রোগে মরিয়াছে		দুর্ভিক্ষে
নিউমোনিয়া	১	অনাহারে
কালাজ্বর	৬	শোথ
ম্যালেরিয়া	২১	আমাশয়
অন্য ব্যাধি	১৬	কলেরা-
		আত্মহত্যা
মোট	৪৪	

অধ্যাপক করুণাময় মুখার্জী গ্রামের অবস্থা গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—"এই তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে, এক বৎসরের মধ্যে এই ৫টী গ্রামে ২৯১৫

...বাংলা চুরমার
...াজ হয় না কেন?
[...াদ্দ ...াম্ম]

...ঋণের জন্য ৫০লক্ষ টাকা, কারিগরদের সূতা প্রভৃতি-ব্যবস্থা।

সরকারের কাজ

সরকার যে জেলায় সবচেয়ে বেশী টাকা রিলিফের জন্য ব্যয় করিয়াছে সেখানেও মাথাপিছু মাত্র ৩/৭ পাই ঋণ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। পুনর্গঠন ব্যাপারেও সরকারী পরিকল্পনা কাগজে কলমে রহিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। 'সেচনের' জন্য ১ কোটী টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। অত্যন্ত জরুরী কাজ—খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দূর করার জন্য এই ব্যবস্থা! অথচ ইহার জন্য শতকরা ৯৬৲ টাকা খরচ হয় নাই, মাত্র ৪৲ টাকা খরচ হইয়াছে। গো-ঋণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বাজেটে দেওয়া হইয়াছে। কত দেওয়া হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব সরকার প্রকাশ করেন নাই। তবে বিভিন্ন জেলা হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় খুব সামান্যই ব্যয় হইয়াছে। নৌকা ফেরতের ব্যাপারে বোধ হয় কিছুই এখনো দেওয়া হয় নাই। নৌকা এখনও তৈয়ার হইতেছে। শিল্পীদের সূতা, লোহা প্রভৃতি সরবরাহ সম্পর্কেও একই অবস্থা। ওয়ার্ক হাউসের হিসাবে দেখা যায় ৩৩৩টী ওয়ার্ক হাউসে ২৫৬২৬ জন দুঃস্থের ও ৮৬টী শিশু আশ্রমে ৪৬৭২টী শিশুর জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা আর বাড়ানো হয় নাই—বরঞ্চ সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, **মাত্র ৬০টী কেন্দ্রীভূত কর্ম্মশালা রাখা হইবে। পুনর্গঠনের কাজ বাড়িতেছে না—কমিতেছে।** জমি ফেরতের জন্য যে আইন হইয়াছে তাহা আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই। যে সব দলিল ২৫০৲ টাকার বেশী—সেগুলি ঐ আইনের আমলে আসিবে না। তাছাড়া আইন প্রয়োগের যে ব্যবস্থা তাহার সুবিধা দুঃস্থদের পক্ষে লওয়া সম্ভব নয়। পতিত জমি চাষের আইনও একই কারণে কার্য্যকরী হয় নাই।

পুনর্গঠনের কাজের এই ধারা দেখিলে মনে হয়, সত্য সত্যই "বাংলা দেশের অবস্থা ফিরিয়াছে পুনর্গঠনের কাজে জোর দিয়া দরকার নাই।" পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ও দুঃস্থদের সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে এই টালবাহানা দেখিয়া কে ভাবিবে যে বাংলায় এই সমস্যা খুবই গুরুতর? সরকার যে ভাবে পুনর্গঠনের কাজ চালাইতেছে তাহাতে স্বাভাবিক ধারণা হইবে যে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন ভাঙ্গে নাই, একটু আধটু রিলিফ দিলেই সমস্যা মিটিয়া যাইবে।

সরকারী বরাদ্দ কতটুকু?

ওয়ার্ক হাউস ও শিশুসদন প্রভৃতির জন্য ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মাত্র ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বিভিন্ন খরচের জন্য এইভাবে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিলঃ খয়রাতি রিলিফ—২৫৬, ৪১৫৭৲; টেষ্ট রিলিফ ১০,৪৯,৬৪৯ টাকা; কৃষিকার্য্যের জন্য ঋণ ১৬,৬৪,২০০৲ এবং পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হিসাবে সেচ খরচ বাবদ ১২৬৫,৬৪৮৲। তাহা ছাড়া, গ্রাম্যশিল্পীদের রিলিফ ও পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকার ভিতর হইতে ১৯,৪৪,০০০ টাকা এই সময়ের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

এই টাকা দিয়া কার্য্যতঃ কি ধরণের সাহায্য হইয়াছে তাহার প্রমাণ এখানে প্রকাশিত কয়েকটী বিবরণে পাওয়া যাইবে।

সোণার বাংলার পারিবারিক জীবন!

দুর্ভিক্ষের এই নিদারুণ আঘাত বাংলার মধুর পবিত্র পারিবারিক জীবনকেও ধ্বংস করিয়াছে। নিতান্ত গরীবের ঘরেও স্নেহময়ী জননী, পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহশীল পিতা বাংলার গ্রামজীবনের বিশেষত্ব ছিল। আজ আর তাহা নাই। খুলনা জেলার কাটিপাড়া গ্রামে মিত্র-বাটীতে একটি দুঃস্থ বালককে দেখিলাম,—তার নাম বৈদ্যনাথ। **বৈদ্যনাথ ঐ পরিবারে দুর্ভিক্ষের দান।** সে বলিল, "খাইতে না পাইয়া আমার অসুখ হয়। খাওয়াইতে বা চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া বাবা আমাদের এই বাড়ীর সামনে রাস্তায় ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাঁচিয়া আছেন কি না তাহাও জানি না। (এই বাড়ীর) মা আমাদের তুলিয়া আনিয়া বাঁচাইয়াছেন।" শুনিলাম, ঐ গ্রামেই দুটী শিশুর মাতা তাহাদের ক্ষুধার তাড়না সহিতে না পারিয়া তাহাদের নদীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। এমনই হইয়াছে—স্বামী স্ত্রী ছাড়িয়া গিয়াছে, মা সন্তানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছে, স্ত্রী ইজ্জত বেচিতেছে।

সংসার তো ভাঙ্গিলই, তার উপর যৌন-ব্যাধির কুৎসিত কলঙ্ক!

জনগণকে বাদ দিয়া এই সমস্যার সমাধান নাই

সরকার পুনর্গঠন-পরিকল্পনাটী জনসাধারণের নিকট গোপন রাখিয়াছে। একটী সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে মাত্র যে বিভিন্ন খাতে ছয় কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কোনো পরিকল্পনা থাকিলে, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকিলে জনসাধারণের নিকট হইতে গোপন করার দরকার হয় না, বরঞ্চ উহার ব্যাপক প্রচার উহাকে কাজে পরিণত করিতে সহায়তা করে। পুনর্গঠন ব্যাপারে গোপনতা বাস্তবিকই রহস্যজনক।

সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সমস্যার তুলনায় তাহা অত্যন্ত ছোট। বর্ত্তমানের কার্য্যসূচী আরও ছোট। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি শতকরা মাত্র ১ জন পুনর্গঠনোপযুক্ত লোকের জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু শতকরা একজনের জন্যও যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর।

পুনর্গঠনের জন্য যে শত শত কোটী টাকা প্রয়োজন, আমাদের দেশের সরকার তাহা দিতে পারেন না। সব দেশেই পুনর্গঠন পরিকল্পনা সরকারী ও বেসরকারী সহযোগীতার ভিত্তিতে তৈয়ার হয়। সরকার ও জনসাধারণের সহযোগ ব্যতীত এই কাজ সফল হইতে পারে না। যাহাদের পুনর্গঠন দরকার, তাহাদের সমষ্টিগত কাজের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা, ইউনিয়ন বোর্ডের মারফত ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের এই ব্যবস্থার ফলে উপযুক্ত জায়গায় সাহায্য পৌঁছিবে না। কাহারও নিকট এই টাকা পৌঁছাইলেও তাহা কাজে লাগাইবার মত সুবিধা ব্যক্তিগতভাবে সকলের নাই।

কৃষক সভার অভিযান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভাও বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ও গ্রাম্যশিল্পীদের সমাজ জীবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। এই কাজে সমস্ত দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃষক-সভা আহ্বান জানাইয়াছে। পুনর্গঠনের জন্য যে সব কাজে হাত দিবে তাহার একটী খসড়াও করা হইয়াছে। পুনর্গঠন সম্পর্কে কৃষকসভা হইতে যে নতুন বই বাহির হইয়াছে তাহাতে এই পরিকল্পনা আছে।

শতকরা ৭০ জনের কাপড় নাই

অধ্যাপক করুণা মুখার্জী ৫টী গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এখনো যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে। ১৫৩টি পরিবারের বাড়ী গিয়াছে। পেটের জ্বালায় তাহারা এক এক করিয়া জানালা দরজা বেচিয়াছে। শতকরা ১৭'৪টি পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন হইয়াছে, আরও শতকরা ১৩'৪টি পরিবার আংশিক বাড়ী হারাইয়াছে। শতকরা ৯৯টি পরিবার তাহাদের বাসন কোসন অস্থাবর বিক্রয় করিয়াছে। শতকরা ৭০ জন প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে বাস করিতেছে। **শতকরা ১৭ জন পুরানো গামছা ইত্যাদি দ্বারা কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিতেছে, আর শতকরা ১৩ জন মাত্র ৯ হাত×৪৪ ইঞ্চি কাপড় পরিতেছে।"**

পুনর্গঠনের কাজে
জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চাই

পৃথক পৃথকভাবে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় কাজ করিতেছেন। এই কাজের মূল্য যথেষ্ট আছে। ইহাদের অভিজ্ঞতার মূল্য সীমাহীন। কিন্তু দেশ পুনর্গঠন করিতে হইলে সরকারী, বেসরকারী সকল দলের মিলিত আয়োজন ছাড়া আর পথ নাই। **বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি** জনগণের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ৮১টী ইউনিট বাংলার গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছে। বি-এম-আর-সি-সি সরকারের ঔষধ বিতরণের গাফিলতি ও ঔদাসীন্য ভাঙ্গিতে সক্ষম হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কুইনাইন সরবরাহ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছে।

১৯টী প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টা হিসাবে ঠিক তেমনি **নারী সেবা সংঘ** দুঃস্থা মেয়েদের সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছে। **নারী সেবা সংঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসের কাজের প্রাথমিক রিপোর্টে** দেখা যায়, তমলুক, ভোলা, কলিকাতা লেক রোড, লিলুয়া, নোয়াখালী ও বরিশালে মেয়েদের হোম চালান হইতেছে। হাওড়া ও ২৪ পরগণা যথাক্রমে বানহরিশপুর ও বিশালাক্ষীপুরে ২টী শিল্প-কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা ছাড়া এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত উইমেন্স ফুড কমিটি, আত্মরক্ষা সমিতি, ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স ইউনিট প্রভৃতি ৬টী প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে হোম চালাইতেছে। নারীসেবা সঙ্ঘ ১০০টী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলায় ৮টী হোম ও ৪৩টী কর্ম্মশালা খুলিবার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে।

মেডিকেল রিলিফের জন্য যাহা সম্ভব হইয়াছে এবং নারীসেবা-সংঘ যাহা সুরু করিয়াছে সারা বাংলার পুনর্গঠনের জন্যও তাহা করা সম্ভব। যেসব রিলিফ প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করিতেছে তাহাদের ও সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির প্রতিষ্ঠানকে অন্য বিষয়ে মতভেদের কথা ভুলিয়া বাংলাকে পুনর্গঠনের কাজে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

...হইয়াছে তাহাদের মৃত্যুর কারণ—

...জন্য মৃত্যু		দুর্ভিক্ষের জন্য
	২৫৬	১৯৪৩ সালে গ্রাম
	৭৪	ছাড়িয়াছে আর
...দরাময়	৫০	ফেরে নাই
...ন্ত	২০	২০৪
	২	
...ট	৪০২	মোট ২০৪

...জন লোকের মধ্যে ৪৪৬ জন গ্রামেই মারা যায়। ২০৪জন ঐ সময়ে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে—ফেরে নাই, খুব সম্ভবতঃ খাদ্যের সন্ধানে পথেই মরিয়াছে; অর্থাৎ শতকরা ২২ জন লোক ও শতকরা ১৬টি পরিবার উজাড় হইয়া গিয়াছে। যাহারা গ্রামেই মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৪৪ জন স্বাভাবিক ভাবে ও ৪০২ জন প্রত্যক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের জন্য মরিয়াছে; অর্থাৎ শতকরা ৯'৮' জন স্বাভাবিক ভাবে মরিয়াছে ও **শতকরা ৯০'২ জন দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে; শতকরা ৪৪'৫টি বলদ,** ৩৫'৫টি গরু, ৩১'৫টি বাছুর ও শতকরা ৬৯ টি ঘোড়া **মরিয়াছে।**

সরকারী রিলিফের বহর

"এই ভয়ানক ধ্বংসলীলার পর যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের জন্য কি করা হইয়াছে? সবচেয়ে বেশী সরকারা রিলিফ দেওয়া হইয়াছে ফরিদপুর জেলাতে। শিক্ষামন্ত্রী মিঃ তমিজউদ্দিন খাঁ বলিয়াছেন যে সব রকমের রিলিফ ধরিয়া ফরিদপুর জেলায় সরকার মোট ৬০,৮৬,০১২৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এই পাঁচটী গ্রামে যে রিলিফ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইঃ—কম্বল (বিনা মূল্যে) ১৯ খানি; কাপড় (বিনা মূল্যে) ৯৫ খানি, কৃষিঋণ (টাকা) ৭৩৩৮৲; ধান ঋণ (২০৲ মণ হিসাবে) ২৫৭০৲ টাকা অর্থাৎ **নগদ ঋণ দান করিয়া মাথাপিছু ৩/৪ পাই দেওয়া হইয়াছে।"**

শ্রমিক জগৎ

সৈন্য ও ট্যাক্সি-চালকদের মধ্যে সদ্ভাব চাই

যুক্ত-কমিটিতে পুলিশ সাহেবের আপত্তি কেন ?

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে আমেরিকান সৈন্য ও ট্যাক্সিচালকদের মধ্যে কয়েকটি শোচনীয় সংঘর্ষ ঘটে। ভবিষ্যতে ঐ ধরণের ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে তজ্জন্য আমেরিকান সৈন্যদের পক্ষ হইতে মেজর জেনারেল চীভস্ মোটর ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক সমিতি এবং ট্যাক্সির মালিক শ্রীগুরু সিং সভার প্রতিনিধি, এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে লইয়া এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে আলোচনার পর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে শ্রমিক সমিতির কাছে যে পত্র আসিয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল :

'ট্যাক্সি-চালক ও সৈন্যদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন—(১) প্রত্যেক সামরিক ক্যাম্প বা ঘাঁটির সংলগ্ন একটি করিয়া ট্যাক্সি-টারমিনাস থাকিবে—সৈন্যদের সেখানে নামাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ সকল টারমিনাসে একটি করিয়া চিহ্ন এবং একজন করিয়া পাহারা থাকিবে, যাহাতে প্রত্যেকে আইন মানিয়া চলে এবং ন্যায্য ভাড়া চুকাইয়া দেয়, তাহারা তাহা দেখিবে। (২) ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার কোন মিলিটারী এস্টাব্লিশমেন্টের অবসরভোগী সৈন্য ছোরা প্রভৃতি কোন প্রকার অস্ত্র লইয়া চলিতে পারিবে না। সৈন্যদের তল্লাসী লইবার জন্য মিলিটারী পুলিশকে হুকুম করা হইয়াছে। (৩) যাহারা ইংরেজীতে কথা বলিতে পারে না তাহাদের সহিত পাঞ্জাবীতে কথা বলিবার জন্য ৬নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে একজন দোভাষী পাঞ্জাবীকে রাখা হইয়াছে।

সৈন্য ও ট্যাক্সি-চালকদের মধ্যে পুরাপুরি সদ্ভাব ও সহযোগিতার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে।'

আমেরিকান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের যেখানে এই প্রকারের মনোভাব, কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের সেখানে মনোভাব কি? যখনই কোন সংঘর্ষ ঘটিয়াছে, শ্রমিক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি "আন্দোলনকারী" বলিয়া সেই সকল প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই অস্বীকার করিয়াছেন। যুক্ত-বৈঠকে ট্যাক্সির ড্রাইভার, মালিক এবং সামরিক ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হইলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হন, কিন্তু কলিকাতার পুলিশের বড় সাহেব রাজী হন না। জনসাধারণের ঐক্য যেখানে দুর্ব্বল সেখানে আমলাতন্ত্রই যে কর্ত্তৃত্ব করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বি-এন-রেল মজুরদের
মাগ্‌গীভাতা আন্দোলন

(পূর্ণেন্দু দত্ত রায়)

বি, এন, রেলওয়ে শ্রমিকদের অতীতের গৌরবময় ইতিহাস সারা রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রাণে আজও সাড়া জাগায়, প্রেরণা দেয়। ১৯২০ সালে দেশবন্ধুর হাতে গড়া তাদের ইউনিয়ন তাদেরই বুকের রক্ত, ত্যাগ ও দুঃখের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু এও তারা দেখেছে যে ১৯৩৬-৩৭ সালের গৌরবময় ধর্ম্মঘটের পর থেকে তাদের নেতৃবৃন্দ যেন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছেন। শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন দুঃখকষ্টও তাদের সে ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। অথচ সব কিছু সত্ত্বেও রেলওয়ে চালু রাখার গুরু দায়িত্ব শ্রমিকরা পালন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে বিনা দ্বিধায়, নিজের ও দেশের স্বার্থে।

গত জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বি, এন, আর, শ্রমিকদের মাগ্‌গীভাতা আন্দোলন সেই দৃঢ় আকাঙ্খারই পরিচয় দেয়। বি-এন-আর মজুরদের দুইটী ইউনিয়নের সাধারণ সভ্যরা নিজেদের উদ্যোগে ও অন্যান্য শ্রমিকদের সহযোগে এ আন্দোলন সুরু করল। নিজেরাই শ্রমিকদের কাছ থেকে কুপন ও রসিদ বইয়ের সহায়তায় টাকা তুলতে লাগলো। হাজারে হাজারে ইস্তাহার ছাপালো ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু, ইত্যাদি ভাষায়, বহু সহস্র গণদরখাস্ত ছাপালো সহি সংগ্রহের জন্য। সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে করার জন্য শ্রমিকরা বানালো একটী সাময়িক সংগঠন কমিটি, আর তারই থেকে ডাক দেওয়া হল হাজার হাজার দস্তখতের জন্য। আর সাথে সাথে সমগ্র শ্রমিকদের আহ্বান জানানো হল—অবিলম্বে বি, এন, আর-এর দুটো ইউনিয়নকে একত্র করে একটী সুদৃঢ় ইউনিয়ন তৈরী করতে। রেলওয়ের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে লোক পাঠানো হল আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য। বহুদিনের মরা গাঙে এলো নূতন জোয়ার। তিনমাস ধরে চললো আন্দোলন। শ্রমিকদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে কি বিরাট সাফল্য লাভ হয়েছে তারই পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হল :—

(১) ১৫০০০ হাজার প্রধান প্রধান শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের দস্তখত সংগ্রহ; (২) ৫০০ শতের অধিক টাকা সংগ্রহ; (৩) প্রায় ২০০০ নূতন ইউনিয়ন সভ্য সংগ্রহ এবং ক্রমাগত আরও বেড়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা; তা' বাদে ইউনিয়নের বহু শাখা পুনরুজ্জীবিত বা সক্রিয় হওয়া; (৪) দুটো ইউনিয়নকে একত্র করার প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি; (৫) ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বহুলাংশে সক্রিয় হয়েছেন এবং সাধারণ শ্রমিকদের উদ্যোগে সৃষ্ট এ আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থনও করেছেন; (৬) বি, এন, আর শ্রমিকদের এ আন্দোলন অন্যান্য রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে এক হয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে রেলওয়ে বোর্ডকে এদের ন্যায্য দাবী অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, আর তার লক্ষণও ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে উৎপাদন কমিতেছে কেন ?

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে যুদ্ধের পূর্ব্বে দৈনিক বস্ত্র-উৎপাদনের হার ছিল ৮০,০০০ গজ, বর্ত্তমানে উহা কমিয়া ৫০,০০০ গজ হইয়াছে।

উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার একটি প্রধান কারণ : মালিকদের মুনাফালোভ। কিন্তু শ্রমিকদের বোনাস প্রভৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা যে মনোভাবের পরিচয় দিতেছে তাহা বিশেষ ক্ষতিকর। পূজা ও ঈদের সময় তিন মাসের মজুরী বোনাস হিসাবে দাবী করা হয়। কিন্তু মালিকরা জানায় যে, যাহারা ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে এক মাসের বোনাস দেওয়া হইবে। এদিকে বোনাস হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যে সমস্ত পুরাতন শ্রমিক ১৯৪৪ সালের মে-জুন পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে তাহাদের সামান্য অজুহাতে ছাঁটাই করে, যাহারা এক ডিপার্ট হইতে অন্য ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরিত হয় তাহাদেরও বোনাস দেওয়া হয় না। এই নীতির ফলে উৎপাদনে মজুরদের মধ্যে উৎসাহ আসিবে কোথা হইতে? জনসাধারণকেই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

কলিকাতা লোহা কারখানা শ্রমিক সম্মেলন

২১শে অক্টোবর, শনিবার

টেকনিক্যাল পারসোন্যাল অর্ডিনান্সে কারখানার মালিকদের যে যথেচ্ছা মজুর ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন কারখানার প্রধান প্রধান দাবী দাওয়ার উপর এডজুডিকেশন বসাইবার দাবী লইয়া কলিকাতার লোহা কারখানার শ্রমিকরা আগামী ২১শে অক্টোবর এক সম্মেলনে মিলিত হইবে। খিদিরপুরের ব্রেথওয়েট, রবার্ট হাডসন, ষ্টিল প্রডাক্টস্, বামার লরী, বালীগঞ্জের ভার্জিয়া, এলেনবেরী, এণ্টালীর স্যাক্সবী ফার্মার, ইণ্ডিয়া ফ্যান্, দক্ষিণ কলিকাতার জয়া এবং মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়ন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা।

সম্মেলন সফল করার জন্য খিদিরপুর, বালীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় শ্রমিক সভা হইয়াছে, বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা তাহাদের দাবীর উপর ইতিমধ্যেই দুই হাজারের উপর সই সংগ্রহ করিয়াছে।

২০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রত্যেক কারখানার প্রতিনিধিদের লইয়া দক্ষিণ কলিকাতা কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন হইবে। ২১শে অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে হাজরা পার্কে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

প্রত্যেকটি লোহা কারখানার শ্রমিক আগাইয়া আসিয়া সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলুন।

★ ফরাসী ভারতে

১৭ই সেপ্টেম্বর ফরাসী ভারতের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন পণ্ডিচেরীতে ফরাসী ভারতের প্রথম ফ্যাশিষ্ট বিরোধী গণসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চন্দননগর, ইয়ানন, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে—ভারতের এই পাঁচটি ফরাসী শাসিত উপনিবেশ হইতে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই বাস্তিল-দিবস উপলক্ষে স্থানে স্থানে জনসমাবেশে এই গণসম্মেলনের জন্য সর্বসমক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিদের নির্বাচন হয়।

ফ্রান্সের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম আজ ফরাসী ভারতের অত্যাচারিত জনগণকে স্বাধীনতার প্রেরণা যোগাইয়াছে।

এই নূতন পরিবর্তিত পটভূমিকার মধ্যেই ১৭ই সেপ্টেম্বর ফরাসী ভারতের জনগণের এই সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল।

পণ্ডিচেরীর একটি বিরাট নারিকেল কুঞ্জে সম্মেলনের মণ্ডপ তৈরী হইয়াছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কলোনিয়াল কলেজের অধ্যাপক প্রিঁজা। আজ দুনিয়ার সামনে যে নতুন ফ্রান্স জন্ম নিতেছে, অধ্যাপক প্রিঁজা সেই প্রগতিশীল ফ্রান্সেরই একজন। ফরাসী কনসাল্‌টেটিভ এসেম্বলির একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জীবরত্নম এই সম্মেলনের সভাপতি।

সভার প্রারম্ভে এক মিনিট নীরব থাকিয়া সভাস্থ সকলে মুক্তিযুদ্ধের ফ্রান্সের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই সম্মেলনের অভিনন্দন জানানো হয়। পণ্ডিচেরী হইতে বহিষ্কৃত শ্রমিক নেতা কমরেড সুব্বায়া এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী পাঠান, তাহাতে বলেন, এই সম্মেলন স্বাধীন ফরাসী ভারতের ভিৎ প্রতিষ্ঠা করুক।

অধ্যাপক প্রিঁজা বলেন, ফ্যাশিষ্টবিরোধী প্রত্যেকটি মানুষ আজ চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা চায়। আজ আমরা এমন সমাজ চাই, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জীবিকা অর্জন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জীবরত্নম তাঁহার অভিভাষণে বলেন, নূতন ফ্রান্সের নেতা দ্য'গল ব্রাজেভিলে প্রেস সম্মে-

গণ-সম্মেলন

লনে ঘোষণা করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ফ্রান্স ও ফরাসী উপনিবেশগুলির প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হইবে স্বায়ত্বশাসিত। পরস্পরের সমবায়ে ইহারা একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। ধনতান্ত্রিকদের অত্যাচার ও শোষণের কায়েমী ব্যবস্থার পতন ঘটিবে। শ্রীযুক্ত জীবরত্নম বলেন, আজ রাজনৈতিক মতভেদ দূরে সরাইয়া স্বাধীনতার পথে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। তা না হইলে, আমাদের অনৈক্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।

সম্মেলনে যে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে দাবী করা হয় যে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে উপনিবেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। ফরাসী ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে। এই নূতন শাসনব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী সময়ের ব্যবস্থা হিসাবে বর্ত্তমান ফরাসী ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ভাবে সংস্কার করিতে হইবে: (১) ১৮৪০-এর লো অর্গানিক বাতিল, (২) ১ম ও ২য় লিষ্টের পার্থক্য বিলোপ, (৩) সংবাদপত্র, সভা, শোভাযাত্রা ও সংগঠন সম্পর্কে সমস্ত বাধার অপসারণ, (৪) প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীপুরুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন করিয়া নির্বাচন, (৫) জনগণের আস্থাভাজন কমিটির সাহায্যে খাদ্য ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, (৬) নবপ্রবর্ত্তিত সমস্ত ট্যাক্সের উচ্ছেদ, (৭) শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের বাধা অপসারণ।

অপর একটি প্রস্তাবে কমরেড সুব্বায়ার উপর হইতে বহিষ্কার আদেশ উঠাইয়া লইবার জন্য দাবী জানানো হইয়াছে।

সম্মেলনে গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিবার জন্য একটি ফরাসী ভারত কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই কর্ম্মপরিষদের কাজ হইবে ফরাসী ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে একত্রিত করা ও ফ্রান্সের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ফরাসী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই পরিষদ এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল।

সংবাদ সংগ্রহ

বাংলার বিভিন্ন জেলায়

চব্বিশ পরগণায় বন্যার ধ্বংসলীলা

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ঝড়ের প্রকোপে মাতলা, বিদ্যাধরী ও করতোয়ায় ভীষণ বন্যা দেখা দেয়। ফলে, অনেকগুলি বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং ক্যানিং, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও ভাঙ্গার থানার শতাধিক গ্রাম জলমগ্ন ও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ধান নষ্ট হইয়া যায়। অবিলম্বে, সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত রিলিফের কার্য্যকরী ব্যবস্থা না হইলে দুর্ভিক্ষ ও বন্যা বিধ্বস্ত ২৪ পরগণার কৃষক ও গরীব অধিবাসীদের চরম দুর্দশা দেখা দিবে।

মহিলা আত্মরক্ষার সমাজ-সেবা

তুলাসারে (ফরিদপুর) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পরিচালিত ওয়ার্ক হাউসে সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার সাথে সাথে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে সমিতি হইতে ৩২টি মুষ্টিঘট বসানো হইয়াছে। তাহাতে যে চাউল হয় তাহাদ্বারা আত্মরক্ষা সমিতি গ্রামের ৬টি দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

বন্দীদের মুক্তি চাই

সম্প্রতি ধলঘাটে (চট্টগ্রাম) হিন্দু-মুসলমান ৪০০ লোকের এক জনসভায় বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, চট্টগ্রামের অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রগতিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৫ই অক্টোবর কুষ্টিয়া পরিমল থিয়েটার হলে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৩৪৯৸০ অসুস্থ রাজনৈতিক কর্ম্মীদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় হইবে।

রিগার মুক্তিঃ বেলগ্রেডের রাজপথে যুদ্ধ

পূর্ব্বসীমান্তে লালফৌজ, পশ্চিমসীমান্তে মিত্রবাহিনী নাৎসীদের কবর রচনা করিতেছে

এবার খাস জার্ম্মাণীতে আক্রমণ

১৫ই অক্টোবর মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে সোভিয়েট ফ্রন্টের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের দুইটী বড় যুদ্ধ খাস জার্ম্মাণীতে অভিযান আরম্ভ করার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। লালফৌজের আটটি বিরাটবাহিনী জার্ম্মানীতে আঘাত হানিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে গত তিন বৎসরের যুদ্ধের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। খাস জার্ম্মানীর ভিতর লালফৌজের বড় রকমের আক্রমণ আসন্ন।

হাঙ্গেরীর যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা

হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরেও লালফৌজ যে বেগে আগাইয়া যাইতেছে তাহাতে হাঙ্গেরীর প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। মস্কো রেডিও সোভিয়েট পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া' হইতে খবর দিতেছে যে শত্রুরা ইতিমধ্যেই বুদাপেস্ত হইতে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মার্শাল মালিনোভস্কীর সৈন্যদল দানেয়ুব পার হইয়া ঘুরিয়া গিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। আবার ইতিমধ্যেই হাঙ্গেরীর তরফ হইতে রিজেণ্ট এডমিরাল হরথি সোভিয়েটের কাছে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠাইয়াছে।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের মুক্তি

১৪ই অক্টোবরের আলজিয়ার্স বেতারে প্রচারিত ভূমধ্য সাগরীয় মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টারের এক বিশেষ ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ও গ্রীক সৈন্যরা আজ এথেন্স ও পিয়েরুস দখল করিয়াছে।

নাৎসী কবলমুক্ত রিগা

১৩ই অক্টোবর লালফৌজ লাটভিয়ার রাজধানী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি রিগা দখল করে। ১৪ই অক্টোবরের 'রেডষ্টার' পত্রে বলা হইয়াছে রিগা রক্ষার সংগ্রামে জার্ম্মানরা বেপরোয়া হইয়া ১৫ শত বিমান ও অসংখ্য সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু লালফৌজের দুর্দম আক্রমণের মুখে তাহারা টিঁকিতে পারে নাই। এই জয়ে সোভিয়েট বালটিক রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির রাজধানী আজ সোভিয়েটের অধিকারে আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন এবং লিথুয়ানিয়ার সাময়িক্ ও স্থায়ী রাজধানী কাউনাস ও ভিলনা লালফৌজের হাতে আসিয়াছে।

১৪ই অক্টোবর মস্কো হইতে খবর আসিয়াছে — লাটভিয়ার রাজধানী রিগা ছাড়াইয়া লালফৌজ বিরামহীন গতিতে তুকুম অভিমুখে ছিন্নভিন্ন জার্ম্মান সেনাকে তাড়া করিতেছে। লিবাউ দখলের যুদ্ধে জোর দিবার উদ্দেশ্যে জেনারেল মাসলেনিকভের ফৌজ উইন্দাউ অভিমুখে ছুটিয়াছে এবং লিবাউ দখলের জন্য জেনারেল এরেমেঙ্কোর সৈন্যদল ধাইয়া চলিতেছে।

পূর্ব-প্রুশিয়ার প্রবেশ পথে বিরাট ভাঙ্গন

অন্যদিক দিয়া পূর্ব প্রুশিয়ায়ও যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণ শুরু হইতে পারে। রিগা দখলে আসায় উক্ত এলাকায় বহু সোভিয়েট সৈন্য বৃহত্তর অভিযানে যোগদানের সুবিবা পাইয়াছে। রিগাতে জয়লাভ করায় ঐ এলাকার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বালটিক সাগর এখন সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জার্ম্মান সৈন্য সরাইতে এখন ডানজিগই একমাত্র পথ। এই বন্দরও সেদিক দিয়া নিরাপদ নয়। রিগার পতন হওয়ায় বালটিক এলাকায় জার্ম্মানদের আত্মরক্ষা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জেনারেল বাগ্রামিয়ান ও জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কীর সৈন্যদল যে ভাবে উত্তরাঞ্চলে পূর্ব-প্রুশিয়ার আশে-পাশে জার্ম্মানদের সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যূহগুলি চুরমার করিয়া দিতেছে তাহাতে এটা বলা অযৌক্তিক হইবে না যে পূর্ব-প্রুশিয়ায়ও জার্ম্মান বাহিনীর অবস্থা নাস্তানাবুদ হইতে আর বেশী দেরী নাই।

এই অঞ্চলে রিগাই ছিল পূর্বপ্রুশিয়ার সোভিয়েট অভিযান ঠেকাইয়া রাখার প্রধান কেন্দ্র। আজ রিগাকে জার্ম্মানী নিজের কবলে রাখিতে না পারাতে উক্ত রক্ষাকেন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

জেনারেল চের্নিয়াকোভস্কী পূর্ব-প্রুশিয়ার বিখ্যাত সহর তিলসিতের ৪০ মাইল পূর্বে জার্ম্মান-ব্যূহে এক নুতন ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহারা নীমেনের বরাবর অগ্রসর হইয়া পূর্ব-প্রুশিয়া সীমান্তের ১২ মাইল দূরে স্কারেনমোন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ওদিকে জেনারেল বাগ্রামিয়ান বাল্টিক যুদ্ধের এক অধ্যায় শেষ করিয়া তিলসিত আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব-প্রুশিয়ার উত্তর সীমান্তের নিকট সংকীর্ণ নীমেন অঞ্চলে বিপুল সৈন্যদল সমবেত করিতেছেন।

ফিনল্যাণ্ডের পেটসামো বন্দর লালফৌজের হাতে

জার্ম্মান নিউজ এজেন্সীর ১৩ই অক্টোবরের একটি সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট সৈন্যদল ফিনল্যাণ্ডের পেটসামো অঞ্চলে অবতরণ করিয়াছে এবং লিইনাহামারী বন্দরটী দখল করিয়াছে। যে সব জার্ম্মান-সৈন্য সেখানে ছিল তাহারা পশ্চিমদিকে হটিয়া যাইতেছে।

পরবর্তী খবরে মার্শাল ষ্টালিনের ১৫ই অক্টোবরের আদেশপত্রে পেট্সামো দখলের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। জেনারেল মেরেতস্কোভ এবং এডমিরাল গলোকভ-এর উদ্দেশে প্রচারিত এই আদেশপত্রে বলা হয় যে 'কারেলিয়ান রণাঙ্গনে লালফৌজ মুরমন্স্কের উত্তর পশ্চিমে সুদৃঢ় জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এবং ১৫ই অক্টোবর নৌবাহিনী সহ উত্তর মেরু অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি পেটসামো সহর দখল করে।

বেলগ্রেডের রাজপথে যুদ্ধ

স্বাধীন যুগোশ্লাভ বেতারের সর্বশেষ সংবাদ যে লালফৌজ এবং মার্শাল তিতোর মুক্তি বাহিনী এখন বেলগ্রেডের রাজপথে যুদ্ধ করিতেছে।

মার্শাল তিতোর হেডকোয়ার্টারের ইস্তাহারে প্রকাশ সোভিয়েট সেনা ও মার্শাল তিতোর মুক্তি বাহিনী বেলগ্রেডের ১২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত এবং বুলগেরিয়া হইতে বেলগ্রেডে ও নিসগামী রেলপথ দুইটির সংযোগস্থল নাজেভাক সহর অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপেও তুমুল লড়াই

এদিকে পশ্চিম ইউরোপের উত্তরঅংশে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হইয়াছে এবং মিত্রসেনার আক্রমণে জার্ম্মানরা তাহাদের সৈন্যদল পুনরায় সংঘবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আকেনের অভ্যন্তর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমেরিকান সৈন্যের পদাতিকদল পাড়ার পর পাড়া, গৃহের পর গৃহ পার হইয়া বিধ্বস্ত আকেনের ভিতর আগাইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ জার্ম্মানরা আকেনকে বাঁচাইবার জন্য বিমান পথে পুনরায় সাহায্য পাঠাইয়াছে।

ইহা ছাড়া সেল্ড নদীর এলাকায় কানোডিয়ান সৈন্যদলের সহিত উক্ত এলাকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবতরণকারী সৈন্যদলের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে এই অঞ্চলে মিত্রবাহিনী নূতন উদ্যমে জার্ম্মানদের বাধাদান পঙ্গু করিয়া দিতে পারিবে।

জনগণের জয় সুনিশ্চিত

ইউরোপে যুদ্ধের রূপ আজ এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে নাৎসীবাদের ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু হিটলার মরার আগে শেষ কামড় না দিয়া ছাড়িবে না। তাই সর্বত্রই সে আদেশ দিচ্ছে, রক্তপাতের দিকে চাহিও না, ধ্বংসের আগুনে ঝাপাইয়া পড়ো। জার্ম্মান সামরিক শক্তিও তাই আজ শেষবারের মত বিজয়ী লালফৌজ ও মিত্রসেনাকে রুখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এ চেষ্টা **যতদিন পারা যায় বাচিয়া থাকার চেষ্টা**। কারণ ইয়োরোপের দলিত জনগণ আজ সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দেশের পর দেশে নাৎসী শাসনকে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। হিটলারের তাবেদাররা কেহ বা পলাতক, কেহ বা বন্দী আবার কেহ বা জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় নিয়াছে। রুমানিয়া বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের পর হাঙ্গেরীর শাসকবর্গও সোভিয়েটের দুয়ারে ধনা দিয়াছে যুদ্ধবিরতির সর্ত্তের জন্য। আঘাতের পর আঘাতে হিটলারী-শাসন ব্যবস্থা আজ একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। ইয়োরোপের মানুষ আজ বলিষ্ঠ হাতে জয়ের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, জয় তাহাদের সুনিশ্চিত।

মুক্ত বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে

দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত গণবিক্ষোভ

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মঁসিয়ে পিয়েলোঁর নেতৃত্বে বেলজিয়ামে যে নুতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কমিউনিষ্টদের প্রবেশ বেলজিয়ামের ইতিহাসে এই প্রথম। বেলজিয়ামের প্রতিরোধ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিষ্টরা। প্রত্যেকটী কমিউনিষ্ট নেতা হয় প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা হিসাবে কাজ করিয়াছেন, না হয় ত' তাঁহাকে জার্ম্মানদের হাতে বন্দী, নির্বাসিত অথবা নিহত হইতে হইয়াছে। তাই পুরানো এবং সাবেকী দলগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশের গবর্ণমেণ্টে কমিউনিষ্টদের স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছে।

বেলজিয়ামের সামনে আজ খাদ্য, মাল চলাচল ও উৎপাদনের দারুণ সংকট দেখা দিয়াছে। আজ তাই দেশদ্রোহীদের উচ্ছেদ করা একটি প্রধান সমস্যা। কিন্তু যে সমস্ত বড় বড় পুঁজিপতির দল গত চার বছর ধরিয়া দেশের ধনসম্পদ শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাহাদের ক্ষমতাচ্যুত করার দিকে ক্যাথলিক পার্টির তেমন আগ্রহ নাই। শোনা যাইতেছে, দেশদ্রোহীদের সদলবলে সরাইবার প্রশ্নে উচ্চপদস্থ ও অধস্তন যাজকদের মধ্যে একটা বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে। অধস্তন যাজকরা দেশদ্রোহীদের ঝাঁটাইয়া দূর করার পক্ষে। লিবারাল পার্টি তো বটেই, এমন কি কমিউনিষ্টবিরোধী সোসালিষ্ট দলও দেশদ্রোহীদের বিতাড়নের পক্ষে।

গবর্ণমেণ্টে দুইজন কমিউনিষ্ট প্রতিনিধির একজন ডাঃ মার্তো এবং অন্যজন এম,আর, দিস্পি। ডাঃ মার্তো হইতেছেন বেলজিয়ামের সর্বদলীয় প্রতিরোধ সংগঠনে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফ্রণ্টে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। খ্যাতনামা সাংবাদিক এফ, দেমানি এই সংগঠনের পক্ষ হইতে মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিয়াছেন। যাহারা 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফ্রণ্ট'কে কমিউনিষ্টদের ছলাকলা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, তাহারা যে মিথ্যাবাদী—ইহাই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমা[ণ]।

বিপদ এখনও দূর হয় নাই। এখনও নানাভা[বে] প্রতিরোধ আন্দোলনকে নিরস্ত্র করা ও ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

জনগণ এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফ্রণ্টের প্রতিনিধিদের গবর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণ জনগণের সেই শক্তিরই প্রথম জয়।

চীনে জাপানী হুম্‌কীর জবাব দাও

সম্প্রতি চীন হইতে এমন কতকগুলি সংবাদ আসিয়াছে, যাহাতে কিছু দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। বীরবিক্রমে চীনের জনগণ এতদিন ধরিয়া যে সংগ্রাম চালাইয়াছে, সে সংগ্রামে প্রয়োজনমত সাহায্য মিত্রপক্ষ এখনও যে পাঠাইয়া উঠিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

চীনে যথেষ্ট সাহায্য যায় নাই

প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্র নৌবাহিনীর নায়ক চেষ্টার নিমিৎস্ সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব চীনে জাপানীদের অগ্রগতি একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার, ঐ অঞ্চলে আমেরিকানদের পক্ষে সাফল্যলাভ করিতে হইলে জাপানী শত্রুকে হারাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমেরিকান সরকারের পক্ষ হইতে মিষ্টার ডোনাল্ড নেল্‌সন সম্প্রতি চীনদেশে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে চীন সম্বন্ধে আশা হারাইবার কোন কারণ না থাকিলেও সেখানকার অবস্থা রীতিমত গুরুতর। এ বিষয় লইয়া শুধু চীনা নয়, আমেরিকানদেরও এখনই যে মাথা ঘামাইতে হইবে, তাহা তিনি জোর দিয়া বলেন। যে স্বাধীন চীনে বিশকোটীরও বেশী লোক বাস করে, সেখানে সামরিক ও বে-সামরিক সকল রকমের কাজে ছয় হাজারেরও কম মোটর ট্রাক ব্যবহার করা হয়। খারাপ রাস্তা দিয়া বহুদিন চলাচল এবং ভালভাবে মেরামতের ব্যবস্থার অভাবের দরুণ প্রায় বিশহাজার মোটরলরী একরকম অকেজো হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকার এক শিকাগো শহরে চল্লিশ লক্ষ লোকের দরকার মিটাইবার জন্য ৬৩,০০০ মোটরলরী প্রতিদিন ঘুরিতে থাকে। চীনের প্রয়োজন যে কত বেশী আর সে তুলনায় ব্যবস্থা যে কত কম, তাহা সহজে অনুমান করা যাইবে।

জাপানী অগ্রগতি থামাইতে হইবে

১০ই অক্টোবর জাতীয় দিবসে বক্তৃতা করার সময় চীনের প্রধান নায়ক চিয়াংকাইশেক বলিয়াছেন যে চীনের সামরিক পরিস্থিতি যে গুরুতর তাহা স্বীকার করিতেই লইবে।

১৯৪২ সালে ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি চীনভ্রমণের সময় বলেন যে চীনে প্রেরিত এরোপ্লেনের সংখ্যা শুনিয়া তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হন। ১৯৪৩ সালে মাদাম চিয়াং ওয়াশিংটনে বক্তৃতায় জানান্ যে মিত্রপক্ষের কাছে আমেরিকার প্রেরিত মোট সাহায্যের শতকরা মাত্র দুইভাগ চীনে যায়। চার্চ্চিল এবং রুজ্‌ভেল্ট অবশ্য বলিয়াছেন যে বিমান পথে প্রতি মাসে চীনে ২০,০০০ টন (২৭ মণে এক টন) মাল পাঠানো হয়, কিন্তু চীনের যাঁহারা মুখপাত্র তাঁহারা বলেন যে যথেষ্ট ট্যাঙ্ক, কামান বা বিমান-বিধ্বংসী কামান সে দেশে যায় না আর সেজন্য দক্ষিণ হুনানে হোনিয়াঙের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান জাপানীরা কাড়িয়া লইতে পারিয়াছে। চীনা ও আমেরিকান বিমানবাহিনীর প্রয়োজন মিটাইবার পর পদাতিক সৈন্যের জন্য প্রায় কিছুই থাকে না, আর এই পদাতিকদেরই শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়, পুরাণো জং-ধরা বন্দুক লইয়া কোনক্রমে মনের জোরে লড়িয়া যাইতে হয়। উত্তর পশ্চিমে কমিউনিষ্ট-বাহিনীগুলির তো কথাই নাই। তাহারা বিন্দুমাত্র সাহায্য কাহারও কাছে পায় না।

জাপানীরা সম্প্রতি কোয়াংসি প্রদেশে ইওয়াই-পিঙে ঢুকিয়াছে, ফুকিয়েন প্রদেশে রাজধানী ফুচাও দখল করিয়াছে। চীনে [illegible] প্রশ্ন আজ তাই এত গুরুতর।

কমিউনিষ্ট-কুয়োমিণ্টাং ঐক্যের গুরুত্ব

বিদেশ হইতে সাহায্য পাওয়া ছাড়া চীনের পক্ষে আভ্যন্তরীণ ঐক্য নিতান্ত প্রয়োজন। কুয়োমিণ্টাঙের ত্রিশলক্ষ সৈন্য যদি একই সামরিক কার্য্যক্রম লইয়া উত্তর চীনে কমিউনিষ্ট সেনার সঙ্গে হাত মিলাইয়া লড়িতে পারে তো চীনে অবস্থিত চারলক্ষ জাপানীর অবস্থা সঙ্গীন হইতে বাধ্য। অথচ এখনও পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কুয়োমিণ্টাঙের পাকাপাকি মিতালি হয় নাই। যাহারা জাপানী ফ্যাশিষ্টের চেয়ে স্বদেশী কমিউনিষ্টদের বেশী ভয় করে, তাহারাই বাধা দিয়াছে। তাই আজ চীনে কমিউনিষ্ট ও কুয়োমিণ্টাঙের মধ্যে মিটমাটের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার সাফল্য সকলেই কামনা করিবে।

বড় দরের আক্রমণ চাই

এদিকে বার্ম্মাতে বড়দরের আক্রমণ হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে, কিন্তু বিলম্বে শত্রুরই সুবিধা। ইঙ্গ-মার্কিন যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিয়া ভারতীয় সৈন্য মণিপুরের লড়াইয়ে যথেষ্ট বীরত্ব ও কৌশল দেখাইয়াছে। সাঙ্গুভ্যালিতে মওদকের কাছে শত্রু লড়িতেছে। কলিকাতায় বোমা পড়িবার আশঙ্কা যায় নাই বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে জানানো হয়।

ইয়োরোপে জনজাগরণ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব রণক্ষেত্রের কথা ভুলিলে চলিবে না। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মুক্তি-কামনাকে সমর্থন করিয়া জনযুদ্ধের প্রকৃত কায়দায় জনগণকে সঙ্গে লইয়া জাপানী ফ্যাশিজমের নিপাত ঘটাইতে হইবে। ইয়োরোপের ঘটনা অবশ্য সর্ব্বদেশে প্রভাব বিস্তার করিবে, কিন্তু প্রাচ্যভূখণ্ডের বিশিষ্ট সমস্যাগুলি ধামাচাপা দেওয়া চলিবে না।

Regd. No. C. 2836

ট্রাম-এডজুডিকেশনের রায়
১০ টাকার স্থানে ১৬ টাকা মাগগীভাতা
সংগঠিত শ্রমিকের দুর্জ্জয় শক্তি : কর্ত্তৃপক্ষের শোষণনীতির পরাভব

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী ও ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে যে এডজুডিকেশন কোর্ট বসিয়াছিল, গত ১৩ই অক্টোবর তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই রায় অনুসারে, ট্রাম শ্রমিকদের বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাহার উপরে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আদায় হইল :

(১) ট্রাম কোম্পানীতে কোন শ্রমিকের বেতন ১৮. এবং কোন কেরাণীর বেতন ৪০৲ টাকার কম হইতে পারিবে না। এতদিন শ্রমিকদের ন্যুনতম বেতন ছিল ১৫৲ এবং কেরণীদের ন্যুনতম বেতন ছিল ৩০৲। (২) ইঞ্জিনীয়ারিং এবং পি ডবলিউ বিভাগের শ্রমিকরা বছরে ১৪ দিন প্রিভিলেজ লীভ এবং ৭ দিন ক্যাজুয়াল লীভ পাইবে। আগে ইহাদের কেবল মাত্র ১২ দিন পুরা বেতনে 'গেজেটেড' হলিডে হিসাবে ছুটি ছিল। অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকেরা ২১ দিনের প্রিভিলেজ লীভ এবং ১০ দিনের ক্যাজুয়েল লীভ ভোগ করিতে পারিবে। আগে ট্রাফিকের যে সমস্ত শ্রমিক ৫ বছর বা তাহার কম চাকুরী করিয়াছে তাহাদের জন্য ১৫ দিনের বেশী পুরা বেতনে ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। ট্রাফিকের মিনিয়াল ষ্টাফের জন্য কোন ছুটির ব্যবস্থাই ছিল না। (৩) সমস্ত শ্রমিক ১৬৲ নগদ মাগগীভাতা পাইবে। এতদিন তাহারা ১০৲ মাগগীভাতা পাইত। ইহা ছাড়া আগে তাহারা সস্তা রেশন হিসাবে যে সুবিধা

ট্রাম ইউনিয়নের পক্ষে সালিশি বোর্ডের নিকট সওয়াল জবাব করেন—কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী।

পাইতেছিল এখনো তাহা পাইবে। উপরন্তু যে সকল শ্রমিক একজনের রেশন পায়, তাহারা এখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রতিমাসে আরও ২৷৵৹ পাইবে। (৪) কোম্পানীর খরচে এবং মজুরদের পরিচালনায় ডিপো ও কারখানায় চা-মিষ্টির ক্যান্টিন খোলা হইবে। (৫) পি, ডবলিউ, ডি বিভাগের যে সকল শ্রমিক গত ৩ বছরে ২৷ বছর চাকুরী করিয়াছে তাহাদের স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা হইবে। এতদিন পি, ডবলিউ, বিভাগের কোন শ্রমিকেরই স্থায়ী চাকুরী ছিল না। (৬) দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতে নূতন করিয়া 'টাইম টেবিল' তৈরী করিতে হইবে এবং উহা লেবার কমিশনার অনুমোদন করিলে তবেই চালু করা হইবে। প্রতি মাসে শ্রমিকরা এক সপ্তাহ নিজেদের মধ্যে 'ডিউটি বদল' করিতে পারিবে।

মজুরী বৃদ্ধি এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের এডভান্স ব্যাপারে কোর্ট কোন দাবী মঞ্জুর করে নাই।

ঐতিহাসিক জয়

ন্যুনতম বেতন, মাগগীভাতা ও ছুটি প্রভৃতি ব্যাপারে ট্রাম শ্রমিকরা যাহা আদায় করিল তাহার সহিত কেবলমাত্র রেলওয়ে শ্রমিকদের অবস্থারই তুলনা চলে। গত জুলাই মাসে কলিকাতার স্যাক্সবী লোহা কারখানার শ্রমিকদের দাবীর উপরেও এডজুডিকেশন কোর্ট বসে। যদিও সেখানকার শ্রমিকরা মাগগীভাতা ও রেশনের সুবিধা হিসাবে মোট ২০৲ টাকার বেশী পাইতেছিল না, কিন্তু কোর্ট তাহাদের কিছুমাত্র মাগগীভাতা বাড়াইতে অস্বীকার করে। কিন্তু ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষে এই জয়লাভ কি করিয়া সম্ভব হইল ?

ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষেও এই জয় খুব সহজ পথে হয় নাই। গত ২৮শে এপ্রিল তাহারা এডজুডিকেশনের আবেদন পেশ করে, ৩১শে জুলাই কোর্টের শুনানী আরম্ভ হয় ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহা চলে এবং ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রমিকদের রায়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশে কি দেখিয়াছি ? দেখিয়াছি, একদলীয় মন্ত্রীত্ব থাকার ফলে আমলাতন্ত্রের শক্তি বাড়িয়াছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আঘাত আসিয়াছে, মজুরদের মাগগীভাতা-রেশন ও অন্যান্য ন্যায্য দাবী পদদলিত হইয়াছে, কাপড় প্রভৃতির ব্যাপারে আমলাতন্ত্র ও মজুদদারের রাজত্ব চলিয়াছে। এই অবস্থায় ট্রাম শ্রমিকদের দাবীকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? একদিকে, মালিকদের সংগঠন ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়েশন, চেম্বার অব কমার্স, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন সকলে একত্র হইয়া গবর্ণরের কাছে ধর্ণা দিয়াছে, মন্ত্রীদের ধমক্ দিয়াছে [মন্ত্রীসভার মিটিং পর্য্যন্ত নাকি ডাকাইতে সমর্থ হইয়াছে !], এই রায় যতদিন সম্ভব চাপিয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। অপরদিকে, ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রাণপণে ধর্ম্মঘটে উস্কানি দিয়াছে, শ্রেষ্ঠ তিনজন ইউনিয়ন সংগঠককে বে-কসুর জবাব দিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকে ঝগড়া লাগাইবার ফন্দী আঁটিয়াছে, দালালদের মারফৎ শ্রমিকদের মধ্যে অবসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে।

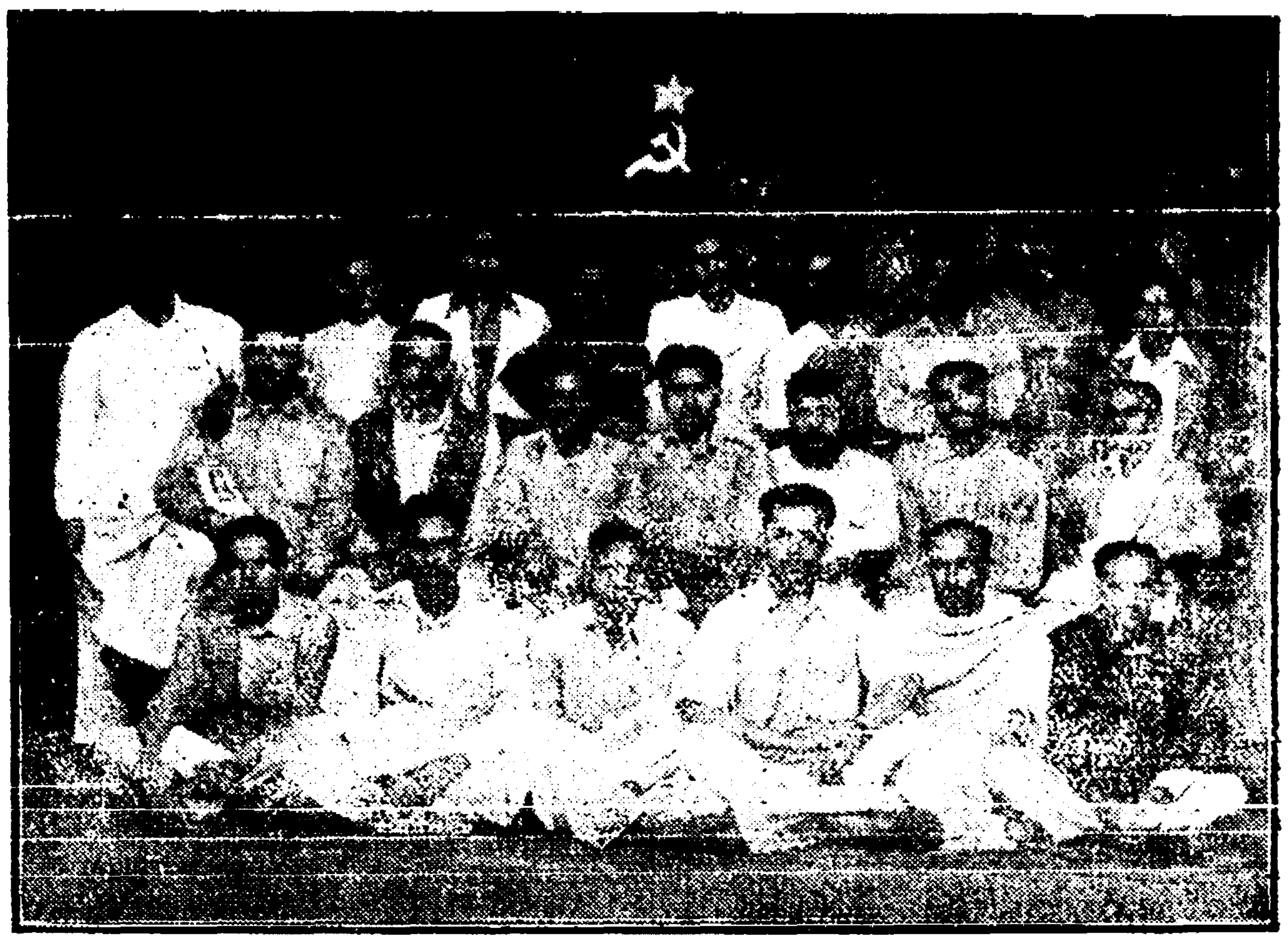

ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ
মাঝের সারিতে মাঝখানে বিখ্যাত শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইল

কিন্তু ট্রাম শ্রমিকের পক্ষে এত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া জয়লাভ করা সম্ভব হইল কি ভাবে ?

সাফল্যের শক্তির উৎস কোথায় ?

সম্ভব হইল, তাহাদের সংগঠন ও নীতির শক্তিতে। ট্রাম শ্রমিকদের নীতি, দেশ সেবার নীতি। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে তাহারা এই নীতি অনুসরণ করিয়া জাপ-বোমার মধ্যেও ট্রাম চালু রাখিয়াছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যায় জনসেবায় অগ্রসর হইয়াছে, কলিকাতার নাগরিকদের দুর্ভোগ কমাইবার জন্য, ট্রাম চলাচলে উন্নতির জন্য আন্দোলন করিয়াছে। এই নীতিই তাহাদের নাগরিকদের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়াছে। তাই, তাহারা যখন ৪০০০ সহি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ন্যায্য দাবী কোম্পানীর নিকট পেশ করিল, তিন মাস কাল ঐ দাবীর উপর প্রত্যেকটি শ্রমিককে সম্মিলিত করিল, জুলাই মাসের বার্ষিক সম্মেলনের বিপুল সাফল্যের মধ্যে, সেক্সনে সেক্সনে সম্মেলনের মধ্যে, শতকরা একশো জন শ্রমিককে ইউনিয়নের সভ্য করার মধ্যে, দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের সংগঠন শক্তির পরিচয় দিল, তখন তাহাদের পাশে দাঁড়াইল কলিকাতার সেরা নাগরিকগণ। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা যে সময়ে মাধ্যমিক-শিক্ষা বিলের মধ্যদিয়া গৃহযুদ্ধের পথে চলিয়াছে, তখনো দেখা গেল, ট্রাম শ্রমিকের দাবী সমর্থন করিয়া বিবৃতি দিলেন লীগ নেতা মৌলানা আক্রাম খাঁ, খান বাহাদুর আবদুল হামিদ চৌধুরী, মিঃ আবদুল মজিদ, লাল মিঞা প্রভৃতি। কংগ্রেস নেতা মিঃ জে, সি গুপ্ত, কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি সমর্থন জানাইলেন, এমন কি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী পর্য্যন্ত। সংবাদপত্রে, কর্পোরেশনে এবং আইন-সভায়ও ট্রামের শ্রমিকদের কথা শুনা গেল। কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে জনসাধারণের সহিত মিলিত সভায় ট্রামের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানানো হইল।

আর একদিকে, শ্রমিকদের দাবী যে কত ন্যায় সঙ্গত তাহা প্রমাণ করার জন্য ব্যবসায়ী উকীলের প্রয়োজন হইল না। কমিউনিষ্ট পার্টির জনপ্রিয় নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে ইউনিয়ন কোম্পানীর মুনাফার হিসাব এবং মজুরদের জীবন যাত্রার খরচের হিসাব হইতে অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ করিলেন, কোম্পানী মজুরদের যে মাগগী ভাতা দেয় তাহা ন্যায্য পাওনার অর্দ্ধেকেরও কম।

তাহারই ফলে আমরা দেখিলাম, আমলাতন্ত্র শ্বেতাঙ্গ বণিকের ষড়যন্ত্র পরাজিত হইল, লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না। স্যাক্সবীর শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াও যাহা আদায় করিতে পারিল না, ট্রাম শ্রমিকদের দেশপ্রেমিক নীতি তাহা হইতে অনেক বেশী আদায় করিল।

ট্রাম-শ্রমিকই পথ দেখাইল

কিন্তু ট্রাম-শ্রমিক কেবল একা নিজেদের জন্যই লড়ে নাই, তাহাদের জয়ে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের সূচনা। ট্রাম শ্রমিক বাংলার শ্রমিক জমায়েতের সবচেয়ে সংগঠিত, বিপ্লবী অংশ। তাই তাহারা মালিকদের উপর প্রথম আঘাত হানিয়া জয়লাভ করিয়াছে, এখন এই জয়কে অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। চটকল, লোহা কারখানা, কর্পোরেশন প্রভৃতিতে এখনো মাগগীভাতার হার খুবই কম। তাহাদের দাবীর পিছনে জনমত গঠন করিতে হইবে। কলিকাতার নাগরিকদের প্রতি ট্রাম শ্রমিকের যে দায়িত্ব আছে, ট্রাম চলাচলের উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে, তাহা এখনই আরো ভালভাবে শুরু হওয়া দরকার। একমাত্র সে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই ট্রাম শ্রমিক তাহার অন্যান্য দাবী দাওয়ার উপরও জনসমর্থন লাভ করিবে, মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমলাতন্ত্র ও শ্বেতাঙ্গ বণিকের ষড়যন্ত্র হইতে আরো বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক সমগ্র বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইবে।

আমেরীর ঔদ্ধত্যের জবাবে
কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের দাবী
কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই

সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টে নূতন করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দাবী করা হইলে ভারতসচিব মিঃ আমেরী তাহাদের মুক্তি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে[illegible] ভারতে রাজনৈতিক অচল অবস্থা বাঁচাইয়া রাখাই যে সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র নীতি ইহাতে তাহাই আর একবার ঘোষিত হইল।

ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সৃষ্টি করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেস নেতাদের সাহায্য যে একান্তভাবে প্রয়োজন প্রত্যেক প্রদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ তাহা অনুভব করিতেছে। যেখানেই কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মুসলমান অন্যান্য জনসংগঠনের কর্ম্মিরা একযোগে সেবাকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন সেখানেই জনসাধারণ আমলাতন্ত্রের অবস্থাকে অনেকাংশে চুরমার করিতে সমর্থ হইতেছে।

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি জাতীয় ঐক্য গড়িবার কাজে গান্ধীজীর শক্তিবৃদ্ধি করিবে, অচল অবস্থার বিষময় ফল হইতে দেশকে বাঁচাইতে সমর্থ হইবে, ভারতে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিবে।

এই সমস্ত কারণে আমরা মনে করি মিঃ আমেরীর উত্তরকে শেষ কথা হইতে না দিয়া একমাত্র ভারতের জনসাধারণের কাছেই যে শেষ কথা রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করার দরকার। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমরা হিন্দু মুসলমান সকলশ্রেণীর দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি—তাহারা আগামী ১৮ই অক্টোবর হইতে একপক্ষকাল সর্বত্র সভাসমিতির অনুষ্ঠান করুন। কলিকাতা শহরের জন্য আমরা নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতেছি।

১৮ই অক্টোবর :—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা।

২২শে অক্টোবর :—হাজরা পার্কে জনসভা।

২৩শে অক্টোবর :—বউবাজার তারাসুন্দরী পার্কে জনসভা।

২৫শে অক্টোবর :—বিডন স্কোয়ারে জনসভা।

২৮শে অক্টোবর :—খিদিরপুরে জনসভা।

২৯শে অক্টোবর :—বালিগঞ্জ টেম্পরারী পার্কে জনসভা।

৩১শে অক্টোবর :—শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা।

মিঃ জে সি গুপ্ত, কামিনীকুমার দত্ত, লীডার কাউন্সিল কংগ্রেস পার্টি, শ্রীশ চাটার্জী, এম, এল, সি (কংগ্রেস), ডাঃ মালেক, খান বাহাদুর আব্দুল হামিদ চৌধুরী, দেবদত্ত মিশ্র, মদনলাল মিশ্র, হরিশংকর শর্ম্মা, বিবেকানন্দ মুখার্জী, সত্যেন মজুমদার, নওয়ল কিশোর সিং, সম্পাদক, বিশ্বমিত্র, মোহন সিং সেঙ্গার, সম্পাদক, বিশালভারত, গোপাল প্রসাদ সিং, সম্পাদক, বিশ্ববন্ধু শ্রীরাম পাণ্ডে সঃ লোকমান্য, জগদীশ হুঙ্কার সঃ জাগৃতি, বঙ্কিম মুখার্জি।

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা] ২৫শে অক্টোবর, '৪৪, বুধবার ৮ই কার্ত্তিক, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই জাতীয় নেতাদের মুক্তি

কলিকাতার পার্কে পার্কে জনতার আওয়াজ

সমগ্র দেশ নেতাদের মুক্তি চায়

আমাদের জাতীয় নেতারা আজ বহুদিন হইতে কারাগারে আবদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছাড়া অন্য সমস্ত নেতাই আজও জেলে। পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ কয়েক জন নেতার স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

সমগ্র জাতি তাহার অবিসম্বাদী নেতাদের মুক্তি চায়। ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার মিঃ এমেরী

সম্প্রতি পার্লামেন্টে জানাইয়া দিয়াছেন—নূতন করিয়া এ প্রশ্ন চিন্তা করার কিছুই নাই। এমেরীর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর পক্ষে দারুণ অপমানজনক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ইহা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কাছে নূতন কিছুই নয়।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই এমেরীর দম্ভ চূর্ণ

এমেরীর এই সদম্ভ উক্তির জবাবে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট দেশনেতা, সাংবাদিক ও নাগরিকের উদ্যোগে গত ১৮ই অক্টোবর হইতে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি-আন্দোলন চলিতেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি গুপ্ত ও হাজরা পার্কে কংগ্রেসনেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দুইটী জনসভা হইয়া গিয়াছে। দুই সভাতেই সমগ্র জনতার কণ্ঠে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত হইয়াছে। প্রত্যেক সভাতেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—যেখানেই কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু, মুসলমান অন্যান্য জনসংগঠনের কর্মীরা একযোগে কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, সেখানেই জনসাধারণ আমলাতন্ত্রের নীতিকে অনেকাংশে চুরমার করিতে সমর্থ হইতেছে।

এই প্রস্তাব মারফৎ জনসাধারণের নিকট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে,—এমেরীর উত্তরকে শেষ কথা হইতে না দিয়া একমাত্র ভারতের জনসাধারণের কাছেই যে শেষ কথা তাহা প্রমাণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী তুমুল গণ আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর দেশবাসীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সারা দুনিয়ার জনগণ ভারতের বন্ধু

এমেরী আজ আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া দুনিয়ার জনশক্তির সামনে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। গান্ধীজী, সরোজিনী দেবী প্রভৃতি জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতারা 'কংগ্রেস জাপানের বন্ধু' এমেরীর এই মিথ্যাপ্রচারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ আজ আবার নূতন করিয়া আন্দোলন চালাইতেছে—বিলাত, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনসাধারণ উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছে—ভারতের জাতীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্ত কর, ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের জন্য ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেল। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর জনগণ উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় প্রবল অভিযানে নামিয়াছে। এমেরী-নীতির ধ্বংসের জন্য ভারতের ভিতরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অতীব প্রয়োজন। তাহা হইলে এমেরীর শিথিল ও কম্পিত হস্তের মুষ্টি হইতে কারাগারের চাবিকাঠি খসিয়া পড়িবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে

আমাদের দেশের নরনারীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে না পারিলে ভারতের দাবীর জন্য বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উপর শুধু মাত্র দুনিয়ার জনগণের আঘাত কখনই মোক্ষম হইতে পারে না। দেশের ভিতর সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনকে একসূত্রে গাঁথিতে না পারিলে ভারতের ঐকাবদ্ধ আন্দোলন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেই পারে না।

জাতীয় সরকার, নেতাদের মুক্তি হইতে সুরু করিয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ প্রভৃতি আমাদের দেশে যত আন্দোলন আছে তাহার মূল প্রশ্ন—কি করিয়া আমরা চল্লিশ কোটী নরনারী এক হইতে পারি কংগ্রেস ও লীগ ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে তাহা কি একসঙ্গে মিলিত হইবে না? কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে দুই ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা কি একটী ধারায় সঙ্গম লাভ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে চরম পরাজয়ের পথে টানিয়া আনিবে না? ইহাই আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন।

সম্পাদকীয়

ঐক্যের পথে বাধা দিও না

২০শে অক্টোবর তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছে, "রাজাজীর সর্ত্তাবলী অথবা তাহার পরিবর্ত্তে গান্ধীজির প্রস্তাব অতীতের কথা হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আর জীয়ান যায় না।" তারপরই "পত্রিকা" পরাধীন দেশে দেশদ্রোহী থাকিবেই এই ভিতীর দিয়া কহিতেছে, "তাহাদের সঙ্গে আপোষ করিবার চেষ্টা নিরর্থক, তদপেক্ষা ক্ষতিকর।" তাই পত্রিকা-সম্পাদক স্বাধীনতার পথের সন্ধান দিতেছেন—"জিন্নাকে লেখা গোড়ার দিকের একটা চিঠিতে মহাত্মাজী খোলাখুলী বলিয়াছেন যে দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগে পরাংমুখ নয় এমন সকলের সহযোগিতায় তিনি সংগ্রাম চালাইবেন।" সর্বশেষে পত্রিকা-সম্পাদক গান্ধীজিকে উপদেশ দিতেছেন, "সেই সংকল্পেই তিনি অটুট থাকুন। অবাস্তবের পিছনে দৌড়াইয়া বাস্তবকে বিসর্জন দেওয়া ঠিক নয়।"

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার মূল বনিয়াদ অটুট আছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস নাই। ভারতের মুক্তির অন্য কোনও রাস্তা নাই, কংগ্রেস-সেবকের স্বাধীন ভারত ও লীগ-সেবকের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। বহু বৎসরের আন্দোলন, ব্যর্থতা ও তিক্ততার ভিতর এই উপলব্ধি জন্মিয়াছে। এই উপলব্ধিই গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেবকে আলোচনার ক্ষেত্রে টানিয়াছিল, এই উপলব্ধির জন্যই গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেব আলোচনা আবার হইবে বলিয়া আশা করেন। এইজন্যই ৩রা অক্টোবর বর্দ্ধমান জেলা কর্মপরিষদের সভায় কংগ্রেসকর্মীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাঁহারা গান্ধীজির ২৪শে সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের অনুকূলে জনমত গঠন করিবেন। এইজন্যই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও যতীন্দ্রমোহন রায়ের উপস্থিতিতে উত্তর কলিকাতার কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে গান্ধীজির প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ।

পত্রিকা সম্পাদকের মত খাঁটি কংগ্রেসসেবকের সঙ্গে মেলে না। পত্রিকা-সম্পাদকের নির্দেশ মাফিক কংগ্রেস কর্ত্তৃক একক সংগ্রামের আত্মঘাতী পথ ভারতের মুক্তি আনিতে পারে না।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা সাধারণ কংগ্রেস-সেবকের লীগ বিরোধী মনোভাবে উস্কানী দিয়া নিজেদের ঐক্যবিরোধী মতলব হাসিল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতেই হইবে। রাজাজীর প্রস্তাব হইতে পিছাইলে চলিবে না, আগাইতে হইবে। ইতিমধ্যেই জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করিয়া আবার কংগ্রেস-লীগ আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। আজ খাঁটী কংগ্রেস-সেবকের চিন্তাধারা পাকিস্তানের ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া ঐক্যের পথেই অগ্রসর হোক্। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম ও একতরফা আপোষ চেষ্টার তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলিলে চলিবে না—সেই ভুলপথে আর নয়!

ঐক্যের মূল প্রশ্নের সমাধানেই গান্ধী-জিন্নার পুনরালোচনার সাফল্য

ঐক্যের জন্য সকলের স্বাধীনতার গ্যারান্টি চাই

জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকটী ভারতবাসীকেই স্বাধীনতার কথা শিখাইয়াছে। আজ ভারতে মুসলিমরা নিজ বাসভূমে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করিবার লক্ষ্যকেই তাহাদের স্বাধীনতার

প্রথম কথা হিসাবে বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জাতি এক সঙ্গে লীগের আন্দোলনের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বাধীনতার এই দাবীই উত্থাপিত করিয়াছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা জাতীয় কংগ্রেস নিশ্চয়ই তাহাদের এই দাবী মানিয়া লইবে। সমস্ত মুসলিম জাতির একত্রে একটী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী লীগ উত্থাপন করিয়াছে তাহাতে মুসলিম জনগণের সত্যকার স্বাধীনতার দাবীই মুখরিত হইতেছে। কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলে যেমন হিন্দু প্রধান জাতিগুলি (তামিল, মালায়ালি, অন্ধ্র, গুজরাটী, মারাঠী, বিহারী, উড়িয়া, ইত্যাদি) একসঙ্গে একটী স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে চায় ঠিক তেমনি মুসলিম জাতিগুলিও তাহাদের পাকিস্তান চায়। এই দাবী স্বাধীনতার আন্দোলনের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক তো নয়ই, ইহাই ন্যায্য ও সত্য দাবী। মুসলিম লীগের এই মূল দাবী মানিবার জন্য কোন সর্ত্ত আরোপ করা চলে না। রাজাজী সম্প্রতি ডেলি-ওয়ার্কারের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—গান্ধীজী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য লীগের যে দাবী তাহা মানিয়াছেন এবং সমস্ত কংগ্রেসকে তাহা মানাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী সুনির্দ্দিষ্ট ও যুক্তি-সঙ্গত সর্ত্ত সাপেক্ষ। এই সর্ত্তের কথা বলিলে লীগের দাবী যে স্বাধীনতা-প্রসূত তাহা কি অস্বীকার করা হইতেছে না? এই সর্ত্ত তুলিয়া দিলে জিন্না সাহেব নিশ্চয়ই কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করিবেন।

পাকিস্তানের মধ্যে অমুসলিম অঞ্চলের দাবী ছাড়িতে হইবে

জিন্না সাহেবও ডেলি ওয়ার্কারের প্রতিনিধির কাছে বলিয়াছেন,—পাকিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী প্রথমে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহারই ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত ফ্রণ্ট গঠিত হইবে এবং বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ক্ষমতা আদায় করিয়া হিন্দু ও মুসলিম জাতিগুলির স্বাধীনতা তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। জিন্না সাহেব আরো বলিয়াছেন—জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের ইচ্ছায় ও সমর্থনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট কাজ চালাইবে। অর্থাৎ তিনি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন—সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই এই মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করিবে। কিন্তু জিন্না সাহেবকে বুঝিতে হইবে যে তিনি জোর করিয়া হিন্দু অঞ্চলগুলিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে আনিতে পারেন না। আসাম প্রদেশ আসামী পার্ব্বত্য জাতির মাতৃভূমি. মুসলিম প্রধান সিলেট বাংলাকে দিলে এ প্রদেশে মুসলিমদের সংখ্যা বেশ কম। সুতরাং আসামকে জোর করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে আনা কি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবী? পূর্ব বাঙ্গলার মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দু-বাঙ্গলাকে জোর করিয়া আনা যায় না। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিমদের সঙ্গে জোর করিয়া মধ্য পাঞ্জাবকে আনা যায় না। তাহা হইলে বাংলার হিন্দু ও পাঞ্জাবের শিখদের গণতান্ত্রিক অধিকার কি খর্ব্ব করা হইবে না? সুতরাং জিন্নাসাহেবের ভারত-বিভাগ-প্রদেশের দাবী মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। বৃটীশের তৈরী প্রদেশের সীমানা ধরিয়া থাকিলে এই সব জায়গায় জনসাধারণের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংকুচিত ধ্বংস করা হয়। সুতরাং এই সমস্ত অমুসলিম জনসাধারণের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বিচার করা অতীব ন্যায় সঙ্গত এবং এই প্রশ্নের সমাধান কংগ্রেস ও লীগের আপোষ চুক্তিতেই সম্ভব।

এই ভাবে কংগ্রেস ও লীগের আপোষ বিচার করিলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অংশের সমস্ত জনসংখ্যার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা পাইবে। এই ভাবেই গান্ধী ও জিন্নার পুনরালোচনা ফলবতী হইতে পারিবে। এবং ইহারই ভিতর আমাদের দেশের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মূল নিহিত রহিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের নেতা এবং কর্মীদের এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলে কংগ্রেস ও লীগের সম্প্রীতি অতি শীঘ্রই এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার ফ্রণ্টে পরিণত হইবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে আমরা প্রত্যেকটী আন্দোলনে দ্রুতগতিতে সাফল্যের দিকে

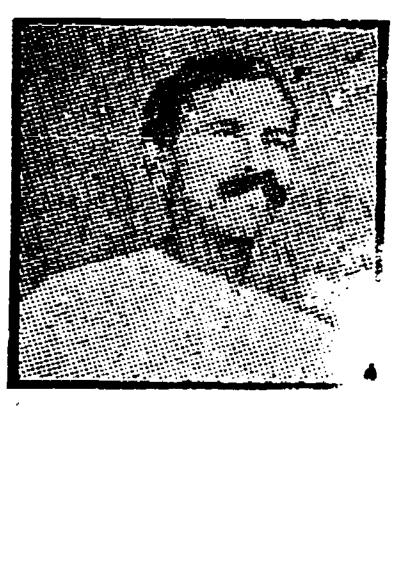

আগাইয়া যাইব। তখন কোন বাধা কোন বিঘ্নই বিরাট ভারতীয় মহাদেশের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

পাকিস্তান দাবীর ব্যাখ্যা

'ডেলি ওয়ার্কার'এর প্রতিনিধির নিকট মিঃ জিন্নার বিবৃতি

(লণ্ডনের 'ডেলিওয়ার্কারে'র ভারতীয় সংবাদাতা কমরেড এ, এস, আর, চারী গত ৫ই অক্টোবর কায়দে আজম জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন আলোচনাকালে কায়দে আজম কমরেড চারীর প্রশ্নাবলীর নিম্নোক্ত জবাব দেন।)

অমুসলমান স্বাধীনতাকামীদের কাছে পাকিস্তানের দাবী তিনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চান, এ বিষয়ে মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন :

'পাকিস্তান দাবীর তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে মনে রাখা দরকার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব এবং উত্তরপূর্ব্ব ভারতের বাংলা ও আসাম—এই ছয়টি প্রদেশে ৭ কোটি মুসলমানের বাস এবং সমস্ত প্রদেশের মোট লোক সংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জনের কম নয়। লোকসংখ্যার বাকি অংশ বর্ণ হিন্দু, অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত (বিশেষ করিয়া আসামে) সম্প্রদায় লইয়া গঠিত।

এই দুই ভূখণ্ড যে সমস্ত মুসলমানের বাসভূমি, তাহারা এই অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা চায়।'

স্বাধীনতার দাবী

প্রশ্ন : পাকিস্তান যে মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবী, তাহা বুঝাইয়া বলুন।

মিঃ জিন্না : পাকিস্তানের অন্তর্গত মুসলমানরা তাহাদের নিজেদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিতে চায় এবং এই জন্যই পাকিস্তান তাহাদের স্বাধীনতার দাবী। এই গবর্ণমেণ্টের পিছনে থাকিবে পাকিস্তানের সমস্ত অধিবাসীর সমর্থন ; জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর ইচ্ছানুসারে ও অনুমোদনে এই গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইবে।

হিন্দুস্তানের সহিত সম্পর্ক

প্রশ্ন : হিন্দুস্তানের সহিত পাকিস্তানের কি প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক থাকিবে ?

মিঃ জিন্না : পাকিস্তানের সহিত হিন্দুস্থানের নিশ্চয়ই প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক থাকিবে—যে কোন দুইটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঠিক যেমন সম্পর্ক থাকে। আমি একথা একাধিকবার জানাইয়াছি। যে কোন বহিঃশক্তিকে আমরা এই কথাই বলিব, 'ভারতবর্ষে তোমাদের হস্তক্ষেপ চলিবে না।' এই উপমহাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তান কখনই কোন বহিঃশত্রুর কুমতলব অথবা আক্রমণ বরদাস্ত করিবে না। আমেরিকা সম্পর্কে মনরো-র যে স্বদেশী নীতি—আমরা অনেকটা সেই নীতিই জোরালোভাবে চালাইয়া যাইব। আমার আশা আছে, হিন্দু-ভারতও আমাদের মত এই মনোভাবই পোষণ করিবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও লীগ

প্রশ্ন : আপনাদের দাবী ও আপনাদের আন্দোলন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি ?

মিঃ জিন্না : রক্ষণশীল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সব থেকে বড় বিরোধী। কারণ, আমার মতে একমাত্র পাকিস্তানই হইতেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বাধীনতালাভের সব থেকে দ্রুত ও নিশ্চিত উপায়। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ইহা ভাল করিয়াই জানে। ইণ্ডিয়া বিল উত্থাপন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে সম্রাটের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আমল হইতে এ পর্যন্ত তাহাদের প্রেরিত গুপ্ত কাগজপত্রে এবং এমন কি সরকারী প্রকাশ্য নথিপত্রেও তাহারা একথা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, আসলে তাহারা অখণ্ড ভারত বলিতে সব সময়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব টিকাইয়া রাখার কথাই বুঝাইয়া থাকে।

তাহারা ভাল করিয়াই জানে, অগ্রগতি কখনও রোধ করা যায় না। কিন্তু তবু তাহারা হিন্দু ও মুসলমানদের কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং একটি জাতীয় ইউনিট হিসাবে ভারতের জন্য একটি সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্টের আশায় হিন্দু ভারতকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা এক অসম্ভব প্রচেষ্টা। ইহার পিছনে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর একটি মস্ত বড় চাল আছে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসনবিধি প্রবর্ত্তনের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলিয়াছিল :

তোমাদের ঝগড়া দ্বন্দ্বের জন্য ভারতের প্রগতি ও কল্যাণ ঠেকিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর প্রেরিত জাতি হিসাবে আমাদের করণীয় কর্তব্য আছে। তোমরা একমত হইবার অপেক্ষায় আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। কাজেই আমরা শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ করিবই এবং বিবদমান সম্প্রদায়গুলির উপরওয়ালা হিসাবে সেই শাসনতন্ত্র জোর করিয়া চাপাইয়া দিব।

—যাহাতে আবার ঐরূপ উক্তি করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার জন্যই সাম্রাজ্যবাদীদের এই নূতন চাল।

অনুরূপ শাসনতন্ত্রে হিন্দু অথবা মুসলমান—ভারতের কোন অংশই সত্যকার স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন কিছুই পাইবে না।

দেশরক্ষা

প্রশ্ন : পাঞ্জাবে সরকার ও তাহার দালালরা প্রচার করিতেছে যে, ফ্যাশিষ্ট চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আপনাদের নাকি আগ্রহ নাই এবং সেই কারণে লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে নাকি যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে ?

মিঃ জিন্না : ইহা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। আমরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করি নাই। বরং, যুদ্ধের শুরু হইতে এ বিষয়ে শুধু আমি একা যে বলিয়াছি তাহা নয়, মুসলিম লীগ বার বার তাহার প্রস্তাবে স্পষ্টাস্পষ্টি ঘোষণা করিয়াছে যে, আমরা কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ বরদাস্ত করিব না, আমরা সাগ্রহে আমাদের দেশ রক্ষা করিতে প্রস্তুত ও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা সহযোগিতা করিতে চাই।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কাজেই আমাদের পক্ষ হইতে সহযোগিতা সম্ভব হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। গবর্ণমেণ্টের যা কিছু ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব তাহারা নিজেদের মুঠার মধ্যে রাখিয়া দিতে চায় এবং আমাদের মত অধীনদের দিয়া যতকিছু ভার ও দায়িত্ব বহন করাইয়া নিতে চায়।

যে সমস্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা কাজ করিতেছে, প্রাদেশিক ব্যাপারে কিছুটা ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব থাকার ফলে তাহারা নিজের নিজের প্রদেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর

প্রশ্ন : লীগ অথবা কংগ্রেস কাহারো সহিত মীমাংসা করিতেই গবর্ণমেণ্ট চায় না ; কারণ আসলে ক্ষমতা ছাড়াতেই তাহার আপত্তি—এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন ?

মিঃ জিন্না : আমরা যাহাতে সাগ্রহে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারি এবং নিজেদের দেশ রক্ষা করিতে পারি, তাহার জন্য কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ—কাহারো হাতেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের অংশ দিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চায় না।

বৃটিশ জনগণের কাছে বাণী

প্রশ্ন : ব্রিটিশ জনগণের কাছে কী আপনার বাণী ? আপনার মতে তাহাদের কর্তব্য কি ?

মিঃ জিন্না : পাকিস্তানের মধ্য দিয়া শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও স্বাধীনতা আসিবে—পাকিস্তানের এই নীতি মানিয়া লইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ সৃষ্টি করাই হইতেছে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। বৃটিশ জাতির মধ্যে হৃদয়বান লোকের অভাব নাই। ইহার মধ্য দিয়াই তাহাদের আন্তরিকতা প্রকাশ পাইবে। ব্রিটিশ জনগণের কাছে ইহাই আমার বাণী।

স্বাঃ এম, এ, জিন্না

হিন্দুর উত্তরাধিকার ও বিবাহ

২

লেখক : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

রাও বিল আইনে পরিণত হইলে হিন্দুসমাজে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া গতানুগতিক পন্থীর দল যে তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক প্রথম প্রবন্ধে আমি তাহা আলোচনা করিয়াছি। বৈবাহিক আদান-প্রদান ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রাচীন ও প্রচলিত ব্যবস্থা যে সমাজের পক্ষে অশেষ অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে অস্বীকার করা, চিন্তা ও বুদ্ধির জড়ত্বমাত্র। সামাজিক রক্ষণশীলতার দিক হইতে যাঁহারা প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই, করিতেছেন না। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত এক-শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বহুবিধ নূতন নূতন বৃত্তিজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটায় দেশাচার ও লোকাচারের সংস্কারের গণ্ডী যে ভাবে ভাঙ্গিয়াছে, যৌথ-পরিবার প্রথা বিলুপ্ত হইয়া পারিবারিক জীবন যে ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে উত্তরাধিকার ও বিবাহ-বিধির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেননা, বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার অভাবে সমাজের একাংশে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর অংশে বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দু নারীদের দুঃখদুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের জন্যই রাওকমিটি সংহিতা ও স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত এবং রক্ষণশীল অংশের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যুগপ্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও, অগ্রগতির দিক হইতে বিচার করিয়া সমাজ কল্যাণকামীরা সমর্থন করিতেছেন।

উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিলে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের উইল করিবার অধিকার আছে এবং ইচ্ছামত ত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের অধিকার আছে। যে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উইল থাকিবে না, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী ও কন্যা সর্ব্বস্বত্বাধিকারে সম্পত্তির অংশ পাইবে, কন্যারা পাইবে পুত্রদের অর্দ্ধেক। কৃষিজমীর কোন ভাগ কন্যারা পাইবে না। এই সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে যাঁহারা ভ্রাতা ভগ্নীতে মামলা এবং হিন্দুসমাজের ভাবী দারিদ্র্য উল্লেখ করিয়া সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের কুযুক্তির উত্তরে আমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি (১) বাঙ্গলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে পতির ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার রহিয়াছে, দক্ষিণে পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার ও অংশ আছে। তাহার ফলে ঐ সকল অঞ্চলের হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(২) এই প্রস্তাবে শতকরা ৮০ জন হিন্দু কৃষক, শ্রমিক, কারিগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ত্যক্ত ধনের (যাহা প্রায় থাকে না, থাকে ঋণ) কোন সম্পর্ক নাই। উকীল, ডাক্তার, কেরাণী শ্রেণীর বৃত্তিজীবী—যাহাদের সংখ্যা শতকরা পনর জন—ইহাদের পরিবারে স্ত্রী ও বিধবা এবং অবিবাহিতা কন্যাদের কপালে অতি অল্পই জুটিবে, যাহার ফলে অশান্তির সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সমাজের ধনী ও উচ্চ মধ্যশ্রেণী, যাঁহাদের সংখ্যা সমগ্রের শতকরা ৫ জন, অর্থাৎ সমাজের যে অংশে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা সর্ব্বাধিক, সেইখানে নারীরা কিছু অধিকার ও মর্য্যাদা পাইবেন। আমাদের দেশের ধনী জমীদার ও ব্যবসায়ী বিলাসে পালিতা সহধর্ম্মিণীর জন্য উইলে ১৫৲।২৫৲ মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া বৈধব্যের কৃচ্ছ্র ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া যান, পুণ্যশ্লোক পিতা উইল না করিলে, ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র বিপুল বিত্ত আত্মসাৎ করিয়া, জননীকে ১৫৲ টাকা মাসোহারা দিয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। ফলে বাঙালী নারীর কি দুর্দ্দশা হয় তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ভদ্র ও স্বচ্ছল পরিবারে নানা কারণে আজকাল অল্প বয়সে বিবাহ হয় না। অনেক শিক্ষিতা অনূঢ়া কন্যা চাকুরী করিয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করে; ইহারা পিতৃগৃহে বাস করিবার আইনসঙ্গত অধিকার পাইলে পিতা বা ভ্রাতারা মামলাবাজীর আশঙ্কায় ভীত হইবেন কেন!

(৩) সম্পত্তি অখণ্ড বা অব্যাহত রাখিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হয়, মামলাও হয়। ভূসম্পত্তি পাকা উইল করিয়া রক্ষা করিবার জন্য অনেকে উত্তরাধিকারীদের দানবিক্রয়ের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মাসোহারাভোগী করিয়া রাখেন; ফলে পরিণামে এটর্ণী, উকীল, রিসিভার এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীরা তাহা ভোগ করে। পুত্র পরিশ্রম করিবে না, "পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবে" এই আদর্শই হিন্দুসমাজের অধিক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সম্পত্তি বণ্টন হওয়াতেই সমাজের কল্যাণ, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সম্পত্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইলেই সমাজ দরিদ্র হয়।

লাঞ্ছিতা, অধিকার বঞ্চিতা নারীদের দুর্নীতি ও দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করার জন্যই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠিয়াছে। হিন্দুসমাজের নারীদের সামগ্রিক দুর্গতি যাহাদের দেখিবার শক্তি নাই, বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাহারাই মূঢ়ের মত ভুল বুঝিতেছে এবং অপরকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে।

হিন্দু বিবাহ বিধানটি আইনে পরিণত হইলে অন্যকার অনেক গলদ দূর হইবে। দেশাচার ও লোকাচারের প্রভাব আমাদের সমাজে অতি প্রবল। সাধারণতঃ ঐগুলিকে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান বলিয়া মানিয়া লয়। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় লোকে মনে করে, স্মরণাতীত কাল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু যখন স্বাধীন ও জীবন্ত জাতি ছিল, তখন বৈবাহিক আদান প্রদানে এত কড়াকড়ি ছিল না, জাতি শ্রেণীর এত ভেদ ছিল না। সমষ্টির সহিত সামাজিক যোগসূত্রহীন ছুঁৎমার্গী হিন্দুসমাজ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গত ৩।৪ শতাব্দীতে যে সকল অদ্ভুত অশাস্ত্রীয় শ্রেণী ও শাখা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলেই হিন্দু সমাজ আজ দুর্ব্বল, ক্ষয়িষ্ণু। বৈবাহিক আদান প্রদান কৃত্রিম হওয়ার ফলে আজ হিন্দুসমাজে শতকরা ২৭ জন নারী বিধবা। ক্ষুদ্র গণ্ডীর সহিত বরপণ ও কন্যাপণ মিলিত হইয়া, সমাজের একাংশে অবিবাহিতা নারীর আধিক্য, অন্য অংশে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব। কন্যাপণ কায়ক্লেশে সংগ্রহ করিয়া যে হিন্দু যৌবনের শেষপ্রান্তে গিয়া বালিকা বিবাহ করে, সে বিধবা ও অনাথ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি করিবে? আমাদের বিবাহ প্রথা যদি এতই ভাল, তাহা হইলে হিন্দু-নারীরা দলে দলে কেন ভিখারিণী, বেশ্যা ও বৈষ্ণবী হয়? এই হৃদয়হীন আত্মপরায়ণ অনুদার সমাজের কৃত্রিম অস্বাভাবিক বৈবাহিক আদান প্রদান প্রথা হতভাগিনী নারী সৃষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতিদিন পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে মানবপ্রকৃতি বিদ্রোহও করিতেছে। নাগরিক জীবনে ভদ্রসমাজের মধ্যে আজ অসবর্ণ বিবাহ ঠেকান যাইতেছে না। শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর বস্তীজীবনে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বেহারীর মধ্যে বিবাহ চলিতেছে। পল্লীতে লোকে নানাকারণে রক্ষণশীলতা মানিয়া চলে। উচ্চশ্রেণীর জমীদার, মহাজন ও বণিকশ্রেণীর পীড়ন ও শাসনে কৃষক ও কায়িক শ্রম-বৃত্তিজীবীরা প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয়, এমন কি আইনসঙ্গত হইলেও বিধবা বিবাহ করিতে সাহস পায় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই হিন্দু-মহাসভাপন্থী নেতারা—যাঁহারা হিন্দু সংগঠন, হিন্দুর ঐক্য ও শক্তি বৃদ্ধির কথা সর্ব্বদা প্রচার করেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজের প্রধান দৌর্ব্বল্য ও দুর্নীতি দূর করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহ-বিধির প্রতিবাদ করিতেছেন।

(শেষাংশ ৭ম পৃঃ দেখুন)

গান্ধী-জিন্না মিলনের অগ্রগতিকে পিছনে টানিও না

'আবার সাক্ষাৎ চাই' ঃ জনতার কণ্ঠে ধ্বনি

কলিকাতার ছাত্র

গত ১৪ই অক্টোবর **কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের** উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সম্পাদক মৌলবী আবুল হাশেম সভায় যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন ঃ গান্ধী জিন্না আলোচনায় সাময়িকভাবে যে ছেদ পড়িয়াছে, তাহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। আমরা ঐক্যের পথে যে যাত্রা শুরু করিয়াছি সে যাত্রা ক্ষান্ত হয় নাই। সেই যাত্রাপথে আজ শুধু একটি নূতন বাঁক আসিয়াছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, মহাত্মাজী ও কায়েদে আজম উভয়েই পুনর্বার মিলিত হইবার আশা পোষণ করিয়াছেন। আর দেশবাসীর হাতেই এই দুই নেতার পুনরায় সাক্ষাতের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।

সভায় বিখ্যাত **কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত** বলেন, গান্ধীজী নিজেই ভবিষ্যৎ পুনরালোচনা সম্বন্ধে আশাবাদী। কংগ্রেস ও লীগ কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যের ভাব বজায় রাখিয়া ঐক্যের পথ সহজ করিয়া তুলিতে হইবে।

সভায় কংগ্রেসনেতা ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কমিউনিষ্টনেতা সোমনাথ লাহিড়ী, ছাত্রনেতা রঞ্জিৎ গুহ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কলিকাতার নাগরিক

গত ১৫ই অক্টোবর কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ

গত ৯ই অক্টোবর **ময়মনসিংহ** শহরে পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের দাবীতে যে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে **জেলা লীগের সম্পাদক মৌলবী গিয়াসুদ্দিন** বলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিতর দিয়াই স্বাধীনতা আসিবে। আবার যাহাতে দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাহার জন্য নগর ও পল্লী হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠে মিলনের দাবী ধ্বনিত হউক। সর্বত্র যাহাতে কংগ্রেস ও লীগ প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করে, তাহার জন্য বক্তা আবেদন জানান। সভায় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের ও শ্রীযুক্ত সুরেন ঘোষের মুক্তি দাবী করা হয়।

হুগলী

গত ৮ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে **হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনের** প্রকাশ্য অধিবেশন এক প্রস্তাবে বলা হয় ঃ গান্ধী-জিন্না ঐক্যচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। বরং, **ঐক্য আন্দোলন এক কদম অগ্রসর হইয়াছে** এবং জাতীয় ঐক্যের ভিৎ রচিত হইয়াছে। গান্ধী-জিন্না পুনর্মিলনের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্যের পথে স্বাধীনতার দিন আসন্ন করার জন্য ছাত্রসমাজের বিরাট কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।

আসাম

জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য আন্দোলন চালাইবার জন্য **গৌহাটির** সমস্ত মতবাদের ছাত্রদের লইয়া একটি **সম্মিলিত ছাত্র বোর্ড** গঠিত হইয়াছে। গত ২রা অক্টোবর এই বোর্ডের উদ্যোগে শহরে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত **কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ**। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া ও কমিউনিষ্ট নেতা বীরেশ মিশ্র আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানান।

রামপুর, কারোরা, নলবাড়ী ও **বেলশরে** ৪টি বড় বড় জন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সভায় মহাত্মাজী ও কায়েদে আজমের কাছে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় মিলিত হইবার অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়

বাংলার শ্রমিক শ্রেণী

গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর **বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের** ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নিম্নোক্ত মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ঃ প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার জন্য দু'পক্ষের মতামত বন্ধুভাবে বিচার করিতে হইবে এবং চরম ত্যাগ স্বীকার ও আপোষরফার সাহায্যে যাহাতে ঐক্যের একটি সর্বসম্মত সূত্র গড়িয়া উঠে তাহার জন্য উভয় নেতা পুনরায় মিলিত হইয়া সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন—এই সভা তাঁহাদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাইতেছে। এই সভা উভয় নেতাকে এই আশ্বাস দিতেছে যে, এই ঐক্য প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তাঁহারা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিবেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কংগ্রেস ও লীগনেতাদের বাণী

বোম্বাইয়ে ২০শে অক্টোবর হইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তাহব্যাপী যে বৈঠক হইবে, তাহার পূর্বাহ্নে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে পাঞ্জাব লীগ মহিলা কমিটির সভানেত্রী বেগম বশীর আহমদ, নিখিল ভারত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য লাতফুর রহমান কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসসদস্য শ্রীপ্রকাশ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বাণী প্রেরণ করিয়াছে

তাঁহারা আবার মিলিত হইবেন
খাসিয়া-নেতার উক্তি

গত ৮ই অক্টোবর, **কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিলং অপেরা হলে গান্ধী জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। হলে এত জনসমাগম হয় যে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। বহুদিনের মধ্যে শিলংএ এত বড় সভা হয় নাই। আইন সভার স্পীকার বসন্ত কুমার দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

খাসিয়া নেতা মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হয় নাই—তাহার প্রমাণ গান্ধী-জয়ন্তী উৎসবের আবেদনপত্রে প্রথম স্বাক্ষরকারী হইলেন মুসলীম লীগের প্রেসিডেণ্ট মোঃ এ, টি, ওয়াছে। এই আলোচনার ভিতর দিয়া উভয় নেতা পরস্পরকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, তাঁহারা আবার মিলিত হইবেন এবং সেই মিলনের ভিতর দিয়াই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। খাসিয়া সম্প্রদায়েরও ন্যায্য দাবী দাওয়া পূর্ণ হইবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকট প্রতিরোধে ছাত্রসমাজের অভিযান

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য গত ২২শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' ছাত্রজীবনের বহুমুখী সংকটের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই ছবি আজ খুবই সত্য। একদিন 'সপ্তনারণের যুগে'র সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আমাদের দেশে যে একদল বুদ্ধিজীবী গড়ে উঠেছিল—ছাত্র আন্দোলনের মূলে ছিল তাদেরই অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দেশসেবার প্রেরণা। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগামী ভাবধারাই ছিল তাদের প্রাণের উৎস।

আজ জাতীয় জীবনের গভীর নৈরাশ্যে আর অবসাদে বুদ্ধিজীবী মন পঙ্গু, ছাত্রজীবনে আজ তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি। নৈরাশ্যে অবসাদগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী মন কোনদিকেই আজ সুস্থ বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সভ্যতাবিরোধী কুৎসিত পথে তার পরিচয় পাই নানাবিধ আদর্শচ্যুত কার্যকলাপে।

তবুও সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে চকিত বিদ্যুৎরেখার মত তার অপূর্ব কর্মোদ্যম চোখে পড়ে। আজও এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছাত্রসমাজের সার্বজনীন উদ্যম ত' নয়ই, বরং সীমাহীন মরুভূমিতে ক্ষুদ্র ওয়েসিসের মতই তা' অসহায়। তা'হলেও এই জাগ্রত প্রাণশক্তির মধ্যেই রয়েছে অতীতের সম্পদ, ভবিষ্যতের সন্ধান।

ক্ষীণ অথচ মহান প্রয়াস

জাতির আত্মবিলুপ্তির বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই গৌরবময় সংগ্রাম নানা জায়গায় নানাভাবে রূপ নিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন হতাশার মধ্যে ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক কর্মোদ্যমের একটা ক্ষীণ অথচ মহান্ ধারা বরাবর বেঁচেছিল। দেশবাসী যখন দেশসেবার পথে আস্থাহীন, তখন ছাত্রসমাজের একটা অংশও যে দেশসেবার ধারাকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছে, সেটাই আজ সব থেকে বড় কথা।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে

গত দুবছরে ছাত্রসমাজ জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য, বাংলায় গৃহবিবাদের পরিবর্তে সংযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর জন্য যে আন্দোলন করেছে তা' নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সত্য বটে সমস্ত ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে সাড়া দেয়নি। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস যেখানে সার্বজনীন, সেখানে ছাত্রসমাজের একটা অংশও যে সাড়া দিয়েছে তা' নিতান্ত কম কথা নয়। এই চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নি তার প্রমাণ আমরা পাই গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎকারের ফলে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনায় ছাত্র সমাজের উল্লাসে। সেদিন সমস্ত বাংলায় তিন শতাধিক ছাত্রসভায় এই ঐক্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষে ও রোগ-সেবায়

ছাত্রদের একক চেষ্টায় ৫০,০০০ হাজার দুঃস্থ তিন মাস খেয়ে-পরে বেঁচেছে, ৮০,০০০ হাজার রুগ্ন দেশবাসী ঔষধ ও শুশ্রূষায় বেঁচে উঠেছে, ২০,০০০ হাজার নারী ও শিশু তাদের নগ্নতা ঢাকবার মত আচ্ছাদন পেয়েছে।

এই কাজের ভিতর দিয়েই ছাত্রসমাজের মধ্যে নূতন দেশপ্রেম জেগে উঠল। দুর্ভিক্ষ আমাদের সামনে অধঃপতনের সহস্র পথ খুলে দিয়েছিল, আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সেই অধঃপতনের পথে উৎসাহিত করেছিল। সেই সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মধ্যে আদর্শচ্যুতি যেরকম সহজ ছিল, আদর্শনিষ্ঠাও ছিল তেমি কঠিন। দুর্ভিক্ষের শুরুতেই যখন সমস্ত সামাজিক চেতনা লুপ্ত করে কদর্য্য স্বার্থপরতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল তখন আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি জিলার ছোট ছোট স্কুলের ছাত্ররা সপ্তাহে একদিন উপবাস ক'রে সেই পয়সায় তাদের দুঃস্থ সহপাঠীদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

বীরত্বের অলিখিত কাহিনী

অভাবের তাড়নায় যখন শত শত ছাত্র কিশোর বয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে কুলিগিরির কাজ খুঁজছিল, তখনও আবার তাদের সাহায্যে তাদের সহপাঠীরাই এগিয়ে এসেছিল ঃ হাওড়া, কাটিপাড়া ও কিশোরগঞ্জে স্কুল খুলে, বহু জায়গায় পাঠাগার খুলে, বিভিন্ন ৭টা জিলাতে সস্তায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে বহু ছাত্রের শিক্ষা জীবনকে তাদের সহপাঠীরা রক্ষা করেছিল।

হাওড়ায় ১২টি স্কুলের ছাত্র দারিদ্র্যের তাড়নায় লেখাপড়া ছেড়ে চৌর্যবৃত্তি শুরু করে। তাদের সহপাঠীদের চেষ্টায় আবার তারা সভ্য সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বীরত্বের এরকম বহু অখ্যাত কাহিনী ছাত্র সমাজের মধ্যে পাওয়া যাবে। ইতিহাস হয়ত এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেনি কিন্তু ছাত্র জীবনের উপর এর স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাই আমরা দেখি ছাত্র সমাজের মধ্যে অধোগতি ও ভাঙ্গনের প্রতিভূ যারা, তাদের কুমন্ত্রণা ছাত্রসমাজকে বিপথগামী করতে পারেনি। এই বিরাট বুভুক্ষাকে লুটতরাজের রাস্তায় পরিচালিত করবার অপচেষ্টায় তারা ছাত্র-সমাজের কোন সমর্থনই পায়নি। দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট দেশবাসীকে বাঁচাবার স্বাভাবিক প্রেরণাই তাদের এই দেশদ্রোহী পথ থেকে দূরে রেখেছে।

ছাত্র ঐক্য

এই প্রেরণাই সংঘবদ্ধ রূপ পেয়েছে বাংলার শতাধিক শিক্ষক-ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটি এবং ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যুক্ত বোর্ডে—ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সমাবেশে। দেশজোড়া ঐক্যের প্রতি অবিশ্বাস ও আত্মকলহের মধ্যে এই ছাত্র-ঐক্য ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর কাছে নূতন ভরসা দিয়েছে, নূতন কর্মের আহ্বান জানিয়েছে।

কিশোর আন্দোলন

ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন উদ্যম চলেছে যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব আজকের দেশজোড়া অধোগতির দিনে অত্যন্ত বেশী। আমাদের কিশোর সমাজের 'বয়সোচিত অমলিন মন এখন থেকেই বিকৃতির পথে চলেছে' এর আশঙ্কাজনক উদাহরণ রাস্তাঘাটে সর্বত্রই চোখে পড়ে।

কিশোর সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দেশপ্রেম যাতে পারিপার্শ্বিক বিকৃতির ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত হয়ে দেশকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে পারে তার চেষ্টা করছে "কিশোর বাহিনী"। এখনও এই চেষ্টা হয়ত নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি, কিন্তু তবুও চারিদিককার পঙ্কিলতা যে তাদের মনকে এখনও সম্পূর্ণ বিষাক্ত করে তুলতে পারেনি তার প্রমাণ দুর্ভিক্ষের সময় তাদের সেবাকার্য। তারা নিজেদের একক চেষ্টায় সমস্ত বাংলাদেশে ২০টি দুগ্ধ-কেন্দ্র চালিয়েছে।

নূতন সংস্কৃতির বনিয়াদ

আদর্শভ্রষ্টতা ও প্রতিক্রিয়ার এই অবাধ অগ্রগতির মধ্যেও জাতির শিক্ষাসভ্যতা ও দেশপ্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার এই চেষ্টা রক্ষা পেয়েছে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্যে। তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছে নাচে গানে, নাটকে। চারিদিকের চিন্তার দৈন্য ও অবিশ্বাসের সুরের মধ্যেও ছাত্রদের কোন কোন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা অতীত দিনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সুর পাই। তাই ছাত্রদের সাংস্কৃতিক বাহিনী জাপ-আক্রান্ত আসামে এত বড় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তাই সেখানকার জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন, তোমাদের অনুষ্ঠান দেখে ১৯০৫ সালের কথা মনে পড়ে। সেদিনকার নবীন দেশাত্মবোধ আপন সজীবতার জোরেই যেমন সবাইকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিল, তোমাদের গান, নৃত্য ও নাট্যও তেমনি তার নিজস্ব বলিষ্ঠতায় জাতির ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতাকে লজ্জা দেয়!

বহু অধঃপতনের মধ্যেও ছাত্রসমাজে আজও এই সুস্থ দেশপ্রেমের ভাষা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই আংশিক বিদ্রোহের মধ্যেই রয়েছে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভবিষ্যৎ।

—প্রভাত দাশ গুপ্ত

সারা বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

সরকারের ‘যথাসাধ্য করার’ ইহাই কী নমুনা ?

কলিকাতায় ও বাংলার জেলায় জেলায় ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই খবর আসিতেছে কুইনাইনের দারুণ অভাব, রোগীর পথ্য—দুধ, সাবু, বার্লি প্রভৃতি গরীবের পক্ষে পাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফলে মৃত্যু ও আক্রমণের হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। শত শত ফসলের জমি আজ অনাবাদী পড়িয়া আছে, ঘরে ঘরে রোগে পঙ্গু কৃষকের খাটার ক্ষমতা নাই। কারখানায় কারখানায় একটার পর একটা যন্ত্র লোকাভাবে বেকার পড়িয়া আছে। বস্তির পর বস্তি ম্যালেরিয়ার কবলে। ওষুধ নাই; ওষুধ থাকিলেও বিলি করার লোক নাই। সর্বগ্রাসী মহামারীর হাতে বাংলার সমগ্র জীবন আজ বিপন্ন।

১১ই অক্টোবর বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী খানবাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দীন বলিয়াছেন—গত জুলাই মাস হইতে বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাকে রুখিতে সরকার মানুষের সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছে এবং ইহার বেশী সরকার কিছু করিতে পারে না। অবস্থা সত্য সত্যই সাংঘাতিক। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারে সরকারের কোন হাত নাই, ইহা খোদার দেওয়া।

বাংলার এই দুর্দ্দিনে সরকারের তরফ হইতেই যদি এইরূপ নিরাশার বাণী আসে তবে সাধারণ লোকের মনের অবস্থা কি হইতে পারে? রোগ নিবারণ গভর্ণমেণ্টের হাতে নাই, একথা কেমন করিয়া যে একজন সরকারী মুখপাত্রের উক্তি হইতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। দেশের সংঘবদ্ধ শক্তি এবং সরকার যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়া দাঁড়ায়—যদি অবিলম্বে কুইনাইন ও পথ্যের চোরাবাজার বন্ধ করিয়া জনসাধারণের সহযোগিতায় বাংলা সরকার ম্যালেরিয়া কমাইতে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করে, তবে বাংলার জনসাধারণ এই নিদারুণ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবেই। আজ নিরাশায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার সময় নাই, আজ সমবেত প্রচেষ্টায়—সরকার ও জনসাধারণের মিলিত শক্তিই ম্যালেরিয়াকে রুখিতে পারিবে।

জেলায় জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিভাবে বাড়িয়াছে এবং কুইনাইন ও পথ্যাভাবে গ্রামে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা আমাদের সংগৃহীত নীচের সংবাদগুলি হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে :

রাজসাহী

এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। আত্রেয়ী থানার গ্রামগুলিতে শতকরা ৫০ জন হইতে ৮০ জন পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। রাণীনগর থানার গ্রামগুলির অবস্থাও ভাল নয়। স্থানীয় হাইস্কুলে ২১২ জন ছাত্রের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন এবং সাহাগোলা এম, ই স্কুলে ১০০ জন অনুপস্থিত থাকে।

শিংড়ী থানার লালোর ইউনিয়নে শতকরা ৩০ জন শয্যাশায়ী। এই অঞ্চলে আত্রাইকুলা গ্রামে ৮৬ ঘর লোকের মধ্যে ৩২টী পরিবারেই গড়ে ২ জন করিয়া অসুস্থ। পুটিয়া থানার বানেশ্বর ইউনিয়নে সরকারী হাসপাতালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় গত জানুয়ারীতে ৭০৮ জন হইতে আগষ্টে দাড়াইয়াছে ১০২১ জন। সবই নূতন রোগী। চারঘাট থানায় ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা খুবই বাড়িয়াছে।

রাজসাহী শহরের রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর এলাকাতে ১৭৫টি পরিবারে ৩৫৯ জন মাসাধিক কাল হইতে ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছে।

বীরভুম

এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই জেলার শতকরা ৩০ জন এই রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। যদিও ম্যালেরিয়া বীরভূমে নূতন নয়, তবুও এবছর ইহার ব্যাপকতা ও মৃত্যুহার অনেক বেশী এবং অধিকাংশ স্থলেই ইহা ‘ম্যালিগনাণ্ট টাইপ।’

রোগের এই দারুণ প্রাদুর্ভাবে ফসল কাটার লোকের অভাব ঘটিবে এবং রবিশস্যের চাষ এক রকম বন্ধ থাকিবে।

কিভাবে এই রোগ এক একটি গ্রামকে ধ্বংসের পথে নিতেছে তাহা ভ্রমরকোল গ্রামের খতিয়ান হইতেই বোঝা যাইবে। হাতমধ্যেই এখানে ১১ জন এই রোগে মরিয়াছে এবং ৬৯টি পরিবারের ১৪৫ জন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। স্থানীয় উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ৩১ জন ছাত্রের মধ্যে ২৮ জন অসুস্থ এবং ২ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রধান শিক্ষক শয্যাশায়ী।

মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রায় সমুদয় অঞ্চল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সর্বত্রই বিদ্যমান। বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অত্যধিক। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ২৩১৬২ জন মারা গিয়াছে।

হাওড়া

এই জেলার আমতা থানায় এই বৎসর ম্যালেরিয়া অত্যন্ত ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা অনেকখানি বিকল হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া স্থানীয় স্কুলগুলির অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় হইয়া উঠিয়াছে। পাঁতিজাল, বেলিয়া, মুন্সিরহাট, বলহরিশপুর, রসপুর, উদং, ঝিকিয়া প্রভৃতি এলাকায় প্রায় শতকরা ৫০ জন ছাত্র ও শিক্ষক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔষধ না পাওয়ায় অথবা অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায় তাহারা বিনা ঔষধে রোগভোগ করিতেছে।

মেদিনীপুর

সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। বলিষ্ঠ লোক পীড়িত হইয়া পড়াতে চাষের দারুণ ক্ষতি হইতেছে। ইহার জন্য এই অঞ্চলে সম্ভবতঃ আট ভাগের এক ভাগ জমি পতিত পড়িয়া থাকিবে।

বরিশাল

ম্যালেরিয়া এমন ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে যে শুধু একমাত্র জেলা বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় গুলিতেই ২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই এক সপ্তাহে ১২৪০০ ম্যালেরিয়া রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী

এই জেলার অন্তর্গত গোঘাট থানায় গ্রামে গ্রামে ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঔষধ ও পথ্যের অভাবে অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। রোগীদের পথ্য দিবার কোন বন্দোবস্তই করা যাইতেছে না। সাগুর সের চোরাবাজারে ৬৲ হইতে ১০৲ দরে বিক্রয় হইতেছে। মিছরী একদম পাওয়া যায় না—চিনি পাওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

পাবনা

বেরা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। কুইনাইনের দারুণ অভাব।

রাণাঘাট

এখানে ম্যালেরিয়া পুনরায় মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। শহরে এমন বাড়ী নাই যেখানে রোগী নাই। **কুইনাইন একেবারে পাওয়া যাইতেছে না।**

চাঁদপুর

এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে।

বগুড়া

জেলার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ সুরু হইয়াছে। জয়পুর থানার ভাতকোটা অঞ্চলের শতকরা ৭০ জনেরও বেশী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ধলাহারা মৌজায় ১৪৮ জন অধিবাসীর মধ্যে ৯৬ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী।

ম্যালেরিয়ার কবলে

কুইনাইন চাই, ডাক্তার

একমাত্র বেলেঘাটায়

[জনযুদ্ধের বিশেষ

গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কমিউনিষ্ট কাউন্সিলর কমরেড মহম্মদ ইস্‌মাইল বেলেঘাটা অঞ্চলে ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, একমাত্র ২৮ নং ওয়ার্ডেই ৪০ হাজার লোকের মধ্যে ৩০ হাজার লোক শয্যাশায়ী আছে। কর্পোরেশনের চীফ অফিসার স্বীকার করেন যে, অবস্থা সত্য সত্যই খুব গুরুতর।

‘জনযুদ্ধে’র প্রতিনিধি সমগ্র বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা খুবই উদ্বেগজনক।

বিধ্বস্ত এলাকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড হইতে ক্যানেল পর্য্যন্ত সমগ্র ২৮ নং ওয়ার্ড ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। স্থানীয় সুচিকিৎসক ডাঃ ভোলা বসু, এম, বি বলেন, “এই এলাকার ৪০ হাজার বাসিন্দার মধ্যে শতকরা একজন দুইজনও সুস্থ পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।” তাঁহার নিজের পরিবারে ১২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রমিকবস্তী গুলির অবস্থা সম্পর্কে কাদাপাড়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন যে তথ্য সংগ্রহ করে তাহাতে দেখা যায়ঃ কাদাপাড়ার কয়েকটি বাড়ীতে মোট ৭০০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৬০০ বা তাহারও বেশী শ্রমিক শয্যাশায়ী হইয়াছে।

সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ

কিন্তু ম্যালেরিয়া কেবল শ্রমিকদেরই আক্রমণ করে নাই। স্থানীয় কর্পোরেশন কাউন্সিলর শ্রীযুত অবিনাশ ব্যানার্জীর বাড়ীতে দেখা গেল, তিনি নিজে এবং পরিবারের প্রত্যেকটি লোক শয্যাশায়ী। মণীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী একজন কংগ্রেস কর্ম্মী। তাঁহার পরিবারে ৯ জন সভ্যের মধ্যে ৯ জনই আক্রান্ত, তিনি নিজে গত ২৬ দিন যাবৎ ভুগিতেছেন। স্থানীয় হাসপাতালে যাইয়া দেখা গেল, সেখানে তিনজন ডাক্তারের মধ্যে একজন শয্যাশায়ী। রিলিফের কর্ম্মীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন আক্রান্ত।

ছোট ছোট শিশুরাও বাদ পড়ে নাই;

কলকারখানা অচল

কাদাপাড়া চটকলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তাঁহারা বলেন, “মিলে মোট ১৮ শত শ্রমিক কাজ করে; এখন মাত্র ১২ শত শ্রমিক দিয়া কাজ চালাইতে হইতেছে, তাহাতে প্রত্যহ ১ শত তাঁত বন্ধ থাকিতেছে। প্রায় ৩ শত শ্রমিক কলকাতা ছাড়িয়া নিজ নিজ দেশে পলায়ন করিয়াছে। গত বছর হইতে অনবরত ম্যালেরিয়ার ফলে মিল পরিচালনায় ভীষণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে, কোম্পানীর হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হইতেছে।” এই এলাকায় দুইটি জুটমিল ছিল, সেখানে এখন একটি মিল চালু আছে; অথচ সেই একটি মিল চালু রাখাই এখন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। একটি কেমিক্যাল কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে তাহাদের ম্যানেজার, কর্ম্মচারী সকলেই পীড়িত, কাজকর্ম্ম প্রায় অচল। ভারতকুমার দাস

মৃত্যুর হার চার সপ্তাহে ১০০

বেলেঘাটা ও নারিকেলডাঙ্গা এলাকায় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে চার সপ্তাহে ম্যালেরিয়ায় ১১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যায়ঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ১৮; ৩০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ২২ঃ ৭ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০; ১৪ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯।

এই চার সপ্তাহে ট্যাংরা অঞ্চলের ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর সংখ্যা ১১।

কলিকাতার সহরতলী

চাই, ভলাণ্টিয়ার চাই

৩০,০০০ আক্রান্ত

[...তিনিধির বিবরণ]

একটি ছোট ষ্টেশনারী দোকানের মালিক। তাহার দোকানে আগে দৈনিক প্রায় ২০-২৫৲ করিয়া বিক্রি হইত, এখন তাহা ১০৲ টাকা বা তাহারও কমে দাঁড়াইয়াছে। চাউলের কণ্ট্রোলশপে খরিদ্দার দেখা যাইতেছে না। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়াছে। দোকানে বাজারে লোকজনের বড় একটা ভীড় দেখা যাইতেছে না।

ঔষধকেন্দ্রে ভীড়, কুইনাইন নাই

কেবল যাহা কিছু ভীড় দেখা গেল, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল এবং কুইনাইন-কেন্দ্রে। স্থানীয় প্রাইভেট চিকিৎসকদের নিকট ম্যালেরিয়ার কোন ঔষধ নাই, তাহারা কুইনাইন বা কুইনাইনের কাজ করে এমন কোন ঔষধ পান না। সমগ্র ২৮নং ওয়ার্ডের জন্য গবর্ণমেণ্ট তিনটি ডাক্তারখানাকে কুইনাইন বিক্রয়ের লাইসেন্স দিয়াছেন। ঐ সকল দোকানে প্রতি সপ্তাহে চার পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন সরবরাহ হওয়ার কথা। কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসকরা সকলেই বলেন; যাহারা ঐ সকল দোকানে কুইনাইনের জন্য যায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনের বেশী কুইনাইন পায় না। বেলেঘাটার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। সেখানে প্রত্যহ ২.৩ শত রোগীর ভীড় হয়। হাসপাতালের অন্যতম ডাক্তার সতীশ সাহা বলেন, "গত দুইমাসে তাঁহারা এই হাসপাতালের জন্য মোট দুই পাউণ্ড কুইনাইন এবং কিছু সিঙ্কোনা পান। কুইনাইন সবই শেষ হইয়া গিয়াছে এখন কেবল সিঙ্কোনা দিতেছেন। তাহাও তিন 'ডোজ' হইতে কমাইয়া দুই ডোজ করা হইয়াছে। 'মেপাক্রিন' বা অন্য কোন ম্যালেরিয়ার ঔষধ তাঁহারা পান নাই।" চটকলের কর্তৃপক্ষও একটি ঔষধকেন্দ্র পরিচালনা করেন। তাঁহারা বলেন, "আমরা প্রত্যহ প্রায় ৪ শত শ্রমিককে ঔষধ বিতরণ করি। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের কোন কুইনাইন দেওয়া হয় না। এখন আমাদের হাতে একটুও [কু]ইনাইন বা 'মেপাক্রিন' জাতীয় কোন ঔষধ নাই। [...]জুটমিল এসোসিয়েশন' গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে কুইনাইন পায় তাও তাদের দেওয়া হয় না।" সবচেয়ে বেশী ভীড় দেখা গেল কর্পোরেশনের কুইনাইন-কেন্দ্রে। জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে কর্পোরেশন [...] এলাকায় ৩টি কুইনাইনকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত [ক]রেন। তাহার মধ্যে কাভাসনার শ্রীযুত অবিনাশ [ব্যা]নার্জী এবং শ্রীযুত হেম নস্করের বাড়ীতে দুইটি [কে]ন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহা এখনও সপ্তাহে মাত্র [...]ন খোলা হইতেছে। এক একটি কেন্দ্রে দড় [...]ধিক লোক আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের মধ্যে [...] পাড়ার মেয়ে, শিশু, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক সকল [...]র লোক। কিন্তু প্রত্যহ মোট ১৬৫ ডোজ [...]তে 'ডোজ' পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন এবং প্রত্যেককে [...] 'ডোজ' করিয়া) কুইনাইন মিক্সচার বিলি [...] হয়। ফলে অধিকাংশ লোককে ঔষধ না [পা]ই বাড়ী ফিরিতে হইতেছে।

কর্পোরেশন হেলথ অফিসারের বিবৃতি

'ইউনাইটেড প্রেসের' নিকট কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ডাঃ এম, ইউ, আহমদ বলেন যে, লবন হ্রদের নিকট বস্তী ১, ২৮ এবং ২৯নং ওয়ার্ডে ভীষণাকারে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। ...গত ১৪ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে [.]৪ জন; পূর্ব্ব সপ্তাহে এই রোগে মারা গিয়াছিল [.]৯ জন।

পথ্যের অভাব

যাহারা ঔষধ লইতে আসে তাহাদের মধ্যে [শতক]রা ৭৫ জনের কোন পথ্যের ব্যবস্থা নাই। কাঁপাইয়া জ্বর আসিলে গা ঢাকিবার মত কাপড় কম্বল কিছুই নাই। বেণীমাধব দাস বস্তীর একজন বাসিন্দা। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলে, 'একে তো সাবু, বার্লি বা মিশ্রি কিনিবার পয়সাই নাই। তার উপর বাড়ীতে এমন একজন লোক নেই যে পথ্য তৈরী করে, পরিবারের ৪ জন সভ্যের মধ্যে ৪ জনই আক্রান্ত, প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহাকেও ডাকার উপায় নাই।" দোকানদারদের নিকট হইতে জানা গেল, তাহাদের দোকানে সাবু বা মিশ্রি নাই বলিলেই চলে, বার্লিরও দর বাড়িতেছে। কাদাপাড়া বস্তীর চটকল মজুর কালীচরণ সাহু ক্ষোভের সহিত মন্তব্য করে, "ঔষধ ও পথ্যের জন্য সব কিছু বিক্রয় করেছি, আর একটি পয়সাও খরচ করতে পারব না, এখন কেবল মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব।"

সেবাকার্য্যের সংগঠন

কিন্তু স্থানীয় দেশপ্রেমিক কর্ম্মীরা দেশবাসীকে এই ভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে দিতে পারেন না। তাই, এলাকার রিলিফ কর্ম্মী, শ্রমিক ইউনিয়ন, কমিউনিষ্টপার্টি, এবং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে সেবাকার্য্য চালাইবার আগ্রহ জাগিয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা 'লী মেমোরিয়াল' হইতে দুগ্ধ বিতরণের ভার পাইয়া কাদাপাড়া শ্রমিক বস্তীতে একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে দুধ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হইল এলাকার সকল কর্ম্মী লইয়া একটি মিলিত রিলিফ সংগঠন গড়িয়া তোলা। সেই উদ্দেশ্যে গত ১৭ই অক্টোবর এলাকার নাগরিকদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা ডাকা হয় এবং তাহাতে একটি শক্তিশালী রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। এই সভায় পিপলস্ রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ বিমল বাগচী রিলিফ কার্য্যের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন এবং পিপলস্ রিলিফ কমিটির পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

কাদাপাড়ায় কমিউনিষ্টদের পরিচালনায় লী মেমোরিয়েল দুগ্ধকেন্দ্র রোগীর পথ্য জোগাইতেছে।

ঐ রিলিফ কমিটিতে যাহারা আছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কাউন্সিলর শ্রীযুত হেম নস্কর, অর্দ্ধেন্দু নস্কর, অবিনাশ ব্যানার্জ্জী এবং মহম্মদ ইসমাইল, ভূতর্বপূ কাউন্সিলর মিঃ নসির, জমিদার শ্রীযুত বলাই ঘোষ, ব্যবসায়ী শ্রীযুত মোহন গাঙ্গুলী, রতনলাল ব্যানার্জ্জী, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী সুধাংশু দত্ত, ছাত্র কর্ম্মী কানাইলাল শীল, শিশির সেনগুপ্ত, কংগ্রেস কর্ম্মী দুর্গাপদ ঘোষ, অরুণ চক্রবর্ত্তী, চিকিৎসক ডাঃ সুধীর বসু, ডাঃ ভোলা বসু, অধ্যাপক শ্রীযুত বিজয় ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, মিঃ দেরাজুতুল্লা এবং ডাঃ বেরু।

কুইনাইনের সরবরাহে সরকারী ঔদাসীন্য

অবিলম্বে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনাইন বা মেপাক্রিন ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার, এই উদ্দেশ্যে গত ১৯শে অক্টোবর পিপলস রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ বেরা 'ডিরেক্টর অব পাব্লিক হেল্থের' সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পাব্লিক হেল্থ বিভাগ হইতে তাঁহাকে জানানো হয় যে কলিকাতায় কুইনাইন সরবরাহের সমস্ত ভার কর্পোরেশনের হাতে, সুতরাং তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে তাঁহারা বিভাগীয় মন্ত্রী সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে উপদেশ দেন। এই প্রকারে সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে পিপলস্ রিলিফ কমিটির নেতৃত্বে ৮ জন মেডিকাল ছাত্র সেবাকার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সেবাকার্য্যের সুযোগ পাইতেছে না। তাহাদের হাতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কোন ঔষধ দেওয়া হইতেছে না।

কুইনাইনের সরবরাহ বাড়াইতে না পারিলে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে এই সহস্র সহস্র নাগরিককে বাঁচানো সম্ভব হইবে না। কেবল সরবরাহ বাড়াইলেই চলিবে না, সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থা, এমন কি কর্পোরেশনের কুইনাইন-কেন্দ্র পরিচালনার ভার ও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক রিলিফ কমিটির হাতে দিতে হইবে. একমাত্র তাহা হইলেই কুইনাইন রোগীদের কাজে লাগিবে। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে প্রত্যেকটি রোগীকে আরোগ্য করার জন্য কমপক্ষে ২টি ইনজেক্সন এবং ৯০ গ্রেণ কুইনাইন দরকার। তাহার তুলনায় বর্ত্তমানের সরবরাহ কিছুই নয় বলিলেই চলে।

স্থায়ী প্রতিকার কিভাবে সম্ভব

কুইনাইন এবং পথ্যের ব্যবস্থা যেমন দরকার, স্থায়ী প্রতিকারের দিকে নজর দেওয়াও তেমনই প্রয়োজন। গত এক বছরের মধ্যে এই এলাকায় দুইবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইল। ইহার কারণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের ধারণা প্রায় সকলেরই একরকম। গত বছর যে সমস্ত নিরাশ্রয় কলিকাতা আসে, তাহাদের একটা বিরাট অংশ বস্তীগুলিতে থাকিয়া যায় (তাহাদের একটি আশ্রয়-ঘরও এই এলাকায় আছে) এবং সঙ্গে তাহারা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি লইয়া আসে। **দ্বিতীয়তঃ**, গত এক বছরে ইমপ্রুভমেণ্টট্রাষ্ট ঐ এলাকার অনেক জায়গা দখল করিয়াছে, এবং ঐসকল জায়গায় বস্তী অথবা বাড়ীঘর ভাঙ্গিবার ফলে যে জলা-ডোবার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান হইয়া উঠিয়াছে। **তৃতীয়তঃ** ঐ এলাকায় বরাবরই কাঁচা নর্দ্দমা এবং বহু ডোবা ছিল, তাহাতে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে কিছু কিছু মশক-নিবারণী তৈল প্রভৃতি ছড়ানো হইত। এক্ষণে যুদ্ধের দরুণ তাহা একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং সব চেয়ে বড় কারণ, খাদ্যাভাবে গরীব বস্তী বাসিন্দাদের জীবনীশক্তি হ্রাস। গত এক [...] চটকলগুলি ক্রমশ বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের বাঁচিবার ক্ষমতা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। ইহাই ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণের প্রধান কারণ। ইহার স্থায়ী প্রতীকারের পথ জনসাধারণ, গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনকে বাহির করিতেই হইবে। জাপ বিরোধী যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতাকে বিপন্ন হইতে দেওয়া কাহারো স্বার্থ হইতে পারে না।

দেশপ্রেমের নিকট আবেদন

যাহারা এতদিন মনে করিতেছিলেন যে বাংলার ব্যাপক মহামারী হইতে কলিকাতার জীবন নিরাপদ, তাহারা বেলেঘাটা অঞ্চলের এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা শহরের মৃত্যু-সংখ্যা স্বাভাবিক বছরের তুলনায় প্রায় ৪গুণ বাড়িয়াছে, তাহাতে যাহারা উদ্বেগ বোধ করেন নাই—কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ৩০ গুণ বাড়িয়াছে, এই সংবাদও যাহাদের চঞ্চল করিয়া তোলে নাই—কলিকাতায় সেবাকার্য্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া যাঁহারা রিলিফের সংগঠন ও কাজকর্ম্ম গুটাইতেছিলেন, বেলেঘাটার মর্ম্মন্তুদ চিত্রে তাহাদের চোখ খুলিবে কি? কলিকাতার প্রত্যেকটি রিলিফ সংগঠন, কংগ্রেস, লীগ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক সংগঠন ম্যালেরিয়ার কবল হইতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হউক, বেলেঘাটার ঘরে ঘরে মৃত্যু পথের যাত্রী সহস্র সহস্র শিশু ও মায়ের আর্ত্তকণ্ঠ হইতে এই আহ্বানই আসিয়াছে।

ম্যালেরিয়া মহামারীর বিরুদ্ধে

জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান বি,এম,আর,সি,সি'র অভিযান

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাংলা আজ মৃত্যুর পথে ধুঁকিতেছে। আমরা জানি, এই বিপদ হইতে বাঁচিবার হাতিয়ার আমাদেরই হাতে। আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছুক হাতকেও প্রসারিত করিতে পারি, আমাদের প্রত্যেকের আত্মত্যাগে আমরা ৩ কোটি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙালীকে জীবন দান করিতে পারি।

আমরা পারি, তাহার প্রমাণ—১৯টি রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান **বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কোঅর্ডিনেশন কমিটি**। ইহা বাংলার ৬ কোটি মানুষের গর্ব। বাংলার অমর দেশপ্রেম ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমলাতন্ত্রের নির্বোধ শাসন পদেপদে বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে, দেশদ্রোহীরা মিথ্যা প্রচারের সাহায্যে রিলিফের কাজে বাধা দিয়াছে। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা ভাঙিয়া দিয়া দেশপ্রেম জয়ী হইয়াছে।

এই সম্মিলিত কমিটির কাজের বিবরণ আমরা একাধিকবার 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত ইউনিটগুলি ৬ই অক্টোবর হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করিতেছে ঃ

মৈমনসিংহ ঃ শেরপুর, টাঙ্গাইল।

২৪ পরগণা ঃ চৈতা, পাগলাডাঙ্গা, ডায়মণ্ডহারবার।

রংপুর ঃ গাইবান্ধা, ডিমলা।

ত্রিপুরা ঃ গোয়ালমারী চাঁদপুর।

বোম্বাই হইতে আগত ২১ জন ও **আমেদাবাদ** হইতে আগত ১৫ জন মেডিকেল ছাত্র ও ডাক্তারের যে দুইটি দল বাংলায় রিলিফের জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হইয়াছে।

বাংলার সাহায্যে আজ অন্যান্য প্রদেশ হইতে শত শত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা আসিতেছেন। বাংলা ইঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ বাঙালী যদি বাঙালীর সাহায্যে আত্মত্যাগে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে বাংলার স্বদেশপ্রেম কলঙ্কিত হইবে। ৬ কোটি বাঙালী প্রাণ থাকিতে তাহার দেশপ্রেমের অসম্মান হইতে দিবে না।

রেলে মাল চলাচল ও যাত্রীর অসুবিধা

বি-এণ্ড-এ রেলশ্রমিকদের সমস্যা

লেখক : জ্যোতি বসু
বি-এণ্ড-এ রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
জেনারেল সেক্রেটারী

বর্দ্ধমান বিভাগ ছাড়া সারা বাংলাদেশের এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র পথ বি-এণ্ড-এ -রেলওয়ের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। ১৯৪২ সালের প্রথমে যুদ্ধ যখন আসাম সীমান্ত ও চট্টগ্রামে পৌছিল এবং চীনের সরবরাহ-পথ জাপান অধিকার করিল, সেই সময় হইতেই ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে এবং চীনে সমর উপকরণ ও সৈন্য সামন্ত বহন করিবার বিরাট দায়িত্ব পড়িল এই বি-এণ্ড-এ রেলওয়ের উপর। বাংলা ও আসামের জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্য ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বহনের গুরু দায়িত্বও পড়িল এই রেলওয়ের উপর। সাহস ও গৌরবের সহিত সমস্ত শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে সীমান্তের রেলপথে থাকিয়া দেশরক্ষার কাজ সাফল্যের সহিত করিয়াছে।

দেশরক্ষায় বাধা, যাত্রীদের অসুবিধা

কিন্তু রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের বহু দোষ ত্রুটি রেলশ্রমিক ও জনসাধারণের চোখ এড়ায় নাই। মালগাড়ীর অভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইতেছে না অথচ বহু মালগাড়ী কাজে না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। যাতায়াতের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। মালগাড়ী বিভিন্ন জংশন ষ্টেশনে বহুক্ষণ পড়িয়া থাকে। যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা অসম্ভব রকম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কয়টি ট্রেণ এই উদ্দেশ্যে চলাচল করে তাহাও অধিকাংশ সময়েই ঠিক সময়মত যাতায়াত করে না। যাত্রীদের অবস্থা সমস্ত ষ্টেশনেই শোচনীয় হইয়াছে। ট্রেণের ভিড়ের কথা আজ কে না জানে? কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি চলিতেছে এবং সাধারণ লোকের বিপদের সুযোগে নানাভাবে কয়েকজন কর্ম্মচারী অর্থ সংগ্রহও করিতেছেন। সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগে নাই—কাজে শৈথিল্য, বিনা কারণে অনুপস্থিতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষতার সহিত রেলওয়ে পরিচালনার পথে এই বাধাগুলি দুর করিবার একমাত্র উপায় হইল—**রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার ব্যাপক পরিবর্ত্তন।**

শ্রমিকদের বাসের ব্যবস্থা

প্রয়োজনের তুলনায় বিবাহিত বা অবিবাহিত শ্রমিকদের থাকিবার "কোয়াটারের" সংখ্যা অত্যন্ত কম। কাঁচরাপাড়ায় বি-এণ্ড-এ রেলওয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা। এইখানেই শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিকের বাসের ব্যবস্থা না থাকায় ২০—৩০ মাইল দূরের বিভিন্ন শহরে বা গ্রামে তাহাদের থাকিতে হয় এবং সেইখান হইতে দৈনিক যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। ডিব্রুগড় ও লামডিংএ শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিকের পরিবার লইয়া বসবাস করিবার মত ঘর নাই। পুরাতন ঘরগুলির সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই সমস্ত স্থানের রেলশ্রমিকদের দাবী—থাকার জন্য প্রত্যেকের উপযুক্ত কোয়টার চাই।

রেলওয়ে শ্রমিকের মাগ্‌গীভাতা

রেলওয়ে বোর্ড বিভিন্ন সময়ে রেল-শ্রমিকদের দুর্মূল্য ভাতা ও সস্তায় "রেলওয়ে গ্রেণ শপ" হইতে জিনিষপত্র সরবরাহের জন্য নানারূপ নিয়মকানুন করিয়াছে। তাহার ফলে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার একজন রেলশ্রমিক মাসিক বেতন বাদে অর্থ ও জিনিষপত্রে প্রায় ৩৩ টাকার মত 'মাগগীভাতা' হিসাবে পাইত। অবশ্য যাহারা কলিকাতার বাহিরে থাকে এবং যাহারা রেলওয়ের ভারতরক্ষা ইউনিটে যোগ দিয়াছে তাহাদের ভাতার পরিমাণ আরও অনেক কম। কিন্তু, সরকারী হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরে সাধারণ শ্রমিকের জীবনধারণের ব্যয় শতকরা ১৮৫ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যয় আরো অনেক পরিমাণ বাড়িয়াছে তথাপি গড়ে ৩০ টাকা করিয়া রেল-শ্রমিকের বেতন হিসাব করিলে, বেতনের উপর বর্ত্তমানে ৫৫ টাকা দুর্মূল্য ভাতা পাওয়া প্রয়োজন। বি-এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং এস-আই-আর জি-আই-পি রেলওয়ের শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির পক্ষ হইতে এই দাবী করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অক্টোবরে জানান হইয়াছে। মাগগীভাতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অতন্ত অদ্ভুত। যাঁহারা ভারতরক্ষা ইউনিটে যোগদান করেন নাই তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে: ৩৯ টাকা পর্য্যন্ত যাঁহারা বেতন পান এরূপ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর দুর্মূল্য ভাতা কিছুই বাড়িল না। কলিকাতা ও 'এ' জোনে ৪০ টাকা হইতে ১৮০ টাকা পর্য্যন্ত যাঁহারা বেতন পান তাঁহাদের বাড়িল ২ টাকা হইতে ৪ টাকা। বি এণ্ড, এ রেলওয়ের অধিকাংশ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ভারতরক্ষা ইউনিটে যোগ দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান আদেশ অনুযায়ী ১০০ টাকা পর্য্যন্ত যাঁহাদের বেতন তাঁহারা বর্ত্তমান ভাতাই পাইবেন, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না।

রেলওয়ে বোর্ড সাধারণ স্বল্প বেতনের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ব্যবস্থা একেবারেই করে নাই। কিন্তু তাঁহারা অধিক বেতনের কর্ম্মচারীদের জন্য এইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সকলকে সমানভাবে (ফ্লাট রেটে) দুর্মূল্যভাতা দেওয়া হইয়াছে কারণ জিনিষপত্র কিনিতে গেলে সকলকেই সমানভাবে বেশী খরচ করিতে হইতেছে।

শ্রমিকদের মাসিক বেতন

সাধারণ রেলকর্ম্মচারী ও শ্রমিকেরা যে বেতন যুদ্ধের পূর্ব্বে পাইত তাহাও জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত অল্প। অধিকাংশ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেতনের হার যথাক্রমে ১২ টাকা হইতে ২৮ টাকা, এবং ৩০ টাকা হইতে ৬৫ টাকা।

বেতনের হার সংশোধন করিয়া নূতন ভাবে তাহা তৈয়ার করা একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকিলেও একজন শ্রমিক ও তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এইরূপ ৪ জন পূর্ণবয়স্ক লোকের ৪৫ টাকা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেও প্রয়োজন হইত। সেইজন্য রেলশ্রমিকের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৪৫ টাকা করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া কম বেতনের শ্রমিকদের শতকরা ১০০ টাকা বেতনবৃদ্ধি এবং তাহার উপরের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের শতকরা ৩০ টাকা করিয়া বেতন বাড়াইতে হইবে। বেতন বৃদ্ধির সময় শ্রমিকের বিশেষ দায়িত্ব ও দক্ষতার কথা বিবেচনা করিয়া 'গ্রেড' স্থির করিতে হইবে।

রেলকর্তৃপক্ষ বিনাকারণে বা সামান্য কোনও ব্যাপারেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করেন এবং বিভিন্ন ভাবে শ্রমিককে লাঞ্ছিত করা হয়। বহুদিনের সুদক্ষ কর্ম্মচারীকেও অকস্মাৎ কারণ না দেখাইয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্য্যন্ত না দিয়া কর্ম্মচ্যুত করা হয়।

সাধারণ রেলশ্রমিক যখন এইরূপ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে এবং তাহাদের বিভিন্ন দাবী উপেক্ষিত হইতেছে সেই সময়েই রেলওয়ে বোর্ডের লাভের পরিমাণ অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের রেলওয়ের লাভ হইয়াছিল ৪ কোটী ৩৩লক্ষ টাকা এবং ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া ৪০ কোটী হইয়াছে।

শ্রমিকদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রেলশ্রমিকেরা ইউনিয়নের নির্দ্দেশে কয়েকটি কেন্দ্রে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং রেল চলাচলের সুব্যবস্থা নিজেদের প্রচেষ্টায় করিয়াছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের একজন উৎসাহী শ্রমিক নিজের চেষ্টায় একটি প্রয়োজনীয় পেট্রোল ট্যাঙ্ক সারাইয়াছিল। স্থানীয় ম্যানেজার "নাট" ও "বল্টুর" অভাবে উহা সারান অসম্ভব বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। লামডিং ষ্টেশন ইয়ার্ডে এক সময় বহু গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইউনিয়নের শ্রমিকেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া কয়েকটি ইঞ্জিনে তাড়াতাড়ি কয়লা বোঝাই করিয়া গাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দেন। চিৎপুর ইয়ার্ডে একটি "ডক" মেরামত করিবার জন্য লইয়া আনা হয় এবং ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্মীদের চেষ্টায় মেরামতের কাজ ২১ দিনের পরিবর্ত্তে ১৫ দিনের মধ্যেই হইয়া যায়। অন্যান্য কেন্দ্রেও ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় শ্রমিকেরা কাজ ভালভাবে করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিল! দুঃখের বিষয় সাধারণতঃ রেলওয়ের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এইরূপ পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করেন না বা গ্রহণ করেন না। অনেক সময়ই তাঁহারা এইরূপ প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন।

শ্রমিকদের দাবী আদায়ের অভিযান

রেলশ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা প্রতিকারের জন্য বি, এণ্ড, এ, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ব্যাপকভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, একদিকে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ওপর অপর দিকে সারা দেশবাসীর সমর্থন। শ্রমিকদের নিকট ইউনিয়নের বিশেষ আবেদন এই যে যানবাহন ব্যবস্থা ও রেলওয়ে কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে তাঁহাদের চেষ্টা করিতে হইবে। রেলকর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে সমস্ত প্রকারের দুর্নীতি ও শৈথিল্য দূর করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীর পিছনে জনসাধারণের সমর্থন সংগৃহীত হইবে এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব হইবে। বি, এণ্ড, এ, রেলশ্রমিকদের এখনও একটি বিরাট ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে নাই। এবিষয়ে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বহু প্রচেষ্টা হইয়াছে কিন্তু ইহাকে সফল করিতে হইলে সমস্ত রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে সচেতনভাবে আন্দোলন করিতে হইবে এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বা বি, বি, সি, আই রেলওয়ের ন্যায় বিরাট শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়ন বি, এণ্ড, এ, রেলওয়েতেও গড়িয়া উঠিবে।

জনযুদ্ধ

বি এণ্ড এ রেলশ্রমিকদের দাবী

(১) রেলওয়ে শ্রমিকের জন্য ৫৫৲ মাগ্‌গীভাতা (২) সর্ব্বনিম্ন বেতন—৪৫৲ (৩) শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের যথাক্রমে ১০০ ও ৩০% বেতন বৃদ্ধি (৪) শ্রমিকদের থাকিবার ব্যবস্থা ও রেলওয়ে হাসপাতালগুলির উন্নতিবিধান। (৫) যে সমস্ত রেলওয়ে শ্রমিক উন্মুক্ত অবস্থায় কাজ করে তাহাদের জন্য ওয়াটারপ্রুফ, টুপি এবং শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা। (৬) সাময়িকভাবে নিযুক্ত রেল শ্রমিকদের চাকুরী স্থায়ী করা। (৭) ই, বি, বি, ডি, এবং এ, বি, ষ্টাফের জন্য একইরূপ নিয়মপ্রণয়ন। (৮) গ্রেনশপ পরিচালনার জন্য মালিক ও শ্রমিকপ্রতিনিধিদের যুক্ত কমিটি। (৯) বি. এণ্ড এ, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে মানিয়া লওয়া।

১৫,000 লোহামজুরের শোচনীয় অবস্থা

বার্ণপুরের মজুরের ভাগ্যে মাত্র ২৷।০ টাকা মাগগীভাতা

(তুষার চট্টোপাধ্যায়)

আসানসোলের নিকটবর্ত্তী বার্ণপুর শহরটী ষ্টীল কোং, ওয়াগন কোং এবং স্কব এই তিনটী কারখানা অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই শহরের মধ্যে বাহিরের লোকের প্রবেশাধিকার নাই, কারখানায় যারা কাজ করে শুধু তারাই শহরের মধ্যে যাইতে পারে। শহরের চারপাশে গ্রামাঞ্চল সেখানে মজুর ছাড়া আরো লোকজন বাস করে, বার্ণপুর শহরের মধ্যকার বাজারই এই সব জায়গার লোকের সম্বল। কিন্তু বাহিরের লোকের পক্ষে বাজার করিতে যাওয়াও আইনবিরোধী। শুধু বাজার কেন, বার্ণপুর ষ্টেশনটীও নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে! অর্থাৎ আশেপাশের অঞ্চলের লোকজন এই ষ্টেশনে আসিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত, দূরবর্ত্তী কোন ষ্টেশন হইতে পায়ে হাটিয়া তাদের আসিতে হয়!

সভাও নিষিদ্ধ

বার্ণপুর শহর সম্বন্ধে তো এত কড়াকড়ি। তাতেই শেষ নয়। এই অঞ্চলের কোনো জায়গাতেই সভা করাও যায় না। আসানসোল লোহা কারখানার মজুর ইউনিয়নের প্রায় ২ হাজার সভ্যের সকলেই বার্ণপুরের তিনটী কারখানায় কাজ করে। এই ইউনিয়নের তরফ হইতে গত ছয় সাত মাস ধরিয়া বার বার সভার অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি পাওয়া যায় নাই। ওয়াগন কোম্পানীর মজুররা ওয়াগনের পয়দা বাড়াইয়াছে, পয়দা বাড়ানের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যও সভার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ইউনিয়ান রেজিষ্টার্ড হইয়াছে, এই খবর জানাইবার জন্যও সভার অনুমতি পাওয়া যায় নাই।

মজুরী ও মাগ্‌গীভাতা

অন্যদিকে কোম্পানীগুলি মজুরকে কতটা সুখে রাখিয়াছে, তাহাও দেখুন! ওয়াগন কোম্পানীতে মজুরের সর্ব্বনিম্ন মজুরী দৈনিক ৮ আনা, ষ্টীল কোম্পানীতে মেয়ে মজুরের মজুরী ৬ আনা, পুরুষের সর্ব্বনিম্ন মজুরী ৮ আনা, স্কবে ৮ আনা।

মাগগীভাতার হার ৫০ টাকা মাহিনা পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই টাকা পিছু ৬ পয়সা। এই হিসাবে গড়পড়তা মাগগীভাতা দাঁড়ায় **মাসিক ২৷।০ টাকা।**

একদিন কামাইয়ে এক সপ্তাহের রেশন বন্ধ

সমস্ত মজুরকেই খাওয়ার রেশন দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কড়া নিয়ম আছে যে, একদিন অনুপস্থিত হইলেই মজুরের এক সপ্তাহের রেশন কাটা যাইবে।

তাছাড়া চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে তারতম্য করা হয়।

অর্দ্ধেক মজুরের কোয়াটার নাই

শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে কলের জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্য, পায়খানা একেবারেই নাই। জঞ্জাল পরিষ্কারের কোনো ব্যবস্থা নাই।—অথচ এইখানেই শতকরা ৫০ জন মজুরকে মিল-কোয়াটার অভাবে বাস করিতে হয়। তা সত্ত্বেও ঘরের অভাবে বহু মজুরকে স্থান হইতে স্থানান্তরে অনবরত ঘুরিতে হয়। শোনা যায় যে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারকে খুসী করিতে না পারিলে নাকি মিল কোয়াটারে ঘর পাওয়া মজুরের পক্ষে দুষ্কর।

টেকনিকাল আইনের কবলে

হাসপাতালে চিকিৎসার বন্দোবস্তের মধ্যও এই রকম জুলুমের কথা শোনা যায়। ছুটী অত্যন্ত সামান্য, বোনাস বলিয়া কোন কিছু মজুরের ভাগ্যে জোটেনা। প্রতি মাসে বহু মজুর এই সমস্ত কারখানার কাজে বিরক্ত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য আবেদন করে। কিন্তু সেখানেও মজুরের রাস্তা বন্ধ। টেকনিকাল আইনের জোরে মালিক মজুরের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করে। সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় মজুরের দরখাস্তের জবাবে মালিকের চিঠি আসে তাতে বাঁধাগত হিসাবে ছাপানো থাকে: ন্যাশনাল ট্রাবুনালের অনুমতি মিলিল না। মাসের পর মাস সকলেই এই একই ধরণের ছাপানো চিঠি পাইতেছে—মজুরের পক্ষে বুঝিবার উপায়ও নাই, সত্যিই ট্রাবুনাল এই ভাবে চিঠি দিয়াছে, না মালিকই এই ভাবে চিঠি সাজাইয়া রাখিয়াছে!

এ্যাডজুডিকেশনের দাবী

এই সমস্ত অসুবিধার প্রতিকারের দাবীতে আজ বার্ণপুরের মজুর আওয়াজ তুলিয়াছে। মাগগীভাতা প্রভৃতির দাবী বিচারের জন্য ইউনিয়নের পক্ষ হইতে সরকারের কাছে এ্যাডজুডিকেশন দাবী করা হইয়াছে। সভার অধিকার নাই, কারখানা অঞ্চলে ইউনিয়নের কর্ম্মীরা যাইতে পারে না, প্রচারের প্রত্যেকটী পথ মালিক বন্ধ করিয়াছে, তবু বার্ণপুরের মজুর ঘাবড়ায় নাই। ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ ২ হাজার মজুর এ্যাডজুডিকেশনের দাবীকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এবার জার্ম্মানীর ভিতরই তুমুল যুদ্ধ

পূর্ব প্রুশিয়ায় গোলডাপ ও পশ্চিম ফ্রণ্টে আকেন সহর দখল

ইউরোপের যুদ্ধ আজ চরম স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গণেই খাস জার্ম্মানীর অভ্যন্তরেই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। যে দুর্দ্ধর্ষ নাৎসীবাহিনী একদিন ইয়োরোপের বুকের উপর দিয়া ঝড়ের গতিতে দেশের পর দেশ জয় করিয়াছিল, আজ সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরাজিত, বিজিত দেশগুলি আজ একে একে জার্ম্মান শাসনকে হটাইয়া দিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লাগিয়া গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই নাৎসীদের প্রভুত্ব স্তিমিতপ্রায়।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে লালফৌজ সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করিতেছে। পূর্বপ্রুশিয়া হইতে দক্ষিণ যুগোস্লাভিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত আটশত মাইল রণাঙ্গণে হিটলারের সৈন্যদল পিছনে সরিয়া যাইতেছে। ইয়োরোপ জুড়িয়া বিরাট সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী সর্ব্বত্র নাৎসী ফৌজকে ধ্বংস করিতেছে। দক্ষিণে হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যদল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, ফলে বুদাপেষ্ট ও ভিয়েনার পথ উন্মুক্ত।

বেলগ্রেড ও ডেব্রেকাজন অধিকারের গুরুত্ব

তৃতীয় ইউক্রেনিয়ান ফ্রণ্টের নায়ক মার্শাল টলবুখিনের নেতৃত্বে লালফৌজ ও মার্শাল তিতোর যুগোস্লাভ জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সৈন্যদল একযোগে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড দখল করে। সাথে সাথে বুদাপেষ্টের ১১৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত হাঙ্গেরীর বিরাট রেলওয়ে কেন্দ্র ডেব্রেকাজন লালফৌজের হাতে আসায় মার্শাল মালিনোভস্কীর পশ্চিমাভিমুখী অভিযানের পথ আজ মুক্ত। জার্ম্মানদের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লালফৌজ দানিয়ুব উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে।

মালিনোভস্কীর সৈন্যদলের এখন প্রথম লক্ষ্য হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ত। এদিকে যে জার্ম্মানরা আর বিশেষ বাধা দিতে পারিবে তাহা মনে হয় না, কারণ এখানকার শত্রুবাহিনীগুলি একেবারে পর্য্যুদস্ত হওয়ার মুখে।

প্রায় সমগ্র ট্রানসিলভানিয়া শত্রু কবলমুক্ত

আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েটবাহিনী বিপুলবেগে পশ্চিমদিকে আগাইয়া যাইতেছে। ট্রানসিলভানিয়ার প্রায় সমগ্র অঞ্চলই এখন জার্ম্মানদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতরেও লালফৌজ দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়া সোভিয়েট সৈন্যদল বিপুল সংখ্যায় শ্লোভাকিয়ায় ঢুকিয়া পড়ায় উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে হাঙ্গেরীর বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। মার্শাল মালিনোভস্কীর ট্যাঙ্ক, লরী ও পদাতিক বাহিনী এক্ষণে দ্রুতগতিতে রুমানিয়া (ট্রানসিলভানিয়া), হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই তিনটি দেশের সংযোগস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছে। মার্শাল ষ্টালিনের সর্ব্বশেষ ঘোষণায় প্রকাশ ডেব্রেকজেনের ৩০ মাইল উত্তরে হাঙ্গেরীর বৃহৎ যানবাহন চলাচল কেন্দ্র শত্রুর আত্মরক্ষা ব্যূহের প্রধান ঘাঁটি নিরেঘাজা লালফৌজ অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব্বপ্রুশিয়া দখলের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্য্যায়ে

জার্ম্মান সামরিক সংবাদদাতা ফন্ ওলবুর্গ ২০শে অক্টোবর খবর দিতেছে—পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বিরাট সংগ্রামে পরিণত হইতেছে। এইরূপ বিরাট সংগ্রাম রুশিয়ার অভিযানেও বেশী দেখা যায় নাই। এবার সোভিয়েট বাহিনীর অশ্রুতপূর্ব্ব সংখ্যাধিক্য আছে।

জার্ম্মান সৈন্য ইতিমধ্যে প্রুশিয়ার সীমান্তে ইদকাল সহর ছাড়িয়া গিয়াছে। ইহা জার্ম্মাণীর একটি সহর এবং সহরটি জার্ম্মাণীর কিছুটা অভ্যন্তরে।

ইহার পরবর্ত্তী জার্ম্মান নিউজ এজেন্সীর খবর—সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মানীর গোলডাপ সহর অধিকার করিয়াছে এবং নীমেন নদীর ভাঁটিতে গুরুত্বপূর্ণ সহর তিলসিতে উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মানরা নীমেন নদীর দক্ষিণ তটে হটিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিম রণক্ষেত্রে

মিত্রসেনার হাতে জার্ম্মানীর বিখ্যাত সহর আকেন

রয়টারের ২০শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ—আকেনের পতন ঘটিয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর মার্কিন সৈন্যরা প্রথমে আকেনে প্রবেশ করে এবং এই কয়দিন তুমুল লড়াইয়ের পর আকেনে যুদ্ধে জার্ম্মান বাহিনী পরাজিত হইয়াছে। জার্ম্মানদের আত্মসমর্পণের সময় আকেনে ২৮০০ জার্ম্মান সৈন্য ছিল।

ইহাছাড়া এই রণাঙ্গনে এণ্টওয়ার্পের উত্তর-পূর্ব্বে মিত্রপক্ষের জোর আক্রমণ চলিয়াছে। ২২শে অক্টোবর কানাডিয়ান আর্মির সহিত অবস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদ দাতা জানাইতেছেন—ব্রেসকেন ও এসচেন মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। জেনারেল প্যাটনের সৈন্যদল নাঁসীর ১৮ মাইল পূর্ব্বে ফরেত-দ্য-প্যারয়ের উত্তরে জার্ম্মান ঘাঁটিগুলির উপর এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

"জার্ম্মানী পরাভূত হয় নাই"

সাফল্যের এই সব খবর সত্ত্বেও রয়টারের এক বিশেষ সংবাদদাতা যুদ্ধাঞ্চলগুলি ঘুরিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে এক কথায় তিনি বলিয়াছেন—জার্ম্মানী পরাভূত হয় নাই। ভীষণতম যুদ্ধ আগত প্রায়। রয়টারের সংবাদদাতার এই খবরে আজ ইহাই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে হিটলার ও নাৎসীবাদকে ঘায়েল করিতে হইলে মিত্রপক্ষের এখনও তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে। আমরা একথা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে ধ্বংস স্থির জানিয়াও হিটলার বেপরোয়াভাবে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, এবং যত দিন পারা যায় যুদ্ধকে বাঁচাইয়া রাখিবে। ক্ষমতালোভী নাৎসী সমরযন্ত্র অনর্থক লোকক্ষয়, রক্তপাত প্রভৃতিকে আমলেই আনে না, তাই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের এই চরম অধ্যায়ে হিটলারের নির্ম্মম ধ্বংসাত্মক নীতিকে রুখিতে হইলে, মিত্রপক্ষকে আরও সুসংবদ্ধ হইয়া একযোগে হিটলারের শেষ প্রচেষ্টাকে ঘায়েল করিতে হইবে। ইয়োরোপের জনগণ আজ বীরবিক্রমে আগাইয়া আসিয়াছে। এই সংহত সুপরিচালিত জনশক্তির বলেই মিত্রপক্ষ আজ জয়ী হইবে, নাৎসীবাদকে খতম করিতে পারিবে।

পাকিস্তান সমস্যার সমাধান ও কংগ্রেস-লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা কি করিয়া সম্ভব? এই প্রশ্নই আজ সকলের মনে সব চেয়ে বড়। আমরা দুইটী পুস্তিকা ছাপিতেছি—ইহা হইতে দেশের যে-কোন লোক এই সব প্রশ্নের জবাব পাইবেন। পি-সি-জোশীর লেখা ঃ—

(১) গান্ধী-জিন্নার আবার সাক্ষাৎ চাই ও গান্ধী-জিন্না পত্রাবলী

(একত্রে) (কথোপকথন)

দাম ৵০ আনা

(২) কংগ্রেস-লীগ আপোষ

দুইখানি পুস্তিকা একত্রে—[ভারতের অন্তর্গত ভবিষ্যৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানচিত্র ও বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত প্রভৃতি সম্বলিত] দাম—।০ আনা

(৩) পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য

ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত

দাম—।৵০ আনা

অবিলম্বে ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিঃ নিকট আপনার প্রয়োজনীয় কপির অর্ডার দিন। এক সপ্তাহের ভিতর সমস্ত বইএর ষ্টক ফুরাইয়া যাইবে।

দি ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শহীদ স্মরণে

কমরেড নিমাই ঘোষ

প্রায় ছয়মাস যক্ষ্মারোগে ভোগের পর ফরাসী চন্দননগরের কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড নিমাই ঘোষ গত ৪ঠা অক্টোবর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কমরেড ঘোষ ছিলেন চন্দননগর বিড়ি মজুর আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ছয়মাস জেল খাটিয়াছেন।

বিড়ি মজুরা নিমাইকে বাঁচাইবার জন 'রেড এড ফণ্ড' প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সমস্ত চিকিৎসার ভার নেয়। মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ নিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা শ্মশানঘাটে গিয়া মৃত বীরের প্রতি সম্মান দেখায়।

কমরেড লালমোহন

[কমরেড লালমোহন]

ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ী এলাকায় মানপাড়া গ্রামের কমরেড লালমোহন সরকার গত ১৮ই সেপ্টেম্বর জামালপুর মহকুমা কৃষকসমিতির সভায় যোগদান করিতে আসিয়া কলেরায় মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে কমরেড লালমোহন কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং পরে পার্টির সভ্য হইবার গৌরব লাভ করেন। নালিতাবাড়ীর কৃষক আন্দোলন আজ যে এত আগাইয়া গিয়াছে তাহার মূলে ছিল কমরেড লালমোহন। ইঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহ জেলা একজন শ্রেষ্ঠ দেশভক্তকে হারাইল।

বার বৎসর জেল খাটার পরও জেল গেটেই আবার বন্দী!

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দী প্রমুখ বাংলার যে সমস্ত বীর সন্তানেরা আজও দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন—জনগণের দাবী সত্ত্বেও বাংলা সরকার তাঁহাদের মুক্তি দিতেছে না, বরং সুদীর্ঘ কাল জেল খাটার পর যাঁহাদের কারাদণ্ড শেষ হইয়া যাইতেছে—তাঁহাদেরও জেল গেটেই পুনরায় ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

চট্টগ্রামের হিমাংশু ভৌমিক, বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার রজত দত্ত ও উত্তর বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলার দীনেশ দাসের কারাবাস সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছিল। হিমাংশু ভৌমিকের কারাদণ্ড ছিল ১০ বৎসর, রজত দত্তের ছিল ১২ বৎসর আর দীনেশ দাসের মেয়াদ ছিল ১২ বৎসর। এঁরা ছিলেন আলিপুর জেলে। এঁদের এই দীর্ঘ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এঁদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। জেল গেটেই এঁদেরকে পুনরায় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুক্তির পরই জেল গেটে এরূপ গ্রেপ্তার—এরূপ আটক বর্ত্তমান পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে হয় কিনা জানিনা। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার পক্ষে এই সব বীর যোদ্ধাদের মুক্তি আশু প্রয়োজন। বাংলার প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকটি নরনারী আজ ইঁহাদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত করুক।

হিন্দুর উত্তরাধিকার ও বিবাহ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ।৵০ আনা ।৵০ আনা ছিল; আজ উল্টাদিকে দশ আনা ছয় আনা হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ৯০ লক্ষ হিন্দু-কৃষক মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ অথবা প্রধান কারণ হিন্দুর বিবাহ প্রথা। অবশ্য এই আইন পাশ হইলেই সমাজে ব্যাপকভাবে অসবর্ণ বিবাহ বা একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলন হইবে না। পাঁচ পুরুষ আধুনিক শিক্ষা সভ্যতার মধ্যে থাকিয়াও, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতি অর্থহীন শ্রেণীর বন্ধন মুক্ত হইতে পারে নাই। অশাস্ত্রীয়, অনিষ্টকর, দুর্নীতিমূলক, কুলীন, বংশজ, কাপ, গোত্রীয় প্রভৃতি উপশাখার গণ্ডী এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও প্রবল। এই মৃতের পূজায়, সমাজের উপরের দিকে যখন নারী বলি চলিতেছে, তখন নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে?

যাহারা এত অনুদার, তাহারা যে বিবাহ নাকচ ও বিচ্ছেদের নামে মূর্চ্ছা যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অথচ যে সকল কারণে বিবাহ নাকচ ও বিচ্ছেদ হইতে পারিবে, তাহা এত সীমাবদ্ধ যে উহা কার্য্যকরীই হইবে না। ৭ বৎসর উন্মাদ চিররুগ্ন বা নিরুদ্দেশ থাকিলে উভয় পক্ষ বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায়, পুরুষ ইচ্ছা করিলে একাধিক পত্নীকে বর্জ্জন করিতে পারে, খুসীমত বিবাহ করিতে পারে, দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্যপালনে পুরুষের পক্ষে কোন বাধ্যবাধকতা নাই; কিন্তু নারীর কথা স্বতন্ত্র। অনিচ্ছা, আপত্তি আইন শুনিবে না, স্বামী স্ত্রীর দেহ ভোগের জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে পারে। রাও বিলের এই অংশটি অতি অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাব। নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা এবং কেবল উপপতি উপপত্নী (স্থায়ী) নহে, ব্যাভিচারের অপরাধকেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সর্ত্ত করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজা, জমিদার, পুরোহিত ও কুশীদজীবী শাসিত ও শোষিত, যৌথ পরিবার মণ্ডিত সমাজের অবসান হইয়া বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে বহুবৃত্তিবৈচিত্র্যে জটিল বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছে। পল্লী, জিলা এমন কি প্রদেশের গণ্ডীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়াছে, ভাঙ্গিতেছে। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐতিহাসিক যুগেও শক্তিমান সামন্ত নৃপতি এবং স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ সমাজ বিন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রয়োজনের গরজে ব্রাহ্মণরা, এই বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে একদিন 'নবশাখ' (শাখা) করিয়া হিন্দু-সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। আজিকার গতিশীল ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন সমাজে আইনের পরিবর্ত্তন দ্বারাই সমাজরক্ষা করা [illegible] গতানুগতিক পন্থীদের নির্ব্বোধ কুযুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, সমাজ-কল্যাণকামীদের এই বিল সমর্থন করা কর্ত্তব্য এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় হিন্দু সদস্যগণ যাহাতে শীঘ্র এই বিল আইনে পরিণত করার জন্য প্রযত্নশীল হন তাহার জন্য তাঁহাদের উপর জনমতের চাপ দেওয়া উচিত।

---

২৪ পরগণা কমিউনিষ্ট সমাবেশ

গত ১৫ই অক্টোবর কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে **২৪ পরগণা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির** ১৫০০ কর্ম্মী, দরদী ও সমর্থকদের লইয়া এক বিরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার শপথ নেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহ্‌মদ সমাবেশের সাফল্য কামনা করিয়া উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। বাংলা কমিটীর পক্ষ হইতে কমরেড সরোজ মুখার্জ্জি ও জেলা কমিটীর সম্পাদক কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। পার্টি ফাণ্ডের জন্য আবেদন জানান, প্রাদেশিক নেতা কমরেড নেপাল নাগ; সকলের কাছ হইতে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। সভা শেষ হইবার আগে সভাপতি-পরিষদের পক্ষ হইতে কমরেড আবদুল হালিম সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে সবাইকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান জানান।

Regd. No. C. 2836

জাপানী ব্যূহের অভ্যন্তরে

ফিলিপাইনে মার্কিন সেনার অবতরণ

"জাপানীরা বিতাড়িত হইলে ফিলিপাইন স্বাধীনতা পাইবে"

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী ফ্যাসিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক নূতন পর্য্যায় সুরু হইয়াছে।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে মার্কিন অভিযানকারী বাহিনী ফিলিপাইন দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে, এবং লেট দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূল দখল করিয়া মিত্রবাহিনী অগ্রসর হইতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই অবতরণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন—'আমরা ফিরিয়া আসিব বলিয়া ছিলাম, আমরা সেই শপথ রক্ষা করিয়াছি।'

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ সুরু হয়। ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাপানীরা ফিলিপাইন দ্বীপে প্রথম অবতরণ সুরু করে। ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী এই দ্বীপের রাজধানী ম্যানিলার পতন হয়। ১৯৪২ সালের ৯ই এপ্রিল বাটান যুদ্ধের অবসান হয় এবং ৬ই মে ফিলিপাইনে করিজিডর দ্বীপ আত্মসমর্পণ করে।

জেনারেল ম্যাকআর্থার খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত বাটানে ও করিজিডরে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের প্রবল আক্রমণ তিন মাস কাল প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাপানী আক্রমণকে বাধা দানের লড়াইয়ে সেদিন ফিলিপাইন-বাসীরাও অপরিসীম দৃঢ়তা দেখাইয়া পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মনে দারুণ উৎসাহ জাগাইয়াছিল। সেদিন সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধচিত্তে বাটান ও করিজিডরের যুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ সেই ফিলি-পাইন দ্বীপে জাপানীদের বিরুদ্ধে পুনরায় লড়াই সুরু হওয়াতে সবাই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে যে ফ্যাসিষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে চরম অভিযানের ইহাই প্রথম স্তর।

প্রেসিডেণ্ট-রুজভেল্টের ঘোষণা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইতিমধ্যেই এক ঘোষণায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার 'ফিলিপাইন পুনরধিকার' করিতে যাইতেছেন না, জাপানী আক্রমণকারীরা বিতাড়িত হইলেই ফিলিপাইনবাসীরা স্বাধীন জাতি হিসাবে তাঁহাদের স্বদেশের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে। আমরা ফিলিপাইন বাসীদের যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি—আজ জেনারেল ম্যাকআর্থারের ফিলিপাইন ভূমিতে পদার্পণের সঙ্গে পুনরায় সেই প্রতিশ্রুতিই দান করিতেছি।

এই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াই ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট সের্গিপে ওসমানো এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—এত দিন ধরিয়া আমরা যে দিনের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, সেই দিন আজ সমাগত। বিদেশী শাসনে যাঁহারা জর্জ্জরিত, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, আজ ফিলিপাইনের জনগণের মনের অবস্থা কিরূপ। ফিলিপাইনের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে আমাদের দেশবাসী বাটানের গত যুদ্ধের মতই সংগ্রাম চালাইবে।

অভিযানকারী বাহিনীর সাফল্য

২২শে সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যাক আর্থারের ফিলিপাইনস্থিত হেড কোয়ার্টার হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—মার্কিন বাহিনী লেট-দ্বীপের সমস্ত এলাকায় গড়ে ৪ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। উত্তর রণাঙ্গনে মার্কিন সৈন্যদল লেট-দ্বীপের রাজধানী টাক্‌লোবান ও উহার বিমান ক্ষেত্র দখল করিয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে মার্কিন বাহিনী টাকলোবানের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ডুলাগ ও তাহার বিমান ঘাঁটী জাপানীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। প্রতিপক্ষের দুইটী প্রবল আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ম্যাক আর্থার বলিয়াছেন, "লেট-দ্বীপে জাপানীদের অবস্থা নৈরাশ্য জনক—তাহাদের আর নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ পাইবার আশা নাই।"

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব

এই দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হস্তচ্যুত হওয়ার অর্থ জাপানের অধিকৃত দক্ষিণ অঞ্চলগুলি—জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, বোর্ণিও, মালয় ও ব্রহ্মদেশ খাস জাপান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সাথে সাথে চীন সমুদ্রে জাপানী প্রাধান্য বিপদগ্রস্ত হওয়া। এই সব সমৃদ্ধ এলাকা হইতে জাপান তাহার যুদ্ধ চালানের জন্য প্রচুর কাঁচা মালের যোগান পায়। এই কাঁচামালের উপর জাপানী সমরশক্তিকে অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। তাই প্রশান্ত মহা-সাগরের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে আসার পথে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব এত বেশী। ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের এই বিরাট অংশ পুনরায় মিত্রশক্তির হাতে আসিলে খাস জাপানের বিপদ বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। চীনের উপকূল ভাগে জাপবাহিনীকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত অবস্থায় মিত্রবাহিনীর নূতন আক্রমণের জন্য দিন গণিতে হইবে, আর জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীর চীনের নির্ভীক বাহিনীগুলি বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা পাইবে।

ভারতব্রহ্ম রণক্ষেত্র

অন্যান্য রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর সাফল্যের সাথে সাথে এই রণাঙ্গনেও মিত্রসেনা কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ১৯শে অক্টোবরের ঘোষণায় প্রকাশ যে চতুর্দ্দশ আর্মির ভারতীয় সৈন্যরা চীন পাহাড় এলাকায় টিডিম দখল করিয়াছে। ইহার পরেই চীন পাহাড়ের অসামরিক হেড কোয়ার্টার্স ফালামও জাপানীদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার পর দক্ষিণ চীন পাহাড়ে ১৪শ আর্ম্মির সৈন্যগণ হাকা অধিকার করিয়াছে। সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, চীন পাহাড় এলাকায় মিত্রসেনা টিড্ডিম ছাড়াইয়া ছয় মাইল আগাইয়া গিয়াছে। আরাকানে মিত্রপক্ষের গোলন্দাজ সৈন্য-দল একটি জাপ হেডকোয়ার্টার্সের উপর গোলাবর্ষণ করে। পশ্চিম আফ্রিকার সৈন্যদল সাঙ্গু উপত্যকা হইতে কালাদান নদী তীরে পৌঁছিয়াছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ

প্রাচ্যের বৃটিশ নৌবহর গত সপ্তাহে বঙ্গোপসাগর স্থিত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গোলা বর্ষণ করে। আর নিকোবরের বিমানক্ষেত্র ও পোতাশ্রয়ের উপর আকাশ ও জল হইতে আক্রমণ চালান হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এই আক্রমণ চলে। এই আক্রমণে কয়েকখানি ছোট ছোট জাপানী জাহাজ ও আটটি বিমান ঘায়েল হয়।

ভারতব্রহ্ম রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনীর আক্রমণ এখনও আশানুরূপভাবে সুরু হয় নাই। আক্রমণের তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ সফল করিতে হইলে আগে এ দেশের লোকের মনোবলের উপর তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতের লোক যুদ্ধজয় সম্পর্কে উদাসীন থাকিবে, অথচ ভারত হইতেই প্রথমে ব্রহ্মকে মুক্ত করিবার চরম অভিযান চালান হইবে। ইহা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ভারতবাসীকে পুরাপুরিভাবে সক্রিয় করিতে হইলে এদেশের অধিবাসীদের মনে ধারণা থাকা দরকার যে, এ যুদ্ধ তাহাদেরই যুদ্ধ, এ যুদ্ধ জয়ের সাথে সাথে তাহাদের স্বাধীনতার পথও উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম অভিযান সম্পর্কেও বৃটিশ সরকারের আজ খোলা মনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মত ঘোষণা করা দরকার—জাপানীরা বিতাড়িত হইলে তোমরা স্বাধীনতা লাভ করিবে—তবেই ব্রহ্মের অধিবাসীরাও অভিযানকারী মিত্রবাহিনীর সাথে এক হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে আগাইয়া আসিবে।

ষ্টালিনের সহিত চার্চ্চিলের সাক্ষাৎ

পোলাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের নীতি স্বীকৃত

মস্কোতে চার্চ্চিল-ষ্টালিন আলোচনা শেষ হইয়াছে। মস্কো ত্যাগ করিবার আগে চার্চ্চিল বলিয়াছেন : 'আমার বন্ধু ও লড়াইয়ের সহকর্মী মার্শাল ষ্টালিনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে।'

এই আলোচনা সম্পর্কে লণ্ডন হইতে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পোলাণ্ডের সমস্যা লইয়া সোভিয়েট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে উভয়ের মধ্যকার মতভেদ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি সংসদ ও রাজকীয় গভর্ণমেণ্ট, এই দুইয়ের মিলন সাধিত হইয়াছে এবং জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে এই দুই শক্তি সম্মিলিত ভাবে নিযুক্ত হইবে। ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে, **কিরূপ গভর্ণমেণ্ট গঠন হইবে তাহা লড়াইয়ের পরে যুগোশ্লাভ অধিবাসীরা ঠিক করিবে।**

এই চার্চ্চিল-ষ্টালিন আলোচনা সম্পর্কে আমেরিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, এবার ষ্টালিনের কাছে চার্চ্চিল দর কষাকষিতে হারিয়াছেন। চার্চ্চিল মস্কো গিয়াছিলেন পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ-স্বার্থ বজায় রাখিতে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে তিনি সফল হইতে পারেন নাই, সোভিয়েটের স্বার্থই জয়ী হইয়াছে।

কূটনীতিক সংবাদদাতারা এই ভাবে সংবাদ পরিবেশন করিয়া এই সাক্ষাৎকে শুধু কূটনীতিক দর কষাকষির পর্য্যায়ে ফেলিয়াই লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে ইহা ক্ষমতা সাম্যের লড়াই। কিন্তু ইহা ক্ষমতা সাম্যের লড়াই, না মুক্তিকামী জনগণের জয়, তাহা কয়েক মাসের ঘটনা স্মরণ করিলেই বুঝা যাইবে। জুন মাসেও চার্চ্চিল পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাতে লণ্ডনস্থিত পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টের প্রতি দরদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল তিতোর বিরুদ্ধে সার্ভিয়ানদের অভিযোগের কথাও চার্চ্চিল তুলিয়াছিলেন। তারপরে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পূর্ব্বে লালফৌজের অপ্রতিহত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে জনগণের মুক্তিফৌজ বিপুল শক্তি লইয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কোথায় থাকিল চার্চ্চিলের পুরাণ কথার মূল্য! পোলাণ্ড সম্বন্ধে সোভিয়েট তার নীতি পরিষ্কার ঘোষণা করিল। মার্শাল তিতোর বাহিনীর সহিত লালফৌজের সংযোগ স্থাপিত হইল। পূর্ব্ব ইউরোপের মুক্তি জনগণের হাতেই রচিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুক্তির অগ্রদূত সোভিয়েট।

এখন প্রশ্ন আসিল লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে। চার্চ্চিল এদেরই সমর্থক। কিন্তু এ সম্পর্কে সোভিয়েটের নীতি খুবই স্পষ্ট। সোভিয়েট-বিরোধিতার জন্য, ফ্যাসিষ্ট ঘেঁষা নীতির জন্য সোভিয়েট কখনও ইহাকে বরদাস্ত করে নাই। আজ যদি এই গভর্ণমেণ্ট তার সোভিয়েট-বিদ্বেষীদের ছাড়িয়া ফেলিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়—হিটলারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় তবে পোলিশ মুক্তি-সংসদের সঙ্গে লণ্ডনের পোলিশ গভর্ণমেণ্টের একটা মীমাংসা হইতে পারে। ইটালীতে এই মিলনের ভিত্তিতেই নূতন গভর্ণমেণ্ট রচিত হইয়াছে—ফ্যাসিষ্ট বিরোধী মিলিত গণফ্রণ্টই সোভিয়েটের লক্ষ্য। কিন্তু সোভিয়েট বিরোধী যারা, তারাই ক্রমাগত এই প্রকার মিলনে বাধা দিয়া আসিয়াছে। ষ্টালিনের সঙ্গে চার্চ্চিলের এই সাক্ষাৎ সোভিয়েটবিরোধী সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের আশায় ছাই দিল।

জনযুদ্ধের
নভেম্বর দিবস বিশেষ সংখ্যা

আগামী ৮ই নভেম্বর জনযুদ্ধের একটী বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে। নভেম্বর বিপ্লব দিবসের এই সংখ্যায় ১৬পৃষ্ঠা থাকিবে। রঙ্গীন প্রচ্ছদ পট ও বিভিন্ন ছবিসহ সুলেখকদের বহু লেখা এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। দাম—প্রতি কপি তিন আনা। এখন হইতেই আপনার অঞ্চলে কত কপির প্রয়োজন তাহা আমাদের অফিসে জানান। **৩রা নভেম্বরের** মধ্যে কত বেশী কপি দরকার, তাহা জানাইতে হইবে।

এই সংখ্যায় থাকিবে :

ভারতের জাতীয় রাজনীতি	বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা
ভারতীয় মুসলিমদের স্বাধীনতা	আধুনিক কবিতা
ইউরোপে জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র	আধুনিক গল্প
সোভিয়েটের মুসলিম জাতি	নূতন সাহিত্য
ইউরোপে লালফৌজের অগ্রগতি	চটকল ও লোহা মজুরের জীবন
পোলাণ্ড—বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অগ্নি পরীক্ষা	দুঃস্থ বাংলার জীবন কথা
	পুস্তক পরিচয়

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ

★ নবান্ন ★

এক সময়ে কলিকাতা ও বাঙলার পল্লী অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের নানা জায়গায় "জবানবন্দী" অভিনয় করিয়া **ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা** গত দুর্ভিক্ষে বাঙলার কিষাণদের গভীর দুঃখ ও বেদনার কথা সফল ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। এই গণনাট্য সঙ্ঘ পুনরায় "জবানবন্দী"র লেখক বিজন ভট্টাচার্য্যের দীর্ঘ চার অঙ্কের নাটক "নবান্ন" অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ২৪শে অক্টোবর হইতে শ্রীরঙ্গমে উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলার পল্লী অঞ্চলে ১৯৪২ সাল হইতে যে-দুর্দ্দিনের সুরু হইয়াছিল—তাহা বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়া বাঙলার কিষাণকে কোথায় কোন মহা ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহার মর্ম্মান্তিক এক ছবি এই "নবান্ন।"

শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে ২৭শে অক্টোবর ১০ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৭ই ও ২০শে নভেম্বর "নবান্ন" অভিনীত হইবে এবং সংগৃহীত অর্থ দেশের দুঃস্থগণের রিলিফে ব্যয়িত হইবে।

এই **গণনাট্য সঙ্ঘ** নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে **যশোহরে** 'নবান্ন' অভিনয় করিবেন।

★

ম্যাক্সিম গোর্কি

আগামী ২৯শে অক্টোবর, রবিবার সকাল সাড়ে ৯৷০ টায় প্যারাডাইস সিনেমা হলে সোভিয়েট সুহৃদ্ সঙ্ঘের উদ্যোগে 'ম্যাক্সিম গোর্কির শৈশব' চিত্রটি প্রদর্শিত হইবে। ৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রবেশপত্র পাওয়া যাইবে। ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই ছবি বাংলাদেশে থাকিবে।

★

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : **বঙ্কিম মুখার্জ্জি,** এম. এল. এ

অফিস ঃ ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৷৷০ ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

নভেম্বর দিবস
বিশেষ সংখ্যা

তৃতীয় বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
৮ই নভেম্বর, ১৯৪৪
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫১

দাম ঃ
তিন আনা

অব্যক্ত বাণী

ভারত ঃ

সন্দেহ নেই, তুমি সারা দুনিয়ার বন্ধু।
কিন্তু কই, হিন্দুস্থানের নাম তো নেই তোমার মুখে।
আমার বেদনায় কেন তুমি এমন উদাসীন ?

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

আমরা তোমাকে ভুলেছি একথা ভুলেও ভেবো না।
আমাদের "শুভেচ্ছাকে" আমরা শুধু ঢেকেছি "কাজে।"
কথায় কি আসে যায়, দেখ আমাদের বাহুবল।
দেখ আমরা পীড়ন ও হিংসার যন্ত্র কিভাবে ধ্বংস করেছি।
তোমার গৌরবময় ভাগ্যকে চিনে নেবে তোমার আপন দৃষ্টি ;
আমরা তোমার পথে জ্বেলেছি আলো।
সে দৃষ্টিকে খুঁজে নাও ; আমরা জীবনের মুখ থেকে
ঘোমটা খসিয়েছি।

মানুষের চেতনায় সঞ্চারিত হ'ল গান ;
সে-গান আমরা গেয়েছি ইন্‌কিলাবের সুরে।
মানুষের অন্ধকার রাত আমরা তারায় সাজিয়েছি,
তার বিষণ্ণ সকালকে উপহার দিয়েছি আনন্দ।
তোমার তরণীর দিকে ছুটেছিল ঝড় ; আমরা
রক্তের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাকে রুখেছি।

তাকাও ভালো করে', দেখ, দাসত্বের ভিত্ টলমল,
শহীদের রক্তে তোমার আলো জ্বলছে ;
তোমার সমস্ত অস্তিত্ব জ্যোতির্ময় ;
মহিমান্বিত ভবিষ্যৎ তোমায় ডাক্‌ছে।
তোমার সাম্‌নে জয়-বধূ অনবগুণ্ঠিতা
তাকে আলিঙ্গন কর।
ঐক্যের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে
তোমায় এখনও যেতে হবে
তবেই পৃথিবী তোমার,
তবেই স্বর্গ।

(কাইফি আজমির কবিতার অনুসরণে)

গান্ধীজির নূতন নির্দ্দেশ কি অগ্রগতি ?

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কমিউনিষ্টরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রত্যেক প্রদেশেই নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসসেবীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা কি হইবে—ইহাই তাঁহাদের সামনে প্রশ্ন। গান্ধী-জিন্না আলোচনা সফল হইলে কংগ্রেস-লীগ আপোষ হইত এবং গান্ধীজির ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়াভেলের উদ্ধত প্রত্যাখ্যানের সমুচিত জবাব দেওয়া সম্ভব হইত। কিন্তু সেই আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। যে সব কংগ্রেস-কর্মী এখন বাইরে আছেন তাঁহাদের কি করিয়া সংহত করা যায়, কি ভাবে জনগণের শক্তি ও একতা পুনর্গঠিত করিয়া ব্যর্থতা হইতে জয়ের পথে অগ্রসর হওয়া যায়—এগুলিই ছিল সমস্যা।

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পরবর্তী কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে পারে এইরূপ একটি কার্য্যপন্থা লইতে হইবে। এখন গান্ধীজির নূতন নেতৃত্ব দুইটী নির্দ্দেশ আকারে সংবাদপত্রের মারফত সমস্ত দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমটি হইল "গঠনমূলক কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্মীদের নিকট পথের ইঙ্গিত!" বোম্বাই নগরী, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটকের কংগ্রেস-কর্মীদের সম্মেলন ২৮শে-২৯শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে সম্মেলনে গান্ধীজির এই নির্দ্দেশ পাঠান হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে প্রেরিত একটি বাণীতে গান্ধীজি বলিয়াছেন "এই সঙ্গে আমি কংগ্রেসকর্মীদের সামনে আমার কর্মপন্থার আভাষ উপস্থিত করিতেছি এবং আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক স্থানেই কংগ্রেস আবার কর্মমুখর হইয়া উঠিবে।" দ্বিতীয়টি হইল, পরিকল্পিত উপবাস সম্বন্ধে গান্ধীজির বিবৃতি। ইহাও সম্মেলনে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সম্মেলনে তাহা পাঠ করা হয়।

গান্ধীজির নূতন নেতৃত্ব

ভারতের সুবৃহৎ দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য কংগ্রেস-সেবীদের সমাবেশ করিতেই হইবে। তাঁহাদের আজ দেশব্যাপী হতাশাকে দূরীভূত এবং জনগণের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? বর্তমানে জনগণের সামনে যে সব জরুরী প্রয়োজন ও সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াই কংগ্রেসসেবীগণ এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন। মূল সমস্যা দুইটি—জাতীয় ঐক্য ও খাদ্য। হিন্দু-মুসলমান একতার জন্য কংগ্রেসসেবীগণকে অক্লান্ত সৈনিকরূপে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে হইবে। লীগ ও তাহার নেতাদের প্রতি তিক্ততা ও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করিয়া বরং পরস্পরের আদর্শকে বুঝিবার এবং জনগণের সেবায় এক যোগে কাজ করিবার মনোভাব নিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। কংগ্রেসকর্মীরা যদি আজ কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মিলিত কাজের আগ্রহ দ্বারা, গান্ধী-জিন্না আপোষের নূতন ভিত্তি তৈয়ার করিতে পারেন—যদি তাঁহারা দুর্নীতি, মজুতদারী ও মুনাফালোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উৎপাদন বাড়ান ও খাদ্যের সুবণ্টনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন—তাহা হইলেই কংগ্রেসকে সংহত ও শক্তিশালী করা সম্ভব। তখন সেই শক্তি দ্বারাই ওয়ার্কিং কমিটি সভ্যদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার আদায় করা যাইবে।

গঠনমূলক কার্য্যক্রম

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই গান্ধীজির নূতন নির্দ্দেশের আলোচনা করা যাক। কংগ্রেসসেবীদের সামনে তাঁহার গঠনমূলক কাজের ১৪ দফা কার্য্যসূচী উপস্থাপিত করিয়া গান্ধীজি বলিয়াছেন, "কল্পনা করুন যে, জাতিকে একবারে গোড়া হইতে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই কার্য্যসূচীতে ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারী আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তখন এই কার্য্যসূচী যে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাইয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবে তাহা কি কেহই অস্বীকার করিতে পারেন?"

খাঁটি, সত্য কথা। এবং আজ এই কথাগুলি যত সত্য এমন আর কোনদিনই ছিল না। কিন্তু, নূতন পরিস্থিতির চাহিদা ও জনগণের আশু দাবী ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই গঠনমূলক কার্য্যপন্থা অনুসরণ করিলেই ইহা জনগণের শক্তি ও একতাকে গড়িয়া তুলিবার বলশালী হাতিয়াররূপে পরিণত হইতে পারে। অন্যথায় এই কার্য্য-সূচী রাজনৈতিক অবস্থার মোড় জনতার স্বার্থে ঘুরাইয়া দিবে না; ইহা বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিজের প্রভাব বিস্তার করিবার অনুষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াইয়া যাইবে। গান্ধীজির অনুগামীগণ গান্ধীজির পরিকল্পিত গঠনমূলক কার্য্যসূচী এইভাবেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন।

জাতীয় ঐক্য ও খাদ্য

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও খাদ্যের কথাই ধরা যাক্। গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়াতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে সাধারণভাবে মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সংযোগ স্থাপন করিলেই চলিবে না। পরন্তু প্রত্যেক এলাকায় কংগ্রেসসেবী ও লীগসেবীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং রিলিফ ও খাদ্যের জন্য জনশক্তিকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত কাজের প্রচেষ্টাই আজ প্রয়োজন। লীগের তোয়াক্কা না রাখিয়া এবং তার চেয়েও খারাপ, গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতার সব দোষ লীগ ও তাহার নেতার কাঁধে চাপাইয়া কংগ্রেসসেবীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে যান, তাহা হইলে লীগ-সেবীরা ভাবিবে যে কংগ্রেস লীগের শক্তিক্ষয় করিবার জন্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহাতে একতা ত হইবেই না বরং বিভেদকে আরওবাড়াইয়া তুলিবে। ঠিক তেমনি, কৃষকদের মধ্যে কাজ করিতে গেলে ফসল বাড়ানো এবং কৃষকেরা যাহাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তার পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কৃষকের ফসল যাহাতেমজুতদার ও মুনাফাখোরীদের হস্তগত না হয়, যাহাতে সেই ফসল উপযুক্ত মূল্যে সুবণ্টন হয় তাহার পথও কৃষকদের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু গান্ধীজির কার্য্যসূচী কৃষকদের মধ্যে কাজের এই বিষয়টি স্পর্শও করে নাই।

লেখক—ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী

বস্তুতঃ পক্ষে খাদ্য পরিস্থিতির জরুরী সমস্যায় গান্ধীজি আমাদের কোন গঠনমূলক নির্দ্দেশ দান করেন নাই। লোভী মজুতদার ও মুনাফাখোরেরা যে দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে, গান্ধীজি বেদনার সহিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে কংগ্রেস সেবীদের পক্ষে জনগণের খাদ্য কমিটিতে কাজ করা উচিত নয়। তিনি মনে করেন যে, এই কাজের ভিতর দিয়া কোন না কোন প্রকারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় আসিতে হইবে। দুর্নীতি, মজুতদারী ও মুনাফা লোভের মুখোস খুলিয়া দিবার এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কার্য্যকরী পন্থাকেই নিজের ও কংগ্রেসকর্মীদের নিকট রুদ্ধ করিয়া দিয়া গান্ধীজি উহারই বিরুদ্ধে উপবাসের এক চরম পরিকল্পনা গ্রহণের দিকে চলিয়াছেন। আজ মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্মীগণকে এরূপ তীব্র জনমত জাগাইতে হইবে যেন দেশকে গান্ধীজির চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাসের গভীর বিপদের সম্মুখীন হইতে না হয়।

গান্ধীজির উপবাস ?

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

নেতিমূলক নেতৃত্ব

তাহা হইলে গান্ধীজির নির্দেশ কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়?

এই নেতৃত্ব সংকীর্ণতাদুষ্ট, নির্দ্দেশবিহীন। গান্ধী-জিন্না আলোচনায় কংগ্রেস-লীগ মিলনের অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল। সেই মিলনকে আগাইয়া নিয়া জাতীয় আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কোন তেজোদৃপ্ত পদক্ষেপ গান্ধীজির নেতৃত্বে পাওয়া যায় না। জাতীয় আন্দোলনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত করিবার কোন প্রাণবন্ত নির্দ্দেশ গান্ধীজি দেন নাই। জনগণের খাদ্য-ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য, খাদ্য সম্পর্কে বাস্তব কাজ দ্বারা জনগণকে মজুতদারীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসকর্মীগণকে উদাত্ত আহ্বান জানান হয় নাই। এই নেতিমূলক ও সংকীর্ণতাদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কোথা হইতে আসিল?

আগষ্ট প্রস্তাবের প্রয়োগমূলক অংশ জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে কত মারাত্মক হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া 'চাপ' দিবার নীতি হইতেই তাহার উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমান নির্দ্দেশও সেই নীতি-প্রসূত। আজ কংগ্রেস কর্ম্মীরা যদি তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় লীগসেবীদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া পারস্পরিক বোঝাপড়া ও জনগণের স্বার্থে সমপ্রচেষ্টার পথে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং তাঁহারা যদি লীগের দিকে পিছন ফিরাইয়া বলিতে থাকেন যে লীগকে বাদ দিয়াই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য গঠন করিবেন ও মুসলমান জনগণকে জয় করিবেন এবং এই ভাবেই জিন্না সাহেবকে টানিয়া নামাইবেন—তাহা হইলে ঐক্যের বদলে বিভেদই বাড়িয়া উঠিবে। ঠিক তেমনি, আজ যদি কংগ্রেস সেবীগণ সরকারী দুর্নীতি, মজুতদারী ও মুনাফাখোরী বন্ধ করিবার জন্য খাদ্য পরিস্থিতিতে পুরাপুরিভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন এবং বলিতে থাকেন যে ইহাতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাহায্য করা হয়—তাহা হইলে তাহাতে সরকার দুর্ব্বল হইবে না, আমাদেরই দেশের লোক উপবাস ও মৃত্যুর কবলে পড়িবে।

"বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলনের" কার্য্যবিবরণী বিচার করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে গান্ধীজির নূতন নির্দ্দেশ কংগ্রেসসেবীগণ কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন এবং বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রেই বা তাঁহারা ইহা কি করিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। এরপর ভারতের অন্যান্য স্থানেও কংগ্রেস পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সব সম্মেলন 'বোম্বাই সম্মেলন' হইতে অনুপ্রেরণা ও নির্দ্দেশ লাভ করিবে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা সম্পর্কেই বোম্বাই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা ধরা যাক। আলোচনার সময়ে "মহাত্মা গান্ধী দৃঢ় ভাবে যে মত অনুসরণ করিয়াছিলেন" সম্মেলন "তাহাতে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে।" "আলোচনার দুঃখজনক ব্যর্থতায় মুহ্যমান না হইতে" সম্মেলন জনগণকে আহ্বান জানাইয়াছে। আর কংগ্রেসসেবীগণের সামনে সম্মেলন কি কার্য্যপন্থা উপস্থিত করিয়াছে?

"মুসলমান জনগণ ও অন্যান্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ

বোম্বাই কংগ্রেস সম্মেলন

সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। এই সংযোগের ভিতর দিয়াই সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিবে।"

ঐক্য, না বিভেদ ?

আলোচনার ব্যর্থতার পর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মিলিত কাজের প্রচেষ্টার আবেদন জানাইয়া গান্ধীজি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, সম্মেলনের প্রস্তাব তাহার মর্ম্ম অনুযায়ী রচিত হয় নাই। লীগকে ডিঙাইয়া মুসলমান জনসাধারণকে স্বমতে টানিবার জন্য স্বপক্ষ সমর্থনে এই একগুঁয়েমি মনোবৃত্তি ঐক্য গঠন করিতে পারে না। ইহাতে কেবলমাত্র বিভেদ আরও বাড়িয়া যাইবে। হিন্দুমহাসভা প্রতিদিনই চীৎকার করিতেছে, "রাজাজীর প্রস্তাব প্রত্যাহার কর", "মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইবে না"। এই সময় কি কংগ্রেস-সেবীদের প্রত্যেক সভা হইতে একথাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা কর্তব্য নয় যে, স্বাধীন ভারতে মুসলমান সংখ্যাধিক অঞ্চলগুলিতে মুসলমানদের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের অধিকার দিতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? একথা আজ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইবে যে, উদ্ধত মনোভাব ও চাপ দিবার কৌশল দ্বারা কংগ্রেস-লীগ মিলন সম্ভব করা যায় না। ভ্রাতৃত্বমূলক বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারাই এই ঐক্য গঠন সম্ভব।

বোম্বাই সম্মেলনের খাদ্য সম্পর্কীয় প্রস্তাবে বল হইয়াছে, "জনগণের দুর্দ্দশা বাড়ান এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্টের খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন নীতি রচিত হইয়াছে।" কাজেই, এই নীতি চালু করিবার জন্য সরকার যে সব প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়াছে কংগ্রেসসেবীরা যেন তাহার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন।" এই প্রস্তাব অদ্ভুত অজ্ঞতা প্রসূত। খাদ্যক্রয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কংগ্রেস-সেবীগণকে নিষেধ করিলে একদিকে দুর্নীতি ও অন্য দিকে মজুতদারীকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়।

এই নিষেধাত্মক নির্দ্দেশের ফলে আমাদের দেশেরই শহর ও গ্রামবাসীরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

কংগ্রেসের পুনর্গঠন

তাহা হইলে সম্মেলনের প্রধান নির্দ্দেশ কি ছিল? এই নির্দ্দেশ দুইটি প্রস্তাবে রূপ পাইয়াছে:

(১) কংগ্রেসের পুনর্গঠন। (২) শৃঙ্খলা রক্ষা।

এই দুইটি প্রস্তাবের উপরই সবচেয়ে জ্বালাময়ী ও বাগাড়ম্বর পূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়। প্রথম প্রস্তাবে "(১) ছাত্র প্রতিষ্ঠান, (২) ট্রেড ইউনিয়ন ও অসংগঠিত শ্রমিকসাধারণ (৩) 'গোমস্তা'দের প্রতিষ্ঠান (৪) কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, নারী-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানের সহিত এখনই পাকা-পোক্ত সংযোগ স্থাপন করিতে" কংগ্রেস সেবীগণকে বলা হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে কর্মীদের শিক্ষিত করিবার কথাও প্রস্তাবে রহিয়াছে। যাঁহারা আগে হইতে শ্রমিক, কৃষকদের সংগঠিত করিবার কাজে ব্যাপৃত আছেন, কংগ্রেসসেবীরা যদি তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিবার পন্থা গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই এই নূতন সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিব। এই কাজ অত্যন্ত বিরাট। যত বেশী কর্মী এই কাজে যোগদান করেন ততই মঙ্গল। কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্য দিয়া একটি ভিন্ন লক্ষ্য ও মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীযুত পাতিলের বিষোদ্গার

শ্রীযুত এস, কে, পাতিল প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ করিতে থাকেন। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্টদের পরিচালিত। এই কমিউনিষ্টরাই "কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।"

কমিউনিষ্টরা কি ভাবে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করিয়াছে, একমাত্র শ্রীযুক্ত পাতিলই তাহা জানেন! কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের পর সারা দেশময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ দেখা দেয়। ধর্ম্মঘট কিংবা ধ্বংসমূলক কাজে মাতিয়া শ্রমিক, কৃষক কিংবা ছাত্রগণ যাহাতে সেই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ না করে, কমিউনিষ্টরা তার জন্য যেখানেই পারিয়াছে সেখানেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে বৈ কি। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত উন্মত্ততা ঠেকাইতে কমিউনিষ্টরা যে সামান্য সফলতা অর্জন করিয়াছিল, তার জন্য তাহারা গৌরব বোধ

(শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভ্রম-সংশোধন :—৩য় পৃষ্ঠায় 'মুসলিম জাগরণ' প্রবন্ধে ১ম কলমে ৩য় সাব-হেডিংএ 'আত্মবিকাশের আশঙ্কা' স্থলে 'আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা' ও ৩য় কলমে ২য় প্যারায় ১৭ লাইনে '১৯১৭' স্থলে '১৯৩৭' হইবে।

মুসলিম জাগরণ

লেখক : পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

লীগের বিরুদ্ধে সন্দেহ

একজন লীগ-বিরোধী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি লীগের জন্মকর্ম্ম সবতাতেই সাম্রাজ্যবাদের হাত আছে বলিয়া মনে করেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি লীগের অপকীর্ত্তির নজিরগুলি দিলেন। প্রথমতঃ লীগের জন্মের কথা,—মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারের সময় পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী নিয়া ১৯০৬ সালে লীগ জন্মগ্রহণ করিল। সুতরাং ভেদনীতির মধ্যে লীগের জন্ম। দ্বিতীয়তঃ লীগ বা মুসলমান সমাজের ইতিহাসে যে যুগটা গৌরবের বলা হয়, অর্থাৎ ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির পরবর্ত্তী যুগ, বিশেষ করিয়া খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ। তাহার ভিতরও তিনি ফাঁকি দেখাইলেন। লীগ বা মুসলমান সম্প্রদায়ের লড়ায়ের পিছনে স্বাধীনতার তিলমাত্র প্রেরণা ছিল না, ছিল শুধু এক ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়ের বিদেশী ধর্ম্মনেতা খলিফার প্রতি অনুরাগ। তৃতীয়তঃ তাঁহার অভিযোগ যে লীগ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মতিলাল নেহরুর খসড়া শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর দিল না এবং পরবর্ত্তী আন্দোলনে কিছুমাত্র অংশ নিল না। চতুর্থতঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত সময়ে পাকিস্তান পাকিস্তান করিয়া লীগ ভেদনীতিকে এমন জায়গায় তুলিয়াছে এবং এত বাড়াবাড়ি আব্দার করিতেছে যে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি ও যুক্তফ্রণ্টের কোনই সম্ভাবনা থাকিল না। আসলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে মুসলমান সমাজকে দূরে রাখিবার জন্যই লীগ-নেতারা জানিয়া বুঝিয়া বারবার অসম্ভব দাবী জাহির করিয়াছে।

লীগ সম্পর্কে এরকমের মত হিন্দুমহাসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এই মতের ছোঁয়াচ খাঁটী দেশপ্রেমিক কংগ্রেসসেবীদের মনেও দাগ কাটিয়াছে। তাই এই সব সন্দেহগুলি নিয়া বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

বৃটীশ শাসনের প্রথম দিকে

মুসলমান রাজত্বের পরে আসিল বৃটীশ শাসন। বাংলাদেশ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের বন্দর হইতে শুরু করিয়া এই শাসন সারা ভারত জুড়িয়া বসিল। বৃটীশ শাসনের সূচনায় এক দিকে যেমন পুরাণো দিন স্মরণ করিয়া মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা বর্জ্জন করিয়াছে, তেমনই শাসকরাও বহুক্ষেত্রে মুসলমানদের পাত্তা দেয় নাই। তাই আমরা দেখি বৃটীশ শাসনের প্রথম যুগে হিন্দুভদ্রলোকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে এবং মুসলমানরা সেই শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া চলিতেছে। শুধু শিক্ষায় নয়, [illegible] সম্পদের ক্ষেত্রেও দেখি হিন্দুভদ্রলোকের অগ্রগতি। [illegible] বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দেখি হিন্দু [illegible] জমিদার ও মধ্যসত্ব এবং মুসলমান প্রজা। শিল্প ও বা[illegible]ণিজ্যের ক্ষেত্রেও পুরোগামীদের মধ্যে মুসলমানের [illegible] পাত্তা পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়াও ভারতের যে স[illegible] অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী,— যেমন বেলুচি[illegible]তান, সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু— সেখানে বৃটীশ [illegible] শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা পৌছিয়াছেও দেরীতে। [illegible] পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের কৃষিপ্রধান ও মুসলমান-প্র[illegible]ধান অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। তাই গো[illegible]টা ভারতে বৃটীশ শাসনের সঙ্গে শিক্ষায় ও সম্প[illegible]দে হিন্দুঅগ্রগতির পাশাপাশি মুসলমানদের প[illegible]ৎপদ অবস্থা অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এই হিন্দু অগ্রগতির পুরোভাগে পাই রাজা রামমোহন এবং হিন্দুকলেজ।

অনগ্রসর মুসলিমদের আত্ম-বিকাশের আশঙ্কা

বৃটীশ শাসন একদিকে আনিয়াছে তীব্রতম শোষণ। অপর দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার আলোড়ন আনিয়াছে। হিন্দুপ্রধান বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতাতেই তাই হিন্দু অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইয়াছে এবং এই অসাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে স্বভাবতঃই হিন্দু-নেতারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মুসলমানরা অগ্রসর হিন্দুসমাজ হইতে প্রায় একশে বছর পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৭৩ সালে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচার শুরু করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই খানে শিক্ষিত মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, ডাঃ আনসারী, ডাঃ মাহ্‌মুদ পরবর্ত্তীকালে মুসলমান সমাজের এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতারূপে দেখা দেন। পশ্চাদ্‌গামী মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

মিণ্টো-মর্লি শাসনসংস্কারের যুগে ভোটের অধিকারের জন্য শিক্ষা ও সম্পত্তির মালিকানাই ছিল মাপকাঠি। সাধারণভাবে নির্ব্বাচন হইলে মুসলমানদের আইনসভায় আসাই প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই মুসলিম জাগরণের সূচনা পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী ভেদনীতি হইতে আসে নাই— আসিয়াছে পশ্চাদ্‌গামী মুসলমানদের অগ্রসর হইবার আন্তরিক তাগিদ হইতে। প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরোধ বাধান অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের চিরা-চরিত নীতি কিন্তু এই নীতির কার্য্যকারিতা ব্যর্থ করাও প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য। তাই আমরা দেখি যে ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের প্রতিভা-শালী নেতারা লক্ষ্ণৌ শহরে লীগের সঙ্গে পৃথক নির্ব্বাচন মানিয়া লইয়া চুক্তি করিলেন এবং সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে যুক্ত-দাবী উপস্থিত করিলেন। এই ঐক্যকে তখনকার দিনে সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র লর্ড সিডেনহাম "বিপজ্জনক চক্রান্ত" বলিয়া ঘোষণা করেন। এই চুক্তির ফলেই ১৯১৭ সালে মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আসিতে বাধ্য হন।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়াই মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারের অসারতা ও ১৯১৯ সালের নিষ্ঠুর দমননীতির বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী অসহযোগ আন্দোলন এমন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারিয়াছিল। এ শুধু খলিফার প্রতি অনুরাগেই মুসলমানরা আসিয়াছিল একথা ইতিহাস বলে না। মুসলমানেরা আসিয়াছিল দুঃখ পীড়ন শোষণের বিরুদ্ধে তাহাদের অন্তরের তাগিদে, তাহারা আসিয়াছিল স্বাধীনতার উদ্দাম প্রেরণায়, খিলাফতের দাবী বৃটীশ শাসনকে সারা দুনিয়ায় ইস্‌লামের শত্রুরূপে দেখাইয়া মুসলমানদের স্বাধীনতার প্রেরণার সঙ্গে ধর্ম্মের অনুরাগকে কাজে টানিয়াছিল।

কংগ্রেস-লীগ যুক্ত আন্দোলনে বাধা দেখা দিল

অসহযোগের পরবর্ত্তী যুগে মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়াছে, শিক্ষার দ্রুত বিস্তার শুরু হইয়াছে। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মুসলমানরা স্থান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের তাগিদে জাগরণের যুগে মুসলমান সমাজের চেতনায় দুই রকম বিরোধের ধারণা আসিয়াছে। মূল বিরোধ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ বিকাশ মোটেই সম্ভব নয় অথচ দ্বিতীয় বিরোধও বাস্তব। তাহা হইতেছে শিক্ষায় অর্থে শিল্পে সংখ্যায় সর্ব্ববিষয়ে গরীয়ান হিন্দু সমাজের প্রাধান্য। মুসলমান সমাজ তাই ভাবিতে শুরু করিল যে ইংরেজশাসনের শেষ চাই বটে কিন্তু তাহার বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অন্য সব বিষয়ে অগ্রসর হিন্দুসমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমানের আত্মবিকাশ ও উন্নতি ব্যাহত হইবে।

তাই দেখি যে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া লীগও সমানে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু মতিলাল নেহেরুর শাসনতন্ত্রের খসড়ায় অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রে না রাখিয়া প্রদেশগুলিকে দিবার জন্য লীগের দাবী মানা হইল না দেখিয়া এই আদর্শের স্বরাজ বা স্বাধীনতার দ্বারা লীগ ও মুসলমান সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নাই। তাই ১৯৩০-৩৪ সালের আন্দোলনে তাহারা মুসলিম প্রগতির রাস্তা দেখিতে পায় নাই এবং সেই জন্য সেই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। কংগ্রেস ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবে ১৯২৯ সালের লীগের ঐ অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশকে দেওয়া দাবী মানিয়াছে। একটু দেরী হইয়া গিয়াছে।

মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির ধাপে ধাপে মুসলিমদের স্বাধীনতার দাবীও রূপ পাইয়াছে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর পর ১৯৩৭ সালে লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের যুগে লীগের নিজস্ব দাবী ছিল প্রদেশে অটোনমি। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে স্বভাবতঃই লীগের দাবী মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবে মুসলমানদের স্বাধীনতার অর্থাৎ পূর্ণ আত্মবিকাশের প্রেরণারই প্রকাশ। বৃটিশ শাসনের অধীনেও নহে, হিন্দুসংখ্যাধিক একটী ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসনের মধ্যেও নহে, ইহাই হইল মুসলমান সমাজের কথা। দেড়শো বছরের শোষণ, পীড়ন ও পশ্চাদপদ অবস্থার পটভূমিতে মুসলিম জাগৃতি এই রূপ নিয়াছে, পশ্চাদপদ মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে, শিক্ষায় সম্পদে শিল্পে তাহাদের অগ্রগামী হইতে হইবে, তাহার জন্য নিজ বাসভূমে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় তাহাদের আত্মবিকাশের অবাধ সুযোগ চাই অর্থাৎ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতা চাই।

কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী। ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদের অবসান কামনা করে। শিক্ষায়, শিল্পে, সম্পদে ভবিষ্যতের গরিমাময় ভারতের ধারণার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের সংকল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এবং তাহার পাশাপাশি আসিয়াছে মুসলীম জাগরণ ও তাহার সংগঠন মুসলিম লীগ। ১৯০৪ সালে কংগ্রেস স্বরাজের প্রস্তাব দিয়াছে ১৯১২ সালে লীগ সেই একই স্বরাজের প্রস্তাব দিয়াছে। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু—চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে সংগ্রাম করিয়াছে। ১৯২৮-২৯ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই তীব্রতম প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ১৯২৯ সালের শেষে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হইবার পর ১৯১৭ সালে লীগও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ফেডারেশন স্কিমের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। কংগ্রেসের নাগাল ধরিয়া লীগও ১৯৩৭ সালের পরে প্রায় কংগ্রেসেরই আদর্শে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরা এবং গণতান্ত্রিক চেতনার দিক দিয়া লীগ ঠিক কংগ্রেসের নাগাল ধরিয়া চলিতেছে।

সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রই মুসলিমদের স্বাধীনতার মূলকথা

এক জায়গায় কেবল স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের কোটী কোটী অনুচরের চেতনার সঙ্গে স্বাধীনতাকামী মুসলীম লীগের কোটী কোটী অনুচরের চেতনার তফাৎ আছে।

ভারত স্বাধীন হইলে এবং একটী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা হইলে তাহাতে কোনও হিন্দুর আশংকার কোনও কারণ নাই। সাম্রাজ্যবাদের লোপ হইলেই শিক্ষায় সম্পদে ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ হিন্দু তাহার পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশের সুযোগ পায়। কংগ্রেসের ঘোষণার মধ্যে ভিন্ন ভাষাভাষীদের আত্মপ্রকাশের গ্যারাণ্টী আছে। ইহাতেই বিভিন্ন ভাষাভাষী গুজরাটী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি সকল হিন্দুই সন্তুষ্ট। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত নয়। শুধু সাম্রাজ্যবাদের অবসান নয়। হিন্দু আধিপত্যের আশংকারও অবসান তাহারা চায়। শুধু সাম্রাজ্যবাদের লোপ হইল অথচ হিন্দু আধিপত্যের সুযোগ রহিল, এরকম অবস্থাকে মুসলমানরা স্বাধীনতা বলিয়া মানে না, এরকম দাবীর জন্য আন্দোলনে মাতিবার প্রেরণা তাহাদের বুকে জাগে না। তাই সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলির জন্য মুসলমান সমাজ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতা চায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের ইহাই হইল আজিকার দিনে বাস্তব বনিয়াদ।

ওই পথ

★ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

উজবেক কবি গফুর গোলামের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে।

ওই পথ,
অতি দীর্ঘ পুরাতন! — পথে
এক দিন গিয়াছে চলিয়া
বিশ্বজয়ী সেকেন্দর,
মহান সীজার,
নিহত জেঙ্গিস্ দল।
তৈমুর গিয়াছে রাখি কত চিহ্ন তার,
মোঙ্গলেরা নিল প্রতিশোধ,
আক্রান্ত হয়েছে মহাচীন।
করিয়াছে নরহত্যা তারা,
লুণ্ঠন করেছে কত সুন্দর উদ্যান।
রক্ত! রক্ত!
বাসের অযোগ্য স্থান—জুগি-অধ্যুষিত।
প্রাচীন সে পথে—
কান্তার বাহিয়া,
গিরি-উপত্যকা বহি
চলিয়াছে দলে দলে ক্রীতদাস, অনাথা বিধবা,
কণ্ঠবদ্ধ লোহার শৃঙ্খলে—
পাচ, দশ, শত লক্ষ নরনারী
দুর্বল ঘৃণিত জীব সবে,
বেদনায় নিপীড়িত—
তবু পুনঃ বেদনার দ্বারে আসিয়াছে ফিরে।
চলেছে ধ্বংসের লীলা রোম হতে পিকিং ব্যাপিয়া
মস্কো হতে সুদূর বোম্বাই,
পথে পথে ছড়ায়েছে নর-অস্থিকংকাল কপাল,
চলিয়াছে অজেয় বাহিনী।

এই সব পুরাতন পথে, যেথা সাক্ষ্য আছে
অতীতের শত কাহিনীর,
ইরান হইতে চীন, তুরস্ক হইতে হিন্দুস্থান—
সারা বিশ্ব ব্যাপি অসংখ্য মজুর
দ্রুতপদে দলে দলে হবে অগ্রসর—অজেয়
ইস্পাৎ চমু যেন,
সংঘবদ্ধ ঘন মৈত্রী পূতঃ।
এ প্রাচীন পথ অমরত্ব বহিবে মোদের।
এই পথে পথে
মুক্তির আনন্দধারা হবে প্রবাহিত,
শোণিতের পূতিগন্ধহীন।

বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা

১৯৩০-৩২এর কথা।

ইস্কুলে তখন নীচের দিকে পড়ি। শহরময় চাঞ্চল্য। ইস্কুলের দরোজায় রোজই পিকেটিং বসছে। পড়াশুনা সব মাথায় উঠেছে। ক্লাসে ব'সে হল্লা ক'রে মাষ্টার-ছাত্র একসঙ্গে তকলি কাটছে।

সারাটা দিন নেশার মত লাগতো। মাথায় খদ্দরের টুপি চাপিয়ে সগর্ব্বে রাস্তা দিয়ে হাঁটা। বিকেলে কংগ্রেস আপিসের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা—রীতিমত রোমাঞ্চ হ'ত।

রোজ একজন ক'রে 'ডিক্টেটর', সঙ্গে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক। জনতা তাদের গলায় ফুলের মালা পরাতো। পাশের গলি দিয়ে মুচিপাড়া থেকে বাঁধা টাইমে পুলিশ আসতো। এ-মোড় থেকে ও-মোড় 'বন্দেমাতরম্' শব্দে ফেটে পড়তো। ভর্তি কয়েদ-গাড়ী যতদূর দেখা যেত, সে ধ্বনি থামতো না।

গ্যাস-জ্বলার অনেক পরে বাড়ী ফিরতাম। লুকানো জায়গায় বে-আইনী বুলেটিন স্তূপাকারে জমতো।

একদিন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। সেদিনকার 'ডিক্টেটর' ফুলের মালা গলায় দিয়ে পুলিশের কালো ঘেরাও গাড়ীটাতে উঠছে। চেয়ে দেখি, এযে আমাদেরই উপরতলার বাড়ীওয়ালা! মনটা গর্ব্বে ভ'রে উঠলো।

সন্ধ্যেবেলায় পাড়ায় পঞ্চায়েত বসে। সারা দিন কোথায় কি ঘটেছে তার একটা হিসেবনিকেশ হয়। আজ অমুক পার্কে লাঠি চালিয়েছে, কাল দেখো ময়দানে ঠিক গুলী চলবে। আতঙ্কিত বয়োবৃদ্ধের দল যে যার ঘর আগলাতে ছোটে।

দেয়ালে দেয়ালে কারা অন্ধকারে নিষিদ্ধ সংবাদ আঁটে। ডাক এসেছে, ডাক!…

শান্ত অন্তঃপুরেও সে আগুন পৌঁছয়। নিরীহ কাকিমা পর্যন্ত রান্নাঘরে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে, 'আমাকে নিয়ে চল্, আমি জেলে যাবো।'

মাঝে কয়েকমাসের সুদীর্ঘ ব্যবধান। বড় একটা অসুখ থেকে উঠেছি। মাঝখানের কয়েকমাস আমার স্মৃতি থেকে লুপ্ত।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, নতুন রকমের পৃথিবী। সব কিছু বদ্‌লে গেছে। মনেই হয় না সামনের বড় রাস্তা কোনদিন বন্দেমাতরমে মুখর হয়েছিল। দুবেলা ম্লানমুখ অফিসযাত্রীর অফুরন্ত মিছিল দেখি।

ইতিমধ্যে আমরা বৌবাজারে ফিরিঙ্গিপাড়ায় এক নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছি।

একদিন হঠাৎ বাড়ীর সামনে জেলফেরত পুরানো বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা। চোখে তাঁর সেই আদর্শের তীক্ষ্ণতা আর নেই। দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 'ভেবেছিলুম জেল থেকে ফিরে এলে মাইনেটা বাড়বে। এসে দেখি, কর্পোরেশনের আগের নিয়মকানুন সব উল্টে গেছে। কি মুর্খোমিই না ক'রেছি।'

কাকিমা আবার মন লাগিয়ে সংসার ক'রছেন। কাঁধ থেকে ভাবপ্রবণতার ভূত একেবারে নেমে গেছে।

বৌবাজারের রাস্তায় ফুটপাথে ছবি বিক্রি হ'চ্ছে—ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাসের ছবি। দেখতে দেখতে সে ছবি নিঃশেষ হয়। আগুন ছাই-চাপা আছে—সান্ত্বনা পাই। মাঝে মাঝে উল্কাপাত হয়—মেছুয়াবাজার, পাহাড়তলী, ডালহাউসী। বোমা পিস্তলের মুখে একেকটা বজ্রনাদ। সকালে কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

বাড়ীতে প্রায়ই বাবার এক বন্ধু আসতেন। বৈঠকখানায় ব'সে তিনি নীচু গলায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গল্প ব'লতেন। সরকার পক্ষের তিনি উকিল। সে গল্প কারু শোনার কথা নয়। ঘরে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দরোজার বাইরে পর্দার আড়ালে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়াতাম। লোকটাকে পছন্দ ক'রতাম না। কিন্তু লোকটার গল্প বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল। শুনতে শুনতে মনে হ'ত, যেন সত্যি কোন মধ্যযুগের চারণের মুখে দেশভক্তের বীরত্বগাথা শুনছি।…

সূর্য সেন, অনন্ত সিং যেন বিচ্ছুরিত একেকটি অগ্নিশিখা। ধলঘাট, পাহাড়তলী যেন কুরুক্ষেত্রের একেকটি উপাখ্যান! বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় অসমসাহসী।

চট্টগ্রামের বীরদের জীবনের ছোট ছোট কাহিনী। হয়ত তাদের ডাইরির টুকরো কোন অংশ। কঠিন অজ্ঞাতবাস, অসাধারণ হৃদয়বৃত্তির চমকপ্রদ কোন গল্প। গল্প শেষ হ'লে মনটা বিষিয়ে উঠতো। এই ভণ্ড তপস্বীই ফের বাড়ী ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আইনের অস্ত্র শাণাবে।

১৯৩৭। মাঝখানে দীর্ঘ কয়েকটা বছর। এই অগ্নিযুগের শহীদ ও বন্দী বীরের দল বাঙালীর জীবনে আজ প্রিয়জনের স্থান নিয়েছে। গ্রাম্য কবির দল এদের বীরত্ব নিয়ে অসংখ্য গান লিখেছে। রাস্তার, মোড়ে, ট্রেণের কামরায় অন্ধ ভিখিরির মুখে সবাই ভিড় ক'রে সে সব গান শুনেছে। শহরপল্লীর শত শত মানুষ সূর্য সেন আর অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ আর অম্বিকা চক্রবর্তীর মত নির্ভীক সন্তান কামনা করেছে।…সে যুগের সে পথ আজ পুরাণো খোলসের মত পরিত্যক্ত। দেশ আজ নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু স্বাধীনতার যে আকাঙ্খা এই বীরদের প্রাণ তুচ্ছ ক'রতে শিখিয়েছিল, সে জ্বলন্ত প্রেরণা আজ বাঙালীর মনে মৃত্যুজয়ী হ'য়ে বেঁচে আছে।

আন্দামানে তখন বন্দীরা অনশন নিয়েছে। আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্তের বিরুদ্ধে নিরুপায় বন্দীত্বের একমাত্র অস্ত্র নিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে।

সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছি। সন্ত্রাসবাদের মোহ কাটিয়ে উঠেছি। অগ্নিযুগের বীররা তবুও কল্পনায় জীবন্ত হ'য়ে আছে। পার্কে পার্কে আবার মিটিঙের পর মিটিং। রাস্তায় রাস্তায় বিরাট মিছিল। পুরাণো উত্তেজনা আবার ফিরে এসেছে।

মহাত্মা গান্ধী আন্দামানের বন্দীদের কাছে অনশন ত্যাগ করবার ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানাবার অনুরোধ জানিয়েছেন। ২৮শে আগষ্ট তার উত্তরে সন্ত্রাসবাদযুগের বন্দীরা ঘোষণা ক'রেছেন:

"সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আপনি আমাদের সুস্পষ্ট মতামত জানাবার সুযোগ দিয়েছেন, সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ কথা আপনাকে জানাতে আমরা গৌরব বোধ করছি যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা এতদিন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, আজ আর সে পথে কারো বিশ্বাস নেই। রাজনৈতিক অস্ত্র কিম্বা পন্থা হিসাবে এ পথের ব্যর্থতা আমরা সবাই স্বীকার করি। আপনার মারফৎ সমগ্র দেশবাসীর কাছে এ কথা আমরা ঘোষণা ক'রতে চাই। আমাদের মতে, সন্ত্রাসবাদের পথে দেশের স্বাধীনতা নিকটবর্তী ত' হয়ই না, বরং এপথে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়।"

বন্দীমুক্তির সে আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বাংলা দেশ বন্দীদের দ্বীপান্তরের নির্ব্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ছাত্রসমাজে এক বিপ্লবী চেতনা দানা বেঁধেছে।

১৯৩৯-এর আগষ্ট। আবার দ্বিতীয় দফায় আলীপুর, দমদমের জেলে অনশন শুরু হয়েছে। আটাশটি দিন, আটাশটি রাত্রি উপবাসে।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর মহাদেব দেশাই এসে-ছিলেন গান্ধিজীর দূত হিসাবে। বন্দীদের তাঁরা অনশন থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছেন।

কয়েকজন অনশনব্রতীর অবস্থা সংকটাপন্ন। জীবনীশক্তি অনেকেরই স্তিমিত হ'য়ে আসছে। প্রাণ যাক্, তবু কঠিন সংকল্প থেকে এক পা পিছানো নয়।…সমগ্র দেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। সকলের চোখেমুখে ব্যাকুলতা: আত্মঘাতী পথ থেকে ওদের ফেরাও, ওদের কিছুতেই মরতে দিও না। …এদিকে ধর্মঘট অবসানের কোন লক্ষণ নেই।

কিন্তু সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ।

বাইরে উদ্বেলিত জোয়ার ফুলে ফুলে উঠছে। ইস্কুল কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্রের শোভা-যাত্রা রাস্তায় বেরুচ্ছে। পার্কে পার্কে বিরাট জমায়েতে বন্দীমুক্তির দাবী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বাংলা কংগ্রেস তার প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষ বোস, শরৎ বোস, মুজফ্ফর আহ্‌মদ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে বন্দীদের কাছে পাঠিয়েছে।

২৮ দিনের সুদীর্ঘ উপবাসেও স্বাধীনতার বীর সৈনিকদের শিরদাঁড়া একটু বেঁকেনি। চোখে তাঁদের শাণিত সংকল্প।

বন্দীমুক্তির দাবী নিয়ে কংগ্রেস লড়বে—গান্ধিজী এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বন্দীদের অনশন থেকে বিরত হবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। একদিকে বাংলা কংগ্রেস, অন্যদিকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি গান্ধীজী—দেশবাসীর অন্তরের এই দুই ব্যাকুল অনুনয় উপেক্ষা করা অসম্ভব। বন্দীদের অনশন ক্ষান্ত হ'ল।

সমস্ত বাঙালী সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে ছিল। এই বীরদের বাঙালী যে শুধু শ্রদ্ধা করে তাই নয়, সমস্ত অন্তর দিয়ে আপন প্রিয়জনের মত ভালবাসে।

আজও যারা কারাগারে বন্দী, স্বাধীনতার সেই ৫১ জন সৈনিক কংগ্রেসের পতাকার নীচেই মানুষ। তাদের অসামান্য স্বদেশপ্রেম, অসীম আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকবে। পুলিশের দেশজোড়া অত্যাচারই তাদের ভ্রান্তপথে ঠেলে দিয়েছিল। পরাধীনতার এই তীব্র জ্বালাই তাদের মনে অন্ধ, অসহিষ্ণু ভাবাবেগ এনেছিল।

ধরা পড়বার সময় এঁরা সবাই ছিলেন স্বাস্থ্যবান অল্পবয়সী যুবক। রমেশ চ্যাটার্জ্জি, হরিপদ ভট্চায, সুখেন্দু দস্তিদার, আশুতোষ ভরদ্বাজ, অমূল্য আচার্য-এঁরা সবাই তখন ১৫।১৬ বছরের বালক মাত্র। আজ জেলের মধ্যে দীর্ঘ ১৪।১৫ বছর অতিক্রান্ত হ'য়েছে। যারা সেদিন বালক ছিল, আজ তারা মধ্যবয়সী যুবক; যারা সেদিন যুবক ছিল, আজ তাদের কেউ প্রৌঢ়ত্বে, কেউ বার্ধক্যে উপনীত।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অম্বিকা চক্রবর্তী আজ ৫৩ বছরের বৃদ্ধ। ১৯৩২ সালে তাঁর ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল, পরে হাইকোর্টে সে হুকুম রদ হয়। ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যায় তিনি রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে চাবাগানের কুলিদের দাবী নিয়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি লড়াই করেন। আসাম বেঙ্গল লাইনের রেলমজুরের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে তিনি একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ও এ-আই-সি-সির সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের আন্দোলনে বহুবার তিনি কারাবরণ করেছেন। জীবনের ২৬টি বছর তাঁর বন্দীদশায় কেটেছে।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, সুনীল চ্যাটার্জী, শচীন কর গুপ্ত—৫১ জন বন্দীর প্রত্যেকেরই জীবনে কংগ্রেস আন্দোলনের এমনি বিরাট ঐতিহ্য আছে। এঁদের দেশপ্রেম আর এঁদের প্রাণতুচ্ছ করা সাহস আজ গ্রামের বহু গানের উৎস।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাধারণ কয়েদীরাও সবাই প্রায় ১৪ বছর কারাবাসের পরই ছাড়া পায়। কিন্তু এই সব রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় আমলাতন্ত্র এক অদ্ভুত প্রতিশোধের মনোভাব নিয়েছে। যাদের অপরাধ দেশে আমলাতন্ত্রের তৈরী এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, যাদের বিচার হয়েছে জুরীবিহীন কুখ্যাত স্পেশাল ট্রাইবুনালে—তাদের মধ্যে ১৪ জন একটানা চৌদ্দ বছরেরও বেশী কারাগারে আটক আছে।

১৯৪১-৪২। ফ্রান্সের পতন হয়েছে। একের পর এক দেশ নাৎসী কবলিত হচ্ছে। বাইশে জুন সোভিয়েট আক্রান্ত হ'ল। দেশে দেশে মুক্তিকামী জনগণের রণডঙ্কা বাজলো। মালয়, শ্যাম, ব্রহ্মদেশে জাপানের অভিযান শুরু হ'য়ে গেছে। নতুন শৃঙ্খল ভারতের পূর্ব দুয়ারে হানা দিল।

জেলের মধ্যে থেকেও বন্দী বীরের দল দেশবাসীর কাছে দৃপ্তকণ্ঠে আহ্বান জানালো: শত্রুকে প্রতিরোধ করো, ৪০ কোটি মানুষের নীরন্ধ্র ঐক্যে জাতীয় সরকার কায়েম করো।…নির্ভীক সেই ঘোষণা দ্বিধাচ্ছন্ন বাঙালীকে সেদিন প্রেরণা দিয়েছিল।

চট্টগ্রামে দিনে দুপুরে বোমা পড়ছে। পতেঙ্গায় জাপানী বোমায় এদেশের শত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছে। কর্ণফুলীর জল তাদের রক্তে লাল হয়েছে।

আমলাতন্ত্র বন্দীদের মুক্তকণ্ঠে জাপপ্রতিরোধের এই ঘোষণা বেতারে আর সরকারী লক্ষ লক্ষ ইস্তাহারে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা জানে, দেশবাসীর কাছে এদের কথার মূল্য আছে। কিন্তু তবু দেশরক্ষায় উন্মুখ এই বন্দীদের আমলাতন্ত্র কিছুতেই মুক্তি দেয়নি।

৩৫ লক্ষ বাঙালী দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিয়েছে। তাদের মৃত্যুযাতনার আর্ত্তনাদ কারাপ্রাচীর দীর্ণ ক'রে বন্দী দেশভক্তদের কানে পৌঁচেছে। চিঠি-পত্রে, বিবৃতিতে বন্দীরা এই দুঃসময়ে দেশবাসীকে সেবা করার ব্যাকুল ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। যাদের মুক্তিতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ভরসা পেত, যাদের সেবায় বাংলার হাজার হাজার মানুষ বেঁচে উঠতো—আমলাতন্ত্র তাদের বন্দী রেখে দেশবাসীর মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত করেছে।

আমলাতন্ত্র নির্লজ্জমুখে মিথ্যা অজুহাত দেখায়। 'বিশেষ জরুরী অবস্থা'র আজও দোহাই দেয়। সে 'অবস্থা' আজ বহুদিন অতিক্রান্ত। সন্ত্রাসবাদের প্রতি অনাস্থা বন্দীদের বহুবার বহু ঘোষণায় সুস্পষ্ট।

এঁদেরই মুক্তিপ্রাপ্ত সহকর্মীরা আজ দেশরক্ষায়, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের একেকজন অগ্রণী নায়ক। এঁদেরই সহকর্মী কমরেড নিরঞ্জন সেন, কমরেড কল্পনা দত্ত, কমরেড রণধীর দাশগুপ্ত, কমরেড সতীশ পাকড়াশী আজ দেশের মুক্তি সংগ্রামের একেকজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

এই বন্দীদের মধ্যে ১৭ জনের দণ্ডকাল ১৯৪১-৪৪এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু জেল গেটেই আবার তাদের ভারতরক্ষা বিধানে আটক করা হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার ৭ বছর আগে যাদের কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছে, সোভিয়েট আক্রান্ত হবার পর থেকে যারা যুদ্ধে সহযোগিতা ঘোষণা করেছে—তাদেরই বিরুদ্ধে এই মর্মান্তিক প্রহসন।

এই ৫১ জন বন্দী জেলের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি তাঁদের আনুগত্য তাঁরা ঘোষণা করেছেন।

এ ছাড়াও কমিউনিষ্ট পার্টির ৬ জন সভ্য নন্দদুলাল সিং, দেবেন দাস, ভূপাল পাণ্ডা, শৈলেন দত্তগুপ্ত, অনিল দে, বিপিন দত্ত ও বীরেন দত্ত ১৯৪২-এর [illegible] আগষ্টের পর বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। তাঁরা [illegible] দেশবাসীকে ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের পথ থেকে ফেরাবার [illegible] জন্য আন্দোলন করছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁরা মুক্তি পাননি।

একজন সহকর্মীর মুখে শুনেছি: [illegible] চট্টগ্রামের দরজায় যখন জাপানীরা হানা দিয়েছিল, যখন চট্টগ্রামের পথে পথে শেয়াল কুকুরের মত [illegible] অনাহারে মানুষ মরছিল—তখন চট্টগ্রামের এক [illegible] অজ্ঞ চাষী নাকি ব'লেছিল, তোমরা দেখে নিও অনন্ত, গণেশ ঠিক আসবে। এই সর্বনাশে তারা কি [illegible] আমাদের ভুলে থাকতে পারে?

অনন্ত, গণেশ আসবে, আসবে বাংলার ৫১ জন বীর বন্দী। কিন্তু তাদের মুক্তির জন্যে আমাদের প্রস্তুতি কৈ?

কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। এই বন্দীরা লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর স্বপক্ষে দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিল। তাই লীগও আজ এদের কাছে ঋণী। বন্দী-মুক্তির দাবী কংগ্রেস ও লীগ একবাক্যে ধ্বনিত করুক।

বন্দীরা আজ ভগ্নস্বাস্থ্য। সময় খুব সংক্ষেপ। কারাজীবনের দীর্ঘ নরকযন্ত্রণায় বন্দীদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'চ্ছে। আজ যদি বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ নামে, সে বন্যার সামনে বাধার দেয়াল চূর্ণ হবেই।

কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল

… জরুরী অবস্থার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাবলে বহু বন্দী আজ পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ। এই সমস্ত বন্দীরা সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাঁদের অনাস্থা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এই অবস্থায় তাঁদের এখনও আটক রাখার মধ্যে কোন ন্যায়বিচার নেই—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই মত পোষণ করে। বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যাকে সর্বভারতীয় বিরাট এক আন্দোলনে রূপ দেবার সংকল্প এ-আই-সি-সির এই বৈঠক গ্রহণ করছে। অবিলম্বে বিনা সর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবীতে দেশময় জোর আন্দোলন চালানোর জন্য সমস্ত কংগ্রেস কমিটির কাছে ওয়ার্কিং কমিটি যাতে নির্দেশ পাঠায়, এই সভা তার নির্দেশ দিচ্ছে।' (১৯৩৯ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব।)

লালফৌজের অগ্রগতিতে
ইউরোপের দেশে দেশে মুক্তির নিশান

লেখক :
গোপাল হালদার

বার্লিন রেডিও-র ২৯শে অক্টোবরের শেষ খবর এই যে, পূর্ব প্রুশিয়ার অভ্যন্তরে লালফৌজ ২০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, গোল্দাপ্ শহর তাহাদের করতলগত ; উত্তরে ফিন্ল্যাণ্ডের পেটসামোর নিকেলের খনি দখল করিয়া লালফৌজ নরওয়ের সীমানায় পৌঁছিয়াছে, দক্ষিণে হাঙ্গারিতে হাঙ্গেরির জার্মান-চালিত সৈন্যরা রাজধানী বুদাপেশ্ত রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। লালফৌজ বুঝি আসিয়া পড়িল।

লালফৌজের শৌর্যের পরিচয়

বুঝা গেল, লালফৌজের যে হৈমন্তিক অভিযান প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে আরম্ভ হয় তাহা সার্থক হইতে চলিয়াছে। পূর্ব প্রুশিয়ার যে-রক্ষাব্যূহ হিটলার সমস্ত শক্তি দিয়া দৃঢ় করিয়াছে গোলদাপ্ ও সুভাল্কি-র মধ্যে লালফৌজ তাহা ভেদ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব প্রুশিয়া সহজে অধিকৃত হইবে না,—এই প্রদেশেই জার্মান সেনাপতি-চক্রের ও জমিদার-চক্রের বাসভূমি, এইখানে যুদ্ধ-কারখানাও এখন আসিয়া জমিয়াছিল। তাই পূর্ব প্রুশিয়ার যুদ্ধ এক হিসাবে প্রায় সমস্ত জার্মানির যুদ্ধ। কাজেই, হিটলারের বাহিনীও এখানে শেষ রক্তবিন্দু দিয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু 'অক্টোবর বিপ্লবের' উৎসবকালে হয়ত আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না, বিপ্লবের বিজয়বাহিনীর সম্মুখে প্রতিক্রিয়ার গৃহকেন্দ্র ভাঙিয়া পড়িতেছে। লেনিন জানিতেন, বিপ্লবকেও সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে—আর সেই সামরিক পরীক্ষায় সামরিক অস্ত্র চাই। লালফৌজই সেই অস্ত্র। বিপ্লবের অস্ত্রকে শান দিতে হয় প্রতিদিন—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাই দেখি ইউরোপের বড় বড় জাতি ও বড় বড় সৈন্যবাহিনী যখন হিটলারের "অপরাজেয় বাহিনার" সম্মুখে চুরমার হইয়া যাইতেছে, তখন বিপ্লবী 'লালফৌজের' যুবক সৈন্যাধ্যক্ষরা এই যুগের যুদ্ধের সামরিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করিতেছে বিপ্লবী নিষ্ঠার সহিত।

এক বৎসর পরে যখন ষ্টালিনগ্রাদের অগ্নিপরীক্ষা চলিয়াছে ১৯৪২-এর এমনি অক্টোবরের দিনে, তখন সকলের বিশ্বাস হইয়াছে—'লালফৌজ' বীরের বাহিনী বটে, তবে সোভিয়েট দেশ আর টিকিল না। নূতন অধ্যায় লেখা শুরু হইতেছিল, কিন্তু তখনি—প্রায় তখনি ১৯শে নবেম্বর, ভলগা পার হইয়া লালফৌজ নূতন উদ্যমে ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করিল। পৃথিবীর যুদ্ধ-পণ্ডিতেরা চমকাইলেন, জার্মানীর যুদ্ধ-চারণেরা চিৎকার জুড়িয়া দিল—"আমরা প্রতারিত হইয়াছি, আমাদের সেনাপতিরা হার মানিয়াছেন, আমাদের যুদ্ধ চাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

সত্যই জার্মান সমরবিশারদেরা প্রতারিত হইয়াছিল। বৎসরে বৎসরে তাহারা সেনাপতি ভরোশিলভের ঘোষণা পড়িয়াছে—"শত্রু আমাদের আক্রমণ করিলে শত্রুর দেশ আক্রমণ করিব। সেই দেশেই তাহাকে পরাভূত করিব।" ইহা আক্রমণমূলক রণনীতি।

সেই মূল যুদ্ধনীতি অনুযায়ী লালফৌজ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রেও আপনাদের সমর সমাবেশ ও যুদ্ধ কৌশল পরিচালিত করে—আক্রমণের মুখে বাধা দেয়, দেশ ছাড়িয়া পিছু হটিয়া আসে, আবার ঘাঁটি বাঁধিয়া দাঁড়ায়,—আর ততক্ষণে নিজেদের পিছনের বিপুল দেশে তৈরী হয় নতুন-বাহিনী, নতুন যুদ্ধোপকরণ ; আর শত্রুর পিছনে অতুল কৌশলে সক্রিয় হয় গেরিলা-বাহিনী। এই ভাবেই জার্মানীর আক্রমণমূলক যুদ্ধনীতি ব্যর্থ হইতেছিল ; একেবারে মিথ্যা হইয়া যায় তাহার 'বিদ্যুদ্ যুদ্ধের' কৌশল!

ষ্টালিনগ্রাদে হিটলারেরও ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে। ইহার পরে হিটলার বাহিনী আরও অনেকবার খুঁটি লইতে চেষ্টা করে। শেষ বারের মত কুর্স্কে (৫ই জুলাই, ১৯৪৩) আক্রমণ-মূলক যুদ্ধের শেষ পরীক্ষা হয়। তাহার পরে—একে একে আর্সিল ওরেল, বেলগোরোদ, খারকভ্, ডনবাস, কিয়েভ,—১৯৪৩-এর এইরূপ দিনে। আর জার্মান যুদ্ধবিদ্রা 'আক্রমণের' কথা তোলেন না। আজ তাহাদের শেষ ঘাঁটি পূর্ব প্রুশিয়া বিদীর্ণ হইতে চলিয়াছে—অন্যদিকে ফিন্ল্যাণ্ড হইতে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া পর্যন্ত সর্বদিকে লালফৌজের অভিযান অগ্রসর হইয়া যাইতেছে—হাঙ্গেরি, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার দুয়ারে তাহারা আসিয়া পড়িতেছে।

এই সামরিক প্রয়াসের সামরিক হিসাব লইলেও আজ যাহা দেখি তাহাও বুঝিবার মত। প্রথমত লালফৌজ অপরাজেয় হিটলার-বাহিনীকে দীপ্তিহীন করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, লালফৌজ প্রমাণ করিয়াছে যে, যুদ্ধবিদ্যা যুঙ্কারদের বা শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া নয়। মিলিটারি কাস্ট বলিয়া কিছু নাই, এমন কি, কৃষক মজুরের সন্তানদেরই নিকটে—এই ঝুকভ, ভাটুটিন্, রোকোসোভ্স্কি, কোনিয়েভ, বাগরামিয়ান—ইহাদেরই নিকটে ম্লান হইয়া গেল জার্মান সেনামণ্ডলের অত বুদ্ধি, অত পাণ্ডিত্য, অত মনীষা, অত প্রতিভা! কোথায় গেল ফন ল্যোব, লীব্, ম্যানষ্টিন্, প্রভৃতিরা। শ্রমিক কৃষকশ্রেণী পৃথিবীর যুদ্ধ-বিদ্যায়ও নতুন জ্ঞান দান করিল। ইহার প্রধান কারণ, অবশ্য এই—লালফৌজ বিপ্লবীর বাহিনী, আর জার্মানবাহিনী প্রতিক্রিয়ার বাহিনী।

লালফৌজের শক্তির মূল

লালফৌজ শুধু বিজয়ী নয়, সে মানুষের মুক্তির বাহিনী।

এই কথাটি আজ বিশেষ করিয়া বুঝিবার মত। অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তির বাহিনীকে দেখিয়া অনেকে মনে করেন লালফৌজ বুঝি শুধুই একটা যন্ত্র—একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ-যন্ত্র। সত্য বটে, যে-কোন বাহিনীকেই যুদ্ধ করিতে হয়, সৈনাধ্যক্ষদের আদেশ মানিতে হয়, আর তাহার মূল যুদ্ধনীতি প্রণয়ন করে সেনাপতি মণ্ডল ও রাষ্ট্রপতিরা। এই হিসাবে যে-কোনো বাহিনীকেই মনে হইবে যন্ত্র। কিন্তু এই যন্ত্রে প্রাণ আছে, না, না—আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় তাহার অতীত দেখিয়া, তাহার সংগঠনের রীতিনীতি হইতে আর তাহার বর্তমান কাজ কারবার হইতে। এই সব দিক হইতে দেখিলেই বুঝা যাইবে সোভিয়েট রাষ্ট্রও যেমন অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে একেবারে স্বতন্ত্র জিনিস, লালফৌজও তেমনি অন্যান্য সৈন্যবাহিনী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, মনে করা দরকার লালফৌজের জন্মক্ষণ, ও জন্মকথা। আজ কেহ বড় তাহাতে সংশয় রাখেন না। বিপ্লবের বৃহৎ আদর্শ সম্মুখে লইয়াই লালফৌজ সংগঠিত হয়। তাহার অতীত ইতিহাস দেখিয়া মানুষ ভরসা পাইতে পারে। ইহার পরেই উঠে লালফৌজের সংগঠনের নীতি ও রূপের কথা। তাহাতেও আজ বেশি লোক সন্দেহ প্রকাশ করেন না। সকলেই প্রায় জানেন যে, এই লালফৌজে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ নাই ; বংশ-গৌরবে বা ধন-গৌরবে কমিশন লাভ হয় না ; গুণেরই আদর হয়। ইহাতে রুশ, ব্যালোরুশ, উক্রাইনী, হইতে জর্জিয়ান্, উজবেক্, কাজাক্, প্রভৃতি সকল জাতির লোক সমভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার অর্থ, উহাতে রুশ না হইলে কেহ কমিশন পাইবে না, কিংবা পাইলেও পাইবে কম বেতন ; ঢুকিতে পারিবে না ট্যাংক বাহিনীতে, কিংবা বিমান-বাহিনীর কোনো বিশেষ কোঠায়—এইরূপ ভেদ নাই। উহার সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের 'ঔপনিবেশিক বাহিনীর' তাই তুলনা হয় না। অবশ্য, ইহার কারণ, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সার্বজাতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি—রাষ্ট্রেই যেখানে বৈষম্য নাই, সেখানে সৈন্যদলে বৈষম্য আসিবে কেন? ইহাও অধিকাংশেই আজ মানেন যে, এই নানা জাতি লইয়া গঠিত লাল ফৌজে শৃঙ্খলা ভালো, কিন্তু সেই শৃঙ্খলা অন্য দেশেরমত উঠিতে বসিতে সেলাম ঠোকা শৃঙ্খলা নয় ; তাই লালফৌজের আফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান নাই, সহযোদ্ধার সৌহার্দ্য আছে। আবার মানেন যে, লালফৌজ সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনী। লেখাপড়া হইতে সমস্ত রকম জ্ঞান বিজ্ঞানে উহার সৈনিকেরা আগ্রহশীল। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে অন্যান্য দেশের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইহার তফাৎ পরিষ্কার হইয়া উঠে। অন্যান্য দেশ চায় সৈন্যকে "বন্য" রাখিতে, অন্তত "যন্ত্র" করিতে ; লাল ফৌজ চায় "সচেতন মানুষ।" এই জন্যই লাল ফৌজ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ইউনিভার্সিটির মত। এখানে সকল রকম শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

লালফৌজ সকল দেশের মুক্তির প্রতীক

এই সংগঠনের যে দুইটি দিক লালফৌজকে প্রগতিশীল রাখিবেই তাহা তাই স্মরণীয়—ইহাতে শ্রেণীভেদ নাই ; ইহা সচেতন সৈনিকের বাহিনী অর্থাৎ লালফৌজ জানে জনগণের মুক্তি ছাড়া সোভিয়েটে দেশও নিরাপদ হইতে পারিবে না।

অক্টোবর বিপ্লবের এই সত্যকে আজ বিজয়ী লাল ফৌজ রূপও দিতেছে। যেখানেই লাল ফৌজ অগ্রসর হইতেছে সেখানেই মানুষের শিকল খসিয়া পড়িতেছে। কোথাও লাল ফৌজের 'আমগট' স্থাপন করিতে হয় না। লাল ফৌজ আজ পোল্যাণ্ডের ভিতরে—পোল্যাণ্ড সে-ই মুক্ত করিতেছে, লণ্ডনে-বসা সোসোনকোভস্কির বন্ধুরা তাহা মুক্ত করিবে না। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সে চাহিবে পোলদের দেশে পোলিশ জনসাধারণের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক, কোন স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন যেন না বসে। লাল ফৌজ রুমানিয়ায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—সেখানে রুমানিয়ার বিপ্লবী জনসাধারণেরই হাতে রহিয়াছে গবর্ণমেণ্টের ভার। লাল ফৌজ যুগোশ্লাবিয়ার "তিতোর" বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বেলগ্রাদ উদ্ধার করিল—সেখানে সে নিজের সৈন্যচালিত শাসন একদিনও বসাইতে চায় নাই। এমন কি ফিন্ল্যাণ্ডে পর্যন্ত লাল ফৌজ পূর্বে বা পরে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হস্তার্পণ করে নাই। প্রত্যেক জাতি আপন স্বাধীন মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ করুক—এই বিপ্লবী নীতিই তাহার মূল মন্ত্র। এই জন্যই ইউরোপের ছোট বড় জাতিগুলি চায় লাল ফৌজ অগ্রসর হইয়া আসুক—তাহাদের মুক্তির দিন তাহা হইলে সমাগত হইবে।

'অক্টোবর বিপ্লবের' দিনে লালফৌজের এই বিজয় অভিযান স্মরণীয় এই জন্যই যে, ইহা শুধু একটা সৈন্য বা সেনাপতিমণ্ডলের সামরিক কীর্তি নয়, লালফৌজ জনগণের নব-চেতনার প্রতীক, তাহার জয় বিপ্লবের এক সার্থক অভিযান। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ২৩শে ফেব্রুয়ারী যখন লালফৌজ ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ভূমিষ্ঠ হয় 'অক্টোবর' 'বিপ্লবের' প্রয়োজনে। বিপ্লবী সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামরিক দায়িত্ব তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, আর বিপ্লবী সোভিয়েট রাষ্ট্র গ্রহণ করে তাহাকে সংগঠন করিবার দায়িত্ব। সোভিয়েট-তন্ত্র ও লালফৌজ দুইই আসলে একটি মূল সত্যকে রূপ দিয়া চলে—সেই সতই অক্টোবর বিপ্লব।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : **বঙ্কিম মুখার্জি**, এম, এল, এ

অফিস ঃ ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৸০, ৬ মাস ২৸০, ৩ মাস ১৷০

বহু জাতির দেশ সোভিয়েটের ঐক্য

ভূপেন চক্রবর্তী

"সোভিয়েট দেশের জাতিসমূহের মধ্যে কলহ এবং গৃহ-যুদ্ধ শুরু হবে, এ-আশা যে কত নিরর্থক, হিটলারপন্থী রাষ্ট্রনায়করা আজ তা বেশ বুঝতে পারছেন। যুদ্ধের সকল ঝড়-বিপদের মধ্যে আমাদের দেশের জাতিসমূহের বন্ধুত্বের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সকল জাতির মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে-বন্ধুত্ব আরো বেশী দৃঢ় হয়েছে।"

নভেম্বর বিপ্লবের ২৬তম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড ষ্টালিন বহু-জাতির দেশ সোভিয়েটের জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

১৮০টি জাতি ও গোষ্ঠি লইয়া যে সোভিয়েট দেশ—জারতন্ত্রের আমলে যে-দেশ ছিল গৃহ-যুদ্ধের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন—সেই দেশে এমন অখণ্ড জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিল কি ভাবে? এই প্রশ্নের জবাব পাইতে হইলে রাশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে জাতি-সমস্যাকে কি ভাবে সমাধান করার চেষ্টা হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়।

সামন্ত যুগের অখণ্ড রাশিয়া

সমগ্র রাশিয়ায় যখন সামন্ত-প্রথা চলিয়াছে, তখন জাতি-সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিয়া সেখানে কিছু ছিল না। গোটা জার-সাম্রাজ্যকেই একটি 'অখণ্ড জাতি' হিসাবে চিন্তা করা হইত। ক্রমশঃ খাস রুশ অঞ্চল "গ্রেট রাশিয়ায়" ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল। গ্রেট রাশিয়ার লোকরা অখণ্ড জাতির' নামে জার-সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনুন্নত জনসাধারণের উপর শোষণ ও আধিপত্য কায়েম করিতে লাগিল। ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে তাহাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর সমগ্র রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক উন্নতির অগ্রগতি দেখা দিল। একদিকে, প্রত্যেক এলাকার ধনিকশ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় শিল্প-বাণিজ্য গড়িবার প্রচেষ্টা দেখা গেল; অপরদিকে, জমিদারী প্রথায় শোষিত সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত এলাকার জনগণের মধ্যেও জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করিল। অথচ জার-শাসন ছিল সকলেরই উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে প্রধান বাধা। জার-সাম্রাজ্যবাদ এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে, এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে টুকরা টুকরা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর হইতে 'জাতি-সমস্যা' একটা সত্যিকারেরর সমস্যা হিসাবে দেখা দিল।

এক জাতি, না বহু জাতি?

ঠিক এই সময়ে রাশিয়ার সাম্যবাদীরা জাতি-সমস্যার আসলরূপ দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন। কমরেড ষ্টালিন ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া বহু জাতির দেশ। যাহারাই অবিচ্ছিন্ন এক অঞ্চলে বাস করে, এক ভাষা বলে, যাহাদের সংস্কৃতি এক, মানসিক গঠন এক রকমের, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রণালী এক রকমের তাহারাই এক একটি জাতি। জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য জনগণের একতাবদ্ধ আন্দোলন যেমন যেমন অগ্রসর হইবে, তেমন তেমন জার-সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি জাতি তাহাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িবার অধিকার দাবী করিয়া অগ্রসর হইবে। ক্রমশঃ তাহাদের অস্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

রাশিয়ার সমস্ত ইহুদী একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইবে কি না, এই প্রশ্ন উঠিলে কমরেড ষ্টালিন তাহার জবাবে বলেন, ইহুদীরা কোন একটি বিশেষ এলাকায় একসঙ্গে বেশী সংখ্যায় বাস করে না। তাহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল, তাহাদের মধ্যে এমন লোক খুব কম আছে যাহাদের সহিত কৃষিকাজের কোন সম্পর্ক আছে। পঞ্চাশ ষাট লক্ষ রুশীয় ইহুদীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩.৪ জনের চাষবাসের সহিত যোগাযোগ আছে, বাকী শতকরা ৯৬ জন সারা রাশিয়ার উপর ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প লইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। 'এমন একটি জেলাও নাই যেখানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ'।

অনগ্রসর জাতির স্বাধীনতা দাবী

ধনতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে, বঞ্চিত জাতিসমূহের মধ্যেও স্বাধীন জীবন গড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, কিন্তু তাহারা স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িবার সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু জাতির শাসকশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহারই ফলে, তরুণ জাতি-সমূহ স্বাধীনতার সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

এই তথ্য আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদীরা বুঝিতে পারিলেন যে, রাশিয়ার প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ষ্টালিন বলিলেন, প্রত্যেক জাতির ভিত্তিতে নিজের জীবন গড়িবার অধিকার থাকিবে, অন্যান্য জাতির সহিত যুক্তরাষ্ট্র গড়িবার অধিকার থাকিবে, সম্পূর্ণ রকমে পৃথক হইবারও অধিকার থাকিবে। ইহার অর্থ হইল, জাতিসমূহকে সার্বভৌম ক্ষমতা দান করা এবং প্রত্যেক জাতিকে সমান হিসাবে দেখা।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য

কিন্তু সকল অবস্থায়ই প্রত্যেক জাতির পক্ষে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া যে লাভজনক হইবে তাহা নহে। স্টালিন বলেন যে, ট্রান্সককেশিয়ার তাতার জাতির মোল্লারা যদি ঠিক করে যে রাশিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা সেখানে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবে তাহার **অধিকার** তাহাদের নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু তাহা কি শোষিত শ্রম-জীবি তাতারদের স্বার্থে হইবে? এই অবস্থায় নিশ্চয়ই সাম্যবাদীদের **কর্ত্তব্য** হইবে জনমতকে উহার বিরুদ্ধে সংগঠিত করা। কাজেই কোন্ অবস্থায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্য দিয়া জাতি সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই দেশের বাস্তব অবস্থার উপর, ইতিহাসের গতির উপর। 'কোন একটা জাতি কিভাবে তাহার জীবন গড়িয়া তুলিবে, তাহার শাসন-তন্ত্রকে রূপ দিবে তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করিবে সেই জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর।' "রাশিয়ার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের আন্দোলনের উদ্দেশ্য পূর্ণ গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। জাতি-সমস্যাকে এই আন্দোলনের সহিত একত্রে বিচার করিতে হইবে। সুতরাং, দেশে পূর্ণগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হইবে জাতিসমস্যার সমাধানের ভিত্তি এবং সর্ত্ত।"

মেনসেভিকদের সহিত পার্থক্য কোথায়?

সাম্যবাদীরা যখন এইভাবে প্রত্যেকটি জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়িবার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তথাকথিত সমাজতন্ত্রী

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি

'মেনসেভিকরা' তখন বলিতেছিল: আমরা আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদী; যদি আমরা আন্তর্জাতিক; সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিক গঠন করিতে চাই, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আজ জারতন্ত্রের অধীন হিসাবে রাশিয়া অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। ইহার পরে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে এবং তাহার মধ্যে মজুর ও চাষী মিলিত হইবে, তখন তো আর জাতি সমূহের কথাই আসে না। আমরা এখন শুধু জাতি-সমূহের সংস্কৃতিমূলক স্বাধীনতাই স্বীকার করি।

সত্যিকারের আন্তর্জ্জাতিকতার সহিত 'মেনসেভিকদের' আন্তর্জ্জাতিকতার যে কত তফাৎ লেনিন তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়া দেন। তিনি দেখান যে, এই সকল লোক আসলে 'অখণ্ড রাশিয়া'-র নামে দুর্ব্বল ও অনগ্রসর জাতিগুলির উপর গ্রেট রাশিয়ানদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে চাহে। লেনিন বলেন যে, যেসমস্ত জাতি শক্তিমান এবং অপর জাতির উপর প্রাধান্য করে, সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য হইল, অনগ্রসর জাতিসমূহের পৃথক হওয়ার অধিকার দাবী করা; অপর পক্ষে, ছোট এবং অনগ্রসর জাতিসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য হইল 'স্বেচ্ছায় সকলে একত্রে থাকিব' এই মনোভাব গড়িয়া তোলা। ইহাই আসল আন্তর্জ্জাতিকতা।

বহুজাতির পরিবার সোভিয়েট রাষ্ট্র

প্রতেক জাতি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এমন কি পৃথক হইবার অধিকার লাভ করিয়া জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের সাফল্যের সাক্ষ্য দেয় রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়া সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ হইল, জনগণের হাতে ক্ষমতা আসিল, সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই **সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র** গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। ১৯১৮-২২ সালের গৃহ-যুদ্ধের মধ্য দিয়া প্রত্যেকটি জাতি আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, সোভিয়েটে গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব মূলক চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইল। ১৯২২ সালে তাহারা জয়যুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় একত্রে এক যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

কিন্তু সংগ্রাম এখানেই শেষ হইল না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা অনগ্রসর, তাহাদের অগ্রসর 'গ্রেট-রাশিয়ার' সহিত সমান উন্নত করার কাজ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। সোভিয়েট প্রাচ্যের কৃষি প্রধান এলাকায় গড়িয়া উঠিল বড় বড় শিল্প, আবার শিল্পোন্নত খাস রাশিয়ারও শুরু হইল কৃষিকাজ। সোভিয়েটের প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি আনয়ন করিয়া বিশ্বের জনগণের বিস্ময় সৃষ্টি করিল। এই অগ্রগতির মধ্য দিয়া অনেক অখ্যাত জাতি, অজ্ঞাত ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করিল; সোভিয়েট পরিবারে সমান মর্য্যাদা লাভ করিল। জাতীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়া সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠিল। ১৯৩৬ সালের 'ষ্টালিন শাসন-তন্ত্র' হইল তাহার সাক্ষ্য।

জাতীয় ঐক্যের নূতন স্তর

কিন্তু ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ত্রও সোভিয়েট দেশের জাতি-সমূহের সম্পর্কে শেষ কথা নয়। ১৯২৩ সালের পার্টি-কংগ্রেসে কমরেড ষ্টালিন বলেন, "জাতি সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অনেক বার আলোচনা করতে হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং এখনও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব।"

সেই পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ফ্যাসিষ্ট দস্যুর আক্রমণের মধ্য দিয়া। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ-প্রেমক সংগ্রামে সোভিয়েটের জাতীয় ঐক্য এক নূতন স্তরে উঠিয়াছে। এই নূতন স্তরকে শাসনতন্ত্রে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট পার্লামেন্টে

(শেষাংশ ১১শ পৃঃ দেখুন)

দুঃস্থ বাঙ্গালীর জীবন কথা

মণ্ডল আবার সংসার পাতিবে

★ লেখক: সরোজ মুখার্জী ★

সেরাজ মণ্ডল গ্রাম ছাড়িল
[পঞ্চাশের ৩রা আষাঢ় সে, তার স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে ও একটি ভাইকে লইয়া খাদ্যান্বেষণে গ্রামের বাইরে চলিল]

আষাঢ়ের বর্ষা। লোকটি জলে ভিজিয়া জড়সড়। গাত্রাচ্ছাদন বলিতে একটী শতচ্ছিন্ন কাপড়। দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—ওইখানে গিয়ে গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াওগে না। একেবারে গ্রামের লোক, কলিকাতায় বোধ হয় এই প্রথম আসিয়াছে। তাই পিচঢালা রাস্তার কোণে যে বসিয়া ভিজিতে পাইতেছে সেইটাই তার কাছে সৌভাগ্য মনে হইতেছিল। বসার জায়গা পাইলে যে মাথা ও শরীর জলের ঝাপটা থেকে বাঁচান যায় না—সে বুদ্ধিটকুও নাই। লোকটির গতর-খাটানো চেহারা—কিন্তু বলিষ্ঠতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধাইলাম, ব্যাপার কি। তখন কলিকাতার রাস্তায় বিনাকাজে বহু লোককে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা যায়। সেও তাদেরই একজন। অন্নাভাবে এখানে আসিয়াছে। সে সেরাজ মণ্ডল। তার দুইটি ভাই ও দুইটী ছেলেমেয়ে আর-এক রাস্তার এক কোণে আছে বলিল—রাস্তার নাম জানে না। তার স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছে। মুসলমানের মেয়ে গ্রামের পর্দ্দা-টর্দ্দা ছাড়িয়া এখন কলিকাতার শহরে, সে গিয়াছে পাঁচ-হাজারের একদল মেয়ের সঙ্গে লাট-কাউন্সিলে। তারা সব চালের অভাবের কথা জানাইবার জন্য মন্ত্রীদের ও বড় বাবুদের কাছে দৌড়িয়াছে।

তখন সবেমাত্র হক-মন্ত্রীসভার পালা শেষ হইয়াছে। চালের দর-বাঁধার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া তাঁরা সিংহাসন হইতে বিদায় লইয়াছেন। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় লোক-জন সভা-সমিতি ও মিছিলের সোরগোল। সেখান থেকে আওয়াজ উঠিতেছে—"এ মন্ত্রীত্ব ভাল কি সে মন্ত্রীত্ব ভাল তা নিয়ে গবেষণা নয়, দেশের কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের দিকে তাকিয়ে সবাই একত্রে দাঁড়াও। জনরক্ষা সমিতিতে আশ্রয় নাও। মিলিত শক্তিতে দাঁড়িয়ে বুভুক্ষুদের মুখে ভাত তুলে দিতে হবে। আজ দলা-দলি একেবারে ছাড়তে হবে।"

নূতন মন্ত্রীরা শ্রাবণে ঘোষণা করিয়াছেন—'৭০।৮০ লাখ মণ চাল পাওয়া গিয়াছে, ১৫ টাকার দরে কণ্ট্রোল দোকানের মারফত এই চাল বিক্রী করা হইবে—। আরো মজুত বাহির করা হইবে, খয়রাতী হিসাবে রাঁধা ভাত অথবা চালও দেওয়া হইবে'।

ঐ লোকটীকে বলিলাম লঙ্গরখানায় যাও, খিঁচুড়ী পাবে। কাছাকাছি একটা ঠিকানা বলিয়া বুঝাইয়া দিলাম।

* * *

কলিকাতার বুকে কঙ্কালসার নর নারী শিশু জন্তুজানোয়ারের মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তারা সব যেন রাস্তাঘাট চিনিয়া ফেলিয়াছে। বাঁধান ফুটপাত, গাড়ী-ঘোড়া, বিজলী, কাপড়-জুতা-জামার চক্ষুমনোরম দোকানপাতি—সব কিছুই ইহারা দেখিয়া লইল। কলিকাতার সভ্যতার সঙ্গে গ্রামের এই সরল ও সেকেলে লোকগুলি যেন খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না।

এরা বাংলার শ্রেষ্ঠ নগরী দেখিয়া ধন্য হইল সত্য। কিন্তু এই মহাতীর্থ দর্শনের জন্য তাহাদের অনেক খরচ করিতে হইয়াছে। বাপ-পিতামহের ভিটা ছাড়িতে হইয়াছে, পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মা-ছেলের স্নেহের ডোর খুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে। ঘর বাঁধিয়া দল বাঁধিয়া গ্রামে বসবাস করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে—বহুদিনের এই অভ্যাস যেন আজ এদের শেষ হইয়া গেল। সংসার করার চিরপরিচিত রাস্তাগুলি সব যেন হঠাৎ প্রবল বন্যার জলে ডুবিয়া গেল। সরল মানুষ, কূলকিনারা না পাইয়া জলে ভাসিতে সুরু করিয়াছে।

ভাদ্রমাসেও লোকে ভাবিতে শিখে নাই যে দেশে এত বড় দুর্যোগ আসিয়াছে। সোমনাথ লাহিড়ী বলিলেন—"সুধী, একবার সারা কলকাতাটা ঘুরে বাঙ্গালার মানুষের দুর্দ্দশাটা ছেঁকে তুলে আন তো, যদি জনযুদ্ধের পাতায় বাংলাদেশকে এঁকে দেখান যায় তবে হয়তো অবস্থার গুরুত্বটা লোকে একটু বুঝবে। বাঁচবার পথটাও হয়তো বেরিয়ে আসবে তাদের কাছে।" ১৮ই ভাদ্র সারা কলিকাতা ঘোরা হইল। সুধী প্রধান খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমার পরিচিত সেই সেরাজ মণ্ডল আর তার স্ত্রী ফাতিমার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। লঙ্গরখানার খিঁচুড়ী তার ছেলেমেয়ের সয় নাই। শিশু-দুইটী আজ সেরাজের দুই চোখে খালি দুই ফোঁটা জল! ভাইটী মিলিটারীর কুলী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সেরাজ তার কি জানে! কিন্তু ইহারা দুইজনে বেশ একটী গলির কোণে বসবাসের জায়গা করিয়া লইয়াছে।

* * *

তিন চার মাস এইরূপই চলিল। চালের দোকানে চাল নাই—পিছন দিকে চাল আছে, দর কিন্তু আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে। নূতন মন্ত্রীরা ভাদ্রের প্রথমদিকে চালের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু সব চাল ভেল্কী-বাজীর মতো মুনাফাখোরদের চোরগুদামে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সরকার কণ্ট্রোল দোকানে চাল সরবরাহ করিতে পারিতেছে না।

সেরাজ মণ্ডলের প্রাণের ভিতরটা যেন কেমন করিতেছে। গ্রামের বন্ধন স্মৃতিপথে প্রায়ই ধাক্কা দিয়া যায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস। ধান চাল নিশ্চয় সেখানেই পাওয়া যাইবে—আর গ্রামের লোকজন তো তাকে চিনে, প্রথমে দিনকয়েক নিশ্চয়ই ধার দিবে। ফাতিমার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই। স্বামীর সহিত থাকিয়া দুঃখে সুখে ভাগী হইবার চির-ইচ্ছা তাহার মন হইতে শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাহাকে বুঝান গেল না। সেরাজ ঠিক করিল—সে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া একটা ব্যবস্থা করিবে, তার পর ঠিক এই জায়গায় আসিয়া একদিন তার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে।

* * *

পৌষ মাস আজও পড়ে নাই। ঢাকা জেলার মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নে একটা মিটীং করিতে গিয়াছি। সেখানে গিয়া দেখি—বসন্ত, কলেরা আর ম্যালেরিয়া। আমাদের কর্মীরা কেবল মরা লোক টানিয়া টানিয়া নদীতে ফেলিতেছেন। আর একটা ছোট চালা-ঘরে হাসপাতাল খুলিয়াছে। কর্মীদের খাইবার ঘুমাইবার সময় নাই। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটা বাড়ীতে দিনরাত খিঁচুড়ী পাক হইতেছে। গ্রামের মধ্যখানে ডাক্তার-কবিরাজদের সারা দিন ধরিয়া রোগী দেখিতে হয়। নদীর ধারে পাহারা দিয়া চোরা-নৌকায় বোঝাই করা ধান-চাল ধরিতে হয়। গ্রামের উত্তর কোণে চালাঘরে বাঁশের চৌকী বানাইয়া হাসপাতাল করা হইয়াছে, দিনরাত ৮ জন রোগীর সেবা, পথ্যের জোগাড় ও চার চারটী শিশুর তত্ত্বাবধান করিতে হয়। বারোয়ারীতলায় খাদ্যকমিটীর দোকানে চিনি, চাল মাপিতে হয়। এত কাজ তাদের করিতে হয়।

মিটীং শুরু। ময়দানে লোকে লোকারণ্য। জ্ঞানবাবু জোর গলায় বুঝাইতেছেন—"নতুন ধান এক কণাও মজুতদারদের দিও না, আন্দোলন করে সরকারকে বলো—৫ কোটী মণ ধান কিনতে হবে, শহরে গ্রামে সব জায়গায় কণ্ট্রোল দামে চালধান, চিনি-কেরোসীন সরবরাহ করতেই হবে। কুইনাইনের জন্য খুব দরখাস্ত চালাও। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ খাদ্যকমিটী গড়। আমাদের দেশ, আমাদের ভাই, আমরাই তাদের বাঁচাব।'

খাদ্য কমিটীর কাজ চালাইবার জন্য গ্রামের ২ জন টাকা-পয়সাওয়ালা লোক হাজার দুই টাকা দিয়াছিলেন। কমিটীর হাতে টাকা আসায় ধান-চাল কেনা হইয়াছিল। হাসপাতালে কিছু ঔষধও আনা হইল। কিন্তু এতেও কিছু হয় নাই।

মিটীং সারিয়া উপেন দাসের বাড়ীতে খাইতে যাইতেছি। একটী লোক পিছন হইতে আসিয়া একটী খামে-ভরা চিঠি দিল—"বাবু পড়ে দিন তো।" সেরাজ মণ্ডল নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম—তাহাকে ডাকিয়াছে এক রিলিফ হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তাহার স্ত্রীর নাকি জঘন্য এক অসুখ, মরিবে কি বাঁচিবে তা জানা নাই। ডাক্তারটী তাদেরই গ্রামের লোক, তাই এত পরিশ্রম করিয়া তাহাকে খবর দিয়াছে।

ভাবিলাম, এত দিন পরে ফাতিমা কেন আত্ম-পরিচয় দিল। সমাজের ঘৃণিত লোকগুলির এতটুকু শক্তি নাই যে, তার নারীত্বের মর্য্যাদা একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারে! বহুবার সে নারীত্বের অপমান সহিয়াছে, তবু স্বামীর প্রতি টানটুকু বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিয়া জাগিতেছিল। সমাজের এই ঘোর বিপর্য্যয়ে স্বামী-স্ত্রীর অমর বন্ধন শিথিল হইলেও এখনও ছিঁড়িয়া যায় নাই। মানুষের অন্তরের গভীর কোণে সংসার, স্বামী-স্ত্রী, বাপ-ছেলে এসবের গৌরবময় আসন এতখানিই দৃঢ় মূল। মনুষ্যত্বের যাহারা অবমাননা করে, তাদের শক্তি আপাত-দৃষ্টিতে অজেয় মনে হইলেও ভিতরে ঘুণধরা। স্বাভাবিক মৃত্যু ইহারই; জীবন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অসীম শক্তি রাখে।

ফাতিমা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রিলিফ হাসপাতালে ধুঁকিতেছে।

* * *

তারপর ৮।৯ মাস যে কি করিয়া দিন গুজরাণ হইয়াছে তাহা সরোজ মণ্ডলের চেয়ে আমি ভাল করিয়া বলিতে পারি না। বিক্রমপুরের যশলদি গ্রামে যাইয়া তার সঙ্গে কথা বলিয়া আসিলে আপনারা নিখুঁত ছবি পাইবেন। বরাবর সে কেদার রায়ের জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। আজ কেদারের নিজের জমিতে কোন স্বত্বই নাই। যিনি একটীও টাকা না দিয়া কাগজের লেখায় একটু অদলবদল করিয়া কেদারের জমি হস্তগত করিয়াছেন, তিনি তাঁর এত জমিতে চাষ করাইবার লোক পান নাই। এই সেদিন কৃষক-সমিতির লোকেরা দল বাঁধিয়া জমির চাষ উঠাইল। এমন ফসল ফলিয়াছে! সেরাজ শুধুই ভাবে, এত ধান কার গোলায় উঠবে!

এদিকে ছোট ভাইটী আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেশ বাবুগিরি চাল-চলন শিখিয়াছে। কিছু টাকা ও ম্যালেরিয়া সঙ্গে আনিয়াছে। তারই টাকায় কিছুদিন কণ্ট্রোলের চাল কিনিয়া খাওয়া হইয়াছে। সেরাজের মনে নিজ বাসভূমে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবার ক্ষীণ আশা বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই এতদিন পরে ফাতিমার কথা মাঝে মাঝে বেশ আঘাত দেয়। সে জানেনা ফাতিমা এখনো সেই হাসপাতালেই চিকিৎসা করাইতেছে কি না। গ্রামের পাশে যে মেয়েদের কাজ করার ও রোগ-চিকিৎসার একটী আটচালা ঘর হইয়াছে, সেইখানেই ফাতিমাকে আনিবার জন্য তদ্বির-তদারক করিতে তাহার বড় ইচ্ছা। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সাহেব বলিলেন—"এ সব কারবার গ্রাম থেকে উঠে যাচ্ছে, শহরে একটা এই রকমের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে পাঠাতে পার। তা-ও আবার আমার ওপর হুকুম আছে, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে কাউকে সেখানে পাঠান হবে না। ওসব আশা ছাড়, সেরাজ। বাগ্‌গে আর ফাতিমা ফাতিমা করে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আর আমায় বিরক্ত করোনা। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে আমার মনটা বিষিয়ে গেছে। আমি নিজেই ভাল কুইনাইন জোগাড় করতে পারছি না। আবার তুমি তোমার ভাইএর জন্য ওষুধ চাচ্ছ! ওসব কিছু হবে না, যাও।"

ফাতিমার আশা তাকে ছাড়িতে হইবে? কাপড়-চিনি কেরোসীনের যে দাম! সে-সব জিনিস তো এখনো সেরাজ চোখেই দেখিতে পায় না। চাল পাওয়া যায় কিন্তু পয়সা কোথায়? আগে ছোট ভাইটী আর ফাতিমাকে যদি ঘরে বসাইয়া কাজকর্ম্মে লাগাইতে পারে তো তারপর সে—এসব কথা ভাবিতে তার মনে দুঃখ ক্রোধ সব জমাট বাঁধিতেছে।

বহুজনের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিয়া নারীত্বের অপমান, লোককে খাইতে না দিয়া লাখ লাখ টাকা মুনাফা—এই জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অধিকার যে-সব ঘৃণিত লোক চাহিতেছে—সমাজের খিড়কী দুয়ার দিয়া তারা মুষ্টি ভরিয়া এই অধিকার পাইল। আর সমাজের সদর দরজায় যে ৬২ লক্ষ লোক বাঁচার অধিকার ভিক্ষা করিতেছে তাদের জন্য সারা সমাজ এক হইয়া দাঁড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ এই মহান কাজে লাগাইতে আজও সাহস পায় না!

* * *

সেরাজের সংসারটী বেশ ছিল। সে নিজে চাষ আবাদ নিয়ে বছর কাটাইত। ভাইটী তার তাঁতে কাপড় বুনিত। ফাতিমা ছেলে-মেয়ে দুইটীকে মানুষ করিত। কিন্তু কিছুতেই আর তেমন করিয়া গুছাইতে পারিতেছে না। ছেলে-মেয়ের মায়া তো কলিকাতায় কাটাইয়া আসিয়াছে। ভাইটীকে সংসারে বসাইবার ইচ্ছা আছে। ফুড কমিটি আর ইউনিয়ন বোর্ডের বাবুরা বলেন, 'সরকার তাঁতীদের সূতা তাঁত, জেলেদের নৌকা প্রভৃতি দেবার নিয়ম করে দিয়েছে।' কই সেরাজ তার ভাইএর জন্য তো কিছুই পায় নাই।

নূতন করিয়া নিজের গ্রামে ঘর গুছাইবার মন লইয়া সেরাজ গাঁয়ে যত মিটীং হয় সবটাতেই যায়। সবারই কাছে যাইয়া, প্রশ্ন করিয়া, উপায় জানিয়া সেরাজ সংসার বসাইতে চায়। মন তার ভাঙ্গিয়া যায় নাই। একদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিল—'বাবু, আমি সবারই বক্তব্য শুনতে যাই। সবাই-ই তো আমাদের নিয়েই কথা বলেন। তবে সবাই যদি একসঙ্গে এসে আমাদের বলতেন বা সাহায্য করতেন তা'হলে আমার খাটুনীটা কমে। একটা মিটীংএ যেয়েই সব বুঝতে পারতাম আর কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেতাম।'

বাংলার সেরাজমণ্ডল একজন নয়। ইহারই মত কোটী কোটী লোক আছে এই দেশে। সবাই বাঁচিতে চায়। ঘর-সংসার বাঁধিতে চায়। তাদের এই বাঁচার আকুল আগ্রহ আমাদের সবাইকে একসঙ্গে—হিন্দু মুসলমান, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট সব একসঙ্গে—হাত মিলাইয়া দাঁড়াইবার ডাক দিতেছে।

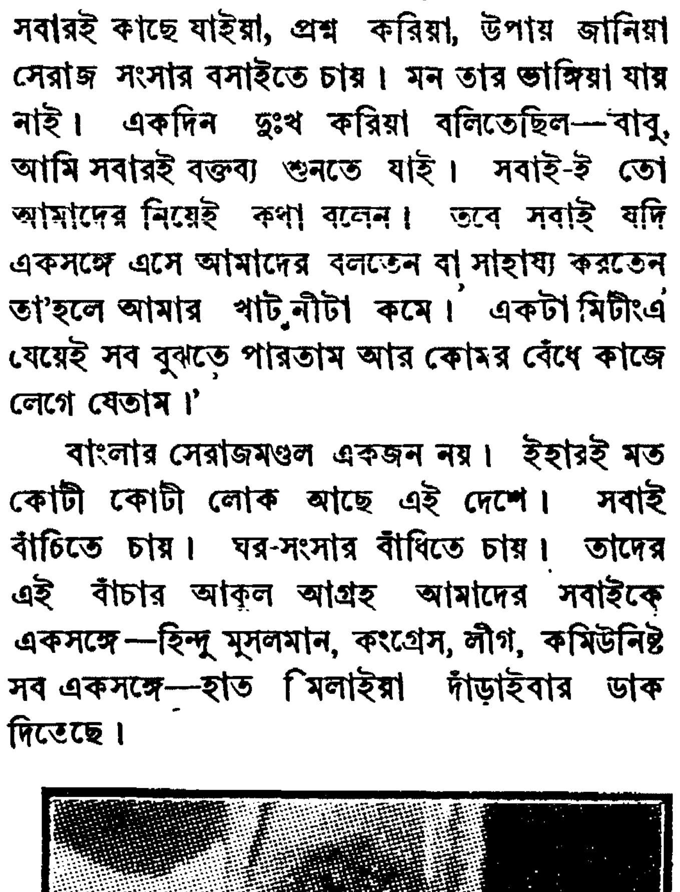

সেরাজের ভাই ম্যালেরিয়া লইয়া ফিরিয়াছে।

লালফৌজের যাঁহারা চালক

* **মার্শাল মালিনোভস্কী**—তৃতীয় ইউ-নিয়ন ফ্রন্টের নেতা। বর্তমানে রুমানিয়ান অঞ্চলে লালফৌজকে পরিচালনা করিতেছেন। হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ত তাঁহার হাতের নাগালের ভিতর। বয়স ৪৫ বৎসর।

* **মার্শাল রকোসভস্কী**—প্রথম হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রন্টের নায়ক। বয়স ৪৭ বৎসর। বর্তমানে পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে লড়াই করিতেছেন।

* **মার্শাল গভোরভ**—লেনিনগ্রাদের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ৪৬ বৎসর বয়স। লেনিন-গ্রাদ ফ্রণ্টে বর্তমানে লালফৌজের নেতৃত্ব করিতেছেন।

* **মার্শাল কনিয়েভ**—পূর্ব্বে একজন কাঠুরিয়া ছিলেন, বয়স ৪৮ বৎসর। লালফৌজের একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁহার সামরিক জীবন শুরু হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় ইউক্রেনিয়ান ফ্রণ্টে লাল-ফৌজকে পরিচালনা করিতেছেন।

* **মার্শাল টলবুখিন**—চতুর্থ ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টের নায়ক। বর্তমানে বুলগেরিয়ায় লালফৌজের পরিচালক।

* **মার্শাল মেরেৎস্কভ**—কেরেলিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক, বর্তমানে উত্তর ফিনল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সৈন্য বাহিনীকে ঘায়েল করিয়া নরওয়েতে প্রবেশ করিয়াছেন।

* **জেনারেল বাগ্রামিয়ান**—প্রথম বালটিক ফ্রন্টের নেতা। বয়স ৫১ বৎসর। আর্ম্মেনিয়ার এক জন কৃষক সন্তান, এক সময় নিজেই মাঠে রাখালী করিতেন।

* **জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কী**—বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ আর্ম্মি গ্রুপ জেনারেল। বয়স ৩৭ বৎসর। ইঁহারই নেতৃত্বে লালফৌজ পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং আস্তে আস্তে জার্ম্মানদের পিছু হটাইয়া দিতেছে। ইউক্রেনিয়ার এক রেল মজুর পরিবারে জন্ম।

* **জেনারেল এরেমেঙ্কো**—দ্বিতীয় বালটিক ফ্রণ্টে সোভিয়েটের আর্ম্মি গ্রুপের নায়ক। এস্তোনিয়া-লাটভিয়া অঞ্চলে জার্ম্মান দস্যুদের রীতিমত শিক্ষা দিতেছেন।

জারের আমল ও সোভিয়েট

(উৎপাদনের উপকরণ ঃ টনের হিসাবে)

	১৯১৩	১৯৪০
তেল ও গ্যাস	৯২ লক্ষ	৩ কোটি ৪২ লক্ষ
কয়লা	২ কোটি ৯১ লক্ষ	১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ
ইস্পাত	৪২ লক্ষ টন	১ কোটি ৮৪ লক্ষ

	১৯১৩	১৯৩৭
ধাতু কাটার যন্ত্র	১৫০০	৪৮৫০০০
লৌকোমোটিভ	৬৬৪ খানা	১৬২০ খানা
রাসায়নিক পদার্থ	৪৫ কোটি রুবল মূল্যের	৫৯৪ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল মূল্যের

মার্শাল গভোরভ

জেনারেল এরেমেঙ্কো

★ সোভিয়েট ও রবীন্দ্রনাথ ★

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক-খ-গ-ঘ শেখায়নি মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয় অন্য জাতের জন্যও এদের সমান চেষ্টা।"

—(রাশিয়ার চিঠি)

শিক্ষার প্রসার

	১৯১৩ (জারের আমল)	১৯৪০ (সোভিয়েটের আমল)
প্রাথমিক ও মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা	৭৮ লক্ষ	৩ কোটি ৫০ লক্ষ
টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা	৩৫,৮০০	৯,৫১,৯০০
বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা	৭১	৭১৬
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা	১,১২,০০০	৬,০০,০০০

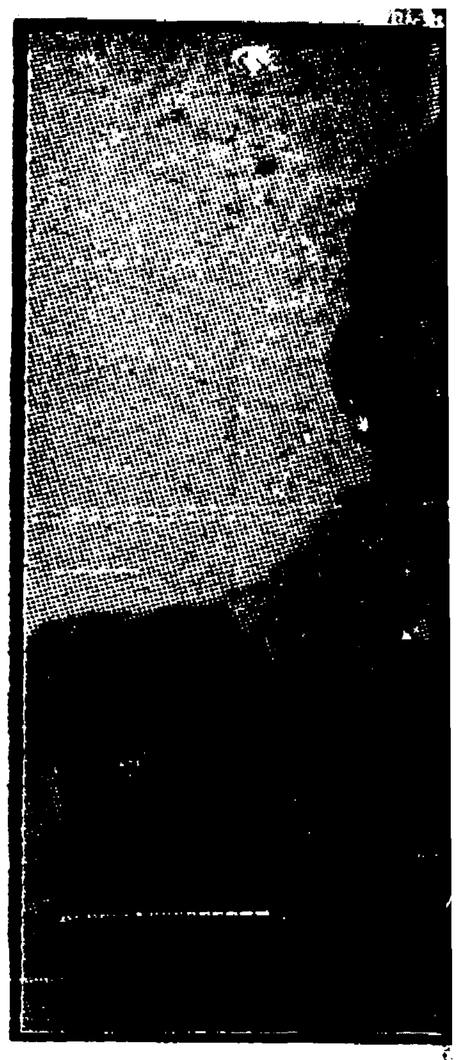

মার্শাল মালিনোভস্কী

মার্শাল কনিয়েভ

★

লালফৌজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ইউক্রেনিয়ার অধিবাসী জেনারেল ভাটুটিন ১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে প্রথম ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে লালফৌজের নায়ক হিসাবে তাঁহার রণনৈপুণ্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার অভিযানের গতি-বেগ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে তাঁকে তখন 'বিদ্যুৎগতি ভাটু-টিন' বলা হইত।

* *

সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণ এবারের

লালফৌজের শ

জেনারেল

মার্শাল

ভলগার বুকের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ষ্টালিনগ্রাদের লড়াই তখন চরমে।

★ শত্রুরও সমস্ত শক্তি জড়ো হয়েছে সেখানে তাদের দিক দিয়ে এ যেন সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। হিটলার ফিল্ড-মার্শাল পাউলাসকে আদেশ দিয়েছে, যেমনি করে পারো, ষ্টালিনগ্রাদ নাও—ওই শহর আমার চাই-ই। ষ্টালিনের নামে আঁকা সহর, ওরই বুকে বসে-মদমত্ত হিটলার দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চায়,—লালফৌজকে এবার কাৎ করেছি।

ষ্টালিনগ্রাদ তবু দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুর ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠে জানিয়ে দিয়েছে, না ষ্টালিনগ্রাদ তোমাদের নেবার সাধ্য নেই—এক একটি মানুষ অভ্রভেদী পাহাড় হয়ে তোমাদের পথ আগলাবে তোমাদের এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

তখনকার দিনের ষ্টালিনগ্রাদের প্রতিটি ঘটনার জন্য পৃথিবীর সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করত। লালফৌজের হাত থেকে ষ্টালিনগ্রাদ বুঝি চলে যায়, শহরের-বেশীর ভাগই নাৎসীরা চষে ফেলেছে, যেটুকু আছে, সেটুকুর উপর লালফৌজ রুখে দাঁড়িয়েছে।

একটি রাতের ঘটনা। কালো কুট কুটে রাতটি। শত্রুর পরিখার ভেতরে তখনো গোলমাল চলছে।

ফরমানভ ও পেস্‌নভ সন্ধান নিতে বেরিয়েছে নাৎসীদের গোপন আড্ডাগুলির। বাঁ দিকে একটু এগিয়ে যেতেই অতি ক্ষীণ একটি আলোর রেশ দেখতে পায়। রেশটী একটি গড়খাই' থেকে বেরুচ্ছে।

ওরা দুজন তখন হুসিয়ার হয়ে যায়। অপেক্ষা করতে থাকে শত্রু কখন ঘুমিয়ে পড়বে।

লালফৌজ এম

খানিক পরে ফরমানভ আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। সে ছিলো উজবেক সন্তান, চাল চলনের শান্ততা যেন দেশের মাটি থেকেই পেয়েছে। 'গড়খাই' এর নাৎসীটা তখন নাগালের ভেতরে নাক ডেকে একটু আরাম করছে। তার রাইফেলটা ফরমানভেরই যেন আজ্ঞাবহ চাকর। জার্ম্মানটার তখন হুঁসও ছিলো না।

পেসনভ সেই ঘুমিয়ে পড়া হুনটাকে পাহারা দিচ্ছিল, আর ফরমানভ গড়খাইটিতে ঢুকে যায়।

★ সোভিয়েট ও জওহরলাল ★

"সোভিয়েট রাশিয়া ও তার কীর্তিকলাপ দেখেই ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা জাগে; যদি পৃথিবীতে কোন বিপর্যয় না ঘটে, এই নতুন সভ্যতাই দেশে দেশে ছড়াবে, ধনতন্ত্রের সৃষ্টি যুদ্ধবিগ্রহের সমাপ্তি ঘটাবে —এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

—সভাপতির অভিভাষণ
লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস, ১৯৩৬

সংস্কৃতির প্রসার

	১৯১৪ (জারের আমল)	১৯৪০ (সোভিয়েট আমল)	
থিয়েটার	১৫৩	৮২৫	
ক্লাব	২২২	৯৫,৬২৬	
লাইব্রেরী	১২,৬০০	৭০,০০০	
মিউজিয়াম	১৮০	৭৬১	(১৯৩৮)
সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা	২৭ লক্ষ	৩১/২ কোটি	
প্রকাশিত পুস্তকের		৮০ লক্ষ	"
সংখ্যা	৮ কোটি	৭০০ কোটি	"
	৬৭ লক্ষ	১০ লক্ষ	"

নভেম্বর

কারখানাঘর ভেঙে এল কয়েদীরা
বাইরে। মাঠের বন্দীরা হাঁকে।
ঘৃণায় ভারী আঁধার
কোটি সকালের লাভা লেগে টলে
গলে জ্বলন্ত পথে।
শীতের আমেজ
ভাঙা কাঁচ-গাঁথা,
ছেঁড়া কাঁথা কাড়ে
টুক্‌রো টুক্‌রো ওড়ায় শুক্‌নো পাতা;
দুর্গে প্রাসাদে জমা জঞ্জাল ওড়ে
হেমন্ত রোদ্দুরে।
বুড়ো বুদ্ধির ঘুরপাক চলে হায়রে হায়;
চালু কারখানা, চষা ক্ষেত থেকে অসংখ্য
আঙুল বাঁকুল কররেখায়;
বনেদী গলার কাতরানিটুকু
সুরেই বাজল;
বিশাল ঐক্যতানে
ভরল পৃথিবী।
মুক্তি আমার—মুক্তি তোমার—মুক্তি।

সে আমার নবজন্মের দিন।
নভেম্বরের আভায় রঙীন
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সেই যাত্রা—আমার
চোখে ভাসে:
সাঁজোয়া মনের বাঁধে আছড়ায়
খ্যাপা ইতিহাস।
কালো কালো সব চিমনি ছাড়িয়ে
মাথা ওঠে তার—
ভ্লাদিমির ইলিইচ লেনিন।
দশটা দিনের চূড়ায় জ্বলল
মশাল-শিখা
দশটা দিনের বনিয়াদে চাপা
শতাব্দীরা।
আমার সে-শিশু চোখের সাক্ষ্য
সবার চোখে।
দশটা দিনের মিনারের আলো
ছড়ায় ছড়ায় পৃথিবীময়।

নভেম্বরের শুরু
বারো মাস জুড়ে কথা বলে
গঙ্গার ধারে, লালদীঘি ঘিরে, গাঁয়ে।
এখনও এখানে প্রাসাদের ভিড়
গুরুগম্ভীর
পাতাবাহারের আড়ালে ক্ষিপ্র বাঘ ফেরে।
নভেম্বর আজ খর করবাল
পশ্চিমে ঘন রাত কাটে
আমার এখানে হেমন্ত রোদ্দুরে
পথ কাটে।

অরুণ মিত্র

উৎপাদনক্ষেত্রে সোভিয়েট

(উৎপন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য: রুবল মূল্যে)

	১৯১৩	১৯৩৭
কাপড়	২৩৬ কোটি	৬৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ
জামা	২ কোটি ৮০ লক্ষ	৩১৫ কোটি ৮০ লক্ষ
জুতা	৬ কোটি ৫০ লক্ষ	১৫৩ কোটি ৯০ লক্ষ

	১৯১৩	১৯৩৭
টিনে রক্ষিত খাবার	৯ কোটি ৩০ লক্ষ টিন	১৩৭ কোটি ২০ লক্ষ টিন
কেক, রুটি মিষ্টান্ন	৭০ হাজার টন	৯ লক্ষ ২১ হাজার টন
সিগারেট	১৯১৩ সালের তুলনায় চারগুণেরও বেশী	

শহীদ সেনাপতি ভাটুটিন

★ এই নভেম্বর দিবসে লালফৌজের শহীদ জেনারেল বীর ভাটুটিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান দেখাইতেছে। লণ্ডনে ইতিমধ্যেই 'ভাটুটিন সম্মান তহবিল' খোলা হইয়াছে। ৫০,০০০ পাউণ্ডের জন্য আবেদন জানাইতে গিয়া জেনারেল আইসেনহাওয়ার জেনারেল ভাটুটিনের রণদক্ষতার অশেষ প্রশংসা করেন। ভাটুটিনের প্রতি এই সম্মান আজ লালফৌজের সব শহীদ বীরদের প্রতি সম্মানেরই নিদর্শন।

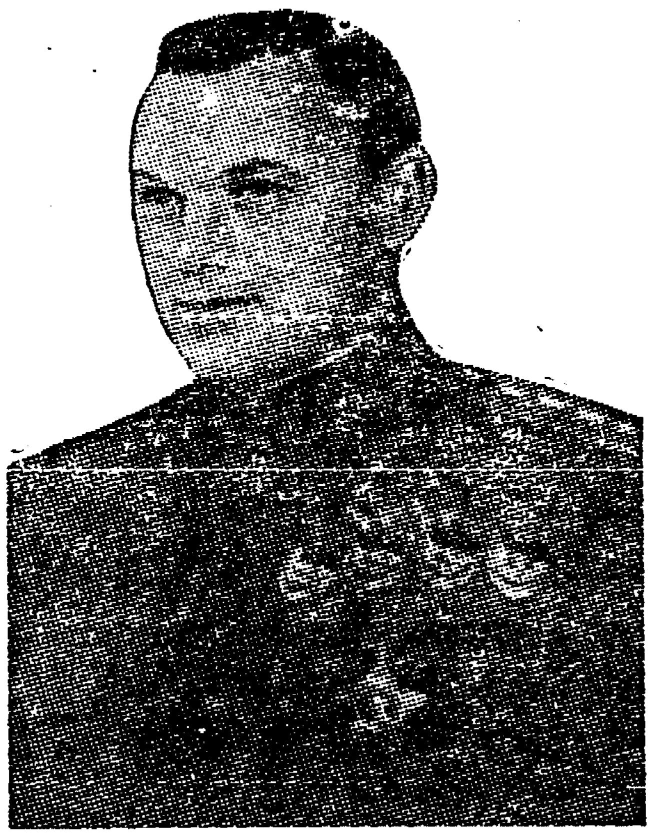

মার্শাল রকোসভস্কী

...মরেৎস্কভ

মার্শাল টলবুখিন

জেনারেল বাগ্রামিয়ান

জেনারেল চের্নিয়াকোভস্কী

জার্মানটা চম্‌কে লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, পেসনভ তাকে সাবাড় করে গড়খাইতে নেমে পড়ে।

সঙ্গীন মুহূর্ত। 'টমি গানটি' তার সাথীর কাঁধে রেখে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালায়, অবস্থাটা পরখ করে নিতে।

—জার্মান অফিসারগুলো আরামে বাঙ্কের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর নীচে তাদেরই আর কতগুলি ঢুলছে।

...নি ক'রেই লড়ে

ফরমানভ আর পেসনভ—সামাল। ষ্টালিনগ্রাদের খুনের জবাব দাও। হাতবোমা বের করে তারা জবাবও দিল। 'গড়খাই-'এর ভেতরটা মুসড়ে পড়ে গেল। তাদের আর দু'জন মার্টিনভ ও নভিকভ এগুচ্ছিল এদের ডান দিক দিয়ে, তারা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। তাদের সামনে জার্মানরা তখন পরিখা খুঁড়ছিল, ওদের অবস্থানের একটা শক্ত কেন্দ্র এটা।

মার্টিনভ দেখল, সময় নেই, এখনি যা করার করতে হবে। অথচ তার সাথীদের কাছ থেকে কোন সাড়াই মিলছে না।...

হঠাৎ মার্টিনভ চেয়ে দেখে, কিছুদূরে একটা আলোর হল্কা জ্বলে উঠে নিভে গেল।

বুঝলো এ ডাক সঙ্গীদের ইঙ্গিত। ট্যাঙ্কমারা হাত বোমাটা পরিখার দিকে ছুড়ে ফেলে নিজে শুয়ে পড়লো, বাঁচতে হবে তো, জার্মানদের জানিয়ে দিতে হবে, ষ্টালিনগ্রাদের এক একজনই একটা প্রতিরোধের শক্ত কেন্দ্র।

হাতবোমার দারুণ আওয়াজ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

মার্টিনভ ছুটে পরিখার মুখে গিয়ে রাইফেলটি তুলে ধরে চীৎকার করে হুকুম দিল—হাত তোল, খবরদার আর এক পাও এগিয়ো না।

তিনটা নাৎসী ইতিমধ্যেই ঘায়েল, বাকীগুলো মুখ বুজে বেরিয়ে এলো, তারা আর লড়াই করবে না—এদের কাছে হার মেনেছে।

ফরমানভ, পেসনভ, মার্টিনভ, নভিকভ...এরা সবাই মিলেই সেদিন ঐ সুদৃঢ় পরিখাটায় লাল পতাকা উড়ায়।

এদের বুকে করেই ষ্টালিনের নামে আঁকা শহর সেদিন পাউলাসকে অবজ্ঞা করে জানিয়ে দিয়েছিল, ষ্টালিনগ্রাদ তোমাদের হবে না।

শহরের রেখাচিত্র

● রিক্সাওলা ●

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ময়দানে নধর পরিপুষ্ট গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছিল। ভদ্রলোক প্রথমে আঙুল দিয়া কাছাকাছি কয়েকটি, তারপর হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা চারিদিকে ছড়ানো সবগুলি গরু দেখাইয়া বলিলেন, ওরা সব নাকি আদর্শবাদের জীবন্ত রূপক। জীবন্ত, বাস্তব ও প্রামাণ্য রূপক। জীবন্ত যে তাতে আর সন্দেহ কি। বাস্তব প্রমাণেই। বাংলার সমস্ত গোহাটা, মাঠঘাট ও গো-পোষা গেরস্ত ঘরে প্রত্যক্ষ, শহর ও মফস্বলের দুধের স্বাদ-গন্ধ ভোলা বা স্বাদ-গন্ধ না-জানা ছেলেপিলেগুলির সংখ্যা ও চেহারায় তথ্যমূলক এবং চিতার ধোঁয়া ও কবরের মাটিতে পরোক্ষ প্রমাণ।—'হোয়াট্, অ্যাঁ অ্যাঁ, হোয়াট? ঠিক না?'

তার ঢুলু ঢুলু লাল চোখে জল আসিয়া পড়িল। না চাহিতে গছানো সরকারী বিবৃতির মত আমার পাঁজরে সজোরে আঙুলের খোঁচা মারিয়া স্বীকার করিলেন যে, হুইস্কি খাইতেছিলেন। মোটে চার পেগ। নেশা হয় নাই। নেশা হয় না। নতুন কণ্ট্রাক্ট পাইলে, বিলের টাকা পাশ হইলে, ট্যাক্সের নোটিশ আসিলে ব্যাঙ্কে কত ছিল কত হইয়াছে আর কত হইবে ভাবিলে এবং এরকম আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বুকটা তার ধড়ফড় করে, দিনের বেলাই খান। দিনে শুরু করা প্রায় অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশা হয় না। ময়দানে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। ভগবান যদি দয়া করেন, ফিরিয়া গিয়া আর গোটা চারেক পেগ খাইলে সন্ধ্যাতক নেশা লাগিতে পারে।

'বাঁচাই অসম্ভব দাদা। টাকায় দু'সের দুধ, তার অর্দ্ধেক জল, তাও পাওয়া মুস্কিল। রিক্‌সাওলা দু'আনা নিলে—শালা ব্লাডি ডাকাত। ওই হোটেল আর এই মনুমেণ্ট, এইটুকু আসতে ছ'আনা—ছ' ছ' গণ্ডা পয়সা! দেশ কি অরাজক?'

ভদ্রলোককে নামাইয়া দিয়া রিক্‌সা রাখিয়া অ্যাসফল্ট দেওয়া ময়দানী ফুটপাথের প্রান্তে ঘাসের রাজ্যে আসিয়া রিক্‌সাওলা দু'হাতে পেট চাপিয়া উবু হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ কাসিয়াছিল মনে আছে, ঘুংরী কাসিতে যেমন হয় তেমনিভাবে হুস্‌প হুস্‌প শব্দে আটকানো দম টানিয়া টানিয়া। কেন কাসিয়াছিল জানি। রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, দশটা মিনিট বসিয়া থাকিতে হয় না, বেশী রেটে ভাড়া মেলে, কতজন্মের পুণ্যফল! টাকার দামের পুরাণো সংস্কারটা এখনো টিকিয়া আছে. টাকার দাম যে কমিতে পারে ধারণায় আসে না। খরচ বাড়িয়াছে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু ভিন্ন কথা।

তাই হরে দরে যাতে সমান না দাঁড়াইয়া যায় সেজন্য এরা খরচ কমাইয়াছে। খাওয়ার বাবদেই বেশী যায়, এ খরচটা ছাঁটিয়াছে মোটারকম। একদিন রাত এগারোটার পর কালীঘাট হইতে রিক্‌সায় টালিগঞ্জ যাইতেছিলাম। রেলের পুলটার কাছে হঠাৎ রিক্‌সা উল্‌টাইয়া ডিগবাজী খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। খুব একচোট গালাগালি আর বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা চড় বসাইয়া দিব স্থির করিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখি, রিক্‌সাওলা সটান মুখ থুবড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। চড় মারার বদলে পানের দোকান হইতে সরবতের গ্লাসে পান ধোয়া জল আনিয়া লোকটির সেবা করিতে হইল। মাথার উপরে আকাশে চাঁদটা ছিল প্রায় আস্ত। রিকসাওলাটিকে ভাল করিয়া দেখিব বলিয়াই যেন সেই সময়টুকুর জন্য চাঁদ জ্যোৎস্নার জোর খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। লোকটির বয়স ত্রিশের নীচে। চিৎ হইয়া শোয়ার জন্য পেটের চামড়া খাদে নামায় ভাঁজ নাই কিন্তু ভাঁজের দাগগুলি বেশ স্পষ্ট। মুখের চামড়া মরা শুকনো ট্যাংরার মত সিটা। চিকণ বিবর্ণ গোঁপের উপরে বনেদী ধাঁচের চোখা দীঘল নাকটা সশব্দ শ্বাস টানার সঙ্গে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিল। দূরে সেই শ্বাস টানার শব্দ যেন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কাছে আগাইয়া আসিতেছিল। একটু পরে টের পাইলাম, রেলগাড়ী আসিতেছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা মালগাড়ী টানিয়া একটা ইঞ্জিন আগুনের হলকা ছাড়িয়া হাপাইতে হাপাইতে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া পরম উপভোগ্য বিরাট ঝন্‌ঝনানির কলরবে পুলে উঠিয়া পড়িল।

তখন খেয়াল হয় নাই। আজ ময়দানে এই হৃদয়বান দার্শনিকের জীবন্ত উপমার কথায় মনে হইল, সে রাত্রে কল্পনা করা হয়তো আমার উচিত ছিল যে রিকসাওলা ও ইঞ্জিনটার একই হাঁপানি রোগ হইয়াছে। একটি খটকা শুধু মনে খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল। রিকসাওলা জিদ ধরিয়াছিল প্রতিদিনকার নিয়ম সে কিছুতেই ভাঙ্গিবে না, খাইতে যদি হয় আমাকে পৌছাইয়া দিয়া সোয়ারী পাইলে সোয়ারী লইয়া ফিরিয়া দু'আনায় কেনা রুটি দু'খানি বিনা পয়সায় পাওয়া ছোলার ডাল ও ছ্যাঁচরাটুকু দিয়া খাইবে। সামনের মিষ্টির দোকানে তাকে ছ'আনার দুধ মিষ্টি খাওয়াইতে আমাকে যেরকম ধস্তাধস্তি করিতে হইয়াছিল, ইঞ্জিনে কয়লা দিতে কি ড্রাইভারের সেরকম হাঙ্গামা ও পরিশ্রম করিতে হয়?

বেচারার করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল আমাকে পুলিশেরও অধম ভাবিতেছে। আমি দাম দিলে অবশ্য সে খুসী হইয়া খাইত। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া দিই নাই। কেবল চুক্তির ভাড়াটা চুকাইয়া দিয়া বাকী পথটা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম।

●

আজকাল অভিযোগ শুনিতে পাই. রিকসাওলাদের পায়া ভারি হইয়াছে। "সোলজারগুলোকে ঠকিয়ে মোটা পয়সা পায়, আমরা ডাকলে কথাই বলতে চায় না। পষ্ট মুখের ওপর ব'লে বসে মশায়, যাব না!" অনুযোগে যে পরিমাণ জ্বালা প্রকাশ পায়, কোন রিকসাওলা সেই অনুপাতে তেজ দেখাইয়া কোন ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে বিশ্বাস করিতে পারিলে খুসী হইতাম। খুব খানিকটা খাতির আর সম্মান দেখায় নাই, সত্য বোধ হয় শুধু এইটুকু! ট্যাক্সিওলার হুমকি আর ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের টিটকারিতে বাবুদের বেশী লাগে না। কিন্তু রিকসাওলা জাতটাই নিরীহ গোবেচারী ভীরু। তাদের দেহ কাবু হয় জঘন্য শ্রান্তিতে—যা প্রায় ক্ষয়রোগ ও হাঁপানি রোগের সমবেত আক্রমণের মতঃ মৃদু এবং শ্লথ কিন্তু দুর্নিবার। মন কাবু হয় আত্ম-তুচ্ছতার কঠিন রোগে। সবাই গাল দেয়, হুমকি দেয়, ধমকায়। সবাই অন্যায় করে, অবিচার করে, অত্যাচার করে। সুস্থ সবল তেজস্বী মানুষ কয়েকবছর রিকসা টানিবার পর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ঝিমায়, বিশ্বাস করে যে রিকসা টানাটাই চুরি করা বা ভিক্ষা করার মত হেয় কাজ। লোকে যে রিকসা চাপিয়া পয়সা দেয় সেটা শুধু অনুগ্রহ করা নয়, উদারতার পরিচয়ও বটে—রিকসা টানার অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা। অস্পৃশ্যরা কঠিন নোংরা কাজ করিয়া টিঁকিয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার মধ্যে জাতওলাদের সে উদারতা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ বোধ করে। নিরীহতম দু'একটি কেঁচো হয় তো যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে নিরীহ হেলে সাপ সাজিয়াছে, তাতেই চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে অনেকের। ছদ্মবেশী বিষাক্ত সাপগুলি যে কিলবিল করিতেছে চারিদিকে তাতে কোন আপশোষ নাই।

এই নিপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলির সহজ সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করে। ভয় বা খাতিরের বিনয় নয়, বক্‌শিসের লোভের খোসামোদ নয়, খাঁটি সৌজন্য। অন্যের আন্তরিকতাকে চিনিয়া গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার প্রতিদান যার মর্মকথা।

'এই উতারো! হিঁয়া উতারো!'

সোয়ারীর গর্জন শুনিয়াও মোড়ের মাথার কাছে প্রধান রাস্তাটির উপরে সেখানে গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে রিক্‌সা থামানো গেল না। একটু আগাইয়া বাঁক ঘুরিয়া বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকিয়া রিকসাওয়ালা গাড়ী নামাইয়া রাখিল। সোয়ারী নামিয়াই রিক্‌সাওলার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

সোয়ারী বাবু নয়। লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ে গামছা কাঁধে শ্রেণীর মানুষ। সেখানে কুড়ি পঁচিশটা রিক্‌সা ছিল, রিকসাওলারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লোকটিকে ঘিরিয়া ধরিল। পথিকও জমিয়া গেল কয়েকজন।

সোয়ারীর সেদিকে খেয়াল আছে মনে হইল না। চড় মারিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রিক্‌সাওলার মুখের দিকে তাকাইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ সে দু'হাতে রিক্‌সাওলার ঘণ্টাসমেত ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।

'মাপ কি জিয়ে ভেইয়া। কসুর হুয়া।'

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া সে আবার বলিল, 'ম্যয় কভি এসা নাহি কিয়া।' বলিয়া রিক্‌সাওলার হাতটি তুলিয়া নিজের গালে চড় বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

'আরে রাম রাম!'

কতক্ষণ দু'জনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আলাপ করিয়াছিল জানি না, মিনিট দশেক পরে বন্ধু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন।

বন্ধু বলিলেন, 'এতে সৌজন্যের কি আছে? তোমার গালে চড় মেরে কেউ যদি ওভাবে মাপ চায়, তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।'

'তাতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হয় তো যে ও আমার চেয়ে ছোট লোক নয়?'—বলিয়া আমি যোগ দিলাম, 'আমি শুধু ক্ষমা করতাম। ওদের মুখের ভাব দেখেছিলে, কথা শুনেছিলে? ক্ষমা ক'রে ও রকম দিলদরিয়া হবার ক্ষমতা তোমার আমার নাই।'

সেইদিনই রিক্‌সাওলা মহাবীরের কাছে তার মুস্কিলের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সোয়ারী নিয়া সে চেতলায় গিয়াছিল। একটি বিধবা স্ত্রীলোককে লইয়া কালীঘাটে আসে। কালীঘাটে আত্মীয়ের বাড়ী স্ত্রীলোকটি আর খুঁজিয়া পায় না। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। মহাবীরেরও চেতলা ফিরিয়া যাওয়ার উপায় নাই। গাড়ী জমা দিতে হইবে। অনেক কষ্টে শেষে চেতলা এলাকার একটি গাড়ীর খোঁজ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তাতে উঠাইয়া দিয়া রেহাই পায়। কালীঘাটে সোয়ারী পৌছাইয়া দিয়া গাড়ীটি চেতলা ফিরিয়া যাইতেছিল।

'ও আপত্তি করল না মহাবীর? ভাড়া ফসকে যাবার ভয় ছিল তো?'

আপত্তি কিসের? মহাবীরের ভাড়াও তো একরকম ফসকাইয়া গিয়াছে! বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীলোকটি যদি ডবল ভাড়া দেয়, দেখা হইলে চেতলার সেই রিকসাওলা—তাকে মহাবীর চেনে না—অর্দ্ধেক মহাবীরকে দিবে। ভাড়া যদি অবশ্য না পায়——

আজ সকালে যা ঘটিয়াছে সেটা শিশুশিক্ষার গল্পের মত শোনাইবে। বেলা তখন সাড়ে দশটা। সহর ব্যস্ত, বিব্রত, উদ্বিগ্ন এবং একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

"আমি অন্ধ বাবা! আমি অন্ধ ভিখিরী বাবা। আমায় পথটা পার করে দাও! অন্ধ বাবা......"

আরও কয়েক মিনিট এভাবে চেঁচানোর পর অন্য কেউ হয়তো তাকে পথ পার করিয়া দিত, একজন রিক্‌সাওলা আগেই কাজটা করিয়া ফেলিল। অন্ধকে যে দয়া করিল ঘটনাক্রমে সে রিকসাওলা, তাই উল্লেখ করিলাম। রিকসাওলারাই শুধু অন্ধজনে দয়া করে একথা বলা উদ্দেশ্য নয়।

আমি? আমি কি করিতেছিলাম? আমি দেখিতেছিলাম অন্ধকে কেউ পার করিয়া দেয় কিনা, কে দেয় এবং কি ভাবে দেয়।

নবান্ন

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ★

নতুন নাটক

শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য্যের 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয় ক'রে গণনাট্যসঙ্ঘ এক নতুন চমক লাগিয়েছিলেন। 'নবান্ন' বিজনেরই পরবর্ত্তী নাটক, বিষয়বস্তু প্রায় একই। সুতরাং যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরণের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্যসঙ্ঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' প'ড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্যসঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনও ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমান ভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় ক'রতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

বাংলার বিগত দুর্যোগ 'নবান্নের' পটভূমিকা। দুর্যোগ এখনো কাটেনি; কিন্তু আমাদের ক্লান্ত মন ভুলে যাবার সুযোগ খুঁজছে। 'নবান্ন' চায়, বাংলা যেন না ভোলে, ক্লান্তি যেন না আসে। তাই বাংলার চোখের সামনে 'নবান্ন' বার বার ধ'রে দেখাবে বিগত দুর্যোগকে। দুর্যোগের কারণ অনেক, কতক বাইরের, কতক ভেতরের। যার ওপর আমাদের হাত নেই, তার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে—আমাদের নিজেদের কতখানি দোষ ছিল, তার হিসেব ক'রতে ভাবনা এনে দেয় 'নবান্ন'। দুর্যোগ আবার আসবে কিনা কেউ বলতে পারেনা। কিন্তু এলেও, আমরা যেন গতবারের মতই একেবারে অপ্রস্তুত না থাকি, এই হ'ল 'নবান্নের' আসল বলবার কথা।

'জবানবন্দী', 'নবান্ন' এদের নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এরা এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরী হবে পরে। এদের পাঠক দর্শক সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হ'য়ে চলতে হয় না। গোড়া থেকেই বাঙ্গালী এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই ত' গণনাট্য সঙ্ঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্যসঙ্ঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রসপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী ক'রে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটছে না ব'লে বন্ধ হয় নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্যসঙ্ঘের অভিনয় এখনও তাই ক্ষুধার্ত্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্ত্তনাদ। সঙ্ঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণ ভাবে সঙ্ঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেন নি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজ ভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধন-বৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্ত্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্ন মধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল ত হবেই।

কিন্তু, ধ্বংস যত বড়ই হক্, প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে। মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য্য সহস্র ঘা খেয়েও মরে যায় না, 'নবান্ন' শেষ পর্য্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা "গাঁতায় খাটতে" লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকে না, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয়নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করব না। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। এতগুলি ছোটবড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয়, এবং আবহ ধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

মধ্যশ্রেণীর সংকট

লেখক :
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নিম্ন মধ্যবিত্তের সঙ্কটের কথা বলতে গিয়ে মন্বন্তরের কলিকাতার একদিনের এক দৃশ্য চোখে ভাসে।

স্থান : বালীগঞ্জ। কাল : বেলা বারটা। পাত্রপাত্রী : তেতলা বাড়ীর নীচ তলার একাংশের রাস্তার দিকের জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের এক আধাবয়সী সীমন্তিনী ; জানালার বাইরে রাস্তার ধারে বাংলার কোন্ সুদূর পাড়াগাঁয়ের গৃহহীন এক গৃহস্থ-বধূ ; অস্থিসার মায়ের সঙ্গে তার কোলের ছেলে ; লিক্লিকে অস্তিত্বটুকু তখনো ধুক্ধুক্ করছে ; যেতে আর বেশি দেরি নেই !

এ দৃশ্য সেদিন নতুন কিছু নয়। পথে ঘাটে যখনতখন অমন আসন্ন মরণ দেখে দেখে লোকের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। সেই এক কথা, সেই একই সুর : "মা গো ! একটু ফ্যান দাও।"

মেয়েটিকে দাঁড়াতে বলে মহিলা ভেতরের ঘর থেকে একটা ছোট বাসনে করে খানিক খিচুড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু মেয়েটির কাঁখের সেই মুমূর্ষু ছোট্ট কঙ্কালের দিকে একবার নজর পড়তেই মুহূর্ত্তে তাঁর মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। জানালা গলিয়ে তাড়াতাড়ি করে খিচুড়িটা ঢেলে দিয়েই দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লেন, "দূর হ' —চোখের সামনের থেকে দূর হয়ে যা। শিগ্‌গির সরে পড়। আর কোনোদিন ইদিকে আসবি তো—"

জানালা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

* * *

এ কি ক্রোধ ? না, ঘৃণা ? না, বিরক্তি ? এ তিনের কোনোটাই নয়। হঠাৎ-জাগা করুণা হঠাৎই মিলিয়ে গেছে। ভয়, ভয়, দারুণ ভয়। রুদ্ধ ঘরেও নিম্ন মধ্যবিত্তের বুক বুঝি তখনো ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল। কে জানে, ঐ সর্ব্বনেশে বীভৎসতা পথ ছেড়ে শেষকালে একদিন ঘরেও উঠবে কি না ! নিম্ন মধ্যশ্রেণী যে ভাঙনের নদীর একেবারে উপকূলের বাসিন্দা !

এ ভয় নিম্ন মধ্যশ্রেণীর নতুন নয়। দুর্ভিক্ষের দাপটে বেড়ে গেছে এই মাত্র। আর্থিক বিন্যাসে যেখানে তার স্থান, পায়ের তলার সেই কঠিন মাটির চারদিকে নিষেধের সতর্ক বেড়া খাড়া করে তার মনের দৃষ্টি বরাবর ঐ উঁচু ডাঙার দিকেই। তাই বাইরের দিকে ভাঙ্গলেও সে মনের দিকে মচকায় না—ব্যক্তিগত জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা-বঞ্চনার শ্মশানে বসেও সে আকাশচারিতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে জানে। সংক্ষেপে এই তো ছিল মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশেরই মনের ছবি। 'ছিল' বলছি এই কারণে, নিম্ন মধ্যবিত্ত আর সেই দু-তিন বছর আগেকার মানসিক স্তরে দাঁড়িয়ে নেই। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তর মিলে তার জীবনযাত্রার ভিতশুদ্ধ টান মেরে তাকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে ইমারত তেমন জখম হয় নি, কিন্তু ভেতরে তার নানাদিকে ফাটল বার হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের দৌলতে সহজলভ্য চাক্‌রির খেলো অস্তরে সে ফাঁক বোজানো সম্ভব নয়—ইন্‌ফ্লেশনের কল্যাণে উপরতলার ভাগাভাগির চালুনি দিয়ে নিচে যে যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্যাবশিষ্ট এসে পড়েছে, তা-ই পেয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত এ-যাত্রা চোট সামলে নিতে পারবে বলে মনে করেছিল। তাতেও আর কুলোচ্ছে না !

* * *

নিম্ন মধ্যবিত্তের মনের জগতে এক বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। কতখানি ? দৃষ্টি তার এখনো মাটির দিকে নামে নি ঠিক, কিন্তু বিপর্য্যয়ের হেঁচকা টানে তার এতকালের উচ্চমঞ্চের দিকের মুখ এবার অনেকখানি নেমে এসেছে। আগের মতো নিজের নাসিকাগ্রে যতটুকু পথ দেখা যায়, তার মধ্যেই আটক থাকতে সে আর চাইছে না। তার একান্ত 'আমি' আজ 'আমরা' হয়ে উঠ্‌ছে। বলা বাহুল্য, এই 'আমরা' নিম্ন মধ্যবিত্ত 'আমরা'। তবু ভালো। নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক আজ সগোত্র-সচেতন হতে পেরেছে, এই বা কম কি ! নিচের দিকের বৃহত্তর 'আমরা'-র দিকে ভিড়তে সে পারছেও না, আপাততঃ চাইছেও না—দৃষ্টি তার ঘন ঘন উপরের দিকেই ছুটে যায়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে আজ দলে-ওঠার স্বপ্ন নেই, আছে বিদ্বেষ আর বিক্ষোভ। সরকারী অনাচার ও চোরাবাজারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে সুযোগ পেলেই তার অভিযোগের ঠাসা বারুদ ফেটে পড়তে চায়। এই অর্দ্ধ-জাগরণ একদিকে যেমন ভরসার, আর একদিকে তেমনি ভাবনার কথা।

* * *

ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখে বাসায় ফিরেছে। নতুন ছবির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। এত ভালো বাংলা বই নাকি এর আগে আর কখনো হয় নি। উৎসুক হয়ে উঠি। প্রশ্ন করে করে এই নতুন ছবির কাহিনীটা পুরোপুরি শুনলাম। শুনে খুশিই হই। বুঝলাম মোড় ঘুরছে—আপাতত যত কমই হক না কেন। ছবিখানি আজকের মধ্যশ্রেণীর চমৎকার প্রতিচ্ছবি। মধ্যশ্রেণী বাস্তবে যতখানি জেগেছে ঐ ছায়াচিত্রও তার বেশি এগোতে পারে নি। তাতে দরিদ্রের দুর্দ্দশার কথা আছে, মজুর সঙ্ঘের ছায়া আছে, শ্রেণীবিরোধেরও আভাস আছে ! এ সবই গৌণ। কিন্তু আসল কথাটা আছে, অর্থাৎ ধনীর বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণীর বিক্ষোভের কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বইখানির সার্থকতা এইখানেই এবং ঐ পর্য্যন্তই।

আমাদের কথার মাঝখানে ঘরে ঢুকল ঐ বাড়ীরই এক কলেজের ছেলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ছবিখানা এখনো দেখেন নি ?"

"না"।

"সে কি !"

"ভীড় কমুক। পরে একদিন দেখব নিশ্চয়ই।"

"শিগ্‌গির দেখে আসুন। ক্যাপিটালিষ্টদের আচ্ছা ঠুকেছে।"

আশ্বস্ত হই। মধ্যশ্রেণী চায় প্রচলিত মূলধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ! কিন্তু কথার পিঠে কথা উঠে প্রসঙ্গ অনেক দূরে গড়িয়ে চলল। একজন সীরিয়স হয়েই বললেন, "যতই বলুন না কেন, রুশিয়ায় সোস্যালিজম আর নেই—হয় তো ছিল। ষ্টালিন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত ভুলেও একবার টু শব্দ করেছেন ?"

আর একজন ফোড়ন কাটেন, "পোল্যাণ্ড নিয়ে কী-সব হচ্ছে।"

আমিও ইচ্ছে করেই টুঁ শব্দ করলাম না। কথাটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়েছে। বেশি ঘাটালে ওর পরেই হয় তো শুনতে পেতাম : "কমিউনিজম্ খুব ভালো জিনিষ—কমিউনিষ্টরাও খুব ভালো। কিন্তু এ দেশের কমিউনিষ্টরা বরাবর ভুল পথে চলে এসেছে—তারা দেশের ক্ষতিই করছে।" ইত্যাকার !

* * *

আলোচনা কিন্তু শেষ হয় নি। জার্ম্মানী যে পরাজিত হবে সে বিষয়ে একমত হয়েই আর একজন (তিনিও সিনেমা-ফেরৎ) এবার মন্তব্য করলেন, "জার্ম্মানীর পরাজয়ে দুনিয়ার ক্ষতিই হল।"

"কী রকম ?"

"কমিউনিজম কে না চায় ? সমাজের শতকরা দু'চার জন ধনীলোকের হাত থেকে শাসনের বল্‌গা শতকরা নব্বুই জনের হাতে একদিন আসবেই।"

উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি কথা শুনে যাই।

"কিন্তু ফ্যাসিজমের জয় হলে শতকরা পাঁচজন ধনীর হাত থেকে ক্ষমতা শতকরা পনেরো বিশ জন মধ্যবিত্তের হাতে তো চলে আসতে পারত। আমরা কয়েক পা এগোতাম সন্দেহ নেই। ফ্যাসিজম্ কমিউনিজমের চেয়ে খারাপ বটে, কিন্তু ক্যাপিটালিজমের চেয়ে যে ভালো একথা স্বীকার করতেই হবে। কী বলুন ?"

ধনিকের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ এক শিক্ষিত লোকের কাছে, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিষ্টবিরোধী মহাযুদ্ধের এই শেষ অঙ্কে, এখনো ফ্যাসিজম্ ক্যাপিটালিজম্ নয়—মূলধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মতোই ফ্যাসিজম্‌ও এক স্বতন্ত্র মতবাদ হয়ে রয়েছে ! !

* * *

এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এদেশেও প্রতিক্রিয়া নানা দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বোম্বাইএর প্রাক্তন পৌরপতি থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক পর্য্যন্ত জনস্বার্থের নাম করে ; সকলেরই লক্ষ্য এক। মধ্যশ্রেণীর সহজ বুদ্ধি গুলিয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে—বই লিখে, প্রবন্ধ ফেঁদে, বক্তৃতা করে, সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপিয়ে, গোপন ইস্তাহার বিলি করে, দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার মেরে, নানা ভাবে। মধ্যশ্রেণীর মুক্তির পথ যে প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ,জনগণের সঙ্গে একযোগে এগিয়ে চলার পথ, এই সহজ ও প্রত্যক্ষ সত্যকে ঘোলাটে করে দেখাবার জঘন্য ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে গেছে। এই অভিযানে মিথ্যার চেয়ে অর্দ্ধ-সত্য বেশি, অর্দ্ধ সত্যের চেয়ে বিকৃত সত্য আরো বেশি। চতুর প্রতিক্রিয়ার ছদ্মবেশের অভাব নেই—কেউ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অকৃত্রিম উপাসক, কেউ বা বিপন্ন সভ্যতার একমাত্র রক্ষক, কেউ কেউ মজুরেরও বন্ধু এবং কিষাণেরও শরিক ! মধ্যশ্রেণী আজ দিশেহারা। কিন্তু সে পথের সন্ধান জানতে চায়। গণতন্ত্রের শত্রু তাকে পথ দেখাবার ভরসা জানাচ্ছে ! মধ্যশ্রেণীর স্বাভাবিক অসন্তোষের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তার অনেক ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তার আড়াল-পড়া দুর্ব্বলতাকে আবার লেলিয়ে দিয়ে, তার অভ্যাস আর সংস্কারকে উস্‌কে তুলে প্রতিক্রিয়া তাকে আপন স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক করতে চায় !

* * *

আজ মধ্যশ্রেণীর সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই। ভরসার কথা, মধ্যশ্রেণী অত সহজে ভুলবে না। বিভ্রান্ত মধ্যশ্রেণীর চোখের সামনে এই যে কুয়'সার বেড়াজাল বিস্তৃত হচ্ছে, তাকে কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার শক্তিও জন্ম নিয়েছে ঐ মধ্যশ্রেণীরই মধ্য থেকে। মধ্যশ্রেণীর যে মুষ্টিমেয় অংশ বহু আগে থেকেই সচেতন, মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে তাদের সংখ্যা-শক্তি বহু বেড়েছে, তাদের দৃষ্টি আরো খুলে গেছে। তারা প্রশংসায়ও গলে না, নিন্দা বিদ্রূপেও টলে না। পদে পদে বাধাবিপদ ঠেলে সরিয়ে প্রাণপাত করে গত দু-তিন বৎসরের যে ইতিহাস তারা রচনা করেছে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। নিম্ন মধ্যশ্রেণীর এই অনমনীয় অংশই দ্বিধাচ্ছিন্ন মধ্যশ্রেণীর সত্যিকার মুক্তি কোন্ পথে সেই স্পষ্ট কথা জানাবার বোঝাবার মানাবার ভার নিয়েছে। নিম্ন মধ্য শ্রেণী ও শোষিত সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পরস্পরের এত কাছে থেকেও এতকাল উভয়ের মধ্যে ছিল সমান্তরাল প্রাচীর। আজ সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর ভাঙ্গন ধরেছে। এই ফাঁকে দুই জগতের দু'হাত যাতে এক না হতে পারে তার জন্যে প্রতিক্রিয়া প্রতি-আক্রমণ সুরু করে দিয়েছে। তার—টাকায় কেনা সুবিধাসুযোগও বহুবিধ। কিন্তু তার দুর্ব্বলতাও কম নয়। প্রতিক্রিয়া মধ্যশ্রেণীর সামনে আর তার আসল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সাহস পায় না। তাকে জনমুক্তির বুলি আওড়াতে হয়, তাকে নিজের কায়েমী স্বার্থের কথা গোপন রেখে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর স্বার্থকে প্রকাশ্যে বড় করে তুলে ধরতে হচ্ছে। ভীরুর এই ভোলই তার কাল হবে। ঐ দুর্ব্বল স্থানে জোর আঘাত করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করবে যে সমাজ-সচেতন মধ্যশ্রেণী, সেই আদর্শনিষ্ঠ যুবক বাংলার অশ্রান্ত কর্ম্মজীবনে আজ আগামী কালের পদধ্বনি শুনতে পাই। "একটা বড় রকমের গোলযোগ পাকিয়ে" আসেই যদি আসুক না। "জোর প্রতিরোধ"ও প্রস্তুত।

* * *

ভাবনার চেয়ে ভরসাই বেশি।

দু'মাস আগে যে ভদ্রলোক ফ্যাসিজমের পরাজয়ে দুনিয়ার ইষ্টানিষ্টের প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে মাস দেড়েক আগে পাম্ দত্তের 'ফ্যাসিজম্' বইখানা পড়তে দিয়ে এসেছিলাম। দিন দশেক আগে তাঁর সঙ্গে আবার একদিন ঘণ্টাখানিক কাটিয়েছি। তাঁর দুর্ভাবনা পুরোপুরি কেটে গেছে এমন কথা অবশ্য বলতে পারলাম না। কিন্তু ফ্যাসিজম যে সেণ্ট পার্সেণ্ট ক্যাপিটালিজম্—ক্যাপিটালিজমের আরও হিংস্র, আরও নগ্ন, আরও জঘন্য রূপ—তা যে বিপন্ন ক্যাপিটালিজমেরই মরণ কামড়, একথা তিনি এরি মধ্যে বুঝতে পেরেছেন। টের পেয়ে এসেছি, তাঁর অনেকটা মনে এখন অজস্র প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। মিথ্যাপ্রচারের সঙ্কটের দিনে এমনি করেই সত্য-প্রচারের অস্ত্র অসংখ্য চোখের ছানি কেটে দেবে। মধ্যশ্রেণী গণতন্ত্রের পথে জনগণের সঙ্গেই চলবে, এ আশা আজ আর স্বপ্ন নয়।

বহু জাতির সোভিয়েটের ঐক্য

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দুইটি নূতন প্রস্তাব আনা হয়। একটি প্রস্তাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি রিপাব্লিককে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী গড়িবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং অপর প্রস্তাবে তাহাদিগকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

এই নূতন প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কমরেড মলোটভ বলেন : 'ইহার তাৎপর্য্য হইল, ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি—এক কথায় জাতীয় উন্নতির ফলে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হইল।' লিথুয়ানিয়ান রিপাব্লিকের ডেপুটি কমরেড প্যালেকিস্ বলেন, 'এ-কথা আমরা ভুলতে পারব না যে ঠিক এই দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কঠিন দিনেই প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা এবং সোভিয়েট জনগণের অধিকার আরও সম্প্রসারিত হইল, সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইখানেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের গৌরব ও শক্তি।'

এইভাবে সোভিয়েটের জাতি-সমূহের রাষ্ট্র-জীবনের রূপ বরাবর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাই কমরেড কালিনিন সোভিয়েট ইউনিয়নের ২০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বলেন, 'ইহাই লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই পরিবর্ত্তন ইউনিয়নের ঐক্যের পথে বাধা হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে ঐক্যকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। যেমন যেমন জাতিগুলির জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা তেমন তেমন ইউনিয়নের নিকটতর হইয়াছে এবং উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা ঐক্য ছাড়া সম্ভব নয়।'

এইভাবে, "পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন সোভিয়েট রিপাব্লিক গঠন করার মধ্য দিয়া রাশিয়ার জাতিসমূহ নূতন, স্বেচ্ছামূলক বন্ধুভাবাপন্ন ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতেছে।" [ষ্টালিন]

পোলিশ চক্রান্তের মুখোস খুলিয়াছে

লেখক :
হীরেন্দ্র মুখার্জী

সোজাসুজি সোভিয়েটকে গালিগালাজ করার স্পর্দ্ধা আজকাল বড় কেহ দেখাইতে সাহস করে না বটে, কিন্তু সোভিয়েটের শত্রুকুল এখনও নির্ম্মূল হয় নাই।

তাই সবদেশে যাহারা সোভিয়েটের শত্রু, তাহারা আজ পোলাণ্ডের বন্ধু সাজিয়াছে, সোভিয়েটের হাতে পোলাণ্ডের দুরবস্থা সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে। ১৯৩৯ সালে যখন বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধে, তখন হিটলার প্রথমেই পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা হিটলার-বিরোধী মুখোস পরিয়া বলিতেছে যে ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডের সীমানা যাহা ছিল, ঠিক তাহাকেই অটুট না রাখিলে হিটলারের কবল হইতে নিরীহ পোলাণ্ডকে উদ্ধার করার অর্থ হয় না। কিন্তু পোলাণ্ডের প্রতি এইভাবে যাহারা দরদ দেখায়, তাহারা প্রকৃতই পোলাণ্ডের বন্ধু নয়, হিটলারেরও বিরোধী তাহারা নয়।

সোভিয়েটের শত্রুদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের দেশেও কয়েকজন ধুয়া তুলিয়াছে যে পোলাণ্ড সম্পর্কে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখাইতেছে। কথাটা অবশ্য একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপার কি, বুঝিতে হইলে পোলাণ্ডের সম্প্রতিকার ইতিহাস একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে।

সোভিয়েটই পোলাণ্ডকে স্বাধীনতা দিয়াছে

১৯১৭ সালে সোভিয়েট-বিপ্লবের কয়েকমাস পরে সোভিয়েট-সরকার ঘোষণা করে যে জারের আমলে যে-সব দেশ রাশিয়ার অধীন ছিল, তাহারা মুক্ত হইল। তখন পোলাণ্ডের অধিকাংশ জার্ম্মান ফৌজের দখলে বলিয়া যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীন পোলাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট যে পরাধীন পোলাণ্ডকে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে যখন পোলাণ্ড স্বাধীন হইল, তখন সে-দেশের জমিদার-পুঁজিদার বড়কর্ত্তার দল সোভিয়েটের প্রতি প্রসন্ন হওয়া দূরে থাক্, অবিলম্বে সোভিয়েট ধ্বংসের জন্য লড়াই বাধাইতে চাহিল। এই দলের পাণ্ডা ছিল পিল্‌সুদ্‌স্কি; এই লোকটী ছিল মুসোলিনি-লাভালের মত একজন নাম-খারিজ করা সোশালিষ্ট, দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা নেতা হওয়া ছিল ইহার মতলব।

"কার্জন্ লাইন" লইয়া বিতর্ক

পোলাণ্ডের সীমানা কতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তখন মিত্রপক্ষ একটা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। ফলে স্থির হয় যে যে-সব অঞ্চলে য়ুক্রেনিয়ান ও শ্বেত-রাশিয়ানরা সংখ্যায় বেশী, সেখানে পোলিশ হুকুমৎ চালু হওয়া উচিত নয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব কার্জন একথা সোভিয়েট সরকারকে জানান বলিয়া এই সীমা রেখার নাম হয় 'কার্জন লাইন'।

কিন্তু পিল্‌সুদ্‌স্কি এ-ব্যবস্থা মানিতে রাজী হয় নাই, বরং ফৌজ পাঠাইয়া সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করে। সকল রাষ্ট্রই তখন সোভিয়েটের শত্রু, আর নূতন সমাজগঠনের সহস্র সমস্যা লইয়া সোভিয়েট তখন ব্যস্ত, তাই ১৯২১ সালে রিগা শহরে সোভিয়েট আর পোলাণ্ডের মধ্যে সন্ধি হয়; পোলাণ্ড এমন অনেকটা জায়গা দখল করিয়া বসে যেখানে য়ুক্রেনিয়ান ও শ্বেত-রাশিয়ানরাই বসবাস করে। এত বড় একটা অবিচার ঘটাতে মিত্রপক্ষ সোভিয়েট-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও চঞ্চল হইয়া পোলাণ্ডকে জানাইল যে য়ুক্রেনিয়ান্ ও শ্বেত-রাশিয়ানদের উপর যেন অত্যাচার করা না হয় এবং পঁচিশ-বৎসর পরে যেন তাহাদের ভোট লইয়া স্থির করা হয় যে তাহারা পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে কি না।

ফ্যাশিষ্ট পিল্‌সুদ্‌স্কির মতলব

কিন্তু ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্র তখন সোভিয়েটের আবির্ভাবে এতই শঙ্কিত যে তাহারা পোলাণ্ডের অপকর্ম্ম থামাইল না। বরং পিল্‌সুদ্‌স্কি প্রভৃতিকে উস্কাইতে লাগিল। পিল্‌সুদ্‌স্কির দল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে একদিন সোভিয়েটকে ধ্বংস করিয়া বল্‌টিক্ হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিরাট এক পোলিশ সাম্রাজ্য বসাইতে হইবে।

১৯২৫ সালে পোলাণ্ড খোলাখুলি ফ্যাশিষ্ট বনিয়া গেল, পিল্‌সুদ্‌স্কি 'ডিক্টেটর' হইয়া বসিল। য়ুক্রেনিয়ান, শ্বেত-রাশিয়ান, ইহুদী প্রভৃতির উপর অকথ্য অত্যাচার চলিল। সোভিয়েটের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা অনেক হইল, একজন সোভিয়েট দূতকে পোলিশ গুণ্ডারা হত্যা পর্য্যন্ত করিল। বড় বড় পোলিশ জমিদার পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন জমি লইয়া জাঁকিয়া বসিল, জনগণের যন্ত্রণার অবধি রহিল না।

"হিটলারের ছড়িবরদার" বেক্

জার্ম্মানীতে হিটলারী শাসন স্থাপিত হওয়ার কয়েকমাস পরেই পোলাণ্ড জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুতা পাকাইবার জন্য চুক্তি করিল। পিল্‌সুদ্‌স্কির স্থানে যে নায়ক সাজিয়া বসিয়াছিল, সেই কর্ণেল বেক্‌কে ইয়োরোপের রাজনীতিক মহলে নাম দেওয়া হইল 'হিটলারের ছড়িবরদার'!

হিটলারী জার্ম্মানী যখন একে একে নানা দেশ গ্রাস করিতে লাগিল, তখন পরমবাধ্য পোলাণ্ড বাহবা জানাইল। সোভিয়েটের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতেই পোলাণ্ড নারাজ বলিয়া সদম্ভে বেক্ আর তাহার অনুচরবৃন্দ বিবৃতি দিতে থাকিল।

১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া কাড়িবার জন্য হিটলার যখন মিউনিকে মন্ত্রণাসভা ডাকিল, তখন পোলাণ্ড হইল তাহার আশ্রিত অনুগ্রহপ্রার্থী। পোলাণ্ড হিটলারের কাছে বক্‌শিস্ বাবদ টেশেন বলিয়া একটী চেক্ জেলা দখল করিতে পাইল।

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ"

আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ"। কিন্তু হিটলারের "পীরিতি" হইল "বালির বাঁধের" চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক। তাই ১৯৩৯ সালে হিটলার প্রথমে আঘাত করিল এতদিনকার আশ্রিত পোলাণ্ডের উপর।

আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য পোলিশ জনসাধারণ বীরবিক্রমে লড়িল বটে, কিন্তু দেশের মালিকরা বিপদ দেখিয়া পলায়ন করিল, বেক্-রিদ্‌জ্‌স্মিগ্‌লির সরকার উধাও হইয়া গেল।

এমন সময় লালফৌজ আসিয়া হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে দিল না। জার্ম্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অবাধে হিটলারকে লালফৌজ আগাইতে দিল না। পোলিশ সরকার যখন ফেরার, পোলাণ্ডের জনগণ যখন শাসকদের দুষ্কর্ম্মের ফলে নরক-ভোগ করিতেছে, তখন সোভিয়েট-সেনা অগ্রসর হইল, যে-সব অঞ্চলে সোভিয়েট য়ুক্রেনিয়ান ও শ্বেত-রাশিয়ানদের স্বজাতীয়েরা বাস করিত, সে পর্য্যন্ত যাইল। এখানেই পরে প্রায় একবাক্যে সকলে সোভিয়েটে যোগ দিবার পক্ষে ভোট দেয়, সোভিয়েটদেশে নূতন মুক্ত-জীবনের সন্ধান পায়।

পোলিশ বড়কর্ত্তাদের সোভিয়েটবিরোধ

এত কাণ্ড ঘটিতে থাকিলেও পোলিশ বড়-কর্ত্তাদের টনক নড়ে নাই। তাহারা পূর্ব্বেরই মত সোভিয়েটের শত্রুতা করিতে থাকে। হিটলার সোভিয়েটদেশ আক্রমণ করার পর পোলিশ নায়ক সিকোর্স্কি সোভিয়েটে একটী পোলিশ বাহিনী সংগঠনের প্রস্তাব করেন। সিকোর্স্কি হয় তো ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুকাল পরেই মারা যান, আর এ ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বের ভার পড়ে অ্যাণ্ডার্স ও সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কির মত বদমায়েস সেনাপতির হাতে। সোভিয়েটের যখন দারুণ বিপদ, তখনও প্রায় ৭৩০০০ পোলিশ সৈন্যকে ইহারা জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে লড়িতে দেয় নাই।

পোলিশ জাতীয়-মুক্তি-সংসদের সভাপতি মারোয়াস্কি

সোভিয়েটের কুৎসা ইহারা রটাইতে থাকে আর শেষে সৈন্যদল লইয়া ইরাণে যাইয়া হাজির হয়।

এই কুৎসা প্রচার চরমে উঠে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে। পোলাণ্ডের ফেরারী সরকার তখন লণ্ডনে বেশ খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে দিন গুজরান করিতেছিল। হঠাৎ গোয়েবেল্‌স্ রটাইল যে স্মোলেন্সকের নিকট কাটিন্ জঙ্গলে ১০,০০০ পোলিশ যোদ্ধাকে নাকি লালফৌজ মারিয়া একত্র কবর দিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে তাহা ধরা পরিয়াছে! লণ্ডনের পোলিশ মাতব্বরেরা তখনই ধরিয়া লইলেন যে গোয়েবেল্‌স্ ধ্রুব সত্য উচ্চারণ করিতেছে, তাই অনুসন্ধানের জন্য রেড-ক্রশের কাছে দরখাস্ত জানানো হইল! সোভিয়েট অবিলম্বে প্রমাণ করিয়া দিল যে জার্ম্মানরা নিজেদের অপকর্ম্মের দায়িত্ব সোভিয়েটের স্কন্ধে চাপাইতেছে আর নাম-কা-ওয়াস্তে পোলিশ সরকার হিটলারেরই মতলব হাসিলে সাহায্য করিতেছে। সোভিয়েট তাই লণ্ডনস্থ পোলিশ সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়।

হিটলারীরাই সুবিধা পাইল

পোলাণ্ডের ভিতর থাকিয়া যে দেশভক্ত দল লণ্ডন হইতে নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছিল, যাহারা হিটলারী দুঃশাসন উৎপাটিত করার জন্য জীবনপণ করিয়াছিল, পোলিশ "সরকার" কেবলই তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিল, হঠাৎ কিছু করিও না—একথাই কেবল বলিতে লাগিল। এমন কি যাহারা দেশের জন্য লড়িতে লাগিয়াছিল তাহাদিগকে 'কম্যুনিষ্ট দস্যু' বলিয়া ফ্যাশিস্টদের হাতে ধরাইয়া পর্য্যন্ত দিল। এ-সমস্ত কথা সোভিয়েট তখনই দুনিয়াকে জানাইয়াছে।

লালফৌজ যখন পোলাণ্ডের ১৯৩৯ সালের সীমানা পার হইল, তখন লণ্ডনস্থ "সরকার" ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল যে সোভিয়েটকে ১৯২১ সালের সীমানা মানিতেই হইবে। তখন যে অবিচার করিয়া ঐ সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তাহা বেমালুম পোলিশ "সরকার" ভুলিয়া গেল। এমন কি লণ্ডনের "টাইম্‌স্" পত্রিকার হিসাবে দেখা যায় যে সেখানকার অধিবাসীরা সোভিয়েটে যোগ দেয়, সেখানে এক কোটী দশলক্ষ লোকের মধ্যে পোলিশদের সংখ্যা বিশলক্ষের বেশী নয়। 'কার্জন লাইন' যে-নীতি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়, সোভিয়েট তাহা একেবারেই লঙ্ঘন করে নাই। কিন্তু তবুও লণ্ডনের পোলিশ "সরকার" ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফঝম্প করিতে লাগিল, এক ফালি জমি ছাড়িব না বলিয়া বড়াই করিল, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার আমাদের সহায় বলিয়া উল্লাস দেখাইল। ইহাতে অবশ্য লাভ হইল একজনের—সে হইল হিটলার।

ওয়ার্স অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য

ইতিমধ্যে সোভিয়েটে পোলিশ দেশ-ভক্তদের এক সংসদ স্থাপিত হইয়াছিল, লাল-ফৌজের সঙ্গে মিলিয়া ইহার সৈন্যদল লড়িতে-ছিল, ১৯২১ সালের অন্যায়লব্ধ সীমানা ইহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। লণ্ডনের পোলিশ "সরকারের" সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও উভয় সংসদের মধ্যে মিটমাটের জন্য সোভিয়েটের আগ্রহ ছিল। তাই লণ্ডন হইতে পোলিশ "প্রধান মন্ত্রী" মস্কো যাইয়া আলোচনা করিলেন। এ-চেষ্টা যাহাতে ফাঁসিয়া যায়, সেজন্য সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কির দল সোভিয়েট ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পরামর্শ না লইয়া ওয়ার্স-তে অভ্যুত্থান আরম্ভ করিল, সোভিয়েট সাহায্য পাঠাইতেছে না বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিল, অন্তত দুই লক্ষ পোলিশ নাগরিকের মৃত্যু ঘটাইল। কিন্তু সোভিয়েট তাহার কর্ত্তব্য পালনে একটুও অবহেলা করে নাই, এ-কথা যখন সকলে বুঝিল, তখন সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কি গতিক মন্দ দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

তখন সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কির জায়গায় প্রধান সেনাপতি পদে বসিল বর। ওয়ার্স-তে না ঢুকিয়াই ইনি ছিলেন অভ্যুত্থানের নেতা, দুনিয়ার বাজারে নাম কিনিয়াছিলেন! সোভিয়েট আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল, জগৎকে জানাইল যে বর হইল সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কির ও-পিঠ, তাহাকে সোভিয়েট বরদাস্ত করিবে না।

ব্যাপার দেখিয়া অতি-সেয়ানা জেনারেল বর সদলে জার্ম্মানদের হাতে আত্মসমর্পণ করিল, সোভিয়েটের প্রভাব এড়াইবার জন্য জার্ম্মান বন্দিশালাকেই তাহারা বাছিয়া লইল!

সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কিরা মিহাইলোভিচের মতই হারিল

• সস্‌ঙ্কোভ্‌স্কি-বর জাতীয় জীব হইল য়ুগোশ্লাভ দেশদ্রোহী মিহাইলোভিচের সগোত্র। তাহারই মত ইহারা কিছুদিন মিত্র-শক্তির অনুগ্রহ পাইল, কিন্তু সোভিয়েটের জোরে ও জনশক্তির চাপে তাহাদের মুখোস খুলিয়া গেল। কে কোন্ দিকে বুঝা আর শক্ত নয়।

সম্প্রতি চার্চ্চিল মস্কো যাইয়া নিশ্চয়ই পোলাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পোলিশ "প্রধান মন্ত্রী"ও গিয়াছিলেন। সোভিয়েটে যে পোলিশ দেশ-ভক্ত-সংসদ আছে, তাহার পক্ষ হইতে লণ্ডনে এক দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার আর শুধু ঐ ফেরারী সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা চালাইয়া যাইতে পারিবে না।

সোভিয়েট প্রতিবেশী হিসাবে চায় স্বাধীন, শক্তিশালী, শান্তিকামী পোলাণ্ড। ছদ্মবেশী ফ্যাশিস্ট দেশদ্রোহীদের দিন আজ ফুরাইয়াছে। সোভিয়েটভূমি ছিনাইয়া লইবার মতলব তাহাদের ফাঁসিয়াছে। পোলাণ্ডের জন-সাধারণই অগ্রসর হইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিবে, এতদিন সুকৌশলে যে সোভিয়েট বিরোধী চক্রান্ত চলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

★ ফ্যাশিষ্টবিরোধী সংগ্রামের প্রথম তীর্থ

লেখক :
নিরঞ্জন সেন

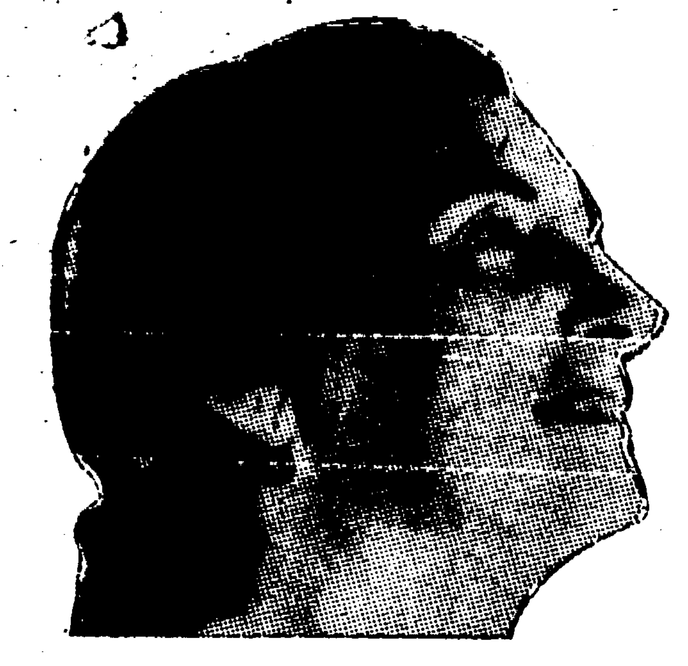

লা পাসিওনারিয়া
স্পেনের মুক্তি-সংগ্রামের নেত্রী

স্পেনে তখন ঘোর দুর্দ্দিন।

'পপুলার ফ্রন্ট' গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। প্রতিক্রিয়ার কালো আঁধার গোটা দেশটাকে গ্রাস করতে উদ্যত।

হিটলার ও মুসোলিনী ছিল এর পেছনে। স্পেনের প্রগতিকে ধ্বংস করার উদ্যমে তাদের কত অফুরন্ত উৎসাহ! তারা কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও বিমান খোলাখুলিভাবেই ফ্রাঙ্কোকে পাঠায়। এমন কি সেনা পাঠিয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই প্রথম বাজীতে জিততে চায়।

অবশ্য তখনকার দিনে এ লড়াইয়ে তারাই সুবিধা করেছিল। তাদেরই সগোত্র ফ্রাঙ্কোর মারফত সেদিন স্পেনে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র কায়েম হয়।

গণতান্ত্রিক শক্তিও কিছুদিনের জন্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—

যারা তখন ফ্রাঙ্কো ও তাহার নেতা হিটলার মুসোলিনীকে শিক্ষা দিতে পারত, যারা তখন পৃথিবীকে বর্ত্তমানের এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্বিষহ যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে পারত, তারা কিন্তু তখন সে মহান কর্ত্তব্য পালনে গাফিলতী করেছে। স্পষ্ট কথায় বলতে কি, হিটলার ও মুসোলিনীকে পরবর্তী-কালে বড় হওয়ায় সাহায্য করেছে।

ফ্রান্সের লিও ব্লুম ও ইংলণ্ডের চেম্বারলেন সরকার স্পেনের এই 'ঘরোয়া' ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির দোহাই দিয়েই প্রতিবেশী স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে গলা টিপে মারে। তখনকার দিনের সে অন্যায়ের ফলই আজ পৃথিবীকে এমনি করে আঘাত দিতে পারছে।

অথচ অস্ত্র পেলে গণতন্ত্রী স্পেনই তখন আজকের এই বীভৎস পশুর শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিতে পারত, নাৎসীবাদকে এমন বিকট হয়ে দাঁড়াতে দিত না।

* * *

ফ্যাসিজমকে বাড়তে দেওয়ার ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির জনসাধারণ আজ যে দারুণ বিপর্য্যয় ভোগ করছে, এ যেন তাদের সেইদিনকার চেম্বারলেন, লিও ব্লুমের নীতিকে মুখ বুজে সয়ে নেওয়ারই প্রায়শ্চিত্ত। সে দিনগুলির জন্যই আজ তাদের অনেক দিতে হচ্ছে।

হিটলারের 'লুফত্‌ওয়াফে' যে গোয়ের্ণিকা দিয়ে হাত পাকিয়েছিল, পরবর্ত্তী কালে সেই বিমানঝাঁকই ইংলণ্ডকে বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত করেছে, নির্ম্মমভাবে রাতের পর রাত ঘুমন্ত শিশুর কোমল অঙ্গকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

ফরাসী জনসাধারণ চার বছর ফ্যাসিষ্ট পরাধীনতা কি তা' মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছে—প্যারিসের জনসাধারণ সেই মধ্যযুগের নিষ্ঠুরতার চাবুকে জর্জ্জরিত হয়েছে।

চেম্বারলেন সরকারের সেদিনের নীতির জের আজও চলেছে—

লিও ব্লুম নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে, জার্ম্মানদের বন্দীশিবিরে তাই আজ তার দিনের পর দিন গুণতে হচ্ছে।

* * *

এর বিরুদ্ধে তবুও স্পেনের জনসাধারণ সেদিন মরদের মত দাঁড়িয়েছিল, ফ্রাঙ্কো বনাম স্পেনের জনগণের লড়াইয়ের সে ইতিহাস অপূর্ব্ব; বীরত্বপূর্ণ ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশে তার পাতাগুলি আজও মুখর।

—অস্ত্র নাই, বাইরের থেকে ষড়যন্ত্র করে গণতন্ত্রীদের অস্ত্র পাওয়ার পথকে রুখে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সেই অস্ত্রহীন জনতার চরম আত্মত্যাগের কাহিনী, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাদের সেই চূড়ান্ত ঘৃণা সমগ্র পৃথিবীতে তখন আলোড়ন এনেছিলো।

তখন স্পেনের জনগণের হাতে হাত মিলিয়েছিল তারাই, যারা সেদিন বুঝেছিল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের লড়াই স্পেনের বুকেই তখন সুরু হয়ে গেছে। এই বীভৎস দস্যুর গতিরোধ আজ যদি না করা যায়, তবে আগামীকাল বাধাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে এ হয়ত ঘুরে বেড়াবার সুবর্ণ সুযোগ পাবে।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সেদিনকার সেই সংগ্রাম, দেশ, জাতি বা ধর্ম্মের গণ্ডীকে মুছে দিয়েছিল—তাই সম্ভব হয়েছিল স্পেনের সে লড়াইয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'।

'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'—কত যে পরিচিত বীর, কত যে অজানা শহীদ সেদিন একে গড়ে তুলেছিল।

পৃথিবীর অতি পরিচিত বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্স তার রক্ত দিয়ে এর ভিত পাকা করেছিল; কডওয়েল, কর্ণফোর্ডের তাজা খুন একে আরও মজবুত করে।

ষ্টালিনগ্রাদ লড়াইয়ের বিশ্ববিখ্যাত বীর রডিমষ্টেভ সেদিন স্পেনের বুকে দাঁড়িয়ে প্রাণ হাতে করে লড়েছিল, শুধু এই কথা ভেবেই যে পৃথিবীতে দু' দলের লড়াই সুরু হয়ে গেছে—এক দল পৃথিবীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, উচ্চতর সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে চায়, আর অন্য দল পৃথিবীকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়, মানুষকে গোলাম বানাতে চায়।

যুগোশ্লাভিয়ার শ্রেষ্ঠ বীর মার্শাল তিতো 'ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেডে' যোগ দিয়েই সেদিনকার হিটলার-বিরোধী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এমনিতর আরও কত জন সেদিন স্পেনের বুকে সবল হাতে গণতন্ত্রের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরেছিল।

—কিন্তু তখন তারা ঘটনার মোড় ঘুরাতে পারে নি, সংহতির অভাবে গণতান্ত্রিক শক্তি সেদিন হিটলারকে এগিয়ে দেবার রাস্তা করে দিয়েছিল।

* * *

কিন্তু তবু উদ্যমের অভাব ছিল না।

আগামী দিনের জীবনকে বাঁচিয়ে র'খার এ লড়াই —১৯৩৮ সালের কথা। ফ্যাশিষ্ট ফ্রাঙ্কোকে বাধা দিতেই হবে। ঘটনার মোড় ঘুরানোর সে কি প্রাণপণ চেষ্টা। স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি এর নেতৃত্ব নিল। বিশ্ববিখ্যাত স্পেনের কমিউনিষ্ট নেত্রী 'লা পাসিওনারিয়া' সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে অস্ত্র সাহায্য দাবী করে ঘোষণা করে—মাদ্রিদের দরজায় ফ্যাসিজম বনাম গণতন্ত্রের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হবে।

কিন্তু ইউরোপের চেম্বারলেনপন্থীরা তখন তাদের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'সাবোতাজের' কাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে—কমরেড ইবারুরীর (লা পাসিওনারিয়া) জরুরী আবেদনের কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি।

দুনিয়াকে ফ্যাসিজমের কবল থেকে বাঁচাবার সে লড়াইয়ে স্পেন তখনকার জন্য ভেঙ্গে পড়েছে সত্য, কিন্তু মাথা নত করে নি। পরবর্ত্তী দিনে তা সে প্রমাণ করেছে।

* * *

গণতন্ত্রের তখন ঘোর বিপদ। হিটলার প্রায় গোটা ইউরোপকেই গিলে ফেলেছে। 'মিউনিকের' যেন বাতাস লেগেছে, পথ ছেড়ে দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন শাসকরা হিটলারকে সেলাম ঠুকছে। হিট-লারের পঙ্গপাল দেশের পর দেশ ছেয়ে ফেলেছে।

পরাধীনতার লাঞ্ছনায় মুহ্যমান জনগণ আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে সত্য, কিন্তু সম্বিৎ হারায় নি। ইয়োরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সবাই এক আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিবেগ কমতে দেয় নি, বাড়িয়েই চলেছে। স্পেনের ব্যাপারেও তাই। স্পেনের মানুষ স্বাধীনতা হারালো সত্য, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামকে একটি দিনের জন্য ভোলে নি।

ফ্রাঙ্কো তা জানে, তাই দিনের পর দিন প্রতিরোধের প্রাচীরের সামনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে।

* * *

পরাজয়ের প্রথম দিন থেকেই স্পেনের স্বাধীনতাকামী জনগণ গেরিলাবাহিনী গড়ে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে।

সুরু থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল (১) ফ্রাঙ্কোর ফ্যালাঞ্জ-পার্টির সঙ্গে সশস্ত্র বোঝাপড়া করা, (২) জার্ম্মানীকে ফ্রাঙ্কো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে, সে সাহায্য যাতে না পৌঁছয় তার জন্য অস্ত্রের কারখানা-গুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, (৩) ফ্যাশিষ্ট বিরোধী বন্দীদের, বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, (৪) ফ্রাঙ্কোর বাহিনীকে সুবিধা পেলেই আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া।

* * *

স্পেনের বিখ্যাত প্রদেশ অষ্টুরিয়ার খনি মজুররা ছিল এ সব ব্যাপারে অগ্রণী। তারা গেরিলা কায়দায় লড়াইতে ওস্তাদ। দিনের পর দিন তারা ফ্রাঙ্কোর কাঠামোকে হাতুড়ীর ঘায়ে পিটেছে—ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে তাকায় নি, রক্ত দিতে হয়েছে অনেক, কিন্তু পরোয়া করে নি।

লোহা ও ইস্পাতের একটি মস্ত বড় কারখানা, খনি অঞ্চলের ভিতরই। জার্ম্মানদের অস্ত্র সরবরাহের একটি বড় কেন্দ্র। মজুরদের আস্তানার ভিতরেই নাৎসী-বাদের প্রাণশক্তি—কত বড় অপমান। একে ভাঙ্গা চাই-ই চাই। মজুর গেরিলারা তৈরী, সমানে সুযোগ খুঁজছে। কারখানার মজুররাও গেরিলাদের হাতে হাত মেলায়। কারখানার ভিতরে যে সব লোহার হাতা ছিল, সেগুলিকে 'ডিনামাইট' দিয়ে গোপনে মজুররা ভরে দেয়, তারপর এক পরম শুভমুহূর্ত্তে সমগ্র কারখানাটির চেহারা বদলে গেল, রইল শুধু ভাঙ্গাচোরা লোহা লক্কড়ের পাহাড়।

গালেসিয়া—স্পেনেরই আর একটি প্রদেশ। উরুগুয়ে থেকে গণতন্ত্রীদের কাগজ 'এস্পানা ডেমো-ক্রাটিকা' খবর দিচ্ছে, এমন দিন যায় না যে দিন কোন না কোন ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজ অনুষ্ঠিত না হয়। ট্রেণ যাচ্ছে জার্ম্মানদের জন্য রসদ নিয়ে, আর যেতে পারে না। পথেই থুবড়ে পড়ে যায়।

কাটলোনিয়ার বার্সিলোনা বন্দর। স্পেনিস বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র। ফ্রাঙ্কোর তাঁবে যে জাহাজ-গুলি আছে, একটা সময়ে তার অনেকগুলিই এখানে ছিল। গেরিলারা খবর পায়। একদিন দেখা গেল অনেকগুলি জাহাজ জখম হয়েছে, কয়েকটা ডুবেও গেছে।

স্পেনের সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বাস্ক, গ্রানাদা, লিয়ন, এসট্রেমাডুরা প্রভৃতি প্রত্যেক অঞ্চলেই শক্ত প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কো—কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না। পৃথিবীকে সাফ করতে হবে, আবর্জ্জনা মুক্ত করতে হবে।

* * *

তাই ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সালে সোভিয়েটের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ওয়ার এণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাস' বেশ সোজা কথায়ই জানিয়েছে—দস্যু ফ্রাঙ্কোর নিরপেক্ষতা, ধরি মাছ না ছুঁই পানি। সে ভাবছে এ যুদ্ধ থেকে সে গা বাঁচাতে পারবে। কিন্তু তা ত হবার নয়, ইউরোপের জনগণ তাকে পাঁকে পুতে তবে ক্ষান্ত হবে।

আজকের দিনের ঘটনার সমাবেশও তাই হচ্ছে। ফ্রাঙ্কো বিরোধী স্পেনের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি স্পেনের মুক্তির জন্য 'স্পেনিশ ন্যাশনাল ইউনিয়ন' নামে এক যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করেছে। স্পেনের অভ্যন্তরে এবং সদ্যমুক্ত ফরাসীদেশে এই সংগঠন দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সমস্ত গণতন্ত্রীদের মিলনের কেন্দ্র হিসাবে এর কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। খবর এসেছে, লা পাসিওনারিয়াই আবার শক্ত হাতে স্পেনের ফ্রাঙ্কো-বিরোধী লড়াইয়ের নেত্রীত্ব নিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই গণতন্ত্রীশক্তি ফ্রাঙ্কোর সাথে শক্তি পরীক্ষায় নেমেছে, স্থানে স্থানে তুমুল লড়াই চলছে। স্পেনিশ সীমান্ত অতিক্রম করে দেশভক্ত-বাহিনী কানফ্রাক ও এস্তোরার মধ্যে পাঁচ ছ'টা গ্রাম দখল করেছে। আরান উপত্যকার লড়াই বেশ জোরেই চলছে। ফ্রাঙ্কোর দরদী নাৎসীরা ঘটনার বিবর্ত্তনে উদ্বেগও দেখিয়েছে। জার্ম্মান পররাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্ত্তা পর্য্যন্ত বলছে—স্পেনের ব্যাপারে শঙ্কা জাগিয়ে তুলছে। সংঘর্ষ যদি এমনি ভাবেই চলে তবে একে তো যুদ্ধই বলতে হবে।

* * *

এবার আবার ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেছে। ইয়োরোপের জনগণ লালফৌজের সহায়তায় ফ্যাসিষ্ট-দাসত্ব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সে সংগ্রাম এখন স্পেনকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। প্রতিক্রিয়ার কালরাত্রি অবসান প্রায়। হিটলার-মুসোলিনীর

(শেষাংশ ১৪ পৃঃ দেখুন)

মাদ্রিদের সেই প্রতিরোধ আজ স্পেনকে জাগিয়ে তুলেছে

চীনের শিল্প সমবায়

লেখক : কৃষ্ণবিনোদ রায়

শিল্প সমবায়ের প্রসার

(১৯৪২, জুন পর্য্যন্ত হিসাব)

এলেকা	সমিতির সংখ্যা	সদস্য	চিনা ডলারে প্রদত্ত মূলধন	মাসিক উৎপাদন
উত্তর-পশ্চিম	৩২৫	৪০১৯	৭২৮,১৯৪	৫,৭৭৪,৮৪৫
চুয়ানকাং	২৪৭	৪৮০০	১,৯২১,৪৩২	৪,৪১১,২৮৫
দক্ষিণপূর্ব্ব	৪৩৩	৫৩৯৫	৫৭২,৯৬৩	১,৭৭৪,৬১৬
দক্ষিণপশ্চিম	২৪৬	৩৪৮৫	৩২৭,০৫৫	৯,৪৭১,৫১৭
টিয়েন-চিয়েন	১৫৮	২৪৯৭	৭৮৫,১২৪	২,০২৭,৭৬৫
সিন-ইউ	১১৮	১৬১০	১৬৭,২১৭	৩২৭,০৫২
চি-ওয়ান	৬৩	৮৭৪	৫১,৪০৭	২৩৫,৮৬৪
	১৫৯০	২১,৬৮০	৪.৫৫৩,৩৯২	২৪,০২২,৯৪৪

বিবিধ শিল্পে সমবায়ের স্থান

(১৯৪২, জুন পর্য্যন্ত হিসাব)

শিল্পের নাম	সমবায় সংখ্যা	শতকরা পরিমাণ	সদস্য সংখ্যা	মাসিক উৎপাদন
যন্ত্রপাতি ও ধাতু	৫৭	৩·৬	১০১১	১,৪৫৮,৩৪০
খনি	১১১	৭·১	৯৭২	৪২,৮৩৩
বস্ত্র-শিল্প	৫৮৪	৩৬ ৭	১০,৪৪৯	১২,১৫৭,০৫৬
সেলাই	১৫৯	১০·০	১,৭১৮	২,৭৬৮,০৮৩
কেমিক্যাল	৩২২	২০·২	৪,৪৯৪	৩,৩১০,৬৬৩
খাদ্য	৭০	৪ ৪	৭০৭	১,০০৮,২৪৯
বিলাসদ্রব্য	৪৩	২·৭	৭৪৯	৯০১,৪৩১
কাষ্ঠ-শিল্প ও স্থাপত্য	১০৬	৬·৭	১,০৯০	৪৫৩,৭৪৪
যানবাহন	৭	০·৪	৬৭	১৫,৪০০
বিবিধ	১৩১	৮·২	১৪২৩	১,৯০৭,১৪০
	১৫৯০	১০০·	২২,৬৮০	২৪,০২২,৯৩৯

জাপানের আক্রমণ

১৯৩৭ সালের সাত মাসের সাত তারিখে চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্ব্বর অভিযান শুরু হয়। শুধু স্বাধীনতা হরণের জন্য নয়, চীনের শিল্প সমৃদ্ধি একেবারে লুপ্ত করিবার জন্য এই আক্রমণ। চীনের জাতীয় জীবনে দুর্যোগের আঁধার রাত আজও শেষ হয় নাই। লড়াই চলিয়াছে। অনিবার্য্য প্রভাতের জন্য অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে। চীনের শিল্প সমবায় চাইনিজ ইন্ডাস্কো (Chinese Indusco) সেই সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

চীনের শিল্প ধ্বংস

সাঁইত্রিশ সালের শেষ দিকে সাংহাই শহরের যুদ্ধ শেষ হয়; কিন্তু বিদেশী আবাস ব্যতীত শহরের অপর অংশে (অর্থাৎ যে অংশটি চীনাদের) তারপরও একমাস ধরিয়া আগুন জ্বলিতে থাকে। সে-আগুন যখন নিভিল, দেখা গেল, বৃহত্তর সাংহাইতে চীনের শিল্প এলেকাটি জাপানীরা মতলব করিয়াই ধ্বংস করিয়াছে। ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ও অবশিষ্ট সব কিছু ভাঙাড়ি লোহা হিসাবে জাহাজ বোঝাই করিয়া জাপানে পাঠানো হইল—পড়িয়া রহিল শ্মশান সাংহাই। লক্ষ লক্ষ সম্বলহীন, গৃহহীন, কর্ম্মহীন দক্ষ মজুর দীর্ঘদিন অভুক্ত। আশ্রয়-প্রার্থীদের সেই ভীড় আজ ১৯৪৩ এর বাংলার কথা মনে করিলে, কতকটা অনুমান করা যায়। সাংহাই-এর এই কাহিনী চীনের সমস্ত শিল্পাঞ্চলের সব কয়টি বন্দরের সবগুলি শহরের কাহিনী। বিরাট চীনকে ছোট্ট জাপান নিজের কুক্ষিগত করিতে চাহিয়াছিল—চীনের শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করিয়া। শিল্প-সম্বলহীন চীন গজরাইতে গজরাইতে অবশেষে বাধ্য হইবে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে—ইহাই ছিল জাপানী ফ্যাসিষ্টদের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র।

চীনের প্রতিরোধ

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ চীন তখন প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। "চীনারা চীনাদের বিরুদ্ধে লড়িবে না" এই আওয়াজ গান, সভা ও মিছিলের মধ্য দিয়া সারা চীনে নূতন চেতনার প্লাবন আনিয়াছে। জাপানী আক্রমণের পর ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ঘোষণায় কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান পাওয়া গেল; মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতিতে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রন্ট ঘোষিত হইল। সমগ্র জাতির চেতনা জাগ্রত হইল—আহত সিংহের প্রতিরোধ শুরু হইল।

চীনের শিল্প সমবায়ের জন্ম

যুদ্ধ শুধু সৈনিকের নয়—যুদ্ধ শিল্পের, যুদ্ধ উৎপাদনের। যুদ্ধের আগে যত জিনিসের দরকার ছিল, এখন তাহা ছাড়া আরও বেশী ও নূতন জিনিসে দরকার। সেনাবাহিনীর সব জিনিস দিতে হবে, সাধারণ অধিবাসীর প্রয়োজন মেটাতে হবে। বিদেশ হইতে মাল আসিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে সরকারী অর্থনীতির বৈদেশিক অবস্থান ক্ষুণ্ণ হয়। তাহা ছাড়া যে কোন সময়ে বিদেশ হইতে আমদানীর পথ বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং চীনের শিল্পই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কিন্তু উপায় কি? বড় বড় কারখানা তো রাতারাতি গড়িয়া তোলা যায় না। কোথায় বা তাহার উপযুক্ত যন্ত্র-পাতি মূলধন? কারখানা গড়িলেও খুব তাড়াতাড়ি মাল উৎপন্ন হয় না। সুতরাং "দেশময় ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল"—ইহাই স্থির হইল। ১৯৩৮ সালের ১৯শে মার্চ্চ সাংহাই-এর শ্মশানে এই বিষয়ে প্রথম বৈঠক হইল মাত্র চারজনের। ৩রা এপ্রিল পুনরায় ১১ জনের বৈঠক হইল কিং-কং রেস্তোঁরাতে—সেইখানে চীনের শিল্প-সমবায় গঠনের জন্য "প্রস্তুতি কমিটি" গঠিত হইল। তখনও হ্যাঙ্কো শহরের পতন হয়নি, সেখানেই তখন রাজধানী। জুলাই মাসে সেখানে শিল্প-সমবায় আন্দোলন শুরু হইল—৫ই আগষ্ট তারিখে চীনের শিল্প-সমবায়—সি-আই-সি (Chinese Industrial Co-operative—C. I. C.) প্রথম চালু হইল। জাপ প্রতিরোধের জন্য, আশ্রয়-প্রার্থীদের একসাথে রিলিফ ও কাজ দেওয়ার জন্য, নূতন চীন গঠন করিয়া তুলিবার জন্য নূতন শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।

* * *

প্রথম শিল্প-সমবায়

১৯৩৮ সালের ২৩শে আগষ্ট। বৃষ্টির দিন, রাস্তাঘাট জল-কাদায় ভরা—চীনের অভ্যন্তরে একটি ছোট্ট শহর—তার নাম পাও-চি। সি-আই-সি-র লু কুয়াং মিয়েন ঐ শহরে পৌঁছিলেন। পরদিন ভোরেই কাদায় সাঁতার দিয়া চলিতে চলিতে পাশের কামারশালায় লু এক বৃদ্ধ কর্ম্মকারকে দেখিলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃদ্ধের ছোট কাহিনীটা জানা গেল। জাপানীরা যখন হোনান আক্রমণ করে, তিনি দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পালাইয়া দেড়শত মাইলের উপর হাটিয়া শেষকালে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন, বন্ধুহীন, বান্ধবহীন। রান্নার বাসন ও কয়েকটি ছোট বস্ত্র ছাড়া কিছুই আনিতে পারেন নাই।

তাহাকে ও অন্য আটজন কর্ম্মকারকে একত্র করিয়া লু বুঝাইলেন সমবায় গড়িবার জন্য। লু সাথে সাথে শহরময় প্রচারপত্র ছড়াইয়া দিলেন; অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের কাছেও প্রচার করা হইল। ছোট শহরটায় নূতন উন্মাদনা দেখা দিল। তখন এই নয়জন কর্ম্মকার লু-র কাছে আসিয়া পাও-চি শহরে চীনের প্রথম শিল্প-সমবায় গঠন করিল। ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতিরোধ শুরু হইল।

চীনের কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে তুং

চীন-শিল্প-সমবায়ের সংগঠন ও প্রসার

সেই শিশুর আজ বিপুল শক্তি। সি-আই-সি'র প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র এখন চুংকিং শহরে। একটি পরিচালকমণ্ডলী ইহার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মপরিষদ, তার সভাপতি ডাঃ এইচ্, এইচ্, কুং, সাধারণ সম্পাদক—কে, পি, লুঁ। সাধারণ সম্পাদকের অধীনে চারটি বিভাগ আছে—(১) প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিভাগ, (২) অর্থ-ব্যবস্থা, (৩) কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা, (৪) অফিস। প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিভাগে সংগঠন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ ও খরিদ এই ৪টি উপবিভাগ। অর্থ-ব্যবস্থা বিভাগে হিসাবরক্ষা, হিসাব পরীক্ষা ও ঋণ ব্যবস্থা এই তিনটি উপবিভাগ। কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা বিভাগে পরিচালনা, সংযোগ, শিক্ষা, কল্যাণ ব্যবস্থা, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ এই ছয়টি উপবিভাগ।

কেন্দ্রীয় কর্ম্মপরিষদের অধীনে ১৮টি প্রদেশে ৮৬টি ডিপো আছে—তাহাদেরই মারফতে সমগ্র দেশের সমবায় আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই ৮৬টি ডিপো সাতটি এলেকায় বিভক্ত।

(১) **উত্তর-পশ্চিম** এলেকা—শেন্‌সি, কাংসু, নিংসিয়া, চিংগাই ও হুপে এই প্রদেশগুলি ইহার মধ্যে।

(২) **চুয়াংকাং** এলেকা—জে-চুয়ান ও সিংকাং প্রদেশ।

(৩) **দক্ষিণ-পশ্চিম** এলেকা—হুনান ও কোয়াংসি।

(৪) **টিয়েন-চিয়েন** এলেকা—ইউনান ও কিউই চাউ।

(৫) **দক্ষিণ-পূর্ব** এলেকা—কিয়াংসি কোয়াংটুং ও ফু-কিয়েন।

(৬) **সিন ইউ**—সানসী ও হোনান।

(৭) **চি-ওয়ান**—চেকিয়াং ও এন্‌-হুই।

শিল্প-সমবায়ের অভিযান—শিল্পের ব্যূহ

ইহার মধ্যে কতকগুলি জায়গা জাপ অধিকৃত, কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে, কতকগুলি চীনের অনেক ভিতরে, নিরাপদ স্থানে। তিন এলেকার তিন রকমের প্রতিষ্ঠান। শিল্প-সমবায়ের বাহিনী তিনটি ব্যূহে রচিত। তৃতীয় ব্যূহ হইতেছে অর্থনৈতিক রিয়ার-লাইন বা পশ্চাদ্‌ব্যূহ—জে-চুয়াং, সি-কাং ও ইউনান প্রদেশে। এগুলি সহসা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। এই সব এলেকায় বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিতেছিল অপেক্ষাকৃত বড় বড় শিল্প-সমবায় গড়িয়া তুলিয়া সেগুলিকে সাহায্য করা হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যূহ যুদ্ধের এলেকায়। উত্তরপশ্চিমে কাংসু হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে কোয়াংটুং পর্য্যন্ত এই এলেকা। তবে যুদ্ধক্ষেত্র হইলেও এই এলেকা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তাহা সত্ত্বেও বড় বড় কারখানা খুলিবার জন্য এখানে শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই এলেকায় শিল্প-সমবায়ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, এখানে বড় কারখানা হইতে পারে না, বড় কারখানার কাজও শিল্প-সমবায়কে করিতে হইবে। আর প্রথম ব্যূহ জাপ অধিকৃত এলেকা ও যুদ্ধ এলেকার সম্মুখ ভাগ। এখানে এমন সমবায় গড়া দরকার যেগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট ও একস্থান হইতে উহা সরাইবার উপযোগী। এগুলি চলিবে গেরিলা সৈন্যের মত, স্থান হইতে স্থানান্তরে—শত্রুর পিছনে এগুলি লুক্কায়িত থাকিবে—এগুলি গেরিলা চীনার গেরিলা হাতিয়ার—তাই এগুলির আর এক নাম **গেরিলা সমবায়**। এমনি ধারা ২০০০ শিল্প সমবায় ৩০,০০০ সদস্য ও অগণিত লাখ লাখ কর্মী—এই বিরাট শিল্প-সমবায়বাহিনী আজ সারা চীনে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই শিল্প-সমবায়ের মারফত সব রকমের উৎপাদন চলিতেছে। যন্ত্রপাতি ও লোহার কারখানা, খনি, বয়ন-শিল্প, সেলাই, ঔষধপত্র, খাদ্য, ছুতারের কাজ, যানবাহন ইত্যাদি সব রকম কাজই চলিতেছে।

শিল্প-সমবায়ের মূলধন

১৯৪২ সালের জুন মাসে মোট মূলধন ছিল ২৫,০০০,০০০ চীনা ডলার। ইহার শতকরা ৩৫ ভাগ সরকার প্রদত্ত, ২০ ভাগ শেয়ার হোল্ডার প্রদত্ত মূলধন ও অবশিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত টাকা ও ঋণ।

শিল্প-সমবায় গড়িবার নিয়ম

একটি সমবায় গঠনের জন্য অন্ততঃ সাত জন বা বেশী লোক চাই। একটি পরিকল্পনা ও আয়ব্যয়ের বাজেট তৈয়ার করিয়া ইঁহাদের পাঠাইতে হইবে সেই এলেকার ভারপ্রাপ্ত ডিপোতে। ডিপো তাহা মঞ্জুর করিলে সমবায় সংগঠন ও রেজেষ্ট্রি করেন এবং তাহার কার্য্যে সব রকমের সাহায্য দেন। অনেক সময়ে ডিপো নিজ তহবিল হইতে টাকা দেন, আবার কখনও কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। শেষক্ষেত্রে ডিপো ঐ টাকার জামীন থাকেন। ডিপো ও সমবায়ের মধ্যে সম্পর্ক হইতেছে—সাধারণ তদারক ও পরামর্শ আদান-প্রদান।

চীন-শিল্প সমবায় একটি সরকারী বিভাগ নহে। চীন-শিল্প-সমবায় একটি সরকারী সহযোগিতাপুষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

চীন শিল্প-সমবায়ের অন্যান্য কাজ

শুধু সমবায় গড়িয়া তোলাই চীন শিল্প-সমবায়ের কাজ নয়। চীনের কারিগরেরা যাহাতে স্বাবলম্বী দেশপ্রেমিক নাগরিকরূপে গড়িয়া ওঠে তাহার জন্য চীন-শিল্প-সমবায়ের চেষ্টার অন্ত নাই। ইহার শিক্ষা বিভাগে সাধারণ শিক্ষা, ব্যবসায় পরিচালনা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৪ বৎসরে ৩৯৬২ জনকে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চীন শিল্প-সমবায়ের একটি কল্যাণ বিভাগ আছে। এই বিভাগ হইতে ৫টি হাসপাতাল, ২৩টি ক্লিনিক, ৫টি নার্সারি, ১০টি ক্রেতা-সমবায়, ৮টি হোষ্টেল, ৭টি ভোজনাগার, ৩০টি ক্লাব ও ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

আহত সৈনিকদের কথাও চীন শিল্প-সমবায় ভুলে নাই। তাহাদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা ছাড়া তাহাদের জন্য ১৩০০ সদস্য লইয়া ৫১টি সমবায় গঠিত হইয়াছে।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য দান করা হইতেছে এবং সাথে সাথে তাহাদের কাজ শিখাইয়া তাহাদের জন্যও সমবায় খোলা হইতেছে। **কৃষকেরা** চাষ করে। কিন্তু তাহাদের অনেক সময় কাজ থাকে না; আর শুধু চাষের আয়ে আজকাল সংসার চলে না। তাহাদের অবসর সময়ে কাজের জন্যও সমবায় খোলা হইতেছে। এখন সমবায় আন্দোলনের প্রধান আওয়াজ হইতেছে—"সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ কর উৎপাদন তিনগুণ বাড়াও।"

শিল্পের অভিযান বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই জোরে প্রবরুদ্ধ চীন আজ "দাঁড়া, আপনার পায়ে দাঁড়া"—এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী নেতা মাও-সে তুং ১৯৩৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন,—"আমি চাই, সমবায়ের মারফত চীনে অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া উঠুক।" তাঁহার সেই বাণী সফলতার পথে চলিয়াছে। সাথে সাথে সে-দিন সন্নিকট হইতেছে যে-দিন চীনের চরম আঘাত জাপ সাম্রাজ্যবাদের সৌধ ধূলিসাৎ করিয়া দিবে।

ফ্যাসিষ্টবিরোধী সংগ্রামের প্রথম তীর্থ

(১৩ পৃঃ শেষাংশ)

বিরুদ্ধে স্পেনের মাটিতে যে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম ৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল, সে সংগ্রাম আজ পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর প্রতিক্রিয়াকে হোর প্রভৃতি ঝুনো সাম্রাজ্যবাদীরা আজও যে বেঁচে রাখতে চেষ্টা করছে, সে চেষ্টা সফল হতে পারে না—পারবেও না।

স্পেনের জনগণই আজ এর জবাব দিচ্ছে। **তাই স্পেনে গণতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী।**

লাইন

চটকল মজুরের জীবন-চিত্র

লেখক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জগদ্দল পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে গেল।

কারখানার গেট থেকে বেরিয়ে অফুরন্ত লোকের মিছিল চলেছে কুলিলাইনের দিকে। লক্ষ লক্ষ পায়ে কালো কুয়াশার মত দম আটকানো ধুলো।

ব্যারাকপুর রোডের দুপাশে দৈত্যের মত ইমারত ফুঁড়ে চিমনি উঠেছে। রাস্তা কেটে' কেটে' গেছে মালগাড়ীর লাইন। বালির বস্তা যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে; কখনো ফ্রান্স, কখনো ফিলিপাইনে—কখনো আগুয়ান লাল ফৌজের পাশে।

'এলায়েন্স সাউথ লাইন' ওরফে নয়া বাড়ী।

সুলেমান মিঞার ঘরে উঠি। ছাঁচে ঢালা দু'হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া পায়রার খোপ। আট আনা ভাড়া। এত ভাড়া একজনে দিতে পারে না, তাই ৯ জনে থাকে। একটা মাত্র জানলা; বন্ধ থেকে সেটা কুলুঙ্গির কাজ করে।

এ লাইনে লোক ৫০০। কেউ তাঁত ঘরে, কেউ সেলাইঘরে, কেউ বা মাগীকলে কাজ করে। ভোর হ'তে না হ'তে টাট্টিখানার সামনে মারামারি লেগে যায়। গোসলখানায় পিছলে পা রাখা দায়। তাড়াহুড়ায় হামেশাই মাথা ফাটে। পাকঘরের ঠিক কোল দিয়ে বারোয়ারী পেচ্ছাপখানা। ঝাড়ুদার দিনে একবার আসে। দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়।

মোড়ে একটা ক'রে ঠুলি-পরানো ইলেকট্রিকের আকাশ প্রদীপ। কয়েক পা এগোলেই অন্ধকারে হাতড়াতে হয়। ইয়াকুব বলেঃ দেশে গ্রামঘরে হাজার হ'ক আলো হাওয়া আছে; যার জোতজমি নেই, দেশে তার ঠাঁই হয় না।

চায়ের দোকানে সুখদেও-র সঙ্গে দেখা। মিল-ফেরত কুলির দল বেঞ্চিতে সজোরে ঠ্যাং তুলে সর্দার আর বাবুদের মা থেকে বাপান্ত ক'রছে।

সুখদেও এলায়েন্সের বীমার। ৮।৯ টাকা হপ্তা পায়; ৭।৮ জনের সংসার। আধপেটা খেয়ে ৫ দিনের চালে ৭ দিন চালাতে হয়। তাও ৪ সেরে আধ সের ইঁটের কুচো। পেটের ভেতরটা স্রেফ কংক্রীটে ঠাসা হ'য়ে গেছে।...

দেশ তার উড়িষ্যায়। শ্রাবণ আশ্বিনে ব্রাহ্মণী নদীর দু দুবার বানে ধান আর রবিখন্দ উপ্‌রো-উপ্‌রি ডুবে গেছে। ভাই বার বার যেতে লিখছে। কিন্তু যাবে কি ক'রে? দেনায় মাথা পর্যন্ত বিকোনো! ঘরে যেতে গেলে ভিটেটাও শেষে লাটে ওঠাবে!

ভোর হ'তেই লাইনে লাইনে কাবুলিওলারা ঘোরে। শুক্র, শনি, রবি—আতপুরের নিমতলায় কিম্বা কারখানার গেটে কুলিদের তারা পাকড়াও করে। বুলি তাদের একটাইঃ 'আস্‌লি নেহি মাংতা, সুদ্‌ লাও!' মাসে টাকায় এক আনা সুদ। দশ টাকা নিলে ৪ হপ্তায় ৪ কিস্তিতে দিতে হবে সাড়ে বারো টাকা।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ডান হাতে ন' নম্বর গলি। চাঁচের দেয়াল কাত হ'য়ে পড়েছে। ঘর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে রাস্তার নর্দমা ভেতরে ঢুকেছে। দরোজার বালাই নেই; কুকুর আটকানোর জন্যে ছেঁড়া চটের শুধু পর্দা ঝুলছে। রাস্তা থেকে ঘরের মেঝে ২।৩ ফুট নীচু।

একটু এগোলে কোন্ এক সর্দারের হাল-ফ্যাশানের পাকা বাড়ী। ২।৩ টি গরু আছে। নিজের ২টি মাঠকোঠাও আছে, ভাড়া খাটায়।

সর্দারের হপ্তা ৩৫৲ টাকা। কিন্তু মাসে রোজগার তাদের পাঁচ-ছ'শোর এক আধলাও কম নয়। গঙ্গার ওপারে মিলের বাবুদের এই বাজারেও নতুন কোঠা উঠছে, দোতলা বাড়ী তিনতলা হ'চ্ছে।

মেঘনা মিলের বেনারসী। সর্দারকে ২২৲ টাকা ঘুঁষ দিয়ে বেচারা কাজে ঢুকেছিল। জ্বর গায়ে ২ দিন কামাই হওয়ায় জবাব হয়েছে। কাজ যাবার ভয়ে অনিল জ্বর নিয়ে, রামধনী মাজার ব্যথা নিয়েও কলে যায়। ছুটি চাইলে ঘুঁষ দিতে হবে। লেট হ'লে জবাব।

পাটঘরে পাটের আঁশ গলায় গিয়ে গলা সুড়সুড় করে। যক্ষ্মারুগীদের কাশির সঙ্গে দলা দলা রক্ত বেরোয়। ছুটি চাইলেই তক্ষুনি জবাব। কোম্পানীর দাওয়াই।

অক্ল্যাণ্ড মিলের দক্ষিণে এক গলি দিয়ে আসছি। কমরেড এরশাদ ব'ললো, এলায়েন্সের মেকানিক গোপাল মাঝি কাশছে। শব্দ শুনলাম। পাঁজর ফেটে দমকে দমকে কাশির বেগ উঠছে।

গোপালের যক্ষ্মা হ'য়েছে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। ১২ জনের সংসার এখন অচল হ'য়ে পড়েছে। আতপুর ইস্কুলের সেরা ছাত্র ছিল গোপালের ছোট ভাই কেষ্ট। মিলিটারীতে এখন সে এপ্রেন্টিসের কাজ নিয়েছে।

গোলকধাঁধার মত গলি। মিস্ত্রি হরি চক্কোত্তির ইঁটখসা ভিটেটা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে আজ পার্টিশান হচ্ছে। মুখ দেখাদেখি নেই।

এংলো ইণ্ডিয়া মিল বন্ধ। কয়লা নেই। ১ হাজার মজুর বেকার। অধিকাংশই মেয়ে কামিন। তারা আজ রেললাইনে কিম্বা ইছাপুর ইয়ার্ডে কয়লা কুড়িয়ে ফেরী ক'রে বেচে।

সব মিলেই স্পিনারের বেজায় অভাব অন্য কারখানায় বেশী মাইনায় কাজ পেয়েছে। ফলে ফ্রোলের তাঁতীরা সুতো পায় না। ডবল শিফটে মজুরীর হার কমেছে। এলায়েন্সের মিস্ত্রি আর তেলওয়ালাদের মজুরী শতকরা ২০।৩০ ভাগ ছাঁটাই হয়েছে। মাকু ভাঙলে, বেল্ট ছিঁড়লে কোম্পানী বদল দেয় না। তাঁতীরা নিজেদের গরজে নতুন মাকুর জন্যে ৫৲ টাকা, নতুন বেল্টের জন্যে ১০৲ টাকা সর্দার-বাবুদের খেসারত দেয়। ৩ মাসের বদ্‌লী পাবার জন্যে ১০৲ টাকা ঘুঁষ। ঘুঁষ ছাড়া কথা নেই।

সিদ্দিক মিঞার ৭ খানা রেশন কার্ড; ৩ খানা অর্থাভাবে প'ড়ে আছে। কিস্তিওয়ালা দেনার জন্যে দুবেলা শাসায়।

গেল বছর চট কলের মালিকরা ৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

গাঁ থেকে আসা মেয়ে আস্তে আস্তে আব্রু ভেঙে কলে কাজ নেয়। পেটে খেতে না পেলে ইজ্জত ধুয়ে জল খাবে? সর্দার বাবুদের জুলুমও গা-সওয়া হয়। অন্তঃসত্তা মেয়েদেরও বাবুদের চড়লাথি মুখ বুজে হজম ক'রতে হয়। ডবল শিফটে ঘরে ছেলে ককিয়ে মরলেও দেখার কেউ নেই। পার্ব্বতীয়া বলে, 'বাবু, ছেলেকে দুধ খাওয়াতে কারখানায় ৫ মিনিটের ছুটি পাই না।'

লক্ষ্মীচাঁদ, নাথুনি, বিকাউ, হীরালাল, আবদুল গণি, শ্যামা, মুরারী—প্রত্যেকেরই আজ এই একই ইতিহাস। কারো যক্ষ্মা, কারো কুষ্ঠ। কারো ঘর ভেঙেছে, কারো ঘর ভাঙছে। ক্রুদ্ধ আক্রোশ চিমনির মুখে ধোঁয়ার মত সব উঁচিয়ে ওঠে।

রাস্তায় আগে যে সব বয়সের ছেলেরা খেলা ক'রতো, আজ তারা সবাই হয় মিলিটারীতে বয় হ'য়েছে, কিম্বা ফুকানলীতে কাজ নিয়েছে। পাড়ার ইস্কুল পাঠশালায় মজুরদের পড়ুয়া ছেলে নেই ব'ললেই চলে।

চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে নবীয়ান বিবির দেড় বছরের ছেলে দেখে ডাক্তার বলে, 'দুধের ছেলেকে রেশনের চাল গিলিয়েছ, বাঁচবে কি ক'রে? তাছাড়া আমার কাছে সাল্‌ফার গুইনিডন্ নেই।' ঘরে ঘরে একই অসুখ। মজুররা চটে' গিয়ে বলে, 'একঠো ঢাকোস্‌লা ঠারা করকে রাখা হ্যায়। কুছ ভি দাওয়া নেহি মিল্‌তা, মিল্‌তা স্রেফ পানি।'

অনেক রাত্রে নৈহাটি ফিরছি। রাস্তা খাঁ খাঁ ক'রছে। তাড়িখানার সামনে মাটির অসংখ্য ভাঁড় মুখ উল্টে প'ড়ে আছে। বস্তিতে বস্তিতে শস্তার গাঁজার দোকানেই ভিড় বেশী। গলিতে গলিতে গোপনে জুয়ার আড্ডা চলেছে। রাণ্ডিখানা থেকে ২।৪ জন মাতাল হৈ-হল্লা ক'রে লাইনে ফিরছে।

ঘুমন্ত লাইন। মনে প'ড়ে গেল, মাষ্টার মশাই, এরশাদ আর জগদ্দল ইউনিয়ন অফিসের কথা। এক লক্ষ মজুর এদের ডাকে একদিন উঠে দাঁড়াবে।

সেদিন এই বুভুক্ষা-লাঞ্ছিত লাইন সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের দৃপ্ত জয়যাত্রার রূপ নেবে।

পুস্তক পরিচয়

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ভিয়েনা লেভিন। অনুবাদক—অনিল কুমার সিংহ। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। দাম—২॥০

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ঠিক মত খবর জানবার এতদিন তেমন কোন উপায় ছিল না। এই বিদেশিনী লেখিকা মস্কৌতে এক স্কুলে শিক্ষকতা করে' হাতে কলমে যা শিখেছেন, যা দেখেছেন এ বই হ'ল তারই চমৎকার বিবরণ। তত্ত্ব দিয়ে এর সূত্রপাত হয়নি। এর আরম্ভ বাস্তব জীবন থেকে, কিন্তু যেহেতু সোভিয়েটে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্ম্ম ও তত্ত্বের সমন্বয় ঘটেছে, তাই তত্ত্ব আপনা থেকেই সহজভাবে এসে গেছে তারই মধ্যে দিয়ে।

আশ্চর্য্য হতে হয় কি অদ্ভুত দরদ ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সোভিয়েট সমাজ এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে—এই বই-এর ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় দেখি। ষ্টালিন এক জায়গায় বলেছেন, 'মালি যে ভাবে, যে-দরদ দিয়ে তার বাগান রচনা করে, তেমন ভাবে আমরা নিয়েছি মানুষ গড়ার ব্রত।' কথাটা যে কত-সত্য, এই বই-এ ক্লাশের পড়া, খেলাধূলো, ক্লাসের বাইরের ছাত্রছাত্রীর জীবন—এই সবের খুঁটিনাটি বিবরণ থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকার শিক্ষাকৌলীন্যও এর কাছে হার মানে চেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীনতা ও গভীরতার দিক থেকে। ভারতবর্ষের মত দাসদেশের কথা না তোলাই ভালো। অথচ সোভিয়েট যেখান থেকে শুরু করেছিল তার থেকে আমাদের পার্থক্য বড়জোর উনিশবিশের আর সোভিয়েট সময় পেয়েছে বড়জোর বছর পনেরো।

এই অদ্ভুত রাতারাতি ভোল বদলের মূলে আছে অবশ্য সমাজবিপ্লব। এই সত্যটি অনেক সময় অনেক সত্যকার সোভিয়েট দরদীর চোখও মাঝে মাঝে এড়িয়ে যায়। যদি সমাজব্যবস্থার সবদিককার পিছুটান এভাবে ঝেঁটিয়ে দূর করা না হ'ত তবে বড় জোর সম্ভব হ'ত চারিদিকের কুশিক্ষার অতল সমুদ্রের মধ্যে দু'চারটে আশ্চর্য্য রকম মানব কল্যাণ প্রচেষ্টার দ্বীপ। এই বিপ্লবের পরে ভিত্তি আছে বলেই সোভিয়েট শিক্ষা বিদ্যায়তনের চৌহদ্দীর মধ্যেই আটক নেই—ম্যুজিয়মে আর চিত্রশালায়, চিড়িয়াখানায় আর নাট্যশালায়, সুদূর পথের দুঃসাহসী অভিযানে আর সমাজের হাজারো কাজের মধ্যে তার অবাধ প্রসার। শিক্ষা সোভিয়েটে শুধু ব্যাপক নয় মাথা গুণতি হিসাবে—মনের উৎকর্ষের দিক থেকেও তার গভীরতা অসামান্য। সামাজিক কাজকর্ম্ম, খেলাধুলো, পিতামাতা শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমাগত শেখে আর শেখায়। আর সমাজকে কেন্দ্র করে এর অভিযান বলেই এ-শিক্ষার ফলে আসে না পাণ্ডিত্যাভিমান—দেখা দেয় গভীর সমাজবোধ। অহঙ্কার, স্বার্থবুদ্ধি পুরোণো সমাজের সব কিছু ক্ষুদ্রতার অমোঘ প্রতিবেধক হিসাবে এখানে তারা প্রয়োগ করে নির্ভীক অথচ দরদী আত্ম-সমালোচনার হাতিয়ার। আর এগিয়ে যাবার প্রেরণা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা প্রবর্ত্তন করেছে সোস্যালিষ্ট প্রতি-যোগিতার।

বই-এর তর্জমা সুপাঠ্য। ছাপা ও অঙ্গসৌষ্ঠব চমৎকার। যদিও দু'একটি ছাপার ভুল চোখে পড়ল। এক কথায় এই বই-এর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এটি কাজে লাগবে, ভালও লাগবে।

—চিন্মোহন সেহানবীশ

●

রিভিউ করিবার জন্য বহু পুস্তক, কবিতা ইত্যাদির বই আমাদের কাছে আসিয়াছে। স্থানাভাবে এবার আমরা সব বইএর সমালোচনা দিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। —জঃ সঃ

যে সব বই পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আছেঃ

দাবী—নীরেন্দ্রনাথ রায় ৷৵০। পলিমাটি—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী ভবন ১৲ টাকা। সুরসন্ধান—মিহিরকুমার সেন ।০। ইঙ্গিত—ছায়া-সহচর মণীন্দ্র রায়, পরিচয় প্রেস ।০। পৌত্তলিক—হরপ্রসাদ মিত্র ১৷০। আকাশগঙ্গা নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২।০।

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে। এই কাজ করিয়া কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের কোন নির্দ্দেশ ভঙ্গ করে নাই। কংগ্রেসের কোন নির্দ্দেশ ছিলনা। যে প্রজ্জলিত দাবানল একদিকে জাপানী আক্রমণকারীর পথ খুলিয়া দিতেছিল এবং অন্যদিকে অসহায় দেশবাসীকে পাশবিক অত্যাচারের মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল—সেই দাবানলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া কমিউনিষ্টরা দেশপ্রেমের মহাম্ নির্দ্দেশকেই মান্য করিয়াছে।

মনে রাখা দরকার যে,শ্রীযুক্ত পাতিল ও মিঃ মাসানি কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে যে বিষ উদগারণ করিয়াছেন তার সঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্যনীতির কোন সংস্রব নাই। ১৯৪২ সালে ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে যে সকল "আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী ঘটিতেছিল" তাহার উপর ভরসা করিয়া শ্রীযুক্ত পাতিল ও মিঃ মাসানী হৃদয়ে গোপন আশা পোষণ করিয়াছিলেন। সেই গোপন আশার সঙ্গেই তাঁহাদের বক্তৃতার সম্বন্ধ।

সে যাহাই হউক, কংগ্রেসসেবীরা শ্রমিক কৃষকদিগকে সংগঠিত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কিন্তু এই কাজ যদি শ্রীযুক্ত পাতিল ও মিঃ মাসানীর মনোবৃত্তি লইয়া চলে, যদি বর্ত্তমানের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলিকে (ছাত্রদের ক্ষেত্রে যাহা রহিয়াছে) ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্ত্তে আরও পাল্টা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইবার মনোভাব থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেসের শক্তি বাড়িবে না—কংগ্রেস পঙ্গুই হইবে। এবং ইহার ফলে গণ-সংগঠনগুলির অভ্যন্তরে আরও বিভেদ দেখা দিবে।

কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস

সর্ব্বশেষে ছিল শৃঙ্খলারক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয়, "বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত পদাধিকারে অধিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যরা কংগ্রেসের এ-আই-সি-সির ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে ও প্রচার করিয়াছে।" প্রস্তাবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবহার সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে "এ মতও প্রকাশ করা হইয়াছে" যে, কংগ্রেসসেবীদের উচিত কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোনরূপ রাজনৈতিক যাগাযোগ না রাখা।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পাতিল পুনরায় কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জোরগলায় বিষোদ-গারণ করিতে থাকেন। কমিউনিষ্টরা কি ভাবে এবং কোথায় আগষ্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে শ্রীযুক্ত পাতিল তাহা দেখাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন এখানেও আবার সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। কমিউনিষ্টরা "কংগ্রেসকে পিছন হইতে ছোরা মারিয়াছে।" যখন "আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী" অনুকূলে ছিল, সেই চরম মুহূর্ত্তে কমিউনিষ্টরা শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে দেয় নাই।

কমিউনিষ্টরা যদি কাহাকেও 'ছোরা মারিয়া থাকে", তাহা হইলে ১৯৪২ সালে শ্রীযুক্ত পাতিল ও তাঁহার 'কংগ্রেস সোশালিষ্ট' বন্ধুরা যে 'গোপন আশা পোষণ করিতেন, কমিউনিষ্টরা সেই গোপন আশারই বুকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। এবং এ কাজ তাঁহারা প্রকাশ্যেই করিয়াছেন।

কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত পদ হইতে অপসারণ করিয়া তাহাদের 'সমাজচ্যুত' করিবার সিদ্ধান্ত বোম্বাই সম্মেলনকে শ্রীযুক্ত পাতিল আজ গ্রহণ করাইতে সফল হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। কংগ্রেসসেবীগণের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তধারণা এখনও প্রবল। কিন্তু তাঁহারা আমাদিকে কংগ্রেস-সেবীদের সঙ্গে একযোগে এবং কংগ্রেসের স্বপক্ষে কাজ করিতে বাধা দিতে পারেন না। যে-নীতির জন্য আমরা আজ সংগ্রাম করিতেছি সেই নীতিই জনগণকে ঐক্য ও জয়ের পথে পরিচালনা করিবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, একত্রে কাজ, সম অভিজ্ঞতা ও আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা কংগ্রেস অনুগামী জনসংঘকে একথা বুঝাইতে সমর্থ হইব। স্বাধীনতা অর্জনের চরম প্রচেষ্টায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসসেবী, লীগসেবী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে যে দেশপ্রেমিক ঐক্যের প্রয়োজন, তাহা আমরা গড়িয়া তুলিব—নিঃসংশয়ে আমরা ইহা বিশ্বাস করি।

Regd. No. C. [illegible]

★ ★ বিধ্বস্ত বাংলাকে আবার গড়িতেছে ★ ★

মাঠের কৃষক

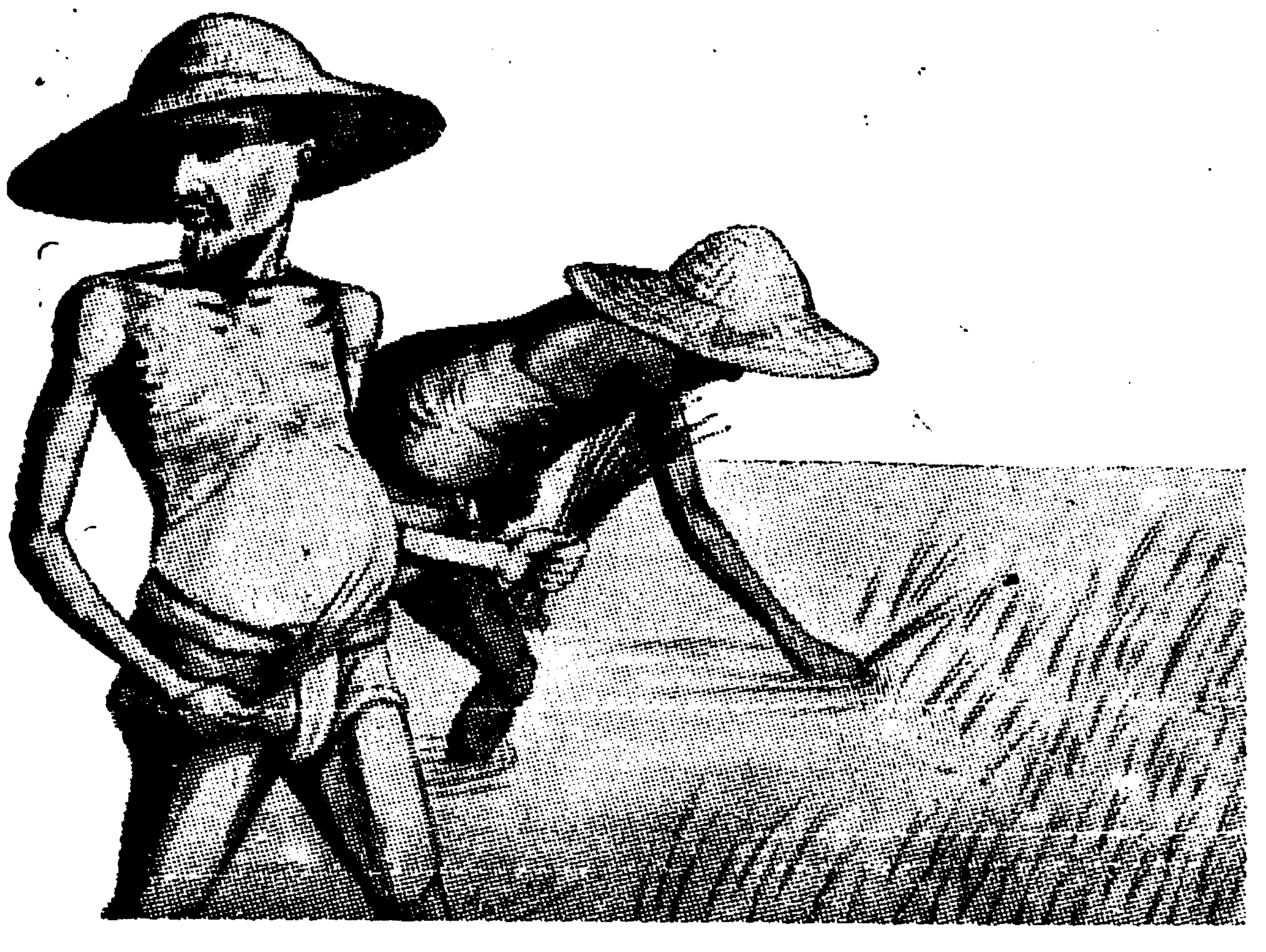

কারখানার মজুর

★

কারখানার শ্রমিক দিন-রাত মেহনত করিয়া যুদ্ধের মাল আর মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে দৃঢ় ব্রত লইয়াছে।

★

মাঠে মাঠে বাংলার কৃষকরাই নিরলস পরিশ্রমে বেশী ফসল ফলাইতে বদ্ধপরিকর—বাংলার মানুষকে তাহারা আহার জোগাইবেই।

★

সোনার বাংলাকে বাঁচাও

বাংলা দেশে এখনও লাখ লাখ দুঃস্থ নরনারী আশ্রয়-সম্বলহীন অবস্থায় রহিয়াছে। অথচ আমলাতন্ত্র উদাসীন। আমলাতন্ত্র নাকি অনেক 'বিশেষ কর্ম্মচারী' নিযুক্ত করিয়াছে একটি পরিকল্পনা তৈয়ারী করার জন্য। কিন্তু এই পরিকল্পনা কবে তৈয়ারী হইবে তাহার হদিস নাই।

অন্যদিকে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলার ২ কোটি লোক আজ রোগগ্রস্ত। কলিকাতার পূর্ব্বপ্রান্তে ম্যালেরিয়া আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথচ, প্রত্যেক স্থানেই ঔষধ ও ডাক্তারের অভাব, রোগীরা উপযুক্ত পথ্য পায় না। 'বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিতেছে' এ কথা বলিয়াই লাটসাহেব নিজের দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন।

এই অবস্থায় দেশের দুইটি বৃহত্তম দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য ছিল এই রোগপ্রতিরোধে ও ৬২ লাখ দুঃস্থ নরনারীকে স্বাভাবিক জীবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব মিলিতভাবে গ্রহণ করা। কংগ্রেস-লীগের মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই আর্ত্ত নরনারীর দুঃখ ঘুচিতে পারে না।

কিন্তু, কংগ্রেস কর্মীরা কংগ্রেস পুনর্গঠনের জন্য সম্মেলন করিতেছেন। কংগ্রেস নেতাদের উচিত ছিল সেই সব সম্মেলন হইতে কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান জানান 'তোমরা তোমাদের এলাকায় আর্ত্ত-নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য লীগসেবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হও।' কিন্তু সে আহ্বান জানান হয় নাই। বরং অনেকক্ষেত্রেই লীগ-বিরোধী বক্তৃতায় সম্মেলনের আবহাওয়া দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেস নেতারা তাহা দমন করিতে পারেন নাই।

লীগও তেমনি বিভেদের পথেই চলিয়াছে। 'আজাদের' স্তম্ভে স্তম্ভে প্রায় প্রতিদিনই দেখিতে পাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার। কংগ্রেসসেবীদের সঙ্গে মিলিতভাবে অগণিত দুঃস্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার কোন নির্দ্দেশই লীগসেবীদের নিকট দেওয়া হয় না।

বিভেদকারীরা মহাউল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। 'কংগ্রেস সোসালিষ্ট' 'ফরওয়ার্ড ব্লক' ও 'আর, এস্, পি' পন্থীরা কংগ্রেসসেবীদের প্ররোচনা দিতেছে—'লীগ পন্থীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখিও না,

লেখক : খোকা রায়

ইহারা দেশের শত্রু, ইহারা স্বাধীনতা চায় না।' হিন্দুমহাসভা পন্থীরা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে "মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিওনা। লীগ দেশের শত্রু। ইহাদের জাহান্নামে পাঠাও।" লীগের ভিতরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ মুসলমান জনতার নিকট প্রচার করিতেছে "কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস হিন্দুরাজত্ব চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিও না।"

এই সব বিভিন্ন বিভেদকারী শক্তি আজ সারা দেশময় অনৈক্যের আগুন ছড়াইতেছে।

তবে আশার আলোকও নিভিয়া যায় নাই। এখনও স্থানে স্থানে আর্ত্তের সেবায় দেশসেবকদের মিলিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। এখনও বেঙ্গল মেডিকেল কোঅর্ডিনেশন কমিটির ভিতর বিভিন্ন দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত। এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানের মিলনকেন্দ্র 'নারীসেবা সংঘ' সমাজ জীবন পুনর্গঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু ইহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ আর সমস্যাও আজ বিরাট ও দেশজোড়া। দেশজোড়া এই দুর্যোগে নিষ্পেষিত হইতেছে বাংলার গরীব জনসাধারণ যাহারা কংগ্রেসের শক্তির উৎস। এই দুর্যোগে নিপীড়িত হইতেছে বাংলার অগণিত মুসলমান যাহারা লীগের ভিত্তি। দুর্যোগ আজ উভয়েরই। এবং উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাই এই দুর্যোগকে প্রতিরোধ করিতে পারে। কাজেই, বাংলার কংগ্রেস ও লীগের কর্ত্তব্য আজ তাহাদের অনুগামীদের এই নির্দ্দেশ দেওয়া যে তাঁহারা যেন প্রতি এলাকায়, প্রতি স্থানে মহামারী প্রতিরোধে, সমাজপুনর্গঠনে ও আর্ত্তের সেবায় মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। প্রত্যেক স্থানের কংগ্রেসসেবী ও লীগসেবীদের কর্ত্তব্য নিজেদের ভিতর বোঝাপড়া করিয়া জনগণের দুর্দ্দশা মোচনে মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া। বাংলার কংগ্রেস ও লীগ যদি এই ভাবে তাহাদের নিজ নিজ সংগঠনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে—তাহা হইলেই উভয় প্রতিষ্ঠানই শক্তিশালী হইবে, জনগণের দুঃখেরও লাঘব হইবে। এই পথে না চলিলে আত্মকলহ ও বিভেদ সোনার বাংলাকে ধ্বংসের ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবে।

ঘরের মেয়ে

মধ্য কলিকাতা আত্মরক্ষা সমিতির কুটীর-শিল্প কেন্দ্রে মেয়েরা জামা, ব্লাউজ ইত্যাদি নানাবিধ সেলাই ও এমব্রয়ডারীর কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকানির্বাহ করিতেছেন।

কলিকাতা জেলা আত্মরক্ষা সমিতির কাগজ তৈরীর কেন্দ্রে মেয়েরা কাজ করিতেছেন। কাগজ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এখানে দেখান হইয়াছে। এই সব মেয়ে একেবারে নিঃসম্বল দুঃস্থে পরিণত হইয়াছিলেন, আজ জীবিকা অর্জ্জনের পথ পাইয়াছেন।

আমাদের বাংলা পুস্তকাবলী

১। **পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি।** মূল লেখক—ফ্রিড্রিশ এঙ্গেল্স্। প্রামাণিক অনুবাদ—রেবতী বর্ম্মণ ২॥০

২। **সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট্ (বল্শেভিক) পার্টির ইতিহাস** প্রামাণিক অনুবাদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৷০

৩। **সমাজতন্ত্রবাদ—কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক।** মূল লেখক—ফ্রিড্রিশ এঙ্গেল্স্ প্রামাণিক অনুবাদ—রেবতী বর্ম্মণ ৸৵০

৪। **গ্রামের গরীবদেরপ্রতি** (লেনিন) অনুবাদ—বিভুতি গুহ ও অরুণ মিত্র ১৲

৫। **জাপানের আসল রূপ** (জ্যাক-চেন্) অনুবাদ—সুধাংশু দাশগুপ্ত ৸৵০

৬। **রামধনু** (ষ্টালিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস) লেখিকা—ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা, অনুবাদ—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲

৭। **পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য** ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী ৸০

৮। **ইতিহাসের ধারা** (ঐতিহাসিক বস্তুবাদ) লেখক—অমিত সেন ১৲

৯। **বিপ্লবী চীন** (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) লেখক—সুধাংশু দাশগুপ্ত ১৲

১০। **যৌন-সমস্যায় লেনিনের মতামত** ৵০

১১। **সোভিয়েটের গল্প-সংগ্রহ**—শলোখভ, ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের গল্পের অনুবাদ ১৲

১২। **কংগ্রেস-লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও** (পি-সি জোশীর লেখা) ।০

১৩। **সোভিয়েট নেতা : ষ্টালিন,** মলোটভ, ভরোশিলভ ও টিমোশিঙ্কোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।/০

কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা ও মার্কসীয় অর্থনীতি—যন্ত্রস্থ।

১২নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট

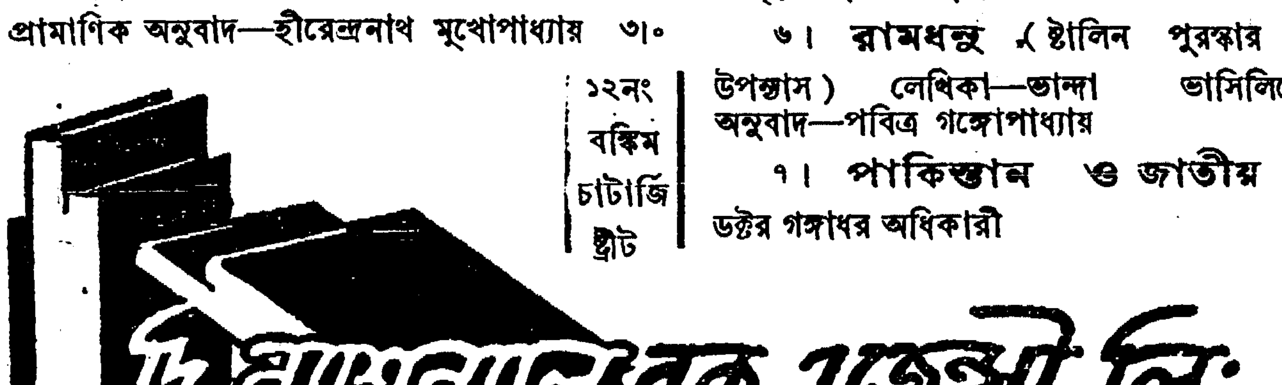

কলিকাতা

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা] ১৫ই নবেম্বর, '৪৪, বুধবার, ২৯শে কার্ত্তিক, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নাজী মতবাদ চূর্ণ

সকল জাতির সাম্য ও বন্ধুত্বই সোভিয়েটের মূলশক্তি

দুনিয়ার জনগণের কাছে ষ্টালিনের বাণী

"সোভিয়েটের স্বদেশপ্রেমের শক্তির উৎস বিভিন্ন জাতিগত সংস্কার নয়। রুশ জনসাধারণের মাতৃভূমির প্রতি অবিচলিত অনুরাগ এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের সহযোগিতার উপর এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন দেশের সকল জাতির লোকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে। এদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকেরা দেশের বাহিরের লোকদের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাহারা সকল সময়েই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রী ও শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার আগ্রহ দেখাইয়াছে। সকল স্বাধীনতা-প্রিয় দেশসমূহের সহিত আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান মৈত্রীর ইহাই কারণ।

জার্ম্মানরা বিদেশী বলিয়া রুশরা যে তাহাদের ঘৃণা করে, তাহা নয়। জার্ম্মানরা আমাদের এবং সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিকে অসীম দুঃখ দিয়াছে বলিয়াই রুশরা তাহাদের ঘৃণা করে।

জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টরা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের যে অস্ত্র বাছিয়া লইয়াছে মানবসমাজের প্রতি ঘৃণাই তাহার মূল কথা। তাহারা মনে করিয়াছিল যে এইভাবে জাতীয়তা প্রচারের ফলে যে নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উৎপত্তি হইবে তাহার ফলে জার্ম্মান আক্রমণকারীরা অধিকৃত-দেশের অধিবাসীদের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে। কিন্তু হিটলারপন্থীদের এই নীতিই আজ জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই হিটলারপন্থীদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, বেলজিয়াম, ইতালী, নরওয়ে এবং হল্যাণ্ডের জনসাধারণ দৈবাৎ জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে নাই। হিটলারের এক কালের তাঁবেদার ইতালী, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং বুলগেরিয়ার অধিবাসীরাও ঠিক ইহাই করিয়াছে। হিটলারপন্থীরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া যে চক্রান্ত করিয়াছিল তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং জার্ম্মান জাতি পৃথিবীর ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মানদের কেবল সামরিক পরাজয় হয় নাই, রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়ও হইয়াছে। আমাদের দেশে সকল জাতির সম্বন্ধে সাম্য ও বন্ধুত্বের যে ভাব পোষণ করা হয়, তাহাই বর্ব্বরোচিত জাতীয়তা এবং জাতি বিদ্বেষের উপর জয়ী হইয়াছে।"

(১৯৪৪ নভেম্বর বিপ্লব দিবস বক্তৃতা হইতে)

পররাজ্য আক্রমণকারী জাতিগুলিকে পাহারায় রাখিতে হইবে

ভবিষ্যত শান্তিব্যবস্থা সম্পর্কে ষ্টালিন

"জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া ঐতিহাসিক কীর্ত্তি হইলেও উহাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী শান্তি এবং জনসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যুদ্ধে জয়লাভ করাই আমাদের কাজ নয়, চিরকালের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা যদি সম্ভব নাও হয়, তাহা হইলে দীর্ঘকালের জন্য উহা বন্ধ করাই আমাদের কাজ। অবশ্য যুদ্ধের পর জার্ম্মানীকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ভাবে অকর্ম্মণ্য করা হইবে। অনেক সরলচিত্ত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে ইহার পর জার্ম্মানী আর শক্তি লাভ অথবা নূতন করিয়া পররাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিবে না। কিন্তু জার্ম্মাণীর শাসকরা ইতিমধ্যেই নূতন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে জার্ম্মানীর আবার ক্ষমতা লাভের পক্ষে বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর সময় যথেষ্ট। জার্ম্মানী পররাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিলে প্রথমেই তাহার কণ্ঠরোধের জন্য আমরা কিরূপ ব্যবস্থা করিব? ইতিহাসে দেখা যায় আক্রমণপ্রিয় জাতিরা শান্তিপ্রিয় জাতির তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে নূতন করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধে আক্রমণকারী দেশগুলিই প্রথমে সমরায়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

পার্ল হারবারের ঘটনা, ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপ দখল এবং হংকং ও সিঙ্গাপুরের পতনের ন্যায় ঘটনা আকস্মিক বলা যায় না। গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকা শান্তির নীতি অনুসরণ করিতেছিল এবং আক্রমণকারী দেশ হিসাবে জাপান যুদ্ধের জন্য অধিকতর প্রস্তুত ছিল। জার্ম্মানীও যুদ্ধের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া প্রথম বৎসরে যেভাবে উক্রাইন দখল করিয়াছিল তাহাও আমরা ভুলিতে পারি না। এই অবস্থায় শান্তিপ্রিয় জাতিগুলি যদি পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ বন্ধের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা আবার একদিন অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইতে পারেন।

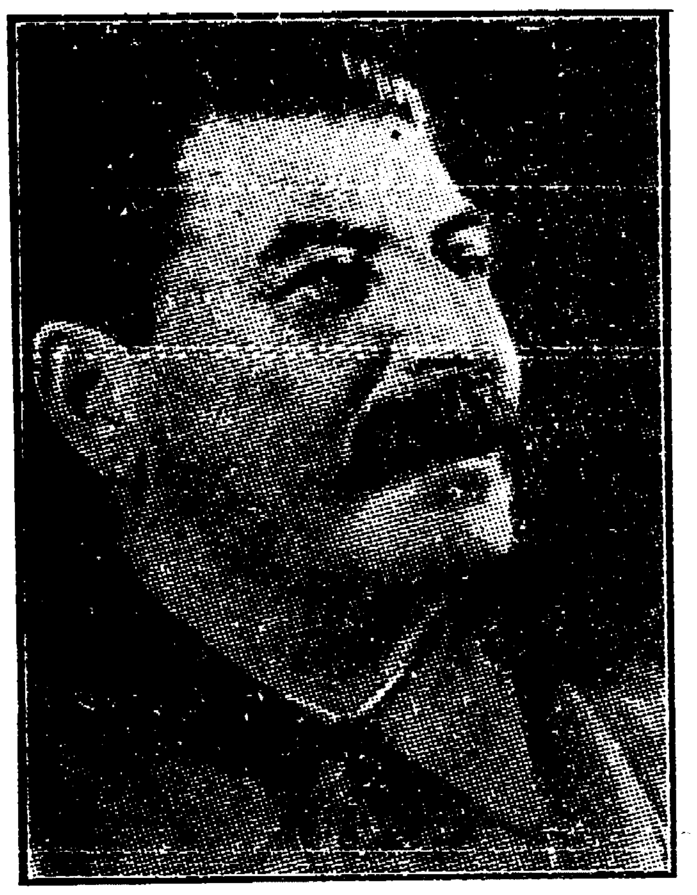

পররাজ্য-আক্রমণকারী জাতিগুলিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা ছাড়া আমাদের জগতের শান্তিরক্ষার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালকদের হাতে আক্রমণকারী জাতিগুলিকে নিরস্ত্র করিবার উপযোগী ন্যূনতম সশস্ত্র সৈন্যদল থাকিবে এবং তাঁহারা যাহাতে প্রয়োজন হইলে অবিলম্বে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতি-সঙ্ঘের পরিতাপকর স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করিলে চলিবে না। কারণ, উহার আক্রমণ রোধের অধিকারও ছিল না, উপায়ও ছিল না। এই বিশেষ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে শান্তি রক্ষা ও আক্রমণের প্রতিরোধের সকল ক্ষমতা দিতে হইবে। বড় বড় যে রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের গুরুভার বহন করিয়াছেন তাঁহারাই এই সকল বিষয় ব্যবস্থা করিবেন।"

(১৯৪৪ নভেম্বর দিবস বক্তৃতা হইতে)

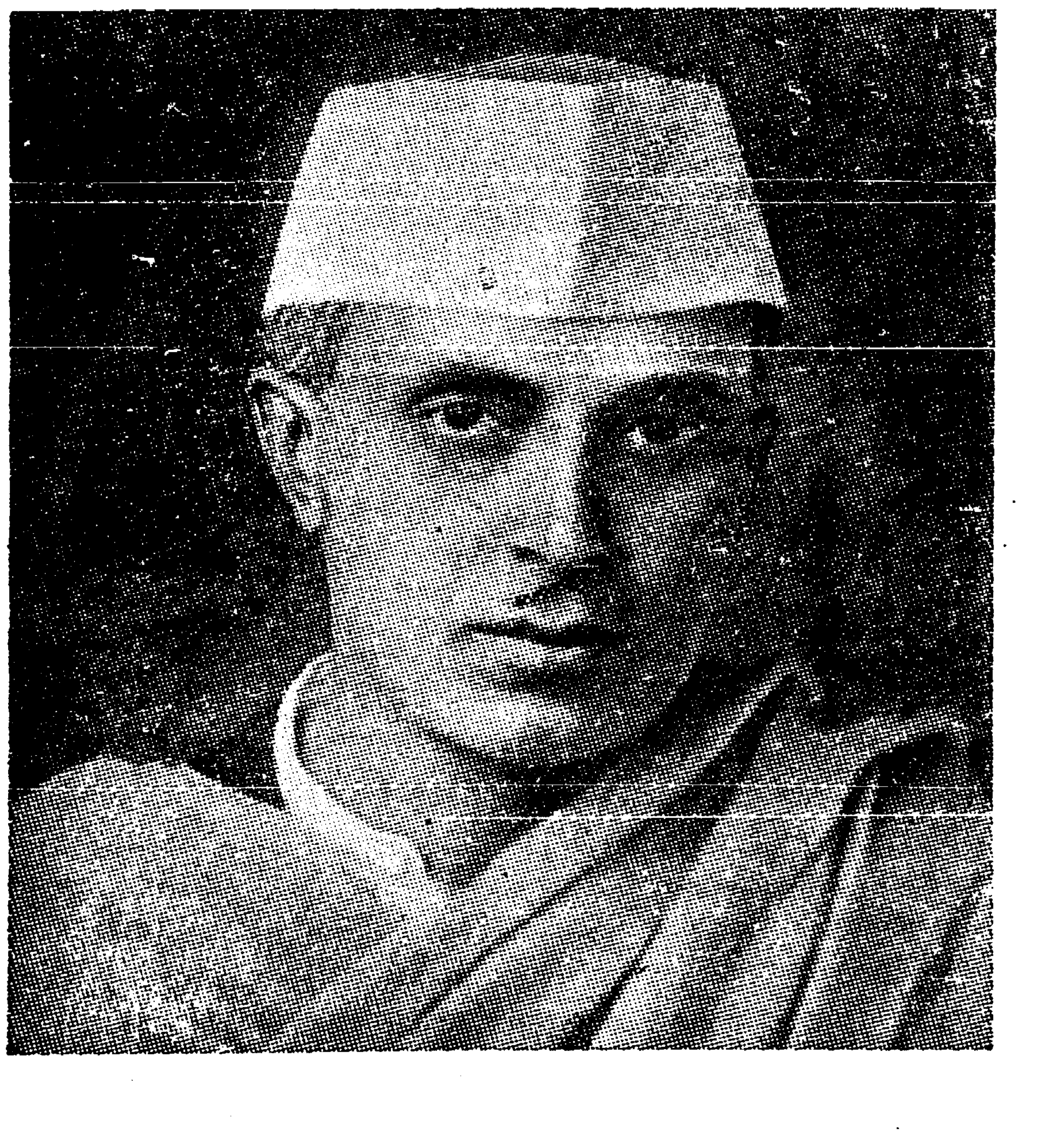

নেহ্রুর জন্মদিনে

"জওহরলাল নেহরুর ৫৫ তম জন্মদিনে আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাঁহার মুক্তির জন্য আমরা আরও কঠোর সংগ্রাম করিতে থাকিব। পৃথিবীর গণতন্ত্রের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া চলিবার শিক্ষা তিনিই কংগ্রেসকে দিয়াছিলেন। দুনিয়াব্যাপী গণতান্ত্রিক শিবিরের ইতিহাস এখন আবার পর্য্যালোচনা করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে কংগ্রেস-নীতিকে সম্পূর্ণরূপে মোড় ঘুরাইয়া দিবার সময় আজ আসিয়াছে—১৯৩০ সালে তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস-নীতিতে যেরূপ চূড়ান্ত পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, আজও তেমনি চূড়ান্ত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সাধুতা ও সততায় উজ্জ্বল, তাঁহার দেশভক্তি নিঃস্বার্থতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার উপর আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে।"

—পি, সি, জোশী

জেনারেল সেক্রেটারী, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

সম্পাদকীয়-

গান্ধীজির প্রতি আবেদন

"গান্ধীজীর উপবাসের প্রস্তাবে দেশবাসীর মনে যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, আমরা, কমিউনিষ্টরাও তাহার সমভাগী। এই উপবাসে জাতির চৈতন্য উদ্দীপ্ত হইবে না। বরং ইহার ফলে হতাশার শোচনীয় মনোভাব শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। আজ এই দুঃসময়ে জাতি তাহার শ্রেষ্ঠ নেতার কাছ হইতে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দাবী করে। কিন্তু এ সময় তাঁহার উপবাসে দেশবাসীর অবস্থা হইবে এক করুণ পরিণতির সম্মুখে অসহায় দর্শকের মত।

আমাদের জাতীয় জীবন আজ গান্ধীজীর নেতৃত্বের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছে। গান্ধীজী যাহাতে আত্মবলিদানের পথ হইতে নিবৃত্ত হন, তাহার জন্য সমগ্র জাতি সকাতরে অনুনয় জানাইতেছে।

গান্ধীজীর কাছে আমার আবেদন, তিনি কংগ্রেসপন্থী পত্রিকাগুলির দিকে একবার দৃক্‌পাত করুন এবং তিনি কংগ্রেসসেবীদের সম্মেলনে যাহা ঘটিয়াছে তাহার ভিতরকার তথ্যগুলি অনুসন্ধান করুন। এই সমস্ত সম্মেলনে মিঃ জিন্নাকে বৃটীশের দালাল বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে এবং লীগকে ধ্বংস করা অথবা লীগকে পরিহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনির পথই প্রশস্ত হইতেছে। গান্ধীজী ছাড়া আর কে এই অবস্থার গতিরোধ করিতে পারে? কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা যেমন বিরাট, তেমনি কঠিন কাজ। ইহার জন্য অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও অশেষ নিষ্ঠার প্রয়োজন। স্বয়ং গান্ধীজী ছাড়া একাজ আর কাহার দ্বারাইবা সুসম্পন্ন হইতে পারে?

তাছাড়া, কারামুক্ত কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে অধিকাংশই খাদ্য আন্দোলন হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন; গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা বনাম অসহযোগিতা—এই জটিল প্রশ্নের পাকে তাঁহারা আটকাইয়া আছেন।

মানুষ যখন উপবাসী, তখন তাঁহাদের এই নিশ্চেষ্টতায় দেশভক্তদের মন যে শুধু মুষড়াইয়া পড়ে, তাহাই নয়, এই নিশ্চেষ্টতা দেশবাসীকে বিদেশী আমলাতন্ত্র ও দেশী মুনাফাখোর ও মজুতদারের হাতে ঠেলিয়া দিতেছে। আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, গান্ধীজী যদি অর্দ্ধবুভুক্ষু এবং মহামারী কবলিত বিহার, বাংলা ও কেরালায় যাইতেন, তাহা হইলে তিনি দেশের ভিতরকার অবস্থা চাক্ষুষ দেখিতে পারিতেন; তিনি দেখিতেন, কিভাবে বিভিন্ন পার্টির অনুবর্ত্তী দেশপ্রেমিক জনগণের মনোবল দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে—এবং তাহা হইলে মজুতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশবাসীর মুখে অন্ন দিবার কাজে ও দুঃস্থদের সাহায্যে সম্মিলিত আন্দোলনের জন্য মর্ম্মস্পর্শী আবেদন গান্ধীজীর মুখ হইতে নিনাদিত হইত।

গান্ধীজীর জীবনে আমাদের সকলের অধিকার। আমাদের জাতীয় জীবনে যে মিথ্যা ও অসত্য ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে গান্ধীজী তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করুন এবং খাদ্যাভাব ও মহামারীর বিরুদ্ধে সকল দলের দেশপ্রেমিক অভিযানের তিনি নায়কতা করুন—আমাদের পার্টি গান্ধীজীর কাছে ইহাই চায়। ভাঙন রুখিতে হইলে এবং আমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পথ।"

—পি, সি, জোশী

ভারতের জন্য নূতন দাসত্ব-শৃঙ্খল---

ক্রীপস্-কুপল্যাণ্ডের ভারত বিভাগ-- —সাম্রাজ্যবাদের অভিনব ষড়যন্ত্র

লেখক : ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী

"পৃথিবীব্যাপী যৌথ শান্তি-ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধ যদি সফলভাবে দমিত না হয় এবং আগামী দিনে পৃথিবীর কোনো খানে যুদ্ধ-বিগ্রহ যদি সম্ভব হয়, তবে স্পষ্টই বলা যায় যে, বিভক্ত ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ অসম্ভব নয়।"

স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে, কোন ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী—যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লওয়া মানে ভবিষ্যৎ ভারতে গৃহযুদ্ধ বাধান—তিনিই এই কথা বলিয়াছেন! কিন্তু বস্তুত এই কথা বলিয়াছেন কোন জাতীয়তাবাদী নয়, গোঁড়া রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী অধ্যাপক রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড।

যখন আমরা দেশভক্তরা নিজেদের মধ্যে পাকিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন সাধারণত ঐক্য অথবা ব্যবচ্ছেদ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই পাকিস্তানের বিচার করি। আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, স্বাধীন ভারতে কি সম্পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রদেশের একটি কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্র হইবে, না ভারত দুই বা তদধিক স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হইবে?

পরস্পরের প্রতি দোষারোপ

আমাদের নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে মুখর হইয়া উঠিয়া আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, এখনও এই দেশে এক তৃতীয় পক্ষ কর্তৃত্ব করিতেছে এবং তাহাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের নিজস্ব পরিকল্পনাও রহিয়াছে। লিনলিথগো কয়েকবার ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা বলিলেন। তারপর ক্রীপস্ সাহেব তাঁহার পরিকল্পনায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এখন আবার প্রফেসর কুপল্যাণ্ড বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভারতকে বিভক্ত করিলে গৃহযুদ্ধ বাধিবে।

কখনও কখনও আমাদের দেশবাসীরা পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদেরশাসকশ্রেণীর এই অবাস্তব দোদুল্যচিত্ততা ও কৃত্রিম পক্ষপাতশূন্যতা দ্বারা প্রতারিত হন। প্রায়ই পাকিস্তান সম্বন্ধে আলোচনায় পাকিস্তানের পক্ষে ও বিপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কথার নজির টানা হয়। কিন্তু এই মূল সত্যটাই আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই সমস্যা সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদের নিজের সুনির্দ্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও সমাধান আছে।

আসল প্রশ্ন

গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতার পর সমস্ত দেশে পাকিস্তানের পক্ষে বা বিপক্ষে এমন তীব্র মতভেদ গড়িয়া উঠিল, যা অতীতে কখনও ছিল না। উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হইল ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকিবে, না বিভক্ত হইবে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের যুক্তিগুলি সুপরিচিত। কংগ্রেসকর্ম্মীরা বলেন, গান্ধীজি ভারতীয় ঐক্যের নীতি অটল ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, চূড়ান্ত ব্যবচ্ছেদের জন্য জিন্না সাহেবের একগুঁয়েমীর ফলেই আলোচনা ব্যর্থ হইল। লীগ কর্ম্মীরা বলেন, জিন্নাসাহেব মুসলমানদের নিজেদের বাসভূমিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার দাবীতে অটল ছিলেন, মুসলমানদের এই অধিকারকে যুক্ত জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তি করিতে গান্ধীজির অস্বীকৃতিই আলোচনার ব্যর্থতার কারণ।

পরস্পরের প্রতি দোষারোপের উত্তেজনায় আমরা এই সহজ সত্য কথাটি ভুলিয়া যাই যে, দেশের সামনে সত্যকার প্রশ্ন একরাষ্ট্রের মধ্যে ভারতকে বিভক্ত করা নয়। ইহা একই সমস্যারই দুইটি দিক এবং সেই সমস্যা হইতেছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনের সমস্যা। আসল প্রশ্ন হইল : আমরা জনসাধারণের স্বার্থে এই সমস্যার এমন সমাধান করিতে পারিব কি—যে-সমাধান স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস ও লীগের যুক্তফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিবে? না, আমাদের বিফলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপরে তাহার নিজের মতলবই হাঁসিল করিবে?

কুপল্যাণ্ড কে ও কেন?

অনেক দেশভক্ত ভাবেন—কংগ্রেস-লীগ আপোষ না হওয়া দুঃখের কথা বটে, কিন্তু যদি নিতান্তই আপোষ না হয় তাহাতেই বা বর্ত্তমান অবস্থার এমন কি ব্যতিক্রম হইবে? তাঁহারা মনে করেন যে, আপোষ না হইলেও অবস্থা অন্তত এখনকার মতই থাকিবে এবং জাতীয় আন্দোলন মারফৎ দেশবাসী আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবে। কেহ কেহ এরূপও ভাবিয়া থাকেন যে, আপোষ না হইলেও যুদ্ধের পর কোন-না-কোন রকমের শাসনসংস্কার নিশ্চয়ই হইবে এবং তাহাতে খুব বেশী সুবিধা পাওয়া না গেলেও এখনকার অপেক্ষা কিছু বেশী অধিকার নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। তাহাই বা মন্দ কি?

কংগ্রেস-লীগ আপোষ না হইলে ভারতের ভাগ্যে কি ধরণের শাসনশৃঙ্খল আঁটিয়া বসিবে—ক্রিপ্স্ সাহেবের প্রস্তাব হইতেই তাহার আঁচ পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক রেজিন্যাল্ড কুপল্যাণ্ড এই প্রস্তাবকেই আরও আধুনিক ও মারাত্মকভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।

১৯৪২ সালে কুপল্যাণ্ড যখন ভারতে আসেন তখন রটনা করা হইয়াছিল যে তিনি অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মাত্র, শুধু শাসনতান্ত্রিক বিদ্যানুশীলনের খাতিরেই নাকি তিনি অনুসন্ধান চালাইতেছেন। কিন্তু এখন প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁহার অনুসন্ধান। অনেকে মনে করেন স্বয়ং চার্চিল সাহেবই তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদ যে কমিশন বসাইয়াছিল কুপল্যাণ্ড সাহেব তাহার সভ্য ছিলেন। সেই কমিশনেও তিনি এমন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যাহাতে ইহুদী-আরব বিদ্বেষ চিরকাল জীয়াইয়া রাখা যায় এবং প্যালেষ্টাইনকে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় যাহাতে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ চিরকাল বজায় থাকে।

এবার তিনি ভারত সম্বন্ধে "অনুসন্ধান" করিয়া ৭০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী যে 'মহাভারত' রচনা করিয়াছেন তাহার আসল উদ্দেশ্য হইল—১৯৪২এর চার্চিল ঘোষণাবাণী ও ক্রিপস প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের শাসনতান্ত্রিক খসড়া তৈয়ার করা। ভারতকে চিরকালের জন্য নানাভাবে ভাগ করিয়া ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িয়া তুলিতে না পারিলে ভারতের ভাগ্যে এই কঠিনতর দাসত্বই অবশ্যম্ভাবী।

ভবিষ্যৎ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের ভিত্তি রচনার জন্য যদি এখনই আমরা আমাদের গঠনতন্ত্র রচনায় ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী না হই, তবে নূতন এক সাম্রাজ্যবাদী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আমাদের উপর চাপিয়া বসিবে। ১৯৩২-৩৪ সালে হিন্দুমুসলীম অনৈক্যের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চাপাইয়া দেয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এই বাঁটোয়ারার ফলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবীর প্রতি ন্যায় বিচার করা হইয়াছে। অবশ্য যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই বাঁটোয়ারায় সেখানে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার আইনসঙ্গত অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচনের ক্ষমতাও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার এই একই অজুহাতে ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্র প্রদেশে ও কেন্দ্রে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়াছে।

এই গঠনতন্ত্রে 'ইউরোপীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে' যে সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাদের সত্যিকারের সংখ্যার তুলনায় দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে তাহাদের একচেটিয়া মূলধনের আধিপত্যের হিসাবে এবং এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রে বৃটিশ ও দেশীয় রাজাদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ইহাই হইতেছে স্বরূপ।

নূতন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

এইবার যে নূতন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আসিতেছে তাহা আরও ক্ষতিকর। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুক্তিকামী প্রগতিশীল জনসাধারণ আগাইয়া আসিতেছে। ফ্রান্স, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, বলকান প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে সেখানেই তাহারা সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের হাত হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছে।

এখনই যদি আমরা জাতীয় সরকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎও আমরা এই পথে রচনা করিতে পারিব, বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনে আমরাও আমাদের স্বাধীন গঠনতন্ত্র রচনার চূড়ান্ত সুযোগ পাইব।

কিন্তু এই পথে যদি আমরা অগ্রসর হইতে না পারি তবে সাম্রাজ্যবাদ তাহার নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক গঠনতন্ত্র আমাদের উপর চাপাইয়া দিবে এবং তাহা হইবে পরাধীন ও বিচ্ছিন্ন ভারতের গঠনতন্ত্র। আমাদের উপর চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ক্রীপ্স ও কুপল্যাণ্ড সাহেব ইতিমধ্যেই এক গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা করিয়াছেন। এই গঠনতন্ত্র আমাদের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি বিদ্রূপ ও পাকিস্তানের প্রহসন মাত্র।

ক্রীপ্স্ পরিকল্পনা

ক্রীপ্স্ সাহেব তাঁহার ঘোষণায় কংগ্রেসকে বলিয়াছেন : তোমরা স্বাধীনতা ও গণপরিষদ চাও। আমার পরিকল্পনায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুদ্ধের পরে প্রত্যেক প্রদেশে নূতন করিয়া নির্ব্বাচন হইবে এবং এইভাবে নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি একটি নির্ব্বাচক-মণ্ডলী নির্ব্বাচিত করিবে এবং এই নির্ব্বাচক-মণ্ডলীই গঠনতন্ত্র-রচনা-পরিষদ নির্ব্বাচিত করিবে। এই নির্ব্বাচিত গঠনতন্ত্র রচনা-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকিবেন এবং ইঁহারা সকলে মিলিয়া যে গঠনতন্ত্র রচনা করিবেন তাহাই হইবে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে চুক্তির ভিত্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েল্থের সমান অধিকারসম্পন্ন সভ্যের অধিকার পাইবে। ইচ্ছা করিলে ভারত কমনওয়েল্থ হইতে বিচ্ছিন্নও হইতে পারে।

ক্রীপ্স্ সাহেব তাঁহার পরিকল্পনায় এই স্বাধীনতা ও গঠনপরিষদই আমাদের দিতে চাহিয়াছিলেন।

ক্রীপ্স্ সাহেব মুসলিম লীগকে বলিয়াছেন : গণপরিষদের প্রস্তাব তোমাদের মনঃপূত নয় কারণ, তোমাদের আশঙ্কা আছে যে এই গণপরিষদ দ্বারা গঠিত গঠনতন্ত্রে হিন্দু আধিপত্য থাকিবে। বেশ, তোমাদের আশঙ্কা আমি দূর করিব। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকিবে। এই সমস্ত প্রদেশ তাহাদের নিজেদের গঠনতন্ত্র-রচনা-পরিষদ নির্ব্বাচিত করিবে এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে। তোমরা পৃথকভাবে তোমাদের স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতা পাইতে পার।

দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের ক্রীপ্স্ সাহেব বলিয়াছেন : গণপরিষদে তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। সেই গণপরিষদ দ্বারা রচিত গঠনতন্ত্র যদি তোমাদের মনঃপূত না হয় তবে আমাদের সঙ্গে চুক্তি দ্বারা তোমাদের যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই অধিকার রক্ষার জন্য আমরা আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিব। আমরা তোমাদের আরও ভাল চুক্তির সর্ত দিতে পারি।

অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন : তোমাদের প্রতি যাহাতে সুবিচার করা হয়, তাহার জন্য আমরা আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিব।

ক্রীপ্স্ সাহেব এইভাবে 'স্বাধীন ভারত' ও 'পাকিস্তানের' গঠনতন্ত্র রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই কারণেই কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সাদা কথায় ক্রীপ্স্ প্রস্তাবের অর্থ হইল এই যে, যদি আমাদের দেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান অচল অবস্থা অবসান করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য এক তুমুল ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে সেই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ উদ্যোগী হইয়া আমাদের দাসত্ব ও বিচ্ছিন্নতা চিরস্থায়ী করিবার জন্য দেশের উপরে এক গঠনতন্ত্র চাপাইয়া দিবে। সেই গঠনতন্ত্রে হয়ত 'পাকিস্তান' থাকিবে কিন্তু সেই 'পাকিস্তান' মিঃ জিন্নার স্বপ্ন সফল করিবে না।

ক্রীপস পরিকল্পিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হিন্দু, মুসলমান, শিখের স্বেচ্ছাকৃত সম্মতিতে গঠিত রাষ্ট্র নয়; জনসাধারণ-শাসিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রও নয়। অজস্র সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের অভাবে তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষাক্ত হইবে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরকে দেখিবে। সাম্রাজ্যবাদ এই পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ হইতে লাভবান হইতে চায়।

আর এই সব কিছুরও উপরে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের গলায় ফাঁসের মত আটকাইয়া থাকিবে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গ। সুতরাং ক্রীপ্সের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যে 'স্বাধীন' ভারতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, ইহা চিরস্থায়ী ও ডবল ব্যবচ্ছেদের ফলে কোমর সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। চিরকালের জন্য ব্রিটিশ মনোপলির কায়েমী স্বার্থের উপরেই নির্ভরশীল থাকিতে বাধ্য হইবে।

তাই ক্রীপস্ পরিকল্পনার অর্থ : (১) বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ। (২) সর্ব্বব্যাপী বিভেদে জনগণের শক্তি-নাশ। (৩) বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের মধ্যেও সমস্ত ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার যে সুযোগ আমরা পাইতাম, সেই সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

কুপল্যাণ্ড সাহেবের বিশ্লেষণ

প্রফেসর রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড তাঁহার ৭০০ পৃষ্ঠার পুস্তক "ভারতের গঠনতান্ত্রিক সমস্যা"র তৃতীয় খণ্ডে এই পরিকল্পনাকে আরও বিস্তারিত করিয়াছেন। ভারতের গঠনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি একজন সুপণ্ডিত ও নিরপেক্ষ গবেষকের ভাব লইয়া বহু বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছেন। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও মিথ্যা প্রচারে আচ্ছন্ন বৃটিশ জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পরিকল্পনা ও তাহার টীকা রচনা করা হইয়াছে।

এই বিজ্ঞ অধ্যাপকটি ভারত ব্যবচ্ছেদ, দেশীয় নৃপতি, ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় সরকার ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উপরে 'উভয় পক্ষের' মতামত বিচার করিয়া একটা সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার ভান করিয়াছেন।

কুপল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার বিশ্লেষণে যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের মধ্যে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি দেখাইয়াছেন। কংগ্রেসের এই শক্তি বৃদ্ধির মধ্যে কুপল্যাণ্ড সাহেব শুধু হিন্দু কায়েমী স্বার্থের শক্তিবৃদ্ধিই দেখিয়াছেন, তিনি শুধু ইহাই দেখাইয়াছেন যে, বৃটীশ শাসনের পর হিন্দু কায়েমী স্বার্থ সমস্ত ভারতে প্রভুত্ব করিবে।

মুসলিম লীগের মধ্যেও তিনি অতীত মুসলিম সাম্রাজ্য-গর্ব্বের পুনরুত্থান এবং মুসলিম-নেতাদের মধ্যে হিন্দু কর্ত্তৃত্বের হাত হইতে এই সাম্রাজ্যরক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

হতাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার

জনগণের মুখে ঐক্যের দাবী

নভেম্বরের ১লা হইতে ৭ই—সাতটি দিন বাংলার জেলায় জেলায় শ্রমিক কৃষক নরনারী জনসাধারণ একত্রে বসিয়া আবার ভাবিতে শুরু করিয়াছে—কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যের প্রশ্ন কিভাবে সমাধান করা যায়।

২৪ পরগণা, হাওড়া, ময়মনসিংহ, হুগলী, কুমিল্লা, রংপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা হইতে আমরা ইতিমধ্যে বহু জনসভার সংবাদ পাইয়াছি। প্রত্যেক জায়গাতেই ঐক্যের জন্য জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

হাওড়া

৫ই নভেম্বর রুদ্রপুর ইউ, পি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে একটী জনসভা হয়। বিষয় ছিল—গান্ধী-জিন্নার আবার মিলন চাই। গত বছর ফরওয়ার্ড ব্লকের যাঁহারা স্থানীয় নেতা ছিলেন তাঁহাদেরই একজন সভায় গান্ধী-জিন্না ঐক্যের উপর বক্তৃতা করেন।

শিবপুরে হাওড়া ৮-৯ নং ওয়ার্ড মুসলিম লীগের সম্পাদক মহম্মদ ইদ্রিসের সভাপতিত্বে ঐ দিনই একটী জনসভা হয়। তিনি গান্ধী-জিন্নার পুনর্মিলনের দাবীর উপর বক্তৃতা করেন। শীলদের বাজার, আন্দুল, ও শালকিয়া কাছারী বাড়ী ও জটাধারী পার্ক প্রভৃতি স্থানেও এই উপলক্ষে সভা হয় এবং জনসাধারণ ঐক্যের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

বালী বাজারে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটী জনসভা হয়। তিনি বলেন, গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেবের পরস্পরের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত এবং কংগ্রেস-লীগের পুনর্মিলন একান্ত প্রয়োজন।

উত্তর ঝাঁপড়দহ গাবতলায় ১লা নভেম্বর কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি-দিবস পালনের জন্য একটী জনসভা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধী একটী দলও এই সভায় যোগদান করে—তাহাদের নেতা শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী কংগ্রেস-লীগ মিলন প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহারই পরিচালনায় পল্লীমঙ্গল সমিতির ছেলেরা সভায় তিনটী গান গায়।

২৪-পরগণা

শ্রমিক, কৃষক ও মেয়েদের ভিতর এই সপ্তাহে বহু সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে। কাঁচড়াপাড়ায় এক হাজার শ্রমিকের সভা, জগদ্দল চটকল মজুরদের সভা, ইছাপুর মেটাল মজুরদের সভা, নৈহাটী, গৌরীপুর ও দমদম শ্রমিকদের সভা উল্লেখযোগ্য। বজবজ চটকল বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকদের বিশেষ সমস্যার উপর জোর দিয়া যে শ্রমিক সমাবেশ হয় তাহাতেও শ্রমিকরা জাতীয় আন্দোলনে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে। বেলঘরিয়া, মেটিয়াবুরুজেও প্রত্যেক এলাকাতেই কারখানার গেটে গেটে, বস্তিতে ও লাইনে কংগ্রেস লীগ ঐক্যের প্রচার হয়, শ্রমিকরা উৎসুক হইয়া গান্ধী-জিন্নার মিলন আবার কি ভাবে হইতে পারে তাহা শুনিতে থাকে।

বারাসত, মসলন্দপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে কৃষকদের সভা হয়।

ঐক্য সপ্তাহে ২৪-পরগণার মহিলারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি এবং গান্ধী-জিন্নার পুনরায় সাক্ষাৎ দাবীতে বজবজ, বদরতলা, বেলঘরিয়া, দেবীপুর, গোবরডাঙ্গার মহিলারা জনসভায় সমবেত হন। বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মীরা প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে ঐক্য সপ্তাহ পালন করেন। প্রত্যেকটি স্থানের সভায় শ্রীযুক্তা প্রতিভা গাঙ্গুলী ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত বিষয় দুইটীর উপর বক্তৃতা করেন। কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি ও গান্ধী-জিন্না পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ দাবী করিয়া ৩টি প্রস্তাব সর্ব্বসমর্থনে গৃহীত হয়।

শেরপুর

৫জন কংগ্রেসসেবী, ১২ জন লীগ ছাত্র, ১০ জন সাধারণ কৃষক ও ৫০ জন কমিউনিষ্টের একটী বৈঠকে ১লা ও ৭ই নভেম্বর দুইটী জনসভা করা স্থির হয়, হঠাৎ বেলা দেড়টার সময় সভার অনুমতি পাওয়ায় শহরে দারুণ উৎসাহে কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ২০০ লোকের একটী সুসংগঠিত বাহিনী ব্যাণ্ড বাজাইয়া মিছিলে বাহির হইয়া পড়ে। বৈকালে জনসভা হয়। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, বিশেষ করিয়া শ্রীযুত সুরেন বোসের মুক্তির জন্য কংগ্রেস-লীগের যুক্ত আন্দোলন করার প্রতিজ্ঞা এই সভায় ঘোষণা করা হয়। সভায় কংগ্রেস-লীগের ঐক্যের জন্য জনমত ব্যক্ত হয়।

রাজবন্দীর চিঠি
হিন্দু-মুসলিম সমস্যা

[রাজবন্দী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ]

"......আমাদের সুনিশ্চিত মত যে কংগ্রেসকে সত্যিকার জন-প্রতিষ্ঠান করতে হলে মুসলমানদের সঙ্গে আপোষের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজাজীর প্রস্তাব যদি তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় তবে আরো এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলতে হবে। ভারতবর্ষের অন্য অনেক অনেক প্রদেশ থেকে বাংলার পক্ষে এটা বেশী দরকার। এ নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই না;—তবে এটুকু বলতে পারি,—তাতে আমরা ঠকব না। প্রতিবারই হচ্ছে—আমরা প্রতিবাদ কচ্ছি, বাধা দিচ্ছি—কিন্তু তা সত্বেও মুসলমানরা নূতন নূতন অধিকার পাচ্ছে। তাদের যা' পাবার, তা' তারা এমনিও পাচ্ছে—এবং ভবিষ্যতেও পাবে; ক্রীপস্ প্রস্তাবে পাকিস্থানের অঙ্গীকার তারা পেয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি থাকার ফলে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের মনে একটা বিরূপতা ও বিদ্বেষ সঞ্চয় হয়। * Communal Awardএর বিরুদ্ধে বাংলা যে প্রতিবাদ করেছে তাতে বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও স্বার্থবুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। তার ফলে মুসলমানদের মনে হিন্দুদের প্রতি বিরূপতা ও বিদ্বেষ অনেকটা বেড়েছে। পৌনে দু'শ বছর "ভদ্রশ্রেণী" সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা একায়ত্তভাবে ভোগ করেছে; আজ সে সব ছাড়বার দিন এসেছে;—ভদ্রভাবে ও স্বেচ্ছায় না ছাড়তে পারলে আমরাই ঠকব।

বক্সা জেল থেকে শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র রায়কে ২১-৯-৪৪ তারিখে লিখিত চিঠির অংশ। "মন্দিরা"য় প্রকাশিত হইয়াছে। * সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা।

ঐক্য ও স্বাধীনতায় মুসলিমদের আগ্রহ

কিশোরগঞ্জ লীগ

ঐক্য সপ্তাহের আন্দোলনে কিশোরগঞ্জের লীগপন্থীগণ পূর্ণ সমর্থন জানান। সিটী লিগের সম্পাদক মৌঃ আফতাবউদ্দীন মিটীংএ উপস্থিত হন। জাতীয় নেতাদের মুক্তির প্রস্তাব মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি আসরাফ আলি সমর্থন করেন।

নারায়ণগঞ্জ লীগনেতাদের বিবৃতি

'গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় সমস্ত দেশপ্রেমিকই আশা করিয়াছিলেন এইবার কংগ্রেস লীগের মিলন হইবে, জাতীয় সংকটের সমাধান হইবে এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ভিতর দিয়া আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব। কিন্তু গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতেছি যে দেশবাসীর মধ্যে নিরাশা দেখা দিয়াছে এবং গান্ধীজি ও জিন্না সাহেব পুনর্বার মিলিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বনিয়াদ তৈয়ার করার আশা পোষণ করা সত্বেও বিভিন্ন কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মীরা জিন্না সাহেব ও গান্ধীজিকে আক্রমণ করিতেছেন, ইহার ফলে দেশের ভিতরে ঐক্যের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

আজ গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেবের মিলনের এই ব্যর্থতা জাতীয় সংকটকে আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইতেছে এবং স্বাধীনতাকে সুদূর পরাহত করিয়া তুলিতেছে। আমরা মনে করি যে আজ সমস্ত দেশবাসী একে অন্যের উপর আক্রমণ বাদ দিয়া গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের মিলনকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য একে অন্যের সমস্যা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত এবং গান্ধীজি ও জিন্নাসাহেবকেও নিম্নলিখিত ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া মিলনকে সফল করিয়া তোলা দরকার।

(১) স্বাধীন ভারতে মুসলিম জাতিগুলির বিনাসর্ত্তে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকার করা।

(২) এই রাষ্ট্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্ব্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা গঠিত হইবে।

(৩) উপরোক্ত ২টী বিষয়ে একমত হইলে কংগ্রেস ও লীগ একযোগে একটী সাধারণ কর্ম্মপন্থা নিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে।"

স্বাঃ—মহম্মদ আলমাছ আলী—সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ শহর মুসলীম লীগ। আব্দুল আওয়াল—সম্পাদক, মহকুমা মুসলীম লীগ। এ, কে শমসুজ্জোহা—সম্পাদক, মহকুমা ছাত্রলীগ। আব্দুল গফুর—সম্পাদক, গোপনগর মুসলীম লীগ।

নয়াদিল্লী

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্না বলেন যে, মুসলিম লীগের আদর্শ ধনীকে অধিকতর ধনশালী করা অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে অর্থ সঞ্চয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া নয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় মানদণ্ডের বৈষম্য দূরীকরণই লীগের লক্ষ্য। তাঁহাদের আদর্শ ধনতান্ত্রিক নহে—ইসলামী।

লাহোর

গত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ, সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার, সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও সভা সমিতির স্বাধীনতা, পরিকল্পনানুযায়ী শিল্প কারখানা স্থাপন ও ভূমির উন্নতি সাধন প্রভৃতি দাবী করিয়া একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হইয়াছে। ঘোষণাপত্রে দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সত্যকার স্বাধীনতা অর্থে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ সাধন বুঝায়, অন্যদিকে তেমনিই ভারতের সকল জাতিকেই পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশ

আলিগড়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অনারারী সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা দানের বস্তু নহে। আর দান হিসাবে উহা লাভ করিলে উহা স্থায়ীও হইতে পারে না। আমরা যদি আত্মচেতনা এবং জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হই, তবে পাকিস্তান কাহারও দ্বারা সমর্পিত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

অমৃতসহর

ভারতীয় মুসলিম লীগের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী রাজা গজনফর আলী বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মিঃ দানিয়েল লতিফ বলেন যে, পাকিস্তান দাবী হিন্দুরা স্বীকার করিয়া লইলে স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

কলিকাতায় নভেম্বর দিবস

গত ৭ই নভেম্বর কলিকাতায় 'নভেম্বর বিপ্লব দিবস' পালিত হয়।

সকাল হইতে রাস্তায় রাস্তায় অগণিত বাস ও ট্যাক্সির সামনে ছোট ছোট লাল নিশান উড়িতে দেখা যায়। পার্টির বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং শ্রমিক এলাকায় রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল সাড়ে ৯ টায় কমিউনিষ্ট পার্টীর প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টার্সে কমরেড মুজফফর আহ্‌মদ পতাকা উত্তোলন করেন এবং পার্টি সভ্যেরা সমবেত হইয়া রক্ত-পতাকার প্রতি অভিবাদন জানান।

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে জনসভা

বিকালে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিউনিষ্ট কাউন্সিলার মহম্মদ ইসমাইল বলেন, নভেম্বর বিপ্লব দিবস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর জয়োৎসবের দিন। হিটলারী দস্যুদের উপর আজ লাল ফৌজ চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে।

রাধারমণ মিত্র বলেন, নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়াছে। এই যুগান্তকারী বিপ্লব গ্রীক পুরাণের প্রমিথিয়ুসের মত নিপীড়িত কোটি কোটি মানুষের কাছে অবারিত সুখ, শান্তি আনিয়া দিয়াছে।

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জার্মান ও বৃটেনের সহিত ২১ বৎসরের সোভিয়েট ব্যবস্থার তুলনা করিয়া সভাপতির অভিভাষণে বলেন, সোভিয়েটের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ ব্যবস্থা আজ বহু ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।

সরোজ মুখার্জী বলেন, সোভিয়েট বহু জাতির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া যে দুর্জ্জয় জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার কাছেই আজ হিটলারের জাতিপ্রভুত্বের মতবাদে প্রতিষ্ঠিত দুনিয়ার প্রবলতম শত্রু ফ্যাশিজম পরাস্ত হইতেছে। এই মূল কথাটিই আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য শিখিতে হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে বহু জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও লাল-ফৌজের বিজয় অভিযান আজ দেশে দেশে নব-যুগের সূচনা করিতেছে—এই মর্মে এক প্রস্তাবে সোভিয়েটের বীর সৈনিকদের প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়।

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও ভূপেশ গুপ্ত সভায় নভেম্বর বিপ্লবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য হইবেই
স্যার নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা

৭ই নভেম্বর ইউনাইটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন, মাণিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ উদ্বোধন করিতে গিয়া বাংলার প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দিন কতকগুলি মানপত্রের জবাবে বলেন,—যেখানে মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার ন্যায় নেতৃদ্বয় আছেন সেখানে দেরীতে আর বিলম্বে হউক, উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য হইতে বাধ্য।

"তবে তিনি কংগ্রেসকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, কংগ্রেস যেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্ব প্রদান না করে। কারণ এই সব প্রতিষ্ঠান কেবল নামেই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করে এবং ইহারা ভারতের স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। মুসলিম লীগই যে মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি তাহা বিভিন্ন স্থানের নির্ব্বাচনেই অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।" স্যার নাজিমুদ্দিন মুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যায় মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য এবং দেশের সর্ব্বত্র লীগের শাখা স্থাপন করিয়া মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের ন্যায় শক্তিশালী করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন যে, মুসলমানরা যদি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যায়, তাহা হইলে লীগের অনুবর্তী হওয়াই তাহাদের একমাত্র পন্থা।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়া ছড়াইতেছে

অথচ সরকার এ বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছে

গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট কাউন্সিলর বলেন যে, ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ ক্রমশঃ পূর্ব্ব কলিকাতা হইতে কলিকাতার অন্যান্য এলাকায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কাউন্সিলর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী বলেন যে, তিনি নিজেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, ম্যালেরিয়া উত্তর কলিকাতায়ও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কতটা ব্যাপক বেলেঘাটা অঞ্চলের নিম্নলিখিত কয়েকটি এলাকার তথ্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

বাহির শুড়া রোড—	জনসংখ্যা	৩৪	আক্রান্ত	২০
বেলেঘাটা মেন রোড	"	৩৯৬	"	১০২
তালপুকুর রোড	"	৪৭৬	"	২৮৯
শীতলাতলা বস্তী	"	১৯৭	"	১১৪
কলিমুদ্দিন সরকার রোড	"	১১৬	"	৬৩
বারোয়ারীতলা	"	১৩০৭	"	৬৯৪
উড়িয়া বাগান	"	২৮৫	"	১৫৩
কাদাপাড়া	"	১০০	"	৭৬
কাঁকুড়গাছি	"	১১৩৬	"	৭৯২

আক্রমণে যাহারা শয্যাশায়ী একমাত্র তাহাদের হিসাবই এখানে দেওয়া হইয়াছে। বেলেঘাটা ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসার ডাঃ ডি, এন, ঘোষ বলেন, গত তিন মাসে একবারও আক্রান্ত হয় নাই এমন লোক এ অঞ্চলে শতকরা একজনও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাগমারী ও নারিকেলডাঙ্গা নর্থরোড এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। পাটুয়াপাড়ার ৬০ বছরের বৃদ্ধা মামুদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, গত এক হপ্তার মধ্যে এলাকায় ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এলাকার অধিকাংশই শ্রমিক। আক্রমণের ফলে তাহাদের অনেকের চাকুরী চলিয়া গিয়াছে। মহম্মদ তায়েব গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসপে কাজ করিত, হাসানগুল একটি প্রেসে কাজ করিত, আবদুল করিম বিড়ির কারিগর, জামীর বেল্টিংএর কাজ করিত—তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকটি লোক আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাহারা কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা আজ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে আগাইতেছে।

প্রতীকার কোথায় ?

প্রায় একমাস হইল ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণের কথা গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতীকারের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা হাস্যাস্পদ! কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বিধ্বস্ত এলাকায় ১০টি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে। গত ৯ই নভেম্বর কাউন্সিলর মহম্মদ ইসমাইল ঐ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে যান। তিনি ৪টি কেন্দ্র বন্ধ দেখিতে পান, তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বাকী কেন্দ্রগুলির ঠিকানা ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসেও পান না। যে কেন্দ্রগুলি খোলা দেখিতে পান, সেখানে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তাররা তাঁহাদের নানা অসুবিধার কথা তাঁহাকে বলেন। বাগমারী কেন্দ্রের ডাঃ আর এন ব্যানার্জী, নারিকেলডাঙ্গা নর্থরোড কেন্দ্রের ডাঃ বাগুই—সকলেই বলেন যে, কুইনাইন ও অন্যান্য প্রতিষেধক ঔষধ যাহা দেওয়া হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। তাঁহারা পথ্য এবং অন্যান্য কিছু ঔষধের প্রয়োজনের কথা বলেন এবং বিশেষ ভাবে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহাদের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা কর্পোরেশনকে চারজন ডাক্তার এবং কয়েক গ্যালন তৈল ধার দিয়াছেন। সেই চারজন ডাক্তার এবং তৈল যে কোথায় কোন কাজে লাগিতেছে তাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। ম্যালেরিয়ার নিবারণকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার এবং বিনামূল্যে কুইনাইন ও পথ্য বিতরণের যে প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা এখনও আনিতে পারিতেছেন না। লক্ষাধিক লোকের জীবন লইয়া আমলাতন্ত্র এখনও খেলিতেছে।

রিলিফ সংগঠনের তৎপরতা

কিন্তু কলিকাতাকে বাঁচাইবার জন্য কলিকাতার দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং রিলিফ সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে কিছুটা সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পিপলস্ রিলিফ কমিটির কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রায় ৩ শত রোগীর চিকিৎসা হইতেছে। কলিকাতা কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতি গত ৩রা নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তাহাদের নিজেদের চিকিৎসাকেন্দ্রেও দৈনিক প্রায় ২ শত রোগীর চিকিৎসা হইতেছে। বেলেঘাটা অঞ্চলের সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন বেলেঘাটা রিলিফ কমিটি।

কিন্তু রিলিফের কাজে সবচেয়ে অগ্রণী হইয়াছে কলিকাতার মজুরশ্রেণী। ট্রাম ও লোহা-কারখানার শ্রমিক ইতিমধ্যেই বেলেঘাটা শ্রমিক রিলিফ ফণ্ডে প্রায় ৫ শত টাকা তুলিয়া দিয়াছে, তাহাদের অর্থে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও দুগ্ধকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতার বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সভায় তাহারা রিলিফের জন্য আরও হাজার হাজার টাকা তুলিবার প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি এবং মহাবোধি চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। মেয়র রিলিফ তহবিল হইতে ২০,০০০৲ মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নারিকেলডাঙ্গায়ও জনসাধারণের চেষ্টায় রিলিফের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

মাত্র শতকরা ৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছে

"যাহারা কোন প্রকার ঔষধপত্র পায় না, এমন লোকের সংখ্যা খুবই বেশী। বস্তুতঃ আক্রান্ত লোকদের মধ্যে শতকরা ৩ জনের বেশী কোন মেডিক্যেল সাহায্য পাইতেছে না।"

—ডাঃ বি, সি, রায়, সভাপতি, বি, এম, আর সি, সি।

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরাও আক্রান্ত

"ম্যালেরিয়া কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদেরও আক্রমণ করিতেছে। অবস্থার গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সহরকে এই দারুণ ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও প্রচণ্ড করিয়া তুলিতে হইবে।"—চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত করপোরেশনের ১জন মজুর

সকলের সহযোগিতায় কলিকাতাকে বাঁচাও

ডাঃ বিধান রায়, শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী, ডাঃ জে, সি ব্যানার্জী, প্রমুখ নেতৃবর্গ অবস্থার গুরুত্বের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যকে চুরমার করার জন্য কলিকাতায় জনমত গঠন করার দায়িত্ব কলিকাতার কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের। কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে জনসাধারণের রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় তাহার কর্ত্তব্য পালন করে, কুইনাইন পাওয়া ও ম্যালেরিয়া নিবারণী ব্যবস্থার জন্য সরকারের উপর চাপ দেয়—তাহার জন্যও আন্দোলন করিতে হইবে। আরও অর্থ, আরও ডাক্তার, ছাত্র, ভলাণ্টীয়ারের জন্য কলিকাতার নাগরিকদের বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ঢাকা জেলায় মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

লক্ষ লক্ষ লোক ব্যাধির কবলে

(বারীন্দ্র দত্ত)

ঢাকা জেলার গ্রামগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অস্থি-কঙ্কালসার লোকগুলি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায় জেলায় কিভাবে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

১৯৪৪ সাল	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর
গ্রাম—ভাটপাড়া	১৯৭৪	১৯৯৩	৪৪৭৫
নরসিংদি	২২৪৩	৩৯৭৭	৩৮৬৬
বংখুরী	৬১৪	৯৩৬	১৬৮৩

এই হিসাবেই সমস্ত অবস্থা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবে দেখা যায় শতকরা ৬৫ জন ম্যালেরিয়ায়, ১০ জন আমাশয় রোগে আক্রান্ত। ইহা ছাড়া জেলার কয়েকটি জায়গায় বসন্তও চোখে পড়ে। চিকিৎসকদের মতে এইবার কলেরা মহামারীরূপে সুরু হইবার সম্ভাবনা এবং ২।১টি করিয়া কলেরার রোগীও দেখা যায়।

দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকটি গ্রামের কয়েকটি পরিবারের হিসাবে সমস্ত অবস্থা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠে।

মহকুমা	গ্রাম	লোকসংখ্যা	ম্যালেরিয়া
নারায়ণগঞ্জ	ভুপতারা	১৪৫	৭৪
মাণিকগঞ্জ	বেগারখোলা	১৫৪	২৩
বিক্রমপুর	পাচনখোলা	১৯১	১০৭
	ছোট কেওয়ার	১১৮	১০৩

এমনি করিয়াই মহামারী সমাজজীবনে ফাটল ধরাইতেছে।

কাহাদের আঘাত করিল

সমাজজীবনের বনিয়াদ কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী ইত্যাদি শ্রেণীগুলি আজ ধ্বংসের মুখে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ইব্রাহিমাবাদ গ্রামে শতকরা ৯৯ জনই কৃষক—শতকরা ৬০ জন ম্যালেরিয়া, শতকরা ১৫ জন আমাশয়ে আক্রান্ত। নারায়ণগঞ্জের ৩০০ ধাঙ্গড়ের মধ্যে ২০ জন ম্যালেরিয়ায় সব সময়ই শয্যাগত থাকে। নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার সুতাকলগুলিতে শতকরা ১৫ জন শ্রমিক ম্যালেরিয়ার কবলে।

আচার্য্য জগদীশ বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কি? মাণিকগঞ্জ তেরশ্রী হাইস্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০; ৮০ জনই ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী।

ঔষধ কোথায়

এই সর্বনাশা মহামারী দূর করিতে না পারিলে গোটা জেলাই যে গোরস্থানে পরিণত হইবে। জনসাধারণ সরকারের দিকে চাহিয়া আছে ঔষধের আশায় কিন্তু ভরসা করিতে পারে না। ঢাকা জেলায় সর্বসমেত ৭৫টি সরকারী জরুরী হাসপাতাল ৪২টি সরকারী ভ্রাম্যমান ইউনিট, ২৬২টি কুইনাইন বিক্রয় কেন্দ্র। তবুও কেন রোগ বৃদ্ধির দিকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমস্ত জেলায় ৫,৯১,৪০,০০০ মেপাক্রিন টেবলেটের প্রয়োজন। কিন্তু সরকার মাত্র ৫,০০,০০০ লক্ষের মত টেবলেট বিলি করিয়াছে! নারায়ণগঞ্জ মহকুমার চালাকচর গ্রামে একটি পিপলস্ রিলিফ কমিটির মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্র গত কয়েকমাস যাবত কাজ করিয়া আসিতেছে। শতকরা ৭০ জনের জায়গায় রোগী ৪৫ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ঔষধের অভাবে এই কেন্দ্রটি ১৫ দিন যাবৎ বন্ধ। কৃষক, তাঁতী, ছাত্রের দল ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রটির নিকট আসিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। বন্ধ ঔষধের কেন্দ্রটি যেন তাহাদের বুকে হাতুড়ীর আঘাত দেয়। মহামারীতে যখন সমস্ত জেলা আক্রান্ত, তখন ঔষধের অভাবে মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ। জনগণ ভরসা পাইবে কোথা হইতে।

মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মহামারী ও খাদ্য সঙ্কটই ঢাকা জেলাকে অক্টোপাশের মত চাপিয়া ধরিয়াছে সত্যি, কিন্তু জনসাধারণ একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রস্থল বলিয়া কুখ্যাত এই ঢাকাতেও তাই মানুষের মনে নূতন আশার আভাষ। ঢাকার দেশপ্রেমিক চিকিৎসকগণের সামনে ভাসিয়া উঠিল অস্থি-কঙ্কালসার মানুষগুলির দৃশ্য। ঢাকা সহরের প্রায় ১০০ জন ডাক্তার সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। শুধু তাই নয়, জেলার ১৫টি ইউনিয়নে রিলিফ অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইল। ঢাকা সহরে ১৪টি মহামারী প্রতিষেধক কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। নারায়ণগঞ্জের চিকিৎসকগণও একত্রিত হইলেন। সাথে আসিয়া যোগ দিল মুসলিম লীগ, কংগ্রেসকর্মী, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি। মহামারীর হাত হইতে ঢাকা জেলাকে বাঁচাইতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়াই তাহারা কাজে নামিয়াছে। ঢাকার সিভিল সার্জনের নিকট হইতে ৫০,০০০ মেপাক্রিন টেবলেট আদায় করিয়াছে—কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য রোগের ঔষধ নিয়া কাজ সুরু করিয়াছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত অল্প। দেশপ্রেমিক চিকিৎসকবৃন্দ মহামারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন এবং সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য জেলার কতকগুলি গ্রামে বাহির হইয়াছে। তাহাদের এই উদ্যম এবং উৎসাহ জেলার অন্যান্য চিকিৎসকদেরও প্রেরণা যোগাইল। বিভিন্ন গ্রামের ও সহরের ডাক্তাররা মেডিকেল রিলিফ অর্গানাইজিং কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পথ ও নির্দেশ লইয়া গেল। অর্গানাইজিং কমিটি নভেম্বর মাসে এক সম্মেলন করিতে মনস্থ করিয়াছে—যাহাতে সমস্ত জেলায় সুসংবদ্ধভাবে মেডিকেল রিলিফের কাজ চলিতে পারে।

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করিয়া মেডিকেল রিলিফ কমিটি গঠন, তথ্য সংগ্রহ, অর্থ ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ, নারীদের ইউনিয়ন গঠন—

এই উদ্দেশ্য নিয়াই মেডিকেল রিলিফ কমিটি মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিয়াছে ও জনসাধারণের মনে এক নূতন আশার স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছে।

সমস্যা আজ বিরাট এবং সকলের। সবাইকে আজ অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। সমস্ত মানুষের মিলিত সংগ্রামের সামনে বিভেদ, নিরাশা দূর হইয়া যাইবে।

শহীদ স্মরণে

মহেশ্বর পাশা (খুলনা) ছাত্র **কমরেড গৌর দে** গত ৪ঠা নভেম্বর একমাস টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। কমরেড গৌরের বয়স মাত্র ১৭ বৎসর—এই বয়সেই সে মহেশ্বর পাশার ছাত্রদের অগ্রণী নেতা হিসাবে কাজ করিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও সে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছে।

চুঁচুড়া বিড়ি ইউনিয়নের কর্মী পার্টি সদস্য **কমরেড গোলাম হোসেন** ২রা নভেম্বর মারা গিয়াছেন। তাঁহার বিপ্লবী কর্ম প্রচেষ্টাতেই চুঁচুড়া বিড়ি ইউনিয়ন ও হুগলী জেলা বিড়ি ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়।

মহিলা আন্দোলন

রাও বিলের সমর্থনে জনমত

রাও বিলের সমর্থনে বাংলার সর্বত্র সভাসমিতি ও সই সংগ্রহ চলিতেছে। মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্ত কমিটি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করিতেছে। আইনজীবী, চিকিৎসক, সংবাদিক ও শিক্ষাজীবীরা কি ভাবে এই প্রস্তাবিত বিলের সমর্থনে আগাইয়া আসিতেছেন, নীচের রিপোর্টগুলি হইতে তাহা কিছুটা বুঝা যাইবে।

কিন্তু এই বিলের বিরোধিতায় একদল রাজভক্ত বিচারক, ধনী জমিদার, মহারাজা ও শিল্পপতির দল হিন্দু নারীসমাজের সর্বনাশ ডাকিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের গৃহিনীরা রাজরাজড়ার বাড়ীতে সভা ডাকিতেছেন, ভাড়াটে লোক মারফৎ ইস্তাহার ছড়াইতেছেন এবং সংবাদপত্রে তাহাই ফলাও করিয়া ছাপাইতেছেন। দারুণ মন্বন্তরে হিন্দু নারীর দেশজোড়া সংকটে যাঁহারা এতদিন এতটুকুও বিচলিত হন নাই, তাঁহারা গোটা হিন্দু সমাজের হঠাৎ দরদী হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্ত্রী; বিলের বিরুদ্ধে ইঁহাদের নাম ভাঙাইয়া বিচারপতিদের মন গলাইবার হীন চেষ্টা চলিতেছে।

আশার কথা ধনসম্পদে পদস্থ হইলেও সংখ্যায় ইঁহারা নগণ্য। বাংলার হাজার হাজার নারী ইহাদের অপপ্রচেষ্টা সত্বেও এই বিলকে অভিনন্দন জানাইতেছে। এই বিল বর্ত্তমান সমাজের অগ্রগতি সূচনা করিয়াছে। হিন্দু সমাজবিধিকে অটুট রাখিয়া এই বিল সমাজকে আধুনিক সময়োপযোগী করিতে সাহায্য করিবে। এই বিল সামাজিক অত্যাচারের হাত হইতে হিন্দু নারীকে রক্ষা করিবে। যা আজ প্রচলিত প্রথা ও সর্বসম্মত, তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতে আপত্তি শুধু প্রতিক্রিয়ারই নামান্তর। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এক বিবাহের প্রথা আজ সমাজে সর্বজনস্বীকৃত, তাহাকে আইনে পরিণত করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই টিঁকিতে পারে না।

বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে হিন্দু নারী-সমাজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাও বিলের স্বপক্ষে দাবী ধ্বনিত হউক।

বিলের সমর্থনে
বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ

গত ৭ই নভেম্বর রাও বিল সম্পর্কে আলোচনার জন্য আশুতোষ কলেজের ছাত্রী ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়াই হিন্দু সমাজ আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। একমাত্র মৃত অথবা মৃতপ্রায় সমাজই এই পরিবর্ত্তন এড়াইয়া চলিতে চায়। রাও বিলে যে এক বিবাহের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলসূত্র। হিন্দুধর্মে উচ্চ, নীচ, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের ব্যষ্টিগত সমানাধিকারের ঘোষণা আছে। স্ত্রীলোকদের পিতৃসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইবার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

সভায় একবিবাহের আদর্শ এবং হিন্দু কন্যার পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারের দাবী সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাজরা পার্কে শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্তের সভাপতিত্বে রাও বিলের সমর্থনে এক বিরাট জনসভা হয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জ্জি প্রতিবাদ আনেন। শ্রীভূপেশ গুপ্ত, শ্রীমতী কমলা চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তারা বিলের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন এবং তুমুল ধ্বনির ভিতর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাও বিলের সমর্থনে বরিশাল, মৈমনসিং, খুলনা, ২৪ পরগণা, বীরভুম প্রভৃতি জেলাতেও জনসভা হয়।

কলিকাতায় সভাসমিতি

রাও বিলের প্রচার ও সমর্থনে জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য **বিভিন্ন ৯০টি মহিলা সমিতির** তরফ হইতে কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেলাতে জনসভা ও বৈঠক মারফৎ প্রচার করা হইতেছে।

যুক্ত কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ কলিকাতায় তীর্থপতি স্কুলে শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট শরৎ জানা সভায় বক্তৃতা করেন। ৯০ জন ভদ্রলোক ও মহিলা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত জে, এন্ বসুর বাড়ীতে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের সভানেতৃত্বে একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চক্রবর্তী গোঁড়া হিন্দুর যুক্তি হইতে এই বিলটি সমর্থন করেন। যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিলটি ব্যাখ্যা করেন। সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় বক্তৃতা দেন।

মধ্য কলিকাতায় কুমার সিংহ হলে শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসুর সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত পি, সি চ্যাটার্জ্জি, নীলিমা চৌধুরী, অনিল রায় প্রভৃতি বিলটির সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

মিসেস্ এস্, এম্, বসুর সভানেত্রীত্বে রাসবিহারী এভিনিউতে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের একটি জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঐ সভায় বক্তৃতা দেন।

উত্তর কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে মাণিকতলা অঞ্চলের মহিলাদের ও ভদ্রলোকদের সভা হয়। শ্রীযুক্ত বসন্ত চ্যাটার্জ্জি বিলটির প্রতিবাদ করেন। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এলা মিত্র প্রভৃতি তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করেন।

ইহা ছাড়া কেরালা মহিলাদের নিজেদের ক্লাবে, সাউথ ইণ্ডিয়ান লেডিজ এবং মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজের সদস্যাদের ভিতর এই বিলের উপর আলোচনা হয়।

দার্জিলিং-এ মহিলা সম্মেলন

গত ২৩শে অক্টোবর **দার্জিলিং** জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দার্জিলিং-এর ইতিহাসে এরূপ সম্মেলন এই প্রথম।

সম্মেলনের সভানেতৃমণ্ডলীতে ছিলেন স্থানীয় গুর্খা মহিলানেত্রী সূর্যমতী ছেত্রিনী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহ-সভানেত্রী নলিনী বসু ও সহ-সম্পাদিকা কনক মুখার্জী। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলন উপলক্ষে আসিয়াছিলেন।

দার্জিলিং জেলা মোটর ড্রাইভার ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বি, হলাম, স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে গণেশলাল সুব্বা এবং অখিল ভারত গুর্খা লীগের কার্যকরী সমিতির সভ্য হর্কবাহাদুর কুমাই এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান।

চা বাগানের মেয়ে মজুরদের জন্য মাগগীভাতা এবং অন্তঃসত্বা মেয়েদের জন্য ৬ মাস বেতনসহ ছুটি, মেয়েদের জন্য বস্তিতে বস্তিতে প্রাথমিক স্কুল, দার্জিলিং-এ সভাসমিতির অক্ষুন্ন অধিকার, অবিলম্বে রেশনপ্রথা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বতন্ত্র প্রস্তাবে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও গান্ধী জিন্না পুনরালোচনা দাবী করা হয়।

মহিলা কর্মীদের দুর্ণাম রটনা করিয়া স্থানীয় পঞ্চমবাহিনী সভা ভাঙার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া গুর্খা-বাঙালী সম্প্রীতি বাড়িয়া গিয়াছে। সকলে বুঝিয়াছে, মেয়েদের সমস্যা সমাধানের জন্য গুর্খা ও বাঙালীদের আজ এই ভাবে একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রদর্শনীর জন্য ছবি

বাংলাদেশে মহামারীর প্রকোপ কি ভীষণভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তাহা সত্বেও দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে দেশপ্রেমিক চেতনা যথেষ্ট পরিমাণ জাগ্রত হইয়াছে, জানা যায় না। দেশের বাস্তব অবস্থার চিত্র সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করাইবার জন্য পিপলস্ রিলিফ কমিটি শিল্পী মণি রায়কে বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রেরণ করে। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চল্লিশখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি ঢাকা অঞ্চলের যে পঞ্চাশখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন, সেগুলির মতো এগুলিও কার্ডবোর্ডে বাঁধাইয়া প্রদর্শনীতে দেখাইবার উপযুক্ত অবস্থায় পিপলস্ রিলিফ কমিটি পাইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা, এগুলি নানা প্রদর্শনীতে দেখানো হয় যাহাতে দেশের লোক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। যদি কোন রিলিফ প্রতিষ্ঠান এগুলি ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহারা পিপলস্ রিলিফ কমিটির সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

নীরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক,
পিপলস্ রিলিফ কমিটি
৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নোটিশ

আমরা "নভেম্বর দিবস" বিশেষ সংখ্যার জন্য বিভিন্ন এজেন্সী হইতে বেশী কপি পাঠাইবার অর্ডার পাইয়াছি; কিন্তু আমাদের কাগজের কোটা কম হওয়ার জন্য আমরা অর্ডার মত পত্রিকা দিতে পারিলাম না। ম্যানেজার—**জনযুদ্ধ**

ছাত্র কাউন্সিলের আহ্বান

(অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য)

গান্ধী জিন্না সাক্ষাতের সময় সব চাইতে বেশী সাড়া পড়িয়াছিল ছাত্রসমাজের মধ্যে। বিশেষ করিয়া মুসলিমদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের এমন উদ্দীপনা আর কোনদিন দেখা যায় নাই। সভা শোভাযাত্রায় হাজার হাজার মুসলমান ছাত্রদের মুখ হইতে সম্মিলিত সংগ্রামের ঘোষণা সেদিন কংগ্রেসপন্থী ছাত্রদের মধ্যে এমন বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সাময়িকভাবে হইলেও তাহারা এই সর্ব্বপ্রথম মুসলিম ছাত্রবন্ধুদের পাশে দাঁড়াইয়া গান্ধীজিন্না সাফল্য কামনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সে আলোচনা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। সমগ্র ছাত্রসমাজ বিষণ্ণ ও হতাশ। ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও তিক্ততা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর ইহারই সুযোগে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐক্যবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলের দল বিভেদ প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। বাংলার প্রাদেশিক হিন্দু ছাত্র ফেডারেশন এক প্রস্তাব দিয়াছে যে, পাকিস্তানের স্বপক্ষে যাহারা প্রচার করিতেছে তাহারা দেশের শত্রু এবং এখনই রাজাজীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে। ইহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াই অক্টোবরের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঃ ছাত্রফেডারেশন ওয়ার্কিং কমিটির সভার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যে-সকল উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছে, দেশের দুই বৃহত্তম সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া সাম্রাজ্যবাদেরই স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আজ সমগ্র ছাত্রসমাজের অভিযান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতীয় ঐক্যে আমরা কি সাহায্য করিব না?

তাই কংগ্রেস ও লীগপন্থী ছাত্রদের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবেনা অথবা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিলেও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। বরং কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতের সমতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এজন্যই মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—গান্ধীজি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি রাজাজীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন নাই; বরং রাজাজীর প্রস্তাবে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, কি হয় নাই, এই প্রশ্ন লইয়া জনসাধারণকে তিনি আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কায়েদে আজম 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক, পাকিস্তান রাষ্ট্র জনসাধারণের দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে এবং যে কোনো বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীন পাকিস্তান হিন্দুস্তানের সহিত হাত মিলাইয়া লড়িবে। আমরা মনে করি যে গান্ধীজি ও কায়েদে আজমের নিজ নিজ মতামতের মধ্যে সমতার বিষয়গুলি কি, তাহা বাহির করিবার কাজে তাঁহাদের এই দুইটী বিবৃতি প্রভূত সাহায্য করিবে।

বাংলাদেশে আমাদের দায়িত্ব উপরোক্ত প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করা, পুনরায় গান্ধী জিন্না সাক্ষাতের উপায় সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা চালান। কিন্তু তাহা কি ভাবে সম্ভব? তাহা নির্দ্ধারণের জন্যই গত ২৭শে হইতে ৩১শে অক্টোবর কলিকাতায় বি, পি; এস, এফ কাউন্সিলের এক জরুরী সভা হয়। প্রতিনিধিদের রিপোর্টে জানা যায়, সাময়িক ব্যর্থতা সত্বেও কংগ্রেস ও লীগপন্থী উভয় ছাত্র সম্প্রদায়ই কংগ্রেস—লীগ একতার জন্য পুনরায় গান্ধীজিন্না সাক্ষাৎকার চায়। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে। ময়মন্‌সিংহের মুসলিমছাত্র এসোসিয়েশনের সম্পাদক বলিয়াছেন, "আমাদের নিজেদের মধ্যে এখনো তীব্র সন্দেহ এবং অবিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়াই গান্ধীজি ও জিন্না সাহেব একবারের সাক্ষাতে একমত হইতে পারেন নাই। আমাদের চেষ্টাতেই তাঁহারা আবার মিলিবেন।" নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ছাত্রফেডারেশন কর্ত্তৃক আহূত গান্ধী-জয়ন্তী সভায় মুসলিমছাত্র নেতা শা' আজিজুর রহমান বলিয়াছেন, "গান্ধীজির সততার প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ আমাদের বন্ধ করিতে হইবে—তবেই পুনরায় গান্ধীজিন্না সাক্ষাৎকার সম্ভব।" নিঃ বঃ মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন কর্ত্তৃক লিখিত "গান্ধীজিন্না আলোচনার ব্যর্থতা ও দেশবাসীর কর্তব্য" নামক পুস্তিকাতেও বলা হইয়াছে—এ-ওকে গালাগাল দিয়ে চললে কারুরই স্বাধীনতা আসবেনা "মতভেদগুলি শান্ত মনে বুঝে দেখার চেষ্টা করতে হবে।"

ছাত্রছাত্রীদের কাজে নামিতে হইবে

শুধু মুসলমান ছাত্ররা নয়। গত ৬ই নভেম্বর ছাত্র ফেডারেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এক বিতর্ক সভা হয়। সেখানে মুসলিমছাত্র নেতা সামসুল হুদা বলেন যে, "মুসলিম লীগও কংগ্রেসের মত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী; লীগের আন্দোলন স্বাধীনতারই আন্দোলন। এই সমতার উপরই পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তাহা নিশ্চয়ই হইবে।" উপস্থিত ১৫০০ কংগ্রেসপন্থী ছাত্র বিপুল হর্ষধ্বনি ও বহুক্ষণব্যাপী করতালি দ্বারা বক্তাকে অভিনন্দিত করে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য যে কংগ্রেসপন্থী ছাত্ররা এখনো সক্রিয় ভাবে আগাইয়া আসিতেছেন না! একতা যে সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ছাত্র কাউন্সিল সংকল্প নিয়াছে—গান্ধীজিন্না সাক্ষাতের আগে ও সময়ে বাংলায় যে ৫০ হাজার ছাত্রের সমাবেশ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সম্ভব হইয়াছিল, পুনরায় তাহাদের কাছে "আবার গান্ধীজিন্না সাক্ষাৎ চাই" এই আওয়াজ পৌছাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে। আর ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের মধ্য দিয়াই সমগ্র ছাত্র-সমাজের ঐক্যবদ্ধশক্তিকে সংগঠিত করিতে হইবে। তাই কাউন্সিল সভায় ছাত্র ঐক্যের প্রস্তাবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে, "বাংলা, কেরল ও বিহারের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত জনগণের ক্লেশ মোচনের জন্য আমরা সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে একত্র হইতে অনুরোধ করিতেছি। ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ইস্কুল-কলেজগুলিকে চালু রাখিবার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের সাহায্যদান আজ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই মহান কর্ত্তব্যপালনে সমগ্র ছাত্রসমাজের সংযুক্ত অভিযান গড়িয়া উঠুক, ইহাই ছাত্র কাউন্সিলের আহ্বান। বাংলার ছাত্রছাত্রীদের আজ তাই জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা অবসানের প্রচেষ্টার সাথে প্রাণপণ চেষ্টায় পরস্পরের মতানৈক্যের একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়া ঐক্যবিরোধীদের একত্রে দাঁড়াইতে হইবে।" ইহাই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উপায়।

শ্রমিক জগৎ

লোহা-মজুরের আওয়াজ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

টেকনিকাল পারসোনেল অর্ডিনান্স বা কারিগর আইন জারী হইয়াছিল লড়াইয়ের অবস্থায় কারিগরদের কাজের উন্নতির জন্য। লড়াইয়ের সরঞ্জাম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লোহা ও ইস্পাতের জিনিস তৈরী যাতে পুরাদমে হইতে পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। উপযুক্ত কারিগরকে উপযুক্ত মাহিনায় দরকারী কাজে লাগাইলে যদি দেশের এই সংকটকালে শিল্পগুলির পয়দা বাড়ে, তাতে অন্যায় কিছু নাই। কিন্তু এই আইনের ফলে সেই আসল উদ্দেশ্যটি কতটা সার্থক হইয়াছে তাহার কোন হিসাব আমরা পাই না। তবে এই আইনের ফলে মজুরদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া লোহা-কারখানার মজুরদের জীবনে যে একটা দুর্বিষহ অবস্থা আসিয়াছে, তার খবর আমরা প্রতি নিয়তই পাই।

বেলঘরিয়ার টেকসমাকো কারখানার ২০০ মজুরকে হঠাৎ একদিন ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। যে ডিপার্টমেণ্টে তাহারা কাজ করিত, সেই ডিপার্টমেণ্ট নাকি সরকারী পরিচালনায় চলিয়া আসায় এই মজুরদের আর রাখা হইল না। ইহাদের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালে আবেদন করিয়াও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হয় নাই।

জয়া-ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার 'ফিটার' কাউসার আলি ও টার্ণার সিরাজুদ্দিনকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অক্ষমতার অভিযোগে বরখাস্ত করা হইল। ইছাপুর ফ্যাক্টরীর বুধনলাল পাণ্ডেকে গত মে মাসে কোনো কারণ না দেখাইয়াই বরখাস্ত করা হইয়াছে।

ইছাপুরের আর একজন কারিগর আহমদ উল্লাহ্ জুলাই মাসে অসুস্থতার দরুণ ছুটী লইয়াছিল। আগষ্ট মাসে কর্ম্মক্ষম বলিয়া সার্টিফিকেট লইয়া সে কাজে যোগ দিতে যায়। কিন্তু গিয়া শোনে যে তার জবাব হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বিষয় ট্রাইবুনালে জানান হইয়াছে। কিন্তু ট্রাইবুনাল কতদিনে বিচার শেষ করিবে, ফলাফল কি হইবে, তার কোনো ঠিকানা নাই।

ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার মজুর অমর নাথ দাস কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া কাজ ছাড়িবার জন্য দরখাস্ত করে। কিন্তু ট্রাইবুনাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাকে কাজ ছাড়িতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

বার্ণপুরের ১০ জন মজুর কম মাহিনায় কুলাইতে না পারিয়া কাজ ছাড়িয়া নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া চাষবাস করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ট্রাইবুনাল অনুমতি দিল না।

টেকনিকাল আইনে আছে দক্ষ কারিগরকে জরুরী প্রয়োজনে এক কারখানা হইতে অন্য কারখানায় বদলী করা যাইতে পারিবে। কারিগর তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না, অবশ্য তার আর্থিক কোনো লোকসান যাতে না হয়, সেইমত মাহিনা দেওয়া হইবে।

হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীর ৪ জন মোল্ডার—শরৎ নস্কর, বিজয় পাত্র, ধীরেন দাস ও নন্দলাল সামন্ত। তাদের এই আইন অনুযায়ী নোটিশ দিয়া বার্ণ হইতে আসানসোলে বার্ণপুরের কারখানায় যাইতে বাধ্য করা হয়। সেখানে কিছুদিন রাখিবার পর তাদের আবার হাওড়ায় পাঠানো হয়, তারপর আবার বার্ণপুরে পাঠানো হয়। বার্ণপুরে কাজ করিতেছে এমনি সময়ে হঠাৎ আবার তাদের হাওড়া ফিরিয়া যাইবার অর্ডার হয়।

গার্ডেনরীচের আই-জি-এন কারখানার মিস্ত্রী আব্দুল কাদেরকে একদিন অর্ডার দেওয়া হইল যে তাকে জব্বলপুরের একটি কারখানায় বদলী করা হইয়াছে। এখানে সে মজুরী পাইত ১৸৵০ দৈনিক, সেখানে পাইবে ১৸০।

কাদেরকে তবু সময় থাকিতে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আই-জি-এন-এর আর একজন মিস্ত্রী অমৃতকে যে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, তা আরো অদ্ভুত। ২৮শে অক্টোবর তাকে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে যে ১লা নভেম্বর তাকে দেরাদুনের কারখানায় গিয়া হাজিরা দিতে হইবে। অমৃত ছিল এই কারখানার মজুরদের নেতা। তাকে দক্ষ কারিগর অজুহাতে জব্দ করার জন্য ট্রাইবুনাল সুদুর দেরাদুনে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিল! মাত্র ৩ দিনের বেশী সময়ও তাকে দেওয়া হইল না।

ইহাই হইতেছে টেকনিকাল পারসোনাল আইনের প্রয়োগের নমুনা। এই আইন কবে দূর হইবে তার জন্য প্রত্যেকটি লোহা-মজুর দিন গণিতেছে। তারই জন্য আজ সমস্ত লোহা-মজুর এক হইতেছে—মেটিয়াবুরুজ হইতে বার্ণপুর পর্য্যন্ত লোহা-মজুরের সমবেত কণ্ঠে আওয়াজঃ টেকনিকাল আইনের রদ-বদল চাই!

চব্বিশ পরগণা চটকল এলাকায় শ্রমিকদের কর্ম্মচাঞ্চল্য

সম্প্রতি বি, পি, টি, ইউ, সি-র উদ্যোগে বাংলার ২৩টি ইউনিয়ন একযোগে পুরা (৪২৲) মাগ্গী ভাতা, ৪০ টাকা সর্ব্বনিম্ন বেতন, পাকা চাকুরী, বোনাস প্রভৃতি আদায়ের জন্য এ্যাড্জুডিকেশন দাবী করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়াছে। প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ৪ঠা নভেম্বর হইতে সমগ্র চটকল এলাকায় শ্রমিক অভিযান সুরু হইয়াছে।

বজবজ এলাকায় কালিপুর, বজবজ ও চিত্রগঞ্জে মিল কমিটীর মিটিং হয়। এ্যাডজুডিকেশনের দাবী সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমরেড আবদুল মোমিন, আবদুল হালিম ও নন্দ বসু এই সমস্ত সভায় শ্রমিকদের দাবী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

গত ৫ই নভেম্বর **গৌরীপুরে** এ্যাডজুডিকেশন দাবী সমর্থন করিয়া জনসভা হয়। ৭ শতের উপর শ্রমিক হাজির হয়।

গত ৫ই নভেম্বর গোলঘর ময়দানে **জগদ্দল** চটকল মজদুর ইউনিয়ন ও বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়ন একযোগে মিটিং ডাকে এবং ১ হাজারের উপর শ্রমিক জড় হয় এবং এ্যাডজুডিকেশন প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

বজবজেও ৭ই নভেম্বর কালিপুরে ৪০০ শ্রমিকের জনসভা হয়। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ও ইউনিয়ান সেক্রেটারী সাদইমানী চটকল মজুরের দুর্দ্দশা বর্ণনা করেন ও বর্ত্তমান দাবীগুলি বুঝাইয়া দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে চটকল-মজুররা এ্যাডজুডিকেশন আন্দোলনকে সফল করিতেই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

নাগরিক জীবনের সম্পদ বাঁচাও

বিজলী-শ্রমিকদের আন্দোলনে জনসমর্থন চাই

মারুফ হোসেন (সম্পাদক, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই মজদুর ইউনিয়ন)

কলিকাতা, হাওড়া, ২৪পরগণা, হুগলী অঞ্চলের ট্রাম, জলকল, চটকল, সুতাকল, অস্ত্রপাতি ও লোহা কারখানাগুলি বিদ্যুৎশক্তিতে চলে। বিদেশী মূলধনে গঠিত এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুষ্ট ধনীদের দ্বারা এই বিলেতী প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা ইলেকট্রীক সাপ্লাই কোম্পানীর উপর এই গুরু দায়িত্ব একচেটিয়া ভাবে ন্যস্ত।

মালিকের ফন্দি

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতেই মালিকদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া চলে। শ্রমিক ছাঁটাই, সস্পেণ্ড, ইউনিয়ন করার অধিকারে হস্তক্ষেপ—প্রভৃতি কাজে মালিক ও তাহার দালালেরা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। ইহাতে শ্রমিকরা নিরাশ বা হতবুদ্ধি না হইয়া এ, আর, পি ব্যবস্থা, রেশনিং, মাগ্গী ভাতার লড়াইকে দৃঢ় করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদেরই বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্তজাল খাড়া করা হইয়াছে। নির্দ্দোষ শ্রমিককে মিথ্যা কারণে ছাঁটাই বা সস্পেণ্ড করিয়া সমস্ত শ্রমিককে হরতালে উৎসাহিত করা হইয়াছে। ইহার নমুনা আমরা দেখিয়াছি লাইন খাতায় গিলেট মেটের শ্রমিকদের মধ্যে। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত হরতাল করিয়াছে। মালিক সুযোগ বুঝিয়া শ্রমিক ছাঁটাই করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

শ্রমিকদের অবস্থা

হপ্তা রেশনঃ বিজলী শ্রমিকদের অবস্থা আজ কি? তাহারা সপ্তাহে মাত্র ৪ সের রেশন পায়। তাহাও আবার কাঁকর, পাথর, পোকা-মাকড় ভূষিতে ভর্ত্তি। গুদাম পচা দুর্গন্ধময় রেশন মানুষের অখাদ্য। কায়িক পরিশ্রম তাহাদের করিতে হয়। শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রমিক গাঁইতি চালায়—খোলা রাস্তায় রোদ-বৃষ্টিতে মাটীর খাদের কাজ—নদীর মধ্যে ডুব দিয়া দিয়া কেবল টানার কাজ—সহর হইতে সহরে গ্রাম হইতে গ্রামে হাওড়া হুগলী ২৪পরগণা কলিকাতার বুকে তাহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে। আর, তাহার পর তাহারা খায় ঐ অমানুষের খাদ্য।

মাসিক মাহিনাঃ মাহিনার কথা হিসাব করিলে দেখি একেকজন ১৬৲ টাকাতে ভর্ত্তি হইয়া ১৭৲ টাকা পর্য্যন্ত পায়। লড়াই বাধার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এক পয়সাও বাড়ান হয় নাই। গ্রেডও তাহাদের যেমনকার তেমনি আছে। শতকরা ৭৫ জন শ্রমিক ঐ মাহিনা পায়। বাকী অংশ ২০৲ হইতে ২৫৲, ২৫৲ হইতে ৫০৲ অথবা ৫০৲ হইতে ৭৫ না হয় ১০০৲ বড়জোর।

মাগ্গী ভাতাঃ অথচ জীবনযাত্রার বোঝা বাড়িয়াছে। খাই খরচের মাত্রা ৩০০ গুণ উঠিয়াছে। সমস্ত জিনিষ দুর্মূল্য আর না হয় অগ্নিমূল্য। শাক পাতা-চচ্চড়ি তাও মিলা দায়। প্রতি মাসে ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা ধার করিতে হইতেছে। কাবুলীওয়ালা কারখানা গেটে অনবরত কিউ লাগাইতেছে। অথচ তাহারা মাগ্গী ভাতা পায় ৭৲ হইতে ৮৲। এত অল্প মাগ্গী ভাতা দিয়া কি করিয়া চলিবে? বাধ্য হইয়া কাবুলীর দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। সরকার মাগ্গীভাতা কমিটী বসাইয়াছিল, কমিটী রায় দিয়াছে পুরা ভাতার পক্ষে। কিন্তু মালিক আজও সেই রায় সিন্দুক চাপিয়া বসিয়া আছে। সরকার বা মন্ত্রীমণ্ডলী এর জন্য একটু চিন্তাও করিতেছে না।

মহামারীঃ মহামারী আজ তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিদিন ইউনিয়নে খবর আসিতেছে অমুক বস্তীতে অসুখ—অমুকের ছুটীর দরখাস্ত—ঔষধের ব্যবস্থা কর। কোম্পানীতে ঔষধ মেলে না। যাহা দেওয়া হয় তাহাও প্রকৃত ঔষধ নয়। গত মাসের রোগসংখ্যার তুলনায় এই মাসে প্রায় ৫ গুণ বাড়িয়াছে। শরীরের শক্তি কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে ব্যাপক ম্যালেরিয়া মহামারী দেখা দিয়াছে। বহু ইলেকট্রিক শ্রমিক এই সব বস্তীতে বাস করে। তাহারা কাজে আসিতে পারিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে কলিক, রক্ত আমাশায় ডিস্পেপসিয়া লাগিয়াই রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কারখানার সেরা শ্রমিকদের মধ্যে মহাবীর সাধু, রমজান, জলিল সারং, কেষ্ট, বিলেশ্বর প্রভৃতি মারা গিয়াছে। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া তাহারা বিড়ম্বনায় জীবন যাপন করিতেছে।

কোম্পানী বোনাসঃ প্রডাকসন বোনাস, প্রফিট বোনাস, প্রভৃতি বহু রকমের নিয়ম কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের শুনাইয়াছে। ভর্ত্তির সময় তাহাদের প্রলোভন দেখান হইয়াছে। বহু কারখানাতে শ্রমিকরা বোনাস পাইতেছে। আর এদের ১৯৩৫এর পর হইতে আজ অবধি কোম্পানী সকল রকম বোনাস দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

মালিকের অবস্থা

কিন্তু মালিক যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ নিয়াছে। সে যুদ্ধের বাজারে এই বৎসরই ৬ মাসে প্রায় ২৯ কোটী, ৭১ লক্ষ, ৩৯ হাজার ৩৬৩ ইউনিট বিজলী-শক্তি বিক্রয় করিয়াছে এবং মুনাফা করিয়াছে ১ কোটী ৩০ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৫০ টাকা ৸৶০ আনা ৩ পাই। মালিকের কাজ কমে নাই। যুদ্ধের দরুণ একচেটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে। শ্রমিকদের অনবরত ওভারটাইম খাটিতে হয়। শরীরে শক্তি না থাকিলেও জোর করিয়া খাটাইয়া লইতেছে। পেটের দায়ে না হইলে পোষ্যদের দিকে চাহিয়া তাহাদের খাটিতেই হয়। যেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন বেশী সেখানেও অল্পসংখ্যক শ্রমিক লাগাইয়া কোম্পানী কাজ চালাইতেছে।

উৎপাদনের অবস্থা

এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর কয়লা আমদানী হইয়াছে কম। এই জন্য মালিকের চিন্তা কম। সে বয়লার খালি রাখিতেছে। টারবাইন বন্ধ রাখিতেছে। শ্রমিকদের ছাঁটাই করার অজুহাত খুঁজিতেছে। সরকার ভীত হইয়া কেবল আদেশ জারী করিতেছে—ইলেকট্রিক দুর্ভিক্ষ, বেশী বিজলী খরচ করা চলিবে না। কোম্পানীর দালালেরা আবার এই অবস্থার সুযোগ লইতেছে। ষ্টোর হইতে ইলেকট্রিক মোটর, ছাঁচ, পেট্রোল রেশন, ত্রিপল প্রভৃতি চুরী করিতেছে। মজুররা ধরিয়া দিলেও কোম্পানী কোন সাজার ব্যবস্থা করিতেছে না। ৪০ লক্ষ কলিকাতার নাগরিক জীবনে এবং সমগ্র শিল্প কেন্দ্রে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার আশংকার অস্ফুট ছবি ক্রমাগত মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে।

শ্রমিক সঙ্কটকে রুখিতেছে

গত বৎসরের দারুণ সংকট হইতে দেশবাসীকে তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় এবৎসরে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে সময়ে তাহারা সবল ছিল। এত মহামারী ছিল না। কিন্তু এবার তাহারা অসুস্থ দুর্ব্বল। গতবার তাহারা কৃষক জনসাধারণকে রক্ষা করিয়াছিল কিন্তু এবার তাহাদের রক্ষা করিবে কাহারা? গ্রাম্য জীবন—শহরের মধ্যবিত্ত জীবন ধ্বংস প্রাপ্ত প্রায় বলিলেই চলে।

কিন্তু শ্রমিক সংগ্রামশীল। নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তাহার আরো একতা, আরো দৃঢ় সংহতি গড়িতে হইবে। এই কথা শ্রমিক তাহার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সংগ্রামের মধ্য দিয়া শিখিয়াছে। তাই একতার সংগ্রাম জোরদার হইয়াছে। ইউনিয়ন সংগঠন দৃঢ় হইয়াছে। আজ মধ্যবিত্ত শ্রমিক ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত শ্রমিক সবাই ইউনিয়নের পতাকার নীচে সংগঠিত হইতেছে। গত সেপ্টেম্বরে যেখানে ইউনিয়ন সভ্য ছিল ৬০০ আজ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১০০। তাহারা বুঝিয়াছে তাহাদের বাঁচিবার একমাত্র পথ—তাহাদের ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত হওয়া।

জনসাধারণের কর্ত্তব্য

গত একমাস ধরিয়া তাহারা ৩০ টাকা মাগগী ভাতা, পচা রেশনের বদলে অবিলম্বে ভাল রেশন, টাকায় চারি আনা মাহিনা বৃদ্ধি এবং সর্ব্ব নিম্ন মাহিনার হার ২০ টাকা হইতে আরম্ভ এবং কোম্পানীর বিপুল মুনাফা হইতে আগামী বড় দিনের পূর্ব্বে একমাসের মাহিনাকে বোনাস হিসাবে দাবী তুলিয়াছে। এই দাবীর পিছনে আজ সমগ্র শ্রমিক একতাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। তাহাদের দাবীর পিছনে জনসমর্থন গড়িবার জন্য—আইন পরিষদকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য—কংগ্রেস ও লীগ এম, এল, এ, এবং জন নেতাদের নিকটও আবেদন করিতেছে।

গত ১২ই নভেম্বর কলিকাতায় তাহারা সমস্ত বিজলী শ্রমিকদের এক সম্মেলনে নিজেদের দাবী-দাওয়ার কথা তুলিয়াছে। দেশের জনসাধারণ দেশের নেতা কংগ্রেস ও লীগের কর্মীদের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে আবেদন করিয়াছে।

কিন্তু এই কাজে একা শ্রমিকদের লড়িলে চলিতে পারে না। দেশবাসী প্রত্যেককে আগাইয়া আসিতে হইবে।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
অফিস ঃ ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১৷০

ক্রীপস্ ও কুপল্যাণ্ডের ধাপ্পা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার দৃষ্টিতে কংগ্রেসের পিছনে যে সমস্ত ভারতব্যাপী প্রবল স্বাধীনতা আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কিছুই নহে। মুসলিম লীগের মধ্যেও যে মুসলিম জনসাধারণের প্রবল জাতীয় চেতনা ও তাহাদের নিজেদের বাসভূমে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং মুসলিম লীগ যে এই স্বাধীনতা আন্দোলনেরই নেতৃত্ব করিতেছে. একথাও তিনি স্বীকার করেন না। সাম্রাজ্যবাদের এই রক্ষণশীল প্রতিনিধির চোখে এই জনশক্তির কোন অস্তিত্বই নাই।

"গর্ব্ব অথচ ভয়ের মিশ্রণ" এই এক কথায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গর্ব্বের কারণ, ইহা মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং ভয় হইতেছে স্বাধীন ভারতে হিন্দু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্ভাবনা। তাঁহার কাছে কংগ্রেস আন্দোলন হইতেছে ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদের তাড়াইবার একটা শয়তানী চক্রান্ত আর লীগও তেমনি বিরোধী শক্তি যাহা সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিবে না।

কুপল্যাণ্ডের 'পাকিস্তান'

কুপল্যাণ্ড সাহেব যেভাবে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকটি দেশ-ভক্তের চোখ খোলা উচিত। তিনি পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষাকে বর্ণনা করিয়াছেন মুসলিম সাম্রাজ্য ফিরিয়া পাইবার আগ্রহরূপে, যে আগ্রহের পিছনে রহিয়াছে নিখিল বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র নীতির (প্যান ইসলামবাদ) আদর্শ।

তুর্কি, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্তানের মধ্যে সাদাবাদে যে চুক্তি হইয়াছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সেই চুক্তির অন্যতম অংশীদার রূপে যোগ দিতে পারে এইরূপ ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন। কুমতলব লইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "যেহেতু হিন্দু-ভারতের সঙ্গে অস্বাভাবিক বন্ধনের ফলেই পাকিস্তান এত দিন এই চুক্তিতে যোগ দেয় নাই, এখন কি সে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার সুযোগ খুঁজিবে না?" মুসলিম জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের বাসভূমে স্বাধীনভাবে বাস করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াও যে হিন্দুস্থানের সঙ্গে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সুপ্রতিবেশী হিসাবে বাস করিতে চায়, মুসলিম লীগের নেতারা যে বহুবার নিখিল বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রের আদর্শকে অস্বীকার করিয়াছেন এই সবকথা সাম্রাজ্যবাদের এই রক্ষককে বিশেষ বিচলিত করে না, কারণ তাহার নীতিই হইতেছে "ভেদনীতির সাহায্যে শাসন"।

তিনি তাঁহার নিজের খুসীমত পাকিস্তানের সীমারেখা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে থাকিবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং আম্বালা বিভাগ বাদে সমস্ত পাঞ্জাব। উত্তর-পূর্ব্ব পাকিস্তানে থাকিবে আসাম এবং বর্দ্ধমান বিভাগ বাদে সমস্ত বাংলাদেশ।

তারপর তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান স্থাপনের পথে শিখরা প্রধান অন্তরায় হইবে এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহাদের উপর জোর করিয়া পাকিস্তান চাপাইলে গৃহযুদ্ধ হইবে! এই ভাবে তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুরা কলিকাতাকে পূর্ব্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করিবে অথচ কলিকাতাকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না করিলে পূর্ব্বপাকিস্তান গঠনই মুস্কিল হইয়া পড়ে।

কংগ্রেস ও লীগ যে এই সীমা নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তাহাদের নিজেদের ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আপোষে আসিতে পারে এ কথা এই গোঁড়া রক্ষণশীল চাণক্য পণ্ডিতের ধারণার একেবারেই বাইরে।

এই চিন্তাধারার দৌড় কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। তাঁহার মতে এই ভাবেও যে পাকিস্তান গঠিত হইবে তাহা নিজেকে রক্ষা করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে না। বিজ্ঞ অধ্যাপকটি বর্ত্তমান বাজেটের অঙ্কের সাহায্যে এই কথাটি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন! হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি দ্বারা যে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, "হিন্দুরা যে মুসলমানদের রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে ইহা কল্পনাতীত।"

তারপর তিনি ভারত ব্যবচ্ছেদের ফলে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ভণ্ডের মত তিনি বলিয়াছেন, "ভারত ব্যবচ্ছেদ যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তবে প্রত্যেকেই আশা করিবে, যদিও এই আশা নিশ্চিতভাবে করা যায় না, যে এই ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে হিন্দু-বিরোধিতা সক্রিয় শত্রুতায় পরিণত হইবে না।" পরিশেষে তিনি "বিভক্ত ভারতে গৃহযুদ্ধের" ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন। (যাহা এই প্রবন্ধে প্যারায় উদ্ধৃত হইয়াছে।)

এই ভাবে কুপল্যাণ্ড সাহেব ভারতীয় সমস্যাকে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে হিন্দু ও মুসলমানরা তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় কোন সমাধানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। একটী সর্ব্বসম্মত কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা আর কোন রকমেই সম্ভব নয়। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের নূতন বীজ লুক্কায়িত থাকিবে এবং উহা দুর্ব্বল হইবে। বিভক্ত ভারতও অসহায় ও শক্তিহীন হইবে।

শয়তানী চক্রান্ত

কুপল্যাণ্ডের আগাগোড়া বক্তব্যই মিথ্যা আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ভণ্ডামি মাত্র। আসলে তিনি এদেশে প্রেরিত হইয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের চর হিসাবে। যুদ্ধোত্তর ভারতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হিসাবে সেই ক্রীপস্ প্রস্তাবই চালু করিবার জন্য তিনি নূতন 'তথ্য সংগ্রহের' কাজে ভারতে আসিয়াছেন।

এই ঝানু সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকের মগজে এই সাধারণ সত্যটুকু প্রবেশ করে নাই যে, কংগ্রেস এবং

স্বাধীনতার ধোঁকা

পাকিস্তানের ছল

লীগ উভয়েই ভারতীয় জনগণের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং প্রথম ব্যর্থতার পরেও উভয়েই স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐক্যবদ্ধ তাহারা হইবেই। অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের ফলে ভারতীয় জনগণ বিপুল মানসিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী, এতবড় ঘটনা কুপল্যাণ্ডের খেয়ালই হয় নাই। দেশপ্রেম ও ঐক্যের জ্বলন্ত প্রেরণায় একথা যখন আমরা নিজেরা উপলব্ধি করিতে পারিব, সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকের সংখ্যাগণনার কসরৎ সহজেই তখন বানচাল হইয়া যাইবে।

সীমান্ত নির্দ্ধারণ, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা—সমানাধিকার এবং পারস্পরিক সমতা, সাহায্য ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে, এইসব সমস্যার সমাধান আমরাই করিতে পারিব কারণ একই স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিক ও বন্ধু আমরা। কুপল্যাণ্ডের চিন্তা জগতে এসবের স্থান না থাকাই স্বাভাবিক।

এসত্ত্বেও, এই ধূর্ত্ত অধ্যাপকটী "নিরপেক্ষ দর্শকের" অভিনয় করিয়া কিছুসংখ্যক পাকিস্তান বিরোধী জাতীয়তাবাদীকে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই প্রতারিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কুপল্যাণ্ডকে নজীর হিসাবে উল্লেখ করিতে সুরু করিয়াছেন। ডাঃ শৌকতুল্লা আনসারীর "পাকিস্তান—ভারতের সমস্যা" নামে সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকে পাকিস্তান দাবীকে নাকচ করিবার জন্য কুপল্যাণ্ডের বহু বক্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে। পাকিস্তান-বিরোধী জাতীয়তা-বাদীরা এখনও পাকিস্তানকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল মনে করেন বলিয়াই এ ধরণের ঘটনা সম্ভবপর হইতেছে। পাকিস্তান দাবী মুসলিম লীগের স্বাধীনতারই দাবী এবং স্বাধীনতার মত পাকিস্তানও সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্ক উদ্রেক করে একথা দেশভক্তরা যতশীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন, জাতীয় ঐক্যও ততই ত্বরান্বিত হইবে।

কুপল্যাণ্ড-পরিকল্পনাকে আরো বিশ্লেষণ করিলেই এই কথা স্পষ্টতর হইবে। এই পরিকল্পনার "পাকিস্তান" কংগ্রেস-লীগ মিলন ও আন্দোলনের ফলে আসিতেছে না। এই "পাকিস্তান" বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উপর হইতে চাপাইয়া দিবে। কুপল্যাণ্ডের মতে, রাজন্যবর্গ পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তান, কোনটার মধ্যেই যোগদান করিবে না।

যদি কংগ্রেস এবং লীগ পাকিস্তানের ভিত্তিতে এবং পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের পারস্পারিক সাহায্য ও সম্পর্কের নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গড়িতে সক্ষম না হয়, তবে গান্ধীজী যেকথা বলিয়াছেন, রাজন্যবর্গের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ সেই "ভারতের চিরব্যবচ্ছেদ প্রথাকেই" জীয়াইয়া রাখিবে, নিজের একচেটিয়া শাসন ক্ষমতা বজায় রাখিবে।

কুপল্যাণ্ড-পরিকল্পনার ইহাই হইতেছে মূলকথা। যুদ্ধের শেষে এশিয়ায় নূতন কায়দায় সাম্রাজ্য বজায় রাখার যে স্বপ্ন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা দেখিতেছেন, এই পরিকল্পনা সেই নীতির অনুসরণেই রচিত হইয়াছে।

কুপল্যাণ্ডের মতে দেশীয় রাজ্যগুলি একটী পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করিয়া বৃটেনের সাথে সরাসরি সন্ধি স্থাপন করিতে পারিবে। সাথে সাথেই তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যে কাথিয়াবাড়, সিন্ধু রাজপুতানা হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন পর্য্যন্ত এক অখণ্ড ভূভাগে দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান। এই দেশীয় রাজ্য গুলিকে লইয়া কুপল্যাণ্ড একটী আলাদা ডোমিনিয়ন অর্থাৎ একটী রাজন্যস্তান গঠনের পরিকল্পনা আঁটিয়াছেন।

সিন্ধু ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী অখণ্ড ভূভাগের দেশীয় রাজ্যগুলি সন্ধিসূত্রের নাগপাশে কার্য্যতঃ সাম্রাজ্যবাদেরই গোলাম হইয়া থাকিবে, এই প্রস্তাব করিতে যাইয়া কুপল্যাণ্ডের রসনা রসাল হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেনের সঙ্গে এই ডোমিনিয়নটী শুধু যে দেশরক্ষা ব্যাপারে সন্ধি-সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে, তাই নয়, ইচ্ছা হইলে অস্ত্রশিক্ষা এবং অন্যান্য শিল্প প্রসারের জন্যও বৃটেনের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারিবে। কুপল্যাণ্ডের ধারণা, কেবলমাত্র সামরিক দিক হইতেও এই ব্যবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপত্তি উঠিবে না।

"ভারতের মধ্যভাগে বৃটিশ অধীনস্থ কতকগুলি বিমানঘাঁটী বৃটিশ কমনওয়েলথের মূলস্বার্থ সহজেই রক্ষা করিতে পারিবে।"

যোধপুর, গোয়ালিয়র এবং মধ্যভারতের অগণ্য দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত বিমানঘাঁটিগুলির কথাই এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইভাবেই যুদ্ধোত্তর "স্বাধীন" ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সাহায্যে প্রাচ্যের পুনরর্জ্জিত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কুপল্যাণ্ড প্রধান প্রধান বিমান পথ বৃটিশের কর্তৃত্বে রাখার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

অববাহিকা তত্ত্ব

খুসীমত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের স্বপক্ষে কুপল্যাণ্ডের কি যুক্তি রহিয়াছে? নিজ বাসভূমে বিভিন্ন জাতিসমূহের স্বাধীন হইবার যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, স্বাধীন ভারতে প্রত্যেকটি জাতির নিজ ইচ্ছামত জাতীয় সংস্কৃতি ও ভবিষ্যতকে নির্দ্ধারণ করিবার যে আগ্রহ রহিয়াছে—সাম্রাজ্যবাদী অনুচর কুপল্যাণ্ডের তাহাতে কিছু আসে যায় না।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থে, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন বোধে এই রাষ্ট্র গঠনের স্কীম আঁটা হইয়াছে; কিন্তু সেকথা স্পষ্টভাবে বলায় বাধা আছে। তাই, ক্রীপস-প্রস্তাবের নবসংস্করণের ভিত্তিতে একপাল রাষ্ট্রগঠনের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করার জন্য ভূয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। এই তত্ত্বের নাম—নদী-অববাহিকা থিওরী! কুপল্যাণ্ড বলিয়াছেন, এই স্কীম নাকি ১৯৫১ সালে একজন পরিশ্রমী সেন্সাস অফিসারের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে!

এই স্কীম অনুসারে, উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হইবে সিন্ধুনদের অববাহিকায়। বাংলা ও আসামের বঙ্গীস্তান গঠিত হইবে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার ব-দ্বীপে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের হিন্দুস্তান রাষ্ট্র গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত অঞ্চলের রাষ্ট্র হইবে। এরপর রাজপুতানা প্রভৃতি এলাকায় রাজন্যস্থান এবং পরিশেষে দাক্ষিণাত্য। কিন্তু শেষোক্ত দুইটা এলাকাকে কোনো নদী-অববাহিকার সঙ্গে আর খাপ খাওয়ানো সম্ভবপর হইল না।

এই অদ্ভুত রাষ্ট্রগুলিকে কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে যুক্ত রাখা হইবে? একথা স্বীকার্য্য, এই রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) অথবা সম্মিলিত রাষ্ট্র (কনফেডারেশন) গঠন করা সম্ভব নয়। এই সব পাকিস্তান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের "স্বাধীনতা" তো রক্ষা করিতে হইবে। কেবলমাত্র একটি 'দুর্ব্বল' কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই একাজে সক্ষম, তাই কুপল্যাণ্ড "এজেণ্ট পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা" গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য এই হইতেছে নব আবিষ্কৃত সর্ব্বশেষ শাসনতান্ত্রিক কসরৎ।

এই "দুর্ব্বল" এজেণ্ট পরিচালিত কেন্দ্রীয়-সংগঠনের অধীনে "মাত্র" তিনটী বিষয় চলিবে—(ক) বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা (খ) বহির্বাণিজ্য ও শুল্কনীতি প্রণয়ন (গ) মুদ্রানীতি।

যথেচ্ছভাবে ব্যবচ্ছিন্ন ভারতের মাথার উপর তিনটী মূল ক্ষমতার অধিকারী "দুর্ব্বল" এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার আসল অর্থ বোঝা কি এতই কঠিন? না, মোটেই নয়।

দেশকে এবং দেশবাসীকে খেয়াল খুসীমত বিভক্ত করিয়া, রাজন্যস্তানে ঘাঁটি গাড়িয়া এই "দুর্ব্বল" কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাটী আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদী প্রভুদেরই দুর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমগ্র দেশের প্রগতি ও উন্নতির গলা টিপিয়া ধরিবে। "এজেণ্ট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার" হোয়াইট হল প্রভুত্বেরই নূতন নামকরণ মাত্র।

আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হই, তবে কুপল্যাণ্ড-ক্রীপস পরিকল্পনা যে ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য রচনা করিতেছে, সেই ভবিষ্যৎ হইতেছে গৃহযুদ্ধে জর্জ্জরিত শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ। এই সত্য যে কুপল্যাণ্ড নিজেও উপলব্ধি করেন, প্রবন্ধের গোড়ার দিকে উদ্ধৃত তাঁর মন্তব্যগুলি হইতেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। সুতরাং এই ধরণের শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষকে জোড়া দিয়া রাখিবার জন্য 'দুর্বল' কেন্দ্রের ভিতর বৃটীশ বাহিনী ও বৃটীশ শক্তিকে আবাহন করিবায় ওজর পাওয়া যাইবে।

একথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে আজ দেশের সম্মুখে সমস্যা এই নয়—সংযুক্ত ভারত অথবা মিঃ জিন্নার পাকিস্তান দাবীর ফলে খণ্ডিত ভারত। যদিও সাধারণ কংগ্রেসভক্তদের মতে আসল সমস্যা হইতেছে ইহাই।

দেশের সম্মুখে আজ প্রকৃত ভবিষ্যত হইতেছে—হয়, কংগ্রেস-লীগের মিলিত আন্দোলনের ফলে স্বাধীন হিন্দুস্তান ও স্বাধীন পাকিস্তান এবং এদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারত ও দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি, আর নয় তো ভারতের চিরস্থায়ী ও ডবল ব্যবচ্ছেদ—যার ফলে না হইবে স্বাধীন পাকিস্তান, না হইবে স্বাধীন ভারতবর্ষ; শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের চির যন্ত্রণা ও চরম অনৈক্যের দুর্ভাগ্য বহন করিয়া চলিতে হইবে।

রামধনু

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা

অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য—৩৲ টাকা

"অমৃতবাজার পত্রিকা" বলেন: গভীর বেদনা 'রামধনু'র উৎস, বইখানির জন্যে লেখিকা ১৯৪৩এ 'ষ্টালিন পুরস্কার' পেয়েছেন।...এই বইখানির অনুবাদক আনাড়ী নন। এমন সুন্দরভাবে তিনি অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন তাতে আমরা বুঝতেই পারি নি যে, বইখানি আসলে অনুবাদ অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য সুরক্ষিত আছে।...

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C2836.

সোভিয়েটের অপরাজেয় শক্তি

নভেম্বর দিবসে ষ্টালিনের মুখে লালফৌজের কৃতিত্বের কথা

শিল্পক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েটের কর্ম্ম-তৎপরতার বিবরণ দিয়া ষ্ট্যালিন বলেন; "ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের এই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শক্তি অন্য যে কোন রাষ্ট্রের শক্তি হইতে বহুগুণে বেশী। অক্টোবরের বিপ্লবের ফলে যে, সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আমাদের জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীকে বিপুল শক্তিশালী করিয়াছে। এখন জার্ম্মানদের চেয়ে লালফৌজের বেশী ও উৎকৃষ্ট ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান আছে। আমাদের লালফৌজ এককভাবে জার্ম্মানবাহিনীকে পরাজিত করিয়াছে কিন্তু সমরশিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা কম সাফল্যলাভ করি নাই। এই কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, লাল ফৌজের গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড আক্রমণ না হইলে আমাদের মিত্রশক্তিবর্গ এত শীঘ্র জার্ম্মানদিগকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে মুক্ত করিতে পারিত না। এখন হইতে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইল, জার্ম্মাণীর উপর অবিরাম আঘাত হানা,ইহাই হইল জয়লাভের উপায়।"

(১৯৪৪ নভেম্বর বিপ্লব দিবস বক্তৃতা হইতে)

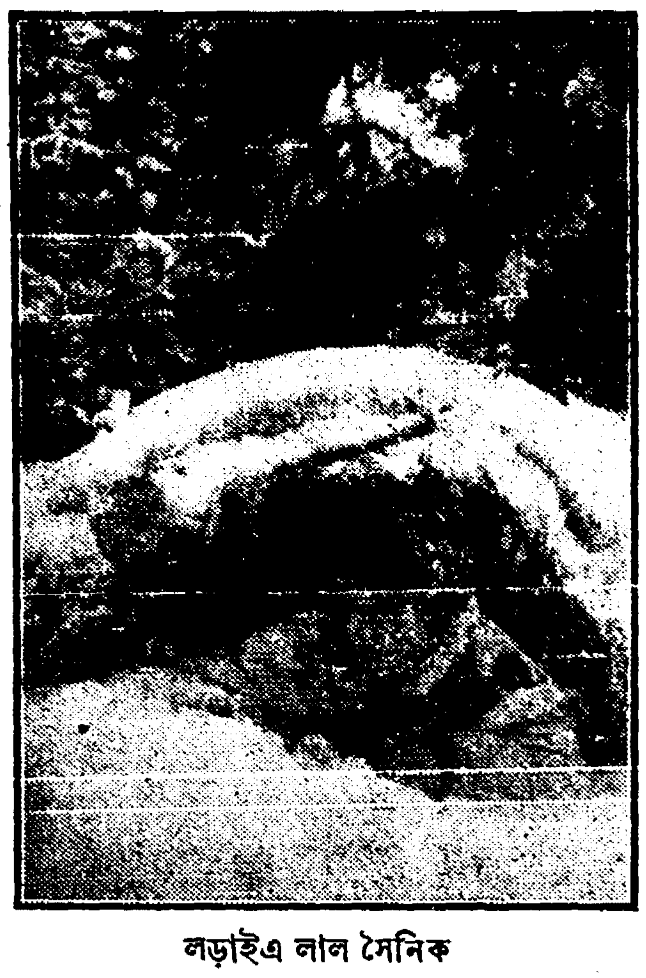

লড়াইএ লাল সৈনিক

হিটলারী-দানবদের আর রেহাই নাই

লালফৌজের দুর্ব্বার গতি

গত নভেম্বর দিবসের বক্তৃতায় ষ্টালিন বেশ সোজাসুজি ভাবেই বলিয়াছেন—লালফৌজ আজ চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, এই লক্ষ্য হইল মিত্রদের সহযোগে জার্ম্মান ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করা, ফ্যাশিষ্ট জানোয়ারদের আস্তানায় ঢুকিয়া তাহাদের নিশ্চিহ্ন করা এবং বার্লিন নগরীর উপর সগর্ব্বে বিজয় পতাকা উড্ডীন করা।

ফ্যাশিষ্টবাদকে ধ্বংস করার এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই আজ লালফৌজ ও অন্যান্য মিত্রশক্তিগুলি লড়াইয়ের শেষ ধাপে আসিয়া পৌছিয়াছে।

কিন্তু সংগ্রাম আরও ভীষণ হইবে

গত বৎসরে লালফৌজের একটানা সর্ব্বাঙ্গীন জয়ের পরেও ষ্টালিন তাঁহার বক্তৃতায় একথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে জার্ম্মাণী তাহার শক্তির প্রধান অংশ পূর্ব্ব-সীমান্তেই জড়ো করিয়াছে।

'সোভিয়েটের সাথে একবার শেষ বোঝাপড়া করিতে হইবে' হিটলারের এই উক্তিই আজ কাজে পরিণত হইতেছে। লড়াইয়ের ভীষণতা দিনের পর দিন চরমে উঠিতেছে। জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কি আজ জার্ম্মানদের কাছ হইতে ভীষণ বাধা পাইতেছেন। গত ৪ঠা নভেম্বর সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব প্রুশিয়ার গোলডাপের উত্তর ও দক্ষিণে ১০ দফা পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে জার্ম্মানরা রুশবাহিনীকে কিছুটা পিছনে ঠেলিয়া নিয়া যায়। কিন্তু লালফৌজ আক্রমণ করিয়া আবার আগাইয়া গিয়াছে। এই সব অঞ্চলে অনেক স্থানেই হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে।

লালফৌজ শত্রুকে বিশ্রাম দিবে না

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে; বাল্‌টিক উপকূলে বহু স্থানে জাহাজ হইতে সৈন্য নামাইয়া দিতে পারেন। সোভিয়েট সৈন্য অবতরণের ভয়ে হিটলার সমগ্র বাল্টিক সমুদ্র অঞ্চলে জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করিয়াছে।

এই পরিকল্পনা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই হাঙ্গেরীয় ফ্রণ্টেও লালফৌজের জোর নূতন ব্যাপক আক্রমণ সুরু হইয়াছে। আরও খবর আসিয়াছে যে ইতিমধ্যেই দুই স্থানে জার্ম্মান-হাঙ্গেরিয়ান আত্মরক্ষা-ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গণেও হিটলার কাবু

সমগ্র বেলজিয়াম আজ শত্রুকবল-মুক্ত। হলাণ্ডের ভালচেরেনে অবশেষে জার্ম্মানরা মিত্রসেনার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সোলেন দ্বীপ এখন আর জার্ম্মানদের হাতে নাই। আবার এদিক আর একটি খবরে প্রকাশ যে মেৎসের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মানরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, মিত্রসেনা এই সহরের ৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে।

হিটলারের ধূর্ত্তামি টিঁকিবে না

পরাজয়ের মুখে হিটলার আজ নূতন চাল চালিতেই চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহার দিক হইতে কোন কোন মিত্রশক্তির কাছে শান্তি প্রস্তাবের কানাঘুঁষা গিয়া পৌছিয়াছে। পোপের মারফৎ নাৎসী এজেণ্টরা স্পেন ও পর্টুগালে বসিয়া এই কাজ চালাইতেছে। খবর পাওয়া গিয়াছে পর্টুগালের ডিক্টেটর সালাজার জার্ম্মানী যাহাতে 'নরম সন্ধির সর্ত্ত' পায় তাহাই চায়। কিন্তু কোন মিত্ররাষ্ট্রেই হিটলার বা অন্যান্য দেশে তাহার সগোত্ররা-ইহাতে সুবিধা করিতে পারিবে না। আজ নভেম্বর দিবসে ষ্টালিনের বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—ভবিষ্যতেও হিটলারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়াইবার চেষ্টা তাহারা (নাৎসীরা) করিবে।... বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যে মিত্রতা তাহা আকস্মিক বা সাময়িক প্রয়োজন নহে—জরুরী এবং স্থায়ী স্বার্থের উপরই উহা প্রতিষ্ঠিত।... যুদ্ধের শেষ অধ্যায়েও যে এই মিত্রতার বন্ধন অটুট থাকিবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

কলিকাতায় লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া

সরকার ও কর্পোরেশনের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি

কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর—বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বি, সি, রায় নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—

যে ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে এতকাল পল্লী অঞ্চলকে ধ্বংস করিয়া আসিতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কলিকাতা মহানগরীতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। পক্ষকাল পূর্ব্বে ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে উহার সূচনা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় ১৮, ১৯, ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডেও উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি সত্বর উহা দুরীভূত করার চেষ্টা না হয় তবে শীঘ্রই সমগ্র-সহরে উহা ছড়াইয়া পড়িবে।

উপরোক্ত ওয়ার্ডগুলি হইতে হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই উক্তরোগে আক্রান্ত এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনই শয্যাশায়ী হইয়াছে। এই চারিটি ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে ১ লক্ষ লোকই উক্তরোগে আক্রান্ত। বেলিয়াঘাটা ও নারিকেলডাঙ্গায় কোন কোন বাড়ীতে বাড়ীর প্রত্যেকটি ব্যক্তিই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত।

রোগগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য কর্পোরেশন ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা ১৭টি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। কর্পোরেশন কিছু কিছু ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ দিতেছে বটে, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুই পাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের নিজ নিজ কেন্দ্রের জন্য ঔষধ ক্রয় করিতে হইতেছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রত্যহ ১৪০ জন করিয়া রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এক একটি কেন্দ্রে সাড়ে তিন শত পর্য্যন্ত রোগী আসিয়া থাকে, সুতরাং চিকিৎসা সাহায্য পায় না এমন লোকের সংখ্যা খুবই বেশী। ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা অনধিক ৩ জন চিকিৎসা সাহায্য পাইয়া থাকে।

এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব যাহাদের, সেই কর্পোরেশন ও গভর্ণমেণ্ট কিভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছে জনসাধারণকে সে সম্পর্কে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয় না। বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোন কোন প্রধান অংশ যথা, বেঙ্গল সিভিক প্রোটেকশন কমিটি এবং পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনামূল্যে ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধাদি চাওয়া হইয়াছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সংবাদপত্রে দেখিলাম, চাঁপাতলা জনরক্ষা সমিতিও অনুরূপ আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে কিয়ৎপরিমাণ ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রদেশের স্নায়ুকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীদের সেই সুবিধাদানে তাঁহারা অক্ষমতা জানাইয়াছেন। প্রকাশ, কর্পোরেশনকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রায় পৌণে দুইলক্ষ ট্যাবলেট মেপাক্রিণ ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বলা চলে। ইহার দ্বারা মাত্র ১০ হাজার অর্থাৎ শতকরা ১০ জন রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বল এলাকার জন্য সিভিল সার্জ্জন ও মহকুমা হাকিমের মারফৎ চিকিৎসা সাহায্য দান প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতায়ও কেন যে সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অবশ্যএ কথা সত্য যে এবিষয়ে কর্পোরেশনের দায়িত্ব সর্ব্বাধিক ; কিন্তু বাহিরের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের পক্ষে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়ত সম্ভব নহে। কোন ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধাদি সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং কলিকাতা নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য সরকারের সহযোগিতায় কর্পোরেশনের একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

যখনই এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে, পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্যভার চাপাইতে ব্যস্ত। এই দুইটী কর্তৃপক্ষ যদি এভাবে তাঁহাদের দায়িত্বভার একে অপরের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং অবিলম্বে এই হাজার হাজার মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বন না করেন, তবে তাহার পরিণাম অতিশয় মর্ম্মান্তিক হইবে।

এদিক দিয়া প্রথম কাজই হইবে, সমস্ত রোগার্ত্ত জনসাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধপত্র সরবরাহ করা। গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন যতদিন ধরিয়া একাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে, ততদিন এই ক্রমবর্দ্ধমান মৃত্যুস্রোত ও মহামারীর দিকে তাকাইয়া আমরা স্থির থাকিতে পারি না।

ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ অভাবে যে সব রোগীর পূরা চিকিৎসা হয় না, তাহারা আবার যে কোন সময় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে পারে। এই ভাবে পুনরাক্রমণের ফলে ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলি ক্রমেই ঔষধ সত্ত্বেও দুরারোগ্য হইয়া পড়ে এবং এই অর্দ্ধচিকিৎসিত রোগীদের দ্বারা রোগ আরও ছড়াইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা ছাড়াও সমবেত ভাবে আমাদের এই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধপত্র দিয়া রোগীদের সাহায্য করিতে হইবে। —ইউ পি

কমিউনিষ্টদের কারামুক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য

বঙ্গীয় রেড-এড কমিটির আন্দোলন

গত ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টী সভ্যদের এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ধর, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কমরেড মুজফফর আহমদ **রেড-এড-কমিটির** গোড়াপত্তন হইতে গত দশ মাসের কাজের একটা রিপোর্ট পেশ করেন। কমিউনিষ্ট কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিছু করিতে পারিলেও বন্দী-মুক্তির আন্দোলনে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই—ইহাই ছিল তাঁহার মূল বক্তব্য। তিনি সভায় একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন ; ইহার মর্ম্ম এই—

(১) কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও পরিবারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজনৈতিক বন্দী, বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট বন্দীদের মামলার পরিচালনা, বন্দী ও পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য এবং তাঁহাদের মুক্তির জন্য অবিরাম আন্দোলন পরিচালনা—এই সমস্ত কাজ রেড-এড-কমিটিকে করিতে হইবে।

(২) রেড-এড-কমিটি জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত অর্থের অর্দ্ধেক পার্টিকর্মীদের স্বাস্থ্য ও বাকী অর্দ্ধেক মুক্তি আন্দোলনের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত কমিটির আয় ব্যয় কি হইয়াছে তাহাও পেশ করা হয়।

(৩) সমস্ত কাজ ভালভাবে চালাইবার জন্য ১৫ জনকে লইয়া ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় রেড-এড কমিটিকে স্থায়ী ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। অস্থায়ী কমিটির পরিবর্ত্তে এই নবগঠিত স্থায়ী কমিটি কি ভাবে কাজ চালাইবে তাহার একটী গঠনতন্ত্র পেশ করা হয়। একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও দুইজন সহঃ সম্পাদক (একজন পার্টিস্বাস্থ্য ও অপর জন বন্দী সংক্রান্ত কাজের জন্য) এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিতে হইবে।

কমরেড মুজফফর আহ্‌মদের প্রস্তাব সমর্থিত ও আলোচিত হওয়ার পর ঐ প্রস্তাব ও আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। সভায় যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি কমরেড মুজফফর আহ্‌মদ,সম্পাদক নিরঞ্জন সেন, সহঃ সম্পাদক—ডাঃ সমর রায় চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সুনীল সেন। আর একজন সহঃ সম্পাদক নির্বাচন বাকী আছে। গৃহীত আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ ঃ **১৯৪৩ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—**

আয়

কমিউনিষ্ট পার্টির	
প্রাদেশিক কমিটীর দেওয়া	১০,৫৮০৲
ব্যক্তিগত চাঁদা আদায়	২৫৮৩৷৴০
সভ্যদের "সপ্তাহে এক আনা"	
বাক্সে আদায় (৫ মাসে)	৫৯৪৲
কলিকাতা জিলা কমিটি	২৩২৫৷৷৩
প্রাদেশিক মেডিকেল ইউনিট	১৯০৬৸৶৬
অন্যান্য জেলা	১,১৫৮৷৷৶৩
অন্যান্য প্রদেশ	৭,০৮৬৸৶৬
মোট	২৬,২৩৫৷৷৬

ব্যয়

পার্টি বিশ্রামাগারের	
ব্যয় (ঔষধপত্র ধরিয়া)	১৪,৯২৫৸৶৬
ভগ্নস্বাস্থ্য কর্মীদের হাওয়া বদলাইতে	
পাঠানোর খরচ	৬,৭৭৩৷৩
রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য	৩০৫৸৴০
হাণ্ডবিল প্রভৃতি ছাপার খরচ	৬৩৪৸৴৯
মোট	২২,৬৩৯৸৶৬
হাতে জমা	৩৫৯৫৷৷৴০
মোট	২৬,২৩৫৷৷৬

কমরেড সত্য চক্রবর্ত্তী রেড-এড-ফণ্ডে একজন সহানুভূতিশীল ভদ্রলোকের কাছ হইতে একটী সোণার আংটী পাইয়াছিলেন, সভাস্থলেই তাহা তিনি দান করেন। কমরেড গোপাল হালদার তাঁহার সম্প্রতি তিনখানি প্রকাশিত বইএর আয় হইতে ১০০৲ টাকা রেড-এড ফণ্ডে দান করেন

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা] ২২শে নবেম্বর, '৪৪, বুধবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ৫॥ লক্ষ সভ্য

লীগ কাউন্‌সিলের বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ

লীগকে এসেম্ব্‌লি রাজনীতির বাহিরে আনিতে প্রতিনিধিদের আগ্রহ

(নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ)

গত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ কাউন্সিলের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গেল।

এতদিন লীগের প্রভাব ছিল কিন্তু উপযুক্ত সংগঠন ছিল না। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী বা এসেম্বলি পার্টি হইতেই প্রধানত উহার সংগঠন পরিচালিত হইত। কিন্তু গত এক বছরের চেষ্টায় এবার লীগ বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্টান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেক্রেটারি আবুল হাশেম সভার প্রথমেই যে রিপোর্ট দিলেন তাহাতে জানা গেল এ বৎসর বাংলা দেশে লীগের মোট সভ্য হইয়াছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ। বাংলার কংগ্রেসেও কখনও এত সভ্য হয় নাই। ১৮টী প্রধান প্রধান জেলায় লীগ সংগঠন বেশ মজবুতভাবে প্রতিষ্টিত হইয়াছে, অন্যান্য জেলায়ও তোড়জোড় ভালই চলিতেছে।

লীগের সংগঠন পদ্ধতিতেও নূতন চেতনা আসিতেছে। যাঁহারা সারা সময় মন দিয়া শুধু লীগ সংগঠনের কাজই করিবেন এরূপ স্বার্থত্যাগী অথচ উপযুক্ত কর্মীকে মাসোহারা দিয়া রাখিয়া কাজ চালানো আরম্ভ হইয়াছে। চার পাঁচ জায়গায় কর্মীদের জন্য 'পার্টীভবন' স্থাপন করা হইয়াছে। কর্মীদের রাজনীতিক শিক্ষার জন্য ফরিদপুরে একটী ট্রেনিং-ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

দূর দূরান্তের মফঃস্বল ও গ্রাম হইতে পর্য্যন্ত দলে দলে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন সভায় যোগ দিতে। একটী বসুপন্থী কাগজের রিপোর্টারও অবাক হইয়া আমাকে বলিলেন, "সত্যি, মফঃস্বলের এত প্রতিনিধি আমি কোনো কংগ্রেস সম্মেলনেও দেখিনি।"

সম্মেলনে পরিষ্কার দেখা গেল মন্ত্রিমণ্ডলী তথা পুরানো নেতৃত্বের উপর অনেকেই খুশী নন। 'মন্ত্রীত্বের জন্য লীগ নয়, লীগের জন্য মন্ত্রীত্ব' এই কথা অনেকবার শোনা গেল। এসেম্বলি সভারা শুধু এসেম্বলির সভ্য বলিয়াই বিনা নির্বাচনে লীগ কাউন্সিলের মেম্বর হইবার অধিকারী—ইহার বিরুদ্ধেও প্রবল আপত্তি উঠিল। এমন কি ইহা নাকচ করিবার প্রস্তাবও আসিয়াছিল, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটী থাকায় সভাপতি উহা বাতিল করিয়া দিলেন।

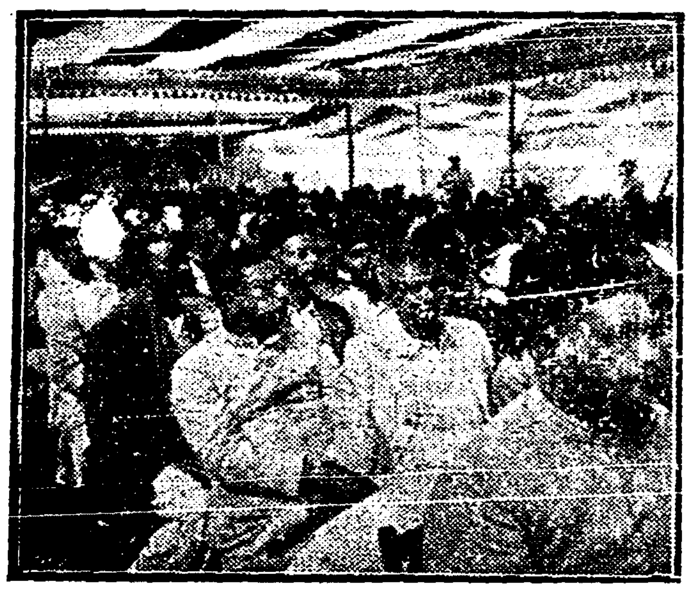

প্রতিনিধিদের একাংশ

বগুড়া জেলা লীগের সম্পাদক মৌলবী ইলিয়াস বর্ণনা করিলেন: কিরূপে তাঁহারা মুসলিম জনসাধারণের জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রীদের কাছে বার বার ডেপুটেশন লইয়া আসিয়াছেন কিন্তু 'কিছু করা যায় না' শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে "মন্ত্রীত্ব যদি এইরূপে লীগের জন্য কাজ না করিতে পারে তবে আমরা যাহারা গ্রামে কাজ করি তাহাদের ভয়ানক মুস্কিল।"

তাই নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ, নূতন নেতৃত্ব গঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইহাই এবারকার লীগ অধিবেশনে কর্মী সাধারণের কথায়, বার্ত্তায়, বক্তৃতায় সর্বত্র প্রকাশিত হইল। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে অন্তত আংশিকভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে—এই দাবী লইয়া অধিবেশনের কয়েকদিন আগে হইতেই বিভিন্ন প্রতিনিধি মহলে আলোচনার পর আলোচনা, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব চলিয়াছিল।

মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থকেরাও ঘাবড়াইয়া গিয়া ভাবিতেছিলেন এই নূতন শক্তিকে এখনই সময় থাকিতে দমাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো আর নিজেদের প্রতিষ্ঠা রাখা যাইবে না। তাই তাঁহারাও চেষ্টা করিতেছিলেন যে আবুল হাশেম

মঞ্চের উপর সভাপতি মৌঃ আক্রাম খাঁ

প্রভৃতি যেসব "বামপন্থী" আগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন তাঁহাদিগকেও সরাইয়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণ মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গড়িয়া লইবেন। সেজন্য আবুল হাশেম কমিউনিষ্টদের লোক ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারও সুরু হইয়াছিল।

কিন্তু প্রথম দিনের অধিবেশনে সভার ভাবগতিক দেখিয়া মন্ত্রীপন্থীরা অন্তত নিজেদের উদ্দেশ্যমত প্রস্তাব তুলিতে সাহস করিলেন না। সেদিন সভা মুলতুবী রহিল।

প্রথম অধিবেশনের বাদ-বিতণ্ডায় যেন মনে হইল একদল **লোকের** বিরুদ্ধে আর একদল লোকের ঝগড়া, সংগঠন কে দখল করিবে ইহার ঝগড়া। সংগঠনের সকলে একসঙ্গে মিলিয়া কোন্ **পথে** এখনি চলিব তাহা যেন সে ঝগড়ার বিষয় নয়।

তার উপর কর্মীদের শোরগোলটাও একটু উগ্র হইয়াছিল। ইহার সুযোগ লইয়া হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার প্রভৃতি লিখিতে লাগিল যে লীগের তরুণ দল এবার বিদ্রোহ করিবে ইত্যাদি। তাঁহাদের লেখা পড়িলে মনে হয় যে লীগে বুঝি ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং তাহাতে তাঁহারা খুশী হইয়াছেন।

ইহা হইতেই কর্মী-সাধারণ বুঝিলেন যে বিদ্রোহে লীগের শক্তিবৃদ্ধি হয় না, লীগের ভিতরে সমস্ত গ্রুপ যত একত্র হইতে পারিবে ততই লীগের শক্তি বাড়িবে। এবং লীগের শক্তি যত বাড়িবে তাঁহাদের পরস্পরের শক্তিও ততই বাড়িবে। অবশ্য আবুল হাশেম সাহেব ইহার জন্য সম্মেলনের গোড়া হইতেই কর্মী-সাধারণের কাছে আবেদন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে এবারও সর্বসম্মতিক্রমে মৌলানা আক্রাম খাঁ সভাপতি ও আবুল হাশেম সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। তৃতীয় অধিবেশনে সুহরাবর্দি সাহেবের তৈয়ারী লিষ্ট মত ওয়ার্কিং কমিটিও একবাক্যে নির্বাচিত হইল। মৌলানা আক্রাম খাঁ গদগদভাবে ঘোষণা করিলেন—

"কাল যখন আমি বলিয়াছিলাম যে মুসলিম বাংলা কিছুতেই বিভক্ত হইবে না, তখন কেহ কেহ উপহাস করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারাই উপহাসের পাত্র হইলেন।"

খাদ্য-মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেবও প্রাচীন নেতৃত্বেরই অংশ সুতরাং তিনিও চান নাই যে ওয়ার্কিং কমিটিতে মন্ত্রীপন্থী নেতৃত্বের বিশেষ কোন রদবদল হয়। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কর্মী-সাধারণকে ভয় দেখাইয়া এরূপ করিতে গেলে সফল হওয়া যাইবে না। তাই আপোষে একটা লিষ্ট তৈয়ারী করিবার জন্য সকলকে বুঝাইবার ব্যাপারে তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। নিজের বক্তৃতায় যুবকদের কাছে তিনি বরাবর আর্জি করিতেছিলেন যে লীগের ঐক্য বজায় রাখার জন্য নেতাদের প্রস্তুত লিষ্টই মানিয়া লইয়া যুবকদের স্বার্থত্যাগ করা উচিত। শেষ পর্য্যন্ত স্বার্থত্যাগের সবটা যুবকদিগকেই করিতে হইল, সুহরার্দি সাহেবের তৈয়ারী লিষ্টে পরিবর্ত্তনকামীদের কেহই স্থান পাইলেন না। মাঝখান হইতে সুহরাবর্দি সাহেবের নিজস্ব দল ভারী হইল অথচ তিনি নিজে দুই মহলেই পসার জমাইয়া লইলেন—স্বার্থত্যাগের কৃতিত্বটা যেন তাঁহারই!

নেতৃত্বের নীতিতে ব্যাপক অসন্তোষ সত্ত্বেও কর্মী-সাধারণ উহার চরিত্র বদলাইতে পারিলেন না। তাহার কারণ পরিবর্ত্তনকামীরা শুধু ব্যক্তির বা সংগঠনের লড়াইই লড়িয়াছিলেন—নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই, এমন কি সে

স্যর নাজিমুদ্দিন ও কয়েকজন প্রতিনিধি

দুর্বলতা অনেক পরিমাণে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল। সেজন্যই পুরাতন নেতৃত্বের সংস্কারের প্রয়োজন তাঁহারা সকলকে মানাইতে পারেন নাই।

প্রস্তাব আলোচনার সময়েই পরিবর্ত্তনকামীদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িল। প্রথম প্রস্তাবে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় জিন্না সাহেবের মত পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের হতাশ ও পদদলিত অবস্থা হইতেই পাকিস্তান দাবীর জন্ম। তাহাদের পূর্ণ বিকাশের জন্যই ইহা প্রয়োজন। কোনোরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের যদি পাকিস্তানের উপর কোনো বিষয়ের ক্ষমতা থাকে তবে তাহাতে হিন্দু সংখ্যাধিক্যের ফলে মুসলমানদের স্বাধীনতা হইবে না, বর্ত্তমান পদদলিত অবস্থাই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং লাহোর প্রস্তাব মতে পাকিস্তানের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধীন ও সমান হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অনায়াসেই স্বেচ্ছামূলক যৌথ নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা হইতে পারে। আর পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতির দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামরিক দিক হইতে নিরাপদ হওয়া দরকার—সেজন্য উহাদের বর্দ্ধমান জনসংখ্যার জন্য বিস্তারের উপযুক্ত স্থান চাই। ইত্যাদি।

কিন্তু প্রস্তাবে বা কোনো বক্তৃতায়ই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না যে বাড়িবার স্থান অন্য লোকেরা দিবে কেন? পদদলিত হওয়ার যে ভয় হইতে তাঁহারা স্বাধীন পাকিস্তান চাহিতেছেন, সেই পাকিস্তানের অ-মুসলিম অধিবাসীদের অনুরূপ ভয় দূর করিবারই বা তাঁহারা কি প্রতিশ্রুতি দিতেছেন? এমন কি জিন্না সাহেব জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমস্ত অধিবাসীর সমান অধিকারের যে-বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পর্য্যন্ত কোনো উল্লেখ নেতাদের বক্তৃতায় পাওয়া গেল না—তা সে নেতা নূতনই হোন বা পুরাতনই হোন।

পাকিস্তান এখনও কেন হইল না, কি করিলে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা যায় সে বিষয়ে নূতন বা পুরাতন নেতা কেহ কিছু ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং লড়াইটা লোকে ব্যক্তির লড়াই বলিয়া মনে করিলে অন্যায় নাই।

খাদ্য প্রস্তাবে আরও পরিষ্কার হইল যে, পরিবর্ত্তনকামীরা পরিবর্ত্তনের কোন পথ ভাল করিয়া দেখাইতে পারিতেছেন না, নেতৃত্ব কেন বিফল হইয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছেন না।

অথচ বেশ বোঝা গেল খাদ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই অসন্তোষ সব চেয়ে তীব্র। চালের দাম পড়িয়া যাইতেছে অথচ চাষের খরচা ও জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে—এই অবস্থার সুযোগ লইয়া বরিশালের এম, এল, এ খান বাহাদুর আক্রাম যখন প্রস্তাব করিলেন যে চালের সর্বনিম্ন দাম ১৮, করা হোক তখন একজন ডেলিগেট চট করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব গত বছর ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে যা জমিয়েছেন তাতে চাষের বাড়তি খরচ দিয়েও তো যথেষ্ট থাকে! না কি এবারও আবার ব্ল্যাকমার্কেট চান?"

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

চাউলের দর

ধান চাউলের দর সর্ব্বত্রই কমিয়া যাইতেছে। অথচ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর অত্যন্ত বেশী। ইহাতে মারা পড়িবে কৃষক। আগামী কয়েকমাস কৃষকদের হাতে ধান থাকিবে এবং কৃষক উহা বিক্রী করিবে। দর এইরূপ কমিতে থাকিলে ধান বেচিয়া সে চাষের খরচও উঠাইতে পারিবে না।

এখনই সরকারী ক্রয়ের ব্যবস্থা যদি না হয় তাহা হইলে মজুতদার এখন এই ধান সস্তায় কিনিয়া এপ্রিল মাস হইতে দর হাঁকিতে সুরু করিবে। সস্তার চাপে এখন কৃষক মরিবে, পরে দরের চাপে কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মজুর সকলে মরিবে।

ধান চাউলের নিম্নতম দর এখনই বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই নিম্নতম দামে সরকার হইতে ক্রয় করার ব্যবস্থা চাই, সরকারী ক্রয় না হইলে বাঁধা দর টিঁকিবে না।

চাউলের উচ্চতর দামও নূতন করিয়া বাঁধিতে হইবে। রেশনের দোকান হইতে প্রতিমণ ১৬।০ লওয়া হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্র সে চাউলও অখাদ্য। অথচ মফঃস্বলের বাজারে এখন ভাল চাউল পাওয়া যায় এবং তাহার দর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৩, টাকারও কম। ইহার ফলে রেশনিং অচল হইবে। রেশন চাউলের দর কমান হউক, ভাল চাউল দেওয়া হউক এবং রেশনিং যাহাতে সর্বত্র চালু হয় তাহার ব্যবস্থা হউক। এবার যে ১৯৪৩ সালের মত দুর্ভিক্ষ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা ও সহরতলীর রেশনিং। রেশনিং অচল হইলে সব চাউল চোরাবাজারে ঢুকিবে।

ধান চাউল ছাড়া অন্যান্য জিনিষ বাঁধাদরে সরবরাহের ব্যবস্থা চাই। নুন, চিনি, কাপড় প্রভৃতি চোরাবাজারে কেন যায়? চোরাকারবারীরা পসার করিবার সুযোগ কেন পায়? তাহার কারণ সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করায় সরকারী অক্ষমতা এবং রেশনিং সফল করা সম্পর্কে দেশভক্তদের উদাসীনতা।

এবারকার আইন সভার প্রধান লক্ষ্য হউক দেশময় রেশনিং সফল করার ব্যবস্থা। ১৯৪৫ সালের বাংলাকে সংকট হইতে বাঁচাইতে হইলে চাই সরকারী ক্রয় ও সরকারী বণ্টন—অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের রেশনিং। ন্যায্যদরে বাংলার প্রত্যেক নরনারী ও শিশু যাহাতে সস্তা দরে সাচ্চা জিনিষ পায় তাহার জন্য সকল দলকে সমবেত হইতে হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন
কোন্ পথের নির্দ্দেশ দিবে

"জিন্না যথেষ্ট অপদস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখোষ খুলিয়া গিয়াছে। জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা এখন আর নাই। জিন্না গণভোটের বিরোধী, এই জন্যই গান্ধী জিন্না আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হইল।"

সংক্ষেপে ইহাই হইল অধিকাংশ কংগ্রেসনেতার মনোভাব। তাঁহারা বলেন—কংগ্রেস বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু সে অধিকার দেওয়া হইবে তখনই—যখন জিন্না সর্ব্বসাধারণের গণভোট দ্বারা স্বতন্ত্র হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন। একজন কংগ্রেসনেতাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: "গণভোটের সর্ত্ত কেন চান?" তাহার উত্তরে তিনি বাংলার উদাহরণ দেখাইয়া বলেন—"এখানে আমরা শতকরা ৪৫ জন হিন্দু। গণভোট থাকিলে এই ৪৫ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সাহায্যে বাংলাকে হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।" অর্থাৎ মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার জন্য নয়, তাহা রোধ করিবার জন্যই গণভোটের সর্ত্ত। এই জন্যই লীগ রাজাজীর প্রস্তাব মানিতে পারে নাই।

মরীচিকা

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর লীগের দাবী বুঝিবার চেষ্টা করা দূরের কথা, সে দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার জিদই বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি লইয়া মুসলমানদের ভিতর গণসংযোগ বাড়াইলে মুসলমান জনগণ লীগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে। মহাসভা পরিচালিত ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকার স্তম্ভে লেখা হইয়াছে—"এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন লীগের ভিতর তাহার সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেহ থাকিবে না।" মুসলিম জনগণ এই মিথ্যা উক্তির জবাব দিতেছে প্রতিদিন।

কৃষক প্রজা পার্টি এবং জমিয়ত উল্ উলেমার শত বিরুদ্ধতা সত্বেও বাংলায় এ বৎসর ৫ লক্ষেরও বেশী মুসলমান মুসলিম লীগের সভ্য হইয়াছে। এতখানি সংগঠিত শক্তি লীগের আর কখনও ছিল না। কংগ্রেসও বাংলায় কোন সময় এত সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। লীগের এই সংগঠিত শক্তির প্রভাবেই ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং এমন কি ফজলুল হক সাহেবও লীগের সভ্যপদ প্রার্থী হইয়াছেন। লীগ কখনও ভাঙ্গিতে পারে এ ধারণা যাহাদের আছে তাহাদের উচিত এবারকার লীগ কাউন্সিল মিটিংএর বিবরণ তলাইয়া দেখা। প্রবল মতবিরোধ সত্বেও লীগ কাউন্সিলের সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাদের ওয়ার্কিং কমিটি নির্ব্বাচিত করিয়াছে, তরুণ কর্ম্মীরা সংগঠনের ঐক্যের কাছে আত্মস্বার্থ বলি দিয়াছে। অনুরূপ অবস্থায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর বাংলার কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের লক্ষ্য যদি মিথ্যাই হইবে তবে তাহা মুসলমানদের এমন ভাবে নাড়া দিয়াছে কেন?

কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে লীগের শক্তি কমিতেছে না, শুধু লীগ আরও বেশী কংগ্রেস-বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। গান্ধী-জিন্নার আলোচনার সময় আজাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে গান্ধীজীর জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতেছিল, এখন প্রতিদিন সেই 'আজাদ' গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতিকেও ভেদপ্রচেষ্টা বলিয়া নিন্দা করিতেছে। কলিকাতায় ও অন্যত্র মুসলমানদের জনসভায় গান্ধীজীকে ঐক্যের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। লীগের ভিতরকার প্রগতিপন্থ তরুণ নেতারা এতদিন লীগের ভিতর কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাও হতাশ হইয়া বলিতেছেন কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃত্ব থাকিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অথচ গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় ইহারাই প্রকাশ্য জনসভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন "আজ যদি কংগ্রেস আমাদের পাকিস্তান দাবী মানিয়া নেয়, তাহা হইলে এমন দিন আসিবে যখন আমরাও বলিতে পারিব যে, কোন্ দুঃখে ভারত হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিব।" এই মনোভাব আজ তাঁহাদের নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার একমাত্র ফল

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর আমরা হিন্দুমুসলিম ঐক্যের পথে অগ্রসর হই নাই। আমরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে চলিয়াছি। গত ২৬শে অক্টোবর কমলাঘাটের বন্দরটি আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। কি কারণে আগুন লাগিয়াছে তাহা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু হিন্দুমহাসভা প্রচার

লেখক: **ভবানী সেন**

করিতেছে যে, এ আগুন মুসলমানেরাই লাগাইয়াছে। লীগনেতারা এই অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু মহাসভার পক্ষ হইতে অবিরাম প্রচার চলিয়াছে। এইরূপ চলিতে থাকিলে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আগুন জ্বলিবে কাহার সাধ্য তাহা নিভায়? কংগ্রেস পাকিস্তানের প্রতি বিমুখ হওয়ার ফলে মহাসভারই জোর বাড়িয়াছে, তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহামারী জর্জ্জরিত বাংলা চলিয়াছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে।

ঠিক এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা প্রাদেশিক সম্মেলনে মিলিত হইবেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কি হইবে তাহার উপর বাংলার ভাগ্য নির্ভর করে। "জাতায় ঐক্যের দ্বার এখন রুদ্ধ" ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কোন পথে তাঁহারা এখন অগ্রসর হইবেন? বাংলার জনৈক কংগ্রেস নেতা বলিয়াছেন—"বাংলার কংগ্রেসের কোন আশা নাই। খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির চৌদ্দদফার সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ ভরসা পাইতেছি না। সম্মেলনে আমরা একটি কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিব. তাহার ফলাফল কি হইবে জানি না।" যাঁহার মুখ দিয়া এই খেদোক্তি বাহির হইয়াছে, তিনি নিজে গ্রামাঞ্চলে মহামারী ও দুঃস্থতার হাত হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য কাজ করিতেছেন। তিনি এইটুকু বুঝিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে নরনারীর জীবনে যে ভাঙ্গন লাগিয়াছে তাহা রোধ করা শুধু একটা দলের কাজ নয় কিংবা শুধু কয়েকজন সমাজসেবীর সাধ্যায়ত্ত নয়।

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকে

কংগ্রেস সোশালিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থীরা চীৎকার করিতেছে—'আপনারা হতাশ কেন? গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিকে সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে কাজে লাগান। ৯ই আগষ্টের মত আর এক সংগ্রামের আয়োজন করুন।' কিন্তু ৯ই আগষ্ট আমলাতন্ত্রকে দুর্ব্বল করে নাই বরং শক্তিশালী করিয়াছে, কংগ্রেসের স্থানে মহাসভার ক্ষমতা বাড়াইয়াছে, জনগণের ভিতর বিপ্লবী স্পন্দন আনে নাই, আনিয়াছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জনিত দুঃস্থতা। গান্ধীজীর এই অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন "১৯৪৪ সালে আমি আর ১৯৪২ সালে ফিরিয়া যাইতে পারিব না।" গান্ধীজী যখন একথা ওয়াভেলকে বলিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বাক্‌চাতুরী খেলিতেছিলেন না।

লীগের সঙ্গে মিটমাটের আশা ত্যাগ করিয়া গান্ধীবাদী হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস সোশালিষ্ট সকলেই বলিতেছেন—"কংগ্রেসের সংগঠন ও শৃঙ্খলা দৃঢ় কর।" কি অর্থে এই কথা বলা হইতেছে? কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্টদের তাড়াও, লীগের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত কর, কৃষকদের বলো কৃষকসভা বর্জ্জন করিয়া পৃথক সভা তৈরী করিতে; ছাত্রদের বলো ছাত্রফেডারেশনের পাল্টা প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি বাড়াইতে। ইহার অর্থ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেককে লাগান। এই মনোভাব লইয়া কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘ তৈরী করা হইতেছে। জনৈক সদ্যমুক্ত কংগ্রেস নেতা এক ঘরোয়া সভায় বলিয়াছিলেন—"আজ মহাসভার শক্তি বাড়িয়াছে; কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে অবসাদ। আমাদের অবসন্ন হওয়া উচিত নয়। বাংলার কংগ্রেসের ইতিহাসের দিকে তাকাও। বাংলার কংগ্রেস এক দিন ছিল মুষ্টিমেয় যুবকের প্রতিষ্ঠান; আজ তাহা কত বড় গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।" সেই ইতিহাসের শিক্ষা কি? প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেককে লাগান নয়, সকলের জন্য সবাইকে একতাবদ্ধ করা। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে ঐক্যের প্রতি আস্থা হারাইয়া ব্যাপক ভ্রাতৃবিরোধের মনোভাব লইয়াই নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন।

সম্মেলনের সমস্যা কি?

বাংলার কংগ্রেস দলাদলিতে বিভক্ত। জনৈক কংগ্রেস নেতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দলাদলি এতদূর গড়াইয়াছে যে কস্তুরবা ফণ্ডের জন্য একটা প্রাদেশিক কমিটি গঠন করাও সম্ভব হয় নাই। জনধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব যে কমিয়াছে তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

কংগ্রেসের স্থান দখল করিতেছে হিন্দু মহাসভা। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে অন্যূন ১০,০০০ করিয়া সদস্য সংগৃহীত হইতেছে। হুগলী জেলা একটি কংগ্রেস প্রভাবান্বিত জেলা। এই জেলাতেও মহাসভার ১০,০০০ সভ্য হইয়াছে। চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক স্থানীয় নেতা কংগ্রেস ছাড়িয়া মহাসভায় যোগ দিতেছেন। বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত কংগ্রেস ছাড়িয়া মহাসভার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে।

এদিকে দেশের ভিতর চলিতেছে নিদারুণ মহামারীর আক্রমণ। শুধু এক কলিকাতাতেই ১ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কুইনিনের

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘটনা ও রটনা

শিরোনামার শিরশ্ছেদ

প্রায় দু বছর ধরে বাংলা দেশের সমস্ত খবরের কাগজের ওপরে একটা অদ্ভুত হুকুম জারি আছে যে, কোন খবরেই দুকলমের বেশী চওড়া হেডিং দেওয়া চলবেনা, এবং হেডিংয়ের টাইপ ২৪ পয়েণ্টের চেয়ে বড় হতে পারবেনা। (জনযুদ্ধে সাধারণত বড় যে-হেডিং দেওয়া হয়—সেইটাই ২৪ পয়েণ্ট)।

ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশে কাগজওলারা প্রয়োজনমত সারা পাতা জুড়েও হেডিং দেন, টাইপও যত বড় খুশী ব্যবহার করেন। তাতে কাগজের সৌষ্ঠব অনেক বাড়ে, সংবাদের গুরুত্বও লোকের চোখে সহজে ধরা পড়ে।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে তাঁরা বলেন যুদ্ধ-বিরোধী বা পরাজয়মূলক খবর যাতে ফলাও করে না দেখান হয় সেজন্যেই এই কড়াকড়ি—ন্যায়সঙ্গত জিনিষের বড় হেডিংয়ের জন্যে আগে থেকে অনুমতি চাইলে তাঁরা মঞ্জুর করতে সর্বদাই রাজি।

অন্য কোনো প্রদেশে যদি বড় হেডিংয়ে যুদ্ধের ক্ষতি না হয় তো শুধু বাংলায় কেন ক্ষতি হবে সে রহস্য সরকারী দিগ্‌গজেরাই বোঝেন—মানুষে বুঝতে পারেনা। আর, আগে থেকে অনুমতি দেওয়া সম্বন্ধে একটু নমুনা দিচ্ছি। আমাদের এই সংখ্যায় ৪-৫ পৃষ্ঠার জন্যে আমরা পৃষ্ঠাব্যাপী হেডিংয়ের অনুমতি চেয়েছিলাম। হেডিংয়ের ভাষা ছিল অতি নিরীহ—"স্বাধীন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আদর্শ, পাঞ্জাব মুসলিম লীগের ইস্তাহার"। কিন্তু আমারা অনুমতি পাইনি।

সংবাদপত্র জগতের নেতাদের এ-বিষয়ে কিছু বলতে শুনি না কেন?

●

ড্রেন-ইনস্পেক্টর

খবরের কাগজের কথায় মনে পড়ল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নতুন দৈনিক "ন্যাশনালিষ্ট"। বেশ বড় এবং বহু সংবাদে ভরপূর। অবশ্য একই খবর অনেক সময় ২।৩ বার ছাপা হয়। তা হোক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এঁরা এত কাগজ পেলেন কোথা থেকে? গবর্ণমেন্ট তো আমাদের কাগজের ২০,০০০ সার্কুলেশন কেটে কমিয়ে এবার মাত্র হাজার ছয়েকের মত কাগজের কোটা দিয়েছে। অন্য সব পুরানো কাগজেরও প্রায় একই অবস্থা। অথচ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কাগজ সম্বন্ধে এই মহা কড়াকড়ির বাজারেও একেবারে আনকোরা এতবড় কাগজের জন্যে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মত "গবর্ণমেন্ট বিরোধী" এত কাগজের কোটা পেলেন—কোন্ যাদুমন্ত্রবলে! লাট কাউন্সিলের মহাসদস্য শ্রীবাস্তব মারফৎ জিন্না-বিরোধী ও কংগ্রেস-বিরোধী সংগ্রামের বাস্তব আশ্বাসে কি?

অবশ্য এঁরা এখনও খোলাখুলি বলেন না যে কংগ্রেস ধ্বংস হোক। চারিদিক থেকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বা মনোমালিন্যের সত্য মিথ্যা খবর আনিয়ে আনিয়ে এঁরা আনন্দে পরিবেশন করেন—পড়লে মনে হবে আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমানের একমাত্র কাজ হচ্ছে ঝগড়া করা। এম্‌নি করেই এঁরা দেশের লোকের মনে কংগ্রেসী মনোভাবের বদলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মনোভাব জাগাতে চাইছেন।

বাজারে গুজব, ন্যাশনালিষ্টের দ্বিতীয় মালিক মিঃ গোয়েঙ্কা নাকি এত বেশী কংগ্রেস-বিরোধিতায় আপত্তি করেছেন, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে বেশ একটু খিটিমিটি বেধেছে। গোয়েঙ্কা ব্যবসায়ী লোক, বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে লোকের মনোভাবকে এত বেশী বিকৃত করে দেখালে কাগজ হয়তো দাঁড়াতে পারবে না। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আসল খবর কি তা আমরা অনুসন্ধান করে পরে জানাব।

●

চক্ষুলজ্জার বিদায়

রাও বিলে মেয়েরা সম্পত্তির ভাগ পাবে কিংবা হিন্দু পুরুষের যতগুলি খুশী বিয়ে করার সনাতন 'অধিকারে' বাধা পড়বে—সম্প্রতি এই হয়েছে বাংলার হিন্দুসভার সব চেয়ে চিন্তার কারণ। পুরাণো উকিল, ব্যারিষ্টার, সরকারী পেন্সনভোগী প্রভৃতি বাঁধাধরা হিন্দু নেতারা তো আছেনই, তাঁরা তাঁদের পত্নীদেরও আপত্তির আসরে নামাচ্ছেন। বেচারী সহধর্ম্মিণীদের আর উপায় কি—পতিই যখন তাঁদের একমাত্র গতি! কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না দেখে নূতন নেতারও আগমন হচ্ছে। যেমন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেদিন আশুতোষ কলেজে বিলের পক্ষে ছাত্রীদের মিটিং হ'ল স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে। পক্ষে সভা—কিন্তু যেহেতু পিতার নামে কলেজ, ভাই গভর্ণিং বডির সভাপতি এবং সময় সংক্ষেপ—সেহেতু পক্ষে বক্তৃতা হতে পারল মাত্র ২৫ মিনিট আর বিপক্ষে রমাপ্রসাদ বাবু বল্লেন ১ ঘণ্টা ১০ মিঃ। তা সত্ত্বেও যে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল, "এই সভা রাও কমিটি বিলের **মূলনীতিকে** সমর্থন করিতেছে।" হঠাৎ দেখা গেল স্যর রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা থেকে বিদায় নেবার পর বাঙ্গালী চক্ষুলজ্জাও বিদায় নিল—রমাপ্রসাদ বাবু এক বিবৃতি ছেড়ে জানালেন যে ঐ সভায় নাকি বিলটি শুধু আংশিকভাবে সমর্থন করা হয়েছে।

কিন্তু ছাত্রীরাও ছাড়বার পাত্রী নন। তাঁরা ১৪, ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর সমস্ত ক্লাশে ছাত্রীদের মতামত নিয়েছেন। ফলে দেখা গেছে যে মোট প্রায় ৮০০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭৮২ জনই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

●

একশত টাকা পুরস্কার

গত ১২ই নভেম্বরের আনন্দবাজারে একটী বিজ্ঞাপন বার হয়েছে—

> যে কেহ আমাকে একটি Decent ফ্ল্যাট-এর সন্ধান দিতে পারিবেন তাঁহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিতে বাধ্য থাকিব। অন্য জায়গায় shift করিতেছেন বা বদলী হইতেছেন এইরূপ কোন ভাড়াটিয়া যদি আমাকে তাঁহার স্থলে তাঁহার ফ্ল্যাটটি ভাড়া দেওয়াইয়া দেন, তিনি তাঁহার দুই মাসের যথার্থ ভাড়ার টাকা অথবা একশত টাকা (যেটি বেশী) তৎক্ষণাৎ পাইবেন।

কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া সমস্যা কি প্রচণ্ড তা এর থেকে বোঝা যাবে। এ অবস্থায় বাড়ীওলারা ভাড়াটেদের কতভাবে দোহন করার সুযোগ পাচ্ছেন বা নিচ্ছেন বলাই বাহুল্য। কি… সরকারী রেণ্ট কণ্ট্রোলারের কাছে পৌছান … বৈতরণী পার হওয়া প্রায় একই রকম দুরূহ … হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস
ভারতীয় নেতাদের কারামুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী

লণ্ডন হইতে বেন ব্র্যাড্লের তার

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বিলাতে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কংগ্রেসে প্রধান রিপোর্ট পেশ করেন হ্যারি পলিট ও রজনী পাম দত্ত তাঁহাদের বক্তৃতার বিবরণ নীচে ছাপা হইল।

হ্যারি পলিট প্রথমে দেখাইয়াছেন—নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য ও সক্রিয় প্রচেষ্টা সর্বত্র গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি করিয়াছে; পৃথিবীতে এমন অবস্থা আসিয়াছে যাহাতে সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা প্রচণ্ডরূপে বাড়িয়া গিয়াছে।

তিনি বলেন, "পুরাতন ইয়োরোপ আজ অতীত। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য, প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র, ফ্যাশিষ্ট একাধিপত্য প্রভৃতির অত্যাচারে যে-সব দেশ বহুদিন ধরিয়া জর্জরিত ছিল সেই সব দেশের অত্যাচারী গবর্ণমেণ্টগুলি আজ গণতন্ত্রের বর্দ্ধিত জ্ঞান ও শক্তির বিরাট উচ্ছ্বাসের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া ও বুলগারিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রগতিকামী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কমিউনিষ্টরা সেই সব গবর্ণমেণ্টে জরুরি পদে অধিষ্ঠিত আছে।

"কিন্তু অগ্রগতির সম্ভাবনা বৃটেনের মত এত বেশী আর কোথাও নয়। লোকের প্রয়োজন কমিয়া যাওয়া, বেকারী, কম মাহিনা, লম্বা খাটুনি, খারাপ বাসস্থান, সামাজিক অনিশ্চয়তা—এই সমস্ত আমাদের সম্মুখে সমস্যা। জনগণের এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সেই একই রকম ঐক্য সংগঠিত করিতে হইবে। ফ্যাশিজমকে পরাজিত করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ও শিল্পোৎপাদনে আমরা যে দৃঢ় কর্ম্মপ্রচেষ্টা চালাইয়াছি এই সব বিষয়েও সেইরূপই করিতে হইবে।"

যুদ্ধক্ষত ইয়োরোপের যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে হইবে সেগুলি তিনি উল্লেখ করেন এবং জোর দিয়া বলেন যে গবর্ণমেণ্টকে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গণতন্ত্রের নূতন ধরণ

"বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক অগ্রগতির নূতন ধরণ হইল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট। যাহারা ফ্যাশিজমের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে তাহাদিগকে সমস্ত প্রভাব ও শক্তি হইতে উৎপাটিত করিয়া এবং গণ-নীতি পরিচালনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থনে নূতন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করিয়া এই ফ্রণ্টের ভিত্তি রচনা করিতে হইবে।...ব্রিটিশ ও আমেরিকান জনগণের নামে আজ যাহারা ইয়োরোপে কাজ চালাইতেছে তাহারা যাহাতে ইহা স্বীকার করে ইহা দেখিবার ভার জনগণেরই উপর।...স্পেন সম্বন্ধেও আমাদের এই ভাবেই বিচার করিতে হইবে—কারণ সেখানকার ফ্যাশিষ্ট একাধিপত্য শুধু সে দেশের জনগণকেই ভীতিগ্রস্ত করিতেছে না, উহা সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রের কাছেও আশঙ্কাস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।...

"ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য যা-কিছু ব্যবস্থা দরকার সে সবই আমরা সমর্থন করিব। কারণ ইয়োরোপের উপর ও আমাদের উপর হইতে যে সব বিভীষিকা দূর করিবার জন্য আমরা লড়িলাম সেই বিভীষিকাই আমরা আবার সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত জাতির ঘাড়ে চাপাইতে সাহায্য করিব—যদি জাপান পরাস্ত না হয়।...ব্রিটেনের অনেক প্রভাবশালী লোক যখন চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জাপানকে তুষ্ট বা উৎসাহিত করিতেছিল তখন আমরাই অটলভাবে চীনা জনগণের পক্ষে লড়িয়াছি।..."

ইহার পর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার জন্য এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন লোকক্ষয়ের পরিমাণ কমানোর জন্য হ্যারি পলিট অবিলম্বে কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। ইহার মধ্যে একটি মুখ্য প্রস্তাব হইল: আটলাণ্টিক সনদের নীতি সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে—এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট হইতে এখুনি ঘোষণা করিতে হইবে।

বৃটেনের জাতীয় জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট স্থান

[ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে ৫৬৪টী শাখা পার্টি কমিটি হইতে ৭৫৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে ১৪৯ জন স্ত্রীলোক। প্রতিনিধিদের গড়পড়তা বয়স ছিল ৩২। ইহা হইতেই বোঝা যায় ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট আন্দোলন কিরূপ বিস্তীর্ণ এবং তারুণ্য ও শক্তিতে পরিপূর্ণ।

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য-সংখ্যা ৫০ হাজার, উহা আজ ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের বাস্তব অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্টির "ডেলি ওয়ার্কার" নামে দৈনিক পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা ১ লাখের উপর, উহার সোজা ও সাচ্চা মতামত সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

অধিকাংশ বড় বড় মজুর ইউনিয়নে, বিশেষ করিয়া খনি, রেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারণ যানবাহন ইউনিয়নে পার্টি সদস্যেরা দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 'কর্ত্তৃপক্ষের' প্রবল বাধা সত্ত্বেও এই বছরই সর্ব্বপ্রথম এ, এফ, প্যাপওয়ার্থ নামে বিখ্যাত কমিউনিষ্ট উহার জেনারল কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টিই বরাবর সর্ব্বাধিক দৃঢ়তার সহিত ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে লড়িয়া আসিতেছে। উপরোক্ত কংগ্রেসের প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে:—

"যুদ্ধের ভিতরেই সম্মিলিত জাতিগুলির মিত্রস্বরূপ ভারতে প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং যুদ্ধের পরে ভারতীয় জনগণকে স্বাধীনতা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সার্ব্বজনীন ভোটে নিজেদের গণপরিষদের ভিতর দিয়া আপন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে পারে।"

ব্রিটেনের শ্রমিক ও অন্যান্য প্রগতিকামীকে একত্র করিয়া উহাদের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি কঠিন সংগ্রাম চালাইতেছে। এই সংগ্রাম আমাদেরও—কারণ তাহারা এই সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইলে একচেটে ধনবাদের প্রভুত্ব নষ্ট হইবে, আমেরি লিন্‌লিথগো প্রমুখ ভারতীয় স্বাধীনতার বিরোধীরা পরাস্ত হইবে।]

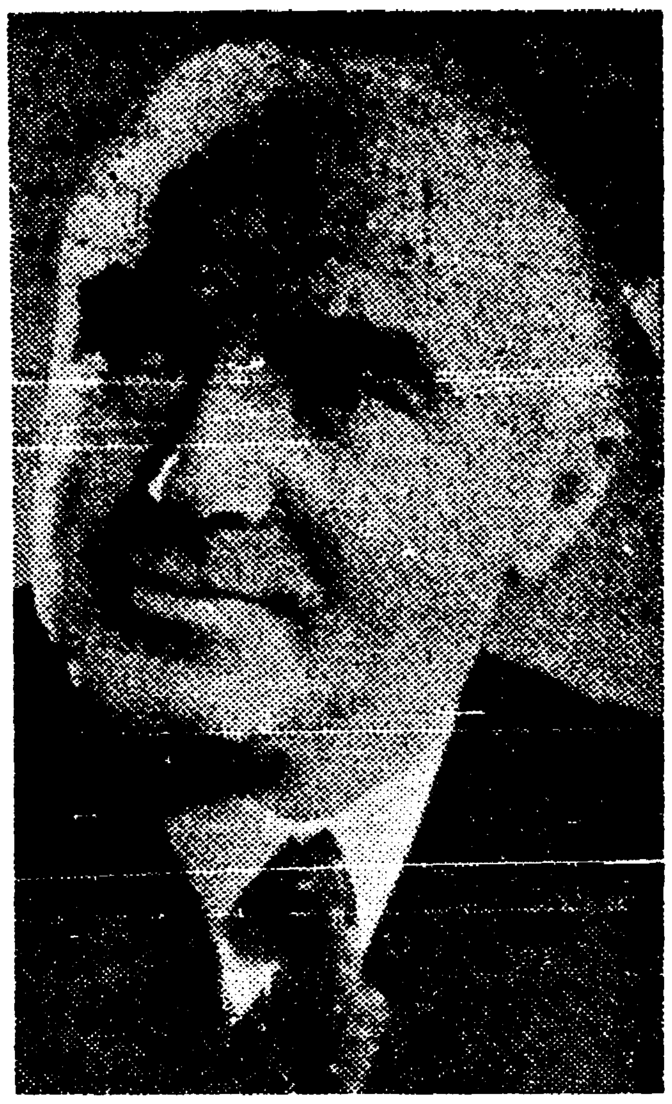

হ্যারি পলিট

মালয়, ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ

"আমরা মনে করি, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে নীতি ঘোষণার প্রয়োজন আছে, তাহার মধ্যে উক্ত ঘোষণাকে অগ্রে স্থান দিতে হইবে। কারণ ইহা সকলেই জানে যে, যখন বিশ্বাসঘাতক জাপান সুদূর প্রাচ্যে আক্রমণ শুরু করিয়া দিল, তখন মালয়, ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের জনসাধারণ আমাদের গবর্ণমেণ্টের নীতি মনেপ্রাণে সমর্থন করে নাই—কারণ, তাহারা এই যুদ্ধকে তাহাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলিয়া মনে ত করেই নাই, বরং ইহাকে তাহারা প্রভু বদলেরই রকমফের হিসাবে দেখিয়াছে।"

ভারতীয় নেতাদের কারামুক্তির জন্য এবং ভারতবর্ষে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আলোচনা শুরু করার জন্য হ্যারি পলিট দাবী জানান।

জার্ম্মানী ও ভবিষ্যৎ শান্তি

নাৎসীদের অনুষ্ঠিত অপরাধের দায়িত্ব হইতে জার্ম্মান জনসাধারণ রেহাই পাইতে পারে না—হ্যারি পলিট দৃঢ়ভাবে এই মত ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য অভিনন্দন জানাইয়া হ্যারি পলিট বলেন:

"গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টগুলির দ্বারা পরিচালিত ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে নূতন ধরণের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সম্মিলিত জাতিবর্গের কাহারও অর্থনৈতিক

রজনী পাম্ দত্ত

জীবনকে দুর্বল করিবে না। জার্ম্মান সৈন্যবাহিনী যাহা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার পুনর্গঠনের জন্য জার্ম্মান শ্রমিকদের নিয়োগ করার প্রস্তাব খুবই ন্যায্য।

"নাৎসী প্রতিরোধ নিঃশেষে ধ্বংস করিতে হইলে নাৎসীদের চূড়ান্ত সামরিক পরাজয়ের পরও কিছু কালের জন্য সামরিক শাসন চালু রাখিতেই হইবে। যে সমস্ত গণতান্ত্রিক জার্ম্মান মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে গণ-তান্ত্রিক জার্ম্মানীর প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহার ভিৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য, যেখানেই দরকার সেখানেই জার্ম্মানীর উপস্থিত সীমান্ত এলাকা তুলিয়া দিতে হইবে।"

আগামী শান্তি বৈঠক ও ভার্সাইয়ের সন্ধির মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করি, তাহা হইলে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; এই শান্তির ফলে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে যে গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থন আমরা লাভ করিব, সেই শক্তি নূতন ও গণতান্ত্রিক জার্ম্মানীর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শান্তি বিধানের সার্থকতা উপলব্ধি করিবে। শান্তি বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপস্থিতিই এই ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তির গ্যারাণ্টি।"

দুইটী দুনিয়া

এই কংগ্রেসে হ্যারি পলিট স্মরণ করাইয়া দেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টি সকল সময়েই ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার জন্য লড়াই করিয়াছে। তিনি বলেন:

"যুদ্ধের পূর্বে আমরা যাহা করিতে পারি নাই, যুদ্ধের মধ্য দিয়া আমরা তাহাই করিতে সক্ষম হইয়াছি। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সহযোগিতার অধ্যায় শেষ হইবেই অথবা শেষ হইতে দেওয়া উচিত হইবে—এই ধরণের পরিণতিতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। একদিকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অন্যদিকে 'ব্রিটেন ফর দি পিপ্‌ল্' (ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচারিত বিখ্যাত গ্রন্থ) পুস্তকে যে কর্ম্মপন্থা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে অনুসৃত আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা—এই দুই নীতি যদি একসঙ্গে চালানো যায়, তাহা হইলে ব্রিটেনের পক্ষে আর বিদেশে মাল রপ্তানির কোন সমস্যাই থাকিবে না।

"১৯৪৪ সালের পৃথিবীতে শুধু শ্রমিকদেরই নয়, বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পক্ষেও বর্ত্তমানের নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব অবস্থা খতাইয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই অনুসারে নিজেদের নীতিকে খাপ খাওয়াইতে হইবে। দূরদর্শী ধনতান্ত্রিকেরা আজ বুঝিয়াছেন, পৃথিবীর এক সুমহান অংশ সাম্রাজ্যবাদের কক্ষপথের বাইরে, আজ তাহা সোভিয়েট ইউনিয়নে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন? আজ উপনিবেশে উপানবেশে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন উত্তাল হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে, পুঁজিবাদীদের সহস্র বন্ধন। তাহাদের বন্ধন পুরানো অভ্যাস, পুরানো চিন্তারই শুধু নয়, সেই সঙ্গে তাহারা এই মুহূর্ত্তের ব্যক্তিগত স্বার্থের লালসায় ঔপনিবেশিক শাসন ও একচেটিয়া শোষণের পুরানো যন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

বৃটেনের ভবিষ্যৎ

হ্যারি পলিট জোর দিয়া বলেন যে, আজ দুনিয়ায় বৃটেনের অবস্থা রাজনৈতিক দিক দিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে। হিটলারের বিরুদ্ধে বৃটেনের অস্ত্রগ্রহণ, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর রণকৌশল, বেসামরিক বৃটিশ জনসাধারণের সহন-শীলতা, উৎপাদনে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অসামান্য নিষ্ঠা, মিত্রপক্ষীয় দেশান্তরী গবর্ণমেণ্টগুলিকে সাহায্য দান এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত নিকট সম্পর্ক স্থাপন—এই সমস্ত মিলিয়াই বৃটেনের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

"যুদ্ধের চাপে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ শিল্পে বহু সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে; যুদ্ধের পরেও যদি এই উন্নতি বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে যোগ্যতার দিক দিয়া বৃটিশ শিল্প উন্নতির শিখরে উঠিতে পারিবে। রাষ্ট্রের অধীনে আসিলে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় ও পরিকল্পনার ক্রমশ আরও উন্নত-তর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবে।... বৃটেনে উৎপাদিকা শক্তি যদিও বিস্ময়কর ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও আমেরিকা, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যে ভাবে উন্নতি হইয়াছে যুদ্ধের শুরুতে বৃটেনের অবস্থা যা ছিল এখন সে তুলনায় যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে বৃটেনকে রীতিমত অসুবিধায় পড়িতে হইবে।...

"বৃটেনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলনকে বিনা দ্বিধায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে আগুয়ান হইতে হইবে; প্রত্যেকে যাহাতে কাজ পায়, সামাজিক নিরাপত্তা পূর্ণমাত্রায় থাকে, যুদ্ধোত্তর জগতে ব্রিটেনের স্থান অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য ব্রিটেনের উৎপাদন-সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি এই সমস্ত পরিকল্পনায় থাকিবে।

"আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন আমাদের জীবন কালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোন্ রাজনৈতিক দল কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবে, তাহাই হইবে সেই দলের বুদ্ধি বিবেচনা, নেতৃত্ব এবং সত্যিকারের দেশ-প্রেমের কষ্টিপাথর। এই সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল আগামী কয়েক বৎসরের জন্য ব্রিটেনের সমগ্র ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকটা পরিমাণে নিরূপিত করিবে।

"এই জন্যই রক্ষণশীল টোরিদের শক্ত বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ফেলা প্রয়োজন। এইজন্য নাম এবং গঠন যাহাই হউক না কেন নূতন যে গভর্ণমেণ্ট হইবে, তাহার বনিয়াদ হইবে পার্লামেণ্টের শ্রমিক ও প্রগতিশীল সভ্যদের পাকাপোক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

(শেষাংশ ৬ পৃঃ দেখুন)

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমান

পাঞ্জাব লীগের ইস্তাহার

"মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে লীগের শেষ লক্ষ্য পাকিস্তান। উহার অর্থ হইল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ধরণের সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি যেমন প্রকৃত স্বাধীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ, তেমনিই উহার ভিতর ভারতবাসী প্রত্যেকটী জাতির স্বাধীন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকা প্রয়োজন। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যেই লোকসংখ্যা সর্ব্বাধিক এবং যদি কোন স্বাধীনতার আবরণে এক জাতি অপর জাতির উপর বরাবর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পায় তবে আমরা সেরূপ "স্বাধীনতা" দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিব। সে যাহা হউক, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতি হইল যে, আমরা যেমন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের জন্মগত অধিকার সঙ্কুচিত হইতে দিব না, তেমনই, আমরা এবং আমাদের ভ্রাতা ও প্রতিবেশী সমন্বিত ভারতের ৪০ কোটী অধিবাসীদের অম্লান স্বাধীনতার জন্য পূর্ণ শক্তিতে সংগ্রাম করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। লীগের এই বিঘোষিত নীতিতে অতীতেও কোন দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা ছিল না, বর্ত্তমানেও থাকিতে পারে না।"

পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান কৃষক—সম্মেলনে পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে

উপরে লীগের নীতি সম্বন্ধে যে অংশটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে—উহা পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্প্রতি প্রকাশিত ইস্তাহারের মুখবন্ধ। সমগ্র ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার জন্য লীগও যে কংগ্রেসের মতই উদ্‌গ্রীব—ইহা বুঝিবার পক্ষে এই ইস্তাহারটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং লীগের স্বাধীন পাকিস্তানের আদর্শের মধ্যে সে অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি ক্রমশ কিরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাও এই ইস্তাহার হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে। ইস্তাহারটী বিরাট, স্থানাভাবে আমরা ইহার কোন কোন অংশ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সংখ্যাল্পদের অধিকারে গ্যারান্টি

যে সব সংখ্যালঘু জাতি লীগ অঞ্চলে বাস করে তাহাদের সম্বন্ধে ইস্তাহার বলিতেছে—

"আমরা নিজেরা যে সকল আর্থিক ও রাজনীতিক স্বাধীনতা চাই সে সমস্তই ইহারা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ভোগ দখল করিতে পারে এবং নিজ নিজ বিশিষ্ট ও মূল্যবান সংস্কৃতি অনুসারে জীবনকে বিকশিত করিতে পারে তাহা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। কায়দে আজমের কথা মত, "পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের জনগণের স্বীকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে—জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র লোকসংখ্যার ইচ্ছা ও স্বীকৃতি অনুসারে এই গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইবে।"

তাহার পর আইন পরিষদে কার্যক্যলাপ সম্বন্ধে বলিতেছে—

"পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দৃঢ় অভিমত পোষণ করে যে, দাসত্বের উচ্ছেদ ব্যতীত আমাদের সমস্যার স্থায়ী বা বাস্তব সমাধান হইতে পারে না। দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে আমরা আমাদের জনগণকে দুঃখ, অধঃপতন ও অন্ধকার হইতে তুলিয়া প্রাচুর্য্য, মর্য্যাদা ও সুশিক্ষার নূতন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। কিন্তু এই সংগ্রাম চলিতে চলিতেই এবং ইহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি না করিয়াই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নীতি হইল, বর্ত্তমান আইন পরিষদের যা কিছু সুবিধা তাহা গ্রহণ কর—যাহাতে ছোট ছোট কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা আদায় করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের জন্য জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়।...

সকল দলের সহযোগিতা প্রার্থী

..."নিম্নলিখিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ এই প্রদেশের সমস্ত সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব আইন পরিষদের লীগ পার্টি উক্ত পরিষদের সমস্ত প্রগতিকামী অংশের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানাইতেছে—যাহাতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা পাঞ্জাবের গলিত ইউনিয়নিষ্ট নীতিকে চিরতরে মুছিয়া দেওয়া যায়।"

ব্যক্তি স্বাধীনতা

...নাগরিক স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তি, বক্তৃতা, বিবেক, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির স্বাধীনতা যাহাতে শাসনকর্তৃপক্ষ কোন মতে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বরং উহাকে রক্ষা করে ও প্রসারিত করে তাহা দেখিবার জন্য লীগ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।...সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে এবং জনগণের আত্ম-অভিব্যক্তি ও বুদ্ধিগত বিকাশের পথে সমস্ত বাধা দূর করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।...

"রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যা যাহাতে একেবারে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী না করা হয় ইহাই আমরা চাই।...জেলের ভিতর রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার আমরা দাবী করি।...

আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে

মুসলিম লীগ পার্টি মন্ত্রীত্বে থাকুক বা না থাকুক সকল সময়ই আমরা শাসনপরিচালনা ব্যবস্থার

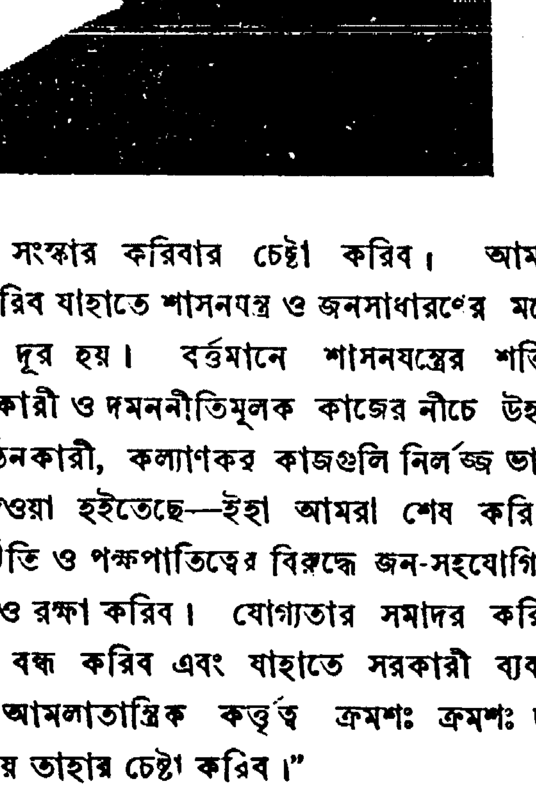

আমূল সংস্কার করিবার চেষ্টা করিব। আমরা চেষ্টা করিব যাহাতে শাসনযন্ত্র ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান দূর হয়। বর্ত্তমানে শাসনযন্ত্রের শক্তি-প্রয়োগকারী ও দমননীতিমূলক কাজের নীচে উহার জাতিগঠনকারী, কল্যাণকর কাজগুলি নির্লজ্জ ভাবে চাপা দেওয়া হইতেছে—ইহা আমরা শেষ করিব। ঘুঁষ দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে জন-সহযোগিতা জাগ্রত ও রক্ষা করিব। যোগ্যতার সমাদর করিব, অপচয় বন্ধ করিব এবং যাহাতে সরকারী ব্যবস্থা হইতে আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ ক্রমশঃ দূর করা যায় তাহার চেষ্টা করিব।"

বর্ত্তমানে যাহারা সবচেয়ে দায়িত্বশীল কাজ করে তাহারাই সব চেয়ে কম মাহিনা পায় এবং যাহারা কম দায়িত্বের কাজ করে তাহারাই বেশী মাহিনা পায়—ইহা লক্ষ্য করিয়া ইস্তাহার লিখিতেছে—

"এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আমরা দূর করিতে চাই। বিশেষত পুলিশের নিম্নতন কর্মী, পাটওয়ারি শিক্ষক প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক দায়িত্বপালনকারী কর্মচারী যাহাতে স্বাধীন ও সাধুভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সে জন্য আমরা তাহাদের অতি-অল্প মাহিনা বাড়াইয়া তুলিতে চাই।...

গণশিক্ষা ও জাতীয়তা

"সমস্ত রকম সম্ভবপর উপায়ে জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করা বিষয়ে মুসলিম লীগ প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে। এই বিকাশই শুধু আমাদের লক্ষ্য নয়; ইহার ফলে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণ আরও শক্তিশালী হইবে—তাহাও আমাদের লক্ষ্য। গণ-শিক্ষাই যে সকল প্রগতির মুল ও সমস্ত অমঙ্গলের সমাধান তাহা আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের প্রভুরা আপন স্বার্থের খাতিরে এ পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে যথাসম্ভব বাধা দিয়াছেন। মুসলিম লীগ কিন্তু সকলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করিবে এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ইহার ব্যবস্থা দাবী করিবে।...

"জাতীয়তা-বিরোধ, হতাশাসঞ্চারকার কিংবা দলহ সুলভক মস্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকগুলির ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে আমাদের সন্তানেরা নজ জাতি ও নিজ ইতিহাসে গর্ব অনুভব করে, ভবিষ্যতে ভরসা স্থাপন করে এবং মনুষ্যত্বের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।...

"অ-মুসলমান সংখ্যাল্প শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে আপন ধর্মগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে শিক্ষা পাইতে পারে সেজন্য লীগ তাহাদের পক্ষ লইয়া লড়িবে।...

পশ্চাৎপদ এলাকার বিশেষ ব্যবস্থা

মুলতান, রাওলপিণ্ডি, অম্বালা বিভাগ প্রভৃতি যে সব অঞ্চল পশ্চাৎপদ এবং আডিদ, অচ্ছুত, যাযাবর প্রভৃতি যেসব জনসংখ্যা পিছনে পড়িয়া আছে—তাহাদের বিকাশের জন্য আইন প্রণয়নে ও শাসন পরিচালনায় বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। লীগ মনে করে যে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ পক্ষপাত ন্যায্য ক্ষতিপূরণেরই স্বরূপ—শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন অঞ্চল ও সম্প্রদায়গুলি পশ্চাৎপদ ও শোষিত জনধারার প্রতি এই ঋণে আবদ্ধ। **সমস্ত অঞ্চল ও সকল সম্প্রদায়ের সম্পদ ও সংস্কৃতি সমান হইলে তবেই দ্রুত সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।** সুতরাং এই সব অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা বাড়াইবার জন্য এবং এই সব পশ্চাৎপদ ভূখণ্ডে শিল্প প্রসারিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।...

পাকিস্তানের গ

ব্যক্তি স্বাধীনতা, শ্রমিক কৃষকে

জমির উপর চাপ কমানো ও শিল্প বিকাশ

"বর্ত্তমানে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। ইহা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট উত্তরাধিকার নয়, ইহার বর্ত্তমান বিরাট পরিমাণ বর্ত্তমান যুগেরই জিনিষ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রত্যক্ষ পরিণাম। জমির উপর অসহ্য চাপ পড়িয়াছে এবং যুদ্ধের পরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের যে আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহাতে উহা আরও অসহ্য হইবে। আমরা মনে করি গ্রামের বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কারখানায় চাকরীর ব্যবস্থা করিলে তবেই এ অসহ্য অবস্থা দূর হইতে পারে।"

উপরোক্ত এবং অন্যান্য কারণে ইস্তাহারে শিল্প-বিকাশ সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মূল শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার প্রথম ধাপ হিসাবে এখনি সাধারণ যান-বাহনের সমস্ত ব্যবস্থা সরকারে লইবার কথা বলা হইয়াছে। যে-সব একচেটিয়া শিল্প ও কায়েমী স্বার্থ জনগণের সাধারণ সম্পদের পরিপন্থী সেগুলির বিরোধিতা করার কথাও বলা হইয়াছে

মজুরদের দাবী

"লীগ এই প্রোগ্রাম উপস্থিত করিতেছে:

(১) মজুরদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রতিপালন।

(২) কারখানা ও অন্যান্য মজুরদের খাটুনি কমানো।

(৩) ন্যূনতম মজুরি বাঁধিয়া দেওয়া। যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম যতটা বাড়িয়াছে ঠিক সেই অনুপাতে মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা।

(৪) কারখানা, মাহিনা, মজুরি প্রভৃতি আইন ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা এবং এ বিষয়ে সরকারী পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(৫) শ্রমিকদের বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং বস্তিগুলি উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা। কারখানায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি। মজুরদের জন্য কোম্পানীর কোয়ার্টার।

(৬) মজুরদের সমবেত ভাবে দাবী পেশ করার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গড়িবার অধিকার, সভা ও মিছিলের অধিকার ও ষ্ট্রাইক করিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে। আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য মজুরকে বরখাস্ত করা চলিবে না।

তান্ত্রিক আদর্শ

অধিকার, শিক্ষা ও গণসংস্কৃতি

(৭) বেকার বা অসুস্থ অবস্থায় অর্থ সাহায্যের জন্য বীমার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন, গর্ভবতী মজুরণীদের সাহায্য।

"মজুরদের ভালমন্দ দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত শ্রমিক দপ্তর খুলিতে হইবে। সমস্ত কর্মক্ষম ও কাৰ্য্যপ্রার্থী শ্রমিককে কাজ দিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকেই লইতে হইবে। এই নীতির পক্ষে মুসলিম লীগ দৃঢ় অভিমত পোষণ করে।...

কৃষকের প্রতি অঙ্গীকার

মুসলিম লীগ পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের শক্তি ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং গ্রামের কৃষকদের প্রতি তাহার সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব, এই কথা বলিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই সব কৃষকদের "জীবিকার মান বিশেষভাবে উন্নত করিবার জন্য লীগকে সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিবার সময় বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; বর্ত্তমানে আমাদের গ্রামে যে দারিদ্র্য ও মধ্যযুগসুলভ পশ্চাদ্পদ অবস্থা রহিয়াছে, যেখানে কোথাও কোথাও আজও এমন দেখা যায় যে বলদের বদলে স্ত্রীলোক জুড়িয়া জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে, যেখানে পানীয় জল পাওয়াই অনেক সময় অত্যন্ত সৌভাগ্য বলিয়া মনে হয়—সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের জন-কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"...

"কৃষকদের অতীত দেনা বাতিল করার আমরা পক্ষপাতী, সঙ্গে সঙ্গে দেনা জমিবার মূল কারণও আমরা দূর করিতে চাই। লীগ চায় যে, দরিদ্র কৃষকদিগকে সরকার হইতে অল্প সুদে ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নহিলে দেনা বাতিল করার কোনো অর্থই হয় না ...

"আমরা দাবী করিতেছি দাম ওঠা নামার অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশঙ্কা হইতে কৃষককে বাঁচাইতে হইবে, তাহার সামাজিক পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। গরু-বলদ মৃত্যুর মত আকস্মিক ক্ষতি হইতে কৃষককে বাঁচাইবার দায়িত্বও সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।...

ক্ষেতমজুরদের জন্য দাবী করা হইয়াছে যে উহাদিগের চিকিৎসা এবং গর্ভবতী নারীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেগার খাটুনি ও বাজে আয় বন্ধ করার এবং বড় বড় জোতে মজুরদের অবস্থা তদ্বিরের সরকারী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রাম্য সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্য

"সংস্কৃতি ও শিক্ষার সংগ্রামে গ্রাম্য সংস্কৃতি তথা গ্রাম্য আনন্দ বিকশিত করার উপরই মুসলিম লীগ সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাণহীন আমলাতান্ত্রিক শাসনে এবং ক্ষুদে আমলাদের অসহ্য অত্যাচারে এগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস পাইয়াছে। আমরা গ্রামকেই আমাদের সম্প্রদায়ের পীঠস্থান বলিয়া মনে করি—গ্রামের উন্নতি ও সুখ দিয়াই আমরা জাতির উন্নতি ও সুখ বিচার করিব। গ্রামের জীবিকার মান বাড়িয়া অবকাশ ও অনুশীলনের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমান ইউনিয়নিষ্ট দালালের পরিবর্ত্তে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের সুখবৃদ্ধির বাস্তব সুযোগ আসে না তাহা আমরা জানি। কিন্তু উহারই প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত রকম সুস্থ সামাজিক আনন্দ-ব্যবস্থা আমরা বাড়াইয়া তুলিতে চাই।...বয়স্কদের শিক্ষা ও লাইব্রেরী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আবৃত্তি, মুশায়েরা, খেলাধূলা প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের ইচ্ছা।...

সেচ, জমি-উদ্ধার, রাস্তা

ইহার পর সেচ ব্যবস্থার উন্নতি। এজন্য নদী প্রভৃতি ছাড়াও ঝরণা ইত্যাদি হইতে খালের ব্যবস্থা করা, বাঁধ বাঁধার আরও উন্নত ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবী করা হইয়াছে। সেচ বিভাগকে স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে যাহাতে জলনিকাশের অব্যবস্থা ঘটিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি রোগবিস্তার না হয়।

জলে ডুবিয়া বা পয়স্তি-শিকস্তি ইত্যাদির ফলে যে সব জমি নষ্ট হইয়া যাইতেছে উহা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা দাবী করা হইয়াছে। রাস্তা ও রেল ব্যবস্থাকে জনসাধারণের স্বার্থ অনুসারে নূতন করিয়া গড়িবার দাবী করা হইয়াছে। গ্রামে সাধারণের জন্য পঞ্চায়েতী মরাই দাবী করা হইয়াছে।

জলপ্রবাহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াইয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, সরকারী চেষ্টায় কতকগুলি আদর্শ যৌথ কৃষি-সমবায় খামার গড়িয়া তোলা, জমি সংক্রান্ত আইনের কূট মারপ্যাঁচ ঘুচাইয়া উহাকে সহজ করার দাবী করা হইয়াছে।

সরকারের খাসে যে সমস্ত জমি আছে তাহা ধনীদের বিক্রয় না করিয়া কৃষকের জমির অভাব মিটানোর জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অনাবাদী সরকারী জমি বিনা খাজনায় গরীব চাষীদের চাষ করিতে দিতে হইবে।

নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতির ক্ষমতা বাড়ানো, সরকারী মনোনয়ন একেবারে সীমাবদ্ধ করা ইত্যাদি দাবীও করা হইয়াছে।

সাধারণ নির্ব্বাচন চাই

নির্বাচন সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

"সমস্ত নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারই মুসলিম লীগের দাবী। লীগের করাচী অধিবেশনে (১৯৪৩) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এখনই সাধারণ নির্বাচন দাবী করিতেছি। সাধারণ নির্বাচনে এতদিন ঠেকাইয়া রাখা আর জনসাধারণের ভোটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া একই কথা—জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহারা গদী আঁকড়াইয়া থাকিতে চায় ইহাতে শুধু তাহাদেরই লাভ।...

"...সমাজ-কল্যাণকর কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করিবনা—

(১) রাজনীতিক গোয়েন্দা ও সি, আই, ডি প্রভৃতির যে জড়বৎ যন্ত্র রহিয়াছে ঐসব বাজে খরচ দারুণভাবে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা।

(২) যাহারা ট্যাক্সের বোঝা বেশ বহিতে পারে অথচ এতদিন ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে তাহাদের উপরই বেশীর ভাগ টেক্স চাপানো।

(৩) জাতীয় বিকাশের জন্য জাতীয় ঋণের ব্যবস্থা...

যুদ্ধের সময়ে জনরক্ষা

"যুদ্ধের জরুরি পরিস্থিতিতে লোকের উপরে যে দুঃখ ও বোঝা চাপিয়াছে, সকল রকম জনসেবার দ্বারা মুসলিম লীগ তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে" এই কথা বলিয়া ইস্তাহার প্রথমত সমস্ত কর্মচারীদের জন্য মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে উপযুক্ত মাগগি ভাতা দাবী করিয়াছে। তাহার পর বলিয়াছে—

মজুতদারী ও অতি-লাভের বিরুদ্ধে

"যে কোন ধরণের মজুতদারী ও অতি-লাভের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ উদ্যম সহকারে সংগ্রাম করিবে। অতি-লাভ বন্ধ করার জন্য সকল রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে সংযুক্ত করা আমরা চাই। মজুতদার ও অতিলাভকারীদের কঠোর সাজা এবং তাহাদের মাল ও অতিলাভজনিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা আমরা দাবী করি। জনসাধারণের স্বার্থে সমস্ত ভারতে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জোরের সহিত চালু করা হোক ইহাই আমরা চাই।

যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাল-ক্রয়ের ফলে, এবং মিলিটারী ও অন্যান্য ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোক নিয়োগের ফলে চাকরী ও উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং তাহাতে আর্থিক স্বচ্ছলতার মান যতটুকু বাড়িয়াছে উহা ভবিষ্যতে সঙ্কটাপন্ন হইতে দেওয়া চলিবে না, যুদ্ধোত্তর বিকাশের সোপানরূপেই উহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা মনে করি যে ইহার জন্য—

(১) যে সমস্ত সম্পদ এখন যুদ্ধের কাজে লাগানো হইতেছে তাহাকে যুদ্ধোত্তর উৎপাদনের কাজে তাড়াতাড়ি ও উপযুক্তভাবে লাগাইতে হইবে। ইহার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

(২) বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের হাতে যে ক্রয়ক্ষমতা জমিয়াছে উহাকে জনসাধারণের হাতে চালাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য সাধারণভাবে সকলের মাহিনা বা মজুরীর হার বাড়ানো দরকার এবং জীবিকার মান উন্নত করা দরকার। কতকগুলি সম্পদ অবশ্য সরকার নিজের হাতে রাখিয়া জনস্বার্থমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারে।"

ইহার পর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈন্যদের জীবিকা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দাবী করিয়া ইস্তাহার শেষ হইয়াছে। এই ইস্তাহার পাঞ্জাব লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ১৯৪৪-এর ৩১শে অক্টোবর তারিখের সভায় একবাক্যে গৃহীত হইয়াছে।

মুসলিম লীগ আজ ভারতের সমস্ত মুসলমান জনসাধারণের জাতীয় সংগঠন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার মধ্য দিয়া মুসলমানদের ব্রিটিশ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার আগ্রহ যেমন দিনের পর দিন পরিস্ফুট হইতেছে, হিন্দুদের প্রভুত্বের আশঙ্কা হইতে বাঁচিবার আগ্রহও উহাদিগকে তেমনি উহার ভিতর এক সূত্রে গ্রথিত করিতেছে। নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পাকিস্তান রূপ স্বাধীনতাকে তাহারা শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছে বলিয়াই লীগের কর্ম্মতালিকার মধ্যে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের অধিকার স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ করিতেছে। সংখ্যাল্পদের অধিকার, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার, জনগণের কল্যাণ এ সবই লীগের প্রোগ্রামে কিরূপ সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লইতেছে তাহা এই ইস্তাহার হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়। মুসলিম জনগণের মধ্যে ইহা কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলনেরই দোসর। দুই আন্দোলন একত্র হইলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ হয়।

পাঞ্জাব মুসলিম লীগ কর্ত্তৃক কংগ্রেস বন্দীদের বিনাসর্ত্তে মুক্তিদাবী

লাহোর ১৪ই নভেম্বর :

পাঞ্জাব মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মিয়া মহম্মদ মমতাজ দৌলতানা এম এল-এ একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে অবিলম্বে পাঞ্জাবের কারারুদ্ধ ও অন্তরীণাবদ্ধ কংগ্রেসীদের সর্ত্তহীন কারামুক্তির দাবী করিয়াছেন।

দৌলতানা সাহেব বলেন "মুসলিম লীগ কংগ্রেস নেতাদের অনুমোদিত ১৯৪২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনকে প্রকাশ্যভাবে দৃঢ়তার সহিত নিন্দা করিয়া মুসলমানদিগকে আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিল বলিয়া কাহারও দুঃখ করা উচিত নয়।"

"যাহা হউক আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে এই অনিষ্টকারী আন্দোলন হইতে এখন আর বিপদের আশঙ্কা নাই। পাঞ্জাব সম্পর্কে বলা যায় যে, জন-নিরাপত্তা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্নের আশঙ্কা না করিয়াই অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণ বন্দীদিগকে বিনা সর্ত্তে কারামুক্তি দানের নীতি কার্য্যে পরিণত করা যায় বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাতে সম্ভবত যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা হইবে।" (আজাদ, ৩০শে কার্ত্তিক)

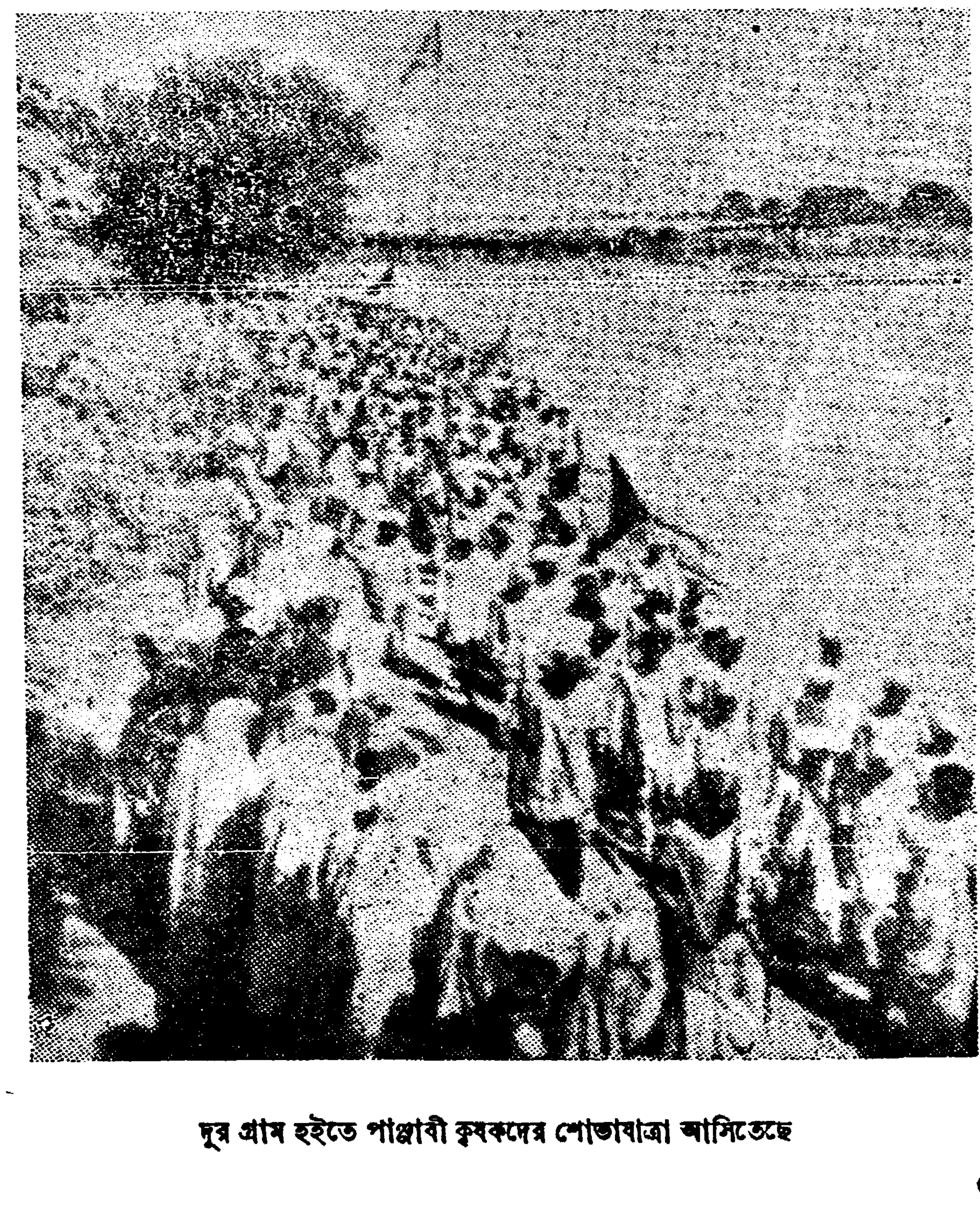

দূর গ্রাম হইতে পাঞ্জাবী কৃষকদের শোভাযাত্রা আসিতেছে

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি, এম, এল, এ
অফিস : ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

শহীদ থ্যালমান

সম্প্রতি নাৎসী বন্দীশিবিরে অবরুদ্ধ জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড থ্যালমানের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে।

জার্ম্মাণ জনসাধারণ ও মজুর শ্রেণীর ভিতরে যাহা কিছু মহান—আর্ণষ্ট থ্যালমান ছিলেন তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক। নাৎসীরা জার্ম্মানীর এই বীর সন্তানকে কুখ্যাত বুকেনওয়াল্ড বন্দী শিবিরের মধ্যে জঘন্য ভাবে হত্যা করিয়াছে। মজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে অবিচলিত থাকা এবং যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ডাকিয়া আনে তাহাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই চালাইয়া যাওয়া—ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। তাঁহার মতবাদ শুধু নিজের দেশের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ ছিল না। তিনি আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৬ বৎসর বয়সে তিনি 'সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে' যোগদান করেন। ছাত্র হিসাবে তাঁহার খুব সুনাম ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা খুব দরিদ্র থাকাতে তিনি আর পড়াশুনা চালাইতে পারেন নাই। তাই অল্প বয়সেই হামবুর্গ ডকে বেয়ারার কাজে লাগিয়া যান। তাঁহার কার্য্যকলাপ ও মতের দৃঢ়তার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মীরা তাঁহাকে সম্মান করিত। তাহারা তাঁহাকে ইউনিয়নের স্থানীয় শাখার কার্য্যকরী সমিতিতে নির্ব্বাচিত করে। ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি চার বার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি প্রুশিয়ান সামরিক বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে অনমনীয় ভাবে বাধা দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নানাবিধ প্রচার-পত্র চারিদিকে ছড়াইয়াছেন এবং সৈন্যদের ভিতর আন্দোলনও চালাইয়াছেন। সেই যুদ্ধের সময়ই তিনি সদ্যগঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই পার্টি ১৯২১ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে মিশিয়া যায়। ১৯২৩ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্যকরী সমিতিতে নির্ব্বাচিত হন এবং তাহার অল্প কিছুকাল পরেই পার্টির এবং অগ্রণী মজুরদের অবিসম্বাদিত নেতা হন। "রেড ফ্রণ্ট ফাইটারস্ লীগ' ছিল জার্ম্মানীর মজুর শ্রেণীর এক ব্যাপক গণ-প্রতিষ্ঠান। কমিউনিষ্ট ছাড়াও অন্যান্য বহুসংখ্যক মজুর ইহাতে ছিল। ইহার কার্য্যকলাপ সামরিক কায়দায় চালান হইত। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের নায়ক।

তিনি বুঝিয়াছিলেন পৃথিবীতে আবার এক মহাযুদ্ধের সূচনা হইবে। তাই তিনি প্রাণপণে জার্ম্মান ও ফরাসী মজুরদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। ফরাসী পুলিশের নিষেধ অমান্য করিয়া ১৯৩২ সালের অক্টোবরে প্যারিসে একটি মজুর সমাবেশে তিনি উপস্থিত হন। তাঁহার উপস্থিতিতে বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—তখনকার দিনে ইহা একটি চাঞ্চল্যকর আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা। ১৯৩২ সালের নির্ব্বাচনে তিনি হিটলার ও হিণ্ডেনবুর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ৫০ লক্ষ ভোট পাইয়াছিলেন!

হিটলার ক্ষমতা পাইয়া অল্প কিছুদিনের মধ্যেই থ্যালমানকে গ্রেপ্তার করে। নাৎসীরা তাঁহার বিচার করিবে বলিয়া বহুবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোন আদালতে বিচারের জন্য তাঁহাকে আনিতে হিটলারের সাহস হয় নাই। থ্যালমানের গ্রেপ্তার ও তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র পৃথিবীতে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তাঁহার মুক্তির জন্য আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখিয়া এবং পৃথিবীর প্রগতিশীল জনগণ থ্যালমানকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহা জানিয়া নাৎসী ঘাতকেরা এত দিন তাঁহাকে হত্যা করিতে সাহসী হয় নাই।

হিটলার বার বারই বলিয়া আসিয়াছে যে, এবার আর '১৯১৮ সাল' হইতে দিব না। থ্যালমানের মত মানুষকে হত্যা করিয়াই নাৎসীরা চাহিতেছে যাহাতে আর ১৯১৮ সালের মত গণ-আন্দোলনের ঢেউ জার্ম্মানীতে না আসিতে পারে। ১৯১৮ সালের গণআন্দোলনে হোহেনজোলার্ণ বংশের প্রভুত্ব ধ্বংস হইয়াছিল এবং সেই আন্দোলন জার্ম্মানীর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে দারুণভাবে লড়িয়াছিল। হিটলার এই কায়েমী স্বার্থবেষীদের দাসানুদাস। তাই গণ আন্দোলনের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোধাকে হত্যা করিয়া সে চাহিয়াছে যাহাতে জার্ম্মানীতে আবার '১৯১৮' সাল ফিরিয়া না আসে।

আন্তর্জাতিক মুক্তি সংগ্রামের এই বীর সেনানায়কের স্মৃতিতে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ফ্যাশিজমকে দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আমরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিব।

ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

"ঐরূপ একটি সর্বসম্মত চুক্তিতে পৌঁছাইবার জন্য সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী এবং প্রগতিশীল সংগঠন-গুলিকে একত্র করিবার দায়িত্ব লেবার পার্টির। এই সমস্ত সংগঠন বলিতে আমরা মনে করি লেবার পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি, লিবারেল পার্টি, কমনওয়েলথ্ পার্টি এবং রাজনৈতিক দল সমূহের অন্যান্য গ্রূপ বা সেকশনগুলি অর্থাৎ যাহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।"

হ্যারি পলিট আরো বলেন যে, লেবার পার্টি যদি সমগ্র জাতীয় ক্ষেত্রে এই রকম একটা বোঝাপড়া করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি মনে করেন যে, স্থানীয়ভাবে যাহাতে বোঝাপড়া হয় তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন "লেবার পার্টির বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য যদি এই রকম একটা চুক্তি সংঘটিত না হয়, এবং নির্ব্বাচন সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া না হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রার্থী নির্ব্বাচন হইতে সরাইয়া আনিব না। ব্রিটেনে আমরা একটি বড় রকমের রাজনৈতিক শক্তি, আমাদের গণপ্রভাব দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে, জনমতের শক্তিসম্পন্ন অংশ-সমূহের আমরা প্রতিনিধিস্থানীয়, পার্লামেণ্টের ভিতরে এবং বাহিরে সমস্ত রকমের দ্রুত সামাজিক উন্নতির জন্য আমরা সংগ্রাম করি। তাই পার্লামেণ্টে কমিউনিষ্টদের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজন।"

তারপর হ্যারি পলিট শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর একতার বিপুল প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। তিনি বিশেষভাবে বলেন যে "ফ্যাসিষ্টবিরোধী সংগ্রামে সাধারণ শ্রমিকরাই অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে এখনো যে সমস্ত বিভেদ আছে তাহা দূর করিবার পক্ষে শ্রমিকদের ইচ্ছার উল্লেখ করেন।

"যদি লেবার পার্টি এবং কমিউনিষ্ট পার্টির ভিতর কোন বোঝাপড়া হয়, তাহা হইলে তাহা ডিসেম্বর সম্মেলনে এবং সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর বিশেষ উৎসাহের সহিত গৃহীত হইবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই মীমাংসা সম্ভব এবং আমরা এ বিষয়ে আমাদের যাহা করণীয় তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"...

"লেবার পার্টির পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত বোঝাপড়ার প্রয়োজন আছে—ইহাতে লেবার পার্টিতে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কো-অপারেটিভ সমূহে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিতে নূতন নূতন সভ্য সংখ্যা বাড়িবে, শ্রমিকদের স্বার্থ আগাইয়া নিয়া আন্দোলন অগ্রগতির পথে চলিবে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রবাদ কি এবং তাহা অর্জন করিবার পক্ষে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শ্রমিকরা শিখিবে, আন্তর্জাতিক সংহতির বন্ধন দৃঢ়তর করিবে এবং এই আন্দোলন এমন একটি ভিত্তি স্থাপনা করিতে সহায়তা করিবে, যাহার ভিতর দিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশে শ্রমিক শ্রেণীর একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গড়িয়া তোলা যাইবে।"

পাম দত্তের বক্তৃতা

'জনসাধারণের জন্য ব্রিটেন' শীর্ষক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আর, পি, দত্ত বলেন, এক বিরাট ও সম্মিলিত আন্দোলন প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট পার্টির এক কর্ম্মসূচিতে জমি. ব্যাঙ্ক, কয়লা, বিদ্যুৎ, যানবাহন ও ইস্পাত—এই সমস্ত মূল অর্থ নৈতিক সম্পদগুলির উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানানো হয়। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে সম্মিলিত শ্রমিক আন্দোলন ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন এই কর্ম্মসূচির পিছনে পাওয়া যাইবে এবং গণ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবে।

প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড করিতেছে। এই অপচেষ্টা নিঃশেষে ভাঙিতে হইবে। যুদ্ধের পর বৃটেন দরিদ্র হইয়া পড়িবে—ইহারা আজ এই ধুয়া তুলিয়াছে। অথচ যুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাদের নিজেদের মুনাফা হাজার গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

বৃটেনের দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী—এই যুক্তি কমিউনিষ্টরা স্বীকার করেন না। সমস্ত কারখানাযন্ত্রের শ্রমশক্তির সমস্ত শিল্পদক্ষতার সম্পদকে আজ প্রাচুর্য্য সৃষ্টির কাজে লাগাইতে হইবে। ১৯১৮ সাল হইতে শিল্প ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ফল মোটেই ভাল হয় নাই; কয়লা, জাহাজ-নির্ম্মাণ, ইস্পাত, সূতাশিল্প, কৃষি ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনে ঘাটতি হইয়াছে। বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিক এবং শিল্পকারখানার একচেটিয়া ব্যক্তিস্বার্থসম্পন্ন কর্ত্তারা হিটলারকে শক্তি যোগাইয়াছে—তাহাদের এই নীতিই বর্ত্তমান যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

পাম দত্ত বলেন: "প্রত্যেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা, অবিলম্বে আসল রোজগারবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সামাজিক মান উন্নত করা—ইহাই আমাদের কর্ম্মসূচি। পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন, অধিকতর দক্ষতা ও নিপুণ সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের অর্থ নৈতিক সহযোগিতা—ইহার ভিতর দিয়া রপ্তানির সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইবে।"

পুস্তক পরিচয়

মুক্তি-সংগ্রামে অস্পৃশ্য শ্রেণী

লেখক: বি, টি, রণডিভে

সোল এজেণ্ট—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ, ১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দুই আনা।

কমরেড রণডিভে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সভ্য। উল্লিখিত প্রবন্ধটি তিনি মারাঠি ভাষায় লেখেন এবং মারাঠি "লোকযুদ্ধ" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন। পরে উহা মারাঠি এবং ইংরেজী ভাষায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা ভাষায়ও তাহার অনুবাদ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইল।

হিন্দু সমাজ যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাহাদের স্থান কোথায়? তাহাদের অধিকাংশই শ্রমিক এবং কৃষি মজুর। বাংলাদেশে অনেক কৃষকও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বর্ণহিন্দু সমাজ ইহাদিগকে অনার্য্য বা দাস বলিয়া মনে করে। তাহাদের জল অচল, হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁয় তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাহারও ঘরে কোন "অস্পৃশ্য" প্রবেশ করিলে গৃহস্বামী হাঁড়ি পাতিল ও জল ফেলিয়া দেন। যাহারা আমাদের দেশেরই জনসংঘের একটি অংশ তাহাদের প্রতি এই বর্ব্বর আচরণের বিরুদ্ধে গান্ধীজী হরিজন আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন।

কমরেড রণডিভে উক্ত পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন যে হরিজন সমস্যা কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের জলচল করিবার সমস্যা নয়। এদেশে সংখ্যায় তাহারা প্রায় পাঁচ কোটি। এই বিরাট জনসংঘ শিক্ষায়, সভ্যতায়, অর্থ নৈতিক সম্পদে, রাজনৈতিক অধিকারে সমস্ত বিষয়ে পশ্চাৎপদ। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের দুর্ব্বলতা এই যে, উহা ভারতের এই বিরাট অনুন্নত অংশকে হিন্দুসমাজের অখণ্ড অংশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং তাহাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা অস্বীকার করে। "হিন্দুসমাজই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী" এই মনোভাবের সমালোচনা করিয়া কমরেড রণডিভে লিখিয়াছেন—"যুগযুগান্তর ধরিয়া 'অস্পৃশ্য'দের উপর যে অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে সে কথা স্মরণ করিয়া কোন হিন্দু স্বচ্ছ বিবেকে একথা বলিতে পারেন না যে উহারা হিন্দু-সমাজের অবিভক্ত অংশ। তাহার উপর হিন্দু-সমাজ কর্তৃক 'অস্পৃশ্য'দের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী তাহাদের পক্ষে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার সামিল।" কমরেড রণডিভে তাই দেখাইয়াছেন, পৃথক যাহাদের করিয়া রাখিয়াছি তাহাদের পৃথক সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, নির্য্যাতিতদের এই বিরাট জনসঙ্ঘ যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলের সমকক্ষ হিসাবে যোগদান করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের প্রতি কংগ্রেসের উদার হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে।

এই জন্যই নিখিল ভারত তপশীলভুক্ত জাতি ফেডারেশন যে দাবী উপস্থিত করিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। ঐ দাবীগুলি হইতেছে এইরূপ:—

(১) ভারতের গঠনতন্ত্র রচনা তপশীলভুক্তদের সম্মতিক্রমে করিতে হইবে। (২) ভারতীয় গঠনতন্ত্রে তপশীলভুক্তদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। (৩) তাহাদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীতার অনুপাতে সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগের ব্যবস্থা চাই। (৪) সরকারী আয় ব্যয়ের ব্যবস্থায় তপশীলভুক্তদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত চাই। (৫) সরকারী খাস জমিতে তাহাদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চাই। (৬) আইন সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তপশীলভুক্তদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা চাই।

অর্থাৎ অনুন্নতেরা আর সকলের সমান হইবার অধিকার চায়। এই দাবীর যৌক্তিকতা উক্ত পুস্তিকায় বিশদভবে আলোচিত হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্মীদের ধারণা যে, পৃথক নির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাহাদের শক্তি বাড়াইবে এই সম্ভাবনা দূর করিবার উপায় "অস্পৃশ্য"দের সমান পর্য্যায়ে উঠাইয়া আনা, তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিয়া স্বাধীনতার প্রতি তাহাদের চেতনা জাগান। সমাজের সম্পদ ও সম্মান হইতে যাহাদের পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে নির্ব্বাচনে তাহাদের জোর করিয়া সংযুক্ত করিবার চেষ্টা বিবেচনাহীন ও অন্যায়। তপশীলভুক্তদের ফেডারেশনকে লক্ষ্য করিয়া কমরেড রণডিভে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি অনুন্নতের উন্নতি করিতে চান তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে, তপশীলভুক্ত শ্রেণীসমূহকে কংগ্রেসের সঙ্গে একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিচালিত করিতে হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান অনুন্নতদের জন্য যে দাবী উপস্থিত করিয়াছে তাহার মধ্যে ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার কথা নাই। ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার সংগ্রাম ছাড়া জনগণের কোন অংশেরই কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তপশীলভুক্তদের অগ্রসর হইতে হইবে, স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একতার পথে। সেই সঙ্গে সঙ্গে "অস্পৃশ্যদের" কর্ত্তব্য শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সভাতে যোগ দিয়া শ্রেণী-সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা, কারণ তাহাদের অধিকাংশই শ্রমিক এবং কৃষক।

উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন—"জাতীয় আন্দোলন এ যাবত অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের প্রকৃত গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই এবং অস্পৃশ্যদের দাবীকে নিজস্ব দাবী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাতে দেশই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অস্পৃশ্যরা নিজেরাই তাহাদের দাবী সম্পর্কে সজাগ হইয়া তাহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে এবং এখন রাষ্ট্রক্ষমতা দাবী করিবার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পথ স্বাধীনতা লাভেরই পথ। প্রত্যেক মুক্তিকামী ভারতবাসীর কর্ত্তব্য তাহাদের এই অগ্রগতিকে অভিনন্দিত করা এবং তাহাদের ন্যায্যদাবী বিনাসর্ত্তে সমর্থন করিয়া তাহাদের সাহায্য করা—যাহাতে দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের স্রোতে তাহাদের আন্দোলনের ধারা আসিয়া মিলিতে পারে। যত শীঘ্র তাহা সম্পন্ন হইবে তত শীঘ্র আমাদের জাতীয় সংগ্রাম স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে।"

—ভবানী সেন

ট্রাম ব্যবস্থা কর্পোরেশনের হাতে চাই

বাহিরের লোককে ইজারা দিবার চেষ্টা রোধ করিতে হইবে

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তিমত কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯৪৫ সাল হইতে কোম্পানীটি কিনিয়া লইতে পারে। বর্ত্তমানে সেজন্য আলোচনা ও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ট্রাম কলিকাতার নাগরিকদের যাতায়াতের প্রধান বাহন। এই ট্রাম পরিচালনা ব্যবস্থা কোন ব্যক্তিগত কোম্পানীর হাতে না থাকিয়া কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে আসাই উচিত। তাহাতে ট্রাম চলাচল হইতে যে বিরাট আয় হয় তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী ধনীর হাতে না পড়িয়া সেই অর্থ নাগরিকদের স্বার্থে ব্যয় হইবে এবং অন্যদিকে কলিকাতাবাসীর স্বার্থ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ট্রাম চলাচলের উন্নতি হইবে।

কিন্তু কর্পোরেশনের তরফ হইতে ট্রাম কিনিয়া নেওয়ার পথে একটি বিরাট সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ট্রাম কোম্পানী খরিদ করিতে হইলে ৭ বৎসরে তাহার গড়ে যে লাভ হয়, সেই পরিমাণ টাকা কোম্পানীকে কর্পোরেশনের তরফ হইতে দিতে হইবে। অর্থাৎ কর্পোরেশনকে ৩ কোটি হইতে ৬ কোটি টাকা বর্ত্তমান ট্রাম কোম্পানীকে দিতে হয়।

অথচ এত টাকা কর্পোরেশনের তহবিলে নাই। একমাত্র ধার করিয়াই কর্পোরেশন এই টাকা পাইতে পারে। কিন্তু এসম্বন্ধেও আইনগত অসুবিধা রহিয়াছে। মিউনিসিপাল আইনের ৯৭ ধারা অনুসারে কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানী খরিদ করিবার জন্য টাকা ধার করিতে পারে না।

কাজেই ট্রাম খরিদ করিবার জন্য টাকা ধার করিতে হইলে মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন প্রয়োজন। আইনের সংশোধন খুব কঠিনও নয়। কারণ কর্পোরেশনের ভিতরে যে সব দল রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে শুধু শ্বেতাঙ্গরা ছাড়া আর সবাই ট্রাম খরিদ করিবার পক্ষে। মুসলিম লীগ দলও ট্রাম খরিদ সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলে নাই। কি পদ্ধতিতে ট্রাম খরিদ করা হইবে সে সম্বন্ধেই মাত্র লীগ দল মতভেদ জানাইয়াছিল। সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের পর কর্পোরেশন যদি নিজে টাকা ধার করিয়া ট্রাম খরিদ করে তাহা হইলে লীগদল আপত্তি করিবে না। কাজেই এ সম্বন্ধে সকল দল একমত হইতে পারে। কিন্তু কর্পোরেশনের ভিতরে ফরওয়ার্ড ব্লক ও হিন্দুসভা দল সকল দলে একতা দ্বারা আইন সংশোধনের পথে না গিয়া কৌশলে আইনের বিধান এড়াইতে চাহিতেছেন। তাঁহারা বিভিন্ন দেশী কোম্পানীর নিকট টেণ্ডার চাহিয়া পাঠাইয়াছেন যে যদি কোন কোম্পানী ট্রাম খরিদ করিবার সব টাকা কর্পোরেশনকে দিতে রাজী থাকে তাহা হইলে সেই কোম্পানী ২৫ বৎসরের জন্য ট্রাম পরিচালনার ইজারা পাইবে। কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ট্রাম পরিচালনার ব্যবস্থার পরিদর্শন করিতে পারিবেন মাত্র—আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

এই উপায়ে ট্রাম খরিদ করিতে গেলে অনেক আইনগত গোলযোগ ঘটিবেই। যদি কোন দেশী কোম্পানী কর্পোরেশনকে টাকা দেয় তাহা হইলে সরকার তখনই আইনগত আপত্তি তুলিবে যে কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানী খরিদ করিবার জন্য টাকা ধার করিয়া মিউনিসিপাল আইনের ৪৭ ধারার বিধান ভঙ্গ করিতেছে। তারপর চলিবে বহুদিনব্যাপী মামলা মোকদ্দমা। সরকার ও কর্পোরেশনের কোন্দলের মাঝে পড়িয়া নাগরিকরা হয়রান হইবে—যেমন হইয়াছিল আবর্জ্জনা পরিষ্কার ম্যালেরিয়ার ঔষধ ইত্যাদির ব্যাপারে। ট্রামই হয়তো বন্ধ হইবে।

তাছাড়া অন্য দিক দিয়াও ট্রাম খরিদ করিবার এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যাপারটা যদি শুধু এরূপ হইত যে একটি বিরাট কারবার শ্বেতাঙ্গ বণিকদের হাত হইতে দেশীয় বণিকদের হাতে আসিতেছে—তাহা হইলে সমস্ত কলিকাতাবাসীই উহা সাগ্রহে সমর্থন করিত। কারণ ইহাতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি হইত।

কিন্তু এখানে কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের সুখ সুবিধার প্রশ্ন জড়িত। যে কোন দেশী কোম্পানীই কর্পোরেশনকে টাকা দিয়া ট্রাম পরিচালনার ইজারা গ্রহণ করুক না কেন—সে কলিকাতার জনসাধারণের নিকট হইতে বৎসর বৎসর বিরাট লাভ করিবে। সুতরাং ইজারা চালু থাকার সময়ে জনসাধারণের স্বার্থে কর্পোরেশন ইহাতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে ইহা সে কোম্পানী স্বভাবতই চাহিবে না এবং ইজারার মেয়াদ ফুরাইলেও যাহাতে সে আবার এই লাভের ইজারা পায় সেজন্য কর্পোরেশনকে হাত করিতে চাহিবে। এম্‌নিই তো দুর্নীতির জন্য কর্পোরেশনের অনেক বদনাম আছে তার উপর প্রচুর অর্থসম্পন্ন কোনো শক্তিশালী কোম্পানী যদি অনবরত দুর্নীতি আরও উস্কায় তবে কর্পোরেশনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে সহজেই আন্দাজ করা যায়। এখনই কত দালাল আসিয়া কত কাউন্সিলরের কানে ফুসফুস করিতেছে।

কাজেই, এই পদ্ধতিতে ট্রাম ক্রয় করিতে গেলে মন্দ ছাড়া ভাল হইতে পারে না। সেইজন্য, কর্পোরেশনের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে কর্পোরেশনের ভিতরের সমস্ত দলকে একত্র করিয়া সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দ্বারা মিউনিসিপাল আইনের ৯৭ ধারা সংশোধন করা যায় কিংবা সরকার হইতে টাকা দাদন পাওয়া যায়। তাহা হইলে কর্পোরেশন নির্ব্বিঘ্নে টাকা ধার করিতে বা ট্রাম ক্রয় করিতে পারিবে, ট্রাম কোম্পানী সত্যই কলিকাতার নাগরিকদের হাতে আসিবে।

৩রা ডিসেম্বর

কলিকাতায় ম্যালেরিয়া বিরোধী দিবস

আজ পূর্ব কলিকাতার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত অধিবাসীদের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার মুল কারণ দুর করিবার জন্য অভিযান চাই। তার জন্য পূর্ব কলিকাতার বস্তী, বদ্ধ ডোবা ও আবর্জনাপূর্ণ ড্রেণগুলি সাফ্ করা চাই। এই কাজ মূলতঃ সরকার ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের কাজ। একদিকে জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং অপরদিকে কর্ত্তৃপক্ষদের তৎপর করিবার জন্য গত ১৯শে নভেম্বর ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার বীরেশ্বর মিত্রের সভাপতিত্বে কলিকাতার চিকিৎসক, মেডিকেল ছাত্র ও বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সভা হইতে ৩রা ডিসেম্বর একটী বিশেষ দিবস হিসাবে পালন করিবার জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে। এইদিন পূর্ব কলিকাতায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া বিরোধী অভিযান চালান হইবে। এই কাজ সফল করিতে হইলে স্বেচ্ছাসেবক চাই এবং ম্যালেরিয়া বিরোধী অভিযানের উপযোগী সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র চাই। ৬৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের আফিসে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম, অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোলার একজন প্রতিনিধি ভাটিয়ালি সুরে একটা গান গাহিলেন—

"(ও ভাই) বাংলা হৈল খালি
মানুষ মৈল ভাতের লাইগা হৈয়রে কাঙালী…
কাপড় দিব ওষুধ দিব আর দিব চাল
নেতারা সব বড় কথা কৈল ভৈরা গাল
(শেষে) চোরাবাজারে বেচল নিয়া রে
মোদের আহারগুলি।……"

তারপর তিনি বর্ণনা করিলেন—লীগের জন্য বিরোধীদের সঙ্গে মারামারি করিয়া জেল খাটিয়াছেন, তারপর দুর্ভিক্ষের সময় লীগের কাজে যখন গ্রামে গ্রামে ফিরিয়াছেন তখন না খাইতে পাইয়া তাঁহার ভাই, ভাই বৌ ও ভাইপো মারা গিয়াছে, কেহ দেখে নাই।

নেতাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মর্ম্মান্তিক গান ও কথা—সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া শুনিল। আর তারপর তাঁহার নাম জানিবার জন্য, তাঁহাকে সমর্থন জানাইবার জন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি উঠিল। ইহার পর আবদুল্লা হিল বাকি সাহেবও সরকারী এজেন্টদের অত্যাচার, সরকার কর্ত্তৃক খাদ্য অপচয় প্রভৃতি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু এমনি আবহাওয়ার মধ্যেও পরিবর্ত্তনকামীরা নেতৃত্বের নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের কোন নীতি দেখাইতে পারিলেন না। চালের দাম পড়া হইতে কৃষককে বাঁচাইতে হইবে, অথচ দাম এমন না হয় যাহাতে অসংখ্য হৃতসর্বস্ব মুসলমান উপবাসে মরে—তাহার একমাত্র উপায় হইল চালের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশন করিয়া কণ্ট্রোল দরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আর শহরগুলিতে খাদ্য রেশনিং চালু রাখিয়া মজুতদারদের শক্তিহীন করা এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত শস্য বাঁধা দামে কেনার জন্য সরকারী ক্রয় ব্যবস্থা পাকা করা। তবেই ঘাটতি এলাকার লোকে কম দামে চাল পাইবে অথচ বাড়তি এলাকার লোকেও অন্য সব জিনিষ কিনিতে পারিবে। এ নীতি অনুসারে কাজ করা যাইতেছে না বা যায় না মন্ত্রীমণ্ডলী ইহাই অজুহাত দেয়!

মন্ত্রীমণ্ডলী দলগত। এই মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে লড়িয়া কাপড়, কয়লা প্রভৃতি আদায় করিতে পারিতেছে না, চোরাবাজার বা দুর্নীতিও রোধ করিতে পারিতেছে না—তাহ ওসমান ও সুহরাবর্দি সাহেবই বক্তৃতায় স্বীকার করেন। সে জন্যই সব জিনিষ কণ্ট্রোল হয় না, কাপড় ও কয়লা প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না। দলগত ঝগড়ার আড়ালে আমলাতন্ত্র ও চোরাবাজার আশ্রয় পায়।

কিন্তু দলগত ঝগড়া মিটাইয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গড়িয়া বাংলার মুসলমানকেই বাঁচাইবার কথা পরিবর্ত্তনকামীরাও এখনো ভাবেন না। এমন কি, মন্ত্রীমণ্ডলীর খাদ্য সম্বন্ধে কি নীতি নেওয়া উচিত তাহাও তাঁহারা ধরিয়া দিতে পারেন নাই। সুতরাং ডেলিগেটদের মধ্য হইতেই ঘাটতি জেলার বিরুদ্ধে বাড়তি জেলার মত, চাষীর বিরুদ্ধে জোতদারের মত ইত্যাদি নমুনা দেখাইয়া সুহরাবর্দি সাহেব পরম সাধুর ন্যায় বলিতে পারিলেন যে সমস্যা সমাধান সহজ নয়, আপনারা প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া ব্যাপারটা আমাদের উপর ছাড়িয়া দিন। আর অমনি সব প্রস্তাব প্রত্যাহার হইল। যে জিনিষের জন্য মন্ত্রীত্ব বা নেতৃত্বের উপর সবচেয়ে বেশী অসন্তোষ সেই জিনিষটাই স্বেচ্ছায় মন্ত্রীদের হাতে পুরাপুরি ছাড়িয়া দেওয়া হইল!

কিন্তু সে যাই হোক দুই পক্ষই মুসলিম জাতীয় সংগঠনের ঐক্য অটুট রাখিবার শুভবুদ্ধি জাগ্রত রাখিয়াছেন ইহাই সব চেয়ে আশার কথা। লাল মিয়া সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে আমরা আমাদের "ত্রিপুরী" হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি!"

নেতৃত্বে বিশেষ স্থান না পাইলেও লীগের নীতিপ্রচার ও নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া পরিবর্ত্তনকামীরা এবার অনেকটা সফল হইয়াছেন। লীগের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবার জন্য সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে যে জনসাধারণের দাবী প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি ইস্তাহারের খসড়া করা হইবে। এই পত্রিকা ও ইস্তাহার-মারফৎ জনসাধারণের সহিত লীগের যোগ আরও দৃঢ় হইবে, জনস্বার্থমূলক নীতিও ক্রমশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাংলার লীগ সংগঠনের ইতিহাসে আজ প্রায় ৫। লক্ষ সভ্য লইয়া এক নূতন যুগ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংগঠনের ঐক্য বজায় থাকার মানেই প্রগতিকামীদের হাতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার বজায় রহিল। এই লগকে আরও সচেতনভাবে প্রসারিত করার ভিতর দিয়া তাঁহারা আরও জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিবেন, সাধারণের অভিজ্ঞতা নাড়িয়া চাড়িয়া তাঁহাদের রাজনীতিক চেতনা আরও পরিস্ফুট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জনসেবার ভিতর দিয়া তাঁহাদের শক্তিও যথেষ্ট বাড়িবে। তখনই লীগ জনসাধারণের সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে, আদর্শ পূর্ণ করিতে পারিবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে শতকরা ১০ জনের বেশী চিকিৎসিত হইতে পারে না। ব্যাপক মহামারী এখন স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগে মানুষ যত মরিতেছে তাহার চেয়েও ঢের বেশী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

১৯৪৫ সালে খাদ্যের অবস্থা কি হইবে? চাউলের দর এখন পড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা গেজেট অনুসারে ৫টি জেলায় চাউল প্রতিমণ ১৪ হইতে ১৫৲ টাকা, ১০টি জেলায় ১০ টাকা হইতে ১৪৲ টাকার ভিতর, ১০টি জেলায় দশ টাকারও কম। কৃষকের হাতে যখন ধান, তখন চাউলের দর এত কম অথচ চিনি, নুন, কাপড় প্রভৃতি পণ্য শুধু দুর্মূল্য নয় দুষ্প্রাপ্য। ফলে কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। তাহারা কৃষির খরচ জোগাইতে অক্ষম। মজুতদার মহাজন তাহাকে দুই দফা লুটিতেছে—এক দফা ধানের দর কমাইয়া আর এক দফা অন্যান্য জিনিষ মায় ঔষধ পর্য্যন্ত চোরাবাজারে লুকাইয়া। তাহার উপর শোনা যাইতেছে যে, কলিকাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আগামী বৎসর খাদ্য সরবরাহ না করিতে পারেন। বাংলা সরকারের ক্রয় ও বিলি ব্যবস্থা যদি নিখুঁত ভাবে না চলে তবে ১৯৪৫ সালে বাংলার সর্ব্বনাশ চরমে পৌছিবে।

কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন এই সংকটের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের সেবা কি ভাবে করিবে? কি ভাবে কংগ্রেসের সংগঠন ও শৃঙ্খল দৃঢ় করিবে? ভ্রাতৃবিরোধ বাড়াইয়া না ঐক্য সৃষ্টি করিয়া?

নোটিশ

কাগজের কোটা কম পাওয়ার জন্য আমরা সবারই কাগজ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হতে কম করে দিতে বাধ্য হয়েছি, সেজন্য সবাই কাগজ কম পাচ্ছেন, এবং যে সব জায়গায় এক পোষ্টাফিসে বা ষ্টেশনে দু'তিন জনের নামে কাগজ যেত সেখানে আমরা এক জনের নামেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাগজ পাঠাচ্চি।—তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন যার নামে কাগজ যাচ্ছে তাঁর সাথে কাগজ পাওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

কাগজের কোটা কম পাওয়ায় আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা আমাদের ২০ হাজার কাগজ দ্বারা ১ লক্ষ লোককে পড়াতাম; তাতে গড়পড়তায় একখানা কাগজ ৫ জন লোক পড়ত; এক একটি পাঠচক্রের জন্য একখানা কাগজ ছিল। এখন আমাদের শ্লোগান হলো—"একখানা কাগজ দ্বারা ৫টি পাঠচক্র চালাব।" তাহলে আমাদের প্রচার কমে গেলেও আমাদের পাঠকসংখ্যা কমবে না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমাদের প্রচার (অর্থাৎ পাঠক সংখ্যা) কমতে দিলে চলবে না, তাই আমাদের শ্লোগান হলো "একখানা জনযুদ্ধ আমরা ২০ জন পাঠককে পড়াব।—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা চেষ্টা করব যাতে আমাদের কাগজের কোটা বাড়ান যায়।"

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

Regd. No. C. 2836.

ইরাণের তেলের জন্য সোভিয়েট ইজারার সুবিধাজনক সর্ত

ইঙ্গ-মার্কিন তৈলপতিদের গাত্রদাহ

ইরাণের দক্ষিণ অংশে তেল তুলিবার ইজারা ব্রিটিশ ধনিকদের হাতে। স্বভাবতই ইহারা চান যে উত্তর অংশের ইজারাও তাঁহারাই পান, ইরাণের অধিবাসীরা বা অন্য কেহ যেন তাহাতে বাদ না সাধে। তাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যখন উত্তর অংশে তেল তুলিবার ইজারা পাইবার জন্য ইরাণ সরকারের কাছে আবেদন করিল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংবাদ প্রতিষ্ঠান রয়টার তাহার বিরুদ্ধে ফলাও করিয়া খবর তৈয়ারী করিতে লাগিল। বিলাতের গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা "সাণ্ডে অবজার্ভার" আতঙ্কিত হইয়া চীৎকার সুরু করিল, লণ্ডন "টাইমস্" পত্রিকা মুরুব্বির মত পরামর্শ দিল, যুদ্ধের মধ্যে আর তেলের কথা তুলিয়া কি হইবে। এই সব সাম্রাজ্যবাদীদের দাসস্য দাস এবং বোম্বাই ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের কর্ত্তা স্যর রুস্তম মাসানি পর্য্যন্ত সোভিয়েটকেই সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া কাগজে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহাদের অন্তর্দাহের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু রয়টারের ধাপ্পায় ভুলিয়া আমাদের দেশেরই কয়েকটী কাগজ ঠিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতই সুর ধরিতেছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের "ন্যাশনালিষ্ট" অভিযোগ করিয়াছে যে সোভিয়েট নাকি ইরাণের "সার্বভৌম অধিকারে" হস্তক্ষেপ করিতেছে। "আনন্দবাজার" সোভিয়েটের ব্যবহারে "উদ্বেগ" বোধ করিতেছে। "আজাদ" প্রশ্ন করিয়াছে রুশ সরকারের ভাবগতি "কি গণতন্ত্র সম্মত"?

আসল ব্যাপার কি?

১৯০১ সালে ডার্সি নামে একজন ব্রিটিশ-নানা কূটনীতির সাহায্যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়া ইরাণের সমগ্র ভূখণ্ডের পাঁচ ভাগের চার ভাগেই (৫ লক্ষ বর্গমাইল) তেল তুলিবার ইজারা আদায় করে। এই ইজারা সে ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বর্মা অয়েল কোম্পানীর কাছে বিক্রয় করিয়া দেয় এবং উক্ত কোম্পানী ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানী গঠন করে।

তারপর রেজা শা ঐ কোম্পানীর ইজারা এলাকার পরিমাণ কমাইয়া ১৯৩৮ সালে উহা এক লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। দীর্ঘ ৪৩ বৎসর ভোগদখল করার পরও এখনও সেই ব্রিটশ ইজারা বলবৎ আছে। ঐ কোম্পানীতে শ্রমিকদের কোন স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতা নাই, টেকনিক্যাল কাজে ইরানীদের নিয়োগ করা হয় না, ইজারার টেকনিক্যাল কাজে তদারক করার কোন অধিকার ইরাণ সরকারেরও নাই—উহার উদ্দেশ্যই হইল ইরাণের অধিবাসীদিগকে নিজ দেশের তেল হইতে চিরকালের মত বঞ্চিত করিয়া ইরাণী শ্রমিকের দাস সুলভ পরিশ্রমে অজস্র লাভ সঞ্চয় করা।

সোভিয়েট ইজারার সর্ত্ত

কিন্তু সোভিয়েট ইজারার সর্ত্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। **ইজারার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তেল তুলিবার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানটিই ইরাণ সরকারের সম্পত্তি হইবে।** সোভিয়েট সরকার ইহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পর্য্যন্ত লইবে না। ইহা ছাড়া ইজারা থাকার সময় সোভিয়েট সরকারের যে লাভ হইবে তাহার একটি অংশও ইরাণ সরকার পাইবে, উৎপাদনের টন হিসাবে সেলামী পাইবে এবং ইরাণ সরকার ও জনসাধারণ তাহাদের ব্যবহারের জন্য কম মূল্যে তেল পাইবে। তেল তুলিবার কাজে যে-সব কর্ম্মচারী ও মজুরকে নিয়োগ করা হইবে তাহাদের স্বাস্থ্য এবং যাবতীয় সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। তাহাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গড়িবার অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তেল তুলিবার জন্য যে সব টেকনিক্যাল শিক্ষার দরকার সে শিক্ষা ইরানীদের দেওয়া হইবে এবং টেকনিক্যাল কাজকর্ম্মে তাহাদের নিয়োগও করা হইবে। ইজারাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্মের উপর ইরান সরকারের তদারকের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং ইহার লাভের হিসাব পরীক্ষা করারও অধিকার থাকিবে।

সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মঃ কাভজারাদজে গত ২৪শে অক্টোবর তেহেরাণের প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট একটি বৈঠকে ইরাণের তেলের ইজারা সম্পর্কে সোভিয়েটের এই মতামত ব্যক্ত করেন। ইহার চেয়ে ভাল বা গণতান্ত্রিক সর্ত্ত আর কি হইতে পারে? মার্কিনের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র সচিব সাম্‌নার ওয়েল্‌স বলিয়াছেন যে সোভিয়েটের সর্ত্ত নাকি খারাপ। ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানীর সর্ত্তের সহিত উপরোক্ত সোভিয়েট সর্ত্ত মিলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে তাঁহার উক্তির মূল্য কতটুকু।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপচেষ্টা

তেলের ব্যাপারে বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের মনোভাব খুবই পরিষ্কার। ১৯৪২ সাল হইতে নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিন কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছে তেলের স্বার্থ নিয়া ইতিমধ্যেই মার্কিণ ব্যবসায়ীরা সউদী আরবে ইজারার সুবিধা করিয়া নিয়াছে, আর বৃটিশ ধূরন্ধররা ইরাক, বাহেরিন, পালেষ্টাইনে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব আরও দৃঢ় করিতেছে।

সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিন ও বৃটিশ কায়েমী স্বার্থবাদীরা আগে কোন কথাই বলে নাই। সোভিয়েট সরকার যখন তাহাদের ইজারা নেওয়ার সর্ত্তাদি প্রকাশ করিল, তখনই তাহাদের টনক নড়িল। সোভিয়েটের ইজারার সর্ত্ত যদি পাশাপাশি এদের সর্ত্তের সাথে কার্য্যকরী হয়, তবে ত সর্বনাশ।

ইরাণের প্রধানমন্ত্রীই বা আজ সোভিয়েটকে তেলের ইজারা দিতে রাজী নন কেন? অথচ মঃ কাভজারাদজে তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, প্রথম যখন ইরাণের প্রধানমন্ত্রী সঈদের সাথে তেলের ব্যাপারে আলাপ হয় তখন তাঁহার দিক হইতে কোন আপত্তিই ছিল না বরং সোভিয়েটের এই দাবীকে সহানুভূতির চোখেই দেখিয়াছেন। কিন্তু আজ যখন সোভিয়েট তাহাদের ইজারার সর্ত্তাদি পরিষ্কার ভাবে প্রেসের প্রতিনিধি মারফৎ ইরাণের জনসাধারণকে জানাইয়াছিল তখনই সঈদ সাহেব বাঁকিয়া বসিলেন এবং জানাইয়া দিলেন—যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তেলের ইজারা সম্পর্কে কোন কথা নয়।

আসলে ইরাণের প্রধান মন্ত্রীর নিজের শ্রেণী স্বার্থও ইহাতে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সোভিয়েটকে তেলের ইজারার সুবিধা দিলে ইরানে স্বতঃই মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আগাইয়া যাইবে, প্রগতিশীল কার্যকলাপও বাড়িবে। যাঁহারা আজও ইরাণে সামন্ততন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বজায় রাখিতে চান, ইরাণের সেই সব ঝুনো রাজনীতিক নেতারা জনসাধারণের এই জাগরণের প্রশ্রয় দিতে রাজী নন—তাই প্রধানমন্ত্রী সঈদ তাহাদেরই মুখপাত্র হিসাবে আজ সোভিয়েটের তেলের ইজারার ব্যাপারে এই কর্ম্মপন্থা নিয়াছেন। ইরাণের প্রধানমন্ত্রীর এই শক্ত মনোভাবের পিছনে আজ বৃটিশ ও মার্কিন কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের হাতও রহিয়াছে কারণ সোভিয়েটের ইজারার নীতি আজ সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ইজারা ও শোষণ নীতির স্বরূপ ইরাণবাসীদের কাছে খুলিয়া ধরিতেছে।

ইরাণের জনসাধারণ কি চায়?

মঃ কাভজারাদজে তাহার ঘোষণায় এটা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আজ যদি সোভিয়েট তেলের ইজারা পায় তাহাতে সোভিয়েটের যথেষ্ট উপকার হইবে। যুদ্ধের জন্য সোভিয়েটের যথে তেলের দরকার। সাথে সাথে যুদ্ধের ভিতরে ফ্যাশিষ্টরা সোভিয়েটের যে সব অঞ্চল ছারে খারে দিয়াছে তাহা পুনর্গঠনের জন্যও তেলের প্রয়োজন। ইরাণের কাছ হইতে সোভিয়েট যে তেল নিতে চায় তাহা সোভিয়েটের নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই—বৃটিশ বা আমেরিকার পুঁজিপতিদের মত অন্যকে শোষণ করিবার জন্য নয়। কিন্তু সোভিয়েট মন্ত্রী এটাও বলিয়াছেন যে, সুবিধা ইরাণের দিক দিয়াও যথেষ্ট হইবে। ইরাণে শিল্পের প্রসার হইবে, ইরাণের জনসাধারণ তাহারই ভিতর দিয়া বহুবিধ সুবিধা পাইতে পারিবে। এবং ইজারার মেয়াদ ফুরাইলে সমগ্র ব্যবসারটাই তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে।

এই কারণেই, ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বা গণতন্ত্রবিরোধী সঈদ গবর্ণমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও ইরানের অধিকাংশ জনসাধারণ সোভিয়েটকে ইজারা দেওয়ার পক্ষপাতী। মস্কো খবর দিয়াছে যে তেহরাণের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ইহা সমর্থন করিয়াছে। রয়টার এ খবরের প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। স্যর রুস্তম মাসানি পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের ভয়েই আপত্তি

ইরাণবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বলিয়াই সইদ গবর্ণমেণ্ট তাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমতের অভিব্যক্তিকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। তাই জনমতকে দাবাইবার জন্য তাহারা ইরাণের বামপন্থী দলগুলি ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর দমননীতির আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। তেহেরাণে গত নভেম্বর দিবসের সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে সব প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং পুলিশ দিয়া ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলি দখল করা হইয়াছে।

সোভিয়েটের ইজারার সর্ত্ত যে ইরানবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক নয় একথা সঈদ গবর্ণমেণ্ট কোথাও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে এ অভিযোগও তোলা যায়না কারণ সোভিয়েট মন্ত্রী বরাবর শুধু ইহাই দেখাইয়াছেন যে ইজারার সর্ত্তগুলি ইরানের পক্ষে কিরূপ সুবিধাজনক।

সোভিয়েট ভয় দেখায় নাই, সাম্রাজ্যবাদী তৈলপতিদের মত গোপন কূটনীতিরও আশ্রয় লয় নাই—শুধু সমস্ত ব্যাপারটা ইরাণ তথা পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে ইরানের 'সার্ব্বভৌমত্ব' ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? বরং যে কোন নিরপেক্ষ লোক ইহাতে সাধুবাদ জানাইবে এবং সোভিয়েটের ইজারার সর্ত্ত ইরাণের শ্রীবৃদ্ধির পরিপোষক বলিয়াই মনে করিবে।

ইয়োরোপে চূড়ান্ত যুদ্ধের আয়োজন

বুডাপেষ্টের দ্বারে লালফৌজ, টায়রাণার মুক্তি, পশ্চিমে নূতন অভিযান

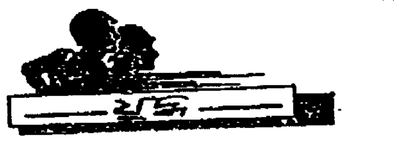

এ সপ্তাহে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর, পূর্ব-ইয়োরোপে বুডাপেষ্ট দখলের জন্য নাৎসী-বাহিনীর উপর লালফৌজের চরম আঘাত, যুগোশ্লাভ মুক্তিসেনার পর পর অনেকগুলি সাফল্য ও শীত-কালীন অভিযানের জন্য সোভিয়েটের নূতন নূতন সৈন্য সমাবেশ এবং পশ্চিম ইয়োরোপে ৩৫০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণে মিত্রবাহিনীর শীতকালীন অভিযান সুরু।

বুডাপেষ্ট দখলের চূড়ান্ত সংগ্রাম

বুডাপেষ্ট ধরিয়া রাখার জন্য জার্ম্মান ও হাঙ্গেরীয় ফৌজ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছে। বলকানে যতগুলি যোগাযোগ কেন্দ্র বর্ত্তমান আছে তাহার মধ্যে বুডাপেষ্টের তুলনা নাই। বুডাপেষ্ট লালফৌজের হাতে আসিলে এদিক হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব জার্ম্মানীর সহরগুলি তখন লালফৌজের নাগালের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। হিটলার এ বিপদ বুঝিতে পারিয়াই বুডাপেষ্টকে যতদিন পারা যায় ধরিয়া রাখার জন্য আদেশ দিয়াছে। তাহারা ঠিক করিয়াছে দরকার হইলে রাস্তায় রাস্তায় এবং বাড়ীতে বাড়ীতেও লালফৌজকে বাধা দিবে। কিন্তু মার্শাল মালিনোভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ নাৎসীদের সে আশা চূর্ণ করিতেছে। গত ১৭ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ লালফৌজ মিসকলোজ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় বুডাপেষ্ট রক্ষায় নিয়োজিত জার্ম্মান ও হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যদের চলাচলের নূতন বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। লালফৌজ মিসকলোজ হইতে ১০ মাইলেরও কম দূরে রহিয়াছে। রাজপথ ও রেল-পথের গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রটি অধিকৃত হইলে বুডাপেষ্টের উত্তর-পূর্বে জার্ম্মানদের চলাচলের ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগমন এমন স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে, যাহাতে বুডাপেষ্টকে ফিরিয়া ফেলিয়া তাহার ভিতরকার নাৎসীবাহিনীগুলিকে চাপিয়া মারিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। লালফৌজের সাঁড়াশী বেষ্টনীর কথা জার্ম্মান সৈন্যদের অবিদিত নাই, তাই এই ফ্রণ্টে শত শত জার্ম্মান আত্মসমর্পন করার জন্য রুশব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

যুগোশ্লাভ মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল তিতোর বাহিনী নাৎসী-দের বিরুদ্ধে পর পর অনেকগুলি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গত ১৮ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, আলবেনিয়ার রাজধানী টায়রাণা সম্পূর্ণভাবে শত্রু-কবল মুক্ত হইয়াছে। টায়রাণাকে স্বাধীন করার যুদ্ধে যুগোশ্লাভ বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িয়াছে আলবেনিয়ার দেশভক্ত গেরিলার দল। ক্রোশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবের দিকেও যুগোশ্লাভ বাহিনী বেশ খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। জাগ্রেব অষ্ট্রীয়ার সীমান্ত হইতে মাত্র ১০০ মাইল দূরে এবং এই সহরের গুরুত্ব আত্মরক্ষার দিক দিয়া জার্ম্মানীর নিকট খুবই বেশী। তাই জাগ্রেবকে শত্রুকবলমুক্ত করিতে পারিলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়াও অষ্ট্রীয়ার ভিতর ঢুকিতে পারা যাইবে। মার্শাল তিতোর বাহিনীর আরও বড় একটা জয় হইয়াছে। তাহারা মাসিডোনিয়ার রাজধানী স্কপলজে সহরটি নাৎসীদের কাছ হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। ইহা দক্ষিণ বলকানে যান চলাচলের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। স্কপলজে অধিকার করার লড়াইয়ে বুলগার-সৈন্যবাহিনী যুগোশ্লাভ বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছিল।

পশ্চিম ইয়োরোপের যুদ্ধ

জেনারেল আইসেনহাওয়ার তাঁহার শীতকালীন অভিযান সুরু করিয়া দিয়াছেন। মার্কিন সৈন্যরা মেৎস সহরের এক তৃতীয়াংশ শত্রুকবলমুক্ত করিয়াছে। রুঢ়ের দিকে ইংরাজ ও মার্কিণ সেনাদলের যুগ্ম অভি-যানের ফলে গাইলেনকিরকেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং উহা ছাড়াইয়া মিত্রবাহিনী আগাইয়া গিয়াছে। ফরাসী বাহিনী বেলফোর দুর্গ প্রাকারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। এই রণাঙ্গনের সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে জার্ম্মানীর ১৪ মাইল ভিতরে মিত্রসেনা গিয়া পৌছিয়াছে। এই সেনা-বাহিনী কলোন ও রাইন নদী হইতে মাত্র ২৭ মাইল দূরে রহিয়াছে। একটি জার্ম্মান ইস্তাহারে বলা হইয়াছে "মার্কিণ সৈন্যরা আমাদের ব্যূহের কয়েক-স্থানে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে।" আবার অন্য দিক দিয়া তৃতীয় আর্মির সৈন্যরা পের্ল এবং ওবের নামক দুইটি জার্ম্মান সহর দখল করিয়াছে। যে স্থানে ফরাসী, লুক্সেমবুর্গ ও জার্ম্মান সীমান্ত মিলিত হইয়াছে সেই স্থান হইতে এই স্থান দুইটী দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।

হিটলারী নীতি সফল হইবে না

পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক হইতে হিটলারী বাহিনীর উপর যুগপৎ আক্রমণ চলিতেছে। এই আক্রমণের তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন, লালফৌজ আগামী বসন্তকালের আগেই জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে অনেকখানি ঢুকিয়া পড়িতে পারিবে। সোভিয়েট সমর নায়করা পূর্বপ্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে পোলাণ্ড বরাবর জার্ম্মানী যাইবার সবচেয়ে সোজা পথে বাছা বাছা আর্ম্মী গ্রুপগুলিকে সন্নিবেশিত করিতেছেন। ফলে হিটলার এখন সব রকমের আক্রমণাত্মক রণনীতি ছাড়িয়া আত্মরক্ষামূলক নীতির আশ্রয় নিয়াছে। এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে 'নরম সন্ধির' চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ইহার জন্য কথাবার্ত্তাও চলিতেছে। এই সম্পর্কে স্পেনের ফ্রাঙ্কো, পর্টুগালের সালাজার ও পোপের নাম শোনা যাইতেছে এবং সাথে সাথে মিত্রপক্ষের 'বিভীষণরাও' চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাৎসীবাদকে এইভাবে জীয়াইয়া রাখার চেষ্টা সফল হইতে পারে না, হইবেও না।

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত JANAYUDDHA

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা] ২৯শে নভেম্বর, '৪৪, বুধবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

কমলাঘাটে কি দেখিলাম

বন্দর তো জ্বলিয়াছেই, বাংলা দেশও না জ্বলিয়া যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের বিবরণ

কমলাঘাট পূর্ব্ববঙ্গের বৃহত্তম বন্দর ও খাদ্যশস্যের বাজার। গত ২৬শে অক্টোবর এই বন্দর ও বাজার আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। উহার পাশের গ্রাম রামনগরে হরেকৃষ্ণ পালের বাড়ীতেও ঐদিনেই আগুন লাগে। ইহা লইয়া বাংলাদেশে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য আমি 'জনযুদ্ধে'র পক্ষ হইতে কমলাঘাট যাই ও যথাসম্ভব খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করি। স্থানীয় ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক এবং হিন্দুসভা, কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতির সমর্থকদিগের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করি ও তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করি।

প্রথম অভিজ্ঞতা

কমলাঘাটের কাছাকাছি পৌঁছিয়া লোকের কথাবার্ত্তা শুনিলে সর্ব্বপ্রথম একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইতে হয়—যেন দুই আজন্ম শত্রুর লড়াইয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে কমলাঘাট যাইতে নিকটবর্ত্তী পানাম গ্রামের শ্রীযুক্ত সন্তোষ তালুকদারের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন,—

"আগুন লাগার দুদিন পরে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়ী যাবার পথে শুনি সবাই আগুন সম্বন্ধে বলাবলি করছে। কেউ বলছে মুসলমানরাই আগুন দিয়েছে, কেউ বলছে বেশ হয়েছে—এই মহাজনরাই গত বছর চালের দর ৯০ টাকায় তুলে লক্ষ লক্ষ লোক মেরেছে। পাপের ধন আগুনে গেল। কিন্তু কারও কথার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ছিল না।

"আবার ১৫ দিন পরে বাড়ী যাচ্ছি। এবারও সেই একই আলোচনা। কিন্তু সুর একেবারে বদলে গেছে। হিন্দুরা উত্তেজিতভাবে মুসলমানদের গালাগালি দিচ্ছে। একটু যুবক যারা তারা বলছে ব্যাটাদের এবার আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে। পথে দু একজন পরিচিত মুসলমানদের সঙ্গে দেখা হল, অভ্যাসমত অভিবাদন এবার আর তারা করলনা।"

ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি

শুনিলাম ৩রা নভেম্বর তারিখে কমলাঘাটের হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের ২২ জন মুসলমান কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়াছেন। কমলাঘাটের মুসলমান মাঝি এবং রিকাবীবাজারের মুসলমান জেলেদের বয়কট করিবার জন্যও জোর চেষ্টা চলিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় একসঙ্গে মিলিয়া বহু রিলিফ কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি হিন্দু ছাত্রদের একটী অংশ ছাত্র ফেডারেশনকে 'নোটিস' দিয়া জানাইয়াছে যে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করিলে তাঁহারা ফেডারেশন বয়কট করিবেন।

গত ২রা নভেম্বর মসজিদের সামনে দিয়া রামনগরের দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অনুমতি হিন্দুরা অবশেষে পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলিম নেতারা মিঃ রফিউদ্দীন আহমদের বাড়ীতে সভা করিয়া স্থির করেন যে ইহার বিরুদ্ধে গোলমাল করা ঠিক হইবেনা, কারণ তাহাতে দাঙ্গা বাধিয়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সেই মুসলমানদেরই অনেকে এখন ভাবিতেছেন যে এবার বকর ঈদ উপলক্ষে রামনগরের হিন্দু জমিদার পালেদের বাড়ীর সামনে মসজিদের খোলা জায়গায় কোরবানী করিতে হইবে।

এমনি অবস্থা। কমলাঘাটের বন্দর তো পুড়িয়াছেই, যে কোনো মুহূর্ত্তে আরও অনেক কিছু পুড়িয়া যাইতে পারে!

* * *

আমি সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের উপর অনুসন্ধান আরম্ভ করি যে আগুন লাগানো মুসলমানদের কাজ বলা যায় কিনা এবং উহার স্বপক্ষে হিন্দু সভার তরফ হইতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে স্থানীয় তথ্য ও স্থানীয় লোকের মতামত কি।

রামনগরে অগ্নিকাণ্ডের সময় হরেকৃষ্ণ পাল মহাশয় নাকি "দেখিয়াছিলেন যে কয়েকজন মুসলমান দৌড়িয়া পলাইতেছে"—এই প্রধান প্রমাণের সাহায্যে মনোরঞ্জন বাবু মুসলমানদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের পরই বেলা ২টার সময় পালেরা মুন্সিগঞ্জ থানার দারোগার কাছে যে এজাহার দিয়াছিলেন তাহা আমি দেখিয়াছি। তাঁহারা শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, "মালকোঁচা মারা ৩।৪ জন লোককে তাঁহারা দৌড়িয়া পালাইতে দেখিয়াছিলেন।" মুসলমানের কথা তাঁহারা তো বলেনই নাই বরং মালকোঁচার কথায় মুসলমান না ভাবার সম্ভাবনাই মনে হয়।

'গোপন সভা'

মনোরঞ্জন বাবু কয়েকটী পারিপার্শ্বিক প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা এই যে রামনগরের দুর্গা প্রতিমা মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে কিনা এ বিষয়ে ২৬শে অক্টোবর হিন্দু-মুসলমানের শান্তি-বৈঠক বিফল হওয়ার পরই মুসলমানেরা আর একটি গুপ্ত বৈঠক করেন। সেখানেই আগুন দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বিষয়ে আমি উক্ত শান্তি-বৈঠকেরই হিন্দু প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সতীশ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে এরূপ কোনো বৈঠকের খবর তাঁহার কানে আসে নাই। জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরীশ দাসও তাহাই বলেন। ঢাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশ চ্যাটার্জি নিজে অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনিও বলেন যে মনোরঞ্জন বাবুর বিবৃতিতেই শুধু এ খবর তিনি দেখিয়াছেন, অন্য কোথাও শোনেন নাই। শুধু ঢাকা শহরের হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ বসু মনোরঞ্জন বাবুর খবর সমর্থন করেন।

আষাঢ়ে গল্প

দ্বিতীয় প্রমাণ হইল: আগুন লাগার ঠিক আগে কয়েকজন মুসলমান ব্যাপারী, বিশেষ করিয়া জনৈক মুস্তফা ব্যাপারী নাকি তাঁহাদের মাল সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ঢাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশ চ্যাটার্জি ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলেন যে—এ রকম কথা এই প্রথম শুনিলাম, এমন কি কমলাঘাটের হিন্দু ব্যবসায়ীরাও তাঁহার কাছে কখনও এরূপ অনুযোগ করেন নাই!

আর মুস্তফা ব্যাপারীর খোঁজে আমি সারা কমলাঘাট বন্দর ঘুরিয়াছি কিন্তু সেখানে ঐ নামের কোন ব্যাপারী পাইলাম না।

তৃতীয় প্রমাণ: মুসলমান মাঝিরা সবাই নাকি আগুন লাগার রাত্রে সব নৌকা সরাইয়া ফেলিয়াছিল এবং হিন্দু ব্যাপারীদের মাল উঠাইতে রাজি হয় নাই। এ কথা শুনিয়া শ্রীশ বাবু তো বটেই, হিন্দু সভার গিরীশ বাবুও অবাক হইয়া গেলেন। স্থানীয় মাঝি ও অন্যান্য লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও মনোরঞ্জন বাবুর প্রমাণের কোন সমর্থন পাইলাম না।

চতুর্থ প্রমাণ: মুসলমানেরা নিশ্চয়ই আগে হইতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, নহিলে পেট্রোল পাইবে কোথায়? আর পেট্রোল না থাকিলে আগুন অত তাড়াতাড়ি ছড়াইবে কেন? কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে কমলাঘাটে আগুন প্রথম যেখানে লাগিয়াছিল সেই জগদীশ পালের গুদামের প্রায় ২০ গজের মধ্যে অনন্ত কুণ্ডুর কেরোসিনের গুদাম ছিল, তাহাতে প্রায় ৪ হাজার টিন কেরোসিন ছিল। এইজন্যই বোধ হয় আগুন এত তাড়াতাড়ি ছড়াইয়াছে। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মুন্সীগঞ্জ সংবাদদাতাও ২৯শে অক্টোবরের সংবাদে ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

দায়ী কে?

কমলাঘাট তথা ঢাকা জেলার সর্বত্র এখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে তীব্র উত্তেজনা জাগিয়াছে তাহাতে কাহারও নিকট হইতে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা খুবই শক্ত। তবুও আমি মুসলিম-বিরোধী তথ্যগুলি সম্বন্ধে দায়িত্বশীল হিন্দু মহল হইতে যেটুকু খবর ও মতামত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই উপরে লিখিয়াছি। যে কোন নিরপেক্ষ লোক ইহা হইতে অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন যে—মুসলমানেরা আগুন লাগাইবার জন্য দায়ী এ কথা কোনো রকমেই বলা যায় না।

আর আগুন লাগানোয় তাহাদের স্বার্থই বা কি? ঐ অঞ্চলের সমস্ত গরীব মুসলমান বন্দরের দৌলতেই মুটে বা মাঝিগিরি করিয়া খাইয়া বাঁচিত। বন্দর পোড়ায় তাহাদেরই কপাল পুড়িয়াছে। আর মুসলমান ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের তুলনায় নগণ্য হইলেও বন্দরে তাঁহাদের সম্পত্তি বড় কম ছিল না। তাহার উপর নূতন এস-ডি-ওর কল্যাণে তাঁহারা এইবারই সবেমাত্র নিজেদের ব্যবসা ভালভাবে জমাইয়া লইতেছিলেন। এমন সময় শুধু হিন্দুদের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বস্বও তাঁহারা জ্বালাইয়া দিবেন ইহা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। হিন্দু ব্যবসায়ীরা বেশী প্রতিপত্তিশালী, তার উপর অধিকাংশই মাল ইনসিওর করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই ক্ষতির ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষেই উহা সামলানো দায় হইবে। তা ছাড়া মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাহারও মাল ইনসিওর করা ছিল না। পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার জন্য এমন ভাবে নিজের নাক কেহই কাটে না।

আগুন লাগে কিভাবে?

কমলাঘাটে জগদীশ পালেদের রান্নাঘরে দুইটি উনান ছিল। সেখান হইতে আপনা আপনি আগুন লাগা অসম্ভব নয়। স্থানীয় অনেকে একথাও বলেন যে ইনশিওরেন্স কোম্পানীর টাকা মারিবার জন্য ব্যবসায়ীদের কেহ বা কাহারা গোপনে আগুন দিয়া থাকিতে পারে। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর বীমার টাকার পরিমাণের তুলনায় মজুদ মাল যে সে সময় অত্যন্ত কম ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের হিসাবে দেখা গেল কমলাঘাটের বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোঁসাই দাস ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডলের গুদামে আগুন লাগার আগে মোট খাদ্যশস্য ছিল মাত্র ২৪ বস্তা ধান ও ৪ মন ৩৩সের চাউল।

স্থানীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবেশ চক্রবর্ত্তী আমাকে বলেন যে কয়েকমাস হইতে ব্যবসায়ীরা মাল সংগ্রহ করিতে খুব বেগ পাইতেছিলেন এবং অগ্নিকাণ্ডের আগে অনেক গুদামই খালি ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্ম্মচারীরাও আগুন দিতে পারে। কারণ শোনা যায় যে, আগষ্ট মাসে নাকি কমলাঘাটের সরকারী গুদামে হিসাবী মালে শতকরা ১৫ভাগ ঘাটতি ধরা পড়ে এবং মিঃ ইব্রাহিম নামে একজন সরকারী কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার হন। কিছুদিনের মধ্যেই গুদামে সরকারী তদন্ত হওয়ার কথা ছিল। উহা এড়াইবার জন্য আগুন লাগিতে পারে।

রটনা

ভাল করিয়া তদন্ত হইলে আগুনের এইরূপ বা অন্য কোন প্রকৃত কারণ বাহির হইতে পারে। কিন্তু আগে হইতেই কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইবার মত কোনো সূত্রই নাই তাহা এই বিবরণ হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কোনো কোনো সংবাদপত্র ইঙ্গিত করিয়াছে, যেহেতু একই রাত্রে দুই জায়গায় আগুন লাগিল সুতরাং ইহা সম্ভবত মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। এইরূপ ভাবে সিদ্ধান্ত টানা যদি কাণ্ডজ্ঞানসম্মত হয় তবে ইহাও অনায়াসে বলা যায় যে, কোনো হিন্দু ব্যবসায়ী ইচ্ছা করিয়াই কমলাঘাটে আগুন দিবার সময় রামনগরেও আগুন দিয়াছিল—যাহাতে সন্দেহটা সহজে মুসলমানদের উপর পড়িতে পারে। কিংবা সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্ম্মচারীরাও ঠিক একই কারণে এরূপ করিয়াছিল। আমাদের এই তুলনা হইতেই বোঝা যাইবে যে, সংবাদপত্রের উপরোক্ত ইঙ্গিত কতখানি অবাস্তব।

গোড়ার কথা

আগুন লাগার কারণ যাহাই হউক, ইহা লইয়া যে দুঃখজনক সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিল—তাহার পিছনে ইতিহাস কি এবং কেন সেই বিরোধ এত তাড়াতাড়ি ছড়াইতেছে এ কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। সে ইতিহাস আমি যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই জানাইতেছি।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

[redacted] সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থামাও

এই সংখ্যায় অন্যত্র কমলাঘাট ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাসভার পক্ষ হইতে প্রচার করা হইতেছে যে মুসলমানরাই বাজারে আগুন লাগাইয়াছিল। এই প্রচারের ফলে কমলাঘাটের নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বাজারে আগুন কে বা কাহারা দিয়াছিল তাহা এখনও অজ্ঞাত কিন্তু এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করার পরিণাম সাংঘাতিক।

সম্প্রতি পাবনা হইতে আর এক সংবাদ আসিয়াছে। সেখানে কলেজ হোষ্টেলের ভিতর উপাসনা লইয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের ভিতর গোলমাল চলিতেছে। মুসলমান ছাত্ররা হোষ্টেলের ভিতর আজান দিয়া নমাজ পড়ে বলিয়া একদল হিন্দুছাত্র সেখানে রোজ সংকীর্ত্তন করা আরম্ভ করেন। সংকীর্ত্তন করাতে মুসলমান ছাত্রদের আপত্তি ছিল না কিন্তু হিন্দু ছাত্ররা খোল করতালে সুবিধা হইল না দেখিয়া ঢাক পিটাইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল এই ব্যাপারের মূলে যাহারা আছে—তাহারা হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটি মহাসভার নেতৃত্বে পরিচালিত। মহাসভার কর্ত্তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, সংকীর্ত্তনে ঢাক পিটাইবার উদ্দেশ্য হরি ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভ নয় মুসলমানদের উত্তেজিত করা।

মহাসভার মতলবটা কি?

সম্প্রতি মহাসভার নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে বাংলার প্রতি কেন্দ্র হইতে ৫০০০ হইতে ১০০০০ পর্য্যন্ত সভ্য সংগ্রহ হইয়াছে। যে শক্তিবৃদ্ধির গর্ব্ব তাঁহারা করিতেছেন তাহা কি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য? কংগ্রেসের ভিত্তি দখল করিয়া তাঁহারা উহা মুসলমানদের তথা লীগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছেন। ইহার পরিণাম কি?

দুর্ভিক্ষপীড়িত ও মহামারীর আঘাতে জর্জ্জরিত বাংলার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অর্থ কি? সংঘর্ষ যেখানেই হউক ইহাতে মধ্যবিত্ত হিন্দুরই সর্ব্বনাশ হইবে সবচেয়ে বেশী।

কংগ্রেস কর্ম্মীসংঘ কি করিবে? মহাসভাকে এইভাবে বাঙ্গালীর ভাগ্য লইয়া খেলা করিতে দিবে? প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রতি আমাদের আবেদন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রোধ করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হউন।

কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তির জন্য
সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচেষ্টা

একদল লোক ধুয়া তুলিয়াছে, লীগ সংগঠন ও পাকিস্তানের দাবী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে জন্ম লাভ করিয়াছে, লীগ ভারতের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি ইত্যাদি।

মুসলিম লীগ যে সারা ভারতের স্বাধীনতা ও জনসাধারণের গণতন্ত্রের জন্যই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতেছে তাহা গত সংখ্যায় প্রকাশিত পাঞ্জাব লীগের ইস্তাহার হইতে বুঝা গিয়াছে।

১৯শে নভেম্বর সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জি এম, শাহ একটি বিবৃতিতে দেশের দুইটি প্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বোঝাপড়ার উপযোগী রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদেশের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের জন্য সিন্ধু সরকারের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, "মুসলিম লীগ কখনো কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মুক্তিদানের প্রশ্নের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে নাই। এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ পরিষদীয় দল দেশবাসীর মঙ্গলার্থে একযোগে কাজ করিতেছে। এজন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গকে কারাগারে আর অধিককাল আটক রাখার দুর্বহ দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য আমি সিন্ধু সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।"

মুসলিম কংগ্রেস-কর্মীদের লীগে যোগদান

লাহোর জিলা মুসলীম লীগ কর্মী সম্মেলনে ৩১ জন কংগ্রেসসেবী মুসলমান লীগে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে জিলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী চৌধুরী রহমতুল্লা এবং খিলাফত আন্দোলনের নেতা ও দালেরি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ গোলাম ফরিদ জকমী আছেন।

এই ৩১ জন কংগ্রেসসেবী মুসলমান লীগে যোগদানের প্রাক্কালে ঘোষণা করেন, "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঝগড়া করিবার জন্য আমরা মুসলীম লীগে যোগদান করিতেছি না, পরন্তু যে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য আমরা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম লীগের ভিতরেও সেই আদর্শের জন্যই সংগ্রাম করিব।" তাঁহারা আরও বলেন যে পাকিস্তানই মুসলিম জাতের মুক্তির আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক। পাকিস্তান ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তিকে দৃঢ় করিবে।

বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য
পাঞ্জাবে লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের মিলিত অভিযান

গত ২৩শে নভেম্বর লাহোরের এক জনসভায় পাঞ্জাব এসেম্বলীর কতিপয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা প্রদেশে বিনা-বিচারে আবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তির দাবী উত্থাপন করেন।

সর্দার প্রতাপ সিং এই সভার সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য কংগ্রেস-লীগ মিলন ও সম্প্রীতি অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিবার জন্য তিনি জনসাধারণকে প্রবল জনমত সৃষ্টি করিবার আহ্বান জানান।

ইউনিয়নিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সদস্য বর্তমান লীগ এম-এল-এ খাঁ বাহাদুর মৌলভী গোলাম মহীউদ্দীন বলেন,—মুসলিম লীগ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিতেছে শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া যাইবে। আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই—জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই কর্তব্য আছে।

পাঞ্জাব এসেম্বলী কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারী সর্দার কাপুর সিং বলেন,—কংগ্রেসের উপর ইউনিয়নিষ্ট গভর্ণমেন্ট নিপীড়ন চালাইতেছে। কংগ্রেসের প্রোগ্রাম ও নীতির সহিত যে সব বিষয়ের মিল আছে সে সবের উপরেই কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা করিবে।

লীগের বক্তা গজনাফার আলি খাঁ-ও কংগ্রেসের উপর ইউনিয়নিষ্ট গভর্ণমেন্টের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

ঘটনা ও রটনা

নিমকহালালি

রায় বাহাদুর রণদা সাহা বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি ষ্টীমার কোম্পানীর ডিরেক্টর, নুনের কন্ট্র্যাক্টর, আরও বহু জিনিষের বিরাট কারবার আছে।

দাতা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট নাম। টাঙ্গাইল মহকুমায় নিজের গ্রামে অনেক টাকা খরচ করে তিনি হাসপাতাল খুলে দিয়েছেন। রেড ক্রস ফণ্ডে ২ লক্ষ টাকা দান করেছেন। ইত্যাদি।

অর্থাৎ তিনি উদারহৃদয়। সে উদারতার উৎস কোথায়?

কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে নুনের দাম উঠেছিল ৮৷৵১০ সের বা ৩৬৷০ মণ। গরীবের নুন-ভাতের নুন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টাঙ্গাইলের গোটা মহকুমায় গবর্ণমেন্টের নুনের সোল এজেন্ট ছিলেন রায় বাহাদুর রণদা সাহা। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, গবর্ণমেন্ট ঐ সময়ে তাঁর মারফৎ ৫০ হাজার বস্তা বা ১ লক্ষ মণ নুন গুদামে রাখবার ব্যবস্থা করে। গবর্ণমেন্ট দাম নিয়েছিল মণ প্রতি ৩৷০ আনা।

কিন্তু তবুও টাঙ্গাইলে নুনের দর ছ' আনার নীচে নামেনি বলেই শোনা যায়। গবর্ণমেন্টের দাম আর বাজার দামের মধ্যে প্রভেদ মাত্র সওয়া এগার লক্ষ টাকা। এই টাকা কার হাতে গেল তা রণদা বাবুই বলতে পারেন।

* * *

রণদা বাবুর জয়যাত্রা আবার এগিয়ে চলেছে।

তাঁর গ্রামে লাট সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রকাণ্ড অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। লাখ টাকারও ওপর নাকি খরচ হয়েছে।

তাঁর একখানি "গ্রীণ বোট" আছে—মার্কিণ কোটিপতিদের যেমন ইয়াট বা প্রমোদ-তরণী থাকে। এই বোটে বিদ্যুৎ আলোর বন্দোবস্ত আছে, সকল রকম সৌখীন জিনিষের ঢালাও ব্যবস্থা আছে, এমন কি নাচ-গানেরও নাকি বন্দোবস্ত আছে। শোনা যায় ভারত গবর্ণমেন্টের খাদ্য-বিভাগের তদারককারী জেনারেল ওয়েকলি সম্প্রতি এই বিলাস-যানে জলবিহার করছেন বাংলায় এসে।

সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গেও রায় বাহাদুরের খাতির যথেষ্ট।

তাঁর অতি-সাম্প্রতিক সৌভাগ্যের খবর আমি কাল পেলাম—বাজারে এখনও সে খবর ভাল করে ছড়ায় নি।

কন্ট্রোল দরে সুতা না পাওয়ায় চোরাবাজারের গুঁতোয় বাংলার তাঁতীরা জাত-ব্যবসা ছাড়তে কি ভাবে বসতে চলেছে তার খবর পাবেন এই সংখ্যা জনযুদ্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠায়।

আর বাংলা দেশে যা কিছু সুতা আমদানি হবে তা সব জমা, বিলি ও পাঠানোর একচেটে ভার দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুর রণদার উপর। সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট এ হুকুম দিয়েছে অতি সম্প্রতি। অর্থাৎ রণদা বাবুকে করা হল সুতার বাজারের ইস্পাহানি।

তাঁতীদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। নুন তো গেছেই, এবার ভাতও যেতে পারে।

অবশ্য ইস্পাহানিকে নিয়ে এসেম্বলিতে যে-রকম হৈ চৈ হয়েছিল সম্ভবত রণদা বাবুকে নিয়ে তা হবে না।

লাট সাহেব, সুহরাবর্দি সাহেব প্রভৃতি তো আছেনই, রণদা বাবু ফজলুল হক সাহেবেরও প্রশংসাপত্র জোগাড় করেছেন। শুনলাম সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর "ন্যাশনালিষ্ট" কাগজকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন।

অবশ্য দান করা তাঁর স্বভাব। তবে এসেম্বলিতে হৈ চৈ নাও হ'তে পারে!

●

বড়র পীরিতি

বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটী মুসলমান। তাদের প্রধান সংগঠন লীগ, যার সভ্যসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। হিন্দু সভা তো ছার, কংগ্রেসেরও কখনো এত সভ্য হয়নি। বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলি, তাদের মতামত যাই হোক, অন্তত বাঙ্গালী জীবনের এই এত বড় অংশের সম্পূর্ণ খবর বাঙ্গালীকে জানাবে তা সবাই আশা করে।

বঙ্গীয় লীগের বাৎসরিক অধিবেশন এই সাড়ে তিন কোটী মুসলমানের কাছে তো বটেই, সারা বাংলার রাজনীতিক জীবনেও একটা বড় ঘটনা। সে সম্বন্ধে বাংলার কাগজ "ন্যাশনালিষ্ট" মোট খবর দিয়েছে মাত্র ২৩ ইঞ্চি. "আনন্দবাজার" দিয়েছে ১৭ ইঞ্চি। তাও কাগজের অবজ্ঞাত কোণে।

অল্প দিন আগে সুদূর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় সামান্য সংখ্যক হিন্দু সংগঠনের সভা হয়েছিল। ন্যাশনালিষ্ট সে সম্বন্ধে খবর দিয়েছিল ৪৪ ইঞ্চি আর আনন্দবাজার ২০ ইঞ্চি!

তবুও শুনি যে হিন্দু সভা ও ফরওয়ার্ড ব্লকের 'অখণ্ড ভারতে' মুসলমানরা নাকি ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ ও সুবিধা পাবে।

●

হিন্দু-সভারও মুসলমান আছে!

ন্যাশনালিষ্টে প্রতি সপ্তাহে মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে লেখেন "মুজাহিদ"। শোনা যায় হকপন্থী ও কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট মিঃ হুমায়ুন কবীরই নাকি হিন্দু সভার এই ন্যাশনালিষ্ট মুখোসের আড়াল থেকে মুসলমানদের প্রতি তীর বর্ষণ করেন।

বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে দলাদলি তেমন পেকে উঠল না দেখে মুজাহিদ খুব ক্ষুণ্ন হয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে লীগে বুঝি এবার ভাঙ্গন ধরবে—যেমন তাঁর মুরুব্বি হিন্দুসভা কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরাচ্ছে।

তাই তিনি সখেদে বলেছেন, লীগের তরুণ দল অনেক গরম গরম কথা বলল শেষে কিনা সুহরাবর্দি সাহেবের প্রস্তাবমত প্রাচীন নেতাদেরই আবার নির্বাচন করল!

কিন্তু লীগের তরুণ দল মুজাহিদের মত মুসলিম জনসাধারণের শত্রু তো নয়! আবুল হাশেম এবং তাঁর তরুণ সহকর্মীরা লীগের নেতৃত্বে প্রগতিশীলদেরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁরা এটুকু বুঝেছিলেন যে মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে লীগকে বাড়াতে হলে লীগের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তাই মুজাহিদের আশা বিফল করে তাঁরা মুসলিম গণ-আন্দোলনকেই রক্ষা করেছেন।

মুজাহিদ টিপ্পনী কেটেছেন যে সুহরাবর্দি সাহেবের কোন মতামতের বালাই নেই বলেই তিনি লীগের বিবদমান গ্রুপগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন এবং নিজে তার থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন।

শুধু ব্যক্তিগত লাভালাভের দিকেই মুজাহিদের নজর। সুহরাবর্দির ব্যক্তিগত ইচ্ছা যাই থাকুক না, তিনি এবং লীগের তরুণ দল মিলে এবার লীগের ঐক্য বাঁচিয়েছেন। ঐক্যের বিরুদ্ধে আঘাত আসছিল প্রাচীন পন্থীদের কাছ থেকে, আবুল হাশেমকে সরানোই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তার বিরুদ্ধে সুহরাবর্দি সাহস করে দাঁড়িয়েছিলেন—লীগের ঐক্য ও সংহতির আহ্বান নিয়ে। সেজন্যেই তাঁর আহ্বানে তরুণ দলের সাড়া জেগেছিল, আনন্দের সঙ্গে তাঁরা স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। সুহরাবর্দি ব্যক্তিগতভাবে কি লাভ করতে চান বা লাভ করলেন তা না ভেবে—আবুল হাশেমের নেতৃত্বে তরুণ দল তাঁর ঐক্যের প্রস্তাবই সমর্থন করেছেন। ফলে আবুল হাশেম আবার সম্পাদক হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ম্যানিফেস্টো ও সাপ্তাহিক পত্র মারফৎ প্রগতিশীল পথের নির্দেশ দেবার অধিকারও তাঁরা পেয়েছেন। তাতে মুজাহিদ ক্ষুব্ধ হবেন বটে কিন্তু যে কোন মুসলমান আনন্দিত হবে।

পার্টি-দরদীর মৃত্যু

২২শে নভেম্বর রত্নগিরি জেলার ভেঙ্গুরলা স্বাস্থ্যনিবাস হইতে নৃপতি নন্দীর মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। নৃপতি পার্টি সভ্য ছিল না। কিন্তু পার্টির প্রতি তাহার অসামান্য অনুরাগ ও পার্টির জন্য তাহার আত্মত্যাগ প্রত্যেক দেশপ্রেমিককে অনুপ্রাণিত করিবে।

কলেজে সেরা ছাত্র বলিয়া নৃপতির নাম ছিল। ১৬ বছর আগে সে মার্ক্সীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া পার্টির সংস্পর্শে আসে। এই সময় সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু তবু সে ভাঙিয়া

পড়ে নাই—বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে থাকিয়া রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকে। স্বাস্থ্যনিবাস হইতে সে তার ভাই বোনদের কাছে যে সমস্ত চিঠি দিত তাহার ছত্রে ছত্রে থাকিত দেশপ্রেমিক আদর্শের জ্বলন্ত প্রচার। নৃপতির দাদা ভূপতি ও ছোট ভাই সুরপতি নৃপতির উৎসাহেই প্রথম পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়—আজ তারা দুজনেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। নৃপতির মা ও ছোট ছোট ভাই সবাই আজ পার্টির ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষী।

নৃপতির পরিবারে অল্প দিনের মধ্যে একের পর এক অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। তা সত্ত্বেও পার্টির ডাকে নৃপতি বিভিন্ন সময়ে ৭ হাজার টাকা পার্টিকে দিয়াছে। এই টাকা নৃপতির পিতা তাঁহার চিররুগ্ন পুত্রের চিকিৎসার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মাঝে কিছু দিন ভাল থাকার পর নৃপতি আবার অসুখে পড়ে। তাহার আশা ছিল, এবার সুস্থ হইয়া সে পার্টির কাজ শুরু করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার আশা অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে নৃপতি কয়েকদিন বোম্বাইএ পার্টির 'রেডফ্ল্যাগ হলে' ছিল। সেখান হইতে ছোট ভাইকে সে শেষ চিঠিতে পার্টির কমিউন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছে, বাড়ীর জীবনযাত্রাও যেন তাহারা এই আদর্শে গড়িয়া তোলে।

সাম্রাজ্যবাদের অভিনব ষড়যন্ত্র
লেখক: ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী—দাম দুই আনা
মুক্তি সংগ্রামে "অস্পৃশ্য" শ্রেণী
লেখক: বি, টি, রণদিভে—দাম দুই আনা
কংগ্রেস কমিউনিষ্ট
লেখক: পি, সি যোশী
বাংলায় বাহির হইতেছে।
দি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

"চাঁলের দর পড়াতে—
আমার ক্ষতি কিন্তু সমাজের মঙ্গল হবে"
—ঘাটতি জেলা ২৪ পরগণার স্বচ্ছল চাষীর উক্তি

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

স্বচ্ছল অবস্থার কৃষক
কিনু মণ্ডলের আয়-ব্যয়

পরিবারের লোক ১১ জন : পুরুষ ৪ জন, স্ত্রীলোক ৬ জন, ১টি শিশু। আউশের জমি ১৮ বিঘা ও আমনের জমি ২২ বিঘা। খোরাকী ধান লাগে বছরে ৯১ মণ। বিক্রেয় উদ্বৃত্ত : ৫৫ মণ ধান।

আয় : ৬।৹ টাকা মণ দরে ৫৫ মণ ধানের দাম : ৩৫৭॥৹ টাকা ও ৪ মণ পাটের দাম ৪০৲ টাকা। খাজনা উশুল ৬৲। এ ছাড়া রবিশস্তে ৬৬৬॥৹ টাকার মত বছরে আয়। কাজেই **গড়-পড়তা মাসিক আয় ঃ ৮৯৲ টাকা।**

মাসিক ব্যয় : সর্ষের তেল : ৫ সের ৬।৹ ; কেরোসিন : ৫ সের ৭।৹ ; নারকেল তেল : ৫ পোয়া ২॥৹ ; নুন : ৬ সের ১৶৹; মাছ : ১৩৲; তামাক : ৩৲; তামাক পাতা : ১৲; পান গুপারী ইত্যাদি : ৪৲; চিনি : ২৲; এছাড়া মাসিক গড়পড়তা হিসাবে গামছা, কাপড় ও শাড়ী : ১৩৷৵৹; মজুর খরচ ১৭॥৶৹ ; কৃষিঋণ পরিশোধ ৪৷৷৶৹। **চাল বাদে গড়ে মাসিক ব্যয় ৮৬৸৹।**

১৪ই নভেম্বর

গ্রামের নাম বাদেখাটুয়া। চিনির দর যেমন সাংঘাতিক, তেমনি অমিল অগত্যা নিতাই মণ্ডলের বাড়ীতে গুড় দেওয়া চা খাইতে হইল।

ঘাটতি জেলা ২৪ পরগণার এ অঞ্চলের অবস্থা অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা ভাল। গত বছর এমনি সময় চালের দর ৩০।৩২৲ টাকায় উঠিয়াছিল। অনাহার, অর্ধাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে খুব কম লোকই।

এখানকার বারো আনা লোকই চাল কিনিয়া খায়। বছরের খোরাকী খুব কম ঘরেরই হইয়া থাকে। কাজেই অধিকাংশ লোককেই রোজগারের অন্য উপায় দেখিতে হয়। তার উপর এ বছর পাশাপাশি পাঁচটি গ্রামের ৬ আনা আউশ ফসল পোকায় নষ্ট হইয়াছে। সময়মত বৃষ্টি না হওয়ায় আমনের ফলনও ভাল হইবে না।

ক্ষেত মজুর
সতীশ সরকারের আয় ব্যয়

পরিবারে ৩ জন লোক : পুরুষ ১ জন, স্ত্রীলোক ২ জন। মাত্র দেড় বিঘা ভিটা জমি আছে।

আয় : বছরে ২ মাস ও মাসে ৪।৫ দিন কাজ থাকে না। গড়ে ১৲ টাকা করিয়া রোজ ও বছরে আম বিক্রির ৫৲ টাকা ধরিলে **মাসিক আয় হয় গড়ে ২১।৹।**

মাসিক ব্যয় : চাল : দৈনিক ২ সের হিসাবে ১৫৲; সর্ষের তেল : ৩ পোয়া ৸৶৹; নারকেল তেল : আধ সের ১৲; নুন : দেড় সের ।১৹ ; কেরোসিন : ৩ পোয়া ।১৹ ; তরীতরকারী ২৲; গুড়. চিনি, মাছ কেনা হয় না। এছাড়া মাসিক গড়পড়তা হিসাবে খাজনা, কাপড়, গামছা বাবদ ১৸৵৫। গড়ে **মাসিক মোট ব্যয় ২১৷/৫।**

নিতাই মণ্ডলের বাড়ী হইতে কিনু মণ্ডলের বাড়ী অনেকটা পথ।

কিনু মণ্ডলের বেশ বড় স্বচ্ছল সংসার। বছরে খোরাকী হইয়াও ধান বাড়তি থাকে। গত বছর ধানচাল চড়া দরে বিক্রি করিয়া বেশ দু পয়সা যে হাতে আসিয়াছে, ঘরদুয়ারের শ্রী দেখিয়া এবং খরচের নমুনা শুনিয়া তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। চালের দর আজ ১০৲ টাকায় নামিয়াছে—কথায় কথায় প্রসঙ্গটি পাড়িলাম। কিনু মণ্ডল কিন্তু এই পড়তি দরে তেমন উদ্বিগ্ন নয়। আসল রাগ তাহার নুন, তেল, কাপড়ের অগ্নিমূল্যের উপর। মজুর খরচও হইয়াছে সাংঘাতিক—১৶৹ আনা রোজ। বিঘাপিছু চাষের খরচ দাঁড়াইয়াছে ২৪৲ টাকা। বিঘা প্রতি ৮ মণ ফসলও হয় না।

মণ্ডলের বাড়ীতে লোকজন দেখিয়া পাশের বাড়ীর বিনয় পরামাণিক আসে। দিনমজুরী করিয়া তাহার সংসার চালাইতে হয়। জমি জায়গা তাহার কিছুই নাই। ৩ জনের সংসারে তাহার দুবেলা আড়াই সের চাল লাগে। মাসে দিন কাজ থাকে না। তবু চালের দর এখন কিছুটা নরম আছে বলিয়া রক্ষা, গত বছর অর্ধেক দিন উনুনে ত' হাঁড়ি চড়িতেই পারে নাই!

সন্ধ্যা বেলা কৃষকদের একটি বৈঠক শুনিতে যাইতেছি। কৃষ্ণপক্ষে রাস্তাঘাটে এমন সময় ক্বচিৎ কখনো লোক নজরে পড়ে। সন্ধ্যা জ্বলিতে না জ্বলিতে খাওয়া দাওয়া সারিয়া নিতে হয়। নহিলে কেরোসিনে আবার কুলায় না।

অনেক দূর হইতে এক দঙ্গল মেয়ে পুরুষের হল্লা শোনা গেল। কাছাকাছি আসিয়া শুনিলাম, এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কাঙালী ভোজন হইবে—৬০।৭০ জন কাঙালীর একটি দল আসিতেছে। ইহারা এই গ্রামেরই লোক—নীচু জাতের বিধবা মেয়েমানুষ ও নাবালক। ভিক্ষাই আজ ইহাদের একমাত্র পেশা।

গ্রামের লোকজনকে না জানাইয়া সরকারী আমলারা ইচ্ছা মত খাদ্য কমিটি বানাইয়াছে। খাদ্য বিলি ব্যবস্থার কোন মাথামুণ্ডু নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া খালি বোতল হাতে শেষ কালে ফিরিয়া আসিতে হয়। এর একটা বিহিত করার জন্যই এই বৈঠক।

দেসের মণ্ডল গ্রামের একজন বড় গাঁতিদার। গত বছর ধানচালে প্রচুর পয়সা কামাইয়াছে। কৃষক সমিতিকে সে মোটেই সুনজরে দেখে না; কিন্তু সে-ও আজ উৎসাহ নিয়া সভায় আসিয়াছে। একটা বিহিত করিতেই হইবে।

সভা ভাঙার পর দেসের মণ্ডলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ধানচালের দাম যে কমছে, এতে কি ভাল হবে?' মণ্ডল একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিল, 'সুবিধে হবে সমাজের—আমার ক্ষেতি হবে বৈকি? কিন্তু গতবার মানুষ ত' চালের অভাবেই না খেয়ে মরেছে।'

মধ্যবিত্ত কৃষক
নিতাই মণ্ডলের আয়-ব্যয়

পরিবারের লোক ৮ জন : ২ জন পুরুষ, ৩ জন স্ত্রীলোক, ২টি শিশু; খোরাকী ধান লাগে ৫৮ মণ। আউশের জমি ১০ বিঘা ও আমনের জমি ৮ বিঘা।

আয় : আউশ-আমন মিলাইয়া ৫৮ মণ ধান হয়। ইহা ছাড়া রবি ফসল বেচিয়া ৩০০৲ টাকা বছরে হয় (কারণ, এখন দাম বেশী); অর্থাৎ, **খোরাকী বাদে মাসিক আয় গড়ে ২৫৲ টাকা।**

মাসিক ব্যয় : নুন : ৬ সের ১৶৹ ; সর্ষের তেল : ৩ সের ৩৸৹ ; কেরোসিন : ৫ পোয়া ২৷/১০ ; নারকেল তেল : ১ ছটাক ১/১০ ; মাছ সপ্তাহে ৪ দিন হিসাবে ৪৲। এ ছাড়া মাসিক গড়পড়তা হিসাবে খাজনা ৪৶১৫, কাপড় ও গামছা ৪৲, কৃষিঋণ পরিশোধ ৪।৶৹, অতিথি ইত্যাদির দরুণ ১৲। **চাল বাদে মাসিক মোট ব্যয় ২৬৵১৫।**

এ অঞ্চলটা গত বছর দুর্ভিক্ষে খুব বেশী রকম জখম হইয়াছিল। হাজার হাজার লোক ভিটামাটির মায়া কাটাইয়া শহরে ছুটিয়াছিল। অনেকে ফেরে নাই। যাহারা গ্রামে ছিল তাহাদের অনেকে রাস্তাঘাটে অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছে।

এ অঞ্চলে আউশ ফলে না। গোটা গ্রামে ২।৩টি ঘরের মাত্র উদ্বৃত্ত ফসল হয়।

সুধীর মিস্ত্রী মজুরী করিয়া মাসে ২০৲ টাকা মত রোজগার করে। ১৬৲ টাকা করিয়া চালের মণ। সংসারে দেড় সের দুবেলা চালেও কুলায় না। মাসে চালের খরচই লাগে ২৪৲ টাকা। সব দিন তাই দুবেলা খাওয়া হয় না। সুধীরের মা উনুন দেখাইয়া বলে রাত্রে আজ আর আঁচ পড়বে না বাবা। সুধীরের ছোট ছোট ভাইবোনগুলি খালি গায়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। ফ্যাকাসে, রক্তহীন চেহারা—সুধীর তাহাদের এক ফোঁটা দুধও খাওয়াইতে পারে না।

নগেন নস্কর সম্পন্ন কৃষক। রান্নাঘর ছাড়া গোটা বাড়ীটা অন্ধকার হইয়া আছে রাত্রে কথাবার্তা বলিতে সে নারাজ। বার বার সকালে আসিতে অনুরোধ জানায় শেষে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বসিতে বলিয়া একটি মোমবাতি জ্বালায়। বলে, নুন. তেল, কাপড় আর মজুর খরচ নিয়াই মুস্কিল। নহিলে চালের মণ ১০৲ টাকায় নামিলেও বেশী ক্ষতি নাই।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নগেন নস্কর উসখুস করিতে থাকে। তাকাইয়া দেখি মোমবাতিটি শেষ হইতে চলিয়াছে। অস্থিরতার কারণ অনুমান করিতে দেরী হইল না। আমাকে উঠিতে দেখিয়া নগেন খুশী হইল।

১৫ই নভেম্বর

পরদিন ট্রেণে করিয়া শিয়ালদহ ফিরিতেছি। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে কামরাগুলি ঠাসা হইয়া আছে। তাহার উপর ষ্টেশনে ষ্টেশনে ভারে ভারে দুধ উঠিতেছে—কলিকাতার বড় বড় মিষ্টির দোকানের বায়না করা দুধ। গাড়ীর মধ্যে এক ময়রা দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, গ্রামে দুধ অভাবে তাহার মিষ্টির দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের ছানা দুধ সমস্তটাই দ্বারিক ঘোষের দোকানে যায়। কাজেই ছোট খাটো গ্রাম্য ময়রার দল বাধ্য হইয়া জাত ব্যবসা ছাড়িয়া দিতেছে।

মাঝেরহাট হইয়া হরিণডাঙ্গা ইউনিয়নের মজলিশপুর আসিতে আসিতে বেলা পড়িয়া গেল।

পরদিন সকালে ফ্রি কিচেনে দেখিলাম বিরাট হাঁড়ি চড়িয়াছে। উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল রিলিফের দুধ নিতে আসিয়াছে। গ্রামের দারিদ্র্য লঙ্গরখানায় উলঙ্গ দেহে দাঁড়াইয়া আছে।

ষ্টেশনে যাওয়ার পথে নীরদ মণ্ডলের সহিত দেখা। পাট শন কাটিয়া মাসে সামান্য রোজগার হয় নীরদ আদিগন্ত জমি দেখাইয়া বলে, বুঝলেন এ সব জমি দুটো তিনটে লোকের হাতে। ছিটে ফোঁটা পেলে আমরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেঁচে যেতাম।

বাদেখাটুরায় চালের দর ১০৲ টাকা—কিনু মণ্ডল, দেসের মণ্ডলদের ক্ষেতি হয় নাই আর বিনয় পরামাণিকের দল ত' প্রাণে বাঁচিয়াছে। মজলিশপুরে চালের দর ১৩৲ টাকা— ১০৲ টাকা হইলেও নগেন নস্করের বিশেষ আপত্তি নাই। আর সুধীর মিস্ত্রী, নীরদ মণ্ডলেরা মজলিশপুরের যাহারা অধিকাংশ মানুষ,—তাহারা দিন গণিতেছে চালের দর কবে অন্তত ১০৲ টাকায় নামিবে?

পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাবী নয়, ভারতের স্বাধীনতারই দাবী
বঙ্গীয় লীগ সম্পাদকের উক্তি

"দি ষ্টুডেণ্ট" পত্রিকার প্রতিনিধির কয়েকটী প্রশ্নের জবাবে বঙ্গীয় মুস্‌লিম লীগের সম্পাদক মোঃ আবুল হাসেম বলিয়াছেন—

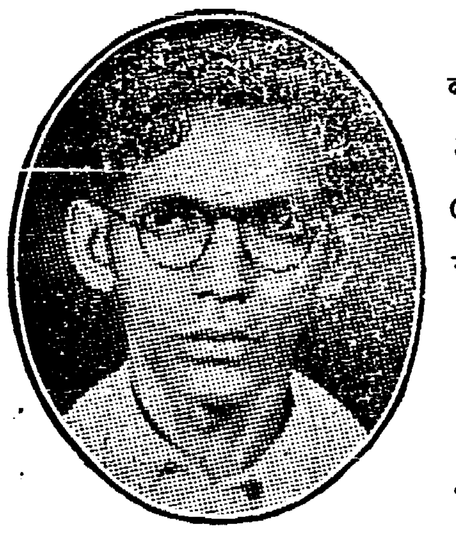

কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত-ফ্রণ্ট ব্যতিরেকে কোন সমস্যারই কার্য্যকরী সমাধান হইতে পারে না। এই মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের একমাত্র পথ—লীগের লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পাকিস্তান দাবী মানিয়া লওয়া।

আমাদের পাকিস্তান দাবী সাম্প্রদায়িক দাবী নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতারই দাবী। ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের একমাত্র পথ—এই দাবীর স্বীকৃতি।

জনসাধারণের ভিতর ঐক্যের ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য জনমত তৈরী করার মহান্ দায়িত্ব ছাত্র সমাজেরই। **মুসলিম ছাত্রদের কর্ত্তব্য** পাকিস্তানের তাৎপর্য্য হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত ব্যাখ্যা করা, নহিলে লীগের বাহিরে যে সব দেশভক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মনোভাব জাগিতে থাকিবে।

মোঃ আবুল হাসেম ছাত্রপ্রতিনিধির নিকট আরো বলেন,—বাংলা দেশ মহামারীর কবলে। দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আরো ভয়ানক। এই সমস্যা একান্তভাবে ও অবিলম্বে সমাধান করিতে না পারিলে চারিদিকে হাজারে হাজারে নরনারী মরিতে থাকিবে। সংকট-বিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনের কাজে একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করার যখন বিশেষ প্রয়োজন তখন এই সমস্যা খুব গভীরভাবে বুঝিতে হইবে।

এই মহামারীর প্রতিরোধের কাজ এত বিরাট যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যুক্ত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন,—ছাত্রদের শিক্ষা, উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার উপর তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে। তাহারা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মহামারী বিরোধী সংগ্রামে, পল্লীবাংলার পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হউক ইহাই তিনি চান।

শেষে তিনি বলেন,—নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ আমাদের সঠিক নেতৃত্বই দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, আর্ত ও পীড়িত মানবসমাজের সেবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মতভেদের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে।

রেশনিংই মজুতদার ও মুনাফাখোরদের উপর চুড়ান্ত আঘাত

আরেকটী প্রশ্নের জবাবে লীগ সম্পাদক বলেন,—জনসাধারণের জীবনধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য জনসাধারণের সহযোগিতায় গবর্ণমেণ্টকে কণ্ট্রোল করিতে হইবে। বর্ত্তমান রেশনিং শুধু চালু রাখাই যথেষ্ট নয়—সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসেরও রেশনিং করিতে হইবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ও আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ় না হয় ততদিন ন্যায্য মূল্যে সমস্ত জিনিষ-পত্রের রেশনিং চালাইতে হইবে। রেশনিং প্রথাই মজুতদারদের ও মুনাফাখোরদের উপর চুড়ান্ত আঘাত। রেশনিংই জনসাধারণের খাদ্য পাওয়ার একমাত্র গ্যারাণ্টি। মোঃ আবুল হাসেম বলেন, তাঁহার মতে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানতঃ দায়ী। স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকেই বৃহত্তর কলিকাতায় সরবরাহ চালু রাখিতে হইবে। উপসংহারে তিনি বলেন,—ছাত্র সমাজকে আজ অগ্রসর হইয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে এবং তাহাদের পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণ, ফুড কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলে।"

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : **বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ**

অফিস ঃ ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪॥৹, ৬ মাস ২॥৹, ৩ মাস ১।৹

কাঁসারি ও কামারের হাপর নিস্তব্ধ

উৎসবই নাই—সানাইওয়ালার বায়না কোথায় ?

বাঙ্গালী সমাজকে বাঁচাইতে ইহাদেরও বাঁচাইতে হইবে

ভয়ঙ্কর ঝড়ের মত বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছিল। আজ সে ঝড়ের রুদ্রগতি শান্ত। কিন্তু প্রাচীন বটগাছের মত সমাজে যাহা কিছুই এতদিন গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা এই ঝড়ের দাপটে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে।

গ্রামকে ঘিরিয়াই বাংলার জীবন। এই জীবনের একটা অতি বড় ও অতি পুরাতন অংশ ছিল গ্রামের শিল্প। তাঁতী, কাঁসারি, শাঁখারি, জেলে, মাঝি, বাদ্যকর প্রভৃতি মিলিয়া গ্রাম্য জনসংখ্যার অনেকখানি। গ্রামের এতখানি জীবন এই শিল্পের ভরসায়ই বাঁচিয়া থাকিত, আবার তাহাদের শিল্প গ্রামের সকলের জীবনের কত বিচিত্র প্রয়োজন মিটাইত। ১৯৪৩-এর ঝড়ে এ জীবন কিভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন ফাটল কিরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার কয়েকটী মাত্র ছবি আমরা নীচে বর্ণনা করিয়াছি।

বাংলা সরকার জানাইয়াছে যে, ইহাদের জীবন পুনর্গঠনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করিবার এক ব্যবস্থা হইবে। তাহা হইতে নাকি ইহাদের কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ধারে বা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে এবং তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। অর্থও ধার দেওয়া হইবে।

মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় কয়জন লোকের ব্যবস্থা হইতে পারে? তবুও ঐ টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্বেও ব্যবস্থা কতদূর আগাইয়াছে তাহার পরিচয়ও এই ছবিগুলিতে পাওয়া যাইবে।

এই বাদ্যকরেরা—

—ছিল ঢাকা জেলার গর্ব

(চিত্ত প্রসাদ)

কয়েক মাস আগের কথা। ঢাকা জেলার ছোট্ট গ্রাম রণছা। হাড়ি আর ডোম, হিন্দুদের ভিতর যারা অস্পৃশ্য তারাই এখানকার বাসিন্দা। কাঁচা চামড়া, বেত আর বাঁশের কাজই ছিল তাদের পেশা। ঢাক ও সানাই বাজাইয়াও তারা বেশ কিছু রোজগার করিত। মন্বন্তরের আগে একটি পাড়াতেই লোক ছিল ২৪০ জন। এই অঞ্চলে চালের দাম উঠিয়াছিল একশত টাকায়, তখন ৫৩ জন একেবারে না খাইতে পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। আমন যখন উঠিল চালের দর তখন ২০ থেকে ২৭ টাকার ভিতর; কিন্তু কাহারো এমন কোন আয় নাই যে কিছু চাল কিনিয়া খায়। চামড়ার ব্যাপারীরা দর একেবারে নামাইয়া দিয়াছে, বাঁশ-বেত কিছুই মিলে না—লোকে পয়সা রোজগার করিবে কি করিয়া? ঢাক-সানাই বাজাইয়া আর কোন উৎসবই হয় না—ঢুলীরা কামাইবে কি?

এ বছরে এখানকার ৪২টী পরিবার সম্পূর্ণ ভিক্ষার দানেই কোনমতে টিঁকিয়া আছে। মাত্র তিনটী পরিবার চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারে। তার ভিতর একটী পরিবার গ্রামের সমস্ত জমির চার ভাগের তিন ভাগেরই মালিক। এই পরিবারটীর কর্ত্তাই চাল ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা করেন।

প্রথমে যে হাটে আমি গিয়া পৌঁছাই তা প্রায় শ্মশানের অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্যাঁত-সেঁতে মেজেয় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া একটি দশ বছরের ছেলে চটের থলে গায়ে জড়াইয়া জ্বরে ধুঁকিতেছে! তার বাপ-মা, একটি বড় ভাই, আর বোনটি গত বছর তিনমাসের মধ্যেই মরিয়াছে। আর একটী ভাই দুইদিন হইয়া গেল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে এখনো ফিরে নাই। এই দুই দিনের ভিতর ছেলেটী মাত্র একবার একটু ফেনভাত পাইয়াছে, একজন পড়োশীই তাকে দিয়াছিল। কাল কি হইবে—তা শিশু ছেলেটী ভাবিতেই পারিতেছে না।

এক মুঠা ভাতের জন্য গ্রামের গর্ব শেষ

আর একটী ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল: এক মুঠা ভাতের জন্য কাতরাইতে কাতরাইতে প্রত্যেক বাড়ীতেই লোক মরিয়াছে। ভিটায় ভিটায় খালি জঙ্গল। তিরিশটী পরিবার ছিল; ৮টী তো একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে আর এগারটী ভিটা ছাঁড়িয়া কে-জানে কোথায় গিয়াছে।

রণছা গ্রামের ঢাকীরা ছিল নামজাদা। সারা পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় নানা উৎসবে তাদের ডাক আসিত। ঢাক বাজাইয়া তারা বেশ মোটা রকমের রোজগার করিত। উপেন্দ্র ঋষি দাস গর্ব্ব করিয়া আমাকে বলিল: "শ্যামান দাস আমাদের পাড়ারই লোক, কলকাতা কংগ্রেসের সময় সে ঢাক-সানাই বাজাইয়াছিল। বিপিন পালের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত যতবার কংগ্রেস আন্দোলনের জোয়ার এসেছে তার সবটাতেই আমরা ছিলাম। শ্যামান দাস একমুঠা ভাতের জন্য চীৎকার করিতে করিতে মরিয়াছে—তার সমস্ত পরিবার আজ নিশ্চিহ্ন।

আট বছরের একটী কালো ছেলেকে দেখাইয়া কয়েক জন পাড়া প্রতিবেশী আমাকে বলিল: "এই হ'চ্ছে কেষ্ট; দুধলালের ছোট ছেলে।" সারা বিক্রমপুরে 'তবলা' বানানোয় দুধলালের জুড়ি ছিল খুবই কম। গত দুর্ভিক্ষে সে গিয়াছে; তার স্ত্রী, দুই মেয়ে, বড় ভাই আর বুড়ী মা সবাই মরিয়াছে। এবং সকলেই একমুঠা ভাতের জন্য ছটফট করিতে করিতেই মরিয়াছে।

কাঁসারীরা দাঁড়ায় কোথায় ?

রাখালচন্দ্র মান্না

মেদিনীপুরের গ্রাম কল্যাণপুর-রামচন্দ্রপুর। দেড়শো ঘর কাঁসারীর বাস। দুইখানি গ্রামে ২৬টী কর্মশালা ছিল। পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে কাঁসা-পিটানোর আওয়াজ শুনা যাইত। আজ সে কর্ম-মুখরতা নাই। আর এদেরই হাতের তৈরী কাঁসার বাসন সারা ভারতে নাম করিয়া ফেলিয়াছিল।

গঙ্গাসাগর মেলা আরম্ভ হইবার দুই মাস আগে হইতে কাঁসার ছোট ডিস তৈরীর মরশুম পড়িয়া যাইত। কর্মশালায় ২৪ ঘণ্টা কাজ চলিত। হাতুড়ীর শব্দ আর কাঁসার ঝনঝনানি আজ প্রায় বন্ধ। ৪৩ সালের মন্বন্তর ৪০ জন কারিগরকে মারিয়া ফেলিয়াছে। যারা বাঁচিয়া আছে, তাদের যন্ত্রপাতি জলের দামে বিকিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলে কাঁসার যত জিনিস ছিল ২৲ টাকা সের দরে কিনিয়া সব বাহিরে চালান দেওয়া হইয়াছে। কাঁসারীদের কাঁচামাল রাং, তামার আমদানী নাই। কাজ করিবার আটচালা ঘরগুলি ঝড়ে নষ্ট হইয়াছে। হেড মিস্ত্রী ওস্তার মাত্র তিন চার বিঘা জমি এখনো আছে। আর বাকী অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পটাশপুরের গৌরব কাঁসা-শিল্প আজ অবলুপ্ত।

৮৫ জন কাঁসারী কারিগরের মধ্যে ৫২ জনেরই এক কাঠাও জমি নাই। ২৩ জনের ২৫ বিঘার মত জমি বিক্রয় হইয়াছে। সকলের দেনা এক সাথে জুড়িলে দাঁড়াইবে দুই হাজার টাকা। কয়েকজন বড় বড় কাঁসার ব্যবসায়ী আছেন। তাঁরা যে কয়জন কারিগর কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তাদের প্রত্যেককে দুই আনা রোজ মজুরী ও একবেলা খোরাকী দিয়া চাষের কাজ করাইতেছেন।

চামড়া ও লোহার যন্ত্রপাতি, ঘর তৈরীর খরচ, কয়লা ও মূলধন বাবদ এদের ৬৭০০ টাকার দরকার। কাঁসারীরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস-ডি-ওর কাছে জানাইয়াছে, যন্ত্রপাতি ও টাকাকড়ি সাহায্য করিয়া কারিগরদের বাঁচাইতে হইবে, কাঁসা-শিল্প আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষ হইতে এখন পর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য নাই।

কুমার ও শাঁখারীর কি হইবে ?

রথের মেলা আর বসে না

(চিত্ত প্রসাদ)

শ্রীনগর যেদিন পৌঁছাই সেদিন রথযাত্রার মেলা। বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মেলা শ্রীনগরের রথযাত্রা। গত বছর এই মেলার সময় মাত্র এক সপ্তাহে এখানে ৪০০ জন দুঃস্থ মরিয়াছিল, কেউ অনাহারে আবার কেহবা ম্যালেরিয়া আর বসন্তে। মিষ্টি আলু যা প্রতি বছর বিক্রী হইত পাঁচ ছয় আনায়, তার দাম উঠিয়াছিল গতবার নয় টাকা।

বছর বছর প্রতিদিন এই মেলায় লোক আসিত চার-পাঁচ হাজার। আমি এবার যা দেখিলাম দুই তিন শতের বেশী কিছুতেই হইবে না। অন্যান্য বছর মাটির পাত্র, মাটির খেলনা ইত্যাদি লইয়া তিরিশ চল্লিশটী কুমারের দোকান বসে; এ বছর এ রকম দোকান মাত্র তিনটী আসিয়াছে। মিষ্টি আলুর দোকান আর আর বছরে গুণিয়া শেষ করা মুস্কিল হইত, এবার মাত্র একটা দোকান, সে-

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন).

ধ্বংসের পথে শান্তিপুরের তাঁতী

শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে সমাদর লাভ করিয়াছে। শান্তিপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মসূতার বস্ত্র সত্যই আমাদের দেশের গৌরব।

শান্তিপুর শহরে তিন হাজার তাঁত চলে। প্রতি তাঁতে দুইজন কারিগরকে কাজ করিতে হয়। এই তিন হাজার তাঁতের আয়ে প্রায় বার হাজার লোক প্রতিপালিত হয়। আজ ১৯৪৪ সালে বাংলার গৌরব এই তাঁতিদের কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আমরা ও আমাদের পোষ্যবর্গ কি না খাইয়া মরিবে? আমাদের এতদিনের রুজীরোজগারের এই তাঁত-শিল্প কি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে?

যুদ্ধের আগে ৮০নং সূতার বাণ্ডিল (৫ পাউণ্ড বা ২০ মোড়া) ৫।০ টাকায় পাওয়া যাইত। আজ সেই সূতা চোরাবাজারে ৬০।৬৫ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

সূতার কণ্ট্রোল মূল্য কমাইয়া ২৩ টাকা বাণ্ডিল করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ মূল্যে কার্য্যোপযোগী একগজ সূতাও পাওয়া যাইতেছে না। প্রত্যেক তাঁতে মাসে গড়ে ১২ খানা কাপড় তৈরী হয়, তাঁত পিছু ৭।০ পাউণ্ড সূতা লাগে অর্থাৎ তিন হাজার তাঁতে মোট ২২ হাজার পাউণ্ড সূতার দরকার। শান্তিপুর বয়ন শিল্প শ্রমিক সমিতির এক আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে,—"শহরে এমন সাক্ষ্য কেউ দিতে পারবে না যে কণ্ট্রোল দামে সূতা পাওয়া যাচ্ছে।" গত ২৩শে নভেম্বরের "যুগান্তরের" একটী সংবাদেও এই কথাই সমর্থিত হয়। চোরাবাজারের সূতার উপর নির্ভর করার জন্য শান্তিপুরের কাপড় মাদ্রাজী, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অশেষ চেষ্টার ফলে তাঁতিরা যেটুকু সূতা যোগাড় করিতে পারিতেছে তাহার মূল্য অসম্ভব রকম বেশী। সেজন্য তৈরী কাপড় অবিক্রীত পড়িয়া থাকার আশংকা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। পূজা পর্য্যন্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত খরিদ্দারেরা শান্তিপুরের শাড়ী কিনিয়াছেন কিন্তু আজ আর কেহই কিনিতে চাহিতেছেন না! শান্তিপুর বয়নশিল্পের হাজর হাজার স্ত্রীপুরুষ তাঁতি আজ কি করিয়া বাঁচিবে?

রাণাঘাট মহকুমা হাকিমের কাছে তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সূতার কথা জানানো হইয়াছে। প্রচুর সূতা নাকি সেখানে পৌঁছাইয়াছেও। কিন্তু বিলি-ব্যবস্থার দুর্নীতি ও গাফিলতির জন্য তাঁতিদের দুর্দ্দশা ঘুচিতেছে না বরং বাড়িতেছে। কণ্ট্রোল দোকান-গুলির তদারকের ভার তাঁতিদের নিযুক্ত একটী কমিটির হাতে না দিলে ন্যায্য মূল্যে সূতা পাওয়া যাইবে না, চোরাবাজারই ফাঁপিতে থাকিবে ও তাঁতশিল্প পুনর্জ্জীবিত হইবে না, ধ্বংসই হইবে।

জেলের জাল নাই, তাঁতীর জাতব্যবসা গিয়াছে

মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে না

(বিমলাবালা মণ্ডল)

তমলুকের পোলন্দা গ্রামে গিয়াছি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দারুণ ক্ষত গ্রামখানিকে উচ্ছন্নে দিয়াছে। এককালে ছিল ২২৫টি পরিবার, এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে ১২৫টি। এককালে ছিল যাহারা কর্ম্মঠ কৃষক, আজ তাহারা খাটিবার শক্তি হারাইয়াছে। বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। মেয়েদের অবস্থা বর্ণনার বাইরে—স্বাস্থ্য একেবারে গিয়াছে, তাদের কোলের শিশু গুলি জীবন্ত কি মৃত দূর হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। অর্দ্ধাহার, অনাহারে লতাপাতাই ইহাদের নিত্যকার খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফলে রোগের হাত হইতেও নিস্তার নাই।

গ্রামের ভিতর মন্দির আছে ৪টি। সামনে গিয়া দেখি মন্দিরের উঠানগুলি ঘাসঘাসলায় ভরিয়া রহিয়াছে। যেন বহু বৎসর হইল মন্দিরের সহিত গ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণ পাড়ায় খোঁজ নিয়া জানিলাম, এখন তাঁহাদের এমন সামর্থ্য নাই যা দিয়া মন্দিরের পূজার্চ্চনার ব্যয় বহন করে। গত সংকটে গ্রামের দেবোত্তর জমিগুলি বিক্রি করিয়া কোন রকমে সংসার চালাইয়াছে। আজ ভিক্ষাই তাহাদের জীবিকা।

দুলেদের অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক। জালের কোন সরঞ্জাম দেখিলাম না। তাদের পাকীগুলিও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। পুরুষরা যদি বড়শী নাচাইয়া কিছু পায়, তাই বিক্রী করে, মেয়েরা ছোট ছোট শামুক কুড়াইয়া বাজারে নিয়া যায়। তাঁতিরা জাত-ব্যবসা হারাইয়াছে। ঘরগুলি ভিন্ন জমি অধিকাংশেরই নাই। এমন কি তাঁতের সরঞ্জামগুলিও একে একে নিঃশেষ হইয়াছে। কারো মাকু আছে, ত' সানা নাই, আবার কাহারও সানা আছে ত' মাকু নাই। তার উপর সূতার দাম আগুন। স্থানীয় সূতার হাট 'রাধামণি'—সেখানে প্রত্যেক হাটবারে প্রায় ৫০৲ টাকার সূতা বিক্রি হয় সেখানে সূতার জন্য যে সব তাঁতি আজো যায় তাদের শুধু হাতে ফিরিয়া আসিতে হয়। গেল হাটে সূতার দাম যাহা ছিল এ-হাটে তার চতুর্গুণ! নিঃস্ব তাঁতিরা ব্যবসাদারদের কারসাজিতে বাজারের এই উঠতি পড়তির সহিত তাল রাখিতে পারে না।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তাদের অল্প ক্ষমতা লইয়া আগাইয়া আসিয়াছে। একটি কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়াছে, সেখানে ৫টি পরিবারের মেয়েরা দড়ির কাজ করে। এদের খোরাক জোটে সাতটি মুষ্টিঘটের চাউলে। আর একটি দুগ্ধকেন্দ্রে ৩৮টি কচি শিশুকে দুধ দেওয়া হইতেছে।

আলুবীজের কর্তা কি চোরাবাজার ?

স্বাধীন বাণিজ্যের চাপে আলুর আবাদ ধ্বংস প্রায়

পোস্তার হাট

হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে চাষীরা আসিয়াছে কলিকাতার আলু পোস্তার হাটে। তাহারা বীজ আলু কিনিতে আসিয়াছে। আর দিন পনেরর মধ্যে এবারকার মত আলু বোনার মরশুম শেষ হইয়া যাইবে, অথচ কোথাও বীজ পাওয়া যায় না। চোরাবাজারে সামান্য পাওয়া যায় কিন্তু তাহার দাম ৫০৲ হইতে ৯০৲ পর্য্যন্ত মণ। তাহার উপর খইলের দাম চড়িয়া চড়িয়া প্রতি বস্তা ১৭।১৮ টাকায় গিয়া ঠেকিয়াছে। আলুর জমি ভাল করিয়া সার দিতে হয়। অনেক খরচ ও পরিশ্রম করিয়া জমি তৈয়ারী করিতে হয়। অত দামে খরচা পোষাইবে কেন ?

সরকার আলু বীজের কণ্ট্রোল দাম বাঁধিয়া দিয়াছে ২৮৲ মণ। সেই বীজই নাকি পোস্তার হাটে পাওয়া যাইবে। ইহার জন্য দেশে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে "খুশী" করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে বীজের জন্য সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে হইয়াছে।

পোস্তা হাটের নোংরা, সরু গলিগুলিতে চার পাঁচ হাজার চাষী। ভিড় গিস গিস করিতেছে। লোকে এক আড়তের সামনে লাইন বাঁধিতেছে, আবার শুনিতেছে— না, আজ অন্য দোকানে কণ্ট্রোলের বাবু বসিবেন। অমনি হুড়মুড় করিয়া এ লাইন ভাঙ্গিয়া আর এক লাইন গড়িবার ঠেলাঠেলি মারামারি। দোকানের সামনে যায় কাহার সাধ্য !

বীজের জন্য কি হায়রাণি !

আমাদের প্রতিনিধি কাগজের লোক বলিয়া ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করিতে পারিতেছিলেন। পর পর পাঁচ জন চাষী আসিয়া তাঁহাকে বলিল বাবু, আমার টিকিটটা যদি সই করাইয়া দিতে পারেন তো পান খাইতে ১০৲ দিব। প্রতিনিধি বলিলেন—১০৲ বেশী খরচ না করিয়া লাইনে দাঁড়াইয়া থাক না কেন ? সে বলিল—বাবু ১০ দিন কলিকাতায় আছি। রোজই সকালে আসিয়া লাইনে দাঁড়াই। কিন্তু কবে কোন্ আড়ৎ হইতে দিবে তাহা বলে না, কদিন ভুল লাইনেই দাঁড়াইয়াছি। আর কয়েকদিন আড়ৎদারের লোকেরা লাইন ভাঙ্গিয়া দিল, নিজেদের লোকের সুবিধার জন্য আর একটী লাইন বানাইল। এদিকে আমার জমি তৈরী পড়িয়া আছে, ২।১ দিনের মধ্যে বীজ না লাগাইলে আবার নূতন করিয়া "পাট" করিতে হইবে। ততদিনে বীজ লাগানোর মরশুমও নষ্ট হইয়া যাইবে, আমার আর আলু বোনা হইবে না। এখন আমি করি কি ?

বাস্তবিকই এই অবস্থা। তাহার উপর পুলিশকে ঘুষ দাও, নহিলে লাইন হইতে বাহির করিয়া দিবে। আমাদের প্রতিনিধির সামনেই পুলিশের ধাক্কায় একজন চাষী পড়িয়া গেল, মাথা ফাটিয়া গেল।

কণ্ট্রোলের বাবু আসেন দশটার সময়। আলুর আড়ৎদারেরা এক সমিতি করিয়াছে—"পশ্চিম বঙ্গ আলু-বীজ সমিতি"। সেই সমিতির পক্ষ হইতে কণ্ট্রোল বাবুকে জানান হয় সেদিন কত আলু আসিয়াছে এবং কোন্ আড়ৎদার মারফৎ বিক্রয় হইবে। তখন কণ্ট্রোল বাবু গিয়া সেই আড়তে বসেন এবং এক হাজার দেড় হাজার চাষী তাঁহার সামনে লাইন করিয়া কোনো রকমে দাঁড়ায়। তিনি তাহাদের ইউনিয়ন বোর্ডের টিকিট দেখিয়া লিখিয়া দেন কে কত আলু পাইবে। এক বিঘা জমিতে এক বস্তা। কিন্তু তিন বস্তার বেশী কাহাকেও দেওয়া হয় না। বেশী পাইতে হইলে আবার আলুর বড় কণ্ট্রোলারের অফিস হইতে হুকুম আনিতে হইবে। কিন্তু সে হুকুম হাকিমের চেয়ে কড়া।

একশো দুশো বস্তার বেশী আলু কোন দিনই আসে না, অথচ টিকিটওলা খরিদ্দার হাজারেরও বেশী। তার উপর আড়ৎদারের বন্ধুবান্ধব আছে, এদিক ওদিক ব্যবস্থাও আছে। ফলে বেশীর ভাগ চাষীই রাত ২।০টা হইতে বাজারে দাঁড়াইয়া, সারাদিন অনাহারে ঠেলাঠেলি গলাধাক্কা প্রভৃতি সহিয়াও দিনের পর দিন খালি হাতে ফেরে।

মফঃস্বলের হাট—মেমারি

মফঃস্বলের অবস্থা আরও খারাপ। মেমারির হাটে অন্যান্য বৎসর ১১০ হইতে ১১৫ ওয়াগন বীজ আলু আসিত, এখন আসে মাত্র ৭ ওয়াগন। তার মধ্যেও আবার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেন যে ইহার অধিকাংশই তাঁহাদের নিজের চেষ্টায় আনা— সরকারী কণ্ট্রোলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। বেশীর ভাগই তাঁহারা চোরাবাজারে ৫০৲ মণ দরে বিক্রী করেন। যেটুকু কণ্ট্রোলে বিক্রি হয় তাও ঐ আলু-বীজ সমিতির এজেণ্ট ও খুচরা বিক্রয় মারফৎ। প্রথম প্রথম ইঁহারা অনেকে এজেণ্টদের বেনামিতে বা বেশী দামে বেচিয়া দিতেন। স্থানীয় খাদ্য কমিটি, কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগের সমবেত চেষ্টায় ইহা খানিকটা বন্ধ হয়। তাঁহারা চাষীদের জমির পরিমাণের হিসাব লইয়া কার্ড মারফৎ বিলির ব্যবস্থা করান।

আলু বীজের এই দুরবস্থার কথা কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে বর্দ্ধমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ১লা নভেম্বরের চিঠিতে কৃষক সমিতিকে লেখেন যে যত-সব ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সমিতি জানেনা, সুতরাং এ বিষয়ে তাহাদের পরামর্শের কোন দরকার নাই। ব্যবস্থার নমুনা তো উপরেই লেখা হইয়াছে কিন্তু দয়াময় ম্যাজিষ্ট্রেট উল্টা কৃষক সমিতিকে ধমক দেন যে তোমরা "লোকের বিশ্বাস নষ্ট করিতেছ।" আলুর বদলে ধমক পাইলেই যেন লোকের বিশ্বাস বাড়িবে।

● ১৫ দিনের মধ্যে আলু চাষের সময় ফুরাইবে

● অবিলম্বে বীজ আনানো চাই : বাজার ছাঁকিয়া সংগ্রহ করা চাই

ভিতরের খবর কি ?

আসল কথা আলুর ব্যাপার লইয়া সরকার আগে হইতে বিশেষ কিছু মাথা ঘামায় নাই। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর সাধারণত প্রায় ৪।০ লক্ষ মণ বীজ লাগে। তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই আসে পাঞ্জাব ও গৌহাটি হইতে। ব্যবসায়ীদের হিসাবে প্রকাশ, অন্তবার গৌহাটি হইতে আসিত দেড় লক্ষ মণ—এবার এখন পর্য্যন্ত আসিয়াছে মাত্র ৩২৫০ মণ, অর্থাৎ টাকায় দু পয়সারও কম। ব্যবস্থার নমুনা যখন এই তখন কণ্ট্রোলে বীজ পাওয়া যাইবে না তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

আগে হইতে ব্যবস্থা না হওয়ায় এবার আলু বীজ আনানোর পরিমাণ সরকারই কম করিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু তাও যদি সরকার সোজাসুজি নিজে আনাইয়া কণ্ট্রোল দরে ব্যবসায়ী মারফৎ বা নিজস্ব দোকান মারফৎ বেচিবার ব্যবস্থা করিত তবে অনেক লোক বীজ পাইত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের চাপে পড়িয়া পাঞ্জাব হইতে আলু আনানোর ভার ঐ "আলু-বীজ ব্যবসায়ী সমিতির" হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বাংলা সরকার পাঞ্জাব হইতে ৭৫ হাজার মণ আলু আনিবার ছাড় পায়, কিন্তু আলু-বীজ সমিতি মাত্র ৩০ হাজার মণ আলু আনে। আরও ৪০ হাজার মণ বাংলার ব্যবসায়ীরাই কেনেন, কিন্তু তাহা সমিতির হিসাবে ওঠে না। কারণ এই ব্যবসায়ীরা নাকি "স্বাধীন" বাণিজ্য করিতেছেন ! খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে সমিতির অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই "স্বাধীন" ব্যবসায়ীদের গভীর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে ? সরকার ইহাদের "স্বাধীন" বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়ায় আজ চোরাবাজারে ৮০।৯০ টাকা পর্য্যন্ত আলু বীজের দাম উঠিয়াছে, কণ্ট্রোল দোকান হইতে খালি হাতেই কৃষককে ফিরিতে হইতেছে, এ বছর হয় তো বারো আনা আলুই আবাদ হইবে না !

এখন সরকারের একটু টনক নড়িয়াছে। বিভিন্ন চোরা-ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ১৪ হাজার মণ আলু ধরিয়া ফেলিয়া সমিতির হাতে দিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে কিছু হইবেনা। পাঞ্জাব হইতে এখনও প্রায় ৩৩ হাজার মণ বীজ আসার কথা, অথচ সেখান হইতে দৈনিক মাত্র একটী ওয়াগণ বা ৩০০মণ আসিতেছে। কিন্তু আর শুধু ১৫ দিন সময় আছে। দিনে অন্তত ৮টী ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতে হইবে তবেই ১৫ দিনে সব বীজ পৌঁছিবে। আসাম এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতেও তাড়াতাড়ি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু লেখালেখি করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ও পাঞ্জাবে ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর এখনি কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত বাজার ও আড়ত ছাকিঁয়া যত নৈনিতাল আলু আছে তাহা ধরিয়া লইয়া কণ্ট্রোল দরে বীজ হিসাবে বিক্রয় করিতে হইবে।

আড়তদাররা যাহাতে কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতে বা তাহাদের ঠকাইতে না পারে সে দিকে সরকারকে নজর দিতে হইবে। এ বিষয়ে চাষীরা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলেও অনেকখানি সুরাহা হইতে পারে।

এ বছর প্রথম তিন মাসে আড়াই লক্ষ লোক

শুধু ম্যালেরিয়াতেই মরিয়াছে !

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জন-স্বাস্থ্য বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বলেন যে, ১৯৪৪ সালের প্রথম তিনি মাসেই বাংলাদেশে ২ লাখ ৪৩ হাজার তিনশত পচাত্তর জন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। গত বৎসর এই তিন মাসেই ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ১ লাখের কিছু উপর।

সরকারী হিসাব হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কি ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। কিন্তু সরকারী এই হিসাবও প্রকৃত অবস্থার ছবি খুলিয়া দেয় নাই।

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ খুবই প্রচণ্ড হইয়াছিল। তারপর কিছুটা কমিয়া যায়। বর্ষার পর হইতেই ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব আবার ভীষণ ভাবে বাড়িতে থাকে এবং এবারকারের আক্রমণ হয় আরও ব্যাপক, আরও মারাত্মক। গত জুন মাসের মাঝামাঝি ডাঃ বিধান রায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, ২ কোটির বেশী লোক রোগাক্রান্ত হইয়াছে। যে কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার নামগন্ধও ছিল না, সেই কলিকাতার বুকেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব-কলিকাতা হইতে এখন উত্তর-কলিকাতাতেও ছড়াইয়া পড়িতেছে—কমিবার কোনও লক্ষণই নাই। অবস্থা যে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা তাহা খোলাখুলিই স্বীকার করিয়াছেন।

মাদারীপুর মহকুমার পশ্চিম অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। একমাত্র বাজিতপুর গ্রামেই ৪৫০ জন মারা গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১৪টি পরিবারেরই ১০৬ জন মারা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী কুইনাইন নাই, তাই বহু রোগী বিনা চিকিৎসায় রহিয়াছে (যুগান্তরের খবর)।

নদীয়া জেলার মেহেরপুরের তেহট্টা ও করিমপুর থানায় ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হার যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ এই দুই জায়গায় ৪২ জন ডাক্তারের মধ্যে মাত্র ২ জনকে অল্প পরিমাণ কুইনাইন দেওয়া হইয়াছে। রাধাকান্তপুর গ্রামে বি, এম্, আর, সি, সির চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীর এত ভীড় হয় যে সবাইকে কুইনাইন দেওয়া যাইতেছে না।

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার সরিকল ইউনিয়নে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে প্রায় ১৮ শত লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। উজিরপুর থানার বামরাইল ইউনিয়নে ঐ সপ্তাহে ১১ হাজারের উপর রোগীর হিসাব পাওয়া যায়। অথচ চোরাবাজার ভিন্ন কুইনাইন পাওয়া যায় না (যুগান্তরের খবর)।

এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিতেছে যে যশোহর জেলার সর্বত্রই ম্যালেরিয়া সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়াছে। কুইনাইন ও অন্যান্য প্রতিষেধক ঔষধের অত্যন্ত অভাব।

মৈমনসিং জেলার নেত্রকোনা মহকুমার প্রায় সর্বত্রই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দেখা দিয়াছে। কুইনাইন সরবরাহ খুবই অল্প ও অনিয়মিত (এ,পি,)। বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমায়ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন বাড়িতেছে।

এই কয়েকটি খবর হইতেই বোঝা যায় যে বাংলার সর্বত্রই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ ঔষধপত্রের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়াছে এই জন্য যে, এবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ক্যাম্বেল ম্যাডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর অখিলরঞ্জন মজুমদার বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে একশত ম্যালেরিয়ার রোগীর মধ্যে ৭৫টি হইত সাধারণ ম্যালেরিয়া আর ২৫টি থাকিত মারাত্মক (ম্যালিগ্‌নেণ্ট)। এখন এই অবস্থা প্রায় উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন একশ রোগীর ভিতর ৩৫টি হয় সাধারণ ম্যালেরিয়া আর বাকী ৬৫টি হয় মারাত্মক।"

মজুরদের নিজস্ব সেবাকেন্দ্র

বেলেঘাটা ও নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া শুশ্রূষার জন্য ট্রাম ইউনিয়নের মজুরেরা গত ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার পথে পথে অর্থ সংগ্রহ করে। একদিনেই তাহারা ১৯১৸১৫ উঠায়। ইহার আগে আরএকদিনও তাহারা এরূপ চাঁদা তুলিয়াছিল। তাছাড়া ট্রাম মজুরেরা নিজেরাও আপন আপন রেশন হইতে বাঁচাইয়া সাহায্যের জন্য চাঁদা দিতেছে। প্রধানত ইহাদের চেষ্টায়ই কাঁকুড়গাছি এলাকায় আর একটী ম্যালেরিয়া সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে

বিহার কংগ্রেস নেতার অভিনন্দন

বিহারের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ বাংলার পিপলস্ রিলিফ কমিটির সম্পাদকের কাছে উত্তর বিহারে তাঁহাদের প্রেরিত মেডিকেল ইউনিটগুলির সেবাকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বাংলা হইতে প্রেরিত এই ইউনিটগুলিই উত্তর বিহারে রিলিফের কাজ প্রথম সুরু করে। ডাঃ নরেশ মুখার্জীর নেতৃত্বে এই সেবাদল বিহারী গ্রামবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে।

রথের মেলা আর বসে না !

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

দোকানটীও আবার একজন বিহারী খুলিয়াছে। মেলায় দর্শক ছিল—মুদী ও সাহাদের বউ-ঝি, আর ছোটখাট চাকুরিয়াদের বাড়ীর মেয়েরা। তারা আসিয়াছে মাঙ্গলিক শাঁখা খরিদ করিতে।

কুমারের দোকান যে কয়দিন ছিল, রোজই প্রায় মালিককে দেখিতাম মাদুর পাতিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, কচিৎ কদাচ হলুদ চোখ মেলিয়া উঁকি মারিতেছে। শুনিলাম অন্যান্য বছর খালে জল দেখা যাইত না—নৌকায় নৌকায় জলই ঢাকা পড়িত ; যে কেউ ইচ্ছা করিলে জলে পা না দিয়া সারি সারি নৌকার উপর দিয়া খালের এ পার-ও পার হইতে পারিত। এত বড় খালে এবার খালি একটাই নৌকা—ডাঃ নন্দীর নিজের নৌকা আমার জন্য দিয়াছেন। শ্রীনগরের চারি পাশে এত তাঁতির বাস, অথচ এবার বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী একখানিও দেখিতে পাইলাম না।

বছরের ৫ মাস গেল, তবু এ অঞ্চলে বসন্ত একদিনও ছাড়ে নাই। কত যে মরিয়াছে তার আন্দাজ করিলেও সত্য হিসাবের কাছ ঘেঁষিবে না। শ্রীনগর থানার দেড় লক্ষ বাসিন্দার জন্য সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে মাত্র একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বরাদ্দ হইয়াছে।

কর্পোরেশনের মজুরদের মধ্যে
এডজুডিকেশনের আন্দোলন
(হরিনারায়ণ ঘোষাল)

২০৩নং কনভেন্ট রোড। কর্পোরেশনের জলকলের মজুরদের বস্তী। সালিশী আদালত বসানোর (এডজুডিকেশনের) দাবীর উপর সই সংগ্রহের জন্য মজুর ইউনিয়নের একটি স্কোয়াড এখানে যায়।

সই তাহারা অনেকবার অনেক দাবীর উপর দিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। আজও তাহাদের শতকরা ৯০ জনের বেতন ২০ টাকার নীচে, মাগগি ভাতা পায় মাত্র ৮ টাকা। অন্য সব জুলুমেরও অভাব নাই। না, সই তাহারা আর দিবে না। তাহাদের উপর ন্যায় বিচার করার কেহ নাই।

আমাদের সাথে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। একজন মজুর অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিতেছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু, ইউনিয়ন না কি দালাল হয়ে গেছে? বাবুরা তো বলছেন ইউনিয়ন এখন আর লড়ে না, ধর্ম্মঘট চায় না।" খবর নিয়া জানিলাম, এ তাহারাই—যাহারা এতদিন বলিত, ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটের উস্কানী দেয়, ইউনিয়ন তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবে।

শ্রমিক জগৎ

করপোরেশনের মজুর সরজু কথাবার্ত্তায় অগ্রণী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বলতো সরজু, কলকাতা সহরে আজ লোকসংখ্যা ডবল হয়েছে, সহরের স্বাস্থ্য দিনদিনই খারাপ হয়ে পড়ছে, মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে, এ অবস্থায় তোমরা যদি জলের কল বন্ধ করে দাও, ধাঙ্গররা যদি তাদের কাজ বন্ধ করে দেয় তো মরবে কারা?" সরজু জবাব দেয়, "বাবু আমরা তা বুঝি বলেই তো আজও কাজ চলছে কিন্তু একথা যারা বোঝে না সেই কাউন্সিলার বাবুদের তোমরা বুঝাতে যাওনা কেন? সহরের বাবুরাও যদি একবার একথা বুঝতে পারতেন তো আমাদের দাবী মিটে যেত।"

আমরা বলিলাম, "জান তোমাদের দাবী আজ এত ন্যায়সঙ্গত যে বাবুরা তা অস্বীকার করতে পারেন না। আর তারই ফলে তোমরা ও সহরের বাবুরা একত্র হয়ে মালিকদের আসামীর কাঠগড়ায় চড়াতে পার।"

সরজু প্রভৃতি আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। আমরা তখন ট্রাম-মজুরদের 'এডজুডিকেশনের' ইতিহাস বলিলাম, ভার্ত্তিয়া ও অন্যান্য লোহা কারখানার এডজুডিকেশনের কথা বলিলাম। ভার্ত্তিয়া লোহা কারখানার মজুররা যখন মালিককে আদালতে হাজির করাইল, তখন জানা গেল মালিকরা মজুরদের সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত, এমন কি ইউনিয়নকে মেনে নিতেও রাজী।

তবুও সরজুদের মনে খুঁত খুঁত থাকিয়া যায়। তাহারা ভাবে কর্পোরেশন এক আলাদা ধরণের মালিক। এখানে সহরের বাবুরাই কর্ত্তা। অথচ, এখানকার মজুরের অবস্থা সহরের সকল মজুর অপেক্ষা খারাপ। এখানে কি কোর্ট বসানো সম্ভব?

আমরা তখন বলিলাম, "ট্রাম আর ভার্ত্তিয়ার মজুর তোমাদের তুলনায় সংখ্যায় কত কম—তোমাদের কাজের গুরুত্ব কত বেশী। তাদের দাবী আদায়ের শক্তি আসল কোথা থেকে? এটা সাহেবের মর্জ্জি নয়, মজুরদের ইউনিয়নের একতার মধ্যেই সেই শক্তি। ট্রাম মজুরদের মধ্যে বিভেদ বাধানোর চেষ্টা সফল হয় নি—তাই তাদের জয় সম্ভব হয়েছে।"

এবার সরজু বলিল, "কিন্তু আমাদের যে তিনটি ইউনিয়ন আছে? আমাদের কর্পোরেশনের বাবুদের মধ্যেও যে দলাদলি রয়েছে?" আমরা তখন বলিলাম—"কোর্ট বসাবার জন্য সকলে যাহাতে একযোগে কাজ করতে পারে তার জন্যই তো 'আন্দোলন কমিটি' গঠিত হয়েছে। এ কমিটিতে যোগদান করতে তো কোনো বাধাই নেই।"

আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া অনেক মজুর জড়ো হইয়াছে। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া অনেকেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এবার অনেকে সই দিল, আর ইউনিয়নের সভ্য হইবার জন্য আগাইয়া আসিল। ৭০ জন মজুরের এই বাড়ীতে একজন মজুরও ইউনিয়নের বাহিরে থাকিল না।

ট্রাম-এডজুডিকেশনের রায় কোম্পানী মানে না কেন?

ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড ধীরেন মজুমদার একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, এডজুডিকেশনের রায় অনুসারে কোম্পানী সস্তায় ক্যান্টিন খোলা, টাইমটেবল ও ছুটি প্রভৃতির সম্পর্কে নির্দ্দেশ পালন করিতেছে না বা করার দিক দিয়া তাহাদের কোন উদ্যোগও নাই। ইহাতে ট্রাম মজুরদের ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি হইতেছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া চাই।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানা বই

পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
মূললেখক—এফ্. এঙ্গেল্‌স্
প্রামাণিক অনুবাদ—রেবতী বর্ম্মণ
দাম আড়াই টাকা

সমাজতন্ত্রবাদ: কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক
মূললেখক—এফ্. এঙ্গেল্‌স্
প্রামাণিক অনুবাদ—রেবতী বর্ম্মণ
দাম চৌদ্দ আনা

কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা
মূললেখক—লেনিন
প্রামাণিক অনুবাদ—অমিত সেন
দাম আট আনা

THE PEASANT WAR IN GERMANY
By Friedrich Engels : Rs. 1/8/-

WHAT IS TO BE DONE?
By V. I. Lenin : Rs. 1/12/-

POLITICAL ECONOMY
By A. Leontiev : Rs. 3/-

JOSEPH STALIN
(Short Biography)
Edited by Marx-Engels-Lenin Institute, Moscow
Price As. 14/-

PROBLEMS OF LENINISM
By Joseph Stalin : As. 10/-

LEFT-WING COMMUNISM
By V. I. Lenin : Re. 1/-

CRITIQUE OF THE GOTHA PROGRAMME
By Karl Marx : Re. 1/-

[সব সময়ে ডাক মাশুল আলাদা দিতে হয়]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
মার্ক্‌স্-লেনিনবাদী সাহিত্যের প্রকাশক ও বিক্রেতা
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট (কলেজস্কোয়ার) কলিকাতা

ধান চালের দর বাঁধ
৩রা ডিসেম্বর কৃষক-দাবী দিবস

ধান, চালের দর অস্বাভাবিক ভাবে পড়িয়া যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অবিলম্বে যদি ধান, চালের নিম্নতম দর বাঁধা না যায় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকের ব্যয়ভার কমানো না যায় তাহা হইলে বাংলার কৃষকশ্রেণী ধ্বংস হইবে। আমাদের দাবী:—

১। ধান চালের নিম্নতম দর বাঁধিতে হইবে।

২। গভর্ণমেণ্টকে ব্যাপকভাবে সরাসরি কৃষকের কাছ হইতে ধান চাল খরিদ করিতে হইবে।

৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপযুক্ত সরবরাহ ও সম্পূর্ণ রেশনিং করিতে হইবে।

৪। নির্দ্ধারিত মূল্যে যাহারা ক্রয় করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য সস্তায় চাল সরবরাহের ব্যবস্থা হউক।

উপরোক্ত দাবীগুলি লইয়া আন্দোলন করার জন্য ৩রা ডিসেম্বর "কৃষক-দাবী দিবস" পালন করুন।

মনসুর হবিব—সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

★ সংবাদ সংগ্রহ

৪০০০ কৃষকের সমাবেশ

গত ৬ই নভেম্বর রংপুর জেলার গয়াবাড়ী ইউনিয়নে **ডিমলা থানা কৃষক-সম্মেলন** হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত বলরাম সাহা। ৩০০ কৃষকের এক শোভাযাত্রা ৩ মাইল রাস্তা ঘুরিয়া সম্মেলন মণ্ডপে উপস্থিত হয়। **সম্মেলনে ৪০০০ কৃষকের উপস্থিতিতে কংগ্রেস লীগের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।**

কৃষক সমিতির বিরোধিতা পরিত্যাগ

মৌকরণে (বরিশাল) একটি ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলনে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর শ্রেণীর লোক গোলমাল বাধাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়া সভাপতি কমরেড প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বক্তৃতা শুনিবার পর নিজেদের বিরুদ্ধবাদিতা পরিত্যাগ করেন এবং সভামণ্ডপে বসিয়াই কৃষক সমিতিতে যোগ দেন। সম্মেলনে শতকরা ৯৫ জনই কৃষক, তাঁতী কামার, কুমার, জেলে প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক জমায়েত হইয়াছিল।

কৃষকদের নৈশ বিদ্যালয়

চট্টগ্রামের কালীপুর ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে ইজ্জতনগর গ্রামে কৃষকদের চেষ্টায়ই একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। খোলার দিন কৃষকদের একটি জমায়েত হয়, সেখানে গ্রামের অন্যান্য লোকও উপস্থিত থাকিয়া স্কুল কমিটির জন্য ১১ টাকা চাঁদা দেয়। বর্ত্তমানে ২৫ জন ছাত্র ও ৩ জন শিক্ষক লইয়া স্কুলটি চলিতেছে।

ধান চাউলের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধার দাবী

শিলচরে ধান চাউল প্রভৃতির দাম অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় গত ৪ঠা নভেম্বর জেলার সমস্ত প্রধান সংগঠন—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ সভা মিলিয়া একটি জনসভা করে। সভাপতিত্ব করেন লীগ-সম্পাদক মকব্বীর আলী মজুমদার।

কাছাড় জেলায় ধানের দর ২৷০ হওয়ায় কৃষকরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সভায় ধানের সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়ার দাবী করা হয়। সভাপতি মহাশয় সরকারী খাদ্য নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আবেদন জানান।

রেশনিংএর গলদ দূর করা চাই

মেটিয়াবুরুজ বদরতলায় গত ১২ই নভেম্বর ফুড কমিটির এক সভা হয়। বদরতলা অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান, মজুর ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সকলেই এই মিটিং-এ সমবেত হইয়া রেশনিং-এর যে গলদ আছে তাহা দূর করার জন্য এবং যাহাতে চোরাকারবার বন্ধ হয় সেই সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা করেন। সভায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সুবোধ পাল, কমিউনিষ্ট নেতা আবদুল হালিম প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় নূতন ওয়ার্ড কমিটি গঠন, চটকল মজুরদের এডজুডিকেশনের দাবী ও আবার গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ চাই সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের মুক্তি চাই

গত ৪ঠা নভেম্বর **ময়মনসিংহের** নালিতাবাড়ী থানার বারোয়ারী বাজারে প্রায় ২৫০০ হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের মুক্তি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য গান্ধী-জিন্নার পুনরায় আলোচনা দাবী করা হয়। উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে হাজং, ডালু, বালাই, গারো ও মুসলমান প্রভৃতির সংখ্যাই বেশী ছিল।

মিলিত দাবীর জয়

গত ৯ই নভেম্বর রংপুর জেলার **কুড়িগ্রামে** এক বিরাট জন সমাবেশ হয়। দূর দূর গ্রাম হইতে বহু মুসলমান কৃষক ইহাতে যোগ দেয়। সভায় ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। সভার সভাপতিত্ব করেন মহকুমা লীগ সম্পাদক নাজীর হোসেন খন্দকার। সমাবেশে জাতীয় ঐক্যের জন্য পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের দাবী ও গ্রাম পুনর্গঠনের দাবী করা হয়। জনসমাবেশের এই ঐক্যবদ্ধ দাবার ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়। সহরে ধোপাদের নানা অজুহাতে সাপ্লাই অফিসার এতদিন সোডা দিতেন না, কিন্তু জনসাধারণের চাপে সমাবেশের পরের দিনই ধোপাদের সোডা দেওয়া হইয়াছে।

রাওবিল সমর্থনে জনসভা

মহিলা আন্দোলন

গত ১লা নভেম্বর হইতে **চব্বিশ পরগণায়** দেবীপুর, বদরতলা, গোবরডাঙ্গা, নৈহাটি ও সোণারপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রাও বিল সমর্থনে জনসভা করে। রাও বিল যে নারীর সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার ইহা বুঝিয়া প্রত্যেকটি সভায় এই বিল সমর্থন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়। শ্রীযুক্তা যুঁইফুল রায় নৈহাটীতে, প্রতিভা গাঙ্গুলী ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য অন্যান্য স্থানের সভায় বিলটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন। বিলটির সমর্থনে প্রচুর সহি পাওয়া যায়।

ভাটপাড়ায়

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত ৪ঠা নভেম্বর নিভাননী চাটার্জীর সভানেতৃত্বে **নৈহাটিতে** ও ১৬ই নভেম্বর অশীতিপর বৃদ্ধা বসন্তকুমারী ভট্টাচার্য্যের সভানেতৃত্বে **ভাটপাড়ায়** রাও বিলের সমর্থনে ২টি মহিলা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভাতেই বিলের স্বপক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয় ও সকলেই বিলের সমর্থনে সহি দেন। নৈহাটি ভাটপাড়ায় বাংলার শ্রেষ্ঠ হিন্দু নৈয়ায়িক ও শাস্ত্রজ্ঞের বাস। সেদিক দিয়া এই দুটি সভার সমর্থন বাংলার আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুদের চোখ খুলিয়া দিবে।

আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিল্প প্রদর্শনী

গত ১৪ই নভেম্বর **মালদহ** মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে একটি শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৪০০ মহিলা ইহাতে যোগ দেন। এই প্রদর্শনীর ভিতর সহরের ১৪।১৫টি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা শিল্পের কাজ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সহরেও ৪টি শিল্প-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এখানে খেজুর পাতার আসন, পাটি, ববের বালি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

কমলাঘাটে কি দেখিলাম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমলাঘাট বন্দরের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবসায়ী হিন্দু ও প্রায় সকলেই লক্ষপতি। ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব হিন্দুদের হাতে থাকায় উদীয়মান মুসলিম ব্যবসায়ীরা স্বভাবতই খানিকটা অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, ঈর্ষাও সৃষ্টি হইতেছিল।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় চালের চোরাবাজারে দর ৯০৲ টাকা পর্যন্ত উঠাইয়া হাজার হাজার মানুষকে মারিবার ষড়যন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারীরা একতাবদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে মিঃ অশোক মিত্র ছিলেন মুন্সিগঞ্জের এস্-ডি-ও। তিনি চোরাকারবারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করেন, এমন কি কমলাঘাটের শ্রেষ্ঠ মহাজন বসন্ত মণ্ডলকে গ্রেপ্তারও করেন। অবশ্য ভাগ্যকুলের রাজার সুপারিশে এবং স্বয়ং লাট হারবার্টের হস্তক্ষেপে বসন্ত মণ্ডল মুক্তি পান।

চোরাকারবারীর হিন্দু মুসলিম ঐক্য

মিঃ অশোক মিত্রকে তাড়াইয়া চোরাবাজারের রক্তশোষণ অব্যাহত রাখিতে হিন্দু ও মুসলিম ব্যাপারীদের মধ্যে নিবিড়তম ঐক্য দেখা যায়। একদিকে হিন্দুদের মুখপাত্র শ্রীইন্দ্র পোদ্দার কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের কাছে আসিয়া দরবার করিতে থাকেন যে অশোক মিত্র 'কমিউনিষ্ট', উহাকে তাড়ানোর জন্য মন্ত্রীদের চাপ দিন। অন্যদিকে মুসলমানদের মুখপাত্র মিঃ বিক্রমপুরি এম, এল, এ, মন্ত্রীদের কাছে দরবার করিতে থাকেন যে অশোক মিত্র হিন্দু, সে মুসলমানদের সর্বনাশ করিল ইত্যাদি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য একই শুধু প্রচারের ধরণ আলাদা।

বেচারী অশোক মিত্রকে বদলি করিয়া ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে বিক্রমপুরীর বন্ধু মিঃ আমিনউল্লাকে এস-ডি-ও নিযুক্ত করা হয়।

আমিনউল্লা আসিয়াই খাদ্য কমিটির প্রতিবাদ সত্বেও জুন-জুলাই মাসে বহু সরকারী ধান-চাল বাজারে ছাড়িবার জন্য মজুতদারদের হাতে দেন। ফুড কমিটিও তিনি নিজের পেটোয়া লোক দিয়া ভর্ত্তি করিতে থাকেন। এই "রাম-রাজত্বে" হিন্দু-মুস্লিম সব মজুতদারই উল্লসিত হন।

বখরা লইয়া ঝগড়া

কিন্তু বখরা লইয়া বিবাদ বাধিল। আমিন-উল্লার পৃষ্ঠপোষকতায় মিরকাদিম ট্রেডিং কোং চিনি ও লবণ বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার পায়। কথা ছিল অর্দ্ধেক কণ্ট্রোল দরে এবং বাকী অর্দ্ধেক মহাজনদের ইচ্ছামত দরে বিক্রী করিতে পারিবে—তবে শেয়ার ও লাভের অর্দ্ধেক হিন্দু মহাজনেরা ও অর্দ্ধেক মুসলমান মহাজনেরা পাইবে। চোরাবাজারে এতদিনের আধিপত্যে হাত পড়ে দেখিয়া হিন্দু ব্যবসায়ীরা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহারা আমিনউল্লাকে সায়েস্তা করিবার জন্য কোমর বাঁধিলেন।

ঠিক এই সময়ে স্থানীয় হিন্দু মহাসভাও "হিন্দু মহাজনদের মুসলমান হাকিমের জুলুম হইতে বাঁচাইবার" জন্য সক্রিয় হইল। তাহারা হিন্দু জনসাধারণকেও দলে টানিতে পারিল কারণ আমিনউল্লার চোরাবাজার-সমর্থক ব্যবহারের ফলে তাহারা প্রতিদিন ভুগিতেছিল।

মুসলমান ব্যবসায়ীরাও আমিনউল্লার পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণকেও দলে টানিতে পারিলেন কারণ ধনী হিন্দু মহাজনদের অত্যাচারে তাহারা অতিষ্ঠ হইয়াছিল।

এইভাবে কমলাঘাটে নিছক মজুতদারের দলাদলিকেই সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও উত্তেজনার রূপ দেওয়া হইল।

ধর্ম্মের আড়ালে জমি দখল

রামনগরের ব্যাপারও সাম্প্রদায়িক ছিল না। সেখানে মুসলমানদের একটি মসজিদের কাছে যে জমি ও রাস্তা তাহার জমিদার হরেকৃষ্ণ পাল, কিন্তু তাহার রায়তী স্বত্ব মুসলমানদের। পাল মহাশয় জমি ও রাস্তা মুসলমানদের কাছ হইতে দখলের জন্য মামলা করেন। কিন্তু জমি পান না তবে রাস্তা দিয়া যাতায়াতের অধিকার পান। মামলার পর এইবারই সর্বপ্রথম তিনি একটি 'সার্বজনীন' দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। ইহার আগে পালরা কখনও দুর্গা পূজা করেন নাই। উদ্দেশ্য ছিল যে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা যদি ঐ রাস্তার উপর দিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আইন অনুসারে উহা সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিবার সুযোগ হইবে, মুসলমানদের রায়তী অধিকার লোপ পাইবে। শোভাযাত্রা লইয়া ইনজাংশন, মামলা প্রভৃতি হইয়া উত্তেজনা আরও চরমে উঠে। "সার্বজনীন" পূজার টানে তিনি স্থানীয় সব হিন্দুদেরই পক্ষে টানিয়া আনেন। নিকটবর্তী কমলাঘাটের মহাজনেরাও ইহাতে হিন্দু ধর্মের 'রক্ষক' রূপে উৎসাহে যোগ দেন, কারণ আমিনউল্লা ও মুসলিম মজুতদারদের হারাইবার জন্য হিন্দু 'জনসাধারণের' সমর্থন প্রয়োজন।

রাস্তায় শোভাযাত্রা সম্বন্ধে পাল মহাশয়ের আসল উদ্দেশ্য বুঝিয়া মসজিদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য মুসলিম জনসাধারণও পূজা ও শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও সংগঠিত হয়। মুসলিম মজুতদারেরাও স্বভাবতই ধর্মের রক্ষকরূপে ইহাতে যোগ দেন।

এমনি ভাবে জমিদারের স্বার্থ এবং হিন্দু-মুসলিম মহাজনের দলাদলিই রামনগরে ও কমলাঘাটে এক প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও উত্তেজনার বারুদ স্তুপ সৃষ্টি করে।

তাহার পর রামনগর ও কমলাঘাটে আগুন লাগে। দুই পক্ষই প্রচণ্ডরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং কোনো পক্ষ ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগাইয়াছে বলা যায় না। এই বোধ ছিল বলিয়াই বোধ হয় পানাম গ্রামের সন্তোষ বাবু আমাকে ষ্টীমারে বলিয়াছিলেন যে প্রথম কয়েকদিন কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যায় নাই (এই প্রবন্ধের ২য় ৩য় প্যারা দেখুন)। এই জন্যই হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মুন্সিগঞ্জ সংবাদদাতা ২৯শে অক্টোবরও অগ্নিকাণ্ডকে 'দুর্ঘটনা' বলিয়া জানাইয়াছেন।

মহাসভার হস্তক্ষেপ

কিন্তু তাহার পর দিনই কাগজে হিন্দু সভার সম্পাদক মনোরঞ্জন বাবুর বিরাট বিবৃতি বাহির হইল—ইহা মুসলমানদেরই কারসাজি। অমনি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার, এমন কি অমৃতবাজার-যুগান্তর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সন্দেহ বা বিদ্বেষপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখেন।

এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার উৎস খুলিয়া দিয়া মনোরঞ্জন বাবু দলবল সহ ২রা নভেম্বর কমলঘাট পৌছান এবং কমলাঘাটে ও আশে পাশের গ্রামে তুমুল সাম্প্রদায়িক প্রচার সুরু করেন। হিন্দু সভার আর এক নেতা স্বর্ণকমল রায়ও একেবারে একদল কীর্ত্তনীয়া লইয়া কমলাঘাটে উপস্থিত হন এবং আশে পাশের গ্রামগুলিতে সভা ও কীর্ত্তন মারফৎ চূড়ান্ত মুসলিম বিদ্বেষ জাগাইতে থাকেন।

আমি হিন্দু সভার প্রচারের একটী মাত্র নমুনা দিতেছি। ৩রা তারিখে মনোরঞ্জন বাবুর উপস্থিতিতে গোবিন্দনগর লক্ষ্মী-নারায়ণজীর আখড়ায় কীর্ত্তন যখন খুব মাতিয়া উঠে তখন কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিয়া যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ:

মুসলমানদের অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল তখনই মহাপ্রভু এই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আজ আবার তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে। তাহারা বন্দর পোড়ায় হিন্দু মেয়েদের উপর অত্যাচার করে, হিন্দু দেবদেবী ধ্বংস করে। গান্ধীজি এই মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন। মুসলমানদের অত্যাচার ও গান্ধীজির ষড়যন্ত্রের জবাব দিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হও। ইহাই মহাপ্রভুর বাণী।

এই কুৎসিত সাম্প্রদায়িক তথা কংগ্রেস বিরোধী প্রচার অনবরত চলিয়াছে। সেজন্যই মুসলমানদের বয়কটের চেষ্টা হইতেছে, দুর্ভিক্ষের দিনে যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে দুর্গতত্রাণের মহান্ কর্মে নামিয়াছিল তাহারাই আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেছে, সারা ঢাকা জেলা ভাঙ্গিয়া হিন্দু আসিতেছে রামনগরে—মসজিদের সামনে দিয়া প্রতিমার শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার হিংস্র আনন্দে। যে-মুসলমানেরা এতটা উত্তেজিত হন নাই তাঁহারাও পালেদের বাড়ীর সামনে কোর্বানির কথা, প্রতিশোধের কথা ভাবিতেছেন। যে কোনো মুহূর্তে দাঙ্গা বাধিলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। বরং মনে হয় হিন্দু সভা মহল উহার জন্য প্রস্তুত।

সরকারের আগুন লইয়া খেলা

স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ আগুন লইয়া খেলিতেছে। যে দুর্গা প্রতিমা মসজিদের সামনে দিয়া ভাসানে লইয়া যাইতে পূজার সময় অনুমতি দেওয়া হয় নাই আজ বন্দর পুড়িয়া ছাই হইবার পরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার এই বারুদস্তুপের উপরই ইংরেজ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই শোভাযাত্রার অনুমতি দিলেন! এবং সমস্ত ঢাকা জিলা ভাঙ্গিয়া হিন্দু আসিল সেই "জয়যাত্রার" উৎকট আনন্দে। তাহারা "হিন্দু সভাকী জয়ের" সঙ্গে সঙ্গে আরও আওয়াজ তুলিল "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কী জয়"!

এরপর আসিবে মুসলমানের পালা। তাহারা যাহাতে জমিদার বাড়ীর সামনে মসজিদের খোলা মাঠে কোর্বানি না করিতে পারে সে জন্য জিলা হিন্দু সভার সভাপতি গিরীশ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরবার করিতে গিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহা-নিরপেক্ষের মত তাঁহাকে জানান, "আপনাদের পালা আপনারা পাইয়াছেন, এবার উহাদের পালা উহাদের পাইতে দিন"—এ কথা গিরীশ বাবু নিজে আমাকে বলিলেন। ইহার ফল কি হইবে? বকর-ঈদের দিনই দুর্যোগ ভাঙ্গিয়া পড়িবে আর নয় তো হিন্দু-মুসলমান দুজনের বুকেই আগুন জ্বাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎ দুর্যোগের পথ প্রশস্ত করিবে। এবং ইতিমধ্যে "ম্যাজিষ্ট্রেট কী জয়" বলিবার পালা আসিবে মুসলমানের।

কংগ্রেস কোথায়?

ঢাকা টাউন মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ বসুকে এই আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করিলে তিনি মন্তব্য করেন যে "মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ চেষ্টা বৃথা। মহাসভা হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিয়াছে!" বর্তমান উত্তেজনার অবস্থায় 'আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া' কোথায় গড়াইবে কে না বোঝে?

জেলার প্রধান কংগ্রেস নেতা শ্রীশ বাবু অবশ্য হিন্দু সভার এই সাম্প্রদায়িক কর্মতৎপরতার তীব্র নিন্দা করিলেন। কিন্তু তিনি বা কোনো কংগ্রেসকর্মীই আজও এই দুর্যোগ রুখিতে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হন নাই। হিন্দু সভার তীব্র প্রচারের সম্মুখে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন।

লক্ষকোটী বাঙ্গালী যেখানে ক্ষুধায়, রোগে মৃতপ্রায় সেখানে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম কি এই কুৎসিত সর্বনাশের পরিণতি রোধ করিবে না? দেশপ্রেমের গঠনই যদি ভাঙ্গিয়া যায় তো গঠন-মূলক কাজ কি দিয়া কাহাকে সংগঠিত করিবে! শ্রীশ বাবু আনন্দ-উজ্জল চোখে আমার কাছে বর্ণনা করিলেন, খিলাফতের সময় এই গ্রামগুলিতেই হিন্দু মুসলমান কি গৌরবময় সংগ্রাম করিয়াছে! তারপর সুভাষ বাবুর কংগ্রেস বিরোধিতার সময় কংগ্রেসের এই শক্ত ঘাঁটি চলিয়া যায় ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। আজ তাহারাই হিন্দু সভার পাণ্ডা, এই সর্বনাশের আগুন দু হাতে ছড়াইতেছে। দু চার-জন কংগ্রেসকর্মী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও প্রায় সকলেই হিন্দু সভায় যোগ দিয়াছেন। সেই অভিজ্ঞতা হইতেই টাউন হিন্দু সভার সুরেশ বাবু আমাকে সগর্বে বলিলেন, "অদুর ভবিষ্যতে বাংলা দেশে হিন্দু সভাই কংগ্রেসকে গ্রাস করিবে, কংগ্রেসের অস্তিত্বও থাকিবে না!"

বাংলা দেশের অস্তিত্বও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মুছিয়া যাইবে। এতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল, সংগ্রামের ব্যর্থতা ছিল, গরমিল ছিল কিন্তু নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ ছিল না। আজ কংগ্রেস যদি ইহাকে রোধ করিতে না পারে তবে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষই হইবে আগামী দিনের মর্মান্তিক পরিণতি।

লালফৌজের নূতন অভিযান আসন্ন

ওজেল দ্বীপ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত

ইয়োরোপের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই প্রচণ্ডতম যুদ্ধের সূচনা দেখা দিয়াছে। মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে লালফৌজের শীতকালীন অভিযান আসন্ন। যদিও বর্তমানে বেশীর ভাগ পর্য্যবেক্ষণের কাজই চলিতেছে, তবুও উহা যে চরম যুদ্ধের পূর্বাভাষ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বাল্টিক রণাঙ্গনে ৩০টিরও অধিক জার্ম্মান ডিভিশনের অবশিষ্ট সৈন্য-বাহিনী তুকুম ও লিবাওয়ের মধ্যে আটক পড়িয়াছে। প্রথম হয়ত সেই অঞ্চলেই লালফৌজের জোর আঘাত পড়িবে। পশ্চিম ইয়োরোপে মিত্রবাহিনী আকেন হইতে বাসলে পর্য্যন্ত যে বিরাট নূতন অভিযান শুরু করিয়াছে তাহার গতিবেগও বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ইতিমধ্যে লালফৌজ বুডাপেষ্টের চতুর্দ্দিকে জার্ম্মানদের আত্মরক্ষা বূহে ভীষণভাবে আঘাত করিতেছে। গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র ও রক্ষাবূহ হাতভানা লালফৌজের দখলে আসাতে সোভিয়েট সৈন্যদল বুডাপেষ্টে যাইবার একটি প্রধান রাস্তায় গিয়া পৌছিয়াছে। অপর দিক দিয়া জার্ম্মানদের আর একটি শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি মিসকলোজও হাতছাড়া হইতে চলিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে লালফৌজ সহরটীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং জার্ম্মানদের সাথে তুমুল লড়াই চলিতেছে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে যাইবার প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলিও লালফৌজের দখলে আসিতেছে।

২৪শে নভেম্বরের সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের সৈন্যরা বাল্টিক নৌবহরের সহায়তায় কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া ওজেল দ্বীপ (এস্তোনিয়া) হইতে শত্রু সৈন্য নিশ্চিহ্ন করিয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে

জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নূতন অভিযান সুরু হইবার পর প্রত্যেক এলাকায় জার্ম্মানরা কিছু কিছু পিছনে হটিয়াছে। লোরেন হইতে জার্ম্মান উচ্ছেদের সংগ্রাম শেষ হইতে চলিয়াছে এবং সারের জন্য সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। তৃতীয় আর্মি মারজিগের দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত টেটিঙ্গেন এবং মারজিগের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত টবিরিঙ্গেন নামক দুইটি জার্ম্মান সহর অধিকার করিয়াছে।

অন্য দিক দিয়া ষ্ট্রাসবুর্গ-মুল-হাউসজঙ্গেস্-রাইন পকেটে জার্ম্মান প্রতিরোধ ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ২৬শে নভেম্বরের খবরে প্রকাশ জার্ম্মানরা বিশৃঙ্খলভাবে রাইন নদী পার হইয়া পলায়ন করিতেছে। অপর আর এক অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী ভেনলোর উত্তরে মাস নদীর তীরবর্তী বূহের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

নাৎসী জার্ম্মানীর বিপদ

জার্ম্মানী দখলের যুদ্ধ যতই চরমে উঠিতেছে এবং নাৎসীদের বিপদ যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, ততই জার্ম্মানী হইতে নানারূপ জল্পনা-কল্পনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কখনও খবর রটিতেছে হিটলারের স্থানে হিমলার সর্বেসর্বা হইয়াছে, কখনও সংবাদ আসিতেছে হিটলার আর বড় আগাইতেছে না, 'গেষ্টাপোর' হাতেই সব কিছু ছাড়িয়া দিয়াছে। খবরগুলি হইতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে জার্ম্মাণ নাৎসীদের ভিতর যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং জল্লাদ প্রকৃতির সেই হিমলারের হাতেই যথেষ্ট ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার অর্থ এই যে নাৎসীরা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেই। আর গোয়েবলস-এর ২৫শে নভেম্বরের বক্তৃতায়ও সেই সুরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়াছে—"......এখন বেপরোয়া ভাবে যুদ্ধ করা ভিন্ন জার্ম্মানীর জনসাধারণের আর গত্যন্তর নাই।"

আবার সাথে সাথে অন্য দিক দিয়া নরম সন্ধির জন্যও জোর চেষ্টা চলিতেছে। মিত্রশিবিরে যে সব সোভিয়েট বিদ্বেষীরা আছে তাহাদের দিয়া এই কাজ করার চেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু আজিকার দিনে সোভিয়েটের বিরোধিতা করিয়া মিত্রপক্ষের কোন রাষ্ট্রই নাৎসীদের ধাপ্পায় ভুলিবে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

Regd. No. C, 2836.

চীন আজ বিধাবিভক্ত। হেংইয়াং ও ক্যান্টন হইতে জাপবাহিনী লিউচো-তে আসিয়া সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে হংকং-এর সরবরাহ পথ আজ জাপানীদের হস্তগত। কুনমিং-এর বিপদ ঘনাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-চীন সাহায্যের পথও আজ বিপন্ন।

কুওমিণ্টাং-এর গণতন্ত্রবিরোধী নীতি ও কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষই আজ চীনের এই বিপর্য্যয়ের কারণ। কমিউনিষ্টরা কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করিয়াছে, উত্তর চীনের বর্ডার এলাকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্বীকার করো ও কমিউনিষ্টবিরোধী নীতি পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় জাপ প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করো।

সম্প্রতি চীনের মন্ত্রিসভায় কিছুটা রদবদল হইয়াছে। কিন্তু একটি মাত্র দলের একনায়কত্ব যেমন এখনও কায়েম রহিয়াছে, তেমনি ঘাগী প্রতিক্রিয়াশীলরা মন্ত্রিসভায় এখনও বহাল থাকিয়াছে। হো-ইং-চিং ও কুং-কে স্ব স্ব পদ হইতে সরাইলেও যথাক্রমে সৈন্যবিভাগ ও অর্থবিভাগের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। চেন-লি-ফুকে শিক্ষা সচিবের পদ হইতে সরানোর ফলে প্রগতিশীলরা খুশী হইয়াছেন বটে, কিন্তু নূতন মন্ত্রী চু-চিয়া-হুয়ার সহিত প্রতিক্রিয়াশীল চেন ভ্রাতৃবর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মোট কথা, নূতন মন্ত্রিসভায় বাস্তব কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। সর্বদলের সমবায়ে জাতীয় সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট—ইহাই আজ চুংকিংস্থ মিত্রপক্ষ ও চীনের প্রগতিশীলদের কাম্য।

১৯৩৯ সালের পর হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদল কি ভাবে গেরিলা অঞ্চলগুলিকে বেড়াজালে আটক রাখার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহার বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সেন্সর ব্যবস্থার দরুণ এতদিন বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। সম্প্রতি 'আমেরেশিয়া' পত্রিকায় উত্তর চীনের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক মাইকেল লিণ্ডসের যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে উত্তর চীনের গেরিলা অঞ্চলে সুনইয়াৎ-সেনের ত্রি-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রূপ অনেকটা বোঝা যাইবে। নীচে আমরা তাহার সারাংশ তুলিয়া দিলাম। উত্তর চীন জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালাইয়াছে। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক সেই উত্তর চীনকেই পিষিয়া মারিতে চাহিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বরাবর জাপ অনুরাগী প্রতিক্রিয়াশীলদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে, কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য কমিউনিষ্ট প্রভাবিত উত্তর চীনের সহিত একযোগে হাত মিলাইতে রাজী হয় নাই।

●

১৯৪২ সালের প্রথম ৬ মাসে উত্তর চীনে ৫০ হাজার জাপানী ও ৩০ হাজার তাঁবেদার সৈন্য গেরিলাদলের সহিত যুদ্ধে হতাহত হইয়াছে। এই বৎসর গেরিলা অঞ্চলে জাপানীরা প্রতিবার ২০ হাজার সৈন্য লইয়া ৯ বার বড় বড় অভিযান চালাইয়াছে। ইহা হইতে সমগ্র চীনের যুদ্ধে এই এলাকার গুরুত্ব অনেক খানি বুঝা যাইবে।

জাপ-বিরোধী গণপ্রতিরোধের উৎস

উত্তর চীনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

চিয়াং কাই শেকের কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের জবাবে অধ্যাপক লিণ্ডসে

এই সমস্ত সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। গেরিলারা বলিতে গেলে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদের অস্ত্র কিংবা রসদ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, উত্তর চীনের সীমানায় সীমানায় পিটুনী ফৌজ বসাইয়াছে। জাপানীরা এই অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে, মেয়ে পুরুষের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার চালাইয়াছে। তবুও সেখানে নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাপানের বিরুদ্ধে বিরাট গণপ্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

গেরিলা অঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট

গেরিলা অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টই এই গণপ্রতিরোধের প্রেরণার উৎস।

গেরিলা অঞ্চলের 'সিয়েন' বা জেলাগুলি ৫।৬টি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা শাসন পরিচালনা। ইহাদের নীচে আছে বিভিন্ন 'চু' বা পরগণা এবং বিভিন্ন গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা।

গ্রাম্য কাউন্সিলের সভ্যরা সর্ব্বসাধারণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকে। ১৮ বছরের বেশী বয়সের প্রত্যেক নরনারীর ভোটাধিকার আছে। গ্রামবাসীরা এই নির্বাচন উপলক্ষে ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া একজন সাময়িক দলপতি ঠিক করে ও তাঁহার নেতৃত্বে নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে গ্রাম্য কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করে। নির্বাচিত গ্রাম্য কাউন্সিল তখন গ্রামের সভাপতি নির্বাচন করে ও শাসনব্যাপারে তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। ভোটারদের দলগুলি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে লইয়া নিয়মিত ভাবে আলোচনা বৈঠক চালায় এবং ইচ্ছামত সেই প্রতিনিধিকে নির্বাচিত পদ হইতে যে কোন সময় অপসারিত করিতে পারে।

শান্‌সি-চাহার-হোপেই এলাকায় প্রতি আড়াই হাজার লোকের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি সিয়েন বা জেলা কাউন্সিলে পাঠাইবার অধিকার আছে। কতকগুলি গ্রাম একত্র করিয়া বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্র গঠিত হয় এবং বিভিন্ন নির্বাচনসভা অনুষ্ঠিত হইবার পর গোপন ব্যালটে ভোট গৃহীত হয়। এখানেও নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করার সম্পূর্ণ অধিকার জনসাধারণের রহিয়াছে। বিভিন্ন গণসংগঠন প্রভৃতিও সভা ডাকিয়া এইরূপ প্রতিনিধি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে।

শান্‌সি-চাহার-হোপেই বর্ডার গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে হইয়া থাকে। সিয়েন বা জেলাগুলি নির্বাচনকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এবং প্রতি ৩০ হাজার লোকের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়াইবার অধিকার থাকিলেও, সাধারণত বিভিন্ন গণসংগঠন হইতেই প্রতিনিধিদের নাম প্রস্তাবিত হইয়া থাকে। নির্বাচিত সভ্য ছাড়াও সিয়েন বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভ্যসংখ্যার শতকরা ১০ জন সভ্য মনোনীত হইতে পারে। জাপ অধিকৃত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে বা দেশের বিশেষ অংশের প্রতিনিধি হিসাবে এই মনোনয়ন হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ৩ শত সভ্যের মধ্যে সৈন্যবিভাগ হইতে ২০ জন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রত্যেক কারখানা হইতে ৩ জন, মুসলমানদের মধ্য হইতে ৫ জন এবং মাঞ্চু, মোঙ্গল ও তিব্বতী জাতিগুলির প্রত্যেকটি হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

উত্তর চীনে কমিউনিষ্ট পার্টিই জনগণের সর্ববৃহৎ সংগঠন। কিন্তু শানসি-চাহার-হোপেই গবর্ণমেণ্টে কুওমিণ্টাং প্রতিনিধিদেরও স্থান আছে। এই গবর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই কুওমিণ্টাং দলভুক্ত। নির্বাচিত সংগঠনে মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী স্থান দখল না করাই উত্তর চীনে কমিউনিষ্টদের নীতি। মোট সভ্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কমিউনিষ্টদের, এক-তৃতীয়াংশ অভিজাত, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ থাকিবে দল-নিরপেক্ষ প্রগতিশীলদের হাতে—নির্বাচনকালে সাধারণভাবে ইহাই কমিউনিষ্টদের লক্ষ্য থাকে।

বিভিন্ন গণ-সংগঠন

বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মারফৎ এই গবর্ণমেণ্ট জনস্বার্থমূলক কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে ও রাজনৈতিক শিক্ষা পরিবেষণ করে। কৃষক, শ্রমিক, যুব, নারী ও কিশোর—এই ৫টি বে-সামরিক গণসংগঠন আছে। সামরিক গণসংগঠন আছে ২টি: আত্মরক্ষী দল ও নগররক্ষী বাহিনী। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বে-সামরিক সংগঠনগুলির সভ্যসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ; এবং সামরিক সংগঠনগুলির সভ্য সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ। অবশ্য কেউ কেউ সামরিক ও বে-সামরিক উভয় সংগঠনেরই সভ্য আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় নেতারা গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রচার করে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনে ও সংস্কৃতি বিস্তারে জনসাধারণকে উৎসাহ দেয় এবং চাষবাসের নূতন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। নূতন সমাজসংস্কারমূলক আইন চালু করা ব্যাপারে ইহারা সাহায্য করে। উত্তর চীনে মেয়ে পুরুষের বৈষম্যমূলক নীতি অনেকাংশে দূর হইয়াছে এবং এমন কি বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যেও গণশিক্ষা ও রাজনৈতিক উদ্যম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকগুলি কাউন্সিলের সভ্যপদে মেয়েরা নির্বাচিত হইয়াছে।

গেরিলা অঞ্চলের গণশিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। ১৯৪১ সালের খবরে প্রকাশ, পিংহান রেলপথের পশ্চিমে সাড়ে ৭ হাজার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং মধ্য হোপেইয়ের স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ। বৎসরের যে সময়টা চাষবাসের কাজ থাকে না, সেই সময় ব্যাপকভাবে বয়স্ক শিক্ষার আন্দোলন চালানো হয়। পিংহান রেলপথের পশ্চিম অঞ্চলে ৩ লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে।

খাজনা ও সুদের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিবাহআইন সংস্কার করিয়া বিবাহের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে; বিবাহবিচ্ছেদের কঠোর বাধাগুলিও অনেক পরিমাণে দূর করা হইয়াছে ও উপপত্নীপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বন্ধকী জমি উদ্ধারের ব্যবস্থাও সহজ হইয়াছে। আদালতে মামলা রুজুর জন্য সমস্ত রকম মাশুল আদায় ইত্যাদি প্রথা রদ হইয়াছে ও উকিলমোক্তারের পেশা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার বদলে এখন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা মামলায় যে কোন পক্ষে সওয়াল করিতে পারে। ইহার ফলে গ্রাম্য সালিশী কমিটিতে ছাড়াও প্রত্যেকেই আদালতেরও সুবিধা পাইয়াছে। কারাগারে নিছক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বদলে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ফসলের পরিমাণে এই অঞ্চলে ট্যাক্স দিবার ব্যবস্থা আছে। এই ফসল স্থানীয়ভাবে মজুত রাখা হয়। গেরিলা অঞ্চলে জাপ অধিকৃত অঞ্চলের তুলনায় ট্যাক্সের হার ১৮ ভাগের ১ ভাগ।

কোনো রকমের কলকব্জা আমদানীর উপায় নাই। কারণ একদিকে জাপানী অন্যদিকে কুওমিণ্টাংয়ের অবরোধ। তবুও শিল্পবাণিজ্যের দিক দিয়াও গেরিলা অঞ্চল যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে; সাবান, তেল, লোহা, বিস্ফোরক, কাগজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প বাড়িয়া উঠিতেছে। কো অপারেটিভ প্রথা প্রবর্তন করা ছাড়াও ধান চালের দরের অস্বাভাবিক ওঠা-পড়া বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উত্তর চীনে কমিউনিষ্টদের অখণ্ড প্রভাব। নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান উদ্যোক্তা হইতেছে কমিউনিষ্ট পার্টি। কিন্তু সৈন্যবিভাগ, বিভিন্ন গণসংগঠন ও বেসামরিক সরকারী বিভাগে কমিউনিষ্ট ছাড়াও অন্যান্য অনেকে আছে। চীনের বর্তমান অবস্থায় কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় আসে নাই, দীর্ঘ দিন ধরিয়া মূলধনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারফৎ মূল শিল্পের কতকাংশে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা আনিতে হইবে—ইহাই কমিউনিষ্টদের কর্ম্মসূচী। কমিউনিষ্টরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বারবার ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে। উত্তর চীনে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, তাহার সহিত যুদ্ধপরবর্তী গণতান্ত্রিক চীন খাপ খাইবে না—এধারণা একেবারেই অমূলক।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে মুহূর্তে এই গণতন্ত্রকে স্বীকার করিবে, সেই মুহূর্তে জাপানী শত্রুদের পরাজয় সুনিশ্চিত ও অনিবার্য হইবে।

বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] ৬ই ডিসেম্বর '৪৪, বুধবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

'প্রাদেশিক' কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন

সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জনের সিদ্ধান্ত

রিলিফ, সামাজিক পুনর্গঠন, খাদ্যসংগ্রহ ইত্যাদিতে নীরব

বাংলার কংগ্রেস সংগঠন দুর্বল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাঙ্গালীর জীবন পঙ্গু ও শতধা বিচ্ছিন্ন। গত দুই বছরের সংগ্রাম কিংবা রাজনীতিক দলাদলি বাঙ্গালীর জীবনে এই দুর্ভাগ্য ঠেকাইতে পারে নাই। কংগ্রেস-লীগ মিলনের সম্ভাবনায় যেটুকু আশা জাগিয়াছিল তাহাও আজ নিঃশেষ। বরং রাজনীতি বা খাদ্যাভাব ও ব্যাধি প্রতিকারের আলোচনা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আলোচনায়ই বর্ত্তমানে বাংলাদেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সুযোগে স্বভাবতই হিন্দু সভা দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে, কংগ্রেসের প্রভাব আরও ক্ষীণ হইতেছে।

এমন ধারা সঙ্গীন অবস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক কংগ্রেসকর্মী আসিয়া গত ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর হাওড়ায় একটি সম্মেলনে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের সভায় প্রধান যে প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হইল (অন্যান্য প্রস্তাবের উপর কোন আলোচনাই হয় নাই) তাহার মূল কথা ইহাই যে, "কংগ্রেসকর্মীরা যেন মুসলিম লীগ, হিন্দু সভা, রায়পন্থী, কমিউনিষ্ট প্রভৃতির সঙ্গে কোন রাজনীতিক সংস্পর্শ না রাখেন।"

অর্থাৎ খাদ্য কমিটি ইত্যাদিতে যেখানে কমিউনিষ্ট, লীগ প্রভৃতির সঙ্গে এক হইয়া কংগ্রেসকর্মীরা আমলাতন্ত্র ও চোরাবাজারের দুর্নীতি হইতে জনসাধারণকে কিছুটা হয়তো বাঁচাইতে পারিতেছেন সে কাজ কংগ্রেসকর্মীদের করা উচিত নয়; মহামারী-বিধ্বস্ত এলাকায় সকলের সমবেত চেষ্টায় যেখানে গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন দিতে বাধ্য হইতেছে কিংবা রিলিফকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে তাহা হইতে কংগ্রেসকর্মীদের সরিয়া আসা উচিত; কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে কমিউনিষ্টরা তো বটেই, এমন কি যেখানে লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে আগাইয়া আসিতেছে সেখান হইতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলাই কংগ্রেস কর্মীর কর্ত্তব্য। ইহাই হইল উক্ত সম্মেলনের প্রধান নির্দ্দেশ। তাঁহারা আশা করেন যে ইহাতেই কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িবে, লোকের নিদারুণ দুঃখে উপশম মিলিবে!

দলাদলি দিয়া আরম্ভ

সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনের ভিতর দিয়াই এই "নীতি" পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ই এ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিও তিনি নিজের ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়াছিলেন। কমিউনিষ্টদের তো বাদ দেওয়া হইয়াছিলই, এমন কি শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকেও ডাকা হয় নাই। ক্ষিতীশ বাবু বাদ পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিরণ বাবু তাঁহাকে জানান যে, তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একত্রে রিলিফের কাজ করেন বলিয়া তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়বাজারের শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা, রংপুরের জিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই 'দোষেই দোষী', কিন্তু তাঁহাদিগকে বাদ দিতে কিরণ বাবু সাহস করেন নাই—হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে, ইঁহাদেরও বাদ দিলে লোকে সম্মেলনকে কিরণ বাবুর সম্মেলন বলিয়াই বুঝিবে, কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন মনে করিবে না।

শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্ত, জে, এম দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বে খাদি প্রতিষ্ঠান গ্রুপের সকলেই এই সম্মেলন বয়কট করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কিরণ বাবু নিজের উপদলকে ভারী করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সতীশ বাবুদের উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি দিতে রাজী হন নাই, তাই তাঁহারা সম্মেলনে যাইবেন না। অভয় আশ্রমের মিহির চ্যাটার্জি প্রভৃতি, হুগলীর রতনমণি চ্যাটার্জি, সুধীর লাহা প্রভৃতিও বোধ হয় এই কারণেই সম্মেলনে আসেন নাই

সম্মেলনের আরম্ভে অসুস্থ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর লিখিত বক্তৃতায় সকল দলের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান আসিল।

সম্মেলনের মূল বক্তব্য

পরে কিরণবাবু কয়েকটি প্রস্তাব মামুলি ভাবে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর সেদিনের আসল বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বোম্বাইয়ের মেয়র মিঃ নগিনদাস মাষ্টার বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযান চালাইবার নেতা যে মিঃ এস, কে, পাটিল—তাঁহারই দক্ষিণহস্ত মিঃ নগিনদাস। তিনি বক্তৃতায় আগষ্ট সংগ্রামকে প্রশংসা করিয়া অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু গান্ধীজি ও মৌলানা আজাদ প্রভৃতি যে এই সংগ্রাম কংগ্রেসের সংগ্রাম নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন সে কথার তিনি উল্লেখও করিলেন না!

তাহার পর তিনি বলিলেন যে, কমিউনিষ্টরা সেই সংগ্রামে যোগ দেয় নাই বলিয়াই আমরা হারিয়াছি। তাই আমরা এখন গান্ধীজির প্রোগ্রাম লইয়া মজুর, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করিব—কমিউনিষ্টদের পাল্টা সংগঠন গড়িয়া তুলিব। সেজন্য আমরা বোম্বাইয়ে ৫০০০ জন কংগ্রেসকর্মীকে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছি।

ইহার পর তিনি বলেন, কমিউনিষ্টরা নাছোড়-বান্দা, লাথি মারিলেও দূর হয় না ইত্যাদি।

অর্থাৎ কনফারেন্সের প্রধান রাজনীতিক উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি তিনিই বর্ণন করিলেন। তাহার বক্তৃতার অল্প পরে সেদিনের মত অধিবেশন স্থগিত হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি বন্ধুত্ব

পরদিন কিরণবাবুর দক্ষিণহস্ত শ্রীযুক্ত প্রতাপ গুহ রায় সম্মেলনের মূল প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন: "যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত পদাধিকারী হইয়াও কংগ্রেস স্বার্থের ক্ষতিকর কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের কাজে এই সম্মেলন অসন্তোষ জানাইতেছে। সম্মেলন আরও প্রস্তাব করিতেছে যে কমিউনিষ্ট সংগঠন, কমিউনিষ্ট ও রায়পন্থী প্রভৃতির সঙ্গে রাজনীতিক সংস্পর্শ রাখা চলিবে না।"

কয়েকজন প্রতিনিধি সংশোধন প্রস্তাব আনিলেন যে, মুসলিম লীগ, হিন্দু সভা, ফরওয়ার্ড ব্লক, কায়স্থ ও মাহিষ্য সভার সঙ্গে সংস্পর্শও নিষিদ্ধ করা হোক।

প্রতাপ বাবু হিন্দু সভা ও মুসলিম লীগকে নিষেধ করার অংশ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকের সহিত সংস্পর্শ বন্ধ করিতে রাজী হইলেন না! তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তারা ইহার পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন যে, কমিউনিষ্টদের অপেক্ষা ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের অনেক কাছে কারণ তাহারা আগষ্ট সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু আর একটি সংশোধন আনিলেন যে "যে সমস্ত নেতা গত ২ বৎসর একেবারে নিষ্কর্ম্মা ছিলেন তাঁহাদিগকে নিন্দা করা হোক।" কিরণ বাবু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার এই প্রস্তাব। ডেলিগেটরা অনেকেই বলিলেন—ইহাতে আমাদের ভিতরের দুর্ব্বলতা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে সুতরাং ইহা প্রত্যাহার করা হোক। শেষ পর্য্যন্ত জগমোহন বাবু সংশোধন প্রত্যাহার করিলেন।

কংগ্রেসী ঐতিহ্য রক্ষায়

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল কমিউনিষ্টদের দূর করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিলেন যে বড় জোর এই ভাবে প্রস্তাব লওয়া উচিত যে যাহারা কংগ্রেস আদর্শ মানে নাই তাহারা পদত্যাগ করুক এবং যে সমস্ত গ্রুপ ও পার্টি কংগ্রেস আদর্শের বিরোধী তাহাদের সহিত সংস্পর্শ না রাখিতে অনুরোধ করা হোক। কিন্তু এই গ্রুপ ও পার্টি কে তাহা নাম করিয়া বলিবার দরকার নাই।

তিনি বলেন যে গত দুর্ভিক্ষের সময় অনেক জেলায় কমিউনিষ্টরা দেশভক্তের উপযুক্ত ভাল কাজ করিয়াছে। কলিকাতায়ও জনরক্ষা সমিতির নামে তাহারা অনেক ওয়ার্ডে জনসাধারণের সেবা করিয়াছে। এখনও অনেক কংগ্রেসকর্মী তাহাদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতায় কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সেই কাজ ত্যাগ করিতে বলা উচিত হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে কমিউনিষ্টদের অপেক্ষা অনেক বিপজ্জনক হইল ফরওয়ার্ড ব্লক। জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাদের স্পষ্ট মনোভাব থাকা উচিত ফরওয়ার্ড ব্লক জাপানীকে সমর্থন করে। ফরওয়ার্ড ব্লকের এই কংগ্রেস-বিরোধী পন্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা উচিত।

শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকাও নলিনাক্ষ সান্যালকে সমর্থন করেন রংপুরের জিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন, কমিউনিষ্টরা ভাল হোক বা মন্দ হোক দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের নেতারা যখন নেতৃত্ব দিতে পারিলেন না তখন আমাদের জেলায় জনসেবার কাজে কমিউনিষ্টরা ভাল কাজই করে এবং শাস্তি বিধানের ভয় অগ্রাহ্য করিয়াও আমি তাহাদের সঙ্গে জনসেবার কাজে যোগ দিই।

একজন তরুণ বয়স্ক ডেলিগেট উঠিয়া বলেন যে ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি প্রভৃতি ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু তাহারা আগষ্ট সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাই।

এবার 'সংগ্রাম'—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে

সকলের শেষে প্রস্তাবক প্রতাপ গুহ রায় বলেন: কমিউনিষ্টরা যাহাতে কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও না থাকিতে পারে সেজন্যই এ প্রস্তাব আনিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের মূলগত পার্থক্য আছে। যখন গান্ধীজী বলেন 'কুইট ইণ্ডিয়া' তখন উহারা বলে জনযুদ্ধ। আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হইবার জন্য উহারাই দায়ী। উহাদিগকে রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক—সকল দিক হইতে বয়কট করিতে হইবে।

এই সময় নলিনাক্ষ সান্যাল, মুরারকা প্রভৃতি চলিয়া যান। তাহার পর মূল প্রস্তাব ভোটে দিলে উহার পক্ষে প্রায় ৭০ ভোট হয়, জন কুড়ি নিরপেক্ষ থাকেন, ২ জন বিরুদ্ধে ভোট দেন।

এই একটী প্রস্তাবের আলোচনায়ই সভার প্রায় সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। উহার পরে তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হয়—১। বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বোমায় আক্রান্ত জনগণের প্রতি সহানুভূতি। ২। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় ঘুষ, দুর্নীতি ও চোরাবাজারের আধিক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস কর্মীদিগকে এই সবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আহ্বান করা। ৩। কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া একটী প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতি গঠন।

শেষোক্ত প্রস্তাব উঠাইয়া কিরণ বাবু বলেন যে গত সংগ্রামকে অনেকে কংগ্রেসের সংগ্রাম বলিতে চান না। উহা কংগ্রেসের না হোক, জাতীয় সংগ্রাম বটে কারণ জনসাধারণ উহাতে যোগ দিয়াছিল! এখন আমাদের ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিতে হইবে। কার্য্যকরী সমিতি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রোগ্রাম তৈয়ারী করিবে, ইত্যাদি। ইহার পর সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলন কি ক্ষতি করিল

বাংলাদেশের অনেক কংগ্রেসকর্মী বহুদিন পরে একত্র হইয়াছিলেন। এই সম্মেলন হইতে তাঁহারা জনসেবা ও রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের স্পষ্ট কার্য্যসূচী পাইবার আশা করিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন যে সম্মেলনে কংগ্রেসের ঐক্য আরও সুদৃঢ় ও বিস্তীর্ণ হইবে যাহাতে কার্য্যসূচী অনায়াসে কাজে পরিণত করা যায়। তাঁহারা কি পাইলেন?

গান্ধীজি, আজাদ প্রভৃতি আমলাতন্ত্রের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে আগষ্ট সংগ্রাম কংগ্রেসের সংগ্রাম নয়। অথচ ডেলিগেটের পর ডেলিগেট উঠিয়া পুলিশ রিপোর্টারদের সামনেই বলিলেন, কমিউনিষ্টদের জন্যই আগষ্ট সংগ্রাম বিফল হইয়াছে, সেজন্য তাহাদের কংগ্রেস হইতে দূর করিতে হইবে। ইহার ফলে তাঁহারা হয় গান্ধীজিকেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করাইলেন, নয় নিজেরাই কংগ্রেস-বিরোধী দলে ভিড়িলেন। কিন্তু সে বোধও কোথাও দেখা গেল না।

(৭ পৃঃ দেখুন)

সপ্রু কমিটির প্রচেষ্টা

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর আপোষ কমিটি যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজে নামিয়াছে তাহা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। জনকয়েক আইনবিদ পণ্ডিতের চেষ্টায় নূতন কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক সূত্র খাড়া করাই আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা দেশের দুইটি প্রধান দেশপ্রেমিক সংগঠন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা। কারণ সাম্রাজ্যবাদ দেশের উপর অচল অবস্থার যে বোঝা চাপাইয়াছে শাসনতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের দ্বারা তাহা দূর করা যাইবে না। উহার জন্য চাই কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মধ্য দিয়া সমগ্র জাতীয় শক্তির উদ্বোধন। চল্লিশ কোটিকে জাগাইবার মন্ত্র ইহাই।

আপোষ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে হইলে কংগ্রেস ও লীগের ভিতর হইতেই তাহার সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন। গান্ধিজী ও জিন্নাসাহেবের যে যুক্ত-বিবৃতি আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে, তাহারই সুরে সমস্ত প্রচেষ্টাকে বাঁধিতে হইবে। পাকিস্তানের দাবী যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী কংগ্রেসসেবীকে তাহা বুঝিতে হইবে এবং উহার জন্য লীগপন্থীদেরই প্রশ্ন করিতে হইবে। আর লীগকে স্বাধীন হিন্দুস্থান ও স্বাধীন পাকিস্তানের মধ্যে এমন একটি সন্ধির নীতি গ্রহণ করিতে ডাক দিতে হইবে যার ফলে সুদৃঢ় সামরিক মৈত্রীর মধ্য দিয়া বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত হয় ও পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি অটুট থাকে। অর্থাৎ সমস্যাটি সঙ্কীর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নয়—ব্যাপক রাজনৈতিক সমস্যা। সে সমস্যা হইতেছে বর্ত্তমানে অচল অবস্থা নিরসনের জন্য যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের ভিত্তি হিসাবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি মানিয়া লওয়া। সে সমস্যা হইতেছে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পারস্পরিক চুক্তির নীতি স্বীকার।

যে সব দেশপ্রেমিক কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বাহিরে আছেন তাঁহারা সমস্যার আপন আপন সমাধান আবিষ্কার করিলে কোন ফল হইবে না। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করিলেই তাঁহারা দেশের সত্যকার কল্যাণ করিতে পারিবেন।

সপ্রু কমিটি বিভিন্ন তথ্য, ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত বিচারের কাজে সাহায্য করিয়া ফলপ্রদ কাজ করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের সক্রিয় সহযোগিতা পাইলে তবেই সে চেষ্টা কার্য্যকরী হইতে পারিবে।

—পি, সি জোশী

১৯৪৫ সালের জন্য
নূতন আমন-ক্রয় নীতি চাই

লেখকঃ
ভবানী সেন

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে খাদ্য বিভাগের সদস্য জওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কলিকাতার জন্য চাউল সরবরাহ করা হইবে না। আটা ও গম অবশ্য দেওয়া হইবে। এই ঘোষণায় সমগ্র বাংলা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যনীতি হইল প্রত্যেক ঘাট্‌তি প্রদেশকে সরবরাহ করা। বাংলাদেশ একটি ঘাটতি অঞ্চল। সরকারী বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারেই বাংলার চাহিদা মিটাইবার জন্য সওয়া দুই লক্ষ টন গম এবং সওয়া দুই লক্ষ টন চাউল বাংলার বাহির হইতে আমদানি করা দরকার। এই আমদানি বন্ধ হইলে বাংলায় গুরুতর সংকট দেখা দিতে বাধ্য।

১৯৪৪-৪৫ সালে আমন ফসল গতবারের চেয়ে অনেক কম হইবে। যাহারা এ বিষয়ে সংবাদ রাখেন তাঁহাদের অনুমান গতবারের ১০ ভাগের ৯ ভাগ এবার পাওয়া যাইবে। বরিশাল এবং দিনাজপুর এই দুটি জেলা বাংলার প্রধান শস্যভাণ্ডার, এই দুই জেলাতেই এবার হয়ত মাত্র দশ আনা ফসল উৎপন্ন হইবে।

কলিকাতার রেশনিং বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। কলিকাতার রেশনিং সফল করার উপর সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করে, কারণ আগামী বৎসর বর্মার যুদ্ধ অভিযানের জন্য বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অসম্ভব চাপ পড়িবে। কাজেই কলিকাতার ভার কেন্দ্রীয় সরকারেরই নেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবাস্তবের বিবৃতির ফলে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক দেখা দিয়াছে. বাংলার বিভিন্ন জেলায় আড়তদারেরা চাউলের দর দু একটাকা চড়াইতে সুরু করিয়াছে। তাহাদের মনে হয়ত এই আশা জাগিয়াছে যে কলিকাতার রেশনিং এবার বন্ধ হইয়া যাইবে চাউলের বাজার আবার '৪৩ সালের মত চড়িবে। এই আশাই যদি তাহাদের মনে জাগিয়া থাকে তবে তাহাদের হতাশ হইতে হইবে। কলিকাতার রেশনিং বন্ধ হইবে না। শ্রীবাস্তবের ঘোষণা হইতেই জানা যায় বাংলা সরকার প্রায় ১০ লক্ষ টন (বা পৌনে তিন কোটি মণ) চাউল কিনিয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলীর ৪২ লক্ষ লোকের জন্য আটা ও গম ছাড়া বৎসরে ৩,২০,০০০ টন চাউল দরকার। শ্রমিকদের খোরাকী একটু বেশী করিয়া ধরিলে দরকার হইবে ৪ লক্ষ টন। এই চাউল যে সরকারের হাতে জমা আছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতার রেশনিং চলিবেই এবং যাহাতে চলে তাহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কলিকাতার রেশনিং চলিতে থাকিলে বাংলার চাউলের বাজারের উপর মজুতদারের প্রভাব কমিতে বাধ্য। এত বড় একটা জায়গার চাহিদা যদি সরকারী ব্যবস্থায় মিটিয়া যায় তাহা হইলে চোরাকারবারী আড়তদারেরা ইচ্ছামত কলিকাতায় চাউল সরাইতে পারিবে না, ফলে সর্ব্বত্রই চাউলের বাজারের উপর মজুতদারের চাপ কিছুটা কম থাকিবে।

সরকারের হাতে যে চাউল জমা আছে তাহা কলিকাতার রেশনিং-এর জন্য রাখিয়া দিলে বাংলার ঘাটতি জেলাগুলিতে সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে—ইহাই হইল এখনকার প্রধান সমস্যা। সুতরাং ঘাটতি জেলাগুলিতে নিয়মিত সরবরাহ পাঠাইবার জন্য সরকারী ক্রয়ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

১৯৪৪ সালের আমন-ক্রয় নীতি প্রকৃতপক্ষে মজুতদারের হাতে আমন সমর্পণ করারই নীতি। কেননা এই নীতি অনুসারেঃ -

(১) সরকারী এজেণ্ট, চাউলের কল এবং লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী এই তিন শ্রেণীর লোককে কিনিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীর প্রতিযোগিতার জন্য সরকারী এজেণ্টরা সরকারী দরে চাউল কিনিতে বেগ পাইয়াছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত সরকার বিশেষ কিছুই কিনিতে পারে নাই। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসেই সবচেয়ে বেশী কিনিয়াছে অথচ আগামী বৎসর জুলাই মাসের ভিতরই বেশীর ভাগ কেনা দরকার, কারণ ঐ সময়ই ঘাটতি জেলায় সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা পড়িবে।

(২) সরকারী এজেণ্টরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকের নিকট হইতে কেনে নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারা কিনিয়াছে সাব-এজেণ্ট, চাউলের কল এবং লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে। অথচ চাউলের কোন নিম্নতম দর বাঁধা ছিল না। কাজেই এই সব মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া ও ব্যাপারীরা কৃষকের নিকট হইতে খুব কম দরে কিনিয়া সরকারের নিকট চড়া দরে বিক্রী করিয়াছে। তাহার ফলে গ্রামের কৃষক ঠকিয়াছে, অথচ সহরের লোক রেশন-শপ হইতেও বেশী দরে চাউল কিনিতে বাধ্য হইয়াছে।

(৩) ক্রয় ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের কোন সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় নাই। এজেণ্টরা কখন্ কোথায় কি দরে কত পরিমাণ চাউল কিনিতে পারে তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। ফলে কৃষকেরা জানিতে পারে নাই তাহাদের ন্যায্য পাওনা দর কি, দেশের আর দশজনেও বুঝিতে পারে নাই যে কত চাউল সরকারের কেনা দরকার আর কত কিনিতেছে। দরে কৃষককে কে ফাঁকি দিল, কে নিজ গুদামে চাউল আটকাইয়া রাখিয়া সরকারী এজেণ্টের সঙ্গে অন্যায়ভাবে দর কষাকষি করিতেছে, সরকারী এজেণ্ট বা সাব-এজেণ্ট কোথায় সরকারের নামে কিনিয়া ব্যক্তিগত কারবার চালাইতেছে এসব জানিতে ও বন্ধ করিতে হইলে সরকারী ক্রয় সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা উচিত।

১৯৪৫ সালের আমন-ক্রয় নীতির সারমর্ম্ম হওয়া উচিত এইরূপঃ—

(১) বৎসরের প্রথম তিন মাসের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ কিনিতে হইবে।

(২) নিম্নতম এবং উচ্চতম এই দুই দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। নিম্নতম দাম হওয়া উচিত প্রতিমণ চাউল ১০৲ এবং উচ্চতম দাম ১২৲, ধানের দর পড়তা অনুযায়ী। রেশনের বাঁধা দর কমাইয়া ১৩৲ করা হউক।

(৩) চীফ-এজেণ্টরা মধ্যবর্ত্তী সাব-এজেণ্ট বা ফড়িয়ার মারফৎ না কিনিয়া প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করিবে।

(৪) ক্রয় ব্যবস্থায় যাহাতে গলদ না থাকে সেজন্য ক্রয় সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হউক এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হউক। মন্ত্রীমণ্ডলীর উচিত অবিলম্বে প্রাদেশিক খাদ্য পরামর্শদাতা কমিটি প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলায় কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ ছাড়া এমন ৭৭টি সহর আছে যাহার প্রত্যেকটিতে ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ লোকের বাস। এই সহরগুলির মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। অন্ততঃ এই ৭৭টি সহরে, '৪৪ সালেই রেশনিং হওয়া উচিত ছিল। ২১ লক্ষ লোকের রেশনের জন্য ১ কোটি মণ চাউল দরকার হয়। '৪৪ সালে সরকার প্রায় ২৷ কোটি মণ চাউল কিনিয়াছে। কাজেই চাউলের অভাবের কথা উঠে না। এই সব সহরে যদি রেশনিং হয় তাহা হইলে গ্রামাঞ্চলে চোরাবাজারের চাপ কমে; শুধু কলিকাতায় রেশনিংএর ফলেই অবস্থা সহজ হইয়াছে সব সহরে রেশনিং হইলে গ্রামের চোরা-বাজারও অচল হইবে। কলিকাতার চাহিদার চাপ এবার বাংলার উপর পড়িবে, এ সময় সমস্ত বড় সহরে রেশনিং না থাকিলে চাউল চোরাবাজারে অদৃশ্য হইবে।

এই ৭৭টি সহরের মধ্যে মাত্র চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং কার্শিয়াং এই তিনটি সহরে রেশনিং আছে। ইহা ছাড়া আর ৯টি সহরে আংশিক রেশনিং আছে। কারণ এই ৯টি সহরে গরীবদের রেশন কার্ড দেওয়া হয়। রেশনের পরিমাণ সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র ২৷ সের। তাহাও নিয়মিত সরবরাহের গ্যারাণ্টি নাই। ইহাকে রেশনিং না বলিয়া রিলিফ বলা উচিত।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত ৭৭টি সহরের সব গুলিতেই রেশনিং চালু করিতে হইবে।

এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে গ্রামের চাষী ন্যায্য দর পাইবে, সহরের গৃহস্থ বাঁধাদরে নিয়মিত খাদ্য পাইবে, গ্রামে যাহারা চাউল কিনিয়া খায় তাহারাও বাজারে সস্তা দরে চাউল পাইবে।

আগামী বৎসরের জন্য এই নূতন খাদ্যনীতি অনুসরণ করিলে খাদ্যব্যবস্থায় বাংলা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে, অন্য প্রদেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপর ভাগ বসাইতে হইবে না।

এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করার অর্থ মজুতদারের হাতে সকলের ভাগ্য সমর্পন করা।

প্রত্যেক স্বদেশভক্ত এবং সমাজসেবকের উচিত এই ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করা এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। কংগ্রেস-সেবকরাও কলিকাতার রেশনিং চাহেন কারণ তাহারা জানেন যে দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষ হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়। এই জন্যই তাঁহারা চাহেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্জাব ও উড়িষ্যার কৃষকদের নিকট হইতে চাউল কিনিয়া বাংলায় সরবরাহ করুক। সুতরাং বাংলার গভর্ণমেণ্ট বাংলার উদ্বৃত্ত জেলা হইতে চাউল কিনিয়া ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করুক ইহাও তাঁহাদের দাবী হওয়া উচিত। কৃষক যাহাতে ন্যায্য দামে চাউল বিক্রী করিতে পারে এবং অন্যেরা যাহাতে ন্যায্য দামে চাউল পাইতে পারে এই ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয় না, দেশসেবার কাজে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করা হয়। তাহা না করার অর্থ জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া এবং মজুতদারের লুণ্ঠন আর আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী যেন মনে রাখেন যে এবার ক্রয়নীতির সফলের প্রধান উপায় কংগ্রেসের সহযোগিতা। বাংলাদেশে মাত্র ৬ কোটি মণ চাউল বাজারে আসে। কলিকাতার দায়িত্ব লইতে হইলে যতই কম কিনুন অন্ততঃ ৩ কোটি মণ কিনিতেই হইবে, এবং তাহার বেশীর ভাগ বছরের প্রথম তিন মাসে কিনিতে হইবে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া কায়েমী স্বার্থের বাধা ঠেলিয়া একাজে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। কাজেই তাঁহাদের উচিত কংগ্রেসকে সহযোগিতার পথে আহ্বান করা এবং '৪৫ সালের খাদ্যনীতির জন্য একটি কংগ্রেস-লীগ চুক্তি স্থাপন করা। ইহা চাই লীগের শক্তি ও মুসলমানদের সমৃদ্ধির জন্য ইহা চাই '৪৫ সালে সারা বাংলাকে আর এক সংকট হইতে বাঁচাইবার জন্য।

ঘটনা ও রটনা

চীনের কমিউনিষ্ট ও ধর্ম্মবিদ্বেষ

এডিথ কাউশ নামে ইংরাজ মহিলা ষ্টেটসম্যানে বিরাট পত্রাঘাত করে জানিয়েছেন যে চীনের কমিউ-নিষ্টদের হাতে চীন নাকি বহু দুর্দ্দশা ভুগেছে, দলে দলে খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোতল হয়েছে এবং এখন কুওমিণ্টাংয়ের সঙ্গে মিটমাট হলে ধর্ম্মের ওপর নাকি ভীষণ অত্যাচার হবে।

যাঁরা কমিউনিষ্ট এলাকায় থেকে এসেছেন তাঁদের সাক্ষ্য কি বলে?

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে হোপি-চাহার সীমান্তের কমিউনিষ্ট এলাকায় চিংইয়াং নামে জায়গায় কয়েকজন স্প্যানিশ পাদ্রী ছিলেন। তাঁরা ঐ এলাকার পুনর্গঠনের জন্য সরকারী ঋণপত্র (বণ্ড) খরিদ করেন এবং বলেনঃ—

> "য়েনান (কমিউনিষ্ট কেন্দ্র) ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ধর্ম্মপ্রচারে স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দিয়েছে। সীমান্ত এলাকা গরীব, গঠনমূলক কাজের জন্য তাদের টাকা দরকার, সুতরাং আমাদের সাহায্য করা উচিত। ইয়োরোপে যুদ্ধ না বাধলে আমরা আরও দিতাম।"

কমিউনিষ্ট এলাকা সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে বেশী জানতেন সেই এডগার স্নো উত্তর পশ্চিমের কমিউ-নিষ্ট এলাকা সম্বন্ধে লিখেছেন, "ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা ছিল প্রাথমিক গ্যারাণ্টি এবং তা বাস্তব। সমস্ত বিদেশী ধর্ম্ম মিশনের সম্পত্তি রক্ষা করা হ'ত এবং যে সব ধর্ম্মযাজক পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল শিষ্য প্রশিষ্যদের কাছে ফিরে আসতে।" (রেড ষ্টার ওভার চায়না, পৃঃ ৩৭০)

শুধু তাই নয়, অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসে যাতে বিন্দুমাত্র আঘাত না লাগে তার জন্যে লালফৌজকে শেখান হ'ত। স্নো লিখেছেন যে মুসলমান এলাকায় ব্যবহার সম্বন্ধে লালফৌজের সৈন্যদের উপর যে পরওয়ানা জারি করা হয়েছিল তাতে বলা ছিল (পৃঃ ৩৩০)—

"লালফৌজ যেন মালিকের অনুমতি বিনা মুসলমানের ঘরে না ঢোকে; কোনো রকমেই মসজিদ বা মোল্লার ক্ষতি না করে; মুসলমান-দের সামনে "শূয়ার" ও "কুকুর" এই দুটি শব্দ ব্যবহার না করে কিংবা মুসলমানেরা কেন শূয়ারের মাংস খায় না সে কথা জিজ্ঞাসা না করে; মুসলমানদের 'ছোট ধর্ম্ম' এবং চীনাদের 'বড় ধর্ম্ম' না বলে।"

অবশ্য ইংরাজ মহিলার উষ্মার কারণ তিনি নিজেই প্রকাশ করে বলেছেন, "কমিউনিজম বা জাপানী প্রভুত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে যদি চীনের লোককে বেছে নিতে বলা হয় তো আমার বিশ্বাস তারা জাপানী প্রভুত্বই বেছে নেবে। **আমি নিজে জাপানী প্রভুত্বই পছন্দ করব।**"

স্ত্রীলোকটি নিজের কথা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু চীনের জনসাধারণ এরকম স্ত্রীলোককে ঘৃণা করে।

* * *

শুধু বাঁদরামি নয়

শ্যামাপ্রসাদ-গোয়েঙ্কার ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকায় "পাক" ছদ্মনামে একজন লেখক দৈনিক রসিকতা করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধকে রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করে তিনি ৩০শে তারিখে খবর দিয়েছেন যে, জাপানীরা নাকি বর্ম্মায় একদল বাঁদরকে যুদ্ধ লাগিয়েছে। তারপর তিনি উদাহরণ স্বরূপ জিজ্ঞাসা করছেনঃ

"এই যুদ্ধের নায়ক রাম কে? তোজো অবশ্য এই সম্মান চাইবেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও পূর্ব্ব-ইতিহাস রামায়ণের নায়ক থেকে সামান্য রকমের আলাদা। যদি এমন কখনো হয় যে সুভাষ বাবু বানর সেনার নেতৃত্ব নিয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করলেন তাহলে আমরা তাঁকে খুসী মনেই রামের ভূমিকার সম্মান দেব। এই তুলনায়ই অন্যদিকে মিত্রশক্তিকে "রাক্ষস" বলে ধরলে কারও অনুযোগ করা উচিত নয়। তুলনাটি আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রাবণ কে তা বার করবার দরকার নেই। মিত্রপক্ষের অনেকেই বেশ সফলভাবে এ ভূমিকা অভিনয় করতে পারবেন। মিত্রপক্ষ অবশ্য সুভাষ বসুকে বিভীষণ বলতে চাইবেন... কিন্তু এ যুদ্ধে এত কুইসলিং তৈরী হয়েছে যে একটা উদাহরণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। মুস্কিল হ'ল রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতা কে? কিন্তু ভারতমাতা (যদিও একটু বয়স্কা) বা বৃটেনের অন্য কোন মুল্যবান সাম্রাজ্য অনায়াসেই এ ছবিতে খাপ খেতে পারে।"

রসিকতাটা যেন একটু সীরিয়াস হয়ে আসছে বলে মনে হয়. না? "পাক" নামধারী এই আধুনিক বাল্মীকির সীতার প্রতি দরদের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রতি দরদও বেশ গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। হিন্দু সভার সুভাষ-ভক্তি এবং "বানর-প্রীতি" কি আর প্রচ্ছন্ন থাকতে চাইছে না?

* * *

শনিবারের চিঠির কামনিষ্ঠা

অঘ্রাণের "শনিবারের চিঠি"তে গোপালদা অর্থাৎ শ্রীসজনীকান্ত সখেদে লিখেছেন যে বর্ত্তমানে "ধর্ম্মনিষ্ঠদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থনিষ্ঠদের কাল শেষ হয়ে এল বলে, এখন কামনিষ্ঠরা মাথা চাড়া দিচ্ছেন।"

সজনী বাবুর ইতিহাস একটু পিছিয়ে পড়েছে। বাজারের কাম-সমুদ্রে ডুব দিয়ে 'মণিমুক্তা' উপভোগের মহোৎসব যখন থেকে শনিবারের চিঠিকে ঢিলে দিতে হয়েছে তখন থেকে কামনিষ্ঠদের যুগও শেষ হয়ে আসছে। এবার উঠছে তারা যারা কর্ম্মনিষ্ঠ।

হিটলারীদের আত্মরক্ষার চেষ্টা

জার্মেনীর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শক্তি এখনও দুর্বল

বর্ত্তমান জার্মেনীর ধ্বংসেই নূতন জার্মেনীর অভ্যুত্থান

হিটলার আজ 'গণ-প্রতিরোধে'র জিগির তুলিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ৩টি: **প্রথমত**, শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইয়া আপোষে এমন সন্ধিসর্ত্ত আদায় করা, যাহাতে হিটলারী শাসন যেন তেন প্রকারে বজায় থাকে; **দ্বিতীয়ত**, এ কৌশল যদি ব্যর্থও হয়, তাহা হইলেও যাহাতে জার্মেনী মিত্রপক্ষের অধিকারে না আসে, তাহার জন্য প্রাণ-পণে বাধা দেওয়া এবং নাৎসী শয়তানদের আত্ম-গোপনের ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে এমন প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করা যাহাতে মিত্রবাহিনী জার্মানভূমিতে তিষ্টিতে না পারে; **তৃতীয়ত**, মিত্রপক্ষের সহায়তায় জার্মেনীতে নাৎসী ভিন্ন আর কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই যাহাতে কায়েম না হইতে পারে, তাহার জন্য যে কেউ এই সহযোগিতার পথে পা বাড়াইবে, তাহাকেই হত্যা করা।

ইহার জন্য প্রস্তুতি

গত এক বছর ধরিয়া সমানে প্রস্তুতি চলিয়াছে। বারো বছরের বেশী বয়সের প্রত্যেক জার্মানকে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদমারি শেখানো হইতেছে। এক জার্ম্মান সংবাদপত্রে প্রকাশ, ১ কোটি নরনারী ও বালককে এইভাবে শিক্ষিত করা হইয়াছে। জার্মেনীতে গত ৬ মাস যাবৎ আধা-সামরিক কায়দায় গ্রামে গ্রামে প্রতি সপ্তাহে ইহাদের অসংখ্য কুচকাওয়াজ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বৃটিশ হোমগার্ডের অনুকরণে জার্মেনীতে গ্রাম, নগর ও কারখানায় রক্ষীবাহিনী গঠিত হইয়াছে। বিদেশী মজুরদের উপর নজর রাখা ও দরকার মত তাহাদের নিষ্কণ্টক করার ভার এই রক্ষীদলের।

নূতন ধরণের অস্ত্রসজ্জা

সরল পদ্ধতিতে তৈরী নূতন এক ধরণের অস্ত্রের উপর এখন খুব বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে। আগষ্ট মাসে সমস্ত জার্মান পত্রিকায় হাওয়াই ছুঁড়িবার এক গোপন অস্ত্রের বিশদ বিবরণের সহিত এই কথা বলা হইয়াছে যে, ঐ ধরণের অস্ত্র যেমন ব্যবহার করা সহজ, তেমনি উহা তৈরী করিতেও খুব বেশী কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না।

ইহা হইতে বুঝা যায়, খাস জার্মেনীতে যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীরা সুবিধা মতন লড়াইয়ের কায়দা অতি সহজেই বদলাইয়া নিতে পারিবে।

কিন্তু এত' গেল শুধু সামরিক প্রস্তুতিরই ছবি। অন্যদিকে মাসের পর মাস নাৎসী নীতি প্রচারের অভিযান পূরাদমে চলিতেছে। পূর্ব রাষ্ট্রসমূহের দপ্তর ছাড়িয়া রোজেনবার্গ তাহার ভূতপূর্ব গদীতে বহাল হইয়াছে। বহু দিন পর আজ আবার সে নাৎসী পার্টির গুরুমশাই সাজিয়া বাছা বাছা এমন সব গোঁয়ারগোবিন্দ সৃষ্টির কাজে লাগিয়াছে, যাহাদের মজ্জায় মজ্জায় বহিবে 'নাৎসীবাদের অনন্ত ভাবধারা'। আর এ কাজে তাহার সাক্ষাৎ পরামর্শ-দাতা স্বয়ং হিটলার ও হিমলার।

হিটলার-ইয়ুথ ও জার্মান সৈন্যদের মধ্য হইতেই রোজেনবার্গ লোক যোগাড় করিতেছে। নাৎসী পার্টির অন্দর মহলের এই বিশ্বাসী অনুচরবর্গ সম্পর্কে নাৎসীরা বিশেষ কিছু খুলিয়া বলিতে চায় না। এ সম্পর্কে একটিমাত্র খবর প্রকাশ পায় ৬ মাস আগে—সমগ্র সৈন্যবাহিনীতে নাৎসী মন্ত্রণাদাতার পদ সৃষ্টির প্রসঙ্গে।

জার্মান সৈন্যদলের আসল নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমে ইহাদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহারাই হইবে জার্মেনীতে ফ্যাশিষ্ট 'জনযুদ্ধের' সামরিক ও রাজনৈতিক অধিনায়ক।

প্রতিপক্ষকে নির্ম্মূল করার ব্যবস্থা

বেসামরিক প্রত্যেক চাকুরীয়াকে ব্যাপক-ভাবে সামরিকবৃত্তির জন্য ডাকা হইতেছে। পুরানো রাষ্ট্র যন্ত্র ভাঙিয়া দিয়া সমস্ত কিছু এই নূতন গুপ্ত অনুচরবর্গের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইতেছে।

অন্যদিকে ছোট বড় সমস্ত রকম প্রতিপক্ষ শক্তিকে পিষিয়া মারার অনবরত চেষ্টা চলিয়াছে। আর গোপন অস্ত্রের মনগড়া যে কাহিনী লোকের মধ্যে প্রচার করা হয়, তাহার পিছনে ঠিক জার্মানদের মনে লাগার মতনই যুক্তি খাড়া করা হইয়া থাকে। বলা হয়, এই গোপন অস্ত্রই জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধের সমস্ত ভোল বদলাইয়া দিবে। বলা হয়, সব কিছুই নির্ভর করে, জার্মানী এই সমস্ত গোপন অস্ত্র কাজে লাগাইবার সময় পাইবে কিনা। আবার বলা হয়, ২০শে জুলাই যাহারা হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এবং যাহারা লণ্ডন ও মস্কো হইতে এই দেশদ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল—তাহারা সকলেই জার্মানীর পরাজয় ও দাসত্ব চাহিয়াছিল। তাহারা একাজে ব্যর্থ হইয়াছে বটে। কিন্তু ভিতরে থাকিয়া এত ভাল ভাবে তাহারা ক্ষতি করিয়াছে যে, ইহার ফলে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে; যদি গোপন অস্ত্র প্রয়োগের সময় না করিয়া ওঠা যায়, তবে ঐ দেশদ্রোহীরাই সেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী হইবে।

সম্প্রতি জার্মেনীতে প্রত্যেক বক্তৃতায়, প্রত্যেক প্রবন্ধে জার্মানদের কানে এই একই বুলি আওড়ানো হইতেছে।

শুধু কি হুমকি

পূর্ব প্রুশিয়া, সাইলেশিয়া এবং রাইনল্যাণ্ডে জার্মানরা ইতিমধ্যেই তাদের এই নূতন কৌশল পরীক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলের সমগ্র জনসংঘকে আত্মরক্ষার যুদ্ধে টানিয়া আনার চেষ্টায় একেবারে যে ফল হয় নাই—তাহাও বলা যায় না। সব থেকে আশঙ্কার কথা, জার্মেনীর সামরিক পরাজয় যদি যথেষ্ট সুপরিকল্পিত না হয়, তাহা হইলে দশ বিশ বছর পরেও জার্মানী তাহার এই কৌশল অনায়াসে আবার কাজে লাগাইতে পারে।

আজ যখন নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রকে গুঁড়াইয়া দিয়া নাৎসী গেষ্টাপো ও তাহাদের গুপ্ত ঘাঁটি সমূহকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে, তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দেশবিদেশে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। ব্রিটেনের ৭০ জন পার্লামেণ্ট সভ্য (অধিকাংশই লিবারাল ও লেবার পার্টির লোক) আটলাণ্টিক সনদ ও জার্মেনী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতির বিরোধিতা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। মে মাসে ২৩ জনের স্বাক্ষর সংযুক্ত আর এক ঘোষণাপত্রেও (ইহার মধ্যে লেবারপার্টির ভাইস চেয়ারম্যানও আছেন) জার্মেনী সম্বন্ধে মিত্রশক্তির গৃহীত নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছে। এমন কি হোর বেলিশা পর্যন্ত ২৫শে মে তারিখে পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে হিটলারের গুণগান করিতে ছাড়েন নাই।

ইউরোপে যাহারা জার্মান প্রভুত্ব জীয়াইয়া রাখিতে চায়, তাহারাই আজ হঠাৎ জার্মানীর প্রতি শাস্তি বিধানের প্রস্তাবের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রমিক ও প্রগতিশীলদের কারো কারো মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ, আজও তাঁহারা ১৯১৮ সালের সহিত ১৯৪৪ সালের মূলগত পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই।

১১ বছরের সুদীর্ঘ নাৎসী প্রভুত্ব জার্মেনীর শ্রমিক শক্তির মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়াইয়া দিয়াছে এবং জার্মান তরুণদের একদল গুণ্ডার বাহিনীতে পরিণত করিয়াছে। যার ফলে, আজ জার্মানীর অভ্যন্তরে জোরালো অন্তর্বিদ্রোহের আশা করা একেবারেই অবাস্তব। বাহির হইতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াই জার্মানীকে কাবু করিতে হইবে।

কিন্তু সামরিক পরাজয়ের পরও নাৎসী জার্মানী যাহাতে কোন ভাবে মাথা না তুলিতে পারে, তার জন্য জার্মানীর কাছ হইতে যুদ্ধ খেসারত আদায় করিতে হইবে ও যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তি বিধান করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে বিড়ম্বিত প্রতিবেশী দেশগুলির উপর যাহাতে নাৎসী জার্মানী ঝাঁপাইয়া না পড়িতে পারে, তাহার জন্য জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ প্রয়োজন।

একমাত্র এই ধ্বংস ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে পারে এবং জার্মান জনগণ এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই তাহাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-জীবন ও সভ্য মানুষের মত সুখ, শান্তি গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

● ফ্যাশিজমের কবর ●

ইলিয়া এরেনবুর্গ

এগারো বছর ধ'রে নাৎসীরা তাদের স্পর্দ্ধাকে নির্ভীকতা ব'লে ভান ক'রে এসেছে। আজ কিন্তু জার্মান জেনারাল ষ্টাফের এক প্রচার পত্রে জনৈক মেজর হ্বের লিখছে:

'খোলা ময়দানে কিম্বা বনজঙ্গল, জলাভূমির গহ্বরে আমাদের সৈন্যেরা গুঁড়ি মেরে প'ড়ে আছে। মাথার ওপর তাদের হেঁট হ'য়ে আছে অন্ধকার হিমশীতল আকাশ। তাদের চতুর্দিকে এক সীমানা-হীন প্রতিকূল দেশ। পিছনে তাদের মুষ্টিমেয় ফৌজ, সামনে উদ্যত শত্রুর বিপুল সৈন্যবাহিনী।

'বলশেভিকদের মৃত্যুবর্ষী বন্দুক কামান থেকে কখনো শিস্ দিয়ে, কখনো বজ্রনাদে ফেটে প'ড়ছে রাশি রাশি গোলাগুলি আর অগণিত বোমা। এরই মাঝখানে আমাদের সৈন্যদের অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, পিছানো চলবে না। আমাদের কামান ক্বচিৎ কখনো ক্ষীণ উত্তর দেবে। আর তিন চার ঘণ্টা নরকযন্ত্রণার পর কর্কশ বীভৎস চীৎকারে পালে পালে শত্রুরা এগিয়ে আসবে। আর এগিয়ে আসবে অসংখ্য ট্যাঙ্ক, এগিয়ে আসবে ট্রাকের ঘর্ঘর আর ইঞ্জিনের হুঙ্কার। এর মাঝখানে মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুবিমান ফুঁসে উঠবে, নিক্ষিপ্ত বোমা মাটিতে আছড়াবে। পাঁচটা, আটটা, বারোটা বিমানের বিরুদ্ধে আমাদের বিমান মাত্র একটা।'

জার্ম্মান সেনাপতি-পরিষদের এই মেজরটি যেন ছোট্ট খুকীর মত ফুঁপিয়ে উঠেছেন। আমি বলি, ষ্টালিনগ্রাডে শুধু যুদ্ধই নয়, ইতিহাসও এক নূতন মোড় নিয়েছে। ষ্টালিনগ্রাডের বীর প্রতি-রোধের ঠিক আগে একটি প্রশ্ন সারা দুনিয়াকে আলোড়িত করেছিল: জার্ম্মনদের এর পরের চালটা কি?' আর 'হিটলার এবার কোন বুলি আওড়াবে?'

এটা একটা ভুঁইফোঁড় ঘটনা নয়। শুধু নির্বোধ হিটলার নয়, শেয়ানা বিসমার্কের আমল থেকেই এর আরম্ভ। ৮০ বছর ধ'রে জার্ম্মেনীর দিকে দুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ—তার কারণ তার সামাজিক অগ্রগতির উজ্জ্বল আদর্শ নয়, কিম্বা তার চিন্তাধারার উন্নত প্রকাশ বা শিল্পের বাহাদুরীও নয়। পৃথিবীর সামনে জার্ম্মেনী বিজেতা সৈনিকের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিটলার যখন দিব্যি কেটেছে, মিষ্টি কথা বলেছে, যখন দুনিয়ার লোক রেডিওর সামনে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে থেকেছে আর যখন সেই উন্মাদাগারে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়করা তীর্থ কাকের মত ছুটেছে—১৯৩৬-১৯৩৯ সালের সেই নির্লজ্জ দিনগুলির কথা কেউ কি ভুলতে পারে?

ষ্টালিনগ্রাডে জার্ম্মেনীর বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সমাধি পেয়েছে। ষ্টালিনগ্রাডের এই প্রতিরোধের পর সারা দুনিয়ার সামনে জার্ম্মেনীর মুখ থেকে দিগ্বিজয়ীর মুখোস খসে পড়েছে; সমস্ত ন্যায়বিচারের দিকে গুণ্ডা জার্ম্মেনী খড়্গ উঁচিয়েছে—দুনিয়ার সামনে তার এই পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। তারপর থেকে ফুরার হিটলারের তর্জ্জনগর্জ্জনে কেউ কান পাতে না। ষ্টালিনগ্রাডের পর থেকেই পরাভূত জার্ম্মানদের দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে দুনিয়ার দৃষ্টি ফিরেছে।

যারা গত ২৫ বছর ধরে আমার স্বদেশকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে, তারা আজ নিজেরা ভেবে দেখুক, কেন আজ রুশিয়ার কৃষক, রাখাল, মজুর, ছাত্র, মাষ্টারের দল ইউরোপের জাতিসমূহের মুক্তির জন্য নীরবে রক্ত ঢালছে। যে জাত তার শান্তিপূর্ণ শ্রমকে প্রতীক ক'রেছিল, আজ এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় তারা অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; আজ সে নিজেকে রক্ষা ক'রে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে। এর মধ্যেই ইতিহাসের সারকথা চিহ্নিত।

রাশিয়ার পরবর্তী চাল কি, তার লক্ষ্য কি, সমস্ত বিষয়ে রাশিয়ার মত কি—আজ এই সব প্রশ্নে সমগ্র জগত নিরন্তর মুখরিত। অনেকে আবার সরলভাবে প্রশ্ন ক'রতে পারে, আর অনেকের মত রুশরা যত লড়ে, তত কথা বলে না কেন। কিন্তু আমরা কথা ত' বলছিই, এমন কি স্বপ্ন দেখতেও ছাড়ি না। আজ ফ্যাশিজমের শুধু সামরিক পরাজয়ই নয়, তার রাজনৈতিক ও মানসিক পরাজয়ও আমাদের কাম্য—মলোটভের এই কথার মধ্যেই আমাদের সমস্ত স্বপ্নকামনার প্রকাশ।

আজ দুনিয়াব্যাপী মৃত্যুর পূতিগন্ধ। গলিত ফ্যাশিজমের বিষনিঃশ্বাসে আমরা একজনকেও মরতে দেব না। ফ্যাশিষ্টরা যদি ছদ্মবেশ ধরে, যদি তারা মুখের চুনকালি ধুয়ে দুচারটে করুণ গান গাইতে শেখেও—যদি তাদের আবার নতুন নরমেধের পথ প্রশস্ত করা হয়—আমরা তা মানবো না। আমরা এগিয়ে চলেছি দিগ্বিজয়ী হিসাবে নয়—জীবন, মুক্তি ও মানবমর্যাদার ত্রাণ কর্ত্তা হিসাবে।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

জাল নাই, নৌকা নাই, বিলের খাজনা বেশী

জেলের ব্যবসা যায়, মাছের দর বাড়ে

সরকার ও জমিদার উদাসীন

(কানাই কুণ্ডু)

নদীয়া জেলার গাদগাছা গ্রাম। ৩০ ঘর লোকের বসতি। ১৯৪২ সালে মোট লোক ছিল ১৪৯ জন। বর্ত্তমানে ৯৮ জন গ্রামে আছে, তার ভিতর ৩৮ জন বালক-বালিকা।

গত বছর খাদ্যাভাবে ৭ ঘর লোক গ্রাম ছাড়িয়াছিল। ৩৫ জন মরিয়াছে। বর্ত্তমানে ২টী ঘর আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

এখানকার লোকের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় গঙ্গায় মাছ ধরা। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪ মাসে মাছ ধরিয়া ইহারা সারা বছরের খোরাকী সংগ্রহ করে।

দুর্ভিক্ষের বছরের ভিতর ইহারা জাল, সূতা, নৌকা ইত্যাদি খোয়াইয়াছে। এ অঞ্চলের বিলগুলি জমিদার ও বড় বড় ইজারাদারদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। জেলেরা মাছ ধরিতে চাহিলে খাজনা দিতে হয়। খাজনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। ভালুকা বিলের জন্ত জেলে ননী হালদার জমিদার রমেশচন্দ্র সিংহকে বছরে ১১৬৲ টাকা খাজনা দেয়। ঐ খাজনায় তাহার ভাই মাছ ধরিতে পাইবে না। তাহাকে আলাদা খাজনা দিতে হইবে। তা ও সারা বছর নয়, কেবল পৌষ হইতে ২০শে ভাদ্র পর্য্যন্ত মাছ ধরার অধিকার পাইবে মাত্র।

আজ কোন জেলে-পরিবারেরই বাঁচার উপায় নাই। এক এক জনের অবস্থা নীচের চার্টে দেখুন।

আয়-ব্যয়ের এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, এই পরিবারটীকে ৬ মাস খরচ চালাইবার পর বছরের বাকী ছয় মাস কর্জ্জ করিয়া চালাইতে হয় অথবা না খাইয়া খরচ বাঁচাইতে হয়।

এইভাবে দিন কাটানোর ফলেই আজ এখানকার জেলেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক বছরে তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে তহা নীচের "গাদগাছা গ্রামের ছবি" হইতে বোঝা যাইবে।

ইহার ফলে জেলেরা অনাহারে দিন

বাড়ীর কর্ত্তা—বিজয় মণ্ডল

সংসারে ৫ জন বড়, ২ জন ছোট—মোট ৭ জন।

আয়

আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪ মাসে গঙ্গায় মাছ ধরিয়াছে। সবদিন কাজ করা সম্ভব হয় না তাই ২৫ দিনে গড়ে এক মাস। রোজ তিন টাকার মত মাছ ধরা হয়।	
মাছ বিক্রি করিয়া ৪ মাসে একুনে পাইয়াছে	৩০০৲
মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময় মাঝে মাঝে মজুরী করিয়াছে। এইভাবে সে ৬০ দিনের মজুরী পাইয়াছে —মোট মজুরীর আয়	৩০৲
সারা বছরের আয়	**৩৩০৲**

ব্যয়

রোজ /৫ সের চাল দরকার (বর্ত্তমান দরে) চালের দাম	১।০
তরিতরকারী ও অন্যান্ত	।০
প্রতিদিন খরচ	টা ১৸০
এই বাবদ মাসিক ব্যয়	টা ৫২।০
ঔষধ, খাজনা, ঘর মেরামৎ, কাপড়	টা ৭।০
জাল, সূতা ও নৌকা মেরামৎ	টা ৭।০
মাসে মোট ব্যয়	টা ৬৭।০
সারা বছরের ব্যয়	**৮৯০৲**

কাটাইতেছে, শহর ও বাজারের লোককে ২।০টাকা সেরে মাছ কিনিতে হইতেছে। মধ্যবিত্ত জনসাধারণ মাছ কিনিয়া খায়, তাদের জীবনযাত্রাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

ইহারা সরকারের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পায় নাই। জেলে ইউনিয়নের নিকট হইতে শুধু কর্ত্তৃপক্ষ তথ্য লইয়াছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তও হইয়াছে। সরকারের কি স্কীম তাহাও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সমিতি হইতে সূতা ও আলকাতরার জন্য ১৪০০৲ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। পিপলস্ রিলিফ কমিটি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, স্থানীয়ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া আমি এই গ্রামের জেলেদের অবস্থা শেষ করিব।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্থানীয় জেলেদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। যাঁদের জমিদারীতে ইহারা বাস করে, যাঁদের বিলে ইহারা মাছ ধরে তাঁরা কেহ কংগ্রেসভক্ত আবার কেহবা গ্রামের প্রতিষ্ঠাবান গণ্যমান্য ভদ্রলোক। অথচ তাঁদেরই চোখের উপর জেলেরা নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্ত খাজনাপত্র মুকুব তো দূরের কথা, ইহাদের উপর আর্থিক শোষণের চাপ ক্রমশই বাড়িতেছে।

বিলের জমিদার কংগ্রেসের এম, এল, সি রণজিৎ পাল চৌধুরীর কি কোন কর্ত্তব্য নাই? বড় ইজারাদারদের হাতে বিলের বন্দোবস্ত না করিয়া জেলেদের নিকট সরাসরি ইজারা দিয়া জমিদাররা কি এই অঞ্চলের ৮টী গ্রামের জেলেদের বাঁচাইতে পারেন না? জাল, সূতা ও নৌকা সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলে-সমিতিকে কি দেশের লোক ও সরকার সাহায্য করিতে পারেন না?

দুর্ভিক্ষ পীড়িত গাদগাছা গ্রামের ছবি

মোট বসতি	৩০ ঘর
জাল বিক্রয় করিয়াছে	২১ জন
বাসন-পত্র বিক্রি বা বন্ধক দিয়াছে	১০ ঘর
৫০ টাকা কর্জ্জ	২ ঘর
দুঃস্থা	পাঁচু দাসী
ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে	৭ ঘর
পরের বাড়ীতে থাকে	২ ঘর
ঘর নাই	৭ জন
১৭ জনের নৌকা খরিদ বা মেরামতের জন্ত দরকার	১,১৮০
গাদগাছা ও মাঝদিয়ার মোট কর্জ্জের পরিমাণ	৬,৪৬০৲

সিদ্দিপাশার তাঁতিরা আজ দিনমজুর

কারিগরদের পোষায় না, বালকদের তাঁতে বসাইয়াছে

(প্রমথ চক্রবর্ত্তী)

যশোর জেলার ধূলগ্রাম-সিদ্দিপাশা পাশাপাশি গ্রাম। ধূলগ্রামে কমবেশী ৮০।৯০ ঘর এবং সিদ্দিপাশায় দু'শ ঘর তাঁতি বাস করে। এই দুই গ্রামের পনের যোল ঘর অবস্থাপন্ন তাঁতিরা প্রতি সপ্তাহে হাওড়ার হাট করে, এবং ইহারাই বড়বাজার হইতে সূতা কিনিয়া নিয়া সাধারণ তাঁতিদের অধিকাংশকে দাদন দেয়। কাপড় তৈরী হইলে একটা মজুরী ধরিয়া দিয়া তাঁতিদের নিকট হইতে সেই সব কাপড় কিনিয়া নিয়া এই সব মহাজনেরা হাওড়ার হাটে চড়া লাভে বিক্রয় করে। এমনি করিয়া কয়েকঘর অনেকদিন হইতে ফাঁপিয়া উঠিতেছিল, এবং সাধারণ তাঁতি সূতা কিনিবার সংগতি না থাকাতে ইহাদের মুখাপেক্ষী থাকিয়া ক্রমে ক্রমে গরীব হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে আসিল, ৪৩ সালের সংকট। সংকটের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত খতিয়ান নিলে দেখা যায়ঃ—

মুখে হাসি নাই, জোরে কথা নাই

ধূলগ্রাম—ইহার উত্তরপাড়ায় ১৮।২০টি পরিবার, এই পরিবারগুলিতে শিশুবৃদ্ধ লইয়া প্রায় ১২০টী প্রাণী ছিল। গত দেড় বছরে ৩০ জনের বেশী মারা গিয়াছে, জন্মিয়াছে ৭।৮টি শিশু। ইহাদের মধ্যে পরিবারের কর্ত্তা কয়েকজন মারা গিয়াছে, ফলে সেই সব পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। দেড়বৎসর আগে ৩০টি তাঁত চলিত, আজ সেখানে চলিতেছে ১৭।১৮টি। যাহারা টিকিয়া আছে, তাহাদের শতকরা ৭০।৮০ জন ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতেছে। ক'বছর আগে যাহাদের স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান দেখিয়াছি আজ তাহাদিগকে কোন মতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। সব যেন পুতুলনাচের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হাসি নাই জোরে কথা পর্য্যন্ত বলে না।

ইহার দক্ষিণ পাড়ায় ৫০।৬০ ঘর তাঁতির বাস। এখানেও শ'দুয়েক প্রাণী কোনমতে 'দিনান্তে পাপক্ষয়' করিতেছে। এই দেড়বছরে কত মরিয়াছে, দুই একটী পরিবার ত একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া সমান হারেই ব্যাপক। খবর লইয়া জানা গেল, এই পরিবারগুলির অর্দ্ধেক সংখ্যকের দিনে দুবার অন্ন মেলে না। ৮।১০টি পরিবারের ত' রোজ মেলেই না। বালকেরা তাঁতে বসিয়াছে। পাঠশালা একরকম ছাত্রছাত্রী হীন। অথচ একদিন ধূলগ্রাম সিদ্দিপাশা হইতে প্রায় একশ তাঁতির ছেলে হাইস্কুলেই পড়িত। এখন বড় জোর ১০।১৫টি ছাত্র হাইস্কুলে যায়।

সুনামও গেল, রোজগারের পথও বন্ধ

সিদ্দিপাশা—বরাবরই ধূলগ্রামের তুলনায় এখানকার তাঁতিদের অবস্থা সামান্ত স্বচ্ছল ছিল, গত দেড় বছরে ইহারাও ধূলগ্রামের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় দু'শ ঘর লোক—ইহাদের মাঝে ১০ ঘর জোলা অর্থাৎ মুসলমান তাঁতশিল্পী আছে। এই গ্রামে শ' তিনেক তাঁত চলে। সূক্ষ্ম কাপড়ের জন্ত এখানকার তাঁতিদের সুনাম ছিল। কিন্তু আজ সূক্ষ্ম সূতার অভাবে ইহাদের সুনাম ত যাইতেছেই, রুজিরোজগারের পথও বন্ধ হইয়া আসিতেছে। চোরাবাজারের দামে তারা সূতা কিনিতে পারে না। শ ছয়েক প্রাণীর মধ্যে গত দেড় বছরে প্রায় ৬০ জন মারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়া ব্যাপক আকারে আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

মহাজন কয় ঘর ছাড়া এই দুই গ্রামের অধিকাংশ তাঁতিই একরকম দিন মজুর, অর্থাৎ সূতার বদলে কাপড় তৈরী করিয়া দেয় তার জন্ত একটা মজুরি পায়। একজন তাঁতি দৈনিক ১০।১২ ঘণ্টা হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলে মাসে কেহ কেহ ১০ জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় বুনিতে পারে। সাধারণতঃ বোনে ৭।৮ জোড়া। যুদ্ধের আগে সে মজুরি পাইত জোড়াপ্রতি ১ টাকা থেকে ২ টাকা, দেড় বছর আগে জোড়া প্রতি পাইত তিন টাকা পর্য্যন্ত, আজ সে ৪ টাকা পর্য্যন্ত পায়, সূক্ষ্ম কাপড়ে কখনো কখনো ৬ টাকা পর্য্যন্তও পায়, কিন্তু তাহা অত বেশী জোড়া বোনা যায় না। এই হিসাবে একজন তাঁতির গড়ে আয় ২৫।৩০ টাকা, কাহারো কাহারো হয়ত ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত, কিন্তু সেরকম তাঁতির সংখ্যা কম। ২৫।৩০ টাকায় একজন তাঁতির সপরিবারে আজকের দিনে চলিতেই পারে না, তাই ছোট ছোট বালকেরা যায় তাঁতে, মেয়েরা নলি পরান প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করে, অবসর সময়ে কেহ কেহ বিড়ি বাঁধে। এমনিভাবে স্ত্রীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ সকলে পরিশ্রম করিয়া কোনমতে টিঁকিয়া থাকিবার চেষ্টা করে।

৪০নংএর সূতার দর সেদিনও ছিল বাণ্ডিল প্রতি ২০।২৫ টাকা, আজ তাহার ব্ল্যাকমার্কেটের দর ৫০।৫২ টাকা। তাহাও মেলা দায়। সূক্ষ্ম সূতা ত' মেলেই না। এখন ত' গড়ে অর্দ্ধেক তাঁত চলিতেছে, সূতা পাওয়ার ব্যবস্থা সহজ না হইয়া আসিলে, সব তাঁত বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে ওই অঞ্চলে হাহাকার উঠিবে।

ধূলগ্রামে মুচিপাড়ায় কি দেখিলাম

(প্রমথ চক্রবর্ত্তী)

বিদেশী শাসন তথা জমিদারী প্রথা এই দুইয়ের কল্যাণে ধীরে ধীরে যে পল্লীবাংলা উজাড় যাইতে বসিয়াছে, যশোহর ধূলগ্রামের মুচিপাড়া তাহার জীবন্ত নিদর্শন। ছেলেবেলায় এই পাড়ার ভিতর দিয়া যখন স্কুলে যাইতাম; তখন এই পাড়ার লোকেদের কোলাহলে, চামড়ালোভী কুকুরদের চীৎকারে গমগম করিত; আমাদের জন্মেরও আগে সে পাড়ার বিশে মুচির বাড়ী ডাকাতি হইয়াছিল—যাহার ভয়াবহ গল্প করিয়া শৈশবাবস্থায় আমাদের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ান'র চেষ্টা করা হইত—তাহার বৃহৎ অট্টালিকা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। আজ সে অট্টালিকা খসিয়া পড়িতেছে, বাড়ী জনশূন্য. সমস্ত মুচিপাড়ার অবস্থাও তাহাই। গ্রামের একপাশে আশাভরসাহীন এরা না খাইয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, কলেরা বসন্তে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ইহারা অন্ত্যজ, তবুও ইহারা হিন্দুজাতিরই অংশ বলিয়া আমরা জোর গলায় দাবী করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা মরিয়া শেষ হইতেছে, গ্রামের বাকী হিন্দুরাও ফিরিয়া দেখে না!

ধূলগ্রামের মুচিপাড়ায় এখন ১৫।১৬টি পরিবার আছে। পাশের গ্রামে সিদ্দিপাশায় ৪।৫ বছর আগেও দশটি পরিবার ছিল, গত সংকটের পরে তাহাদের মধ্যে দুইটি মাত্র পরিবার অবশিষ্ট আছে। ধূলগ্রামে মুচিপাড়ায় গত দেড় বছরে প্রায় দশজন মারা গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়ায়, অল্পাহারে শীর্ণ। একদিন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল, চামড়ার কাজ, আজ সে কাজ একরকম আর নাই। কেহ কেহ হাটে বাজারে বিসে, কিন্তু জুতা সারিয়া এই দুর্দ্দিনে পরিবার প্রতিপালন করা যায় না।

এমনি করিয়া একদিন দেখিব এ পাড়ায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা, হয়ত শ্মশানের মতই জনশূন্যতা!

বর্দ্ধমানের টেষ্ট রিলিফের টাকা বন্ধ কেন!

বাংলা সরকার বর্দ্ধমান জেলায় টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্ত প্রায় ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার পর সরকার এই মর্ম্মে অভিযোগ পান যে, আদৌ কাজ করা হয় নাই, এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে এজেন্টদিগকে টাকা দেওয়া হইয়াছে। এ বছরে কন্‌ট্রাক্ট পদ্ধতিতে কাজ না হইয়া এজেন্সী পদ্ধতিতে কাজ হইয়াছে। অভিযোগ পাওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত দেড় বছরের ভিতর ৫২টী কেন্দ্রের মাত্র ৩টী রিলিফ কেন্দ্রে তদন্ত শেষ হইয়াছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত টাকা দেওয়া বন্ধ আছে। তাহার অর্থ বর্দ্ধমানে টেষ্ট রিলিফ কার্য্য আপততঃ স্থগিত রহিল।

রিলিফের কাজ বন্ধ থাকার ফলেই এবার বাঁকা নদীর বন্যায় নূতন করিয়া প্রায় ৫০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত হয়।

অভিযোগের তদন্ত হইয়া অপরাধীদের শাস্তি হওয়া সকলেই চায়, কিন্তু এই তদন্তের গড়িমসির ফলে জেলার অধিবাসীদের দুর্ভোগ বাড়িয়া চলিবে ইহা কেহই চাহে না।

এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। গত বৎসর এবং এবৎসর বন্যা ও খাদ্য সঙ্কটে জেলা যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে জেলায় ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলিফ পদ্ধতিতে খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, রাস্তা তৈরী প্রভৃতি কাজ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, জেলায় টেষ্ট রিলিফের কাজ সাধারণতঃ জেলা-বোর্ড মারফৎ হইয়া থাকে, গত ১৯৪৩ সালে বর্দ্ধমান জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে কয়েক লক্ষ টাকার টেষ্ট রিলিফের কাজ হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত বাংলা সরকার জেলা বোর্ডকে সেই টাকা না দেওয়ায় জেলা বোর্ড প্রায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে এবং আর কোন রিলিফের কাজ লইতে পারিতেছে না। শোনা যাইতেছে যে এই কারণে নাকি জেলা বোর্ড বাঁকা নদী কাটাইবার কাজ হাতে লইতে পারে নাই। এই সব বিবেচনা করিয়া এবং জেলা বোর্ড যাহাতে জেলার প্রয়োজনীয় রিলিফের কাজ হাতে লইতে পারে তাহার জন্ত এই সভা জেলা বোর্ডের প্রাপ্য টাকা দিবার জন্ত বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে

ঘরের ভিতর মৃতদেহ পচিতেছে

গত ২৫শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ম্যালেরিয়ায় কলিকাতা সহরে ১৪৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্বসপ্তাহের তুলনায় ১৯ জন বাড়িয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে দুই এক সপ্তাহে মৃত্যুর হার কিছুটা কমিবার ফলে কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহা যে কত মিথ্যা তাহা বিভিন্ন রিলিফ কেন্দ্রের রিপোর্ট হইতেই প্রমাণ হয়। বেলেঘাটা রিলিফ কমিটি এবং নারিকেলডাঙ্গা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, কোন কেন্দ্রেই রোগীর সংখ্যা কমে নাই, প্রত্যেক কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ১০০ হইতে ১৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। যাহারা চিকিৎসিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ জন নূতন রোগী।

কোন কোন এলাকায় আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নারিকেলডাঙ্গা সাহেববাগান বস্তীতে [৩নং গ্যাস ষ্ট্রীট এলাকায়] শতকরা ৭০ জন বাসিন্দা আক্রান্ত হইয়াছে, ট্যাংরা ও ধাপা অঞ্চলে উহা ক্রমশঃ ব্যাপক হইতেছে।

নারিকেলডাঙ্গা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাঃ বাগচী বস্তীর গরীব বাসিন্দাদের মর্ম্মন্তুদ অবস্থার কথা বলেন: বস্তীর এক ঘরে একজন মুচি ও তাহার এক ছেলে থাকিত। ছেলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া দেশে চলিয়া যায়। মুচি জ্বর লইয়াও এক চামড়ার আড়তে কাজ করিতে থাকে। তারপর তিন চার দিন কাজে অনুপস্থিত হওয়ায় আড়তের মালিক তাহার খোঁজ লয়। **খোঁজ লইয়া দেখিতে পায়, মুচি ঘরের মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া আছে।**

কসাই বস্তীর রিলিফ কেন্দ্রে সম্প্রতি হোসেন নামে একটি অল্পবয়স্ক ছেলে ঔষধের জন্য আসে। ম্যালেরিয়া তার রোগ নয়, আসলে সে অনাহারে মৃতপ্রায়। বস্তীর কেহ কেহ বলিল, ছেলেটির বাপ খুব অত্যাচারী। রোগীকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠান হইল। দিন দুই পরে ছেলেটার বাপও রিলিফ কেন্দ্রে আসিয়া হাজির। খবর লইয়া জানা গেল, এক মাস যাবৎ সে ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ে শয্যাশায়ী, স্ত্রীপুত্র সকলেই অনাহারে মরিতেছে, বেচারা কাঁদিয়া ফেলিল।

কর্পোরেশনের দায়িত্বজ্ঞান

এমন বেদনাদায়ক কাহিনী একটি দুইটি নয়, শত শত এবং প্রত্যেক বস্তীতেই ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা আজও গবর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন বা জনসাধারণের চেতনাকে তেমনভাবে আঘাত করিতে পারিতেছে না। অনেক চেঁচামেচির পর কলিকাতা কর্পোরেশন গত ১৩ই নভেম্বর ম্যালেরিয়ার উপর আলোচনার জন্য এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হন। ঐ অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যকে অনুপস্থিত দেখা যায়। আলোচনার মধ্যে সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, অবস্থা খুব গুরুতর এবং কর্পোরেশন এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। কিন্তু তাহারা একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়াই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন। যে সমস্ত কাউন্সিলর রিলিফের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাহাদের অনেককেই কমিটি হইতে বাহিরে রাখা হয়।

সুদীর্ঘ ১২ দিন পর গত ২৫শে নভেম্বর 'সাব-কমিটি'র প্রথম বৈঠকে হেল্‌থ অফিসারের লবণ হ্রদ সম্পর্কিত "স্কীম" আলোচিত হয়। এদিকে, কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে নূতন কোন রিলিফ কেন্দ্র খোলা অথবা পুরাতন কেন্দ্রগুলিকে উন্নত করার কোন চেষ্টা হয় না। তাহাদের অন্য কোন কার্য্যোদ্যমের কোথাও কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

নিরেট আমলাতন্ত্র

পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট হইতে সগৌরবে ঘোষণা করা হয় যে, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধের কোন অভাব নাই। অথচ, যে সমস্ত রিলিফ কেন্দ্র আজ দুই মাস যাবৎ হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের হাতে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। অপর পক্ষে, তাহারা কয়েকজন ডাক্তারকে সরাসরি বাড়ীতে পাঠাইয়া তাঁহাদের মারফৎ ঔষধ বিতরণ করিয়া রিলিফ কেন্দ্রগুলির কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। অনেক বস্তীতে রোগীরা রিলিফ কেন্দ্র হইতে ঔষধ লইতেছে এবং একই সঙ্গে হেলথ ডিপার্টমেণ্টের ডাক্তারদের ঔষধও লইতেছে। ঔষধের অপচয় হইতেছে। অপদার্থ এবং মগজহীন এই ব্যবস্থা লইয়াই আমলাতন্ত্র নিজেদের ঢাক পিটাইতেছে!

দেশপ্রেমিকরা বসিয়া নাই

কিন্তু দেশপ্রেমিক কলিকাতার নাগরিক একেবারে চুপচাপ বসিয়া নাই। গত ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার বিশিষ্ট ডাক্তার ও রিলিফ সংগঠণের প্রতিনিধিদের এক সভায় গবর্ণমেণ্টকে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধ এবং উপযুক্ত প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বলা হয়; ৩রা ডিসেম্বর "ম্যালেরিয়া নিবারণী দিবস" প্রতিপালনের জন্য এক।৮ সাবকমিটি গঠন করা হয়। ঐদিন ম্যালেরিয়া অঞ্চলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ শুরু হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটি, মুসলিম লীগ রিলিফ, কমিটি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নারিকেলডাঙ্গা এবং বেলেঘাটা রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায় ইতিমধ্যে কয়েকটি রিলিফ কেন্দ্র খোলেন। কলিকাতার বিড়ি, ট্রাম, পোর্ট প্রভৃতি শ্রমিকরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুইটি 'রেড ফ্ল্যাগ' রিলিফ কেন্দ্র চালাইতেছেন। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং হগ মার্কেটের ফলওয়ালারা প্রত্যহ রোগীদের ১০০০ কমলা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ফ্রেণ্ডস্ ইউনিট এবং রেড ক্রস দুধ ও অন্যান্য ঔষধ দিয়া রিলিফ কেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল ছাত্ররা কিছু কিছু সেবাকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। বে-সরকারী রিলিফ কেন্দ্রগুলি যাহাতে বিনামূল্যে 'ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক' ঔষধ পাইতে পারে এবং প্রতীকারের স্থায়ী ব্যবস্থা যাহাতে অবলম্বিত হয় তাহার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে আইন সভা ও তাহার বাহিরে কংগ্রেস-লীগের মিলিত প্রচেষ্টা চাই। সেবাকার্য্যকে সুপরিচালিত করার জন্য আরও স্বেচ্ছাসেবক, অর্থ ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চাই।

কেসি বলেন--বস্তির অবস্থা ভয়াবহ

কায়েমী স্বার্থ ভাঙ্গিতে পারিলে তবেই ইহার প্রতীকার সম্ভব

বাংলার লাট মিঃ কেসি গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতার ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত বস্তী অঞ্চল এই সর্ব্ব প্রথম পরিদর্শন করেন। সেখানকার অবস্থা দেখিয়া তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন:

"কলিকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিক কি ভাবে থাকিতে বাধ্য হন তাহার খানিকটা আমি দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। মানুষ কখনও অন্য মানুষকে এভাবে থাকিতে দিতে পারে না। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া ও চলিতে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব কাহাদের সে বিষয়ে আমার কৌতূহল নাই। আমি শুধু বলিতে চাই যে এ অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে—রাজনীতিক বা কায়েমী স্বার্থকে এ উন্নতির পথে অন্তরায় হইতে দেওয়া চলিবে না। ছয়মাস পরে ইহার প্রতিবিধান কতখানি অগ্রসর হইল সে কৈফিয়ৎ তলব করিবাব অধিকার কলিকাতাবাসীদের আছে।"

ম্যালেরিয়ায় কলিকাতার বস্তী অঞ্চল প্রায় ছারেখারে যাইবার পর এবং ২ মাস ধরিয়া শহরময় হৈ চৈ হওয়ার পর মাননীয় লাটসাহেবের টনক যে অবশেষে নড়িয়াছে ইহা খুবই আশার কথা। বস্তী অঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থার যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বস্তীর অধিবাসীরা বহুদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে রাজনীতিক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল নাই, ঠিক সেই স্বার্থবাদীদের প্রতিবন্ধকতায়ই এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারিতেছেনা, হইতে পারিবেও না।

কলিকাতারই বিভিন্ন ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান লোক এই সব বস্তীর মালিক, এখানকার মানুষের ভয়াবহ জীবন হইতেই তাঁহারা হাজার হাজার টাকা ভাড়া বা খাজনা হিসাবে উপার্জন করেন। বস্তীর উন্নতির জন্য পয়সা খরচ করিয়া উপার্জন কমাইতে তাঁহারা নারাজ।

কর্পোরেশন বড় বড় বাড়ীওয়ালার হাতে বাঁধা। বাড়ীওয়ালাদের চাপে চৌরঙ্গী বালীগঞ্জ, লেক প্রভৃতি অঞ্চলের উন্নতিতেই কর্পোরেশনের টাকা খরচ হইয়া যায়, বাড়ীওয়ালারাও ঐ সব অঞ্চলে বড় বড় বাড়াতে শাঁসালো ভাড়াটে জুটাইবার সুযোগ পান। নাড়িকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় বাড়ীওয়ালার তেমন স্বার্থ নাই, সেজন্যই উহার উন্নতি হয় না। গবর্ণমেণ্ট মহলেও এই সব বাড়ীওয়ালার যথেষ্ট প্রভাব, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করে না।

বস্তীর লোক মরিতেছে তাহা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী রিলিফ কেন্দ্রগুলিকে বিনা মুল্যে কুইনাইন দেয়না—পাছে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিক দলাদলির ঢাক ভাল করিয়া পিটানো না যায়। গ্যাস কোম্পানীর মজুরেরা নারিকেলডাঙ্গা বস্তিতে এই 'ভয়াবহ' অবস্থায় থাকে। কিন্তু বিলাতী গ্যাস কোম্পানী তাহাদের জন্য কোনো কোয়াটার বানাইতে রাজি নয়, অথচ এই মজুরদের পরিশ্রমেই তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিতেছে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গ্যাসের দাম কমাইবার দাবীর বিরুদ্ধে সরকারী আমলাতন্ত্র গ্যাস কোম্পানীকেই সমর্থন করে—আর সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের কোয়াটার বা মাগগিভাতার দাবীর বিরোধিতা করে।

এই সব কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা ভাঙ্গিতে পারিলে তবেই ছ'মাস পরে কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব হইবে, নহিলে কথাই সার হইবে।

দার্জিলিংয়ে কয়লা অভাবে বস্তীর বাসিন্দারা শীতে কাঁপিতেছে

খাদ্য কমিটিতে আমলারাই সর্ব্বেসর্ব্বা

কেরোসীন অভাবে কুলী-গাড়োয়ানদের কাজকর্ম্ম বন্ধ

দার্জিলিং শহরে বিজলী বস্তী অঞ্চলে পৌছায় নাই। সেখানে যারা বাস করে কেরোসিনই তাদের একমাত্র রাত্রের সম্বল। বস্তীর প্রতিটি পরিবারের জন্য মাসে ১ বোতল কেরোসিন বরাদ্দ আছে। গত তিন মাস এ সব অঞ্চলের লোকজনকে আলো ছাড়াই রাত কাটাইতে হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তারা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ফেলে। যারা রাত্রিতে কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত তাদের আয় আজ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। শীতের এত বড় রাত্রি কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া থাকিলে বস্তীর বহু লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে।

সহর ও আশপাশের অঞ্চলে ৬০০ গাড়োয়ান আছে। গাড়ীতে তেলের অভাবে রাত্রিতে আলো দিতে পারে না—তাই তারা এখন রাত্রিতে গাড়ী খাটাইয়া রোজগার করিতে পারিতেছে না। যারা পেটের জ্বালায় আলো ছাড়া গাড়ী চালাইয়া রোজগার করিতে যায় তাদের ভাগ্যে জোটে পুলিশ-কেস্। একমাসে ১ বোতল তেল; বাড়ীতে আলো জ্বালাইবে, না গাড়ীতে আলো দিয়া রোজগার করিবে? শুধু কি তাই? লবণ নাই, খইল নাই। গাড়ীর চাকায় তেল তো পড়েই না, তার উপর গরু-বলদকে লবণ-খইল খাওয়াইতে পারে না। গাড়ীর চাকার লোহা চোরা বাজারে পাওয়া যায়, তার দাম বর্ত্তমানে ১৩০ টাকা জোড়া—আর এর কণ্ট্রোল দাম ৩০ টাকা জোড়া।

এখানকার লোকের জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু একপোয়া চিনি বরাদ্দ হইয়াছে। রেশন কার্ড এখনো সকলে পায় নাই। যে ভাবে কার্ড-বিলি হইতেছে তাহাতে মনে হয়—শেষ করিতে এখনো তিনমাস লাগিবে।

দার্জ্জিলিংএর সমস্ত দল মিলিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর সভা করিয়া রেশনীংএর দাবী করে। ডেপুটী কমিশনারের নিকট জানায় যে ফুড এডভাইসারী কমিটিতে জনসাধারণের কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্থান না পাওয়ায় দার্জ্জিলিংএর রেশনীং ব্যবস্থা পরিচালন অতিশয় মুস্কিল হইবে। উপরন্তু এমন লোকও এই কমিটির মধ্যে আছে যিনি মজুতদারীর মামলায় জড়িত ছিলেন। কাঠকয়লা, কেরোসিন, চিনি, তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন, শীতের মরশুমে কাঠ কয়লার অভাবে গৃহের আসবাব জ্বালাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

এখানকার ৪০,০০০ নর-নারীকে বাঁচাইবার জন্য মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন, আঞ্জুমান ইসলামিয়া, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, গুর্খা-লীগ, বাঙ্গালী এসোসিয়েশন, গুর্খা দুখ-নিবারক সম্মেলন, মটর ড্রাইভার ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রভৃতি সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠান মিলিয়া এ জন্য সমবেত হইয়াছেন।

স্থানীয় মজুতদার ও মুনাফাখোরদের প্রচেষ্টায় দার্জ্জিলিংএর রেশনিং ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া পণ্ড করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দল মিলিয়া অভিযান চালানের পর দেখা গেল—২১শে নভেম্বর হইতে রেশনিং চালুর ব্যবস্থা হইয়াছে!

বাংলার সর্বত্রই জনপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় খাদ্য কমিটির কাজ পরিচালনা করা হইতেছে অথচ দার্জিলিংএর খাদ্য কমিটিতে ইহাদের একজন প্রতিনিধিও স্থান পায় নাই। গত ১৯শে নভেম্বর দার্জিলিংএর জনসভায় দাবী করা হইয়াছে—ডেপুটী কমিশনারকে একটা প্রকাশ্য সভা ডাকিয়া খাদ্য কমিটি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই সভাতেই আরো বলা হয়:—

"কেবল মাত্র চাল, চিনি, ময়দা-আটার কার্ড বিলি হইতেছে। কাঠ-কয়লা, কেরোসিন তেল প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির রেশন করা হয় নাই। দার্জিলিংএ শীতকালে ৪০০ বস্তা কয়লা প্রতিদিন দরকার হয়, কিন্তু গড়ে মাত্র ১০০ বস্তা চালান আসিতেছে। ইহার ফলে শীতে অনেকেই মরিবে।" সভায় আরো দাবী করা হয় যে সপ্তাহে ২ সের চালের পরিবর্ত্তে সাধারণ মানুষের জন্য ২।০ সের ও যারা মজুরী করিয়া খায় তাহাদের মাথাপিছু ৩ সের চাল বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গরীব লোকরা রেশন কার্ড পাইতে হয়রাণ হইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিয়া প্রতি অঞ্চলে কার্ড বিতরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দার্জিলিংএর রেশনিংএর গলদ অত্যন্ত বেশী। এই ধরণের ব্যবস্থায় জনসাধারণের জিনিসপত্র পাওয়ার কোন সুবিধাই হইতেছে না, বরং মজুতদার ও চোরাবাজার এখনো ক্ষমতাশালীই রহিয়া যাইতেছে।

শ্রমিক জগৎ

বার্ণপুরে 'উদয়ের পথে' সিনেমা নিষিদ্ধ

লোহা-মজুরের জাগরণকে মালিক এমনই ভয় করে

(তুষার চট্টোপাধ্যায়)

এবার বার্ণপুরের লোহা-মজুরদের কাছে গিয়া প্রথমেই যে-কথা শুনিলাম তাহা তাহাদের কারখানা জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক অভিযোগ নয়। মজুরেরা মহা উত্তেজিত হইয়া জানাইল যে, বার্ণপুরের সিনেমায় "উদয়ের পথে" ফিল্মটি দেখাইবার কথা ছিল, কিন্তু কোম্পানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

মজুরের জীবনের উপর মালিকের যে অত্যাচার ও শোষণ প্রত্যহ চলিয়াছে তাহার সামান্য একটু অংশ মাত্র এই ফিল্মটিতে দেখান হইয়াছে। এত সামান্য বলিয়াই সরকার এ ছবি দেখাইতে আপত্তি করে নাই। এবং কলিকাতা শহর ও সারা বাংলায় সাধারণ দুঃখী মানুষ ছবিটিকে ভালবাসিয়াছে, চারিদিকে সমস্ত লোক বাহবা দিয়াছে।

কিন্তু সারা বাংলায় যে আইন বার্ণপুরে তাহা খাটে না। স্যর আর, এন. মুখার্জ্জির কোটীপতি বংশধরেরা এখানে মালিক, তাঁহাদের কথাই আইন। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী কর্ত্তৃক গোটা বাংলায় মিটিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা রদ হইল, কিন্তু বার্ণপুরে সে হুকুম খাটিল না। এমন কি লীগের সেক্রেটারী নিজে বার্ণপুরে মিটিংয়ের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তবুও অনুমতি মিলিল না। লীগের প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেব পর্য্যন্ত একদিন কথাচ্ছলে বলিয়া ফেলিলেন, "বার্ণপুরের মালিকের খাতির একেবারে বড়লাটের খাসকামরায়ও পৌছিয়া যায়, মজুরদের দাবীর কথা আমরা শুনাইব কি করিয়া!"

এম্‌নি জবরদস্ত প্রতাপ কোম্পানীর। কিন্তু অন্যায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার ভয়ও এত বেশী। তাই সামান্য ফিল্ম হইতেও হয়তো তাহার অন্যায়ের ভিত আলগা হইয়া যাইবে এই ভয়ে ফিল্মই বন্ধ করিয়া দিল।

* * *

যে গোলমাল উপলক্ষে বার্ণপুরে গিয়াছিলাম, সেটারই কথা বলি। 'চাপান' শপে প্রায় ৪০০ মজুর কাজ করে। আগে ঠিকাদারী প্রথায় এখানে কাজ হইত—তাতে মজুরদের মজুরী হইত কম। ঠিকাদারের পকেটে যাইত মোটা মুনাফা। মজুররা অনেক দিন হইতে দাবী করিতেছিল—এই প্রথা তুলিয়া দেওয়া হউক, তা হইলে মুনাফার খানিকটা অংশ মজুররাই পাইয়া বাঁচিবে। কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইল। গত তিনমাস ধরিয়া ঠিকাদারী প্রথা এখানে নাই। কিন্তু হিতে বিপরীত! অর্থাৎ মজুরদের মজুরী আরো কমিল! যেন মজুরদের জব্দ করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা, যাতে আবার তারা ঠিকাদারের জোয়ালে গলা দিতে রাজী হয়।

দরবারের পর দরবার করিয়াও মজুররা কোম্পানীকে এই অব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইতে পারে নাই। ইউনিয়ন এ সম্পর্কে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল মজুররা কাজ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কয়েকজন মিস্ত্রী তাদের কাজে যাইতে বারণ করিয়াছে! খোঁজ লইয়া জানা গেল, এই মিস্ত্রীরাই আগে ছিল ঠিকাদার—কোম্পানীর দালাল। কিন্তু ইহাদের চালের চেয়ে ইউনিয়নের কথা মজুরদের কাছে বেশী দামী। তাই ইউনিয়ন যখন মজুরদের কাজে ফিরিয়া যাইতে বলিল, মজুররা তাই করিল।

কিন্তু মালিক অজুহাত পাইয়াছে। সে মজুরদের কাজে লইল না—বলিয়া দিল, 'তোমরা ষ্ট্রাইক করিয়াছ।'

* * *

কিন্তু যে ইউনিয়ন মজুরদের কাজে ফিরাইতে পারিয়াছে সে ইউনিয়নের উপর মালিকের প্রতাপ অত সহজে খাটে না। কাজে ফিরাইবার উদাহরণ দিয়াই ইউনিয়ন প্রমাণ করিতে পারিল যে ইহা ষ্ট্রাইক নয়, মালিকের লক আউট। আর ঐ উদাহরণেই প্রমাণ হইল যে সমস্ত মজুর ইউনিয়নের পিছনে। মহা-পরাক্রান্ত কোম্পানীর উপরও চাপ পড়িল। কোম্পানী ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল—সকলকেই কাজে লওয়া হইবে, এতদিন এই ডিপার্টমেণ্টের অব্যবস্থায় মজুরের যে লোকসান হইয়াছে তাহা মিটাইয়া দেওয়া হইবে এবং এখন হইতে ঠিক নিয়মে মজুরি দেওয়া হইবে। মজুরের এই প্রথম জিত।

শক্তিতে না পারিয়া কোম্পানী এখন ফন্দি ধরিয়াছে। ২৯শে তারিখে দুইখানি নোটিশ দেখা গেল। একটা ইংরাজী, আর একটা হিন্দী। ইংরাজীতে ঠিক লেখা রহিয়াছে যে, এতদিনের লোকসান পূরণ করা হইবে। কিন্তু হিন্দীতে লেখা—এখন হইতে ঠিক মজুরী দেওয়া হইবে।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ইংরাজী নোটিশটা মালিক দিয়াছে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভালমানুষ সাজিবার জন্য; আর হিন্দী নোটিশ দিয়াছে মজুরদের ঠকাইবার ও উস্কাইবার জন্য।

* * *

সমস্ত মজুরকে ফিরাইয়া লইবারই বা ব্যবস্থা কি রকম? মালিক নোটিশ দিল, যত লোককে এই ডিপার্টমেণ্টে লওয়া সম্ভব তাদের লওয়া হইবে, আর বাকী লোককে সুবিধা মত অন্য কাজ দেওয়া হইবে।

১০ দিন আগে এই ডিপার্টমেণ্টে সমস্ত লোকের কাজ জুটিত, আর আজ হঠাৎ কাজের অভাব হইল কেন? তারও ব্যবস্থা মালিক করিয়াছে। ৪টী হ্যামার বন্ধ করিয়া প্রায় ৫০ জনের কাজের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাতে উৎপাদন অনেক কম হইবে। কিন্তু তাতে মালিকের কি? ৫০ জন বাছা বাছা মজুরকে তো জব্দ করা যাইবে!

* * * *

লোহা-কারখানায় অসুখ ও জখম লাগিয়াই আছে। তার জন্য কোম্পানীর চিকিৎসা-ব্যবস্থার ঠাটও কম নয়। কিন্তু হাসপাতালে গিয়া দেখিবেন—আউটডোরের রোগী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতিদিন ৮০০।৯০০ রোগী আউটডোরে যায়, ডাক্তারের মর্জ্জি হয় দেখে, মর্জ্জি না হয় দেখে না। অনেককেই ফিরিয়া আসিতে হয়।

প্রসূতি ওয়ার্ডের খবর জিজ্ঞাসা করিলে মজুররা ভয়ে শিহরিয়া উঠে—বলে, ওখানে হয় প্রসূতি না হয় সন্তান একজনকে রাখিয়া আসিতে হয়।

কোম্পানীর নিয়ম কানুন অনুযায়ীই হাসপাতাল ও ডাক্তাররা চলে। নিয়ম আছে কোন মজুর ১৪ দিন একটানা অসুস্থ থাকিলে তবে সে পুরা মাহিনায় ছুটী পাইবে। এই নিয়ম যে কত সুন্দরভাবে পালন করা হইতেছে, তা মজুরদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত খুব অল্প মজুরের ভাগ্যেই এই ছুটী জুটিয়াছে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, একটানা ১৪ দিন অসুস্থ কাহাকেও থাকিতে হয় না! ১৩ দিনের দিনই ডাক্তার রোগীকে 'সুস্থ' বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া দেয়। আবার কিছু দিন বাদে সেই রোগী হাসপাতালে আসিয়া হানা দেয়। হাসপাতালের নিয়মও থাকে, কোম্পানীর পয়সাও বাঁচে। এই ধরণের চিকিৎসা প্রণালী।

* * *

মালিকের রাজত্ব শুধু সহরটুকু লইয়াই নয়। সহরের আশে পাশের গ্রামাঞ্চলেও মালিকের প্রভুত্ব সমান। সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—নন্দনপুরীর মত। তার চারপাশে যেন নরককুণ্ড। যত রকমের নোংরামী থাকিতে হয় এই অঞ্চলে আছে। অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানকার ইউনিয়ন বোর্ড করে কি? জবাব পাইলাম—ইউনিয়নবোর্ডও তো বার্ণপুর মালিকের হাতে। শুনিলাম, আগে এই অঞ্চলটী হীরাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল। পাছে ইউনিয়ন বোর্ডে বেশী ট্যাক্স দিতে হয়, সেই জন্য সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া কোম্পানী বার্ণপুর ও এই অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র ইউনিয়ন করিয়া লইয়াছে। তাহাতে বেশীর ভাগই কোম্পানীর পেটোয়া লোক। ফুড-কমিটীও আছে তাও এই রকম।

চুরি এই অঞ্চলে লাগিয়াই আছে। ইউনিয়ন অফিসে তিনবার চুরি হইয়া গিয়াছে। মজুররা বলে, এই অঞ্চলে একদল দাগী আসামী আছে, তাদেরই নাকি কাণ্ড এই সব। দেড়-হাজার টাকা মাহিনাপ্রাপ্ত নূতন ওয়েলফেয়ার অফিসার এখানে নিযুক্ত হইবার পরই নাকি এই ধরণের লোককে এখানে আসিতে দেখা গিয়াছে।

* * *

কিন্তু এত কাণ্ড সত্ত্বেও কোম্পানী ভাবিতেছে তার রাজত্ব রক্ষা বুঝি হয় না! ২ হাজার মজুর-সভ্যের ইউনিয়ন দিনের পর দিন জোরালো হইতেছে। সহরের বাহিরে থাকিয়াও ইউনিয়ন-অফিস ওয়াগন, ষ্টীল ও স্কব তিন কারখানারই মজুরের সমাগমে সর্ব্বদা সরগরম। এডজুডিকেশনের দরখাস্তে ডিপার্টমেণ্টে ডিপার্টমেণ্টে সহি উঠিতেছে। দালালরা কোনঠাসা হইতেছে। সভার বদলে ইস্তাহারে ও পোষ্টারে ইউনিয়নের বক্তব্য মজুরদের ঘরে ঘরে পৌছিতেছে। মজুরেরা বলিতেছে—যেমন করিয়া লক-আউট বন্ধ করিয়াছি, তেমন করিয়াই এডজুডিকেশনও আদায় করিব। লৌহপুরের মজুরের মনও লোহার মতই শক্ত, মালিকের প্রতাপ তাহাকে কদিন দাবাইয়া রাখিবে!

কয়লা খনিতে সত্যই কি মজুরের অভাব?

সরকার আর কয়লা খনির মালিক দুজনেই বলে, খনিতে মজুরের অভাব বলিয়াই কয়লা কম উঠিতেছে। এই অজুহাত দেখাইয়া তাহারা খনির নীচেও মেয়ে-মজুর লাগাইবার নিয়ম করিয়াছে—যা কোন সভ্যদেশ ভাবিতেও পারে না।

মজুরের অভাবটা কি ধরণের? **নিউ বীরভূম কোল কোম্পানীর** ব্যাপারটা দেখুন:—

হানিফ সর্দ্দার ছিল বালতেরিয়ার একজন প্রধান সর্দ্দার; প্রত্যহ অনেক লোক দিত। বিনা কারণে ও বিনা নোটিসে তাহার জবাব হইয়াছে। এমন কি পাওনা মজুরির ৫০ টাকাও সে পায় নাই। ফলে তাহার সমস্ত লোকজন নিয়া সে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

আর এক সর্দ্দার বৈশাখু। ঠিক হানিফের মতই তাকেও প্রায় ৩০ জন লোক লইয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

ইসমাইল সর্দ্দার খুব পুরানো লোক, দুপালি কাজেই তার লোক খাটিত। হঠাৎ তার এক পালির কাজ কাড়িয়া লইয়া আর একজনকে দেওয়া হইল। অথচ ইহার নিজস্ব লোক নাই, লোক জোগাড়ের ক্ষমতাও নাই কারণ আগে কখনো সর্দ্দারি করে নাই। বোধ হয় কর্ত্তাদের প্রিয়পাত্র বলিয়াই পালি পাইল—আর ইসমাইল বাধ্য হইল তার ৩০ জন লোককে ছাড়াইয়া দিতে। তারা অন্যত্র গেল।

১৯শে অক্টোবর মোহন রাওকে হঠাৎ জবাব দেওয়া হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টর স্বীকার করে যে মোহনের কোন কসুর নাই, সে ইউনিয়নের কর্মী বলিয়াই তাহাকে ছাড়ানো হইয়াছে। লেবার ওয়েলফেয়ার কমিশনার তদন্ত করিয়া দেখিলেন জবাবের কোন কৈফিয়ৎ নাই। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না, শুধু নোটিসের বদলে সাত দিনের মাহিনা আদায় করিয়া দিলেন।

৪০ জন স্ত্রী মজুর খাদের উপর কামিনের কাজ করিত। তাদের বলা হইল খাদের নীচে কাজ করিবে তো কর, নহিলে জবাব। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ বৃদ্ধা, নীচে কাজ করার শক্তি নাই। আর কতকগুলি অবিবাহিতা কুমারী ১২।১৪ বৎসর বয়স। নীচে গেলে তাহাদের ইজ্জত বাঁচাইবে কে? কিন্তু কণ্ট্রাক্টরের কাছে ইজ্জতের মূল্য নাই, তাই ইহারা নীচে যাইতে অস্বীকার করিবামাত্র ইহাদের ছাড়াইয়া দিল। অথচ ইহাদেরই উপরের কাজে অন্য কামিন ভর্ত্তি করিল।

আসল কথা বোধহয় মজুরের অভাব নয়। কারণ মেয়ে-মজুর লাগাইয়াও উৎপাদন বাড়ে নাই। ঠিক মত মজুরী দিয়া মজুর রাখার অনিচ্ছাই আসল কারণ।

ইছাপুরে ৭000 লোহা-মজুরের সম্মেলন

১৮ই নভেম্বর ইছাপুর গোয়ালপাড়া ময়দানে সারা ব্যারাকপুর অঞ্চলের লোহা-মজুরদের বিরাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এতদিন মজুরদের আন্দোলন নিজ নিজ কারখানার ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকিত, কিন্তু এবার ব্যারাকপুরের সমস্ত লোহা-মজুর ইউনিয়ন একত্র হইয়া সম্মেলন ডাকিয়াছিল। এত বড় সম্মেলন (নীচে ছবি দেখুন) এই অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় নাই—প্রায় ৭ হাজার মজুর সভায় জমা হইয়াছিল।

বিভিন্ন মজুরদের মধ্যে বহু অসন্তোষ জমিয়া আছে। বেলঘরিয়ার একটি কারখানায় মজুরের সর্বসাকুল্যে মাসিক রোজগার ২২।২৩ টাকার বেশী হয় না। ইছাপুরে স্বয়ং সরকারই মালিক, তবু সাধারণ আইন কানুনের যেন বালাই-ই নাই। ইনক্রিমেণ্টের বিধান আছে, কিন্তু না পাওয়াটাই নিয়ম। কোয়াটার, জল, আলো সব বিষয়েই মজুরেরা অসন্তুষ্ট।

ইহার উপর নূতন ট্রাইবুনাল আইনের ১৩ ধারা—মালিক জবাব দিতে পারিবে, কিন্তু মজুর কাজ ছাড়িতে পারিবে না। এই সেদিন টেক্সম্যাকোতে ২০০ শ্রমিককে বিনা কারণে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

কমরেড আবদুর রেজাক খাঁ, বঙ্কিম মুখার্জ্জি প্রভৃতির বক্তৃতায় বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কমরেড নেপাল নাগ বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মজুরদের ডাকিয়া বলেন—"বাঙ্গালী কারিগর নিজেকে ভদ্রলোক ভাবিয়া এখনও শ্রমিক আন্দোলন হইতে অনেকে তফাৎ আছেন। কিন্তু সকলে এক হইয়া না লড়িলে ২০ বৎসর চাকুরী করিয়াও একষ্ট্রা টেম্পোরারি থাকিতে হইবে—উপরন্তু লড়িবার সাহস নাই ভাবিয়া সকলেই উপহাস করিবে।"

৪৫৲ মাগগিভাতা, ৪০৲ নিম্নতম বেতন, ১৩ নং ধারা প্রত্যাহার, টেক্সম্যাকোর ২০০ মজুরের পুনর্নিয়োগ, বোনাস, ছুটি ও অন্যান্য দাবী সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইছাপুর গোয়ালপাড়া ময়দানে ৭ হাজার মজুরের সমাবেশ

গত ৪ সপ্তাহে ২১ হাজার জার্মান ও হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যের অস্ত্রত্যাগ

অষ্ট্রিয়ার ৬0মাইলের মধ্যে লালফৌজ

সোভিয়েট রণাঙ্গনের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া গত ১৯শে নভেম্বর লালফৌজের কর্ণেল ভেসিলিয়েভ বলেন—'এই বৎসরের গ্রীষ্ম অভিযানে লালফৌজ বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫০ মাইল হইতে ৫৬০ মাইল পথ আগাইয়া গিয়াছে। পুনরায় ব্যাপক শীত অভিযান আরম্ভ করার আগে নিখুঁতভাবে সৈন্য সমাবেশ দরকার। ফ্রন্ট লাইনের সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ চলাচলের ব্যবস্থা এবং শত্রুরা যেসব অঞ্চল ধ্বংস স্তূপে পরিণত করিয়াছে সেখানে নূতন ঘাঁটী স্থাপন করাও অতি প্রয়োজনীয় কাজ। লালফৌজ শত্রুর বিরুদ্ধে এবার চরম যুদ্ধ সুরু করিবে তাই এই আয়োজনের গুরুত্ব এত বেশী।'

মার্শাল তলবুখিনের নূতন অভিযান

বুলগেরিয়ায় নাৎসী শত্রুদের নির্মুল করিয়া মার্শাল তলবুখিনের নেতৃত্বে তৃতীয় ইউক্রেনিয়ান আর্মি এতদিন ধরিয়া আক্রমণের জন্য তাহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম হাঙ্গেরীতে তাহারা জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান সুরু করে। মার্শাল ষ্টালিন তাঁহার ২৯শে নভেম্বরের হুকুমনামায় ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় ইউক্রেন রণাঙ্গনের সৈন্যরা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দ্রাভে নদীর উত্তরে দানিয়ুব অতিক্রম করে। যুগোশ্লাভ সৈন্যরাও এই নূতন আক্রমণের অংশ গ্রহণ করে।

লালফৌজ এখন অষ্ট্রীয়া সীমান্ত হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে আছে। দানিয়ুবের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া সোভিয়েট বাহিনীর তীব্র অভিযানের সূচনা দেখা যাইতেছে। ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনী সহ হাজার হাজার রুশ সৈন্য দানিয়ুব পার হইয়াছে। জার্মানরা বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন জার্ম্মান সৈন্যরা মরিয়া হইয়া প্রাণপণ বাধা দান করিতেছে।

লালফৌজের বড় রকমের সাফল্য

গত ২রা ডিসেম্বরের সোভিয়েট-ইস্তাহারে প্রকাশ যে দানিয়ুব এলাকার বৃহত্তম জার্ম্মান প্রতিরোধ ঘাঁটি সেগজারদে লালফৌজ দখল করিয়াছে। মস্কো বেতারে প্রকাশ গত ৪ সপ্তাহে ২১ হাজার জার্ম্মান ও হাঙ্গেরিয়ান অফিসার এবং সৈন্য হাঙ্গেরীতে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে।

এদিকে মার্শাল মালিনোভস্কীর সৈন্যদলের একটী বাহু মিসকল সহর অধিকার করিয়াছে। যোগাযোগের দিক হইতে এই সহরটির গুরুত্ব এত বেশী যে জার্ম্মানরা শেষ মুহূর্ত্তে তাহাদের কয়েকটি বাছা বাছা এস্. এস্. বাহিনী পাঠাইয়া এই সহরটি ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বুডাপেষ্টের ৬৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এগার সহরটিও লালফৌজের হাতে আসিয়াছে। ইহা হাঙ্গেরীর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাৎসীদের বিপদ

চেকোশ্লোভাকিয়া ও উত্তর-পূর্ব হাঙ্গেরীতে রুশ অভিযান অধিকতর দ্রুততা এবং ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। জেনারেল পেট্রভের নেতৃত্বে লালফৌজ উত্তরে জার্ম্মাণ অধিকৃত রাজপথ ও রেলপথ কেন্দ্র প্রেশভ ও কাশার দিকে দ্রুত বূহ বিস্তার করিয়া যেখানে পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে দুক্লা গিরিবর্ত্ম দেখা যাইতেছে। ইহাই চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে দক্ষিণ পোলাণ্ডে প্রবেশের পথ।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী ও জেনারেল পেট্রভের বাহিনীর মধ্যে শীঘ্রই সংযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দুক্লা গিরিবর্ত্ম দখলে রাখা জার্ম্মানদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। পোলাণ্ড ও উত্তর-পূর্ব হাঙ্গেরীতে অবস্থিত জার্ম্মানদের মধ্যে প্রধান যোগপথে অবস্থিত চেকোশ্লোভাকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ঘাটি কোসিস সহর দখল করার জন্য লালফৌজ ছুটিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব ইয়োরোপে চরম যুদ্ধের সূচনা

গত ৩রা ডিসেম্বর রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে সোভিয়েট রণাঙ্গনে বিরাট অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিযানের গতি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। বুডাপেষ্ট সহরটি এক বৃহৎ সাঁড়াশী চাপে পড়িয়াছে। দুইটি সোভিয়েট আর্ম্মি দুই বিপরীত দিক হইতে আগাইয়া যাইতেছে।

অন্যদিক দিয়া ওয়ারশ রণাঙ্গনের প্রস্তুতিও বোধ-হয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সপ্তাহে মার্শাল রকোসভস্কী মস্কোতে গিয়াছিলেন। ওয়ারস হইতে বার্লিনে যাইবার বাধাবহুল রাস্তায় হয়ত শীঘ্রই তুমুল যুদ্ধ সুরু হইবে। ভিশ্চুলাকে অতিক্রম করিতে পারিলে হিটলারের দারুণ বিপদ দেখা দিবে। আশা করা যায় এই আক্রমণের সাথে একযোগেই পূর্ব-প্রুশিয়ায়ও তুমুল লড়াই চলিবে।

পশ্চিম ইউরোপে

এই রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের ছয়টি আর্মি জার্ম্মান সীমান্ত অঞ্চলে তাহাদের চাপ তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসী প্রথম আর্মি ভোজ পর্বতমালার বেলফোর ফাঁক দিয়া আগাইয়া গিয়া কিছুদিন আগেই মুলহাউস দখল করিয়াছে। এই সহরটি সুইস্ সীমান্তের অতি নিকটে। এই সৈন্যদল এখন ষ্ট্রাসবুর্গের দিকের ফাঁক বন্ধ করিতে আগাইয়া যাইতেছে। ইহার ঠিক উত্তরে মার্কিন সপ্তম আর্মি সাভের্ণ ফাঁক দিয়া পূর্ব্বেই ষ্ট্রাসবুর্গ দখল করিয়াছে। আলসাস-লোরেনের দক্ষিণ ও উত্তর দিয়া এই অগ্রগমনের ফলে জার্ম্মানরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপরে আছে মার্কিন তৃতীয় আর্মি। এই সৈন্যদল ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট সহর দখল করিয়াছে। এবং দক্ষিণদিকে সারব্রুকেনের ৮ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্যদিক দিয়া তাহারা লুক্সেমবুর্গের সীমান্তের ধার দিয়া আগাইতেছে। ইহার উত্তরে মার্কিন প্রথম আর্মি ও নবম আর্মি এবং বৃটিশ দ্বিতীয় আর্মির অবস্থিতি। হলাণ্ড ও বেলজিয়ামের কতকাংশ জুড়িয়া এই ফ্রন্টেও তুমুল লড়াই সুরু হইয়াছে। ভেনলো অধিকারের জন্য বৃটিশ আর্মি আক্রমণ চালাইতেছে।

শত্রুকে এবার পিষিয়া মারা হইবে

কর্ণেল ভেসিলিয়েভ যুদ্ধের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—লালফৌজ ও মিত্রবাহিনী শত্রুকে ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাদের নিজেদের দেশে নিয়া গিয়াছে। এই আক্রমণের মুখে আমরা অনেকগুলি সুবিধাজনক ঘাটি অধিকার করিয়াছি। এখান হইতে আমরা নাৎসী জার্ম্মানীর উপর চরম আঘাত হানিতে পারিব। এই অভিযানই চূড়ান্তভাবে জার্ম্মান সমরযন্ত্রকে গুঁড়া করিয়া দিবে এবং অতি অল্প সময়ের ভিতরই নাৎসী জার্ম্মানীর ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে।

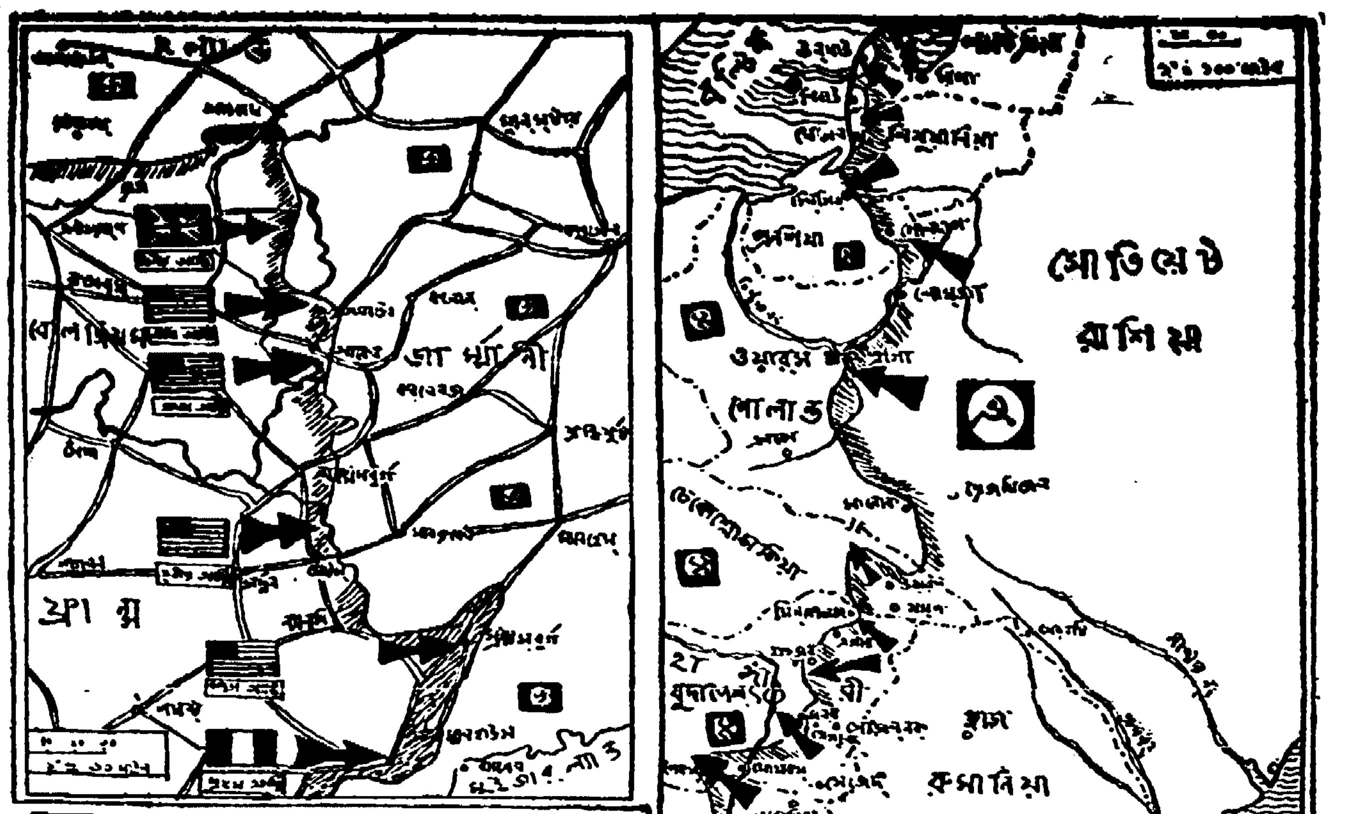

ব্রিটিশ
মার্কিন
ফরাসী

১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষ ও লালফৌজের অগ্রগতি

বেলজিয়ামে মন্ত্রীসভা বনাম জনগণ

বেলজিয়মের পিয়ারলো মন্ত্রীসভা নিরস্ত্র জনতার বিক্ষোভ যাত্রার উপর গুলি চালাইয়া এবং ফ্যাশিষ্ট প্রতিরোধকারী দর হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া শিল্পপতিদের খুশী করিতেছে। এই শিল্পপতিদের অনেকে জার্মান আধিপত্যের সময় সহযোগিতা করিয়াছে। দেশ আজ জার্ম্মান কবলমুক্ত হওয়াতে ইহারা আগের মত মুনাফা না করিতে পারায় কোন কোন স্থানে খনি ও কল কারখানা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সশস্ত্র মজুরদল তাহাতে বাধা দেয়। এই জন্যই আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ইহাদের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার।

পিয়ারলো প্রভৃতি লণ্ডনে পালাইলে যাহারা জার্মানদের শাসনে সাহায্য করিয়াছিল এবং প্রতিরোধকারীদের দমন করিয়াছিল, আজ পিয়ারলোর অনুগ্রহে তাহারা অনেকেই এখনো শাসন কার্য্যে বহাল আছে।

সেজন্য বেলজিয়মের বামপন্থীরা তো বটেই, অন্য অধিকাংশ দলও পিয়ারলোকে নিন্দা করিতেছে। মধ্যপন্থী কাগজ 'লা ডারনিয়ার হিবুরে' পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছে, সরকারের নীতি কায়েমী স্বার্থবাদীদের এমন কি ফ্যাসিষ্টপন্থীদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। উদরাপন্থী কাগজ 'সাইট নভেলী' বলিয়াছে যে দেশের জনমত পুরাপুরিভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে।

বেলজিয়াম সরকারের এই নীতিতে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশেও দারুণ প্রতিবাদ সুরু হইয়াছে। মিত্রবাহিনীর নায়ক মেজর-জেনারেল আর্সকিন পিয়ারলো সরকারকে সমর্থন করায় অবস্থার গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে। পার্লামেন্টের লেবর সদস্য মিঃ শিনওয়েল সীহামে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, সামরিক কারণে এ আন্দোলন দমন করা হইতেছে এমন কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। ব্যাঙ্ক ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য তাহারা দাবী জানাইয়াছিল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কর্তৃত্বের অবসান চাহিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগকে দমন করা হইতেছে। দক্ষিণপন্থী কাগজ 'ইকনমিষ্ট' পর্য্যন্ত বেলজিয়ামের ব্যাপারে মিত্রবাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করিয়াছে।

লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'ডেলী হেরাল্ডের' বৈদেশিক সম্পাদক মিঃ এম, টাউলে বলেন—আমাদের মধ্যে অনেকেই মঃ পিয়ারলো ও তাঁহার নীতির বিরোধী।...তিনি ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব ও জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতা এক মন্তব্যে বলিয়াছেন—বেলজিয়ামের সংকট যে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বেলজিয়াম সরকার এ পর্য্যন্ত শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সরকার বেলজিয়াম অধিকৃত থাকা কালে লণ্ডনে গঠিত হয়। বেলজিয়ামে প্রতিরোধ আন্দোলন অমর ইতিহাস রচনা করিয়াছে; জনসাধারণ উহার সমর্থক, তাই বেলজিয়াম সরকার উহাদের নিরস্ত্র করিয়াছে। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদ হইতে জার্ম্মান সমর্থকদের সরাইয়া না দেওয়ায় জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

মস্কো হইতে সোভিয়েট কাগজ 'প্রাভদা'ও প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের কাছ হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লওয়ার দারুণ নিন্দা করিয়াছে। মন্তব্য করিয়াছে—পিয়ারলো সরকারের এই সব কার্য্য-কলাপের পিছনে আছে বেলজিয়াম জেনারেল ভ্যান ওভারষ্টেট। এই কুখ্যাত জেনারেল প্রকৃতপক্ষে হিটলারেরই সমর্থক।

কিন্তু পিয়ারলো যত চেষ্টাই করুক ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির অভ্যুত্থানে বেশীদিন টিকিতে পারিবেনা।

'প্রাদেশিক' কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশের সর্বাধিক জরুরি প্রশ্ন—কংগ্রেস লীগ ঐক্যের সমস্যা। সে সম্বন্ধে সম্মেলনে আলোচনা পর্য্যন্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে লীগের সঙ্গে রাজনীতিক সংস্পর্শ বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, লীগকে ডিঙ্গাইয়া মুসলমানদের কাছে পৌঁছিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধই বাড়িতে থাকিবে, শুধু হিন্দু সভাই লাভবান হইবে। অপর পক্ষে হিন্দু সভা যে সাম্প্রদায়িক প্রচার আরম্ভ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই। একদিকে লীগকে বয়কট, অন্যদিকে এই নীরবতা ইহাতে হিন্দু সভার প্রভাবই শক্তিশালী হইবে।

জনসেবা, মহামারী-প্রতিরোধ, খাদ্যপরিস্থিতি প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব বা আলোচনাই হয় নাই। চোরাবাজার, দুর্নীতি প্রভৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার উপায় কি সে সম্বন্ধে সম্মেলন নীরব। গবর্ণমেন্টের রেশনিং যাহাতে পুরাদমে চলিতে পারে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক শস্য সংগ্রহ সহজ হয় সে বিষয়ে কংগ্রেসকর্মীরা সাহায্য করিলে তবেই চোরাবাজার বন্ধ হয়—সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমালোচনাই আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি বহু পরিমাণে রোধ করিতে পারে। এ বিষয়ে সম্মেলন কিছু বলা দরকার মনে করে নাই। সেজন্যই কোন কোন প্রতিনিধি মন্তব্য করিলেন যে 'এ সব প্রস্তাব শুধু কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে।'

ইহাই কি দেশপ্রেমের ছবি?

এই সম্মেলনের ফলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্যও বরং আরও শিথিল হইয়াছে, দলাদলি পাকিয়াই উঠিয়াছে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' ঘোষণা করা হইয়াছে। জে-সি-গুপ্ত প্রভৃতিকে বর্জন করা হইয়াছে, হয়তো নলিনাক্ষ বাবু প্রভৃতিকেও বর্জনের চেষ্টা হইবে। সতীশ বাবুরা এত বিরক্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা আর একটী পাল্টা সম্মেলন ডাকিবার কথা ভাবিতেছেন। নেতাদের বিরুদ্ধে কর্মীসাধারণের বিরক্তি ও অসন্তোষ কোনো রকমে ধামাচাপা দিয়া রাখা হইয়াছে, শীঘ্রই আবার একদিন মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। এই হতাশাব্যঞ্জক, বহুধা-বিভক্ত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা ও রেষারেষির ভবিষ্যৎ ছবি লইয়াই সম্মেলনের কর্মীরা কর্মস্থলে ফিরিলেন। তাই উত্তেজনা-শান্ত মূহূর্ত্তে অনেকেই বলিলেন, 'বোঝা গেল বিশেষ কিছুই হইবে না।'

কংগ্রেসের ভিতরে যদি এমনি দুর্দিন ঘনাইয়া আসে তাহা হইলে বাঙ্গালীর আর বাঁচিবার আশা থাকিবেনা। এখনও সময় আছে। কংগ্রেস কর্মীরা সর্বত্র সক্রিয় হইয়া কার্য্যকরী সমিতির উপর চাপ দিন যাহাতে রিলিফ, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সকল দলের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয়, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র প্রতিষ্ঠান গুলিকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলির ভিতরে গিয়াই কংগ্রেস কর্মীরা কাজ করেন, সতীশ বাবু, ক্ষিতীশ বাবু প্রভৃতি সকল মতের কংগ্রেস কর্মীকে আবার সংগঠনের কাজে টানিয়া আনা হয়, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আন্দোলন যেন বর্জন করা না হয়। ইহা না করিতে পারিলে বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাও লোপ পাইবে, হিন্দু সভার সাম্প্রদায়িক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমলাতন্ত্র ও চোরাবাজারের একচ্ছত্র প্রভুত্বের নীচে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি-প্রপীড়িত বাঙ্গালীকে অসহায় ভাবে মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

Regd. No. C. 2836.

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সারা কলিকাতা

দু হাজার দেশভক্ত স্বেচ্ছাসেবক সহরের জঞ্জাল দূর করিতেছে

৩রা ডিসেম্বর ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ দিবসের বিবরণ

ছেলেবেলা হইতে কলিকাতা শহরকে ভালবাসিয়াছি, গর্ব করিয়া বলিয়াছি—'আমাদের কলকাতায় ম্যালেরিয়া নেই, মশাও নেই।' তখন মফঃস্বলের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছেলের পিলে দেখিয়া প্রথমে অবাক হইয়াছি, পরে করুণা করিয়াছি।

আর আজ পিলে-লিভার তো সামান্য কথা, ম্যালেরিয়া মহামারী কলিকাতারই ঘরে ঘরে মৃত্যুর ক্রন্দন তুলিয়াছে। ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র চার সপ্তাহে শুধু ম্যলেরিয়ায় মারা গিয়াছে ৫৯৬ জন কলিকাতাবাসী। কোথাও কোথাও এমনি অবস্থা যে কে কাহাকে দেখে তাহার ঠিক নাই। দিন কয়েক আগে নারিকেলডাঙ্গায় একটী ঘর হইতে একজন মুচির মৃতদেহ বাহির হইল—কদিন হইল ম্যালেরিয়ায় মরিয়া ঘরেই পচিতেছিল কেহ খোঁজও পায় নাই!

একটী কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকের ভীড়

আমাদের কলিকাতা শহর—যেখানে বাংলার সমস্ত সম্পদ আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশহিতৈষণা কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে—সেখানেও এমন মর্মন্তুদ ভয়াবহ ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা শুধু চোখে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলাম। আরও দেখিয়াছিলাম আমাদেরই কর্পোরেশন আর বাংলার গবর্ণমেণ্ট যত না রোগের সেবা করিতেছে তাহার চেয়ে অনেক বেশী পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মানুষের উপর ভরসা কমিয়া গিয়াছিল।

কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, পিপলস্ রিলিফ কমিটি, জনরক্ষা সমিতি ও আরও কয়েকটী রিলিফ কমিটি যখন একত্র হইয়া ঘোষণা করিলেন যে ৩রা ডিসেম্বর আমরা কলিকাতাবাসিরাই শহরতলীকে নিজের হাতে সাফ করিব, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিস্থলগুলি যথাসম্ভব দূর করিব—তখন তাই বিশেষ উৎসাহ পাই নাই। তবুও খোঁজ এবং চেষ্টা করিয়াছিলাম, কারণ মানবধর্ম্ম ও দেশপ্রেমের উপর বিশ্বাস মরিয়াও মরে না।

একদিকে কলেজে কলেজে, বস্তীতে বস্তীতে, ছাত্রদের মধ্যে, ডাক্তারদের মধ্যে, মজুরদের মধ্যে প্রচার চলিল—৩রা ডিসেম্বরের জন্য স্বেচ্ছাসেবক চাই। এমন সেবক চাই যাহারা ম্যালেরিয়ার ভয় না করিয়া, ড্রেনের ময়লা ঘৃণা না করিয়া কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিবে। আর একদিকে কর্পোরেশন ও গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগে হাঁটাহাটি—কোদাল, ঝুড়ি, ঠেলাগাড়ী, বুরুশ, তেল ইত্যাদি অনেক জিনিষ দরকার। তাঁহাদের কাছ হইতে অতি কষ্টে একশো দেড়শো জনের মত মালমশলা পাওয়া যাইবে বোঝা গেল।

তাও সই। দেশের মানুষের মধ্যে জনসেবার আহ্বানে প্রচারে যত অগ্রসর হইতেছি মনেও তত্ই বল পাইতেছি। কারণ বাঙ্গালীর দেশপ্রেম সাড়া দিতেছে। ভরসা সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইলাম ৩রা তারিখ ভোরবেল, যখন কয়েকজনের সঙ্গে মিলিয়া নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে চলিয়াছি। পাশে গ্যাস কোম্পানীর বিরাট কারখানা। তাহারা আমাদেরই শহর হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে অথচ মজুরদের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত দেয় না, কলিকাতা শহরের হাজার খানেক বাসিন্দা কাছাকাছি নোংরা বস্তীর আবর্জনা ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে ভুগিতে বা মরিতে বাধ্য হয়। শীতের ভোর তাহার উপর রবিবার রাস্তায় ভিড় নাই। ম্যালেরিয়া ও মৃত্যুর কালো ছায়া যেন এ অঞ্চলে আরও স্তব্ধতা আনিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ আওয়াজ উঠিল—"ম্যালেরিয়া দূর করব আমরাই।" ঝাণ্ডা লইয়া, গান গাহিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল আসিতেছে। একটী যায়, খানিক পরে আবার একটী আসে, দলে দলে মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। উৎসাহে, আওয়াজে স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল।

নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডের কেন্দ্রে জনতা তখন ভারী। বঙ্গবাসী, রিপন, বিদ্যাসাগর, পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট, সায়েন্স কলেজ হইতে প্রায় ৫০০ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে, ক্যাম্বেল ও কারমাইকেল হইতে কয়েক দল মেডিকেল ভলাণ্টিয়ার আসিয়াছে, ট্রাম, লোহা কারখানা, গ্যাস, বিড়ি প্রভৃতির প্রায় ২০০ মজুর স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে, খাস কলিকাতার বিভিন্ন পাড়া হইতে জনরক্ষার কর্ম্মীরা আসিয়াছে। কাহারও হাতে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা, কাহারও লীগ, কাহারও বা লাল পতাকা। ইহাদের সমাগমে ঐ অঞ্চলের লোকও বহু আসিয়া জড়ো হইলেন—লোকে লোকারণ্য।

লেঃ কর্ণেল জে সি দে, ডাঃ বি এন বসু, বি কে বসু, বীরেশ্বর মিত্র, সৌরীন ঘোষ, জে সি ব্যানার্জি প্রভৃতি কলিকাতার বহু চিকিৎসক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আসিয়াছেন। লীগের এম-এল-সি লাল মিঞা, কর্পোরেশন কাউন্সিলর মহম্মদ ইসমাইল, হেম নস্কর প্রভৃতিও উপস্থিত। বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু সমবেত স্বেচ্ছাসেবককে উৎসাহিত করিয়া বক্তৃতা দিলেন—"এই একদিনেই আমাদের কাজ শেষ হইবে না, স্থায়ীভাবে এই কাজের সঙ্কল্প লইব।"

সমস্ত জনতা আবার জয়ধ্বনি করিয়া, ঝাণ্ডা উড়াইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু হাতিয়ার কই? প্রতি একশো জন পিছু দু তিনটীর বেশী কোদালি, ঝুড়ি প্রভৃতি মিলিল না, তেলও সেই রকমই। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা দমিল না। খালি হাতেই পুকুরের পাঁকে নামিয়া কচুরি ছিঁড়িবে, ড্রেন সাফ করিবে বলিয়া আগাইয়া গেল।

স্বেচ্ছাসেবকেরা পুকুরের পানা তুলিতেছে

তবুও সরকারী ডিরেক্টর অফ পাব্লিক হেল্থ মেজর জাফর মুরুব্বির মত বলিলেন, "এরা শুধু জয়ই হাঁকে, বিশেষ কিছু কাজ করবে বলে মনে হচ্ছে না।" স্থানীয় কয়েকজন নিক্রিয় মাতব্বরকেও এইরূপই বলিতে শোনা গেল। স্বেচ্ছাসেবক দল যখন বস্তিতে বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িল তখন বাসিন্দারাও অনেকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কি সরকারের লোক?' দীর্ঘ দিনের নিক্রিয়তায় কর্পোরেশনের উপর তাহাদের বিশ্বাস তো গিয়াছেই, দেশপ্রেমের উপরও ভরসা রাখিতে পারে নাই।

মানিকতলা, নারকেলডাঙ্গা ও বেলেঘাটা এই তিনটী প্রধান কেন্দ্র, সর্বশুদ্ধ বাহিরের ভলাণ্টিয়ার আসিয়াছে প্রায় ২ হাজার জন। প্রথমটায় স্থানীয় বাসিন্দারা একটু কিন্তু করিয়া পিছনে ছিলেন। মেয়েদের মধ্যেই প্রথম উৎসাহ জাগিল। মহিলা আত্মরক্ষার স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিজে হাতে তেল দিতে দেখিয়া কাঁকুড়গাছি বস্তীর ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মেয়েরাও আগাইয়া আসিলেন—ঝুড়ি, কোদালি প্রভৃতি নিজেরাই যথাসম্ভব জোগাড় করিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ মীর আহম্মদ—সবে মাত্র কাল ২১ দিনের জ্বর হইতে উঠিয়াছেন। তিনিও দুর্বল হাতে ড্রেনে জল ঢালিতেছেন। সুরমা বিক্রী করিয়া চালান, স্ত্রী-পুত্র লইয়া জন দশেক, আড়াই টাকা ভাড়ার একখানি ঘরে দিন কাটান। কি দুর্গন্ধ বস্তি! দুটী খাটা পায়খানা সারা বস্তির জন্য, মাসে ৪ দিন পরিষ্কার হয়।

হিন্দু নিম্ন মধ্যবিত্তের পাড়া। ছেলেরা আগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কাজে নামিলেন। তাঁদের অভিযোগ কর্পোরেশন ও পাড়ার কাউন্সিলরদের উপরই বেশী—কাউন্সিলারের বাড়ীর আশপাশটাই ভাল পরিষ্কার থাকে এ মন্তব্যও করিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের চা না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না।

কয়েকজন ডাক্তারী ছাত্রের স্বেচ্ছাসেবক দল, তাঁহাদের কেহ কেহ আবার লীগ পন্থী। কি আগ্রহে প্যাণ্ট গুটাইয়া নোংরা নর্দমার মধ্যে নামিয়া জলস্রোত বহাইয়া দিবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন! তাঁহারা বলিলেন, "আবার এখানে আসতে হবে, এ অঞ্চল সাফ করা আমাদেরই কাজ।"

সকাল ৯টা হইতে ১টার মধ্যে মোট ৮০টী পুকুর ও ডোবার পানা ও জঙ্গল পরিষ্কার ও তেল ছড়ানো, অসংখ্য বড় ও ছোট ড্রেন সাফ, রাস্তা ও বস্তির আবর্জ্জনা সরানো ও পোড়ানো, এমন কি কর্পোরেশনের গোখানাও সাফ করা হইল।

কংগ্রেসের বড় বড় নেতাকে দেখিলাম না বটে কিন্তু স্থানীয় নেতা অমূল্য রায়, তারিণী চক্রবর্ত্তী, দুর্গাপদ ঘোষ প্রভৃতি উৎসাহে এই কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

কাজ দেখিয়া সরকারী কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত চোখ ফুটিল। ফিরিবার সময় মেজর জাফর স্বেচ্ছাসেবকদের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও যন্ত্রপাতি মাল মশলা সরবরাহ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এম্‌নি করিয়া কঠিন দেশসেবার একটী দিন কাটিল। মনটা খারাপ হইয়াছিল যে, কয়েকদিন আগে কতিপয় কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন ডাকিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছেন—রাজনীতি তথা জনসেবার সমস্ত ব্যাপারে কমিউনিষ্ট, লীগ ইত্যাদি সকলের সংস্পর্শ বর্জ্জন করিতে হইবে। মন আবার সুস্থ হইল যখন বিভিন্ন দলের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক কঠোর পরিশ্রমের পর ফিরিতে ফিরিতেও অতৃপ্ত দেশপ্রেমের আগ্রহে বার বার বলিলেন: "অনেক ত্রুটী আমাদের ছিল, হাতিয়ারের অভাব ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহের—তাই আবার আমাদের এ কাজে ফিরিয়া লাগিতে হইবে।"

ম্যালেরিয়ার ডিপো বিরাট কচুরিপানার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের লড়াই

কমলাঘাটে কি দেখিলাম

(ভ্রম সংশোধন)

গত সংখ্যা জনযুদ্ধে উপরোক্ত প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে লেখা হইয়াছে যে রিপোর্টার জনযুদ্ধের প্রতিনিধিরূপে অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন ও বিভিন্ন লোকের মতামত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের এলায়েড লেবার নিউজের প্রতিনিধিরূপেই এই সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাহার উপর নিজ মতামত দিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। জঃ সঃ

আগামী সংখ্যা জনযুদ্ধ বন্ধ

পরবর্ত্তী সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যা হইবে

জনযুদ্ধের আগামী ১৩ই ডিসেম্বরের সংখ্যা বন্ধ থাকিবে কারণ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির বিস্তৃত অধিবেশনের জন্য আমাদের সকলকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইবে। পরবর্ত্তী সংখ্যা ২০শে ডিসেম্বর বাহির হইবে। এই সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা হইবে; ভারতীয় রাজনীতি, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকিবে। উহার দাম হইবে তিন আনা। এজেণ্টরা কত কপি চান তাহা ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে জানাইবেন এবং ঐ তারিখের ভিতরই তাহাদের সমস্ত দেনা শোধ করিতে হইবে। এই সংখ্যা কাহাকেও বাকীতে দেওয়া হইবে না।

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

পি, সি, জোশীর

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

বাহির হইয়াছে। দাম ৵০ আনা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ সংখ্যা

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা] ২০শে ডিসেম্বর '৪৪, বুধবার. ৫ই পৌষ, '৫১ [দাম তিন আনা

বন্দী কংগ্রেসকর্মীরা কি ভাবিতেছেন

"কমিউনিষ্ট বর্জ্জন, লীগ-বিরোধিতা কংগ্রেসকেই ধ্বংস করিবে"

মেদিনীপুর জেল হইতে সদ্যমুক্ত কংগ্রেসকর্মীদের বিবরণ

(নিখিল চক্রবর্ত্তী)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং আরও প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী বর্ত্তমানে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী আছেন। তাঁহাদের দুইজন সহকর্মী সম্প্রতি মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মেদিনীপুরের কারারুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীরা কি ভাবে ভাবিতেছেন সে বিষয়ে আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি।

তাঁহারা প্রথমেই বলিলেন যে মেদিনীপুর জেলের প্রায় সমস্ত কংগ্রেসী বন্দী কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্ত আগ্রহান্বিত। এমন কি কয়েকজন ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থীও বর্ত্তমানে এই মতের পক্ষে আসিয়াছেন কংগ্রেস সভাপতি সুরেন বাবু জেল হইতেই তার করিয়া গান্ধী-জিন্না আলোচনায় সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ঐক্যের জন্ত তিনি রাজাজির ফর্মুলা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। দেশবন্ধু দাশের মতই সুরেনবাবুও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মুসলমানদের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন বাংলা দেশের রাজনীতিক উন্নতি হইতে পারে না। ১৯৩৮ সাল হইতেই তিনি বাংলায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পক্ষপাতী। তাঁহার আপন জেলা ময়মনসিংহে তিনি এজন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সেখানে আজও কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কতখানি সদ্ভাব আছে তাহা সাম্প্রতিক মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনেই দেখা গেল। তাহার পর দিনে দিনে বহু কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা কর্মী লীগে যোগ দিতে থাকায় লীগের সহিত ঐক্যের প্রয়োজন তিনি আরও গভীরভাবে অনুভব করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের হিন্দুসভা প্রীতিতে জেলের ভিতর প্রায় সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন একথা তাঁহারা আমাকে জানাইলেন। দুর্ভিক্ষের সময় কিরণবাবু যখন একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সারা বাংলা দেশ শ্যামাপ্রসাদের হাতে তুলিয়া দেন তখন ইঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। গান্ধীজির ঐক্য প্রস্তাবেও কিরণবাবু বিরোধিতা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহারা এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে সুরেন বাবু কিরণবাবুর কাছে প্রতিবাদ করিয়া চিঠি লেখেন। কিরণবাবু নাকি তাহার জবাবে তাঁহাকে কল্পনা-বিলাসী বলিয়া উপহাস করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ পাড়য়া সময় কাটাইতে উপদেশ দেন! জেলের প্রায় সমস্ত বন্দীই ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্ত যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্ত সুরেনবাবু অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তিনি চান যে বাংলার কংগ্রেস প্রাদেশিক লীগের সহিত আলাপ-আলোচনা করে।

তাঁহারা বলিলেন যে বক্সা জেলের কংগ্রেসী বন্দীরাও বোধ হয় অধিকাংশই সুরেনবাবুর মতের। তাঁহারা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ বক্সা জেল হইতে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন,

"...আমাদের সুনিশ্চিত মত যে কংগ্রেসকে সত্যিকার জন-প্রতিষ্ঠান করতে হলে মুসলমানদের সঙ্গে আপোসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজাজির প্রস্তাব যদি তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় তবে আরো এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলতে হবে।..."

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে সুরেন বাবুও হতাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি অত্যন্ত "আশাবাদী", "পরাজয় মানিতে" প্রস্তুত নন।

সম্প্রতি কিরণ বাবু ও তাঁহার দলযুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্ত সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতিক সংস্পর্শ বর্জনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনিয়া কারারুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী মারফৎ সুরেন বাবু কিরণ বাবুকে জানাইয়াছেন যে খাদি গ্রুপের সহিত অসহযোগিতা এবং কমিউনিষ্টদিগকে বর্জনের মনোভাব তিনি মোটেই অনুমোদন করেন না।

তিনি মনে করেন যে ইহাতে কংগ্রেস তথা বাংলা দেশ ধ্বংস হইবে। 'জনযুদ্ধ' সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ আছে, কিন্তু তবুও তিনি চান যে সমস্ত দলই কংগ্রেসের ভিতরে

বাংলা কংগ্রেসের কারারুদ্ধ সম্পাদক অরুণচন্দ্র গুহ

কাজ করুক, কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করুক, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত জনগণের সেবা করুক এবং লীগের সঙ্গে ঐক্যের চেষ্টা করিয়া নিখিল-ভারত ঐক্যের প্রশ্নও সমাধান করুক। এইভাবে পুনরুজ্জীবিত কংগ্রেস যদি মজুর, কৃষক, ছাত্র প্রভৃতি সকলের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে তবে বাংলা দেশে আবার দেশভক্তির নূতন জোয়ার আসিবে। বিধ্বস্ত বাংলাকে পুনর্গঠনের কাজে লীগের সঙ্গে একসঙ্গে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে বন্দী নেতারা প্রায় সকলেই একমত।

কিন্তু হিন্দু সভা ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রীতি কিরণ বাবুকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছে যে বন্দী নেতাদের কথায় তিনি কানও দেন নাই। জেলের বাহিরে আসিয়া যাঁহারা কিরণ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন নাই। তবে তাহারা হতাশ হন নাই। তাঁহারা বলিলেন যে জেলায় গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারা জনসেবার কাজে নামিবেন। বিবাদ-বিসম্বাদে কংগ্রেস কখনও বড় হয় নাই, জনগণের মধ্যে কাজ করিয়াই বড় হইয়াছে। এবারও সেই পথেই তাঁহারা কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

তাঁহারা আরও জানান যে জেলের মধ্যে পি, সি, জোশীর "দে মাষ্ট্ নট্ ফেল" প্রবন্ধ তাঁহারা কোনো রকমে পাইয়াছিলেন এবং উহা পড়ার পর প্রায় সকলেই পিপল্‌স ওয়ার ও জনযুদ্ধ পড়িতে চান। কিন্তু সরকারী হুকুমে জেলের ভিতর পিপল্‌স ওয়ার বা জনযুদ্ধের প্রবেশ নিষেধ।

সম্পাদকীয়

বড়লাটের বক্তৃতা

বড়লাটরূপে ভারতে আসিবার ঠিক আগে লর্ড ওয়েভেল বলিয়াছিলেন যে, ভারতের তদানীন্তন "অচল অবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব দূর করিবার স্বপক্ষে ভারতে ও বিলাতে লোকমত কত গুরুতর" তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর আজ এক বছর পরে তিনি ভারতের রাজনীতিক অসুস্থতা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেছেন। ভারতবাসীকে পরামর্শ দিতেছেন—"আপনারা রোগের চিকিৎসা একেবারেই ছাড়িয়া দিন, তাহা হইলে হয়তো দেখিবেন আপনাদের তেমন কোন অসুখই হয় নাই।"

অচল অবস্থা তথা পরাধীনতার রোগ দূর করিবার জন্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছে দেশভক্ত ভারতবাসী কখনই ঔষধ চাহে নাই। তাহাদের নিজস্ব শক্তিতেই তাহারা রোগমুক্তির ভরসা রাখে।

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চিকিৎসক নয়, আমাদের রোগের বীজাণু। ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিয়াছে যে এক বছরের ভিতর এই বীজাণু এত প্রবল হইল? আমাদের শক্তিতে এমন কি দুর্ব্বলতা আসিয়াছে যে ওয়েভেল আজ একদিকে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী, অন্য দিকে পাকিস্তানের দাবী, দুটীকেই উপহাস করিবার সাহস পাইতেছেন?

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও লীগ নিকটে আসিয়া আবার দূরে সরিয়া গিয়াছে আমাদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়—পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া কিংবা সপ্রু কমিটি প্রভৃতি মারফৎ ঐক্যের পরিবর্ত্তে আইনগত সমাধান খুঁজিতে গিয়া কংগ্রেস ও লীগের পরস্পর সন্দেহ বাড়িয়াই গিয়াছে। গান্ধী-জিন্না পুনরালোচনার পরিবর্ত্তে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে উগ্রতর কলহ, এমন কি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অশুভ দিন কাছে আসিয়াছে।

ইহাই সাম্রাজ্যবাদকে সাহস দিয়াছে। তাই ওয়েভেল আজ স্পর্দ্ধার সহিত বলেন যে ১৯৩৫ সালের গোলামি শাসনতন্ত্রে একটুও পরিবর্ত্তন চলিবে না, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—আমার তাঁবেদার পরিষদই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট।

কংগ্রেস ও লীগ যদি পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করে, রোগের বিরুদ্ধে একত্র হয়—তবেই এই বীজাণুর সমস্ত তেজ উড়িয়া যাইবে।

পাল্টা কিষাণ সভা ক্ষতিকর

একত্রে কাজের জন্য কংগ্রেসীদের কাছে কিষাণ সভার ডাক

সম্প্রতি নিখিল ভারত কিষান সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে কয়েকটী গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, কেরালা, মহারাষ্ট্র, সংযুক্তপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কিষান কাউন্সিল গত ৩রা ডিসেম্বরের সভায় কংগ্রেসকর্মীরা কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে কাজ করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে গভীর আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। সভা ঘোষণা করিয়াছে:

নিখিল ভারত কিষান সভার নীতি, কর্ম্মপদ্ধতি ও কার্য্যকলাপ ব্যাপক ও বিস্তৃত। যে কোন দল ও রাজনৈতিক মতের স্বাধীনতাকামীর কাছে কিষান সভার দুয়ার উন্মুক্ত। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্ত যাহাতে সকল দল ও পার্টি কিষান সভার ভিতরে আসিয়া জনসেবা করিতে পারেন তাহার উপযোগী করিয়া সভার গঠনতন্ত্রেও কিছু কিছু অদলবদল করা হইয়াছে। কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, খাদ্যাভাব ও মহামারীর বিরুদ্ধে যিনিই কাজ করিতে চাহিবেন তিনি কিষান সভার ভিতর কৃষকদের ঐক্য রক্ষা করিয়া দেশসেবা করিতে পারেন।

সম্প্রতি অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতি একটী প্রতিদ্বন্দ্বী কিষান সভা গঠন করিতে চাহিতেছেন। কিষান সভা হইতে কংগ্রেসকর্মীদের দূরে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত দলগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সভার কর্ম্মনীতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিতেছেন। এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিষান সভা ঘোষণা করিয়াছে:

"প্রতিদ্বন্দ্বী কিষান সভা গঠন করিলে কৃষকদের তথা সমগ্র দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সারা দেশ তীব্র প্রতিবাদ করিবে কারণ ইহাতে কৃষকদের ঐক্য ও সংগঠন ভাঙ্গিয়া যাইবে। কৃষকরা অসীম স্বার্থত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমে যে ঐক্য ও সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা তাহারা ভাঙ্গিতে দিবে না।

কিষান কাউন্সিলের মূল প্রস্তাবে বলা হইয়াছে: কিষান সভা খাদ্যাভাব, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বাঁচাইবার জন্ত খাদ্যসংগ্রহ, রিলিফ প্রভৃতির কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবে। কণ্ট্রোল দরে গ্রামে গ্রামে চিনি, তেল, কাপড়, লবণ আদায় করিবার জন্ত কিষান সভা কমিটি গঠন করিবে। আমলাতন্ত্র ও জমিদারদের দুর্নীতির মুখোস খুলিয়া দিয়া ফসল বৃদ্ধি ও খাদ্য সংগ্রহের কাজ সফল করিবার জন্ত কিষান সভা অগ্রসর হইবে।

অপর একটী প্রস্তাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্ত যাহাতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার নবপ্রচেষ্টা সুরু হইতে পারে তজ্জন্ত কিষান সভা সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়াছে, এবং কংগ্রেসকে বৈধ করার দাবী জানাইয়াছে।

প্রফুল্ল ঘোষের মুক্তি চাই

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ ঘোষ তাঁহার ভগ্নীর নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার এই পত্র হইতে জানা যায়, ডাঃ ঘোষের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং স্বরাষ্ট্র সচিব কর্ত্তৃক ডাঃ ঘোষের স্বাস্থ্যোন্নতির যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একেবারেই মিথ্যা।

দুর্গত দেশ যখন ব্যাকুল হইয়া দেশনেতাদের মুক্তি কামনা করিতেছে, তখন তাঁহাদের সম্পর্কে

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

আমলাতন্ত্রের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ কঠিন কর্ত্তব্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করি অবিলম্বে ডাঃ ঘোষকে মুক্তি দেওয়া হোক।

উড়িষ্যার কংগ্রেসসেবীরা—— ——কমিউনিষ্ট বিরোধী নন

রিলিফের কাজ চালানোর পক্ষে সর্ববাদী অভিমত

উড়িষ্যার ৬০ জন কংগ্রেসসেবী গত ১৯শে নভেম্বর কটকে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র, শ্রীযুত নন্দকিশোর দাস (উড়িষ্যা এসেম্বলীর ডেপুটী স্পীকার), শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র মহান্তী (নীলগিরি প্রজামণ্ডলের সভাপতি) এবং শ্রীযুত জগন্নাথ মিশ্র। ইঁহারা সকলেই প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা। কংগ্রেস কর্মীরা এইরূপ একটী প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করার জন্য দুই মাস ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু স্থানীয় গান্ধী-সেবা সংঘের নেতৃবৃন্দের একটী অংশ সম্মেলন ডাকার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। পরে ইঁহাদের একজন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সকলেই সম্মেলনে রাজী হন।

সম্মেলনে মূল আলোচনা ছিলঃ বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা ও গান্ধীজিকে উপবাস হইতে নিবৃত্ত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন।

এই সভায় প্রস্তাবে বলা হয়, ধ্বংসমূলক আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেসের নয় সরকারী দমন-নীতিই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

হিন্দুমহাসভা-নীতি পরাস্ত

জিন্না সাহেবের কাছে গান্ধীজি যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহা সকলে একবাক্যে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ একটী শক্তিশালী অংশ নেতাদের পুনরায় মিলনের স্বপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু জাতীয়-ঐক্যের বিরোধী যে কয়জন ছিলেন তাঁহাদের চাপে শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবে এই কথা লিখিত হয় নাই।

রিলিফ করিতেই হইবে

উত্তর বালেশ্বর ও গঞ্জাম দুর্ভিক্ষে বিশেষভাবে পীড়িত অঞ্চল। পুরী ও কটক জেলার কতকগুলি অঞ্চল বন্যা-বিধ্বস্ত। এবার বন্যায় ৫ লক্ষ একর জমির শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র ও প্রাচীন কংগ্রেস নেতা স্বামী বিচিত্রানন্দ দাস "উড়িষ্যা রিলিফ কমিটি"র সম্পাদক। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার জন্য তিন লক্ষ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন। তথাপি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি হইতে রিলিফ, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই।

বালেশ্বর পুরী, কটক ও গঞ্জাম জেলার কংগ্রেস-নেতারা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে 'গ্রামোন্নয়ন কর্ম্মপদ্ধতি'র মধ্যে রিলিফের কাজ ও আন্দোলন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান দেন।

আলোচনার সময় বহু প্রাদেশিক নেতা রিলিফের কাজ সরকারের সহিত সহযোগিতা—এই অজুহাতে বিরোধিতা করেন। গান্ধীসেবা সংঘের একজন নেতা ব্যক্তিগত ভাবে বলেন—রিলিফ তো কমিউনিষ্টদের জনপ্রিয় হইবার শ্লোগান!

রিলিফের কাজ ও বন্যাপীড়িত জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়া যে উড়িষ্যার গোপবন্ধু উৎকলমণি সারা প্রদেশের নেতা হইয়াছিলেন, সেখানে রিলিফ ও জনসেবা ছাড়া আর দেশপ্রেমের ভিত্তি কোথায়? মফঃস্বল জেলার কংগ্রেস নেতাদের দেশপ্রেমিক আবেদনে সমস্ত প্রাদেশিক নেতা শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন—রিলিফের কাজ কংগ্রেসসেবীদের বারণ তো নয়ই, এই ধরণের কাজ প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-সেবীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিবেন।

কমিউনিষ্ট বিতাড়ন চলিবে না

একজন কংগ্রেস-সোশালিষ্ট বিষয় নির্বাচনী সভায় কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্টদের তাড়াইবার কথা উত্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ও অপরাপর কংগ্রেস নেতা সমস্বরে বলিয়া উঠেন,— **তাঁহারা কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন; কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ বাড়াইবার জন্য তাঁহারা সভায় আসেন নাই।**

সমস্ত জেলার কমিউনিষ্ট কংগ্রেস-সেবীদের সম্মেলনে ডাকা হইয়াছিল কিন্তু পুরী জেলার কমিউনিষ্টরা বাদ পড়িল কেন—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন একজন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা। উদ্যোক্তারা সকলেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন—কমিউনিষ্টদের বাদ দেওয়ার কোন নীতিই আমরা গ্রহণ করি নাই। পুরীর পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র নিজের কমিউনিষ্ট-বিরোধী মনোভাব একাই গোপনে চাপিয়া রাখিলেন।

গান্ধীজি বলেন

খাদ্য কমিটিতে যাওয়া উচিত

"মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সরবরাহের তাগিদ ও আদায় ও সরকারী রেশন ব্যবস্থার উপরেই যখন আজকাল মানুষের জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন জনসাধারণকে সাহায্য করিবার ও দুর্গতির হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিভিন্ন 'খাদ্য কমিটি ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগদান করিতে দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?" মাদ্রাজ হইতে প্রাপ্ত এই প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেনঃ হাঁ। নিজ নিজ উদ্যোগ ও স্বাধীনতা না খোয়াইয়া জনসাধারণকে বাস্তবিক সাহায্য করিতে পারিলে তাহাদের যোগদান করিতে দেওয়া উচিত।

★ যুক্তপ্রদেশে কমিউনিষ্ট বর্জনের প্রতিবাদে ★

কংগ্রেসনেতা শ্রীপ্রকাশ ও শ্রীবাস্তব

২৩শে নভেম্বর হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশঃ যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসসেবীদের প্রতিনিধি পরিষদ কমিউনিষ্টদের বাদ দিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা সমর্থন করেন না—এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ ও শ্রীযুত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব কর্মীপরিষদের সভাপতি শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের নিকট পত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ কার্য্যকরী সমিতি হইতে পদত্যাগ করিয়া ৬ পৃষ্ঠার এক চিঠিতে জানাইয়াছেন—তিনি কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্টদের বাদ দিবার পন্থা সমর্থন করেন না। তিনি আরো প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের একমাত্র মাপকাঠি ১৯৪২-এর আগষ্টের সংগ্রামে জেলে যাওয়া নয়। তাঁহার মতে কংগ্রেসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পথ ইহা নয়। কংগ্রেস এই নীতির ফলে দুর্বলই হইবে।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব সভাপতি মিঃ ট্যাণ্ডনের নিকট পদত্যাগ করিবেন কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। চিঠিতে কর্মী পরিষদের মূল নীতির সহিত তাঁহার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। কংগ্রেসের কোন অংশকে বাদ দেওয়ার নীতি তিনি মোটেই সমর্থন করেন না। তিনি লিখিয়াছেন—আগষ্ট প্রস্তাবের কার্য্যকরী অংশের বিরোধী হইলেও তিনি জেলে গিয়াছিলেন। শ্রীবাস্তব আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন,—বোম্বাই কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে যেভাবে কমিউনিষ্টদের বাদ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে জনসেবার সাধারণ কাজকর্মে এই প্রদেশে ও অন্যত্র একযোগে কাজ না করার মনোভাব দেখা যাইতেছে।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের বিবৃতি

বাংলার কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল গত ১০ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—বাংলার কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ কার্য্যকরী সংসদে দলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার অভিসন্ধি না রাখিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যথাসম্ভব প্রশস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিধ্বস্ত বাংলাকে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে গ্রাম উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি যে কাজগুলি একান্ত প্রয়োজন তৎসমুদয় আরো সক্রিয় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সহিত অনুসরণ করিতে হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান জনসেবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া অনুরূপ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে তাহাদের সহিত একযোগে কাজ করিতে হইবে।

লীগ, কমিউনিষ্ট, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি দলগুলির সহিত যোগাযোগ না রাখার জন্য সমস্ত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা আরো অসময়োচিত এবং আত্মঘাতী বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই ওয়ার্কিং কমিটীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং কংগ্রেসের ছদ্ম আবরণে এখনও সেই বিদ্রোহ বজায় রাখিয়াছে। তাহাকে ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না।

পরিশেষে তিনি বাংলার সকল কংগ্রেসকর্মীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন,—সকল কংগ্রেসকর্মীই যেন নিজেদের বিচারবুদ্ধি এবং স্থানীয় অবস্থার মাপকাঠিতে সমস্ত বিষয়টা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন এবং সমগ্রভাবে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। দলগত প্রাধান্যের ফলেই যে বাংলায় কংগ্রেসের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই দলগত প্রাধান্যের অবসান ঘটাইতে হইলে বিনা-প্রতিবন্ধকে প্রাথমিক সদস্যদের তালিকাভুক্ত করার পর নীচের দিক হইতে কংগ্রেস কমিটি সমূহের পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হইবে, উপর হইতে উহা চাপাইয়া দিলে চলিবে না।

● ঘটনা ও রটনা ●

"অখণ্ড" বিশ্ববিদ্যালয়

এসেম্বলির একটী প্রশ্নোত্তরে জানা গেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেরানী, কম্পোজিটর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি সমস্ত মিলিয়ে মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১১১৮। তার মধ্যে মুসলমান মাত্র ৭৮ জন, অর্থাৎ শতকরা সাত ভাগ। আর বাংলা দেশের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ বাসিন্দা মুসলমান।

আমার লেখা এই পর্যান্ত পড়লেই ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ হাঁ হাঁ করে বলে উঠবেন—'কি করব যোগ্য মুসলমান পাওয়া যায় না স কি আমাদের দোষ? তারা উপযুক্ত হলে চাকরী দিতে তো কোনো আপত্তি নেই!'

দু দিকের যুক্তিই খুব ধীরভাবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর ভেবে দেখা দরকার।

১৮৭ বছর ধরে ইংরেজ শাসন। তাকে আমরা উচিত গালাগাল দিই যে, এতদিনের কর্ত্তৃত্বে দেশের মধ্যে শতকরা দশ জনও ভাল করে নাম সই করতে শিখল না। বিলাত বা অষ্ট্রেলিয়া থেকে যখন মোটা মাইনের 'বিশেষজ্ঞ' এনে আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয় তখন আমরা বলি—'দেশের মধ্যে কি লোক ছিল না—না হয় একটু নিরেসই হ'ত তবু দেশের লোকই তো!' আমাদের এ দাবী যে ন্যায্য তা সবাই মানবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স হ'ল ৮৭ বছর, ইংরেজ রাজত্বের চেয়ে একশো বছর কম। সেখানকার চাকরী-বাকরী তথা শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দুদের কর্ত্তৃত্বই মোটের ওপর চলে আসছে। এখন মুসলমান যদি জিজ্ঞাসা করে—৮৭ বছরের কর্ত্তৃত্বেও শতকরা সাত জনের বেশী মুসলমানকে উপযুক্ত করে নিতে পারলে না কেন,—তখন আমরা তার কি জবাব দেব?

আমরা মুসলমানকে জবাব দিই যে. তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজে কর, আমার ব্যবস্থা আমি করছি, তোমাকে কিছু সাহায্যও করছি। ইংরেজও তো আমাদের সেই জবাবই দেয়! কিন্তু তাতে আমরা চটি কেন?

শ্যামাপ্রসাদ বাবুরা এক মুখে বলছেন—মুসলমান তুমি নিজেকে উপযুক্ত কর, অর্থাৎ নিজের ব্যবস্থা নিজে কর। আর এক মুখে বলছেন—বাংলার হিন্দু-মুসলমান সব এক, এক জাতি, কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ১১১৮ আর ৭৮-এর পার্থক্য যে মুসলমানেরা চোখের সামনে অনবরত দেখছে এবং সে পার্থক্য তো শ্যামাপ্রসাদ বাবুদেরই কীর্ত্তি!

●

৮৭০০ বছরের পরিকল্পনা

এই সূত্রে তপশিলীদের কথা মনে পড়ল। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে ১৩০৲ টাকার গ্রেড (অর্থাৎ এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার ইত্যাদি) থেকে আরম্ভ করে ৩০০—১০০০৲ টাকার গ্রেড পর্য্যন্ত মোট চাকরীর সংখ্যা ৫২২। তার মধ্যে তপশিলী জাতির লোক আছেন মাত্র ৫ জন।

মুসলমানেরা না হয় মুসলমানই! কিন্তু তপ-শিলীরা তো আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজেরই অংশ, তাদের উন্নতির জন্যে সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই দায়ী হওয়া উচিত। ৮৭ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর পরেও অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় এদের আমরা এমনই 'উপযুক্ত' করে তুল্লাম যে আমরা হলাম ৫০০টা সরকারী চাকরীর উপযুক্ত আর এরা হল মাত্র ৫টার উপযুক্ত, অর্থাৎ শতকরা এক! কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও ১১১৮ জন চাকুরের মধ্যে তপশিলী মাত্র ১০ জন, অর্থাৎ সেখানে শতকরা একেরও কম। অথচ বাংলা দেশের মোট হিন্দুর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগই তপশিলী! এর পরেও তপশিলীরা যদি বলে যে বুঝেছি তোমরা আমাদের নীচেই রাখতে চাও—আমাদের অধিকার ও উন্নতির জন্যে আলাদা নির্বাচন, আলাদা ব্যবস্থা চাই—তাতে আপত্তি করবার সাহস কার থাকতে পারে?

গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন কলেজে মোট ১২২ জন অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ২ জন তপশিলী। ১৪ জন প্রিন্সিপাল তার একজনও তপশিলী নন।

তবু একজন তপশিলীকে প্রিন্সিপাল করবার কথা উঠলেই আমাদের বুক ফেটে যাবে। আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পদের জন্যে তপশিলী প্রার্থীদের আবেদন করার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, তাতেই "ন্যাশনালিষ্ট", "আনন্দবাজার" প্রভৃতি সব রে রে করে উঠেছে। অবশ্য আর্ট স্কুলের মত বিশেষ ব্যাপারে তপশিলী প্রিন্সিপাল খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে, গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল অন্য কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদ তপশিলী প্রার্থীকে দেওয়া কিন্তু তাতেও যে সমান শোরগোলই উঠবে তা বলা বাহুল্য।

৮৭ বছরে যদি আমরা মুসলমান ও তপশিলীদের আমাদের তুলনায় শতকরা এক ভাগ "উপযুক্ত" করে তুলতে পেরে থাকি তবে আমাদের সমান করে তুলতে তো ৮৭০০ বছর লাগবে!

●

নোয়াখালি থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন—শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ন্যাশনালিষ্ট কাগজের জন্যে এত কোটা পাওয়া খুবই রহস্যজনক তা মানছি কিন্তু সম্প্রতি সব সাপ্তাহিক প্রভৃতির সাইজ কমানোর হুকুম হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের 'জনযুদ্ধ" ৮ পেজই থাকল কি করে?

যে সব পত্রিকা মিলের কাগজে ছাপা হয় সাইজ কমানোর হুকুম শুধু তাদেরই ওপর যে সব সাপ্তাহিক বাইরের আমদানী নিউজ প্রিণ্টে ছাপে (যেমন সাপ্তাহিক "দেশ") তাদের সাইজ ঐ হুকুমের আমলে পড়ে না। জনযুদ্ধ নিউজ প্রিণ্টে ছাপা হয় তাই সাইজ কমাতে হয়নি।

● কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট ●

লেখক
পি, সি, জোশী

কারামুক্তির পর গান্ধীজি যখন ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের নিন্দা করিয়া এবং সম্মানজনক আপোষের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বড়লাটের নিকট চিঠি লেখেন, পরে তিনি আবার যখন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়া মিঃ জিন্নার নিকট পত্র দেন, তখন দেশভক্তদের মহলে বলাবলি শুরু হয়, গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে কমিউনিষ্টরা এতদিন যে-সব কথা বলিয়া আসিয়াছে, গান্ধীজী স্বয়ং আজ সে-কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গান্ধী-জিন্নার আলোচনার ব্যর্থতার পর কয়েকটী প্রদেশে কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস হইতে বাদ দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও কেহ বড় একটা আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। ৯ই আগষ্ট এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পর কংগ্রেস সোশালিষ্ট ও তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা কংগ্রেসের ছদ্ম আবরণ গ্রহণ করে এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য মিথ্যা প্রচার করে যে, কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণ গান্ধীজীর নূতন নেতৃত্বে যতখানি আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছে, কমিউনিষ্ট বিতাড়নের নীতিতে তার অর্দ্ধেকও অবাক হয় নাই।

কমিউনিষ্টরা গান্ধীজীকে দলে টানিতে পারিয়াছে, কিংবা, জরাগ্রস্ত এবং অসুস্থ গান্ধীজী স্পষ্টভাবে ও সাহসিকতার সহিত চিন্তা করিতে পারেন না—কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের এই সব প্রচার স্পষ্টতই মিথ্যাপ্রসূত।

গান্ধীজী আজ মুক্ত, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য নেতারা আজও জেলে। দেশবাসীর জীবনে দুর্দ্দশা আজ চরম, কিন্তু দেশভক্তরা অসহায় বোধ করিতেছে। এই মহাযুদ্ধে পৃথিবীর ভাগ্য বহু যুগের জন্য নির্দ্ধারিত হইতেছে, কিন্তু ভারতের ভাগ্য আজও তাহার নেতৃবৃন্দের হাতে আসে নাই; আজ তাই এক সঙ্গে চলার, গভীরভাবে চিন্তা করার এবং আমাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে আমাদের স্থান

এই সঙ্কটের দিনে আমরা কমিউনিষ্টরা যখন দেখি আমাদেরই সহকর্ম্মী কংগ্রেসভক্তরা আমাদের বর্জন করিতেছেন, তখন কংগ্রেসের পক্ষে বা আমাদের পক্ষে কিংবা আমাদের উভয়েরই প্রতিপালক জনসাধারণের পক্ষে এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য আদৌ লঘু নয়। শুধু মাত্র কংগ্রেস নয়-সমগ্র দেশবাসীর জীবনেই এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল যে-কোনো খাঁটি দেশভক্তই স্বীকার করিবেন:

১। কংগ্রেস দেশের সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং দেশবাসীর সেবা করিয়া ও দেশের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে নিজ সংগঠনের মধ্যে স্থান দিয়া কংগ্রেস আজ শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে;

২। কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি। কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের বাদ দিলে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস্, কে, পাতিলের মত এমন উগ্র কমিউনিষ্ট-বিরোধী দ্বিতীয় আর কেহ নাই। আমাদের বিতাড়ন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে, আমাদের শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মত্যাগ তাঁহারও ঈর্ষ্যার বস্তু।

৩। হিন্দু এবং মুসলমান দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অংশ আজ আমাদের পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীযুক্ত এস্, কে, পাতিল আমাদের সাংগঠনিক কৃতিত্বের জন্য ঈর্ষ্যা বোধ করেন; আর শ্রীযুক্ত কে, এম্, মুন্‌শী ঈর্ষ্যা বোধ করেন আমাদের বুদ্ধিমত্তার জন্য।

"......ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি খুবই সংগঠিত; কমিউনিষ্ট প্রচারকার্য্যে ও কায়দাকানুনে সুদক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতারা এই পার্টির নেতৃত্ব করেন। ইঁহাদের শৃঙ্খলা অতি চমৎকার......

(১০।১১।৪৪ তাং "দি সোশাল ওয়েলফেয়ার"-এ শ্রীযুক্ত মুন্সীর বক্তব্য)

৪। একমাত্রআমাদের পার্টির মধ্য দিয়াই কৃষক-শ্রমিকের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এবং যুবক ছাত্রেরা শুধু যে নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা এবং ছাত্র-ইউনিয়নের সংগঠক হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই নয়; রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরেও তাহারা উন্নত হইয়াছে।

৫। একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া বৃদ্ধা হইতে তরুণী পর্য্যন্ত বিভিন্ন রকমের এত অধিক সংখ্যক মহিলা সংগঠক আর কোন দলেই নাই।

৬। ১৯৩০-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়া যে-সব বামপন্থী সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ১৯৪০ এবং তারপরে সে-সব দল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। একমাত্র আমাদের পার্টিই ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং আজ নিজের শক্তির বলে আমাদের পার্টিই কংগ্রেস এবং লীগের পরেই দেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

দেশ উভয় সংগঠনকেই চায়

ইহাই যখন কংগ্রেস এবং আমাদের পার্টির ইতিহাস, তখন কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট দলাদলিতে সুবিধা হইবে কাহার? একমাত্র আমাদের উভয়ের শত্রুই লাভবান হইবে। ভারতবর্ষের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। নিজেদের মধ্যে কলহ করিলে ভারতের মুক্তির জন্য কি করিয়া আমরা লড়াই করিব? আমাদের মধ্যে যে-পক্ষ প্রথম বিসম্বাদের পথে পা বাড়াইবে, সে-পক্ষই ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের সহযোদ্ধাকেই আঘাত করিবার এবং জাতীয় আন্দোলনের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার অপরাধে অপরাধী হইবে। পরাধীন দেশে পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিবার মত সহজ কাজ আর কিছু নাই। এতদিন ধরিয়া আমরা ইহাই করিয়া আসিতেছি এবং তাহারই ফলে আজও আমরা দাস। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা এবং স্বাধীনতার সমস্ত সৈনিককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা অনেক বেশী কঠিন কাজ। এই কংগ্রেসই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছে। এই কংগ্রেস-নেতাদেরই নিকট হইতে দেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা আমরা পাইয়াছি। যে ব্রতকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন সেই ব্রতকে সার্থক করার কাজেই, তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করিবার অধিকার হইতে তাঁহারাই আজ আমাদের বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন। কংগ্রেসের মধ্য হইতেই আমাদের জন্ম; কংগ্রেসনেতারাই আমাদের রাজনৈতিক গুরু এবং কংগ্রেস-অনুগামীরা আমাদেরই সহযোদ্ধা।

প্রবীণ সহযোদ্ধাদের নিকট আবেদন

চল্‌তি কথায় পরিণতবয়স্কেরা হন ধীরস্থির এবং যুবকেরাই থাকে অস্থিরচিত্ত, নবীন সংগঠনগুলিই হয় ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন, আর পুরাতন সংগঠনগুলি থাকে সহনশীল। আজ যখন কংগ্রেসের ভিতর আমাদের গুরুজনেরা বক্তব্য বুঝাইয়া বলিবার সুযোগ না দিয়াই আমাদিগকে হঠাৎ বাদ দিবার সিদ্ধান্ত লইতে চান, তখন তাঁহাদের সম্মুখে নতজানু হইয়া এই অনুরোধ জানাইবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়াই মনে করি:

আপনারা বিবেচনা করুন, বার বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, কী সিদ্ধান্ত আপনারা গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন। যে-কোনো প্রশ্নই আমাদের জিজ্ঞাসা করুন, এবং আমরা আপনাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। যদি মতবিরোধ হয়, বার বার আমরা আলোচনা করিব, কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারি না।

আমরা অধীর হইব না; কারণ, শুধু নিজেদেরই নয়, কংগ্রেসভক্তদের দেশপ্রেমেও আমাদের গভীর বিশ্বাস রহিয়াছে। আমরা জানি যে, শুধু মাত্র কংগ্রেসভক্তদের ভ্রান্ত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত দেশপ্রেমের সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে নবীন দল হওয়া সত্ত্বেও আমরা ধৈর্য্যশীল, কারণ, আমাদের এই স্বল্পপরিসর জীবনের সারা সময়ই আমরা ভ্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছি। আমাদের পার্টিকে আজিকার দিনের এই উন্নত অবস্থায় আনিবার জন্য অপরের কমিউনিষ্ট-বিরোধী সংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়িতে হইয়াছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা শিখিয়াছি যে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং দেশপ্রেমের জন্য সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। আমরা আরও শিখিয়াছি যে, এই সংগ্রামে জয়লাভ দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ।

তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসসভ্যদের অভিযোগ কি এবং কি জন্যই বা তাঁহারা আমাদের বাদ দিতে চান?

আমাদের সমালোচকদের বক্তব্য

আমাদের সমালোচকদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমতঃ, একদল আমাদের সহিত তাঁহাদের "মূল নীতির বিরোধ" উপস্থিত করেন। তাঁহাদের ধারণা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহিত কমিউ-নিজ্‌মের কোনোই মিল নাই, সুতরাং মিটমাটও অসম্ভব। আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করি—আমাদের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহাদের মোক্ষম যুক্তি।

দ্বিতীয় দলের সমালোচকদের বক্তব্য আরো অনেক সুনির্দ্দিষ্ট। আগষ্ট-প্রস্তাবকে কার্য্যকরী না করিয়া আমরা কংগ্রেসকে পিছন হইতে ছুরি মারিয়াছি (এস্, কে, পাতিল),—আমাদের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহাদের অভিযোগ।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে আজ গভীর চিন্তা শুরু হইয়াছে। জেলের বাহিরে আসিয়া কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ ৯ই আগষ্টের পরবর্ত্তী সময়ের 'ঘটনাবলীকে বিচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন'—যাহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের বিভিন্ন দল কি কাজ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন এবং কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা ঠিক করিতে পারেন। এই দিক হইতে এই চিন্তা, আলোচনা, অবস্থা অনুধাবন করা এবং এই কাজ করার জন্য আগ্রহ খুবই শুভ লক্ষণ। ঠিক এই মনোভাব লইয়াই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি—যাহাতে আমাদের বক্তব্য বুঝাইয়া বলিতে পারি, তাঁহাদের বক্তব্যও আমরা বুঝিতে পারি এবং আমরা সবাই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা

প্রথমতঃ, 'মূল নীতির বিরোধ' লইয়াই আলোচনা করা যাউক। আমাদের কমিউনিষ্ট মতবাদের জন্য আমরা লজ্জিত নই, বরং এইজন্য আমরা গৌরব অনুভব করি। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, অর্থাৎ, স্বাধীন, সমানাধিকারসম্পন্ন জনগণের দুনিয়াব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে এই মতবাদই আমাদের অদম্য প্রেরণা দিয়াছে। আমাদের প্রাচীন জাতি আজও পরাধীন, কেবলমাত্র ইহার জন্যই আমরা লজ্জা বোধ করিয়া থাকি। কমিউনিজ্‌ম্ আমাদের এই কর্ত্তব্যই শিখাইয়াছে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে। আমাদের পার্টি শুধু এই কাজই শিখাইয়াছে যে, সমস্ত দেশপ্রেমিকের সহযোগিতায় ভারতের মুক্তির জন্য যুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা কমিউনিষ্টরা শুধু এই দাবী করি যে, আমাদের নীতি দেশপ্রেমিক এবং এই নীতিকে কার্য্যকরী করার জন্যই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি। দেশবাসীর কাছে আমাদের একটি মাত্র অনুরোধ—কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আপনা-দের ধারণার দ্বারা বিচার না করিয়া আমরা কি বলি এবং কি করি তাহার দ্বারাই আমাদের বিচার করুন।

যাঁহারা বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহিত কমিউনিজ্‌মের কোনো মিল নাই, তাঁহারা হয় অজ্ঞ, না হয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বর্ত্তমান ইতিহাসকেই বিকৃত করিতেছেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন হইতেই ভারতীয় কমিউনিজ্‌মের জন্ম। আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা ১৯১৯-২০ সালের কংগ্রেসী বা খিলাফৎ-আন্দোলনের কর্ম্মী ছিলেন কিংবা পুরানো সন্ত্রাসবাদী দলগুলি হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন।

পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হউক—ইহাই ছিল আমাদের পার্টির সর্ব্বপ্রথম আওয়াজ। ১৯২০-২৯ সালে আমাদের জাতীয় নেতাদের যুক্তি ছিল, 'স্বরাজকে' ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে তাঁহাদের মনে এই আশা ছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সহজেই লাভ করা যাইবে এবং ইহাই ভাল।

আমরা যখন চাপ দিলাম যে, কৃষক এবং শ্রমিকের প্রাথমিক দাবীগুলিকে কংগ্রেসের নিজের দাবী বলিয়া গ্রহণ করা হউক, তখন আমাদের এই যুক্তি দেখান হইত যে ইহার ফলে কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, কারণ মিলমালিক এবং জমিদারেরা ভয় পাইয়া সরকারের সঙ্গে যোগ দিবে এবং ফলে সরকারই শক্তিশালী হইবে। আমাদের আশ্বাস দেওয়া হইত, কংগ্রেসের হাতে শ্রম-জীবীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং স্বরাজ লাভের পরই তাহাদিগকে তাহাদের দাবীর উপরও অনেক কিছু দেওয়া হইবে।

যখন আমরা এই যুক্তি তুলিলাম, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার জন্যই শ্রমিক-কৃষকের দাবী গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং শ্রমিক-কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া স্বরাজ লাভ অসম্ভব, তখন আমাদের বলা হইল: বাগাড়ম্বর না করিয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা রাখ এবং বিদেশী কেতাবের শেখানো বুলি আওড়াইও না।

যে-নীতি আমরা প্রচার করিয়াছি, তাহাই কাজে পরিণত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের ডুবাইয়া দিয়া আমরা দেশের বৃহত্তম ধর্ম্মঘট-আন্দোলনকে সংগঠিত করিয়াছি এবং জঙ্গী গণ-ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের গোড়া পত্তন আমরাই করিয়াছি। পাঠ-চক্র পরিচালনা করিয়া আমরাই প্রগতিশীল যুবকসম্প্রদায়কে সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়াছি। কমিউনিজ্‌ম্ ভারতের মাটীতে শিকড় গাড়িতে পারে না—এই সংস্কারকে আমরা নির্ম্মূল করিয়াছি এবং যে-সব বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের বাক্যবাগীশ বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন, তাঁহাদের আমরা স্তব্ধ করিয়াছি।

১৯২০-২৯ সালে আমরা সাধ্যানুযায়ী যে-সব দাবী প্রচার করিয়াছিলাম, ১৯৩০ সালে ও তৎ-পরবর্ত্তী সময়ে কংগ্রেস ধাপে ধাপে সে-সব দাবীকেই গ্রহণ করিয়াছে—ইহা আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি।

স্বায়ত্ত শাসনের দাবী মানিয়া লইবার জন্য কংগ্রেস এক বছরের যে-চরম পত্র দিয়াছিল, তাহার সময় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃঃ দেখুন)

জনসেবাই দেশভক্তির কষ্টিপাথর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

লাহোর-অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিজ উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

১৯৩০ সালের আন্দোলনব্যর্থ হইবার পর কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের মূল দাবী স্বীকার করিয়া 'মৌলিক অধিকারে'র প্রস্তাব গ্রহণ করে।

যুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনে আমাদের অবদান

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ফাঁসিয়া যাইবার পর এবং ১৯৩২-৩৪ সালের দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন নূতন পথে অগ্রসর হয় এবং নিজ নীতিকে নূতন রূপ দেয়, তখন তাহাতে আমরা কমিউনিষ্টরা দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানাইয়াছি। নেহ্রু চাহিয়াছিলেন যে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধীই কংগ্রেসকে দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করুন এবং ভারতীয় জনগণের যুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিবার কাজে সাহায্য করুন। আমরা দাবী তুলিয়াছিলাম যে, উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে সমষ্টিগত হিসাবে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য (collective affiliation) কংগ্রেসকে স্বীকৃত হইতে হইবে। নেহ্রু আমাদের এই প্রস্তাবে রাজী হন; কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের অপরাংশ রাজী হন নাই।

সে যাহা হউক, নেহ্রুর প্রেরণায় কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষককর্ম্মীরা একই সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেস-কমিটিগুলিও শ্রমিককৃষক-আন্দোলনের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাহাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম সমর্থন করিতে শুরু করেন। এই একতার ফলে উভয়েই শক্তিশালী হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার অভূতপূর্ব্ব শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা এমন বিরাট আকার ধারণ করে যাহার তুলনায় পূর্ব্বের সংখ্যা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সমগ্রভাবে জাতীয় আন্দোলনই শক্তিশালী হয়। কংগ্রেস-সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা মজ্বুত করিবার কাজে আমাদের পার্টি যথাসাধ্য করিয়াছে। কংগ্রেস ও দেশবাসীর প্রতি এই দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের পার্টি ক্রমশঃ দেশের জাতীয় জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বর্দ্ধিষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বাড়িতে থাকে—ইহার আগে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র দল বলিয়া পরিগণিত হইতাম। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই আমাদের পার্টি বামপন্থী দলগুলির মধ্যে নেতা হিসাবে গড়িয়া উঠে। যখন সুভাষ বসু কংগ্রেসকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন, তখন আমরা তাঁহার নিজ প্রদেশ বাংলাতেই তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি। যখন জয়প্রকাশ নারায়ণ আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার দলের সমস্ত সভ্যই আমাদের পার্টিতে চলিয়া আসেন।

ঐক্যের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধ বাধার পর মাতৃভূমির নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতাই আমাদের সম্মুখে জরুরী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষমতা তখন আমলাতন্ত্রের হাতে; অথচ এই সঙ্কটজনক অবস্থায় দেশশাসনের ভার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের হাতে থাকাই একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। গত কয়েক বছরে কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক তেমনি লীগের শক্তিও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লীগ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের কিছু কিছু লোকের একটি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসভক্তের মনে কিন্তু এই পুরাতন ছবিই জাগিয়া রহিল।

লীগ যখন পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করে এবং তাহার পতাকাতলে মুস্লিম জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, তখন আমরাই প্রথম লীগের এই বিরাট পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করি ও স্বীকার করি। আমরা পার্টির মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা চালাইতে থাকি। ১৯৪১-৪২ সালে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মুস্লিম লীগ একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান ও মুস্লিম জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; লীগের পাকিস্তানের দাবী আত্মনিয়ন্ত্রণেরই দাবী, এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত ফ্রণ্ট এখনই গড়িয়া তোলা দরকার। আমরা প্রথম যখন কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য আন্দোলন শুরু করি, তখন আমাদের বিরুদ্ধে এই সস্তা যুক্তি দেখানো হয় যে, আসন্ন "জাতীয় সংগ্রামে" যোগ না দিবার অজুহাত হিসাবেই এই অসম্ভব আওয়াজ আমরা তুলিয়াছি। দুই বছর পরে সংগ্রামের ব্যর্থতার পর চিন্তাশীল দেশভক্তরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যই আজ একমাত্র বাস্তব পথ। দুই বৎসর আগে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে এ, আই, সি, সি'-র অধিবেশনে "সংগ্রাম" আরম্ভ করার ব্যাপারে যেমন ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আপোসরফার জন্য গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময়ও তেমনি আগ্রহ-উদ্দীপনা সারা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

আরো উন্নত মার্ক্সীয় জ্ঞান চাই

কমিউনিষ্টরা নেতৃত্ব দেয়, আর কংগ্রেস তাহারই অনুসরণ করে, এই কথা বলিবার জন্যই আমি উপরের ঘটনাবলীর উল্লেখ করি নাই। আমি জানি, কংগ্রেসভক্তরা দেশব্যাপী বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফলেই ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে কংগ্রেসভক্তরা যে-সব জিনিস পরবর্ত্তী কালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মার্ক্সবাদের সাহায্যে আমরা কমিউনিষ্টরা পূর্ব্বেই সেই সব জিনিস বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ, আমরা নিজেদের মধ্যে এবং পার্টির মধ্যে প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকি—মার্ক্সবাদের জ্ঞান যদি আমাদের আরো বেশী থাকিত এবং পার্টি যদি ইহার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হইত, অর্থাৎ এক কথায় আমরা যদি আরো ভালো কমিউনিষ্ট হইতে পারিতাম, তাহা হইলে জাতির জীবনের কত দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনার অগ্নিপরীক্ষাই না এড়ানো যাইত, জাতীয় আন্দোলনকে আরো কত তাড়াতাড়িই না আমরা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইতাম।

যে-সব সমালোচকেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রচার করেন, আমরা কমিউনিষ্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী শক্তি, তাঁহাদের জবাব দিবার অভিপ্রায়েই উপরের তথ্যগুলিকে আমি উল্লেখ করিলাম। জাতীয় আন্দোলনের যে-ধারাকে আমি উপরে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা হইতে কি বোঝা যায়? আমার বর্ণনার মধ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বাহিরের শক্তি হওয়া দূরের কথা, আমরা জাতীয় আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; এই আন্দোলনকে পিছনের দিকে টানা দূরে থাক, ইহাকে সম্মুখের পথে ঠেলিয়া লইবার জন্যই আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি; এবং এই আন্দোলনকে খণ্ডবিখণ্ড করার বদলে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে বেশী ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্যই আমরা লড়াই চালাইতেছি।

আজ সবাই এই কথা জানে যে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ—এই তিনটি জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা। ইহার পিছনে দীর্ঘ বিশ বছরের নীতিগত তর্কবিতর্কের ইতিহাস রহিয়াছে। **যাঁহারা সত্যের মর্য্যাদা দেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে কংগ্রেস পরবর্ত্তী কালে যে সব নীতিকে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেই সব নীতি যাঁহারা প্রথম প্রচার করিয়াছেন কমিউ-নিষ্টরা তাঁহাদের অন্যতম।**

সমালোচকেরা যে আমাদের কংগ্রেসের মধ্যে একটি বিরোধী শক্তি বলিয়া মনে করে, ইহাতে কি তাহাই প্রমাণিত হয়, না, কংগ্রেসের সাহসী ও শক্তিমান সন্তান হিসাবে আমরা আজ যে-দাবী করি, তাহাই ঠিক?

'আমরা পারি না' নয়, 'আমরা পারি'

সাম্প্রতিক ইতিহাস একটু বিচার করিলেই অধিকাংশ কংগ্রেসভক্তরা উপরোক্ত বক্তব্য স্বীকার করিবেন। কিন্তু তৎপরেই তাঁহারা এই প্রশ্ন তোলেন: তোমরা এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলাতেই আসল গোলমাল শুরু হইল। কথাটা ঠিক। প্রশ্নই হইল এই, কি ভাবে এই সমস্যার আলোচনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া সম্ভব করা যায়।

মৌলিক বিষয় লইয়া আলোচনা করার মত স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। যখন আমরা ইহাকে 'জনযুদ্ধ' বলি, তখন আমরা একটা দুনিয়াজোড়া ঐতিহাসিক ঘটনার আসল চেহারা বর্ণনা করি মাত্র। যদি সংক্ষেপে আমি বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে কি ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সমগ্র গতিরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলে কংগ্রেসভক্তরা বলিবেন, নিজের দেশের চেয়ে আমি দুনিয়া লইয়াই যেন বেশী ব্যস্ত। ভারতবর্ষ পরাধীন থাকা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' হইতেই পারে না। ইহার উত্তরে যদি বলি "আপনি এখনও উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় ডুবিয়া আছেন আপনি মনে করেন বৃটেনের বিপদে ভারতের সুযোগ, আসলে দুনিয়া বদ্লাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি আজও সেকেলে ধারণা আঁকড়াইয়া সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদীই রহিয়া গিয়াছেন"—এই কথায় কংগ্রেসসেবী মনে করিবেন আমি তাঁহাকে গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছি।

যখন স্বাধীনতাযুদ্ধের সহযোদ্ধারা একই যুগান্তকারী ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করেন, তখন প্রকৃষ্ট পথই হইল পরস্পরের মতকে প্রত্যক্ষ কাজের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখা, কি ভাবে আমরা উভয়েই বাস্তব অবস্থা বিচার করিয়া জনগণের সেবার কাজে অগ্রসর হইয়াছি তাহা দেখা।

হিটলার যখন সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, কংগ্রেসভক্তরা তখন বলিলেন: 'সোভিয়েটকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা নৈতিক সহানুভূতি দেখাইতে পারি মাত্র।' আজ তিন বছরেরও বেশী সময় কাটিয়া গিয়াছে। এই কথা কি আজ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই যে, সোভিয়েটকে সাহায্য করাটাই সমস্যা ছিল না। কারণ নিজেকে বাঁচাইবার মত ক্ষমতা সোভিয়েটের তো আছেই এবং তাহার চেয়েও বেশী কিছু করিবার শক্তিও সোভিয়েট রাখে। সোভিয়েট সম্বন্ধে কংগ্রেসভক্তদের কত ধারণাই না আজ শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

জাপানীরা যখন আমাদের সীমান্তে আসিয়া হানা দেয়, কংগ্রেসভক্তরা বলেন: জাতীয় সরকার না হইলে আমরা দেশ রক্ষা করিতে পারিব না, জওহরলালের ১৯৪২ সালের জাপবিরোধী উক্তিগুলিও যেন আর পছন্দ হয় না। শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ দেশকে মুক্ত করিবার একটি পথ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আজ আমাদের দেশ কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে?

খাদ্যসঙ্কট যখন দেখা দিল অধিকাংশ কংগ্রেস-ভক্তই বলিলেন, সরকারের সহিত আমরা সহযোগিতা করিতে পারিব না। আজ এই কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট নয় কি যে, কার্য্যতঃ এই নীতি জনসাধারণকেই ভাগ্যের হাতে এবং আমলাতন্ত্র ও মুনাফাখোরের পায়ের তলায় সঁপিয়া দিয়াছে?

স্বাধীন দুনিয়ায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য

হিটলার যখন সোভিয়েট ভূমিকে আক্রমণ করে, আমরা দেখিলাম, পৃথিবীর সম্মুখে আজ মাত্র দুইটি পথ—পৃথিবীব্যাপী ফাশিজ্ম্ অথবা স্বাধীনতা। আমরা বলিয়াছি, সোভিয়েটকে সাহায্য করাটা সমস্যাই নয়,—সমস্যা হইল ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য কি ভাবে দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের সাহায্য আমরা লাভ করিতে পারি। ফাশিজ্মের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে—এই কথাটি দেশভক্তদের বুঝাইবার মত শক্তি আমাদের ছিল না। আজ যখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই স্বাধীনতার লড়াই দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে, তখন আমাদের চোখের সামনেই ভারতের মুক্তি-আন্দোলন টুক্রা টুক্রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

জাপ-বাহিনী আমাদের দ্বারে যখন আঘাত হানিল, আমরা বলিলাম দেশের এই দারুণ দুর্য্যোগ দেশসেবী দলগুলির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগও বটে; কারণ, একই বিপদের সম্মুখে অতীতের কলহ ভুলিয়া গিয়া দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় সরকার অর্জ্জনের জন্য আমরা এক হইতে পারি। কিন্তু বিপদের দিনেও আমাদের প্রধান প্রধান দেশপ্রেমিক দলগুলির নেতারা পারস্পরিক মিলনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, বরং তাঁহারা আলাদা আলাদা ভাবে আপোস করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের মুখ চাহিয়া ছিলেন। স্বভাবতই বৃটিশ সরকার একের দাবীর অজুহাতে অন্যের দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়া উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

অর্থসঙ্কটের ফলে জিনিসপত্রের দুর্ম্মূল্যতা, অনশন এবং মহামারী যখন দেখা দিল, আমরা তখন বলিলাম রাজনৈতিক মতভেদ ভুলিয়া গিয়া জনগণের সেবায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। সমস্ত ভারতবাসীর দুর্গতির বেসাতি করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ও মিলমালিক যখন কোট কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়া সমাজজীবনে ভাঙ্গন ধরায়, তখন আমরা বলি, দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি মজুতদার এবং মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিতে পারে, তবেই এই ভাঙ্গনকে রোধ করা সম্ভব। আমরা আরও বলি, দেশভক্তরা যদি জনগণকে স্বাবলম্বনের জন্য জাগাইতে পারেন, তবে এই অনশন ও দুঃখযন্ত্রণার হাত হইতে রেহাই পাওয়া সম্ভব। আমাদের কাজ হইতেই আমরা দেখাইলাম দেশভক্তরা যেখানে যেখানে জনসাধারণকে সমা[illegible] করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেখানে সেখানেই স্থানীয় আমলাতন্ত্র জনগণের কথা শুনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ একটি সর্ব্বব্যাপী ঘটনা। আমরা চাই বা না চাই, প্রত্যেকের ভাগ্যই এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে এবং যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহারও মূল কারণ এই যুদ্ধই।

আমরা মনে করি, কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ যুদ্ধ সম্বন্ধে নেতিমূলক মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই নেতিমূলক রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণেও তাঁহারা বাধ্য হইলেন। ভাল ভাল কথা, কিন্তু কাজের সময় নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রত্যেকটি সমস্যা সম্বন্ধেই 'কিছুই করিতে পারি না' এই অসহায় মনোভাব—ইহাই হইল পরিণতি। আমাদের স্বাধীনতা না দেওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বমুক্তির যুদ্ধে আমরা যোগ দিতে পারি না; বৃটিশ ভারত ত্যাগ না করিলে আমরা দেশরক্ষা করিতে পারি না; আমাদের নিজেদের হাতে শাসনভার না আসা পর্য্যন্ত আমরা মজুতদারী মুনাফাখোরী বন্ধ করিতে পারি না। মোট কথা দাঁড়ায় এই যে, অন্যেরা আমাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিক;

(শেষাংশ ৫ম পৃঃ দেখুন)

(৪র্থ পৃঃ পর)

কিন্তু বাস্তব জীবনে এইরূপ ঘটনা কখনই ঘটে না, ইতিহাস এইভাবে কোনো দিনও রচিত হয় না।

আমরা মনে করি, যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক। সেইজন্যই দেশের সম্মুখে আমরা একটি যথার্থ কর্ম্মপন্থা (positive policy) উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই কর্ম্মপন্থায় আমাদের আস্থা অনেক বাড়িয়াছে, কারণ অন্যান্য দেশভক্তরা আজ পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে এই দিকেই অগ্রসর হইতেছেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকাতে কী সুবিধা

দেশকে দুই বছর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। লিনলিথগো ও ওয়েভেলের মাতব্বরী গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব উভয়কেই একে একে সহ্য করিতে হইল—তবে তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের কথা ভাবিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎ সফল হয় নাই। কিন্তু কে না চায়, আবার তাঁহারা সাক্ষাৎ করুন এবং দ্বিতীয় বারে তাঁহাদের আলোচনা সার্থক হউক! বাংলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভাইবোনকে প্রাণ দিতে হইল। তাহার পর বাংলার দেশপ্রেমিকেরা ডাঃ বি, সি, রায়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া রিলিফ-কার্য্য চালাইতে রাজী হইলেন এবং শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ও সরকার-গঠিত খাদ্য-কমিটিতে যোগ দিবার জন্য বিভিন্ন জেলায় নির্দ্দেশ পাঠাইলেন।

যুদ্ধের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব অবলম্বন করিয়া অন্যান্য কংগ্রেসভক্তরা "আমরা কিছুই করিতে পারি না" এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিলেন। আর যুদ্ধের প্রতি বাস্তব ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া "আমরা করিতে সক্ষম" এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপস্থিত হইলাম। রূঢ়ভাষী হইতে চাহি না, তবুও জিজ্ঞাসা করি—কোন্ নীতি জনগণের শক্তির প্রতি বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ নীতি কংগ্রেসের ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ?

কংগ্রেসের তরুণ কর্ম্মী হিসাবেই জনগণকে আমরা ভালবাসিতে শিখিয়াছি, শিখিয়াছি জাতীয় আন্দোলনে অসীম বিশ্বাস রাখিতে। কিন্তু আমরা দেখি, কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা যুক্তি দেন যে, আমরা এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলি, অতএব আমরা জনগণের স্বার্থবিরোধী। তাঁহারা ভাবেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টা বিদেশী সরকারের হাতে থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে সাহায্য করিতে যখন আমরা বলি, তখন আমরা সরকারের দলেই ভিড়িয়া পড়িয়াছি। ইহার উত্তরে আমাদের বলিতে হয়, রাজনীতি পণ্ডিতী ন্যায়ের মত সহজ ব্যাপার নয়।

মূলকথা—জনগণের পক্ষে, না বিপক্ষে

'জনযুদ্ধ' প্রভৃতি শব্দ তাঁহারা না-ই বা ব্যবহার করিলেন, কারণ তাঁহারা এইগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রমাণ করুন, জনগণকে আমরা যে-সব কাজ করিতে বলি তাহার একটিও জনস্বার্থবিরোধী। কংগ্রেস জনকল্যাণ ও রাজনৈতিক সততার যে-আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করুন, জাতীয় আন্দোলনকে যে-সব নীতি গ্রহণ করিতে আমরা অনুরোধ করিয়াছি তাহার কোন্‌টি দেশবিরোধী; আমরা এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিয়া তাঁহাদের সন্দেহ দুর করিতে পারিব।

কমিউনিজ্‌ম্ দুনিয়া এবং তাহার ইতিহাস বুঝিবার দৃষ্টিভঙ্গী। আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি, কারণ ইহার দ্বারা নিজেদের দেশেরই ঘটনাধারাকে আমরা ভালো ভাবে বুঝিতে পারি। আমরা এই যুদ্ধকে কি ভাবে দেখি তাহা 'জনযুদ্ধ' শব্দের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়াছি। যুদ্ধের প্রকৃতি-নির্ণয় যে-ভাবে আমরা করিয়াছি, তাহার সঙ্গে অ-কমিউনিষ্টরাও একমত হইবেন, এমন আশা আমরা করি না। আমরা জানি, বৃটিশের দাসত্ব সমস্যাটিকে ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের ঘোষিত জাতীয় নীতির ভিত্তিতেই এবং সর্ব্বোপরি জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন যে-আন্দোলন আমরা চালাইয়া যাইতেছি, তাহার দ্বারাই দেশভক্তরা আমাদের বিচার করুন। হয়তো তাঁহারা আমাদের সহিত একমত হইবেন না; কিন্তু **ইহার পর নিশ্চয়ই আর তাঁহারা আমাদের দেশবিরোধী বলিবেন না; বরং বর্ত্তমান অবস্থার সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে-ভাবে দেশবাসীকে আমরা সেবা করিতেছি তাহা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধই হইবেন।**

এ-আই-সি-সির অধিবেশনে আমাদের নীতি কি ছিল?

আমাদের বিরুদ্ধে আর একটি চল্‌তি অভিযোগ এই যে, আমরা ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। প্রস্তাবের প্রধান অংশের প্রতি আন্তরিক সমর্থন আমাদের ছিল। ফাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা, সম্মিলিত জাতিসমূহের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি, জাপ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সহিংস এবং অহিংস উভয় উপায়ে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার অবিচলিত সঙ্কল্প এবং জাতীয় সরকারের দাবী—প্রস্তাবের এই প্রত্যেকটী বিষয়কেই আমরা সমর্থন করিয়াছি।

এ, আই, সি, সি অধিবেশনে উপস্থিত কর্ম্মীরা ছাড়া আর মাত্র গুটিকয়েক সক্রিয় কংগ্রেসকর্ম্মীই জানেন যে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি কি সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। কারণ, অধিবেশনের ঠিক পরেই তাঁহারা গ্রেফ্‌তার হন। কংগ্রেসকর্ম্মীদের মতামত নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য অপর পৃষ্ঠায় আমাদের সংশোধন-প্রস্তাব ও তৎসহ কংগ্রেস-প্রস্তাবের কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম সংশোধন-প্রস্তাব ছিল স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে। এ, আই, সি, সি'র অন্যতম কমিউনিষ্ট সদস্য সাজ্জাদ জাহীরকে মওলানা আজাদ আশ্বাস দেন যে, যখন এ, আই, সি, সি অধিবেশনের ঠিক পরেই গান্ধীজী জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক তখন এই সংশোধন-প্রস্তাবের দ্বারা আমরা যেন গান্ধীজীর উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ না করি। আমরা বলিয়াছিলাম, কেবলমাত্র সদিচ্ছার দ্বারাই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ন্যায্য ও গণতন্ত্রসম্মত কি না, ইহাই প্রথম বিচার্য্য। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে যদি ন্যায্য ও গণতন্ত্রসম্মত বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, যেমন আমরা করিয়াছি, তাহা হইলে মিঃ জিন্নার সহিত দর-কষাকষির প্রশ্ন উঠে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ, এমন কি, পৃথক হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া গান্ধীজির মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত, তাহা হইলেই কংগ্রেস-লীগ আপোসের সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বে শ্রমিক-কৃষকের দাবী সম্বন্ধে যেরূপ আত্মবিশ্বাসের সহিত আমরা সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, ঠিক তেমনি বিশ্বাস লইয়া এবারও সংশোধন-প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলাম; কারণ আমরা জানি, শোষিতের এই দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং দেশের ন্যায্য দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে কিছুতেই দীর্ঘ দিন অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আমাদের সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু আমাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার সময় এই বিশ্বাস আমাদের ছিল, যতই আমরা কংগ্রেসভক্তদের কাছে মুসলমানদের দাবী ব্যাখ্যা করিতে পারিব, তত তাড়াতাড়ি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই দাবী স্বীকৃত হইবে।

গান্ধীজি কর্ত্তৃক আমাদের বক্তব্য সমর্থন

গান্ধীজি তখন জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। লিনলিথগো পথ রোধ করিল। কারামুক্তির পর গান্ধীজি যখন জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গান্ধীজির নিকট হইতে আমরা ইহাই চাহিয়াছিলাম।

কংগ্রেসভক্তরা আমাদের সংশোধন-প্রস্তাবগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখুন। পড়িলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আপোস-আলোচনার সময় গান্ধীজি জিন্না সাহেবকে যাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমাদের প্রস্তাবে তাহার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। আমরা শুধু যে-সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করিবার ও ভোগ করিবার অধিকার **আছে তাহাদের জাতিগত সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম।**

আমাদের দ্বিতীয় সংশোধনটী ছিল ৮ই আগষ্ট-প্রস্তাবের কার্য্যকরী অংশ সম্পর্কে। সংগ্রামের হুম্‌কির পরিবর্ত্তে কংগ্রেস-লীগের মিলিত চেষ্টায় ৪০ কোটী ভারতবাসীকে উদ্দীপিত করার জন্যই আমরা প্রস্তাব তুলিয়াছিলাম।

মূল প্রস্তাবের আলোচ্য অংশ এবং আমাদের সংশোধনও এই পুস্তিকার অন্যত্র দেওয়া হইল।

কোনো সহযোগী কংগ্রেসভক্ত আমাদের সহিত একমত না হইতে পারেন, কারণ আমাদের বক্তব্য সেই সময় জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু, জওহরলাল নেহ্‌রু, যিনি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিংবা সর্দারজী, যিনি প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিংবা কোনো এ, আই, সি, সি, সদস্য, এমন কি কংগ্রেস-সোশালিষ্ট পর্য্যন্ত—কেহই আমাদের সংশোধন-প্রস্তাবকে জাতীয়তাবিরোধী কিংবা কংগ্রেসের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বে গান্ধীজি বক্তৃতা করেন, এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য তিনি এ, আই, সি, সি'র কমিউনিষ্ট সদস্যদের প্রশংসাই করেন।

প্রস্তাবটী কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ গান্ধীজি কখনো পান নাই। কিন্তু দুই বৎসর পরে কারামুক্তির পর জাতিকে পরিচালনা করার সুযোগ আবার যখন তিনি লাভ করিলেন, তখন তিনি কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই অগ্রসর হইলেন। এই পথই গ্রহণ করিবার জন্য ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসকে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইহাতে কি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, আমরা কংগ্রেসবিরোধী? বরং আমরা কি দাবী করিতে পারি না যে, কংগ্রেসের সুসন্তান হিসাবে আমরা সমগ্র দেশ সম্বন্ধে সমগ্র ভাবে ভাবিতে পারি, চরম উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও স্থিরভাবে চিন্তা করিতে আমরা সক্ষম এবং কংগ্রেসের ও জনসাধারণের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উপর ভরসা রাখিয়া কুৎসা-অপবাদের সম্মুখেও অটল থাকিতে পারি?

মূল প্রস্তাবের নির্দ্দেশমূলক অংশটী দেশকে আজ কোথায় ঠেলিয়া দিয়াছে—তাহাই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ আক্রমণ শুরু করিয়াছিল, এই কথা বলায় কোন লাভ নাই। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইহা ছাড়া অন্য কিছু আশা করা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুরদর্শিতার পরিচয় তো নয়ই, বরং নেহাৎই স্বল্পবুদ্ধির নিদর্শন। এই কথা বলিয়াও আজ লাভ নাই যে, কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা এবং অন্যেরা কংগ্রেস-নীতি উপেক্ষা করিয়াছিল। ইহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, প্রত্যেকেরই তাহা জানা ছিল, এবং পূর্ব্ব হইতেই ইহা অনুমান করা উচিত ছিল। 'অল্পকালস্থায়ী এবং দ্রুত সংগ্রাম'-এর কথাটি তখন প্রত্যেকের মুখে মুখে। কিন্তু বাস্তবে দাঁড়াইল নির্ম্মম হতাশা ও শোচনীয় ব্যর্থতা। কেবল মাত্র আমরা কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরাই এই পরিণতির সম্বন্ধেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

তাহা হইলে সহযোগী কংগ্রেসভক্তরা কি আমাদের এই রাজনৈতিক দুরদর্শিতার তারিফ করিবেন? না, যে-সংগ্রামকে গান্ধীজি হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক নামজাদা কংগ্রেসনেতাই কংগ্রেসী সংগ্রাম নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই "সংগ্রামে" যোগ না দেওয়ার জন্য আমরা অভিশপ্ত হইব? ইহার কোন্‌টি আমরা আশা করিতে পারি?

সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই

কারামুক্তির পর অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মীই তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আমরা কি বলিয়াছি এবং করিয়াছি, সে-সম্বন্ধে বিকৃত খবরই মাত্র তাঁহারা পাইয়াছেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমি এখানে সঙ্কটের জন্য দায়ী কে, "সংগ্রামের" প্রকৃতি কি, অচল অবস্থা ও **তাহার অবসানের উপায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজির পত্রাবলীর কিয়দংশ, বড়লাটের নিকট লিখিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত মওলানা আজাদের চিঠির কোন কোন অংশ বিশেষ, আমার প্রবন্ধ ও বিবৃতি এবং কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "পিপ্‌ল্‌স্ ওআর"-এর সম্পাদকীয় হইতে অংশ বিশেষ উল্লেখ করিতেছি।**

(অন্যত্র দেখুন)

জাতীয় নেতাদের গ্রেফ্‌তারের পর কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনো সরকারী নির্দ্দেশ ছিল না। অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের মতই আমাদিগকেও নিজ নিজ বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী চিন্তা এবং কাজ করিতে হইয়াছে। যে-অংশগুলির উল্লেখ করিতেছি তাহা যখন আমরা লিখিয়াছিলাম, তখন কি আমরা, কি দেশবাসী কেহই জানিত না, জেলের মধ্যে বসিয়া গান্ধীজি এবং ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে মওলানা আজাদ বড়লাটের নিকট কি পত্র লিখিতেছিলেন। আজ যে-কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই সব অংশ একসঙ্গে মিলাইয়া পড়িলেই একই রাজনীতিক পরিবারের কথার মত পরিষ্কার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবেন। শুধু যে একই ধরণের যুক্তি এবং একই ধরণের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নয়; অনেক ক্ষেত্রে ভাষাও হুবহু এক রকম। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ আমরা কংগ্রেসের সন্তান এবং আমাদের পার্টি আমাদিগকে নিজেদের বুদ্ধির দ্বারাই রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করিতে শিখাইয়াছে।

নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পর উত্তেজনার যে-দাবাগ্নি সারা দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার জন্য সরকারী প্ররোচনাকেই আমরা দায়ী করিয়াছি।

হিংসা ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের প্রসার বন্ধ করিবার জন্য এবং এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের কবল হইতে যত দূর পারা যায় যুবকদের রক্ষা করিবার জন্য আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছি।

যাহারা কংগ্রেসের নাম জাল করিয়া এই সংগ্রামকে কংগ্রেস-আন্দোলন বলিয়া জনসাধারণের সমর্থন আদায় করিতেছিল, আমরা তাহাদের মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। লিনলিথগোর নিকট লিখিত গান্ধীজির চিঠিপত্র সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজই ছিল আমাদের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ।

এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বৃটিশ-বিরোধী দেশপ্রেমিক চেতনা যাহাতে হতাশামূলক জাপপক্ষীয় মনোভাবে পরিণত না হয়, তাহার জন্যও আমরা সংগ্রাম করিয়াছি।

ভারতের বাহিরে কংগ্রেসের সুনাম রক্ষা

কংগ্রেসের ফাশিষ্টবিরোধী ঘোষণাবলীর যত দূর সম্ভব ব্যাপক প্রচার করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারের কুৎসাপ্রচারের বিরুদ্ধেও আমরা লড়িয়াছি।

ধ্বংসাত্মক আন্দোলন কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত বলিয়া সরকার যে-অভিযোগ হাজির করিয়াছিল, তাহারও যথাযোগ্য জবাব আমরা দিয়াছি।

ভারতের বাহিরে বৃটিশ সরকারের প্রচারকার্য্য এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল এবং বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের মনে বিভ্রান্তি এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, ৯ই আগষ্টের পর বিদেশে ভারতের বন্ধু খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মারফৎ বিবৃতি এবং সংবাদ পাঠাইয়া কংগ্রেসের সুনাম আমরা রক্ষা করিয়াছি এবং আমাদের জাতীয় দাবী জনপ্রিয় করিয়াছি। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি নিজ নিজ পত্রিকা এবং সভাসমিতির মারফৎ ভারতের দাবী প্রচার করিয়াছে, এবং আমাদের জাতীয় সরকারের দাবী মুক্তিকামী জাতিগুলির স্বার্থেরই অনুকূল বলিয়া সমর্থিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশে নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় দাবীর পূর্ণ সমর্থনের আন্দোলন যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে সেই সব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিই তাহা করিয়াছে।

আর ভারতবর্ষে আমরা ক্রমাগত কংগ্রেস-

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

কংগ্রেসের শত্রু কংগ্রেস-সোশালিষ্ট

(৫ম পৃঃ পর)

নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় সরকারের জন্ত আন্দোলন চালাইয়াছি।

লীগপন্থীদের মধ্যে আমরা প্রচার করিয়াছি, কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তান সম্ভব নহে। কংগ্রেসপন্থীদের কাছে আমরা বলিয়াছি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য না হইলে জাতীয় সরকার আদায় অসম্ভব। এইভাবে উভয়কে পরস্পরের দাবীর সম্মুখীন করিয়াছি। এইভাবেই উভয়ের মনের মধ্যে চিন্তা জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কারামুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের আছেঃ "জেলের বাহিরে থাকিলে আপনারা কি করিতেন?" "তোমরা যে-রূপ কাজ করিয়াছ, আমরাও সেইরূপ কাজই করিতাম"—এই উত্তরই আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে আশা করি।

আমাদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য সঠিকভাবে আমরা পালন করিয়াছি, তাই আমাদের বিবেক নির্ম্মল। ঠিক এই জন্যই গান্ধীজীর পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা আমাদের নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নাম এবং মর্য্যাদা ব্যবহার করিয়াছিল তাহারা এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের শক্তি হ্রাস তো হয়-ই নাই, বরং আমাদের শক্তি ও প্রভাব অনেক বাড়িয়াছে।

৮ই আগষ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের নীতি এবং সেই প্রস্তাবের পরিণাম আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমাদের নীতির সহিত একমত হউন বা না হউন, প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী এই কথা অন্তত স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি যে, প্রত্যেকটি জরুরী সমস্যা সম্বন্ধে আমরা দেশপ্রেমের পথই অনুসরণ করিয়াছি।

কংগ্রেস-সোশালিষ্ট এবং তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা আমাদের বিরুদ্ধে সহযোগী কংগ্রেসভক্তদের মধ্যে কুৎসা প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। এ-কথাও প্রত্যেকেই জানেন যে, কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্টদের বহিষ্কার করার জন্য এই কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা অগ্রণী হইয়াছে। এখন ইহাদের নীতি বিচার করা হউক।

কমিউনিষ্ট-বিরোধী জেহাদের পরিচালক

তাহাদের প্রচুর পরিমাণ বে-আইনী পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং অন্যবিধ সাহিত্য আমরা পাইয়াছি। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে আমি মাত্র তাহাদের প্রধান নেতাদের মূল্যবান বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

"১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম কংগ্রেস-অনুমোদিত নয় বলিয়া প্রমাণ করা নীচ মনোবৃত্তি এবং কাপুরুষতারই পরিচায়ক।" ইহা টটেনহ্যামের পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত নয়; ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের "স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের প্রতি দ্বিতীয় পত্রে"ই উপরোক্ত বক্তব্য লিখিত হইয়াছে। গান্ধী-লিনলিথগো পত্রাবলীর মারফৎ গান্ধীজি ধ্বংসাত্মক ও হিংসামূলক আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং ৯ই আগষ্টের পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য সরকারী অত্যাচারকেই দায়ী করেন। গান্ধীজির এই সব পত্র প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাস পর জয়প্রকাশ উক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

অচ্যুত পটবর্দ্ধন ও রামমনোহর লোহিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাক্ষিক মুখপত্র" বলিয়া প্রচারিত "৯ই আগষ্ট" কাগজের '৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংখ্যায় লেখা হইয়াছেঃ "আমাদের প্রাথমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং স্বরাজের জন্য বৃটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।" দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি ধ্বংসাত্মক ও হিংসামূলক কাজকেই এবং সীমান্তের ওপারে অবস্থিত সুভাষ বসুর সৈন্যবাহিনীকে এই পত্রিকা আগাগোড়া প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে।

৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে কংগ্রেস ফাশিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই বিজয় কামনা করিয়াছে এবং স্বাধীন দুনিয়া প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভারতও যাহাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য কংগ্রেস ভারতে জাতীয় সরকারের দাবী তুলিয়াছে। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ ভরসা করিয়াছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে, চীন তোজোর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িবে আর সুভাষ বসু ভারতে প্রবেশ করিবে। জয়প্রকাশের নিজ বক্তব্যই পাঠ করুনঃ—

"রুশ-জার্ম্মান চুক্তি কিংবা জাপ-চীন সন্ধি, বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরাজয় এবং ভারতের মাটীতেই যুদ্ধের বিস্তার প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় বিরাট কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটিলে আমাদের পক্ষে বড় একটা কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করি না।"

পুনরায়ঃ

"কোনো বৈদেশিক শক্তি 'নিজ চেষ্টায়' আমাদের স্বাধীন করিতে পারে না। ভারতের মাটীতে মিত্রপক্ষ এবং অক্ষশক্তির মধ্যে লড়াই বাধিলে নিজেদের চেষ্টাতেই ক্ষমতা দখলের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই প্রচেষ্টা করিবার জন্য আমরা নিজেরা প্রস্তুত থাকিতে পারিলেই সুভাষ বসুর পরিচালিত জাতীয় বাহিনীর মত বৈদেশিক সাহায্য আমাদের উপকারে আসিবে এবং তোজোর ভারত দখলের চেষ্টাকে ব্যর্থ করা যাইবে।"

সোজা কথায় তাহাদের নীতি ছিল এইঃ 'ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইয়া যাও, সুভাষ বসুর নির্দ্দেশ পাইবামাত্র বিপ্লব করিবার জন্য প্রস্তুত হও, বসুর বাহিনীই আমাদের হইয়া কাজ সমাধা করিয়া দিবে।' এবং অতি চতুরতার সহিত সুভাষ বসুর প্রভু তোজোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে।

নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কংগ্রেস-ভক্তরা এ-কথা জানেন। সেই সুভাষ বসুকে দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশ পরাইয়া পুনরায় অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসার জন্য জয়প্রকাশ এই বলিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেনঃ

"সুভাষ বসুকে বিভীষণ বলিয়া নিন্দা করা খুবই সহজ.........কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাঁহাকে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বলিয়াই জানে। তাঁহার মত লোক দেশকে বিক্রয় করিবে, এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

সুভাষ সম্পর্কে জওহরলাল ও গান্ধীজির উক্তি

এই সম্বন্ধে **পণ্ডিত জওহরলালের** বক্তব্য দেখা যাউকঃ

"বহু বৎসর পূর্ব্বেই সুভাষ বসুর সংস্রব আমরা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইয়াছে এবং আজ আমরা পরস্পর হইতে বহু দূরে। বেদনার সহিত এ-কথা আমাকে অনুভব করিতে হইতেছে, যে-পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সে-পথ একেবারেই ভুল। তাঁহার পথ আমি যে শুধু গ্রহণ করিতে পারি না, তাহাই নয়; তাঁহার নীতি কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার বিরোধিতা করিব। কারণ বিদেশ হইতে যে-কোন শক্তি আসুক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতের পুতুল হিসাবেই আসিবে।"

"সম্মুখযুদ্ধ করিবে সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনী, আর আমরা গেরিলা-যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করিব।"

(১২ই এপ্রিল, ১৯৪২)

এই বিষয়ে **গান্ধীজির** বক্তব্যও লক্ষ্য করা যাকঃ

"অক্ষশক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ ঘোষণার উপর আমি কখনও বিন্দুমাত্র গুরুত্ব বা মূল্য দিই নাই। তাহারা যদি কখনও ভারতে আসে, তাহা হইলে তাহারা মুক্তিদাতা হিসাবে আসিবে না, লুণ্ঠনের মালে ভাগ বসাইতে আসিবে। সুভাষ বাবুর নীতির প্রতি আমার সমর্থনের কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। (২১শে জুন, ১৯৪২)

কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের বুলি

লিনলিথগোর নিকট গান্ধীজীর পত্রাবলী প্রকাশ হইবার পর নেতাদের মুক্তি ও অচল অবস্থার অবসানের জন্য আমাদের আন্দোলন কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণের মনে স্বতঃই সাড়া জাগায়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে জয়প্রকাশ বলেন যে, কংগ্রেস-নেতাদের উপযুক্ত স্থান কারাগারের মধ্যে এবং অচল অবস্থাই ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতিঃ

"মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি আজাদ, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি জেলের বাহিরে আসিলেই বিশ্বের লোক ভারতকে ভুলিয়া যাইবে। পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তাদের উপর অচল অবস্থা যে চাপ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এক্ষেত্রে সে-চাপ অপসারিত হইবে। তাঁহারা যথার্থই মনে করিবেন, আপাততঃ ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইল এবং বিকৃতমস্তিষ্ক গান্ধী আবার তাঁহার অনুগামীদের লইয়া জেলে যাইবার পরিকল্পনা না করা পর্য্যন্ত ভারতীয় সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিবে না। নেহরু কারা-মুক্তির পর হয়তো সুন্দর সুন্দর বিবৃতি দিবেন এবং মার্কিন সংবাদদাতারা হয়তো তাহা সোৎসাহে লুফিয়া লইবে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য থাকিলেও সেই সব বিবৃতির কোনো মূল্যই থাকিবে না। মহৎ কথায় পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া এবং প্রধান জাতিগুলির প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করিয়া জওহরলাল যাহা করিতে পারিবেন তাহার চেয়ে কারাগারে থাকিয়া তিনি চার্চিল-রুজভেল্ট গোষ্ঠীকে অনেক বেশী বে-কায়দায় ফেলিতে পারেন। ... অচল অবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি।"

(স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি জয়প্রকাশের ২য় পত্র; অক্টোবর, ১৯৪৩)

কারামুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীরা অবশ্য জানেন যে, খাদ্যসঙ্কট যখন শুরু হয় তখন কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা তাহাদের "স্বাধীনতা-বিপ্লব" পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই লুঠপাট বাধাইতে চাহিয়াছিল। বাংলায় দুর্ভিক্ষ যখন শুরু হয়, তখন তাহারা প্রথমে রিলিফ-আন্দোলন সংগঠন করার ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে।

গান্ধীজীর মুক্তির পর ইহারাই গেন্ডারের নিকট গান্ধীজির বিবৃতিকে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই কথা বলার মত সাহস তাহাদের ছিল না। তাহাদের ছাত্র-সমর্থকদের মারফৎ তাহারা চেষ্টা করিয়াছে, যুবকদের মধ্যে এই ধরণের প্রচারকে চালু করা যায় কিনা।

গান্ধীজি যখন মিঃ জিন্নার নিকট সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন ইহারা অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং হতাশাপূর্ণ ও বিভেদমূলক প্রচার চালাইতে আরম্ভ করে যে, এই সাক্ষাৎকার সফল হইবে না এবং এইবার জিন্নার আসল রূপ বাহির হইয়া পড়িবে।

কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন মুক্ত হইতে লাগিলেন, ইহারা তখন নেতা হইতে শুরু করিয়া সাধারণ কংগ্রেসকর্ম্মী পর্য্যন্ত অধিকাংশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেঃ কমিউনিষ্টরা সরকারের টাকা খায়, **তাহারা জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতা ও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কংগ্রেসের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহারা শক্তিশালী হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কংগ্রেস হইতে ইহাদের তাড়াইয়া দেওয়া উচিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি।**

কংগ্রেস-বিরোধী, কাজেই কমিউনিষ্ট-বিরোধীও বটে

কংগ্রেসভক্তরা অল্পেতেই বুঝিতে পারিবেন যে, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারের টাকা খাওয়ার এবং পুলিসের চর হিসাবে কাজ করার অভিযোগ একে-বারেই মিথ্যা। এই সব রটনা বামপন্থী দলগুলির পরস্পরকে গালাগালি দিবার একটা কৌশল মাত্র—এই সহজ যুক্তি দেখাইয়া কংগ্রেসকর্ম্মীরা এই সব অভিযোগকে নাকচ করিয়া দিবেন। কিন্তু সংগ্রামের ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের রাজনৈতিক যুক্তির দ্বারা অধিকাংশ কংগ্রেসভক্তই অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। আজ যখন কংগ্রেসকর্ম্মীরা সব বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, আজ যখন তাঁহারা অতীতের পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করিতে উন্মুখ, তখন আমরা তাঁহাদিগকে বিষয়টি সকল দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

গান্ধীজি এবং মওলানা আজাদের বিবৃতির সহিত জয়প্রকাশের উদ্ধৃত বক্তব্য তাঁহারা মিলাইয়া পড়িয়া দেখুন এবং বলুন কংগ্রেসের নীতির সহিত কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের নীতির কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা।

জাতীয় সঙ্কটের দায়িত্ব, অচল অবস্থার অবসান, এক কথায় ৯ই আগষ্টের পরে উদ্ভূত প্রত্যেকটি প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি এবং কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা যাহা লিখিয়াছে কংগ্রেসভক্তরা তাহা পাশাপাশি রাখিয়া একবার পড়িয়া দেখুন; এবং পরে বিচার করুন, আমাদের মধ্যে কে কংগ্রেস-নীতিকে বেশী যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, কে কংগ্রেসের সম্মানকে অধিকতর রক্ষা করিয়াছে, কে খাঁটি কংগ্রেসভক্তের মত কাজ করিয়াছে, এবং কে-ই বা কংগ্রেসবিরোধী। তাহারা (কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা) স্মরণ রাখুক যে, কোনো প্রমাণ উপস্থিত না করিয়াই তাহারা ইচ্ছা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যাহার চাইতে জঘন্যতম অপরাধ কোনো দেশভক্তের পক্ষেই আর হইতে পারে না। সজ্ঞানেই তাহারা এই মিথ্যা রটাইয়াছে। কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছে এবং আমরা তাহার বিরুদ্ধতা করিয়াছি।

- ইহারা কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়াছে, আমরা শুধু ব্যবহার করিয়াছি আমাদের পার্টির নাম।
- ইহারা চায় কংগ্রেসনেতারা জেলে থাকুন; আর আমরা নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়াছি।
- জাতীয় সরকারের দাবীকে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ বলিয়া ইহারা তাহার বিরুদ্ধতা করিয়াছে; আর আমরা এই দাবী পূরণের জন্য আন্দোলন করিয়াছি।
- ইহারা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরোধিতা করে, আমরা এই ঐক্যের জন্যই কাজ করিতেছি।
- নিজেদের জাপানী পক্ষপাতী নীতিকে ঢাকা দিবার জন্য আমাদের নীতিকে ইহারা বৃটিশ পক্ষপাতী বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ রটাইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই যে, কংগ্রেস-ভক্তরা যত বেশী এ-সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন, ততই আমাদের সহিত একমত হইবেন; জনগণের সেবায় যত বেশী তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তত শীঘ্র তাঁহারা আমাদের মূল্য এবং কংগ্রেস-সোশালিষ্ট-দের মূল্যও বুঝিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসভক্তরা যেন স্মরণ রাখেন, কমিউনিষ্টদের তাড়াইবার জন্য আজ যাহারা সবচেয়ে বেশী চীৎকার করিতেছে তাহারাই কংগ্রেসের নামের অপব্যবহার করিয়াছে; নিজেদের নামে জনসাধা-রণের সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস ইহাদের নাই, এবং ইহারাই সহকর্ম্মী কংগ্রেসভক্তদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়াছে। এই যোগাযোগ মোটেই আকস্মিক নয়।

(শেষাংশ ১১শ পৃঃ দেখুন)

কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তির জন্য

● নেতৃবৃন্দের আপত্তি সত্ত্বেও লেবর পার্টিতে প্রস্তাব গৃহীত

● ● ইণ্ডিয়া লীগের প্রশংসনীয় প্রচার কার্য্য

লেবর পার্টির প্রস্তাব

গত ১১ই ডিসেম্বর বৃটিশ লেবার পার্টির যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ভারত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়ঃ—

"এই সম্মেলন মনে করে যে ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা দিলে এবং ভারতে স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে চূড়ান্ত সুবিধা হইবে, ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠায়ও সুবিধা হইবে। সেজন্য এই সম্মেলন অবিলম্বে অচল অবস্থা অবসানের অনুরোধ জানাইতেছে এবং তাহার উপায় স্বরূপ ভারতীয় জনগণের সমস্ত নেতার সহিত আলোচনা করিয়া এমন একটি দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বলিতেছে যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামে একত্র করিবে। আলোচনার যাহাতে সুবিধা হয় সেজন্য আমরা ভারতের জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিতে অনুরোধ করিতেছি।"

লেবর পার্টির নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রতিনিধি-সাধারণ বিপুল উত্তেজনার মধ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে ভারতের প্রতি সহানুভূতি কত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। লেবর পার্টি সম্মেলনের সময়ে ও উহার আগে ইণ্ডিয়া লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতের স্বপক্ষে যে বিপুল প্রচার চালাইয়াছে—এই সাফল্য অনেক পরিমাণে তাহারই ফল।

আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১১ই ডিসেম্বর—আমেরিকার ১২৭ জন বিখ্যাত মনীষী ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে একটি আবেদন পাঠাইয়াছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে আছেন—নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত লেখিকা পার্লবাক, বিখ্যাত সাংবাদিক জন গান্থার, লুই ফিশার, লুই এডামিক (প্রেসবিটেরিয়ান ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক), ডেভিড বেকার (মেসেঞ্জার সম্পাদক), রজার বল্ডুইন (ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের পরিচালক), জে ডেকার (পাদ্রী কাউন্সিলের সেক্রেটারী), হেনরী ফ্লিশম্যান (নিউ ইয়র্ক সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী) ফ্রেঞ্চ কার্চওয়ে (নেশন সম্পাদক), ইত্যাদি। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি এই সমস্ত কংগ্রেসী বন্দী ফ্যাশিজমের বিরোধিতার জন্য বিখ্যাত। গান্ধীজির মুক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তাঁহারা লিখিয়াছেন:

"মুক্তির পর মিঃ গান্ধী ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে এই সব প্রস্তাবের ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। বন্দী নেতৃবর্গ বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গের সঙ্গে মিঃ গান্ধী যাহাতে আলাপ আলোচনা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইলে এই বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, নেতৃবর্গকে মুক্তি দিলে ভারতীয় অচল অবস্থা অবসানে বৃটেনের যে ইচ্ছা আছে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানে মিত্ররাষ্ট্রবর্গ কেবল যুদ্ধের ব্যাপারেই নহে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দিক হইতেও প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবে।..."

● ● ১২৭ জন আমেরিকান মনীষীর আবেদন

● সাত লক্ষ ক্যানেডিয়ান মজুরের সিদ্ধান্ত

পৃথিবীর দেশে দেশে বিপুল আন্দোলন

গ্যালাকারের স্পষ্ট কথা ★

গত ১লা ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রাজার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়া কমিউনিষ্ট সদস্য উইলিয়াম গ্যালাকার ভারতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া বলেন:

"ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণের ন্যায্য দাবী না মানার ফলে এবং অচল অবস্থা অবসান না করার ফলে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহাতে জাপানের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের সম্ভাবনায় বিঘ্ন ও বিলম্ব হইতে বাধ্য।"

★

ইণ্ডিয়া লীগ

গত ১১ই ডিসেম্বর লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া লীগ" (ভারতীয়দের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান) কর্ত্তৃক আহূত একটি জনসভায় ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বন্দী করিয়া রাখার প্রতিবাদ করা হয়। সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতির ফলে সংঘর্ষ ও অচল অবস্থা চিরস্থায়ী হইতেছে এবং তাহাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা তথা মিত্রজাতিগুলির সহিত সহযোগিতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

বৃটেনের প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন—অ্যামালগামেটেড এঞ্জিনীয়ারিং ইউনিয়ন। ঐ ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ ট্যানারই উপরোক্ত ইণ্ডিয়া লীগ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বলেন যে ভারতের অবস্থা দেখিয়া আসিবার জন্য ব্রিটিশ শ্রমিকদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি পাঠানো দরকার।

ক্যানাডা

ক্যানাডার মজুরদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হইল **ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস অফ লেবার।** উহার সভ্য সংখ্যা ৭ লক্ষ। গত অক্টোবর মাসে কুয়েবেক শহরে উহার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের দাবী সমর্থন করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ—

"ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের ও অচল অবস্থার অবসানের অনুকূলে মিঃ গান্ধী ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন ও সম্মিলিত জাতিসমূহকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সুতরাং, ভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক বন্দীসমূহকে মুক্তি দিবার জন্য, ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন ফ্যাশিষ্টবিরোধী জাতীয় সরকার গঠন করিবার জন্য, সেই জাতীয় সরকারের সাহায্যে জাপানের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনগণকে সংগঠিত করিবার জন্য, ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সহিত পুনরায় আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করুক—ক্যানাডার মজুর কংগ্রেসের এই সম্মেলন সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিতেছে।"

বিলাতে কংগ্রেসবিরোধীদের অপচেষ্টা

সম্প্রতি "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ও "ন্যাশনালিষ্ট"—কলিকাতার এই দুইখানি কংগ্রেস-বিরোধী কাগজেই পর পর কয়েকদিন খবর বাহির হইয়াছে যে বিলাতের সমস্ত ভারতীয় নাকি একত্র হইয়া কভেণ্ট্রিতে সম্মেলন করিতেছে। এই সম্মেলন কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহারাই নাকি বিলাতের কংগ্রেসপন্থী ভারতীয়দের প্রকৃত প্রতিনিধি।

"ইউ-পি" ৬ই ডিসেম্বর খবর দিয়াছে যে, এই সম্মেলনে "কংগ্রেস সোসালিষ্ট ও অন্যান্য গুপ্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। মহিলা সাংবাদিক মিস মার্গারেট পোপ এই দলের মুখপাত্র হিসাবে আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। **প্রকৃত কংগ্রেসীগণ যদিও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন,** তথাপি এই সমস্ত গুপ্ত দলের প্রশংসা করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

সংবাদে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে "ইণ্ডিয়া লীগ"-এর সহিত এই সম্মেলনের কোন সংশ্রব ছিল না। কভেণ্ট্রি সম্মেলনে কাহারা আসিয়াছিল ও কি উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝিবার জন্য বিলাত প্রবাসী ভারতীয়দের আন্দোলনের ইতিহাস আমরা বর্ণনা করিতেছি।

আসল ব্যাপার কি ?

ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের সর্বপ্রধান ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইল ইণ্ডিয়া লীগ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন উহার সম্পাদক। ১৯৩২ সালে ভারতে প্রচণ্ড দমননীতির সময় তিনি একদল প্রগতিশীল বৃটিশ প্রতিনিধি লইয়া ভারতের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আসেন—উহাতেই তিনি সর্বপ্রথম প্রবাসী ভারতীয় তথা ভারতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধিদল দমননীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন ভারত সরকার তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

ফৈজপুর কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে পণ্ডিত নেহরু কৃষ্ণ মেননের কাজ সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসা করেন। তাঁহার পর কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষ বাবু, কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতিও ইণ্ডিয়া লীগকেই প্রকৃত জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত নেহরু যখন স্পেনে যান তখন কৃষ্ণ মেনন ছিলেন তাঁহার সঙ্গী। গণতান্ত্রিক স্পেন ও চীনকে সাহায্য দানের আন্দোলনে ইণ্ডিয়া লীগ অগ্রণী ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব ইহাই যে, ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ ও দাবী প্রচারে উহা বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহার ১৪টী শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে এবং বিলাতী মজুরদের ৮০টী ট্রেড ইউনিয়ন উহার সহিত সংযুক্ত আছে। ইহার সমর্থকদের মধ্যে আছেনঃ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য রেজিনাল্ড সোরেনসেন, শ্লোয়ান, গ্রেনফেল, এলেন উইলকিন্সন, হোরাবিন ইত্যাদি; উদারনৈতিক সদস্য কর্ণেট অ্যাশচি, মিস মড রয়ডেন, ভার্ণন বার্টলেট ইত্যাদি। তাছাড়া কমিউনিষ্টরাও ইহাকে সমর্থন করেন।

যুদ্ধের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া লীগ ভারতের দাবীর সমর্থনে বহু জনসভা করিয়াছে, ইহাদেরই চেষ্টায় বিলাতে আমেরী-বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই পৃষ্ঠায়ই তাঁহাদের অনুষ্ঠিত একটী জনসভার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

ভুঁইফোড় সংগঠন

১৯৪২ সালে ভারতে কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের পর দেখা গেল ইংল্যাণ্ডে আরও কতকগুলি "ভারতীয় সঙ্ঘ" গজাইয়া উঠিতেছে। একটীর নাম হইল "কমিটি অফ ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসমেন", আর একটীর নাম হইল "কাউন্সিল ফর ইণ্টারন্যাশনাল রিকগনিশন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" ইত্যাদি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী আদর্শ প্রচার করিয়াই ইণ্ডিয়া লীগ কংগ্রেসের প্রতি ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের সহানুভূতি দ্রুত বাড়াইয়া তুলিতেছিল। এই নূতন ভুঁইফোড় সংগঠনগুলি কংগ্রেসের সেই ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী আদর্শই খাটো করিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। খুবই উল্লেখযোগ্য যে, সুভাষ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয় বসু এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হন। ১৯৩৬-৩৯ পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেস তথা ইণ্ডিয়া লীগের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোনো সংশ্রব ছিল না, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর ময়দান খোলা পাইয়া তিনি ভেদসৃষ্টির কাজে আগাইয়া আসেন। তাঁহার পিতৃব্য তখন জাপানী ফ্যাশিষ্টদের অতিথি; অমিয় বাবুর প্রেরণা কোথা হইতে আসিল আন্দাজ করা শক্ত নয়!

প্রকৃত রহস্য

বৃটেনের চার্চিল-আমেরির দলও ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে ইহাই প্রচার করে যে, কংগ্রেস ফ্যাশিষ্ট বিরোধী নয়—সুতরাং অমিয় বসু প্রভৃতির প্রচারে তাহাদেরই লাভ।

বোধ হয় সেই জন্যই দেখা যাইতেছে যে মার্গারেট পোপ নামে এক রহস্যজনক মহিলা-সাংবাদিক আসিয়া কভেণ্ট্রি সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য গুপ্ত দলের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। মিস পোপ ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৃটিশ মন্ত্রীসভার প্রচার বিভাগের (ব্রিটিশ মিনিষ্ট্রি অফ ইনফর্মেশন) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রেরণা কোথা হইতে আসিতেছে তাহাও আন্দাজ করা কঠিন নয়।

কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলই কংগ্রেসকর্মীদিগকে ধ্বংসাত্মক কাজের প্ররোচনা দিয়াছিল এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফ্যাশিষ্ট পক্ষকে সমর্থন করিয়াছিল। কংগ্রেসের নামে তাহাদিগকে প্রশংসা করার অর্থই হইল ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে চার্চিল আমেরির কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারকে শক্তিশালী করা।

কভেণ্টি সম্মেলনের সময় অমিয় বাবু উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, যদিও তাঁহার কমিটি অফ ইণ্ডিয়ান "কংগ্রেসমেন" উহাতে মুখ্য অংশ লইয়াছিল। সে সময় অমিয় বাবু ভারতবর্ষে আসিয়া চার্চিলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ওকালতি করিতেছিলেন। গত ১০ই ডিসেম্বর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তিন কলম জুড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের এক বিরাট বিবরণ বাহির হয়। তাহাতে তিনি বলেন যে লেবর পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল পার্টির মধ্যে ভারতের স্বপক্ষে প্রচার করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তিনি বলেন, "রক্ষণশীলরাই (অর্থাৎ চার্চিল আমেরির দল) ইংল্যাণ্ডের প্রকৃত প্রভু। তাহাদিগকেই আমাদের মতে আনা (কনভিন্স) দরকার…। রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রচার করার বিরুদ্ধে সমালোচনার কথা আমি জানি—কিন্তু আমার মনে হয় যে বর্ত্তমান "বাস্তব রাজনীতির" যুগে ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীকে উপেক্ষা করা খুবই ভুল।"

মার্গারেট পোপ ও অমিয় বসুর সংযোগ কতখানি "বাস্তব" হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বোধ হয় আর বুঝাইবার দরকার হইবে না!

ইহারা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যেরও বিরোধিতা করে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সংগঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তোজোরও লাভ নাই, চার্চিল আমেরিরও লাভ নাই। অমিয় বসু এবং মার্গারেট পোপের যৌথ-বিরোধিতার কারণ কি এবার ভাবিয়া দেখুন!

কিন্তু কংগ্রেসপন্থী প্রবাসী ভারতীয়েরা যে এই ষড়যন্ত্রে পা দেন নাই তাহা ইউ, পির খবর হইতে জানা যায়। ইণ্ডিয়া লীগের নেতৃত্বে তাঁহারা ব্রিটিশ জনসাধারণের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী আদর্শ ও সংগ্রামের সহিত কংগ্রেসের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ঐতিহ্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহারা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে 'স্বমতে আনিবার' দরবার করিতেছেন না, ব্রিটিশ জনসাধারণের স্বাধীনতা-প্রিয়তার কাছে আবেদন করিতেছেন। প্রধানত তাঁহাদেরই চেষ্টায় এবং কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের সহায়তায় আজ ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন এত জোর বাধিয়াছে যে সম্প্রতি লেবার পার্টি সম্মেলনে নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

★ মেয়ে পাইলট ওলগা সোভিয়েটের গর্ব

ভ্লাডিভোষ্টকের নিকটে ওলগা লিসিকোভার শৈশব কাটে। সেখানে সর্ব্বদাই তার চেষ্টা ছিল খেলাধুলা, লেখাপড়ায় কি করে সে ফার্ষ্ট হবে। প্রশান্ত সাগরের তীরে ঝলসানো রোদ্দুরে তার মুখ পুড়ে যেত, তবু সে কাজে কর্ম্মে কত চটপটে। সাঁতারে তার কাছে ছেলেরা হেরে যেত।

আট বছর বয়সে বাপ-মার সঙ্গে সে লেনিনগ্রাডে আসে। উনিশ বছরের মেয়ে যখন, তখন কারখানার কাজে ঢোকে। লেনিনগ্রাডের ব্যায়াম সমিতির "বী" টীমের সেরা মেম্বার ছিল ওলগা। উড়োজাহাজের স্কুলে ঢোকার সুযোগ পেয়ে সে একটি দিনও দেরী করল না। নিটোল দেহ, শক্তিও কম নয়। অনার্স ডিগ্রী পেয়ে ওলগা পাইলট হল।

নারীমুক্তির প্রতীক সোভিয়েটের এই মেয়ে-পাইলটের হাতে বহু জার্ম্মান বোমারু-বিমান ধ্বংস হ'য়েছে

যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই ওলগা লিসিকোভা সামরিক বিমান বহরে ছুটে গেল।

লিসিকোভা এপর্য্যন্ত ৩০০ বার লড়াইয়ের জন্য উড়েছে। তার মধ্যে ২০ বার গেছে শত্রু লাইনের পিছনে। সবশুদ্ধ সে ২০০০ ঘণ্টা বিমান চালিয়েছে, তার মধ্যে ১৬০০ ঘণ্টা দেশ বাঁচানোর এই মহাযুদ্ধের কাজে। প্রতিটি দিন তার কেটেছে আত্মত্যাগের গরিমায়। সোভিয়েট-মানবের গর্ব্বের মেয়ে ওলগা। রেড ব্যানার ও রেড ষ্টার আজ তার অঙ্গের ভূষণ। সে বলেছে,—যতদিন না শেষ শত্রুটি আমাদের সীমানা ছাড়াচ্ছে ততদিন আমি আমার কাজে আঁকড়ে থাকব। আমার জীবনের সব কিছু সম্পদ আমার দেশের।'

কাঠুরিয়া পিটার

শান্ত ও স্বভাব-কবি কাঠুরিয়া পিটার ট্রাভিন যুদ্ধ করতে চায় নি—কিন্তু জার্ম্মান বর্ব্বরতা তাকে শক্ত করে তুললো: "এদের যদি আমরা ধ্বংস না করি, এরা আমাদের ধ্বংস করবে।"

পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক পিটার। শান্ত সবুজ প্রকৃতির কোলে সে মানুষ। স্বল্পভাষী স্বপ্ন-বিলাসী কবি উচ্ছসিত হয়ে উঠ'ত অরণ্য প্রসঙ্গে আলোচনায়—মনে হ'ত কবি সূর্য্যাস্তের বর্ণনা করছেন। "ইংলণ্ড আমাদের পাইন বনের কথা জানে"—সে এমন ভাবে বলত যেন মনে হ'ত গাছগুলি তারই ছেলেমেয়ে।

১৯৪১এর অক্টোবরে তাকে সৈন্যদলে ডাকা হয়। তখন সেই পারিপার্শ্বিক অরণ্য-সৌন্দর্য্য ছেড়ে আসতে তার মন চায় নি। তবুও সে বলেছিল, "মনে হয় পিটার ট্রাভিনকে বাদ দিয়ে এযুদ্ধ জয় করা যাবে না।" তাই এক অক্টোবর প্রভাতে সুদৃশ্য পাইন বনানীর মাঝে সে স্ত্রী কন্যার কাছে বিদায় জানালো।

না—কাঠুরিয়া পিটার ট্রাভিন যুদ্ধ ভালবাসে না। কিন্তু যখন লেনিনগ্রাডের আবাল বৃদ্ধবনিতার উপর জার্ম্মান উড়োজাহাজের নিষ্ঠুর লীলাখেলা দেখল তখন সে বুঝল 'এই বর্ব্বরদের ধ্বংস করা প্রয়োজন।' পিটার তার কর্ত্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল।

প্রথমে সে ভেবেছিল, 'নরহত্যা—সে কি আমি পারবো?' কিন্তু যখন তার দলের সাথে একদিন জার্ম্মানদের মুখোমুখি সাক্ষাত হ'ল তখন সে আবিষ্কার কর'ল ঠিক এইরকম যুদ্ধই সে চায়। "আমি রক্ত পিপাসু নই। একটা পাইন গাছ ভেঙ্গে পড়তে দেখলে আমার মনে বিষাদের ছায়া দেখা দেয়। কিন্তু যদিও আমি জানি এই জার্ম্মানরা মানুষ, তবুও এদের কুচি কুচি করে কেটে ফেলতেও আমার দ্বিধা আসে না।

সে নির্ব্বিবাদে কত জার্ম্মানদের বুকে বেয়নেট চালিয়েছে। কত শত্রু সে গুলি করে মেরেছে। কত হাত বোমা সে ছুঁড়েছে। কারণ সে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থির—নিঃসন্দিহান। সে জানে, এ সংগ্রামে আপোষের বালাই থাকতে পারে না। 'আমরা তাদের ধ্বংস না করলে, তারা আমাদের ধ্বংস করবে।'

একবার একটী জার্ম্মান ট্যাঙ্কের উপর হাত-বোমা ছুঁড়তে গিয়ে সে আহত হয়। কর্তৃপক্ষ যখন তাকে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার প্রস্তাব করলে পিটারের তখন মনে হ'ল এটা অপমান। সে চীৎকার করে বলল,'আমার গালে এভাবে চড় মারাটা কি ঠিক? যতদিন পর্য্যন্ত একটা জার্ম্মান এই রুশদেশের মাটীতে বেঁচে আছে, ততদিন আমার ছুটী নেই।'

এক সময় ভীষণ বৃষ্টিপাত হয়। রাতারাতি নদী উপছিয়ে উঠল। বরফ ভাঙ্গা তখন একটা ভীষণ ব্যাপার। পথঘাট বন্ধ—আমদানী আসে না।

এক রাত্রে পিটার দেখল একটা বিরাট বরফের চাঁই নদী দিয়ে ভেসে আসছে। খাদ্যসম্ভার পূর্ণ ফেরি-নৌকার পথ আটকে গেল। বরফে ধাক্কা লেগে সেগুলি বোধহয় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। পিটার তখন একটা কোদাল নিয়ে নদীর দিকে ছুটে গেল। বরফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সেটাকে ঘা মারতে মারতে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তার নিজের অবস্থা তখন বিপজ্জনক। সেই সময় আবার আর একটা বিরাট বরফখণ্ডের আবির্ভাব হল। পিটারের হাতে সেটাও শায়েস্তা হল। তিনদিন ধরে পিটার এই সংগ্রামে ব্যস্ত। কিন্তু শেষ হয়ে যাবার পর একযোগে সে কুড়িঘণ্টা ঘুমিয়েছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষরা পিটারের প্রশংসায় উচ্ছসিত। তারা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—'এর কি ভয় নেই!'

পিটার বলে, ভয় সবাইয়ের আছে। আমিও প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি জানি জার্ম্মানদের হটাতে হবে। তাই ভয় পাওয়ার আর সময় পাই না। জার্ম্মানদের শিখিয়ে দিতে হবে রাশিয়ানদের সাথে যেন তারা আর ছেলেখেলা না করে।

নারী সেবাসঙ্ঘ প্রদর্শনীর প্রোগ্রাম

১৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত কার্য্যসূচী ছাপা হইয়াছে। মুসলমানদের পর্ব্বদিন বলিয়া ২৭শে ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ৪টায় শ্রীমতী নাইডু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। অন্যান্য কার্য্যসূচী ঠিকই থাকিবে।

মেয়েদের অধিকার ও পারিবারিক জীবনে শৃংখলা
নারীমুক্তিতে সোভিয়েটপরিবারে উন্নতি

অনেকে বলেন, সোভিয়েট শাসন রাশিয়ার পরিবার-জীবন ধ্বংস করিয়াছে। নর-নারীর সম্পর্কে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে।

ক্যান্টারবারীর ডিন বলিয়াছেন—"পারিবারিক জীবন ধ্বংসের অর্থ যদি হয় নৈতিক অধঃপতন ও জীবনযাত্রায় চরম শৈথিল্য, তাহা হইলে এই অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। বর্ত্তমানে সোভিয়েটের নৈতিক আবহাওয়া পরিষ্কার ও স্বচ্ছই হইয়াছে।"

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ১২২ ধারায় আছে,—"ইউ-এস-এস-আরে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পাইবে।"

সোভিয়েট শাসনের ফলে ইউ-এস-এস-আরের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের ১১৪৩ জন ডেপুটীর মধ্যে ১৮৯ জন মেয়ে। স্থানীয় সোভিয়েটে প্রতিনিধিদের শতকরা ৩৩ জন মেয়ে। সোভিয়েটে এই সব স্থানীয় মেয়ে ডেপুটীর মোট সংখ্যা ৪,২২,০০০।

সোভিয়েটে স্বামী ও স্ত্রী সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায়। দুই জনেরই সমান রাজনৈতিক অধিকার আছে। সম্পত্তিতে দুই জনেরই সমান অধিকার। গবর্ণমেন্ট, সমাজ, পার্টি, ট্রেড ও শিল্পে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে সমান যোগ্যতায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে পারে। শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অবাধ সুযোগ মেয়েরা ভোগ করিতেছে।

বিবাহের নিয়ম কানুনের মূল লক্ষ্য সন্তানের স্বার্থসংরক্ষণ। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে অমিল ঘটিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজেই হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র বিবাহ-বিচ্ছেদে উৎসাহ দেয় না, তাই নিয়ম আছে, প্রথম বিচ্ছেদে ৫০ রুবল, দ্বিতীয় বার ১৫০ রুবল ও তৃতীয় বার ৩০০ রুবল ফি দিতে হইবে। সাময়িক বিবাহ ও বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে কড়া নজর রাখা হয়। কিন্তু বিবাহ সম্পর্কের ভিতর কদর্য্য অবস্থার অবসানের জন্য সমস্ত সভ্য দেশের মতই এখানেও বিচ্ছেদের নিয়ম চলে। বিচ্ছেদের পর সাধারণ নিয়মে স্ত্রীর হেপাজতেই সন্তানসন্ততি থাকে। স্বামীকে এক সন্তানের জন্য আয়ের এক চতুর্থাংশ দিতে হয়, দুই সন্তানের জন্য এক তৃতীয়াংশ ও তিনজন বা বেশী হইলে আয়ের অর্দ্ধেক দিতে হইবে। এইভাবে আয়ের উপর এই কঠিন বোঝা চাপানোই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি।

ইহার ফলে সোভিয়েটের পারিবারিক জীবন ক্রমশই সুখের হইয়া উঠিতেছে। স্বাভাবিক হৃদ্যতা ও মায়া মমতাই পারিবারিক বন্ধন। যে বিবাহ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনপ্রাণ ক্ষয় করে ও জীবন-যাত্রায় প্রতিপদে বিরক্তি ও দুঃখের কারণ হয়, সে বিবাহের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য।

বিগত কয়েক বৎসরে সোভিয়েটের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে এখানে পতিতাবৃত্তির অবসান হইয়াছে বলা চলে।

সোভিয়েটের শাসন পদ্ধতির ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে—শিল্প, কৃষি, শাসনব্যবস্থা, সামাজিক কাজ-কর্ম্ম প্রভৃতির এমন একটীও বিভাগ নাই যেখানে মেয়েরা প্রবেশ করে নাই বা উচ্চপদে উঠিতে পারে নাই। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মেয়েরা যোগ্যতার সহিত কাজ চালাইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে মেয়েরাও নিজেদের শক্তি দিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশের জন্য লড়িতেছে।

সোভিয়েটে ধর্ম্মকর্ম্ম কি বন্ধ?

আমাদের দেশে অনেকেরই মনে এখনো এ রকম ধারণা আছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় জোর জবরদস্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সোভিয়েটকে যারা ভাল চোখে দেখে না তারাই আবার এই ধরণের ব্যাপক-প্রচার চালাইয়া থাকেন!

কিন্তু সত্য ঘটনা অন্যরূপ।

সোভিয়েট শাসনের যে সব মূল নিয়ম কানুন আছে তার ১২৪ ধারায় প্রত্যেকটী অধিবাসীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং উপাসনা, আরাধনা ও নমাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

লুই সেগল লিখিয়াছেন,—সেন্ট্রাল এসিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের মনে ধর্ম্ম এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কার উৎসাহ ও প্রেরণার জীবন্ত উৎস হিসাবে এখনো বর্ত্তমান। সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট মুসলিম-প্রধান সেন্ট্রাল এসিয়ার অঞ্চলগুলিতে সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও শ্রীবৃদ্ধির নূতন নিয়মগুলি প্রবর্ত্তন করার সময় নানা ধরণের লোকাচার ও সংস্কারে যাহাতে আঘাত না পড়ে, সে-বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়াছিল। যখন রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে আধুনিক ও উন্নত সামাজিক আইনকানুন চালু হইল, তখনও সেন্ট্রাল এসিয়ার স্কুলে কোরাণ পড়ান হইতেছে, ধর্ম্মের আদালতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিচার করার অধিকার চালু আছে। বহু-বিবাহ, স্ত্রী-ক্রয়, পর্দ্দা-প্রথা প্রভৃতি এই সব অঞ্চলের সমাজে বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। স্ত্রী-ক্রয় ও নারী-ধর্ষণ শাস্তিমূলক আইন করিয়া বন্ধ করা হইল কিন্তু পর্দ্দা-প্রথার বিরুদ্ধে কোনরূপ বাধ্যতামূলক বিধি করা হয় নাই।

প্যাট স্লোন লিখিয়াছেন,—সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেকটী বাড়ী ধর্ম্ম-জীবনের কেন্দ্র। সোভিয়েট-রাষ্ট্র সরকারীভাবে নাস্তিকবাদ সমর্থন করে, কিন্তু রাশিয়ার গবর্ণমেন্ট প্রত্যেকটী লোককে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার দিয়া থাকে। বিদ্যায়তনে যদিও ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় না, প্রত্যেকের বাড়ীতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রত্যেক ধর্ম্মকে সমান চক্ষে দেখা হয়। গোঁড়া রুশ ধর্ম্ম (রাশিয়ান অর্থডক্স), খৃষ্টান দীক্ষা-ধর্ম্ম (ব্যাপটিষ্ট), মুসলিম ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সোভিয়েট রাশিয়ার নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারের অঙ্গ।

রাশিয়াতে গোঁড়া গির্জ্জার হাতে সবচেয়ে বেশী জমিদারী ছিল। তাই প্রথম দিকে গোঁড়া গির্জ্জার দল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জমিদারী হারাইবার ভয়ে দারুণভাবে প্রচার চালাইত। ঠিক তেমনি সেন্ট্রাল এসিয়ার মুসলিম ধর্ম্মাধিকারগণ নারীজাতির আধুনিক সামাজিক মুক্তির ভয়ে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নানারূপ অপপ্রচার শুরু করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট কোন সময়েই জনসাধারণের সামাজিক মনোভাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ কোন জবরদস্তি আইন কানুন চাপাইয়া দেয় নাই। যেখানে যে পদ্ধতি জনসাধারণের অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম রাখার পক্ষে ছিল, সে পদ্ধতির বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট জোর লড়াই চালাইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনো কোনও আইন, রীতিনীতি চালাইবার চেষ্টা ছিল না বলিয়াই রাশিয়ার উপর নাৎসী আক্রমণ হওয়ার পরে বিভিন্ন ধর্ম্মগোষ্ঠীও জনসাধারণের দিকেই সাহায্য করিয়াছে ও এখনো করিতেছে। হিটলারের আক্রমণের পরেই ১২,০০০ লোক মস্কোর গির্জ্জায় সোভিয়েটের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক লেনিনগ্রাড হইতে জেনারেল গ' গলের সমর্থনে বেতার-বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, যাহার যে ধর্ম্ম থাকুক না কেন সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের জয়ের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটী পরিবার প্রাণপণ কামনা করিয়াছে।

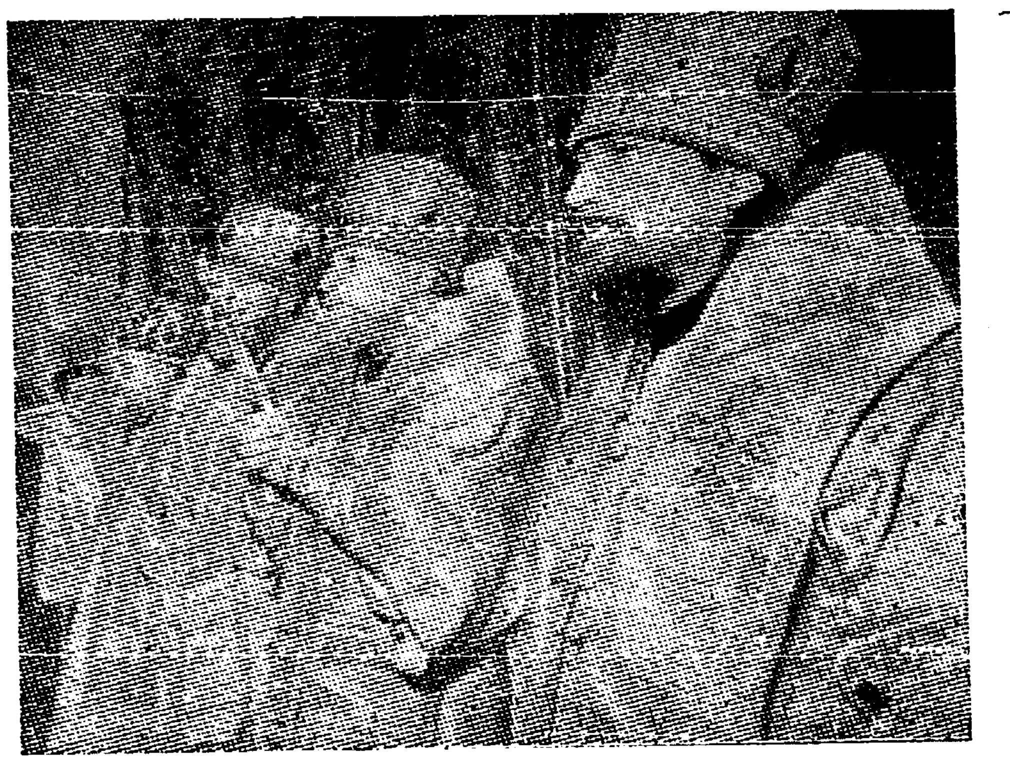

★ ধর্ম্মযাজকেরা সোভিয়েটের জয়লাভের জন্য গির্জ্জায় প্রার্থনা করিতেছে। ★

প্যারিসে ৩০ হাজার নাগরিকের সভায়
কমরেড থোরেকে সম্বর্দ্ধনা

সম্প্রতি ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারাল সেক্রেটারী **মরিস থোরে** মস্কো হইতে প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে যখন দালাদিয়ের গবর্ণমেণ্ট কমরেড থোরের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে, তখন তিনি সৈন্যবাহিনী হইতে সরিয়া পড়েন এবং ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ফ্রান্সে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। এই সময় হিটলারের বিরুদ্ধে ফরাসী দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন তিনি নিজে পরিচালনা করেন। ইহার পর কমরেড থোরে মস্কোতে যান।

ফ্রান্স জার্ম্মান কবলমুক্ত হইবার পর 'সৈন্যদল-ত্যাগী' এই অজুহাতে ফরাসী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে দিতে প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্তু ফরাসী মুক্তি আন্দোলনের চাপে শেষ পর্য্যন্ত কমরেড থোরেকে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসার অনুমতি দিতে ফরাসী সরকার বাধ্য হয়।

গত ৩০শে নভেম্বর প্যারিসের ৩০ হাজার নাগরিক এক বিরাট সভাগৃহে কমরেড থোরেকে অভিনন্দন জানায়।

কমরেড থোরে এই সভায় স্পেনের ফ্যাশিষ্ট জেনারাল ফ্রাঙ্কোকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন, এরূপ লোককে কখনোই গণতন্ত্রের প্রবেশদ্বারে থাকিতে দেওয়া চলেনা। তিনি বলেন, ফ্রান্সের উচিত বার্লিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। ফ্রান্সে এখনও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় নাই দেখিয়া তিনি বলেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা যে, বহুসংখ্যক তরুণদের আজও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর ভিতরে স্থান দেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আজই ৪০ ডিভিশন সৈন্য নামানো আমাদের উচিত। সমস্ত দেশদ্রোহী ও তাহাদের সহযোগীদের শাস্তি দেওয়া এবং **জাতীয় শ্রমিক পার্টি** গঠন করাই (অর্থাৎ সোশালিষ্ট পার্টির সহিত অভিন্ন কর্ম্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন) আজ ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য।

গত ৩০শে নভেম্বর ফ্রান্সের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা আঁদ্রে মার্তি ন্যাশনাল এসেম্বলিতে এক বক্তৃতায় পঞ্চম বাহিনীর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের বিশদ তথ্য প্রকাশ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের পোর্টিয়াসে যাহারা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী তাহাদের শাস্তি বিধানের দাবী করিয়া তিনি বলেন, একজন নামজাদা কেমিক্যাল ট্রাষ্টের মালিক নূতন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীকে অর্থ যোগাইতেছে।

নতুন ইটালীর প্রতীক
কমরেড এর্কোলি

ফ্যাশিজমের ঘৃণিত অতীতকে দূরে সরাইয়া নূতন ইটালি আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর এই নূতন ইটালিরই নায়ক **কমরেড এর্কোলি** (ওরফে **পামিরো টোগলিয়াত্তি**)।

১৮৯৩ সালে জেনোয়া শহরে কমরেড এর্কোলির জন্ম। ১৯১৪ সালে তিনি ইটালিয়ান সোশালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে তিনি ইটালির কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

অল্প বয়স হইতেই পড়াশুনার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল। ইটালিয়ান সাহিত্যে রাজনৈতিক লেখক হিসাবে তাঁহার বিরাট খ্যাতি আছে। জার্ম্মান, রুশ, ফরাসী, স্প্যানিশ—সমস্ত ভাষাতেই তিনি সমানভাবে লিখিতে ও বলিতে পারেন। এই ভাষাগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় অবিকল বজায় থাকে।

১৯২২ সালে রোমে মুসোলিনীর ফ্যাশিষ্ট গুণ্ডারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিস্তলের ভয় দেখাইয়াও যখন তাঁহার নিকট হইতে একটি কথাও তাহারা বাহির করিতে পারিল না, তখন তাঁহাকে অমানুষিকভাবে তাহারা মারপিট করে। তারপর দীর্ঘ ২২ বছর ধরিয়া কমরেড এর্কোলি তাঁহার স্বদেশ হইতে নির্বাসিত। কিন্তু বিদেশে থাকিয়াও তিনি এই দীর্ঘকাল পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে স্বদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন।

কমরেড এর্কোলি ডিমিট্রভের সহিত একত্রে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন ও ১৯৩৫ সালে কমিউনিষ্টদের নিখিল বিশ্ব সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পথ নির্দ্ধারণ করেন। ১৯৩৬ সালে রিপাব্লিকানদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কমরেড এর্কোলি স্পেনে যান। স্পেনের যুদ্ধে জোসিফ ব্রোজ (বর্ত্তমানে মার্শাল টিটো), আঁদ্রে মার্তি, লা পাসিওনারিয়া, মার্শাল জুকভ প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মী ছিলেন।

ইতালীর সহ-প্রধান মন্ত্রী এর্কোলি

স্পেনের যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে মাদ্রিদে তিনি ধরা পড়েন এবং রিপাব্লিকান সৈন্যরা তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করে। তারপর ফ্রান্সে পলায়ন করিয়া কিছুদিন পর আবার তিনি স্পেনে ফিরিয়া যান এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানে লড়াই চালান। রিপাব্লিকানদের প্রতিরোধের শেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হইল, তখন প্রতিপক্ষের একটি বিমানঘাঁটি দখল করিয়া, কমরেড এর্কোলি কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত শত্রুপক্ষের তিনটি বিমানের সাহায্যে শেষ মুহূর্ত্তে মস্কো পৌছান।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যেদিন যুদ্ধ শুরু হইল, তখন এর্কোলি প্যারিসে। তাঁহাকে ফ্রান্সের পুলিশ তখন তখনই গ্রেপ্তার করে ও অমানুষিকভাবে তাঁহার উপর নির্য্যাতন করে। ফ্রান্সে জার্ম্মানদের প্রবেশের মাত্র কয়েকদিন আগে এর্কোলি জেল হইতে পলায়ন করেন।

আজ ২২ বছর পর কমরেড এর্কোলি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নূতন ইটালিয়ান মন্ত্রীসভার তিনি এখন সহকারী প্রধান মন্ত্রী।

স্বাধীনতার পাদপীঠ ফ্রান্সে
দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণ

দেশদ্রোহীরা নূতন নূতন মুখোষ পরিয়া ফরাসী জনগণের পায়ে পরাধীনতার নূতন শৃঙ্খল পরাইতে চায়। ১০ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকার প্রবন্ধে **ইলিয়া এরেনবুর্গ** ফ্রান্সের এই পঞ্চমবাহিনীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আমরা তাহার সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে তুলিয়া দিলাম।

●

পয়লা নভেম্বর ছিল ফ্রান্সের শহীদদের স্মৃতি-দিবস। কুয়াশাচ্ছন্ন প্যারিস সহসা বিস্ফোরণের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। জার্ম্মানেরা গোলাবারুদবাহী গাড়ীতে দেশদ্রোহীরা আগুন দিয়াছে।

এই দেশদ্রোহীর দল একদিকে যেমন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, অন্যদিকে তাহারা আবার 'দেশপ্রেমিক' বলিয়া ভান করে। যে সমস্ত জঘন্য ব্যবসাদার জার্ম্মানদের কাছে মদ আর রেশম বেচিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা কামাইয়াছে, তাহারা আবার সময় সময় নিজেদের 'ম্যাকুইস' (ফরাসী গেরিলা বাহিনী) দলভুক্ত বলিয়া দেশবাসীকে ধোঁকা দেয়। উঁচু ঘরের যে সমস্ত বিলাসী মহিলা জার্ম্মান সেনাপতিদের শয্যায় বহু রাত্রি যাপন করিয়াও এতটুকু ঘৃণা বোধ করে নাই, তাহারা আবার নির্লজ্জভাবে বড়াই করে যে, তাহারা নাকি ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিয়াছে।

পল ক্লডেল ফরাসী ভাষায় গাঁজাখুরী গল্পের একজন লেখক এবং টোকিওতে রাষ্ট্রদূত হিসাবেও সে কাজ করিয়াছে। ১৯৪১ সালে সে দেশদ্রোহী মার্শাল পেতাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া এক কবিতা লেখে এবং সে আজ তার সেই পুরানো কবিতাটিতেই কৌশলে দ্য'গলের নাম বসাইয়া দেশবাসীকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিতেছে।

আজ দেশদ্রোহী ভিশিপন্থীরা ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে ছদ্মবেশী জার্ম্মানদের লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখন তাহারাই ফরাসী দেশপ্রেমিকদের কাছ হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার আওয়াজ তুলিতেছে। এই ভিশিপন্থীরা বিদেশীদের কাছে বলিতেছে, সমস্ত ফ্রান্স অরাজকতার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। বার্লিন রেডিও আবার তাহাদেরই কথায় প্রতিধ্বনি করিতেছে।

প্যারিসে মজুতদার ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা একটি নূতন সমিতি বানাইয়াছে। অধিকৃত অবস্থায় ফ্রান্সে ইহারা বহু দোকানপাট ও কারখানা জোর করিয়া হস্তগত করিয়াছিল। এই খুনীর দল আজ সমিতির ভদ্র নামের আড়ালে নূতন করিয়া মানুষ মারার অস্ত্র শানাইতেছে।

দেশদ্রোহী ভিশিপন্থীরা ফ্যাশিষ্ট ফ্রাঙ্কোর সহিত ফ্রান্সকে সখ্যসূত্রে বাঁধিবার জন্য আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। শয়তান ফ্রাঙ্কো ঘন ঘন তাহার চর পাঠাইতেছে।

ফ্রান্সে আজও অনেকগুলি কারখানা বেকার বসিয়া আছে। মালিকরা অসুবিধার দোহাই পাড়ে। অথচ জার্ম্মানদের অধীনে এই সমস্ত কারখানাতেই সমানে ওভারটাইম কাজ হইয়াছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা এই মালিকদের চক্ষুশূল। ফ্রান্সের পায়ে তাহারা ফ্যাশিষ্ট শৃঙ্খল কায়েম রাখিতে চায়। যে সমস্ত কারখানায় জার্ম্মানদের ট্যাঙ্ক তৈরী হইয়াছে, আজও পর্য্যন্ত সে সমস্ত কারখানা দেশদ্রোহী মালিকদেরই হাতে। অথচ মাত্র একটি বিস্কুট তৈরীর কারখানাই এ পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

কিছুদিন আগে এই দেশদ্রোহীরাই প্যারিসের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে ঢুকিয়া জগদ্বিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর আঁকা ১৫টি ছবি ছিঁড়িয়া দেয়। পিকাসো একজন দেশপ্রেমিক, ইহাই তাঁহার অপরাধ।

কিন্তু এই বিশ্রী কুয়াশা দূরে সরাইয়া ফ্রান্সের মুক্তিপ্রিয় জনগণের পদক্ষেপে এক নতুন অরুণোদয় আসন্ন।

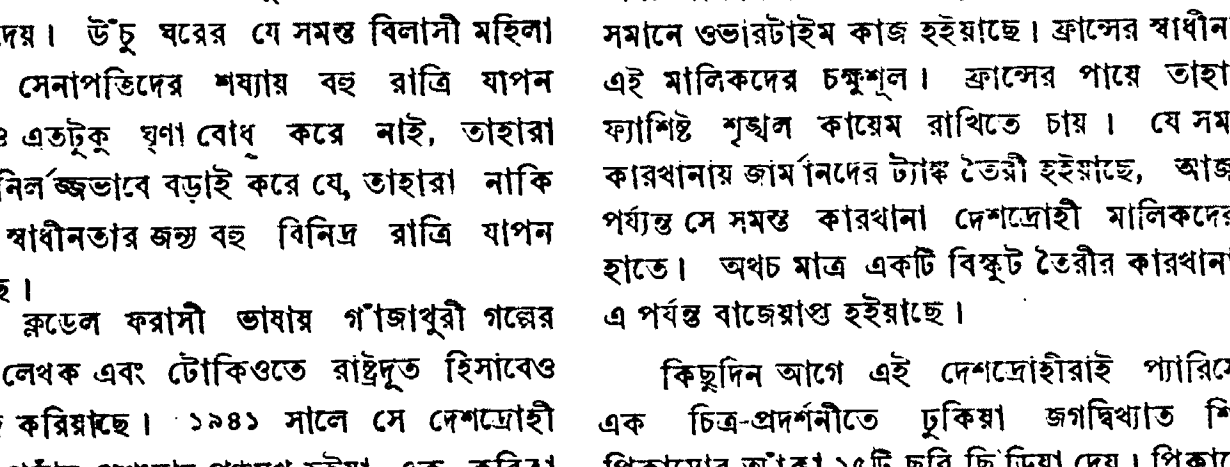

ফ্রান্সে ফসল কাটায় আমেরিকান সৈন্যরা সাহায্য করিতেছে

পোলিশ জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে
পোলাণ্ডের পুনরভ্যুত্থান

পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত জনপদ আজ জার্ম্মানদের কবলমুক্ত, সেই সমস্ত অঞ্চলে আজ পোলিশ জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এতদিন যাহা ছিল জনমনের গণতান্ত্রিক স্বপ্নকামনা—তাহাই আজ বাস্তব হইতে চলিয়াছে।

পুরানো রাজনৈতিক দলগুলির অজ্ঞাতবাসের দিন আজ শেষ হইয়াছে। স্বাধীন পোল্যাণ্ডে সম্প্রতি পোলিশ কৃষক পার্টি ও সোশালিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। পোলিশ কৃষক পার্টি যুদ্ধের আগে পিলসুডস্কি ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গের হাতে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। স্বাধীন পোলাণ্ডে এই প্রথম পোলিশ কৃষক আত্মবিকাশের অধিকার পাইয়াছে। এই উভয় পার্টির সম্মেলনেই হিটলারী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সোশালিষ্ট পার্টি সম্মেলনে পলাতক পোলিশ সরকারের কার্য্যাবলীর তীব্র নিন্দা করা হয়। এই সম্মেলন পোলিশ শ্রমিক পার্টি (কমিউনিষ্ট পার্টি), কৃষক পার্টি ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের সহিত সহযোগিতার নীতি চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মধ্যবিত্ত উদারনৈতিক দলগুলি সম্প্রতি মিলিত হইয়া একটি নূতন গণতান্ত্রিক পার্টি গঠন করিয়াছে। ইহারা পোল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি কমিটিকে সমর্থন করিতেছে। পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন মতবৈচিত্র্য আজ জাতীয় ঐক্যেই অঙ্গীভূত হইয়াছে।

শ্রমিক সংগঠনগুলিও আজ বসিয়া নাই। লুবলিন শহরের শ্রমিক সঙ্ঘে রেল, রাজমিস্ত্রি, ছাপাখানা, ডাকবিভাগ, চামড়া কারখানা প্রভৃতির মজুররা আজ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি আজ বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলের কারখানাগুলির অনেকগুলি ছিল জার্ম্মানদের অধীন; কতকগুলি কারখানার মালিকদের জার্ম্মানরা হয় মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাকি কারখানাগুলির মালিকরা পলাতক। কাজেই জাতীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে শ্রমিক সংগঠনগুলি এই ধরণের কতকগুলি কারখানার পরিচালনা ভার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছে। লুবলিন শহরের বনকোস্কি কারখানার মজুররা নির্বাচিত কারখানা কমিটি গঠন করিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের মুক্ত এলাকার বড় বড় ক্ষেতভূমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়ার ফলে ফসল বাড়ানোর আগ্রহ কৃষকদের মধ্যে বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

দেশের সংস্কৃতি যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পোলিশ লেখকরা সম্মিলিত হইয়া কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। 'পুনরুজ্জীবন' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে এবং শিল্পসংস্কৃতিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র সরকারী দপ্তর গঠিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তার জন্য পোলিশ জাতীয় কমিটি বেলোরুশিয়া ও ইউক্রেনের সোভিয়েট রিপাব্লিকের সহিত এই মর্ম্মে চুক্তি করিয়াছে যে, কার্জন সীমানার ওপারে যে সমস্ত অধিবাসী বসবাস করিতে চায়, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হইবে না। সোভিয়েট লিথুয়ানিয়ার সহিতও অনুরূপ চুক্তি করা হইয়াছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পোলিশ জাতীয় কমিটী গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার পথে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহাতে আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাতীয় কমিটীই পোলিশ জনস্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধি।

২০ হাজার চটকল মজুরের সমাবেশ

বিচার-আদালত বসানোর জোর দাবী ঃ বিলাতের মজুরদেরও সমর্থন

(গত ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জগদ্দল গোলঘর ময়দানে ২০,০০০ চটকল মজুরের বিরাট সমাবেশ হইয়া গিয়াছে।) চারিদিকে লালঝাণ্ডা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের ফেষ্টুনের সমারোহ। মজুরদের মুখ চোখগুলি নূতন আশা ভরসায় উজ্জ্বল। বিরাট মাঠ লোকে একদম ভরিয়া গিয়াছে।

সাথে সাথে মনে পড়িয়া গেল গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এই গোলঘর মাঠেই সারা বাংলার মজুর সমাবেশের কথা। সেদিনও ইস্তাহার, প্রচার ও সমারোহের অভাব হয় নাই, বরং আরও বেশী হইয়াছিল। কিন্তু লোক হইয়াছিল ইহার অর্দ্ধেক। তাহাদের চোখে মুখে সেদিন কোন ভরসা ফুটিয়া ওঠে নাই। সেদিন মাঠের এক কোণে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের লোকজন সভা-আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধতা করিতেছিল। আর মজুররা ক্রমাগত মিটিং হইতে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলাবলি করিতেছিল, ইহারা নিজেরা এক হতে পারে না, আর মজুরদের উপকার করতে এসেছে। কিছু হবে না রে ভাই, কিছু হবে না।

আর আজ কি বিরাট পরিবর্তন। মজুরদের কথাবার্তা, চলাফেরা শান্ত দৃঢ় বিশ্বাসে ভরপুর। তাই মজুরদের মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল জগদ্দল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কমরেড সত্য দাসের বক্তৃতায় :—'আজ আমরা সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছি, বিভিন্ন মিলের বিভিন্ন ডিপার্টের কিছু কিছু মজুরী বৃদ্ধি আদায় করিয়াছি। ৩ টাকা মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধি আমাদের প্রথম জয়লাভ। আমাদের প্রত্যেকটি দাবী ন্যায্য এবং **আমরা বিচার আদালত চাই-ই।**' সমবেত মজুর একবাক্যে সায় দিল।

(৩ মাস আগেও বাংলার সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজ মালিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন জানাইয়া দিয়াছে—চটকল মজুরদের আর একটি পয়সাও বেশী দিবে না।) ইহারা অনেকেই কোটিপতি এবং দেশের অন্যান্য নানাবিধ শিল্পের মালিক। বার্ড কোম্পানীর চটকল ছাড়া চা বাগান আছে, কয়লার খনি আছে, ব্যাঙ্ক আছে। ম্যাক্লিয়ড, এণ্ড্রুইয়ুল, বেগ ডানলপ, জাডিন স্কিনার প্রভৃতি প্রত্যেকটি কোম্পানীই ঐ এক ধাঁচেরই। ইহারা ইহাদের মূলধন ছাড়া চটকলের ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা জমাইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে মাত্র ৬০টি মিলের নীট লাভের পরিমাণ হইয়াছে ৮ কোটী টাকার উপরে। ১৯৪৩ সালে ২৯টি মিলের হিসাবে নীট লাভ হইয়াছে ১,০৮,৯৪,২১১৲ টাকা। আবার গেল বৎসর ইহাদের কোন কোন কোম্পানী চটকলের ব্যবসার লভ্যাংশই শতকরা সাড়ে সায়ত্রিশ টাকা হিসাবে দিয়াছে! আমলাতন্ত্র ইহাদের ভয় করিয়া চলে, সরকার পর্য্যন্ত এক পা আগাইতে ইহাদের মুখের দিকে তাকায়।

মালিকরা কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে অথচ গত ২ বৎসর যাবত চটকল মজুরের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। কয়লার অভাবে মিল বন্ধ হইয়াছে, সামরিক প্রয়োজনে অনেক মিল নেওয়া হইয়াছে। হাজার হাজার চটকল মজুর বেকার হইয়াছে। সামান্য খোরাকী দিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। (চটকল মজুরের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার হয় নাই। এই অবস্থার মধ্য দিয়া জন্মলাভ করিয়াছে চটকল শ্রমিকের দাবী ঃ ৪২৲ টাকা মাগ্গী ভাতা, ৪০৲ টাকা নিম্নতম মজুরী, পাকা চাকুরী ও পেন্সনের ব্যবস্থা।) চটকল মজুর পাইত মাত্র ৫৲ টাকা মাগ্গীভাতা, তার মজুরী গড়ে মাত্র ১২।১৩৲ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলার অন্যান্য শিল্পের মজুররা যে সামান্য মাগ্গীভাতা পায়, চটকলের মজুরদের ভাগ্যে তাহাও জোটে না। ট্রামের মজুররা মাগ্গীভাতা পায় ১৬৲ টাকা, সূতাকল মজুররা পায় ১৪।১৫৲ টাকা। করপোরেশন, রেলওয়ে প্রভৃতি মজুররাও চটকলের চেয়ে বেশী পায়।

গত জুন মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন কারখানার ইউনিয়নগুলি একযোগে আন্দোলন চালাইয়াছিল, ৮০ হাজার সহি তুলিয়াছিল ও কলিকাতায় ১০ হাজার মজুর সমাবেশ করিয়াছিল। এই আন্দোলনকে সরকার অস্বীকার করিতে পারিল না—ট্রামওয়েতে বিচার আদালত (এ্যাডজুডিকেশন) বসাইতে হইল। ট্রাম শ্রমিকের আন্দোলন সংঘবদ্ধ মালিকের জারিজুরি ভাঙ্গিয়া মাগ্গীভাতা বৃদ্ধি, নিম্নতম মজুরী, ছুটি, পেন্সন প্রভৃতি দাবী আদায় করিয়া নিল। পর পর আরও কতকগুলি এডজুডিকেশন হইয়া গেল।

(ইহার পরই আসিল বাংলার চটকল মজুরদের ভিতর আন্দোলনের নূতন জোয়ার। মজুরদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২৩টি চটকল মজুর ইউনিয়ন একযোগে মজুরদের দাবীর জন্য বিচার আদালত চাই এই ধ্বনি নিয়া আন্দোলন শুরু করিল। জগদ্দলের বিরাট মজুর সমাবেশ তাহারই পরিণতি।

চটকল শ্রমিক আন্দোলনে বহুকাল পরে এই প্রথম বিভিন্ন দলের ইউনিয়ন গুলি এক সাথে কাজ করিল, একই দাবীর কথা বলিল। শ্রমিক বিভেদের কথা শুনিল না, শুনিল একতার রণধ্বনি।)

বাংলার চটকল মজুরদের দুর্দ্দশার কাহিনী বিলাতের মজুরদের ভিতরও আলোড়ন আনিয়াছে। সেখানে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে যখন ডাণ্ডির চটকল মজুরদের এক সভায় বাংলার চটকল মজুরদের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন সেই সভার মজুরদের ভিতর তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, বাংলার মজুরদের নগণ্য মাহিনা ও ভাতার কথা শুনিয়া তাহারা বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে এবং সকলে একবাক্যে দাবী করে—সরকার অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া এ অবস্থার পরিবর্তন করুক। বাংলার হাজার হাজার চটকল মজুর বেকার অথচ সোভিয়েট সরকার যে চটের অর্ডার দিয়াছিল তাহা সমস্ত দেওয়া হয় নাই শুনিয়া ডাণ্ডির চটকল মজুররা আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তাই কমরেড ডাঙ্গে যখন মজুরদের কাছে চটকল মালিকদের আসল রূপ উদ্ঘাটন করেন, তখন তাহারা দৃঢ়তার সহিত এই অবস্থার পরিবর্তন চাহে। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একবাক্যে প্রস্তাব নেয়—অবিলম্বে সরকারকে চটকল মজুরদের দাবীর জন্য বিচার আদালত বসাইতে হইবে এবং তাহাদের সমস্ত ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে হইবে; সরকার এবং মালিককে চটকল ইউনিয়নগুলি মানিয়া লইতে হইবে।

একতাবদ্ধ আন্দোলনের জোরে আজ চটকল মজুর তাহাদের মাগ্গীভাতা আরও ৩৲ টাকা আদায় করিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। তাই তাহাদের দাবী তদন্তের জন্য যতদিন না বিচার আদালত বসিবে ততদিন তাহারা আন্দোলন আরও জোরে চালাইবে, আরও ব্যাপকভাবে একতার অভিযানে লাগিয়া থাকিবে।

★ চটকল মজুরের স্বার্থরক্ষায় বৃটেনের মজুরের আগ্রহ

কমরেড ডাঙ্গের প্রশংসনীয় উদ্যম

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে বিলাত হইতে বাংলার মজুর-নেতা কমরেড রণেন সেনের কাছে পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল :—

ডাণ্ডির মজুররা ভারত সম্পর্কে খুব আগ্রহান্বিত, পাটের দাম বাড়ার অজুহাতে যখন মালিকরা মজুরী বাড়াইতে আপত্তি করিয়াছিল তখন এখানকার মজুররা দাবী করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল, কেন পাটের দর বাড়িল? তাদের নানা বাজে কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছিল। আমি তার অনেক কিছুরই প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু আমার কাছে পুরা তথ্য নাই। ৬ মাসের আগের পুরানো 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা হইতে আমি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার পরের তথ্য দরকার। পাটের চাষ ও দর প্রভৃতি সম্পর্কে খবর আমাকে অবিলম্বে পাঠা।

চটকল মজুরদের থাকিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে 'ডাণ্ডি ডেপুটেশনে' কোন উন্নতি হইয়াছে কি না তাহাও জানিবার জন্য এখানকার মজুররা খুবই উদ্গ্রীব।

নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে

আসামের চিঠি ●

২ সের তেল ও ১ সের নূনের জন্য ১ মণ ধান

আসাম এসেম্বলির অধিবেশন

করুণাসিন্ধু রায়, এম-এল-এ

সুরমা উপত্যকার—অর্থাৎ কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার—চাষীদের আজ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কত ঘরে ঘরে গত বছরের ধান পচিতেছে, সরকারী এজেণ্ট কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অথচ এখনো নেবার কোন ব্যবস্থা করে নাই। এদিকে বোরো ধান এবং শীতকালীন ধানও কাটিয়া ঘরে আনিবার সময় বহিয়া যাইতেছে। আনিয়া রাখিবার স্থান কোথায়? এজেণ্টের লোক তাই সুবিধা পাইতেছে। প্রতি মণে ১৷০ টাকা হইতে ৩৷০ টাকা পর্য্যন্ত কম দিয়া চাষীদের কাছ হইতে ধান কিনিতেছে। সেই মূল্যও চাষীরা নগদ পাইতেছে না, বিল পাশ হইলে টাকা মিলিবে এই ভরসা দিয়া কিছু কিছু ধান কেনা হইতেছে। নূতন ধান রাখিবার স্থান নাই, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার টাকা নাই, এই বিপাকে পড়িয়া যে কোনো মূল্যে চাষীরা ধান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার উপর, আগামী বোরো ধানের চাষ করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। শীতকালীন ধানও কাটিয়া ঘরে তুলিতে হইবে অথচ খরচা কোথায়? একজন ক্ষেত মজুরের রোজকার মাহিনা ২৲ টাকা। চাষের গরু এবং চাব করিবার যন্ত্রের দাম ৮ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাই অনেক জায়গায় মাঠের ধান মাঠে পড়িয়া আছে, বোরো ধানের জমিতে চাষ পড়িতেছে না। শুধু তাই নয়। কোন কোন স্থানে ধানের দাম নামিয়া ৩৷০ টাকায় আসিয়াছে, চালের দর নামিয়াছে ৬।৵০ আনায়। অথচ নুন, তেল, কেরোসিন, কাপড় ইত্যাদি কিছু যোগাড় করা চাই। একে এই সমস্ত জিনিষ বণ্টনের সরকারী কণ্ট্রোল দোকান বা সমবায় ষ্টোর্স প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম, তাহার উপর এক মণ ধান বেচিয়া বড় জোর একসের সরিষার তৈল, এক সের লবণ এবং এক সের কোরোসিন কেনা যায়।

সরকারী এজেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে ধান চাউল সংগ্রহের একচেটিয়া অধিকার। চড়া দামের সময় ১৬৲ টাকায় কিনিয়া সরকারের কাছেই ২১৲ টাকায় ইহারা বিক্রয় করিয়াছে। অন্যায় লাভ, দুর্নীতি, অপকৌশল—এই খাদ্যসংগ্রহ নীতির অবদান। ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্য, এমন কি শোনা যায় কোন কোন মন্ত্রীরও নাকি খাদ্যসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত সরকারী এজেন্সির সহিত স্বার্থ সম্পর্ক আছে।

এই অবস্থার পটভূমিকায় আসাম ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশন বসিয়াছিল। ইহার আগে তিন মাস ধরিয়া সুরমা উপত্যকার চাষীদের মাঝে কৃষক সভার নেতৃত্বে আন্দোলন উদ্বেলিত হইতেছিল। চাষীদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন তাহাদের চরম দুর্দ্দশা, গ্রামাঞ্চলের অশেষ দুর্গতির সংক্রামক ইতিহাস পরিষদের সভ্যদের টনক নড়াইয়া দিয়াছে। সরকার পক্ষ থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল বেশী।

আসাম প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন যে সরকারী খাদ্যক্রয় নীতি আমাদের চাষীদের যে দুঃখ দুর্দ্দশা আনিয়াছে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাহার তুলনা মেলা ভার। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়াছেন, চাষীদের দুঃখ দৈন্য তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ চাষীর দুর্দ্দশা তাঁহাকে এবং তাঁহার দলের সভ্যদের ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাই একই দলভুক্ত হইয়াও স্যার সাদুল্লার নীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ উঠিয়াছে সব চেয়ে বেশী।

কংগ্রেসী দলের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র আদিত্য প্রভৃতি সরকারী ক্রয় নীতির তুমুল নিন্দা করেন। এমন কি ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ হুইটেকার পর্য্যন্ত ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে ভারত শাসন আইনের ৬৯(১) ধারা অনুসারে আইন সভার সভ্যগণ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন লাভজনক কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাঁহাদের সভ্যপদ বাতিল হইয়া যায়। জনসাধারণের খাদ্য লইয়া কাহাকেও ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া হইবে না—ইহা বলিয়া তিনি শেষ করেন।

দুইদিন আলোচনার পর যে প্রস্তাব পাশ হয় তাহাতে আছে : (১) সুরমা উপত্যকার ধান চাউল ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী এজেণ্টগণকে বাতিল করিতে হইবে; (২) এজেণ্টগণের কার্য্যাবলী তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে; (৩) সুরমা উপত্যকার ধান চাউল সরকার সরাসরি ক্রয় করিবে; (৪) শতকরা ৪০ ভাগ দাম দিয়া বাড়তি সমস্ত বোরো ধান ক্রয় করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হইবে; (৫) বাড়তি আমন, শালি এবং আউস ধানও অবিলম্বে কেনা হইবে এবং সরকারী গুদামে রাখা হইবে এবং (৬) ধান ও চাউল বিক্রয়ের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

বাংলা হইতে আগত চাষীদের জমি অর্পণ বিষয়ে মতানৈক্য পরিষদের সদস্যদের মনে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই হইল জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ ঐক্যের পথে বাধা। তবে এ বিষয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রধান মন্ত্রী সব দলের নেতাদের লইয়া একটি সম্মিলিত বৈঠক ডাকিবেন—তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এ বিষয়ে একটা যুক্ত-সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিলে আসামে শান্তি আসিবে না। এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠনের বিশেষ তৎপর হওয়া আশু প্রয়োজন।

প্রতিবাদ

৩১শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধে'র ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'উদয়ের পথে' চিত্রটি বার্ণপুর শহরে নিষিদ্ধ বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বার্ণপুর টকিজ-এর পক্ষ হইতে বাদল মজুমদার আমাদের কাছে চিঠি দিয়াছেন যে, সংবাদটী সত্য নহে। বার্ণপুরে এই চিত্র এক সপ্তাহ প্রদর্শিত হইয়াছে। —জঃ সঃ

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসের আজ কোন কর্ম্মনীতি নাই

কংগ্রেসভক্তদের অনুপস্থিতিতে যে-সব ভাল কাজ আমরা করিয়াছি এবং আমাদের মতে যে-সব কাজ কংগ্রেসের ফাশিষ্টবিরোধী ও দেশপ্রেমিক ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, জেলমুক্ত কংগ্রেস-ভক্তরা কেন সেইগুলি দেখিতে পাইতেছেন না, কেনই বা তাঁহারা আমাদিগকে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বলিয়া আমাদের প্রতি স্পষ্টতই অবিচার করিতেছেন,—প্রথমে ইহা আমাদের নিকট রহস্যজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে।

কিন্তু গভীর চিন্তার পর আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছি যে, জাতীয় আন্দোলন আজ যে গভীর সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, কমিউনিষ্ট বিতাড়নের দাবী তাহারই একটি-বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কংগ্রেসকর্ম্মীরা আজ প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহারা আজ হতাশ বোধ করিতেছেন এবং আগাইবার পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কিন্তু ইহা তাঁহারা নজর করিতেছেন না যে, আজ সমগ্র জাতীয় আন্দোলনই একটা অন্ধগলিতে গিয়া ঢুকিয়াছে। তাঁহারা এই কথা বুঝিতেছেন না যে, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অবস্থার সহিত বেমানান সেই পুরাতন নীতি ছাড়া নূতন কোন নীতি কংগ্রেসের নাই। কাজেই সেই কর্ম্মনীতি আজ দেশকে সম্মুখের দিকে পরিচালনা করিতে অক্ষম।

জাতীয় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সরকারী নীতি ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবেই নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে ঘোষিত লক্ষ্যের সহিত কর্ম্মপন্থার মূলগত বিরোধ বর্ত্তমান।

সফলভাবে দেশরক্ষা এবং ভারতের স্বাধীনতা—অর্থাৎ "স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিবর্গের সহযোগী হিসাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের যুক্ত প্রচেষ্টায় দুঃখকষ্ট একই সঙ্গে ভোগ করিবে"—ইহাই ছিল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম্মপন্থায় বলা হইল, "ব্যাপকতম ভিত্তিতে অহিংসভাবে গণ-আন্দোলন।"

ভারত নিজেই যখন বিপদাপন্ন এবং সম্মিলিত জাতিবর্গ জীবনমৃত্যু-সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ভারতের অভ্যন্তরে গণ-আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে পরিণত হইতে বাধ্য এবং তাহা ভারতের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ও সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত না করিয়া পারে না। ইহা যে সত্য তাহা বাস্তব কার্য্য-ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোনো গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা যাইতে পারে না—গান্ধীজির এই সিদ্ধান্তের মধ্যে উক্ত স্ব-বিরোধিতার স্বীকৃতি প্রকাশ্যে না হউক, পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই স্ব-বিরোধিতার জন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার ক্ষমতা ত্যাগের অনিচ্ছাকে গোপন রাখিতে পারিয়াছে এবং কংগ্রেস জাপ-পক্ষপাতী ও ভণ্ড এই অপবাদ দিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই স্ব-বিরোধিতার জন্যই নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পর মুষ্টিমেয় কংগ্রেস-সোশলিষ্ট কংগ্রেস সংগঠনকে নিজেদের কুক্ষিগত করিতে এবং তাহাদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকে বোম্বাই এ, আই, সি, সি কর্ত্তৃক সমর্থিত ও অনুমোদিত বলিয়া সফলভাবে চালু করিতে পারিয়াছে।

একক গান্ধীজিকেই ভার বহন করিতে হইতেছে

এই স্ব-বিরোধিতার জন্য দেশকে যথেষ্ট মূল্যই দিতে হইয়াছে। গত দুই বছরের ঘটনাবলীই ইহার সাক্ষী। আজ পর্য্যন্ত সমস্যার এই দিকটা আমরা আলোচনা করি নাই। আমাদের সহযাত্রী কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন কারাগারে এবং সরকারী অত্যাচার যখন বেপরোয়াভাবে চলিতেছে, তখন ঐ আলোচনায় সরকার পক্ষেরই সুবিধা হইত।

অত্যন্ত জরুরী ও প্রত্যক্ষ প্রয়োজন না থাকিলে এবং বিশেষতঃ কোন আলোচনা যখন বিদেশী সরকারকে শক্তিশালী করে তখন নিজেদের আভ্যন্তরীণ মত-বিরোধ লইয়া আলোচনা নিষিদ্ধ বলিয়া কংগ্রেসের যে-ঐতিহ্য রহিয়াছে, তাহা প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে আমরা পালন করিয়াছি। সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মুক্তির দাবী, অচল অবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করা, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের নীতিকে জনপ্রিয় করা, এবং খাদ্য ও রিলিফের কাজের দ্বারা জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা—এই কাজই ছিল গত দুই বৎসর আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য।

আজ কংগ্রেসকর্ম্মীরা মুক্ত হইতেছেন। গত দুই বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহারা যে বিচার করিবেন এবং অচল অবস্থার অবসান ও জনগণের সেবার জন্য কংগ্রেস কি নীতি গ্রহণ করিবে, সে-সম্বন্ধেও যে আলোচনা করিবেন—ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এই আলোচনা পুরাতন পথ ধরিয়াই চলিয়াছে। ফলে, বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কোন্ নীতি এবং কোন্ পথ গ্রহণ করিলে কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে অচল অবস্থার সমাধান করিতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনো কর্ম্মপন্থাই উদ্ভাবিত হইতেছে না। সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা ইহাই, যে-ওয়াকিং কমিটি গত বিশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসকে পরিচালনা করিয়াছে সেই ওয়ার্কিং কমিটি আজ কারাগারে। গান্ধীজিকে আজ একা তাঁহার পুরাতন ও বিশ্বস্ত সহযোগীদের সাহায্য ছাড়াই গোটা জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্বই বহন করিতে হইতেছে।

নেতাহীন কংগ্রেসকর্ম্মীরা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের চিন্তাধারা পুরাতন পথেই চলিতেছে। তাঁহাদের চিন্তার মূল ধারাগুলি সংক্ষেপে এই ঃ

- বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ যুদ্ধে জয়ী হইতেছে, সুতরাং আমাদের কথায় তাহারা কান দিবে না।
- জিন্না একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী, তাঁহাকে দিয়া ভরসা নাই। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আসিবেন না। তিনি সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে বেশী কিছু পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছেন।
- কমিউনিষ্টরা ৯ই আগষ্টের সংগ্রামে যোগ দেয় নাই। কাজেই তাহারা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে।
- দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্গতির জন্য বর্ত্তমানে সরকারের উপর যেটুকু চাপ পড়িতেছে, খাদ্য-আন্দোলন ও মহামারীর বিরুদ্ধে কাজ করিলে সেই চাপ অনেকটা কমিয়া যাইবে এবং তাহা ছাড়া আমলাতন্ত্র আমাদের কোনো কাজই করিতে দিবে না।

ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্ম্মীরা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হন যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় শুধুমাত্র কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করা ছাড়া আর কোনো কিছু করাই সম্ভব নয়। ঠিক এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কমিউনিষ্ট বহিষ্কারের দাবী জানায়।

'কিছুই-করা-যায় না' নীতির অর্থ কি ?

এই প্রকার চিন্তাধারার তাৎপর্য্য কি দেখা যাউক।

একটি নীতি উপস্থিত করা হইয়াছে যে, বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে বোঝাপড়া সম্ভব নয়, কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইহা চায় না। কিন্তু কোন্ দিন হইতে দেশভক্তদের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরাই আমাদের দেশের ইতিহাসের রচয়িতা হইয়া বসিল? দাস-মনোবৃত্তির ইহার চেয়ে কুৎসিত পরিচয় আর কি হইতে পারে? এই ১৯৪৪ সালে যে-কোনো স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের সঙ্গে যদি আপোসনিষ্পত্তি না হয়, তবে বৃটিশ জনসাধারণকে যুদ্ধের কঠোরতর বোঝা আরও অধিক দিনের জন্য বহন করিতে হইবে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘতর হইবে। ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া না হইলে যুদ্ধোত্তর যুগে বৃটিশ জনসাধারণকে পুনরায় ব্যাপক বেকার-সমস্যার ও বেকার-ভাতা দানের অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারত স্বাধীন হইলে তাহার বাজার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। সেই স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই মাত্র যুদ্ধোত্তর দিনে সমৃদ্ধিশালী বৃটেন গঠিত হইতে পারে।

আমরা যদি যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই জাতীয় সরকার আদায় করিতে না পারি, তবে আমাদের বণিক এবং শিল্পপতিরা একপাল হৃদয়হীন মুনাফাখোর ও ধড়িবাজে পরিণত হইবে, ঘাট্‌তি এলেকার কৃষকসমাজ সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হইবে, ব্যর্থতাই হইবে আমাদের যুবকদের জীবনের একমাত্র সম্বল, আর মহামারীর আঘাতে আমাদের সমগ্র জাতি অবসন্ন ও ক্ষীণবল হইয়া যাইবে। আমাদের দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ ভারতের ভাগ্য নিজেদের করায়ত্ত করিতে যদি সক্ষম না হন, তবে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক বিভেদ, অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ ও নৈতিক অধঃপতনের গ্লানির ভিতর বহু দিনের জন্য আমাদের ডুবিয়া থাকিতে হইবে।

বৃটিশ ও ভারতীয় জনগণের উভয়েরই এই অতি প্রয়োজনীয় দাবীকে যদি সফল করা না যায়, তবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কি মূল্য রহিল? এই দাবী পূরণ করা যায় না, এমন কথা বলা চলে না। কি ভাবে এই দাবী আদায় করা সম্ভব, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই নেতৃবৃন্দের সম্মুখে আজ কর্ত্তব্য।

এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মুস্‌লিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং জিন্না সাহেব একজন বৃটিশ-ভক্ত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তাহাই? কংগ্রেসী জনসাধারণের নিকট গান্ধীজির যে-স্থান, মুক্তিকামী লীগ-জনসাধারণের নিকট জিন্না সাহেবের স্থানও সেইরূপ। কংগ্রেসভক্তরা মহাত্মাজিকে যেরূপ শ্রদ্ধা করেন, লীগভক্তরা তাঁহাদের কায়েদে আজমকে তেমন গভীরভাবেই শ্রদ্ধা করেন। কংগ্রেসকে আমরা যেরূপ স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করি, মুস্‌লিম জনসাধারণ লীগকেও তেমনি দেশপ্রেমিক সংগঠন বলিয়াই শ্রদ্ধা করে। ইহার কারণ, ১৯১৯-২০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যেরূপ গণসংগঠনে পরিণত হইয়াছে, জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে লীগও আজ সেইরূপ গণসংগঠনে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কারণ, "স্বরাজ" এই একটি শব্দের দ্বারা গান্ধীজি আমাদের স্বাধীনতার প্রেরণাকে যে-ভাবে ভাষা দিয়াছিলেন, জিন্না সাহেব তেমনি তাঁহার 'পাকিস্তান' কথার মধ্যে মুস্‌লিম জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও নিজ বাসভূমে পূর্ণ অধিকার অর্জ্জনের কামনাকে রূপ দিয়াছেন।

একজন কংগ্রেসকর্ম্মী এখনি এই সব কথা স্বীকার করিবেন. এমন আশা আমরা করি না। কিন্তু তাঁহার নিকট এইটুকু নিশ্চয়ই আমরা আশা করিব যে, তিনি যেন অন্যের দেশপ্রেমকে অস্বীকার না করেন, বরং অন্যের দেশপ্রেম কি রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার জন্য চেষ্টা করেন। দেশপ্রেমে একচেটিয়া অধিকারের দাবী কংগ্রেসকর্ম্মীরা করিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি। কংগ্রেসভক্তরাই যদি সঙ্কীর্ণচেতা এবং ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়েন, তবে কে আর উদার দৃষ্টি লইয়া আমাদের এই হতভাগ্য দেশের দেশ-প্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করিবার কাজে আগাইয়া আসিবে! কংগ্রেসভক্তরা যদি লীগকে কেবল গালাগালিই দেন এবং লীগের বিপুল শক্তিবৃদ্ধির ও ন্যায্য দাবীর তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সংগঠনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনেই অস্বীকার করিবেন। নিজেকেই একমাত্র দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রচার করা এবং অন্যের দেশপ্রেমকে অস্বীকার করা নেহাৎই সহজ কাজ। কিন্তু কংগ্রেসের ঐতিহ্য কি ইহার বিপরীতই নয়?

আমলাতন্ত্রকে কি আমরা বাধ্য করিতে পারি না?

খাদ্যের জন্য এবং রিলিফের জন্য কাজ সম্ভব নয়, উচিতও নয়—এই ধরণের একটি মতবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই কাজ সম্ভব নয়, কারণ আমলাতন্ত্র আমাদের এই কাজ করিতে দিবে না। এই কাজ করা উচিতও নয়, কারণ এই কাজ করার অর্থ সরকারের সহিত সহযোগিতা করা, এবং ইহার ফলে সরকারই শক্তিশালী হইবে।

কিন্তু আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দিকে একবার নজর দেওয়া যাউক। এই কথা সত্য, আমলাতন্ত্র কংগ্রেসের কোনো কার্য্য-কলাপকেই সুনজরে দেখে না। কিন্তু কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকে আমলাতন্ত্র কি কখনও বাধা দিতে পারিয়াছে? অবশ্য গঠনমূলক কাজকে যখন আইন-অমান্য আন্দোলনেরই অংশ হিসাবে পরিচালনা করা হইয়াছে, তখনই মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আজ কমিউনিষ্টরা যেখানেই রহিয়াছে, সেখানেই তাহারা খাদ্য ও রিলিফের জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছে। যেখানেই আমরা শক্তিশালী এবং স্থানীয় আমলাতন্ত্র সৎ, সেখানেই আমরা সরকারী সহযোগিতাও অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আর যেখানে আমরা দুর্ব্বল এবং সরকারী আমলাতন্ত্র সাহায্যদানে বিমুখ, সেখানে নিজেদের চেষ্টায় সামান্য যাহা কিছু সম্ভব তাহাই আমরা করিয়াছি।

তত্ত্ববাগীশেরা ঘরে বসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, আমরা সরকারকে শক্তিশালী করিতেছি। কিন্তু যে-জনসাধারণের মধ্যে আমরা কাজ করি তাহারা দুই হাত তুলিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করে, কারণ তাহাদের সাহায্য করিবার এবং বাঁচাইবার জন্য আমরা আপ্রাণ লড়াই করিতেছি।

কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠরা যখন বলেন, আমলাতন্ত্র থাকা পর্য্যন্ত খাদ্য ও রিলিফের জন্য কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, তখন এইটুকু মাত্র আমরা বলিতে পারি যে সরকারকে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই মনে করেন, অথচ আসলে সরকারের তেমন কোনো শক্তিই নাই। কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠরা আজ নিজশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, এবং যে-কাজে কেহ তাঁহাদের বাধা দিতে পারে না তেমন কাজেও তাঁহারা ভরসা পাইতেছেন না।

যখন তাঁহারা বলেন, খাদ্যের জন্য, রিলিফের জন্য কাজ সরকারকেই শক্তিশালী করে, তখন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, দেশবাসীর সেবা কি করিয়া আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে? আরো জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—কংগ্রেসের ঐতিহ্য কি ইহাই শিখায় না যে দেশবাসীকে সেবা করিলেই জাতিকে শক্তিশালী করা হয় এবং কর্ম্মীরাই আরো অভিজ্ঞ হইয়া উঠে?

কংগ্রেসে একনায়কত্বের ঠাঁই নাই

বৃটিশ আমাদের কথায় কান দিবে না, জিন্নাকে দিয়া কোন আশা নাই, যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছুই করা সম্ভবপর নয়—এই ধরণের কথাবার্ত্তা নেতিবাচক মনোবৃত্তি ও হতাশমূলক মনোভাবেরই পরিচায়ক। এই সব বিবৃতির মধ্যে কোনো রাজনৈতিক কর্ম্মনীতি নাই, বরং আসলে এই সব বিবৃতি নীতিহীনতার পরিচায়ক।

যে-সব কংগ্রেসকর্ম্মী মনে করেন সংগঠনের অভাবেই "জাতীয় সংগ্রাম" ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত মনোভাব খুবই ব্যাপক।

"বর্ত্তমানে কিছুই করা সম্ভব নয়"—এই নীতি হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন. "যুদ্ধোত্তর কালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।" বসিয়া থাকো, আর কার্য্যতঃ এই নীতির পরিণাম "আপাততঃ সংগঠন গড়িয়া তোলো।" কিন্তু

(শেষাংশ ১২শ পৃঃ দেখুন)

(১১ পৃঃ পর)

এই কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, নির্ভুল কার্য্যকরী রাজনৈতিক নীতি না থাকিলে কোনো সাংগঠনিক কাজই সম্ভবপর নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই যদি নেতিবাচক হয়, তবে সাংগঠনিক পরিকল্পনা বিচ্ছেদমূলক হইতেই বাধ্য।

এই ধরণের "সংগঠন-করনেওয়ালাদের" সবচেয়ে উগ্রপন্থীর উদাহরণই আমি এখানে উল্লেখ করিব—ইনি হইতেছেন শ্রীযুক্ত এস্, কে, পাতিল। "কংগ্রেসের পুনর্গঠন ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তব্য" নামে তিনি এক অদ্ভুত প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন।

"আমার মতে, সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্তাগুলির এবং সংগঠিত, অসংগঠিত সকল জনসাধারণেরই সহিত কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা আবশ্যক।"

এই সব সত্তা বলিতে তিনি শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, দোকানকর্ম্মচারী প্রভৃতির নামই উল্লেখ করিয়াছেন এবং "তিনটি মূল নীতির ভিত্তিতে, অর্থাৎ সংযুক্ত কংগ্রেস, এক নেতা এবং এক প্রোগ্রাম"-এর ভিত্তিতে ইহাদের সংগঠিত করিবার জন্য তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদের আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাতিল ছাড়া লোকচক্ষে হীন অনেক ব্যক্তিও উপরোক্ত বুলি লইয়া গলাবাজি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাতিল যদি মনে করিয়া থাকেন, ভারতের সর্ব্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরণের সাংগঠনিক একনায়কত্ব চালু করা যাইবে, তবে তিনি নিতান্তই ভুল করিয়াছেন।

তাঁহার মূল রাজনৈতিক ধারণা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে:

"আমাদের অনেকেরই ধারণা, সমগ্র জাতি কংগ্রেসের পিছনে রহিয়াছে। অন্য দল এবং উপদলের সমর্থক লোক ছাড়া আর সবাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে বিচার করা মারাত্মক, কারণ এইভাবে অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা অসম্ভব। এই ধরণের আত্মসন্তুষ্টি আমাদের সংগঠনকে ভিতর হইতে ঘুণ ধরাইয়া দিতেছে, এবং আমাদের ক্ষতি করিয়া অন্য দল ও উপদলগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের সহিত আমাদের যোগাযোগ আরো স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। **'যাহারা আমাদের সঙ্গে নাই, তাহারাই আমাদের বিরুদ্ধে'—আমার মতে এই ভাবেই আমাদের শক্তি বিচার করা উচিত।** এই ভাবে বিচার করিলে প্রতারিত হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।"

ইহা আত্মম্ভরিতা ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

উপরোক্ত বক্তব্যের পর এই বিষয়ে আর অবাক হইবার কিছুই নাই যে, শ্রীযুক্ত এস্, কে, পাতিল নিজে গান্ধীপন্থী হইয়াও আজ কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের সবচেয়ে বড় বান্ধব সাজিয়াছেন। কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের সহিত বন্ধুত্বকে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্টদের বহিষ্কারের দাবী করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কমিউনিষ্টদের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্যও কংগ্রেসকর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের ঘরোয়া সম্মেলনে ও আলোচনায় তিনি এতদিন যাহা বলিয়া আসিতেছেন তাহার খোলাখুলি অর্থ এই দাঁড়ায়:

বোম্বাইতে বিগত সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর উপর কমিউনিষ্টদেরই কর্ত্তৃত্ব ছিল এবং কোনো শ্রমিক-ধর্ম্মঘট সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কমিউনিষ্টদের প্রভাব সহজে নষ্ট করা সম্ভব নয়, কারণ কমিউনিষ্টরা চমৎকারভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পরিশ্রমী। কংগ্রেসকর্ম্মীদের আজ তাহাদেরই মত হইতে হইবে—শ্রমিকদের মধ্যে যাইতে হইবে ও শ্রমিকদের সংগঠিত করিতে হইবে, যেন ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সময় শ্রমিকশ্রেণী আর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে না পারে। কংগ্রেসের তরফ হইতে অর্থ ও উপদেশ দেওয়া হইবে।

কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা কর্ম্মী জোগাইতে আর শ্রীযুত এস্, কে, পাতিল অর্থ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের জন্য আবেদন

এই ধরণের ঘটনা যদি কেবলমাত্র বোম্বাইতেই সীমাবদ্ধ থাকিত এবং শ্রীযুত এস্, কে, পাতিলের ব্যবহার যদি শুধু একটি মাত্র ঘটনা হইত, তাহা হইলে উদ্বেগের কোনোই কারণ থাকিত না। কিন্তু বিরোধী কমিউনিষ্ট সংস্কার অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মীর মনকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ৯ই আগষ্টের পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্য হইতেই এই বিদ্বেষের জন্ম। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মীই আগষ্ট-আন্দোলনকে ১৯২০ এবং ১৯৩০ সালের গণ-আন্দোলনেরই অনুরূপ বলিয়াই মনে করেন। এই সংগ্রামে যোগ না দেওয়ার জন্য তাঁহারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ। আমাদের নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেস-ভক্তদের স্বাভাবিক সন্দেহের সুযোগ লইয়া কংগ্রেস-সোশালিষ্ট ও তাহাদের অনুচরেরা কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষকে আরো বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছে এবং কংগ্রেসভক্তদের কমিউনিষ্ট-বিরোধী সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

কংগ্রেসের ছদ্মবেশ পরিয়া মুষ্টিমেয় কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা সজ্ঞানে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এতদিন যাহা করিয়া আসিয়াছে, এবং কমিউনিষ্টরা সরকারের টাকা খাইয়া কংগ্রেসকর্ম্মীদের পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিয়াছে বলিয়া যে-কুৎসা জানিয়া শুনিয়া তাহারা এতদিন প্রচার করিয়াছে, তাহার পর তাহাদের বুঝাইবার মত আশা আমরা আর পোষণ করি না।

কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। পরস্পরের মতামত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের দ্বারা তাঁহাদের দিয়া এইটুকু অন্ততঃ স্বীকার করাইতে পারিব যে, কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের নীতি দেশপ্রেমের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ কংগ্রেসের বিরাট বক্ষে ও জাতীয় আন্দোলনে আমাদের স্থান রহিয়াছে—যদি আমরা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলি। কার্য্যতঃ এই শৃঙ্খলা বরাবরই আমরা রক্ষা করিয়াছি এবং পার্টিও আমাদের এই শৃঙ্খলা পালনের জন্য আজীবন শিক্ষা দিয়াছে। **কমিউনিস্ট মাত্রই সুশৃঙ্খল অক্লান্তকর্ম্মী খাঁটি দেশপ্রেমিক।**

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার এবং জনগণকে সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের আগ্রহকে আমরা বিদ্রূপ করি না। বরং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের নিকট হইতে এই কাজই আমরা আশা করিতেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি, ইহার ফলে দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক বিপুল অংশের মধ্যে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার ঐকান্তিক আগ্রহ আমাদের গভীর আনন্দ দিয়াছে। কারণ, কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া আমরা এতদিন ঠিক এই জন্যই আন্দোলন করিয়াছি। আমরা জানি, এতদ্বারা কংগ্রেস এবং জনগণ উভয়েই শক্তিশালী হইবে।

আমরা স্বীকার করি যে, কোনো একদল কংগ্রেসকর্ম্মীর ঘরোয়া সম্মেলন করার এবং আমাদের বাদ দিয়াই সম্মেলন ডাকার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু নির্ম্মল বিবেক লইয়া আমরা দাবী জানাইতেছি, কংগ্রেসকর্ম্মীদের যে-অধিকার আমাদেরও সেই অধিকার রহিয়াছে; কারণ আমাদের উপর ন্যস্ত প্রতিটি কর্ত্তব্য ঐকান্তিকতার সহিত পালন করিতে আমরা প্রস্তুত। আমাদের বিশ্বাস আছে, কংগ্রেস যখন স্বাভাবিকভাবে কাজ পুনরায় আরম্ভ করিবে, আমরা কংগ্রেস হইতে তখন বাদ পড়িব না। আমাদের আত্মত্যাগের বিরুদ্ধে কোনো দলগত চক্রই জয়ী হইতে পারে না। কোনো কমিউনিষ্ট বিরোধী সংস্কার আমাদের দেশপ্রেমকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কারামুক্ত হইয়া আসিবার পর আমি তাঁহাদের সম্মুখে আনন্দের সহিত আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি; ৯ই আগষ্টের পর আমরা যে-নীতি প্রচার করিয়াছি ও যে-কাজ করিয়াছি, তাহারই ভিত্তিতে আমাদিগকে তাঁহারা বিচার করুন।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধের উপর অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী অপেক্ষা আমাদের অধিকতর বিশ্বাস রহিয়াছে। ৯ই আগষ্টের পরে অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া লর্ড ওয়েভেলের নিকট চিঠি লেখার পর তাঁহারা আমাদিগকে সেই ৯ই আগষ্ট-আন্দোলনেই যোগ না দিবার জন্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবেন, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। এমন কোনো কথা আমরা বলি নাই বা এমন কিছু লিখি নাই, যাহা আমাদের অস্বীকার করার প্রয়োজন হইবে। আমাদের কৃতকার্য্যের জন্য আমরা লজ্জিত নই। আমাদের কেবল একটি মাত্র আক্ষেপ যে আমাদের কণ্ঠে আরো বেশী শক্তি ছিল না, আমাদের পদক্ষেপ দুর্ব্বল ছিল!

অন্য কোনো স্থানের কারামুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীরাই নিজেদের ঘরোয়া সম্মেলনে বোম্বাই সম্মেলনে গৃহীত কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের প্রস্তাব পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। 'বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায়' এড্ হক কমিটিগুলি হইতেই মাত্র সরিয়া থাকার জন্য যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসনেতারা আমাদের বলিয়াছেন; কিন্তু রাজবন্দী-সাহায্য, কস্তুরবা-স্মৃতিভাণ্ডার প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহারা আমাদের যোগদান শুধু অনুমোদন করা নয়, আমাদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুত এস্, কে, পাতিলের নেতৃত্বে ঐ ধরণের প্রস্তাব পাসের পিছনে শুধু যে কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের উস্কানি রহিয়াছে এবং তাঁহার নিজেরও জবরদস্তিমূলক আচরণের প্রমাণ রহিয়াছে তাহাই নয়, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসকর্ম্মীরা যতখানি কমিউনিষ্টবিদ্বেষী হইলে উক্ত প্রস্তাব পাস করা সম্ভব, বোম্বাই-সম্মেলনে তাহারও প্রমাণ মিলিয়াছে।

উভয়েরই বিবেচিত মহৎ প্রচেষ্টায় কারামুক্ত কংগ্রেসসেবীরা যদি আমাদের সহিত সহযোগিতা না করেন, তবে একমাত্র দেশের জনগণই অধিকতর দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিবে। অথচ দুর্গত দেশবাসীর সেবায় অগ্রসর হইবার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক সন্তানের কাছেই ডাক আসিয়াছে। আজ যদি কংগ্রেসসেবীরা রাজনৈতিক ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন, তবে দেশের অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? আমরা আশা করি, অন্যান্য স্থানের কংগ্রেসকর্ম্মী-সম্মেলন বোম্বাই-সম্মেলনের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ তো করিবেনই না, বরং বোম্বাই-কংগ্রেসকর্ম্মীরা আবার যখন সম্মেলনে মিলিত হইবেন তখন যাহাতে তাঁহারা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া এই প্রস্তাব পরিহার করেন তাহার জন্য বোম্বাইয়ের কংগ্রেসসেবীদের কাছে অনুরোধ করিবেন।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক-আন্দোলনে এতদিন আমরা কাজ করিয়াছি; আজ এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের আমরা সানন্দে অভ্যর্থনা জানাইব। যত বেশী কর্ম্মী পাওয়া যায়, এই সব সংগঠন ততই শক্তিশালী হইবে, ততই তাহারা জনগণের স্বার্থকে অধিকতর রক্ষা করিতে পারিবে, এবং আমাদের জাতীয় আন্দোলনও ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা আশা করি, নূতন উৎসাহী কর্ম্মীরা জওহরলাল নেহ্‌রুর মতই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নিখিল ভারত কৃষকসভার নীতি ও ঐতিহ্য মানিয়া চলিবেন। তবে, কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের প্ররোচনায় যদি তাঁহারা পাল্টা গণসংগঠন গড়িবার কথা চিন্তা করেন, তবে এই কথাই আমরা তাঁহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে এই পথে সংগঠন নয়, বিচ্ছেদই বাড়িবে।

সংগঠিত বিরাট শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ কংগ্রেসকে নিজেদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়াই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু শ্রেণীসংগঠন হিসাবে নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভাকেও তাহারা ভালবাসে। যদি কোনো পাল্টা ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক-সভা গঠিত হয়, তবে স্বভাবতঃই তাহারা প্রবলভাবে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবে, এবং এই চেষ্টাকে তাহাদের সংগঠন ও ঐক্যকে ভাঙিবার অপচেষ্টা বলিয়াই মনে করিবে। অন্যান্য স্থানের কংগ্রেসসেবীরাও যদি শ্রীযুত এস্, কে, পাতিলের ন্যায় কমিউনিষ্ট-বিরোধী মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পাল্টা গণ-সংগঠন গড়িবার চেষ্টা করেন, তবে ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা যেখানে শক্তিশালী, সেখানে পাল্টা সংগঠন গড়িবার চেষ্টা সফল হইবে না। গত ১০ বৎসর যাবৎ শ্রীযুত এস্, কে, পাতিল বোম্বাইতে এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি সফলকাম হন নাই। অধিকসংখ্যক কর্ম্মী পাইলেই এবং প্রচুর টাকা খরচ করিলেই এই কাজ সম্পন্ন করা যাইবে না। ৯ই আগষ্টের পর সেই চরম উত্তেজনার দিনে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট বাধাইবার জন্য অচ্যুৎ পটবর্দ্ধন ও তাহার দল যত যুবককে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পাঠাইতে এবং যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল, শ্রীযুত পাতিলের পক্ষে আজ আর তত যুবক ও টাকা সংগ্রহ সম্ভব নয়। ঐ ধরণের অপচেষ্টা আবার যদি শুরু হয়, তবে শ্রমিকদের কাছে গিয়া আমরা এই কথাই বুঝাইব যে, ধৈর্য্য ধর, কারণ সমস্ত কংগ্রেসসেবীই এই ধরণের নয়, এবং আজ দেশের পক্ষে দুঃসময় আসিয়াছে।

ইহার আগে কংগ্রেস-সোশালিষ্টদের "স্বাধীনতার বিপ্লব" যেভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, শ্রীযুত এস্, কে, পাতিলের "নূতন সাংগঠনিক পরিকল্পনা"ও তেমনি ভাবেই বানচাল হইয়া যাইবে। অনেক কঠিন কর্ত্তব্যই আমাদের করিতে হইতেছে; শ্রীযুত পাতিল আমাদের জন্য আর একটি কঠিন কাজ বাড়াইবেন মাত্র। সেই কাজ হইল, গণসংগঠনের ঐক্য বজায় রাখা, এবং যে-সকল কংগ্রেসকর্ম্মী বর্ত্তমান গণ-সংগঠনগুলি ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াও ভাবিবেন যে তাঁহারা জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিছেন তাঁহাদের ভেদমূলক কার্য্যকলাপের ফলে জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কংগ্রেস-বিদ্বেষ যাহাতে না ছড়ায়, সেইজন্য চেষ্টা করা।

যেখানে আমাদের শক্তি কম এবং কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা যদি সেইখানে পাল্টা সংগঠন গড়িয়া তোলেন তাহা হইলে ফল দাঁড়াইবে এই যে, অসংগঠিত বিপুল শ্রমিক-সমাজ যে-গণ-সংগঠনে আমরা কাজ করিতেছি কিম্বা যে-সংগঠন নূতন গড়িয়া উঠিবে তাহার কোনটাতেই যোগ দিবে না। প্রকৃত বন্ধু কে ইহা বিচার করার নির্ভুল পথ জনসাধারণ জানে এবং সেই যাচাইয়ের পথ অত্যন্ত সোজা। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, প্রকৃতই যদি তোমরা আমাদের সেবা করিতে চাও, তবে তোমরা এক হও না কেন? এরূপ ক্ষেত্রে, যে-সামান্য সংগঠন আছে, তাহা-তো ভাঙ্গিয়া যাইবেই, উপরন্তু জনসাধারণের মধ্যে গভীর হতাশা নামিয়া আসিবে। তাহারা মনে করিবে, আমরা দুইটি বিরুদ্ধ দল এবং জনগণকে সংগঠিত এবং সেবা করা অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেই আমরা অধিকতর আগ্রহশীল।

ব্যাপকতর ঐক্যের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

রাজনৈতিক ব্যর্থতা কি আমাদের সাংগঠনিক বিচ্ছেদের পথে টানিয়া লইবে, না, গভীরতর রাজনৈতিক চিন্তা, কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপকতর ঐক্য এবং জনগণের মধ্যে অধিকতর কাজের পথে এই ব্যর্থতা আমাদের পরিচালিত করিবে?

● আমরা কমিউনিষ্টপন্থী কংগ্রেসসেবীরা কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি।

● আজ যখন কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য আমরা আন্দোলন করি, তখন ১৯১৯-২০ সালের

(শেষাংশ ১৩শ পৃঃ দেখুন)

● সরকারী কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে
● দেশবাসীর প্রতি পথনির্দ্দেশে

কংগ্রেসের পতাকা বহিয়াছে কাহারা ?

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ঐতিহাসিক দিনগুলি এবং কংগ্রেস-খিলাফৎ মৈত্রীতে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ইতিহাসই আমাদিগকে উৎসাহ যোগায়।

● ১৯৩০ ও তৎপরবর্ত্তী কালের জওহরলাল নেহ্‌রুর প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতা হইতেই শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন চালাইবার প্রেরণা আমরা লাভ করিয়া থাকি।

● কংগ্রেসসেবীদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও একনায়কত্বের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আমরা সাহস পাই, কারণ ১৯৩৪ সালে 'কংগ্রেসকে একদলীয় প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করিবার পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, তবে ১৯৪৪ সালে আর সেই পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে না।

আমরা জানি, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে কমিউনিষ্টবিদ্বেষ আজ প্রসার লাভ করিয়াছে। আমরা মনে করি, কংগ্রেসসেবীদের মনে যে আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহা হইতেই এই বিদ্বেষের জন্ম এবং এই ভুল ধারণাকে দূর করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ইহাও জানি যে, মিথ্যা কুৎসা প্রচার এই ভুল ধারণা সৃষ্টির জন্য কিয়দংশে দায়ী, এবং সেই মিথ্যা প্রচারও শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে। কমিউনিষ্ট-বিরোধী সংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশপ্রেমিক নীতিকে আমরা প্রয়োগ করিব এবং কংগ্রেসসেবীদের মন নরম হইবেই। বিভেদকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম আমরা চালাইয়া যাইব এবং আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, বিভেদকারীরা জয়ী হইবে না।

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট নীতির পার্থক্য কোথায়?

৯ই আগষ্টের দায়িত্ব

গান্ধীজী…

লিন্‌লিথগোর প্রতি চিঠিতে গান্ধীজী লেখেন:

"কংগ্রেস-নেতাদের পাইকারী ভাবে গ্রেফ্‌তারের ফলেই জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ও ইহার জন্যই তাহারা আত্মসংযম হারায়……"

—টটেন্‌হ্যামের পুস্তিকার উত্তরে তিনি আবার সেই কথারই উপর জোর দিয়া এইভাবে বক্তব্য শেষ করেন:

"আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে আমার বৃটিশ অপসরণের প্রস্তাব দ্বারা গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার কোন বিশেষ প্রস্তুতি বা কল্পনা সূচিত হয় না—আমি বা অন্য কোন কংগ্রেস-নেতা হিংসাত্মক কাজের কথা ভাবি নাই, এবং আমি এই ঘোষণাই করিয়াছি যে কংগ্রেসসেবীরা যদি হিংসার তাণ্ডবে মাতেন তবে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের মধ্যে জীবিত না-ও দেখিতে পারেন। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমি কখনই গণ-আন্দোলন শুরু করি নাই—একমাত্র আমার উপরেই উহা আরম্ভ করার ভার ন্যস্ত ছিল; গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালানোই আমার মতলব ছিল। ঐ আলোচনা ব্যর্থ হইলে তবেই আমার আন্দোলন শুরু করার কথা ছিল এবং আলাপ-আলোচনার জন্য 'দু'-তিন সপ্তাহ' অবকাশের কথাই আমি ভাবিয়াছিলাম।

"অতএব ইহা পরিষ্কার যে, গত ৯ই আগষ্ট ও তাহার পরে যে-গোলমাল হয়, গ্রেফ্‌তার না করিলে ঐরূপ ঘটিত না। প্রথমে আমি আলাপ-আলোচনা সফল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম, আর দ্বিতীয়তঃ কৃতকার্য্য না হইলে গোলমাল এড়াইবার চেষ্টা করিতাম………

"……আন্দোলন অহিংস থাকে, কংগ্রেসনেতারা ইহাই চাহিয়াছিলেন।……অতএব কংগ্রেসী বা অন্য কেহ জনসাধারণ যে হিংসামূলক কাজ করিয়াছে তাহা নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করিয়াছে।"

মওলানা আজাদ…

ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে লিনলিথগোকে লেখা তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রে মওলানা আজাদ লেখেন:

"আমি এই কথাই পরিষ্কার ভাবে বলিতে চাই যে, ব্যক্তিগত দিক দিয়া ও যৌথভাবে সংগঠনের পক্ষ হইতে আমাদের ক্ষেত্রে আপনার কংগ্রেস কর্ত্তৃক গুপ্ত আন্দোলন চালাইবার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন………

"কংগ্রেস যদি হিংসামূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিতেই চাহিত তবে ভারতবর্ষে কি অবস্থার সৃষ্টি হইত আমি আপনাকে সেই কথা চিন্তা করিতে বলি। কারণ, এ-পর্যান্ত যাহা ঘটিয়াছে কংগ্রেসের মত ব্যাপক ও প্রভাবশালী সংগঠনের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শতগুণ শোচনীয় অবস্থা ঘটানো সম্ভব ছিল……

"……আমাদের গ্রেফ্‌তারের পর গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারতের জনসাধারণের প্রতি যে-আচরণ করা হইয়াছে তাহার ফল জনসাধারণের উপর কি হইয়া উঠিয়াছিল, কি ভাবে বহু লোক বাধ্য হইয়া মরিয়া হইয়া উঠে—তাহাই আপনাকে বিচার করিতে বলি।"

পি, সি, জোশী…

১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট সকালে গ্রেফ্‌তারের কয়েক ঘণ্টা পরে কমিউনিষ্টদের পক্ষ হইতে পি, সি, জোশী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন। উহাতে সঙ্কটের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করা হয় এবং বোম্বাই-এ নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি যে সংগ্রাম নয়, আলোচনার জন্যই আবেদন জানায়—এই কথা দেশবাসীকে স্মরণ করানো হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে কমিউনিষ্ট পার্টি আগষ্ট-প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যা দেয় ঠিক সেই সময়েই যখন অচ্যুত পটবর্দ্ধন ও ডাঃ রামমোনহর লোহিয়া কর্ত্তৃক গঠিত ভুঁইফোঁড় "এ, আই, সি, সি কর্ম্মকেন্দ্র" কংগ্রেস বোম্বাই-এ নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সভায় গণসংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছে এই মর্ম্মে প্রচার চালাইতেছিল। ইহাও দ্রষ্টব্য যে এই বিবৃতিতে পাঁচ দিন পরে লিনলিথগোকে লেখা গান্ধীজির প্রথম পত্রের (১৪ই আগষ্ট) অনুরূপ রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা হয়।

জোশী বলেন:

"উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ প্রথম আঘাত হানিয়াছে। কংগ্রেস আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রাখে। সমস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তার ও আরো অধিক নির্ম্মম আচরণের দ্বারাই গভর্ণমেণ্ট উহার জবাব দিয়াছে। প্ররোচনা যোগাইতেছে গভর্ণমেণ্ট, বিশৃঙ্খলার ইন্ধনও তাহারাই যোগাইতেছে আর অন্ধভাবে জাতীয়তাবিরোধী ও কংগ্রেসবিরোধী এক সমাবেশের চেষ্টা চালাইয়াছে।

"গভর্ণমেণ্টের নীতির অর্থ আমাদের প্রিয় দেশের পক্ষে নরকযন্ত্রণা—নির্ম্মম নিষ্পেষণের উত্তেজনায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত হানাহানি। জাতীয় দাবী পদদলিত করার ফলে দেশপ্রেমিক বৃটিশবিরোধী মনোভাব ফাশিষ্টদের অনুকূল নৈরাশ্যবাদী মনোভাবে পরিণত হইবে। জাতির দেশরক্ষার নামে গভর্ণমেণ্ট যাহার উপর সত্যকার দেশরক্ষা নির্ভর করে সেই ভিত্তিকেই দুর্ব্বল করিতেছে। যে-পথে গভর্ণমেণ্ট চলিতেছে তাহার পরিণাম ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশের পুনরাবৃত্তি।

"আমাদের কমিউনিষ্টদের দৃঢ় বিশ্বাস, ওয়ার্কিং কমিটির সংগ্রামের প্রসঙ্গ অবতারণা জাতীয় সংগ্রামের পথ নয়, জাতির আত্মহত্যার পথেরই নির্দেশ দেয়। তবুও জাতীয় নেতারা নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির ভোটের সাহায্যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপোস-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। উদ্ধত বিদেশী গভর্ণমেণ্টই সঙ্কট সৃষ্টি করিল।

"আমরা কমিউনিষ্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করিব যাহাতে গভর্ণমেণ্ট পিছু হটে। জাতীয় নেতাদের বিনাশর্ত্তে মুক্তি, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার দাবী লইয়া জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিব। প্রাণ পাত করিব যাহাতে আমাদের সুমহান জাতীয় আন্দোলন বিশৃঙ্খলার আগুনে নিঃশেষ না হয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে আগুন জ্বালাইয়াছে। ধ্বংস ও বিপর্য্যয়ের হাত হইতে একমাত্র জনগণই দেশকে রক্ষা করিতে পারে।

"প্রত্যেক দেশবাসী ও গণপ্রতিষ্ঠানকে আমরা এই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইতে আহ্বান জানাই। আজ আমাদের দেশপ্রেমেরও পরীক্ষা। ফাশিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র হাতিয়ার সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনকে আজ আমলাতন্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত। গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট গড়িবার দুরভিসন্ধি আমাদের ব্যর্থ করিতেই হইবে। আমরা মিলিত কণ্ঠে দাবী করি, কংগ্রেসনেতাদের অবিলম্বে মুক্তি ও ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের জন্য আপোস-আলোচনা আরম্ভ করা হউক। ভারতবর্ষ ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ—উভয়েরই স্বার্থে এই দাবী। মুহূর্ত্তমাত্র সময় আমরা অপচয় করিলে তাহাতে ফাশিষ্ট দস্যুরাই লাভবান হইবে।"

—এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিস-জুলুম ও জনসাধারণের উন্মত্ততার ফলে বিপর্য্যয় ও ধ্বংসকার্য্যের প্রথম লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'পিপ্‌লস্‌ ওআর'-এর (১৬ই আগষ্টের) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়:—

"সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের পাশবিক নিষ্পেষণের তড়িৎ-আঘাত সমস্ত দেশে আগুন জ্বালাইয়াছে। জনসাধারণের পুঞ্জীভূত রোষ ও অসন্তোষকে উত্তেজিত করিয়া অসঙ্ঘবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিস্ফোরণের পথে চালাইয়া দিয়া লাঠি, গুলী ও কাঁদুনে গ্যাসের সাহায্যে উহার সম্মুখীন হওয়ারই এই চেষ্টা … ভারতবর্ষ ও স্বাধীনতাকামী মানবতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড অপরাধের জন্য দায়ী কাহারা? ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন রক্তস্রোতে নিভাইতেই যাহাদের আনন্দ, ফাশিষ্টানুকূল তোষণ-নীতির দ্বারা যাহারা বৃটিশ জাতির উপর সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে—সে এমেরী ও তাহার চরম প্রতিক্রিয়াশীল বন্ধুরা…।

"……কংগ্রেসসেবী সহকর্ম্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি:

(১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই। নির্ব্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দিবারপূর্ব্বেই গ্রেফ্‌তার হ'ন।

(২) নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি নেতা গ্রেফ্‌তার হইলে আইন-অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী—কেহই বিশৃঙ্খল বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়তার বিরোধী।

অচল অবস্থা প্রসঙ্গে

১২ই আগষ্টের পর হইতেই গান্ধীজি বারবার লিনলিথগোকে "অচল অবস্থার অবসান ঘটাইতে", "আপোস-মীমাংসার পথ অনুসন্ধান করিতে" পত্র লিখেন এবং সর্ব্বশেষে গেন্ডারের নিকট বিবৃতি ও গান্ধী-জিন্না আলোচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়েভেলের নিকট পত্রে সাময়িক যুদ্ধকালীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

৯ই আগষ্টের পরে প্রকাশিত 'পিপ্‌লস্‌ ওআর'-এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই আবেদন জানান হয়: "কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লও, দমননীতি বন্ধ কর নেতাদের মুক্তি দাও ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ কর।"

গেন্ডারের সঙ্গে সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই 'পিপলস্‌ ওআর'-এর (১৯৪৪-এর ১৬ই জুলাই-এর সংখ্যা) উহাকে "আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ কার্য্য" বলিয়া অভিনন্দিত করা হয় ও লেখা হয়: এখন গান্ধীজি খোলাখুলিভাবেই যে রাজাজীর আত্ম নিয়ন্ত্রণের সূত্র সমর্থন করিতেছেন তাহার সহিত একত্র করিয়া দেখিলে বলা যায় যে ইহা যেন এক আঘাতে অচল অবস্থা অবসানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।"

ধ্বংসকার্য্য প্রসঙ্গে

গান্ধীজী………

লিনলিথগোর প্রতি পত্রে ও টটেন্‌হ্যাম-পুস্তিকার উত্তরে গান্ধীজি বারবার ধ্বংসকার্য্যের নিন্দা করেন।

—১৯৪৩ এর জানুয়ারীতে তিনি লিনলিথগোকে লেখেন:

"গত ৯ই আগষ্টের পর যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে আমি নিশ্চয়ই তাহার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি কি ভারত সরকারকেই উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করি নাই?……… এই কথা আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি যে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অহিংসানিষ্ঠায় অবিচলিত। আপনি হয়তো নাও জানিতে পারেন যে কংগ্রেসকর্ম্মীদের যে-কোনো হিংসাত্মক কাজের আমি খোলাখুলি ও দ্বিধাহীন সমালোচনা করিয়াছি……"

—টটেনহ্যাম পুস্তিকার উত্তরে তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করেন এবং ৯ই আগষ্টের "হরিজনে" শ্রীযুক্ত মশ্‌রুওয়ালা "সেতু, রেল-লাইন প্রভৃতি ধ্বংসের" জন্য যে-নির্দেশ দেন তাহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ধ্বংসকার্য্যের বিভিন্ন পন্থাগুলির নিন্দা করেন। "জনগণের নিকট উহার অবতারণা বিপদজনক, কারণ উহারা অহিংসভাবে ঐ কাজ করিবে এমন আশা করা অসঙ্গত।"

মওলানা আজাদ………

ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে লিখিত তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রে মওলানা আজাদ "নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির নামে প্রচারিত গুপ্ত নির্দেশ অনুসারেই ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে" এই অভিযোগ সম্পর্কে লিখেন:

'………পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই আমরা এ-কথা বলিতে পারি যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কখনও ঐরূপ আন্দোলনের কথা চিন্তা করে নাই বা গুপ্ত অথবা অন্য কোন রকম নির্দেশ দেয় নাই………আমরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, কোন কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্বশীল কংগ্রেস-অনুরক্ত কোন নরনারী বোমা নিক্ষেপ ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে উৎসাহ যোগাইতে পারে না।"

পি, সি, জোশী………

১৯৪২-এর ২৩শে আগষ্ট তারিখের 'পিপ্‌লস্‌ ওয়ার'-এ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি, সি, জোশী এক আবেদনপ্রসঙ্গে লিখেন:

"ভারতের আত্মরক্ষার নামে এক বিদেশী গভর্ণমেণ্ট যে-সব **রাজনৈতিক** কারণের উপর জাতীয় দেশরক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে তাহাই ধ্বংস করিতে বসিয়াছে।

"………গভর্ণমেণ্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশপ্রেমিকেরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা-ব্যবস্থার **কার্য্যকরী** উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত। ………ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা-লইয়া হেলাফেলা করা, ভারতীয় যানবাহন-ব্যবস্থা অচল করার অর্থ ফাশিষ্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।

"উহার অর্থ নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটিতে 'ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বসিয়া থাকিতে পারে না' মওলানা আজাদের এই ওজস্বিনী ভাষণের প্রত্যেকটি কথা ভুলিয়া যাওয়া। ………আমরা এখানে যাহা বলিলাম, তাহা বোম্বাই-এর নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাবের সারাংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

"সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমিকদের কাছে আমাদের আবেদন এই: ধ্বংসকার্য্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে ফাশিজ্‌মেরই লাভ

(শেষাংশ ১৪শ পৃঃ দেখুন)

স্বাধীনতার পথ : জাতীয় ঐক্য

(১৩শ পৃষ্ঠার পর)

হইবে। সমস্ত দল ও সংগঠনকে একত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কর...ইহাই তোমাদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য, কারণ তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী।"

বোম্বাই-এ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় কমিউনিষ্ট নীতি

ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে

সরকারী প্রস্তাব

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এইজন্য ভারত হইতে বৃটিশ শক্তির অপসারণের দাবী পুরা জোরের সহিত আবার তুলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি সাময়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহা সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্র হিসাবে মুক্তি-সংগ্রামের মিলিত অভিযানে সমস্ত দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইবে। একমাত্র প্রধান প্রধান পার্টী ও দলগুলির সহযোগিতায়ই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্ভব। এইরূপে উহা ভারতের জনগণের সমস্ত প্রধান অংশের প্রতিনিধিত্বমূলক সংযুক্ত গভর্ণমেণ্ট হইবে। উহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে মিত্রশক্তির সহযোগে সমস্ত রকম ভাবে সশস্ত্র ও অহিংস উপায়ে ভারতকে রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিহত করা এবং ক্ষেতে ও কারখানায় যাহারা কাজ করে, মূলতঃ যাহাদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভার রাখিতে হইবে, তাহাদেরই কল্যাণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা। সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদের এক পরিকল্পনা ঠিক করিবে। এই পরিষদই জনগণের বিভিন্ন অংশের সমর্থনযোগ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের এক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবে। কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্রের রূপ হওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্র। যুক্ত-রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির যথাসম্ভব স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার থাকা উচিত এবং ইহাদেরই হাতে উদ্বৃত্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত। ভারত ও মিত্রশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এইভাবে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা সকলের সুবিধার এবং আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কাজে সহযোগিতার জন্য পরস্পরের সহিত আলোচনা চালাইবে। স্বাধীনতাই, জনগণের মিলিত ইচ্ছা ও শক্তির সাহায্যে ভারতকে আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি দিবে।"

কমিউনিষ্ট সংশোধন-প্রস্তাব অনুযায়ী

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি এইজন্য ভারত হইতে বৃটিশ শক্তি অপসারণের দাবী পুরা জোরের সহিত আবার তুলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি সাময়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহা সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্র হিসাবে মুক্তিসংগ্রামের মিলিত অভিযানে সমস্ত দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইবে। একমাত্র প্রধান প্রধান পার্টি ও দলগুলির সহযোগিতায়ই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্ভব। এইরূপে উহা ভারতের জনগণের সমস্ত প্রধান অংশের প্রতিনিধিত্বমূলক সংযুক্ত গভর্ণমেণ্ট হইবে। উহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে মিত্রশক্তির সহযোগে সমস্ত রকম ভাবে সশস্ত্র ও অহিংস উপায়ে ভারত রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিহত করা এবং ক্ষেতে ও কারখানায় যাহারা কাজ করে, মূলতঃ যাহাদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভার রাখিতে হইবে, তাহাদেরই কল্যাণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা। সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গণপরিষদের এক পরিকল্পনা ঠিক করিবে। ঐ পরিষদই জনগণের বিভিন্ন অংশের সমর্থনযোগ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের এক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবে। কংগ্রেসের মতে এই শাসনতন্ত্রের রূপ হওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্র। উহার প্রত্যেকটি ইউনিট ভারতীয় জনগণের মোটামুটি এক ধরণের অংশ লইয়া গঠিত হইবে। উহাদের বাসভূমি হইবে একত্র সংযুক্ত এক ভূখণ্ডে, যাহার সহিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বন্ধনে তাহারা বাঁধা। উহাদের ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক প্রবণতা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এক হইতে হইবে এবং স্বাধীন ও সমমর্য্যাদার সঙ্ঘ হিসাবে উহাদের আত্মাধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করারও শক্তি থাকিবে। ভারত ও মিত্রশক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্দ্ধারিত এইভাবে করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা সকলের সুবিধার এবং আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কাজে সহযোগিতার জন্য পরস্পরের সহিত আলোচনা চালাইবে। স্বাধীনতাই, জনগণের মিলিত ইচ্ছা ও শক্তির সাহায্যে, ভারতকে আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি দিবে।"

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের অংশ

সরকারী প্রস্তাব

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি শেষ মুহূর্ত্তেও সমস্ত পৃথিবীর মুক্তির জন্য বৃটেন ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট পুনরায় এই আবেদন জানাইতেছে। কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব চালাইয়া তাহাদের নিজ স্বার্থ ও মানবতার জন্য সংগ্রাম করিতে বাধা দিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে জাতির শক্তিকে আর বেশী কাল প্রতিহত রাখা উচিত নয়, কমিটি ইহাই বোধ করিতেছে।

"এইজন্য কমিটি ভারতের স্বাধীনতার অপরিবর্ত্তনীয় অধিকারের জন্য ব্যাপকতম ভাবে অহিংস পন্থায় গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার ভার লইবার প্রস্তাব করিতেছে, যাহাতে দেশ গত ২২ বছরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের অর্জ্জিত সমস্ত অহিংস শক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয়। ঐ সংগ্রামের নেতৃত্ব অনিবার্য্যভাবেই থাকিবে গান্ধিজীর হাতে, এবং জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে জাতিকে নেতৃত্ব দিবার ও পরিচালনা করিবার জন্য কমিটি তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছে।

"কমিটি জনগণকে গান্ধীজির নেতৃত্বে সাহস ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাহাদের উপর যে-সব দুঃখকষ্ট বিপদ আসিবে তাহার সম্মুখীন হইতে এবং ভারতের স্বাধীনতার নিয়মনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে আবেদন জানাইতেছে। তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আন্দোলনের ভিত্তি হইতেছে অহিংসা। এমন সময় আসিতে পারে যখন নির্দেশ দেওয়া যাইবে না, বা নির্দেশ জনগণের নিকট পৌছিবে না অথবা কোন কংগ্রেস-কমিটিই কাজ চালাইতে পারিবে না। যখন এই অবস্থা আসিবে তখন সাধারণ যে-সব নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহারই নীতির প্রতি অবিচলিত থাকিয়া যে-সব নরনারী আন্দোলনে যোগ দিতেছে তাহারা প্রত্যেকে নিজে নিজে কাজ চালাইয়া যাইবে। স্বাধীনতালিপ্সু ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত প্রত্যেক ভারতীয়কে এই দুর্গম পথে নিজেই নিজেকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই পথে বিশ্রামের কোন স্থান নাই। ইহাই শেষে জাতিকে ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবে।

"সর্বশেষে নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্পর্কে নিজ মত ঘোষণা করিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলিতে চায় যে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসের জন্য ক্ষমতা দখলের উহার কোন ইচ্ছা নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে, তখন ভারতের সমস্ত জনগণের জন্যই আসিবে।"

কমিউনিষ্ট সংশোধন-প্রস্তাব অনুযায়ী

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি শেষ মুহূর্ত্তেও সমস্ত পৃথিবীর মুক্তির জন্য বৃটেন ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট পুনরায় এই আবেদন জানাইতেছে। কিন্তু কমিটি আর অধিক কাল নিষ্ক্রিয়তার নীতি চলিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় এ-কথা বুঝিতেছে। বর্ত্তমান বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভারতের আশু স্বাধীনতা লাভের যে-সব পার্টি ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ আকাঙ্ক্ষা করে,—যাহারা সাময়িক জাতীয় সরকারে অংশ গ্রহণ করিতে বা সাহায্য করিতে চায় তাহাদের লইয়া সংযুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের জন্য কমিটিকে এখন উদ্যোগী হইতে হইবে। এই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিসমূহ ও তাহাদের সৈন্যবাহিনীর সহযোগে ফাশিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও অহিংস গণ-প্রতিরোধ সংগঠন করিবে।"

"কমিটি এই জন্য প্রস্তাব করিতেছে :

"(১) যে, এই চরম সঙ্কটমুহূর্ত্তে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন। বৃটিশ আধিপত্যের অবসান ও সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্য গণসমর্থন সংগ্রহই হইবে উহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে কমিটি মুস্‌লিম লীগের সঙ্গে আপোস ও যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে মনস্থ করিতেছে। স্বাধীন ও সংযুক্ত ভারতবর্ষের জন্য কংগ্রেস এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র চায় যাহা মোটামুটি এক ধরণের অধিবাসীপূর্ণ ভূখণ্ড, এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক প্রবণতা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইউনিয়নগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগের অধিকারযুক্ত স্বয়ংশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবে। এই প্রতিশ্রুতি সংযুক্ত ফ্রণ্ট ও সম্মিলিত সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ভিত্তি হওয়া উচিত।

"(২) যে, কংগ্রেস ও লীগ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের অন্যান্য সকল দলকেও একত্র করিবে, যাহাতে জাতীয় দাবীর পিছনে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সমর্থন থাকে। ইহাতেই সম্মিলিত জাতিসমূহের জনসাধারণকে বোঝানো যাইবে যে সমস্ত ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিসমূহের সৈন্যবাহিনীর সহযোগে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাইতে প্রতিশ্রুত এক সাময়িক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রস্তাবের ভিত্তিতে একমত ও ঐক্যবদ্ধ।

"(৩) যে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগ সারা দেশে গণসমাবেশ ও সভা সংগঠনের জন্য গণসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে এক মিলিত আন্দোলন আরম্ভ করিতে অগ্রণী হইবে। উহাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সাময়িক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইবে, জনসাধারণকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়িতে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করা হইবে, জাপ-অনুকূল মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইবে, এবং জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য তাহাদের মিলিত প্রচেষ্টা সংগঠন করা হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত সেখানে তাহাদের অনুরূপ চেষ্টার সঙ্গে আমাদের কাজের যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ জুলুম চালায় সেখানে তাহাদের বাধা দিতে হইবে।"

নারী সেবাসঙ্ঘ ★
কুটীর শিল্প প্রদর্শনী

আগামী ২৭, ২৮, ৯ এবং ৩০শে ডিসেম্বর প্রতিদিন বেলা ৫।টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ গৃহে নারী সেবা সঙ্ঘের কুটীর শিল্প প্রদর্শনী হইবে। প্রবেশ মূল্য দুই আনা।

২৭শে ডিসেম্বর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। উক্ত প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করিবার জন্য প্রত্যহ বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারে কয়েকটি সভার অধিবেশন হইবে। **২৮শে ডিসেম্বর** ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় নবশিক্ষা প্রণালী; **২৯শে ডিসেম্বর** পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষা ব্যবস্থা, **৩০শে ডিসেম্বর** দুঃস্থা নারীদের সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যা।

ইহা ছাড়া প্রদর্শনীর কয় দিবস প্রত্যহ সন্ধ্যা-৬ ঘটিকায় প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত চারিটি **অভিনয়** অনুষ্ঠিত হইবে। **প্রবেশ মূল্য** ঃ প্রতিদিন ৫৲, ৩৲, এবং ১৲ টাকা।

২৭শে—রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" উত্তরায়নী ক্লাব কর্ত্তৃক; ২৮শে—বিবিধ অনুষ্ঠান—ভারতীয় জন-নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক; ২৯শে—বিবিধ অনুষ্ঠান—শ্রীমতী উমা দের ব্যবস্থাপনায়; ৩০শে—রবীন্দ্র নাটক—পূর্বপরিষদ কর্ত্তৃক।

দুঃস্থা নারীদের দুর্গতি ত্রাণ এবং সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে রত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদর্শনীতে স্থান সংগ্রহের জন্য সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

সীতা চৌধুরী,
সম্পাদিকা : নারী সেবা সঙ্ঘ

দেশের প্রধান সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

এই প্রশ্নের জবাব দিবে ঃ

১। বাংলা কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা —বঙ্কিম মুখার্জি ও সোমনাথ লাহিড়ী ৵০ আনা
২। পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য—ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী ৶০ আনা
৩। সাম্রাজ্যবাদের অভিনব ষড়যন্ত্র—ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী ৵০ আনা
৪। মুক্তি-সংগ্রামে অস্পৃশ্য শ্রেণী—বি, টি, রণডিভে ৵০ আনা
৫। কংগ্রেস লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও—পি, সি, জোশী ।৴ আনা
৬। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট—পি, সি, জোশী ।০ আনা
৭। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি (২য় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ) —ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী ।৵০ আনা

●

গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতার পর আজ দেশবাসী বিহ্বল ও হতাশ। দেশপ্রেমিকেরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া অসহায় ভাবে বসিয়া আছেন। এই সুযোগে একদিকে লীগের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা যেমন কমিউনিষ্ট-আতঙ্ক প্রচার করিতেছে, তেমনি কংগ্রেস সেবীদের মধ্যেও কমিউনিষ্টবিদ্বেষ প্রচারে আজ কংগ্রেস সোশালিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থীরা অগ্রণী হইয়াছে। পার্টির সম্মুখে সব থেকে বড় কর্তব্য আজ শুধু কমিউনিষ্টদের প্রতি কুৎসা প্রচারের জবাব দেওয়াই নয়, সেই সঙ্গে ঐক্যের প্রতি আস্থাহীন কংগ্রেস ও লীগের দেশভক্তদের এক করিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

স্রোতের বিরুদ্ধে আজ আমাদের সংগ্রাম। কুৎসার বিরুদ্ধে পাল্টা কুৎসা রটানো আমাদের পার্টির নীতি নয়। আমাদের পার্টি সঙ্কীর্ণতার বদলে দেশপ্রেম প্রচার করে।

দেশভক্তদের কাছে আমাদের পার্টির সাহিত্য পৌছাইয়া দেওয়া প্রত্যেক পার্টিকর্মীর আজ সব থেকে বড় কর্তব্য। এই অভিযানের মধ্য দিয়াই আমরা দেশভক্তদের মানসিক জড়ত্ব দূর করিয়া জাতীয় ঐক্যের পথে টানিয়া আনিতে পারিব।

এই বইগুলি পড়ুন ও পড়ান

★ THEY MUST MEET AGAIN— 8 as.
★ CONGRESS AND COMMUNISTS— 6 as.
★ THE IMPERIALIST ALTERNATIVE— 2 as.

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রীক জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

গ্রীক জনসাধারণের উপর মিঃ চার্চিলের আক্রমণের পরও চার্চিলের দলেরই গোঁড়া রক্ষণশীল কাগজ লণ্ডন "টাইম্‌স" গত বৃহস্পতিবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে যে গ্রীক রাজধানীর সামান্ত স্থান ছাড়া আর কোথাও পাপাণ্ডেরু গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব চলে না। টাইমস আরও লিখিয়াছে ঃ—

"ব্রিটিশ অস্ত্রবলের ভরসা দিয়া পাপাণ্ডেরু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।...যে মুক্ত ও মিত্র জনসাধারণ মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে জার্ম্মান-প্রতিরোধে বীরত্ব ও তৎপরতা দেখাইয়াছিল—আজ এই অচল অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে সেই জনসাধারণেরই এক অংশকে ব্রিটিশ মুক্ত ফৌজের সাহায্যে দাবাইতে ও পরাজিত করিতে হইবে এ কথা কল্পনারও অযোগ্য।" সেজন্ত টাইম্‌স প্রস্তাব করিয়াছে যে "গ্রীসের জাতীয় মুক্তি সংসদের (তথাকথিত বিদ্রোহী দল) পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন সর্ত্তের সাহায্যে যুদ্ধ-বিরতি ও আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে," যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে।

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, গ্রীসের ব্যাপারে চার্চিল মন্ত্রীসভার দুর্নীতি বিলাতের সর্বত্র কি প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছে। গ্রীসে বর্ত্তমান গণ্ডগোলের আসল কারণ কি সে সম্বন্ধে আমেরিকার রক্ষণশীল কাগজ "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পর্য্যন্ত লিখিয়াছে ঃ

"অন্তর্নিহিত কারণ বুঝিতে হইলে ১৯৩০-এর ৪ঠা অগাষ্টে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সে সময় রাজার অনুমোদনক্রমে জেনারেল মেটাক্সাস গ্রীসের উপর জবরদস্তি একাধিপত্য (ডিক্টেটরশিপ) জারি করেন।...এই একাধিপত্যের ধারালো দাঁত ছিল... ইহা জার্ম্মানী ও ইটালি হইতে আমদানী করা হইয়াছিল।"

মেটাক্সাসের ফ্যাশিষ্ট রাজত্বে আইন সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি এবং শ্রমিক সঙ্ঘগুলি নিষিদ্ধ হইল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইল এবং ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে বড় বড় বন্দীনিবাস স্থাপন করিয়া রাজনীতিক কর্মীদিগকে দলে দলে নির্বাসিত করা হইল।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স লিখিয়াছে যে এই রাজত্বের বিরুদ্ধে "জনসাধারণের কি তীব্র ঘৃণা ছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ হয়তো তখন অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। মেটক্সাসের মৃত্যুর (১৯৪০) পর রাজা সেই অতীত রাজই বহাল রাখিলেন। ইহার ফলে দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হইল।..."

মুক্তি সংসদই জনগণের প্রতিনিধি

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে হিটলার যখন গ্রীস আক্রমণ করিল তখন সরকারের অধিকাংশ বড় বড় কর্ম্মচারী ও সেনানায়ক হিটলারের তাঁবেদারীতে যোগ দিল। রাজা ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ দেশকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া লণ্ডন পলাইলেন। এদিকে গ্রীসের বীর জনসাধারণ দেশের মাটিতে শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোর ও প্রাণান্ত সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রধানত কমিউনিষ্ট পার্টিরই চেষ্টায় ১৯৪২ সালে সমস্ত প্রতিরোধকারী দল "জাতীয় মুক্তি সংসদের" (EAM) ভিতর একতাবদ্ধ হইল। লণ্ডন "টাইমস" পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে ঃ—

"জাতীয় প্রতিরোধের ফলে ছোট, বড় বহু পার্টি আসিয়া মুক্তি সংসদে সম্মিলিত হইয়াছে।........ কমিউনিষ্ট পার্টি, সোশ্যালিষ্ট পার্টি, ইউনিয়ন অফ পপুলার ডেমোক্র্যাট, এগ্রেরিয়ান পার্টি, বামপন্থী উদারনীতিক এবং অন্য অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মিলাইয়া এই সংসদ গঠিত।"

১৯৪৪ সালে মুক্তি সংসদ দেশের অনেকগুলি শত্রুমুক্ত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচনের এবং শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হয়। সংসদের সভাপতি অধ্যাপক স্বলস একজন আইন-বিশেষজ্ঞ, কমিউনিষ্ট পার্টির বাহিরের লোক। সংসদের নিজস্ব বাহিনীর নাম এলাস (ELAS), উহার নিয়মিত সৈন্ত সংখ্যা ৭৫ হাজার হইতে ১ লক্ষের মধ্যে।

পলাতক সরকারের সাহায্যে এই এলাসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কর্ণেল জেরভাসের নেতৃত্বে এডেস (EDES) নামে আর একটী বাহিনী গঠন করার চেষ্টা হয়। গ্লোব নিউজ এজেন্সির মতে উহার সৈন্তসংখ্যা দশ হাজারের বেশী হইবে না। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও মুক্তি সংসদ বার বার ঐক্যের জন্ত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পলাতক সরকার তাহাতে সাড়া দেয় নাই। তাহাদের ভয় ছিল যে কোনোরূপ আপোষে আসিলে পলাতক রাজার একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে মুস্কিল হইতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত মধ্য প্রাচ্যের সমগ্র গ্রীক বাহিনী ও নৌ-সেনা যখন ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে পলাতক সরকারের হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইল তখন বৃটিশ সৈন্তের সাহায্যে সে বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে কিন্তু নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় রহিল না। বহুদিনব্যাপী আলোচনার পর মুক্তি সংসদ ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি সহ একটী নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। মিঃ প্যাপাণ্ডেরু হইলেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত গ্রীসে থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও জার্মান-প্রতিরোধে যোগ দেন নাই।

আসল প্রশ্ন

ইহার পর জার্মান আধিপত্য হইতে গ্রীস দ্রুতবেগে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল—এই মুক্তি সংগ্রামে মুক্তি-সংসদের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দাঁড়াইল ঃ গ্রীসের জনসাধারণই শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিবে, না মেটাক্সাসপন্থী ফ্যাশিষ্ট কর্তৃত্বেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে? কাজেই সৈন্যবাহিনীর সংগঠন হইল প্রধান কথা—উহা ফ্যাশিষ্টদের হাতে যাইবে, না জনসাধারণের ভিতর হইতে সংগঠিত হইবে?

যে পুলিশ বাহিনী হিটলার রাজত্বের তাঁবেদারী করিয়াছিল তাহাই এখনও বজায় থাকিবে বলিয়া প্যাপাণ্ডেরু নির্লজ্জের মত দাবী করিয়াছিলেন। শেষ পর্যান্ত আপোষ হইল যে এই ফ্যাশিষ্ট পুলিশ দল এবং মুক্তি-সংসদের প্রহরী দল দুইই ভাঙ্গিয়া দিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে নূতন জাতীয় প্রহরী দল গঠন করা হইবে। আরও স্থির হইল যে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত স্বেচ্ছাসৈন্ত বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্য হইতে জাতীয় বাহিনী গঠন করা হইবে।

কিন্তু রাজার অনুচরেরা দাবী করিতে লাগিল, যে মধ্যপ্রাচ্যে যেসব পর্বত বাহিনী, সেক্রেড ব্যাটালিয়ন, বিশেষ পুলিস প্রভৃতি সংগঠিত হইয়াছিল তাহাদের অস্ত্র রাখিতে দিতে হইবে। মেটাক্সাসপন্থী ফ্যাশিষ্ট অফিসারদের নেতৃত্বেই এগুলি গঠিত হইয়াছিল, ইহাদের হাতে অস্ত্র থাকিলে পুরাতন একাধিপত্য ফিরাইয়া আনিবার আশা থাকিবে।

কিন্তু তবুও সারা গ্রীসের উপর মুক্তি-সংসদের প্রভাব এত বেশী (সমস্ত বৈদেশিক সংবাদদাতাই স্বীকার করেন যে, গ্রীসের জনসাধারণ শুধু মুক্তি-সংসদকেই মানে) যে প্যাপাণ্ডেরুর দলকে আস্তে আস্তে পিছু হঠিতে হইল। সংসদের প্রতি সহানুভূতিশীল জেনারেল সারাফেইজ যুদ্ধ-সচিব নিযুক্ত হওয়ায় ঝগড়া আপোষে মিটিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইল।

চার্চিলপন্থী প্রতিক্রিয়া

ঠিক এই সময়ে চার্চিলের গ্রীসস্থ সেনাপতি স্কোবি বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত ১লা ডিসেম্বর ঘোষণা করিলেন যে তিনি পাপাণ্ডেরু গবর্ণমেণ্টকে যে-কোন বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করিবেন, এই "নিয়মতান্ত্রিক" গবর্ণমেণ্টকে তিনি সমর্থন করিবেন।

অমনি সেইদিন সন্ধ্যায় পাপাণ্ডেরু মুক্তি সংসদের মন্ত্রীদিগকে না জানাইয়াই মন্ত্রীসভার অধিবেশনে হুকুম পাশ করেন যে সংসদের বাহিনী এখনই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এই হুকুম সংসদপক্ষীয় মন্ত্রীদের ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে দু ঘণ্টার মধ্যে উহা সই করিতে বলা হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া সংসদ মন্ত্রী ৫ জনই পদত্যাগ করেন।

অর্থাৎ সংসদ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া মেটাক্সাসপন্থী পর্বতবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করিবার যুদ্ধায়োজন হিসাবেই পাপাণ্ডেরুদের এই ষড়যন্ত্র। এবং জেনারেল স্কোবি সেই যুদ্ধায়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

সংসদ-মন্ত্রী সিরিমকোস এবং সভাপতি স্বলস দুজনেই বলিয়াছেন যে পর্বতবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে পাপাণ্ডেরুদের অস্বীকৃতির ফলেই সমস্ত গোলযোগের সূত্রপাত। সংসদ মন্ত্রীরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই উপায়ে রাজপক্ষ হইতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা হইতেছে।

ইহার প্রতিবাদে জনসাধারণ ৩রা ডিসেম্বর রবিবার একটী শান্তিপূর্ণ মিছিলের ব্যবস্থা করে। শনিবার সকালেও পাপাণ্ডেরু ইহাতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রিবেলা হঠাৎ মিছিল নাকচের হুকুম দিয়া তিনি গা ঢাকা দেন। সিরিমকোস বলিয়াছেন, "এই ভাবে আমাদের ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা হইল, কারণ অত দেরীতে তখন আর আমাদের পক্ষে মিছিল প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না।"

শিশুহন্তার দল

যে মেটাক্সাসপন্থী পুলিশ হিটলার রাজত্বেও তাহার দমননীতির সাহায্য করিয়াছিল সেই পুলিশই এখন পাপাণ্ডেরুর হুকুমে শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র মিছিলের উপর গুলির পর গুলি চালাইল। এমনি অমানুষিক ও বর্বর সে দৃশ্য যে টাইম্‌সের সংবাদদাতা পর্যান্ত স্তম্ভিত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"মিছিলের এক অংশ তাহার অধিকাংশই বালক বালিকা, সামান্ত কয়েকজন বয়স্ক—স্কোয়ার হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল...ইউনিভার্সিটি ষ্ট্রীট অর্দ্ধেক পার হইবামাত্র রাইফেল ও টমি গান হইতে পুলিশ গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল।

"গুলি এড়াইবার জন্য জনতা তখনি শুইয়া পড়িল কিন্তু পুলিশ গুলি চালাইয়া চলিল। বন্য বর্বরের মত গুলি চালানো হইল—থামিয়া থামিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া। কতকগুলি বৃটিশ অফিসার তীব্র প্রতিবাদ করাতেও কোন ফল হইল না।"

নিরস্ত্র জনতার উপর এই আক্রমণের পর তবেই সংসদ বাহিনী ও এডেস তথা পুলিশ বাহিনীর মধ্যে লড়াই আরম্ভ হইল। এই লড়াইয়েও সংসদ বাহিনী ২৪ ঘণ্টায়ই জিতিতে পারিত। তাহাদের সাধারণ ধর্ম্মঘট এমন ব্যাপক হইয়াছিল যে পাপাণ্ডেরু পর্য্যন্ত ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা প্রত্যেকটী পুলিশ ব্যারাক দখল করিয়াছিল। পাপাণ্ডেরু ভয় পাইয়া পদত্যাগ করিতেও রাজি হইয়াছিলেন, সমস্যা আপনা আপনিই মিটিবার সম্ভাবনা জাগিয়াছিল।

কিন্তু জেনারেল ডায়ারের মত জেনারেল স্কোবি এবং তাঁহার প্রভু চার্চিল পাপাণ্ডেরুকে পদত্যাগ করিতে দেন নাই। তাঁহাদের ট্যাঙ্ক আজ গ্রীসের বীর ও দেশভক্ত জনসাধারণকে পিষিয়া মারিতেছে, হিটলারের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

কিন্তু গ্রীসের জনসাধারণ এখনও মরে নাই। পৃথিবীর জনমত তাহাদের সমর্থনে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কি গ্রীক কি বৃটিশ প্রতিক্রিয়া গ্রীসের মানুষকে স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

গ্রীস সম্বন্ধে শেষ সংবাদ

মুক্তি-সংসদের পক্ষে ভারতীয় সৈন্ত

অমৃতবাজার লিখিয়াছে যে ১১ই ডিসেম্বর এথেন্স হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, সালোনিকার ভারতীয় সৈন্তের দলগুলি গ্রীক মুক্তি সংসদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। ঐ অঞ্চলে মুক্তি সংসদই একমাত্র রাজনীতিক দল।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে (তিনি এখন লণ্ডনে আছেন)। উপরোক্ত ভারতীয় সৈন্তদের প্রশংসা করিয়া বলেন যে ভারতীয় জনগণের প্রকৃত মনোভাব উহা দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের শ্রমিক ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে কমরেড ডাঙ্গে দাবী করেন যে এথেন্সের লড়াইয়ে ভারতীয় সৈন্তদিগকে যেন ব্যবহার না করা হয়।

গত রবিবার লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বহু সহস্র ইংরাজ জনসাধারণ একটী বিরাট সভায় সমবেত হইয়া দাবী করে যে গ্রীসের ব্যাপারে চার্চিলের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হোক। লেবর, কমিউনিষ্ট ও কমনওয়েল্‌থ পার্টি এবং বহু শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। স্কটল্যাণ্ডের ২০০ জাহাজ কারখানার দেড় লক্ষ শ্রমিক ১৮ই তারিখে বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

গ্রীসের ভিতরে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে, তবে মিটমাটের চেষ্টাও কিছু কিছু চলিতেছে। গ্রীসের আর্চ-বিশপের নেতৃত্বে একটী সাময়িক রাজপরিষদ (রিজেন্সি কাউন্সিল) গঠনের প্রস্তাব উঠিয়াছে। উহাতে আর্চবিশপ রাজি ছিলেন, মুক্তি সংসদও রাজি ছিল, কিন্তু পলাতক রাজা নাকি রাজি নন। এখনও পর্য্যন্ত কোন মিটমাট হয় নাই। ১৯।১২।৪৪

চীন সম্বন্ধে জনযুদ্ধের বিশেষ সংবাদ

রুজভেল্ট দূতের য়েনান পরিদর্শন

কুওমিণ্টাংকে আপোষে রাজী করাইবার চেষ্টা কি বিফল হইবে?

চীনের কমিউনিষ্ট রাজধানী য়েনানে বর্ত্তমানে মার্কিন পক্ষ হইতে একজন কর্ণেলের নেতৃত্বে একটী সামরিক পরিদর্শক কেন্দ্র বসানো হইয়াছে। কমিউনিষ্ট ৮ম আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবার জন্য মার্কিন সংযোগ অফিসারও নিযুক্ত হইয়াছে। আমেরিকান মহলে একথা এখন আর অজানা নাই যে কয়েকজন সামরিক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কয়েকবার য়েনান ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দূত মিঃ হারলি নিজে দু বার য়েনান পরিদর্শন করিয়াছেন। কমিউনিষ্ট নেতা মাওৎসে তুং ও চু-তে তাঁহাকে দৃঢ় আশ্বাস দেন যে, চীনের সমুদ্র উপকূলে কমিউনিষ্ট গেরিলাদলের এলাকায় আমেরিকান সৈন্য অবতরণ করিলে সকল রকম সাহায্য নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। মনে হয় মিঃ হারলি কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের দক্ষতা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। কুওমিণ্টাংয়ের সহিত কমিউনিষ্টদের মিটমাট আলোচনার জন্য কমিউনিষ্ট প্রতিনিধি চৌ এন-লাইয়ের সহিত এক সঙ্গেই তিনি চ্যাং কাইশেকের সহিত দেখা করেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই আলোচনা চলে, তাহার পর আলোচনার বিবরণ জানাইবার জন্য চৌ এন-লাই য়েনান গিয়াছেন। সকল দলের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব চ্যাং কাইশেক প্রত্যাখান করিয়াছেন কিনা এখনও তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, তবে ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে কুওমিণ্টাংয়ের একক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য চ্যাং প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। চেন চেং, টি-ভি সুং প্রভৃতি নরমপন্থীকে মন্ত্রীমণ্ডলীতে অল্প প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ বোধহয় এই একাধিপত্যকেই কোনো রকমে বজায় রাখা।

তরুণ বয়স্কদিগকে সৈন্যদলে যোগ দিবার যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহাতেই চীনের ভাগ্য নিরূপিত হইবে—এইভাবে কুওমিণ্টাং প্রচার করিতেছে। নূতন সৈন্যেরা শ্রেষ্ঠ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং কুওমিণ্টাংয়ের কড়া পাহারায় আছে। অনেকে মনে করেন যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কুওমিণ্টাংয়ের ইহাই শেষ রাজনীতিক সম্বল।

আগামী বসন্তকালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চুংকিং আসিবেন শুনিয়া চুংকিংয়ের মহলে মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য যে, হুনান ও কোয়ানসির শরণাগতদের ভিড়ে চুংকিং ভরিয়া গিয়াছে, উহার বর্ত্তমান জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। প্রবল গুজব যে রাজধানীতে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী আত্মীয় না থাকিলে এখন আর কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হইবে না—এই বলিয়া নাকি হুকুম জারি হইয়াছে।

Regd. No. C. 2836.

যাঁদের দেশপ্রেম অতুলনীয়
কারাগারে সেই বন্দীবীরদের জীবনদীপ নিভিতেছে

"ফ্যাসিজমের পরাজয় হইলে এক নূতন যুগের উদয় হইবে। সেখানে মানব দাসত্বের প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ভাবে ভয়ানক দুর্বল হইয়া পাড়বে। এই কারণে আমরা মনে করি যে ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য।"

(১৯৪২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে দেশবাসীদর কাছে বিপ্লবী বন্দীদের আবেদন হইতে)

যে সব বন্দীরা এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন বা বিনা বিচারে আটক আছেন তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল :

কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এইরূপ বন্দীদের নাম	জিলা	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
১। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী	চট্টগ্রাম	যাবজ্জীবন	১৪।৷ বছর
২। অনন্ত সিংহ	"	"	১৫ "
৩। গণেশ ঘোষ	"	"	১৫ "
৪। লোকনাথ বল	"	"	১৫ "
৫। লালমোহন সেন	"	"	১৫ "
৬। সুবোধ চৌধুরী	"	"	১৫ "
৭। সহায়রাম দাস	"	"	১৫ "
৮। সুখেন্দু দস্তিদার	"	"	১৫ "
৯। কালী চক্রবর্ত্তী	"	"	১৭ "
১০। হরিপদ ভট্টাচার্য্য	"	"	১৬ "
১১। মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী	"	"	১২।৷ "
১২। প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী	"	"	১২।৷ "
১৩। সুনীল চট্টোপাধ্যায়	২৪ পরগণা	"	১৪ "
১৪। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়	"	"	১৩ "
১৫। রমেশ চট্টোপাধ্যায়	বরিশাল	"	১৮ "
১৬। নলিনী দাস	"	"	১৩ "
১৭। প্রভাত চক্রবর্ত্তী	কুমিল্লা	"	১১ "
১৮। জিতেন গুপ্ত	ঢাকা	"	১১ "
১৯। পূর্ণানন্দ দাস গুপ্ত	"	"	৯ "
২০। সীতানাথ দে	ফরিদপুর	"	৯ "
২১। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	"	"	১২।৷ "
২২। বিরাজ দেব	কুমিল্লা	"	১৪ "
২৩। বিনয় রায়	ঢাকা	"	১৪ "
২৪। সুকুমার সেন গুপ্ত	"	"	১২ "
২৫। অমূল্য রায়	"	"	১৩ "
২৬। কামাখ্যা ঘোষ	মেদিনীপুর	"	১২ "
২৭। কাননবিহারী গোস্বামী	"	"	১৬ "
২৮। শীতল ভট্টাচার্য্য	"	"	১৬ "
২৯। ভূতনাথ মান্না	"	"	১৬ "
৩০। বিনোদ বেরা	"	"	১৬ "
৩১। হবি ভট্টাচার্য্য	ফরিদপুর	"	১২।৷ "
৩২। অমূল্য চৌধুরী	"	"	১০ "
৩৩। সুরেন কর	ফরিদপুর	,,	১৫ ,,
৩৪। সুরেশ দাস	,,	,,	১৫ ,,
৩৫। হেম বক্‌সি	রংপুর	,,	১৪ ,,
৩৬। শান্তি সেন গুপ্ত	ঢাকা	,,	১২ ,,
৩৭। মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী	,,	,,	১২ ,,
৩৮। আশু ভরদ্বাজ	ফরিদপুর	,,	৮ ,,
৩৯। প্রফুল্ল সেন	কুমিল্লা	১৪ বছর	১০ ,,
৪০। প্রাণ গোপাল মুখার্জি	বীরভূম	,,	১০ ,,
৪১। শ্যামবিনোদ পাল	ঢাকা	১২ ,,	১০ ,,
৪২। নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	দিনাজপুর	১৫ ,,	১৩ ,,
৪৩। হরিপদ দে	বরিশাল	,,	১১ ,,
৪৪। নরেন্দ্র নাথ ঘোষ	কুমিল্লা	১৪ ,,	১১ ,,
৪৫। হিমাংশু ভৌমিক	নোয়াখালী	১০ ,,	৯।৷ ,,
৪৬। অমূল্য আচার্য্য	চট্টগ্রাম	১০ ,,	৯ ,,
৪৭। বিনোদ দত্ত	,,	৭ ,,	৲।৷ ,,

কমরেড অনন্ত সিং (চট্টগ্রাম)

ছাত্রজীবনেই তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৯১৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি চারবার কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া ১৯৩২ সালে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। অসমসাহসী এই জনপ্রিয় নেতা আজ চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত। ১৯৩৭ সালে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মহাত্মাজীকে জানান যে সন্ত্রাসবাদের পথে তাহারা বিশ্বাসী নহেন। জেলের মধ্য হইতে ১৯৪২ সালে দেশবাসীর কাছে দৃপ্ত আহ্বানে জানাইয়াছিলেন—ফ্যাসিষ্ট জাপানকে প্রতিরোধ করো। তিনি জেল হইতে বহুবার তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিতে বিশ্বাসী। এই বীর নেতা আজ ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে দারুণ হাঁপানী রোগে শয্যাশায়ী।

নির্দ্দিষ্ট কারাদণ্ড ভোগের পরেও যাহারা আটক আছেন তাঁহাদের নাম	জিলা	কত বছর জেল খাটিয়াছেন	কত বছর পর্য্যন্ত আটক আছেন
১। যতীন চক্রবর্ত্তী	কুমিল্লা	৭ বছর	৩।৷ বছর
২। প্রভাত মিত্র	কলিকাতা	৭ "	৩।৷ "
৩। সত্যেন মজুমদার	শিলিগুরী	৭ "	৩।৷ "
৪। বিমল ভট্টাচার্য্য	কুমিল্লা	৭ "	৩।৷
৫। নিরঞ্জন ঘোষাল	ফরিদপুর	৭ "	৩ "
৬। জীবন ধুপী	"	৫ "	৩ "
৭। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্ত	"	৮ "	২ "
৮। সুরেন ধর চৌধুরী	কুমিল্লা	১০ "	৩ "
৯। দ্বীজেন তলাপাত্র	রাজসাহী	৭ "	৩ "
১০। সত্য চক্রবর্ত্তী	দিনাজপুর	১০ "	২।৷ "
১১। সরোজ বসু	"	১০ "	২।৷ "
১২। প্রফুল্ল সান্যাল	ফরিদপুর	১০ "	২ "
১৩। কালী দে	চট্টগ্রাম	১০ "	২ "
১৪। মণি দত্ত	"	১০ "	২ "
১৫। মধু ব্যানার্জ্জী	ঢাকা	১০ "	২ "
১৬। অমূল্য সেন গুপ্ত	"	৯।৷ "	২ "
১৭। শচীন কর গুপ্ত	বরিশাল	১৫ "	১ "
১৮। দীনেশ দাস	দিনাজপুর	১২ "	৬ মাস
১৯। রজত দত্ত	বীরভূম	১০ "	৬ "
২০। পূর্ণেন্দু গুহ	দিনাজপুর	১১।৷ ,,	১ ,,
২১। পরেশ গুহ	রংপুর	৭ "	৩।৷ বছর
২২। রাধাবল্লভ গোপ	ফরিদপুর	১০ "	২ "
২৩। কুমুদ মুখার্জী	রংপুর	১০ "	২ "
২৪। জ্যোতিষ মজুমদার	কুমিল্লা	৭ "	৩ "
২৫। সুকুমার ঘোষ	ঢাকা	১০ "	২ "

কমরেড অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম নেতা। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হইয়া প্রায় দুই বৎসর বিচারাধীন থাকার পরে স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে ইঁহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল, পরে হাইকোর্টে সে হুকুম রদ হয়। আজ তিনি ৫৩ বৎসরের বৃদ্ধ। ১৯০৭ সালে তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। গত ৩৭ বৎসরের মধ্যে তিনি ২৬ বৎসরেরও উপর বন্দীদশায় কটাইয়াছেন। ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যায় তিনি রিলিফের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৯২১ সালে চা বাগানের কুলীদের দাবী নিয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পাশে দাঁড়াইয়া তিনি লড়াই করেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসিদ্ধ মজুর ধর্ম্মঘটে তিনি একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহাকে জেল খাটিতে হয়। তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ও এ-আই-সি-সির সভ্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে বন্দজিলা সত্যাগ্রহের সময় তিনি বি, পি, সি, সি কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসের আন্দোলনে বহু বৎসর তিন কারাবরণ করিয়াছেন।

এই সাহসী জননেতা আজ জেলে নানা রকম ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয় ছেন। ১৯৩৮ সালে বাংলা সরকার নিযুক্ত 'এডভাইসরী কমিটি' একমত হইয়া বিনা সর্ত্তে ইঁহার মুক্তির সুপারিশ করে, কিন্তু আজও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ইঁহার ফ্যাসিষ্টবিরোধী মতবাদ দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে ইনি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি মনেপ্রাণে সমর্থন করেন।

শাসনসংস্কারের আগেই যাঁহারা বন্দী
তাঁহাদের মুক্তি দাবী করুন

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক "রেড এড্ কমিটির" সভাপতি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার আগের যুগে যেসব দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিয়া দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এখনও দণ্ডভোগ করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে খবর পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই কঠিন ও দীর্ঘদিনব্যাপী রোগে ভুগিতেছেন।

এখনও জেলে দণ্ডভোগ করিতেছেন এইরূপ বন্দীদের সংখ্যা অনেক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডকাল ভোগ করার পরেও মুক্তি পান নাই। ১০ হইতে ১৫ বৎসর কারাভোগের পরে জেলের দরজায় তাঁহারা আবার ভারতরক্ষা বিধান বলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই ১৪ বৎসর কারাভোগের পরেও মুক্তি পান নাই যদিও বাংলা গভর্ণমেণ্টের কারাবিধি অনুসারে তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল।

ইঁহাদের জীবন দেশের নিকট মূল্যবান। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কমরেড অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টা মামলার কমরেড সুনীল চট্টোপাধ্যায়, আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার কমরেড প্রভাত চক্রবর্ত্তী, মেছুয়াবাজার মামলার কমরেড শচীন করগুপ্ত এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুলী চালনা ও ষড়যন্ত্র মামলার কমরেড নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জ্জি এবং অন্যান্য আরও অনেকে বহুদিন পূর্ব্বেই ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের পথে বিশ্বাসী নহেন এবং বাহিরে তাঁহারা দেশবাসীর বর্ত্তমানে দুঃখদুর্দ্দশার সময়ে তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

ইঁহাদের সকলের জীবনেরই শ্রেষ্ঠাংশ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অতিবাহিত হইয়াছে। এতদিন কারাভোগের পরেও এইরূপ বন্দী অবস্থায় তাঁহাদিগকে মরিতে দিলে তাহা কেবল মাত্র আমাদের স্বদেশপ্রেমের বিরুদ্ধেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না—মানবতার বিরুদ্ধেও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইঁহাদের অসুখ ও ভগ্নস্বাস্থ্যের সংবাদ আমাদিকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর কাছে, কংগ্রেস-সেবী, লীগপন্থী ও মহাসভা-পন্থী সকলেরই কাছে এই আবেদন জানাইতেছি যে তাহারা যেন এই সব বন্দীদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে ইঁহাদের মুক্তি দাবী করেন। আইন সভার সকলদলের প্রতিনিধিদের কাছেও আমাদের আবেদন যে তাঁহারা যেন আইন-সভায় একত্র হইয়া এই সব বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। মানবতা ও দেশবাসীর নামে আমরা বাংলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকেও অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন ইঁহাদের সম্বন্ধে সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং ইঁহাদের মুক্তির বিষয়ে আমলাতন্ত্রের বিরোধীতাকে কাটাইয়া উঠিতে পারেন।

দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের কাছেও আমরা আবেদন জানাইতেছি যে তাহারাও যেন এই সব বন্দীদের প্রশ্নকে দেশবাসীর কাছে তুলিয়া ধরেন যাহাতে দেশবাসী এককণ্ঠে এই সব বিস্মৃত শহীদদের মুক্তি দাবী করে।

কমরেড গণেশ ঘোষ (চট্টগ্রাম)

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার একজন নেতা। ছাত্র-জীবনেই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেন। কিশোর বয়স হইতেই ইঁহাকে কারানির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং জীবনে বার বার জেল খাটিয়াছেন। ইঁহার পিতা ছিলেন এ. বি রেলওয়ের একজন ষ্টেশন মষ্টার। ১৯২১ সালে ধর্ম্মঘটে চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ঐ সময় পিতাপুত্রে অগ্রণী হইয়া রেল মজুরদের দাবী আদায়ের জন্য কাজে লাগিয়া যান। চট্টগ্রাম হইতে তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র রেলমজুর তখনকার দিনে আদর করিয়া কমরেড গণেশকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকিত। পরবর্তী জীবনে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে চট্টগ্রামের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং বহুবার বি, পি, সি, সিতে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার স্বাস্থ্য আজ ভগ্ন, দুরারোগ্য হৃদ্-রোগে তিনি আক্রান্ত।

কমরেড সুনীল চাটার্জ্জী (২৪ পরগণা)

১৯৩২ সালে ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টার মামলায় ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই তেজস্বী বিপ্লবী নেতা সন্ত্রাসবাদে তাঁহার অবিশ্বাস সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবেই নিজের বন্ধু-বান্ধবদের জানাইয়াছেন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজী যখন দমদম বন্দীদের সাথে দেখা করেন তখন কমরেড চাটার্জ্জীই তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া কথাবার্ত্তা চালান। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির একজন উৎসাহী সমর্থক। জেল জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। তিনি 'প্লুরিসি' রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

কমরেড শচীন কর (বরিশাল)

ছোটবেলা হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী হিসাবে পরিচিত। নিজের গ্রাম নলচিড়া অঞ্চলে কাজ সুরু করিয়া পরবর্তী জীবনে সমগ্র বরিশাল জেলায় কংগ্রেস আন্দোলনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হইয়া ৭ বৎসর কারাদণ্ড দণ্ডিত হন। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করার অপরাধে পুনরায় দণ্ডিত হন। সর্ব্বসমেত ১৫ বৎসর জেল খাটার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াই সরকার আবার তাঁহাকে জেল গেটেই গ্রেপ্তার করে। বৎসরের পর বৎসর জেল ভোগের দরুণ তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি অর্শ, অজীর্ণ ও হৃদরোগে ভুগিতেছেন।

কমরেড প্রভাত চক্রবর্ত্তী (কুমিল্লা)

১৯১৭ সাল হইতে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী। ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন। অন্তরীণাবস্থায় পলায়ন করার পর সরকার তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। এরপর আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার একজন নেতা হিসাবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জেল থেকেই তিনি তাঁহার মতবাদ স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির একজন দৃঢ় সমর্থক। জেলে তিনি অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইতেছেন।

কমরেড নলিনী দাস (বরিশাল)

ছাত্র বয়সেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ভোলা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। খেলাধূলাতেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৯৩০ সালে বিনা বিচারে বন্দী হইয়া হিজলী বন্দীনিবাসে প্রেরিত হন। কিছুদিন পরেই বন্দীনিবাস হইতে পলায়ন করেন। ১৯৩৩ সালে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গুলী চালনা ও ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাহার ১৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জেলেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি গ্রহণ করেন। তিনিও হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছেন।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, [illegible] প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা] ২৮শে ডিসেম্বর '৪৪, বৃহস্পতিবার, ১৩২ পৌষ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

রংপুরে গুণ্ডা ও লম্পটের "রাজনীতি"

গান্ধীজির নাম লইয়া মেয়েদের অপমান, পার্টি অফিসে রাহাজানি

কিরণশঙ্করী কংগ্রেসনীতির পরিণতি কোথায় ?

গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া একদল যুবক হঠাৎ রংপুর শহরে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করে। উহাদের অধিকাংশই কলেজের ছাত্র—সংখ্যায় প্রায় ৩০।৪০ জন এবং অনেকেই লাঠি, হকিষ্টিক প্রভৃতি হাতিয়ার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

উহারা 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়' ধ্বনি করিয়া অফিসের আলো, ক্লক ঘড়ি, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং কাগজ পত্র ছিঁড়িয়া, ছড়াইয়া তছনচ করে। গোলমালে রাস্তায় লোক জড়ো হইতে আরম্ভ হওয়ায় তাহারা অল্পক্ষণ পরেই পলাইয়া যায়।

উহাদের "স্বদেশীর" হাতিয়ার

গত নভেম্বর মাসে রংপুর কারমাইকেল কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনের সময় হইতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আর-এস-পি নামক দলের ভক্তদের সহিত কতকগুলি ফরওয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু সভাপন্থী ছাত্রনেতা মিলিয়া ছাত্র ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও ভয় দেখানোর অভিযান আরম্ভ করে। তাহাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল ফেডারেশনপন্থী ছাত্রীদের নামে অশ্লীল ছবি আঁকা ও পোষ্টার দেওয়া এবং অশ্লীল মন্তব্য করা। ইহা এত বীভৎস হইয়া উঠে যে সমস্ত ছাত্রী তো প্রতিবাদ করেনই স্থানীয় মুসলিম ছাত্র লীগের মুখপত্র 'নওজোয়ান" পত্রিকায় পর্য্যন্ত ইহার প্রতিবাদে প্রকাশ্য সম্পাদকীয় বাহির হয়।

এদিকে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা এই সব ইতর দলাদলিতে কান না দিয়া ছাত্রদের জরুরি দাবী লইয়া আন্দোলন চালাইয়া যান। তাঁহাদের চেষ্টায় কলেজের ছাত্রদের জন্য ৫০ টিন কেরোসিন আদায় হয়। তাহাতে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা বাড়ে, অন্যপক্ষ নিক্রিয় বলিয়া সাধারণ ছাত্ররা তাহাদের উপর বিরক্ত হইতে থাকেন।

তখন আর-এস-পি ছাত্ররা মরিয়া হইয়া কমিউনিষ্টদের ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের একলা পাইলেই মারিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। কংগ্রেসনেতা কিরণশঙ্কর রায়ের কর্মী সম্মেলন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পর ইহাদের সাহস বাড়িয়া যায়। সাত আট জনে মিলিয়া কমিউনিষ্ট কর্মী অনিল লাহিড়ীকে মারপিট করে। তাঁহার অপরাধ যে, তিনি নাকি সেদিন ক্লাস বন্ধ করিয়া ক্রিকেট খেলার প্রস্তাবে আপত্তি করেন যেহেতু টেষ্ট পরীক্ষা নিকটে।

উহারা এই ভাবে বেপরোয়া মারধোর শুরু করায় কমিউনিষ্ট ছাত্ররাও স্বভাবতই কোন কোন সময় আত্মরক্ষার জন্য উহাদের মারের জবাব দেয়। আর-এস-পি আরও ক্ষেপিয়া যায়। প্রথম বার্ষিকের কমিউনিষ্ট ছাত্র অনিল সেনকে বাড়ী ফিরিবার পথে একলা পাইয়া সাইকেল হইতে ফেলিয়া দেয় এবং ছুরী মারে। তাহার জবাবে আর-এস-পির জনৈক নেতা একজন কমিউনিষ্ট কর্মী কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়।

ইহার পরেই উহারা ৩০।৪০ জন লাঠি সোটা লইয়া কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে হানা দেয়।

পরদিন এই জঘন্য গুণ্ডামির বিরুদ্ধে নাগরিক-দিগকে সতর্ক করিবার জন্য কমিউনিষ্টরা একটী বিরাট মিছিল বাহির করে। গ্রাম হইতে আগত চাষীরাও তাহাতে যোগ দেয়। কিন্তু মিছিল কোথাও এতটুকু শান্তিভঙ্গ করে নাই। নাগরিক জীবনের শান্তিরক্ষা ও গুণ্ডাদের হাত হইতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার আবেদন লইয়া তাহারা শহর প্রদক্ষিণ করে।

উহারা কিসে প্রশ্রয় পায়

কিন্তু তবুও অনেক নাগরিক মনে করিয়াছিলেন ইহা দলাদলির ব্যাপার, ইহাতে আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। কলেজ হোষ্টেল হইতেই আর-এস-পির ছাত্ররা সমস্ত মারামারি শুরু করিতেছিল তাহা প্রায় সকলেই জানে, কিন্তু তবুও (অফিস আক্রমণের পরও) কলেজের প্রিন্সিপাল তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছিলেন। বোধহয় নাগরিকদের ঔদাসীন্য দেখিয়াই গুণ্ডারা আরও সাহস পায়। পার্টি অফিস আক্রমণের তিন দিন পরে শৈলেন রায় ও ক্ষৌণীশ রায় নামে ছাত্র ফেডারেশনের ২ জন কর্মী কলেজে যাইবামাত্র আর-এস-পি গুণ্ডার দল তাঁহাদের ঘিরিয়া মারিতে আরম্ভ করে। ক্ষৌণীশ রায়কে মুস্লিম হোষ্টেলের ছাত্রেরা রক্ষা করেন।

ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া উঠে যে শহরের ভদ্রলোকদের পর্য্যন্ত কলেজে দৌড়িয়া যাইতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর শ্রীশ্যামাদাস রায়চৌধুরী, কৈলাশরঞ্জন স্কুলের প্রতিনিধি শ্রীনরেন্দ্র মোহন সেন ও অন্যান্য কয়েকজন নাগরিক কলেজে যাহা দেখিলেন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"…আমরা সেখানে গিয়েই শুনলাম শৈলেন রায় নামে ১টী ছাত্র (৪র্থ বার্ষিক সাহিত্য) অন্য কয়েকটী ছেলে দ্বারা প্রহৃত হয়েছে। আমরা কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে যাই। তিনি বললেন প্রায় তাঁর চোখের সামনেই এ ঘটনাটী ঘটেছে।…

এতে মনে হয় কলেজের শিক্ষা আবহাওয়ার ক্ষতি হচ্ছে।"

তাঁহাদের বিবৃতিতে জনসাধারণ অবস্থার গুরুত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে কলেজে একটী বিরাট সভায় এই গুণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। শহরের ভদ্রলোকেরাও ইহার প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়াছেন এবং শীঘ্রই জনসভা করিয়া গুণ্ডামির নিন্দা করা হইবে।

দেশভক্তির নামেও কলঙ্ক লেপন

আক্রমণকারীরা বলে—আমরা সাধারণ গুণ্ডা নই, শুধু 'দেশদ্রোহী' কমিউনিষ্ট পার্টিকে উচিত শিক্ষা দিতেছি। সে জন্যই লাঠি মারিবার আগে ইহারা মহাত্মা গান্ধীর নাম লয়। ইহাদের এই ধরণের দেশপ্রেমের সংবাদ পাইলে মহাত্মা গান্ধীকে আবার অনশন করিতে হইত।

ইহারা 'সাধারণ' গুণ্ডা নয় সে কথা ঠিক। কারণ সাধারণ গুণ্ডাও বোধ হয় নিজের সহপাঠী মেয়েদের নামে অশ্লীল ছবি আঁকিতে বা ইঙ্গিত করিতে লজ্জা পাইত। দশজনে মিলিয়া একজনকে মারিতে সাধারণ গুণ্ডাও অনেক সময় কুণ্ঠিত হইত। ইহাদের লজ্জা বা কুণ্ঠার বালাই নাই।

কিন্তু তবুও ইহারা ভদ্রসমাজে, দেশভক্ত নাগরিকদের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে কিসের ভরসায় ? কারণ ইহারা জানে যে কমিউনিষ্ট-বিরোধী সংস্কারের আড়ালে অনেক সময় আশ্রয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কংগ্রেস-সম্মেলন করিয়া কমিউনিষ্টদের সঙ্গে লড়াই করাই যখন একমাত্র দেশপ্রেম বলিয়া ঘোষণা করিলেন তাহার পরই ইহারা কংগ্রেসের নাম লইয়া এই প্রকাশ্য গুণ্ডামি করিতে সাহস করিল।

দেশভক্ত নাগরিকদের কাছেও ইহাই প্রশ্ন—কংগ্রেস কোথায় থাকিবে ? আজ ইহারা ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে মারামারির উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় পাইলে কাল নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মারামারি করিবে। (রংপুরে আর-এস-পি এবং হিন্দু সভার মধ্যে এখনই ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে)। আজ ইহারা কমিউনিষ্ট মেয়েদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতে দেশভক্তের কাছে ভর্ৎসনা না পাইলে কাল পাড়ার অন্য মেয়ের প্রতিই অশ্লীল ইঙ্গিত করিবে। আজ ইহারা কমিউনিষ্টদের আক্রমণ করিয়া বাঁচিয়া গেলে কাল উহারা কমিউনিষ্টদের কাজকেই আক্রমণ করিবে—ঐক্যবদ্ধ রিলিফ, জনসেবা, চোরাবাজারের বিরুদ্ধে লড়াই প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই উহারা বাতিল করিয়া দিবে। এবং এই সমস্তর ফলে কমিউনিষ্টদের ক্ষতি হোক বা না হোক কংগ্রেসের প্রতিই লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যাইবে।

রংপুরের প্রতিটী মানুষের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনকেই এই গুণ্ডামি আঘাত করিয়াছে। সে জন্যই কমিউনিষ্ট পার্টি গুণ্ডাদের পুলিশে ধরাইয়া দেয় নাই, কিংবা লাঠির বদলে লাঠি চালায় নাই। সমাজ জীবনের এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তাহারা নাগরিকদের দেশভক্তির কাছেই আবেদন করিয়াছে—কারণ ইহা রোধ করার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে রংপুরের নাগরিকেরা সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়াছেন।

চাউলের দর চড়িতেছে কেন ?

গত দুই তিন সপ্তাহের ভিতর ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, পাবনা, খুলনা, মেহেরপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থান হইতে হঠাৎ ধান-চালের দর বাড়িবার খবর আসিয়াছে।

ইহার আগে কিছুদিন ধরিয়া প্রায় সব জায়গায়ই চালের দর পড়িতেছিল। তাহা লইয়া কাগজপত্রে অনেক লেখালেখিও হইয়াছিল। এই ধান-চাল কাহারা বেচিতেছিল ? চাষীরা নয়, কারণ তাহাদের নূতন আমন ধান তখন বাজারে আসে নাই। অতি-রিক্ত লাভের আশায় যে সব কারবারী, চালের কল, জোতদার প্রভৃতি গত বৎসর ধান-চাল জমাইয়া রাখিয়াছিল তাহারাই তখন জমানো ধান বাজারে ছাড়িতেছিল। কলিকাতায় রেশনিং এবং সরকারী শস্য-সংগ্রহের আংশিক সাফল্যের ফলে তাহারা দেখিতেছিল যে চোরাবাজারের সুবিধা কমিয়া গিয়াছে। তাই মুনাফা শিকারে নিরাশ হইয়া তাহারা জমানো শস্য বিক্রয় করিতেছিল, দরও পড়িতেছিল।

তবুও হঠাৎ আবার দর চড়িতে লাগিল কেন ? ইতিমধ্যে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে, কলিকাতায় রেশনিংয়ের জন্য বাহির হইতে চাল সরবরাহের দায়িত্ব তাহারা আর বহন করিবে না। সুতরাং নিরাশ মুনাফা-শিকারীদের মনে আবার আশা হইয়াছে যে শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে বাংলা সরকারকে কোনো রকমে কাত করিতে পারিলে কলিকাতায় রেশনিং বানচাল করা যাইবে, চোরা-বাজারের হাতে স্বর্গ ফিরিয়া আসিবে। তাই তাহারা চাল আটক করিতেছে, কাজেই দরও বাড়িতেছে।

ইহার উপর ইন্ধন জোগাইয়াছে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক বাহিরে চাল পাঠানোর গুজব। ভারত সরকার কর্ত্তৃক কলিকাতার দায়িত্ব-ত্যাগ এবং এই গুজব—দুটীকেই কতকগুলি সংবাদপত্র এবং কোনো কোনো রাজনীতিক চক্রান্তকারী যেভাবে ফুলাইয়া ও ফাঁপাইয়া প্রচার করিতেছে তাহাতে আগামী বৎসরে খাদ্যাভাব সম্বন্ধে লোকের মনে আতঙ্ক বাড়িবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে। সেই সুযোগে মুনাফা-শিকারীরা গবর্ণমেণ্টের শস্যসংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আবার এ বৎসর মজুতদারী ও খাদ্যাভাবের যুগ ফিরাইয়া আনিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। সেজন্যই নূতন ধান ওঠার সময়েও চালের দর বাড়িতেছে।

নূতন আমন প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসিতে আরম্ভ করিলে দর কিছুটা পড়িবেই, কারণ মজুতদারও তখন অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনিতে চাহিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি সে সময় কিনিতে না নামে, কিংবা দর একটু বেশী দেখিয়া পিছাইয়া যায় তাহা হইলেই চোরাকারবারী বাজার দখল করিয়া ফেলিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট পরে আর সংগ্রহ করিতে পারিবে না। খাদ্যাভাবের হাহাকার আবার বাংলাকে গ্রাস করিবে।

সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে সর্বপ্রথম লোকের আতঙ্ক দূর করিতে হইবে। আমরা যতদুর জানিতে পারিলাম বাংলা সরকার বাহিরে চাল পাঠায় নাই—তবে প্রয়োজনমত সময়ে শোধ দিবার কড়ারে ভারত সরকারকে এখন কিছু চাল দিতে প্রস্তুত আছে। ফিরিয়া পাওয়া যখন নিশ্চিত তখন অন্য প্রদেশের প্রয়োজনে বাংলা হইতে কিছু চাল দিলে কোনো বাঙ্গালীই অন্যায় মনে করিবে না, বরং দুর্ভিক্ষের সময় অন্য প্রদেশের সাহায্য স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তেই দিবে। কিন্তু লোকের আতঙ্ক দূর করিতে হইলে সরকারের এখনি আসল কথা খুলিয়া বলা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ নূতন শস্য সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া চোরাবাজারের নূতন ষড়যন্ত্র রোধ করিতে হইবে। ধান চাল বিক্রয়ে কৃষককে উৎসাহিত করিবার জন্য নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিষ কণ্ট্রোল দরে পাওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে শস্য-সংগ্রহে কোনই অসুবিধা থাকিবে না।

অফিস আক্রমণের ঠিক আগে রংপুরে যাহা ঘটিতেছিল তাহা শুনিয়া রংপুরের শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসনেতা জিতেন বাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিরণ বাবুদের সম্মেলনে আমি এই আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঠিক তাহাই দেখিতেছি। এখন সারা বাংলায় ইহাই ঘটিবে—কংগ্রেস কোথায় থাকিবে ?"

বিশিষ্ট নাগরিকদের নিন্দাবাদ

রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর শ্রীশ্যামাদাস রায় চৌধুরী, ডাঃ নির্ম্মলকুমার বসু, ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র দে, ডাঃ হিরণচন্দ্র দাসগুপ্ত, আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীতারাকান্ত মিত্র, টাউন এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসত্যানন্দ সেন, কৈলাসরঞ্জন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশমোহন সরকার এবং রংপুর সহরের আরও অনেক বিশিষ্ট নাগরিক গুণ্ডামির নিন্দা করিয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"…(কমিউনিষ্ট) পার্টি গত ৭ বৎসর যাবৎ দেশের কাজ করিতেছে। এবং গত ২ বৎসর যাবৎ নানারূপ দুর্নীতি ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিককে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমরা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পূর্ণ মতবাদ গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদের দেশভক্তিকে অস্বীকার করিতে পারি না। এই ভাবে পার্টি অফিস আক্রমণ করাকে গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা মানে গুণ্ডামিকেই প্রশ্রয় দেওয়া—যাহার ফলে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই কাজ করা অসম্ভব হইবে। তাই আমরা দেশপ্রেমিক ও নাগরিক হিসাবে এই হীন কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।"

সহরের প্রধান চিকিৎসক এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েসনের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যও এই গুণ্ডামিকে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

বড়লাটের জবাবে দিল্লীর লীগ---

"লাট পরিষদের সভ্যরা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য"

অর্ডিন্যান্স জর্জ্জরিত শাসনের প্রতিবাদ

বড়লাট কর্ত্তৃক একসিকিউটিভ কাউন্সিলকে জাতীয় সরকার বলিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রয়াসকে দিল্লী প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি 'রাজনৈতিক পরিহাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন,—একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণের বিশ্বস্ত ভৃত্য" এবং ঘোষণা করেন,—"তাঁহারা এই দেশের কাহারও আস্থাভাজন নহেন।" ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, অর্ডিন্যান্স জর্জ্জরিত এই দেশে তথাকথিত জাতীয় সরকারের শাসনে বাংলা, বিহার, এবং মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ, মহামারী মুদ্রাস্ফীতি এবং অসংখ্য দুর্ব্বিপাকে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ছাড়া আর কোনও সুফল দৃষ্ট হয় নাই।

পাকিস্তানকে বড়লাট কর্ত্তৃক একটা "বড় রকমের রাজনৈতিক অস্ত্রোপচার" বলিয়া উল্লেখ করার পশ্চাতে দেশে আরও বিচ্ছেদের বীজ বপন করা এবং বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া তাঁহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা ওয়ার্কিং কমিটি বুঝিতে অক্ষম। এই কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে,—ভারতে অবিলম্বে একটা রাজনৈতিক মীমাংসার প্রয়োজন। এই মীমাংসা কেবল পাকিস্তানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করার পরেই সম্ভব হইতে পারে এবং কমিটি হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রতি পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইয়া অপমানকর বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য আবেদন করেন।

(১৮ই ডিসেম্বর, ও পি)

বঙ্গীয় লীগ সম্পাদকের বিবৃতি

"বড়লাট পাকিস্তান দাবীকে "একটা বৃহৎ অস্ত্রোপচার" বলিয়া বর্ণনা করায় ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন্দল ও অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বড়লাটের জানা উচিত—ভারতবাসীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক চেতনা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা এখন কোনরূপ নির্দ্দেশ অন্ধের ন্যায় মানিতে প্রস্তুত নয়। ইংলণ্ড যেমন ভারতের কাছ হইতে গঠনমূলক কার্য্যের যুক্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত জানিতে ইচ্ছুক ভারতও সেইরূপ ইংলণ্ডের নিকট হইতে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণার প্রত্যাশা করে।

বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ মতানৈক্য অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাও ব্রিটিশের বিভেদ ও শাসননীতির ফল।

বড়লাট মহোদয়ের মনে রাখা উচিত যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন তাহা সমস্তই বিফল হইতে বাধ্য। ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির পক্ষ হইতে একটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করার যৌক্তিকতা আছে। এরূপ প্রস্তাব পেশ করা বা না করা ভারতবাসীরই বিবেচ্য বিষয়।

ওরিয়েণ্ট প্রেসের নিকট গত ১৪ই ডিসেম্বর মৌঃ আবুল হাসেম উপরোক্ত মর্ম্মে বড়লাটের বক্তৃতার জবাব দিয়াছেন।

মিলিত আন্দোলনের জন্য সিন্ধুর লীগ নেতাদের কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান

সিন্ধুর লীগনেতারা কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন—এ সংবাদ জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি করাচীর "ডেলী গেজেট" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সিন্ধুর কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান হইয়াছে। পাঞ্জাবের আদর্শ অনুসরণ করিয়া সিন্ধুর হিন্দু-মুসলিম একতার ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সিন্ধু-নেতাদের অনুরোধ করা হইয়াছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া করাচীর লীগ-মেয়র মিঃ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন (কেন্দ্রীয় এম-এল-এ) বলিয়াছেন,—সিন্ধুর লীগ ও কংগ্রেসের নিশ্চয়ই একযোগে কাজ করা উচিত। অনেকে বলেন লীগ ভারতের স্বাধীনতা চাহে না। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সকলের মতই সমানভাবে মুসলিম লীগ ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র। আমরা কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে তাহার প্রমাণ দিয়াছি। সিন্ধু কংগ্রেস-লীগের যুক্ত ফ্রণ্টের আন্দোলনে পাঞ্জাব হইতে পিছাইয়া পড়িল সত্য, কিন্তু আমরা আর দেরী করিব না। উপসংহারে তিনি প্রদেশের কংগ্রেস-নেতাদের কাছে লীগের সর্ব্বত্র ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। মুসলিম লীগকে বিনাসর্ত্তে মানিয়া লইলে এই যুক্তফ্রণ্ট অতি শীঘ্রই সম্ভব হইবে। বিনা বিচারে বন্দীদের মুক্তির জন্য আমরা সকলে একযোগে আন্দোলন সুরু করিব। মিঃ আর, কে, সিদ্ধ ইহাতে সাড়া দিলে সিন্ধুপ্রদেশে অবিলম্বে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত ফ্রণ্ট আন্দোলন গড়িয়া উঠিবে।

● ঘটনা ও রটনা ●

চতুরানন বিড়লা

শুনলাম বিড়লা-ভক্তেরা নাকি কমিউনিষ্টদের ওপর খুব চটেছেন। চটবার ন্যায্য কারণ আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিছুদিন আগে 'পিপল্‌স ওয়ার' কাগজ খবর বার করে দিয়েছিল যে, রাজমহলে "বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর" নামে মামলা চলছে। অভিযোগ, তাঁরা নাকি গবর্ণমেণ্টের সুতা নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি ভঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ লোকের চলতি ভাষায় যাকে চোরা-কারবার বলে সেই অপরাধেই তাঁরা অভিযুক্ত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টদের নামও তলব করেছেন। ম্যানেজিং এজেণ্ট বোধহয় যুগল কিশোর বিড়লা, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, বি-এম-বিড়লা ও আর-কে-বিড়লা।

আশ্চর্য্য এই যে বাংলা দেশের কোনো কাগজ ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদ জানায় নি। ইস্পাহানির কোন্ এজেণ্ট যখন সি-পিতে না কোথায় অনেকটা এই ধরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল তখন বাংলা দেশের সব কাগজ সে খবর খুঁজে খুঁজে বার করে জানিয়েছিল। খুব উচিত কাজ করেছিল। কিন্তু বিড়লা কেম্পানীর বেলায় ন্যাশনালিষ্ট-আনন্দবাজার তো বটেই, অমৃতবাজার পর্য্যন্ত চুপ!

কোটিপতি বিড়লা পরিবারের মত বিখ্যাত দেশভক্ত ও দাতা সারা ভারতে আর নেই বল্লেই হয়। গান্ধীজি তাঁদের আত্মীয়-তুল্য স্নেহ করেন। স্বয়ং চ্যাং কাই শেক তাঁদের বাড়ী মাটিতে আসন পেতে নিরামিষ খেয়ে গেছেন। যুগপৎ চার বিড়লা হওয়ায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মত তাঁরা চারদিকেই দৃষ্টি রাখতে পারেন। কেউ গান্ধীজিকে সেবায় তুষ্ট করেন; কেউ দিল্লীতে হিন্দু-সভা অফিসের পাশে প্রকাণ্ড মন্দির তুলে এবং রাও-বিল-বিরোধী সভায় পৌরহিত্য করে হিন্দু দিকটা সামলান; আবার কেউ বা দালাল মারফৎ লাট-দরবারেও টাটা-বিড়লা মতলবের জাল বোনেন। এখন আবার বোধহয় মামলারও তদ্বির করতে হচ্ছে!

এহেন বিড়লার ভক্তবৃন্দ কমিউনিষ্টদের উপর এত খাপ্পা হয়েছেন যে প্রবল গুজব শুনলাম তাঁরা নাকি অমৃতবাজারের কর্ত্তাদের ডেকে শাসিয়েছেন—কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে যদি কোন খবর বার হয় তবে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বেচারী অমৃতবাজার! কমিউনিষ্টদের স্বপক্ষের খবর তো কিরণ বাবুদের প্রচারের চাপে অনেকদিন আগেই তুলে দিতে হয়েছে। এখন বিড়লাভক্তদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে কি করা যায়? আমরা পরামর্শ দিচ্ছি—কমিউনিষ্টদের বিপক্ষের খবরগুলোও তুলে দিন, তাহলে শত্রুভাবে ভজনা করার দায় থেকেও রেহাই পাবেন!

* * *

নির্লজ্জ ও নির্জ্জলা

হিন্দুসভার বিলাসপুর অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেছেন—অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের একাবদ্ধ হবার অন্যতম সর্ত হ'ল যে, সেই সব সম্প্রদায়কে "ভারতের জাতীয় জীবনের সার্বজনীন সুখ ও দুঃখের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এক হতে হবে।" সাদা কথায় এর মানে দাঁড়ায়—হিন্দুরা অনেক দুঃখ সয়েছে, মুসলমানদেরকেও তার ভাগ নিতে হবে, তবেই ঐক্য হতে পারে।

"ভারতের জাতীয় জীবনের সুখ" ভোগ করেন ভারতের সম্পত্তিশালী লোকেরাই। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের সময় চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ধনপতিদের নির্বাচন-কেন্দ্রে ভোটারের যোগ্যতা এই ভাবে মাপা হয়েছিল: যাঁর এক লক্ষ টাকা মূলধন আছে কিংবা যিনি অন্তত দশ হাজার টাকা আয়ের আয়কর দেন শুধু তিনিই ভোটার হতে পারবেন। সুতরাং এই সব সৌভাগ্যবান ভোটারের প্রত্যেকেই অন্তত লাখপতি, কাজেই "সুখপতিও" বটে। সেই সময় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকা থেকে দেখা যায়, বাংলার বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সে লাখপতির সংখ্যা এই রকম:—

	লাখপতি ভোটার
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার	২২৪
ইণ্ডিয়ান চেম্বার	১৪৬
মাড়োয়াড়ী এসোসিয়েসন	১৩৪
মোট	৫০৪ জন
আর	
মুসলিম চেম্বার	২৯ জন

প্রথম তিনটী চেম্বারের প্রায় সকলেই হিন্দু, আর মুসলিম চেম্বারের প্রায় সবাই মুসলমান। সুতরাং বাংলা দেশে লাখপতির অনুপাত অর্থাৎ সুখের অনুপাত হ'ল:

হিন্দু—৫০৪, মুসলমান—২৯!

ব্রিটিশ হিন্দুস্তানেই এই ব্যাপার। অখণ্ড হিন্দুস্তানের মধ্যে বাংলা দেশকে ঢোকাতে পারলে সুখ আরও অখণ্ড হবে!

* * *

এক ঘাটে

অতীতে একদা আনন্দবাজার পত্রিকা তার কংগ্রেসী খোলস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লকী ফণা বিস্তার করেছিল। জাপানীরা পিছু হটবার পর থেকে সে আবার নতুন খোলসের সন্ধানে ফিরছে। শ্যামা-প্রসাদের বিলাসপুর বক্তৃতায় মুসলিম লীগ-বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রণ্টের আহ্বান শুনে এবার সে নতুন 'দেশগৌরব' বরণ করে নিয়েছে, ১০ই পৌষের সম্পাদকীয়তে খোলাখুলি বলেছে—শ্যামাপ্রসাদের কর্মপন্থাই **"বর্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা"।**

আর ওদিকে ময়মনসিংহ মিউনিসিপাল নির্বাচনে আনন্দবাজার-প্রশংসিত আর-এস-পি দল কংগ্রেসী প্রার্থীর বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের নেতা নির্মল্য চাকলাদারের জন্য ভোট ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে। ময়মনসিংহের কংগ্রেস যেহেতু লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে নেমেছিল (এবং তার ফলে আশ্চর্য্য সাফল্য অর্জ্জন করেছে) সেই জন্যেই আর-এস-পি জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টে যোগ দিয়েছে। তাতে দোষ নেই। কারণ শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ওয়েভেল ও শ্রীবাস্তব থেকে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট পর্য্যন্ত সবাই আসতে পারে, শুধু পাকিস্তান-বিরোধী হলেই হ'ল।

ভারতের ভবিষ্যৎ কাহারা গড়িবে?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বসিবে। ইহারা কেবলমাত্র মৃত অতীতের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে চিন্তা করিতে পারে, ইহাদের স্থানও সেই অতীতেই। আমরা জীবন ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ আমাদেরই হইবে—যদি আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জাতীয় সমস্যাগুলির সুসমাধান করি, জাতীয় ঐক্য অর্জ্জন করিতে পারি, জাতীয় নেতাদের কারাগার হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর গ্রাস হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার উপায় বাহির করিতে পারি এবং আগামী দিনের স্বাধীন জগতে আমাদের সুমহান্ দেশের জন্য একটা গর্বোজ্জ্বল আসন অর্জ্জন করিতে পারি।

ঐক্য রচয়িতাদের হাতেই ভবিষ্যৎ

দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব কমিউনিষ্ট-বিরোধী, দেশ-ভক্তিকে তাঁহাদেরই একচেটিয়া বলিয়া দাবী করেন এবং কংগ্রেস নীতি পরিচালনায় মোড়লি করিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের চিন্তাধারা এরূপ নহে। শ্রীযুক্ত এস্, কে, পাতিল ইঁহাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট রকমের গোঁড়া। তামিলনাড প্রদেশে ভ্রমণকালে তাঁহার বক্তৃতার কিছু নমুনা উপহার দিতেছি:

"গান্ধিপন্থী এবং কংগ্রেস সোসালিষ্টগণ কমিউনিষ্ট বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রণ্টে মিলিত হইয়া কাজ করিতেছে—নবগঠিত কংগ্রেস সংগঠন অবশ্যই ইহাদের জন্য একটা সাধারণ কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিবে।......... আজ কংগ্রেসের সব চেয়ে বড় শত্রু হইল কমিউনিষ্টরা।"

পাতিল মহাশয় ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের নীতি আজ দেশকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহার মর্ম্মান্তিক পরিচয় পাইবেন জনযুদ্ধের প্রথম পৃষ্ঠায়, রংপুরের "কমিউনিষ্ট-বিরোধী" গুণ্ডামির বিবরণে।

শ্রীযুক্ত পাতিলের ঝাঁঝ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, ভারতীয় কমিউনিষ্টদেরই বিরুদ্ধে। আবার শুধু কমিউনিষ্টরাই নয়, মুসলিম লীগও তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত পাতিলের নিজের ভাষায়—

"সরকার বোধহয় আশা রাখে মুসলিম লীগকে ঠেলিয়া তুলিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবে।" (বোম্বে ক্রনিকেল, ১৯শে ডিসেম্বর)

পাতিল মহাশয় একবার ওয়াভেল সাহেবের সর্ব্বশেষ কলিকাতার বক্তৃতা পড়ুন এবং তাহার পর নিজের বুকে হাত দিয়া বলুন যে সত্য সত্যই তিনি সততা অবলম্বন করিতেছেন কিনা।

জনযুদ্ধের ২য় পৃষ্ঠায় সিন্ধু প্রদেশের লীগনেতাদের কংগ্রেসের সহিত যুক্তফ্রণ্ট গঠন করিবার আবেদন রহিয়াছে, তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন পাঠকেরা তাহা পড়ুন। তাঁহারা কি চান যে শ্রীযুক্ত পাতিলের মত ব্যক্তিরাই কংগ্রেসের হইয়া কথা বলেন ও কংগ্রেসকে চালিত করেন?

জাতীয় অনৈক্যের পারিস্থিতিতে নৈরাশ্যের আবহাওয়ার মাঝখানে আমাদের নিজেদের শিবিরে পাতিল মহাশয়ের মত ব্যক্তিরা বাড়িয়া ওঠে এবং অন্য শিবির হইতে আমেরি এবং ওয়াভেল সাহেবরা পিঠ চাপড়াইবার সুরে আবোল তাবোল বকিতে ভরসা পায়। যদি আমরা আমাদের মাঝে পাতিলদের শক্তিমান হইতে সুযোগ দিই তবে ওয়াভেলরা আমাদের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিবে। যাঁহারা কংগ্রেসকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবেন তাঁহাদিগকে পাওয়া আজ কংগ্রেসের বড় প্রয়োজন। যাহারা কংগ্রেসকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে চায় তাহাদিগকে দূরে রাখাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন তাহাদের যাহারা কংগ্রেস এবং লীগের যুক্তফ্রণ্ট গঠন করিবে। সবজান্তা তাচ্ছিল্যকারিদের আজ সেখানে স্থান নাই। দেশের মধ্যে এই ঐক্যপন্থীরাও আছেন, আমাদের সকলের মাঝেই আছেন। সমগ্র দেশ তথা সমস্ত জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিভূ তাঁহারাই—তাই ভবিষ্যৎ ইতিহাসও তাঁহারাই রচনা করিবেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ কাহারা গড়িবে?

লেখক :
পি, সি, জোশী

বিলাতের শ্রমিক দলের গত সম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রস্তাবের আলোচনায় সাধারণ সভ্যদের মতামত নেতাদের মতামতকে পরাভূত করিয়াছে। শ্রমিকদলের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই সর্ব্বপ্রথম ঘটিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রমিকদলের সম্মেলনের প্রস্তাব 'জনযুদ্ধ' পাঠকদের পক্ষে আদৌ বিস্ময়ের বস্তু নহে। বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ সম্বন্ধে 'জনযুদ্ধে' যে সব বিবরণ বাহির হয় তাহা হইতে পাঠকেরা জানেন যে, শ্রমিক দলের নেতাদের সহানুভূতিহীনতা সত্ত্বেও বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টি সেই আগষ্ট দুর্য্যোগের দিন হইতেই কি ভাবে বৃটিশ শ্রমিকদের ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, এবং ভারতের দাবীকে তাহাদের নিজেদে: দাবী বলিয়া ভাবিতে শিখাইয়া আসিতেছে।

প্রথমে ছোট ছোট শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ঘোষণা প্রকাশ করিল, তাহার পর খনিমজুর, ইঞ্জিনীয়ার, রেলওয়ে শ্রমিকদের বড় বড় ইউনিয়নগুলি। ৬০ লক্ষ শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গত অধিবেশনে প্রথম বড় জয় অর্জিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উপর ইহার সেই প্রস্তাব তখনকার-কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আসিয়াছে শ্রমিক দলের নিজের বাৎসরিক সম্মেলনের প্রস্তাব। প্রস্তাবটিতে ভারতের রাজনীতিক নেতাদের কারামুক্তি দাবী করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ভারতে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জাতীয় সরকার গঠনের দাবী করা হইয়াছে (গত সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' প্রস্তাবটী পাইবেন)।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ রেলওয়েমেন্ প্রস্তাবটি আনে। প্রধান প্রধান শিল্পের ইউনিয়ন সমূহ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে। ইহারাই বিলাতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা সংগঠিত এবং সচেতন অংশ। দলের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধতা করেন। তাহা সত্ত্বেও প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। গৃহীত হইবার পর বিজয়োল্লাস চলে দশ মিনিট ধরিয়া। আমরা ইহা হইতে আমেরি কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিলাতের মজুর-শ্রেণীর অসন্তোষ এবং আমাদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতির আভাস পাইতে পারি।

কংগ্রেসকর্মীরা শুনিয়া কৌতূহল বোধ করিবেন, চার্চ্চিলের শ্রমিকদলীয় সহকর্মিগণের মুখপত্র ওয়াকার সাহেব শ্রীযুক্ত এস, কে পাতিলের 'এক দল, এক নেতা, এক কার্য্যতালিকা' এই উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছিলেন যে, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়, উহা ফ্যাসিষ্ট ধরণের সংগঠন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাবে শুধু সাধারণ শ্রমিকদের মনোভাবই প্রকাশিত হয় নাই। শ্রমিকদলের নেতৃত্বের একটী অংশও এখানকার পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দলের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক তাঁহার বিদায়কালীন বক্তৃতায় বলেন :—

"আমাদের ভারতীয় কমরেডগণ, আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের বন্ধুগণ, জাতির উন্নতি এবং স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন পণ করিয়াছেন তাঁহারা জেলে বন্দী আছেন, ইহাতে আমি অসুখী। পণ্ডিত নেহেরু এবং তাঁহার সহকর্মীরা বিনা বিচারে জেলে আটক থাকিবেন, ইহা আমি পছন্দ করি না।"

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ জনগণ

যে কেহই বুঝিবেন যে কলিকাতায় অ্যাসো-সিয়েটেড্ চেম্বারস্ অব্ কমার্সের সভায় লর্ড ওয়াভেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রমিকদলের প্রস্তাব তাহার ঠিক বিপরীত। কারণ সুস্পষ্ট। একটী হইল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বক্তব্য আর একটি হইল ব্রিটেনের জনসাধারণের বাণী। আমাদের মত ঔপ-নিবেশিক দাস-দেশের জীবনে যতদিন জাতীয় জাগরণ আসে নাই, আর সাম্রাজ্যবাদ যতদিন ব্রিটিশ জনগণকে নিজের চাকায় বাঁধিয়া চলিতে পারিয়াছে, ততদিনই সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ নিরাপদ ছিল।

চার্চ্চিল, আমেরি এবং ওয়াভেলদের ক্ষুদ্র কোম্পানি ছাড়া সমগ্র জগৎ জানে যে অন্য যে কোন দেশের অধিবাসীদের মতই ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা পাইতে ব্যগ্র। আজ নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ইহাই যে, বিলাতের শ্রমজীবি জনগণও আমাদের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করিতেছে। তাহারা তাহাদের নিজেদের শাসকশ্রেণীর স্বার্থপর, বন্ধ্যা নীতি—যে নীতি মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখে—সেই নীতির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। ইহা দেখিতে না পাওয়ার অর্থ হইল সময়ের গতি না বুঝিতে পারা, আমাদের মিত্রদের না চিনিতে পারা; ইহা দেখিতে না পাওয়ার অর্থ হইল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষমতা এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের মাঝে আমাদের মিত্রদের সমর্থন অপেক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করা।

ওয়াভেল ও অকিনলেক

বড়লাটের নিজের দপ্তরের প্রধান সেনাপতিই যখন তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলেন তখন বড়লাটের কথা কে বিশ্বাস করিবে? ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের ভিতর দিয়া লাভবান হইয়াছে এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া ওয়েভেল বলিয়াছেন :

"ভারতবর্ষের জায়গাজমি বিধ্বস্ত হয় নাই। বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যাও যদি যুদ্ধে হতাহতের তালিকাভুক্ত মনে করি, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে ভারতবর্ষে হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্পই হইয়াছে। যদি একান্তভাবে উপকারিতার দিক হইতে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্ত যুদ্ধক্ষতি ছাপাইয়া ভারতবর্ষ অনেক বেশি লাভবান হইয়াছে—যুদ্ধের ফলে ভারতীয় জনগণের একটি বৃহৎ সংখ্যা শিল্পশিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছে। অর্থ-নীতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ দেনাদার হইতে পাওনা-দার দেশে পরিণত হইয়াছে। কি বিত্ত, কি অর্থ, কি লোকবল সব দিকেই যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারত-বর্ষের ক্ষতি ত' হয়ই নাই, বরং লাভ হইয়াছে।"

প্রায় একই সময়ে স্যার ক্লড্ অকিনলেক যুদ্ধে ভারতবাসীদের ত্যাগ সম্পর্কে বলেন—

"যুদ্ধের এই বিরাট আয়োজন ভারতবর্ষের গোটা অর্থনীতিক কাঠামোকে বিপুল ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চলিয়াছে। সারা ভারতবর্ষই পর্যুদস্ত। অন্যান্য যুদ্ধরত জাতির যে দশা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষেও সে দশা ঘটিতে বাধ্য। কখনো কখনো কোন কোন মহলে এই ধারণা চালু হয় যে, যুদ্ধে ভারতবর্ষের লোক সম্পদ খুব সামান্যরূপেই নিয়োজিত হইতেছে। আমার মতে সে ধারণা সত্য নয়। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের নগণ্যতম ব্যক্তির উপরও যুদ্ধের ধাক্কা পৌছিয়াছে। তাহারাও যুদ্ধ প্রচেষ্টার বোঝা বহন করিতেছে। তাহাদের কেহ কেহ হয়তো বোঝার কথা জানেনা কিন্তু তাহাদের ঘাড়ে বোঝা ঠিকই আছে। এমন কি নগণ্যতম কৃষকেরও এই বোঝা বহন করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের বাহিরের জগৎ জানে না যে ভারতীয় কৃষকের জীবনধারণের সম্বল কতটুকু। তাহার নিজের এবং তাহার পরিবারের জন্য যে কয় গজ কাপড়ের দরকার, যুদ্ধের জন্য তাহা সে পায় না। আমেরিকা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রের জনগণ স্বচ্ছন্দ জীবনের আয়োজন হইতে বঞ্চিত হইয়া যে কষ্ট পাইতেছে ভারতের কৃষকের কষ্ট ঠিক তাহারই সমান।"

বড়লাট সাহেব বলিতে চান এইযুদ্ধে ভারতবর্ষ লাভবান হইয়াছে আর প্রধান সেনাপতি বলিতেছেন যে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের মতই প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। অথচ দুইজনই ভারতের শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্ত্তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কোন্ ধাপে নামিয়াছে, তাহার নমুনা এই,—অথচ তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা আমাদের রাজনীতিক নেতাদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী, এবং এই ভাবেই তাঁহারা আমাদের ভাগ্য পরিচালনা করিয়া যাইবেন!

অচল অবস্থাই ওয়াভেলের আকাঙ্ক্ষা

মাদ্রাজের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র "হিন্দু" অত্যন্ত ধীরস্থির, বলিতে গেলে একরকম উদারনীতিক দৃষ্টিসম্পন্ন। ইহা ওয়াভেল সাহেবের বক্তৃতার শিরোনামায় লিখিয়াছে **"অচল অবস্থা অবসান করাইবার নূতন কোন প্রচেষ্টা নাই।"** "বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থাই জাতীয় সরকার।"

গত ১৪ই ডিসেম্বর বিলাতের পার্লিয়ামেন্টে আমেরি সাহেব তাঁহার বাঁধা বুলি আওড়ান যে কংগ্রেস নেতাদের কেন মুক্তি দিতে হইবে তিনি তাহার কোন যুক্তি দেখিতেছেন না। শুধু তাই নয়। তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, "অসহযোগিতা এবং বাধাদানের নীতি পরিত্যাগ করিতে বড়লাট সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁহারা (কংগ্রেস নেতারা) কোন সাড়া দেন নাই।"

তবুও বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র মহলে জোর গুজব চলিতেছে যে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে কতকগুলি প্রস্তাব আনিয়াছেন, তিনি গান্ধীজির সম্মুখে সেগুলি পেশ করিবেন। যাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়াছে, ইহা তাহাদের কল্পনা বিলাস মাত্র।

বড়লাট সাহেবের কলিকাতার বক্তৃতার মাঝে কোন মর্য্যাদাপূর্ণ আপোষের স্থান নাই। যাহা আছে তাহা হইল যুদ্ধকালে কংগ্রেসকে দন্তে তৃণ ধরিয়া বড়লাট সাহেবের হুকুম তামিল করিতে হইবে। পাকিস্তান নীতিও গ্রহণ করা চলিবে না। এবং প্রকারান্তরে তাহার অর্থ হইল সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সালিশী করিয়া মিটাইবার ভার ইংরেজ প্রভুদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস এবং লীগকে আর একটি গোলটেবিল সম্মেলনে আনিবার জন্য মতলব ফাঁদিতেছে, সেখানে তাহারা বিচারক হইয়া সভাপতির আসনে

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কিশোরদের কথা

★ মৃত্যুর আগে সৈনিকের চিঠি ★

[জন সিমণ্ডস একজন ইংরেজ সৈনিক। সম্প্রতি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মরার কিছুদিন আগে ছোট ছেলে ক্লিমকে তিনি একটী চিঠি লিখেছিলেন। সারা দুনিয়ায় যে যুদ্ধ চলেছে সে সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন। সহস্র সহস্র দেশপ্রাণ সৈনিক তাদের জীবন দিয়ে ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে কেন লড়ছে তার জবাব পাবে সিমণ্ডসের এই চিঠি থেকে।]

'প্রিয় ক্লিম, এ চিঠি যখন তোমার কাছে পৌছবে, তখন আমি ফ্রান্সের আকাশে গ্লাইডারে ক'রে উড়ে চলেছি।...আজ তুমি, ক্লিম, এ প্রশ্ন ক'রেই খালাস: 'এটা কী? ওকে কী বলে?' কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন তুমি নিজেই প্রশ্ন ক'রতে থাকবে:—'কেন? জীবন যখন এত সুখের, তখন কিসের জন্যে আমরা অপরকে মারতে ও নিজেরা মরতে যাই?'

'...তোমার প্রশ্নের জবাব খুব সহজ ক্লিম। জীবনযাত্রা দুই রকমের হ'তে পারে। এক হচ্ছে সুন্দর স্বাধীন ও পরিপূর্ণ আশায় ভরা জীবন। আর হচ্ছে এমন এক জীবন যেখানে না আছে আশা, না আছে স্বাধীনতা। আজ আমি যে কাজে আছি, সে কাজ ঐ সুন্দর স্বাধীন জীবনের ব্রত—সে জীবনের দুয়ার খুলে দিতে হবে সকল দেশের সকল লোকের জন্যে। আমাদের শত্রু ফ্যাশিজম সেই জীবনের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখেছে।...'

'সামাজিক জীবনে যে মানুষ পরস্পর হানাহানি আর ছলনা প্রতারণায় মেতে থাকে, সেই মানুষই আবার যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের সামনে পরস্পরের কতই না আপন হ'য়ে পড়ে। এর কারণ, তারা একই আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করছে। শান্তির সময়েই বা তা হবে না কেন? শান্তির কালেও তা সম্ভব, যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সেজে নিতে পারি, যেখানে মানুষ হানাহানি না ক'রে পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে কাজ ক'রবে।... পৃথিবীর একটি সুবিশাল দেশে (সোভিয়েট ইউ-নিয়নে) তা ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে।...'

লেনিনের জীবনের একটী কাহিনী

একবার একটা অসুখ থেকে লেনিন সবে মাত্র সেরে উঠেছেন। বন্ধুরা সখ ক'রে তাঁকে নিয়ে একদিন খেঁক শিয়াল শিকারে বেরুলো!

খেঁকশিয়ালের আস্তানার চারপাশে ছোট ছোট রঙীন নিশান পোঁতা হ'ল। শিকারীর দল বন্দুক নিয়ে যে যার জায়গায় তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। একটা পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন লেনিন।...

অনেকটা দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। দূরে একটা রাইফেল গর্জন ক'রে উঠলো। তারপরই সমস্ত স্তব্ধ! বোঝা গেল, বনের একদিক থেকে আর একদিকে খেঁকশিয়ালটাকে তাড়ানো গেছে।

লেনিনের মাথার ওপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে এসে পাইন গাছের ডালে বসলো। গাছ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার মাটিতে ছড়িয়ে প'ড়লো। বনের মধ্যে সেই নিঃশব্দ মুহূর্ত্তগুলি কী সুন্দর।...

হঠাৎ লেনিনের সামনে ঝোপটা নড়ে উঠলো। খেঁকশিয়ালটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন শুঁকছে।

গায়ের লোমগুলো তার দীর্ঘ, রেশমের মত নরম। তার লেজটার ওপর সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। দেখাচ্ছে ভারী সুন্দর।

খেঁকশিয়ালটা তখনও লেনিনকে দেখতে পায় নি। সামনে এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়। কান তার খাড়া হ'য়ে ওঠে। চোখে তার ভয়ের আভাষ। মানুষের গন্ধ পেয়েছে সে!

হঠাৎ হাওয়া দেয়। শিকারীদের ছোট ছোট রঙীন নিশান সশব্দে নড়ে ওঠে। খেঁকশিয়াল আতঙ্কে ছুটে পালায়।

ইতিমধ্যে শিকারী বন্ধুদের একজন লেনিনের কাছে এগিয়ে আসে।

লেনিন নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্দুকের মুখটা মাটির দিকে ফেরানো।

লোকটা রাগে গজ গজ ক'রতে ক'রতে ব'ললো, 'তোমার পাশে এসে দাঁড়ালো আর তুমি গুলী ক'রলে না, লেনিন?'

লেনিন হেসে ব'ললেন, গুলী ক'রতে করুণা হ'ল। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

কিশোর ভাই-বোনেরা!

তোমরা মনে করছ তোমাদের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। সত্যি আমাদের খুব অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তোমরা চিঠি লিখে খোঁচাওনি কেন?

যাই হোক এবার থেকে নিয়মমত তোমাদের কথা থাকবে—মাসে একবার তো নিশ্চয়ই, দুবারও দেবার চেষ্টা করব। আমাদের ছোট্ট সাপ্তাহিক কাগজ, জায়গার কত অভাব তা তোমরা জান!

কিন্তু তোমরা ভাল খবর না দিলে, লেখা না পাঠালে কিচ্ছু হবে না। আমাদের কাগজ তো আনন্দবাজার নয় যে, 'মৌমাছি' গুরু মশায়ের মত তোমাদের লম্বা লম্বা উপদেশ দেব। আমরা তোমাদের কথা তোমাদের মত করেই জানতে চাই, জানাতে চাই।

দেশের মধ্যে, গ্রামের মধ্যে, তোমাদের চোখের সামনে কত কি ঘটছে। স্কুলগুলো কত খালি হয়ে গেছে, কত মাষ্টার ছেড়ে চলে গেলেন, খেলাধূলোয় তেমন আর জৌলুষ নেই, বাড়ীর মধ্যে হাসিখুসি বাবা মায়েরা আজ হয়তো মুখ গোমড়া করে থাকেন—এমনি সব কত কি তোমরা দেখছ। কি হ'ল, কেন হ'ল সে সম্বন্ধে তোমরা ঠিক যা যা ভাবছ তাই লিখে পাঠাবে। নিজের মনের কথা লিখবে, অন্যের 'উপদেশ' সাজিয়ে লিখো না।

হ্যাঁ দেখ, একটা খুব ভাল বই বেরিয়েছে—তার নাম "মানুষ কি করে বড় হ'ল"। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের এই কাহিনী এমন আশ্চর্য্য যে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। অথচ সব সত্যি, ছেলেভুলোনো গাঁজাখুরি "এডভেঞ্চারের" গল্প নয়। বইটা খুঁজে দেখো।

আচ্ছা একটা খবর দিও তো—ছোটদের জন্যে যে সব লেখক লেখেন তার মধ্যে কার লেখা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

আবার দু হপ্তা পরে আলাপ হবে।

ধানের দর বাঁধ, অন্য জিনিষ কণ্ট্রোল কর

এই পৃষ্ঠার খবরগুলি দুই বা তিন সপ্তাহ আগেকার। সমস্ত খবরেই দেখা যায় যে একদিকে ধান-চালের দর পড়িতেছে, অন্য দিকে কৃষকের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্রই অগ্নিমূল্য। মজুর পাওয়াও খুবই মুস্কিল, যেখানে মিলিটারী কাজের সুবিধা আছে সেখানে অনেকেই সেই কাজে চলিয়া যাইতেছে। জোতদার প্রভৃতি যাহারা শুধু মোটা লাভের আশায় চাষ করিত তাহারা এই অবস্থা দেখিয়া জমি বর্গা দিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন কি কোথাও জমি ফেলিয়াও রাখিতেছে। আর কৃষক—জমির সঙ্গে যাহার নাড়ীর সম্বন্ধ—সেও ধান চাষের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইতেছে। অবস্থা এমনই যে কৃষকের সহিত মজুরের, গ্রামের সহিত শহরের, খরিদ্দারের সহিত দোকানীর সংঘর্ষ সুরু হইয়েছে, সামাজিক জীবনে গৃহবিবাদ আসিতেছে।

এখন ধানের দাম কোথাও কোথাও কিছুটা চড়িয়াছে বটে কিন্তু নূতন ধান বাজারে আসিলে আবার দর পড়িবে। কৃষক তথা অন্য সমস্ত শ্রেণীকে বাঁচাইতে হইলে এখনই ধান-চালের নিম্নতম ও উচ্চতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া দরকার এবং কণ্ট্রোল দরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা দরকার।

খরচা পোষায় না—তাই মাঠে ধান পড়িয়া আছে

সৎ কৃষকও চুরি করিতে বাধ্য হয়

৩রা ডিসেম্বর। **খুলনা** জেলার ঘাটভোগ গ্রামে যাইতেছি।

রাস্তার দুইপাশে ধান ক্ষেত। একেই এবার ধান কম হইয়াছে, তাহার উপর পাকা ধান মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। ধানের দাম কম থাকায় মজুর খাটাইয়া খরচা পোষায় না—তাই ধান কাটানোর দিকে অনেকেরই গা নাই। রোগের জন্য নিজেরাও আবার অনেকে ধান কাটিতে পারিতেছে না।

গ্রামে ৩৬ ঘর কৃষকের বাস। ২ ঘর চাষী বছরে কিছু ধান বিক্রি করে, ৬ ঘর কোন রকমে ধারকর্জ করিয়া বছর চালায়—বাকি ২৮ ঘর ১ দিন অন্তর অনাহার অর্ধাহারে কাটায়। ঘরে ঘরে অসুখ লাগিয়াই আছে। শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়ার রোগী।

দুর্ভিক্ষের আগের বছরেও এই গ্রামেরই ৪০ খানা হাল ছিল। বর্ত্তমানে মাত্র ৮ খানা হাল আছে। তাতে বড় জোর ৮০ বিঘা জমির চাষ হইতে পারে। বাহিরের হাল আনিয়া পোষায় না বলিয়া কেহ চাষ করিবে না ঠিক করিয়াছে।

সিন্দুরডাঙ্গার কুশৈ বিশ্বাস দুঃখ করিয়া বলিল, '১ পৈকে (৭ সের) ধান বেচে ১ পোয়া তামাক কিনি—কি ক'রে চালাই বলেন!'

৬০ বছরের হৃদয় সর্দার বলিল, 'জীবনে কখনও মজুরী খাটিনি, তবুও আজ খেতে পাই না।' হৃদয় সর্দারের বছরে খোরাকী ধান হইত। গত বার মিথ্যা করিয়া পুলিশ তাহাকে হাজতে রাখে। ৮ বিঘা জমিতে একটি ধানও সে বুনিতে পারে নাই।

দুর্ভিক্ষ আসিয়া চাষীদের শুধু সর্ব্বস্বান্তই করে নাই, চুরি করিতেও বাধ্য করিয়াছে। গতবার অনেকেই ধান, নৌকা ইত্যাদি চুরি করিয়া বেচিয়াছে। 'চোর হ'তে কে চায়, বাবু? কিন্তু চোখের সামনে ক্ষিধের জ্বালায় ছেলে-মেয়েদের কান্না ত' সইতেও পারি না'—বলিতে বলিতে একজন ত' কাঁদিয়াই ফেলিল।

মধ্যবিত্তদের শুধু দালানই সার

জমিদার অর্দ্ধেন্দুশেখরের কাকা রাখাল চাটুয্যের আজ আর গাঁতী নাই। গত বছর বসতবাড়ীর টিন, বেড়া, খুঁটি বেচিয়া কোন রকমে দিন চলিয়াছে। এবার বেচিবারও আর কিছু নাই। ছোট ছেলেটিকে আজ আর ইস্কুলে পড়াইবার সামর্থ্যও তাঁহার নাই।

বৃদ্ধ ভরত রায় নিজের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ২৬ বছর ধরিয়া রামনগর ষ্টেটের সেরেস্তায় তিনি কাজ করিয়াছেন। জমিদারী হাত বদল হওয়ায় আজ ৩ বছর তিনি বেকার। ১ বিঘা বর্গা দেওয়া জমি হইতে ৯।১০ সের মাত্র ধান পাইয়াছেন। তাও মজুরী দিয়াছেন ১৶০ আনা হিসাবে। ৩টি ছেলেকেই অভাবে পড়িয়া ইস্কুল ছাড়াইয়াছেন। এ অবস্থা তাঁহার একলার নয়—এ পাড়ার ৩০ ঘর লোকের মধ্যে ১৬ ঘরেরই আজ এমনি অবস্থা।

ব্রাহ্মণপাড়ার মণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ভদ্রপাড়ায় শুধু দালানই আছে, ভিতর খাঁ খাঁ করিতেছে।

● কেহ ধান চাষ করিবে না ●

১০ বিঘা জমি চাষের আয়ব্যয়

১ খানা হালে (১টা লাঙ্গল, ২টি বলদ) ৩ বছর চলে—মোট ২০০৲।৩০০৲ টাকা খরচা।

১৩৫০-৫১ সালে ১০ বিঘা জমি চাষে খরচ

হাল—৬৬৲; বলদ খোরাকী—১৪৲, মজুরী (পান তামাক সমেত)—৩০০৲; বীজধান (গতবারের দামে)—১৫০৲, মোট খরচ **৫৩০৲ টাকা।**

এবারের দরে উৎপন্ন ধানের (এবার বিঘায় ৪ মণ ধান হইয়াছে) দাম—২০০৲ **টাকা।**

মোট লোকসান—৩৩০৲ টাকা।

ধানচাল ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম

	অগ্রহায়ণ ১৩৪৯	অগ্রহায়ণ ১৩৫০	অগ্রহায়ণ ১৩৫১
ধান প্রতিমণ	৪।০	৯৲	৫।০
চাল "	৭৲	১৫৲	৯।০
কেরোসিন প্রতি সের	৶০	১৲	১৲
নুন "	৵০	৶০	।৵০
সর্ষের তেল "	॥০	১৵০	১৸০
তামাক "	।০	৸০	৪৲
ধুতি জোড়া	৬।০	১০৲	৮।০
শাড়ী "	৮৲	১১।০	১০৲

গ্রামের ৩টি পরিবারের হিসাব।

স্বচ্ছল কৃষক: কর্ণধর বিশ্বাস; লোক সংখ্যা ৭ জন।

(খোরাকী বাদে ৪০মণ ধান, পান ও তামাক বেচিয়া)

মাসিক	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১
আয়	২১।৶০	৩৮।/০	৩০।৶০
ব্যয়	১৮।৶০	২৬৸০	৩০।/০

মধ্যবিত্ত কৃষক: মধু মোল্লা; লোকসংখ্যা ৫ জন।

(শুধু খোরাকী ধান হয়; খেজুর গাছ কাটা ও গুড় বিক্রিতে)

	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১
আয়	৪৶০	৫৸/০	৮।/০
ব্যয়	১৮৲	১০৸৵০	৭৲

(৩ বছরে ঋণ ১৫০৲ টাকারও বেশী)

দিনমজুর: সহদেব; লোকসংখ্যা ৭ জন।

(দৈনিক চাল কিনিয়া খাইতে হয়)

	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১
আয়	১৭।০	২২।০	২৭/০
ব্যয়	১৭।/০	৩৯৶০	৩১৲

(প্রত্যেক মাসেই রিলিফের উপর নির্ভর করিতে হয়; মাসের ১৫ দিনের বেশী ২ বেলা ভাত জোটে না—৫ দিন উপবাসে কাটায়)

—**অনিল বিশ্বাস**

গৃহবিরোধের স
জিনিষপত্রের অগ্নি

কয়েকদিন আগে যশোহর জেলার খাজুরার হাটে মাছের দর লইয়া কৃষক ও জেলেদের মধ্যে একটি ছোট খাটো হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও কৃষক সমিতির কর্মীদের হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটি বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই।

জেলার বিভিন্ন হাট হইতে এইরূপ গোলমালের খবর আজকাল নিত্য আসিতেছে। কোথাও কাপড়ের দোকানদার, কোথাও মুদিখানার মালিক, কোথাও বা জেলে—এইরূপ বিভিন্ন ধরণের বিক্রেতাদের সহিত খরিদ্দার কৃষকদের সংঘর্ষ আজ-কাল রোজকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার পিছনের ইতিহাস অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু এই ঘটনাস্রোত এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে চলিয়াছে।

ধানের দাম কমিতে কমিতে এখন মণ পিছু ৩৲ টাকা এবং কোথাও কোথাও ২৲ টাকায় অথচ অন্যান্য জিনিষপত্রের দর কিছু-মাত্র না কমার ফলে, কৃষকের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে।

উৎপাদনের খতিয়ান

অভয়ানগর থানার গোদপাড়া গ্রামের তথ্য হইতে কৃষকদের বর্তমান অবস্থা বোঝা সহজ হইবে।

বর্গা চাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। চাষের

বিঘা প্রতি

		১৯৪
কিষাণ	রোয়ার জন্য ৬টা	৩৲
	কাটার জন্য ৫টা	২॥০
	(১৯৪৪ সালে ৬টা)	
লাঙ্গল	... ...	৪৲
বীজ	... ...	১৲
গাড়ী	... ...	১৲
মলাই	... ...	১৲
কিষাণ খোরাকী	...	২৲
		১৪॥০

	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	পণ্যে মূল্য
মোট পণ্য	২ শলা	১॥শলা	১ শলা	

উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়া বিঘা প্রতি জমিতে কৃষকের হাতে অবশিষ্ট থাকে ৫॥০

খরচ তাহাদের সমানই, কিন্তু ফসলের বেলায় তাহারা মোটে অর্ধেক পায়।

পাট বিক্রিতে দুপয়সা যে কৃষকের হাতে আসিবে তাহারও উপায় নাই। একজন কৃষকের গত ৩ বছরের হিসাব নীচে দেওয়া হইল:

	জমি	খরচ	ফসল	বিক্রি
১৯৪২	৮ কাঠা	১৬৲	৩ মণ	১৮৲
১৯৪৩	১২ কাঠা	১০৲	হয়নি	×
১৯৪৪	১২ কাঠা	৪৮৲	৬ মণ	৫৪৲

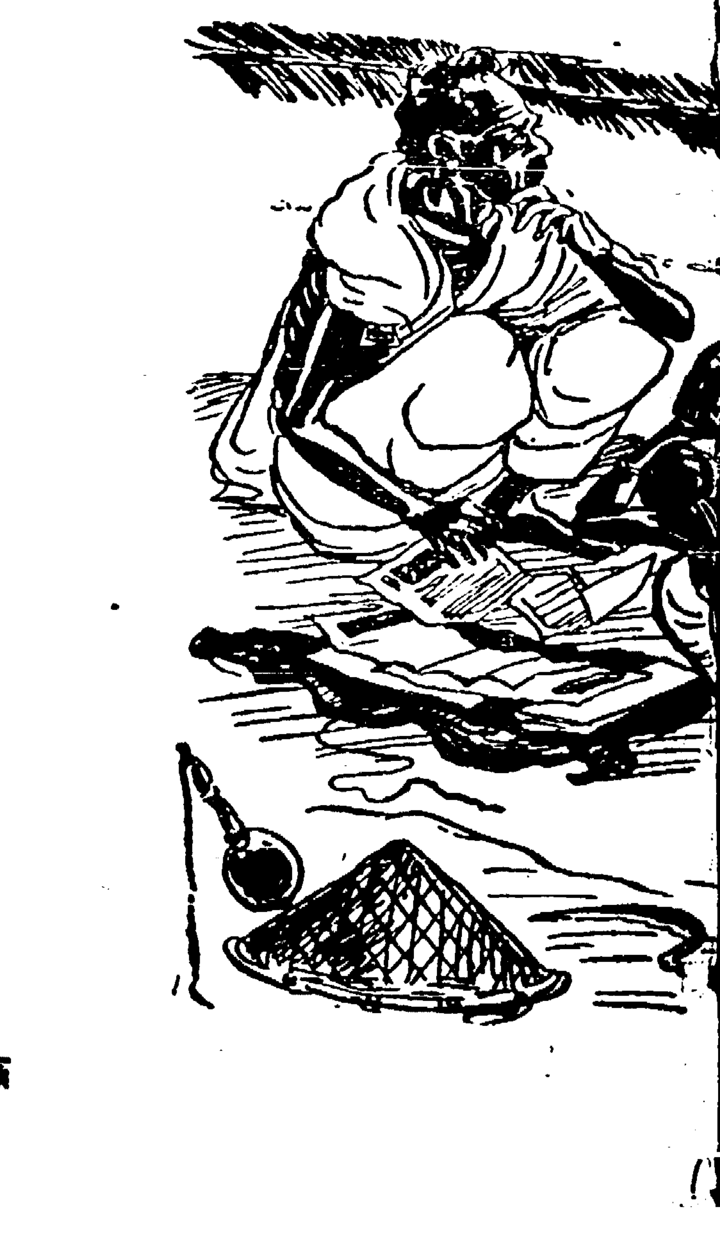

অজয় বাঁধ সম্মেলন

১৫ হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ

গত ৬ই ডিসেম্বর **বর্দ্ধমান** জেলায় গুস্করার নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর গ্রামে বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে অজয় বাঁধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার ১৫ হাজার নরনারী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

গত ৪০ বছর ধরিয়া বন্যাঞ্চলের ১০টী ইউনিয়নের ১৬৭টী গ্রামের ৭০ হাজার মানুষ পার্বত্য নদী অজয়ের উন্মত্ত বন্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। চাষীর ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ হইয়াছে, সেচের পুকুরগুলি মজিয়া গিয়াছে। যার ৪০ বিঘার উপর এক কালে জমি ছিল, আজ তার ৫।৭ বিঘার বেশী আবাদযোগ্য জমি নাই। পর পর দু' বছর অজয়ের বন্যা ৪০ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করিয়াছে।

বন্যাপীড়িত জনসাধারণের আহ্বান জেলার কংগ্রেস ও লীগ-নেতারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বাংলা **লীগের সম্পাদক** আবুল হাশেম বলিলেন, সরকারী অনুগ্রহ ও শুভবুদ্ধির উপর ভরসা করিলে চলিবে না। গণশক্তিকে আরও সুদৃঢ় করিতে হইবে। সমস্ত দল সংঘবদ্ধ হইয়া চাপ দিলে সরকার আমাদের দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। **নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য** আব্দুস সাত্তার এই আন্দোলনকে কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষ হইতে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সভায় কমিউনিষ্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার, লীগনেতা আব্দুল বাসেত, শ্রীযুক্ত করুণাময় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বক্তৃতা করেন। সভায় সময়োপযোগী কয়েকটী গ্রাম্য গানেরও ব্যবস্থা ছিল।

উদ্বৃত্ত জেলা দিনাজপুরে

আমজানখোর ইউনিয়নে দশ আনা জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার পশ্চিম অঞ্চল। রামপুর গ্রামের নশক বর্মণের সহিত দেখা। তার নিজের বলিতে জমি নাই; ৮ বিঘা জমি আধি করে। তাহাতে চলে না, কাজেই দিনমজুরী করিতে হয়। এবার মাত্র ২০ বিশ ধান পাইবে, তার মধ্যে কর্জা শোধ দিতেই ১৫ বিশ ধান চলিয়া যাইবে। এখন আবার মজুরী হইয়াছে টাকায় ২টা। দিন একটা টাকা হইলেও কোন রকমে চলিত।

বড়সিঙ্গিয়ার আধিয়ার তফিরদ্দিন। সংসারে তার ৫ জন লোক। সমস্ত জমি খোয়াইয়া শুধু ৪ বিঘা ঠিকা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ৬ বিঘা জমি সে আধি করে। চাষ ও বুনানের সময় খোরাকী থাকে না—অগত্যা মালিকের কর্জা ধান খাইয়া ফসল বুনিতে হয়। ফসল ওঠার পর কর্জা শোধ করিতে যাইয়া তফিরদ্দিন দেখে, তার প্রাপ্য সমস্ত ধান দিয়াও কর্জা শোধ হয় না। ৪ বিশ ধান নতুন কর্জা লিখাইয়া শুধু ডালা ও কুলা হাতে তফিরদ্দিনকে ঘরে ফিরিতে হয়। বলিতে বলিতে বেদনায় তফিরদ্দিনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

লাঙ্গলের ফলার দাম দু' আনার যায়গায় আজ একটাকা পাঁচসিকায় উঠিয়াছে। এক মণ ধান দিয়া এক সের তেল কিনিতে হয়। ধানের দাম আজ মণ পিছু ৩৲ টাকায় নামিয়াছে। ধান ঘরে ধরিয়া রাখারও উপায় নাই। কাছারীতে খাজনার দায়ে আটক হইতে হইবে।

সওয়া কোটি মণ উদ্বৃত্ত ধানের জেলা দিনাজপুর। এখানেও শত শত কৃষক পরিবার অন্নাভাবে, রোগে শোকে আজ ভিটাছাড়া।

আমজানখোর ইউনিয়নে ৯০০ ঘর লোকের বাস; ৩৫০ ঘরের লাঙ্গল গরু নাই, ২৫০ ঘরের গরু আছে ত' লাঙ্গল নাই কিম্বা লাঙ্গল আছে ত' গরু নাই গোছের অবস্থা। ৩০।৪০টি ঘর দুর্ভিক্ষে সাফ হইয়া গিয়াছে। দশ আনা জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে।

পারিয়া ইউনিয়নের বারো আনা জমিতে জলের অভাবে ফসল হয় নাই। ভাণ্ডারপাড়ার সিকি ভাগ জমি বোনা হয় নাই।

চিলিভিটা গ্রামের দর্প সিং দিন মজুর ছিল, মারা গিয়াছে। **দেড় মাস আগে তার ছেলেটী ৪নং বড় বাড়ীতে ১১৲ টাকায় বিক্রি হইয়া গেছে।**

—**কৃষ্ণবিনোদ রায়**

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: **বঙ্কিম মুখার্জি**, এম, এল, এ
অফিস: ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪।০, ৬ মাস ২।০, ৩ মাস ১।০

...র্বনাশা ভবিষ্যৎ

...ূল্যে কৃষকের দুর্দ্দশা

ইহার মধ্যে খুঁটিনাটি হিসাব ও কৃষকের খোরাকীও ধরা হয় নাই।

ফসলের ভবিষ্যত

একদিকে জমির উৎপাদন শক্তি কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে কৃষকদের খাটিবার শক্তিও কমিয়াছে।

ফলে, অবস্থা এমন জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, কৃষকদের মধ্যে উৎপাদনের সামান্য উৎসাহ পর্য্যন্ত আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। একদিকে গোমড়ক, অন্যদিকে চড়া দরে গরু কেনার অক্ষমতা। ফলে, অনেক জায়গা হইতে লাঙল বেচিয়া ফেলারও খবর আসিতেছে।

দিনমজুরদের ১৲ টাকা রোজ হইলেও গড়ে ইহাদের ৩ জন করিয়া পোষ্য এবং গ্রামে কণ্ট্রোলের মাল ইহারাই সব থেকে কম পায়।

৫ আঁটি শাক আগে ছিল এক পয়সা, এখন তার দাম ছয় পয়সা। আগে দু' আনার মাছে হাট ভোর চলিয়া যাইত, এখন ২৲ টাকার মাছেও ৩ বেলা কুলায় না। এক আনা সের দুধের দাম এখন বারো আনা। ইহার উপর চালের দাম বাড়িলে আর রক্ষা নাই—মধ্যবিত্তদের মনের অবস্থা আজ এইরূপ।

জমিতে খরচ

	১৯৪৩	১৯৪৪
	৯৲	৯৲
	৭৷৷০	৬৲
	১৬৲	১৬৲
	৩৲	৩৲
	২৲	×
	২৲	২৲
	৪৲	৪৲
	৪৩৷৷০	৪২৲

২০৲ ৯০৲ (দর খুব বেশী ছিল) ১৫৲ (বর্তমান দর ইহা হইতেও কম)

৪৬৷৷০ ২৫৲ টাকা

(এই সময় অন্যান্য জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য ছিল) লোকসান

কৃষক, মধ্যবিত্ত, দিনমজুর—সবাই চায় সব জিনিষের কণ্ট্রোল হোক। ধানের নিম্নতম দর না বাঁধিলে কৃষকের যে সর্বনাশ হইবে, একে অপরকে না দেখিলে যে আত্মঘাতী গৃহপ্রলয় দেখা দিবে—আজ এই চেতনা গ্রামবাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছে।

—শান্তিময় ঘোষ

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

সফিজদ্দির জীবন-কথা

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার পূর্ব নাঠই গ্রাম।

ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে বৃদ্ধ সফিজদ্দি। গ্রামের হালচাল জিজ্ঞাসা করিলাম।

সফিজদ্দি নির্বিকার। আমার একটি কথাও তার কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। ততক্ষণে আমার গলা শুনিয়া সফিজদ্দির স্ত্রী ভানুবিবি বাহির হইয়া আসিয়াছে।

চার কুড়ি বয়স হইয়াছে সফিজদ্দির। একেবারে অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। নড়িয়া বসার ক্ষমতাও তার নাই। সফিজদ্দির ইতিবৃত্ত ভানুবিবির মুখ হইতেই শুনিলাম।

ঘরামীর কাজ করিত সফিজদ্দি। পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের সেরা ঘরগুলি সফিজদ্দিই বানাইয়াছে। হারমোনিয়াম মেরামতির কাজও জানিত সফিজদ্দি। সুখে-দুঃখে কোনরকমে দিন চলিয়া যাইত; সংসারে কাহাকেও ভাতের কষ্ট কখনো পাইতে হয় নাই।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ আসিয়া সব ওলট পালট করিয়া দিল। ঘরে ঘরে অভাবের আগুন জ্বলিতেছে, ঘরামীর কাজে সফিজদ্দিকে কেউ আর ডাকে না। নয় দিন, নয় রাত্রি সফিজদ্দির গোটা সংসারকে শুধু পেঁপে খাইয়া কাটাইতে হইল।

নিরুপায় সফিজদ্দি ৫ কড়া জমি ৪৩৲ টাকায় বিক্রি করিয়া দিল। দলিল লিখিতে হইল ৫০৲ টাকার।

সোনার দর চালের। ৪৩৲ টাকায় ৭টি প্রাণীর ক'দিন চলে? সফিজদ্দির বড় ছেলে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফ্যান যোগাড় করিয়া আনে। গরম ফ্যান বহিয়া আনিতে আনিতে বেচারার মাথার চুল উঠিয়া গেল। চোখের উপর এ দৃশ্য বাপ হইয়া সফিজদ্দি দেখিতে পারে না।

সফিজদ্দি ঘরের ৭ খানা টিন ৩০৲ টাকায় বেচিয়া দেয়। কয়েক দিন চলে। আবার একটানা ৭ দিন উপোধ। এবার ১ জ্যৈষ্ঠ জমি ১০৲ টাকায় বেচিয়া দেয় সফিজদ্দি।

সফিজদ্দির বিবাহিত ৪টি মেয়ে সন্তানসহ বাপের কাছে ফিরিয়া আসে। স্বামী তাহাদের দুর্দ্দিন দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, বাপ সফিজদ্দি তাদের ফেলিতে পারে না।

সফিজদ্দি প্রাণপণে ঘরামীর কাজ জোটাইতে চেষ্টা করে। কাজ শেষ পর্যন্ত মিলিল বটে, কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে ঘরের চাল হইতে বৃদ্ধ সফিজদ্দি পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যায়। সেই পড়িয়াছে সফিজদ্দি আর উঠিতে পারে নাই।

শেষ সম্বল ছিল দাওয়ার ৪ খানা টিন, তাও শেষ পর্যন্ত ১৬৲ টাকায় বেচিতে হইল।

তারপর হইতে একটানা লঙ্গর-খানার জীবন। বড়রা কোনো রকমে জীবনের জের টানিয়া চলে, কিন্তু ছোটরা পারে না। প্রথমে একটী মেয়ে মরিল, তারপর আর একটী......তারপর আরও। নিকরুণ মৃত্যুর একঘেয়ে পরোয়ানা বারে বারে ফিরিয়া আসে—৬ মাসের ভিতর মারা গেল ৪টী মেয়ে ও ১টি ছেলে।

মাঠে আবার নতুন ধান উঠিল। তখন সফিজদ্দির গোটা পরিবার মাঠে মাঠে ধান কুড়াইয়াছে। নাবালক এক ছেলে ধান কাটার কাজে লাগিয়া গেল। সফিজদ্দির স্ত্রী ভানুবিবি, মেয়ে মইফুল, আরজান আর কেয়ামতী ধান ভানিয়া কিছু কিছু ঘরে আনিয়াছে।

● কাহিনীর চেয়েও করুণ ●

আরও নয়টির প্রতীক্ষায় উঠানের পাঁচটি কবর

কিন্তু রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। মা ও তিন মেয়ে জ্বরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সংসার আর চলে না। এক মেয়ের স্বামী দয়া করিয়া ৭৲ টাকা পাঠাইয়াছিল, তাতেই কয়েকদিন চলিয়াছে। সরকারী রিলিফও আজ বন্ধ। মইফুল জ্বর গায়ে গৌরনদী গিয়াছিল, খালি হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। গৌরনদীর সেণ্টার কবে উঠিয়া গিয়াছে।

তাই আজ সফিজদ্দির ৯টী প্রাণীর সংসার উপবাসে।

—কথা শেষ করিয়া ভানুবিবি এবার দাওয়া ছাড়িয়া উঠানে নামিল। চোখ তাহার জলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট্ট উঠানে কতগুলি মাটির ঢিবি! ভানুবিবি একটার পর আর একটার উপর হাতে রাখে আর ঝাপসা চোখে বলে, 'বাবু এই আমার ৯ বছরের মেয়ে, এই আমার ৪৷ বছরের মেয়ে, এই ৩ বছরের, এই ১৷ বছরের মেয়ে আর এই ৩ মাসের ছেলে।'

দেখি আরও ৯টী কবরের প্রতীক্ষায় ৫টী মাটীর ঢিবি উঁচু হইয়া আছে!

—ন্টু ব্যানার্জী

চাষী-গৃহস্থ গৃহস্থী ভাঙ্গিয়া দিতেছে

জমি চাষে কৃষকের আজ উৎসাহ নাই

ঢাকা জেলার উত্তর মহেশ্বরদীর সরিৎপুর গ্রাম। ভাদ্র মাস। অশ্বিনী সিংহের বাড়ীতে বসিয়া আমন চাষের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। হরেন্দ্র সিংহ আসিয়া খবর দিল, দক্ষিণ পাড়ার দুইজন বড় গৃহস্থ তাহাদের গৃহস্থী ভাঙিয়া দিয়াছে, সমস্ত জমি তাহারা বর্গা দিয়াছে। চাষের অবস্থা এবার নাকি কিছু বোঝা যাইতেছে না, চাষে ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় বাজারে ধানের দর তখন ৯৲।১০৲ টাকা।

রহিমাবাদের ভুইঞারা সবাই সম্পন্ন গৃহস্থ। নিজেরাই লোক খাটাইয়া নিজেদের জমি এতদিন চাষ করিয়া আসিয়াছে। '৪২।'৪৩ সালে জমির পরিমাণও বেশ কিছু বাড়াইয়াছে। কিন্তু এবার আমন চাষের সময় দেখা গেল, তাহারা নিজেরাই গরজ করিয়া জমি বর্গা দিতে চায়। কিন্তু বর্গা নিতে লোক আর আসে না। অনেকেই জমিজমা বেচিয়া আসামের দিকে পাড়ি দিয়াছে।

আটপাইকার যতীন্দ্র গোপ -ঘরের খায়, বাড়তি বিক্রয় করে। এবার আমন চাষের সময় পরিবারের খোরাকী আন্দাজ জমিই শুধু চাষ করিয়াছে। বাকিটা খিলা (অনাবাদী) রাখিয়াছে। শতকরা ৭০ জনের ম্যালেরিয়া, চাষের লোক পাওয়া যায় না।

আয়ের চাইতে খরচ বেশী

বিক্রমপুরের কয়েকটী গ্রামের চাষের হিসাব দেখুন:

ক্ষেত-মজুরের মজুরী (জেলার গড় হিসাব)

	এপ্রিল	নভেম্বর
১৯৪৩	৷৶০	৸০
১৯৪৪	১৷০	১৷০

চাষীর আয়

গ্রাম	জমির পরিমাণ	খরচ	পণ্যের মূল্য
মেদিনীমণ্ডল	১'৪০ একর	৩০৯৲	২৮৭৲
ধামদ ···	'৪০ "	৬৪৲	৮৭৲
বলই	'৭০ "	১৬৫৲	১৬১৷৷০
আউটসাহী	'৪২ "	৬১৲	৪৫৷৷০

(৭৲ টাকা মণ ধরিয়া হিসাব। খরচের ঘরে গোলার হিসাব ধরা হয় নাই। মূল্যের ঘরে কূটা, ঝাড়া ইত্যাদি সব জিনিষের দাম ধরা হইয়াছে।)

ক্ষেতমজুর সমস্যা

সেদিন টঙ্গিবাড়ী ফুড কমিটির অফিসে বসিয়া আছি। কথায় কথায় আগামী চাষের কথা উঠিল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, সামনের পর চাষ করা আর সম্ভব হইবে না। তাঁহার অবস্থা খারাপ না। ২ জন মুনি (মজুর) রাখেন গৃহস্থীর জন্য। ১৫৲ টাকা মাইনা, ৩ বেলা খোরাকী। 'সামনের চাষের কথা যে কন, খৈলের দাম ১২৲ টাকা মণ, ১ কানি (১'৪০ একর) জমিতে হাল দিতে যায় ১০০৲ টাকা। আলুর বীজ চোরাবাজারে ৫০৲ টাকা মণ, তাও পাওয়া যায় না।'

আউটসাহীতে কয়েকজন কৃষক আলাপ করিতেছিল, 'বদলি (ক্ষেতমজুর) যারা খাটে, তারাই রাজা। দু' টাকা তিন টাকা রোজ গোণে।' রাণীগাঁ গ্রামের হাউলারা (যারা জমিতে হাল-দেয়) নাকি সভা করিয়া পরামর্শ করিতেছে ১০০৲ টাকার কমে ১ কানি জমিতে তাহারা হাল দিবে না। গত চাষের সময়ও কানি পিছু হালের দর ছিল ৪০৲ টাকা।

সব কিছুর দাম কমুক

শ্রীনগর হইতে নৌকায় হাসাড়া যাইতেছিলাম। মাঝির সহিত আলাপ হইতেছিল—

'নৌকার দিন ত' শেষ হইয়া আইল, এখন কি করবা?'

'ধান কাটুম।'

'তোমাগো এলাকায় দর কি? কত ভাগ?'

'গৃহস্থরা দিতে চায় ৮ ভাগের ১ ভাগ, আমরা চাই ৪ ভাগের ১ ভাগ। একটা বৈঠক হইয়া গেছে—এখনও দর ঠিক নাই। গৃহস্থরা কয়, ৪ ভাগের ১ ভাগ দিতে রাজী আছি, কিন্তু সামনের বাইনের সময় আট আনা মজুরীতে খাটবা। কিন্তু আট আনায় কি কইরা পোষায়? সব জিনিষের দাম নামুক, আমরাও আট আনায় খাটতে রাজী আছি।

—প্রবোধ গুপ্ত

মায়াপুরের সমৃদ্ধি কোথায় গেল

সম্পন্ন কৃষক আজ দিনমজুর

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার মায়াপুর গ্রাম। কয়েক বছর আগেও সমৃদ্ধিশালী চাষীর বাস হিসাবে এ গ্রামের নাম ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই।

২।৩ বছর আগেও যারা সম্পন্ন কৃষক ছিল, আজ তারা জমি জমা হারাইয়া গরীব দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে। বেশীর ভাগ জমিই আজ হয় জমিদার কিংবা গৌড়ীয় মঠওয়ালাদের হাতে জমা হইয়াছে।

তিন বছর আগেও এই গ্রামেরই অজিত মোল্লার ৩২ বিঘা জমি, ২টি লাঙ্গল আর ৪টি বলদ ছিল। আজ সে দিনমজুর। দৈনিক চৌদ্দ আনা হইতে এক টাকা রোজে তাহাকে ৬ জন পোষ্যের পেট চালাইতে হয়। দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার মত শুধু চাল কিনিতেই লাগে ১৵০ আনা। সবদিন তাই খাওয়াও জোটে না। বাড়ীর মেয়েরা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া দিন কাটায়। রোগীর মুখে এক ফোঁটা ঔষধ দিবার সঙ্গতিও আজ অজিত মোল্লার নাই।

মায়াপুরে শুধু অজিত মোল্লাই নয়—জান আলি, সাহাদৎ আলিরও আজ এমনি দুরবস্থা।

মায়াপুরের ২৬টি কৃষক পরিবার

	জমি	লাঙ্গল	বলদ
১৯৪১	৫১৩৷ বিঘা	৩০টি	৭০টি
১৯৪৪	১২৬ বিঘা	১১টি	১৪টি

এই ২৬টি পরিবারের মধ্যে গত দুর্ভিক্ষে ১০টি পরিবারের সমস্ত জমি, ১৩টি পরিবারের সমস্ত লাঙ্গল এবং ১৪টি পরিবারের সমস্ত বলদ খোয়া গিয়াছে।

বল্লালদীঘি গ্রামেরও আজ এমনি দশা। ভোলা দাস, সদানন্দ, রহমান সেখ—অজিত মোল্লারই মত ইহাদেরও জীবনের দুর্গত ইতিহাস।

বল্লালদিঘীর ১১টি চাষী পরিবার

	জমি	লাঙ্গল	বলদ
১৯৪১	১৩৯ বিঘা	১০টি	২৩টি
১৯৪৪	২৮ বিঘা	৪টি	৭টি

এমনি করিয়াই মায়াপুর, বল্লালদীঘির মত শত শত গ্রামের চাষী গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত দিনমজুরে পরিণত হইতেছে। আর সমস্ত জমি গ্রাস করিতেছে অর্থগৃধ্নু জমিদার, মুনাফাখোর আর ছদ্মবেশী পরগাছার দল!

—নৃপেন সেন

চটকল মজুরের দুর্দ্দশার করুণ চিত্র

পুরা কাজ ও ৪০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দাবী

‘প্রায় কোন সপ্তাহেই আমি দুবেলা খাই না’

গুইরাম পাল। লরেন্স মিলের ফিনিসিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। পোষ্য আট জন, পুরুষ ২জন, স্ত্রীলোক ২ জন, বালকবালিকা ৪ জন।

আয়—মিল হইতে সাপ্তাহিক—৪।০, মুড়ি বিক্রি—১।০ ; **মোট ৫॥০ টাকা।**

ব্যয়—মিলের রেশন—১।৫, ২৬ সের চালের বাকী ২৩।০ সেরের দাম—৯।১৫, মস্‌লা ও তরকারী —২৲ ; **মোট ১৩/০।**

গুইরাম তার জীবন হইতে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষই বাদ দিয়াছে। ৬ ফুট লম্বা দারুণ শক্তিমান এই গুইরামের হাড় কখানা আজ গোণা যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—প্রায় কোন সপ্তাহেই আমি দু’বেলা খাই না।

‘ওর মেয়ে পেটের জ্বালায় কোথায় চলে গেছে’

কেষ্ট হাজরা, বাউরিয়া ববিন ঘরে কাজ করে। তাদের গাঁয়ের অনেক মজুরই আমায় চেনে, তাই সেদিন যখন সেখানে গেলাম অনেকেই এসে জড়ো হলো আমি কি বলি তা শুনতে। সকলের পেছনে ছিল কেষ্ট। আমি কথায় কথায় তাদের ইদানীং অবস্থা জানতে চাইলাম। আস্তে আস্তে অনেকেই নিজেদের কথা জানাতে লাগল। কেষ্ট হাজরা একটু এগিয়ে এলো, তারপর বলতে লাগল—‘হাতখান আমার প্রায় কাজের অযোগ্য হয়ে গেছে। তাই রোজগারও বেশী করতে পারি না। ৫টি লোক নিয়ে আমার সংসার। যা আয় তাতে কিছুই হয় না…।’ কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল। কি যেন বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারলাম না। পাশ থেকে তখন আর একজন এগিয়ে এসে বলল—ওর মেয়ে পেটের জ্বালায় কোথায় চলে গেছে, আজও তার খোঁজ নেই। ও তাই বলতে চায়।’

সন্তান স্নেহও শুকিয়ে গেছে

কার্ত্তিক দাস। বজবজ ক্যালেডেনিয়ান মিলে তাঁত ঘরে কাজ করে। সকলের সাথে মেলামেশা করে বলে গাঁয়ের সবাই কার্ত্তিক দা বলে ডাকে। তার ১৩ বৎসরের মেয়ের ‘ম্যালিগ্‌নাণ্ট’ ম্যালেরিয়া। অবস্থা খারাপের দিক। কিছুদিন আগে ২ ছেলের অসুখে ডাক্তারের কাছে অনেক দেনা হয়ে গেছে, তাই মেয়ের এই সাংঘাতিক অসুখেও ডাক্তার ডাকতে ভরসা পায় নি। ’৪৩ সালের আকালে ও অসুখে সোনা দানা, পিতল কাঁসা, সবই যায়। বোনের অসুখে ছেলেরা যখন ডাক্তার ডাকতে চায় তখন কার্ত্তিক দা বলে,—‘চিকিৎসার আর দরকার নেই। বেঁচে থাক্‌লে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে. তাতে খরচও অনেক হবে। কোথায় পাবো সে টাকা। তারচেয়ে মরুক গে।’ রাত্রে মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ হয়। ছেলেরা আর চুপ করে থাক্‌তে পারে না। ছুটে যায় বজবজের মজুর-কর্ম্মী শচীন দাসের কাছে। তিনি এসে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

একদিন ছিল মজুর পরিবার, এখন রাস্তার ভিখারী

ল্যাডলো মিলের সুরেন কোঁড়া স্পিনিংএ কাজ করতো। গত অক্টোবর মাসে বিনা চিকিৎসায় আমাশায় মারা যায়। আজ তার বৃদ্ধা মা, বৌ, ছেলেমেয়েরা রাস্তায় এসে দাড়িয়েছে। ভিক্ষাই তাদের সম্বল।

বাউরিয়ার চটকলে কাজ করতো নকুড় দে। অসুখ হয়ে হাসপাতালে মারা যায়। এখন তার স্ত্রী ও ৫টি ছেলেমেয়ে রাস্তার কাঙ্গাল।

দুঃস্থ শ্রেণীতে পরিণত

চটকল মজুরদের অবস্থার কি শোচনীয় পরিণতি। ’৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, তারপর ক্রমাগত মিল বন্ধ থাকায় তাদের সব তৈজসপত্রই বিক্রি করতে হয়েছে। কেশব পোদ্দার অভাবের তাড়নায় তার ঘরের টালি পর্য্যন্ত বিক্রি করেছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি অর্দ্ধ উলঙ্গ। দারুণ শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। অনেক স্থানে শতকরা ৮০টি ম্যালেরিয়া রোগী—ঔষধ যোগাড় করতে পারে না। বাস করার ঘরগুলি মানুষের বাসের অযোগ্য। পরমাণচক ‘বেবিস্ ক্যানটিনে’ ১২৫টী ছেলের ভিতর সকলেই চটকল মজুরের ছেলে। মাগগীভাতা ৩৲ টাকা বাড়া সম্পর্কে মজুরদের মতামত চাইলে তারা বলল—যদি ৪০৲ টাকা মাগগীভাতা না পাই আর মিলগুলি পুরা না চলে তবে আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাব।

—রাধিকা ভট্টাচার্য্য

বার্ণপুর মজুরের প্রথম জিত

বার্ণপুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর মজুরদের দাবী বিচারের জন্য এ্যাডজুডিকেশন বসাইবার অর্ডার পাশ হইয়াছে। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাডজুডিকেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউনিয়নের তরফ হইতে যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে তার মধ্যে মজুরী, মাগ্‌গীভাতা, ছুটী, বোনাস, বরখাস্ত লোকদের পুনর্নিয়োগ, সভা করিবার অধিকার প্রভৃতি সমস্ত দাবীই আছে।

ইহাই টেকনিকাল আইন!

গেষ্টকীনের ইউনিয়ন সেক্রেটারীকে তাড়াইবার কাহিনী

হাওড়ার গেষ্টকীন কারখানাটী এক সাহেবী কোম্পানীর। এই কোম্পানীর মালিক নাকি বিলাতের প্রতিপত্তিশালী লোক, তাই বাংলা গবর্ণমেণ্টকে ইনি তোয়াক্কাই করেন না। শোনা যায়, কয়েক মাস আগে এই কারখানায় একটী গোলমাল উপলক্ষে তদন্ত করিবার জন্য লেবার কমিশনার যখন কারখানায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁকে নাকি তদন্ত করিতেই দেওয়া হয় না। এই রকম জবরদস্ত মালিক আইনের মর্য্যাদা কতটা রাখিবে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। টেকনিকাল আইনে নিয়ম এই যে কতগুলি বিশেষ কারণ দেখাইয়া তবে মালিক মজুরকে বরখাস্ত করিতে পারে। এই বিশেষ কারণের একটী হইতেছে ‘অবাধ্যতা’।

কিন্তু অবাঞ্ছিত মজুরকে ‘অবাধ্য’ বলিয়া প্রতিপন্ন করা মালিকের পক্ষে এমন আর কি শক্ত ব্যাপার? গেষ্টকীনের মত মালিকের পক্ষে তো তা আরও সহজ। গেষ্টকীনের একজন মজুর তাঁর বরখাস্তের ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা নীচে দেওয়া হইল।

এ-এইচ-মোল্লা অনেকদিন হইতে গেষ্টকীন কারখানার একজন দক্ষ কারিগর। অপরাধের মধ্যে এই যে সে মজুরদের ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী হইয়াছে। সুতরাং তাকে সহ্য করা গেষ্টকীনের মত জবরদস্ত মালিকের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব।

৮ই ডিসেম্বর মোল্লা তার কাজ করিতেছে এমন সময় ফোরম্যান আসিয়া তাকে লোহার টুকরা কাটিবার জন্য মাপ ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু যে-মাপ দেওয়া হইল, সেই মাপের টুকরা কাটিতে গিয়া মোল্লা দেখিল যে যন্ত্রের কাটার খুলিয়া আসে। শক্ত লোহা হইলে এ রকম হয়। ধীরে ধীরে কাটিলে অবশ্য যন্ত্রকে সামলান যায়। কিন্তু ফোরম্যানের হুকুম তাড়াতাড়ি কাটিতে হইবে এবং বেশী মাল তৈরী করিতে হইবে।

সুতরাং, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে না পারার অপরাধে ফোরম্যান মোল্লাকে অবাধ্য বলিয়া বরখাস্ত করিল। মোল্লা ম্যানেজারের কাছে নালিশ করিল। ম্যানেজার, ডিরেক্টার সকলেই আসিলেন। তাঁরাও দেখিলেন যে যে মাপ ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা কাটা যায় না। কিন্তু তবু তাঁরা ফোরম্যানেরই পক্ষে দাঁড়াইলেন।

অর্থাৎ মোল্লার ‘অবাধ্যতা’ সাব্যস্ত হইল এবং তাকে পাকাপাকি ভাবে বরখাস্ত করা হইল।

এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে তার অর্থ—গেষ্টকীনে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া এখনি দরকার। কিন্তু গেষ্টকীন-মালিকের প্রতাপের কথ যা শোনা যায়, তাতে লেবার-কমিশনার বা ট্রাইবুনাল তদন্ত করিতে সাহস করিবেন কি?

ঔষধ ও পথ্যাভাবে বার বার আক্রমণ

অথচ সরকারের মতে ম্যালেরিয়ার অবস্থায় সুস্পষ্ট উন্নতি

৯ই ডিসেম্বর বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্ত্তা (ডিরেক্টর) বলিয়াছিলেন,—“ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস না পাইলেও, মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি হইয়াছে।” ২১শে ডিসেম্বর বিলাতের কমন্সসভায় মিঃ আমেরীরও সেই একই সুর—“দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় কলেরা ও ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তারপরে অনেক কমিয়া গিয়াছে।” অথচ সাতদিন আগেই বাংলা সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন,—২০টি জেলায় ৯৭টী শহরে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জাফরের হিসাব মত—১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় গড়ে ৭০ হাজার বেশী নরনারী ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে। এ বৎসর জানুয়ারী মাসে সরকারী হিসাব অনুসারে যত লোক মরিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজারের কম নয়।

মহামারী প্রতিরোধের আসল সমস্যা

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু মানুষ বরাবর ঠেকাইতে সক্ষম হইয়াছে। আর সেই রোগেই এত লোক মরে কেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাবার চেষ্টা সরকারী কর্ত্তাদের নাই। ’৪৩ সালে অক্টোবর-নভেম্বরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িতে থাকে ও দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্যাভাবে জীবনশক্তি হ্রাস হওয়ায় ম্যালেরিয়া রোগেই মানুষ মরিতে সুরু করে। জানুয়ারী মাসে এই মৃত্যু চরমে ওঠে। তারপর আবার কমিতে থাকে বটে, কিন্তু জুলাই মাসে আবার চরম সীমায় পৌছায়। গত নভেম্বর হইতে পুনরায় আর এক পর্য্যায় শুরু হইয়াছে—দুই তিন মাসের মধ্যেই এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণের ফলাফল চরম মাত্রায় দেখা দিবে। বার বার রোগে আক্রমণ ও পথ্যাভাব নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে বাঙ্গালীকে ঠেলিয়া দিতেছে।

পরাধীন বাঙ্গালীর পক্ষে ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কিছু পরিমাণে হ্রাস হওয়া উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি হইতে পারে কিন্তু বারবার রোগে আক্রমণ ও পথ্যাভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে পড়িয়া সারা বাংলার কর্ম্মশক্তি যে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে তাহা তলাইয়া দেখিবার কাহারও অবসর নাই। কৃষি ও শিল্পে তথা সমাজের গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি যে একেবারে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে তাহার সহিত আমাদের শাসকদের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে!

সরকারী প্রচেষ্টার নমুনা

তাই স্বাস্থ্যবিভাগের বড়কর্ত্তা বড়াই করিয়া বলিয়াছেন,—কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রুখিতে ৩৫ জন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি আরো বলিয়াছেন,—যুদ্ধের কালে স্থায়ীভাবে বাংলার ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়, কিন্তু রোগের আক্রমণ হইলে প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া তাহার উপশম করা ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের এখন আর করা সম্ভব নয়। দিন দিন মানুষের জীবনীশক্তি যে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে—দুঃস্থ বাংলাকে সমাজ ও কর্মজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহারা রোগের আক্রমণ হইতে যে বাঁচিতে পারে না—সে কথা সরকারী বড়কর্ত্তাদের মগজে প্রবেশ করিলেও তাহা ধামাচাপা দিবার কি অদ্ভুত প্রচেষ্টা!

ম্যালেরিয়া হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি সরকার বলিয়াছে,—বি-এম-আর-সি-সির অন্তর্ভুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণ করা হইবে। ইহা ভাল কথা, কিন্তু যে ঔষধ দেওয়া হইবে তাহার ভিতর মাত্র দশভাগ কুইনাইন পাওয়া যাইবে। সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইএর ইহাই কি একমাত্র উপায়? যাঁহারা ভাবিতেছেন—অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবছরে আক্রমণ ও মৃত্যু অনেক কমিয়াছে তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বেশী আর কি আশা করা যাইতে পারে।

রোগ মহামারী সম্বন্ধে সরকারী মুখপাত্রদের চিন্তা ভাবনা এইরূপ হওয়ার দরুণই আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা হইতে রোগের আক্রমণ, গ্রাম ও শহর জীবনের প্রবল ভাঙ্গন ও নরনারীর মৃত্যুর সংবাদ পাইতেছি।

শহরে ও গ্রামে কি ঘটিতেছে

নোয়াখালী হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী, কল্যাণ হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতুল ভট্টাচার্য্য, এ-পির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মুখার্জ্জি এক যুক্ত আবেদনে জানাইয়াছেন,—‘নোয়াখালী শহরে গরীব ও মধ্যবিত্ত সকলেই দারুণ ভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ঔষধের কোন ব্যবস্থা নাই। যে ডাক্তারের মাসে প্রয়োজন ২ পাউণ্ড কুইনাইন তিনি ৪ মাসে মাত্র ১ পাউণ্ড পাইলেন, ম্যাপাক্রিন এক কণাও লোকের ঘরে যায় না। দুধ পদার্থটী আকাশের চাঁদের ন্যায়,” ইত্যাদি।

হাওড়া জেলার নবগ্রাম হইতে আর্য্যপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, বিমলেন্দু বসু, কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী, নন্দলাল ঘোষ ও অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী যুক্ত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন,—“স্থানীয় দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র হইতে দুগ্ধ পাইয়া বহু দুস্থ ও রোগীকে আমরা বাঁচাইয়াছি কিন্তু হঠাৎ ওপর হইতে হুকুম আসিল—কেন্দ্রটী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। নাম জানি না একটী দুস্থকে আমরা এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম, আর পারিলাম না, সেই লোকটী কয়েকদিন হইল মারা গিয়াছে। একদিকে দুগ্ধ কেন্দ্র বন্ধ করিতে হইল অপরদিকে সেই লোকটীকে দাহ করিয়া আসিলাম।”

মেদিনীপুর হইতে কানাই ভৌমিক জানাইতেছেন,—“কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় তমলুক থানায় মহেন্দ্র মেমরিয়াল রিলিফ কমিটীর একটী মেডিকেল ইউনিট চলিতেছিল। দিন ১৫০—২০০ রোগী হয়। এবারে ম্যালেরিয়া জ্বর ফিরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করিতেছে। কুইনাইন নাই ঔষধপত্র নাই, কম্পাউণ্ডারের খরচ চালাইবার অর্থ নাই। অনেকে একেবারে হতাশ হইয়া ইউনিট তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতেছিলেন। পরে ৩০০ মুষ্টিঘট বসাইয়া খরচের সামান্য উপায় করা হইয়াছে। কিন্তু কুইনাইন, ঔষধপত্র ও কিছু অর্থ সাহায্য না পাইলে কি করিয়া ইউনিটটী চলিবে?”

ফরিদপুরের গোপাল দাস জানাইতেছেন,—“গয়ঘর এলাকার ৪টী ইউনিয়নে ১ লক্ষ লোকের জন্য ৩টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সিভিল সার্জেন ৩ মাসের জন্য **৫॥০ আউন্স** কুইনাইন ও ১৫ শত ম্যাপাক্রিণ দিয়াছেন। স্থানীয় রোগীদের একদিনের পক্ষেও এই ঔষধ যথেষ্ট নয়। অথচ এখানে চোরাবাজারে কুইনাইন ও কুইনাইন নামধেয় বাজে বস্তু প্রতি ট্যাবলেট দশ আনায় বিক্রয় হইতেছে।”

এই কয়েকটী সংবাদেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে—বাংলার গ্রাম ও শহরে কিভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা চলিতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বি-এম-আর-সি-সির মারফৎ যে অশেষ প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছে তাহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে সরকারের আত্মসন্তোষ ও অব্যবস্থার উচ্ছেদ-সাধনের উপরই।

পশ্চিমে জার্ম্মানদের পাল্টা আক্রমণ

অষ্ট্রীয়ার দিকে লালফৌজ : হাঙ্গেরীতে ফ্যাশিষ্টবিরোধী সরকার

দক্ষিণ বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গে শত্রুর নূতন অভিযান

১৭ই ডিসেম্বর হইতে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ অঞ্চলে জার্ম্মানদের এক ভীষণ পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছে। আকেনের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে বেলজিয়ামের মালমেডী ও মনশাউ এলাকা হইতে লুক্সেমবুর্গের একতারনাক অঞ্চল পর্য্যন্ত এই আক্রমণ সীমাবদ্ধ। জার্ম্মানরা ইতিমধ্যেই এই আক্রমণে কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহারা বেলজিয়ামের সেণ্ট ভিত ও ষ্টাভলেট প্রভৃতি সহর এবং লুক্সেমবুর্গের উইলজ সহর দখল করিয়াছে এবং বেলজিয়ামের বাসটোগোন সহরকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

এতদিন একটানা পরাজয়ের পর জার্ম্মানরা হঠাৎ এভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল কেন? নাৎসী সমরনায়করা আজ ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে আরও জোর অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইয়াছে—আক্রমণ সুরু হয় হয়। মিত্রপক্ষের এই আক্রমণ এইবার জার্ম্মানীর প্রধান শিল্পকেন্দ্র কলোন ও রুঢ়ের উপরই গিয়া পড়িবে। এই সব অঞ্চল বিপন্ন হইলে জার্ম্মানীর সমর প্রচেষ্টার মূলে দারুণ আঘাত লাগিবে এবং যুদ্ধ মারাত্মকভাবে জার্ম্মানীর অন্তঃস্থলেই গিয়া পৌঁছিবে। তাই মিত্রপক্ষের এই আক্রমণোদ্যোগকে অবিলম্বে বাধা দেওয়াই জার্ম্মানীর এই পাল্টা আক্রমণের এক মূল উদ্দেশ্য।

ইহাছাড়া এই আক্রমণের আর এক উদ্দেশ্য মিত্রপক্ষের নূতন আক্রমণোদ্যোগকে এমন ভাবে ব্যাহত করিয়া দেওয়া যাহাতে জার্ম্মানী এই রণাঙ্গন হইতে সৈন্য নিয়া লালফৌজের আসন্ন শীতকালীন বিরাট অভিযানকে বাধা দিতে পারে। লালফৌজের শীতকালীন অভিযানকে যদি বাধা দেওয়া না যায় তবে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরেই অতি শীঘ্র তুমুল লড়াই সুরু হইবে, যাহার ফল হইবে আরও সুদূরপ্রসারী।

১৯৪৩ সালেও জার্ম্মানরা সোভিয়েটের গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে কুরস্ক এলাকায়ও এক তীব্র পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েটের আসন্ন আক্রমণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়া। কিন্তু তখন তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। লালফৌজ জার্ম্মানদের সে আক্রমণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

মিত্রপক্ষের শিবির হইতে নূতন পাল্টা আক্রমণ সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা থাকিলেও এবং নূতন নূতন সৈন্য আমদানী সত্ত্বেও পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা ক্রমশই আয়ত্তে আসিতেছে।

সোভিয়েট রণাঙ্গনে

বার্লিনের সমরদপ্তর হইতে সোভিয়েট ফ্রণ্টের যুদ্ধ সম্পর্কে ম গমতে বলা হইয়াছে যে ৭৪০ মাইলব্যাপী বিস্তৃত রণাঙ্গণে লালফৌজের শীতকালীন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অভিযানের তুমুল তীব্রতা দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে পূর্ব ইয়োরোপীয় যুদ্ধের মোটামুটি পরিস্থিতি এই—**উত্তরে ল্যাটভিয়া** অঞ্চলে জার্ম্মানদের যে বিরাট সৈন্য বাহিনী লিবাউ বন্দর এলাকায় সামান্য পরিমান জমিতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে লালফৌজের এক নূতন আক্রমন সুরু হইয়াছে।

পূর্বপ্রুশিয়া অঞ্চলের যুদ্ধের ভাব এখনও থমথমে। তবে সোভিয়েটের দূর পাল্লার কামান সম্প্রতি জার্ম্মান লাইনের উপর গোলা বর্ষণ সুরু করিয়াছে।

পোলাণ্ড এলাকায় বিরাট সোভিয়েট বাহিনী নূতন অভিযান আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের প্রধান লক্ষ্য জার্ম্মানীর সাইলেসিয়ার উপর ঝাপাইয়া পড়া। গলিত বরফ শক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—লালফৌজের আক্রমণ যে কোন মুহূর্ত্তে সুরু হইতে পারে।

চেকোশ্লোভাকিয়া অঞ্চলে অভিযানের তীব্রতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। চেক-হাঙ্গেরীয় সীমান্তে জার্ম্মানদের যে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ ছিল তাহা ডানিয়ুব তীরবর্ত্তী সীমান্ত সহর গ্রানের দিক দিয়া ভেদ করা হইয়াছে। ইহ ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার আরও কতকগুলি সহর শত্রুকবলমুক্ত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলা যাইতে পারে যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নীচের দিক দিয়া হাঙ্গেরীর সীমান্ত লাইনে মার্শাল মালিনভস্কীর সৈন্যরা এবং উত্তরের দিকে পোলাণ্ডের দিক ঘেঁষিয়া জেনারেল পেট্রভের সৈন্যরা অগ্রসর হইতেছে।

হাঙ্গেরীয় ফ্রণ্টে—বুডাপেষ্টের সংগ্রামের তীব্রতা দিনের পর দিন ভীষণ হইয়া উঠিতেছে, তবে ইহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বুডাপেষ্ট সহর যে কোন মুহূর্ত্তে লালফৌজের হাতে আসিতে পারে। দুই দিক হইতে এক বিরাট সাড়াশী আক্রমণ বুডাপেষ্টের চলাচল কেন্দ্রের শেষ লাইনটি পর্য্যন্ত দখল করিতে উদ্যত হইয়াছে। দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আসিয়াছে মার্শাল টলবুখিনের বিপুল সৈন্যবাহিনী, আর উত্তর পশ্চিমে ডানিয়ুবের বাঁকে মার্শাল মালিনভস্কীর সেনাদল বীর বিক্রমে আগাইয়া চলিয়াছে। জার্ম্মানদের তরফ হইতে বুডাপেষ্টকে যতদিন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় তাহার জন্য দারুণ চেষ্টা হইতেছে। ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। বুডাপেষ্ট হাতছাড়া হইলে দুইটি সোভিয়েট আর্ম্মি ভীষণ বেগে অষ্ট্রীয়া ও দক্ষিণ জার্ম্মানীতে ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পাইবে। সুতরাং এই অঞ্চলের রক্ষাব্যূহগুলি আরও সুদৃঢ় করিতে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ সময় চাহিতেছে—বুডাপেষ্টের যুদ্ধের ফলাফলের উপরই তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

হাঙ্গেরীতে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট

২৪শে ডিসেম্বর মস্কো রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে কর্ণেল জেনারেল বেলা মিকলসকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া একটি সাময়িক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রীসভা সোভিয়েটের সাথে এক হইয়া নাৎসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে।

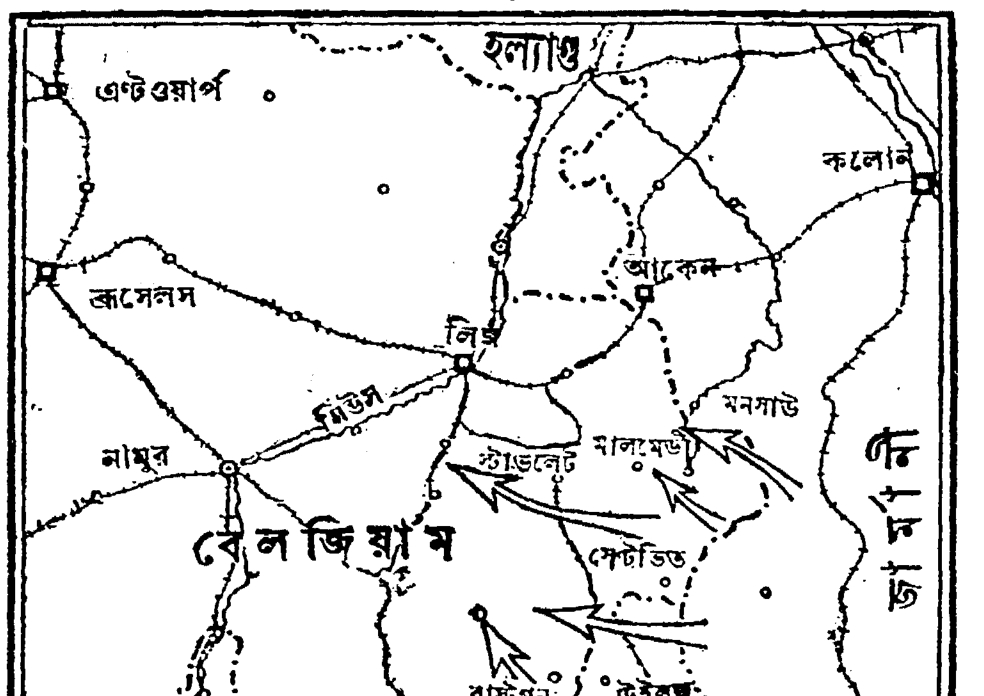

২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনের ছবি

ইহার বিচার তুলাদণ্ডে নয়

হিটলারের নরমেধ যজ্ঞ

লুবলিনের জবাইখানা

"পোলিশ-সোভিয়েট এক্সট্রাঅর্ডিনারী কমিশন" তদন্ত শেষ করিয়া জানাইয়াছে যে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইটালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ডেনমার্ক, পোলাণ্ড এবং রাশিয়া হইতে আনা **১৫ লক্ষ** লোককে জার্ম্মাণরা দক্ষিণ পোলাণ্ডে লুবলিন সহরের নিকট মাইডানেক "মৃত্যু-শিবিরে" হত্যা করে। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন লুবলিনের ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ডাঃ কুপ্‌জিন্স্কি, লুবলিন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিয়ালকোস্কি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সোভিয়েট ও পোল নাগরিক।

এই "মৃত্যু-শিবির" জার্ম্মাণরা পোলাণ্ড জয়ের কিছুকাল পরেই প্রতিষ্ঠা করে। গত জুলাই মাসে বিজয়ী লাল ফৌজ লুবলিন দখল করার পর এই শিবির আবিষ্কৃত হয়। পিছু হটিবার আগে জার্ম্মাণরা তাহাদের পাপের চিহ্ন মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই।

গোটা শিবির প্রায় ১০ বর্গ মাইল জায়গা বিস্তৃত। সারা ইয়োরোপে মানুষ হত্যা করিবার যে অভিজ্ঞতা জার্ম্মাণরা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা এখানে কাজে লাগাইত। বন্দীদের এখানে আনা হইত মরিবার জন্য, বাঁচিবার জন্য নয়, এবং অনশন ও রোগেই বহু লোক মারা যাইত। তবে সকলের চাইতে বেশী লোককে হত্যা করা হয় গ্যাস বা বিষ বাষ্পের সাহায্যে। ইহাতে সুবিধা ছিল এই যে এক এক বারে বহু লোককে এক সঙ্গে হত্যা করা যাইত। তারপর বিরাট বিরাট চুল্লিতে থরে থরে মৃতদেহ সাজাইয়া পোড়াইয়া ফেলা হইত। পাঁচটি এইরূপ চুল্লি দিনরাত জ্বলিত। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এইভাবে ১৪০০ মৃতদেহ পোড়ান হইত।

সেই ভস্মাবশেষ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইত জার্ম্মাণীতে। সেখানে আর্য্য গৃহস্থরা উহা ব্যবহার করিতেন তাঁদের বাগানের সার হিসাবে।

শয়তানের দালাল

দালালি

ইংলণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির নেতা মিঃ ব্রেলস্‌ফোর্ড সম্প্রতি জার্ম্মানী সম্পর্কে এক বই লিখিয়াছেন। এই বইতে তিনি জার্ম্মানদের পক্ষে যে সুক্ষ্ম ওকালতি করিয়াছেন, নীচে তাহার একটি নমুনা দেওয়া হইল।

'এই যুদ্ধে জার্ম্মানরা যদ্দেশে যদাচার নীতি অবলম্বন করিয়াছে—এই ঘটনা মনে রাখিলে আমরা সহজেই তাহাদের কার্য্যকলাপের মূলসূত্র বুঝিতে পারিব। দু' একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া তাহারা বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কখনোই যুদ্ধের কানুন লঙ্ঘন করে নাই। নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে তাহাদের আচরণের মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব ইউরোপের নিষ্ঠুরতার তুলনায় উহা অনেক ভাল। যে সমস্ত জাতিকে তাহারা 'মানুষের অধম' বলিয়া মনে করে—যেমন ইহুদী কিম্বা শ্লাভ—শুধু তাহাদের বেলায় জার্ম্মানদের কুঠার বাধাই নাই। শুধু এই সমস্ত ক্ষেত্রে জার্ম্মানরা সহস্র সহস্র অসহায় ও নিরপরাধ মানুষকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের জঘন্য জন্তু জানোয়ার হিসাবে মনে করিয়া তাহাদের সহিত সেইমত ব্যবহার করিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া আমার মনে হয়, জার্ম্মানদের এই নিষ্ঠুরতা তাহাদের স্বভাবজাত অথবা জন্মগত নহে। ভালো লাগে বলিয়াই যে তাহারা এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে, তাহা মনে করা ভুল। এই নিষ্ঠুরতার পিছনে তাহাদের একটি বিশেষ মতবাদ আছে। এমন কি তাহারা একটি করণীয় কর্ত্তব্যই পালন করিতেছে।"

জবাব

ইহারই উত্তরে বিখ্যাত সোভিয়েট লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ লিখিতেছেন :

'হিটলারীদের মতবাদ সম্বন্ধে 'মানুষের অধম' জাতিগুলি শুধু নিছক ঘৃণা বোধ করিয়াই ক্ষান্ত নয়—ইহাই আমার বলিবার কথা। আমরা তাহাদের কার্যকলাপ ভাল করিয়া জানি। এই শিশুহন্তাদের পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেলিতে আমরা যে বদ্ধপরিকর—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি এমন কোন কথা আজও থাকিয়া থাকে যাহা আমাদের ক্রোধান্ধ করিতে পারে—তবে তাহা হিমলারের নহে : ব্রেলস্‌ফোর্ডের মত হিমলারের ছদ্মবেশী দালালদের এই ধরণের উক্তির ফলেই আমরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে পারি।—

আজ যখন জার্ম্মানদের হাতে অত্যাচারিত অসহায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের রক্তে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছে, তখন যদি শয়তানের কোন দালালের মুখে সাফাই শুনি তবে অসহ্য রাগে আমি জ্বলিতে থাকি। শিশুহন্তারা তাহার সন্তানসন্ততিকে হত্যা না করিয়া অন্যের সন্তানসন্ততিকে হত্যা করিয়াছে এই চিন্তায় যে লোক আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, যার বলিতে বাধে না যে, শিশুহন্তারা অত্যন্ত ভদ্র এবং তাহারা একটা মতবাদে বিশ্বাসী ও সগৌরবে তাহারা 'তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে'—সে লোক যখন মানবতার নামে মায়াকান্না কাঁদে, তখন তার পিছনে দারুণ হৃদয়হীনতা ও নিছক ভণ্ডামি ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখি না।'

Regd. No. C. 2836.

কলিকাতায় নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন আসন্ন

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্রপঞ্জী ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

সংকট মোচনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদল

ভারতের জাতীয় জীবনের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সারা ছাত্র সমাজকে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী ২৮শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছে। এই সম্মেলনের শুভকামনা করিয়া কলিকাতার বহু কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি ৬৩ জন মনীষী এক আবেদন দিয়াছেন (অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া নিঃ ভাঃ কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, শান্তিনিকেতন চীন ভবনের অধ্যক্ষ তান য়ুনানসান, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব, সি-পির ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস ডি গোখলে ও আলমোরার ২২ জন ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির নিকট বাণী পাঠাইয়াছেন। নলিনাক্ষ সান্ন্যাল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা সম্মেলনে যোগ দিবেন।

সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন যুগে বাংলার জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার একটী চিত্রপঞ্জী (আলবাম) প্রস্তুত করিবার জন্য বহু প্রসিদ্ধ শিল্পী তাঁহাদের আঁকা ছবি প্রেরণ করিয়াছেন। "বাংলার জীবন স্বাক্ষর"এর এই মূল্যবান সংগ্রহে যাঁহারা ছবি পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন—শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ইন্দ্র দুগার, অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, মণীন্দ্র গুপ্ত, যামিনী গাঙ্গুলী, যামিনী রায়, রথীন্দ্র ঠাকুর, রামকিঙ্কর বৈইজ, শান্তিনিকেতন কলাভবনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিনোদবিহারী মুখার্জী, দেরাদুন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ সুধীর খাস্তগীর, জয়নাল আবেদীন, খামরুল হাসান, কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্ত্তী, সূর্য্য রায়, শুভ ঠাকুর, চিত্তপ্রসাদ, গোপাল বসু, অতুল বসু ইত্যাদি।

ঘাটশীলার সাঁওতাল কৃষ্টি, গৌহাটীর অসমীয়া কৃষ্টি, কালিম্পং, অন্ধ্র ও বাংলার বিভিন্ন জেলার কৃষ্টি সম্মেলনে প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ সমস্ত স্থানের সাংস্কৃতিক দল কলিকাতায় আসিতেছেন।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিবেন। কলিকাতা ছাড়া বাংলার ভিন্ন জেলা হইতে ১৭ জন শিক্ষাব্রতী ও বাহির হইতে ১০ জন শিক্ষাব্রতী সম্মেলনে যোগ দিতে আসিতেছেন। শান্তিনিকেতনের একদল ছাত্র ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসাবে আসিবেন—শান্তিনিকেতনের ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ব্বে কখনও এই ধরণের সম্মেলনে যোগ দিতেন না। সিংহল, নিঃ বঃ মুসলিম ছাত্র লীগ, কলিকাতা মারোয়াড়ী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন হইতে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি আসিতেছে। পুণা ছাত্র ইউনিয়ন আগষ্ট সংগ্রামের সময় ফেডারেশনের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এবার সৌহার্দ্দমূলক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন। তাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ছাত্র, দার্জ্জিলিংএর নেপালী ছাত্র, ঘাটশীলার সাঁওতাল ছাত্র, হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যের ছাত্র প্রতিনিধি পাঠাইতেছে। সংযুক্তপ্রদেশের প্রতিদ্বন্দী ছাত্র-সংগঠনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও জনৈক কার্য্যকরী সভ্য এবং অন্ধ্র ছাত্র কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধি আসিবে।

বিদেশ হইতে আগত এই সমস্ত ছাত্র প্রতিনিধি ও শিক্ষাব্রতীদের অভ্যর্থনার সাহায্যের জন্য কলিকাতার শিক্ষায়তনগুলি যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, মেট্রোপলিটান বড়বাজার শাখা, পলিটেকনিকাল (কাশিমবাজার), বাগবাজার হাই স্কুল প্রভৃতি কলেজ হোষ্টেল ও শিক্ষালয় প্রাঙ্গণ সম্মেলনের অভ্যর্থনার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

বিগত কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় ১৬৯ জন অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগ দিয়াছেন। কলিকাতার ছাত্র ও নাগরিকদের কাছ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

ছাত্র অন্দোলনের সঙ্গে দেশের সকল ধরণের মানুষের দেশপ্রেম ও সংস্কৃতিকে মিলাইয়া নূতন জীবন-সঞ্চারের এই যে সফল চেষ্টা—ইহার বিরুদ্ধেও কোনো কোনো লোক ষড়যন্ত্র করিতেছে। ১৮ নং মির্জাপুরের কয়েকজন ছাত্র শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কলিকাতা আসার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে নিষেধ করে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সম্মেলনে বক্তৃতা করিতে চাহিয়াছিলেন—কোন কোন সংবাদপত্রে ছাত্র ফেডারেশন হইতে সঠিক সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সভানেত্রীত্ব করিবেন এই ভুল খবর ছাপা হয়। ইহার ধুয়া ধরিয়া এই সব ছাত্র একটা শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়াছে। শ্রীমতী নাইডুর কাছে ছাত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ দিয়া বার বার বার ধর্না দিতেছে।

১৭-১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার প্রত্যেকটী কলেজ ও স্কুলে সম্মেলনের পোষ্টার ছিঁড়িবার চেষ্টা হয়। 'সম্মেলন হইয়া গিয়াছে' এই ধরণের মিথ্যা পোষ্টার লাগাইয়া সাধারণ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হইয়াছে। মারামারি বাধাইবার ষড়যন্ত্রও নাকি চলিতেছে।

কিন্তু ছাত্র সাধারণের দেশপ্রেম ও সুধীজনের সমর্থনের কাছে ইহাদের ষড়যন্ত্র বিফল হইবে সে ভরসা অনুষ্ঠাতাদের আছে।

নেতা ও সুধীবৃন্দের অভিনন্দন

কলিকাতা ও মফঃস্বলের প্রায় ৬৩ জন বিখ্যাত প্রিন্সিপাল, প্রোফেসর, আইনব্যবসায়ী, পত্রিকা সম্পাদক প্রভৃতি মনীষি নিখিল-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের আগামী কলিকাতা অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—ছাত্র-ফেডারেশনের অক্লান্ত জনসেবার আমরা প্রশংসা করি। গত বছর পীড়িত বাংলাকে রক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্ররা ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই মহৎ দেশসেবার পিছনে ছিল ফেডারেশনের 'বাংলাকে বাঁচাও' আন্দোলন। নেতাদের মুক্তি অর্জ্জন, ছাত্রদের ঐক্য, সমগ্র দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র-ফেডারেশন নিরলস পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে।

তাঁহারা বিবৃতির শেষে সমস্ত দেশবাসী ও দেশভক্তের নিকট আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন—সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সকলেই এই তরুণ মুক্তি-যোদ্ধাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

যাঁহারা বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন,—**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এ টি এম হবিবুল্লা, গিরীন্দ্র শেখর বসু, প্রফুল্লকুমার মিত্র ইত্যাদি; **প্রিন্সিপাল** জন কেলাস—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, প্রশান্তকুমার বসু—বঙ্গবাসী কলেজ, উপেন্দ্রনাথ সেন—নরসিংহ দত্ত কলেজ, ডাঃ আই, এচ, জুবেরী—ইসলামিয়া কলেজ, ডাঃ কে, পি, মিত্র—যশোহর কলেজ, ডাঃ টি, সি, সেন—যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; **বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি** শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু **কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ডেপুটী লীডার** শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত; **যুগান্তর সম্পাদক**—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **সিণ্ডিকেটের সভ্য**—শ্রীযুত মন্মথনাথ রায়; মেসার্স বি কে ঘোষ, পি কে বসু, এম এফ রহমান প্রভৃতি ১৩ জন বার-এট-এল। তাছাড়া উইমেন্স কলেজ, রিপন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, লরেটো গার্লস কলেজ, স্কটিশ চার্চ প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের বহু অধ্যাপক ও শিক্ষকের স্বাক্ষর আছে।

ট্রাম কেনা সম্বন্ধে কর্পোরেশন ও সরকারের মিলিত ব্যবস্থা

লীগের সঙ্গে ঐক্যে সাফল্যের ভরসা

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ট্রাম কোম্পানী কেনা সম্বন্ধে আমরা ২৯শ সংখ্যা জনযুদ্ধে জানাইয়াছিলাম যে, কর্পোরেশনের হাতে ট্রাম কিনিবার টাকা নাই। অথচ মিউনিসিপাল আইনের ৯৭ ধারা অনুসারে ট্রাম কিনিতে টাকা ধার করিবার ক্ষমতাও কর্পোরেশনের নাই। সুতরাং কর্পোরেশন ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইলে তবেই ট্রাম কোম্পানী জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে। অন্য অনেক "স্বদেশী" কাগজ তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী ব্রিটিশ ধনিকদের দালাল, বিলাতী কোম্পানীর হাত হইতে ট্রাম ব্যবস্থা ছাড়াইয়া আনিতে তাহারা কিছুতেই রাজী হইবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টাই বৃথা ইত্যাদি! কিন্তু আমরা জানাইয়াছিলাম যে ট্রাম কোম্পানীকে দেশের লোকের হাতে লইয়া আসার জন্য লীগ পক্ষও সমান আগ্রহান্বিত. সুতরাং ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু সভা প্রভৃতি দল কিছুটা চেষ্টা করিলেই ব্যবস্থা হইতে পারে। আমাদের কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু তখন কেহই আমাদের কথা শুনেন নাই। বাহিরের কোনো দেশী কোম্পানীকে অন্ততঃ ৩৫ বছরের জন্য ট্রামের ইজারা দিয়া ট্রাম কেনার টাকাটা দাদন রূপে তাহাদের কাছে আদায় করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইহাতে ট্রাম ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে না আসিয়া দেশী ধনিকদের হাতে চলিয়া যাইত। তা ছাড়া সব চেয়ে বড় বাধা ছিল যে, আইনের ৯৭ ধারা মতে কর্পোরেশনের এরূপ করিবার অধিকার আছে কিনা তাহাই অত্যন্ত সন্দেহজনক। ব্যারিষ্টার পি, আর, দাশ অবশ্য ইহা করা যায় বলিয়া মত দিয়াছিলেন, কিন্তু এডভোকেট জেনারেল বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন সুতরাং এই পদ্ধতি ধরিলে একমাত্র ফল হইত যে অনেক খরচপত্র করিয়া কর্পোরেশনকে বহুদিনব্যাপী এক বিরাট মামলায় নামিতে হইত। এবং ইতিমধ্যে সময়ের মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় এবারের মত ট্রাম কিনিবার অধিকার হাত ছাড়া হইয়া যাইত। বিলাতী কোম্পানীই ট্রামের মালিক থাকিয়া যাইত।

আইনগত অবস্থা এত সন্দেহজনক বলিয়াই বাহিরের কোনো নামকরা ব্যবসায়ীই ট্রাম ইজারার টেণ্ডার দিতে আসে নাই. [illegible] একটি দরখাস্ত আসিয়াছিল। এই সব দেখিয়া শেষপর্য্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক ও লীগ দলে মিলিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ নিষ্পত্তি করে :

ট্রাম প্রভৃতি সাধারণের যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটী স্বাধীন যানবাহন বোর্ড গঠন করা হইবে। উহাতে কর্পোরেশন, গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির প্রতিনিধি থাকিবেন—তবে প্রতিনিধিত্বে প্রধান অংশ হইবে কর্পোরেশনেরই। ট্রাম কিনিবার সম্পূর্ণ খরচা গবর্ণমেণ্ট বা আমাদের এই বোর্ড দিবে, কর্পোরেশনকে দিতে হইবে না। কর্পোরেশন এখন ট্রাম কোম্পানীর কাছে লাইনের খাজনা হিসাবে বার্ষিক মাত্র ৭৮ হাজার টাকা পায়, বোর্ড হইলে উহা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে (কর্পোরেশন মনে করে ইহা প্রায় ৫ লক্ষ হওয়া উচিত)। বোর্ডের যাহা লাভ হইবে তাহার আনুপাতিক অংশ কর্পোরেশন পাইবে কিন্তু লোকসানের অংশ তাহাকে লইতে হইবে না। এই সব ব্যবস্থার জন্য আইনে যাহা কিছু রদবদল দরকার তাহার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিবে এবং আগামী ৩১শে জুনের মধ্যে বোর্ড গঠিত না হইলে কর্পোরেশনই যাহাতে ট্রাম কিনিয়া লইতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সকল রকমে সাহায্য করিবে। আর ১৯৪৪-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উপরোক্ত মতে চুক্তি না হইলে ট্রাম কেনা সম্বন্ধে কর্পোরেশনের বর্ত্তমান অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

গত শুক্রবার কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় ফরওয়ার্ডব্লকপন্থী কাউন্সিলর শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্ত মত একটী প্রস্তাব পেশ করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের দু একজন সভ্য এবং হিন্দু সভা দল ইহার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীদেবব্রত মুখার্জি বলেন : ইহার ফলে ট্রাম কিনিবার অধিকার চিরদিনের মত বিকাইয়া দেওয়া হইতেছে। ট্রাম কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেশনের হাতে আসিলে তবেই উহা জনসাধারণের হাতে আসিল, নহিলে নয়। এজেণ্ট দিয়া যদি নাও হয়, বরং ৭ বছর পরে কিনিব তাহাও ভাল কিন্তু এখন বোর্ডের হাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত [illegible]

ট্রামওয়ে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে সুধীর বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কমিউনিষ্ট কাউন্সিলর সোমনাথ লাহিড়ী বলেন : বাহিরের মুনাফাখোর এজেণ্টের হাতে প্রায় চিরদিনের মত ট্রাম কোম্পানী তুলিয়া দিতে দেবব্রত বাবুর বিশেষ আপত্তি ছিলনা—কিন্তু নির্বাচিত কর্পোরেশন ও নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রতিনিধি সমন্বিত গণতান্ত্রিক বোর্ডের হাতে দিলেই তাঁহার আপত্তি! আর ৭ বছর পরেই বা কর্পোরেশন কিনিবে কি করিয়া? তখনও হয় মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে হইবে, নয় ট্রাম কোম্পানী বিলাতি ধনিকদের হাতেই থাকিয়া যাইবে। কর্পোরেশন কাউন্সিলররা মাত্র ৫০ হাজার ভোটদাতার প্রতিনিধি, আইন পরিষদ তথা মন্ত্রীমণ্ডলী আরও অনেক বেশী জনসাধারণের প্রতিনিধি। এই দুইটী মিলিয়া বোর্ড গঠন করিলে তাহাতে জনসাধারণের অধিকার আরও বিস্তীর্ণ হইবে, অথচ কিনিবার টাকা বা লোকসান সম্বন্ধে কর্পোরেশনকে ভাবিতে হইবে না। লীগ পক্ষ ও অন্য পক্ষ আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই ট্রাম দখল করিবার বাস্তব সম্ভাবনা আসিয়াছে, নহিলে বিলাতী কোম্পানীই দখলকার থাকিয়া যাইত।

ইহার পর সুধীর বাবু বক্তৃতা দেন। তাঁহার সঙ্গে হিন্দু সভা দলের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়। সুধীর বাবু হিন্দু সভার ডাঃ সিংহকে বলেন যে এজেণ্ট হইয়া বসিবার সুযোগ হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে বলিয়াই তাঁহাদের এত রাগ! ডাঃ সিংহ বলেন হ্যাঁ, আমি তো ট্রাম কোম্পানী কিনিতে প্রস্তুতই ছিলাম।

এই সমস্ত বাদ বিতণ্ডা হইতেই বোঝা গেল বিরোধী পক্ষের আসল ব্যথা কোথায়। যাই হোক সুধীর বাবুর প্রস্তাব কর্পোরেশনে গৃহীত হয়।

Received From Moscow :

1. LENINGRAD by Nicolai Tikhonov Rs. 2-3
2. AN ARMY OF HEROES—True Stories of Soviet fighting men. Rs. 5-8
3. BLACK SEA SAILOR [a novel] —by Leonid Solovyev Rs. 1-12
4. THREE YEARS OF THE SOVIET UNION'S PATRIOTIC WAR— A military and Political Summary Anna I
5. THE DEFENCE OF MOSCOW— by Colonel N. Frenkel, Dr. Hist. As. 4
6. ORDER OF THE DAY OF J. STALIN NO 16. Anna 1
7. INTERNATIONAL LITERATURE Nos. 8, 9, 10, 11, 12 of 1943 and Nos. 1, 2, 3, 4 of 1944 Re. 1 per copy
8. MOSCOW NEWS [Bi-weekly] from April 29 to Aug 9, 1944 27 Copies in all at 1 anna per Copy Rs. 1-11 a set.

[Postage charged extra]

NATIONAL BOOK AGENCY LTD.

12, Bankim Chatterjee St. (College Square), Calcutta.

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

ছাত্র ফেডারেশনের অতীত ও বর্ত্তমান ● সংগ্রাম, সেবা ও দেশপ্রেমের ইতিহাস

১৯৩৯—রাজনীতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ছাত্রবাহিনী—কলিকাতা

১৯৪১-৪২—গ্রামে জাপ-বিরোধী প্রচার

●

১৯৪২—গুজরাটের শহীদ ছাত্র-নেতা উমাভাই

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২-এর পরদিন আমেদাবাদে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করিয়া পুলিশের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার সময় তিনি পুলিশের গুলিতে নিহত হন

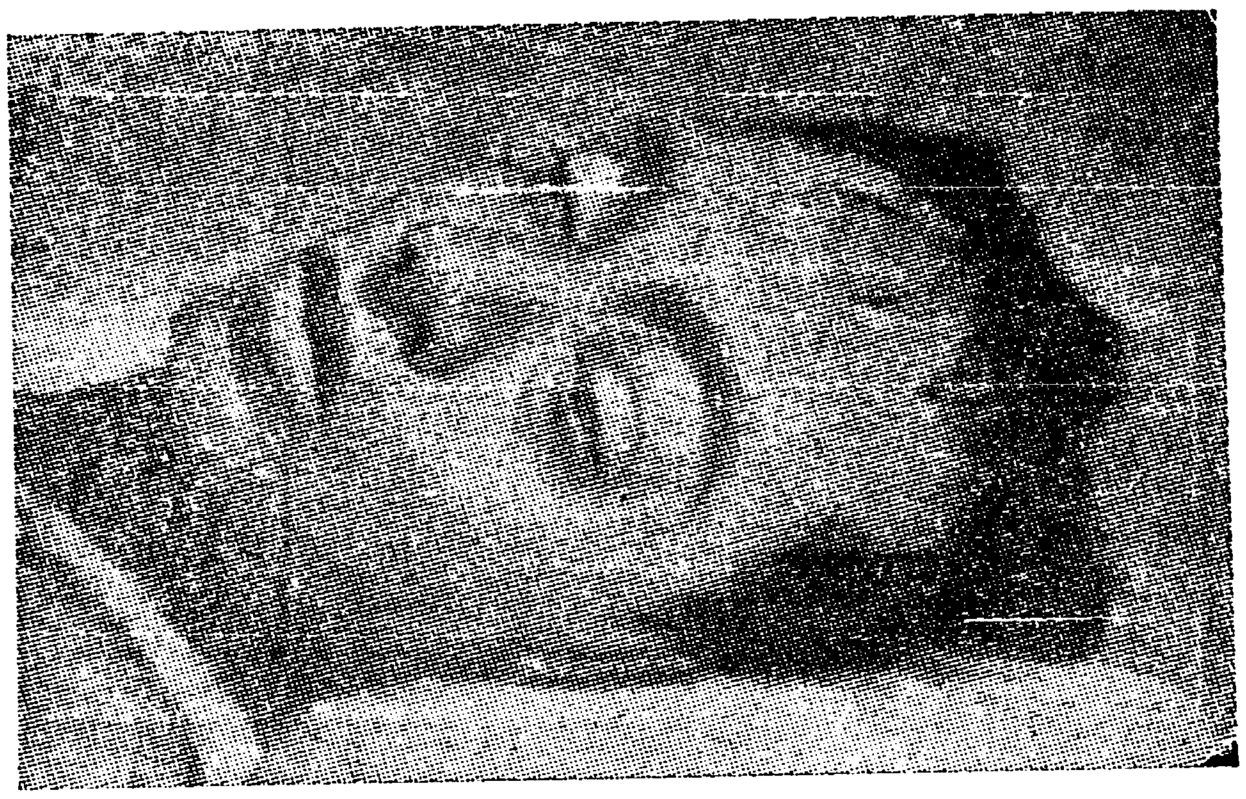

১৯৪৩—জাপানী দালালের ছুরিতে নিহত মৈমনসিংহের ফণী চক্রবর্ত্তী

১৯৪৩—কলিকাতায় ছাত্রদের দুর্ভিক্ষ রিলিফ

১৯৪৪—গান্ধী-জিন্না অপোষের জন্য ছাত্র-সভা

১৯৪৪—মেডিক্যাল রিলিফ

১৯৪৪ শেষ—কলিকাতায় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ৮ম অধিবেশনে পতাকা উত্তোলন

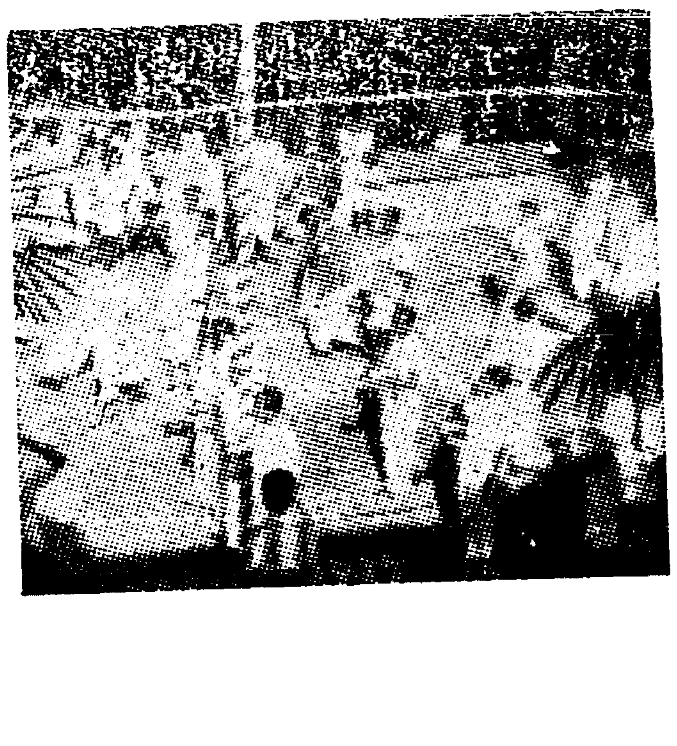

ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম অধিবেশন — ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা] ৪ঠা জানুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার, ২০শে পোষ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি ; ১১১, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কলকাতার এই দুটী দৈনিকের নাম ছাড়া আর সব এক

কিন্তু এরা কাগজের ডবল কোটা পায় ঃ সে কাগজ কোথায় যায় ?

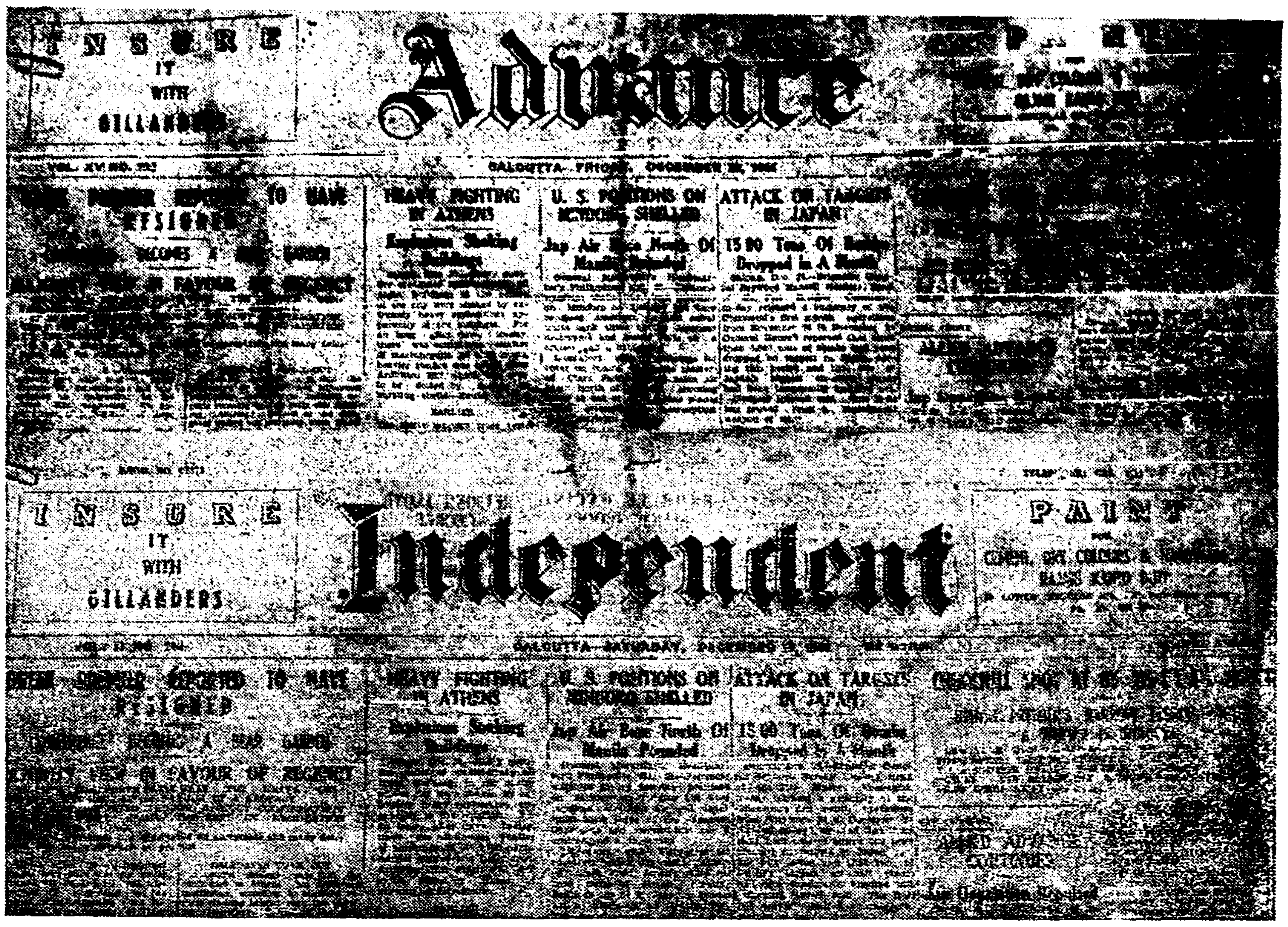

INSURE IT WITH GILLANDERS

Advance

CALCUTTA FRIDAY, DECEMBER 29, 1944

HEAVY FIGHTING IN ATHENS

U. S. POSITIONS ON MINDORO SHELLED

Jap Air Base North Of Manila Pounded

ATTACK ON TARGETS IN JAPAN

1500 Tons Of Bombs Dropped In A Month

INSURE IT WITH GILLANDERS

Independent

CALCUTTA SATURDAY, DECEMBER 30, 1944

HEAVY FIGHTING IN ATHENS

U. S. POSITIONS ON MINDORO SHELLED

Jap Air Base North Of Manila Pounded

ATTACK ON TARGETS IN JAPAN

1500 Tons Of Bombs Dropped In A Month

"ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" ও আগরওয়ালা

শ্রীযুক্ত মুলচাঁদ আগরওয়ালা খবরের কাগজের বাজারে প্রকাণ্ড দিকপাল। কলকাতা শহরেই তিনি তিনখানি দৈনিক কাগজের মালিক—"এডভান্স" (ইংরেজী), "মাতৃভূমি" (বাংলা) আর "বিশ্বমিত্র" (হিন্দী)।

প্রকাণ্ড প্রেসেরও মালিক তিনি। তা ছাড়া দিল্লী এবং বোম্বাই শহরেও তাঁর কাগজ আছে। অর্থ, মান, নাম কিছুরই অভাব নেই।

তিনি প্রকাণ্ড কংগ্রেসভক্ত বলেই নিজেকে প্রচার করেন। তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর কাগজগুলির প্রত্যেকটীতে নিয়মিতভাবে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়।

তিনি কমিউনিষ্টদের উপর ভয়ানক খাপ্পা। কারণ তারা নাকি গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এহেন স্বদেশভক্ত মুলচাঁদ আগরওয়ালার একটা কাহিনী আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

* * *

আপনারা কখনো শুনেছেন কি, এই কলকাতা শহরেই "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক কাগজ আছে? আপনারা হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, বলবেন দৈনিক ইংরেজী কাগজ থাকলে কি হকারের হাতে দেখতাম না, অন্ততঃ নামটাও শুনতাম না! কিংবা হয়তো বলবেন—নতুন কাগজ হতে পারে, এখনও চোখে পড়েনি।

শুনলে আরও অবাক হবেন, এই "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" কাগজ একমাস-আধমাস নয়, প্রায় দু বছর ধরে আমাদের এই কলকাতা শহরেই রোজ নাকি বার হচ্ছে। কাগজের মালিক তাই প্রচার করেন।

আমি-আপনি না বিশ্বাস করলে কি হবে, আসল কর্তা যাঁরা তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ আমি-আপনি যখন কাগজের অভাবে লেখাপড়াই প্রায় ছাড়লাম, ছেলেগুলো এগ্‌জামিনের কাগজ জোটাতেই হিমসিম খেয়ে গেল—তখনও কর্ত্তাদের অনুগ্রহে এই অজানা-অদেখা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের মালিক কণ্ট্রোল দরে প্রত্যহ হাজার হাজার কাগজের কোটা পায়।

ঠিক কত কোটা পায় এখন বলতে পারছিনে, ৫।৭ টনের কম হবে না মনে হয়। ৭ টন হলে দৈনিক প্রায় ৭।৮ হাজার কাগজ ছাপা উচিত। ধরলাম না হয় ৪।৫ হাজারই। এত হাজার একটা দৈনিক কাগজ দু বছর ধরে রোজ বার হলে একদিনও কি আপনার-আমার চোখে পড়তনা?

* * *

আসল রহস্য উপরের ছবি দুটো থেকেই বুঝতে পারবেন। শ্রীযুক্ত মুলচাঁদ আগরওয়ালা এডভান্স কাগজের মালিক, আবার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজের কোটাও তাঁর ওখানেই আসে। এডভান্সের ফটোর নীচে আমরা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের ফটো দিয়েছি। ফটোতে দেখতে পাবেন ২৯ ডিসেম্বরের এডভান্সই ৩০ ডিসেম্বরের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে গেছে। মায় বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত। তার নীচে দুই কাগজের সম্পাদকীয়ও ফটোতে দেখতে পাবেন। এডভান্স আর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে কোনো তফাৎ নেই। এর মানে হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলে কোন আলাদা কাগজ ছাপা হয় না। এডভান্স কাগজটাই ছাপা হয়ে যাবার পর তার কম্পোজ করা জিনিষের মাথায় শুধু নামটা বদলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বসিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৮ হাজার কপি ছাপা হ'ল কি ৮ কপি ছাপা হ'ল তার তো কেউ খোঁজ করছে না! সরকারী কর্ত্তারা চোখ-কান বুঁজে পাঁচ দশ হাজারের কোটা দিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা চোখ-কান বোজার উপযুক্ত মূল্য আদায় করেন কিনা তা তাঁরাই জানেন।

যে-কাগজ আপনি আমি কখনো চোখে দেখলাম না যে-কাগজ শুধু এডভান্সেরই পুনমুদ্রণ, সে কাগজও হাজার হাজার ছাপা হয় এবং বিক্রী হয় এও কি আপনার আমার বিশ্বাস করতে হবে?

মোট কথা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যে কাগজে ছাপা হয় তা সরকার থেকে পাউণ্ড পিছু ।/১০ আনা দরে পাওয়া যায় এবং সেই ধরণের কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটে আপনি ৮৮/০ আনা দরে বিক্রী করতে পারেন। ৭ টন কোটা পেলে তাতে আপনি মাসে প্রায় ৭ হাজার টাকা লুঠতে পারেন। স্বদেশভক্ত মুলচাঁদ আগরওয়ালা তা করেন কিনা সে-কথা এক তিনি বলতে পারেন, আর কাগজের সরকারী মালিকরা বলতে পারেন।

অবশ্য পুলিশকেও খোঁজ করতে বলা যায়। কিন্তু তাহলে আপনার স্বদেশভক্তি কোথায় থাকবে? "স্বদেশভক্ত" মিঃ আগরওয়ালার কমিউনিষ্টদের ওপর চটবার কারণই হ'ল তারা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে—অর্থাৎ কাগজ প্রভৃতির চোরা-কারবারীকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়।

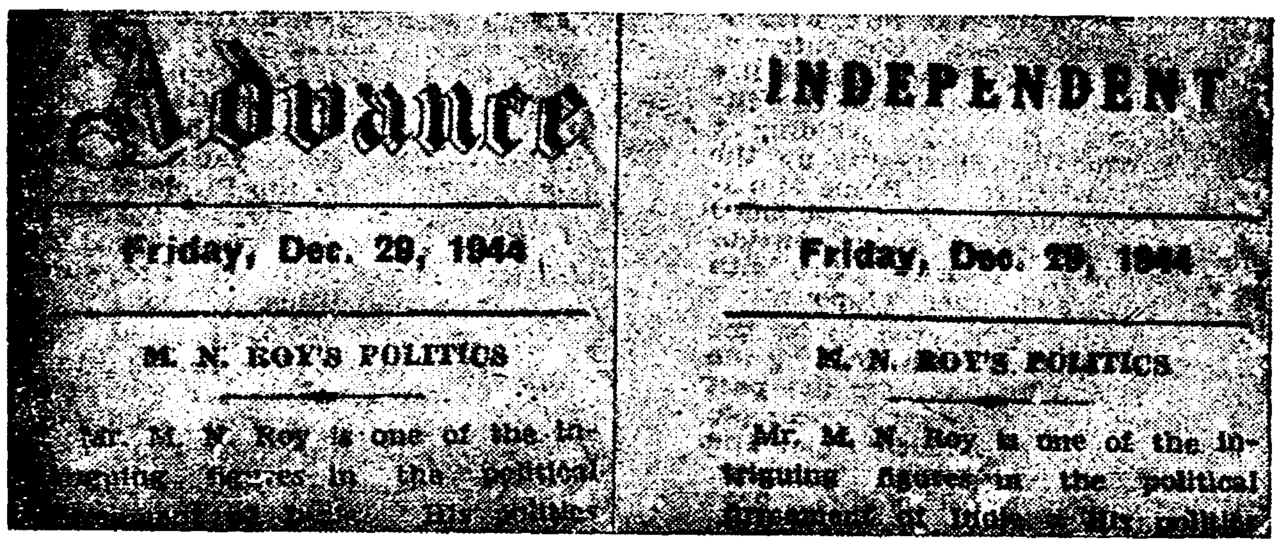

Advance

Friday, Dec. 29, 1944

M. N. ROY'S POLITICS

Mr. M. N. Roy is one of the intriguing figures in the political ...

INDEPENDENT

Friday, Dec. 29, 1944

M. N. ROY'S POLITICS

Mr. M. N. Roy is one of the intriguing figures in the political firmament in India ...

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্তা নাইডুর আহ্বান

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু অল্প দিনের জন্য বাংলা দেশে আসিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়স, তাহার উপর তাঁহার শরীরও অসুস্থ। কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি যে-কর্ম্মচাঞ্চল্যে কলিকাতাকে মুখরিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার নেতৃত্ব ও দেশভক্তির গৌরবকে আরও মহিমান্বিত করিয়াছে। তিনি ছাত্র সম্মেলনকে ঐক্যের প্রেরণা দিয়াছেন, নারী সেবা সঙ্ঘের প্রদর্শনীকে সফল করিতে সাহায্য করিয়াছেন, শহরের দূর দুরান্তে ছোট বড় যা কিছু জনসেবার প্রতিষ্ঠান তাহা উৎসাহের সহিত পরিদর্শন করিয়াছেন, বস্তির ভিতরে পর্য্যন্ত গিয়া রোগজীর্ণ দরিদ্র শিশু ও তাহাদের পিতামাতার মুখে হাসি ফুটাইয়াছেন। "জনসেবাই যে কংগ্রেসের কাজ" তাহা এই মহিময়ী দেশনেত্রী নিজের কঠিন পরিশ্রমের উদাহরণ দিয়াই সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর কাছে বাস্তব করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য। সেই কংগ্রেসের উদার দেশভক্তির আদর্শেই তাঁহার জনসেবা ও রাজনীতিক কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে দলগত সঙ্কীর্ণতা ছিলনা, গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা হইয়া যাইতে পারে ইহা ভাবিয়াও তিনি ব্যাকুল হন নাই। গবর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ও হিন্দু-সভার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ উভয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই তিনি নারীসেবা সঙ্ঘের আবেদন দেশের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য ছাত্রের মিলিত প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছেন। আবার নারিকেলডাঙ্গায় মুসলিম লীগ পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্র উৎসাহের সঙ্গে পরিদর্শন করিয়া সাগ্রহে মন্তব্য করিয়াছেন, "কংগ্রেসের মতই লীগও জনসেবা করিতেছে।"

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-বিক্ষত বাংলার করুণ ছবিকে তিনি নিজের আবেগ দিয়া নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে যে গ্লানি আসিয়াছে, এমন কি নারীদের মধ্যেও যে মর্য্যাদাবোধের অভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। অকুণ্ঠ-ভাবে তাহার প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন দেশপ্রেমের সহস্র ধারায় এই মলিনতা মুছাইতে হইবে—দল, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীকে এক হইয়া আমাদের অর্থনীতিক ও নৈতিক জীবনকে একসঙ্গে পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

কংগ্রেস নেত্রীর মুখ দিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর কাছে ইহাই কংগ্রেসের আহ্বান। বাংলার অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী আজও সন্দেহে দুলিতেছেন, অনেকে আবার কংগ্রেসকে কি করিয়া অপরের সংস্রব হইতে সরানো যায় সেই চিন্তায়ই ব্যাকুল হইতেছেন। সরোজিনী দেবীর আহ্বান তাঁহাদের সংশয় দূর করুক, বর্দ্ধনের আত্মঘাতী পথ হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করুক—তবেই বাঙ্গালী রক্ষা পাইবে।

কমিউনিষ্ট বিতাড়নের বিরুদ্ধে নাইডু

৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় বড়বাজারের কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটী সভায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:

চার আনা পয়সা দিয়া যিনিই কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন তিনিই কংগ্রেসের সভ্য হইবার অধিকারী—তা তিনি কমিউনিষ্ট হন, আম্বেদকর হন বা অন্য যে কেহ হন। এইরূপ লোককে কংগ্রেসের সভ্য হইতে কেহ বাধা দিতে পারেনা।… শ্রী প্যারেলাল মারফৎ মহাত্মা গান্ধী এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন—এবং আমারও ইহাই মত। কংগ্রেস হইতে কাহাকেও বাহির করিয়া দেওয়া বা আলাদা করিয়া রাখার অধিকার কাহারও নাই। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাজ করিবে তাহার সম্বন্ধে নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।"

বড়বাজার কংগ্রেসকর্ম্মী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই সভা ডাকা হইয়াছিল। পণ্ডিত মদনলাল মিশ্র সভাপতি হন। তিনি প্রথমে শ্রীযুক্তা নাইডুকে অল্প কথায় বাংলার অবস্থা জানাইয়া দেন। পরে প্রশ্ন করেন, "আজ সারা দেশে এক হাওয়া উঠিয়াছে যে কংগ্রেসকর্ম্মী যেন কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখে। আপনি আমাদের বলুন আমরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কাজ করিব কিনা।"

এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীযুক্তা নাইডু উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে অগাষ্ট আন্দোলনের নির্দেশ কংগ্রেস হইতে আসে নাই। [দৈনিক "বিশ্ববন্ধু" হইতে উদ্ধৃত]

সংবাদসংগ্রহ

কৃষক সমিতির আন্দোলন
"চাউলের দর বাঁধ"

স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতা মোঃ আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে বরিশালে **চাঁদসী** ইউনিয়ন কৃষক সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কৃষকরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ বর্ণনা করিয়া খাদ্যশস্যের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধা ও অন্যান্য জিনিষ-পত্রের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহের দাবী করে। **বানরগাছা** অঞ্চলের ৩৪টী ইউনিয়নের কৃষকরা একটী বিরাট জনসভায় গত ৩রা ডিসেম্বর দাবী করে যে চালের সর্ব্বনিম্ন দর ১০।০ টাকা হইতে ১১৲ টাকায় বাঁধিয়া দিতে হইবে। যাহারা কন্‌ট্রোল দরে কিনিতে পারিবে না তাহাদের জন্য সস্তা রেশন ও খয়রাতীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব দাবী মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইবে।

নোয়াখালির বিনোদপুর গ্রামে ৩০০ কৃষকের সভায় ধান চালের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার জন্য দাবী জানান হইয়াছে।

অনুরূপ সভা বরিশাল শ্যামেরহাট প্রভৃতি স্থানেও হইয়ছে।

যশোহর জেলায় দুর্গাপুর ইউনিয়ন কৃষক সমিতির আহ্বানে ১১খানি গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক হইতে শুরু করিয়া দিনমজুর, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল সকলে এক বিরাট জনসভায় সমবেত হয়। সভায় চাউলের সর্ব্বনিম্ন দর ১০৲ টাক ও পাটের দর ২০৲ টাকা বাঁধিয়া দিবার দাবী জানান হয়।

ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক-বস্তী ভস্মীভূত
সূতাকল শ্রমিকদের সাহায্য করুন

গত ১১ই ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় ১নং ঢাকেশ্বরী মিলের সংলগ্ন শ্রমিক বস্তীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি ছিল। আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বস্তী পুড়িয়া যায়। ফলে ৪০০ শ্রমিক পরিবার অর্থাৎ ২০০০ হাজার নরনারী একেবারে নিঃস্বতে পরিণত হইয়াছে। বিছানাপত্র, কাপড় চোপড়, থালা বাসন—কোন কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। এই অসহায় দুঃস্থ শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীদের আহ্বান জানান হইতেছে। যথাসাধ্য সাহায্য 'ঢাকা জিলা সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন,' পোঃ নারায়ণগঞ্জ—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতার উপর
অন্তরীণাদেশ

গত ১২ই ডিসেম্বর বাংলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়ের উপর স্বগ্রামে অন্তরীণাদেশ জারী হইয়াছে। শ্রীযুত রায় সারা জীবন জনসেবায় কাটাইয়াছেন। বগুড়ায় আসিয়াই তিনি শহরে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চরকা ও অন্যান্য কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া দুঃস্থ ও দরিদ্র জন-সাধারণকে স্বজীবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর যশোহর জেলার গ্রামে অন্তরীণে থাকার আদেশ হওয়ায় বহু দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবার অন্নসংস্থানহীন হইয়া পড়িবে। তাঁহার মুক্তির জন্য সারা বাংলার জনসাধারণ দাবী জানাইবে।

নোয়াখালীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নোয়াখালী শহর, চৌমুহানী প্রভৃতি জায়গায় "জবানবন্দী" অভিনয় করিয়া স্থানীয় শিল্পীরা বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। অনুষ্ঠানে ভুখ নৃত্য, দাঁড়ী নৃত্য, গান, জবানবন্দী, চাটগায়ের তেজেন সেনের 'নবদিনের অভিনন্দন সংগীত' প্রভৃতি ছিল কার্য্যসূচী। দুই রাত্রির অনুষ্ঠানেই জেলা শিল্পী সংঘের সভাপতি শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ সেন উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন।

২য় বারের অনুষ্ঠান জিলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে হয়। চাটগার কবি রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবিগান ইত্যাদি এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মজুতদারীর ফল ও ১৩৫০ সালের বাংলা চিত্রে দেখান হয়।

ইসলামপুরের কুম্ভকারেরা কি গোলামে পরিণত হইবে?
কুমারের মাটিও মুনাফাখোরের গর্ভে

গ্রামে আজকাল মাটির পাত্র পিতল-কাঁসার জায়গা জুড়িয়াছে। মাটির বাসনের চাহিদা আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু কুম্ভকারদের অবস্থা ফেরা দূরে থাকুক, বরং আজ আরও শোচনীয় হইয়াছে।

হাওড়া জেলার ইসলামপুর গ্রামে ১১ ঘর কুম্ভকারের বাস। একটী পরিবার অভাবে পড়িয়া জাতব্যবসা তুলিয়া দিয়াছে। বাকি পরিবারগুলির মধ্যে ৮টী ঘর অন্য দুটী ঘরের কাছে ১২৫০৲ টাকার দেনার দায়ে বাঁধা পড়িয়া আছে। এই দুটী সম্পন্ন পরিবার ইহাদের কাছ হইতে দু' আনায় একটী হাঁড়ি কিনিয়া আট আনা দশ আনা দামে বাজারে বিক্রি করে।

কুম্ভকারদের চাকের যন্ত্র কিনিয়া চাক চালাইবার সঙ্গতি নাই। ৩৲ টাকার চাকের দাম আজ ১২৲ টাকা। হাঁড়ি পিটিবার জন্য যে কাঠের পিটুনির দরকার, শালকাঠের অভাবে বাজারে তাহার আমদানী নাই। তাই একটী যন্ত্র অকেজো হইলে তাহার বদলে নতুন যন্ত্র আর জোটে না।

এ ছাড়াও সমস্যা আছে কয়লা আর কেরোসিনের। কয়লার অভাবে হাঁড়ি পুড়াইবার পোন জ্বালিতে প্রচুর কাঠ লাগিতেছে তাহাও আবার প্রায়ই মিলে না। কাজেই অনেক সময় খড় দিয়া পোন জ্বালাইতে হয়। ইহাতে অসম্ভব খরচ পড়ে। পূর্ব্বে পোন জ্বালাইতে মণ পিছু কয়লায় খরচ ছিল তিন আনা, এখন তার বদলে মণ পিছু কাঠের খরচ পড়ে দেড় টাকা। একটি পোন পোড়াইতে যেখানে কয়লা লাগিত ৬।৭ মণ, তাহার বদলে এখন কাঠ লাগে ১০ মণ।

পূর্বে এক আনার কেরোসিনে যেখানে রাতভোর চলিত, এখন সেখানে প্রতি রাত্রে তিন আনা করিয়া সরিষার তেলের খরচ। তাছাড়া সরিষার তেলে আলোর জোর কম। ইহাতে হাঁড়ি তৈরীর কাজ ভাল হইতে পারে না।

মাটির একচেটিয়া ব্যবসা

হাঁড়িকে শক্ত করার জন্য ও হাঁড়িতে রং লাগানোর জন্য চন্দ্রকণা ও বনক মাটির প্রয়োজন। চন্দ্রকণা মাটি আসে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকণা গ্রাম হইতে। শোনা যায়, একজন ব্যবসাদার সেই গ্রামে মাটির ইজারা লইয়া একচেটিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। হাওড়া জেলায় আমতা গ্রামের মাত্র একজন ব্যবসায়ীর কাছ হইতে এই মাটি কিনিতে পাওয়া যায়। এই মাটির সঙ্গে অন্য মাটির ভেজাল মিশাইয়া খুব চড়া দামে ইহা বিক্রি হইতেছে। আগে যেখানে চন্দ্রকণা মাটির মণ পিছু দাম ছিল পাঁচ সিকা, আজ সেখানে তাহার দাম বাড়িয়া ১০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে—তাহাও আবার ভেজাল সমেত। বনক মাটিরও এমনি অবস্থা। ইসলামপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম মাজুক্ষেত্রে এই মাটি আগে বিনামূল্যে মিলিত, আজ ইহারই দাম মণ পিছু ১০৲ টাকা।

একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ সারা মাস পুরা খাটিয়া যে হাঁড়ি তৈরী করিতে পারে, বাজারে তাহার মূল্য দাঁড়ায় ৬০৲ টাকা। কিন্তু আজকাল হাঁড়ি তৈরীতে খরচই পড়ে ৩০৲ টাকা। মহজনদের কাছে গরীব কুম্ভকারদের মাথা পর্য্যন্ত বিকানো। কাজেই হাঁড়ি তৈরী করিয়া যে নামমাত্র মজুরী ইহারা পায়, তাহাতে সংসার চালানো ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আজ তাই ইসলামপুরের ৮ ঘর কুম্ভকার পরিবার ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, আর ইহাদেরই শুষিয়া দুটি কুম্ভকার পরিবার মুনাফা লুটিতেছে।

—সমর মুখার্জী

খনি-মজুরদের বোনাস বন্ধ হইবে?

শ্রমিক জগৎ

১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের সরবরাহ মন্ত্রী স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার ধানবাদে বিভিন্ন খনি-মালিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের সহিত যে বৈঠক করিয়াছিলেন, তার সম্বন্ধে অতি সামান্য খবরই কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের খবরে প্রকাশ, কয়লা তুলিবার জন্য বিদেশ হইতে ভাল যন্ত্রপাতি আমদানী করার প্রশ্ন লইয়াই খনি-মালিকদের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সরবরাহ মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে।

কিন্তু যে খবরটী কাগজে প্রকাশিত হয় নাই, অথচ কানাঘুষা শোনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এই আলোচনা বৈঠকে খনি মালিকদের আগ্রহ ছিল অন্য একটী বিষয়ে—সেটী হইতেছে মজুরদের বোনাস কমাইবার প্রস্তাব।

ইতিপূর্ব্বে ধানবাদ সম্মেলনে ঠিক হইয়াছিল যে মজুরকে মাগ্‌গীভাতা ছাড়া হাজিরা-বোনাস হিসাবে দৈনিক ৵০ নগদ ও আধ সের চাল দেওয়া হইবে। পোষ্য থাকিলে আরো ৵০ দেওয়া হইবে। দেশময় খনিমজুরদের অবস্থা লইয়া যে আন্দোলন তখন চলিয়াছিল, তার ফলে খনি-মালিকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই নিয়ম মানিয়া লইয়াছিল। এখন তারা নাকি এই নিয়মটী বন্ধ করিবার জন্য মুদালিয়ারের কাছে পীড়াপীড়ি করিয়াছে। খনি-মালিকরা প্রস্তাব তুলিয়াছে যে, হাজিরা বোনাসের বদলে আগেকার প্রথা মত টাকায় ৬ সের রেশন দিবার ব্যবস্থা হউক।

বরাকর অঞ্চলে জোর গুজব যে জানুয়ারী মাস হইতে এই নিয়ম চালু করা হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে ইহাতে প্রত্যেক মজুরের সপ্তাহে কমপক্ষে ১২ আনা লোকসান হইবে। বরাকরের মজুর ইউনিয়ন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে চতুর্দ্দিকে পোষ্টার লাগাইয়াছিল। কোম্পানী মজুরদের সন্দেহ দুর করার কোন চেষ্টা না করিয়া লোক লাগাইয়া পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ইহাতেই মনে হয় যে, এই গুজব অমূলক নয়।

ধানবাদের সিদ্ধান্ত মানিতে মালিককে বাধ্য করিবার কোন ব্যবস্থা ভারত সরকার করেন নাই। তাই আজ সুযোগ বুঝিয়া মালিকরাও আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। মালিকরা আজ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছে, সরকার হইতে রেশন শপের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই 'মজুর সমস্যা' আর থাকিবে না।

খনি-মজুরদের উপর এই নূতন আক্রমণের আশঙ্কাকে রুখিতে সমস্ত মজুর ও দেশবাসীকে একত্র দাঁড়াইতে হইবে।

● কয়লার অভাবে আরো চটকল বন্ধ ●

সরকার ও খনি-মালিকদের মধ্যে যখন এইরকম জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, তখন কয়লার উৎপাদন বা সরবরাহে যে সঙ্কট বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহা 'ক্যাপিটালে' প্রকাশিত একটী খবর হইতেই বুঝা যায়।

২১শে ডিসেম্বরের 'ক্যাপিটাল' লিখিতেছে যে, "গত সপ্তাহে কয়লার অভাবে অনেকগুলি 'ফষ্টার' মিলের কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।"

'ফষ্টার' মিল হইতেছে বড় মিল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ছোট মিলগুলি চলে। ইতিপূর্ব্বে কয়লার অভাব সামলাইবার জন্য চটকল মালিকরা ঠিক করিয়াছিল যে, যে পরিমাণে কয়লা আসিতেছে তাহাতে অন্য মিল না চালাইয়া শুধু 'ফষ্টার' মিল-গুলিই চালান হইবে। ইহাতে কারবারে লোকসান খানিকটা ঠেকান যাইবে, মজুর সমস্যাও খানিকটা মিটিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, 'ফষ্টার' মিলও চলিবার উপায় নাই।

ইহা কি কয়লা উৎপাদনে কমতির ফল, না সরবরাহে অব্যবস্থা? চটকল মজুরদের উপর ইহার যে প্রচণ্ড ধাক্কা আসিবে, সে সম্বন্ধে মিল মালিক ও সরকার কি করিতেছে?

★ কেশোরাম সূতাকলের মজুর জাগরণ ★

বাংলাদেশের সূতাকলগুলির মধ্যে অবস্থিত কেশোরাম কটন মিল সব চেয়ে পুরাতন। বিড়লা ব্রাদার্স এই মিলের মালিক। এই মিলে যে ৮ হাজার মজুর কাজ করে তাহাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ফোরম্যান, সুপারভাইজার, সর্দ্দার প্রভৃতির মেজাজের দাপটে মজুরদের টেঁকা ভার। মেসিন ও খারাপ সূতার জন্য কাপড় খারাপ হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় মজুরদের। শারীরিক অসুস্থতার জন্য একদিন অনুপস্থিত হইলেও চাকুরী বজায় রাখা যায় না। মজুরদের বস্তীগুলি লোক থাকার অযোগ্য। কর্ত্তৃপক্ষের জবরদস্তিতে মজুররা ইউনিয়ন গড়িতে সাহস পায় না।

১৯২৮-৩২ সালে মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে কিছুটা দাবী উশুল করিতে পারিয়াছিল। তারপর হইতে মজুরদের অবস্থা মন্দের দিকেই চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে তাহা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মজুররা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইতি-মধ্যে একটি ইউনিয়ন গড়িয়াছে। কিছুদিন আগে কারখানার মজুর নিত্য, মদন ও মান্নান মিলের গেটের সামনে প্রচার করার অপরাধে বরখাস্ত হয়, কিন্তু ইউনিয়নের মারফৎ মিঃ বিড়লার নিকট সঙ্ঘবদ্ধ ডেপুটেশনের ফলে আবার কাজে বহাল হইয়াছে। গত ১০ই ডিসেম্বর মেটিয়াবুরুজ 'কবরস্থান' ময়দানে কেশোরামের মজুরদের এক সাধারণ সভা হয়। প্রায় ৫০০ মজুর এখানে জমায়েত হয়। ইহার সভাপতিত্ব করে কারখানার মজুর ফিরোজ এবং এখানে বক্তৃতা করে নিত্য, নূর মোহাম্মদ, কালীপদ, দিব্য সিং রাউথ প্রভৃতি মজুররা। এই সভা হইতে মজুরদের নিম্নলিখিত দাবীর আওয়াজ উঠে—(১) রোজ হিসাবে মাগ্‌গীভাতা; (২) দুই মাসের 'প্রফিট বোনাস'; (৩) চাকুরীর স্থায়ীত্ব; (৪) চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত।

দণ্ডভোগের পরেও মুক্তি নাই

ঢাকা জেল হইতে দিনাজপুরের পূর্ণেন্দু গুহ এবং ঢাকার হরিপদ দে ১১।০ বৎসর জেল খাটার পর খালাস হওয়'র সাথে সাথেই জেল গেটে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী।

শান্তিনিকেতন পরিচয়

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গীতভবন

এই শাখাটি নূতন। এখানে রবীন্দ্রগীতি, নাচ ও বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতিকে রূপায়িত ও তাহার প্রচলন করায় সঙ্গীত-ভবনের কৃতিত্ব অনেকখানি। শান্তিনিকেতনের বাহিরেও যাহাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিতে পারা যায়, তাহার জন্য কলিকাতায় ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে ইহার পরিচালক। ইহার কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ, নন্দিতা কৃপালনী, নিবেদিতা বোস প্রভৃতি সংস্কৃতি জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

চীনভবন

চীন ও ভারত এই দুই মহান দেশের সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক এই চীনাভবন। এখানে চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল চীন ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চীন পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া **শ্রীনিকেতন** আর একটী প্রতিষ্ঠান। উহার বিবরণ পৌষ-উৎসবের মধ্যে পাইবেন।

তারাশঙ্করের অভিভাষণ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"সাহিত্যের রাজনীতি পলিসি নয়, প্রিন্সিপল। তার লক্ষ্য আইনগত অধিকার নয়, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি।...যা 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বল্পজন-কেন্দ্রিক তাকে বর্জন ক'রে, যা "সর্ব্বজনকল্যাণকর—হোক সে আমার স্বল্পসুখের কারণ তাকেই আমরা গ্রহণ করব।...পৃথিবীর সঙ্গে সমগতিতে চলার ছন্দে অর্থাৎ গতির ছন্দে জীবন-বিপ্লবের বাণীই হোক আমাদের সাহিত্যের বাণী।"

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব
রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অগ্রগতি কোন পথে?

[নীহার দাশগুপ্ত]

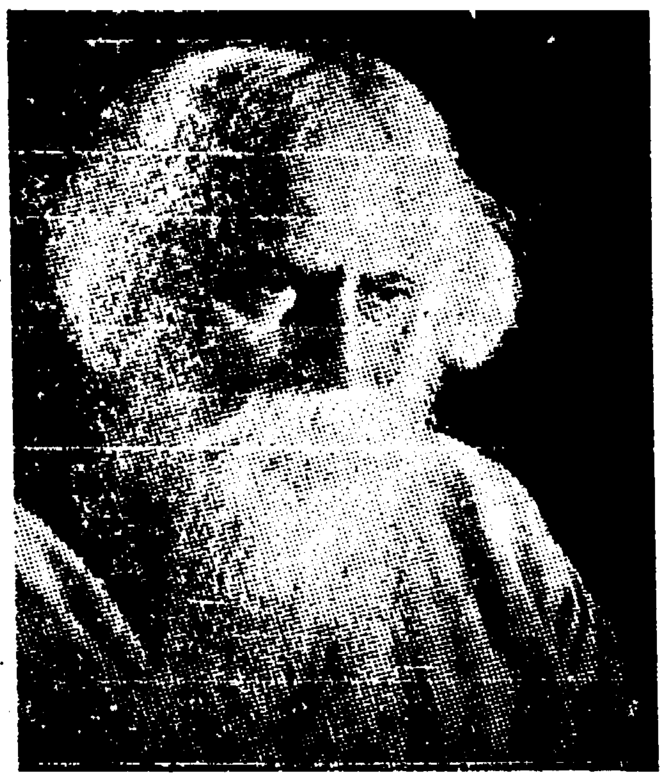

প্রতি বছর পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতন মেতে ওঠে। দেশদেশান্তর থেকে বিচিত্র বেশভূষায় বিচিত্র ভাষাভাষী অসংখ্য মানুষ এখানে এসে জমা হয়। মন্দিরে উপাসনা চলে, আম্রকুঞ্জে সভা বসে। বৈতালিক গানে রাত্রি ভোর হয়, বিকালে প্রাঙ্গণে মেলা বসে।

একদিন এখানে ধূ-ধূ করা মাঠ ছিল। সেই মাঠের বুকে আজ এক শিল্পসমৃদ্ধ জনপদ গ'ড়ে উঠেছে। দেশদেশান্তর থেকে শিল্পী এসেছে, সুরজ্ঞ এসেছে—জ্ঞান অর্জন আর জ্ঞান বিতরণের তীর্থভূমি হ'য়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন।

৭ই পৌষ তাই স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দিন তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে আশ্রয় ক'রে এখানে বেড়ে উঠেছে শিল্প-সংস্কৃতির আশ্রম। যখন ধর্ম্মের গোঁড়ামী আর কুসংস্কারে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির আলো আচ্ছন্ন, স্রোত রুদ্ধ—তখন দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের উদার মন্ত্রে দেশের মধ্যে নতুন জাগরণ এনেছিলেন।

এবার উপাসনা মন্দিরে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বললেন, 'আজ দুঃখের রাত্রি সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে; এই দুঃখের মধ্যেও আশার বাণী আসছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতন। এখানে সাধনার যে বীজ উপ্ত হয়েছে, সর্বত্র বিস্তৃত তার ছায়া। মৈত্রীবন্ধনের মন্ত্র আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হোক্।'

মহর্ষির সেই স্বপ্নসাধনা রবীন্দ্রনাথ সফল ক'রেছেন। আজ শান্তিনিকেতন শুধু প্রদেশকে প্রদেশের সঙ্গেই নয়, বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে মৈত্রীর বন্ধনে এক করেছে।

এমনি মৈত্রীরই প্রতীক হ'চ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত চীনভবন। এবারকার উৎসবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশন তাঁরই সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হ'ল। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কার্য্যবিবরণীতে বললেন, চীনের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বিশ্বভারতীতে বৃত্তি দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন; শান্তিনিকেতনের চীন ভবনের একজন শিক্ষাব্রতীকে তাঁরা কুনমিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করেছেন।

শ্রীমতী নাইডু বললেন, 'অস্ত্রবলে বলীয়ান শত্রুর হাতে চীন আজ আক্রান্ত। চীনের সাধারণ চাষী মজুর আজ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ প্রতিজ্ঞা ক'রে লড়ছে। যে চীন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়েছে, তার কাছে আমরা কি বাণী পাঠাবো! চীনের কাছ থেকে আমরা আজ এই শিক্ষাই নেবো যে, অস্ত্রের পরাক্রমের কাছে আমরা যেন মাথা নত না করি, ভারতের সাধনার চূড়ান্ত জয়ের উপর আমরা যেন আস্থা না হারাই।'

উৎসব উপলক্ষে কলাভবনে চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। কলাভবনের দেয়ালগাত্রে ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনগুলি দর্শককে মুগ্ধ করে। শিল্পীনায়ক নন্দলাল বসুর পরিচালনায় এই কলাভবন

পৌষ-উৎসবে কবিগানের আসর

ভারতের শিল্পকলার গৌরব। এখানে নন্দলাল বাবু ছাড়াও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বেজ প্রভৃতি আছেন। রামকিঙ্কর বেজের 'ঝড়' ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝেছেন বাংলার মন্বন্তর কি ভাবে আশ্রমবাসী শিল্পী-মনকে পর্য্যন্ত নাড়া দিয়াছে।

কিন্তু এবার কলাভবনের প্রদর্শিত ছবিগুলিতে দেশের এই বাস্তব জীবনের যেন লেশমাত্র ছাপ নেই। প্রদর্শনীতে ছিল অতীত ভারতের ছবির কিছু নিদর্শন আর সবই জাপানী কাঠখোদাই ছবি। জাপানী শিল্পী সামামুরা কানজান ও তাইকনের আঁকা দুটি সুদীর্ঘ ছবি—'জীবনের সত্য' ও 'নদীর জন্ম'। প্রথম ছবিটির একাংশে এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আর অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত আর হানাহানির পরিণতি; একটিতে প্রজ্বলিত আগুনে সব কিছু পুড়ে যাচ্ছে, অন্যটিতে শান্ত আকাশে স্নিগ্ধ চাঁদ উঠছে। নন্দলাল বাবু ছবিটির ব্যাখ্যা করে বললেন, সন্ন্যাসী হয়ে শান্তি খোঁজাটাই জীবনের সত্য নয়, সত্য হচ্ছে নিজের জীবনের ওপর নির্ভর করে যাওয়া। যে বলবান—জয়ী হয়ে সে-ই শান্তি লাভ করবে। শক্তিহীনের অনিবার্য্য পরিণতি ধ্বংস।

শক্তিমানের সুখ ও শান্তির এই যে সাম্রাজ্যবাদী সুর জাপানী ছবিটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এরই বিরুদ্ধে ছিল রবীন্দ্রনাথের আজীবন বিদ্রোহ। আজ নিছক কলা-কৌশলের খাতিরে শান্তিনিকেতনের চিত্র-প্রদর্শনীতে তাই পেয়েছে প্রথম স্থান। রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদর্শ রইল স্তব্ধ, শিল্পের খোলসই উঠল বড় হয়ে!

সঙ্গীতভবনে ছাত্রছাত্রীদের গান ও নৃত্য দেখে মনে হ'ল চার বছর আগে যা দেখেছি এ তারই নিষ্প্রাণ রোমন্থন। যে রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণ ছিল তার অবিরামগতি চাঞ্চল্য, নতুন নতুন পরিবেশে নিত্য নতুন সৃষ্টি, সেই ঐতিহ্য আজ তরুণ নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিভার পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজছে। এমন কি, দেশের বুকে যে-ঝড় এল তার সঙ্গেও তার সম্বন্ধ নেই।

শান্তি নিকেতন থেকে দু মাইল দূরে শ্রীনিকেতন। এখানে কুটির শিল্প, কৃষি ও পশু পালনের কাজ হয়। চামড়া, তাঁত, মৃৎশিল্প, কাগজ, বই বাঁধাই, কাঠের কাজ ও ঘানি—এই কয়টি বিভাগ নিয়ে শিল্প ভবন। এই শিল্পভবন ছোট থেকে আজ অনেক বড় হয়েছে। শিক্ষার্থী ও কারিগরের সংখ্যা এখন ৪৭৪। গত বছর এখান থেকে ৪০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

৮০ বিঘা জমি নিয়ে এখানকার কৃষিবিভাগ। জমি সম্বন্ধে নানা গবেষণা হচ্ছে! জমির গুণানুযায়ী কোন কোন ফসল ভাল হয়, সে সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। শিল্প, কৃষি ও পশু সমস্ত বিভাগেই নানা ধরণের কাজ হ'চ্ছে বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তেমন চমকপ্রদ সাফল্য তাঁরা দেখাতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমাদের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, স্থবিরত্ব "সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি।" তাই শ্রীনিকেতনকে তিনি করতে চেয়েছিলেন—"জনসাধারণের সেই শক্তি-সমবায়ের সাধনা।" আজ শ্রীনিকেতন বড় হয়েছে, লাভজনক হয়েছে বটে কিন্তু শক্তির "সমবায়" হয়নি, কারিগর আর কর্ত্তৃপক্ষের যৌথ-প্রতি...ন হতে পারেনি। এমন কি কোনো কোনো কারিগর অনুযোগ করলেন যে তাঁদের মজুরি নাকি ক্রমশই কমে এসেছে। কৃষি-বিভাগের কাজও আশে পাশের গ্রামগুলিকে তেমন ভাবে টেনে আনতে পারেনি, গবেষণার অভিজ্ঞতাও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে নি।

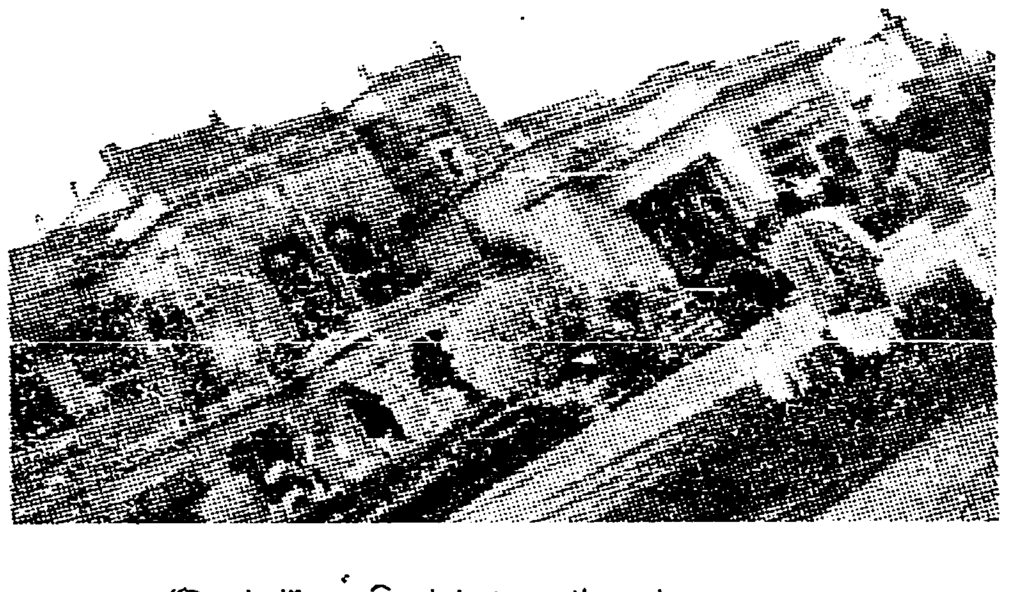

"উত্তরায়ণ"—কবি সাধারণত এখানে বাস করতেন

বিকেলে পড়ন্ত রোদে পৌষ উৎসবের মেলা। নানা ধরণের দোকান খুলেছে; আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসেছে। একদিকে ভদ্রলোক সৌখীন স্ত্রীপুরুষ, অন্যদিকে ময়লা কাপড়পরা সাঁওতালী—এক উৎসবে সবাই মিশে গেছে। বিরাট মাঠে কখনও কবিগান, কখনও যাত্রা চলছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাদল বাজছে—সাঁওতালরা দল বেঁধে নাচছে গাইছে।

জাতিভেদ নিয়ে কবিরা লড়াই ক'রছে—জনজীবনের ভাষা, জনজীবনের ধ্যানধারণা তাদের কণ্ঠে। গ্রাম্য আর শহরে সবাই উপভোগ করছে। বাঙালীর প্রাণের তার এই সুরেই বাঁধা। কৃতজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথকে মনে মনে প্রণাম করলাম।

শান্ত সন্ধ্যায় বিশ্বভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামছাড়া রাঙা মাটির পথে যখন পা বাড়ালাম তখন সঙ্গীরা অনেকেই বল্লেন—বাইরের আবহাওয়া আর কোলাহল থেকে মুক্ত শান্তিনিকেতনে কদিন বেশ শান্তিতে কাটানো গেল। মানতে পারলাম না। মনে হ'ল আজকের শান্তিনিকেতনের যে শান্তি সে যেন বর্ত্তমানের বাস্তব দুনিয়াকে ভুলে থাকার শান্তি, বদ্ধ জলাশয়ের নিস্তরঙ্গতা। রবীন্দ্রনাথ কি তাই চেয়েছিলেন?

শ্রীনিকেতনে মাটির পাত্র তৈয়ারী

শ্রীনিকেতনের কাছে সাঁওতাল বসতি

★ শান্তিনিকেতন পরিচয় ★

ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বিরুদ্ধে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ই ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা। কথিত আছে, একবার শান্তিনিকেতনের বিশাল শূন্য প্রান্তরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার সময় এই সাধনার তাৎপর্য্য তিনি উপলব্ধি করেন। পরে সেই প্রান্তরেই তাঁহার আশ্রমের পত্তন হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে আশ্রমের কার্য্যকলাপ উপাসনা ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে ইহা নূতন রূপ লইল।

উপাসনা ইত্যাদি আশ্রমিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রথম জীবনে মোহিত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শিক্ষকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্যতম শিক্ষক ছিলেন।

আশ্রম-বালকদের সেই বিদ্যালয় ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের হাতে 'বিশ্বভারতীর' মত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার নিম্নলিখিত প্রতিটি শাখা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিদ্যাভবন

ইহার দুইটি শাখা—পাঠভবন ও শিক্ষাভবন। আশ্রম-বালকদের প্রথম পাঠ পাঠভবনে, উচ্চতর শিক্ষা হয় শিক্ষাভবনে। বিদ্যাভবনের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ আছে। সেখানকার সাধারণ পরীক্ষাগুলি পাঠভবন ও শিক্ষাভবন হইতে দেবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বভারতীর পৃথক পরীক্ষাও আছে—তাহার জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদ্যাভবনের শিক্ষার ভার ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, কৃষ্ণ কৃপালনী প্রমুখ প্রখ্যাত অধ্যাপকদের উপর ন্যস্ত।

কলাভবন

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে কলাভবন এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যশস্বী শিল্পীদের শিক্ষকতায় 'কলাভবন' ভারতবর্ষে চিত্রকলা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। কলাভবনের কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বরূপ বোস, গৌরীভঞ্জ প্রভৃতি বর্ত্তমানে কলাভবনের শিক্ষকতা কার্য্যে রত।

রবীন্দ্রভবন

রবীন্দ্র-রচনার উপর গবেষণা চালাইবার জন্য অল্প কিছুদিন হইল এই শাখাটির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারী সেবাসঙ্ঘের প্রদর্শনী

"বিপন্নসেবায় বাঙ্গালীর ঐক্য বৃহত্তর প্রয়োজনেও প্রতিষ্ঠিত হোক"

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর আহ্বান

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিক্ষুব্ধ ভারতের জাতীয় জীবনে একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা গত সপ্তাহের **নারী সেবা সঙ্ঘ প্রদর্শনী**। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে দীর্ঘ ৪দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী ধনী দরীদ্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতের বিখ্যাত কলেজের ত্রিতল গৃহে সুসজ্জিত ২৫টী কেন্দ্রের হস্তশিল্পের এই প্রদর্শনী সারা বাংলার দুঃস্থ নারীর জীবন প্রতিষ্ঠার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনা নাইডু যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত অবদান।

"বাংলার মেয়েরা শুধু যে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিয়া মরিতেছে তাহাই নয় তাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য সম্মান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। চোরাবাজারে খাদ্য আসিয়াছে, কয়েকজন তাহা কিনিতে পারিয়াছে। রেলগাড়ী বোঝাই খাদ্য সস্তার আসিয়াছে, তাহা দরিদ্র নিঃস্বদের ঘরে পৌঁছায় নাই। জীবন মৃত্যুর দ্বারে করাঘাত করিতেছে। কিন্তু যখন দুঃস্থা নারীর দুঃখকষ্ট 'জ্বালাযন্ত্রণার বিরুদ্ধে বাংলার নারীত্ব জাগিয়া উঠিল তখন জীবনের নবীন আশা ফুটিয়া উঠিল। নারী সেবা সঙ্ঘের এই প্রদর্শনী দেখিয়া আমরা সকলে যেন পুনর্জীবন লাভ করিলাম। বিপন্ন মানবের সাহায্যকল্পে বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী সকল নর-নারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় একত্রিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখদুর্দ্দশার দিনে বাংলা যে রকম ঐক্যবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিল ভবিষ্যতের বৃহত্তর প্রয়োজনের সময়েও তাহারা সেইভাবে সমবেত হইতে পারিবে ইহাই আমার আশা।"

শ্রীযুক্তা নাইডু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন,—সম্প্রদায়ের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড় এই কথাই যেন তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন।

প্রদর্শনী দেখিয়া শ্রীমতী নাইডু বলেন,—যে নারী জীবনের আশা ছাড়িয়াছিল সেই আবার আজ কেমন সুন্দররূপে হস্তশিল্প বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে। তিনি লেক রোড হোমে দুঃস্থা নারীদের মুখে নতুন আশা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের মুষ্টির ভিতর নবসৃষ্টির মহাশক্তির পরিচয় পাইয়াছেন।

প্রতিদিন তিন চারি সহস্র নরনারীর সমাগমে নারী সেবা সঙ্ঘের প্রদর্শনী জীবনের গানে মুখরিত হইয়াউঠিয়াছিল। মেয়েদের হাতের তৈরী ডালা, কুলা, মাদুর, কাগজ, খেলনা, জামাকাপড় প্রদর্শনীর ঘরগুলি ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। এই সব হস্তশিল্পকে রক্ষা করিয়া বাংলার দুঃস্থা নারী-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু দর্শক এই সব জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়াছেন।

হাজং মেয়েদের তাঁতের কাপড়ের থান দেখিয়া মিসেস এপষ্টিন তিরিশ টাকা দিয়া ১ থান কিনিয়া নেন। মিসেস এপষ্টিন চীনের কো-অপারেটিভ'র উদ্যম সম্পর্কে একটী স্বচ্ছ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শেষে তিনি হাজং মেয়েদের আবেদন পাঠ করেন। তাহারা লিখিয়াছে,—গ্রাম হইতে থান বুনিয়া পাঠাইলাম, শহর হইতে আপনারা সূতা পাঠাইবেন; এখানে সূতার অভাব অত্যন্ত বেশী।

আসাম থেকে চামড়ার ও পশমের জিনিষ আসিয়াছিল। দার্জিলিংএর মোটা পশমের জামা বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার ৮টী কেন্দ্র ও দশটী জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কাগজ, ডালা, ফুল, জামা বিভিন্ন ধরণের শিল্পের কাজ পাঠাইয়াছিল। নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারীর কাজ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটির হোম থেকে সুন্দর সুন্দর মাটীর কাজ আসিয়াছিল। জয়নগর বারাসত হোমের কৃষকমেয়েরা মাটীর তৈরী কৃষক পরিবার—বাড়ী, গরু, লাঙ্গল দেখাইয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স, হিন্দু-মহাসভা নারীরক্ষা কেন্দ্র, হিন্দুমিশন, রামকৃষ্ণ মিশন, সরোজনলিনী, ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি, পানিহাটী গোবিন্দকুমার হোম, শচীন্দ্রপ্রসাদ নারী-শিল্প সদন, সরগা পুণ্যাশ্রম, ব্রাহ্মসমাজ, মূক ও বধির স্কুলের বিভিন্ন জেলার হাতের কাজ চিত্রশিল্প, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী, পিপলস্ রিলিফ কমিটির দুর্গত ও মহামারী বিধ্বস্ত জীবন পুনর্গঠনে ছবি-প্রদর্শনী, হিন্দু অবলা আশ্রম প্রভৃতি সমস্ত কুটীর ও হস্তশিল্পের প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। মিসেস্ এপষ্টিন চীনের কো-অপারেটিভের একটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন—ডালা, পাখা, পর্দা, প্রভৃতির সুন্দর সজ্জা এই কেন্দ্রে ছিল। তাহা ছাড়া হাতের তৈরী বহু খাদ্যসামগ্রীও এখানে আনা হইয়াছিল।

★ আত্মনির্ভরতাই আত্মসম্মান আনিয়া দেয় ★

কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রসিদ্ধ কাগজ তৈরীর কেন্দ্রের সাফল্য একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া উৎসাহের সহিত লিখিয়াছেন,—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত কাগজ তৈরীর প্রতিষ্ঠানই প্রথম রিলিফ-কেন্দ্র যা আমি এবার দেখলাম। এইরূপ লাভজনক শিল্পে এত নিপুণতার সঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে দেখে আমি খুব আনন্দিত।……… সমিতির এই সব বস্তুর কাজ আমি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখছি। এর ভিতর দিয়ে মেয়েরা আত্মনির্ভরতা শিখছে—আর তারই ফলে তারা আত্মসম্মান অর্জ্জন করছে।"

"জনসেবাই কংগ্রেসের কাজ, উহাতে দলগত রাজনীতির স্থান নাই"—নাইডুর উক্তি

২৮শে ডিসেম্বর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পূর্ব-কলিকাতায় রিলিফকেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করেন। নারিকেলডাঙ্গা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির অফিসে পৌঁছাইয়া তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বলেন,—রোগাক্রান্ত মানুষের জন্য আমরা যাহা করিতেছি, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ক্ষেত্রের বৃহত্তর সমস্যায় আমাদের ঠিক তাহাই করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া **পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া মহামারী আক্রান্ত ও পীড়িত জনসাধারণের জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন সকলকে একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে।**

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমূল্য রায়, দুর্গাপদ ঘোষ, মৌলভী হামিদ শাহেব ও স্থানীয় বহু রিলিফকর্ম্মী শ্রীযুক্তা নাইডুর বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম লীগের নেতা লাল মিঞা ও কমিউনিষ্ট-কর্ম্মীরাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

এখানে পৌঁছার আগে তিনি বিভিন্ন-রিলিফক্ষেত্রে যান। বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটীর বাগমারী রোড কেন্দ্রে তিনি বলেন,—কংগ্রেস জনসেবার প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়ের জন্য কংগ্রেস কাজ করে। এই তো স্বরাজ। যদি লোকই মরিয়া গেল তো স্বরাজ কার জন্য? নিজেদের অন্তর্বিভেদ মিটাইয়া লওয়াই স্বরাজের সংগ্রাম।

মুসলিম লীগের রিলিফ কেন্দ্র দেখিতে গিয়া তিনি শুনিলেন যে, মুসলিম লীগের বিভিন্ন রিলিফ কেন্দ্রে কলিকাতায় মোট ২ লক্ষ রোগীর সেবা করা হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলেন, কংগ্রেসের ন্যায় লীগও জনসেবা করিতেছে। একটী মুসলমান জ্বরাক্রান্ত শিশুকে আদর করিয়া তিনি বলেন,—কুইনানের সাহায্যে সৈন্যের মতো ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে তোমাকে লড়াই করিতে হইবে। বস্তীর মুসলমানেরা তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়।

কাকুরগাছির রেড ফ্ল্যাগ রিলিফ সেণ্টারে গিয়া শ্রীমতী নাইডু জানিতে পারেন যে,—দরিদ্র শ্রমিকদের দুই চারি পয়সা সাহায্যে এই কেন্দ্র চলিতেছে। ৮ই ডিসেম্বর হইতে এই কেন্দ্রে ৩০০০ রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া যায়।

নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কেন্দ্রে গিয়া তিনি ডাক্তাররা কি ভাবে চিকিৎসা করে ও কি ধরণের রোগা এখানে আসে এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন।

কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তিনি সকলকে বলেন, কর্পোরেশনের সমস্ত দলকে এই কাজে এক সঙ্গে নামিতে হইবে—এখানে দলগত রাজনীতির স্থান নাই। তিনি যখন শুনেন যে অনেকে মনে করিতেছে বাংলার সংকট শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি স্তম্ভিত হইয়া উঠেন—মানুষ যখন পথ্য পায় না তখন একথা বলা বাতুলতা। রোগের বিরুদ্ধে লড়াইএর দায়িত্ব কর্পোরেশনের না সরকারের এই প্রশ্ন উঠিলে তিনি বলেন, মানুষ মরিতেছে আর আমরা এই প্রশ্নে ডুবিয়া আছি!

এই সমস্ত রিলিফ-কেন্দ্র দেখিয়া তিনি বলেন—ইহাই প্রকৃত কাজ। মেয়েদের রোগীসেবায় উদ্যোগ, দরিদ্র শ্রমিকদের রিলিফ প্রচেষ্টা আর মুসলিম-লীগের সহানুভূতি—এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি ঐরূপ মন্তব্য করেন।

নতুন সাহিত্য হবে ছয় কোটি বাঙ্গালীর ভাষা ও কামনা

★ তারাশঙ্করের অভিভাষণ

কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব অভিভাষণ দেন। বাংলা সাহিত্য আজ যে অবস্থার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, প্রথমে তাই বর্ণনা করে তিনি বলেন:

"সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার মহাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিছক জীবন তাড়নায় মা কোলের ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে; বাপ সন্তানকে হত্যা করছে; স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নী বিক্রী করছে মানুষ; নারী নিজেকে বিক্রী করছে। …হাজারে হাজারে মানুষ এল মহানগরীতে। …তারপর তারা ফুটপাথে শুল—মরল। আশ্চর্য্যের কথা তারা একবার বল্লেনা—কেন আমরা না খেয়ে মরছি? বল্লে না—আমরা বাঁচতে চাই…আমরাও মানুষ।"…

এই অবস্থায় বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দায়িত্বের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে "নেতিবাদ বাঙ্গালীর জীবনে আজ প্রবল হলেও" বর্ত্তমান যুগের স্রষ্টা সাহিত্যিকরা "রামমোহন হতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সৃষ্ট সাহিত্যের হানি করেন নি।" তবুও কেন এমন হ'ল—"ভাষাহীন শিশুর" মত বাঙ্গালী কেন খাদ্যাভাবে কাতরিয়ে মরল?"

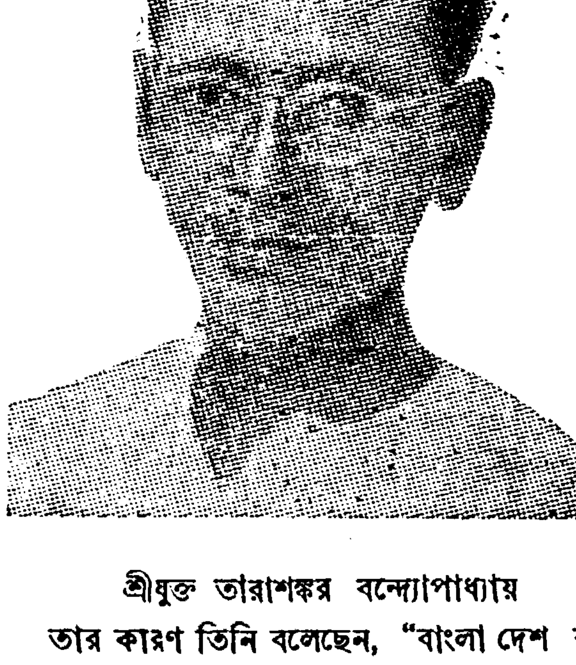

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তার কারণ তিনি বলেছেন, "বাংলা দেশ বাংলা সাহিত্য থেকে ভাষা খুঁজে পায়নি।" সে "সাহিত্য ন লক্ষ (শিক্ষিত) লোকের সাহিত্য।"

"ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত। কারণ আমাদের জীবনের গতিবেগ পৃথিবীর গতিবেগের মত সমগতিতে চলছে না।……

"এর একমাত্র পথ আমাদের সাহিত্যের আদর্শ এবং বাণীকে বাঙ্গালীর জীবনে সার্থক করে তোলা। অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে বাঙ্গালীর সমগ্র সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে তোলা।……

তার উপায় হ'ল: "সমগ্র জাতিকে টেনে তুলে আনতে হবে এমন স্তরে যে-স্তরে এসে তারা গ্রহণ করতে পারবে এই সাহিত্য।…ধীর গতিতে সংস্কার-পন্থার আদর্শের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত করতে হবে। যার আবেগে বর্ত্তমানকে পরিবর্ত্তন করে নূতন সার্ব্বজনীন ভাবী জীবন রূপায়িত করবার গভীর ভাবনায় ভাবিত হয়ে উঠবে শিক্ষিত বাঙ্গালী।……

তার মানে এই নয় যে সাহিত্য প্রচারধর্ম্মী হবে। তিনি বলছেন যে পৃথিবীতে যা-কিছু মহৎ সাহিত্য (Great Art) "তার মধ্যে বড় আদর্শবোধ আছেই এবং সে বোধ লেখকের সেই আদর্শের উপর গভীর বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।…দৃষ্টিকে পারিবারিক গণ্ডী থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে" হবে।

…"বাংলা দেশের চাষীও তো ভাবে বেহেস্তের কথা বৈকুণ্ঠের কথা; তখন সে কি ভাবেনা ইহলোকে মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের কথা—সে কি ভাবেনা জীবনে স্বাধীনতার কথা?…নিশ্চয় সে এসব কথা ভেবেছে। সে ভেবেছে জীবনে সে মহৎ হবে, সমাজে সে গণনীয় হবে, অন্যায় অবিচারের প্রতীকার করবে…সে কামনা করেছে সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে তার ঘর, কামনা করেছে তার গ্রাম হয়ে উঠবে সমৃদ্ধতর, গৌরবান্বিত। তারই মধ্যে তো রয়েছে জাতির কামনা…।"

বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা যে সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থাৎ সমগ্র জীবনক্ষেত্রকেই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যত হয়েছেন এবং তার আলোচনার জন্যে কয়েকটী সঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন তার উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে এর মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি উগ্র হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি সাবধান করে বলেছেন,

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জনগণের কর্ত্তৃত্বে নূতন পোলাণ্ড,
না সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের প্রাচীন শৃঙ্খল?

কয়েকদিন আগে পার্লামেন্টে চার্চিলের বক্তৃতার পর সকলের মনেই পোলাণ্ড সম্বন্ধে নূতন করিয়া কৌতুহল জাগিয়াছে। লণ্ডনের পলাতক পোলিশ গভর্ণমেণ্ট এবং লুবলিনের পোলিশ জাতীয় মুক্তিসংসদ কাহাদের নিয়া গঠিত এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধেরই বা কারণ কি—এ প্রশ্ন সকলের মনেই দেখা দিয়াছে।

পোল জাতির অতীত ইতিহাসেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। ১৭৯৩ হইতে গত মহাসমর পর্য্যন্ত পোল জাতি শুধু পরাধীন নয়, তিনভাগে বিভক্ত ছিল। জার্ম্মান সাম্রাজ্য, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য এবং রুশিয়ার জার সাম্রাজ্য পোলাণ্ডকে ভাগ করিয়া নিয়াছিল। তাহাদের আওতায় পোলাণ্ডে মধ্যযুগীয় জমিদারশ্রেণী সকল প্রকার স্বাধীনতা এবং প্রগতির বিরোধী শক্তি হিসাবে ১৭৯১, ১৮৩০ এবং ১৮৬৩ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে পরাস্ত করে।

১৯১৪-র মহাসমরে জার্ম্মান সাম্রাজ্য পরাজিত হয় এবং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রুশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষক, বলশেভিকদের নেতৃত্বে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া সোভিয়েট-তন্ত্র কায়েম করে। বিজয়ী মিত্রপক্ষ সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া জার্ম্মানীতে বিপ্লব ঠেকাইবার জন্য ধনিক এবং য়ুংকারদের (প্রাশিয়ান জমিদারশ্রেণী) শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সেইরূপ সোভিয়েটের সারা সীমান্ত ঘিরিয়া তাহারা যেন তেন প্রকারেণ প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতে থাকে। ফিনল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্র সমূহ, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ইত্যাদি নিয়া এই "প্রতিষেধক বেড়াজাল" (Cardon Sanitaire) সৃষ্টি হয়।

দেড় শত বৎসরের পরাধীনতার পরে পোলাণ্ড স্বাধীন হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিদের সহায়তায় পোল জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়া রহিল সেই পুরাতন মধ্যযুগীয় সামন্তগোষ্ঠী।

১৯২১ বনাম ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্র

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অসীম বীরত্ব ও ত্যাগের সহিত লড়িয়াও পোল জাতি স্বদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। তাহাদের দেশ হইয়া দাঁড়াইল সামন্ততন্ত্র ও সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তের প্রধান কেন্দ্র। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—১৯২১ সালের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পরিণতি। এই শাসনতন্ত্রে ২১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কদের সার্ব্বজনীন ভোট অনুসারে পোলাণ্ডের গণপরিষদ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্রের সভাপতি গণপরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহার ক্ষমতা যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সভাপতি (যেমন ফ্রান্স) অপেক্ষা অধিক ছিল না। দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল গণপরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এক মন্ত্রী-পরিষদের উপর। শাসনতন্ত্রে পোলাণ্ডের সকল জাতির রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

প্রথম হইতেই এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। শাসক-সম্প্রদায় দমননীতি ও জবরদস্তির সাহায্যে ১৯৩৫ সালে সম্পূর্ণ নূতন এক শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেয়। এই শাসনতন্ত্রে মন্ত্রী-পরিষদ, গণপরিষদ, সেনাবাহিনী, এমন কি বিচারশালাগুলিকে অবধি সভাপতির অধীনে আনা হইল। সভাপতি তাহার কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী রহিলেন একমাত্র "ঈশ্বর এবং ইতিহাসের" কাছে। গণ পরিষদে নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং জমিদার গঠিত "নির্ব্বাচন-সংসদ" কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইতে হইত। উচ্চ পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সভাপতি কর্ত্তৃক মনোনীত হইত। অবশিষ্ট সদস্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত মাত্র তিনলক্ষ লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত।

এই শাসনতন্ত্র বাস্তবিক পক্ষে ডিক্টেটর প্রথারই নামান্তর। তাই ১৯৩৫এর নির্ব্বাচনে মোট ভোটদাতার দুই তৃতীয়াংশ ইহাকে বয়কট করিয়াছিল।

কৃষক, মজুর ও সংখ্যালঘু জাতির দুরবস্থা

মাত্র ১৬০০০ জমিদার দেশের সমস্ত জমির শতকরা ৪৫ ভাগের মালিক ছিল। অন্যদিকে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ ভূস্বামীরই ১২ একারের বেশী জমি ছিল না। শতকরা ৩০ ভাগের ৫ একারেরও কম ছিল। সমস্ত কৃষকদের প্রায় অর্দ্ধেকের একটি ঘোড়াও ছিল না। বেশীর ভাগ কৃষকেরই একমাত্র খাদ্য ছিল আলু এবং রাই। ১৯২৭এ মিঃ বেকেট নামক বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য পোলাণ্ড অধিকৃত পশ্চিম ইয়ুক্রেন পরিদর্শন করিয়া বলেন যে সেখানকার চাষীদের অবস্থা ভারতবর্ষের কৃষকদের মতই শোচনীয়।

কারখানার শ্রমিকদের বেতন ছিল পুরুষদের জন্য সপ্তাহে ১২ শিলিং, মেয়েদের সপ্তাহে ৬ শিলিং। অধ্যাপক রোজ বলেন যে তাহাদের জীবনযাত্রা ইয়োরোপের সর্ব্বনিম্ন স্তরে। মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি কেবলমাত্র পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিতে পারিত।

সেনাবাহিনীর অফিসার-গোষ্ঠীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছিল। পোলাণ্ডই ইয়োরোপের একমাত্র দেশ যেখানে অফিসাররা তাহাদের "ইউনিফর্মের মর্য্যাদাহানি" হইয়াছে মনে করিলে যে কোন লোককে গুলি করিতে পারিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। ইহুদিরা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পলাতক গভর্ণমেণ্টের অনেকেরই ইহুদি-বিদ্বেষ নাকি নাৎসিদেরও হার মানায়। ১৯২০ সালে পিলসুডস্কি যে সব বেলো-রুশ এবং ইউক্রেনিয়ানদের জোর করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের উপরও অত্যাচার চলিতে থাকে। তাহাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি চর্চ্চা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়। ১৯২০ সালে পোলাণ্ড অধিকৃত ইউক্রেনে ইউক্রেনিয়ান স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৬০০,—১৯৩৫এ অবশিষ্ট ছিল মাত্র ৪৫৭ (সরকারী হিসাব)। জমিদার ছিল প্রায় সবাই পোল জাতীয়। এসব অঞ্চলে রায়তদের উপার্জ্জনের হার অন্য অঞ্চল অপেক্ষা শতকরা ৩০ বা ৪০ ভাগ কম ছিল।

শাসকশ্রেণী দেশরক্ষায় অক্ষম

বেক, স্মিগলি-রিজ প্রভৃতি শাসকদের সোভিয়েট বিরোধী চক্রান্ত এবং হিটলার-তোষণ নীতির ফলে ১৯৩৯এ পোলাণ্ড যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। শাসকদের নীতির ফলে জনসাধারণ নাৎসি আক্রমণের সামনে একরকম অসহায় হইয়া পড়ে। তিন সপ্তাহের মধ্যে পোলাণ্ড সম্পূর্ণভাবে নাৎসি করতলগত হইল। জনসাধারণকে শত্রুর মুখে ছাড়িয়া দিয়া শাসকগণ যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল।

তাহার পর বিজিত পোলাণ্ডে যে পরাক্রমশালী প্রতিরোধ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহার তরফ হইতে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয় যে জার্ম্মান বিজেতাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাহা স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক পোলাণ্ডের জন্য সংগ্রাম। দেশপ্রেমিকদের এই অকুণ্ঠ রক্তপাতের পর যে পোলাণ্ড জন্ম নিবে তাহার রূপ ১৯৩৯এর পোলাণ্ড নয়। পোলাণ্ডের গুপ্ত জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল) ও উহার মনোনীত জাতীয় মুক্তি সংসদ একথা ঘোষণা করিয়াছে।

মুক্তি সংসদের ইস্তাহার

এই সমস্ত নীতি পোলিশ জাতীয় মুক্তি সংসদের ১৯৪৪এর ২২শে জুলাইর ইস্তাহারে কার্য্যকরী রূপ পায়। ইস্তাহারে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে ১৯২১ সালের গঠনতন্ত্র আবার প্রচলিত হইবে। কিছুদিন পর সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচিত একটি "কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি" আহ্বান করা হইবে। ইতিমধ্যে সকল গণপ্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে গণপরিষদ গঠন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

নাৎসীদের গঠিত সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থা দূর করিতে হইবে। তাহাদের দেশদ্রোহী "ব্লু পুলিশ" ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার বদলে প্রতিরোধ বাহিনীর সভ্যদের নিয়া গঠিত একটি অ-সামরিক বাহিনী গঠন করিতে হইবে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে কিন্তু ফ্যাশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দমনে কোন দ্বিধা দেখান চলিবে না। তেমনই শত্রু যে সম্পত্তি বে-দখল করিয়াছে তাহা পুরাতন মালিককে ফিরাইয়া দিলেও জার্ম্মানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

যে ইহুদিরা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের বিশেষ করিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে তাহাদের বর্ত্তমান চরম দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে।

সমগ্র দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক এবং যানবাহন সংক্রান্ত সম্পত্তি যতদিন না মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হয় ততদিন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

জার্ম্মানদের এবং দেশদ্রোহীদের জমি সরাসরি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ১২৫ একারের অধিক জমিসম্পন্ন জমিদারের জমিও বাজেয়াপ্ত করা হইবে, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইলেও নাগরিক হিসাবে সকল অধিকার দেওয়া হইবে। এই সকল জমি একটা নির্দ্দিষ্ট দামে ক্ষেতমজুর, দরিদ্র কৃষক, মধ্যবর্গের কৃষক, ছোট রায়ত এবং বড় পরিবার সম্পন্ন কৃষকদের দেওয়া হইবে। প্রত্যেক সাধারণ পরিবার যাহাতে মোটমাট ১২৷ একর জমি পায় তাহা দেখা হইবে। জার্ম্মানী হইতে যে সব অঞ্চল (পূর্ব্ব প্রাশিয়া ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন করা হইবে তাহা এইভাবে ব্যবহার করা হইবে। নাৎসীরা 'যা' আদায় করিত তাহা হইতে অনেক কম খাজনা (তাও শস্যে দেয়) ছাড়া আর কিছুই কৃষকদের দিতে হইবে না। এই শস্যও কেবলমাত্র সেনাবাহিনী ও শহরগুলিকে খাওয়াইতে যেটুকু দরকার তার বেশী হইবে না।

রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্বাধীন ব্যবসা সমর্থন করা হইবে, সেই সঙ্গে আবার বৃহৎ আকারে সমবায় বা কো-অপারেটিভ আন্দোলনেরও চেষ্টা করা হইবে।

ইস্তাহারের বাকি অংশের উদ্দেশ্য যাহাতে দেশবাসী স্বাচ্ছন্দ্য এবং সচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়া সংস্কৃতি চর্চ্চার সুযোগ পায়। শিক্ষার আয়োজনের মধ্যে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, কারণ ইহাদের উপরই নাৎসীরা বিশেষভাবে কুপিত ছিল।

পলাতক শাসকের দিন শেষ

মুক্তি-সংসদের এই ইস্তাহার যুধ্যমান পোলদের অধিকাংশেরই মধ্যে এত বেশী সমর্থন লাভ করিয়াছে যে, ৩০শে জুলাই লণ্ডন রেডিও মারফৎ পলাতক পোল গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি ঘোষণা করিয়াছে "আমরা পূর্ব্বেই এই রকম কিছু ভাবিতেছিলাম।" "পলতক"দের পরিকল্পনা দেখিলে মনে হয় উপরোক্ত ইস্তাহারেরই নকল, তফাৎ শুধু এই যে উহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই নকলের অবশ্য রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আছে। ২২শে জুলাইর ইস্তাহার জনসাধারণকে এতটা জাগাইয়াছে যে রাজনৈতিক ব্যবধান ঘুচিয়া যাইতেছে। শুধু রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যবধানই নহে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবধানও ইহার আহ্বানে ঘুচিয়া যাইতে বাধ্য। নাৎসী-পদানত ইয়োরোপের যেখানেই জনসাধারণ আজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছে, সেখানেই তাহারা প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প; ১৮৪৮ এবং ১৯১৯-২০তে যে প্রতিক্রিয়া গণতন্ত্রকে মাথা তুলিতে দেয় নাই সেই প্রতিক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্যই তাহারা প্রাণ দিয়া লড়িতেছে।

ওয়ারস বিদ্রোহের আসল ঘটনা

★ [জনৈক বিদ্রোহীর বিবরণ] ★

গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনস্থ পলাতক পোলিশ সরকারের প্রতিনিধি জেনারল বর-এর নির্দ্দেশে ওয়ারসতে যে বিদ্রোহ হয়, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সোভিয়েটবিদ্বেষীরা দেশে দেশে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়াছে। সম্প্রতি জনৈক পোলিশ ইঞ্জিনিয়ার (যিনি স্বয়ং ওয়ারস বিদ্রোহে লড়িয়াছেন) এই বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। নীচে আমরা তাহার সারমর্ম্ম তুলিয়া দিলাম।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাস। মার্শাল রোকোসভস্কির নেতৃত্বে লালফৌজ পূর্ব্ব পোলাণ্ডের চেল্‌ম, লুবলিন প্রভৃতি শহর হইতে জার্ম্মানদের হটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানরা ওয়ারস শহর প্রাণপণে রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ওয়ারসর সন্নিকটে লালফৌজ। কিন্তু যতক্ষণ না লালফৌজ ভিশ্চুলার পশ্চিম তীরে তার ঘাঁটি মজবুত করিতে পারে, যতক্ষণ না ওয়ারসর বিদ্রোহীদের সহিত লালফৌজের সংযোগ স্থাপিত হয়, ততক্ষণ শহরে বিদ্রোহ আরম্ভ করা সময়োচিত হইবে না—পোলিশ দেশভক্তরা তখন এইভাবে চিন্তা করিতেছে। কিন্তু জেনারাল বর তখন কাহারো সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহার হোম আর্মি মারফৎ ১লা আগষ্ট বিদ্রোহ শুরু করিয়া দিল।

বিদ্রোহ যখন অসময়ে আরম্ভ হইয়াই গেল তখন অন্যান্য দেশভক্ত গুপ্ত বাহিনীও এই বিদ্রোহে যোগ দিল। পোলিশ জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগঠন গড়িয়া উঠিল। পোলিশ জাতীয় কমিটি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে নাই, ইহাকে জেনারাল বর-এর বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে—কিন্তু বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন যেমন করিয়াই হউক জার্ম্মানদের হটাইতেই হইবে।

প্রথম তিন দিন বিদ্রোহীরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জ্জন করিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বিদ্রোহীরা সুবিধা করিতে পারিল না, পিছু হটিতে বাধ্য হইল। জেনারাল বর-এর হোম আর্মি তেমন জোরালো ভাবে যুদ্ধ করিল না। ফল সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। শহরের অধিবাসীদের উপর ক্ষিপ্ত জার্ম্মানরা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহারা জলের পাইপ কাটিয়া দিল। অসহায় নাগরিকদের উপর নির্ব্বিচারে বোমাবর্ষণ করিতে লাগিল। শহরে জল না থাকায় আগুন অবাধে ছড়াইতে লাগিল। যাহারা জলের জন্য লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের উপর জার্ম্মানরা উড়োজাহাজ হইতে গোলা ছুঁড়িতে লাগিল।

গোড়াতে যাহারা ভাবিয়াছিল লালফৌজের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াই এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের ভুল ভাঙিতে দেরী হইল না। জেনারাল সোস্‌নকোস্কি ও জেনারাল বর যে পলাতক পোলিশ সরকারের সহিত চক্রান্ত করিয়া ওয়ারস'র দেশভক্তদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে—ইহা সকলের কাছেই পরিষ্কার হইল। পলাতক পোলিশ সরকার এই বিদ্রোহের সময় শহরবাসীর দুঃখমোচনে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। ব্রিটিশ, মার্কিন, দক্ষিণ আফ্রিকান ও পোলিশ বৈমানিকেরা কিছু কিছু অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই শত্রুপক্ষের হাতে পড়িয়াছে। জেনারাল সোস্‌নকোস্কি অথবা বর কেহই সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের অবস্থানের সঠিক সংবাদ দেয় নাই কিম্বা পোলিশ সামরিক কপর্ত্তৃক্ষের সহিত সোভিয়েটের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে নাই।

৪২ দিন পর খবর পাইয়া শত শত পোলিশ ও সোভিয়েট বৈমানিক জার্ম্মানদের গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র ও রসদ পৌঁছাইয়া দেয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সোভিয়েট ও পোলিশ সৈন্যবাহিনী প্রাগা দখল করিল। জার্ম্মানরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়া তখন ওয়ারস'র বিদ্রোহীদের দাবাইবার চেষ্টা করিল। জার্ম্মানদের বিপুল শক্তির সামনে ওয়ারস'র বিদ্রোহীদের আর দাঁড়াইবার উপায় থাকিল না। ওয়ারসর হোম আর্মির কাছে সোভিয়েট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, জার্ম্মান লাইন ভেদ করিয়া সমস্ত বিদ্রোহী ও দেশভক্ত নাগরিকের দল লালফৌজের এলাকায় চলিয়া আসুক। পিপল্‌স আর্মি ইউনিটগুলি জার্ম্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া ভিশ্চুলার দক্ষিণ তীর দিয়া লালফৌজের সহিত মিলিত হইল। লালফৌজ জার্ম্মানদের উপর অবিরাম গোলা বর্ষণ করিয়া বিদ্রোহীদের পথ করিয়া দিল। কিন্তু জেনারল বর জার্ম্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ওয়ারস'র সহস্র সহস্র নিরপরাধ নাগরিককে সে এইভাবে শত্রুর কাছে সঁপিয়া দিল।

জঘন্য নাৎসী বর্ব্বরতা, নিরস্ত্র শান্তি-দূতকে হত্যা

বুডাপেষ্ট প্রায় লালফৌজের দখলে

সোভিয়েট রণাঙ্গনে বুডাপেষ্টের লড়াই যদিও এখন শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে, তবুও ইহার ভীষণতা একটুও কমে নাই। জার্ম্মানদের প্রায় ৫০,০০০ হাজার বাছা বাছা সৈন্য এখানে লালফৌজের বাহু বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ায় জার্ম্মানরা মরিয়া হইয়া লড়িতেছে।

মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে—অচিরেই বুডাপেষ্টের ভাগ্য নির্ণীত হইবে।

এই ফ্রণ্ট হইতে সর্বশেষ যে খবর আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে সহরের অধিকাংশ এলাকাই লালফৌজের দখলে আসিয়াছে এবং অবরুদ্ধ জার্ম্মান বাহিনীগুলিকে অল্প পরিসর স্থানে চাপিয়া ফেলা হইয়াছে। 'রেডষ্টার' পত্রিকা জানাইয়াছে—সকল দিকে আমাদের অগ্রগতির চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

নাৎসীদের বর্ব্বরতা

অবরুদ্ধ জার্ম্মানদের ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়াই যাহাতে অযথা লোকক্ষয় না হয় এবং সহরটির অবশিষ্ট অংশকে বাঁচানো যায় সেই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালানোর জন্য যে দুইজন আলোচনাকারীকে শ্বেতপতাকা নিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় লালফৌজের তরফ হইতে পাঠান হইয়াছিল, তাঁহাদের একজনকে পৌছার পূর্ব্বেই জার্ম্মানরা গুলি করিয়া হত্যা করে এবং আর একজনকেও ফেরার পথে পিছনের দিক হইতে গুলি করিয়া মারা হয়। নাৎসীদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বর্বরতার ইহা আর একটি নিদর্শন।

ইহার পর সোভিয়েটের . পক্ষ হইতে মার্শাল তলবুখিন ও মার্শাল মালিনোভস্কী বুডাপেষ্টের অবরুদ্ধ জার্ম্মান সেনাপতির উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের চরম আহ্বান জানাইয়াছেন। সোভিয়েট চরমপত্রে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, রণসম্ভার ও যানবাহন অর্পণ করার দাবী করা হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার ৫০ মাইল দূরে লালফৌজ

মার্শাল মালিনোভস্কীর সৈন্যদের এক বাহু বুডাপেষ্টে আসিয়া মার্শাল তলবুখিনের সৈন্যদের সাথে মিশিয়াছে এবং অপর এক বাহু বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়া ব্রাটিস্লাভার ফাঁকের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। ব্রাটিস্লাভা চেকোস্লোভাকিয়ার একটি বিখ্যাত যানবাহন কেন্দ্র এবং অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার প্রধান রক্ষাব্যূহ। জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী ৩০শে ডিসেম্বর যে খবর দিতেছে তাহাতে জানা যায় যে লালফৌজ ব্রাটিস্লাভা উপত্যকার দিকে এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

মার্শাল তলবুখিনের সৈন্যদলের অপর আর একটি অংশ বুডাপেষ্টের পশ্চিমে গয়র নামক প্রসিদ্ধ রেলজংশনের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে আগাইতেছে। এই সৈন্যদলের ও মূল লক্ষ্য অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা! এই অঞ্চলেই লালফৌজ ভিয়েনার সর্বপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পূর্ববর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে মার্শাল তলবুখিনের বাহিনী অষ্ট্রিয়া সীমান্ত হইতে অনুমান ৫০ মাইল দূরে আছে।

পশ্চিম ফ্রণ্টের লড়াই

লুক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ বেলজিয়ামে আর্ডেনিস এলাকায় জার্ম্মানদের যে পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছিল, অনেকস্থানেই তাহার গতি মন্থর হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। বাষ্টগনে যে মিত্রবাহিনী অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ রকেফোর্ট নামক সহরটি আবার মিত্রবাহিনী দখল করিয়াছে।

আক্রমণের প্রথম দুই সপ্তাহে জার্ম্মানরা প্রায় ৬০ মাইল পথ আগাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদের অগ্রগতি নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জার্ম্মান সৈন্যদের আক্রমণের প্রথম উদ্যম শিথিল হইয়া গেলেও জার্ম্মানরা যে আরএকবার জোর চেষ্টা করিয়া দেখিবে তাহা বোঝা যাইতেছে সব শেষের খবরগুলি হইতে। মিউজ ও মোইজল নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে দুই পক্ষ এত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে যে পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধরত ডিভিশনগুলির আধাআধি এখন তথায় যুদ্ধে লিপ্ত আছে। রয়টার আর একটি সংবাদে জানাইতেছে—'অদ্য (৩০শে ডিসেম্বর) রাত্রিতে . জার্ম্মানরা মিত্রপক্ষের বাষ্টগনের সংযোগমুখ; বন্ধ করায় এবং সহরের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করায় উদ্দেশ্য শক্তিশালী সাড়াশী আক্রমণ চালায়।'

ফ্রান্স ও সোভিয়েটের চুক্তি

স্বাধীনতাকামী ফরাসী জনগণের জয়

সামরিক ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সভাপতি জেনারেল দ্য গোল মস্কো গিয়া গত ১০ই ডিসেম্বর ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন। এই চুক্তির কয়েকটী প্রধান সর্ত্ত হইল:

হিটলারী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েট ও ফ্রান্স একসঙ্গে লড়িবে, পরস্পরকে সাহায্য করিবে, একের অনুমতি ভিন্ন অপরে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন আপোষ-চেষ্টা করিবে না। এই যুদ্ধের পরে জার্ম্মানী যদি আবার কোন নূতন আক্রমণের চেষ্টা করে তবে দুই পক্ষই সম্মিলিত ভাবে তাহার বিরুদ্ধে লড়িবে।

কোন পক্ষই অপরের বিরোধী কোন দল-বন্দীতে যোগ দিবে না।

যুদ্ধের পর উভয় দেশের পুনর্গঠনে উভয়েই অর্থনৈতিক সাহায্য করিবে।

নাজী জার্ম্মানীর আশা ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো পশ্চিম ইয়োরোপে সোভিয়েট-বিদ্বেষের আশ্রয় লইয়া কোনো রকমে বাঁচা যাইতে পারে। চেম্বারলেনী ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রেতাত্মারও আশা ছিল যে ফ্রান্সকে কুক্ষিগত করিয়া ভবিষ্যৎ ইয়োরোপে আবার সোভিয়েট-বিদ্বেষের অস্ত্রে রাজ্য জয়ের খেলা খেলিতে পারা যাইবে। ফ্রান্স ও সোভিয়েটের চুক্তিতে এই দুই দুরাশাই একেবারে নির্ম্মূল হইল।

জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্যলিপ্সা হইতে ফরাসী দেশের পক্ষে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় যে সোভিয়েট ও ফ্রান্সের ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সতর্কতা তাহা ফরাসী জনসাধারণ অতীতেও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্ট আন্দোলনের চাপে ফ্রান্স ও সোভিয়েটে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

কিন্তু হিটলার, চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের মিউনিক চক্রান্তে সে চুক্তি নিস্ফল হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী দাসত্ব ও অপরিসীম যন্ত্রণায় ফ্রান্সকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

পেতাঁ প্রভৃতি নাৎসী-ভৃত্যদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনসাধারণ যখন হইতে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হইল, সমস্ত ফরাসী জাতি দ্য গোলের নেতৃত্বে হিটলার ও ভিশিপন্থীদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইতে লাগিল, সোভিয়েটের অপূর্ব্ব বীরত্ব যখন ইয়োরোপের সমস্ত ফ্যাশিষ্ট-বিরোধীদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল; তখন হইতেই আবার ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হইল। ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরে সোভিয়েট দ্য গোলকে স্বাধীন ফরাসীদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিল। আবার ১৯৪৩-এর অগাষ্টে মার্কিণ সাম্রাজ্যপতিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সোভিয়েটই সর্ব্বপ্রথম ফরাসী জাতীয় মুক্তি সংসদকে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইল। এখন সেই সংসদের গবর্ণমেণ্টই ইংলণ্ড ও আমেরিকা দ্বারা ফ্রান্সের সামরিক গবর্ণমেণ্ট রূপে স্বীকৃত। সোভিয়েটের সুপারিশে ইয়োরোপের মন্ত্রণা-কমিশনে ফ্রান্স অন্য ৩টী শক্তির সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে।

হিটলার ও তাহার সহিত সহযোগিতাকারী ফরাসী বিভীষণদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফরাসী জনসাধারণ যতই সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অধিকারও ততই বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনও ততই সুদৃঢ় হইয়াছে। এই মৈত্রী কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয়, কারণ ফরাসী সামরিক গবর্ণমেণ্টে ফরাসী জনগণের প্রভাব প্রচুর এবং তাহা প্রতিদিন বাড়িতেছে। সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীর সিদ্ধান্ত তাহাদেরই সিদ্ধান্ত—প্রতিনিধি-পরিষদ উহাকে একবাক্যে সমর্থন করিয়াছে। তাই আমেরিকার "টাইম" পত্রিকার মত কমিউনিষ্ট বিদ্বেষীও ৪ঠা ডিসেম্বর খবর দিতে বাধ্য হইয়াছে যে ফরাসী প্রতিনিধি-পরিষদে চুক্তির প্রস্তাব যখন আলোচনা হয় তখন পরিষদের সভ্য ও "প্রাচীন কমিউনিষ্ট বঁতের এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায়ই" সারা পরিষদে "বজ্রনাদের মত আনন্দধ্বনি পড়িয়া যায়"।

শ্যামাপ্রসাদ ও সাভারকরে তফাৎ কি?

——————লেখক: পি, সি, জোশী——————

বাংলা দেশে অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকাই প্রধানত কংগ্রেসের মতামত গঠন করে। হিন্দুসভার বিলাসপুর অধিবেশন সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্য হইতে সমস্ত কংগ্রেসসেবীই বুঝিতে পারিবেন যে তাহারা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বদলে বরং কংগ্রেস-হিন্দুসভা যোগাযোগের কথাই ভাবিতেছে।

২৫শে ডিসেম্বর "অমৃতবাজার" লিখিয়াছে:

"ডাঃ মুখার্জ্জি তাঁহার বিশিষ্ট পূর্ব্বগামীর (সাভারকরের) তুলনায় যেমন কম উগ্র, তেমনি মতামতের দিক দিয়া তিনি অনেক বেশী উদার। তাঁহার আবেদন জাতির কাছে অনেক বেশী ব্যাপক, তাঁহার মোট দৃষ্টিভঙ্গীতেও মিঃ সাভারকরের তুলনায় গোঁড়ামি কম।...মিঃ সাভারকর মনেপ্রাণে কংগ্রেস-বিদ্বেষী; বাংলা হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নেতা (ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ) কংগ্রেস ও মহাসভার মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করিতে চান—এতখানি যদি নাও বলা যায়, বলা চলে তিনি দুয়ের মধ্যে দূরত্ব কমাইয়া আনিবার জন্য উৎসুক।"

২৬শে ডিসেম্বর "যুগান্তর" লিখিয়াছে:

"একটা আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িক বক্তৃতায় সস্তা করতালির মোহ ত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে ঐক্য সংগঠন ও শক্তি অর্জ্জনের পথে হিন্দুদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এজন্য তিনি সমগ্র জাতির ধন্যবাদার্হ।...কাহারো স্বার্থ নাশ করিয়া নহে, সকল স্বার্থের সম্মিলিত ঐক্যেই তিনি জাতি গঠনের আবেদন জানাইয়াছেন।"

আর "আনন্দবাজার" শ্যামাপ্রসাদের পন্থাকে বলিয়াছে "ইহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা এবং জিন্না সাহেবের সহিত ব্যর্থ আলোচনার পরে কংগ্রেস এই পন্থাই অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।"

কংগ্রেসী কাগজগুলির এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক? একই সঙ্গে কংগ্রেস-বিদ্বেষী ও লীগবিদ্বেষী যে হিন্দু লড়াইবাজির পথ, সেই পথ হইতে শ্যামাপ্রসাদ কতখানি আগাইয়াছেন তাহার কয়েকটী নমুনা আমরা তাঁহার বিলাসপুরের অভিভাষণ হইতে তুলিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—

'হিন্দুর স্বার্থ এবং সমগ্র জাতির স্বার্থ একই।'

হিন্দুমহাসভার এই উক্তিকে কংগ্রেস বরাবর ঘৃণার চোখে দেখিয়াছে। কংগ্রেস নিজেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আরও বলিয়াছেন,—

'মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল দাবী-দাওয়াগুলিকে তুষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টায় কংগ্রেস হিন্দুর স্বার্থ বলি দিতে ছাড়ে নাই।'

হিন্দুমহাসভার মুঞ্জে সাভারকরও এতদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্যামাপ্রসাদের নতুনত্ব কোথায়? তিনি বলেন,

"নিজের শক্তির জোরে মুসলিম লীগ তাহার পাকিস্তান দাবী কখনই আদায় করিতে পারিবে না—লীগনেতা এরূপ আশাও করেন না। লীগ নেতা ভারতবর্ষ ভাগাভাগি করার জন্য বৃটিশের মুখাপেক্ষী।"

গান্ধীজি সম্প্রতি যে উপবাসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, 'ডন' পত্রিকা তাঁহাকে চতুর হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল—তাহার অন্য কারণ, কায়েদে আজম জিন্নাকে বৃটিশের দালাল বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইতেছিল এবং শ্যামাপ্রসাদের মত নেতারা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিষ ছড়াইতেছিলেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন,

"মিঃ জিন্নার ও মুসলিম লীগের সুনাম যখন ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, তখন গান্ধীজি আসিয়া সি-আর প্রস্তাবকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন এবং ইহার ফলেই লীগ সুবিধা পাইয়া গেল।"

গান্ধীজি আগেরবারই সাংবাদিকদের সম্মেলনে বলিয়াছিলেন: 'আমি বরাবর বলিয়াছি মুসলিম লীগই মুসলমানদের সর্ব্ববৃহৎ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান।' (হিন্দু—৬ই ডিসেম্বর)। শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য ইহা ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মনে করেন গান্ধীজির চেয়ে তাঁহার জ্ঞান বেশী!

উপরোক্ত প্রতিটী বিষয়ই মূল কথা, উহাদের উপরই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য এবং ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। ঐ সব বিষয়ের উপর গান্ধীজির সাম্প্রতিক উক্তি ও শ্যামাপ্রাসাদের উক্তিতে কোনো মিল আছে কি? যে শ্যামাপ্রসাদকে কংগ্রেসী কাগজগুলি আজ মালাদানে উৎসুক সেই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে মুঞ্জে সাভারকরের কোনো তফাৎ আছে কি? ইঁহারা তিন জনেই বলিয়াছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি মানিয়া গান্ধীজি জাতীয়তার বিরোধিতা করিয়াছেন—তিনজনেই ভাবেন যে লীগ বৃটিশেরই সৃষ্টি, আর তাঁরা নিজেরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মানসপুত্র। কিন্তু কংগ্রেস কখনো তাঁহাদের কথায় ভোলে নাই, সব সময়েই মহাসভার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে ও উহাকে পরাস্ত করিয়াছে। কংগ্রেস সব সময়েই লীগের সঙ্গে ঐক্যের চেষ্টা করিয়াছে অবশ্য এখনও সফল হয় নাই।

এই সব ভুলিয়া কংগ্রেসী কাগজগুলি যখন জিন্নার প্রতি বিরক্তিতে শ্যামাপ্রসাদের দিকে হাত বাড়ান তখন মনে হয় নিমজ্জমান ব্যক্তির মত তাঁহারা খড়কুটা ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা খড় নয়, জীবন্ত সাপ।

সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ একই সংগঠনের এপিঠ এবং ওপিঠ। দুজনেই মুসলিম বিরোধী। একজন যান বৃটিশের কাছে, সহযোগিতার দরবার করিতে। আর একজন যান কংগ্রেসের কাছে—লীগের সঙ্গে ঐক্যে বাধা দিতে, হিন্দু সভার গণেশ যাহাতে না উল্টায় তাহার ব্যবস্থা করিতে। নিজ নিজ ভূমিকার অনুযায়ী ভাবাও তাঁহারা বাছিয়া লইয়াছেন। ওয়েভলকে তুষ্ট করা সাভারকরের কাজ, সুতরাং মহাত্মাকে গালাগালি দিয়া তিনি নিয়মিত বিবৃতি বাহির করেন। ডাঃ মুখার্জ্জিকে কংগ্রেসকর্ম্মীর কান ভাঙ্গাইতে হয়, কাজেই মাঝে মাঝে দেশপ্রেমের বুলি ছাড়েন—"ভারত ও তাহার স্বাধীনতার জন্যই আমরা বাঁচিব ও মরিব। ইহা আমাদের মূলমন্ত্র, ইহাতে আপোষের স্থান নাই।" (বিলাসপুর অভিভাষণ)

কংগ্রেসী কাগজগুলি মহাসভার লীলা তো বুঝিতেছে না বটেই, কিন্তু তাহাদের মন্তব্য হইতে আরও আশঙ্কা জাগিতেছে। গান্ধী জিন্না আলোচনার ব্যর্থতার পর হইতে নিরাশা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে, প্রাচীন কংগ্রেসী পত্রিকাগুলিও কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতার সব আশা ছাড়িয়া দিয়া বরং হিন্দুসভার সঙ্গে সহযোগিতার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিতেছে। এই মনোভাব বাড়িতে থাকিলে কংগ্রেস পিছনে চলিবে, গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। তাহাতে যুদ্ধের পর বৃটিশ যেমন খুসী শাসনতন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারিবে, আমাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী হইবে।

[বিঃ দ্রঃ পি, সি, জোশীর মূল প্রবন্ধের ইহা অংশ মাত্র, এবং বাংলার উপযোগী উদাহরণ দিয়া উহা আমরা পুনর্লিখিত করিয়াছি।—জঃ সঃ]

Regd. No. C. 2836.

ছাত্র ফেডারেশনের ৮ম অধিবেশন

সভাপতি ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

বন্ধুগণ, দেশের অবস্থা আজ ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার মত, যেখানে আশা ও উৎসাহের আলো আমাদের পথকে আলোকিত করে না। যে যৌবনের আলো চিরকাল আমাদের পথ দেখাইয়াছে, সেই আলোও আজ নির্ব্বাপিত। আমার চিরপরিচিত বিদ্যায়তনের মধ্যে ১৯৩০ সালের প্রাণবন্ত উৎসাহের পরিবর্তে আজ দেখি নির্জ্জীব ছাত্রের ভীড়। ছাত্ররা আজ রোল নম্বরের অঙ্কে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতীতে ছাত্ররা ক্লাব গড়িত, সংঘ স্থাপন করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সে উৎসাহ নাই। মাত্র তিন বছর আগে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হষ্টেল একটি করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিত, কিন্তু আজ তাদের চিহ্নমাত্র নাই।

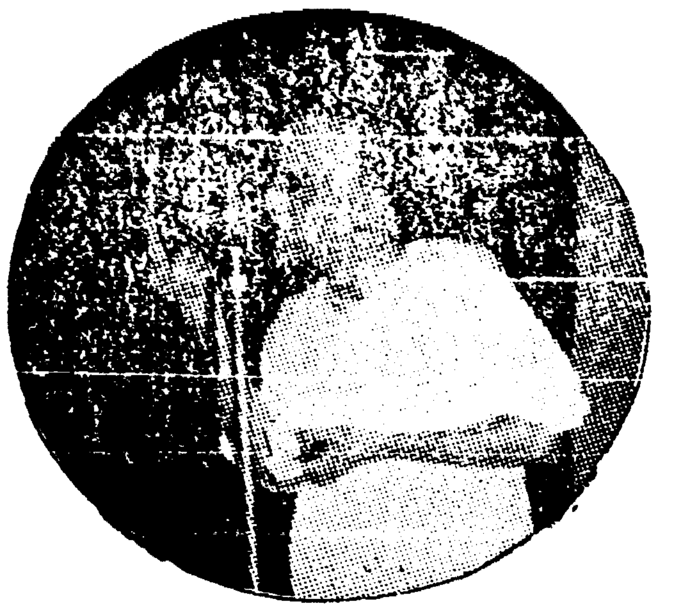

বঙ্কিম-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে পালিত বাংলার ছাত্র সমাজ বাংলার সংস্কৃতিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করিয়াছে। কিন্তু সেই সৃজনী প্রতিভাও আজ হতাশায় নিমজ্জিত।

বিগত মহাযুদ্ধের পরেও একবার আমাদের দেশের যুবশক্তি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই আদর্শ ভ্রষ্টতার সহস্র অপরাধের মধ্যেও নুতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা আগ্রহ ছিল এবং এই আগ্রহই সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তারাশঙ্কর প্রভৃতির মত নূতন প্রতিভার জন্ম দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সঙ্কটে অতীতের সম্পদ তো ধ্বংস হইতেছে, নুতন কিছুরও সৃষ্টি হইতেছে না। এই পরিণতি বড়ই করুণ। সব কিছুর প্রতি অশ্রদ্ধা এই অবস্থাকে আরও মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে।

এই বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়াইয়াও ছাত্রদের আত্মকলহের অবসান হইতেছে না। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ দলাদলি জঘন্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক দলের ছাত্র অন্য দলের ছাত্রকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। এই দলাদলির কুৎসিৎ উন্মত্ততায় ছাত্রীরা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায় নাই। হকি ষ্টিক লইয়া তাহাদের উপরে আক্রমণের দৃষ্টান্ত আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি।

অনেকে বলেন যে দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থাই সমস্ত সমাজ জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সত্য বটে দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু দেশের যুবক যারা তারা কেন বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্যকে মাথা নত করিয়া মানিয়া লইবে? আজকাল প্রায় সমস্ত যুবকই সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ কি আদিম মানুষের মত ভাগ্যকে নতশিরে স্বীকার করিবার শিক্ষা দেয়? সংহত চেষ্টায় ঘটনার চেহারা ও গতি বদলাইবার শিক্ষাই কি সমাজতন্ত্রের শিক্ষা নয়? যাঁরা আজ বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যকে রাজনৈতিক অচল অবস্থার উপর আরোপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাঁরা আদিম বর্ব্বর যুগের গুহাবাসীর মতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ১৯০৭ সালে যুবশক্তিই জাতীয় আন্দোলনের গতিবেগ নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, করাচী কংগ্রেসও তাহাদের শক্তির জয়চিহ্ন। সেদিন তাহারা 'বাস্তব অবস্থা'র কাছে পরাজয় স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আজ সেই যুবশক্তি ইতিহাস রচনার চেয়ে আত্মকলহেই বেশী আগ্রহশীল। দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দেশের ভাগ্যকে সকলের সংহত চেষ্টায় পরিবর্তন করা কি আত্মকলহের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কাজ নয়? এই লক্ষ্যের জন্যও কি তোমরা তোমাদের আত্মকলহ বিসর্জন দিতে পার না? দেশে কখনও কোনদিন যদি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে সে আজ। ছাত্র-আন্দোলনের আজ একমাত্র শ্লোগান—ছাত্র-ঐক্য। এই ছাত্র-ঐক্য দ্বারাই তোমরা দেশের দূষিত আবহাওয়া দূর করিতে পারিবে। মিথ্যা আত্মকলহ বন্ধ কর, কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ ছাড়িয়া দেশের দিকে তাকাও। কলহের পথেই জার্ম্মানী জাহান্নামে গিয়াছে ও সমস্ত পৃথিবীকে জাহান্নামে পাঠাইয়াছে। তোমাদের কাছে আমার কাতর আবেদন ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ কর। আজও যদি ঐক্যবদ্ধ না হও তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ জাহান্নামে যাইবে, দেশকেও জাহান্নামে পাঠাইবে।

তোমাদের শুভবুদ্ধি এখনও মরিয়া যায় নাই। তোমাদের রিলিফ কাজ, দেশের সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারের জন্য তোমাদের আন্দোলন যে কোন লোকের মনে আশার সঞ্চার করিবে। কিন্তু এখনও তোমাদের প্রচেষ্টা নিতান্ত দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন। এই দুর্ব্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

ছাত্র-জীবনের গ্লানিতে আমার হৃদয় বেদনায় দীর্ণ। আমি মনেপ্রাণে কামনা করি তোমাদের দুর্ব্বলতা ঘুচুক, ইতিহাস সৃষ্টির অবিচলিত সাধনাই তোমাদের সাধনা হোক। তোমাদের কাছে আমার শেষ আবেদন দুনিয়ার দিকে চোখ মেলিয়া তাকাও। দেখ, স্বাধীনতার জয়যাত্রা। পরিবর্ত্তমান পৃথিবীর এই বলিষ্ঠ জীবন তোমরা কি দুহাতে গ্রহণ করিবে না? পুরানো দিনের মানুষ আমরা; এতদিন যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছি, আজ তা নাগালের মধ্যে। তোমরা তরুণ, আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত ব্যর্থ হইতে দিবে?

★ শ্রীযুক্তা নাইডুর বক্তৃতা ★

শব্দগত ঝগড়ায় কি লাভ? ওসব ত' শুধু ফাঁকা আওয়াজ। দেশের বাস্তব অবস্থা, দুনিয়ার হালচাল একবার চাহিয়া দেখ—ঠিক পথে স্বদেশের স্বাধীনতা গড়িয়া তোল। তবেই তোমার স্বপ্ন সার্থক হইবে, আন্তর্জ্জাতিক বিশ্বসভে তোমার দেশ গৌরবময় আসনলাভ করিবে।

পদদলিত দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। দারিদ্র্য আর মড়কে লাঞ্ছিত, দলাদলি আর আত্মকলহে দীর্ণ, অশিক্ষার অন্ধকারে মগ্ন আমাদের দেশ। সুদীর্ঘ পরাধীনতা এদেশের মানুষকে অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে।

একদল আছে, যাহারা কেবল আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চিন্তা করে। মানচিত্রে ছাড়া তাহাদের কাছে ভারতের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই। আবার একদল আছে, যাহারা ভারতকে পৃথিবী হইতে আলাদা করিয়া দেখে। তাহাদের দৃষ্টি হিমালয় ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। দুদলই সমান অন্ধ। তোমরা রাশিয়ার বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হও—বিপদের সামনে তাহারা যে ঐক্য, যে সংহতি গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই ঐক্য, সেই সংহতি তোমরা নিজেরা গড়িয়া তোল। রাশিয়ার প্রদর্শিত ঐক্যের পথেই তোমাদের স্বাধীনতা। যাহারা মনে করে, ভারত শুধু ভারতবাসীর জন্য, আর কাহারও এখানে ঠাঁই নাই—তাহারা ভারতের সার্ব্বজনীন আদর্শকেই অস্বীকার করে।

তোমরা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের কথা বলিয়া থাকো। সেই ঐক্য কেমন করিয়া সম্ভব? ঐক্য আকাশ হইতে পড়িবে না। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, পরস্পরকে জানা ও বোঝার মধ্য দিয়া পরস্পরের সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ থাকিয়া আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ঐক্য হইতে পারে না। যেমন, শুধু মাত্র সেনাপতিদের দ্বারা যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। ঐক্যের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করো। কাগজে কলমে যে ঐক্য, সে ঐক্যের কোন দাম নাই। জনগণের প্রত্যেক অংশের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত অধিকার স্বীকারের মধ্য দিয়াই ঐক্য সম্ভব হয়। যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা যদি সংখ্যালঘুদের অধিকার মানিয়া লয়, সংখ্যালঘুরাও তাহা হইলে সহজেই তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য স্বীকার করিবে। ঐক্য কখনও একতরফা হইতে পারে না।

জাতীয় আন্দোলন যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার মূল উৎস ছাত্ররাই। যে সেনাবাহিনী গান্ধিজীকে শক্তি যোগাইয়াছে তাহারা ছাত্র। দেশনেতারা যখন কারাগারে তখন বাংলার দুর্দিনে এই তরুণদের অনেকেই চমৎকার কাজ করিয়াছে এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতার বেড়া ভাঙিয়া বাংলার দুর্দ্দশাকে সকলের ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে।

আজ ব্যক্তিগত মতপার্থক্য দূরে ঠেলিয়া জাতির মুক্তি-সংগ্রামে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিগ্রহের পর মতামতের মীমাংসা হইবে। আজ যুদ্ধের দিনে ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে।

ডাঃ বিধান রায়ের উদ্বোধন

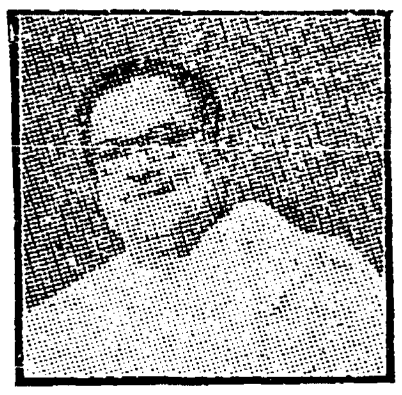

সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, 'আমি আজ আমার ছাত্র জীবনের অতিক্রান্ত যুগের প্রতিনিধি হিসাবে তোমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তোমরা বাংলার দুর্দিনে যে সেবাপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছ, দেশ তাহা মনে রাখিবে। বর্ত্তমান জগতের সামনে পাঁচটি মূল সমস্যা,—দারিদ্র্য, রোগ, অপরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা ও আলস্য। দেশ ও প্রদেশগত সঙ্কীর্ণতা দূরে ঠেলিয়া আজ সমস্যা সমাধানের পথে আগাইতে হইবে। তোমরা বাংলার দুর্দিনে যে সেবাপরায়ণতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছ, তাহাকে সফল করিতে হইলে চাই আরো সংগঠন, আরো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, আরো ঐক্য। তোমাদের কাছে একটি কথাই আমার বলিবার আছে—ঐক্য, চাই আরো ঐক্য।

★ ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের বক্তৃতা

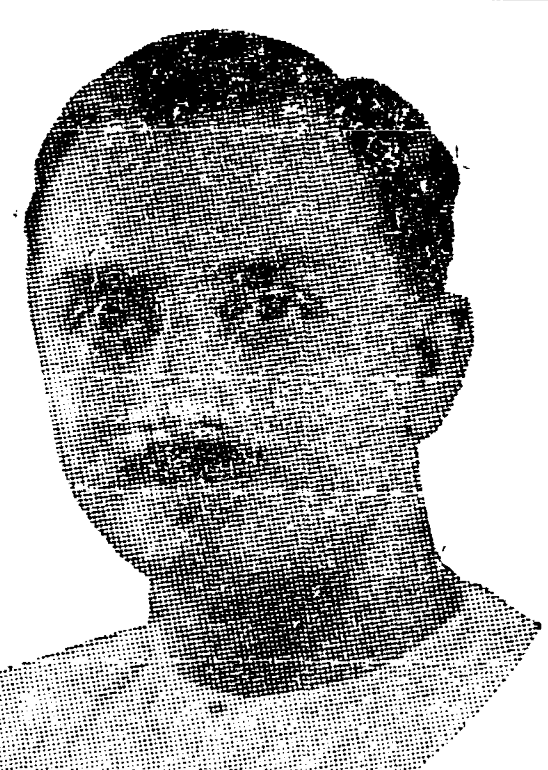

তোমাদের কাছে আমার আবেদন সমস্ত চিন্তা ও সংগঠনকে জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত কর। শুধু মাত্র প্রস্তাব পাশ দ্বারা ঐক্য হয় না। ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের অপরের মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা।

এই অসহিষ্ণুতা আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। আমি মনে করি কংগ্রেস ও অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানে সর্ব্বরকমের মত প্রকাশের সমান অধিকার থাকা উচিত।

আমি আশাকরি তোমরা ছাত্ররা এই ক্ষতিকর অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে, তোমাদের অপরের মত সহ্য ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা তোমাদের ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিবে।

★

সভাপতির বিদায় বাণী

বন্ধুগণ, তোমাদের সম্মেলন আমার মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে আমি আমার অভিভাষণে অনেক রূপকথা বলিয়াছিলাম। ছাত্রজীবনের অধঃপতনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমার মন ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু তোমাদের সম্মেলন ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে আশান্বিত করিয়াছে।

তোমাদের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে আমাদের জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ ধারাই প্রকাশ পাইয়াছে। গান্ধীজির আজীবন সাধনা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ইচ্ছাই তোমাদের প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের প্রস্তাবে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের সুষ্ঠু ধারণা ও তার প্রতিকারের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। লোকে বলে ছাত্রদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই। এই অভিযোগ তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছ। ছাত্র জীবনের অধঃপতনে তোমাদের চিত্ত ব্যথিত। তোমরা বুঝিয়াছ যে একমাত্র তোমরাই এই গ্লানিকর অবস্থার অবসান ঘটাইতে পার। তোমাদের অকৃত্রিম নিষ্ঠা আমাকে আনন্দিত করিয়াছে। তোমাদের তরুণ জীবন আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার সঠিক নির্দ্দেশ তোমরা দিতে পারিয়াছ ইহাই আশার কথা।

সর্ব্বশেষে তোমরা ছাত্র ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছ। এই ঐক্যের জন্য 'জনযুদ্ধ' লইয়া অনাবশ্যক ঝগড়া বন্ধ করিবার আহ্বান জানাইয়াছ। ইহা দ্বারা তোমরা তোমাদের সাহস ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছ। এই প্রস্তাব কোন অতীত 'ভুলের' সংশোধন নয়, এই প্রস্তাব তোমাদের ঐক্যের আগ্রহ ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয়।

তোমাদের নিষ্ঠা, বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ, তোমাদের বাস্তবজ্ঞান আমাকে আনন্দিত করিয়াছে। তোমরা জয়যুক্ত হও।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৭, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত JANAYUDDHA

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা] ১১ই জানুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার, ২৭শে পৌষ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

"কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের অধিকার আপনাদের নাই"

কংগ্রেসকর্ম্মী সভায় শ্রীযুক্তা নাইডুর চূড়ান্ত রায়

গত ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়মে কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মীর সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যাহা বলেন তাহার প্রধান কথা ছিল :—

"আপনারা কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলেন কেন ? একটা পার্টিকে আপনারা দণ্ড দিতে চান কেন ? পার্টি সম্বন্ধে আপনাদের করিবার কিছু নাই তাহা কি বোঝেন না ? **কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্ট সভ্য থাকিতে পারে। তাহারা কমিউনিষ্ট বলিয়া তাহাদের অধিকার আপনারা কাড়িয়া লইতে পারেন না।** যাহারা কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাদের একজনকেও তাহার কংগ্রেসগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না—যদি না কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়। একজনকেও অস্বীকার করার ক্ষমতা আপনাদের নাই। **আমি পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের সহিত বলিতেছি যে এইরূপ ব্যক্তি যতক্ষণ কংগ্রেসের মেম্বর থাকিবেন ততক্ষণ আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।**

"সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর মন হইতে এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিতেই হইবে। লোককে আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে টানিয়া আনাই আমাদের কাজ, তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া আমাদের কাজ নয়। আজ আপনারা কমিউনিষ্টদের তাড়াইতে চান, কাল লীগ পন্থীকে তাড়াইতে চাহিবেন। এমনি করিয়া একে একে সকলকেই আপনারা দূর করিতে চাহিবেন, ফলে আমরা নিজেরাই অস্পৃশ্যে পরিণত হইব।...... বিশ বৎসরের মধ্যে আজই আমি প্রথম শুনিতেছি যে কংগ্রেসকর্ম্মীরা কোনো একটী জিনিষকে ভয় করিতেছে। **লোককে আমাদের নিকট হইতে তাড়াইতে হইবে না, বরং যুক্তি দিয়া, বুঝাইয়া লোককে আমাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহাই কংগ্রেসের নীতি।"** [অমৃতবাজার পত্রিকা, ৫।১।৪৫]

কমিউনিষ্ট ছাড়া কথা নাই !

বর্ত্তমানে বাংলার অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীর কাছে প্রধান রাজনীতিক কাজই হইল কমিউনিষ্টদিগকে কংগ্রেস হইতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা। সে জন্যই সরোজিনী দেবীর কাছে তাঁহারা যখন যত কথা বলিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে। সে জন্যই সরোজিনী দেবী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে ছাড়া কি কংগ্রেসকর্ম্মীর আর কোন কথা নাই ?

বাস্তবিকই নাই। বাংলা দেশের রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট পার্টি একটী প্রধান পার্টি। দুর্ভিক্ষ ও রোগ সেবা, খাদ্য-কমিটি, বস্ত্রাভাব, জন-আন্দোলন প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি সকলের আগে জনসেবায় অগ্রসর হয়। বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের বোধ হয় সবচেয়ে বেশী অংশ কমিউনিষ্ট। কংগ্রেসের প্রভাব গ্রামে গ্রামে বহিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা অতীতে যথেষ্ট বহন করিয়াছে, বর্ত্তমানে আরও বেশী করিতেছে। কাজেই কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিবে কি না থাকিবে সে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা না হইলে কংগ্রেসকে কি করিয়া পুনর্গঠিত করা যাইবে তাহা কমিউনিষ্ট-বিরোধী কংগ্রেসকর্ম্মীরাও ভাবিয়া পাইতেছেন না।

শ্রীযুক্তা নাইডুর চূড়ান্ত রায়

কংগ্রেসের যত নেতা বাহিরে আছেন তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীজির পরেই সরোজিনী দেবীর স্থান; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বররূপে কংগ্রেসের নীতি, সংগঠন ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দিবার কর্তৃত্বও তাঁহারই আছে। সেজন্যই বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাঁহাকে বার বার কমিউনিষ্টদের-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

এবং শ্রীযুক্তা নাইডুও পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন যে, যতদিন কংগ্রেসের বর্ত্তমান নিয়মতন্ত্র বজায় থাকিবে ততদিন কোনো কমিউনিষ্টকে কংগ্রেস হইতে বাদ দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

বিরুদ্ধবাদী কংগ্রেসকর্ম্মীরা কমিউনিষ্টদের বিপক্ষে সাধারণত যতগুলি অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহার প্রায় প্রত্যেকটীর জবাব সরোজিনী দেবীর বক্তৃতা হইতেই পাওয়া যাইবে। সব চেয়ে ব্যাপক অভিযোগ ইহাই উঠে যে কমিউনিষ্টরা অগাষ্ট আন্দোলনে যোগ না দিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছে।

অগাষ্ট সংগ্রাম কংগ্রেসের নয়

অগাষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন,

"বাংলা দেশে এ সম্বন্ধে আমি প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাইতেছি। সেজন্য আমি বারবার, বারবার এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। আপনারা ইহাকে কংগ্রেস আন্দোলন

বলিয়া চলিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেস কোনো আন্দোলন আরম্ভ করে নাই।"

পাছে এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই বলিয়া কমিউনিষ্টদিগকে বা অন্য কাহাকেও বর্জ্জন করিবার কথা উঠে সেজন্য শ্রীযুক্তা নাইডু বিরুদ্ধবাদীদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন,

"বর্জ্জনের কথা যদি উঠে তবে যাঁহারা ২০ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজির শিক্ষা পাইয়াও সেই শিক্ষার প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবার কথাও তুলিতে হইবে।"

ইহা হইতে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীই বুঝিতে পারিবেন যে অগাষ্ট আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার অজুহাতে কোন কংগ্রেসকর্ম্মী বা কমিউনিষ্টকে বর্জ্জন করা যায় না।

গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা

বিরুদ্ধবাদী কংগ্রেসকর্ম্মীদের দ্বিতীয় অভিযোগ হইল : কমিউনিষ্টরা গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করে। তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখান হয় যে ফুড কমিটি, মহামারী রিলিফ কমিটি ইত্যাদিতে কমিউনিষ্টরা যোগ দেয়। এই সহযোগিতা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন,—

"দুর্গত জনসাধারণের সেবায় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ করা কংগ্রেসকর্ম্মীদের উচিত নয়। তিনি আরও বলেন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফুড কমিটিতে যোগ দিতে অস্বীকার করা কংগ্রেসকর্ম্মীদের উচিত নয়।" [হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের রিপোর্ট]

ইহা ভিন্ন অন্য কোনো রকম প্রত্যক্ষ সহযোগিতার উদাহরণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা কখনও উপস্থিত করিতে পারেন না—দু একজন বিরুদ্ধবাদী যে সব আবোলতাবোল মনগড়া অভিযোগ করেন তাহা মিথ্যা কুৎসা মাত্র—সেজন্যই সেরূপ কোন অভিযোগ কেহই প্রকাশ্যে সরোজিনী দেবীর কাছে তুলিতে সাহস করেন নাই।

অগাষ্ট প্রস্তাব ও জনযুদ্ধ

তাঁহাদের শেষ অভিযোগ হইল যে কমিউনিষ্টরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া কংগ্রেসের অগাষ্ট প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছে, অগাষ্ট প্রস্তাব নাকি এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়াছে। এ সম্বন্ধে সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন,

"এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ কিংবা এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয় তাহার উপর কংগ্রেস প্রস্তাব রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে কিনা, যদি পায়, কখন পাইবে, কোথায় পাইবে তাহারই উপর সে প্রস্তাব।"

কমিউনিষ্টরাও কোনোদিন বলে নাই কংগ্রেস প্রস্তাব এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়াছে। কমিউনিষ্টরা শুধু ইহাই বলিয়া আসিয়াছে—অগাষ্ট প্রস্তাব এমন কিছু নির্দ্দেশ দেয় নাই যে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। সরোজিনী দেবী সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,

"কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এ কথা মনে রাখিতেই হইবে। এখান ওখান হইতে বাছিয়া বাছিয়া বন্ধু নির্ণয় করিলে চলিবে না।"

সেজন্য এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ইহার সাম্রাজ্যবাদী রূপ প্রচার করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন সরোজিনী দেবীর আছে (এবং আলোচ্য বক্তৃতায় তিনি প্রচার করিয়াছেনও) তেমনি ইহার জনযুদ্ধ গত স্বরূপ প্রচার করিবার অধিকারও কমিউনিষ্টদের আছে। তাহার জন্য কেহ কমিউনিষ্টদিগকে কংগ্রেস হইতে সরাইতে পারে না। এমন কি উহার বিচার করিতে হইলেও কংগ্রেসের কোনো কর্ম্মী সংঘের সে ক্ষমতা নাই, একমাত্র নিয়মতন্ত্রসঙ্গত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যখন আবার পুনর্গঠিত হইবে তখনই ইহার বিচার হইতে পারে। সরোজিনী দেবীর বক্তৃতার ভাবের মধ্যে একথা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এবং কংগ্রেসের বিচারশালায় দাঁড়াইয়া নিজেদের দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা দিতে কমিউনিষ্টরা প্রস্তুত আছে, কারণ তাহারা জানে যে দেশের দুর্দ্দিনে কংগ্রেসের প্রকৃত আদর্শ তাহারা সগৌরবে বহন করিয়াছে।

তর্কের সময় নাই

কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ কি সে তর্ক সম্বন্ধে সরোজিনী দেবীর ভাষাতেই বলি, "শব্দগত ঝগড়ায় কি লাভ ?" বাংলার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া ঐ দিনের বক্তৃতায়ই তিনি বলিয়াছেন যে, "দেশের এই বিরাট সঙ্কটের দিনে মানবতা সমস্ত পার্টির চেয়ে বড়, কংগ্রেসের চেয়ে বড়, ভগবানের চেয়ে বড়।" অতি বড় দুঃখে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন,

"এত লোক মরিতেছে আর এই দুর্গত মানুষের বন্ধুরূপে কংগ্রেসকর্ম্মীদের যাহা করা উচিত ছিল তাহা তাঁহারা করিতেছেন না।"

বাংলার সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর কাছে আমাদের আহ্বান—আসুন, আমরা মহিমময়ী দেশনেত্রীর এই অভিযোগ দূর করি। কমিউনিষ্ট, খাদি, কিরণশঙ্করপন্থী এবং অন্য সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী একত্রে হাত মিলাই। আমাদের দেশের মানুষের ক্ষতবিক্ষত জীবনকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চূড়ান্ত চেষ্টায় আসুন আমরা সকলে সমবেত হই। সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হইয়া দাঁড়াইলে বাংলায় কংগ্রেস নবজীবন পাইবে, বাঙ্গালীও জীবনের ভরসা পাইবে।

সম্পাদকীয়

এই ঘৃণ্য ব্যাধি নির্ম্মূল কর

৪ঠা জানুয়ারী হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে নিম্নলিখিত খবরটি বাহির হইয়াছে :—

"করাচী ডেইলি কাগজের সংবাদ এইরূপ: সারা গুজরাটে যুবতী স্ত্রীলোক বিক্রীর মাত্রা বাড়িয়াছে। উক্ত পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে আমেদাবাদে ভদ্রকালী মন্দিরের নিকটেই এই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র, এই ব্যবসায় মেয়েদেরও যথেষ্ট হাত আছে। আমেদাবাদে একটি স্ত্রীলোকের মূল্য ৩০০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত। সুন্দরী স্ত্রীলোকের দাম আরও বেশী।"

এত বড় একটা সাংঘাতিক খবর পত্রিকার এক কোণে ছোট করিয়া বাহির হইয়াছে, এত বড় একটা জঘন্য ব্যাপার যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিতেছে! আমাদের দেশের হইল কি !

এই ঘৃণিত কারবার যে শুধু গুজরাটে ঘটিতেছে তাহা নয়। এই সংখ্যার জনযুদ্ধে ভবানী সেনের লিখিত বিবরণে দেখিতে পাইবেন চট্টগ্রামে এই কদর্য্য ব্যাপার কত ব্যাপক ভাবে চলিতেছে। অথচ দেশে ইহা লইয়া কোন সাড়া শব্দ নাই !

গত ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সভায় এই বর্ব্বরতার প্রতি বাংলার নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন মনুষ্যত্বের এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে।

ইহা শুধু দুঃখ, দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের কথা নয়। যে দেশে স্ত্রীলোক পণ্যের মত ক্রয়-বিক্রয় হয় সে দেশ বর্ব্বরের দেশ, আমরা সেই বর্ব্বর হইতে বসিয়াছি, আমাদের মনুষ্যত্ব আজ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। সমাজ, নীতি এবং সভ্যতার এখন কি গতি হইবে ?

যেদিন আমাদের দেশ ঐক্যের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে সেই দিন হইতেই আমরা সভ্যতার নিকট হইতে দূরে সরিতে আরম্ভ করিয়াছি। ঐক্যের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা আমলাতন্ত্রের হাতে আমাদের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়াছি, তাই আজ জঘন্য বর্ব্বরতায় আমরা আচ্ছন্ন।

দুঃস্থা নারী কেন আত্মবিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় ? ভিক্ষাও যখন অমিল হয় তখনই দুঃস্থা নারী তাহার আত্মসম্মানের কথা ভোলে এবং আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা যখন একেবারে চলিয়া যায় তখনই একটী জাতির পুরুষেরা নারীর আত্মসম্মানকে পণ্যের মত মনে করিতে পারে। দুর্ভিক্ষ যে দুঃস্থতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই আজ সভ্যতার সমাধি রচনা করিতেছে। আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা যে যাহার নিজ দল ভারী করিতে ব্যস্ত! সম্পত্তিশালীরা যে যাহার সম্পদ বাড়াইবার ধ্যানে মশগুল!

যে ঘৃণ্য বর্ব্বরতায় দেশ আজ আচ্ছন্ন তাহা বিদেশী শাসনের চূড়ান্ত পরিণতি। আসুন এই সত্যকে সকলে মিলিয়া বিশ্বের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করি।

আমাদের নারীর মর্য্যাদা, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা উহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্বল। উহাকে আমাদেরই বাঁচাইতে হইবে। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দুঃস্থদের জীবন গড়িয়া তুলি যাহাতে কোন দুঃস্থা নারী সম্মান বিসর্জ্জন না দেয়। আসুন সকলে মিলিয়া ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের স্বরূপ খুলিয়া ধরি যাহাতে তাহারা আর স্ত্রীলোক লইয়া ব্যবসা করিতে সাহস না পায়।

চিমুর ও অস্তি'র দণ্ডিতদের বাঁচাও !

৯ই আগষ্টকে উপলক্ষ করিয়া মধ্য প্রদেশের অস্তি ও চিমুর গ্রামে পুলিশের যে প্রচণ্ড দমন-নীতি চলে তাহার ফলে গ্রামবাসীদের সহিত পুলিশের সজ্ঘর্ষ হয়। তাহাতে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত হয় এবং গ্রামবাসীদের উপরও নানাভাবে পুলিশ জুলুম চলে। পুলিশ কর্ম্মচারীদের হত্যার অভিযোগে ২৫ জনের উপর ফাঁসীর হুকুম হয়। পরে আপীলে ১০ জনের দণ্ড মকুব হয়। বিচারপতি পুরাণিক বৃটিশ বিচারকদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বলেন, দণ্ডাজ্ঞার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ খুবই সামান্য এবং ইহার উপর ভরসা করিয়া আসামীদের দণ্ড দেওয়া চলে না।

আইনের দিক হইতে দণ্ডিতদের বাঁচাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠান হইতে ইহাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানানো হইয়াছে। এমন কি চিমুরের নিহত পুলিশ দারোগার মা পর্য্যন্ত ইহাদের জন্য অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও প্রাণভিক্ষার দাবী সভাসমিতি মারফৎ জানানো হইয়াছে।

সময় খুবই কম। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ দেশবাসী সজ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহাদের দণ্ড মকুবের দাবী না করি, তবে দেশের এই মূল্যবান ১৫টি জীবন আমরা নষ্ট হইতে দিব। এই আন্দোলনে আজ লীগকেও টানিয়া আনিতে হইবে। জন আন্দোলনের জোরে অতীতেও আমরা ফাঁসীর মঞ্চ হইতে বহু তরুণের প্রাণরক্ষা করিয়াছি, আজও আমরা যেন সেই শক্তির প্রতি আস্থা রাখি।

ময়মনসিংহ জেলায় সরকারী এজেন্টের ধানচাল খোলা রাস্তায় পড়ে পচছে ● এই চাল ভাল করে পচার পরই বোধ হয় আমাদের কিনতে হবে

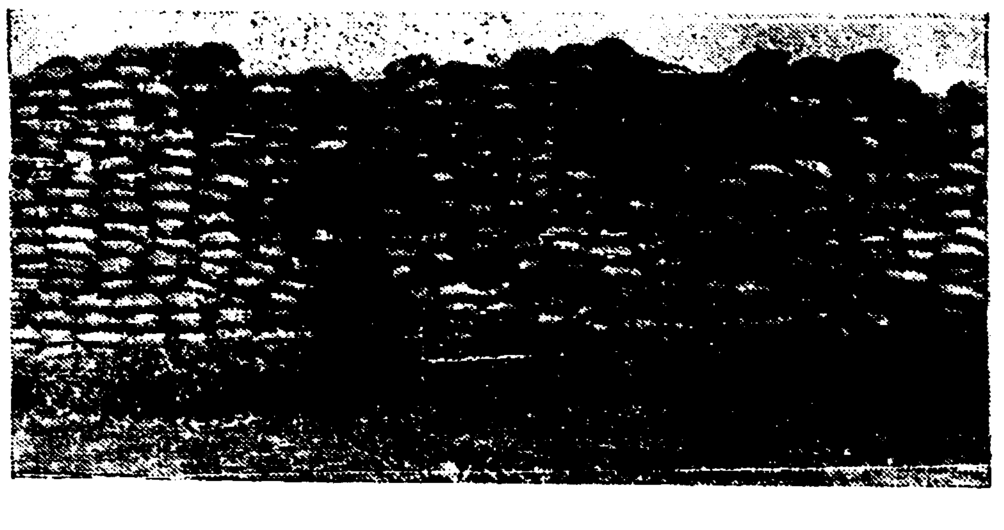

জারিয়াতে নদীর ধারে রাস্তায় হাজার হাজার মণ ধানচাল

নারী-ব্যবসায় রোধে সমস্ত দল

শ্রীযুক্তা নাইডুর নেতৃত্বে সকল মহিলা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন

নারী বিক্রয় ব্যবসা রোধ করার জন্য গত ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে বিরাট জনসভা হয়। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নারী সেবা সঙ্ঘ, ভিজেলেন্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি অন্যূন চৌদ্দটি নারী কল্যাণ ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই সভা আহুত হয়। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দল সভায় যোগ দেয়।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলার এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে মাতৃত্বের অধিকারী হইবার উপযুক্ত ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মেয়েরা সব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অর্থশালী চক্রান্তকারীদের কাছে এই সব অসহায় নারীদের মর্য্যাদা বিক্রীত হইয়াছে। অথচ এই সব দুশ্চরিত্র লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য কি সরকারী কি সক্ষম বেসরকারী লোক কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় নাই। এই পাপ ব্যবসায় শুধু যে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দুঃস্থ নারীদের লইয়াই হইতেছে তাহা নহে সমাজের সর্ব্বস্তরে এই ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। কিছু দিন আগে আইন সভায় আমি একটি সরকারী বিভাগের দুর্নীতির উদাহরণ দিয়াছিলাম। এদেশে মেয়েদের উপার্জ্জনক্ষম হইবার পথ অবশ্যই উন্মুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু সেই সুযোগে দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধির পথও যাহাতে উন্মুক্ত না হয় সেই দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমি এই সৎকার্য্যে আমার ও আমার দলের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতেছি এবং আশা করি সকলেই এই কাজে সহযোগিতা করিবেন।

লীগের পক্ষ হইতে লালমিঞা সাহেবও এই কাজে তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতা অঙ্গীকার করেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন বলেন—গত দুর্ভিক্ষে শুধু যে বাংলার ৩৫ লক্ষ নরনারীই মরিয়াছে তাহা নহে, সেই সঙ্গে সমাজের নীতিবোধও মরিয়াছে। তাই আজ আমাদেরই সমাজের লোক প্রকাশ্যে নিন্দা-বিদ্রূপের ভয় না করিয়া এই পাপ ব্যবসায় লিপ্ত। এই কলিকাতা শহরেই একদল ভদ্রবেশী দুর্ব্বৃত্ত ভদ্র মেয়েদের রাস্তায় দেখিলে কুপ্রস্তাব করিতে সাহসী হয়। ভদ্রসমাজে তাহাদের লালসার ইন্ধন আছে বলিয়াই বোধ হয় তাহারা এই সাহস পায়। আমাদের সমাজের নীতিবোধ এতটা অধঃপতিত যে এই সব দুর্বৃত্তের নিন্দাবাদ পর্য্যন্ত কোথাও উত্থিত হয় না। বস্তুতঃ এমন দৃষ্টান্তও আছে যে এই কার্য্যের নিন্দা করিতে গেলে প্রহৃত পর্য্যন্ত হইতে হয়, কারণ এই সব লোকের অর্থের জোর আছে। সমাজ-কর্ম্মীদের আজ এই অনাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীযুক্তা নাইডু উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, আমাদের সামাজিক নীতিবোধ এই ধরণের যে, নিজের ঘরের মেয়েদের আমরা সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য করি অথচ অন্যত্র অপর কোন মেয়ের সর্ব্বনাশ করার সময় এই চিন্তাটা মাথায় আসে না যে নিজের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সেই মেয়েটির কোন পার্থক্য নাই। যতদিন পর্য্যন্ত একজন মাত্র নারী কলঙ্কিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত একজন মাত্র স্ত্রীলোক পুরুষের লালসায় ভস্মীভূত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত বলবান পুরুষের পক্ষে শত শত নিরাশ্রয় নারীকে জালে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ততদিন পর্য্যন্ত কোন নারীর সম্মানই নিরাপদ নহে।

এই পাপ যাহাতে আমাদের মধ্য হইতে দূর হয় তাহা দেখা তোমাদের কর্ত্তব্য। তোমাদের জাতীয় সম্মান কিছুমাত্র যদি অবশিষ্ট থাকে তবে নারীদের সম্মান রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হও। যে নারীকে তুমি জান না অথচ যে নারী বাংলার মাটি বাংলার জলে বাড়িয়া উঠিয়া তোমার ভগ্নী বলিয়া পরিগণিত—সেই নারীর সম্মান রক্ষার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। বাংলায় তোমরা এই পাপের বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রামের আদর্শ স্থাপন কর। আমি আজ তোমাদের ও সমস্ত বাংলাকে এই কাজের ভার দিতেছি।

কলিকাতায় পতিতালয়ের বৃদ্ধি

১৯২১ সালে পতিতাদের সংখ্যা ছিল	১০,২০৭
১৯২৫ " " "	১৯,২২০
১৯৩৮ " " "	২০,০০০
১৯৪৪ " " "	৪৫,০০০ উপরে

(ডাঃ সৌরেন ঘোষের বক্তৃতা হইতে)

অথচ সরকার নাকি পতিতালয় বন্ধ করিবার আইন করিয়াছে !

জনযুদ্ধের স্বাধীনতা সংখ্যা

২৫শে জানুয়ারী বাহির হইবে—দাম ৵০।

আগামী ৩৭শ সংখ্যা জনযুদ্ধ ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ "স্বাধীনতা সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হইবে। উহাতে বিভিন্ন দলের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের লিখিত রচনা, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি, চিত্র সমালোচনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য অনেক বৈচিত্র্য থাকিবে। বিশেষ সংখ্যার অর্ডার ১৮ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে ম্যানেজারের কাছে পৌঁছান চাই।

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ
১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ঘটনা ও রটনা

ভাগ্যকুলের ভাগ্যবান

ভাগ্যকুলের রায়েরা খুব ভাগ্যবান কুল। তাঁরা জমিদার, ব্যবসাদার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, বাংলার অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। বাংলা সরকারের চাল কেনার এজেন্ট হিসাবে ইস্পাহানিকে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যখন বিরাট যুদ্ধ চালালেন তার পরিণতিতে ইস্পাহানিও গেল না, বাংলার লোক দুর্ভিক্ষ থেকেও বাঁচল না, মাঝখানে ভাগ্যকুলের রায়েরা এবং আরও দু একজন এজেন্সির বখরা পেলেন। তারপরই শ্যামাপ্রসাদের গর্জ্জন ঢিমিয়ে গেল কেন সে রহস্য আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে, জানতে হলে শ্যামাপ্রসাদ বাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন। আমি শুধু রায়েদের সম্পর্কিত একটা ঘটনাই আপনাদের এবার জানাতে চাচ্ছি।

রায়েদের কোম্পানী "রাজা ব্রাদার্স" ময়মনসিংহ জেলা থেকে সরকারের জন্য ধান-চাল কেনার একচেটে এজেন্সি পেয়েছিল। গত ৭ই অক্টোবর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মৈমনসিংহের নলিতা-বাড়ীতে আউষ চালের বাজার দাম ওঠা নামা করেছে ৮।০ থেকে ৭৲ মণের মধ্যে আর আমন চাল ১১৲ থেকে ৯৲ টাকার মধ্যে। শেরপুরে আউষ চাল ৮৲ থেকে ১০।/০ আনার মধ্যে আর আমন চাল ১২৵০ আনা থেকে ১০।/০ আনার মধ্যে। অথচ আমরা শুনলাম যে সে সময়ে রাজা ব্রাদার্স নাকি সরকারের কাছে চাল বিক্রী করেছে ১২।০ আনা বা ১২।৶০ আনা মণ দরে, অর্থাৎ গড়ে মণ পিছু বাজার দরের চেয়ে প্রায় ৩৲ টাকা বেশী দরে। তার ওপরে একচেটে এজেন্সির কমিশন পেয়েছে মণ প্রতি ।/০ আনা। চীফ এজেন্টের মোট কমিশনের পরিমাণই দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১। লক্ষ টাকা, অন্য লাভ কত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। দুর্ভিক্ষ যেমন কত অখ্যাত পরিবারকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেল তেমনি দু একটা "সম্ভ্রান্ত" পরিবারকে কি উঁচুতেই না তুলে দিয়ে গেল !

কিন্তু যা বলছিলাম। রাজা ব্রাদার্স ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় ৩৬ লক্ষ মণ চাল কেনে। তার মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ মণের মত চালান হয়েছে, বাকীটা সুদিনের অপেক্ষা করছে। বারহাট্টা থেকে খবর পাওয়া গেল কিছুদিন আগে ৮ খানি মালগাড়ী আসে ধানের চালান নিতে, কিন্তু তখন বস্তা না থাকায় গাড়ীগুলি ১০।১৫ দিন বারহাট্টা ষ্টেশনে বিশ্রাম করে শূন্য বুকেই ফিরে গেল। তারপর যখন বস্তা যোগাড় হ'ল তখন আর মালগাড়ী এলনা !

এইবার আসল কথা। চাষীর দাম এবং রায়দের দাম—দুইয়ের মধ্যে 'সামান্য' কিছু মোটা মুনাফার তফাৎ। কিন্তু কাহিনী সেখানেই শেষ নয়। চীফ এজেন্টের সঙ্গে সরকারী এজেন্সির সর্ত্ত হ'ল যে তারা ধান-চাল জমা রাখার গুদামের ব্যবস্থা করবে। ব্যবস্থার নমুনা ওপরের ছবিতেই দেখতে পাবেন। মৈমনসিংহের জারিয়াতে নদীর ধারে, রাস্তার ওপর হাজার হাজার মণ সংগৃহীত ধান চাল কেমন ভাবে একেবারে খোলা পড়ে আছে তার কিছুটা এই ছবি দুটীতে দেওয়া হয়েছে। তেমনি বারহাট্টা, নেত্রকোণা, শ্যামগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেও হাজার হাজার বস্তা ধান-চাল দিনের পর দিন খোলা পড়ে আছে, আরও কতদিন থাকবে কে জানে ! ধান-চালের অনেক অংশ এখনই পচে গেছে, বাকীটা আর একটু সময় পেলেই পচতে পারবে।

কিন্তু তার জন্যে রাজা ব্রাদার্সের পুরো দাম পাওয়ায় আটকাবে না, এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতিও বোধহয় সে সম্বন্ধে গর্জ্জন করে উঠবেন না। আর সুহরাবর্দি সাহেব তো খোদ—নাঃ সে কথা থাক।

* * *

নুনের গুণ

স্বনামধন্য শ্রমিক "নেতা" এ, এম, এ, জামান এম, এল, এ এবং খান সাহেব ওসমান আলি প্রভৃতির বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ আদালতে নুনের চোরা-কারবার করার অভিযোগে মামলা চলছে। হোম গার্ডের লোকেরা এদের ধরে। সাক্ষীরা বলেছেন যে আসামীরা নাকি একটী নৌকা থেকে ৩৫৲ বস্তা দরে নুন বেচছিলেন—অথচ বস্তার কণ্ট্রোল দাম তখন ১৭৲ টাকা। জামান সাহেব নাকি হোম গার্ডদের বন্দুক নিয়ে তাড়াও করেছিলেন। সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ নৌকায় ৮।৯ শো বস্তা নুন ছিল। অর্থাৎ অভিযোগ সত্য হলে বলতে হবে জামান সাহেবরা গরীবের নুন থেকে মাত্র ১৪।১৫ হাজার টাকা লাভের ফিকিরে ছিলেন।

মামলা এখনও বিচারাধীন কাজেই কোনো মন্তব্য করতে চাই না, শুধু আশা করি আসামীদের বিরুদ্ধে "তদ্বিরে" পুলিশ যেন ফাঁক না রাখে। আর জামান সাহেবের ইতিহাস একটু শোনাব, কারণ পুরুষাকারের এমন উদাহরণ সচরাচর মেলে না।

তিনি প্রথমে হলেন স্বাধীন শ্রমিক নেতা। তারপর এসেম্বলিতে কংগ্রেস দলে। তারপর শরৎ বোসের দলে। তারপর হুমায়ুন কবীর ও ফজলুল হকের ভক্ত। লীগ যখন কর্পোরেশন নির্ব্বাচন বয়কট করে, তখন মুসলমানের ভোটে কর্পোরেশনে যান, তারপর দাড়ী রাখেন। অনেকের নুনই তিনি খেয়েছেন, এবার গরীবের নুনও খাচ্ছিলেন কিনা তা মামলায় প্রমাণ হবে। সম্প্রতি এসেম্বলির টানা পড়েনে তিনি লীগকে ভর করেছেন। তাঁর সহযোগী আসামী খান সাহেব—নারায়ণগঞ্জ মহকুমা লীগের সভাপতি।

খুব আশ্চর্য্যের কথা, কোনো লীগপন্থী কাগজে এই মামলার খবর বার হয় নি। এরই নাম "রাজনীতি"।

কিন্তু আশ্বস্ত থাকতে পারেন—শ্যামাপ্রসাদ ভোলেন নি। বিড়লার কোম্পানীর মামলার বিবরণ, পাঞ্জাবে হিন্দু পত্রিকা "বিশ্ববন্ধু"র বিরুদ্ধে কাগজ চোরা-কারবারের মামলা—এ সব খবর ষ্টাশনালিষ্টে না থাকতে পারে, কিন্তু "লীগ" এম, এল, এর মামলার খবর ষ্টাশনালিষ্টেই সর্ব্বাগ্রে দিয়েছে।

৪০ হাজার দর্শক, ১ হাজার প্রতিনিধি
ঐক্য ও দেশসেবার নব ভিত্তি
নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাফল্যপূর্ণ ৮ম অধিবেশন

[প্রভাত দাশগুপ্ত]

শ্রীযুক্তা নাইডু সম্মেলনে বক্তৃতা করিতেছেন

দীর্ঘ তিন বছর পরে আবার নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হইল। এই তিন বছরে ছাত্রজগতে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। একদিন ছিল যখন ছাত্র আন্দোলন তার শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতার জোরে সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু আজ অনেক লোকের কাছে ছাত্র আন্দোলন একটা পরিহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কাছে ছাত্র-আন্দোলন মানে বিভিন্ন দলের মারামারি, খুনজখম ইত্যাদি। এই দলাদলি এমন মারাত্মক রূপ নিয়াছে যে সাধারণ দেশপ্রেম ও শুভবুদ্ধিও ইহার কাছে পরাজিত! বম্বের উইলসন কলেজের ছাত্র রিলিফ কমিটিতে একজন কমিউনিষ্ট ছাত্র আছেন বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রেরা সেই কমিটির সঙ্গে অসহযোগীতা করেন। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের কতিপয় ছাত্র বেলেঘাটা রিলিফ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন কারণ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা সেই আন্দোলনের নেতা। রংপুর কলেজে এই দলাদলি ছাত্রীদের সম্পর্কে অশ্লীল ইস্তাহার প্রকাশের কদর্য্য রূপ নেয়। সংগঠিত ছাত্রআন্দোলনের এই আত্মঘাতী কলহের ফলে ছাত্রসমাজ জাহান্নামে যাইতেছে, দেশও তাহাদের সম্পূর্ণ সেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের সমর্থন

দেশের কল্যাণকামী প্রত্যেকটি ব্যক্তি উন্মুখ আগ্রহে চাহিয়াছিলেন কবে ছাত্র আন্দোলনে এই দলাদলির অবসান হইবে, কবে আবার ছাত্র-আন্দোলন তাহার পূর্ণ গৌরব ফিরিয়া পাইবে। তাই যখন দীর্ঘ দিন পরে ছাত্র আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন ডাকা হইল তখন দেশের সমস্ত শুভাকাঙ্খী আগাইয়া আসিলেন এই সম্মেলনকে অভিনন্দিত করিতে। বিভিন্ন প্রদেশের ১১৭ জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, ডাঃ বিধান রায়, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বারদলৈ, বসন্ত দাস, শ্রীপ্রকাশ, গোপীনাথ শ্রীবাস্তব, অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা, বহু লীগনেতা ও জনসেবক সম্মেলনকে অভিনন্দিত করেন। সর্ব্বোপরি অভিনন্দিত করেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। ঐক্যের বিরোধী যাহারা তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাহাতে শ্রীযুক্তা নাইডু সম্মেলনে না আসেন। তাঁহার কাছে ছাত্র ফেডারেশনের নামে বহু মিথ্যা প্রচার হয়। কিন্তু সমস্ত মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও তিনি সম্মেলনে আসেন কারণ ছাত্র আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার কোন চেষ্টা হইতেই তিনি দূরে থাকিতে পারেন না।

ছাত্রসমাজকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন: শব্দগত ঝগড়ায় কি লাভ? দেশের বাস্তব অবস্থা দুনিয়ার হালচাল দেখ। লাঞ্ছিত দেশবাসীর সেবায় এক হও।

শ্রীযুক্তা নাইডুর এই ব্যাকুল আহ্বানে সম্মেলন সাড়া দেয় ছাত্র ঐক্য সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করিয়া। দল ও মত নির্ব্বিশেষে সম্মেলন প্রত্যেকটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করে: জাতীয়নেতাদের মুক্তির জন্য, জনগণের সেবা ও ছাত্রদের শিক্ষা-জীবন বাঁচানর জন্য, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য সম্মিলিত আন্দোলন সৃষ্টি কর। ছাত্রফেডারেশনে যোগ দিতে না চাও, দিও না, কিন্তু ছাত্রফেডারেশনের সঙ্গে তোমার পার্থক্য বজায় রাখিয়াও দেশকে বাঁচাইতে হাত মেলাও।

জনযুদ্ধের প্রস্তাব

ঐক্যের পথে শেষ বাধা দূর করিবার জন্য সম্মেলন ঘোষণা করিল: যুদ্ধের স্বরূপ লইয়া ঝগড়া আজ অনাবশ্যক, কারণ যুদ্ধের স্বরূপ ঠিক করা আজ ছাত্র আন্দোলনের সামনে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন নয়। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, দেশকে সেবার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ফ্যাশিজমের পরাজয়ের জন্য, জাতীয় সরকার আদায়ের জন্য সমস্ত ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা।

অন্ধ্রের হরিজন ছাত্রী শ্রীপরিপূর্ণা

সম্মেলনের এই ঘোষণা কোন অতীত 'ভুলের' সংশোধন নয়। অধ্যাপক ধূর্জ্জটীপ্রসাদের ভাষায় ইহা ছাত্র-ফেডারেশনের "ঐক্যের আগ্রহ ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়।" আজ ছাত্র-আন্দোলনের সামনে সব চেয়ে বড় দায়িত্ব অনৈক্যের কলঙ্কময় অধ্যায়ের শেষ করিয়া দেশসেবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা। এই অবস্থায় 'জনযুদ্ধ' বনাম 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' শুষ্ক তর্কে ছাত্র আন্দোলনকে আবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন রাখা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এই তর্কে আমাদের শুষ্ক বুদ্ধি সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যমোচনের দিকে আমরা একপাও অগ্রসর হইব না। তাই সম্মেলন তাহার ফাশিষ্ট-বিরোধী মূলনীতির সঙ্গে বর্ত্তমান বাস্তবের মিলন ঘটাইয়া শ্রীযুক্তা নাইডুর আহ্বানে সাড়া দিল, সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করিল: অবাস্তব বিরোধ ত্যাগ কর, দুঃখময় বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য এক হও।

সেবা ও দেশপ্রেমের ইতিহাস

ঐক্যের এই আহ্বান ছাত্র-ফেডারেশনকে ঐক্যকামী প্রমাণ করিবার জন্য কোন মামুলি আহ্বান নয়। এই আহ্বানের পিছনে রহিয়াছে ছাত্র-ফেডারেশনের দীর্ঘ আট বছরের সংগ্রাম, সেবা ও দেশপ্রেমের ইতিহাস। এই আহ্বান ছাত্র-ফেডারেশনই জানাইতে পারিল কারণ বিগত তিন বছর বহু নির্য্যাতন, বহু কুৎসা ও বিরোধিতার মধ্যেও ছাত্র-ফেডারেশন দেশবাসীর সেবায় অবিচলিত ছিল। দারিদ্র্য আর মড়কে লাঞ্ছিত দেশবাসীর দৈন্য সে দেখিয়াছে, হতাশায় মগ্ন আত্মকলহে দীর্ণ দেশবাসীর দুর্ভাগ্য সে প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছে। তার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সে এই বিরাট ভাঙ্গনের প্রতিরোধে সচেষ্ট ছিল। তাই সে মনেপ্রাণে বুঝিয়াছে এই অনৈক্যকে বাড়িতে দেওয়া কত বড় সর্ব্বনাশ, তাই ছাত্রফেডারেশনের সম্মেলন হইতেই এই ঐক্যের আহ্বান প্রচারিত হইল।

ঐক্যের এই আগ্রহই ছিল সম্মেলনের প্রাণ। এই আগ্রহ এতটা তীব্র ছিল বলিয়াই ভারতের প্রতিটি কোন হইতে এক হাজার প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। শুধু মফঃস্বল ও অন্যান্য প্রদেশ হইতেই প্রায় দুই হাজার দর্শক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন সিংহলের ছাত্র-প্রতিনিধি, দার্জ্জিলিংএর গুর্খা ছাত্রদল, আসামের পাহাড়ী ছাত্র, শান্তি-নিকেতনের প্রতিনিধি, মাদ্রাজের হরিজন ছাত্রী এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অসংখ্য ছাত্র। ছাত্রী প্রতিনিধির সংখ্যাও ছিল ২০০-র বেশী। এই বিরাট প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী ছাড়াও সম্মেলনের চারদিন প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র ও নাগরিক রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সম্মেলনের আলোচনা শোনেন।

এই বিরাট জনতার মনে একটি মাত্র আশা ছিল, এইবার ছাত্র আন্দোলন তাহার পুরাতন গৌরব ফিরিয়া পাইবে। এই আশাতেই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য সম্মেলনের ঠিক আগে ভারতে প্রত্যেকটি কোনে ছাত্রদের মধ্যে অসংখ্য প্রাথমিক নির্ব্বাচনের ধূম পড়িয়া যায়, এই আশাতেই অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ছাত্র-ফেডারেশনের চিত্রপঞ্জীতে ও প্রদর্শনীতে ছবি পাঠান, এই আশাতেই ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ২৫ জন অধ্যাপক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

সম্মেলনের নিষ্ঠা ও বাস্তব বোধ আরও প্রকাশ পায় অন্যান্য প্রস্তাব, বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে

সম্মেলনের প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের জন্য ছাত্র সমাজকে সমস্ত বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে উভয়ের মতামত আলোচনা করিতে অনুরোধ করা হয়। গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইবার পরে সমস্ত দেশের আবহাওয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে দূষিত। এই অবস্থায় সম্মেলন কোন শুষ্ক 'ফরমূলা'র বাহাদুরী দেখায় নাই। ছাত্র সমাজের কাছে তাহার আবেদন স্পষ্ট: কংগ্রেস-লীগ ঐক্য না হইলে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অনৈক্যের প্রসারে দেশের সর্ব্বনাশ তো বটেই, আমাদের ছাত্রজীবনের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে। তাই আমাদের ছাত্র জীবনের ভবিষ্যৎকে বাঁচাইবার জন্যই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রোধ কর, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য সচেষ্ট হও। (শেষাংশ ৪র্থ পৃঃ)

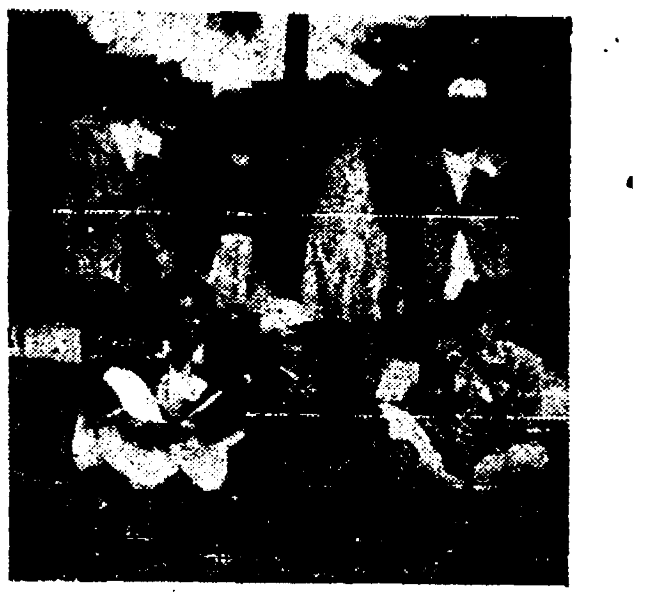

দার্জ্জিলিং-এর গুর্খা ছাত্রদল

★ দুটি প্রধান প্রস্তাব

ছাত্র ঐক্য প্রস্তাবের সারমর্ম্ম

নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের নীতি: (১) ছাত্রদের স্বাধিকার ও দেশপ্রেমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করা। (২) দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত দেশবাসীর সেবার জন্য গঠনমূলক কাজ করা। (৩) দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, ফ্যাসিজমের পরাজয়, জাতীয় সরকার ও নেতাদের মুক্তির জন্য, কংগ্রেস ও লীগকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করা।

এই নীতি যাঁহারা মানিয়া লইবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের স্থান ছাত্রফেডারেশনে আছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ছাত্র ফেডারেশনের কোন অংশের যদি কোন মতানৈক্য থাকে তবে সেই মতভেদ প্রকাশ করিবার পূর্ণ অধিকারও তাঁহাদের আছে।

একটি সম্মিলিত আন্দোলনে সমস্ত ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্র ফেডারেশন বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত সর্ব্ববাদীসম্মত কর্ম্মপন্থায় ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছে।

(১) জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্যের জন্য আন্দোলন। (২) বাংলা, বিহার, কেরলা, উড়িষ্যা ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারী গ্রস্ত প্রদেশের জনসাধারণের সেবার জন্য আন্দোলন। (৩) ছাত্রদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য এবং বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও সরকারী কর্ত্তৃত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আন্দোলন।

জনযুদ্ধ ও ছাত্র ফেডারেশন

যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলিয়া আখ্যাত না করিবার যে সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহা সমর্থন করিতেছে, কারণ যুদ্ধের রূপ নির্দ্ধারণ ছাত্রসমাজের সম্মুখে জ্বলন্ত সমস্যা নহে। বিভিন্ন মতবাদের ছাত্রগণকে একটি সর্ব্বসম্মত কর্ম্মনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশরক্ষার জন্য ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথে এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা আনয়নের পথে যুদ্ধের এই রূপনির্দ্ধারণ প্রচেষ্টা সহায়তা করা দূরে থাকুক বাধা সৃষ্টি করে।

অতএব যুদ্ধের রূপ-নির্দ্ধারণ লইয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া যাহাতে জাতীয় সরকার সৃষ্টির পথে এবং জনসাধারণের সেবায় ঐক্যবদ্ধ হইবার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতে তাহারা বিচ্যুত না হয় তজ্জন্য এই সম্মেলন ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানাইতেছে। ★

ছাত্রী প্রতিনিধিদের একাংশ

ছাত্র প্রতিনিধিদের একাংশ

চট্টগ্রামে মেয়ে বিক্রীর ব্যবসা

এই মেয়েরা আমাদেরই মা-বোন!

"দেনা না শুধিলে স্ত্রীকে দিতে হইবে"—কাটুলিতে জেলের উক্তি

৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতার এ[illegible]
বলিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব ঘৃণ্য [illegible]
এ ব্যবসা গোপন করিয়া লাভ নাই, বিশ্ব[illegible]
……কত মা যে অন্ন কোন লোভে [illegible]
এই ব্যবসায়ের কবলে পড়িতেছে তাহার[illegible]
চট্টগ্রাম জেলায় ঘুরিয়া অবস্থার যে প্র[illegible]
প্রকাশিত হইল। উহা হইতেই শ্রীযু[illegible]
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন

আমাদেরই দেশের একটি অংশে[illegible]
সে কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বলা উচি[illegible]
সে আঘাতে যাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে তা[illegible]
নিজের দেহ আজ পণ্যের মত বিক্রী[illegible]
একটা জেলার সর্ব্বত্র নারী বিক্রীর ব্যবসায়[illegible]
ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নাই, কে[illegible]
বন্যাস্রোতে আমাদের সমাজ-সভ্যতা ভাসি[illegible]
এই বর্ব্বরতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে[illegible]
যদি জানিতে চান কেন এমন হইল তাহা [illegible]
বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করুন—সেখানেই এ সমস্ত[illegible]

এই মেয়েটির মত আরও অনেককে কুৎসিত ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে

বাংলার পল্লীজীবনের চিত্র দেখিবার জন্য চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। দুর্ভিক্ষে এ জেলার কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে তাহার পরিচয় পাইলাম ডবলমুরিং থানার কাটলী গ্রামের জেলে পাড়ায়।

আমাদের অভ্যর্থনা করিল বৃদ্ধ দেবীচরণ জলদাস। "বুড়ো, তোমরা কেমন আছ?"—জিজ্ঞাসা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারই আপন জনের মধ্যে কত যে মারা গিয়াছে, কত যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, কত যে অনাথ শিশু পাড়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারই বিবরণ দিতে লাগিল। তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাড়ার ভিতর ঢুকিলাম। স্বপ্ন জলদাস শোথে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মেরামত করিবার সাধ নাই। স্বপ্ন জলদাসের মা, তিন ভাই, দুই মেয়ে এবং ভাই ঝি দুর্ভিক্ষে না খাইয়া মরিয়াছে। তাহার স্ত্রী এখন মিলিটারী লেবার কোরে কাজ করে। ঘর মেরামত করিবার জন্য স্বপ্ন এক মহাজনের নিকট হইতে ২৫ টাকা ধার করিয়াছিল। এই টাক সে খাইয়া ফেলিয়াছে, ঘর উঠাইতে পারে নাই, টাকাও শোধ দিতে পারিতেছে না।

স্বপ্ন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলিল—

"বাবু, এই টাকা শোধ দিতে না পারিলে মহাজন আমার বউকে চাহিবে, এবং দিতেও হইবে।" যেন টাকার বদলে বউ চাওয়া ও পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার! কি বিপর্য্যয় এখানে ঘটিয়াছে স্বপ্নের এইটুকু কথাতেই তাহার আভাষ পাইলাম।

দেবীচরণ একটা ছাড়া ভিটা দেখাইল। এই বাড়ীতে ১১ জন লোক ছিল। পর পর ৯ জন মারা যাবার পর একটি বাচ্চা শিশুকে ফেলিয়া তাহার মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আজও সে নিরুদ্দেশ। এ রকম কাহিনী শুধু একটি নয়, অনেক শুনিলাম। এই পাড়ারই একটি অংশে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে দেখিলাম মাত্র এক একজন স্ত্রীলোক। াড়ীর সবাই মারা যাবার পর লেবার কোর-এ কাজ করিতে গিয়াছিল; সেখান হইতে গণোরিয়া এবং সিফিলিস লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন অকর্ম্মণ্য। ইহাদেরই একজনের সঙ্গে কথা বলিলাম, তাহার আকুল কান্নার সামনে দাঁড়াইতে পারিলাম না.

গ্রামে যুবতী স্ত্রীলোক নাই

এই গ্রামে এখন ১০০০ জেলে আছে, তাহাদের প্রায় সবারই ম্যালেরিয়া, ৫৪ জনের কালাজ্বর, ৮২ জনের সিফিলিস এবং গণোরিয়া। এখানে ২৯৪টি পরিবার আছে, তাহার মধ্যে ৩৫টি গৃহহীন। আরও ৩০টি পরিবারের ঘর অর্দ্ধেক ভাঙ্গা, বর্ষার আগে মেরামত না করিলে সেগুলি টিকিবে না। ১৯টি পরিবারের মাছ ধরিবার জাল আছে, বাকি সবাই নিঃসম্বল। সমস্ত জেলেপাড়ার মধ্যে যুবতী স্ত্রীলোক খুব কমই দেখিলাম। যুবতী স্ত্রীলোকের অধিকাংশই হয় নিখোঁজ হইয়াছে অথবা লেবার কোরে কাজ করিতে গিয়াছে।

দেবীচরণ তাহাদের অতীতের কথা বর্ণনা করিল :—"আমাদের জাতটা এর আগে বেশ সুখে ছিল। প্রতি বৎসর আমাদের মনসা পূজা হইত। ঐ সময় একমাস ধরিয়া গাজীর গীত এবং মনসাপুঁথির কীর্ত্তন চলিত, আমি ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতাম। আমাদের জাতটা ছিল জোয়ানের জাত, বিপদে আপদে লাঠি লইয়া একজোট হইয়া দাঁড়াইতাম! দুর্ভিক্ষে আমাদের কিছু নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "গ্রামের বাবুরা কি তোমাদের সাহায্য করে না?" সে বলিল, "আমরা অছুৎ জাত, ভাত ত আমাদের দেয়ই না, বাবুদের পুকুরে আমাদের জল আনতেও দেয় না।"

দেবীচরণ এই জেলেদের সর্দ্দার ছিল, একদিন সে সকলকে চালাইত, আজ সে সকলের জন্য কাঁদিতেছে।

ঘৃণ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্র

এই কাহিনীর পরিণতি কোথায় তাহার চয় পাইলাম পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছে বাজারে আসিয়া। বাজারের অলিতে গলিতে দেখিলাম এক এক জায়গায় জড়ো হইয়া রহিয়াছে একদল বিদেশী, সঙ্গে বাক্স ভর্ত্তি মদের বোতল। যে বস্তীতে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের মজুররা বাস করিত তাহারই অনেকগুলিতে এখন বেশ্যালয় হইয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম ওখানকার সকলেই জেলের মেয়ে জেলের বউ, দুর্ভিক্ষের সময় ঘর ছাড়িয়াছে। বুঝিতে পারিলাম—কাট্টলি জেলে-পাড়ায় যুবতী স্ত্রীলোক বেশী দেখি নাই কেন।

পল্লীবাংলার বেদনাময় ইতিহাসের এক বিভীষিকাপূর্ণ বিবরণ পাইলাম স্থানীয় একজন বৃদ্ধ মুসলমান অধিবাসীর নিকট। তাঁহাকে সবাই পাঠান বলিয়া ডাকে। পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখানকার অবস্থা কি? উত্তরে পাঠান যাহা বলিল তাহার সারমর্ম্ম এই : দুর্ভিক্ষের সময় গরীবের মেয়েরা আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তাহাদের কোন অপরাধ নাই। কোন জায়গায় তাহারা আশ্রয় পায় নাই, কেহ তাহাদের বাঁচাইতে চাহে নাই। একদিকে ক্ষুধার তাড়না, অন্যদিকে দেশবাসীর উপেক্ষা এই পথে তাহাদের ঠেলিয়া দিয়াছে। এ পথের সুযোগও এখানে প্রচুর। এক শ্রেণীর কণ্ট্রাক্টর এই দুঃস্থা মেয়ের খোঁজে থাকে, তাহাদের বিক্রি করিয়া টাকা রোজগার করে। এই পাহাড়তলীই মেয়ে কেনা-বেচার একটা ডিপো। **এই জায়গায় একটা দাগী ১০ ধারার আসামী কণ্ট্রাক্টর হইয়াছে, দুঃস্থা মেয়ে সরবরাহ করা তাহার ব্যবসায়।** বাধা দিবারও উপায় নাই, টাকা দিয়া বহুলোককে সে হাত করিয়া রাখিয়াছে, দশ জনে মিলিয়া বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হইলে আর দশজনে ঐ কণ্ট্রাক্টরের পক্ষ হইয়া লড়িবে। মেয়েগুলোও তেমনি। আগে অভাবের তাড়নায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, এখন স্বভাবই তাহাদের ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন জীবনের কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। দুই বৎসর আগে এই পাহাড়তলী কি ছিল আর আজ কি হইয়াছে! আমি আমার ৫০ বছর বয়সে এমন আর কখনও দেখি নাই।

আদিম যুগের কাহিনী নয়

সভ্যতার কি ভীষণ ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে তাহার আরও বস্তুত পরিচয় পাইলাম। চট্টগ্রাম শহরের এক উপকণ্ঠে জেলে ও ডোমদের বাস। দুর্ভিক্ষ অনেকের জীবন লইয়াছে, জীবিতদের আত্মাকে দুমড়াইয়া মচকাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই পাড়া হইতে বিশেষ শ্রেণীর ক্যাম্পের জন্য মেয়ে সরবরাহ করা হয়। যুবক ছেলেরা চায় না সব মেয়েদের বেচিয়া ফেলা হয়, কিন্তু বুড়োদের মায়া টাকার উপর, মেয়ে সম্ভোগ করিবার বয়স তাহাদের পার হইয়া গিয়াছে। এই লইয়া বুড়োদের সাথে যুবকদের ঝগড়া চলিতেছে। ইহা কোন প্রাগ্-ঐতিহাসিক অসভ্য সমাজের কাহিনী নয়, ইহা এই যুগের আমাদের দেশেরই সত্য ঘটনা।

মেয়ে বিক্রীর কদর্য্য কাহিনী অনেক শুনিলাম। মরিয়াম খাতুন নামে একটি মুসলমান মেয়েকে উদ্ধার করিয়াছিল। তাহার বয়স ২৭।২৮ বছর; দুর্ভিক্ষের সময় সে লঙ্গরখানায় আশ্রয় লইয়াছিল। লঙ্গরখানা বন্ধ হইলে সে কোন এক ওয়ার্কহাউসে যায়। ঐ ওয়ার্কহাউসের সুপারভাইজার তাহাকে ৫০০ টাকায় বেচিয়া দিয়াছিল। তাহার চেহারা খুব ভাল ছিল এবং ক্রেতা একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাই তাহার এত দাম। নতুবা সচরাচর অনেক কম দামেই কেনা বেচা চলিয়া থাকে।

আমাদের পার্টির চেষ্টায় একটি জেলের মেয়েকে উদ্ধার করা হইয়াছে। মেয়েটির বয়স ১৮ বৎসর। স্বামীর ঘরে খাইতে না পাইয়া সে তাহার মায়ের নিকট আসিয়াছিল। তাহার মায়ের নাম ইন্দ্রবালা। ইন্দ্রবালা ৬০ টাকায় একজন কণ্ট্রাক্টরের কাছে তাহাকে বিক্রী করিয়া দেয়। কণ্ট্রাক্টর মেয়েটিকে বিশেষ কাজে নিযুক্ত বিদেশীদের কাছে ভাড়া খাটাইত। মেয়েটির স্বামী যখন টের পায় তখন হৈ চৈ সুরু করে। আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে চাপ দেওয়ার ফলে উক্ত কণ্ট্রাক্টর মেয়েটিকে ফিরাইয়া দেয়। কণ্ট্রাক্টরের কৈফিয়ৎ এই—"ইন্দ্রবালা এমন অনেক মেয়ে সরবরাহ করিয়া থাকে, আমি তাহাকে সাহায্য করি মাত্র।"

বিধবা বিক্রয়ের ব্যবসায়

দুই একটি ক্ষেত্রে যাহাদের উদ্ধার করা গিয়াছে তাহাদের বিবরণই আমরা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু জানিতে পারি নাই এমন অনেক ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। **শহরের একজন প্রবীন কবিরাজের নিকট শুনিলাম যে এমন অনেক কণ্ট্রাক্টর আছে যাহাদের পেশা বিধবা সংগ্রহ করিয়া চালান দেওয়া।** বিধবা সরবরাহে মুনাফা বেশী কারণ তাহারা সবচেয়ে বেশী নিরাশ্রয়া, কম দামেই তাহাদের কিনিতে পাওয়া যায়; অথচ অবস্থাপন্ন অফিসাররা বিধবা কিম্বা সধবার দামের তারতম্য করে না। সুতরাং কণ্ট্রাক্টর জাতীয় অর্থপিশাচেরা বিধবা বেচিয়া বেশী মুনাফা করিতে পারে।

এই জঘন্য ব্যবসায় সমাজের নীতি ও সভ্যতার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। ইহারই বিবরণ দিলেন ডাঃ যোগেশ দে। তিনি ধলঘাট অঞ্চলে এক জায়গায় গত ১৫ বছর ধরিয়া ডাক্তারী করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এইরূপ :—

দেবী

"জেলে, যুগী, আচার্য্যি এবং বেহারারা এই শয়তান ব্যবসায়ীদের কবলে বেশী পড়িয়াছে। কারণ দুর্ভিক্ষে তাহারাই সবচেয়ে বেশী দুঃস্থ হইয়াছিল। কিন্তু চারিদিকের এই ঘটনায় মুসলমান এবং হিন্দু মধ্যবিত্তদেরও নীতির বাঁধন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অনেকগুলি চায়ের দোকান মদের দোকান হইয়া উঠিয়াছে, রোজ রাত ৯ টার পর সেখানে হল্লা আরম্ভ হয়। জনসংখ্যার শতকরা ৫ হইতে ১০ জন গণোরিয়া এবং সিফিলিসে ভুগিতেছে। যুদ্ধের আগে এ রোগ শতকরা ১ জনের বেশীর ছিল না। একটি গ্রামের কথা জানি। লেবার কোর থেকে ১৫টি মেয়ে এই ব্যাধি নিয়ে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এখন তারা আর সবার ভিতর এই রোগ ছড়াইতেছে।"

ছাত্র ফেডারেশনের অধিবেশন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলিতে এই সর্ব্বপ্রথম বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া মৃতপ্রায় শিক্ষা জীবনকে বাঁচাইবার সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নৈতিক অধঃপতন হইতে শিক্ষাজীবন বাঁচাইবার কঠিন সঙ্কল্প এই প্রস্তাবে ঘোষিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নূতন বাস্তববোধ প্রকাশ পাইয়াছে। এতদিন গান ও নাচ ছিল বিলাসের বস্তু। জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনেও যখন গান ও নাচের ব্যবহার হইয়াছে তখনও তাহা মামুলি স্বাদেশীকতার বেড়া ভাঙ্গিয়া কঠিন বাস্তবের সঙ্গে হাত মিলাইতে পারে নাই, সেই বাস্তবকে গানে ও নাচে রূপান্তরিত করিয়া দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, তাহার জারি নৃত্য, নাগা নৃত্য, কথাকলী নৃত্য ও "নবজীবনের" গানে বর্ত্তমান বাস্তব প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহা উপস্থিত বিরাট জনতাকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

যে আশা লইয়া হাজার হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক ভারতের প্রতিটি প্রান্ত হইতে সম্মেলনে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, যে আশা লইয়া অসংখ্য লোক আগ্রহের সঙ্গে সম্মেলনের আলোচনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই আশা ব্যর্থ হয় নাই।

সারা সমাজে কুৎসিত রোগ

যারা কেনে-বেচে তারাও ভারতবাসী!!

বিশেষ ক্যাম্পে সরবরাহের জন্য বিবাহের নামে বেশ্যালয়

জনসভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ...বসায়ীর পণ্যসামগ্রী হইয়া দাঁড়াইতেছে, ...নের সম্মুখে ইহা নগ্ন করিয়া ধরা উচিত। ... শুধু সন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহের আশায় ... বা ঠিকানা কি?" শ্রীযুক্ত ভবানী সেন ...্যক্ষ বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে ... নাইডুর কথার অর্থ প্রত্যেক বাঙ্গালী

...সমাজ-জীবনের উপর কি ঝড় বহিতেছে ...। দুর্ভিক্ষের সময় ছিল ক্ষুধা এবং মৃত্যু। ...রা আজ অসহায়। সহায় সম্বলহীন নারী ... করিতেছে, একটি দুইটি ঘটনা নয়, ...স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...ন চাঞ্চল্য নাই। আদিম বর্ব্বরতার এই ...চলিল। পল্লীর পর পল্লী অসহায় ভাবে ...ছে। আমাদের মানবত্ব আজ বিপন্ন। ...হলে দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত নরনারীর জীবন-...র সন্ধান মিলিবে।

ইতরেরাই সমাজে প্রধান

এই আদিম বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে একজোট হইয়া ...ড়িবার উৎসাহ কাহারও নাই। সমাজের ভিতর ... যত ইতর, যে যত দুর্বৃত্ত সেই হইয়া উঠিতেছে ...াবশালী।

ডাঃ যোগেশ দের কাছে শুনিলাম একটি পাড়ায় ...ী-সমিতির বেশ প্রভাব ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ...পাড়ার বহু মেয়ে নারী সমিতির কর্ম্মীদের ডাকে ...া দিত। কিছুদিন হইল এক কণ্ট্রাক্টর ঐ গ্রামে ...শ করিয়াছে। সে গ্রামে আসিবার কিছু দিন ...নারী সমিতির কর্ম্মীরা ও পাড়ায় গেলে পাড়ার ...েরা তাহাদের তাড়াইয়া দেয়। তাহারা বলে ...ট্রাক্টর আমাদের নারী সমিতির কর্ম্মীদের সাথে ...লামেশা করিতে নিষেধ করিয়াছে। কণ্টাক্ট্রর ...তিমধ্যে ঐ অঞ্চলে বহু উপঢৌকন বিতরণ ...রিয়াছে।

একটি অঞ্চলের খবর পাই আমাদের পার্টি ...গঠক কমরেড প্রভাত সেনের নিকট হইতে। তিনি একটি ওয়ার্কহাউসের বিবরণ দেন। ঐ ওয়ার্কহাউসের পরিচালক একটি ইউনিয়ন ...োর্ডের প্রেসিডেণ্ট। গ্রামে জোর গুজব শোনা ... ঐ ওয়ার্কহাউসের মেয়েদের লইয়া প্রেসিডেণ্ট ...ত্র ব্যবসায় চালায়। একবার একটি মেয়েকে

কিছুদিনের জন্য সরাইয়া ফেলা হয়। পরে জানা গেল সে গর্ভবতী হইয়াছিল, গর্ভপাতের জন্য তাহাকে অন্যত্র পাঠান হইয়াছিল। একদিন প্রভাত সেন, প্রিয়দর্শী বড়ুয়া এবং আরও দুই জন ঐ অঞ্চলে খবর লইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে একদল গুণ্ডা প্রিয়দর্শী বড়ুয়াকে পাকড়াও করে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। প্রিয়দর্শীকে ধরিয়া ...সিডেণ্টের দরবারে উপস্থিত করা হয়। ...ল গ্রামবাসীও তখন সেখানে উপস্থিত ... প্রিয়দর্শীর সঙ্গী প্রভাত সেন প্রভৃতি অপর কয়েকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ...প্রসিডেণ্টের অভিযোগ এই যে প্রিয়দর্শী অযথা তাহার বিরুদ্ধে গ্রামের লোককে উত্তেজিত করিতেছে। কাজেই উহাকে মার দওয়া হইবে। প্রভাত সেন ...বলেন—ওয়ার্ক হাউসে দুর্নীতির গুজব শুনিয়া প্রিয়দর্শী ...তাহার সংবাদ আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু গ্রামবাসী কেহ তাহাকে সমর্থন করিল না বরং বলিল, প্রেসিডেণ্ট কি করে না করে আমরা দেখিব তা আপনারা তাহার বিরুদ্ধে লাগিতে গেলেন কেন? কোন রকম সমর্থন না পাইয়া বাধ্য হইয়া প্রিয়দর্শীকে ক্ষমা চাহিতে হয়। সেখান হইতে বাহির হইয়া ঐ গ্রামবাসীরা তাহাকে বলে—প্রেসিডেণ্ট মেয়েদের লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কথা বলা কি সহজ? সেই আবার ডিলার, তারই হাতে রেশনের জিনিষপত্র।"

এই প্রেসিডেণ্টটি আগে ছিলেন ১০ ধারার আসামী। এখন তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং যখন ওয়ার্কহাউস খোলা হয় তখন তাহার পরিচালকও হন তিনি। তাহার সাকরেতি করে একজন ব্যাঙ্কের মালিক। এই সঙ্গে জড়িত আছেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী। দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা চাউল বেচিয়া বিস্তর মুনাফা করিয়াছিল। রেশনিং চালু হবার পর রেশনের জিনিষপত্র ইচ্ছামত নিজেদের লোককে বিলাইয়া একটি দল তৈরী করিয়াছে। এই রকম দল জেলার অনেক জায়গায় আছে। গ্রামে গ্রামে ইহাদের মেয়েপুরুষ এজেণ্ট থাকে, এই সব এজেণ্টরা মেয়ে জোগাড় করে। এই ইতরেরাই সমাজের মাথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ইতরদের জোর জুলুম কি রকম তাহার আর একটি উদাহরণ দিলাম।

গৃহস্থ পরিবারে বেশ্যালয়

হাটহাজারী থানার কোন একটী গ্রামের এক পাড়ায় ২০টী মুসলমান কৃষক পরিবার আছে। তাহার মধ্যে ৫টি পরিবার রীতিমত বেশ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। আগে এইসব বাড়ীর পুরুষেরা ক্যাম্পে মেয়ে পৌছাইয়া দিত, এখন ক্যাম্পের লোকই এই সব বাড়ীতে আসে। ২ মাস আগে আমাদের পার্টির ৩ জন কর্ম্মী এই অঞ্চলের খবর সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা খবর লইতে আসিয়াছেন জানিয়া দালালরা আসিয়া তাঁহাদের মার দেয়। ইতরদের হাতে মার খাইয়া তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হয়, গ্রামবাসীরা অসহায়ের মত নিশ্চেষ্টভাবে এই সব সহ্য করে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে গ্রামে কি এমন লোক নাই যাহারা এই জঘন্য ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হয়? আছে, কিন্তু ইতরদের প্রভাব ক্রমশঃ সৎলোকেরও মন দূষিত করিয়া দিতেছে। ফতেয়াবাদ অঞ্চলের একটি ঘটনা জানি। জনৈক মুসলমান গ্রামবাসী প্রথম প্রথম কিছুদিন নিগ্রোদের গ্রামে ঢুকিতে দেখিলেই তাড়া করিত। একবার সে একজনকে একটা বাড়ীর ভিতর ধরিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। কিছুদিন যাবত একাকী প্রতিরোধ করিয়া ক্রমশঃ সে নিজে হতাশ হইয়া পড়িতে থাকে। তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। আজ সে নিজেই মেয়ে সরবরাহ করিয়া থাকে।

এই বর্ব্বরতাই ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ পল্লী অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে এই জঘন্যতা পছন্দ করে না এমন লোকও ইহার আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। দোহাজারীর একটি অঞ্চলের কথা জানি। এই অঞ্চলে বহু যুগী ও মুসলমান চাষীর বাস। এক ব্যক্তি আগে মুড়ি মুড়কির দোকান করিয়া সৎভাবেই জীবন যাপন করিত। ঐ অঞ্চলে যখন ঘৃণ্য ব্যবসায় জমিয়া উঠে তখন সে ব্যাপারটি পছন্দ করে নাই। কিন্তু বাধাও দিতে পারে নাই। এখন সে মুড়িমুড়কির দোকান তুলিয়া দিয়া সাড়ীর দোকান খুলিয়াছে। গত ২ মাসে সাড়ী বেচিয়া সে ৩০০০ টাকা লাভ করিয়াছে। তাহার দোকানে দামী দামী সাড়ী থাকে। গ্রামের যুগী ও মুসলমান চাষীরা আগে কখনও এ সাড়ী চোখেও দেখে নাই। দোকানদার বলে, "আজকাল ঐ সাড়ীরখুব কাটতি, দেশী বিদেশী সিপাই সান্ত্রীরা কিনিয়া থাকে। এই জায়গার যুগী এবং মুসলমান চাষীর মেয়েরাই ঐ সাড়ী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।"

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

কাটলির একটি জেলে পরিবারে শুধু এই শিশু দুটী বাঁচিয়া আছে

আমাদের সভ্যতা কোথায়?

যে শয়তানেরা পল্লীজীবনে এই নগ্ন বর্ব্বরতার অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছে তাহারাও তথাকথিত ভদ্র সমাজের সন্তান। তাহাদের বিবেক বুদ্ধিকে তাহারা কি বলিয়া প্রবোধ দেয়? তাহাদের একজনের কথা এই—"মেয়েদের আত্মীয় স্বজনই স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে উহাদের পাঠাইয়া দেয়, আমাদের দোষ কি?"

চট্টগ্রামের হিন্দুমুসলমান অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই জানেন যে চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি বন্দর এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্র। হিন্দু মুসলমান বহু কণ্ট্রাক্টর এই জঘন্য কাজে লিপ্ত। লেবার কোর এবং ওয়ার্কহাউসের অনেক মেয়ে সিফিলিস গণোরিয়ায় ভুগিতেছে। এমন একটি ওয়ার্ক হাউস আমি নিজে দেখিয়াছি। রাস্তার উপর এই ওয়ার্ক হাউসের ব্যারাক, সামনের রাস্তায় 'বিশেষ ধরণের' লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইচ্ছা করিলেই ভিতরে ঢুকিতে পারে। এই ওয়ার্কহাউসের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিয়াছি, তাহারা সভ্য জীবনের অতীত কথা ভুলিয়া গিয়াছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনিয়াছি দুঃস্থা মেয়ে সোনার গহনা গায়ে কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে দিনের বেলায় রাস্তার কাজ করে রাত্রে শুধু পিশাচদের পরিচর্য্যা করে। শহরের উপকণ্ঠে এমন ব্যারাক আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যেখানে স্থানীয় মুসলমান গ্রামবাসীদের মেয়ে আনিয়া মজুদ করা হইয়াছে। পাড়ার লোকে বলিল, "উহারা টাকা দিয়া একজন মোল্লা রাখিয়াছে, আইনের দায় এড়াইবার জন্য মোল্লার সাহায্যে মেয়েদের উহারা বিবাহ করিয়া রাখে।"

১৯৪৩ সালে ছিল খাদ্যের দুর্ভিক্ষ, তাহার পর আসিয়াছে নীতির দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সালে মানুষ মরিয়াছে, এবার সভ্যতা মরিতেছে। এই মৃত্যু হইতে নিস্তার নাই কাহারও। আজ চট্টগ্রামে যাহা ঘটিতেছে কাল সমগ্র বাংলায় তাহা ঘটিবে। যেমন খাদ্যের দুর্ভিক্ষের সময় ঘটিয়াছিল।

চট্টগ্রামে একজন ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি এখানে নূতন আসিয়াছেন। আমার নিকট চট্টগ্রামে স্ত্রী-বিক্রয় ব্যবসায়ের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"আমি আমাদের দেশের সভ্যতার পরিণতির কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি। আমাদের দেশের ভদ্র যুবকেরা সৈন্য হইয়া এদেশে আসিয়াছে, এই বর্ব্বরতার আবহাওয়া হইতে ইতর মন লইয়া তাহারা যখন দেশে ফিরিবে তখন আমাদের সভ্যতা পুড়িয়া ছারখার হইবে। তোমরা যেমন করিয়া পার এই তথ্য ইংলণ্ডের জনসমাজের নিকট উপস্থিত কর। নতুবা তোমাদেরও পরিত্রাণ নাই—আমাদেরও পরিত্রাণ নাই।"

সভ্যতাকে বাঁচান!

একটা সভ্যজাতির অপমৃত্যুর এই কাহিনী বিশ্বের সম্মুখে খুলিয়া ধরা আজ নিশ্চয়ই দরকার। রাজনৈতিক অচল অবস্থা, আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন রাজনীতি কি নোংরা আবর্জ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে বিশ্ববাসী তাহা জানুক। যে শক্তির অধীনে মনুষ্য সভ্যতার এতবড় সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য বিশ্বশক্তি জাগিয়া উঠুক!

কিন্তু আমি ভাবিতেছি আমাদের দেশের কি হইল? স্ত্রীজাতির এতবড় আত্মঅবমাননায় সংবাদপত্রগুলি পর্য্যন্ত এখনও নীরব, আমরা সবাই কি আমাদের আত্মা হারাইয়া ফেলি নাই?

চট্টগ্রাম দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্মভূমি, সারা ভারতের তীর্থ ক্ষেত্র। শিক্ষায়, সভ্যতায়, জাতীয় সংগ্রামের গৌরবে চট্টগ্রামের স্থান সারা বাংলার উর্দ্ধে। সেই চট্টগ্রামে পল্লীর পর পল্লী অসহায় ভাবে নগ্ন বর্ব্বরতার কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে, আর আমরা করিতেছি কি?

কলিকাতায় বসিয়া কংগ্রেস নেতারা এখনও তর্ক করিতেছেন কোন্ দলের সঙ্গে একত্র কাজ করা উচিত আর কোন্ দলের সাথে একত্র কাজ করা উচিত নয়। গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ কিম্বা দুঃস্থদের বাঁচানর কাজ এসব ব্যাপারে হাত দিলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয় কি না। এই তর্ক বিতর্ক শুনিলেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—"আগুন লাগিলে গৃহে গৃহী খুঁজে তার যজুর্ব্বেদ।" শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সবাইকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ এমন একটি ব্যবস্থা যাহাতে আমাদের হারান মা বোনেরা তাহাদের আত্মসম্মান ফিরিয়া পায়।" এই কাজে যদি আমরা সকল দলের সমবেত শক্তি নিযুক্ত না করি, আমরা আমাদের সভ্যতা হারাইব।

—ভবানী সেন

লাইন প্রথা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তাহাদের কোন্ কোন্ দাবী মানা হইবে, তাহাদের জাতিগত প্রতিষ্ঠান আহোম এসোসিয়েশনের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে কিনা—এই সব বিষয়ে সুষ্ঠু স্বীকারোক্তি আসিলে তবেই আহোমরা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে পারে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি ছিল না। উপরন্তু আহোম এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী 'জাতীয়তাবাদী' আহোম সভা খাড়া করিবার চেষ্টা করায় আহোমরা কংগ্রেসকে ভেদপন্থী বলিয়াই ভাবিয়াছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুতা জাগিয়াছে। সেজন্যই কংগ্রেস প্রার্থীর এরূপ শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। আহোম এসোসিয়েশন ও আহোমদের দাবীর প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে এই ইতিহাসই পুনরাবৃত্ত হইতে থাকিবে।

● আসামের চিঠি ●

অনেকদিন হইতে ভূমিহীন বাঙ্গালী চাষী আসামে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলার গত দুর্ভিক্ষের সময়ে গৃহহীন, বিত্তহীন প্রধানতঃ মুসলমান চাষী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কাতারে কাতারে আসামে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই আসামের অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের দলে দলে আসিয়া বাস করা পছন্দ করে নাই। অনেক সময়ে এই সব বহিরাগতদের সহিত স্থানীয় বাসিন্দাদের সজ্ঘর্ষও হইয়াছে। আসামের "লাইনপ্রথা" এই সমস্ত বহিরাগতদিগকে এক এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা ইহার বাহিরে গিয়া বসবাস করিতে পারে না, কোন ঘর উঠাইতে পারে না। ইহারা আসামী মেয়ে বিবাহ করিলেও ইহাদের সন্তানেরা আসামী মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না।

পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষ

সম্প্রতি আসামে ভূমি বিলির সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। দলে দলে বাঙ্গালী মুসলমান আসিয়া আসাম উপত্যকার পশুচারণ ভূমির যেখানে সেখানে আসন গাড়িতেছে, আসাম সরকারও তাহাদের জন্য কিছু কিছু জমি ছাড়িয়া দিতেছেন, ইহাতে আসামবাসীর মনে বিশেষ উষ্মার উদয় হইয়াছে। আবার, ইহাদের থাকার একটা পাকাপাকি বিধিব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হইতেছে না, মাঝে মাঝে ইহাদের সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বহিরাগত বাঙ্গালী মুসলমানদের যথেষ্ট দুর্দ্দশা হইতেছে, মনেও বিশেষ তিক্ততা জন্মিয়াছে। অধিকন্তু আসামবাসীদের কাহারো কাহারো ধারণা যে অধিকসংখ্যায় বাঙ্গালী মুসলমানদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবার মূলে রহিয়াছে আসামকে সঙ্কল্পিত পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা। সর্ব্বশেষে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে অধিক ফসল বাড়াইবার জন্য যুক্তপ্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক আসামে আমদানী করিবেন। সব মিলিয়া একটা দারুণ তিক্ততা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস আসামের রাজনৈতিক জীবনে দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যেও এই ব্যাপারে বিশেষ মতবিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।

খাদ্যনীতিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ফল

কিন্তু ইহা বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। সরকারী ক্রয়নীতির ফলে সুরমা উপত্যকার চাষীদের দুরবস্থার একশেষ হইতেছিল। ইহাতে কংগ্রেস এবং লীগ দুই দলই বিচলিত হইয়া এই নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান। ফলে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের গত নভেম্বর অধিবেশনে সরকারী খাদ্যক্রয় নীতি বাতিল হইয়া যায় এবং চাষীদের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ঐক্যের জের

লাইন প্রথা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

ডিব্রুগড় উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস হারিল কেন

টানিয়া কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই আসামের জমি বিলি সম্পর্কে একটা যুক্ত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় কি না সেই প্রচেষ্টায় একটা সর্ব্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করিবার প্রস্তাব আনেন। প্রধানমন্ত্রী তাহাতে রাজি হ'ন। ১৯শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিন সব দলের নেতাদের লইয়া প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি যুক্ত বৈঠক বসে। এই সম্মেলনের পূর্ণ সিদ্ধান্ত এখনো প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অন্যান্য সব দল একটা যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন কিন্তু লীগের প্রতিনিধি দুইজন অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। যুক্ত সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি এই ধরণের:—

যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত

আসাম উপত্যকার পতিত জমির শতকরা ৩০ ভাগ স্থানীয় লোকদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং অবশিষ্ট জমি স্থানীয় এবং বহিরাগত লোকদের মধ্যে বিলি হইবে। তবে ১৯৩৮ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সব লোক বাহির হইতে আসিয়াছে, শুধু তাহারাই এ সুবিধা পাইবে।

লীগ সভাপতি সময় বাঁধিয়া দেওয়াতে আপত্তি জানান, এবং লীগের অন্য প্রতিনিধি রৌফ সাহেব ১৯৩৮ সালের বদলে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত যাহারা আসিয়াছে তাহাদের এই সুবিধা দেওয়া হোক এই প্রস্তাব আনেন, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে "ব্লক" (খণ্ড) হিসাবে জমি বিলি করা হইবে। প্রতি সম্প্রদায়ের ভূমিহীন লোকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই সমস্ত "ব্লক" বন্টিত হইবে। "লাইন প্রথা"র সমতুল, পরন্তু তাহার চেয়েও নিন্দনীয় এই যুক্তি দিয়া লীগ সভাপতি "ব্লক" হিসাবে জমি বিলির ঘোর প্রতিবাদ করেন! কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত বরদলই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক হিসাবে বাস করাই সুবিধাজনক এই যুক্তিতে প্রস্তাবটির সমর্থন করেন। রৌফসাহেব প্রস্তাবটিতে বিশেষ আপত্তি করেন না।

গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং এবং নওগাঁ জেলায় যদি পরিকল্পিত শতকরা ৩০ ভাগ জমি না পাওয়া যায়, তাহা হইলেই লক্ষীপুর এবং শিবসাগর জেলাকে এই পরিকল্পনার ভিতর আনিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে নয়। লীগনেতাদ্বয় শেষোক্ত জেলা দুইটিকে পরিকল্পনার বাহিরে রাখার ঘোর আপত্তি জানান। কেননা তাহা হইলে এই দুইটি জেলার বহিরাগতদের বহিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, তাঁহারা এই যুক্তি দেন। কিন্তু অন্যান্য সকলে একমত হওয়াতে তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়কে জন্য নির্দ্ধারিত "ব্লক"গুলিকে ভর্ত্তি করিবার জন্য তিন বৎসর সময় দেওয়া হইবে। তাহার মধ্যে ভর্ত্তি না হইলে অন্য সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া ভর্ত্তি করিতে পারিবে।

জমি বন্টনের পর দুই বৎসর কোন খাজনা নেওয়া হইবে না। ইহার পর বিঘা প্রতি পাঁচ টাকা দক্ষিণা পাঁচ বৎসরে শোধ করিতে হইবে। এই পাঁচ বৎসরে পাট্টা দেওয়া হইবে বৎসর হিসাবে। ইহার পর এক একবারের পাট্টা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিবে অর্থাৎ জমির উপর বাসিন্দার একরকম মৌরসী দখল জন্মিবে, জমি হস্তবদল করাও চলিবে।

উপজাতীয়দের (Tribal people) জন্য গিরিনিম্ন প্রদেশে ভূমি সংরক্ষিত থাকিবে। সেখানে আর কেহ জমি দখল করিতে পারিবে না। অন্যান্য স্থানের তুলনায় দ্বিগুণ হারে ইহাদের জমি বিলি করা হইবে।

কংগ্রেস এবং লীগ পক্ষ হইতে শুধুমাত্র চাষীদের সহিত জমি বিলির বন্দোবস্ত করা হউক এই প্রস্তাব আনা হয়, কিন্তু অন্যান্য সকলের আপত্তিতে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

জমি বিলি করিবার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কেমন অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার জন্য এই বৈঠকের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি বৎসরে একবার বা প্রয়োজন মত তাহার বেশী বার বসিবে।

ইহা ছাড়া জমি বিলি বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারদিগকে উপদেশ দিবার জন্য কামরূপ নওগাঁ এবং দারাং জেলার জন্য এক একটি বোর্ড গঠিত হয়। রাজস্ব সচিব এবং লীগ সভাপতি এই সমস্ত বোর্ডে যে সমস্ত সভ্য মনোনীত হন, তাহাদের পছন্দ করেন নাই।

১৯৪০ সালেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিবার পর এই রকম একটি বৈঠক বসে। তখনও ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে জমি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার পর য'াহারা আসিয়াছিল তাহাদেরও জমি পাইবার পক্ষে কোন বাধা নিষেধ আরোপিত হয় নাই। কংগ্রেসপক্ষ এই ব্যবস্থায় পুরাপুরি সম্মতি না দিলেও, তাঁহাদের উপস্থিতিতেই এই ব্যবস্থা ঠিক হয়।

● নিজস্ব প্রতিনিধির সংবাদ ●

কংগ্রেস ও লীগের দায়িত্ব

কংগ্রেসপক্ষকে বুঝিতে হইবে ১৯৩৮ সালের পরে যে অগণিত ভূমিহীন চাষী আসামে গিয়া মাথা গুঁজিয়াছে, হঠাৎ ভিটা ছাড়া হইয়া তাহারা যাইবে কোথায়? তাহারা খাইবে কি করিয়া? এই অসংখ্য যাযাবর কি সমগ্র আসাম প্রদেশের পক্ষে চিরদিনের মত একটা অন্তর্বিরোধের বিষয় হইয়া থাকিবে না? লীগপক্ষকেও বুঝিতে হইবে "লাইন প্রথা" উচ্ছেদের জন্য লীগের দীর্ঘদিনের দাবি স্বীকৃত হইয়াছে, জমির উপর বাসিন্দাদের এক রকম মৌরসী দখলের ব্যবস্থা হইয়াছে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তমত প্রায় ছয় লাখ বিঘা জমি বাংলার চাষীদের মাঝে বিলি করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা ইহাতে কোন বাধা না দিয়া লীগপক্ষ কংগ্রেসের এবং উপজাতীয়দের নেতাদের সহিত ধীরভাবে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করুন। ১৯৩৮ সালের পর যাহারা আসিয়াছে অর্থাৎ যাহাদের বহিষ্কার করা হইবে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার চূড়ান্ত অসুবিধার কথা সব দলই সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করুন, একটা সর্ব্বসম্মত মীমাংসায় পৌছান যাইবেই। অন্যথায় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশনে গভর্ণর সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার যে খেলা খেলিয়াছেন, তাহারই অনুসরণে আমলাতন্ত্র অনৈক্যের খোরাক জোগাইতে সচেষ্ট থাকিবে, অন্যথায় পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে, অবিশ্বাসে, কটুক্তিতে—এমন কি গৃহবিবাদে আসাম জর্জ্জরিত হইবে, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় উপদ্রুত আসামের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না।

* * *

সম্প্রতি ডিব্রুগড় এলাকায় আসাম ব্যবস্থা পরিষদের একটি উপনির্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্বাচনে আহোম এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ ১৭৭৩ ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুক্ত অম্বিকা গগৈ মাত্র ৬৮১ ভোট পাইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই নির্বাচনে এক দিকে বহু ত্যাগী কংগ্রেসকর্ম্মী কংগ্রেসপ্রার্থীর জন্য খাটিয়াছেন। অন্যদিকে শুধু ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারীরাই ঘনকান্ত বাবুর স্বপক্ষে প্রচার চালাইয়াছেন। তবুও আমলাতন্ত্রের এই প্রতিনিধির নিকট কংগ্রেসের এরূপ শোচনীয় পরাজয় হইল কেন?

আহোমদের দাবী কংগ্রেস মানে নাই

আহোমেরা আসামের এক বিশেষ সম্প্রদায়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। আসামের বহু কংগ্রেসকর্ম্মী ইহাদের মধ্য হইতে আসিয়াছেন। কয় বৎসর ধরিয়া নিখিল আসাম আহোম এসোসিয়েশন আহোমদের বিশেষ দাবীর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার দাবী সংখ্যানুপাতে আইন সভায় আহোমদের জন্য আসন সংরক্ষিত এবং চাকুরী দেওয়া হউক। এখন আবার আহোম সভা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী পুরাপুরি সমর্থন করিয়া স্বাধীন আসামের দাবীকেই উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই হিসাবে ইহা আহোমদের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইতেছে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস ইহাদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নাই, পরন্তু আহোম সভাকে জাতীয়তা বিরোধী হিসাবে গণ্য করে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ইহা দ্রুত শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী 'জাতীয়তাবাদী' আহোম সভা খাড়া করিতেও চেষ্টা করিয়াছে।

কংগ্রেস অতীতে মুসলীম লীগ সম্বন্ধেও এই ভাবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মুসলমানের মধ্যে লীগের প্রভাব বাড়িয়াই গিয়াছে, কংগ্রেসের প্রভাব নষ্ট হইয়াছে। ঠিক অনুরূপ কারণেই আহোমদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব নষ্ট হইয়াছে, উহারা মনে করিয়াছে যে কংগ্রেস বর্ণ হিন্দুদের প্রতি[illegible]ন, 'পিছপড়া' জাতিগুলির স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন ডিব্রুগড় নির্বাচনের সময় কংগ্রেস নেতারা শুধু পুরানো কথারই মৌখিক পুনরাবৃত্তি করিয়া[illegible]ন যে কংগ্রেস সর্বদাই 'পিছপড়া' সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখিয়া থাকে।

(শেষাংশ ৭পৃঃ দেখুন)

নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন

নবম অধিবেশন

নেত্রকোণা—ময়মনসিংহ

নিখিল ভারত কিষাণ সভার জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: নিখিল ভারত কিষাণ সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে এ বৎসর নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন বাংলায় অনুষ্ঠিত হইবে। তারপর প্রাদেশিক কিষাণ কাউন্সিল সেই অধিবেশন ময়মনসিংহ জেলায় করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলায় সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজও আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলার সমগ্র কৃষক সমাজ গত দুই বৎসর যাবত দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে ভীষণভাবে প্রপীড়িত হইয়াছে। আজও বাংলার লাখ লাখ কৃষক সহায়সম্বলহীন। বাংলার দুঃস্থ কৃষকদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার কাজে সাহায্য করিবার জন্য কমরেড মুখার্জ্জী বাংলার কৃষক সমাজ এবং কংগ্রেস ও লীগ নেতা ও কর্ম্মীদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

● শোক সংবাদ ●

গত ২১শে ডিসেম্বর ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ পালের মৃত্যু হয়। তিনি পার্টি সভ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু পার্টির প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ এবং তাঁহার অসামান্য দেশপ্রেম সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

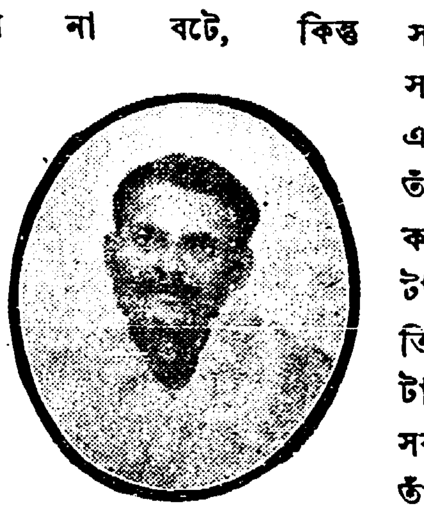

নদীয়া জেলার মেহেরপুরে তাঁহার জন্ম হয়। ছাত্রবয়স হইতেই তিনি ছিলেন সমাজ সেবায় অগ্রণী কর্ম্মী। এই সময়ে তিনি তদানীন্তন বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারই প্রেরণায় তিনি ১৯১০সালে তাঁহার গ্রাম কেচুয়াডাঙ্গায় একটি 'ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার ভিতর দিয়াই তিনি স্থানীয় ছাত্রদের সেবার কাজে সংগঠিত করেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তিনি তখন হইতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইহার জন্য নানারূপ ঝড়ঝাপটা সহ্য করেন এবং আত্মত্যাগের জলন্ত পরিচয় দেন। পড়াশুনার দিকে তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল এবং পড়াশুনার ভিতর দিয়াই তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার পরিচিত সকলের ভিতরই তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই মতবাদ অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তিনি দেশের কাজে ব্যয় করিতেন—অনেক পার্টিকর্ম্মীকেই টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতেন। গেল বৎসর তিনি লেনিন ডে পার্টি ফাণ্ডে এককালীন ৩০০৲ টাকা দিয়াছেন। তাঁহার সংস্পর্শে যাহারা আসিতেন সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে পার্টি একজন শ্রেষ্ঠ দরদী হারাইল।

●

ময়মনসিংহের টংক এলাকার রাণীপুর গ্রামের কমরেড বাশীনাথ বর্ম্মণ গত ২৫শে ডিসেম্বর নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। ১৯৪২সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি পার্টি সভ্য হইবার গৌরব লাভ করেন। টংক এলাকায় আজ যে বিরাট কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে কমরেড বাঁশীনাথের মত কর্ম্মীদের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রেরণা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়া যান।

গণতন্ত্রই চীনকে বাঁচাইতে পারে

কলিকাতাস্থ চীনা সরকারী দপ্তরের মিথ্যা প্রচার বাঁচাইবে না

গত এক বৎসর ধরিয়া চীনের কুওমিণ্টাং সৈন্যদল জাপানীদের হাতে পদে পদে পরাজিত হইয়াছে। দক্ষিণ চীনের ৮টা প্রধান প্রধান আমেরিকান বিমান-ক্ষেত্র এবং ৬টা ছোট ছোট বিমানক্ষেত্র জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে। উত্তরে পিকিং হইতে দক্ষিণে ইন্দোচীন পর্য্যন্ত সরাসরি রাস্তা প্রতিষ্ঠা করার বহুদিনব্যাপী ইচ্ছা তাহারা এইবার পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। তা ছাড়া সম্প্রতি কুনমিং প্রভৃতির দিকে তাহারা যে-পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালাইয়াছিল সেখান হইতে ফিরিবার পথে হুনান-কোয়াংসি এবং কোয়াংসি-কুইচো রেলপথের সমস্ত লাইন প্রভৃতি রোলিং ষ্টক একেবারে চাঁছিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। উহাতে চীন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই আক্রমণের প্রতিরোধে ছিলেন কুওমিণ্টাংয়ের প্রসিদ্ধ সেনাপতি তাং এন-পো। ঋণ ও ইজারা প্রাপ্ত আধুনিক আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে তাঁহার সৈন্যদল সুসজ্জিত ছিল। তবুও তাঁহাকে শোচনীয় ভাবে পিছু হঠিয়া যাইতে হয় এবং তাঁহার সৈন্যদলের প্রায় সমস্ত সমর-সজ্জা খোয়া যায়। তিন বৎসর ধরিয়া তাং এন-পো'র সৈন্যবাহিনী ঐ অঞ্চল "রক্ষার" জন্য মোতায়েন ছিল—কিন্তু তাং'এর অত্যাচার স্থানীয় চীনা কৃষকদিগকে এমনি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে তাঁহার বাহিনী পিছু হঠিবার সময় স্থানীয় চাষীরাই সৈন্যদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয়।

চুংকিং ও দিল্লীর মিতালি

চীনের সামরিক দুর্ব্বলতা ও আভ্যন্তরীণ গলদ যে এত ভয়নক হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা চীনের প্রতিবেশী হইয়াও এতদিন জানিতে পারি নাই। তাহার কারণ ১৯৪২ সাল হইতেই নয়া দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং চুংকিংয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উভয়ের মধ্যে গুপ্ত বোঝাপড়া ছিল যে চুংকিংয়ের বৃটিশ দৌত্য-বিভাগের অনুমতি ছাড়া ভারতের কোন খবর চীনে প্রকাশ করা হইবে না, আর ভারতস্থ চীনা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া চীনের কোন খবর ভারতে প্রকাশিত হইবে না। সেজন্যই আমেরি কোম্পানীর কীর্ত্তি-কলাপ চীনে প্রকাশিত হইত না আর কুয়োমিণ্টাং চক্রীদের কীর্ত্তিকলাপ ভারতে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা ও চীনে ইহার বিরুদ্ধে জনমত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, তাহারই চাপে সেন্সরের কড়া পাহারা শিথিল হইতে বাধ্য হইয়াছে। সেজন্যই এখন ভারতে চীনের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ এত খবর বাহির হইতে পারিতেছে।

চীনের দুইটী প্রধান রাজনীতিক দল—কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ও তাহার জাপ-বিরোধী সংগ্রামের বিরুদ্ধে কুওমিণ্টাং চক্রীদের কারসাজি আজ ভারতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্যই কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের ভারতস্থ প্রচার দপ্তরের পরিচালক মিঃ লো অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া গত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

মিঃ লো'র কথা মিথ্যা

তাঁহার প্রধান বক্তব্য হইল: "চীনের কমিউনিষ্ট সৈন্যদল যা-কিছু চায় সবই যদি আমরা দিই, তবুও তাহারা জাপ-বিরোধী যুদ্ধে কোনো মূল্যবান সাহায্য করিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহজনক।

কে কতখানি লড়ে সে সম্বন্ধে শত্রুপক্ষই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল বিচারক। টোকিওর প্রধান দৈনিক পত্র "আসাকি সিনবুম" গোটা ১৯৪৩ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ বিচার করিয়া লিখিয়াছে,

"১৮শ শোয়া বর্ষের (অর্থাৎ ১৯৪৩-এর) যুদ্ধের যে-সাধারণ বিবরণ উত্তর চীনের (জাপানী) সৈন্যদল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহা ভাল করিয়াই বুঝানো হইয়াছে যে, চুংকিং সৈন্যদলের পরিবর্ত্তে কমিউনিষ্ট সৈন্যদলই এখন শত্রু-বিতাড়নের (মপিং আপ) প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...... ১৫০০০ খণ্ডযুদ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগই কমিউনিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে; শত্রুসৈন্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সৈন্য; যত সৈন্যের মৃতদেহ কুড়ানো হইয়াছে তাহারও অর্দ্ধেক কমিউনিষ্ট; যে ৭৪০০০ সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে তাহার শতকরা ৩৫ ভাগ কমিউনিষ্ট।"

"জাপানী পলিটিক্যাল মন্থলি" নামক কাগজের ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ডে তাং চেন লিখিয়াছে, "পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা এখন আর চুংকিং গবর্ণমেণ্ট নয়, কমিউনিষ্ট পার্টিই প্রধান বাধা। উহাদের রোখ চুংকিং সৈন্যদলের চেয়ে অনেক বেশী।"

কে কত লড়িয়াছে

১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে কমিউনিষ্টদের মুখপাত্র জেনারেল চু এন-লাই এক বক্তৃতায় যুদ্ধের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন:

"গত ছয় মাসে (কুওমিণ্টাং সৈন্যদল কর্ত্তৃক রক্ষিত) চীনের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে ১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল) উর্ব্বর জমি জাপানীদের হাতে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে; ঐ সময়ে শত্রু-অধিকৃত এলাকার পিছনেই ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি আমরা (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সৈন্য দল) শত্রুর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিয়াছি। ঐ সময়ে প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় ৪ কোটি লোক শত্রুর দখলে গিয়াছে, আর আমরা প্রায় ৪০ লক্ষ লোককে শত্রু কবলমুক্ত করিতে পারিয়াছি। প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে (কুওমিণ্টাং সৈন্যদের হাত হইতে) ১০২টী শহর শত্রু দখল করিয়া লয়, আমরা ২৮টী শহর পুনর্দখল করিতে পারিয়াছি। প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ সৈন্য হতাহত বা বন্দী হইয়াছে, আর শত্রুর পিছনে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে ১ লক্ষ নূতন নিয়মিত সৈন্য যোগ দিয়াছে।...

"আপাততঃ অবশ্য দক্ষিণ পশ্চিম চীনেই শত্রুসৈন্যের সংখ্যা বেশী—তবুও শত্রুর পশ্চাদবর্ত্তী আমাদের সৈন্যরাই এখনও সমগ্র জাপবাহিনীর ৪৯। ভাগকে রুখিতেছে।... শত্রুর পিছনে সমুদ্রোপকূলভাগের ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জমি আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে, আরও ৬৫০০ কিলোমিটার আমাদের আক্রমণে সর্ব্বদা বিপন্ন।"

মিঃ লো'র বক্তৃতা যে নির্জ্জলা মিথ্যা তাহা বোধহয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য হইল যে, বর্ত্তমান কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট স্বনির্ব্বাচিত নয়, "উহার ক্ষমতা 'জনগণের জাতীয় কংগ্রেস' কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং কয়েক বছর আগে নানকিং শহরে সেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। সুতরাং এই গবর্ণমেণ্ট... অপ্রত্যক্ষরূপে জনগণ দ্বারাই নির্ব্বাচিত—এবং যুদ্ধ-শান্তির পর 'জনগণের জাতীয় কংগ্রেসের' পুনরধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে পারে না।"

চুংকিং সরকার স্বনির্ব্বাচিত

অথচ এই মিঃ লো'র অফিস হইতেই ১৯৪৩ সালের যে 'চায়না ইয়ার বুক' নামে বই বাহির হইয়াছে তাহার ১৬৯ পৃষ্ঠায় জানা যায় যে তথাকথিত 'জনগণের জাতীয় কংগ্রেসের' কখনও কোন অধিবেশন হয় নাই। ১৯৩৫ সালে প্রথম অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তখন না হইয়া ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়; তাহার পর আবার ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত মুলতুবী হয়; তাহার পর স্বয়ং চ্যাং কাই-শেক উহাকে যুদ্ধ-শান্তির এক বৎসর পর পর্য্যন্ত মুলতুবী ঘোষণা করেন সুতরাং চুংকিং গবর্ণমেণ্ট কাহারও দ্বারা নির্ব্বাচিত নয়, চুংকিং শাসনতন্ত্রও জনসাধারণের অনুমোদিত নয়—উহা কুওমিণ্টাং দলের স্বনির্ব্বাচিত ও স্বরচিত। উপরোক্ত 'চায়না ইয়ার বুকেরই' ১৭১ পৃষ্ঠায় ইহা স্বীকার করিয়া লেখা হইয়াছে, "১৯৩৬ সালে যে খসড়া শাসনতন্ত্র জারি হইয়াছিল তাহা যতদিন না জনগণের কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং যতদিন না নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন বর্ত্তমান জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সমগ্রভাবে কুওমিণ্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দায়ী। গবর্ণমেণ্টের যে পাঁচটী শাসনবিভাগ যথা—পরিচালনা, আইন প্রনয়ণ, বিচার, পরীক্ষা ও দমন—এই পাঁচটী বিভাগের সভাপতি ও সহ-সভাপতি সকলেই উক্ত (কুওমিণ্টাং) কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারাই নিযুক্ত।"

সুতরাং মিঃ লো'র দপ্তরই স্বীকার করিতেছে, চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কাহারও দ্বারা নির্ব্বাচিত নয় এবং সম্পূর্ণরূপে কুওমিণ্টাংয়ের তাঁবে। জেনারেল চু এন-লাই লিখিয়াছেন যে কুওমিণ্টাং এলাকায় কুওমিণ্টাং দলেরই একাধিপত্য। "জাতীয় গণপরিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার গণপরিষদ পর্য্যন্ত সমস্ত রকমের গণপরিষদই কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত। তেমনি রাষ্ট্রপতি হইতে গ্রামের মোড়ল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী বেসামরিক কর্ম্মচারীও কুওমিণ্টাং কর্ত্তৃক মনোনীত।"

কমিউনিষ্ট এলাকায় গণতন্ত্র

অন্যপক্ষে থিওডোর হোয়াইট, ষ্টুয়ার্ট গেল্ডার, এপষ্টাইন প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিদেশী সংবাদদাতা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে কমিউনিষ্ট এলাকার প্রায় অধিকাংশ জায়গায়ই জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতেও কমিউনিষ্টরা ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের সংখ্যাধিক্য দাবী করে না। নির্ব্বাচনে তিন ভাগের এক ভাগ প্রতিনিধি কমিউনিষ্ট, এক ভাগ কুওমিণ্টাং ও এক ভাগ অ-দলীয় লোকের জন্য সংরক্ষিত করার পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

এডগার স্নো, এপষ্টাইন, ষ্টুয়ার্ট গেল্ডার প্রভৃতি যাঁহারাই কমিউনিষ্ট এলাকা দেখিয়াছেন তাঁহারাই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে সেখানে এক জাপানী-পক্ষপাতী বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর সকলেরই পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। অন্যপক্ষে কুওমিণ্টাং সরকার দুই দুইটী গুপ্ত পুলিশ বিভাগ মোতায়েন রাখিয়া সমস্ত বিরোধী জনমতের কণ্ঠরোধ করিতেছে। এমন কি "তা কুং পাও" নামক চুংকিংয়ের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ১৯৪৩-এর শীতকালে হোনান দুর্ভিক্ষের বিবরণ বাহির করিয়াছিল বলিয়া তিন দিনের জন্য উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতি এত বেশী যে শুধু ১৯৪৩ সালেই প্রায় ৪ হাজার কোটী চীনা ডলার-নোট ছাপানো হইয়াছে। রয়টার গত ২৩শে ডিসেম্বর খবর দিয়াছে যে চুংকিংয়ে একজোড়া জুতার দাম ২৫০৲ টাকা, আধসের মাখন ২৩০৲ টাকা। শাসন ব্যবস্থা কতখানি অপদার্থ, দুর্নীতিপূর্ণ ও জনগণের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইলে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে তাহা আমরা ভারতের দুরবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

এই অবস্থায়ও মিঃ লো তাঁহার বক্তৃতায় যখন বলেন যে চীন গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা না করিয়া এবং কমিউনিষ্টদের প্রতি দরদ না দেখাইয়া সকলে চুপ করিয়া থাকিলেই "চীনের নেতৃবৃন্দ নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিতে পারিবেন"—তখন তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে কি?

স্তোকবাক্যে ফল নাই

চ্যাং কাই-শেক তাঁহার নববর্ষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সামরিক অবস্থা আরও সুস্থির হইয়া যখন আমরা জয়লাভের অধিকতর নিশ্চয়তা লইয়া প্রতি-আক্রমণে নামিতে পারিব তখন আমাদের জনগণের কংগ্রেস ডাকা উচিত এবং এমন একটী শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা উচিত যাহাতে শাসনকর্ত্তৃত্ব কুওমিণ্টাংয়ের হাত হইতে জনগণের হাতে ন্যস্ত করা যায়। কুওমিণ্টাং কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এইরূপ প্রস্তাব করিতে আমি এখনই রাজি আছি।"

কিন্তু এই প্রস্তাবের কোনই মূল্য নাই। কুওমিংটাংয়ের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারী একাধিপত্য, গণতন্ত্র বিরোধিতা এবং কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষের ফলেই কুওমিণ্টাং সৈন্যদল পদে পদে পরাজিত হইয়াছে, জনগণের অসন্তোষ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আজ এখনই কুওমিণ্টাংয়ের একাধিপত্য দূর করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই "জয়লাভের অধিকতর নিশ্চয়তা লইয়া প্রতি-আক্রমণে" নামা যাইবে—নহিলে জাতীয় কংগ্রেস ডাকিবার দিন আর আসিবেই না। সেজন্যই কমিউনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত ন্যায্য দাবী করিয়াছে যে, প্রত্যেক পার্টি, সৈন্যদল প্রভৃতির শক্তি অনুপাতে প্রতিনিধি লইয়া একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকা হউক এবং সেখানে সময়োপযোগী ভাবে যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে কর্ম্ম-তালিকা গ্রহণ করা হউক। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটী সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হউক এবং উক্ত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত কর্ম্মতালিকা অনুসারে যুদ্ধ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন তথা পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করুক। চীনের বর্ত্তমান "সামরিক অবস্থাকে সুস্থির" করিতে হইলে ইহা ছাড়া পথ নাই।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
অফিস: ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

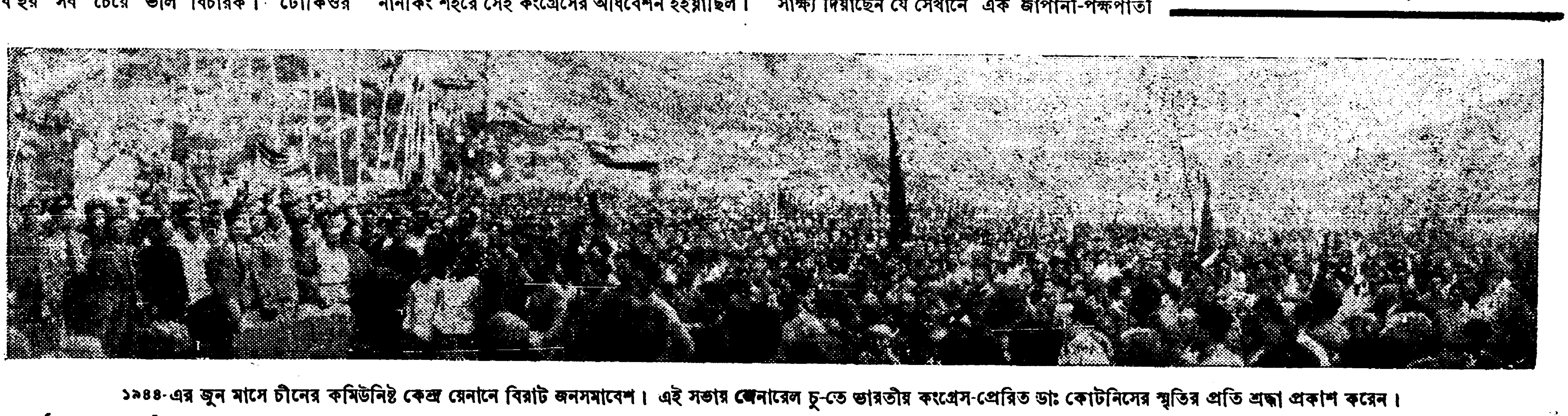

১৯৪৪-এর জুন মাসে চীনের কমিউনিষ্ট কেন্দ্র য়েনানে বিরাট জনসমাবেশ। এই সভায় জেনারেল চু-তে ভারতীয় কংগ্রেস-প্রেরিত ডাঃ কোটনিসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

Regd. No. C. 2836.

কেন লিখি ?

" 'কেন লিখি?' কারণ, না লিখে পারি না। কাগজে যদি নাও লিখি, মনে মনে লিখবই। চিন্তার মধ্যে লিখব। লিখে আমি ধারণা স্পষ্ট করতে চাই। আমাকে লিখতেই হবে। আমার কাছে লেখাই হচ্ছে চিন্তার এবং কাজের শ্রেষ্ঠ ধরণ। নিঃশ্বাস নেওয়ার মত, বেঁচে থাকার মত লেখাটাও আমার কাছে অপরিহার্য্য।......

আমার প্রত্যেকটি কাজকর্ম্ম চিরদিনই গতিবেগে চঞ্চল। যারা অবিরাম এগিয়ে চলেছে আজীবন তাদেরই জন্য আমি লিখি এসেছি। আমিও বসে নেই, প্রাণ থাকতে কোনদিন থামছি না। জীবন বলতে যদি সিধে সামনে এগিয়ে চলা না বোঝায়, তবে সে জীবনের কোনই অর্থ নেই। তাই ত' আমি আছি সেই জনপুঞ্জের সঙ্গে, সেই শ্রেণীদের সঙ্গে—যারা জীবনস্রোতকে করেছে মানবতার নদীকল্লোলমুখী। আমি তাই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-মানবের সহযাত্রী—আমি তাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আছি।

'কার জন্য লিখি?'—যারা অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী, তাদেরই জন্য আমি লিখি। দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ চলেছে—এই যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মানবের শ্রেণীশূন্য অখণ্ড সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বজোড়া সমাজ-

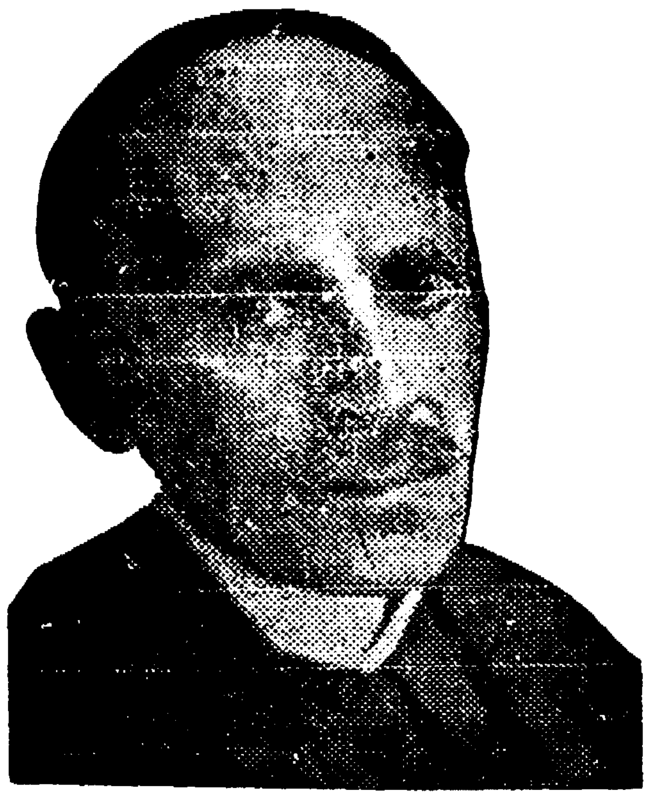

বিপ্লবের একমাত্র পার্টি কমিউনিজম। আজ তা' এগিয়ে চলেছে—হাতে তার উড্ডীন নিশান, চোখে তার ক্ষুরধার সাহসী দৃষ্টি—দ্বিধাহীন অবিচলতায় এগিয়ে চলেছে সে গিরিবিজয়ের পথে। যারা পিছিয়ে আছে, আমরা লেখকের দল তাদের ডাক দিয়ে যাই। আমরা থামবো না, ওরা এগিয়ে আসুক।, যারা এগিয়ে যাওয়ার দল, তারা থামে না।'

রোমাঁ রোলাঁ—১৯৩৩

রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যুতে

গত ৩০শে ডিসেম্বর পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রোলাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬৬ সালে ২৯শে জানুয়ারী ফরাসী দেশের ক্লামেসি শহরে রোলাঁর জন্ম হয়। ছোট বেলা হইতেই সঙ্গীত ও শিল্পকলায় রোলাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখা যায়। ইহার পর রোলাঁর সাহিত্য জীবনের আরম্ভ। 'জাঁ ক্রিস্তফ' নামে রোলাঁ একটি বিরাট উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯১৫ সালে নোবেল প্রাইজ পান। দেশে দেশে রোলাঁর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের সময় রোলাঁ যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। রোলাঁ ছিলেন মানবতার একনিষ্ঠ উপাসক। অত্যাচারিত মানুষের দরদী বন্ধু ছিলেন রোলাঁ। সাম্রাজ্যবাদের তিনি ছিলেন চিরশত্রু। ভারতের শৃঙ্খলিত মানুষের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি তিনি বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও বিবেকানন্দের জীবনচরিত লিখিয়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত রোলাঁর বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড় ছিল। রোলাঁ আজীবন মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন সভ্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া রোলাঁ বলিয়াছিলেন, 'কুচক্রীর দল, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তোমাদের উদ্যত হাত সম্বরণ করো।'

সোভিয়েটে মুসলমানদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা
মুফ্‌তি আব্দার রহমান রসুলের ঘোষণা

রুশ সোভিয়েট-গণতন্ত্রে যে সব মুসলীম বসবাস করে তাহাদের ধর্ম্মগুরুর নাম মুফ্‌তি আব্দার রহমান রসুল। রসুল সাহেব এখন ৬৪ বৎসরের বৃদ্ধ। উরাল অঞ্চলে ট্রইটস্ক নামক স্থানে এক মুসলীম মাদ্রাসায় তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর আগে তাঁহার শিক্ষা শেষ করেন। বৈরাম উৎসব উপলক্ষে তিনি মস্কো আসিয়াছিলেন।

কয়েকজন সাংবাদিক তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি তাঁহাদের বলেন—"রাশিয়ার অধিবাসী সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করাই আমার গত ৩৫ বৎসরের স্বপ্ন ছিল। জারের আমলে কেবল মাত্র বর্ত্তমান রুশ গণতন্ত্রের সীমানার অন্তর্ভুক্ত মুসলমানরাই ঐক্যবদ্ধ ছিল। সমগ্র রাশিয়ার তিন কোটি মুসলমান অধিবাসীর বেশী সংখ্যকই দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে বসবাস করিত। জারের গভর্ণমেণ্ট সব সময়েই এই সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়া ব্যর্থ করার চেষ্টা করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন শাসনতন্ত্রের ১২৪ ধারায় মুসলমান বা অন্যান্য সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতার পথে সমস্ত বাধা দূর হইয়াছে। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বহু বছরের যে প্রচেষ্টা তাহার ফলে গত বছর এবং এ বছর মধ্যএসিয়া, ট্রান্সককেশিয়া এবং উত্তর ককেশাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উজবেকিস্থানের রাজধানী টাসকেণ্ট, আজার-বৈজানের রাজধানী বাকু, এবং বুইনাস্ক ও দাগেস্তানে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশন হয়। এই সব কংগ্রেসে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কাজ পরিচালনার জন্য বোর্ড নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং এইভাবে রাশিয়ার সমগ্র মুসলমান ধর্ম্মানুরাগীরা একতাবদ্ধ হইয়াছে।"

মুফ্‌তি আমাদিগকে বলেন—"কংগ্রেস কেবল-মাত্র বোর্ডগুলিই নির্ব্বাচিত করে নাই। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা একটি প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশকে রক্ষা করিতে আমাদের দেশের হাজার হাজার সন্তান যুদ্ধ করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মবিশ্বাসীদের নিকট হইতে দেশরক্ষার জন্য "ডিফেন্স ফণ্ডে" চাঁদা সংগ্রহের কাজ চালাইয়া যাইতে ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা করার যে মহৎ দায়িত্ব তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং তাড়াতাড়ি পূর্ণ করার জন্য আল্লার কাছে অনবরত প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়।"

মুফ্‌তি আমাদিগকে আরও বলেন যে মুসলীম ধর্ম্মবিষয়ক এই সব বোর্ড যে বৃহৎ কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার ভিতর নূতন মসজিদ নির্ম্মাণ, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করা এবং মোল্লা হওয়ার শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজ রহিয়াছে। এ বৎসর ১০টি নূতন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—ইহাদের কয়েকটি গর্কি, ওমস্ক ও নভোসিব্রিস্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চাক্‌লভ, চেলিয়াবিনস্ক এবং অন্যান্য সহরে আরও নূতন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

মুফ্‌তির নিজের সম্পাদনায় "ইসলাম দিনি" নামক একখানা পুস্তক রচিত হইতেছে। এই বইতে মহম্মদের জীবনী এবং মুসলমানদের ধর্ম্মানুষ্ঠানসংক্রান্ত নির্দ্দেশ থাকিবে। —(টাস্‌)

"পৃথিবীর ভীষণতম যুদ্ধ"
বুডাপেষ্ট লড়াই সম্বন্ধে সাংবাদিকদের উক্তি

"জার্ম্মাণরা বুডাপেষ্টের রাস্তায় রাস্তায় আগুন ধরাইয়া দিতেছে। লালফৌজ যাহাতে নগরীর কেন্দ্রস্থলে পৌছিতে না পারে, তজ্জন্য সহরের সর্ব্বশেষ ঘাঁটির চতুর্দ্দিকে অগ্নিবলয় রচনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব উপকণ্ঠের বৃহত্তম অংশই সোভিয়েটের হাতে আসিয়াছে।"—রয়টারের উপরোক্ত খবরটি হইতেই বেশ বোঝা যায় যে হিটলারীরা এই অঞ্চলে অগ্রগামী লালফৌজকে ঠেকাইয়া রাখিতে মরিয়া হইয়া কি ভীষণভাবেই না লড়াই করিতেছে। এ সম্পর্কে সোভিয়েট পত্রিকা 'রেড ষ্টার' লিখিয়াছে 'হাঙ্গেরীর যুদ্ধ বর্ত্তমান সংগ্রামের বৃহত্তম যুদ্ধ।'

নাৎসীদের এই মরণ-কামড় কেন?

বুডাপেষ্টের জন্য আজ জার্ম্মানরা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে কেন তাহা 'প্রাভদা'র বর্ণনা হইতেই বেশ বোঝা যায়। 'প্রাভদা' ইহাকে বার্লিনে যাইবার বিস্তৃত পথের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইহা ছাড়া এই সহরে যে সব জার্ম্মান বাহিনীগুলি অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ বাহিনী। ইহাদের যে কোন রকমে রক্ষা করার জন্যই নাৎসী সমরনায়কেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু রণক্ষেত্র হইতে সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় 'বুডাপেষ্টে জার্ম্মান রক্ষীরা শেষ অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছে এবং মার্শাল তলবুখিন ও মালিনোভস্কীর দুই প্রবল সোভিয়েট আর্ম্মি সহরটি পতনের সঙ্গে সঙ্গে একযোগে অষ্ট্রিয়া অভিযান বিপুল ভাবে আরম্ভ করিবে।' 'প্রাভদা' এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছে—'আমরা সকল দিক দিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। খুব নিকট ভবিষ্যতে জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট বিবরে ঢুকিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মিত্রশক্তি নববর্ষে পদার্পণ করিল।' সুতরাং বুডাপেষ্টের লড়াই-এর ভীষণতা উগ্র হইতে উগ্রতর হইলেও লালফৌজের লক্ষ্য আজ আর শুধু বুডাপেষ্ট দখলেই সীমাবদ্ধ নাই। লালফৌজের মূল উদ্দেশ্য এখন ভিয়েনা ও দক্ষিণ জার্ম্মানী।

পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্ম্মানদের নূতন আক্রমণ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে সার উপত্যকায় জার্ম্মান আক্রমণ এখন পুরা দস্তর বড় আক্রমণের মত হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে আমেরিকান সৈন্যদলের সহিত জার্ম্মানদের তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্ম্মানদের আলসেস লোরেন সমতলভূমিতে প্রবেশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মান আক্রমণ সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে নাৎসীরা রাত্রি-যোগে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য ষ্ট্রাসবুর্গের ১১ মাইল উত্তরে গামহিমের নিকটে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু ইহার উত্তরে জার্ম্মানদের প্রথম পাণ্টা আক্রমণের ক্ষেত্র আর্ডেনিসে মিত্রশক্তি তাহাদের চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে। ৭ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ—আর্ডেনিস স্ফীতিমুখের উত্তরাংশে ষ্টাভলেটের দক্ষিণ-পশ্চিমে মিত্রবাহিনী পূর্ব্বের ন্যায় আক্রমণোদ্যোগ বজায় রাখিয়াছে। বাষ্টগণের উত্তর-পূর্ব্বে জার্ম্মানদের এক পাণ্টা আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে।'

পাণ্টা আক্রমণ সম্পর্কে 'প্রাভদা'

পশ্চিম রণাঙ্গণে রুনষ্টেডের এই পাণ্টা আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া 'প্রাভদা' মন্তব্য করিয়াছে—'প্রধান প্রধান জার্ম্মাণ সৈন্যদল সোভিয়েট রণাঙ্গনে আটকা পড়িয়াছে। অতএব জার্ম্মান পাণ্টা অভিযানের গতি যে মন্থর হইয়াছে, এটা স্বাভাবিক।'

জার্ম্মান পাণ্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছিল দক্ষিণ বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ অঞ্চলে। সেখানে মিত্রশক্তি জার্ম্মান আক্রমণকে ভোঁতা করিয়া দিয়াছে। এবার আবার তাহারা আরও দক্ষিণে নূতন এক আক্রমণ সুরু করিয়া কিছুটা আগাইয়াও গিয়াছে; কিন্তু এই আক্রমণ একটি বৃহৎ অভিযান নয় বলিয়াই মনে হয়। কারণ পশ্চিম ইউরোপে ও সোভিয়েট রণাঙ্গনে একই সঙ্গে প্রবল বিক্রমে লড়াই করার ক্ষমতা আজ আর হিটলারের নাই। এবং জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ সৈন্য বাহিনীর প্রায় অধিকাংশই যখন পূর্ব্ব ইয়োরোপে লালফৌজের অগ্রগমন রুখিতে নাস্তানাবুদ হইতেছে, তখন এই ফ্রণ্টে জোর প্রতিআক্রমণ চালাইবে কাহাদের নিয়া? তবে এটা ঠিকই যে জার্ম্মানীর এই পাণ্টা আক্রমণের ফলে মিত্রশক্তির আক্রমণোদ্যোগের উপর খানিকটা আঘাত পড়িয়াছে। কিছুদিনের জন্য জার্ম্মানীর কলোন প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলি যে যুদ্ধ এলাকার বাহিরে থাকিতে পারিল ইহাও হিটলারের পক্ষে মস্ত লাভ।

বর্ম্মায় আকিয়াব দখল

ব্রহ্ম রণাঙ্গণের এই সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর আকিয়াব বন্দর শত্রু কবলমুক্ত হওয়া। পশ্চিমে মায়ু নদী ও পূর্ব্বে কালাদান নদীর মধ্যে অবস্থিত এই আকিয়াব দ্বীপ মিত্রপক্ষের দখলে আসায় জাপানীরা উত্তর আরাকান হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, আর মিত্রপক্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্ত্তী বিমান ও নৌঘাঁটি পাইল। আকিয়াব অধিকৃত হওয়ায় ব্রহ্মদেশের সমগ্র মায়ু উপদ্বীপ হইতে জাপানীরা বহিষ্কৃত হইল বলা চলে।

ফিলিপাইনে নূতন আক্রমণের সূচনা

এতদিনে ফিলিপাইনের লেইতি দ্বীপের যুদ্ধ শেষ হইল। জাপানীরা এখানে ম্যাকআর্থারের বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছে; এই ফ্রণ্টের সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ মিত্রপক্ষের রণতরীবহর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ লুজেনের পশ্চিম উপকূলে লিঙ্গায়েন উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে এবং উপকূলভাগে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

এই সব রণাঙ্গনে জাপানীদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সাফল্য হওয়া সত্বেও জাপানের পরাজয়ের পক্ষে এবং তাহার যুদ্ধোদ্যমকে শীঘ্র খাটো করার দিক দিয়া ইহা যে যথেষ্ট নয় তাহা বলাই বাহুল্য। জাপানী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে খর্ব্ব করিতে হইলে বর্ত্তমানের আক্রমণ ও অগ্রগতির ধারা আমূল পরিবর্ত্তন করা যে দরকার ইহা মিত্রপক্ষের সমরনায়করাও উপলব্ধি করিতেছেন।

চীনের কমিউনিষ্ট-কুওমিংটাং অনৈক্য ও ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা জাপানের বিরুদ্ধে জোরদার যুদ্ধ পরিচালনার সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তাই ফ্যাসিষ্ট জাপানের শীঘ্র ও চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য অবিলম্বে এই দুই সমস্যার সমাধান দরকার।

Just Received From Moscow :

1. LENINGRAD by Nicolai Tikhonov Rs. 2-3
2. AN ARMY OF HEROES—True Stories of Soviet fighting men. Rs. 5-8
3. BLACK SEA SAILOR [a novel] —by Leonid Solovyev Rs. 1-12
4. THREE YEARS OF THE SOVIET UNION'S PATRIOTIC WAR— A military and Political Summary Anna 1
5. THE DEFENCE OF MOSCOW— by Colonel N. Frenkel, Dr. Hist. As. 4
6. ORDER OF THE DAY OF J. STALIN NO 16. Anna 1
7. INTERNATIONAL LITERATURE Nos. 8, 9, 10, 11, 12 of 1943 and Nos. 1, 2, 3, 4 of 1944 Re. 1 per copy
8. MOSCOW NEWS [Bi-weekly] from April 29 to Aug 9, 1944 27 Copies in all at 1 anna per Copy Rs. 1-11 a se

[Postage charged extra]

NATIONAL BOOK AGEN
LTD.
12, Bankim Chatterjee St.
(College Square), Calcutta

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা] ১৮ই জানুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার. ৫ই মাঘ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

হিন্দু মহাসভাপন্থী জমিদারের জুলুম

খুলনায় এক হাজার আশী জন কৃষক ও কৃষক-নেতার বিরুদ্ধে মামলা

ষোল হাজার বিঘায় প্রজা-উৎখাতের জঘন্য ষড়যন্ত্র

খুলনা জেলার শোভনা ইউনিয়নে আবাদ অঞ্চলের কৃষক বহুদিনের অনাহার দুঃখ দুর্দ্দশার অবসানের জন্য গত ২ বৎসর ধরিয়া নদীর বাঁধ বাঁধিয়া জমিতে ফসল ফলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। জেলার সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায় আবাদ অঞ্চলের কৃষকদের ফসল জন্মাইবার এই উদ্যমে সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। জমিদার, জোতদাররাও কৃষকদের সঙ্গে এই কাজে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। গতবার সারা বছর ধরিয়া কৃষকরা অসীম পরিশ্রমে ১৬০০০ বিঘা জমিতে ফসল ফলাইয়াছে। বহুদিনের অনুর্ব্বর জমিকে লবণাক্ত জলের হাত হইতে রক্ষা করিয়া শস্যশ্যামলা করিয়াছে এই কৃষকরাই। আর আজ ১৯৪৫-এর সুরুতেই জমিদার রায় বাহাদুর শৈলেন ঘোষ এই জমি হইতে কৃষকদের উৎখাত করিতে চাহিতেছেন। জমি ও ফসলের অতিরিক্ত লোভেই এই সব জমিদার কৃষকদের সহিত এত অমানুষিক ব্যবহার করিতেছে বলিয়া বাংলার বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকে। বাড়তি জেলা খুলনায় ফসল কমিয়া যাওয়া ও বাংলার খাদ্যাভাব বৃদ্ধি হওয়ার ইহা একটি প্রধান কারণ। বাংলার সর্ব্বনাশের জন্য এই ধরণের লোকেরাই দায়ী।

শোভনা ইউনিয়নের আবাদ অঞ্চলের এক হাজার আশীজন কৃষক ও কৃষক নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হইয়াছে। কমরেড বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খুলনা জেলার কৃষক সমিতির সমস্ত নেতা ও কর্ম্মী এবং ৫০০ জন হিন্দু মুসলমান কৃষককে ১০৭ ধারায় আসামী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরো বহু কৃষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় আট দশটী মামলা করা হইয়াছে। কয়েকটী মামলার বাদী জমিদারের নায়েব ত্রৈলক্য বসু, আর কয়েকটীর বাদী ভারতেশ্বর এবং পরে আরো কয়েকটী মামলা স্থানীয় নায়েবের কয়েকজন দালাল-কৃষক নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধেই রুজু করিয়াছে।

অনাবাদী জমিতে সোণা ফলাইল

ডুমুরিয়া থানার শোভনা ইউনিয়নের বলাবুনিয়া পাতিবুনিয়া, কদমতলা, পাথির বাদাল প্রভৃতি আবাদ অঞ্চল প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া ছিল। গত বৎসর কৃষকরা নিজ উদ্যমে নদীর বাঁধ বাঁধিয়া লবণাক্ত জলের খরস্রোত হইতে ১৬০০০ বিঘা ফসলের জমি রক্ষা করিয়াছে। তাহারই ফলে এই সমস্ত জমিতে এবার অফুরন্ত ফসল ফলিয়াছিল। সমস্ত ইউনিয়নের কৃষকরা জমির ধান ডিসেম্বরেই কাটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তবুও কয়েকশত বিঘা জমির ধান কাটা শেষ হয় নাই। স্থানীয় কৃষক সমিতি সারা বছরের পরিশ্রমের ফল যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার জন্য সমগ্র ইউনিয়নের কৃষকদের আহ্বান জানাইল— দূর দুরান্তের গ্রাম হইতে সমস্ত কৃষককে আবাদ অঞ্চলে আসিয়া এই তিনটি গ্রামের ধান যৌথভাবে কাটিতে হইবে।

বহুদিনের পতিত জমির ফলন্ত ফসল দেখিয়া সারা কৃষক সমাজ আনন্দে ভরপুর। বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে কৃষকরা বালাবুনিয়ায় সমবেত হইল। বহু কৃষক দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বিনা মজুরীতে এই অঞ্চলে আসিয়া মাঠের কাজ করিয়া দিল। বাঁধের উপর কৃষকসমিতির নেতারা উপস্থিত; সমিতির লাল পতাকা উড়িতেছে। কৃষকদের "ধান কাটি ফসল কাটি" গানের ছন্দে ছন্দে জমির ধান কাটার কাজ দ্রুত শেষ হইতে লাগিল।

জমির উপর নায়েব-দারোগা-পুলিশ-লাঠিয়াল

কিছু জমির ফসল কাটা বাকী আছে—এমন সময় আসিল জমিদারের অতর্কিত আক্রমণ। আবাদ অঞ্চলের গ্রামে জমি-ডিক্রীর নোটিশ আসিল, শমন-পরোয়ানা, পুলিশ এমন কি সশস্ত্র ফৌজ পর্য্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করিল। ৫৭০ বিঘা জমির স্বত্ব জমিদারের খাস দখলে আসিবে এই মর্ম্মে রায় বাহাদুরের নায়েব ত্রৈলক্য বসু কোর্টে আবেদন করেন। খুলনার হাকিম মিঃ নুর আমেদ চৌধুরী কোনরূপ জুডিশিয়াল বা অন্যবিধ তদন্ত করার পূর্ব্বেই জমির ফসল ক্রোক করার অর্ডার জারী করিয়া বসেন। দারোগা সাহেব পুলিশ-ফৌজ লইয়া এই জমির ধান কাটাইতে গেলেন। নায়েব মহাশয় গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লাঠিয়াল সংগ্রহে বাহির হইলেন। ৫৭টী গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখা গেল বহু কৃষক অগ্রিম বায়নার টাকা লওয়া স্বত্বেও পরে কৃষকসমিতির বিরুদ্ধে ধান কাটিতে যাইতে রাজী হয় নাই। নায়েব মহাশয়কে বাধ্য হইয়া ফরিদপুর জেলা হইতে টাকার লোভ দেখাইয়া কিছু কৃষক মজুর আনাইতে হইল।

গ্রামের কৃষকরা নদী পারের গ্রামে সমবেত হইয়া সমিতির সভা করিতেছে। গ্রামে আছে শুধু মেয়েরা ও শিশুরা। বাড়ী বাড়ী পুলিশ যাইয়া আসামীর খোঁজ খবর করিতে থাকে। ২রা জানুয়ারীর "যুগান্তরে" বিস্তারিত খবর সকলেই দেখিয়াছেন। রমণীরা আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটায়। নায়েবের দালাল লাঠিয়ালরা পিছনে পুলিশের জোর পাইয়া গ্রামবাসীদের অনুপস্থিতির সুযোগে কয়েকজন বামলাকে ও কৃষকদের ছোট ছোট ভাইকে প্রহার করে, কৃষক রমণীদের ডাকাইয়া অকথ্য ভাষায় শাসায় এবং বাড়ীর ভিতরে গিয়া আসামীদের খোঁজে খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট করে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীর ভিতর জিনিসপত্র তছনছ করিয়া এই সব দালালরা ভীষণ আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে একজন কৃষক রমণী প্রাণ রক্ষার জন্য দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যেও নদী সাঁতরাইয়া অপর গ্রামে চলিয়া যায়!

কৃষকের দুঃখে পাষাণও গলে

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আশ্বাস প্রদান

পরদিন দলে দলে কৃষক ও বহু কৃষক মেয়ে নৌকায় ও পায় হাঁটিয়া খুলনা শহরে হাজির হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহারা এই জুলুমের প্রতিবিধান দাবী করে। মুসলিম লীগের নেতারা হাজির থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পুরুষ ও মেয়ে কৃষকদের কথা শুনিয়া এই সঙ্ঘর্ষ থামাইবার প্রতিশ্রুতি দেন।

শহরের মধ্যবিত্ত

শত শত কৃষকের মিছিল খুলনা শহরের মধ্যবিত্তের বাড়ী বাড়ী গিয়া ও জনসভা করিয়া জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। শহরের লোকজন কৃষকের কথা মন দিয়া শুনে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। তারপর তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যায়। ক্ষেতখামারের কাজ ফেলিয়া, ধান ঝাড়া বন্ধ করিয়া জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিনই দলে দলে কৃষককে কোর্টে আসিতে হয়। কোর্টে আসা, জামিনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রামে শোনা গেল, দারোগা সাহেব বলিতেছেন— শুধু শুধু এখানে আসিলাম ৫৭০ বিঘা জমির ধান ক্রোক করিতে হইবে উপরওয়ালার হুকুম, কিন্তু ধান কোথায়—এই কয়দিনে পাইয়াছি মাত্র তিন হাজার আঁটী, নিলাম করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব। কৃষকদের পাঠাইয়া দিবেন, তাহাদের কাছেই সব দিয়া যাইব।

কিন্তু জমিদারের এত নিষ্ঠুরতা কেন

এই অঞ্চলের জমিদার রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮০ আনার মালিক। সাহসের বিমলচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ।০ আনার মালিক। ইহাদের গাঁতিদারী স্বত্ব উপরস্থ মালিক দেবপ্রসাদ ঘোষের। লোনাজল আটকাইবার জন্য জমিদাররা কোনদিনই বাঁধবন্দী করিতে রাজী হন নাই। বছরের পর বছর অজন্মা হওয়ার ফলে কৃষকরা মরিতে মরিতে কোনরূপে টিঁকিয়া আছে মাত্র। বেশীর ভাগ কৃষককেই পাতি বিক্রয় (যাহার দ্বারা মাদুর তৈয়ার হয়) করিয়া কিছু কিছু মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ফলে জমা নিলামবিক্রয় হইতে লাগিল—কৃষকরা নিরুপায় হইয়া বার বার জমিদারদের নিকট বাঁধবন্দীর জন্য আবেদন করে। প্রতিবারই তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। তারপর একে একে বহু কৃষক জমি ও গ্রাম ছাড়িয়া অন্যান্য স্থানে দিনমজুরী করিতে যায়, নোনা কাঁকড়া খাইয়া দিন কাটায় কৃষক রমনীরা বিবস্ত্র অবস্থায় পড়িয়াথাকে। এই সমস্ত কৃষকদের জীবনকে ঘিরিয়া বর্ব্বরতার যুগ নামিয়া আসে। খাজনা দিতে পারে না—টাকা দিলেও কাছারী হইতে রসিদ লইতে ভয় পায়।

১৯৪২ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষকরা প্রায় ৮।৯ মাস ধরিয়া প্রতিদিন সকাল হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত, কোন কোন দিন সারা রাত্রি কাজ করিয়া খরস্রোতা নদীর প্রায় দশ মাইল বাঁধ বাঁধে।

ধান পাকিয়া উঠিলে জমিদারের লোক ২১শে ডিসেম্বর (১৯৪৩) ধান কাটিয়া নেয়। এক হাজার সাধারণ কৃষক বিলে সমবেত হইয়া ধান বোঝাই নৌকাগুলির সামনে দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত নায়েব মহাশয়ের ঔদ্ধত্য দমিত হয়—কৃষকের ন্যায্য অংশ দিতে তিনি বাধ্য হন।

আপোষের ফলেই জমিতে ফসল

১৯৪৪এর শুরুতে ৩৫ জন মাতব্বর কৃষককে লইয়া সমিতির নেতারা জমিদার শৈলেন ঘোষের নিকট যায়। তিন দিন ধরিয়া ১৬ ঘণ্টা আলোচনার পর জমি-ব্যবস্থার আপোষ হয়। উভয় পক্ষই যেসব শর্ত্ত মানিয়া লয় তাহা এইরূপ :—

১। প্রজার যে সমস্ত জমি জমিদার খাস করিয়া লইয়াছেন, তাহা ফেরৎ দিবেন।

২। পূর্বে প্রজার যত জমি ছিল তাহার এক তৃতীয়াংশ জমিদার বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা দর ধরিয়া প্রজার নিকট হইতে লইবেন। ঐ অর্থ মোট বকেয়া ও ডিক্রীর টাকা হইতে বাদ পড়িবে। বাকী যাহা পাওনা থাকিবে তাহা ৪।৫ বৎসরের কিস্তীতে জমিদার পাইবেন।

৩। যে এক তৃতীয়াংশ জমিদার লইবেন তাহা প্রজারা ভাগে চাষ করিবে। প্রজারা সক্ষম হইলে উপযুক্ত সেলামী দিয়া পুনরায় জমি ফেরৎ পাইবে। **জমিদার অপর কাহারও নিকট ঐ জমি বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না।**

৪। যে সমস্ত প্রজার এই জমিতে কোন কালেই স্বত্ব ছিল না অথচ বাঁধ বন্দী করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া জমি দেওয়া হইবে।

৫। প্রজাকে প্রতি বছর হাল খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।

৬। এই বছরের সমস্ত ধান প্রজা পাইবে। হাল খাজনা শোধের জন্য জমিদার ও সমিতির নির্দ্দিষ্ট মাতব্বর কৃষকের বাড়ীতে প্রজারা অর্দ্ধেক ধান উঠাইবে। যে মুহূর্ত্তে হাল খাজনা শোধ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই প্রজারা সেই ধান নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিবে। **কোন ধানই জমিদারের কাছারীতে উঠিবে না।**

৭। প্রজা বিনা রসিদ ও দাখিলায় টাকা দিবে এবং যখনই তাহার বাকী বকেয়া পরিশোধ হইয়া যাইবে তখনই জমিদার প্রজাকে জমি লেখাপড়া করিয়া দিবেন।

৮। জমিদার বাঁধ-কমিটীর মধ্যে থাকিবেন।

৯। চাষের সময় জমিদার বীজ ধান, লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতির জন্য কৃষককে অর্থ-সাহায্য করিবেন।

১০। কৃষক সমিতির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া নায়েব-গোমস্তা স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া লইবেন।

জমিদার শর্ত্ত ভাঙ্গিল

কৃষক সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় **প্রজারা বিনা দাখিলায় প্রায় ২০ হাজার টাকা জমিদারকে দিয়া দিল।**

এদিকে বর্ত্তমান নায়েব ত্রৈলোক্য বসু গোপনে গোপনে কিছু কিছু জমি লম্বা টাকা ঘুষ লইয়া লাঠিয়ালদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে শুরু করে। বহু লাঠিয়াল কৃষক সভার সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া এই ষড়যন্ত্রে পা দিতে অস্বীকার করে। তবুও তিনি প্রতি মহালের জন্য ৪০০।৫০০ টাকা ঘুষে কয়েকজন সমিতিদ্রোহী লোকের সহিত জমির বন্দোবস্ত করেন। পুরানো প্রজার তৈরী ফসল সমেত এই জমি অন্য লোকের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। তারপর তাঁহারা হাকিম ও পুলিশের কাছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করিতে থাকেন।

কৃষকরা দেশবাসীর কাছে বিচারপ্রার্থী

গরীব অসহায় কৃষকের দলকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইয়া জমিদার মতলব করিয়াছে— তাহাদের আবাদ অঞ্চল হইতে উৎখাত করিয়া সমস্ত জমি খাস করিয়া লইবে। চিরকালের পতিত জমিকে যাহারা উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা করিয়া দিয়াছে তাহাদের মারিয়া তিনি এই অঞ্চলে নূতন বিদেশী প্রজা বসাইবেন। এই শৈলেন বাবুই কয়েক বৎসর আগে রামপাল থানায় বহু জমি এই ভাবে খাস করিয়া লইয়াছেন। আবাদ অঞ্চলের সোণার লাভ তাঁহাকে এবার পাইয়া বসিয়াছে

সাহস গ্রামের একজন বৃদ্ধ জোতদারই বলিলেন —মধুপুরে শৈলেন ঘোষ বসিয়া আছেন আর এদিকে ১৫০০০ লোককে নিরন্ন করার ঘৃণা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অপর এক শরীকের নায়েব বলিলেন, আমরা এই স্থানেরই বাসিন্দা। আমরা কি প্রজাদের সঙ্গে দৈনন্দিন ঝগড়া বিসম্বাদ করিয়া নিজেদের বাঁচাইতে পারিব?

হিন্দু মহাসভা পন্থী জমিদার শৈলেন ঘোষ বহু অর্থ জমাইয়াছেন, বহু কৃষকের জমি খাস করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বছরে খুলনার অন্যান্য সমস্ত জমিদারই কৃষকদের বাঁধবন্দী ও খালকাটার কাজের প্রশংসা করিতেছেন—কৃষকদের পাশে আসিয়া তাঁহার দাঁড়াইয়াছেন। একা শৈলেন ঘোষই বোধ হয় সারা বাংলায় জমিদারী প্রতাপের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন!

কংগ্রেস নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিনাসর্ত্তে মুক্তি

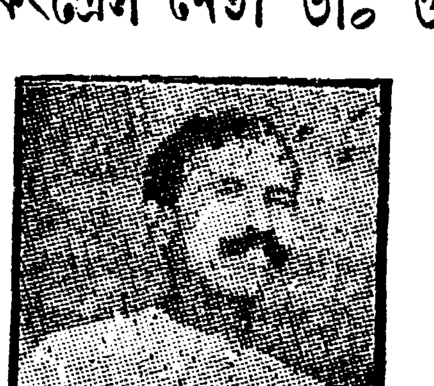

আমেদাবাদ দুর্গে আটক কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া গত ১৫ই জানুয়ারী মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বাংলার এই দারুণ সঙ্কটের দিনে তাঁহার মুক্তি সমগ্র বাঙ্গালীর মনে আশার সঞ্চার করিবে। আমরা কামনা করি তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া দুর্গত বাংলার সমাজ জীবনকে গড়িয়া তোলার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

আগামী স্বাধীনতা দিবস

১৯৪৫ সালকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ বিজয়ের শুভদিন বলিয়া মনে করিতেছে। যুদ্ধশেষে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে দুঃখলেশহীন পৃথিবী গড়িবার সংকল্পে দেশে দেশে আস্থাভাজন নেতার দল আজ দ্রুত অগ্রসর। আর নিজেদের দেশের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতেছি, শ্রমজীবী জনসাধারণ ও বেতনজীবী মধ্যবিত্তের দল আজ এমন এক দুর্দ্দশার মধ্যে ডুবিয়া আছে, যে দুঃখ আগে তাহারা কখনও ভোগ করে নাই। আমাদের সুপ্রাচীন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার যে দুটি মহান্ দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত, আজও তাহারা পরস্পর মিলিতে পারে নাই। দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব যে সাম্রাজ্যবাদী আমলাদের হাতে, তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা আজ সীমা ছাড়াইয়াছে।

শুধু ইহাই নয়। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতার পর দেশভক্তদের মধ্যে একদিকে চূড়ান্ত হতাশা আসিয়াছে, অন্যদিকে বিভেদ শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। মীমাংসার পথ আরও সহজ করা দূরে থাকুক, কংগ্রেস ও লীগ পত্রিকাগুলি আজ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। ভাই ভাইয়ের উপর এই ভাবে যদি দোষ চাপায়, দেশবাসীর আশা এই ভাবে যদি নিভিয়া যায়—তবে আর গৌরব করার থাকিল কি? আমরা আজ শুধু দুইটি পৃথক্ শিবিরেই বিভক্ত নই, আমরা ক্রমে দুইটি যুধ্যমান শিবিরে পরিণত হইতে চলিয়াছি। এই ভাবে কি করিয়া আমরা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্য ও উভয়ের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসর হইব? ইহা কি আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ঠেলিয়া দিবে না?

দেশভক্তদের প্রত্যেকটি শিবিরে অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রত্যেকটি অংশ কায়েদে আজমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেও লীগ আজ ভিতরকার দলাদলিতে ভাগ হইয়া যাইতেছে। গঠনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া 'কংগ্রেসকে পুনর্গঠনে'র নামে কংগ্রেস সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইতেছে। সামনে যে ভবিষ্যৎ, তাহাতে দেশের দুটি প্রধান দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের পিছনে শক্তি দ্বিগুণ হওয়া দূরে থাকুক, ভিতরকার শক্তিই দারুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আমাদের মিলিত স্বাধীনতার সংগ্রাম যাঁহাদের কীর্ত্তি—আমাদের সেই দেশবাসী, আমাদের সেই নেতৃবৃন্দ অতীতে যা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা আগাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, আমরা সবাই তাহা আরও টানিয়া নামাইতেছি। ইহা যদি আমরা উপলব্ধি না করি—তবে বুঝিতে হইবে আমরা আমাদের নিষ্ঠা হারাইয়া বসিয়াছি, বুঝিতে হইবে বেদনাদায়ক আত্ম-সমালোচনার ভয়ে নিষ্ঠুর সত্যের প্রতি আমরা অন্ধ হইয়া আছি।

আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের তরুণ পার্টি স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহ পালনের সংকল্প নিয়াছে। যে একমাত্র পথে দেশের স্বাধীনতা সম্ভব—সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও দেশবাসীর কল্যাণ বৃদ্ধির সেই কাজে আমাদের পার্টি আবার নূতন করিয়া আত্ম-নিয়োগ করিবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীই হইবে এই সপ্তাহের প্রধান ও মুখ্য আওয়াজ। সমগ্র দুনিয়ার সামনে আজ দারুণ সংকট, আজই আমাদের দুর্গত দেশবাসীর সেবা সব থেকে বেশী প্রয়োজন—কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সর্ব্ব বৃহৎ দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে দেশবাসী তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া না পায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজেদের চোখে চারিদিকের ঘটনাবলী না দেখিতে পান, ততদিন পর্য্যন্ত মুক্তিকামী ভারতবর্ষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠান একটি গোটা পরাধীন জাতিকে বল দিয়াছে, কোটি কোটি মানুষের মনে দেশপ্রেমের দুর্ব্বার প্রেরণা আনিয়াছে, সমস্ত স্বদেশভক্ত শক্তিকে একত্র মিলাইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের যে জয়যাত্রা, তাহারই পুরোভাগে থাকিত যে প্রতিষ্ঠান—সেই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বপদে আমরা বন্দী নেতৃবৃন্দকে যতদিন না ফিরাইয়া আনিতে পারি, ততদিন মুক্তিকামী ভারত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

নেতৃবৃন্দের অভাবে কংগ্রেসকর্ম্মীরা শুধু অন্ধের মত অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকিবে, অক্ষমের মত খোঁড়াইতে থাকিবে এবং লীগ ও আমাদের পার্টির সহিত ঝগড়ায় মত্ত থাকিবে। এক দিকে স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম চালাইতে কংগ্রেসের বাধা, অন্যদিকে কংগ্রেসকর্ম্মীরা নেতৃত্বহারা—ফলে, দেশময় অসহায়তা এবং সমগ্র দেশবাসীর মনে দারুণ নৈরাশ্য। আমাদের হতভাগা দেশের আজ ইহাই অবস্থা।

আমাদের যে নেতারা দেশের সর্ব্ববৃহৎ দেশ-প্রেমিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে নেতৃত্ব দিয়াছেন—তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে দেশজোড়া এক বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তোলাই আজ এই মুহূর্ত্তে সব থেকে বড় প্রয়োজন। স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহে আমাদের পার্টি এই আন্দোলন শুরু করিবে। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি দেশভক্ত নরনারী এই আন্দোলনে যোগ দিবে অথবা নিজেরা পৃথকভাবে লক্ষ কণ্ঠে সেই অবিমিশ্র জাতীয় দাবীই ধ্বনিত করিবে, যে দাবী শ্রেণী ও দল নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলেরই এক দাবী।

আগষ্ট গোলযোগকে কংগ্রেস কি চোখে দেখে, গান্ধীজী তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কেও ঘোষণা করিয়াছেন। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী আমলাদেরও আজ কংগ্রেস-নেতাদের আটক রাখার পক্ষে কোনই যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের সহিত মিটমাট করিবার পক্ষে এবং নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে বিদেশে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাই এ সত্যের বাস্তব প্রমাণ।

যাহার যে মতই হউক, সমস্ত ভারতবাসী যদি এক কণ্ঠে নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী ধ্বনিত করে, পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই সে দাবী উপেক্ষা করে।

আমরাই একমাত্র অমুসলমান প্রতিষ্ঠান, যাহারা লীগের পাকিস্তান দাবী অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করিয়া থাকে এবং আমরা আমাদের সাধ্য মত ব্যাপকভাবে এই দাবীর স্বপক্ষে প্রচার চালাইয়াছি। কাজেই লীগপন্থী ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে আমরা সেই ভ্রাতৃসুলভ অধিকারের জোরেই এই সহজ সরল প্রশ্নটি করিতে চাই: আপনাদের মন্ত্রিসভা যখন কংগ্রেসকর্ম্মীদের বন্দীদশায় রাখিয়াছে, তখন আপনারই বা কি ভাবে আশা করেন যে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিবে? খিজর হায়াতের বিশ্বাসঘাতকতার

(৭ম পৃঃ দেখুন)

নিঃ ভাঃ কৃষক সম্মেলন

নবম অধিবেশন : নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ

পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই

নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ শুরু হইয়াছে। একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও অর্থ সংগ্রহ চলিতেছে। সম্মেলনের যাবতীয় কাজের জন্য ৫০,০০০৲ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

নেত্রকোনা শহরের সন্নিকটেই সম্মেলনের জন্য যে ৩০ একর জমি ঠিক করা হইয়াছে তাহাতে এক লাখ লোক সমাবেশ হইতে পারে এরূপ একটি সভামণ্ডপ ও দশ হাজার লোকের বাসগান তৈরী হইবে। কৃষকরা তাঁহাদের সাধ্যমত ধান চাউল, বাঁশ ইত্যাদি দান করিতেছে। সারা ভারতের কৃষককে অভ্যর্থনার আয়োজনে বাংলার দেশবাসী সাহায্য করুন।

অভ্যর্থনা সমিতি
২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জনযুদ্ধের স্বাধীনতা সংখ্যা

২৫শে জানুয়ারী বাহির হইবে—দাম ৵০।

আগামী ৩৭শ সংখ্যা জনযুদ্ধ ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ "স্বাধীনতা সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হইবে। উহাতে বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক রচনা এবং সাহিত্য, ছবি, চিত্র-সমালোচনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য অনেক বৈচিত্র্য থাকিবে।

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ
১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ঘটনা ও রটনা

মায়ের চেয়ে মাসী

গান্ধীজি যখন বল্লেন যে অগাষ্ট সংগ্রাম কংগ্রেসের নয় তখন স্বরাষ্ট্রসচিব টটেনহামই সব চেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং মিথ্যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে এর দায়িত্ব কংগ্রেসেরই।

সম্প্রতি আর একজন মহারথীও সেই কাজেই ব্রতী হয়েছেন। তিনি হলেন স্বনামধন্য হুমায়ুন কবীর। কবীর সাহেব বোম্বাইয়ের ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতায় বলেছেন যে "১৯৩২ সালের আন্দোলনেও কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল না। তবুও সে আন্দোলনকে কংগ্রেস আন্দোলন বলা হয়; তবে ১৯৪২ সালে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আসেনি, শুধু এই কারণে '৪২ সালের আন্দোলনকে কেন কংগ্রেস আন্দোলন বলা যাবে না?"

কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে এবং অগাষ্ট "বিপ্লব" সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার কবীর সাহেবের নিশ্চয়ই আছে। কারণ (১) সেই ১৯৩৬ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি বাংলার আইন সভায় কৃষক-প্রজা দলে বিরাজ করছেন, কখনও কংগ্রেস দলে যোগ দেননি, (২) বাংলায় অগাষ্ট আন্দোলন উপলক্ষ ক'রে কংগ্রেসীদের বিনা-বিচারে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, তাদের উপর লাঠিবাজি ইত্যাদি যা কিছু হয়েছে তা হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীমণ্ডলীর রাজত্বকালেই হয়েছে। সেই মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থক ছিলেন মিঃ হুমায়ুন কবীর ও তাঁর কৃষক-প্রজা দল। সেজন্যই অগাষ্ট "বিপ্লবের" প্রচণ্ড সমর্থক এই কবীর সাহেবকে "বিপ্লবের" দিনে কখনও জেলখানায় বা জনতার মধ্যে দেখা যায় নি, দেখা গিয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলী তথা আমলাতন্ত্রের আনাচে কানাচে। সুতরাং আমলাদের রাজা টটেনহামের কথাই যে তিনি এখনও আওড়াবেন তাতে বিচিত্র কি?

সেজন্যেই তাঁর বক্তৃতা কংগ্রেসী কাগজগুলি বিশেষ আমল দেয়নি, ঘটা করে ছাপিয়েছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের "ন্যাশনালিষ্ট" কাগজ। কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে প্রামাণিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে—হিন্দু সভা আর কৃষক-প্রজা আর—টটেনহাম!

*　　*　　*

একি কথা...মন্থরার মুখে

মার চেয়ে মাসীর দরদ সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ নজরে এসেছে। কোনো কোনো কংগ্রেস-কর্ম্মী কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস থেকে বাদ দেবার যে আওয়াজ উঠিয়েছেন তার সমর্থন এল কংগ্রেস-বিরোধী প্রচণ্ড মওলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের "আজাদ" পত্রিকা থেকে। হঠাৎ দেখলাম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের "শক্তি, সংহতি এবং নীতি ও কার্য্যক্রমের অবিভাজ্যতা রক্ষা" করবার জন্যে আজাদ এত ব্যাকুল হয়েছে যে আজাদের সম্পাদক মহাশয় কমিউনিষ্ট-বিরোধী কংগ্রেসকর্ম্মীদের সমর্থন করে লিখে ফেলেছেন, "কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপের ফলে কংগ্রেসের ভিতর ভাঙ্গন ও গোলমাল আসা খুবই স্বাভাবিক এবং তার প্রতিকারার্থে কংগ্রেসকে কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলেই হয়ত চলিবে না।"

আপনি হয়তো ভাবছেন একি হ'ল, কংগ্রেসের স্বাস্থ্যরক্ষায় আজাদের এত আগ্রহ—গান্ধী-জিন্না প্যাক্ট কি ভেতরে ভেতরে হয়ে গেছে? আশ্বস্ত হতে পারেন যে সেরকম কিছু নয়—শুধু ব্যথার ব্যথী, অর্থাৎ যার যেখানে ব্যথা! আজাদ সম্পাদক কংগ্রেসের এই বাদ বিতণ্ডার শিক্ষাকে উপলক্ষ করে লীগ সম্বন্ধেও কমিউনিষ্টদের "উপদেশ" দিয়েছেন যে "তাঁহাদিগকে কমিউনিষ্ট দল লইয়া মোছলেম লীগ হইতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিতে হইবে।"

অর্থাৎ কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আজাদ সম্পাদকের লোভ নেই, তিনি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করছেন মিঃ পাটিল প্রমুখ ভেদপন্থীদের আদর্শের দিকে—অর্থাৎ "এক কংগ্রেস, এক নেতা, এক প্রোগ্রাম" এই বুলির দিকে। এই বুলি যে হিটলারের আদর্শ তা সম্পাদক মশায় ভুলে গেছেন।

ভুলবার হয়তো কারণও ঘটেছে। বাংলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির কোনো মেম্বরই লীগের ভেতর নেই, তবুও আজাদের হঠাৎ এই সাজ সাজ রব কেন? কারণ মুসলিম জনসাধারণ যতই লীগে যোগ দিচ্ছে, লীগের নীতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে তাদের পক্ষ থেকে তাগিদও ততই বাড়ছে। শুধু মন্ত্রীত্ব, আইন সভা, চাকরী বা খবরের কাগজের জোরে প্রাচীনপন্থী নেতাদের নেতৃত্ব বজায় রাখার দিন ফুরিয়ে আসছে। এখন তাঁরা শেষ অস্ত্র সম্বল করছেন—নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তায় যে-ই নাড়া দেবে তাকেই কমিউনিষ্ট নাম দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা কর।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে অতীতে এ খেলা যেমন ব্যর্থ হয়েছে, লীগের মধ্যেও ভবিষ্যতে তাই হবে।

*　　*　　*

ভুল শোধরানো ও সত্যনীতি

গত সপ্তাহে জামান সাহেবের নামে মুনের চোরা কারবারের মামলার বিবরণে আমি লিখে-ছিলাম যে কোনো লীগপন্থী কাগজ এ খবর ছাপেনি। এতে একটু ভুল হয়েছিল। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া এবং মর্ণিং নিউজে এ খবর বার হয়নি ঠিকই কিন্তু ২৬শে অগ্রাণের আজাদে এ খবর বার হয়েছিল, তা আমার চোখে পড়েনি। এই ভুলের জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আবার আনন্দিতও। কারণ আমার খবরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মামলার পূর্ণ বিবরণ আজাদ আর একবার আবৃত্তি করেছে। এ ধরণের ব্যাপার যতবার কাগজে বার হবে, তত বেশী লোকের চোখে পড়বে। আজকের দিনে তার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

তবে আজাদ সম্পাদক আমার এই ভুলকে আক্রমণ করতে গিয়ে একটু মাত্রা হারিয়ে ফেলেছেন, বলেছেন "লীগপন্থী কাগজের রাজনীতি সত্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যিকার রাজনীতি—বাজার চলতি সামানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি নয়।"

আজাদের সত্যনীতির পরিচয় কয়েক মাস আগে আমরা একবার দিয়েছিলাম। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল সম্বন্ধে আমাদের একটা প্রবন্ধে লীগের নীতির বিরুদ্ধে যে-সব কথা ছিল তা বেমালুম বাদ দিয়ে শুধু কংগ্রেস ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সমালোচনার অংশটুকু আজাদ ছাপিয়েছিল—কিন্তু এমন ভাবে ছাপিয়েছিল যাতে লোকে ভাববে জনযুদ্ধের গোটা প্রবন্ধটাই ছাপা হয়েছে। এমন কি একটা ডট ড্যাশেরও বালাই ছিল না। যখন আমরা তার প্রতিবাদ পাঠালাম তখন লজ্জার খাতিরে তা আজাদে ছাপা হ'ল বটে, কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির 'মিথ্যানীতি' সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুঃখ প্রকাশের কোনো সাড়া পাইনি।

বোধহয় এ ধরণের বিকৃতি তাঁদের কাছে দুঃখজনক নয়, এ তাঁদের "সত্যনীতিরই" অংশ। তার নতুন নমুনা হাতে হাতে। আমাদের সামান্য দৃষ্টিবিভ্রমের প্রতিবাদে ১লা মাঘ তাঁরা উপরোক্ত মন্তব্য সহ যে কলাম খানেক লিখেছেন তাতে জামান সাহেবের মামলা সম্বন্ধে আমার লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন। দেখলে মনে হবে গোটা লেখাটাই ছাপা হয়েছে, কারণ কোথাও কোনো ডট, ড্যাশ বা আংশিক উদ্ধৃতির অন্য কোনো স্বীকারোক্তি নেই।

আমার লেখার মাঝখান থেকে এবং শেষ থেকে আজাদ সম্পাদক মশায় এমন ভাবে খানিকটা খানিকটা অংশ চেপে গেছেন যাতে লেখাটা পড়লেই মনে হবে লীগকে খারাপ করে দেখা নাই জনযুদ্ধের কাজ। সুতরাং যে সব মুসলমান পাঠক জনযুদ্ধ পড়েন না তাঁরা ভাববেন জনযুদ্ধ তথা কমিউনিষ্টরা লীগ-বিরোধী। "এ কি কথা...মন্থরার মুখে" আলোচনা থেকেই আপনারা বুঝবেন, আজাদের "রাজনীতি" এখন কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ প্রচার করা। এখন কমিউনিষ্টদের লেখা তাঁরা বিকৃত করছেন তা এই "রাজনীতির" খাতিরে না "সত্যনীতির" খাতিরে তা তাঁরাই বলতে পারেন।

ছাত্রদের মাহিনা বৃদ্ধিতে
শিক্ষকদের সঙ্কট বাড়িবে বই কমিবে না

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কিছুদিন আগে এক সভায় প্রস্তাব পাশ করেন যে সমস্ত স্কুলে ছাত্রদের মাথাপিছু আট আনা মাহিনা বাড়াইয়া শিক্ষকদের বেতন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সম্প্রতি এই বিষয়ে স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষের মতামত চাহিয়া একটি সার্কুলার দিয়াছেন। গত কয়েক মাসে বাংলার বিভিন্ন স্কুলে বেতন বৃদ্ধির দাবীর উপরে শিক্ষকদের কয়েকটি ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে।

অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি ময়মনসিংহ শহরের সিটি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মফঃস্বলের অনেক স্কুলের মতই এই স্কুলটির নিজস্ব বাড়ীটি সরকার দখল করিয়াছেন। যে বাড়ীতে এখন স্কুল বসে সেটি একটি বহুকালের পুরাতন তিনদিক বন্ধ বাড়ী।

শিক্ষকদের দুরবস্থা

সিটি স্কুলের শিক্ষক ও জিলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মনোরঞ্জন বাবু ও উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষকরা যা' বলিলেন তাহার অর্থ এই-দাঁড়ায় যে—ময়মনসিংহ জেলায় বেসরকারী শিক্ষকরা গড়ে মাসে ৩৫—৪০৲ টাকা বেতন পান। অধিকাংশ স্কুলেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বলিয়া কিছু নাই। যেখানে আছে সেখানেও শিক্ষকরা মাসে টাকা প্রতি এক আনা এবং কর্তৃপক্ষ দু' পয়সা দেন অর্থাৎ ২৫ বছর চাকুরীর পর একজন শিক্ষক তাঁহার সমস্ত জীবনের পুঁজি ৭০০৲—১০০০৲ টাকা লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। গত দু বছর অভাবের তাড়নায় এই সিটি স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক তাঁহাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের চার ভাগের তিন ভাগ খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন।

সরকার এক বছর আগে শিক্ষকদের জন্য মাথা পিছু ৫৲ টাকা ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা অবশ্য মাসে মাসে দেওয়া হয় না। গত আগষ্ট মাসে একসঙ্গে ছয় মাসের টাকা দেওয়া হইয়াছে, বাকী ছয় মাসের টাকা কবে দেওয়া হবে কেউ জানে না। একজন শিক্ষকের ভাষায়, "এ যেন ৬ দিন উপোষ করিয়ে রেখে একদিন খুব মিঠাই মণ্ডা খাওয়ার ব্যবস্থা।"

স্কুলের বৃদ্ধ মৌলভী এতক্ষণ চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। এবার তিনিও আলোচনায় যোগ দিলেন,—"৩৫৲—৪০৲ টাকায় কি হয়? এসব কথা বলতেও লজ্জা হয়। আমি আর আমার ছেলে দুজন থাকি এখানে। নিজের হাতেই রান্না করে খাই। খাই ভাত আর ডাল, তাতেই গত ১৫ দিনে ২২৲ টাকা খরচ হয়ে গেছে। বাকী ১৫ দিন খাবই বা কি, বাড়ীতেই বা পাঠাব কি আর ছেলের পড়ার খরচই বা চালাব কি করে? ভাবছি এবার ছেড়েই দেব।"

আর একজন শিক্ষক বলিলেন অতুলবাবুর কথা। এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। কঠিন অসুখ হয়, ডাক্তার বলেন ছুটি না নিলে বাঁচিবেন না। কিন্তু ছুটি নিলে মাহিনা পাইবেন না, খাইবেন কি? সুতরাং স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এমনি ভাবে অতুলবাবু মারা গেলেন একদিন। এই রকম আরও দুটি ঘটনা ময়মনসিংহ শহরে গত এক বছরে ঘটিয়াছে।

আমি প্রশ্ন করিলাম, "এরকম অবস্থায় শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকবে কদিন?" উত্তর দিলেন একজন অল্পবয়স্ক শিক্ষক, "সকাল থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত চাল, নুন, কেরোসিনের ধ্যান করে, টাকার জন্য আলাদা টিউশনি করে কি আর শিক্ষকতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকে? প্রথম প্রথম ক্লাশে নানা বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করতাম। এখন আর ভাল লাগে না।" যাঁহারাই সুযোগ পান অন্যত্র চাকুরী লইয়া চলিয়া যান। এক মৃত্যুঞ্জয় স্কুল হইতেই গত এক বছরে ১০।১২ জন শিক্ষক চলিয়া গিয়াছেন। নূতন যাঁহারা আসেন মনোরঞ্জন বাবুর ভাষায় "অন্য সময় হ'লে তাঁরা চাকরীর দরখাস্ত করতেও সাহস পেতেন না।"

আনন্দহীন ছাত্র জীবন

জিজ্ঞাসা করিলাম, "চারিদিকে একটা কথা শুনছি ছাত্রদের মেধাশক্তি নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই ওপরের তাকে তোলা থাকে আর মোহন সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনীর কাটতি ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। কথাটা কি ঠিক?"

উত্তর দিলেন আর একজন শিক্ষক। তাঁহার মাথার চুল অর্দ্ধেক শাদা হইয়া গিয়াছে এই শিক্ষকতার কাজে। "অনেকটা ঠিক ত বটেই। শুধু লেখা-পড়ায় কেন, খেলাধূলায় সে রকম ভাল ছেলে আজকাল কই? খেলবেই বা কি করে? এই তো সেদিন ক্লাশ টেন থেকে ক্লাশ নিম্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম, ৩০০ ছাত্রের মধ্যে একজন বাড়ীতে দুধ খায়।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ শিক্ষক আবার বলিয়া চলিলেন, "দেখ, আগেকার দিনে লেখা-পড়ায় উৎসাহ পাবার অনেক কারণ থাকত ছাত্রদের। শিক্ষাজীবন শুরু হ'ত হাতেখড়ির উৎসবের মধ্য দিয়ে। তারপর বছর বছর নূতন বই, স্কুলে আসার সময় পরিষ্কার জামা, হাতে জলখাবার পয়সা, স্কুলের পরে খেলা—সব মিলে একটা সুন্দর আবহাওয়া ছিল। আর আজকাল ছেলেদের সকাল থেকে ঘুরতে হয় দোকানে দোকানে চালের খোঁজে, পড়তে হয় বহু বছরের ছেঁড়া ময়লা বই, লিখতে হয় একপিঠে-লেখা ময়লা কাগজে, বিকেলে খেলার কোন ব্যবস্থা নেই, এই তো স্কুলঘর আর এই তো আমরা শিক্ষকরা। কি করে ওরা উৎসাহ পাবে? ওদের আর দোষ কি?"

ছাত্র-শিক্ষক মিলিত আন্দোলন চাই

আমি ছাত্রদের মাহিনা বাড়াইবার প্রশ্ন তুলিলাম। "তা'হলে দেখছি ছাত্র ও অভিভাবকদের অবস্থা আপনাদের মতই। অক্ষম ছাত্রদের দোহন করে আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে কি ক'রে? তার চাইতে বরং সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে একত্র করে জননেতাদের সহযোগিতায় সরকারকে চাপ দিন।"

উত্তর শুনিলাম, "শহরের জনৈক কংগ্রেসনেতার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি গল্পের রামনাথ পণ্ডিতের মত তেঁতুল পাতা খেয়ে আমাদের শিক্ষকতা করবার উপদেশ দিয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে একজন চৌকিদারের মূল্য আমাদের চেয়ে বেশী। আর সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে এক করে আন্দোলন করবার কথা বলছেন? তা আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন, আমরাও ভেবে দেখি।"

সেদিনের মত আলোচনা শেষ হইল। নানাভাবে এই এক কথাই শুনিলাম, কিছুই হইবে না, কেহই আমাদের দেখিবে না। এই হতাশার অবশ্যম্ভাবী ফল ছাত্রদের উপর মাহিনা বৃদ্ধির নিষ্ঠুর বোঝা চাপান এবং তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায় হইবে ছাত্র ও শিক্ষকের তিক্ত সঙ্ঘর্ষ।

বাংলার ছাত্র আন্দোলন কি অবস্থাকে এই সঙ্ঘর্ষের পথে যাইতে দিবে? নিজেদের ও শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষায়ও কি সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠান এক হইবে না? —রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সামসুল হক একদা মুলাদি মহম্মদজান হাইস্কুলের ছাত্র ছিল—এখন দুঃস্থদের হাসপাতালে।

মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের নূতন ধারা
পাকিস্তানের সঙ্কল্প ঃ দেশসেবায় ঐক্যের আগ্রহ

[নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ]

গত ৩১শে ডিসেম্বর কুষ্টিয়া শহরে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। এতদিন মুসলিম ছাত্রদের উপর ছাত্র লীগের সাধারণ প্রভাব ছিল মাত্র, কিন্তু মুসলিম ছাত্র-সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্র লীগ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ছাত্র লীগের এই দুর্ব্বলতার মূলে ছিল নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অস্পষ্টতা। সংগঠনের বাঁধুনীও ছিল নিতান্ত হালকা। কিন্তু বিগত এক বছরে মুসলিম লীগের প্রসার ও রিলিফের জন্য ছাত্রলীগের প্রচেষ্টা তাহাদের নীতি ও কর্ম্মপন্থার মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্টতা আনিয়াছে, ছাত্রলীগ মুসলিম ছাত্রদের দেশসেবার সংগঠক হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

নূতন কর্ম্মপন্থা

সম্মেলনে গৃহীত কর্ম্মপন্থায় এই সর্ব্বপ্রথম ছাত্রলীগের উদ্দেশ্য ও নীতি স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হইল ঃ

(১) মিঃ জিন্নার ভাষায় সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য হইল, "দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ান।" (২) পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং মুসলমানদের পাকিস্তানের জন্মগত অধিকারের স্বপক্ষে জনমত গঠন করার জন্য দেশে প্রচার চালান। (৩) মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করা এবং ব্যাপক ভাবে লীগের সভ্য সংগ্রহ করা। (৪) বাংলার দুঃস্থ জনগণের সেবা ও তাহাদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। (৫) মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা।

বিগত একবছর জনসেবার মধ্য দিয়া ছাত্রলীগ যেমন তাহার নীতির স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে তাহার সংগঠনও প্রসার লাভ করিয়াছে। এই বছর ছাত্র লীগের সভ্য হইয়াছে ১২ হাজারেরও বেশী এবং বাংলার ২৩টি জিলায় তাহার শক্ত সংগঠন গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য জিলাতেও সংগঠন গঠনের পথে। আগে কখনও ছাত্র লীগের সংগঠন এতটা ব্যাপক ও শক্তিশালী ছিল না।

ছাত্র লীগের নীতি ও কর্ম্মপন্থার এই পরিবর্ত্তন এইবারকার সম্মেলনেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। বাংলার প্রায় সব জেলা হইতে ৩৭১ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। ছাত্রলীগের অধিবেশনে এত প্রতিনিধির সমাবেশ এই সর্ব্বপ্রথম। প্রতিনিধি ছাড়াও ৭০০ দর্শক প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেন।

সম্মেলনের প্রস্তাব

দেশের সর্ব্ববৃহৎ সমস্যা কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্বন্ধে সম্মেলনের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব মুসলমান ছাত্রদের মতামত প্রকাশ করে। প্রস্তাবে গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর হইতে পারে একমাত্র মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবীর স্বীকৃতির ভিত্তিতে। প্রস্তাব সংখ্যা লঘুদের সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া ঘোষণা করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাহাদের আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মগত অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্য সম্মেলন আলাদা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় দাবী করে।

দুর্গত দেশবাসীর সেবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগীতাকে অভিনন্দিত করিয়া আর একটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে ভবিষ্যতেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত দেশবাসীর সেবায় এই সহযোগীতা বজায় থাকিবে।

পরিশেষে সম্মেলন পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য, মহামারীর বিরুদ্ধে সকল সংগ্রামের জন্য সমস্ত মুসলিম ছাত্রকে ছাত্রলীগের পতাকা তলে সমবেত হইতে আহ্বান জানায়।

সম্মেলন যে ভাবে স্বাধীনতা, পাকিস্তান, শিক্ষার উন্নতি ও দেশবাসীর সেবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে মুসলিম ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে বহু সংশয়ীর বহু সন্দেহ দূর হইবে, দেশবাসীর মনে ছাত্রলীগ সম্বন্ধে নূতন আশার সঞ্চার হইবে।

কিন্তু তবুও এই সম্মেলনে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা তাহাদের প্রত্যেকটি শুভাকাঙ্খীকে ব্যথিত করিবে।

প্রথমতঃ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে কিছুটা অধিক মাত্রায় উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী সভা ত্যাগ পর্য্যন্ত করেন। আজ মুসলিম ছাত্র আন্দোলন যখন দেশ সেবার নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে যাইতেছে তখন এই ধরণের দলাদলিতে আন্দোলনেরই ক্ষতি হয়। আশার কথা এই দলাদলি কোন মারাত্মক রূপ নেয় নাই এবং মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের নব কর্ম্মপন্থা এই দলাদলির উর্দ্ধে রহিয়াছে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জনৈক বক্তা তাঁহার বক্তৃতায় অনাবশ্যকভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়াছেন। সম্মেলনের প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাবে গান্ধী-জিন্নার সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হইবার পরে কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষে যে তিক্ততা সৃষ্টি হইয়াছে, মুসলিম ছাত্র আন্দোলন যদি সেই তিক্ত বাদানুবাদে অংশ গ্রহণ করে তবে এই দুঃখ প্রকাশের বিশেষ কোন অর্থ থাকে না। মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের প্রত্যেকটি শুভাকাঙ্ক্ষীই আশা করিবেন যে এই সজীব ছাত্র আন্দোলন বর্ত্তমান তিক্ততার উর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহাদের পাকিস্তানের দাবীর যুক্তিকতা সকলকে বুঝাইতে সক্ষম হইবেন। আশার কথা যে, এই বিশেষ বক্তার মনোভাব সম্মেলনে প্রাধান্য লাভ করে নাই, সম্মেলন দেশবাসীর শুভবুদ্ধি ও দেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করিয়া প্রচার ও আলোচনা দ্বারা দেশবাসীকে পাকিস্তান দাবীর স্বপক্ষে আনিবার কথাই বলিয়াছে।

★

প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যুক্ত রিলিফ বোর্ড সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শাহ্ মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের বিবৃতির অংশ বিশেষ ঃ

"খাদ্যসঙ্কট ও মহামারীর আঘাতে বাংলা আজ বিপর্য্যস্ত। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবেই সচেতন; গত বছর এই ছাত্রলীগ যুক্ত রিলিফ বোর্ডের সাহায্যে খাদ্যসঙ্কট ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে।

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ বাংলার নর নারীর, ছাত্র সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে দূর করিবার জন্য মহামারী ও খাদ্যসঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি বাংলার মুসলিম ছাত্রদের কাছে আবে[দন] জানাইতেছি যে তাহারা যেন তাহাদের দায়ীত্ব সম্[বন্ধে] সচেতন থাকেন। বাংলার মুসলিম ছাত্ররা তা[দের] সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফেডারেশনের একযোগে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, নতুবা দেশ বাঁচিবে না, পূর্ব্ব পাকিস্তান রক্ষা পাইবে না।"

★

সারা বাংলায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

মেদিনীপুরে গ্রামের পথে মা বোনেরা প্রায় উলঙ্গ ফিরিতেছে

বর্তমানে বাংলা দেশে কাপড়ের এক ভয়ানক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। যে কলিকাতার দোকানে দোকানে নানা প্রকার সাড়ী ও ধুতি থরে থরে সাজানো থাকিত—সেই কলিকাতার দোকানে দোকানে ঘুরিয়া একজোড়া ভাল ধুতি পাওয়ার উপায় নাই। আমাদেরই এক বন্ধু কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বড় বড় পাঁচ ছ খানা দোকান খোঁজ করিয়াও একখানা ভাল ধুতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সরকার নাকি ১৫০টি দোকান ঠিক করিয়া দিয়াছে যাহারা কন্ট্রোল দরে কাপড় বেচিবে। কিন্তু তাহার সামনেও অগণিত লোক রেশন কার্ড হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা 'কিউ' করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র জনগণ যে ভাবে একমুঠো চাউলের জন্য কন্ট্রোলের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিত—আজকাল কাপড়ের কন্ট্রোলের দোকানের সামনে ঠিক সেই দৃশ্য।

১৯৪৩ সালে কলিকাতার লোক যখন চাউলের সঙ্কট অনুভব করিতে থাকে তার পূর্বেই বহু মফস্বল জেলায় সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। কাপড়ের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই। বাংলার অনেক গ্রাম্য এলাকায় আজ কাপড়ের দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। রোজই খবরের কাগজে মফস্বলে কাপড়ের অনটনের খবর বাহির হয়। সেই অনটন যে কোন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে নীচের ঘটনাটি তাহার প্রমাণ। মেদিনীপুরের এক বন্ধু এই ঘটনাটি বলেন। তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানায় বহু সংখ্যক গরীব মাহিষ্য চাষীর বাস। সেখানে কাপড় এমন কি ষ্ট্যাণ্ডার্ডক্লথও পাওয়া যায় না। এর ফলে গরীব চাষীদের ১০।১১ বৎসরের ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত প্রায় উলঙ্গই থাকে। বয়স্ক পুরুষদের অধিকাংশের পরণেই ছেঁড়া নেংটী। বয়স্থা মেয়েরা কোন প্রকারে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড় দ্বারা কোমর হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া লজ্জা নিবারণ করে—আর সারা দেহ থাকে অনাবৃত। প্রথম প্রথম এই অবস্থায় মেয়েরা ঘর হইতে বাহির হইত না। কিন্তু গরীবের মেয়েরা ঘরে বসিয়া থাকিলে চলে না। কাজেই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায়ই এই অসহায় নারীরা অর্দ্ধসভ্য মানুষের মত গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৯৪৩ সালে চাউলের দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ বাঙ্গালী চাষী প্রাণ দিয়াছে আর এখন কাপড়ের দুর্ভিক্ষে বাংলার চাষী সভ্যতা ও শ্লীলতা হারাইতে বসিয়াছে।

কাপড়ের চোরাকারবারই যে এই অবস্থা ঘটাইতেছে তাহা সবাই স্বীকার করে। মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেব বার বার বলিতেছেন যে একেই ত ভারত সরকার বাংলাকে কম কাপড় সরবরাহ করিতেছেন তাছাড়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নাকে কাপড় মজুত করিয়া এই দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। মিহি কাপড় নিয়া ব্যাপক চোরাকারবার চলিতেছে বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। এই চোরাকারবারীদের দমন করিবার জন্য সুরাবর্দ্দি সাহেব কয়েকটি গরম গরম বিবৃতি দিয়াছেন এবং পর পর অনেকগুলি আইনও পাশ হইয়াছে। অন্যদিকে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী এই বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন যে কাপড় বিতরণের জন্য সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছে তাহারই ভিতর অনেক গলদ। কাজেই চোরাকারবারীরা সুবিধা পাইতেছে।

এই ভাবে তর্কের পর তর্ক, বিবৃতির পর বিবৃতি বাহির হইতেছে। কিন্তু লোকে কাপড় পায় না—অর্দ্ধনগ্ন থাকে। আর চোরাকারবারীরা মহা আনন্দে মুনাফা শিকার করে। মূল প্রয়োজন ছিল কাপড় বিতরণে জনগণের সহযোগিতা নেওয়া। এটাই সরকার এড়াইয়া চলিতেছে। সেজন্যই চোরাকারবার বন্ধ হয় না—সঙ্কটও বাড়িয়া চলে।

কয়লার অভাবে মিল বন্ধ

শুধু বিতরণের ক্ষেত্রে নয়, কাপড়ের উৎপাদনেও সঙ্কট দেখা গিয়াছে। ইউনাইটেড প্রেস খবর দিয়াছে "কয়লার অত্যধিক অভাব হওয়ায় আমেদাবাদ মিল মালিক সমিতি ১০ হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কল বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! ইহার ফলে শহরের ৭০টির অধিক কল বন্ধ থাকিবে! এই সকল কলের শ্রমিক-সংখ্যা প্রায় এক লাখ।" ইউ, পির ৮ই জানুয়ারীর আর একটি খবরে প্রকাশ যে, উজ্জয়নে (মধ্য ভারত) তিনটি কাপড়ের কলই কয়লার অভাবে ১৫ দিন বন্ধ ছিল।

গত বৎসর ঢাকেশ্বরী মিল ও কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল কয়লার অভাবে কিছু দিন বন্ধ ছিল। এবারের অবস্থাও গত ১৩ই জানুয়ারীর অমৃতবাজারের খবর হইতে বেশ বুঝা যাইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার 'বেঙ্গল মিল-মালিক সঙ্ঘকে' জানাইয়াছে যে, এ মাসে বাংলার সুতাকলগুলিকে প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ সম্ভব হইবে না এবং যে সমস্ত সুতাকলে অন্ততঃ ৮ দিনের কয়লা মজুদ নাই—সেগুলি যেন পর্য্যাপ্ত মজুদ না হওয়া পর্য্যন্ত উৎপাদন বন্ধ রাখে। ফলে, কয়লার অভাবে কতগুলি সুতাকল কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকার সম্ভাবনা।

এছাড়া অন্য কারণেও কাপড়ের উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

সরকার কন্ট্রোল হুকুম দ্বারা ও 'টেক্সমার্ক' জারী করিয়া কাপড়ের দাম বাঁধিয়া দিয়াছে। এই হুকুমের ফলে মিল মালিকের মুনাফা স্বভাবতই কমিয়া যায়। তখন মিল মালিকরা মুনাফা করিবার নূতন ফন্দী বাহির করে। তাহারা কাপড় উৎপাদনের খরচ কমাইতে চেষ্টা করে।

প্রথমতঃ, কাপড়ের সুতা ভাল ও মজবুত করিবার জন্য মাড় প্রভৃতি যে সব জিনিষ দেওয়া হইত তাহার পরিমাণ কমান হয় এবং কোন কোন জিনিষ দেওয়াই হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, একটি কাপড়ে আগে যে সংখ্যায় টানা-পোড়েন দেওয়া হইত এখন তাহার চেয়ে কম দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটি কাপড়ে আগে যে পরিমাণ সুতা লাগিত এখন তাহার চেয়ে কম দেওয়া হয়।

এই ভাবে মিল মালিকরা উৎপাদনের খরচ কমাইয়াছে এবং লাভের মাত্রা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, একখানা কাপড় আগে যতদিন টিকিত এখন তার চেয়ে অনেক কম টেঁকসই হয়। কাজেই ঠকিতেছে জনসাধারণ। তাহারা দাম দেয় আগের চেয়ে চারগুণ, পাঁচগুণ অথচ কাপড় আগের চেয়ে অনেক খারাপ।

মিল মালিকদের এই কারসাজির ফলে কাপড়ের উৎপাদনও কমিয়া যাইতেছে। সুতা কম মজবুত হওয়াতে এবং প্রতি কাপড়ে আগের চেয়ে সুতা কম থাকাতে কাপড় বোনার সময় বার বার সুতা ছিঁড়িয়া যায়। দেখা গিয়াছে আগে যেখানে একটি তাঁতে দৈনিক পাঁচ জোড়া, সাড়ে পাঁচ জোড়া কাপড় তৈরী হইত এখন সেখানে কোন শ্রমিকই একটি তাঁতে দৈনিক তিন জোড়া, সাড়ে তিন জোড়ার বেশী তৈরী করিতে পারে না।

১ নং মোহিনী মিলের হিসাবই ধরা যাক। সেখানে ৫০১টি তাঁত। প্রতি তাঁতেই দু'জোড়া কাপড় কম হয়। অর্থাৎ দৈনিক ১০০২ জোড়া কাপড় কম হয়। বাংলা দেশে ৫৪টি কাপড়ের কল। সব মিলেই একই ব্যাপার। কাজেই মিল মালিকদের মুনাফার জন্য বাংলার প্রতিদিন হাজার হাজার জোড়া কাপড় যে কম তৈরী হয় তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

প্রতি তাঁতে কাপড়ের উৎপাদন কম হওয়াতে কাপড় কলের শ্রমিকদের জীবনযাত্রাও ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। এই শ্রমিকরা কাজ হিসাবে মাহিনা পায়। আগে প্রত্যেক তাঁতী-শ্রমিক মাসে ৪০, ৪৫, টাকা রোজগার করিত এখন উৎপাদন কমাতে তাহারা মাসিক ৩০, ৩৫, টাকার বেশী রোজগার করিতে পারে না। এই আয়ে বর্ত্তমানে কোন লোকেরই চলিতে পারে না। সেই জন্য বহু সংখ্যক শ্রমিক কাপড়ের কল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। শ্রমিকের অভাবে ১নং মোহিনী মিলে ৫০টি, শ্রীরামপুরের বঙ্গেশ্বরী মিলে ১০০টী, রামপুরিয়া মিলে ২০০টী এবং বঙ্গলক্ষ্মী মিলে ১০০টী তাঁত দৈনিক বন্ধ থাকে। যদি প্রতিটি তাঁতে দৈনিক তিন জোড়া করিয়াও কাপড় তৈরী হয়—তাহা হইলে শুধু মাত্র এই চারিটি মিলের হিসাবেই দৈনিক সাড়ে তের শত জোড়া কাপড় কম তৈরী হইতেছে।

শ্রমিকরা অতি দুঃখেই মিল ছাড়িতেছে। ঢাকেশ্বরী মিলের একজন ওস্তাদ শ্রমিক মিল ছাড়িয়া কোন এক বড় সাহেবের আর্দ্দালির কাজ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা এখানে মাহিনা বেশী। এই ভাবে ঢাকেশ্বরী মিলের অসংখ্য ওস্তাদ শ্রমিক মিল ত্যাগ করিয়াছে। সেখানে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত শতকরা ৫০ জন শ্রমিক ছিল অভিজ্ঞ, যাহারা ১২ বৎসর হইতে মিলে কাজ করিতেছিল। শতকরা ৩০ জন ছিল যাহারা ৬।৭ বৎসর হইতে মিলে ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শতকরা ৮০ জন নূতন অনভিজ্ঞ শ্রমিক। পুরানো ওস্তাদ শ্রমিকরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার পাত্তা নাই। এর ফলেও স্বভাবতই কাপড় খারাপ হইবেই—জনগণকেও সেই খারাপ কাপড়ই চড়া দামে কিনিতে হইবে।

মিল মালিকের মুনাফা লোভের আগুণে এইভাবে বাংলার কাপড়ের শিল্প ধ্বংস হইতেছে! যেটুকু কাপড় তৈরী হয় তাহাও চোরাকারবারীর জুয়াচুরিতে লোকে পায় না। সেজন্যই কলিকাতার কাপড়ের কন্ট্রোলের দোকানের সামনে অগণিত লোকের 'কিউ' আর বাংলার গ্রামে উলঙ্গ বালক বালিকা ও অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর মিছিল।

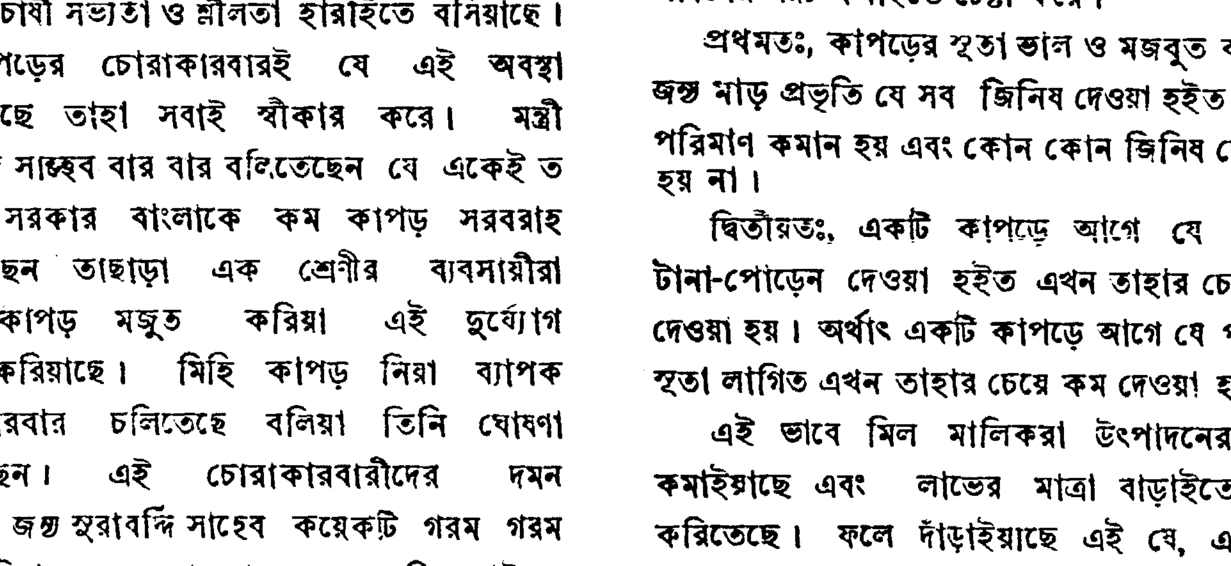

কলিকাতার কটন ষ্ট্রীটে কাপড়ের দোকানের সামনে খরিদ্দারের ভিড়

মেদিনীপুরের গ্রামে অর্দ্ধ উ

বাংলার তাঁত-শিল্প

বাংলা দেশে তাঁতশিল্প অবলম্বন করিয়া লক্ষ দুর্ভিক্ষ এই লক্ষ লক্ষ জীবন গ্রাস করিতে বসিয়া জাতব্যবসা ছাড়িয়া ক্ষেতমজুরী কিম্বা মিলিটারী বনিয়াদ আজ টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইয়া যাওয়ার খবর পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণ অচল হইয়াছে। প্রত্যেক জেলারই এমনি অবস্থা। ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছে। কোথাও কোথাও লুটত

১০ই নভেম্বর তারিখে মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন বেল সুতা দেওয়া হইবে। তিনি নিজেও স্বীকার করি

সরকারী বণ্টনব্যবস্থার বর্ত্তমান ধারা না পা পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই পাইকার ও অন্যান্য ডিলারের কু

এজেণ্ট মারফৎই হউক আর সরাসরি নিজে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের তাঁতীদের প্রয়োজনীয় সু কমিটির কাছে এক সঙ্গে দিতে হইবে। সেই দিবার সরকারী পরিকল্পনা অবিলম্বে কাজে পরিণ বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কুমারখালি হাটে স

নদীয়া জেলার শান্তিপুর তাঁতের জন্য বিখ্যাত। এখানকার ৩ হাজার তাঁত শহরের মোট ১৫ হাজার নরনারীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাই প্রধানত এই শিল্পের ভাল মন্দের উপর শান্তিপুর শহরের ভালমন্দ নির্ভর করে। প্রায় **১৮০০ তাঁত সুতার অভাবে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।** সুতার বাজারের অবস্থা বর্ত্তমানের মত থাকিলে বাকি তাঁতগুলি বন্ধ হইতেও দেরী হইবে না। এখানে ৩ হাজার তাঁতের জন্য মোট সুতা লাগে ২২ হাজার পাউণ্ড। ৪২নং পাকোয়ান দরকার ৬ হাজার পাউণ্ড ও ৬৪নং পাকোয়ান দরকার ৫ হাজার পাউণ্ড। আজই ইহা সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে হাজার হাজার তাঁতীকে না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুধু শান্তিপুরই নয়, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া

খুলনার তাঁতীরা কেউ গিয়াছে কিষাণ দিতে, কেউ মিলিটারী খাঁটিতে

তাঁতীহাটার সে জৌলুষ নাই

খুলনা জেলার নামকরা হাট ফুলতলায় সেদিন গিয়া দেখি তাঁতীহাটায় আগের সে জৌলুস আর নাই। কাপড়, গামছা, চাদর লইয়া মাত্র জন পঞ্চাশেক তাঁতী টিম টিম করিতেছে। শীতের মধ্যে গামছা গায়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রেতা বিশেষ নাই বলিলেই চলে।

আমাদের দেখিয়া ২৫।৩০ জন তাঁতী ও জোলা ছাঁকিয়া ধরিল। যখন শুনিল আমরা সুতার কারবারী নই, তখন একটু হতাশ হইয়া গেল। একজন বলিল—বাবু, আমরা সুতার অভাবে চোরাকারবারীদের হাতে মরিতে বসিয়াছি। যে কাপড় তৈরী করিতে আড়াই টাকা খরচ, হাটে আজ তাহা তিন টাকাতেও বিকাইতে চায় না। মহাজনের টাকা ভাঙ্গিয়া খাইতেছি—ঘটিবাটি আর কাহারও একটিও নাই। রূপার গহনাগুলি গেলবার চল্লিশ টাকা মণ চালের আগুনে পুড়িয়া ত' ছাই হইয়াছে।

তাঁত চালাইয়া পেট চলে না। তাই কেউ গিয়াছে দক্ষিণে কিষাণ দিতে, কেউ পেটের দায়ে গিয়াছে মিলিটারী খাঁটিতে।

ফুলতলা হাটে ৭ জন সুতার মহাজন। লোকে বলে ১২৷৶ আনা দামে আগের কেনা প্রচুর সুতা ইহাদের জমানো আছে, তাহাই ২৮, টাকা বাণ্ডিল দামে ইহারা বিক্রি করিতেছে। দারোগা হাটে আসিলে ইহারা দারোগার সামনাসামনি কন্ট্রোল দরে সুতা বেচে বটে, কিন্তু দারোগা পিছন ফিরিবার সাথে সাথেই মহাজনরা ধাঁ করিয়া সুতার দাম বাড়াইয়া দেয়।

দক্ষিণডিহি গ্রামের তাঁতীপাড়ায় ২২ ঘর তাঁতীর বাস। ১০ খানা তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একেবারে বন্ধ থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাই ১০ দিনের কাজ ২ মাসে চালাইয়া ৩১ খানা তাঁত কোন রকমে টিঁকিয়া আছে।

...ঞ্জ একটি জেলে পরিবার

...মরিতে বসিয়াছে

...ক স্ত্রীপুরুষ জীবন নির্ব্বাহ করে। আজ সূতার ...ে। হাজার হাজার তাঁতী আজ পেটের দায়ে ... কুলির কাজ করিতেছে। একটি বিরাট শিল্পের ...। প্রতিদিন সংবাদপত্রে সহস্র সহস্র তাঁত বন্ধ ...ঞ্জের ৪০ হাজার, সিরাজগঞ্জের ১০ হাজার তাঁত ...সূতার বাজারে চোরাকারবারীদের ঘিরিয়া অসন্তোষ ...জ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার অবস্থাও সৃষ্টি হইতেছে।

...রেশনপ্রথায় বাংলার তাঁতীদের সাড়ে ১০ হাজার ...াছেন প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্ত সামান্য। ...হলে এই বরাদ্দ সূতার সমস্তটা তাঁতীদের হাতে ...র আবার তাহা চোরাবাজারে অদৃশ্য হইবে।

... হউক—সরকার যে ভাবেই বিক্রি করুক না কেন, ... স্থানীয় তাঁতীদের কো-অপারেটিভ অথবা তাঁতী ...সঙ্গে তাঁতের আনুষঙ্গিক জিনিষ-পত্র ও তাঁতীঋণ ...করিতে হইবে। ইহার জন্য আজ সারা বাংলায়

...তা লুটের উপক্রম

...মহকুমারও আজ এমনি অবস্থা। **মেহেরপুর** ...মহকুমার কুমারশিলা গ্রামে ৬১ ঘর তাঁতী জোলা ...াস করে। ৭৭ খানা তাঁতের মধ্যে গত ৫।৭ মাসে ...ড়ে ২০ খানার বেশী চলে না। মহকুমা হাকিমের ...কাছে ৪০ জন কারিকরের এক ডেপুটেশান যায়। ...তিনি আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না। ধান কাটার সময় গ্রামের লোকেরা দুঃস্থ তাঁতীদের কিছু কিছু কাজ দিয়াছিল। তাহাতেই এতদিন একবেলা করিয়া চলিয়াছিল। ধানকাটা শেষ হইতে চলিল, তবুও সূতা পাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই গ্রামেরই জেকের কারিকর তাঁত বেচিয়া দিয়া আজ মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন এক গ্রামে দিনমজুরী করিতেছে। জেকেরের বউ ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কাটাইতেছে।

এই পাড়ারই যোগিবর তাঁতী অর্থাভাবে বিবাহ করে নাই। নিজে অনাহারে থাকিয়া বিধবা ভ্রাতৃবধূর সংসার চালাইয়াছে। যোগিবর অসুখের দায়ে তাহার শেষ সম্বল তাঁতটিও বেচিয়া দিল। তবু সে সারিয়া উঠিতে পারিল না। আজ তাহার ভাইয়ের বউ পরের বাড়ী ধান ভানিয়া বেড়ায়, ভাইয়ের ছেলেটি পরের বাড়ীতে বিনা মাহিনার চাকর হইয়া আছে।

দামোদরের রসুল কারিগর একখানা তাঁতে একমাত্র বউয়ের পেটও চালাইতে পারে নাই। শেষকালে ঘরবাড়ী. তাঁত যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া সেই যে চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

গ্রামের দুশো খানা তাঁতের মধ্যে একখানিও পুরা চলে না, সূতার অভাবে দেড়শো খানা একেবারে বন্ধ, বাকি ৫০ খানায় ২ মাসে ১০ দিনের কাজ হয়।

জমির বিশ্বাসের কাছে শুনিলাম, সূতা পাইলেও তাঁতীদের হাতে সূতা কিনিবার পয়সা নাই। মহাজনরা তাঁতীদের কাছ হইতে কণ্ট্রোলের সূতার স্লিপ আট আনা—এক টাকায় কিনিয়া নেয়। পরে ঐ কণ্ট্রোলের সূতাই তাহারা বাণ্ডিল প্রতি ১৪।১৫৲ টাকা বেশী দামে বিক্রি করে।

নারায়ণগঞ্জে 40 হাজার তাঁত অচল

বিক্রমপুরে আমলাদের আশ্রয়ে সূতার চোরাবাজার

ঢাকার মহেশ্বরদি ও মাধবদি অঞ্চলের তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র 'বাংলার ম্যাঞ্চেষ্টার' বাবুরহাট ও শেখেরচর হাটে প্রতি সপ্তাহে ২ লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় কেনাবেচা হইত। ১১ই জানুয়ারীর এক খবরে প্রকাশ, **নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ৪০ হাজার তাঁত সূতার অভাবে অচল হইয়া পড়িয়াছে।** মহকুমার হাকিমের মারফৎ ১৫৭ বেল সূতা পাঠানোর নাকি ব্যবস্থা হইয়াছে।

শুধু নারায়ণগঞ্জ নয়, **বিক্রমপুর** পরগণার তাঁতীদের অবস্থাও আজ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অঞ্চলে ৬ হাজার তাঁতের উপর ৫০ হাজার নরনারীর জীবন নির্ভর করে। ইহাদের শতকরা ৯০ জন মুসলমান কারিকর। বিক্রমপুরের পশ্চিম এলাকায় মেদিনীমণ্ডল, কুমারভোগ ও শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের ১১৬৩ খানা তাঁতের মধ্যে দুই মাস আগেও ৮৪৮ খানা তাঁত কোন মতে টিকিয়া ছিল। কিন্তু উৎপাদন অর্দ্ধেকে আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

৪০নং সূতার কণ্ট্রোল দর ২০/০ আনা। কিন্তু চোরাবাজারে তাহাই ৫০৲।৫৫৲ টাকায় তাঁতীদের কিনিতে হইত। ফলে, তাঁত ছাড়িয়া শত শত তাঁতী জীবিকার অন্য পথ খুঁজিতে লাগিল। কেউ সৈন্যদের ঘাঁটীতে মজুরী করিতে গেল, কেউ নদীতে ইলিশ মাছ ধরিতে গেল। গোয়ালীমান্দ্রা ও শিবরামপুরের মত জমজমাট কাপড়ের হাটের আজ শ্মশানপুরীর মত দশা। হাটের দিন মানুষজন নাই। শুধু কুকুর বিড়াল শূন্য হাটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।

তাঁতীদের পরিবারে আজ দুমাস আগের অবস্থাও নাই। ইলিশ মাছের দিন শেষ হইয়াছে। মিলিটারী ঘাঁটীতে এত লোক কাজও জুটাইতে পারে না।

মাস খানেক আগে গোয়ালীমান্দ্রার ইমান আলি ব্যাপারীর ঘরে সূতার সন্ধান পাইয়া স্থানীয় তাঁতীরা তাহার কাছে সূতার দাবী করে। কিন্তু ইমান আলি ২০৲ টাকার সূতা ৬০৲ টাকা দরেও বেচিতে রাজী হয় না এবং দোকানে তালা লাগাইয়া চলিয়া যায়। ইমান আলি যাহাতে ঐ সূতা রাতারাতি অন্যত্র সরাইতে না পারে, তার জন্য তাঁতীরা রাত্রে ঘরের সামনে পাহারা দিতে থাকে। কিন্তু গভীর রাত্রে পুলিশ আসিয়া তাহাদের উপর চড়াও হয় এবং তাহাদের সরাইয়া দেয়। ইমান আলি সেই সুযোগে তাহার মজুত সূতা দূরবর্ত্তী গ্রামে সরাইয়া ফেলে।

স্থানীয় দারোগার কাছে এই ঘটনা জানানোর পর তিনি হলদিয়াতে আসেন এবং সূতা ও রংয়ের বড় কারবারী শচীনন্দন সাহার দোকানে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, চোরাকারবার চলিতে না দিলে সূতার অভাব মিটিবে না। ইহার পর তদন্তের সময় সমস্ত সাক্ষী ইমান আলি ব্যাপারীর চোরাকারবারের বিরুদ্ধে একবাক্যে অভিযোগ জানায়। কিন্তু ইমান আলিকে গ্রেপ্তার না করিয়া তাহার দোকান হইতে ১ বেল ২৪ বাণ্ডিল সূতা লইয়া থানায় চলিয়া যায়। এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয় না। ইহার পর চোরাকারবারীর দল একটি গোপন বৈঠকে চোরাকারবার চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

দিঘলী বাজারে মহকুমা হাকিমের কাছে ইহার কিছুদিন আগে তাঁতীদের এক ডেপুটেশন যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার কিছুই করিবার নাই, যাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে তাহারা অন্যত্র কাজ দেখুক। সেই দিনই তিনি নাকি দিঘলী বাজারের মহাজনদের বে-পরোয়াভাবে চোরাকারবার চালাইবার সনদ দিয়া আসিয়াছেন এবং স্থানীয় তাঁতীদের গঠিত রেজিষ্ট্রি করা কো-অপারেটিভে সূতা বিলি ও বিক্রির ভার না দিয়া সেখানকার ধানের মহাজনদের সিণ্ডিকেট মারফৎ সূতা বিক্রির ব্যবস্থা চালু করিয়া আসিয়াছেন।

তাঁতীদের অবস্থা আজ খুবই শোচনীয়। কিন্তু তাহারা হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই। ৬ হাজার তাঁতীর সঙ্ঘবদ্ধতায় এই মাসের শেষে বিক্রমপুরে একটি সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে।

(continued column) তাঁতীদের সূতা পাইবার কোন একটা ব্যবস্থা যদি না হয় তাহা হইলে গ্রামের সমস্ত জোলাই জেকের কারিকরে পরিণত হইবে।

কুষ্টিয়া মহকুমার **কুমারখালি** বাংলার তাঁত শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেকগুলি অঞ্চল হইতে প্রায় ১০।১৫ হাজার তাঁতী এখানকার হাটে আসে।

১৯৪১-৪২ সালে এই হাটে ৬ হাজার বেল সূতার কেনাবেচা হইয়াছে; ১৯৪২-৪৩ সালেও ৫ হাজার বেল সূতা উঠিয়াছিল। ১৯৪৪ সালের শেষ ৫ মাসে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০০ বেল। ২০, ২২ ও ১০ কাউণ্টের অর্থাৎ মোটা সূতা ছাড়া অন্য কোন সূতার আমদানীই নাই। তাহাও আবার প্রয়োজনের মাত্র ১০ ভাগের একভাগ। কোন কোন সূতার দাম দু'গুণ হইতে তিনগুণ উঠিয়াছে।

৩০শে ডিসেম্বর হাটে মাত্র ২১ বেল সূতা আসিয়াছিল। অথচ সূতা কিনিবার জন্য হাটে আসিয়াছিল ১০ হাজার তাঁতী। ইহার ফলে লুট হইবার উপক্রম হয়। শেষ পর্য্যন্ত কৃষক কর্ম্মীদের চেষ্টায় জনতা শান্ত হয়। কিন্তু টেক্সটাইল ইনস্পেক্টরকে থানায় গিয়া আশ্রয় লইতে হয়। কিছুদিন আগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া তাঁতীদের দুঃখ নিবেদনের উত্তরে তাহাদের মিলিটারীতে কুলির কাজ নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ বাৎলাইতে পারেন নাই। অথচ চোরাবাজার বন্ধ করিয়া তাঁতীদের সূতা সরবরাহের দিকে এই সমস্ত আমলাদের কোনরূপ উৎসাহ নাই।

যুগীয়া গ্রামের তাঁতীরা নিজেদের চেষ্টায় ২০৩টি পরিবারকে একত্র করিয়া কো-অপারেটিভ গড়িয়াছে। সঙ্কটের বিরুদ্ধে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কুমারখালির হাটের উপর নির্ভরশীল ৫০ হাজার তাঁতীকে তাহারা পথ দেখাইয়াছে।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : **বঙ্কিম মুখার্জি**, এম, এল, এ

অফিস : ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

সূতার অভাবে বরিশালের তাঁতীদের দুর্গতি

বাজেয়াপ্ত সূতা গুদামে পচিতেছে

আজিজের মুখ হইতে সেদিন শুনিলাম, টরকীর হাট হইতে তাঁতীর দল শুধু হাতে ফিরিয়াছে, ৪০নং সূতার দর এখন ৫৫৲ টাকা।

বরিশাল জেলার গৌরনদী এলাকায় কাপড়ের সব থেকে বড় কেন্দ্র এই টরকীর হাট। ১৫।২০ মাইল দূরের গ্রামাঞ্চল হইতে হাজার হাজার লোক এখানে কেনাবেচা করিতে আসিত। টরকীর হাটের সে শ্রীসৌষ্ঠব আর নাই। তাঁতীরা সূতাই পায় না, কাপড় কেনাবেচা হইবে কিসে?

দেড় মাস আগেও সূতার বাজার এখানে এমন ছিল না। চোরাকারবারীদের দৌলতে বিভিন্ন পথে সূতার আমদানী ছিল, প্রকাশ্য বাজারে তাহা কণ্ট্রোলের অতিরিক্ত দরে বিক্রি হইত। সরকারী কণ্ট্রোল চালু করার প্রথম চেষ্টার মুখে গৌরনদীর বন্দরে ৬৮ গাঁইট সূতা বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে চোরাকারবারীদের দল সন্ত্রস্ত হইয়া মাল গোপন করে—সূতার বাজার ঝাঁ ঝাঁ করিয়া চড়িতে থাকে। এখন এই অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। ২ মাসে দর কি ভাবে বাড়িয়াছে দেখুন :

প্রতি বাণ্ডিলের দর

সূতার নম্বর	কণ্ট্রোল দর	অক্টোবর	নভেম্বর
৪০ নং	১৯৷০	২৫৲	৫৫৲
৩২ "	১৬।৵০	২১৲	৪৪৲
২৬ "	১৪৷০	২০৲	৩৪৲
২৪ "	১৪৲	১৮৲	৩২৲
২২ "	১৩।৵০	১৭৲	৩০৲
২০ "	১২৷০	১৬৲	২৮৷০
১২৷ "	৭৲	১০৲	১৪৷৵০

ইহার উপর আবার সূতা রং করার খরচ। যে নীল রংয়ের দর আগে ছিল ১২৲ টাকা পাউণ্ড, এখন তার দর ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এক পাউণ্ড হাইড্রো-সাল্‌ফাইডের দাম আগে ছিল তিন-চার আনা, এখন তারই দাম ৪০৲ টাকা। কাঁচা রং অবশ্য সস্তা, কিন্তু বাজারে তাহার ত' আর কাটতি নাই। কাজেই মাত্র ২।১টি কারখানাতেই রংয়ের কাজ হইতে পারে। ৪০ নং সূতা সাদার বদলে রঙীন কিনিতে গেলেই ত' ৫৫৲ টাকার জায়গায় ৯০৲ টাকা গুণিতে হয়।

এত চড়া দামে সূতা কিনিয়াও তাঁতীর বিপদের শেষ নাই। বাজারে কলের কাপড়ের সহিত সে আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

কাপড়ের পিছনে তাহার মজুরী বাদে শুধু খরচই ৯।০ আনা. বাজার দর মত তাহাকে সেই কাপড়ই ৮৲ টাকায় বেচিতে হয়। গুনোগার দিয়া কতদিন তাঁত চালু রাখা যায়? কাজেই তাঁতীর দল আস্তে আস্তে তাহাদের জাত-ব্যবসা তুলিয়া দিতেছে।

স্থানীয় তাঁতের মালিক মধুসূদন দাস ১৯২০ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের উন্মাদনায় চাকুরী ছাড়িয়া নিজের আদর্শ অনুযায়ী তাঁত স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজের ভাইকেও তিনি চাকুরী ছাড়াইয়া তাঁতে বসাইয়াছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় চাঁদসী ইউনিয়নের বহু তাঁত স্থাপিত হয়, অনেক কারিকর কাজ শেখে। এ অঞ্চলে তাঁহাকে সবাই তাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মধুসূদন বাবু সেদিন দুঃখ করিয়া বলিলেন. ২ বছর আগেও ১৫০০৲ টাকা পুঁজি ছিল, আজ তাহা দুই শতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাছাড়া সূতার দোকানে নাকি দেনার পরিমাণই এখন তাঁহার চার-পাঁচ শত টাকা। অন্য দশ জনের মত লোকসানের ভয়ে তিনি তাঁত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন নাই। একটি গোটা জীবনের সঙ্গে যে শিল্পাদর্শ ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো, তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অত সহজ নয়।

আগের দামে কেনা প্রচুর সূতা এখনও বাজারে মজুত আছে। কিন্তু কণ্ট্রোল আজও লোক-দেখানো হওয়ার ফলে চোরাব্যবসায়ীরা মাল আটকাইয়া চড়া দর হাঁকিতেছে। ইহা সকলেরই জানা ব্যাপার যে, **টরকীর মাত্র ৬ জন বড় বড় সূতা-ব্যবসায়ী এই অঞ্চলের সূতার বাজারের সর্ব্বেসর্ব্বা।** সরকারী অব্যবস্থার ফলে চোরাব্যবসায়ীরা মুনাফার খোলা ময়দান পাইয়াছে। সূতা সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া দূরে থাকুক, গৌরনদী বন্দরে বাজেয়াপ্ত ৬৮ গাঁইট সূতা বাজারে কণ্ট্রোল দরে ছাড়িবার ব্যবস্থাও সরকার করিতে পারে নাই।

ঢাকার কয়কীর্ত্তন গ্রামের একটি দুঃস্থ তাঁতী পরিবার

মজুরের সঙ্কট—মালিকের মুনাফা!

প্রায় অর্দ্ধেক চটকল বন্ধ! অথচ মালিক-সজ্ঘ খুসী কেন?

গত ২ মাস ধরিয়া মাগগীভাতা ও মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে চটকল মজুররা আদালত বসাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। ২৩টি ইউনিয়নের সংযুক্ত শক্তিতে এই আন্দোলন অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। মালিক-সজ্ঘ ঘাবড়াইয়া গিয়া ৩৲ মাগগীভাতা বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু আদালত বসাইবার দাবী এখনও পূরণ হয় নাই। মালিক-সজ্ঘ চাহিতেছে ৩৲ মাগগীভাতা বৃদ্ধিতেই মজুর চুপ করিয়া থাক্, আদালত যেন না বসে। সরকার চটকল মালিকদের ধমকের সামনে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় চটকল মজুরের সামনে প্রশ্ন জাগিতেছে এখন কোন পথে আন্দোলন চালান হইবে।

মালিক ষ্ট্রাইকের উস্কানী দেয় কেন?

হুগলী জেলার কোন একটী চটকলের মজুররা ম্যানেজারের কাছে তাদের দাবী জানাইলে, মালিক তাদের বলেঃ **তোমরা ষ্ট্রাইক কর না কেন, ইহাই তো আমি চাই।**

মালিকই আজ ষ্ট্রাইকের উস্কানী দেয় কেন? চিরকাল মজুররা জানিত যে, ষ্ট্রাইকের চাপে মালিকই কাবু হয়, কিন্তু আজ মালিকের মুখেই ষ্ট্রাইকের কথা! ইহার আসল কারণ কি?

আসল কারণ খুঁজিতে হইলে চটকলের বর্ত্তমান সঙ্কটের চেহারাটা কি তাহাই দেখিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে 'জনযুদ্ধে' এক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে আজ কয়লার অভাবে ১৮টী চটকল বন্ধ যাইতেছে। তার উপর সরকার ১৬টী মিল লইয়াছে। এই সমস্ত কারণে আজ প্রায় ৮০ হাজার চটকল মজুর প্রায় বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। সম্প্রতি 'ক্যাপিটাল' কাগজে লেখা হইয়াছে যে কতগুলি 'ফ্যক্টার' মিলও কয়লার অভাবে সাময়িক ভাবে বন্ধ করিতে হইয়াছে!

চটকলের এই সঙ্কট আজ নূতন নয়, ইহা লইয়া অনেক সোরগোল চলিয়াছে। মালিকদের পক্ষ হইতেও অনেকবার কাঁদুনী গাওয়া হইয়াছে যে, তাদের কারবার নষ্ট হইয়া গেল! কিন্তু তবু আজকে চটকল বন্ধ করিতেই মালিক উস্কানী দেয় কেন?

চটকল বন্ধে মালিকের ক্ষতি নাই

কারণ, মুখে যতই কাঁদুনী গাক না কেন, আসলে মালিক দেখিতেছে মিল বন্ধে তার ক্ষতি তো নাই-ই, বরং লাভ। তার হিসাব দেখুনঃ

গত সালে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসে চাঁপদানী জুট মিলের নীট মুনাফা হয় ৮,৩৬,৮৩৯ টাকা এবং তারপর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই ৬ মাসে তাদের মুনাফা হয় ১১,১৮,৯১৩ টাকা।

ইণ্ডিয়া জুট মিলেও গত সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের চেয়ে পরের ৬ মাসে নীট মুনাফা বাড়িয়াছে ২,৬৫,৬১৬ টাকা। (ক্যাপিটাল, ৪ঠা জানুয়ারী)

চালু মিলগুলির এই বর্দ্ধিত মুনাফার অংশ যাহাতে সমস্ত চটকল-মালিকেই পাইতে পারে তারই জন্য চটকল-মালিক সজ্ঘ আগে হইতেই একটা 'সংযুক্ত তহবিলের' ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে এবং সরকারও ইহাতে সাহায্য করিতেছে।

এইভাবে ভিতরে ভিতরে নিজেদের ব্যবস্থা পাকা করিয়া এখন মালিকেরা অনবরত চীৎকার করিতেছে যে, তাদের কারবার গেল! তারা নিজেরাই জানাইতেছে যে, কয়লার অভাবে চটের উৎপাদন কম হইতেছে। প্রতি মাসে এক লক্ষ টন চট তৈরী করার কথা, কিন্তু কোন মাসেই তা হইতেছে না। গত অক্টোবরে তৈরী হইয়াছিল ৯২,৭৫৫ টন, নভেম্বরে হইয়াছিল ৮৮, ১৭৭ টন, এবং এখন আরো কম হইবে।

অর্থাৎ, মালিকরা বলিতে চায় যে এই অবস্থায় তাদের উপর যেন কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা না চাপান হয়, যাতে তাদের মুনাফার কোন ক্ষতি হয়।

পাটের দর বাঁধিবার ব্যাপারে তাই মালিক-সজ্ঘের অত্যন্ত আপত্তি। কেন না, এই জায়গায় মালিকরা কম-উৎপাদন ও একচেটিয়া কারবারের সুযোগ লইয়া প্রচণ্ড মুনফা লুটিতেছে। কাঁচা মালের তুলনায় চটের দর কত উচু করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবেঃ—

	কাঁচা পাট	তৈরী মাল	শতকরা বৃদ্ধি
১৯৩৪-৩৮	৪৯	৬৯	১৪১
১৯৩৯-৪৩	৮৭	১৩৪	১৫৪
১৯৪৪ জানুয়ারী	১২১	১৯৯	১৬৪
১৯৪৪ অক্টোবর	১১৮	১৯৫	১৬৫

(কেন্দ্রীয় জুট কমিটির হিসাব হইতে)

বেকার মজুরদের ৪।০ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারেও মালিকরা খুসী নয়। আগেই মালিকরা বলিয়াছিল, কত দিন এই ভাবে খয়রাত করিয়া যাইতে হইবে! সেই জন্যই কয়লার অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করা ছাড়া আর কিছু মালিকরা করে না। অথচ **এই চটকল মালিকদের অনেকেই কয়লাখনিরও মালিক, তারা কয়লা সমস্যার প্রতি উদাসীন!**

মালিকের ফন্দী কি?

মালিকরা জানে যে, এতদিন কাঁদুনী গাহিয়া তারা যা করিতে পারে নাই, আজ যদি মজুররা ইচ্ছা করিয়া কাজ বন্ধ করে, তা হইলে তার সেই কাজই হাসিল হইয়া যায়।

প্রথমতঃ, ৮০ হাজার বেকার মজুরকে কাজে-রত মজুরের বিরুদ্ধে টানিয়া আনা মালিকের পক্ষে খুবই সহজ হইবে। তাতে তার কারখানা চালাইতে একটুও অসুবিধা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই অজুহাতে সমস্ত বেকার মজুরদের ভাতা দেওয়া বন্ধ করা যাইবে, যার জন্য অনেক দিন হইতেই মালিক-সজ্ঘ মতলব ভাঁজিতেছে।

তৃতীয়তঃ, আদালত বসাইবার আন্দোলন কম-জোর হইয়া যাইবে, যার ফলে মাগগী ভাতা আর বাড়াইতে হইবে না।

এবং, তখন সরকারের উপর চটকল-মালিক সজ্ঘের প্রতাপ আরো জবরদস্ত হইবে। পাটের দর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কিছু তারা ইচ্ছামত আয়ত্তে আনিতে পারিবে।

ইহাই আজকে মালিকের ফন্দী। এই ফন্দীর বিরুদ্ধে চটকল মজুররা যদি সজ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে না পারে, তবে মাগগীভাতা ও মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন কেমন করিয়া সফল হইবে? একটীর পর একটী চটকল যদি বন্ধই হইয়া যাইতে থাকে, বেকারের সংখ্যা যদি ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে, তবে মাগগীভাতা কে ভোগ করিবে?

চটকল-সমস্যা কি দেশের সমস্যা নয়?

ইহাই আজ চটকল মজুরের সামনে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। সেই জন্যই 'আদালত' বসাইবার আন্দোলনকে আজ চটকল-খোলানর আন্দোলনের সঙ্গে একত্র করিয়া লইতে হইবে এবং শুধু চটকল মজুরই নয় সমস্ত মজুর ও সমস্ত দেশবাসীকে এই আন্দোলনের মধ্যে টানিতে হইবে। চটকলের সমস্যা আজ শুধু মজুরের সমস্যা নয়, দেশের সমস্যা। মুষ্টিমেয় বিলাতী পুঁজিপতিরা মিলিয়া আমাদের দেশে এই যে খেলা খেলিতেছে, যার ফল ভোগ করিতেছে আমাদেরই দেশের মজুর, আমাদেরই দেশের চাষী,—এবং যে খেলা শেষ পর্য্যন্ত রাজ-নীতির খেলায় গিয়া পৌছাইতেছে, তার সম্বন্ধে সমগ্র দেশবাসীকে কেন সচেতন করা যাইবে না? তা করিতে পারিলে, চটকল মজুরের দাবী পূরণ হইতে কতক্ষণ?

নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন

আগামী ১৮ই হইতে ২৩শে জানুয়ারী মাদ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হইবে। সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে বিলাতে থাকায় সহ-সভাপতিদের মধ্যে একজন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। বাংলা হইতে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শোক-সংবাদ

গত ৩রা জানুয়ারী নবদ্বীপের **কমরেড গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য** টাইফয়েড রোগে মারা গিয়াছেন। পার্টির বে-আইনী অবস্থায় তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। এবং সেই থেকে তিনি সব সময়ের জন্যই পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি তাহার পাড়ার খাদ্য কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ এলাকায় সকল রকম জনহিতকর কাজের নেতা ছিলেন। তাহার সহৃদয় ব্যবহার ও শান্তপ্রকৃতি সকলকেই মুগ্ধ করিত।

●

দারুণ টাইফয়েড ব্যাধিতে ভবানীপুরের তরুণ **কমরেড ফণী মুখার্জিও** গত ১৮ই ডিসেম্বর মারা যান। এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ কাজ দ্বারা পার্টির দায়ীত্বপূর্ণ কাজে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। তিনি ছিলেন ভবানীপুর পাড়া সেলের সেক্রেটারী।

সংবাদ-সংগ্রহ

চিমুর ও অস্তি'র দণ্ডিতদের বাঁচাও!

গত ৭ই জানুয়ারী ঢাকার ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে ৩০০০ সূতাকল মজুর এক জমায়েত করিয়া অস্তি ও চিমুর দণ্ডিতদের ফাঁসীর হুকুম রদ করার দাবী জানায়, সেই সাথে ২নং মিলের যে তিন জন নেতৃ-স্থানীয় মজুরকে জবাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের পুনর্নিয়োগ, মজুরদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৩০৲ টাকা ও ৩০৲ টাকা মাগগী ভাতার দাবীও জানান হয়।

"রুশ-সাফল্য বিশ্বের স্বাধীনতাকে সাহায্য করিবে"

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডাঃ খান সাহেব গত ৫ই জানুয়ারী লাহোর হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেনঃ

"আমি দেখিয়া বিস্মিত হই যে নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করিবে।

কিন্তু যে কোন নিরপেক্ষ দর্শকই বুঝিবেন যে সোভিয়েট শক্তির সাফল্য সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতা আনিবে এবং এই শান্তি ও স্বাধীনতার সাফল্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত।"

চট্টগ্রামে ঐক্য প্রদর্শনী

গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর স্থানীয় মুসলিম হলে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটী ঐক্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। চট্টগ্রামের অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত নলিনীকান্ত দাস ইহার উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল—চট্টগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল দেশপ্রেমিক অতীতের পটভূমিকায় জাপানী বোমা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দুঃস্থতার মধ্য দিয়া যে বিপদ ও সঙ্কট চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা রুখিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার ইতিহাস চিত্রে রচনা করা। প্রদর্শনীর প্রায় ছবিগুলিই আঁকিয়া ছিলেন কমরেড সোমনাথ হোড়। এই তিনদিনে ১৫০০ নরনারী মুগ্ধচিত্তে এই ছবিগুলি দেখিয়াছেন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর খামখেয়ালী হস্তক্ষেপ

গত ২৫শে ডিসেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কলিকাতায় গ্রীসের পরিস্থিতির উপর জনসভা করার অনুমতি চাওয়া হয়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার তাহাতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

খাস বিলাতে ২০ হাজার জনতার সভায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গ্রীস নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অথচ এখানে পুলিশের বড়কর্ত্তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্মান রাখার বালাই নাই।

কুইনাইন বিতরণের নূতন ব্যবস্থা

বি এম আর সি সি-র প্রতিনিধিদের নিকট বাঙ্গলার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা মেজর জাফর প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, এখন হইতে একবারে এক সপ্তাহের পরিবর্ত্তে একমাসের উপযুক্ত কুইনাইন জিলা কর্তৃ-পক্ষের পরিবর্ত্তে মহকুমা কর্তৃপক্ষের নিকট বি এম আর সি সি-র সহিত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত সমস্ত বে-সরকারী রিলিফ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিতরণের জন্য দেওয়া হইবে। যানবাহনের অসুবিধার জন্য যাহাতে রিলিফ কর্ম্মীরা রিলিফের মালপত্র ব্যক্তিগত লাগেজ হিসাবে নিতে পারেন—এরূপ ব্যবস্থার জন্য মিঃ জাফর রেল ও ষ্টীমার কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিতে রাজী হ'ন।

কায়দে আজম জিন্নার জন্মদিন পালন

গত ২৫শে ডিসেম্বর ফরিদপুরে কায়েদে আজমের জন্মদিবস পালন উপলক্ষ্যে এক সভা হয়। সভায় সকল বক্তার বক্তৃতাতেই একটী কথা ফুটিয়া উঠে—'পাকিস্তানের দাবী তুলে আমরা হিন্দুদের স্বার্থে আঘাত দেইনি, স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তুলবার ন্যায্য অধিকার ঘোষণা করেছি।' পরিশেষে সভাপতি মৌলবী আবদুস সালাম সভার মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন—'স্বাধীনতার জন্য আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব।"

* * *

গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম সিটি মুসলিম লীগের উদ্যোগে কায়দে আজমের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় মুসলিম হলে এক জনসভা হয়। এই সভায় বিভিন্ন মুসলমান বক্তা মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা জিন্না সাহেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এই সভায় কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কায়দে আজম জিন্নার জন্মদিবসে তাহাকে স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

চিকিৎসা সাহায্য সমিতি গঠন

গত ৬ মাস যাবত ফরিদপুরের বালুচর গ্রামে বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র চলিতেছে। উক্ত কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত ৪০ হাজার রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটী সেবা কাজের ভিতর দিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের একটি সভায় বি, এম, আর, সি, সি-কে সাহায্য করিবার জন্য একটি চিকিৎসা-সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শিশু হাসপাতাল বার্ষিকী

গত ২৯শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বেবিজ-হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এই হাসপাতালের প্রথম বার্ষিকী প্রতি-পালিত হয়। চট্টগ্রাম্ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আবু হেনা সভাপতির অভিভাষণে বলেন—আজকের সমাজ থেকে মনুষ্যত্ব দূর হতে বসেছে। সেই সমাজে অসহায় এই রুগ্ন শিশুদের বাঁচাইবার এই হাসপাতাল মুসলমানদের হজ বা হিন্দুদের তীর্থস্থান হইতেও পবিত্র। সভার শেষে নূতন বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

Just Received From Moscow :

1. LENINGRAD by Nicolai Tikhonov Rs. 2-3
2. AN ARMY OF HEROES—True Stories of Soviet fighting men. Rs. 5-8
3. BLACK SEA SAILOR [a novel] —by Leonid Solovyev Rs. 1-12
4. THREE YEARS OF THE SOVIET UNION'S PATRIOTIC WAR— A military and Political Summary Anna I
5. THE DEFENCE OF MOSCOW— by Colonel N. Frenkel, Dr. Hist. As. 4
6. ORDER OF THE DAY OF J. STALIN NO 16. Anna 1
7. INTERNATIONAL LITERATURE Nos. 8, 9, 10, 11. 12 of 1943 and Nos. 1, 2. 3, 4 of 1944 Re. 1 per copy
8. MOSCOW NEWS [Bi-weekly] from April 29 to Aug 9, 1944 27 Copies in all at 1 anna per Copy Rs. 1-11 a set.

[Postage charged extra]

NATIONAL BOOK AGENCY LTD.

12, Bankim Chatterjee St. (College Square), Calcutt .

Regd. No. C. 2836.

দেশসেবায় আড়াই লক্ষ টাকা চাই

কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন

কমিউনিষ্ট পার্টি যখন বে-আইনী, তখন পার্টির আয় ছিল জনকয়েক মধ্যবিত্ত চাকুরে কমরেড আর শ্রমিক ও কিষাণ দরদীদের সাহায্য। আইনসঙ্গত হইবার পরে পার্টির কাজ বাড়িয়াছে ব্যয়ও বাড়িয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে পার্টি ২ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন জানায়, ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। ১৯৪৩-৪৪ সালে, আমরা ৫ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করি, কিন্তু উঠে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষ—আমাদের যতটুকু অর্থসঙ্গতি আমরা পিপলস রিলিফ কমিটির ফাণ্ডে আর ডাঃ বি, সি রায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ফাণ্ডে নিয়োগ করি। এই বছরে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আবার ২। লক্ষ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন। স্বাধীনতা দিবস হইতে অর্থ সংগ্রহ শুরু হইবে, সে দিবসের আগেই এই টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই বছরে আমরা আরো বেশী সাড়া পাইব, আরো কম সময়ে টাকা তুলিব।

আমাদের নীতি

আমরা মনে করি—যতদিন ভারতবাসীর পরস্পরের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি চলিতে থাকিবে, ভারতবর্ষের স্বার্থে আর নিজের ন্যায্য স্বতন্ত্র

অধিকারের স্বার্থে ভারতবাসী যতদিন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলিত না হইবে, ততদিন কি ভারতের স্বাধীনতা কি পাকিস্তান—দুই-ই দুরাশা। আমরা মনে করি, কংগ্রেস-লীগ আপোসই আজ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সামনে প্রধান কর্ত্তব্য।

বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি দেশভক্তের, দেশপ্রেমিক সংগঠনের—কংগ্রেসের আর লীগের—সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আমাদের স্থির বিশ্বাস, রাজনীতির মতভেদ সত্ত্বেও যতই আমরা সাধারণের সেবায় মিলিত হইব, ততই আমরা স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিব। আপন অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের এই বিশ্বাস; তাই, কংগ্রেসের কোন কোন অংশ যখন দলীয় সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন, তখনও আমরা অবিচলিত। রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব—জনসাধারণের নিঃস্বার্থ সেবা। দেশবাসীর সেবাই প্রথম কর্ত্তব্য—প্রত্যেকটি সভ্যের কাছে এই-ই পার্টির শিক্ষা। এই কর্ত্তব্য হইতে যাহার বিচ্যুতি ঘটে—সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত হয়, যে প্রতারণা করে—নির্ম্মমভাবে সে বিতাড়িত হয়।

আমাদের আবেদন ঃ

এই আমাদের পার্টির নীতি, এই আমাদের কর্ম্মীদের প্রত্যক্ষ কাজ—এরই জোরে আমরা আমাদের সহকর্ম্মীদের শুভেচ্ছা প্রত্যাশা করি, আমাদের নীতি-প্রচারে সহায়তা প্রার্থনা করি, যাতে আমরা দেশবাসীর সেবায় লাগিতে পারি সে জন্য পার্টি তহবিলে সাহায্য প্রার্থনা করি।

কংগ্রেসের সহকর্ম্মীদের কাছে—

৯ই অগাষ্টের পরে যদি কোনো পার্টি দেশের রাজনৈতিক জীবনকে সজীব রাখিয়া থাকে তো সে আমাদের পার্টি, সাম্রাজ্যবাদের কুৎসার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতাদের অভিপ্রায় মতো কংগ্রেসের সুনাম কেহ যদি রক্ষা করিয়া থাকে তো সে আমাদের পার্টি। যদি কোনো পার্টি লীগসেবীদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য প্রচার করিয়া থাকে তো সে আমাদের পার্টি।

লীগের সহকর্ম্মী কাছে—

আমাদের পার্টিই অ-মুসলমান জনসাধারণের কাছে আপনাদের ন্যায্য দাবীর কথা পৌছাইয়া দিয়াছে। লীগের বাহিরে পাকিস্তানের স্বপক্ষে যেটুকু জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, সে আমাদের পার্টিরই চেষ্টায়।

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে—

বিদেশী অপ-শাসনের অন্ধকারে আপনারাই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের প্রকাশিত সাহিত্য আপনাদের কাছে ক্রমশই আদৃত হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আমাদের দেশও বিজ্ঞান, শিল্পকলায় ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক এই যদি আপনাদের কামনা হয়, তবে আপনারা আমাদের পার্টির আরো ঘনিষ্ঠ সহযোগী হোন। আমাদের পার্টির সাহিত্য-প্রকাশের আয়োজন যাতে সচল রাখিতে পারি, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্য পৌঁছাইয়া দিতে পারি সেজন্য আপনারা মুক্তহস্তে আমাদের পার্টি তহবিলে দান করুন।

মা-বোনদের কাছে—

কমিউনিষ্ট মেয়েরা আমাদের এই দেশের নারী আন্দোলনে নতুন এক অধ্যায় রচনা করিয়াছে। মজুর আর কিষাণ মেয়েদেরও তারা এই আন্দোলনে নামাইয়া আনিয়াছে। তাদের সাহায্য করুন যাতে তারা আপনাদের আরো শক্তিশালী, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারে।

ছাত্র-যুবকদের কাছে—

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা পুরান নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আজ আমাদের পার্টির মধ্যে। ৯ই আগষ্ট আপনাদের মধ্যে সাংঘাতিক বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন কমিউনিষ্ট ছাত্ররা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও দায়িত্বশীল কর্ম্মীদের অন্যতম। তারা আপনাদের সাবোতাজ আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, আজ আপনারা স্বয়ং গান্ধীজির মুখ হইতে শুনিতেছেন কংগ্রেসের সে-আন্দোলনে কোনো দায়িত্ব নাই। তারা আপনাদের বাংলা রিলিফ আন্দোলনে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল,—আজ আপনারা শ্রীমতী নাইডুর মুখ হইতে শুনিতেছেন সে কাজের মূল্য কী। যারা একদিন আপনাদের সাবোতাজ আন্দোলনে প্ররোচিত করিয়াছিল, বাংলা রিলিফ আন্দোলনে বাধা দিয়াছিল, তারাই আজ কমিউনিষ্ট বিরোধিতার পাণ্ডা। পার্টির ছাত্রকর্ম্মীদের কাছে পার্টি নির্দ্দেশ দিয়াছে এই বিচ্ছেদকে দূর করিয়া ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কিষাণ ভাইদের কাছে—

আমাদের পার্টি আপনাদের কিষাণ সভা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব আর বাংলার গ্রামাঞ্চলে আপনাদেরই হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে আমাদের পার্টিতে আসিয়াছে। বে-আইনী অবস্থায় আমাদের কত সংগঠককে আপনারা বাঁচাইয়াছেন, আর আজ নিশ্চয়ই আশা করেন আমাদের পার্টি হইতে আরো বেশী সংখ্যায় কিষাণ সভার সংগঠক বাহির হইবে। গত বছরে কত প্রবীণ কিষাণ তাঁদের ফসলের অংশ পার্টিকে দান করিয়াছেন, কত জন তাঁদের জমি জমা পার্টির জন্য বেচিয়া দিয়াছেন। এই বছরেও পার্টীর জন্য জমি দিন, ফসল দিন—আপনাদের স্বার্থত্যাগ আপনাদের সন্তানদের গর্বিত করিবে!

মজুর ভাইদের কাছে—

আমাদের পার্টি আপনাদেরই আপন পার্টি, আমাদের পার্টিই আপনাদের জঙ্গী ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিয়াছে, আপনাদেরই ছেলেমেয়ে তার নেতা, কর্ম্মী। গত বছরে কয়েকটি ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছিল—পার্টি তহবিলে কে কত বেশী দিবে। এই বছরে পার্টির প্রত্যেকটি মজুর সমর্থকের কাছে তিন চার কিস্তিতে পুরা এক মাসের মাহিনা আমরা পার্টি তহবিলে দাবী করি। আমরা জানি, মজুর ভাইদের কাছে পার্টির আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

পার্টি-সভ্যদের কাছে—

গত দুই বছরের চাঁদার শতকরা ৫০ ভাগ পার্টি সভ্যদের দান। তাঁদের স্বার্থত্যাগের কাহিনী তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রে ঘরে ঘরে প্রচলিত। শুধু নিজের দান নয়, মা-বোন-স্ত্রীকেও তাঁরা পার্টির জন্য গহনা, ঘরোয়া আসবাবপত্র, এমন কি রান্নার বাসন-কোসন দান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এইবারে প্রত্যেকটি পার্টি সভ্যের কাছে পার্টির দাবী—পুরা এক মাসের মাহিনা সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারকেও তাঁরা পার্টির জন্য দান করিতে উদ্বুদ্ধ করুন।

বিভিন্ন প্রদেশে ধার্য্য কোটা

অন্ধ্র	৫০,০০০৲	আসাম	১৫,০০০৲
বাংলা	৫০,০০০৲	বিহার	৬,০০০৲
বোম্বাই	৩০,০০০৲	মধ্যপ্রদেশ	১,০০০৲
দিল্লী	২,০০০৲	গুজরাট	২,০০০৲
কর্ণাটক	১০০০৲	কেরলা	১০,০০০৲
মহারাষ্ট্র	৫,০০০৲	উড়িষ্যা	১,০০০৲
পাঞ্জাব	৫০,০০০৲	সিন্ধু	১,০০০৲
তামিলনাড	১০,০০০৲	যুক্তপ্রদেশ	১৫,০০০৲
সীমান্তপ্রদেশ	১,০০০৲		

মোট—২,৫০,০০০৲ টাকা

কমিউনিষ্ট পার্টি দেশের দেশপ্রেমিক পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ, সবচেয়ে কম খরচে চলে। পার্টি তহবিলে যাঁরা দান করিবেন তাঁরা দেশবাসীর সেবায়, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রচেষ্টায়, জাতীয় সরকার আদায়ের পথে পার্টিকে সাহায্য করিবেন। দেশকে যাঁরা ভালবাসেন, ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেন—তাঁদের প্রত্যেকের আয়ের উপরে আমাদের পার্টির দাবী আছে, আমাদের পার্টিকে সাহায্য করা তাঁদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য।

—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সমস্ত পার্টি ইউনিটের প্রতি

প্রিয় কমরেড,

আগামী ২০শে হইতে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের মহান জাতির উপযুক্ত গৌরবের সঙ্গে 'স্বাধীনতা সপ্তাহ' পালন করিতে হইবে। ১৯৪২সালের জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের মত এইবারের স্বাধীনতা সপ্তাহও যেন পার্টির জীবনে এক নূতন পরিবর্ত্তন সূচনা করে। সেবার আপনারা ধ্বংসকারীদের পিছু হটাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবার কমিউনিষ্ট-বিরোধীদের পরাজিত করিতে হইবে।

কি ভাবে? এই সপ্তাহে আপনাদের এলাকায় সবচাইতে বড় জনসমাবেশ করিতে হইবে। আপনাদের এলাকার সমস্ত অধিবাসী যেন বুঝিতে পারেন যে প্রত্যেকটি কমিউনিষ্ট তাহার পার্টির নেতৃত্বে দেশের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে। একমাত্র এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমই কমিউনিষ্ট-বিরোধীদের তফাৎ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

আপনার এলাকার প্রত্যেকটি দেশভক্তের কাছে পার্টির নীতি পৌছাইয়া দিন। কোন দেশভক্ত আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবেন তাহা বড় কথা নয়। যাঁহার সততা ও বুঝিবার আগ্রহ আছে তিনি আমাদের সঙ্গে একমত না হইয়া পারেন না। প্রয়োজন শুধু ধৈর্য্য সহকারে পার্টি নীতি সঠিক ভাবে বোঝান।

এই সপ্তাহে নীচের কাজগুলি করিতে হইবে ঃ

(১) সাহিত্য বিক্রী বাড়াও ঃ জাতীয় সমস্যার উপরে তিনটি প্রধান পুস্তিকা বেশ ভাল ভাবেই বিক্রী হইতেছে। ইতিমধ্যেই "কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট" ৫০,০০০ কপি, "আবার সাক্ষাৎ চাই" ৩৮,০০০ কপি ও "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" ২৪,০০০ কপি বিক্রীর জন্য পাঠান হইয়াছে (প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই)। এই কপিগুলি যেরকম খুসী বিক্রী করা চলিবে না, দেখিতে হইবে যাহাতে আপনাদের এলাকার প্রত্যেকটি জননেতা, বিভিন্ন দলের কর্ম্মী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এই পুস্তিকাগুলি বিক্রী করা হয়, কারণ তাঁহারাই স্থানীয় জনমত গঠন করেন।

শুধু এই তিনখানি পুস্তিকা বিক্রী করাই যথেষ্ট নয়। পিপ্‌লস্ পাবলিসিং হাউসের স্থানীয় এজেন্টদের যা পুস্তিকার ষ্টক আছে এই সপ্তাহের মধ্যেই সব নিঃশেষ করিতে হইবে।

(২) মে'ডে ফাণ্ডে টাকা তোল ঃ এই সপ্তাহেই অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করিতে হইবে। ২০শে জানুয়ারী পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা হইতে অর্থসংগ্রহ আরম্ভ হইবে এবং সপ্তাহের পরবর্ত্তি দিনগুলি প্রত্যেকটি স্কোয়াড তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপকভাবে টাকা তুলিবে। জনসমাবেশ-গুলিতে অর্থসংগ্রহের রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উপস্থিত জনতার নিকট হইতেও টাকা তুলিতে হইবে।

গত দুই বছর পার্টি ফাণ্ডের বেশীর ভাগ টাকাই পার্টির সমর্থকদের নিকট হইতে তোলা হইত। এইবার টাকা তুলিতে হইবে আরও ব্যাপকভাবে। পার্টিনেতারা স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতা ও অন্যান্য দেশহিতৈষীদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবেন। আমরা দানভিক্ষা চাহি না, তাই কেবলমাত্র তাঁহাদের কাছে যাওয়া উচিত যাঁহারা আমাদের চেনেন ও আমাদের কাজকে শ্রদ্ধা করেন।

কংগ্রেস সোশালিষ্টরা জেল হইতে মুক্ত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কাছে আমাদের পার্টি ফাণ্ড সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা প্রচার করে। এই সব কংগ্রেস কর্ম্মীদের দেখান আমরা কি করিয়া টাকা পাই, কি ভাবে আমাদের জিলা-কমিটিগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে কংগ্রেস জিলা-কমিটির চাইতে বেশী টাকা তোলে, কি করিয়া আমাদের পার্টি সভ্যরা অন্য যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের চাইতে তাহাদের পার্টির জন্য বেশী আর্থিক স্বার্থত্যাগ করে।

(৩) আপ্রাণ জনসমাবেশের চেষ্টা কর ঃ যেখানে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা নাই সেখানেই জনসমাবেশ করিতে হইবে।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর কংগ্রেস ও লীগ এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যেও মতানৈক্য মারাত্মক ভাবে বাড়িয়াছে। তাই যুক্ত সভা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু তবুও চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে কংগ্রেস ও লীগকর্ম্মী ও বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের নেতারা আমাদের সভায় বক্তৃতা করেন। তাছাড়া যত বেশী সংখ্যক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী আমাদের সভায় যোগ দেন ততই ভাল। বক্তৃতা সর্ব্বসম্মত হওয়া উচিত।

সভায় বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানের নেতাদেরও বলিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ ফ্রণ্টের অবস্থা ও তাঁহাদের এক বছরের জনসেবার সাফল্য বর্ণনা করিবেন এবং আগামী বছর অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আরও ভালভাবে দেশসেবার শপথ নেবেন।

"স্বাধীনতা সপ্তাহ" সমস্ত রকম দলগত সংকীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া পালন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি লোক আমাদের প্রচারের মধ্যে তাহার জীবনের বাস্তব ছবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। আমাদের প্রচার এমন হইবে যে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সাধু ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। সমস্ত পার্টীকে এমন কঠিন পরিশ্রম ও সুষ্ঠভাবে কাজ করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি কংগ্রেস-কর্ম্মী বলেন কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস হইতে বাদ দিলে কংগ্রেসরই বিরুদ্ধতা করা হইবে। সমস্ত সপ্তাহের আন্দোলন যেন পার্টির মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যাহাতে পার্টির মধ্যেকার সমস্ত নৈরাশ্য দূর হইয়া যায় এবং ১৯৪৫ সালে পার্টি পতাকাকে আরও উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার উৎসাহ আমরা পাই।

লাল সালাম

পি, সি, জোশী

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা [illegible] হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত JANAYUDDHA

পোলাণ্ডের নূতন গভর্ণমেণ্ট

[লণ্ডন হইতে বেন ব্রাড্লের তার]

পোলিশ জাতীয় মুক্তি সংসদকে পোলিশ গণতন্ত্রের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হিসাবে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে পোলাণ্ডের জাতীয় কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে—(জাতীয় কাউন্সিল পোলিশ জাতির অস্থায়ী পার্লামেণ্ট এবং এক বৎসর আগে সমস্ত পোলাণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহা গঠিত হইয়াছিল)—কাউন্সিলের সভায় ১৫০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব কাউন্সিল সভ্যদের মধ্যে অনেকেই জার্ম্মান অধিকৃত পোলাণ্ড হইতেও আসিয়াছিলেন।

নূতন গঠিত এই গভর্ণমেণ্টের প্রধান এবং বৈদেশিক মন্ত্রী হইয়াছেন এডোয়ার্ড ওসুবকা মোরায়াস্কি; ইনি জাতীয় মুক্তি সংসদের সভাপতি ছিলেন। দেশরক্ষা-মন্ত্রী হইয়াছেন জেনারেল রোলা-জিমিয়েরস্কি। দুইজন সহকারী প্রধান মন্ত্রীর একজন হইতেছেন কৃষক দলের সহকারী সভাপতি এম, জ্যানুস, এবং দ্বিতীয় হইতেছেন শ্রমিক দলের সম্পাদক এম, গোমোলকা।

মন্ত্রীমণ্ডলীতে সমাজতান্ত্রিক দলের পাঁচ জন, কৃষক দলের চার জন, শ্রমিক দলের চার জন এবং গণতান্ত্রিক দলের দুই জন সভ্য রহিয়াছেন। রোলা জিমিয়েরস্কি কোন রাজনৈতিক দলেই নাই।

জাতীয় কাউন্সিলের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ঘটে নাই। গত মাসে পোল্যাণ্ডের শত্রুকবলমুক্ত এলাকায় মুক্তি সংসদকেই দেশের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হিসাবে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য হাজার হাজার সভায় দাবী উঠিয়াছে।

এইরূপ ঘটিবার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্ণমেণ্টের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে মিকোলাজিকের ন্যায় নরমপন্থী, যাঁহারা মুক্তি সংসদের সহিত একটা আপোষ রফার পক্ষপাতি ছিলেন তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে পোলিশ সোসালিষ্ট ও জমিদার দল—"এনডেক" প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েট বিরোধী শক্তিগুলিকে ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে লণ্ডন ও লুবলিনের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আর নাই।

দ্বিতীয়তঃ মুক্তি সংসদ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসার করা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা কাজে পরিণত করার ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে।

ভূমি প্রথা সম্পর্কিত ব্যবস্থা

শত্রুকবলমুক্ত পোলাণ্ডের তিন লক্ষ চাষী পরিবারকে বড় বড় জমিদারী ভাঙ্গিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গণতন্ত্র

মুক্ত এলাকায় এলাকা ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের সাহায্যে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে; আগে যে পুলিশবাহিনী ছিল এবং যাহা জার্ম্মানদের অধীনেও কাজ করিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নির্ব্বাচিত স্থানীয় কাউন্সিলের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে। যে সব দেশদ্রোহী জার্ম্মানদের সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হইতেছে। যুদ্ধের আগে পোলিশ সরকার জুরীর সাহায্যে যে বিচার প্রথা রহিত করিয়াছিল, তাহা আবার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শক্তিশালী সৈন্যদল

যুদ্ধের জন্য দুইটী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। ত্রিশ হাজার অফিসার এবং পনের হাজার অফিসার পদপ্রার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

লুবলিন হইতে "বৃটিশ ইউনাইটেড প্রেসের" একটি খবর হইতে জানা যায়—যে সব পোলিশ অফিসারদের লণ্ডনে শিক্ষিত করিয়া কুখ্যাত সসন্‌কওয়াস্কির "হোম আর্ম্মি"তে যোগ দেওয়ার জন্য প্যারাসুট সাহায্যে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকেই এখন নবগঠিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের জাতীয় সৈন্যদলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। এই খবরের হিসাব হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে মুক্ত অঞ্চলে যাহারা এক সময়ে সসন্‌কওয়াস্কির "হোম আর্ম্মিকে" সমর্থন করিত তাহাদের শতকরা ৫০ জন অফিসার এবং ৯০ জন সাধারণ লোক এখন জাতীয় সৈন্য দলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতেছেন।

অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন

যথেষ্ট বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিল্পব্যবস্থা নূতন করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। জার্ম্মান ও দেশ-দ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে অন্যথায় ব্যক্তিগত শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থা বজায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকদের কমিটী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করিতেছে। ইহার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক মস্তবড় জাগরণ দেখা দিয়াছে। গত নভেম্বর মাসে যে ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায় দশ হাজার শ্রমিকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পোলাণ্ডের মত বিধ্বস্ত এবং কৃষি প্রধান দেশে ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই সব কাজের ফলেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এতটা জনপ্রিয় হইয়াছে যে মুক্ত অঞ্চলে মিকোলাজিকের দলের সকলেই নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রিকার লুবলিনস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা ষ্টিফান লিটাওর এই ঘটনাকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লিটাওর বিখ্যাত পোলিশ সাংবাদিক। পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনস্থ পোলিশ মন্ত্রীমণ্ডলের সংবাদ-সংগ্রহ দপ্তরে ছিলেন কিন্তু লণ্ডনস্থ পোলদলের সোভিয়েট বিরোধী প্রচারের প্রতিবাদের ফলে তাঁহাকে সেজন্য সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লুবলিনস্থিত বৃটিশ ও মার্কিন সাংবাদিকদের প্রায় সকলের সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমতকে ব্যক্ত করিয়া লিটাওর লিখিয়াছেন:

"আমাদের এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে যে প্রকৃত স্বাধীন পোলাণ্ড সম্বন্ধে আমরা আগ্রহান্বিত তাহা এই মুক্ত অঞ্চলেই অবস্থিত—বিদেশে অন্য কোথাও নহে।...বিদেশে পলায়িত র‍্যাজকিভিজ বা লণ্ডনস্থ অন্যান্য পোলদের অসময়োপযোগী এবং আজেবাজে প্রতিবাদ সম্বন্ধে এখানে কেহ কোন ভ্রূক্ষেপই করে না।

শক্তিশালী ও ক্রমবর্দ্ধমান পোলিশ সৈন্যবাহিনীর ভিত্তিতে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থনে নূতন পোলিশ রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এতটা শক্তিশালী হইয়াছে যে ইহা এই ধরণের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে।"

বিভিন্ন ফ্রণ্টের লড়াই

লালফৌজের নূতন অভিযান

লালফৌজ বিভিন্ন ফ্রণ্টে শীতকালীন অভিযান সুরু করিয়াছে। এই সম্পর্কে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"শীঘ্রই এই অঞ্চলে এমন এক যুদ্ধ সুরু হইতে যাইতেছে যাহার ফলাফল দ্বারা জার্ম্মানীর সাইলেসিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলি এবং খাস জার্ম্মানীর রক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নির্ভর করিবে। দক্ষিণ পোলাণ্ডের কর্দ্দমাক্ত অঞ্চল ধরিয়া মার্শাল কনিয়েভের ট্যাঙ্ক ও কামান শ্রেণী অবিরাম ভাবে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে এবং তাহারা জার্ম্মান-সাইলেসিয়ান সীমান্তের ৭০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। সোভিয়েটের এই নূতন অভিযানের গতি একটুও মন্থর হয় নাই।" মার্শাল কনিয়েভের অধীন তিনটি আর্মি এই আক্রমণ সুরু করে। জার্ম্মানীতে প্রবেশের জন্য যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ, তাহা ধরিয়া তাহারা সাইলেসিয়া ও ব্রেসলু নগরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সোভিয়েটের 'রেড ষ্টার' পত্রিকা নূতন আক্রমণ সম্পর্কে লিখিয়াছে—"আমাদের সৈন্য ক্ষিপ্রতার সহিত আগাইয়া প্রত্যেক সাফল্যটিকে কাজে লাগাইতেছে এবং শত্রুসৈন্যকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছে। খবরগুলি হইতে বোঝা যাইতেছে যে এই অভিযান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে সফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা এই যুদ্ধের একটি বিরাট সাফল্যমণ্ডিত অভিযান বলিয়াই খ্যাত হইবে।"

ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপে

ফিলিপাইনের সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ লুজনে মার্কিন সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ৮০০ জাহাজ হইতে বিপুল পরিমাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ উপকূলে নামানো হইয়াছে। অবতরণের পরই জেনারেল ম্যাক আর্থারের শিবির হইতে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—"আমাদের সৈন্যরা লুজনে অবতরণ করিয়াছে। ব্যাপক স্থল ও জল অভিযানে আমাদের সৈন্যরা লিঙ্গায়েন উপসাগরে ৪টি সেতুমুখ দখল করিয়াছে। আমরা শত্রুর পশ্চাতে আসিয়াছি। ফিলিপাইনে তাহার সৈন্য প্রেরণের ও সরবরাহ দিবার প্রধান লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; এখন লুজনে তাহার যে সঙ্গতি আছে তাহা দিয়াই লড়াই চালাইতে হইবে।"

ব্রহ্ম রণক্ষেত্রে

ব্রহ্ম রণাঙ্গণের এ সপ্তাহের খবর হইতেও বোঝা যাইতেছে যে জাপানীরা এখান হইতে আস্তে আস্তে হটিয়া যাইতেছে। আকিয়াব দখলের পর মিত্রশক্তি ইহার ১৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কালাদানের পশ্চিম তীরে পোলাগিয়ান ষ্টীমার ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গণে জঙ্গলাকীর্ণ ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বাহিনী সোয়েবো দখল করিয়াছে। সোয়েবোর দক্ষিণে অগ্রসর মিত্র সেনা মান্দালয়ের অনুমান ৩০ মাইল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মিচিনা মান্দালয় রেলপথের ওয়েটলেট ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছে।

এই সব সংবাদ হইতে ইহা বেশ বোঝা যাইতেছে যে জাপানীরা মিত্রশক্তির রক্ষা ঘাঁটিগুলির সব চেয়ে দুর্ব্বলতম স্থানে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে। প্রাচ্য রণক্ষেত্রের আজিকার দিনে দুর্ব্বলতম স্থান হইতেছে চীন। তাই গত ৬ মাস ধরিয়া জাপানীরা চীনের ভিতর তাহাদের প্রধান সামরিক শক্তি সংহত করিতেছে। ৩ লক্ষ জাপানী সৈন্য মধ্য ও দক্ষিণ চীনে নূতন ভাবে সুসজ্জিত হইতেছে।

আত্মকলহে বিভক্ত চীনের মাটিতে জাপানীরা শক্ত হইয়া হাটু গাড়িতেছে, মিত্রশক্তি হইতে চীনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং এই বিপজ্জনক অবস্থায় মোড় ঘুরাইতে চাই চীনে এক সর্ব্বদলীয় সরকার, যাহার উপর সমগ্র দেশবাসীর আস্থা ন্যস্ত হইবে এবং যে সরকার আজ সমগ্র চীনের জনগণকে সংহত করিয়া জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাইবে, চীনের মধ্য হইতে পরাজয়ের মনোবৃত্তিকে পিশিয়া মারিতে পারিবে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুংও তাঁহার নববর্ষের বাণীতে বস্তুতঃ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। (১৪-১ ৪৫)

আগামী স্বাধীনতা দিবস

[২য় পৃষ্ঠার পর]

পরে তবে পাঞ্জাবে লীগের চেতনা হইয়াছে, তাঁহারা কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তির দাবীতে আগাইয়া আসিয়াছেন। কোন প্রদেশেই লীগের মন্ত্রিসভা শক্তিশালী নয়; চারিদিকে প্রবল চক্রান্ত চলিতেছে। পাঞ্জাবের লীগ বহুকষ্টে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের লীগ সে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কি নিজেদের মন্ত্রিসভার পতন আনিয়া দিবে?

স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহে আমরা লীগপন্থীদের কাছে এই কথাই বুঝাইব যে, গান্ধীজী ইতিমধ্যেই আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলনীতি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তিনি মিঃ জিন্নাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতখানি আগানো উচিত ছিল, ততখানি আগান নাই। পাকিস্তানের দাবীর পিছনে যদি কংগ্রেসের সমর্থন আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে আইন-সঙ্গত করার জন্য ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তির জন্য দাবী জানাইতে হইবে। আমরা আশা করি, তাঁহারা এই খেলো প্রশ্নটি করিয়া বসিবেন না যে, কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তান দাবী সমর্থন যে করিবেনই তাহার নিশ্চয়তা কি। কারণ এই দাবী মানাইতে হইলে প্রয়োজন শুধু একদিকে লীগনেতাদের পক্ষে মুসলমানদের এই দাবী বুঝাইবার যোগ্যতা ও অন্যদিকে কংগ্রেস নেতাদের শুভবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা। এ বিষয়ে উভয় পক্ষেরই ব্যর্থতা কি আমরা আশা করিতে পারি? এ ধরণের আশঙ্কা একমাত্র বিশ্বাস-হীন পরাজিতের মনোবৃত্তি হইতেই আসিতে পারে। আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন লীগপন্থীদের কাছ হইতে আমরা এই কথাই আশা করি যে 'তাঁহাদের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য আমাদের পালন করিতে দাও। বিশ্বাস করো, তাঁহারাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন।'

কংগ্রেসের মধ্য হইতেই আমাদের পার্টি উঠিয়াছে। কংগ্রেসের প্রতি আমাদের অনুরাগ কোন কংগ্রেসকর্ম্মীর চাইতে কম নয়। যখন কোন কোন কংগ্রেসকর্ম্মী আমাদের বলেন, কংগ্রেসের মধ্যে আমরা অবাঞ্ছনীয়—তখন আমরা অসীম বেদনা অনুভব করি। একই পরিবারের মধ্যে বয়সে যাহারা তরুণ, তাহারা যখন প্রবীণদের কাছে দুঃখ পায়—তখন তাহাদের সোজাসুজি কথাবার্ত্তা বলার অধিকার থাকে। আগামী স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহে আমরা যথাসাধ্য বেশী সংখ্যায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত দেখা করিব এবং তাঁহাদের বলিব তাঁহারা যেন কমিউনিষ্ট-বিরোধী জেহাদের পাণ্ডাদের সহিত আমাদের একবার তুলনা করিয়া দেখেন।

ইচ্ছা করিয়া হউক অথবা ভুল করিয়াই হউক ধ্বংসাত্মক কাজ প্রভৃতির সহিত তাহারাই কি কংগ্রেসের নাম যুক্ত করে নাই? মহাসভাপন্থী ও লীগ বিরোধী যথাসম্ভব কদর্য্য লোকজন কি ইহাদেরই দলভুক্ত নয়? একদিকে কমিউনিষ্ট বিরোধিতা, অন্যদিকে মহাত্মাজীর প্রতি আনুগত্য—এই ছদ্মবেশের মধ্যে দেশের সব থেকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী লোকজন কি আশ্রয় খুঁজিতেছে না?

কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্মেলনে যাহা বলা ও করা হইতেছে, তাহা কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে, না কংগ্রেসের শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে? ইহা কি নিয়মতান্ত্রিক, না ইহা নিছক জবরদস্তি? সব থেকে বিরাট ও শ্রেষ্ঠ জনসেবা কি ইহাকেই বলে? আমাদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু কুৎসা প্রচার হইতেছে তাহা কি স্পষ্টতই মিথ্যা ও নীচতাপ্রসূত নহে? কংগ্রেস কর্ম্মীদের কাছে আমরা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিব। যাঁহারা বালক বয়স হইতেই আমাদের চেনেন, যাঁহাদের মনের মধ্যে কুটিলতা নাই—আমাদের সেই প্রবীণ অগ্রজদের কাছ হইতে আমরা এই প্রশ্নগুলির দ্বিধাহীন জবাব প্রত্যাশা করি। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে আছেন এবং চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিহ্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন সব থেকে বেশী গোলমাল শুরু করিতেছেন।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিয়া আলোচনা করিতে আমরা প্রস্তুত। যে সংগঠন হইতে আমাদের জন্ম, যে সংগঠনে আমরা কাজ করি—সেই সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের পার্টির নিয়মতন্ত্র অনুসারেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কংগ্রেসের প্রবীণ কর্ম্মীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা বিভেদ-

(তৃতীয় কলমের নীচে দেখুন)

কারীদের নিরস্ত করুন। কুৎসা রটনাকারীদের মুখ বন্ধ করুন।

স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র দিনে কংগ্রেসকর্ম্মীদের কাছে আমরা আবেদন জানাইব, একই জাতীয় আন্দোলনে আমাদের দান তাঁহারা স্মরণ করুন—দেশের সব থেকে সুশৃঙ্খল আমাদের যে রাজ-নৈতিক পার্টি, তাহার শক্তি ও সজীবতাকে তাঁহারা নিজেদের বলিয়া মনে করুন। দেশ আমাদের সকলকে চায়। কংগ্রেসকর্ম্মী ও কমিউনিষ্টরা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে দেশ কি লাভবান হইবে? সকল দেশভক্তের জননী যে কংগ্রেস—পরস্পরের এই বিচ্ছিন্নতায় সেই কংগ্রেসই কি লাভবান হইবে?

স্বাধীনতা দিবস সপ্তাহে দেশের প্রধানতম নেতাদের কারামুক্তির জন্য এবং জাতীয় শক্তিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমরা দেশবাসীকে প্রাণপণে অনুপ্রাণিত করিব। আমাদের পার্টির সম্মুখে এই দুটিই সব থেকে মুখ্য কর্ত্তব্য; ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে—আরও নৈরাশ্য ও বিভেদ, না বিপুলতর ঐক্য ও চরম জয়—১৯৪৫ সালে দেশ কোন্ পথে চলিবে।

(পিপলস ওয়ারের সম্পাদকীয়)

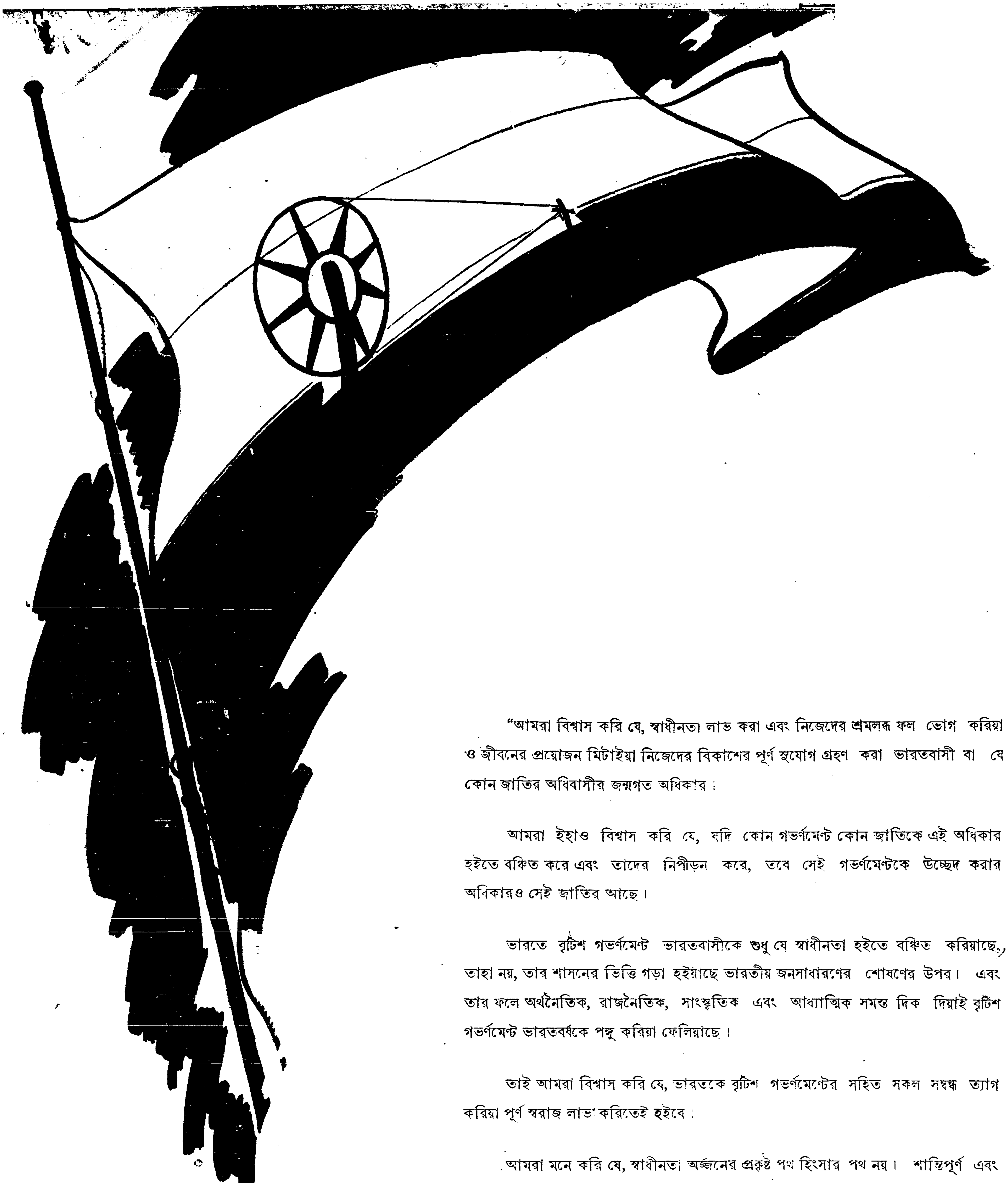

জনযুদ্ধ

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৫
৩৭ সংখ্যা, দাম–৵০ আনা

"আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা লাভ করা এবং নিজেদের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিয়া ও জীবনের প্রয়োজন মিটাইয়া নিজেদের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা ভারতবাসী বা যে কোন জাতির অধিবাসীর জন্মগত অধিকার।

আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গভর্ণমেণ্ট কোন জাতিকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাদের নিপীড়ন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করার অধিকারও সেই জাতির আছে।

ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নয়, তার শাসনের ভিত্তি গড়া হইয়াছে ভারতীয় জনসাধারণের শোষণের উপর। এবং তার ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক দিয়াই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে।

তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতেই হইবে।

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ হিংসার পথ নয়। শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারত শক্তিমান হইয়াছে, আত্মনির্ভরতা অর্জ্জন করিয়াছে এবং স্বরাজের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই পথ অনুসরণ করিয়াই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমরা নূতন করিয়া আবার ভারতের স্বাধীনতার শপথ লইতেছি। আমরা সংকল্প করিতেছি যে, যতদিন না পূর্ণ স্বরাজ লাভ হয় ততদিন অহিংসভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইয়া যাইব।......"

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

স্বদেশী যুগে

অখ্যাতনামা যুবক ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে আমরা প্রথম কংগ্রেসী মঞ্চে দেখিতে পাই,—১৯৩৬-এর কলিকাতা কংগ্রেসে। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ-বঙ্কিমের স্বদেশানুরাগের অনুগামী চিত্তরঞ্জন স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হন এবং নব-গঠিত (গঠিত বলিলে কিছু ভুল হইবে, তখন কেবল দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে বলাই সঙ্গত) জাতীয় দলে যোগদান করেন। স্বদেশী ও বয়কট প্রস্তাব লইয়া মডারেটদের সহিত মতভেদ হেতু তিলক-বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে যে সকল প্রতিনিধি প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন, তাহার মধ্যে চিত্তরঞ্জনও ছিলেন। ১৯০৭-১৫ এই কয় বৎসর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। জাতীয়দলের কেহই মডারেট-মজলিসে পরিণত কংগ্রেসে যোগ দিতেন না। ১৯০৭-এর পর বিখ্যাত মানিকতলা বোমার মামলায় "সন্ত্রাসবাদের" অস্তিত্ব দেখা যায় এবং তাহার বিরুদ্ধে অবলম্বিত দমননীতি জাতীয়দলের উপরই পতিত হয়। তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড, লালা লাজপৎ রায়ের ও সরদার অজিত সিংহের নির্ব্বাসন, বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া অরবিন্দের আধ্যাত্মিকতার পথে পণ্ডিচেরী পলায়ন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু, কবি রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের পিছাইয়া পড়া প্রভৃতি কারণে স্বদেশী আন্দোলন মন্দীভূত এবং গুপ্ত আন্দোলন যুবসমাজে প্রবল হইয়া উঠে। এই কালে আমরা চিত্তরঞ্জনকে রাজদ্রোহের প্রত্যেকটি মামলায়, স্বদেশ প্রেমিক যুবকদিগকে জঘন্য পুলিশী অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ আদালতে অক্লান্ত যোদ্ধারূপে দেখিতে পাই। আলীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের তিনি ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর মহাযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ ও বিনাবিচারে ব্যাপক আটক, আইনের প্রয়োগের সময় এই বিচক্ষণ আইনজীবী বহু মামলায় যুবকদিগকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল থাকিয়া তিনি বহু দেশকর্ম্মীকে রক্ষা করিয়াছেন, সেদিন বাঙ্গলায় চিত্তরঞ্জন না থাকিলে পরবর্ত্তী অসহযোগ যুগে অনেক কর্ম্মীকেই আমরা পাইতাম না। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের মামলায় বাঙ্গলার সুনাম ও দেশপ্রেমিক যুবকদিগকে রক্ষা করা তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

জাতীয় কংগ্রেসে

ক্রমে রাজনীতির চাকা ঘুরিল। মডারেট ও জাতীয়দল কংগ্রেসী কেন্দ্রে মিলিত হইল, মিসেস বেশান্তের হোমরুল-লীগ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে প্রবল করিয়া তুলিল। ১৯১৬-র লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মুসলিম-লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইল। ভারতবাসীর ভারতের হিন্দু মুসলমান জননায়কদের ঐক্যবদ্ধ দাবীকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৯১৭-র আগষ্ট মাসে তাঁহারা মহাযুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সমগ্র ভারতে মধ্য শ্রেণীর মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিল। ১৯০৫-০৮এর বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের কিয়দংশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই প্রথম জাতীয় আন্দোলন ভারতব্যাপী রূপ গ্রহণ করিল। এই সময় চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় গিয়া স্বায়ত্তশাসন ও হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য জনমত গঠন করিতে লাগিলেন।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী

১৯১৭ র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ—বাঙ্গলার কথা। অতীতের মামুলী রাজনৈতিক বক্তৃতার ধারা হইতে উহা এক অভিনব পথে প্রস্থান। বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক বিকাশের ভিত্তির উপর অতুলনীয় ভাষায় চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। দশসহস্র মানুষ তাঁহার আবেগময় কণ্ঠ হইতে শুনিল, হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী—বাঙ্গালীই মুসলমান হইয়াছে, মুসলমান আবার নূতন করিয়া কি বাঙ্গালী হইবে। চিত্তরঞ্জনের সেই অভিভাষণ বাঙ্গলার স্বদেশ-প্রেমিক তরুণদের নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিল। কবি ও ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন—দয়ালু ও সহজদাতা চিত্তরঞ্জন; প্রেমিক ও পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জন—তাঁহার উদারহৃদয় গভীর স্বজাতিপ্রীতি এবং একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের বলে অনায়াসে বাঙ্গালীর চিত্তজয় করিলেন। বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে অবিসম্বাদী নেতারূপে বরণ করিল।

লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে পৃথক নির্ব্বাচন ও সাম্প্রদায়িক নির্দ্দিষ্ট আসন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার গঠন ও স্বায়ত্ত শাসনের যে খসড়া রচিত হয়, ১৯২০-২১-এর দ্বৈতশাসনপদ্ধতিতে মোটামুটি ভাবে তাহাই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসন দিবার যে ব্যবস্থা করিলেন, রাজনৈতিক ভারত তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাউলাট আইন, সত্যাগ্রহ, পাঞ্জাবের সামরিক আইন, জালিওয়ানালা বাগ—এই সকল দ্রুত পরিবর্ত্তিত ঘটনায় কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি অর্থাৎ ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বরাজ লাভের জন্য গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিলেন। চিত্তরঞ্জন ১৯১৬ হইতেই জাতীয়তাবাদী নেতারূপে কংগ্রেসে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি এবং আরও বহু জাতীয়তাবাদী অসহযোগ প্রস্তাবের অন্যান্য অংশে সম্মতি দিয়া আইনসভা বর্জ্জনের বিরুদ্ধতা করিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, ক্ষমতা যত সীমাবদ্ধ হউক না কেন, নূতন শাসন-তন্ত্রকে গভর্ণমেণ্ট মডারেট ও রাজভক্ত দল লইয়া চালু করিবে এবং ইহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে। নাগপুর কংগ্রেসে জনমতের দাবীর নিকট চিত্তরঞ্জন আত্মসমর্পণ করিলেন। আইনসভা কংগ্রেস বয়কট করিল। কিন্তু আইনসভা শূন্য রহিল না, নেতৃস্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নেতার পরিবর্ত্তে কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন সদস্য লইয়া মডারেটরা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিলেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব মৈত্রী সৃষ্টি করিলেন। গান্ধিজী ও আলীভ্রাতৃদ্বয় একযোগে স্বরাজ লাভের জন্য কোন চুক্তি করেন নাই। উভয় সম্প্রদায়ের হাতে পরস্পরের স্বার্থ নিরাপদ—অতএব আন্দোলন জয়যুক্ত হইলে অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজী হইলে ভবিষ্যতের স্বরাজের রূপ হিন্দু-মুসলমান নেতারা অনায়াসে নির্ণয় করিয়া লইতে পারিবেন, এই ধারণা সকলের ছিল বলিয়া কোন চুক্তির আবশ্যক হয় নাই। দেশের মুক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণের কথাই তখন মুখ্য, অন্য সব গৌণ।

১৯২১

১৯২১-এর আন্দোলনে প্রথম গভর্ণমেণ্ট বাধা দিলেন না, নূতন নির্ব্বাচন, আইনসভা ও মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়া গভর্ণমেণ্ট বলাবল বুঝিয়া লইলেন। প্রতিক্রিয়াশীল মডারেট ও খাঁমাখাঁদের সমর্থনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইবার পর গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করিলেন। সেপ্টেম্বর মাস হইতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে হরতাল ও বয়কট আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিল। গান্ধীজি ছাড়া অধিকাংশ নেতা ও সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হইলেন। আন্দোলনের শক্তি ও হিন্দুমুসলমানের ঐক্য দেখিয়া লর্ড রেডিং বিহ্বল হইয়া আপোষের জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিলেন। বৈঠকের আলোচনার-জন্য লর্ড রেডিং নেতাদের মুক্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু আলীভ্রাতৃদ্বয়সহ করাচীর ৭ জন বন্দীকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করিলেন। দেশবন্ধু ও মতিলাল ঐ অর্থেই আপোষ আলোচনায় সম্মত হইলেন, কিন্তু গান্ধীজি সম্মত হইলেন না। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে মতভেদ দেখা দিল, গান্ধীজি অটল রহিলেন। অবশেষে চৌরী-চোরার হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। হতোদ্যম নৈরাশ্যে সমস্ত উৎসাহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সৈন্য ও পুলিশ বিদ্রোহ করিবে, এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজিকে গ্রেফতার করেন নাই। আন্দোলন স্থগিত হইবার পর মার্চ্চ মাসে ইয়ং ইণ্ডিয়ার তিনটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে গান্ধীজি ৬ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন। গঠনমূলক কার্য্যের নামে খাদি উৎপাদন চলিতে লাগিল।

অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন হইলেও এই আন্দোলনে অন্ধ ধর্ম্মোন্মাদনাও প্রশ্রয় পাইল। গান্ধীজির তপস্বী জীবন, তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বহু কংগ্রেসকর্ম্মী ধর্ম্মজীবনের কৃচ্ছ্রতা বরণ করিতে লাগিলেন—গান্ধীজির অশন বসন ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে খিলাফৎ আন্দোলনে বহু মৌলানা মৌলবী (ধর্ম্মপ্রচারক) জনসভায় ধর্ম্মের বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুরাগ অসহযোগ আন্দোলনে অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল—আন্দোলনের ভাটার মুলে ইহাই পরবর্ত্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিবার স্বাধীনতার নামে গো-কোরবাণী, মসজিদের সম্মুখে বাদ্য প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলি মর্ম্মান্তিক কলহের কারণ হইয়া উঠে—যাহার জের আমরা আজ পর্য্যন্ত টানিয়া চলিতেছি।

১৯২২-২৩শে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইল। গান্ধী অনুগামীরা আইনসভায় প্রবেশ অনুমোদন করিলেন না। দেশবন্ধু দাশ ও মতিলাল নেহেরু আইনসভায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে বাধাদানের কার্য্যক্রম প্রস্তুত করিয়া স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস-পন্থীরা একযোগে নূতন নির্ব্বাচনে মডারেট ও প্রতি-ক্রিয়াশীলদের প্রায় বিতাড়িত করিলেন; বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলের বারংবার পতন রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে লাগিল।

বেঙ্গল-প্যাক্ট

স্বরাজ্যদলের আইনসভায় প্রবেশের পর, বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল হিন্দু-মুসলমান প্রতিষ্ঠাভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহারা মসজিদের সামনে বাদ্য, নামাজ-আরতি লইয়া এক উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিলেন। পরস্পরের প্রতি সুবিবেচনা অপেক্ষা উসকানীই প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে নৃশংস দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল। কংগ্রেস ও জাতীয়তা-বাদী মুসলমান দল বিপাকে পড়িল। উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময় কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেসের সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কর্পোরেশনে উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত অনেকগুলি চাকুরী মুসলমানদের দিলেন, ডেপুটি মেয়রের পদ মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৯২৪ সালে

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

তিনি বিখ্যাত "বেঙ্গল-প্যাক্ট" সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক সম্মেলনে ভোটাধিক্যে পাশ করান। যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক আসন সংরক্ষণ এবং সরকারী চাকুরীর শতকরা ৪০টি মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা প্রভৃতি কতকগুলি সর্ত্ত ইহাতে ছিল। "বেঙ্গল-প্যাক্ট" লইয়া সংবাদপত্র সভা-সমিতিতে তুমুল তর্কের তুফান উঠিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষের উগ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি উদ্দাম হইয়া উঠিল। এই সময় সন্ত্রাসবাদের নামে বহু কংগ্রেসকর্ম্মী এবং দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী কারারুদ্ধ হইলেন। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, অন্য দিকে

লেখক:
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দমননীতি—এই দুইএর বিরুদ্ধে অশান্ত সংগ্রামে তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতের অমঙ্গল তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণ ছায়াপাত করিল। তিনি "সম্মানজনক সর্ত্তে" বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ করিতে উদ্যত হইলেন। ভারতের নানা কেন্দ্রে কতকগুলি 'ঐক্য সম্মেলনে' তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য উদারভাবে মুসলমানদের দাবীপূরণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তিরা স্বার্থের আবরণে সাম্প্রদায়িক দাবীগুলি কেবলই চড়াইতে লাগিলেন এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা ছদ্মবেশে রাজনীতিক্ষেত্রে জাঁকিয়া বসিলেন। ভগ্ন-হৃদয়ে দেশবন্ধু ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিংশ দশকের সাম্প্রদায়িক বিরোধ উত্তর ভারত হইতে সমস্ত বাংলা দেশকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি সমগ্র ভারতের সমস্যা হইতে বাঙ্গলার সমস্যাকে পৃথক করিয়া মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গলায়ই মুসলমানদের সংখ্যা সর্ব্বাধিক এবং বাঙ্গলাদেশেই তাহারা অনগ্রসর। বাঙ্গলার মীমাংসা সারা ভারতকে পথ দেখাইত। কিন্তু মাদ্রাজ কংগ্রেস দেশবন্ধুর "বেঙ্গল-প্যাক্ট" অনুমোদন না করায়, উহার আর কোন গুরুত্ব থাকিল না।

দেশবন্ধুর শিক্ষা

১৯২৬ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিভিন্ন দাবীর বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনার স্থান ইহা নহে। আজ মুসলিম গণ-প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের দাবী পাকিস্তান। পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে যাঁহারা বিশ্বাসী—তাঁহাদিগকে আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' রচনায় দেশবন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন মৌলানা আকরম খাঁ। তিনি সৌভাগ্যক্রমে এখনও আমাদের মধ্যে আছেন এবং বাঙ্গলার লীগে তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্ম্মী রহিয়াছেন, যাঁহারা লীগের সহিত আপোষে গান্ধিজীর চেষ্টা ও রাজাজির পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন এবং এখনও করেন। বাঙ্গলার প্রগতিশীল স্বাধীনতাকামী তরুণ হিন্দু মুসলমানরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় নীচের দিক হইতে দাবী ও চাপ সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হন—তাহা হইলে আপোষের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য যিনি নিজেকে একান্ত-ভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া, আজ স্বাধীনতাদিবসে আমরা যেন হিন্দু-মুসলমান মিলনকে সফল করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

বাংলার পুনর্গঠনের সমস্যা

দুর্ভিক্ষের জের

বাংলার উপর দিয়ে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ধ্বংসলীলা করে চলে গেছে। কিন্তু তার জের আজও মেটে নাই। সরকারী তরফ হ'তে মুখে বলা হ'চ্ছে যে বিপদ চলে গেছে, কিন্তু অল্প দিন হ'ল গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য নূতন দপ্তর খোলাতে এই কথাই স্বীকার করা হয়, যে ধ্বংসের শেষ পর্য্যায় এখনও শেষ হয় নাই; যাদের ঘরবাড়ী দুর্ভিক্ষের আগুনে পুড়ে গেছে, তারা এখনও গৃহহারাই রয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সমাজসেবিগণ বাংলার গ্রামকে বাঁচাবার জন্য এগোন দরকার এই কথা বলছেন। কিন্তু বাংলার গ্রামকে রক্ষা করবার জন্য এক হ'য়ে কাজ করতে এখনও যথেষ্ট উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে। কোনও লোকের ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন সে ব্যক্তি অত্যন্ত ঘোরতর সনাতনপন্থী হিন্দু হলেও আগুন নেভাবার কাজে জাতিবিচার করে না। কিন্তু আমরা এখনও কাজে না নেমে জাতি বিচারেই ব্যস্ত। আমাদের ব্যবহার হ'তে মনে হয় যে, দেশে বুঝিবা আগুন লাগে নাই। বোধ হয়, সরকারী তরফের "এবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে" মনোভাবের ছোঁয়াচ আমাদেরও মনে লেগেছে। তাই এই উপসর্গের উপশমের জন্য সামান্য বিচার করা দরকার যে দেশের লোক আজ কি অবস্থায় আছে।

লেখক :
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে (১) প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক ১৯৪৩ সালে মোটমাট মারা গেছে; তাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ঐ বয়সের মেয়েদের দুইগুণ। (২) কৃষকদের বহু লোকে জমি হারিয়ে মজুর শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। (৩) মৎস্যজীবি সম্প্রদায় বিশেষ আঘাত পেয়েছে, তাদের গ্রামে অভাবে ও রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশী। সূতা না পাওয়ায় এদের জাল নাই; নৌকা বাজেয়াপ্ত কিম্বা নষ্ট হওয়ায় মাছধরা এদের সারা বৎসর চলে না। (৪) গ্রামের শিল্পগুলি ক্রেতা ও মূলধনের অভাবে লোপ পেয়ে গেছে।

নিষ্ফল তর্ক

যারা মারা গেছে তাদের ফেরানো যায় না। কয়েক লক্ষ বেশী মরেছে কি কম মরেছে, ঐ তর্কও ঐ রকম নিষ্ফল। বাংলার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে চলেছে; বাংলা দেশ ক্রমশঃই দরিদ্রতর হ'চ্ছে। সুতরাং প্রতি বৎসর স্বাভাবিক দুরবস্থাতেই যে বহু লক্ষ লোক মারা যাবে, তাতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নাই। সরকারী মতে বার লক্ষ আন্দাজ লোক এদেশে প্রতি বৎসর মারা যায়। গত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে এক সনে তার প্রায় তিন গুণ লোক মারা গেছে। এই সংখ্যা হ'তে ১৯৪৩ সালের দুর্দ্দশার পরিমাণ পাওয়া যায়।

এত লোক মারা গেল; তাই দেশের লোক ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই আলোচনা হয়, কেন এত লোক মারা পড়ল? কারা এর জন্য দায়ী? স্বভাবতঃই দোষ ও দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে পড়ে, ক্ষমতা যাদের হাতে। যার হাতে শক্তি সে ব্যক্তি চেষ্টা করলে কাজ করতে পারে—একথা সত্য। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে সকলের হাতেই কি শক্তি আসে না? আমরা কি শক্তি পাবার এই চেষ্টা করেছি?

আর একটা কথা শক্তি হাতে পেলে কি উপায়ে লোকদের বাঁচান যেত, অথবা এখন যারা বেঁচে আছে, তাদের নূতন প্রাণশক্তি দিতে পারা যায় সে কথা কি আমরা তলিয়ে বিচার করেছি?

কৃষকের অবস্থা

আগে এই সম্পর্কে কৃষকদের কথা আলোচনা করব। কারণ দেশের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবি; ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও অর্দ্ধেক লোক ঘুরে ফিরে কৃষকের উপর নির্ভর করে। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে ফ্লাউড্ কমিশন নামে একটী সরকারী ও বেসরকারী সভ্যের মণ্ডলী এদেশের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তাঁদের দপ্তরের হিসাব হ'তে দেখা যায় যে কৃষকদের বেশীর ভাগ লোক (শতকরা প্রায় ষাটজন) গড়ে আট নয় বিঘার কম জমি চাষ করে থাকে। আট নয় বিঘার কম বলে কথাটা ঠিক হয় না; বেশীর ভাগই পাঁচ ছয় বিঘা বা তার চের কম ক্ষেত-খামারের মালিক। হিসাব করে দেখা গেছে যে পনের বিঘা জমি চাষ করলে তবে একটী সাধারণ কৃষক-পরিবারের খাওয়া পরা চলে। এ কথা উল্লিখিত মণ্ডলীও স্বীকার করেছেন। কাজেই দাঁড়ায় এই, যে দেশের বেশীর ভাগ চাষী,—আর যেহেতু দেশের লোক চাষ করেই খায়—দেশের বেশীর ভাগ লোকই অতি দুঃখে কষ্টে সারা বৎসর সংসার চালায়। মোটামুটি বলা চলে যে বৎসরে অন্ততঃ মাস দুই এই সব পরিবার একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না; বৎসর বৎসর বেড়ে যায় শুধু বয়স ও ঋণ। যদি রোগ হয়—আর পেটভরে ভাল খেতে না পেলে, রোগ হ'বেই—তা হলে রোজগারের সরঞ্জাম চাষের জমি বন্ধক দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়, আর না হয় বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে মরা বাঁচার জন্য "বরাতের" উপর নির্ভর করতে হয়। এই অবস্থায় এল ১৩৫০ সালের দুর্ব্বৎসর। দেশে চাল মজুত ছিল কম; যাও ছিল, তাও উধাও হ'ল মজুতদারের ঘরে। গরীব কৃষক যারা, তাদের শ্রাবণ ভাদ্র নাগাদ চাল কিনে খেতে হয়। তাদের রোজগার সামান্য বেড়েছে, কিন্তু চালের দাম বেড়েছে সাতগুণ আটগুণ। শুধু পেটে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের শেষ সম্বল জমি বাঁধা পড়ল। আজকাল কৃষি আইনের ফলে বন্ধকী দাবীর অনেক গোলমাল ঘটে। ফলে বন্ধকের নামে বেশীর ভাগ জমি বিক্রয় হ'ল। বৎসরের শেষ গরীব কৃষক,—শতকরা প্রায় ত্রিশজন জমিহীন মজুরে পরিণত হ'ল। তারা মজুরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে বললে ভুল হ'বে। কারণ এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রথম দিকে মজুরের অভাব ছিল না। আর তা ছাড়া, মজুরীর হার উঠেছিল তিনগুণ আন্দাজ কিন্তু চালের দর তাকে টপকে বহু উপরে চড়ে গেছল। ফলে মজুরীতে মজুর পরিবারের খোরাকী মিটে নাই। কলিকাতা শহরে যে লক্ষ নিঃস্ব লোক এসে পথে ঘাটে প্রতিদিন মৃতদেহের সারি দিয়েছিল, তাদের শতকরা পঁচাত্তর জন ছিল কৃষি মজুর ও গরীব চাষী।

জমি হস্তান্তর আইন

এই শ্রেণীকে বাঁচাবার জন্য সরকারী তরফ হ'তে হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে একটী আইন পাশ করা হ'য়েছে। গত বৎসর যখন এই পরিকল্পনা প্রকাশ হয় তখনই সমালোচনা করেছিলাম যে শুধু কিনে নেবার অধিকার দেওয়া নিরর্থক। চাষী জমি বেচে শেষ অবস্থায়, যখন তার আর কিছুই থাকে না। এবার আইন সভায় যে প্রস্তাব পাশ হ'য়েছে, তাতে বলা হ'য়েছে যে দামটা দশ বৎসর সমান কিস্তিতে শোধ দেওয়া চলবে। কিন্তু প্রথম কিস্তি দেবে কে? যে লোক সরকারী লঙ্গরখানায় অথবা বেসরকারী সাহায্যকেন্দ্রের দৌলতে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে রেখে আবার স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে ফিরে আসবার চেষ্টা করছে? আর এই আইনে কতটা জমি ফেরৎ পাওয়া যাবে? তার মূল্য ২৫০৲ মাত্র। তার মানে দেড় বিঘার বেশী জমি অভাবে পড়ে বিক্রয় করে থাকলে, সেই বাড়তি জমিটা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। এই ধরণের আইনে কি গ্রাম পুনর্গঠিত হ'বে? না গ্রাম বেঁচে উঠে গ্রামের শিল্প পুনর্জ্জীবিত হ'বে? গ্রামের চাষের জমি দুর্ভিক্ষের আগেও মহাজন ও অবস্থাপন্ন জোতদার এবং বর্দ্ধিষ্ণু কৃষকের হাতে চলে যাচ্ছিল; আর বেশীর ভাগ কৃষিজীবীই, বরগাদার ও কৃষি মজুরে পরিণত হ'চ্ছিল। এবার দুর্ভিক্ষে সেই পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান যুগের দ্রুত যানবাহনের গতিতে এগিয়ে গেছে। শুধু জমি বিক্রয় হয় নাই; জমি চাষের সরঞ্জাম, হালের গরু ঠিক এমনই ভাবে খোয়া গেছে ও কতক অবস্থাপন্ন মহাজন ও জোতদারদের ঘরে বেশী জমা হ'য়েছে। একেই সাধারণ সময়ে হালের গরু যা দরকার তার চেয়ে দেশে ছিল কিছু কম; আর তারই আবার বেশীর ভাগ ছিল অল্পসংখ্যক সচ্ছল লোকের ঘরে। দুর্ভিক্ষে কতক গরু না খেতে পেয়ে মারা গেল; কিন্তু বেশী হ'ল বিক্রয়, ফলে ছোট চাষীর আজ জমি নাই, হাল বলদও নাই। যাদের এখনও অল্প জমি আছে, তাদের গড়ে একটীর বেশী বলদ নাই। মধ্যম শ্রেণীর কৃষক—যাদের পনের বিঘা আন্দাজ জমি ছিল—তারাও এই দুর্ভিক্ষে ধাক্কা খেয়েছে। তাদেরও জমি আংশিক বিক্রয় হ'য়েছে; তাদেরও মধ্যে হাল বলদের অভাব। আর পুঁজি সকলেরই ফুরিয়ে গেছে।

অভাবের দায়ে কৃষক গরু বিক্রি করিতে চলিয়াছে

পুনর্গঠনের পথ

কাজেই এদের নিজের পায়ের উপর খাড়া করে দাঁড় করাতে হ'লে প্রথমেই চাই কৃষি ঋণ—বিনা সুদে ও অল্প সুদে। যারা জমি হারিয়েছে, তাদের জমি ফিরে পাবার জন্য বিনা সুদে ঋণ দিতে হ'বে। আদায়ের দাবী এখন দুবৎসর আনলে চলবেই না। তারপর কিস্তির ব্যবস্থা করতে হ'বে—যেমন মালিকের সঙ্গে—দশ বৎসরের। কিন্তু শুধু জমি ফিরিয়ে দিলে বা হাল বলদ কিনে দিলেই এরা দাঁড়াবে না। এদের যখন ঐ দুচার বিঘা জমি ছিল, হাল বলদ কতক ছিল, তখন এরা বছরে দুমাস খেত একবেলা, আর বছরের শেষে যে খালিহাত সেই খালিহাত। এদের উপর খাজনার যে দাবী আছে সেটাও কমাতে হ'বে। এখন অনেক চাষীই অর্দ্ধেক ফসল দিতে বাধ্য—বর্গাদার হিসাবে। পাঞ্জাবে আন্দোলনের ফলে জমির খাজনা বহুদিন হ'তে ফসলের দামের এক চতুর্থাংশে উর্দ্ধসীমা বাঁধা হ'য়েছে। বাংলাতেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করা উচিত। ভাগ চাষেরও এর বেশী মালিকদের দাবী উঠিয়ে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে সমবায় সমিতি গড়তে সাহায্য করা আবশ্যক। এখানে দেশের লোকের ও সরকারী সাহায্য দুয়েরই আবশ্যক। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে, এ বিষয় বোঝাতে শিক্ষিত সমাজের পরিশ্রম করা দরকার। সরকারী তরফ হ'তে কৃষি সমবায় সমিতির জন্য কৃষি ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাও আবশ্যক। কৃষক সমিতি গড়ে উঠলে তবেই চাষীরা সমবেত ভাবে সহজে সস্তায় হালবলদ বীজ ও জমির সার কিনে উঠতে পারবে; এবং পরস্পরকে সাহায্য করে প্রত্যেকের ছোট খাট সাময়িক অভাবে মহাজনের হাত হ'তে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু কৃষি ব্যাঙ্ক না থাকলে, শুধু কৃষি ঋণ সম্বন্ধে আইনে ফল হ'বে না। তাতে সাধারণ মহাজন শ্রেণী লোপ পাবে বটে, কিন্তু তার বদলে আসবে আরও বেশী লোলুপ কৃষক-মহাজন। পাঞ্জাবে এই বিপদ ঘটেছে ও তার ফলে জমিরক্ষা আইন ঐ প্রদেশে অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হ'য়েছে। কৃষিসমবায় সমিতি গড়ে উঠলে আর একটা সুবিধা হ'বে—ফসল বিক্রয়ের। এখানেও কৃষক, ফড়িয়া ও মহাজনের হাত হ'তে উদ্ধার পাবে। আর একটা নিয়ম করা দরকার। জমি বা নূতন উত্থিত হবে বা খাস হ'তে বিলি হবে সেটা আসল যে কৃষক—জোতদার নয়—তাকে বিলি করবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত। পতিত জমি আবাদের উপযুক্ত করলে, যে চাষী বা সমবায় সমিতি এই কাজ করবে, তাদেরই ঐ জমি বিলি পাবার প্রাচীন নিয়ম পুনরায় বহাল করা কর্ত্তব্য।

জেলেদের অবস্থা

কৃষকদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম বলে মৎস্যজীবিদের কথা বেশী করে দেশের লোকের চোখের সামনে পড়ে নাই। কিন্তু এদের অবস্থা আরও খারাপ। জমিদাররা জমি সাধারণতঃ আসল কৃষিজীবিকে না বিলি করে নিশ্চিন্ত মনে খাজনা পাবার জন্য জোতদার ও ঐ ধরণের মধ্যস্বত্বভোগীদের দিয়ে থাকেন। তবু জমির খাজনার একটা উর্দ্ধসীমা আছে। কিন্তু জল-করের বেলা কিছুরই ঠিক ঠিকানা নাই। মাছ ধরার স্বত্ব সাধারণতঃ ডাকে বিলি করা হয় এবং জেলেরা বেশী টাকা দিয়ে ডেকে নিতে পারে না। ডাক যায় কোনও অবস্থাপন্ন মহাজনের কাছে; এবং জেলেরা বর্গাদারেরও অধম অবস্থায় মাছ ধরে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কাজেই এবার যখন প্রথমেই সামরিক দাবীর ফলে তাদের বহু লোকের নৌকা গেল, এবং তারপর ১৩৫০ সালে মাছের দাম বাড়লেও, চালের দাম তার তিনগুণ হ'য়ে গেল, তখন জেলেরা না খেয়ে মরে উজাড় হ'য়ে গেল। নৌকার অভাবেও যেটুকু মাছ ধরা হয়, সূতার চোরাবাজারে চড়া দাম দিয়ে সূতা কিনে জাল মেরামত অসম্ভব হওয়ায়, সেটুকু রোজগারও অনেকের সম্ভব হ'ল না। সরকারী মৎস্যশিল্প বিভাগ এ বিষয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় সূতা এখনও অনেক জায়গায় পৌছায় নাই। মৎস্যজীবিদের ক্ষেত্রেও সমবায় গঠনই এদের বাঁচাবার প্রধান উপায়। তবেই এরা মাছধরা ও বেচা হ'তে উপযুক্ত জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে। এদের জন্য সরকার নৌকা তৈয়ারী করাচ্ছেন। কিন্তু সে নৌকা দাম

(শেষাংশ ৪র্থ পৃঃ দেখুন)

গ্রাম আজ জনশূন্য শ্মশানে পরিণত [শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ

আধুনিক শিল্প-আলোচনা

শিল্প-কলার আবেদন

[বাংলার চিত্রশিল্পে আজ এক নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। শিল্পীর মধ্যে আসিয়াছে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা। বিজ্ঞাপনের বাজারে ও ধনীর করুণায় মোহাচ্ছন্ন যে শিল্প মরিতে বসিয়াছিল, জনগণের মধ্যে সে আজ বিপুল ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে।

নীচের প্রবন্ধে বাংলার জনৈক বিখ্যাত শিল্পী শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাংলার আধুনিক শিল্পকলার আন্দোলন বুঝিতে এই প্রবন্ধ সাহায্য করিবে।]

লেমান হেয়ারের একটা কথা মনে পড়ছে। কোথাও তিনি লিখেছেন যে, 'আজকাল শিল্পকলা সম্বন্ধে এত বাজে সব কথা বলা হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার মধ্যে পড়ে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে এবং আসল কথা বুঝতে না পেরে শিল্পকলা সম্বন্ধে নীরব হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ শিল্পকলা সম্বন্ধে বেশি জানবে বা বুঝবে—অর্থাৎ পাকা শিল্পী মেপে জোকে অঙ্কণ, রঙের ব্যবহার ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবে, শিল্পী যারা নয় তাদের কাছে এমনটি আশা করা অন্যায়। কিন্তু বিজ্ঞ শিল্পীরা তাদেরকে হেয় চোখে দেখবার সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, "Art is an appeal to the mind, and not addressed, as commonly believed, to the eye" (J. D. Harding)। (অর্থাৎ শিল্পের আবেদন চোখের কাছে নয়,মনের কাছে।) যারা শিল্পী নয়, যাদের চোখ আশৈশব রঙ আর ক্যানভাসের কর্কশতা দেখে অভ্যস্ত নয়, রঙ্গমঞ্চের অন্তরালের বাস্তবতার মত সম্পূর্ণ ছবির পেছনের কথাও যাদের জানা নেই, তাদের কাছে একটা চিত্র ভিন্ন আবেদন জানাবে, সে-চিত্র চোখ অতিক্রম করে মনে ও হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবে। জনৈক জাপানী শিল্পীর একটা চিত্রের কথা মনে পড়ছে। সেটা যখন দেখছিলাম তখন সঙ্গে ছিল একজন অশিল্পী। মস্ত বড় চিত্র, কিন্তু তার অধিকাংশ স্থান জুড়ে শূন্যতা। কেবল এক কোনে হাওয়ার আঘাতে জর্জ্জরিত ও নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়ের দুটী শাখা, কটি পাতা। তাছাড়া কোথাও কিছু নেই। চিত্রটি মুগ্ধ করে দিচ্ছিল, কিন্তু তার অঙ্কন-বৈশিষ্ট্যে মশগুল হয়ে আছি এমন সময় পাশের অশিল্পী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে চিত্র সম্বন্ধে তার হৃদয়ে অনুভূত একটী কথা বললে। ছবিতে শূন্যতা, কিন্তু কোনের হাওয়ার আঘাতে জর্জ্জরিত বাঁশের ইঙ্গিতে সারা শূন্যতা ভরে উঠেছে—উদ্দাম হাওয়ায় মন ভাসিয়ে নেওয়া অপর্য্যাপ্ত গতিতে। পাকা শিল্পীর চোখ তখনো বাঁশের গিঁটে, কিন্তু অশিল্পীর মন ভেসে গেছে হাওয়ার উদ্দামতায়।

কিন্তু হৃদয়ে অনুভূত এ কথা এই অশিল্পীই অর্ন্তর্থাৎ বলতে হয়তো সাহস পাবে না, অন্তরের কথা ঠেকে যাবে একটা আশঙ্কায়। বিজ্ঞেরা সব আশে-পাশে, কী বলতে কী ফল হবে, তাদের মধ্যে কে আবার কখন নাক সিঁটকে উঠবে। শিল্পের গতি তার দুর্বোধ্য, যে-টা হৃদয় উপভোগ করছে, তা অস্বীকার করে অন্য আরেক শিল্পকলা-বিজ্ঞ আরেক কথা কইছে, বেচারা সংশয়াপন্ন হয়ে চিত্র সম্পর্কে নীরব হয়ে যায়। ভাবে, ওটা দুর্বোধ্য, ওসব আলাদা এক জীবদের জন্যে, যে-জীবরা তাদের বিকৃত মনোভঙ্গীর তৃপ্তির জন্যেই ছবি আঁকে শুধু। ইজম-এর ধাক্কায় আলোড়িত শিল্পকলা, অভিনবত্বের সঙ্গীনে তার প্রাণ সঙ্গীন হয়ে উঠলো। সোজাকে বলবে বাঁকিয়ে, আর বাঁকানোটাকে এমন করবে যে তা সাধারণের নজরেই পড়বে না। নন্দলালবাবু অবশ্য একখানে বলেছেন আসল ব্যাপার এড়িয়ে যাবার কথা। ভূদৃশ্যের মধ্যে একজন মানুষ—এই যদি চিত্রের বিষয় হয়, এবং ভূ-চিত্রটি বিশেষ করে আঁকবার উদ্দেশ্য থাকলে মানুষটি আঁকতে চেষ্টা করতে হবে, আবার মানুষটি আঁকাই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে ভূচিত্রটি যত্ন করে আঁকতে হবে।

এর সঙ্গে তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যবহারের তুলনা করেছেন। কিন্তু যে এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে, তা এ মাধুর্য্য থেকে ঢের ভিন্ন এবং ঘোরতর দোষণীয়। পাশ্চাত্যে শিল্পপদ্ধতির চমকপ্রদ আবিষ্কারের মধ্যে যেন কাটাকাটি চলছে এবং যে ত্রুতি একমাত্র সম্ভব বিজ্ঞানে, সে ত্রুতিই আনবার চেষ্টা চলছে শিল্পে। বোধ হয় সে দেশে যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত নিখুঁত অনুকরণ চিত্রের পরে এটা একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং এ প্রতিক্রিয়া হয়তো সাময়িক। রুচি সঠিক রাখতে হলে অরুচির দোরে ধন্না দিতে হয়।

ভারতে মোগল শাসনের অবসানের পর শিল্পকলা যেন অনাদরে গা ঢাকা দিলো। কিন্তু পরে প্রধানত ঠাকুর পরিবারের প্রচেষ্টায় ভারতীয় শিল্পের যে পুনরুত্থান হলো, তা বিগত সরণী ধরে নয়। ভারতীয় শিল্পে এলো মিশ্রণ এবং পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় যে আলোড়ন চলছে তার হাওয়া এখানেও এমন ভাবে বইতে লাগলো যে তার মধ্যে মৌলিক ও বিশিষ্ট পথ ধরবার চেষ্টা করেও তেমন সফল হওয়া গেলো না। পুরোনো পুঁথি ঘাটা শুরু হলো, গুহায় অংকিত চিত্র নোতুন করে দেখা শুরু হলো, ধর্ম্মকথা নোতুন ভঙ্গীতে পড়া আরম্ভ হলো। আঁকবার পুরোনো পদ্ধতি রইলো বটে তবে তাতে বিদেশীয় মিশ্রণ এসে পড়লো বলে তার ছন্দ ও গতিময়তার স্বকীয়তা আর অটুট রইলো না। এবং রইলো না বলেই মন ভরলো না, পরিপূর্ণ তৃপ্তি এলো না কাজে। তাছাড়া ২টি দল যে গড়ে উঠলো—তাদের কোন পথ যে অনুসরণীয়, সে সম্পর্কে কেউ স্পষ্ট মীমাংসায় পৌঁছতে পারলো না। বিদেশীয় অনুকরণে কেউ ঝুঁকে রইলো, কেউ শত শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় (মোগল-রাজপুত পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে) শিল্পকলায় ফিরে যাবার চেষ্টায় রইলো। ফল হলো অনির্দ্দিষ্টতা, এবং এ অনির্দ্দিষ্টতা থেকে এখনো মুক্ত হয় নি ভারতের শিল্পীরা। পন্থা যে রকমই হোক, নির্দ্দিষ্টতা না থাকলে চলায় গতি আসতে পারে না কিছুতেই। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পে নোতুনত্ব ও স্বকীয়তা আনবার প্রচেষ্টার পেছনে সরল অনুপ্রেরণা নেই, প্রত্যয় নেই, এবং সে প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের ঘূর্ণীর প্রভাবে ধোঁয়াটে। শারীরস্থান বাদ দিয়ে যে ভারতীয় শিল্পকলা শুধু মাত্র ভাব ও ছন্দের দ্বারা উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় পৌঁছেছিলো, এ-যুগে ঠিক তেমনি ভাবেই পৌঁছবে এমন আশা করা অন্যায়। আবার যে-ধারায় চলে পাশ্চাত্য শিল্পকলা জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেছে, সে-ধারাকে গঙ্গা-যমুনার ধারায় এসে ইচ্ছাকৃতভাবে মিলিত করবার প্রয়োজন নেই। শিল্পকলার জন্যে ভারতের অদম্য ক্ষুধা যদি জন্মে থাকে (এখনো জন্মেছে কিনা সন্দেহ রয়েছে) তবে আপনা থেকে প্রয়োজন মত শিল্পকলা জন্মাবে, এবং অজস্রভাবে জন্মাবে সে-ক্ষুধা মেটাবার জন্যে।

তবে চিত্রের আবেদন চোখের কাছে নয়, মনের কাছে। এবং চিত্র ধনীর প্রাসাদের দেয়াল সজ্জিত করবার জন্যে নয়, সাধারণ মানুষের জন্য। শিল্পকলা সমগ্র মানবের অন্তরে যখন পৌঁছবে তখন শিল্পকলা হবে সার্থক, আর সে সার্থকতার নানা বিজ্ঞের নানা কথা ভেসে যাবে। সমগ্র মানব যে-শিল্পকলা কামনা করবে, সে-শিল্পকলায় অধিকার থাকবে সৃষ্ট হবার, বাঁচবার। হার্ডিং উক্ত কথাটি আরেকটু বাড়িয়ে বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: আর্টের আবেদন চোখের কাছে নয়—মনের কাছে। এবং তার আবেদন মুষ্টিমেয় শিল্পকলা-সমজদারের কাছেও নয়, সমগ্র মানবের কাছে। সমজদারের মোহ কাটিয়ে উঠে সমগ্র মানবের অন্তরের আহ্বান যেদিন শিল্পীর প্রাণে বাজবে সেদিন শিল্পীর তুলিতে আসবে সত্যিকারের চিত্রের প্রেরণা, ও গতি।

শরৎচন্দ্র স্মরণে

২০শে জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী।

শরৎচন্দ্র যে বাঙালী সমাজের ছবি আঁকিয়াছিলেন, সে সমাজ আজ রাহুগ্রস্ত। আজ বাংলার

গ্রামে গ্রামে শুধু মৃত্যুর বিলাপ, ঘরে ঘরে শুধু অভাবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা। বহু শতাব্দীর প্রাচীন সভ্যতা আজ সমূলে ভাঙিতে বসিয়াছে। আমাদের সমস্ত সঞ্চয় আমরা হারাইতে বসিয়াছি! বেদনা আমাদের ভাষা হারাইয়াছে।

এমন দিনে আজ বাংলার সেই অদ্বিতীয় কথা-শিল্পীকে আমরা স্মরণ করিতেছি, যিনি এই বেদনাকে ভাষা দিতে পারিতেন, যাঁহার নির্ভীক লেখনী সর্ব্বনাশা ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলিয়া দিতে পারিত।

শরৎচন্দ্রই প্রথম বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রাঙ্গণ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু সাধারণের জীবন-চিত্রই যে তিনি আঁকিয়া ছিলেন, তাহাই নয়—সাধারণের ধ্যানধারণা তিনি সাধারণের মতন করিয়াই বলিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাঁহার জীবন হইতে উৎসারিত। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আমরা চেনা মানুষকে খুঁজিয়া পাই। এই মানুষ-গুলি দেব-চরিত্র নয়; ইহাদের মধ্যে অসংখ্য গ্লানি, অসংখ্য বিকার আছে। কিন্তু সমস্ত মিলাইয়া এই মানুষ-গুলির মধ্যে এক অসামান্য মহত্ত্বের আমরা সন্ধান পাই। জীবনের প্রতি আমরা অসীম আকর্ষণ অনুভব করি।

শরৎচন্দ্র দেশের মানুষকে গভীর ভাবে ভাল বাসিতেন বলিয়াই, যেখানে তিনি অন্ধতা ও ভীরুতা দেখিয়াছেন সেখানে তিনি ক্ষমা করেন নাই। যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু গলিত—তাহাকেই তিনি সাহসের সহিত আঘাত করিয়াছেন।

সাহিত্যে এতদিন যাহারা অপাঙক্তেয় ছিল, যাহাদের সুখদুঃখ দেশের মানুষের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল—সেই উপেক্ষিত মূক জনসাধারণের কথা শরৎচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বাংলা সাহিত্যে একটি অনাবিষ্কৃত জগৎ তাঁহার লেখনীর মুখে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল।

শরৎচন্দ্র সমস্ত রকমের অত্যাচারের চিরশত্রু ছিলেন। শৃঙ্খলিত নারীজীবনের ব্যথাবেদনা এই দরদী শিল্পীর লেখায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নারীকে সম্মানের আসন দিয়াছেন। পুরুষ জাতির কাছে নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি একচক্ষু সমাজের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে যেন উচ্চারিত একেকটি প্রতিবাদ।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত শুধু সাহিত্যগত নয়, শরৎচন্দ্রের জীবনেরও নিবিড় যোগ ছিল। কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হাওড়া কংগ্রেসের তিনি সভাপতি ছিলেন। পরাধীনতার যে জ্বালা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন, 'পথের দাবী' উপন্যাসে আমরা তাহারই অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাই। বাংলার সন্ত্রাসবাদী যুগে তরুণ বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। দেশের প্রত্যেকটি নূতন ভাবধারার মধ্যে যা কিছু মহৎ, তাহাকেই তিনি সাদর অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শরৎচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্র সেদিন মুসলমান সমাজকে সাহিত্যে রূপ দিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ব্রত তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সেদিন যে সত্যের দিকে শরৎচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আজ তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুদিনে আজ তাই সেই দূরদর্শী শিল্পীর প্রতি অমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বাংলার পুনর্গঠনের সমস্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে কেনবার এদের সামর্থ্য নাই। এখানেও জমি কেনার মত বিনা সুদে ও লম্বা কিস্তির সরকারী ঋণের ব্যবস্থা চাই। আর ঠিক জমির মত জল-করেরও নিয়ম ধার্য্য করতে হবে যে মাছধরার অধিকার বিলি হবে মৎস্যজীবিকে—মধ্যস্বত্বভোগীকে নয় এবং ন্যায্য সীমাবদ্ধ খাজনা নিয়ে।

চিরস্থায়ী দুঃস্থতা

এবার রোগ ও রোজগারী লোকের অভাবের সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে ক্ষান্ত হ'ব। পূর্ব্বেই বলেছি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরও শতকরা প্রায় ৫০ জন বৎসরের মধ্যে তিনচার মাস করে কঠিন রোগে ভোগে। বেশী পুরুষ মারা যাওয়ার ফলে বহুসংখ্যক নারী ও শিশু স্থায়ী ভাবে তাদের রোজগারী পুরুষকে হারিয়েছে। আর উপার্জ্জন-কারীদের রোগের ফলে তেমনিই বহুসংখ্যক পরিবার বৎসরের অনেকটা সময় উপায়হীন হ'য়ে পড়ে থাকে। যতদিন না অনেক দিক হ'তে নানা উপায়ে দেশের অবস্থার উন্নতির চেষ্টার ফলে দারিদ্র্য কিছু কমছে, ততদিন এই সব শিশুদের ও নারীদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হ'বে। না হ'লে শিশুরা মারা যাবে; এবং মেয়েদেরও কতক ঐ পথেই যাবে। বাকী মেয়ে তাদের চরম লজ্জা ত্যাগ করে দেহবিক্রয়ের পথে অগ্রসর হবে। চট্টগ্রামে ও মেদিনীপুরের দুঃস্থ অঞ্চলে মেয়েদের এই দুর্ভাগ্য, তাদের রক্ষা করবার জন্য দেশের লোকের সমবেত চেষ্টার ও উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা এই দুইএর অভাবে সম্ভব হ'য়েছে।

চাই দরদী মন ও সমবেত চেষ্টা

দেশের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা, এবং জমির উপর যে সব লোক বাধ্য হ'য়ে জীবিকার বৃথা চেষ্টা করে যন্ত্রশিল্পের প্রসার করে তাদের কাজে লাগানো—এ দুটী বিষয়ের কোনও কথা এ প্রবন্ধে বলি নাই এজন্য যে, এই দুটী কাজ দীর্ঘ দিনের। কিন্তু এ দুটী ব্যবস্থাও করতে হ'বে কারণ তা না হ'লে অন্য সব ব্যবস্থায় স্থায়ী ফল দেবে না।

যে সব বিষয়ের আলোচনা করা গেল, সব ক'টীকে সফল করার জন্য দরকার দরদী মন ও সমবেত চেষ্টা। দেশের মানুষকে যারা বাঁচাতে চান, তাঁরা এক হ'লেই তবে কার্য্য সিদ্ধির পথ মুক্ত হবে।

সমাজের এই ভাঙ্গনের কথা ভেবেও কি আমরা এক হ'তে পারব না?

২৬শে জানুয়ারী

লেখক : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

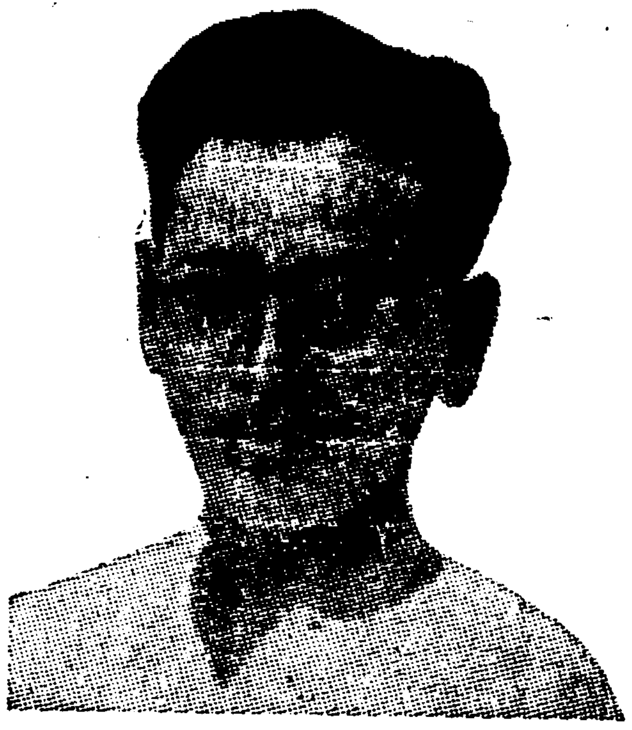

২৬শে জানুয়ারী Independence Day—স্বাধীনতা দিবস।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নির্দ্দেশক্রমে প্রথম স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সারাটা দেশ থম থম করছে ক্রমবর্দ্ধমান আবেগে উত্তেজনায়। পণ্ডিত জহরলালজী রচনা করেছেন স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণী। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে—সেই সংকল্পবাণী গ্রহণ ক'রে।

বাংলার একটি মধ্যবিত্ত প্রধান পল্লীগ্রাম; গ্রামে থানা আছে, পোষ্টাপিস আছে, হাসপাতাল আছে, হাই ইংলিশ স্কুল আছে,গার্লস স্কুল—টোলও আছে, সবরেজেষ্ট্রী অফিসও আছে। বড় হাট বসে, দশ বারোখানা কি আরও বেশী গ্রামের বিকিকিনির কেন্দ্রস্থল বাজারটিও বড় লোকজনে ভরা। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড স্কীমের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিধানে দশখানি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়নটির প্রধান গ্রাম এই গ্রামখানি, (অনেকে রহস্য করে রাজধানী বলে থাকে) এবং এই গ্রামের নামেই ইউনিয়নটির নামকরণও হয়েছে। কয়েকজন ভাবপ্রবণ তরুণ এখানে তখন একটি ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটিও স্থাপন করেছে। ২৫শে জানুয়ারী তারা ওই সংকল্পবাণী নিয়ে আলোচনা করছিল। যে পড়ছিল সে-ই কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট আবার ইউনিয়ন বোর্ডেরও প্রেসিডেণ্ট। বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ; রাজনীতিতে পাকা না হলেও তার অতীত অভিজ্ঞতা আছে। বিগত মহাযুদ্ধ থেকে অসহযোগ আন্দোলন এবং সে থেকে এ পর্য্যন্ত একটা যোগসূত্র তার ছিল। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরেছে, পল্লীবাসীর সুখে দুঃখে বন্যায় দুর্ভিক্ষে মহামারীতে তাদের সেবা করেছে। তার মুখে চিন্তার রেখা। ২৬শে জানুয়ারীর চিন্তা।

তার দলে ভাঙন ধরেছে। সব চেয়ে উৎসাহী তরুণ সভ্যটি গ্রামের লক্ষপতি ধনীর ছেলে। তার অভিভাবক তাকে এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলালজীর পতাকা উত্তোলন দৃশ্য দেখবার জন্য টাকা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। আরও দু তিনজন সরবে বলে মনে হচ্ছে। ভরসা মাত্র তিন চার জনের।

ঠিক এই সময় এল একজন চৌকীদার। একখানা চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠিখানা সার্কল অফিসারের। শুধু সার্কল অফিসার বললে ঠিক হবে না—তিনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। পাঠ্যজীবনে সহপাঠী ছিলেন। বন্ধুত্ব তাদের অকৃত্রিম। বন্ধু আছেন এখান থেকে ষোল মাইল দূরে এক ডাক বাংলোয়। তাঁর শরীর অসুস্থ। তিনি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন—আজই যেন তাঁর সঙ্গে বন্ধু দেখা করেন। বিশেষ অনুরোধ।

যেতে হলে—এ গ্রামের রেল ষ্টেশন থেকে আট মাইল ট্রেণে গিয়ে—সেখান থেকে আট মাইল হেটে অথবা গরুর গাড়ীতে যেতে হবে। বিংশশতাব্দীর জয় হোক—বাইসিক্লের কথা তার পরমুহূর্ত্তে মনে হ'ল।

* * *

অনেকে অনেক কথা বললে। কেউ বললে শাসন করবে, কেউ বললে আটকে রাখবে। কেউ বললে—পূর্ব্বে থেকেই ওর সঙ্গে সার্কল অফিসারের বন্দোবস্ত হয়ে আছে, সেই বন্দোবস্ত মত এসেছে ওই চিঠি। ও আর কাল ফিরবে না। কিন্তু তবু সে গেল।

ট্রেণ থেকে নেমে ন' মাইল বাইসিক্ল করে সেখানে যখন পৌছুল তখন সন্ধ্যা নামছে। শীতের দিন—প্রায় সাতটা। ফেরবার ট্রেণ সাড়ে ন' টায়। ন মাইল রাস্তা বাইসিক্লে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে। পল্লীগ্রামের মেঠো শড়ক। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়।

বন্ধু তাকে মিথ্যে লেখেন নি। তিনি অসুস্থ, হাঁপানী আছে তাঁর, হাঁপানী উঠেছে। বক্তব্যও তাঁর যা অনুমান করেছিল সে তাই। তিনি তাকে অগ্রসর হতে নিষেধ করছেন। সরকারী আদেশে নয়—প্রাণের আবেগে। তিনি তাকে সত্য ভালবাসেন তাই তাকে হারাতে ভয় করেন। বললেন—জীবনে পড়ার সময় একপথে হঠাৎ এসে কলেজে মিলেছিলাম, একসঙ্গে চলার পথে প্রীতির বিনিময় হয়েছিল। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আবার হঠাৎ দেখা হয়েছে। আজ আবার আপনি বিপরীত মুখী পথ ধরে চলতে চাচ্ছেন। এবার ছাড়াছাড়ি হ'লে যে আর আপনাকে পাব না। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ল। বেদনার্ত্ত মন নিয়েই সে বিদায় নিলে।

অন্ধকার মেঠো পথ। বাইসিক্লের ল্যাম্পের এক টুকরো গোল আলোকচ্ছটা সামনেটায় এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সোঁ করে শব্দ হল। গাড়ীটা ঝাঁকি খেলে। নামতে হল গাড়ী থেকে। পিছনের চাকা পাংচার হয়ে গেছে। মাঠের মধ্য দিয়ে পথ—গ্রাম পিছনে—গ্রাম সামনে—দুই পাশে অনেক দূরে, গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে গাঢ়তর অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে—তারই মধ্যে—মধ্যে মধ্যে সঞ্চরমান আলোকবিন্দু। বাইসিক্ল ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে চলল।

সম্মুখে তাকে ডাকছিল জাতীয় পতাকা—২৬শে জানুয়ারীর প্রভাত। স্বাধীন ভারতবর্ষ। দু'পাশের মাঠে কাটা ধান, শিশিরে এরই মধ্যে ভিজে উঠেছে, একটা গন্ধ আসছে, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র, তারই মধ্যে তার মনশ্চক্ষে ভাসছে তার ভারতবর্ষ। ষ্টেশনে এসে সে বিস্মিত হ'ল না, বিব্রত বোধ করল না; ট্রেণ চলে যাওয়ারই কথা, চলে গেছে। এর পর পাকা শড়ক্ কিন্তু দু পাশে ঘন গাছ পালা জঙ্গল। অন্ধকার গাঢ়তর। কিন্তু সে অন্ধকার তার ভারতবর্ষকে ঢেকে ফেলতে পারে নি। ঘন অরণ্যকুন্তলা ভারতবর্ষ! কালো মানুষের দেশ ভারতবর্ষ! মধ্যে মধ্যে দিগন্ত চোখে পড়লে মনে হয় সেখানে ২৬শে জানুয়ারীর সূচনা।

হঠাৎ মনে পড়ল তার আর একদিনের কথা।

১৩১৩ সালের ১৯০৬ সালের ৩০শে আশ্বিনের কথা। রাখীবন্ধন হয়েছিল সেদিন। কলকাতায় বোধ হয় ১৯০৫ সালেই হয়েছিল কিন্তু তাদের গ্রামে প্রথম রাখীবন্ধন হয়েছিল—১৯০৬ সালে। সে তখন ছেলেমানুষ, সে শুনেছিল বন্দেমাতরম গান, 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গান। শুনেছিল বুঝেছিল—তারা পরাধীন। পরাধীনতার দুঃখ কি সে তা সেদিন বুঝতে পারে নি, কিন্তু অকৃত্রিম বেদনা অনুভব করেছিল। তার মনে হ'ল সেই সেদিন বাঁধা রাখী আজও তার হাতে বাঁধা রয়েছে। সে মনে করতে চাইলে তার সেদিনের ভারতবর্ষ। মনে পড়ল না। সেদিনের ভারতবর্ষ আজকের ভারতবর্ষের মধ্যে মিশে গিয়েছে; তার নিজের বাল্যবয়সের ছবি যেমন তার মনে নাই, সে ছবি মনে করতে গেলেই যেমন ভেসে ওঠে আজকের ছবি—তেমনি ভাবেই তার সেদিনের ভারতবর্ষকে আজকের ভারতবর্ষ থেকে খণ্ডিত ক'রে দেখতে পারে না। সেদিনের অস্পষ্ট ভারতবর্ষ আজকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মন তার উদ্যমে উৎসাহে ভ'রে উঠল! মনে হল সেদিন ২৬শে জানুয়ারীর প্রভাত ছিল সুদূর; শুধু যাত্রী দলের ঘুম ভেঙেছিল মধ্য রাত্রে—তারা উদয়াচলের পথে মুসাফির দলের মত যাত্রা করেছিল। আজ মুসাফির দল পথ অতিক্রম করেছে, উদয়াচল নিকটবর্ত্তী হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারীর প্রভাতে আর দেরী নাই।

রাত্রি বারোটার সময় সে বাড়ী পৌছুল। পথে ছিল একটা ছোট নদী, হাটু জল অবশ্য, তার জলে কাদায় পথের ধূলোয় সত্যই তার মূর্ত্তি তখন মুসাফিরের মত। বাড়ী এসেও সে বাকীটা রাত জেগে বসে রইল। ২৫শে জানুয়ারীর রাত্রি অবসান হবে— ২৬শের সূর্য্য উদিত হবে অন্ধকার কাটবে।

সকালে বারোয়ারী তলায় যাচ্ছিল সে। সেইখানে পতাকা তোলা হবে, ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, মনও তার অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এ পতাকার তলে সমবেত হবার জনগণ কৈ? কে সে পতাকাকে অভিবাদন করবে?

একটা গলি পার হয়ে একটা বড় রাস্তা। সে—রাস্তায় পড়েই সে বিস্মিত হয়ে গেল। চলছিল একটি মেয়েদের দল। তার সর্ব্বাগ্রে চলছেন—মহানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। আজও তার চোখের উপর ভাসছে—তাঁর উৎসুক—দৃঢ় পদক্ষেপ।

আরও এগিয়ে এল গ্রামের সবচেয়ে বড় রাস্তা। রাস্তাটা চলে গেছে এক জেলা থেকে আর একটা জেলা পর্য্যন্ত, গ্রাম গ্রামান্তরের মধ্য দিয়ে জীবনের যোগসূত্রের মত। সে পথে চলছে জনতা, বালক বৃদ্ধ যুবা। চলছে ওই বারোয়ারী তলায়। ওই পতাকার তলে সমবেত হবে, তাকে অভিবাদন করবে।

তার একজন সঙ্গী তাকে বললে—এখানে রটেছে, পতাকা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করবে; সকলে মজা দেখতে চলেছে।

সে হাসলে। বিশ্বাস করলে না সেকথা। ২৬শে জানুয়ারীর প্রভাত—পাখী ডাকছে, আলো ফুটেছে, মানুষ জেগেছে, তারা ছুটেছে কর্ম্মের পথে, মজা দেখবার জন্য নয়। মানুষের মন এত ছোট হতে পারে না। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতে আসে কর্ম্মের প্রেরণা। মানুষের মধ্যে তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০ সালে—পতাকা তুলেছিল সে। সে পতাকা শীতের সকালের বাতাসে উড়তে আরম্ভ করলে। আজও তার চোখের সামনে সে পতাকা উড়ছে।

* * * *

আজ ১৯৪৫ সাল। আবার ২৬শে জানুয়ারী আসছে। তার সঙ্গে দেখা হল। সে এখন ছবি আঁকে। আঁকে সে সেই সব ছবি। বৃহত্তর জীবনে এসেছে সে কিন্তু তেমনি স্বপ্নাতুর, তেমনি আশাবাদী। তাকে আমি প্রশ্ন করলাম—কি ভাবছ?

সে হেসে বললে—২৬শে জানুয়ারীর কথা ভাবছি।

বললাম—চৌদ্দটি ২৬শে জানুয়ারী পার হয়ে গেছে। এখনও সেই স্বপ্ন দেখছ?

সে বললে—দেখব না? আকাশ এই চৌদ্দ বছরে বড় দীপ্ত হয়ে উঠেছে—চেয়ে দেখ! তার আলো কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল দেখেছ ১৯৩০ সালের আলো—দেখা দিয়েছিল—দিগন্তে, সে আলো প্রসারিত হয়েছিল—মধ্যবিত্তের পল্লী পর্য্যন্ত। ১৯৩১ সালে মার্চ্চ মাসে করাচী কংগ্রেস মনে আছে? আলো ছড়াল কিষাণ মজুরের বস্তীর মাথায়। ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেস মনে কর। আলো গিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ডাক দিল তাদের। দলে দলে একত্রিত হবার জন্য আদেশ এল। আলো ছড়ায় নি? আলো উজ্জ্বল হয় নি? বল কি? তবে ডাক দিলে কেন? তারা উঠল কেন?

হেসে প্রশ্ন করলাম—তারপর? অর্থাৎ আজ?

সে বললে—আজ আমার ভারতবর্ষের রূপ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আকাশে আলো ভাস্বর হয়ে উঠছে। মানুষ-মানুষ-মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ। হিন্দু মুসলমান—বৌদ্ধ খ্রীষ্টান—শিখ পারসীক—মজদুর কৃষাণ—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—নারী পুরুষ নানা দল বেঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে। ললাটে তাদের আলোর প্রতিচ্ছটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। যুদ্ধ, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কত বাধাই না এল। হয় তো আরও বাধা আসবে। তবু ২৬শে জানুয়ারীর প্রত্যাশিত সূর্য্যোদয়ে আর দেরী নাই।

বললাম—তুমি তার জন্যে বুঝি সেই দিক তাকিয়ে বসে আছ?

সে দেখালে—একখানা অসমাপ্ত ছবি। বললে—ওই ছবি আঁকছি। ভাস্বর দিবালোকের জীবনময় উষ্ণতার মধ্যে, জড়িমামুক্ত কোটী কোটী মানুষের দৃষ্টির আরতির মধ্যে হবে যে কংগ্রেসের অধিবেশন—সেই অধিবেশনে কংগ্রেসনগর সাজাবার জন্যে ছবিখানাকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব সেখানে। এই আমার সাধ—এই আমার আশা—এই আমার কামনা।

২৬শে জানুয়ারী

তুষার কঠিন শীতসমুদ্র-পার হয়ে আসা
নাবিকের গানে মুক্তির মীড় লাগে।
স্থলচর যত হিংস্র ঘটনা, আহত বন্য পশুদের মত,
ক্লান্ত আড়াল মাগে।
দূরে দেখা যায় উদয়ের মেঘে নব জাগ্রত দিন,
দুর্দম লাল ফৌজের মত চোখে মুখে আলো মাখা।
কুচ কাওয়াজের সারি দেয় যত বাড়ী।
ধারালো শীতের আকাশে মেলেছে ভাবী বসন্ত পাখা।
দ্বারে কড়া নাড়ে ছাব্বিশে জানুয়ারী।

ছায়াচারী ভগ্ন মনে তাই লাগে দোলা।
দেশ বিদেশের হৃদপিণ্ডের ধ্বনি
শুনি সব বুকে। তবু যায় না ত' ভোলা
এ দেশের মাটি আর এ দেশের দুঃখের খনি।
যখনি দেখেছি যত শহরে বাজারে
আত্মকলহের শত কুরূপ কীচক,
অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকে ওৎ পেতে,
হানে অপঘাত আর হীন গালাগালি;
শবের বুকের 'পরে চলে যত ধ্বংসের দালালি;
তখনি প্রতিজ্ঞা মোর হয়ে ওঠে ভীম খড়্গ সম
তীক্ষ্ণ, প্রস্তুত।
আর, দূর গ্রাম পার হয়ে
উঠে আসে দয়াহীন কান্নার ঝড়।

লক্ষ শোক জমে হয় বজ্রগর্ভ মেঘ।
শঙ্কাহত, কাঁপে ঘর, কাঁপে রুগ্ন মন;
শঙ্কাহত কাঁপে শুষ্ক তরু।
প্রতি গ্রামে চট্টগ্রাম বাজায় ডমরু।
যাদের হাতের মুঠি রৌদ্রে, জলে তুলেছে ফসল,
গড়েছে ধান্যের স্তূপে প্রাণের ভাণ্ডার,
তারা প্রবঞ্চিত। আর হিংস্র মড়কেরা দেয় হানা
তাদেরই ত অরক্ষিত ঝড়ে-ভাঙ্গা ঘরে।
চিকিৎসা-সংস্থান-হীন,
নিশ্চেষ্ট:নির্জীব চোখে চেয়ে দেখে গ্রামের মানুষ
সোনার ধানের মাঠে, ভরে ওঠে কঙ্কালের
বীভৎস ফসল।

তবু এই ভাবে যাবে না কিছুতে দিন।
আবার এসেছে নবতম আশা নিয়ে
পতাকা উড়ায়ে মৃত্যু-তারণ দূত,
দুর্দম লাল ফৌজের মত চোখে মুখে আলো মাখা।
উদয় তোরণে মুক্তি প্রহর বাজে,
কুচ কাওয়াজের সারি দেয় যত বাড়ী।
ধারালো শীতের আকাশে মেলেছে
ভাবী বসন্ত পাখা।
দ্বারে কড়া নাড়ে ছাব্বিশে জানুয়ারী।

—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বাঙলায় মুসলিম রাজনীতির
ক্রমবিকাশের ধারা

কংগ্রেস থেকে লীগ অনেক দূরের পাল্লা—সাধারণ দেশপ্রেমিকের এইই ধারণা। কারো কারো মতে একেবারে সাদ-কালোর সম্বন্ধ। অথচ বহু মশহুর কংগ্রেসী মুসলমান, অনেক জেলখাটা পরীক্ষিত মুসলিম দেশপ্রেমিক কংগ্রেস ছেড়ে লীগে যোগ দিয়েছেন। এদের সবাইকে এক তুড়িতে দেশদ্রোহী বলে উড়িয়ে দেবার সহজ পন্থা যাঁরা নিচ্ছেন না, তাঁদের জন্যই বাঙলার মুসলমান দেশ-প্রেমিকদের এই মানসিক ক্রমবিকাশের ধারাটা খুলে ধরবার চেষ্টা করবো আমি এই প্রবন্ধে।

কংগ্রেসের বাইরে কৃষক-প্রজাদল গড়ে উঠে ১৯৩৩ সালে প্রধানতঃ কংগ্রেসী মুসলমানদের চেষ্টায়। এ কাজের নেতা ছিলেন তৎকালের কংগ্রেসী রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৯৩৩ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা বোর্ড নামে একটা অস্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। এইটাই কিছুদিন পরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নামে পরিচিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি নাম গ্রহণ করে।

এই সমিতি গড়ে উঠবার পিছনের যে ইতিহাস, সেটা নিছক শ্রেণী স্বার্থ-বোধ-স্ফুরণের ইতিহাস নয়। ভারতের আরো অনেক জায়গায়ও কিষাণ সভা ও বিভিন্ন মজদুর সভা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ওদের অভ্যুদয়ের সাথে বাঙলার কৃষক-প্রজা সমিতির অভ্যুদয়ের ষোল আনা মিল নেই। যদি থাকতো তবে কৃষক-প্রজা সমিতি এতদিনে নিখিল ভারত কিষাণ সভার সঙ্গে মিশে যেতো। কিন্তু বন্ধুবর বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও মুজফ্ফর আহ্মদ জানেন, তাঁদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তা হয় নি এবং বোধ হয় বন্ধুদের ধারণা, এই প্রবন্ধ লেখকের দোষেই তা হয় নি। কিন্তু কারো দোষে নয়—নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই তা হয় নি। সে স্বাভাবিক কারণটাই মুসলিম রাজনীতির স্বকীয়তা লাভের গোড়ার প্রয়াস। সে কথাটাই বলছি।

কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে বাঙলার কংগ্রেসী মুসলমানরা কৃষক-প্রজা সমিতির এই যে ভিন্ন গোঠ রচনা করলেন, তার কারণ শুধু শ্রেণী স্বার্থ নয়—"সাম্প্রদায়িক' স্বার্থও বটে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীকে কংগ্রেসের সরকারী দাবী করে নিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মিলনী অস্বীকার করায় এবং অবশেষে ১৯২৮ সালে নজর সেলামীর ব্যাপারে কংগ্রেসী দল জমিদার পক্ষে ভোট দেওয়ায় কংগ্রেস মুসলিম জনসাধারণের চোখে খুবই অপ্রিয় হয়ে পড়েছিল সত্য; কিন্তু শুধু মাত্র সেই কারণেই কৃষক-প্রজা সমিতির জন্ম হয় নি। মুসলিম কংগ্রেসীদের "সাম্প্রদায়িক" অসন্তোষও তার মূলে ছিল। সোজা কথায়, শুধু Leftism প্রজা সমিতির ভূমিকা ছিল না; ওর ভূমিকা ছিল Leftist-cum-Communal role. কৃষক-প্রজা সমিতির অভ্যুদয় ছিল কংগ্রেসের প্রতি বাঙলার মুসলিম কংগ্রেস কর্ম্মীদের অসন্তোষের প্রকাশ; আর সে সমিতির ভিত্তি ছিল মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ। সে অসন্তোষ ধূমায়িত হয় ১৯২৫ সালে। ঐ সালে কংগ্রেসী মুসলমানরা ফরিদপুরে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। নেহরু রিপোর্টে সে দাবী অগ্রাহ্য হয়। তার উপর ১৯২৯ সালে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট জাবেদা ভাবে বাতিল হয়। পরবর্ত্তী অধিবেশনে দিনাজপুরে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সম্বন্ধে মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য হয়।

এতগুলি ঘটনা একের পর এক কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মন খুব তেতো করে তুলে। ফলে ১৯৩১ সালে ডেল্টাল হলে মুসলিম কংগ্রেস কর্ম্মীরা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী মুসলমানদের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও।

প্রস্তাব গৃহীত হয় বটে, কিন্তু ১৯৩৩ সালের আগে পর্য্যন্ত হাতেকলমে কিছু করা হয় না। মুসলিম কর্ম্মীরা কি করবেন অতঃপর, তা স্থির করা সহজ ছিল না। মুসলিম লীগ তাদের হাতের পাঁচ ছিল বটে, কিন্তু তার কোনো প্রভাব ছিল না। কংগ্রেসের শাখা বলে মুসলিম সমাজে তার বদনাম ছিল। সর্ব্বোপরি, লীগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নেতা জিন্না সাহেব তখন ভারত ছেড়ে বিলাত আইন-ব্যবসা শুরু করেছেন।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে এই দুঃসময়ে মুসলিম কংগ্রেস কর্ম্মীদের মেজরিটী নিখিল বঙ্গ কৃষক বোর্ড গঠন করেন। মুসলিম লীগকে তাজা করবার চেষ্টা না করে, অথবা কোনো নয়া 'সাম্প্রদায়িক' প্রতিষ্ঠান না গড়ে, প্রজা সমিতির মত দৃশ্যতঃ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়বার মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল, তা বোঝা যাবে একটীমাত্র কথায়। 'আজাদের' বর্ত্তমান সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দীন প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক নামের আবশ্যকতা বুঝাতে গিয়ে সেই সভায় বলেছিলেন: কংগ্রেস যেমন অসাম্প্রদায়িক নাম সত্ত্বেও হিন্দুপ্রধান প্রতিষ্ঠান, আমরা তেমনি এমন একটী প্রতিষ্ঠান গড়বো, যা দৃশ্যতঃ অসাম্প্রদায়িক হয়েও কার্য্যতঃ হবে মুসলিম-প্রধান প্রতিষ্ঠান।

লেখক ঃ
আবুল মনসুর আহ্মদ

বস্তুতঃ প্রজা-সমিতি গড়বার পিছনের সত্য মানসিকতা এই। এ ছাড়া কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে একটী অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়বার আর কোন কারণ বা যুক্তি ছিল না। এই জন্যই সনাতনী কংগ্রেসী মুসলমানদের অনেকেই প্রথম দিকে প্রজাসমিতি বয়কট করলেন এবং হিন্দু কংগ্রেস নেতারা একে বিরুদ্ধ চক্ষে দেখলেন। ফলে অসাম্প্রদায়িক নামের দোহাই দিয়েও সমিতি হিন্দুদের আস্থা অর্জ্জন করতে পারলো না। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জে, এল, বানার্জ্জী, মিঃ অমূল্যধন রায় প্রভৃতির মত কয়েকজন নামজাদা হিন্দু নেতা এই সমিতিতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মনে তার কোনই আসর হলো না।

কিন্তু মুসলিম সমাজে এই সমিতি অদ্ভুত সাড়া পেল। জমিদারী ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলায় মুসলিম জনসাধারণ এই সমিতিকে লুফে নিল। কিন্তু সমিতির নেতা ও কর্ম্মীদের বেশীর ভাগের কংগ্রেসী ঐতিহ্য থাকার ফলে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বিপুল অংশ সমিতির আসল মতলব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থাকলো। ঐ সন্দেহ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে সমিতির উদ্যোক্তারা সার আবদুর রহীম, মৌঃ ফজলুল হক, খান বাহাদুর আবদুল মোমিন ও মৌঃ আবদুল করিম প্রভৃতি অকংগ্রেসী ও কংগ্রেস বিরোধী বড় বড় নেতার নামের আড়ালে দাঁড়ালেন। তাঁদেরকে সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি করে নিলেন।

এই সময় কয়েকটী জিলা আঞ্জুমান ছাড়া মুসলমানদের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। ঐ সব আঞ্জুমান সরকারকে তোষামোদ-খোসামোদ করা ছাড়া আর কিছু করবার বা বলবার জন্য ছিল না। কংগ্রেসই ছিল তখন গরম রাজনীতি করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে উহা ছিল অতিরিক্ত গরম—রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উভয় কারণেই। কাজেই গরম রাজনীতি করবার মুসলমানদের কোনো নিজস্ব প্ল্যাটফরম ছিল না। কৃষক-প্রজা সমিতি তাদের এই প্ল্যাটফরম সরবরাহ করলো। এতে পুরা মুসলিম প্রাধান্য ছিল। 'বন্দেমাতরম', 'জাতীয় পতাকা', 'মঙ্গল ঘট' ও 'অখণ্ড জ্যোতি'র হাঙ্গামা এতে ছিল না। ইসলামী কায়দায় যথারীতি কোরয়ান তেলাওত করে সভার কাজ শুরু করা যেত। [illegible] সভা বন্ধ করে মঞ্চের উপর নামাজ পড়া যেতো। হিন্দু কোনো সভ্য বা শ্রোতা সভায় আছেন কিনা, সেটা লক্ষ্য করবার বা ঠিক করবার কোনো দরকার ছিল না। কারণ আজান শুনেই তাঁরা আলগোছে সরে পড়তেন।

এমন ইসলামী আবহাওয়ায় মাঝারি রকম গরম রাজনীতি করবার সুবিধা হওয়ায় মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ এতে যোগ দিল। জমিদার ও মহাজনদের গাল দিতে দিতে স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যবাদীদেরও যথেষ্ট গাল দেওয়া হল। ফলে স্বরাজ স্বাধীনতার কথা স্বভাবতই এসে পড়ল। কংগ্রেসের সকল রকম সক্রিয় আন্দোলন থেকে দূরে থেকে স্বরাজ স্বাধীনতার কথা বলায় মুসলিম জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোনো আপত্তি ছিল না। প্রজা সমিতি বোল-চালে কংগ্রেসের মতই গরম হয়ে উঠলো। কংগ্রেস নেতারা খুশী হলেন। আগেকার বিরূপ ভাব ছেড়ে সবাইকে তাঁরা সহায়তা করতে লাগলেন। সনাতনী কংগ্রেসী মুসলমানরাও এই সময়ে প্রজা সমিতিতে যোগ দিলেন। তাদের যোগ দেবার আর একটা কারণ ছিল। সাধারণ নির্ব্বাচন তখন আসন্ন। কংগ্রেসের টিকিটে মুসলিম ভোট পাওয়া যাবে না। এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তাঁরা সদলবলে প্রজাসমিতিতে যোগ দিলেন। কিন্তু মুসলিম ভোটারদের আস্থা অর্জ্জনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রার্থীদের ছাপার হরফে ইস্তাহার জারী করতে হল এইমর্ম্মে যে, তাঁরা আর কংগ্রেসে নেই।

ফলে ১৯৩৬-৩৭ সালের নির্ব্বাচনে প্রজাসমিতির জয় জয়কার হলো। কিন্তু খুব স্বাভাবিক কারণে সে জয় হলো অল্পক্ষণ স্থায়ী। পার্লামেণ্টারী কর্ম্ম-পন্থায় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে কাজ করবার সুবিধা এঁদের হলো না। লীগ ও অকংগ্রেসী হিন্দুদের সঙ্গে কাজ করতে হলো বলে কংগ্রেস থেকে এঁরা খুব দূরে পড়ে গেলেন। লীগের সঙ্গে সহযোগ স্থাপন হওয়ায় অধিকাংশ প্রজা-মেম্বর লীগ-মেম্বর হয়ে গেলেন। প্রজা-নেতা হক সাহেবই হলেন এই পথের অগ্রনায়ক। কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট অল্পকয়েকজন প্রজা-মেম্বর হক সাহেবকে গাল দিয়ে আলাদা হয়ে পড়লেন। এঁরাই বহন করতে লাগলেন কৃষক-প্রজা নাম ও নিশান। বেশীরভাগ মিলে গেলেন লীগে।

কৃষক-প্রজা পার্টির এই দুঃবস্থার জন্য হক সাহেবকে আমরা দোষ দিয়ে থাকি। হক সাহেব অন্তরূপ হলে কৃষক-প্রজা পার্টির অবস্থাও অন্যরূপ থাকতো, আমরা অনেকে এ কথা বলেও থাকি।

কিন্তু এটা বাস্তববাদীর কথা নয়। হক সাহেবের আর যত দোষই থাক, রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি খুবই বাস্তববাদী। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে তিনি যেভাবে লীগে মিশে গিয়েছিলেন, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা অনুসারেই তিনি তা করেছিলেন। অন্য কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না—স্বাভাবিকও ছিল না; এমন কি যৌক্তিকও ছিল না।

কারণ যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে মুসলমান কংগ্রেসীরা প্রজা সমিতি গঠন করেছিলেন, সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিণতি মুসলিম লীগের আদর্শ—পাকিস্তান। কংগ্রেসী জাতীয়তা ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের সমর্থক হয়ে কংগ্রেসের বাইরে কোনো অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—তার মানে কংগ্রেসের প্যারেলাল প্রতিষ্ঠান—গঠন করবার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। যে কোনো ব্যক্তি চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে এর মেম্বর হতে পারে। বাঙলার মুসলমানরা সংখ্যা-গুরু। মুসলমানরা ইচ্ছা করলেই দলে দলে কংগ্রেস-মেম্বর হয়ে বাঙলার কংগ্রেস দখল করতে পারতো। কিন্তু এই স্বাভাবিক পথে না গিয়ে কংগ্রেসী মুসলমানরা যে কংগ্রেসের বাইরে একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়লেন, তাতে এইটাই প্রমাণিত হলো যে, তারা তখন স্থির বুঝেছিলেন কংগ্রেসের ভিতরে তাঁরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবেন না। এই মনোভাবের পরিণতি কৃষক-প্রজা সমিতি নয়—এর পরিণতি লীগ এবং পাকিস্তান। কংগ্রেসের জাতীয়তা মানবো, অথচ কংগ্রেসের ভিতরে তার আইন-কানুনের অধীনে যাবো না—এ দুমুখো নীতি সৎও নয়, বাস্তবমুখীও নয়।

এই অবাস্তব ও অসরল নীতির জন্য কৃষক-প্রজা সমিতির সাফল্য স্থায়ী হলো না। কৃষক-প্রজা সমিতি মুসলিম গণমনের যে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করছিল, মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদর্শে সে স্বাতন্ত্র্যকে যেদিন রূপ দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কৃষক-প্রজা সমিতির আবশ্যকতা সেইদিন শেষ হয়েছে। বামপন্থী ফ্রন্ট হিসেবে এর আবশ্যকতা আছে ও থাকবে; কিন্তু তা হবে মুসলিম লীগের ভিতরে—বাইরে নয়।

কাজেই কংগ্রেস সম্বন্ধে কিষাণ সভা যে নীতি অবলম্বন করে চলছে, লীগ সম্বন্ধে কৃষক-প্রজা সমিতিরও সেই নীতি অবলম্বন করা উচিৎ।

সুতরাং যারা আজো লীগের বাইরে এবং বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা সমিতি চালাবার চেষ্টা করছেন, তাঁরা অবাস্তব ও অসরল রাজনীতি করছেন। কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের তাঁরা শত্রুতা করছেন অর্থাৎ তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার শত্রুতা করছেন। এঁরা জমিয়ত ই ওলামা, আহরার, মজলিস, লীগে-রসুল করে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করছেন, অথচ লীগের বিরুদ্ধতা করে কংগ্রেসী হিন্দুদের বিভ্রান্ত করছেন, এটা হিন্দু-মুসলিম মিটমাটের প্রতিকূল; সুতরাং দেশের শত্রুতা।

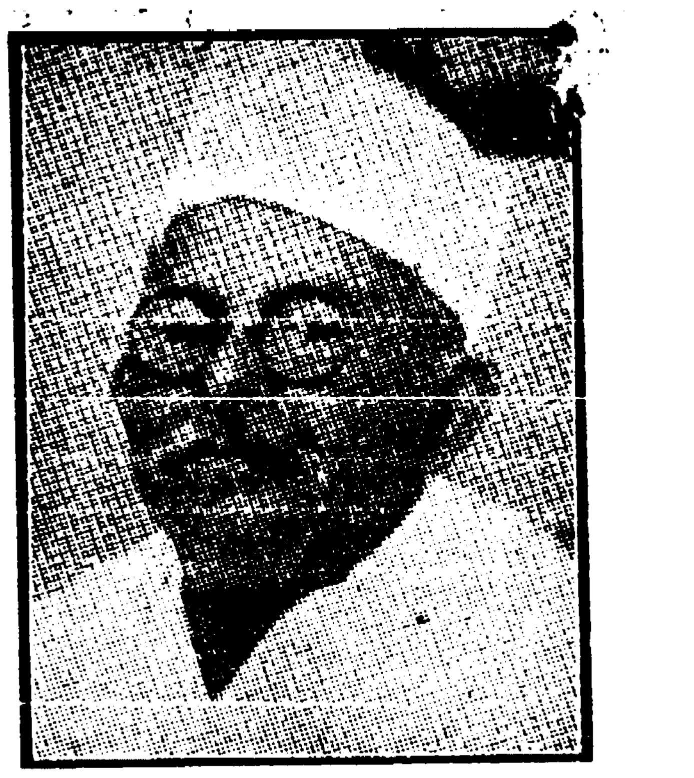

বাংলার লীগ-সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁ

ঘটনা ও রটনা

এবার স্থানাভাবে ঘটনা ও রটনা বাদ দিতে হ'ল।

একটু কথা আছে। জনযুদ্ধ ৩৫ শ সংখ্যায় "ভাগ্যকুলের ভাগ্যবান" আলোচনায় আমি দেখিয়েছিলাম যে নলিতাবাড়ী ও শেরপুরে চালের বাজার দর যখন দশ টাকা বা তারও নীচে তখন রাজা ব্রাদার্স সরকারকে চাল বেচেছে ১২৷০ বা ১২৷৵০ দরে। একজন সংবাদদাতা জানিয়াছেন যে রাজা ব্রাদার্স তার সাব-এজেন্টদের ঐ ১২৷০ বা ১২৷৵০ দরই দিয়েছে বলে খাতাপত্রে লেখা আছে। রাজা ব্রাদার্স তার নিজের মনোনীত সাব-এজেন্টকে কি দর দিয়েছে তাতে কারও কিছু এসে যায় না, প্রশ্ন হচ্ছে বাজার দর যখন অনেক কম তখন চীফ এজেন্ট তার চেয়ে বেশী দামে সরকারকে মাল বিক্রী করল কেন? যে-এজেন্ট বাজার দরেও মাল বেচতে পারে না—হয় তার এজেন্ট হবার যোগ্যতাই নেই কিম্বা সে বাজার দরের ওপরও মুনাফা করছে।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক ঃ বঙ্কিম মুখার্জি, এম, এল, এ
অফিস ঃ১২১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম ★

হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়--বৃটিশের বিরুদ্ধে

হিন্দু-মুসলিম যুক্ত ফ্রণ্টই দেশের স্বাধীনতা আনিবে--মিঃ জিন্নার উক্তি

গত ১৫ই জানুয়ারী আমেদাবাদে ছাত্রদের এক বিরাট সভায় লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না সকলকে সংস্কারমুক্ত মন লইয়া পাকিস্তান দাবীর বিচার করার জন্য আবেদন জানান। মিঃ জিন্না বলেন, পাকিস্তান 'জনবুল'কে কোনঠাসা করার একমাত্র উপায়। লীগের নীতি ও কর্ম্মপন্থা হিন্দুস্বার্থের পরিপন্থী নয়। লীগের লক্ষ্য প্যান-ইসলাম এই ভয়ও ভিত্তিহীন। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

'অখণ্ড ভারত' বৃটিশের আওয়াজ

অখণ্ড ভারতের আওয়াজ সম্বন্ধে মিঃ জিন্না বলেন যে বৃটিশ কুটনীতির ষড়যন্ত্রের ফলেই আজ অখণ্ড ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ধুয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ রাজনীতিকরা আজ অখণ্ড ভারতের ধুয়া তুলিয়াছে এই জন্য যে ভারতবর্ষে তাহাদের রাজত্ব চালাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দাবীতে এক হইতে পারিবেনা জানিয়াই তাহারা এই অখণ্ড ভারতের আওয়াজকে উৎসাহ দিতেছে। তাহাদের মতলব এই যে আমাদের ঝগড়ায় মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া দুই বানরের ঝগড়ায় বিড়াল যে রকম বিচার করিয়াছিল সেই রকম বিচার করিতে পারে। তাহাদের অখণ্ড ভারতের অর্থ হিন্দু ও মুসলমানদের এমনভাবে রাখা যেন আমাদের উভয়ের উপরই তাহারা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে বর্ত্তমান অখণ্ড ভারতের মালিক আমরা নই, উহার সত্যিকারের মালিক বৃটিশ মেশিনগান।

পাকিস্তানের ভিত্তি গণতন্ত্র

কেহ কেহ বলেন যে পাকিস্তানের দাবী একটা ধাপ্পাবাজী এবং ধূর্ত্ত জিন্নার দর কষাকষির উপায় মাত্র। পাকিস্তানের দাবী ধাপ্পাবাজী নয়, দর কষাকষির উপায়ও নয়। পাকিস্তানের দাবীতে আমরা সেই অঞ্চলই দাবী করি যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে পাকিস্তান এলাকায় বর্ব্বর সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে কোন অ-মুসলমানের স্বার্থই নিরাপদ থাকিবে না। এই ভয় অমূলক। পাকিস্তান অঞ্চলে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সুব্যবহার পাইবে। পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান কোন রাষ্ট্রই একনায়কতন্ত্র-শাসিত হইতে পারে না। জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপরই এগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্র গঠিত হইলে সকল অবিশ্বাসের কারণ দূর হইবে, নচেৎ সমস্ত ভারত একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিতে পরিণত হইবে।

পাকিস্তান হিন্দু বিরোধী নয়

বলা হয় হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে পাকিস্তান সম্ভব হইবে কি করিয়া? হিন্দুদের বিরোধিতা পাকিস্তানের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে সত্য। কিন্তু আমি হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করি এই বিরোধিতায় তাঁহাদের কি লাভ? মুসলমানদের পাকিস্তানের সংগ্রাম হিন্দুস্তানের স্বাধীনতাকে বাদ দিয়া নয়। আমরা যখন বলি যে আমরা পাকিস্তানের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিব, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিব তখন শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির জন্যই এই কথা বলি না, সমগ্র ভারতের জন্যই একথা বলিয়া থাকি। আমরা যদি বৃটিশরাজের উচ্ছেদ করিতে না পারি তবে পাকিস্তান পাইব কী ভাবে? অতএব পাকিস্তানের জন্য আমাদের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতারই সংগ্রাম।

যুক্ত ফ্রন্টের ভিত্তি

পর দিন, অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে মিঃ জিন্না বলেন, কংগ্রেস যদি লীগের লাহোর প্রস্তাবের সারমর্ম্ম পাকিস্তান সমর্থন করে, ৮ই আগষ্ট প্রস্তাব সংশোধন করে এবং জগৎ নারায়ণ লালের অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তবে ভারতে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন সম্ভব হইবে।

৮ই আগষ্ট প্রস্তাব সম্বন্ধে মিঃ জিন্না বলেন, ৮ই আগষ্ট প্রস্তাবে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু বলা হইয়াছে যে প্রস্তাবিত অস্থায়ী সরকার একটি গণ পরিষদ গঠনের খসড়া প্রস্তুত করিবেন আর সেই গণপরিষদই ভারতের সকল অধিবাসীর পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য গঠনতন্ত্র রচনা করিবে। প্রস্তাবের এই অংশ আমি সমর্থন করিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রধান প্রধান বিষয়ের ক্ষমতা দিয়া বাকী

ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়ার প্রস্তাবেরও আমি বিরোধী। কারণ ইহা দ্বারা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে।

ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতালাভ করিতে হইলে চাই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আর তাহার জন্য চাই যুক্ত ফ্রন্ট। সমস্যার মূল কথা হইল এই যে, আমরা উভয়ে এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি কি না যে, যেসব অঞ্চলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে হইবে আমাদের রাষ্ট্র ও যে সব অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে হইবে হিন্দুদের রাষ্ট্র এবং আমরা যেমন বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের সংখ্যা-লঘুদের নিরপত্তা হিন্দুদের হাতে দিতে রাজী আছি, তাহারাও কি সে রকম তাহাদের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের উপর দিতে প্রস্তুত?

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের প্রশ্ন

গান্ধিজী বহুবার মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছেন এই কথা তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন, আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই বা তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসুন ইহা বড় কথা নয়, কোটি কোটি হিন্দুর নেতা গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি যে কোন স্থানে যাইতে প্রস্তুত। আমি যদি তাঁহার নিকট আমার দাবী পেশ করি এবং তিনি যদি তাহা মানিতে রাজী না হন তবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করা অসঙ্গত। আমরা পুনরায় মিলিত হইবার আশা রাখি।

বৃটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি না হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। হিন্দুদের হাত হইতে পাকিস্তান লাভ করা যতটা অসম্ভব, আমার নিকট হইতে অখণ্ড ভারত পাওয়াও হিন্দুদের পক্ষে ততটাই অসম্ভব। সব কিছুই বৃটিশের হাতে এবং তাহাদের হাত হইতে দাবী আদায়ের একমাত্র পথ হিন্দু-মুসলিম যুক্তফ্রন্ট। এই যুক্তফ্রন্টের ফলে আমাদের কলহ বন্ধ হইবে। তখন আমরা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের অধিবাসীরা মিলিত হইয়া শাসকদের সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করাইব, আমরা স্বাধীন ভাবে আমাদের দেশ শাসন করিব।

দেশপ্রেম কাহারও একার নয়

বিভিন্ন দলের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে শ্রীযুক্তা নাইডু

১৮ই জানুয়ারী মাদ্রাজে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের আদর্শ ও বিভিন্ন দলের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। বহু-আলোচিত কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে যিনি কংগ্রেস সংকল্প পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাকে প্রাথমিক সভ্যপদ হইতে বাদ দেওয়া যায় না। তিনি যদি কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক পদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন সে পদ হইতেও তাঁহাকে বহিস্কৃত করা যায় না। ওয়ার্কিং কমিটির একজন দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে তিনি এই নির্দ্দেশ দেন যে ব্যক্তিগতভাবে অথবা এড্ হক্ কমিটি হিসাবে কংগ্রেস কর্ম্মীরা অন্য কোন কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

আজকাল প্রায়ই মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না, কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ শোনা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক অংশের কার্য্যকলাপ অন্যের কার্য্যক্রমে বিঘ্ন না ঘটাইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে অন্যকে এই ভাবে অভিযুক্ত করিবার কোন অধিকার নাই। দেশপ্রেম কাহারও একার নহে। প্রত্যেকেরই আপন সংগঠন গড়িবার ও নিজেদের বিশ্বাস মত কাজ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করিবার চেষ্টা করে।

কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক বিকাশ বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারে আছে কিন্তু কোন বিষয়ে একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সেই সিদ্ধান্ত সকলের মানিয়া চলা উচিত। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে কংগ্রেসের ভিতরে প্রত্যেকের আপন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আনুগত্যের দাবী গণতন্ত্রেরই দাবী।

শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, মুসলমানেরা কংগ্রেসের ভিতরে নাই; বিরাট সংখ্যক হরিজন নরনারীও কংগ্রেসের বাহিরে। ভারতীয় খৃষ্টান ও পার্শীদেরও একই অবস্থা। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রতীকমাত্র। ঐক্যবদ্ধ গোটা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেওয়া—ইহাই কংগ্রেসের চিরকালের লক্ষ্য ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

★ ★

যাহারা সব কিছুতেই ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিবে, শুধু এমনি কয়েকজন লোককে নিয়াই নহে—প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাধীন মত পোষণ করার ও তাহা প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়া এবং এক সর্ব্বগ্রাহ্য আদর্শ ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে কংগ্রেসের উচিত সমগ্র জাতির দাবীকে রূপ দেওয়া।

যাহার সঙ্গেই মতের তফাৎ তাহাকেই কংগ্রেস হইতে দূর করিয়া দেওয়া যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিভক্ত ভারতের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগুলির সহিত কংগ্রেসের আর কোনই পার্থক্য থাকিবে না। কংগ্রেসের ভিত্তি যদি ব্যাপক হয়, যদি কংগ্রেসসেবীরা জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করিয়া না দেখিয়া তাহার পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করেন, তবেই কংগ্রেসের অগ্রগতি সম্ভব।

মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান প্রভৃতি অংশকে তাড়ানোর বদলে কংগ্রেস কর্ম্মীদের উচিত তাহাদের টানিয়া নেওয়া। ভারতের প্রত্যেকটি অংশ জানুক তাহারা যাহা কিছু শ্রদ্ধা করে, এবং তাহাদের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মগত ও ব্যক্তিগত সমস্ত অনুষ্ঠানের রক্ষাকর্ত্তা কংগ্রেস এবং কংগ্রেসই সকলের মিলনস্থল।

শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, গুরুতেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলন হওয়ার মূল লক্ষ্যে আমি বিশ্বাসী। যদি এই প্রচেষ্টা ঠিক পথে চালানো হয় তাহা হইলে সুফল ফলিতে বাধ্য। কংগ্রেসের পক্ষে শুধু মাত্র রাজনৈতিক চেতনাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপক 'মানব-প্রীতির'ও প্রয়োজন। নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া ভারতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন না কোন বিশেষ অবদান আছে; স্বাধীনতার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা কখনই তাহাদের সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করিবে না—তাহাদের সে সাহসই হইবে না।

পাকিস্তানের মর্ম্ম সকলের স্বাধীনতা

লীগ-সম্পাদক লিয়াকত আলী খাঁর বিশ্লেষণ ★

গত ১৫ই জানুয়ারী মাদ্রাজে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লীগ সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ বলেন:

লোকে জিজ্ঞাসা করে পাকিস্তানের অর্থ কি? পাকিস্তানের অর্থ স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম। পাকিস্তান রাষ্ট্র এমন অবস্থার কল্পনা করে যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বাধীন।

হিন্দুরা মনে করেন হিন্দুস্থানের মালিক তাঁহারাই। মুসলমানরা মনে করেন তাঁহারা হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই অবস্থার সমাধান হইতে পারে একমাত্র পাকিস্তানের স্বীকৃতি দ্বারা। পাকিস্তানের মূল কথা হইল এই যে, যে জাতি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারাই সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবে।

গত ৬।৭ বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় ও জাতীয় চেতনা জাগাইয়াছে। ১৯৩৬ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে আজ অনেকেই মুসলমানদের বিরাট জাগরণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। খিলাফৎ যুগের মুসলিম জাগরণের সঙ্গে বর্ত্তমানের মুসলিম জাগরণের তফাৎ অনেক। সেদিন সেই জাগরণের পিছনে ছিল ধর্ম্মের প্রেরণা কিন্তু আজকার জাগরণের মূলে আছে রাজনৈতিক চেতনা, যে-চেতনা মুসলমানদের তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে।

অনেক সমালোচক লীগের দাবীর ভুল ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে লীগ ভারতের স্বাধীনতার পথে অন্তরায়, লীগ চায় বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব। কিন্তু পাকিস্তানই হইতেছে একমাত্র পথ যে পথে দেশ স্বাধীন হইবে।

পাকিস্তানের দাবী শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য। চিরকালের মত ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসকের পদানত রাখার জন্য পাকিস্তানের দাবী তোলা হয় নাই। মুসলমানদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কাহারও চাইতে কম নয়। বৃটিশ শাসনে তাহারাই সব চাইতে বেশী উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহারা এত মূর্খ নয় যে এই অত্যাচারকে তাহারা দীর্ঘস্থায়ী করিবে।

এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চিত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া নেয়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহারা উভয়ের স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে শুধু নয়, সেই রাষ্ট্রদ্বয়কে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও পরস্পরকে সাহায্য করে—ততক্ষণ ভারতে স্বাধীনতার কোন আশা নাই। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে একবার স্বাধীন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইলে তখন উভয়ের যুক্ত আওয়াজ হইবে "ভারত ভারতবাসীর জন্য। ভারতবর্ষ হইতে তফাৎ থাকো।"

যতীন্দ্রমোহনের জন্মভূমিতে

স্মৃতির সৌধ নাই—আছে কঙ্কালের স্তূপ

যাত্রামোহন টাউন হলের প্রাঙ্গনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি

ইতিপূর্ব্বে জনযুদ্ধে আমি চট্টগ্রামের এক বিবরণ দিয়াছিলাম। সেই বিবরণে চট্টগ্রামে সমাজধ্বংসের করুণ কাহিনী পড়িয়া আমার জনৈক বন্ধু এক চিঠিতে লিখিয়াছেন—"এই বিবরণ পড়িয়া মনটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, দূর হইতে মনে হয় চট্টগ্রামে কি মানুষ নাই ?"

'মেয়েটি আমার নয়'

আছে বৈকি। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের জন্মভূমিতে দেশভক্তের অভাব নাই। তাহারই পরিচয় পাই ডবলমুরিং থানার একটি গ্রামে এক সাহিত্য বাসরে। মুসলিম লীগের এক তরুণ কর্ম্মীর বাড়ীতে এই নিমন্ত্রণ হয়। তাঁহার নাম আব্দুস সালাম। আব্দুস সালাম ২ বছরের একটি মেয়েকে কোলে করিয়া সভার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন; মেয়েটির স্বাস্থ্য এবং গড়ন অতুলনীয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, মেয়েটি বুঝি আব্দুস সালামেরই হইবে। কিন্তু সভার আরম্ভে আব্দুস সালাম ঘোষণা করিলেন—"এই মেয়েটি আমার নয়, দুর্ভিক্ষের সময় আমার এক আত্মীয় এই মেয়েটি পুকুরের ধার হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। ও এক দুঃস্থার মেয়ে। সেই হইতে আমি উহাকে পালন করিতেছি।" আব্দুস সালাম তাহাকে নিজের মেয়ের মতই যত্ন করিয়াছে তাই তাহার দেহে দুঃস্থতার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু এই দুই বছর বয়সেও সে দু একটি ছাড়া কথা বলিতে শিখে নাই, কারণ কথা শিখিবার সময় তাহার ভাগ্যে ছিল অনশনের যন্ত্রণা, তখন সে শুধু শুনিয়াছে দুঃস্থা মায়ের কান্না। এই শিশুর মা এখনও দুঃস্থা, মাঝে মাঝে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য বিভিন্ন দলের সমবেত চেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরে একটি অনাথ শিশুর হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। এই হাসপাতালে যে ৪টি শিশু দেখিলাম তাহাদের দেহ হইতে দুঃস্থতার চিহ্ন এখনও দূর হয় নাই! তাহাদের রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে। পথে পথে কত শিশু মরিয়া গিয়াছে, শত শত নাবালক এখনও পথে পথে ঘুরিতেছে। বাঙ্গালীর একটা বংশ এই ভাবে যে অনাদৃত, সে কথা ভাবিবার মনোবৃত্তি তেমন দেখি কই? দু একটা হাসপাতাল কিংবা দু এক জন আবদুস সালাম কি করিতে পারে?

আত্মত্যাগের অমর কাহিনী

আর এক তপস্বীর বিবরণ শুনিয়াছি কাট্টলী গ্রামে, তাঁহার নাম সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন দাস। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। চট্টগ্রামে তিনি আর্য্যসঙ্গীত নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীত সাধনা ছিল ইহার লক্ষ্য। প্রতি বৎসর চট্টগ্রামে এই প্রতিষ্ঠান যে আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করিত তাহা বাংলার সংস্কৃতি-জীবনে এক অপূর্ব্ব দান ছিল। ১৯২১ সাল হইতে এই আর্য্যসঙ্গীত স্বাধীনতা উৎসবের গান গাহিয়া বেড়াইত। ১৯৪০ সালে এই প্রতিষ্ঠানের শেষ উৎসব হয় রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন। তাহার পর আসে জাপদস্যুর আক্রমণ, চট্টগ্রাম শহরে হয় যুদ্ধের আয়োজন। বোমাবর্ষণে শহরের স্বাভাবিক জীবন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, সুরেন দাসও তখন কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ১৯৪৩ সালে তিনি যখন শুনিলেন কাট্টলীর জেলে পাড়ায় মৃত্যুর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে তখন তিনি কাট্টলিতে ছুটিয়া যান, জেলে পাড়ায় লঙ্গরখানা খুলিয়া দুঃস্থদের অন্ন বিতরণ করিতে সুরু করেন। এইখানেই দুঃস্থদের সেবা করিতে করিতে মেনিঞ্জাইটিসে তাঁহার মৃত্যু হয়। কাট্টলীর দুঃস্থ জেলেদের মুখে এই সঙ্গীতাচার্য্যের অমর কীর্ত্তির কাহিনী শুনিয়াছি।

সরকারী সাহায্যে, কমিউনিষ্ট পার্টির এবং আরও অনেকের চেষ্টায় গত বৎসর সারা জেলায় ৬৪৩টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ১ লক্ষ দুঃস্থ খাদ্য পাইয়াছে। কিন্তু সারা জেলায় প্রায় দুই লক্ষ নরনারী দুঃস্থ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় একলক্ষ লোক মারা যায়। এই মৃত্যুস্রোত রোধ করিবার মত যথেষ্ট স্বদেশপ্রেম দেশে জাগে নাই। আর জাগে নাই এই মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছে যে মুনাফাখোর মজুতদার তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট ঘৃণা।

এখন রিলিফ কিচেন নাই। কিন্তু দুঃস্থেরা দুঃস্থই আছে।

কোয়েপাড়ার স্কুলে আছে আর এক পণ্ডিতের গৌরবময় ত্যাগের কাহিনী। এই পণ্ডিত স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের আঘাতে ছাত্র এবং শিক্ষকেরা স্কুল ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন জীবন দিব তবু এ স্কুল ছাড়িব না। অনেক স্কুলের অনেক শিক্ষক স্কুল ছাড়িয়া মিলিটারীর চাকুরীতে যোগ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, এই পণ্ডিতও সে পথ অবলম্বন করিতে পারিতেন, কিন্তু শিক্ষাব্রতের মায়া তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। নিজে যখন সহায়সম্বলহীন দুঃস্থ হইয়া পড়িলেন তখনও খিচুড়ি এবং ফ্যান খাইয়া তিনি স্কুলের শিক্ষকতা করিতে থাকেন—ছাত্রদের তিনি উপদেশ দেন স্কুল ছাড়িও না, যেমন করিয়া পার স্কুলটিকে বাঁচাইয়া রাখ। ছাত্রদের শেলাই করা শতজীর্ণ শার্ট পড়িয়া ফ্যান্ খাইয়া তিনি স্কুল চালাইতে থাকেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন ফ্যান খাইয়া খাইয়া শোথে আক্রান্ত হন তখন তিনি তাঁহার ছাত্রদের ডাকিয়া বলেন—"আমি তোমাদের থাকিতে বলিয়াছিলাম আজ আর পারিতেছিনা।" অনাহার জনিত শোথেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অবিচল দেশপ্রেম

কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য দেশভক্তদের সঙ্গে মিলিতভাবে সরকারী সাহায্য লইয়া রিলিফ কিচেন ও রিলিফ হাসপাতাল পরিচালনা করিত। কিন্তু তাহাদেরও কর্ম্মীরা দুর্ভিক্ষের কাছে পরাস্ত হইয়াছে। বোয়ালখালি থানার সারদা শীল একজন কৃষক নেতা। সে ছিল পার্টির সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী। পার্টি হইতে যখন রিলিফ কিচেন খুলিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছিল তখন এই সারদা শীলের আত্মীয় পরিজনেরাই খাদ্যাভাবে মারা যায়। তাহার স্ত্রী, মা, বাপ, এক ভাই মারা যাবার পর সে অশান্ত হইয়া উঠে। এতদিন ক্ষুধা সহ্য করিয়াও সে তাহার কর্ম্মস্থলে অটল ছিল কিন্তু ইহার পর তাহার বাড়ীতে ও পাড়ায় মৃতের শবদেহ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। সব মারা যাবার পর এই সারদা শীল আর সহ্য করিতে পারে না; পার্টি, দেশ, জনতা সব ফেলিয়া নিজেকে বাঁচাইবার জন্য মিলিটারীর কাজ নেয়।...ঐ জায়গাতেই আর একজন পার্টি কর্ম্মীর নাম শরৎ দে। একে একে তাহার ভাই, মা এবং মেয়ে না খাইয়া মারা যায়। শরৎ দে'র মনে তখন ভয় দেখা দেয়। এ ভয় মৃত্যুর ভয় নয়। সে বলে—"আমার মনে ভয় হইল আমি কি শেষে সারদা শীলের মত নিজের আত্মা হারাইয়া ফেলিব?" সে তখন কৃষক জনসাধারণের কাছে আবেদন জানায়—"তোমরা আমাকে বাঁচাও, আমার রাজনৈতিক কর্ম্মজীবন রক্ষা কর।" সে কৃষকদের দরদী নেতা, কৃষকেরা তাহাকে চাঁদা তুলিয়া খাদ্যের সংস্থান করিয়া দেয়। শরৎ দে'কে শারদা শীলের ভাগ্য হইতে বাঁচায় কৃষক সমিতির কৃষকেরা। শরৎ দে আজও অবিচলিত ভাবে দেশসেবার কাজ করিয়া যাইতেছে।

আমাদের পার্টির বহু কর্ম্মী শরৎ দে'র মত আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু সারদা শীলের মত পলাইয়া যায় নাই। তাহারা পার্টির ভিতরেই আছে কিন্তু রোগের আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। বহুদিন ধরিয়া আমাদের পার্টির সভ্যদের শতকরা ৪০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, ২৫ জন ভুগিতেছে আমাশায় এবং ২জন যক্ষ্মা রোগে। জেলার ২৫ জন সংগঠকের মধ্যে ১৭ জন অসুখে অকর্ম্মণ্য। দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া পার্টিই মহামারীর আঘাতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম।

দেশপ্রিয়ের দেশে

বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বীরদের এই আত্মত্যাগ চট্টগ্রামকে বাঁচাইতে পারে নাই। ১৯২১ সালে সেনগুপ্ত, কাজেমালি এবং বদিউল আলম হিন্দুমুসলমান মিলনের জয়গানে চট্টগ্রাম মুখরিত করিয়াছিলেন—নবজাগ্রত বাংলার মুক্তি অভিযানে তাঁহাদের দান অমর হইয়া থাকিবে। কিন্তু আজ তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে ভাঙ্গনের কলরোল। পাটিয়াথানায় 'বরমা' সেনগুপ্তের পৈতৃক গ্রাম। এই গ্রামের একজন অধিবাসী বলিয়াছেন—"আসাম বেঙ্গল রেল-ধর্ম্মঘটের সময় সেনগুপ্ত নিজ বাড়ী বন্ধক দিয়া মজুরদের খাওয়াইয়াছিলেন। এই বরেণ্য নেতারই গ্রামবাসীরা লঙ্গরখানার দ্বারস্থ হইয়াছে। দুঃস্থের মত শোথ এবং আমাশয়ে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।"

বাঙ্গালীর বিপন্ন স

গ্রাম পুনর্গঠনের সমস্যা এখনও বাংলাকে তে
যখন হাজার হাজার দুঃস্থ কলিকাতার রাস্তার আসি
সাড়া পড়িয়াছিল। 'বাংলাকে বাঁচাও' এই ধ্বনি
কলিকাতার রাজপথে দুঃস্থদের দেখা যায় না, ব
আগেকার প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধে বুঝিতে পারিবেন—
গ্রামে ভিত্তি সমেত আমাদের সমাজ ও সভ্যতা ভাঙ্গি

অন্য একটি প্রবন্ধে শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপা

দুর্ভিক্ষের সময় টাকা তুলিয়া রিলিফ কিচেন
তোলা তত সহজ নয়। ইহার জন্য চাই বাংলার সম

'বাংলাকে গড়িয়া তোল'—ইহাই হউক আজ
তেমন ধরণের গঠনমূলক কাজ নয়। এ কাজ হইব
করা। একাজে যদি আজ আমরা অপারগ হই
পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবে।

এই প্রবন্ধগুলির বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি
আজ বাঁচিয়া নাই, তিনি যদি বাঁচিয়া থাকিতেন—পৃথি
তাঁহার সুরঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

লেখক কবি এবং শিল্পীরা আগাইয়া আসুন
ছবিতে, গল্পে ও গানে ফুটাইয়া তুলুন। যে নরপশুরা
নামাইতেছে তাহাদের ঘৃণ্য প্রবৃত্তিকে কশাঘাত ক
রাখিয়াছে তাহাকে আঘাতের পর আঘাত করুন।

যাহাদের অর্থবিত্ত আছে তাঁহারা আগাইয়া আ
মুক্তহস্ত করুন। আত্মত্যাগের এত বড় আহ্বান বহু
জনগণের জন্য বাড়ীঘর তৈরী করিয়া দিন, কারিগর
মুক্তহস্তে অর্থদান করুন যাহাতে প্রত্যেকের জন্য ঘর,

সমাজসেবীরা আগাইয়া আসুন। চারণের
কোথায় কাহার কাজ চাই, ঘর চাই, খাদ্য চাই, জীবন
ব্যবস্থা করুন। মানুষের মনে আশা জাগুক। দুঃস্থ
ভরসা সৃষ্টি করা। দেশের দশজন জীবনের আস্থ
আত্মা পুনরুজ্জীবিত করিবে।

সমস্ত রাজনৈতিক দল আগাইয়া আসুন। অ
আহ্বান দিতেন সমস্ত পৃথিবী তাহা হইলে জা
দলের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা। বাংলার সমাজ-জীব
সম্ভব গঠিত হইলে দেশে নব জাগরণ আসিবে। এই
হারাইয়া ফেলিবে।

সকল দল মিলিয়া এক কর্ম্মীবাহিনী গড়িয়
কাঁধ মিলাইয়া দেশের সর্ব্বত্র সমাজ-গঠনের কাজ
হইতে নারী উদ্ধার, স্ত্রী বিক্রয় রোধ করা, দুঃস্থে
দেওয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাহায্যে অপমৃত্যুর
বাহিনীর কাজ।

দেশের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সকলে মিলিয়া
এবং সামরিক বিভাগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দুর্নীতিকারী

দেশের অচল অবস্থাই আজ আমাদের
চলিবে না। কংগ্রেস এবং লীগকে আজই সম
করিয়া হউক মিলিত হইতে হইবে। রাজনীতি
বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হউন। দেশের সকলেরই
ভাঙ্গিতেই হইবে, আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ক্ষমতা

সেনগুপ্তের নিজ গ্রামে স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী কোন স্মৃতি-সৌধ রচনা করে নাই, সে সৌধ রচনা করিয়াছে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, সে সৌধ কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত শ্মশান। সেনগুপ্ত এবং কাজেমালির স্বদেশবাসী আমরা কি এমনি করিয়াই মহাপুরুষের ঋণ শোধ করিতেছি?

সঙ্গীতাচ

অপসারিত গ্রামে

চট্টগ্রামের দিকে দিকে বিভিন্ন রকমে কত পরিবার যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহার বিবরণ শেষ করা যায় না। গ্রাম অপসরণের ফলে যাহারা উৎখাত হইয়াছে এমন কতকগুলি পরিবারের ঘটনা শুনিলাম।

সমাজ সভ্যতা ধ্বংসের পথে

দেশভক্তের অভাব নাই—তবু দেশবাসী লাঞ্ছিত

ভ্যাতাকে বাঁচাও

ন ভাবে নাড়া দেয় নাই। দুর্ভিক্ষের সময় হাজির হইয়াছিল তখন সমগ্র ভারতবর্ষে একটা তখন সমগ্র ভারত নড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ জেই স্বদেশভক্তরা নিশ্চিন্ত আছেন। ভবানী সেনের লিকাতার রাস্তায় দুঃস্থরা না থাকিলেও দুঃস্থ-জীবন দিতেছে।

ায় এই সমস্যারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

লা যত সহজ ছিল, বাংলার সমাজ জীবন গড়িয়া দল এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সমবেত শক্তি।

সমস্ত বাঙ্গালীর মিলিত রণধ্বনি। এ কাজ যেমন —একটা জাতির সমাজ, সভ্যতা ও নীতি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বাঙ্গালী সভ্যতার নাম

বেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কি? রবীন্দ্রনাথ ীর দিকে দিকে আজ মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর কাহিনী

। মাতৃত্ব ও নারীত্বের বেদনার করুণ কাহিনীকে বিপদের সুযোগ লইয়া আমাদের সভ্যতাকে টানিয়া ন। যে ক্ষুদ্রতা আমাদের এখনও অন্ধ করিয়া

ন। বাংলার মনুষ্যত্ব এবং সভ্যতার জন্য নিজেদের অন্তর একবার আসে মাত্র। সমগ্র বাংলার দুঃস্থ ও দিনমজুরদের জন্য শিল্পাশ্রম তৈরী করিয়া দিন, াজ এবং খাদ্য সংগৃহীত হয়।

সেবার গানে সমস্ত দেশ মুখরিত করিয়া তুলুন। াবণের ব্যবস্থা চাই,—তাহা অনুসন্ধান করুন আর র সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথম দরকার ন লইয়া আগাইয়াছে—এই জন্যই নিষ্প্রাণ দুঃস্থের

জ যদি বুদ্ধ কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত কোন মহাপুরুষ া উচিত। সে-জাগরণ আনিতে হইবে সকল পুনর্গঠিত করিবার জন্য সকল দলের মিলিত ব জাগরণ না আসিলে প্রত্যেকেই তাহার আত্মা

তুলুন। এই কর্ম্মীবাহিনীর কাজ হইবে কাঁধে আরম্ভ করা। ব্যাধির চিকিৎসা, পতিতালয় র জন্য স্বাভাবিক কাজের ব্যবস্থা করা, ঘর বাঁধিয়া মনোভাব দূর করা—এইগুলিই হইবে কর্ম্মী-

মবেত ভাবে চেষ্টা করুন—যাহাতে আমলাতন্ত্র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

সভ্যতা বিপন্ন করিয়াছে। আর দেরী করিলে ত ভাবে অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য যেমন আত্মকলহ বন্ধ করিবার জন্য পরস্পরের দাবী লক্ষ্য হউক শুধু মাত্র একটি—অচল অবস্থা মানিতেই হইবে।

র্য্যি সুরেন দাস

একখানি গ্রাম হইতে অপসারিত ৭৮৫ জন নরনারীর মধ্যে ২০০ জন মারা গিয়াছে। ইহারা সকলেই হিন্দু। সরকারী ব্যবস্থায় আনোয়ারা থানায় এই সব অপসারিত লোকদের জন্য একটি শিবির তৈরী করা হইয়াছে। শুনিলাম এই শিবিরে যাহারা আছে তাহাদের অনেকেই সংক্রামক আমাশয় রোগে ভুগিতেছে। এ অঞ্চলে গত ৪ মাসের ভিতর ৫০০ জন মারা গিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিশু। মৃত্যুর ভয়ে অনেকেই এই শিবির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাড়ী কোথাও তৈরী করিতে পারে নাই।

কোন একটি স্থান হইতে অপসারিত মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ২৬০০০। তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষে ৫০০০ মারা গিয়াছে। ইহাদের অপসারণই করা হইয়াছে কিন্তু ইহাদের জন্য থাকিবার মত বাড়ী তৈরী করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাতা বিভিন্ন দুশ্চরিত্র কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করিতেছে।

সুধাংশু এবং হিমাংশু দুই ভাইএর এক পরিবার। রেঙ্গুনে তাহাদের দোকান ছিল। রেঙ্গুন হইতে আসিয়া চট্টগ্রামের এক পল্লীতে আশ্রয় নেয়। সেখানে অপসারণের আদেশ আসিলে অন্য গ্রামে যায়। এই পরিবারের তিনটি প্রাণী মাত্র জীবিত আছে—সুধাংশুর স্ত্রী, তাহার মা এবং দুই বৎসরের একটি ছেলে। ভিক্ষাই তাহাদের জীবন যাত্রার একমাত্র সম্বল।

দেবেন্দ্র মজুমদার একজন কৃষক। তাহাদের বাড়ীতে ছিল ১১ জন লোক। তাহার ৬ কানি জমি ছিল। তাহার বাড়ীতে ১০টি গরু ছিল আর ৬টি মহিষ ছিল। গ্রামে অপসারণের হুকুম আসিলে এসব ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এই সম্পদশালী কৃষক তারপর কুলিগিরি আরম্ভ করে। দেড় বৎসর কোনমতে জীবন সংগ্রাম চালাইবার পর বেরিবেরিতে তাহার মৃত্যু হয়। তারপর তাহার ছেলে মরে কালাজ্বরে। দেবেন্দ্রের ভাই যখন মৃত্যুশয্যায় তখন এই ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তারপর মরে তাহার নিজের ছেলে। এতগুলি লোক মরে অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায়। এই পরিবারে দুই ভাইয়ের দুই স্ত্রী এবং তিনটি শিশু এখনও জীবিত আছে।

এমন পরিবার বহু আছে। তাহাদের জন্য কেহ বাড়ী তৈরী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করে নাই। সরকার নামমাত্র ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছে; দেশভক্তেরা নিশ্চিন্ত আছেন এই বলিয়া যে গ্রাম অপসারণের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে যুদ্ধ ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা হয়

গ্রাম অপসারণ, বোমা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী একটার পর একটা আঘাতে চট্টগ্রামের সমাজজীবন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বাংলার দিকে দিকে যখন এই বিয়োগান্ত ঘটনা আরম্ভ হয় তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার দেশভক্তেরা দলগত সংঘর্ষে লিপ্ত। এই আত্মকলহ বাংলার ভাগ্য আমলাতন্ত্রের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে, বাংলার শত শত মা বোনকে সমাজচ্যুত করিয়াছে।

মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু

কি অসহায় অবস্থায় বাংলার নারী আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়াছে দু একটি ঘটনা বলিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সমাজে নারীর স্থান অন্তঃপুরের অন্তরালে, দুর্ভিক্ষ তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দেয়। লঙ্গরখানায় চট্টগ্রামের যে এক লক্ষ দুঃস্থ আশ্রয় লইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৫ জন ছিল পুরুষ বাকী সবাই স্ত্রীলোক। রামমোহন রায়ের স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনও যাহাদের পুরুষের সমকক্ষ করিয়া জীবন-যুদ্ধে যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে নাই দুর্ভিক্ষের কঠোর বাস্তব তাহাদিগকে রিলিফ কিচেনে টানিয়া আনে। কিন্তু রিলিফ কিচেনেও সকলের জায়গা হয় নাই, বিশেষতঃ শিশুদের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

একটি জেলের মেয়ের ঘটনা বলি। তাহার দুইটি ছেলে, একটি কোন মতে হাটিতে শিখিয়াছে, অন্যটি একেবারে দুধের বাচ্চা। এই দুই শিশুকে লইয়া কিছুদিন উপবাস করার পর তাহাদের মা শহরের দিকে যাত্রা করে। একটা নদীর ধার দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মায়ের কি খেয়াল হয়, নদীর পাঁকের ভিতর তাহার কোলের ছেলেটাকে পুঁতিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। দূরে দুই জন মুসলমান গ্রামবাসী কাজ করিতেছিল, তাহারা দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে বাঁচায়। তাহারা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কেন এমন কাজ করিতেছিলে?" মেয়েটি উত্তর দেয়, "ওকে এত যন্ত্রনার মধ্যে বাঁচাইবার চেয়ে মারিয়া ফেলা কি ভাল নয়!"

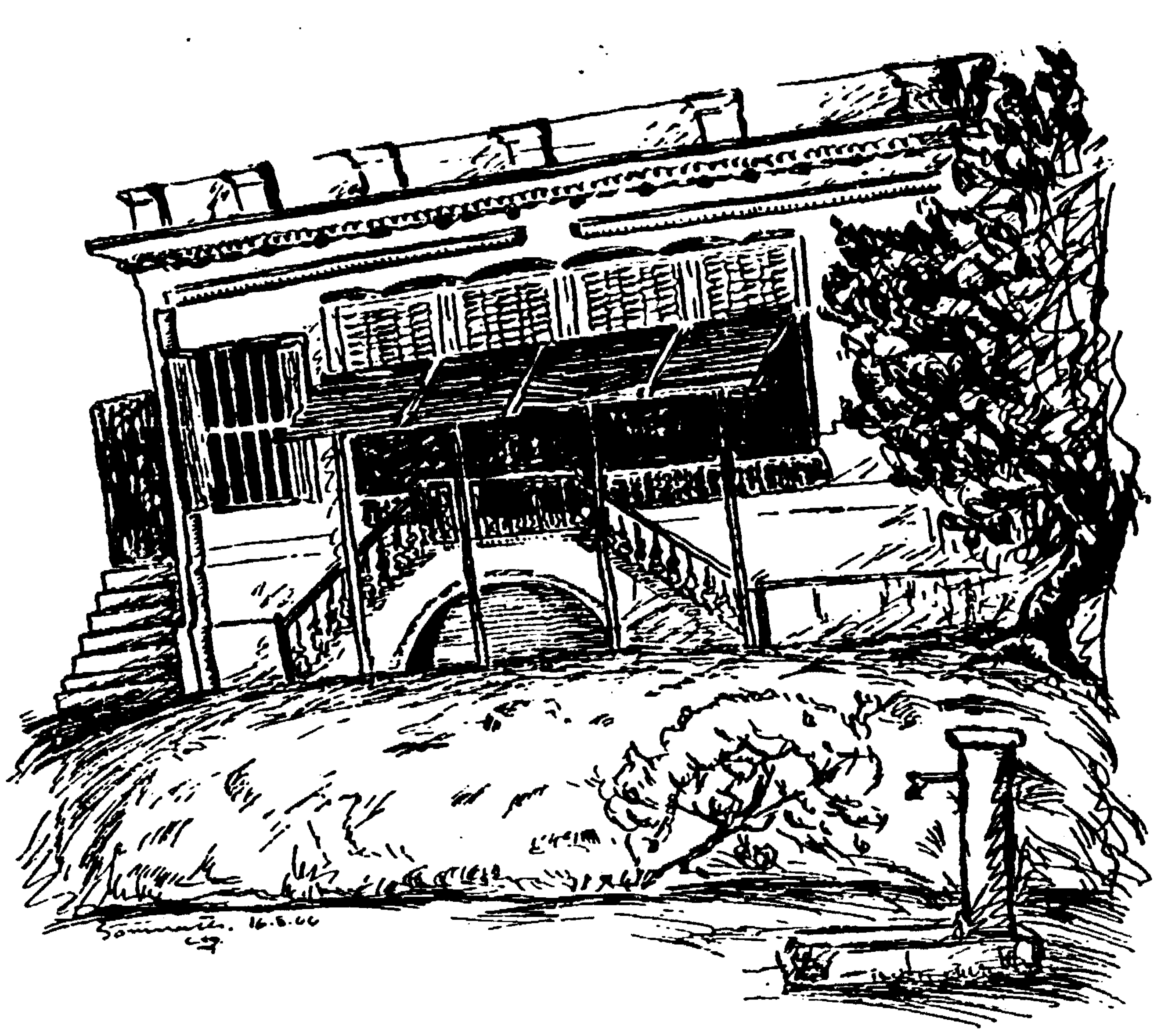

* দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের শহরের বাড়ী—রহমতগঞ্জ *

১৯২১ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের সময় এই বাড়ীতে ধর্ম্মঘটীদের ঘাঁটি ছিল। এখান হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় নেতার নির্দ্দেশ নিতেন। রেলওয়ে ও অন্যান্য শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যয়ভারে অবশেষে যতীন্দ্রমোহনকে এই বাড়ী বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বাড়ীতে বসিয়াই যতীন্দ্রমোহনকে মাত্র তিন মাসের জন্য ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনে যোগ দিবার পর ঐ তিন মাসের কথা ভুলিয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

চাঁদবালা জলদাস এক জেলের বউ। দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাক্কায় তাহার স্বামী মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়, এখন সে চট্টগ্রামের পতিতালয়ে। ঘর ছাড়িবার ছয় মাস পরে একবার তাহার অনুতাপ হয়, সে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীর কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু পতিতা বলিয়া কেহ তাহাকে সাহায্য করে না, সে আবার পণিকাবৃত্তিতে ফিরিয়া গিয়াছে। হরিবালা জলদাস ছিল বিধবা। সে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল, এবং নিয়মিত বৈধব্য ব্রত পালন করিত। তাহার বয়স ১৭ বৎসর। দুর্ভিক্ষের সময় ভিক্ষাও যখন অমিল হইল তখন সে গেল মিলিটারীর কাছে। এখন সে পতিতালয়ে।...ধনবাসী জলদাসের বয়স ২৫ বৎসর। তাহার একটি সাত বৎসরের ছেলে ছিল, এই ছেলেটিকে সে কখনও চোখের আড়াল করিত না। একবার তাহার ছেলের খুব অসুখ হয়, সে তখন ছেলের জন্য মানত করিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার পূজা করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় মজুতদার প্রতিবেশীর বাড়ীতে যখন ভিক্ষা পাইল না, তখন এই ছেলেকে সে ১০ টাকায় এক সাহেবের কাছে বিক্রী করিয়া দেয়। ছেলেকে বেচিয়া দিয়া সেই দিন সারারাত সে এই বলিয়া কাঁদিয়াছে—"কত লোকের দুয়ারে ভিক্ষা চাহিলাম, অথচ কেহ একটু ফ্যানও দিল না। দুর্ভিক্ষ থামিলে আবার ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব, আবার সে আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে এই রমণী এক সৈন্যের সঙ্গে আরাকান চলিয়া গিয়াছে।

এমনি ভাবে বাঙ্গলার হাজার হাজার মা রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিয়াছে কণ্ট্রাক্টর, ব্যবসাদার, সরকার সকলেরই অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য আছে অথচ এই নির্দ্দয় সমাজে তাহার কোলের ছেলেকে বাঁচাইবার পথ নাই। তাহারা দেখিয়াছে যে টাকা দিয়া তাহার ছেলে কিনিবার লোক আছে, তাহার সতীত্ব কিনিবারও লোক আছে, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার লোক নাই, তখন তাহারা তাহাদের মাতৃত্বের প্রতি, নারীত্বের প্রতি, সমাজের প্রতি সকলের প্রতি সমস্ত আস্থা হারাইয়াছে।

গিন্নীবালা জলদাস দুর্ভিক্ষের সময় মিলিটারী লেবর কোরে কাজ নেয়। সেখানে সে প্রথম তাহার আত্মসম্মান হারায়। কিন্তু ভয়ে ও লজ্জায় সমাজে সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। এখন সে চট্টগ্রাম শহরে সাহেব পাড়ায় পেশাদারী গণিকাবৃত্তি করিতেছে।

বামাসুন্দরী দুর্ভিক্ষের সময় লেবর কোরে যোগ দেয়। সেও গিন্নীবালার মত আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়াছে।

জেলেদের এক পাড়া হইতে এই রকম ২৫টি মেয়ে সমাজচ্যুত হইয়াছে।

দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা

নিরবালা, রূপেশ্বরী ও শৈলবালা তিন জনই জেলের মেয়ে, বয়স যথাক্রমে ২৮, ২৫ ও ৩০ বৎসর। পেটের জ্বালায় তাহারা এক কণ্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করিতে যায়। মাইনে ঠিক হয় দৈনিক বার আনা। কণ্ট্রাক্টরের কুৎসিৎ প্রস্তাবে ভীত হইয়া তাহারা চাকরী ছাড়িয়া অন্যত্র কাজ নেয়। কিন্তু চট্টগ্রামের সমাজজীবনে কণ্ট্রাক্টর সর্ব্বশক্তিমান। সে তাহাদের তিনজনকেই জোর করিয়া তাহার অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছে। তাহারা আজও সেখানে আছে।

শুধু যে জেলের মেয়েরই এই অবস্থা হইয়াছে তাহা নয়। এক ভদ্র রমণীর কথা জানি। তাহার স্বামী রেঙ্গুন হইতে অপসারণের সময় কলেরায় মারা যায়। রমণীটি কাট্টলীতে তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ভাইয়ের এমন সাধ্য ছিল না যে ভগ্নীর ভরণপোষণ করে। উক্ত রমণীটি তখন মিলিটারীর অধীনে চাকুরী করিতে যায়। এখন তাহার অবস্থা জেলের মেয়েদের মত।

এই বেদনার মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী পাতার পর পাতা লিখিয়াও শেষ করা যাইবে না।

এই ভাঙ্গনের গতি রোধ করা যায় কিনা সে তর্ক আজ অবান্তর। বাংলাকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য সকলের সমস্ত শক্তি একত্র করিব কি করিব না এই দ্বিধা যদি এখনও থাকে আমাদের সমাজ ও সভ্যতার মৃত্যু অনিবার্য্য। আজ নিজে বাঁচিতে হইলে সকলকে বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেককে অগ্রসর হইতে হইবে; সে জন্য চাই যথেষ্ট স্বদেশপ্রেম।

—ভবানী সেন

প্রাদেশিক কৃষক সভার নূতন বই

"কৃষি সংকটের নূতন রূপ"

দাম—ছয় পয়সা

অস্তি ও চিমুর বন্দীদের বাঁচাও

দল মত নির্ব্বিশেষে দেশভক্তের সাড়া

সম্মিলিত কমিটি

অস্তি ও চিমুরের ১৫ জন তরুণ বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত দেশে দল মত নির্ব্বিশেষে জনমত তৈয়ারী হইয়াছে। কলিকাতার এই আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত ছাত্র ও জনসাধারণকে টানিয়া আনার জন্য কলিকাতা সিটি ছাত্র ফেডারেশন অগ্রণী হয়। ছাঃ ফেঃ-র উদ্যোগে আহূত এক সভায় কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট নেতা, অধ্যাপক, বিশিষ্ট চিকিৎসক, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিদের লইয়া "অস্তি ও চিমুর বন্দীদের বাঁচাও" কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু। সভ্যদের মধ্যে আছেন বড়বাজার কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা, শ্রীযুক্ত জে, সি গুপ্ত ও কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, "যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য ও ধীরেন সেন, ডাঃ নীহার মুন্সী ও সুনীল দত্ত, কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড ভবানী সেন ও বঙ্কিম মুখার্জী, বঃ প্রাঃ কৃষক সভার সম্পাদক মনসুর হবিব। কমিটি গঠনের সভায় বাংলার লীগের সম্পাদক মৌঃ আবুল হাসেম এবং কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র লীগের প্রতিনিধিরা সভায় জানান যে যত শীঘ্র সম্ভব ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করিয়া তাঁরা এই কমিটিতে যোগদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। গণসহি সংগ্রহের জন্য কমিটি যে স্মারকলিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই কলিকাতার ১১৯জন বিশিষ্ট আইনজীবী সই করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রীনির্ম্মল চ্যাটার্জীর স্বাক্ষরও আছে। অধ্যাপক কালিদাস নাগ, বটকৃষ্ণ ঘোষ, য়ুনিভার্সিটি কলেজ টিচার্স এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণী মোহন রায় প্রমুখ ১০৭ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর পাওয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, মদনলাল মিশ্র, নলিনাক্ষ সান্যাল স্মারকপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন। কলিকাতার শ্রমিক, ছাত্র, নাগরিক ও মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সহি সংগ্রহ ইতিমধ্যে সুরু হইয়াছে।

'আমার পূর্ণ সমর্থন আছে'
শ্রীযুক্তা নাইডুর বাণী

এদিকে ক'লজে কলেজে ছাত্ররা সভা করিয়া এই বন্দীদের প্রাণ রক্ষার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। ছাঃ ফেঃ, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস প্রত্যেকেই এই কাজে নামিয়াছে। ছাঃ ফেঃ-র পক্ষ হইতে তাই মির্জাপুর ছাঃ ফেঃ ও ছাত্র কংগ্রেসের নিকট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য আবেদন জানান হয়। কিন্তু "কমিউনিষ্ট"দের সঙ্গে অসহযোগের নামে এঁরা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু নেতারা যাই বলুন, ছাত্র কংগ্রেস ও মির্জাপুরের স্থানীয় কর্মীরা কলেজে কলেজে মিলিত আন্দোলন সুরু করিয়াছে। সরোজিনী নাইডু যখন জানিতে পারেন যে তরুণ বন্দীদের বাঁচাইবার কাজে পর্য্যন্ত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান গুলি ঐক্যবদ্ধ হইতে নারাজ তখন তিনি য়ুনিভার্সিটি ও ল'কলেজের ছাত্রদের কাছে তাঁর বক্তৃতায় আহ্বান জানান যে দল ও মতামত নির্বিশেষে প্রত্যেককে এই আন্দোলনে মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। কলিকাতা-ত্যাগের দিন কঃ সিঃ ছাঃ ফেঃ-র সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বলেন: তোমাদের এই আন্দোলনে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আমি আশা করি তোমাদের এই মহৎ কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে কারও আপত্তি থাকিবে না। একথা আমি মুখে বলিলেও, আমার নাম করিয়া প্রেসে বা প্রকাশ্য ভাবে তোমরা জানাইতে পারো।"

লীগপন্থীদের সাড়া

দিল্লী বার এসোসিয়েশনের ১৪১ জন সদস্য বন্দীদের প্রাণদণ্ড মকুব করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এবং কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট দলের সদস্যগণ আছেন।

দিল্লীর মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও লীগ-পন্থী সংবাদপত্র সমূহ এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে: "যদি এই ১৫ জন যুবককে ফাঁসী দেওয়া হয় তবে আইন ও শৃঙ্খলার নামে মানবতাকেই হত্যা করা হইবে।"

নিঃ ভাঃ কৃষক সম্মেলন
৫০ হাজার টাকা চাই

নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ শুরু হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের শেষভাগে স্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইবে। একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভা ও অর্থ সংগ্রহ চলিতেছে। সম্মেলনের যাবতীয় কাজের জন্য ৫০,০০০৲ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

নেত্রকোনা শহরের সন্নিকটেই সম্মেলনের জন্য যে ৩০ একর জমি ঠিক করা হইয়াছে তাহাতে এক লক্ষ লোক সমাবেশ হইতে পারে এরূপ একটি সভামণ্ডপ ও দশ হাজার লোকের বাসস্থান তৈরী হইবে। কৃষকরা তাঁহাদের সাধ্যমত ধান চাউল, বাঁশ ইত্যাদি দান করিতেছে। সারা ভারতের কৃষককে অভ্যর্থনার আয়োজনে বাংলার দেশবাসী সাহায্য করুন।

অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গাছ কাটা

পাহাড়ের ঠিক ওপরে রাশিয়ার গোর্কি শহর। শহরের পার্কে দাঁড়ালে দূরে পাহাতলীর মাঠ দেখা যায়। মাঠ পেরিয়ে গ্রাম। গ্রামের ও-মুড়োয় রেলের লাইন।

পার্কের ঠিক পাশ দিয়ে গেছে পাথুরা নদী।

লেনিনের জীবন থেকে একটি গল্প

নদীর দিকে রাস্তাটা যেখানে ঘুরে গেছে, সেখানে ছিল পার্কের সব থেকে উঁচু একটা গাছ।

গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে প্রায়ই এই রাস্তাটা দিয়ে লেনিন নদীতে যেতেন। রাস্তার এই জায়গাটায় এসে প্রায়ই তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের চলন্ত রেলগাড়ী দেখতেন। রাস্তার ওপর ঝুঁকে-পড়া গাছটার ডালপালায় নীচটা অন্ধকার হ'য়ে থাকতো। গরম কালে ছেলের দল গাছটার ছায়ায় নীচে খেলা ক'রত, আর কর্ম্মক্লান্ত মানুষেরা এর নীচে দুদণ্ড বিশ্রাম ক'রে নিত।

একদিন লেনিন এসে দেখলেন, সে গাছ আর নেই। কারা যেন কুড়ুল দিয়ে গাছটার আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

লেনিন ত রেগেই আগুন। তক্ষুণি শহরের কম্যাণ্ডেন্টের ডাক প'ড়ল। গাছ কাটলো কে? পাহারা দেবারই বা কেন ব্যবস্থা হয়নি?

কম্যাণ্ডেন্ট ত' অবাক্। গাছ তিনিই কাটিয়েছেন শহরে বেড়া তোলার জন্যে। লেনিন শুনলেন না কম্যাণ্ডেন্টকে গ্রেপ্তার করার হুকুম হ'ল। লেনিন তাঁকে কড়া ক'রে ব'ললেন, 'বেড়া লাগাবার জন্যে ত' আর পার্কে গাছ লাগানো হয় নি। বুড়োধাড়ি হ'য়েও এইটুকু জ্ঞান নেই?'

কম্যাণ্ডেন্ট অনেক ক'রে মাপ চাইলেন। কিন্তু ফল হ'ল না।

লেনিনের বাড়ীর লোকের মধ্যেও কেউ কেউ লেনিনকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। লেনিন তার উত্তরে বললেন, উনি নিজে একজন কম্যাণ্ডেন্ট, যে কোন সাধারণ লোক ত' নন জনসাধারণের ধনসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যাঁর ওপর, তিনিই যদি সে সম্পদ ধ্বংস করেন—তাহ'লে তাঁর অপরাধের ক্ষমা নেই।

কমাণ্ডাণ্টকে পার্কের গাছ কাটার দায়ে পুরো তিন দিন গারদবাস ক'রতে হ'ল।

★ কিশোরদের কথা ★

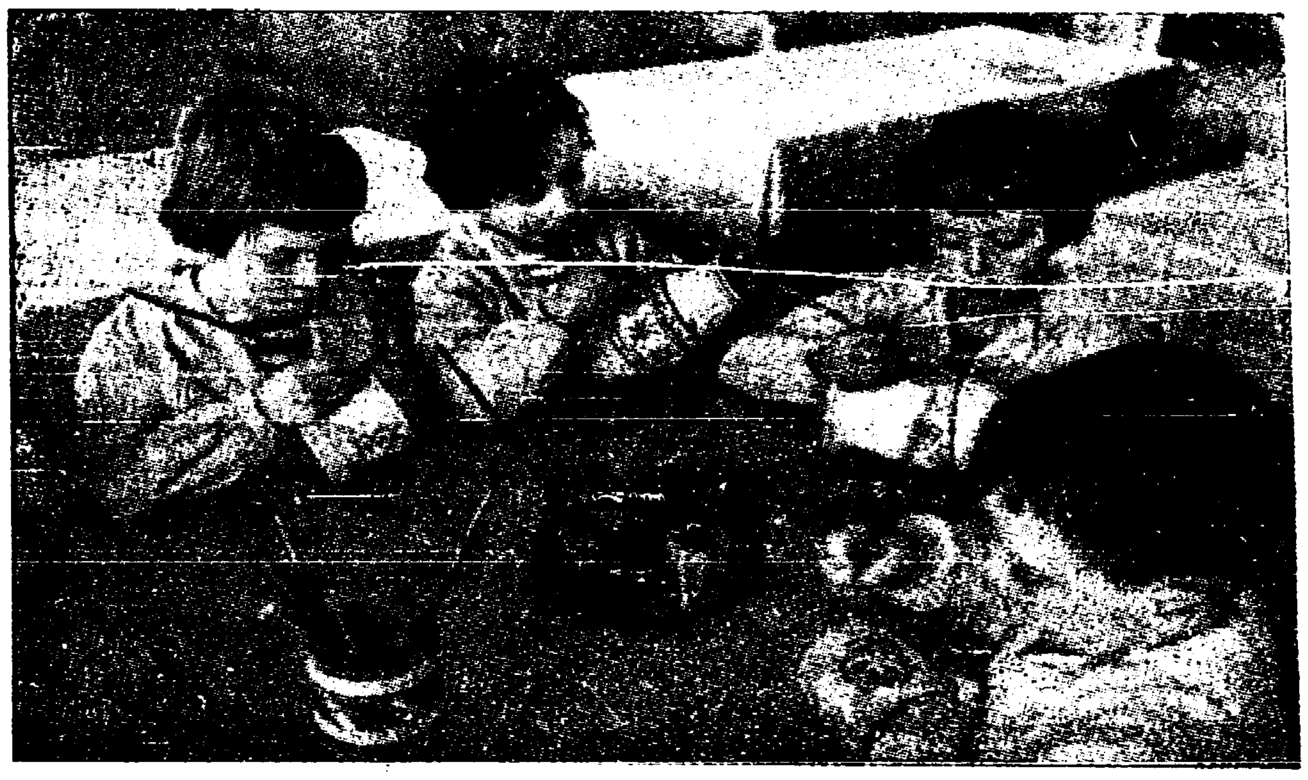

সে ভি‌য়েটের ছেলে মেয়ে

শ হী দ কি শো র

জানোয়ারের বাচ্চা জানোয়ার হ'লেও দারোগার বাচ্চা কখনো কখনো মানুষ হয়। ঝণ্টু সেই ধরণের মানুষ। বাপ তার মস্ত দারোগা নাম ব'লবো না। তবুও আমাদের পাড়ার যারা থাকো তারা তাঁকে চিনতে পারবে। ঝণ্টু শুধু কথায় নয়, পড়াশুনায়ও ভালো ছিলো। আমরা তাকে 'সিপাহী কা বেটা' ব'লে ক্ষেপালেও সে কিছু ব'লতো না, চুপ ক'রে থাকতো।

'স্বাধীনতা দিবসে' আমরা ঝণ্টুকে ধ'রলুম পতাকা কেনো। প্রথমে সে কিছুতেই কিনবে না বলে, বাবা মারবে। শেষে আমাদের জোরজবরদস্তিতে বাধ্য হ'য়ে একখানা কিনে বুকে লাগালো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চ'লে গেলো।

ঝণ্টু আন্দাজ ক'রেছিলো তার বাবা এতোক্ষণে থানায় বেরিয়ে গেছে, কিন্তু বাড়ী ঢুকেই চমকে উঠে দেখে সামনে তার বাবা দাঁড়িয়ে—সাজ গোজ ক'রে বোধ হয় থানায়ই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝণ্টুর বুকে পতাকা দেখে ব'লে উঠলেন: দেখি দেখি, ওটা কী তোর বুকে? 'ও কিছু নয়, বাবা' ব'লে ঝণ্টু তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলো, তার বাবা খপ ক'রে হাতটা ধ'রে ফেলে জিনিসটা ভালো ক'রে দেখেই একটা চড় কষিয়ে ব'ললেন: 'এই সব করা হ'চ্ছে?'

হঠাৎ কেন জানিনা এই প্রথম ঝণ্টু ঝাঁজালো মেজাজে তার বাবাকে জবাব দিলো—'অন্যায় তো কিছুই করিনি, বাবা!'

'ও, স্বাধীনতা দিবসে বুঝি একেবারে স্বাধীন হয়ে গেছো', তাই পটপট মুখের ওপর জবাব দিচ্ছো' ব'লেই তিনি বেদম প্রহার শুরু ক'রলেন। দারোগার চোর ঠেঙানো মার! ফলে সেই রাত্তিরেই ঝণ্টুর জ্বর এলো।

তারপর কয়েকদিন আর ঝণ্টুর কোনো খবর পাইনি। হঠাৎ সেদিন বিশু দৌড়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলো, ব'ললো, 'শিগ্‌গির চল্‌, ঝণ্টু মারা যাচ্ছে।'

গিয়ে দেখি সত্যিই ঝণ্টুর জীবন শেষ হ'য়ে আসছে। একটু পরেই সে মারা গেলো। কেউ কেউ কেঁদে উঠলো, কিন্তু ঝণ্টুর মা পাথরের মতো নীরব। হঠাৎ ঝণ্টুর মামা ঝণ্টুর বুকের চাদর তুলে ফেললেন, দেখা গেলো ঝণ্টুর বুকে তখনো সেই পতাকাটা জামার সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা, দেখেই ঝণ্টুর মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

আমরাও চ'মকে উঠলুম, ভাবলুম: স্বাধীনতার লড়াইয়ের লক্ষ লক্ষ শহীদের পাশে কি ঝণ্টুর ঠাঁই হবে না?

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

জনরব

পাখি সব করে রব রাত্রিশেষ ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি; অন্ধকার হ'য়ে আসে ফিকে,
আমার ঘরেও রুদ্ধ অন্ধকার, স্পষ্ট নয় আলো
পাখিরা ভোরের বার্ত্তা অকস্মাৎ আমাকে শোনালো।
স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি অন্ধকারে খাড়া করি কান
পাখিদের মাতামাতি শুনি মুখরিত ঐকতান;
আজ এই রাত্রি শেষে বাইরে পাখির কলরবে
রুদ্ধঘরে ব'সে ভাবি হয়তো কিছু বা শুরু হবে,
হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল,
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল;
স্বপ্নের কুসুমকলি হয়তো বা ফুটেছে কাননে
আমি কি খবর রাখি? আমি বদ্ধ থাকি গৃহকোণে।
মধ্যবিত্ত মন নিয়ে চিরকাল অন্ধকারে বাসা,
তাইতো মুক্তির স্বপ্ন আমাদের নিতান্ত দুরাশা।
জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা,
দিকে দিকে প্রতিদিন অবিশ্রান্ত শুধু যায় শোনা;
এরাতো নগণ্য জানি, তুচ্ছ ব'লে ক'রে থাকি ঘৃণা
আলোর খবর এরা কি ক'রে যে পায় তা' বুঝি না।
এদের মিলিত সুরে কেন যেন বুক ওঠে দুলে,
অকস্মাৎ পূব দিকে মনের জানলা দিই খুলে
হঠাৎ বন্দর ছাড়া বাঁশি শুনি বাণিজ্য জাহাজ,
চকিতে আমার মনে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ হয় আজ।
অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাকচক্র ধ্বনি,
দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি;
মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি কারখানার তীব্র শাঁখ,
তবে কি হবে না জমা সেখানে জনতা লাখে লাখ?
জন-পাখিদের গানে মুখরিত হবে কি আকাশ?
—ভাবে মধ্যবিত্ত মন, চিরকাল অন্ধকারে বাস।
পাখিদের মাতামাতি বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠেনি সূর্য, তবু আজ শুনি জনরব।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

বাংলার পল্লীকবি

রমেশ শীল

এই বছরের ৬ই আশ্বিন সংখ্যায় 'জনযুদ্ধে' সুভাষ মুখোপাধ্যায় চাটগাঁয়ের শ্রেষ্ঠ কবি রমেশ শীল ও তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়ার কথা লেখেন। সেই লেখা পড়ে একটা বড় রকমের উৎসাহ ছিল ওঁদের সঙ্গে দেখা করার। গ্রামের মানুষ তাই কবি গান আগেও শুনেছি। তবু শ্রদ্ধেয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে কবি গুমানি শেখের কথা অনেকবার শুনে মনে মনে বেশ একটা লোভ ছিল এই নূতন ধরণের কবি দর্শনের।

রমেশ শীল কেবল নূতন ধরণের নন—আসলে জাত কবি। বয়সও প্রায় ৬০ বছর হয়েছে। প্রথমে দেখে গ্রামের একটী বৃদ্ধ মোড়ল বলে ভুল হয়। কিন্তু মোড়লের মত গাম্ভীর্য্য নেই মুখে—আছে শিল্পীর কোমলতা—আর শিশুর মত হাসি। কিন্তু যখন কবিগান করতে ওঠেন এবং বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তির বাণ নিক্ষেপ করেন তখন সেখানে ফুটে ওঠে সিংহের বিক্রম।

রমেশ উঠলেই আসরে সাড়া পড়ে যায়—ছেলে বুড়ো সকলেই সমস্বরে বলে ওঠে "এইবার রমেশ উঠছেন।" বিপক্ষের হার তখন থেকেই সুরু।

কথার মোলায়েম ছুরি চালানোর বিদ্যাটা তাঁর অন্য দিক থেকে এসেছে। বাবা ক্ষত রোগের চিকিৎসা করতেন। যে সব রোগী সহরের ডাক্তারদের কাছে পৌঁছাতে পারত না বা যারা সেখান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতো নানারকম গাছপালার ওষুধে তাদের ঘা সারানো ছিল ব্যবসা। রমেশ শীলও এটা শিখেছিলেন। আজো মাঝে মাঝে রোগীর বায়না আর গানের বায়নার মধ্যে কোঁদল বাধে। জীবন ভরে যিনি যন্ত্রণায় প্রলেপ দিয়ে এসেছেন—তিনি যে কি গান গাইবেন তা বোঝা কষ্টকর নয়।

৪০ বছর আগে এই উদীয়মান ক্ষত চিকিৎসক সহরে এসে শোনেন বিখ্যাত কবি গাইয়ে মোহন বাঁশী জলরাম ও চিন্তাহরণের কবিগান। রাস্তার ধারে আসর বসেছে—লোকে লোকারণ্য। দুটী একেবারে নিরক্ষর লোক—ছন্দের পর ছন্দ রচনা করে যাচ্ছে আর শুনছে শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই। গাছ গাছড়া দিয়ে দুরারোগ্য ক্ষত সারানোর কবিরাজ রমেশের মনে বিস্ময় হ'ল "কিসের জোরে এরা পদপূরণ করে; তারপর দিন নেই, রাত নেই স্বপ্নে, জাগরণে, পথে ঘাটে শুধু পদপূরণের চেষ্টা করেছি।"

দেশে সবেমাত্র রেল লাইন বসেছে। জমিগুলি সব বিদেশীরা কিনে নিচ্ছে—নদীর দুধারে বসেছে বিদেশীর কাঁপা কারবার। সাগর ও পাহাড়ের মাঝে গড়া সুন্দর চট্টগ্রামের বুকে কুৎসিত ব্যাধির গুটিকা যেন! আমার প্রথম কবিগান তাই চট্টগ্রামের এই বৃত্তান্ত নিয়ে। কিন্তু সে কেবল আবেগ আর মিলের প্রথম কোলাকুলি মাত্র।

পরের বছর আবার শহরে এসে বসেছে—সেই কবিদের আসর। মোহন বাঁশীর বিপক্ষ কবির হঠাৎ গলা ধরে গেল—আসর মাটি হয়ে যায় আর কি। শুধু তাই না—বায়নার টাকা মাঠে মারা যাবে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠলো। আসরের একদিক থেকে কয়েকজন মুসলমান শ্রোতা রমেশকে তুলে দিল। মোহন বাঁশী এসে বল্লেন "ভাই, কোন রকমে রাত দশটা বাজিয়ে দাও তা হলেই টাকাটা পাওয়া যাবে।" সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান, তাও আবার শহরে—রমেশের সেদিন ভয়ে কাঁপুনি ধরেছিল। কিন্তু মোহন বাঁশী হঠাৎ গানের মধ্যে কবিসুলভ গালিগালাজ করলেন। ব্যস—আর যাবি কোথায়—"উত্তর দিতে গিয়েও সে এক বিপদ—পদ কি সহজে জোটে? মোহন বাঁশী যদি "শালা" বলেন তো আমি "মালা" দিয়ে পদপূরণ করি। কিন্তু রাত দশটার জায়গায় পরের দিন দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙ্গে না। শেষে শ্রোতারা বল্লে "জোটক দাও" (গানের শেষে দুই পক্ষের মধ্যে রফা)। কিন্তু জানলে তো দেব? বল্লাম—"যে হারবে সে আসর ছেড়ে চলে যাবে।" কিন্তু মোহন বাঁশী সরকার একটা ছোট ছেলের কাছে কি হারতে পারেন? অগত্যা শ্রোতারা নিজেরাই গান ভঙ্গ হল বলে ঘোষণা করলেন।" এই দিন থেকে রমেশ শীল বিখ্যাত হয়ে গেলেন—শ্রোতারা জেনে গেল—মোহনবাঁশী হেরেই গেছেন।

এর কিছুদিন পরে রমেশের জীবনে আর একটা বিরাট প্রভাব এসে পড়ে। চট্টগ্রামে মাঝভাণ্ডার বলে একটা জায়গা আছে। এখানে একজন পীর থাকতেন। এটা পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের একটী অত্যন্ত প্রিয় তীর্থ। বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় এখানে এবং প্রার্থনা চলে গানের মারফতে। রমেশ এখানে এসে ঐ পীরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। রমেশের আগে অনেক কবিওয়ালা ওখানে অমর হয়ে রয়েছেন—কিন্তু রমেশ এতই প্রিয় হয়ে যান যে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই আজ তাঁকে মাঝভাণ্ডারের মাঝি বলে ডাকে। এই জন্য রমেশকে পুরাণ ও কোরাণের অনেককিছু জানতে শুনতে হয়েছিল। এই গানগুলিতেও ছিল—তত্ত্বপ্রধান গুরুভক্তি, বিশ্বাস, অধ্যাত্মবাদ ও বিচ্ছেদপ্রধান গান। এই গানগুলি নিয়ে রমেশের কয়খানা বই হয়েছে—আসঙ্গমালা, শান্তিভাণ্ডার ও সত্যদর্পণ। এই মাঝভাণ্ডারের মারফৎ রমেশ শুধু চাটগাঁয়ে নয়—প্রায় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু তত্ত্বকথায় ডুবে পৃথিবীর দৈনন্দিন ক্ষত ভুলে থাকার লোক রমেশ নন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ক্ষুদিরামের ফাঁসী, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ, বিধবা বিবাহ ও জাতবিচারের প্রসঙ্গ কবি রচনা করেছেন। স্বাধীনতা ও প্রগতির উন্মাদনায় সমগ্র জাতির সঙ্গে কবিও মেতেছেন এবং মাতিয়েছেন চট্টলের লোককে। এর পরে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস। বার বার পুলিশের চাপে কবিগান বন্ধ হল। কিন্তু তাদের অগোচরে বহু গান রচিত হয়েছে এবং লোকের মুখে মুখে সে গান ছড়িয়ে পড়েছে।

তবু অত্যাচারের ফল ফললো: চট্টগ্রামের সাধারণ কবিগানে হতাশার মধ্য দিয়ে দেখা গেল—অশ্লীলতা, গালাগালি ও কুটতর্ক। রমেশের ভাষায়: "মনে বড় বিক্ষোভ এল—দেখি ভদ্রলোকেরা আর গান শুনতে চায় না এবং গরীব লোকেরা নেশার মত গেলে এই অশ্লীলতার কড়া মদ।" প্রতিকারের জন্য সমস্ত জেলার কবিরা সমবেত হয়ে এক সমিতি গড়লেন। "রমেশ উদ্বোধিনী কবি সমিতি।" এখানে নিয়ম করা হল—অশ্লীল গান যে গাইবে—তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। এ প্রায় ৫।৭ বছর আগের কথা। কিন্তু তার পরে এই যুদ্ধ—সারা জাতির জীবনের বিভ্রান্তি ওদের জীবনেও। শিল্পের প্রতি প্রবল মমত্ব বোধে অশ্লীলতা দূর করা গেলেও কিসের উপরে গান রচনা করতে হবে তাকি দেশও জানতো? "রমেশ উদ্বোধিনী কবি সমিতি" তাই বেশী দিন টেঁকেনি।

কিন্তু বর্ম্মা পতন, সেখান থেকে অসংখ্য লোকের ফিরে আসা, জাপানী বোমা ও ১৯৪২ সালের জাতীয় ও অর্থনৈতিক সংকট আবার এদের সহজাত স্বদেশ প্রেমকে নাড়া দেয়। মানুষের এই বিপর্য্যয় চোখে দেখার পর হতাশাগ্রস্ত 'রমেশ উদ্বোধিনী সমিতি'র কবিরা এবারে নূতন করে "চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি" গঠন করেছেন। রমেশ তার সভাপতি ও ফণী বড়ুয়া সম্পাদক। সেখানে আরো আছেন রমেশের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু বরদা, নিবারণ, রায় গোপাল গোবিন্দ ও হেদায়ত। প্রত্যেক মাসে ২৫শে তারিখে এঁদের সমিতির সাধারণ সভা হয়। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্য্যন্ত বৈঠক চলে। সেখানে সমিতির কাজের কথা ছাড়া নূতন কবি গান গাওয়াও হয়।

রমেশ বল্লেন যে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রী বলেছিলেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে আসরে না নামাই ভাল। তিনি বরং রচনা করে যাবেন আর শিষ্যরা গাইবে। কিন্তু গানের নূতন বিষয়বস্তু এবং জনসাধারণের দুর্দ্দশা রমেশকে বিশ্রাম নিতে দেয় নি। রমেশ বল্লেন: এত অভাবে পড়ে আছে মানুষ, মানুষ আজ আর মানুষ থাকছে না—কেমন যেন একটা মতিচ্ছন্ন অবস্থা এ জেলার। তবু যখন এই নিদারুণ অবস্থার বাপক ছবি আর পুরানো দিনের গৌরব গানের মধ্যে তুলে ধরতে আরম্ভ করি তখন দেখি মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে। আমাদেরও ডাক পড়ে বার বার। বয়সের অজুহাতে সে ডাক ফেরাই কেমন করে। বিদ্যা আমার বেশী নেই জানি, কিন্তু গাছ পালা দিয়ে তো ঘা সারিয়ে এসেছি এতকাল। মতিচ্ছন্ন চট্টলের মনকে সারাবার উজ্জ্বল আশা বৃদ্ধ কবির চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

—সুধী প্রধান

আশুতোষ চৌধুরী

চট্টগ্রামের পল্লীকবি আশুতোষ চৌধুরী খাঁটি বাঙালী কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যে বাংলার গ্রাম্যজীবনের আনন্দ-বেদনার রসায়িত রূপ, তাঁহার ছন্দে লোককাব্যের অকৃত্রিম সুর—সব কিছু মিলাইয়া পল্লীবাংলার প্রতিচ্ছবি তাঁহার কাব্যে। 'গীতিকা' কাব্যের উৎসর্গপত্রে বাংলার পল্লীগায়কদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন—

'তোমাদের গান শুনেছি আবেগ ভরে
ঘাটে বাটে আর ঢেউ-তোলা সেই
শ্যামল মাঠের পরে।
কভু বা নিশীথ রাতে,
নদীপথ বাহি ছুটে চলেছিনু
মাঝি মাল্লার সাথে।
কল্প-বিহারী মন
জারি সারি আর ভাটিয়াল রাগে
হয়েছিলো নিমগন।
মোর গীতিকায় জাগিতেছে সেই সুর,
চাষী-মজুরের সোনার বাংলা
যেই গানে ভরপুর।'

ইহা কোন শহুরে কবির কল্পনাবিলাস নহে, পল্লীকবি আশুবাবুর ইহাই ছিল জীবন-সাধনা।

আশুবাবু তাঁহার আপন আবেষ্টনীকে মনেপ্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসার মধ্যেই ছিল তাঁহার কাব্যের উৎস। নদ-নদী, খাল-বিল—প্রকৃতিক সমস্ত কিছুর সঙ্গে তিনি মানুষের মনের বন্ধন অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া গ্রামের মানুষ তাহার সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের কাহিনী বলে। খরস্রোত নদীকে ডাকিয়া কবি তাঁহার প্রাণের আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন।

'কোনখানে যাও বইয়া রে …
নন্দী, কোন খানে যাও বইয়া।
কই থাকি আসিলা নন্দী—
কিসের লাগিয়া রে। …
কোন বা পন্থে যাও।'

আশুবাবু গ্রামের সাধারণ মানুষের সহিত অকুণ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। আশুবাবুর কণ্ঠে তাই খাঁটি গ্রাম্যজনেরই ভাষা। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যে শব্দভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতেই আশুবাবু তাঁহার কাব্যে শব্দ আহরণ করিয়াছেন। জলপথের নাড়ীনক্ষত্র তাঁহার জানা; সে পথের কোথায় চর, কোথায় আবর্ত্ত—মাঝিকে তাহার সন্ধান দিয়া কবি বলিতেছেন—

'কালাপানি ধলা পানির
মধ্যে ডুবা-চর,
গাছ-বিরিক্ষ নাইরে কিছু
সে চরের উপর:
এই পন্থে চালাইতে ডিঙা ডানেবামে চাইও।
… না যাইও না যাইওরে বন্ধু
ধলা পানির বাঁকে,
হাঙ্গর কুম্ভীর সেথা খাপে বইসা থাকে;
সামনে যদি আসে বালাই পীরের দোহাই দিও।
… দক্ষিণা সায়রের দিকে
না যাইও দূরে;
পাহাড়িয়া নদীর মুখে
পাকে পানি ঘুরে।
… হাইরা কোণে বাইরার মেঘ
তার উপরে দেয়া,
ঝিক্কি-ঠাডার দেখ যদি
না দিও রে খেয়া;
দীঘল পাড়ি যোগাইতে মেঘের গতি চাইও।

পৌষের শীতে রাত্রি জাগিয়া জেলের দল গাঙে মাছ ধরিতে যায়। আশুবাবু জেলেদের এই শ্রমকঠোর জীবনেরও ছবি আঁকিয়াছেন—

'পুষমাস্যা শীতের কাল …
'বেইন' জাল বোসাইলাম রাইতে
দেরী হইল খাইতে দাইতে,
উজান গাঙে নাও বাইতে
ভাইঙা গেল হাল।
কাঁইচার মুখে ডুবাচর—
সেই জাগাতে মাছের ঘর,
হুরাহুরী পৈড়া গেলে
ছিড়া যায়গো জাল।
কুতুবদিয়ার উত্তর বাঁকে,
'ভাইল্যা', 'কাইগ্যা' জাগ দি থাকে—
লড়া পাইলে একিকারে,
ফালের উপর ফাল।

গ্রামের বহুমুখী জীবনের ছবি আশুবাবুর কাব্যে। এই জীবনের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে তিনি ইহাদেরই মুখের ভাষায় ফুটাইতে পারিয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে ইহাদেরই সঙ্গে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, ইহাদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

কৃষকের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের মর্ম্মব্যথা তাই তাঁহার কণ্ঠে বাজিয়াছে—

'আমি ধাঁধায় পড়ে মরি—
হাটে গেলে হাটের ধাঁধাঁ
গিরাতে নাই কড়ি।
আমি ধাঁধাঁয় পড়ে মরি রে—
ধাঁধাঁয় পড়ে মরি।
মাঠে গেলে মাঠের ধাঁধাঁ
হাল চষা যে দায়;
জুয়াল কাঁধে তুলে দিতে
বলদে লাফায় রে—
যখন কসে লাঙল ধরি।
আমি ধাঁধাঁয় পড়ে মরি।…
পাড়ায় গেলে পাড়ার ধাঁধাঁয়
আঁধার দেখি চোখে;
আমার ঘরের অকথা যে
ঘোষে পাড়ার লোকে।
ঘরে আর বাহিরে আমার
সবে যে হৈল বৈরি।
আমি ধাঁধাঁয় পড়ে মরি;'

গ্রামের নববিবাহিতা বধূ, বাপের বাড়ীর জন্য উতলা হইয়া উঠে। মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া যায় তাহার চির পরিচিত গ্রামটির কথা—

'ঘাঁটার আগায় তেঁতই গাছটার তেঁতই বেঁকা দেখা
পাড়াল্যা মা ভৈনের সঙ্গে আর নি হৈব দেখারে—'

বেদনার্ত্ত হৃদয় প্রকৃতির কোলে আপন দুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখে।

'ফুল কেন মৈলান দেখি,
চান কেন মৈলান।'

পূর্ব্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আশুবাবুর কাব্যে এই সামঞ্জস্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু শব্দ প্রয়োগেই নয়, তার প্রকাশের মধ্যেও তিনি এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

'আসমান কালা জমিন কালা, কালা নদীর পানি;
সকল থাইক্যা অধিক কালা আখের বেইমানি রে—
আখের বেইমানি।
হেঁন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙের ভাটি,
মুছুলমান মইরা গেলে পাইতা দিব মাটি;
অসার দুনিয়ার শেষে আখেরের ইনছাপ রে—
আখেরের ইনছাপ।'

যে মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যের ধরণে আশুবাবু 'আদম-আশকে'র কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নাই। মুসলমানী রচনারীতির সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত নিবিড় পরিচয়।

১৯৪২-সালে আশুবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। শুধু পল্লী কবি হিসাবেই নয়, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের বহু লুপ্ত পুঁথির আবিষ্কর্ত্তা হিসাবেও বাঙ্গলা সাহিত্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অমূল্য দানের কথা চিরদিন মনে রাখিবে।

লে নি ন

লেখক :
হীরেন মুখার্জ্জী

ঠিক্ একুশ বৎসর পূর্ব্বে একুশে জানুয়ারী তারিখে জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স চুয়ান্ন বৎসরও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু জীবনের মাপকাঠি শুধু বয়স নয়। রুশিয়ার বলশেভিক দলকে তিনি গড়েছিলেন; সোভিয়েট বিপ্লবের তিনি ছিলেন কর্ণধার; দুনিয়ার, সাম্যবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন গুরু। সর্ব্বদেশের নিপীড়িত জনগণের কাছে যে অবদান তিনি রেখে গেছেন ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

মস্কো শহরে সোভিয়েট সৌধের শিখরে লেনিনের যে প্রতিমূর্ত্তির পরিকল্পনা হয়েছে, সেটা হবে মানুষের হাতে গড়া সকল মূর্ত্তির চেয়ে বড়। সোভিয়েট জনসাধারণ এইভাবে তাদের অতি প্রিয় নেতার স্মৃতিকে সম্মান করছে। লেনিনের নাম যে শহরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, বিপ্লবের পীঠস্থান সেই লেনিনগ্রাদ যখন প্রায় চতুর্দ্দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, প্রতিদিনই বারবার বোমা ফেলে, কামান দেগে, নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে হিটলারী পঙ্গপাল যখন লেনিনগ্রাদ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে লড়ছিল, খাদ্যাভাবে লেনিনগ্রাদ বাসীদের যখন মাঝে মাঝে দেওয়ালের চূণ পর্য্যন্ত মুখে দিয়ে প্রাণধারণের চেষ্টা করতে হয়েছিল, তখনও মুহূর্ত্তের জন্য লেনিনগ্রাদ হার মানে নি, লেনিনের স্মৃতির তিলমাত্র অপমান ঘটতে দেয় নি। আর ঠিক্ ১৯৪৩ সালের লেনিন দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে তারা ফ্যাশিষ্ট অবরোধ ভেঙে দুনিয়াকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল।

সাম্যবাদী বিপ্লব ছিল লেনিনের দিবারাত্রির স্বপ্ন; কিন্তু কোন কালেই স্বপ্নবিলাসী তিনি ছিলেন না। তাঁর জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল তত্ত্ব ও কর্ম্মের সমন্বয়, যা হল মার্ক্‌স্‌বাদের একটা প্রধান অঙ্গ। কথা ও কাজের মধ্যে যে মিল আজ বিশেষ করে ষ্টালিনের মত বলশেভিকের মধ্যে দেখা যায়, তা হল মার্ক্‌স্‌বাদী শিক্ষারই ফল। "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে লেনিন লিখেছিলেন: "বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার চেয়ে আসল বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী দরকার ও অনেক বেশী ভালো লাগে।"

* * *

লেনিনের অন্তরঙ্গ যাঁরা, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে তাঁর হৃদয় ছিল যেন কুসুম কোমল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে প্রাণ খোলা আনন্দ করতে যারা দেখেছে, তারা কখনও তা ভুলতে পারে নি। এই হৃদয়ের গুণেই তিনি চির নির্য্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকদের মনের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিলেন, অতি বড় বিপদের দিনেও কখনও তাদের উপর বিশ্বাস হারান নি। কিন্তু এই কুসুম কোমল মানুষই আবার বজ্রের চেয়ে কঠোর হতে পারতেন, বিপ্লবী আন্দোলনকে যারা বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করেছে, তাদের ক্ষমা করা তাঁর স্বভাব ছিল না, নির্ম্মমভাবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গ ধারণ করতেন।

লেনিন সম্বন্ধে ভাববিলাস করে ফেলা রীতিমত ভুল হবে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মরণ করা দরকার। লেনিনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ষ্টালিন একবার বলেছিলেন যে নিজের নেতৃত্ব কায়েম করার জন্য কোন রকমের আড়ম্বর করতে অতি বড় শত্রুও তাঁকে দেখে নি। লেনিনের চেহারা কিছু অসাধারণ ছিল না, বড় বড় আত্মম্ভরী নেতাদের মত দেরী করে সভায় পৌঁছে একটা সোরগোলের মধ্য দিয়ে প্রতিপত্তি জাহির করা তাঁর কোষ্ঠীতেই লেখা হয় নি; বৃথা বাগাড়ম্বরে সকলকে হকচকিয়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। বিখ্যাত মার্ক্‌স্‌বাদী প্লেখানভ্ সম্বন্ধে গল্প ছিল যে কমবয়সী কমরেডদের কাছে তর্কে হারবার উপক্রম হলে তিনি চটে উঠে না কি বল্‌তেন, "জানো তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বাবার প্রথম দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকে আমি একজন মার্ক্‌স্‌বাদী ?" এই ধরনের মার্ক্‌স্‌বাদী "পণ্ডিতের" ঠিক উল্টো ছিলেন লেনিন। কোন সভায় যেতে হ'লে সেখানে যথাসময়ে পৌঁছে, সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনা করে, যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় তিনি প্রকাশ করতেন। আর তাঁর ছিল অসাধারণ চরিত্রবল; আলোচনায় হার হলেও যেমন তিনি ব্যতিব্যস্ত হতেন না, জিত হলেও তেমনই অতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তেন না। কাজে যাতে গাফলি না ঘটে, সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য সর্ব্বদা থাকৃত।

জনসাধারণের যেমন তিনি নেতা ছিলেন, তেমনই জনসাধারণের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত যখন অনেক প্রধান বলশেভিক নেতা নৈরাশ্যের সুর ধরেছিলেন, তখন লেনিন একা পার্টি আর পার্টির মতবাদকে অক্ষুণ্ণ করার জন্য লড়েছিলেন। আবার ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের মাতব্বর নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ধ্বজা তিনি নামাতে দেন নি। নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশে তাঁকে জার্ম্মান গোয়েন্দা বলে কুৎসা চল্‌ত; পশ্চিম ইউরোপের 'সুসভ্য' সোশালিষ্টরা তখন নিজেদের দেশের পুঁজিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই চালানোর স্বপক্ষে ছিল। এদের সকলের বিরুদ্ধে লেনিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; আর সোভিয়েট গণতন্ত্র স্থাপন করে দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের যে অতুল দুর্গ তিনি নির্ম্মাণ করলেন, তা হ'ল তাঁর কর্ম্মবীরত্বের নিদর্শন আর বাক্‌সর্ব্বস্ব সোশালিষ্ট ধুরন্ধরদের ব্যর্থতার প্রমাণ।

* * *

মার্ক্‌স্‌বাদের মধ্যে যাতে "ভেজাল" না ঢোকে সেদিকে লেনিন প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাই যে সব "নেতা" ধনিকদের সঙ্গে শান্তিতে থাকার অলীক আশায় মার্ক্‌স্‌বাদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারে ব্যস্ত হতেন, সেই বের্ণষ্টাইন, কাউটাস্কি, বাউয়ের, হিল্‌ফার্ডিং, প্লেখানোভ প্রভৃতির যথার্থ রূপ তিনি বার বার প্রকট করে দিয়েছিলেন। পরে আবার সোভিয়েট শাসননীতি সম্পর্কে মূল নীতির দিক থেকে ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিণ, রাদেক্ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর মতভেদ হয়েছিল। এইসব বিপথগামীদের তিনি কখনও মার্জ্জনা করেন নি, আর এদেরই পরে সোভিয়েট-দ্রোহিতার জঘন্য অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে।

কিন্তু "ভেজাল" যাতে মার্ক্‌স্‌বাদে না ঢোকে এই চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থেকে কখনও তিনি মার্ক্‌স্‌বাদকে একটা নিষ্ঠাসর্ব্বস্ব প্রাণহীন ধর্ম্মবিধানে পরিণত হতে দেন নি। তিনি বলেছিলেন যে মার্ক্‌স্‌বাদ সমাজব্যবস্থা ও তার রূপান্তর সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা বিধির কথা বলেছে কিন্তু তার প্রয়োগ করতে হবে দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী, তাই মার্ক্‌স্‌বাদকে নিছক্ শাস্ত্রের সনাতন বিধান বলে না মনে করে তিনি পার্টির কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদের পুষ্টি সাধনই করেছেন। আর তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগে মার্ক্‌স্‌বাদের নূতন যে রূপ তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন, তাকে ষ্টালিন লেনিনবাদ বলে বর্ণনা করেছেন।

লেনিন ও ষ্টালিন

বচনবাগীশ বিপ্লবী যদি লেনিন হতেন, তো আজ আমরা জনগণের স্বকীয় সৃষ্টি সোভিয়েটকেই দেখতে পেতাম না। চড়া বামপন্থী বুলি আউড়ে যারা আত্মতুষ্টি লাভ করত, তাদের "ছেলেমানুষী ন্যাকামির" বিরুদ্ধে লেনিন জোরগলায় প্রচার করতে কসুর করেননি। বিপ্লবের বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্যই যে মাঝে মাঝে এক পা পিছু হটতে হয়, পরে একেবারে দুই পা এগিয়ে যাওয়ার জন্যই যে এক পা পিছু হটতে হয়, এ হল লেনিনের শিক্ষা। হাজার শত্রু যখন শিশু সোভিয়েটকে টুঁটি টিপে মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতি নানা বিপদ যখন সোভিয়েটকে ঘিরেছিল, তখন ট্রট্‌স্কি-জাতীয় লোক কেবল ইন্‌কিলাবের মন্ত্র নিয়েই মুশ্‌কিল আশানের কথা বলেছিল। আজ তারা স্থান পেয়েছে ইতিহাসের ছাইগাদার মধ্যে, আর লেনিনের শিষ্য ষ্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট আজ গুরুর শিক্ষা আত্মস্থ করে জগৎকে আশ্চর্য্য করছে।

* * *

ভারতবাসী আমরা বিশেষ করে স্মরণ করব সর্ব্বজাতির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লেনিনের আগ্রহ, লেনিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা যখন ছয়দিন ধর্ম্মঘট করে, তখন লেনিন সুদূর রুশিয়া থেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, দুনিয়ার মুক্তি আন্দোলনে ভারতের অবদান সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন তিনি লিখেছিলেন যে প্রাচ্য মহাদেশ আজ নবজাগ্রত চেতনা নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে নাম্‌ছে দেখে সকল মুক্তিকামী উৎফুল্ল হবে। সোভিয়েট যখন স্থাপিত হল তখন ষ্টালিনের সহায়তায় সর্ব্বজাতির মুক্তি সম্বন্ধে যে নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছিল, তার প্রয়োগ তিনি করলেন, জারসাম্রাজ্যে যারা অতি অবনত, নির্য্যাতিত অবস্থায় ছিল, সেই উজবেক, তাতার, কাজাক, কির্গিজ, তুর্কমান প্রভৃতি বহু জাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। পারস্যে বা তুরস্কে হাজির হয়ে জোর করে সোভিয়েটশাসন চাপাবার দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর কখনও হয় নি, বিপ্লবকে একটা রপ্তানীর মাল তিনি কখনও মনে করতেন না। কিন্তু এশিয়ার সকল দেশের সঙ্গে, এশিয়ার জনআন্দোলনের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনি স্থাপন করে গেছেন, তারই ফলে আজ সকল দেশের জনসাধারণ হল সোভিয়েটের মিত্র।

লেনিন প্রায়ই বলতেন, বিপ্লবের পথ কখনও নেভ্‌স্কি সড়কের মত সোজা রাস্তা নয়।" বিপ্লবী কেতাবের বুলিই যাদের পুঁজি, সোজাসুজি শানবাঁধানো রাস্তায় নিশান উড়িয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব যারা মনে করে, তারা লেনিনের শিক্ষারই অপমান করে। বিপ্লবের কোন একটা বাঁধা ধরন যে নেই, একথাই লেনিন আমাদের বুঝিয়েছেন। সোভিয়েটের শত্রুনিপাত, সোভিয়েটের শক্তিবৃদ্ধি যে বিশ্ববিপ্লবের সব চেয়ে বড় কথা, একথা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। আজ যে জনযুদ্ধে সোভিয়েট হল নেতা, সে জনযুদ্ধই একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব। লালফৌজ দুর্দ্দম বেগে অগ্রসর হচ্ছে, আর দেশে দেশে জনগণ আশায় উৎফুল্ল হচ্ছে, নিজেদের জাতীয় ঐক্য সুসংগঠিত করে নূতন এক যুগের প্রতীক্ষা করছে। এই প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যবলে মুক্তি অর্জ্জন করার পথে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষ লেনিনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাবে।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত বই :—

পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্
রেবতী বর্ম্মণের প্রামাণিক অনুবাদ ২॥৹

সমাজতন্ত্রবাদ : কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক—মূললেখক—ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্
রেবতী বর্ম্মণের প্রামাণিক অনুবাদ ৸৶৹

গ্রামের গরীবদের প্রতি (লেনিন)
অরুণ মিত্র ও বিভূতি গুহের অনুবাদ ১৲

কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা (লেনিন)
অমিত সেনের অনুবাদ ॥৹

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস
হীরেন মুখার্জির অনুবাদ ৩৷৹

ইতিহাসের ধারা (অমিত সেন) ১৷৹

পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য
ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত ৷৹

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি
ডক্টর অধিকারী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৶৹

বিপ্লবী চীন (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)
সুধাংশুলাল দাশগুপ্ত ১৲

জাপানের আসল রূপ (জ্যাক্ চেন্)
সুধাংশু দাশগুপ্তের অনুবাদ ৷৹

সোভিয়েট নেতা (ষ্টালিন, মলোটভ, ভরোশিলভ ও টিমোশেঙ্কোর জীবনী) ৷৹

রামধনু (ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌স্কার উপন্যাস)
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ ৩৲

সোভিয়েটের গল্প সংগ্রহ
সুধী প্রধান প্রভৃতির অনুবাদ ১৲

Some of our English Publication :

CRITIQUE OF THE GOTHA PROGRAMME (Karl Marx) Re. 1/-

LEFT-WING COMMUNISM By V. I. Lenin Re 1/-

PROBLEMS OF LENINISM By Stalin As. 10/-

POLITICAL ECONOMY By A. Leontiev Rs. 3/-

V. I. LENIN (A short sketch of his Life and Activities) Prepared By Marx Engels Lenin Institute—Moscow Rs. 3/8/-

Published by Modern Publishers :

WHAT IS PHILOSOPHY (Howard Salsam) (An introduction to Marxist Philosophy) Rs 2/8/-

CHINA RESISTS (Abridged from Edgar Snow's Scorched Earth) Rs 3/8/-

বনস্পতি
(সোমেন চন্দের গল্প সংগ্রহ) ১॥৹

নূতন ইউরোপে সোভিয়েটের ভূমিকা

লেখক ঃ
নিখিল চক্রবর্ত্তী

সম্প্রতি কলিকাতার "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকাতে একটি মার্কিনী কাগজ থেকে সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ইউরোপে সোভিয়েটের নীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ঘোষণার প্রয়োজন কারণ সোভিয়েট আপন স্বার্থসুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করছে—কমিউনিষ্ট মতবাদের খাঁটি আদর্শের দিকে আজ তার লক্ষ্য নাই। এই সব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও সোভিয়েটের দালাল হিসাবে আপন আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে যেখানে যে রকম সুবিধা সে রকম নীতি অবলম্বন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে ইটালীতে সোভিয়েট প্রথম থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বাদোগলিওকে সমর্থন করে, যদিও সেই বাদোগলিও রাজপরিবারের পক্ষ অবলম্বন করে। হাঙ্গেরীতেও সোভিয়েট বেলা মিক্‌লসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সমর্থন করেছে যদিও মিকলস্‌ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হিটলারকে সাহায্য করেছিল। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াতেও কমিউনিষ্টরা রাজপরিবারের সমর্থনে দাঁড়ায়। অপরদিকে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রাসে কমিউনিষ্টরা রাজপরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

এরকম প্রবন্ধ আজকার দিনে নতুন নয়। লালফৌজের বিজয় অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে ইউরোপে নব গণজাগরণের সম্ভাবনায় নানারকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যাঁরা মনে করেছিলেন হিটলারের পরাজয়ের পরে ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের তাঁবেদার করে রাখবেন তাঁদের কাছে সোভিয়েট নীতি সত্যিই ভীতি-সঞ্চারক। এবং তাঁরাই নানাভাবে জনসাধারণের মনে সোভিয়েটের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী গণ-ফ্রন্টকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মোদ্দা কথা হল, সোভিয়েট আপন আধিপত্য বিস্তার করে ইউরোপের স্বাধীনতা ধ্বংস করছে, তার সম্বন্ধে সাবধান হও। বিভিন্ন দেশে যে গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে, তাকে তাঁরা "লাল-জুজুর" ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন এবং কমিউনিষ্ট প্রাধান্যের অজুহাতে ধ্বংস করতে ব্যগ্র। ঠিক এই ভাবেই চার্চ্চিল গ্রাসের কমিউনিষ্টদের গালাগালি দিয়ে গ্রীসের জনগণের উপর ব্রিটিশের তাঁবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আসল অবস্থাটা কি? সোভিয়েট কি সত্য সত্যই আপন স্বার্থসুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করছে? যে যে উদাহরণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করা যাক্‌।

"অ্যাম্‌গটের" হাত থেকে মুক্তি

প্রথমে ইটালী। ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের পতনের পরই ইটালীতে মিত্রপক্ষের সামরিক সরকার ইটালীর জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে—এই সামরিক সরকার "অ্যামগট" নামে কুখ্যাত। এর সাহায্যে বৃটিশ ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা গণজাগরণের পথ রোধ করে নিজেদের তাঁবেদার, এমন কি বহু ফ্যাসিষ্ট দালালদের নিযুক্ত করেছিলেন। বাদোগ্‌লিওর যে মন্ত্রীসভা ছিল, তার উপরেও তারা নির্ভর করে নি। ঠিক এই সময়ে সোভিয়েট বাদোগ্‌লিও সরকারকে মেনে নেয়। ফলে "অ্যাম্‌গটের" অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হ'ল এবং গণ-আন্দোলনের পথ পরিষ্কার হল। অবশ্য বৃটিশ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সোভিয়েটের কুৎসা করে জাহির করলেন যে সোভিয়েট ফ্যাসিষ্ট বাদোগ্‌লিওকে সমর্থন করছে! আসল কথা হল, ফ্যাসিজমের পরিবর্ত্তে মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রকে স্থান না দিয়ে, গণতন্ত্রের পথ সোভিয়েট মুক্ত করে দেয়। কয়েক মাসের মধ্যেই বাদোগ্‌লিওকেই সরে দাঁড়াতে হয় এবং সর্ব্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাঙ্গেরীর গণ-জাগরণ

হাঙ্গেরিতে বেলা-মিক্‌লসের মন্ত্রীসভার পিছনে যে গণ-জাগরণ রয়েছে তাতেও প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্বিগ্ন হৃষ্টি করার কারণ আছে। হিটলারের তাঁবেদার হর্থীর পতনের পর সর্ব্বদলীয় সরকার স্থাপিত হয়, তাতে এমন কি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিও স্থান পেয়েছে। হিটলারীদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি গণ-সম্মেলনে এই সরকার নির্ব্বাচিত হয়। এবং ইহার কার্য্যসূচীর সবচেয়ে প্রধান ঘোষণা হল হাঙ্গেরীর বড় বড় জমিদারীগুলিকে রদ করে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করা। এই সব জমিদারেরাই বিশ বছর পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে হাঙ্গেরীর গণ-বিপ্লব ধ্বংস করে এবং হিটলারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসিদের ডেকে আনে। মিত্রপক্ষীয় প্রতিক্রিয়াপন্থী মহল হয় মনে করেছিল, এই সব পুরণো বিশ্বস্ত নায়েবদের সাহায্যে আবার হাঙ্গেরীকে হাত করতে পারবে। কিন্তু, নতুন সরকার এসে এই সব জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার ফলে, হাঙ্গেরীতে গণ-আন্দোলনেরই জয় হল। বেলা মিক্‌লস্‌ অতীতে নাৎসীদের পক্ষে থাকতে পারে, কিন্তু, নাৎসীদের পরাজয়েতে সে সাহায্য করে এবং লালফৌজের দিকে চলে যায় এবং আজকে হাঙ্গেরীতে বড় কথা বেলা-মিকলসের সরকার নয়, গণ-জাগরণের পুরোভাগে গণতান্ত্রিক সরকার।

রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে রাজপরিবারের সমর্থনের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু, দেখতে হবে সেই রাজপরিবারের অবস্থা কি। এতদিন ছিল তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেখানে একসময়ে প্রভুত্ব করেছে এবং রুমানিয়াতে তেলের সম্পত্তিতে বৃটিশ মুনাফাখোরীরা অনেক দিন পর্য্যন্ত লাভ করেছে। তারপর হিটলার এসে সেগুলো হাত করে। আজ রুমানিয়াতে যদিও রাজপরিবারের পতন হয়নি তবু আসল ক্ষমতার মালিক হল সেখানকার নবপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বদলীয় সরকার। আজ বাইরের কায়েমী স্বার্থ রুমানিয়াতে বিচলিত হয়ে পড়েছে—বুঝি বা তেলের মুনাফা বন্ধ হয়ে যায়! কারণ, রুমানিয়ার নব জাগরণ কোনওরকম সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য আর মানবে না—বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তারা আজ সেটুকু বুঝতে পেরেছে। তাই রাজপরিবারের অস্তিত্ব রইল কি না তা' দিয়ে রুমানিয়াকে বিচার করা চলে না, গণতন্ত্রের বিস্তারই সেখানকার বড় কথা।

ঠিক সেইরকম বুলগেরিয়াতেও। বুলগেরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন সর্ব্বদাই শক্তিশালী ছিল, এবং এক সময়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল। বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েট প্রীতি চিরকালই প্রবল। আজ সোভিয়েটের মৈত্রী বুলগেরিয়াকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে চলেছে; রাজপরিবারের শক্তি বৃদ্ধি করেনি।

যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস

যুগোশ্লাভিয়াতে কমিউনিষ্টরা রাজপরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কেন? কারণঃ রাজপরিবার গণ-আন্দোলনকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। প্রথম থেকেই তারা মিখাইলোভিচকে টিটোর বিরুদ্ধে সমর্থন করে, যদিও মিখাইলোভিচ নাৎসিদের সঙ্গে একজোট হয়ে গণআন্দোলন ধ্বংস করছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে টিটোর নেতৃত্বে যখন গণ-ঐক্য প্রবলরূপ নিল তখন লণ্ডনস্থিত যুগোশ্লাভী দল টিটোকে মানতে বাধ্য হয়। আজ আমরা দেখতে পাই যে লণ্ডনের যুগোশ্লাভ রাজকীয় সরকারের মন্ত্রী শুবাসিক টিটোর সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন রাজা তাও মানতে প্রস্তুত নয়। এথেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে যুগোশ্লাভ আন্দোলনকে রাজা স্বীকার না করে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করছে, এবং সেই কারণেই যুগোশ্লভিয়ার কমিউনিষ্ট বা অন্যান্য দল রাজার পুনরাগমন সমর্থন করবে না।

গ্রীসে কমিউনিষ্টরা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? তাদের প্রধান দাবী হল—ফ্যাসিষ্ট জাতীয়-স্বার্থ-বিরোধী নাৎসি সমর্থক দলগুলিকে নিরস্ত্র করা হোক্‌। কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল গ্রীস সরকার ও তার পিছনে চার্চ্চিল তা' করতে নারাজ। ইটালীতে যখন "অ্যাম্‌গটকে" পাততাড়ি গোটাতে হল, তখন ভূমধ্য আন্দোলন রোধ করে আপন স্বার্থ বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তাই একদিকে ফ্রাঙ্কোকে তোয়াজ করা হচ্ছে, অন্য দিকে গ্রীসে তাঁবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। "লাল জুজু"র ভয় দেখিয়ে গ্রীসের জনসাধারণকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পৃথিবীর জনগণের কাছে গ্রীসের কমিউনিষ্টদের হেয় প্রতিপন্ন করাই চার্চিলের একমাত্র অবলম্বন।

ষ্টালিনের প্রতিশ্রুতি

সোভিয়েট নীতির কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টদের নীতিতেও আদর্শের বিচ্যুতি হয়নি। ষ্টালিন পরিষ্কারভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ফ্যাশিষ্ট পদানত দেশগুলিকে তাদের "মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করব" এবং তারপর সেইসব জনগণকে "আপন আপন দেশে তাদের ইচ্ছামত স্বাধীন জীবন সংগঠন করতে সাহায্য করব।" বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টরাও দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন করতে অগ্রগামী হয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোথাও বা সেই ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় দক্ষিণপন্থী, এমন কি অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিও যোগ দিয়েছে কারণ সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি ও ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের অভিজ্ঞতা লাভের পর বহুদল ও ব্যক্তির চোখ খুলে গিয়েছে এবং তারা জাতীয় ঐক্যে আজ যোগদান করেছে।

এই প্রসঙ্গের দুটী উদাহরণ সহজেই মনে পড়ে। একটি হল চেকোশ্লোভাকিয়া, অপরটি ফ্রান্স। ১৯৩৯ সালে চেম্বারলেন যখন হিটলারকে তুষ্ট করবার জন্য মিউনিক চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের কবলে স'পে দেয়, তখন ডাঃ বেনেস্‌ ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি। বেনেস্‌ হলেন খাঁটি উদারনৈতিক এবং বৃটীশ-আস্থার উপর চিরকালই বিশ্বাসী ছিলেন এবং সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ও দ্বিধাই বেশী ছিল। তাই মিউনিক চুক্তির সময় বেনেস চেম্বারলেনের মিথ্যা আশ্বাসের উপর নির্ভর করেছিলেন। এমন কি সোভিয়েট সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেও তিনি সেদিকে তাকাননি। পরে তিনি বুঝতে পেরে বলেন "মিউনিক ও ইউরোপের তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেকটি বিপর্য্যয়ের মূল কারণ হল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি পাশ্চাত্য ইউরোপের বিদ্বেষ।" তাই ১৯৪৩ সালে বেনেস নিজে মস্কোতে গিয়ে চেক-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই প্রসঙ্গে বেনেস্‌ স্পষ্টভাবেই বলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়াতে একটি শক্তিশালী গণরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পক্ষপাতী এবং সেই রাষ্ট্রই ভবিষ্যত ইউরোপে স্বাধীনতা ও শান্তি রাখতে সোভিয়েটকে সাহায্য করবে। পোল্যাণ্ডের প্রতিও সোভিয়েটের একই মনোভাবের কথা বেনেস্‌ উল্লেখ করেন। বেনেসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে খাঁটি উদারনৈতিকের কাছে আজ সোভিয়েটের নীতি ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনও রকম সন্দেহের স্থান নেই। তেহেরাণ ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতা ও জনজাগরণে সাহায্য করাই যে সোভিয়েটের একমাত্র উদ্দেশ্য, জোর করে সোভিয়েট আধিপত্য বিস্তার করা এমন কি সমাজতন্ত্র বিপ্লব ঘটান যে সোভিয়েটের অভিসন্ধি নয় তা বেনেসের মতন লোককে বুঝাবার আজ তার দরকার নেই।

সম্প্রতি ফ্রান্সও সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করে। জেনারেল দ্য গল্‌ স্বয়ং মস্কোতে গিয়ে সেই চুক্তি সাক্ষর করেন। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের সময়ে ব্রিটিশের আশ্রয়ে দ্যগলকে আসতে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল দ্যগলকে তাদের তাঁবেদার হিসাবে কাজে লাগাবে। কিন্তু, দ্যগল দেখলেন সর্ব্বদলের ঐক্য ও প্রতিরোধ বিনা ফ্রান্সের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এবং তখন থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলদের চোখে দ্যগলের খাতির কমতে আরম্ভ হয়। তাই আমরা দেখতে পাই উত্তর আফ্রিকাতে তারা ফ্যাসিষ্ট দালাল দারলাঁকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু, ফ্রান্সের গণ-সংগ্রামের সামনে দারলাঁ, জিরো, পুচো, পেরুটন একে একে সকলেরই পরাজয় হল। দ্যগল কমিউনিষ্ট নন কিন্তু, তিনি জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের পুরোধা হিসাবেই সোভিয়েটের সঙ্গে মিতালীর পথ বেছে নিয়েছেন। তাতে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র শক্তিশালী হল, শুধু বিভেদকারীদেরই পরাজয় ঘোষিত হল।

আজকের দিনে সোভিয়েটের কুৎসা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। "বিপ্লবী নীতির বিচ্যুতি" বলে যারা সোভিয়েটকে নিন্দা করছে তাদের আসল স্বরূপ বুঝতে মুস্কিল হয় না, তারা চায় মিত্রপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সোভিয়েটকে কোনঠাসা করতে এবং সেইভাবে ইউরোপে দাসত্ব ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু, ইউরোপের জনগণ বিশবছরের কঠোর অভিজ্ঞতা এবং ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের অগ্নি-পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আজ তার নিজের সঠিক পথ বেছে নিতে শিখেছে। গণতান্ত্রিক ইউরোপ তেহেরাণের ঐক্য বজায় রাখতেই বদ্ধপরিকর হবে কারণ, তার মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের অভিসন্ধি নেই। তেহেরাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী লালফৌজ তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গ্রীসে যুদ্ধ বিরতি

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ঐ সমস্ত দলের নেতা নহেন। পপুলার ডেমক্রেটিক ইউনিয়নের নেতা ইসিরিমকস ও কৃষক দলের নেতা গেব্রিলাইডিস এখন ই. এ, এম-এর সঙ্গে গ্রাসবাসীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। ১৬ই জানুয়ারীর 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' উপরোক্ত দলগুলির প্রতিনিধিদের এক বিবৃতি বাহির হইয়াছে। ঐ বিবৃতিতে তাঁহারা যে কোন জাতীয় সরকারে কমিউনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানাইয়াছেন। এথেন্সে বৃটিশ রাজদূত মিঃ লীপার কিছুদিন আগে ক্রোকস নামে জনৈক 'শ্রমিক নেতার' বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে উক্ত 'শ্রমিক নেতা' জেঃ স্কবির পিছনে গ্রীসের সমস্ত শ্রমিকদের সমর্থন জানায়। মিঃ সেমুরকস্ব পার্লামেণ্টে এই 'শ্রমিক নেতার' মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। এই 'শ্রমিক নেতা' জার্ম্মানীর অন্যতম তাঁবেদার।

এই ভাবে মিঃ চার্চিলের সমস্ত মিথ্যা প্রচারের মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। জেঃ প্লাষ্টিরাসকে আর সমর্থন করা চলিবে না এই দাবী বৃটেনের সমস্ত অংশের দাবী হইয়া উঠিয়াছে। এই দাবীর চাপেই মিঃ চার্চিল, এটলী ও ইডেনকে পার্লামেণ্টে বারবার ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে জেঃ প্লাষ্টিরাসকে সমস্ত অবস্থায় সমর্থন করিতে হইবে এরকম কোন প্রতিশ্রুতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেন নাই। কিছুদিন আগে প্লেষ্টিরাস গভর্ণমেণ্ট ই, এ, এম ও এলাস নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বাহির করিয়াছিল। চার্চ্চিল প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সজ্বর্ষে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইবে না।

গ্রীসের ভবিষ্যৎ

কিছুদিনের মধ্যেই আবার ষ্টালিন-রুজভেল্ট-চার্চিল সাক্ষাৎকার হইবে এবং সেখানে গ্রীসের প্রশ্নও আলোচিত হইবে। ২১শে ডিসেম্বর মিঃ ইডেন যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে সোভিয়েট ও আমেরিকা গ্রীসে বৃটিশ নীতি সমর্থন করে না। মিঃ ইডেন সখেদে বলেন, "আগে যদি বুঝিতে পারিতাম যে গ্রীসের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিবে তবে আমরা সোভিয়েট ও আমেরিকান বাহিনীকে আমাদের সঙ্গে গ্রীসে আসিতে আমন্ত্রণ করিতাম।" মিঃ ইডেনের এই বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সোভিয়েট ও আমেরিকা বৃটেনকে জার্ম্মান বিতাড়নের জন্য গ্রীসবাসীদের সাহায্যে গ্রাসে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মান বিতাড়নের পরে গ্রীসের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অনুমতি দেন নাই। তাই মিঃ ইডেন দুঃখের সঙ্গে 'মতভেদের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রীক জনগণের ঐক্য, বৃটেনের জনমত ও ষ্টালিন-রুজভেল্ট-চার্চিলের আগামী বৈঠক চার্চিলের উপর কতটা চাপ দিতে পারে তাহারই উপর নির্ভর করে যুদ্ধ বিরতি সর্ত্তের এবং গ্রীসে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

গ্রীসে যুদ্ধ বিরতি

সন্ধি-সর্ত্ত ভাঙ্গিতে চার্চ্চিলের চক্রান্ত

বৃটিশ জনমতের তীব্র প্রতিবাদ

যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত

দীর্ঘ ৩৮ দিন হিংস্র যুদ্ধের পরে গত ১১ই জানুয়ারী গ্রীসে যুদ্ধ বিরতি হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে যুদ্ধ বিরাতর সর্ত্ত হইল :

(১) এলাস বাহিনী এথেন্স, সালোনিকা ও পিরাযুস অঞ্চল ত্যাগ করিবে।

(২) জাণ্টে, ইউবিয়া, কিথেরা, সাইক্লাডিস ও স্পোরাডিসী দ্বীপগুলিও এলাস বাহিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে।

(৬) গ্রীক পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর যে সব সৈন্য এলাস বাহিনীর হাতে বন্দী তাহাদের মুক্তি দিতে হইবে। বিনিময়ে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অনুরূপ সংখ্যক বন্দী ছাড়িয়া দিবে। অসামরিক বন্দীদের কোন পক্ষই আপাততঃ মুক্তি দিবেন না।

সন্ধির সর্ত্তে উল্লেখিত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করিবার পরেও গ্রাসের ৩৭টি জিলার মধ্যে ২১টি জিলা এলাসদের কর্ত্তৃত্বে থাকিবে। এলাসদের অস্ত্রত্যাগ করিবার দাবীও আপাততঃ জেঃ স্কবি ত্যাগ করিয়াছেন,—এলাস বাহিনী এখনও পৃথক সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে আছে।

যুদ্ধ বিরতির ঠিক আগে ও পরে জেঃ স্কবি ও ও জেঃ প্লাষ্টিরাস তাঁহারের বিবৃতিতে এলাসদের নিম্নলিখিত দাবীগুলি স্বীকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন :

(১) প্রতিক্রিয়াশীল মাউনটেন ব্রিগেড ও এডিস বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

(২) জার্ম্মান শাসনের আমলে যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল জার্ম্মান শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ইতিমধ্যেই জার্ম্মান তাঁবেদারের পুলিশের বড়কর্ত্তাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

(৩) আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য মিত্রশক্তির একটি যুক্ত কমিশন নিয়োগে জেঃ প্লাষ্টিরাস রাজী হইয়াছেন।

এলাস গণতন্ত্রের রক্ষক

১৯৪০ সাল হইতেই ই, এ, এম ও এলাস বাহিনী জার্ম্মান আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে। বৃটিশ বাহিনী যখন এথেন্স হইতে ১০০ মাইল দূরে তখন তাহারাই এথেন্স জার্ম্মান কবল মুক্ত করে। যুদ্ধ জয়ের পরে তাহাদের একমাত্র আশা ও দাবী এই ছিল যে গ্রীসে আবার মেটাক্সাসের মত ফ্যাশিষ্ট একাধিপত্য স্থাপন করা চলিবে না।

তাই প্রথম হইতেই তাহাদের প্রধান দাবী ছিল :

(১) মাউনটেন ব্রিগেড, এডিস ইত্যাদি ফ্যাশিষ্টপন্থী বাহিনীগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং সমস্ত জাতীয় প্রতিরোধ বাহিনীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিতে হইবে। এলাসবাহিনী নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া এই জাতীয় সৈন্যদলে যোগ দিবে।

(২) যে সমস্ত দল ও ব্যক্তি জার্ম্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩) সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি জাতীয় সরকার গঠন করিতে হইবে। এই সরকার ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিবে।

সংগ্রাম এলাস শুরু করে নাই

কিন্তু চার্চ্চিল বিশ্বময় রটাইয়া বেড়াইতেছেন এবং দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অনেকেই একথা বিশ্বাস করেন যে, এলাস বাহিনী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তেমন কিছু সংগ্রাম করে নাই, তাহাদের মতলব ছিল গায়ের জোরে গ্রীসের শাসনযন্ত্র দখল করা। ই, এ, এম ও এলাসদের বিরুদ্ধে চার্চ্চিল প্রথমে পাপেণ্ড ও পরে প্লাষ্টিরাসকে সমর্থন করেন। এই পাপেণ্ড কখনও গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং জেঃ প্লাষ্টিরাস বিগত কয়েক বছরে দুইবার গ্রীসের ডিক্টেটারী করিয়াছেন। চার্চ্চিলের সমর্থনে ও ফ্যাশিষ্টপন্থী মাউণ্টেন ব্রিগেড ও এডিস বাহিনীর সাহায্যে ইহারা চেষ্টা করেন গণ-বাহিনী এলাসকে ধ্বংস করিয়া গ্রীকে আবার প্রতিক্রিয়াশীল একাধিপত্য স্থাপন করা। তাহাদের ষড়যন্ত্রের পূর্ণ বিবরণ ২০শে জানুয়ারীর 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গ্রীসবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যই ছিল এলাসদের সংগ্রাম।

কিন্তু তাহাদের উপর এই আক্রমণের পরও এলাস বাহিনী বরাবর সংঘর্ষ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই সংঘর্ষ শুরু হইবার তিন দিন পরেই এলাস কেন্দ্রীয় কমিটি জেঃ স্কবিকে জানান যে তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইলে এক মুহূর্ত্তে তাঁহারা যুদ্ধ বন্ধ করিবেন। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইলেই তাঁহারা এ্যটিকা, পিরায়ুস প্রভৃতি অঞ্চল ত্যাগ করিবেন। ইহার পর ১২ই ও ২৫শা ডিসেম্বর এলাসা কর্ত্তৃপক্ষ আরও দুবার এই ঘোষণা করেন।

এথেন্সে চার্চ্চিল ও ইডেনের সঙ্গে সন্ধি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরেও আলোচনা পুনরায় শুরু করিবার উদ্দেশ্যে এলাস বাহিনী এথেন্স ত্যাগ করে। ফ্রী প্রেসের সংবাদদাতার ৮ই জানুয়ারীর তারে প্রকাশ যে এথেন্স হইতে এলাস বাহিনীর অপসারণের কারণ সামরিক পরাজয় নয়। তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের সুযোগে জেঃ স্কবি যাহাতে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা এড়াইতে না পারেন সেই জন্যই এলাস বাহিনী এথেন্স ত্যাগ করে।

কিন্তু প্রতিবারই এলাসদের এই সন্ধি প্রস্তাব জেঃ স্কবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং নির্ম্মম যুদ্ধ চালাইয়া যান। এলাসদের ধ্বংস করিবার এই আপ্রাণ চেষ্টা তাহাদের অস্ত্রধারণের ফল নয়। বহুদিন হইতেই এলাসদের ধ্বংস করিয়া গ্রীসে প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। পার্লামেণ্টে আলোচনার সময় শ্রমিক সদস্য মিঃ এ্যনুয়ারিন বিভান প্রকাশ করেন যে ১৯৪৪ সালের ১লা আগষ্ট মিঃ চার্চ্চিল নির্দ্দেশ দেন যে বৃটিশ বেতার বা সরকারী কোন ঘোষণায় ই, এ, এম এবং এলাসদের জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করা চলিবে না। মার্কিন সাংবাদিক ড্ পিয়ারসন জেঃ স্কবির নিকট লিখিত মিঃ চার্চ্চিলের যে পত্র প্রকাশ করিয়া দেন তাহাতে দেখা যায় যে এলাসদের সন্ধি প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের ধ্বংস করিবার নির্দ্দেশই তিনি জেঃ স্কবিকে দিয়াছিলেন।

বৃটিশ জনমতের প্রতিবাদ

কিন্তু মিঃ চার্চিল তাঁহার গ্রীক বন্ধুদের রক্ষার জন্য গ্রীক জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বেশীদিন সশস্ত্র আক্রমণ চালাইতে পারিলেন না। সমস্ত বৃটেনে চার্চিলের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। একমাত্র 'ডেইলি মেল' 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ও 'ডেইলি এক্সপ্রেস' ছাড়া সমস্ত বৃটিশ সংবাদপত্র গ্রাক জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। লেবার পার্টি সম্মেলনে শ্রমিক দলের মন্ত্রীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্রীসে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবী পাশ হয়। এমালগামেটেড এন্‌জিনিয়ারীং ইউনিয়নের ১০ লক্ষ শ্রমিক, মাইন ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ৭ লক্ষ শ্রমিক, ট্রান্‌স্‌পোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব লেবার প্রভৃতি সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান চার্চিলের নীতির তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। এমন কি পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত চার্চিল নীতির এত কঠোর সমালোচনা হয় যা অতীতে কখনও হয় নাই। চার্চিল তাঁহার উপরে ব্যক্তিগতভাবে আস্থার প্রশ্ন টানিয়া আনিয়া কোনরকমে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। কিন্তু রক্ষণশীল দলের অনেক সদস্যই পরিষ্কার জানাইয়াছেন যে "পার্লামেণ্টের আস্থাজ্ঞাপক ভোট চার্চিলের উপর ব্যক্তিগতভাবে আস্থা প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার গ্রীক নীতির উপরে নয়।" আমেরিকাতেও চার্চিলের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ড্রু পিয়ারসনের বিবৃতিতে প্রকাশ যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট নিজে চার্চিলের গ্রীক নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।

বাধ্য হইয়া চার্চিল ২৫শে ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরতির জন্য এথেন্সে আসেন। যাহাদের তিনি কিছুদিন আগে যাহাদের 'খুনে দস্যু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই ই-এম-এ ও এলাসদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু এবারও তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়। বৃটিশ জনমত ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। লর্ড সভায় লর্ড ফেরিংডন জানান যে অবিলম্বে এলাসদের সঙ্গে আপোষ না হইলে সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। বৃটিশ শ্রমিকরা চার্চিলকে সতর্ক করিয়া দেন যে "আর বেশাদিন যদি সরকার গ্রীক প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করিতে থাকে ১৯২০ সালে তবে রাশিয়াতে বৃটিশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে রকম আন্দোলন হইয়াছিল সে রকম তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হইবে।" এমন কি রক্ষণশীল 'টাইমস্' পর্য্যন্ত বলে "নীতির দিক হইতে এলাসদের একটি দাবীও অস্বীকার করা যায় না।...যুদ্ধ বিরতির জন্য তাহাদের সমস্ত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব কেন উপেক্ষা করা হইল ?"

দেশব্যাপী এই বিরোধিতার চাপে বাধ্য হইয়া গত ১১ই জানুয়ারী এলাসদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সাক্ষর করা হয়।

চুক্তিতে ই-এ-এম ও এলাসদের অনেক দাবী স্বীকার করা হইয়াছে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সৈন্য বাহিনীর দাবী সম্বন্ধে এখনও কোন পরিষ্কার বোঝাপড়া হয় নাই।

চার্চিলের চক্রান্ত এখনও শেষ হয় নাই

কিন্তু যে দাবী স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কাজে পরিণত করিবার এবং যে দাবী এখনও স্বীকৃত হয় নাই তাহা গৃহীত হইবার নিশ্চয়তা কি ? চার্চিল ইতিমধ্যেই আবার প্রতিক্রিয়শীল গ্রীস প্রধানমন্ত্রী প্লাষ্টিরাসের গুণকীর্ত্তন এবং ই-এ-এম ও এলাসদের কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। প্লাষ্টিরাসকে গণতন্ত্রের মহানরক্ষক এবং ই-এ-এম ও এলাসদের অত্যাচারী দস্যুরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা হইতেছে। এলাসরা অসংখ্য শিশু ও নারী বন্দীকে হত্যা করিয়াছে, গ্রীসের সমস্ত জনসাধারণ তাহাদের বিরোধী, এলাসরা "জার্ম্মানদের চাইতেও জঘন্য", কমিউনিষ্ট ছাড়া আর সকলেই ই-এ-এম দল ত্যাগ করিয়াছে,—ইত্যাদি প্রচার অনবরত হইতেছে। চার্চ্চিলের এই বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়াই জেঃ প্লাষ্টিরাস আবার ঘোষণা করেন, এলাসবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না। মিঃ চার্চিল তাঁহার গ্রীকবন্ধুদের সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন, জনমতের চাপে এলাসদের যে দাবী স্বীকৃত হইয়াছে সেই দাবী আবার অস্বীকার করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। এই প্রচার তাহারই প্রস্তুতি।

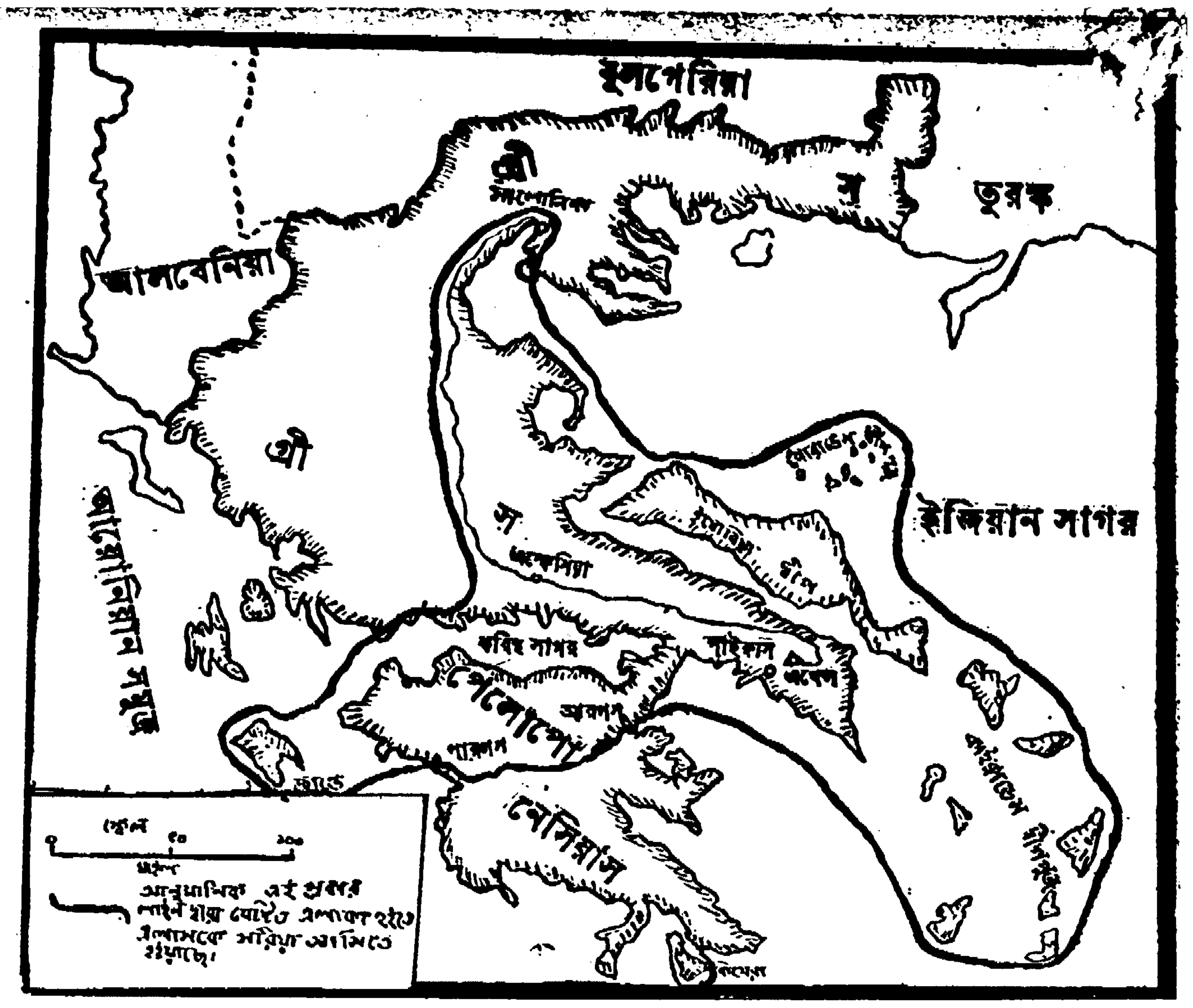

'গ্রীসে হস্তক্ষেপ বন্ধ কর'

কিন্তু চার্চিল অত সহজে গ্রাক জনস্বার্থকে পদদলিত করিতে পারিবেন না। ইতিমধ্যে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বৃটেনে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেসের ১৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ "পার্লামেণ্টের আলোচনার আগে শ্রমিক-দলের প্রতিনিধিরা মিঃ চার্চ্চিলের সঙ্গে দেখা করেন : প্রকাশ প্লাষ্টিরাস গভর্ণমেণ্টকে আর সমর্থন করা হইবে না এবং অন্যান্য নাৎসী কবলমুক্ত দেশে গ্রীসের পুনরভিনয় হইবে না এই প্রতিশ্রুতি না দিলে চার্চ্চিলকে পার্লামেণ্টে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।" (হিন্দু, ১৯শে জানুয়ারী)

চার্চ্চিলের উত্তর সন্তোষজনক না হওয়াতে পার্লামেণ্টে তাঁহাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। তাঁহার নীতির বিরুদ্ধে জনমত এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে "বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি ও জনমত ইতিপূর্ব্বে কখনও গভর্ণমেণ্টের নীতির এত কঠিন সমালোচনা করে নাই। গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যও কখনও এতটা বিকৃত করা হয় নাই।" পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের অন্যতম নেতা মিঃ গ্রিফিথস চার্চিলকে সাবধান করিয়া দেন যে, "রাশিয়াতে বৃটিশ হস্তক্ষেপের স্পষ্ট স্মৃতি এখনও বৃটিশ শ্রমিকদের মনে আছে। এইবার যাহাতে পৃথিবীর শ্রমিক ও গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেই রকম হস্তক্ষেপ না হইতে পারে তাহার জন্য বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন বদ্ধপরিকর।"

মিথ্যা প্রচারের মুখোস খুলিল

এলাসদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুৎসা প্রচারের মুখোসও একে একে খুলিয়া যাইতেছে।

পার্লামেণ্টে চার্চিলের বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। এলাসদের অত্যাচারের যে সমস্ত কাহিনী প্রচারিত হইতেছে তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শ্রমিক সদস্য মিঃ সেমুর কক্স দেখান যে মিঃ চার্চিলের নির্দ্দেশে জেঃ স্কবি এখনও কিভাবে এথেন্সের শ্রমিক অঞ্চলে অত্যাচার চালাইতেছে।

এলাস বাহিনী বন্দীদের মুক্তি দিতেছে না এই অভিযোগের উত্তরে 'টাইমস' পত্রিকার কুটনৈতিক সংবাদ দাতা বলেন "গ্রাক সরকারের হাতে এলাস বন্দীদের নির্য্যাতন বন্ধ করিবার জন্যই এলাস বাহিনী সরকার পক্ষের বন্দীদের আটকাইয়া রাখিয়াছে। এলাস বন্দীদের নির্য্যাতন করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলেই সমস্যার সমাধান হয়।"

ই, এ, এম দলে ভাঙ্গন সম্পর্কে প্রচারও মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত 'রেনল্ড নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ যে, সমাজতান্ত্রিক পার্টি, কৃষক পার্টি, পপুলার ডেমক্রেটিক ইউনিয়ন প্রভৃতি দলের যে সমস্ত তথাকথিত প্রতিনিধি ই এ, এম দল ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহারা কেহই

(শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

লালফৌজের বৃহত্তম অভিযান

"আমরা বার্লিনে গিয়া পৌঁছিবই"—'রেড ষ্টার' পত্রিকার ঘোষণা

[নিরঞ্জন সেন]

মস্কো বেতারে ১৮ই জানুয়ারী রাত্রে ঘোষণা করা হয়—"জার্ম্মানীর দিকে বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। লালফৌজ জার্ম্মানীর পথে সর্ব্বশেষ বাধা চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। কোন কিছুই লালফৌজের বার্লিন প্রবেশের পবিত্র প্রেরণায় বাধা দানে সমর্থ হইবে না।"

সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে নূতন করিয়া এবার আবার প্রচণ্ড লড়াই সুরু হইয়াছে। আক্রমণের দুর্ব্বার গতি দেখিয়া বচনবাগীশ গোয়েবলস্ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে 'যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।' গোয়েবলস্ যে কেন এমন হতাশভাবে নূতন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহা বোঝা যাইবে এই কয়েক দিনের রুশ সৈন্যের বিপুল সাফল্যের খবরগুলি হইতে।

লালফৌজের বিরাট জয়

এই অভিযান সুরু হইবার সাথে সাথেই সোভিয়েট বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান গৌরবময় সাফল্য হইতেছে পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ অধিকার। ওয়ারশ জয়ের পরে মার্শাল জুকভের আর্ম্মি ইতিহাস প্রসিদ্ধ পোলিশ নগরী লজ দখল করে। আবার অন্য দিকে দক্ষিণ পোলাণ্ড ও সাইলেসিয়া অঞ্চলে

পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার টানেনবুর্গ, ইনষ্টার-বুর্গ ও গাম্বিনেন লালফৌজ দখল করিয়াছে।

মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যবাহিনী ক্রাকাও, জেষ্টো-চোয়া, রডমস্ক, রাডোম প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল ও যান চালাচলের কেন্দ্রগুলি ক্ষিপ্রবেগে নাৎসীদের হাত হইতে কাড়িয়া নেয়। উত্তর পোলাণ্ডে মার্শাল রকোসভস্কীর সৈন্যদল পূর্ব্বপ্রুশিয়ার সীমানা ভেদ করিয়াছে। তাঁহার উত্তরে মার্শাল চের্ণিয়াকোভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ খাস জার্ম্মান সহর টিলসিট নাৎসীদের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। ইহা ছাড়া চেক-হাঙ্গেরী সীমান্তে কোসিস সহরটি প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লালফৌজের হাতে আসিয়াছে।

আক্রমণের গতিবেগ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 'রেড ষ্টার' পত্রিকা লিখিয়াছে—'লালফৌজ আজ যুদ্ধকে জার্ম্মান সীমান্তে লইয়া গিয়াছে এবং অভিযানের বেগ পুরাদস্তুর বজায় আছে।'

শত শত মাইল ব্যাপী জার্ম্মানব্যূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সোভিয়েট অগ্রগতি শিথিল করার ব্যর্থ চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ জার্ম্মানদলগুলিকে প্রাণপণে নূতন ভাবে সন্নিবেশ করা হইতেছে।

মার্শাল কনিয়েভ, জুকভ ও রকোসভস্কী সৈন্যদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, 'শত্রুকে পর্যুদস্ত করিয়া ধ্বংস কর।'

সোভিয়েটের নূতন আক্রমণের গতি

অভিযানের প্রথম দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার তিনজন বিখ্যাত মার্শাল তিনটি বিরাট সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া এই দুর্দ্দান্ত অভিযান সুরু করেন। এই আক্রমণ এত প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যে জার্ম্মান রক্ষাব্যূহগুলি ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, ফলে পূর্ব্ব প্রুশিয়া হইতে দক্ষিণ পোলাণ্ড পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে একটানা ফ্রণ্টের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই আক্রমণের উত্তরে মার্শাল রকোসভস্কীর সৈন্যদলের উপরের বাহু পূর্ব্ব-প্রুশিয়াকে পাশ কাটাইয়া ডানজিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার সাথে সাথে জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কীর সৈন্যদল সম্মুখভাগ হইতেই পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার দিকে আগাইয়া গিয়াছে। তাহাদের লক্ষ্য কনিংসবুর্গ।

মার্শাল রকোসভস্কীর সৈন্য বাহিনীর দক্ষিণে মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে লালফৌজ ওয়ারশ দখল করিয়া তড়িৎ গতিতে বার্লিনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার সেনাদল সামনের দিকে আগাইতে যাইয়া যে কোন বাধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাকেই তৃণের মত পিষিয়া মারিতেছে। ওয়ারশ হইতে বার্লিন যাইবার সোজা রাস্তার তিন ভাগের এক ভাগ তাহারা ইতিমধ্যেই পার হইয়া গিয়াছে। অগ্রগমণের এই ক্ষিপ্রতার উল্লেখ করিতে গিয়া 'রেড ষ্টার' লিখিয়াছে—'আমাদের অভিযান সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। আমরা বার্লিন গিয়া পৌঁছিবই।' সর্ব্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে সোভিয়েট বাহিনী বার্লিনের দুইশত মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

মার্শাল জুকভের আর্ম্মি যেখানে রহিয়াছে তাহার নিম্নে মার্শাল কনিয়েভের নেতৃত্বে সোভিয়েট সেনা বিরাট অভিযানে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে। এবারকার শীতকালীন অভিযান সর্ব্বপ্রথম সুরু করিয়াছিলেন মার্শাল কনিয়েভ এবং অভিযানের ৯ দিনের মধ্যেই তাঁহার বাহিনী ১৭০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। লালফৌজ সাইলেসিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জার্ম্মানীর পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে ব্রেসলুর ২৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত মানসলাউ নামক একটি সহর দখল করে। এই ফ্রণ্টেরই অন্যান্য স্থানে লালফৌজ জার্ম্মানীর ২০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

মার্শাল কনিয়েভের নীচেই জেনারেল পেট্রভের বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত যানবাহন কেন্দ্র কোসিস দখল করিয়া আরও অনেক পথ আগাইয়া গিয়াছে। মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যদলের একটি বাহু দক্ষিণ পোলাণ্ড দিয়া চেক সীমান্তে জেনারেল পেট্রভের সৈন্যদলের সহিত মিলিতে চলিয়াছে।

লালফৌজের বর্ত্তমান সন্নিবেশ

তৃতীয় শ্বেত-রাশিয়ান আর্ম্মির নায়ক জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কী ও তাঁহার সৈন্যদল সম্মুখের দিক দিয়া পূর্ব্বপ্রুশিয়ায় ঢুকিয়াছে।

তাহারই নীচে দ্বিতীয় শ্বেত-রাশিয়ান আর্ম্মি মার্শাল রকোসভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ একদিক দিয়া পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার মধ্যে ঢুকিয়াছে এবং সীমান্ত ধরিয়া পূর্ব্বপ্রুশিয়াকে ঘিরিয়া ফেলিতে চলিয়াছে, আবার অন্যদিক দিয়া নীচের দিকেও চাপ রাখিয়াছে।

ইহার দক্ষিণে মার্শাল জুকভের অধীনে প্রথম শ্বেত রাশিয়ান আর্ম্মি সোজাসুজি জার্ম্মানীর অন্তঃস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মার্শাল কনিয়েভের সেনাদলের অবস্থিতি ইহারই নীচে। ইনি প্রথম ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মির নেতৃত্ব করিতেছেন। ইহার সৈন্যদল ইতিমধ্যেই সাইলেসিয়ায় ঢুকিয়া পড়িয়া ব্রেসলু নগরী দখল করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার নীচে চতুর্থ ইউক্রেনিয়ান সেনাদলের নায়ক জেনারেল পেট্রভের বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাৎসীদের নির্ম্মূল করিতেছে।

লালফৌজের শীতকালীন অভিযানে এখন পর্য্যন্ত এই পাঁচটি সেনাদলকে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া হাঙ্গেরীর যুদ্ধে দুইটি সোভিয়েট আর্ম্মি বহুদিন আগে হইতেই নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সেনাদল দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মি। ইহাদের নেতা মার্শাল টলবুখিন ও মার্শাল মালিনোভস্কী।

জেনারেল পেট্রভের নীচে মার্শাল মালিনোভস্কীর সৈন্যদল বুডাপেষ্টে এক বাহু বিস্তার করিয়াছে এবং অন্য আর একটি বাহু ব্রাটিশ্লাভার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে ভিয়েনা লক্ষ্য করিয়া। মার্শাল টলবুখিনের সৈন্যদলের এক অংশ বুডাপেষ্টে গিয়া মার্শাল মালিনোভস্কীর সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অন্য বাহু হাঙ্গেরীর দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তার লাভ করিতেছে। তাহাদের লক্ষ্য নীচের দিক হইতে অষ্ট্রিয়াকে আঘাত হানা।

মার্শাল টলবুখিনের সৈন্যদলের সহিত যোগ রাখিয়া চলিয়াছে যুগোশ্লাভ মুক্তিবাহিনীর নেতা মার্শাল টিটোর সেনাবাহিনী।

লালফৌজের এই ব্যাপক অভিযান সম্পর্কে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এতবড় অভিযান আর হয় নাই।

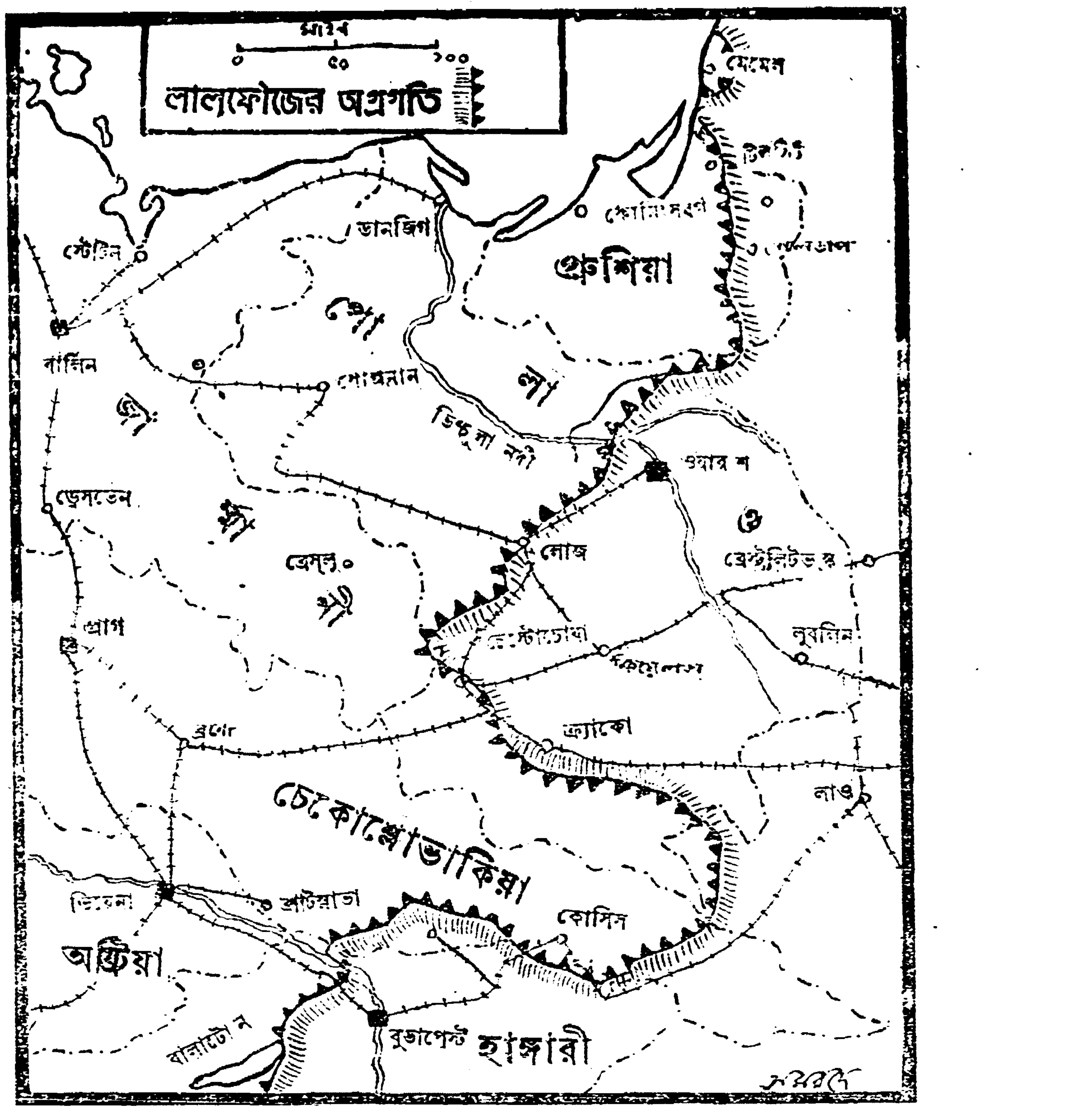

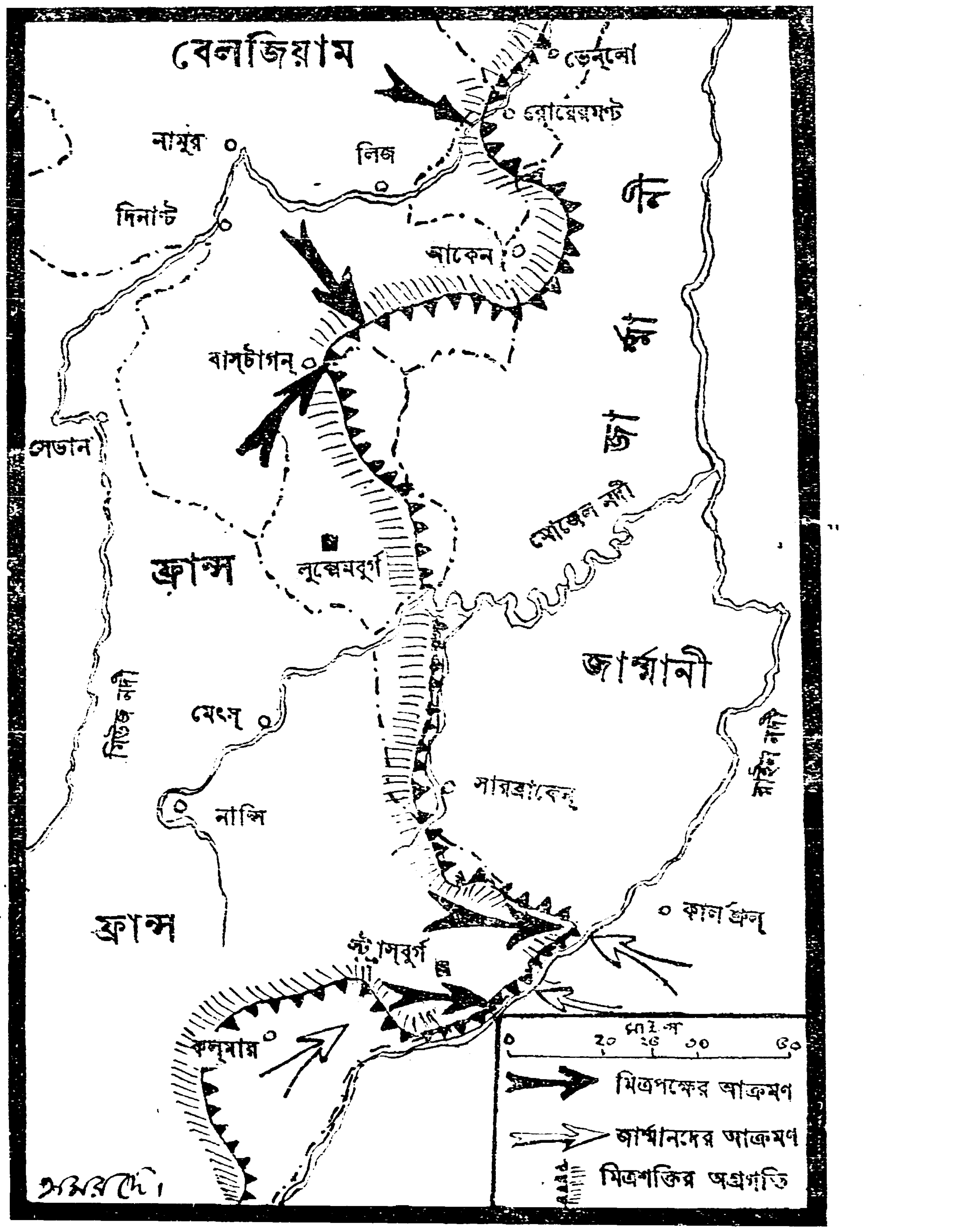

পশ্চিম ইউরোপের লড়াই

পশ্চিম ফ্রণ্টে মিত্রপক্ষের সৈন্য সমাবেশ সুরু হইয়াছে হলাণ্ড হইতে। সর্ব্বপ্রথমই ক্যানাডিয়ান প্রথম আর্ম্মির অবস্থিতি। ইহার নীচে পর পর রহিয়াছে বৃটিশ দ্বিতীয় আর্ম্মি, মার্কিন নবম আর্ম্মি মার্কিন প্রথম আর্ম্মি, মার্কিন তৃতীয় আর্ম্মি, মার্কিন সপ্তম আর্ম্মি এবং সর্ব্বনিম্নে রহিয়াছে ফরাসী প্রথম আর্ম্মি।

জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণ প্রথম সুরু হইয়াছিল মার্কিন প্রথম আর্ম্মি ও মার্কিন নবম আর্ম্মির অবস্থানের উপর দক্ষিণ বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ অঞ্চলে। এই আক্রমণের প্রথম দিকে জার্ম্মানরা পর পর অনেকগুলি সহর দখল করে এবং প্রায় ৭০ মাইল আগাইয়া যায়। ফলে মিত্রপক্ষের একটানা আক্রমণোদ্যোগের উপর আঘাত পড়ে।

(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

Regd. No. C. 2836.

মার্শাল জুকভ

মার্শাল রকোসভস্কি

মার্শাল কনিয়েভ

মার্শাল মালিনভস্কি

★ লালফৌজের বিরাট শীত অভিযানেঃ রুশ রণাঙ্গনের সেনানায়কগণ ★

(১৫ পৃঃ পর)

অবশ্য তারপর জার্ম্মানদের এই পাল্টা আক্রমণকে ভোঁতা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষ খবর হইতে জানা যায় যে আর্ডেনিসে জার্ম্মানদের এই পাল্টা আক্রমণের সাফল্যের প্রায় সব চিহ্নই

·জেনারেল পেট্রভ

মুছিয়া ফেলা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলে মিত্রবাহিনী নূতন আক্রমণও সুরু করিয়াছে।

জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণের পরবর্ত্তী লক্ষ্য ছিল ষ্ট্রাসবুর্গ অঞ্চলে মার্কিন সপ্তম আর্ম্মির অবস্থানের মধ্যে। এখানেও আক্রমণের প্রথম দিকে জার্ম্মানী কিছুটা আগাইয়া গিয়াছিল। পরে যদিও আক্রমণের তীব্রতা শিথিল হইয়া যায়, তবে এখনও জার্ম্মান সৈন্যরা এখানে কিছু কিছু তৎপরতা বজায় রাখিয়াছে।

জার্ম্মানদের পাল্টা আক্রমণের সোরগোল কমিয়া যাওয়ার সাথে সাথে মিত্রবাহিনী অবশ্য এই রণাঙ্গনে আক্রমণের কিছুটা উদ্যোগ দেখাইতেছে, যেমন হল্যাণ্ডে কানাডিয়ান সৈন্যের একটি নূতন অভিযান, বৃটিশ বাহিনীর কিছুটা নূতন অগ্রগতি, স্থানে স্থানে মার্কিন বাহিনীগুলির কিছু কিছু কর্ম্মতৎপরতা এবং সর্ব্বনিম্নে প্রথম ফরাসী বাহিনীর দক্ষিণ আলসাসে একটি নয়া আক্রমণ।

জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্য

কিছুদিন আগেও জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণ যখন সুরু হয় নাই, পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনী তখনও জার্ম্মানীর দিকে আগাইয়া যাইতেছিল। এই সাফল্যের ফলে ইঙ্গ মার্কিন মহলে কিছুটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দেয়। তাঁহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদের কত তাড়াতাড়ি নির্ম্মূল করা যায় সেই চিন্তা না করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন কি ভাবে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখা যায়। বেলজিয়ামের দ্বারদেশে যখন নির্ম্মম শত্রু পুনরায় সুযোগ খুঁজিতেছিল কি ভাবে আবার সেখানে ঢুঁ মারা যায়, তখন ব্রুসেলসের রাস্তায় রাস্তায় নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলিয়াছিল বৃটিশের তাঁবেদার পিয়ারলো সরকারের আদেশে। রক্তে রঙ্গীন বেলজিয়ামের উপর তখনই আবার জার্ম্মানীর পাল্টা আক্রমণ সুরু হয়।

রুনষ্টেড চাহিয়াছিল লালফৌজের শীতকালীন অভিযানের সাথে সাথেই যাহাতে মিত্রপক্ষ এই ফ্রণ্টেও জোর আক্রমণ না হানিতে পারে। তাহার পাল্টা আক্রমণের এই অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কি

ফ্যাসিষ্টদের আশা নির্ম্মূল কর

এখন আবার হিটলার তাহার দালাল ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোকে দিয়াও কিছুটা সুবিধা সুযোগ খুঁজিতেছে। ফ্রাঙ্কোর মারফত বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা হইতেছে। 'নরম সন্ধি'র কথা কিছুদিন আগেও শোনা গিয়াছিল। আবার কথা উঠিয়াছে ফ্রাঙ্কোকে আগামী শান্তি বৈঠকে ঢুকিতে দেওয়া উচিত। ফ্রাঙ্কোর সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতি সাধারণ লোকের মনে আস্থা আনিতে পারে নাই। ফ্রাঙ্কো হিটলার ও মুসোলিনীর সাকরেদ। স্পেনের বুকেই ফ্যাসিষ্ট শক্তি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম বাজীতে জিতিয়াছিল এবং ফ্রাঙ্কোই ছিল সেদিন তাহাদের প্রধান অবলম্বন। বেলজিয়ামের ঘটনাবলী, ফ্রাঙ্কোর আবদার, গ্রীসে প্লাষ্টিরাসের কুকীর্ত্তি প্রভৃতি ঘটনাগুলি হইতে এই প্রধান সত্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে, মিত্র শিবিরে আজও এমন সব জিনিষ বরদাস্ত করা হয় যাহা সর্ব্বগ্রাসী ফ্যাসিষ্টবিরোধী লড়াইকে সফল করার পথে দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

সোভিয়েট রণনীতির মূল কথা স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন ও সংগঠিত যুদ্ধপ্রচেষ্টা। আজ অন্যান্য মিত্রশক্তিকেও এই গণতান্ত্রিক রণনীতির উপর দাঁড়াইয়া একযোগে লালফৌজের সাথে ঐক্য বজায় রাখিয়া জার্ম্মান সমরযন্ত্রের উপর তীব্র আঘাত হানিতে হইবে।

মার্শাল টলবুখিন

পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে একসাথে আঘাত হানিলে নাৎসী জার্ম্মানী আর কতদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে?

ফিলিপাইন যুদ্ধ

লুজন দ্বীপে মার্কিন সৈন্যের অগ্রগতি

ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপে ম্যাকআর্থারের বাহিনী বেশ খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। ১৯শে জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ 'শক্তিশালী টহলদারী সৈন্যদল বর্ত্তমানে লুজনের উপকূল হইতে দেশের ৩৫ মাইল অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা ফিলিপাইনের এই নূতন আক্রমণের গুরুত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে।

ম্যানিলার উত্তরে মিত্রপক্ষের অবতরণে জাপানীরা বিরাট এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই দ্বীপের সাহায্যে সমুদ্রপথে একস্থান হইতে অন্যস্থানে জাপানীরা সরবরাহ ব্যবস্থা চালাইত। তাহার পথ রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। জাপানী অধিকৃত জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশ জাপান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং চীন সমুদ্রেও জাপানী প্রাধান্য বিপদ্গ্রস্ত হওয়া—ইহাই ফিলিপাইন হস্তচ্যুত হওয়ার অর্থ। এই সব সমৃদ্ধ এলাকা হইতে জাপান প্রচুর কাঁচামালের যোগান পায়।

তাই জাপানের ভিতর এই সমস্যা লইয়া যথেষ্ট আলোড়ন দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট নৌবাহিনীর মুখপত্র 'রেড ফ্লিট' ২৯শে ডিসেম্বরের 'তাইরি সিম্পো' হইতে যে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছে তাহা এই—'ফিলিপাইন ফ্রণ্ট যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাই এই ফ্রণ্টের পরাজয়ের সাথে অন্য কোনস্থানের পরাজয় তুলনা করা চলে না।'

মিত্রপক্ষের লুজন আক্রমণ জাপানে যে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বোঝা যায় বিখ্যাত জাপানী সংবাদপত্র 'আসাই সিম্বুন'-এর ১১ই জানুয়ারী তারিখের মন্তব্যে। এই কাগজে বেশ জোরের সহিতই জাপানী সমরযন্ত্রকে নূতন ভাবে ঢালিয়া সাজার দাবী করা হইয়াছে।

জাপ প্রধান মন্ত্রী কাইসো ২১শে জানুয়ারী জাপ-পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা দেয় তাহা হইতেও জাপানীদের উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বক্তৃতায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—'যুদ্ধ পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে গুরুতর হইতেছে। বৃহত্তর পূর্ব্ব এসিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমাদের দেশ আজ বৃহত্তম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। আমেরিকানরা লুজনে অবতরণ করায় একটি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।...বর্ত্তমান সংগ্রাম আমাদের জীবনমরণের সংগ্রাম।'

জাপানের আভ্যন্তরীণ এই সব গোলমালের কথা খাভারোভস্কের সোভিয়েট রেডিও হইতেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সামরিক দিক দিয়া জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাপানী মনোবলের উপর দারুণ আঘাত পড়িয়াছে। এমন কি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ও বড় বড় শিল্পপতিদের মধ্যে মতানৈক্যও দেখা দিয়াছে।

সুতরাং ফিলিপাইনের অবতরণ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের এক নূতন অধ্যায় আনিয়া দিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলের জাপানী অধিকৃত সমগ্র দ্বীপগুলির জন্য যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার শেষ অধ্যায় উপস্থিত হইলে লড়াই খুব ভীষণ হইবে। জাপানীরা প্রাণপণে বাধা দিবে যাহাতে ৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত চীনের উপকূলে সৈন্য নামাইবার কোন ভাল ঘাঁটি মিত্রশক্তি না পায়। সেইরূপ সুবিধা করিতে সম্ভবতঃ মিত্রপক্ষের আরও কয়েক মাস লাগিবে। কিন্তু আজকের দিনে এই এলাকায় চীনই লড়াইয়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে।

অথচ চীনের বিপদ ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকারের গঠনের জন্য কমিউনিষ্ট ও প্রগতিশীলদের যে দাবী, সে দাবী স্বীকার করার দিকে চিয়াং কাই-সেক এক পাও অগ্রসর হন নাই!

ব্রহ্মদেশেও মিত্রপক্ষের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে।

এ বিষয়ে লণ্ডনের 'ডেলি ওয়ার্কার'-এর মত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলামঃ

'ফিলিপাইনের স্থলযুদ্ধে ফিলিপাইনবাসী গেরিলার দল বিরাট ভাবে সাহায্য করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ফিলিপাইনবাসীর স্বাধীনতার জন্য দিন নির্দ্ধারিত করিয়া এবং সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ঘোষণাই এই গেরিলা দলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের জনসাধারণের কাছ হইতে যুদ্ধে সাগ্রহ সমর্থন এবং ভবিষ্যতের আরও কঠোরতর কাজের জন্য তাহাদের নিকট হইতে আন্তরিক সহযোগিতা লাভের জন্য বিটিশ গবর্ণমেণ্ট কবে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন?

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা] ১লা ফেব্রুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার. ১৯শে মাঘ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

কলিকাতায় বসন্ত মহামারীর মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে

কর্পোরেশন ও সরকারে লড়াই বন্ধ কর

টাকার অঙ্কে জীবন মাপিও না

সাধারণতঃ মার্চ্চ-এপ্রিল মাসেই কলিকাতায় বসন্ত রোগ দেখা দেয়। কিন্তু এবার নভেম্বর মাস হইতেই একেবারে মহামারীর মত বসন্ত সুরু হইয়াছে। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর মাসে বসন্তে মারা গিয়াছিল ১৫০ জন, আর এবার ডিসেম্বর মাসে তাহার তিন গুণ লোক (৪৫০ জন) মারা গিয়াছে। তাহার পর জানুয়ারী মাসে কলিকাতার ঘরে ঘরে বসন্তের বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রথম তিন সপ্তাহেই প্রায় ৮২২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সব চেয়ে আতঙ্কের কথা যে, এই রোগে আক্রান্ত লোকের অধিকাংশই মারা যাইতেছে। কর্পোরেশনের হিসাব মতে জানুয়ারী মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে ১০১৫ জন বসন্তে আক্রান্ত হয়, তাহার মধ্যে ৮২৩ জনই মারা যায়। অর্থাৎ প্রায় তেরো আনা রোগীই মরিতে বাধ্য হইতেছে, অবধারিত মৃত্যুর হাত হইতে প্রায় কাহাকেও বাঁচানো যাইতেছে না। যাহারা কোনো ক্রমে বাঁচিবে তাহাদিগকেও ইহার ক্ষতচিহ্ন ও শারীরিক বিকৃতি চিরজীবন বহন করিতে হইবে। এখনই এই ভীষণ অবস্থা, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বসন্তের আসল মরশুম সুরু হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে ভাবিতে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

মাত্র ২৫০ রোগীর ব্যবস্থা

অথচ শহরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সরকার ও কর্পোরেশন রোগের চিকিৎসার ভার প্রায় দৈবের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছে। একমাত্র ক্যাম্বেল হাসপাতালে বসন্ত রোগীকে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে সাধারণতঃ ১২০টী রোগীর ব্যবস্থা থাকে, বর্ত্তমানে উহা সামান্য বাড়াইয়া প্রায় ২৫০ রোগীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় বারো আনা রোগীর জন্যই হাসপাতালে স্থান নাই। কলিকাতার ঘিঞ্জি

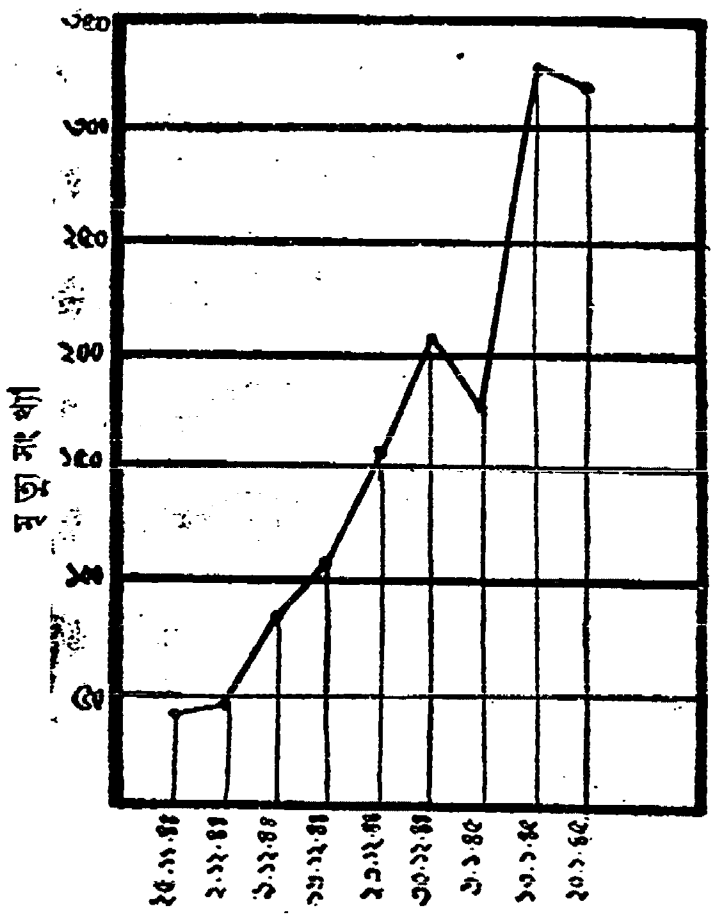

বসন্তে মৃত্যুর সাপ্তাহিক হিসাব

বাড়ী বা বস্তীর ভিতরেই তাহাদিগকে ছটফট করিয়া মরিতে হইতেছে এবং তাহাদের রোগের বিষ সারা অঞ্চলকে বিষাক্ত করিয়া আরও হাজার হাজার সুস্থ মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিতেছে।

ইহার ভিতর একটুও অত্যুক্তি নাই। বসন্তের অবস্থা দেখিবার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে বেতবাগান বস্তীর এক বাড়ীতে দেখিলাম ঘরের বারান্দায় একটী মজুর পরিবার বাস করে। একটী শিশুর সারা গায়ে বসন্তের গুটী পচিয়া দুর্গন্ধ উঠিয়াছে, মাছি ভনভন করিতেছে। তাহার বিছানার পাশেই রান্নার উনুন, সেখানে বসিয়া আর দুইটী ছেলে ভাত খাইতেছে। স্বচক্ষে দেখিলাম গুটী হইতে মাছি উঠিয়া ভাতে বসিতেছে। শুনিলাম ঐ একটী ছাড়া বিছানা তাহাদের নাই। এই শীতের রাত্রে তিনটী শিশু একটী কাঁথার নীচেই শুইয়া থাকে।

৩৪।১ নং ট্যাংরা রোডে কর্পোরেশনের ধাঙ্গড় ব্যারাক, সেখানে প্রায় ২৫০ লোক থাকে। দেখিলাম ঘরের সম্মুখে রৌদ্রে ১৪।১৫ জন পাশাপাশি শুইয়া আছে, প্রত্যেকেই বসন্তে আক্রান্ত। আরও প্রায় ৬০ জন ঘরেই শুইয়া আছে, তাহাদের বাহিরে আসার ক্ষমতা নাই।

শবের মিছিল

বাগবাজার জেলিয়া পাড়া বস্তিতে এমন ঘর নাই যেখানে অন্তত একজন আক্রান্ত হয় নাই। সেখানকার এক দোকানদার বলিল, "বাবু, কদিন আগে এমন অবস্থা হয়েছিল যে একটা মড়া পুড়িয়ে বাড়ী ফিরেই আর একটা নিয়ে শ্মশানে ছুটতে হয়েছিল, বসবারও সময় পাইনি!"

অথচ সময়মত টীকা দিলে ইহাদের প্রায় প্রত্যেককেই বাঁচানো যাইত। কিন্তু ইহাদিগকে বাঁচাইবার দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের নেতারা অনুভব করেন না।

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতার দেশপ্রেম— —টাকার অঙ্কে

বর্ত্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লক দলই কর্পোরেশনে সব চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব করে। ঐ দলের নেতা শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী গত ১৭ই জানুয়ারী কর্পোরেশনের সভায় ঘোষণা করেন:

"...বর্ত্তমানে কলিকাতার জনসংখ্যা ৪০ লক্ষেরও বেশী, উহার মধ্যে একটী অংশ মাত্র (কর্পোরেশনের) ট্যাক্স দিয়া থাকে। মাত্র এই কয়েক লক্ষ লোক ৪০ লক্ষ লোকের (টীকা দিবার) বোঝা বহন করিবে ইহা গবর্ণমেণ্ট কিরূপে আশা করে?..."

[অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮।১।৪৫]

অর্থাৎ সুধীর বাবু যাহাতে বসন্তে আক্রান্ত না হন তাহা দেখিবার দায়িত্ব কর্পোরেশনের। কিন্তু সুধীর বাবুর ভৃত্য বা মোটর ড্রাইভারকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কর্পোরেশনের নাই, যেহেতু তাহারা ট্যাক্স দেয় না!

এবং এই ব্যাপারে হিন্দুসভা দলও সুধীর বাবুর দলকেই সমর্থন করে।

মহামারীতে ধনী দরিদ্র নাই

শুধু ধনীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই কলিকাতা কর্পোরেশন—একথা শুনিলে কলিকাতার ধনী-নির্ধনী প্রত্যেকটী দেশভক্ত নাগরিকই ঘৃণা বোধ করিবেন। কিন্তু সেকথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যায় যে, সুধীর বাবুদের মত ধনী নাগরিকদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরেও কলিকাতার প্রত্যেকটী অধিবাসীকে বসন্তের আতঙ্ক হইতে বাঁচানো দরকার কারণ বসন্ত মহামারী ধনী-দরিদ্রের ভেদ করে না— সুধীর বাবুর ভৃত্য বসন্তে আক্রান্ত হইলে তাহা হইতেই তাঁহার পাড়ায় সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আক্রান্ত হইবে।

আজ কলিকাতায় তাহাই ঘটিতেছে। গরীব বসতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত অঞ্চলও বসন্ত মহামারীতে ছাইয়া যাইতেছে।

মধ্যবিত্ত এলাকা

শোভাবাজার এলাকার একজন এ-আর-পি কর্ম্মী টীকা দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, শোভাবাজার ষ্ট্রীটের ৪০টী বাড়ীতে ১৩ জন বসন্ত রোগী দেখিয়াছেন এবং তিনি নিজেই জানেন যে এই বাড়ীগুলিতেই গত ১৫ দিনের মধ্যে ৫ জন মারা গিয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশই স্বচ্ছল গৃহস্থ।

বাগবাজার এলাকার একজন ডাক্তার বলিলেন যে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত বাড়ীতে তিনি প্রায় পঁচিশ জন রোগী দেখিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারীর ষ্টেটস্‌ম্যানে কলিকাতার প্রত্যেকটী এলাকা আলাদা আলাদা ধরিয়া মৃত্যুর যে মানচিত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ধনী-দরিদ্র কোনো অঞ্চলই মহামারী হইতে নিস্তার পায় নাই। শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, জোড়াসাঁকো হইতে বালিগঞ্জ, একবালপুর, হেষ্টিংস প্রভৃতি সব অঞ্চলই মহামারীতে ভুগিতেছে।

নিম্ন-মধ্যবিত্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ৬৯।১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের অপূর্ব্ব বাবু দুইটি শিশু সন্তান, স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে লইয়া একটী ঘরেই থাকেন। বড় ছেলেটী বসন্তে মারা যাইবার পর কর্পোরেশনের লোক আসিয়া নিয়ম অনুযায়ী ঘরের বিছানাপত্র ফেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু তাঁহাদের দ্বিতীয় বিছানা নাই বলিয়া তাঁহারা কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করেন। ১১ দিন পরে ছোট ছেলেটীও আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। সময়মত হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ও টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে হয়তো দুটী ছেলেই বাঁচিতে পারিত। বিছানার অভাবও শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিত না।

সরকার ও কর্পোরেশনে মল্লযুদ্ধ

কলিকাতা শহরের বাসিন্দারা যখন এই ভয়াবহ মহামারীর আতঙ্কে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে তখন কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলা সরকার কাগজে কলমে মল্লযুদ্ধ করিতেছে—দায়িত্ব কাহার, টাকা কে দিবে! গবর্ণমেণ্ট তো এই অজুহাতে ভারতরক্ষা-আইন বলে হুকুম জারি করিল যে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগ গবর্ণমেণ্টের তাঁবে আসিবে। যেন তাঁবে আসিলেই লোকের রোগ সারিয়া যাইবে!

তাহার পর কাহার কত কেরদানী তাহা লইয়া পাল্লাপাল্লি সুরু হইল। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিল— প্রায় পাঁচশো জন এ-আর-পি কর্ম্মীকে বাড়ী বাড়ী টীকা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বাধ্যতামূলক ভাবে টীকা দেওয়ার আইন জারি করা হইতেছে ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট হিসাব দিল যে ১১ ও ১২ জানুয়ারী এই দু'দিনেই তাহারা ২ লক্ষ লোককে টীকা দিয়াছে, এই হারে বাকী সমস্ত লোককে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই টীকা দেওয়া হইয়া যাইবে।

সরকারী বিজ্ঞাপন

কিন্তু এই টীকার অনেকখানিই কাগজে কলমে। একটী উদাহরণ দিতেছি। এ-আর-পি ১৯ নং সাব এরিয়ায় শীল ষ্ট্রীটের প্রত্যেকটী বাড়ীতে টীকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারের রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে। তাহার পর ঐ রাস্তার ১৪টী বাড়ীতে আমরা খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম ৫৬ জন অধিবাসীকে টীকা দেওয়া হয় নাই।

বহু এ-আর-পি কর্ম্মী সকলকে টীকা দিবার জন্য যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। একজনের সঙ্গে আলাপ করিতে তিনি বলিলেন, "যারা বাড়িয়ে হিসাব দিচ্ছে তাদের আর দোষ কি? নিজেতো দেখছি, অনেক না বোঝালে লোকে সহজে টীকা নেয়না, একদিনে কিছুতেই ১০০ জনের বেশী দেওয়া যায় না। অথচ ওপর থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে—আরও বেশী। বাধ্য হয়েই বোধ হয় মিথ্যে হিসেব দিতে হয়।"

আর একজন এ-আর পি ডাক্তারও এই কথাই বলিলেন। ৫০০ জনের মধ্যে ১০০।২০০ জন ছুটী, পোষ্ট ডিউটী ইত্যাদি কারণে টীকা দেওয়ার কাজে যাইতে পারে না। বাকী ৩।৪ শো জন রোজ ১০০

(শেষাংশ ২য় পৃঃ দেখুন)

সম্পাদকীয়

হক-শ্যামাপ্রসাদের "ঐক্য"

ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলার এসেম্বলি বসিবে। তাহার ঠিক কয়েকদিন আগে ফজলুল হক সাহেব হঠাৎ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে এসেম্বলির সমস্ত রাজনীতিক দলের পক্ষে এখন একত্র হইয়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের মতই এখনও প্রয়োজন হইলে তিনি নিজে মন্ত্রীত্বের লোভ সংবরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

তাঁহার বিবৃতি দেখিয়া আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে উহা হক সাহেবের চিরাচরিত আত্ম-বিজ্ঞাপন মাত্র। বিশেষতঃ কলিকাতায় যখন সমস্ত ভারতের সম্পাদক-সম্মেলন হইতেছে তখন বিজ্ঞাপনের এত উপযুক্ত সময় আর কবে হইতে পারে? হক সাহেবের বিবৃতি সম্বন্ধে অমৃতবাজার প্রভৃতি দায়িত্বশীল কাগজের নীরবতা দেখিয়া আমাদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছিল।

কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিবৃতির পক্ষে বিরাট ওকালতি দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল হক সাহেবের প্রেরণার উৎস কোথায়। ন্যাশনালিষ্ট এই বিবৃতির ব্যাখ্যা করিয়া যাহা লিখিয়াছে তাহার সারমর্ম্ম হইল: নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীমণ্ডলী বাংলার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং উহার প্রধান প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করুন যে, সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছেন না। সেজন্য লাটসাহেব কেসির কাছে ন্যাশনালিষ্ট দরবার করিয়াছে যে, তিনি এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে দূর করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করুন—তাহাতে প্রদেশের মঙ্গলসাধন কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

সোজা কথায় ইহার অর্থ দাঁড়ায়, দেশভক্ত ও 'চরমপন্থী' ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ লাটসাহেব তথা আমলাতন্ত্রের কাছে বিনীত আর্জ্জি পেশ করিতেছেন যে, তোমরা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে দূর করিয়া আমাদের মত লোককে গদিতে বসাও, তাহাতে তোমাদের কাজেরই সুবিধা হইবে। এই আমলাতন্ত্রই আজ বাংলা তথা ভারতের একচ্ছত্র প্রভু, তাঁহাদের রাজত্বেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অভাবের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তথা হক সাহেবের আবেদন তাঁহাদেরই কাছে।

১৯৪৩ সালে হক সাহেব পদত্যাগ করিয়াও আবার পদ আঁকড়াইয়া ধরিবার পরিহাসকর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তখন সার জন হারবার্ট যে অপকৌশলে তাঁহাকে সরাইয়া নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীমণ্ডলীকে গদিতে বসাইয়াছিলেন, দেশভক্ত বাঙ্গালী তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। আজ আবার সেই কৌশলেই নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডলীকে সরাইবার জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের কাগজ মিঃ কেসির কাছে দরবার করিতেছে!

বাংলা দেশে আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়া প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে হইলে সকলের আগে প্রয়োজন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তথা হক সাহেবের এই দুর্নীতিকে পরাস্ত করা। শুধু কংগ্রেস ও লীগের একতাবদ্ধ চেষ্টায়ই তাহা সম্ভব।

কমিউনিষ্ট বর্জ্জন নীতি পরাস্ত : জনসেবার বাস্তব সিদ্ধান্ত গৃহীত

রংপুর কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন

গত ২১শে জানুয়ারী রংপুর জেলা কংগ্রেস অফিসে কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মহীউদ্দিন খাঁ সাহেব, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মৌলবী আবু হোসেন সরকার, ভবতারণ লাহিড়ী, অতুলকৃষ্ণ রায়, ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জগদীশ দাশ গুপ্ত ব্রজমাধব দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং মণিকৃষ্ণ সেন, অবনী বাগচী প্রভৃতি কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীবৃন্দ। এমন কি দু'জন পুরাতন কংগ্রেসকর্ম্মী—করুণাকান্ত সাহা, যিনি ডোমারে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা এবং ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের সময় কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহারাও এই সম্মেলনে নূতন উৎসাহে যোগ দেন।

রংপুর শহরে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন মতের কংগ্রেসকর্ম্মীদের এই ধরণের একত্র সমাবেশ আর কখনও দেখা যায় নাই। রংপুরের কংগ্রেসকর্ম্মীরা শুধু যে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাই নয়—তাঁহারা কংগ্রেসকে দলগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আত্মঘাতী পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; জেলার অনশনক্লিষ্ট রোগজর্জ্জরিত জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প এই সম্মেলনে ধ্বনিত হয়।

রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ছবি ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ঐক্যের বাণীতে সভাগৃহ সুসজ্জিত। স্থানীয় সারস্বত সম্মেলনের জনপ্রিয় সাহিত্যিক জগদীশ দাশ গুপ্তের 'বন্দে মাতরম্' গানে সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। **মহীউদ্দীন খাঁ সাহেব** সভাপতির উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিলেন, কংগ্রেসের যে গৌরবময় ঐতিহ্য আমরা হারাইয়া বসিয়াছিলাম, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্যই এই সভার আয়োজন হইয়াছে। জনসেবার মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রংপুরের বিধ্বস্ত সমাজ-জীবনকে পুনর্গঠিত করার জন্য গান্ধীজির গঠনমূলক প্রস্তাবকে কাজে লাগানোর জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। কংগ্রেসকে দলগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রশ্নে সভাপতি অতীতের যুক্ত ফ্রণ্টের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা বলিলেন। বর্ণহিন্দুর মত বর্জ্জন নীতি অনুসরণ করিলে কংগ্রেস নিজেই অচ্ছুতের দলভুক্ত হইয়া পড়িবে।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের এই ঐক্যবদ্ধতা দেখিয়া বিভেদপন্থীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় কলেজের জনৈক ছাত্র 'অগাষ্ট বিপ্লব'কে কংগ্রেসের নামে চালাইবার চেষ্টা করিলে সভাপতি তাহাকে বসাইয়া দেন। 'জনযুদ্ধ' না 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'—এই ধরণের ধুয়া তুলিয়া বিভেদপন্থীরা কমিউনিষ্টদের বিতাড়নের প্রশ্নকেই কংগ্রেসকর্ম্মীদের সম্মুখে সব চাইতে বড় প্রশ্ন হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

মৌলবী আবু হোসেন সরকার, জগদীশ দাশগুপ্ত ও ভবতারণ লাহিড়ী স্বরাজ্য পার্টির নজীর দিয়া কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। **মৌলবী আবু হোসেন সরকার** বলিলেন যে, জনসেবার মধ্য দিয়াই কংগ্রেস সকলকে জয় করুক। জনসেবার মধ্য দিয়াই কংগ্রেসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নীতি প্রতিষ্ঠিত হউক। কংগ্রেসের মধ্যে সকল সম্প্রদায় ও সকল দলকে স্থান দিয়া কংগ্রেসকে বৃহত্তর ও মহত্তর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিধ্বস্ত রংপুরকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই বক্তৃতার ফলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের মনের সমস্ত সংশয় ধুইয়া মুছিয়া গেল। আশা ও আনন্দে অনেকেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, কংগ্রেসের ১৯২১ সালের হৃত গৌরব আমরা ফিরাইয়া আনিব।

বিভেদপন্থীরা এই ঐক্য ভাঙিবার জন্য কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মনে বিদ্বেষের ভাব জাগাইবার শেষ চেষ্টা করে। কলেজের ছাত্রটি অভিযোগের সুরে বলে, কমিউনিষ্টরা 'জাপানকে রুখবার কথা বলে।' মৌলবী আবু হোসেন সরকার তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিয়া বলেন, 'জাপানকে আনতে হবে একথা কেউ ত' বলে না।' ছাত্রটি সমবেত হাস্যধ্বনির সম্মুখে বিব্রত বোধ করিল।

অতুল কৃষ্ণ রায় গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে একবাক্যে তাহা গৃহীত হইল। কলেজের বিভেদপন্থী ছাত্রটি আবার বগুড়ার আদর্শে কমিউনিষ্টবর্জ্জিত কর্ম্মীপরিষদ গঠনের দাবী জানাইল। সভাপতি তাহার মুখের উপর বলিলেন, 'রংপুর বগুড়ার আদর্শে চলবে না।' ছাত্রটির বাড়ী রাজশাহীর নওগাঁয়। রংপুরের ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য তাহার কাছে অপরিচিত; জনসেবার আদর্শের প্রতিও তাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। কাজেই সভা হইতে উঠিয়া গেল।

দেশসেবার কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত

রংপুরে এবার আমন ধান শতকরা ৪০ ভাগ কম হইয়াছে। চোরাকারবারীরা তাহাও বাহিরে চালান দিতেছে, কৃষিকার্য্যের খরচও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাই রংপুরবাসীর জীবনের এই গভীর সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে একবাক্যে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন; এই প্রস্তাবে দাবী করা হইল, বাহিরে ধান চালান বন্ধ করিতে হইবে এবং সরকারের সহযোগিতায় সরাসরি কৃষকদের কাছ হইতে ধান কিনিয়া স্থানীয়-ভাবে ষ্টক করিতে হইবে। এজন্য গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ গঠন করিতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করা হয় এবং স্থির হয় জেলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও ধান চালান বন্ধ করার জন্য অতুলকৃষ্ণ রায় ও আবু হোসেন সরকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আলাপ করিবেন।

জেলার মহামারীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদলীয় রিলিফ কমিটির কাজ আরও ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ করিবার জন্য আর একটি সাবকমিটি গঠিত হয়।

এই দিন বিকালে কংগ্রেস প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও চিমুর ও অষ্টি বন্দীদের প্রাণদণ্ড মকুবের দাবী জানাইয়া মৌলবী মহীউদ্দিন খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। এই সম্মেলন যে রংপুর বাসীদের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারিয়াছে এই জনসভায় তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল।

কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস্তব জনসেবার পথে রংপুরের কংগ্রেস রংপুরবাসীর মধ্যে যে নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথে সেই যাত্রা যদি প্রসারিত হয়—তাহা হইলে বাংলায় অচিরে নব যুগ দেখা দিবে।

কংগ্রেসে সকলের সমান অধিকার

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন—শ্রীযুক্তা নাইডুর উক্তি

[গত ১৮ই জানুয়ারী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মাদ্রাজে সাংবাদিকদের একটি বৈঠকে কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট সম্পর্ক, কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘগুলির ক্ষমতা, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় সরকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি ব্যাখ্যা করেন। জনযুদ্ধের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় আমরা এই বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' ও 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় আমরা শ্রীযুক্তা নাইডুর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ পাই। এই বক্তৃতার কতকগুলি প্রয়োজনীয় অংশ বাংলাদেশের কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। তাই আমরা বক্তৃতার এই অংশগুলি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। জঃ সঃ]

কংগ্রেস সকলের জন্য

প্রথমেই শ্রীযুক্তা নাইডুকে প্রশ্ন করা হয়, "কলিকাতায় আপনি বলিয়াছেন কংগ্রেসের প্রতি অবিভক্ত আনুগত্য রক্ষা করা চাই। কমিউনিষ্ট পার্টি একটি আলাদা রাজনৈতিক পার্টি, লাল পতাকার প্রতি তাহার আনুগত্য, তাহার আলাদা নীতি—সেই পার্টির সভ্যরা কি কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবে?"

উত্তরে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন,—যেখানে কংগ্রেস কমিটি কাজ করিতে পারে এবং কাজ করিতেছে, সেখানে আঠারো বৎসর বয়সের উপরে যে-কোনো ব্যক্তিই কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া সভ্য হইতে পারে—সে কমিউনিষ্টই হোক, সোসালিষ্টই হোক বা অন্য যে কোনো দলেরই সভ্য হোক—সেই কারণে কিছুতেই তাহাকে সভ্যপদ হইতে বিতাড়িত করা যাইবে না। যদি কোনো সভ্য সে-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তবে মাত্র কংগ্রেসই তাঁহার বিচার করিতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, ক্ষমা করিতে পারেন—সে-ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নাই।

কংগ্রেসের ক্ষমতা কর্ম্মীসঙ্ঘের নাই

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস কর্ম্মীদের যে সমস্ত সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন:

এই 'এ্যাড হক' কমিটিগুলি কখনো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হিসাবে কাজ করিবার কথা বলে নাই। কংগ্রেসের চিরাচরিত রীতি-নীতি বদল করিবার অথবা কাহারো সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকারও তাহার নাই। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কোনো সিদ্ধান্ত করিবেই ধরিয়া লইয়া, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারও এই "এ্যাড হক" কমিটির নাই।

আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে এই সমস্ত "এ্যাড হক" কমিটির অস্তিত্ব অস্থায়ী, কংগ্রেস কমিটিগুলি যখন কাজ করিতে আরম্ভ করিবে তখন এগুলি আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যাইবে।

নির্ব্বোধ কমিউনিষ্ট বিরোধিতা

বহু আলোচিত কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন,

কমিউনিষ্টদের নামে সকলের কেন গাত্রদাহ হয়, কংগ্রেসের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কেন কমিউনিষ্টদের নামে ভয় পায় তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।

তাঁহার পরিচিত কমিউনিষ্ট যুবক-যুবতীর দেশপ্রেম ও সেবাকার্য্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, তাহাদের এ-দেশে কাজ করিবার অধিকার লইয়া কে প্রশ্ন করিতে পারে? বাংলায় তাহারা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য কাজ করিয়াছে। অন্য কেহ যদি সে রকম কাজ না করিতে পারেন, তবে কেন তাঁহারা কমিউনিষ্টদের প্রাপ্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করিবেন? কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তাহাকে তিনি 'নির্ব্বোধ' বলিয়া অভিহিত করেন এবং সকলের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, যাহার সহিত মতের মিল নাই, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা খুবই সহজ।

একবার কেহ তাঁহার কাছে মিঃ জিন্নার সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন। আমি তাঁহাকে তাঁহার বাচালতা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলাম, 'মনে রাখিবেন, সমস্ত ভারতে যদি নির্দ্দোষ নির্ম্মল কেহ থাকেন তো তিনি মিঃ জিন্না; তাঁহার সহিত আমার মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু যদি এমন কেহ থাকেন যাঁকে পদবী অথবা সম্মানের দ্বারা প্রলুব্ধ করা যায় না, তিনি মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না।

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কেন আপনারা অভিযোগ করেন যে তাহারা সরকারের ঘুস নেয়, যখন সে অভিযোগ আপনারা প্রমাণ করিতে পারেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয় যে কংগ্রেস বিড়লার-টাকায় বাঁধা। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগও সমশ্রেণীর।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, আপনাদের সাহায্যের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। আরও বিভ্রান্তি ও আত্মকলহ সৃষ্টি করে এমন কিছু আপনারা ছাপাইবেন না। আজ হইতে আপনারা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ন্যায্য ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আন্দোলন শুরু করুন।

'তৃতীয় পক্ষের' অজুহাত

জনৈক সাংবাদিক তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করায় শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় দেখিয়া আমি দুঃখিত। যাহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করেন তাঁহারাই 'তৃতীয় পক্ষের' হস্তক্ষেপের অজুহাত দেন। আমাদের অনৈক্যের জন্য আমরাই দায়ী।

জাতীয় সরকারের ভিত্তি

জাতীয় সরকার সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে জাতীয় সরকার গঠিত হইলে সেই সরকার অতীতের প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের মত হইবে না। সেই সরকার কেন্দ্রে ও প্রদেশে সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সত্যিকারের জাতীয় সরকার হইবে। একমাত্র সমস্ত দলের মধ্যে সমান অধিকারের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়া হইলেই আমরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারি। অতীতের স্বল্পক্ষমতা বিশিষ্ট কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পুনরাবৃত্তি করিয়া কাহারও কোন লাভ হইবে না। আমরা শুধু নিজেদের (কংগ্রেসের) হাতে ক্ষমতা চাই না, আমরা চাই একটি সত্যিকারের জাতীয় সরকার।

কর্পোরেশন ও সরকারের লড়াই বন্ধ কর

[১ম পৃঃ পর]

করিয়া টীকা দিলে দৈনিক ৩০।৪০ হাজারের বেশী কিছুতেই দেওয়া চলে না। সরকারী হিসাবের প্রায় অর্দ্ধেকই যে ভূয়া তাহা আন্দাজ করা শক্ত নয়।

চিকিৎসার ব্যাপারেও টাকার প্রশ্ন। অনেক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম সালফা থিয়াজল প্রভৃতি ঔষধ দিলে অনেক রোগীকেই বাঁচানো যায়। এই ঔষধ দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়,—কিন্তু সরকারী ক্যাম্বেল হাসপাতালে পর্য্যন্ত রোগীদের নিজের খরচে ছাড়া এই সব ঔষধ দেওয়া হয় না। কর্পোরেশনও সরবরাহ করে না।

লড়াই কর—রোগের বিরুদ্ধে

সরকার কর্পোরেশনের সঙ্গে আপোষ ও সহযোগিতার প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া জবরদস্তি কর্পোরেশনের অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া কর্পোরেশনের কর্ত্তারাও শহরবাসীর রোগ ও মৃত্যুর কথা ভুলিয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে "কর্পোরেশনের একটি টাকা বীজ কিংবা একজন টীকাদারকেও যেন এই কাজে না দেওয়া হয়!" এবং তাহার পর গবর্ণমেণ্টের হুকুমের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করিয়া কর্পোরেশনের টাকার শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই টাকা টীকা দেওয়ায় খরচ করিলে কত লোকের প্রাণ বাঁচিত।

কর্পোরেশনের কোনো বিভাগের উপর সরকার কর্ত্তৃত্ব করিবে ইহা কলিকাতার কোনো নাগরিকই চান না। কিন্তু সেই লড়াইয়ের সময় এখন নয়, মানুষের প্রাণ বাঁচানোই এখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। সমস্ত লোককে টীকা দিয়া কলিকাতা শহরকে বাঁচাইবার জন্য কর্পোরেশনের যদি ১০।২০ লক্ষ টাকা খরচ হয় তো কলিকাতার দেশভক্ত করদাতারা সানন্দে সে খরচ বহন করিবেন—কারণ কর্পোরেশনের ট্যাক্স ও কর্পোরেশনের অস্তিত্বই তো এইরূপ কাজের জন্য। আমরা কলিকাতার নাগরিকেরা দাবী করি যে সরকার কি করিল বা না করিল তাহার ছুতা ধরিয়া বসিয়া না থাকিয়া কর্পোরেশন এই কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুক। কলিকাতাবাসীকে বাঁচাইবার পূর্ণ দায়িত্ব পালনে কর্পোরেশন অগ্রসর হইলে কলিকাতাবাসীর জনমতই সরকারকেও পূর্ণ সহযোগিতায় বাধ্য করিতে পারিবে।

—রমেন ব্যানার্জ্জি

দামোদর—সমস্ত বাঙ্গালীরই সমস্যা

অবিলম্বে পুনর্গঠনের কার্য্যকরী ব্যবস্থা চাই

পশ্চিমবঙ্গ বিপন্ন

বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিছু অংশ নিয়া অজয় ও দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল। একমাত্র দামোদর অঞ্চলেই প্রায় ত্রিশলক্ষ লোকের বাস। এই অঞ্চল হইতে দারুণ দুর্দ্দশার সংবাদ আসিতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার রায়না ও খণ্ডঘোষ থানা হইতে একটী বিবরণ আসিয়াছে :

"এই দুই থানায় প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। দামোদরের বন্যা ও ভাদ্র হইতে বৃষ্টির অভাব, এই দুই কারণে এই বিরাট অঞ্চলে ধান এত কম হইয়াছে যে লোকের বাৎসরিক খোরাকী হওয়া দূরের কথা চৈত্রমাস হইতেই অনেকের অনশন সুরু হইবে।

সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে রায়না থানার পূর্ব্বদিকের ৪টী ইউনিয়ন—নতু, মুগুরা, বড়বেনান ও গোতান, এদের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। ১৩৫০ সালের প্রবল বন্যায় নতুনমোহনপুরে যে হানা হইয়াছিল তাহা না বাঁধার ফলে সেই পথে দামোদরের জল গত বর্ষায় এই ৪টী ইউনিয়ন ভাসাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণে এই হানার জলের সঙ্গে "বেগো"-র হানার জল মিলিয়া বড়বেনান ও গোতান ইউনিয়নে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বন্যায় অধিকাংশ ফসল নষ্ট হইয়া যায়। পরে কৃষকেরা যেটুকু চাষ করিয়াছিল, ভাদ্র হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। পৌষমাসের মাঠে ধানের বদলে বেণাঘাস ও পতিত জমিই বেশী নজরে আসে। ধান হইয়াছে যৎসামান্য। আধ হইতে একহাত লম্বা ধানের গাছ, আর ২।৩ ইঞ্চি মাত্র লম্বা ধানের শীষ, যে জমিতে ধান হইয়াছে সেখানে গড়পড়তা বিঘাপ্রতি দু'মণের বেশী ফসল হইবে না।

নতু ইউনিয়নের তেয়াগুল গ্রামে ১২৯ ঘর লোকের বাস—তাহার ভিতর মাত্র ৪ ঘরের খোরাকী হইবে।"

বর্দ্ধমান জেলার আর এক অঞ্চলের রিপোর্টে প্রকাশ : "জমির অবস্থা কি হইয়াছে তাহা গুস্করায় নামিয়া মুরুলের বিলের দিকে যাইলেই বুঝা যায়। বিস্তৃত এলাকায় জমির উপর মানুষপ্রমাণ উঁচু বেণাঘাস। মাঝখাড়া, ফতেপুর, নারায়ণপুর, উলে, আয়মা প্রভৃতি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে ফসলের জমি দেখা যায় না। ফসলের জমির কথা কৃষকদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নীরবে জমি হইতে মুঠা ভরিয়া বালি উঠাইয়া দেখায়।...... গোপালপুর, নপাড়া আমডোব, খেতিয়া, চাণক প্রভৃতি গ্রামে ঢুকিয়াই মনে হয় যেন ভুতুড়ে গ্রাম—মানুষ যেন সব চলিয়া গিয়াছে। চাণক সেকালের একটী নামকরা গ্রাম। আর এখন ভাঙ্গা মন্দির, পোড়ো দালান আর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সন্ধ্যাবেলা গ্রামে ঢুকিতে ভয় করে। আগে এখানে ১৮টী পাড়ায় ১৫০০ পরিবার ছিল, আজ কোনও রকমে ২৫০।৩০০ পরিবার চাণকে বাস করে।"

বেগোর হানা দিয়া দামোদরের জল সমগ্র আরামবাগ মহকুমাকে বন্যায় বিধ্বস্ত করিতেছে। আরামবাগ নামটীও আজ পরিহাসের বিষয়। বর্ষাতে বন্যায় সারা মহকুমা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে,—এবার গড়ে বিঘাপ্রতি কোথাও ধানের ফসল ৪ মণের উপরে যাইবে না। রামমোহন রায় ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, এককালের সমৃদ্ধ জনবহুল এলাকা আজ জনবিরল ক্ষয়িষ্ণু এলাকা হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে যেমন দামোদরের মূলস্রোত বেগোর হানা ধরিয়া আরামবাগকে ভাসাইয়া দেয়, অপরদিকে দামোদরের দক্ষিণ-মুখী স্রোত ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় শ্রীরামপুর মহকুমা ও হাওড়া জেলার দুরবস্থা। দামোদরের পূর্ব্বপারের বাঁধ এবং কাণানদীর পথ বন্ধ করার জন্য বেহুলা, কাণা, কুন্তী প্রভৃতির ধারে আগেকার সমৃদ্ধ অঞ্চল জনবিরল হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলে হুগলী জেলার সদর মহকুমা নিকৃষ্ট ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

মজা নদী, শস্যবিরল মাঠ, পোড়ো গ্রাম, ভাঙ্গা মন্দির, রুগ্ন মানুষ,—ইহাই হইল এ অঞ্চলের বাস্তব ছবি।

রূপকথা নয়, ইতিহাস

একশো বছর আগেকার কথা,—রূপকথা নয়, একেবারে খাঁটী ইতিহাস। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টন সাহেব (একজন ইংরেজ পর্যাটক) বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া সম্পর্কে লিখিয়াছে, "সমগ্র হিন্দুস্থানে আয়তনের তুলনায় কৃষি সম্পদে বর্দ্ধমান সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়েও কলিকাতার লোক অসুস্থ হইলে হাওয়া-বদল করিবার জন্য বর্দ্ধমান অঞ্চলে যাইত। শাহজাহানের সময়কার বর্দ্ধমানের অবস্থা নেহাৎ রূপকথার মতই শুনাইবে,—খ্যাতনামা পর্যাটক বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে এই অঞ্চলের মত সুগঠিত শরীরের লোক অন্য যে কোনও দেশে দুর্ল্লভ।

উত্তরে ছোটনাগপুরের পাহাড় ও উপত্যকা, পূর্ব্বে ভাগিরথী, দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যে এই বর্দ্ধমান বিভাগ একটী গোটা এলাকা, বহু দিনের চলতি কৃষি ব্যবস্থার দিক দিয়া সমগ্র এলাকার মধ্যে সেচের দিক দিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আছে। ছোটনাগপুরের পাহাড়-অঞ্চলে মেঘ হইতে বৃষ্টি নামে, বর্ষার জল ছোটবড় বহু নদী ও শাখানদী ধরিয়া এই সমগ্র অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে, নদীপথে বর্ষার জলের সঙ্গে আসে পাহাড় অঞ্চলের সারবান পলি। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে এই অঞ্চলের লোক বন্যার সময় স্থানে স্থানে বাঁধ কাটিয়া অসংখ্য ছোট বড় খাল ও নালার সাহায্যে বন্যার প্রবাহকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়া দিত। অজয়, দামোদর বেহুলা, কুন্তী, কাণা, রূপনারায়ণ, দারুকেশ্বর, কাঁসাই প্রভৃতির জলপথ দিয়া প্রতিবৎসর বর্ষা আসিত ফসলের আশ্বাস নিয়া। তাই এই অঞ্চল ১৮১৫ সালেও কৃষিসম্পদে এদেশে শীর্ষস্থানে ছিল, তাই বার্ণিয়ারের সময়ে এখানকার লোকের দেহসৌষ্ঠব ছিল পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশে দুর্ল্লভ, তাই বিদ্যাসাগরের যুগেও এ অঞ্চল ছিল বাংলার স্বাস্থ্যনিবাস।

'শয়তানের শৃঙ্খল'

এই সোনার দেশে কেমন করিয়া দুর্দ্দিন আসিল। ১৮৫০ সালে দুর্দ্দিনের সূত্রপাত। এই সময়েই কোম্পানীর রেলপথ সুরু হয় এবং রেলপথ বাঁচাইবার জন্য দামোদরের পূর্ব্বদিকে বাঁধ দেওয়া হয়। এক তো ছিল মামুলী বাঁধ, দ্বিতীয় নম্বর বাঁধ হইল গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড্ রাস্তার এবং তৃতীয় নম্বর হইল রেলপথের। এই বাঁধগুলির কল্যাণে দামোদরের উত্তর ও পূর্ব্বপারের লোকেরা সেচের জল হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহারা স্থানে স্থানে বাঁধ কাটিয়া বর্ষার সময় জলসংগ্রহ করিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সরকার আইন দ্বারা বাঁধ কাটা নিষিদ্ধ করিলেন। ইহা ছাড়াও মূল বাঁধের পূর্ব্বদিকে জল আসিবার একমাত্র পথ কাণা নদীর ধারেও সরকার ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঁধ দিলেন এবং তাহাতেও খুসী না হইয়া শেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কাণানদী বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইহার ফলে যে সর্ব্বনাশ হইল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। জল চলাচলের পুরানো ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিল। ডাক্তার ফ্রেঞ্চ্ রিপোর্ট দেন যে ১৮৬২ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলে তিন ভাগের একভাগ লোক মারা যায়। হুগলী জেলা সম্পর্কে লেফ্টেনান্ট কর্ণেল ক্যাম্প্বেল বলেন যে বিশ বৎসরে এই জেলার লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ হইতে দশ লক্ষে নামিয়া আসে।

জল চলাচলের পুরানো ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যেও ভীষণ ক্ষতি দেখা দিল। পর পর বাঁধের জন্য দামোদরের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে যেমন প্রায় প্রত্যেক বছর জলের অভাব ঘটে, তেমনই পশ্চিম অঞ্চল প্রতিবছর বানে ভাসিয়া যায় এবং শস্যভরা ক্ষেত ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে আগেকার দিনের সমৃদ্ধ অঞ্চল বালি ও বেণাঘাসে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে জল চলাচলের পথ না থাকায় নদীর খাত পলি পড়িয়া ভরিয়া উঠিতেছে এবং সেইজন্য বর্ষা দিনে নদীর পাড় উপচাইয়া অত্যন্ত সহজেই বন্যার জল গ্রাম ভাসাইয়া দেয়।

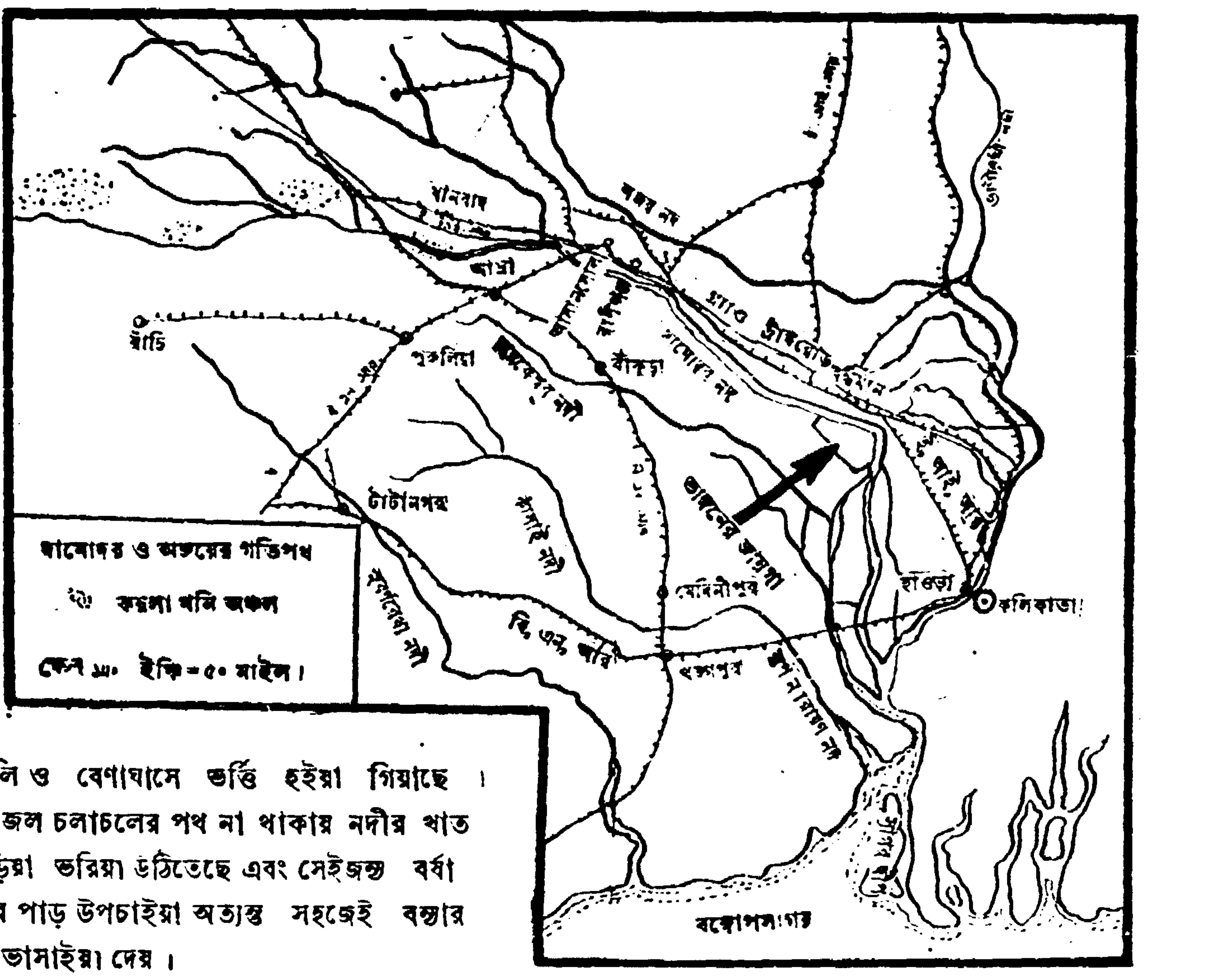

সার উইলিয়ম উইলকক্স নীলনদের ব্যাপারে সুব্যবস্থা করিয়া সমগ্র মিশরকে বন্যা হইতে বাঁচাইয়াছেন এবং সম্বৎসর সেচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দামোদর সম্পর্কে এখানকার সরকারের এই নিদারুণ অব্যবস্থা ভালভাবে পর্যালোচনা করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "এই জল আটকের বাঁধগুলি হইতেছে শয়তানের শৃঙ্খল, সত্যিই এগুলি শয়তানের শৃঙ্খল।"

পরাধীনতার মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্রই দুরবস্থা হইয়াছে কিন্তু শয়তানের শৃঙ্খলে বন্দী দামোদর অঞ্চলের দুর্দ্দশা সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছে। ইতিহাস-বিখ্যাত সমৃদ্ধ জনপদে এক অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিয়াছে। অর্দ্ধেক লোক মারা গিয়াছে, বাকী অর্দ্ধেক রুগ্ন। একদিকে জলের অভাব অপরদিকে বন্যা। সোনার ক্ষেত বালি ও বেণাঘাসে ভর্ত্তি। শয়তান শুধু দামোদরকেই বাঁধে নাই, সমগ্র জনপদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ লিখিয়া দিয়াছে। পরিত্যক্ত গ্রামে, ভাঙ্গা মন্দিরে, মানুষের রোগজীর্ণ শরীরে আজও পর্য্যন্ত শয়তানেরই বিধান পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

৩০ লক্ষের জীবন-মরণ সমস্যা

দামোদর অঞ্চল কিন্তু শুধু এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরই ব্যাপার নয়। দেশের ৩০ লক্ষ লোকের জীবন-মরণ অবশ্যই সমগ্র জাতির চিন্তা ভাবনার বিষয় কিন্তু দামোদর সমস্যা তাহা হইতেও অনেক বড়, ইহার সমাধান সমগ্র দেশের পক্ষে অন্যান্য গুরুতর কারণেও জরুরী। ১৯৪৩ সালের বন্যায় এইদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দামোদর রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিল এবং বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসাইয়া দিল। কলিকাতার সঙ্গে খনিজ অঞ্চল ও উত্তর ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। একদিকে যেমন শিল্প বাণিজ্য ও কলিকাতার জীবনযাত্রার ক্ষতি, তেমনিই অপরদিকে নূতন আশঙ্কা যে দামোদরের জল যদি কলিকাতার উত্তরে ভাগিরথীতে পড়ে তাহা হইলে কলিকাতা শহর পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যাইবার কথা।

দামোদর সমস্যা লইয়া সরকারের টনক নড়িল। ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও এ বিষয়ে আলোচনা সুরু করিলেন। কয়েকটী কারণে দামোদর সমস্যা কেবল স্থানীয় সমস্যা নয়, ইহা একটি রীতিমত জাতীয় সমস্যা। প্রথমতঃ ইহা ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন মরণের সমস্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের শস্য ঘাটতি পূরণের সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতার সহিত খনিজ অঞ্চল ও উত্তর ভারতের যোগাযোগ নিরাপদ রাখার সমস্যা। ১৯২০ সালে মিঃ এডাম্স্ উইলিয়ামস্ যে কথা বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দামোদরের পূর্ব্বগামী প্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯১৩ সালের মতন ভীষণ বন্যা হইলে ও জল আসিয়া কলিকাতার উত্তরে ভাগিরথীতে পড়িলে কলিকাতা শহর বাঁচান যাইবে না।

শুনা যাইতেছে যে দামোদর লইয়া সরকার নাকি বিরাট পরিকল্পনা করিতেছেন। ডাক্তার আম্বেদকরের মুখ হইতে এক ফলাও প্লানের আভাস পাওয়া গিয়াছে। সরকারী প্লান কবে ফল প্রসব করিবে তাহার ভরসা করা মুস্কিল। সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া দামোদর সমস্যার সমাধানে দেশে সর্ব্বদলীয় মিলিত আন্দোলন সুরু করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান বিভাগে দামোদরের প্রত্যেকটী খাত, শাখাপথ ও অন্যান্য ছোট বড় নদীর ধারের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করা চাই। বর্দ্ধমান জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে অজয় ও দামোদর সম্মেলনে এই আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট ও মহাসভা একই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছে—বর্দ্ধমানের মহারাজা হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত একই উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে জমায়েত হইয়াছে। আরামবাগের কংগ্রেস কর্ম্মীরা বাঁধ বাঁধিয়া বোরো চাষের যে উদ্যোগ করিয়াছেন তা এই একই আন্দোলনের একটি ছোট অংশ। হুগলী জেলার সদর মহকুমার ৬টী ইউনিয়নে ঘিয়া ও কুন্তীর সংস্কার নিয়া কৃষক সমিতি এই আন্দোলনই সুরু করিয়াছে। সরস্বতী নদীর দুধারে এবং সমগ্র হাওড়া জেলার সেচের জন্য আন্দোলন এই একই সমস্যার অঙ্গীভূত। সমগ্র দামোদর অববাহিকার পুনর্ব্যবস্থার জন্য সকলের মিলিত আন্দোলন চাই। তবেই সরকারকে পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিতে বাধ্য করা যাইবে, তবেই "শয়তানের শৃঙ্খল" ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

৮ম অধিবেশন : ১২-১৩-১৪ই মার্চ্চ

হাটগোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান শহর হইতে আট মাইল দূরে বর্দ্ধমান-কালনা রোডের উপর অবস্থিত হাটগোবিন্দপুরে সারা বাংলার কৃষক সমিতির অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন হইবে। বর্দ্ধমানের প্রবীন কংগ্রেস কর্ম্মি ও জননেতা মৌলবী আবুল হায়াতকে সভাপতি করিয়া সম্মেলনের আয়োজনের জন্য সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা ৪।৫ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া ড্রাম ও বিউগল্ সহ প্রচার করিয়া ঘুরিতেছে। স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে। একজন সাঁওতাল কৃষক দিয়াছেন ২ মণ ধান। প্রায় ২০০মণ ধান উঠিবে এরূপ আশা করা যায়। বন্যা অঞ্চলে কৃষকরাও বাঁশ ইত্যাদি সাহায্য দিবেন। ৩০ মাইল দূর মঙ্গলকোট ও আউষগ্রাম অঞ্চল হইতে ২০০০ কৃষক মিছিল করিয়া সমবেত হইবার আয়োজন করিতেছেন। ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। ১৩ই তারিখ স্থানীয় কৃষকরা যোগ দিবেন এবং ১৪ই তারিখে সমস্ত জেলা ও বাইরের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকরা যোগ দিবেন। সংগঠন সমিতি শেষ দিন ২০ হাজার লোকের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নূতন সংস্কৃতির মূলমন্ত্র---স্বাধীনতা •

জনগণের বৈচিত্র্যময় জীবনই শিল্প সংস্কৃতির উৎস •

লেখক ঃ খাজা অ

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নাম
এই সঙ্ঘের বাংলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠি
'নবজীবনের গান' ও 'মধু বংশীর গলি' আবৃ
আনিয়াছে। এই সঙ্ঘকে কেন্দ্র করিয়া
শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা একত্র মিলিয়াছেন, বাংলা
করিয়াছেন।

শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের
সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। গণনাট্য স
প্রেমের নব জাগরণ আনিয়াছে।

**ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক, শ্রেষ্ঠ নৃত্য
যে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বাহিনী গড়িয়া
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিব**
তাঁহাদের কয়েকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হই
আব্বাসের লেখা প্রবন্ধ হইতে এই সং
খাজা আহম্মদ আব্বাস ভারতের একজন না
রাজনৈতিক মতবাদের জন্যও তাঁহার খ্যাতি
তাঁহার প্রবন্ধ দলমতনির্ব্বিশেষে সকলেরই ভ

বাংলা দেশ এই গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রী
জানাইতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত, দলাদলিগ্রস্
বাহিনীর কাছ হইতে নূতন জীবনের প্রেরণ

* যুক্তপ্রদেশের লোকশিল্প—রামলীলা

জনসাধারণের জীবনের মধ্যে যে শিল্পের শিকড় প্রসারিত, একমাত্র সেই সঙ্গীত, সেই নাটক, সেই নৃত্যকলাই যে প্রাণপূর্ণ ও কল্যাণকর হইয়া উঠিতে পারে—বোম্বাইয়ের কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত গণনাট্য সঙ্ঘের পাঁচ দিন ব্যাপী সম্মেলনে তাহারই বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গেল।

পাঁচটি দিনের সমস্ত কার্য্যসূচির মধ্য দিয়া জীবনের সহিত অভিন্ন শিল্পের এই নূতন চেতনা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল!

জনসাধারণের যে জীবন বহু সহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পুষ্ট, যে জীবন আজও আশায় উজ্জ্বল, ভবিষ্যতে আস্থাবান—জনসাধারণের সেই জীবনের বহুবর্ণ বৈচিত্র্যই গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যগীত-নাটকের মর্ম্মকথা। সমস্ত কিছুর মধ্যেই অনুরণিত একটি ভাব—স্বাধীনতা!

খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা ও 'বম্বে ক্রনিক্ল্' পত্রিকার সম্পাদক **এস, এ ব্রেলভির** (সম্মেলনের অন্যতম সভাপতি ; ইনি ছাড়াও সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন প্রবীণ মারাঠী সাহিত্যিক মামা ভারেরকার, শ্রেষ্ঠ গুজরাটি নাট্যকার চন্দ্রবদন মেটা এবং বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পৃথ্বিরাজ কাপুর) উদ্বোধনী ভাষণে সেই মূলকথাই ধ্বনিত হয় ঃ

"যে সমাজে জীবন ও শিল্পকলার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, একমাত্র সেই সমাজই সুসম্বদ্ধ। শিল্পের সাহায্য ছাড়া মানুষের জীবনে যেমন পরিপূর্ণতা আসিতে পারে না, তেমনি জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া খাঁটি শিল্পের সৃষ্টিও অসম্ভব। ভারতবর্ষে শিল্প ছিল বহুলাংশে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। তাই ভারতবাসীর সম্মুখে দুইভাবে সমস্যা দেখা দিল। সকল অভাব, সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভের প্রথম সোপান যে স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা সমস্ত শৃঙ্খল অপসারিত করিবে, মানুষের জীবনকে রমণীয় করিয়া তুলিবে—সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তাহাদের গোড়াকার সমস্যা। শুধু যে এই স্বাধীনতার সংগ্রামের কাজেই শিল্পকে ডাকিতে হইয়াছে তাহাই নয়, জীবনের সুরের সহিত শিল্পের সুর মিলাইতে হইয়াছে। ……

গণনাট্য সঙ্ঘের এই আন্দোলন শিল্প ও জনসাধারণের মধ্যে শুধু যে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছে তাহাই নয়, এই আন্দোলন আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিন নিকটে আনিবার কাজে সহায়তা করিতেছে। বিপুল সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক শক্তির দিকে এবং সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য ঐক্য ও সংগঠনের দিকে এই আন্দোলন জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত করিতেছে।"

চন্দ্রবদন মেটার বক্তৃতাতেও ভিন্নভাষায় এই একই সুর ফুটিয়া উঠিল ঃ

"জীবন্ত বলিয়াই সর্ব্বদা ইহা (নাট্যাভিনয়) গতিচঞ্চল। জীবনের তালে তালে ইহার অগ্রগতি। যতদিন মানুষের ধমনীতে জীবন স্পন্দিত হইবে, ততদিন নাট্যকলার শেষ নাই।…যে জীবন বাস্তব, যে জীবন বাঞ্ছিত—সেই বিচিত্র ও বহুমুখী জীবনকে রূপায়িত করিয়া তোলাই নাটকের লক্ষ্য হইবে।"

নৃত্য ও নূতন শিল্পরূপ

এই বক্তৃতাবলীর পরেই দর্শকবৃন্দ বক্তাদের হৃদয়ানুভূতির বাস্তব শিল্পরূপ দেখিতে পাইলেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্তৃক প্রদর্শিত নৃত্য, গীত ও আধ-ঘণ্টার একটি নৃত্য-আখ্যান 'ভারতের মর্ম্মবাণী'—বাস্তব জীবনের সহিত প্রত্যেকটি নৃত্যগীতের গভীর সংযোগ, স্বাধীনতার প্রেরণার মধ্যে প্রত্যেকটি নৃত্যগীতের অফুরন্ত প্রাণাবেগ।

ইকবালের রচিত বিখ্যাত দেশপ্রেমিক সঙ্গীত 'হিন্দুস্থান হামারা' গানে অনুষ্ঠানের আরম্ভ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রশঙ্কর (উদয়শঙ্করের ভ্রাতা) এই গানে নূতন ভাবে অনুপ্রাণনাময় সুর সংযোগ করিয়াছেন। উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল সত্ত্বেও 'দুন্দুভি' প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করে। শচীনশঙ্কর, (উদয়শঙ্করের সম্পর্কিত ভ্রাতা) দীনা সজ্ঝবি এবং শান্তি বর্দ্ধন (কেন্দ্রীয় বাহিনীর আনাড়ী শিক্ষানবীশদের যিনি আপন প্রতিভাগুণে ছয় মাসের মধ্যে কুশলী শিল্পীর দলে পরিণত করিয়াছেন) ইহাকে রূপদান করিয়াছেন। দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান দুন্দুভিতে বাজিয়া উঠে—জাতির উদ্বোধকের ভূমিকায় শান্তি বর্দ্ধন অবতীর্ণ হন। প্রবল দেশানুরাগ ইহার প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু হওয়া সত্ত্বেও নৃত্যকলাবিদ্‌দের কাছেও ইহা খাঁটি শিল্পের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

লোক-নৃত্যের ভূমিকায় দীনা সজ্ঝবি

লাম্বাদি নৃত্য, ধোবি নৃত্য, রামলীলা—ইহার প্রত্যেকটিতে আছে সহজ ও সাবলীল মাধুর্য্য। যে দেখিয়াছে তাহারই মন আপন দেশবাসীর প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভারতের পদদলিত কৃষক শ্রেণীর মধ্যে জীবন ও সংস্কৃতির লাবণ্য যে আজও অম্লান—প্রত্যেকটি নৃত্যের মধ্যে এই সত্যের বলিষ্ঠ ঘোষণা।

সেদিন সন্ধ্যায় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল 'ভারতের মর্ম্মবাণী' নামে নৃত্য-আখ্যান। ইহা সাধারণ নৃত্য-আখ্যান নহে—দেশপ্রেমিকতার মূর্ত্ত সমারোহ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের এই নৃত্যরূপ প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। এই নৃত্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবকে যে ভাবে শিল্পরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও দুঃসাধ্য শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন। নিউ ইয়র্কের বামপন্থী থিয়েটারে 'সূচ ও আল্‌পিন' এবং ভারতবর্ষে উদয়শঙ্করের 'মজুর ও যন্ত্র' ও 'জীবনের ছন্দ' প্রদর্শিত হওয়ার পূর্ব্বে এই শিল্পপদ্ধতিতে ভাব প্রকাশকে সকলেই অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। এই নূতন নৃত্যরূপে একদিকে তাঁহার শিল্পপ্রতিভা, অন্যদিকে তাঁহার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে উন্নত চেতনা—এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ে শান্তিবর্দ্ধন তাঁহার শিক্ষাগুরুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

এই নৃত্য-আখ্যানের সহিত 'কাথা'র ভঙ্গিতে রচিত গীতানুষঙ্গটির রচয়িতা প্রেম। বিনয় রায়ের কণ্ঠে এই গাথা-গান একবার যে শুনিয়াছে, তাহার পক্ষে সে সুর ভোলা অসম্ভব। একদিকে নৃত্য, অন্যদিকে গান—সমস্ত কিছু মিলাইয়া রঙ্গমঞ্চে এক মহাকাব্যের আবির্ভাব মনে হয়; বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, মধ্যযুগ-সুলভ ভূমিদাস প্রথা ও নবাগত পুঁজিবাদ—এই তিন অভিশাপে জর্জ্জরিত মানুষের যথাযথ ছবি ইহাতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের ঐক্য ও শৃঙ্খল-মোচনের দুর্দ্দম সংকল্পে আশা ও জয়ের মধ্যে এই মহাকাব্যের সমাপ্তি!

তামাশার রূপান্তর

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে **মামা ভারেরকর** মারাঠীতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলেন ঃ তামাশা, কাথা, পল্লীগীতি ও লোকনৃত্য প্রভৃতি উৎসবরীতির মধ্য দিয়া গ্রামে বরাবরই 'গণ-নাট্যশালা'র অস্তিত্ব ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এই উর্ব্বর স্বদেশী মাটির গভীরে আপন-মূল প্রসারিত করিয়াছে।

প্রথম দিনের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যে ধরণের উন্নত শিল্পকৌশল দেখা গিয়াছিল, দ্বিতীয় দিনের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানগুলি ঠিক সে ধরণের হইল না। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ছিল না বটে, কিন্তু তাহার বদলে ছিল বহুলবৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি। দেশের দিকে দিকে গণ-নাট্য সঙ্ঘ যে বহুমুখী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে এই দিনের অনুষ্ঠানে তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল। 'কোনা খাতির' ('কাহার জন্য?') নামে কোঙ্কানী নাটিকাটিতে কোঙ্কানী নাট্যসাহিত্যের প্রগতিশীল ধারার পরিচয় পাওয়া গেলেও অভিনয় হিসাবে উহা অত্যন্ত কাঁচা হইয়াছিল। তাহার উপর সংলাপসর্ব্বস্ব হওয়ার দরুণ অধিকাংশ দর্শকই নাটকের একবর্ণও বুঝিতে পারে নাই। গুজরাটি ভাষায় রচিত দেশভক্তির একটি গান নীরস সুরের জন্য অত্যন্ত জোলো লাগিয়াছিল।

অন্ধ্র প্রদেশের গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে যে তিনজন ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কৃষক সমিতির কর্ম্মী। ইঁহারা যে তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখান, তাহার মধ্যে 'বুরা কাথা'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্ধ্র দেশের কৃষকদের কাছে নব জাগরণের বাণী পৌঁছাইবার সব চাইতে জনপ্রিয় শিল্পবাহন এই 'বুরা কাথা'।

বোম্বাইয়ের গণনাট্য সঙ্ঘের মারাঠী গায়কেরা গভঙ্করের লেখা যে 'তামাশা' প্রদর্শন করেন, তাহা প্রত্যেককেই মুগ্ধ করে। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এক ধরণের লোককাব্যের নামই 'তামাশা'। কিন্তু বহু শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণুতা ও ভাঙনের মধ্য দিয়া এই লোকশিল্পের অধঃপতন ঘটে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই লোকশিল্পের মধ্যে একটি সহজ আকর্ষণ আছে। তাই এই কাব্যের অনাড়ম্বর প্রাঞ্জল ভঙ্গি কৃষকদের মুগ্ধ করে। গণনাট্য সঙ্ঘের কর্ম্মীরা এই জনপ্রিয় লোককলার প্রচলিত ভঙ্গিমার মধ্যে নূতন বিষয়বস্তু আনিয়া যেভাবে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। ধানচালের একজন মজুতকারীর 'নিষ্ঠুর

নব সংস্কৃতির বাহক গণনাট্য সঙ্ঘ

আগামী ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বাহিনীর অনুষ্ঠান

হম্মদ আব্বাস

ংলা দেশে আজ আর অপরিচিত নয়। ত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকাভিনয়, ও বাংলা দেশের সংস্কৃতি জগতে চাঞ্চল্য বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, দেশের সংস্কৃতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার

ভিন্ন প্রদেশে আজ ভারতীয় গণনাট্য য ভারতের দিকে দিকে আজ স্বদেশ

—

ণীদের নেতৃত্বে গণনাট্য সঙ্ঘের উঠিয়াছে, সেই বাহিনী আগামী ায় আসিতেছেন। কলিকাতায় । এই পৃষ্ঠায় **খাজা আহম্মদ** তিবাহিনীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। করা সাহিত্যিক। এ ছাড়া নির্ভীক াছে। কাজেই আমরা আশা করি লাগিবে।

সংস্কৃতি বাহিনীকে সাদরে আমন্ত্রণ ও আত্মবিস্মৃত বাংলা এই সংস্কৃতি লাভ করিবে।

বড়যন্ত্র মিলিত গ্রামবাসীরা কিভাবে ভাঙিয়াছিল—সম্মেলনে প্রদর্শিত 'তামাশা'টির ইহাই ছিল আখ্যানবস্তু। কয়েকদিন পর থানা জেলার কৃষক সম্মেলনে যখন এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখানো হয়, তখন উপস্থিত পাঁচ সহস্র কৃষক উৎসাহে মুখর হইয়া উঠে।

মৃচ্ছকটিক

তৃতীয় দিনে গুজরাটি নাটক 'মৃচ্ছকটিক' অভিনীত হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে বোম্বাই আইন পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীমঙ্গলদাস পাক্কবাস বক্তৃতা করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলন ও ইহার আদর্শের প্রতি তিনি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানান।

'মৃচ্ছকটিকে'র মত প্রাচীন নাটক নির্ব্বাচিত করিয়া ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহারা মোটেই অন্ধ নন। 'চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার সুন্দরম এই কাহিনীর মধ্যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিকতাকে রূপ দিয়াছেন। এই অভিনয় দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। গুজরাটি সাহিত্যের কয়েকজন প্রবীণ সমালোচক বলিয়াছেন, এইরূপ সু-অভিনীত ও সুপরিচালিত নাটক গুজরাটিতে খুব কমই হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা একটু উগ্র রকমের প্রগতিশীল (বিশেষ ভাবে ছাত্রদের মধ্যে), তাঁহাদের মুখে তীক্ষ্ণ সমালোচনা শোনা গেল—গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষে এইরূপ নাটক দেখানোর নাকি কোন অর্থই হয় না। অনেকে বলিলেন, পুরানো ধরণের গুজরাটি নাটকে যে মঞ্চ-ঘেঁষা দোষ দেখা যায়, এ নাটকেও সে ত্রুটি আছে।

এই অভিনয় প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় হইলেও, বড় বড় চরিত্রের ভূমিকায় যদি আরও উন্নত ধরণের অভিনেতাদের নামানো হইত এবং যদি আরেকটু সতর্ক ভাবে নাটকটির পরিচালনা হইত, তাহা হইলে নাটকটি আরও সার্থক হইতে পারিত। বসন্তসেনার চরিত্রে অনসূয়া ভারতীয়ের অভিনয় মন্দ হয় নাই—কিন্তু ছোট ছোট চরিত্রের ভূমিকায় ওঝা, যশবন্ত ও গদিওয়ালার অভিনয়ই সব থেকে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শিশুদের অনুষ্ঠান

চতুর্থ দিনের অধিবেশনে শিশুদের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক গুরুদয়াল মালিক এই দিনকার অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বলেন, গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্প প্রচেষ্টা 'ভারতের শিশু সমাজ'কে ঐক্যবদ্ধ করুক। ছোটদের মধ্যে কয়েকজনের মঞ্চপ্রতিভা দর্শকদের বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু ছোটদের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই নিতান্ত চলতি ধরণের হইয়াছিল। যে সামাজিক চেতনা গণনাট্য সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য, এই অনুষ্ঠানে সেই বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা গেল। (কথোপকথনের ধরণে লেখা আপ্তের একটি রচনায় শুধু ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। পাঁচটী শিশু নিজেদের অন্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছে—পাখীর মতন যদি উড়িবার পাখা থাকিত, রাশিয়ার ছেলে-মেয়েদের উপর যাহারা বোমা ফেলিতেছে, তাহাদের নিশ্চয়ই ধ্বংস করিতাম—একজন বলিয়া উঠে।) বোম্বাই গণনাট্য সঙ্ঘের শিশুবিভাগে প্রতিভাবান এমন অনেকে আছে, ঠিক মত চালিত করিতে পারিলে যাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

এইদিন শিশুদের অনুষ্ঠান ছাড়াও গুজরাটি বিভাগ কর্ত্তৃক চণ্ডালিয়া ও স্বপ্নস্থ প্রভৃতি প্রগতিশীল কবিদের রচিত গানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গুজরাটি সাহিত্যে যে সমাজসচেতন ও প্রাণবন্ত নূতন কাব্যের যুগ আসিয়াছে—এই অনুষ্ঠানে তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল। 'বুঙ্গিও' গানটি অভিনয় সহযোগে গীত হইল। কিন্তু গত বছর বাংলার প্রদর্শিত সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে 'হৈ-হৈ-হৈ' গানের নৃত্য-ভঙ্গিতে যে বলিষ্ঠতা দেখা দিয়াছিল, 'বুঙ্গিও' গানে সে বলিষ্ঠতা ছিল না।

পঞ্চম দিনের সম্মেলনে হিন্দুস্থানী নাটক 'জুবাইদা' অভিনীত হয়। ইহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ ইহার সমালোচনা আমি নিজে করিতে চাহি না। (নাটকটি খাজা আহম্মদ আব্বাসের লেখা—স্বাধীনতা দিবস সংখ্যার 'পিপল্‌স্ ওয়ার' পত্রিকায় পি, সি, জোশী এই নাটকের সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছেন—অনুবাদক।)

পাহাড়ীদের প্রিয় নৃত্য—লাম্বাদি

প্রথম সম্মেলন

এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া জনসাধারণ গণনাট্য সঙ্ঘের কাজ ও আদর্শের পরিচয় লাভ করিল। বোম্বাই গণনাট্য সঙ্ঘের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আঙ্গিকগত নানা ত্রুটি ছিল; সবগুলি অনুষ্ঠানই সকলের ভাল লাগিয়াছিল—এমন নয়। কিন্তু একটা না একটা অনুষ্ঠান প্রত্যেকের হৃদয়কেই নাড়া দিয়াছে—তা সে 'ভারতের মর্ম্মবাণী'ই হউক, 'তামাশা'ই হউক অথবা ছোটদের গানই হউক।

চিন্তাশূন্য হৃদয়হীন নিন্দুকের দল এই সম্মেলনকে 'জনগণ-বিবর্জ্জিত গণনাট্য' বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ফোর্ট এলাকার বুর্জ্জোয়া ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আমরা পাঁচদিনব্যাপী সংস্কৃতি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া তাহারা আমাদের বিদ্রূপ করিয়াছে। এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে থানা জেলার কৃষক সম্মেলনে গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'তামাশা'য়। বাংলা ও অন্ধ্র দেশের গ্রামে গ্রামে, বোম্বাই ও কলিকাতার বস্তিতে বস্তিতে পাড়ায় পাড়ায় গণনাট্য সঙ্ঘের কর্ম্মীরা এই অভিযোগ যে মিথ্যা তাহা প্রমাণিত করিতেছে।

অন্ধ্র প্রদেশের ধোবি নৃত্য

গণনাট্য সঙ্ঘ আজ জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জনগণের জীবনের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছে।

কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গণনাট্য সঙ্ঘের যে সমস্ত উৎসাহী সমর্থক ও

কলিকাতায়

ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বাহিনী

ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ৩ সপ্তাহ ব্যাপী সংস্কৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন। এই পৃষ্ঠার প্রবন্ধে অনুষ্ঠান লিপির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

স্থান, তারিখ ও প্রবেশপত্রের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘ

৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শুধু দেখিয়া গিয়াছেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ কিভাবে তাহার আদর্শকে কাজে রূপায়িত করিতেছে। গণনাট্য সঙ্ঘের আসল কাজ এখানেই সীমাবদ্ধ নয়—গ্রাম ও সহরের বিরাট জনতার মধ্যেই তাহার কাজ প্রসারিত।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কমিউনিষ্ট সভ্যরা সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অ-কমিউনিষ্ট কর্ম্মী হিসাবে তাঁহাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাহারা শিল্পসাধনার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে চান—তাঁহাদের সকলের সমবেত প্রতিষ্ঠান এই **ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ**। কংগ্রেসভক্ত ও সোশালিষ্ট এমন কি লীগপন্থী ও হিন্দুমহাসভাভক্ত অথবা দল নিরপেক্ষ—যিনি যে মতেরই হউন না কেন, গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি লোকের জন্য এই সঙ্ঘের দ্বার উন্মুক্ত। তাঁহাদের পাশাপাশি সমানাধিকারের ভিত্তিতে কমিউনিষ্টরা এই সঙ্ঘের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকিবেন। কাজেই গণনাট্য সঙ্ঘ যেমন কোন দলেরই নহে, তেমনি আবার ইহা সকল দলের প্রতিষ্ঠান। শিল্প হইতেছে মনুষ্যত্বের সারবস্তু। তাই আমরা বিশ্বাস করি, খাঁটি শিল্প দলগত সকল কলহের উর্দ্ধে। জনসাধারণই শিল্পের স্রষ্টা, শিল্প প্রেরণার উৎস। তাই গণনাট্য সঙ্ঘের একমাত্র আনুগত্য—**জনসাধারণের** কাছে। গণনাট্য সঙ্ঘের একমাত্র মানদণ্ড—**জনসাধারণের** কাছে।

—'পিপলস্ ওয়ার' হইতে অনুবাদ

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

হাওড়ার গ্রামে বস্ত্রাভাবের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী

বাংলার সভ্যতা বিপন্ন

'ও গ্রামে যাবেন না'

হাওড়া জেলার সারদা গ্রাম কৃষক সমিতির একটি পুরানো ঘাঁটি। গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলের কাছেই কৃষক সমিতির নেতারা অত্যন্ত প্রিয়।

সেদিন জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক মদন দাস সমিতির কাজে গ্রামটির দিকে চলিয়াছেন। গ্রামের কাছাকাছি আসিতেই একজন কৃষক জোড় হাত করিয়া গ্রামে ঢুকিতে নিষেধ করিল। মদন দাস প্রথমে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি কারণ জানিতে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষকটি যাহা বলিল তাহা শুনিয়া মদন দাস স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। **গ্রামের মেয়েদের কাপড় নাই, প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই তাহাদের গ্রামে ঘোরাফেরা করিতে হইতেছে।**

নিউ আব্দুল স্কুলের একটি ছাত্রকে সে দিন ক্লাসে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'অমন জুজুবুড়ির মতন বসে আছ কেন, চটপটে হ'তে পার না? গায়ের ময়লা চাদরটা খুলে ফেলে ভাল হ'য়ে বসো।' ছেলেটি মুখ করুণ করিয়া আরও সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। মাষ্টার মশাই রাগিয়া গেলেন। কিন্তু তবু ছেলেটি গায়ের চাদর খুলিতে চাহিল না। মাষ্টার মশাই তার কাছে আসিয়া গা হইতে নিজেই চাদরটা সরাইয়া দিলেন। ছেলেটি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। গায়ে তার জামা নাই। শতচ্ছিন্ন গেঞ্জীর মধ্য দিয়া তার শীর্ণ পাঁজরগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছে। অনুতপ্ত মাষ্টার মশাই ছাত্রটির গায়ে আবার চাদর ঢাকিয়া দিলেন।

কয়েকদিন আগে হাওড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন কর্ম্মী শিবপুর অঞ্চলে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে বস্ত্রাভাবের যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তিনি দেখিলেন তাহাতে প্রচার আর চলিল না, ফিরিয়া আসিতে হইল।

শুধু হাওড়া নয়, সমস্ত বাংলা জুড়িয়া আজ কাপড়ের এমনি হাহাকার।

গোটা বাংলায়

কিছুদিন আগের ঘটনা। **মেদিনীপুরের** মহিলা কর্ম্মী বিমলাবালা মণ্ডল পূর্ব্ব চিঙ্কা গ্রামে দুগ্ধ কেন্দ্রে গিয়াছেন। গ্রামের একটি মেয়ে আসিয়া তাহার শতচ্ছিন্ন কাপড় দেখাইয়া বলিল, একটি কাপড় না পাইলে বিমলাবালাকে কিছুতেই সে ছাড়িবে না এবং যদি সে অন্ত কাপড় না পায় তাহা হইলে বিমলাবালার কাপড়ই সে ছাড়াইয়া নিবে। মহিলা কর্ম্মীটি তাহাকে কাপড়ের প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন রকমে তার হাত হইতে তখনকার মত নিষ্কৃতি পান।

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ হইতে আমাদের কাছে টেলিগ্রাম আসিয়াছে; শহরের বাজারে ধুতি ও শাড়ী একেবারে নাই। এ ছাড়াও প্রত্যেকটি জেলা হইতেই বস্ত্রাভাবের নিদারুণ সংবাদ আসিতেছে।

১৬ লক্ষ মানুষের জন্য দোকান মাত্র ২টি

আগে যেমন দুমুঠো চালের জন্ত কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে কাতারে কাতারে মানুষ ভোর হইতে না হইতেই ভিড় করিয়া দাঁড়াইত, কাপড়ের দোকানের সামনে আজ তেমনি অবস্থা। দুমুঠো অন্নের জন্ত যেভাবে বাংলার শত শত মা বোনকে আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছে, একটি কাপড়ের বিনিময়েও শহর ও গ্রামের মেয়েদের আজ তেমনি বাধ্য হইয়া আত্মমর্য্যাদা বলি দিতে হইতেছে।

আজ কাপড়ের অভাবে বাংলার শহর ও গ্রামগুলিতে সভ্যতার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অথচ এ বিষয়ে আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্যের অবধি নাই। যে হাওড়া জেলায় গ্রামে মেয়েদের প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, যেখানে কাপড়ের অভাবে ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে পড়া পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হইতেছে—সেখানে **গোটা হাওড়া জেলার ১৬ লক্ষ মানুষের জন্য নাকি দুটি মাত্র কণ্ট্রোলের দোকানের ব্যবস্থা হইয়াছে।—হাওড়া ও বালির ৫.৬ লক্ষ শহরবাসীর জন্য একটি দোকান ও গ্রামাঞ্চলের ১০.১১ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অপর একটি দোকান থাকিবে।** হাওড়া জি, টি রোডের উপর কণ্ট্রোলের দোকানে কাপড়ের আশায় প্রতীক্ষমান অগণিত জনতার অসংযত ভিড় যাঁহারা চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ১৬ লক্ষ অধিবাসীর জন্য নির্দ্ধারিত দুটি মাত্র কণ্ট্রোলের দোকান কি নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করিবে, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

এত কাপড় যায় কোথায়

ইহার উপর কাপড়ের যে সব ব্যবসায়ী সরকারী কোটা পায়, তাহারা বহু জায়গায় প্রকাশ্যে চোরা-বাজার চালাইতেছে।

দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত একটী খবরে প্রকাশ, শহরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সামান্য কিছু যদিও বা পাওয়া যায়, একটু মিহি কাপড় একেবারে অমিল। এখানে কাপড়ের পাইকারী ডিলার একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। শোনা যায়, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় চালের চোরাবাজারে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি নূতন একটী চালের কল খুলিতেছেন। ইংরাজী নববর্ষের দিন এই ব্যবসায়ীটি মহা জাঁকজমকের সহিত স্থানীয় সরকারী বড় কর্ম্মচারী, মিশনারী প্রভৃতিদের বিরাট ভোজ দিয়াছেন। এ ছাড়া অনেক সরকারী কণ্ট্রাক্টও তাঁহার হাতে। পাইকারী ডিলার হওয়া সত্ত্বেও শোনা যায় তিনি নাকি শতকরা ৫২ ভাগ কাপড় রিটেল্ ডিলার হিসাবে বেনামীতে রাখেন। বাকি শতকরা ২৫ ভাগ কাপড় যে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীটি পান তাঁহার নামে চোরাকারবারের দায়ে একটি মামলা চলিতেছে। ফলে কাপড়ের চোরাবাজার প্রকাশ্যে চলিতেছে।

ইহাই আজ বাংলা দেশে কাপড়ের অবস্থা। কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদন বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সুতাকল মজুরদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ। তাঁতীরা সুতা পাইতেছে না। আজ যদি দেশের জনসাধারণ এই দুরবস্থার প্রতিবিধানে ঐক্যবদ্ধ হইয়া না দাঁড়ায় আমাদের শতাব্দীসঞ্চিত সভ্যতার আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

● শোক-সংবাদ ●

ময়মনসিংহে বাণীগ্রামের কমরেড **অনিল গোস্বামী** পার্টির বে-আইনী অবস্থা হইতে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পার্টির সভ্যপদ লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন। তাঁহার সেবাপরায়ণতায় স্থানীয় কৃষকরা তাঁহাকে খুব আপনার জন মনে করিতেন। দারুণ খাদ্য সংকটের দিনে বাণীগ্রামে যে লঙ্গরখানা স্থাপিত হয় কমরেড অনিল তাহাতে একজন অগ্রণী কর্ম্মী হিসাবে কাজ করেন। কমরেড গোস্বামী তাঁহার ছাত্রজীবন হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের একজন উৎসাহী সংগঠক ছিলেন।

৩০ বৎসর বয়সেই তিনি ক্ষয় রোগে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহ জেলা একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকে হারাইল।

বীরভূমের মহিলা কর্ম্মী কমরেড **দীনতারিণী মুখোপাধ্যায়** তরুণ বয়সেই মারা গিয়াছেন। তিনি গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির বে-আইনী অবস্থায় ইহার সেবাযত্ন ও সতর্কতা অনেক কমরেডদের নানা অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ গ্রামে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাঁর মৃত্যুতে বীরভূমের মহিলা আন্দোলন একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীকে হারাইল।

দুধের বদলে শিশুর জন্য আটার জল

গরু ও দুধ যায় চোরাবাজারে

হাওড়ায় দুধের দারুণ সঙ্কট

পূর্ব্বে **হাওড়া** শহরে প্রত্যহ মার্টিন কোম্পানীর ট্রেনে আমতা লাইনে যেখানে দুধ আসিত ২০০।২৫০ মন এখন সেখানে আসে মাত্র ৪০।৫০ মণ। চাঁপাডাঙ্গা লাইনে দুধের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে দৈনিক ছানা আসে প্রায় ৬০ মণ গ্রামের গোয়ালা পরিবারগুলি কলিকাতার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নিয়োজিত লোকেদের কাছে হয় দুধ বিক্রী করে, না হয় ক্ষীর অথবা ছানা তৈরী করিয়া বেচে।

গত বৎসর দুর্ভিক্ষে এ জেলার প্রায় ৩০% গরু মরিয়াছে এ ছাড়া গরুর চোরাকারবারের ফলে অনেক গরুই জেলার বাহিরে চালান যাইতেছে। একা শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জ গ্রাম হইতেই প্রায় ২০০ গরু বিক্রী হইয়াছে এবং এখনো প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২০টী গরু শিবগঞ্জের খেয়া ঘাট দিয়া দালালরা দৈনিক বিক্রীর জন্য অপর পারে লইয়া যায়।

মহিষগোট গ্রামের একজন কৃষক গৃহস্থ বলিতেছে যে, পূর্ব্বে তার যে গরুটী ৵৩ সের করিয়া দুধ দিত এখন সে প্রায় এক সেরের বেশী দুধ দেয় না; কারণ খইল ও খড়ের দাম অতিরিক্ত হওয়ায় গরুকে আর উপযুক্ত ভাবে খাওয়ানো যায় না। প্রায় সব গ্রাম হইতে এই একই ধরণের সংবাদ আসিতেছে।

গ্রামগুলিতে রেড ক্রশের দুগ্ধ কেন্দ্রগুলি ছাড়া শিশুদের জন্য আর দুধ মিলিতেছে না। মাশিলা গ্রামের তিনশ' শিশুর ভিতর ২০০ রেডক্রশের মিল্ক ক্যান্টিনে দুধ খায়, বাকী ১০০ শিশু দুধ পায় না। অধিবাসীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। এই গ্রামের এক পূর্ব্বপাড়াতেই ৭৯টী শিশু দুধ পায় না।

হাওড়া শহরের চাটুয্যে হাটের একটী মধ্যবিত্তের বাড়ীতে সংবাদ নিয়া জানা গেল তাদের দু'টী শিশুকে দুধের পরিবর্ত্তে আটা ও সুজির জল দেওয়া হয়। শিবপুর শীলবস্তির একটী চটকল মজুর পরিবারের সংবাদ নিয়া জানা গেল যে ছোট শিশুকে তারা ফুলুরী কিনিয়া তার জল খাইতে দেয়।

দিনাজপুরে দুধের জন্য আন্দোলন

দিনাজপুর শহরে দুধের অবস্থা ভয়াবহ। গোয়ালারাই বাড়ী বাড়ী দুধ যোগান দেয়। বর্ত্তমানে গোয়ালারা আর দুধ সরবরাহ করিতে পারিতেছে না।

রেডক্রস হইতে ১০টি দুধের ক্যান্টিনে দুধ সরবরাহ করে। ৪টি ক্যান্টিন চালায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। মোট প্রায় এক হাজার শিশু এই সব ক্যান্টিন হইতে দুধ পায়। শহরে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। ইহার ভিতর ২ হাজার শিশুর পক্ষে দুধ কিনিয়া খাওয়া কঠিন। কাজেই ক্যান্টিনের দুধে সব গরীব শিশুর কুলায় না। যে সব ক্যান্টিনে দুধ দেওয়া হইতেছে তাহাও সরবরাহ কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে দুধের আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ফুড কমিটি হইতে যে সব পাড়ায় সভা হইতেছে তাহাতে মহিলারা দুধের দাবী উপস্থিত করিতেছেন ও ফুড কমিটি ইহাতে সমর্থন করিতেছে।

দনাজপুরের তার

গত ২৪শে জানুয়ারী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে শহরের রাস্তায় রাস্তায় মহিলাদের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়, প্রায় প্রত্যেকের কোলেই দুধের শিশু। এই শোভাযাত্রায় কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকল দলের মহিলারাই ছিলেন। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিয়াছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা গাঙ্গুলী ও হেমন্ত বালা সেন। শোভাযাত্রার পর সবাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া দাবী জানান যে অবিলম্বে আরও দুধের ক্যান্টিন ও দুধের কোঅপারেটিভ খোলা হউক এবং ক্যান্টিনের দুধ সরবরাহ অব্যাহত রাখা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্বাস দিয়াছেন যে অবিলম্বে এক প্রতিনিধিমূলক সভা ডাকিয়া ইহার ব্যবস্থা করা হইবে।

★ নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন ★

নেত্রকোনা মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশ ধর, বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক অখিল সেন, মুসলিম নেতা সৈয়দ তুরাবুদ্দিন মিঞা ও অন্যান্য হিন্দু মুসলিম নেতা সম্মেলনের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া পাকাপাকি ভাবে পারলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ময়দান সম্মেলনের জন্য ঠিক করিয়াছেন।

পারলা গ্রামের মিউনিসিপাল কমিশনার যোগেন বাবু সম্মেলনের মণ্ডপের জন্য জমি ও প্রতিনিধিদের বাসের জন্য তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। মুসলিম নেতা দেওয়ান হোসেন সাহেবও প্রতিনিধিদের জন্য তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন।

সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। জিলা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি মৌলভী জহীরুদ্দিন একা ৫ই জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে ১৩২৮ জন কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতায় সম্মেলনের জন্য ইতিমধ্যে আট হাজারের বেশী টাকা উঠিয়াছে।

সরকারী প্রতিবাদ

৬-৯-৪৪ তারিখের 'জনযুদ্ধে' একটি খবর ছিল যে, লালমনির হাট থানার সিংমারি গ্রামের সর্ব্বদাস দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তাহার পরিবার ত্যাগ করিয়াছে এবং চিনাই গ্রামের পোলাসেক ৭, টাকায় তাহার ছেলে বিক্রয় করিয়াছে।

বাংলা সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন-ফরমেশন আমাদের কাছে এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

এঙ্গেলস্-এর লেখা

(১) সমাজতন্ত্রবাদ ঃ কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক

রেবতী বর্ম্মণের প্রামাণিক অনুবাদ ৸৵০

(২) পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রেবতী বর্ম্মণের প্রামাণিক অনুবাদ ২৷৷০

By Marx Engels Lenin Institute, Moscow

1. V. I. LENIN (A short sketch of his life and activities) Rs. 3/8/-

বার্লিন আর ১০০ মাইল দূরে

‘রুশ অভিযান যদি না থামে, তবে কি হইবে?’—গোয়েবলসের বিলাপ

“পূর্ব্ব রণাঙ্গনে সর্ব্বত্র লালফৌজের আক্রমণ ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বার ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বাঞ্চলের জার্ম্মান আর্ম্মি সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে” —মস্কো বেতারের এই ঘোষণাই সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রন্টের বর্ত্তমান চিত্র।

দুই সপ্তাহ আগে সোভিয়েট বাহিনীর বিরাট শীত অভিযান সুরু হয়। এই অভিযানের প্রস্তুতি এমন নিখুঁত ভাবে করা হইয়াছে যে লালফৌজের সম্মুখে জার্ম্মান ব্যুহগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার ঝড়ের মত গতিবেগ দেখিয়া জার্ম্মানরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই সংকটের তীব্রতায় বাক্যবাগীশ গোয়েবলসকে পর্য্যন্ত বলিতে হইতেছে ‘এই প্রচণ্ড রুশ অভিযান যদি থামানো না যায়, তাহা হইলে অবস্থা কি হইবে?’

ডানজিগ ও কোনিংসবুর্গ

গত সপ্তাহে আমরা লালফৌজের সন্নিবেশ ও আক্রমণের গতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করিয়াছিলাম। এ সপ্তাহে তাহারই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিব।

পূর্ব্ব প্রুশিয়ার যুদ্ধঃ—দ্বিতীয় শ্বেত রাশিয়ান আর্ম্মি মার্শাল রকোসভস্কীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে এবং তৃতীয় শ্বেত রাশিয়ান আর্ম্মি জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কীর নেতৃত্বে উত্তর ও পূবদিক হইতে পূর্ব্বপ্রুশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

মার্শাল ষ্টালিন তাঁহার ২৬শে জানুয়ারীর হুকুমনামায় ঘোষণা করিয়াছেন—“লালফৌজ **ডানজিগে** প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় জার্ম্মান সৈন্যদল মুল জার্ম্মানবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।” (ডানজিগ সহর বাল্‌টিক সাগরের একটি বিখ্যাত বন্দর এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা ছিল পোলাণ্ডের সমুদ্রে যাইবার রাস্তা)। গোটা পূর্ব্ব প্রুশিয়া এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে জার্ম্মান সৈন্যের এক বিরাট অংশ (প্রায় ২ লাখ) এমন ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল যাহাতে স্থলপথ হইতে ইহাদের সরিবার আর কোন উপায় রহিল না। এক বাল্‌টিক সাগর দিয়া তাহাদের পালাইবার একটি পথ খোলা আছে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে সেদিক দিয়া সরানো একরূপ অসম্ভব।

বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ব প্রুশিয়ার ভিতরের অবস্থাও খুব সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার রাজধানী **কোনিংসবুর্গের** উপকণ্ঠে লালফৌজ প্রবেশ করিয়াছে। এই সহরটি এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ রেল জংশন ও যানবাহন কেন্দ্র। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন—কোনিংসবুর্গ সহরের উপকণ্ঠে ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলিতেছে এবং এক বিরাট সোভিয়েট বাহিনী নগররক্ষী সৈন্যদের অবরুদ্ধ করার জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। সহর হইতে ধূম্রকুণ্ডলী আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। মনে হয় জার্ম্মানরা সহরের এক অংশে আগুন ধরাইয়া দিতেছে।

লিথুয়ানিয়া সম্পূর্ণ শত্রু কবলমুক্ত—পূর্ব্ব প্রুশিয়ার ঠিক উত্তরপূবে লিথুয়ানিয়ার মেমেল বন্দর অবস্থিত। এতদিন ইহা জার্ম্মানদের হাতেই ছিল। ২৮শে জানুয়ারীর সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে বাল্টিক অঞ্চলে লালফৌজের নূতন অভিযান সুরু হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ মেমেল সহর লালফৌজ দখল করিয়াছে। ইহার ফলে লিথুয়ানিয়া হইতে জার্ম্মানদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হইল।

পোজনানের রক্ষাব্যুহ ভেদ

ওয়ারশ-বার্লিন সড়কের মধ্যে **পোজনানই** জার্ম্মানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাব্যুহ। ইহা পোলাণ্ডের অন্যতম বৃহৎ সহর এবং বার্লিনের পূবে জার্ম্মান সীমান্তের সম্মুখে নাৎসীদের শেষ আত্মরক্ষা ঘাঁটি। মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে প্রথম শ্বেত-রাশিয়ান আর্ম্মি পোজনানকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সব শেষের সংবাদে জানা যায় সহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট পত্রিকায় প্রাভ্‌দার সংবাদদাতা জানাইতেছেন—জার্ম্মানরা সহরের অভ্যন্তরে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে লালফৌজের অগ্রবর্ত্তী দল পোজনান পশ্চাতে ফেলিয়া উহার উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে জার্ম্মান সীমান্তে পৌছিয়াছে। আরও দক্ষিণে লালফৌজ অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে এবং মনে হয় আজ (২৮শে জানুয়ারী) রাত্রির মধ্যেই তাহারা বার্লিন হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে গিয়া পড়িবে।

ব্রেসলাউ ও জার্ম্মান শিল্পাঞ্চল সাইলেসিয়া

সাইলেসিয়া জার্ম্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। জার্ম্মান সমরযন্ত্র এই এলাকার বিভিন্ন ধরণের কল-কারখানা হইতে অনেক রকম যোগান পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া কয়লা উৎপাদনে ইহা জার্ম্মানীর এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজ সোভিয়েটবাহিনী জার্ম্মানীর এই ঐশ্বর্য্যশালী সমগ্র অঞ্চলটিকে দখল করিতে উদ্যত।

মার্শাল কনিয়েভের নেতৃত্বে লালফৌজ সাইলেসিয়ার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎবেগে সহরের পর সহর দখল করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। ২৭শে জানুয়ারী জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী যে সংবাদ দিতেছে তাহাতে জানা যায় উত্তর সাইলেসিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলি জার্ম্মানীর হাতছাড়া হইয়াছে। ওপেল্‌ন্ লালফৌজ অধিকার করিয়াছে।

ইহা ছাড়া রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে সাইলেসিয়ার বৃহত্তম সহর ও রাজধানী **ব্রেসলাউ**-এর উপর লালফৌজ জোর আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং ইহাকে পার্শ্বদেশ হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলার কাজও আরম্ভ হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী

জেনারেল পেট্রভের সেনাদল কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালায় ও শ্লোভাকিয়ায় জার্ম্মানদের বাধা দানকে চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই ফ্রন্টেও লালফৌজের অগ্রগতি নাৎসীরা মরিয়া হইয়া বাধা দিয়াও ঠেকাইতে পারিতেছে না। মার্শাল ষ্টালিন জেনারেল পেট্রভের উদ্দেশে যে হুকুমনামা ২৮শে জানুয়ারী তারিখে প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের ভাডোভিচ প্রভৃতি অনেকগুলি সহরই জার্ম্মান কবলমুক্ত হইয়াছে।

হাঙ্গেরীতে মার্শাল মালিনোভস্কীর নেতৃত্বে সোভিয়েটবাহিনী অন্যান্য ফ্রন্টের সাথে সমান তালে আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বলা হইয়াছে—লালফৌজ মিসকলোজ-এর (হাঙ্গেরী) উত্তরে এক নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। ২৫ মাইল দীর্ঘ ব্যূহ রচনা করিয়া লালফৌজ ১২ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ

লালফৌজের আক্রমণের ব্যাপকতার সাথে পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধের তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে এই ফ্রন্টে জার্ম্মানীর অবস্থা তত সঙ্কটজনক হইয়া ওঠে নাই! কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রশক্তি কিছুটা আগাইয়া যাইতেছে সত্য কিন্তু আবার ষ্ট্রাসবুর্গ প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণোদ্যোগ এখনও জার্ম্মানদের হাতেই আছে।

পশ্চিমের অবস্থা এইরূপ বলিয়াই জার্ম্মান সমর নায়করা রুশ অগ্রগতি রুখিবার জন্য সোভিয়েট ফ্রন্টে এই অঞ্চল হইতে বাছা বাছা ‘পানজার’ সৈন্য পাঠাইতে পারিতেছে। ইতিমধ্যেই লালফৌজ এমন কতক জার্ম্মান সৈন্য বন্দী করিয়াছে যাহারা কিছুদিন আগেও পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধরত বাহিনীগুলির মধ্যে ছিল। ২৫শে জানুয়ারী প্যারিস হইতেও এইরূপ একটি খবরে জানা যায় যে পশ্চিম রণাঙ্গনে অবস্থিত জার্ম্মান সেনাদলের এক অংশকে রুশ রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা আজ যদি এইরূপ না হইত তবে অবিলম্বেই জার্ম্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত। আজ লালফৌজের এই আক্রমণই চূড়ান্ত হইবে কিনা তাহা অনেকটা নির্ভর করিতেছে পশ্চিমে মিত্রপক্ষের নূতন আক্রমণের ক্ষমতার উপর। বার্লিন অভিমুখে লালফৌজে এই জয়যাত্রার গতিবেগ বাড়িয়াই চলিবে যদি ইহার সাথে সাথে আজ মিত্রশক্তিও পশ্চিম দিক হইতে জার্ম্মানীর উপর জোর আক্রমণ চালাইতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতার কি হইবে?

বৃটিশ রক্ষণশীলদের কাছে ‘প্রাভদার’ প্রশ্ন

ডাচেস অব এথল ইংলণ্ডের গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহারই আওতায় ‘ইউরোপীয় স্বাধীনতার জন্য লীগ’ (লীগ ফর ইউরোপীয়ান ফ্রিডম) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘৃণ্য নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট গণ-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং লালফৌজের জয়যাত্রার সাথে সাথে নিপীড়িত জনগণের ভিতর যে আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার আসিয়াছে, ডাচেস অব এথল ও উঁহার সমপন্থীরা ইহা পছন্দ করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি তাঁহার তথাকথিত ‘স্বাধীনতা লীগের’ নামে সোভিয়েটকে নিন্দা করিতে সুরু করিয়াছেন। সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির উপর অযথা ইঙ্গিত করা হইতেছে।

সোভিয়েট পত্রিকা ‘প্রাভদা’র রাজনৈতিক সমালোচক জাস্লাভস্কী ডাচেস অব এথলের এই সব ফাঁকা কথায় উত্তর দিতে গিয়া কয়েকটি স্পষ্ট কথার অবতারণা করিয়াছেন। সোভিয়েটের নীতির সাথে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের গণতান্ত্রিক নীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়া জাস্লাভস্কী বলেন—আজ এশিয়া ও আফ্রিকায় অগণিত নরনারী স্বাধীনতার জন্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে, অথচ শুধু ইউরোপীয় দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য হঠাৎ একটি লীগের উদ্ভব হইল কেন? ভারতবর্ষের জনগণও তাঁহাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য তীব্র আন্দোলন চালাইতেছেন, ডাচেস অব এথলের সেই দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কি বলার আছে?

সোভিয়েট প্রেস ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের এই সব কুচক্রী দলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। ডাচেস অব এথলকে ‘প্রাভদা’র ভারত সম্পর্কে মন্তব্য সম্বন্ধে বলায় তিনি ইহার কোন পরিষ্কার জবাব না দিতে পারিয়া বলেন—“লীগের সম্মুখে বহু গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে! ইয়োরোপের সমস্যাই এখন আমাদের বেশী গুরুতর।’ ৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রশ্ন যাঁহার কাছে ‘গুরুতর সমস্যা’ নয়, জনগণের স্বাধীনতার অগ্রদূত সোভিয়েটের নীতিকে তিনি পছন্দ করিবেন না এ আর বিচিত্র কি?

পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল চীন

জাপানকে রুখিতে চীনে সর্ব্বদলীয় গণতান্ত্রিক সরকার চাই

বর্ম্মা ফ্রন্টের যুদ্ধে মিত্রসেনা আরও খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। আকিয়াব দখলের পর মিত্রসেনা রামরী দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহার অর্দ্ধেক দখল করে এবং সম্প্রতি আবার, রামরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কেদুবা দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

কিন্তু এই ফ্রন্টের সব চেয়ে প্রধান খবর হইল লেডো রোড ও বর্ম্মারোডের সংযোগস্থল মিত্রপক্ষ দখল করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে এখন চীনে সরবরাহ পাঠানো সম্ভব হইবে।

ব্রহ্মের যুদ্ধ এক বিরাট অভিযান নহে

জাপানীরা ইম্ফল হইতে তাড়িত হইবার পর এই ফ্রন্টে কোথায়ও তাহারা কোন বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয় তাহারা উত্তর বর্ম্মার জন্য আর নূতন সৈন্য নিয়োগ করিতে অক্ষম। আজ মার্কিন সেনার ফিলিপাইনের লুজনে অবতরণের সাথে সাথে চীনের উপকূলেও মার্কিন সৈন্যের অবতরণ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় জাপানী সমর নায়করা তাহাদের সমস্ত শক্তি চীনেই কেন্দ্রীভূত করিতেছে।

এই সম্পর্কে মার্কিন জেনারেল ওয়েডমেয়ার বলিয়াছেন যে ফিলিপাইনে জাপানীরা দারুণ ঘা খাইবার আশঙ্কায় খাস চীনের উপকূলে ক্ষিপ্রতার সহিত সুদৃঢ় রক্ষাব্যুহ গড়িয়া তুলিতেছে এবং স্থলপথে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত রেল রাস্তা মেরামত করিয়া নিতেছে।

বর্ম্মায় জাপানী সমরনীতি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—মনে হয় বর্ম্মায় জাপানীরা পিছনেই হটিয়া যাইবে, তবে তাহাদিগকে অল্প বিস্তর জোর করিয়াই স্থানচ্যুত করিতে হইবে।

সামগ্রিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বর্ম্মার এই অভিযানকে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া যায় না। আজ চীনে যখন জাপানীরা তাহাদের সমস্ত শক্তি জড়ো করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তখন জাপানী শক্তির মর্ম্মস্থল এই চীনদেশেই তাহাদের আয়োজনের উপর আঘাত হানা দরকার।

বর্ত্তমানে বর্ম্মায় মিত্রশক্তির যে বিরাট সৈন্য সমাবেশ রহিয়াছে ইহার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সামরিক দায়ীত্ব হইতেছে চীনের ইউনান প্রদেশে ও দক্ষিণ চীনের দিকে আগাইয়া যাওয়া। তাহারই জন্য বর্ম্মার ভিতরকার জাপানী সৈন্যদের পিছনে হটানো দরকার যাহাতে অবিলম্বে এই মূল উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করা যায়।

আজ অভিযানের এইরূপ পরিকল্পনা লইলেই খুব তাড়াতাড়ি জাপানী ফ্যাসিষ্টদের ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের কেন্দ্রস্থল—চীন

বর্ম্মা লড়াইয়ের নীতি যদি এই হয়, তবে চীন সম্পর্কে কি করা দরকার? আজিকার দিনে প্রাচ্যের যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইতেছে চীন। ইহা নিশ্চিত যে এই চীনের ভূমিতেই জাপানীদের সাথে চরম লড়াই করিতে হইবে। দক্ষিণ দিক হইতে বৃটিশ, পূব হইতে মার্কিন সেনার সাথে আজ কি চীন জাপানীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম হইতে অভিযান সুরু করিতে পারিবে?

চীন যতদিন অনৈক্য ও বিভেদে জর্জ্জরিত থাকিবে ততদিন জোরদার সুকল্পিত প্রতিআক্রমন সম্ভব হইবে না। হয়ত এখানে সেখানে কিছুটা ছোট খাটো আক্রমণ চলিতে পারে কিন্তু তাহা যে জাপানীদের ঘায়েল করিতে যথেষ্ট হইবে না ইহা বলাই বাহুল্য।

আজ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, কুয়োমিংটাং দলের স্বেচ্ছাতন্ত্র দূর না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের সামরিক অবস্থায় উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু কুয়োমিংটাং নেতৃত্বের তরফ হইতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টাই দেখা যাইতেছে না। বিদেশে জনমতের চাপে চিয়াংকাইশেক সম্প্রতি কয়েকটি বিবৃতিতে চীনে গণতন্ত্রের প্রসার এবং “জনগণের কংগ্রেস” ডাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু ইহা ফাঁকা কথা মাত্র এবং ইহা চীনের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের প্রসারের পরিবর্ত্তে বিদেশের সমালোচনার মুখ বন্ধের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি য়ুনান এক্‌জিকিউটিভের রাজনৈতিক দপ্তরের মুখপাত্র ডাঃ টি, এফ, সিয়াং বলিয়াছেন—প্রস্তাবিত গণ-কংগ্রেসের জন্য নির্ব্বাচন হইবে কিনা অথবা ১৯৩৬ (!) সালের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সভা হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট কিছুই সিদ্ধান্ত করে নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, চিয়াং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯৩৬ সালের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা কি ভাবে এখনকার চীনা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন?

চিয়াং কাইশেকের প্রতিশ্রুতি যে ফাঁকা তাহা আরও প্রমাণিত হয় চীনের সংগঠক মন্ত্রী এবং চীন গুপ্ত পুলিসের প্রধান কর্ত্তা ও কুখ্যাত চেন ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন চেন-লি-ফুর বিবৃতি হইতে। কিছুদিন আগে এই ভদ্রলোক ‘টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার’ সংবাদদাতা মিঃ মোরায়েজের নিকট বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “গণ-কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ১২০০শত প্রতিনিধির মধ্যে ৯৫০ জন-নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ১৯৩৬ সালে। তিনি সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পান না এবং তাহার মতে বাকী শূন্য

(শেষাংশ ৮ম পৃঃ দেখুন)

Regd. No. C. 2836.

ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন

৫৷৷ লাখ সংগঠিত মজুরের প্রায় ১০০০ প্রতিনিধির সমাগম

সর্ব্বসম্মতভাবে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত

গত ২০শে হইতে ২২শে জানুয়ারী মাদ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাসে এত বড় অধিবেশন আর কখনও হয় নাই। ৫৷৷০ লাখ সংগঠিত মজুরের পক্ষ হইতে প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে এই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিল। জাতীয় কংগ্রেস ব্যতীত আর কোন সম্মেলনে এত অধিক প্রতিনিধির সমাগম দেখা যায় নাই।

কিন্তু শুধু সংগঠনের দিক দিয়াই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আদর্শের দিক দিয়াও এই সম্মেলন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সম্মেলনে সমস্ত প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর আজ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পূর্ণ মতৈক্য দূরে থাকুক, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী যে তিন-চতুর্থাংশ মতৈক্যের দরকার হয়, তাহাও ইতিপূর্ব্বে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এবারের অধিবেশনে সর্ব্ববাদী সম্মত রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হইয়াছেঃ **ভারতে অচল অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্না প্রমুখ নেতারা দেশের আভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করিবার ও শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার পিছনে দেশের মজুর শ্রেণীর পুর্ণ সমর্থন নিয়োজিত থাকিবে।**

এই একতা শুধু মজুর শ্রেণীর একতা নয়, সমগ্র দেশবাসীকে একতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উচ্ছসিত ভাষায় অভিনন্দন জানাইলেন এবং সমগ্র দেশবাসী যাহাতে এই একতার দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহার আহ্বান জানাইলেন। সিংহল ও বেলুচিস্তান হইতে দুইজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁরা বলিলেন, এই একতার শিক্ষা তাঁরা তাঁদের দেশে কাজে লাগাইবেন। সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন দলের নেতাদের বক্তৃতার মধ্যেও এই একতার জন্য উৎসাহ ও আস্থা ফুটিয়া উঠিল।

নাগপুর হইতে মাদ্রাজ

এই সাফল্য কেমন করিয়া হইল? ইহার পিছনে রহিয়াছে গত এক বছরের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস। এই অধিবেশনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। নাগপুরে মাত্র ৩০০ প্রতিনিধির সমাগম যাঁরা দেখিয়াছিলেন, তাঁরা এখানকার প্রতিনিধি সমাগম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। শুধু সংখ্যাই বাড়িয়াছে তাহা নহে, এবারকার প্রতিনিধিদের একটী বিশিষ্ট অংশ হইতেছে কারখানার মজুর। আলোচনার মধ্যে, প্রস্তাব রচনায় মজুর-প্রতিনিধিরা অংশ লইয়াছে---এরূপ দৃষ্টান্ত নাগপুরে দেখা যায় নাই।

নাগপুর হইতে মাদ্রাজ যে কতদূর অগ্রগতি তাহা সাধারণ সম্পাদক কমরেড এন-এম যোশীর বিবরণীতেই পরিষ্কার হইল। নাগপুর অধিবেশনের সময় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ২৬৯, আর আজ এই সংখ্যা হইয়াছে ৪০০। নাগপুরের সময় মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩২ হাজার, আর আজ সভ্য সংখ্যা ৫৷৷ লাখ। অর্থাৎ, এই এক বছরে ভারতের মজুর আন্দোলন দ্বিগুণ শক্তিশালী হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, এই এক বছরে ভারতের মজুর-আন্দোলনের শক্তি ভারতের বাহিরেও প্রতিফলিত হইয়াছে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে গত কয়েক মাস ধরিয়া বিলাতের শুধু মজুর শ্রেণীকে নহে, জনসাধারণকেও ভারতের মজুরের দাবী শুনাইতেছেন। ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কথা দুনিয়ার সামনে তিনি উচু করিয়া ধরিয়াছেন, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও শক্তিকে তিনি বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিলাতের মজুর শ্রেণী আজ ভারতের মজুর শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের জন্য লড়িতেছে।

গণ-সমাবেশ

২০শে তারিখে মাদ্রাজ শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে পেরাম্বুর ষ্টেশানের নিকটে রেলওয়ে ময়দানে সম্মেলন সুরু হইল। এই সম্মেলনের ভার লইয়াছে এখানকার রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন। হাজারে হাজারে রেলওয়ে মজুর সম্মেলনে আসিয়াছে। তারা ইংরাজী বা হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ নয়। তবু তারা ধৈর্য্য ধরিয়া সমস্ত বক্তৃতা শুনিল। তাদের প্রিয় নেতা কমরেড রামমূর্ত্তি তামিল ভাষায় যখন এক একটা বক্তৃতা তর্জ্জমা করিয়া দিতেছিলেন, তখন তাদের জয়ধ্বনি সমস্ত সম্মেলন ক্ষেত্রকে সজীব করিয়া তুলিতেছিল।

সভাপতি কমরেড ডাঙ্গের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহ-সভাপতি **কমরেড কোর্ব্বান** এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন। কমরেড কোর্ব্বান তরুণ বয়স্ক যুবক, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোধহয় সর্ব্বকনিষ্ঠ সভাপতি। কিন্তু সভাপতি হিসাবে কমরেড কোর্ব্বানের যোগ্য-পরিচালনা, ভ্রাতৃ-সুলভ ব্যবহার, ঐক্য বজায় রাখিবার ঐকান্তিক চেষ্টা সমবেত প্রতিনিধি ও জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিল। কমরেড কোর্ব্বান এই ঐতিহাসিক অধিবেশনকে যেভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিলেন, তাহাতে কমরেড ডাঙ্গের শুভেচ্ছা সত্যই কার্য্যে পরিণত হইল।

২১শে তারিখে পেরাম্বুরে আরো বড় জন-সমাবেশে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত জাতীয় কংগ্রেসের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া যাহারা প্রচার করে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর উপস্থিতি ও বক্তৃতা তাদের জবাব। এই অধিবেশনের সময়ে তিনি আগ্রহ সহকারে বলেন যে, দেশের জনসাধারণের একটী বিরাট অংশের কাছে তিনি কথা বলিতে চাহেন। তিনি সমাবেশে উপস্থিত হইয়া বলেনঃ **ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লক্ষ্য ও জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্যের মধ্যে সাধারণ ভাবে কোনো পার্থক্যই থাকিতে পারে না। তিনি কংগ্রেসের তরফ হইতে মজুরশ্রেণীকে অভিনন্দিত করিলেন।**

ভেদপন্থীদের চেষ্টা ব্যর্থ

কিন্তু একতা রক্ষার চেষ্টা নেহাৎ সহজসাধ্য হয় নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত দেশনেত্রীর অভিনন্দন সত্বেও এবং প্রতিনিধিদের শতকরা ৯০ জনের আন্তরিক আগ্রহ সত্বেও সম্মেলনের আবহাওয়া ভেদপন্থীদের দ্বারা মাঝে মাঝে দূষিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই দূষিত আবহাওয়াকে পরাস্ত করিয়া এই সম্মেলন যাহা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সুস্থ ও সবল জীবন আনিয়া দিবে।

ভেদপন্থীরা এই সম্মেলনে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে, সেটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাদের মুখোস সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গিয়াছে। মত-বিরোধের জন্য নয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ভাঙ্গিবার জন্যই তারা গোলমাল করিতে বদ্ধপরিকর, ইহাই এই সম্মেলনে সকলের কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। এবং সেই জন্যই এক এক করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সাচ্চা ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট তাদের পক্ষ ত্যাগ করিল।

(সম্মেলনের সুরু হইতেই, অর্থাৎ জেনারেল কাউন্সিলের সভা হইতেই একটা বিরোধী পক্ষ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই বিরোধী পক্ষের নেতা হইলেন মিঃ বি-কে মুখার্জ্জী এবং বিরোধী পক্ষ গড়িয়া উঠিল মৈত্রেয়ী বসু, হুমায়ুন কবির, সি-এস-পি দল ও লেবার পার্টির লোক লইয়া কমিউনিষ্ট বিরোধের জন্য। প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন কমিউনিষ্ট, ইহাতেই তাঁদের প্রধান মর্ম্মবেদনা। কালাপ্পা, গিরি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে তাঁহারা প্রথমে নিজেদের পক্ষে টানিয়া আনিয়াছিলেন।)

কিন্তু কমিউনিষ্টরা ট্রেড ইউনিয়নে অন্যায় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। টেড ইউনিয়নের ঐক্য গড়িয়া তোলাই ছিল তাদের একমাত্র চেষ্টা। সুতরাং রাজনীতিক প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব সর্ব্বসম্মত হইয়া যাওয়ায়, বিরোধীপক্ষের কথা আর উঠিল না। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভাঙ্গাই যাদের কাজ, তারা থামিবে কেন? বরং তারা আরো মরিয়া হইয়া গোলমালের চেষ্টা করিবে।

তাদের মুখোস খুলিল

তাই হইল। (এবার আসরে রহিলেন শুধু বি-কে মুখার্জ্জী, মৈত্রেয়ী বসু, কবীর ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গর দল। সমগ্র অধিবেশনের সময় তাঁরা যে কোন ছুতা ধরিয়া গোলমাল সুরু করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার তাদের পক্ষে লেবার পার্টীও নাই, গিরিও নাই, কালাপ্পাও নাই। মৃণালকান্তি, জোশী প্রভৃতি নিরপেক্ষ নেতারা অনেক পূর্ব্বেই তাঁদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালাপ্পা তো শেষ পর্য্যন্ত তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সম্মেলন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সম্মেলনের শেষ দিকে দেখা গেল ১ হাজার প্রতিনিধির মধ্যে জন ২০ মাত্র এই ভেদ-সৃষ্টিকারীর দলভুক্ত হইয়া আস্ফালন করিতেছে এবং ইহাদের নেতাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন এমন তিন জন, যাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন মিল নাই।

বি-কে-মুখার্জ্জীর কোন রাজনীতির বালাই আছে কিনা তাতে অনেকেরই সন্দেহ। তিনি রাজনীতিক প্রস্তাব সম্পর্কে প্রথমে বলিয়াছিলেন যে টে ড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই ধরণের রাজনীতিক প্রস্তাব গ্রহণের কোন অধিকার নাই। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিলেন। মৈত্রেয়ী বসুকে কেহ কোন দিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে দেখেন নাই, বছরখানেক হইতে ট্রেড ইউনিয়নে ভেদ-সৃষ্টির কাজে তাঁকে অগ্রণী হিসাবে দেখা যাইতেছে। আর মিঃ হুমায়ুন কবির! তিনি কোন্ ট্রেড ইউনিয়নের লোক তাহা এখনও সকলে বুঝিতে পারে না। এম এন রায়ের ফেডারেশন অফ্ লেবারেও তিনি আছেন আবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও তিনি আছেন।)

গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

রাজনৈতিক প্রস্তাব ছাড়া আর যে সমস্ত প্রস্তাব নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ—

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী; কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী; ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী; লাল ফৌজের প্রতি অভিনন্দন; গ্রীসে চার্চ্চিল নীতির নিন্দা; টুটিশ মজুর প্রতিনিধি-দলের প্রতি অভিনন্দন; সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ।

মজুর দাবী সম্পর্কিতঃ—টেকনিকাল পারসোনেল আইনের ১৩ ধারার প্রত্যাহার দাবী; বেকার প্রতিবিধানের দাবী; এ্যাড্‌জুডিকেশনের ক্রটী সংশোধনের দাবী; ঠিকা মজুর প্রথা রদের দাবী; বাংলা ও বিহারের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মজুরদের সাহায্যের আবেদন।

ইহা ছাড়া চটকল মজুর, চা মজুর, সুতাকল মজুর, রেলওয়ে মজুর, বিড়ি মজুর প্রভৃতির দাবী সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব অবশিষ্টদের বাঁচাও

জনমতের চাপে অস্তি ও চিমুরের আট জন বন্দীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব হইয়াছে। কিন্তু সাতজনের উপর ফাঁসীর আদেশ এখনও বলবৎ আছে। এই সাতজন তরুণ বন্দীকে বাঁচাইবার জন্য আরও আন্দোলন চাই।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অভিনন্দন

"এই অধিবেশনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও, তারা যে তাদের দলগত মতভেদের কথা ভুলিয়া একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে এবং সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য তাদের আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য সকলেরই মনে প্রেরণা জোগাইবে।"

কমরেড এন এম জোশী

"নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সমস্ত দলের মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন হইয়া গড়িয়া উঠুক। তাহাতেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সত্যকার শক্তি। কংগ্রেসের নামে, লীগের নামে বা হিন্দুমহাসভার নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইলে কখনই তাহাতে ভারতের মজুর আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সমস্ত দলের সম্মিলন দ্বারাই আমরা সরকার-পুষ্ট ফেডারেশন অফ লেবারকে নির্ম্মূল করিতে পারিব।"

(সম্মেলনের শেষের বক্তৃতা)

কমরেড মৃণালকান্তি বসু

"বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে গত বছর যখন রাজনীতিক প্রস্তাবে সকলে একমত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিনিধি সাধারণের পক্ষ হইতে যে বিপুল জয়ধ্বনি উঠিল, তখন সেই জয়ধ্বনির মধ্যে আমি দেখিলাম মজুরশ্রেণীর অভ্রান্ত নির্দ্দেশ—একতা গঠনের নির্দ্দেশ। আজও এখানে একতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে মজুর শ্রেণীর সেই নির্দ্দেশই আমরা পালন করিতেছি।

এই একতা আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে যেদিন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

(রাজনীতিক প্রস্তাব সমর্থনকালে বক্তৃতা)

এই তিনের সমন্বয়ে যে বিরোধী পক্ষ তারা যে সমস্ত সাচ্চা ট্রেড ইউনিষ্টদের সমর্থন হারাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

মজুর আন্দোলনের নূতন দায়িত্ব

সম্মেলনের শেষে নূতন নির্ব্বাচিত সভাপতি কমরেড মৃণালকান্তি বসু ও নূতন নির্ব্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড এন-এম যোশী ট্রেড ইউনিয়নের নূতন গুরু দায়িত্বের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁরা বলিলেন যে, যে একতা আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাকে রক্ষা করাই হইতেছে প্রত্যেক ইউনিয়নের এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন-সভ্যের কর্ত্তব্য। এই কথা দ্বারাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করিয়া সরকারী ভেদ-নীতিকে পরাস্ত করা যাইবে এবং তাহাই হইবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সব চেয়ে বড় সাফল্য। প্রতিনিধিরা এই দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা লইয়াই মাদ্রাজ হইতে ফিরিল।

—তুষার চাটার্জ্জি

চীনে সর্ব্বদলীয় সরকার চাই

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিনিধি পদগুলি পূর্ণ হইলে কংগ্রেস আহ্বান করা যাইতে পারে।"

১৯৩৬ সালের চীন ও ৭ বছর যুদ্ধের পরে বর্ত্তমান চীনের পার্থক্য যে কত তাহা আর বুঝাইয়া বলার দরকার হয় না। কাজেই যাহারা ১৯৩৬ সালের কংগ্রেসের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন তাহারা এই ৭ বছর পরেও কি করিয়া চীনের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন? তাই এই সব দেখিয়া মনে হয় যে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের যে দাবী সে দাবী স্বীকার করার দিকে চিয়াং কাইশেক এক পাও অগ্রসর হন নাই।

পূর্ব্ব এসিয়ার জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করিতে চীনের অনৈক্য এখনই দূর করা দরকার। ইহা দূর করিতে চাই শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক চীন। ইহার ভিত্তি হইবে সর্ব্বদলীয় একটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, এজন্য চিয়াংকাইশেককে আজ কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের সহিত এখনই রফা করিতে হইবে।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত JANAYUDDHA

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা] ৮ই ফেব্রুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার, ২৬শে মাঘ, '৫১ [দাম ছয় পয়সা

জমিদারী কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক প্রায় চল্লিশ হাজার বস্তীবাসীকে পথে বসাইবার ষড়যন্ত্র

বস্তী হইতে উচ্ছেদের শত শত নোটিস

গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতার কয়েকটী বস্তীর বীভৎস অবস্থা দেখিয়া লাট সাহেব মিঃ কেসি শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যে বস্তীগুলির উন্নতিবিধান দাবী করার অধিকার কলিকাতাবাসীদের আছে। সেজন্যই তিনি জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—রাজনীতিক বা কায়েমী স্বার্থকে এই উন্নতির অন্তরায় হইতে দেওয়া হইবে না।

তাহার পর দু' মাসেরও বেশী কাটিয়া গিয়াছে। এতদিনে গবর্ণমেণ্ট শুধু কয়েকজন লোকের সম্মেলন ডাকিয়া একটী বিশেষজ্ঞ কমিটি বসাইতে পারিয়াছে। কি কর্পোরেশন, কি গবর্ণমেণ্ট কেহই সে সম্মেলনে বস্তীর অধিবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের কথা শুনিবার জন্য তাহাদের কোনো প্রতিনিধিকে গ্রহণ করে নাই—যদিও আইন সভা এবং কর্পোরেশন উভয় প্রতিষ্ঠানেই বস্তিবাসী শ্রমিকদের নিজস্ব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু অকর্ম্মণ্য আমলাতন্ত্র এবং বস্তির জমিদার প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করিবার মত লোকের সে সম্মেলনে অভাব ছিল না।

সে যাই হোক, সম্মেলন ও কমিটি চিরকালের প্রথামত লম্বা লম্বা প্ল্যান লইয়া সরকার বা কর্পোরেশনের দপ্তরে বসিয়া চুল-চেরা তর্ক করিতেছে। আর সেই সুযোগে কলিকাতার বিভিন্ন বস্তির কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন ধনী জমিদারেরা বস্তীবাসীদিগকে একেবারে গৃহহারা করিয়া দিবার জন্য এক নূতন চাল আরম্ভ করিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার বেলগাছিয়া, নারিকেলডাঙ্গা, বালিগঞ্জ (গরচা) প্রভৃতি নানা অঞ্চলের বস্তি-অধিবাসীদের উপর জমিদারের পক্ষ হইতে হঠাৎ শত শত নোটিশ জারি হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে তোমাদের বস্তি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আদালতে দরখাস্তের পর দরখাস্ত পড়িতেছে এবং এখনই অনেক বস্তীবাসীকে উচ্ছেদ করা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বস্তি-জগতে সর্ব্বত্র আতঙ্কের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে।

তিনতলা বিছানা

এমনি আতঙ্ক যে বেলগাছিয়া বস্তির বাসিন্দারা আমাদের অফিসে আসিয়া আমাদের প্রায় টানিয়াই বস্তিতে লইয়া গিয়াছিলেন—দুরবস্থার প্রচণ্ডতা দেখাইবার জন্য। ঐ বস্তিতে সত্তর, আশী হাজার লোক। প্রত্যেকেই দিনমজুর, রাজমিস্ত্রী বা চটকলের মজুর।

বস্তীর অর্থ যেখানে মানুষ বাস করে, কিন্তু অভিধানকারীরা নিশ্চয়ই বেলগাছিয়া বস্তিটী দেখেন নাই। দেখিলে অর্থ লিখিতেন—'যেখানে রাস্তায় আলো জ্বলে না, যে এলাকায় ড্রেন মানে রাস্তার ধারে বাড়ীর গায়ে পচা জল ও দুর্গন্ধ ময়লার নালা, যেখানে কোন ঘরে কোনদিন রৌদ্র ঢোকে নাই, যে এলাকায় মেয়েদের লজ্জাসম্ভ্রমকে জলাঞ্জলি দিয়া খোলা রাস্তায় স্নান করিতে হয়, যেখানে লোকে একই ঘরে দশজন করিয়া পশুর মত থাকে, আর যে কোন মহামারীর ধাক্কায় শতে শতে মরে।'

প্রায় অর্দ্ধেক ঘরেই দেখিলাম একটী খাটিয়ার উপর আর একটী খাটিয়া চাপান। উপরেরটিতে, মধ্যেরটীতে এবং তাহার নীচে মাটীতে—তিন স্তরে ঘরের অধিবাসীরা শোয়।

বস্তীটীর ঠিক মধ্যখানে এক বিরাট ডোবা, জল পচিয়া সবুজ রং ধরিয়াছে। পাড় হইতে যতদূর বোঝা যায় মশার ডিমে আচ্ছন্ন। পাশেই দেখিলাম একটী পায়খানা, তাহার ময়লা কত দিন পরিষ্কার হয় নাই কে জানে। তাহার ময়লা রাস্তা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই উপর দিয়া জল গড়াইয়া আসিয়া এই ডোবায় পড়িতেছে। আশে-পাশের এইরূপ ৭টী নর্দ্দমা বা জলস্রোত এই ডোবায় আসিয়া পড়িতেছে। ইহারই জলে বাড়ীর মেয়েরা কাপড় ধুইতেছে, বাসন 'পরিষ্কার' করিতেছে। সেই বাসনে ভাত খাইবে, সেই কাপড় ইহারা পরিবে।

ইহা বস্তীবাসীর স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব নয়, জমিদারের ব্যবস্থা। বেলগাছিয়া বস্তীর এই অংশে প্রায় ১০।২৫ হাজার লোক আছে। জমিদার তাহাদের জন্য ৭টী জলের কল করিয়া দিয়াছেন এবং গত ১২ বৎসর চেষ্টার ফলে কর্পোরেশন আর ১৫টী কলের ব্যবস্থা করিয়াছে।

মহামারীর স্মৃতিস্তম্ভ

এই ১৫টী কলও একবারে হয় নাই। এক একবার এক একটী মহামারীতে ২০০।২৫০ লোক মরিয়াছে, আর তখন লোক দেখানোর জন্য কর্পোরেশন হইতে ২।৩টী করিয়া কল বসানো হইয়াছে। এগুলি জলের কল নয়। বছরের পর বছর মহামারীর ধাক্কায় যত দুর্ভাগা মরিয়াছে তাহাদেরই স্মৃতিস্তম্ভ।

এই বারই বসন্তে সরকারী হিসাব অনুযায়ী বস্তীর এই অংশে ২৫৩ জন মারা গিয়াছে। দেখিলাম শেখ নবিবক্সের বৃদ্ধা মাতা এক মাসে চারিটী শিশু পৌত্রের শোকে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিলাম যে আজও প্রায় প্রত্যেকটি বাসায় একজন অন্ততঃ ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী।

দেখিয়া শুনিয়া মোটেই আশ্চর্য্য হইলাম না। শুধু মনে হইল যে এই সমস্ত জমির মালিক বিডন ষ্ট্রীটের দে পরিবার, যাঁহারা শুধু এই বস্তী হইতেই মাসে লক্ষাধিক টাকা পান না, এইরূপ আরও বস্তী, বাজার হইতে তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য ছাতুবাবু ও লাটুবাবু যাঁহারা দানবীর ও ধর্ম্মপরায়ণ হিসাবে কলিকাতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারীরা সামান্য ৮।৯ হাজার টাকা খরচ হইবে বলিয়া এই ডোবাটী বুজাইবার ব্যবস্থা করিতে নারাজ, তাহার জন্য শত শত লোকের জীবন গেলেও তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

শুনিলাম কয়েক বৎসর আগে ইঁহারা বস্তীর উন্নতি করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কাঠা প্রতি এক টাকা হইতে দুই টাকা খাজনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। প্রতি মাসে উপরি খাজনা ঠিকই আদায় করিতেছেন কিন্তু একটী কল, একটী বাতিও করিয়া দেন নাই।

উচ্ছেদের হিড়িক

এইরূপ ত' চলিতেছে চিরকাল, কিন্তু হঠাৎ তাহার উপর চাপিয়াছে উচ্ছেদের ব্যবস্থা। এই বস্তীটীতেই গত এক মাসে প্রায় ১০০ শত বাড়ীর উপর নোটীশ জারি করা হইয়াছে। সময় মত না উঠিলে প্রতিদিন এক টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার ভয় দেখান হইতেছে। যাহারা উঠে নাই তাহাদের উপর ডিক্রীর জন্য কেস রুজু হইয়াছে।

এই বস্তীর অধিকাংশ বাড়ীর মালিকই কাঠা প্রতি মাসিক দু টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া জমি নিয়া বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। জমীর উপর তাহাদের কোনই অধিকার নাই। বাড়ীর একটী বা দুইটী ঘরে নিজে থাকিয়া, অন্য ঘরগুলি ইহারা মাসে বার আনা হইতে দেড় টাকায় ভাড়া দেয়। করপোরেশনের ট্যাক্স দিয়া নিজেদের ভাড়া ছাড়া ইহাদের প্রায় কিছুই লাভ হয় না।

ইহারাই বস্তী গড়িয়াছিল

অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এখানে ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া আছে। বেলগাছিয়া বস্তীর মীনা হাজিংকে দেখিলাম বাড়ীর দরজায় বসিয়া ধুঁকিতেছে। বয়স প্রায় ৫০ হইবে। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিল—'বাবা, এই বাড়ীতে আমার বাপ, মা, সবাই মারা গেল। তখন আমি তোমাদের হাটুর সমান ছোট। তখন এখানে ছিল বন-জঙ্গল। আমি নিজে, আমার ভাইরা মাটী কেটে বন সাফ করে, গর্ত্ত বোঝাই করে জমি করেছি, বাড়ী করেছি। এই বাড়ীতে আমার ছেলেরা হোল, মারাও গেল। ভেবেছিলাম আমিও এখানেই মাটী পাব। কিন্তু কি জানি কি হোল জমিদার বাবুর, এখন এই বাড়ী আমার ছেড়ে যেতে হবে। কোথায় যাব? কি করেই বা যাব?' বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু পাশেই দত্তবাগান বস্তীর বুড়ী হালিমা অন্য ধাতুর গড়া। তাহার বয়স ৬০ এর উপর। মুখের সব চামড়া কুচকিয়া গিয়াছে, কানে ভাল শোনে না। বলিল, আমাকে তাড়াবে? কে? যখন বার আনা করে কাঠা জমির দর ছিল তখন আমি এসেছি। সারা রাত্রি জন্তুর ভয়ে দা হাতে করে কাটিয়েছি ঘরের মধ্যে। আমাকে তাড়াবে? আসুক না!'

এমনিতর ইতিহাস শেখ রহমানের, শেখ হবির!

ভাড়া দিয়াও পথে বসিবে

ইহাদের মধ্যে যাহারা ভাড়াটে তাহারা মাসে মাসে ভাড়া ঠিকই দিয়াছে। যাহারা নিজেরাই বাড়ীর মালিক তাহারাও জানে না কেন হঠাৎ এই উচ্ছেদের নোটিশ। খোঁজ নিয়া জানিলাম যে বেশীর ভাগ বাড়ীরই খাজনা কোন না কোন সময়ে কয়েকমাস হয়ত বাকী পড়িয়াছিল, তারপর মাস মাস ঠিক খাজনা ইহারা দিয়াছে। জমিদারও কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সেই পুরানো বাকীর অজুহাতে উচ্ছেদ করিতে সুরু করিয়াছে। বিনাদোষে হাজার হাজার ভাড়াটিয়া আজ রাস্তায় ফুটপাথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইতেছে। বাকীর অজুহাতে পুরুষানুক্রমিক ভিটা জমিদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

কলিকাতার অন্যান্য বস্তীতেও এই আতঙ্ক। বালিগঞ্জ গরচা বস্তীতে গিয়া দেখিলাম ২০টী বাড়ীর উপর উচ্ছেদের নোটীশ জারী হইয়াছে। এই বস্তির মালিক বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ। উহার অন্যতম কর্ত্তা ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ।

কাউন্সিলরের কীর্ত্তি

স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক শৈলেন বাবুর নিকট এই ব্যাপারে গেলে তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, 'আমি মশাই ব্যাঙ্কার, ব্যাঙ্ক ত' আর দানশালা নয়। বস্তীর লোকের কি হবে তা দেখতে গেলে আর ব্যাঙ্ক চলে না। এই রকম কত বস্তি আমাদের রয়েছে। আইন মত আমাদের অধিকার আছে, সেই মত আমরা যা করার করবই।'

এই শৈলেন বাবুই নয় মাস পূর্ব্বে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা লইয়া হিন্দুসভার প্রার্থী হিসাবে এই সব বস্তীর লোকের ভোটেই কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন!

আইনের সুবিধা লইয়া কিছুকাল আগে ঐ বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কেরই গরচা লেনস্থ আর একটী বস্তী "পাকায়" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ বস্তীর অধিবাসীরা উচ্ছন্নে গিয়াছে, সেখানে পাকা বাড়ী উঠাইয়া জমিদার ও বাড়ীওয়ালারা বোধহয় হাজার হাজার টাকা মুনাফা পিটিতেছে।

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত রোখো

আজ প্রায় সমস্ত বস্তীতেই জমিদার প্রভৃতির পক্ষ হইতে সেই উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র হঠাৎ পাইকারী ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ কেসির

(শেষাংশ ২য় পৃঃ দেখুন)

সম্পাদকীয়

টীকা সম্বন্ধে উদ্বেগ

তিনজন বিখ্যাত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বসন্ত-টীকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রায় দিয়াছেন যে ঐ ব্যবস্থায় কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটী আছে এবং সেই ত্রুটী সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের টীকা লইয়া জনসাধারণের কোনো কাজ হইবে না। সে অনুসারে গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছে যে ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা কর্পোরেশনের টীকা লইয়াছেন তাঁহাদিগকে আবার গভর্ণমেণ্টের টীকা লইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের টীকা বীজ ঠিক আছে বলিয়া নাকি বিশেষজ্ঞেরা রায় দিয়াছেন।

এদিকে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন, এ বছর যাহারা কর্পোরেশনের টীকা লইয়াছে তাহারা আবার নূতন করিয়া টীকা লইলে বিপদ ঘটিতে পারে।

ফলে কলিকাতাবাসীরা উভয় সংকটে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমরা কি করি? আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, যাঁহারা এবার এখনও টীকা লন নাই তাঁহারা এখনই গভর্ণমেণ্টের টীকা কিংবা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নৈনিতাল হইতে আনীত নূতন টীকা নিন। ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের টীকার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের ফল বাহির হইবে; আবার টীকা নিলে বিপদ আছে কিনা সে সম্বন্ধেও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত জানা যাইবে। যাঁহারা একবার কর্পোরেশনের টীকা লইয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারা আবার লইবেন কিনা সে সম্বন্ধে তখনই মনস্থির করিতে পারিবেন।

কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার বিবৃতিতে কয়েকটী কৈফিয়ৎ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বোধহয় এই সব কারণেই বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার সময় টীকা-বীজের তাপে গলদ বাহির হইয়াছে। তাহা হইলেও গলদ যে আছে তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এই সব গলদ দূর করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিবেন।

কলিকাতাবাসীও তাহাই চায়। মহামারীর মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে কর্পোরেশন ভাল কি গভর্ণমেণ্ট ভাল, বাঁচাইবার দায়িত্ব কাহার এই মল্লযুদ্ধে তাহাদের লাভ নাই। কর্পোরেশন কলিকাতাবাসীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, মহামারী হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা তাহারা কর্পোরেশনের কাছেই আশা করে। সেই ব্যবস্থায় যখন গলদ বাহির হইয়াছে তখন অবিলম্বে তাহা দূর করিতে হইবে, যাহারা ইহার জন্য দায়ী দৃঢ় হস্তে তাহাদের শাস্তি দিতে হইবে। নিজের জঞ্জাল সাফ করিয়া তাহার পর যদি কর্পোরেশন গভর্ণমেণ্টের কাছে ন্যায্য সাহায্য দাবী করে তাহাকে কলিকাতার প্রতিটী নাগরিক সমর্থন করিবে।

'পিপল্‌স ওয়ারের' বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

মিটাইয়া লইতে হক সাহেবের ব্যগ্রতা

ঢাকার নবাব লীগে ঠাঁই পান, আমি কেন পাইব না--হকের বিলাপ

কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরেজী সাপ্তাহিক পিপল্‌স ওয়ারের বিরুদ্ধে মিঃ ফজলুল হক কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে যে মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছেন—গত ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী তাহার শুনানী হয়। এ সম্বন্ধে দৈনিক কাগজের রিপোর্টে হক সাহেবের অনেক মূল্যবান স্বীকারোক্তি বাদ পড়িয়াছে। স্থানাভাবের জন্য আমরা মাত্র কয়েকটী অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সাহসী হক সাহেব

হক সাহেব তাঁহার নিজের উকীলের প্রশ্নের জবাবে বলেন, মুসলিম রাজনীতিতে আমার স্থান থাকিবে না ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জীবনে কখনো ভয় পাই নাই। (লীগের ভিতরে) আমার হইয়া সুপারিশ করিবার জন্য আমি স্যর নাজিমুদ্দিনকে ধরিয়াছিলাম—পিপল্‌স ওয়ারের এই কথা মিথ্যা। মিঃ জিন্না আমাকে ২ বছর কোনো পদপ্রত্যাশী না হইতে বলিয়াছেন ইহা সত্য নয়। আমার অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ায় আমি দুবছর পর্য্যন্ত মন্ত্রীত্ব বা অন্য কোনো পদ প্রত্যাহার করিতে রাজী হইয়াছিলাম ইহা সত্য নয়।

কমিউনিষ্ট উকীল মিঃ চারির জেরার জবাবে হক সাহেব বলেনঃ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব আমিই উপস্থিত করি, যদিও তখন পাকিস্তান শব্দটী ব্যবহার করা হয় নাই। **এই প্রস্তাব কোনো মতেই ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী নয়।**

তিনি আরও স্বীকার করেন যে জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক কোটী কোটী মুসলমান পাকিস্তান দাবী সমর্থন করেন।

তিনি বলেনঃ দেড় বছর আগেও মুসলিম লীগ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ছিল। তারপর ঐ সংগঠন প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। লীগ পাকিস্তান ধ্বনির উপর জোর দেয়, ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব বাড়িয়া যায়। সেজন্য আমি এখন উহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলি।

কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে তিনি লাহোরে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, লীগের লক্ষ্য এখনও তাহাই আছে মনে হয়। মুসলমানের পক্ষে লীগে যোগ দেওয়া লজ্জাজনক তাহা তিনি বলেন না। লীগকেই মুসলমানদের প্রতিভূস্থানীয় (অথরিটেটিভ) রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধরা হয়।

কিন্তু প্রকাশ্যে সাহস দেখান নাই

তিনি বলেনঃ এখন লীগ যেরূপ হইয়াছে তাহাতে লীগে ফিরিয়া যাওয়া অসম্মানজনক। তবে উহাকে সংস্কার করিবার জন্য আমি লীগে ফিরিয়া যাইতে চাই। লীগ ও আমার মধ্যে আপোষ করাইয়া দিবার জন্য গত দেড় বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের বলিয়াছিলাম আমি লীগে ফিরিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি আজও প্রস্তুত আছি। লীগ অধঃপাতে যাইতেছে ইহা আমি গম্ভীরভাবে ভাবিয়াছিলাম।

যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে লীগ সম্বন্ধে তাঁহার এই মনোভাব তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা, তখন তিনি বলেন, না আমি প্রকাশ্যে কিছু বলি নাই। লীগ স্বাধীনতার জন্য না লড়িয়া শুধু অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়িতেছে ইহা তিনি মনে করেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—না, তাহা তিনি মনে করেন না।

তিনি বলেন যে লীগ তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া যে আদেশ দিয়াছে তাহা বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার করিলে তিনি লীগে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন, লীগের শৃঙ্খলা মানিতে প্রস্তুত আছেন। এমন কি লীগের মামুলি সভ্যরূপে কাজ করাও তিনি অসম্মানজনক মনে করিবেন না। তবে লীগে যাওয়ার আগে কোনো সর্ত্ত মানিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত নন এবং চিরদিনই তিনি এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

এই কথার পর মিঃ চারি তাঁহাকে মনে করাইয়া দেন যে তিনি ১৯৪২-এর ১৩ই নভেম্বর মিঃ জিন্নাকে একটী চিঠি লেখেন এবং পরে তাঁহাদের মধ্যে পত্রালাপ চলিতে থাকে। ইহা হক সাহেব স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে এই পত্রাবলী পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লীগ-বিরোধিতার জন্য হক দুঃখিত

তখন মিঃ চারি তাঁহাকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ তারিখের "ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" কাগজ দেখাইয়া বলেনঃ মিঃ জিন্নার যে চিঠি এই কাগজে বাহির হইয়াছে উহাতে জিন্নার সহিত আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাত উল্লেখ করিয়া জিন্না সাহেব আপনাকে লিখিয়াছেনঃ

"আপনার আচরণ ও কর্ম্ম দ্বারা আপনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের শৃঙ্খলা গুরুতররূপে ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং লীগের মূল নীতি ও কর্ম্মধারার (পলিসি) বিরোধিতা করিয়াছিলেন—সে-জন্যই আমি আপনাকে লীগ হইতে বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। **এই কারণে আপনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাকে নিশ্চিত করিয়া জানাইয়াছেন যে আপনি অনুতপ্ত। আমি যে-কোন প্রস্তাব উচিত মনে করিব তাহা মানিয়া চলিতে আপনি ইচ্ছুক আছেন ইহাও আপনি আমাকে জানাইয়াছেন।**"

হক সাহেব কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলেন যে মিঃ জিন্নার এই বিবৃতিতে কিছু ভুল আছে। যাহা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য আমি দুঃখিত ছিলাম সত্য, কিন্তু অনুতপ্ত ছিলাম না।

বর্ত্তমানে লীগের প্রভাব বাড়িয়াছে

১লা ফেব্রুয়ারী পুনরায় মিঃ চারীর জেরার উত্তরে হক সাহেব স্বীকার করেন যে ১৯৩৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে মুসলমানদের উপর লীগের প্রভাব বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ জেলা বাখরগঞ্জেও লীগের প্রভাব বাড়িয়াছে। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর তিনি স্বীকার করেন যে বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ জেলায় লীগের সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার।

তিনি স্বীকার করেন যে তাঁহার নিজ দল "কৃষক-প্রজা পার্টির" অনেক সভ্য দল ত্যাগ করিয়া লীগে যোগ দিয়াছেন।

লীগের কাছে মিঃ হকের প্রার্থনা

চারিঃ মিঃ হক, আমি আপনাকে একটী বিবৃতি পড়িয়া শুনাইতেছি। উহাতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে আপনি বলিয়াছেনঃ

"আমি অতীতের কথা ভুলিতে প্রস্তুত আছি। আমি মন্ত্রী হইতে চাহি না, কোনো পদেরও প্রত্যাশী নহি। আমি শুধু (মুসলিম) সম্প্রদায়ের সেবা করিতে চাই। ঢাকার নবাবের জন্য যদি মুসলিম লীগের দ্বার অবারিত থাকিতে পারে তবে আমার বেলায়ই বা উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে কেন? আমি আশা করি লীগ আমার কথা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি ন্যায় বিচার করিবে। আমি মুসলিম লীগকে ছাড়ি নাই, লীগই আমাকে ছাড়িয়াছে।"

এই বিবৃতি কি আপনি করিয়াছিলেন?

হকঃ হ্যাঁ, আজও আমার মত এইরূপ।

প্রতিবাদ-প্রহসন

হক সাহেব অভিযোগে বলিয়াছেন যে পিপলস ওয়ারে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করিয়া পিপলস ওয়ারকে চিঠি লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাহা ছাপে নাই। এ সম্বন্ধে জেরা করিলে তিনি বলেনঃ চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে আমার কাছে কোন প্রমাণ নাই। বোধ হয় অভিযোগের ৭।৮ দিন আগে পিপলস ওয়ারের কলিকাতা অফিসে তিনি প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহারা উহা লইতে অস্বীকার করে।

তখন মিঃ চারি বলেন কলিকাতায় তো পিপলস ওয়ারের কোনো অফিস নাই, সুতরাং হক সাহেব প্রতিবাদ পাঠান নাই বলিয়াই ধরিতে হইবে। পিপল্‌স ওয়ারেই লেখা বাহির হইয়াছে যে কোনো প্রতিবাদ-পত্র আসে নাই, আসিলে ছাপানো হইত।

অমনি হক সাহেবের উকিল বলেন যে তাহা হইলে প্রতিবাদটী ছাপাইয়া মামলা মিটাইয়া লইলেই হয়। হক সাহেব বলেন, "হ্যাঁ, এই মামলা হইতে আমি কিছু পাইবার আশা করি না। কাগজটী লিখিয়াছিল, আমি স্যর নাজিমুদ্দীনের দ্বারস্থ হইয়াছি—শুধু এই কথাতেই আমার আপত্তি। এই খবর সত্য নয় বলিয়া অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে—এইটুকু লিখিয়া আমার প্রতিবাদ ছাপাইলেই আমি মামলা মিটাইয়া লইতে চাই।"

চারিঃ পিপলস ওয়ার দায়িত্বশীল সংবাদপত্র। মামলা করার আগে প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা ছাপাইতাম। কিন্তু নোটিস পর্য্যন্ত না দিয়া আমাদিগকে কলিকাতায় মামলায় টানিয়া আনিয়া ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টার পর হক সাহেবের আশা করা অন্যায় যে তাঁহার প্রতিবাদ ছাপিয়া আমরা তাঁহাকে মামলা উঠাইয়া লইতে দিব।

৯ই ফেব্রুয়ারী আবার শুনানী হইবে।

● ঘটনা ও রটনা ●

কোটীপতি সিংঘনিয়া
কয়লার চেয়েও কালো

কানপুর জে-কে কটন মিলের কোটীপতি মালিক স্যর পদমপৎ সিংঘনিয়া, তাঁর ভাই পি-এল-সিংঘনিয়া এবং আরও অনেক মহারথীর সম্প্রতি দায়রা বিচারে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হয়েছে। যখন কয়লার অভাবে চারিদিকে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেশের লোকের হাঁড়ি চড়ানোও দায় হয়ে উঠেছে তখন এই কোটীপতিদের সূতা কলে প্রায় ১৫ হাজার মণ কয়লা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ কয়লার কণ্ট্রোল দাম প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার লোভে এই কোটীপতি আসামীরা দেশবাসীকে এত বিপুল পরিমাণ কয়লা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। তাদের অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই সামান্য হয়েছে। যেখানে একখানা রেজর ব্লেড দু আনা বেশী দাম বিক্রী করায় গরীব দোকানদারের ছ' মাস পর্য্যন্ত জেল হয় সেখানে এই অর্থ-পিশাচদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেই উপযুক্ত হ'ত। কিন্তু চোর হ'লেও—কোটীপতি, তার ওপরে স্যর! আইনের মর্য্যাদা তারা রাখেনি বটে কিন্তু আইন তাদের মর্য্যাদা না রেখে পারে কি?

এই আসামীদের ব্যাপার কমিউনিষ্টদের পিপল্‌স ওয়ার কাগজই সকলের আগে দেশবাসীকে জানায়—গোড়ার দিকে অন্য সব কাগজই কোটীপতিদের এই কেলেঙ্কারির কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিল। পরে বিভিন্ন কাগজে শাস্তির খবর যা বার হয়েছে তার থেকেও কারও বুঝবার উপায় নেই যে আসামীরা কি রকম ঘৃণ্য অপরাধ করেছে। কাগজ-ওয়ালারাও কোটীপতিত্বের মর্য্যাদা রাখতে জানেন।

* * *

অবাঞ্ছনীয়

কিছু দিন আগে উপরোক্ত সিঙ্ঘনিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের বাসভূমি কানপুর শহরেই "নিখিল ভারত হিন্দী সাংবাদিক সম্মেলন" হয়েছিল। উদ্বোধন করলেন যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস থেকে কমিউনিষ্ট বর্জ্জন যজ্ঞের হোতা এই ট্যাণ্ডনজি। সাংবাদিক সম্মেলনে 'বর্জ্জন' আন্দোলনের খুব বেশী সুবিধা ছিল না তবুও অদম্য ট্যাণ্ডনজি বার বার ঘোষণা করলেন যে, যারা 'জাতীয়তা বিরোধী' তাদের সম্মেলন থেকে দূর করতে হবে। কমিউনিষ্টরাই যে জাতীয়তা বিরোধী তা পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিতে তিনি কসুর করেননি এবং তার ফলও হয়েছিল। দেখা গেল কানপুরের তীব্র কমিউনিষ্ট বিরোধী পত্রিকা "প্রতাপ", লাহোরের গোস্বামী গণেশ দত্তের হিন্দু সংগঠনী পত্রিকা "বিশ্ববন্ধু" (এঁদের নামে সম্প্রতি কাগজ চোরা কারবারের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে) ইত্যাদির প্রতিনিধিবর্গ ট্যাণ্ডনজীর বক্তৃতায় খুব উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়ছেন।

বোধহয় এরই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সিঙ্ঘনিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাসাদে ট্যাণ্ডনজি ও অন্যান্য সাংবাদিকদের প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করা হল। তখন সিঙ্ঘনিয়াদের নামে মামলা চলছে, এবং কমিউনিষ্টরা তাদের জুয়াচুরির কথা ফাঁস করে দিয়েছে বলে তারা রাগে জ্বলছে। সুতরাং কমিউনিষ্ট-বিরোধী ট্যাণ্ডনজি, প্রতাপ সম্পাদক প্রভৃতিকে আপ্যায়িত করতে তাদের আগ্রহ হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য্য শুধু এই যে এ রকম লোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেও ট্যাণ্ডনজিদের "জাতীয়তা" বজায় থাকে!

পরদিন সম্মেলনে প্রস্তাব আসে—"অবাঞ্ছনীয়" বিজ্ঞাপন যেন হিন্দী পত্রিকাগুলি না ছাপে। কমিউনিষ্টরা বলে যে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট প্রভৃতির জাতীয়তা-বিরোধী বিজ্ঞাপন অবাঞ্ছনীয় বলে ধরা উচিত। সেই হিসাবে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত হয়—"জাতীয়তা-বিরোধী ও অশ্লীল" বিজ্ঞাপন অবাঞ্ছনীয়। প্রতাপ, বিশ্ববন্ধু প্রভৃতি যে-সব কাগজ এত দিন 'জাতীয়তা-বিরোধীদের' মুণ্ডপাত করছিলেন, দেখা গেল তাঁরা সবাই এই সংশোধনের বিপক্ষে ভোট দিলেন—অর্থাৎ তাঁদের মতে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের মত জাতীয়তা-বিরোধী বিজ্ঞাপন কিংবা অশ্লীল বিজ্ঞাপন অবাঞ্ছনীয় নয়! যে কমিউনিষ্টরা এই সব অসুবিধাজনক কথা তোলে শুধু তারাই অবাঞ্ছনীয়।

* * *

একজন পাঠক চিঠি লিখেছেন যে "জনযুদ্ধে" অনেকগুলি লেখাই বিনা নামে বার হয়। সেগুলো নিশ্চয়ই সম্পাদকীয়—তাই তিনি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেছেন, বঙ্কিম বাবু একা এত লেখেন? এমন কি ঘটনা-রটনাও?

না, ঘটনা-রটনা বঙ্কিম বাবু লেখেন না। লিখি আমি, কিন্তু নাম বল্লে হয়তো চিনে ফেলবেন, তা আমি চাই না। তবে আপনাদের খাতিরে আমার নতুন নামকরণ করলাম (অবশ্য পরে বদলাতেও পারি)—দেশাভিমানী।

বস্তী হইতে উচ্ছেদের নোটিশ

(১ম পৃঃ পর)

বিশেষ কমিটি পাছে বস্তীর উন্নতির জন্য জমিদারের কিছু অর্থ খরচ করাইতে বাধ্য করে, বোধ হয় সেই জন্যই কমিটির রায় বাহির হওয়ার আগেই জমিদারেরা বস্তী হইতে প্রজা উচ্ছেদ করিয়া সেগুলিকে বস্তী আইনের বাহিরে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর যুদ্ধের বাজারে অনেক চোরা-কারবারীর হাতেই প্রচুর টাকা জমিয়াছে। খালি বস্তী পাইলে তাঁহারা এখনই কিনিয়া লন, ভবিষ্যতে সেখানে পাকা বাড়ীর লাভজনক ব্যবসা করা চলিবে। আমরা শুনিলাম বেলগাছিয়া বস্তীতে উচ্ছেদ নোটিশগুলির প্রধান কারণ এই যে ঐখানে ৫॥০ বিঘা জমি দেড় লক্ষ টাকায় ভবানীপুরের এক ব্যবসাদারের কাছে বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

একদিকে আমলাতন্ত্রের গড়িমসি এবং অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্র—দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া কলিকাতার বস্তিবাসীরা আজ গৃহহারা হইতে চলিয়াছে। বস্তির উন্নতি দূরে থাক, বস্তি ছাড়িয়া ফুটপাথেই তাহাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে—কারণ জনাকীর্ণ কলিকাতায় আজকালকার দিনে নূতন আশ্রয়স্থল সংগ্রহ করা অসম্ভব। বস্তী অধিবাসীদের অধিকাংশই গরীব মুসলমান, তাহারাই মুসলিম লীগের বনিয়াদ। তবুও লীগমন্ত্রীমণ্ডলী এই কঠোর সমস্যার কোনো ব্যবস্থা করিতেছে না। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনেও বস্তি সম্বন্ধে কোনো রক্ষার ব্যবস্থা নাই। এখনই অর্ডিনান্স জারি করিয়া সমস্ত উচ্ছেদের নোটিশ বাতিল করিতে হইবে এবং বস্তীবাসীদের প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে আইন করিতে হইবে। নহিলে গবর্ণমেন্টের বস্তী পরিকল্পনায় বস্তির কোনো উন্নতি হইবে না, শুধু সর্ব্বনাশই ডাকিয়া আনিবে।

—রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৫-এর স্বাধীনতা দিবস

জাতীয়পতাকার নীচে সবাই একসাথে

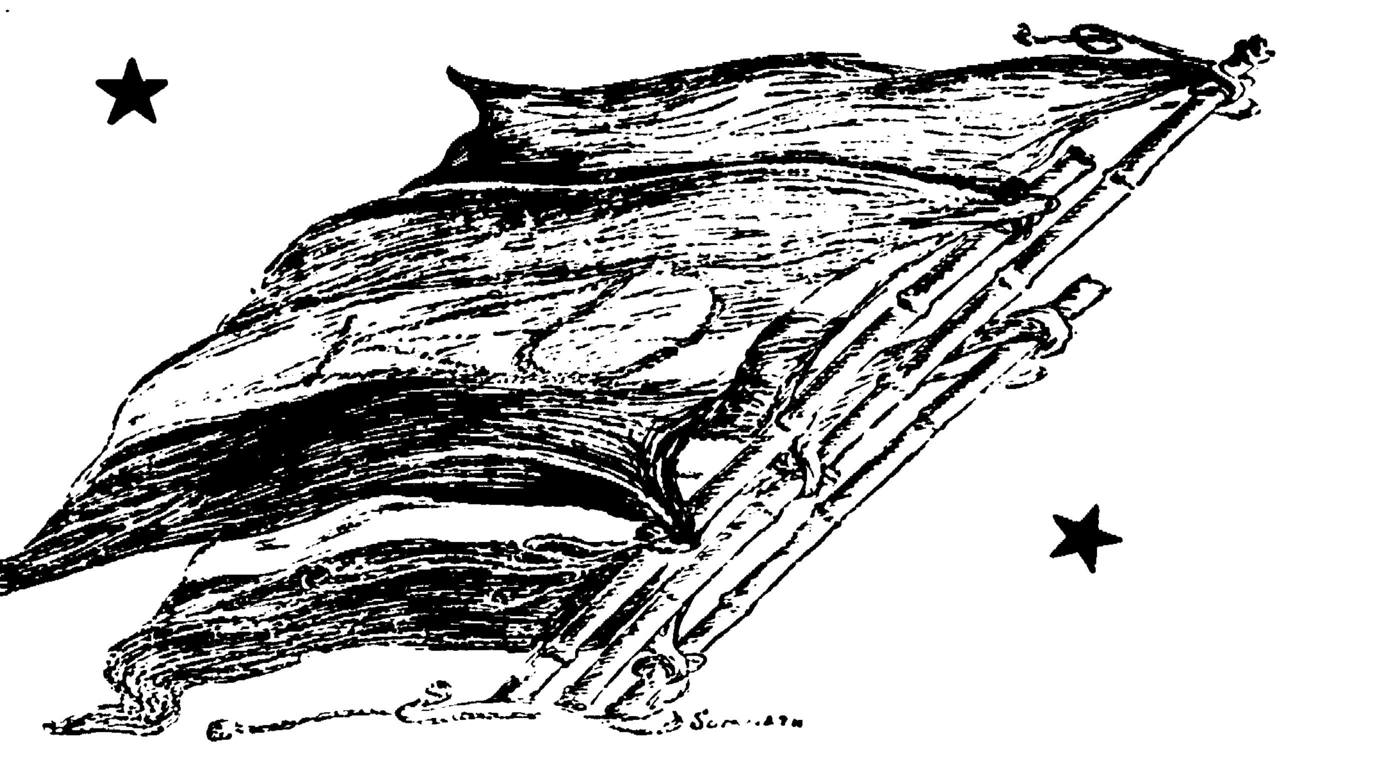

বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবার মহা উৎসাহের মধ্যে 'স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালিত হইয়াছে। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভিতর যখন বিভেদ ও কলহের সুর বিদ্যমান, যখন একদল কংগ্রেসকর্ম্মী বিভেদের পথ বাছিয়া নিয়া কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীদের সাথে কোন সংশ্রব রাখিতেই নারাজ, তখন এবারকার স্বাধীনতা দিবসে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ঐক্যবদ্ধ অনুষ্ঠান সকলের প্রাণেই উৎসাহ জোগাইবে। আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে 'স্বাধীনতা দিবসের' যে সব রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহা হইতে ইহাই ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক বিরাট অংশই অনৈক্য ও বিভেদের পঙ্কিলতার বাহিরে। তাঁহাদের বলিষ্ঠ দেশপ্রেমই এবৎসরের স্বাধীনতা দিবসকে আরও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারী। ক্লান্ত, অবসাদ গ্রস্ত, মহামারী বিধ্বস্ত কলিকাতাবাসীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেশপ্রেমিক প্রভাতফেরীর দল গান ধরিল—"শহীদের মৃতপ্রাণ শোন্ করে আহ্বান, করাঘাত হানে তবে দ্বা—রে।"

একটি নয়, দুইটি নয়, প্রায় প্রত্যেক মহল্লায় প্রভাত ফেরীর মুখে স্বধীনতা দিবসের ডাক শুনা গেল। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট এবং স্থানীয় লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি সকল সংগঠনের কর্ম্মীরাই একযোগে এক কণ্ঠে কলিকাতার রাজপথ মুখর করিয়া তুলিল। অনেককেই বলাবলি করিতে শুনা গেল—গত কয়েক বছরে কোন স্বাধীনতা দিবসেই এত বেশী প্রভাত ফেরীর দল বাহির হয় নাই।

তারপর পতাকা উত্তোলন উৎসব। রাজপথের দুই পাশে জাতীয় পতাকার সমারোহ। ছোট, বড় অসংখ্য বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উঠিল। চেতলার একটি মুদী দোকানে পতাকা উত্তোলন উৎসব দেখিয়া ট্রাম হইতে নামিলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন জাতীয় পতাকা তুলিলেন? শীর্ণকায় দোকানদার গৌরবোজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন—দেশের অনেক বড় বড় লোক এই পতাকাকে সম্মান করেন, এরজন্য অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। আমরা অনেক অপরাধে অপরাধী। পতাকা তুলে আজ দোকানকে পবিত্র করিলাম।—মানুষের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই আজ প্রকাশ হইল।

বালিগঞ্জ ডোভার লেনে ট্রাম মজুরদের মেসে পতাকা উত্তোলন করিলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত নলিনাক্ষ্য সান্যাল। পতাকা অভিবাদন প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—কংগ্রেস ক্রমশঃ প্রত্যেকটি শ্রেণীর দাবীকে গ্রহণ করিতেছে। করাচী কংগ্রেসে মৌলিক দাবী গৃহীত হইয়াছিল, কংগ্রেস নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে অনেক দাবীর কথা আরও পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে; এবং সম্প্রতি গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছেন—'কংগ্রেস চায় মজুর-কৃষক রাজ'।

উত্তর কলিকাতায় নিবেদিতা লেনে নবীন সঙ্ঘে পতাকা উত্তোলন করিলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জগমোহন বসু। ছোট্ট একটি বক্তৃতায় তিনি বলিলেন—পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যাহাতে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অফিসে পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বলিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে কেবল মাত্র কংগ্রেস ও লীগই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেও একসাথে লড়িতে হইবে।

স্কুল ও কলেজে পতাকা উত্তোলন ও সংকল্পবাক্য গ্রহণে আজ আর কোন দলাদলি নাই। সব মতবাদের ছাত্রই পাশাপাশি দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞা লইল। দক্ষিণ কলিকাতায় কালীধন একাডেমীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের বলিলেন—স্বাধীনতা না হইলে আমাদের শিক্ষার উন্নতি নাই; স্বাধীনতার জন্য নিজেদের তৈরী কর।

বাসের শ্রমিকরা পতাকা উড়াইল নিজেদের বাসে বাসে। ট্রাম, লোহা কারখানা, গ্যাস, চা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মজুর বুকে পতাকা ধারণ করিয়া কাজে গেল।

বন্দীদের পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহ। ট্রামে, বাসে, দোকানে দোকানে ছাত্র, শ্রমিক-ছেলে ও মেয়ে শত শত ভলাণ্টিয়ার নাগরিকদের নিকট আবেদন জানাইল—"অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ এবং শত শত কংগ্রেসকর্ম্মী আজও কারাগারে। তাহাদের দুঃস্থ পরিবারের ভার লউন।" এই আবেদনে অপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া গেল।

পার্কে পার্কে সূত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান। মনে পড়িতেছিল বাংলার মরণোন্মুখ তাঁতিদের কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকার যে তাঁতিকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, আজ তাহারা ধ্বংস হইতেছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহাদের বাঁচাবার দৃঢ় সঙ্কল্প।

অপরাহ্নে জনসভা। কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাবে, লাইব্রেরীতে, বস্তি ও মহল্লায় প্রায় ২৫টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পৌরোহিত্য করেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং বক্তৃতা দেন বাংলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ভবানী সেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগেএক মহিলা সভায় বৃদ্ধা কংগ্রেসনেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সকলকে একযোগে কাজ করিতে আহ্বান জানাইলেন।

এক সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের সফল অনুষ্ঠান। কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি ২০শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতার পার্কে পার্কে বিরাট বিরাট জনসভা করিয়া নাগরিকদের বলে—"দুঃস্থ বাংলাকে বাঁচাতে হবে, দেশ নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হবে, এ সকল কাজ কংগ্রেস ও লীগকে একযোগে করতে হবে।" শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বাংলার দেশপ্রেমিকদের সম্মুখে যে পথ যে দায়িত্বের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন বাংলার দেশকর্ম্মীরা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এবারকার স্বাধীনতা দিবসের ঐক্য অনুষ্ঠান সেই শুভ সম্ভাবনাই বহন করিয়া আনিয়াছে।

* * *

দিনাজপুরের স্বাধীনতা দিবস সার্থক হইয়াছে। স্বাধীনতার দৃপ্ত পতাকা সব বিভেদ, সব অনৈক্য ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে। প্রভাত ফেরীতে দেখা গেল কমিউনিষ্ট, অ-কমিউনিষ্ট সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীই একসাথে চলিয়াছেন। পতাকা হাতে পুরোভাগে ছিলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত প্রভাতসেন ও লোকেন সেন। তাঁহাদের পাশেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা কালিপদ ধর।

ময়মনসিংহ অবরুদ্ধ বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বাসভূমি। এবার স্বাধীনতা দিবসকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন এ জেলার দেশসেবকরা। বিভেদের কোন কালিমা নাই, দেশভক্তির সুমহান আদর্শকে ম্লান হইতে দেন নাই। কংগ্রেস ভক্ত সকলের মিলিত আয়োজনই এবারকার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

মুর্শিদাবাদেও স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসকর্ম্মীরা ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান। জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলন উৎসবে যোগ দিয়াছেন জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এবং মৌলবী রেজাউল করিম। বৈকালে জনসভাতে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে সকল মতবাদের লোকই মিলিত হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসের অপরিহার্য্য অঙ্গ জাতীয় পতাকা বিক্রি। **চাঁটগার** রাস্তায় রাস্তায় ইহার সমারোহ চলিতেছিল। একটি সাবানের দোকানের মালিকের কাছে জাতীয় পতাকা কিনিবার অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হইতেছিল না। মালিক বলিতেছিলেন—কংগ্রেসকে সম্মান করি, কিন্তু জাতীয় পতাকা উড়াইলে আমাদের দোকানের উপর পুলিশের অশুভ দৃষ্টি পড়িবে। এমন সময়ে একজন লীগভক্ত আলোচনা শুনিয়া উক্ত দোকান-দারকে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—কেন আপনি কংগ্রেস পতাকা কিনিবেন না? পাকিস্তান দিবসে আমরা প্রত্যেক মুসলমান লীগ পতাকা তুলিয়াছি, লীগকে শক্তিশালী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। আর আপনি আজ কংগ্রেসকে সাহায্য করিবেন না, স্বাধীনতা দিবস পালন করিবেন না? ভদ্রলোক লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন, পরে ১৲ টাকা দিয়া জাতীয় পতাকা কিনিলেন। কংগ্রেসের মর্য্যাদাকে অকুণ্ঠভাবে এইরূপ উঁচুতে তুলিয়া ধরাতে দেশভক্ত এই লীগকর্ম্মির স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহাছড়া, **২৪ পরগণা** ও **হাওড়া** প্রভৃতি জেলায়ও খুব ব্যাপকভাবেই স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার অনুষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় মজুর ও কিষাণরা যোগ দেয়। হাওড়ার বালিতে সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে বড় বড় পোষ্টার ও জাতীয় পতাকা শোভিত ছোট ছোট তোরণ শোভা পাইতেছিল। **কুষ্টিয়ার** জনসভায় মুসলিম লীগপন্থী বহু মুসলমান সভায় যোগ দিয়া কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি সৌভ্রাত্র্য জানাইয়াছেন। **বরিশালের** গৌরনদী ও মুলাদী প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ ঐক্যবদ্ধ অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। **নোয়াখালীর** চৌমুহনীতে ও শহরে, **ফরিদপুরের** তুলাসারে, **দার্জ্জিলিঙ-এর** কালিম্পংএ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসকর্ম্মীরা ঐক্যের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

* * *

কোনো কোনো স্থান হইতে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে হিন্দুসভাপন্থীদের বিরোধিতার সংবাদ আসিয়াছে। **বরিশালের** কিছু কিছু লোক হিন্দুমহাসভার সভ্য বলিয়া-জাতীয় পতাকা কিনিতেও অস্বীকার করিয়াছেন। **বগুড়ায়** স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রসভায় হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মিলিত অভিযানকে ব্যর্থ করিবার জন্য হিন্দু ছাত্রফেডারেশনের কয়েকজন কর্ম্মী চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসে হুমকী ও গ্রেপ্তার

এবার স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছিল **পাঞ্জাব, মাদ্রাজ** ও **সিন্ধু** প্রদেশে। স্বাধীনতা দিবসের আগেই এই সব প্রদেশের জেলায় জেলায় **সরকারী** বাধা নিষেধ জারী করা হয়। ইহা ছাড়া **জব্বলপুর** প্রভৃতি স্থানেও নিষেধাজ্ঞার তোড়জোড় পড়িয়া যায়। স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের নানা স্থানে গ্রেপ্তার প্রভৃতিও চলিয়াছিল। এই সম্পর্কে **নয়াদিল্লীতে** ১০জন, **আমেদাবাদে** ৫জন, **করাচীতে** ৫জন, **লক্ষ্ণৌতে** ৭ জন গ্রেপ্তার হন।

বিলাত-আমেরিকায়ও স্বাধীনতা দিবস

★ জনগণকর্ত্তৃক কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী ★

ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু সভা সমিতি হইয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে লণ্ডন, বার্মিংহাম গ্লাসগো, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সাউথওয়েলস নিউ ক্যাসেল এবং অন্যান্য শহরে এই সম্পর্কে যতগুলি সভা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গুলিতেই প্রায় সমস্ত মতের ও দলের লোক উপস্থিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সমগ্র বৃটেনে যে দারুণ আন্দোলন চলিতেছে তাহা এই সব সভার প্রস্তাব-গুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

'স্বাধীনতা দিবসে' বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ইণ্ডিয়া লীগের নিকট বাণী পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে পার্লামেণ্টের সদস্য **ডি এন প্রিট, রাইট অনারেবল পেথিক লরেন্স,** অধ্যাপক **হ্যারল্ড ল্যাসকি** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিভিল সার্ভিস ক্লেরিকাল এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী জানান—ইণ্ডিয়া লীগের কাজের সহিত এই এসোসিয়েশনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ; উহার অনুসৃত নীতি এই এসোসিয়েশন সমর্থন করিয়াছে। আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া আমি আশা ও বিশ্বাস করি।

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে **হ্যারি পলিট ও পাম দত্ত** একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন: "ভারতের স্বাধীনতা দিবস সমস্ত পৃথিবীর কাছে আর একবার ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে, এই মুক্তি-যুদ্ধের লক্ষ্য যাহা, তাহা ভারতের ক্ষেত্রেও কাজে দেখান হউক।…

বিবৃতিতে আরো দাবী জানাইয়াছেন যে, নেহরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়া শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধান করা হউক।

লর্ড **ষ্ট্রাবোল্গি** একটী বিবৃতিতে বলেন: ভারতের স্বাধীনতা দিবসে আমি ভারতবাসীর প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি।…

ভারতের স্বাধীনতা কোটি কোটি নিপীড়িতের মুক্তি আনিবে

ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে **লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে** স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে। এই সভায় নিগ্রো নেতা ও নাইগেরিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি **মিঃ ব্যাঙ্কোলি** ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা পৃথিবী ব্যাপী কোটি কোটি নিপীড়িত নিগ্রোর মুক্তির সাহায্য করিবে।

সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে সভার পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও বন্দী কংগ্রেস নেতাদের নিকট এক বাণী পাঠান হইবে।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েমেনের **মিঃ জন হিণ্ড** (পার্লামেণ্ট সদস্য) প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন।

এই সভায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা **মিঃ ডাঙ্গে** বলেন—শাসকগণ পছন্দ করুন বা না করুন ভারতের অধিবাসীরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চলিয়াছে।

জোহানেসবার্গে স্বাধীনতা দিবস পালন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে আহূত এক সভায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অবিলম্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানানো হয়।

বিশ্বশান্তির জন্যই ভারতের স্বাধীনতা

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে **ওয়াসিংটনে** (আমেরিকায়) এক বিরাট জনসভায়

(শেষাংশ ৫ম পৃঃ দেখুন)

রংপুরের মুসলিম সমাজের একাংশ

৩০০ বালক ক্রীতদাসে পরিণত

রোদ আলো ঢোকে না, বাতাস বয় না, তামাকের ঝাঁঝে বাতাস ভারি, এমন এক অন্ধকূপে সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া বসিয়া বিড়ি বাঁধে এক হাজার মানুষ—শক্ত সমর্থ জোয়ানও আছে, আবার সবে পাঁচ-ছয়ে পড়িয়াছে এমন কচি বাচ্চারও অমিল নাই। শোথে-কোলা ঘায়ে ভরতি তাদের মুখ, এই বয়সেই বাতে ধরিয়াছে, চোখের তেজও আসিতেছে কমিয়া। বেলা বাড়িলে ওদের জন্য ভারে করিয়া ভাত আসে, মাঝে মাঝে তার পিছু পিছু আসে কচিবয়সী ছেলের দল—তারাও কাজ চায় এখানে। মাঘের কনকনে ঠাণ্ডা রাত—সারি সারি ছেড়া-চট-ঢাকা খুপরি, কেউ রান্না করে, কেউ বা মালিকের কাছে সারাদিনের কাজের হিসাব দেয়, কতক লোক তখনও বসিয়া বসিয়া টিমটিমে আলোয় বিড়ি বাঁধে, আর কোথাও ছেলে বুড়ো গায়ে-গায়ে জড়াইয়া শীতের রাত কাটায়।

রংপুর শহরেরই এক কোণে এই ভাবে সাতশো জোয়ান ও তিনশো শিশুর জীবন কাটিতেছে। এরা সকলেই মুসলমান।

তিস্তা নদীর ধারে হারাগাছ গ্রাম—সে-ওদেরই গ্রাম। ওরা সেখানে অফুরন্ত তামাক ফলাইত, খোদ বর্ম্মার ব্যাপারীদের সঙ্গে কারবার করিত। তারই দৌলতে আবার নৌকা-তৈরির ব্যবসা, বিড়ির কারখানা, শাখার কারিগরি। মুসলমানের গ্রাম—চোখ ভোলানো জুম্মা, একটি হাই মাদ্রাসাও তারা গড়িয়াছিল, আর খেলাধূলায় তাদের গ্রামের যুবকরা ছিল এ তল্লাটে দিগ্বিজয়ী। স্বাধীন, খাটিয়ে জীবন ছিল। আজ তাদের শহরের ব্যবসায়ীর লোভের গারদে এই গোলামি!

বর্ম্মা যখন জাপানাদের দখলে গেলো, তখন হইতেই ওদের কপাল পুড়িয়াছে। মাল আমদানি রপ্তানির গোলমাল, কাজ-কারবার বন্ধ, অভাবের তাড়নায় কেউ কেউ গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিল, রংপুরের বাসন্তী বিড়ি কারখানায় দিন-মজুরী লইল। তার উপরে আবার কেরোসিনের অমিল—রাতে কাজ করা যায় না। শহরের ছোট-বড় পুঁজিদাররা গ্রামে ঢুকিল, সস্তা মজুরি দিয়া কারখানা গড়িল, রাজবালী আর মণি সরকারের বনেদী ব্যবসা, অনেক টাকা—এই সব সুস্থ স্বাধীন মুসলমানদের গোলামির মেহনতে তারা আজ ফাঁপিয়া উঠিতেছে। যেটুকু স্বাধীনতা আর জোর বাকি ছিল আকালের ধাক্কায় মহামারীর ঝাপটায় তাও এরা খোয়াইয়াছে। মা-বোনের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য এরা একদিন গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিল, আজ তাদের কথা এদের মনেও পড়ে না, সিনেমা দেখিয়া হোটেলে খাইয়া টাকা ওড়ায়, প্রায়ই টাকার অকুলান হয় তখন কাজ বন্ধক দিয়া হাওলাত করে, বলে, "শহরের জীবন অনেক ভালো!"

রংপুর জেলা মুসলমান-প্রধান জেলা, হারাগাছ বর্ধিষ্ণু মুসলমান অঞ্চল। তাদেরই মতো সাধারণ মুসলমান মানুষের মেহনতে কারিগরিতে শিখিবার আগ্রহে মুসলমান সমাজের যা কিছু বড়াই করিবার গড়িয়া ওঠে। আজ এমনি এক মুসলমান জনপদে আত্মসম্মানী পরিশ্রমী মানুষের দল এমনি করিয়া প্রাণে মরিতেছে মনে মরিতেছে। মুসলমান সমাজের প্রধানদের কি এদের জন্য কিছুই করিবার নাই? সেই কথাই জেলা মুসলিম লীগের সভাপতিকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই এদের জন্য আমি যথাসাধ্য করবো।" এই আশ্বাসের কথা শুনিলেই ওরা আবার জোর পায়, আবার নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রতিজ্ঞা জাগে। মুসলিম লীগের নেতা মৌঃ বদিরউদ্দিন আহম্মদ আর কমিউনিষ্ট কর্ম্মী মুকসুদ মিঞা যখন ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাদের ডাকিয়া ভালবাসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, তাদের কষ্টের অবসানের জন্য সব-দলের রিলিফ কমিটি সাহায্য করিবে বলিলেন, তখন চোখে-মুখে যে-আলো জ্বলিয়া উঠিল সে তাদের পুরনো গৌরবের জীবনের স্মৃতি আর আপন জোরে আবার তেমন করিয়া ঘর বাঁধিবার পণ।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের সুসভ্য দেশেও মেথরের ঘরে জন্মিবার 'অপরাধে' কিরূপ সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ফরিদপুর শহরের এক যুবকের করুণ কাহিনীটি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যুবকটির নাম সমরচাঁদ বিশ্বাস। পিতা মিউনিসিপালিটির ঝাড়ুদার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান যুবক, রাজেন্দ্র কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু "মেথরের ছেলে" এই পরিচয়ই তাহার জীবনের অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত ২১শে ডিসেম্বর সমরচাঁদ জজ কোর্টের সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় চা পান করিতে যায়। চা তাহাকে দেওয়া হয় না, ভাগ্যে জুটিল অপমান। "মেথরের ছেলেকে চা দেওয়ার মত ভাঙ্গা কাপ সেখানে নাই।" এই অন্যায়ের প্রতিবাদে জিলা জজ সাহেবের কাছে আবেদন করা হয়। ভদ্রলোক বাঙ্গালী, সহানুভূতি দেখাইয়া ঐ রেস্তোরাঁয় একটি পৃথক আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু মানুষের যোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদা লইয়া রেস্তোরায় প্রবেশের অধিকার না পাওয়াতে সমরচাঁদ ঐ রেস্তোরাঁয় আর যায় না।

এইরূপ লাঞ্ছনা বাল্যজীবন হইতেই সমরচাঁদের সাক্ষী। মেথরের বস্তীতে রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া শহরের বিভিন্ন হাই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষায়তনের দ্বার "মেথরের ছেলের" জন্য ছিল রুদ্ধ। এমনিভাবে পাঠ্যজীবনের তিনটি মূল্যবান বৎসর তাহার নষ্ট হয়। অবশেষে সাহায্য আসে, কিন্তু সমরচাঁদের দেশবাসীর নিকট হইতে নয়, তখনকার ইংরাজ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হিউজেস-এর কাছ হইতে। তাহার কাছ হইতে সমরচাঁদ জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পায়।

বিদেশী হাকিম সমরচাঁদকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল বটে কিন্তু তাহাকে সকলের সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। স্কুলে সমরচাঁদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা হইল। সহপাঠীদের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া

সমরচাঁদ কষ্টক্লেশে ওঠে। এই সময় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নিকট হইতে এক বছরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা হারে বৃত্তি পাইবার সৌভাগ্য তাহার হয়। কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সাহায্যও মিঃ হিউজেস-এর সাহায্যের মত সমরচাঁদকে কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি মাত্র দিল, তাহার কিশোর জীবনকে কোন মর্য্যাদা দিল না।

কলেজে ভর্ত্তি হইয়া সমরচাঁদ গান্ধীজির "হরিজন সেবক সঙ্ঘ" হইতে মাসিক ১২৲ টাকা হারে বৃত্তি পায়। কিন্তু কলেজের বাইরে সামাজিক লাঞ্ছনা এখনও তাহার সমান ভাবেই চলিতেছে। সেলুন বা রেস্তোরাঁয় এখনও তাহার প্রবেশাধিকার নাই। দশজনের পাশে দাঁড়াবার অধিকারও তাহার নাই। একমাত্র তাহার কতিপয় ছাত্রবন্ধুদের কাছ হইতেই মানুষের সম্মান সে পায়।

খিলাফৎ আন্দোলনের কেন্দ্র হরিয়ারকুটি

হারাগাছ-এরই মতো রংপুর জেলায় আর একটি মুসলমান জনপদ—হারিয়ারকুটি ইউনিয়ন। আজ যারা হারিয়ারকুটির মানুষ, তাদের বোধহয় মনেই নাই একদিন তারাও খিলাফৎ আন্দোলনে একজোটে পরদেশী জুলুমের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বোধ হয় মনেই পড়ে না নিজেরা মক্তব গড়িয়াছিল। সে-মক্তবের শিক্ষকরা আজ উপবাসী, পড়ুয়ারা কতক মরিয়াছে, কতক ম্যালেরিয়ায় ধুকিতেছে, কতক পাঁচড়ায় জ্বলিতেছে, মাঘের ঠাণ্ডায় খোলা গায়ে কাঁপিতেছে।

গত তেতাল্লিশ সালের আকালে কলেরা বসন্তে এখানে মরিয়াছে দুই হাজার মানুষ। এক গ্রামে এক চাষী বলিল: "আকালের আগে আমাদের পাড়ায় ছিল ৩২ ঘর, এখন ১০ ঘর ফেরার, কলেরায় বসন্তে মরেছে ৬৯ জন, এ বছরে নতুন শিশু জন্মেছে মাত্র ১টি।" সেই আকালের কাল এখনো শেষ হয় নাই, সেই মহামারীর দাপট এখনো থামে নাই।

সরকারী ফসল-জরিপ অফিসের হিসাবে এ-সালে এই অঞ্চলে ধান উঠিয়াছে মাথা-পিছু ৬৷ সাড়ে ছয় মণ, তার চারভাগের এক ভাগ ফুরাইবে মাঘ মাসের শেষে, চৈত্রের শেষে ফুরাইবে অর্দ্ধেকটা। গত সালে যেখানে ফলিয়াছিল ২০ আনা এবার সেখানে ফলিবে ১০ আনা।

কিন্তু তাহাতে জমিদার সুরেশ বাবুর মণীন্দ্র বাবুর কি? খাজনা তাঁদের চাই-ই, এমন কি হাল খাজনাও, সে চালের বিনিময়েই হোক, গরীব চাষীরা গরু-বলদ বেচিয়াই হোক; তাঁদের সুদের হার টাকায় পাঁচ আনা ছ আনা।

হালে এইখানে বি, এম, আর, সি, সি একটী চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিয়াছে, দৈনিক এখানে ২০০-৩০০ রোগী আসে, নানান রোগ: ম্যালেরিয়া, পাঁচড়া আমাশয়, শোথ। গ্রামের যারা গত বছরের ধান মজুতদার এবারে তারা পাকিয়া হইয়াছে চোরা-কারবারী। তারাই আবার পিছন দুয়ার দিয়া ফুড কমিটিতে গিয়া আসর জমাইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড দখল করিয়াছে। বি, এম, আর, সি, সি, কেন্দ্র বসাতে তাদের চোখে ঘুম নাই—যেমন করিয়াই হোক একে উঠাইতে হইবে। তারা নিজেরা মুসলমান, যে সব গরীব সেখানে রোগের ওষুধ পায় তারাও তাদেরই গ্রামের মুসলমান ভাই-বোন কিন্তু চোরাকারবারের কাছে তারা আপন মনুষ্যত্বও বেচিয়াছে। তারা সুরেশবাবু প্রমুখ জমিদারদের পাকড়াও করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, মিলিটারী মেডিক্যাল অফিসার ইত্যাদির কাছে দরবার করিল—আমাদের গ্রামে চিকিৎসাকেন্দ্র দরকার নেই। কিন্তু তবুও সেই কেন্দ্র চলিতে থাকে।

হরিয়াকুটিতে সরকারী কোন রিলিফ নাই। কর্জ্জা পাওয়া যায় না, বন্ধক লাগে। আছেরউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হইতেই সে কাঁদিয়া দিল। "এতদিন তোরা আসিস নাই কেন? বদরগঞ্জে জমি রেজেষ্ট্রী অফিসে জমি কবলা দিয়ে বাড়ী ফিরে দেখি ঘরে কলেরা। একে একে প্রায় সবাই মারা যায়, ছেলেটাকে ২৷০ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে নিজে মজুর হয়েছি। এতদিন তোরা আসিস নি কেন? তোরা এলে তো এত দুঃখ পেতাম না।"

—আবুল মকসেদ

★ কবি আশুতোষ চৌধুরী

জনযুদ্ধের 'স্বাধীনতা দিবস' সংখ্যায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺আশুতোষ চৌধুরীর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে আশুবাবুর জীবনী সম্বন্ধে কিছু ভুল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল যে ১৯৪২ সালে আশুবাবুর মৃত্যু হয়। তিনি ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের বহু লুপ্ত পুঁথির আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন।

চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত শুভাশীষ চৌধুরী আমাদের জানাইয়াছেন যে, "আশুবাবুর মৃত্যু হয় ১৯৪৪ সালের ২৭শে মার্চ্চ এবং তিনি জীবনে কখনও পুঁথি আবিষ্কার করেন নাই, আবিষ্কার করেছেন শুধু পুরণো কতগুলি পালাগান যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হ'তে ডাঃ দীনেশ সেনের সম্পাদনায় অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে।"

এই ভুল তথ্য প্রকাশিত হইবার জন্য আমরা দুঃখিত এবং এই ভুল সংশোধনের জন্য শ্রীযুক্ত শুভাশীষ চৌধুরীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শুভাশীষবাবু আর একটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাংলার পল্লীকবি নাম দিয়ে পালাগায়ক রমেশ শীলের পাশে মননশীল সাহিত্যিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গীতিকা সংগ্রহক ও ভাষাতত্ত্ব গবেষক—আশুতোষ চৌধুরীকে বেমালুম পল্লীকবি হিসাবে চালিয়ে নেবার হেতু বুঝলাম না। পল্লীকবি বলতে খাঁটি যা বোঝায় আশুবাবু তা' ছিলেন না।...লেখকের উচিত ছিল প্রবন্ধের নাম 'আশুতোষ চৌধুরী' না দিয়ে "আশুবাবুর গীতিকা" দেওয়া। সেটা অনেকটা শোভন হ'ত।"

আশুবাবুর বহুমুখী প্রতিভার সম্পূর্ণ আলোচনা করা উল্লেখিত প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল না। রমেশবাবু ও আশুবাবুর তুলনামূলক আলোচনাও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রবন্ধলেখক দেখাইতে চাহিয়াছিলেন কি ভাবে গ্রামের বহুমুখী জীবনের সঙ্গে আশুবাবুর নিবিড় পরিচয় ছিল, কি ভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনাকে তিনি তাহাদেরই ভাষায় রূপ দিয়াছিলেন। আশুবাবুর প্রতিভার এই দিকটাই লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। লেখক আশুবাবুকে "গেঁয়ো কবি" অর্থে পল্লীকবি বলেন নাই। পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ লইয়া পল্লীবাসীর ভাষায় এমন অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে পল্লীকবি বলা হইয়াছে।

★

হুমায়ুন কবীর ও লেবার ফেডারেশন

গত সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিবরণের মধ্যে মিঃ হুমায়ুন কবীরের সম্পর্কে লেখা হইয়াছে যে, তিনি টি-ইউ-সি ও ফেডারেশন অফ্ লেবার, উভয়েরই মধ্যে আছেন। কিন্তু পরে আমরা জানিতে পারিলাম আসল ব্যাপার এইরূপ:—

মিঃ কবীর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ডেলিগেট হইয়া গিয়াছিলেন হাওড়ার পোর্টকমিশনস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হইতে। অথচ তাঁহার নাম ডাক বেশী রেলওয়ে এম্প্লয়িজ এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে এবং এই এসোসিয়েশনের সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই। এই এসোসিয়েশনটী আগে ফেডারেশন অফ্ লেবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিঃ কবীর ইহার সভাপতি হওয়ার পরও ইহা ফেডারেশন অফ্ লেবারের সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে কি না তাহা তাঁহারা জানান নাই। তাঁহারা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে এখনও আলাদাই আছেন এবং এই অবস্থাতেই মিঃ কবীর দুই বছর ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইহার সভাপতিত্ব করিতেছেন। ইহাতে লোকের মনে এই সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয় যে, মিঃ কবীরের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ঢোকা শুধু সুযোগ লাভেরই জন্য, আসলে তিনি ফেডারেশন অফ্ লেবারের সঙ্গেও সহযোগিতার আশা রাখেন।

সংশোধন

৩৭শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' কমরেড ভবানী সেনের প্রবন্ধ পড়িয়া ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত মিহির চৌধুরী আমাদের জানাইয়াছেন যে গত দুর্ভিক্ষে বোয়ালখালী থানার সারদা শালের মাতৃপিতৃ ও পত্নী বিয়োগ হইয়াছে বলিয়া উক্ত প্রবন্ধে যা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নয়। সারদাবাবুর মাতৃপিতৃ ও পত্নীবিয়োগ হয় নাই। তবে তিনি ও তাঁহার পরিবার দুর্ভিক্ষে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সারদা বাবু মিলিটারীতে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের একজন কনট্রাকটারের সহিত কাজ করিতেছেন।

আমরা এই ভুলের জন্য দুঃখিত।

সুতার পাইকারেরা মিথ্যা হিসাব দিয়া সরকারকে ভুলাইতেছে

আমলাতন্ত্র ও এজেণ্টে মণিকাঞ্চন-যোগ

[নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট]

৩৬শ সংখ্যা জনযুদ্ধে বাংলার তাঁতীদের দুর্দ্দশার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার তাঁতীর সংখ্যা ২ লক্ষ এবং আরও ১২ লক্ষ লোক তাহাদের উপর নির্ভরশীল। বাংলার কাপড়ের চাহিদার এক-চতুর্থাংশ তাঁতীরা মিটায়। এই তাঁত শিল্প আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ফলে ১৪ লক্ষ বাঙ্গালী নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আগাইতেছে। বাংলায় কাপড়েরও দারুণ অনটন দেখা দিয়াছে।

বাংলার এই নিজস্ব শিল্পটি একদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদৃত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি তাঁতীদের আঙ্গুল পর্যান্ত তাহারা কাটিয়া দেয়। তবুও এই শিল্প গৌরবের সঙ্গে বাঁচিয়াছিল। কিন্তু আজ এই প্রাচীন শিল্পটি ধ্বংসের মুখে। প্রত্যেক জিলাতে সহস্র সহস্র তাঁত অচল হইয়া পড়িয়া আছে। একদিন যাহারা দেশের গৌরব ছিল সেই তাঁতীরা আজ দলে দলে কুলিগিরী অথবা ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে। কেন এ রকম হইল ?

অপ্রচুর সরবরাহ

সাধারণতঃ বাংলা দেশের তাঁতের জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১৪,০০০ গাঁট সূতা প্রয়োজন। এই সূতার সবটাই বাংলার বাহির হইতে আমদানী হয়, বাংলার মিলে উৎপন্ন সূতা প্রায় সমস্তটাই বাংলার মিলেই ব্যবহৃত হয়।

১৯৪৪ সালে বাংলায় কত সূতা আমদানী হইয়াছে সঠিক জানা যায় নাই। তবে ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের ১৬ই অক্টোবরের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত মাদ্রাজ হইতে সমুদ্র পথে বাংলায় প্রতিমাসে গড়ে ৮৬৭৮ গাঁট সূতা পাঠান হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতেও নাকি ২০০০ গাঁট পাঠান হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোডি বাংলাদেশে প্রতি মাসে ১০০০০ গাঁট সূতা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কখনও রক্ষিত হয় না। প্রাদেশিক টেক্সটাইল কর্ত্তৃপক্ষের হিসাবে জানা যায় যে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে বাংলা দেশে মাসে গড়ে ৬।৭ হাজার গাঁটের সূতা আমদানী হয়। ২২শে জানুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে টেক্সটাইল কমিশনার বাংলার সূতার কোটা কমাইয়া মাসে ৫৪৪২ গাঁট করিয়াছেন।

সূতা যাহা আসিয়াছে বাংলা সরকার তাহাও সম্পূর্ণ ভাবে বিতরণ করেন নাই। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিতরণ করা হইয়াছে ৩০০০ গাঁট, '৪৫ সালের জানুয়ারীতে ৫০০০ গাঁট। ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারের ষ্টকে ছিল ৩০০০ গাঁট।

মাল মজুতদারের হাতে

উপরের হিসাব হইতেই দেখা যায় যে বাংলায় সূতার একটা প্রকাণ্ড ঘাটতি আছে। কিন্তু এই বিরাট ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হইবে সে সম্বন্ধে সরকার কোন উচ্চবাচ্যই করিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ ঘাটতি যখন আছে তখন ইহা আশা করাই স্বাভাবিক যে সূতার বিতরণ খুব কড়া কণ্ট্রোল ও বিচক্ষণতার সহিত হইবে, যাহাতে এই সামান্য পরিমাণ সূতা চোরা বাজারে না যায়। কিন্তু সরকারের বিতরণ-ব্যবস্থার ফলে সূতা আপনা আপনি চোরা বাজারে যাইতেছে।

কিছুদিন আগেও কিছু পুরান নিয়ম ছাড়া সূতা কণ্ট্রোলের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। পাইকার ও কোটার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা বাহির হইতে সূতা আমদানী করিত। কিন্তু কলিকাতা পৌছান মাত্রই সেই সূতা চোরাবাজারে অন্তর্হিত হইত। অধিকাংশ সূতাই কিনিত কাপড়ের কলের মালিকরা, তাঁতীদের কপালে সামান্যই জুটিত। যাহাও জুটিত তাহার দামও ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে।

বাহির হইতে আমদানী সূতার উপর তবুও একটা মামুলি কণ্ট্রোল ছিল, কিন্তু বাংলায় উৎপন্ন সূতার উপর তাহাও ছিল না। ঢাকার কাপড়ের কলগুলির সূতা কোথায় যাইতেছে সে খবর ঢাকার জিলা কর্ত্তৃপক্ষও জানিতেন না। মিল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে হিসাব চাহিলে তাহারা উত্তর দিতেন, "ভারত সরকারের টেক্সটাইল কণ্ট্রোলারের কাছে সব হিসাব পাঠাইয়াছি, দ্বিতীয়বার হিসাব দিতে পারিব না।" ভারত সরকারের কাছে কি হিসাব পাঠান হয় তাহা কেহই অবশ্য জানিতেন না। একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী নিজেই স্বীকার করেন যে ভারত সরকারের নিকট হইতে কোন খবর আনিতে অন্ততঃ দুই বছর লাগিবে। তিনি ইতিপূর্ব্বে ২।৩ বার চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গত ৯ই নভেম্বর ব্যবসায়ী সমিতিগুলির-প্রতিনিধিদের কাছে এক বক্তৃতায় সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি সাহেব নিজেই স্বীকার করেন যে সূতার দাম শতকরা ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে! চোরাকারবারীদের মামুলী ভর্ৎসনা ছাড়া চোরাবাজার দমনের কোন ব্যবস্থাই তিনি করিলেন না। সূতা বণ্টনের জন্য তিনি তাঁতীদের প্রতিনিধিদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া চোরাকারবারীদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিলেন।

সরকারী কণ্ট্রোলের নমুনা

সম্প্রতি ২০নং এবং তাহার উপরের সমস্ত নম্বরের সূতা সরকার আটক করিয়াছেন। কিন্তু এই সরকারী হুকুম সত্ত্বেও বড় বড় ব্যবসায়ীরা কাগজপত্রে ভুল হিসাব দেখাইয়া অনায়াসেই চোরাকারবার চালাইতেছেন। ১৫ই জানুয়ারী "নেশনালিষ্ট" পত্রিকায় লিখিত এক চিঠিতে কলিকাতা বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মিঃ কে, ডি, মুখার্জ্জি বলেন, "পাইকার ও কোটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট সঠিক হিসাব দাখিল করা সত্ত্বেও কি ভাবে চোরা কারবার করে তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের খুচরা বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও কাগজে কলমে হিসাব ঠিক রাখা যায়।"

বর্ত্তমানে সমস্ত সূতাই সরকারী কণ্ট্রোলে। সরকারের নিজস্ব প্রতিনিধি ছাড়া কাহারও সূতা বিক্রি করার হুকুম নাই। কিন্তু সবাই জানে যে কলিকাতার চোরাবাজারে রোজ অজস্র সূতা কেনাবেচা হয়। কিন্তু এদিকে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন।

সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থা

সমস্ত বাংলাদেশে সূতা বণ্টনের জন্য সরকার রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহাকে তাহাদের প্রধান এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কোটিপতি ব্যবসায়ীর একমাত্র কাজ হইতেছে সরকার যত সূতা আমদানী করে তাহা বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে পৌছাইয়া দেওয়া। এই পরিশ্রমের জন্য তাহাকে শতকরা ৩৷৷ সাড়ে তিন ভাগ কমিশন দেওয়া হয়।

রণদাবাবু সূতা যখন জিলাতে পৌছাইয়া দিলেন, তখন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সূতা বিক্রীর জন্য স্থানীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। মহকুমা হাকিমও তাহার এলাকার স্থানীয় এজেণ্ট নিয়োগ করেন। চোরাকারবারীরাই সর্ব্বত্র এজেণ্ট নিযুক্ত হয়, কারণ তাহাদের পয়সা আছে, কর্ত্তৃপক্ষ মহলে প্রতিপত্তিও আছে। তাঁতী অথবা তাহাদের প্রতিনিধিরা কখনও এজেণ্ট নিযুক্ত হয় না, কারণ তাহাদের কোনটাই নাই।

চোর যখন দারোগা হয়...

সরকারের এই বণ্টন-নীতি কি ভাবে কার্য্যকরী হইতেছে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিব।

মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় ২০,০০০ তাঁত বেকার হইয়া পড়িয়া আছে, কারণ সূতা নাই। এই তমলুকে প্রথম তাঁতী সমিতির মারফৎ সূতা বণ্টন করা হইত। কিন্তু হঠাৎ মহকুমা হাকিম তাঁতী সমিতির হাত হইতে সূতা বণ্টনের ভার কাড়িয়া লইয়া দুই ব্যক্তিকে এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ইহাদের একজন পেন্সনভোগী প্রাক্তন সরকারী কর্ম্মচারী। অচিরেই বাজার হইতে সূতা অদৃশ্য হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়িতে লাগিল। শোনা যায় যে মহকুমা হাকিম এজেণ্টদের অনুরোধে বাজারে চলতি দামের উপরে আরও শতকরা ৭৷৷ সাড়ে সাত ভাগ বেশী দামে এজেণ্টদের সূতা বিক্রীর অনুমতি দিয়াছেন।

হাওড়াতে বেঙ্গল ক্লথ ডিলার্স কর্পোরেশন লিঃ নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সরকারী এজেণ্ট। গত ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার তাঁতীদের জন্য ৬০ গাঁট সূতা পাঠান হয়। শোনা যায় ২০ নং সূতার জন্য গাঁট প্রতি ২০০৲ টাকা, ২২ নং সূতার জন্য গাঁট প্রতি ২৬০৲ টাকা এবং ৪০ নং সূতার জন্য গাঁট প্রতি ৬২০৲ টাকা অতিরিক্ত দাম দিয়া মেদিনীপুরের জনৈক ব্যবসায়ী ঐ ৬০ গাঁটের মধ্যে প্রায় ৫৫ গাঁটই কিনিয়া লয়।

অন্যান্য জিলাতেও এই ভাবে তাঁতীদের জন্য প্রেরিত সূতা চোরাবাজারে অদৃশ্য হইতেছে। এজেণ্টদের ভাগ্যে জুটিতেছে মোটা লাভ আর তাঁতীদের ভাগ্যে অনাহার ও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা।

বাংলার যে-গৌরব একদিন বিদেশী বণিকের লোভ ও অত্যাচারেও বাঁচিয়াছিল আজ স্বদেশী বণিকের লোভে তাহা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি, এম, এল, এ

অফিস ঃ ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

যারা বীভৎসতার জন্য দায়ী

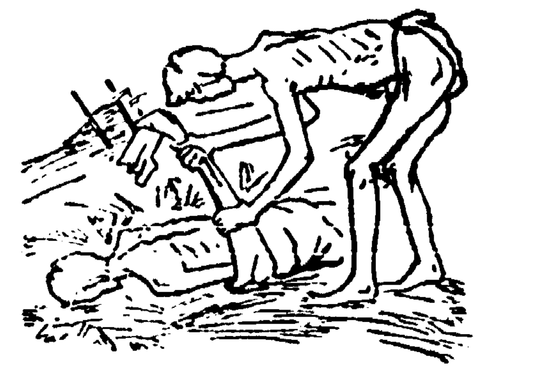

কাপড়ের দারুণ অভাব সম্পর্কে মালদহের মিরচক গ্রামের একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা কিছু আগে জনযুদ্ধে প্রকাশ হইয়াছিল। গ্রামের একজন গরীব মুসলমান কাপড়ের অভাবে মরিয়া হইয়া এক গভীর রাত্রে কবর খুঁড়িয়া একটি শবের দেহ হইতে কাপড় নিয়া আসে। আজ কেন একজন ধর্ম্মভীরু গ্রাম্য মুসলমান এমন বীভৎস কাজ করিল? ইহাদের কাপড় গেল কোথায়? নীচের ঘটনাটিই ইহার জবাব দিবে।

★

গত ২২শে জানুয়ারী পুলিশ শিয়ালদা ষ্টেশনে ১,২৫,০০০, টাকার কাপড় বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। বড় বাজারের কোন বড় ব্যবসায়ী গোপনে কাপড় চালান দিতেছিল। উক্ত ব্যবসায়ীর গুদাম খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ আরও ১১ গাঁট সূতা বাজেয়াপ্ত করে।

খুলনার কংগ্রেসনেতা কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের বিপক্ষে

খুলনার প্রবীন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, শরৎচন্দ্র দাস, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিষ্ণু ও কালীপদ পই স্বাধীনতা দিবসে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন, "...আমরা সকলকে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও তাহাদের মতানৈক্য ভুলিয়া কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। কংগ্রেসসেবী বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় পীঠস্থান মহান জাতীয় কংগ্রেসকে বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া আমরা বয়োবৃদ্ধ কংগ্রেসসেবীরা অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে সংবাদপত্রে লক্ষ্য করিতেছি যে বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসকর্ম্মিদের একাংশ কংগ্রেসকর্ম্মি সম্মেলনে সমবেত হইয়া কংগ্রেস হইতে কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী কংগ্রেসকর্ম্মিদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক দৃশ্য এবং কংগ্রেস নীতি বহির্ভূত।

কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আমাদের কোন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই কারণে তাহাদের কংগ্রেস হইতে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অযৌক্তিক, এবং কংগ্রেস গণতন্ত্র বিরোধী। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আমরা একমত যে, কংগ্রেস স্বাধীনতাকামী সমস্ত মতাবলম্বী ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান। কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী কংগ্রেসকর্ম্মীদের সঙ্গে সেবাকার্য্য, সমাজ পুনর্গঠন প্রভৃতি সাধারণ কাজ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধারণ কর্ম্মতালিকায় যোগ দিতে কাহারও আপত্তি থাকিবার কোন কারণ নাই।"

বিদেশে স্বাধীনতা দিবস পালন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"ওয়াশিংটনের জনসাধারণের এই সভা মার্কিন গভর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইতেছে যে, ভারতবর্ষে যে হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী বিনা বিচারে আটক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাহা যেন মার্কিন গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানান। মুক্তিদানের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর আটলাণ্টিক সনদের নীতি অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভে ভারতবর্ষকে সাহায্য করার কথাও যেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলা হয়। সুদূর প্রাচ্যে দ্রুত জয় লাভ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুইটি কাজ প্রয়োজনীয় বলিয়া সভা মনে করিতেছে।"

চিঠি

দেশপ্রিয়ের জন্মভূমিতে

৩৫শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' চট্টগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে কমরেড ভবানী সেন লিখিয়াছিলেন যে কাট্টলী গ্রামের জেলেরা তাঁহার নিকট অভিযোগ করে যে গ্রামের বাবুরা তাঁহাদের পুকুর হইতে জেলেদের জল আনিতে দেন না। কাট্টলীগ্রামের শ্রীযুক্ত বিমল দের পত্রে আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্ন হোর, কামিনী দাশগুপ্ত ও আদিনাথ চৌধুরী তাঁহাদের পুকুর জেলেদের ব্যবহার করিতে দেন। আমরা আরও জানিয়া সুখী হইলাম যে কাট্টলী গ্রামের দুরবস্থার বিবরণ পড়িয়া সমস্ত চট্টগ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং চট্টগ্রামের দেশভক্তরা কাট্টলীকে বাঁচাইবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন।

এডজুডিকেশন কি তামাসা ?

মালিকের স্বার্থে সরকার আইনের মর্য্যাদা রাখিতেছে না !

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ (ক) ধারা অনুযায়ী মজুর ও মালিকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা এডজুডিকেশন বসাইয়া বিচার করিবার ব্যবস্থা আছে। লেবার কমিশনার এডজুডিকেটর নিয়োগ করেন, সেই এডজুডিকেটর বিচারে যা রায় দিবেন তা কাজে পরিণত করিবার দায়ীত্ব লেবার ডিপার্টমেন্টের। ৪ মাস এই রায় বলবৎ থাকিবে তারপর দরকার হইলে আবার বিষয়টী বিচারের জন্য পেশ করা যাইতে পারে। এই বিচারের ব্যাপারে মালিক পক্ষ ও মজুর পক্ষ উভয়েরই সমান অধিকার। ভারতের মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা একটা বড় রকম অগ্রগতি সন্দেহ নাই। মজুরের দাবী আদালতে বিচার হইবে, মজুর-দাবীর প্রতি এতটুকু মর্য্যাদাই বা কবে দেওয়া হইয়াছে? মজুর তার দাবীর ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইবে, ইহাই বা কবে হইয়াছে? তাই, আজ এই এডজুডিকেশন ব্যবস্থাকে মজুরেরা যেমন পরিপূর্ণ ভাবে নিজেদের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে, তেমনি মালিক পক্ষও 'এডজুডিকেশনের' নামে আতঙ্কিত হইয়া যে-কোন উপায়ে ইহাকে বানচাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এবং সরকার তার নিজের আইনের ফাঁক নিজেই খুঁজিয়া মালিকের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতেছে। গত কয়েক মাসের 'এডজুডিকেশন'-আন্দোলনের হিসাব লইলে ইহাই পরিষ্কার হইয়া উঠে।

ট্রামে কোম্পানীর প্রথম হার

ট্রাম-এডজুডিকেশনে মালিক পক্ষ প্রথম একটী বড় রকম ঘা খাইল। কোম্পানী ভাবিয়াছিল, বুদ্ধিতে ইউনিয়নকে হারাইয়া দিবে। কিন্তু তা যখন সম্ভব হইল না, তখন কোম্পানী সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সাহায্য লইয়া চেষ্টা করিল যাতে হাকিমের রায় কাজে পরিণত না হয়। শোনা যায়, বড় বড় ইউরোপীয়ান মালিক মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে হানা দিয়া তাদের পর্য্যন্ত ধমক লাগাইয়াছিল যে, এই রায় কাজে পরিণত করা চলিবে না। কিন্তু হয়কে নয় করিতে মন্ত্রীমণ্ডলী পারিলেন না, শেষ পর্য্যন্ত রায় বাহির হইল।

সরকারের উপর মালিকের চাপ বাড়িল

কিন্তু তারপর হইতে মালিকরা আরো হুঁশিয়ার হইল। কলিকাতায় আরো অনেকগুলি লোহা-কারখানার এডজুডিকেশন বসিল। ভার্ত্তিয়া, ষ্টীল প্রোডাক্টস, হাওয়া ইলেকট্রিক প্রভৃতির এডজুডিকেশনের সওয়াল জবাব কবে শেষ হইয়াছে, কিন্তু রায় আর বাহির হয় না। শোনা গেল, ভার্ত্তিয়ার রায় লইয়া মালিক-মহল সরকারকে আবার চাপিয়া ধরিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ভার্ত্তিয়ার রায় বাহির হইল, কিন্তু তাহাতে মাগগীভাতার প্রশ্নটী নাই! বলা হইয়াছে, মাগগীভাতার সম্বন্ধে রায় পরে দেওয়া হইবে।

এবারে মালিকের কৌশল কি? শোনা গেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের তরফ হইতে মাগগীভাতা সম্পর্কে একটী মেমোরাণ্ডাম সরকারের কাছে দাখিল করা হইয়াছে, সেই মেমোরাণ্ডাম বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত মাগগীভাতা সম্পর্কে নাকি কিছু করা হইবে না।

সরকার পক্ষ তো এই অজুহাত দেখাইতে পারেন না; তাই তাঁরা বলিলেন, মজুরের ভালর জন্যই মাগগীভাতার রায় বন্ধ আছে—মাগগীভাতা সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটী কমিটী বসান হইতেছে, সেই কমিটীর সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই মাগগীভাতা সম্পর্কে রায় দেওয়া হইবে না।

কমিটি বসিল কিনা, কবে তার সিদ্ধান্ত হইবে—সে বিষয়ে কোন কথাই জানা গেল না। গ্রেগরী কমিটী বসিবার পর আবার নূতন করিয়া কমিটী বসিবার কি দরকার হইল, তাহারও কোন কৈফিয়ৎ শুনা গেল না। মোটের উপর মালিক যা চাহিয়াছিল তাই হইল—অর্থাৎ এখন কিছুদিনের জন্য মাগগীভাতার প্রশ্ন ধামা চাপা রহিল।

সরকারের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া মালিক কতদূর আগাইতে চায়, তারও পরিচয় পাওয়া গেল রবার্ট হাডসনের এডজুডিকেশনের ব্যাপারে। সওয়াল-জবাবের তারিখ ঠিক হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় কোম্পানী সরকারের কাছে এক আবেদন করিল যে, যতদিন না ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের মেমোরাণ্ডাম বিবেচিত না হয়, ততদিন এডজুডিকেশনই যেন স্থগিত থাকে!

এডজুডিকেশন স্থগিত রাখা সরকারের ক্ষমতার মধ্যে থাকিলে তাও করা হইত কিনা জানি না। তবে চটকলের ব্যাপারে প্রায় এই রকমই করিতে দেখা যাইতেছে। শোনা যায় যে, চটকলের এডজুডিকেশন বসিতেছে না, তার বড় কারণ এই যে, মাগগীভাতা সম্পর্কে সরকার ও মালিকে এখনও কোন রফা হয় নাই। এই রকম করিয়াই এডজুডিকেশনকে তামাসায় পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

লেবার অফিসের কেলেঙ্কারী!

ইহা তো 'এডজুডিকেশন' বসিবার পরের ব্যাপার। এডজুডিকেশন অর্ডার পাইতেই যে কত কাঠখড় পুড়াইতে হয়, তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে হয়—এই উদ্দেশ্যেই কি ভারত-রক্ষার ৮১ (ক) ধারা তৈরী হইয়াছিল!

আইনে আছে—মালিক ও মজুরে বিবাদ বাধিলে এডজুডিকেশন বসান হইবে। কিন্তু বিবাদের ৬ মাস বা এক বছরের আগে কোন জায়গায় এডজুডিকেশন বসিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। নীচের হিসাব হইতে এডজুডিকেশনের উদ্যোগ-পর্ব্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

লেবার কমিশনারের অফিসের অদ্ভুত কেতা-দুরস্ততার জন্যই এই রকম দেরী হয়। প্রথমে লেবার-অফিসার, তারপর এ্যাসিষ্টাণ্ট লেবার-কমিশনার, তারপর ডেপুটী-লেবার-কমিশনার—এতগুলি সিঁড়ি পার হইয়া তবে কোন ব্যাপার খোদ লেবার কমিশনারের নজরে আনা যায়। এক একটী সিঁড়ি পার হইতেই ২।১ মাস লাগিয়া যায়। এবং প্রত্যেক বারই কর্ত্তারা মীমাংসার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়া ডেপুটেশনকে ফিরাইয়া দেন।

এডজুডিকেশনের বিচার্য্য বিষয় ঠিক করিবার দায়ীত্বও লেবার কমিশনারের। তিনি কি রকম ভাবে তাঁর দায়ীত্ব পালন করেন, তার দু'একটা নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

ভার্ত্তিয়া কারখানার কয়েকজন মজুরকে ৬।৭ মাস পূর্ব্বে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। তখনই ইউনিয়ন তাদের পুনর্নিয়োগের জন্য লেবার কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করে। লেবার কমিশনার এতদিন পরে বিষয়টী এডজুডিকেশনের অন্তর্ভুক্ত করিলেন! এদিকে বরখাস্ত মজুররা বহুদিন অপেক্ষা করিয়া পেটের জ্বালায় অন্যত্র কাজ খুঁজিয়া লইয়াছে। এখন বিচারে তাদের পুনর্নিয়োগ হউক আর না হউক একই কথা।

বার্ণপুরের কয়েকজন মজুর বরখাস্ত হইয়াছিল মে মাসে। এতদিন পরে যখন তাদের অর্দ্ধেক লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে তাদের বিষয় এডজুডিকেশনে বিচার হইবে! বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত বরখাস্ত স্থগিত রাখার কোনো আইনও নাই, অথচ বিচার হইতেও এত দেরী করা হয়! ইহাই লেবার-ডিপার্টমেণ্টের মজুর-দরদ!

আসল কথা, লেবার ডিপার্টমেণ্টের কাজ কর্ম্মের উপর মালিকদের প্রভাবই বেশী। খোদ লেবার কমিশনারকে পর্য্যন্ত অনেক সময় মালিকদের মুখ চাহিয়া কাজ করিতে হয়। বার্ণপুর সম্বন্ধে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীই বলেন যে, বার্ণপুর মালিকের সঙ্গে বিবাদ করা মুস্কিল, কেন না, ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেই তাঁর দহরম মহরম। প্রধান মন্ত্রীই যদি মালিকদের এত ভয় পান, তবে তাঁর লেবার-ডিপার্টমেণ্ট যে পদে পদে মালিকদের সন্তুষ্ট করিয়া চলিবে, তাতে আবার বিচিত্র কি? তারই নমুনা আমরা লেবার ডিপার্টমেণ্টের কাজে দেখিতেছি। অথচ নিজেদের মান বাঁচাবার জন্য তাঁরা সে কথা স্বীকার না করিয়া নিয়ম কানুনের দোহাই দিয়া বেচারী মজুরদেয় নাজেহাল করিতেছেন।

একজনের ঘাড়েই সব এডজুডিকেশন

আজকাল একটার পর একটা অনবরত এডজুডিকেশন বসিতেছে। কিন্তু এডজুডিকেটর মাত্র একজন হওয়ায় প্রত্যেক মামলাটীই দেরী হইয়া যায়। আরো এডজুডিকেটর নিয়োগ করার কথা লেবার কমিশনারকে বলিলে তিনি ক্ষেপিয়া ওঠেন; কেন, একজনের দ্বারাই তো সব কাজ হইয়া যাইতেছে! অথচ আমরা জানি, কোন কোন ক্ষেত্রে এডজুডিকেটর নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাড়াতাড়ি মামলার মীমাংসা করার দরকার মনে করিলেও, বেশী 'কেস' হাতে থাকায় তিনি দেরী করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই বোম্বাইয়ে এডজুডিকেটরের একটী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে যা হইতে পারে, বাংলায় তা হইবে না কেন?

এডজুডিকেশন সম্পর্কে দায়ীত্ব পালনের নমুনা

কারখানা	লেবর-কমিশনরের কাছে প্রথম দরখাস্তের তাং	লেঃ কঃর ক[illegible]ছ ডেপু[illegible]ন	এডজুডিকেশন দাবী করিয়া দরখাস্তের তাং	বর্ত্তমান অবস্থা
জয় ইঞ্জিনীয়ারিং	৩০শে জুন, ১৯৪৪	৩০ [illegible]	৩১শে অক্টোবর	এখনও এডজুডিকেশন বসে নাই।
রবার্ট হাডসন	২৯শে আগষ্ট, '৪৪	২০ বার	২০শে নভেম্বর	সম্প্রতি এডজুডিকেশনের শুনানী হইয়াছে।
বামার লরী	১০ই অক্টোবর	২৫ বার	১৪ই নভেম্বর	এখনও অর্ডার পাশ হয় নাই।
মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং	মে, ১৯৪৪	১৫ বার	জুন, ১৯৪৪	এডজুডিকেশন শেষ হইয়াছে, এখনও রায় বাহির হয় নাই।
এলেন বেরি	এপ্রিল, ১৯৪৪	২০ বার	২২শে জুলাই	এখনও অর্ডার হয় নাই।
ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক	১০ই জুন, ১৯৪৪	১৫ বার	৩০শে আগষ্ট	এডজুডিকেশন শেষ হইয়াছে এখনও রায় বাহির হয় নাই।

যুক্ত এডজুডিকেশন কবে হইবে?

সম্প্রতি ভারত সরকার ৮১ (ক) ধারার সংশোধন করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, একই রকম কারখানার একই রকম সমস্যার মীমাংসার জন্য যুক্ত এডজুডিকেশন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা কাজে পরিণত হইলে অনেক ঝঞ্ঝাট কমিয়া যায়। কিন্তু যুক্ত এডজুডিকেশন হইবে কিনা, তা ঠিক করিবার অধিকার নিজের হাতেই যখন রাখিয়াছেন, তখন সন্দেহ হয়, সহজে এই ব্যবস্থার সুফল মজুররা ভোগ করিতে পারিবে না। যেমন এডজুডিকেশনের ব্যাপারে নানারকম অজুহাত সৃষ্টি হয়, এ ব্যাপারেও তেমনি অজুহাতের অভাব হইবে কি? ইতিমধ্যেই শোনা যাইতেছে যে চলতি মামলাগুলির মাগগীভাতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবার জন্যই নাকি মালিক ও সরকার উভয়েই এই যুক্ত-এডজুডিকেশনের ছুতা ধরিয়াছেন। এমনিভাবেই আইনকে উল্টা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে!

জনমত সজাগ কর!

এডজুডিকেশনের ব্যাপারে এত কেলেঙ্কারী চলিতেছে, অথচ এই সমস্ত বিষয় লইয়া সাধারণ খবরের কাগজে কোন মন্তব্য করা হয় না। দেশের কতরকম সমস্যার খবর কাগজে বাহির হইতেছে, সরকার ও মুনাফালোভীদের কত চালবাজী উন্মুক্ত করিয়া ধরা হইতেছে; কিন্তু মজুর মালিক সংক্রান্ত ব্যাপারে সামাজিক ও শাসনতন্ত্রগত এত বড় অন্যায় ও অবিচারের সম্বন্ধে কাগজগুলি যেন উদাসীন। ট্রামওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ভার্ত্তিয়া কারখানা পর্য্যন্ত যে সব এডজুডিকেশন মামলা হইয়াছে, তার কোন খবর কাগজগুলি ভাল করিয়া ছাপেও নাই। চটকলের এডজুডিকেশনের প্রশ্নের উপর বাংলার ৪ লাখ চটকল মজুরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে সংবাদপত্র জগত প্রায় নর্ব্বাক। দেশের জনমতকে এই রকম উদাসীন দেখিতে পাইলে মালিক ও আমলাতন্ত্র তো জোর পাইবেই। এই উদাসীনতা কাটাইয়া মজুরের দাবী সম্বন্ধে সমস্ত দেশবাসীকে সচেতন করিতে পারিলে, তবেই এডজুডিকেশনকে তামাসায় পরিণত হওয়া বন্ধ করিতে পারিব।

—তুষার চট্টোপাধ্যায়

রণসম্ভার উৎপাদনে নিযুক্ত সোভিয়েট মজুর

সোভিয়েটে অফুরন্ত রণসম্ভারের উৎস কোথায়?

লালফৌজের বিরাট সাফল্যের সাথে সাথে চতুর্দ্দিক হইতেই কেবল এই প্রশ্ন শোনা যাইতেছে—"রুশরা ইহা কেমন করিয়া সম্ভব করিতে পারিতেছে?"

ইহার আলোচনা করিতে গিয়া মস্কো হইতে 'গ্লোবের' সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—এই প্রশ্নের জবাব বহুলাংশে নিহিত রহিয়াছে উরাল পর্ব্বতমালার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সার্লভস্ক, ম্যাগ্নেটোগর্স্ক, চেলিয়াবিনস্ক ও অন্যান্য শহরের সমরোপকরণ উৎপাদনের অঞ্চল সমূহে।

সার্লভস্ক অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী মজুর মার্শাল ষ্টালিনের কাছে একটি লিখিত বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে সার্লভস্ক অঞ্চলের ট্যাঙ্কের কারখানাগুলি অর্ডারের অপেক্ষাও ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড অধিক মূল্যের ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এক একটি রুশ ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণে ৫১০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। সুতরাং সেখানে অর্ডারের অপেক্ষা ৬০০০ বেশী ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ একই অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর গোলা বারুদের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে শতকরা ২০ ভাগ বেশী হইয়াছে। কামানের গোলা উৎপন্ন হইয়াছে ১৮ গুণ অধিক। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অসংখ্য কামান ব্যবহার করিয়াও কি করিয়া রণ-ক্ষেত্রে লালফৌজের গোলা-গুলির অভাব ঘটিতেছে না। উক্ত সার্লভস্ক অঞ্চলের নিকট হইতে সমরোপকরণ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে যে পরিমাণ বিমান উৎপাদনের প্রত্যাশা করা হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা ২ লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড মূল্যের অধিক বিমান পাওয়া গিয়াছে।

[সার্লভস্ক, চেলিয়াবিনস্ক, ম্যাগ্নেটোগর্স্ক প্রভৃতি শহরগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার এশিয়াখণ্ডে উরাল পর্ব্বত এলাকায় অবস্থিত]

ভুলাভাই-লিয়াকৎ আলোচনা ব্যর্থ করিতে সাম্রাজ্যবাদী কূট চক্রান্ত

বিহারের গ্রেপ্তার তাহারই পূর্ব্বাভাষ

[নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট]

কিছুদিন আগে খবর রটিয়াছিল যে বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগদানের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মিঃ জিন্না ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ উভয়েই এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁর মধ্যে আলোচনার ভিতরের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা এই প্রতিবাদে মোটেই আশ্চর্য্য হইবেন না। আমি যতদূর খবর পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় যে এই আলোচনার ভিত্তি খুবই সংকীর্ণ ছিল।

ভুলাভাই-লিয়াকৎ 'আপোষ'

উভয়ের মধ্যে আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল এই যে শ্রীযুক্ত দেশাই যদি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে কোন আপোসে আসিতে পারেন তবে লীগ নিম্নলিখিত সর্ত্তে কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে বড় লাটের শাসন পরিষদে যোগ দিবে। সর্ত্তগুলি হইল :

(ক) শাসন পরিষদে কংগ্রেস ও লীগ সমান সংখ্যা আসন পাইবে। (কংগ্রেস শতকরা ৪০টি, লীগ শতকরা ৪০টি এবং বাকী অন্যান্য দল শতকরা ২০টি আসন পাইবে—এই ভাবেই আসন সংখ্যা ভাগ করা হইয়াছিল।)

(২) কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন নাই এই রকম কোন আইন বা সিদ্ধান্ত এই শাসন পরিষদ সমর্থন করিবে না।

(৩) এই শাসন পরিষদ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ করিবে এবং শাসন পরিষদে যোগদান লীগের পাকিস্তানের দাবীকে কোন রকমেই ক্ষুন্ন করিবে না।

যতদূর জানা যায় বড় লাটের আইন সভা বা শাসনপরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনই আলোচনা হয় নাই।

এই ব্যাপারকেই কেহ কেহ "কংগ্রেস-লীগ আপোষ" বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বস্তুতঃ দেশাই-লিয়াকৎ আলোচনার সোজা অর্থ হইতেছে এই যে :

শ্রীযুক্ত দেশাই যদি বড় লাটকে সমান সংখ্যার ভিত্তিতে আসন ভাগাভাগির প্রস্তাবে রাজী করাইতে পারেন তবে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে নূতন শাসন পরিষদে যোগ দিবে। কিন্তু শাসন-পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে সহযোগিতা করিলেও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের মতভেদ বজায় থাকিবে এবং এই মতভেদ লইয়া ভবিষ্যতে তাহারা পরস্পরের বিরোধিতাও করিতে পারিবেন।

লীগের পক্ষ হইতে বলা হয় যে কংগ্রেসের সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে লীগ শাসন পরিষদে যোগ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এই শাসন পরিষদ বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

শাসন পরিষদে যোগদান দ্বারা পাকিস্তানের দাবী বাতিল যাইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়াই লীগ এই সর্ত্ত আরোপ করিয়াছে।

গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের মত

বিড়লার কাগজ 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট'-এর দিল্লীর সংবাদদাতা সাধারণতঃ এই সব ব্যাপারে যথেষ্ট খবরাখবর রাখেন। শ্রীযুক্ত দেশাই'র এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নার মনোভাব বর্ণনা করিয়া ১৯শে জানুয়ারী তিনি লেখেন,

"কংগ্রেসের সহিত সমান সংখ্যা আসন পাইলে মিঃ জিন্না তাঁহার সহকর্ম্মীদের শাসনপরিষদে যোগ দিবার অনুমতি দিয়া নিজে উহার বাহিরে থাকিয়া পাকিস্তান সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করেন যে ব্যাপকভাবে গঠনমূলক কাজ করিলেই স্বরাজের দাবী শক্তিশালী হইবে। কিন্তু তা' হইলেও তিনি আইন-সভায় কাজ করিতে ইচ্ছুক এরকম কংগ্রেস-কর্ম্মীদের তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে প্রস্তুত।"

শ্রীযুক্ত দেশাই'র প্রস্তাব সম্বন্ধে লীগের মনোভাব কতকটা এইরূপ : তোমরা ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা কর। ওয়াভেল যদি নূতন শাসন-পরিষদ গঠনে রাজী হন এবং সেই শাসন পরিষদে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সমান সংখ্যক আসন দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমরা শাসন পরিষদে যোগ দিব।

এই ঘোষণা ছাড়া কংগ্রেস-লীগ সম্পর্ক এবং লীগের আভ্যন্তরীন অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শ্রীযুক্ত দেশাইর প্রতি গান্ধীজীর বক্তব্য কতকটা এইরূপ : ওয়াভেল যদি রাজী হয় এবং আসনের ভাগাভাগি লইয়া লীগের সঙ্গে যদি কোন আপোষ হয় তবে তুমি অগ্রসর হইতে পার। তোমার চেষ্টা সফল হইলে আমি তোমাকে সমর্থন করিব।

এই ঘোষণা ছাড়া গান্ধীজীও কংগ্রেস-লীগ সম্পর্কের অথবা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

বড়লাটের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিবার সময় শ্রীযুক্ত ভুলাভাই বড়লাটকে গান্ধীজী ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলীর মতামত জানাইয়াছেন। শোনা যায় যে ওয়াভেল মনোযোগ দিয়া সব কথা শুনিয়াছেন এবং বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি নাকি ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন যে, যেহেতু বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের সদস্যরা বিপদের দিনে সরকারকে আনুগত্যের সঙ্গে সাহায্য করিয়াছেন, সেহেতু তাহাদের এভাবে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

বিহারের গ্রেপ্তার

আলোচনা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহাতে সব কিছুই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে। এবং বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ যে অবিলম্বে কিছু করিবে মস্ত বড় আশাবাদী কংগ্রেস নেতাও ইহা বিশ্বাস করেন না। তাই তাঁহারা চুপ করিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহারা বসিয়া থাকিলেও সরকার বসিয়া নাই। ভারত সরকার ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব মুডিকে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য সফরে পাঠাইয়াছে। উদ্দেশ্য—বিভিন্ন শ্রেণীর কংগ্রেসকর্ম্মীর মনোভাব ও তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ কতটা তীব্র তাহা বোঝা।

বিড়লার কাগজের উল্লিখিত সংবাদদাতার ২৬শে জানুয়ারীর রিপোর্টে জানা যায় যে নয়াদিল্লী মহল মুডির সফরকে দেশের, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতিগতি বুঝিবার জন্য সরকারী চেষ্টা বলিয়া মনে করেন।

মুডি সাহেবের সফরের পরেই বিহার সরকার বিহারের নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন। বিহারের অতি-উৎসাহী সরকার নিজেদের উদ্যোগেই নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন ইহা মনে করা ভুল। বিহার সরকারের অভিযোগ যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ গঠনমূলক কাজের ছিলায় আর একটি মারাত্মক সংগ্রামের পরিকল্পনা করিতেছিলেন।

ভারত সরকারের চক্রান্ত

অনেকেরই মনে গোপন আশা ছিল যে ভুলাভাই-ওয়াভেল আলোচনার পরে ওয়াভেল সাহেব কংগ্রেস ও লীগকে একত্র করিয়া অচল অবস্থা অবসান করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা ভারত সরকারের চক্রান্ত বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দেশাই ও লিয়াকৎ আলী খাঁর মধ্যে যে সামান্য বোঝাপড়া হইয়াছে তাহাতেই বড়লাটের পরামর্শদাতারা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগের এই নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বোঝাপড়ার ভিত্তিতেও যদি কোন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলেও তাহার ফলে জাতীয় নেতারা মুক্তি পাইবেন এবং আরও অগ্রগতির জন্য কংগ্রেস ও লীগ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভারতের সমস্ত অধিবাসীকে সংগঠিত করিবে। এইখানেই সরকারের ভয়। সুতরাং তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিল কি ভাবে বর্ত্তমান অবস্থার দুইটি প্রধান দুর্ব্বলতার সুযোগে এই সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করা যায়।

প্রথমতঃ, ভুলাভাই ও লিয়াকৎ আলীর তথাকথিত আপোষ শুধু মাত্র নূতন শাসন পরিষদের আসনের ভাগবাঁটোয়ারা লইয়া। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনৈক্য রহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও তিক্তভাও পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের মধ্যেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রশ্নে তীব্র মতভেদ আছে। যাঁহারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে চান অচল অবস্থা অবসানের জন্য তাঁহাদের উদ্যম প্রত্যেকটী চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকই অভিনন্দিত করিবে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের এই চেষ্টার পিছনে সমগ্র কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থন অর্জ্জনের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাই কংগ্রেসসেবীদের মধ্যেও বিরোধ বিদ্যমান।

এই দুইটি দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ ভারত সরকার নিতেছে। একদিকে তাহাদের চেষ্টা বিহারের মত 'সংগ্রামের' মিথ্যা অজুহাতে মন্ত্রীত্ব বিরোধী গঠন মূলক কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপর আক্রমণ চালান এবং যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী আইন সভায় কাজ ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহাদের আলাদা ভাবে লীগের সঙ্গে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া। এই চেষ্টা সফল হইলে কংগ্রেস বিভক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে আমলাতন্ত্রেরই লাভ। অন্যদিকে তাহাদের চেষ্টা কংগ্রেস ও লীগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগান এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র ও পাকিস্তানের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাইর প্রস্তাবের চূড়ান্ত উত্তর দেবার আগে ভারত সরকার এই ষড়যন্ত্র কাজে পরিণত করিতে চায়। এই ষড়যন্ত্র সফল না হইলে ভারত সরকার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যেই বড়লাটের শাসন পরিষদের মহাসভা-পন্থী সমর্থকরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বড়লাট যাহাতে শ্রীযুক্ত দেশাইর প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্র আন্দোলন শুরু করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় কংগ্রেস ও লীগ নেতারা তাঁহাদের সংগঠন দ্বয়ের পূর্ণ সমর্থন লইয়া যুক্তভাবে এই আলোচনা করিতেছেন না। উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই এই প্রশ্নের উপরে যথেষ্ট মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি রহিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে অস্থায়ী সরকার আদায় করিবার জন্য দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কোন যুক্ত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতেছেন না। সব কিছুই নির্ভর করিতেছে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের উপর। ইহাই হইল বর্ত্তমান অবস্থার বিপদ।

শ্রীযুক্তা নাইডুর নামে আলবা'র কুৎসা

কংগ্রেসী ছাত্রের মাথা ফাটাইবার হুমকিতে কংগ্রেস আদর্শ প্রচার!

বোম্বাই "ফোরাম" কাগজের সম্পাদক ও প্রচণ্ড কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট মিঃ জোয়াকিম আলবা সম্প্রতি কলকাতায় এসে "কংগ্রেসের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে" কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম বার্ষিক (কমার্স) শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুখেন্দু মজুমদার তাঁর একটী ছোট্ট সভায় উপস্থিত ছিলেন। "কংগ্রেস" সাহিত্য সঙ্ঘ ও ছাত্রসংসদ ঐ সভা ডেকেছিল। সুখেন্দু বাবু ঐ সভা সম্বন্ধে আমাদের কাছে একটী চিঠি পাঠিয়েছেন, স্থানাভাবে তার অংশ মাত্র উদ্ধৃত করছি।

তিনি প্রথমেই জানিয়েছেন যে তিনি কংগ্রেস-ভক্ত এবং জনযুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি লিখেছেন, আলবা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,

"বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে একজন অষ্ট্রেলিয়ান দ্বারা এদেশ শাসিত হচ্ছে। আরও দুঃখের কথা যে এই অষ্ট্রেলিয়ানেরই স্ত্রী মিসেস কেসির সঙ্গে শ্রীযুক্তা নাইডু দেখা করতে গিয়েছিলেন! এরপর শ্রীযুক্তা নাইডু কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনকে আশ্রয় দেবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?..."

তারপর সুখেন্দু বাবু লিখছেন যে মিঃ আলবা বলেন, কমিউনিষ্ট বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথাও তিনি উড়িয়ে দেন। তাঁর সারা বক্তৃতার ভেতরেও কাজ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ না পেয়ে সুখেন্দু বাবু জিজ্ঞাসা করেন যে ছাত্রদের জন্যে কি প্রোগ্রাম তিনি রাখতে চান।

অমনি তিনি রেগে উঠে সুখেন্দুবাবুকে বলেন যে তুমি কমিউনিষ্ট, এখানে মিটিং ভাঙ্গতে এসেছ। কিন্তু সুখেন্দুবাবু নাছোড়বান্দা হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের কথা আপনি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ?

এবার আলবা সাহেব একেবারে ফেটে পড়ে তাঁকে দেশদ্রোহী প্রভৃতি বলে গালাগালি দেন এবং এই গালাগালির ভেতরেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান।

সুখেন্দু বাবুর এক বন্ধু তাঁকে টেনে হলের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যান এবং পরে তাঁকে জানান যে কংগ্রেসী (?) ছাত্রেরা নাকি তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেবার মতলব করছিল।

"আমি কংগ্রেস-লীগ ঐক্যে বিশ্বাস করি বলে আমার মাথা ফাটাতে হবে?"—এই প্রশ্ন করে সুখেন্দু বাবু তাঁর চিঠি শেষ করেছেন।

* * *

বাছাই করা "মাথা ফাটানো" শ্রোতার নিরাপদ সভা ছেড়ে ৩১শে জানুয়ারী পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সাধারণ ছাত্রদের এক সভায় ঠিক একই ধরণের কুৎসাজনক বক্তৃতা করার দুঃসাহস মিঃ আলবাকে পেয়ে বসে। মিঃ হুমায়ুন কবীর তাঁর এই সভায় পৌরহিত্য করেন।

তাঁর কুৎসা রটনা শুনে সাধারণ ছাত্ররা ক্ষেপে ওঠেন। অবশেষে গোলমালের মধ্যে সভাপতির অনুরোধক্রমে ছাত্ররা তাঁকে প্রশ্ন করেন :—

কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যা শ্রীযুক্তা নাইডুর কথা বিশ্বাস করব, না আপনার কথা বিশ্বাস করব ? যারা আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দেয়নি তাদের আপনি বিশ্বাসঘাতক বলেছেন। গান্ধীজী, মৌলনা আজাদ প্রভৃতি এই আন্দোলন সম্বন্ধে কংগ্রেসের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন—তাঁরাও কি বিশ্বাসঘাতক ? লীগ তথা মুসলমানেরা এ আন্দোলনে যোগ দেননি। তাঁরাও কি বিশ্বাসঘাতক ? যারা পাকিস্তান দাবী করে তাদের আপনি আরব দেশে যেতে বল্লেন কেন ? ইত্যাদি।

মিঃ আলবা প্রথমে শ্রীযুক্তা নাইডু সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি এড়িয়ে পাকিস্তান ও মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন—"হিন্দু মুসলিম ঐক্য আমিও চাই, কিন্তু সে কথা পরে, আগে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে (অমনি চারিদিক থেকে প্রশ্ন ওঠে—"কি করে ?")। তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে আলবা বলেন, "আমি মুসলমানদের আরব দেশে চলে যেতে বলিনি।" অমনি মুসলমান ছাত্রেরা তাঁকে "মিথ্যাবাদী" বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। গোলমাল চলতে চলতে আবার হঠাৎ আলবা সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে নিজেই প্রশ্ন করেন—"এ যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ তা কেউ বুঝিয়ে দিতে পার ?" ৩।৪ জন কমিউনিষ্ট ছাত্র এগিয়ে এসে বলেন, "হ্যাঁ, আমরা জবাব দিতে পারি।"

এই শুনে হুমায়ুন কবীর সাহেব তাড়াতাড়ি মাইক আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, "না, না এখানে কাউকে বিতর্ক করতে দেওয়া হবে না, মঞ্চের ওপর কাউকে আসতে দেওয়া হবে না।"

শ্রীযুক্তা নাইডুর বিরুদ্ধে, লীগের বিরুদ্ধে ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার জন্য ছাত্ররা প্রায় সকলেই মিঃ আলবার ওপর ক্ষেপে ওঠে। সারা হল থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠতে থাকে, "আলবা, ফিরে যাও—কংগ্রেস-লীগ এক হোক" ইত্যাদি। বেগতিক দেখে আলবা সাহেব, কবীর সাহেব ও তাঁদের কয়েকজন অনুচর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান—তাঁদের অনুচরদের মুখে শুধু একটী ধ্বনি—"কমিউনিষ্ট পার্টি ধ্বংস হোক।"

Regd. No. C. 2836.

সোভিয়েটের এই অভিযানে প্রতি ৫ গজ অন্তর এক একটি কামান

নাৎসীদের শান্তিচেষ্টার পিছনে ভণ্ডামি

"বার্লিনের বিজয় গৌরব সুরু হইয়াছিল ওয়ারসর পতনে। আজ ওয়ারসর মুক্তিতে সূচিত হইতেছে বার্লিনের পতন।.........মুক্তি ফৌজ তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। যুগোশ্লাভদের জন্ত বেলগ্রেড, পোলদের জন্ত ওয়ারস। কিন্তু আমরা কি চাই? আমরা চিন্তা করিতেছি অন্ত বিষয়! জার্ম্মান সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছে 'যুদ্ধ আজ শেষ অধ্যায়ে পৌছিয়াছে।' এবার অন্ততঃ এ সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা ঘোষণা করে নাই—যুদ্ধ সত্যই চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে। অল্প কয়েকদিনের ভিতরই আমরা অনেক দূর আগাইয়াছি।.........যে শহরই আমরা দখল করি না কেন আমাদের চিন্তা একটি স্থানেই নিবদ্ধ। আমরা আমাদের সেই একটি লক্ষ্যের দিকেই তড়িৎবেগে আগাইতেছি—সে লক্ষ্যকে কখনও ভুলিতে পারি না। আমরা সোফিয়া, বেলগ্রেড এবং ওয়ারস মুক্ত করিয়াছি। তিনটি রাষ্ট্র; তিনটি রাজধানী আজ মুক্ত। আমরা বুখারেষ্ট অধিকার করিয়াছি, হেলসিনস্কী সায়েস্তা হইয়াছে। বুডাপেষ্টের শেষ বাধা চূর্ণ হইতেছে। ছয়টি রাজধানী, ছয়টি রাষ্ট্র। কিন্তু আমরা আরও একটি বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। আমাদের চিন্তা ও লক্ষ্য সপ্তম রাজধানী। আমরা আমাদের সমস্ত মন প্রাণ দিয়া সেই দিকে আগাইতেছি। সেই দিকেই আমাদের সতেজ পদক্ষেপ সুরু হইয়াছে—রণসম্ভার পরিপূর্ণ ট্যাঙ্কবাহিনীও ছুটিয়াছে, আমরা সেখানে পৌছিবই।

মৃত ওয়ারসর জীবন আবার ফিরিয়া আসিবে। বার্লিন আজও জীবিত কিন্তু তাহার আয়ু আর বেশী দিন নাই।"

—ইলিয়া এরেনবুর্গ

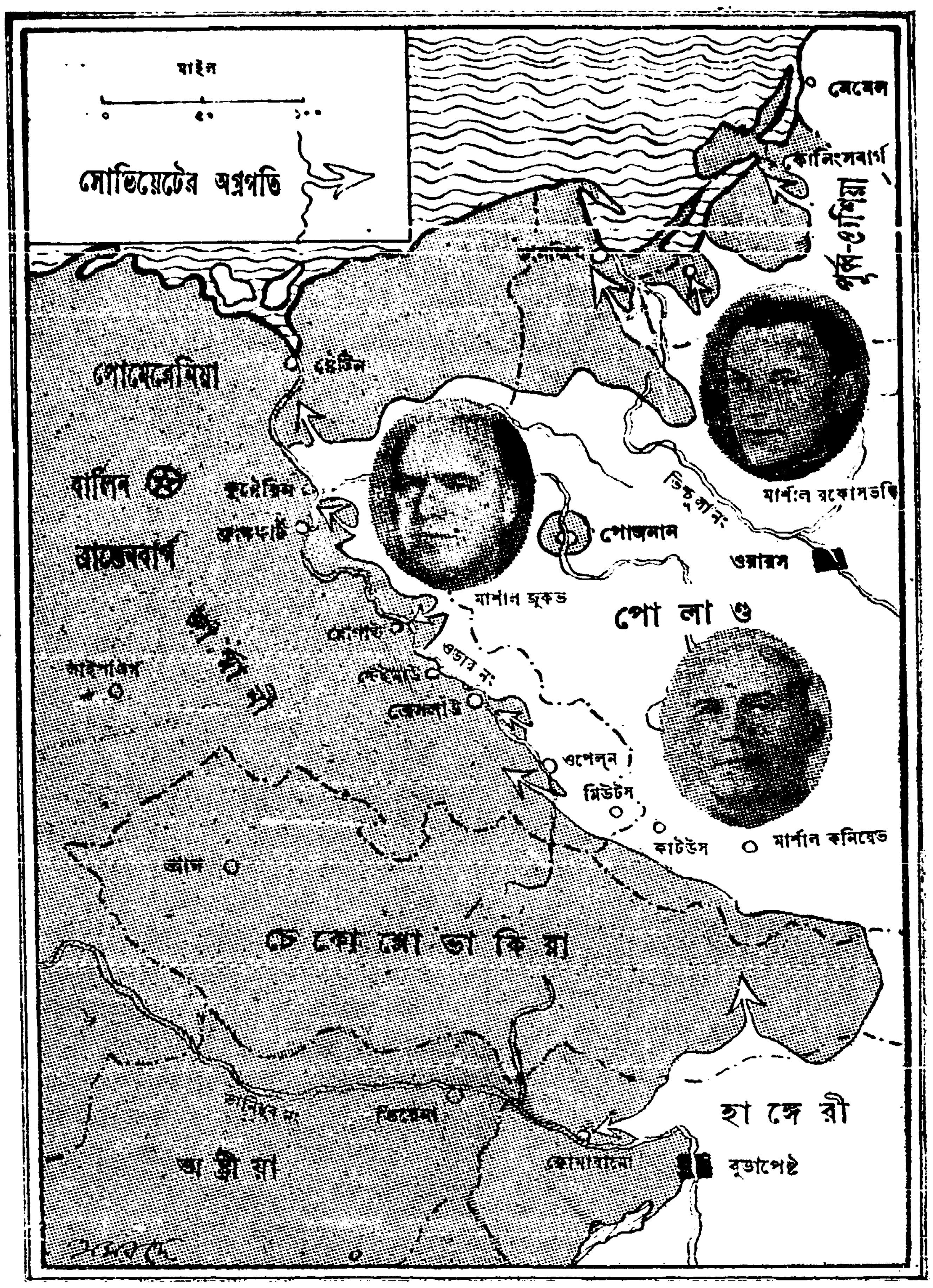

বার্লিনের দিকেই লালফৌজ

জার্ম্মান শ্রম মন্ত্রী ডাঃ লে ঘোষণা করিয়াছে—"আমরা বার্লিনের সম্মুখে, বার্লিনের অভ্যন্তরে এবং বার্লিনের পিছনেও যুদ্ধ করিব।' এই বিবৃতি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে সোভিয়েটের অভিযানের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থার এক বিরাট পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। অভিযান সম্পর্কে লণ্ডনের প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ 'ডেলী মেল'কে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে—'এবারকার রুশ অভিযান সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে সামরিক ইতিহাসে ইহার তুলনীয় উদাহরণ আর নাই। জার্ম্মানরা যখন ক্ষমতার অতি উচ্চ শীর্ষে তখনও তাহারা এরূপ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই।

'ইহা যেন একটি চলন্ত প্রাচীর'

লালফৌজের এই বিরাট আক্রমণকে বর্ণনা করিতে গিয়া একজন সোভিয়েট সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—'ইহা যেন একটি চলন্ত প্রাচীর। পথের সব কিছু ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছে। মার্শাল জুকভের সৈন্তবাহিনী যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে এরূপ আর কখনও হয় নাই।"

চলন্ত প্রাচীরের আঘাতে সর্ব্বত্রই জার্ম্মান ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাই লক্ষ্যস্থল বার্লিনের দিকে পৌছার আগেই সোভিয়েটবাহিনী অনেকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা জার্ম্মান আভিজাত্যের প্রাণকেন্দ্র পূর্ব্বপ্রুশিয়াকে খাস জার্ম্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া ফেলিয়াছে। এখানের বাছা বাছা ২ লাখ শত্রু সৈন্তকে হয় ধ্বংস হইতে হইবে নয় বন্দী হইতে হইবে। ইহার ফলে জার্ম্মান সমরযন্ত্র যে বেশ খানিকটা বিকল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ সাইলেসিয়ার কাটউস ও বেথুন শহরের সংলগ্ন জর্ম্মানীর কয়লা ও তেল উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ এলাকাগুলি হাতছাড়া হওয়াতে সামরিক দিক দিয়া জার্ম্মানী দারুণ ঘা খাইল। এখানে জার্ম্মানীর শতকরা ১০ ভাগ কয়লা ও প্রায় ৩০ ভাগ তেল উৎপাদন হইয়া থাকে। এই সব অঞ্চলে সোভিয়েট অগ্রগতি এমন দ্রুত হইয়াছে যে তাহার ফলে পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর চলাচল ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সোভিয়েট যে এবার নাৎসী শত্রুকে তাহার নিজের বিবরেই পিষিয়া মারার সংকল্প নিয়া আগাইতেছে তাহা বোঝা যাইতেছে ষ্টালিনগ্রাদের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে 'রেডষ্টারের' ঘোষণা হইতে। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—'আমরা এবার ষ্টালিনগ্রাদের ধ্বংস ও রক্তক্ষয়ের জন্ত শত্রুকে উত্তর দিতে বাধ্য করাইব। চূড়ান্ত জয়লাভের সময় পূর্ব্বের চেয়ে অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।'

জার্ম্মানীতে আতঙ্ক

ফলে ইতিমধ্যেই জার্ম্মনীতে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সমস্ত জার্ম্মান অধিবাসীদের মধ্যে ভয় ও হতাশা ছড়াইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মানরা যে ভীত ও ত্রস্তভাবে পালাইতেছে এখন তাহার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বপ্রুশিয়াতে বরফের উপর অসংখ্য মৃতদেহ ছড়ান রহিয়াছে। তাহাদের কবর না দিয়াই লোকজন সব চলিয়া গিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপও রহিয়াছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় অরক্ষিত অবস্থায় গরু ও মেষের পাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পূর্ব্বপ্রুশিয়ার পলায়নপর অধিবাসীদের সম্পর্কে লিখিতে গিয়া কয়েকজন সমর সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে ইতিমধ্যেই এই সব জার্ম্মান অধিবাসীদের মধ্যে দাসসুলভ মনোভাব দেখা দিয়াছে। লালফৌজের কোন সেনানায়ক প্রভৃতি দেখিলেই ইহারা সেলাম করে এবং তাহাদের জন্ত কোন একটা কিছু করিয়া তাহাদের সুখী করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপ্রুশিয়ার অধিবাসী বলিয়া তাহাদের যে 'আভিজাত্য গৌরব' এতদিন ছিল তাহা পরাজয়ের এই প্রথম আঘাতেই ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে।

অন্ত আর এক স্থানে একজন যুদ্ধ বন্দী একটি রেল ষ্টেশনের বর্ণনা দেয়। অধিবাসীরা পালাইতে ব্যস্ত। ট্রেণে উঠার জন্ত হুড়াহুড়ি, কোন শৃঙ্খলাই নাই, গোলমালের চূড়ান্ত। কে আগে পালাইবে তাহার জন্ত লজ্জাস্কর ব্যগ্রতা।

খুব দরকারী কারখানার পরিচালকরা কি ভাবে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে তাহার একটি উদাহরণ 'রেডষ্টার' পত্রিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘটনাটি এই—পজনানের পশ্চিমে মস্ত বড় ফক্‌ভুলফ কারখানা। যুদ্ধের অনেক প্রয়োজনীয় মাল এখানে তৈরী হয়। লালফৌজের তড়িৎবেগের কথা সবাই শুনিয়াছে। কারখানার পরিচালকরাই সবার আগে ভয় পাইয়া কারখানা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। লালফৌজ তখনও তাহার অনেক দূরে।

নাৎসীদের বিষাক্ত প্রচারে একদিন অন্ধ হইয়া যাহারা দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতে ছিল, লালফৌজের হাতে ধরা পড়িয়া বা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আজ তাহারা চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিতেছে।

বার্লিনের অবস্থাও সঙ্গীন

লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেলে' বলা হইয়াছে, শহরে সমস্ত জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাবান একরূপ পাওয়াই যাইতেছে না। সিগারেটের রেশন কমাইয়া মাসিক ৬০টি করা হইয়াছে ও মহিলাদের ভাগে পড়িয়াছে ৩০টি মাত্র। বেসামরিক অধিবাসীরা কোন কিছুই কিনিতে পারিতেছে না, ফলে—মুদ্রার দাম অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। শহরের লোকজন দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলের মনেই জাগিতেছে, গত মহাযুদ্ধের পরের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কথা। এবার তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে এখন হইতেই।

সোভিয়েট মনোবল অটুট ছিল

আড়াই বছর আগে রুশিয়ার চিত্র ছিল অন্তরূপ। বিজয়ী মদমত্ত জার্ম্মান বাহিনীর সম্মুখে রুশ অধিবাসীদের মনোবল অটুট ছিল। শত্রুকে বাধা দিতে হইবে এই দারুণ প্রতিজ্ঞাই ছিল তাদের মূল মন্ত্র। শত্রুর কাজে লাগিতে পারে এরূপ সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া তাহাদের অনেকেই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়া শত্রুর পিছনে রহিয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে তাহারা তীব্র ঘৃণা নিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালাইয়া গিয়াছে। আজ এই বিরাট সাফল্যের দিনেও তাহাদের লক্ষ্য এতটুকু বদলায় নাই, আত্মসন্তুষ্টিতে কোন শিথিলতা দেখা দেয় নাই। তাই সমগ্র সোভিয়েটে এখনও এই আওয়াজই ওঠে—"যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রয়োজন আগে,—সব কিছু যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্ত।"

নাৎসী দস্যুরা গা বাঁচাইতে চায়

লালফৌজ ও সমগ্র সোভিয়েট জনসাধারণের এই দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া নূতন করিয়া গোয়েবলসের আর্ত্তনাদ সুরু হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাছে আবেদন আরম্ভ হইয়াছে 'এখনও বাঁচাও, সন্ধি কর। আমরা হারিয়া গেলে ইউরোপ বলশেভিক হইয়া যাইবে।' এ সেই অতীতের বলশেভিক বিরোধী উদগার।

সাথে সাথে চারিদিক হইতে সন্ধি-প্রচেষ্টারও গুজব। প্যাপেন মাদ্রিদ গিয়াছে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী সিমেন্স গিয়াছে ষ্টকহলমে। সোভিয়টকে বাদ দিয়া যদি কোন রকমেও সন্ধি করা যায়। অন্তদিকে রুশিয়ার কাছেও জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে প্রস্তাব আসিতেছে একটা আপোষের জন্ত।-সর্ত্ত,—জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে রুশরা আর আগাইবে না। যতদূর আসিয়াছে সেই পর্য্যন্ত, অবশ্য জার্ম্মানী আত্মসমর্পণ করিবে।

কিন্তু আজ নাৎসীদের এই সব ফন্দি ফিকিরে কোন লাভই হইবে না। সোভিয়েট ও মিত্রপক্ষের ঐক্য সুদৃঢ় থাকিবেই। নাৎসীদের এই সব চালবাজীর যোগ্য উত্তর আসিয়াছে সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদার' নিকট হইতে। প্রাভদা লিখিয়াছে—'এবার আমরা আর এই সব শান্তি-প্রস্তাবে প্রতারিত হইব না। আমরা বার্লিন না পৌছিয়া ক্ষান্ত হইব না।'

সোভিয়েট অভিযানের সাফল্য

তৃতীয় শ্বেত রাশিয়ান ফ্রণ্ট

জেনারেল চার্ণিয়াকোভস্কি ২০ দিনে ১০০ মাইলের বেশী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সীমান্ত হইতে অভিযান আরম্ভ করিয়া এখন ইহার রাজধানী কোয়েনিংসবুর্গের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার আশু লক্ষ্য কোয়েনিংসবুর্গ। তাঁহার সৈন্তদলের বাম বাহু মার্শাল রকোসভস্কির সৈন্তদলের দক্ষিণ বাহুর সহিত মিলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্বেত রাশিয়ান ফ্রণ্ট

এই ফ্রণ্টে আছেন মার্শাল রকোসভস্কি। তাঁহার সৈন্তদল ২২ দিনে ন্যারু নদীর তীর হইতে বাল্টিক সমুদ্রের উপকূলে এলেবিংএর উত্তর পর্য্যন্ত মোট ১২৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। ইহার লক্ষ্য ডানজিগ। ইঁহার সৈন্তদলের বাম বাহু জুকভের বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর সহিত মিলিত রহিয়াছে।

প্রথম শ্বেত রাশিয়ান ফ্রণ্ট

মার্শাল জুকভ। তাঁহার বাহিনী ২৬ দিনে অগ্রসর হইয়াছে ২৫০ মাইল। ওয়ারস শহরের পূর্ব্বদিক হইতে সুরু করিয়া এই বাহিনী ওডার নদীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। লক্ষ্য ওডার অতিক্রম করিয়া পশ্চিম তীরে ষ্টেটিন, কুয়েষ্ট্রিন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট। ইহার মধ্যে কুয়েষ্ট্রিনের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। এই বাহিনীর বাম বাহু মার্শাল কনিয়েভের বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর সহিত মিলিয়াছে।

প্রথম ইউক্রেনিয়ান ফ্রণ্ট

মার্শাল কনিয়েভ। ২৫ দিনে ইঁহার বাহিনী অগ্রসর হইয়াছে ২৫০ মাইল। সানডোমিয়েরজ হইতে ওডারের তীর পর্য্যন্ত ব্রেসলাউয়ের উত্তরে। ওডারের উপর পারঘাটা স্থাপিত হইয়াছে। লক্ষ্য ব্রেসলাউ অধিকার। সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ, কনিয়েভের বাহিনী ওডারের ১২ মাইলে যুদ্ধ করিতেছে।

চতুর্থ ইউক্রেনিয়ান ফ্রণ্ট

জেনারেল পেট্রভ। ইঁহার বাহিনী ২১ দিনে সানক অঞ্চল হইতে সুরু করিয়া ১২৫ মাইলের বেশী অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার উত্তরে পোলাণ্ডের অংশ এবং শ্লোভাকিয়ার অর্দ্ধেক শত্রু কবলমুক্ত করিয়াছেন।

★ অন্যান্য ফ্রণ্টের খবর ★

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে মার্কিন সেনা প্রবেশ করিয়াছে। অবতরণের ২৬ দিন পরে ম্যানিলা মুক্ত হইল।

পশ্চিম ইউরোপে ষ্ট্রাসবুর্গের দক্ষিণে ফরাসী ও মার্কিন সৈন্তদলের মিলন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর একটি অঞ্চলে সিগফ্রিড লাইনের দ্বিতীয় ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

নাৎসিনেতা গোয়েবল্‌সের মুখে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার

নাৎসী জার্ম্মানীর প্রচার সচিব ও বার্লিনের নব-নিযুক্ত কমাণ্ডার ডাঃ গোয়েবলস্‌ সম্প্রতি জার্ম্মান কাগজে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছে:

'তীব্র যন্ত্রণার বিষ আজ আমাদের নিঃশেষে পান করিতে হইবে—ইহাই ভাগ্যের লিখন।

যে সমস্ত জার্ম্মান এলাকা এতদিন আমাদের যুদ্ধ ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ছিল, যা ছিল আমাদের শিল্পদ্রব্য ও রসদ সরবরাহের সব চেয়ে বড় নির্ভর—সে সমস্তই আজ শত্রুর দখলে।

জমি ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ চালাইবার নীতির দিনও আজ ফুরাইয়া গিয়াছে।

যে-গ্রাম, যে-জমি, যে-শহর ও যে-কারখানাই আমরা ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি তাহাতেই আমাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা সোজাসুজি কমিয়া যাইতেছে। তা ছাড়া অসংখ্য জার্ম্মানীকে গভীর দুঃখ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও সহিতে হইতেছে—সে কথা না হয় বাদই দিলাম।

বিভীষিকার চতুরঙ্গ তুরঙ্গ ধাইয়া আসিতেছে—দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে অত্যাসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের বা পলায়নের অন্য কোন উপায় থাকিলে জার্ম্মাণ কমাণ্ড কখনও জার্ম্মাণদের উপর এই যন্ত্রণা, কষ্ট ও উদ্বেগের পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা চাপাইত?'

শিশুহন্তা আর্য্য বীরদের গর্ব্ব শেষ

লালফৌজ বিপুল বিক্রমে ছুটিয়া চলিয়াছে।...

গোটা জার্ম্মানী আজ সে আক্রমণের সামনে আতঙ্কগ্রস্ত। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর শ্মশানভূমির মত জনশূন্য। ভূতগ্রস্তের মত জার্ম্মানরা প্রাণভয়ে পলায়মান। জার্ম্মান জেনারালরা অর্দ্ধভুক্ত খাবার টেবিলে ফেলিয়া, বীরত্বের সম্মান আঁটা পোষাক আল্‌নায় রাখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে আশ্রয় খুঁজিতেছে। নরওয়ে হইতে ভারপ্রাপ্ত সমর নায়ক বিমানযোগে ঘাঁটি আগলাইতে আসিয়া দেখে, সে ঘাঁটি বহুক্ষণ আগেই লালফৌজ দখল করিয়া বসিয়াছে।

বার্লিনের নাভিশ্বাস

মস্কোর এক খবরে প্রকাশ, লালফৌজের আক্রমণের ফলে জার্ম্মানীর ভিতরকার অবস্থা খুবই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। দলে দলে আতঙ্ক-গ্রস্ত নাগরিকেরা বার্লিন শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। শহরে গ্যাস নাই, আলো নাই, যানবাহনও বন্ধ। খাদ্যদ্রব্যের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। বার্লিন শহরের কারখানাগুলিতে কাজ হইতেছে না। সমস্ত শহরবাসীর উপর নগররক্ষার জন্য গড়খাই ও ব্যারিকেড নির্ম্মাণের হুকুম হইয়াছে। বার্লিনের অভ্যন্তরে ২০ লক্ষ গৃহহীন জার্ম্মান ও হাজার হাজার দলত্যাগী সৈন্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

টলায়মান নাৎসী শাসন

জার্ম্মান শাসনযন্ত্র একেবারে যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার সমর্থনে নানা সংবাদ আসিতেছে। জার্ম্মান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন আর বিশেষ ধরণের জল ছাপ যুক্ত কাগজে নোট ছাপাইতেছে না। ফলে, নোট জাল হওয়ার পক্ষে আর কোনই বাধা থাকিল না। এক মার্কের দাম কিছু দিন আগেও প্রায় বারো আনা ছিল, এখন এক আনায় দাঁড়াইয়াছে। তাছাড়া সরকারী ট্যাক্স ও অন্যান্য কর আদায় একেবারে বন্ধ আছে। বিচার বিভাগ এমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে যে, ফৌজদারী অপরাধের জন্য সাজার ব্যবস্থাও উঠিয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রগুলি একে একে সমস্তই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কেবল মাত্র রেডিও মারফৎই এখন সংবাদ প্রচার হইতেছে।

রুশরা জার্ম্মান নয়

মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার রাস্তায় দুই বুড়ো, বুড়ি ও এক জার্ম্মান তরুণীর সহিত কয়েকজন রুশ সাংবাদিকের দেখা। রুশদের দেখিয়া জার্ম্মান তিনজন প্রাণপণে কুর্নিশ করিতে লাগিল। কাছে আসিতেই তরুণীটি গাড়ীতে তার শায়িত শিশুটিকে দেখাইয়া প্রাণভিক্ষার জন্য কাতরভাবে অনুনয় করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, জার্ম্মাণরা যেমন রুশ শিশুদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে, রুশ সৈন্যরাও তেমনি জার্ম্মান শিশুদের হত্যা করিবে। কিন্তু রুশরা যখন তাহাদের অভয় দিল, তখন বুড়ো জার্ম্মানটি বলিল, তারা তিনজন কোনিংসবার্গে পলাইতেছিল। লালফৌজ আসিয়া পড়ায় তাহারা পলাইতে পারে নাই। লালফৌজ তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছে।

অন্য একটি দল মালপত্র বোঝাই অনেকগুলি গাড়ী ঠেলিয়া আনিতেছিল। তাহাদের চোখে নির্ব্বোধ শূন্য দৃষ্টি। সামনে লালফৌজকে দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে তাহাদের টুপি তুলিয়া সম্মান জানাইল এবং হিটলারের নামে কটূক্তি করিতে লাগিল। লাল ফৌজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আগাইয়া গেল।

দলে দলে আত্ম-সমর্পণ

জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে কি ভাবে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে, বন্দী জার্ম্মানদের মুখে তাহার অসংখ্য কাহিনী শোনা যায়। পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র ফেলিয়া নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতে সকলেই ব্যস্ত।

জার্ম্মান সাইলেশিয়ার যে সমস্ত শহর হইতে জার্ম্মানরা পলাইতে পারে নাই, সেই সমস্ত শহরের দোকান পাট আবার খোলা হইতেছে। জার্ম্মানরা তাহাদের জানালা হইতে শাদা পতাকা উড়াইতেছে এবং হাতে শাদা বাজুবন্ধ বাঁধিতেছে। এক বুড়ো জার্ম্মানকে শাদা বাজুবন্ধের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দেয়: ইহার অর্থ—আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করিতেছি। জার্ম্মানদের এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি খুব অদ্ভুত—কারণ, লালফৌজ ঐরূপ শাদা বাজুবন্ধ পরার কোন হুকুমই জারী করে নাই।

জার্ম্মানীতে বিদেশী মজুরদের বিদ্রোহ

চেসনাকভ, জোরুবিন, সুসলভ ও সিবির্কো রুশ মজুর। জার্ম্মানরা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া জার্ম্মান কারখানায় গোলামি করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

কিন্তু তাহারা সোভিয়েটের মানুষ। তাই অল্প-দিনেই পরামর্শ আঁটিয়া গোপনে কারখানার কাজ নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

এবার লাল ফৌজ যখন সাইলেশিয়ার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, জার্ম্মানরা ট্রেণ ভর্ত্তি করিয়া বিদেশী মজুরদের ক্রয়েৎসবার্গে সরাইয়া ফেলিতেছিল। চেস্‌নাকভ কৌশলে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করিয়া দিল। অস্ত্রশস্ত্রে ঠাসা ছয়টি কামরা সেই অবস্থাতেই জার্ম্মানদের রাখিয়া আসিতে হইল। ফলে সমস্ত অস্ত্রই পড়িল লাল ফৌজের হাতে।

চার বন্ধুর নেতৃত্বে ক্রয়েৎসবার্গের কারখানায় বিদেশী মজুরের দল বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া দিল। কারখানার জার্ম্মান প্রহরীর দল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হইল। রিভলবার, বন্দুক সমস্ত কিছু বিদ্রোহীরা দখল করিয়া ফেলিল।

জোরুবিন তখন কারখানার চিমনির মাথায় লাল নিশান উড়াইতেছিল। জার্ম্মান সৈন্যরা আসিয়া পড়ায় সে-ই প্রথম প্রাণ দিল।

জার্ম্মানরা ট্যাঙ্ক আনিয়াছে। বড় বড় কামান হইতে তাহারা গোলা বর্ষণ করিতেছে। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ!

জার্ম্মানদের গুলীতে সুস্‌লভ আর সিবির্কোও মারা পড়িল। বাকি শুধু চেস্‌নাকভ।

ক্লান্তিতে চেস্‌নাকভের শরীর টলিতেছে। তবুও তাহার হাতের দৃঢ়বদ্ধ রিভলবার হইতে সমানে গুলী ছুটিতেছে।

এ দিকে লাল ফৌজের ট্যাঙ্ক বাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে লাল ফৌজকে আসিতে দেখিয়া জার্ম্মান সৈন্যরা প্রাণভয়ে সরিয়া পড়িল।

লাল ফৌজ আসিয়া দেখে, কারখানার চিমনির উপর হইতে লাল পতাকা নীরবে তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে। আর মুখর অভিনন্দন জানাইবার জন্য বাঁচিয়া আছে শুধু চেস্‌নাকভ।

বন্দী মেয়েদের বিক্রীর বাজার

রুশ মেয়েদের বন্দী করিয়া আনিয়া জার্ম্মানরা তাহাদিগকে গরু-ভেড়ার মতই প্রকাশ্য হাটে বিক্রয় করিত। জমিদার রিশনাউ ক্রয়েৎসবার্গ হাট হইতে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তিনটী রুশ মেয়েকে কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহার এইরূপ আরও ১১৭ জন রুশ বাঁদী ছিল।

রিশনাউ গিন্নী তাহাদের আস্তাবলে থাকিতে দিত আর নানা অজুহাতে অনবরত নিজের হাতেই মারধর করিত।

মার খাইতে খাইতে বেচারা গালিয়ারত' মাথাই খারাপ হইয়া গেল, ব্রিয়ান্‌স্ক-এর জোয়া গলায় দড়ি দিল আর লিলিয়া ওডারের জলে ডুবিয়া মরিল।

কিন্তু এবার ২৪শে জানুয়ারী রিশ্‌নাউয়ের 'পিতৃভূমিতে'ই লালফৌজের কামানগর্জ্জন! আতঙ্কিত রিশ্‌নাউগিন্নী মেয়েদের হুকুম দিল, সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাক।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মুক্তিদাতা লালফৌজ আসিতেছে! ভয়ের চোটে জার্ম্মান সৈন্যরা তখন পলাইতেছে। স্থানীয় পুলিশ পাহারা-দাররাও পলাইতেছে। রিশ্‌নাউ গিন্নীর সম্পত্তি রক্ষা করিবে কে?

রুশ মেয়েরা হাতের কাছে ইঁটপাথর, দাকুড়ুল যা পাইল, তাই নিয়া ছুটিয়া আসিল। রিশ্‌নাউয়ের দুই দরোয়ান তাদের হাতে প্রাণ হারাইল। রিশনাউগিন্নী চটপট সরিয়া পড়ার যোগাড় করিতেছিল। রুশমেয়েদের মারমূর্ত্তি দেখিয়া সে তাদের পায়ে কাঁদিয়া পড়িল, অনেক টাকা পয়সাও ঘুঁষ দিতে চাহিল। কিন্তু রিশনাউ-গিন্নীর অত্যাচার ভুলিবার নয়। আজ সেই প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে।

বিজয়ী লালফৌজ যখন প্রবেশ করিল, তখন শানবাঁধানো মেঝেতে জমিদারগিন্নীর মৃতদেহ লুটাইতেছে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা] ১৫ই ফেব্রুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার, ৩রা ফাল্গুন '৫১ [দাম ছয় পয়সা

'মাথা গুঁজিবার ঠাঁই'

জার্ম্মানদের "মাথা গুঁজিবার জন্য আরও ঠাঁই চাই" (লিভিং রুম) এই রব তুলিয়া হিটলার অন্যান্য জাতির দেশ লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল...

এবার খাদ্যের ঘাটতি

ধান শতকরা ষোল ভাগ কম

তবু সমস্ত শহরে রেশনিং-এর পরিকল্পনা নাই !

ঘাটতির সুযোগে ধান চোরাগুদামে

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এবার বাংলার উৎপন্ন আমন চাউলের পরিমাণ ৭,০৯৩,৫০০ টন; অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টন কম। আউষ এবং আমন মিলাইয়া এবার মোট ৯,৭৪৭,৮০০ টন চাউল পাওয়া গিয়াছে। সচরাচর প্রতি বৎসর যাহা হয় এবার হইযাছে তাহার চেয়ে শতকরা ১৬ ভাগ বা ছয় ভাগের এক ভাগ কম। গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক খোরাক ৪০০ পাউণ্ড ধরিলে এক বৎসরে বাংলার জন্য লাগে ১০৫ লক্ষ টন। বীজধান সহ লাগে ১০৯ লক্ষ টন। এই হিসাবে এ বছর ঘাটতি পড়িবে ১২ লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, বাংলায় ঘাটতি পড়িলে সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু ইতিমধ্যে জোতদার ও অন্যান্য মজুতদারেরা বুঝিতে পারিয়াছে যে এ বছর ফসল খুব কম তাই তাহারা মজুতও শুরু করিয়াছে। এই ভাবে মজুত চলিতে থাকিলে ১৯৪৩ সালের পুনরাবর্ত্তন অনিবার্য্য।

গত বছরের উদ্বৃত্ত ধান চাউল সমস্তই যদি সরকার কিনিয়া রাখিত তাহা হইলে এ বছর মজুত করিয়া দাম বাড়ান অসম্ভব হইত, দাম বাড়িতে আরম্ভ করিলেই লোকে বাঁধা দরে সরকারী দোকান হইতে চাউল পাইত। কিন্তু গত বছর ইচ্ছা করিয়াই মন্ত্রীমণ্ডলী সমস্ত উদ্বৃত্ত ধান কেনে নাই, অথচ গতবার এত ধান হইয়াছিল যে উহা কেনা মোটেই শক্ত ছিল না। বাংলা সরকার গত বছর যে পরিমাণ ধানচাল কিনিয়াছে তাহাতে কলিকাতার রেশনিং চালান সম্ভব হইবে কিন্তু মফঃস্বলে বাঁধাদরে চাউল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না—যদি না, এ বছর আবার সরকারী এজেন্টরা আগষ্ট মাসের ভিতর তিন কোটি মণ চাউল কিনিতে পারে। তাহা যদি না পারে তবে বাঙ্গালীকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, যদি সময় মত ভাল বৃষ্টি হয় ত ভাল নতুবা আউষের ফসল গত সালের মত কম হইবে এবং তাহা হইলে সেপ্টেম্বর মাস হইতে দেখা দিবে ১৯৪৩ সালের মত মন্বন্তর।

বাকি ৭০টি শহরেও রেশনিং চাই

কলিকাতায় রেশনিং আছে বলিয়া এবার আর '৪৩ সালের মত মফঃস্বলের চাউল কলিকাতার চোরাবাজারীদের ঘরে জমিবে না, এইটিই হইল দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে মস্ত বড় রক্ষাকবচ। কিন্তু বাংলার কতকগুলি জেলাতে এবার ধান এত কম হইয়াছে যে '৪৪ সালের মত শুধু কলিকাতার রেশনিং-এ চলিবে না, মফঃস্বলেও চাউল পাঠাইতে হইবে। কলিকাতা লইয়া বাংলার মোট ৭টি শহরে রেশনিং আছে কিন্তু ১০,০০০ হাজার লোকের বেশী লোক বাস করে এমন শহরের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে ৭৭টি। তাহার ভিতর সত্তরটি শহরে রেশনিং নাই, এই সত্তরটি শহরে চাউল মজুত করিয়া চোরাবাজার চলিবে। চাউলের চোরাবাজার কি রকম সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে তাহার এক নমুনাও পাওয়া গিয়াছে। গত ২৯।১।৪৫ তারিখে উত্তরবঙ্গীয় চাউল-কল সমিতির সম্পাদক মিঃ আর, কে, আগরওয়াল ২৯শে জানুয়ারীর ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকায় এক চিঠিতে লিখিয়াছেন—'আমি ১১ টাকা মণ দরে ৫ লক্ষ মণ চাউল ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে পারি যদি কেহ যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।" সরকারী ক্রয়নীতি এবং চাউল-কল কণ্ট্রোল আইন সত্ত্বেও যখন এত চাল একজন চাউলকলের মালিক মজুত করিতে পারে তখন উৎপাদনের ঘাটতি এবং দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া মজুতদারেরা বছরের শেষে শকুনের মত চাউলের উপর পড়িবে তাহা আর এমন অসম্ভব কথা কি ?

১৯৪৪-এর ভুল

১৯৪৪ সাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে একটা সুযোগের বৎসর গিয়াছে। এই বছর দেশে প্রচুর চাউল হইয়াছিল এবং সরকার ইচ্ছা করিলেই সমস্ত শহরে রেশনিং-এর ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে নাই। আমরা যখন দাবী করিয়াছিলাম সমস্ত শহরে রেশনিং চাই তখন মিঃ সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি সদম্ভে বলেন—এবার চাউলের দর আপনা আপনি এত নামিয়া যাইবে যে সরকারী ক্রয় ও বণ্টন খুব অল্প করিলেই চলিবে। সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি সাহেব তখন কি এ চিন্তা করেন নাই যে ১৯৪৫ সালে আবার কম ফসল পাওয়া যাইতে পারে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে? সেদিন একজন সরকারী এজেন্টকে এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে 'জোতদার এবং কৃষকেরা আমাদের কাছে বিক্রী করিতে চাহে না। আমাদের এত টাকা এবং এত কর্ম্মচারী ছিল না যে দূর দূর গ্রামে যাইয়া ধান কিনি কিন্তু কৃষকরাও এমন অলস যে দূরে ধান আনিয়া আমাদের কাছে বিক্রী করিতে চাহে নাই।' সরকার গতবার ব্যবসায়ীর দয়াধর্ম্মের উপর বাংলার আমন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন যে 'লাইসেন্স ডিলার ও সাব্‌এজেন্টদের ফাঁকি ধরিতে পারি নাই বলিয়া ধান চাউল অনেক চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে।' আসল কথা গতবার তাঁহারা মজুতদারকেই প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, কৃষকের নিকট হইতে সরাসরি কিনিবার ব্যবস্থা না করিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে ধান ছাড়িয়া দিয়াছেন। ব্যবসায়ীরা সরকারকে ঠকাইয়া নিজেদের পসার বাড়াইয়াছে। নতুবা '৪৪ সালে এত ধান কেনা যাইত যে '৪৫ সালে বাজারের ধান স্পর্শ না করিয়াও বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইত।

ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করার ফল

'৪৪ সালে যে শুধু কম কেনা হইয়াছে তাই নয়,; সরকারী বিভাগের কৃতিত্বে সরকারী কেনা চাউল এত অখাদ্য হইয়াছে যে রেশন শপের চাউল লোকে কিনিতে চাহে নাই। বাংলার বাহির হইতে চাউল কেনার ভার যাহার উপর ছিল তিনি বাছিয়া বাছিয়া সস্তার অখাদ্য চাউল কিনিয়াছেন—অথচ রেশন শপে তাহারই দাম প্রতি মণ সওয়া ষোল টাকা। বাংলার ভিতর যাহারা কিনিয়াছেন তাঁহারা চাষীর নিকট হইতে বোরো ও আউষ কিনিয়া রেশন শপে আমনের সমান দরেই তাহা বিক্রি করাইতেছেন। লোকে অত দামে এই সব কিনিতে চায় না দেখিয়া সরকারী সরবরাহ বিভাগ অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের কাছে বেচিয়া দিয়াছে; ব্যবসায়ীরা এই চাউল আমনের সঙ্গে মিশাইয়া আবার সরকারের নিকট বেচিয়াছে; সেই চাল ১৬৷০ টাকা দরে রেশন শপে বিক্রী হইয়াছে।

ইহাই হইল জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করার ফল। মন্ত্রীরা এখন বলিতেছেন, গত বছরের মত দুর্নীতি এবার হইতে দিব না, মজুত ধরার জন্য ও দুর্নীতি দমনের জন্য এবার নূতন বিভাগ খুলিয়াছি। এই বিভাগের দুর্নীতি দমন করিবার জন্য আবার আগামী বৎসর আর এক বিভাগ খুলিতে হইবে, তথাপি '৪৫ সালে ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করিয়া মজুত দমন করা যাইবে না।

অথচ এবারও মন্ত্রীমণ্ডলী গত বৎসরের আমনক্রয় নীতির পরিবর্ত্তন করে নাই, গত বারের নীতি এবারও চলিবে। বাংলার সমস্ত শহরে রেশনিং চালু করার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা এবৎসরও স্বীকার করিতেছেন না। অথচ বছরের এই গোড়াতেই ঘাটতি জেলাগুলিতে চাউলের দর ১৫৲ টাকা হইতে ১৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সমস্ত শহরে ভালভাবে রেশনিং চালাইতে হইলে যে পরিমাণ চাউল কিনিতে হয় তাহা ব্যবসায়ীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কেনা যাইবে না, কাজেই মন্ত্রীরা সমস্ত শহরে রেশনিং চালাইবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন এবং নিজেদের এই দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্যই বলেন যে আমাদের ষ্টকে বিস্তর চাউল আছে, কোন ভয় নাই। তাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাজারে এখন ১৪৲ হইতে ১৭৲ পর্য্যন্ত দর উঠিল কেন আর রেশন চালের দরই সওয়া ষোল টাকার নীচে নামিল না কেন? ১৯৪৩ সালে সত্য গোপান করিয়া হক্ সাহেবের যে অবস্থা হইয়াছিল ১৯৪৫ সালে সত্য গোপন করিলে নাজিমুদ্দিনেরও সেই অবস্থা হইবে।

লীগের প্রচেষ্টা চাই

সমস্ত শহরে রেশনিং চালাইতে হইলে যে পরিমাণ চাউল দরকার তাহা যদি পাইতে হয় তাহা হইলে সরকারকে সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে চাউল কিনিতে হইবে। আমলাদের যদি এত লোক না থাকে যে দূর দূর গ্রামের হাট পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে তাহা হইলে মুসলিম লীগকে আগাইয়া আসিতে হইবে অন্যান্য দলের সঙ্গে যোগদিয়া কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সরকারী বিভাগে বিক্রী করিবার জন্য। দেশাত্মবোধের নামে কৃষকদের কাছে আবেদন করিতে পারিলেই কৃষককেরা তাহাতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবে। কিন্তু আমলাদের সে সাধ্য নাই, ব্যবসায়ীদেরও গরজ নাই।

সরকারী চাউলের দর কমাইতে হইবে, এবং সরকারী চাউলে যাহাতে ভেজাল না হইতে পারে সেজন্য সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সরকারী গুদাম পরীক্ষার

অধিকার দিতে হইবে। সমস্ত শহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের সর্ব্বত্র রেশনিং এর জন্য লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের সমবেত প্রচেষ্টা চাই। এ ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে না করা হয় তাহা হইলে নূতন নূতন বিভাগের পর বিভাগ খুলিয়াও মজুতদারের প্রতিপত্তি দূর করা যাইবে না; কিন্তু নাজিমুদ্দিন-সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি এ ব্যবস্থায় রাজী নন কারণ জনসাধারণের চাইতে মজুতদারের সাধুতার উপরই তাঁহাদের আস্থা বেশী। মজুতদারীর প্রতি মন্ত্রীদের এই দুর্ব্বলতা ছাড়াইবার দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী মুসলিম লীগের।

—ভবানী সেন

সম্পাদক সম্মেলনের এক দিক

(জনৈক বিশিষ্ট সংবাদিক কর্ত্তৃক সমালোচনা)

খুব ধুমধামের সঙ্গে কলকাতায় নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। খবরের কাগজের বড় বড় মালিকদের নানা ভঙ্গীর ছবিতে বোঝাই দৈনিক কাগজগুলো মাতামাতি কম করে নি। যেন স্বাধীনতার জয় যাত্রার একটা বিরাট অভিযান। আসল কথা, এর নামটাই ভুয়ো, এটা সম্পাদক সম্মেলন নয়, মালিক সম্মেলন। কেবলমাত্র সম্পাদকেরাই এর প্রতিনিধি হবেন, নিয়মতন্ত্র এ কথা বলে না। সমিতির সদস্য হ'ল সংবাদপত্রগুলি—সংবাদপত্রের তরফ থেকে যে কেউ প্রতিনিধি হতে পারেন। যারা একাধারে মালিক ও সম্পাদক তাদের বাদ দিলেও প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি ছিলেন ম্যানেজার ও ঐ শ্রেণীর লোকেরা। কেন না, সম্পাদকদের দায়ীত্ব কর্ত্তব্য অধিকার নয়, সংবাদপত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এর জন্ম।

*　　*　　*

যুদ্ধের এক বৎসর ভারতরক্ষা আইন, সেন্সর, সরকারী খবরদারীর উৎপাতের পর দেখা গেল, কাগজ না পেলে খবরের কাগজ চলবে না। প্রতিযোগিতা আছে, কেউ কারো মুখের দিকে চাইবে না। যার গুদামে বেশী কাগজ আছে সেই দাঁও মারবে। গভর্ণমেণ্টের দয়া ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া উপায় নাই। এদিকে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের মতিগতিও ভাল নয়। ১৯৩০-এর মত ব্যাপার দেখা গেলে—কাগজ বন্ধ করতে হলে জাতীয়তার ব্যবসা মাটি। প্রত্যেকের পৃথকভাবে সরকারী অনুগ্রহ ও সহৃদয়তা ভিক্ষা করা অশোভন—লোকে নিন্দা করবে। সহসা দিল্লী শহরে জাতীয় ও বিজাতীয় সংবাদপত্রের মালিকেরা একত্র হয়ে সরকারী দরবারে ধর্ণা দিলেন। মালিকেরা মিলিতভাবে আবেদন করলেন, আমরা মিত্রশক্তির অনুকূলে প্রচার কার্য্য করবো, যুদ্ধায়োজনের বাধা সৃষ্টি হয় এমন কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করবো না; বিনিময়ে গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাগজ সরবরাহ করবেন, মূল্য ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ঠিক করে দেবেন এবং হঠাৎ কারো কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে খাড়া আইন যেন জারী না করা হয়। প্রাদেশিক পরামর্শ সমিতির সঙ্গে প্রাদেশিক সংবাদপত্র নিয়ন্তারা যেন পরামর্শ করেন। এই আবেদনে গভর্ণমেণ্ট খুসী হলেন। "ভদ্রলোকের চুক্তি" অনায়াসে হয়ে গেল। সরকারী সূতিকাগারে সম্পাদক-সম্মেলন ভূমিষ্ঠ হ'ল। আদর করে নাম নাম রাখা হল "ওয়ার বেবী।" আজ বেবীর বয়স পাঁচ বছর।

●

কিন্তু কাজের বেলায় 'ভদ্রলোকের চুক্তিতে' সংবাদপত্রগুলি যত নরম হলেন, গভর্ণমেণ্ট তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ হস্তে আইনের কশা উদ্যত রেখে তাঁরা বাম হস্তে কাগজের দরাজ কোটা ও বিজ্ঞাপন বর্ষণ করতে লাগলেন। বড়দের হাত করে রাজনৈতিক কারণে অবাঞ্ছনীয় ছোট ছোট কাগজদের দমন করা চলতে লাগলো। এমন সময় এলো—আগষ্ট হাঙ্গামা। সম্পাদক সম্মেলনের ঢাল সম্মুখে রেখে, বড় বড় মালিকরা ফাঁড়া কাটালেন। গভর্ণমেণ্ট তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন,--শীর্ণকায়া কাগজ চড়া দামে বেচে, বিজ্ঞাপনের চল্‌তি হার বাড়াও, সরকার অনেক টাকা বিজ্ঞাপন খরচ করবেন;—বড়দের জাতীয়তার কারবার লাল হয়ে উঠলো। ছোটরা প্রথমে দরখাস্ত হাতে দিল্লীতে কাগজের জন্য কাঁদাকাটি করতে লাগলো। অনেকেই মরলো, কেউ কেউ সরকারী মুষ্টিভিক্ষায় ডেষ্টিটিউটদের মত শীর্ণ কলেবরে বুকের ধুক্‌ধুকি বজায় রাখলো।

●

সংবাদপত্রের বাড়তি মুনাফা এত বেড়ে গেল যে কর্ত্তারা খাতাপত্রের সব রকম কারচুপী করেও "একসেস্ প্রফিট ট্যাক্স" দিতে বাধ্য হলেন। দুঃস্থ কর্ম্মচারীদের অনেক আবেদন নিবেদনের পর বাড়তি মুনাফার দিকে দৃষ্টি রেখে মালিক সমিতি (ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি) সুপারিশ করলেন দেশীভাষার কাগজে সর্ব্বনিম্ন বেতন ৭৫৲ আর ইংরাজীর ১০০৲ করা হোক। এই তারতম্যের তীব্র অথচ অক্ষম প্রতিবাদ দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সাংবাদিকেরা করলেন। এবারের সম্মেলনে এই তারতম্য রহিত এবং সাংবাদিকদের বেতন, ভাতা, ছুটি, কাজের সময় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করে দেবার দাবী নিয়ে দুটি প্রস্তাব সম্মেলনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সাংবাদিকদের অবস্থা ভাল করার প্রস্তাব দুটী নিয়ে ৫ ঘণ্টা আলোচনা হ'ল। দু'জন মালিকের গর্জ্জনে দু'জন সম্পাদকের তর্জ্জন নিভে গেল। মালিকদের ঔদার্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করেও ফল হ'ল না। প্রকাশ্য সভায় কিছু কানাকানি ও ইসারা ইঙ্গিতের পর প্রস্তাবকগণ হেটমুণ্ডে নতি স্বীকার করে প্রস্তাব তুলে নিলেন। আশ্বাস পাওয়া গেল, মালিকেরা সুবিচার করবেন।

আজকাল ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল, ওষুধের কারখানা, খবরের কাগজ সবই 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' এবং মালিক বা পরিচালক সকলেই গড়পড়তা জাতীয়তাবাদী। সকলেই গভর্ণমেণ্টের ঘরে অতিরিক্ত মুনাফা কর তুলে দেয়, নিতান্ত দায়ে না পড়লে শ্রমিকের মজুরী বাড়ায় না। তবে ইদানীং কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ শহরে বিশেষভাবে ও অন্যত্র সাংবাদিকদের বেতনের হার বেড়েছে। তার কারণ মালিকদের ঔদার্য্য নয়—সংবাদিকরা বেশী বেতনে অন্যত্র চলে যাবে, এই আশঙ্কা।

(৭ এর পৃঃ দেখুন)

স্বাধীনতা দিবসে 'বর্জ্জন-নীতি' পরাস্ত

কমিউনিষ্ট বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমে কংগ্রেসকর্ম্মীদের আগ্রহ

প্রায় দুই মাস আগে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের 'কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলনে' কমিউনিষ্টদের সহিত রাজনীতিক সংস্পর্শ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রধান উদ্যোক্তা ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ঘোষণা করেন—"কমিউনিষ্টরা অগাষ্ট সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; উহাদিগকে রাজনীতিক, আর্থিক ও সামাজিক—সকল রকমেই বয়কট করিতে হইবে।"

বহু কংগ্রেসকর্ম্মী বর্জ্জন-বিরোধী

যে সংগ্রাম কংগ্রেসের নির্দ্দেশে হয় নাই সেই সংগ্রামেই যোগ না দেওয়ার 'অপরাধে' কমিউনিষ্টদিগকে কি করিয়া কংগ্রেস হইতে বর্জ্জন করা যায় তাহা অনেক সত্যাশ্রয়ী কংগ্রেসকর্ম্মীই বুঝিতে পারেন নাই। বাংলার বহু কংগ্রেসকর্ম্মী ইহাও দেখিয়াছেন যে অগাষ্ট-পরবর্ত্তি দমননীতির অন্ধ প্রতিক্রিয়ায় দেশের অনেকেই যখন কংগ্রেসের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী স্বাধীনতার আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছিলেন তখন কমিউনিষ্টরাই কংগ্রেসের আদর্শ জাগরূক রাখিয়াছে। যখন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু অন্যান্য অনেক কংগ্রেসকর্ম্মির প্রতি অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বাংলাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব তাঁহারা পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তখন কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরাই কংগ্রেসের জনসেবার মহান আদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কাজে যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী ব্যস্ত থাকেন তাঁহারা অনেকেই দেখিয়াছেন যে কমিউনিষ্টদের বাদ দিয়া কংগ্রেসের জনসেবাকার্য্যে পূর্ণ সাফল্য পাওয়া যায় না, জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও দ্রুতগতিতে বাড়ানো যায় না।

এ কথা এত সত্য যে বর্জ্জন আন্দোলনের হোতা ডাঃ প্রতাপ গুহ রায় পর্য্যন্ত উপরোক্ত প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরও ময়মনসিংহ মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থীদের জয়লাভের জন্য কমিউনিষ্টদের সহযোগিতায় কাজ করিয়াছেন এবং এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য দেখিয়া তিনি নিজেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাজ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করিয়াছেন।

এই সব কারণেই বাংলার বহু কংগ্রেসকর্ম্মী কমিউনিষ্ট বর্জ্জন প্রস্তাব মনে মনে মানিয়া লইতে পারেন নাই। এবং গত দুই মাসের প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়া তাঁহারা ক্রমশঃই কমিউনিষ্টদের আরও নিকটে আসিয়াছেন। তাহাতে কংগ্রেসের শক্তি ও আদর্শই যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহা এবারকার স্বাধীনতা দিবসের সাফল্যজনক অনুষ্ঠানের বিবরণ হইতেই বোঝা যায়।

ঐক্য-বিরোধে কিরণ বাবুর ব্যর্থতা

কলিকাতায় শ্রী কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একত্রে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে রাজি হন নাই, জেলায় জেলায় তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদেরও হয়তো সেই উপদেশই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই কলিকাতায়ই দলাদলির সমস্ত বিধিনিষেধ স্বাধীনতা দিবসের পূণ্য আদর্শের কাছে পরাজিত হইয়াছে। সকল দল ও সকল শ্রেণীর নরনারী একত্র হইয়া কলিকাতার প্রতিটী পাড়ায় প্রভাত-ফেরী বাহির করিয়াছে। লোকে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছে স্বাধীনতা দিবসের এত পতাকা, এত অনুষ্ঠান বহুদিন দেখি নাই। দলাদলির প্রধান কেন্দ্র স্কুল কলেজগুলিতে পর্য্যন্ত কোনো পার্থক্য হয় নাই, সকল দলের ছাত্র একত্র হইয়া অনুষ্ঠান করিয়াছে, স্বাধীনতার সংকল্প লইয়াছে।

দিনাজপুরের যে সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী কিরণবাবুর সম্মেলনের নির্দ্দেশমত আলাদা কংগ্রেস কর্ম্মীসংঘ গড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের ঐক্যের আদর্শ ভুলিতে পারেন নাই। কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া মিছিল, সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অগাষ্ট আন্দোলনের উত্তেজনার সময় কংগ্রেস নেতা শ্রীনরেন সেন কমিউনিষ্টদিগকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আজ ১৯৪৫-এর স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিষ্টদের সহিত হাত মিলাইবার জন্য তিনিই সকলের অগ্রণী হইয়াছেন।

দলাদলির চেয়ে দেশপ্রেম বড়

নেত্রকোণায় মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশ ধর সকলের সমবেত জনসভায় পতাকা উত্তোলন করেন, আবার কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসেও তাঁহারই পৌরহিত্যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়। ময়মনসিংহ শহরে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির সংযুক্ত মিছিল শহরে পরিভ্রমণ করে। মিছিলের শেষে বিরাট সম্মিলিত জনসভায় এসেম্বলির কংগ্রেসী সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র লাহিড়ী সঙ্কল্প পাঠ করেন। এই ঐক্যের মধ্যে বিভেদের পরিহাসকর প্রয়াস পায় সুভাষপন্থী আর-এস-পি দল, মাত্র জন চল্লিশেক লোক লইয়া তাহারা আলাদা শোভাযাত্রার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিশোরগঞ্জেও আর-এস-পি পন্থীদের আলাদা সভা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা দিবস পালনের বিপুল সাফল্যের খবর আসিয়াছে পটুয়াখালি, গৌরনদী, বগুড়া, যশোহর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বাংলার অধিকাংশ স্থান হইতে। বাঁকুড়ায় কিরণশঙ্করপন্থী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় কিছুটা গোলমাল করিলেও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সিংহ স্বয়ং অসুস্থ শরীর লইয়াও সংযুক্ত শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান।

স্বাধীনতা সমর্থনে লীগকর্ম্মী

বহু জায়গায় লীগকর্ম্মীরা পর্য্যন্ত স্বাধীনতার সঙ্কল্পে সমর্থন জানাইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লীগদল ভোট দিয়াছে বটে, কিন্তু লীগের অনুষ্ঠানও কর্পোরেশন পালন করিবে এইরূপ ভ্রাতৃত্বমূলক আশ্বাস দিলে ইহা কখনই ঘটিত না। বরিশালের গৌরনদী, মাহিলাড়া, সৈদেরগাঁও প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবসের সভায় লীগের সম্পাদক, সভাপতি প্রভৃতি স্বাধীনতার সঙ্কল্প সমর্থন করেন। যখন কিরণবাবুর সম্মেলন লীগের সংস্পর্শ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে তখনই চট্টগ্রাম জেলা লীগের সম্পাদক ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব স্বাধীনতা দিবসে অভিনন্দন জানাইয়া বাণী পাঠাইয়াছেন।

সারা-বাংলায় ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা দিবসের এই বিরাট সাড়া। আর যেখানেই বিভেদের মনোভাব বাধা দিয়াছে সেখানেই কংগ্রেসকর্ম্মীরা হয় টিম টিম করিয়া কোনো রকমে অনুষ্ঠান রক্ষা করিয়াছেন আর নয়তো তাঁহাদেরই নাম লইয়া ফরওয়ার্ড ব্লক আর-এস-পি প্রভৃতি দল কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছে।

বিভেদে কংগ্রেসেরই শক্তি হানি

চট্টগ্রামে সকল দলের ছাত্রেরা দলাদলি ভুলিয়া একত্রে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। কিন্তু কর্ম্মী-সংঘের প্রবীণ নেতারা ক্ষুদ্র সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একত্রে সভা অনুষ্ঠানে রাজী হইলেন না। আমাদের রিপোর্টার লিখিয়াছেন, "কর্ম্মী সঙ্ঘের নেতারা পাঞ্চজন্য অফিসের অপরিসর প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিলেন। ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ২ জন ছাত্র কংগ্রেসের নেতা ও ও কর্ম্মী সম্মেলনের সম্পাদক সুশান্তবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে আরও তিন জন নেতা আসিলেন। অবস্থা দেখিয়া দমিয়া গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ম্মীরা ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়া কোনো রকমে পতাকার সম্মান বাঁচাইলেন। অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে লালদিঘীর পাড়ে বিকাল বেলা হাজার লোকের সভা—দলে দলে কংগ্রেসের বাণী শুনিতেছে, কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাব কোন্ পথে কাহারা বাড়াইতেছে তাহা কি কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল?"

ডাঃ প্রতাপ গুহ রায়ের নিজ জেলা ফরিদপুরে শ্রীনিবারণ পাল এখন জেলা কংগ্রেসের নেতা। তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালনে নারাজ

সম্পাদকীয়-

কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একত্রে চলিতে আপত্তি নাই। একত্রে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য অনেক অনুরোধের পর তিনি কমিউনিষ্টদের বলেন, "আপনারা যদি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই এই ধ্বনি না দেন তবে একত্রে স্বাধীনতা দিবস পালন করা যাইতে পারে।" স্বয়ং গান্ধীজি জেলের বাহিরে আসিয়াই "কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিবার" দাবী করিয়াছেন, কিন্তু সেকথা নিবারণ বাবুকে বোঝানো বৃথা। কাজেই কমিউনিষ্টরা তাঁহার সর্ত্তেই রাজি হয়। এবং সারা দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে কোথাও তাহারা এই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাই, অথচ প্রধানত তাহাদেরই চেষ্টায় স্বাধীনতা দিবসে যত বড় শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে গত দুই বৎসরে ফরিদপুর শহরে সেরূপ দেখা যায় নাই।

কংগ্রেস অনুষ্ঠানে সুভাষ বাবুর জয়!

নিবারণ বাবু ফরওয়ার্ড ব্লক পন্থীদিগকে অবশ্যই শোভাযাত্রায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহারা পতাকা উত্তোলনের আগে "সুভাষ বাবু কী জয়" ধ্বনি করিতে থাকে। তাহাতে অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী অত্যন্ত বিরক্ত হন কিন্তু তবুও নিবারণ বাবু ফরওয়ার্ড ব্লক "কংগ্রেসের" নেতা শ্রীযদু পালকে দিয়া পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান করান। নিবারণ বাবু স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে "সুভাষ বসু কী জয়" ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন করেন।

কিন্তু উঁহাদের কংগ্রেস-বিরোধী আতিশয্যে শেষ পর্য্যন্ত নিবারণ বাবুরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। বিকালে বিরাট জনসভার শেষে উঁহারা আবার সুভাষ বাবুর জয়ধ্বনির করিলে নিবারণ বাবু বিরক্ত হইয়া বলেন, "ইহাদের সহিত ভবিষ্যতে কখনও কাজ করা হইবে না।" নির্য্যাতিত রাজবন্দীদের সাহায্যের জন্য কমিউনিষ্টরা ঐদিন জনসাধারণের মধ্য হইতে প্রায় ষাট টাকা তুলিয়া জিলা কংগ্রেসে জমা দেয়। অপর পক্ষে জিলা কংগ্রেসের অনুমতি ব্যতীতই ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী ছাত্রেরা পতাকা বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে কিন্তু জিলা কংগ্রেসের জন্য এক পয়সাও তুলিতে রাজী হয় না। এজন্য নিবারণ বাবু পর্য্যন্ত বিরক্ত হন।

স্বাধীনতা দিবসে সৌম্যেন ঠাকুরপন্থী "লাল নিশান" লিখিয়াছে—"এদেশের ধনীদের প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস...প্রতারণা করে বিভ্রান্ত করেছে জনসাধারণকে। হাজারে হাজারে যারা প্রাণ দিল...তাদের দেশপ্রেমকে আজ কংগ্রেস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে।"

সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির চাকার নীচে যাহারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের দেশপ্রেমের সম্মান কংগ্রেস, গান্ধীজি ও প্রত্যেকটি দেশবাসীই দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদেরই দেশপ্রেমকে যাহারা সংগ্রামের নামে ফ্যাশিষ্টদের সাহায্যে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আর বর্ত্তমান দিনে কংগ্রেসকেই হেয় করিবার চেষ্টায় লাগাইতেছে, বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মী কি তাহারই সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কংগ্রেসের শক্তি বাড়াইতে পারিবেন?

এবারের স্বাধীনতা দিবসেই ফরওয়ার্ড ব্লক বে-আইনী ইস্তাহারে লিখিয়াছে: "...অগাষ্ট বিপ্লবে যোগ দিয়ে যাঁরা কারাগারে রয়েছেন—তাঁদের মুক্তি ভিক্ষা করে তাঁদের অপমান করতে চাইনা, বরঞ্চ তাঁদের আদর্শ হবে আমাদের সংগ্রামের পথে অনুপ্রেরণা। এই দিনে সব চাইতে বেশী স্মরণ করি বিপ্লবী নেতা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে যাঁর ভারত-ত্যাগ লেনিন, শিবাজীর মতই একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর নেতৃত্বে "আজাদ হিন্দ বাহিনী" ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে কাজ করছে।"

কংগ্রেস আদর্শ কে রাখে

অগাষ্ট সংগ্রামের দিনে ফরওয়ার্ড ব্লক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল, এই দুর্ব্বলতায় যেসব কংগ্রেস-কর্ম্মী আজ উহাদের সঙ্গেও মিলনের কথা ভাবিতেছেন তাঁহারা কি এই 'আজাদ হিন্দ বাহিনীর' দাসত্বের আশায় সংগ্রামে নামিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই নামেন নাই। প্রত্যেকটী দেশভক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীই এই মনোভাবকে ঘৃণ্য দাস মনোভাব বলিয়া জানিয়াছেন, কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শের অপমান বলিয়া ভাবিয়াছেন। আজ ইহাদের সঙ্গে মিলিলে সেই অপমানই তাঁহাদের সহিতে হইবে।

কমিউনিষ্টরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের ঐক্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী আদর্শকেই জনতার মধ্যে বহিয়া লইয়া গিয়াছে; সভা, শোভাযাত্রা ও উৎসাহের ভিতর দিয়া কংগ্রেসেরই শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে; অপ্রিয় সর্ত্ত আসিলেও কংগ্রেসের শৃঙ্খলা মানিয়া কংগ্রেসেরই গৌরব বাড়াইয়াছে।

ইহার পরও কি দেশভক্তের মনে সন্দেহ থাকিতে পারে—কংগ্রেসের পতাকা কাহারা বহিতেছে?

আসাম ও জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের বিরুদ্ধে

গত ২৭শে জানুয়ারী আসাম প্রদেশের **নওগাঁর** বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা **শ্রীযুক্ত মহীচন্দ্র বরা** এম-এল-এ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'জেল হইতে মুক্তিলাভের পর গত দেড় বছর আমি বিভিন্ন জেলায় কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আসিতেছি। দুর্গত দেশবাসীর সেবায় এবং প্রত্যেকটি মুখ্য রাজনৈতিক প্রশ্নে সকল শ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে কমিউনিষ্টরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এসেম্বলির নভেম্বর অধিবেশনে সুরমা উপত্যকায় ধানচাল ক্রয় করার প্রশ্নে ও জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে কমিউনিষ্টরা যাহা করিয়াছে, তাহাতে সত্যই তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়। ধানচাল ক্রয়ের প্রশ্নে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য এসেম্বলি সভ্যদের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য কমিউনিষ্টদের যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্য।...

কমিউনিষ্টদের খাঁটি দেশপ্রেম সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে মনান্তর ঘটিলে তাহাতে শুধু স্বাধীনতার শত্রুদেরই লাভ। জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে ব্রত কমিউনিষ্টরা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের এই কাজে পরিপূর্ণ সাফল্য আমি কামনা করি।'

* * *

জলপাইগুড়ী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও কংগ্রেস কর্ম্মী সঙ্ঘের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য **শ্রীযুক্ত প্রীতিনিধন রায়** গত ১লা জানুয়ারী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসে বরাবরই বিভিন্ন পার্টির স্থান ছিল এবং সে ঐতিহ্য কখনই ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। ইহা সত্য যে, কমিনিউষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্বন্ধে অ-কমিউনিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে কিছুটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। এই অবিশ্বাসের ভাব দূর করিতেই হইবে। তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, এই মতানৈক্য খুব শীঘ্র দূর হইয়া যাইবে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।' তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেসের শক্তির মূল উৎস জনসেবা। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে ধ্বংসোন্মুখ দেশকে বাঁচাইতে হইলে কংগ্রেসের বাহিরে অন্যান্য শক্তিগুলির সহিত একযোগে নিজেদের নিয়োগ করিতে হইবে।

* * *

আসামের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা **শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই** এক বিবৃতিতে বলেন যে, যাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও—তাহাদের ঘৃণা করা ত' উচিতই নয়, তাহাদের বর্জ্জন করাও অন্যায়। তিনি বলেন, নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ও কংগ্রেসের উন্নতির জন্য তিনি সকলের নিকট হইতেই সত্যের আলোক লাভ করিতে উৎসুক। শ্রীযুক্ত বরদলই বলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনরূপ কূট তর্কই আমাকেবিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে, ভারতবর্ষে আমরা জনযুদ্ধ চালাইতেছি। পক্ষান্তরে, আমাদের লক্ষ লক্ষ অসহায় বুভুক্ষু দেশবাসীর সমস্যার ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে ঐক্য ও সমবেত প্রচেষ্টা দরকার—আমাদের কমিউনিষ্ট বন্ধুরা যে সত্যের দিকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন—তাহার গুরুত্বকেই বা আমি কি করিয়া অগ্রাহ্য করি? কাজেই একটি বিশেষ পার্টিকে সমগ্রভাবে দোষী সাব্যস্ত

[শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ঐক্য চাই না, নেতাদের মুক্তি চাই না, সমবেত দেশসেবা চাই না !

খুলনায় ছাত্র "কংগ্রেসের" অধিবেশনে সিদ্ধান্ত

গত ২৮শে জানুয়ারী খুলনা গান্ধী পার্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে খুলনা জিলা ছাত্র কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। ছাত্রকংগ্রেস 'কমিউনিষ্ট' ছাত্রফেডারেশনের বিরুদ্ধে 'জাতীয়তাবাদী' ছাত্রদের সংগঠন করিবার দাবী লইয়া সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। বাংলার ছাত্র কংগ্রেসের ইহাই প্রথম অধিবেশন। খুলনায় ছাত্রকংগ্রেসের পিছনে জিলার বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা প্রায় সকলেরই সক্রিয় সমর্থন আছে। ছাত্রকংগ্রেসের কর্ম্মীরা সাধারণ ভাবে প্রায় সকলেই কংগ্রেসী বলিয়া পরিচিত। এমন কি এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারও হইয়াছিল যে, কংগ্রেস বেআইনী বলিয়া ছাত্রকংগ্রেসের নামে আসলে কংগ্রেসেরই সম্মেলন হইতেছে। বহু ছাত্র এই প্রচার বিশ্বাস করিয়া সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। সম্মেলনের সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনাই কংগ্রেসের মত বলিয়া ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

ছাত্রফেডারেশনের আহ্বান

সম্মেলন উপলক্ষে জিলা ছাত্রফেডারেশন ছাত্রকংগ্রেসের কর্ম্মীদের কাছে ঐক্যের আহ্বান জানায়। তাহারা প্রস্তাব করে যে দুঃস্থ দেশসেবীর সেবা, শিক্ষা জীবন রক্ষা ও জাতীয় নেতাদের মুক্ত করিবার কাজে খুলনার দুইটি বৃহৎ ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রফেডারেশন ও ছাত্রকংগ্রেসের এক হওয়া প্রয়োজন, কারণ কাহারই একক চেষ্টায় এই কাজে সমস্ত ছাত্রকে সংগঠিত করা যায় না। প্রত্যেকেরই আশা ছিল যে আজ অন্তত দুঃস্থ দেশ-বাসী ও ছাত্রসমাজের সেবায় দুইটি ছাত্রপ্রতিষ্ঠান এক হইবে।

কিন্তু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত এই আশাকে ধূলিসাৎ করে। ছাত্রফেডারেশন তার ঐক্যের প্রস্তাব লইয়া সমস্ত নেতৃবর্গ ও সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে।

রিলিফের উদ্দেশ্য দল গড়া !

ছাত্রকংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও জিলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়া সম্মেলনে এই ঐক্যের প্রস্তাব সমর্থন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি সাফ জবাব দেন যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না সুতরাং সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতেও পারিবেন না। খুলনার ছাত্রদের দুরবস্থার কথা বলাতে তিনি বলেন, "রিলিফের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন কি ? রিলিফের আসল উদ্দেশ্য তো যার যার প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধিকরা। খুলনা জেলায় ১৮০০টি গ্রাম আছে। তোমরা তাকে আধাআধি ভাগ করে নাও না কেন ? তা' হ'লে ঝগড়াও হবে না, ঐক্যেরও প্রয়োজন হবে না।"

দেশের দুর্দ্দশা ও তাহা মোচনের জন্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধাই সম্মে-লনের প্রতিটি আলোচনার মধ্যে ফুটিয়া ওঠে। তাই বোধহয় সম্মেলন মণ্ডপে জাতীয় নেতাদের কোন ছবি, এমনকি একটি জাতীয় পতাকা পর্য্যন্ত ছিল না।

ঐক্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

সম্মেলনের প্রতিটি বক্তা ছাত্রফেডারেশনের ঐক্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ছাত্রফেডারেশনকে তীব্র আক্রমণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রভুরঞ্জন সেন বলেন, ছাত্রফেডারেশনের ঐক্যের বুলি একটা ধাপ্পাবাজী। ঐক্য কিসের জন্য ? কার সঙ্গে ? ফ্যাশিজম্‌কে রুখিবার জন্য ? নেতাদের মুক্তি ভিক্ষার জন্য ? শয়তানের সঙ্গে ঐক্য হয় না।

বর্দ্ধমানের মৌলবী আব্দাস সাত্তার বলেন, ছাত্র ফেডারেশন তার জন্মের দিন হইতে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছে। (সাত্তার সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে ছাত্রফেডারেশনের এই তথা-কথিত কংগ্রেস-বিরোধীতার যুগে তিনি নিজেও ছাত্রফেডারেশনের একজন নেতা ছিলেন।)

সমস্ত ছাত্র সমাজের দুর্ভাগ্য যে ছাত্রকংগ্রেস ছাত্রফেডারেশনের বন্ধুত্বের হাত প্রত্যাখান করে। যে ভাবে ঐক্যের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহাতে মনে হয় যে ছাত্র কংগ্রেসের কর্ম্মীগণ ঐক্যবদ্ধ দেশসেবা হইতে ক্ষুদ্র দলগত দাম্ভিকতাকেই বড় বলিয়া মনে করেন।

ছাত্র কংগ্রেসের 'নির্দ্দেশ'

ছাত্র কংগ্রেসের এই সম্মেলন তাহাদের পতাকাতলে 'ঐক্যবদ্ধ' খুলনার সমস্ত ছাত্রকে কি নেতৃত্ব দিয়াছে ?

জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী আজ সমস্ত দেশের সার্ব্বজনীন দাবী। কিন্তু এই প্রশ্নের উপরে সম্মেলনে কোন প্রস্তাব বা বক্তৃতা তো হয় নাই, বরং এই দাবীর বিরোধীতা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মৌলবী আব্দাস সাত্তার বলেন, "নেতাদের মুক্তি চাহিয়া তাঁহাদের গৌরব ম্লান করিও না। তাঁহারা জেলে পচুন, সেও ভাল।"

যে জাতীয় সরকারের দাবীকে ব্যর্থ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করে, সেই জাতীয় সরকারের দাবীর সমর্থনেও কোন প্রস্তাব বা বক্তৃতা হয় নাই।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দাবী আজ সমস্ত মরণোন্মুখ দেশের দাবী। কিন্তু এই দাবীর সমর্থনও সম্মেলনে ঘোষিত হয় নাই। বরং সাত্তার সাহেব এই দাবীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে দেশের অনৈক্যের কথা বলিয়া ছাত্রফেডারেশন সরকারকে সাহায্য করিতেছে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের কথা বলা জাতীয়তা বিরোধী।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত। আজ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই বোনের একমাত্র আবেদন 'আমাদের পুনরায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর'। কিন্তু দেশবাসীর এই কাতর ক্রন্দন ছাত্রকংগ্রেসের কর্ম্মীদের মনে কোন সাড়াই জাগায় নাই। সম্মেলনে রিলিফ বা পুনর্গঠনের কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই। একমাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেশের লক্ষ লক্ষ ভাইবোনের অপমৃত্যুর জন্য সাম্রাজ্যবাদী অব্যবস্থাকে দায়ী করিয়া। আমাদের দেশেরই যে অসংখ্য ভাই-বোন আজ গৃহহীন অন্নহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি শুধুমাত্র 'গভীর নিন্দা' প্রকাশই তাহাদের ক্ষুধার অন্ন বা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দিবে না। তাহার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভাবে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। কিন্তু ছাত্রকংগ্রেসের দেশপ্রেম নিন্দা প্রকাশেই আপন দায়িত্ব শেষ করিল।

সর্ব্বোপরি ছাত্র সম্মেলনে ছাত্রদের সমস্যার আলোচনাই চিরকাল প্রাধান্য পায়। কিন্তু ছাত্রদের জীবনের কোন সমস্যাই এই সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। রুগ্ন, দরিদ্র শিক্ষকদের রিলিফ দেবার প্রশ্ন, গ্রামাঞ্চলে স্কুলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রশ্ন, ছাত্রদের সাংস্কৃতিক জীবন রক্ষা করিবার প্রশ্ন, এবং ছাত্র জীবনের এই জাতীয় আরও সহস্র সমস্যা কোনটাই এই সম্মেলনে আলোচিত হয় নাই।

গঠনমূলক কাজ কাহার জন্য ?

সম্মেলনে গান্ধীজীর গঠনমুলক কর্ম্মসূচীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কর্ম্মসূচীকে দেখা হইয়াছে এক কল্পিত 'সংগ্রামের' প্রস্তুতি হিসাবে, দেশ-বাসীর জীবনকে উন্নত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নয়। ছাত্র কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, যশোহরের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আগষ্ট বিপ্লব' ব্যর্থ হয় কারণ কমিউনিষ্টরা শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের এই 'বিপ্লবে' যোগ দিতে দেয় নাই। গঠনমূলক কর্ম্মসূচীর উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্য হইতে কমিউনিষ্টদের প্রভাব উচ্ছেদ করা এবং যুদ্ধ অবসানের পরে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

বক্তার পর বক্তা গান্ধীজীর গঠনমুলক কাজের এই 'ব্যাখ্যা' করেন. তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন যে বিহার সরকারও গান্ধীজীর গঠনমুলক কাজের এই অপব্যাখ্যা করিয়া সেখানকার কংগ্রেস নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আর যুদ্ধ-পরবর্ত্তি কালের 'সংগ্রামের' প্রস্তুতির কথা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য ছাত্রদের কি কিছুই করার নাই ? এই উপদেশের সোজ অর্থ: বর্ত্তমান অবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লও এবং যদি পার তবে 'আগামী সংগ্রামের' জন্য সংগঠিত হও। আজ দুর্ভিক্ষ মহামারী ও সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে দেশ গুড়াইয়া যায় যাক ! সে সম্বন্ধে ছাত্রদের কিছুই করিবার নাই। তাহাদের একমাত্র কাজ হইল কমিউনিষ্ট নিধন। এই নির্লজ্জ উপদেশই ছাত্র কংগ্রেসের নেতারা কংগ্রেসের নামে ছাত্রদের দিলেন।

কমিউনিষ্ট-বিরোধিতার পরিণতি

জাতির জীবনের সমস্ত জীবন্ত সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া ছাত্রকংগ্রেস ছাত্রসমাজের কাছে এক মাত্র কর্ম্মসূচী পেশ করিল: 'আগামী সংগ্রামের' জন্য প্রস্তুত হও এবং এই প্রস্তুতির জন্য কমিউনিষ্টদের ধ্বংস কর। বক্তার পর বক্তা উঠিয়া দুনিয়ার সমস্ত রকম কদর্য্য কাজের জন্য কমিউনিষ্টদের দায়ী করিয়া বক্তৃতা দিলেন। ছাত্রদের জীবনের দুঃখবেদনার কোন কথা নাই, দেশসেবার কোন আহ্বান নাই, শুধু একমাত্র আওয়াজ, 'কমিউনিষ্টদের ধ্বংস কর।' এই উন্মত্ততা মানুষের সহজ বুদ্ধিকে কতদূর বিকৃত করিতে পারে তাহার পরিচয় পাইলাম সম্মেলনের পরে দৌলতপুর কলেজে গিয়া।

দৌলতপুর কলেজে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কয়েকজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথের 'মরু বিজয়ের কেতন' গানটি গাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট-বিরোধীরা প্রবল আপত্তি তোলেন, 'ও গান কমিউনিষ্টরা গায়, সুতরাং ও গান চলবে না।' কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষের মনোবিকার শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র বিদ্বেষে পরিণত হইল !

এই ভাবে কমিউনিষ্ট-বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করিয়া বাংলার ছাত্র কংগ্রেস তাহার প্রথম জিলা সম্মেলনে তাহাদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য শেষ করিল।

'কাজের কথা কিছুই হ'ল না'

সম্মেলনের পরে সম্মেলন সম্বন্ধে কয়েকজন প্রতিনিধির ধারণা জিজ্ঞাসা করিলাম। ছাত্র কংগ্রেসের জনৈক কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সম্মেলন তো হয়ে গেল। এখন এই সব স্কুলের ছেলেরা গ্রামে ফিরে গিয়ে কি করবে, তাদের অনেকের গ্রামেই তো কমিউনিষ্ট নেই।" তিনি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সত্যি, খালি গালাগালই হ'ল। কাজের কথা কিছুই হ'ল না।" খুলনার বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু কিশোর ছাত্র কংগ্রেসের নামে সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। সম্মেলনে কংগ্রেসের দেশসেবার কথাই তাহারা শুনিবে আশা করিয়াছিল। কিন্তু সম্মেলনের আলোচনায় তাহারা হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলে তাহারা আগ্রহের সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের ঐক্যের প্রস্তাব কিনিয়া পড়ে এবং পড়িয়া তাহাদের স্বভাবসুলভ সরলতার সঙ্গে বলে, "এই তো ঠিক কথ, সৎকাজে সকলের এক হওয়া উচিত।" বাহিরদিয়া, সেনহাটি, রঙ্গদিয়া, কাটিপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রতিনিধিরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের তাহাদের গ্রামে আহ্বান করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ফিরিয়া গিয়া তাহারা সমস্ত ছাত্রের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করিবে।

ঐক্যের এই আগ্রহের আরও পরিচয় পাইলাম। সম্মেলনের পরদিন গান্ধীপার্কে ২৫০০নাগরিক ও ছাত্রের এক সভায় ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল এবং খুলনার শ্রীযুক্ত চারু বিষ্ণু প্রমুখ কয়েকজন প্রবীন কংগ্রেস নেতা এই উন্মত্ত কমিউনিষ্ট বিরোধীতার তীব্র নিন্দা করিয়া সমস্ত ছাত্রকে বাংলা পুনর্গঠনের নামে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। ছাত্রকংগ্রেসের সম্মেলনের বহু প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তাহারা এই ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেন। ছাত্রকংগ্রেসের সম্মেলনের সিদ্ধান্তে তাঁহারা যে আশা করিয়াছিলেন এই সভায় সেই নির্দ্দেশ তাঁহারা পাইলেন।

—অজিত রায়

ইহাদের কথা ভাবিয়

হাওড়ার লিট আল্দুল স্কুলের একটি ছাত্র
মাষ্টার মশায় জিজ্ঞাসা করেন "ছুটি নিয়ে কোথায়
মাষ্টার মশায় তখন ধমক দিয়া বলেন, "না, ছুটি হবে
পারিল না। কিন্তু তবু ছুটি তার চাই-ই। অনে
তখন বহু কষ্টে সে বলিল, "আমাকে ছুটি দিন, মায়ে
আমাদের খাবার জোটে না।"

সম্প্রতি ছাত্র ঐক্য লইয়া চারিদিকে তুমুল ত
ক্ষণকালের জন্য নিজেদের মধ্যে এই তর্ক বন্ধ ক
পাইবেন। এই ছাত্রটার মতই আরও অসংখ্য ছা
করিবার জন্য ছাত্রসম্প্রদায়ের ঐক্যই বড়, না দল

শিক্ষা-সংকট ও ছাত্রদে

[শিক্ষকে

[শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী খুলনার ছাত্রী-কলেজের একজন অধ্যাপক এবং সেণ্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক। তাঁহার এই চিঠিটী আমরা দুই সপ্তাহ আগে পাইয়াছি কিন্তু অপরিহার্য্য কারণে ইতিপূর্ব্বে ছাপাইতে পারি নাই। স্থানাভাবে চিঠির কোন কোন অংশ আমাদের বাদ দিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে পৃথ্বীশবাবুর মূল বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বাংলার শিক্ষা জীবনে চারিদিক দিয়া যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা প্রত্যেক দেশবাসীর চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাপক আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। পৃথ্বীশবাবু তাঁহার চিঠিটিতে 'শিক্ষক সম্প্রদায়ের বক্তব্য' বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্রতীর মত আমরা জনযুদ্ধে প্রকাশ করিতে চাই।

ছাত্রদের মাহিনা বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে অভি-ভাবকদের মত সম্বলিত চিঠিও আমরা চাই। জঃ সঃ]

অনাদৃত শিক্ষাব্যবস্থা

গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখের "জনযুদ্ধে" ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রমেন বন্দোপাধ্যায় বর্ত্তমানে দেশে যে শিক্ষা সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মোটামুটি একটি চিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শিক্ষা ও শিক্ষকদের দুর্গতি বাংলা দেশে এই প্রথম নহে। দেশের সুস্থ ও সাধারণ অবস্থাতেও শিক্ষা ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর যে হৃদয়হীন ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শিক্ষক সম্প্রদায়কে যে কঠোর দারিদ্র্য ও ক্লেশের মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা পরি-চালনা করিতে হইয়াছে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা যে বিস্ময়কর কোন পরিবর্ত্তন আনিয়াছে

া দলাদলি বন্ধ করুন

কদিন বেলা ২টার সময় শিক্ষকের কাছে ছুটি চায়।
াবে ?" ছাত্রটি কিছুতেই উত্তর দিতে চায় না।
া।' তখন ছেলেটি আর চোখের জল রোধ করিতে
কাকুতি মিনতির পরেও মাষ্টার মশায় যখন অটল;
সঙ্গে ভিক্ষা করতে যেতে হবে। ভিক্ষায় না বেরুলে

চলিতেছে—কার সঙ্গে ঐক্য, কিসের জন্য ঐক্য।
া আন্দুলের এই ছাত্রটিকে প্রশ্ন করুন, অভ্রান্ত উত্তর
র জীবনে যে দুর্য্যোগ নামিয়াছে তাহা রোধ
লি বড় ?

বাংলা পুনর্গঠনের ভিত্তিতে

ছাত্র আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষীদের বিরোধিতা

কিছুদিন আগে ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল "দল ও মত নির্ব্বিশেষে বাংলা পুনর্গঠনের এক সর্ব্ববাদী-সম্মত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে" সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের এক বৈঠক আহ্বান করেন। ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র সংসদ, ছাত্র কংগ্রেস ও ১৮ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রফেডারেশনের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

ঐক্যের ভিত্তি

সভার উদ্বোধন করিয়া ডাঃ সান্যাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, দুবছর পরে আজ আবার ছাত্র জগতে নূতন কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। দুঃস্থ দেশবাসীর সেবার জন্য কিছু করা দরকার এই অনুভূতিও ছাত্রদের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন আজ বিভক্ত, প্রত্যেকেই নিজের নিজের দল ভারী করিতে ব্যস্ত। ভরসার কথা যে অসংখ্য ছাত্র আছে যাহারা এই দলাদলি পছন্দ করে না, এই দলাদলি হইতে দেশসেবায় তাহাদের আগ্রহ বেশী। একটা সর্ব্ববাদী সম্মত গঠন মুলক কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে এই সব ছাত্রকে দেশসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তাই সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার আবেদন যে সমস্ত দলগত স্বার্থের উর্দ্ধে একটি কর্ম্মতালিকায় আপনারা ঐক্যবদ্ধ হউন। অপনাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত আমি ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। সেই মতামত আপনারা আপনাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মারফৎ প্রচার করুন। কিন্তু আপনাদের দলগত মতামতের বাইরেও বাংলাকে পুনর্গঠিত করিবার যে বিশাল কাজ-আছে সেই কাজে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হউন।

কি কাজ হইবে, তাহা হইতে কে সেই কাজে মোড়লী করিবে এই তর্কেই কমিউনিষ্ট বিরোধীদের উৎসাহ বেশী। তাই ডাঃ সান্যালের উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ হইবার আগেই তাহাদের তরফ হইতে প্রশ্ন হইল, সর্ব্ববাদীসম্মত কর্ম্মতালিকার আলোচনা পরে হইবে। আগে আমরা জানিতে চাই এই কর্ম্মতালিকা কোন সংগঠনের মারফৎ কার্য্যে পরিণত হইবে। অবশ্য সমাগত প্রতিনিধিদের প্রতিবাদে এই অবান্তর আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

তারপর ডাঃ সান্যাল গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠন, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দ্য, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও অশিক্ষা দুরীকরণ এই চার দফা কার্য্যতালিকা পেশ করেন এবং ইহার উপরে সমবেত প্রতিনিধিদের মতামত চাহেন।

দেশসেবা বনাম তাত্ত্বিক আলোচনা

কমিউনিষ্ট-বিরোধী সমবায়ের নেতা দিলীপ চক্রবর্ত্তী প্রথমে আলোচনা শুরু করেন: এই প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক ও পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী আছে। যেমন সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দ্যের প্রশ্ন। আমরা ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এবং মুসলমানদের দাবীকে অন্যায় বলিয়া মনে করি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপস্থিত সকলেই এই প্রশ্নের উপর একমত হইতে না পারি ততক্ষণ সকলের একযোগে কাজ করা সম্ভব নয়।

দিলীপ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হইল। প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বলেন: পারস্পরিক রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও ডাঃ সান্যালের প্রস্তাবের উপরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এক হইতে পারে। আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা। কিন্তু আজ দেশের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ছাত্র সমাজের মধ্যে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে তাহা রোধ করিতে না পারিলে কোন দলের কর্ম্মপন্থার উপরেই আমরা ছাত্রদের সংগঠিত করিতে পারিব না। তাই আজ বিভিন্ন মতবাদের তাত্ত্বিক আলোচনার চাইতে যাহাদের জন্য সেই মতবাদ সেই দেশের মানুষগুলিকে বাঁচানর কাজ ঢের বেশী জরুরী। বি-এম-আর-সি-সি-তে মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভা একসঙ্গে কাজ করিতেছে। সেখানে তো তাহারা রুগ্নের সেবার উপরে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের তর্ককে স্থান দেয় নাই। আমরা সকলে মহাত্মাজীর গঠন-মূলক কার্য্যপন্থার প্রতি আস্থা জানাই। কিন্তু মহাত্মাজী তো এই কথা বলেন নাই যে গঠনমূলক কাজ করিতে হইলে সেই সঙ্গে আমার ভারতের একজাতিত্ব নীতিরও প্রচার করিতে হইবে। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করি, আসুন এই অবান্তর তর্ক বন্ধ রাখিয়া বাংলা পুনর্গঠনের কাজে একত্রিত হই।

আরও কিছুক্ষণ বিতর্কের পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের সভায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ডাঃ সান্যালের প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিত মতামত জানাইবে। আরও সিদ্ধান্ত হয়—পরের সভায় প্রত্যেক কলেজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং এই কমিটি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বাংলা পুনর্গঠনের একটী সর্ব্ববাদীসম্মত কর্ম্মতালিকা রচনা করিবে।

দ্বিতীয় দিনের সভা ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে হয়। এই সভায় ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়াও অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, হরিচরণ ঘোষ, কালীচরণ ঘোষ ও খগেন সেন উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ সান্যাল গত দিনের সভার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আলোচনা আহ্বান করেন।

দিলীপ চক্রবর্ত্তী আবার পুরান প্রশ্ন তুলিলেন।

ডাঃ সান্যাল সমাগত সকলকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত অনুসরণ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের মত অন্যের উপর চাপাইবার চেষ্টা অনুচিত। আমাদের উদ্দেশ্য যদি দেশবাসীর সেবা হয় তবে একসঙ্গে কাজ করিবার মধ্যদিয়া পরস্পরের মধ্যে মনের মিল হইবে, সঠিক নীতিও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তারপর ডাঃ সান্যালের অনুরোধে অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য বলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য যখন বলিতে ছিলেন তখন কলিকাতা ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক আনিউজ্জামান প্রশ্ন করেন বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় এই সব নেতা ও অধ্যাপকরা কি করিয়াছিলেন। অন্য একটি ছাত্র মন্তব্য করে, এই সব শুধু আত্মপ্রচারের ভাওতা। সমবেত সকলেই এই অশিষ্ট মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হন।

ছাত্রসমাজের রায়

বিদ্যাসাগর কমার্স ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক মনি দাস বলেন, কলেজেও দেখি, এখানেও দেখিতেছি যে ছাত্র নেতারা বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তথাকথিত মূলগত তর্কে ব্যস্ত। এই সভাকেও তাহারা তাহাদের দলগত প্রচারের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে চান।

ইস্‌লামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক মিঃ সালে বলেন, এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া পাকিস্তান হিন্দুস্থান সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা হইতেছে। আমি প্রস্তাব করি যে এহ আলোচনা বন্ধ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের উভয়ের মঙ্গলের জন্য বাংলা পুনর্গঠনের বাস্তব সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গৃহীত হউক।

সিটি কলেজ ইউনিয়নের সহসভাপতিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

ছাত্র সংসদের সম্পাদক বিমল শাসমল বলেন, আমাদের পথনির্দ্দেশক হিসাবে গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যসূচী রহিয়াছে। সেই কার্য্যসূচীতে সকলেই একমত হইতে পারেন এরকম বহু জিনিস রহিয়াছে। আমি মনে করি না যে সকলে একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করিবার আগে সমস্ত মুলগত প্রশ্নের উপরে একমত হইতে হইবে। আসল কাজ আরম্ভ করিলে মতৈক্য আপনিই হইবে।

কিন্তু তবুও দিলীপ চক্রবর্ত্তি বলেন, আমরা আমাদের অতীতের মতভেদ ভুলিতে পারি না, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিতে পারি না। তাই কাজের ঐক্যের আগে চাই মতের ঐক্য।

ইতিমধ্যে উপস্থিত অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই বিরক্ত হইয়া সভা ত্যাগ করেন। সভাপতি মহাশয় ও ডাঃ সান্যাল তখন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া সোজা প্রশ্ন করেন "এখানে কাহারা মুলগত মতভেদ স্বত্বেও বাংলা পুনর্গঠনের কাজে সহযোগীতা করিতে প্রস্তুত ?"

ছাত্র সংসদের বিমল শাসমল, ইসলামিয়া কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং, কারমাইকেল কলেজ ও সিটি কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক, রিপণ কলেজ, আশুতোষ কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভাগ, বেথুন কলেজ, ক্যালকাটা মেডিকাল স্কুল ও মেডিকাল কলেজের প্রতিনিধি সকলেই সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। একমাত্র দিলীপ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পাঁচজন সহকর্ম্মী সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যত লইয়া এত ব্যস্ত যে বর্ত্তমানকে জাহান্নামে পাঠাইতেও কুণ্ঠিত নহেন। এই তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব আলোচনায় ছাত্র-ঐক্যের আর একটি চেষ্টা ব্যর্থ হইল। —রণজিৎ গুহ

র মাহিনা বৃদ্ধির প্রস্তাব

কর চিঠি]

তাহা আমাদের মনে হয় না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেদিনও যেমন অনাদৃত ছিল আজও ঠিক তেমনটি আছে।......

আজ যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত্তে যেমনি শিক্ষক সম্প্রদায়ের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে, সমর্থবান, উদ্যোগী শিক্ষকেরা সমর সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটা মাহিয়ানার চাকুরী লইয়া এই হীন দরিদ্রতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। যাঁহারা গিয়াছেন তাহাদের শাপমুক্তি হইয়াছে কিন্তু যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সমস্যা লইয়া বর্ত্তমানে একটু আধটু আলোচনা আন্দোলন দেখা যাইতেছে।......

শিক্ষার মূল্য

সাময়িকভাবে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত মাথা পিছু ছাত্র-বেতন বাড়াইয়া সমস্ত টাকাটা দুর্গত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার একটি প্রস্তাব শিক্ষক সমিতি করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে সহৃদয়তার সহিত প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে দরিদ্র ছাত্রদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে প্রত্যেক শিক্ষককে ১০৲ হইতে ১৫৲ পর্য্যন্ত একটা সাময়িক ভাতা দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের সুচনা দেখা যাইতেছে।...

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অবিচার না হয় এজন্য তাঁহার উক্তি এখানে তুলিয়া দিতেছি: "এই হতাশার অবশ্যম্ভাবী ফল ছাত্রদের উপর মাহিয়ানা বৃদ্ধির নিষ্ঠুর বোঝা চাপান এবং তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায় হইবে ছাত্র ও শিক্ষকদের তিক্ত সঙ্ঘর্ষ।" এখানে আমাদের দুইটি কথায় আপত্তি আছে। প্রথমতঃ বেতন বৃদ্ধির বোঝা ছাত্রদের উপর পড়ে না, পড়ে তাহাদের অভিভাবকদের উপর। সুতরাং শিক্ষকদের সঙ্ঘর্ষ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে (শপথ করিয়া বলিতে পারি নিরীহ শিক্ষকদের দ্বারা সে সম্ভাবনা নাই) তবে তাহা ছাত্রদের সঙ্গে নহে, তাহাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, আট আনা বেতন বৃদ্ধি কি দেশবাসী বর্ত্তমান অবস্থায় সত্যই "নিষ্ঠুর বোঝা" বলিয়া মনে করেন?......

সব জিনিষেরই দর বাড়িয়াছে

আজ দেশের সব জিনিষের মূল্যই অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪৲ মণের চাল আজ ২০৲ মণ দরে খাওয়া হইতেছে, দেশবাসী তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে। তেল, লবণ, কাপড়, মজুর সব কিছুই এইরূপ ৮।১০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের বর্ত্তমান মূল্য কমাইয়া যুদ্ধ-পূর্ব্ব পর্য্যায়ে আনিতে গেলে আজ দেশে তীব্র আন্দোলন দেখা দিবে।......

নিরপেক্ষ বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে অন্যান্য দ্রব্যের অনুপাতে শিক্ষাব্যয় তিনগুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলেও তেমন মারাত্মক হয় না। দেশে শিক্ষা চাই (আবার তাহাও সু-শিক্ষা হওয়া দরকার), অথচ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিবে না এই যদি দেশবাসীর মনোবৃত্তি হয় তবে সে দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকদের দুর্গতি যে চরমে পৌছিবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? একদিকে গবর্ণমেণ্ট ত পণ করিয়া বসিয়া আছে যে শিক্ষা ব্যাপারে আর এক কপর্দ্দকও বেশী ব্যয় করা হইবে না। ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মিলিত আন্দোলন দীর্ঘ-দিন চলিয়া আসিতেছে। সে আন্দোলন তীব্রতর করিয়া তুলিতে শ্রীযুক্ত রমেনবাবু উপদেশ দিয়াছেন। আমাদেরও তাহাতে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সে আন্দোলন সফলতা লাভ করিতে এবং তাহা দ্বারা দেশের শিক্ষকদের অবস্থা ফিরাইতে যে সময় ব্যয় হইবে তাহার মধ্যেই দেশের শিক্ষা ও শিক্ষককুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।......

শিক্ষারই বা দর বাড়িবে না কেন

অভিভাবকদের কথাই বলি। তাহারা ছেলে-মেয়েদের সিনেমা, মিহিকাপড় প্রভৃতি সংগ্রহে যে-পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তাহার সামান্য একটা অংশও কি শিক্ষকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না? যে কৃষক অভিভাবক ৪৲ মণ স্থলে ২০৲ মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতেছেন তিনি কি তাহার পুত্র কন্যাদের শিক্ষা ব্যাপারে আট আনা, এক টাকা বেশী ব্যয় করিতে পারেন না? মজুর, দুধওয়ালা, গোয়ালা, দোকানদার, ব্যবসায়ী, রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই আয় এইভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে,—তাহারা সকলেই যদি জীবনের সর্ব্বব্যাপারের ব্যয়-বৃদ্ধি মানিয়া লইতে পারেন, তবে শিক্ষা ব্যাপারে এই সামান্য ব্যয় বৃদ্ধি কেন মানিয়া লইতে পারিবেন না? আমার মনে হয়, ছাত্র-আন্দোলন বা গণ-আন্দোলন বর্ত্তমানে শিক্ষামূল্য বৃদ্ধির অনুকুলেই হওয়া উচিত এবং যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইরূপ মাহিয়ানা বাড়াইয়া শিক্ষকদের সাময়িক সাহায্য করিয়া বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, দেশবাসীর অবিলম্বে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। —শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী

বগুড়ায় লীগ কর্ম্মী সম্মেলনে

লীগকর্ম্মীদের কাছে জনসেবার ব্যাকুল আহ্বান

'পাকিস্তান ভারতের স্বাধীনতারই সংগ্রাম'—লীগ সম্পাদকের উক্তি

গত ৩০শে জানুয়ারী বগুড়া শহরে জেলা মুসলিম লীগ কর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বাংলার প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক মৌলবী আবুল হাশেম, নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সম্পাদক শাহ আজিজর রহমান, মুসলীম লীগের পূর্ব্ববঙ্গের সংগঠক মৌলবী শামসুল হক প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন বক্তৃতায় একটি মূল সুর ধ্বনিত হয়—মুসলিম লীগ আজ আর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা আজ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান শুধু মুসলমানদেরই নয়, হিন্দুদেরও। এবং হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তিতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়াই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই পাকিস্তানের সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম এক ও অভিন্ন। লীগ ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে।

পাকিস্তান স্বাধীনতারই সংগ্রাম

মৌলবী আবুল হাশেম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন:

'পাকিস্তানে মোগলের মসনদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, প্রতিষ্ঠিত হইবে ভালবাসার মসনদ—প্রেমের মসনদ। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারই অখণ্ড ভারতের বনিয়াদ। হাজার হাজার হেষ্টিংসের অত্যাচার ও হাজার হাজার অযোধ্যার বেগমের চোখের জলেই অখণ্ড ভারতের ভিত্তি। ভারতের বিভিন্ন জাতিগুলির সংস্কৃতি, আশা, আকাঙ্খা ধ্বংস করাই অখণ্ড ভারতের নীতি।

পাকিস্তান সারা ভারতের অচল অবস্থা অবসানের একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা। মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ও পাকিস্তান ভারতের পরাধীনতা কায়েম করে—এই প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এ কথা ঘোষণা করিতে চাই যে, মুসলিম লীগ ভারতের অন্যান্য দলের মতই ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে ব্যগ্র। আর কায়েদে আজমের ভাষায় পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করা অর্থ সারা ভারতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পাকিস্তান—ইহাই আমাদের নীতি।'

বগুড়া মুসলিম লীগের তরুণ নেতা ফজলুল বারি বলেন: 'সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের বিরোধী—ওয়াভেলের বক্তৃতায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।... অনেকে পাকিস্তানের ধ্বনিতে প্যান-ইসলামবাদের গন্ধ পান। এই ধারণা একেবারে ভুল। হিন্দু ভাইদের কাছে আমার আবেদন—আপনারা যদি পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে ভারতের হিন্দু মুসলমানদের যে সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিবে, তার সম্মুখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।'

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্পাদক শাহ আজিজর রহমান মুসলিম লীগের ছাত্রদের হিন্দু ছাত্রদের কাছে তাহাদের দাবী বুঝাইবার জন্য আবেদন জানাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বক্তৃতার এক জায়গায় গান্ধীজি ও কংগ্রেস সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁহারা হিন্দু পুনরুত্থান চান। ইহার প্রতিবাদ করিয়া নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম সংগঠক একরামুল হক বলেন, পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের আদর্শ ইহা নয়। হিন্দুদের সংস্কৃতি বিকাশে মুসলমানেরাও সাহায্য করিবে। আমরা হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করিব।

জনসেবার আহ্বান

মুসলিম লীগের পূর্ব্ব বঙ্গের তরুণ সংগঠক শামসুল হক বলেন:

'মুসলিম লীগের মঞ্চ হইতে শুধু পাকিস্তানের ভাসাভাসা বুলি আওড়াইলেই চলিবে না। গ্রামে গ্রামে আজ আমাদের কর্ম্মীদের দৈনন্দিন দুঃখদুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিলে লীগ বড় হইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, রোগে ঔষধ নাই। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মুসলিম লীগকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। পাকিস্তান আজ গোরস্থানে পরিণত হইতে চলিয়াছে—কতজন মুসলিম লীগ কর্ম্মী খবর রাখেন, গ্রামের কতলোক অনাহারে আছে; কতলোক রোগগ্রস্ত?...দেশের এই সংকটের জন্য সরকারই দায়ী। সরকারী আমলার দল ঘুষ লইতেছে আর মুনাফাখোরের দল অবাধে চোরাকারবার চালাইতেছে। মুসলিম লীগ এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

অনেকে প্রশ্ন করেন, হিন্দুদের কেন আমরা সেবা করিব?—মুসলিম লীগের আদর্শ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সেবা করা। যদি আমরা এই দায়িত্ব পালন করিতে পারি, তবেই জনসাধারণ বুঝিবে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া সত্যকার স্বাধীনতা আসিবে। হিন্দু জনসাধারণ বুঝিবে, পাকিস্তানে তাহাদের কোন ভয় নাই।'

ইহার পর লীগকে গঠন করার প্রসঙ্গে বক্তা বলিলেন, নির্ব্বাচনের সময় 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধুয়া তুলিয়া অনেকে লীগের টিকিটে দাঁড়ান ও লীগকে শুধু নির্ব্বাচনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের পরই তাঁহারা লীগের কথা ভুলিয়া যান। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

সম্মেলনে উপস্থিত জনতার মধ্যে শামসুল হকের বক্তৃতা অভূতপূর্ব্ব সাড়া আনিয়া দিল। এই বক্তৃতার মধ্যে তাঁহাদেরই নিজেদের দুর্গত জীবনের কথা, দুঃখ-দৈন্য ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা তাহারা শুনিল। বগুড়া জেলা লীগের তরুণ নেতা ফজলুল বারি গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন।

যুক্ত রিলিফ বোর্ড

মুসলিম ছাত্র লীগ সম্পর্কে আলোচনায় প্রাদেশিক ছাত্র লীগের সম্পাদক রিলিফের ব্যাপারে ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের সহিত সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানাইলেন। ছাত্রদের যুক্ত রিলিফ বোর্ড গঠন করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি আবেদন জানাইলেন। কুষ্টিয়ার মুসলিম ছাত্র সম্মেলন প্রসঙ্গে প্রাদেশিক ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা একরামুল হক আনন্দের সঙ্গে জানাইলেন, কুষ্টিয়ায় যে সাময়িক দলাদলি হইয়াছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। মুসলিম ছাত্র লীগ আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে।

তুমুল উৎসাহের মধ্যে মুসলিম লীগ কর্ম্মী সম্মেলন শেষ হইল। দোয়া পড়ার সময় দেশপ্রেমিক মৌলবী সাহেব বলিলেন, 'আল্লা, আমাদের শক্তি দাও যাহাতে আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারি। আল্লা, আমাদের শক্তি দাও যাহাতে আমরা আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে পারি।...'

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের সভায় বহু মুসলমান সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু আহ্বান জানানো সত্ত্বেও লীগের এই সভায় খুব বেশী সংখ্যক হিন্দু জনসাধারণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা লীগ সম্পর্কে নূতন চেতনা লইয়া ফিরিয়াছেন। বগুড়ার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী এই সভায় আসিয়াছিলেন। এই সম্মেলন লীগ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। বগুড়ার এই লীগকর্ম্মী সম্মেলনকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

—অরুণ মৈত্র

শোক-সংবাদ

কলিকাতায় বিশিষ্ট পার্টি-দরদী কমরেড বীণাপাণি সুর হঠাৎ হৃদরোগে মারা গিয়াছেন।

১৯৩৮ সালে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির অবৈধ অবস্থায় গোপন কর্ম্মীদের তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। পার্টিকে তিনি নিয়মিত অর্থ-সাহায্যও করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে সমগ্র পরিবার পার্টি-দরদী হইয়াছে।

বজবজ কেলিডোনিয়ান মিলের শ্রমিক-কমরেড **প্রফুল্ল মণ্ডল** গত ২৩শে জানুয়ারী কলেরায় মারা গিয়াছেন। বে-আইনী অবস্থায় তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৪১ সালে পার্টি সভ্যপদের সম্মান লাভ করেন। ১৯৪২-এর বজবজ ষ্ট্রাইকের মধ্য দিয়া তিনি একজন দৃঢ়চেতা পার্টিকর্ম্মী এবং স্থানীয় শ্রমিক-নেতা হিসাবে গড়িয়া উঠেন।

রাজসাহী হাফানিয়া গ্রামের কমরেড **দুখু প্রামাণিক** গত ২০শে জানুয়ারী কলেরায় মারা গিয়াছেন। কমরেড প্রামাণিক কৃষকের ছেলে ছিলেন। ১৯৪২ সাল হইতে কৃষক-আন্দোলন ও কৃষক সমিতির কাজের মধ্য দিয়া তিনি পার্টি-সভ্য পদের গৌরব অর্জ্জন করেন।

বর্জ্জনের বিরুদ্ধে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

না করিয়া কোথায় মিল আছে তাহাই দেখিতে হইবে এবং দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করিতে হইবে।' শ্রীযুক্ত বরদলই বলেন যে, দেশের যে-কোন পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে আমাদেরই ক্ষতি। দলগত ঝগড়ার মধ্য দিয়া পরাধীন দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য চরিতার্থ হইতে পারে না। অহিংসা যে কংগ্রেস কর্ম্মীদের সম্বল, তাহারা কমিউনিষ্টদের এড়াইয়া চলিতে চাহিবে কেন? বিশ্বাস যদি দৃঢ় হয় ও পন্থা যদি প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে শত্রু-মিত্র কাহাকেও ভয় করার নাই।

চটকলের মালিকদের ষড়যন্ত্র

উৎপাদন কম করিয়া বেশী মুনাফার ফন্দী

যুদ্ধের দরুণ চটের চাহিদা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। চটের বস্তার জন্য বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোভিয়েট হইতে রোজ অজস্র অর্ডার আসিতেছে। বিমান ঘাঁটি, খাদ্যের ও বালির বস্তা এবং দেশলাইয়ের বাক্স প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য ত' বটেই এমন কি যুদ্ধক্ষত ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যও চটের জিনিষের অত্যন্ত প্রয়োজন।

কলিকাতার চারিপাশে যে ৭৮টি চটকল আছে, সেখানকার উৎপন্ন চটেই দেশবিদেশের এই বিরাট চাহিদা মিটাইতে হয়। যুদ্ধের এই চাহিদার ফলে চটকলগুলির উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু মুনাফালোভী মালিকদের ষড়যন্ত্রের ফলে উৎপাদনের হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। নীচে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইল।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে চটকল মালিক সঙ্ঘ প্রতি মাসে ১ লক্ষ টন চট উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ছোট খাট অকেজো মিল হইতে মজুর আনিয়া কয়লার নিয়মিত সরকারী সরবরাহে ১২টি বড় বড় মিলে দুই-তিন শিফ্‌টে কাজ চালানের ব্যবস্থা হইল।

গত ৬ মাসেরও বেশী এই ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। প্রথম ৬ মাসের হিসাব নীচে দেওয়া হইল:

জুলাই	৭৮,৬৯১	টন
আগষ্ট	৯১,৪৩৯	”
সেপ্টেম্বর	৭১,৫৪১	”
অক্টোবর	৯২,৭৫৫	”
নভেম্বর	৮৮,১৭৭	”
ডিসেম্বর	৭৩,৯৬২	”

অর্থাৎ সাদা কথায়, কোন মাসেই মালিকরা তাঁহাদের ১ লক্ষ টনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মালিকরা রব তুলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কয়লা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছে না। কিন্তু উৎপাদন ঘাটতির কারণ কি শুধু ইহাই?

উৎপাদন পণ্ড করার ষড়যন্ত্র

এ দেশের বৃটিশ বণিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় ১৬ই নভেম্বর তারিখে লেখা হইয়াছে: 'সম্প্রতি কয়েকমাসে উৎপাদনের হার খুবই কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই উৎপাদন হ্রাসের ফলে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। যা মাল উৎপন্ন হইতেছে তাহা খালাস করাই এখন মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইতেছে।' অর্থাৎ, **মজুত মাল বেশী জমিয়া যাইতেছে**; এখন উৎপাদন, কিছু কম হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

কিন্তু পুরা একমাস যাইতে না যাইতে ৭ই ডিসেম্বরের 'ক্যাপিটালে' ইহারই বিপরীত কথা লেখা হইল: **'মজুত মাল বেশী নয়**; ১৯৪৩-এর নভেম্বরের শেষে মজুত মাল ছিল ২ লক্ষ ২২ হাজার ৭ টন কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত ৪৯ টন। দু বছরেরও কম আগে বর্ত্তমানের তুলনায় মজুত মালের পরিমাণ ১ লক্ষ টন বেশী ছিল।' কাজেই তাঁহারা যে মজুত মালের দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে কয়েকদিন আগেও এত সোরগোল তুলিয়া ছিলেন, তাহার পরিমাণ মাসে ১ লক্ষ টন হিসাবে দু'মাসের মোট উৎপাদনেরও কম।

'ক্যাপিটাল' যাহা লিখিতেছে তাহার মধ্যেই এই রহস্যের হদিশ পাওয়া যাইবে। 'সর্ব্বোচ্চ দামে বেচিবার উদ্দেশ্যে মাল ধরিয়া রাখার জন্য মিলগুলির বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা হইয়াছে।' (১৬ই নভেম্বর) 'বর্ত্তমান অবস্থায় মাসে ১ লক্ষ টন উৎপাদন মিলগুলির পক্ষে অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন মালের দাম আরও পড়িয়া যাইবে।' (২৩শে নভেম্বর)

চাহিদা যখন বাড়িয়া যাইতেছে, তখন যদি সরবরাহের পরিমাণ কমানো যায় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে খুব চড়া দর মিলিবে—উৎপাদন কমানোর পিছনে ইহাই মালিকদের আসল মতলব। কয়লা সরবরাহ সম্বন্ধে সরকারী অব্যবস্থার সুবিধা লইয়া তাহারা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

মালিকের মুনাফা কমে নাই

যুদ্ধের প্রথম চার বছরে চটকল মালিকরা তাহাদের মুনাফার হার ৯ গুণেরও বেশী বাড়াইয়াছে।

এণ্ড্রইয়ুল কোম্পানীর ৪টি মিলে ১৯৪৩-এর শেষার্দ্ধে মোট লাভের পরিমাণ ২ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত ৬৮ টাকা। ইহার পরবর্ত্তী ৬ মাসে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬ শত ৯৮ টাকা।

১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসের ষাণ্মাসিক হিসাব মতে বালি জুট মিলের লাভের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ২০ টাকা এবং সেপ্টেম্বর মাসের ষাণ্মাসিক হিসাবে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ২ শত ১৮ টাকা। হাওড়া, এলায়েন্স, ওয়েভারলি, এংলো ইণ্ডিয়া ও চাঁপদানী মিলেরও ঐরূপ মোটা লাভ হইয়াছে।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে এলায়েন্স, ফোর্ট গ্লষ্টার ও ফোর্ট উইলিয়ম মিল হইতে অংশীদারদের যথাক্রমে ১৭॥০, ১০, ও ৫, টাকা হারে ষাণ্মাসিক লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ মাসের লভ্যাংশের হার ছিল যথাক্রমে ১২॥০, ৮, ও ৪, টাকা।

বার্ড কোম্পানীর ৭টি মিল হইতে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক লাভ হইয়াছে ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪ শত ৯০ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ মাসে মোট লাভ হইয়াছিল ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ১ শত ৯৩ টাকা।

এই ভাবে মিল মালিকরা উৎপাদন কম করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা কামাইয়াছে এবং কয়লা সরবরাহে সরকারী অব্যবস্থা মালিকদের মুনাফাখুরীর ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিয়াছে। মালিকের দল শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে নাই। ইহাদের স্কীমের ফলে ৪৫ হাজার মজুর বেকার হইয়াছে। একদিকে ৩ লক্ষ চটকল মজুরের দুঃখদৈন্য চরম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে কৌশলে উৎপাদন ঘাটতি করিয়া চটকল মালিকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটিতেছে।

সম্পাদক সম্মেলনের একদিক

[২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সাংবাদিকদের সৌভাগ্য—সিনেমার মালিকেরা যেমন বেশী টাকা দিয়ে নটনটী সরিয়ে নেয়, তেমনি ভাবে প্রতিযোগী সংবাদপত্রের মালিকেরাও সেই পথ ধরেছেন। তার ওপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রচার বিভাগে এবং রেডিয়োতে মোটা বেতন দিয়ে সরকার অনেক সাংবাদিক ভাগিয়ে নিয়েছেন। সাংবাদিকদের ঐক্য না থাকলেও মালিকদের আছে। কলকাতা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের এই আলোচনার খবর কোন দৈনিকে প্রকাশিত হয় নি। লোকে খবরের কাগজের কেরামতির কথা পড় ক,—তা ব'লে ঘরের কথা!

●

কংগ্রেসপন্থী এবং বোম্বাই ক্রনিকলের সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী তাঁর অভিভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস বল্লেন। গভর্ণমেণ্ট "ভদ্রলোকের চুক্তি" কতভাবে ভঙ্গ করেছেন, কিভাবে জুলুম জবরদস্তী চালাচ্ছেন, সেই ক্লেশকর ইতিহাস তিনি উত্তেজনাহীন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। এঁর অভিভাষণ সময়োপযোগী এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষের বাস্তব বর্ণনা। সংবাদপত্রের উন্নতি ও আদর্শ-রক্ষার অনেক সদুপায়ের কথাও তাঁর অভিভাষণে ছিল। সাংবাদিকদের বেতন সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বল্লেন,—ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি লাহোরে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তা বেতনভুক সম্পাদকদের মত নিয়েই করা হয়েছিল। দেশী ভাষার অধিকাংশ কাগজের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বড় বড় শহরের কাগজের সঙ্গে ছোট ছোট শহরের কাগজের আর্থিক অবস্থার তুলনা হয় না। সাংবাদিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ট্রেডইউনিয়ন পদ্ধতিতে দাবী করতে যেদিন পারবে, সেই অনাগত দিনকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মালিকেরাই সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন। "ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটি"—ধনাভিজাত মালিকদের মিলিত প্রতিষ্ঠান, আর সম্পাদক সম্মেলন হল মালিকদের দ্বিতীয় সারির রক্ষাব্যূহ। এর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নী ভঙ্গীতে সঙ্ঘ গড়ার অনেক বিপদ ও ঝক্কি আছে। চাকর ও শ্রমিক হলেও, সাংবাদিকেরা ভদ্রলোক—কুলী-কামিনের মত আচরণ করতে গেলে কি ভব্যতা থাকে? তাঁদের একমাত্র ভরসা নূতন (পুরাতনই) ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা মালিক সমিতি দয়া করে যদি কিছু করেন।

●

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, তাঁর ৬৯ বৎসর বয়সের বোঝা পিঠে নিয়ে আমাদের একেবারে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নিয়ে গেলেন। কত বড় বড় নামধারীর কোটেশন উদ্ধৃত বাণী আর স্বদেশী ও বিদেশী তাঁর পছন্দসই সম্পাদকদের কীর্ত্তি। ভারতীয় সংবাদপত্রের বাল্যলীলার ধুরন্ধরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথাও কিছু বল্লেন। কিন্তু বাঙলার সংবাদপত্র শৈশব অতিক্রম করে—১৯২০-৪৪এ রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে, তার কথা তিনি আদৌ উল্লেখ করলেন না। ১৯০৫।০৬ সালে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' করেছেন, সে কথা আমরা শুনলাম, কিন্তু ১৯৩০-৩২ সালে তিনি (তখন 'বসুমতী' থেকে অপসারিত) যখন প্রেস-অফিসার মিঃ বি, আর, সেনের (সিভিলিয়ন) সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতীয় পতাকা হস্তে আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা এবং জাতীয় নেতাদের কুৎসা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, সে আত্মোৎসর্গের ইতিহাস শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হ'ল না। আমাদের শোনবার সৌভাগ্য হ'ল না, সুরেন্দ্রনাথ মতিলালের পর মৃত সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল সরকার এবং জীবিত মৃণালকান্তি বসু, সত্যেন মজুমদার, সত্য বক্সী (রাজবন্দী) থেকে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সাংবাদিক ও সম্পাদকগণ বাঙলার সংবাদপত্র সেবায় কিছু করেছেন কিনা। অবশ্য সমসাময়িক ও কনিষ্ঠদের নিন্দা করা ছাড়া তিনি প্রশংসা দুঃস্বপ্নেও করেন না। বর্ত্তমান কাল তাঁকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়েছে এজন্য তিনি রুষ্ট ও বিরক্ত। আরও দুঃখ এই যে সেবার সরকার তাঁকে যুদ্ধ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল,—সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গে কর মর্দ্দনে তিনি ধন্য হয়েছিলেন; এবার পাঁচ বৎসরেও তাঁর ডাক এলো না। ১৯৩০-৩২এ আইন অমান্য আন্দোলন বিদলনে অশ্রান্ত লেখনী চালকের কথা ১৯৪২এর আগষ্টেও গভর্ণমেণ্ট ভুলেই রইলেন। কিছু সান্ত্বনা এই যে, আধুনিক জাতীয়তাবাদী কাগজের মালিকেরা তাঁকে জাতে তুলে নেতা করে নিয়েছেন। তাই তিনি সম্পাদক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে পাদ্রীর ভঙ্গীতে উপদেশ দেবার সুযোগ পেলেন,—"Follow Light and do the Right." যাঁর যেটার যত অভাব, তিনি সেইটে বলেই আনন্দ পান। আমেন্।

ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের যুক্ত ঘোষণা

কৃষ্ণসাগরের তীরে য়াল্টা বন্দরে মিলিত হইয়া গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট তাঁহাদের যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—

তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া জার্ম্মানীকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবার সামরিক ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছেন। জার্ম্মানীর বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের পর তিন শক্তি উহার এক একটী অঞ্চল দখল করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে, ফরাসী গবর্ণমেণ্টকেও আর একটী অঞ্চল দেওয়া যাইবে। জার্ম্মানীর সৈন্যদল, সমর-সম্ভার, সামরিক শিল্পায়োজন, সেনানীমণ্ডলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। নাৎসিদের পার্টি, আইন, প্রতিষ্ঠান ও প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা হইবে। জার্ম্মান জনগণকে ধ্বংস করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু নাৎসিবাদ ও জঙ্গীবাদ নিশ্চিহ্ন হইলে তবেই জার্ম্মান জাতি বাঁচিতে পারিবে।

বিশ্ব-নিরাপত্তা সংগঠন সম্বন্ধে ডুম্বার্টন ওক সম্মেলনে যে মতদ্বৈধতা হইয়াছিল তাহা এবার মিটিয়া গিয়াছে। চীন ও ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্ট সহ এইরূপ আর একটি সম্মেলন আগামী এপ্রিল মাসে ডাকা হইবে।

মুক্ত ইয়োরোপের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা যুক্ত ঘোষণাবলীতে নূতন আশ্বাস দিয়াছেন এবং আটলাণ্টিক সনদের মূলনীতির প্রতি পুনরায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।

পোল্যাণ্ড সম্বন্ধেও তাঁহারা একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান লুবলিন গভর্ণমেণ্ট এবং পোল্যাণ্ড ও তাহার বহিরস্থ অন্যান্য গণতান্ত্রিক পোলিশ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া আরও বিস্তৃত জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠিত হইবে। সেই গভর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব সার্ব্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবে। পোল্যাণ্ডের সীমানা মোটামুটি কার্জ্জন লাইনের বরাবর হইবে।

সারা দুনিয়ার ট্রেডইউনিয়ন সম্মেলন

ভারতীয় এম-এন-রায়ের দল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ও ধনিকদের পক্ষে

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে লণ্ডন শহরে সারা দুনিয়ার সমস্ত প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

সোভিয়েট, আমেরিকা, বৃটেন ফ্রান্স, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ৪০টী দেশের প্রায় ৫ কোটী সংগঠিত মজুর-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৩৪০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে একত্র হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত মজুর যাহাতে ফ্যাশিষ্টদের পরাজিত করিতে ও ভবিষ্যত দুনিয়ায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে তাহার পন্থা নির্ণয় করা এবং একটী আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্মেলনস্থ প্রধান সঙ্ঘগুলির সভ্যসংখ্যা

সোভিয়েট—	২ কোটী ৭০ লক্ষ
বৃটেন—	৮০ "
আমেরিকান (সি, আই, ও)	৬০ "
দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা	৪০ "
ভারতীয় টি, ইউ, সি—	৫ "

অতীতেও কয়েকবার এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু প্রধানত ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবরের নেতৃবৃন্দের সোভিয়েট-বিদ্বেষী মনোভাবের ফলে ইহা সম্ভব হয় নাই। তাহার পর মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের বিরাট নেতৃত্ব বৃটেন তথা সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার চাপে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সোভিয়েট বিদ্বেষ অনেক কমিয়াছে। এবার বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যস্থতায়ই এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। যেসব দেশে একটীর বেশী কেন্দ্রীয় শ্রমিক সঙ্ঘ আছে (যেমন আমেরিকা ও ভারতবর্ষ) সেখানে সবগুলি সঙ্ঘকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

কিন্তু ফ্যাশিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে যাহাদের উৎসাহ নাই সেই সব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক নেতার সোভিয়েট-বিদ্বেষ আজও মিটে নাই। তাই সম্মেলনের আরম্ভেই আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবরের প্রতিনিধি মিঃ ওয়াট ঘোষণা করেন যে সোভিয়েটের শ্রমিকদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সম্মেলনে তাঁহারা থাকিবেন না। তিনি আরও বলেন যে তাঁহারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের (অর্থাৎ ধনবাদী নীতির) পক্ষপাতী।

ধনিকদের তাঁবেদার ও সোভিয়েটের শত্রু এই মিঃ ওয়াটের কথা দুনিয়ার ৪০টী দেশের মজুর প্রতিনিধিদের কেহই সমর্থন করেন নাই, বরং অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট মিঃ এম, এন, রায়ের যে ফেডারেশন অফ লেবার নামক দালাল প্রতিষ্ঠান আছে তাহার প্রতিনিধি মিঃ পিল্লাই ওয়াটকে সমর্থন করেন। কিন্তু অন্য সকলে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় মিঃ ওয়াটের দল সম্মেলন ত্যাগ করেন। আমেরিকার সি, আই, ও নামক আর একটী বিরাট শ্রমিক সঙ্ঘ (সভ্য সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ) সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে।

সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নের নেতা কমরেড কুজনেট সেভ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে দুনিয়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের মজুরদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তাঁহারা ব্যগ্র। ফ্যাসিজম ও তাহার প্রভাব ধ্বংস করার জন্য সকল দেশের মজুরকে সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিয়া ও যুদ্ধাপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে জার্ম্মাণী আর কখনও যুদ্ধ না বাধাইতে পারে।

বৃটিশ প্রতিনিধি স্যর ওয়াল্টার সিট্রিন নাকি জার্ম্মাণীর উপর অপেক্ষাকৃত লঘু নিয়ন্ত্রণের জন্য ওকালতি করেন। তাহার জবাবে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি কমরেড ডাঙ্গে বলেন যে, যাহারা শিশু ও স্ত্রীলোকদের পুড়াইয়া মারিয়াছে তাহাদের জন্য "নরম" শাস্তির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তিনি ভারত সম্বন্ধে বলেন যে ভারতে যাহাতে প্রগতিশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হয় তাহার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে চেষ্টা করিতে হইবে।

সম্মেলন এখনও চলিতেছে। উহার বিশেষ বিবরণ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

জনযুদ্ধের "লালফৌজ" সংখ্যা

১২ পৃষ্ঠা—দাম দু আনা

পি, সি, জোশীর নূতন রচনা এবং আরও অনেক প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি সহ আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী বাহির হইবে।

—ম্যানেজার, জনযুদ্ধ।

Regd. No. C. 2836.

শীঘ্রই বার্লিনে বিজয় পতাকা উড়িবে

বার্লিন দখলের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। আক্রমণরত সোভিয়েট বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আরও অগণিত পদাতিক সৈন্য ও প্রচুর সমরোপকরণ আসিয়া জড়ো হইতেছে। প্রত্যেকটি কামান ও প্রত্যেকটি ট্যাঙ্কে, রাস্তার প্রতিটি ফলকে খোদাই রহিয়াছে একটিমাত্র শব্দ—"বার্লিন।" এই অভিযানকে বর্ণনা করিতে গিয়া সোভিয়েট সমর সমালোচকগণও বলিতেছেন যে ইহা নাৎসী শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আঘাত। বার্লিনের আগে আত্মরক্ষার শেষ প্রাকৃতিক ব্যূহ ওডার নদী অতিক্রমের যুদ্ধ ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। হিটলারীরা এখন মরিয়া হইয়া বাধা দিতেছে। তাহারা জানে, লালফৌজ যদি একবার ওডারের বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারে তবে বার্লিনকে তাহারা কোনমতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে প্রথম শ্বেতরাশিয়ান আর্মি ওডারের পুবপারে বেশ ভাল ভাবে ঘাঁটি গাড়িয়াছে। কুয়েষ্ট্রীন ও ফ্রাঙ্কফুর্টের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কুয়েষ্ট্রীনের উপকণ্ঠে ও ফ্রাঙ্কফুর্টের ৩ মাইলের মধ্যে লালফৌজ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালাইতেছে। এই সেনাদলের আর একটি অংশ ওডারের মোহনায় অবস্থিত বিখ্যাত জার্ম্মান বন্দর ষ্টেটিনকে দখল করিতে ক্ষিপ্রবেগে আগাইয়া যাইতেছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১২ই ফেব্রুয়ারীর খবরে জানাইতেছেন যে লালফৌজ এখন সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়াই বার্লিনকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। ওডার নদীতটে মার্শাল জুকভের বাহিনী বার্লিন হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরে।

ইতিমধ্যে মার্শাল কনিয়েভের অগ্রগতি আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইঁহার নায়কত্বে প্রথম ইউক্রেনিয়ান সেনাবাহিনী ওডার অতিক্রম করিয়া তড়িৎগতিতে সহরের পর সহর দখল করিতেছে। মার্শাল ষ্টালিন তাঁহার ১১ই ফেব্রুয়ারীর হুকুমনামায় ঘোষণা করিয়াছেন—প্রথম ইউক্রেনিয়ান রণাঙ্গনে লাল ফৌজ ব্রেসলাউয়ের উত্তর পশ্চিমে ওডার অতিক্রম করিয়া ৪ দিনে ৩৭ মাইল অতিক্রম করিয়াছে এবং লিগনিৎস, ষ্টেনাউ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সহর দখল করিয়াছে।

মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী একদিকে যেমন পার্শ্বদেশ হইতে বার্লিনের দিকে চাপ রাখিয়াছে, আবার অন্যদিকে সোজা পশ্চিমে ড্রেসডেনের দিকেও আগাইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া নিতেছে। এই সম্পর্কে জার্ম্মান সংবাদবিভাগ সর্ব্বশেষ যে খবর দিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ব্রেসলাউ-এর প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ড্রেসডেনের প্রায় মধ্যপথে রুশসৈন্যগণ বোবের নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং দুইটি সেতুমুখ দখল করিয়া আছে। লাল ফৌজ যদি এই পথে আগাইয়া গিয়া ড্রেসডেনে পৌছিতে পারে তবে তাহার ফল হইবে সুদূর প্রসারী। উত্তর দিকে বার্লিন অঞ্চলে যেসব জার্ম্মাণ-বাহিনী আছে এবং দক্ষিণ দিকে জার্ম্মানীর যেসব বাহিনী অষ্ট্রীয়া, ইতালী ও হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট অঞ্চলে আছে তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় একরূপ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

যখন সোভিয়েটের এই প্রবল আক্রমণের গতিরোধ করিতে গিয়া জার্ম্মান সমরযন্ত্র নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িতেছে, তখন যদি এর সাথে সাথে পশ্চিম ইয়োরোপেও জার্ম্মান বাহিনীগুলির উপর চরম আঘাত পড়িত তবে অচিরেই জার্ম্মান বাহিনীগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই সম্পর্কে সোভিয়েট সমালোচক ইয়ারমাস্তেভ বেশ খোলাখুলী ভাবেই সম্প্রতি লিখিয়াছেন।

পশ্চিম ইউরোপে আজও মিত্রপক্ষের দিক হইতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে চরম অভিযানের লড়াই দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। যে মুহূর্ত্তে তাহা সুরু হইবে, সেই সাথে সাথে জার্ম্মান প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

সব রাস্তাই বার্লিনের দিকে

রোজেনবার্গ গ্রামের বাজারের ঠিক সামনে দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তারই চৌমাথায় দাঁড়াইয়া যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে লালফৌজের ট্র্যাফিক বিভাগের চীফ সার্জেন্ট গ্রুনিয়া বুরোভা। এই সপ্রতিভ মেয়েটি যুদ্ধের আগে এখান হইতে দেড় হাজার মাইল দূরে কুইভিশেভের এক কৃষি সমবায়ে কাজ করিত।

লালফৌজের ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতা চৌমাথার সামনে ট্যাঙ্কের মিছিল থামাইয়া জিজ্ঞাসা করে: 'ক্রাইজবার্গের রাস্তা কোন্‌টা?' গ্রুনিয়া তার হলুদবর্ণ পতাকাটি ক্রাইজবার্গের নিশানায় তুলিয়া ধরে। মুখময় তেল মাখা আর একজন লরীর ড্রাইভার চৌমাথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করে: 'ওপেল্‌নে যাবো কোন্ রাস্তায়?' গ্রুনিয়া তাহাকেও মৃদু হাসিয়া পথ বলিয়া দেয়। তারপরই আসে সাঁজোয়া গাড়ীতে একদল পদাতিক বাহিনী। তারা ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করে: **'বার্লিনে যাবার রাস্তা কোনটা?'** গ্রুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়: **'বার্লিনে যেতে চাও? যে কোন রাস্তা নিতে পারো। সব রাস্তাই বার্লিনে যাবে।'**

পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় জার্ম্মান সৈন্যেরা শ্বেত পতাকার অভাবে সাদা তোয়ালে উড়াইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে

পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় লাল ফৌজের পদাতিকেরা আক্রমণ করিতেছে

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

বিশেষ সংখ্যা

মৃতদেহ ঢাকারও কাপড় নাই—কাপড়ের লাইনে লাঠি

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা] ২২শে ফেব্রুয়ারী '৪৫, বৃহস্পতিবার ১০ই ফাল্গুন '৫১ [দাম ৵০

সরকার-"অনুমোদিত" দোকানের রহস্য

আমলাতন্ত্র ও বস্ত্রব্যবসায়ী—কে কাহাকে কণ্ট্রোল করে ?

কলিকাতা, শ্যামপুকুরের শ্রীব্যোমকেশ কর্ম্মকারের স্ত্রী কয়েকদিন আগে কারমাইকেল হাসপাতালে মারা যান। স্ত্রীর মৃতদেহ হাসপাতালে রাখিয়া ভদ্রলোক শব আচ্ছাদনের কাপড় খুঁজিতে বাহির হইলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সারা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রত্যেকটী দোকানেই তিনি একখানি সাধারণ শাড়ী কিনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক দোকানীই 'নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দিল। তাহার পর চীৎপুর এলাকার অনেকগুলি দোকানেও তিনি ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শোকার্ত্ত করুণ কাহিনীতে একটু নরম হইয়া চীৎপুরের একজন দোকানদার একখানি শাড়ী বেচিয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইলেন।

নিমতলার শ্মশান ঘাটে যান। দেখিবেন হিন্দু এয়োস্ত্রীর মৃতদেহ—কপালে সিঁদূরের সমারোহ কিন্তু ধুতি বা পুরানো কাপড় দিয়া কোনো রকমে গা ঢাকা। হিন্দু বাঙ্গালীর জীবনে ইহা কতখানি লজ্জা ও মর্ম্মবেদনার কথা তাহা হিন্দু মাত্রেই জানেন। কলিকাতা মহানগরীতে এরূপ ঘটনার কথা আগে কেহ কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই।

হাত-পা ভাঙ্গিয়াও বস্ত্র মিলেনা

মরিবার সৌভাগ্য যাহাদের এখনও হয় নাই তাহারাও কাপড় যোগাড়ের চেষ্টায় দোকানের সামনে লাইনের ভিড় ও মারামারিতে প্রায় মরিতে বসিয়াছে। শুধু গরীব লোকই নয়, কলিকাতার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কাছেও এই সরকার-"মনোনীত" দোকানের লাইনই কাপড় কিনিবার একমাত্র আশা! সেদিন শোভাবাজারের একটী দোকানের লাইনে পুলিশই লাঠি চার্জ্জ করিয়াছে। মধ্য কলিকাতার একটী দোকানের সামনে ছোটখাট দাঙ্গা বাধিয়া দোকানের শো-কেস প্রভৃতি চূরমার হইয়াছে। ক্রস ষ্ট্রীট কেশোরাম কটন মিলের দোকান "পারিকের" সব গণ্ডগোলের জন্ম বন্ধ আছে। চীৎপুরে মৌলা বক্সের দোকানের কপাটের পাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্রেতাদের মাথা বা হাত-পা কত ভাঙ্গিয়াছে আন্দাজ করা শক্ত নয়।

এখন আবার অধিকাংশ দোকানেই ভিড় নাই কারণ দোকানদারেরা কাপড় দেয় না. বলে ষ্টক ফুরাইয়া গিয়াছে। এদিকে সারা বাংলার লোক কাপড়ের জন্ম দিগ্বিদিক চষিয়া বেড়াইতেছে। কণ্ট্রোল দরে দ্বিগুণ তিনগুণ দাম না দিলে কাপড়ের চেহারাও দেখা যায় না।

ইহার জন্ম দায়ী কে?

সরকারী কৃতিত্ব ও বিজ্ঞাপন

সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, প্রতিমাসে বাহির হইতে ৮ হাজার গাঁট করিয়া কাপড় বাংলায় আসিতেছে, তাহার উপর বাংলার মিল ও তাঁতের উৎপন্ন কাপড়ও আছে। কিন্তু প্রাদেশিক টেক্সটাইল কর্ত্তৃপক্ষের অফিস হইতে জানা গেল যে তাঁহাদের কণ্ট্রোল অর্ডারের বলে তাঁহারা যে কাপড় "সংগ্রহ" করিতে পারিয়াছেন গত তিন মাসে তাহার পরিমাণ মাত্র :—

নভেম্বর—প্রায় ২০০০ গাঁট
ডিসেম্বর—প্রায় ৩৫০০ "
জানুয়ারী—৬২০ "

কর্ত্তৃপক্ষ কাপড়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতে কার্পণ্য করেন না। ২৩শে সেপ্টেম্বর মন্ত্রী সুহরাবর্দ্দি বক্তৃতা দিলেন, "শীঘ্রই বস্ত্রাভাবের সুরাহা হইবে", ৭ই অক্টোবর তিনিই আবার বলিলেন যে, "সংবাদপত্রসমূহে যে বস্ত্রাভাবের চীৎকার হইয়া থাকে উহা আপেক্ষিক" অর্থাৎ তেমন কিছু নয়। ৯ই অক্টোবর খোদ নয়া দিল্লী সিভিল সাপ্লাই কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টেটস্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন ছাপাইলেন—"There is Enough Cloth for your needs" (অর্থাৎ সাধারণের প্রয়োজনের উপযুক্ত যথেষ্ট কাপড় পাওয়া যাইবে)! আর সম্প্রতি ২২শে ডিসেম্বর সুহরাবর্দ্দি আবার বক্তৃতায় ছাড়িলেন—"বস্ত্র বিতরণে গবর্ণমেণ্ট মোটেই শৈথিল্য দেখাইবে না।"

যদি "শৈথিল্যই" না থাকে তবে বাহিরের ৮০০০ গাঁট এবং বাংলায় প্রস্তুত আরও কয়েক হাজার গাঁট—এই কাপড়ের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসে মাত্র ৬২০ গাঁট "সংগ্রহ" করে কেন? লোকে হাত-পা ভাঙ্গিয়াও কাপড় পায় না—কিন্তু তিন গুণ দাম দিলে চোরা বাজার হইতে অনায়াসেই পাওয়া যায় কিরূপে?

কণ্ট্রোলের পুকুর চুরি

আসল কথা গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র-ব্যবসায়কে মোটেই কণ্ট্রোল করিতেছে না। ৬৲।৮৲ জোড়ার নীচে যে-সব ধুতি শাড়ী তাহার দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু উহা বেচিবার জন্ম যাহারা কোটা পাইয়াছে তাহাদের কাপড়ের ষ্টক প্রভৃতি সম্বন্ধে হিসাব দিবার কোন দায়িত্ব নাই। ফলে খুচরা ব্যবসায়ী বা খরিদ্দার কণ্ট্রোল দামে মাল চাহিলেই তাহারা বলিতে পারে যে মাল ফুরাইয়া গিয়াছে। বাজারের সকলেই জানে, যাহারা আগে হইতে চুপি চুপি বেশী দাম দিতে রাজী হয় শুধু তাহারাই মাল পায়, অন্যেরা ক্বচিৎ কখনও।

আরও মজার কথা—ধোয়ানো কাপড়ের উপর কোনো কণ্ট্রোলেরই বালাই নাই, যে-কোনো দামে বিক্রয় করা যায়। ব্যবসায়ীরা কণ্ট্রোলের কোরা কাপড়গুলিই ধোয়াইয়া দামের ছাপ প্রভৃতি তুলিয়া ফেলে। তারপর একটা মামুলি টেক্স-মার্ক লাগাইলেই হইল, দামের কোন বাঁধাবাঁধি নাই। এবং গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আরও দুইটী তথাকথিত "ব্যবসায়ী-সমিতি" এই ছাপ দেওয়ার ক্ষমতা পাইয়াছে।

ধোয়ানো কাপড়ের গুপ্ত রহস্য

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী আমি ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম-এল-এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটী দোকানে এই ধোয়ানো রহস্য হাতে হাতে ধরিয়া ফেলি। দোকানের নাম "রামচন্দ্র দাস অমূল্যচন্দ্র দাস", উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "অনুমোদিত"। সেখানে অনেক ধোয়ানো কাপড় ছিল, কিন্তু অত্যন্ত চড়া দাম। কোরা কাপড় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে না, নাই। তখন একটী ধোয়া কাপড়ের উপর পেন্সিল দিয়া দাম লিখাইয়া লইয়া ডাঃ সান্যাল চলিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার ... হইতে বোধহয় দোকানী বুঝিতে পারে ... সাধারণ ক্রেতা নয় পরখ করিতে আসিয়াছে ...

যাই হোক দোকান হইতে বাহিরে ... সান্যালের তাগাদার ফলে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ... তৎপর হইতে বাধ্য হন। আধ ঘণ্টার মধ্যেরিক দোকান খানাতল্লাস হয়। পুলিশ আসি... দেখা গেল দোকানের বিভিন্ন দরজা দিয়া বস্তা ...

[১১ পৃষ্ঠা দেখুন]

জবাব চাই

যুগান্তর পত্রিকা ১০ই ফেব্রুয়ারীর খবর লিখিয়াছেন—"বড়বাজারের এক দোকান হইতে পুলিশ গতকল্য ৫০,০০০৲ টাকার ধুতি শাড়ী ও জামার কাপড় উদ্ধার করিয়াছে। এই সম্পর্কে চারিজন ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।"

আমাদের কাছে খবর আসিয়াছে, এই ব্যক্তিদের একজন নাকি সরকারী বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভ্য। ইহা সত্য কিনা আমরা সরকারের কাছে জানিতে চাই। আমরা আরও জানিতে চাই যে, এই ধরণের লোকদের গ্রেপ্তার করার পর তাহাদের নাম প্রকাশ না করিয়া তাহাদের ... বাঁচাইবার জন্ম পুলিশ মূল্য আদায় করে কিনা।

কাপড় কণ্ট্রোলে(র) গঙ্গাযাত্রা

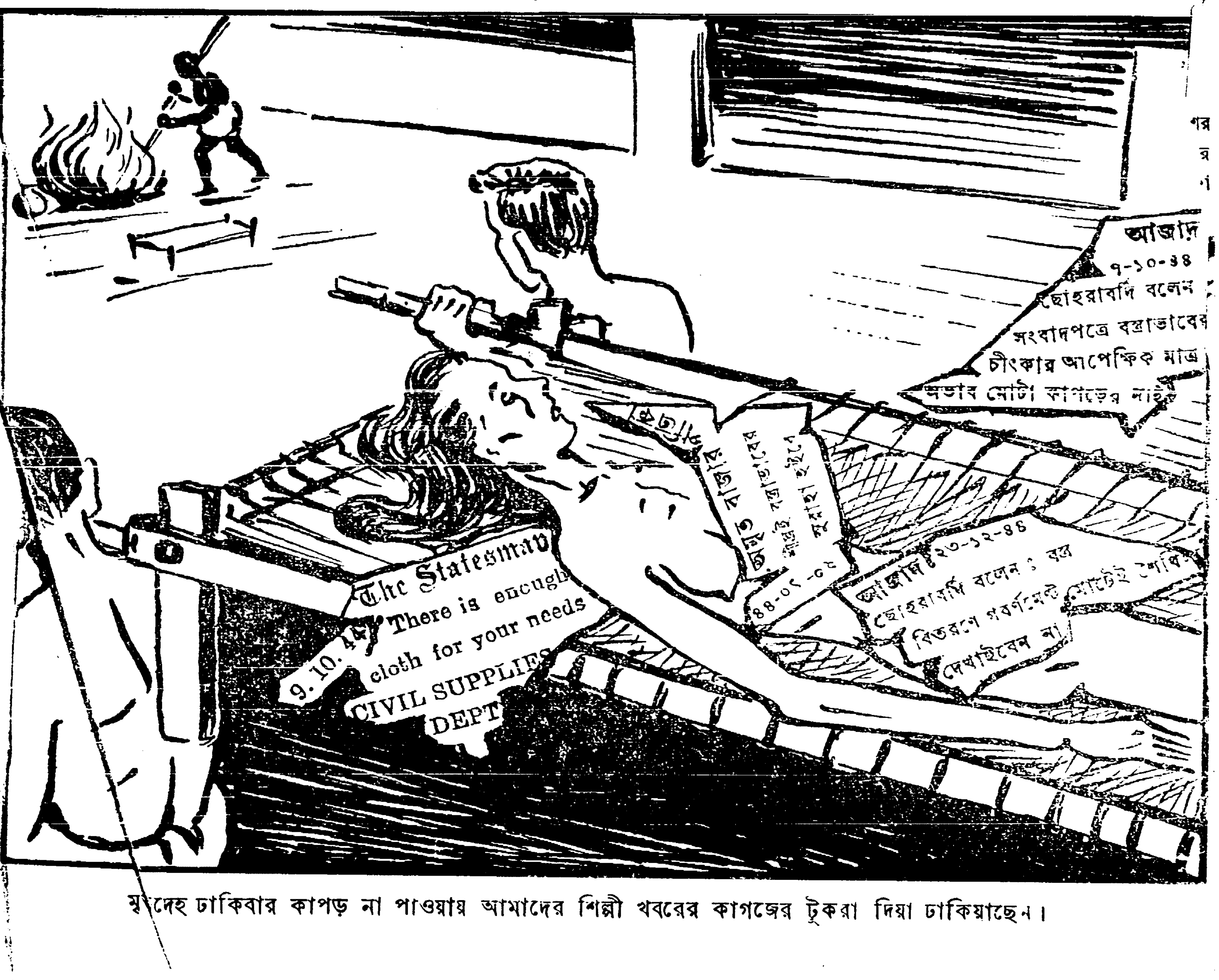

মৃতদেহ ঢাকিবার কাপড় না পাওয়ায় আমাদের শিল্পী খবরের কাগজের টুকরা দিয়া ঢাকিয়াছেন।

এবার কলকাতায় এসেই কি মনে হ'ল

পি-সি-জোশী

ম।

ক এক বছর পর কলকাতায় এসেছি ; এসে মনে শান্তি নেই। রাস্তার দুধারে জনারণ্যের যখন তাকাই, বুকের স্পন্দন স্তিমিত হ'য়ে । লোকজনের মুখগুলি বিষণ্ণ, রুক্ষ চেহারা, ন্ত্রিত পোষাক। কোন কিছুতেই উৎসাহ । রাস্তায় লোকজনের আড়ষ্ট হাঁটাচলা দেখে বলবে এই শিল্পপ্রধান মহানগরীই জাপবিরোধী দ্ধের প্রাণকেন্দ্র ? দুর্ভিক্ষের দিনে যাদের চোখে-মুখে ছিল আতঙ্কের চিহ্ন, তাদের মুখগুলি আজ ভাবলেশহীন। গত দুর্ভিক্ষে শুধু ৩৫ লক্ষ মানুষই র নি। যে মহান্ জাতি ভারতের নব জাগরণের ম উদ্‌গাতা, যে জাতি ভারতের জাতীয় ন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক—দুভিক্ষ সেই জাতির ন্তরাত্মা ধ্বংস করেছে।

কলকাতার যে অমায়িক গৃহকর্ত্রীদের আমি নতাম—যাঁদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম ছিল শিল্পের নিখুঁত, পুরাণো বন্ধন কাটিয়ে উঠে নূতন াস্তিকতার আলো যাঁরা গ্রহণ করছিলেন, যাঁরা দের সন্তানদের উন্নততর শিক্ষায় মানুষ ক'রে আলেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যাঁরা হয়ে আছেন—এবার এসে আর সেই নারীচরিত্রের পাইনি—গৃহকর্ত্রীদের কাছে ঘর আজ অশান্তির কুণ্ড। অষ্টপ্রহর মাথায় শুধু অভাবের চিন্তা। নের দোকানে চাল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে দের বালাই নেই। কাঁকরভর্ত্তি চালের মধ্যেও আবার নানা জিনিষের ভেজাল! দুর্ভিক্ষের বছরেও অন্য জিনিষপত্রের যা দর ছিল, এখন সে সব জিনিষের দু'গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু বাড়ীর চাকুরে দের মাইনে আগের মতই আছে। অসুস্থ মীর জন্যে অষুধ কিনবে, না শিশুসন্তানের জন্যে কিনবে—গৃহিণীর কাছে আজ এই নিদারুণ স্যা। শিশুসন্তান দিন দিন রক্তহীনতায় শুকিয়ে চ্ছে, স্বামী আজকাল অনবরত রোগে শয্যা নিচ্ছে—যে কোন মা, যে কোন স্ত্রীর কাছে এই কঠিন সমস্যা। গ্রামদেশ থেকে মর্ম্মস্পর্শী চিঠি আসে। মা কিম্বা বিধবা বোন, নিকট সম্পর্কের দরিদ্র কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া চিঠি লেখে—টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ, কাপড় অভাবে মেয়েদের লজ্জা বাঁচানো দায়। অসহায় গৃহকর্ত্রী আপন দুঃখে কেঁদে ওঠে। তার মনে পড়ে, অতীতে পরিবারের সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে একা দেখেছে ; পরিবারের সবাই তাকে ভাল বলেছে। কিন্তু আজ ছেলেমেয়েদের দেখতে গেলে স্বামীকে দেখা আর ম্ভব হয় না, স্বামীকে দেখতে গেলে ছেলেমেয়েদের দেখা হয় না। কাজেই তার সদাসর্ব্বদা ভয়, াকে তাকে স্বার্থপর বলবে। সে জানে, কাউকেই খুসী করা তার পক্ষে আজ সম্ভব নয়। লোকের শ্রদ্ধাও আজ কমে আসছে। তাই আজ তার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। ফলে, আজকাল মধ্যবিত্তদের বাড়ীতে, রোজই একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে।

বৃটিশ যত দিন আছে, তত দিন কিছুই করা যাবে না—এই মারাত্মক ভুল ধারণার জন্যে বাঙালী মধ্যবিত্তকে কি বিষম মূল্যই না দিতে হচ্ছে। তারা ভেবেছিল, তারা মস্ত দেশপ্রেমের কথা বলছে। আসলে তখন তারা এই কথা ব'লে জোর গলায় নিজেদের অসহায়তাই জাহির করছিল। আর সেই সুযোগে তাদেরই সমাজের কয়েকজন স্বার্থান্বেষী মানুষ দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কলকাঠি নিজেরা দখল ক'রে ব'সল। গ্রামের বড়লোকেরা যখন গরীব কৃষকদের সমস্ত জমি নিজেদের কুক্ষিগত করে নিল, যখন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দল পথেঘাটে কুকুর বেড়ালের মত মরতে লাগল, মধ্যবিত্তের দল তখন বৃটিশদের লক্ষ্য ক'রে শাপান্ত করা ছাড়া আর কিছুই ক'রল না। যে মধ্যবিত্তশ্রেণী এক দিন বাংলার জাতীয় জীবন চালনা করে এসেছে, মজুতদারের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে সেদিন সে তার দায়িত্ব পালন করেনি। আপন শ্রেণীর প্রতিও সেদিন সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাই টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাচ্ছে।

বাংলার সামনে আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমস্যাই শুধু নয়, বাংলার সামনে আজ সর্ব্বগ্রাসী ভাঙনের সমস্যা।

কলকাতার সর্ব্বত্র আজ আলোচনার সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে—আমেরিকান সৈন্যদের দুর্ব্যবহারের কাহিনী। আমেরিকান সৈন্যরা যা খুশী তাই করছে। দেশের মা-বোনদের তারা দৈনিক যেভাবে অসম্মান করছে—তা লোকের চোখে তুলে ধরবার সাহস আজ বাংলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের নেই। দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের ফটো 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশ ক'রেছিল। সেই অপমানের ইতিহাসের কি আবার পুনরাবৃত্তি হবে? মতিলাল ঘোষ কিম্বা দেশবন্ধু যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁরা কি করতেন—বাঙালী সাংবাদিকরা একথা একবারও ভেবে দেখেছেন কি? ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা—বাংলার সংবাদপত্র আজ সেই ঐতিহ্যকে রক্ষাই করতে পারছে না।

বাংলার জননেতারা আজ জাতীয় ঐতিহ্যের অবমাননা করছেন। এদিকে দেশের যুবশক্তি আজ অসভ্য, বর্ব্বর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে আজকের দিনে সব থেকে বেশী আলোচনা যৌন বিষয় নিয়ে।

বাংলার যে সমস্ত যুবকেরা দেশের জন্যে প্রাণ বলি দিয়েছে, তাদের অধিকাংশই এসেছিল ছাত্র-সমাজের মধ্যে থেকে। অথচ বিদেশী গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজের দেশের কোন মেয়ের সম্মান বাঁচানোর 'অপরাধে' একজন বাঙালী ছাত্রকেও আদালতে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। একা ছাত্রদেরই বা দোষ দেব কী। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিয়েছে, তখন বাংলার নামকরা কংগ্রেস নেতারাও ত' চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। তাঁরা মুসলিম প্রধান প্রদেশে হিন্দু জাত্যভিমানী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে এসেছেন এবং যে লীগের সভ্য সংখ্যা ৫ লক্ষ, সেই লীগকে তাঁরা বিদ্রূপ করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টীর শক্তি-বৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক'রে এই কংগ্রেস নেতারা তাঁদের বাকি সমস্ত সময় নষ্ট করেছেন—বাংলাকে বাঁচানোর জন্যে সমস্ত দেশপ্রেমিককে ঐক্যবদ্ধ করা দূরে থাক, জনসাধারণের সেবা করাও তাঁরা কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন নি।

বাংলার নেতারা আজ আর দেশবাসীর কথা ভাবছেন না। আজ তাঁরা সঙ্কীর্ণ আত্মচিন্তায় মগ্ন। নিজেদের অতীতের প্রতি আজ তাদের নিষ্ঠা ত' নেইই, বরং নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁরা আজ বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

বাংলা জাতীয় জাগরণের জন্মভূমি, বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুর্গ। সেই বাংলা আজ টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে।

সম্পাদকীয়

বাংলা সরকারের বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালে বাংলা সরকারের মোট আয় হইয়াছে ৩৬ কোটি টাকা, ব্যয় হইয়াছে মোট ৪৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি পড়িয়াছে ১১ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য আয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ২৯ কোটি টাকা আর ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ৩৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ৮ কোটি টাকা। ১৯৪৬ সালের ৩১ মার্চ্চ সরকারী দেনার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৯ কোটি টাকা। এই দেনার ভিতর মাত্র ২ কোটি টাকা ফসল বাড়াইবার কাজে লাগিয়াছে, কাজেই এই দুই কোটি টাকার বিনিময়ে বাংলার নূতন ধানোৎপাদন হইবে কিন্তু বাকি ১৭ কোটি টাকার দেনা এমন সমস্ত খরচে লাগিয়াছে যাহাতে নূতন কোন সম্পদ আমরা পাইব না। এই ঘাটতিতে এবং এই দেনায় বাংলার দেউলিয়া অবস্থারই পরিচয় মিলে, তাহার চরম দুঃস্থতাই ফুটিয়া বাহির হয়।

অর্থ সচিব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, দুভিক্ষ এবং মহামারীর জন্যই এত দেনা এবং এত ঘাটতি ; অথচ দুঃস্থ এবং পীড়িত নরনারীর স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য ব্যয় হইয়াছে অতি সামান্যই। রিলিফের জন্য চলতি বৎসরে খরচ হইয়াছে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, আগামী বৎসরের জন্য বরাদ্দ ধরা হইয়াছে মাত্র ১। কোটি টাকা। গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য চলতি বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আর আগামা বৎসরের জন্য বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। জনস্বাস্থ্যের জন্য চলতি বৎসর খরচ হইয়াছে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আর আগামী বৎসরের জন্য বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৯৫ লক্ষ টাকা। রিলিফ, গ্রাম পুনর্গঠন এবং মহামারী দমন এই তিনটি প্রধান কাজে ১৯৪৪ হইতে ১৯৪৬ এই দুই বৎসরে ৬ কোটি বাঙ্গালীর জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এই ব্যয়ের জন্য যদি দুই বৎসরের ১৯ কোটি টাকা ঘাটতি কিংবা দেনা দাঁড়াইত তাহা হইলে সে দেনাকে স্বাস্থ্য এবং জীবনের মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করিতাম কিন্তু এ দেনা সে জন্য নয়। গত দুই বৎসরে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাংলা সরকারকে রিলিফ এবং মহামারীর জন্য দান করিয়াছে ১০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দানের টাকার বেশী বিশেষ কিছু বাংলা সরকার স্বাস্থ্য ও দুঃস্থের জন্য ব্যয় করেন নাই।

শতকরা মাত্র একজন দুঃস্থের রিলিফের ব্যবস্থা

দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীই গত দুই বৎসরে বাংলার প্রধান ঘটনা। প্রাদেশিক রাজকোষ হইতে এত বড় দুর্য্যোগে যে সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে রীতিমত একটা কেলেঙ্কারীর কথা। এই বায়ে মোট ১,৮০,০০০ দুঃস্থকে রিলিফ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে ৩৫ লক্ষ, পিপলস্ রিলিফ কমিটির হিসাবে জীবিত দুঃস্থ আছে ৬০ লক্ষ। চলতি বৎসরে ২৬৮টি কর্ম্ম কেন্দ্র, ৬৭টি দুঃস্থনিবাস এবং ৮৮টি শিশুসদন আছে, এইগুলি তুলিয়া দিয়া ৬০টি কেন্দ্রীয় দুঃস্থনিবাস খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে কতলোকের ব্যবস্থা হইতে পারিবে তাহা অর্থসচিব বলেন নাই, অনুমান বড় জোর ৬০০০ লোক হইতে পারে, তাহার বেশী নয়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন দুঃস্থের ভিতর ১ জনের ব্যবস্থা হইবে, বাকি ৯৯ জন কি করিবে?

মহামারীর বিরুদ্ধে জনস্বাস্থ্যের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও ঐ একই রকম ছবি পাওয়া যায়। রোগীর চিকিৎসার জন্য ১০০ বেড সমেত ৫২টি হাসপাতাল, ৫০ বেড সমেত ৯২টি এবং ৪৪১ বেড সমেত ২০টি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সব সরকারী হাসপাতালে এক সময়ে মোট ২৯৬২০ জন রোগীর ব্যবস্থা হইতে পারে। শুধুমাত্র কলিকাতায় মহামারীগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যখন ডাঃ বিধান রায়ের হিসাব অনুসারে ২ লক্ষ তখন সারা বাংলার জন্য শুধুমাত্র সাড়ে উনত্রিশ হাজার লোকের হাসপাতাল খুলিয়া বাংলা সরকারের অর্থসচিব নির্লজ্জের মতই বাহাদুরী লইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য এই সব হাসপাতাল ছাড়া ২০০টি চিকিৎসক বাহিনী বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে, কিন্তু সারা বাংলার গ্রামের সংখ্যা প্রা ৯০,০০০ এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামই মহামারী আক্রান্ত।

এই জন্যই মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৪৪ সালের ১০ মাস দাঁড়াইয়াছে সরকারী হিসাবে প্রায় ১২ লক্ষ। এই এক বছরে রিলিফ, গ্রাম পুনর্গঠন এবং স্বাস্থ্য এই তিন খাতে মোট ব্যয় হইয়াছে মাত্র কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

ঘাটতি ও দেনার কারণ

এত মৃত্যু সত্ত্বেও সরকারী তহবিলে ত ঘাটতি এবং এত দেনা কেন? সরকারী সরবরাহ বিভাগ খাদ্য সরবরাহের ব্যবসায় লোকসান দিয়াছে মোট ২২। কোটি টাকা (১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ এই দুই বছরে ১৭ কোটি টাকা, আগামী বছরে ৫। কোটি টাকা)। এত লোকসানের বরাদ্দ কেন ধরিতে হয়? সত্য বটে ১৯৪৩ সালে বেশী দরের কেনা চাউল ১৯৪৪ সালে কম দরে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহার মানে এই যে বাংলা সরকার মজুতদারের চাউল বাজেয়াপ্ত করিতে পারে নাই, চোরাকারবারীর নিকট হইতে চোরাবাজারের দর দিয়া চাউল কিনিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে বাজারে চাউল প্রতিমণ ৯৲ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল, অথচ সরকারী রেশন দোকানে চাউল ১৬।০ করে বিক্রী হইয়াছে। তাহা সত্ত্বে লোকসান পূরা হয় নাই কেন? সরকারী এজেণ্টরা সরকারের নিকট চাউলের জন্য বার টাকার টাকা করিয়া মণ লইয়াছে, সরকার যদি ব্যবসায়ীর নিকট হইতে না কিনিয়া সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে কিনিত তাহা হইলে বহু টাকা বাঁচিত। মজুতদারকে না ধরিয়া মজুতদারের নিকট হইতে চাউল কিনিয়া সরবরাহ করার ফলেই সরকারী তহবিল হইতে ২২। কোটি টাকা লোকসান হয়, এবং ঠিক সেই জন্যই আজ সারা বাংলার ঘাড়ে ১৯ কোটি টাকা দেনা। এই ১৯ কোটি টাকা হইল দুঃস্থের মৃত্যুর বিনিময়ে মজুতদারের জন্য খেসারত। মজুতদারের মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া চাউল আদায় করিলে এবং ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর না করিয়া সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে চাউল কিনিলে লোকসান হইত না, ১৯ কোটি টাকা দেনাও ঘাড় চাপিত না, ১৯ কোটি টাকার দেনায় ৪ গুণ বেশী দুঃস্থের জন্য খাদ্য, বাসগৃহ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারিত। তাহার ফলে ১২ লক্ষ লোকের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক প্রাণে বাঁচিতে পারিত।

মজুতদারীর ঋণ মজুতদারই শোধ করিবে

কিন্তু খাদ্যসংগ্রহ এবং খাদ্যসরবরাহের ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে ব্যবসায়ী মজুতদারের উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না, কারণ মজুতদারের চাউল কাড়িয়া লইতে হইলে কিংবা সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে চাউল কিনিতে হইলে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করা চলে না। কাজেই এক উপায় ব্যবসায়ী ও মজুতদার আর এক উপায় জনসাধারণের স্বদেশপ্রেম। কিন্তু দলাদলি করিয়া জনগণের স্বদেশপ্রেম জাগান যায় না, তাই বাঙ্গালীকে দলাদলির জন্য তিন বছরে অর্দ্ধকোটি প্রাণ ছাড়াও ২।০ কোটি টাকা মজুতদারকে খেসারত স্বরূপ দিতে হইয়াছে। এই ২২।।০ কোটি টাকার কোটি টাকা এখনও পরিশোধ করা বাকি আছে। এই ঋণ মজুতদারের ঋণ।

ফসল বাড়াইবার জন্য ১৯৪৩-৪৪ সালে ব্যয় হইয়াছে ১ কোটি টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে ব্যয় করা হইয়াছে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, ১৯৪৫-৪৬ সালের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৭৭০০০ টাকা। এই ব্যয়েরও অধিকাংশ যাইবে কর্ম্মচারীর

(১১ পৃষ্ঠা দেখুন)

কলিকাতার মেয়র, কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট সংবাদিকদের বাণী

লালফৌজ দিবসের অভিনন্দন

ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে লাল ফৌজের বিরাট জয়যাত্রায় সমস্ত পৃথিবী প্রশংসমান। জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাশিয়ানরা যে তীব্র দেশপ্রেম, অটল ঐক্য ও সজ্ঞবদ্ধ শক্তি দেখাইয়াছে—আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি আশা করি যে তাহাদের প্রয়াস শীঘ্রই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিবে।

—আনন্দিলাল পোদ্দার
কলিকাতার মেয়র
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

★

বিরাট মানব কল্যাণের আদর্শ লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া যখন তাহার শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছিল, ঠিক সেই সময় রাজ্যলোলুপ নাৎসী জার্ম্মানী তাহার উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধারণ সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া ওঠে। কারণ তাহারা জানিত নাৎসীবর্ব্বরতাকে সোভিয়েট রুখিতে পারিবে কি না তাহার উপরই মানব জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাই আমাদের ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েট রাষ্ট্রকে তাঁহাদের সমবেদনা জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু নাৎসী বর্ব্বরতা তাহার অকথ্য অত্যাচারেও সোভিয়েট দেশকে ধ্বংস করিতে পারিল না। শীঘ্রই লালফৌজ প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাদের সোভিয়েট দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিল। সেই আক্রমণে একদিকে যেমন প্রগতিশীল জনসাধারণ আশা ও আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমন প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা হতাশা ও ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। কারণ লালফৌজ প্রগতির সৈনিক এবং লালফৌজের জয়ের অর্থ প্রগতির জয় ও প্রতিক্রিয়ার বিনাশ। তাই লালফৌজের জয় আজ শুধু সোভিয়েটের জয় নয়; প্রত্যেক স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তি ও জাতির জয়। এই জন্যই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অভিনন্দন লালফৌজের প্রাপ্য।

—জে, সি, গুপ্ত এম-এল-এ
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

★

'এখন কি হবে', 'ভারতবর্ষের কি হবে'—এই ধরণের প্রশ্ন বহু ভারতবাসীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজয় অভিযান, অন্যদিকে পশ্চিমে ও বিমান পথে মিত্রপক্ষের রণনীতি অনুযায়ী যুগপৎ আক্রমণ—ইহার পর জার্ম্মান সমরযন্ত্রের টিকিয়া থাকার বিন্দুমাত্র আশা তাঁহারা আর পোষণ করেন না। প্রুশিয়ানদের কাল্পনিক অজেয়তার কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু আজও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমানের ভয়ঙ্কর পট ভূমিকায় লাল ফৌজের জয়যাত্রার সুদূরপ্রসারী অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না। লাল ফৌজ হইতেছে মুক্তির বাহিনী—আমার এ কথা এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। মুক্তির দুর্ব্বার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বলিয়াই লাল ফৌজ আমাদের হৃদয় সহজে স্পর্শ করে। যে সামাজিক মুক্তির কথা আমরা এতকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি, যে শক্তি সেই সামাজিক স্বাধীনতার একমাত্র ভরসা—লাল ফৌজ তার আক্রমণ, রণ কৌশল আর মুক্তির দুর্ব্বার প্রেরণার জোরে সেই শক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতেছে। লাল ফৌজ বিপ্লবের বাহিনী। আজ ইউরোপ, কাল এশিয়া কিনা কে বলিতে পারে! আজ এই বাহিনী আটলান্টিকের বুকে; কাল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই বাহিনী অভিযান শুরু করিবে কিনা কে বলিতে পারে! গতানুগতিক অর্থে পেশাদার সৈন্যবাহিনী লালফৌজ নয়। তাহাদের সোশালিষ্ট পিতৃভূমি রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়া লাল ফৌজের জন্ম। যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহাদের এই বলিষ্ঠ মৌলিক লক্ষ্য মানব-মুক্তির ব্যাপকতর ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতেছে। লাল ফৌজকে রুশ সৈন্যবাহিনী মনে করা ভুল। লাল ফৌজ বিশ্ববিপ্লবের বর্শাফলক। লাল ফৌজ সর্ব্বকালের! লাল ফৌজ সর্ব্বজনের!

—ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন
অন্যতম সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

★

১৯৪১-৪২ সালে যে সোভিয়েট রাশিয়া নাৎসী জার্ম্মানীর দুর্দ্দান্ত আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িবার জো হইয়াছিল বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হইয়াছিল, সেই রাশিয়ার সৈন্যদলই আজ বার্লিনের ৩০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। নিঃসন্দেহে সামরিক জগতের ইহা বিস্ময় এবং জনসাধারণের নিকট ইহা এক গোলক ধাঁধার মত। কিন্তু ইহার মধ্যে ধাঁধাঁ কিছুই নাই, রণনীতিতে যাদুবিদ্যা ও ভেল্কিবাজীর কোন স্থান নাই। জার্ম্মানীর সৈন্যদল ওয়ারস হইতে ষ্টালিনগ্রাদ, বোধ হয় দেড় হাজার মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল এবং বল্টিক সাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত আরও দেড় হাজার মাইল ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিজের সামরিক শক্তির অনুপাতে স্থানের দূরত্ব ও পরিসর বাড়িয়া গেল। হিটলারী সৈন্যেরা দূরত্বের রণনীতির (Strategy of space) প্যাঁচে পড়িয়া গেল। সোজা দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যে এক বড়ি কালিতে যেখানে এক দোয়াত উৎকৃষ্ট কালি হইতে পারিত, হিটলার তাহা দিয়া তিন দোয়াত কালি তৈয়ারির রণনৈতিক দুঃসাহস দেখাইতে পাইলেন। ফলে, বহু দূর বিস্তৃত হিটলারী সামরিক শক্তি "জলো" হইয়া পড়িল। ইহার সঙ্গে চলিল লাল ফৌজের গভীরতর ব্যূহের আত্মরক্ষার সহিত সুযোগ ও সময় মত হিটলারী সৈন্যের উপর প্রত্যাঘাত। দূর দেশের অভ্যন্তরে পিছু হটিয়া গিয়া সোভিয়েট হাইকমাণ্ড জার্ম্মাণ সেনানীমণ্ডলীকে দীর্ঘস্থায়ী বলক্ষয়কারী সংগ্রামের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। যোগাযোগ ও সরবরাহ রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জার্ম্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক শক্তির আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সীমানা হইতে বহিষ্কৃত হইল। অবশ্য ইহার সঙ্গে অন্যান্য বহু প্রশ্ন আছে, যাহার আলোচনা এই সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্ভব নহে।

আজ লাল ফৌজ জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালের মত রাশিয়াও কি জার্ম্মানীতে দূরত্বের রণনীতির প্যাঁচে পড়িবে?—না। প্রথমতঃ লাল ফৌজ সরবরাহ ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে। দ্রুত পলায়মান জার্ম্মানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পোড়া মাটীর নীতি অনুসরণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানীর শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান নহে, ক্রমক্ষীয়মান—নিত্য নূতন রিজার্ভ সৈন্য কিম্বা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আনিয়া লাল ফৌজকে সে পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। সৈন্যসংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় আজ জার্ম্মানী রাশিয়ার তুলনায় হীনবল। তৃতীয়তঃ সোভিয়েট রণনীতির শ্রেষ্ঠতা জার্ম্মানীকে ফাঁদে ফেলিয়া দিয়াছে। পোল্যাণ্ড, পূর্ব্ব প্রুশিয়া, সাইলেসিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মান সৈন্যেরা এক একটি বড় বড় ঘাঁটিতে আটকা পড়িয়াছে। যেমন কোনিংসবার্গ, পোজনান, ব্রাসলাউ, বুদাপেষ্ট (সদ্যমুক্ত) ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লাল ফৌজের একটা বড় অংশ এই সমস্ত জার্ম্মান সৈন্যদলের চারিদিকে মৃত্যুবেষ্টনী রচনা করিয়া ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে সাবাড় করিতেছে। আবার ইহারই সঙ্গে প্রধানতম রুশবাহিনী অগ্রসর হইয়া মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে জার্ম্মানীর হৃদপিণ্ড বার্লিনকে বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! অপর দুইজন মার্শাল (কোনিয়েভ ও রকোসোভিস্কি) জুকভের দুই পার্শ্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এবং নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন জার্ম্মান সৈন্যদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া বার্লিন অভিযান শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছেন। ফলে, দাঁড়াইয়াছে এই যে রুশ অভিযানের প্রথম বন্যাস্রোতে জার্ম্মান সৈন্যেরা বিভিন্ন স্থানে নিমজ্জমান দ্বীপের মত ডুবিতে বসিয়াছে। সমগ্র হিটলারী বাহিনী একত্রে ও সমবেতভাবে লাল ফৌজকে বাধা দিতে পারিতেছে না,—Continued line of resistance আর নাই। ট্র্যাজিডি এই যে জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি এখনও যথেষ্ট থাকা সত্বেও সে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। উহা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। রুশ রণনীতির আক্রমণ চাতুর্য্যে এবং দুঃসাহসিক কৌশলের নিকট আজ জার্ম্মান হাইকমাণ্ড বিভ্রান্ত। সামরিক দিক হইতে জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিটলার ও নাৎসীদলের পক্ষে যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের চরম সর্ব্বনাশ আজ জার্ম্মানী বরণ করিতেছে—বার্লিনেরও যেমন রক্ষা নাই, হিটলারেরও তেমনই ত্রাণ নাই।

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, যুগান্তর
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

ষ্টালিনের আত্মপরিচয়

[ষ্টালিন সম্বন্ধে আজকাল গবেষণার অন্ত নাই। বহুলোক তাঁহাকে বহু ভাবে চিত্রিত করিয়াছে। টিফ্লিস রেল মজুরদের কাছে ষ্টালিনের এই বক্তৃতায় তাঁহার নিজের বিপ্লবী জীবনের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাইবে।]

"কমরেডস্, আপনারা এখানে আমার যে রকম প্রশংসা করেছেন, আসলে তা'র অর্দ্ধেকও আমার প্রাপ্য নয়। আপনারা আমাকে "নভেম্বর বিপ্লবের বীর", "কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের নেতা" ইত্যাদি খুসিমত নানাবিধ আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

এই সবই অত্যন্ত অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি, নিষ্ফল আলোচনা। বিপ্লবীদের শোক সভায় এই জাতীয় বক্তৃতা হয়, কিন্তু কমরেডস্, আপাততঃ আমার মরবার ইচ্ছা নেই।

আগে আমি কি ছিলাম এবং কা'দের সাহায্যে আমি পার্টিতে আমার বর্ত্তমান স্থান পেয়েছি, সে কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

বিপ্লবে শিক্ষানবিশী

কমরেড আরাকেল এই মাত্র বল্লেন যে তিনি অতীতে নিজেকে আমার শিক্ষক এবং আমাকে তাঁর একজন ছাত্র বলে মনে করতেন। কমরেড আরাকেল খুবই সত্যি কথা বলেছেন। আমি আগে এই টিফ্লিস রেল কারখানার একজন সচেতন শ্রমিক ছিলাম এবং এখনও আমি এখানকার শ্রমিক বলে নিজেকে মনে করি।

মনে পড়ে ১৮৯৮ সালে রেল শ্রমিকদের একটি গ্রুপে আমি প্রথম যোগ দিই। কমরেড ষ্টুরভার ঘরে মিলভেষ্টার (সে সময় তিনিও আমার একজন শিক্ষক ছিলেন) চোড্রিস্ভিলি, কমরেড নিনুয়া এবং টিফ্লিসের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় শ্রমিকের কাছ থেকে আমি বাস্তব কাজের শিক্ষা পাই।

এই সমস্ত কমরেডদের তুলনায় আমি তখন শিক্ষানবিশ মাত্র। এঁদের অনেকের চেয়ে হয়ত আমি বেশী পড়েছি, কিন্তু হাতেকলমে কাজের দিক থেকে তখন আমি শিক্ষানবিশ মাত্র।

টিফ্লিসের এই সব কমরেডদের কাছ থেকেই বিপ্লবে আমার প্রথম হাতে খড়ি। এই সব কমরেডের মধ্যে আমি প্রথম বিপ্লবের শিক্ষানবিশ হই। সুতরাং আমার প্রথম শিক্ষক হচ্ছে টিফ্লিসের শ্রমিকরা। তাঁদের আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত পার্টি নির্দ্দেশে আমি বাকুতে কাজ করি। সেখানে তেল খনির মজুরদের মধ্যে দু' বছর কাজের ফলে আমি হাতেকলমে অনেক কিছু শিখি এবং এই শিক্ষাই আমাকে একজন বিপ্লবী যোদ্ধা ও বাস্তব-জ্ঞানসম্পন্ন নেতা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

বিপ্লবী নেতা

ওয়াচেক, সারাটোভেটস প্রমুখ বাকুর নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের সংস্পর্শে এবং তেলখনির মালিক ও মজুরদের তীব্র সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ ক'রে আমি প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার মানে কি তা' শিখলাম।

এই ভাবে বাকুতে দ্বিতীয় দফায় বিপ্লবে আমি দীক্ষিত হলাম এবং বিপ্লবের শিক্ষানবিশী থেকে বিপ্লবী কর্ম্মীতে পরিণত হলাম। এই সঙ্গে আমি আমার বাকুর শিক্ষকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯১৭ সালে কারাদণ্ড ও নির্ব্বাসন শেষ করে পার্টির নির্দ্দেশে আমি লেনিনগ্রাডে যাই। সেখানে বিশ্বশ্রমিকের শ্রেষ্ঠনেতা কমরেড লেনিনের সঙ্গলাভে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে শ্রমিক ও ধনিকদের তীব্র সংঘর্ষের অংশ গ্রহণ করে আমি প্রথম বুঝলাম শ্রমিকদের পার্টি নেতা হওয়ার মানে কি।

বিশ্বের সমস্ত নির্য্যাতিত জাতি ও সমস্ত দেশের শ্রমিকদের নেতা লেনিনগ্রাডের এই শ্রমিকদের কাছ থেকে আমি বিপ্লবে তৃতীয় দীক্ষা পেয়েছি।

এই ভাবে লেনিনের নেতৃত্বে আমি বিপ্লবের একজন নেতা হই। এই সঙ্গে আমি আমার রুশদেশের সমস্ত শিক্ষকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক লেনিনের স্মৃতির কাছে মাথা নত করছি।

কমরেডস্, সমস্ত অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের ইতিহাস।"

ভারতের দাসত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট নেতাদের মন্তব্য

[লণ্ডন হইতে প্রেরিত সংবাদ]

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য প্রচণ্ড সোভিয়েট-বিদ্বেষী কমাণ্ডার বোয়ার পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতা দিয়াছেন। সোভিয়েটের উচ্চতম পরিষদের পাঁচজন সদস্য "ইজভেস্তিয়া" কাগজে এক চিঠি লিখিয়া এই বক্তৃতার উত্তর দিয়াছেন। পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে কমাণ্ডার বোয়ারের সমস্ত মিথ্যা সমালোচনার উত্তর দিয়া তাঁহারা বলেন:—

"পোল্যাণ্ড অথবা অন্য কোন দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কমাণ্ডার বোয়ারের লম্বাচওড়া ঘোষণা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। কারণ সকলেই জানেন যে এই বোয়ারই ভারতবাসীদের চিরদিন পরাধীন রাখিবার পক্ষপাতী।"

বর্ব্বরতার প্রতীক জার্ম্মান বাহিনী

যে নাৎসী ব্যবস্থা আজ সভ্য মানব সমাজকে এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে টানিয়া নামাইয়াছে, যাহার কুৎসিত ক্ষুধা মিটাইতে দেশের পর দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, যাহার নিষ্পেষণ যন্ত্রের তলে লক্ষ লক্ষ শিশু, মেয়ে, পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা যে শুধু এক আধটি সেনাদলের খাম-খেয়ালী জুলুম বা ব্যক্তিবিশেষের বাড়াবাড়ি তা নয়। সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়াই প্রতিটি অধিকৃত দেশে নাৎসীরা এই দারুণ অত্যাচার চালাইয়াছে।

তাই জার্ম্মানদের লক্ষ্য করিয়া বিখ্যাত রুশলেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ বলিয়াছেন—"সমস্ত পৃথিবীর সামনে তোমরা একটা মস্ত বিভীষিকা। মধ্যযুগের নিষ্ঠুরতা নতুন করে তোমরা আবার ফিরিয়ে এনেছো। তোমরা যেখানেই যাও, তোমাদের হাতে ধারালো চাবুক আর ফাঁসীর দড়ি।"

নির্ব্বিচারে খুন করার হুকুম

নিরস্ত্র বেসামরিক নিরীহ লোকজনের উপর জার্ম্মান সেনাদল কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহার অসংখ্য হুকুমনামা ধরা পড়িয়াছে। নমুনা হিসাবে একটি দেওয়া গেল।

সোভিয়েটের ফিওডেসিয়া অঞ্চল তখন জার্ম্মানদের দখলে। সেখানকার কর্ত্তা ছিল এবারহার্ড নামে একটা নাৎসী অফিসার। তারই ৪৩১।৪১ নং হুকুমনামা, যাহা লালফৌজের হাতে আসিয়াছে, তাহা এই—"রাস্তায় লোকজনের চলাচল কখনও বরদাস্ত করিও না। গুলি করিতে যেন গাফিলতি না হয়। একত্র কয়েকজন দেখিলেই ঘিরিয়া ফেলিয়া সাবাড় করিবে। কোন অনুকম্পা নয়। দলের সেরা সেরা গুলিকে প্রকাশ্য স্থানেই যেন ফাঁসীতে লটকানো হয়।"

জার্ম্মান সৈন্যরা অক্ষরে অক্ষরে নাৎসী সমর-নায়কদের এই সব হুকুম তামিল করিয়াছে। কার্চ্চ সহরে এক দিনেই তাহারা ৭০০০ লোককে মেসিন-গানের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। বেলোরাশিয়ার তিনটি সহরের অসম্পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে—অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শুধু ফাঁসীতেই ভাইটেবস্কের ৬০০০, পিনস্কের ১০,০০০ এবং মিনস্কের ১২,০০০ লোককে মারা হইয়াছে। খারকভ অধিকার করার পরেই জার্ম্মানরা ১৪,০০০ লোককে ফাঁসী দিয়াছে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে৫২,০০০ লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। এছাড়া ওডেসায় ৮০০০, নেপ্রোপেট্রোভস্কে ১০,৫০০ মেরিয়াপোলে ৩০০০, কামেনটস্-পোলডস্কে ৮৫০০ লোককেও এমনি ভাবেই মারিয়া ফেলা হয়।

অর্দ্ধদগ্ধ দেহের উপরও অত্যাচার

ফাঁসী ছাড়াও নানারকম অস্বাভাবিক উপায়ে নাৎসীরা অসংখ্য লোককে ধ্বংস করিয়াছে। মহিলা, শিশু বা বৃদ্ধ বলিয়াও কোনরূপ বাছবিচার করা হয় নাই।

জার্ম্মানীর কবলে তখন সোভিয়েটের ওরেল অঞ্চল। সতের বছরের তরুণী সোভিয়েট মেয়ে নাদেজদা মাণ্টসাভা ও তার বৃদ্ধা মাকে একদিন জার্ম্মানরা ধরিয়া আনে। মা বা মেয়ে কিম্বা গ্রামের কেউ জানেনা তাদের কি অপরাধ। গ্রামের সবাইকেও জড়ো করা হয় মাঠের দিকে। সেখানে মাণ্টসাভাকে তার বৃদ্ধা মায়েরই পাশে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। এবার জার্ম্মানগুলো তরুণী মেয়েকে মায়ের সামনেই কুৎসিত ইঙ্গিতে অপমান সুরু করে। খানিক পর মায়ের উপরই হুকুম হয় মেয়ের গায়ে আগুন ধরাইয়া দিতে। প্রস্তাব শুনিয়াই বৃদ্ধা মা জ্ঞান হারায়। জার্ম্মানদের আর তর সয় না। নিজেরাই মাণ্টসাভার চারিদিকে আঁটিবাঁধা খড় আনিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। মা যখন জ্ঞান ফিরিয়া পায় তখন আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সবাইর সামনে মেয়েটিকে আরও যন্ত্রনা দিয়া হত্যা করার জন্য তার অর্দ্ধদগ্ধ দেহটি আগুন হইতে টানিয়া বার করা হয়। মেয়ের মুখে তখন মৃত্যু-যন্ত্রনার করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর আশেপাশে জার্ম্মানগুলোর মুখে চোখে ছিল পিশাচের হাসি। গ্রামের সবাই এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারে নাই। উন্মত্ত ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া নারীহন্তাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু মেসিন গানের গুলিতে সবাইকেই তখন তখনই প্রাণ দিতে হয়।

লাইব্রেরী মিউজিয়াম ভস্মীভূত

জার্ম্মানরা কি ভাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সব কিছু অবদান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ।

মস্কো অঞ্চলের খানিকটা অংশ এখন জার্ম্মান বাহিনীর অধিকারে। নাৎসীরা সেখানের ১১২টি লাইব্রেরী ধ্বংস করে এবং ৪টি মিউজিয়াম ও ৫৪টি থিয়েটার এবং সিনেমা গৃহে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া ফেলে। বরোডিনো মিউজিয়াম সোভিয়েটের একটি শ্রেষ্ঠ কৃষ্টিকেন্দ্র। নাৎসীরা সেটির চিহ্নও রাখে নাই। তাহারা এমনি ভাবে 'পুস্কিন ভবনকে'ও নষ্ট করিয়াছে, কালুগার বিখ্যাত সিয়োলজোভস্কী মিউজিয়মকে গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। ওরেল এলাকায় একটি লাইব্রেরীতে ৪০,০০০ দুষ্প্রাপ্য বই ছিল। সেগুলির আর একখানাও নাই।

খারকভের করলেঙ্কো লাইব্রেরী ইউক্রেনের একটী গর্ব্বের বস্তু। পৃথিবীর শিক্ষিত লোকদের অনেকেই ইহার নাম শুনিয়াছে। ইহার অনেক গুলি অমূল্য বই ফ্যাশিষ্টরা প্রথমেই পুড়াইয়া ফেলে, তারপর হঠাৎ খেয়াল হইল এদের গর্ব্বের জিনিষ এদেরই চোখের সামনে নষ্ট করা হইবে। হইলও তাই। বইগুলি রাস্তায় স্তরে স্তরে বিছাইয়া মোটরের রাস্তা করা হয়। তারপর সহরের শিক্ষিত লোকদের জোর করিয়া আনিয়া সেখানে বসান হয়। পরে সুরু হয় সেই বইগুলিকে ধ্বংস করিবার কদর্য্য পালা। জার্ম্মানরা বিভৎস উল্লাসে কিছুক্ষণ বইগুলির উপর দিয়া মোটর চালাইয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন পেট্রোল ঢালিয়া বইগুলিকে পুড়াইয়া ফেলে।

মায়ের সামনে সন্তান হত্যা

সোভিয়েটের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত জার্ম্মান হুনদের হাত হইতে রেহাই পায় নাই! অকথ্য অত্যাচার তাদেরও সহ্য করিতে হইয়াছে।

মস্কোর নিকটবর্ত্তী একস্থানে জার্ম্মানরা একবার এক হাজার শিশুকে তাদের মায়েদের সহিত ধরিয়া আনে। তারপর প্রত্যেক মায়ের কোলে তাহারা শিশুটিকে রাখিয়া সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করানো হয়। কয়েকটা জার্ম্মান তখন এক দল শিশুর হাতগুলি এক সাথে মট মট করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয় এবং অন্য একদল শিশুর চোখগুলি উপড়াইয়া দেয়। মায়েরা এ দৃশ্য চোখে দেখিতে না পারিয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকে, কিন্তু নাৎসী বর্ব্বররা প্রত্যেকের হাত জোর করিয়া চোখ হইতে সরাইয়া দেয়—তাদের সন্তান হত্যার দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখিতেই হইবে।

গ্রাম ও সহরগুলিকে ধ্বংস

অধিকৃত দেশের সহর ও গ্রামগুলিকে ফ্যাশিষ্টরা যে কি ভাবে ধ্বংস করিয়াছে তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মস্কো এলাকার যে ২৩টি জেলা জার্ম্মানরা অধিকার করিতে পারিয়াছিল সেখানকার ৫৩৭টি গ্রামের কোন চিহ্নই জার্ম্মানরা রাখে নাই; আর ৯২৮টি গ্রামকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের ৩৮,৪২৩টি থাকিবার ঘর গুঁড়া করিয়া দিয়াছে, সহরের ৫১৪০টি ঘর নষ্ট করিয়াছে। ১২২০টি স্কুলের ৯৪৭টিরই ঘরবাড়ী পুরাপুরি ভাবেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। টুলা অঞ্চলের ৩১৬টি গ্রাম পুড়াইয়া দিয়াছে। জারিৎসা প্রাচীন শহরটী একদম ধূলিসাৎ করিয়াছে। কালুগা শহরের প্রতিটি রাস্তা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমনি অনেক সহরের নাম করা যায়, যেখানে এই সব ধ্বংস কার্য্য চলিয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩রা জানুয়ারী হিটলার নিজের নামেই এই ধ্বংস করার হুকুম জারী করে।

ফ্যাশিষ্ট বন্দীনিবাসে সোভিয়েট বন্দীদের মৃত্যু দৃশ্য। একটী জার্ম্মান সৈন্যের কাছে এই ফটো পাওয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধ বন্দীদের গুলী করিয়া হত্যা

যুদ্ধবন্দীদের উপর জার্ম্মানরা যে কিরূপ ব্যবহার করে তাহা ২৩৪নং জার্ম্মান পদাতিক বাহিনীর পল্টন ওয়াণ্টার গ্যারলাকের ১৯৪২ সালের ২০শে আগষ্টের বিবৃতি হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

কোরোষ্টানে আমাদের বাহিনী একবার ২০ জন লাল ফৌজকে ধরিতে পারে। প্রথমে যখন তাদের জেরা করা হয়, তখন তাদের উপর বেশ কিছুটা মারধর চলে, তারপর জেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ব্রিয়ানস্ক ও জিজড্রার মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় কিটগিজ নামে আমাদের এক অফিসার নিজের হাতেই ৬ জন যুদ্ধবন্দীকে বিনা কারণে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

আহত লালফৌজদের সাধারণতঃ প্রথম চোটেই হত্যা করিয়া ফেলা হইত। আমি একবার একদল যুদ্ধবন্দীকে নিয়া যাইতেছিলাম। পথের মাঝে হারমান নামক এক অফিসার অযথা প্রায়ই আসিয়া লাঠির বাঁট দিয়া বন্দীদের জোরে জোরে আঘাত করিত। বন্দী শিবিরগুলিতে অসুখের চিকিৎসা করানো হইত না এবং রোগীদের ১৪।১৫ ঘণ্টা দৈনিক খাটিতে হইত। ওরেল ক্যাম্পের যে খবর শুনিয়াছি তাহার অবস্থা বর্ণনাতীত……।

ফ্রান্সে ৮ জনে ১জন নিহত বা সর্ব্বস্বান্ত

জার্ম্মানরা এক একটা জাতিকে কি ভাবে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে, তাহা ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার একজন ফরাসী নাগরিকের চিঠি হইতেই বোঝা যাইবে।

জার্ম্মানরা গুলী করিয়া মারিয়াছে	১ লক্ষ ৩০ হাজার
জেলখানায় মরিয়াছে	১২ হাজার
জার্ম্মানীতে যুদ্ধবন্দী হিসাবে নির্ব্বাসিত	৯ লক্ষ ১৫ হাজার
জোর করিয়া মজুরী খাটাইতে জার্ম্মানীতে পাঠানো হইয়াছে	১৭ লক্ষ ২০ হাজার
রাজনৈতিক কারণে জার্ম্মানীতে নির্ব্বাসিত	২ লক্ষ
এলসাস ও লোরেন হইতে জোর করিয়া জার্ম্মানীতে পাঠানো হইয়াছে	২ লক্ষ
জার্ম্মানীতে য়িহুদী নাগরিক নির্ব্বাসিত করা হয়	১ লক্ষ ১০ হাজার
গৃহহারা করা হইয়াছে	১৫ লক্ষ
বাড়ী ঘর প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইয়াছে	৭ লক্ষ
মোট	৫৪ লক্ষ ৮৭ হাজার

ফরাসী দেশে মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটি। এই হিসাবে দেখা যায় ফরাসী দেশের প্রতি ৮ জন লোকের ১ জনকেই অর্থাৎ প্রতি পরিবারে একজনকে জার্ম্মানরা হয় সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে না হয় হত্যা করিয়াছে। — নিরঞ্জন সেন

★ সংস্কৃতির বাহক লালফৌজ ★

"সেদিন আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভূত চাপল। তুমি ত' লেখক, আমাদের তখনকার অবস্থা ভাল বুঝবে। যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে ভাল ভাল বই পড়তে কী ভালই যে লাগে। সম্প্রতি হেড কোয়ার্টার থেকে পুশকিনের কবিতা, লিও টলষ্টয়ের 'সেবাস্তোপোল', নিকোলাই টিখোনভের কবিতা এবং শেখভ-এর ছোট গল্পের কতকগুলি সংগ্রহ আমাদের হাতে এসেছিল। শুনে আশ্চর্য্য হবে সেদিনটা আমাদের মহা ফূর্ত্তির দিন।… আমাদের প্রিয় লেখকদের লেখা আমরা নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে পড়তে লাগলাম। একজনের পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন কেড়ে নিচ্ছে—সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।"

—এই চিঠিটি আসিয়াছিল, এক রুশ ট্যাঙ্ক-অফিসারের কাছ হইতে। নাম তাঁহার ভেডেণিকভ। হয়ত এই চিঠি লিখিবার পরই তিনি স্বদেশরক্ষার যুদ্ধে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছিলেন। জার্ম্মান সৈন্যদের পিছু পিছু ধাওয়া করিবার সময় পুশকিনের কথাগুলি হয়ত তাঁহার মনে পড়িতেছিল:

'অন্ধকার লুপ্ত হ'ক, সূর্য উঠুক।'

…নৌবাহিনীর তরুণ সৈনিক আইভান মরোজভ লিখিয়াছেন: "কাল ফ্যাশিষ্টদের একটা জাহাজ ডুবিয়ে দেবার পর আমরা আমাদের সাব-মেরিনে এক সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করি। বিষয় ছিল: নিকোলাই অষ্ট্রোভস্কির সাহিত্য আলোচনা। আমি ছিলাম প্রধান বক্তা। কিন্তু সোভিয়েট তরুণদের এই প্রিয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আপনি যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কাছে দুচার কথা লিখে পাঠান ও এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য কি ক'রে পাওয়া যায় ব'লে দেন তাহ'লে খুব ভাল হয়। এসব পেলে আর একদিন আমরা বৈঠকের আয়োজন করতে পারি।"

…সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের গত সম্মেলনে নিকোলাই টিখোনভ এক কাহিনী বলেন। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে যখন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, লালফৌজের অনেকের মুখে তখন শোনা যাইত:

"আজ আমরা প্রাণপণ লড়াই করেছি।…সমস্তক্ষণ আমাদের মনে হচ্ছিল, নিকোলাই অষ্ট্রভস্কি স্বয়ং যেন আমাদের কামান থেকে গোলা বর্ষণ করছেন, আমাদের বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করছেন। আমরা যেন তাঁর কণ্ঠে রণধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম: "এগিয়ে চলো কমরেড! স্বদেশরক্ষার শপথ আমাদের! ষ্টালিনের কাছে আমরা প্রতিশ্রুত।…"

লেনিনগ্রাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে বীর সৈনিকদের পাশাপাশি নিকোলাই অষ্ট্রভস্কি লড়িতেছেন—একজন লেখককে ও তাঁহার রচনাকে কত বেশী ভালবাসিলে এবং শিল্পস্রষ্টার কত গভীর অনুভূতি থাকিলে তবে যুদ্ধের উন্মত্ততার মধ্যেও মানুষের মনে এই কল্পনা আসিতে পারে।

লালফৌজ যে আজ শত্রুর উপর মরণ আঘাত হানিতেছে, তাহার অন্যতম কারণ কবিতা, কথা-সাহিত্য আর রাশিয়ার ইতিহাস, শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্য আর জনগণের বীরত্ব কাহিনীর প্রতি লালফৌজের এই অসীম অনুরাগ।

লালফৌজের এই শক্তির উৎস নাৎসী দস্যুরা বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষিত, চিন্তাশীল যে সমস্ত সৈনিক লেনিন, ষ্টালিন, পুশকিন, বায়রণ, লংফেলো, গর্কী প্রভৃতির অনুরাগী পাঠক—তাহারাই আজ পশ্চিমের দিকে নাৎসী বর্ব্বরতার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে।

লাল ফৌজ ইতিহাস গড়িতেছে

লেখক :
হীরেন মুখার্জ্জি

লালফৌজ আজ বিজয় বৈজয়ন্তী লইয়া বার্লিন অভিমুখে দুর্জ্জয় বেগে অগ্রসর হইতেছে। ১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্রকে সহস্র শত্রুর লোলুপ আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য লাল ফৌজ সংগঠিত হইয়াছিল। তখন হইতে ২৭ বৎসর সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর দিয়া কত ঝড়ঝাপটা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া, হিটলার জার্ম্মানীর গর্ব্বোদ্ধত সমরশক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সোভিয়েট আজ সর্ব্বদেশের জনগণের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে। লাল ফৌজ ছিল বলিয়াই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন না হইয়া আজ নবদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছে।

নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে ষ্টালিন বলিতে পারিয়াছিলেন যে সোভিয়েট ভূমির কোথাও আর শত্রু টিঁকিতে পারে নাই, পথ-কুকুরের মত শত্রু পলাইতে বাধ্য হইয়াছে। এবার লাল ফৌজের জন্মোৎসব যখন পালিত হইতেছে, তখন শত্রুর আর পলাইবার মত স্থানও নাই, হিংস্র পশুর মত মরিয়া হইয়া লড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা সে করিতেছে বটে কিন্তু বিনাশ তাহার নিশ্চিত। ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরের দল বিশ্বব্যাপী যে নিষ্ঠুর তাণ্ডবের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার অবসান এখন আসন্ন।

পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস, রুমেনিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট, বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড, এবং হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট এখন লাল ফৌজের কল্যাণে ফ্যাশিষ্ট দুঃশাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইয়োরোপের দেশে দেশে জনজাগরণ ঘটিয়াছে প্রধানত লাল ফৌজের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ফলে। বিশ্বের মুক্তির আহ্বান আজ সর্ব্বদেশে যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার মূলে আছে লাল ফৌজের বিপুল সাফল্য।

সোভিয়েট সেনাপতি

জুকভ, কোনিয়েভ, রকোসভ্স্কি, তলবুখিন, পেট্রভ, মালিনোভ্স্কি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর লাল ফৌজকে দুর্দ্দম বেগে শত্রুনিপাতের পথে পরিচালনা করিতেছেন। জার্ম্মাণ সেনাপতিদের মত কুলগৌরব ইঁহাদের নাই; শ্রমিক ও কৃষকের বংশোদ্ভূত এই যোদ্ধারা আজ নূতন করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন, যুদ্ধবিদ্যা যে অর্থবানদের একচেটিয়া নয় তাহার প্রমাণ আজ জ্বলন্ত লাল অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা হইতেছে। লাল ফৌজকে । কিছুতেই দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা বলিয়া মানতে রাজী নয়, আজ তাহারাও আর বাগ্‌বিস্তার করিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপারে সোভিয়েট দেশ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছে।

রাত্রির অন্ধকারে দস্যুর মত অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হিটলার যখন প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহার মতলব ছিল ছয় হইতে আট সপ্তাহের মধ্যে মস্কো দখল করিয়া সোভিয়েটের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেওয়া। সমস্ত ইয়োরোপের যুদ্ধশক্তি প্রয়োগ করিতে পারায় হিটলার তখন সোভিয়েট-ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। অনেকেই তখন মনে করিতেন যে অপরাজেয় হিটলার বাহিনীকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই, অনেকেই তখন ভাবিয়াছিলেন যে সোভিয়েটের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

হিটলারী দম্ভের জবাব

কিন্তু হিটলারের দম্ভের জবাব যে কি ভাবে দিতে হয়, তাহা সোভিয়েটই দেখাইল। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে মিলিয়া প্রতিরোধ কাহাকে বলে, তাহা সোভিয়েটই শিখাইল। স্বদেশ যখন সত্যই জনগণের স্বদেশ, তখন স্বদেশের ধূলিকে স্বর্ণরেণু মনে করিয়া দেশরক্ষায় কী অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অটল সংকল্প দেখানো যায়, তাহা সোভিয়েটই দুনিয়াকে বুঝাইল।

১৯৪১ সালে একা সোভিয়েট হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িল, দেশের বহু অঞ্চল শত্রু হস্তগত হইলেও মুহূর্ত্তের জন্য পরাজয় স্বীকার করিল না, শত্রুর হাতে পড়ার আশঙ্কা থাকায় কত কষ্টে গড়া, কত সাধের শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া দিল, ওডেসা, লেনিনগ্রাদের দরজায় জগৎকে দেখাইল যে দেশপ্রেম ও যুদ্ধকৌশল কাহাকে বলে। স্মোলেন্সকের কাছে তিনমাস হিটলারীদের ঠেকাইয়া রাখিয়া শত্রুর পরিকল্পনাকে চুরমার করিয়া দিল, আর যে মস্কো দখল করিব বলিয়া বারবার হিটলার বড়াই করিয়াছিল, সেই মস্কোর নিকট শত্রু-বাহিনীকে যেভাবে পরাজিত করিল, তাহারই পূর্ণ ফলাফল আজ জার্ম্মাণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি।

১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে লাল ফৌজ যে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তখনই মার্কিন সেনাপতি ম্যাকার্থার বলিয়াছিলেন যে ইতিহাসে কোথাও তাহার তুলনা নাই।

ষ্টালিনগ্রাদের মহাকাব্য

কিন্তু সমস্ত ইয়োরোপকে পদানত করিয়া হিটলার যে শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল, তাহার পূর্ণ পরাজয় তখনই সম্ভব ছিল না। ১৯৪২ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা হইবে বলিয়া আশ্বাস সোভিয়েট পাইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যত সোভিয়েটকে একা লড়িতে হইয়াছিল। তাই হিটলার যখন দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিল, পিছন হইতে মস্কো দখল করার স্বপ্নে মাতোয়ারা হইয়া যখন তাহার সৈন্যদল ইউক্রেণ সম্পূর্ণ দখল করিবার চেষ্টায় নামিল তখন লাল ফৌজ শত্রুকে যার পর নাই জখম করিতে করিতে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিজয় দর্পে ফাশিষ্টরা তখন শতমুখ, সোভিয়েটের পতন যে অবশ্যম্ভাবী একথাই সর্ব্বত্র উঠিতে লাগিল। আটমাস প্রতিরোধের পর সেবাস্তোপোল যখন নাৎসিদের হাতে গেল, তখন সোভিয়েটের বীরত্বের প্রশংসা সকলে করিলেও সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তাহা বলিতে ছাড়িল না। কিন্তু ওস্তাদের মার আসে শেষে, তাই ভল্‌গা নদীতীরে ষ্টালিনগ্রাদে যে যুদ্ধ হইল তাহা যুগ যুগ ধরিয়া কীর্ত্তিত হইবে, লালফৌজের রণকৌশল ও মনোবলের অতুল পরিচয় হইয়া থাকিবে। ষ্টালিনগ্রাদে হিটলার যে মার খাইল, বহু সেনাপতি সমেত লক্ষাধিক জার্ম্মান যেভাবে সেখানে বন্দী হইল, হিটলার বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যে ভাবে পর্য্যুদস্ত হইল, তাহা যেন বিরাট এক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

১৯৪৩ সালের অগ্নিপরীক্ষা

ভল্‌গার তীর ও ককেশস পর্ব্বতমালার পাদদেশ হইতে ঘৃণিত ফ্যাশিষ্টদের বিতাড়িত করিয়া শত্রু নিধনের ব্যবস্থা করিল লাল ফৌজ। ১৯৪৩ সালেও পশ্চিম ইয়োরোপে শত্রুকে আক্রমণ করার আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া লাল ফৌজকে প্রকৃতপক্ষে একাই লড়িতে হইল। কিন্তু শত্রুর অগাধ সমর শক্তি দেখিয়া লালফৌজ মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইল না, আত্মবিশ্বাস হারাইল না।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার প্রাণপণ চেষ্টা করিল লালফৌজকে পর্য্যুদস্ত করিতে। যে ধরণের বিপুলকায় ট্যাঙ্ক কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় নাই, তেমনই হাজার হাজার বাঘ-মার্কা ট্যাঙ্ক ও প্রচণ্ড এক যন্ত্রবাহিনী লইয়া শত্রু ওরেল-কুর্স্ক-বিয়েলগরড অঞ্চলে যুদ্ধে নামিল, পরিশ্রান্ত সিপাহীদের হিটলার সদম্ভে জানাইল যে এ যাত্রা বিজয় একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু লালফৌজ সম্বন্ধে হিটলারের তখনও অনেক কিছু জানিতে বাকী ছিল। সোভিয়েট যোদ্ধা, সোভিয়েট কামান, সোভিয়েট ট্যাঙ্ক, সোভিয়েট বিমান জানাইয়া দিল যে কোথাও যদি অপরাজেয় বলিয়া কোন বাহিনী থাকে তো সে বাহিনী হইল লাল ফৌজ।

বন্দী ইয়োরোপের শৃঙ্খলমোচন

বারবার ব্যাহত হইয়া শত্রু খারকভ শহরকে নিজের কবলে রাখার জন্য মরিয়া হইয়া লড়িল, খারকভ কয়েকবার হস্তান্তরিত হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাল ফৌজই শত্রুকে বিতাড়িত করিল। ইতিহাসবিখ্যাত কীয়েভ্ লইয়া নিদারুণ যুদ্ধ চলিল, শহরের ভিতরে ও বাহিরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। কিন্তু এখানেও লালফৌজ দিল ওস্তাদের মার। ক্রমে সোভিয়েটের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল শত্রুর বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তি পাইল, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট ভূমির প্রায় কোথাওই আর শত্রু টিঁকিতে পারিল না।

যুদ্ধ অবশ্য সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া চলিতেছিল। প্রায় চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়াও হিটলার লেনিনগ্রাদ দখল করার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে লেনিনগ্রাদের অবরোধ লাল ফৌজ ভাঙিতে পারে। তাহার পর হইতে লালফৌজের অভিযান উত্তর অঞ্চলকে শত্রুর কবল হইতে কাড়িয়াছে। মধ্য রণক্ষেত্রেও রিজেভ, গজাট্স্ক, ভিয়াজ্মা, ব্রিয়ান্স্ক্, স্মোলেন্স্ক্, মিন্সক্ প্রভৃতি স্থানে অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়া লাল ফৌজ হিটলারের দর্প চূর্ণ করিয়াছে।

সোভিয়েট ভূমি হইতে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের খেদাইয়াই লাল ফৌজ ক্ষান্ত হয় নাই। বন্দী ইয়োরোপের শৃঙ্খলমোচন ছিল লাল ফৌজের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই লাল ফৌজ রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী হইতে হিটলারীদের দূর করিয়া আজ খাস জার্ম্মানীর ভিতরই দুর্ব্বার বেগে অগ্রসর হইতেছে। হিটলারের তাঁবেদারের দল যে একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, কিম্বা কৃতকর্ম্মের জন্য জনগণের বিচার মাথায় পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা প্রধানত লাল ফৌজেরই কল্যাণে ঘটিয়াছে। আজ তাই লাল ফৌজের বার্লিন অভিযান সর্ব্বদেশের জনগণের মনে কত আশা, কত উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছে।

হিটলারের হিসাবে ভুল

হিটলারের হিসাবে অনেক ভুল হইয়াছে। লাল ফৌজের শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকৃত ধারণাই তাহার মস্তিষ্কে ছিল না। সোভিয়েটের জনসাধারণ নাৎসিবাহিনীর আক্রমণ ও অসম্ভব নৃশংস অত্যাচারের ফলে মাথা নোয়াইবে বলিয়া যে আশা সে পোষণ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া গেল। সোভিয়েট শাসনে বহু জাতির যে অটুট ঐক্য গঠিত হইয়াছে তাহা হিটলারীদের কল্পনার বাহিরে। তাই সোভিয়েটে অসন্তোষ দেখা দিবে বলিয়া যে আশা তাহারা করিত, তাহা ভাঙিয়া গেল। প্রকৃত দেশপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা সোভিয়েটের বহুজাতি দেখাইল আর সোভিয়েটে সর্ব্বজাতির স্বাধীনতা যে কত বাস্তব, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলিল—যখন যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যেই আইন হইল যে সোভিয়েটের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র বাহিনী ও স্বতন্ত্র বৈদেশিক সম্পর্ক রাখার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।

হিটলার আশা করিয়াছিল যে সোভিয়েটের মিত্রদের সঙ্গে একটা সংঘাত সে ঘটাইতে পারিবে এবং ইহার ফলে সহজে জয়লাভ সম্ভব হইবে। ১৯৪১ সালে বিলাতে হেসকে পাঠাইয়া সে এই চক্রান্ত বেশ জম্‌কালো ভাবে শুরু করে। তখন হইতে এই চেষ্টায় সে একবারও বিরত হয় নাই। সেদিনও গোয়েবল্‌স্ ব্রিটেন ও আমেরিকাকে বলিয়াছে যে তাহারা সোভিয়েটের তাঁবেদারী করিতে বাধ্য হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটকে ও সকল দেশে সোভিয়েটের বন্ধুদের এই বলিয়া ধোঁকা দিতে চাহিয়াছে যে সোভিয়েটই ব্রিটেন ও আমেরিকার তাঁবেদারী করিতেছে! এই দুমুখো প্রচার বহু দিন চলিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তেহেরাণ সম্মেলন, গত বৎসর জুন মাসে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট, এবং সম্প্রতি সোভিয়েট ভূমিতে ষ্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে ফ্যাশিষ্টদের শেষ আশার বুদ্বুদটীও মিলাইয়া গিয়াছে।

দিন আগত ঐ

নাৎসি পশু আজ তাহার বিবরে ঢুকিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইয়োরোপের দেশে দেশে মুক্তির আহ্বান আজ সকল দেশভক্তকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। সোভিয়েটের নীতির কদর্থ করিয়া যাহারা লণ্ডনে পোলাণ্ডের পলাতক সরকারকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিতেছিল তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে। যুদ্ধের পর সমস্ত দুনিয়াতে যথার্থ শান্তি স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বজাতির স্বাধীনতা যে স্বীকার করিতেই হইবে একথা সোভিয়েট তাহার কাজের মধ্য দিয়া দেখাইতেছে।

জয়ধ্বজা লইয়া লালফৌজ ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের শেষ পর্ব্ব সমাপ্ত করিবার জন্য অগ্রসর। আর জাগ্রত জনশক্তি ইয়োরোপের দেশে দেশে নবযুগের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে।

নীপার বাঁধ আবার উঠিয়াছে

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় আধ মাইল লম্বা নীপার বাঁধ পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় ছিল। এই বিরাট বাঁধ হইতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইত। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল এই বাঁধ তৈরী করিতে।

জার্ম্মানরা সোভিয়েট আক্রমণ করার পর লাল ফৌজ যখন নীপ্রোপেট্রভস্ক হইতে সরিয়া আসে, তখন এই বিরাট বাঁধ তাহারা উড়াইয়া দেয়। যে বাঁধ তাহারা দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে তৈরী করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিতে সময় লাগিয়াছিল মাত্র ১ মিনিট।

আজ জার্ম্মানরা সোভিয়েটের সীমানা ছাড়িয়া পালাইয়াছে; নীপ্রোপেট্রভস্ক শত্রুকবলমুক্ত। মাত্র ১।• বছরের মধ্যে সোভিয়েট বিপুল উদ্যমে আবার নীপার বাঁধ গড়িয়া তুলিয়াছে। দশ হাজার সোভিয়েট মজুর ও টেক্‌নিশিয়ান এই বাঁধ ও বিদ্যুৎ কারখানা মেরামতির কাজে হাত লাগাইয়াছিল।

১ লক্ষ ৩০ হাজার কিউবিক গজ বিস্তৃত ইঁটপাথর সরাইয়া তবে এই বাঁধ মেরামতের কাজ সুরু করিতে হইয়াছিল। উপরের সেতুগুলি এখন নতুন করিয়া তৈরী হইতেছে। আশা করা যায়, এই কাজ আগামী বসন্ত কালের মধ্যেই শেষ হইবে এবং নীপার বাঁধ সম্পূর্ণরূপে তার যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবে।

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা ভুলবার নয়

২২শে জুন ১৯৪১—মস্কোর অধিবাসীরা জার্ম্মানদের অতর্কিত আক্রমণ সম্বন্ধে মলোটভের ঘোষণা শুনিতেছে

বছরের পর বছর ধ'রে হিটলারী নর-পিশাচেরা জার্ম্মান তরুণদের মনে আত্মশ্রেষ্ঠত্বের বিষ সংক্রামিত করেছে। জাত আর রক্তের বড়াই যে কি জিনিষ—পৃথিবী তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাত যদি মনে করেঃ দুনিয়ার মধ্যে আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ; কাজেই অন্যান্য জাতকে দাবিয়ে রাখার অধিকার কেবল আমারই আছে—তাহ'লে বিংশ শতাব্দীতে শত শত * মাজদানেক-এর শ্মশানচুল্লী জ্বলে উঠবে।

অহঙ্কারের মূল কোথায়

জার্ম্মানীর এই অহঙ্কারের মূল কোথায়? কেউ কেউ এর উত্তরে বলবে, জার্ম্মানীর অতীতই এর উৎস। একথা ঠিক যে, অতীতে জার্ম্মানদের মধ্যে অনেক বড় বড় দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গয়টে বা বিটোফেনকে অস্বীকার করার কথা কোনো ফ্যাশিষ্ট-বিরোধীই কল্পনায় আনে না। কিন্তু সংস্কৃতি তো উত্তরাধিকার সূত্রে আসে না, সৃষ্টিপরম্পরায়ই তা গঠিত হয়। জার্ম্মানীর অতীত গৌরবের কিছুই আর ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মানীতে অবশিষ্ট নেই। বুদ্ধি বা জ্ঞানের বদলে বংশই আজ যাদের কাছে বড় কথা সেই অধমরা আমাদের উপহাসের পাত্র। যাদুঘর বা পুস্তকাগার জ্বালিয়ে দেওয়ার পরও যে-জাতি শীলার বা কাণ্টের নাম নিয়ে বড়াই করতে আসে সে জাতি আমাদের কাছে হাস্যকর, অসহ্য।

আবার কেউ কেউ বলেন, জার্ম্মানদের বর্ত্তমানই তাদের কাছে গৌরবের বিষয়। গৌরবের বিষয়টা কি? গোয়েরিংয়ের লোভ? গোয়েবলসের লাম্পট্য? তাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্নীতি ও অজ্ঞতা? হিমলারের 'পরিশ্রম'? কিংবা হয়তো নিজেদের শিল্পগত বিকাশ নিয়ে তারা বড়াই করছে; তাদের শহরগুলো কত পরিচ্ছন্ন, বাড়ী-ঘর কত আরামের—এই নিয়েই হয়তো তাদের গর্ব্ব। কিন্তু এর কোনোটাই তো ফ্যাশিষ্টদের সৃষ্টি নয়, হিটলার তো শুধু জার্ম্মানীকে ধ্বংসই করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে জার্ম্মানীর তুলনায় আমেরিকার শিল্পগত বিকাশ আরও অনেক বেশী, হল্যাণ্ডের শহরগুলি জার্ম্মানীর চেয়েও পরিচ্ছন্ন, সুইডদের বাড়ীঘরে জার্ম্মানীর চেয়ে অনেক বেশী আরাম। আরও বড় কথা হ'লঃ রাষ্ট্রের নির্জীব দেহে যদি উচ্চ আদর্শের প্রাণ-সঞ্চার না হয় তবে শিল্পগত জ্ঞান কোনো জাতিকেই গৌরব এনে দিতে পারে না। আর ফ্যাশিষ্ট জার্ম্মানীতে সভ্যতার ব্যবহার শুধু ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; জার্ম্মান শিল্পোন্নতির স্বাভাবিক পরিণতি শুধু গ্যাস-কুণ্ড বানানোর জন্যে—যেখানে হাজার হাজার শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়।

না। ফ্যাশিষ্ট ছেলেদের মনে যে আত্ম-শ্রেষ্ঠত্বের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা জার্ম্মানীর অতীত থেকেও আসেনি, বর্ত্তমান থেকেও আসেনি। জার্ম্মান স্পর্দ্ধার ভিত্তি হ'ল—কুসংস্কার। জার্ম্মান-রক্তের যাদু-শক্তিতে বিশ্বাসের উপরও সে স্পর্দ্ধা—যাতে মনে হয় যে জার্ম্মানীর সব কিছু বাইরের অন্য সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দেশপ্রেম ও জাত্যাভিমান এক নয়

প্রায় তিরিশ বছর আগে আমি এক অদ্ভুত তর্ক শুনেছিলাম। রুশ সৈন্যরা গমের লাপ্‌সি খায় দেখে একজন ফরাসী বলছিল, "লাপসি আমাদের দেশে গরুতে খায়।" রুশিয়ান জবাব দিল, "তোমরা ব্যাঙ খাও, আমাদের গরুতেও তা খাবে না।" লোকে বলে, "আপ রুচি খানা, তা নিয়ে তর্ক করা চলে না" (আমি অবশ্য লাপসি এবং ব্যাঙ দুইই খেতে ভালবাসি); কিন্তু ফ্যাশিষ্টরা দুনিয়াকে রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিল যাতে জার্ম্মানদের রুচির অভাবই দুনিয়ার সকলে মেনে নেয়। ফ্যাশিষ্ট বাচ্চাকে শেখান হয়—গৌরাঙ্গী কায়েটচেন (জার্ম্মান তরুণী) শ্যামাঙ্গী য়ানেট-এর (ফরাসী তরুণী) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সিডার বা ক্বাসের চেয়ে বীয়ার অনেক ভাল; লেনিনগ্রাড বা লণ্ডনের চেয়ে বার্লিন শহর অনেক সুন্দর; যে লোকটি রুশ বা ফরাসী ভাষায় কথা বলে তার চেয়ে জার্ম্মান ভাবা অনেক উঁচু।

মনে হয়, মানুষের মূর্খতার নিরীহ উৎস থেকেই আজ রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। যা কিছু নূতন ও অনভ্যস্ত তা দেখলে হেসে ওঠা ছেলেদের স্বভাব। তখন মা ছেলেকে বকেন এবং বড় হলে সে বুঝতে পারে যে, পৃথিবীটা তার নিজের বাড়ী বা পাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে জিনিস ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে তাকে সব লোক, সব জাতিই ভালবাসে। রূপালি বার্চ্চ গাছ দেখে কোন রুশিয়ানই বা চঞ্চল না হয়? কিন্তু তা বলে আমরা কখনও বলি না, বলবও না যে সাইপ্রেস বা সিডার গাছের চেয়েও বার্চ্চ গাছ অনেক "বিরাট", অনেক "শ্রেষ্ঠ"। আমার মা অন্যের মার চেয়ে বুদ্ধিমান হতে পারেন—কিন্তু মাকে আমি ভালবাসি সেই কারণে নয়, মা বলেই তাঁকে আমি ভালবাসি। প্রকৃত দেশপ্রেম (পেট্রিয়টিজম) বিনয়ে নম্র, জাত্যাভিমানের (ন্যাশানালিজম) সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। দেশপ্রেম মানে সৌভ্রাত্র; জাত্যভিমান মানে হত্যা আর মৃত্যু।

"শ্লাভদের কোন-ঠাসা কর" এই নির্ব্বোধ ও বিরক্তিকর আদর্শেই জার্ম্মানরা লালিত হয়েছে। তাদের একথা কেউ জানায় নি যে শ্লাভরাই (রুশ প্রভৃতি জাতি) হুস ও কপার্ণিকসের জন্ম দিয়েছে, টলষ্টয় ও শেকভ, চপিন ও চিয়াকভস্কি, মেণ্ডেলেফ ও লোবেচেভস্কিকে জন্ম দিয়েছে। তাদের মাথায় শুধু বারে বারে এই কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—"শ্লাভদের কোন-ঠাসা কর। এবং পশুতে পরিণত ছাত্রেরা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেছে যে এই সব গুণবান ও শক্তিশালী জাতিকে কোন-ঠাসা করতে হবে। কেন? কারণ, ওলন্দাজেরা পালক দেওয়া সবুজ টুপি পরে, ইংরেজরা স্কিটল খেলতে ভালবাসে আর জার্ম্মান তরুণ তার নববধূর কানে কানে বলে, "কায়েটজচেন।"

যে সব দেশ ও অঞ্চল জার্ম্মানরা দখল করেছে সেখানে ছেলে থেকে বুড়ো পর্য্যন্ত সমস্ত ইহুদীকে তারা হত্যা করেছে। এই ষাট লক্ষ নিরীহ লোককে কেন হত্যা করা হল তার কারণ সম্বন্ধে যে কোন জার্ম্মান বন্দীকে জিজ্ঞাসা করুন—সে জবাব দেবে, "কেন, ওরা যে ইহুদী। ওদের চুল কালো (বা লাল)। ওদের রক্ত আলাদা।" অশ্লীল গল্প, পাড়ার ছেলেদের ক্ষ্যাপানো, দেওয়ালের গায়ে কয়লার লেখা—এমনি ধারা জিনিস দিয়েই এই সব আরম্ভ হয়েছিল; তা আজ পৌঁচেছে মাজদানেক, বাবিয়ার বা ট্রেবলিঙ্কার বিভীষিকায়, শিশুর মৃতদেহে পরিপূর্ণ খাদের পর খাদে। ট্রেবলিঙ্কার আগে ইহুদী-বিদ্বেষকে যদি শুধু অবাঞ্ছনীয় কলঙ্ক বলে মনে হয়ে থাকে তবে আজ মনে হবে ঐ শব্দের রেণুতে রেণুতে রক্তের দুর্গন্ধ। পোলিশ কবি জুলিয়ান তুইম ঠিকই বলেছেন, "ইহুদী-বিদ্বেষ হ'ল ফ্যাশিষ্টদের আন্তর্জ্জাতিক ভাষা।"

বংশ ও জাতিগত স্পর্দ্ধা কোথায় পৌঁছায় সারা দুনিয়া তা আজ দেখতে পাচ্ছে। মাজদেনেকের বিভীষিকাময় চুল্লীতে জার্ম্মানরা যে ত্রিশটা জাতির মানুষকে পুড়িয়ে মারল তাদের একমাত্র অপরাধ তারা রুশ বা ফরাসী বা পোল বা ইহুদী। এই চুল্লী একদিনে হঠাৎ গড়ে ওঠে নি, জাতিগত ঘৃণার সুদীর্ঘ শিক্ষার ভিতর দিয়েই তার বনিয়াদ খাড়া হয়েছিল। যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অন্য জাতিকে পীড়নের ওপরই নির্ভর করে, যদি কোনো দেশ বর্ণ বা চর্ম্মের প্রভেদে নাগরিকদের অধিকার ভেদ করে, একজনের নাকের গড়ন প্রতিবেশীদের মত নয় বলে কোনো সমাজ যদি তার ওপর অত্যাচার করে—তাহলে সেই জাতি, সেই দেশ ও সেই সমাজের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ফ্যাশিজমের জন্মদাতা কারা

মানুষের মধ্যে যারা সব থেকে জঘন্য চরিত্রের—তাদের মনেই ফ্যাশিজম সংক্রামিত হয়েছিল। যে সব মানুষের মধ্যে নৈতিকতার কোন বালাই নেই, যারা নিজেরা খুনী কিম্বা বেশ্যার দালাল, জীবনে যারা সমস্ত দিক দিয়ে অকৃতকার্য্য, যারা চোর-ডাকাত—ফ্যাশিজমের গুরু হয় তারাই। ফ্যাশিষ্টরা কাদের মধ্যে থেকে গজিয়েছিল, এ কথা জানাই যথেষ্ট নয়—মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্তদের 'বিশিষ্ট' (তথাকথিত) ভদ্রলোকেরা সাহায্য করেছিল। কিছুদিন থেকে ফ্যাশিজমের প্রবর্ত্তক যশোলোলুপ ও রক্তলোভী ডুচের কথা আমরা ভুলতে বসেছি। ইটালীর নব জীবনের পর মুসোলিনী এখন জার্ম্মানদের সামান্য অনুচর মাত্র। কিন্তু মুসোলিনীর অতীত সুদিনের কথা ভুললে চলবে না—সেদিনের কথা আজ মনে করতে হবে মনে রাখার জন্যে; এবং বেঁচে থাকার জন্যে সে কথা মনে রাখতেই হবে। কোন কোন গণতন্ত্রী বহুদিন ধ'রে মুসোলিনীকে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা হিসেবে গণ্য ক'রে এসেছেন। মুসোলিনীর জীবন আরম্ভ গুণ্ডামি দিয়ে। মুসোলিনীর কালো কোর্ত্তার দল মজুরদের ক্লাব ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, স্তূপাকার বইতে আগুন লাগিয়েছে, ছাত্র, শিক্ষক আর মজুরদের জোর ক'রে ক্যাষ্টর অয়েল গিলিয়েছে এবং নির্দ্দোষ নাগরিকদের হত্যা করেছে। সেই সময় কোন কোন 'গণতন্ত্রী' ভাবতেনঃ রুশ বইয়ের চেয়ে ইতালীর ক্যাষ্টর অয়েল অনেক ভাল। পরে মিউনিকের সময় এঁরাই আবার নিজেদের এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতার জয়ের চেয়ে হিটলারও ভাল। এই সব উন্মাদ রাজনীতিকেরা ভেবেছিল, ক্ষ্যাপা নেকড়েদের দিয়ে পাহারাদার কুকুরের কাজ করিয়ে নেবে। তারা ভেবেছিল তাদের দেখিয়ে দেওয়া শিকারের ওপরই শুধু ক্ষিপ্ত নেকড়ের দল দাঁত বসাবে। ওয়ার শ'র ধ্বংসস্তূপে, বেদনার্ত্ত প্যারিসে, বিক্ষত লণ্ডনে সেই দুর্নীতির বিষময় ফল ইউরোপ ও সারা বিশ্ব আজ প্রত্যক্ষ করছে। ভুল ভাঙার জন্যে কি বিষম মূল্য এই দেশগুলিকে দিতে হয়েছে!

আমাদের মনে রাখতে হবে ফ্যাশিজম-এর জন্মের জন্য দায়ী—এক দলের লোভ ও মূর্খামি এবং অন্য দলের বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতা। মানুষ যদি সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির পুনরাবৃত্তি না চায় তা হ'লে ফ্যাশিজমকে শেষ করতেই হবে। দোমনা ব্যবস্থায় এখানে কাজ হতে

* পোল্যাণ্ডের মাজদানেকে জার্ম্মানরা এক কারখানা খুলেছিল। হাজার হাজার নিরস্ত্র বন্দী নর-নারীকে তারা সেই কারখানায় গ্যাস দিয়ে হত্যা ক'রে চুল্লীর ভেতরে মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে ফেলত।

...য়া এরেনবুর্গের দুটী লেখা

পারে না। যদি কোথাও কোনখানে ফ্যাশিজমকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়, তা হ'লে দশ বিশ বছরের মধ্যে আবার রক্তগঙ্গা বইবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তাড়ানো যায়, কিন্তু ফ্যাশিজম দিয়ে ফাশিজম ধ্বংস করা যায় না। এক ধরণের ফ্যাশিষ্টদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে আরেক ধরণের ফ্যাশিষ্টদের হাতে সঁপে দেওয়াকে মুক্তি দেওয়া বলে না। ফ্যাশিজম হচ্ছে মারাত্মক কুষ্টের মত। মুন জল খাইয়ে এ রোগ সারানো অসম্ভব। ফ্যাশিজমের মুলোচ্ছেদ করতে হবে। যারা খুনীদের আর দেশদ্রোহীদের জন্তে দরদ প্রকাশ করে, তাদের সহৃদয়তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এই কপট বিশ্বপ্রেমিকেরা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করছে। ইউরোপের মানুষ আক্রমণকারী দস্যুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। তারা কেনা গোলাম নয় যে, কাজ ফুরোলেই তারা সরে পড়বে। ফরাসীদের একটা ভাল প্রবাদ আছে: 'খনির মজুর তার নিজের বাড়ীর মালিক।' শুধু ফরাসীরাই যে একথা বোঝে তা নয়। লাল ফৌজ দেখিয়ে দিয়েছে কি ক'রে মুক্তি দিতে হয়: পোল, নরওয়েজিয়ান, সার্ব্ব আর শ্লোভাক—সবাই সে কথা জানে। আমরা ফ্যাশিজমের শূন্য আসনে আধা-ফ্যাশিজমকে বসাতে চাই না। আমরা বিনাসর্ত্তে স্বাধীনতা দিই। আমরা জানি, গণতন্ত্র জনসাধারণের দুহিতা; যে বিশিষ্টা ভদ্র মহিলাকে কেবল দূর থেকে প্রশংসা করতে হয়—তাও তাঁর সদয় অনুমতি ভিন্ন নয়—তাকে আমরা গণতন্ত্র বলি না।

মনে রাখবো, মনে রাখবই

যে সমস্ত মানুষকে ফ্যাশিষ্টদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তারাই আমাদের সহজে বুঝবে। এটা হচ্ছে জনগণের যুগ, কূটনীতিকদের নয়। ফ্রান্সের বীর জনসাধারণ আমাদের বুঝবে। মিত্রপক্ষের সকলেই আমাদের বুঝতে পারবে। এক সময় ইংরেজরা ইংলিশ চ্যানেলের রক্ষাকবচে বিশ্বাস করত। এখন তারা বুঝতে পেরেছে ফ্যাশিজম সে প্রতিবন্ধ মানেনি। ইংলণ্ডে বাইরের দেশ থেকে কুকুর আমদানী করা বহুদিন থেকে নিষিদ্ধ। এই ভাবে তারা কুকুরের দংশনজনিত জলাতঙ্ক ব্যাধি নিবারণ করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্ষিপ্ত দ্বিপদ আর ক্ষিপ্ত চতুষ্পদের মধ্যে তফাৎ এই যে, ক্ষিপ্ত দ্বিপদের হাতে সর্ব্বনেশে 'ভি' অস্ত্র। বৃটেনকে নিরাপদ করার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে—ওয়ার শ' থেকে আরম্ভ ক'রে জিব্রাল্টারের ছোট্ট শহর লা্লিনিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ফ্যাশিজমের উচ্ছেদ করা। এমন কি মহাসমুদ্র সামনে রেখেও ফ্যাশিজমের হাত থেকে বাঁচা যায় না। নতুন নতুন যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আমেরিকাকে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করতে হবে।

'পমারসে সাইটুং'-এর (জার্ম্মান সংবাদপত্র) যদি একথা বলার সাহস হয় যে, শান্তিপ্রিয় কল্যাণকামী আদর্শের জন্যই জার্ম্মানী যুদ্ধে নেমেছিল—তাহ'লে মনে করতে হবে যে, ফ্যাশিষ্টদের শেষ আশা মানুষের স্মৃতি বিলোপের ওপরই নির্ভর করছে। খুব বেশী রকম আঘাত পেলে সময় সময় মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হয়; ডাক্তারী শাস্ত্রে এই রোগকে বলে এম্নেসিয়া। আজ পৃথিবীর আঘাত সত্যিই সাংঘাতিক। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশের রোগ জনসাধারণের হয়নি। সমস্ত কিছু তাদের মনে আছে। বিচারের দিন তারা সমস্ত কিছু স্মরণ করবে। বিজয়ের পর কখনই তারা ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা ভুলে যাবে না।

আমরা যেন মৃত বীর ও শিশুসন্তানদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য মনে রাখি।

যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমরা নিজেরা চোখে দেখেছি, সে স্মৃতি যেন আমাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যেও ম্লান না হয়। সেই স্মৃতির মূল্য দিয়ে আমরা পৃথিবীকে রক্ষা করব। ভুলে যাওয়া খুব সহজ, তা আমরা জানি। কিন্তু আমরা ভুল্‌বো না। আমরা শপথ করছি: মনে রাখবো, আমরা মনে রাখবোই।

(গত ১৫ই ডিসেম্বরের প্রাভডা থেকে সংক্ষিপ্ত)

ইতিহাসের ভ্রূক্ষেপহীন জয়যাত্রা

আমাদের অভিযান যেন ইতিহাসের ভ্রূক্ষেপহীন জয়যাত্রা। জার্ম্মানদের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র ওপেল্‌ন এখন আমাদের হাতে। কোনিংস্‌বার্গ-এর নিকটবর্ত্তী আমরা; ব্রেস্‌লাউয়ের পতনও আসন্ন। বিদ্যুৎবেগে আমরা ছুটে চলেছি ডানজিগের দিকে। আমাদের ইস্তাহারে মুদ্রিত হচ্ছে পশ্চিম প্রুশিয়ার একটির পর একটি শহরের নাম। ওয়ার শ' ছাড়িয়ে আমাদের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী এখন বার্লিনের পথে।

নাৎসী নেতাদের আতঙ্ক

জার্ম্মান পাণ্ডারা এখন আর তাদের আতঙ্ক চেপে রাখতে পারছে না। নাৎসী শ্রমিককর্ত্তা লে, প্রেস দপ্তরের বড় কর্ত্তা সুণ্ডারমান আর জার্ম্মান হাই কমাণ্ডের মুখপাত্র জেনারাল ডিটমার—এদের প্রত্যেকেরই লেখা আমার সামনে রয়েছে। এদের লেখার আগাগোড়া শুধু বিহ্বলতার চিহ্ন—শুধু আর্ত্তনাদ আর কণ্টকিত ভয়।

'তৈরী ঘরবাড়ী বিক্ষুব্ধ ঝড়ের আঘাতে যখন ভাঙতে থাকে, তখন মানুষের যে মনের অবস্থা হয়, আমাদের মনের অবস্থাও আজ তেমনি।' (লে)

'ব্যারিকেডে দাঁড়াও: এ ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় বক্তব্য নেই।' (সুণ্ডারমান)

'বিস্তৃত ভূমি আজ আর আমাদের সহায় নয়। যুদ্ধের জয়পরাজয় আজ চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হতে চলেছে।' (হাম্‌বুর্গার ফ্রেম্‌ডেনব্লাট)

'অবস্থা আজ সাংঘাতিক গুরুতর। সব কিছু ধারালো খাঁড়ার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্ন চরগুলি বন্যার জলোচ্ছ্বাসে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। শাস্ত্র-বর্ণিত অনার্য্যের দল আমাদের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সীমান্ত এলাকা থেকে অনেক দূরে যে মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, কিছুদিন আগেও যেখানে শত্রুর আক্রমণ ধারণাতীত ছিল—সেখানকার অধিবাসীদের সামনে আজ ঘোরতর বিপর্য্যয় উপস্থিত। সমস্ত কিছু আজ বিপদাপন্ন। হয় জয়, না হয় মৃত্যু—আমাদের সামনে দুটি মাত্র পথ।' (ডিট্‌মার)

'জয়'?—এমন কি অরসিক জার্ম্মানরাও একথা শুনে না হেসে পারবে না। তারা বলবে, 'আমাদের জেতার কোনই আশা নেই।' ভদ্রতার খাতিরেই আর 'প্রত্যাদেশে'র কথাও তাদের জানা নাই। তাদের আজ অন্য দুশ্চিন্তা; পালানো যায় কোথায়? তারা আবার আজ ভূগোল খুলে বসেছে। তিন বছর আগে তারা স্বর্ণপ্রসূ উরাল আর মেসোপোটেসিয়ার স্বপ্নে মশগুল ছিল; মিশর আর ককেশাসের মানচিত্রে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এখন তাদের প্রধান চিন্তা ব্যাভেরিয়া; দক্ষিণ জার্ম্মানীর কোন গ্রামে নিরাপদ আশ্রয় নেবার জন্যে তারা আজ ব্যগ্র। এই সমস্ত অতিমানবদের দেখে ক্ষুদ্র মূষিকের কথাই আমাদের মনে পড়ছে।

চার বছর ধ'রে তারা মিথ্যে ব'লে এসেছে

পূর্ব্বদিকে মার খেয়ে জার্ম্মানরা এখনও পশ্চিম দিকে মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। অবশ্য পশ্চিমেও তারা ঠ্যাঙানি খাচ্ছে। যাই হ'ক আমি এখানে জয়ের প্রসঙ্গ আনতে চাই না; আমি দেখাবো জার্ম্মানরা কি বলছে। এখনও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে জার্ম্মানরা এমন ভাব করছে যেন তারা বিচলিত নয়। এখন আর বেলজিয়ামের শহরগুলি দখল করার ওপর তাদের বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। তাদের আকাঙ্ক্ষা আজ এর চেয়ে অনেক কম; ইংলণ্ড ও আমেরিকার কিছু কিছু সমর-ভাষ্যকারকে তারা বোকা বোঝাতে চায়। এমন লোকও তারা পেয়েছে, যারা সাধ ক'রে আত্মপ্রতারণা করে। এই সব ভাষ্যকাররাই লিখছে জার্ম্মানরা তাদের 'পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে' পালাচ্ছে।

এই যুদ্ধের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা যখন স্মরণ করি, তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, 'মানুষের মূঢ়তা এর চেয়ে আর কি বেশী হতে পারে?' চার বছর ধ'রে যে সব ভাষ্যকাররা

সোভিয়েট জনগণের বিজয় অভিনন্দন

ক্রমাগত মিথ্যে কথা লিখে আসছে, লোকে সে সব পড়ে কি ক'রে? রাশিয়া 'দৈত্যের মত বিরাট বটে, কিন্তু তার পা মাটি দিয়ে তৈরী'—কোন কোন সংবাদপত্রে অনবরত যে এই সব কথা লেখা হ'ত, ইংরেজ ও মার্কিণ পাঠকরা কি তা ভুলে গেছেন? যদি সে কথা তাঁরা ভুলে না গিয়ে থাকেন, তবে সেই সব ভাষ্যকারদের তাঁরা একবার জিজ্ঞেস করুন, 'মাটির তৈরী পা' নিয়ে কি ক'রে ভিশ্চুলা থেকে ওডার পর্য্যন্ত রাশিয়া এগিয়ে গেল। এই ভাষ্যকাররা এক সময় লিখেছিলেন, মস্কোর পতন অবধারিত। তাঁরা নতুন কোন ছদ্মনাম না নিয়েই এখন লিখছেন, বার্লিনের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কথাগুলো আমি উদ্ধৃতির ভঙ্গিতে তুলে দিলাম। মৃত্যু ছাড়া তাদের দ্বিতীয় পথ নেই।

লে তার লেখায় খোলাখুলি স্বীকার করেছে, 'নিদারুণ ঘটনার চাপে' তার 'চিন্তা করা'র পর্য্যন্ত অবসর নেই। বড় বড় চুরি আর দুশ্চরিত্রতার জন্য কুখ্যাত এই দুর্ব্বৃত্ত অতীতে কখনই চিন্তা করে নি। তবে আজ তার একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হবার দশা।

সাধারণ জার্ম্মানদের কি অবস্থা ঘটেছে—এ প্রশ্ন এর পর অবান্তর নয় কি? সাধারণ জার্ম্মানরা প্রবন্ধও লেখে না, ব্যারিকেডের কথাও বলে না,

বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা রুশদের বিজয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে

ফ্রান্সে অভিযান চালানোর আয়োজন করতে মিত্রপক্ষের তিন বছর লাগে। ভাষ্যকাররা এই বিলম্বের সম্বন্ধে বলেন, সামরিক প্রয়োজন। আর তিন বছর ধরে অবিশ্রান্ত লড়াই চালানোর পর পোলাণ্ডের শক্ত জার্ম্মান ব্যূহ চূর্ণ করার প্রস্তুতিতে লাল ফৌজ সময় নিয়েছিল মাত্র চার মাস। সেই একই ভাষ্যকাররা এই বিলম্বের কারণ দেখান, রাজনৈতিক প্রয়োজন। বেলো-রুশিয়ায় লাল ফৌজ যখন জার্ম্মানদের ঘায়েল ক'রে দেয়, তখন মিত্রপক্ষের কোন কোন সংবাদপত্র বলতে থাকে যে, জার্ম্মানরা বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে এবং জার্ম্মানদের পরাজয়ের কারণ তাদের দুর্ব্বলতা—রুশদের শক্তি নয়। আর জার্ম্মানরা যখন বেলজিয়াম আর আর্দ্দেনে ৩১ মাইল এগিয়ে গেল, তখন এই একই সংবাদপত্রগুলি বলতে লাগল, জার্ম্মান বাহিনী অসম্ভব শক্তিশালী। এই সমস্ত সংবাদপত্র এখন লালফৌজের দ্রুত অগ্রগতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং রেখে ঢেকে এই রকম উক্তি করছে যে, লোড্‌স্‌ ও ওপেল্‌ন্‌-এর মতন তুচ্ছ জায়গাগুলো জার্ম্মানরা হয়ত নিজে থেকে রুশদের উপহার দিচ্ছে। আমরা যখন এগিয়ে যেতে থাকি তখনও এই ভদ্রলোকেরা অপ্রসন্ন হন, আবার যখন আমরা মুহূর্ত্তের জন্য থামি তখনও এঁরা অসন্তুষ্ট হন। এ সব দেখে শুনে মনে হয়, লালফৌজ জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত নয়, বরং কয়েকজন বিদেশী ভাষ্যকারদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কেই যেন তারা লিপ্ত।

এই সমস্ত 'হায়, হায়' আর 'গেল, গেল' আর্ত্তনাদ দিয়ে বার্লিনের পথে আমাদের অভিযান কেউ ঠেকাতে পারবে না। ডেলি টেলিগ্রাফ কিম্বা নিউইয়র্ক টাইমস্‌-এর সমর-ভাষ্যের প্রতিবাদ করার চেয়েও ঢের বড় কাজ আমাদের হাতে: আমরা এখন আক্রমণ চালাচ্ছি।

পশ্চিম রণাঙ্গনের সমর সংবাদদাতারা খবর দিচ্ছেন যে, বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী সৈনিকেরা আমাদের বিজয় বার্ত্তা শুনে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রতি সন্ধ্যায় এই সৈনিকেরা মস্কোর নূতন নূতন বিজয় ঘোষণার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে প্রতীক্ষা করেন। মনে হয়, তারা তাদের নিজেদের বন্দুক কামান থেকে অগ্নিবর্ষণ ক'রে এবং সাইলেশিয়ার রুশ আক্রমণের পাশাপাশি যুগপৎ রুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মস্কোর বিজয় ঘোষণার প্রতিধ্বনি করার জন্য ব্যগ্র। জার্ম্মান সংবাদপত্রগুলি তাদের ভীতিবিহ্বল পাঠকদের এই ব'লে সাহস দিতে চেষ্টা করছে যে,

(৯ম পৃঃ দেখুন)

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের জয়

পলাতক "গবর্ণমেণ্টের" চক্রান্ত ব্যর্থ

[লেখক : প্রভাত দাশগুপ্ত]

ইয়ালটা সম্মেলনে পোলিশ স্বাধীনতা ও সীমান্ত প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, শক্তিশালী স্বাধীন গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড গঠন করিতে মিত্রপক্ষ সম্পূর্ণ ভাবে সাহায্য করিবে। পোল্যাণ্ডের অন্যান্য নাৎসী-বিরোধী গণতান্ত্রিক নেতাদের ওয়ারসর অস্থায়ী পোলিশ জাতীয় সরকারের (ভূতপূর্ব্ব জাতীয় মুক্তি কমিটি) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাকে আরও শক্তিশালী করা হইবে এবং এই অস্থায়ী সরকারই আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের জাতীয় সরকার হিসাবে কাজ করিবে।

সীমান্ত সম্বন্ধে ঠিক হইয়াছে যে, কার্জ্জন লাইনকে পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্ত বলিয়া ধরা হইবে এবং কার্জ্জন লাইনের পূর্ব্বে ইউক্রেন ও বেলোরাশিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে। পশ্চিমে যে সমস্ত পোলিশ অঞ্চল বহুকাল হইতে জার্ম্মান পদানত রহিয়াছে তাহা পোল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

এই সিদ্ধান্ত লণ্ডন প্রবাসী পলাতক পোল 'সরকারের' মনঃপূত হয় নাই। তাহাদের দাবী ছিল ইউক্রেন ও বেলোরাশিয়া পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হউক এবং তাহাদের হাতে পুনরায় পোল্যাণ্ডের রাজত্ব ফিরাইয়া দেওয়া হউক। ১৯২১ সালের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ১৯৩৫ সালের আধা-ফ্যাশিষ্ট শাসনতন্ত্রই বজায় রাখিতে হইবে ইহা তাহাদের মূল দাবী। তাই তাহারা ইয়ালটা সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিয়াছে "ইহা মিত্রপক্ষের মূলনীতির—ইহা দ্বারা আটলাণ্টিক সনদের আসল উদ্দেশ্য ধ্বংস করা হইয়াছে।" সর্ব্বপ্রকারে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্তও তাহারা ঘোষণা করিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল

লণ্ডন প্রবাসী পোলিশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত মোটেই বিস্ময়কর নয়। বস্তুতঃ তাহারা ইয়ালটা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেই লোকে বিস্মিত হইত।

১৯১৮ সালে রুশ বিপ্লবের সাহায্যে পোল্যাণ্ড জারের শাসন হইতে মুক্ত হয় কিন্তু মুক্ত পোল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বৃটিশ, ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক সম্প্রদায় পোল্যাণ্ডে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল। সে সময়কার বৃটিশ সচিব মিঃ অর্মসবি গোর এই শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের সাহায্য পরিষ্কার স্বীকার করিয়া উহার কারণ দেখাইয়াছিলেন যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল পোল্যাণ্ড বলশেভিজমের বিরুদ্ধে "প্রাচীরস্বরূপ দাঁড়াইয়া" ইয়োরোপের "স্বাস্থ্যরক্ষা" করিবে।

রুশ বিপ্লবের সাহায্যে দীর্ঘ ১৫০ বছরের বিদেশী শাসন হইতে পোল জাতি মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে জুটিল সাম্রাজ্যবাদের দালাল পিলসুড্স্কির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল এক গভর্ণমেণ্ট।

পিয়াষ্টা, সাইলেসিয়া, ওয়ারমিয়া প্রভৃতি বহু পোলিশ রাজ্য বহুদিন ধরিয়া জার্ম্মানীর পদানত। কিন্তু পিলসুড্স্কি এই সমস্ত অঞ্চলের ২২ লক্ষ পোলের স্বাধীনতা অর্জ্জনের কোন চেষ্টাই করে নাই। সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় ১৯২০ সালে সে সোভিয়েট রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইউক্রেন ও বেলোরাশিয়া দখল করে। কিছুদিনের জন্য সে কিয়েভও দখল করে এবং তাহার এই বিজয় উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাহাকে অভিনন্দিত পর্য্যন্ত করে।

কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি

স্বদেশে পিলসুড্স্কি জনসাধারণের উপর অকথ্য নির্য্যাতন চালায়। পোলিশ সরকারের ১৯৩৯ সালের সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৯২১ সালে পোল্যাণ্ডে দেশের সমস্ত জমির শতকরা ৪৫ ভাগের মালিক ছিল মাত্র ১৯০০০ জমিদার পরিবার। গড়ে তাহাদের প্রত্যেকের দখলে ছিল ১৮০০ একর জমি এবং চাষীদের ছিল ২'৫ একর জমি। ১৯৩১ সালে শতকরা ৭৫ জন চাষীরই নিজেদের পরিবার পোষণ করিবার মত যথেষ্ট জমি ছিল না। শতকরা ৪০ জন চাষীর চাষ করাইবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছিল না এবং শতকরা ৫০ জন চাষীর চাষের বলদ ছিল মাত্র একটি করিয়া। ১৯৩৫ সালে পোল্যাণ্ডরই 'ওয়াস' কাগজে লিখিয়াছে যে, পোলিশ চাষীদের কাছে লবণ বা দেশলাই বিলাসের বস্তু ছিল। দেশলাইয়ের অভাবে তাহারা সারাক্ষণ আগুন জ্বালাইয়া রাখে। লবণের অভাবে লোনাধরা লোহা সিদ্ধ করিয়া সেই জল তাহারা ব্যবহার করে।

পোলিশ সরকার দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে নাই। যুদ্ধের ঠিক আগে সরকারী হিসাবে জানা যায় যে দেশের কৃষি ব্যবস্থা এমন অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে ৯০ লক্ষ চাষী কৃষিকার্য্যে আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে না, অথচ দেশে শিল্পবাণিজ্যের এমন প্রসারও নাই যে সেখানে তাহারা কাজ পাইবে।

ইউক্রেনিয়ান ও বেলোরুশদের উপর অত্যাচার

পোলিশ পদানত ইউক্রেন ও বেলোরাশিয়ার অধিবাসীদের ভাগ্যে নির্য্যাতনের মাত্রাটা আরও একটু বেশী ছিল। ১৯২১ সালে রীগা চুক্তিদ্বারা পোলিশ সরকার এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণ স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সেই চুক্তি কখনও রক্ষিত হয় নাই। এই সমস্ত অঞ্চলের ১ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে পোলিশ সরকারের হিসাব মতও ২৫ লক্ষের বেশী পোল নয়। বাকী সব ইউক্রেনিয়ান ও বেলোরাশিয়ান; সোভিয়েট ইউক্রেন এবং বেলোরাশিয়াই তাহাদের পিতৃভুমি। অথচ ইউক্রেনে শতকরা ৮৮ ভাগ ও বেলোরাশিয়ার শতকরা ৬০ ভাগ জমির মালিক পোলিশ জমিদারেরা। পোল্যাণ্ডের দখলে যাইবার আগে ইউক্রেনে ৩৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ২৫০টি ছাড়া আর সব স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলগুলি টিঁকিয়া ছিল সেখানেও ইউক্রেনিয়ানদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত না।

রাজনৈতিক ব্যাপারেও পোলিশ সরকার জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে হরণ করে। ১৯২১ সালে পোল্যাণ্ডে এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনও সম্পূর্ণ চালু হয় নাই। ১৯৩৫ সালে তাহারা প্রকাশ্যে এই শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া এক ডিক্টেটারী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং শাসন-যন্ত্রের উপরে রাষ্ট্রের সভাপতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন নির্ব্বাচিত পরিষদের কাছে এই সভাপতি দায়ী থাকিবে না। থাকিবে একমাত্র "ভগবান ও ইতিহাসের" কাছে। নির্ব্বাচন প্রথারও পরিবর্ত্তন করা হয়। ১৯২৯ সালের গঠনতন্ত্রে ২১ বছরের যে কোন ব্যক্তির ভোট দেবার বা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবার অধিকার ছিল কিন্তু এই নূতন গঠনতন্ত্রে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের বয়স বাড়াইয়া ৩০ করা হইল। শুধু তাহাই নয়। নিয়ম হইল জমিদার, মহাজন ও মিলমালিকদের দ্বারা গঠিত এক বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা মনোনীত না হইলে কেহই নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবে না। উচ্চপরিষদে এই নির্ব্বাচন-প্রহসনেরও বালাই রহিল না। সেখানে এক তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনীত হইবে সভাপতি দ্বারা এবং বাকী সভ্যদের নির্ব্বাচিত করিবে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত ৩ লক্ষ লোক মিলিয়া।

স্বদেশদ্রোহী পলাতক সরকার

এই ভাবে এক প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের গবর্ণমেণ্ট আর্থিক ও রাজনৈতিক ভাবে সমস্ত পোল্যাণ্ডকে মধ্যযুগীয় দাসত্বে আবদ্ধ করিল। তাহারা তাহাদের নিজেদের স্বার্থে এতটা অন্ধ ছিল যে জার্ম্মান আক্রমণের মুখে রাশিয়া যখন পারস্পরিক সাহায্যের প্রস্তাব করিল তখন পোলিশ পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাহার ভয় ছিল যে লালফৌজ পোল্যাণ্ডের সাহায্যে আসিলে তাহাদের প্রভাবে নির্য্যাতিত পোল ও ইউক্রেনিয়ানরা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। তাই লালফৌজের সাহায্যে দেশরক্ষার চাইতে তাহারা জার্ম্মান পদানত হওয়া শ্রেয় মনে করিল।

পোলিশ বাহিনী লাল ফৌজের সহিত একসঙ্গে লড়িয়াই ওয়ারস শহরকে জার্ম্মানদের হাত হইতে মুক্ত করে। ওয়ারসর শহরতলী প্রাগা দখল হইবার পর যুদ্ধরত এক পোলিশ সৈন্যের সহিত হঠাৎ তাঁহার ভগ্নী ও ছোট্ট ভাইয়ের মিলনের দৃশ্য।

পোলিশ শাসনকর্ত্তাদের এমনি যোগ্যতা যে মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে পোলিশ সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। শাসক সম্প্রদায় দেশবাসীকে শত্রুর মুখে ছাড়িয়া দিয়া কেহ রুমানিয়ায়, কেহ লণ্ডনে পালাইল। লণ্ডন প্রবাসীরা সেখানে একটি 'গভর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেখান হইতেও তাহারা তাহাদের জনস্বার্থ ও সোভিয়েট বিরোধী ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনস্থ পোলিশ সরকার ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট সরকার এক পোলিশ সৈন্যদল গঠনের জন্য পোলিশ গবর্ণমেণ্টকে ৩০ কোটি রুবল বিনা স্থদে ধার দেয়। ইহা ছাড়া সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিদের সাহায্যের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ ও দুঃস্থ পোলদের সাহায্যের জন্য ১০ কোটি রুবল ধার দেয়। রাশিয়ায় পোলিশ আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য আরও ৫৮৯টি বিভিন্ন ধরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। কিন্তু পোলিশ সরকারী প্রতিনিধিরা এই আতিথেয়তার অসম্মান করে। তাঁহারা এই অর্থ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করে এবং অনেকে জার্ম্মান গুপ্তচরের কাজও করে। রাশিয়ায় পোলিশ সৈন্যদলের কর্ত্তা জেঃ এণ্ডার্স তাঁহার সৈন্যদলকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে সোভিয়েট পরাজিত হইলে তাঁহার সৈন্যদল রাশিয়া দখল করিবে। পোলিশ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাশিয়া তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে।

জাতীয় মুক্তি পরিষদ

ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল মিলিয়া জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠিত হয়। এই সমস্ত দল পোলিশ জমিদারদের রাজত্বে বে-আইনী ছিল এবং জার্ম্মান আক্রমণের মুখে পোল্যাণ্ডের শাসকরা যখন পলায়ন করে তখন এই সব দলই জার্ম্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায়। বিভিন্ন শ্রমিক, কৃষক, সমাজতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক দল এই পরিষদে যোগ দেয়। ইহাছাড়া অদলীয় বহু নেতাও এই মুক্তি পরিষদে যোগ দেন।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মুক্তি পরিষদ নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে সমস্ত পোলিশ দেশপ্রেমিককে এক হইতে আহ্বান করে:

(১) ১৯২১ সালের গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(২) পোল্যাণ্ডে নাৎসী প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

(৩) ইহুদিদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

(৪) দেশদ্রোহী ও ১২৫ একরের বেশী জমির মালিক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে বণ্টন।

লণ্ডনের পলাতক সরকার এই কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে মুক্তি পরিষদের সঙ্গে হাত মিলাইতে রাজী হইল না। কারণ এই কর্ম্মসূচী তাহাদের জমিদারী স্বার্থ ক্ষুন্ন করে। কিন্তু তাদের অজস্র বাধা সত্ত্বেও মুক্তি পরিষদ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। লণ্ডন সরকারের বহু সমর্থক মুক্তি পরিষদে যোগ দেন এবং দেশপ্রেমিক পোলদের লইয়া মুক্তি পরিষদ একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে। পলাতক পোলিশ সরকার যখন লণ্ডনে বসিয়া বীরদর্প করিতে ছিল তখন এই সৈন্যদলই লালফৌজের পাশে থাকিয়া পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মান কবল মুক্ত করে।

মুক্তি পরিষদের এই শক্তি বৃদ্ধি দেখিয়া লণ্ডন সরকারের মধ্যে দেশপ্রেমিক অংশ মুক্তি পরিষদের সঙ্গে রফা করিতে ব্যগ্র হন। লণ্ডন সরকারের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিকোলাইজিক ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যে মস্কো আসেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা জেঃ বোরের নেতৃত্বে ওয়ারসতে এক বিদ্রোহ ঘটায়। এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে সে সময় বিদ্রোহ করিয়া জার্ম্মানদের পরাজিত করা কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। এই বিদ্রোহের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মুক্তি পরিষদ ও লালফৌজকে অপদস্থ করা এবং মিকোলাইজিকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা। বিখ্যাত সাংবাদিক পল উনণ্টারটন ওয়ারসর বহু লোকের সঙ্গে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ২৪শে জানুয়ারীর প্রেরিত সংবাদে জানাইয়াছেন যে ওয়ারসর পোলিশ অধিবাসীরা মনে করেন—জেঃ বোর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অসংখ্য পোলের জীবন নাশ করিয়াছে।

কিন্তু বিদ্রোহ জার্ম্মানদের পরাজিত না করিতে পারিলেও মিকোলাইজিকের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হয়। ইহার কিছুদিন পরে লণ্ডন 'গবর্ণমেণ্ট' মিকোলাইজিককে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে এবং আরসিজেস্কির নেতৃত্বে একটি জমিদার-প্রধান মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। মিকোলাইজিক ও তাঁহার কৃষক দল এই সভায় যোগ দেন না। এই ভাবে পোলিশ জনসাধারণের সঙ্গে পলাতক পোলিশ সরকারের শেষ যোগসূত্রও ছিন্ন হইল!

জার্ম্মান কবলমুক্ত পোল্যাণ্ড

ইতিমধ্যে লাল ফৌজ পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ ভাবে জার্ম্মান কবলমুক্ত করে। মুক্তিপরিষদের সৈন্য বাহিনী লাল ফৌজের পাশে থাকিয়া পোল্যাণ্ড হইতে নাৎসী বিতাড়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। শত্রু-কবলমুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই পোলিশ জাতীয় কাউন্সিলের (পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইতিহাসের ভ্রূক্ষেপহীন জয়যাত্রা

[৭ম পৃষ্ঠার পর]

আমরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যুদ্ধ চালাচ্ছি। আমাদের ফুয়ার-এর চতুর রণনীতিকে ধন্যবাদ। সমস্ত দিকেই শুভ।' এ ক্ষেত্রেও জার্ম্মানদের হিসাব ভুল হওয়াই খুব বেশী সম্ভব। রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেস-এর সংবাদদাতারা বলছেন, পশ্চিম রণাঙ্গনে এখন জার্ম্মানদের সংখ্যা অনেক কম; তাঁদের পূর্ব্ব ধারণা মত, জার্ম্মান সৈন্যরা আর্দ্দেন থেকে আণ্টওয়ার্পে ছুটে আসছে না, দলে দলে ছুটে যাচ্ছে তারা ব্রেসলাউ আর ডান্‌জিগের দিকে। জার্ম্মানদের এই গতি পরিবর্ত্তনের পর খুব সম্ভব মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী আর্দ্দেন থেকে রুর কিম্বা কলোন কিম্বা ফ্রাঙ্কফুর্টের দিকে পা বাড়াবে। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা ভাল, ফ্রাঙ্কফুর্ট দুটো আছে—একটা মেইন্ নদীর ধারে আর একটা ওডার নদীর ধারে। ওডারের পাশে যেটা, সেটাকে আমরা যদি তাড়াতাড়ি কাবু ক'রতে পারি, তাহ'লে খুব সম্ভব মেইন্-এর পাশেরটাকে মিত্রপক্ষই বাগে আনার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

আমি জানি, ইংরেজরা জার্ম্মানদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘায়েল করার জন্য উৎসুক। জার্ম্মানরা তাদের শান্তিপ্রিয় শহরগুলির ওপর অবিশ্রান্ত বোমা ফেলেছে; ইংরেজদের মনে অবিরত সেই ঘৃণার আগুন জ্বলছে। আমেরিকানদের প্রাণোচ্ছল প্রকৃতি ও ফরাসীদের আহত হৃদয়াভিমানের সঙ্গেও আমি পরিচিত। বার্লিনে সারা শহরজোড়া এক রেলপথ আছে। শহরের পূব্বপ্রান্তের রেল ষ্টেশনটির নাম সাইলেশিয়া ষ্টেশন। আমাদের ঐ ষ্টেশনটি নেবারবড় ইচ্ছা। বার্লিনের পশ্চিম প্রান্তে খুব মাজাঘষা বড়লোকদের পাড়ায় যে ষ্টেশনটা, তার নাম শারলটেন্‌বার্গ। এটা মিত্রপক্ষেরই ভাল মানাবে।

ভাল ক'রে ভেবে দেখ

আমাদের অভিযানের মধ্যে একটা বিষয় শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সবাইকে গভীর চিন্তার খোরাক দেবে। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা বার বার এই কথাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, লাল ফৌজ যখন নিজের দেশে লড়াই করে তখন সে দুর্দ্ধর্ষ; কিন্তু নিজেদের বনস্থলীর বাইরে লাল ফৌজ হীনবল। কার্পাথিয়ান পর্ব্বতমালার গিরিপথে, সাইলেশিয়ান শহরের রাস্তায় রাস্তায়, পূর্ব্ব প্রুশিয়ার বক্ষে—পরদেশে লাল ফৌজ এখন যুদ্ধ করছে। আর তারা আদৌ খারাপ লড়ছে না। আমাদের ভালমত চেনা ও জানার জন্য আজ সময় এসেছে। পৌরাণিক উপাখ্যান ও রূপকথা থেকে আমাদের চেনা ও জানা যাবে না, এমন কি উষ্ট্রভ্‌স্কির লেখাও আমাদের পরিচিতি নয়—আমাদের চিনতে ও জানতে হবে আমাদের আজকের দিনের বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ড আর মানুষের পরিচয় থেকে।

আলিওশা, পোপোভিচ, কিম্বা আনিকা—লাল ফৌজ এর একটাও নয়। লাল ফৌজ হচ্ছে আধুনিক সৈন্যবাহিনী। শুধু নিজের দেশের মাটিতেই নয়, দূর দেশের মাটিতেও এই বাহিনী নিজের দেশ রক্ষার জন্য লড়তে পারে। আমাদের ইতিহাসের অনেক কিছুই দুনিয়ার অন্য দেশের লোকের ধারণার বাইরে। পিটার, ডিসেম্‌ব্রিষ্ট, টলষ্টয়, অক্টোবরবিপ্লব ও ম্যাগ্নিটোগর্স্ক-এর আবির্ভাবে অতীতে যেমন বিদেশীরা বিস্মিত হয়েছিল, আজ আবার আমাদের একের পর এক বিজয় দেখে তারা অবাক হচ্ছে। আমরা লিখতে আর গড়তে আর লড়তে শিখছিলাম—দুনিয়া যদি এতদিন এই সত্য না দেখে থাকে, তবে বলতে হবে তারা চোখে আঙুল দিয়ে ঘুমচ্ছিল। আমরা যে আজ জিতছি, তার কারণ কশাকদের দুর্দ্ধর্ষতা কিম্বা কমাণ্ডারদের ব্যক্তিগত প্রতিভা নয়—পুরানো রুশ সৈন্যদের অসীম আনুগত্যও এর কারণ নয়। আসলে আমরা আধুনিক কালের উপযোগী যুদ্ধে শিক্ষিত হয়েছি। উড়ন্ত বোমা ছুঁড়ে আমরা গৃহকর্ত্রীদের চোখ কপালে তুলতে চাই না। সেরা সেরা কামান, নতুন নতুন ট্যাঙ্ক (যার সামনে শত্রুর 'বাঘা ট্যাঙ্ক ভেড়া বনে' যায়) আর ষ্টরমোভিক বিমান—এই নিয়ে আমাদের যুদ্ধ। সুদক্ষ আর সুরুচিসম্পন্ন কমাণ্ডাররাই আমাদের সৈন্যদলের নায়ক।

লালফৌজের জন্মদাতা অক্টোবর বিপ্লব

জার্ম্মানরা রণনীতিকে একটা সঙ্কীর্ণ সামরিক গোষ্ঠীর অধিকার হিসাবে দেখেছিল। উপাধি কিম্বা ব্যাধি ছাড়া প্রতিভা কখনও পৈতৃক পাওয়া যায় না। জার্ম্মান সেনাপতিদের ছেলে সেনাপতিই হয়, কিন্তু তাই বলে সুদক্ষ সেনাপতিদের ছেলেরা যে রণনিপুণ সেনাপতিই হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমাদের কমাণ্ডাররা যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলন ক'রে তবে দক্ষ হ'য়েছে। তাদের কাঁধে ঝোলানো সম্মানচিহ্ন তারা বাপপিতামহর সূত্রে পায়নি। আমরা জিতছি কারণ, আমাদের পিছনে প্রতিভা ও নৈপুণ্য দুইই আছে।

জার-এর সৈন্যবাহিনীতে যে সব সৈন্য ছিল, তারা সাহসী ছিল; দেশকে তারা ভালও বাসত কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল ভাসা ভাসা। লালফৌজের প্রত্যেকটি সৈন্য জানে কেন ও কিসের জন্যে সে লড়াই করছে। সৈন্যের পোষাকপরা সে একজন নাগরিক। উচ্চপদস্থের আদেশ সেও পালন করে, তার কারণ তার উপরওয়ালার জন্ম অভিজাত বংশে ব'লে নয়—সামরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন সে নিজেই বোঝে।

এখন যদি কোন বিদেশী পণ্ডিতম্মন্য বলে যে, রুশ সৈন্যদের সনাতন গুণগুলিই লাল ফৌজের বিজয়ের কারণ—তাহ'লে আমরা তার মুখের ওপর বলতে পারি যে, তোমরা যে প্লাটন কারাটায়েভ-এর (পুরাণো দিনের রুশ সৈন্য—অনুবাদক) প্রশংসা ক'রছ, তার কারণ চুচক্ষে তোমরা অক্টোবর বিপ্লবকে দেখতে পার না। লাল ফৌজ পূর্ব্ব প্রুশিয়ার টানেন্‌বুর্গ দখল করেছে। জার-এর সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ইতিহাসের সঙ্গে এই শহরটির নাম জড়িত। যেখানে জার-এর আমলের মূর্খ, দুর্ব্বিনীত সেনাপতিরা নির্বীর্য্য প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে জার-এর সৈন্যেরা বিনা প্রতিবাদে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে, আজ ঠিক সেখানেই আমরা একটার পর একটা বিজয়ের সঙ্গে বীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

বিদেশীরা মমতার সুরে পুরানো রাশিয়ার স্তুতিগান করুক আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তারা যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা ব'লে থাকে, তখন প্রশংসা না হ'ক, অন্তত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করি।

দীর্ঘ তিন বছর ধ'রে মুক্ত প্রান্তরের সৈন্য শিবিরে বিনিদ্র চোখে আমরা নীরবে যে রাস্তার স্বপ্ন দেখেছি—আজ সেই শেষ রাস্তায়, আমরা পদার্পণ করেছি। সুইডিশ সংবাদপত্রগুলিতে লেখা হচ্ছে, আমাদের রুখবার জন্যে হিটলার এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বুডাপেষ্টে জার্ম্মানদের ভূতপূর্ব্ব দূত ফন্ জাগোকে পর্য্যন্ত হিটলার রণসাজ পরিয়ে সাধারণ সেপাই হিসাবে ফ্রণ্টে পাঠিয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই সেই মাননীয় দূতটির ভার নেবো।

এখনও অবশ্য একাধিক ভয়ঙ্কর লড়াই আমাদের সামনে। কিন্তু ওপেল্‌ন ও মোরুঙ্গেন নিয়ে নেওয়ায় কাজ এবার আমাদের সহজ হয়ে গেছে। আমাদের এই বৃহৎ অভিযানের পরিচালক স্বয়ং ষ্টালিন। দারুণ বিপদের দিনেও ষ্টালিনই আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, দিন আসবে, যেদিন রাস্তায় রাস্তায় আনন্দের ধুম পড়ে যাবে। ষ্টালিন সেই বিপদের অন্ধকারেও তাঁর মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন, পূর্ব্বপ্রুশিয়ার প্রাণকেন্দ্রের দিকে সুতীক্ষ্ণ তীর ছুটে যাচ্ছে। তিনি সেদিন দেখেছিলেন, লাল ফৌজের ওডার অতিক্রমের দৃশ্য। সেদিন ষ্টালিন তাঁর মনশ্চক্ষে ওপেল্‌ন্ থেকে আরম্ভ ক'রে বার্লিনের দিকে ধাবমান অসংখ্য বিচিত্র পথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর আজ আমরা ওপেল্‌ন্-এর মাটিতে পা ফেলে চলেছি। বার্লিনের মাটিতেও আমরা পা দেব।

ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক মৈত্রী

বিভিন্ন দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে এক প্রতিষ্ঠানটি আছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি **ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের** কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীদের জীবনী ও কার্য্যাবলীর সহিত পরিচিত হইতে অত্যন্ত উৎসুক। ভারতের গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে সাময়িক পত্র, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, ছবি, এল্‌বাম প্রভৃতি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েটের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁহারা পুস্তক পত্রাদি সমস্ত কিছু পাঠাইতে রাজী আছেন।

বাবরের পাণ্ডুলিপি

ভারতের শিল্পসংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েটের আগ্রহ আজ নূতন নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন যাদুঘরে ভারতীয় প্রাচীন পুঁথি ও শিল্পকলার বহু সংগ্রহ আছে। লেনিনগ্রাদের একাডেমি অব সায়েন্সস ও হার্মিটেজ-এর চিত্রশালাতেই এই ধরণের সংগ্রহ সব থেকে বেশী।

মস্কো শহরে প্রাচ্য সংস্কৃতির চিত্রশালাতেও ভারতের পুরাকালীন একাধিক শিল্পনিদর্শন রক্ষিত আছে। জার্ম্মান আক্রমণের সময় এই শিল্পসংগ্রহগুলি মস্কোর বাইরে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলা হয়। শীঘ্রই এগুলি ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হইতেছে। সোভিয়েটের যাদুঘরগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প নিদর্শনের মধ্যে সম্রাট বাবরের ফার্সী ভাষায় লেখা 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত ৭০টি ক্ষুদ্রাকার ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট আকবরের আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজ-দরবারে এই ছবিগুলি অঙ্কিত হয়। এই ছবিগুলি মোগল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে আঁকা। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে ছবিগুলি আঁকা। ছবিগুলির শিল্পনৈপুণ্য অসাধারণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর অঙ্কিত চিত্রাবলীও এখানে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া বালচাঁদের অঙ্কিত ও স্বহস্তের স্বাক্ষর ষোড়শ শতাব্দীর একটি ছবিও এই চিত্রশালায় আছে।

জগন্নাথের রথ

এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় কারুশিল্পের নিদর্শন সোভিয়েটের চিত্রশালাতে সংরক্ষিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর 'জগন্নাথের রথ' সম্পর্কে খোদাই চিত্রও এখানে সংগৃহীত আছে। গালার তৈরী আয়না ও কলমের আধার ও ভারতীয় রেশমের তৈরী নানারূপ কারুকার্য্য করা প্রাচীন শিল্পকলাও এখানে আছে।

এই সমস্ত শিল্প নিদর্শনগুলির সংগ্রাহক হইতেছেন সেমিয়ন টিউলিয়ায়েভ। তিনি নিজে একজন ভারতীয় শিল্পবিশারদ। ভারতীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য কারুশিল্প সম্পর্কে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সোভিয়েট হইতে প্রকাশিত 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থে মধ্য যুগের ভারত সম্পর্কে তাঁহার একটি প্রবন্ধ আছে। মস্কোর প্রাচ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

ভ্রম সংশোধন

৩৯শ সংখ্যা জনযুদ্ধে কলিকাতার বস্তি উচ্ছেদের রিপোর্টে এক জায়গায় লেখা হইয়াছিল যে গরচা বস্তীর ২০টি বাড়ীর উপর উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। উহা গরচা বস্তীর স্থলে পণ্ডিতিয়া বস্তী হইবে।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড

[৮ম পৃষ্ঠার পর]

দেশপ্রেমিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত অস্থায়ী আইন পরিষদ) নির্দ্দেশে মুক্তি পরিষদ একটি অস্থায়ী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট গঠন করে। কৃষক, শ্রমিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দল এই গবর্ণমেণ্টে যোগ দেয়। এমন কি মিকোলাইজিকের দল পর্য্যন্ত এই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে।

লণ্ডনের পলাতক পোলিশ সরকার ও তাহাদের রাজনৈতিক পূর্ব্বপুরুষরা ২০ বছরে পোল্যাণ্ডে যত কিছু মধ্যযুগীয় বর্ব্বর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল মুক্তি পরিষদ দুই মাসের মধ্যে তাহা নির্ম্মূল করিয়াছে।

মুক্তি পরিষদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ হইয়াছে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করা। ১২৫ একরের বেশী জমির মালিক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ কৃষক পরিবার এই ভাবে ১২ একর করিয়া জমি পাইয়াছে। বিখ্যাত জমিদার কাউণ্ট পোটোকির ৬১,০০০ একরের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া ১৫০০ কৃষকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় শাসনের ভার নির্ব্বাচিত স্থানীয় পরিষদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরান পুলিশ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া শান্তিরক্ষার ভার নাগরিক রক্ষীদলের হাতে দেওয়া হইয়াছে। এই রক্ষীদল স্থানীয় পরিষদের কাছে দায়ী থাকিবে।

ইউক্রেন, বেলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল ভূতপূর্ব্ব পোলিশ সরকার দখল করিয়াছিল সেই সমস্ত অঞ্চল ঐ সব রাষ্ট্রকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সব অঞ্চলে যে সকল পোল বাস করে তাহারা যদি তাহাদের দেশে ফিরিতে চায় তবে তাহাদের সাহায্যের জন্য পরিবার পিছু ৫০০০ রুবল ধার দেওয়া হইবে। দুই বছরের জন্য তাহাদের কোন রকম খাজনাও দিতে হইবে না।

সোভিয়েট রাশিয়া এই নূতন গণতন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছে। পোলিশ প্রতিনিধিদের মার্শাল ষ্টালিন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে বিধ্বস্ত ওয়ারস'কে পুনর্গঠিত করিবার জন্য সোভিয়েট সরকার সমস্ত রকমে সাহায্য করিবে। পিয়াষ্টা, সাইলেসিয়া, ওয়ারমিয়া প্রভৃতি জার্ম্মান পদানত পোলিশ রাজ্য যাহাতে পোল্যাণ্ড পুনরায় ফিরিয়া পায় তাহার জন্যও সোভিয়েট রাশিয়া চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত।

ফ্যাশিজম বনাম গণতন্ত্র

এইভাবে ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে ন্যায় ও স্বাধিকারের ভিত্তিতে একটি নূতন গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে। লণ্ডনে পলাতক 'সরকারের' কার্য্যাবলীর সঙ্গে মুক্তিপরিষদের কার্য্যাবলীর তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে কাহারা পোল্যাণ্ডের সত্যিকারের প্রতিনিধি। ইয়ালটা সম্মেলনে এই মুক্তি পরিষদকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতারই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

কিন্তু তবুও কেন অতি সহজ সত্য কথাটা ইংলণ্ডে ও আমেরিকার কোন কোন লোক বুঝিতে পারিতেছে না।

লণ্ডনের পোলিশ সরকারের মর্ম্মবেদনা বুঝা যায়, কারণ তাহাদের জমিদারী বিপন্ন। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার এই সব লোকেদের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি কোথায়? এর উত্তর পাওয়া যায় ইউনাইটেড প্রেসের ৯ই ফেব্রুয়ারীর লণ্ডনের খবরে। লণ্ডনের পোলিশ সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোটিপতিদের কাছে কোটি কোটি টাকার মালের অর্ডার দিয়াছে। সুতরাং এই সরকার যদি পোল্যাণ্ডে ফিরিতে না পারে তবে তাহাদের মোটা লাভ নষ্ট হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাহারা প্রাণপণে পলাতক পোলিশ সরকারকে সমর্থন করিতেছেন। তাই তাহারা আর্ত্তনাদ করিতেছেন, "আগামী ত্রিশক্তি সম্মেলনে ইয়ালটার সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে হইবে। ইহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে ডিউক অব বেডফোর্ডের মত কিছু সাম্রাজ্যবাদী। যুদ্ধের পরে বৃটেন "দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি" হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদী ডিউক "ইউরোপ ও এশিয়ায় সর্ব্বশক্তিমান রাশিয়ান একনায়কত্বে"র বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরামর্শ দিয়াছেন।

[১০ পৃষ্ঠা দেখুন]

বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস

"পূজি বাণীপদ বঙ্গে কাশী কৃত্তিবাস
মুকুন্দ ভারতচন্দ্র; শ্রীমধুসূদন
রেখেছেন যে নির্ম্মাল্য, সদা অভিলাষ
সে নির্ম্মাল্য করিবারে মস্তকে ধারণ।"

কোন কবি এই পদ রচনা করেছেন জানি না কিন্তু বাংলার প্রত্যেকটি সাহিত্যসেবীর এবং শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অ-শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই যে কামনা একথা নিশ্চিত বলা যায়।

বাংলার এই আদি কবির জন্মতিথি উৎসব গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হয়ে গেল। কবি নিজেই তাঁর গ্রামের নাম জন্ম তারিখ ও বংশ পরিচয় দিয়ে গেছেন। শান্তিপুরের কাছে,—

গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে সদা তরঙ্গিনী॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

রামায়ণ সমস্ত ভারতের গৌরব। ভারতের সভ্যতার ও নৈতিক জীবনে রামায়ণের প্রভাব অসামান্য। এই রামায়ণকে প্রথমে বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করে কৃত্তিবাস বাংলার মানস জীবনকে কত ভাবে সম্পদশালী করেছেন তা বলাই বাহুল্য। এমন বাঙ্গালী খুব কমই আছে যে কৃত্তিবাসের নাম জানে না। পল্লীগ্রামের সামান্য শিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণের কাছে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসই বৎসরের পর বৎসর বংশ পরম্পরাক্রমে সাহিত্য শিল্প ও ধর্ম্ম নীতি বোধ বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনি সম্পদের আধার কৃত্তিবাস।

অথচ কবি কৃত্তিবাসকে আমরা ভুলতে বসেছি। প্রায় ৫৫ বছর আগে বিখ্যাত কবি নবীন সেন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম "কৃত্তিবাস সেবা সমিতি" গঠিত হয়। এই কমিটির সম্পাদক হন পণ্ডিত-প্রবর হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। কিন্তু এই কমিটির কাজ বেশী দুর চলে নি।

তার পরে ১৯১৬ সালে স্যর আশুতোষের চেষ্টায় ফুলিয়াতে একটি স্মারক স্তম্ভ স্থাপিত হয়। এবং সেই উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম মহাধুমধামের সঙ্গে মহাকবির স্মৃতি দিবস পালিত হয়।

সেদিন ওখানে বাংলার বহু সাহিত্যিক এসেছিলেন—কৃষ্ণনগর, নাটোর ও কাশিমবাজারের রাজারাও ছিলেন। আর এসেছিলেন—জেলার আশে পাশের কবি—জারী তরজাওয়ালারা। নদীয়া জেলার বিখ্যাত গায়ক গুপে ভাটের ভাগনে ভূষণের 'সীতার বনবাস' পালা গান সেদিন রাজামহারাজাদের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত জনসাধারণের চোখে জল বইয়ে ছিল। বাংলার আদি কবির স্মৃতি দিবসে বাংলার পল্লী কবিরা—যাঁরা নানা অসুবিধা ও অবহেলা সত্ত্বেও আজো বাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে কৃত্তিবাসের সম্পদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁরা একটি দিনের জন্যও জাতিতে উঠবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন।

স্যর আশুতোষ এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির কথা হয় তো জানতেন। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওখানে কৃত্তিবাস কূপ ছাড়াও একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। আশা ছিল এই সব উপলক্ষে বছরে বছরে কবির স্মৃতি পালিত হবে।

কিন্তু তারপরে ১০।১২ বছর কিছুই হয় নি। শেষে শান্তিপুরের স্থানীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত প্রভাস প্রামাণিক মহাশয় আরো কয়েকজন উৎসাহী কর্ম্মী নিয়ে গত কয়েক-বছর ধরে স্মৃতি দিবস পালনের আয়োজন করে আসছেন। তাঁর উৎসাহে কিছুদিন বিভিন্ন যায়গা থেকে লোকজন আসতো। রেল কোম্পানী দর্শনীয় স্থানের বিজ্ঞাপনে এই স্থানটীর নাম রেখেছিল এবং স্মৃতি দিবসে ট্রেণের সুবিধা করে দিত। গত ১৯৩৯ সালে রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেছিলেন। কিন্তু তার পর আর সে উৎসাহ নেই। এবারকার সম্মেলনে স্থানীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নলিনী সান্যাল ও রায় বাহাদুর সচ্চিদা সান্যাল—এবং আরো ২।১ জন ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কেউ যান নি। শান্তিপুরের উৎসাহী শত খানেক লোক ছিলেন।

কৃত্তিবাসের গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিমে এখন আর গঙ্গা নেই। অনেক দূরে সরে গেছে। ঠিক যে যায়গাটায় কৃত্তিবাসের গৃহ বলে নির্দ্দেশ করা হয় সেখানে জন বসতি নেই বল্লেই চলে। ঐ স্থান থেকে বেশ কিছু দূরে—কিছু ঘর মুসলমান ও কৈবর্ত্ত চাষীর বাস। স্কুলটী মাইনর থেকে ইউ, পি, তার পর এল, পি এবং বর্ত্তমানে ফ্রি প্রাইমারী হয়ে গেছে। স্কুলের মাষ্টার মশায় বল্লেন যে ছাত্রসংখ্যা ১২৫ থেকে ৯০ হয়েছে। গত বছরের দুর্ভিক্ষ এবং এবারের মহামারীর দাপটে বিনা মাইনেতেও স্কুলে ছাত্র আসে না। মাষ্টারদের মাইনাও ১৬৲।১২৲ টাকা হারে।

কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে

'হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্য তীর্থে
হে পথিক সম্ভ্রমে প্রণম'।

কিন্তু এ কথা পড়বার লোকও বোধ করি কিছুদিন পরে ও রাস্তা দিয়ে যাবে না। শুনতে পেলাম গত বৎসর ক্ষুধার জ্বালায় কয়েকজন গ্রামবাসী ঐ স্তম্ভের চারিপাশে ঘেরা লোহার শিকগুলি তুলে নিয়ে যায়। শেষে কোন হাকিম এসে অনেক অনুসন্ধানের পর ফেরৎ পান।

সরকারের কোন দরদী কর্ম্মচারী এসে কবে কি করবেন এই ভরসাতেই বাংলার আদিকবির স্মৃতিস্তম্ভকে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ কৃত্তিবাসকে যখন গৌড়েশ্বর পারিতোষিক দিতে চান, তখন তিনি সগর্ব্বে বলেছিলেন ঃ

কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

কৃত্তিবাস যে বংশে জন্মেছেন—শ্যামাপ্রসাদ সেই বংশেরই লোক। শান্তিপুরে স্যর আজিজুল হকেরও বাড়ী। কিন্তু এই জাতীয় সম্পদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আজো হল না।

কৃত্তিবাস শুধু শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি নন—বাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণের একান্ত আপন জন তিনি। সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করার জন্য তাঁর যুগের রক্ষণশীলেরা কম নিন্দা করে নি। "কৃত্তিবাসে, কাশীদাসে আর বামুন ঘেঁষে
এই তিন সর্ব্বনেশে"।

জনসাধারণকে রামায়ণের অমৃত পান করাচ্ছেন বলে এই অভিযোগ হয়েছিল। বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ তাঁদের প্রিয় কবির সম্মান রক্ষার্থে আবার অগ্রসর হবে—শান্তিপুরের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের চেষ্টা থেকেই সে আশা জেগে ওঠে।

—সুধী প্রধান

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড

[৯ম পৃষ্ঠার পর]

আশ্চর্য্যের কথা আমাদের দেশেও কোন কোন 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোটিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতেছে 'ইয়ালটা সিদ্ধান্ত নাকচ কর।' ১৫ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে "হিটলারের আক্রমণের পূর্ব্বে যে গবর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডে ছিলেন—যাঁহারা নাৎসী শক্তিকে বাধা দিতে পশ্চাদপদ হন নাই, তাহাদের পোল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করাই গেল না।... পোল্যাণ্ডের প্রতি চার্চ্চিল-রুজভেল্টের এই আচরণ তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠার অভাব, সুবিধাবাদ ও প্রবলের ও প্রবলের তোষণ নীতিরই পরিচয় দিতেছে।" 'ন্যাশনালিষ্ট' কাগজও "ক্রিমিয়ার অপরাধ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে একই কথা বলিয়াছে।

চার্চ্চিল-রুজভেল্ট যাহাতে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী "আদর্শনিষ্ঠা" বজায় রাখেন তাহার জন্য আনন্দবাজার ও ন্যাশনালিষ্টের আগ্রহ খুবই কৌতুকজনক। কিন্তু ইতিহাসের দুর্নিবার অগ্রগতির কাছে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের সাম্রাজ্যবাদী "আদর্শ" আজ পদে পদে পরাজিত হইতে বাধ্য। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে ইয়ালটা সিদ্ধান্ত তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।

কৃত্তিবাস স্মরণে

কবিশেখর কালিদাস রায়

কি মহিমা রচনার উদয়ন কথা আর কহেনাক গ্রাম-বৃদ্ধদল,
তাহাদের চারিপাশে যুবা শিশু কেন আসে? তব বাণী তাদের সম্বল
পশারী পশরা শিরে থমকি দাঁড়ায় ঘিরে শুনে যদি রামায়ণ পাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুই চোখে ধারা ঝরে ভুলে যায় বেচা কেনা হাট
বঞ্চক 'মুরারি শীল' ছাড়ে না যে এক তিল মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে
পাপ করি দিন কাটে সাঁঝে রামায়ণ পাঠে রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে
শিখাইলে কি যে সত্য গ্রামে গ্রামে ভাঁড়ুদত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়
কৃপণ তোমার গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে যক্ষদেরও হৃদয় গলায়।
দিনে হাটে হট্টগোল কাড়াকাড়ি ডামাডোল সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরা কাণ্ডটী পড়ি দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ
বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায় দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন জলে একই কথা শুনে বার বার।
তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা স্নিগ্ধ শান্ত—গ্রীষ্মের দিবস
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি সুধা তাতে না জানি শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।
মোদকের খই চূড়, তব গীতি সুমধুর আরো যেন মিঠা করে তুলে
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বার বারই দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।
জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা নির্যাতন করে তব পুঁথি পড়ে মাতা তার,
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর গ'লে যায় তার কর-ভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায় অযোধ্যার নির্ব্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে তারি প্রায়শ্চিত্ত করে চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।
তুমি রস গঙ্গা হ'তে আনিলে নূতন স্রোতে আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নব রস ভাগীরথী, উদ্বেল তাহার গতি তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খালবিল, একাকার গোষ্পদ পল্বল
সে ধারার দুই কূলে লতা তৃণে শস্য ফুলে ফলিতেছে সোণার ফসল॥

রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষার

আবেদন

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল। এই সময়ের মধ্যে দেশ বহু দুঃখদৈন্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; তাঁহাকে হারাইবার দুঃখ এই চরম দুর্দ্দিনে আমরা যেমন উপলব্ধি করিয়াছি এমন বোধ করি আর কোনো সময়েই করি নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই সময়ের মধ্যে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজনে আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই।

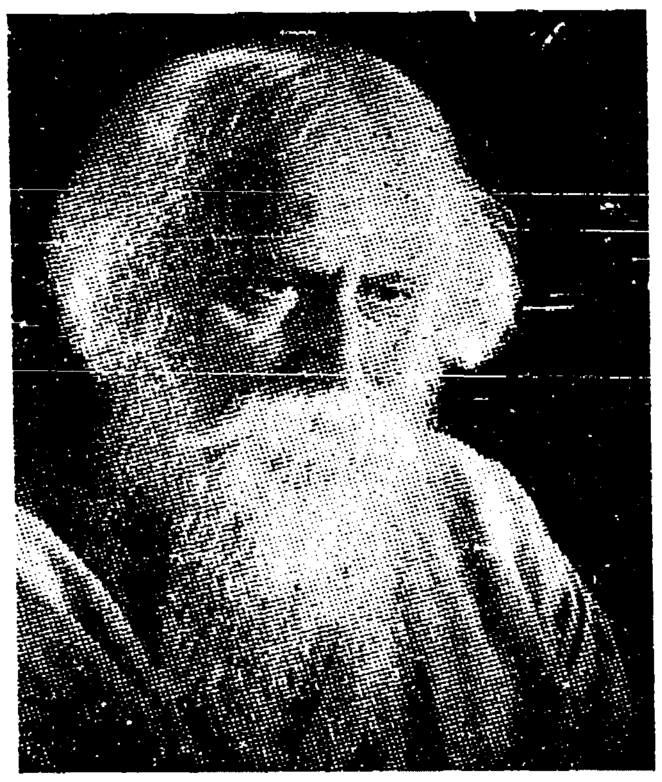

কবির জীবনব্যাপী সাধনার মূর্ত্ত প্রকাশ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের ভার দেশবাসীকে লইতে হইবে। কলিকাতায় যে স্থানে তাঁহার জন্ম, যেখানে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের—তাঁহার জীবনের অনেক দিন কাটিয়াছে, সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে তাহাকেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।

এই সকল কাজে বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি, কবির স্বদেশবাসিগণ কবির প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আগামী **২৫শে বৈশাখ** কবির জন্মদিনের পূর্ব্বেই যাহাতে এই সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়, তাহার জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ প্রেরণীয় ঃ—

১। **সম্পাদক**—নিখিল-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা (বৈকাল ১টা হইতে ৬টা)।

২। **সম্পাদক**—নিখিল-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, (আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড কার্য্যালয়) ১, বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা)।

তেজ বাহাদুর সপ্রু, সভাপতি।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক।

কাপড়ের অভাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোরা কাপড় বাহিরে সরাইয়া ফেলা হইতেছে—ধোয়াইবার জন্য! ঢাকেশ্বরী মিলের লক্ষপতি এজেন্ট মিঃ ভিওয়ানীওয়ালা প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় যে "ধোয়ানো সমিতি" আছে এই দোকান নাকি সেখান হইতেই নিয়মিত ভাবে এই সব কাপড় ধোয়াইয়া আনে।

তাঁতের কাপড়ে কন্ট্রোল নাই বলিয়া আজকাল দোকানে গেলেই দেখিবেন নানারকম নূতন নূতন কোম্পানীর (যেমন গ্রেট ইণ্ডিয়া উইভিং ফ্যাক্টরী, ঢাকেশ্বরী উইভিং মিল, বাসন্তী উইভিং ফ্যাক্টরী ইত্যাদি) ছাপ মারা "তাঁতের" শাড়ী। বাজারে গুজব শোনা যায় যে অনেক সুতাকল কোটা-প্রাপ্ত সুতায় মিলের ধুতির বদলে তাঁতে ধুতি বানাইতেছে কারণ উহাতে কোন কন্ট্রোল নাই।

গবর্ণমেণ্ট যাহা "সংগ্রহ" করে তাহারও বহু অংশ গুদামেই থাকে। যেমন ডিসেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষের হাতে প্রায় ৩৫০০ গাঁট কাপড় ছিল। তার মধ্যে ডিসেম্বরে কলিকাতায় ছাড়া হইয়াছে মাত্র ৫৩৬ গাঁট ও মফঃস্বলে ৭৫০ গাঁট। গোটা হাওড়া শহরে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে আজ পর্যন্ত মোট মাত্র ৩৬ গাঁট মিহি কাপড় "সাপ্লাই" করা হইয়াছে—অর্থাৎ হাওড়ার কোনো দোকানে ভদ্রলোকের কাপড়ই নাই। বিলি করিবার মত উপযুক্ত "পারিশ্রমিক" পাওয়া যায় নাই বলিয়াই আমলারা সংগৃহীত মালও বিলি করে না কিনা তাহা তাহারাই বলিতে পারে।

পূজার সময় ব্যবসায়ীদের মজুত গুদাম খানা-তল্লাস করা স্থির করিয়াও কর্তৃপক্ষ কোনো রহস্যময় কারণে সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। পরে বলা হয় ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিয়াই ৭ হাজার গাঁট কাপড় "সারেণ্ডার" (সমর্পণ) করিতে রাজী হইয়াছে। তাই খানাতল্লাসের দরকার নাই। তার পর সেই ৭ হাজার গাঁট কি হইল সে প্রশ্ন "জনযুদ্ধে" অনেকবার করা হইয়াছে। এখন কর্তৃপক্ষ বলিতেছে যে, সে সময়ের হুমানের "ফ্রীজ করা" কাপড়ের কোনো লিষ্টই পাওয়া যাইতেছে না। অর্থাৎ সে কাপড়ের কতখানি সরকারের হাতে আসিয়াছিল এবং কতখানি মজুতদারের ঘরেই রহিয়া গেল তাহা কর্তৃপক্ষই জানে না!

মফঃস্বলের ৯৩টি মহকুমায় অন্তত একটী করিয়া "অনুমোদিত" দোকান খোলা-হইবে স্থির হইয়াছে কিন্তু আজ পর্যন্ত মাত্র ৩০টী খোলা হইয়াছে। বাকীগুলি না খোলার কারণ উপযুক্ত ঘুষের অভাব কিনা তাহা কোন্ আমলা বলিতে পারিবে?

"অনুমোদনের" মূল্য কত ?

কলিকাতায় ১৫০টী দোকান "বাছিয়া" কাপড় বিলির "ব্যবস্থা" হইয়াছে। ধর্মতলা ষ্ট্রীটে সাধু এণ্ড কোং নামক এরূপ একটি দোকানে আমি ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অফিসার মিঃ গ্রিফিথসকেও দেখাইয়া আনিয়াছি। উহা জুতার দোকান, কিন্তু কাপড় বিলিরও ভার পাইয়াছে। কারণ সাধু এণ্ড কোংয়ের সাধুতায় সন্দেহ নাই। উত্তর লেনে মুদীর দোকানের এক কোণে রাতারাতি কাপড়ের দোকান বসিয়াছে। নাম মুসলমান কিন্তু পাড়ায় শুনিলাম আসল মালিক হিন্দু। চেতলা এলাকায় কয়েক হাজার লোকের বাস কিন্তু সেখানে শুধু একটী দোকান। আর মাত্র ২০০ গজ লম্বা গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটে প্রায় ১০টী "অনুমোদিত" দোকান।

এভাবে যাহারা "অনুমোদিত" হয়—চোরকারবার করিলেও যে তাহাদের "অনুমোদন" বজায় থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। এখন দোকানে গেলে বোধ হয় সেই কারণেই আর কন্ট্রোলের মাল পাওয়া যায় না।

আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ী মহল কর্তৃক আমাদের লজ্জা নিবারণ "প্রচেষ্টার" ইহাই লজ্জাজনক ইতিহাস। উহারা আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া সাধু সাজিবার চেষ্টা করে। আমলাতন্ত্র দুই-চারিটি চুনোপুঁটির মজুত ধরার খবর ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিতেছে যে আমরা দেবদূত, খারাপ ব্যবসায়ীরাই যত নষ্টের গোড়া।

আর ব্যবসায়ীরা প্রচার করে—সরকারী আমলারা মিলিটারীতে কাপড় পাঠাইয়া দেয়, ঘুষ নেয়—তাই তো আমরা কাপড় দিতে পারি না! ইহারা খবরের কাগজগুলিকে পর্যন্ত ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করে। সেদিন কোন্ এক বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি আনন্দবাজারের শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য হোমরা চোমরাকে গ্রেটওয়ে হোটেলে ভোজ দিয়া আপ্যায়িত করিয়া দুঃখের কাহিনী শুনাইলেন—সরকার অমুক করুক, সরকার তমুক করুক। কিন্তু তাঁহারা নিজেরা চোরাবাজার করিবেন না কিনা সে বিষয়ে শব্দ মাত্র নাই! অমনি সে মিটিংয়ের কথা ঘটা করিয়া হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজারে ছাপা হইল—পড়িয়া লোকে ভাবিবে আহা, বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কি দুঃখ!

মীরচক গ্রামের ধর্মভীরু গরীব মুসলমান গভীর রাত্রে কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহের কাপড় চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছে শুনিয়া আপনার চোখে জল আসে, কিন্তু আমলাতন্ত্র বা ব্যবসায়ী মহলে এতটুকু মমতাও

"আমি নিজেই ব্যবসায়ী, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় হইতে এতদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমিই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ব্যবসায়ী মহলে নীতি (মরালস্) বলিয়া আর কোন বস্তু নাই। কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা একেবারে রেশন প্রথায় কন্ট্রোল না করিলে তাহারা কিছুতেই মানুষকে ন্যায্য দামে কাপড় দিবে না। কিন্তু তাহার জন্য আন্দোলন কোথায়?"

বিড়লা কোম্পানীর কর্তৃস্থানীয় মিঃ সরোগীও তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, "উহারা যেন, রক্তের গন্ধ পাওয়া বাঘ, অতি-লাভের স্বাদ পাইলে আর রক্ষা নাই।" জে, সি, গুপ্ত, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতিও রেশন করিয়া কড়া কন্ট্রোলের কথা বলিলেন।

লীগ এম-এল-এ খান বাহাদুর জসিমুদ্দিন আহমদ স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের "বস্ত্র ট্রিবিউনালের" মেম্বর। তিনিই বলিলেন, "এতদিনেও আমি বুঝিতে পারিলাম না সরকারের কন্ট্রোল কি করিতেছে। ঐ ডিপার্টমেণ্টে বিরাট বিশৃঙ্খলা। মিঃ জোনস্ কন্ট্রোলার বটে, কিন্তু তাঁহারও আবার কন্ট্রোলার আছেন! ঘুষ, দুর্নীতির কথা নাই তুলিলাম!... কিন্তু একদল আর এক দলের দোষ দেখাইয়া কিছু হইবে না। সকল দল মিলিয়া একসঙ্গে ইহার জন্য লাগুন তবেই বাংলার লজ্জা নিবারণ হইবে।"

ইহা ছাড়া বস্ত্রাভাব মিটাইবার পথ নাই।

—ভূপেশ গুপ্ত

জনসাধারণের উদ্যম

গত রবিবার কলিকাতার বিভিন্ন রিলিফ কমিটির প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ এই নিদারুণ বস্ত্র সমস্যার সমাধান স্থির করিবার জন্য একত্র হইয়াছিলেন। কোটীপতি কারবারী ও বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রীভগীরথ কানোড়িয়া অতি বড় দুঃখে বলিলেন:

শয়তানের দালাল

স্পেনের ডিক্টেটর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে কোনো এক লেখকের রচনা থেকে কয়েকটী উজ্জ্বল মণি আপনাদের উপহার দিচ্ছি:—

(স্পেনের) "গৃহযুদ্ধের সময় জার্মানী ও ইটালি যে পক্ষকে সাহায্য করেছিল সে পক্ষের সাফল্যে জার্মানী ও ইটালির কি উপকার হ'ল তা (বর্তমান) মহাযুদ্ধের গতি থেকে কিছু দেখা যায় না। স্পেনে বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া উঠছে, তাই গোপনে গোপনে কয়েকজন ফ্রাঙ্কো-বিরোধীকে স্পেনের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা এখনি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু কোডিলো (অর্থাৎ ফ্রাঙ্কোর) নামে কতকগুলো সাজানো অভিযোগ খাড়া করে কিংবা ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিয়ে তাঁকে হারাবার সাহায্য করলে তা হবে নীচ কাজ, বিশ্বাসঘাতকের কাজ। সেটা ভুল নীতিও বটে।"

ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে "বিশ্বাসঘাতকতা" বা "ষড়যন্ত্র" না করবার জন্যে চার্চিলকে এই উপদেশ দিয়েছেন কে বলুন দেখি? ফ্যালাঞ্জ দলের কাগজ এল-আরিবা? স্যর অসওয়াল্ড মোজলে? অন্তত স্যর স্যামুয়েল হোর বা লেডী এঁষ্টর? কিংবা স্বয়ং চেম্বারলেনই আবার ভূত হয়ে এসে চার্চিলকে পরামর্শ দিচ্ছেন না তো!

না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও মিঃ গোয়েঙ্কার "ন্যাশনালিষ্ট" কাগজের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে আমি রত্নটুকু তুলে দিয়েছি।

মুসোলিনী ডুবেছে। হিটলার ডুবছে। ফ্রাঙ্কোই এখন ফ্যাশিষ্টদের ভবিষ্যতের আশা। সেজন্যেই কি হিন্দুসভার স্বস্তিকা আজ বিশ্ব-স্বস্তিকার হয়ে ওকালতি করছে?

পোলিশ চাষীর বর্তমান

শত্রুর মুখে স্বীকৃতির চেয়ে বড় প্রমাণ আর হয় না। আমেরিকার বিখ্যাত "টাইম" পত্রিকা কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ এবং সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্যেও বিখ্যাত। সেই টাইমের ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৫ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটী বার হয়েছে—লুবলিন গবর্ণমেণ্টের আমলে পোল্যাণ্ডের চাষীদের অবস্থা বর্ণনা করে:—

"তিওফিল পনিকওস্কি জীবনের গোটা ৪৭ বছরই চাষী। কিন্তু যে জমি সে চাষ করে এসেছে তার এক মুঠোও কোনো দিন সে আপনার বলতে পারেনি। তার বাপ, ঠাকুরদা—সবাইয়ের মতই সে "পান"-এর (অর্থাৎ জমিদারের) গোলাম চষে এসেছে। ফসলের অংশ সে পেয়েছে, দেনায় হাবুডুবু খেয়েছে, বংশবৃদ্ধি করেছে। জমিদারেরা যখন ঘোড়ায় বা মোটরকারে চড়ে পাশ দিয়ে গেছেন তখন টুপি তুলে মাথা নীচু করতে ভোলেনি। এখন লুবলিনের নতুন গবর্ণমেণ্ট পান-এর জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে।

সাড়ে সাত একর জমি এবং চুণকামকরা কুটীরটী, যা এখন তার নিজস্ব, তার জন্য পনিকওস্কি গর্বিত। কুটীরের দেওয়ালে রোমান ক্যাথলিক মহাত্মাদের ছবি টাঙানো। "নিউ ইয়র্ক টাইমসের" প্রতিনিধি ডব্লু, এচ, লরেন্স নামক আমেরিকান দেখা করতে এলে সে আগ্রহে তার সঙ্গে কথা বলে। গবর্ণমেণ্ট তাকে মালিকানার একটী দলিল দিয়েছে। সে এখন কাজের অনেক প্ল্যান ভাবছে। শীতের গম ও রাই বোনা তার এখনই শেষ হয়ে গেছে। আরও বুনতে পারত, কিন্তু ভূতপূর্ব জমিদার বীজগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। বসন্ত এলে সে আলু বুনবে, আরও শস্য বুনবে...

ভূতপূর্ব জমিদার রাজওস্কি, তার কি হল? পনিকওস্কি ঝাঁকড়া মাথা নাড়ল। কেউ বলে, জমিদার ছিল জার্মানদের বন্ধু, তাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কেউ বলে ওয়ারস' গেছে, তার বৌ-ছেলের কাছে। আবার আর এক জমিদার কাউণ্ট পটোকি নাকি ৩০ সিন্দুক মাল বোঝাই করে জমিদার-বাড়ী থেকে ভিয়েনায় দৌড় মেরেছে। সব জমিদারই ওদের মত নয়। যেমন প্রিন্স জারতরিস্কি, নির্বিবাদে গবর্ণমেণ্টকে জমি ছেড়ে দিল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাকে ৬০০ জ্লটি (প্রায় ৩৪০ টাকা) মাসিক বৃত্তি দিতে চেয়েছে।..."

* * *

কিন্তু আমাদের "ন্যাশনালিষ্ট" পত্রিকায় "দুনিয়ার চুটকী" লেখক অধ্যাপক বিনয় সরকার অনেক খুঁজে পেতে লণ্ডনস্থ জমিদার-পন্থী পোল-সরকারের ভগ্নদূত "পোলিশ নিউজ" বলে একটী পত্রিকা আবিষ্কার করেছেন। তার থেকে তিনি মহা আনন্দে এই অদ্ভুত সংবাদ জানিয়েছেন যে পোল্যাণ্ডের "চাষীরা লুবলিন সরকারের দেওয়া জমি নিতে চায় না।" সেজন্যে বিনয় বাবু তাদের "দেশপ্রেমের" প্রশংসা করছেন।

[ন্যাশনালিষ্ট ১২ই ফেব্রুয়ারী]

জমিদার শোষণমুক্ত পোলিশ চাষীরা সানন্দে জমি ভাগ ক'রে নিচ্ছে

তা বটে। জমি তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারী কিংবা ... পত্রের ... চাকরী নয় ... নিতে হবে! ... কথা চাষীরা ... বন্ধু ... সঙ্গে জমি ভাগ ... নিচ্ছে তার এক ... ফটোও টাইম পত্রিকা... বেরিয়েছে। সে... আমি পাশেই দিল...

পোল্যাণ্ডের জমিদারদের দুঃখে মর্মাহত হ... বিনয় বাবু তাঁর সম্পাদককেও ছাড়িয়ে গেছেন। সম্পাদক করেছেন ফ্রাঙ্কো বন্দনা আর বিনয় বাবু করছেন বৃটিশ সাম্রাজ্য বন্দনা। তিনি লিখছেন:

"আজ পোল্যাণ্ডের একমাত্র মুক্তি...তা ... হয় বৃটিশ সাম্রাজ্য বা মার্কিন ... উভয় সাম্রাজ্যই।"

"পোল্যাণ্ডের বন্ধু"-রূপে বিনয় ... চাইছেন তিনটী জিনিষ এবং তার ... করে তিনি প্রশ্ন করছেন:

"ইঙ্গ মার্কিন মিত্রপক্ষ কি জার্মান... অনুরোধ করবে যে, তোমরা আমাদের ... যোগ দাও এবং বৃটিশ, মার্কিন ও জা... সৈন্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে তোমরা সোভিয়েটে... বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালাও, সোভিয়েটকে পোল্যা... থেকে দূর কর? এই সম্ভাবনাই কৃষ্ণসা... তীরে সম্মিলিত তিন প্রধানের 'valien' (sic) উপর ছায়াপাত করতে পারে।"

আবার নাৎসিদের "নেতৃত্বে" বৃটেন ... আমেরিকা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়ুক—সে আশা লণ্ডনের পলাতক পোলিশ জমিদারেরাও প্রকা... করতে সাহস পায় নি। শুধু গোয়েবলস্ পেরেছি... আর পেরেছেন—স্বনামধন্য অধ্যাপক বিনয়কুম... সরকার।

—দেশাভিমানী

মজুতদারি বাজেট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বেতনে। ফসল বাড়াইবার কাজে হাত দিয়া শুরুতেই কৃষি বিভাগে ৩০০ জন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অর্থসচিব ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন—আমাদের অভাব টাকার নয় আমাদের অভাব হইল কাজের লোকের।

অর্থসচিবের কথাই ঠিক। টাকা-ত দেশের দরিদ্র জনগণের ঘাড় মুচড়াইয়া আদায় করা যায়, যত দেনাই হউক না কেন, ট্যাক্স বাড়াইয়া তাহা শোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কাহারও ঘাড় মুচড়াইয়া কাজ আদায় করা যায় না। ট্যাক্স এখনও বাড়ে নাই, কিন্তু অর্থসচিব আভাস ... যে ট্যাক্স বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে।

দুস্থের জীবন পুনর্গঠন এবং মহামা... জন্য সমস্ত বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ ... তোলা যায় না? নিশ্চয়ই যায়, ... আয়ব্যয়ের হিসাবে তাহার কোন স্থান নাই। তাই তাহাতে আছে ঘাটতি এবং দেনার বোঝা। চোরাবাজারের উপর জরিমানা বসাইয়া এবং চোরা-কারবারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এই ঘাটতি এবং দেনা পুরণ করা হউক। চোরাবাজারে রেহাই দিয়া দরিদ্র জনগণের ঘাড়ে যেন অর্থ? পয়সাও বেশী ট্যাক্স চাপান না হয়। ম... ঋণ মজুতদারই শোধ করুক।

Regd. No. C, 2836. JANAYUDDHA

.ঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত জনযুদ্ধের নিজস্ব তার

সারা দুনিয়ার ট্রেডইউনিয়ন সম্মেলন

লণ্ডন, ৯ই ফেব্রুয়ারী।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল হলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ৫ কোটি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের পক্ষ হইতে ২০৪ জন প্রতিনিধি ও দর্শকের এক ঐতিহাসিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে এই সম্মেলন ... হয়।

কিন্তু ... সোভিয়েটের ২ কোটি ৭০ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ ... তে ৩৫ জন প্রতিনিধির একটি দল ... লনে উপস্থিত ছিল। এই প্রতিনিধি ... পস্থিতিতে সম্মেলনে বেশ সাড়া পড়িয়া ... হল। সোভিয়েটের পুরুষ ও নারী প্রতিনিধিদের ... কের চোখে মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ এবং ... লকেই বেশ উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। এই ...তিনিধি দলের অধিকাংশই তরুণ বয়সী।

সম্মেলনে প্রতিনিধি সংখ্যার দিক হইতে দ্বিতীয় ... ছিল বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের। ... লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ বৃটিশ শ্রমিকের পক্ষ হইতে ১৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী পরিষদের মনোভাব ...পর্কে যাঁহাদের আগে হইতে কিছুটা ধারণা ছিল, ...হারা এই প্রতিনিধি দলের কাছে খুব বেশী প্রগতিমূলক নেতৃত্ব আশা করেন নাই। বৃটিশ ...মিক প্রতিনিধি দলে অভিজ্ঞ লোকের অভাব ...স না বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও তরুণ ...সী শ্রমিক ছিল না। বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেসের ...র্য্যকরী পরিষদ ইচ্ছা করিয়াই প্রতিনিধি তালিকা ...ইতে এমালগ্যামেটেড ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়নের ...্যাক ট্যানার, খনি মজুর সঙ্ঘের উইল ...থার প্রমুখ বিখ্যাত নেতাদের নাম বাদ দিয়া ...খিয়াছিলেন; কারণ ইঁহারা কেহই সিট্রিন-এর খুশীমত হুকুম তামিল করিবার লোক নন। অবশ্য খনি শ্রমিকদের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে উইল লথার এই সম্মেলনে উপস্থিত ...ন। সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে ...ড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সিট্রিন্ যখন ...লন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইলেন, তখন বৃটিশ প্রতিনিধি দল হইতে সুযোগ্য প্রতিনিধিদের বর্জ্জনের আসল কারন স্পষ্ট বুঝা গেল।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংহতি

ফরাসী শ্রমিক প্রতিনিধিদের নেতা হিসাবে আসিয়াছিলেন প্রতিরোধ কাউন্সিলের সভাপতি ...ইয়। লণ্ডন কাউন্টি কাউনন্সিলের সুসজ্জিত সভাগৃ... এই ফরাসী শ্রমিক নেতার উপস্থিতি বিপ্লবের গৌর...র ঐতিহ্যের কথা মনে পড়াইয়া দিতেছিল। **আ...মেরিকার** সি-আই-ও প্রতিষ্ঠানের ...নিধিদলের হাবভাবে মার্কিন চরিত্রের সমৃদ্ধি ও ...দ্বিগ্নতার ভাব চমৎকার ফুটিয়াছিল। **লাটিন ...মেরিকার** শ্রমিকনেতা লোম্বার্ডো টোলেডানোর ...খে মুখে তেজস্বিতা, উৎসাহ ও চিন্তাশীলতার ...ভীর ছাপ।

আফ্রিকা, জ্যামেইকা এবং প্যালেষ্টাইনবাসী ইহুদী ও আরবদের পক্ষ হইতেও বহু প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন; ইঁহাদের সকলের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংহতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

...প্রথমে সম্মিলিত জাতি সমূহের যুদ্ধ প্রচেষ্টার ... প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ ...বাহিনী শ্রমিক নেতা কুজনেটসভ বিবৃত ... ইহার পর বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ...নিধিরা ফ্যাশিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে নিজ নিজ ...কশ্রেণী ও জনগণের আত্মত্যাগের ...বিময় ইতিহাস বর্ণনা করেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এট্লী যখন তাঁহার অভিনন্দন বক্তৃতায় বলেন, শ্রমিকদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাইবার আর কিছুই নাই মার্ক্সের এই কথা বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে খাটে না, ... বহু প্রতিনিধির মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটিয়া ...

সিট্রিনের বিষোদ্গার

সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহ ও সদস্য পদের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি থর্নটন যখন বক্তৃতা শেষ করেন, তখন সিট্রিন উঠিয়া এমন বক্তৃতা করিলেন যে সম্মেলন পণ্ড হওয়ার উপক্রম হইল। ৪টী প্রশ্নে প্রতিনিধিদের মধ্যে দারুণ মতান্তর দেখা দিল: (১) ফিনল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া ও ইটালির শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হইবে কিনা; (২) পোলাণ্ডের লুবলিন হইতে আগত শ্রমিক প্রতিনিধি-দের সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা; (৩) প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের জোরে প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা এবং (৪) ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স কমিটির মনোনীত কমিটি-গুলিতে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক ফেডারেশনের কোন প্রতিনিধি না নেওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা।

সিট্রিনের বক্তৃতার আগাগোড়া শুধু সোভিয়েটের শক্তি সম্বন্ধে ভয় ও ঘৃণা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'এই সম্মেলনের অর্দ্ধেক ভোট সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের; আমি মনে করি না যে, বাকি সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের সমান গুরুত্ব একা সোভিয়েটের। এ কথা বলার সময় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক ফেডারেশনের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য হইতেছে বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেসের অথচ সেখানে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ ত' হয়ই না, প্রস্তাব পাশ হয় মাত্র সামান্য সংখ্যক ভোটাধিক্যের জোরে। বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া ও ইটালির প্রতিনিধিদের বেলাতেই তাঁহার শুধু আপত্তি। ফিনল্যাণ্ডের ফাশিষ্টপন্থী শাসকবর্গের প্রতি সিট্রিনের অনুরাগ নূতন নয়। তাই শুধু ফিনল্যাণ্ডের প্রতি উদারতা দেখাইতে তিনি প্রস্তুত। লুবলিনের শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার বিরোধিতার একমাত্র কারণ, ঐ শ্রমিক সঙ্ঘ সম্পর্কে তথ্যাবলী মস্কো হইতে আসিয়াছে। যদি তাঁহার প্রতিবাদগুলি মানিয়া না নেওয়া হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ সম্মেলনে তিনি যোগ দিবেন না—এই হুমকী দেখাইয়া সিট্রিন তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁহার এই বক্তৃতায় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক প্রতিনিধিরা খুব খুশী হইয়া উঠে। যাঁহারা এই সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বক্তৃতা শুনিয়া দুঃখিত হন।

সিট্রিনের বক্তৃতার মোক্ষম জবাব

পরের দিনের অধিবেশনে ফরাসী, মেক্সিকান ও সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সিট্রিনের বক্তৃতার মোক্ষম জবাব দেন। ফরাসী শ্রমিক প্রতিনিধি বলেন, 'ভাগ্যে লাল ফৌজ বিরাট ছিল, তাই আজ সমগ্র পৃথিবী আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। তবে সোভিয়েট শ্রমিক সঙ্ঘ বিরাট বলিয়া দুঃখ করার কি আছে?' ফ্রান্স, বৃটেন ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকসঙ্ঘগুলিরও যে নীতি, সোভিয়েট শ্রমিকসঙ্ঘেরও সেই নীতি। সুতরাং সম্মিলিত শ্রমিক আন্দোলন সোভিয়েটের ভোটের জোর দেখিয়া ভয় পাইবে কেন? ফ্রান্সেও একাধিপত্য চালু ছিল, কিন্তু ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। অন্যান্য বহু ভূতপূর্ব্ব শত্রুদেশ সম্পর্কেও এই কথা খাটে। অথচ সিট্রিন স্বয়ং পোল্যাণ্ড বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ের (এর প্রত্যেকটিতেই আগে ডিক্টেটরশিপ শাসনব্যবস্থা ছিল) শ্রমিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। পোলাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের শ্রমিকসঙ্ঘগুলির কেন্দ্র বৃটেনে অবস্থিত, অন্যগুলির তাহা নয়—ইহাই সিট্রিনের আপত্তির প্রধান কারণ। ভোট সম্বন্ধে গত ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেস যে প্রস্তাবে রাজি হইয়াছিল আজ সেই প্রস্তাবই সে মানিতে অস্বীকার করিতেছে। সিট্রিনের জবাব হইতে বোঝা গেল যে তাহার আসল উদ্দেশ্য, সোভিয়েটের বিরুদ্ধতা করা ও প্রগতিশীল আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করা।

আলোচনা চলিতে থাকার সময় সম্মেলনের অন্যতম নির্ব্বাচিত সভাপতি আমেরিকার সি আই-ও প্রতিনিধি মিঃ টমাস সম্মেলনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, শত্রুপক্ষীয় দেশের প্রতিনিধিদের সম্পর্কিত প্রশ্নটি প্রস্তাব হইতে বাদ দেওয়া হউক, এবং যে সমস্ত কমিটির সভ্যদের সম্পর্কে মতভেদ আছে সেই কমিটিগুলিকে ইচ্ছামত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দেওয়া হউক। সিট্রিন এই সংশোধিত প্রস্তাব মানিয়া নেন।

বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধিদের চাপে এই আপোষ সিট্রিনকে মানিয়া নিতে হইল বটে, কিন্তু তাঁহার বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেসের সাঙ্গোপাঙ্গোরা আরও নানাভাবে সম্মেলনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স কমিটি নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত করে (বৃটিশ শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিও এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন): যে সমস্ত দেশের শ্রমিকসঙ্ঘগুলি সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছে, অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মতই তাহাদের সুপারিশপত্রও পরীক্ষা করা হউক; পোলিশ নাবিকসঙ্ঘকে লুবলিন শ্রমিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। বৃটিশ শ্রমিক সঙ্ঘের কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি ইহার বিরুদ্ধতা করেন। লণ্ডনস্থ পোলিশ পলাতক সরকার কি ভাবে বৃটেনের শ্রমিক নেতাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এই বিরোধিতা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

এতদিন এই ঐতিহাসিক সম্মেলন সম্বন্ধে লণ্ডনের কাগজগুলি বিশেষ কিছু সংবাদ প্রকাশ করে নাই। সম্মেলনে যে মুহূর্ত্তে প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, অমনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহা বড় বড় হরফে ফলাও করিয়া ছাপা হইতে লাগিল।

এমন কি শ্রমিক দলের মুখপত্র ডেলি হেরাল্ড পত্রিকাতেও ইহার আগে সম্মেলন সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখা হয় নাই। একমাত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' (বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক) বৃটিশ শ্রমিকদের কাছে এই সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল। বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেস বিদেশী প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থাও করে নাই। সম্মেলনকে খেলো করিয়া দেখাইবার জন্য বিশেষ তরফ হইতে বোধহয় হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা বিভেদকারীদের পক্ষে সহজ হইবে না।

রায়পন্থীদের মুখে চুণকালি

লণ্ডন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক প্রতিনিধির কাছ হইতে সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে রায়পন্থী ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রেডেন্শিয়াল্স্ কমিটি নির্ব্বাচনের প্রথম দিনেই নাইগেরিয়ান শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি কমিটীর সদস্য পদের জন্য ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি আমার (কমরেড ডাঙ্গের জঃ সঃ) নাম প্রস্তাব করেন। রায়পন্থী ফেডারেশনের এ, কে, মুখার্জ্জী ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এই সম্মেলনে কোনরূপ স্থান দেওয়া উচিত নয়। অযথা সামান্য বিষয়ের উপর যাহাতে দলাদলির সৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য আমি আমার নাম প্রত্যাহার করি। কিন্তু নব-নির্ব্বাচিত কমিটিও ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায়পন্থী ফেডারেশনের আপত্তি বাতিল করিয়া দেয়।

ইহার পর শান্তি কমিটি ও বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন কমিটিতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাই নির্ব্বাচিত হন। আই-এফ-টি-ইউ প্রতিষ্ঠানের মিঃ শেভেনেল্স্ ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স কমিটিতে রায়পন্থী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের ঢুকাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু পক্ষে ৩ ও বিরুদ্ধে ৬ ভোট হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। শেভেনেল্স্কে মাত্র আর ২ জন প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ প্রতিনিধি সমর্থন করে। রায়পন্থী ফেডারেশনের স্বরূপ আজ দেশবিদেশে সকলেই চিনিয়াছে। তাহারা তাহাদের রাজপ্রভুদের সুরে সুর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল দেশের প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিট্রিনের আক্রমণকে সমর্থন করিয়াছে। বিশ্বনিন্দিত আই-এফ-টি-ইউকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য সিট্রিনের অপচেষ্টার পিছনে তাহারা শক্তি যোগাইয়াছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ধ্বংস ঠেকায় কে?

জাপানী সমুদ্রে মার্কিণ নৌবহর

বুডাপেষ্টের মুক্তি : জাপানী দ্বীপ আয়োজিমায় মার্কিণ বাহিনী

লালফৌজ বুডাপেষ্ট সহর পুরাপুরি দখল করিয়াছে। সেখানে অবরুদ্ধ জার্ম্মানদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। জার্ম্মান জেনারেল ভিল্ডেনব্রুকও সেই সাথে ধরা পড়ে। কিছু দিন আগে এই বীরপুঙ্গবই লালফৌজের দু'জন শান্তি-দূতকে নৃশংসভাবে হত্যা করার হুকুম দিয়াছিল। তাই সোভিয়েটের বিখ্যাত পত্রিকা 'রেড ষ্টার' লিখিয়াছে—"ন্যায়বিচারের সময় আজ আগত। আমাদের শান্তিদূতকে যাহারা বিনাকারণে নিষ্ঠুরভাবে খুন করিয়াছে, সেই সব ফ্যাশিষ্টদের জঘন্য অপরাধের কোন ক্ষমা নাই।'

বুডাপেষ্ট জয় করার ফলে নাৎসী জার্ম্মানীর বিপদ আরও ভীষণ ভাবে বাড়িয়া গেল। মার্শাল টলবুখিন ও মার্শাল মালিনোভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজের দু'টি বৃহৎ সেনাবাহিনী আজ অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা ও দক্ষিণ জার্ম্মানীর উপর অভিযান চালাইবার বিশেষ রকম সুবিধা করিয়া নিল।

ওডারের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে

এদিকে মার্শাল কনিয়েভের বিদ্যুৎগতি জার্ম্মান বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। এই সম্পর্কে 'প্রাভদা' লিখিতেছে—'জার্ম্মানীর সুদৃঢ় ওডার নদীর রক্ষা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।' ব্রেসলাউ নগরীও সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে জার্ম্মানরাও স্বীকার করিয়াছে—"আমরা ব্রেসলাউ দুর্গের করিডর ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

মার্শাল কনিয়েভের সেনাবাহিনী এক দিকে যেমন বার্লিনের উপর বেজায় চাপ দিতেছে আবার অন্যদিকে গোরলিৎস, ড্রেসডেন ও লিপজিগের মধ্যবর্ত্তী জার্ম্মানীর অন্যতম শিল্পপ্রধান অঞ্চলটীকেও বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্পর্কে রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"মার্শাল কনিয়েভের দুই শত মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ চলিতেছে। সহস্র সহস্র ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমাণের আক্রমণে বার্লিন, ড্রেসডেন ও মধ্য জার্ম্মানী বিপন্ন হইয়াছে।"

সমগ্র জার্ম্মানীতে দারুণ আতঙ্ক

এদিকে বার্লিনে জরুরী অবস্থা ও স্বাস্থ্য আইন জারীকরা হইয়াছে। রাস্তায় কেহই বাহির হইতে পারিতেছে না। গোটা জার্ম্মান শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম। গোয়েলবল্সের সহকারী সুণ্ডেরমান আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছে—বর্ত্তমান পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া সম্ভব করিয়া তুলিব? জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে 'রেড ষ্টার' পত্রিকা খবর দিতেছে—স্বস্তিকার পরিবর্ত্তে জার্ম্মানরা এক খণ্ড সাদা কাপড় দিয়া পতাকা তৈরী করিয়া জনগণের পতাকা হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। যাহারা পালাইতে পারিতেছে না, তাহারা হিটলার ও গোঁড়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে সব রকম অভিযোগই করিতেছে; তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে-কোন উপায়ে রেহাই পাওয়া যায়।

ফ্যাসিষ্ট জাপানেরও নিস্তার নাই

এদিকে প্রাচ্যের রণক্ষেত্রেও ফ্যাসিষ্ট জাপানকে বেশ ভাল রকমেই ঘায়েল করার বন্দোবস্ত হইতেছে। গত কয়েক দিন যাবত মার্কিনের এক বিরাট নৌবহর অনেকগুলি বিমানবাহী জাহাজ সমেত জাপানের দরিয়ায় ঢুকিয়া খাস জাপানের উপর অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। টোকিও প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলির উপর পর পর অনেকবার বোমা ফেলা হইয়াছে। এখনও জোর আক্রমণ চলিতেছে। ইহার সাথে সাথে মার্কিন নৌবহরের যুদ্ধ জাহাজগুলি জাপানের নিকটবর্ত্তি ভঙ্কানো দ্বীপপুঞ্জের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী আয়োজিমা দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই সেখানে মিত্রপক্ষের একটি সুদৃঢ় সেতুমুখ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়োজিমা টোকিও হইতে মাত্র ৭৫০ মাইল দূরে। এই দ্বীপ মিত্রপক্ষের হাতে আসিলে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সমর শিল্পগুলির উপর আরও কঠোর ভাবে আঘাত হানা সম্ভব হইবে।

ই সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মিলিটারীর অত্যাচার সম্বন্ধে এসেম্বলিতে আলোচনা

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা] ১লা মার্চ্চ, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ফাল্গুন '৫১ [দাম ছয় পয়সা

সৈন্য ও নাগরিকের মধ্যে তিক্ততা দূর কর

জনমতের স্বাধীন প্রকাশেই তাহা সম্ভব

কলিকাতা ও শহরতলীতে কোনো কোনো সৈন্য মাঝে মাঝে অত্যাচার ও অভদ্র ব্যবহার করে ইহা লইয়া নাগরিক মহলে যথেষ্ট অসন্তোষ আছে। সন্ধ্যার পর পথে যাতায়াত করিতে আজকাল অনেক ভদ্রমহিলাই ভয় পান। "বিশেষ ধরণের বিদেশীদের" হাতে রিকশাওয়ালা বা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের নিগ্রহের কথা প্রায়ই শোনা যায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী এসেম্বলিতে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করেন যে বিদেশী ও ভারতীয় সৈন্য (মিলিটারী মেন) কর্ত্তৃক লোকের বাসভবনে অনধিকার প্রবেশের ৮টী কেস তাঁহারা পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী কেস কোর্ট মার্শালে দেওয়া হইয়াছে, অপর কয়েকটী সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

প্রধান মন্ত্রী আরও স্বীকার করেন—গত ৩১শে অক্টোবর রাত্রে নৌবাহিনীর পরিচ্ছদ পরিহিত দুইজন ইয়োরোপীয়ান হাওড়ার একটী ভদ্র-পরিবারের বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাড়ীর লোককে রিভলভারের ভয় দেখাইয়া তাহারা একটী ভদ্র-যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাদের নামে মামলা চলিতেছে।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে আক্রান্ত হইবার সময় ভদ্র-মহিলাটী অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার ১ বৎসর বয়সের একটী শিশুসন্তান ছিল। বীভৎস অত্যাচারের ফলে তাঁহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অনেক দিন হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছে। আক্রমণের পর দিনই তাঁহার শিশুসন্তানটীর মৃত্যু হইয়াছে।

এই সব ঘটনা আজ ঘটে নাই। আশে পাশের সকলেই ইহা জানিতে পারিয়াছিল, ইহা লইয়া তুমুল আতঙ্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। গুজবও প্রচণ্ড রটিয়াছিল। কিন্তু এতদিন এ খবর জনসাধারণকে জানিতে বা বলিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগকে কোনো রূপে সতর্কও করা হয় নাই। সম্ভবত মিলিটারী সংক্রান্ত ব্যাপার বলিয়াই মন্ত্রীমণ্ডলী এ বিষয়ে নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিয়াছেন। এসেম্বলিতে খবর প্রকাশের পর আমরা মামলার চালান প্রভৃতির নকল আনিবার জন্য আদালতে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু পেশকার মহাশয় তাহা দিতে সাহস করেন নাই।

সৈন্যদের দুর্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিতে বা তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কেহই আনন্দ-বোধ করেনা। দুর্ব্যবহারের প্রমাণ পাইলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করেন তাহাও আমরা জানি। কিন্তু তবুও আমরা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতে চাই—যেখানে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও অসন্তোষ জাগিতেছে বলিয়া সকলেই জানে সেখানে জনসাধারণকে অসন্তোষের কথা প্রকাশ্যে স্পষ্ট করিয়া বলিতে না দিলে অসন্তোষ আরও বাড়িয়াই যাইবে না কি? মুখে মুখে অসম্ভব গুজবের ফলে আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইবে না কি? এবং তাহার ফলে সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে না কি?

শুধু কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি ক'টী হ্যাঙ্গামা ঠেকাইবে?

গত বৎসর এপ্রিল মাসে হাওড়া ষ্টেশনে জনৈক সৈন্যের ছুরীতে যখন গুরুমুখ সিং নামক ট্যাক্সি ড্রাইভার নিহত হয় তখন আমেরিকান সামরিক পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ সহানুভূতির সহিত এই আতঙ্ক-জনক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন। মোটর-শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে সৈন্যদলের কোন লোকই "অবসরে থাকার সময় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিতে পারিবেনা।" নিহতের পরিবারকে তাঁহারা খেসারতও দিয়াছিলেন।

কিছুদিন ইহার ফলও হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকে নাই। কারণ জনসাধারণ এই ধরণের বিপদ সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে পায় নাই, নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ জনমতে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। মারামারি বা স্ত্রীলোকের অসম্মান এ সব ব্যাপারে পরে কর্ত্তৃপক্ষকে খবর দিয়া আত্মরক্ষা করা যায় না—তখনি সেখানেই উপস্থিত মানুষেরা যদি আত্মরক্ষা করে, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকে তবেই রক্ষা পাইতে পারে। যে-সৈন্য দুর্ব্যবহার করে সেও ইহাতে বুঝিতে পারে যে ভবিষ্যতে এরূপ করা চলিবেনা।

কিন্তু এই সব ব্যাপারে জনমত প্রকাশিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না দিলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কয় জায়গায় কয় জনকে ঠেকাইতে পারিবেন?

খুন, জখম, রাহাজানি

গুরমুখ সিংহের পর গত অগাষ্ট মাসে চন্নন সিং নামক একজন ট্যাক্সিচালক নিগ্রোর হাতে খুন হয়।

৩রা নভেম্বর "বিদেশীর" গুলির আঘাতে দিলা মিঞা নামক রিকশাওয়ালা চিরজীবনের মত পঙ্গু হইয়া যায়।

আমেরিকান সৈন্য প্রাইভেট লনি সিদন কলিকাতার ওয়াটগঞ্জ এলাকায় তিনজন নাগরিককে জখম করার অপরাধে কোর্ট মার্শাল বিচারে পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

আমেরিকান সৈন্য ফেলিক্স আর্বোলাফ্‌জ মারাত্মক অস্ত্র দিয়া দুজন নাগরিককে আহত করায় কোর্ট মার্শাল বিচারে ৭ বৎসরের সাজা পায়।

২৬শে জানুয়ারীর আনন্দবাজার খবর দিয়াছে যে ভাড়া লইয়া কলহের ফলে চৈতন মণ্ডল নামক রিক্সাওয়ালা "জনৈক বিদেশীর" হাতে প্রহৃত হয়। সে হাসপাতালে আছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর অমৃত বাজার খবর দিয়াছে যে জঙ্গী সিং নামক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ হইতে তিনজন "বিদেশী" পেসেঞ্জার ১১৫ টাকা কাড়িয়া লয় ও তাহাকে মারিয়া গাড়ী হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়।

ঐ তারিখের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড জানাইয়াছে যে প্রায় ছয়জন "বিদেশী" কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে চারজন নাগরিক আহত হয় তাহার মধ্যে দুজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

৯ই ফেব্রুয়ারীর যুগান্তর লিখিয়াছে যে হাওড়ায় একজন রিকশাওয়ালা কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে অস্বীকার করায় তাহাকে দুইজন "বৈদেশিক" ছোরার আঘাত করে। হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর তাহার মৃত্যু হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ষ্টেট্‌সম্যানে খবর বাহির হইয়াছে যে আলিপুর অঞ্চলে ৫ জন "বিদেশী" মিলিয়া ফাগুন সিং নামক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ হইতে ৬০৲ টাকা সহ মনিব্যাগ কাড়িয়া লয় এবং তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার ট্যাক্সি লইয়া চলিয়া যায়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় মিশন রো'তে ট্যাক্সি-খানি পাওয়া যায়।

২০শে ফেব্রুয়ারীর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড জানাইয়াছে যে মকবুল হোসেন নামক ট্যাক্সি ড্রাইভার নাকি ৪ জন "বিদেশীর" হাতে জখম হইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনীত হইয়াছে।

এসেম্বলিতে সৈন্যদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রকাশ হইবার পর আমরা কয়েকটী চিঠি পাইয়াছি। যাহাতে আতঙ্ক সৃষ্টি না হইয়া এই সাধারণ সমস্যার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সেজন্য আমরা মাত্র একটী চিঠির দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সম্ভ্রান্ত মহিলার অভিযোগ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৪নং জেলার হেল্‌থ অফিসারের কন্যা শ্রীযুক্তা শান্তি সরকার এম, এ একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা এবং দেশকর্ম্মী। তিনি লিখিয়াছেন:

"গত ১৫ই জানুয়ারী রাত আটটার সময় নিখিল ভারত মহিলা সভা থেকে বাড়ী ফিরছিলাম।...... ট্রাম থেকে বাড়ী পৌঁছাতে ৬।৭ মিনিট লাগে। বেকার রোড দিয়ে আসবার সময় রাস্তায় কোন লোক ছিল না—কিছুটা আসবার পর তিনজন মিলিটারী পোষাক-পরা লোককে পার হলাম। তারা হয় নিগ্রো নয় হাবসী। আরও কয়েক ফুট যাবার পর তারা যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে আমি একা যাচ্ছি তখন একজন অপেক্ষা করতে থাকল ও অন্য দুজন আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমি কোন উপায় না পেয়ে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগলাম।

"কিন্তু তারা দুজন খুব তাড়াতাড়ি আমার দুপাশে এসে গেল। উপায়ান্তর না দেখে আমি ওই রাস্তায় যে-একটিমাত্র বাস করবার বাড়ী ছিল তারই গেট ধরে দরজা খোলার জন্য ডাকতে লাগলাম। নিগ্রো দুজন দুপাশে দুটী গাছের ধারে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল—বোধ হয় এই ভেবে যে এটা আমার বাড়ী কিনা, তাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা। ইতিমধ্যে বেকার রোডে অন্য লোকের গলা শুনে আমি ছুটে তাদের কাছে হাজির হলাম এবং তাদের অনুরোধ করলাম আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে। তাঁরা দুজন কাছাকাছি গ্রামের মুসলমান—তাঁদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিলাম ততক্ষণ নিগ্রো তিনজন খুব কাছে প্রায় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। লোক দুটী আমাকে বল্লেন যে তাঁরা ৬।৭ জন একসঙ্গে আসছিলেন—ওদের দুজনকে হঠাৎ ছুটতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাঁরাও দল ছেড়ে ছুটে এসেছেন। তারপর তাঁদের দলের বাকী লোকেরা এসে পড়লেন, বেশী লোক দেখে নিগ্রো তিনজন ফিরে গেল। 'বোনের বিপদে ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত' এই কথা বলে মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

তিনি পুলিশে খবর দেননি কেন তা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি তো আর ওদের সনাক্ত করতে পারব না। তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে পুলিশের ক্ষমতাই বা কতটুকু?"

মিত্রজাতির লোক ভারতের বন্ধু

কর্ত্তৃপক্ষের এ কথা ভাল করিয়া জানা উচিত যে কলিকাতা শহরের বহু অধিবাসীর মধ্যে এইরকম ব্যাপার লইয়া প্রচুর উদ্বেগ ও অসন্তোষ আছে—এবং সে সম্বন্ধে উপরোক্ত ধরণের অসহায়, নিরুপায় মনোভাব প্রায় প্রত্যেকেই প্রকাশ করেন।

আমেরিকান বা বৃটিশ জাতির স্বাধীনতার ঐতিহ্য ও ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামের আদর্শকে ভারতবাসী শ্রদ্ধা করে। আমেরিকান বা অন্যান্য বিদেশী সৈন্যদের অধিকাংশই দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলিকে আমাদের মতই ঘৃণা করে তাহা আমরা জানি। বহুদিন ঘরছাড়া হইয়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের একঘেয়ে ক্লান্তির মধ্যে তাহাদের কেহ কেহ কেন এরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে খোঁজ পাইলে প্রতিবিধানের চেষ্টার ত্রুটি করেন না তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু তবুও এ ধরণের বিশ্রী ঘটনা কমিতেছে না—স্ত্রীলোকের সম্মান হইতে মানুষের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতেছে। তাহার ফলে ভারতবাসীর কাছে আমেরিকান বা বৃটিশ জাতির মর্য্যাদাই কমিয়া যাইতেছে। এবং কর্ত্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে ভারতবাসীকে খোলাখুলি তাহাদের নিজেদের কথা বলিতে না দেন তবে বিদেশী মিত্র জাতিগুলি সম্বন্ধে ভারতীয়দের ঘৃণাই জাগিতে থাকিবে। সামরিক দৃষ্টিতেও ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য-নিপীড়িত কুলি মজুর বিদেশীদের কাছে বেশী মজুরী আদায় করিবার চেষ্টা করে, আমাদের লোভী ব্যবসায়ী বা কণ্ট্রাক্টর তাহাদের ঠকায়; আমাদের দেশের মানুষ অনেক সময় সৈন্যের হাতে নারীর অসম্মান দেখিয়াও রুখিয়া দাঁড়ায় না; আইন, জামিন ও শাস্তির "ভয়ে" আমাদের সংবাদপত্র সোজাসুজি প্রতিবাদ ও আন্দোলন করিতে সাহস পায় না। ইহা দেখিয়া বিদেশী সৈন্য আমাদের মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারে না, প্রকাশ্যে কদর্য্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয়।

নিজের মর্য্যাদায় দাঁড়ান

উহাতে ভারতবাসীর ক্ষতি তো নিশ্চয়ই; কিন্তু এই কদর্য্য অভ্যাস লইয়া সৈন্যেরা যখন আমেরিকা বা বৃটেনে ফিরিবে তখন সেখানকার সমগ্র জাতির সভ্যতাও তাহারা টানিয়া নামাইবে। আজ আমাদের প্রতিবাদ ও আত্মসম্মানকে বন্ধ না করিয়া সাহায্য করিলে আমেরিকান বা বৃটিশ জাতির ভবিষ্যৎ আত্মসম্মান-রক্ষায়ই সাহায্য করা হইবে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষও বুঝুন, দেশবাসীরাও বুঝুন যে, জীবনহানি বা স্ত্রীলোকের অসম্মানের পর থানায় খবর দিয়া কোনো জাতিই তাহার প্রাণ বা মান বাঁচাইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট বা মিলিটারীকে শাপান্ত করিয়াও প্রাণ বা মান বাঁচে না। অসম্মানের প্রতিরোধে জনমত যতক্ষণ না সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সাহস করিয়া দাঁড়াইতেছে ততক্ষণ অপমানকারীরাই উৎসাহ পাইবে।

নিজেদের শক্তিতেই নিজেদের বাঁচাইতে হইবে আমাদেরই দেশবন্ধু, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি দেশনেতা কাগজ বন্ধ হইবার আশঙ্কাও তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক ভাবে দেশবাসীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শই আমাদের প্রেরণা। যে বাঙ্গালী তরুণ সম্প্রদায় গোটা স্বদেশী যুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাসই আমাদের ইতিহাস বর্ত্তমান উপদ্রব আমরা ঠেকাইতে পারিব না কেন?

সম্পাদকীয়

কাপড় যায় কোথায় ?

বাজারে কাপড় পাওয়া যায় না কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়ের দোকানদার পর্য্যন্ত সকলেই বলেন—বাংলার জন্ম বরাদ্দ হইয়াছে বৎসরে মাথাপিছু মাত্র ১০ গজ কাপড়, অথচ বাংলার জন্ম দরকার মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড়। এই ঘাটতির জন্মই বাজারে কাপড় অমিল।

কাপড়ের বরাদ্দ যে কম হইয়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কাপড় পাওয়া যাইতেছে তাহাই বা দোকানে বিক্রী হয় না কেন? সেপ্টেম্বর মাসে পূজার আগে হঠাৎ কাপড় বাজার হইতে উধাও হইয়া গিয়াছিল, দোকানীরা বলিতেছিল কাপড় নাই। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করে যে অবিলম্বে বাজারে যদি ১৫০০০ গাঁইট কাপড় না বাহির হয় তাহা হইলে ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই নোটিশ বাহির হইবার পর মারোয়ারী চেম্বার অব কমার্স ১৪ই সেপ্টেম্বর কোটা-হোল্ডারদের কাপড় সরবরাহ করিতে অনুরোধ করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করে এবং ঠিক ১৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোটাহোল্ডাররা স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট ৭০০০ গাঁইট জমা দেয়। অথচ ইহার আগ পর্যান্ত তাহারা সবাই বলিতেছিল কাপড় পাইব কোথায়, কাপড় নাই। ১৩ই অক্টোবর তারিখে বড়বাজারের এক দোকান হইতে পুলিশ ৬ লক্ষ টাকার কাপড় উদ্ধার করিয়াছে।

এই সব ঘটনায় প্রমাণিত হয় বড় বড় পাইকার ব্যবসায়ীরা কাপড় মজুত করিয়া রাখিয়াছে, সরকারী চাপ পড়িলে কিছু কিছু বাহির হয়, চাপ না পড়িলে উহা চোরাবাজারে যায়। যে সব পাইকারদের কোটা আছে তাহারা মাল আটকাইয়া রাখিয়াছে, খুচরা ব্যবসায়ীরা তাহাদের কাছে দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়াও কাপড় পাইতেছে না। কোটাহোল্ডার পাইকারদের কায়দা হইল এই—তাহারা খুচরা ব্যবসায়ীদের বার বার ফিরাইয়া দিয়া হয়রাণ করিতে থাকে, কেহ যদি কয়েক গাঁইট কাপড় পাইকারকে ঘুষ দেয় তাহা হইলে সে কাপড় পায়। এই ঘুষের গাঁইট চোরাবাজারে চালাইয়া পাইকার নিজে মুনাফা করে, তাহার পর খুচরা কারবারীকেও ঘুষের টাকা কাপড়ের দর হইতে তুলিয়া লইতে হয় সুতরাং সেও চোরাবাজার ছাড়া কাপড় বেচিতে চায় না।

বাজারের ভিতর পর্দ্দার আড়ালে এই সব কাণ্ড চলিতেছে এদিকে দোকানের সামনে কিউএর ভিড় ১৯৪৩ সালের চাউলের দোকানের কিউএর মতই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়ের যখন এত অভাব তখন অন্যান্য জিনিষের মত রেশনিং করিয়া রেশন দোকানের মারফত কাপড় বিলি করিলেই সমান ভাবে কাপড়ের বণ্টন হয়। কিন্তু সরকার রেশনিং ব্যবস্থা না করিয়া পাইকারদের হাতেই কাপড় বিতরণের ভার ছাড়িয়া রাখিয়াছে।

১৫ই আগষ্ট তারিখে বাংলা সরকার কাপড়ের জন্য একটি পরামর্শ দাতা কমিটি গঠন করেন। এই পরামর্শদাতা কমিটিতে কে কে আছেন নজর করিলেই বুঝা যাইবে যে সরকারী নীতিটা কি? এই কমিটির চব্বিশ পঁচিশ জন সদস্যের ভিতর অধিকাংশই বড় বড় বস্ত্র ব্যবসায়ী। এই কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এস, সি, রায়—ইনি ঢাকেশ্বরী কটন মিল্সের বড় কর্ত্তা। জয় পুরিয়া, ঝাঝারিয়া, ভোজনগরওয়ালা প্রভৃতি পাইকার বস্ত্র ব্যবসায়ীদের লইয়া এই যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে ইহার ভিতর ডাঃ মালেক এবং মহম্মদ ওসমান প্রভৃতি দু একজন লীগ নেতা ব্যতীত কোন জন-নেতা স্থান পান নাই। গত ছয়মাস ধরিয়া এই কমিটি কি করিতেছে? আমরা শুধু এইটুকু দেখিতেছি যে এই কমিটি গঠিত হইবার পরই কাপড় বাজার হইতে একেবারে উধাও হইয়াছে।

পাইকার ব্যাপারীদের হাতে ভার দেওয়ার ফলে কাপড় বাজার হইতে উধাও হইয়াছে—এইটিই হইল আসল কথা। বাংলায় কাপড়ের পাইকার ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় ৯০০০; তাহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা। ইহারা টাকা দিয়া আমলাতন্ত্র এবং সমগ্র মন্ত্রীসভাকে কিনিয়া রাখিতে পারে। মাস দুই আগে কেন্দ্রীয় সরকার দাবী করিয়াছিলেন বাংলায় বস্ত্র আমদানির জন্য একজন সরকারী এজেণ্ট ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন এজেণ্ট ঠিক করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রী, সিভিল সাপ্লাই, পরামর্শ-দাতা কমিটির সভ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্যাণ্ডিডেট দাঁড়ায় এবং শুনা যায় যে বড়বাজার হইতে এজন্য জলপানির ডাক এক লাখ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত নাকি ২২জন এজেণ্ট ঠিক করা হইয়াছে, অর্থাৎ সকলকেই খুশী করিতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি সরকারী এজেণ্ট হইবার জন্য এক লাখ টাকা ঘুষ দিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থায় অনেক কিছু আশা রাখেন। এখনও নাকি মফঃস্বলের অনেক জায়গার জন্য দোকান স্থির করা সম্ভব হয় নাই, মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া এস-ডি-ও পর্য্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ ক্যাণ্ডিডেট আছে, টেক্সটাইল ট্রাইবুনালের যারা সভ্য তাদের ভিতরও ইহা লইয়া স্বার্থ এবং মতভেদ আছে, কাজেই গত ছয় মাসের ভিতর অনেক মফঃস্বল জেলার দোকান ঠিক করা সম্ভব হয় নাই, কাপড় পাইকারদের হাতে মজুত রহিয়াছে, এদিকে কাপড়ের অভাবে গ্রামের মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না।

মন্ত্রীমণ্ডলী, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট এবং পাইকার ব্যবসায়ী এই তিনের মধ্যে যে লাভের যোগাযোগ এবং লাভের প্রতিযোগিতা আছে সেই জন্যই আজ কাপড় অমিল। এদিকে লক্ষপতিরা ক্রোড়পতি হইতেছে, কাপড় লইয়া জুয়া খেলা চলিতেছে! শুধু মাত্র লোক ঠকাইবার জন্য পাইকারেরা রব তুলিয়াছে কাপড় নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী ও আমলাদের সঙ্গে পাইকারদের যে যোগাযোগ আছে এই যোগাযোগ না ভাঙ্গিতে পারিলে কাপড় পাওয়া যাইবে না। টেক্সটাইল ট্রাইবুনাল এবং এডভাইসরি বোর্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক, পাইকারদের নিকট হইতে সমস্ত কাপড় কাড়িয়া লইয়া বাংলার সর্ব্বত্র কাপড়ের রেশনিং চালান হউক। মজুতদারদের প্রভাব কাটাইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী যদি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা হইলে লীগের পক্ষেও মঙ্গল, সারা বাংলার পক্ষেও মঙ্গল।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনগণ আগাইয়া আসুন—জেলায় জেলায় বস্ত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত করুন, দিকে দিকে গণ-সম্মেলন হইতে ধ্বনি উঠুক—কাপড়ের জন্য সর্ব্বত্র রেশনিং চাই, কাপড় বণ্টনের ব্যবস্থা হইতে পাইকার ব্যাপারীদের হটাইয়া দাও। কংগ্রেস, লীগ, কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান সমবেত ভাবে মজুত কাপড় বিলি করিবার জন্য স্থানীয় আমলাদের চাপিয়া ধরুন। প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে স্থানীয় সকল দল সমবেত ভাবে কাপড় রেশনের প্রয়োজনীয় চাহিদার লিষ্ট তৈরী করিতে আরম্ভ করুন যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক রেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া মাত্র উহা হাজির করিতে পারেন। সকল দল সমবেত ভাবে মজুত ধরিতে বাহির হউন, মজুত কাপড় টানিয়া বাহির করিয়া মজুতকারীকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করুন।

মজুতকারী পাইকার এবং ঘুষখোর আমলার বিরুদ্ধে সারা বাংলায় অভিযান চলুক,—ইহাই কাপড় পাইবার একমাত্র উপায়। যে ব্যক্তি কাপড়ের ব্যাপারে ঘুষ কিংবা জালজুয়াচুরিতে নিযুক্ত আছে সর্ব্বজনসমক্ষে তাহার মুখোষ খুলিয়া ধরা হউক, জনমতের ভয়ে যেন কেহ এই জালজুয়াচুরীতে না যাইতে পারে।

● ঘটনা ও রটনা ●

বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপন

একটী মিলিটারী কেন্দ্র আছে, —রাস্তা ও —রাস্তার মোড়ে (পাছে শত্রুপক্ষ এই "গুপ্ত" সংবাদ জেনে ফেলে সেজন্যে আমি রাস্তার নাম দিতে পারলাম না)। তার দেওয়ালে প্রকাশ্য ভাবে টাঙ্গানো নিম্নলিখিত পোষ্টারটী অনেক দিন লক্ষ্য করেছি:—

"Here is an Indian Cooly
on whom we rely
He cares not for the war
and still less for supply
Keep him on the ball."

অন্যার্থ: "এই ভারতীয় কুলীর উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয় (যদিও) সে যুদ্ধের জন্যে থোড়াই কেয়ার করে, মাল সরবরাহের জন্যে তো আরো থোড়া। ওকে চালু রাখ" (অর্থাৎ বসতে দিও না)।

ভারতীয় মানুষ সম্বন্ধে এই প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের ওপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

* * *

হোম টুথ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ জে-সি-দাস প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহায়তায় এবং "ইন্দো-আমেরিকান এসোসিয়েসনের" উদ্যোগে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী — নামক স্থানে এক ভোজের আয়োজন হয়। অনেক উঁচু মার্কিন সামরিক কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া "স্বয়ং পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ডকারী" সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেকে ভোজসভার শোভাবর্দ্ধন করছিলেন।

কিন্তু ধূমকেতু স্বরূপ ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালও কুক্ষণে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাস্থ "মিউচুয়াল এডমিরেশন সোসাইটীর" মিষ্টি আলাপের মধ্যে তিনি হঠাৎ বক্তৃতা করবেন বলে গোঁ ধরে বসলেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ দাস প্রভৃতি তাঁকে নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টায় ক্রুটী করেন নি (হাজার হলেও ব্যাঙ্কের জগত, সেখানে আমেরিকান সম্বন্ধের কত লোভনীয় ভবিষ্যৎ রয়েছে), কিন্তু ডাঃ সান্যাল চিরাচরিত অভ্যাসমতই নাছোড়-বান্দা। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত পোষ্টারের কথা সকলের সামনে খুলে ধরলেন। তিনি আরও বল্লেন: এই রকম ঘটনা এবং সৈন্যদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ অনেক আসছে। ভারতবাসী আমেরিকানদের স্বাধীনতার আদর্শকে প্রেরণাস্বরূপ গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তাদের খুবই আগ্রহ কিন্তু এই ধরণের ব্যাপার যদি আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষ সময়মত বন্ধ না করেন তাহলে ভারতবাসী আমেরিকানদের বিরোধীই হয়ে উঠবে।

উপস্থিত আমেরিকান অফিসারেরা এ বিষয়ে নজর দেবেন বলে ডাঃ সান্যালকে প্রতিশ্রুতি দেন। আমরাও ডাঃ সান্যালের সঙ্গে একমত। আমেরিকানরা যাকে "হোম টুথ" বলে তার ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আমাদের ভাব হওয়া দরকার। নইলে চায়ের টেবিলে টুং-টাংয়ের মরীচিকা রাস্তায় বার হলেই মিলিয়ে যাবে।

* * *

সংবাদপত্র জগতের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো কাগজেই এ খবর বার হয়নি। কি জানি হয়তো জামিন-জরিমানার হাঙ্গামায় পড়তে হবে। অতীতকালে দেশের লোকের খাতিরে, স্বদেশীর খাতিরে বাংলার বহু সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাবার বিপদও পরোয়া করেনি। কিন্তু বর্ত্তমান তো অতীত নয়!

* * *

আড়কাটি জ্ঞানাঞ্জন

২০শে ফেব্রুয়ারীর হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড ও অন্যান্য কাগজে নিম্নলিখিত খবরটী বার হয়েছে:—

"কাল (সোমবার) বেলা ৫টার সময় বেঙ্গল জুট মিলের মনোরম লনে উইমেন্স অকজিলিয়ারী কোরের (স্ত্রী-সৈন্যবাহিনীর) সৈন্যসংগ্রহ সমাবেশে হাওড়া এবং বালি অঞ্চলের ও বাণী মন্দিরের প্রায় ৭০০ বাঙ্গালী মেয়ে জমা হয়েছিল—তাতে বোঝা গেল ঐ কোর সম্বন্ধে লোকে কত আগ্রহান্বিত। ভারতীয় মেয়েদের ঐ কোরে কেন যোগ দেওয়া উচিত তা শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন—কলকাতা কর্পোরেশন মিউজিয়মের মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মিসেস ডে এবং রায়সাহেব এস-কে ব্যানার্জি।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী নিজেকে একজন প্রচণ্ড 'কংগ্রেসী' বলে মনে করেন। যখন গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছিলেন তখন তিনি কর্পোরেশনের চাকরীতে ছুটী নিয়ে (অবশ্য বেতনসহ) ওয়ার্দ্ধায় গান্ধিজীকে 'বোঝাতে" দৌড়েছিলেন—যাতে বাংলার 'কংগ্রেসকর্মীদের' মতের বিরুদ্ধে গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে আপোষ না করে বসেন।

ফিরে আসার পর থেকে তাঁর মত "কংগ্রেসকর্ম্মীর" দ্বিতীয় কর্ত্তব্য তিনি সাগ্রহে পালন করছেন—অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের বর্জ্জন করবার "গঠনমূলক কর্ম্মপন্থায়" মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন।

জ্ঞানাঞ্জন বাবুর প্রধান অভিযোগ হ'ল কমিউনিষ্টরা যুদ্ধের পক্ষে সুতরাং কংগ্রেস-বিরোধী। জ্ঞানাঞ্জন বাবুর নিজের বেলায় অবশ্য আলাদা কথা। স্ত্রী-সৈন্যবাহিনীর আড়কাটির কাজ করলেও তাঁ সতীত্বে দাগ লাগতে পারে না—কারণ সে কাজ বোধহয় ভাড়াটে হিসাবে। কমিউনিষ্টরা ভাড়া খাটে না, সুতরাং বর্জ্জনীয়।

* * *

আমাদের স্বাধীনতা দমবে না

কিছুদিন আগে আমরা এডভান্স ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাগজের কীর্ত্তিকাহিনী ফাঁস করে দিয়েছিলাম। আমলাতন্ত্রের নাকের নীচে একই কাগজ কি ক'রে দু নামে বার হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা আমলাতন্ত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম। তার পুরস্কার আমরা পেয়েছি।

এডভান্স, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের গায়ে এখনও হাতও লাগে নি, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের হিন্দী সাপ্তাহিক "স্বাধীনতা" বন্ধ করে দেবার হুকুম এসেছে এবং কাগজটীকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্তানী মজুরদের জন্যে "স্বাধীনতা" বার হ'ত। ছোট্ট কাগজ, জনযুদ্ধের মাত্র দু পৃষ্ঠার সমান। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে স্বাধীনতা প্রথম বার হয়। ঠিক তার পর নতুন কণ্ট্রোল আইন প্রভৃতি জারি হওয়ায় কাগজ জোগাড় করা অত্যন্ত মুস্কিল হয়ে পড়ে, তাই বাধ্য হয়ে মাস দুয়েক স্বাধীনতা বন্ধ রাখতে হয়। তারপর ১৯৪৩-এর জানুয়ারী মাস থেকে আজ দু বছর হিন্দী স্বাধীনতা নিয়মিত বার হচ্ছে। কিন্তু আড়াই বছর আগে মাস দুই স্বাধীনতা বন্ধ ছিল এই অজুহাতে আমলাতন্ত্র এখন স্বাধীনতাকে আইনের প্যাঁচে ফেলে বন্ধ করে দিয়েছে।

১৯৪৪-এ কোটা দেবার সময় সরকার জনযুদ্ধের প্রচার সংখ্যা থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়ে কোটা দিয়েছে। তারপর স্বাধীনতা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তাতে জনযুদ্ধের স্বাধীনতা দমানো যাবে না।

* * *

অন্যদিকে এম-এন-রায়ের "পিপলস ভয়েস" এবং শ্যামাপ্রসাদের "ন্যাশন্যালিষ্ট" বার করার জন্য গত বছরখানেকের মধ্যে এই আমলাতন্ত্রের কাছেই নতুন মঞ্জুরি পাওয়া গেল। চক্রীর চক্র!

আগামী সংখ্যা জনযুদ্ধ বন্ধ

পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে

১৫ই মার্চ্চ

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশনের জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আগামী বৃহস্পতিবার (৮ই মার্চ্চ) জনযুদ্ধ বন্ধ থাকিবে। পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৫।

—ম্যানেজার, 'জনযুদ্ধ'

-প্রতি দুইটী মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মাত্র একটীর জন্ম হয়

ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর বংশে বাতি জ্বালাইবার কেহ থাকিবে না

অন্যান্য দেশে

(১৯৩৫-৩৯ পাঁচ বছরের গড়)

	প্রতি হাজারে মৃত্যু	প্রতি হাজারে জন্ম
ইংলণ্ড	১২	১৫
অষ্ট্রেলিয়া	৯.৬	১৭.২
আমেরিকা	১১	১৭.১
সোভিয়েট	২০.২	৪৪.১
মিশর	২৭.৪	৪৩
ক্যানাডা	৯.৮	২০.২

চট্টগ্রামেও জন্মহার নামিয়াছে

	প্রতি হাজারে মৃত্যু	প্রতি হাজারে জন্ম
১৯৪১	?	২৫.৬২
১৯৪২	২১.০৭	২২.১
১৯৪৩	৪৭.০৫	১৫.১
১৯৪৪	২৮.৬	১৩.৯২

(অক্টোবর পর্য্যন্ত) [জিলা বোর্ডের হিসাব]

যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, যেমন বারাদি গ্রামের সুনীল সাহা চৌধুরী, তাহারাও একেবারে বাঁচে নাই। চালের ব্যবসায় তাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন কিন্তু মহামারীতে জীবনী-শক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। জন্ম সংখ্যা হ্রাস পাইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উপলব্ধি করিলাম প্রধান সমস্যা মৃত্যুর নয়, প্রধান সমস্যা জন্মের। শক্তিহীন জাতি তাই জন্ম হারই কমিয়া যাইতেছে। মৃত্যুর মোট সংখ্যা কমিয়া আসিলেও জন্মসংখ্যা তাহার নাগাল পাইতেছে না—ফলে গোটা জাতিই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ইকনমিকসের দোহাই

কুষ্টিয়া শহরে আসিয়া এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া অবস্থার ভয়াবহ রিপোর্ট খুলিয়া ধরিলাম। তিনি বিশ্বাসই করিতে চান না। ইকনমিকসের দোহাই পাড়িয়া বলিলেন, "তা কখনও হয়—লোকে যত পুওর হবে পপুলেশনও ততই বাড়বে। ও আপনার সংখ্যাগুলো তো জেলার হেল্‌থ অফিস থেকে নেওয়া—ওখানে কি আর সব জন্মের রিপোর্ট আসে?"

তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—রিপোর্টে কিছুটা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু কয়েক বছরের আপেক্ষিক রিপোর্টে ভুল প্রায় একই ধরণের থাকিবে—তাহা হইলে বছরগুলির আপেক্ষিক তুলনা তো মোটের উপর ঠিকই হইবে! তা ছাড়া আমার নিজের চোখে দেখা ও কানে শোনা বিবরণের সঙ্গেও তো ইহা মিলিয়া যাইতেছে।

এস-ডি-ও আর ওজর তুলিতে পারিলেন না, রিহ্যাবিলিটেশনের (গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের) জন্য আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেতনায় বিশেষ কোন নূতনত্ব আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

তাঁহারই বা দোষ কি? কুষ্টিয়া ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন এলাকা হইতেই যখন জন্মহ্রাস ও বংশ লোপের এই ভয়াবহ চিত্র আসিতেছে তখন তাঁহারই কর্তৃপক্ষ সে খবর চোখ বুঁজিয়া এড়াইয়া বলিতেছে এবার আর তেমন কোন সঙ্কট নাই। তাই গতবার বজেটে যেখানে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য ১.৮১ কোটী খরচ হইয়াছিল এবার সেখানে মাত্র ১.৬৯ কোটী বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য গত বৎসর যেখানে ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল, এবার সেখানে মাত্র ৫২ লক্ষ ধরা হইয়াছে।

দেশবাসী

কিন্তু দল ও রাজনীতি নির্বিশেষে কুষ্টিয়া শহরের প্রায় প্রত্যেকটী ভদ্রলোক ও জননেতার কাছে এই বিবরণ আতঙ্ক, ক্ষোভ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা ও মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ শামসুদ্দীন আহ্‌মদ আমার রিপোর্ট শুনিয়া বলিলেন, "এতদিন এই সংকটকে আংশিক ভাবেই দেখিয়াছি। জীবনীশক্তি কমায় জন্মহার কমিতেছে ইহা এই প্রথম বুঝিতে পারিলাম। এই সংকট প্রতিরোধে আমরা যে-কোন প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বিশ্বাস বলিলেন, "আশ্চর্য্য যে আমরা এত কাছে থাকিয়াও এ সম্পর্কে এ ভাবে ভাবি নাই।" হিন্দুসভার সেক্রেটারী শ্রীপ্রিয়নাথ বাগচী, কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীনির্ম্মল চক্রবর্তী, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি অনেককেই আমি অনুসন্ধানের বিবরণ জানাইয়াছি। প্রত্যেকেই প্রায় অভিভূত হইয়া বলিয়াছেন যে সকলে মিলিয়া এই সংকটে প্রতিরোধে নামিতে হইবে। আর গ্রামের কবি আজিজুর রহমান, যিনি নিজে এই অনুসন্ধানে আমার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ফিরিয়াছেন—কয়েকদিন পরে তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলাম তখন দ্বিধাভরে বলিলেন, "ওখান থেকে ফিরে এসে সেই রাত্রেই একটা কবিতা না লিখে পারি নি। শুনবেন কি?"

কবিতার কয়েক চরণ এখনও মনে রয়েছে—

"যে নিষাদেরা ঘিরেছে চতুর্দ্দিক
মৃত্যুর পাখা আসমান ছেয়ে ওড়ে
গড়ো প্রতিরোধ হে কৃষাণ সৈনিক
কঙ্কাল ছায়া ফসলের মাঠে ঘোরে।"

—ক্ষিতীন রায় চৌধুরী

ছিনিমিনি খেলা!

নোয়াখালীর জেলে মেয়েরা উলঙ্গ

ধরা পড়ে। কাপড় ব্যবসায়ীদের চোরাকারবারের ফলে সুতার অভাবে উজিরপুর গ্রামের তাঁতীদেরও তাঁত বন্ধ। বিভিন্ন নম্বরের ২২ বাণ্ডিল সুতা চোরা দামে বিক্রির জন্য স্থানীয় নামকরা ব্যবসায়ী মাখনলাল সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে।

নোয়াখালী জেলায় মৃতদেহ গোর দিবারও কাপড় জুটিতেছে না। হরপার্ব্বতী গ্রামে জেলে পাড়ায় মেয়েরা উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় চলাফেরা করিতেছে।

ফেনী শহরে গত ৬ মাসে কয়েক হাজার শহরবাসীর লজ্জানিবারণের জন্য মাত্র ২৪৪ বেল কাপড় আসিয়াছিল। এই কাপড় চোখে দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হইয়াছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারী অটল সাহার দোকানে এক বেল কাপড় আসিয়াছিল। এ-আর পির লোকেরা নাকি এই অটল সাহার দোকান হইতেই কয়েক মাস আগে কাপড়ের চোরাই মজুত ধরিয়া ফেলে। এই কাপড় কেনার জন্য দুই শত লোক ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। ভিড় দেখিয়া দোকানদার মহকুমা হাকিমকে সংবাদ দেয়। মহকুমা হাকিম আসিয়া দোকানদারকে লটারী করার হুকুম দেন। লটারীর এমনি গুণ যে দেখা গেল স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সরকারী চাকুরেদের ভাগ্যেই বেশীর ভাগ কাপড় জুটিয়াছে।

সদর মহকুমার আর এক এস-ডি-ওর কাহিনী শুনুন। চৌমুহনীতে যখন কাপড়ের ভয়ানক সঙ্কট, তখন সরকার রেশন কার্ড মারফৎ কিছু কাপড় বিলি করে। এস-ডি-ওর রেশন কার্ডের দরকার নাই—তিনি পাইলেন ১০ জোড়া শাড়ী ও ২ খানি কেলিকো মিলের থান। অন্যান্য সরকারী চাকুরেরাও ভাগ পাইলেন। গরীবদেরই শুধু লজ্জা নিবারণের কাপড় জুটিল না।

"জাতি প্রায় লোপ পাওয়ার আশঙ্কা"

মহামারী রোধে সাহায্যের জন্য ডাঃ বিধান রায়ের আবেদন

বি-এম-আর-সি-সির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত আবেদন করিয়াছেন:

"দুর্ভিক্ষ শেষ হইতে না হইতেই মহামারী সমগ্র প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই মহামারী বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর ধ্বংসের সূচনা করে। ঠিক এমনি অবস্থায় গত বৎসর বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান ছয় মাসের জন্য কাজ করিবে ইহা স্থির হয়। কিন্তু মহামারীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে থাকায় এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনবরত আবেদন আসার ফলে বি-এম-আর-সি-সি কাজ চালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। বি-এম-আর-সি-সির অন্তর্ভুক্ত যে সব প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করিতেছিল তাহারা সকলেই রিলিফ কো-অর্ডিনেশনের কাজ চালু রাখিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হয়।

"মহামারীর ভীষণতা কিছু পরিমাণে কমিয়াছে কিন্তু রিপোর্টে দেখা যায় যে ইহার ব্যাপকতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। যে সব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল বর্ত্তমানে সে সমস্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং পাচড়া স্থায়ী মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। এ সব জায়গায় এই সমস্ত ব্যাধি পূর্ব্বে মহামারীরূপে কচিৎ কখনও দেখা দিত মাত্র। **খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য ক্রমাগত অবনতির দিকে চলিতেছে।**

"বিগত বহু বছর ধরিয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবান ও রুগ্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। **কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সামনে প্রশ্ন—জাতির একেবারে লোপ পাওয়ার আশংকা।** এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় কিছু না করিয়া আমরা সন্তোষচিত্তে বসিয়া থাকিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থাই করুক না কেন, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন তাহা বিফল হইতে বাধ্য বিগত কয়েক মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার মত বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি।

"বি-এম-আর-সি-সির প্রয়োজনীয়তা ও কর্ম্মীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিচার করিবার দায়িত্ব আমি জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। আমি শুধু ইহাই বলিব যে, গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতিনিয়তই আবেদন আসিতেছে এবং গ্রামবাসীদের দাবী আমাদের সঙ্গতি ও সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের দেশবাসীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং আন্তরিক শুভেচ্ছার উপরই আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে। এখন আমরা অর্থের অভাবে কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছি।

"লক্ষ লক্ষ রোগাক্রান্ত জনমানবের পক্ষ হইতে আমি আমার দেশবাসী বিশেষতঃ বাংলার অধিবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছি—সকলে অগ্রসর হউন, আমাদের সাহায্য করুন যাহাতে আমরা দেশের হতভাগ্য ভাই-বোনদের বাঁচাইতে পারি। ইহাদেরই উপর আমাদের প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমরা সকলে অক্লান্ত চেষ্টায় এই মহান প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তুলিয়াছি—ইহাকে কখনই ধ্বংস হইতে দেওয়া যায় না।"

বাঁকুড়া কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের পক্ষে নয়

গত ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়া জিলা কংগ্রেসকর্ম্মীদের একটি ঘরোয়া সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্ম্মী সঙ্ঘের একটি জিলা শাখা গঠন করিবার জন্য সম্মেলনটী আহূত হয়। কমিউনিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছাড়া অন্যান্য সকলেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন।

জিলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমেই সভাপতি মহাশয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন, প্রায় তিন বৎসর যাবৎ গান্ধীজির গঠনমূলক কাজ আমরা কিছুই করি নাই। জিলাব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ভাবে গঠনমূলক কাজ করিবার জন্য আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। তিনি সকলকে যতদূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার আহ্বান জানান এবং কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান না করিয়া মিলিত ভাবে কাজ করিবার আবেদন করেন।

কংগ্রেস এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ কংগ্রেসের মধ্যে সকল দল ও মতের লোককে একসঙ্গে কাজ করিবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, কংগ্রেসের দ্বার সকল স্বাধীনতাকামীর জন্যই উন্মুক্ত। কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই।

তিনি আরও বলেন যে, কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল সন্দেহ ও ভুল ধারণা আছে তাহা দূর হওয়া প্রয়োজন এবং কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিলিতভাবে ব্যাপক গঠনমূলক কাজ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। যদিও প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন কমিউনিষ্ট-বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তবুও এই জিলা কর্ম্মী সম্মেলনে স্থান ও কালপোযোগী চিন্তা করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণীমোহন সেন প্রমুখ আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করিবার আবেদন জানান।

শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় ও আর কয়েকজন কংগ্রেসনেতা কমিউনিষ্ট-বর্জ্জনের পক্ষে বক্তৃতা দেন। বহু আলোচনার পরে সম্মেলন কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করে না।

সম্মেলনে মাতা কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই ও অন্যান্য নেতাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া, দুর্ভিক্ষে সরকারের ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীন কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া ও জিলাব্যাপী গঠনমূলক কাজ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়া তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"আমার জীবন ও সাধনার পীঠস্থান কমিউনিষ্ট পার্টি"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী পাব্লো পিকাসো ★

শিল্পীর পরিচয়

বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী পিকাসো ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন, এ সংবাদ আমরা জনযুদ্ধে ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান প্রসঙ্গে তাঁহার এক বিবৃতির অনুবাদ আমরা এই পৃষ্ঠায় অন্যত্র দিলাম।

১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগা শহরে পাব্লো পিকাসোর জন্ম। বার্সিলোনায় তাঁহার শিল্পী পিতার কাছেই চিত্রবিদ্যায় পিকাসোর প্রথম হাতে খড়ি। ১৯০৩ সালে পিকাসো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলিয়া আসেন এবং সেই হইতে তিনি প্যারিসের বাসিন্দা।

নতুনের সন্ধানী

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কোন শিল্পীই শিল্পজগতে পিকাসোর মত এতখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পিকাসো চিত্রাঙ্কণের পুরানো রীতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহার ছবিতে সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গি আনেন। পিকাসোর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনই আপন সৃষ্টির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েন নাই। বার বার তিনি শিল্প সৃষ্টির নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন।

১৯০৩ হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত পিকাসো যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার বিষয়বস্তু ছিল শহরের বিকারগ্রস্ত জীবন। তাঁহার ছবির নায়ক নায়িকা সার্কাসের বাজিকর, বহুরূপীর দল। ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সালে পিকাসো চিত্রাঙ্কনে কিউবিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। ফলমূল, বোতল, বাদ্যযন্ত্র, আসবাবপত্র—এই সব অচেতন পদার্থ তখন তাঁহার ছবির বিষয়বস্তু। অঙ্কিত পটের উপর কাঠের টুকরা ইত্যাদি জুড়িয়া পিকাসো চিত্র ও ভাস্কর্য্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটান। এই সময় পিকাসোর লক্ষ্য ছিল—বস্তু অবয়বের হুবহু অনুকরণ না করিয়া নূতন অবয়বের সৃষ্টি করা। পিকাসোর ছবিতে বাস্তব ও কল্পনার একান্ত রূপ ফুটিয়া উঠিল।

১৯১৮ সালের পর পিকাসোর ছবিতে আবার বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি স্থান পাইতে লাগিল। স্বল্প রেখার আঁচড়ে নূতন ভঙ্গিতে পিকাসো এই ছবিগুলি আঁকেন। এই ছবিগুলির মধ্যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিল। পিকাসোর এই নূতন অঙ্কনভঙ্গিতে শিল্পজগতে সাড়া পড়িয়া গেল। দেশবিদেশের শিল্পীরা পিকাসোর প্রদর্শিত পথে ছবি আঁকিতে লাগিলেন। ছোট বড় বহু শিল্পীর উপরই পিকাসোর প্রভাব দেখা গেল। এই সময় পিকাসো রঙ্গমঞ্চের জন্য একাধিক সিন্‌-সিনারি আঁকেন। রুশ রঙ্গমঞ্চের জন্য পিকাসোর অঙ্কিত একটি পট তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। বহু বিখ্যাত লেখকের বইয়ের জন্য এই সময় তিনি সুন্দর সুন্দর প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দেন।

স্বাধীনতার আজন্ম সাধক

পিকাসো আজীবন স্বাধীনতার জন্য শিল্পী হিসাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে যখন ফ্যাশিজম পৃথিবীর সভ্যতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল, তখন তিনি 'গোয়েনিকা' চিত্রে ফ্যাশিজমের সর্ব্বনাশা রূপ বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

তারপর ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের দেশদ্রোহী শাসনকর্ত্তারা জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফ্যাশিষ্টরা পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু পিকাসো অক্লান্তভাবে ছবি আঁকিতে লাগিলেন। তাঁহার ছবির বিষয়বস্তু হইল ফ্রান্সের মানুষ ও প্রকৃতি। এ ছবির উৎস সুগভীর দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। ফ্রান্সের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পিকাসোর ছবিতে বাস্তব জীবনের কথা ফুটিয়া উঠিল। পিকাসো শিল্পের নূতন পথের সন্ধান পাইলেন। ফ্রান্সের গুপ্ত মুক্তি আন্দোলন তাঁহার মনে সাড়া জাগাইল। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম পিকাসোকে শিল্পসৃষ্টির অফুরন্ত প্রেরণা দিল। ফাশিষ্ট জার্ম্মানরা ও ফরাসী দেশদ্রোহীরা পিকাসোকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার

(৪র্থ কলমে শিল্পীর ছবির নীচে দেখুন)

ছবির সমালোচনা লিখিতে লাগিল। পিকাসোকে তাহারা ইহুদী বলিয়া গালাগাল দিল এবং কুৎসিত বিশেষণ প্রয়োগ করিতে লাগিল।

ফরাসী দেশপ্রেমিকদের হাতে প্যারিসের মুক্তির পরই প্যারিসে পিকাসোর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হইল। পিকাসোর ছবির মধ্যে নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি দেখিয়া প্যারিসের জনসাধারণ মুগ্ধ হইল। পিকাসো তাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

★ পার্টিতে যোগদানপ্রসঙ্গে বিবৃতি ★

"আমার জীবন ও সাধনার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার একটা গভীর সঙ্গতি আছে। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি ব'লেই আমার জীবন ও সাধনা আজ সার্থক হ'য়ে উঠেছে। রং ও রেখায় আমি বিশ্বজগৎ ও মানুষ সম্পর্কে এমন এক অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানে ফিরেছি, যে দৃষ্টি দেবে আমাদের মুক্তি। সব থেকে সত্য, স্বাধ্য, কল্যাণকর ও তাই সব থেকে সুন্দর ব'লে যাকে জেনেছি, আমার আপন ভঙ্গিতে সেই কথাই বলতে চেয়েছি।

কিন্তু নিপেষণ ও বিদ্রোহের দিন যখন এল, তখন আমি অনুভব করলাম, যা এতদিন ক'রে এসেছি তা যথেষ্ট নয়। আমি বুঝলাম শুধু ছবি দিয়ে নয়, আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে লড়তে হবে। এর আগে কিছুটা অজ্ঞানতার জন্যেই এ কথা বুঝি নি।

আমি কমিউনিষ্ট হয়েছি এই জন্যেই যে, আমাদের পার্টি অন্য যে কোন দলের চেয়ে বেশী প্রাণপাত করে দুনিয়াকে জানতে ও গড়তে, চেষ্টা করে মানুষকে স্পষ্ট চিন্তা করতে শেখাতে, মুক্ত করতে, আনন্দ দিতে। কমিউনিষ্ট হয়েছি কারণ ফ্রান্সে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আর আমার স্বদেশ স্পেনে কমিউনিষ্টরাই সব থেকে সাহসী। পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগে আমি কখনও নিজেকে এত মুক্ত ও সম্পূর্ণ বোধ করি নি।

যতদিন পর্য্যন্ত স্পেনে আবার আমি ফিরে না যেতে পারছি, ততদিন ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিই আমার স্বদেশ। কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আবার আমি ফিরে পেয়েছি আমার সমস্ত বন্ধুদের—ফিরে পেয়েছি পল লাজভাঁ ও ফ্রেডরিক জোলিও কুরির মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের, লুই আরাগঁ ও পল এলুয়ার্ডের মত মহৎ সাহিত্যিকদের, ফিরে পেয়েছি প্যারিসের বিদ্রোহীদের অনেক, অনেক আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মুখ।

আমি আজ আবার আমার ভাইদের মধ্যে।"

কবি শেখ গোমানী দেওয়ান

লেখক :
সুধী প্রধান

মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সীমান্তে জিন্দগী গ্রামে ১৮৯৫ সালে এক কৃষক পরিবারে কবি গোমানীর জন্ম। খুব ছোট বয়সেই গোমানীর মুখে মুখে পদ রচনার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সকলে অবাক হয়। গোমানীদের বাড়ীর সামনে আম-জাম-লিচু বাগানের সরু পথ ধ'রে সকালে গ্রামের লোক গরু বাছুর আর লাঙল নিয়ে মাঠে যায়। বালক কবির মনে এই কর্ম্মমুখর শোভাযাত্রা সাড়া জাগায়। বালক গোমানীর মনে কবিতা আসে : 'আম, জাম, কাঁঠাল ও লিচু। আমি চলি তার পিছু পিছু।'

উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ ক'রে গোমানী মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু ইস্কুলের বদ্ধ ঘরের চেয়ে মুক্ত মাঠই তাঁকে ডাকে বেশী। বাবার ধমকের উত্তরে গোমানী বলেন, 'ঘোড়া না পেলে কি ইস্কুলে হেঁটে যাওয়া যায়?' অগত্যা বাবা ছেলেকে ঘোড়া কিনে দিলেন। কিন্তু ঘোড়া রাস্তার নয়নজুলীতে চরে বেড়াতে লাগল—কবিকিশোর মুগ্ধনেত্রে সবুজ ফসলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে নিষ্ঠা

ছোট কাল থেকেই গোমানী ছিলেন গ্রাম্য কবিওয়ালাদের একনিষ্ঠ শ্রোতা। গোমানী ইস্কুলের পণ্ডিত হবার পর তারা তাঁকে ধ'রল, পালা বেঁধে দিতে হবে। গোমানী ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে কাহিনী বেছে নিয়ে তাদের জন্যে পালা বাঁধতে লাগলেন।

তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-ওয়ালা ছিলেন জীবনকৃষ্ণ উড়ে কর্ম্মকার ও শশী-ভূষণ মুচী। পাশের এক গ্রামে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে জিন্দগী গ্রামের কবির দলের লড়াই বাধে। গ্রামের কবিদের হেরে যেতে দেখে গোমানী প্রথম আসরে নামলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শশী ও জীবনকে গোমানীর কবিপ্রতিভার কাছে হার মানতে হ'ল।

রামায়ণ, মহাভারতে ও দেবদেবতাদের আখ্যানে রাবণ, দুর্য্যোধন, অহল্যা ইত্যাদি যেসব চরিত্র নিন্দিত হয়েছে—তারাই ছিল এই সময় গোমানীর রচিত কাব্যের কীর্ত্তিত নায়ক-নায়িকা। গোমানী গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন।

ফলে, পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর তর্ক বাধে। শেষে কাশীর পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ন্যায়রত্ন কবিকে ডেকে তাঁর সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন ও এই সব গ্রন্থের মধ্যে যে মূল্যবান ভাব আছে, তার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। কবি গোমানী আমাকে বলেন যে, কুতর্ক ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অশিক্ষিত জনসমাজকে ভাল জিনিষের সঙ্গে পরিচিত করা এবং গানে নূতনত্ব ও সুরুচি আনাই ছিল তাঁর অন্তরের প্রেরণা।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের পাশে

১৯২১ সালের আন্দোলনের সময় কবি গোমানী বৈষ্ণব ও শাক্ত পালার মধ্যে হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলেন ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের গান রচনা করেন। এর পরই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, লক্ষ্মী-সরস্বতী (ধনিক-শ্রমিক), একাল-সেকাল, নবীন-প্রবীণ প্রভৃতি পালার মধ্য দিয়ে তিনি শোষিত ও দলিত জনসাধারণের পক্ষ নিয়ে আগামী কালের জয়ধ্বনি শোনাতে থাকেন। পুরাতন যুগ শুধু স্বর্ণযুগ নয়, তার মধ্যে ছিল শৃঙ্খলের বীজ; কিন্তু ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়। নবযুগ বয়ে নিয়ে আসছে যে নবীন, সেই আমাদের ভবিষ্যৎ—হাজার হাজার কৃষকদের মধ্যে কবি এই গান গাইলেন। বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কবি গাইলেন :

'পরের দাসখতে শুধু দস্তখত দিতে।
আস নি এ জগতে বহু কাজ আছে ভাই।
চিরদিন উমেদারী পেশা নয় তোমাদেরি।
মনুষ্য দেহ ধরি তাতে প্রাণ রাখা চাই।'

গানের শেষে কবি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ

গোমানীর কাব্যপ্রতিভার কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। গোমানী আমাকে বললেন, 'বুড়ো ডেকে পাঠালেন; আমি ত' ভয়ে সারা। সেথা আমি কি গাহিব গান।'

গোমানী রবীন্দ্রনাথকে 'কাবুল ও ভারত' পালাগান শোনালেন। এই পালাতে ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের আগে ভারতের দুরবস্থার কথা, এবং পরে ভারতের জনগণের বীরত্ব কাহিনী।

বিশ্বকবির সভায় এরপর থেকে প্রতি বছর ডাক আসতো। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় প্রতিবছর গোমানীর গান উৎসবের অঙ্গ হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে কবি গোমানীর ডাক পড়ে। শোকাতুর পল্লীকবি সেদিন বাংলার সমস্ত কৃষকের হৃদয় বেদনা জানালেন :

'দে শান্তি বারি ব'লে কেনরে কাঁদিস তুই
ওরে মোর বোকা মন পাখী
কে তোরে দিবেরে জল
—বিশ্ব মহামরু স্থল…
সাহিত্য আকাশ মাঝে যে রবি উঠেছিল
সে রবি এ জগতে নাই…
আমরাও তোমা সনে হব সহগামী রে
ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে।'

কবি গোমানীর বিশ্ববোধ

পল্লীকবি গোমানীর বিশ্ববোধও বড় কম নয়; রোলাঁ, আইনষ্টাইন, ফ্রয়েড, মার্ক্স ও গর্কির কথা তিনি জানেন। জার্ম্মানীর অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও বর্ত্তমান জার্ম্মানীর প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও দেশে হিটলারী পাপ এল কি ক'রে?' কিছু দিন আগে যখন তিনি গোলাম মোস্তাফার বিখ্যাত 'আমরা কিশোর, আমরা কুঁড়ি' কবিতায়, 'শিক্ষার জন্য যাব জার্ম্মানী' লাইনটি শোনেন তখন কবি গোমানী ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন এবং তার জবাবে একটি কবিতা লেখেন। এখানে তার কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি :

"বাংলা আমার নয় রে কাঙাল ধনে জনে পূর্ণ রয়।
পরের পানে থাকব চেয়ে সোণার বাংলা সে দেশ নয়।
…মল্ল রণে তোমার গামায় বিশ্ব দিল ইস্তফা।
তোমার বুকের রাঙা কবি গোলাম নবী মুস্তফা।
তোমার পরাণ বাগে বাঁধন হারা সে বুলবুল।
আকাশ বাতাস দুলিয়ে তোলে বীর কবি নজরুল।
বঙ্গ মা তোর বিশ্ব মাঝে দৃশ্য অতি চমৎকার।
বিশ্বকবি রবীন ঠাকুর তোর কোলেতেই জন্ম তাঁর।"

এই দীর্ঘ কবিতায় কবি গোমানী বাঙালীকে তার সুবিশাল ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য পল্লীকবি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিজয়ে কবি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিপুল শক্তির কথাই স্মরণ করেছেন 'এক ভাইয়ের পদাঘাতে যদি বিশ্ব কাঁপে, তো সব ভাই মিললে না জানি কি হবে।'

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার স্মরণে কবি বলেছেন :

'কানের গান আর দরকার নেই ভাই
প্রাণের গান গাইতে হবে।'

শিক্ষিত সমাজ কৃষকের দুঃখের প্রতি বিমুখ ব'লে কবির মনে অন্তহীন ক্ষোভ। দেশের নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা, রোগ, অনাহারে তাঁর হৃদয় ব্যথিত। কবি গোমানী আমাকে বললেন, মানুষকে বাঁচাতে না পারলে কংগ্রেস, লীগ কেউ বড় হতে পারবে না।

গ্রাম্য কবির এই অভ্রান্ত স্বদেশপ্রেম দেখে মুগ্ধ হ'লাম।

Regd. No. C. 2836.

জার্ম্মানীর বাইরেও মূর্খের অভাব নেই!

ইলিয়া এরেনবুর্গ

হিটলারীদের শেষ আশা

সমস্ত পৃথিবী আজ অবাক হ'য়ে লাল ফৌজের বিস্ময়কর অভিযানের দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে, হিটলারী সৈন্সরা আর কোন্ ভরসায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা ক'রে তারা বাঁচতে পারবে? ওডার নদীর প্রাকৃতিক বাধা, না তাদের জনবাহিনী—কিসের ওপর তারা বাঁচার ভরসা রাখে? না। এর কোনটাতেই হিটলারীদের আস্থা নেই। মানুষের নির্বুদ্ধিতাই তাদের একমাত্র ভরসা স্থল।

বার্গাণ্ডির এক ডাকাত সম্বন্ধে পুরানো একটা গল্প আছে। লোকটার অত্যাচারে সে অঞ্চলে মানুষ টিকতে পারত না। শেষকালে একদিন তাকে ধ'রে বিচারকদের কাছে উপস্থিত করা হ'ল। কিন্তু কথার যাদুতে লোকটা বিচারকদের মন এমন ভাবে গলিয়ে ফেলল যে, বিচারকরা শুধু 'অনুতাপ ও প্রার্থনা'র মৃদু সাজা দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।" বিচারকদের এই হৃদয়বত্তা দেখে লোকটা মুগ্ধ হ'ল। অবশ্য সে তার দস্যুবৃত্তি ছাড়ল না। এবং রায় বের হবার অল্প দিনের মধ্যেই তার হাতে বিচারকদের প্রাণ গেল বটে, কিন্তু তাদের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জানাতে কোন দিনই ভুলে যায় নি। প্রতি বছর সে ঐ বিচারকদের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাদের আত্মার শান্তির জন্যে গির্জ্জায় একটি ক'রে বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে আসত।

খুব সম্প্রতি একটা অদ্ভুত ইস্কুলের কথা পড়লাম। জিনিষটা প্রথম তাই এ সম্বন্ধে না লিখে পারছিনা। প্রথম ব'লেই এর গুরুত্বও কম নয়। আমি যে ইস্কুলের কথা বলছি, তার উদ্যোক্তা হ'চ্ছে আমেরিকানরা। এই ইস্কুলের এখন যারা ছাত্র মাত্র কিছুদিন আগেও তারা ফরাসী বন্দীদের বেঁধে আনত এবং রাশিয়া থেকে ধ'রে আনা মেয়েদের নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন ক'রত। সোজা কথায় বলতে গেলে, ৩৯ থেকে ৬০ বছর বয়সের এই 'ছোকরা'র দল আসলে ছিল হিটলারী পুলিশ। আমেরিকানরা চাইছে, আমেরিকার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আশীর্ব্বাদ এই শয়তানদের মনে সংক্রামিত ক'রে আবার তাদের নিজের নিজের কর্ম্মস্থলে পাঠিয়ে দেবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে ফ্যাশিষ্ট জল্লাদদের সজ্জন ক'রে তোলবার এই ব্যবস্থা।

ফ্যাশিষ্টদের পাঠশালা

এই ইস্কুলের ছাত্র যারা, তারা সবাই পাকা ফ্যাশিষ্ট। হিটলারী সৈন্যরা যখন আকেন ছেড়ে পালাবার যোগাড় করছিল, তখন তারা স্থানীয় পুলিশদের ওপর আস্থা হারিয়ে কোলোন থেকে বাছা বাছা কয়েকজন গুণ্ডা বদমায়েশ আনায়। এই গুণ্ডার দলই পরে মিত্রপক্ষের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের যখন পুলিশ ইস্কুলে শিক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন তারা নিজেরাই সব থেকে বেশী অবাক হয়েছিল। 'লিবার্টি' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, এই ধরণের ৮৯ জন ছাত্র এই ইকুলে সামরিক কর্তৃপক্ষের ইংরাজী কানুন অধ্যয়ন করছে এবং সেই সঙ্গে তারা 'সামরিক শিষ্টতা' শিখছে। অপরূপ ব্যবস্থা বটে। আমি দিবা চোখে দেখতে পাচ্ছি হিটলার যেন আসিসির ফ্রান্সিসের লেখা '...রাস' মন দিয়ে পড়ছে আর বন্ টনের বই ... ডক্টর লে (জার্ম্মানীর শ্রমিককর্ত্তা) জ্ঞান ... করছে। 'লিবার্টি' পত্রিকায় এই সব ...দের মানসিক অবস্থার যে বিবরণ বেরিয়েছে ...থেকে জানা যায়, কৃতকর্ম্মের জন্যে এই ফ্যাশিষ্ট ...নদের এতটুকু আপশোষ নেই। তারা এখন ...ারীদের দেখতে পারে না, তার কারণ তারা ... যাচ্ছে। বুরোনিংকে কর্ত্তা ক'রে গণতান্ত্রিক ...নী প্রতিষ্ঠায় তাদের সম্মতি আছে। এর ... অকপট আর কিছু হ'তে পারে না: এই ...ষ্টরা আমেরিকানদের সোহাগে গলে গিয়ে ...দের নিরীহ গোবেচারা বলে ঘোষণা করছে। ... হেরে গেছে আপাতত তারা তাদের ফুয়ারকে ত্যাগ করতেও রাজী এবং যে বুরোনিং একদিন হিটলারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল, তার হাতেই তারা জার্ম্মানীকে আজ স'পে দিতে চায়। এখানেই এর শেষ নয়। 'লিবার্টি' পত্রিকা বিনা দ্বিধায় এ কথা প্রকাশ ক'রে দিয়েছে যে, এই 'পড়ুয়া'র দল অর্থাৎ, এই ৮৯ জন হিটলারী পুলিশ বুরোনিংকে মেনে নিতে ও ইংরাজী ব্যাকরণ শিখে নিতে রাজী আছে, তবে এর বদলে ওয়াশিংটনের কাছে তাদের দুটি দাবী—প্রথমত, সামরিক শত্রুতার ফলে বিধ্বস্ত নগরগুলি মিত্র-পক্ষকে নতুন ক'রে গড়ে দিতে হবে; দ্বিতীয়ত, জার্ম্মান অর্থনীতিকে সবল ক'রে তোলার জন্যে' আমেরিকার সাহায্য। এই পড়ুয়ারা এখানেই ক্ষান্ত হবে না। আর একটা খবর দিলেই ষোল কলা পূর্ণ হ'ত—খবরটা এই যে, ব্যাকরণ ও সদাচার শিক্ষা ছাড়াও এরা প্রাণপণে শরীরচর্চ্চা শিখছে, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে এরা মানুষের মাথা আরও নিখুঁতভাবে ফাটিয়ে দিতে পারে।

'ত্রাণকর্ত্তা'র দল

'লেটার্স ফ্রাঙ্কেসেস' কাগজে এমনি ঘটনার বর্ণনা আছে: আমেরিকানরা একটা ছোট জার্ম্মান শহর দখল করেছে। সামরিক কমাণ্ডার কর্ণেল প্যাটারসন জার্ম্মানদের কাছে আবেদন জানালেন, স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে আবার হাত লাগাও। কিন্তু জার্ম্মানরা তার উত্তরে বলল, সবে মাত্র তোমরা আমাদের মুক্ত করেছো; কাজেই বিশ্রাম নেবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।'

'ওরা মুক্ত হ'চ্ছে'—এই ছবির চিত্রনাট্য তৈরী। গৃহস্থরা পুলিশের হাত থেকে, পুলিশরা নগরপালের হাত থেকে, নগরপালেরা সুবাদারের হাত থেকে, সুবাদাররা হিমলারের হাত থেকে, হিমলার হিটলারের হাত থেকে আর হিটলার সমস্ত দায়িত্বের হাত থেকে মুক্ত। কারু দোষ নেই, সবাই বিশ্রাম চায়! এতদিন ধ'রে দস্যুবৃত্তি ক'রে, মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে যন্ত্রণা দিয়ে ও শূলে চড়িয়ে আহা তারা ক্লান্ত। আজ তারা অপারগ। শিষ্টাচারের ওপর বক্তৃতা শোনার জন্যে আর হাওয়াই দ্বীপের আনারসের জন্যে আহা আজ তারা হাঁপিয়ে উঠেছে।

'বেচারা জার্ম্মানদের' এই ত্রাণকর্ত্তাদের বহুরূপী বেশ: কারো পরণে আলখাল্লা, কারো পরণে গণতন্ত্রীর গাত্রবাস। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকার কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ: 'রাশিয়াতে জোর ক'রে জার্ম্মান মজুর খাটানোর বিরুদ্ধে তোমরা প্রতিবাদ জানাবে না? ইলিয়া এরেনবুর্গ আর আলেক্সি টলষ্টয় প্রমুখ সোভিয়েটের যে সব লেখক জার্ম্মান নৃশংসতাকে নিন্দা করেছে, তাদের লেখার বিরুদ্ধে তোমরা প্রতিবাদ করবে না?' রুথ ফ্রাই নামে এক কোয়েকার রমণী ইংরেজী কাগজে ভণ্ডভক্তির লেখা উদ্ধৃত করে হিটলারী কশাইদের হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। 'আর্শে' পত্রিকায় ফরাসী নন্দনশাস্ত্রের পণ্ডিতরা ঘৃণার সঙ্গে বলেছেন, 'যুদ্ধে সাধারণত একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়েই থাকে। তার জন্যে জার্ম্মানীকে দায়ী ক'রলে সত্য ও সুন্দরের নীতিকে অমান্য করা হবে। লেডি গিব লিখেছেন, হিটলারের একমাত্র উচিত শাস্তি হচ্ছে তাকে তার পুরোনো চিত্রকরের কাজে ফিরে যেতে দেওয়া। ক্যাথলিকরা গেষ্টাপোর অত্যাচারী গোয়েন্দাদের হ'য়ে এই ব'লে অনুকম্পা দেখাতে বলছে যে, 'ভুল ত' মানুষেরই হয়।' ট্রটস্কীপন্থীরা বলছে, হিটলারের এস-এস দল হ'চ্ছে খাঁটী প্রোলেটারিয়ান ধাতুতে গড়া। গণতন্ত্রী ডরোথি টমসন চাইবেন, হিটলারের পক্ষে ভোট দেওয়ার অবাধ সুযোগ জার্ম্মানদের দেওয়া হোক। আর মিউনিকের গোঁড়াপন্থীরা ভিন্ন এক বিষয়ে 'ভোট দেওয়ার' জন্যে জার্ম্মানদের বাঁচাতে চাইবে। এই বিভিন্ন লোকগুলির শুধু একটি বিষয়ে মিল আছে—তারা সবাই ন্যায্য শাস্তির হাত থেকে জার্ম্মানীকে রেহাই দিতে চায়। সেকালের গল্পের সেই ডাকাত যেমন বলেছিল, 'দিজঁতে বিচারকের অভাব হয় নি'—ঠিক তেমনি এ যুগের শয়তানরাও তাদের অভাবিত ত্রাণকর্ত্তাদের দেখে বলছে, 'জার্ম্মানীর বাইরেও মূর্খের অভাব নেই।'

পরিত্রাণ নেই

মাজদানেকের নিহত মেয়েদের চুলে বোনা মাদুরে যে সব জার্ম্মানরা রাত্রি কাটায়, তারাই আবার আমেরিকানদের মুখের ওপর দুর্ব্বিনীত সুরে বলে, 'তোমরা আমাদের মুক্ত করেছো। কাজেই আমরা স্বচ্ছন্দে এখন বিশ্রাম করতে পারি আর আগামী যুদ্ধের আয়োজন করতে পারি।' লালফৌজের মুখের ওপর এ কথা উচ্চারণ করার সাহস জার্ম্মানদের কখনই হবে না। হিটলারের হাত থেকে হিটলারীদের উদ্ধার করতে আমরা জার্ম্মানদের সামনে আসি নি। দস্যু জার্ম্মানীর হাত থেকে নিজেদের ও গোটা দুনিয়াকে উদ্ধার করার জন্যেই আমরা তাদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছি। জার্ম্মান পুলিশদের আমরা নতুন ক'রে লেখা পড়া শেখাবার চেষ্টা করব না। যারা অসহায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়েছে, তাদের স্থান হবে কয়েদীর কাঠগড়ায়—ইস্কুলের বেঞ্চিতে নয়। এই বর্ব্বরদের সঙ্গে ব'সে লুবেক কিম্বা কোলোন নতুন ক'রে গড়ে তোলার আলোচনা আমরা ক'রব না; স্মলেনস্ক, ওয়ারশ' ও হাভার প্রথম তাদের গড়ে দিতে হবে।

আজ যখন সাইলেশিয়া ও প্রুশিয়ার যুদ্ধ প্রান্তরে স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য রুশ সৈন্যরা রক্ত পাত করছে, ঠিক তখন নরপিশাচদের পক্ষ নিয়ে বকধার্ম্মিকদের ওকালতি অসহ্য। আমাদের দেশের জনসাধারণই এ বিচারে তাদের রায় দেবে। একদিকে অসীম ত্যাগ ও ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও হৃদয়ের মহত্ত্ব, অন্যদিকে অতুলনীয় বীরত্ব—এরই জোরে আজ তারা জার্ম্মানীর মাটিতে পা দিয়েছে। হিটলার রঙ আর তুলি নিয়ে পৃথিবীর বুকে মহানন্দে হেঁটে বেড়াবে, আকেনের ইস্কুলে জার্ম্মান পুলিশরা আগামী যুদ্ধের জাল বুনবে আর আবার রক্ত আর লবণাক্ত অশ্রুর নদী বইবে—এই দৃশ্য দেখার জন্যে মায়ের দল তাদের সন্তানদের প্রাণ দিতে পাঠায় নি। বিশ্বের চোখ আজ আমাদের দিকে ফেরানো—সে চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও আশা। আর আমরা বার্লিনের দিকে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে যাচ্ছি আর বলছি: 'না।' পরিত্রাণ নেই। দুর্ব্বৃত্তদের আমরা সাজা দেবই। আমরা শিশুদের রক্ষা করবো।'

(২৪শে জানুয়ারীর 'প্রাভদা' থেকে)

মিত্রশক্তি কলোন হইতে ১৪ মাইল দূরে : পোজনান লালফৌজের দখলে

জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে ভয় ও হতাশা

এই কয়েক দিন সোভিয়েট-জার্ম্মান লড়াই কোন কোন স্থানে আরও চরমে উঠিয়াছে। ইহার সাথে একমাত্র ষ্টালিনগ্রাদ বা বুডাপেষ্টের মত ভীষণ লড়াইগুলিরই তুলনা চলিতে পারে। জার্ম্মানদের অতি দরকারী ও সুরক্ষিত ঘাটি পোজনান সহর দখল করা হইয়াছে। মার্শাল জুকভের সেনাদল ইতিপূর্ব্বেই এই সহরটির পাশ কাটাইয়া ওডারের তীরে আসিয়া পৌছিয়াছিল এবং প্রায় গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়া ইহা শত্রুকবলমুক্ত করে। মার্শাল কনিয়েভের ট্যাঙ্ক-বাহিনী ব্রেসলাউ সহরের অভ্যন্তরে যতই গভীর ভাবে প্রবেশ করিতেছে, সংগ্রামের তীব্রতা ততই বাড়িতেছে। পোলিশ করিডরে মার্শাল রকোসভস্কীর সেনাদল বিখ্যাত বাল্টিক্ বন্দর ডানজিগের ২০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বপ্রুশিয়াতেও লড়াই অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। অবরুদ্ধ জার্ম্মানসৈন্যদের যে বিরাট অংশ কনিংস্বুর্গ সহরে এবং ঠিক ইহার দক্ষিণে মোতায়েন আছে, তাহারা বারবার সোভিয়েট সেনার লৌহদৃঢ় বেষ্টনী ভাঙ্গিবার জন্য জোর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাতে তাহারা কোন সুবিধাই করিতে পারিতেছে না বরঞ্চ দিনের পর দিন লাল-ফৌজের চাপে তাহাদের জায়গার পর জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। ফলে তাহাদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু এই অঞ্চলেই নয়, আরও অন্যান্য অনেক অঞ্চলেরই সংবাদ এইরূপ। আজ পর্যন্ত এই অভিযানে জার্ম্মানদের ১৫০-এর উপর সহর এবং ১০,০০০-এর উপর গ্রাম লালফৌজ দখল করে।

জার্ম্মানদের অবস্থা

রাস্তায় রাস্তায় যে সব জার্ম্মানদের পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই শ্বেত পতাকা। একজন সোভিয়েট সাংবাদিক এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—এখন থেকে জার্ম্মানীর রং হইবে সাদা, অর্থাৎ আত্মসমর্পণের রং।

ওদিকে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে অনেক স্থানে নানারূপ গোলমাল চলিতেছে। বার্লিনে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। নাৎসীদের হেড-কোয়ার্টার্সও ওখান হইতে অন্যত্র সরান হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রুশিয়া হইতেই ইতিমধ্যে ৪৫ লক্ষ জার্ম্মান তাহাদের নিজেদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া এই সব অঞ্চল ছাড়িয়া পালাইয়াছে। অথচ একদিন এই জার্ম্মানদেরই মুখপত্র কনিংসবুর্গের "আলজেমিং জিতুং" গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছিল—"আমাদের মাটিতে যদি কোনদিন বিদেশী শত্রু সৈন্য পদার্পণ করে, তবে সমগ্র দেশের লোক এক সাথে গর্জ্জিয়া উঠিবে।" বিখ্যাত সোভিয়েট লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ ইহার জবাবে লিখিয়াছেন—'কই, কোথায় জার্ম্মানীর গেরিলা বাহিনী, তাহাদের কোন চিহ্নই ত নাই। ...অনেক সময়ই আমি রাত্রের অন্ধকারে একা একা পূর্ব্বপ্রুশিয়ার নিস্তব্ধ রাস্তা ঘাটে, বনে জঙ্গলে বাহির হইয়াছি, কিন্তু কোথায়ও একজন গেরিলাও আমার পথ রোধ করে নাই।"

এদিকে জার্ম্মান সৈন্যদের মনের অবস্থাও বা কি তাহা জানা যায় তাহাদেরই একজন সৈন্য জোহান রেকটীর ডায়েরী হইতে। এই জার্ম্মান সৈন্যটী পূর্ব্বপ্রুশিয়ার যুদ্ধে ১৪ই ফেব্রুয়ারী মারা পড়ে। তাহার ডায়েরীর কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করা গেল:—

২১শে জানুয়ারী—খুবই ক্লান্ত। খবর শুনিতেছি আমাদের সরিয়া পড়িবার কোন অসুবিধা হইবে না, জাহাজে করিয়া আমাদের পার করা হইবে। আমরা আজও খানিকটা পিছনে হটিয়াছি।

২২শে জানুয়ারী—মনে হয়, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। চারিদিকেই অগণিত লালফৌজ। একদিন আমাদের বুঝান হইয়াছিল, লাল ফৌজ আর কি লড়াই জানে, জানে শুধু তামাক টানিতে ......কিন্তু বাপরে বাপ, তাদের গোলাগুলার কি ভীষণ দাপট। এটা অতি-সত্য যে আমাদের মরিতেই হইবে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—আজও যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছি? আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। জার্ম্মানী বা ইরমার কথা পর্যন্ত মনে আসে না। আমার মন অবশ, বাঁচিয়া থাকিবার সাধ আছে কি না, তাও বুঝি না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—সব শেষ, সব শেষ, জার্ম্মানীর আর রক্ষা নাই।......আমার উদাসীন মনকে কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিতেছি না।

পশ্চিম ইয়োরোপের লড়াই

মিত্রশক্তির আক্রমণোদ্যোগ কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যেই জার্ম্মান শহর ডুরেন দখল করে এবং বিখ্যাত জার্ম্মান শিল্পাঞ্চল কলোনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। তাহারা কলোন হইতে ১৪ মাইল দুরে আছে। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য ২।১ স্থানেও মিত্রশক্তি জোর আক্রমণ সুরু করিয়াছে। এই আক্রমণের বেগ যতই বাড়িবে, ততই একদিকে যেমন জার্ম্মানদের এই আক্রমণের বেগ ঠেকাইতে হইবে, আবার অন্য দিকে এই রণাঙ্গন হইতে সৈন্য সরাইয়া নিয়া লালফৌজকে জোর বাধা দিতে পারিবে না। একমাত্র দুই ফ্রন্টের জোর চাপ পড়িলেই হিটলারের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

আসামে লাইন প্রথার ঝগড়া

৩য় পৃষ্ঠার পর

ইহাদের এক মাত্র ব্যবসা। সরকারী বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে এবং উপনিবেশিকদের এইরূপ অভিযানে গো-পালনকারীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে স্থানে স্থানে সংঘর্ষও বাধিয়া উঠে। আসামে দুগ্ধের এমনিই অভাব। আসামবাসীদের মতে বর্ত্তমান গো-চারণ রিজার্ভই গরু ও মহিষ সংরক্ষণের পক্ষে প্রচুর নহে। ইহার মধ্য হইতে আবার চাষের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলে দুগ্ধ সরবরাহের ভয়ানক ক্ষতি হইবে। সুতরাং সমস্ত অসমীয়ারাই একজোটে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে। নবেম্বর অধিবেশনে সাদুল্লা সাহেব এই প্রশ্নের উপর এক সর্ব্বদলীয় কনফারেন্স আহ্বান করিতে রাজী হন এবং শুধু রিজার্ভ খোলার প্রশ্ন নহে, আসামের জমি বিলি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নই সেই কনফারেন্সে আলোচনা করিতে রাজী হন। ইহাতে আসামবাসীদের চাঞ্চল্য কথঞ্চিত প্রশমিত হয়।

কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শিলংএ এই সর্ব্বদলীয় কনফারেন্স বসে। উহাতে মুসলিম লীগের দুইজন সভ্য ছাড়া বাকী সকল দল এবং আসাম সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আপোষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোটামুটি সিদ্ধান্তগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

আসামের সমস্ত আবাদযোগ্য পতিত জমি (লাইনের ভিতরে কিম্বা বাহিরে যেখানেই থাকুক) একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্দোবস্ত দিতে হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জমিহীনের সংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট পৃথক পৃথক ব্লক ঠিক করিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। আবাদযোগ্য পতিত জমির শতকরা ৩০ভাগ আসামবাসী সকলের (বাঙ্গালী বসতকার অথবা অসমীয়া উভয়ই) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। আপাততঃ নিম্ন আসামের চারিটি জেলায়ই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই জেলাগুলিতে সংরক্ষণ সম্ভবপর না হইলে লক্ষ্মীপুর জেলার পতিত জমি হইতে সংরক্ষিত জমি রাখা হইবে;

বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের যাহারা ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে আসিয়াছেন শুধু তাহাদেরই জমি দেওয়া হইবে। এর পরে যাহারা আসিয়াছেন তাহারা জমি পাইবে না;

উপজাতিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে;

তিন বৎসরের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কার্য্য সমাধা হইবে। এর পর আসামের একসনা বন্দোবস্তীয় পাট্টাগুলি সাময়িক (অর্থাৎ ৩০ সনা) পাট্টায় রূপান্তরিত হইবে (ইহাতে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের যে বাধা নিষেধ করা ছিল তাহা দূর হইবে);

গোচারণ রিজার্ভ বন্দোবস্ত দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, কতকগুলি কারণ ছাড়া বাকী সকল ক্ষেত্রেই যাহারা রিজার্ভ দখল করিয়া আছে তাহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কনফারেন্সের এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে সামান্য অদলবদল করিয়া আসাম সরকার বিগত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে তাঁহাদের জমি-বিলি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে আসামের সমস্ত পতিত জমিই একটি প্ল্যান-মাফিক বন্দোবস্ত দেওয়ার আওতায় আসিয়া পড়িল এবং লাইন প্রথার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল এই প্ল্যানের ভিতর দিয়া আগামী তিন বৎসরের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ লোপ সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। কিন্তু সময় নির্দ্ধারণ এবং উচ্ছেদ সম্পর্কিত ব্যাপারে বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের উপর অবিচার করা হইল।

মুসলিম লীগ এই সম্পর্কে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করিলে ব্যবস্থা আরও ভাল হওয়া সম্ভবপর ছিল।

লীগ চায়—অবাধ জমি বিলি

এরপর বিগত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে গৌহাটিতে লীগ কাউন্সিলের যে সভা হইল তাহাতে তাঁহারা সরকারী নীতিতে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন এবং অবিলম্বে লাইন প্রথা তুলিয়া দিয়া, কোনরূপ সময়ের সীমা না টানিয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের অবাধ জমি বন্দোবস্ত দিবার এবং কাহাকেও উচ্ছেদ না করিবার দাবী জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রীমণ্ডলী যদি এই দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে লীগ সভ্যদের সরকারী নীতির সহিত অসহযোগিতা করিতে বলা হয়। অপর দিকে কংগ্রেস, ট্রাইবেল লীগ এবং আসামের স্বতন্ত্রদলের প্রতিনিধিরা বিগত শিলং কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের উপর এক যুক্ত বিবৃতি সরকারের নিকট দাখিল করেন। উক্ত বিবৃতিতে তাহারা কনফারেন্সে যে সমস্ত সুবিধা বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের দেওয়া হইয়াছিল তাহার অনেকখানি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভার পর ইহারা আগামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন। উহাতে তাহারা তাহাদের যুক্ত বিবৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সরকারী প্রস্তাব রচিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত প্রস্তাবকে কার্য্যকরী না করিয়া সমস্ত ভূমি-বন্দোবস্ত কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিতে চাহিয়াছেন।

এই ভাবে একদিকে মুসলিম লীগ অবাধ জমি-বন্দোবস্তের অধিকারের জন্য জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। অপরদিকে আসামের অপরাপর সমস্ত দল উপনিবেশিকদের বর্ত্তমানে কোন জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার দিকে ঝুকিয়াছেন।

ইতিমধ্যে বড়পেটায় উপনিবেশিকদের উপর গুলি চলিয়াছে। আত্মঘাতী কলহের ভয়াবহ পরিণতির ইহা সূচনামাত্র। আমলাতন্ত্র কংগ্রেস-লীগ-ট্রাইবেল দলের এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগের সুযোগ খুজিতেছে। আমাদের খাদ্য সমস্যা এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সাদুল্লা সাহেবের স্নেহপুষ্ট কর্ম্মচারী ও মহাজনেরা জনসাধারণের রক্ত শোষণের অবাধ অধিকার পাইতেছে।

এই দ্বন্দ্বের পরিণতি আরও যে বহু দুরপ্রসারী হইবে তার ইঙ্গিতও আমরা পাইতেছি। আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশ করা হইবে।

আপোষে ন্যায্য সমাধান কি

এখন প্রশ্ন, এই আত্মকলহের অবসান কোন পথে? কি ভিত্তিতে বিবদমান দলগুলির মধ্যে আপোষ হওয়া উচিত? ন্যায্য সমাধান কি?

প্রথমতঃ লাইন প্রথার কথা ধরা যাক :—লাইন প্রথার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল বিগত শিলং কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত ও সরকারী প্রস্তাব তাহা সম্পূর্ণ তুলিয়া দিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে। আগামী তিন বৎসরের মধ্যে একদিকে সমস্ত আবাদযোগ্য পতিত জমিই প্ল্যান-অনুযায়ী বন্দোবস্ত অথবা রিজার্ভের আওতার মধ্যে আসিতেছে। তাছাড়া সাময়িক পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীরা তিন বৎসর পর আসামের যেখানে ইচ্ছা জমি কিনিতে সমর্থ হইবে। আসামবাসী এবং কংগ্রেসের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া দাঁড়ানো উচিত হইবে না! মুসলিম লীগের পক্ষে "এই মুহূর্ত্তেই লাইনপ্রথা তুলিয়া দাও" বলিয়া আওয়াজ উঠানোর অর্থ জমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে কোন প্ল্যান স্বীকার না করা এবং যদৃচ্ছা জমিতে বসিয়া পড়ার নীতিকে উৎসাহিত করা। আজিকার দিনে কোন সভ্য জাতিই ইহাকে সমর্থন করিবে না।

তার পর আসে সময় নির্দ্ধারণের প্রশ্ন :—মুসলিম লীগ কোনরূপ সময় নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী নহেন আর কংগ্রেস ১৯৩৭ সনের পরে আগতদের জমি দিতে রাজী নহেন। লীগের পক্ষে এই কথা বুঝা প্রয়োজন—আসামে যা জমি আছে এবং জমিহীনের সংখ্যা যে পরিমাণ তাহাতে প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ সকল জমিহীনকে জমি দেওয়াই সম্ভবপর নহে। সুতরাং আরও উপনিবেশিক বাহির হইতে আসিতে থাকিলে আসামে বাঙ্গালী ও অসমীয়া সকলের অবস্থাই কাহিল হইয়া উঠিবে। সুতরাং লীগকে প্রথমে নূতন উপনিবেশিক আমদানী বন্ধ করিবার নীতি স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রদেশের অভ্যন্তরে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সন পর্য্যন্ত সময়কে সীমা ধরিয়া বন্দোবস্তের নীতিকে স্বীকার করিতে হইবে।

১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ধরা উচিত

১৯৪০ সালকে স্বীকার করিয়া লইলে জমির পরিমাণ ও ন্যায় নীতির দিক হইতে ঠিকই হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে ২ লক্ষ বাঙ্গালী উপনিবেশিকরা জমি পাইতে পারে। বাকী যাহারা আছে তাহাদিগকে আপাততঃ অপরের জমিতে ভাগচাষী হিসাবে অথবা দিন-মজুরী করিয়া থাকিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটা রফা হইয়া গেলে এবং নূতন বাঙ্গালীরা আর আসিতেছে না দেখিতে পাইলে আসামবাসীরাও আশ্বস্তি অনুভব করিবে, বাঙ্গালী ও আসামবাসীদের মধ্যে সদিচ্ছার সৃষ্টি হইবে এবং আসামবাসীদের নিজেদের সমস্যা হিসাবে ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪'র মধ্যে আগত জমিহীনদের জমি দেওয়ার জন্য তাহারা সমবেত চেষ্টা করিতে পারে।

আসামবাসী ও কংগ্রেসের বুঝা প্রয়োজন একমাত্র আপোসের ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সুতরাং ১৯৩৭ সালকে আকড়িয়া থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা বা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘোষণা করা হয় নাই যে ১৯৩৭ এর পরে যাহারা আসিবে তাহারা আর জমি পাইবে না। বরং ১৯৪০ সালে প্রথম মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাই ঘোষণা করে যে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত আগত জমিহীনদের জমি দিলে আর বন্দোবস্ত দেওয়ার মত জমি থাকিবে না! ১৯৪০ পর্য্যন্ত আগত জমিহীনদের জমি দিতে গেলে ৩ লক্ষ বিঘা জমি বেশী লাগিলেও যদি আপোষ রফা হইয়া যায় এবং নূতন লোক আমদানী বন্ধ হয় তবে তাহাতে আসামবাসীরা লাভবানই হইবেন।

উচ্ছেদ সম্পর্কে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, বল-প্রয়োগ করিয়া উচ্ছেদ করা অত্যন্ত অন্যায়। ইহাতে লোকের দুঃখকষ্ট বাড়ে এবং দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হয় বড়পেটার ঘটনার মত ঘটনাকে প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকই নিন্দা করিবেন। কিন্তু অপরপক্ষে অধিকার বহির্ভূত অঞ্চলে জোর করিয়া বসিয়া থাকিব, নড়িব না, তাহাও চলিতে পারে না।

হঠাৎ উচ্ছেদ চলিতে পারেনা

সুতরাং এই সম্পর্কে কি নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে? প্রথমতঃ যাহারা বাড়ীঘর বাঁধিয়া ফেলিয়াছে তাহারা যদি ১৯৪০'র আগে আসিয়া থাকে তবে তাহাদেরে উচ্ছেদ করা উচিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪০'র পূর্ব্বের আগতদের গোচারণ রিজার্ভ হইতে উচ্ছেদ করিতে হইলে তাহাদের অন্যত্র জমি দিবার গ্যারান্টি দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ১৯৪০'র পরে আগতদের উচ্ছেদ করিতে হইলে যথেষ্ট সময়ের নোটিশ দিয়া তাহাদের সরিয়া যাইবার সুযোগ দিতে হইবে। তবুও যদি তাহারা না যায় তবে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাদেরে বুঝাইয়া শুনাইয়া তুলিয়া নিতে সমর্থ হইতে পারেন। এই নীতি অনুসরণ করা মোটেই শক্ত নহে এবং এই ভিত্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ হওয়া উচিত। কিন্তু কোন উচ্ছেদই চলিবে না—এই নীতি কখনও চলিতে পারে না। প্রয়োজনীয় উচ্ছেদের জন্য যাহাতে বর্ব্বর বল প্রয়োগের নীতি অনুসৃত না হয় তাহাই হইবে উচ্ছেদের মূলনীতি।

ইহা ছাড়া জমি বিলি সম্পর্কে ঘুষপ্রথা এবং গরীবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত জরুরী। জমি বিলির ব্যবস্থার ভিতর দিয়া যাহাতে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি না হইতে পারে সেই জন্যও উপযুক্ত পন্থা স্থির করিতে হইবে, এবং অন্যায় ভাবে ঘুষ দিয়া অথবা বেনামীতে জমি রাখিয়া যাহারা জমিদার সাজিয়া বসিয়াছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহাদের অন্যায়লব্ধ জমি বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে সকল দলই অনায়াসে এক মত হইতে পারেন।

পরিশেষে আসামে যদি জমি-বিলি সম্পর্কে আপোষ রফা না হয় তবে কি অসমীয় কি বাঙ্গালী কাহারো স্বার্থ রক্ষিত হইবে না, আমলাতন্ত্র তার নিজের প্ল্যান অনুযায়ী চলিবার অবাধ সুযোগ পাইবে এবং সকলশ্রেণীর জনসাধারণের জীবনে আসিবে অসীম দুঃখ-কষ্ট। আসামের দেশপ্রেমিকরা কি সময় থাকিতে সজাগ হইবেন না?

★ জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কি ★

গুরুতর আঘাতের ফলে লাল ফৌজের বিখ্যাত জেনারেল চের্নিয়াকোভস্কীর মৃত্যু হইয়াছে। লাল ফৌজে তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ আর্ম্মিগ্রুপ কমাণ্ডার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৭ বৎসর।

মৃত্যুর পূর্ব্বে জেনারেল চেনিয়াকোভস্কী পূর্ব্ব প্রুশিয়াস্থিত সোভিয়েট আর্ম্মির পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

জেনারেল চেনিয়াকোভস্কীর জন্ম ইউক্রেনে। ইনি একজন য়িহুদী রেলওয়ে মজুরের ছেলে। খেত-মজুরের কাজে ইঁহার বাল্যকাল অতীত হয়। নভোসিবিস্কে কাজ করার সময় সর্ব্বপ্রথম ইনি লাল ফৌজে যোগদান করেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় চেণিয়াকোভস্কী ছিলেন লিথুয়ানিয়ার একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের নায়ক। এই সময়ে চেণিয়াকোভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ অনেক বেশী শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে দ্বিনা নদীর তীরে তাহাদের ঘাঁটিগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেই সময়ে এই বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য জেনারেল চের্ণিয়াকোভস্কী ও তাঁহার বাহিনীর ৭২ জন লাল ফৌজ সোভিয়েট সরকার হইতে এই যুদ্ধের সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করেন।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে ইনি নীপার নদী অতিক্রম করেন। মৃত জেনারেল ভাটুটিন ইঁহাকে কিয়েভ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর পুরোভাগে রাখিয়াছিলেন। কিয়েভের পর তিনি জিতোমির, সেপ্টভ্কা ও টার্ণোপোল অধিকার করেন।

তারপর জেনারেল চেণিয়াকোভস্কীকে ভিটে... রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁহার সে... বাহিনী ভিটেবস্ক, ওর্শা, বরিসভ, ভেলুকি এ... মিনস্ক দখলের গৌরব লাভ করে।

এই মৃতবীরের প্রতি সম্মান দেখা... সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে ইঁহ... সোভিয়েট লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ...তে সরকারী ভাবে সমাহিত করা হইবে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা হইবে। ষ্টালিনের আদেশক্রমে ইঁহার সম্মানার্থ ১২৪টি কামান হইতে ২৪ বার তোপ... হয়।

বিশেষ সংখ্যা

বস্ত্রাভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ : বস্ত্রহরণের জন্য দায়ী কে ?

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪৩-৪৪শ সংখ্যা] ১৫ই মার্চ্চ, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ১লা চৈত্র '৫১ [দাম দুই আনা

দায়ী কণ্ট্রোল বোর্ড — উহাকে দূর করুন

বিশ হাজারের জনসভায় কাপড় রেশনের দাবী

কাপড়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। দেহের লজ্জা নিবারণের জন্য লজ্জাসম্ভ্রমের মাথা খাইয়া কলিকাতায় আরও হাজার হাজার নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের লাইনে দাঁড়াইয়া কাপড়ের বদলে পুলিশের লাঠি সহিতে বাধ্য হইতেছে। ৬ই তারিখে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে একটি কাপড় দোকানের লাইনে পুলিশ কর্ত্তৃক "জনতা নিয়ন্ত্রণের" চেষ্টার ফলে হরেন্দ্রনাথ সাহা নামক একজন যুবক গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশের "নিয়ন্ত্রণ" হইতে প্রাণভয়ে পলাইতে গিয়া শৈলবালা দাসী নামক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা লাইনের পাশেই বিশেষ ধরণের লরী চাপা পড়ে। যদি সে মরিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পরিজনেরা হয়তো সরকারকে ধন্যবাদ দিবে, কারণ মৃতদেহ হইতে কাপড় খুলিয়া পরার ঘটনা এই সমৃদ্ধ রাজধানীর শ্মশানগুলিতে বিরল নয়। আহত দেহের রক্তের দাগ সে কাপড়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বিবস্ত্র নরনারীর চোখের জল সে দাগ মুছিয়া দিতে পারিবে।

কাপড়-তালাক !

কাপড়ের অভাবে বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সংসার পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। রংপুর জেলার রাজারহাট ইউনিয়নে কাপড় দিতে পারিবে না বলিয়া জনৈক মুসলমান কৃষক প্রিয়তমা স্ত্রীকেও "তালাক" দিতে বাধ্য হইয়াছে। স্ত্রী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিয়া নিজের লজ্জা নিবারণ করুক—সরল চাষী ইহাকেই তাহার ভালবাসার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। ঐ ইউনিয়নেরই আর একজন কৃষকের স্ত্রী কাপড়ের অভাবের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সেনাই ইউনিয়ন হইতেও এরূপ একটী ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। ঐ সব অঞ্চলে বস্ত্রহীন মুসলমান চাষীদের মধ্যে "কাপড়-তালাক" বলিয়া একটী নূতন শব্দই তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে।

ময়মনসিংহ শহর হইতে শ্রীসুনির্ম্মল সেন লিখিয়াছেন, "জিলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌলবী গিয়াসউদ্দীন পাঠান আমাকে বলিলেন যে কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধু-পত্নীর অঙ্গাচ্ছাদনের অবস্থা দেখিয়া লজ্জায় সেদিকে চাহিতেও পারেন নাই। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্ত্রীর দুইখানি কাপড় বন্ধুকে পাঠাইয়া দেন।

পাঠান সাহেবের কথায় অতিরঞ্জনের আশঙ্কা নাই। বছরে মাথা পিছু দশ গজ কাপড় ধরিলেও ময়মনসিংহ জেলায় প্রতি মাসে প্রায় ৩৫০০ হাজার গাঁট কাপড় আসা দরকার। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের জুন হইতে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট বিশ মাসে ঐ জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৩৬৬৩ গাঁট কাপড় আমদানী হইয়াছে। **অর্থাৎ ময়মনসিংহের লোকেরা সারা বছরে মাথা পিছু মাত্র আধ গজ করিয়া কাপড় পাইয়াছে।** কিন্তু দু তিন গুণ দাম দিলে চোরাবাজার হইতে যথেষ্ট কাপড় কিনিতে পারা যায়।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ হইতে খবর আসিয়াছে যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কোন বাজারেই কণ্ট্রোল বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পাওয়া যায় না। মফঃস্বল এলাকার জন্য ৮।১০ জন কোটা হোল্ডার আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাপড় কোথায় বিক্রয় হয় কেহ বলিতে পারে না। অবশ্য চোরাবাজারে কাপড় পাওয়া যায়।

৩৬ কোটী গজ কাপড় গেল কোথায় ?

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই কাপড়ের এই অবস্থা। অথচ বাংলায় কাপড় সরবরাহের পরিমাণ অনুসারে বর্ত্তমান অভাবের কোনো অজুহাত নাই। দিল্লীর সরকারী হিসাব মতে ১৯৪৪-এর জুলাই হইতে ১৯৪৪-এর নভেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে বাংলায় অ-সামরিক লোকের জন্য যে কাপড় পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ :

বাহিরের আমদানী	২০৫৬৩৪০০০ গজ
বাংলা মিলের প্রস্তুত	৮২১৫২০০০ ,,

মোট প্রায় ২৯ কোটী গজ

অর্থাৎ পাঁচ মাসে বাংলা দেশের জনসাধারণের নামে মাথা পিছু প্রায় পাঁচ গজ করিয়া কাপড় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁতের কাপড়ও নাকি মাথা পিছু প্রায় ১ গজ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ মাসে মোট ছয় গজ অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১৩ গজ করিয়া কাপড় বাংলা দেশের প্রত্যেকটী মানুষের নামে পাওয়া যাইতেছে—ইহাই স্যর আজিজুল হক ঘোষণা করিয়াছেন। শিশুদের প্রয়োজন কিছুটা কম করিয়া ধরিলে এই হিসাব মতে বাংলায় প্রত্যেক লোকের বৎসরে দুখানি ধুতি বা শাড়ী এবং দুটী কামিজ ন্যায্য দামে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া উচিত।

একথা সকলেই বুঝিতে পারে যে কলিকাতায় চালের রেশনিংয়ের মত বাংলার সমস্ত লোকের জন্য কাপড়ও যদি রেশন করিয়া বিলির ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে এক জোড়া ধুতি-শাড়ী ও দুটী কামিজে প্রত্যেক লোকই কষ্টে সৃষ্টে চালাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু আমলাতন্ত্র ও কারবারীদের চুরি, ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতায় রেশনিং হইতে পাইতেছে না, কাপড় চোরাবাজারে গুম হইয়া যাইতেছে, লোকেরও কাপড় মিলিতেছে না। ইহার জন্য প্রধান দায়িত্ব কাহাদের ?

খুচরা দোকানীরাও চোরাকারবার করে সত্য, কিন্তু কলিকাতা ও মফঃস্বলে সরকারের হিসাব হইতে দেখা যায় (উহার কয়েকটী উদাহরণ আমরা উপরে দিয়াছি) আমদানী ও প্রস্তুতের তুলনায় খুচরা কারবারীদের কাছে কাপড় প্রায় পৌঁছায় নাই বলিলেই হয়। সুতরাং আমদানী-কারক পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়ী, বাংলার কাপড় কলের মালিকশ্রেণী, সরকারী আমলাতন্ত্র, এবং উহাদের মনোনীত প্রাদেশিক বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডই কাপড়ের দুর্ভিক্ষ ও চোরাবাজারের জন্য দায়ী। এবং চোরাবাজারে কাপড় চালান করার ব্যাপারে ইহাদের অনেকেই পরস্পরকে সাহায্য করে।

ছোট চোর

কয়েকটী ঘটনার বিবরণ দিতেছি। আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের হিসাব মত কুষ্টিয়ায় বাজারে নাকি প্রতি মাসে ৬০ গাঁট বা ২৪০০ খানি মোহিনী মিলের মিহি ধুতি আসে। কিন্তু কণ্ট্রোল দামে বাজারে কেহ ধুতি কিনিতে পায় না।

(১১ পৃষ্ঠা দেখুন)

চোরাকারবারীদের নাম গোপনের জন্য

পুলিশ ঘুষ লয় ?

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।১।৪৫ :

কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া পুলিশ বড়বাজারের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৭৮ গাঁট কাপড় উদ্ধার করে। উহার মূল্য ১।০ লক্ষ টাকা হইবে।

ষ্টেটসম্যান, ১১।২।৪৫ :

এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিশ কলিকাতার লোহিয়া নর্ম্মল লেনের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৫০,০০০, টাকা মূল্যের ধুতি ও শাড়ী উদ্ধার করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।৩।৪৫ :

এনফোর্সমেণ্টের বিভাগের পুলিশ উত্তর কলিকাতা মনোহর দাস ষ্ট্রীটে এক দোকান হইতে ২৫০০০, টাকা মূল্যের ধুতি, শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্র উদ্ধার করে।

হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, ৬।৩।৪৫ :

বরিশাল জিলার ঝালকাটির এক মারওয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পুলিশ ২৫,০০০ টাকা মূল্যের কাপড় উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ ব্যবসায়ীর ঐ কাপড় পায়খানায় লুকানো ছিল।

বিনা লাইসেন্সে ১০,১৫৬ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় রাখিবার অভিযোগে পুলিশ সেতাবগঞ্জের (দিনাজপুর) এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ন্যাশনালিস্ট, ৭।৩।৪৫ :

এনফোর্স বিভাগের পুলিশ মধ্য কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ীর গুপ্ত গুদাম হইতে ১০,০০০, টাকা মূল্যের ৪ গাঁট কাপড় উদ্ধার করিয়াছে।

ন্যাশনালিষ্ট, ১০।৩।৪৫ :

এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিশ হারিসন রোডের এক দোকান হইতে ৮ গাঁট কাপড় ও ৬৭৬ গজ সার্টের ছিট উদ্ধার করিয়াছে।

[এই সব চোরাকারবারীর নাম পুলিশ বা সংবাদ-পত্র ছাপে না কেন ? ঘুষের জন্য কি ? —জঃ সঃ]

গত রবিবার কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এই বিরাট সভায় দাবী করা হইয়াছে—জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বে কাপড়ের রেশনিং চাই, বর্ত্তমান কণ্ট্রোল বোর্ডকে দূর কর!

সরকারী শ্রমিকনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াও

বাংলা সরকারের শ্রমিকনীতির প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৪ঠা মার্চ্চ হইতে ১৮ই মার্চ্চ একপক্ষ কাল প্রদেশের সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নির্দ্দেশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে জনসাধারণের হস্তক্ষেপ না হইলে সমগ্র দেশের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

১৯৪৩ সালে ছিল চাউল-আটার দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্দ্দিনে শ্রমিকরা অনেকক্ষেত্রেই বাঁধা দরে খাদ্য আদায় করিয়া কারখানার কাজ চালু রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ আসিল জীবন ধারণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। তাহার উপরে আসিল মহামারী। শ্রমিকদের পরিবার প্রতিপালন এক কঠিন সংগ্রামে পরিণত হইল।

সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান অভাবঅভিযোগ শ্রমিকদিগকে কি ভাবে ধর্ম্মঘটের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহা নীচেকার হিসাব হইতেই দেখা যায় ১৯৪৩ সালে সারা ভারতে ধর্ম্মঘটে মোট কাজের দিন নষ্ট হয় ১২৯১০০০ দিন।

১৯৪৪ সালে অক্টোবর পর্যান্ত মাত্র ১০ মাসেই দেখা যায়, কাজের দিন নষ্ট হয় ৩৭৭৯০০০।

হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, যে সমস্ত কলকারখানায় ধর্ম্মঘট হইয়াছে তাহার মধ্যে কাপড়ের কল, চিনির কল, লোহা কারখানা, কোনটাই বাদ যায় নাই। এবং এই সকল ধর্ম্মঘটের কারণ সম্পর্কে 'গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান লেবার গেজেট' মন্তব্য করিয়াছে, "ধর্ম্মঘটের শতকরা ৭৩টি ক্ষেত্রে একমাত্র বা প্রধান কারণ হইল মজুরী, মাগগীভাতা, অথবা দুই সমস্যাই।" ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতির সম্ভাবনা কিছু মাত্র কমে নাই, বরং দিন দিন বাড়িতেছে।

অথচ ইহার প্রত্যেকটি ধর্ম্মঘট এড়ান সম্ভব ছিল, এবং কাগজে কলমে তাহার ব্যবস্থাও আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাসার জন্য কয়েকটী আইন রচিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভারত রক্ষা আইনের ৮১ (ক) ধারায় "এডজুডিকেশন কোর্ট" বসানো, এসেনশিয়াল সার্ভিস অর্ডিনান্স অনুসারে বিশেষ বিচার এবং টেকনিক্যাল পারসোন্যাল অর্ডিনান্স অনুসারে নিয়োগ ছাঁটাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্যতম। যখনই শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে এই সকল আইন প্রয়োগে তাহার দ্রুত আপোষ-মীমাংসা হইবে, মালিক এবং শ্রমিক তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে, উৎপাদনের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না—ইহাই ঐ সকল আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু গত দুই বছর যাবৎ কার্য্যতঃ যাহা ঘটিতেছে তাহা কেবল প্রহসনই নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক নীতিও বটে।

জীবনধারণের খরচ বৃদ্ধি, জবরদস্তিমূলক ছাঁটাই, বাধ্যতামূলক কাজ বন্ধ, বা যে কোন ধরণের কারণে মালিকের সহিত বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, সরকারী আমলারা প্রথমে তাহা আমলেই আনেন না। লেবার কমিশনারের দপ্তর হইতে রাইটার্স বিল্ডিংএর "লেবার ডিপার্টমেণ্ট" অফিসার, ডেপুটি অফিসার, এমনকি মন্ত্রীপর্য্যন্ত সকলের মুখেই এক কথা—ধর্ম্মঘটের নোটিশ না দিলে কি করিয়া প্রমাণ হইবে যে সত্য সত্যই কোন বিরোধ বর্ত্তমান! শতকরা ৮০।৯০ জন শ্রমিকের গণদরখাস্তেরও কোন মূল্য নাই। জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা এই ধরণের দরখাস্ত লইয়া ঐ সকল সরকারী দপ্তরে কমপক্ষে ৩০ বার ডেপুটেশন পাঠাইয়াও "কোর্ট" বসাইতে পারিল না। চটকলের লক্ষ শ্রমিকের আবেদনও সফল হইল না।

তারপর যেখানে কোর্ট বসিল সেখানে চলিল শুনানী লইয়া গড়ীমসী। একজন মাত্র হাকিম, তাঁহাকে সাধারণ আদালতে চাকুরী করিয়া আবার এ কাজে ডবল খাটুনী দিতে হয়। তাই দেখা গেল, বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর শ্রমিকরা এক বছর আন্দোলন করিবার পর গত ৮ই ডিসেম্বর "কোর্ট" বসাইবার আদেশ জানিতে পারিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোর্টের শুনানী হইল না। কর্পোরেশন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একবার শুনানী হইয়া বিচারের কাজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকিল। ট্রামের ছাঁটাই মজুরদের মামলার রায় লেবার কমিশনারের দপ্তরের চোরাবালিতে আটক পড়িল।

রায় প্রকাশের বিলম্ব এক রহস্যজনক ব্যাপার। মামলার শুনানী শেষ হইল, কিন্তু মাসের পর মাস চলিয়া যায় রায় বাহির হইতেছে না। লেবার কমিশনারের দপ্তর বলেন, লেবার ডিপার্টমেণ্ট, লেবার ডিপার্টমেণ্ট বলেন, লেবার সেক্রেটারী জানেন। ট্রামের ক্ষেত্রে হিসাব লইয়া দেখা গেল, প্রত্যেকটি মাস বিলম্বের জন্য কোম্পানীর কেবল মাগগী ভাতা বাবদে বাঁচিয়া গিয়াছে ৪০।৫০ হাজার টাকা। ভারতীয়-লোহা কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আরও অদ্ভুত ব্যবস্থা হইল। প্রায় ছয় মাস পরে যখন কোর্টের রায় বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তাহাদের প্রধান দাবী মাগগীভাতা সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সরকারই মাঝে পড়িয়া স্থগিত রাখিয়া দিল।

সম্পাদকীয়

ট্রাম শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়েশনের পরাজয় ঘটিয়াছিল। মন্ত্রিমণ্ডলীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এবার তাহারা পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইল।

অনেক ক্ষেত্রে কোর্টের রায় কার্য্যকরী না করার ব্যাপারেও মালিকদের স্বাধীনতা দেওয়া হইল। ট্রামের শ্রমিকরা ক্যাণ্টিন, ছুটি প্রভৃতি ব্যাপারে যে রায় আদায় করিয়াছিল, কোম্পানী সরকারী আমলাদের সহযোগিতায় তাহা কার্য্যকরী করিতে অস্বীকার করিল।

টেকনিক্যাল পারসোন্যাল অর্ডিনান্সের বিচার তো নিছক প্রহসন! শ্রমিকদের জবরদস্তি ছাঁটাইএর প্রতিবাদে কোন কথাই খাটে না, মালিকদের কথাই সেখানে শেষ কথা। মজুরী দান আইন, ক্ষতিপূরণ আইন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও শ্রমিকরা কোন সুবিচার পায় না। অল্প সময়ের মধ্যে শত শত মামলা শেষ করিয়া আমলারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য "পালন" করেন।

লেবার কমিশনার একাধারে বহু কাজের ভার লইয়া প্রায় সারাক্ষণ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাকে অফিসে পাওয়া কঠিন। শ্রমমন্ত্রী অথবা প্রধান মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন গেলে তাঁহারা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাপারে নিজেদের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন এবং হস্তক্ষেপে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ফলে শ্রমিকরা ন্যায় বিচারের আশায় সর্ব্বত্র যেভাবে হয়রাণ হয় তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ সম্পর্কে সালিশী মীমাংসার জন্য বাংলাদেশে কোন সালিশী আদালতের ব্যবস্থা নাই। সেই দিকে নজর দেওয়া ত দূরের কথা, সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট আর একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রমিক বিরোধের মামলা এডজুডিকেশন কোর্টের হাতে না দিয়া কয়েকজন এসেসর নিয়োগ করিয়া

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘটনা ও রটনা

মেরিলিন জোন্‌স

পি, সি. জোশী তিন হপ্তা আগে জনযুদ্ধে লিখেছিলেন যে কলকাতায় কোনো কোনো সৈন্যের হাতে মা-বোনেদের দৈনিক অসম্মানের কথা "লোকের চোখে তুলে ধরবার সাহস আজ বাংলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের নেই। দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের ফটো ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকাই প্রথম প্রকাশ করেছিল। সেই অপমানের ইতিহাসের কি আবার পুনরাবৃত্তি হবে?"

ঠিক তাই হয়েছে।

ষ্টেট্‌সম্যানে আমেরিকান সৈন্যদের প্রতি হতভাগিনী মেরিলিন জোন্‌সের বিখ্যাত চিঠি বার হওয়ার পর সরকারী হুকুম আসে যে ঐ চিঠি সম্বন্ধে কেউ আর কোনো উল্লেখ করতে পারবে না। ষ্টেট্‌সম্যান থেকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র পর্য্যন্ত সবাই এ হুকুম গলাধঃকরন করতে বাধ্য হয়।

তারপর দিল্লী এসেম্বলিতে গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে স্যর ওলাফ ক্যারো একটী প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে খারাপ মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যেই এ চিঠি ছাপানো হয়েছিল। তাঁর কথার ভেতরে ইঙ্গিতটা হল যে এ ধরণের ব্যাপার ঘটেছে তার কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং অনুসন্ধানেরও দরকার নেই।

স্যর ওলাফ ক্যারোর ধৃষ্টতাপূর্ণ ইঙ্গিতেও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি নীরবই থাকে। কিন্তু ষ্টেট্‌সম্যানই অগ্রণী হয়ে এই অসম্মানজনক নীরবতা ভঙ্গ করেছে, বলেছে যে এরপর গবর্ণমেন্টের "নিষেধাজ্ঞা আমরা আর মানতে পারছি না।" আরও খবর দিয়েছে যে, মেরিলিন জোন্‌স অবশ্য নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করেছিল, কিন্তু তারপরে আরও একটী ঠিক ঐ রকম ঘটনার বিবরণ ঠিকানা-সহই তাদের কাছে এসেছিল। অনুসন্ধানের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য তার আমেরিকান প্রণয়ীকে বিশেষ অনুমতিও দিয়েছিলেন।

* * *

মেরিলিন জোন্‌সের চিঠির মধ্যে সমস্ত আমেরিকান সৈন্যকে এই রকম দুর্ব্যবহারের জন্যে দায়ী করা যে ঠিক হয় নি তা ষ্টেটসম্যান স্বীকার করেছে, আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু কোনো কোনো সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় নানা রকম নৈতিক বিকার ঘটছে, দেশের সামনে বেশ কঠিন একটা সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বিকার বা সমস্যার বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশের কণ্ঠরোধ করলে একদিকে বিকার বাড়বে অন্যদিকে যে-নৈতিক শক্তি ফাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার তারও পরাজয় ঘটবে।

* * *

পেটে খেলে পিঠে সয়

এই ধরণের ও অন্যান্য নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে শুধু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজই ভুগছে না—ভারতীয় নর-নারীর জীবনেও কতটা আঘাত আসছে তার কিছু পরিচয় আমরা গত সংখ্যা জনযুদ্ধে দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের কথা নিয়ে ষ্টেটস্‌ম্যান যে সাহস দেখাতে পারল—আমাদের সমাজের কথা নিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তার এক কণাও দেখাতে পারল না। দেশবন্ধু বেঁচে থাকলে বোধ হয় লজ্জায় গলায় দড়ি দিতেন।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে জামিন, জরিমানা বা বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই বুঝি আমাদের সংবাদপত্রগুলি কথা বলে না। তারপর খোঁজ করে দেখলাম যে আরও শক্ত বাঁধন আছে—আমদানীর বাঁধন। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রেসে একখানি আমেরিকান কাগজ নিয়মিত ছাপা হয়, তার থেকে শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার এণ্ড কোম্পানীর মাসে প্রায় হাজার পনের টাকা আমদানী হয়। শ্রীতুষারকান্তির প্রেসেও ছাপা হয় আর একখানি আমেরিকান কাগজ সেও ঐ রকম হাজার পনেরর ধাক্কা। ঘাঁটাতে গেলে যদি এমন মোটা আমদানীই বন্ধ হয়ে যায়। তার চেয়ে চুপ করে যাও—পেটে খেলে পিঠে সইবেই।

* * *

পি. সি. জোশীর পূর্ব্বোক্ত লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়ে কয়েকটী অতি-বিপ্লবী ছাত্র, (না ভয় পাবেন না, মেয়েদের পক্ষে দাঁড়িয়ে মার খাবার মত উত্তেজনা তাদের হয় নি) বার করেছে একটি হ্যাণ্ডবিল। পি, সি, জোশী বাংলার নেতা, সংবাদপত্র প্রভৃতির নীরবতার সমালোচনা করেছেন বলে তারা উত্তেজিত ভাবে গাল দিয়ে বলেছে-"ননসেন্স"। এবং মিঃ জোশীকে তারা আর "বিপ্লবী" বলবে না বলে শাসিয়েছে। অবশ্য আনন্দবাজার প্রভৃতিকে তারা বিপ্লবী নেতা বলে বরণ করেছে কিনা তা এখনও জানতে পারিনি।

* * *

গভীর দুঃখের কথা

একটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা কিভাবে কয়েকজন নিগ্রোর আক্রমণ থেকে রাস্তার লোকের সাহায্যে বেঁচে গিয়েছিলেন সে খবর জনযুদ্ধের গত সংখ্যায় বার হয়েছিল।

জনৈক হিন্দুসভাপন্থী কর্পোরেশন কাউন্সিলর খবরটী পড়ে মহিলাটীর আত্মীয়ের কাছে মন্তব্য করলেন—'কেমন, ওকে আরও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিশতে দাও—এখন স্ত্রী-স্বাধীনতার ফল হাতে হাতে পেলে তো!" অনেক আত্মীয়ও এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে ঘরের কথা বাজারময় রাষ্ট্র হয়ে গেল।

উপরোক্ত কাউন্সিলরটী সম্প্রতি বস্তি থেকে বহু গরীব প্রজাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর চরিত্রে বোনের অসম্মানের কথা প্রতিবাদের প্রচেষ্টা জাগাবে না, শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের ইচ্ছাই জাগাবে তা বিচিত্র নয়।

কিন্তু শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়দের অনুযোগ আমাকে বড়ই দুঃখ দিল। সামাজিক হোক, রাজনীতিক হোক যে কোন কারণে আমাদের অসম্মানকে আমরা লুকিয়ে রাখি, তাতেই অপমানকারীর দাপট বাড়ে। এই বিপদের কথা প্রকাশ করে বলবার সাহস যে মেয়ের আছে—অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই তো প্রথম সৈনিক। নিজের বোন হলে ব্যক্তিগত সামাজিক দুর্ব্বলতায় কেউ কেউ শুধু কলঙ্কের কথা ভাবেন, কিন্তু অন্যের বোন হলে সকলেরই গা জ্বলে ওঠে, প্রতিবিধানের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা সুরু হয়। দেশের মধ্যে যে হাজার হাজার ভাই-বোন আছেন তাদের কাছেই মহিলাটী তাঁর বিপদের কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। তাতে তাঁর গৌরবই বেড়েছে, ভাই-বোনের মনে সাড়া তোলার কাজও সুরু হয়েছে।

কমিউনিষ্ট বলেই মহিলাটী এ সাহসে অগ্রণী হতে পেরেছেন। ইস্তাহারবাজ ছাত্র কয়জন প্রশ্ন করেছিলেন—কমিউনিষ্টরাই বা কি করছে? আশা করি আর জবাব দিতে হবে না।

* * *

অমর কাহিনী

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ 'প্রবাসী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে কমিউনিষ্টরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের চর সে সম্বন্ধে বিরাট গবেষণা প্রকাশ করেছেন। এখন স্থানাভাব, তাঁর মতামত সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে জবাব দেব।

শুধু একটা কথা। তিনি লিখেছেন যে কমিউনিষ্টরা "শ্রমিক সম্প্রদায়কে বুঝাইল, "দেখ ভাই, ফাসিজমকে ধ্বংস করিতে হইলে যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিলে চলিবে না। ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়া যাও। দেশে যে-সব বিদ্রোহাত্মক কার্য্য চলিতেছে তাহা জাপানের গুপ্তচর পঞ্চমবাহিনীর কাজ, তোমরা ইহাতে যোগ দিও না।"

প্রবন্ধের এই অংশের আগেই তিনি কমিউনিষ্টদের ইস্তাহার থেকে কোটেশন দিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তারপরে শ্রমিকদের প্রতি এই উক্তিটুকুও কোটেশনের মধ্যে, সুতরাং লোকে সহজেই ভাববে যে এটুকুও কোনো কমিউনিষ্ট প্রচার পত্র থেকে নেওয়া।

এই কোটেশনটী যে অমর বাবুর মনগড়া নির্জ্জলা মিথ্যা তা বলাই বাহুল্য। তারপর তিনি লিখেছেন, "সেই সময়কার People's War খুঁজিয়া জোগাড় করিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন কিরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহারা কংগ্রেস-ওয়ালাদের পঞ্চমবাহিনী বলিয়া প্রচার করিতেছিল।" অমরবাবু নিজেই বোধহয় সে সময়কার Peoples' War "খুঁজিয়া জোগাড় করিতে" পারেন নি, তাই পড়ারও সুবিধা হয়নি—কিন্তু তাই বলে কমিউনিষ্টদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে কোন অসুবিধে হয়নি। আশা করি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবের বেলায়ও তিনি এই ধরণের সত্যের আশ্রয় নেন না।

কিন্তু আমি অমর বাবুর কথা ভাবছিনে, ভাবছি প্রবাসীর কি হ'ল। রামানন্দবাবু যখন বেঁচে ছিলেন তখন সততার জন্যে প্রবাসী বিখ্যাত ছিল, আমার মনে আছে কোনো প্রবন্ধে ষ্ট্যাটিসটিক্‌স পর্য্যন্ত মূল বইয়ের উল্লেখ না থাকলে তিনি গ্রহণ করতেন না। আর আজ মিথ্যা কোটেশনও পার হয়ে যাচ্ছে!

—দেশাভিমানী

ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে নূতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র

[আসাম হইতে জনযুদ্ধের বিশেষ প্রতিনিধির তার]

আসাম ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আসামের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া একটী উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ খাড়া করিবার পরিকল্পনা আঁটিতেছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে যদি কোনো পরিবর্ত্তন আসে তবুও সেই পরিবর্ত্তন হইতে ঐ অঞ্চলকে তফাৎ করিয়া উহাকে সোজাসুজি সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে রাখা হইবে—ইহাই উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। চীন, ব্রহ্ম ও ভারতের সংযোগস্থলে এইরূপ একটী বৃটীশ রাষ্ট্র গঠন করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এই তিনটী দেশকে নিজের তাঁবে রাখিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সীমান্ত প্রদেশ হইতে চীন, ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথগুলি বৃটীশের অধীনে থাকিবে। ব্রহ্মদেশের তেল ও কাঠের অঞ্চল এবং আসামের চা-বাগান অঞ্চল—এই দুইএর মাঝামাঝি এই ভাবী রাষ্ট্রের অবস্থান। ব্রহ্মের তেল, টিম্বার ও আসামের চা-বাগানে বৃটীশ মূলধনীদের বহু টাকা খাটিতেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ দখলে রাখিতে পারিলে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ আসাম ও ব্রহ্মদেশে তাহার শোষণ বজায় রাখিতে পারিবে। তাহারা ব্রহ্ম ও চীনের ব্যবসা বাণিজ্যে আধিপত্য করিতে সক্ষম হইবে।

সারা ভারতের জন্য কুপল্যাণ্ড তাহার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র গঠন করিয়া ভারতকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিতে চাহিতেছে এবং প্রত্যেকটী রাষ্ট্রের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ বপন করিবে স্থির করিয়াছে, ঠিক তেমনি আসামের উত্তর পূর্ব্বে এই নূতন রাষ্ট্র গঠন করিয়া তিনটী দেশের উপর বৃটীশ-কর্তৃত্ব বজায় রাখার ষড়যন্ত্রও চলিতেছে। এই সীমান্ত-রাষ্ট্র ভারতের জন্য কুপল্যাণ্ড পরিকল্পনারই অঙ্গ বিশেষ।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ এইভাবে গঠিত হইবে। সাদিয়া ফ্রণ্টিয়ার ট্র্যাক্ট, নাগা পাহাড় অঞ্চল, উত্তর কাছাড় হিল্‌স্, মণিপুর ও লুসাই হিল্‌স্ আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে এবং ইহার সহিত চীন হিল্‌স্ ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল সংযুক্ত করিয়া এই নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইবে। জাপমুক্ত উত্তর ব্রহ্মের কিছু অংশও ইহার সহিত সংযুক্ত হইবে। এই প্রদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরাসরি বৃটীশের অধীনে একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নূতন রাষ্ট্র হইতে হইবে।

এদিকে আসামের বাকী অংশ এমন কি খাসি জয়ন্ত ও গারো পার্ব্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া কুপল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-জোন তৈরী করা হইবে।

বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য এখন হইতেই কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে।

এই নূতন অঞ্চল পরিচালনা করিবার জন্য মিঃ জে, পি, মিল্‌স্ আই-সি-এস ভাবী-কর্ত্তা হিসাবে কাজ করিতেছেন। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের উপর কোন নূতন শাসনতন্ত্র চাপান হইলে এই সমস্ত ননরেগুলেটেড অঞ্চলে তাহা প্রযুক্ত হইবে না এবং ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে বৃটীশের প্রত্যক্ষ অধীনে রাখা হইবে।

ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি

যাহাতে আসামের জনসাধারণ এবং কংগ্রেস, লীগ ও পার্ব্বত্য জাতীয় লীগের তরফ হইতে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোন বাধা আসিতে না পারে সেজন্য আসামে যেনতেন প্রকারেণ বর্ত্তমান মন্ত্রীত্ব শাসনের বদলে ৯৩ ধারার শাসন চালাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বোধ হয় এইজন্য আসামের গবর্ণর বাহাদুর প্রত্যেকটী পার্টির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পার্ব্বত্য জাতির নেতা মিঃ ভিস্বার দেওরীকে তিনি নাকি বলিয়াছেন—সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্ব্বত্য জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন, তাঁহার উপর ভরসা করিয়া থাকুন। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বেলীরাম দাসকে তিনি নাকি উস্কাইয়াছেন—আসামের স্বার্থের পক্ষে সমূহ বিপদ হইতেছে বাংলা হইতে আগত লোকেরা—ইহার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। আবার লীগনেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁকে গভর্ণর নাকি আশ্বাস দিয়াছেন—গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবে বিদেশ হইতে আগত লোকদের উচ্ছেদ করার কথা আছে সত্য কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করা হইবে না।

এইভাবে আমলাতন্ত্রের চেষ্টা হইতেছে আসামের জমি সমস্যার সমাধানে যেন আসামের জন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন আপোষ না হইতে পারে। ফলে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে মুসলীম লীগের সহিত কংগ্রেস ও উপজাতি-লীগের কোন আপোষই হইতেছে না। কোন সাল পর্য্যন্ত আগত লোকদের জমি দেওয়া হইবে সে বিষয়ে কেহ আপোষ করিতে প্রস্তুত নয়। কংগ্রেস ও উপজাতি-লীগের মধ্যে জমি ব্যাপারে লীগের মতের বিরুদ্ধে ঐক্য থাকিলেও তাহাদের নিজেদের ভিতর আবার অনেক অবিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে।

আত্মকলহের পরিণাম

আসামের জননেতাদের ভিতর এইরূপ বিভেদের ফলে এবারকার এসেম্বলি অধিবেশনে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক সদস্যই হাজির হইতেছেন। আসাম লীগ সভাপতি প্রমুখ লীগ নেতারা বাজেট আলোচনার সময় অনুপস্থিত আছেন। উপজাতির নেতারা এখনো পৌছান নাই। কংগ্রেস নেতারাও অনুপস্থিত। যাঁহারা হাজির আছেন তাঁহাদের ভিতরও দারুণ নিরুৎসাহ ভাব। ফলে স্যর সাহদুল্লা ভাবিতেছেন—তাঁরই জয়জয়কার। প্রথম দিনেই লোকাল বোর্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন ১৫ই জুন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য যে গবর্ণমেণ্ট-বিল উপস্থাপিত হয় তাহার বিরুদ্ধে বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই। স্যর সাহদুল্লা ইয়োরোপীয় চা-বাগান মালিকদের পক্ষে খুব লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা দিতেছেন—তিনি বলিতেছেন, ইহারাই ১২ লক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত প্রতিনিধি।

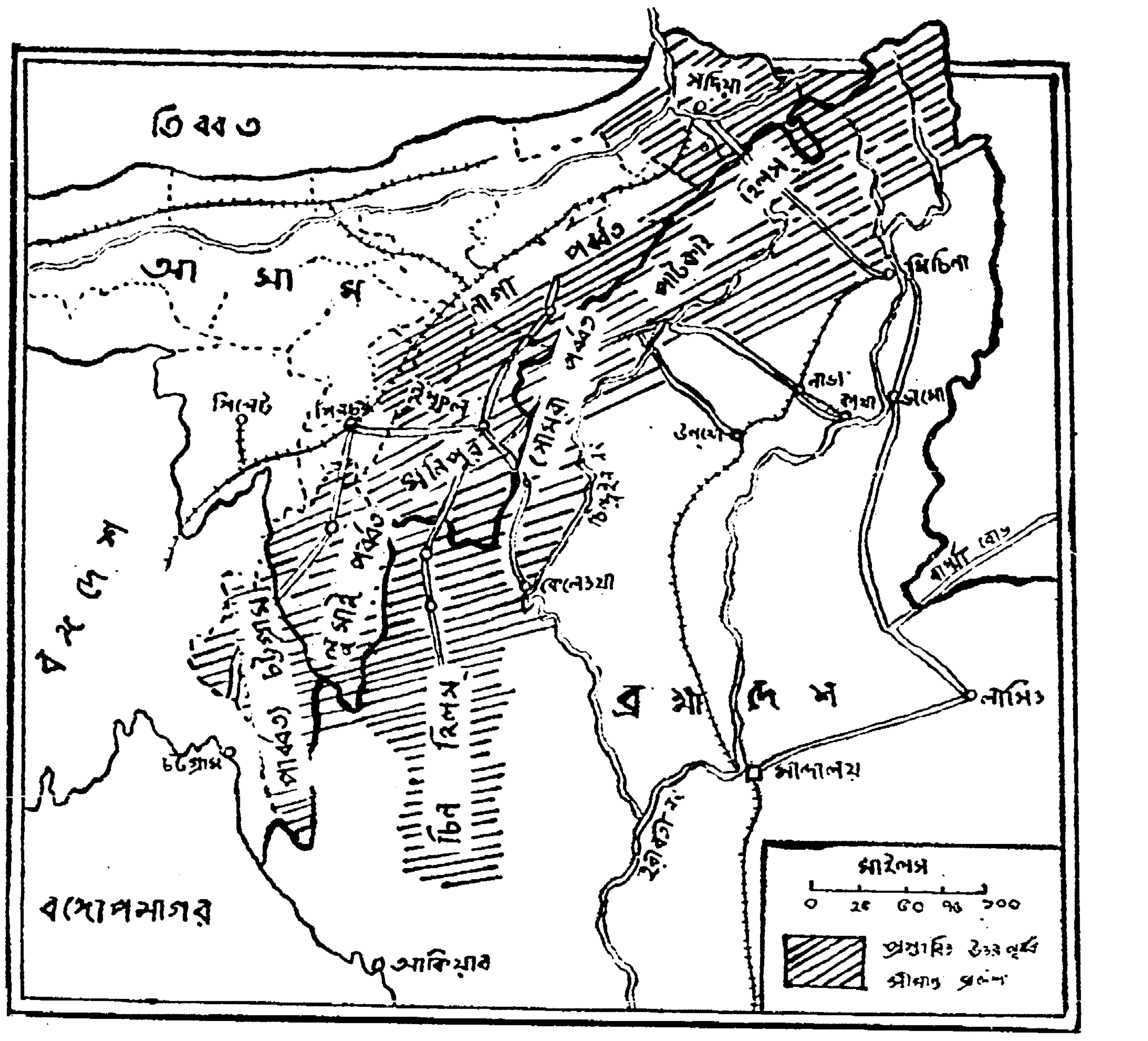

বস্ত্র সংকট ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে করুণাসিন্ধু রায়ের যেসব প্রস্তাব উঠে তাহার মধ্যে প্রথমটী গবর্ণমেণ্টের সুষ্ঠু সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাহৃত হয়, অপরটী ১৭টী পক্ষে ৩১টী বিপক্ষে ভোটে পরাজিত হয়। লীগ দল সরকারের পক্ষে ভোট দেয়। অথচ লীগের সভাপতির উপর পর্য্যন্ত নিষেধাজ্ঞার আক্রমণ আসিয়াছিল।

গত নভেম্বরের অধিবেশনে লীগ, কংগ্রেস ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক সদস্যরা (উপজাতি লীগের) সাহদুল্লার খাদ্য সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আর আজ দেখা যাইতেছে—ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা প্রতিদিনই গভীরতর হইতেছে।

এইভাবে ৯৩ ধারা প্রয়োগের আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী হইতে চলিয়াছে। জনসাধারণ মনে করিতেছে শুধু দুইটী পথই খোলা আছে—হয় সাহদুল্লা মন্ত্রীত্ব, না হয় ৯৩ ধারা।

কিন্তু সময় থাকিতে কংগ্রেস, লীগ ও উপজাতীয় নেতাদের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া বৃটীশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক হইয়া না দাঁড়াইলে আসামকে খণ্ডিত করিবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তই সফল হইবে।

কুয়োমিণ্টাঙের স্বেচ্ছাচারিতা চীনে ঐক্যের পরিপন্থী

(চুংকিং হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ২রা মার্চ্চ মার্শাল চ্যাং কাই শেক চুংকিংয়ে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিটমাটের জন্য কুয়োমিণ্টাং প্রস্তাব করিয়াছে এবং সে প্রস্তাব এখনও বলবৎ আছে—কিন্তু কমিউনিষ্টরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই প্রস্তাবগুলি কি তাহা কুয়োমিণ্টাংয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ ওয়াং শে-চে ১২ই ফেব্রুয়ারী চুংকিংয়ের একটী সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি মারফৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রস্তাবগুলি কেন প্রত্যাখ্যান করা হইল সে সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট প্রতিনিধি জেনারেল চু এন-লাই নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

চু এন-লাইয়ের বিবৃতি

চুংকিং ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী

১৪ই ফেব্রুয়ারী বৈদেশিক সাংবাদিকদের বৈঠকে ডাঃ ওয়াং শে-চে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার ভিতর সততা ও ন্যায়ের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বর্ত্তমান আপোষ আলোচনার সময়ে সরকার যে সকল তথাকথিত সুযোগ সুবিধা দিতে চাহিয়াছিলেন তিনি শুধু সেগুলিই বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সব তথাকথিত সুযোগ সুবিধা পাইতে হইলে তাহার পূর্ব্বে যে সকল সর্ত্ত মানিয়া নিতে হইবে তাহার উল্লেখও তিনি করেন নাই। প্রথম সর্ত্ত ছিল যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে জাতীয় সরকারের সামরিক পরিষদের চালনার অধীনে থাকিতে হইবে—অর্থাৎ কুয়োমিণ্টাঙের নেতৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে। কারণ জাতীয় সরকার কুয়োমিণ্টাঙের একনায়কত্বেই পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় সর্ত্ত ছিল যে, কুয়োমিণ্টাঙের একনায়কত্ব অবসানের কোন প্রশ্নই আসিবে না। উপরিলিখিত এই দুইটী সর্ত্তে ঐ সমস্ত তথাকথিত সুযোগ সুবিধার কোন অর্থই থাকে না। কিংবা সেগুলি কার্য্যকরীও হইতে পারে না। উপরন্তু, জাপবিরোধী শক্তিকে খর্ব্ব ও ধ্বংস করিতে সেই সব 'সুযোগ-সুবিধা' কোন প্রকারেই কোনও সুবিধা দান করে নাই।

কুয়োমিণ্টাঙের সর্ত্তের আসল অর্থ

"সুযোগ-সুবিধার" নামে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ঃ

(১) কুয়োমিণ্টাঙ সরকারের হাতে সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্পণ না করিলে কমিউনিষ্ট পার্টির কোন আইনগত সত্তা থাকিবে না।

(২) আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে জাতীয় সরকারের যে সামরিক পরিষদে কমিউনিষ্টদের নেওয়ার কথা হইয়াছিল তাহা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার কোনই ক্ষমতা নাই এবং কোনদিনই সে পরিষদের বৈঠকও বসিবে না।

(৩) "কার্য্যকরী সংসদ" নামধারী কুয়োমিণ্টাঙের অধীনস্থ তথাকথিত সামরিক মন্ত্রীসভার (উপরিলিখিত সর্ত্তগুলি মানিয়া এই সংসদে যোগদান করিবার জন্য কমিউনিষ্টদের আহ্বান করা হইত) রাষ্ট্রের কোন নীতি নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতাই নাই।

(৪) যতদিন পর্য্যন্ত একনায়কত্ব চলিতে থাকিবে এবং অন্য কাহাকেও এক বিন্দু ক্ষমতাও দিব না—এই সামরিক নীতি যতদিন অব্যাহত থাকিবে তখন 'তিনজনের কমিটি' কমিউনিষ্ট সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করিবার জন্য যে-সব কাজ করিবে তাহাতে কমিউনিষ্ট বাহিনীকে কুয়োমিণ্টাঙের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইবে। তাছাড়া, জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার কার কত শক্তি—এই ভিত্তিতে যদি বিচার করা হয় তাহা হইলে কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনীকেই পুনর্গঠন করা দরকার হইবে—কমিউনিষ্ট সেনাবাহিনীকে নয়।

উপরে পরিষ্কার ভাবে যে সব তথ্য বিবৃত হইল তাহা হইতে যে কেহই বুঝিতে পারিবেন যে কেন আমি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ হইতে সরকারের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।

কুয়োমিণ্টাং গণতন্ত্র প্রচলনে রাজী নয়

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার অন্য একটি দিকও রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যাখ্যানের আরও গুরুতর এবং জরুরী কারণ আছে। কারণটি এই যে, চীনের সমস্ত যুধ্যমান শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য একটি গণতান্ত্রিক সর্ব্বদলীয় সরকার এবং সম্মিলিত সামরিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের যে প্রস্তাব আমরা করিয়াছিলাম জাতীয় সরকার তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। জাতীয় সরকার, কুয়োমিণ্টাং এবং চীনের ডেমোক্রাটিক্ ফেডারেশনের নিকট আমরা একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম যে, জাতীয় সরকার সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করুক। একনায়কত্বের অবসান, বর্ত্তমান সরকারের সংস্কার সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকারে পরিণত করা এবং সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য একটি সর্ব্ববাদীসম্মত রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের খসড়া প্রস্তুত করা প্রভৃতি সমস্যার কথা ঐ সম্মেলনে আলোচিত হইবে। জাতীয় সরকার জবাব দিয়াছিলেন যে শুধু মাত্র আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে। এবং একনায়কত্বকে অব্যাহত রাখা ও যে কোন প্রকার সম্মিলিত সরকারের প্রস্তাবকে বাধা দেওয়া—এই দুইটি বিষয়কে সেই সম্মেলনের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

এই অবস্থায় আমাদের পার্টির কেন্দ্রকে সমস্ত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য আমি ইউনান

(১০ পৃষ্ঠা দেখুন)

★ বাংলার জাতীয় সঙ্গীত ★

বঙ্কিমচন্দ্র

জাতীয় আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় নাই, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করার সময় যখন আসে নাই, তখনও আমাদের কবিতা ও গানের মধ্যে পরাধীনতার বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছাড়াইয়া মুক্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বেই খাঁটী বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিতে পারিয়াছিলেন "দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" "আনন্দমঠে" বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীদলকে দিয়া দেশমাতৃকার বন্দনা করাইয়াছিলেন—"বন্দেমাতরম্"। "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী" বলিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার "ভারতসঙ্গীতে" আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" বলিয়া রঙ্গলাল সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন দেশের কাজে আত্মবলি দিবার জন্য। গোবিন্দচন্দ্র গাহিয়াছিলেন, "কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারে পার হবে"; "পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে" বলিয়া দেশবাসীর মর্ম্মান্তিক বেদনা ও লজ্জার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু প্রাধান্য কেন ?

কিন্তু স্বদেশী যুগ ও তাহার পূর্ব্বে লিখিত গানগুলির কয়েকটী বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে পড়ে। গানগুলি পড়িলেই বুঝা যায় যে আমাদের জাতিবোধের প্রধান অনুপ্রেরণা তখন ছিল হিন্দু ভাবধারা। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বাংলার সমাজজীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দুরাই তখন প্রধান। আজও স্বাধীন ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সর্ব্বব্যাপারে অগ্রসর হিন্দুদের প্রাধান্য ও প্রভাব কায়েম থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা, মুসলমানদের মনে রহিয়াছে। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে হিন্দুরাই আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদেরই মনে জাতীয়তার সঞ্চার প্রথমে ঘটে। অনুপ্রেরণার জন্য অতীতের দিকে ফিরিয়া চাওয়া মানুষের স্বভাব বলিয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্তরে হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু আদর্শের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা ঘটিয়াছিল। তাই বাংলাদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে জাতীয় ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহার প্রধান ফল হইল—হিন্দুমেলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত বহুদিন ধরিয়া জাগ্রত ভারতবর্ষের জয়নির্ঘোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ইহার ভাব ও ভাষার সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্ম ও চিন্তাধারার সম্পর্ক অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। ঐতিহাসিক কারণে "বন্দে মাতরম্" কংগ্রেসে প্রধান জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গীত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু মুসলমান দেশভক্তদের ঘনায়মান অভিযোগের ফলে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ইহার অনেকগুলি কলি জাতীয় সমাবেশে অব্যবহার্য্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। ফলে অনেক হিন্দু "বন্দে মাতরম্" অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে, অপরপক্ষে অধিকাংশ মুসলমানের কাছে ঐ সঙ্গীতের নূতন সংস্করণও মনঃপূত হইতে পারে নাই।

রঙ্গলাল যখন দেশবাসীকে মাতাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি রাজস্থানের হিন্দু গৌরবকেই উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করেন। হেমচন্দ্র এক নামাবলীমণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কণ্ঠে পরাধীনতার গ্লানি বিদূরণের আহ্বান জানাইয়াছিলেন, প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়াছিলেন।

পদ্ধতির সামান্য পরিচয় থাকিলেই জানা যায়। হিন্দুত্বের ছাপ স্বদেশী গানে সুস্পষ্ট।

ভবানীপূজা, বীরাষ্টমী, গণেশপূজা, গঙ্গাস্নানের পর রাখীবন্ধন ইত্যাদি ছিল স্বদেশীযুগের প্রধান উৎসব। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে যে স্বাদেশিকতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সুদৃঢ় করার জন্য শিবাজী উৎসবের প্রবর্ত্তন হইল। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার লেশশূন্য হইয়াও রবীন্দ্রনাথ তখন যে কবিতা লিখিলেন—"এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি", শিবাজীর এই কথা স্মরণ করিয়া যে ভাবে সেই "রাজতপস্বী বীরকে" প্রণতি জানাইলেন, তাহাতে যে মুসলমানের মনে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, একথা তিনি যেন বুঝিলেন না, কিম্বা বুঝিয়াও নিজের সহজাত হিন্দুত্বকে বর্জ্জন করিতে পারিলেন না। "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতির সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার যে স্বপ্ন তিনি দেখিলেন, তাহাও প্রকাশ পাইল অপ্রচ্ছন্ন হিন্দু রূপকের মধ্যে—

> মার আবাহনে এস এস ত্বরা,
> মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
> সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

জাতীয় আন্দোলনকে হিন্দু-প্রাধান্য তখন সত্যই ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছিল। দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যুব্রতী সন্ত্রাসবাদীরা যে তখন কালীপ্রতিমার পদস্পর্শ করিয়া দেশসেবার শপথ গ্রহণ করিত, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তখনকার স্বদেশী গানে যে হিন্দু ভাবধারা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "জয় ভারতের জয়" সঙ্গীতে ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, পৃথুরাজ আদি বীরগণের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের একটা বিরাট অংশ যে মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাতে

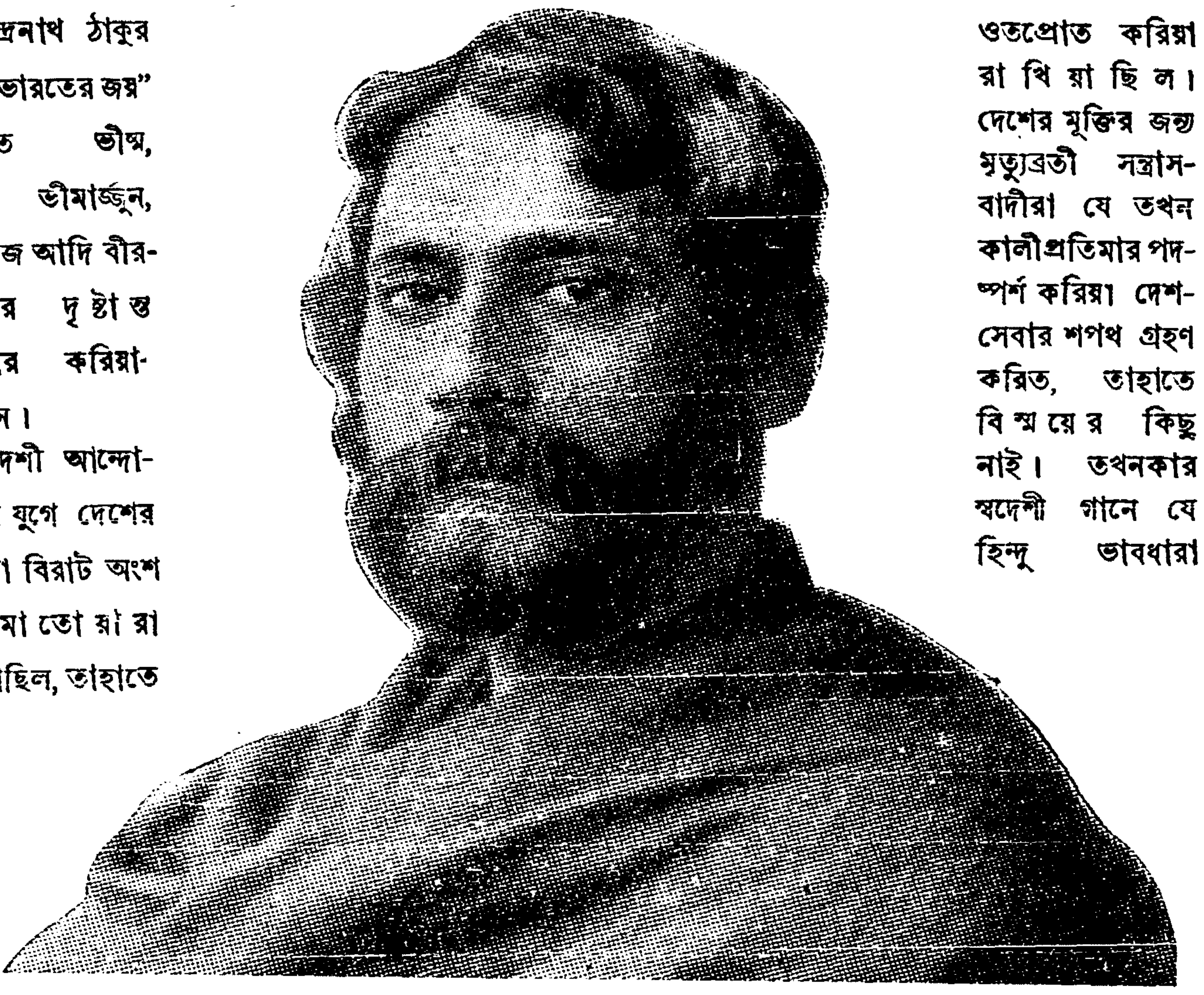

রবীন্দ্রনাথ—১৯০৬

সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন সঙ্গীতের মর্ম্মস্পর্শী আবেগে বাঙালীর যে সহজাত আবেগপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার হিন্দু অনুপ্রেরণা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই বাংলায় তেজোদৃপ্ত আবির্ভাবের আবাহন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন :—

> ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
> বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
> দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
> ললাট নেত্র আগুন বরণ!

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য "অবনত ভারতের" উদ্ধারের জন্য "সুদর্শনধারী মুরারির" কাছে প্রার্থনা জানাইলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত উৎসাহের প্রচণ্ডতায় "দানব-দলনী, ত্রিদিব-নাশিনীকে" "ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে" বলিয়া গান লিখিলেন। প্রখর সাংবাদিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মাতৃভূমিকে "কংস-কারাগারে দেবকীর মত" শৃংখলিত বলিয়া বর্ণনা করিলেন, "মাগো যায় যেন জীবন চলে, তোমার কাজে, বন্দে মাতরম্ বলি" গাহিয়া দেশবাসীকে কাঁদাইলেন। "আমায় দে মা অসি" বলিয়া দেবব্রত বসু দেশসেবার অগ্নি-পরীক্ষায় নামিলেন। দেশকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তিপূজা মুসলমানের মনে যে অগ্রাহ্য, এ কথা মুসলমান ধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম-প্রকট হইবে, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

বাঙালীর জাতিবোধ

কেবল হিন্দু ভাবধারার প্রাধান্য নয়, বাংলার সোনার মাটী বাঙালী কবির মনকে যে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল, তাহা তখনকার গানের আর এক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় ঐক্যবোধজাত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালী বাউলের সুরে রবীন্দ্রনাথ যখন "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গাহিয়াছিলেন, কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলাল যখন "বঙ্গ আমার, জননী আমার" সম্বোধন করিয়া দেশের দুঃখ দৈন্য গ্লানি দূর করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের কণ্ঠে যে আত্মীয়তার সুর ফুটিয়াছিল, তাহার যেন তুলনা নাই। অথচ ভারতীয় আদর্শ যে কবিচিত্তকে আলোড়িত করে নাই, তাহা নয়, কিন্তু বাংলার কথা বলিতে গিয়া কোথাও যেন কবিকে সামান্যতম কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। হৃদয় গম্ভীরে যে ঝঙ্কার বাজিয়াছে তাহাতে কোথাও যেন অসঙ্গতি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম্" লেখার সময় বাংলার "সপ্ত কোটী" নরনারীর কথাই ভাবিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই প্রথম বাঙালী তাহার জাতিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। "সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিবাদ" ("The universal protest of **the Bengali Nation**") সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বাহাল হওয়ার জন্যই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। ভারতের ঐক্য যে কেবল বিভিন্ন জাতির স্বাধিকার-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মহাজাতি-ঐক্যরূপে গড়িয়া উঠিবে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, তখনকার দিনে দেখা যায়। রাজনৈতিক চৈতন্যে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অগ্রসর ছিল বলিয়া বাঙালীদের স্বতন্ত্র জাতিবোধ স্বদেশী যুগেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

জাতীয় সঙ্গীতে জন-জীবন

১৯২০-২১, এবং আবার ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের অপূর্ব্ব জনজাগরণের বিবরণ স্বদেশীগানের মত রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। এক নজরুল ইসলামকে বাদ দিলে স্বদেশী যুগের মত মন-মাতানো গান আর কেহ লিখিলেন না। সাহিত্যের অমরাবতীতে জাগ্রত জনসাধারণের যেন প্রবেশ মিলিল না। জাতির জীবনে কোথায় যেন একটা গলদ ঢুকিয়া রহিল। জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান খাড়া হইতে লাগিল। এই ব্যবধান ভাঙিবার জন্য নবীন লেখকরা যে উদ্যম করিয়াছেন, জনজীবনের বহুরূপী দুঃখদৈন্য দূর করার সংহত প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বদেশের মুক্তির সুনিবিড় সংযোগ সম্পর্কের কথা যে ভাবে গানের সুরে বলিলেন, তাহার পরিচয় মিলিবে "জাতীয় সঙ্গীত" সংকলনে। বাঙালীর দেশপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে হইলে এমন একটা গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ তাই ইহার প্রকাশব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—হীরেন মুখার্জ্জী

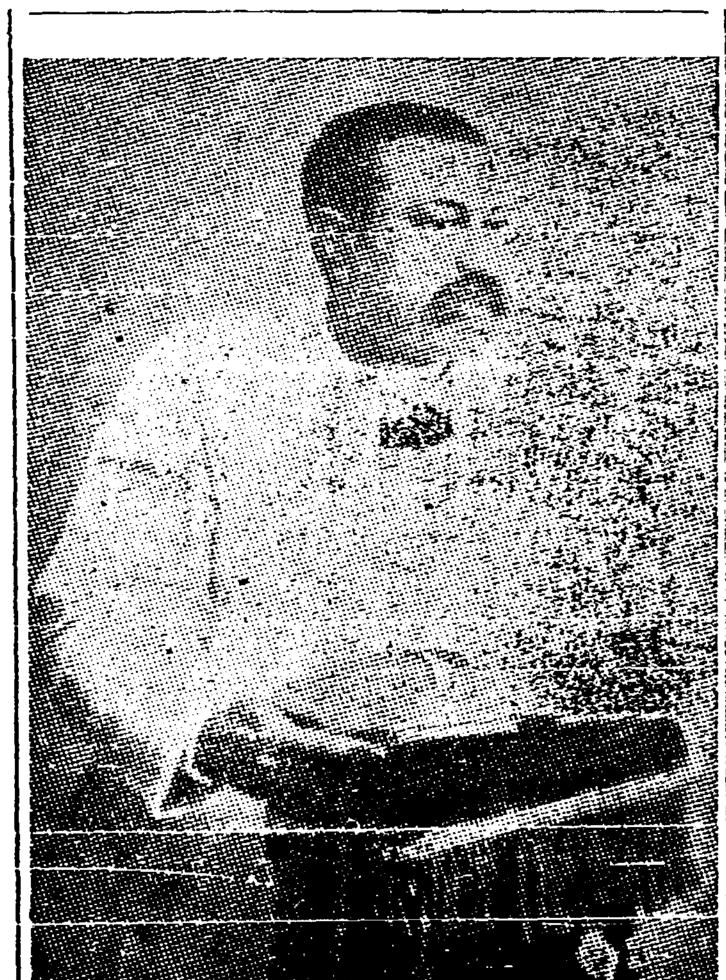

হেমচন্দ্র

জাতীয় সঙ্গীত

★

রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং অতি-সাম্প্রতিক কবিদের লেখা

গানের সংকলন

দাম আট আনা

★

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ

৪৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জার্ম্মাণীর ভিতরে : হিসাবনিকাশের দিন আজ এসে'ছ

ইলিয়া এরেনবুর্গ

বর্ব্বরতার দম্ভ চুরমার

প্রুশিয়ার একটা শহর। স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় অফিস। গাদা গাদা পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। গ্যালি ভরা টাইপ সাজানো। কয়েক সংখ্যা কাগজ টেনে বের করে পাতা উল্টাচ্ছিলাম। একখানা কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে না হেসে আর পারলাম না। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরপে জাঁকালো ভাবে ছাপানো হয়েছে হিটলারের হুকুমনামা। কি জানি কোন কারণে উন্মত্ত হিটলার তাতে ইলিয়া এরেনবুর্গকে জুজুর ভয় দেখিয়েছে। আর তারই সাথে দম্ভভরে বলেছে পূর্ব্ব প্রুশিয়া ভেদ করতে পারে কার সাধ্য।……কয়েক সপ্তাহ পরে সেই ইলিয়া এরেনবুর্গই পূর্ব্ব প্রুশিয়ার পথে এগিয়ে চলেছে মাসুরিয়ান হ্রদ থেকে এলবিং-এর দিকে।

এমনি করেই মজার ভূমিকা সুরু। যদিও গল্পটা আর যাই হোক মজার নয়। হিসাব নিকাশের দিন এসেছে। কবে কোন অনাগত ভবিষ্যতে আসবে প্রতিশোধের দিন—সে কথা নয়। প্রতিশোধের সেদিন আজ আগত।

মনে পড়ে স্পেনের ১৯৩৯ সালের জানুয়ারীর কথা। দেখেছিলেম এক হৃদয়বিদারী দৃশ্য। ঘর-বাড়ী ছাড়া মানুষের মিছিল। তছনছ হয়ে গেছে উত্তর কাটালোনিয়া। কত গাড়ী উল্টে গেছে পথে। পিছনে পড়ে আছে কত আসবাব, কত জিনিষ। ছেঁড়া কাপড়-ন্যাকড়ায় পথঘাট হয়েছে আচ্ছন্ন। লাখ লাখ ভীতিবিহ্বল নারী ও শিশু দিশেহারা ছুটে চলেছে। তাদের মাথার ওপর উড়ে এল শকুনীর মত জার্ম্মান বিমানপোত চালকের দল। প্রশান্তভাবে তারা চালালো মেশিনগান। ছুটলো বুলেট বারিধারার মত। তারা গেয়ে চলেছে লেফ্‌টেন্যান্ট এরিখ বার্ডেনের লেখা গান—"আমরা জার্ম্মান বাহিনী! সব সীমান্ত অতিক্রম করে বিজয়ী মোরা উড়ে চলি।" হঁা, সেদিন তারা ছিল বিজয়ী। কিন্তু আমি ভুলিনি সেদিনকার স্পেনের অগণিত শিশুর ছিন্নভিন্ন রক্তপ্লুত দেহের কথা।

তারপর। দুবছরও পার হয়নি। ১৯৪০ সালের জুন মাস। দেখেছি ফরাসী দেশের পথঘাট। সেই একই কাহিনী। আবার সেই চূর্ণবিচূর্ণ গাড়ীর স্তূপ, শত শত শিশুর শব, লাখ লাখ পলায়মান নরনারীর ত্রস্ততা। কোথায় তারা লুকোবে, তারা জানে না। শুধু এই টুকু জানে—জার্ম্মানদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে হবে। আবার সেই 'বিজয়ী বীরের' দল প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত নারীর বক্ষ বিদীর্ণ করে চলেছে। তাদের কণ্ঠে আবার সেই গান, "ফরাসীর বুকের ওপর চলেছে আমাদের অভিযান। আমাদের পদভরে চূর্ণ হবে পৃথিবী।"

অবশেষে এল ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমাদের মনে থাকবে সে দিনের কথা। কৃষকের গাড়ীর চাকার সেই গোঙরাণী, জ্বলন্ত গ্রাম আর শহর, আর মরণোন্মুখ শিশুর কাৎরাণী। নগ্নবুকে মৃত শিশুকে আঁকড়ে ধরে মায়ের সে কী বুকফাটা চীৎকার। আজও যেন শুনতে পাই। জার্ম্মানরা গেয়ে চলেছে, "পুব দিকে আমাদের যাত্রা সুরু। যাত্রা বিজয়ের পথে। আমাদের শিরায় জার্ম্মান রক্ত। পূর্ব্বাচলে রক্তাক্ত প্রভাতের উদয় ঐ। আজ আমরা এসেছি রাশিয়ায়। বল্‌টিকের তীর থেকে আমাদের অভিযান। কে রোখে আমাদের পথ?" সেদিনের কথা ভুলব না আমরা।

এরই নাম প্রতিশোধ

আজ আমার চোখের সামনে জার্ম্মানীর পথ-ঘাট, মসৃণ। দু দিকে গাছের সারি। পথভরা পরিত্যক্ত গাড়ী, বাক্স, পালঙ্কের বিছানা, কত রকমের ছড়ানো জিনিষ। কোথাও মেয়েদের ড্রেসিং গাউন, কোথাও ট্যাক্স ইন্‌স্পেক্টরের কাগজে ভরা পোর্টফোলিও। কোথাও বলড্রেস, আর হাঁড়ি-কুড়ি। আশ্রয়প্রার্থী মানুষের দল এসে পড়েছে রণক্ষেত্রে। পালকের বিছানা ভেঙ্গেছে। বসন্তের উষ্ণ বাতাসে তুষারের মত পালক ঘুরছে—পালকের ঘূর্ণী। শহরগুলো জ্বলছে। দুধের ভারে দুগ্ধবতী গাভী আর পথ চলতে পারে না। শূকর ছানা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটছে। যুদ্ধ জার্ম্মাণীতে ঢুকেছে।

রণক্ষেত্রের পেছনে গেলে দেখতে পাবে, হাজার হাজার জার্ম্মান নারী আর শিশু চলেছে এঁকেবেঁকে পুব দিকে। তারা পালাতে চেয়েছে যে-কোথাও। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে চলেছে ঘরের দিকে। বুড়ো জার্ম্মানও আছে তাদের ভেতর। কৃপা প্রার্থী হয়ে তারা অভিবাদন জানাচ্ছে। একজন আমাকে বললে, "হের্ ষ্টালিন জিতেছে। আমি বাড়ী চলেছি।" এই 'অতি-মানবের' দলকে বিজয়ীর মত দেখায় না।

কামানের গোলায় তাদের ঘরবাড়ী চূর্ণ। পথে-ঘাটে তাদের জিনিষপত্র ছড়ানো। ট্যাঙ্কের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের বিশ্বপ্রভুত্বের স্বপ্ন।

এই সব জার্ম্মান শিশু ও বৃদ্ধা নারীর দুঃখে আমার বিদ্বেষমূলক আনন্দ নাই। আমাদের সৈনিকদেরও আনন্দ নাই। আমাদের লড়াই শিশুর বিরুদ্ধে নয়, আমাদের প্রতিশোধ বৃদ্ধার ওপরও নয়। আমরা তো ফাসিষ্ট নই। কিন্তু বৃদ্ধা ও শিশুই আমরা দেখছি না। এখানে আছে যুদ্ধ বন্দী, সৈনিক, কর্ম্মচারী, জমিদার ও নাৎসী পার্টির মেম্বর। কোনিসবার্গের চারিদিকে সামান্য একটু অংশ ছাড়া গোটা পূর্ব্ব প্রুশিয়াই আমরা দখল করেছি। এরই নাম প্রতিশোধ, এরই নাম ন্যায়। বিদ্বেষের হাসি নয়, পবিত্র আনন্দে মন ভরে ওঠে যখন দেখি জার্ম্মানীর সব চাইতে লুণ্ঠনকারী প্রদেশ আগুনে পুড়ছে, সেখানে এসেছে বিহ্বলতা, তাদের বিষ দাঁত ভেঙ্গেছে, কাঁপছে তারা, আমাদের শক্তির সামনে তারা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে।

ইঁদুরের মত পালাচ্ছে

জার্ম্মানীর পথ দিয়ে যখন চলি তখন এত আনন্দ কেন আমার মনে? মস্কো থেকে এলবিং চলেছি। আবার দেখছি স্মোলেন্স্ক্, বেলোরুশিয়া আর লিথুয়ানিয়া। পোলাণ্ডের ভেতর দিয়ে চলেছি। কি ঘন মসীমাখা জার্ম্মানদের দুষ্কৃতি! ক্রাসনোয়া গ্রামে এক রাত কাটিয়েছি। গ্রাম আর নেই। গড়খাই-এ ভরা। এক বৃদ্ধ এসে আমাকে জানালো, "আমার মেয়েকে হয়তো জার্ম্মানীতে দেখতে পাবে। নাম তার ভেরা। শয়তানরা তাকে কেড়ে নিয়েছে।" আর একটা পরিবারে ১৪বছরের এক বালককে তারা হত্যা করেছে। সব কিছু লুটে নিয়ে অবশেষে ঘরে আগুন দিয়েছে। একটা জিনিষ তারা ফেলে গেছে সিগারেটের ছাই ফেলার অ্যাস্‌ট্রে। তাতে কোন সৈনিক জার্ম্মান ভাষায় লিখে গেছে—"মিনস্ক, ব্রিয়ানস্ক, ওরেল, স্মোলেন্সক।" এই পথ ধরে সে অভিযান করেছিল। রক্ত, অশ্রু, আর ভস্মে ভরা সে পথ। এর পর জার্ম্মান শহরগুলোর টাউন হলে ঢুকে কার না আনন্দ হয়? আমাদের সংবাদপত্রে অনেক বার বলা হয়েছে, জার্ম্মানরা অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে। পলাতক জার্ম্মানদের বাড়ীতে ঢুকলে দেখতে পাবে টেবিলে সাজানো রয়েছে খাবার। পলাতক খাবারও সময় পায়নি। পড়ে রয়েছে ক্ষুর, তখনও বুরুশ ভরা সাবান—মালিক হয়তো একগাল কামিয়েই পালিয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের পালানো আরও হাস্যকর। টাউন হলে যেয়ে দেখেছি মিউনিসিপ্যালিটির পতাকা, ফাইল, রেকর্ড, শিলমোহর। দেশরক্ষী বাহিনীর রেকর্ড পড়ে রয়েছে। রাষ্টেনবুর্গের বার্গোমাষ্টারের টেবিলে দেখি, একটা ফাইলে লেখা 'দৈনন্দিন কাজ'। বার্গোমাষ্টার একটা কাগজ সই করতে সুরু করে-ছিলেন। সই আর শেষ হয় নি, কালি ঢেলে পড়েছে। কলম ছুঁড়ে ফেলেই তিনি পালিয়েছেন। জার্ম্মানদের ফেলে-যাওয়া অনেক পতাকা আমি দেখেছি। কোনটার ওপর একটা সিংহ আর তিনটে ক্রুশ আঁকা, কোনটায় হরিণের মাথা, কোথাও একটা হাতে ঝলসে উঠেছে তরবারি, কোন পতাকায় অস্ত্র আঁকা। এমনি আরও অনেক। এই সব আর্য্যের দল নিজেদের বাঘের সাথে তুলনা করে। কিন্তু তারা পালিয়েছে ইঁদুরের মত।

দারিদ্র্য নয়, লোভ

জার্ম্মানরা ক্রাশনোয়া গ্রাম থেকে চুরি করেছে কড়াই, রুমাল, কম্বল! কেন? অভাবে পড়ে তারা চুরি করেছে এসব? না, মোটেই নয়। এ তাদের নিছক লোভ। কড়াই আর কম্বলের অভাব নেই তাদের। একটা জার্ম্মান বাড়ীতে দেখি ছোট একটা টেবিল। তাতে লেখা রয়েছে লেনিনগ্রাডের একটা ফার্ম্মের নাম। জার্ম্মানরা টেবিলটা নিয়ে এসেছে কেন? এতো আর সৈনিকদলের পতাকা নয়। এদের ঘরে তখনও দেখি পাঁচটা টেবিল। ঘর বোঝাই জিনিষপত্র। দেওয়াল ভরা নির্জীব অয়েল পেন্টিং, ডজনে ডজনে হরিণ মাথার ম্যান্টেলপিস্। হরেক রকমের টেবিল আর ফুলদানি। তোয়ালের ওপর লেখা রয়েছে, "ভাল ঘরকন্নার ভিত্তি শৃংখলা।" বিছানার চাদরে লেখা আছে "মধুর স্বপন"। ঘরে হিটলার আর হিণ্ডেনবুর্গের ছবি। জমিজমা গরুবাছুর, জিনিষপত্র তাদের প্রচুর। বাঁচবার জায়গা চাই বলে তারা চেঁচিয়েছে। বেলোরুশের গ্রাম তারা লুটেছে। না, সে দারিদ্র্যের জন্য নয়। এ নিছক লোভ। এর জন্য কোন ছলছুতারই অভাব নাই, সামান্য মানবসুলভ করুণার প্রয়োজনও তাদের পড়ে না।

রাষ্টেনবুর্গের সোভিয়েট মিলিটারী কমাণ্ডার যে ঘরে বাস করছেন, সেই ঘরে একদা হিটলার রাত কাটিয়েছে। দেওয়ালে একটা ফটো দেখছি: বাড়ীর একটি মেয়ে হিটলারকে ফুলের তোড়া দিচ্ছে। আমার এই লেখা যখন হিটলারের কাছে পৌছবে, তখনও হয়তো সে বেঁচে থাকবে। হিটলার জানুক তার সেই ফটোওয়ালা ঘরে আমি বাস করেছি। আরও সে জানুক রাষ্টেনবুর্গের সোভিয়েট মিলিটারী কমাণ্ডার মেজর রোজেনফেল্ড রাষ্টেনবুর্গে শৃংখলা এনেছে। নাৎসী 'নয়া ব্যবস্থা' নয়, মানবতার নব ব্যবস্থা।

জার্ম্মান মেয়ে আর বৃদ্ধরা শহরের পথ ঝাড় দিচ্ছে। আগ্রহে তারা হুকুমের অপেক্ষা করছে। তবু জার্ম্মানরা কমাণ্ডারের গোটা পরিবারকে হত্যা করেছে! কমাণ্ডার নির্ম্মম প্রতিশোধ নিতে পারতো। না, সে প্রতিশোধ সে নেয় নি। নিরস্ত্র অসহায়কে সে হত্যা করে নি। কাল যারা ছিল 'অতিমানব', তাদের আজ সে বাধ্য করেছে কাজ করতে। এই হয়তো সব চাইতে মধুর প্রতিশোধ। আজ তারা সবাই হীনের মত মাথা নীচু করে আর বলে, "আমরা তো হিটলারের বিপক্ষেই ছিলাম।" কোন কোন ফাসিষ্ট আবার বদ্ধমুষ্টি তুলে চীৎকার করে "রেড ফ্রন্ট"। আমাদের কেউ তাদের সাথে কথা কয় না, তর্ক করে না, গাল দেয় না। এদের জন্য ভাল পথ হচ্ছে চুপ করে থাকা। এরা কাজ করুক। যে কাজ তারা করেছে তার সামান্য প্রায়শ্চিত্তও তারা করুক। আর যারা দুর্বৃত্ত, শীগগীরই তাদের বিচার হবে। তারা শাস্তি পাবে।

বক-ধার্ম্মিকদের ভণিতা

রাশিয়াতে জার্ম্মানরা যে অত্যাচার করেছে, সবাই আজ তা অস্বীকার করে, বলে তারা নাকি সে সব কিছুই জানে না। ভণিতার তাদের অন্ত নাই। দুর্বৃত্তের সাথে এদের যে যোগ রয়েছে এ তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যখন তারা দেখে যে তাদের গ্যাস চেম্বারে দম আটকে হত্যা করা হবে না কিংবা জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত দগ্ধে মারা হবে না, তখন তারা আশ্বস্ত হয়ে স্বীকার করে, "হঁা, সৈনিক-দের কাছে শুনেছি বটে…। ওয়ারসা, কিয়েভ, স্মোলেন্সকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈ কি।"

ক্যাথলিক বিশপ ক্রাউয়েনবার্গের ডেপুটি, ভাইকার জেনারেল আলোইজ মার্কবার্টের সাথে কথা হচ্ছিল। কানে কানে তিনি হিটলারীদের অত্যাচারের কথা বললেন যেন আমি তাঁর কথায় গলে যাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম—ভয় করছেন কাকে, গেষ্টাপো পুলিস, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে? না ভাটিকানকে? তিনি স্বীকার করলেন জার্ম্মানরা ইউরোপে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এবার এই জার্ম্মানদের কি করা উচিৎ। তিনি কুটনীতিক চালে বললেন 'আর যাই করুন, জার্ম্মানরা যা করেছে তা যেন না করা হয়।' রাষ্টেনবুর্গের লুথেরান পুরোহিত রুডোল্‌ফ আব্রামাতস্কি একটুখানি কেসে বললেন, "দেখুন, আমাদের দিয়ে জোর করে করানো হয়েছে……।" সবার মুখেই ঐ একই বুলি। চোখের ডাক্তার শিলিং ঐ একই কথা বলে। বড় ব্যবসায়ী ব্রেষ্ট থেকে সুরু করে মুদী স্কীভার পর্য্যন্ত সবাই বলে, "জোর জুলুম করে করানো হয়েছে।" তারা লুট করেছে। মদ খেয়ে বেহুঁস হয়েছে। হঁা, সবই জোর করে করানো হয়েছে বৈকি! এদের ঘরে দেখতে পাবে দামী লাল ফরাসী মদ, সাদা সার্বীয় আর ইটালীয় মদ। ইউক্রেনীয় কারুকার্য্যে ভরা অমূল্য রুশ ফার। দেয়ালে রয়েছে ষ্টালিনগ্রাড সীমান্তের মানচিত্র, লাল নীল পেন্সিলের দাগ এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। সম্মানের কোন ধারই ধারে না এই সব 'নীটশে পন্থী'র দল। না, না, 'নীটশে পন্থী' নয়—এরা শেয়াল আর ভেড়ার ঘৃণ্য সংমিশ্রণ।

যতই পশ্চিমের দিকে যাবে ততই এই সব জীবকে দেখতে পাবে। অনেক। প্রথমে তারা সবাই একযোগে পালিয়েছিল। (এখন তারা বলে তাদের নাকি জোর করে ঘরছাড়া করা হয়েছিল)। এখন তারা আর পালাবে না। একজন মোটা শহরবাসীকে জিজ্ঞেস করলাম (তার পেটে অন্ততঃ দশ বোতল মদ আটবে নিঃসন্দেহে). 'তুমি পালাও নি কেন?' মাথা নীচু করে সে বললে, 'পালিয়ে লাভ নেই।' জার্ম্মান কাগজগুলো লিখছে, আমরা নাকি পরিত্যক্ত শূন্য অঞ্চল দখল করছি। নিছক মিথ্যা কথা। রাষ্টেনবুর্গের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীই রয়েছে। নিকোলাইকেন ও হেইলস-বার্গের বেলায়ও তাই। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর এলবিং-এ ১ লাখ লোকের বাস। সেখানকার ৬০ হাজার লোক আজও রয়েছে, যদিও এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল পথে পথে লড়াই। তারা মাথা নীচু করে নমস্কার করে। দেহখানা একটু বাঁকিয়ে মৃদু হাসতেও চেষ্টা করে।

দু সপ্তাহ আগে তাদের মন আশায় ভরপুর ছিল, হিটলার তাদের সে ভরসা দিয়েছিল। জহ্লাদ এরিখ-কোচ জার্ম্মান সুস্পষ্টতার সাথেই তাদের বলেছিল, "রুশদের ক্ষমতা নেই যে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার ভেতর ঢুকতে পারে। গত চার মাসের ভেতরই আমরা

(৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

বগুড়ায় ভদ্র-নারী দেহ বিক্রয়ে বাধ্য হইতেছে, শিক্ষিত

বাংলার সমাজ জীবনে ইহাই দুর্ভিক্ষের পরিণতি---এখনি রোধ না করিলে বাঙ্গালীর স

দুর্ভিক্ষ-বিক্ষত চট্টগ্রামের সমাজে গৃহস্থ মেয়েরা সতীত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, মানুষরূপী পশুর দল সজ্ঘবদ্ধভাবে সেই ব্যবসা চালাইয়া অর্থ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করে—বাঙ্গালী সভ্যতার এই বীভৎস অধঃপতনের কাহিনী জনযুদ্ধে পড়িয়াছিলাম। পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম—ওখানে অত মিলিটারী আছে, বড় বড় কণ্ট্রাক্টর আছে, ওখানে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বগুড়া জেলায় কখনই এরূপ ঘটিতে পারে না। আরও শুনিয়াছিলাম বগুড়া বাড়তি জেলা, গতবার প্রায় ১০ লক্ষ মণ চাউল বেশী উৎপন্ন হইয়াছে, রাজপুরুষ হইতে দেশভক্ত পর্য্যন্ত সকলেই ভাবিতেছেন দুর্ভিক্ষের ক্ষতচিহ্ন কিছুদিন যন্ত্রণার পর মিলাইয়া যাইবেই। এই ক্ষত যে বগুড়াবাসীর গোটা সামাজিক জীবনকেই বহুকালের মত বিষাক্ত করিয়া রাখিতেছে, নূতন নূতন ক্ষত সৃষ্টি করিতেছে সে কথা তাই স্বীকার করিতে পারি নাই।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করিলাম বগুড়া শহরে একটী ভদ্র-সন্তান রিকশা টানিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম—দুর্ভিক্ষ বগুড়ার সমাজ ও সভ্যতায় কি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছে।

ভদ্র রিকশাচালকটির শ্বশুর শহরের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক। শ্বশুরটির অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। দুর্ভিক্ষের আগে জামাই শ্বশুরেরই গৃহে সপরিবারে থাকিত। কিন্তু দুর্ভিক্ষের চাপে শ্বশুর ও জামাই আলাদা হইয়া যায়। অভাবের তাড়নায় গরীব জামাইয়ের মন কঠিন, পৈশাচিক হইয়া উঠিল। বাপ হইয়া নিজের হাতে সে তার মেয়েকে পাপপথে ঠেলিয়া দিল। মেয়েটির মামারা মেয়েকে তখন অন্যত্র পাঠাইয়া দিল। কিন্তু বাপের আর মনুষ্যত্ব নাই। মেয়ের কাকুতি মিনতি, অশ্রুপাত সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। মেয়েকে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ্য গণিকালয়ের পাশে ঘর বাঁধিল।

বড় বড় উকীল বড় বড় ব্যবসায়ীর শহর এই বগুড়া---অথচ তাহাদেরই চোখের সামনে এমনি আরও কত সম্ভ্রান্ত পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মনুষ্যত্ব পুড়িয়া গিয়াছে, নারীজীবন কলঙ্কিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। বগুড়ায় কি কোন মানুষ ছিল না?

একদিন, হঠাৎ এরূপ ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে ঘটিয়াছে, মানুষের চোখের সামনেই মানুষ সমাজের এই ক্রমাবনতির কাহিনী পাতার পর পাতা উল্টাইয়া বিয়োগান্ত নাটকের চরম পরিণতির দিকে নির্ম্মম ভাবে ছুটিয়াছে। বগুড়া জেলায় গৃহস্থ সমাজের প্রত্যেকটী শ্রেণীর মধ্যে সেই ক্রমাবনতির ইতিকথাই আমি এখানে শুনাইতেছি!

দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানায় এক সান্দর পরিবারকে দেখিয়াছিলাম পরিবারে ছিল স্বামী-স্ত্রী ও দুটী মেয়ে। ৩।৪ দিন পর পুরুষটি অনাথা অবস্থায় বউ-মেয়েদের রাখিয়া মারা গেল। দুদিন পর তাহাদেরই দেখিলাম শহরের এক ভাল বাড়ীতে। শহরের লম্পটেরা তাহাদের 'আশ্রয়' দিয়াছে।

ইহারা পাষাণ হইল কেন

সোনাতলা অঞ্চলের কাছু মিঞা সংকটের আঘাতে জমিজমা বেচিয়া দিয়া সপরিবারে পথে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রমে ম্যালেরিয়া ও শোথে যখন সে একেবারে অথর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন নিজের বউকে সে এক পাটের দালালের কাছে বেচিয়া দিল। এত বড় শোক কাছু মিঞা সহ্য করিতে পারিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল। পাটের পাইকারটিও কয়েকমাস পরে কাছু মিঞার অসুস্থা স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিল। আজ তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখি। অন্তঃপুরের পর্দ্দা তাহার খুচিয়াছে, দেহের নির্ল্লজ্জ বেসাতিই এখন তাহার সম্বল। গ্রামে গ্রামে কত যে তালাক, নিরুদ্দেশ ও সন্তান বিক্রয়ের ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তিনটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদের কাছে সংবাদ লইয়া দেখিয়াছি—বিধবা ও এতিমের সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি ১০০ জনের কম নহে। এইরূপ ১৪৮টি ইউনিয়নে কম পক্ষে ইহাদের মোট সংখ্যা হইবে ১৫ হাজার।

দুর্ভিক্ষের দিনে বসতভিটা বেচিয়াও ইন্দুবালা তাহার রুগ্ন স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিল না। ছেলে তিনটির হাত ধরিয়া বিধবা ইন্দুবালা শহরে আসিল। কিন্তু শহরে আসিয়া দেখিল, সরকার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিয়াছে। নূতন ধান উঠিয়াছে—কাজেই সরকারী হিসাবে তখন দুর্ভিক্ষ নাই। শহরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াও কোথাও সাহায্য মিলিল না। ইন্দুবালার মন পাষাণ হইয়া উঠিল। সে তার বড় ছেলেটিকে একজনের দুয়ারে বিলাইয়া দিল। কোলের ছেলেটির শরীর নীল হইয়া গিয়াছে। এখন তখন অবস্থা। ইন্দুবালার ভ্রূক্ষেপ নাই। মহিলা আত্মরক্ষার কর্ম্মীরা দুধ দেয়, অষুধ দেয়। কিন্তু সমস্তই পড়িয়া থাকে। অনাহারে, অযত্নে ছেলেটি মারা গেল। নিজের পেটের ছেলে উঠানে নিষ্প্রাণ পড়িয়া আছে—ইন্দুবালার চোখে একফোঁটা জল নাই।

পাড়ার যুবকদের সৎকার সমিতি আছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও পাওয়া গেল না। শেষকালে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া আত্মরক্ষার মেয়ে কর্ম্মীরাই সাত বছরের বড় ভাইয়ের শীর্ণ কাঁধে মৃত ছেলেটিকে তুলিয়া দিল। নদী দূরে নয়। কিন্তু অতটুকু পথই ভাইয়ের শবদেহ বহিতে রোগা শরীরে তাহার কত কষ্ট। বার বার পিঠ হইতে গড়াইয়া পড়ে আবার তুলিয়া লয়। রাস্তার ছেলেবুড়ো অনেকেই সেই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিল। একজনও আগাইয়া আসিয়া সাহায্য করিল না। এমনিভাবে বাংলার মা আজ কাঁদিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, বাংলার সমাজ পরদুঃখে আর চঞ্চল হইয়া উঠে না।

বগুড়া জেলার যাহারা শতকরা ৫ জন, সেই জেলে, তাঁতী, জোলা প্রভৃতি গ্রাম্যশিল্পীদের জীবনে এই দুর্ভিক্ষ রচনা করিয়াছে এক করুণ ইতিহাস। শত শত জেলে এক মুষ্টি অন্নের জন্য সর্ব্বস্ব বেচিয়া আসামে গিয়াছিল। গিয়া দেখিয়াছে সেখানেও সেই অনাহার, মৃত্যুও মহামারী।

কঙ্কালের ভেলা

গাড়ীতে ফিরিবার পাথেয় নাই, নৌকাও আগেই বিকাইয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতে ভেলা ভাসাইয়া পাড়ি দিয়াছে। পথে যে কত মরিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কত ভেলা ফিরিয়াছে শূন্য বক্ষে, কত ভেলা ফিরিয়াছে কঙ্কালের স্তূপ বহিয়া। ইহাদের নিরাশ্রয় স্ত্রীর দল প্রবাসী স্বামীর ফিরিবার আশায় দীর্ঘদিন পথ চাহিয়া থাকিয়াছে। একমুষ্টি ভাতের জন্য সহর-গ্রামে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে। তবু আত্মসম্মান খোয়াইতে চাহে নাই। কিন্তু সমাজে যখন তাহারা কোনরূপ ভরসা পায় নাই, তখন ঘর ছাড়িয়া হয় অন্যের সহিত সংসার পাতিয়াছে, নয়ত কোন শহর-বন্দরে গণিকালয়ে ঘর বাঁধিয়াছে। গ্রামের লোক ইহাদের কথা বলিতে গ্রামের অসম্মান মনে করে। তাই ঘুরাইয়া বলে, উহারা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। একেকটি গ্রামে ৩।৪ জন করিয়া এইরূপ 'নিরুদ্দেশে'র সংবাদ আমরা শুনিয়াছি।

শিক্ষক, কেরাণী, পিওন প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও দুর্গতির সীমা ছিল না। বহু সংসারের কথা জানি, যাহারা দুই দিন পর পর একবেলা করিয়া খাইয়াছে। তবুও আত্মসম্মান খোয়াইয়া বাহিরে হাত পাতিতে পারে নাই। কত পরিবার যে তাহাদের আসবাব পত্র, ঘরের টিন, গহনা গাঁটি ও জীবনবীমার পলিসি প্রভৃতি বিক্রি করিয়া দিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। নিজে দেখিয়াছি যে, কত ভদ্রঘরের ছেলেরা কুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ্য বাজারে দাঁড়াইয়া আলপাকা প্রভৃতি সংসারের সৌখীন শাড়ী দুমুঠো অন্নের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছে। যখন সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তখন লাজমান দূরে সরাইয়া লঙ্গরখানায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভদ্রনারীও পাপপল্লীতে

এই কাহিনীর গোড়ায় যে ভদ্র রিকশা চালকের কথা আমি জানাইয়াছি তিনি একা নয়, অন্যান্য ভদ্র সন্তানও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় এই কাজেই আসিয়া নামিয়াছে। শচীন-দাসগুপ্ত নামে এক বৈদ্য যুবকের কথা জানি। দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় স্ত্রী এবং ছোট্ট ছেলের হাত ধরিয়া শহরের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। **শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে আজ সে রিক্সা টানিয়া খায়।**

এক বৃদ্ধ আইনজীবির কথা জানি। এক সাইকেল দোকানের মালিকের কাছে নিজের মেয়ের ইজ্জত বেচিয়া তাঁহাকে পেটের দায় মিটাইতে হইয়াছে। পাড়ার লোক সব জানিল, সব বুঝিল—কিন্তু এক রত্তি সাহায্য দিয়াও কেহ তাঁহাকে এই সর্ব্বনাশা পথ হইতে টানিয়া তুলিল না। কিছুদিন পরে যখন এই পাপ পথেই মেয়েটি একটি সন্তানের মা হইল, তখন পাড়ার সকলে তাহাকে একঘরে করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিল। বৃদ্ধ আইনজীবির অন্তর ছিঁড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, সমাজে তাঁহার স্থান ফুরাইয়াছে। এখানে শাসন আছে, বিদ্রূপ আছে কিন্তু সহানুভূতি নাই। পিতৃপুরুষের বহুকালের ভিটাবাড়ী ছাড়িয়া এই শহরেরই স্থানান্তরে তিনি উঠিয়া গেলেন, যেখানে তাঁহারই মত অনেক হতভাগ্য পূর্ব্বেই বাসা বাঁধিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বরেন্দ্রভূমির অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বগুড়া। এখানকার টোলে পড়িবার জন্য দেশবিদেশ হইতে ছাত্রের দল আসিত। বাংলার সাহিত্য সম্পদ 'অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ' আজও বগুড়ার প্রতিভার পরিচয় দেয়। ইংরাজ রাজত্বেও বগুড়া জেলা শিক্ষার দিক দিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত। ভারতের যেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৬, সেখানে বগুড়া জেলার শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫।

অদ্ভুতাচার্য্যের বগুড়া

দুর্ভিক্ষ আজ বগুড়ার এই গর্ব্ব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ১৯১৯ সালের প্রতিষ্ঠিত সোনাতলা হাই স্কুলের হিন্দু হোষ্টেল দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাক্কাতেই উঠিয়া গেল। বগুড়া টাউন স্কুলের ছাত্র ছিল ৩ শত। এই স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। বগুড়ায় গ্রাম পিছু ২।৩টি করিয়া প্রাইমারী বিদ্যালয়। এইরূপ প্রায় ১ হাজার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৬০ হাজার হইতে সিকি ভাগে আসিয়া ঠেকিয়াছে। উপকরণ অভাবে মেডিকেল স্কুলের ল্যাবরেটরী বন্ধ হইয়া গেল।

বগুড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা অনেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। সুধাংশু মৈত্র নামে 'বাংলা স্কুলের' এক ছাত্রের কথা জানি। পর পর দুই দিন না খাইয়াও ইস্কুল কামাই করে নাই। কিন্তু তৃতীয় দিনে উপবাসক্লিষ্ট শরীরে ক্লাসের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল।

সোনাতলা হাইস্কুলের একজন বৃদ্ধ শিক্ষক। চক্ষুলজ্জায় নিজে লঙ্গরখানায় আসিতে পারেন নাই—তাই মেয়েকে খিচুরী আনিতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এত কঠিন সাধনাও শেষে অনেকের ব্যর্থ হইয়াছে। নিরুপায় হইয়া শিক্ষকতা ছাড়িয়া কেহ গিয়াছেন মিলিটারীতে আর কেহবা মুহুরী বা দোকানদার হইয়াছেন। পাঁচবিবি হাইস্কুলের শিক্ষক অভাবের তাড়নায় আত্মীয়দের সাহায্যে একটি ছোট্ট বেনেতির দোকান খুলিলেন। ক্রমে অনিচ্ছা সত্বেও চোরাবাজারের পাঁকে পড়িতে হইল। একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—মন তো চায় না কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলির কি অবস্থা হইবে? কিছুদিন পর তাঁহাকে দেখিলাম ধানচালের চোরাবাজারে। এবার তাঁহার স্বভাব কঠিন, উদ্ধত। হাত গুটাইয়া বলিলেন, 'আমার যা খুশী করব, অন্যের কি?'

বগুড়ার নেতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

দুই বৎসরের দুর্ভিক্ষ মহামারী যেন সমাজ-জীবনে পাঁচ শত বৎসর পশ্চাতের মধ্যযুগীয় দাসব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছে। উপকরণের উৎপাদনের উপর মুষ্টিমেয় ধনীর প্রভুত্ব কায়েম হইতেছে; বাকি সবাই এক সর্ব্বহারা গোলাম শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে।

যুবক রিকশা টানিতেছে

ভ্যতাই লোপ পাইবে

লেখক :
শচীন ঘোষ

স্বাধীন চাষী আজ গোলাম

দশটিকা গ্রামে ২ শত ঘর তাঁতীর বাস। মোট তাঁতের সংখ্যা ১৭৩ এবং ২৫ জনের ৪।৫ বিঘা করিয়া আবাদীজমি। দুর্ভিক্ষের সময় ৫০জন লোককে শহরের লঙ্গরখানায় খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে। অসুখবিসুখে মরিয়াছে ৬০ জন। ২৫ জনের মধ্যে ১৩ জনই তাহাদের মোট ৫২ বিঘা জমিজমা বেচিয়া দিয়া দিনমজুর হইয়াছে। প্রায় ১০০ জন তাহাদের তাঁত ২।১ জন বৰ্দ্ধিষ্ণু তাঁতীর কাছে বন্ধকী রাখিয়া সংসার চালাইয়াছে। শুধু দশটিকা নয়, জেলার সমস্ত গ্রামেই তাঁতীদের আজ এমনি অবস্থা।

বালিয়াদীঘি ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বলিলেন যে, তাঁহাদের ইউনিয়নে ৫ শত কিষাণের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ২ শতের কম নয়। মহীপুর গ্রামের ২ শত দিনমজুর পরিবারের মধ্যে ২৭৫ জনই মারা যায়। বাকি অনেকে আসামে পলাইয়া যায়। ৭০টি পরিবার মাত্র টিঁকিয়া আছে। অনেক গ্রামে দেখিয়াছি, **২।১ মণ ধান কর্জ্জার জন্য আজও অনেকে মহাজনের ক্রীতদাস হইয়া আছে।**

মালিপাড়ায় মাত্র একজনের উপযুক্ত জাল আছে আর সকলেই তাহার দিনমজুরী করে। চকনন্দনে দেখিয়াছি ৫৩ ঘরের মধ্যে মাত্র দুইজনের বড় জাল আছে! বাকি সকলে এই দুইজনের মুখাপেক্ষী।

বহু বৎসরের সংগ্রামের ফলে কৃষকেরা জমির উপর যে দখলী স্বত্ব লাভ করিয়াছিল আজ সংকটের আঘাতে শতকরা ১৫ জন কৃষকই সে-সব খোয়াইয়া সর্ব্বহারা হইয়াছে। বগুড়ায় হস্তান্তরিত মোট জমির সংখ্যা জানা যায় নাই কিন্তু মোট বিক্রি কবালা হইতে কিছুটা আন্দাজ করা সম্ভব। ১৯৪২ সালে বিক্রি কবালার সংখ্যা ছিল ২৫,৭৫১; আর শুধু ১৯৪৩ সালেই ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৮,০২০। ১৯৪৪ সালেও এই সংখ্যা বেশী ছাড়া কম নয়। গড়ে কবালা পিছু ২ বিঘা জমি ধরিলেও হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ হইবে প্রায় ২ লক্ষ বিঘা। নীলাম, ক্রোক, বন্ধকী প্রভৃতি ধরিলে নিঃসন্দেহে আরও ১ লক্ষ বিঘা জমি হস্তান্তরিত হইয়াছে।

অর্থাৎ কম পক্ষে ৩ লক্ষ বিঘা জমি হইতে অন্তত ৭৫ হাজার স্বাধীন, স্বাবলম্বী কৃষক পরিবার উৎখাত হইয়া পরমুখাপেক্ষীতে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ জমিই গিয়াছে জোতদারদের হাতে। বালিয়াদীঘি ইউনিয়নে যে দুইজন জোতদার সব থেকে বেশী জমি লুটিয়াছে তাহাদের একজন ১৭০০ ও অন্য একজন ৮০০ বিঘা জমির মালিক।

সম্প্রতি সত্যনারায়ণ মাড়োয়ারীর কথা শুনিলাম। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে কেরোসিন, ধানচাল প্রভৃতির "ডিলারী"তে এখন সে প্রভূত টাকার মালিক। এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ দহরম-মহরম। চাউলের কল কিনিতে না পারিয়া সত্যনারায়ণ ঢালা হুকুম দিয়াছেন—দামের পরোয়া নাই, যত পারো জমি কিনিয়া দাও।

ক্রীতদাস প্রথা

দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা নিজেদের ছেলেমেয়ে বিক্রয় করিয়াছে অথবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে পোষ্য রাখিয়াছে, তাহাদের সেই সব ছেলেমেয়েদের লইয়া সমাজে এক দুর্ভাগা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা মোটেই পোষ্য নয়, আসলে ইহারা আমৃত্যু ক্রীতদাস। বাহিরের লোকের সহিত আলাপ করিতে ইহারা ভয় পায়, চারিদিকে মনিবের পাত্তা দেখিয়া লইয়া তবে হয়ত দু'একটি কথা বলে। বালিয়াদীঘি ইউনিয়নের দুইটি গ্রামে এইরূপ ১৮ জনের সন্ধান পাইলাম। ইহাদের লইয়া পণ্যের মত কেনাবেচাও চলে। জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি নসিরউদ্দীন মণ্ডলের কাছে পাঁচবিবি থানার এক বুড়ীর কথা শুনিলাম। অনাহারে রোগে একমাত্র ছেলে রাখিয়া বুড়ীর মেয়ে যখন মারা গেল, তখন নাতিকে লইয়া বুড়ী একমুঠো অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে। কেহ দয়া করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল ফেলিয়া শিলিগুড়ির একজনের কাছে নাতিকে বিক্রী করিয়া আসিল। কিছুদিন আগে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বুড়ী গিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। শিলিগুড়ির সে লোক আবার অন্য কাহার কাছে ছেলেটীকে বেচিয়া দিয়াছে। বুড়ী এখন কাঁদে আর মিনতি করে, 'আমার নাতিকে ফিরিয়ে এনে দাও।'

দুর্নীতির সর্ব্বময় রাজত্ব

শুধু অর্থনৈতিক ভাঙন নয়, সতীত্ব বিক্রয় নয়, দুর্ভিক্ষের দুঃস্থতা নৈতিক জীবনের সকল দিকেই বিপর্য্যয় আনিয়াছে।

জোরগাছা গ্রামে এক সান্দর সম্প্রদায়ের জাত ব্যবসা ছিল হাটে কাঁচের চুড়ি বিক্রী করা। দেড়শ' পরিবারের মধ্যে ৭টি পরিবার কোন রকমে আজ টিঁকিয়া আছে। কাঁচের চুড়িও আজ চোরাকারবারীদের দখলে। অগত্যা হাটে বাজারে পকেট মারিয়া এখন ইহাদের অধিকাংশই জীবন ধারণ করে।

বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে পাটনী পাড়া। বাঁশের কাজ করিয়া ইহাদের দিন চলিত। শহরের বাড়ীতে বাড়ীতে সিঁদকাটা এখন ইহাদের অনেকের একমাত্র পেশা।

পাঁচবিবি বন্দরের কাছেই কয়েক ঘর বুনো ঘাসির বাস। বহু ঝড়ঝঞ্ঝা আসিয়াছে, কিন্তু এই আদিম জাতিটির স্বভাব কেহ কলুষিত করিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষের আঘাতে ইহাদেরও মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মিলিটারী ক্যাম্পে আত্মবিক্রয় করিয়া আজ ইহাদের মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে টাকা রোজগার করিতেছে। গ্রামেরই একদল অপোগণ্ড যুবক যাহারা চালের দালালী করিয়া পয়সা করিয়াছে—তাহারাই আজ মেয়ের দালালী করিতেছে। প্রশ্ন করিলে অকুণ্ঠিত ভাবে ইহারা জবাব দেয়, 'ওরা এমনিতেই ক্যাম্পে যাবে; মাঝে থেকে আমরা যদি ২।৪ টাকা পাই তাতে আপত্তি কি?' গ্রামের মাতব্বর ২।৪ জনকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'ওদের স্বভাবই খারাপ তো আমরা কি করব?' কোথাও কোন প্রতিবাদ নাই। নৈতিক বিকার কত গভীর হইলে সমাজের পক্ষে মাতৃজাতির অবমাননা এত সহজ হইয়া উঠিতে পারে।

এইরূপ ঘটনা শহরেও বিরল নয়। সকলের জ্ঞাতসারে একটি বিত্তশালী পরিবারের পাশে একটি সম্ভ্রান্ত নিঃস্ব পরিবার আত্মবিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছে—এরূপ সংবাদ অনেক আছে। অভাবে একবার পদস্খলন হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়হীন সমাজ তাহাদের আরও দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। আজ তাই পাপ পথই তাহাদের পেশা। এমন অনেক অভিশপ্ত পরিবার গোষ্ঠীকে লইয়া শহরের মধ্যেই নূতন পাপপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু রিক্সা এই কাজের জন্য বাঁধা। শহরের প্রত্যেকটি লোক তাহা জানে। বার লাইব্রেরীতেও অনেক বড় বড় বাড়ীতেই এ সম্বন্ধে অনেক গাল গল্প শুনিয়াছি. কিন্তু এতগুলি দুর্ভাগা মানুষকে বাঁচাইবার আগ্রহ কোথাও দেখি নাই।

খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পাপ ব্যবসায়ের পিছনে আছে একজন বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর ও একজন অতি উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর দুই দুশ্চরিত্র সন্তান। চোরাকারবারে দুজনেই আজ প্রচুর অর্থের মালিক।

আমার নাতিকে ফিরিয়ে দাও!

★ মজুত বিরোধী অভিযানের সময় মাড়োয়ারী পুঙ্গবের ঘর হইত প্রচুর চাল বাহির হইয়াছিল। মুসলমান যুবকটি তাহার উচ্চপদস্থ বাপের কৃপায় কেরোসিন ও অন্যান্য জিনিসের ডিলারীতে দুহাতে টাকা লুটিয়াছে। ইহাদের সঙ্গী জুটিয়াছে শহরেরই একদল মেরুদণ্ডহীন যুবক। যাহারা একাধারে ইহাদের চোরাকারবার ও মেয়ে সংগ্রহের দালালী করিয়া থাকে।

কেহ গলা টিপিয়া ধরে না!

প্রতিবেশীর চোখের সামনে মারোয়ারীর মোটর আসে; আতরের গন্ধ ছিটাইয়া পরস্ত্রীকে লইয়া ছিনিমিনি খেলে, মোটরে করিয়া শান্তাহার-জয়পুরহাটে রঙ্গ করিতে যায়। তবুও শহরবাসীর মধ্যে এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। একজনও এ সবের প্রতিবাদে উঠিয়া দাঁড়ায় না। শহরের যে কোন পূজাপার্ব্বন যে কোন উৎসবে তাহাদেরই আবার মোড়লী করিবার জন্য ডাকিয়া আনে।

এই সর্ব্বনাশা দুর্নীতি আজ ছোট ছোট ছেলেদেরও মন পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় সব পাড়াতেই দেখিয়াছি ১০।১২ বছরের বালকদের লইয়া ৩০।৩৫ জনের একেকটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা 'রহস্য সিরিজে'র বই পড়ে, ট্রেণে ট্রেণে পকেট মারিয়া বেড়ায়, কেহ কেহ আবার মদ গাঁজাও খায়। ইহারা সকলেই ভদ্র পরিবারের সন্তান এবং এই সমস্ত দলের সর্দ্দার প্রায়ই সেই সব পরিবারের ছেলেরা হয়, যে সমস্ত পরিবার দুর্ভিক্ষের সময় চোরাকারবারে দালালী করিয়াছে অথবা নৈতিক সম্পদ হারাইয়াছে।

এই ভাঙনের মধ্য দিয়া এক বৃহত্তর সংকটের বারুদ জমা হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে এখনই শুনিলাম শতকরা ১০ জনের ঘরের ভাত ফুরাইয়াছে! উৎপাদনের খরচের তুলনায় ধানের দাম অনেক কম। তাই চাষীর আজ জমির প্রতি মমতা নাই। ১৯৪৩ সালে জমিহীন কিষাণেরা গ্রাম ছাড়িয়াছিল; ১৯৪৫ সালে বর্গাদার ও গরীব চাষীরা দলে দলে বসত ভিটার মায়া কাটাইয়া মিলিটারীতে ও রেলে চাকুরীর সন্ধানে চলিয়াছে। যে সব ক্ষেত মজুর গ্রামে আছে, তাহারা রোগব্যাধিতে পঙ্গু। মহামারীর মত ব্যাপক নিউমোনিয়া রোগ দেখা দিয়াছে: গ্রামে গ্রামে মৃত্যুর আতঙ্ক। অনেক জায়গায় লোক অভাবে পাকা ধান মাঠে নষ্ট হইতেছে। হাল-বলদের অভাবে রুগ্ন গাইগরু দিয়া চাষের কাজ চালাইতে হইতেছে। ফলে, সমগ্র জলা আজ বিরাট উৎপাদন সংকটের সম্মুখীন। গত বৎসর ৭৩ লক্ষ মণ চাল উৎপন্ন হইয়াছিল, এবছর আগামী আউশ ধরিয়া উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ২৭ লক্ষ মণ হইবে। অথচ জেলার জন্য বছরে প্রয়োজন অন্তত ৫৬ লক্ষ মণ চাল।

চোরাকারবারীরা ইতিমধ্যেই অস্ত্র শাণাইতেছে। গত বছর দেখি নাই এমন অনেক নতুন নতুন ব্যবসায়ীকে এবার চালের বাজারে দেখিতেছি। দুর্ভিক্ষের বছর ধানচালের বাজারে যে চোরাকারবারের সৃষ্টি হইয়াছিল, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আজ তাহা পরিব্যাপ্ত। সূতার অভাবে হাজার হাজার তাঁতী বেকার। বহু গ্রামে দেখিয়াছি তাঁতীরা তাঁত ব্যবসা ছাড়িয়া হাটে হাটে মিষ্টি ফেরী করিয়া বেড়ায়। উৎপাদনের প্রতিটি উপকরণ আজ লোভী চোরাকারবারীর দখলে।

দেশপ্রেম কোথায়

বগুড়া জেলার এই মর্ম্মান্তিক পরিণতির পিছনে রহিয়াছে বগুড়ার দেশভক্তদের উদাসীনতার মর্ম্মান্তিক ইতিহাস। রোগে অনাহারে কাতারে কাতারে মানুষ মরিয়াছে, চোখের সামনে দুমুঠো অন্নের জন্য নারী তার সম্মান বলি দিয়াছে—তবু দেশভক্তদের মধ্যে সামান্যই সাড়া জাগিয়াছে। লঙ্গরখানা, রিলিফ ও ফুড কমিটির মধ্য দিয়া জনসেবার যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেশপ্রেমিকদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগ মিলিত হইয়া সেই প্রচেষ্টাকে বিরাট আন্দোলনে রূপ দেয় নাই। সরকারের সহিত অসহযোগিতার নামে বগুড়ার কংগ্রেস মিলিত রিলিফ হইতে দূরে থাকিয়াছে। জনগণের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি এই উদাসীনতা কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিয়াছে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে অবসাদ আনিয়াছে। কংগ্রেসের অনেকেই আজ 'গণমঙ্গলে'র গৌরবময় জনসেবার ঐতিহ্যকে ধূলায় টানিয়া নামাইয়াছে।

বগুড়ার অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায়—যিনি আজীবন দেশবাসীকে সেবা করিয়া আসিয়াছেন, উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের সেবার যিনি বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন. জেলায় জেলায় কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া যিনি বিরাট জনসেবার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তিনিও আজ কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্কীর্ণ দলাদলি দেখিয়া অসহায় বোধ করিতেছেন। কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে মিলিত ভাবে দেশবাসীর সেবা করার আগ্রহ নাই, লীগ ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষই তাঁহাদের বড় কথা। তাই তাঁহারা কমিউনিষ্ট বর্জ্জিত সম্মেলন ডাকিয়া যে গঠনমূলক কার্য্যক্রম নিলেন, তাহাতে জনজীবনের

(৮ পৃঃ দেখুন)

বিভেদ-বিচ্ছিন্ন বাংলার একমাত্র গর্ব্ব বি এম আর সি সি

আরও সাহায্য না পাইলে এই মাসেই বন্ধ হইয়া যাইবে ঃ অবিলম্বে দেড় লক্ষ টাকা চাই

এক বৎসর আগে বাংলার বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানকে লইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল মেডিকাল রিলিফ কোঅর্ডিনেশন কমিটী (বি, এম, আর, সি, সি) গঠিত হয়। এই এক বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান ২৩ লক্ষ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর সেবা করিয়াছে।

কিন্তু অর্থের অভাবে বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বি, এম, আর, সি, সি, তহবিলে বর্ত্তমানে ৩৫,০০০৲ টাকার বেশী নাই। প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য মাসিক ব্যয় হয় ৬০০৲ টাকা। সুতরাং এই টাকায় তাহাদের ৫০টি চিকিৎসা কেন্দ্রের খরচ মাত্র এক মাস চলে। অর্থাৎ আরও অর্থ সাহায্য না পাইলে মার্চ্চ মাসেই বি, এম, আর, সি, সি-র সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

গত তিন মাসে দেশবাসী এই প্রতিষ্ঠানটিকে সামান্যই অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। একমাত্র মোটা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৫০,০০০৲ টাকা। এই টাকা না পাইলে আরও অনেক আগে সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিতে হইত।

অথচ এই তিন মাসে বাংলাদেশে মহামারীর প্রকোপ কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। একমাত্র জানুয়ারী মাসেই বি, এম, আর, সি, সি-র সমস্ত কেন্দ্রে ডিসেম্বর মাস হইতে ৩৩,৩০০ বেশী রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। জানুয়ারীর দ্বিতীয় পক্ষে প্রথম পক্ষ হইতে ২০৫৫ বেশী রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে। কলিকাতায় এখনও বসন্তে সপ্তাহে প্রায় ৩০০ করিয়া লোক মারা যায়।

সরকারী রিলিফের স্বরূপ

এই অবস্থায় অর্থের অভাবে বি.এম.আর.সি.সি. বন্ধ হইয়া যাওয়া মানে মহামারীগ্রস্ত বাংলাকে সরকারী অব্যবস্থার হাতে সপিয়া দিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে, চিকিৎসার সরকারী ব্যবস্থা "চলতি বছরে যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে," সুতরাং আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই! কিন্তু চিকিৎসার সরকারী ব্যবস্থা কতটা প্রসারিত হইয়াছে নীচের তথ্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে সরকার ১০০টি বেডের ৬১টি, ৮৯টি বেডের ৫০টি এবং ২০ বেডের ৪১৩টি রিলিফ হাসপাতাল খোলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রকাশ বর্ত্তমানে সরকারের পরিচালনাধীনে ১০০ বেডের ৬২টি, ৫০ বেডের ৯২ এবং ২০ বেডের ৪১১টি রিলিফ হাসপাতাল আছে। পাঁচ মাসের চেষ্টায় সরকার ২টি হাসপাতাল বাড়াইয়াছেন! অন্যদিকে সরকারী রিলিফ হাসপাতালের অব্যবস্থার জন্য রোগীরা সেখানে যাইতে চায় না এবং যাহারা যায় তাহাদের নিকট হইতে নানা ফন্দীতে পয়সা আদায় করা হয়—এইরূপ অভিযোগ প্রায় সর্ব্বত্রই শোনা যায়।

অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভের কথা যে, যে-প্রতিষ্ঠান গত এক বৎসর ধরিয়া মহামারীর হাত হইতে বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় একক সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে সে-প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বাঙ্গালীর দানই সর্ব্বাপেক্ষা কম। বি, এম, আর, সি, সি-র তহবিলের শতকরা ৯২ ভাগ আসিয়াছে বাংলার বাহির হইতে এবং আজ যখন অর্থের অভাবে বি, এম, আর, সি, সি-র কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম তখনও বাংলাদেশ হইতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। অথচ বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা ও তাহাদের সম্পদের পরিমাণ কমে নাই বরং যুদ্ধের বাজারে বাড়িয়াছে।

বি এম, আর, সি, সি, আরও ছ' মাস ৪৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র চালাইবার সংকল্প করিয়াছি। ইহার জন্য প্রয়োজন ১,৪৪,০০০৲ টাকা। এই টাকা যদি অবিলম্বে না পাওয়া যায় তবে তাহাদের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং তাহার ফলে মহামারীর বিরুদ্ধে এত দিনের চেষ্টায় বাংলায় যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই শুধু নষ্ট হইবে না, মহামারীর আক্রমণে দেশ গুড়াইয়া যাইবে।

অবিলম্বে নীচের ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য পাঠান: বেঙ্গল মেডিকাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটী, ৯৩।১ এ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শোক-সংবাদ

কমরেড মিহির মুখার্জ্জি গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ২১ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। প্রায় ১০ মাস পূর্ব্বে একদিন ট্রাম হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি আহত হ'ন এবং তারই ফলে এতদিন ভুগিয়া তাঁর মৃত্যু হয়।

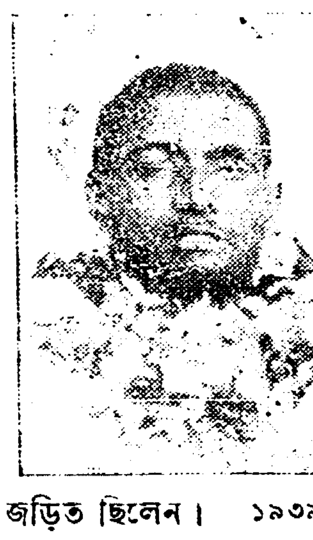

তিনি বাল্যকাল হইতেই কলিকাতার ৫নং ওয়ার্ডের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে পার্টির বে-আইনী অবস্থায় তিনি প্রথম ইহার সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু, ১৯৪২-এর আগষ্টে তিনি স্থানীয় অঞ্চলে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের নেতা হইয়া দাড়ান। কিন্তু, পরে ভুল বুঝিয়া এই পথ হইতে সরিয়া দাড়ান এবং পার্টির কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়া ১৯৪২-এই পার্টি সভ্যপদের গৌরব অর্জ্জন করেন।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে প্রধানতঃ কমরেড মুখার্জ্জিরই প্রচেষ্টায় কলিকাতার নূতন বাজারে জনরক্ষা সমিতি গড়িয়া ওঠে। এই এলাকার জনসাধারণ তাঁহাকেই এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচন করে। এই সময়ে বস্তীতে, কিউতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জনসেবার মধ্য দিয়া কমরেড মুখার্জী স্থানীয় সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে দলে দলে স্থানীয় জনসাধারণ শেষ সম্মান জানাইতে ছুটিয়া আসে।

●

গত ফেব্রুয়ারী মাসে **কমরেড সুনীল পান্থ** চট্টগ্রামের অন্তর্গত স্বগ্রাম কেলিসহরে যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়াছেন। কমরেড পান্থ শ্রীরামপুর বেঙ্গল বেল্টিংএ কাজ করিতেন। হুগলী জেলা সূতাকল ও বেল্টিং মজদুর ইউনিয়নের তিনি একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। কমরেড পান্থ পার্টির একজন বিশিষ্ট দরদী ছিলেন।

বি এণ্ড এ রেলে ৭০ ভাগ মজুরের বেতন ৩৫৲ টাকারও কম

★ ১৩,০০০ মজুরের স্মারকলিপি ★

প্রত্যেক রেলকর্ম্মচারী ও মজুরের ৪৫৲ টাকা মাগ্গীভাতা, নূতন এবং বর্দ্ধিতহারে মাহিনার গ্রেড, সর্ব্বনিম্ন বেতন ৪০৲ ও বর্ত্তমানে অন্যায়ভাবে যে 'জোন প্রথার' শ্রমিকদের বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার উচ্ছেদ—নিখিল ভারত রেলওয়ে মেন্স্ ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের মোগলসরাই অধিবেশনে এই দাবীগুলির ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারতের সমস্ত রেলমজুরদের আহ্বান করা হয়। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গত অধিবেশনেও এই দাবীগুলি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা হয়।

গত কয়েক বৎসর বি এণ্ড এ রেলওয়ের মজুররা বহু বিপদ এবং বাধা বিপত্তির মধ্যে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন পরিচালনা করিয়াছে। সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার এবং জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বহনের প্রধান দায়ীত্বই এই রেলওয়ের। পূর্ব্বের তুলনায় প্রতিটি রেলওয়ের এবং মজুরের কাজের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩।৪ গুণ এবং সাথে সাথে রেলবিভাগের আয়ের পরিমাণও অসম্ভব বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ১৯৩১ সালে জিনিষের দাম কমিয়া গিয়াছে, রেলওয়ের আয় কম হইতেছে প্রভৃতি অজুহাতে যে কম বেতনের হার ধার্য্য করা হয় তাহা এখনও বলবৎ আছে। অথচ এদিকে রেলওয়ে বোর্ড দেশ বিদেশে প্রচার করে যে রেলমজুররা কত সুখেই না থাকে! রেলওয়ের অতি দায়িত্বশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত—গ্যাংম্যান, পয়েন্টস্‌ম্যান, খালাসী, ব্লকসিগন্যালম্যানের বেতন এখনও ১৩৲ হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে এবং শতকরা ৭০ ভাগ রেলমজুরের বেতন ৩৫৲ টাকারও কম।

বি, এণ্ড এ রেল শ্রমিকেরা বি, এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই সকল দাবী লইয়া ব্যাপকভাবে প্রচার ও আন্দোলন চালায়। ইউনিয়নের মেমোরেণ্ডামে ১৩ হাজারেরও বেশী আসাম ও বাংলার রেল শ্রমিকেরা সহি দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে চিৎপুর, শিয়ালদহ, কাঁচরাপাড়া, বনগ্রাম, সোণারপুর, পার্ব্বতিপুর, লালমণিরহাট, শান্তাহার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ধুবড়ী, গৌহাটী, ডিব্রুগড় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্রে এই দাবীগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপক জনসমাবেশ হয়। বিভিন্ন রেলকেন্দ্রে জনসমাবেশে এইবার স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই রেলশ্রমিকের আন্দোলনে সাফল্য কামনা করেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট আলোচনার পূর্ব্বে বি এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে বাংলার এবং আসামের রেলশ্রমিকেরা বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ১০০টি টেলিগ্রাম পরিষদের কংগ্রেস নেতা শ্রীভুলাভাই দেশাই এবং লীগ নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁনের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের নিকট রেলমজুরের দুরবস্থা প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস-লীগের মিলিত সমর্থন প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

ইহার ফল হিসাবে এইবার সর্ব্ব প্রথম রেলশ্রমিকের সমস্যার জন্য কংগ্রেস এবং লীগ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরা একযোগে সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মতই লক্ষ লক্ষ রেলকর্ম্মচারী ও শ্রমিককে কি ভাবে রেলওয়ে বোর্ড তাহাদের ন্যায্য এবং প্রাপ্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহাও সমস্বরে বিভিন্ন নেতারা ঘোষণা করিয়াছেন।

বগুড়াকে বাঁচাইবে কে?

(৭ পৃষ্ঠার পর)

আসল সমস্যার সমাধান নাই। গো-পালন ও চরকার যে মামুলি কার্য্যক্রম তাঁহারা গ্রহণ করিলেন তাহাতে গ্রাম পুনর্গঠন, খাদ্য সমস্যা, চোরাবাজার ইত্যাদি জনগণের দুর্দ্দশা সমাধানের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নাই। বগুড়াবাসী এই সম্মেলন হইতে কোন আশার বাণী শুনিতে পাইল না।

অন্যদিকে লীগের দিক হইতেও ঐক্যবদ্ধ জনসেবার আন্দোলন সৃষ্টি করার কোন প্রেরণা নাই। চোরাকারবারীরা যখন দেশকে উচ্ছন্নে দিতেছে, যখন লীগের নামে পরিচিত গ্রাম্য প্রধানেরা কৃষকের জমিজিরাত লুটিয়া নিতেছে—লীগ তখন একটি প্রতিবাদও করে নাই।

বগুড়ার দুটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের উপর আজ ১৩ লক্ষ মানুষের জীবন নির্ভর করিতেছে। নিষ্ক্রিয়তা ও অবসাদ দূর করিয়া বগুড়ার দেশপ্রেমিকরা যদি জনসেবার পথে সংঘবদ্ধ না হয় তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ আসিতেছে, তাহার আগুনে গোটা জেলা ভস্মীভূত হইবে।

জার্ম্মাণীর ভিতরে

[৫ পৃষ্ঠার পর]

যা গর্ত্ত আর ট্রেঞ্চ খুঁড়েছি তা দৈর্ঘ্যে হবে ২২,৮৭৫ কিলোমিটার, আর মাটি তুলে ফেলেছি ৪১,৪২১,৫১১ কিউবিক মিটার।"

একথা অস্বীকার করবার নয় যে পূর্ব্ব প্রুশিয়া আত্মরক্ষার জন্য ভাল করেই তৈরী হয়েছিল। অতর্কিতে তাদের আমরা ধরে ফেলিনি। যাই হোক তবু দখল তো হয়েছে। তাদের আত্মরক্ষা বূহ ১০০ কিলোমিটার করে গভীর। মোট ২০টি লাইন। শুধু চার বছর ধরে তারা হয়নি, চল্লিশটি বছর। ওস্তলিফ চাষীদের টাকা দিয়েছিল। দেড় মিটার পুরু করে দেওয়াল গাঁথতে হবে আর ভিত গাড়তে হবে পাকা পোক্ত করে। কোথায় গেল সে দেওয়াল আর পাকা ভিত, কোথায় সে কিউবিক মিটার আর হ্রদ, কিছুই তাদের বাঁচাতে পারল না। লালফৌজ সব বাধাই চূর্ণ করতে জানে।

কার সাধ্য লালফৌজকে রোখে

জানুয়ারীর প্রথমে মূর্খ জার্ম্মানরাই শুধু বিশ্বাস করতো যে পূর্ব্ব প্রুশিয়া দুর্ভেদ্য। লিয়েবষ্টাডে দেখলাম একটা অসমাপ্ত সার্টিফিকেট—আর্য্য জন্মের পরিচয় পত্র। ১৯৪৫ সালের ১২ই জানুয়ারী জনৈক এরিখ স্নেলার বিয়ে করবে বলে এই জন্মবৃত্তান্ত পত্র পূর্ণ করতে সুরু করে। বাপ, মা ও ঠাকুরদার জন্মবৃত্তান্তের ঘরগুলো সে পূরণ করেছে; কিন্তু তিনটি কলম তখনও অসম্পূর্ণ। এই পবিত্র আর্য্যের কাজে লাল ফৌজ এসে বাধা দিয়েছে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানবে না এরিখের ঠাকুরমা কে ছিলো। এলবিং-এর একটা পোষ্টাফিস থেকে এক তোড়া চিঠি কুড়িয়ে নিলাম! সেগুলো ঠিকানামত তখনও পাঠান হয়নি। একটা চিঠিতে খুব ভরসার সাথে দম্ভভরে বলা হয়েছে, "পশ্চিমে আমাদের যুদ্ধ চমৎকার চলেছে। রুশরা তাদের নিজ জমিতেই শুধু লড়তে পারে। এ তো যে কোন শিশুই জানে। কাজেই আমাদের জন্য ঘাবড়িয়ো না...।" এই বছরের ১৬ই জানুয়ারীতে এলবিং-এ বসে একজন জার্ম্মান একথা লিখছে।

তবু সমস্ত পৃথিবী জানতো লালফৌজের গতিরোধ আর কেউ করতে পারবে না। পূর্ব্ব প্রুশিয়া একথা জানতো। জানতো বহু দেশ থেকে আগত লাখ লাখ রুশ, ফরাসী, ইংরেজ ও পোল যুদ্ধবন্দীরা। আমাদের মিত্রশক্তিরা তো জানতো নিশ্চয়ই। ইউরোপের সব চেয়ে পশ্চাৎপদ লোকরাও জানতো। সুইজারল্যাণ্ডের রাজনীতিকরা জানতো। এলবিংএ তীব্র পথযুদ্ধের পর আমাদের লোকরা সুইস ভাইস-কনসাল মঃ চার্লস ব্রাণ্ডেনবার্গকে রক্ষা করে। কনসাল মশাই ৩ হাজার সুইস পনীরওয়ালার (অন্ততঃ সরকারী খাতায় তাই লেখা আছে) স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন! এই কড়া "নিরপেক্ষ" কূটনীতিককে কয়েকটি অপ্রীতিকর দিন কাটাতে হয়েছে মদের পিপার তলায়। গোলার হাত থেকে বাঁচবার আর পথ ছিল না। দোভাষীর কাজ করার ভার পড়ল আমার ওপর। তার খাবার থাকবার ব্যবস্থা আমরাই করলাম। 'মুখ দিয়ে তার হাসি ফুটলো, সে ভাবতেই পারে না যে সে বেঁচে আছে। তার কাছে ছিলো একটা পাশ। সুইস কনফেডারেশনের পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্ত্তার সই ছিল তাতে। সুইস রাজধানী বার্ণের শিল। রুশ ভাষাতে লেখা ছিলো নিরাপদ'। আমি তাকে না জানিয়ে পারলাম না, এই বিখ্যাত দলিল খানার জোরেই তার বাঁচোয়া। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বার্ণ সহরে ১৯৪৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রুশ ভাষায় কেন লেখা হয়েছে এই দলিল?" হেসে তিনি জবাব দিলেন, "বার্ণের কারও সন্দেহ ছিল না যে লাল ফৌজ এলবিং দখল করবে।" বার্ণেও তারা অবস্থা কিছু কিছু বুঝতে সুরু করেছিল। বার্লিনেও তাই হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে ব্রাণ্ডেনবুর্গ ও স্ট্যাক্সোনিতে ফাসিষ্টরা রুশ ভাষায় বলতে শিখছে "আমাদের তো দোষ নেই।" পূর্ব্ব প্রুশিয়াতেও জার্ম্মানরা এই শব্দ ক'টাই প্রথম শিখেছিল। উচ্চারণও তাদের বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা কথা তারা বোঝে না, যে তারা যা বলে তা আমরা শুনি না। তারা যা করেছে তা আমরা ভাল করেই জানি।

[রেডষ্টার, ২২-২-৪৫]

১৯৪৪-এর বাংলায় জন্মহার অস্বাভাবিক কমিয়াছে—

এখন তো দুর্ভিক্ষ "নাই", তবে জন্মহার আরও কমে কেন?

কুষ্ঠিয়ার গ্রামে গ্রামে কি দেখিলাম

যখন শুনিলাম যে কুষ্টিয়া থানায় প্রতি ১০০টী সন্তানের জন্মের বদলে ২১৬ জনের মৃত্যু হয় তখন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। খাদ্য সংকটের আগে দশ বছরের হিসাব হইতে বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে জানিয়াছিলাম যে বাংলায় মৃত্যু হারের চেয়ে জন্মের হার শতকরা একটি করিয়া বেশী। তারপর দুর্ভিক্ষের দিনে হয়তো মৃত্যু-হার বাড়িয়াছিল; কিন্তু ১৯৪৪ সালে যখন কর্ত্তরা সকলেই বলিতেছেন যে সংকট প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছি তখনও মৃত্যুহার জন্মের চেয়ে ডবলেরও বেশী হইবে তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পরি নাই। তাই চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য কুষ্টিয়া থানা দেখিতে গিয়াছিলাম।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপাল এলাকা বাদ দিলে ১৫টী ইউনিয়ন এবং ১০৫১১২ জন লোক (১৯৩১-এর সেন্সাস) লইয়া কুষ্টিয়া থানা। ইহার মধ্যে দুইটী ইউনিয়নকে নমুনা স্বরূপ ধরিয়া আমি নিজে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লোক পালাইয়াছে, মরিয়াছে, মরিতেছে—কাজেই লোকসংখ্যা কমার ফলে জন্মসংখ্যাও কমিতেছে সেরূপ চিত্র বহু দেখিলাম। হাটশ হরিপুর গ্রামে পৌছিয়াই কবি আজিজুর রহমানের কাছে শুনিলাম মুসলমান চাষী চেতন মোল্লার মৃত্যু কাহিনী। সাত বছর আগে চেতনের বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীকে সে ভালবাসিত, ৪টী সন্তানও হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীকে ভালবাসিত বলিয়াই দুর্ভিক্ষের দিনে অনাহারক্লিষ্ট সহধর্ম্মিনীর দুঃখ সে সহিতে পারে নাই। নিজেই অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্ত্রীকে রাজি করাইয়াছিল তাহাকে ছাড়িয়া আর একজন অবস্থাপন্ন কৃষককে নিকা করিতে। তারপর অনাহারে ৩টী সন্তান মরিয়াছে—এই প্রেম গৌরবান্বিত অখ্যাত চাষী চেতন মোল্লাও মরিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা জন্মসংখ্যাকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

আর সন্তান জন্মে না

জেলে পাড়ায় ৫৪ বৎসরের বৃদ্ধ নরেন বিশ্বাসদের ছিল বিরাট যৌথ পরিবার, মোট ২৯ জন লোক। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ঝড়ে এই বিরাট বৃক্ষের প্রায় সমস্ত ডাল পালাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শুধু দুটী ছেলে মেয়ে ও একটি ভাই লইয়া বুড়া-বুড়ী বাঁচিয়া আছে। নরেন বিশ্বাসই বলিল যে তাহাদের পাড়ায় আগে প্রায় ৪০০ লোক ছিল—খাদ্যসঙ্কটে ১৫০ মারা গিয়াছে। আগে প্রতি বৎসর ৩০।৪০টী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত, এখন ৮।১০টীও জন্মায় না।

মুচিপাড়ায় ২৭।২৮ ঘরের মধ্যে ৫।৬ ঘর বাঁচিয়া আছে। আর সকলের ভিটা শূন্য, অনেকের ভিটা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে এখন তামাকের চাষ হয়। গত এক বছরে গোটা পাড়াটীর মধ্যে মাত্র একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

সালদা গ্রামে তারেন গায়েন সপরিবারে নির্ব্বংশ হইয়াছে, হিসাব শেখের পরিবারে শুধু হিসাবই বাঁচিয়া আছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধ কুবীর হালদার আর ৪০ বছরের বিলাত আলি এক টানা উপবাসে ক্লান্ত হইয়া গলায় দড়ি দিয়াছে।

হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে স্বাভাবিক মৃত্যু হার ছিল বৎসরে ১৪।১৫ কিন্তু ১৯৪৪-এর শুধু নভেম্বর ডিসেম্বর মাসেই মারা গিয়াছে ১৫ জন। আগে প্রতি বৎসর ৩০।৩৫টী সন্তান জন্মিত। এবার গ্রামের লোকের সঙ্গে হিসাব করিয়া দেখিলাম গত ১৩ মাসে মাত্র ৮টী জন্মিয়াছে। বছরে কমপক্ষে ৭।৮টী বিবাহ হইত, এবার মাত্র একটী নূতন বিবাহ হইয়াছে।

নীরব ষষ্ঠীতলা

সালদা গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী আহম্মদ আলির কাছে শুনিলাম তাহাদের পাড়ায় ১৫।১৬ ঘর চাষীর বাস। গত দেড় বৎসরে মাত্র দুটী সন্তানের জন্ম হইয়াছে, তার মধ্যেও একটী মারা গিয়াছে। কমলাপুর গ্রামে হালদার পাড়ায় ১৫টী পরিবারে কাহারও ঘরেই ১৯৪৩-এর পর আর সন্তান জন্মে নাই। বিবাহও একটিও নূতন হয় নাই।

● কুষ্ঠিয়ায় এবার জন্ম সংখ্যা দুর্ভিক্ষ-বৎসরেরও অর্দ্ধেক

নদীয়া জেলা কুষ্টিয়া থানা—লোকসংখ্যা ১০৫১১২ (কুষ্টিয়া মিউনিসিপাল এলাকা বাদ)

সাল	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪ (১১ মাস)
মৃত্যু	২৭৮৫	২২১৫	২৬১৬	২৭৮৬	৩২৮৪	৪০০৩	২৭৭৮
জন্ম	৩১৫৮	৩৩৩৪	৩৩৮৪	৩০৪০	২৮২৬	২৩৮১	১২৮৪

[জেলা বোর্ড অফিসের হিসাব হইতে]

নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ কাটু হালদার চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আমাকে গ্রামের ষষ্ঠীতলাটী দেখাইলেন। শুধু বটগাছটি নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। বহু দিন আগেকার ছেলে-মানতের সূতা দু' একটী এখনও ঝুলিতেছে। পূজার জায়গাটী দুর্ব্বা ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে, নীচের জমিটী অনেক দিন নিকানো হয় নাই। সন্তান-জন্মের আনন্দ শঙ্খ আর এ গ্রামে বাজিয়া ওঠে না, তাই মা ষষ্ঠীর পূজার প্রাঙ্গনও অন্ধকারে পরিত্যক্ত।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ও লোক সংখ্যা হ্রাস হইলে জন্মের উপর মৃত্যু আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল না। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের বছর এই থানায় প্রতি ১০০টী মৃত্যুর পিছনে ৫৩টী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর এখন দুর্ভিক্ষের পরও (১৯৪৪) একশোটী মৃত্যুর পিছনে জন্ম আরও কমিয়া মাত্র ৪৬টীতে দাঁড়াইল কি করিয়া—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

হরেকৃষ্ণপুরের বৃদ্ধ ইরফান বিশ্বাস ইহার জবাব দিলেন—"ছেলে কেন কম হয় তা কি আপনারা বোঝেন না, বাবু? লোকে ভাত পায় না—নাড়ীর জোর গেছে কমে—তো ছেলে হবে কোত্থিকে?"

জন্ম কমিবার কারণ

মালদার গ্রাম্য ডাক্তার মুকুন্দলাল প্রামাণিক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই সমর্থন করিয়া বলিলেন,—

"আগে এই মালদা গ্রামে প্রতি ঘরে আড়াই, তিন বছর অন্তর আঁতুড় হত—এখন আর তা হয় না। আমার তো মনে হয় ৫।৬ বৎসর অন্তরও হবে না। যারা মরেছে তারা ছাড়াও যারা বেঁচে আছে তাদেরই বা সন্তান-প্রজননের শক্তি কতটুকু? কলাই আর মটর খেয়ে, ভাতের অভাবে কাঁঠাল সেদ্ধ খেয়ে যারা দিন কাটিয়েছে—তাদের আর কটা ছেলে হবে?"

হাজারকরা মাত্র ৬টী জন্ম!

ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানায় জন্মের হিসাব

ইউনিয়ন	লোকসংখ্যা	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪
১। বাড়ইখালি	১১০১৩	২৮৯	৩৫২	৩৬৪	৩৮৫	২৮১	—	৩৯
২। হাসাড়া	১০৬৩৮	৪৪৮	৩৫৬	৪৮৪	৫১৩	৪১৪	২৫৯	৭২
৩। বীরতারা	৭৯৯১	৩০৩	২৮৮	৪২৬	৩২১	২৭৯	১৮৩	৭৬
৪। ষোলঘর	১২৫০৭	৪৮২	৪১৪	৩১৬	৪৮১	৩৮৮	২৪১	৫১
৫। শ্রীনগর	৯২৮৫	৩৭০	৩৫৭	৪২৪	৩৬৭	৩১২	২৪২	৫৭
৬। শ্যামসিদ্ধি	৯০৩২	৫০১	৪১৮	৪৫২	৫২০	৩৮৫	—	৯৭
৭। বাঘড়া	৮৪৩৭	৩০১	২১২	৩৩১	২৬৮	২৩৮	১৪৮	১৭
৮। ভাগ্যকুল	১৩৭৪৯	৬২১	৫৭৭	৭৩৯	৭৭২	৪৪৪	৩১৯	১০
৯। রাঢ়িখাল	১০১২০	২৮৪	২৮০	৩১৭	৩০৯	২২৩	১১১	৭
১০। কালাপাড়া	১০০২০	৪৮১	৪০৫	৬০৭	৫৯৭	৪৬২	১৭৬	৫৯
১১। পাটাভোগ	৭৬৪৮	৩০৪	২৯৯	৩৩৫	৩৭৫	৩০৮	১৭৩	৩৬
১২। আটপাড়া	৮০৬০	২৯৪	৩২৮	৩২১	৩৯৪	২৯১	১৭৮	৫৯
১৩। তাঁতার	১০৮১৪	৪৬৯	৪৪১	৪০৩	৪৬৯	৪৩৫	২৩৮	১২৯
১৪। কুঁকুটিয়া	১৩৬২৫	৪৯১	৫৪৩	৫৪১	৫৯৭	৪৮১	—	৯০
মোট	১৪২৯৩৯	৫৬৩৮	৫২৭০	৬০৬০	৬৩৬৮	৪৯৪১	২২৬৮	৭৯৯

[এই তালিকাটি শ্রীনগর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার কর্ত্তৃক জেলা বোর্ড হইতে সংগৃহীত এবং নিজস্ব তদন্ত দ্বারা সংশোধিত]

কাপড় লইয়া মজুতদার ও আমলার

● বগুড়ায় কণ্ট্রোলকে ফাঁকি : বরিশালে চোরাকারবারীর রাজত্ব :

বগুড়া শহরে মাস খানেক পূর্ব্বেকার কথা। ধুতি শাড়ী আগেই অন্তর্ধান হইয়াছিল। বর্তমানে জামা বানাইবার ছিট কাপড় পর্য্যন্ত পাইবার উপায় নাই, সাপ্লাই আসা বন্ধ হয় নাই—সাপ্লাই অফিস তা স্বীকার করেন। কিন্তু বিশেষ ভাগ্যবান না হইলে সারা বগুড়া সহর খুঁজিয়া প্রকাশ্য বাজারে একচিলও পাওয়া দুষ্কর।

থান কাপড়ের উপরে কণ্ট্রোলের দাম লেখা। সব সময় কারচুপী করিয়া তা বিক্রী করাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, কাজেই কাপড়ের মহাজনেরা এখন দর্জ্জি রাখিয়া নিজেরাই জামা তৈরী করিয়া বিক্রী শুরু করিয়াছে। এতে কণ্ট্রোলেরও হাঙ্গামা নাই—বেশ দু' পয়সা বেশী মুনাফাও হয়। দীপচাঁদ বোথ্‌রা এহেন মহাজনদেরই অন্যতম।

দর্জ্জিরও কোন অভাব নাই দীপচাঁদ বাবুর। ১৲।১।০ দর্জ্জিদের মজুরী—সকাল হইতে রাত বারটা পর্য্যন্ত তাদের খাটুনি। তাও বছরে ছয় মাস মাত্র তাহাদের কাজ—বাকী ছয় মাস দীপচাঁদ বাবুর তাহারা বেগার খাটিবে—জল আনিয়া দিবে, ঘর দোর পরিষ্কার করিবে, কাপড়ের গাঁট বাঁধিবে—এমনি বন্দোবস্ত।

বাজারের মধ্যে দীপচাঁদ বাবুর প্রকাণ্ড দোকান। লোকে বলে গত দুই বৎসরে দীপচাঁদ বাবু একেবারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু যত গোল বাধাইয়াছে বৃন্দাবন-পাড়ার কাটা কাপড়ের ফেরিওয়ালারা। ২০০।২৫০ ঘর হইবে। নিজেদেরই সেলাইয়ের কল আছে। ১১৲ টাকার থান ১৯৲ টাকায় কিনিয়া জামা বানাইয়া তারা ফেরি করে—কেউ ফুটপথের ধারে, কেউ রাস্তার কুনি ঘাপচিতে বসিয়া বিক্রী করে। সংসারের সকলে মিলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করে—কেরোসিনের অভাবে মোম বাতির আলোয় রাত ১টা দুটা পর্য্যন্ত কল চালায়। দিন ১৫৲।২০৲ টাকা বিক্রী করিতে পারিলে ১।০।১।০ টাকা মাত্র আয়। তবু দীপচাঁদ বাবুর দোকান হইতে এদের দোকানে দু'চার আনা সস্তা। সহরের এবং গ্রামের যারা এদের ছোট্ট দোকানেই তাহারা ভীর করে

দীপচাঁদ বাবুর এ অসহ্য। এস্, ডি, ও সাহেবের দরবারে তার অবাধ গতি। হঠাৎ একদিন পুলিশ ফেরিওয়ালাদের উপর ট্রাফিক আইনের পরওয়ানা জারী করে। হুকুম হইল—বাজারের মধ্যে দোকান বসাইয়া ভীড় করা চলিবে না। অর্থাৎ বাজার হইতে এদের তাড়াইতে পারিলেই দীপচাঁদ বাবুরা নিষ্কণ্টক। অথচ ঐ একই জায়গায় ফেরিওয়ালারা বাপঠাকুর্দ্দার আমল হইতে বসিয়া আসিতেছে, আর ট্রাফিক আইনও আজের নতুন নয়। এদের মেহনতে দৈনিক ১ হাজার হইতে ২ হাজার পর্য্যন্ত জামা, সেমিজ, প্যাণ্ট প্রভৃতি বাজারে আসিত, বগুড়াবাসীদের অনেকখানি বস্ত্রাভাব মিটিত। কিন্তু তাতে পুলিশের বা দীপচাঁদ বাবুর কি আসে যায়!

—[শচীন ঘোষের চিঠি হইতে]

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী **বরিশাল** সদর টেক্সটাইল অফিসার উজিরপুর গ্রামে কাপড়ের বড় ব্যবসায়ী নকুল সাহার দোকানে হানা দিয়া ৪০০ জোড়া মজুত কাপড় উদ্ধার করেন। এই মজুতের অধিকাংশ কাপড়ের বিক্রয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইয়া গিয়াছিল। অথচ একমাস ধরিয়া লোকে ধর্ণা দিয়াও কোনো দোকানে কাপড় পায় নাই। নকুল সাহার দোকানে মজুত ধরা পড়িল বটে, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে টেক্সটাইল অফিসার ঐ মজুতকারী মহাজনকেই আবার মজুত মাল বিক্রির পরোয়ানা দিলেন। ফলে ২।১ দিন পরই কিনিতে যাইয়া খরিদ্দারদের আবার শুধু হাতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্ত সাহার দোকানে হানা দেওয়ার ফলে লুকানো কাপড়

আসামে লাইন প্রথা লইয়া কংগ্রেস ও লীগের দ্বন্দ্ব গভর্ণর-তন্ত্রই ডাকয়া আনিবে

১৯৪০ পর্য্যন্ত আগন্তুকদের জমি দিয়া মীমাংসার ভিত্তি

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আসামের বড়পেটা সহর হইতে ১০ মাইল দূরে কৈমারী রিজার্ভে পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে ২ জন বাঙ্গালী উপনিবেশিক (immigrant) মুসলমান আহত হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। যে জমি-বিলি (Land Settlement) সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আসামে এইরূপ আরও ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে বাংলা এবং আসামের কংগ্রেস ও লীগ মহলে এবং খবরের কাগজ-গুলিতে বিগত কিছুদিন যাবৎ বেশ বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের উপর অত্যাচারের করুণ চিত্র প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের বক্তব্য হইতে মনে হয় আসামে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি এমনি অনাবাদ পড়িয়া আছে অথচ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ভূমি-হীন আসামের পথে ঘাটে বনে জঙ্গলে মুমূর্ষু অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। যদি বা কোনও ক্রমে কেহ কেহ কোনও রিজার্ভে বা অন্যত্র একটু স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হয় অমনি সরকারের পুলিশ এবং স্থানীয় অধিবাসীরা মিলিয়া ইহাদের ঘরবাড়ী এবং শস্যক্ষেত্র পুড়াইয়া দিয়া তাহাদের উৎখাত করিয়া দেয়।

অপর পক্ষে আসামের খবরের কাগজগুলির সংবাদ এবং আসামের কংগ্রেস নেতা ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলৈ কর্ত্তৃক লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িলে মনে হয়—আসামে আবাদযোগ্য এবং বন্দোবস্ত দেওয়ার মত জমি আর মোটেই অবশিষ্ট নাই, বাঙ্গালী মুসলমান উপনিবেশিকরা সরল আসামবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, এই সমস্ত দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালীরা ইতিমধ্যেই আসামের আবাদযোগ্য প্রায় সমস্ত জমিই দখল করিয়া লইয়াছে—ইহাদের ভয়ে আসাম সরকার ও তাহার কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্ত, ইহাদের উপদ্রবে আসামের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই কাহিনী পড়িলে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তর বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে তিক্ত হইয়া উঠে।

আসামের এই জমি-বিলি সমস্যা শুধু আসামবাসীদের এবং আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের সমস্যাই নহে, ইহা আজ বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য আসামের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বরদলৈ গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পরামর্শের জন্য আসামের মুসলিম লীগ সভাপতি ইদানীং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; আসাম লীগ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নিকটও পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছে। আসামের এই সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মনোমালিন্য আরও দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে সে জন্য এই সমস্যা সম্পর্কে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে যথাসম্ভব বাস্তব তথ্য আমরা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করিতেছি।

বাঙ্গালী চাষীর অভিযান

আসাম উপত্যকায় সর্ব্বত্রই প্রচুর খাস সরকারী জমি পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম সরকারের অনুমতি ব্যতীতই জমি আবাদ করিয়া চাষ করা চলিত। ইহার জন্য কোন নজরানা বা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত কোন রাজস্ব লাগিত না। গোয়ালপাড়ার জমিদারী এলাকায়ও প্রথম দিকে নাম মাত্র খাজানা দিলেই জমি বন্দোবস্ত মিলিত।

সুতরাং জমিদারি প্রথা জর্জ্জরিত বাংলা দেশে বিশেষ করিয়া পূর্ব-বাংলার জল বহুল মৈমনসিংহ জেলায় যখন লক্ষ লক্ষ জমিহীন কৃষক প্রজার উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইল তখন ইহাদের অনেকেই জমির সন্ধানে আসামের দিকে ধাবিত হইল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই অভিযান সুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯১১ সালের আদমসুমারী মতে দেখা যায় যে প্রায় ৫০ হাজার বাঙ্গালী কৃষক (ইহাদের অধিকাংশই মৈমনসিংহের মুসলমান) আসামে জমির সন্ধানে আসিয়াছে। ১৯২১ সালে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩ লক্ষ, ১৯৩১ এ প্রায় ৬ লক্ষ, এবং ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে প্রায় ৯ লক্ষ। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষের মত দাঁড়ায়।

আসাম উপত্যকায় সমগ্র অধিবাসীদের তুলনায় ইহাদের এই ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। ১৯১১ সালে আসাম উপত্যকায় মোট অধিবাসী ছিল ৩১ লক্ষ, ১৯২১ সালে ৩৮ লক্ষ, ১৯৩১ সালে ৪৬ লক্ষ, ১৯৪১ সালে প্রায় ৫৭ লক্ষ এবং ১৯৪৪ সালে মোট জন-সংখ্যা প্রায় ৬২ লক্ষে আসিয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় আসাম উপত্যকায় আজ জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশই এই বাঙ্গালী উপনিবেশিকরা। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের উপরেই মুসলমান।

প্রথম প্রথম সরকারী পতিত জমি আবাদ করিয়া ইহারা বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেও ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন বসতিসম্পন্ন বস্তি অঞ্চলের জমির দিকে ইহাদের আগ্রহ স্বভাবত বাড়িতে থাকে, কারণ ঐ অঞ্চলগুলিতে রাস্তা ঘাট, বাজার, পোষ্টাফিস ইত্যাদির অধিকতর সুবিধা ছিল। সুতরাং নবাগত বাঙ্গালীরা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক মূল্যে জমি ক্রয় করিয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জোর করিয়া এবং নিরীহ পুরাতন অধিবাসীদের নানাবিধ সংস্কারের সুযোগ লইয়া তাহাদের জমি হস্তগত করিতে থাকে। বাংলার এই সমস্ত চাষীরা আসামের চাষীদের চাইতে চাষ আবাদে বহু দক্ষ। ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসামের পুরাতন চাষীরা পিছু হাটিতে বাধ্য হয়।

লাইনপ্রথা কি ও কেন

প্রতিযোগিতা হইতে আসামের চাষীদের রক্ষা করিবার জন্য এবং জমি যাহাতে নবাগতরা অবাধে দখল করিয়া না লইতে পারে সেই জন্য ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে নওগাঁ এবং কামরূপের জেলা কর্ত্তৃপক্ষ লাইন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গালী উপনিবেশিক এবং প্রাচীন বসতকারীদের মধ্যে এক সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাইরে বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত না। অপরদিকে পুরাতন বন্দোবস্তীয় অসমীয়া কৃষকের জমি যাহাতে বাঙ্গালী বসতকারীরা হস্তগত করিতে না পারে এই জন্য অসমীয়া কৃষকদের সমস্ত বন্দোবস্তীয় জমিকে একসনা পাট্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একসনা পাট্টা আইনত হস্তান্তর করা চলে না। বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের নূতন জমি বন্দোবস্ত নেওয়া এবং পুরাতন অসমীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে জমি ক্রয় করার অবাধ অধিকারের পথে এই যে অন্তরায় ইহাই লাইন প্রথার প্রকৃত রূপ।

নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান উপনিবেশিকদের যখন স্থান আর সঙ্কুলান হয় না, তখন তাহারা লাইন প্রথার উপরোক্ত দ্বিবিধ বিধিকেই লঙ্ঘন করিয়া জমি অধিকার করিতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ লাইন বহির্গত এলাকা হইতে উপনিবেশিকদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসাম সরকার বে-আইনীভাবে লাইনের বাহিরে অধিকৃত জমিতে উপনিবেশিকদের বসতি আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে থাকেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে লাইন প্রথা অসমীয়া কৃষকদিগকে প্রবলের প্রতিযোগিতা হইতে যথেষ্ট রক্ষা করে।

এই জন্য আসামের অধিবাসীরা লাইনপ্রথা রক্ষা করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, অন্যদিকে বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাইনপ্রথা উঠাইয়া লইবার জন্য উপনিবেশিকদের তরফ হইতে দারুণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। যেহেতু ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান, সেই জন্য মুসলিম লীগ ইহাদের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে এবং উপনিবেশিকরাও মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকে। আসামের মুসলিম লীগের আজ ইহারাই প্রধান শক্তি।

উভয়পক্ষের অতিরঞ্জন

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন বাঙ্গালী উপনিবেশিকরা যে নিরীহ আসামবাসীদের উপর মাঝে মাঝে জোর জুলুম করিয়াছে এবং তাহাদের জমিও কাড়িয়া লইয়াছে তাহা ঠিক কিন্তু যে ভাবে **সমস্ত উপনিবেশিকদেরেই** দুর্দ্দান্ত দস্যু হিসাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা অন্যায়। অপর দিকে উপনিবেশিকদেরে আসাম হইতে মারিয়া পিটিয়া, ঘরবাড়ী শস্যক্ষেত্র পুড়াইয়া দিয়া আসাম হইতে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্রের যে কাহিনী প্রচার করা হয় তাহাও অতিরঞ্জিত। বাঙ্গালী উপনিবেশিকরা নিতান্ত নিরীহ প্রাণী নহে। এখানে আসিয়া তাহাদের কেহ কেহ জোর করিয়া সরকারী রিজার্ভ জমি ও লাইনের বাহিরের জমিও দখল করে। সুতরাং মাঝে মাঝে তাহাদের উচ্ছেদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আজ পর্য্যন্ত তাহারা আসামে ১৭ লক্ষ বিঘা জমি শুধু বন্দোবস্তই পাইয়াছে, কত জমি কিনিয়া লইয়াছে তাহার হিসাব নাই। তাহাদের অন্যায় অধিকার হইতে তাহাদেরে উৎখাত করার চাইতে সরকারের তরফ হইতে উহাকে মানিয়া লওয়াই হইয়াছে বেশী।

কিন্তু ক্রমশঃ একদিকে বাঙ্গালীদের সংখ্যা এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করে এবং অপরদিকে বন্দোবস্ত দেওয়ার মত জমির পরিমাণও কমিয়া আসে, অথচ বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের অবিরাম স্রোত আসামের দিকে অনবরত ধাবিত হইতে থাকে। এইরূপ চলিতে থাকিলে আসামবাসীদের বসতি বিস্তারের জন্য অদূর ভবিষ্যতে আর কোন জমিই যে অবশিষ্ট থাকিবে না এই আতঙ্ক অসমীয়াদের মনে দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বসতিস্থাপন ও পাকিস্তান

রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এই আতঙ্ককে আরও বাড়াইয়া তোলে। ১৯৩৭ সালে নূতন ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালীর মুসলমানেরা ৫ জন এম, এল, এ আসাম এসেম্বলীতে প্রেরণ করে। অপর দিকে ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব আসামকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত করিয়া লইবার ইঙ্গিত করে। সুতরাং আসামে বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার মানেই আসামকে পাকিস্তানের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া—প্রত্যেক অসমীয়াই এই ভাবেই সমস্যাটিকে দেখিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে লীগ সমর্থক মনের মধ্যেও মুসলমানদের অবাধ বসতির অধিকারের ভিতর দিয়া আসামকে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করিবার ঝোঁকও দেখা দেয়। এইরূপে জমিবিলির অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে।

রাজনৈতিক প্রশ্নকে একটু তফাৎ রাখিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, আসামে আবাদযোগ্য কত জমি আছে এবং বাঙ্গালী ও অসমীয়া ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বা কত। আসাম সরকারের হিসাব মত আসামে মোট অকর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৪২ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে পাহাড়, পর্ব্বত, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বাদ দিলে প্রায় ১৮৷০ লক্ষ একরের মত দাঁড়ায় যাহা চাষের যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জমিই সহজে চাষের যোগ্য হইতে পারে না। নিবিড় জঙ্গল, জলা-যায়গা (বর্ষায় যেগুলি জলমগ্ন হওয়ায় চাষ সম্ভব নয়) এবং গোচর রিজার্ভ ইত্যাদি বাদ দিলে সমগ্র আসামে ২৫৷৩০ লক্ষ বিঘার মত আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্য হইতে লক্ষ্মীপুর ও শিবসাগর জেলার আবাদযোগ্য ভূমি আসামের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য পৃথক করিয়া রাখিলে—বাকী চারটী জেলার ১৮ লক্ষ বিঘা বা ৬ লক্ষ একরের মত আবাদযোগ্য পতিত জমি অবশিষ্ট থাকে। জন প্রতি এক একর (৫ জনের পরিবার প্রতি ১৫ বিঘা) করিয়া ধরিলে ৬ লক্ষ লোককে জমি দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

সকলে জমি পাইতে পারে কি?

বাঙ্গালী ভূমিহীনের যে সংখ্যা বিভিন্ন মহল হইতে পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় বর্ত্তমানে আসামে প্রায় ৪ লক্ষ ভূমিহীন বাঙ্গালী কৃষক বর্ত্তমান। আসামবাসীদের মধ্যেও ভূমিহীনের সংখ্যা ইদানীং খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনেও বহুলোক ভূমিহীন হইয়াছে। ইহাদের সকলের সংখ্যাও ৪ লক্ষের কম হইবে না।

নিম্ন আসামের ৪টি জেলার জমি হইতে কোন জমি রিজার্ভ না করিয়াও যদি ১৮ লক্ষ বিঘা জমি সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তবুও ৮ লক্ষ ভূমিহীনের প্রয়োজন মিটাইবার মত জমি থাকে না।

লেখক : বীরেশ চন্দ্র মিত্র

এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া কি লীগ মন্ত্রীসভা কি কংগ্রেসী মন্ত্রসভা পর পর সকলেই উপনিবেশকদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সময়ের সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এইরূপ নির্দ্ধারিত সময়ের পরে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার পক্ষেই আসামবাসীরা মত পোষণ করিতে থাকেন এবং উক্ত সময়ের পরে আগত যাহারা জোর করিয়া জমি দখল করিয়া লইয়াছে, কিম্বা কোন রিজার্ভ জায়গা জোর করিয়া দখল করিয়াছে সেই স্থান হইতে তাহাদের উচ্ছেদ করিবার পক্ষেও মত পোষণ করেন।

অপর পক্ষে মুসলিম লীগ লাইনপ্রথা তুলিয়া দেওয়া এবং বাঙ্গালীদের আসামে অবাধ জমি পাওয়ার অধিকারের উপরে জোর দিতে থাকেন। কোন সময়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে তাহারা নারাজ হন। উচ্ছেদ সম্পর্কেও তাহারা সর্ব্বপ্রকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪২-৪৩ সালে গো-চারণ রিজার্ভ চাষআবাদের জন্য খুলিয়া দিবার আন্দোলনও উপনিবেশিক বাঙ্গালীদের মধ্যে দানা বাধিতে থাকে। বিভিন্ন সরকারী প্রস্তাব এনকোয়ারী কমিটী ও পর পর কয়েকটি কনফারেন্সও জমি বিলির কোন সুসঙ্গত সমাধান করিতে অসমর্থ হয়।

সর্ব্বদলীয় কনফারেন্স

আসাম এসেম্বলীর বিগত নবেম্বর অধিবেশনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আসামের জমি-বিলি সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করিতে থাকে। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বর্ত্তমান সাদুল্লা মন্ত্রীসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অধিক ফসল ফলাইবার তাগিদ পাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আসামে যে সমস্ত গো-চারণ রিজার্ভ আছে তাহার একাংশ ফসল ফলাইবার জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। সরকারের হিসাব মত ৯ লক্ষ বিঘা গো-চারণ রিজার্ভের মধ্যে ২ লক্ষ বিঘার মত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে। এই ২ লক্ষ বিঘা জমিহীন বাঙ্গালী উপনিবেশিক ও অন্যান্যদের বন্দোবস্ত দিবার আয়োজন উদ্যোগ চলে এবং নওগাঁ জেলার কোনও কোনও রিজার্ভ বন্দোবস্তও দেওয়া হয়। অনেক রিজার্ভে বাঙ্গালী মুসলমান উপনিবেশিকরা সরকারী বন্দোবস্তের বাহিরে জোর করিয়া জমি চাষ আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

এই সমস্ত রিজার্ভে পেশাদার গো-চারণকারীদের অধিকাংশই নেপালী। অসমীয়া লোকেরাও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; দুধ সরবরাহের জন্য গরু ও মহিষ পালনই

(৭ম পৃঃ দেখুন)

★ বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নূতন ভবিষ্যতের সূচনা ★

ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে প্রতিদিন দশ সহস্র লোকের সমাগম

সঙ্ঘের নূতন নাম ঃ "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ"

কবি রমেশ শীল

গত ২রা হইতে ৮ই মার্চ্চ কলিকাতায় **ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের** তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রায় সমস্ত জেলা হইতে নির্ব্বাচিত দুই শতাধিক শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া দিল্লী ও বোম্বাই হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। মহম্মদ আলি পার্কের সুসজ্জিত বিরাট সভামণ্ডপে ছয় দিন ধরিয়া যে প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রতিদিন দশ সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিল। সভামণ্ডপের নামকরণ করা হইয়াছিল 'রবীন্দ্র নগর' এবং তোরণের নামকরণ করা হইয়াছিল 'সোমেনচন্দ স্মৃতিতোরণ।' বাংলার শহর ও গ্রামের সংস্কৃতির এত বড় প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন বাংলাদেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। সম্মেলন পরিচালনার জন্য যে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহাতে শুধু যে **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী** ও **ডাঃ ধীরেন সেনের** মতন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকই উপস্থিত ছিলেন তাহাই নয়, পশ্চিম বঙ্গের পল্লীকবি **শেখ গোমহানি** ও গ্রাম্য মৃৎশিল্পী **পশুপতি ভট্টাচার্য্য**ও এই সভামণ্ডলীতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি ও গ্রাম্য লোকশিল্পের মধ্যে যে বিচ্ছেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, জনজীবনের মধ্যে সংস্কৃতির মূল প্রসারিত করিয়া এই সম্মেলন এক নূতন ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত অখ্যাত প্রতিভা ছড়াইয়া আছে, সঙ্ঘের কর্ম্মীদের চেষ্টায় তাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় আমরা এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া লাভ করিয়াছি। রংপুরের অন্ধ দোতারা বাদক **টগর অধিকারী**, চট্টগ্রামের কবিগায়ক **রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়ার** অসাধারণ শিল্প প্রতিভা প্রত্যেককে মুগ্ধ করিয়াছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ধারা সম্মেলনের নৃত্য, গীত, অভিনয় ও চিত্রপ্রদর্শনীর মধ্য দিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহাতে নূতন বাংলাকে গড়িয়া তোলার উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হইল।

শিল্পের উৎস জীবন

২রা মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ **শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার** ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হলে 'আমার দেশ' চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া বলেন, শিল্পের উৎস জীবন এবং শিল্পী তাঁহার তুলি ও রঙে বিচিত্র জীবনেরই রূপ দান করিয়া থাকেন। অতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদীন, সতীশ সিংহ, শৈল চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন আশ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মুরলীধর টালি, মণি রায়, প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের অঙ্কিত ছবি এই চিত্র প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ইহা ছাড়া কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও ঢাকার মসলিন শিল্প এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

৩রা মার্চ্চ হইতে মহম্মদ আলি পার্কে মূল সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার সিয়ান্‌ওকেজি, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সাজ্জাদ জাহির, অন্ধ্র প্রাদেশিক গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ডাঃ রাজা রাও, লক্ষ্ণৌ হইতে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মণিপুর হইতে ইরাবৎ সিং, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি যে বাণী প্রেরণ করেন, সম্মেলনে তাহা পাঠ করা হয়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া ডাঃ ভূপেন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন। বিখ্যাত উর্দ্দু সাহিত্যিক ডাঃ আহম্মদ আলি সম্মেলনে তাঁহার স্বরচিত দুইটি কবিতা পাঠ করেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, আজীবন তিনি সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন; বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছেন। তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও এই সম্মেলনের ডাক তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নদীয়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যও এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান।

সম্মেলনের মূল সভাপতি **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়** তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন,

কবি শেখ গোমহানি

কুলি মজুরদের অভিশপ্ত জীবনযাত্রাই তাঁহাকে প্রথম সাহিত্যের প্রেরণা দেয়। তাহাদের দুর্গত জীবনের ছবি তিনি তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আজ দেশের সামনে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংকট দেখা দিয়াছে, সাহিত্যিকদের তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। সেই নব চেতনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করার জন্য তিনি নবীন সাহিত্যিকদের আহ্বান জানান। **মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে আজ একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক কুৎসিত দলাদলি আরম্ভ করিয়াছে; প্রগতির শক্তিতে তাহারা সন্ত্রস্ত, মানবকল্যাণের তাহারা শত্রু। সাহিত্যের আবর্জ্জনা দিয়া ইহারা নূতন সাহিত্যের প্রাণচঞ্চল গতিকে বার বার রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁহার ভাষণে বলেন, মন্বন্তর বাংলা সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। সাহিত্যিক ও শিল্পীর দল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বেদনাকে ভাষা দিয়াছেন। আজকের দিনে সাহিত্যিক ও শিল্পীর দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি বলেন, '**রচনা করো, রচনা করো, রচনা করো নব জীবনের গান।**' গ্রাম্য কবি **শেখ গোমানী** বলেন, গ্রাম আজ শহরবাসীর কাছে উপেক্ষিত। রোগে অন্নাভাবে গ্রাম্যজীবনের মেরুদণ্ড আজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। গ্রামবাসীর দুঃখ বেদনার কথা শহরবাসীদের আজ জানিতে হইবে। এই সম্মেলন গ্রাম ও শহরের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করুক। গ্রাম্য মৃৎশিল্পী **পশুপতি ভট্টাচার্য্য** তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, জীবনের প্রতি গভীর মমত্ব বোধই শিল্পের উৎস।

সঙ্ঘের নূতন নাম

বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া একটী শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়াও আজকের দিনে লেখক ও শিল্পীর কর্ত্তব্য, সঙ্ঘের নাম পরিবর্ত্তন, রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা, শিশু সাহিত্য, রেডিও সিনেমা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন মুখার্জ্জী, হিরণ সান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অশোকবিজয় রাহা, সরোজ দত্ত, নীহার সরকার, সুধী প্রধান, অমল সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। 'ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া '**প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ**' রাখার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া হীরেন মুখার্জ্জী বলেন, দেশের একটি বিশেষ অবস্থায় 'ফ্যাশিষ্টবিরোধী' আখ্যা প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন যে দ্বিধা ও সংশয় ছিল, তাহা আমরা আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়া দূর করিতে পারিয়াছি। তাই এখন আমরা নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র নামে আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার নাম করণ করিতেছি।

রবিবার সকালে সম্মেলনমণ্ডপে সংস্কৃতি উৎসবের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলা হইতে গ্রাম্য গায়কের দল তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার লোকসঙ্গীত শুনাইলেন। আগরতলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাউল গায়ক সাহেব আলির গান এবং নির্ম্মল চৌধুরী ও খালেদের নেতৃত্বে শ্রীহট্টের পল্লীগীতি সকলকে মুগ্ধ করিল। রংপুরের অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারীর অপূর্ব্ব যন্ত্রসঙ্গীত ১০ হাজার শ্রোতাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিল। কুমিল্লার অন্ধ বাদক ব্রজেন বিশ্বাসের সুর সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। চট্টগ্রামের গায়কদের একটি গান প্রত্যেকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল—গানটি চিত্তপ্রসাদের লেখা 'মা ভৈনর কাহিনী।' ইহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত গৃহস্থবধূর আত্মবিক্রয়ের হৃদয় বিদারক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এ ছাড়াও জলপাইগুড়ী, খুলনা প্রভৃতি জেলার গায়কের দল এই সংস্কৃতি উৎসবে গান করে। এই দিন সব থেকে উল্লেখযোগ্য বাংলার গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যদের দ্বারা গীত ১৯০৫ সালের পরবর্ত্তী জাতীয় সঙ্গীত। বহু দিন পর এই গানগুলি শুনিয়া বাংলার গৌরবময় অতীত মনে পড়িয়া গেল। ইহার পর কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নব জীবনের' গানে একদিকে আর্ত্ত বাংলার মর্ম্মবেদনার কথা, অন্যদিকে পুনরুজ্জীবনের সংকল্প ঘোষণা অপূর্ব্ব সুরসৃষ্টির মধ্য দিয়া জনতার মনে বলিষ্ঠ প্রেরণা আনিয়া দিল।

কবির লড়াই

পরের দিন সন্ধ্যায় সভামণ্ডপে কবিগানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়া এবং মুর্শিদাবাদের শেখ গোমহানি ও লম্বোদর চক্রবর্ত্তী কবিগান গাহিলেন। কলিকাতায় এ ধরণের কবিগানের আয়োজন এই প্রথম। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া নাগরিক পরিবেশের মধ্যে গান করিতে এই গ্রাম্য কবিরা কেহই অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু ইঁহাদের ছন্দ চাতুর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও সপ্রতিভ বাক্‌নৈপুণ্য দেখিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত হাজার হাজার জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া থাকিল।

ইহার পরদিন বিজন ভট্টাচার্য্যের বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন' অভিনয় করিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা। কলিকাতায় এত বিরাট জনতার সামনে ইতিপূর্ব্বে আর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।

শেষ দুই দিন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াড সম্মেলন মণ্ডপে 'ভারতের মর্ম্মবাণী' ও অন্যান্য নৃত্যাবলী দেখান।

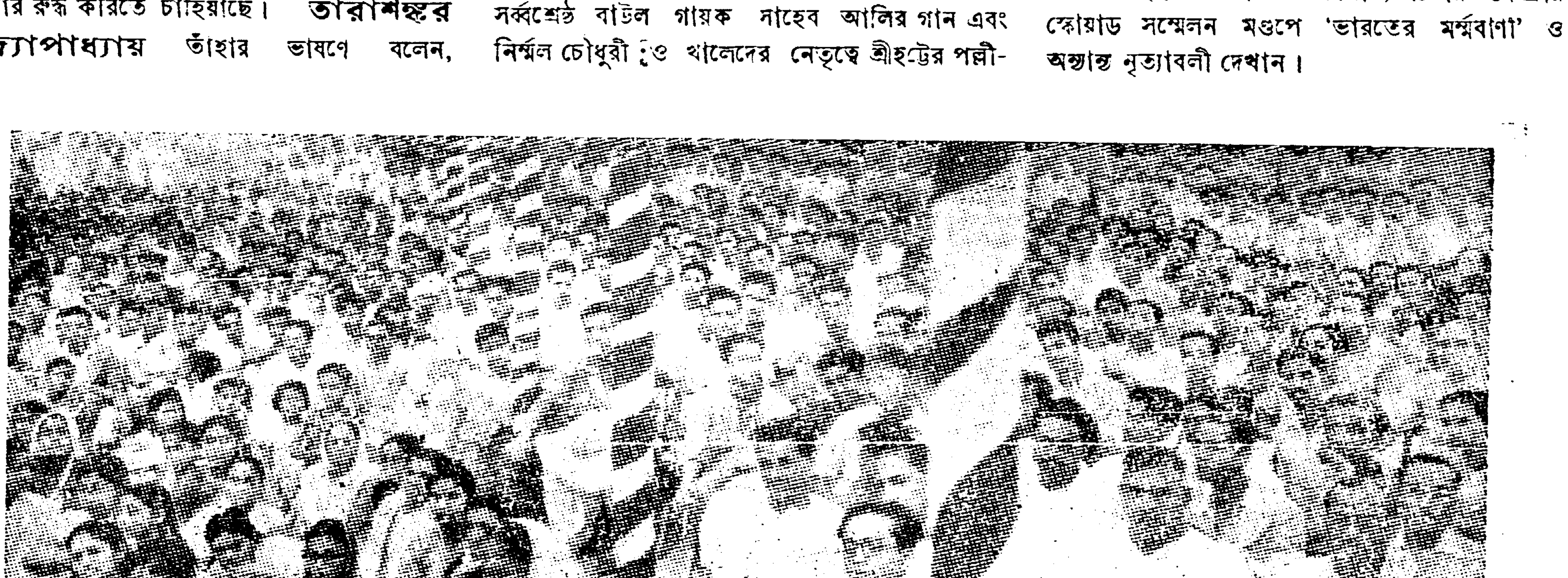

মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট জনতা

কিষাণ সভার ভিতরে

স্বামী সহজানন্দের গণতন্ত্র-বিরোধী ভেদচেষ্টা

সম্প্রতি নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সংবাদপত্রে কয়েকটী বিবৃতি দিয়াছেন। স্বামীজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বহুদিন ধরিয়া কিষাণ সভায় কাজ করিয়া আসিতেছেন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের কয়েকটী পুরাতন ঘটনা স্বামীজী তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা

বর্ত্তমানে মতবিরোধের কারণ খুব সংক্ষিপ্ত। গত ২৫-১-৪৫ তারিখে নিঃ ভাঃ কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিত এক চিঠিতে স্বামীজী কতকগুলি দাবী উপস্থিত করেন। প্রথম দাবী, আগামী বৎসর স্বামীজীকেই কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক করিতে হইবে। দ্বিতীয় দাবী, স্বামীজী কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন, তাঁহাকেই কিষাণ সভার সভাপতি করিতে হইবে; তিনি হয়ত কিষাণ সভার এক আনার সদস্যও না হইতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিষাণ সভার গঠনতন্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়াও ইহা করিতে হইবে। তৃতীয় দাবী, কিষাণ সভার একটি মুখপত্র বাহির করিতে হইবে এবং কিষাণ সভার মধ্যে যাঁহারা কমিউনিষ্ট আছেন তাঁহারা উহার সম্পাদক হইতে পারিবে না, স্বামীজীর মনোনীত কোন অ-কমিউনিষ্টকে উহার সম্পাদনার ভার দিতে হইবে।

সাধারণ সম্পাদক গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামীজীর আশ্রমে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত ও আলোচনা করেন, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় না। সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান করিতে চান, স্বামীজী তাহাতেও সম্মত হন না। সাধারণ সম্পাদক ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ফিরিয়া আসেন, তাহার পর স্বামীজী বিবৃতিগুলি বাহির করিয়াছেন।

কিষাণ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত

স্বামীজীর মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য গত ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী উহাতে যোগ দেন নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—

"স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২রা ও ৭ই মার্চ্চ তারিখে তিনটি বিবৃতি দিয়াছেন। প্রথম বিবৃতিতে স্বামীজী কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় অফিসকে বাতিল করিয়া অফিসের দায়িত্ব নিজে সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি কিষাণ সভার সভাপতিপদে ইস্তাফা দিয়াছেন। ফলে কিষাণ সভার দৈনন্দিন কাজ চালাইবার মত কেহই নাই। কিষাণ সভার একজন দায়িত্বশীল কর্ম্মকর্ত্তা কিষাণ সভার ধ্বংসকর্ত্তার ন্যায় বিভেদাত্মকভাবে কাজ করিয়াছেন দেখিয়া কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল দুঃখবোধ করিতেছেন।

"কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল মনে করে, স্বামীজী যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই এবং উহা গঠনতন্ত্রের বিরোধী। কিষাণ সভার গঠনতন্ত্র অনুসারে একমাত্র কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল শাস্তিবিধান করিতে অধিকারী। সাধারণ সম্পাদক বিহিটায় যাইয়া স্বামীজীর উত্থাপিত সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন এবং ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক করিবার প্রস্তাব করেন; স্বামীজী সম্মত হন না। অথচ ইহার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী এই শাস্তি বিধান করেন। গত বৎসর স্বামীজী অন্ধ্র কিষাণ সভার বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল তাহা সমর্থন করেন না এবং কাউন্সিলের সদস্যগণ মন্তব্য করেন যে, স্বামীজীর শাস্তি বিধানের ক্ষমতা নাই। গতবার স্বামীজী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, এবার তিনি সভাপতি। মনে হয়, স্বামীজীর ধারণা শাস্তি বিধানের ক্ষমতা পদাধিকার-নির্ব্বিশেষে তাঁহারই ব্যক্তিগত অধিকার। কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল পুনরায় ঘোষণা করিতেছে যে, কিষাণ সভা গঠনতন্ত্র সম্বলিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। স্বামীজী যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা স্বামীজীর ক্ষমতার বহির্ভূত।

পাকিস্তান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন

কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল আরও মনে করেন যে, স্বামীজীর যুক্তিগুলি ভিত্তিহীন ও বিভেদাত্মক। তিনি তাঁহার এই গর্হিত কার্য্যের সমর্থনে বলিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট কৃষক সভা ও কমরেডগণ পাকিস্থান সম্পর্কে সভার নিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। কিন্তু, প্রথমতঃ স্বামীজীই গতবারের সভাপতির ভাষণে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। দ্বিতীয়তঃ গান্ধী-জিন্না মিলন সম্পর্কে স্বামীজীর নিজের নেতৃত্বে বিহার কিষাণ সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রস্তাবে তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলা হয় নাই। তৃতীয়তঃ দুইটী জেলা কৃষক সমিতি কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের নিকট কিষাণ সভার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন নিম্নতম শাখার উচ্চতম পরিষদের নিকট এইরূপ অনুরোধ করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। জনসাধারণের মধ্যে সভার নীতিবিরোধী প্রচার না করিলে শাস্তিবিধান করা যাইতে পারে না। শেষ কথা, এই সব বিষয়ই কিষাণ সভার সর্ব্বোচ্চ পরিষদ কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের ডিসেম্বর অধিবেশনে আলোচনা হয়। কাউন্সিল এ সম্পর্কে কোন শাস্তিবিধান প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই সব কারণে স্বামীজীর বিবৃতি ভ্রান্ত এবং অমূলক।

কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের জবাব

নিজের সমর্থন করিতে যাইয়া স্বামীজী কমিউনিষ্ট বিরোধিতা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া এই কাউন্সিল দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কিষাণ সভা একটী বিস্তৃত গণ-প্রতিষ্ঠান। কিষাণ সভার নীতি গ্রহণ করেন ও কৃষকদিগকে সংগঠিত করিতে চাহেন এইরূপ সমস্ত দেশভক্তই কৃষক সভার মধ্যে সর্ব্বদা স্বাগত। কিষাণ সভার শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা আত্মত্যাগী সংগঠকদের মধ্যে কমিউনিষ্টগণ আছেন; এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল সভার কমিউনিষ্ট সহকর্ম্মীদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। কৃষকদের সেবায় বিরামহীন কাজ করিয়া কৃষকসভার ভিতরে কমিউনিষ্টগণ আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সভার মধ্যে সংখ্যাধিক হওয়ার সুযোগ তাঁহারা কখনও নেন নাই। কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল এই উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিতেছে যে, কোন বিতর্কমূলক বিষয় ভোটের জোরে পাশ করাইবার চেষ্টা না করিয়া এ যাবত কাউন্সিলের সমস্ত বৈঠকে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণই কমিউনিষ্ট বন্ধুদের আন্তরিক চেষ্টা হইয়াছে। স্বামীজী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া জানেন যে, কমিউনিষ্টরা ইচ্ছা করিলে যে কোন দিনই কিষাণ সভাতে জনযুদ্ধ বা পাকিস্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু, অন্য সকলের ন্যায় কিষাণ সভার মধ্যে যে সকল কমিউনিষ্ট আছেন, তাঁহারাও সাধারণের সমর্থিত নীতিই কিষাণ সভায় গ্রহণ করিতে চাহেন। কংগ্রেস ও লীগের কর্ম্মীগণের নিঃ ভাঃ কৃষক সভায় যোগদানের পথে যাহাতে কোন বাধা না থাকে, নিঃ ভারত কৃষক সভা সমস্ত কৃষকের সম্মিলিত কৃষক সংগঠনরূপে যাহাতে জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমিক একতার মূলভিত্তি হইয়া দাঁড়ায় ইহাই কমিউনিষ্টদের একান্ত কামনা। কংগ্রেস কর্ম্মীদের কিষাণ সভায় আমন্ত্রণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে তাহা কমিউনিষ্টরাই প্রস্তাব করেন।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল দুঃখ বোধ করিতেছে যে, স্বামীজী যখন দেখিলেন যে কিষাণ সভায় তাঁহার অধিকাংশ সহযোগী আগামী বৎসরের পদাধিকারী নির্ব্বাচন সম্পর্কে তাঁহার সহিত একমত নহেন, তখনই কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের নিকট তাঁহার মত ও অভিযোগ উপস্থিত না করিয়া তিনি নিজেই খুসীমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উত্থাপিত কিষাণ সভায় কমিউনিষ্ট প্রভাবের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে অশোভন। সভার বিগত অধিবেশনে তাঁহার সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল তাহাই স্বামীজীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—'কয়েকটী বিভেদকারী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী দল কিষাণ সভার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে ঈর্ষান্বীত হইয়া, কিষাণ সভা কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন, কমিউনিষ্টরা তাহাদের মত কিষাণ সভার উপর চাপাইয়া দেয়—এই সব মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতেছে।'

সর্ব্বশেষে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল স্বামীজীকে নেত্রকোণায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে এবং কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইলে নিঃ ভাঃ কৃষক কমিটী ও নেত্রকোনায় সমবেত লক্ষ কৃষক জনতার সমক্ষে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিবার জন্য আবেদন করিতেছে।

কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল বঙ্গীয় কিষাণ সভাকে নির্দ্দেশ দিতেছে যে, আগামী বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করুন এবং নিঃ ভাঃ কৃষক সভার পতাকাতলে যে সওয়া আট লক্ষ কৃষক সংগঠিত হইয়াছেন তাঁহাদের যোগ্যভাবে সম্মেলন সফল করিয়া তুলুন।"

নূতন বই

বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা

চার আনা

"অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥"

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার যে বীর বন্দীদের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেই বন্দীরা আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। এই বীর বন্দীদের জীবনের পরিচয় এই বইতে পাওয়া যাইবে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত
কবিতা সংকলন

আকাল আট আনা

সুধী প্রধান সম্পাদিত

কয়েকজন লোক কবি

বার আনা

Just Arrived From Moscow

The War & The Working Class

A FORTNIGHTLY JOURNAL

Devoted to questions of the foreign policies of the U. S. S.R and to current event in international life.

Annual Rs. 12/-
Half-Yearly Rs. 6/-

প্রাপ্তিস্থান:—

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পিপল্‌স্ ওয়ারের বিরুদ্ধে হক সাহেবের মামলা ফাঁসিয়া গেল

মিঃ হকের পিছনে গোপন হস্ত কাহার?

'বাংলার শের' মিঃ ফজলুল হক আবার লীগে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—এই ধরণের কথা লিখিবার জন্য হক সাহেব 'পিপল্‌স্ ওয়ারে'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন।

চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হক সাহেবের অভিযোগ বাতিল করিয়া দিয়া মন্তব্য করেন যে হকসাহেব একটা অনাবশ্যক হৈচৈ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং "এই ব্যাপার লইয়া আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না।"

হকসাহেব নিজেও তাহা জানিতেন এবং আদালতেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি আবার লীগে যোগ দিতে প্রস্তুত এবং 'পিপল্‌স্ ওয়ারে'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কোন ইচ্ছাই তাঁহার ছিল না, শুধু মাত্র বন্ধুদের প্ররোচনায় ইহা করিয়াছেন।

এই বন্ধু কাহারা? এবং ইহাদের মতলব কি?

হক সাহেবের প্রধান সাক্ষী ছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মুসলীম অনুচর মিঃ হুমায়ূন কবীর এবং শ্যামাপ্রসাদের সেক্রেটারী মিঃ হরিদাস মজুমদার। এই বন্ধুদের প্ররোচনায় ও ভরসাতেই হকসাহেব মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। অবশ্য 'বন্ধুরা' হকসাহেবকে গাছে তুলিয়া দিয়া যথাসময়ে মই কাড়িয়া লইয়াছিলেন—আদালতে তাঁহারা কেহই সাক্ষী দিতে আসেন নাই। জেরায় হকসাহেব দুর্দ্দশা দেখিয়াই তাঁহাদের সাহস উপিয়া গিয়াছিল কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

হকসাহেব লীগে যোগ দেবার চেষ্টা করিতেছেন সংবাদ পাইয়া এই বন্ধুরা বোধ হয় অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়েন, কারণ এতদিন হকসাহেবই ছিলেন লীগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র, তাই মহাসভাপন্থীরা ও তাঁহাদের কতিপয় মুসলমান অনুচর হকসাহেবকে এই মামলায় প্ররোচিত করেন। তাঁহাদের আশা ছিল এক ঢিলে দুই পাখীই মরিবে। প্রথমতঃ এই মামলার ফলে হকসাহেব ও লীগের মধ্যে তিক্ততা আরও বাড়িবে এবং হকসাহেবের আর লীগে যাওয়া হইবে না, তিনি চিরকাল তাহাদের হাতের পুতুলরূপে অক্ষয় হইয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ এই মামলায় হকসাহেব যদি জেতেন তবে শ্যামাপ্রসাদ বাবুও 'পিপল্‌স্ ওয়ারের' বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারেন—কারণ তাঁহার মজুতদারী-সমর্থক নীতির একমাত্র সমালোচক এই কমিউনিষ্টরা। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল এই মামলার পিছনে ষড়যন্ত্র। কিন্তু বিচারে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া গেল।

কুয়োমিণ্টাঙের স্বেচ্ছাচারিতা

—চীনে ঐক্যের পরিপন্থী—

[৩ পৃষ্ঠার পর]

ফিরিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে আমি ইহাও প্রকাশ করিতে চাই যে আমরা আশা করিয়াছিলাম কুয়োমিংটান সরকার দেশভক্ত সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিবেন। জনবিরোধী সমস্ত আইন ও ডিক্রী বাতিল করিবেন। গুপ্তচরদের জঘন্য কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং সেন্‌শী কান্‌শী নিয়েনশা সীমান্ত প্রতিরোধ ও অষ্টম ও নূতন চতুর্থ রুট আর্ম্মিকে আক্রমণ করিবার জন্য যে সমস্ত সৈন্যবাহিনী রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবেন। কিন্তু সরকার ইহার একটি কাজও করে নাই।

মালিকদের হাতে কাপড়ের কণ্ট্রোল

কটন ষ্ট্রিটে কাপড়ের দোকানের সামনে বিপুল জনতার একাংশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহকুমা ফুড কমিটির সভ্যগণ এ বিষয়ে এস-ডি-ও সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে "সৎ-ব্যবসায়ী মারফৎ কাপড় বিলি হয়। কি ভাবে বিলি হয় তাহা আমি জানাইতে বাধ্য নই।" এস-ডি-ও সাহেবও সৎলোক, ব্যবসায়ীও সৎলোক—সুতরাং সৎ-এ সৎ-এ মাসতুতো ভাই, বিশেষ বিবরণ অন্য কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই!

পরে জানা গেল যে মিল-মালিকেরই এক পুত্রের দোকান—ন্যাশনাল এজেন্সি মারফৎ নাকি ঐ কাপড় "বিক্রয়" হয়। কিছুদিন আগে পুলিশ খানাতল্লাসের ফলে ঐ দোকান হইতে ৩ গাঁট টেম্প মার্ক না দেওয়া মোহিনী মিলের কাপড় বাহির হইয়াছিল। ইহা বে-আইনী, তাই দোকানের নামে মামলা করিবার জন্য পুলিশ সুপারিশ করে। কিন্তু এস-ডি-ও সাহেব তো দোকানদারকে সৎ-ব্যবসায়ী বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেনই, তা ছাড়া মামলার বিরুদ্ধে কলিকাতায়ও বিশেস "তদ্বির" চলে। সুতরাং স্বয়ং প্রাদেশিক বস্ত্র কণ্ট্রোলারের অফিস হইতে নাকি মামলা না চালাইবার নির্দ্দেশ আসে। প্রাদেশিক বস্ত্র কণ্ট্রোল বোর্ডের অন্যতম মেম্বর মিঃ মোহনলাল দাস মোহিনী মিলের লোক। সুতরাং কণ্ট্রোলারের এরূপ রায় আসিয়া থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

কিছুদিন আগে বরিশাল শহরের বস্ত্রালয়গুলি খানাতল্লাস করিয়া ৪৫ গাঁট কাপড় ধরা হয়। কিন্তু অমনি প্রাদেশিক সরকার হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তার আসিল—এরূপ করিও না, উহাতে স্বাভাবিক ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে!

বড় চোর

প্রাদেশিক বস্ত্র কণ্ট্রোলার ও বস্ত্র কণ্ট্রোল বোর্ডই সমস্ত কিছু ব্যবস্থা, অনুমতি ইত্যাদির মালিক। কাপড়ের চোরাবাজার ইঁহাদের পরিকল্পনা ও কর্ম্মপদ্ধতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

এই বোর্ডের ২৫।২৬ জন মেম্বরের মধ্যে মাত্র চারজন ছাড়া বাকী প্রায় ১৪ জন বস্ত্র বা সূতার মালিক কিংবা কাপড়ের কলের মালিকদের সঙ্গে সংযুক্ত, আর তিনজন আমলা।

প্রথম বস্ত্র কণ্ট্রোলার স্বয়ং। জমা (ফ্রীজ করা) কাপড় ছাড়িবার এখতিয়ার শুধু ইঁহারই আছে। কিন্তু তবুও পূজার সময় বস্ত্রব্যবসায়ীদের "সমর্পিত" (সারেণ্ডার্ড) প্রায় ৭ হাজার গাঁট কাপড়ের কোন হিসাবই পাওয়া যাইতেছে না! সম্প্রতি নাকি ইঁহারই অধীনস্থ মিঃ রহমান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জমা কাপড় বে-আইনীভাবে ছাড়িয়া দিবার জন্য সসপেণ্ড হইয়াছেন। কণ্ট্রোলার স্বয়ং কেন বাঁচিয়া গেলেন তাহা বলিতে পারি না।

বোর্ডের আর দুইজন সভ্য মিঃ বি-কে-বিড়লা ও মিঃ বাগড়ি উভয়েই বিড়লা কোম্পানী তথা কেশোরাম কাপড় কলের কর্ত্তৃস্থানীয়। কেশোরাম কটন মিল সম্প্রতি মজুরদের মাগগীভাতা কমাইয়া দিয়া ধর্ম্মঘট ও বস্ত্রোৎপাদন হ্রাসের ভূমি তৈয়ারী করিয়াছে। রাজমহলে বিড়লা কোম্পানীর নামে কাপড়ের চোরা-কারবারের অভিযোগে মামলা দায়ের হইয়াছিল। বোর্ডের কাছ হইতে মিঃ বাগড়ি কাপড়ের উপর দামের ছাপ বসাইবার ভার পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্সটাইল কণ্ট্রোলার মিঃ ভেলোডি কলিকাতায় আসিলে আমরা তাঁহাকে কেশোরাম কটন মিলের অনেকগুলি কাপড়ের নমুনা দিয়াছিলাম—উহাতে নিরেস কাপড়ের উপরও বেশী দামের ছাপ মারা ছিল!

এই দশ হাজারও পলাইবে?

মিঃ মংটুরাম জয়পুরিয়া আর একজন বিরাট বস্ত্র ব্যবসায়ী—প্রায় কাপড় বাজারের ইস্পাহানি। শোনা যায় লক্ষ্ণৌ, কানপুর বা বোম্বাইয়ে তাঁহার যে লাইসেন্স ছিল তাহা সরকার হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবুও তিনি বস্ত্র কণ্ট্রোল বোর্ডের হোমরা চোমরা।

কণ্ট্রোলার মিঃ জোন্‌সের সঙ্গে ইহার বিশেষ খাতির। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে প্রায় দশ হাজার গাঁট কাপড় কলিকাতার বন্দরে আসিয়া সরকার কর্ত্তৃক জমা (ফ্রীজ করা) হইয়াছে। উহার মধ্যে কয়েক হাজার গাঁট মিঃ জয়পুরিয়ার নামে। কাপড় সরকারী হিসাবে জমা হইয়া যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন—এবং "স্বাধীন" ব্যবসায়ের খাতিরে উহা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। হোর মিলার কোম্পানীর কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজও নাকি ঐরূপ চেষ্টা করিতেছেন। কাপড় ছাড়া পাইলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। না হয় আর কোন রহমানের সসপেণ্ড অর্ডার হইবে।

তা ছাড়া বঙ্গশ্রী কটন মিলের ডাঃ এন দত্ত, ১৮টী মিলের এজেন্ট মিঃ ভোজনগরওয়ালা, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রচণ্ড "অসহযোগী" ও কমিনিউষ্ট-বর্জ্জনকারী সূতা ব্যবসায়ী খাদিপন্থী "কংগ্রেসকর্ম্মী" শ্রীসুকুমার দত্ত, মোহিনী মিলের শ্রীমোহনলাল সাহা, চাউলের কারবারে ইস্পাহানার দোসর হাশেম কাশেম দাদা এণ্ড কোম্পানীর মিঃ ওসমান—ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ীই বোর্ডের সভ্য। ঢাকেশ্বরী মিলের এজেণ্ট মিঃ ভিওয়ানিওয়ালাও আছেন। শোনা যায় বেশী মুনাফা লওয়ার জন্য তাঁহার লাইসেন্স একবার বাতিল হইয়াছিল।

কণ্ট্রোলের কণ্ট্রোলার

আর সকলের মাথা হইলেন কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এস-সি-রায়। ইনি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডিরেক্টর। কণ্ট্রোল বোর্ডের আসল নিয়ন্ত্রক ইনিই। বোধ হয় সেজন্যই কলিকাতায় কণ্ট্রোলের দোকানে ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য চোরাবাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইনি আবার আর্য্যস্থান ইনশিওরেন্স কোম্পানীরও ম্যানেজিং এজেণ্ট। বস্ত্র কণ্ট্রোল অফিস হইতেই কলিকাতায় ১৫০ দোকান "মনোনীত" হইয়াছে। খোঁজ করিয়া জানা গেল এই সব দোকানদারদের অনেকেই আর্য্যস্থানে ইনশিওর করিয়াছেন। উহাতে "মনোনীত" হওয়ার সুবিধা হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না।

একজন সংবাদদাতা আমাকে খবর দিয়াছেন, মিঃ এস-সি-রায় যে-ঢাকেশ্বরী মিলের ডিরেক্টর সেই ঢাকেশ্বরীর ২ নং মিলেই কয়েকটী কাপড়ের টানায় আগের তুলনায় বর্ত্তমানে ৪০টী করিয়া বেশী সূতা খরচ হইতেছে বলিয়া হিসাব দেখানো হয়। সূতার পরিমাণ বাড়িলে কাপড়ের বহর বাড়িবে, কোয়ালিটীও ভাল হইবে—অথচ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে বর্ত্তমান দিনে কাপড়ের কোয়ালিটী বরং খারাপই হইতেছে। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে এই বেশী সূতার হিসাব যদি মিথ্যা করিয়া দেখানো হইয়া থাকে তবে বাকী সূতা অনায়াসেই চোরা-বাজারে পাঠানো যায় এবং তাহাতে বাৎসরিক প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা আমদানী হইতে পারে। মিঃ এস-সি-রায় এবং ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্য বসুর কাছে আমরা জানিতে চাই—ইহার জবাবে তাঁহাদের কিছু বলিবার আছে কিনা। যে-আমলাতন্ত্র ইহার তদ্বির করে তাহাদেরই বা কি বলিবার আছে?

ইহাদের দূর কর

বস্ত্র-ব্যবসায়ের এই সব রাঘব-বোয়ালেরা যে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন—আমলাতন্ত্র যেখানে পদে পদে ঘুষখোর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—জনসাধারণের যে বোর্ডের উপর কোনো কর্ত্তৃত্বই নাই—সেই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে লোকে মৃতদেহের কাপড়ও খুলিয়া পরিতে বাধ্য হইবে এবং বেশীর ভাগ কাপড় চোরাবাজারে গুম হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কাপড় পাইতে হইলে এই বোর্ডকে এখনি ঝাঁটাইয়া দূর করিতে হইবে। কলিকাতায় চালের মতই সমস্ত লোককে রেশন-প্রথায় কাপড় বিলির ব্যবস্থা আদায় করিতে হইবে। ইহার জন্য জনসাধারণকে বিরাট আন্দোলন ও নির্ম্মম সংগ্রাম চালাইতে হইবে—কারণ আমলাতন্ত্র ইহাতে বাধা দিতেছে, ব্যবসায়ী পুঙ্গবেরা ইহাতে বাধা দিতেছে। কোনো কোনো রাজনীতিক দল ও কোন কোন সংবাদপত্রের উপরেও উহাদের প্রভাব রহিয়াছে।

এস-সি-রায়ের সহযোগী ডিরেক্টর শ্রীসূর্য্য বসু স্বয়ং ঢাকা জেলা হিন্দু সভার সভাপতি। হিন্দু সভার উপর বিড়লাদেরও যথেষ্ট প্রভাব। চালের দুর্ভিক্ষের সময় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যেমন "স্বাধীন ব্যবসায়ের জন্য" ওকালতি করিয়াছিলেন—এখন এই সব ব্যবসায়ী-শোষকের চাপে কাপড়ের জন্যও আবার তেমনি ওকালতি করিয়া "দেশপ্রেমের" নামে রেশনিং দাবীর বিরোধিতায় নামিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না। বস্ত্র-আন্দোলনের জন্য সকল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও রিলিফ কমিটির প্রতিনিধিদের লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং যাহার আহ্বানে গত রবিবার কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব জনসমাবেশ হইয়াছিল (ছবি ১-পৃষ্ঠায় দেখুন) সেই কমিটিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই বোঝা যায় হাওয়া কোন দিকে বহিবে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর দিয়া দেশবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে যে বর্ত্তমান দিনে "স্বাধীন ব্যবসা" মৃত্যুরই পরওয়ানা—পুরাপুরি রেশনিং ও কণ্ট্রোল ছাড়া উপায় নাই—এবং জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানেই তাহা করিতে হইবে। তাই গত রবিবার প্রায় বিশ সহস্র নরনারী সকল দলের নেতাদের আহ্বানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইয়া একবাক্যে দাবী উঠাইয়াছে—বর্ত্তমান বস্ত্র কণ্ট্রোল বোর্ড দূর কর, মাথা পিছু রেশনিং চাই, জনসাধারণের সহযোগে বিলির ব্যবস্থা কর। বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হোক, মজুতদার ও ঘুষখোর আমলাতন্ত্রের মাথায় জনগণের রুদ্ররোষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক—বস্ত্রসংকট নিশ্চয়ই দূর হইবে।

—ভূপেশ গুপ্ত

সরকারী শ্রমিকনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াও

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাহাদের হাতে দেওয়া হইবে। এই এসেসররা কাহাদের প্রতিনিধি হইবেন এবং কিভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহা কিছুই প্রকাশ হয় নাই। শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত সত্যিকারের প্রতিনিধি ইহাতে না থাকিলে উহা যে মালিকদের হাতে পুতুল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সরকারী নীতি আমাদের এই সন্দেহকেই দৃঢ় করিতেছে যে নূতন প্রস্তাবটি আসলে মালিকদের নিকট আর এক দফা আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা।

সমহারে মাগগীভাতা নির্দ্ধারণের নাম করিয়া ভারতীয় লোহা কারখানার শ্রমিকদের মাগগীভাতা সংক্রান্ত রায় অপ্রকাশিত রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আত্মসমর্পণের নীতিকে খুবই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমে শুনা গেল যে, মাগগীভাতার প্রশ্ন বিচারের জন্য তিনজন সদস্য লইয়া একটি "বোর্ড" গঠন করা হইতেছে। এখন গুজব যে, ঐ কাজের জন্য প্রতিনিধিমূলক বোর্ডের প্রয়োজন হইবে না, একজন বিশেষ সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে। আজ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন সরকারী ঘোষণাই জানা গেল না। অথচ, মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং, ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক, ষ্টীল প্রোডাক্টস্‌, রবার্ট হাডসন প্রভৃতি কারখানার মামলা শেষ হইয়া গিয়াছে গত ডিসেম্বর মাসে, এতদিন তাহাদের রায় মুলতুবী রাখিয়া সরকারী আমলারা মালিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা পক্ষপাতিত্ব আর কি হইতে পারে?

এই অসহনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? কলকারখানার মালিক মুনাফা লোভে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। কিছুদিন আগে "ষ্টীল প্রডাক্ট" লোহা কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী বহু পরিমাণ কুইনাইন চুরির মামলায় ধৃত হন। শুনা যায় ইতিপূর্ব্বে আরও একবার ঐ কারখানায় পুলিশ হানা দেয়। এই ধরণের অভিযোগ আজ অনেক মালিকের বিরুদ্ধেই শুনা যাইতেছে। গত ছয় মাসে ঢাকেশ্বরী মিলের কোন কাপড় কেহ বাজারে দেখিতে পায় নাই। কাপড়, লোহার মাল, প্রভৃতি কোথায় যায়, কি ভাবে যায়, কেন যায় এবং তাহার পরিণাম দেশবাসীর পক্ষে কী—এই প্রশ্ন লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না কেন?

কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আত্মকলহের পিছনে মালিকরা আশ্রয় লইতেছে। বাংলার আইন সভায় শ্রমিকদের এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইলে সরকারের পক্ষ হইতে তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অথচ, মুসলিম-লীগের সদস্যরা ভাল করিয়াই জানেন যে, শ্রমিকদের এই সংকট দেশকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের কলহ না মিটিলে চটকল লোহাকল প্রভৃতির মত শক্তিশালী মালিকের সহিত লড়িবে এমন শক্তি তাঁহারা কোথায় পাইবেন?

তাই লেবার দপ্তরের উপর জনসাধারণের কোনই খবরদারী নাই! মুনাফালোভী মালিকেরা উহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে পারিতেছে, দেশের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিতেছে।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিবার জন্য বাংলার শ্রমিকরাই অগ্রণী হইয়াছে। যে সময়ে প্রত্যেকখানা কাপড়, প্রত্যেকটি লৌহ দ্রব্য, প্রত্যেকটি কলকারখানার মাল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনে অমূল্য সম্পদ—সে সময় দেশপ্রেমিক শ্রমিক উৎপাদনকে পণ্ড হইতে দিবে না। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১০ হাজার শ্রমিক প্রতিজ্ঞা লইয়াছে—সরকারের শ্রম-নীতির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করিব। তাহাদের প্রতিজ্ঞার সহিত দেশবাসীর প্রতিজ্ঞা যুক্ত হোক।

[এই প্রবন্ধ লিখিবার পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রবল জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট এইমাত্র জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ইণ্ডিয়া ফ্যান কোম্পানীর শ্রমিকদের এডজুডিকেশন মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছে।—জঃ সঃ]

Regd. No. C. 2836. JANAYUDDHA

ওডার ও রাইনের বাধা চূর্ণ : কুয়েষ্ট্রীন ও কলোন অধিকার

প্রাচ্যের যুদ্ধে জাপানেরও 'অবস্থা সঙ্গীন'

প্রায় সারা ইয়োরোপ দখল করার পর ফুলিয়া ফাঁপিয়া মত্ত হস্তীর মত জার্ম্মানীর যে চেহারা হইয়াছিল, আজ তাহা শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিটলার-গোয়েবলস্-রিবেনট্রপ ফ্যাসিজমের সম্পূর্ণ ধ্বংস একেবারে সন্নিকট জানিয়াই আজ নিরুপায় অবস্থায় প্রাণপণ গলাবাজী করিতেছে।

মস্কো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে জার্ম্মানীর প্রাণকেন্দ্রে একযোগে চূড়ান্ত আক্রমণ চালাইবার সময় একেবারে আসন্ন। বার্লিনের খবর, সহরের মধ্যে লালফৌজকে ঠেকাইবার জন্য হিটলারীরা নানা রকম কৌশল অবলম্বনের শেষ চেষ্টায় লাগিয়াছে। বার্লিন সহরের পূরোভাগে একশো মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা আজ বাজিয়া উঠিয়াছে।

লাল ফৌজের জয় জয়কার

মার্শাল রকোসভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ যেমন পূর্ব্বপ্রুশিয়ার পাশ কাটিয়া কয়েক লক্ষ জার্ম্মান-সেনাকে বন্দী করিয়াছিল, তেমনি বালটিক সাগর-কূলে প্রধান বন্দর ডানজিগেও জার্ম্মানদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। একশো মাইল পশ্চিমে কস্‌লিন বন্দর এখন লাল ফৌজের হাতে। ডানজিগ ও গিডনিয়া বন্দরের মাঝামাঝিও লাল-ফৌজ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সব শেষের খবরে জানা যায় যে খাস ডানজিগের সহরতলীতেই লড়াই জমিয়া উঠিয়াছে।

রকোসভস্কীর এই অভিযানের একটা উদ্দেশ্য হইল যাহাতে মার্শাল জুকভের বার্লিন অভিমুখে অভিযান আরও দ্রুত ও শক্তিশালী হয় তাহার ব্যবস্থা করা। জুকভ কোলবার্গ ও ষ্টারগার্ড দখল করিয়া ষ্টেটিন বন্দরের কাছাকাছি পৌছিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণে হাঙ্গেরীতে জার্ম্মানরা ট্যাঙ্কের সাহায্যে প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইয়াছে। রকোসভস্কী, জুকভ ও কনিয়েভের সেনাবাহিনী এখন নানা দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বার্লিন দখল ও হিটলারীদের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ওডারের তীরে জার্ম্মানীর অতি বড় ঘাঁটি কুয়েষ্ট্রিন সহর লালফৌজের হাতে আসাতে বার্লিনে পৌছিবার রাস্তা খুবই সহজ হইয়া গেল।

মিত্রসেনার রাইন নদী পার

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে সোভিয়েট বাহিনী যেমন কয়েক জায়গায় ওডার নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তেমনি পশ্চিমেও মিত্রসেনা কয়েকটি স্থানে রাইন নদী পার হইয়া গিয়াছে। সেনাপতি হজের সেনাদল জার্ম্মানদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহর কলোন হিটলারীদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়াছে। রাইন নদী এখান হইতে এইভাবে পার হওয়া একটা মস্ত বড়দরের সাফল্য। জার্ম্মানরা নিজেরাই বলিতেছে যে আমেরিকানরা হনেফের দক্ষিণে আবার রাইন নদী পার হইয়াছে আর প্রাচীন সহর বন্‌ এবং গোডেসবুর্গ দখল করিয়াছে। সেনাপতি প্যাটনের সৈন্যদল মোজেল নদী অঞ্চলে অগ্রসর হইতেছে, রাইন নদীর তীরে বিশ্ববিখ্যাত কোব্‌লেনজ্‌ সহরও নাৎসীদের হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। বৃটিশ সেনা আর এক স্থান দিয়াও রাইনকে অতিক্রম করার জন্য তৈরী হইয়াছে। খবর আসিয়াছে যুদ্ধের গতি এমন হওয়ায় হিটলার আগুন হইয়া সেনাপতি রুণষ্টেডকে সরাইয়া সেনাপতি মডেলকে এই ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছে। হিটলার সেনা পরিচালনার অদল-বদল করিয়া এবং যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহা হইবার নয়। গোয়েবল্‌স্ যতই চীৎকার করিয়া বলুক না কেন, "আমরা কিছুতেই আত্ম-সমর্পণ করিবে না," তাহাতে যে কোন ফলই হইবে না, তাহা যুদ্ধের গতি দেখিলেই বুঝা যায়।

'মিকাডোর' প্রাসাদে আগুন

ইয়োরোপে ফ্যাসিজমের দুর্দ্দশা আজ একেবারে চরমে উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াতেও জাপান ক্রমেই বুঝিতেছে যে অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যাইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকান বিমান বাহিনী জাপানের রাজধানী টোকিওর উপর পর পর অনেকবার নিদারুণ বোমা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বশেষের আক্রমণ এত ভীষণ হইয়াছিল যে টোকিওতে তাহার জন্য দারুণ আতঙ্কেরও সঞ্চার হইয়াছে। জাপানী-ফ্যাসিষ্টরা যাহাকে দেবতা সাজাইয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া থাকে, সেই 'মিকাডো'র (জাপানী সম্রাট) খাসপ্রাসাদেও বোমার ফলে ১৭ ঘণ্টা ব্যাপী আগুন জ্বলিয়াছিল।

টোকিও রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে আমেরিকানরা খাস জাপানে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জাপান হইতে ৭৫০ মাইল দূরে আয়োজিমা দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকানরা অবতরণ করিবার পর হইতেই জাপানীদের মনে বেজায় ভয় ঢুকিয়াছে। এখানে তাহারা মরিয়া হইয়া বাধা দিতেছে কিন্তু তবুও মার্কিন নৌসেনাদের আটকাইতে পারিতেছে না। এখন স্বয়ং জাপানী প্রধান মন্ত্রীই বলিতেছে যে শত্রু জাপান আক্রমণ করিতে চায় এবং অবস্থা বেজায় সঙ্গীন। জাপানী মন্ত্রীসভার বিশেষ জরুরী অধিবেশনও ডাকা হইয়াছে। দেশের লোক যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে জাপানী সরকার তাহার জন্য মতলব ভাঁজিতে ব্যস্ত।

তাবেদাররাও পোষ মানিতেছে না

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে মিণ্ডানাও দ্বীপে মিত্রসেনা ট্যাঙ্ক লইয়া নামিয়াছে।

ফরাসী ইন্দোচীন এতদিন ছিল জাপানী প্রচারের একটা বড় ঘাঁটি কিন্তু সেখানেও আজ দশ হাজার লোক গোপনে সংগঠন চালাইয়া ফ্যাসিজমের ধ্বংসের জন্য লড়িতে রাজী রহিয়াছে। দিনকাল বদলাইয়াছে দেখিয়া ইন্দোচীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ আর জাপানীদের হুকুম মুখ বুজিয়া তামিল করিতে রাজী না থাকায় ফরাসী বড়লাটকে জাপানীরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ম্মাতেও মিত্রসেনার অগ্রগতি

এদিকে মধ্য বর্ম্মার সব চেয়ে বড় সহর মান্দালয় মিত্রসেনার দখলে আসিয়াছে বলিলেও চলে। সহরের ভিতর তুমুল লড়াই চলিতেছে এবং আস্তে আস্তে জাপানীরাই কাবু হইতেছে। অথচ চীনের অনৈক্য এখনও বিদ্যমান। চিয়াং-কাইশেক পরিচালিত কুয়োমিণ্টাং-এর স্বেচ্ছাতন্ত্র আজ যদি দূর না হয়, কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের সহযোগে চীনে যদি একটি সর্ব্বদল-সরকার অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে চীনকে কেন্দ্র করিয়া জাপান যে শক্ত রক্ষা ঘাঁটি তৈরী করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার উপর জোর আঘাত হানার সুযোগ আসিবে না। এই অবস্থায় যথাসম্ভব শীঘ্র চীনের বিভেদ মীমাংসা হইলে জাপানী ফ্যাসিষ্টরা মহা বেকায়দায় পড়িবে।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস : ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

পুলিশ কর্তৃক কাপড় বেহাত--মেয়েদের উপরেও লাঠি

জনযুদ্ধের রিপোর্টার পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার

লাইনে পুলিশ চাই না, স্বেচ্ছাসেবক চাই

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা] ২২শে মার্চ্চ, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ই চৈত্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

১৫ই মার্চ বিকালে বড়বাজারে গিয়া দেখিলাম, ক্রশ ষ্ট্রীটে কেশোরামের দোকানের সামনে হাজার দুই মেয়ে ভোর রাত্রি হইতে কণ্ট্রোলের এক টুকরা কাপড়ের আশায় সারাটা দিন অসহ্য গরমের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। কি একটা গণ্ডগোলের অজুহাতে দুপুর হইতে দোকান বন্ধ। জনতা তবু ফিরিতে চাহে নাই। সন্ধ্যার কিছু আগে দোকান আবার খোলা হইল। দোকান খুলিতে দেখিয়া অনিশ্চিত আশায় মেয়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হঠাৎ দেখিলাম, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কয়েকজন পুলিশ ও সিভিক গার্ড একদল মেয়ের উপর ছোট লাঠি চালাইতেছে ও চড় চাপড় মারিতেছে এবং কয়েকটি মেয়ের হাত ধরিয়া লাইন হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। চোখের সামনে অসহায় মেয়েদের উপর পুলিশের এই অত্যাচার ও অসম্মান দেখিয়াও কেহ প্রতিবাদ জানাইতে সাহস করিল না।

পুলিশের স্পর্দ্ধা আজ সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ইহারা শুধু যে কাপড়ের লাইনে লাঠি চালাইতেছে তাহাই নয়, দোকান হইতে কাপড়ও আজ ইহারাই কৌশলে লুটিয়া নিতেছে।

স্পেশাল লাইন

গত বুধবার রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে 'চন্দ্রকুমার ষ্টোর্সের' সামনে ভোর রাত্রি হইতে ৫ হাজার নরনারী কাপড়ের জন্য লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া। দোকানে মাত্র ৮ শত কাপড় আছে জানিয়া জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা বুঝাইয়া শুনাইয়া দেড় হাজার নরনারীকে ফিরাইয়া দেন। হঠাৎ সকাল ৮টার সময় টালিগঞ্জ থানা হইতে জন দশেক পাগড়ীওয়ালা পুলিশ, দুইজন অফিসার, একজন সার্জ্জেণ্ট ও তাহাদের সঙ্গে পোষাক সমেত ও পোষাক ছাড়া আরও একশ' দেড়শ' পুলিশ দোকানের সামনে উপস্থিত হইয়া যায়। সাধারণের দুটি লাইনের মধ্যে একটি লাইন ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে পুলিশের একটি আলাদা লাইন খাড়া হইয়া গেল। কিন্তু পুলিশের কারসাজি বুঝিতে জনতার দেরী হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে একসঙ্গে দাবী উঠিল, পুলিশের আলাদা লাইন চলিবে না। সে দাবী অগ্রাহ্য করার সাহস পুলিশের ছিল না। কাজেই তাহাদের আলাদা লাইন ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। তখন এই পুলিশেরা সাধারণের লাইন ভাঙ্গিয়া জোর করিয়া দোকানে ঢুকিতে থাকে। ইহার বিরুদ্ধে জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা যখন আপত্তি জানান, তখন একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন কনষ্টেবল আসিয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তারের ভয় দেখান।

ইহার পরে সাদা পোষাকের ৩০।৪০ জন পুলিশের লাইনের সামনে ঢুকিয়া পড়ায় জনতার মধ্যে হল্লা পড়িয়া যায়। পোষাক পরিহিত একজন পুলিশকে এই সময় জনরক্ষা সমিতির ভলাণ্টিয়ার অমিয় দাশগুপ্ত ধরিয়া ফেলেন। ৪।৫টি পুলিশ নাকি অমিয় দাশগুপ্তের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে মারিতে মারিতে থানায় লইয়া যায়। এই সময় জনতা ও পুলিশের মধ্যে কয়েক মিনিট বেশ সংঘর্ষ চলে।

হাতেনাতে পুলিশ গ্রেপ্তার

কংগ্রেসনেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে আসিতেছিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই তিনি নিজের হাতে দুইজন পুলিশকে বে-আইনীভাবে কাপড় নেওয়ার জন্য ধরেন। এনফোর্সমেণ্ট অফিসার মিঃ বোস ঠিক এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাত্র একটি কেসে সাক্ষী থাকিতে রাজি হইয়াছেন।

ইহার পর একের পর এক পুলিশেরা জনরক্ষা সমিতির সভ্যদের ও পাড়ার উৎসাহী যুবকদের হাতে ধরা পড়িতে থাকে। ১৭।১৮ জন পুলিশকে এই ভাবে ধরিয়া ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। দুএকজন পুলিশ ভয়ে ট্রাম রাস্তার উপর শুইয়া পড়ে ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে থাকে। সমস্ত পাড়ায় বিরাট চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছিল। সেদিন জনশক্তির প্রতাপ দেখিয়া অনেক দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারীদের মুখও ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল।

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল প্রভৃতি পুলিশের এই ব্যবহার সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দীনের কাছে তদন্ত দাবী করেন। প্রধান মন্ত্রী তখনই পুলিশের কর্তৃপক্ষকে হুকুম দেন যে—অবিলম্বে ইহার তদন্ত করিয়া তাঁহাকে রিপোর্ট দিতে হইবে।

কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই এক মনোভাব—কি করিয়া পুলিশের সাফাই দেওয়া যায় ইহাই তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা। তদন্তের একটু নমুনা দিতেছি।

পরদিন সকালে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ দোহা উপরওয়ালার হুকুমে দোকানে তদন্তে আসিয়াছিলেন। 'জনযুদ্ধের' রিপোর্টার হিসাবে আমি তখন দোকানের সামনেই উপস্থিত ছিলাম। মিঃ দোহা সদলবলে দোকানের মধ্যে ঢুকিলেন। কথাবার্ত্তা কি হইল জানি না, পাশের দোকান হইতে গ্লাস গ্লাস সরবৎ ও সিগারেট 'চন্দ্রকুমার ষ্টোর্সে' ঢুকিতে দেখা গেল। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত আগের দিনের জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ ও পুলিশের অত্যাচারের খবরটি দোকানের সামনে একটি থামের গায়ে লাগানো ছিল। মিঃ দোহা মটরে উঠিবার সময় একবার তাহা আদ্যোপান্ত পড়িলেন। তারপর চোখে চোখে কি কথা হইল জানা না। টালিগঞ্জ থানার অফিসারটি বীরবিক্রমে আগাইয়া গিয়া কাগজটা ছিড়িয়া ফেলিলেন। পরদিন সকালে শোনা গেল, আশে পাশের কয়েকজন দোকানদার ও পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোককে ভয় দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইবার জন্য পুলিশ চেষ্টা করিয়াছে।

ব্যারাক তল্লাস করো

শনিবার লোকমুখে শুনিলাম ভবানীপুর থানার সম্মুখে রসারোডের উপর 'অনাথবন্ধু বস্ত্রালয়' হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রি করা হইবে। এই দোকানের ঠিক পিছনের অংশে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ব্যারাক। কিছুদিন আগে সাধারণের লাইন অমান্য করিয়া কাপড় নেওয়ার দরুণ এখানেও জনতা-পুলিশে একটা ছোট খাট সংঘর্ষ হয়। সেই হইতে নাকি দোকানের উপর হুকুম হইয়াছে যে, পুলিশেরা আলাদা লাইন করিয়া কাপড় পাইবে। পুলিশের পক্ষে কার্ড বা টিকিট দেখানোর বালাই নাই। আসিলেই পাইবে এই ব্যবস্থা। শোনা যায়, পুলিশেরাও তাই বার বার আসে এবং বার বার পায়। একে পুলিশ তার উপর বন্দুকধারী—তাই পাড়ার লোকে ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার সাহসও এতদিন পায় নাই। এই সমস্ত পুলিশ ব্যারাকগুলি যদি জনসাধারণ একবার খানাতল্লাস করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে কেঁচো কিম্বা সাপ একটা কিছু যে বাহির হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শনিবার সকালে জনরক্ষা সমিতির ভলাণ্টিয়াররা পুলিশের এই অন্যায় লাইনপ্রথার বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় দুই দুই বার অভিযোগ করেন, কিন্তু থানা অফিসার দুই দুইবারই তাঁহাদের ভাগাইয়া দেন। দোকানের সামনে তখনও দুইটি লাইন—সাধারণের লাইনে প্রায় ২০০ জন ভোর হইতে দাঁড়াইয়া আছেন আর পুলিশের লাইনে ২০।২৫ জন পুলিশ খুশিমত লাইন ভাঙিয়া ব্যারাকের ভিতরে যাইতেছে আসিতেছে। পুলিশের পৃথক লাইন প্রথার বিরুদ্ধে একটি আবেদন পত্রে সাধারণের স্বাক্ষর সংগ্র করিবার অভিযোগে ভবানীপুর থানার সার্জ্জেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন জনরক্ষা সমিতির রমাকৃষ্ণ মৈত্র ও দেবে

(২ পৃষ্ঠা দেখুন)

কলেজ ষ্ট্রীটে কাপড়ের দোকানের সামনে বিরাট লম্বা লাইন

এই ঘড়ি-বিক্রেতা কে? সে ছাড়া পাইল কেন?

স্যর আজিজুল জবাব দিন!

কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে ছোট্ট খবর বাহির হইয়াছিল, একটী ঘড়ী ও ক্লক তৈরীর দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ প্রায় ৮০২টী সোণার ঘড়ী ধরে এবং তাহা খরিদ্দারদের বিক্রয় করা হয় না এই অভিযোগে বিক্রেতা ও আরেক জনকে গ্রেপ্তার করে। দোকানের নাম-ধাম কিছুই সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় নাই।

উহার প্রায় ২০ দিন পরে ষ্টেট্‌সম্যানে আবার আরও ছোট্ট খবর বাহির হয় যে ধৃত ব্যক্তিদের বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঘড়িগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবারও নাম ধাম কিছু প্রকাশ করা হয় নাই

জনৈক সংবাদদাতা আমাদের জানাইয়াছেন যে ঐ দোকান নাকি ড্যালহাউসি স্কোয়ারের লিমটন ওয়াচ কোং। তিনি লিখিয়াছেন যে ঐ দোকানে কিছু দিন আগে ঘড়ি কিনিতে গিয়া পান নাই—দোকানদার বলিয়াছে মাল নাই।

তিনি আরও লিখিয়াছেন: এক মুসলমান ভদ্রলোক ঐ দোকানের মালিক। তাঁহার সঙ্গে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যর আজিজুল হকের বিশেষ খাতির আছে। পুলিশের যে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ঘড়ি বিক্রেতাকে ধরিয়াছিল সে বিভাগও সরাসরি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন। স্যর আজিজুল নাকি এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ঘড়ি বিক্রেতা মুক্তিও পাইয়াছে, ঘড়িও পাইয়াছে।

স্যর আজিজুলকে কর্ত্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা তাঁহার কাছে ও স্থানীয় পুলিশের কাছে জানিতে চাই—ঐ দোকান লিমটন কোম্পানীর কিনা, উহাদের ছাড়া হইল কেন এবং স্যর আজিজুল ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিলে কেন করিয়াছেন? সর্ব্বব্যাপী চোরাবাজার ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁহাদের সরকারী কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয়

সী[No.]ন্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব বলিয়াছেন—"মন্ত্রীত্ব লইয়া জনসাধারণের দুঃখ দূর করা এবং দুর্নীতি দমন করাই আমার কাজ হইবে।" জনসেবাই কংগ্রেসের ঐতিহ্য, জনসেবার কাজে কংগ্রেসমন্ত্রারা অগ্রসর হউন ইহাই সীমান্তবাসী পাঠানদের আন্তরিক কামনা, সারা ভারত এই কামনারই প্রতিধ্বনি তুলিতেছে।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেস সীমান্তের খান আব্দুল গফর খান প্রভৃতি বন্দী নেতাদের মুক্তি দান করিয়াছে। মুক্ত নেতাগণ কংগ্রেসকে সীমান্তবাসী পাঠানদিগকে ঐক্যের পথে পরিচালনা করিলে ডাঃ খান্ সাহেবের লক্ষ্য পূর্ণ করা সম্ভব হইবে।

লীগমন্ত্রীত্বের পতনের পর ভূতপূর্ব্ব লীগ-মন্ত্রী সরদার ঔরংজেব খাঁ বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান সংকটপূর্ণ সময়ে একটা জনপ্রিয় মন্ত্রীত্ব চাই—তা সে কংগ্রেস মন্ত্রীত্বই হউক আর লীগ মন্ত্রীত্বই হউক।" সরদার সাহেব আরও বলিয়াছেন "অচল অবস্থার ফলে সীমান্তের জনসাধারণ অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, এখন তিনি এই আশাই পোষণ করেন যে ডাঃ খাঁ সাহেব মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইবেন। সরদার ঔরংজেব খাঁ অবিচলিত কণ্ঠে মন্তব্য করিয়াছেন যে ৯৩ ধারার শাসনের চেয়ে যে কোন দলের মন্ত্রীত্ব বাঞ্ছনীয়।

সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সীমান্তের লীগ নেতাগণ যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা না করিয়া কংগ্রেসের প্রতি সেবার আহ্বান জানাইয়াছেন ইহা সীমান্তবাসী পাঠানদের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা।

সীমান্ত প্রদেশে খাদ্যের ঘাটতি আছে, সীমান্তের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাংলার মতই দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। ডাঃ খাঁ সাহেব এবং সরদার ঔরংজেব খাঁ উভয়েই পাঠান, পাঠান পাঠানের বিরুদ্ধে লড়িবে না, সব পাঠান একযোগে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে—ইহাই উভয়ের বিবৃতির সারমর্ম্ম। এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হউক, সীমান্তের কংগ্রেস এবং লীগ একযোগে সীমান্তবাসীর জীবন গড়িয়া তুলুক ইহাই প্রত্যেক স্বদেশ ভক্তের কামনা।

বাংলার সংবাদপত্রসমূহে দুই ধরণের বিকৃতি লক্ষ্য করিতেছি। কংগ্রেসপন্থী পত্রিকাসমূহ লীগ-মন্ত্রীত্বের পতনকে লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জয় হিসাবে গ্রহণ করিয়া উল্লসিত হইয়াছে এবং লীগের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। কিন্তু ডাঃ খান্ সাহেবের বিবৃতিতে এই মনোভাব নাই। গৃহযুদ্ধের এই ক্ষতিজনক মনোভাব প্রচার করা সীমান্তবাসীকে সাহায্য করা নয়, তাহাদের গৃহযুদ্ধের বিপদের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া। আবার লীগ পত্রিকাসমূহ কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব স্থাপনকে লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও গৃহযুদ্ধেরই মনোভাব। সরদার ঔরংজেব খাঁর বিবৃতিতে এই মনোভাব নাই। গৃহযুদ্ধের মনোভাব পাঠানদের ভাল করিবে না, বরং সর্ব্বনাশ ঘটাইবে।

সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নেতারা মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। আইন সভায় যাহারা সংখ্যাধিক তাঁহারাই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই সীমান্তে ৯৩ ধারা অসম্ভব করিয়াছে। সীমান্তের কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই গৃহ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া জনসেবার প্রতি আগ্রহ জানাইয়াছে। এখন উভয়ে একযোগে জনসাধারণের জীবনকে স্বেচ্ছাতন্ত্র, দুর্নীতি এবং অন্নবস্ত্র সংকট হইতে মুক্ত করিবার পথে অগ্রসর হউক। সীমান্তের ঘটনাবলীকে প্রত্যেক স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী এইভাবেই দেখিবে। এইভাবে দেখিলেই আমরা কংগ্রেস এবং লীগের দ্বন্দ্বকে কংগ্রেস এবং লীগের মিলনে পরিণত করিতে সাহায্য করিতে পারিব।

এইভাবে না দেখিয়া যাহারা সীমান্তের ঘটনাবলীকে কংগ্রেস ও লীগের সংঘর্ষ হিসাবে দেখিবে ও দেখাইতে চাহিবে তাহারা পাঠানদের কল্যাণ না করিয়া সর্ব্বনাশই করিবে।

সরদার ঔরংজেব খাঁ যে আশা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি মন্ত্রীত্বপদে লীগই থাকুক আর কংগ্রেসই থাকুক, উভয়েই একযোগে পাঠানকে বাঁচাইবে। ডাঃ খান সাহেবের উক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি জনসেবাই হইবে সীমান্ত কংগ্রেসের মূল কাজ। ভ্রাতৃবিরোধে পাঠানের জীবন যাহাতে বিষময় না হয় তাহাই হউক প্রত্যেক বাঙ্গালীরও আন্তরিক চেষ্টা।

● ঘটনা ও রটনা ●

আর একজন কোটীপতি চোর

পাঞ্জাবের কোটীপতি ব্যবসায়ী লালা করমচাঁদ থাপরের নামে গুড়ের চোরাকারবারের মামলা চলছিল। মামলায় তাঁর দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আটমাস কারাদণ্ড শাস্তি হয়েছে।

★ ভারতের বৃহত্তম ব্যবসায়ীদের মধ্যে থাপর একজন মহারথী। তাঁর প্রায় ৪২টি কয়লার খনি আছে, চিনির কল আছে, মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট আছে, আরও অনেক কিছু আছে। মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের ব্ল্যাক লিষ্টে তাঁর নাম আগে একবার উঠেছিল, কিন্তু পরে "তদ্বির" করে আবার ভাল লিষ্টে নাম উঠিয়ে নিতে পেরেছিলেন। টাকা থাকলে সবই সম্ভব।

সুভাষ বাবুর অগ্রজ শরৎ বাবুর ইনি একজন বিশিষ্ট বন্ধু। যখন শরৎ বাবু স্বাধীন ছিলেন তখন তাঁর সুপারিশে বহু ফরওয়ার্ড ব্লকী ও 'এক্স-ডেটিন্যু' থাপরের কাছে চাকরী পেয়েছেন। সেই সূত্রে থাপর মহাশয় নিজেকে একজন প্রকাণ্ড স্বদেশী বলে পরিচয় দিতেন এবং জিনিসপত্রের অভাবের কথা উঠলেই বলতেন যে আমাদের দেশ পরাধীন বলেই এই দুরবস্থা—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম না হলে কিছুই হবে না!

বড়ই দুর্ভাগ্য যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হওয়া পর্য্যন্ত চোরাকারবার চালিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরাস্ত করার সঙ্কল্প একটু শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তবে অর্থবান চোরের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মায়া-দয়া আছে—ঘানি টানা নয়, চাবুকও নয়, মাত্র দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা। ও তো আর একটা চোরাকারবারেই উঠে আসবে।

●

মিস মেয়োর বংশধরেরা

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ চেম্বার অফ কমার্সের (বণিক সমিতির) সভাপতি এরিক জনষ্টন কিছুদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজন রিপোর্টার ছিলেন, নাম ওয়াণ্টার হোয়াইট।

এরিক জনষ্টনের তল্পীবাহক রিপোর্টারপুঙ্গবটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত সোভিয়েট দেখে শুনে ফিরে এসে একটি বই লিখে ফেলেছেন। সোভিয়েট কিছু নয়, ক্যাপিটালিষ্ট আমেরিকা অনেক ভাল, সোভিয়েটের লোকেরা খেতে পায় না, হাসতে জানে না, উপরওয়ালাদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে ইত্যাদি অনেক খবরই তিনি আবিষ্কার করেছেন।

এককালে ফ্যাশিষ্ট ইটালির ভক্ত এবং বর্ত্তমানে ক্যাপিটালিষ্ট আমেরিকার প্রেমে উর্দ্ধবাহু স্বনামধন্য অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহা আনন্দে এই প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করে "ন্যাশনালিষ্টে" পরিবেশন করেছেন। "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়ে গত রবিবার প্রবন্ধটির অগ্রিম কপি গোটা দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপিয়েছে—এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে প্রবন্ধটি নিয়মিত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

ঐ প্রবন্ধের অন্য সব কুৎসার কথা ছেড়ে দিলাম। তার জবাব ওয়েব দম্পতি, মিঃ ডেভিস, ডীন অফ ক্যাণ্টারবেরী প্রভৃতি বিখ্যাত লোকের লেখায় পাবেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য,—যে-সোভিয়েট দেশ মাত্র ২০-২৫ বছরের চেষ্টায় প্রায় একবারে শিল্পহীন অবস্থা থেকে পৃথিবীর তৃতীয় শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে এবং যার সামরিক শিল্পোৎপাদন ইয়োরোপাধিপতি হিটলারের সামরিক শক্তিকেও পরাজিত করেছে—সেই সোভিয়েটের উৎপাদন সম্বন্ধে ওয়াণ্টার হোয়াইট লিখেছেন সেখানে কারখানায় উৎপাদন আটকে থাকে (বটলনেক), কারখানাগুলো নোংরা এবং অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি। সোভিয়েট কারখানা দেখে তাঁর মুরুব্বি "এরিক জনষ্টন তাঁকে ফিস ফিস করে বলেন—আমাদের ইউনাইটেড ষ্টেটসে কারখানার উৎকর্ষ সম্বন্ধে মোটামুটি শ্রেষ্ঠ বিচার হচ্ছে সে কারখানা কত পরিষ্কার তা পরীক্ষা করা। ময়লা কারখানা অপদার্থ হবেই।"

এই "মনোমুগ্ধকর সুসমাচার" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কোটেশন) যে মিথ্যা-প্রচার তা কিন্তু ওয়াণ্টার হোয়াইটের মুরুব্বি এরিক জনষ্টন স্বয়ং ফাঁস করে দিয়েছেন—বেচারী হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও বিনয় সরকার এখনও তা জানেন না। আমেরিকার বিখ্যাত "নিউজ উইক" পত্রিকা ১লা জানুয়ারী খবর দিয়েছে যে ওয়াণ্টার হোয়াইটের মুরুব্বি এরিক জনষ্টন এই রিপোর্টারটীর কথার প্রতিবাদ করেছেন। নিউজ উইক লিখেছে:

> "সরকারীভাবে কিছু বলা হয়নি, তবে এরিক-জনষ্টন…রুশিয়ানদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মস্কো ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গী ওয়াণ্টার হোয়াইট…যে বই লিখেছেন তাতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন (এমব্যারাস্ড)।…জনষ্টন স্বীকার করেছেন যে বইটীর সমালোচনায় খুব বাড়াবাড়ি আছে।"

* * *

যে-ভ্রমণ সম্বন্ধে ওয়াণ্টার হোয়াইটের বৃত্তান্ত সেই ভ্রমণের সময়েই এরিক জনষ্টন মস্কোতে একটী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন:

"আপনাদের (অর্থাৎ রুশিয়ানদের) সম্বন্ধে আমাদের কাছে যে-তথ্য আছে তা একটু পুরানো, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে আপনারা আপনাদের শিল্পগত মূলধন বাড়িয়ে তুলেছেন—১০ বিলিয়ন রুবল থেকে ৭৫ বিলিয়ন রুবলে। আমরা আরও জেনেছি যে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে আপনারা শিল্পগত উৎপাদন বাড়িয়েছেন শতকরা ৬৫০ ভাগ। **সারা দুনিয়ার শিল্পগত ইতিহাসে এই কৃতিত্বের তুলনা নেই।** আমেরিকান ব্যবসায়ীরা এই কৃতিত্বের মানে বোঝে এবং তাকে প্রশংসা করতে জানে।"

যে "রীডার্স ডাইজেষ্ট" থেকে বিনয় সরকার বা হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াণ্টার হোয়াইটের কুৎসা লুফে নিয়েছেন সেই রীডার্স ডাইজেষ্টেরই আগষ্ট সংখ্যায় উপরোক্ত বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। কিন্তু স্বভাবতই বিনয় বাবু ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেটী চেপে গেছেন। মিস মেয়োও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিনয় বাবুদের মতই খবর দিয়েছিল।

●

জ্ঞানাঞ্জনের দোসর

কলকাতা কর্পোরেশনকে আমলাতন্ত্রের উদরে নেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে কর্পোরেশনের সভায় আলোচনার সময় সুভাষবসুপন্থী শ্রীসুধীর রায়-চৌধুরীর দল পরিত্রাণের জন্য আবেদন করলেন—আমলাদের রাজা মিঃ কেসির কাছে! তখন রহস্যটা ভাল বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ ১০ই মার্চ্চের আনন্দবাজার চোখে পড়ল। দেখলাম "দেশগৌরব" আনন্দবাজারের প্রায় গোটা কলম জুড়ে বিরাট ছবি ও বিবরণ—"চৌমুহনী মহিলা **যুদ্ধ কমিটির** সভ্যগণ সহ মিসেস কেসি।"

মিঃ ও মিসেস কেসির বিজ্ঞাপন কয়েক দিনই আনন্দবাজার-হিন্দুস্থানে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এবার একেবারে মহিলা যুদ্ধ কমিটির বিজ্ঞাপন! কিছুদিন আগে শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্ত্তৃক মহিলা-সৈন্য সংগ্রহের আড়কাটি বৃত্তান্ত আমি জানিয়েছিলাম। জ্ঞানদা' আজকাল কর্পোরেশনে দেশগৌরব-পন্থী দলের প্রধান মন্ত্রণাদাতা (তাতে চাকুরী এবং ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা দুইয়েরই সুবিধা হয় কিনা জানিনা)। সেই জ্ঞানদার হাতই দেশগৌরবের ঐতিহ্যবহনকারী আনন্দবাজারেও প্রসারিত হয়েছে কিনা—কেউ আমাকে জানাবেন কি?

—দেশাভিমানী

কাপড়ের লাইনে স্ত্রীলোকের উপরেও লাঠি

(১ পৃষ্ঠার পর)

ঘোষকে দোকানের সামনে গ্রেপ্তার করে। 'জনযুদ্ধে'র প্রতিনিধি হিসাবে আমি ঐ সময় ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিলাম। একদল কনষ্টেবল আসিয়া আমাকেও তাহার সহিত থানায় যাইতে বলে। আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি—একথা জানানো সত্ত্বেও আমাকে থানায় যাইতে বাধ্য করা হয়।

কিছুক্ষণ পর ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল থানায় আসিয়া উপস্থিত। 'অনাথবন্ধু বস্ত্রালয়ে'র সামনে এক ভদ্রলোককে পুলিশেরা জোর করিয়া লাইন হইতে বার করিয়া দেয়। সেই অভিযোগ পাইয়া ডাঃ সান্যাল ব্যাপার জানিতে আসিয়াছিলেন। এসেম্বলির অধিবেশন থাকায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। বেলা ১১টার সময় সার্জ্জেণ্ট ফ্রাঙ্কলিনকে সঙ্গে দিয়া আমাদের তিনজনকে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ দোহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। জনরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য্য সেখানে উপস্থিত থাকিয়া মিঃ দোহার কাছে পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেন। সমস্ত কিছু শুনিয়া মিঃ দোহা বলিলেন, "এঁদের তো গ্রেপ্তার করা হয় নাই!" তবে আমরা কি নিজের খুশীতে মিঃ দোহার শ্রীমুখ দেখিবার জন্য পুলিশ পাহারায় একবার থানা একবার তাঁহার অফিসে ছুটিতে বাধ্য হইয়াছিলাম? তদন্তের ভয়ে মিঃ দোহা মিথ্যা কথা বলিলেন তাহা সকলেই বুঝিবে।

এখান হইতে আমরা সোজা এসেম্বলিতে গিয়া ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালকে ব্যাপারটী জানাই। ডাঃ সান্যাল জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আবার প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে নাকি বলেন যে, আগের অভিযোগ তদন্ত করিয়া পুলিশ রিপোর্ট দিয়াছে—লাইনে কোনো গণ্ডগোল, কোনো অন্যায় নাই, একেবারে সুখে শান্তিতে বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে। তাহারা দোকানদার প্রভৃতি আশে পাশের অনেক লোকের কাছ হইতে এইরূপ স্বীকৃতির রিপোর্টও দিয়াছে। পুলিশের কালি ধুইবার জন্য পুলিশের উপরওয়ালারা কি ভাবে তদন্ত করিয়াছেন তাহা সহজেই বোঝা গেল।

কিন্তু ইহার জন্যও জনরক্ষা সমিতি এবং ডাঃ সান্যাল প্রস্তুত ছিলেন। পুলিশ যাহাদের বক্তব্য প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের অনেকেরই সই করা বিবৃতি ডাঃ সান্যালের হাতে জমা করা ছিল—সেই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে পুলিশ ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিয়াছে।

শুনিয়া স্যর নাজিমুদ্দীন অত্যন্ত বিরক্ত হন। ডাঃ সান্যাল প্রভৃতির সাক্ষ্য কেন লওয়া হয় নাই সেজন্য তিনি পুলিশের কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং হুকুম দেন যে আবার তদন্ত করিতে হইবে।

কিন্তু পুলিশ ভাঙ্গে তবু মচকায় না। পূর্ব্বোক্ত মিঃ দোহাই আবার রবিবার সকালে চন্দ্রকুমার ষ্টোর্সের সামনে তদন্তের প্রহসন বসাইলেন। জনরক্ষা সমিতিরই অভিযোগ, তাহারই স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত হইয়াছে অথচ জনরক্ষার শ্রীভূপেশ গুপ্তকে মিঃ দোহা কিছু বলিতেই দিলেন না—মহা মুরুব্বি চালে বলিলেন যে জনরক্ষা সমিতিই নাকি 'আসামী'।

(৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের শুষিয়া লক্ষপতি ব্যবসায়ীদের বাঁচাইবার চেষ্টা

আমলাতন্ত্র কর্ত্তৃক কর্পোরেশন গ্রাস করার চক্রান্ত

ফরোয়ার্ড ব্লকীদের প্রার্থনা—লাটসাহেবের কাছে!

বাংলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে হুকুম দিয়াছে যে শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ষোলটী ছোট বড় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট চালাইবার ভার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে দিতে হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে শাস্তিবিধানের ক্ষমতা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হাতে দিতে হইবে এবং বাড়ী, বস্তী প্রভৃতির কর শতকরা আড়াই টাকা বাড়াইতে হইবে। ১৬ই মার্চ্চের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটী প্রস্তাব মানিয়া না লইলে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে বাতিল করিয়া নিজের হাতে উহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

কলিকাতা শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা, ময়লা পরিষ্কার, জল সরবরাহ প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয়ে কর্পোরেশন গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে অক্ষমতা দেখাইয়া আসিয়াছে—এবং কর্পোরেশনের ভিতর প্রত্যেকটী বিষয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির যে অবাধ রাজত্ব চলিয়াছে তাহাতে নাগরিকেরা প্রায় সকলেই কর্পোরেশনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত। আবার খাদ্য, কাপড়, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি দেশবাসীর অধিকাংশ জরুরি সমস্যায় সরকারী আমলাতন্ত্র যে অপদার্থতা ও দুর্নীতি দেখাইয়াছে তাহাতে উহাদের হাতে কর্পোরেশন আসিলে কোনো উন্নতি হইবে সে বিষয়েও প্রায় কাহারই বিশ্বাস নাই।

তাছাড়া নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা কর্পোরেশন চালাইবার গণতান্ত্রিক অধিকার এই শহরের অধিবাসীরাই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ভিতর দিয়া অর্জ্জন করিয়াছেন; সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু প্রভৃতি মহান্ নেতাদের প্রাণান্ত সাধনা ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। কর্পোরেশনের যত দোষই থাকুক আজ শহরবাসীর সেই কষ্টার্জ্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার গবর্ণমেণ্ট এক কথায় নাগরিকদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমলাদের হাতে সঁপিয়া দিবে ইহা কোনো নাগরিকই সহজে বরদাস্ত করিতে পারেন না। তাই স্বভাবতই এই ব্যাপার লইয়া শহরে তুমুল চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, শহরবাসীর কি করা উচিত—তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না।

লীগ ও সুভাষপন্থীদের প্রস্তাব

গত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় গবর্ণমেণ্টের এই হুকুম সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহার আলোচনা হয়। ফরওয়ার্ডব্লকী কংগ্রেস দল এবং মুসলিম লীগ দল—এই দুই দলই কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সাধারণত এই দুই দলই প্যাক্ট করিয়া কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনা করে। সুতরাং কর্পোরেশনের অপদার্থতা, দুর্নীতি ইত্যাদির জন্য প্রধান দায়িত্ব এই দুই দলেরই। কিন্তু ঐ দিন স্বভাবতই দুই দলে বিরোধ বাধিয়া যায়।

লীগ দল প্রস্তাব করে যে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের নীতি মানিয়া লইয়া বিশেষ বিবরণ আলোচনা করার জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে কর্পোরেশন হইতে প্রতিনিধি পাঠানো হোক। ইয়োরোপীয়ান ও মনোনীত কাউন্সিলররা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আর ফরওয়ার্ড ব্লকী দল হইতে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী, এক দীর্ঘ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের অপদার্থতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এক লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করেন এবং বলেন যে কর্পোরেশন এই হুকুম "মানিতে অস্বীকার করিতেছে।" অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের এই হুকুম যদি না বদলায় তাহা হইলে কর্পোরেশন একেবারে গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। তাঁহার প্রস্তাবের শেষ অংশে "গভর্ণর কেসি সাহেবকে আহ্বান করিয়া" বলা হয় যে তিনি হয় নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষ তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই হুকুম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুন অথবা "এই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে (অর্থাৎ মন্ত্রী-মণ্ডলীকে) তিনি উচ্ছেদ করুন।"

হিন্দু সভা দলও মোটের উপর সুধীর বাবুর প্রস্তাবই সমর্থন করে।

কমিউনিষ্ট কাউন্সিলর সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল প্রস্তাব দুইটীর কোনটীই সমর্থন করা যায় না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সেদিনের সভায় সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতাই বোধ হয় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল—উহা হইতেই সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার বোঝা যাইবে। তিনি যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ:—

সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতা

"গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবের আমরা প্রতিবাদ করি। শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে-যে কথা গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছে তাহার মধ্যে এক ইয়োরোপীয়ান অঞ্চলের বিশেষ সুবিধার কথা ছাড়া বাকী প্রায় সবগুলি কর্পোরেশনই অনেক আগে প্রস্তাব করিয়াছে কিম্বা উচিত বলিয়া মানিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে কলিকাতার লোকসংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়াছে, সেজন্য কর্পোরেশনের দায়ও প্রচুর বাড়িয়াছে, অথচ আমদানী এক পয়সাও বাড়ে নাই; তাই টাকার অভাবে কর্পোরেশন এই সব স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না।

আমদানী বৃদ্ধির উপায় করিয়া দিবার জন্য কর্পোরেশন বার বার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছে: কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্টকে দেয় টাকার পরিমাণ কমাও, আমোদ-কর ও বিক্রয়-কর প্রভৃতি হইতে কিছু অংশ কর্পোরেশনকে দাও, ফায়ার ইন্সিওরেন্স, পেট্রল, টার্মিন্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি চালু করিবার অধিকার দাও,—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাতও করে নাই, সাহায্য হিসাবেও গত বৎসর মাত্র ১০ লক্ষ টাকা দিয়া সারিয়াছে।

আর এখন সাহায্যের এতটুকু প্রতিশ্রুতি না দিয়াই গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে হুমকি দিতেছে যে ঐ সব ব্যবস্থা এখনি কর নহিলে কর্পোরেশনই উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা মোটেই সৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় নয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছে যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা দাও এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ভার দাও। ইহাতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। সুধীর বাবুরা যে কেন আপত্তি করিতেছেন তাহা খুবই আশ্চর্য্য। গত এক বৎসর ধরিয়া সার্ভিস (চাকুরী) কমিটিতে ফরওয়ার্ড-ব্লকী কংগ্রেস ও লীগ পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি হইতে আমি এই শোচনীয় অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি যে পুরাতন চাকুরিয়াদের উন্নতি কিম্বা নূতন যোগ্যতম লোককে নিয়োগ করা এই সব সর্ব্বজনস্বীকৃত ন্যায়-নীতি তাঁহারা প্রায় প্রতিপদে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সুপারিশ না পাইলে কাহারও উন্নতি বা দুষ্কর্ম্মের শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় নিয়োগ, শাস্তি প্রভৃতির নীতি কর্পোরেশন হইতে বাঁধিয়া দিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর ভার ছাড়িয়া দিলে তবেই দুর্নীতি দূর হইতে পারে—এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ছাড়া পৃথিবীর আর সর্ব্বত্রই তাহা হয়।

বেতন না পাইলেও ছাড়িব না

আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ চালাইবেন ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। ডাঃ বি-এন-দে স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে এখন সমগ্র ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা হইয়া আছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিয়োগ মঞ্জুরী করে নাই, সেজন্যই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাউন্সিলরদেরও এমন সাহস হয় নাই যে তাঁহার মাহিনা মঞ্জুর করে। গবর্ণমেণ্টের না-মঞ্জুরী ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার এখানে অবান্তর। এখানে দ্রষ্টব্য শুধু এই যে প্রায় দুই বছর ধরিয়া তিনি বিনা মাহিনায় কাজ করিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার মাহিনা মঞ্জুর হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের "ভার" বোধ হয় এমনই লাভজনক ব্যাপার যে বিনা মাহিনায় কাজ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই! কিংবা হয়তো ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দূর হইলে তিনি মাহিনা পাইবেন এই আশায় কাজ করিয়া যাইতেছেন! যে-কারণেই তিনি কর্পোরেশনে লাগিয়া থাকুন না কেন, বিনা মাহিনায় তাঁহাকে আমাদের আটকাইয়া রাখা উচিত নয়—চীফ ইঞ্জিনিয়ারকেই ডিপার্টমেণ্টের ভার দেওয়া উচিত।

কিন্তু এগুলি আসল কথা নয়। আসল কথা গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স সম্বন্ধে প্রস্তাব। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে যে বাড়ী ও বস্তীর করভার শতকরা আড়াই ভাগ বাড়াইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে।

[এই লেখাটী প্রেসে যাইবার পর ১৮ই মার্চ্চ সরকারের যে নূতন হুকুম বাহির হইয়াছে তাহাতে অন্য সমস্ত নির্দ্দেশই একরূপ আছে, শুধু ট্যাক্স কত বাড়াইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই, বলা হইয়াছে যে এই সকল নির্দ্দেশ-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা কর্পোরেশনকেই করিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বের আদেশের সঙ্গে বিশেষ কোন প্রভেদ ঘটিতেছে না, কারণ বাড়ী ও বস্তীর ট্যাক্স বাড়ানো ছাড়া বাড়তি খরচা সংগ্রহ করিবার অন্য কোন উপায়ই কর্পোরেশনের নাই—বাড়ীর ট্যাক্স ছাড়া অন্য কোন রূপ ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতাও কর্পোরেশনের নাই। সুতরাং আসলে দুটী আদেশ একই এবং এই প্রবন্ধের সমালোচনা নূতন আদেশ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।—জঃ সঃ]

খরচ কোথা হইতে আসিবে?

প্রথমত, উহাতে মাত্র ২০।২৫ লক্ষ টাকা আমদানী হইতে পারে, উহা দ্বারা স্বাস্থ্যব্যবস্থাগুলির পুরা খরচ কিছুতেই মিটে না। সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আসল কথা হইতেছে যে বাড়ী ও বস্তীর ট্যাক্স বাড়ানোর প্রস্তাব দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালীন কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষায় নিজের অংশ বহন করিবার দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছে।

কলিকাতায় বাড়ীর উপর ট্যাক্স এখনই শতকরা ২০৲ টাকা, আর বোম্বাইয়ের মত সমৃদ্ধ শহরেও সর্ব্বাধিক পরিমাণ হইল শতকরা ১৮ টাকা মাত্র। ১৯৪১-৪২ সাল ধরিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় ঐ বৎসর কলিকাতায় বাড়ী ও বস্তীর ট্যাক্স হইতে আমদানী হইয়াছে প্রায় ১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা আর অন্য সমস্ত ট্যাক্স হইতে মোট আমদানী মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা। অথচ বোম্বাই শহরে বাড়ী প্রভৃতির ট্যাক্স হইতে আমদানী প্রায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা এবং অন্য সমস্ত ট্যাক্স হইতে আমদানী প্রায় ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কলিকাতায় বাড়ী ও বস্তীওয়ালাদেরই ট্যাক্সের প্রায় সমস্ত বোঝা বহন করিতে হয়—ব্যবসায়ী, কারবারী প্রভৃতি যাহারা যুদ্ধের বাজারে কোটী কোটী টাকা কামাইতেছে তাহারা অতি অল্প ট্যাক্স দিয়া রেহাই পায়। এখন আবার বাড়ীর ট্যাক্স আরও বাড়ানো হইতেছে, অথচ শিল্পপতি বা মজুতদার ব্যবসায়ীদের স্পর্শও করা

[৬ পৃষ্ঠা দেখুন]

★ প্যারী কমিউন জিন্দাবাদ ★

'প্যারী কমিউনের' জন্ম হয় ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ্চ। সেদিন প্যারীর বিপ্লবী মজুর শ্রেণী তাহাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের মত জার্ম্মান আক্রমণকারীর কাছে মাথা নত করে নাই। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তখন তাহারা সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা প্যারীতে মজুর ও জন-সাধারণের রাজ প্রতিষ্ঠা করে। এই ভাবেই প্যারীর মজুর শ্রেণী ও জনসাধারণ তাহাদের দেশের স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমকে বিশ্বাস-ঘাতক বুর্জ্জোয়া নেতাদের দ্বারা বিক্রীত হইতে দেয় নাই।

'প্যারী কমিউনের' জীবন ছিল মাত্র একশ দিন। এই অল্পদিনের ভিতরই এখানে খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ সোভিয়েটে আমরা সেই গণতান্ত্রিক নীতিরই প্রসার দেখিতে পাই এবং দুনিয়ার জনসাধারণও আজ তাহাই সর্ব্বত্র কায়েম করিতে ব্যগ্র। যে সব কারখানা মালিকরা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, সেখানে মজুরদের কর্ত্তৃত্বে সেগুলি আবার চালু করা, অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা এবং এই ধরণের আরও অনেকগুলি প্রগতিমূলক সংস্কার ছিল প্যারী কমিউনের প্রবর্ত্তিত নীতি।

প্যারী রোম, বেলগ্রেড, বুখারেষ্ট ও সোফিয়ার মজুর শ্রেণীও আজ 'প্যারী কমিউনের' প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইতেছে। খাঁটী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধে আজ তাহারা তাহাদের দেশের জনসাধারণের নেতৃত্ব করিতেছে। মার্কস্ তাই সত্যই বলিয়াছিলেন—মজুরশ্রেণীর প্যারী ও কমিউন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান অগ্রদূত হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

জার্ম্মানীর সহিত মোলায়েম সন্ধিই নূতন যুদ্ধের প্রেরণা

ডাম্বার্টন ওকসের সিদ্ধান্তে স্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতের দায়িত্ব জ

আমাদের দেশের কোনো কোনো সংবাদপত্র এবং বিদেশেরও কোনো কোনো লোক (যেমন বার্ণার্ড শ, ব্রেলস্‌ফোর্ড, জোয়াড) বলেন যে, শান্তির সর্ত্ত যত কঠোরই হোক না কেন তাহার দ্বারা ছ' কোটী জার্ম্মান-ভাষী লোককে এমন ভাবে বাঁধা যায় না যাহাতে তাহারা আবার সামরিক শক্তিতে সংগঠিত না হইতে পারে। তাঁহাদের যুক্তি হইল :

ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করার ও তাহার দণ্ডবিধান করার চেষ্টা হইয়াছিল। জার্ম্মান নৌবাহিনী ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সৈন্যসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব জার্ম্মান জনগণ দশ বছরের মধ্যেই হিটলারের কথায় সায় দিতে আরম্ভ করিল, সামরিক শক্তিতে আগের অপেক্ষাও সুসজ্জিত হইয়া আর একটা অধিকতর সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ সুরু করিল।

ইহার জবাবে বৃটেনের বিখ্যাত মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক রজনী পাম দত্ত লিখিয়াছেন :

ভার্সাই সন্ধির ব্যর্থতার কারণ

এই সব যুক্তির অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত এই যে পরাজিত নাৎসী জার্ম্মানীর সঙ্গে হৃদ্যতার চুক্তিতে আবদ্ধ হও, তাহার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিলে জার্ম্মান জনসাধারণ আবার কোন এক নূতন হিটলারের অনুগামী হইবে।

এই যুক্তির প্রতিটি কথাই মিথ্যা, বিকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য নয় যে ভার্সাই সন্ধি জার্ম্মানীকে কার্য্যকরী ভাবে নিরস্ত্র করিয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় শক্তিরা তখন জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদ দমনের চাইতে রুশ বিপ্লব দমনেই বেশী ব্যস্ত। তাই ভার্সাই সন্ধির পরেই জার্ম্মানী যখন গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে তখন মিত্রপক্ষ তাহাকে সাহায্য করে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এই সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাহাও গোপন রাখা হয়। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এই কারণে নয় যে একটা পরাজিত জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা অসম্ভব। জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করিবার ক্ষমতা মিত্রশক্তির ছিল কিন্তু সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাহাকে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি জার্ম্মানীকে মারাত্মক ভাবে সশস্ত্র হইতে সাহায্য করে। ভার্সাই সন্ধির ব্যর্থতার ইহাই প্রকৃত কারণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিরোধ ও সংঘর্ষের সুযোগেই জার্ম্মানী পরাজিত হইয়াও ২০ বৎসরের মধ্যে আবার সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া পররাষ্ট্র আক্রমণ করিতে পারিল। সোভিয়েট রাশিয়া ও ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের এই বিরোধই দুই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালের সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত শান্তিকামীরা এই মূল ঘটনাটিকেই উপেক্ষা করিয়াছেন। তেহেরাণ ও পরে ইয়াল্টা সম্মেলনে এই মূল বিরোধের অবসান ঘটাইয়া এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নূতন সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এই সহযোগিতার ফলে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই বিরোধের ভিত্তিতে রচিত সমস্ত পুরান যুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছে।

ইতিহাসের অপব্যাখ্যা

নাৎসী জার্ম্মানীর সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহারের পক্ষপাতীরা বলেন যে ভার্সাই চুক্তির জন্যই হিটলার শক্তিশালী হয়। এই যুক্তিও সত্য নয়। নাৎসীরাই ইহা প্রচার করে। মিত্রপক্ষ বলশেভিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য জার্ম্মানীতে যে বে-আইনী সৈন্যদল গঠনে সাহায্য করিয়াছিল সেখান হইতেই জার্ম্মান ফ্যাসিজমের উৎপত্তি। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্ম্মান জনসাধারণের বিক্ষোভই যদি হিটলারের ক্ষমতার উৎস হইত তবে ভার্সাই সন্ধির অনতিবিলম্ব পরেই হিটলারের অভ্যুত্থান হওয়া উচিত ছিল, কারণ তখন রুঢ় দখল ও ভার্সাই সন্ধির অন্যান্য তিক্ত স্মৃতি জার্ম্মান জনসাধারণের মনে অত্যন্ত সজীব ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই জার্ম্মানীতে হিটলারের সমর্থন অত্যন্ত কমিয়া যায়। রাইখ্‌ষ্টাগের ভোটেই ইহার প্রমাণ। হিটলারের অভ্যুত্থান শুরু হয় ১৯৩০ সাল হইতে। নাৎসীরা ভার্সাই সন্ধির তিক্ততা তাহাদের প্রচার কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছিল মাত্র। জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে শ্রেণীসংঘাত, সেখানকার জঙ্গী প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র, সোশাল ডেমোক্রাটদের ব্যর্থতা ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্যে নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করে।

এইভাবে তেহেরাণ [ও ইয়াল্টা] সিদ্ধান্তের বিরোধী শান্তিবাদীদের তথাকথিত ঐতিহাসিক যুক্তি অতীতের প্রধান শিক্ষা ও বর্ত্তমান অবস্থার মূল ঘটনাকেই অস্বীকার করে। সোভিয়েট ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিরোধ, এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্ধ সোভিয়েট বিদ্বেষই গত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানীকে সশস্ত্র হইতে সাহায্য করে, লীগ ও সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরেও যদি বিগত দিনের এই দ্বন্দ্ব পুনরুজ্জীবিত করা হয় তবে তাহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

শান্তি ও গণতন্ত্র কোন পথে?

কিন্তু এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎকে ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতেই আছে। মস্কো, তেহারাণ, ডাম্বারটন ওকস্ [ও ইয়াল্টা] সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশ্বের জনগণকে ভিন্ন দিকে ইতিহাসের মোড় ঘুরাইবার পথনির্দ্দেশ দিয়াছে। এই পথেই ফ্যাসিজমের ধ্বংস হইবে, বিশ্বের শান্তি রক্ষিত হইবে এবং উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার পথে বিভিন্ন জাতির বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে।

পশ্চিম ভূখণ্ডের ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণ কি এই সুযোগ গ্রহণ করিবে? আমাদের আশু লক্ষ্য—জার্ম্মানীর সামরিক শক্তির বিনাশ আর আমাদের দূর-বিস্তৃত লক্ষ্য—ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় জার্ম্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শান্তি ভঙ্গ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা, সম্মিলিত সহযোগিতার বর্ত্তমান ভিত্তিতে শান্তি রচনা—এই উভয় লক্ষ্যের জন্য জনসাধারণ কি ঐক্য বজায় রাখিবে? 'ইকনমিষ্ট' নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে জার্ম্মানীর সম্পর্কে মিত্ররাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হইলে জনগণ এই ঐক্য রক্ষায় আগ্রহশীল হইবে না।

লেখক :
রজনী পাম দত্ত

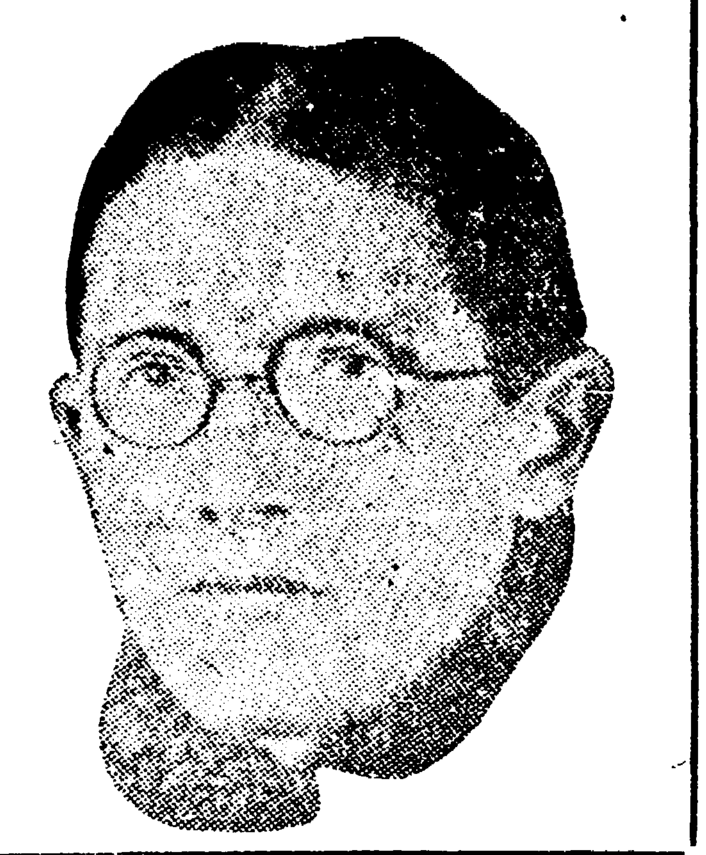

দশ বৎসর পরে যদি আবার ফ্যাশিষ্ট অভ্যুত্থানের আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন ইউরোপীয় জাতিসমূহ আর এই সকল ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে সম্মত হইবে না, এই 'বাস্তব' যুক্তিতে 'ইকনমিষ্ট' তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন :

"যদি তেমন সময় কখনো আসে, তখন পশ্চিম দেশের জনমত প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য একটি আঙ্গুলও তুলিবে না, বিশেষত ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবগুলি তো নয়ই।" —'ইকনমিষ্ট' ১২, ৮, ১৯৪৪।

অতীতের পুনরাবৃত্তি হইবে না

আজও যাহাদের জন্ম হয় নাই, এখনও যাহারা স্কুলের ছাত্র তারা দশ বৎসর পরে কি করিবে সেই সম্বন্ধে এই পূর্ব্ব জ্ঞান 'ইকনমিষ্ট' কোন দৈব প্রভাবে আয়ত্ত করিল? 'ইকনমিষ্ট' নেহাৎ সরলমনা শিশুর মত অতীতের দিনের অবস্থাকে ছাঁকা তুলিয়া লইয়া ভবিষ্যতের উপরে বসাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, 'ইকনমিষ্ট' মনে করে ১৯৩০ যুগের ঘটনা আবার ঘটবে, ইউরোপে ও সারা পৃথিবীতে একই ধরণের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে—সেই সোভিয়েট বিরোধিতা, সেই ফ্যাসিজমের আবির্ভাব এবং সেই একই ধারায় পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্র, সেই মিউনিকের চক্রান্তের পুনরভিনয়। কিন্তু তেহেরাণ যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহা যদি অনুসৃত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর ঘটনা, জার্ম্মানীর অভ্যন্তরেরও ঘটনা একেবারে নতুন খাতে বহিবে। কিন্তু এ-শুধু যদির কথা নয়। পশ্চিমের জনসাধারণ যে কঠিন দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে তাহার পর তাহারা আর দ্বিতীয় কোনো মিউনিক বরদাস্ত করিবে না।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জনসাধারণ অসাড় মনে ছিল, তাহারা ফ্যাশিজমের অভিযান রোধ করিতে অগ্রসর হয় নাই—এ কথা মিথ্যা কথা, জনসাধারণের সেই সময়কার ধ্যান-ধারণা-অনুভূতির প্রতি অপমান। স্পেনেই এই কথার অসত্যতা প্রমাণ করে, আর প্রমাণ করে অপ্রত্যাশিত উৎসাহে আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে ব্রিটেনের ৬ লক্ষ লোকের ভোটদান. আরো প্রমাণিত হয় সেই সময়ে সংবাদপত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত জনমতের ফলাফলে যেখানে, শতকরা ৮০ ভাগ লোক সরকারের

নিঃ ভাঃ কৃষক সভার নবম অধি

নেত্রকোণায় বিপুল উদ্যোগ

★ বিভিন্ন দিবসের কর্ম্মসূচী ও প্রতিনিধিদে

নিখিল ভারত কৃষক সভার নবম বার্ষিক অধিবেশনের জন্য নেত্রকোণা শহরের কাছেই এগারো একর জমির উপরে প্যাণ্ডাল তৈরী হইতেছে। এই প্যাণ্ডালে এক লাখ লোক বসিতে পারিবে। ঐ সঙ্গে যে প্রদর্শনী বসিবে তাহাতে কৃষকদের ও গ্রাম্য কারিগরদের তৈরী নানা জিনিষ দেখান হইবে। তাহা ছাড়া, কৃষকদের দাবী-দাওয়া জীবন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আঁকা অনেক রকম ছবি প্রদর্শনীতে দেখান হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতি একটি অস্থায়ী হাসপাতালও তৈয়ার করিতেছে। 'পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি'র ডাক্তার ছাড়াও স্থানীয় ডাক্তারদের এবং কম্পাউণ্ডার এসোসিয়েশনের সাহায্য সব সময় পাওয়া যাইবে।

হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা রান্নার ব্যবস্থা হইবে। মেয়েদের জন্যও আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা হইবে। একবেলা খাওয়ার জন্য চার আনা দিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রতিনিধি ও দর্শক মশারি, হালকা বিছানা ও জলপানের জন্য একটা পাত্র সঙ্গে আনিবেন। বসন্ত, কলেরা ও টাইফয়েডের প্রতিষেধক টিকাও লইয়া আসিবেন।

চাটগাঁ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও সিলেট-কাছাড়ের ডেলিগেট ও দর্শকেরা **আখাউড়া গৌরীপুর-ময়মনসিংহ** জংশনে তাঁহাদিগকে নেত্রকোণার জন্য গাড়ী বদল করিতে হইবে। **উত্তর বঙ্গের** সকলে **ফুলছড়িঘাট ও বাহাদুরাবাদের পথে**, এবং বাংলার অন্য সব জিলার লোকেরা **সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জের পথে**, ময়মনসিংহ হইয়া আসিবেন। ময়মনসিংহ হইতে সোজা ট্রেন নেত্রকোণায় যায়। সিরাজগঞ্জের পথে ট্রেন গভীর রাত্রে ময়মনসিংহ পৌছায়। এই পথে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা যদি জগন্নাথগঞ্জে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন না ধরিয়া ফ্ল্যাটে কিংবা ষ্টীমারে অপেক্ষা করিয়া রাত্রি ৩টার ট্রেনে রওয়ানা হন তবে ভালো হয়। এই ট্রেন দিনের আলোয় ময়মনসিংহ পৌছিবে। জগন্নাথগঞ্জ ষ্টেশনে খাওয়ার হোটেল ইত্যাদিও আছে। ময়মনসিংহ হইতে **দিনে একটি মাত্র ট্রেন** বিকাল বেলা নেত্রকোণায় যায়, ভীড় অত্যন্ত বেশী। তবে, **শ্যামগঞ্জ পর্য্যন্ত দিনে দুইটি ট্রেন** যায়। শ্যামগঞ্জ হইতে আমাদের সভার জায়গা মাত্র ১০ মাইল দূর। ভালো রাস্তা আছে, দশ মাইল পথ হাটিয়াও যাওয়া চলে। "নেত্রকোণা কোর্ট" ষ্টেশনের টিকেট কিনিবেন।

আজকাল **ডাকের চিঠিপত্র** পাইতে খুব দেরী হয়, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে। কাজেই নেত্রকোণায় আসার খবর এক্সপ্রেস **টেলিগ্রামে** দিতে হইবে। এক সঙ্গে কয়জন রওয়ানা হইলেন সেই খবর টেলিগ্রাম যোগে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা দুই জায়গাতেই দিতে হইবে। টেলিগ্রাম করিবার সংক্ষিপ্ত ঠিকানা :—

ময়মনসিংহের জন্য 'KISANS' Mymensingh.

নেত্রকোণার জন্য 'KISANS' Netrakona.

জোগাইবে

সাধারণের হাতে

রোধিতা অগ্রাহ্য করিয়াও ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করে।

আসলে, পশ্চিম ইউরোপের শাসকশ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রতিক্রিয়াপন্থী, তাহারাই ফ্যাসিজমকে পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনসকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়, আর এই নীতি চালাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া জনমতকে প্রতারিত করে। কিন্তু এই ঘটনার পরে এক যুগ ধরিয়া নানা অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করিয়াছি। এমন কি, শাসক শ্রেণীর মধ্যেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আজ চার্চ্চিলের যে নীতি তাহা চেম্বারলেনের নীতি নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাৎসী বর্ব্বরতার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণ পার হইয়া আসিয়াছে। আজ সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। তাহাদের আপন আপন সরকারও সোভিয়েটের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিতে, ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শান্তিরক্ষায় সহযোগী হইতে ও জার্ম্মান ফ্যাশিজম ও জঙ্গীবাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় হাত মিলাইতে প্রস্তুত।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ

বাহির হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া জার্ম্মানীর ভবিষ্যতের চূড়ান্ত সমাধান হইবে না। জার্ম্মানীর ফ্যাশিজম্, জঙ্গীবাদ ও প্রতিক্রিয়াকে নির্ম্মূলও করা যাইবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষের প্রথম অবস্থায় যখন শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণ-শক্তিগুলি দুর্ব্বল, তখন যাহাতে ফ্যাশিজমের শক্তি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে না পারে সেজন্য বাহির হইতে বলপ্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নাই।

জার্ম্মানীর সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান আসিবে একমাত্র সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, আর সে-পরিবর্ত্তন আনিবে জার্ম্মানীর মজুরশ্রেণী ও সাধারণ মানুষ।

কিন্তু যুদ্ধশেষের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে নাৎসী ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরাজিত হইয়াও ১৯১৮ সালের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিমান ও সংগঠিত থাকিবে। আর সেই তুলনায় মজুরশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ দীর্ঘ ১১ বৎসরের নাৎসী নির্যাতনে অনেক বেশী দুর্ব্বল ও অসংগঠিত অবস্থায় থাকিবে। এই দীর্ঘ ১১ বৎসর ধরিয়া নাৎসীরা সহস্র সহস্র নাৎসী-বিরোধী কর্ম্মীকে হত্যা করিয়াছে এবং দেশের কিশোর ও তরুণ মনকে নাৎসী আদর্শের অন্ধ বিষে আচ্ছন্ন করিয়াছে। দু'দশ বৎসর অথবা বিশ বৎসরই হোক, এই সময়টাই সবচেয়ে কঠিন বিপদের সময়। এই সময় নাৎসী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আবার তাহাদের রাজত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্য সন্ত্রাসক ও ধ্বংসাত্মক কার্যাকলাপের আশ্রয় লইবে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে কোন বিরোধের সুযোগও তাহারা লইতে ছাড়িবে না।

জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করিবার জন্য, নাৎসী দস্যু-দলকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য, ইউরোপে তাহারা যাহা ধ্বংস করিয়াছে তাহা পুরাইয়া দিবার জন্য, মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপে তাহাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য নষ্ট করিয়া দিবার জন্য জার্ম্মানী সম্পর্কে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি এই সময়েই প্রয়োগ করিতে হইবে। আজ আমাদের সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়—ইউরোপীয় জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আর তাহার সহিত ভবিষ্যৎ জার্ম্মানীতে গণতন্ত্রের বিকাশকে নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যকে সম্ভব করিবার জন্যই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে চলিবে সেই কাজ যা জার্ম্মানীতে মজুর শ্রেণীর সংগঠন ও স্বাধীন গণশক্তির আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিবে, জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। অনেক ভাড়াটে দালাল প্রতিক্রিয়া-পন্থীর মুখে এক বুলি ফুটিয়াছে: জার্ম্মানীর "নতুন দীক্ষা-"র প্রয়োজন (জার্ম্মানীর না হোক, তাদের কিছু "নতুন দীক্ষা" হইলে ভালো হয়)। কিন্তু সাধারণ জার্ম্মান মানুষের মধ্যে যে সহজ ফ্যাশিজম বিরোধিতার বীজ আজ প্রচ্ছন্ন তাহাই যখন আপন অভিজ্ঞতার তাপে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে তখনই "নতুন দীক্ষা"র প্রথম পাঠ সুরু হইবে। কিন্তু মিত্ররাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রযুক্ত ব্যবস্থাগুলির পূর্ণ স্বীকৃতির মধ্য দিয়াই এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন আসিবে।

জার্ম্মানীর সহিত স্থায়ী বোঝাপড়ায় নিকট ভবিষ্যতের সমস্যা এবং বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার ব্যাপক লক্ষ্য নির্ভর করে ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট ও চীন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতৃস্থানীয় এই চতুঃশক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপরে। এই নূতন অবস্থা যুদ্ধকালীন সময়ের সমস্ত অভিজ্ঞতার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

ডাম্বারটন ওকসের আলাপ-আলোচনায় এই মূলনীতিই সুপরিমিত আকার লইয়াছে, এই নীতিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই ইউরোপের যুদ্ধ হইতে দূরে থাকার নীতি লইয়া আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলরা তাহাদের মুখপাত্র ডিউই-র মুখ দিয়া এই চতুঃশক্তি-নেতৃত্বের নীতিকেই আঘাত করার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ এক গোষ্ঠির হাতে সমস্ত পরিচালন-ক্ষমতা থাকা, সোভিয়েট ইউনিয়নকে আসিতে না দেওয়া, আমেরিকার বাহিরে থাকা প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে যুদ্ধের পূর্ব্বে লীগ অব নেশনস নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল আজ সে সমস্ত দুর্ব্বলতাই দূর হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ইয়োরোপের পশ্চিম অংশের রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা ও সোভিয়েট বিদ্বেষের নীতিই গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতিকে ব্যহত করিয়াছিল। আজই সর্ব্বপ্রথম এই সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিতেছে যে বিশ্বের গণতন্ত্র-প্রিয় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে, আর তারই সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত নীতি পরাস্ত হইবে। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যারা নতুন করিয়া শান্তির সম্ভাবনাকে ধ্বংসের চক্রান্ত করিতেছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

[—"মার্কসিষ্ট মিসলেনী" হইতে সংক্ষিপ্ত]

শান্তির নূতন রূপ

বেশন আসন্ন

আয়োজন

প্রতি নির্দেশ

অধিবেশনের জন্য খরচ ৫০।৬০ হাজার টাকা হইবে। বিভিন্ন **জিলা কৃষক সমিতির** উপরে যে-যে টাকার কোটা ধার্য্য করা হইয়াছে সেই টাকা এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছে না। প্রত্যেক জিলা কৃষক সমিতি এখনই টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। সময় একেবারেই হাতে নাই। টাকা পাঠাইবার সময় চাঁদাদাতাদের নাম ও ঠিকানা এবং প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে দেওয়া রসিদের নম্বর পাঠাইবেন। একটি মুহূর্ত্তও এখন যেন নষ্ট না হয়। সারা-ভারত কৃষক সভার নবম অধিবেশনের জন্য **জোর প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকুন।**

কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের সভা—২রা ও ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৫; সারা-ভারত কৃষক কমিটির সভা—৪ঠা এপ্রিল; বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটি ও ডেলিগেট-গণের যুক্ত সভা—৫ই, ৬ই ও ৭ই এপ্রিল।

প্রকাশ্য অধিবেশন—৮ই ও ৯ই এপ্রিল। কৃষকদের নিজস্ব নাচ, গান ও থিয়েটার প্রভৃতি ৮ই ও ৯ই এপ্রিল রাত্রি বেলা। প্রদর্শনী ৩রা এপ্রিল তারিখে খোলা হইয়া এক সপ্তাহ থাকিবে।

যাঁহারা কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের সভ্য তাঁহাদিগকে ১লা এপ্রিল (১৮ই চৈত্র) তারিখে নেত্রকোণায় পৌঁছিতে হইবে।

যাঁহারা নিখিল ভারত কৃষক কমিটির সভ্য তাঁহাদিগকে ৩রা এপ্রিল (২০শে চৈত্র) তারিখে নেত্রকোণায় পৌঁছিতে হইবে। প্রতিনিধিদিগকে ৪ঠা এপ্রিল (২১শে চৈত্র) তারিখে নেত্রকোণায় পৌঁছিতে হইবে।

এই অধিবেশনের জন্য এ পর্যান্ত কলিকাতায় প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন:

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাজরাদী ব্যাঙ্ক ১০০০৲, সুপ্রিয়া আচার্য্য ১০০০৲, পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি ৩০০০৲, এস, কে, আচার্য্য ৫০০০৲, জ্ঞানেশ গুপ্ত ২১০৲, শচীন্দ্রনাথ বসু ৩০০৲, সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ২০০৲, সুকুমার মোতায়েদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মারকেন্টাইল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০০৲, রথীন কর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাওয়াল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ৫০৲, তরুণ মজুমদার ২৫০৲, প্রতুল ভট্টাচার্য্য ১০০৲, পাল ৫০০৲, দিব্যেন্দু মুখার্জ্জী ২৫৲, জে এন ঘোষ ১০০৲, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৲, অখিল নন্দী ১০০৲, জনৈক বন্ধু ১০৲, জনৈক বন্ধু ২০৲, জনৈক বন্ধু ২০৲, জনৈক বন্ধু ৫৲, কমল বসু ২৫০৲, জনৈক বন্ধু ২০৲, বেনু ঘোষ ৫০৲, এস, কে চাটার্জ্জি ৩০৲, রমেশ দাস ১৲ জনৈক বন্ধু ১৲, সত্যশঙ্কর গুপ্ত ১৫৲, সুনীল কুমার বসু ১০৲, হিন্দুস্থান পেপার হাউস ১৪৲, নারায়ণ চন্দ্র রায় ১৫০৲, শৈলেন দাসগুপ্ত ১০০৲, হীরেন মুখার্জ্জী ২০০৲, গৌর আডিড ১৲, এন কে ভট্টাচার্য্য ১৲, গোপাল বোস ৫৲, নিশিকান্ত ঘোষ ৫৲, পি টি দালাল ২০৲, মোহাম্মদ ইসাক ৫০৲, সরোজ বসু ৫৲, মোহাম্মদ অ নছার খান ১০০৲, কল্যাণ লাহিড়ী ১০০৲, অরুণা মিত্র ১০৲, জনৈক বন্ধু ১০০৲, জনৈক বন্ধু ২৲, ধীরেন গুপ্ত ৫০৲, শচীন মিত্র ২৲, খান বাহাদুর ফজল ইলাহী ৫০৲, গোপাল বসু ১০৲, শচীশ সরকার ১০০৲, ধীরেন লাহিড়ী ৪৫৲, বিমল রায় ২৫৲, সীতা চৌধুরী ৪০৲, অনিল সেন ৫৲, বঙ্কিমচন্দ্র পোদ্দার ১৲, সমরেন্দ্র-নাথ মজুমদার ১৲, জ্যোতির্ম্ময় দত্ত ১৲, বিশ্বনাথ দাশ ১৲, ললিত মোহন সরকার ১৲, ভূপেশ নাগ ১৲, দিলীপ পাল ৩০০৲, শেখরেশ চক্রবর্ত্তী ২৫৲, জনৈক বন্ধু ২০৲, জনৈক বন্ধু ২০৲, নারায়ণ চৌধুরী ২৫৲, আর এন মুখার্জ্জী ৫০৲, বিষ্ণু দে ২০০৲, গোপাল হালদার ৪০০৲।

অন্যান্য দাতাদের নাম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতি

যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে কি হইবে?

জার্ম্মানীর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ভার্সাই সন্ধির মতই ব্যর্থ হইবে না?

তৃতীয় মহাযুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী?

বিশ্বশান্তি ও গণতন্ত্র কোন পথে?

এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইতে হইলে—

Marxist Miscellany

পড়ুন

দাম ১॥০ টাকা।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কর্পোরেশনকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্র

(৩ পৃষ্ঠার পর)

হইতেছে না। বাড়ী বা বস্তীর ট্যাক্স বাড়ানো মানেই কলিকাতার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভাড়াটের ভাড়া বাড়িবে, তাহাদিগকেই এই ট্যাক্সের বোঝা বহন করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ীকে রেহাই

আজ গভর্ণর কেসিরই আমলাতন্ত্র ইয়োরোপীয়ান ও অন্যান্য ব্যবসায়ী স্বার্থকে ট্যাক্স হইতে রেহাই দিয়া কলিকাতার দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে শহরের স্বাস্থ্যোন্নতির মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও আমলাতন্ত্রের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে না লড়িয়া তাহাদের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতেছে! যুদ্ধকালীন কলিকাতায় স্বাস্থ্যোন্নতির সমস্যার জন্য গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টা তথা লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও দায়ী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজের সেই দায়িত্বও আজ কলিকাতার অধিবাসী-সাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার জন্য কর্পোরেশনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে চলিয়াছে, নিজের দায়িত্বহীন ও লজ্জাহীন আমলাতান্ত্রিক হুকুমের কাছে কলিকাতাবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারও বলি দিতে প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতার প্রত্যেকটী অধিবাসীই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিবে এবং উচ্ছেদের হুকুম প্রত্যাহৃত হোক ইহাই দাবী করিবে।

শুধু প্রতিবাদ করাই কর্পোরেশনের কাজ নয়। কর্পোরেশন আজ শহরবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই জানাইয়া দিক যে ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রস্তাব ছাড়া গবর্ণমেণ্টের অন্য সব কয়টী প্রস্তাবই কর্পোরেশন এখনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—কিন্তু তাহার আগে উচ্ছেদের হুকুম রদ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

কেসি'র কাছে বসুপন্থীদের প্রার্থনা

কিন্তু উচ্ছেদের হুকুম প্রত্যাহার দাবী করা এক কথা আর কর্পোরেশনকে উচ্ছেদ হইতে দেওয়া আর এক কথা। সুধীরবাবুরা তাঁহাদের প্রস্তাব ও বক্তৃতায় মহা আস্ফালন সহকারে বলিয়াছেন যে, এই হুকুম কর্পোরেশন মানিবে না, ইহাতে বাধা দিবে। কিন্তু কি উপায়ে বাধা দিবে? গভর্ণর মিঃ কেসির কাছে নিবেদন করাই তাঁহারা বাধা দিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত হাস্যকর প্রস্তাব। এদেশে সাম্রাজ্যবাদী তথা ইয়োরোপীয়ান বণিক স্বার্থের প্রতিভূ যে আমলাতন্ত্র ও গবর্ণমেণ্ট তাহার মালিকই হইলেন মিঃ কেসি। তাঁহার সম্মতি বা ইচ্ছা ছাড়া এই হুকুম আসিতেই পারে না। আজ আবার সেই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধির কাছেই দরবার করার প্রস্তাবে যে-কোন দেশভক্ত নাগরিকই লজ্জা অনুভব করিবে। সেজন্যই আমরা কমিউনিষ্টরা সুধীর বাবুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

মিঃ কেসির কাছে নয়, দেশবাসীর কাছে আবেদন করুন—যাহাতে সারা বাংলার নরনারী এই আদেশের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। সেই আন্দোলন যদি প্রকৃতই শক্তিশালী হইয়া উঠে তবে হুকুমও রদ হইবে।

নিজের নাক কাটিয়া

আর যদি তেমন শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া না উঠে যাহাতে আমলাতন্ত্রকে হুকুম পরিবর্ত্তনে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে কি সুধীর বাবুর প্রস্তাব মত হুকুম অস্বীকার করিয়া আমরা গোটা কর্পোরেশনই আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দিব? যে আমলাতন্ত্র এমনই নির্লজ্জ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন—ক্ষোভের বশে তাহাদের হাতেই শহরবাসীর সমগ্র ভবিষ্যৎ তুলিয়া দিলে শহরবাসীই মরিবে, আমলাতন্ত্রের মনস্কামনাই পূর্ণ হইবে। নাগরিক অধিকারের পূর্ণ ক্ষমতা আজও পাওয়া যায় নাই এবং গবর্ণমেণ্ট উহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে পারে ইহা জানিয়া শুনিয়াই তো আপনারা কর্পোরেশনে আসিয়াছেন। আজ আমাদের প্রতিবাদ যদি এই ক্ষমতা হরণের হুকুম বদলাইতে না পারে তাই বলিয়া বাকী ক্ষমতাও আমরা গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিব? কখনই নয়। আইনের বলে বাধ্য হইয়া আমাদের যে-টুকু করিতে হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং প্রতিবাদ সহকারেই আমরা তাহা পালন করিব—তাহাতে অন্ততঃ কর্পোরেশনের বাকী অধিকারগুলিও শহরবাসীর হাতেই থাকে। এই অধিকারের মধ্যেই আপনারা যদি নিজ নিজ দুর্নীতি দূর করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে প্রতিবাদের শক্তি প্রতিদিন বাড়িতে থাকিবে, একদিন না একদিন আমলাতন্ত্র তাহার হুকুম বদলাইতে বাধ্য হইবে।"

কাউন্সিলর সোমনাথ লাহিড়ীর উপরোক্ত বক্তৃতা হইতেই কলিকাতার প্রত্যেকটী নাগরিক বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি। কর্পোরেশনে ভোটের জোরে অবশ্য সুধীর বাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে—ইহার অর্থ হইল যে কর্পোরেশন একেবারে গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হইয়াছে। এখনি কলিকাতার প্রত্যেকটী এলাকায় হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত নাগরিক ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ আরম্ভ করুন, নিজ নিজ এলাকার কাউন্সিলরদের উপর চাপ দিন, গবর্ণমেণ্টকে আদেশ বদলাইতে বাধ্য করুন। তবেই কলিকাতা কর্পোরেশন বাঁচিবে।

★

ভ্রম-সংশোধন

ফেণী হইতে অজিত রায় জানাইয়াছেন:—

"গত ৪২শ সংখ্যা জনযুদ্ধে 'কাপড় লইয়া মজুতদার ও আমলার ছিনিমিনি খেলা' শীর্ষক সংবাদের এক স্থানে লেখা আছে যে এ-আর-পির লোকেরা নাকি কয়েক মাস আগে ফেণী শহরে অটল সাহার দোকান হইতে কাপড়ের চোরাই মজুত ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আরও লেখা আছে যে একদিন এই অটল সাহার দোকানেই অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া দোকানদার মহকুমা হাকিমকে সংবাদ দেয়!

এই দুটী সংবাদই ভুল। অটল সাহার দোকানে এ-আর-পির লোকেরা চোরা কাপড় ধরে নাই। কাছাকাছি আর একটী দোকানে ধরিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু সে খবরও সরকারী ভাবে সমর্থিত হয় নাই। আর অটল সাহার দোকানে ভিড়ের জন্য মহকুমা হাকিম আসিয়া লটারী করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অটল সাহা হাকিমকে খবর দেন নাই, হাকিম নিজেই আসিয়া নিজের ইচ্ছামত লটারী করাইয়াছিলেন। আশা করি সংবাদের এই সংশোধন আপনারা প্রকাশ করিবেন।"

[এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। আশাকরি ভবিষ্যতে সংবাদদাতারা পাকাপাকি অনুসন্ধান করিয়া তবে সংবাদ পাঠাইবেন।—সম্পাদক, জনযুদ্ধ]

ক্যাম্বেল হাসপাতালে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা—ভুক্তভোগীর পত্র

সেই জন্যই কি ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তে মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়াছে?—সরকার জবাব দিক

কলিকাতায় বসন্ত মহামারীর প্রকোপ ও তাহার চিকিৎসার অব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বসন্তের প্রকোপ এখনও কমে নাই। জানুয়ারী মাসে বসন্তে মারা যায় ১২১৪ জন, ফেব্রুয়ারী মাসে ১১৬১ জন, অর্থাৎ জানুয়ারীতে যেখানে প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা ২৭০ জন মারা গিয়াছে, সেখানে ফেব্রুয়ারীতে মারা গিয়াছে ২৯০ জন।

বসন্তের মৃত্যুর হার এই রকম থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনই উন্নতি হয় নাই। কলিকাতায় বসন্ত চিকিৎসার একমাত্র হাসপাতাল ক্যাম্পবেল হাসপাতাল। এই হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্বন্ধে আমরা একটি চিঠি পাইয়াছি। চিঠিখানি নীচে ছাপাইলাম। পত্রলেখক নিজে বসন্তে আক্রান্ত হইয়া ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ছিলেন। পত্রে তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই হাসপাতালের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া এখানকার ছাত্ররা গত বছর ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। তখন সরকার ও কর্ত্তৃপক্ষ এই সব অব্যবস্থা দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এক বছর অতিবাহিত হইয়া গেল। মহামারীর প্রকোপও ইতিমধ্যে বাড়িয়াছে। কিন্তু ক্যাম্পবেল হাসপাতালের অব্যবস্থা অক্ষয় হইয়াই রহিয়াছে। —জঃ সঃ]

বিশ্বাম্বর সাহার পত্র

সম্পাদক মহাশয়!

ক্যাম্বেল হাসপাতালের বসন্ত ওয়ার্ডে ভর্ত্তি হয়ে আমি দেখলাম উক্ত ওয়ার্ডে প্রায় ৩০০ রোগীর স্থান সঙ্কুলান হ'তে পারে। এই সব ওয়ার্ডে যে সব অব্যবস্থা ও দুর্নীতি অবাধে চলছে। সেগুলো অপসারণের জন্য জনসাধারণের নিকট সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নিম্নলিখিত সমস্ত বিষয় রোগী হিসাবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি।

প্রথমে অব্যবস্থার কথাই বলছি। ৩০০ রোগীর জন্য মাত্র ৫টী পায়খানা আছে। তার মধ্যে ৪টীই ব্যবহারের অযোগ্য বলা চলে। প্রস্রাবের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই। ফলে ওয়ার্ড-এর চারপাশেই হাটতে সক্ষম সমস্ত রোগী প্রস্রাব করে। মেন হলে ২০০ রোগীর মধ্যে মাত্র ৪টী বেডে অর্দ্ধ ছেঁড়া মশারী আছে। বেড-এর চাদর কদাচিৎ ধোপায় দেওয়া হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও রোগীর পুঁজ শুকিয়ে বেড-এর চাদর চটচটে হয়ে থাকে এবং তার উপরই নূতন রোগী এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রব। চারদিকে প্রস্রাব ও পায়খানার গন্ধ। কিন্তু ফিনাইলের কোনও ব্যবস্থা নেই বলা চলে। যেখানে ২৪ ঘণ্টা জলের প্রয়োজন সেখানে বেশীর ভাগ সময়েই কলে জল থাকে না। কিছু সুস্থ রোগীদের যে দুটী হলে স্থানান্তরিত করে রাখা হয় সেখানে বেড ও মশারীর ব্যবস্থা আছে বটে তবে তাদের স্নান করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও স্নানের কোনও ব্যবস্থা নেই। হলের বাইরের যে দুটি মাত্র নল থেকে ওয়ার্ড ধোয়ানো ও অন্যান্য সমস্ত কাজের জন্য কুলি ও জমাদারেরা জল ব্যবহার করে সেখানেই সকাল ১০টার মধ্যে সুস্থ রোগীদের কোনও রকমে স্নান পর্ব্ব সমাধা করতে হয়। চলতে অক্ষম রোগীদের পায়খানা ও প্রস্রাবের অসুবিধার চরম। জমাদার আছে বটে কিন্তু কাজের সময় তাদের পাওয়া যায় খুব কমই। রোগীদের প্রতি এসব জমাদারদের ব্যবহারও অত্যন্ত কদর্য্য। কম্বল, গামলা, খাটিয়া এবং টেবিল প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ অতি সহজেই এ সবের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়া হয় না বলেই মনে হয়। খাওয়ার অব্যবস্থাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মেন হলের তিনটি ওয়ার্ডে বেলা ১টার পূর্ব্বে কোনও দিনই ভাত দেওয়া হয় না।

এবার দুর্নীতির কথা বলছি। সকাল ৮টায় চা দেওয়া হয়। চা-তে চিনি দেওয়া হয় না। ভাতপথ্যকারীদের ডালে লবণ দেওয়া হয় না। দুধ যা দেওয়া হয় তাতে চার ভাগের এক ভাগ থাকে জল। কুলি ও পানিওয়ালারা (পরিবেশনকারী] ওয়ার্ডে নার্সদের চোখের উপর দুধ, চিনি, রুটী রোগীদের নিকট বিক্রী করে। দুধের সের চার আনা, রুটীর পাউণ্ড চার আনা ও চিনি এক আনায় ছটাক খানেক পাওয়া যায়। লবণ সম্ভবতঃ হাসপাতালের বাহরে এনে চোরাবাজারে চালান হয়। এমন অবাধে তারা এ সব কাজ করে তাতে এ সব কাজ হাসপাতালের রীতি-নীতির অঙ্গ বলে নূতন রোগীরা ভ্রম করে।

এ সব অব্যবস্থা ও দুর্নীতি আজকের নূতন নয়। বছরের পর বছর ধরেই এ সব চলছে। হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ যে এসব জানেন না এ কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এ সবের কোনও প্রতিকার হয় না।

আশাকরি জনসাধারণ ও কর্ত্তৃপক্ষ এ সব অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূরীকরণে অবিলম্বে তৎপর হবেন।

শ্রীবিশ্বাম্বর সাহা

৫৩এ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩।৩।৪৫

খনি-মজুরদের সভা নিষিদ্ধ হয়

কিন্তু দালালের গুণ্ডামি নিষিদ্ধ হয় না

বহুদিন হইতেই আসানসোল মহকুমায় সভা-সমিতি একেবারে বন্ধ। লোহা-কারখানার মজুর ইউনিয়ন ও কয়লা-খনি মজুর ইউনিয়ন হইতে যতবার সভার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, এস-ডি-ও সাফ জবাব দিয়াছেন, সভা করা চলিবে না। গত বছর প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দিন কাউন্সিলে ঘোষণা করিলেন যে, কলিকাতা, ঢাকা ও মেদিনীপুর ছাড়া আর কোথাও সভার উপর নিষেধাজ্ঞা নাই। কিন্তু এই ঘোষণার পরও আসানসোলে সভার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির এক চিঠির জবাবে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী লেবার ডিপার্টমেণ্ট লিখিয়াছেন যে, এখন আর আসানসোলে নিষেধাজ্ঞা নাই। কিন্তু তারপরও আমরা খবর পাইয়াছি, বরাকর অঞ্চলে বিনা-অনুমতিতে সভা করার অভিযোগে কয়েকজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই অদ্ভুত অবস্থার অর্থ কি? শোনা যায়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর খনি-মালিকদের প্রভাব এত বেশী যে, বাংলা-সরকারের নির্দ্দেশের চেয়ে তাদেরই ইচ্ছা সেখানে বেশী খাটে। সেই জন্যই বোধ হয় সরকারী-ঘোষণা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ভারত রক্ষা আইনের যতটুকু তাঁদের হাতে আছে তা খাটাইয়া মালিকদের সুবিধা করিয়া দেন।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া দালালদের সাহস কতদূর বাড়িয়া গিয়াছে, তার নমুনা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি বরাকর, শ্রীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে-সব খবর আসিতেছে, তাতে দেখা যায় ঐ অঞ্চলে ইউনিয়নের আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য দালালেরা রীতিমত গুণ্ডামি সুরু করিয়াছে। গদাধর পাল ও কেষ্ট অধিকারী শ্রীপুর কোলিয়ারীর কর্ম্মচারী ছিলেন। ইউনিয়নে যোগ দিবার অপরাধে কোম্পানী তাদের বরখাস্ত করিল। তারপর একদিন শোনা গেল সন্ধ্যার সময় শ্রীপুর বাজারে কয়েকজন লোক তাদের মারপিট করিয়াছে। কোম্পানীই এইভাবে মারপিট করাইয়াছে বলিয়া ইহারা আদালতে নালিশ রুজু করিয়াছে।

এই একটী ঘটনাই নয়। শিমুলিয়া অঞ্চলেও এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। তাছাড়া ইউনিয়নের জন্য কেহ অফিস ঘর ভাড়া যাতে না দেয়, তার জন্যও কোম্পানী রীতিমত শাসাইয়া বেড়ায়। সভা-সমিতি সম্পর্কে সরকারের নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু এই ধরণের গুণ্ডামী বন্ধ করিতে কি নিষেধাজ্ঞা নাই? খনি-মালিকের ভয়ে কি এই গুণ্ডামীও কর্ত্তৃপক্ষ হজম করিয়া যাইবেন?

লালফৌজের ব্রাণ্ডেনবুর্গ ও মিত্রসেনার কবলেঞ্জ অধিকার

আয়োজিমা ও মান্দালয়ের যুদ্ধে সাফল্য

ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্ট জানোয়ার এখন মরণ যন্ত্রনা কাহাকে বলে বুঝিতেছে। কিন্তু 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' রাখে বলিয়া আজ মাঝে মাঝে মিত্রপক্ষে ভাঙ্গাভাঙ্গি বাধাইয়া কোনক্রমে আপন প্রান বাঁচাইবার মতলব হাঁসিল করার জন্য প্রানপণ চেষ্টা করিতেছে। একমুখে হিটলার তাহার সিপাহীদের অটল হইয়া লড়িবার আহ্বান জানাইতেছে, অন্যমুখে কৌশলে সোভিয়েটের মিত্রদের জানাইতেছে যে সোভিয়েটের সমরশক্তির সীমা নাই, সুতরাং একদিন সোভিয়েটের কাছে তাহাদেরও নাকাল হইতে হইবে! হিটলারের বিশ্বস্ত অনুচর রিবেনট্রপ সেদিন ভয় দেখাইয়াছে যে "যদি হারিয়াই যাই, তাহা হইলে সোভিয়েট

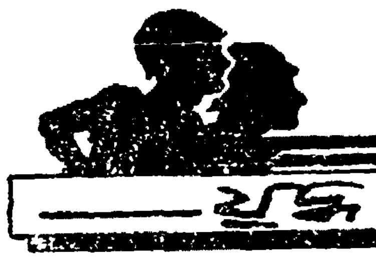

রাশিয়ার হাতে জার্ম্মানীকে তুলিয়া দিব।' হিটলারের শেষ আশা এই যে মিত্রপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল যাহারা আছে, লালফৌজের অগ্রগতি ও দেশে দেশে জনগণের জাগরণ দেখিয়া যাহারা সন্ত্রস্ত, তাহারা শেষ মুহূর্ত্তে সোভিয়েটের হিংসায় জ্বলিয়া মিত্রপক্ষের ঐক্যকে চূর্ণ করিয়া দিবে। এজন্যই সুইডেন মারফৎ রিবেনট্রপের এক বিশ্বস্ত অনুচর নাকি বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে আলাদা মিটমাটের চেষ্টায় লাগিয়াছিল। এজন্যই রিবেনট্রপ ও ফ্যাসিষ্ট মার্শাল কাইটেল সুইজারল্যাণ্ড যাইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু হিটলার এই আশায় পিছনে যতই ছুটুক না কেন, ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্টদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঠেকাইবার, সকল উদ্যমই বিফল হইবে, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

লালফৌজের লক্ষ্য

বার্লিনের দিকে যাইবার পথে লালফৌজ এখন ষ্টেটিন, ফ্রাঙ্কফোর্ট আর ব্রেসলাউয়ের কাছে লড়িতেছে। অনেকে মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হইয়া প্রশ্ন করেন বার্লিন পতনে এত বিলম্ব ঘটিতেছে কেন? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রযুদ্ধ পূরাকালের যুদ্ধের মত নয়। শত্রু যে আজ চরম বিপদে পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রানপাত করিবে, লালফৌজ তাহা জানে। এখন হয়ত শত্রুর শক্তির কেন্দ্রস্থল উত্তর হইতে দক্ষিণে অষ্ট্রিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়া অঞ্চলেও স্থানান্তরিত হইতে পারে। তাই একদিকে যেমন বার্লিন দখল করা ও রাইন অতিক্রম করা লালফৌজ ও মিত্রশক্তির এক মস্ত বড় কাজ, অন্য দিকে তেমনি দক্ষিণে অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যাহাতে হিটলার হাটু গাড়িতে না পারে সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আর এক মস্ত বড় প্রয়োজন।

লালফৌজ এই দিকে যে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে তাহা বোঝা যায় মার্শাল টলবুখিনের নূতন আক্রমণের খবর হইতে। হাঙ্গেরীর পশ্চিমে জার্ম্মানরা ১৩ দিন ধরিয়া মরিয়া হইয়া পাল্টা আক্রমণ চালায়, কিন্তু তাহাদের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। মার্শাল টলবুখিন এখন লালফৌজ লইয়া দানিয়ুব নদী ও বালাটন হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অগ্রসর হইতেছেন। এই অভিযানের লক্ষ্য হইল অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা ও উত্তর ইতালীর ট্রিষ্ট সহর। এখানে শত্রুর বহু বিরাট কারখানা আছে। এবং ইস্পাত ও কলকব্জা তৈরীর একটা বড় কেন্দ্র। ওদিকে আবার মার্শাল মালিনোভস্কীর সৈন্যদলও চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের বহুবাধা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাগ সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্যদিক হইতে মার্শাল কনিয়েভ ব্রেসলাউ দখল করিবার জন্য প্রচণ্ড লড়াই চালাইতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্রেসলাউ হইতে ড্রেসডেনের পথে শত্রুকে ধাওয়া করা। লালফৌজ যদি একবার ড্রেসডেনে পৌছিতে পারে, তবে শত্রুর আর দক্ষিণে পলাইবার রাস্তাই থাকিবেনা।

নানা দিকে লালফৌজের বেড়াজাল

পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় যে নাৎসী বাহিনী ঘেরাও হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্গীন। দুই দুই খণ্ডে তাহারা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার রাজধানী কোনিংসবুর্গ জার্ম্মানদের হাতছাড়া হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ইহার পাঁচ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম লালফৌজের দখলে আসিয়াছে, আর দশ মাইল দূরে বিখ্যাত প্রাচীন সহর ব্রাণ্ডেনবুর্গ লালফৌজ অধিকার করিয়াছে।

বাল্টিক বন্দর ডানজিগে শত্রুর অবস্থা খুবই খারাপ। গিদনিয়া বন্দরেও লালফৌজ ঢুকিয়াছে, আর কোলবুর্গ এখন লালফৌজের হাতে।

পশ্চিমে মিত্রশক্তির অগ্রগতি

পশ্চিম ইয়োরোপে সেনাপতি প্যাটন রাইন নদী ও সারব্রুকেনের মাঝামাঝি ৫০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে আগাইয়া চলিয়াছে। দুইদিনে তিনি ৩১ মাইল অগ্রসর হইয়াছেন, ও ৭টি সহর দখল করিয়াছেন; মোজেল নদী পার হইয়া আমেরিকানরা রাইন নদীর উপর অবস্থিত বিখ্যাত সহর কবলেঞ্জ অধিকার করিয়াছে। সেদিন বার্লিনের উপর গিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে ১৩০০ মার্কিণ বিমান বোমা ফেলিয়া আসিয়াছে। শোনা যাইতেছে ইয়ালটার চুক্তি অনুযায়ী উত্তর দিক হইতেও শীঘ্রই হিটলারীদের আক্রমণ করা হইবে।

বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করিলে হিটলার-জার্ম্মানীকে এই প্রচণ্ড সাঁড়াশী আক্রমণের ধাক্কা সহিতেই হইবে। মিত্রপক্ষের ভেদাভেদ ঘটাইবার যত কৌশলই হিটলার করুক না কেন, ইয়োরোপে ফ্যাসিজমের চূড়ান্ত বিপর্য্যয় এবার আর রোধ করিতে পারিবে না।

সাংহাইতে দেড় লক্ষ জাপ সৈন্য

প্রশান্ত মহাসাগরের আয়োজিমা দ্বীপ এখন সম্পূর্ণ ভাবেই মার্কিন নৌসেনাদের হাতে আসিয়াছে। এডমিরাল নিমিজ ঘোষণা করিয়াছেন—'আয়োজিমার যুদ্ধে জয়লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছে।'

বর্ম্মাতে মান্দালয়ের যুদ্ধেও মিত্রসেনা বেশ কিছুটা সুবিধা করিয়া নিয়াছে। জাপানীরা মান্দালয়ে জয়লাভের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানের পরিবেষ্টিত জাপ সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম হইয়াছে মরণ পর্য্যন্ত লড়াই চালাইয়া যাইতে। মান্দালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ইরাবতীনদীর তীরবর্ত্তী আভা দুর্গও শত্রুকবল মুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এদিকে খাস চীনে জাপানীরা বেশ ভাল ভাবেই নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করিতেছে। খবর পাওয়া গিয়াছে, মার্কিণ বাহিনীর অবতরণ আশঙ্কায় দেড় লক্ষ জাপানী সৈন্য সাংহাই, নাঙচো, নিঙপো প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া আছে।

জাপানীদের ইন্দোচীন দখল করা,' চীনে প্রচুর সৈন্য জড়ো করিয়া নূতন নূতন শক্ত ঘাঁটি তৈয়ার করা প্রভৃতি ঘটনা হইতে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে চীনকে কেন্দ্র করিয়াই জাপানীরা তাহাদের চরম লড়াই চালাইবে। এ অবস্থায় চীনের বিভেদে আজ জাপানীদের শক্তি বৃদ্ধিই পাইবে। তাই অবিলম্বে যদি চিয়াং কাইশেকের একনায়কত্বের অবসান ঘটানো যায় এবং সেখানে সকল দলের মিলিত সরকার কায়েম হয়, তবেই ফ্যাসিষ্ট জাপানকে ধ্বংস করিবার লড়াই বেশ জোড় কদমে আগাইয়া যাইবে।

কাপড়ের লাইনে পুলিশ চাই না

[২ পৃষ্ঠার পর]

লোকজনকে ঘাবড়াইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় রাস্তায়ও পুলিশের পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তবুও দলে দলে নরনারী পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে আগাইয়া আসিল। সময় অল্প এই অজুহাতে তাহাদের অনেকেরই সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই। এই তদন্তেরও ফল কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

যে-ভক্ষক সেই যদি আবার রক্ষক হয় তো কেহই রক্ষা পাইবে না। পুলিশের দুর্নীতি ও অত্যাচার সম্বন্ধে কলিকাতার জনসাধারণ নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিতেছে। আরও দাবী করিতেছে যে কাপড়ের লাইন হইতে এখনই সমস্ত পুলিশ সরাইয়া লওয়া হউক। কাপড়ও পাইবে না পুলিশের গুঁতায় মাথাও ভাঙ্গিবে ইহা সহ্য করিতে জনসাধারণ প্রস্তুত নয়। লাইনে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় লোকদের ভিতর হইতেই স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হোক—কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি প্রভৃতি হইতে স্বেচ্ছাসেবক চাওয়া হোক—মাত্র ১৫০টি দোকানে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাইবে।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

(৮ পৃষ্ঠার পর)

৭৲ টাকা ও ঘাটতি এলাকায় ৭৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা হওয়া উচিত। সরাসরি চাষীর নিকট হইতে সরকারকে ধান কিনিতে বাধ্য করিতে হইবে এবং সেজন্য প্রতি হাটে সরকারী খরিদ চাই। দ্বিতীয়ত খইল, সার, তেল, লবণ প্রভৃতি দরকারী জিনিষ চাষীকে ধানের দরের অনুপাতে শস্তা নিয়ন্ত্রিত দরে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও দামোদর, অজয় সেচ, নিকর রক্ষা, ফুড কমিটি, গ্রাম্য রেশনিং, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, লালফৌজকে অভিনন্দন, কাপড় ও সূতা সমস্যা, দুধ, গো-সমস্যা, বীজ ও সার, ইউনিয়ন বোর্ডের নমিনেশন প্রথা উচ্ছেদ, পার্টি ভাগচাষীর দুরবস্থার প্রতিকার, মাছের চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৩ই মার্চ্চ ও ১৪ই মার্চ্চ রাত্রিতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে 'নবান্ন' অভিনয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবি রমেশ শীলের গান সহস্র সহস্র জনতা মুগ্ধ হইয়া শোনে। বর্দ্ধমানের মন্মথ দাসের বাউল দলের গান ও বীরভূমের কবি রমাপদ দাসের কবিগান খুবই উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং হইতে ওগেন লামার নেতৃত্বে আসিয়াছিল ৪ জনের একটি সাংস্কৃতিক দল—কুঞ্জ, তাহার স্ত্রী ও ছোট মেয়ে পাশা এবং এক বৃদ্ধ। তাহাদের তরবারি নৃত্য খুবই ভাল হইয়াছিল।

সহস্র সহস্র কৃষক বাংলাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলার চেতনা লইয়া সম্মেলন হইতে ফিরিল। দুলে জাতির এক গরীব কৃষক বলিল, বাংলার 'সমস্ত জেলার হিন্দুমুসলমান এসে একতার কথা বলেছেন—এর আগে এমন কখনও হয়নি। মনে আশা হচ্ছে, আমরা পারব।'

বি এম আর সি সি'কে অর্থ-সাহায্যে বাংলা সরকার অস্বীকৃত

★ মুক্তহস্তে দান করিয়া ইহাকে বাঁচান

মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্ব্বদলীয় দেশপ্রেমিক সংগঠন বেঙ্গল ম্যাডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি [বি, এম, আর, সি, সি] সম্প্রতি বাংলা সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য দাবী করিলে জনস্বাস্থ্য বিভাগ তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

ডাঃ বিধান রায়ের নেতৃত্বে বি, এম, আর, সি, সি আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা দেশে ২৩ লক্ষ রোগীর সেবা করিয়াছে। তাহাদের এই কাজে বাংলা এবং বাংলার বাহির হইতে তিন লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স ইউনিট এবং আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি দেড়লক্ষ টাকার ঔষধপত্র দিয়াছে। শত শত ডাক্তার এবং মেডিক্যাল ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে টীকা দিয়াছে, শত শত মেডিক্যাল কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবা করিয়াছে। তাহাদের প্রচেষ্টায় জেলায় জেলায় সর্ব্বদলীয় মেডিক্যাল রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে, জনসেবায় ডাক্তার, ছাত্র, জনসাধারণ সকলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

জনসাধারণ, এবং বিশেষভাবে ডাক্তারদের, এই দেশপ্রেমিক ঐক্যের ফলে কুইনাইন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের চোরাবাজার কিছুটা বন্ধ হয়। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এক সার্কুলারে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, "ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীরা যাহাতে ঠিকমত চিকিৎসিত হইতে পারে তাহার পক্ষে এই কেন্দ্রগুলি বিশেষ মূল্যবান"। তাহারা বি, এম, আর, সি, সি, সি-র মেডিক্যাল কেন্দ্র মারফৎ কুইনাইন বিলি করিতে স্বীকৃত হন।

কিন্তু ১৯৪৫ সালে সরকারী আমলাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে মারাত্মক আত্মসন্তুষ্টি। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী বাংলাদেশের জীবনে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে, এই বাস্তব সত্যই যে তাহাদের চোখের সামনে নাই, এই বছরের বাজেট বরাদ্দ হইতেই তাহা দেখা যাইবে: ১৯৪৪-৪৫ সালে মেডিক্যাল রিলিফ খাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ছিল ১,৭০,০০,০০০৲, ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য উহা কমাইয়া ৭১,০০,০০০৲ করা হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতায় মন্ত্রী মিঃ জালালুদ্দিন আমেদ বলিয়াছেন, সরকার বাংলাদেশে মহামারী দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন!

কিন্তু কেবল আত্মসন্তুষ্টির বশবর্ত্তী হইয়াই কি গবর্ণমেণ্ট বি, এম, আর, সি, সি কে অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন? বি, এম, আর, সি, সি-র ৫০টি কেন্দ্র এখনও বাংলার বিভিন্ন গ্রামে সেবার কার্য্য চালাইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য মাসিক খরচ হয় ৬০০৲! কমিটির তহবিল দুর্ব্বল হওয়ার ফলে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে জানান যে তাহারা যদি উহার ব্যয়ভার আংশিকভাবে বহন করিতে পারেন, তাহা হইলে কেন্দ্রগুলির কাজ অব্যাহত ভাবে চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। জন-স্বাস্থ্যবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হল্যাণ্ড তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে সরকারী কেন্দ্রের খরচ বি, এম আর, সি, সি-র তুলনায় অনেক কম, মাত্র মাসিক ২৯০৲। সুতরাং তাহারা বি এম, আর, সি সি-কে তাহাদের প্রতি কেন্দ্রের জন্য মাসিক ৭০৲ টাকার বেশী সাহায্য করিলে তাহা "অপব্যয়" হইবে।

সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র যে চিকিৎসার একটা প্রহসন মাত্র তাহা সকলেই জানেন। আইনসভার অন্যতম সদস্য মিঃ হরেন্দ্রনাথ সুর সম্প্রতি বলেন, বি, এম, আর, সি, সি যেখানে মেডিক্যাল কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন তাহার ১০।১৫ মাইলের মধ্যে কোন সরকারী কেন্দ্র হইতে জনসাধারণ ঔষধ ব্যবস্থা লয় না। বাজেট আলোচনার কালে মিঃ ওয়ালীউর রহমান বলেন, মফঃস্বলের ঔষধালয়কে যে সাহায্য দান করা হয় তাহা খুবই সামান্য এবং তদুপরি দেখা যায় ঐসকল ঔষধালয়ের অধিকাংশ ঔষধ চোরাকারবারে চলিয়া যায়। হৃদয়হীন আমলাদের হাতে যেটুকু ঔষধ যাইয়া পৌছে, তাহাতেও হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি কেন্দ্রে দৈনিক ২০।২৫ জন রোগীর বেশী চিকিৎসিত হয় না।

বি, এম, আর, সি, সি-র ডাক্তার দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবক, সামান্য বেতন লইয়া স্থানীয় দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় জনসেবা করেন। তাহাদের কেন্দ্রে যে সমস্ত ঔষধপত্র থাকে তাহা অনেক সরকারী "হাসপাতালে"ও থাকে না। তাহারা গড়ে দৈনিক ১১৫ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। এত কম টাকায় এত বেশী রোগীর চিকিৎসা আর কোথাও হয় না।

গবর্ণমেণ্ট আসলে জনসংগঠনের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া আমলাদের দিয়া রিলিফের কাজ চালাইতে চাহেন। তাহারা বি, এম, আর, সি, সি-র মধ্যে যে দেশপ্রেমিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে ভয় করেন বলিয়াই এ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি আইন সভার স্পীকার মিঃ নওসের আলি প্রমু নেতৃবৃন্দ বি, এম, আর, সি, সি-কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। ১৬ই মার্চ্চ সমগ্র কলিকাতায় শত শত স্বেচ্ছাসেবক পথে, দোকানে, অফিসে অর্থ সংগ্রহে বাহির হয়। তাহারা প্রতিজ্ঞা লয় অর্থাভাবে, বি, এম, আর, সি সি-র সেবাকার্য্য হইতে দিবে না, আমলাতন্ত্রকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বদলাইতে বাধ্য করিবে।

বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে ৩০ হাজার কৃষকের বিরাট সমাবেশ

★ ★ বাড়তি ও ঘাটতি এলাকায় ধানের দর নির্দ্ধারণ ★ ★

বর্দ্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুর গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ কমপক্ষে ৩০ হাজার কৃষকের এক বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের ইতিহাসে এত বড় সমাবেশ ইহাই প্রথম। বাংলার সমস্ত জেলা হইতে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি ও কৃষকনেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

হাটগোবিন্দপুর বর্দ্ধমান শহর হইতে ৮ মাইল দূরে। গতবার বন্যার ফলে এ অঞ্চলে এবার ফসল হয় নাই। যতদূর দেখা যায়—ফসলের জমিতে ধূধূ করিতেছে বালি। সম্মেলনে পল্লীগায়ক মন্মথ দাসের গানে স্থানীয় বন্যাপীড়িত কৃষকের সেই মর্ম্মবেদনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে:

'শোনাই মোদের ইতিহাস—
হালের হেলে ভাসলো জলে
ঘুচলো মোদের চাষ।
...ঘরে যত ছিল কাঁথা বালিশ
বাঁশের ডগায় পেল স্থান।
...ভেঙে অজয়, দামোদর
জমি হ'ল বালির চর
খড়ি, কুনুর, বাঁকা ভেসে' উঠলো হাহাকার।'

দামোদর, অজয়, বাঁকা প্রভৃতি নদীর বন্যায় ও বেহুলা, কুনুর প্রভৃতি নদীর সেচ-নিকাশের অভাবে এই অঞ্চলটি আজ শ্মশান হইতে বসিয়াছে। জমিদাররা আজ এ অঞ্চলের বন্যাপীড়িত চাষীদের সাত পুরুষের নিষ্কর জমির উপর কর বসাইয়া অত্যাচারের নূতন বন্যা আনিয়া দিতেছে। ইহার উপর সরকার আবার ক্যানেল কর বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এ অঞ্চলের কৃষকেরা ১৯৩৭—৩৯ সালে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে বিরাট ভাবে আন্দোলন গড়িয়া তোলে। আজও সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী শুনাইয়া কৃষক বধূরা তাহাদের কোলের শিশুদের ঘুম পাড়ায়। হাটগোবিন্দপুর গ্রামে ৫০০ ঘর কৃষকের বাস; সকলেই কৃষক সমিতির সমর্থক। এই কৃষকেরা নিজেদের চেষ্টায় গ্রামে একটি হাই স্কুল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই স্কুলটিতেই সম্মেলনের অফিস, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র ও প্রতিনিধিদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৮৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া

বিভিন্ন জেলার দূর দূর অঞ্চল হইতে কৃষকের দল পায়ে হাঁটিয়া সম্মেলনে আসিয়াছিল। নদীয়া হইতে ৪০ জন কৃষক **৮৫ মাইল**, মেদিনীপুর হইতে ৮০ বছরের বৃদ্ধ শেখ জসিমউদ্দিন ও কৃষ্ণবিহারী পাঞ্জার নেতৃত্বে ২৫ জন **৮০ মাইল** এবং হাওড়া হইতে বৃদ্ধ পরাণ লস্করের নেতৃত্বে ৩৫ জন **৭৫ মাইল** পথ পায়ে হাঁটিয়া সম্মেলনে উপস্থিত হন। মহিলারাও বহু সংখ্যায় এই সম্মেলনে আসিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার ৭০ বছরের বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা ননী চ্যাটার্জ্জী ও হাওড়ার ৫০ বছরের প্রৌঢ়া 'মা'র নেতৃত্বে মহিলা শিবিরটি সুন্দর একটি পরিবার হইয়া উঠিয়াছিল।

১৩ই মার্চ্চ সকালে **প্রদর্শনীর** উদ্বোধন করিলেন সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায়। সামনেই মেমারীর অমূল্য রাণার নির্ম্মিত একটি কৃষক ও কৃষকরমণীর বিরাট মাটির মূর্ত্তি। প্রদর্শনী গৃহের একদিকে দুর্গত কৃষককুলের জীবনচিত্র, অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস ও বিবরণ। বীরভূম, দার্জ্জিলিং, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার হস্তশিল্প এখানে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া কৃষকদের জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত বহু পোষ্টার দেখানো হয়। কৃষকেরা এই প্রদর্শনী বার বার মুগ্ধ হইয়া দেখি...ছে।

১৪ই মার্চ্চ বিকালে প্রকাশ্য অধিবেশন। ১০।১২ হাজার কৃষক আগের দিনই সম্মেলনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৪ই মার্চ্চ ভোর হইতে কাতারে কাতারে গরুর গাড়ী আসিতে থাকে। বেলা ১২টা-১টার মধ্যে স্থানটি একটি বিরাট কিষাণ মেলার মত হইয়া উঠে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৭ হাজার মহিলা সভাস্থলে আসিয়া জমা হয়।

সংকটের-বিরুদ্ধে লড়াই

কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের সভ্য জালালউদ্দিন বোখারী রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। সভাপতি পরিষদের অন্যতম সভ্য বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা মৌলভী আবুল হায়াত সমাগত কৃষকদের অভ্যর্থনা জানান। ইহার পর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসু, সুর্য্যভাণী কৃষক সমিতির সম্পাদক, যুক্ত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্পাদক প্রভৃতির বাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। **যাদবপুর হাসপাতাল হইতে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ৪ জন কৃষক কর্ম্মী** এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হয়। আসানসোলের কয়লাখনি ও লোহা কারখানার মজুরদের পক্ষ হইতে প্রভাত কুণ্ডু, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে মণিকুন্তলা সেন ও মুসাম্মৎ শামসুন্নেছা, বর্দ্ধমান জেলা **কংগ্রেস কমিটির** সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাদেশিক মুসলিম **লীগ কাউন্সিলের** সদস্য মৌলভী এ, বাসেত সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন বলেন, 'সরকারী ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে কৃষকদের আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। যেখানে মজুতদার, সেখানেই তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তবে তারা বাধ্য হবে চাষীর দরকারী জিনিষ ন্যায্য দামে বেচতে,তবে দেশ বাঁচবে।' ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক **পি, সি জোশী** বলেন, 'কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সভা গড়ে তোলার কাজে কমিউনিষ্ট পার্টি সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাংলার সমাজে আজ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছাড়াও বহুমুখী সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে বাংলার কৃষক সভা আড়াই লক্ষ সভ্য করেছে, ১ হাজার ইউনিয়নে সমিতির শাখা ছড়িয়ে পড়েছে, খাল বাঁধ ইত্যাদিতে ৩ লক্ষ বিঘা জমি উদ্ধার ক'রে তাতে ফসল ফলিয়েছে। এক বর্দ্ধমানেই ১১ হাজার কৃষক সমিতির সভ্য হয়েছে, বাঁধের দাবী উঠেছে—ঐক্যবদ্ধ কৃষকের এই দাবী রুখতে পারে, এমন শক্তি কারও নেই।'

ইহার পর নিখিল ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী বক্তৃতা করেন।

উপরে—মেদিনীপুর হইতে ৮০ মাইল পদব্রজে আগত কৃষক দলের নেতা ৮০ বছরের বৃদ্ধ শেখ জসিমুদ্দীন; মধ্যে—সম্মেলনে জনতার এক অংশ; নীচে—গরুর গাড়ীতে দূরদূরান্ত হইতে আগত কয়েকটী কৃষক পরিবার।

ধানের দাম

সভাপতি-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রতিনিধি সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের মর্ম্ম বিবৃত করেন। **ধানের দর** সম্পর্কে একটি জরুরী প্রস্তাবে বলা হয়, **ধানের দাম বাড়তি এলাকায় ৬৲ টাকা হইতে**

(৭ পৃষ্ঠা দেখুন

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৭,: বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস :১২: লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

জনযুদ্ধ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র
৩য় বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা] ২৯শে মার্চ্চ, '৪৫, বৃহস্পতিবার. ১৫ই চৈত্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

কাপড় রেশনিং ব্যর্থ করিতে ব্যবসায়ীদের হরতাল

হিন্দুসভা কর্ত্তৃক এই ষড়যন্ত্র সমর্থন

রেশনিং সফল করিতে দেশভক্তদের প্রতিনিধিমূলক বোর্ড চাই

কণ্ট্রোল দরে কাপড় পাওয়া যায় না কেন? শ্রীযুক্ত গোয়েঙ্কা, বিড়লা, খৈতান, জয়পুরিয়া, সাহা, দোসানি, সরকার প্রভৃতি শহরের "প্রধান প্রধান" নাগরিক গত শনিবার সমস্ত কাগজে এক প্রকাণ্ড বিবৃতি দিয়া ইহার কারণ জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ১লা মার্চ্চ হইতে নূতন আমদানী সমস্ত কাপড় "গবর্ণমেণ্ট ফ্রীজ (বন্ধ) করিয়া রাখিয়াছে, সেজন্যই এই প্রদেশের লোকেরা কণ্ট্রোল দরের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।"

ইঁহারা সকলেই শহরের "প্রধান" নাগরিক কি করিয়া হইলেন তাহা বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ইঁহাদের প্রত্যেকেই বড় ব্যবসায়ী, অনেকেই কাপড়ের বাজারের মহারথী এবং কেহ কেহ বঙ্গীয় বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের হোমরাচোমরা সভ্য—অর্থাৎ কাপড়ের ব্যবসায় এবং নিয়ন্ত্রণ প্রায় ইঁহাদের হাতের মুঠার মধ্যে। ইঁহাদের বিবৃতির অর্থ হইল—বস্ত্র ব্যবসায়ীদের হাতে কাপড় আছে এ কথা কেহ ভুলেও ভাবিও না, ব্যবসায়ীরা চোরাকারবার করে ইহাও ভাবিও না, সমস্ত দুর্দ্দশার মূল গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোল ও ফ্রীজিং অর্ডার, সুতরাং গবর্ণমেণ্টকেই চাপিয়া ধর!

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ব্যবসায়ীদের এই সাধু বিবৃতির কালি শুকাইতে না শুকাইতেই পরদিন হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল। রবিবার সকাল হইতে রাত পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রায় তিন হাজার বস্ত্রালয়ে হানা দিয়া পুলিশ দোকানের মাল আটক করিল। পুলিশ এখনও প্রাপ্ত কাপড়ের পুরা হিসাব জানায় নাই, শুধু বলিয়াছে যে "প্রত্যেক দোকান বা গুদামেই কমপক্ষে পাঁচ হইতে বেশী পক্ষে তিন হাজার গাঁট পর্য্যন্ত কাপড় পাওয়া গিয়াছে।" এই হিসাবে তিন হাজার বস্ত্রালয়ে মোট কাপড়ের পরিমাণ কমপক্ষে ১৫ হাজার গাঁট হইবে, বেশী পক্ষে ৯০ লক্ষ গাঁটও হইতে পারে। ন্যূনতম সংখ্যাকে কিছুটা বাড়াইয়া ধরিলাম না হয় মাত্র ৫০ হাজার গাঁটই পাওয়া গিয়াছে। গত জানুয়ারী পর্য্যন্ত পাঁচ মাস বাংলা দেশ যে হারে কাপড় পাইতেছিল তাহাতে এই পঞ্চাশ হাজার গাঁট বাংলা দেশে প্রায় দুই মাসের আমদানী। ইহাতে প্রায় দেড় কোটী লোক একখান করিয়া ধুতি পাইতে পারে। দেখা গেল অনুমান দেড় কোটী বাঙ্গালীর কাপড় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ঘরেই জমা ছিল—এবং তাঁহারাই এতদিন কণ্ট্রোল দরে উহা বিক্রয় করেন নাই, বোধ হয় চোরাবাজারে ছাড়িতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিবৃতিদানকারী "প্রধান" নাগরিক-ব্যবসায়ীরা যে ঠিক কথা বলেন নাই তাহা বোঝা শক্ত নয়।

গোপন গুদাম, বাড়ীর সিঁড়ি, বারান্দা প্রভৃতি স্থান হইতেই প্রায় এক হাজার গাঁট কাপড় পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে আবার তিন লক্ষ টাকার মাল একেবারে "বেওয়ারিশ"—উহার চোরা-মালিকেরা মালিকানা পর্য্যন্ত কবুল করিতে সাহস পান নাই।

থানাতল্লাসীর ফাঁক

মাল আটকাইবার এই অভিযানের মালিক আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রীমণ্ডলী। তাঁহাদের ব্যবস্থার মধ্যে চোরাকারবারীর জন্য ফাঁকের অভাব ছিল না। বাছিয়া বাছিয়া রবিবারই থানাতল্লাসী করা হইল, যেদিন বহু দোকান বন্ধ থাকে। বন্ধ দোকান খুলিয়া কাপড়ের হিসাব লওয়া হয় নাই, শুধু বাহির হইতে দরজায় শীল লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ঘুষখোর আমলা ইচ্ছা করিলে হিসাবের আগে কারবারীকে মাল সরাইয়া লইবার সুযোগ দিতে পারে। আর বড় বড় কোটা-হোল্ডার, যাঁগদের বহু জায়গায় বহু মাল লুকানো আছে তাঁহাদের অনেকেই তল্লাসী হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন কারণ তাঁহাদের দোকান নাই। বড়বাজার, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো ও হেয়ার ষ্ট্রীট—মাত্র এই চারটী থানার এলাকায় অনুসন্ধান হইয়াছে, কলিকাতার অন্য অংশ, শহরতলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানের বাকী কারবারীরা এখন বিপদ বুঝিয়া কাপড় লুকাইয়া ফেলিতে পারিবে।

কিন্তু এত ত্রুটী ও ছিদ্র সত্ত্বেও থানাতল্লাসীর ভিতর দিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে এই বিরাট পরিমাণ বস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। তাহা হইতেই বোঝা যায় যে যত কাপড় বাংলায় আসিতেছে তাহা যদি চোরাকারবারী ও ঘুষখোর আমলাদের কারসাজি হইতে বাঁচাইয়া রেশনপ্রথায় সকলের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দেওয়া যায় তবে বস্ত্রের দুঃখ অনেকখানি ঘুচিতে পারে।

পুলিশের উপর চোরের রাগ!

গত এক মাস ধরিয়া কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ "বস্ত্র-আন্দোলন কমিটির" উদ্যোগে যে

ডাঃ আবদুল মালেক
(বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নীতির প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করেন)

বিরাট আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহার ফলেই গবর্ণমেণ্ট আজ এতদূর অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে। সে জন্যই বড়বাজারের গলিতে গলিতে চোরা-কারবারীরা প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া বস্ত্র আন্দোলন কমিটি ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে শাপান্ত করিতেছে, দেশভক্ত সাজিয়া বলিতেছে যে, আন্দোলনকারীরা পুলিশের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে! কিন্তু চোরকে পুলিশে ধরাইয়া দেওয়াই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় তাহা সাধারণ মানুষমাত্রেই বোঝে, চোরাকারবারীদের গলাবাজি উহাকে উল্টা বুঝাইতে পারিবে না।

বস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট নরনারী হাজারে হাজারে মিলিত হইয়া দাবী তুলিয়াছিল—মজুত কাপড় খুঁজিয়া বাহির কর, সকলের জন্য কাপড় রেশনিংয়ের ব্যবস্থা কর, অপদার্থ বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে দূর করিয়া দাও। জনসাধারণের প্রথম দাবী খানিকটা পূরণ হইয়াছে। রেশনিংয়ের দাবীও গত সপ্তাহের মধ্যে অনেকখানি জোর বাঁধিয়াছে।

কণ্ট্রোল-বোর্ড সভার গুপ্তরহস্য

কাপড় বাজারের রাঘববোয়ালেরা এবং আমলা-তন্ত্রের হোমরাচোমরারাই হইলেন সরকারী বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ২৬ জন সভ্যের মধ্যে ১৭ জন—অর্থাৎ মেজরিটি। ইঁহারাই এতদিন রেশনিংয়ের বিরোধিতা করিতেছিলেন, কাপড় নাই ইত্যাদি অজুহাত দিতেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের লীগ পক্ষীয় সাধারণ সভ্যেরাও যোগ দেন। 'বস্ত্র-আন্দোলন কমিটি'র রেশনিংয়ের প্রস্তাব লীগ এম-এল-এ জসিমুদ্দীন আহম্মদ সাহেব স্বয়ং গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভায় উপস্থিত করেন।

সেদিন ষোল জন সভ্য হাজির ছিলেন। মিল মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে রেশনিং প্রস্তাবে এমন ভয়ানক আপত্তি উঠে যে প্রস্তাব পাশ হইবে না ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া লীগ পক্ষীয় সভ্য ডাঃ আবদুল মালেক সভা ত্যাগ করেন—রেশন-বিরোধী সভার প্রস্তাবে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেও রাজী ছিলেন না।

কিন্তু আন্দোলনের ফলে নিয়ন্ত্রণ-বোর্ডের কায়েমী স্বার্থও কতখানি টলমল হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। জসিমুদ্দীন সাহেবের রেশনিং প্রস্তাবের পক্ষে ৮ ভোট হয়, বিপক্ষেও ৮ ভোট হয়—সভাপতি রেশনিংয়ের পক্ষেই কাষ্টিং ভোট দেওয়ায় জনসাধারণের দাবী সভায় গৃহীত হয়। যাঁহারা কাপড় রেশনিংয়ের বিরোধিতা করিয়া চিরস্থায়ী চোরাবাজারেরই সাহায্য করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই কাপড়ের বড় বড় মালিক—সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন নয়। জনসাধারণ যাহাতে ইঁহাদের চিনিয়া রাখিতে পারেন সেজন্য আমরা সেই ঘরোয়া বৈঠকের খবরও সংগ্রহ করিয়া দিলাম। রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন:—

রেশনিং বিরোধীদের চিনুন

১। বি, কে, বিড়লা—কেশোরাম কাপড় কলের অন্যতম মালিক।

২। ভোজনগরওয়াল—১৮টী সূতাকলের এজেণ্ট!

৩। এচ, কে, ঝাঝারিয়া—বৃহত্তম সূতা ব্যবসায়ী।

৪। এস, সি, নান—বাঙ্গালী বস্ত্রব্যবসায়ীদের শিরোমণি।

৫। এম, আর, জয়পুরিয়া—কাপড় বাজারের ইস্পাহানি। পূর্ব্ববর্ণিত "প্রধান প্রধান" বিবৃতিকারী নাগরিকদের ইনি অন্যতম।

৬। মোহনলাল সাহা—মোহিনী মিলের অন্যতম কর্ত্তা। ইনিও বিবৃতি দিয়াছিলেন।

৭। এ, এস, ব্রাউন—হল এণ্ড এণ্ডারসনের প্রতিনিধি।

৮। গার্ডনার—কেট্লওয়েল কোম্পানীর প্রতিনিধি।

ইহা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে জনসাধারণের দাবীর বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়ান ও দেশী ব্যবসায়ী উভয়েই এক হইয়া একসঙ্গে ভোট দিয়াছে। সাধারণের প্রতিনিধি উঁহাদের মধ্যে একজনও নাই। আর রেশনিংয়ের দাবী সমর্থন করেন— জসিমুদ্দীন আহ্মদ, হামিদুল হক চৌধুরী, নুরুদ্দীন প্রভৃতি লীগ সভ্য, কংগ্রেসের সুকুমার দত্ত, সংবাদপত্র জগতের বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

একদিকে অপদার্থ ও ঘুষখোর আমলার দল, অন্যদিকে কণ্ট্রোল বোর্ড ও ব্যবসায়ী মহলের প্রভাব—এই দুই চাপে পড়িয়া লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও এতদিন জনসাধারণের দাবীতে কর্ণপাত করে নাই।

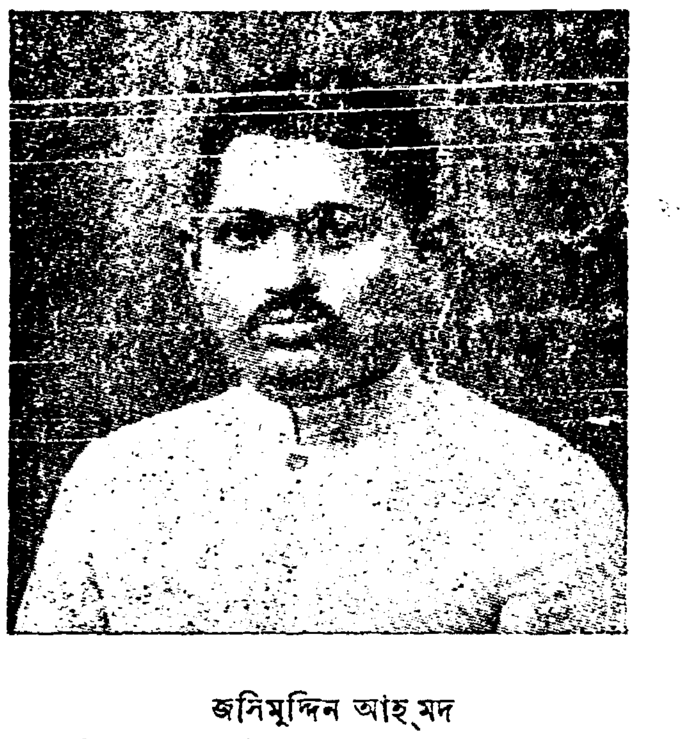

জসিমুদ্দিন আহ্মদ
(কণ্ট্রোল বোর্ডে ইনিই রেশনিংয়ের জন্য লড়েন)

কিন্তু জনসাধারণের বিপুল আন্দোলন যখন কণ্ট্রোল বোর্ডকে পর্য্যন্ত টলাইয়া দিয়া সেখান হইতেই রেশনিংয়ের দাবী পাশ করাইয়া লইল তখন আর লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে চুপ করিয়া থাকার উপায় রহিল না। গত ২১শে মার্চ সিভিল সাপ্লাই বিভাগের মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেব ঘোষণা করিলেন যে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বাংলা দেশে কাপড়ের রেশনিং চালু করা হইবে। তাহার দুই দিন পরে কলিকাতা হইতে মাল সরানো নিষিদ্ধ হইল, চার দিন পরে মজুত মাল খুঁজিবার অভিযানও আরম্ভ হইল। ফলে দেখা গেল, রেশনিং বা মাথা পিছু বরাদ্দ করার কাজ আরম্ভ করিবার মত কাপড় আছে—ঠিক ভাবে বণ্টিত হইলে সকলে কষ্টে সৃষ্টে চালাইয়া লইতে পারে। ১০৲ জোড়ার যে সেনগুপ্ত ধুতি কয়েকদিন আগেও চোরাবাজারে ২৫৲—৩০৲ জোড়ার কমে পাওয়া যাইত না—থানাতল্লাসীর পর তাহাই মাত্র কণ্ট্রোল দামে গোপনে বিক্রয় করিবার জন্য কারবারীরা হন্যে হইয়া ফিরিতেছে।

চোরাকারবারের মরণ কামড়

কিন্তু জনসাধারণ যদি ভাবিয়া থাকেন যে এইবার রেশনিংয়ের মত অন্ততঃ খানিকটা কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই, সুতরাং আন্দোলনে ঢিলা দেওয়া যাক—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এতদিন কাপড় নাই বলিয়া ও গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নির্ব্বিবাদে চোরাকারবার চালাইতেছিল। এখন থানা-তল্লাসীর পর তাহাদের এত মাল আছে তাহা যখন লোকে জানিতে পারিল, অথচ গবর্ণমেণ্ট শীল করিয়া দেওয়ায় চোরাকারবারের সুবিধা কমিয়া গেল—তখন ব্যবসায়ীরাও একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কত অর্থ কত প্রতিপত্তি,

[৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]

দুধের দুর্ভিক্ষ

কিছুদিন আগে বাংলা সরকার দুধ সরবরাহের সুবিধার জন্য মিঠাই তৈরী বন্ধ করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও এ বিষয়ে তাঁহাদের মত জানাইয়াছিলেন। মিঠাই তৈরী নিষেধ করিলে যে দুধ বাঁচিবে তাহা যদি বে-সামরিক জনসাধারণের জন্য বিতরণের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন মিঠাই তৈরী বন্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার পরে এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। বাংলা সরকার কিংবা কলিকাতা কর্পোরেশন কাহারও এখন দুধ সম্পর্কে কোন উদ্বেগ নাই। কলিকাতা সম্পর্কেই এই নিস্তব্ধতা, মফঃস্বল জেলার ত কথাই উঠে না।

কলিকাতায় দুধের দর টাকায় দেড় সের। মফঃস্বলের অধিকাংশ জায়গায় দুধের দর টাকায় দুই সের, অনেক জায়গায় দুধের সের দশ আনা হইতে বার আনা। কলিকাতার কোন এক পাড়ায় কয়েক ঘর অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ৮টি বাড়ীতে মোট ৯টি শিশুর জন্য কোন দুধের বন্দোবস্ত নাই। আরও কয়েকটি বাড়ীতে শিশুর জন্য মাথা পিছু মাত্র এক পোয়া দুধের ব্যবস্থা আছে। ব্যাপক ভাবে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে দুধের অভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য ও জীবন কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছে। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে যাহাদের আয় ১০০ টাকার কম তাহারা তাহাদের শিশু সন্তানদের দুধ খাওয়াইতে পারে না। শিশুদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন—এদেশে অপরিপুষ্ট শিশুদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, এবং এই অপরিপুষ্টতার প্রধান কারণ দুধের অভাব। দুধের অভাবে শিশুদের এরূপ জীবনীশক্তির ক্ষয় ইউরোপের কোন দেশে বর্ত্তমান যুগে দেখা যায় না, এরূপ অবস্থা সেসব দেশে ছিল স্মরণাতীত প্রাচীন কালে। ডাঃ চৌধুরীর এই উক্তি সম্পর্কে বাংলা গভর্ণমেন্টের কি বলিবার আছে?

বাংলা সরকারেরই খবর যে কলিকাতায় প্রতিদিন ৭০০০ মণ দুধ আসে, তাহার ভেতর ৪০০০ মণ দুধ দিয়া মিঠাইর জন্য ছানা তৈরী হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন যে কলিকাতায় প্রতিদিন ৭০০০ মণ দুধের মিঠাই মণ্ডা তৈরী হয়। অথচ এদিকে কলিকাতায় ১,৬২,০০০ শিশু দুধের অভাবে শীর্ণ হইতেছে। শিশু এবং রোগীকে বঞ্চিত করিয়া বিলাস-ব্যসনে দুধ ব্যয় হইতেছে অথচ তাহা বন্ধ করিবার জন্য সরকার কিংবা কলিকাতা কর্পোরেশন কাহারও কোন চেষ্টা নাই। মনুষ্যত্বের প্রতি কতখানি বিমুখ হইলে এই নিশ্চেষ্টতা সম্ভব? আমরা জানিতে পারিলাম যে কলিকাতায় কয়েকটি কারখানা চায়ের বাক্সের জন্য কাঠ তৈরীর (প্লাইউড্) কাজে প্রচুর কেসিন ব্যয় করিয়া থাকে। উক্ত কেসিন দুধ হইতেই প্রস্তুত হয়। শিশু এবং রোগীদের প্রয়োজনীয় দুধ অন্য কাজে অপব্যয় করা যে দেশে বন্ধ হয় না সে দেশে কি সভ্যতা লোপ পায় নাই? দুধ সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীর নীরবতা একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশু এবং রোগীদের ভুখ মিছিল করিয়া সরকারী দরবারে হাজির হইবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই কি এই নিস্তব্ধতা সম্ভব হইয়াছে?

কিছুদিন আগে বঙ্গীয় সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল যে কলিকাতা সহরে শুধু যদি মিঠাই মণ্ডা তৈরী করা বন্ধ হয় তাহা হইলেই কলিকাতায় দুধের সরবরাহ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে। এ ব্যবস্থা এখনও অবলম্বন করা হয় না কেন? কাপড়ের মত দুধের ব্যবসায়েও বড় বড় পাইকারদের স্বার্থ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে কি? শুধু মিঠাই তৈরী বন্ধ করিলেই চলিবে না, দুধ যাহাতে সমানভাবে শিশু ও রোগীর জন্য বণ্টন করা হয় তাহার ব্যবস্থা চাই; চায়ের জন্য গরম দুধ ব্যবহার না করিয়া পাউডার মিল্ক বা কনডেন্সড্ মিল্ক ব্যবহার করিলে চলে, বম্বে সহরে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু ভারতের অদ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতাতে তাহা হয় নাই; বাংলার প্রধান মন্ত্রী এবং কলিকাতার মেয়র এজন্য জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।

সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে নিখিল ভারত নারীসঙ্ঘের কলিকাতার শাখা দুধের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘ দুধ সম্পর্কে তিনটি দাবী করিয়াছিলেন—(১) সমস্ত দুধ রেশনিং করিয়া বিতরণ করা হউক, (২) ৫ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু, প্রসূতি এবং রোগী যাহাতে দুধ পায় সে ব্যবস্থা সকলের আগে করা হউক, (৩) যাহাদের আয় কম তাহাদের জন্য কম দরে দুধ বিক্রীর ব্যবস্থা হউক। এই দাবী লইয়া কলিকাতায় কয়েকদিন ধরিয়া জনসভায় প্রচার এবং আন্দোলন চলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর দেশের কোন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে আর কোন আন্দোলন করে নাই। সরকার ত দূরের কথা, দেশের জাতীয়তাবাদী নেতারাও এ বিষয়ে নীরব আছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন এবার হাটগোবিন্দপুর অধিবেশনে দাবী করিয়াছে—অন্য প্রদেশ হইতে দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হউক এবং যতদিন দুধের সরবরাহ প্রচুর না হয়, ততদিন শিশু ও রোগীর পথ্য ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে দুধ ব্যবহার বন্ধ করা হউক। এই দাবী আদায় করিবার জন্য সারা দেশের জনশক্তি সমবেত করিতে হইবে, দেশে এমন কে আছে যে শিশুর জীবনের জন্য আন্দোলনে নামিতে চাহিবে না?

বাংলার দুধের সমস্যা কেবলমাত্র আজ দেখা দেয় নাই। সারা বাংলায় বৎসরে মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ মণ দুধ উৎপন্ন হয় (শিল্প তদন্ত কমিটির রিপোর্ট), ইহা হইল সারা ভারতের উৎপন্ন দুধের শতকরা ৫·৬ ভাগ। এই দুধে প্রতি জনের ভাগে প্রতি দিন গড়ে ২·৯ আউন্স দুধ পড়ে। সারা ভারতের গড় পড়তা দুধের হিসাব হইল মাথা পিছু ৬·৬ আউন্স। সারা ভারতের তুলনায় বাংলার দুধ জোটে অনেক কম। দুধ অথবা ঘি অন্যান্য প্রদেশে সর্ব্বসাধারণের দৈনিক খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু খুব কম বাঙ্গালীই দুধ ঘি চোখে দেখে। বছরে পৌনে চার কোটি মণ দুধ এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য দৈনিক দেড় পোয়া করিয়া দুধের ব্যবস্থা করিতে হইলেও বৎসরে ২০ কোটি ৬৪ লক্ষ মণের বেশী দুধ লাগে। বাংলায় গরুর প্রাচুর্য্য না হইলে দুধের এই অভাব দূর হইবে না।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে গরু আমদানী করিতে হইবে। ভারতের কোন কোন প্রদেশ হইতে গরু রপ্তানি নিষিদ্ধ আছে, সুতরাং বাংলা গবর্ণমেণ্টকেই অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া গরুর আমদানী করিতে হইবে। যানবাহনের অভাব গরু আমদানীর পথে একটি প্রচণ্ড বাধা। কেন্দ্রীয় সরকারকে যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গরু কেবল আমদানী করিলেই হইবে না, গরু যাহাতে বাঁচে এবং দুধ দেয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য চাই গো-হত্যা নিয়ন্ত্রণ, গো-পালনের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন গো-চিকিৎসক।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার 'জনযুদ্ধে'র ৭ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে 'বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন' প্রবন্ধে ধানের দাম সম্পর্কে প্রস্তাবে নিম্নলিখিত দাবীগুলি ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়া গিয়াছেঃ

'গবর্ণমেণ্ট ধানের উচ্চতম দাম ৫৷৵৹ আনা হইতে ৬৷৵৹ মণ দরে বাঁধিয়া দেওয়ায় সরকারী এজেণ্টরা নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের বেচিতে বাধ্য করিতেছে। কাজেই অবিলম্বে উপরোক্ত ৫৷৵৹ আনা হইতে ৬৷৵৹ ন্যূনতম দর হিসাবে সরকারকে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই দরের কম মূল্যে যাহারা কৃষকদের নিকট হইতে কিনিবে তাহাদের শাস্তি দিতে হইবে। এই প্রস্তাবে কৃষকদের কাছে আবেদন জানাইয়া বলা হয় যে, বেশী মূল্য দিলেও যাহাতে কোন কৃষক কোন চোরাকারবারীর কাছে ধানচাল বিক্রি না করে।'

● ঘটনা ও রটনা ●

রতনে রতন চেনে

কলকাতায় চিনির রেশন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের মানুষ চিনি তো দূরের কথা গুড়ও পায় না। অতিথিকে মিষ্টিমুখ করানোর রেওয়াজ প্রায় উঠে গেল—গুড় চিনির অভাবে মানুষের জীবনই মিষ্টতাবর্জ্জিত হয়ে উঠেছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী লালা করমচাঁদ থাপরের মত কোটীপতি চিনি সম্রাট, যারা সাধারণ লোকের গুড় ও চিনি কেড়ে নিয়ে চোরাবাজারে চালান করছে। গতবারে আমি খবর দিয়েছিলাম গুড়ের চোরাকারবার করার জন্যে থাপর সাহেবের দেড়লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আট মাস জেলের হুকুম হয়েছে। আমি আরও মন্তব্য করেছিলাম যে এত লঘুদণ্ড দেখে মনে হয় কোটিপতি চোরের প্রতি সরকারের দয়া মায়া আছে।

তারপর দেশের প্রতিষ্ঠাবান ও "সাধু" ব্যবসায়ী মহলের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেখানে এই কোটীপতি চোরের প্রতি শুধু দয়ামায়াই নয়, যথেষ্ট শ্রদ্ধাও আছে! থাপরের শাস্তির খবর সব কাগজে এবং বাজারে রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর গত ২৩শে মার্চ্চ শ্রীবি-এম-বিড়লার সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান এই চেম্বার অফ কমার্স—সেই চেম্বারের বণিক শিরোমণিরা যাঁদের নতুন বৎসরের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করেছেন তার মধ্যে লালা করমচাঁদ থাপর অন্যতম। গজনবি, জালান, বিড়লা, জয়পুরিয়া, ক্ষিতীশ নিয়োগী খৈতান, মেটা প্রভৃতি দিগ্গজ ব্যবসায়ীদের নামের মধ্যে থাপরের নামও জ্বলজ্বল করছে।

আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মহলে চোরাকারবার এমন স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে যে শাস্তিপ্রাপ্ত চোরকেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। সারা দেশময় চোরাবাজারের হাতে মানুষের যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা তা তাঁদের মুখ থেকে তীব্র প্রতিবাদ বা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ডেকে আনেনা, বরং চোরাকারবারীই তাঁদের কাছে সম্মান পায়!

●

য়াল্টা ও ড্রু পিয়ারসন

ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কাছে মিঃ ফিলিপস্ যে গুপ্ত রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্যে মার্কিন সাংবাদিক ড্রু পিয়ারসন এদেশে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সরকারী গুপ্ত খবর বার করে আনায় তিনি যথেষ্ট ওস্তাদি দেখিয়েছেন। সম্প্রতি ড্রু পিয়ারসন জানিয়েছেন যে বৃটিশ অর্থের সাহায্যেই গ্রীসে গৃহ বিবাদ উস্কানো হয়েছিল—এসম্বন্ধে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন। এ খবর আমাদের দেশের সব কাগজে বেরিয়েছে।

য়াল্টায় ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে পোলিশ সমস্যা আলোচনা বিষয়েও সম্প্রতি "ওয়াশিংটন মিরর" কাগজে ড্রু পিয়ারসন একটি খবর দিয়েছেন, তা ভারতের অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি। খবরের সংক্ষিপ্ত সারটুকু আমি নীচে দিচ্ছি [ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মুখ থেকেই তিনি এই বিবরণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন]:—

"বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ষ্টালিনের সরলতা ও সোজাসুজি কথা বলার ধরণে মুগ্ধ হন।... রুশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সীমানা কার্জ্জন লাইন বরাবরই টানা উচিত এই ছিল তাঁর যুক্তি। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে (রুশ ও পোল) ৩টি জাতির মধ্যে এই লাইনই যে সব চেয়ে ভাল সীমানা তা আমেরিকান ভূগোল-বিশারদেরাই কার্জ্জনকে এঁকে দেখিয়েছিলেন।......

"জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রাচীররূপে শক্তিশালী ও বন্ধুভাবাপন্ন পোল্যাণ্ডই যে রুশিয়ানরা চায় তা আবার জানিয়ে দিয়ে ষ্টালিন বল্লেন:

"কে বলে জার্ম্মানরা আবার পোলিশ করিডর অতিক্রম করবে না? ২৫ বছরের মধ্যে দু দুবার তারা রুশিয়া আক্রমণ করল। মিঃ চার্চ্চিল, আমাদের দেশ আক্রান্ত হলে কি আপনার সৈন্যদল এসে আমাদের রক্ষা করবে?

"লুবলিন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করে ষ্টালিন বল্লেন:

"যে-গবর্ণমেণ্ট ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে অবস্থান করল তাকেই আমাদের মেহেরবাণী দেখাতে হবে? না যে-গবর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডে থেকে গুপ্তভাবে লড়াই চালাল তাকে আমরা স্বীকার করব? মিঃ চার্চ্চিল, আপনার সৈন্যদল কি পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করেছে? মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আপনার সৈন্যদল কি পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করেছে?...

"প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল ভেবেছিলেন যে পোল্যাণ্ডে গুপ্ত ব্যালট সহ নির্ব্বাচনে হয়তো ষ্টালিন রাজী হবেন না। কিন্তু তাতে ষ্টালিন রাজী—তিনি শুধু সর্ত্ত রাখলেন, যে সমস্ত পোলিশ সৈন্য এখন দেশের বাইরে যুদ্ধ চালাতে ব্যস্ত, তাদের ভোট দিতে ফিরে আসার মত সময় দিতে হবে।"

ড্রু পিয়ারসনের খবর কতখানি সত্যি তা আমি জানিনে। তবে ষ্টালিনের যুক্তিটা যদি পিয়ারসনের নিজের যুক্তিও হয়—তবুও সে যুক্তি সোভিয়েটের ন্যায়নীতিকেই সমর্থন করে।

●

অঙ্গারঃ শতধৌতেন...

গত বারে আমি আনন্দবাজারের কেসি-প্রীতি ও মহিলা যুদ্ধ-কমিটির পক্ষে বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপনের কথা জানিয়েছিলাম। তা বলে আপনারা ভাববেন না যে দেশগৌরবের কথা আনন্দবাজার একেবারে ভুলতে পেরেছে।

ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের "ভারতের মর্ম্মবাণী" ও লোকনৃত্য প্রদর্শনী সম্বন্ধে গত ১৮ই মার্চ্চ রবিবারের আনন্দবাজারে প্রায় আধপৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট সমালোচনা বেরিয়েছে—জনৈক ভদ্রলোকের নামে। তার মধ্যে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে ভদ্রলোক শুধু একটি কথাই প্রকাশ করেছেন যে, ঐ নাচগানগুলি দেখে ও শুনে তাঁর মনে নাকি শুধু আদিরসেরই সঞ্চার হয়েছে। কথায় বলে—"ইল্লৎ, যায় না মলে", অর্থাৎ যার যা স্বভাব তা সহজে বদলায় না। সুতরাং ঐ জাতীয়তার প্রেরণার মধ্যেও ভদ্রলোকটি যদি ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার খোরাক খুঁজে খুঁজে বার করে থাকেন তো তাঁকে দোষ দিয়ে কি হবে?

ভেবেছিলাম সমালোচনায় এইটাই শেষ কথা—কিন্তু হঠাৎ দেখলাম শেষ দিকে আনন্দবাজারীয় "রাজনীতিও" (অর্থাৎ সুবোধ ঘোষ, সজনী দাস মার্কা "বাতিল-কংগ্রেস সাহিত্যসঙ্ঘ" সুলভ প্রেরণাও) আছে। ভদ্রলোক লিখেছেন যে, ঐ প্রদর্শনীতে "দুর্ভিক্ষের কথায় পূর্ব্ববঙ্গের চাষী অন্যান্য দুঃখের কারণের সঙ্গে জাপানী বোমার উৎপাতের কথাটাও গানে গাইছে। এই সব অবান্তর কথা না থাকলেও হোতো, কোনো প্রয়োজন ছিল না।"

বটেই তো! সে বোমা স্বয়ং বাতিল কংগ্রেসের দেশগৌরব পাঠিয়েছেন, তার আবার নিন্দা!

কিন্তু আনন্দবাজার বড় দোটানায় পড়েছে। একদিকে মিঃ ও মিসেস কেসির বিজ্ঞাপন আর একদিকে দেশগৌরবের জাপানী বোমা—কাকে রেখে কাকে ধরি!

—দেশাভিমানী

এফ-আর-এস প্রাপ্ত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহলানবীশ

দেশের পুনর্গঠন সমস্যায় রাশিবিজ্ঞানের স্থান

★ ★ [জনযুদ্ধের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা] ★ ★

অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এ বৎসর ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছাড়া এই প্রসিদ্ধ সংগঠনের ফেলো কেউ নির্ব্বাচিত হন না। অধ্যাপক মহলানবীশের পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ মেঘনাদ সাহা শুধু এই দুইজন বাঙালী এই সম্মানলাভ করেছেন। রাশি-বিজ্ঞানের (ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের) গবেষণা ও প্রয়োগের জন্য অধ্যাপক মহলানবীশের এই বিশিষ্ট সম্মানলাভে আমরা আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করি। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসাবে অধ্যাপক মহলানবীশ সকলের কাছে সুপরিচিত। এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে বহু একনিষ্ঠ ও অক্লান্তকর্ম্মী ছাত্র ও সহকর্ম্মীদের সহায়তায় তিনি রাশিতত্ত্বের যে গবেষণা ও প্রয়োগ এতদিন করে এসেছেন তাহা সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়েছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে অধ্যাপক মহলানবিশের বাসভবনে ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল ল্যাবোরেটরী

বিজ্ঞানের লক্ষ্য — মানবের কল্যাণ

"জনযুদ্ধে"র পক্ষ থেকে আমি তাঁকে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হয়েছেন শুনে আপনার প্রথমেই কী মনে হলো?" তিনি হেসে বললেন, "রাশিতত্ত্বের কাজে এবার সুবিধা হবে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক-মহলে রাশিতত্ত্ব এবার জাতে উঠতে পারবে। এর প্রয়োজনীয়তা সকলে এখন বুঝতে পারবে।" আমি বললাম, "সাধারণের কাছে রাশিতত্ত্ব অত্যন্ত শুকনো ও নীরস মনে হয়। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আপনি সাধারণের বোধগম্য করে বলুন। তিনি বল্লেন, "শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য মানবজাতির কল্যাণ। দেশর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জাতীয় সম্পদ এ সব বিষয়ে ঠিক খবর জানা না থাকলে সত্যি সত্যি দেশের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। আমার ও আমার সহকর্ম্মীদের আসল চেষ্টা যে, খাঁটি তথ্য কি করে সংগ্রহ করা যায় যার উপরে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা পাকা ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্ত জীবনে অনুসন্ধান

"পঁচিশ বছর আগে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলুম ঝড়বৃষ্টির আসল কলকাটি আবহ-মণ্ডলের কোন্ স্তরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তার কিছুদিন পরে ১৯২২ সালে যখন উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যা হয় তা নিয়ে রাশিতত্ত্বের সাহায্যে একটা রিপোর্ট লিখেছিলুম। তাতে কিছু কাজও হয়েছিল। আসল অভাব ছিল জল নিষ্কাশনের—রেল লাইনে পরে অনেকগুলি সাঁকো তৈরির ব্যবস্থা হয়। তারপরে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পীদের অবস্থা, বড়ো বড়ো চটের কল আর অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের খাওয়া-পরা, মধ্যবিত্ত পরিবারদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান এই রকম অনেক কাজ আমরা করেছি।

"কিছুদিন ধরে আমরা বাংলাদেশের পাট, ধান, চাল আর অন্যান্য শস্য কতো উৎপাদন হয় তা 'স্যাম্প্‌ল্ সার্ভে' (অংশ পদ্ধতি) দিয়ে নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। এ হচ্ছে সাত্যকারের ডাল-ভাতের হিসাব। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষে কতো বয়সের কতো লোক আছে তা আমাদের ল্যাবরেটরিতে এই উপায়ে স্থির করার চেষ্টা হচ্ছে।

সত্য নিরূপণের পদ্ধতি

"নমুনা যাচাই ক'রে হিসাব করার দুটো প্রধান সুবিধা। সময় লাগে কম আর খরচ হয় সামান্য। শতকরা এক বা দুই অংশ (ওয়ান অর টু পার্সেণ্ট স্যাম্প্‌ল্) যদি কোনো রকমে বাছাই না করে নেওয়া যায় তবে সমস্ত খবরই প্রায় ঠিকভাবে পাওয়া যায়। এছাড়া ২টা নমুনা আলাদা আলাদা করে নেওয়া যায়—তাতে দুবার দুটো সম্পূর্ণ আলাদা হিসাব পাওয়া যায়। আর এই দুই হিসাবে কেমন মিল আছে দেখলেই খবর কতোটা ঠিকভাবে পাওয়া গেল তা বোঝা যায়। সম্পূর্ণ গুণতিতে কোনো ভুল হলে ধরবার জো নেই; তাছাড়া খরচ আর সময় লাগে দশ, বিশ, বা পঞ্চাশ গুণ। তাই শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নোতুন স্যাম্প্‌ল্ সার্ভে বা আংশিক নমুনা দিয়ে তথ্য নির্ণয় করার ব্যবস্থা ক্রমেই বেশী প্রয়োগ হচ্ছে।"

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাতিগত তুলনা

গাণিতিক রাশিতত্ত্বে তাঁর 'ডি-স্কোয়ার' পদ্ধতিটী কি জানতে চাইলে তিনি সহজ ভাষায় বোঝালেন যে এই পদ্ধতিটীর সাহায্যে বিভিন্ন জাতি উপজাতি, গোষ্ঠি, ইত্যাদির মধ্যে শারীরিক (ও ইচ্ছা করলে, মানসিক) বৃত্তির সমষ্টিগত পার্থক্য সত্যিই যদি থাকে তো এই পার্থক্য কতোখানি তা মাপা যায়। বাংলাদেশে আছে কিনা তা বোঝা যায়: ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ঐকান্তিক প্রভেদ পাওয়া যায় নি। উঁচু বা নীচু জাতের মধ্যে আকৃতিগত তফাৎ আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিদের মধ্যে মিলও আছে প্রচুর। যে কোনো বৃত্তিই ধরা যাক্ না কেন, যাদের নীচু জাত বলা হয়, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের এই বৃত্তিতে উঁচু জাতের অনেক লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যাহোক অধ্যাপক মহলানবীশের প্রণালীতে জাতিগত তুলনা এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হতে পারবে। শুধু মুখের কথা বা মনের ধারণা দিয়ে অমুক জাত শ্রেষ্ঠ বা অমুক জাত নিকৃষ্ট তা বলা চলবে না।

বাংলার পুনর্গঠন ও যুদ্ধোত্তর ভারতের উন্নতি

বিদায় নেবার আগে প্রশ্ন করলাম, "বর্ত্তমান ও যুদ্ধোত্তর ভারতে রাশিবিজ্ঞানের কাজ কি রকম হবে আপনি মনে করেন?" তিনি বললেন, "দেশের অবস্থা যে কোনো দিক দিয়ে উন্নতি করতে হলেই রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। ১৯৪৩ সালের অন্ন-সংকটে বাংলা দেশে কতো লোক মরেছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কী রকম ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে আমরা এখন অনুসন্ধান করছি। আমরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করছি তার উপরেই পুনর্গঠনের পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে।

"যুদ্ধের পরে দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি করতে হলে পরিষ্কার জানা দরকার যে, কোন জিনিষের চাহিদা কতো হবে। শিক্ষার আয়োজন করতে হলে জানতে হবে যে, বিদ্যালয়ে পড়বার মতো ছেলেমেয়ের সংখ্যা কতো হবে পাঁচ বছর, দশ বছর বা বিশ বছর পরে। ৫ বা ১০ বা ২০ বছর পরে কতো পরিমাণ চাল, গম, ডাল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করতে হবে, কাপড়, জুতা, বাড়িঘর, আসবাবপত্রেরই বা কী চাহিদা হবে—এ সমস্তই নির্ণয় করতে হবে রাশি-বিজ্ঞানের সাহায্যে। ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র কতো লাগবে তাও স্থির করতে হবে। আর এই সব মোটামুটি ভাবে হিসাব করতে পারলে তবেই স্থির করা যাবে যে কতো কলকারখানা, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ক্রমে ক্রমে কতো দরকার হবে! দেশের উন্নতি যেমন হতে থাকবে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে রাশিতত্ত্বের হিসাব নির্ণয় করতে হবে। মোট কথা, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য গোড়া-ঘরের তথ্য সংগ্রহ আর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি তৈরী করায় সাহায্য করা—এই হচ্ছে রাশি-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা

"আমার সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য এই যে, আমি অনেক খুব উৎসাহী আর নিষ্ঠাবান ছাত্র ও কর্ম্মী পেয়েছি। রাশি গণিত, রাশি-তত্ত্ব বা তথ্য-সংগ্রহের কাজে এঁরা প্রত্যেকেই এক এক দিকে আমার চেয়ে দশগুণ দক্ষ। আমাদের ল্যাবরেটরীতে এখন রাশিবিজ্ঞানের এমন একটা কর্ম্মীমণ্ডলী গড়ে উঠেছে যা দিয়ে আমাদের দেশে ভবিষ্যতে অনেক কাজ হবে আশা করি।"

ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম, বাংলার এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তাঁর সহকর্ম্মী ও ছাত্রদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করছেন। তাঁদের সাধনার বৈজ্ঞানিক মূল্য আজ বিদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করলেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে আমরা এ দেশের কল্যাণে লাগাব কি করে—যেদেশে সরকারের হাতে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতি অতি সামান্য সাহায্যই পায়? তখনই আবার মনে হল—শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশবাসীর চেষ্টাই আজ শিক্ষাকে এতখানি অগ্রসর করেছে যাতে এদেশের বৈজ্ঞানিক বিদেশেও সম্মানের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারছেন। তেমনি ধারা দেশের ভগ্ন জীবন পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় সমস্ত দেশ যখন এগিয়ে আসবে—তখন এই বৈজ্ঞানিকদের সাধনাও দেশের শ্রেষ্ঠ কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

—ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

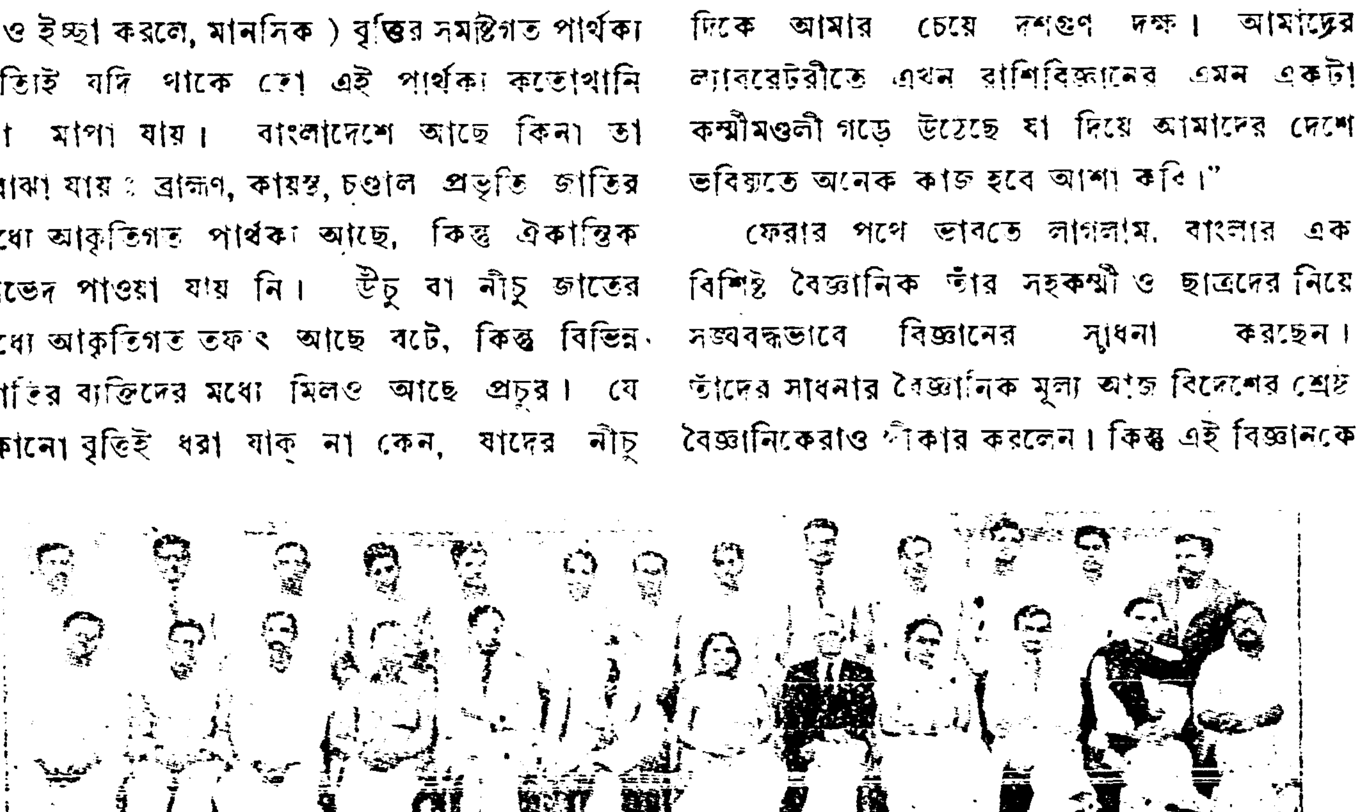

ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল ল্যাবোরেটারী প্রাঙ্গণে অধ্যাপক মহলানবিশের সহকর্ম্মীবৃন্দ

★

কলিকাতা
ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের বিজয় দিবস

৩১শে মার্চ্চ শনিবার, বেলা ৩টা, হাজরা পার্ক

গত ৬ মাস হইতে কলিকাতার ১০টী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকেরা তাহাদের দাবী দাওয়া বিচারের জন্য এ্যাড্‌জুডিকেশন কোর্ট বসাইবার দাবী লইয়া মিলিত ভাবে আন্দোলন করিতেছিল। সমস্ত মালিকেরা শ্রমিকদের এই দাবীকে ঠেকাইবার জন্য সরকারের উপর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চাপ দিতেছিল এবং তাহার ফলে ভারতীয়া, মায়া, ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস্ ও ষ্টীল প্রোডাক্টস কারখানা গুলির রায় ৪ মাস পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে! মালিকেরা শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করাইবার জন্যও অনেকস্থলে উস্কানী দেয়, কিন্তু শ্রমিকদের দেশপ্রেমিক নীতি ও মিলিত আন্দোলনের ফলে মালিকদের সমস্ত চালবাজী আজ ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রমিকেরা এই চারটী কারখানার রায় প্রকাশ করিতে সরকারকে বাধ্য করিয়াছে, এবং তাহাদের মাগগী ভাতা ৭৲।১০৲ টাকা হইতে ২০৷৷০ পর্য্যন্ত বাড়াইতে ও অনান্য দাবী দাওয়া আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহাদের মিলিত আন্দোলনের ফলে সে-সব কারখানাতে এতদিন কোর্ট বসে নাই (যেমন বাগারলরী, জ্যাস্ আলেকজেণ্ডার, এয়ার কণ্ডিসনিং কর্পোরেশন) সেখানেও কোর্ট বসাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লোহা কারখানা শ্রমিকদের এই জয় সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীরই জয়; এবং এই আন্দোলন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অনান্য শ্রমিকেরা যাহাতে তাহাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে পারে, তাহার জন্য **৩১শে মার্চ্চ (শনিবার) বেলা ৩টায় হাজরা পার্কে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ করা হইবে! আপনারা সকলে সভায় যোগদান করিয়া এই সমাবেশকে সাফল্য মণ্ডিত করুন।**

★

বিরাট বিরাট বাড়ী থাকিতে স্কুলকলেজ গবর্ণমেণ্ট দখল ক

শিক্ষার এমনই দুর্গতি যে স্কুলের ছেলে সৈন্যদের মেয়ে জোগায় ● ৯০ বছরের স্কুল

দুর্ভিক্ষ, অভাব ও রাজনীতিক ব্যর্থতাজনিত হতাশার ধাক্কায় বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কত দিক দিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহারই মাত্র কয়েকটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। অনেক শহরে অনেক বড় বড় কলেজ ও স্কুলবাড়ী সরকার যুদ্ধের নামে দখল করিয়া লইয়াছে। ("ভারত রক্ষা" বিধানের জন্য আমরা নাম দিতে পারিলাম না, পাঠকেরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে মিলাইয়া লইবেন।) অথচ খোঁজ করিলে দেখিবেন সেই সেই শহরেই বড়লোকের খালি বা প্রায় খালি বাড়ীর অভাব নাই। শিক্ষাকে বাঁচাইবার জন্য একটু কষ্ট করিয়া অন্য বাড়ীতে ব্যবস্থা করাও বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র দ্বারা ঘটিয়া উঠে না—দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দরদের ইহাই নমুনা।

কিন্তু এই আমলাতন্ত্রের বিমুখতা সত্ত্বেও দেশবাসীর দান ও সংগ্রামে দেশে শিক্ষার অধিকার ও ব্যবস্থা অর্জ্জিত হইয়াছে, ধনী দাতাদের আগ্রহ উহাকে অনেক সমৃদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে ধনীর ধন প্রচুর বাড়িয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও হতাশার ধাক্কায় আজ সেই দেশপ্রেমের আগ্রহ পর্য্যন্ত কতখানি মরিতে বসিয়াছে এবং দেশের তরুণ বংশধরদের মানসিক জীবনে তাহা কি ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে—দেশভক্তদিগকে সে কথা বুঝাইবার জন্যই আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ কয়টা তুলিয়া ধরিতেছি।

স্কুলের ছাত্র আজ সাহেবের "বয়"

এক বছরেরও বেশী হইল যশোহর শহরের একটী মাত্র কলেজ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যশোহরে ধনী লোকের সংখ্যা আগের তুলনায় বরং বেশী, কিন্তু অগ্নিদগ্ধ কলেজটীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মত সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কলেজের সেক্রেটারী শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী কিছুদিন আগেও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মাইকেলের জন্মভূমি "যশোহরের" পাঁচটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। শতকরা ৫০।৫৫ ভাগ উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। সহরেই অভাবের তাড়নায় প্রায় ৫০ জন ছাত্র সি, পি, ডব্লু, ডিতে কাজ করিতেছে, ৫ জন স্কুলের ছাত্র মিলিটারীদের সঙ্গে মাদ্রাজ গিয়াছে। এই প্রকার বহু স্কুলের ছাত্র অভাবের তাড়নায় সাহেবদের "বয়" হিসাবে কাজ করিতেছে।

শিক্ষকরা পেটের দায়ে মিলিটারীতে

শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা আজ শোচনীয়। পাঁজিয়া স্কুলের ১২ জনের মধ্যে ৭ জন, সিঙ্গিয়া স্কুলের ১ জন বাদে সমস্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক, বিদ্যানন্দকাটি, পাটনা, শত্রুজিৎপুর স্কুলের ৫০ ভাগ শিক্ষক স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছেন। যশোহর মাইকেল কলেজের সহ-অধ্যক্ষের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিলে তিনি বলেন, "এতদিন ধরে সবাই যে ভাবে শিক্ষকদের ওপর অবিচার কোরেছে, সে অবস্থায় তাদের মিলিটারীতে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। জনসাধারণ ও দেশের নেতাদের উদাসীনতা দূর হ'লে শিক্ষা হবে।" দেশবাসীর উদাসীনতার জন্যই আজ শিক্ষকদের মিলিটারী চাকরীতে ভরণ পোষণ নির্ভর করিতে হয়। বাইনান বামনদাস স্কুলের হেডপণ্ডিত মশাই একটী আমেরিকান ফ্যাক্টরীতে যোগ দেন। "ব্লাডি ড্যাম ইডিয়েট, ফুল্ "বরদাস্ত করিতে না পারিয়া কাজে ইস্তফা দিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

নব্বই বছরের স্কুল কি ধ্বংস হইবে?

কলিকাতার আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালা ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করেন পরলোকগত যদু পণ্ডিত মহাশয়। উত্তর কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, শ্যামবাজার এ, ভি স্কুল খুবই পুরাতন প্রতিষ্ঠান। এই বাংলা পাঠশালায় ৭ জন শিক্ষক। কর্পোরেশন বাৎসরিক ২০০৲ টাকা মাত্র ও গভর্ণমেণ্ট মাসিক অনিয়মিত ভাবে ৪১৲ টাকা দেয়। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় তবুও এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটীর মায়া তাঁহারা কাটাইতে পারেন নাই। এই নব্বই বছরের প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি উদাসীনতা খুবই লজ্জার। চাঁচড়া ইউ-পি স্কুলও যশোহরের পঞ্চাশ বছরের পুরাতন পাঠশালা। মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলা বোর্ড—এ দুয়ের মধ্যে কার আর্থিক সাহায্য করা উচিত-অনুচিত এর মাঝখানে পড়িয়া ১৬৲ হইতে ২০৲ টাকায় ২ জন শিক্ষকের দিন গুজরাণ করিতে হয়।

ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি

আর্থিক অনটনের সঙ্গে সঙ্গেই নৈতিক অবনতির বিষ ও আবহাওয়া নির্ম্মল ছাত্রসমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। হাওড়ার একটী স্কুলের শিক্ষকের লেখা চিঠি,—"দশম ও নবম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্রের সম্বন্ধে খবর পেলাম। একটী ছাত্র তার এক বন্ধুর স্ত্রীকে লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে। আর একজন ছাত্র গভীর রাত্রিতে কয়েকজন লোকসহ বাড়ীর গোলা হইতে ধান বিক্রী ক'রে সেই অর্থে সিগারেটের দেনা শোধ কোরেছে। বাড়ীর কোন মেয়ের দুগাছি সোনার চুড়ি অপর একজায়গায় বিক্রী করেছে অন্য একজন ছাত্র। সিগারেটের মাসিক খরচ ১০৲।১৫৲ টাকা। জেলার সর্ব্বত্র ঘুরে দেখেছি আজকাল অনেক স্কুলের ছাত্রই সিগারেট খায়, মদ্যপানও করে। স্কুলে দেখেছি শৃঙ্খলার অভাব। সাধারণ অভিভাবকরা কণ্ট্রোলের আটা, চিনি, চালের বস্তা বইতে বইতে জীবনের উদ্যম হারিয়ে ফেলেন—সম্ভব হলে ছেলেদের বেতন দিয়েই খালাস।"

যশোহরের একটী ছাত্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বাস্তভিটা বেচিয়া সাহেবদের "বয়"এর কাজ করে। পূর্ব্বে সে প্রায়ই কাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত। এখন সে বিদেশীদের মেয়ে জোগাইবার হীন পেশা গ্রহণ করিয়াছে। যশোহরের সদর রাস্তার উপর একদিন কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলিম ছাত্র—একটী সাহেবের কাছে গিয়া হাত পাতিয়া বলে, "সাহেব বখশিষ", সঙ্গে সঙ্গে কয়টী সিগারেট পায়। সে ক'টী উহারা ভাগ করিয়া খায়। কলেজে একটী ছাত্রীকে একটী বদ ছেলে অপমান করে। ছাত্ররা তার কোন প্রতিবাদ করে না।

জেলে সম্প্রদায়ের ধ্বংস রুখিতে

★ খুলনায় দেড় হাজার মৎস্যজীবীর সম্মেলন ★

খুলনা জেলায় ১৯ লক্ষ লোকের ভিতর ১ লক্ষের বেশী জেলে এবং এই বিরাট সম্প্রদায়ের বসতি জেলার ১৫টি থানার ১১৩টি ইউনিয়নেই ছড়াইয়া আছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ইহারাই সবচেয়ে বেশী মরিয়াছে এবং সাথে সাথে ইহাদের জাত ব্যবসাও ধ্বংস পাইয়াছে। নৌকা ও জালের অভাবে ইহাদের অবস্থা আজও তেমনি সঙ্গীন। ফলে ইহার ধাক্কা গিয়া পড়িয়াছে জেলার সাধারণ লোকের উপর। যে সব গরীব লোক দু'চার পয়সা মাছের উপর নির্ভর করিত তাহারা মাসের পর মাস মাছ চোখেও দেখে নাই—এমন কি রোগীর পথ্য হিসাবে মাছ যোগাড় করাও সকলের পক্ষেই এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাঙ্গনের মোড় ঘুরাইয়া জেলে সম্প্রদায়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে অবিলম্বে লাগাইবার জন্যই ইহাদের একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সুরু হয় এবং গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মৎস্যজীবী সম্মেলন তাহারই প্রথম ধাপ।

খুলনা সহরের গান্ধীপার্কে এই সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইহার সভাপতিত্ব করেন জেলার লীগ নেতা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মৌলভী সৈয়দ মোস্তাগওমল হক। জেলার ৬৮টি ইউনিয়নের মৎস্যজীবীদের ২০০ মৎস্যজীবী প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ১০০ মৎস্যজীবী ভলাণ্টিয়ার সম্মেলনের সব রকম কাজ করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন। সম্মেলনে আর একটি আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু ছিল মৎস্যজীবী সম্প্রদায়েরই ছেলে কাটিপাড়া নিবাসী অনিল হালদারের নিজেরই লেখা গান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি রাড়ুলা কাটিপাড়ার মৎস্যজীবীদের সুখের সংসার কি ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কিভাবে ইহাদের ঘরের মেয়েদের স্নেহহীন করিয়া তুলিয়াছে, কি ভাবে মা জীবন্ত শিশুকে অনাহারের তাড়নায় নদীর বুকে ফেলিয়া দিয়াছে, কি ভাবে একজন জেলে পেটের দায়ে ২৫৲ টাকায় নিজের স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে—অনিলের গানের এই সব বিষয় বস্তু সমগ্র জনতা জলভরা চোখে স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছে।

এই সম্মেলন জেলায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাড়া আনিয়াছে তাহা বোঝা যায় যে ইহাতে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্টপার্টি, ব্যবসায়ী সমিতি, বার এসোসিয়েশন, মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লোক উপস্থিত ছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধি ছাড়াও সরকারী কর্ম্মচারী সদর মহকুমার হাকিম মিঃ নুরমহম্মদ চৌধুরী, মৎস্যবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, দাসগুপ্তের কাছ হইতে জেলার মৎস্যজীবীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়। সম্মেলনে মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে নানারূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও ডাঃ রসিকলাল সরকারকে সম্পাদক করিয়া মৎস্যজীবী সমিতির একটি জেলা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করা হয়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দাবীগুলি আদায় করিবার জন্য এবং সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে জনসাধারণের সহযোগিতায় কার্য্যকরী করার জন্য কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, বার এসোসিয়েশন, মোক্তার এসোসিয়েশন, হিন্দুমহাসভা, ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়া একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হয়।

ছাত্রী হষ্টেলের দারোয়ান নৈতিক চা

● ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট হষ্টেলে

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিট্যুশানের হষ্টেলে কিছুদিন হইতে চুরি হইতেছিল। একদিন মেয়েরা একটা শব্দ শুনিয়া চোর আসিয়াছে ভাবিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। প্রিন্সিপাল তখনিই ছুটিয়া আসেন। একটী মেয়ে তাঁহাকে ঘটনা বলে। প্রিন্সিপাল তাহা বিশ্বাস না করিয়া মেয়েটীকে একটী অন্ধকার ঘরে একলা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ছাত্রীদের বহু অনুরোধে দরজা খুলিবার পর দেখা যায় মেয়েটী মূর্চ্ছা গিয়াছে। তারপর তার প্রবল জ্বর আসে—ফলে বাড়ী যাইতে বাধ্য হয়।

কয়েক দিন আগে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্রে উক্ত ঘটনাটি বিবৃত করিয়া ও নিম্নোক্ত অভিযোগগুলি জানাইয়া এখানকার মেয়েরা অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করে। আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার ব্যবস্থা শুনিলে মনে হয় ইহা যেন মোগল বাদশার হারেম। প্রথমেই কর্ত্তৃপক্ষ অভিভাবকের নিকট হইতে যারা দেখা করিতে আসিবেন তাদের নামের তালিকা নেন। সেই তালিকাভুক্ত লোক আসিলেও কৈফিয়তের অন্ত নাই। তারপর আলাপ করিবার জন্য পৃথক জায়গা নাই, দারোয়ানের ঘরে দারোয়ানের সামনেই কথাবার্ত্তা চালাইতে হয় পরে দারোয়ান সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দেয়।

চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধে নিয়মকানুন আরও অমানুষিক। বিবাহিত মেয়েদের চিঠি পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ খুলিয়া পড়েন।

মেয়েদের চুলের উপর পর্য্যন্ত আইন আছে। মেয়েদের চুল খুলিয়া শুকাইবার জন্য বারান্দায় বসা পর্য্যন্ত বারণ। কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর দেন—'চুল কাটিয়া ফেল—ভিক্টোরিয়ায় "অসভ্যতা" চলিবে না।'

মোগল হারেমের খোজা প্রহরীর মত হষ্টেলে মেয়েদের জীবনে দারোয়ানদের প্রতাপ অসীম।

মেয়েদের নৈতিক শিক্ষার ভার যেন তাদেরই হাতে। সময় সময় অভিভাবকদের ওপর তাদের তম্বি চলে।

বাংলায় স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইহার পরিচালক সভার সম্পাদক এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অন্যতম সভ্য। তাঁহারা হয়ত খবরও রাখেন না যে এই কলেজের ছাত্রীদের শিক্ষার ভার যাহাদের ওপর ন্যস্ত তাহাদের শিক্ষানীতির ধারণা হইল—"শিক্ষার উপর এই মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠন নির্ভর করে না—করে নিয়মের বাঁধন ও দারোয়ানের কড়া নজরের উপর। প্রত্যেকটি মেয়েই যেন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য উন্মুখ।"

আজ কলিকাতার প্রত্যেকটী ছাত্রী-হষ্টেলেই এই কলেজের মত অবস্থা। মেয়েদের নিজেদের প্রতিকার করা মুস্কিল কারণ অভিভাবকরা ভর্ত্তি

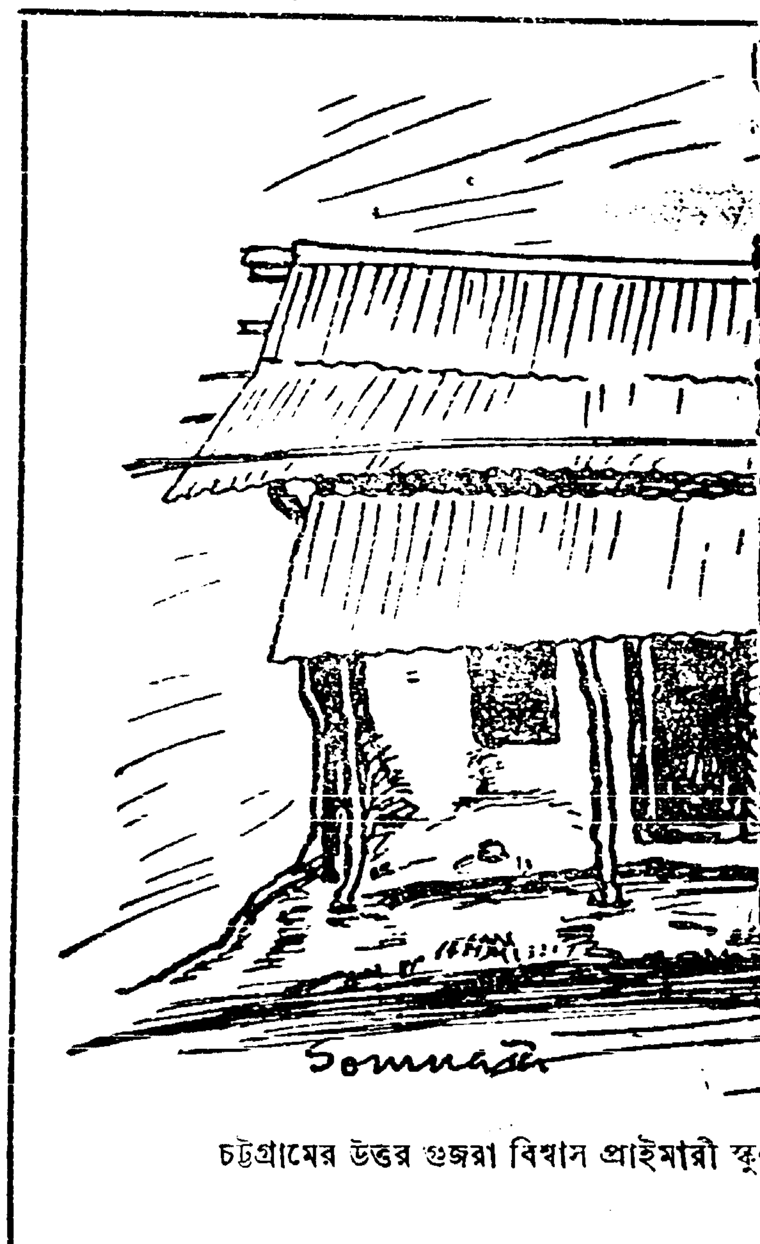

চট্টগ্রামের উত্তর গুজরা বিশ্বাস প্রাইমারী স্কু

রে কেন?●—

ও উঠিয়া যাইতেছে

ঢাকার ছাত্রীদের চিঠি

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীদের ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়া ইহা প্রকাশ পাইয়াছে—কলেজ হোষ্টেলে দারোয়ানের উপর আজ ভার পড়িয়াছে শিক্ষাব্রতী মেয়েদের চরিত্ররক্ষার গুরু দায়ীত্ব! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মিলিটারীর দুর্ব্যবহার হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীবৃন্দ একটী পত্রে জানাইয়াছেন, "গত তিন বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে ছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ঢাকা সহরের রাস্তার উপরে মিলিটারী সৈন্যের মেয়েদের ওপর দুর্ব্যবহার কয়েকবার ঘটিয়াছে এবং কয়েকদিন আগে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।...... গত দুই বৎসর যাবৎ আমরা বাস্ কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করিবার জন্য ভাইস্‌চেন্সেলার মহাশয়ের নিকট দাবী পেশ করিয়া আসিতেছি কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ পেট্রলের অভাব কিংবা অন্য অজুহাতে দাবী উপেক্ষা করিতে থাকে।......অধুনা কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রীদের সাবধানে চলাফেরা করিবার জন্য উপদেশ দিয়া নোটীশ জারী করিয়াছেন. কিন্তু যানবাহনের কোন কথা নাই। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন—হয় তাঁহারা প্রয়োজন হইলে রিকুইজিশন করিয়া ২টী বাস সংগ্রহ করুন, না হয় ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করুন"।

রিত্রের জিম্মাদার!

অ ন শ ন

করার সময় এইরূপ ব্যবস্থার দাসখতে সই করিয়া আসেন। এমনকি দেশীয় সংবাদপত্রগুলি পর্য্যন্ত এ অভিযোগ ছাপাইতে রাজী হন নাই।

• ছাত্রীদের চরিত্ররক্ষার ভার তাহাদের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা যদি দারোয়ানের উপর দেন—তাহা হইলে মেয়েদের নিজেদের সম্মান রক্ষা করিবার মত সাহস বা শক্তি কোথা হইতে আসিবে? ডাঃ বিধান রায়ের আশ্বাস পাইয়া ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাব্রতী, অভিভাবকদের ও ছাত্রীদের নিজেদের চেষ্টায় হষ্টেলবাসিনী ছাত্রীদের উপর এই মধ্যযুগীয় বর্ব্বর ব্যবহারের অবসান হইবে কবে?

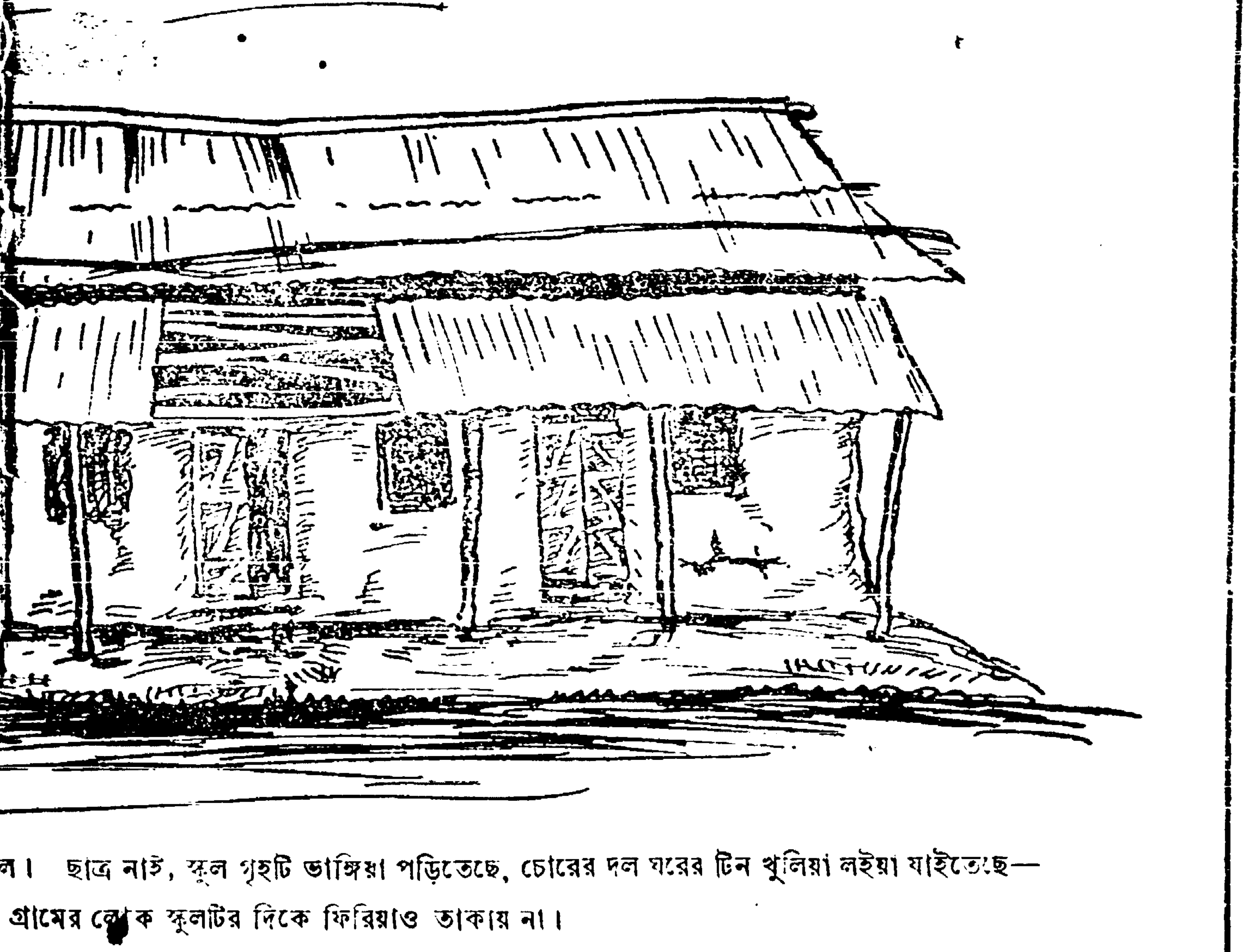

ল। ছাত্র নাই, স্কুল গৃহটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চোরের দল ঘরের টিন খুলিয়া লইয়া যাইতেছে—
গ্রামের লোক স্কুলটির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

★ শিক্ষার ভাঙ্গন ★

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধ ও কলিকাতার শিক্ষাব্যবস্থা

আজকাল কাগজে প্রায়ই আলোচনা দেখা যায় যে যুদ্ধের পর আমাদের শিক্ষার কি সুব্যবস্থা হ'বে—কত বেশী শিক্ষা হবে এবং কত রকমের ধারায় তার প্রসার বাড়বে। কিন্তু মাঝে মাঝে শিক্ষকদের বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ ছাড়া একটা খবর এক রকম চাপা পড়ে গেছে। সেটা এই যে বাংলাদেশের শিক্ষার বনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। অবশ্য কলিকাতায় যারা থাকেন ও শুধু এখানকার স্কুল ও কলেজগুলির খবর রাখেন, তাঁরা একথা বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করবেন। কারণ ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে কলিকাতার সব কলেজেই ছেলে অনেক বেশী ভর্ত্তি হয়েছে। এটা শুধু ১৯৪৩ সালের সংখ্যার চেয়ে বা ১৯৪২ সালের কলিকাতা শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময়ের চেয়ে বেশী নয় তার আগের চেয়েও কিছু বেশী। আমার জানা কলিকাতার একটী পুরাতন নামজাদা শিক্ষায়তনে ছেলেদের সংখ্যা ১৯৪১ সালের উপর শতকরা চল্লিশ জন বেড়ে গেছে। কিন্তু এই সব স্কুল ও কলেজে যারা পড়ে, তাদের বাপ মায়ের আয় কম হলেও মাসে আন্দাজ একশত, দেড়শত। অবশ্য গরীব লোকের ছেলেরাও পড়ে এই সব বিদ্যায়তনে। তারা সাহায্য পায় বেতনের দিক হতে; কখনও কখনও অন্য সহায়তাও জোটে। বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ কলিকাতার ও হাওড়ার মধ্যবিত্ত লোকের চাকরীর অভাব নাই। সরবরাহ বিভাগ, খাদ্যবণ্টন বিভাগ ও অন্য নানাকাজে এই সমাজের শিক্ষিত ও মাঝারী লেখাপড়া জানা ছেলেরা অনেক চাকরী পেয়েছে। যাঁরা ছোট আপিসে অল্প মাহিনায় কেরাণী রেখে আগে চালাতেন বা বিজ্ঞাপন দিলে কাজের জন্য পাঁচ সাত শো দরখাস্ত পেতেন তাঁরা জানেন যে, ম্যাট্রিক পাশ কেরাণী বা টাইপিষ্ট বা হিসাবনবীশ এখন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় পাওয়া দুষ্কর। যারা আছে, তারা প্রায়ই বেশী মাহিনায় অন্যত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থা

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে কি গ্রামের লোকের আয়ের হারও এই রকম বেড়ে উঠেছে? একটু তদন্ত করলেই দেখা যায় যে বেশীর ভাগ জেলাতেই তা ঘটে নাই। ১৯৪৩ সালের কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে; তখন মানুষ শুধু মরে গেছল, কিম্বা কোনও রকমে দেহে প্রাণ ধরে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালে যে তারা পেটভরে খেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে যারা গরীব কৃষক ছিল তারা অনেকে ১৯৪৪ সালে মজুর ও নিঃস্বের স্তরে নেমে এসেছে। যারা মধ্যবিত্ত চাষী বলে পরিচিত ছিল তারা হয়েছে গরীব চাষী। শুধু ধনী জোতদার যারা, তাদেরই জমি বেড়েছে, কতক পরিমাণে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে গ্রামের ছোটখাট, যাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চাষীর সঙ্গে, তাদের বহুসংখ্যক লোক নিজেদের পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু চালের কারবারী ও আড়তদারেরা ফেঁপে উঠেছে। অন্য যে সব লোক গ্রামে থাকে—কুমোর, তাঁতী, জেলে—যারা চাষীকে তার দরকারী জিনিষ সরবরাহ করে—তারা সবাই ভেঙ্গে পড়েছে চাষীর সঙ্গে সঙ্গে। বেড়ে গেছে শুধু ভিক্ষুক ও নিঃস্বের দল। এই অবস্থায় কি আমরা আশা করতে পারি যে গ্রামের চাষী কি শিল্পীর ছেলে পয়সা খরচ করে পড়াশুনা শিখতে আসবে? কলেজের পড়া নয় ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথাও বলছি না, শুধু প্রাথমিক শিক্ষার কথা—যেটুকু না হলে মানুষ বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াতে পারে না। এই সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে এখন অর্দ্ধেকের বেশী ছেলেমেয়ের জন্য নাই। যেটুকু ছিল, সেটুকুও লোপ পেতে বসেছে।

১৯৬৩-এ শিক্ষাক্ষেত্রেও দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপের সময় অনেক জেলাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা একরূপ উঠে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তমলুক মহকুমায় ছাত্রসংখ্যা ১৯৪৩ সালে শতকরা ৫৫ ভাগ কমে গেছল। শিক্ষার এ দুর্গতি কোনও বিশেষভাবে নির্ব্বাচন করা গ্রামের অবস্থা হ'তে দেওয়া নয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টী গ্রামের পুরাপুরি তালিকা হ'তে আজামোজা বেছে নেওয়া হয়। সেই গ্রামগুলির অবস্থা হ'তেই এই নমুনা পাওয়া যায়। সুতরাং এই নমুনা সমগ্র মহকুমার নমুনা এই কথা জোর করেই বলা যায়। ১৯৪৪ সালে এই অবস্থা কিন্তু পরিবর্ত্তিত হ'লেও উন্নত হ'য়েছে বলা যায় না। তমলুকের ছাত্রসংখ্যা তখনও শতকরা ৫০টী কম ছিল। অনেক জায়গায়, যেমন কিশোরগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা ১৯৪৪ সালে আগের বৎসরের চেয়েও খারাপ হ'য়েছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কি ভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়েছে, সরকারী দপ্তর হ'তে তার একটী তালিকা রাজস্ব বিভাগ তৈয়ারী করেছেন। তাঁদের মতে ১২টী মহকুমা ১৯৪৩ সালে বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তারপর ২৫টী মহকুমা মাঝারি রকমের অভাবে পড়ে; এর আবার দুটী স্তর আছে। আর গুটি ছয়েক মহকুমা অল্পস্বল্প আঘাত পেয়েছিল। শোনা যায় এই তালিকাটী তৈয়ারী হয় ঐ সব অঞ্চলের জেলা হাকিমদের মন্তব্য অনুযায়ী। তাঁরা তাঁদের এলাকার যেরূপ অভাব ও দুরবস্থা জানিয়েছিলেন, সেই হিসাবেই তালিকাটি সাজান হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় দুই শত গ্রামের শিক্ষার দুর্গতি সম্বন্ধে তদন্ত করে কিন্তু সরকারী এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া গেল না। এ যোগাযোগের অভাব অন্যান্য তথ্য সন্ধান করেও দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন মহকুমার মৃত্যুর হার এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে মেলে না। অথচ দুর্ভিক্ষের ফলে অনাহারে ও অর্দ্ধাশনের জন্য রোগে ঐ সব অঞ্চলে অভাবের প্রকোপের অনুপাতে লোক মারা গিয়েছিল। আমাদের সাধারণ বিচারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যে-সব জায়গায় বেশী হ'য়েছিল (মৃত্যুর হার তার নির্দ্দেশ দেয়) ঐ সব অঞ্চলে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকেও ইস্কুলগুলিতে শতকরা চল্লিশজন করে পড়ুয়া কম ছিল। আর যে সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মাঝারি রকমের ছিল, ঐ সব মহকুমায় ছাত্রসংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব এই তিন বাংলাতেই অবস্থা প্রায় সমান। শুধু মধ্য বাংলার কতক অঞ্চল ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে এসেছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় গড়ে পড়ুয়া সংখ্যা ১৯৪৪ সালে প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম ছিল।

বাংলায় ও ইংলণ্ডে প্রভেদ

শিক্ষার দিক হ'তে বাংলা দেশে বর্ত্তমান যুদ্ধের আগের অবস্থা খুব যে ভাল ছিল এ কথা বলা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বার উপযোগী ছেলেমেয়ের অর্দ্ধেকও পড়াশুনার সুযোগ পেত না। তারও আবার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাদ গেলে বাকী থাকে বিশ বৎসর আগেকার মত শিক্ষার্থীর পরিমাণ।

গ্রাম পুনর্গঠনের যে সরকারী পরিকল্পনা ১৯৪৪ সালে প্রকাশ পেয়েছে তাতে শিক্ষার এই দুরবস্থা দূর করবার বিশেষ কথা নাই। আর শিক্ষাবিভাগ যে এই ব্যাপার নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিলেন তারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাংলার শিক্ষার বনিয়াদ ধ্বসে পড়ে একতলা নেমে গেছে। এই ভাঙ্গনের ফলে কৃষ্টির অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থায় কি রকম ব্যবস্থা হয়, তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের বড় বড় সহরগুলি হ'তে ছোট ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়। হঠাৎ বহু লক্ষ ছেলেমেয়েকে সহর হ'তে গ্রামে নিয়ে যেয়ে তাদের থাকার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নয়। কিন্তু তা সত্বেও এ ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে এর কয়েকমাস পরেই ইংলণ্ড অতি ভীষণভাবে বোমা ও বিমান বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধের আরম্ভ হতেই ইংলণ্ডের সমস্ত শক্তি যুদ্ধের মালমশলা তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত হয়। প্রথমের দিকে গোলমালের ফলে বড় সহরগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থার যথেষ্ট দুর্গতি ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ সব শহরের মাত্র শতকরা ৫০ জন ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যেত। কিন্তু তখনই আরও শতকরা ২৩ জনের জন্য বাড়ীতে পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তা হ'লেও শতকরা ২৭-২৮ জন পড়ুয়ার লেখাপড়া বন্ধ হ'য়ে গেছল। কিন্তু সামান্য তিন মাসের মধ্যে, এই পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগেরও কমে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯১ জনের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইংলণ্ডে সম্ভব হয়েছিল। তারপর অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকে পৌঁছায়।

অবশ্য এই ইংরাজই যখন এদেশে শাসন করতে আসে, শিক্ষা সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়; আর আমাদের দেশের যে সব লোক এদের অবলম্বন করে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে চায়, তারাও তাতে সায় দেয়। তাই নানা অজুহাত ওঠে যে যুদ্ধের সময় শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক রাখা সম্ভব নয়। এ সব ব্যবস্থা পরে হ'বে। কিন্তু দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী যারা, তাদের এখনই ভাবতে হবে, ও চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অন্ততঃ এখনই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, ও শিক্ষার প্রসার শীঘ্রই সহজে বাড়ানো চলে। যেমন গ্রামে রোগের চিকিৎসার জন্য, সহরে ও সর্ব্বত্র কাপড়ের সঙ্কট দূর করবার জন্য এক হ'য়ে চেষ্টা করতে হ'য়েছে ও তাতে সুফল ফলেছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই রাস্তাতেই সফলতা আসবে। আলাদা হয়ে ভিন্ন থেকে চেষ্টা করলে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যই জুটবে।

কুওমিণ্টাং-শাসিত চীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই

জীবনধারণের মুল্য একমাসে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি

চুংকিং. ১১ই মার্চ্চ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই

গত ৭ই মার্চ্চ চুংকিংয়ে সাংবাদিকদের সাপ্তাহিক বৈঠকে কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সংসদের উপদেষ্টা ডাঃ পি, এইচ, চ্যাংকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে প্রশ্ন করা হয়। চুংকিংয়ের কমিউনিষ্ট মুখপত্র 'সিন হুয়া জি পাও' পত্রিকার পক্ষ হইতে সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলা হয় যে, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির উপর সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বিচারে কাঁচি চালায় এবং এই পত্রিকায় যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন না দেয় তার জন্য তাহাদের ভয় দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, এই পত্রিকার কর্ম্মীদের প্রায়ই পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও তাহাদের উপর মারপিট করে। সংবাদপত্রগুলির এই অভিযোগের উত্তরে ডাঃ চ্যাং বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন না। কমিউনিষ্ট সংবাদপত্রের অভিযোগের উত্তরে ডাঃ চ্যাং বলেন, এ ধরণের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়; তবে পুলিশের কাছ হইতে ঐ ধরণের কোন রিপোর্ট তিনি পান নাই।

সরকারী সংবাদ-দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ ওয়াং-এর কাছে 'সিন হুয়া জি পাও' পত্রিকার পক্ষ হইতে একটি লিখিত পত্রে অভিযোগ জানাইয়া বলা হয় যে, এই পত্রিকার অফিসের সামনে সাদা পোষাকে পুলিশ ও সৈন্যেরা টহল দিয়া বেড়ায় ও রাস্তার লোকজনকে পত্রিকার অফিস দেখাইয়া বলে, ইহা দেশদ্রোহীদের আস্তানা। এ ছাড়াও পত্রিকার বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে ভয় দেখাইয়া সইযুক্ত সরকারী চিঠি পাঠানো হইয়া থাকে। সেন্সার সম্বন্ধে অন্য একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, "সিন-হুয়া-জি-পাও' পত্রিকায় যখন কুওমিণ্টাং সরকারকে সমালোচনা করিয়া লেখা হয়, তখন সেন্সার কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল 'ই-শি-পাও' পত্রিকায় যখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করিয়া লেখা হয়, তখন তাহা আবার সরকারী সেন্সার কর্ত্তৃপক্ষই মনোনীত করিয়া থাকে। ডাঃ ওয়াং এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে না পারিয়া বলেন, যাহারা সোভিয়েট বিরোধী লেখা লেখে তাহারা যে গবর্ণমেণ্টের নীতি অনুসারেই লেখে এমন নয়।

কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে একদিকে তাহাদের অপদার্থতা ও দুর্নীতি ঢাকিয়া রাখিতে চায় ও অন্যদিকে গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচারিতা নির্ব্বিচারে চালাইতে চায়!

নিদারুণ গৃহসমস্যা, ৮৭৩ গুণ মূল্য বৃদ্ধি

চুংকিং শহরে গৃহ সমস্যা কি নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শহরের মেয়রের কথা হইতেই বোঝা যায়! 'শাংহাই ইভনিং পোষ্ট'-এর প্রতিনিধির কাছে তিনি বলিয়াছেন, 'রাস্তায় আপনার দশ জন বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয়, দেখবেন তার মধ্যে ন জনই ঘর খুঁজতে বেরিয়েছে।' এ ছাড়াও শহরবাসীর সামনে আজ হাজারটা সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যার কোন কূলকিনারা করার ক্ষমতা অত্যাচারী কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের নাই! সমস্ত বাজার চোরাকারবারীদের হাতে এবং কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট ইহাদেরই প্রতিনিধি।

১৯৩৭ সালের জুন মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যে দর ছিল, ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে তাহা ৪৫৫ গুণ, ১৯৪৫-এর জানুয়ারীতে তাহা ৬৫৫ গুণ ও ফেব্রুয়ারীতে তাহা বাড়িয়া ৮৭৩ গুণ দাঁড়াইয়াছে।

৭ই মার্চ্চ সাংবাদিকদের বৈঠকে ডাঃ চ্যাং এই সংবাদ প্রকাশ করেন। সরকার হইতে চুংকিংয়ের বাসের ভাড়া ও শূকরের মাংসের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দর এই সপ্তাহ হইতে বহুগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শূকরের মাংসের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধিতে শহরবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রকাশ্য বাজারে মাংসের আমদানী বেজায় কমিয়া গিয়াছে। বাঁধা দরের দেড়গুণ দামে চোরাবাজারে ছাড়া মাংস কেনার আর উপায় নাই। তাছাড়া দু' এক সের কিনিতে চাহিলে আবার এই চোরাকারবারীরা বেচিবে না। দশ বিশ সের মাংস এক সঙ্গে কিনিতে হইবে। ফলে সাধারণ গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া নিরামিষ খাইতে হইতেছে।

শতকরা ২০ জনের ভাগ্যে কাপড়

কাপড়ের সমস্যাও গভীর ভাবে দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সূতাশিল্পের একটি তথ্যে প্রকাশ যে, মিল ও তাঁতে এখন যা কাপড় উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে স্বাধীন চীনের শতকরা ২০ জনের মাত্র লজ্জা নিবারণ হইতে পারে। এই তথ্য হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে মাত্র ১ লক্ষ ৭০ হাজার মাকু চালু রহিয়াছে এবং তাহাতে বছরে গড়ে ১ লক্ষ কাপড় উৎপন্ন হইতে পারে। চীনের মোট উৎপাদনের তুলনায় ইহা প্রায় অর্দ্ধেক। বাকি উৎপাদনের সম্পূর্ণই নির্ভর করে হস্তচালিত তাঁতে। সেগুলির অবস্থাও শোচনীয়। সারানোর অভাবে, রং-এর অভাবে ও পুঁজির অভাবে ৬০ হাজার মাকু বেকার পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানের উৎপন্ন বস্ত্রের সমস্তটাই যদি বেসামরিক জনসাধারণের হাতে পৌঁছায়, তাহা হইলেও স্বাধীন চীনের ১৯ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ জনই তাহা পাইবে। কিন্তু উৎপাদনের বারো আনা অংশ সামরিক বিভাগের লোকজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ার ফলে, উৎপাদনের মাত্র সিকি ভাগ থাকিবে বেসামরিক জনসাধারণের জন্য। অর্থাৎ বস্ত্র সংকট মারাত্মক আকারে দেখা দিবে।

ইতিমধ্যে আবার বস্ত্র ব্যবসায়ীরা কাপড়ের দাম বাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এদিকে স্বল্প মজুরীতে সংসার চালাইতে না পারিয়া দলে দলে তাঁতী অন্য কাজে চলিয়া যাইতেছে। সরকার হইতে যথেষ্ট সূতা বণ্টন না করার ফলে বহু তাঁত বেকার পড়িয়া আছে।

কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের এই জীবনের সমস্যা সমাধান করার দিকে এক পাও অগ্রসর হয় নাই। কুওমিণ্টাংয়ের স্বেচ্ছাচারী দলগত শাসন পদে পদে চীনের জনগণকে বিধিনিষেধের নাগপাশে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। চীনের কুংচাণ্টাং (কমিউনিষ্ট পার্টি) বার বার চিয়াং কাই-শেকের কাছে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নূতন চীন গড়িয়া তোলার জন্য ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছে, কিন্তু চিয়াং কাই-শেক কুওমিণ্টাং দলের একনায়কত্ব ছাড়িতে ও সর্ব্বদলের গণতান্ত্রিক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে কিছুতেই রাজী হন নাই।

চীনের জীবন-মরণ সমস্যা

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চিয়াং কাই শেকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কারণ কুওমিণ্টাং গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করিয়াছে ও কৌশলে কমিউনিষ্টদের জব্দ করিতে চাহিয়াছে। চিয়াং কাই-শেক একজন আমেরিকান কমাণ্ডারের হাতে কমিউনিষ্ট বাহিনী সঁপিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কমিউনিষ্টরা ইহা সহ্য করে নাই। কারণ এতদিন পর্য্যন্ত যখন কুওমিণ্টাংয়ের সরকারী বাহিনী কমিউনিষ্টদের উপর চড়াও হওয়া ছাড়া জাপানীদের বিরুদ্ধে কমই লড়িয়াছে, তখন একমাত্র কমিউনিষ্ট সৈন্য বাহিনীই জাপানীদের বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ চালাইয়াছে। তাই যদি আমেরিকান কমাণ্ডারের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট বাহিনীকে রাখিতেই হয়, কুওমিণ্টাং বাহিনীকেও তাহা হইলে এই একই ব্যবস্থা মানিতে হইবে।

সম্প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, 'এই গণতান্ত্রিক দাবী-গুলি কিছুতেই মানিয়া না নেওয়ায় আমাদের আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা যেমন চীনের দুর্ভাগ্য, তেমনি কুওমিণ্টাংয়েরও দুর্ভাগ্য।' চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা আপোষ আলোচনা চালাইতে কখনই অসম্মত থাকিবেন না। চীনে কুওমিণ্টাং-কমিউনিষ্ট ঐক্য যে কত প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতিতে বলা হইয়াছে:

'কুওমিণ্টাং-কমিউনিষ্ট আপোষ আলোচনা আজ আর কেবলমাত্র দুটি পার্টির মধ্যেকার সমস্যাই নয়—দেশ ও জাতির জীবন মরণ আজ যে সমস্ত জরুরী রাজনৈতিক সমস্যার উপর নির্ভর করিতেছে, সেই সমস্ত সমস্যা এই আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়াই সমাধান করিতে হইবে।'

চুংকিং হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার চিঠি

উদারপন্থীদের দাবী

কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়াও চীনে যে তৃতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার নাম **'ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন'**। জাতীয় মুক্তি সঙ্ঘ, চীনা যুব সংঘ, জাতীয় সোশালিষ্ট পার্টি, জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রাম কমিটি প্রভৃতি উদারপন্থী দলগুলি এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। গত ২৬শে জানুয়ারী ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের পক্ষ হইতে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে: একদিকে যেমন হোনান, হুনান ও কোয়াংসি প্রদেশ জাপানীরা দখল করায় চীনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি শত্রুর পশ্চাদভাগে চীনের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামও জোর বাঁধিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাস আলাপ আলোচনা চালাইয়াও কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কুওমিণ্টাং ঐক্য স্থাপন করিতে পারে নাই। এমন কি বন্দীমুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সভাসমিতি ও সংগঠন প্রভৃতির ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পর্য্যন্ত কুওমিণ্টাং স্বীকার করে নাই।

চিয়াং কাই-শেক যেভাবে গণসম্মেলন ডাকিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে জনগণের সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না—তাহা এই বিবৃতিতে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে; কারণ, ৮৷৯ বছর পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত ১,১৪০ জন সভ্য ও শূন্য আসনগুলিতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কুওমিণ্টাং কেন্দ্রের শত শত সরকার মনোনীত পার্টি সভ্য—ইহাদেরই যদি আবার গণসম্মেলনে বসাইয়া সমগ্র দেশের উপর নূতন গঠনতন্ত্র চাপানো হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতি কোন কিছুরই কোন আশা নাই।

ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন কুয়মিণ্টাংয়ের কাছে নিম্নলিখিত দাবী উপস্থাপিত করিয়াছে:

অবিলম্বে কুওমিণ্টাংকে একনায়কত্বের অবসান করিয়া সর্ব্বদলীয় সম্মেলন ডাকিয়া সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংবাদপত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার দিতে হইবে। সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। গুপ্তচর বিভাগ ও কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্প প্রভৃতি ফাশিষ্ট সংগঠন ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। অপরাপর দলের সৈন্যবাহিনীকে স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠার ন্যায্য অধিকার দিতে হইবে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করিতে হইবে। বর্ত্তমান পার্টি নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রথা তুলিয়া দিয়া শিক্ষায়তন-গুলিকে স্বাধীন সত্তা দিতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির সহিতও সম্পর্ক দৃঢ় করিতে হইবে।

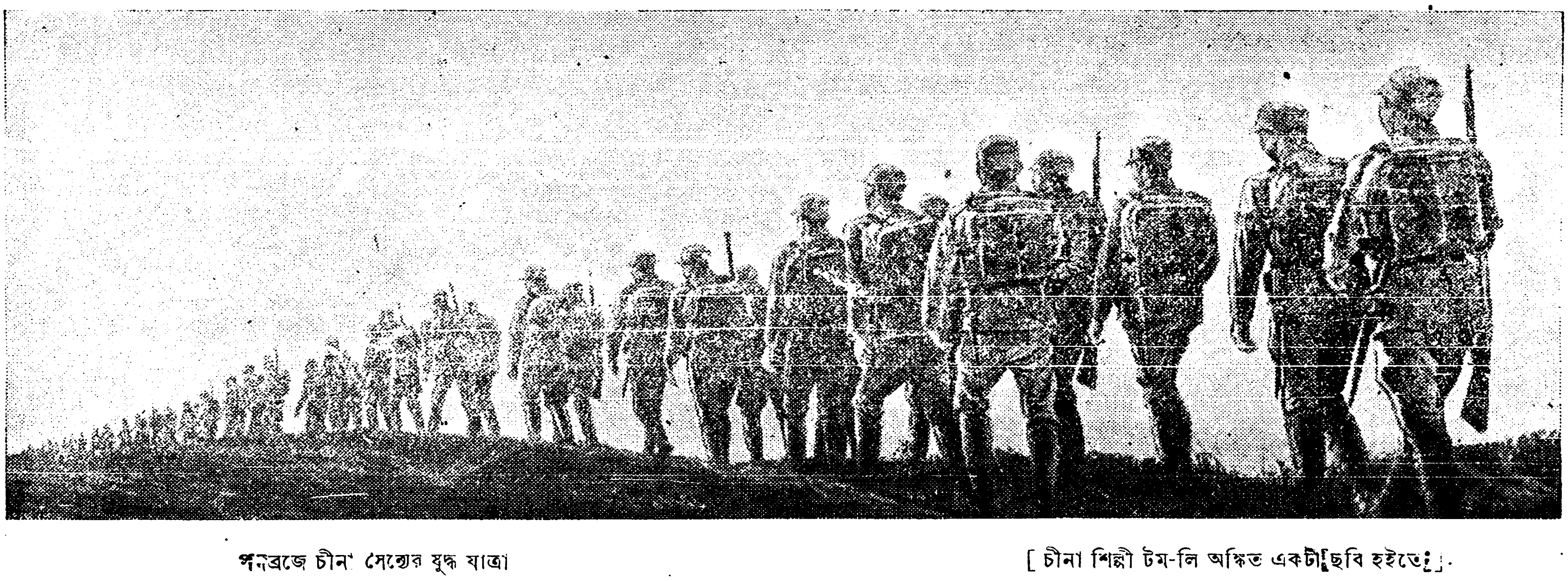

গণবজ্রে চীন' সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রা [চীনা শিল্পী টম-লি অঙ্কিত একটা ছবি হইতে]

ভিয়েনা-প্রাগ-বার্লিনের দিকে লালফৌজ : ফ্রাঙ্কফুর্টে মিত্রসেনা

★ জাপানের মাত্র ৩৫০ মাইল দূরে মার্কিন সেনার অবতরণ ★

জার্ম্মান 'নিউজ এজেন্সী' হইতে একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"যুদ্ধ শেষ ও চরম অধ্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। আতঙ্কগ্রস্ত হিটলারীদের এই উক্তি মিথ্যা নয়, কেননা, বার্লিন আক্রমণের উত্তোগপর্ব্ব লালফৌজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছে। কুষ্ট্রেন অঞ্চলে সোভিয়েট সেনা বার্লিন হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরে রহিয়াছে। মার্শাল জুকভের বাহিনী পশ্চিমে অগ্রসর হইবার জন্য সম্পূর্ণ তৈয়ার; বার্লিনের পশ্চিমে কোথাও বোধ হয় লালফৌজের সঙ্গে বৃটিশ ফিল্ডমার্শাল মণ্টেগোমারীর মোলাকাৎ ঘটিতে বিশেষ বিলম্ব নাই।

স্থানে স্থানে শত্রুসেনা আটক

পূর্ব্ব প্রুশিয়াতে আনাচে কানাচে জার্ম্মান লুকাইয়া আছে বটে, কিন্তু রাজধানী কনিংসবুর্গে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। লালফৌজের সেনাপতি মৃত চের্ণিয়াকোভস্কীর স্থানে আসিয়া মার্শাল ভেসিলেভস্কী পূর্ব্ব প্রুশিয়ার ব্রাউন্স্‌বুর্গ সহর দখল করিয়াছেন।

ডানজিগ ও গিদনিয়া বন্দরেও শত্রুর অবস্থা কাহিল। বার্লিনের রাস্তা সাফ করার জন্য জুকভ ষ্টেটিনের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিতে উদ্যত। জার্ম্মানরা বলিতেছে যে দশ মাইল জায়গায় তিনি এক লক্ষ যোদ্ধা আর এক হাজার কামান জড়ো করিয়াছেন।

বার্লিন ও ভিয়েনার রাস্তা সাফ

মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যবাহিনী ওপলনের দক্ষিণ-পশ্চিমে তুমুল আক্রমণ চালাইয়া অনেকগুলি স্থান দখল করিয়াছে। একদিনে শত্রুর ১৫০০০ সৈন্য বন্দী করিয়াছে। জার্ম্মানরা এখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। কনিয়েভ মোরাভস্কা-অষ্ট্রাভার কাছে শত্রুকে তাড়া করিতেছেন আর চেক রাজধানী প্রাগ ও অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার রাস্তা ক্রমেই খুলিয়া যাইতেছে।

জার্ম্মানীর শেষ প্রতিরোধ চূর্ণ হইতেছে

হাঙ্গেরীতে জার্ম্মানরা একবার মাথা চাড়া দিতে গিয়া লালফৌজের হাতে বেদম মার খাইয়াছে। বুডাপেষ্টের দক্ষিণপশ্চিমে মার্শাল টলবুখিন ৬০ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে সোজাসুজি ৪৪ মাইল অগ্রসর হইয়াছেন। অষ্ট্রীয়ার সীমান্ত হইতে লালফৌজ এখন মাত্র ৩৫ মাইল দূরে রহিয়াছে।

বার্লিন, প্রাগ ও ভিয়েনা পৌছিবার রাস্তা লালফৌজের কামানের গোলায় পরিষ্কার হইতেছে। উত্তর জার্ম্মানী হাতছাড়া হইলে দক্ষিণে ব্যাভেরিয়া, অষ্ট্রীয়া ও বোহেমিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে শত্রু যে আত্মগোপন করিয়া যুদ্ধ চালাইবে, দিন দিন সে আশা কমিয়া যাইতেছে।

মিত্রবাহিনীর রাইন অতিক্রম

পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর হাতেও জার্ম্মানরা ক্রমাগত পর্য্যুদস্ত হইতেছে। মণ্টগোমারীর সৈন্যদল রাইন নদীর উত্তরাংশ পার হইয়া ২৫-৩০ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতেছে। একটি মিত্রবাহিনী ৮০০০ শত্রুকে বন্দী করে। বৃটিশ ও মার্কিন সেনা রাইন নদীর পূর্ব্বে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়াছে। চার্চিল স্বয়ং রাইন নদীর পূর্ব্বে যাইয়া যুদ্ধকার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্রশক্তির বিমান বাহিনী পাঁচ দিনে ৫০,০০০ টন বোমা ফেলিয়া জার্ম্মানদের আত্মরক্ষা বূহ্য জ্বালাইয়াছিল। সারব্রুকেন, লুডভিগশাফেন, মাইনজ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র আমেরিকানরা অধিকার করিয়াছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের সহরতলীতেও মিত্রসেনা গিয়া পৌছিয়াছে। শিল্পব্যাপারে যে প্রদেশ হইল জার্ম্মানীর মর্ম্মস্থল, সেই রূঢ় প্রদেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে। মণ্টগোমারী ঠিকই বলিয়াছেন যে যুদ্ধের শেষ অধ্যায় আজ চলিতেছে, ফ্যাশিষ্ট শক্তির চূড়ান্ত পতনের জন্য আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

জাপ প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা

প্রাচ্যের যুদ্ধে ফ্যাশিষ্ট জাপানও দিনের পর দিন নূতন নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। খাস জাপানের উপর বিমান আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিল্পকেন্দ্র নাগোয়ায় সম্প্রতি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। জাপান ও ফরমোসা দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত জাপান হইতে মাত্র ৩৫০ মাইল দূরে রিউকিউস দ্বীপপুঞ্জেও গত ২৬ মার্চ্চ মার্কিন বিমান জোর হানা দেয় এবং পরের দিন ওকিনাওয়া দ্বীপে মার্কিন সেনা অবতরণ করিয়াছে। অবস্থা যে সঙ্গীন তাহা বুঝা যায় জাপ প্রধানমন্ত্রী কাইসোর উক্তি হইতে। জাপানী দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের আবেদন করিতে গিয়া কাইসো বলিয়াছে—"শত্রু আমাদের দ্বারে আঘাত হানিতেছে। আজ আমরা যে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি জাতির সমগ্র ইতিহাসে উহার তুলনা মিলে না।"

১৯৪১ সালে জাপান যখন অতর্কিতে আমেরিকা ও বৃটেনের উপর আক্রমণ সুরু করে তখন পর পর প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় সমগ্র দ্বীপপুঞ্জগুলিই তাহার কুক্ষিগত হইয়াছিল। আজ আর প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সেই অপ্রতিহত ক্ষমতা নাই। একের পর এক অনেকগুলি দ্বীপই মার্কিন নৌবাহিনী ও জেনারেল ম্যাকআর্থারের পরিচালিত মিত্রবাহিনী জাপানের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। মিত্রপক্ষের প্রতিআক্রমণ সুরু হয় ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে সলোমান দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালকানালে। তার পর গত আড়াই বৎসর ধরিয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া মিত্রসেনা আজ খাস জাপানের অতি নিকটে ৩৫০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌছাইতে সমর্থ হইয়াছে। জাপানীদের আশঙ্কা যে অতি শীঘ্রই খাস জাপানেও মিত্রসেনা অবতরণ করিতে পারে।

জাপানের এই গভীর উদ্বেগের কথা উল্লেখ করিয়া সোভিয়েটের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'প্রাভ্‌দা'র সমালোচকও বলিয়াছেন—ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে দ্রুত জাপানের অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকায় জাপ সরকার বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিতেছে।

কাপড়ের রেশনিং সফল করিতে হইবে

(১ পৃঃ পর)

পুলিশের চোখের সামনে তাহারা কি দাপটে চোরাকারবার চালায় তাহা চালের বেলায় সকল লোকেই দেখিয়াছে। কাপড়ের মালিকরা আরও বড়লোক, আরও প্রতিপত্তিশালী, রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের উপরও তাহাদের প্রভাব অসামান্য। তাই মরিয়া হইয়া এবার তাহারা একদিকে আরও কাপড় লুকাইয়া রেশনিং ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক লড়াই আরম্ভ করিয়া সমস্ত দলগুলিকে দিয়া নিজেদের রেশনিং-বিরোধী প্রচার চালাইবার চেষ্টা করিবে। এমনিই লোকে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতায় তিত-বিরক্ত হইয়া আছে। উহার সুবিধা লইয়া তাহারা রেশনিং-বিরোধিতাকেই লীগ-বিরোধিতা বলিয়া সাজাইয়া ধরিবে, গবর্ণমেন্টের মুণ্ডপাত করিয়া "দেশভক্তির" আড়ালে নিজেদের চোরাকারবার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী রাজনৈতিক দল ও নেতারা এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিবেন।

আমরা আগেই খবর দিয়াছিলাম যে সকল দলের মিলিত বস্ত্র-আন্দোলন কমিটিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যোগ দিতে রাজী হন নাই। হিন্দু সভাও এ আন্দোলনে সাড়া দেয় নাই, মিঃ শামসুদ্দীন-হুমায়ুন কবীর প্রমুখ কৃষক-প্রজা নেতাদেরও বড় দেখা যায় নাই।

মাসতুতো ভাইয়েরা

কিন্তু যেদিন সারা কলিকাতায় কাপড়ের খানাতল্লাসী চলিতেছে, হাজার হাজার গাঁট কাপড় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কাছে পাওয়া যাইতেছে। ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাবেলা কলিকাতার দুই পার্কে এক সঙ্গে দু'দুটি মিটিং! শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভা কৃষক-প্রজা ও ফরওয়ার্ড ব্লকী ছাত্রদের দ্বারা আহূত। সারা সভায় সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে শুধু একটি কথা—লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীই বস্ত্রাভাবের জন্য দায়ী, উহাকে দূর কর। অর্থাৎ নাজিমুদ্দীনের বদলে শামসুদ্দীন বা হুমায়ুন কবীর বা সন্তোষ বসু গদীতে বসিলেই লোকের সকল অভাব মিটিয়া যাইবে! ব্যবসায়ীদের কাপড় না ধরিতে পারিলে নাজিমুদ্দীনও কিছু করিতে পারিবেন না, শামসুদ্দীনও না—কিন্তু চোরাবাজার ধ্বংস সম্বন্ধে একটি কথাও সভায় শোনা গেল না। বরং ফরওয়ার্ড ব্লকী কংগ্রেসের এম-এল-এ নিশীথ কুণ্ডু বলিলেন—সাপ্লাই কোথায় যে রেশনিং করিবে? কারবারীরাও ঠিক এই কথা বলিয়াই রেশনিং বানচাল করিতে চায়, চোরাবাজারকে অক্ষয় করিয়া রাখিতে চায়!

আর দেশবন্ধু পার্কে হিন্দু সভার মিটিংয়ে কারবারীদের পক্ষে ওকালতি আরও নির্লজ্জ ভাবে। ব্যারিষ্টার নির্ম্মল চ্যাটার্জি একেবারে পূর্ব্ববর্ণিত "প্রধান" নাগরিক-ব্যবসায়ীদের বিবৃতি কোটেশনে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন ১লা মার্চ্চ হইতে গবর্ণমেন্ট কাপড় ফ্রীজ করিয়া রাখিয়াছে তাই এই বস্ত্রাভাব। শ্রীআশু লাহিড়ী "বিশ্বস্তসূত্রে" ফাঁকা গুজব রটনা করিলেন যে বাংলার কাপড় বর্ম্মায় চালান যাইতেছে। তিনি এবং পতিরাম রায় দুজনেই ইঙ্গিত করিলেন যে কাপড়ের দাম কত তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, পাইলেই হইল। চোরাকারবারীরাও ঠিক এইরূপ ধনী খরিদ্দারের জন্যই কাপড় জোগাড় করিয়া থাকে!

প্রস্তাব গৃহীত হইল: ব্যবসায়ীদের "জমা কাপড় ছাড়িয়া দাও", "ব্যবসায়ী প্রভৃতির সহযোগিতায়, চোরাকারবারের অমঙ্গল রোধ কর" ইত্যাদি। রেশনিং প্রভৃতির কোনো প্রয়োজন নাই! যখন এই প্রস্তাব গৃহীত হইতেছিল ঠিক সেই সময় বড়বাজারে যে সব সাধু ব্যবসায়ী কাপড় নাই বলিয়া লোককে ফিরাইয়া দিয়া থাকেন তাঁহাদের দোকানে গাঁটের পর গাঁট কাপড়ে শীল লাগানো হইতেছিল, সিঁড়ির ধারে, বারান্দার উপর বেওয়ারিস মাল ফেলিয়াই চোরাকারবারী পালাইতেছিল।

পর দিন (সোমবার) বড় বাজারের প্রায় ১০০ বস্ত্র ব্যবসায়ী খানাতল্লাসের প্রতিবাদে অনির্দ্দিষ্ট কাল হরতাল ঘোষণা করিয়া শোভাযাত্রা করিলেন, পুরোভাগে রহিলেন বস্ত্র-কণ্ট্রোল বোর্ডের জয়পুরিয়া, ভিয়ানিওয়ালা ইত্যাদি—এবং হিন্দুসভার শ্রীনির্ম্মল চ্যাটার্জি। সকলের মুখে হিন্দু সভার জয়ধ্বনি, বুকে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে ধ্বংস করিবার মহান সঙ্কল্প—আর অন্তরে একমাত্র কামনা কি করিয়া শীল-করা কাপড়গুলি ফিরাইয়া আনা যায়! শোনা যায় যে বস্ত্রব্যবসায়ের এই চাঁইয়েরা লাটপরিষদের হিন্দু-সভাপন্থী সদস্য শ্রীবাস্তবকে জরুরি তার পাঠাইয়াছেন যাহাতে তিনি আসিয়া কাপড়গুলি আবার এই ব্যবসায়ীদের গর্ভে চালিয়া দেন।

কিন্তু খানাতল্লাস ও রেশনের বিরুদ্ধে এই হরতালের অপচেষ্টায় কলিকাতার অন্যান্য খুচরা ব্যবসায়ীরা কেহই যোগ দেন নাই!

"স্বদেশী" চোরাবাজার

যে মিল মালিকের অক্ষমতা হেতু বস্ত্র উৎপাদন প্রায় চার আনা কমিয়া গিয়াছে, যে চোরাকারবারী সারা বাংলার বস্ত্রহরণ করিয়াছে তাহারাই আজ রেশনিং বানচাল করিবার জন্য প্রাণপণে মিথ্যা গুজব রটাইতেছে যে, বিলাতী কাপড় আমদানী করিয়া দেশী শিল্প ধ্বংস করিবার জন্যই নাকি এই সব কাপড় কণ্ট্রোল ও রেশনিংয়ের ব্যবস্থা। অথচ এই মিল মালিকেরাই অতিরিক্ত লাভের লোভে ভারতবাসীকে বস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় কাপড় চালান দিতেছে। ২৫শে জানুয়ারীর ক্যাপিট্যাল পত্রিকা খবর দিয়াছে:

"অষ্ট্রেলিয়া এখন ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ টন মাল কিনিতেছে, তাহার মধ্যে আছে বিপুল পরিমাণ কাপড়, সুতা, ও তৈরী পোষাক......"

চারিদিক হইতে এমনি ভাবে রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে এবং কারবারীদের স্বপক্ষে প্রচণ্ড শোরগোল উঠিতেছে, লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর ভীষণ চাপ আসিতেছে। মিঃ জসিমুদ্দীন, মালেক প্রভৃতি লীগের সাধারণ সভ্য জনসাধারণের দাবী লইয়া অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী কারবারীদের প্রতি কতখানি মমতা ও দুর্ব্বলতা পোষণ করে তাহা সকলেই জানেন। সকলে মিলিয়া কারবারীদের চক্রান্ত একেবারে ব্যর্থ করিয়া না দিতে পারিলে মন্ত্রীমণ্ডলী আবার কারবারীদের দিকেই ঢলিয়া পড়িবে, চোরাবাজারের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। সুতরাং জনসাধারণ হুঁসিয়ার!

জনগণের কণ্ট্রোল বোর্ড চাই

বস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং আমলাতন্ত্র অধ্যুষিত বস্ত্র-কণ্ট্রোল বোর্ডকে সরাইতে না পারিলে মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা কিছুতেই কমিবে না—কারণ ঐ বোর্ডই ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি। ব্যবসায়ীদের বোর্ড চাই না—কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া এখনই জনপ্রিয় প্রাদেশিক কণ্ট্রোল বোর্ড গঠন করা হউক—ইহাই এই মুহূর্ত্তে সব চেয়ে বড় দাবী। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান না থাকিলে বস্ত্র-রেশনিং কেলেঙ্কারিতে পর্য্যবসিত হইবে, ঘুষখোর আমলাদের সহস্র ছিদ্রপথে হাজার হাজার কাপড় চোরাবাজারে ফিরিয়া যাইবে। খুচরা ব্যবসায়ী মারফৎই বিতরণ করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক এলাকায় জনসাধারণের কমিটি তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। আর কোটা হোল্ডার, পাইকার প্রভৃতি শোষকদের সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

মফঃস্বলে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে বেশী। অথচ শ্রীনলিনী সরকার, জয়পুরিয়া, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, খৈতান, আনন্দি পোদ্দার, রফিক প্রভৃতি শহরের ধনী নাগরিকেরা নির্লজ্জভাবে বলিয়াছেন যে শুধু কলিকাতার লোককে মাথাপিছু ত্রিশ গজ কাপড় দেওয়া হোক—অর্থাৎ মফঃস্বলের মাত্র দশ গজ বরাদ্দ হইতেও কাটিয়া লইয়া এই সব সৌখীন ও অবস্থাপন্ন নাগরিকের সখ মিটানো হোক! (অথচ ইঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যত জামা-কাপড় আছে তাহাতে এক গজও কাপড় না কিনিয়া বহু বৎসর চালাইয়া দেওয়া যায়।) কলিকাতার প্রতিটি দেশভক্ত নাগরিক এই আব্দারে ঘৃণা বোধ করিবেন। কলিকাতায় যাহাদের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন তাহাদের ছাড়া অন্য সকলের জন্য বস্ত্র বিতরণ দিন পনের বন্ধ রাখিয়া মফঃস্বলে কাপড় পাঠাইবার যে প্রস্তাব মিঃ সুহরাবর্দ্দি করিয়াছেন তাহাতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু কাপড় সত্যই মফঃস্বলে যায় কিনা তাহার তদারক করিবে কে? সেজন্য এখনই সকল দেশভক্ত দলের সহযোগিতায় প্রাদেশিক বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পুনর্গঠিত করিয়া তাঁহাদের হাতে তদারকের ভার দেওয়া দরকার। নহিলে শুধু আমলাতন্ত্র বা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর জনসাধারণ বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না, তাঁহাদের ডাকে স্বেচ্ছাত্যাগেও আগাইয়া আসিবে না।

চালের রেশনিং অপেক্ষা কাপড়ের রেশনিং অনেক কঠিন ব্যাপার, কারণ চাহিদার তুলনায় কাপড়ের পরিমাণ বাস্তবিকই কম, জনসাধারণের বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন ও পছন্দ আছে, চালের কারবারীদের তুলনায় বস্ত্রব্যবসায়ীরা অনেক বেশী প্রতিপত্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ। সুতরাং রেশনিংয়ের গলদ-জনিত অসন্তোষ উস্কাইয়া তাহারা রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন জাগাইতে পারিবে। ইহার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবে এবং বাংলার বরাদ্দ বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশব্যাপী বিরাট দাবী তুলিতে হইবে। তবেই বস্ত্রাভাবের সমাধান হইতে পারে।

—ভূপেশ গুপ্ত

Regd. No. C. 2836.

JANAYUDDHA

সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে সকলের সম্বর্দ্ধনা

লেখক :
বি-টি রণদিভে

প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী

কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস-লীগের মিলিত বিজয়ে দেশের মধ্যে যে মিলনের আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই ফলে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের হাতে লীগ মন্ত্রিসভার পরাজয় সত্ত্বেও দেশবাসীর মধ্যে কোনরূপ তিক্ততা দেখা দেয় নাই। দায়িত্বশীল মুসলিম পত্রিকাগুলি বন্ধুভাবে এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য কোন কোন মুসলিম পত্রিকা ইহাকে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অন্যতম চক্রান্ত হিসাবে দেখিয়াছে।

লাহোরের লীগ দৈনিক 'নব-ই-বখ্ত' সীমান্ত প্রদেশের লীগ মন্ত্রিসভাকেই লীগের দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী করিয়া বলিয়াছে :

'পরিষদ সভ্যদের কারারুদ্ধ রাখিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের আশ্রয়ে এতদিন যে মন্ত্রিসভা টিকিয়া ছিল, তাহার বিদায়ে লীগের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না।'

সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের লীগ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ প্রসঙ্গে দিল্লীর লীগ পত্রিকা 'আন্জাম' লিখিয়াছে :

'বর্ত্তমান দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসনের অবসানে কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধিদের সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টই আজ দেশবাসীর কাম্য।'

অন্যান্য প্রগতিশীল ও লীগ সমর্থক পত্রিকায় লীগ মন্ত্রিসভার পতনের জন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ করিলেও সমস্ত পত্রিকাতেই কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতা ও সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

দিল্লীর জমিয়ৎ-উল-উলেমার কংগ্রেস সমর্থক মুখপত্র 'আন্সারী' সীমান্তের নবগঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছে :

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কর্ম্মীরা কংগ্রেসের দলগত মন্ত্রিসভা গঠনের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর হইবে না এবং জাতি সমস্যা ও বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলিম সমস্যারও কোন সমাধান হইবে না। কংগ্রেস ও লীগ মিলিত হইয়া কেন্দ্রে সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ না করিলে ও প্রদেশে প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা না করিলে বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর হওয়ার কোনই আশা নাই।"

কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্টদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম, লীগের প্রতি আমলাতন্ত্রের উদ্ধত ব্যবহার এবং দুর্গত দেশবাসীর সেবার প্রতি লীগ মন্ত্রিসভার বিমুখতা—এই সমস্ত কিছুর ফলেই লীগের কর্ম্মীদের মধ্যে কংগ্রেসের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার নূতন আগ্রহ জাগিয়াছে। লীগের মধ্যে যাঁহাদের সত্যকার আন্তরিকতা আছে তাঁহারা দেখিয়েছেন যে, লীগ মন্ত্রিসভা দুর্নীতি ও চোরাকারবারের বিরুদ্ধে লড়িয়া দেশবাসীর দুর্গতি মোচনের ব্যবস্থা করে নাই এবং কোন একটি দলের মন্ত্রিসভা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। একমাত্র কংগ্রেস লীগের মিলিত শক্তিতেই ইহা সম্ভব। এই জন্যই কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাঁহারা প্রদেশের অচল অবস্থা অবসানের ও কংগ্রেস লীগ মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখিয়াছেন।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের দ্বিধা

কংগ্রেস সমর্থক মাত্র কয়েকটি পত্রিকায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও এমন কি সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠনেরও আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখিলে বলা যায়, একতরফা মনোভাবই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল। কেন্দ্রের নূতন অবস্থার কথা তাঁহাদের মগজে নাই।

তাই ১৭ই মার্চ্চ 'হিন্দুস্থান টাইমস্' লিখিতেছে :

'লীগবহির্ভূত কোন মুসলমান থাকিলে সেই মন্ত্রিসভায় লীগের কোন সভ্য যোগদান করিতে পারিবে না—বোধ হয় লীগের এই নিষেধাজ্ঞার ফলেই ডাঃ খান সাহেব তাঁহার মন্ত্রিসভায় কোন লীগ সভ্যকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে মন্ত্রিসভায় লীগের যোগদানে আমরা খুসী হইতাম।'

জাতীয়তাবাদী প্রায় সমস্ত পত্রিকাই সীমান্তে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণকে অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমোদনের পিছনে যথেষ্ট দ্বিধা ও সঙ্কোচ রহিয়াছে। জনগণের এই বিজয়কে তাঁহারা আমলাতন্ত্রের বিজয় বলিয়া ভুল করিতেছেন। সীমান্তের বিশেষ অবস্থার চাপেই যেন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে—অন্যান্য প্রদেশে ইহার পুনরভিনয় হইবে না। তাই ১৬ই মার্চ্চ দিল্লীর 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণকে শুধুমাত্র 'পার্লামেণ্টারী' কার্য্যে ফিরিয়া যাওয়া ও প্রদেশের বিশেষ অবস্থার চাপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সমস্ত সংবাদপত্রেই আজ এই একই ধরণের কথা—অর্থাৎ, কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকতার পথে ফিরিয়া যাইতেছে এবং ইহাতে জনসাধারণের বদলে গবর্ণমেণ্টেরই লাভ। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে নয়, দেশের ও বিশ্বের জনমতের চাপেই যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিয়াছে, জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্টের অচল অবস্থার নীতিই যে পরাস্ত হইতে চলিয়াছে—সংবাদপত্রগুলি সে সত্য দেখিতে পারে নাই।

বিভেদপন্থীদের গাত্রদাহ

কংগ্রেস সোশালিষ্ট মতবাদী পত্রিকাগুলি খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের নিন্দা করিয়াছে এবং অনেকেরই মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। বোম্বাইয়ের 'লোকমান্য' পত্রিকা লিখিতেছে :

'সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের সহিত সত্য, অহিংসা, গঠনমূলক কার্য্যসূচী, কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী (?) নীতি, সত্যাগ্রহ, খাদি গ্রাম্য কুটির শিল্প, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, সাম্প্রদায়িক ঐক্য অথবা এমন কি সুবিধাবাদিতারও কোন মিল নাই।... শত্রুপক্ষের প্রস্তাবিত সর্ত্তে আত্মবলি দিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিতেছে। ইহা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাতে কোন মঙ্গল নাই।'

আজ জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী যে জনগণের নূতন আন্দোলনেরই প্রতিনিধি—এই সত্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির চোখে পড়িতেছে না। আগাইয়া গিয়া ঘটনার লাগাম হাতে নিতে হইবে, জনগণের দাবী লইয়া লড়িতে হইবে, মিলিত শক্তিতে ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে—বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতায় কংগ্রেস কর্ম্মীরা আজ এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন। পুরানো প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি সমর্থন বজায় রাখা আমলাতন্ত্রের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির বিরোধিতা করা কিম্বা লীগের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের মন্ত্রিত্বের গদীতে টিঁকাইয়া রাখাও তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। কারণ, লীগের কর্ম্মীরা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও জুলুমের বিরুদ্ধে নিজেরাই আজ বিদ্রোহ করিতেছে। তাহারা আজ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হাতে হাত মিলাইতে প্রস্তুত।

আসামে নূতন অবস্থা

আসামে সম্প্রতি লীগ প্রধান মন্ত্রী সাদুল্লার নেতৃত্বে বন্দীমুক্তি, জনগণের খাদ্য ব্যবস্থা ও ভূমি সংক্রান্ত নীতি পরিবর্ত্তনের ভিত্তিতে **কংগ্রেসের সমর্থনে** একাধিক দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এতদিন লীগ মন্ত্রিসভা অত্যাচারী চা-বাগান মালিকদের ভোটের জোরেই টিঁকিয়া ছিল। এমন কি এই মন্ত্রিসভা লীগপন্থীদেরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ এই মন্ত্রিসভা শুধু কংগ্রেসের উপরই যে নানারূপ নির্য্যাতন চালাইয়াছে তাহা নয়, বহু স্থলে লীগের সভাসমিতি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছিল।

কংগ্রেস সমর্থিত আসামের নূতন সম্মিলিত মন্ত্রিসভা দুর্গত দেশবাসীর সেবার এবং কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের ঐক্যের কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য জমি বিলির ব্যাপারে এখনও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোধ হয় নিষ্পত্তি হয় নাই, লীগের এক অংশের মধ্যে এই কারণে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে হয়তো অভিযোগও আছে। তবুও এই ঐক্যের মধ্য দিয়া জনগণের শক্তির কাছে আমলাতন্ত্রের পরাজয়ই সূচিত হইয়াছে।

এমন কি, সিন্ধু প্রদেশের হিদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভাও আজ জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া গণতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। স্বরাষ্ট্র সচিব কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মীকে ইতিমধ্যে মুক্তি দিয়াছেন ও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য কংগ্রেসনেতা জয়রামদাস দৌলতরামের মুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন।

যেখানেই মিলিত প্রচেষ্টা চলিতেছে সেখানেই আমলাতন্ত্রের পরাজয় ঘটিতেছে। আমরা আজ এক আসন্ন পরিবর্ত্তনের মুখে। কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ঐক্যের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে, প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। [পিপ্‌লস ওয়ার হইতে সংক্ষিপ্ত ও সামান্য পরিবর্ত্তিত।—জঃ সঃ]

প্রতিবাদসহ সরকারী আদেশ গৃহীত

কর্পোরেশন সভায় ফরওয়ার্ড ব্লকীদের মিথ্যা আস্ফালন

জনযুদ্ধের বিগত সংখ্যায় আমরা জানাইয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে আদেশ দিয়াছে—কতকগুলি স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বাড়ী ও বস্তীর কর শতকরা আড়াই ভাগ বাড়াইতে হইবে, চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের অধিকাংশ কাজের ভার দিতে হইবে, কর্ম্মচারীদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হাতে দিতে হইবে—নহিলে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশন উঠাইয়া দিবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে কর্পোরেশন ও জনসাধারণের প্রতিবাদের পর গবর্ণমেণ্ট যে নূতন হুকুম দেয় তাহাতে বলা হয় যে স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপরিচালনামূলক সব ব্যবস্থাগুলিই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন না করিলে কর্পোরেশনকে উচ্ছেদ করা হইবে, তবে বাড়ী ও বস্তীর ট্যাক্স বাড়ানো সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন বাধ্যতামূলক আদেশ দিতেছে না, কর্পোরেশন বাড়তি খরচার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

গত ২০শে মার্চ্চ কর্পোরেশনের বাৎসরিক বাজেট প্রস্তাবে স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক গবর্ণমেণ্টের সকল নির্দ্দেশই গ্রহণ করা হয় এবং তাহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়। তাহার পর গত শুক্রবার নূতন আদেশের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের সভায় আলোচনা হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকী "কংগ্রেস" দলের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম মানিবার প্রয়োজন নাই—অর্থাৎ হুকুম না মানার ফলে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের আপত্তি নাই।

গৃহীত প্রস্তাব

ঐ দলেরই দ্বিতীয় অংশের পক্ষ হইতে শ্রীদেবব্রত মুখার্জ্জি প্রস্তাব করেন : গবর্ণমেণ্টের আদেশ আমাদের অধিকারের উপর অন্যায় আক্রমণ। তবে ট্যাক্স বাড়ানোর প্রস্তাব যখন প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং কর্পোরেশন ও গবর্ণমেণ্টে আরও বিবাদ চলিলে সমস্ত ব্যবস্থাই যখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ার সম্ভাবনা তখন আমরা প্রতিবাদ সহকারে এবং বাধ্য হইয়াই গবর্ণমেণ্টের আদেশ গ্রহণ করিতেছি।

দেবব্রত বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কমিউনিষ্ট কাউন্সিলর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন : দেবব্রত বাবু গত মিটিংয়ের সময় গবর্ণমেণ্টের হুকুম মানিব না বলিয়া আবার আজ মানিবার প্রস্তাব আনায় স্বভাবতই মনে হয় যে তাঁহার আপত্তি ছিল শুধু বাড়ীর ট্যাক্স বাড়ানোর বিরুদ্ধে, গবর্ণমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে নয়। বর্ত্তমান আদেশেও গবর্ণমেণ্টের নীতি কিছুমাত্র বদলায় নাই—কারণ ব্যবসা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসানোর প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট আজও সম্মতি দেয় নাই। অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের শুষিয়া কোটিপতি ব্যবসায়ীর স্বার্থকে ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া এবং স্বাস্থ্যোন্নতির আংশিক খরচা বহনে গবর্ণমেণ্টের নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করা—এই দুই বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের দুর্নীতি অব্যাহত আছে। তাছাড়া যোগ্যতম প্রার্থীকে চাকুরী দেওয়া, পুরাতন কর্ম্মীদিগকে প্রমোশন দেওয়া প্রভৃতি নীতির কথা গবর্ণমেণ্ট তুলে নাই—ইহার অর্থ কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ নাই। আর জনসাধারণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া কর্পোরেশনকে আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দিবার অপচেষ্টাও গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে আমরা ঠিক আগের মতই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করি।

কিন্তু তাই বলিয়া হুকুম না মানিয়া কর্পোরেশনের বাকী সমস্ত ক্ষমতাও এই আমলাতন্ত্রের হাতেই তুলিয়া দিতে জনসাধারণ মোটেই প্রস্তুত নয়। সেজন্যই আমরা প্রতিবাদ সহকারে এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের হুকুম মানিতেছি। আমাদের কর্ত্তব্যে অটুট থাকিয়া আমরা যদি বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হুকুম বদলাইতে বাধ্য হইবে।

বাক্যবীরেরা ইস্তফা দিবেন ?

দেবব্রত বাবুর প্রস্তাব ৩৯-২৩ ভোটে গৃহীত হয়। এক সুধীর বাবুর দল ছাড়া বাকী প্রায় সকলেই ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয় যে সুধীর বাবু প্রভৃতি কর্ত্তৃক হুকুম না মানার হুমকি শুধু "বীর" সাজিবার চেষ্টা, আসলে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবের প্রতিবাদে কর্পোরেশন ছাড়িয়া যাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা রাখেন না। এই আদেশ বলবৎ থাকিতে তাঁহারা যদি সত্যই কর্পোরেশনে থাকা অসম্মানজনক মনে করেন, তবে উপরোক্ত প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তাঁহাদের নিজ যুক্তিতে সঙ্গতি রাখার জন্য কর্পোরেশন কাউন্সিলারিতে ইস্তফা দেওয়া উচিত। তাঁহারা এরূপ করিবেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন কি, গবর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে জনসভা করিয়া প্রতিবাদ জানাইবারও তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রথম দিনের সভায় সোমনাথ লাহিড়ী যখন এইরূপ প্রস্তাব করিতে যান তখন সময়াভাবের অজুহাতে তাঁহাকে প্রস্তাবই করিতে দেওয়া হয় না।

শুধু আস্ফালনে জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হয় না—উহাতে বরং দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পায়। কলিকাতা শহরের নাগরিকেরা বুঝে যে ক্ষোভের বশে কর্পোরেশনের সমস্ত ক্ষমতাই আমলাতন্ত্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া নিজেদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করা—ক্ষমতা হাতে রাখিয়া প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত করাই অধিকার রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস :১২: লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

জার্ম্মানীর বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল রুঢ় সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত

★ ভিয়েনার মাত্র ২০ মাইল দূরে লালফৌজ ★

নাৎসী প্রচারসচিব ডাঃ গোয়েবলস 'ডাস রাইখে' এক প্রবন্ধে সম্প্রতি লিখিয়াছেন : 'এই যুদ্ধে আমরা এত কিছু হারাইয়াছি যে, এখন আমাদের সম্মান ও স্বাধীনতা ছাড়া বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।' কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব্ব রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি যে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে নাৎসীনেতাদের স্বাধীনতা'ও আর বেশীদিন অবশিষ্ট থাকিবে না।

পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের অগ্রগতিতে জার্ম্মানীর বিস্তৃত এলাকায় জার্ম্মান সরকারের কর্তৃত্ব আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত। অসংখ্য ছোট বড় জার্ম্মান সৈন্যদল নেতৃত্বহীন অবস্থায় অসহায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জার্ম্মানীর শেষ আত্মরক্ষার বাহ এলব লাইন হইতে মজুত সৈন্যদলকে আনিয়া মিত্রপক্ষের এই অগ্রগতি রোধের চেষ্টা করাই এখন মার্শাল কেসেলরিং-এর একমাত্র ভরসা। বিভিন্ন স্থানে মিত্রপক্ষের সৈন্যদল জার্ম্মানীর মধ্যে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। জেঃ পেটনের সৈন্যদল ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৮,৭৯০ বর্গমাইল জার্ম্মানভূমি ও ৩,০৭২টি ছোটবড় জার্ম্মান শহর দখল করিয়াছে। জেঃ হজেসের ১ম ও ৯ম বাহিনী জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল রুঢ় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। মার্শাল মণ্টগোমারীর নেতৃত্বে বিমানবাহী ষষ্ঠ বাহিনী ডোটমুণ্ড-এমস্ খাল পার হইয়া ওস্নাব্রুক হইতে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লেঙ্গেরিকের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও আমেরিকান সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্যরা মুন্‌ষ্টারে প্রবেশ করিয়াছে।

জার্ম্মানীর মধ্যে আজ ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। বার্লিন হইতে এক অজ্ঞাত স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের খবর আসিয়াছে। গেষ্টাপোর হেড অফিসও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে কনষ্ট্যান্স শহরে অপসারিত হইয়াছে। দলত্যাগী জার্ম্মান সৈন্যরা জার্ম্মান অধিবাসীদেরই ঘরবাড়ী লুট করিতেছে। হিটলার এই দলত্যাগী সৈন্যদের গ্রেপ্তার ও গুলি করার হুকুম দিয়াছে। মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণে যানবাহন ব্যবস্থা আজ এমনভাবে পঙ্গু যে, জার্ম্মান খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যরেশন কমাইয়া দিবার জন্য ঘোষণা জারী করিয়াছে। ২৮শে মার্চ্চ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, রুঢ় এলাকা হইতে শুধু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বেসামরিক পুরুষদেরই অপসারিত করা হইবে। বাকি সকলকে 'সাহসের সহিত' মৃত্যু বরণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সব থেকে মজার ঘটনা, বিখ্যাত জার্ম্মান শহর ম্যানহেম টেলিফোনে মার্কিণ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনেও লালফৌজ নাৎসীদের পলায়নের পিছনের দুয়ার অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ২৫০ মাইল জুড়িয়া রণাঙ্গনে মার্শাল টলবুখিন ও ম্যালিনোভস্কি আক্রমণ চালাইতেছেন। মার্শাল টলবুখিনের সৈন্যদল ভিয়েনা হইতে মাত্র ২০ মাইল এবং ম্যালিনোভস্কির সৈন্যদল ব্রাটিশ্লাভা হইতে সাড়ে ১২ মাইল দূরে। ইহার ফলে, ইতালী ও বল্‌কান রণাঙ্গনের সহিত জার্ম্মানীর যোগাযোগ আজ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম। বাল্টিক রণাঙ্গনে শ্রেষ্ঠ বাল্টিক বন্দর ভিনিয়া ও ডানজিগ আজ লালফৌজের দখলে। পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় মার্শাল ভেসিলেভস্কি কালহারজের হাফেন অন্তরীপে অবরুদ্ধ অবশিষ্ট সৈন্যদলের নিধনে ব্যস্ত। মার্শাল জুকভের অগ্রগতির ফলে জার্ম্মানরা বিখ্যাত ষ্টেটিন বন্দর পরিত্যাগ করিয়াছে।

২রা এপ্রিল মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, সুপ্রীম সোভিয়েট মার্শাল জুকভ, কনিয়েভ এবং রজোসভস্কিকে সর্ব্বোচ্চ সামরিক সম্মান "অর্ডার অব ভিক্টরি" প্রদান করিয়াছে।

২৫শে মার্চ্চ 'ডেলি এক্সপ্রেসের' খবরে প্রকাশ, বড় বড় নাৎসী নেতারা খবরের কাগজে নিজেদের মৃত্যু সংবাদ ছাপাইয়া জার্ম্মানীর বন্ধু স্পেন ও আর্জ্জেণ্টাইনে বাস করিতেছে। যুদ্ধের পর ঐখান হইতে আবার নাৎসী অভ্যুত্থান সংগঠিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মানীর জন্য নরম সন্ধি ও পরাজয়ের পরও নাৎসী ব্যবস্থা টি কাইয়া রাখার জন্য নানা রাষ্ট্রের দিক হইতে চেষ্টা চলিতেছে। ফ্যাশিষ্ট স্পেন ইহাদের পাণ্ডা। নাৎসীদের পক্ষে ওকালতির জন্য শান্তি সম্মেলনে সে আসন পাইবার চেষ্টা করিতেছে; জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়াও সে জাপানকে শাসাইয়াছে। কিন্তু বিশ্বের গণশক্তির চাপে নাৎসীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন চক্রান্তই কাজে লাগিবার আশা নাই।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

গত ৩০শে মার্চ্চ শুক্রবার মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে বিখ্যাত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মৃত্যুতে কমিউনিষ্ট পার্টি একজন বিশিষ্ট দরদী হারাইল। বঙ্গবাসী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে সুরেন্দ্রবাবুর খ্যাতি বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে নিখিল ভারত দার্শনিক সম্মেলনে মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে বিদ্যানুশীলন লইয়াই তিনি ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলী একত্র প্রকাশের ব্যবস্থা তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই আর তাঁহার কল্পিত বহু গ্রন্থই অলিখিত হইয়া রহিল।

কিন্তু বিদ্বান্ বলিলেই অধ্যাপক গোস্বামীর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল অফুরন্ত; কবিত্ব শক্তিও তাঁহার ছিল। প্রবন্ধ লিখনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই যখন প্রথম ভারতবর্ষে প্রগতি লেখক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন তিনি ছিলেন একজন পুরোধা। বাংলার প্রগতি লেখক সংঘের তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক; কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের সময় (১৯৩৮) তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক। "প্রগতি" নামক সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা তিনি করিয়াছিলেন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন তাঁহার কাছে গভীরভাবে ঋণী। বোধ হয় বাংলার এমন জেলা নাই যেখানে তিনি ছাত্রসম্মেলন উপলক্ষে যাইয়া স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার সহিত বক্তৃতা করেন নাই। বাংলার বাহিরেও বহুবার তাঁহার ডাক পড়িত। তিনি সাগ্রহে সাড়াও দিতেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি যখন বে-আইনী, তখন অধ্যাপক গোস্বামী পার্টির সহিত নিবিড় সংযোগ রাখিয়াছিলেন। পার্টির মুখপত্র "গণশক্তির" তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

তাঁহার শরীর কিছুকাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বের মত উৎসাহ লইয়া কাজে নামিতে তিনি পারেন নাই। কিন্তু কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি এত শীঘ্র আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন। বাংলাদেশ সভাই আজ তাহার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি বজ্রমুষ্টি তুলিয়া এক পরমহিতৈষী সহকর্ম্মীর স্মৃতির প্রতি অভিবাদন জানাইতেছে।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব চাই

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বাংলার এখন যা অবস্থা তাহাতে আইন সভার সমস্ত দল একতাবদ্ধ না হইলে ৯৩ ধারার অবসান ঘটিবে না। কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মীমাংসা ছাড়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব হইতে পারে না। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্বই সকল দলের সৎলোকদের একতাবদ্ধ করিয়া চোরাকারবারের সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি-পরায়ণ লোকদের প্রভাব নষ্ট করিতে পারে। দুর্নীতি ও চোরাকারবার দমন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, বাংলার পুনর্গঠন, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর রেশন প্রথা প্রভৃতি দাবী হইবে সর্ব্বদলীয় ঐক্যের ভিত্তি। এই দাবী কার্য্যকরী করিবার জন্য যে যে দল প্রস্তুত, তাহারা সকলেই একতাবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করুক। কংগ্রেস এবং লীগ যদি নিজেদের মীমাংসা করিয়া লয় তাহা হইলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মন্ত্রীদের নামের তালিকা ঠিক করা যাইতে পারে।

বাংলার লীগ প্রতিনিধিরা জিন্না সাহেবের কাছে যান। জিন্না সাহেবের নিকট হইতে অনুমতি আনুন যে, বাংলার বিশেষ অবস্থা স্মরণ করিয়া বাংলার লীগকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দেওয়া হউক। বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিরা গান্ধীজীর নিকট হইতে অনুমতি আনুন যে, কংগ্রেসকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক। কংগ্রেস এবং লীগ যদি এক সঙ্গে মন্ত্রীসভার ভিতর থাকে তাহা হইলে কোন দুর্নীতি মাথা উঁচু করিতে পারিবে না। মন্ত্রীসভার সকল দলের ভাল লোকদের একত্র করা হইলে সকল দলের ভিতরকার মন্দ লোকদের মন্দ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইবে, সকল দল একত্র হইলে ৯৩ ধারার অবসান ঘটিবে এবং মজুতদার সায়েস্তা হইবে। আজ বাংলার কোন দলের পক্ষে ৯৩ ধারার অবসানের চেয়ে বড় নীতি আর কিছু হইতে পারে না।

আসামের চিঠি] [বীরেশ মিশ্র

নূতন মন্ত্রিসভার কৃতিত্ব ও দুর্ব্বলতা

আসামে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ করিয়া কংগ্রেস সমর্থিত সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় আসাম ৯৩ ধারার দুর্ভাবনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে এবং নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্র তথা ইয়োরোপীয়ানদের বাধা তুচ্ছ করিয়া জনস্বার্থ মূলক কাজ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতেছে তাহা সকলেই জানেন। এই ঐক্য সাধনে শ্রীযুক্ত বড়দলই স্যর সাদুল্লা, শ্রীরোহিণী চৌধুরী প্রভৃতির কৃতিত্বের কথাও সকলে জানিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন যাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও চেষ্টা নহিলে এই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইতেই পারিত না।

সকলের প্রথমে নাম করিতে হয় স্বতন্ত্র মুসলিম দলের নেতা আলি হায়দর খাঁ সাহেবের। ইনি জাতীয়তাবাদী মুসলিম। আপোষ-আলোচনা চলিতে চলিতে তদানীন্তন সাদুল্লা মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীনবকুমার দত্ত যখন ইস্তফা দিয়া শ্রীযুক্ত বড়দলই প্রভৃতিদের সঙ্গে যোগ দেন তখন সাদুল্লার বিরোধী পক্ষই দলে ভারী। সুতরাং তাহারা ইচ্ছা করিলে লীগকে বাদ দিয়া শুধু কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে পারিতেন এবং সেরূপ মন্ত্রীমণ্ডলীতে আলি হায়দর খাঁ সাহেবের দল অন্ততঃ তিনটী মন্ত্রিত্বপদ পাইতে পারিতেন। কিন্তু আলি হায়দর সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্য না হইলে জনসাধারণের স্বার্থ পূরণ করা যাইবে না। সেজন্য তিনি মন্ত্রিত্বের আশা প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেই উদ্যোগী হইয়া ঐক্য সাধনে মধ্যস্থতা করেন। কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীরবীন্দ্র আদিত্য, শ্রীরোহিণী চৌধুরী প্রভৃতিও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন ও দৃঢ়তা দেখান।

লীগ পক্ষের মধ্যেও আপোষের বিরোধিতা যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া ইমিগ্রেণ্ট (আসামের বাহির হইতে আগত) সদস্যদের মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত সর্ত্ত লইয়া বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ ঐ সর্ত্ত অনুসারে ১৯৩৭ সালের পরে যাহারা আসামে আসিয়াছে তাহাদিগকে জমি দিবার কথা নাই। লীগের সভাপতি (ইমিগ্রেণ্ট) আবদুল হামিদ খান অধিবেশনের সময় বরাবরই অনুপস্থিত ছিলেন। আপোষ আলোচনা সম্বন্ধে লীগ দলের সভায় ইমিগ্রেণ্ট সদস্য মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী এই কারণে আপোষের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু সুরমা উপত্যকার অন্যান্য লীগ সদস্য, বিশেষতঃ মোঃ আবদুল বারি, মকবুল হুসেন, আবদুর রহমান প্রভৃতি দৃঢ়রূপে আপোষ সমর্থন করেন—ফলে ২৭·৮ ভোটে আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই অধিবেশনেরই গোড়ার দিকে সাদুল্লা সাহেব সভা-সমিতির অধিকার, বন্দী মুক্তি প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আপোষের পর এই সমস্ত প্রস্তাবই তাঁহাকে মানিতে হইল এবং বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়াও আরম্ভ করিতে হইল। যে-মন্ত্রীর অতীতে যে-দুর্ব্বলতাই থাকুক ঐক্যের শক্তির কাছে তাহাকে আপন দুর্ব্বলতা এই ভাবেই ছাড়িয়া চলিতে হইবে। এমন কি সকলের চাপে ও উপহাসে পড়িয়া ইয়োরোপীয়ান দল পর্য্যন্ত ঘোষণা করিল যে তাহারা 'সিভিল লিবার্টির বিরোধী নয়'!

আপোষ চুক্তি এই ভাবেই সফল হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহার এখনও একটী বড় দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে—তাহা হইল ভূমি বণ্টন সমস্যা। এই সম্বন্ধে যে সর্ত্ত গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে লীগ পক্ষ এখনও মুখ খুলেন নাই।

লীগের-পক্ষে এইরূপ মনোভাব লীগের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। ইতিমধ্যেই মুসলীম লীগ দল তাহাদের নীতির ফলে অপর দলগুলি হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে নবগঠিত কংগ্রেস কোয়ালিশন ও স্বতন্ত্র মুসলীম দলে প্রায় সমস্ত সভ্যেরা যোগ দিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়াছেন।

কংগ্রেস ও অপরাপর দলও ভূমিবণ্টন নীতি সম্পর্কে যদি আরও উদার মনোভাব না অবলম্বন করেন তবে আসামের বর্ত্তমান ঐক্য টিকিতে পারে না। যদিও তাঁহারা বর্ত্তমানে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়াছেন, তথাপি রফার ভিতর দিয়া না গেলে ভূমিবণ্টন নীতি প্রদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও উন্নতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে।

আশার কথা যে, শ্রীযুক্ত বড়দলই তাঁহার এসেম্বলি বক্তৃতায় ভূমি সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর আপোষের মনোভাব দেখাইয়াছেন। তবে আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে মুসলিম লীগ দলের মধ্যে কিছুটা নৈরাশ্য দেখা গিয়াছে, তাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহারা হারিয়া গিয়াছেন। আবার কংগ্রেস কোয়ালিশন দলের অনেকে ভাবিতেছেন—পরবর্ত্তী পদক্ষেপেই তাঁহারা কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। (বর্ত্তমানে কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভায় কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই যদিও নবগঠিত মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন)।

কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলৈ এই সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন তাহাতে মনে হয় আসামে কংগ্রেস লীগের ঐক্য আরও দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা। বিগত ২৭শে মার্চ্চ তারিখেই গোয়ালপাড়া সহরে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, "যতদিন পর্য্যন্ত মুসলিম লীগ আপোষের সর্ত্ত পালন করিয়া চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস বর্ত্তমান ঐক্যকে ব্যাহত হইতে দিবে না।"

কিন্তু উভয় পক্ষে যতইচ্ছা থাকুক না কেন, ভূমিবণ্টন নীতি সম্পর্কে যদি মুসলিম লীগ আপোষের মনোভাব গ্রহণ না করে, এবং কংগ্রেসপক্ষ যদি আরও অগ্রসর হইয়া না আসে তবে আসামে সম্মিলিত মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নহে। ভরসা এই—ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগ পক্ষ তাঁহাদের নীতির দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য মৌলবী আবদুল মতিন সাহেব প্রথমে মন্ত্রীসভায় পদগ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও ইমিগ্রেণ্ট সভ্যদের চাপে শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন। যদি এই মন্ত্রীসভা সম্মিলিত ভাবে কাজ করিয়া যায় তবে আপোষের আবহাওয়া আরও অনুকূল হইয়া উঠিবে—এই আশা সকলেই পোষণ করিতেছেন।

"বৃটেনের উপনিবেশ বলিয়াই ভারতের বিকাশ রুদ্ধ"

ভারতের দুরবস্থা সম্বন্ধে সোভিয়েট পত্রিকা

'দি ওয়ার এণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস' পত্রিকায় এ, ডিয়াকভের প্রবন্ধ

[**"দি ওয়ার এণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস"** নামক সোভিয়েট রুশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা সম্প্রতি ভারত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে—"বর্ত্তমান দিনে ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে কোথা হইতে বাধা আসিতেছে ?" এবং উহার জবাব দিয়া লিখিয়াছে :—

'যাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্ব্বলতার জন্য ভারতবাসীর বিশেষ কোন জাতীয় গঠন, জাতীয় চরিত্রের কোন বিশেষত্ব অথবা ভারতবাসীর মনোবৃত্তি ইত্যাদিই দায়ী—যে কোন সত্যকার গণতন্ত্রীই তাঁহাদের এই অপব্যাখ্যার বিরোধিতা করিবেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত আজও ভারতবর্ষ বৃটেনের উপনিবেশ হইয়া আছে—দেশের এই চরম পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক অবস্থাই যে ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার মূল ও প্রধান কারণ, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক স্বীকার করিবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর আজ এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপানো আছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ধরণের ব্যবস্থা ইউরোপের কোন দেশেই ছিল না। কাজেই স্বভাবতই এই ধরণের সেকেলে রাজনৈতিক প্রথায় বহু দিন হইতেই ভারতীয় জনসাধারণের বিকাশ ব্যাহত হইতেছিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে, একদিকে বাহির হইতে চাপানো আবদ্ধ সামাজিক জীবন এবং অন্যদিকে ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে যে ধরণের সংগ্রাম বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত অন্যান্য কোন দেশের সংগ্রামের মিল নাই। ভারতের বিকাশের নিরুদ্ধগতি দুর্ণিবার করার জন্য এবং দেশকে স্বাধীন বিকাশের পথে অগ্রসর করার জন্য যে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন ও ধারা অবিরাম চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের উপরও আজ পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব অনুভূত হইতেছে।'

এই প্রবন্ধের মাত্র এক লাইন ভারতবর্ষের কাগজগুলিতে পৌঁছিয়াছে। আমরা উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের আগে ভারত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অংশ অনুবাদ করিয়া নীচে দিলাম।]

বিরাট ঐতিহ্য যে দেশের

পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ও বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশ বরাবরই সমগ্র সভ্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। এই দেশ এতই বিরাট যে, দুনিয়ার সর্ব্ববৃহৎ উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও, ইহাকে যথার্থই উপমহাদেশ বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে ভারতবর্ষ এক বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী দেশ। জনসংখ্যার দিক হইতে প্রায় ৪০ কোটী অধিবাসীর এই দেশ অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। ইউরোপীয়েরা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষকে অসম্ভব সম্পদশালী দেশ হিসাবে দেখিয়া আসিয়াছে। ইউরোপের দেশগুলি হইতে স্বার্থান্বেষীর দল ভারতবর্ষের উপর বহুবার যুদ্ধ অভিযান চালাইয়াছে। যে সমস্ত মনীষী প্রাচ্যে বিশ্বজ্ঞানের চাবিকাঠি খুঁজিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের দিকেই তাঁহাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছেন। বহু প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে এক অতি উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—অন্যান্য সভ্যদেশের মানসিক বিকাশে এই সংস্কৃতি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ তাহার অতীত গৌরব, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল এবং বিপুল সম্ভাবনার তুলনায় আজ আধুনিক সমাজের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এত বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিশাল দেশ যে বহুগুণ অনগ্রসর, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আক্রমণকারীর দল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলির উপর আজ যে যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে, সেই যুদ্ধের অবস্থাতেই খুব বেশী করিয়া ভারতবর্ষের এই অসঙ্গতি চোখে পড়িতেছে। বৃটিশ ও আমেরিকান পত্রিকায়, পার্লামেণ্টের বিতর্ক ইত্যাদিতে যুদ্ধের গোড়া হইতেই ভারতের যে সমস্ত সমস্যার উপর প্রচুর আলোচনা চলিতেছে, তাহার মূলেও যে এই অসঙ্গতির কথাই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ ও আমেরিকান পত্রিকায় বার বার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্যের মিত্রপক্ষের সামরিক ও অর্থনৈতিক ঘাঁটি হিসাবে ভারতবর্ষকেই কাজে লাগাইতে হইবে। সম্প্রতি বৃটিশ এবং বিশেষ করিয়া আমেরিকান কাগজগুলি বেশী করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যুদ্ধের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থা তীব্র ভাবে ধরা পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের উৎপাদনশক্তি অনুন্নত অবস্থায় থাকার ফলে কি শান্তিকালে, কি যুদ্ধাবস্থায়—কোন সময়ই এই দেশের জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিতে পারে না। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের এই অর্থনৈতিক দৈন্য বিশেষভাবে প্রকট।

শিল্পোৎপাদন

ক্যানাডার মোট জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ আর ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৪০ কোটী। অথচ ক্যানাডা ও ভারতবর্ষ সমান পরিমাণ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি তৈরীর শিল্প আজও কি অবস্থায় পড়িয়া আছে। যুদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষে ইস্পাত উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এমন কি ৯০ লক্ষ জনসংখ্যাযুক্ত বেলজিয়ামে যুদ্ধের পূর্ব্বেও যে পরিমাণ উৎপাদন হইত, তাহার তুলনায় ইহা অনেক কম। সূতাকল শিল্পই ভারতের প্রধান শিল্প; কিন্তু এমন কি এই সূতাকলগুলিও ভারতবাসীর অতি সামান্য পরিমাণ চাহিদাও সম্পূর্ণ মিটাইতে পারে না। ইহা সত্য যে, যুদ্ধের ফলে ভারতের কতকগুলি শিল্পবিভাগে উৎপাদন বাড়িয়াছে। বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও গোলাবারুদের উৎপাদন এখন কিছুটা সুসংগঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ, জুতা, তাঁবু, ছাতা প্রভৃতি সরবরাহ হইতেছে। একটী কেমিক্যাল কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিমান মেরামতের একটী কারখানাও তৈরী হইয়াছে। কিন্তু বৃটীশ ও আমেরিকান পত্রিকা হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষ তাহার নিজের বিমান, ট্যাঙ্ক ও মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারে না—কারণ, ভারতবর্ষে ইঞ্জিন তৈরী হয় না।

কৃষির অবস্থা

ভারতবর্ষে শিল্পজাত ও কৃষিজাত উৎপাদনের অনুপাত লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনের দৈন্য সহজেই ধরা পড়িবে। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ১৯৪৩-এর ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার হিসাবে ভারতের মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগ হইতেছে শিল্পজাত এবং বাকি চার ভাগই হইতেছে কৃষিজাত।

শিল্পোন্নতির অভাবে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইয়া আছে। জনসংখ্যার বেশীর ভাগেরই জীবিকা কৃষিকাজ। ভূমিদাসপ্রথা দ্বারা শৃঙ্খলিত ভারতের কৃষিব্যবস্থা আজও মান্ধাতার আমলেই থাকিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের কৃষিব্যবস্থায় কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। ভারতের সরকারী হিসাব মতে, ১৯২৯-৩০ হইতে ১৯৩৮-৩৯ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে আবাদী জমির পরিমাণ ত' বাড়েই নাই বরং ২২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬১ হাজার একরের জায়গায় জমির পরিমাণ কমিয়া এখন ২০ কোটি ৯৪ লক্ষ একরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বিশেষ ভাবে কমিয়াছে ধানের আবাদী জমির পরিমাণ (৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৪ হাজার একরের জায়গায় এখন ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৮ হাজার একর); এবং বাংলা বিহার প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রদেশে চালই হইতেছে প্রধান খাদ্যদ্রব্য। তুলা, পাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাঁচা মাল আবাদের ক্ষেত্রেও বহু পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনও মোট প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক কম।

ভারতের কৃষির এই দুরবস্থার জন্য দায়ী অনাবৃষ্টি, বন্যা কিম্বা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা প্রভৃতি কোন দৈবদুর্ব্বিপাক নয়। ভারতের জলবায়ু কৃষির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল; কৃষিক্ষেত্রগুলিরও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে; মানুষের জানা সমস্ত রকম শস্যই প্রায় এই কৃষিক্ষেত্রগুলিতে চাষ হইতে পারে। বহু প্রদেশে একই জমিতে বছরে দুইবার করিয়া ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে জমিতে সেচের জলের জন্য বড় বড় নদী আছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনগত যে সেকেলে সম্পর্ক আজও পর্য্যন্ত বজায় আছে—তাহাই ভারতের কৃষিব্যবস্থার এই দৈন্যের কারণ। আবাদী জমি চাষ করে ছোট ছোট কৃষক—ইহাদের অধিকাংশেরই চাষোপযোগী গরু নিজেদের নাই; চাষের প্রণালী উন্নত করা, জমির উর্ব্বরতা সাধন অথবা চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার—এর কোনটাই তাহারা আশাই করিতে পারে না। ভারতীয় কৃষকেরা যাহা রোজগার করে তাহার প্রায় সবটাই যায় মহাজন ও জমিদারের হাতে—ফলে, পরবর্ত্তী ফসল ঘরে তোলা পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ রাখার জন্য আবার তাহাকে মহাজনের কাছেই কর্জ্জ করিতে ছুটিতে হয়।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার কোন পথে

এই অবস্থার মধ্যে ভারতের কৃষিব্যবস্থা যে যুদ্ধের চাপ সহ্য করিতে পারে নাই, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি থাকিতে পারে। প্রাচ্যে শুধু মিত্রপক্ষের সৈন্যদের জন্যই রসদ সরবরাহে ভারতবর্ষের যে অসামর্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই নয়, স্বদেশবাসীর মুখেও ভারতবর্ষ অন্ন যোগাইতে পারে নাই। কৃষিব্যবস্থার চূড়ান্ত অধোগতি এবং বাহির হইতে চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য আমদানীতে ঘাটতির ফলে দেশের কয়েকটি প্রধান প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বাংলায়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের সংবাদে গ্রেট বৃটেনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে তাহা বোঝা যায়; কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য যে সমস্ত পন্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা বাহ্য প্রলেপ ভিন্ন কিছুই নহে। ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষের মূল কারণ দূর হইবে না; এবং এই মূল কারণই হইতেছে এই যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আগাগোড়াই মান্ধাতা আমলের।

সাংস্কৃতিক দৈন্য

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং তাহার অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকে তাকাইলে বলিতে হয়, সভ্য সমাজে যে আসন তাহার পাওয়া উচিত ছিল, সে আসন ভারতবর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের শুধু চরম নিরক্ষরতার কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি না—বিশ্বের সংস্কৃতি ইতিহাসে একদিন যে দেশের বিরাট দান ছিল, আজকের সভ্যতায় সেই দেশ একেবারে রিক্ত। নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলিও তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টি দিয়া আধুনিক সাহিত্যকে যতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছে, বিরাট একটি উপমহাদেশ হইয়াও ভারতবর্ষ তাহা করিতে পারে নাই। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের অন্যান্য বিভাগগুলিতেও আজ এই একই দৈন্য। ভারতবর্ষের খুবই কম কবি, লেখক ও মনীষী পৃথিবীজোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে কিসের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক উন্নতি এই ভাবে রুদ্ধ হইয়া আছে ?

[এই প্রশ্নের জবাব বর্ত্তমান অনুবাদের উপক্রমণিকাতেই ছাপা হইয়াছে, সেখানে দেখুন। তাহার পর মূল প্রবন্ধটীতে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দল, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, অচল অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ভারত যদি তাহার রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করিতে পারে ও জাতি-কুল-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাম্যের গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী দেশগুলির মধ্যে ভারতের উপযুক্ত স্থান অর্জ্জিত হইবে। আমরা ভবিষ্যতে এই অংশগুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব—জঃ সঃ]

সোভিয়েটে ভারতীয় সংস্কৃতি

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন আমন্ত্রিত

সোভিয়েট দেশবাসীর জন্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সোভিয়েটের বিশিষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দিবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বক্তাদের আমন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ইতিমধ্যেই লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিভাগের ভার গ্রহণের আমন্ত্রণ পাইয়া লেনিনগ্রাদ যাইবার পথে তেহেরাণ পৌঁছাইয়াছেন। রাহুলজী ভারতবর্ষের শুধু একজন মহাপণ্ডিতই নহেন, কমিউনিষ্ট নেতা হিসাবে ভারতের কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া তিনি একাধিকবার কারাবরণ করিয়াছেন এবং কারাগারে থাকিয়া গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি হিন্দী ভাষায় গণ-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

আগামী সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' বন্ধ

পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে

১৯শে এপ্রিল

নিখিল ভারত কৃষক সভার নেত্রকোণা অধিবেশনের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার, ১২ই এপ্রিল, 'জনযুদ্ধ' বন্ধ থাকিবে। পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫।—ম্যানেজার, 'জনযুদ্ধ'

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২ঃ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

নিখিল ভারত কৃষক সভার নবম অধিবেশন ★

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪৮-৪৯শ সংখ্যা] ১৯শে এপ্রিল, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ৬ই বৈশাখ '৫২ [দাম ছয় পয়সা

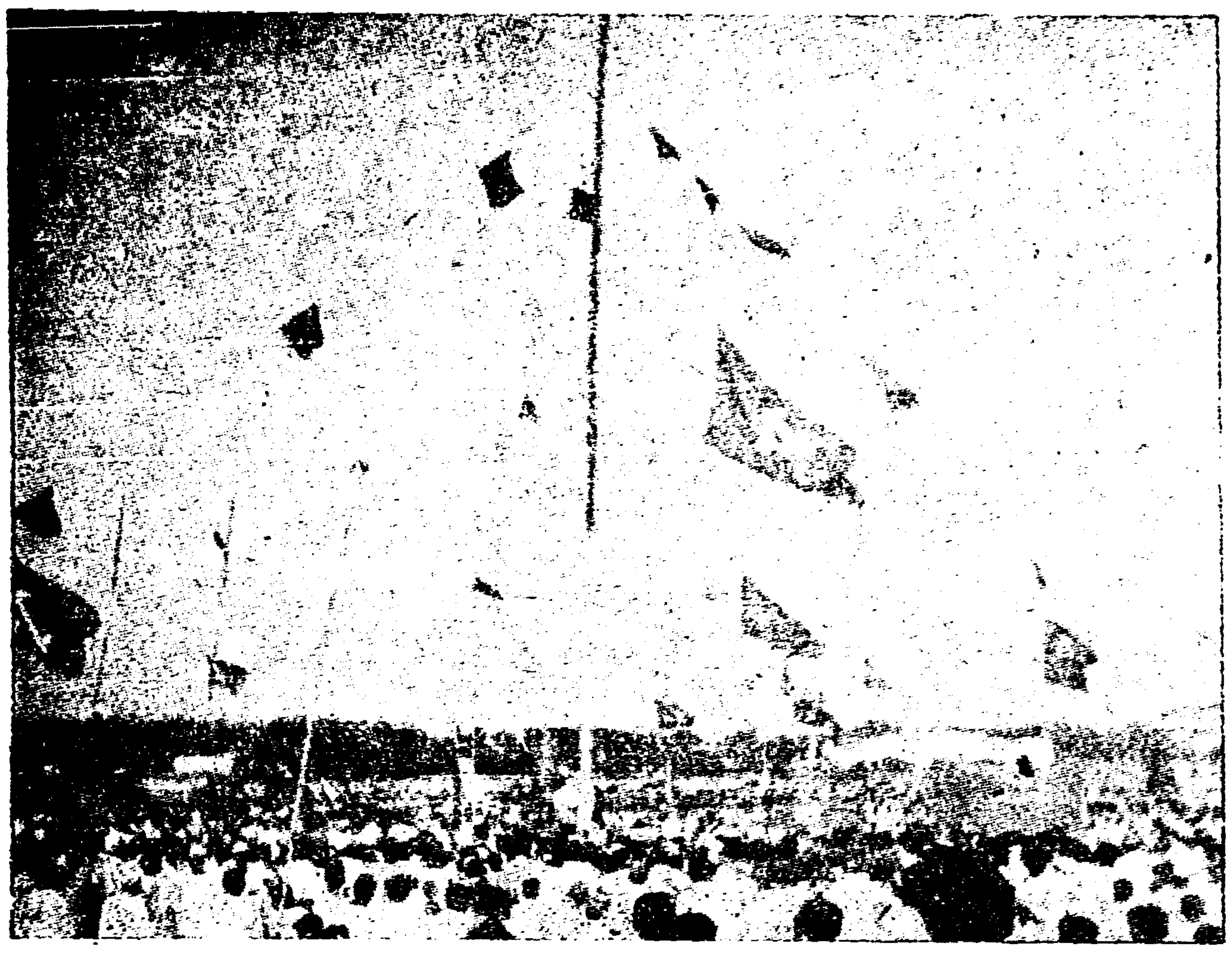

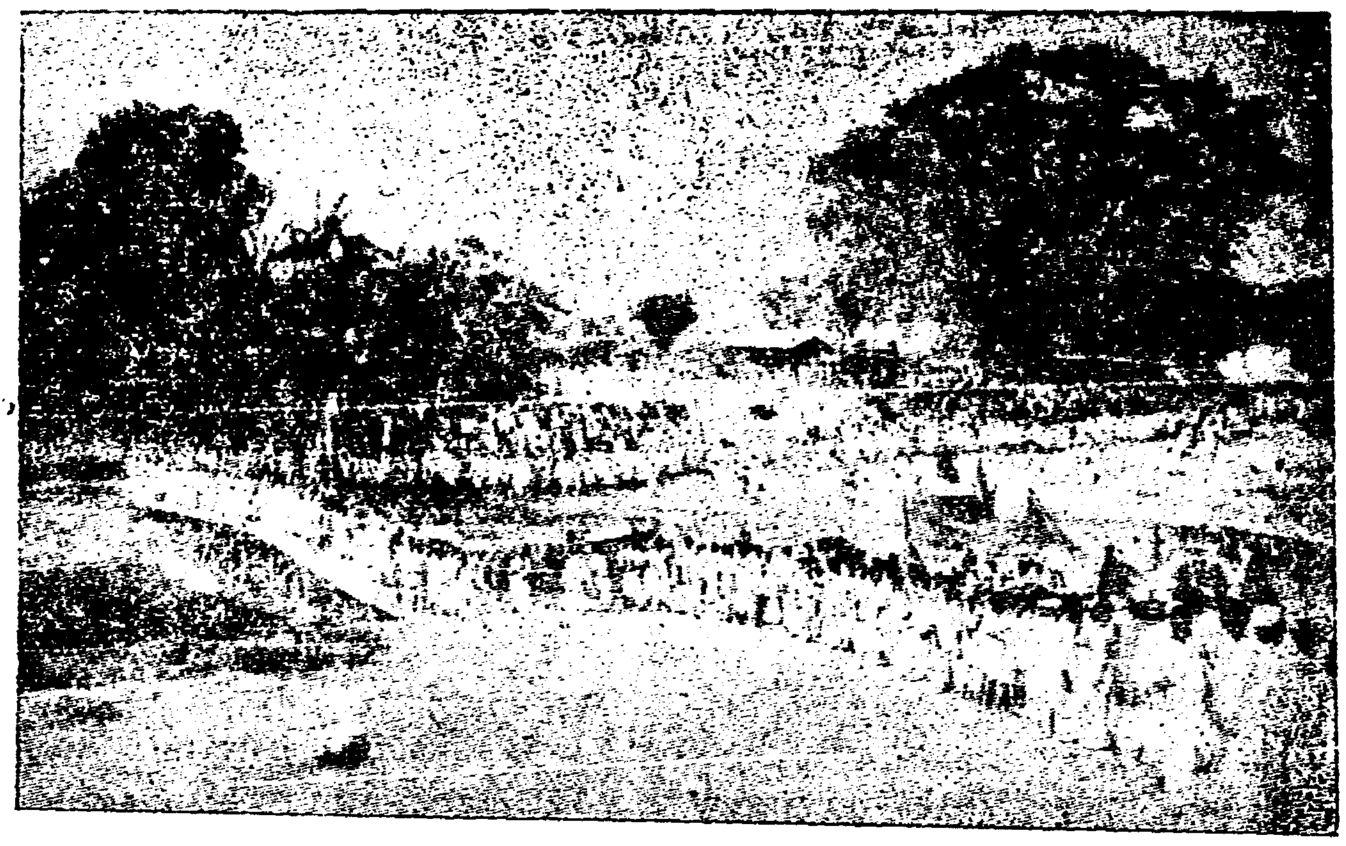

এই সংখ্যায়

● ৪ পৃঃ দেখুন ●

—সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা—

নেত্রকোণায় লক্ষ চাষীর মেলা

ছবি : নীরদ মজুমদার

ফটো : শৈলেন ব্যানার্জ্জী, সুনীল সেন

★ চিত্র পরিচয় ★

বাঁ দিকে

১। নবনির্ব্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক—মুজফ্‌ফর আহম্মদ ও বঙ্কিম মুখার্জ্জী

২ পতাকা উত্তোলন

৩। বালি গ্রামের আব্দর রহমান

ডান দিকে

১। শোভাযাত্রা

২। মেয়েদের তাঁত প্রদর্শনী

৩। মঞ্চসজ্জায় শিল্পীরা

বড়বাজার হইতে কাপড় উদ্ধারের পর

জনগণের নূতন জয় ● ব্যাপারীদের নূতন ষড়যন্ত্র

কলিকাতার বড় বড় কাপড়ের দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া ২০ হাজার গাঁইট কাপড় যেদিন আটক করা হয়, সেইদিন কাপড়ের চোরাকারবারীরা সাঙ্ঘাতিক রকমে আঘাত পায়। তাহার ধকল সামলাইতে না সামলাইতে তাহারা আর এক আঘাত পাইয়াছে।

গত ৫ই এপ্রিল বাংলা সরকার বস্ত্র বণ্টনের জন্য একটি সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, নারী সেবাসঙ্ঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, জনরক্ষা সমিতি, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই সম্মেলনে সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই ৩০ জনের ভিতর ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ী আর সবাই বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি। এই কমিটির কাজ চালাইবার জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির কাজ হইবে (১) চোরাবাজার দমন করা, (২) কাপড় বিতরণ ব্যবস্থায় সরকারকে সাহায্য করা, (৩) অবিলম্বে যাহাদের কাপড়ের দরকার সবচেয়ে বেশী তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা (৪) খুচরা দোকানের তালিকা অনুমোদন করা।

কলিকাতা সহরে এই সব কাজ পরিচালনার জন্য ২০০ টি এলাকায় ২০০ টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি-মূলক কমিটি তৈরী করা আরম্ভ হইয়াছে। এই সব কমিটি তৈরীর ভার পড়িয়াছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গঠিত একটি সাব-কমিটির উপর। জনগণের প্রতিনিধিরা বিপুল উদ্যমে বিভিন্ন এলাকায় কমিটি তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কমিটিগুলি কাজ আরম্ভ করিলে সরকার কর্ত্তৃক কাপড় বিতরণ করা আরম্ভ হইবে।

এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে বাংলার বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থায় যুগান্তর আসিবে। এতদিন সরকারী বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থার জন্য ২৬ জন লোক লইয়া একটি পরামর্শদাতা কমিটি ছিল। এই কমিটির সদস্যদের ভিতর মাত্র ৯ জন ছিলেন জনগণের পক্ষের লোক, ১২ জন ছিলেন বড় বড় বস্ত্র ব্যবসায়ী আর ৫ জন ছিলেন কাপড় কলের মালিকদের পক্ষের লোক। কায়েমী স্বার্থ লইয়া গঠিত এই কমিটি বাংলার কাপড় চোরাবাজারের দখলে রাখিয়া দিয়াছিল। কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দমন করিবার জন্য যখন দেশময় ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে, তখন সরকার কাপড়ের ব্যাপারীদের দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া ২০০০০ গাঁইট কাপড় উদ্ধার করে, এই ২০০০০ গাঁইটের মধ্যে মাত্র ৪০০০ গাঁইট ছিল সরকারের আগে হইতে শীল করা কাপড় আর বাকি ১৬০০০ গাঁইট বেআইনীভাবে মজুত করা ছিল। এই কাপড় এখন জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে আসিতেছে।

৫ই এপ্রিলের সর্ব্বদলীয় সম্মেলন বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। এই দিনে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় কাপড় বিতরণের ক্ষমতা মজুতদারের হাত হইতে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে আসিতেছে। গত তিন মাস ধরিয়া সর্ব্বদলীয় বস্ত্র আন্দোলন কমিটি এই দাবীই করিয়া আসিতেছিল, এই দাবীর উপর কলিকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় সহস্র সহস্র নরনারীর গণ সমাবেশ হইয়া গিয়াছে, নূতন বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা সেই আন্দোলনেরই জয়লব্ধ ফল।

কিন্তু চোরাকারবারীরা এখনও হাল ছাড়িয়া দেয় নাই, যাহারা চোরাকারবারীদের প্রশ্রয় দেয় তাহারা এখনও চোরাকারবারীর প্রভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা চালাইতেছে।

৫ই এপ্রিল সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে যখন প্রস্তাব উঠে যে, খুচরা দোকান মনোনীত করার ভার জনগণের এই কমিটির উপর দেওয়া হউক, তখন তাহার প্রবল বিরোধিতা করেন হামিদুল হক চৌধুরী। ইনি মুসলীম লীগের সদস্য হিসাবে কমিটিতে গেলেও আসলে তিনি ব্যাপারীদের লোক। তিনি শালিমার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর একজন অংশীদার। এই [illegible]াবে তিনি ব্যাপারীদের স্বার্থ অনুযায়ী দাবী করেন যে দোকান মনোনীত করার ভার সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতেই থাকুক। কমিটির ভিতর তিনি সমর্থন পান শুধু এক জনের, তিনি স্বনামধন্য ইস্পাহানি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত কাপড় বিলির জন্য দোকান মনোনীত করার ভার সর্ব্বদলীয় কমিটিকেই দিয়াছে, এইখানেই চোরাকারবারীদের হইল সব চেয়ে বড় পরাজয়।

এই ঘটনায় সমস্ত ব্যাপারীমহলে হৃৎকম্প উঠিয়াছে। একে ত কাপড়ের রেশনিং হইবে, তাহার উপর দোকান মনোনীত করার ভার সর্ব্বদলীয় কমিটির উপর। চোরাকারবারের উপর এত বড় শক্ত আঘাত বাংলায় চোরাকারবারের উৎপত্তির পর আজ পর্য্যন্ত আর আসে নাই। তাই ব্যবসায়ীদের সমস্ত আক্রোশ পড়িয়াছে সর্ব্বদলীয় কমিটির উপর।

বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত আই, বি, সেন সর্ব্বদলীয় সভার ঠিক দুই দিন পর অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে সর্ব্বদলীয় কমিটির পরিবর্ত্তন দাবী করিয়া বলিয়াছেন—

"এই কেন্দ্রীয় কমিটি এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা হউক যাহাতে সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ হয় ব্যাপারীদের প্রতিনিধি। এই ব্যাপারীদের মনোনয়ন করিবার ভার দেওয়া হউক চেম্বার অব কমার্সের উপর। এক তৃতীয়াংশ সদস্য সাধারণ লোকের ভিতর হইতে সরকার মনোনীত করুন। যাহারা কোন পার্টিতে নাই এমন লোক আসাই বাঞ্ছনীয়। বাকি এক তৃতীয়াংশ মনোনয়ন করা হউক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে।"

অর্থাৎ এই ভদ্রলোকটি চান যে আগেকার মত আবার জয়পুরিয়া, ভোজনগরওয়ালারাই আসিয়া কমিটি করুন, বসন্তলাল মুরারকা, ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতির হাতে দোকান নির্ব্বাচনের ও বিক্রয় তত্ত্বাবধানের ভার থাকাতে ব্যাপারীরা বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। যাহারা ঘুষ লয় না তাহাদের হাতে দোকান মনোনীত করা এবং দোকান তদ্বির করার ভার, ব্যাপারীদের চিন্তার বিষয়!

কিন্তু সর্ব্বদলীয় কমিটির মজবুত ঐক্য ব্যাপারীদের হতাশ করিয়াছে। ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ভেলডি সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, শুনা যায় বড় ব্যাপারীদের ডাকেই নাকি তাঁহার আগমন। আর সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাঁহারা ভেলডির শরণাপন্ন হইয়াছেন কারণ ইনি ব্যাপারীদের পক্ষপাতী এবং এঁর ক্ষমতাও প্রচুর। বাংলার ব্যাপারীরা এখন নাকি ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছেন যে অন্ততঃপক্ষে কাপড় বিতরণের সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয় টেক্সটাইল এডভাইসরি বোর্ডের হাতে দেওয়া হউক। এই বোর্ডটিতে কলের মালিকদের প্রভাব রহিয়াছে. এই বোর্ডের হাতে ক্ষমতা গেলে বাংলার চোরাকারবারীরা সেখান হইতে প্রসাদ আহরণ করিতে পারিবেন—এই তাঁহাদের আশা। কিন্তু ব্যাপারীদের আর সমস্ত আশা যেমন গত হইয়াছে, এই আশাও তেমনি গত হইবে যদি সর্ব্বদলীয় কমিটির ঐক্য অটুট থাকে এবং পাড়ায় পাড়ায় সকল দলের সমর্থনে জনগণের কমিটি তৈরী হয়।

এ বিষয়ে ভেদপন্থীরা ব্যাপারীদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন এবং সে চেষ্টারও তাঁহারা ত্রুটি করিতেছেন না। হিন্দু মহাসভারও কোন কোন নেতা কোন কোন পাড়ায় তাঁহাদের মনগড়া কমিটি তৈরী করিয়া সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠনে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সুধীর রায় চৌধুরী তাঁহার দলবল লইয়া ৩নং ওয়ার্ডে কমিটি গঠনের সভায় রীতিমত হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের নিজদলের একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীরাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাহারাও এ, আর, পি কর্ম্মচারীদের দিয়া ৭২টি কমিটি গঠন করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বদলীয় কমিটির প্রাণপণ চেষ্টায় মহাসভা, সুধীর রায় চৌধুরী ও এ, আর, পির গড়া মেকি কমিটিগুলি অনুমোদিত হয় নাই। সর্ব্বদলীয় সহযোগিতায় পাড়ায় পাড়ায় প্রতিনিধিমূলক কমিটি গড়াই তাঁহাদের লক্ষ্য, ভেদপন্থীরা চেষ্টা করিতেছে দলগত কমিটি তৈরী করিতে। সর্ব্বদলীয় কমিটির চেষ্টায় ১৪টি ওয়ার্ডে স্থানীয় কমিটি তৈরী হইয়াছে, ভেদপন্থীদের গোলযোগে বাকি সব ওয়ার্ডে এখনও কোন কমিটি তৈরী হয় নাই। কিন্তু জনসাধারণ কাপড় চায়, ব্যাপারী ও ভেদপন্থীদের চক্রান্ত টিকিবে না, অবিলম্বে সমস্ত ওয়ার্ডেই কমিটি তৈরী হইবে।

এদিকে গভর্ণমেণ্ট আর এক দরজা দিয়া কাপড়ের আড়তে বড় বড় ব্যাপারীদের ঢুকাইতেছেন। আটক করা কাপড়ের গাঁইটগুলি উদ্ধার করিয়া তাঁহারা ৪ জন হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টের হাতে দিতেছেন, তাহাদের বলিয়াছেন দোকানীদের দাম দিয়া কাপড়গুলির দখল লইতে। এই হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের মনোনীত করিয়াছে সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং এদের কেউ কেউ বড় বড় কাপড়ের ব্যাপারী। কলিকাতা ক্লথ এজেন্সি হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের একজন, এবং সেই কোম্পানির একজন অংশীদার মাংতুরাম জয়পুরিয়া। ইনি কাপড়ের একজন মস্ত বড় ব্যাপারী এবং বড়বাজারে যেদিন কাপড় ধরা হয় তার পরদিন ইনি অগ্রণী হইয়া ব্যাপারীদের হরতাল করান। এহেন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা হইল না, বরং তাহারই কোম্পানিকে আবার কাপড়ের জিম্মাদার করা হইয়াছে।

সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে এখনও পর্য্যন্ত কাপড় রেশনিংএর আয়োজন আরম্ভ করা হয় নাই। সরকারী মতিগতি দেখিয়া মনে হয় রেশনিং আরম্ভ হইবার এখনও দেরী আছে। রেশনিং এ যত দেরী হইবে ততই লোকের দুরবস্থা বাড়িবে। কর্ত্তৃপক্ষ রেশনিং আরম্ভ করিতে গড়িমসি করিতেছেন এইজন্য যে উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় এখনও হাতে আসে নাই। বাংলার জন্য ১০ গজ করিয়া কাপড় বরাদ্দ আছে, এপ্রিল ও মে মাসের জন্য ১২ গজ করিয়া কাপড় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা লইয়া রেশনিং করিলে মাথা পিছু সম্বৎসরের জন্য এক জোড়া ধুতি কিংবা এক জোড়া শাড়ী দেওয়া হইবে।

কিন্তু কাপড়ের পরিমাণ বাড়াইবার যে পন্থা সরকারের হাতে আছে সে পন্থা গভর্ণমেণ্ট এখনও আরম্ভ করে নাই।

প্রথমতঃ কাপড় মজুতের সমস্ত আড্ডায় এখনও খানাতল্লাসী করা হয় নাই, একবার কয়েকটি জায়গায় মজুতবিরোধী অভিযান চালাইয়াই কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত আছেন। মজুত এখনও আরও অনেক জায়গায় আছে। সেগুলি ধরিয়া বাহির করা হউক।

দ্বিতীয়তঃ সৈন্যদের জন্য ৭৫ কোটি গজ এবং ৬০ কোটি গজ ভারতের বাহিরে রপ্তানির জন্য যে বরাদ্দ আছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করা হউক। বিদেশের এবং সৈন্যদের চাহিদা বিলাতী কাপড় দিয়া মিটাইলে আমাদের দেশের বেসামরিক জনসাধারণ মাথাপিছু মোট ১৬ গজ করিয়া দেশী কাপড় পাইবে।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য সমান পরিমাণ কাপড়ের সরবরাহ করিলে বাংলার ভাগে কাপড় কিছু বাড়িবে, দুর্ভিক্ষের সময় সকল প্রদেশের জন্য সমান ভাগ করাই যুক্তিসঙ্গত।

বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতেই কাপড়ের দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকারের সংবাদ আসিতেছে। কলিকাতার জন্য যতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, মফঃস্বলের জন্য তাহাও হয় নাই। বড়বাজারের আটক করা কাপড় হইতে ১০,০০০ গাঁইট মফঃস্বলে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু মফঃস্বলের কোথাও জনগণের কমিটি নাই। এস, ডি, ও-দের কাছে কাপড় পাঠান হইতেছে এবং এস, ডি, ও-দের বলা হইতেছে খুচরা দোকানদার মনোনীত করিয়া লইতে। এই ব্যবস্থা হইলে যে কাপড় মফঃস্বলে যাইবে তাহাও চোরাবাজারে অদৃশ্য হইবে। প্রত্যেক জেলায় কলিকাতার মত সর্ব্বদলীয় কমিটি চাই, এই কমিটির তত্ত্বাবধানে কাপড় বিলির ব্যবস্থা চাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলে আরও তাড়াতাড়ি কাপড় পাঠান দরকার। সারা বাংলার জন্য অবিলম্বে কাপড়ের রীতিমত রেশনিং করিতেই হইবে। যে গণআন্দোলন কাপড় বণ্টনের জন্য জনগণের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা আদায় করিয়াছে, সেই গণআন্দোলনের জোরেই সারা বাংলার জন্য অবিলম্বে কাপড়ের রেশনিং আদায় করিতে হইবে।

—ভবানী সেন

সম্পাদকীয়

সাধারণ নির্ব্বাচন চাই

বাংলার উপর ৯৩ ধারার শাসন অটল হইয়া রহিল। লীগ নেতারা এখনও ভাবিতেছেন আইনতঃ তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব অব্যাহত আছে, যখনই লাট সাহেব ৯৩ ধারার অবসান ঘটাইবেন তখনই আপনা হইতে লীগ মন্ত্রীত্ব কাজে বহাল হইবে। এ চিন্তা তাহারাই করিতে পারে যাহারা বাস্তবের প্রতি একেবারে অন্ধ। ৯৩ ধারার অবসান আজ আর আপনা-আপনি ঘটিবে না, লাট সাহেব স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

কংগ্রেসনেতাদের চিন্তাধারাও ঠিক লীগের মত, তাঁহারাও বলিতেছেন—যদি সম্ভব হয় লীগকে লইয়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব গড়িব; যদি তাহা সম্ভব না হয় লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের মন্ত্রীত্ব সমর্থন করিব। তাঁহারাও ভুলিয়া যাইতেছেন যে এখন আর শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গড়িতে পারিলেই মন্ত্রীত্ব পাওয়া যাইবে না, আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া আনিতে পারিলে তবেই মন্ত্রীত্ব গঠন সম্ভব।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে আমরা যে ক্ষমতা পাইয়াছি তাহা খুবই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তবু সকল দলই স্বীকার করিবেন যে নিজেদের মন্ত্রীত্ব গঠন করিতে পারিলে জনগণের সেবা করার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। আজ সেই সুযোগ বন্ধ হইয়াছে, আইন সভার সীমাবদ্ধ অধিকার হইতেও দেশবাসী বঞ্চিত হইয়াছে। আইন সভার ভিতর কংগ্রেস আর লীগ দুই দিকে দল পাকাইয়াছে আর সংঘর্ষ চালাইয়াছে, সেই সুযোগই লাট সাহেবকে সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিতে সাহায্য করিয়াছে। একথা আজ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট যে কংগ্রেস এবং লীগকেই সমবেত ভাবে সেই ক্ষমতা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আইন সভার অন্যান্য দলের কথা ধরি না কারণ আইন সভার বাহিরে বাংলার জাতীয় জীবনে তাহাদের স্থান খুবই সঙ্কীর্ণ।

যাহারা জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধি নয় তাহারাই প্রচুর সংখ্যায় আইন সভার ভিতর আছে এবং তাহারাই আত্মগত সুবিধার খাতিরে কখনও এদল কখনও ওদল ঘুরিয়া বাংলার আইন সভাটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই আইন সভার নির্ব্বাচন হইয়াছিল ৮ বৎসর আগে। গত ৮ বৎসরের ভিতর দেশে বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বর্ত্তমান আইনসভা সেই পরিবর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

তাই আজ অবিলম্বে চাই সাধারণ নির্ব্বাচন। কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধ ভাবে জনকল্যাণের জন্য, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য, বাংলার দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত সমাজ নতুন করিয়া গড়িবার জন্য এবং দুর্নীতি ও চোরাকারবার নির্ম্মূল করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হউন। ৯৩ ধারা অবসানের প্রধান অস্ত্র সাধারণ নির্ব্বাচন। আমরা চাই যে এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধ ভাবে আইন সভার অধিকার ফিরাইয়া আনিবেন। একবার সাধারণ নির্ব্বাচন হইলে দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপর ঘুষখোর সুবিধাবাদীদের পরাস্ত করিয়া সাচ্চা স্বদেশভক্তরাই জনগণের সমর্থনে নূতন আইন সভা গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

আইন সভার ভিতর প্রত্যেক দলই সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের কথা বলিতেছেন কিন্তু কার্য্যতঃ প্রত্যেক দলই দলগত মন্ত্রীত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ও আমলাতন্ত্র সাধারণ নির্ব্বাচন বন্ধ করিয়া আইন সভার ভিতর দলগত সংঘর্ষকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার সাধারণ নির্ব্বাচন।

সাধারণ নির্ব্বাচনের স্বার্থ যেমন কংগ্রেসের তেমনি লীগের। কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হইয়া শক্তিশালী সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন। কংগ্রেস এবং লীগ একতাবদ্ধভাবে সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য দেশময় আন্দোলন চালাইলে আমলাতন্ত্র তাহার কাছে পরাস্ত হইতে বাধ্য।

জনযুদ্ধের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী ৩রা মে 'জনযুদ্ধের' বার্ষিক সংখ্যা বাহির হইবে। দাম দুই আনা। প্রত্যেক এজেণ্ট অবিলম্বে অর্ডার দিন।

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ

আমলাতন্ত্রের আশ্রিত ঘৃণ্য মজুতদারদের ধ্বংস ক

কংগ্রেস-লীগ-কিষাণসভার ঐক্যেই তা সম্ভব

★

নেত্রকোণা সারা ভারত কৃ সম্মেলনে কমিউনিষ্ট নেত পি-সি জোশীর বক্তৃতার সারাংশ

★

পি-সি-জোশী

কিষাণ সভা বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠান

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে আমি আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। কমিউনিষ্ট পার্টি সকল শ্রেণীর ভিতর কাজ করে। আমার বলতে গর্ব্ব বোধ হচ্ছে যে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যদের তিন ভাগের এক ভাগ কিষাণদের মধ্য থেকে এসেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি কিষাণ সভা গড়ে তুলেছে, তার জন্যও আমি গর্ব্বিত।

কংগ্রেস এবং লীগকে বাদ দিলে কিষাণ সভা জনগণের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। গৌরবে এবং মর্য্যাদায় তাদের সমান না হতে পারে, কিন্তু তাদের কোনটাতেই এমনভাবে সমসংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান একত্রে যোগ দেয় না।

শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন? আমাদের দেশ ভারতবর্ষ শতসহস্র রকমে অত্যাচারিত, তার মাঝে সব চেয়ে অত্যাচারিত আবার ভারতের নারীসমাজ। এখানে যাঁরা এসেছেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ হলেন মেয়েরা। তাঁরা এসেছেন তাঁদের মুক্তির সন্ধানে—কেননা কিষাণ সভা শুধু কিষাণদেরই সংগঠিত করে না, নারী সমাজকেও সংগঠিত করে।

আপনারা এখানে বাংলার কিষাণদের সমাবেশ ও শক্তি দেখছেন। ঠিক এই ছবিই দেখতে পাবেন ভারতের প্রতি প্রদেশে। যেখানেই যে গ্রামে কিষাণ সভা ঢুকেছে, সেখানেই প্রতিটি পরিবার কিষাণ সভার মাঝে এসেছে। হিন্দু, মুসলমান, ছুত, অচ্ছুত, হরিজন সবাই এসেছে।

দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই

গত দুই বছরে বাংলার সর্ব্বপ্রধান দুটি ঘটনা দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি। এ দুটিরই আঘাত কিষাণদের উপর পড়েছে বেশি, কিষাণরাই মরেছে বেশি সংখ্যায়, তাই কিষাণ সভা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যেরা ছড়িয়ে পড়েছে লঙ্গরখানায়, চালের সারিতে, হাসপাতালে, যেভাবেই তারা কিষাণদের বাঁচাতে পারে, কিষাণদের একটু সুখসুবিধা আনতে পারে, তা করতে তারা কসুর করেনি। কিষাণ সভার আহ্বানে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনে ৪।৫টি জেলায় বাংলার কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁধ বেঁধেছে, ৮।১০টি জেলায় খাল কেটে জল নিকাশ করেছে। এইভাবে এক লাখ বিঘা পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে, ৫।৬ লক্ষ মণ বেশি ধান ফলেছে। এইরকম আপনারা দেখতে পাবেন ভারতের সব প্রদেশেই।

সমাজের একটি শ্রেণী যখন সংগঠিত হয়, তখন সমাজের চেহারা বদলায়। আজও আপনারা তাই দেখতে পাবেন। আগে গ্রামের যুবকেরা গাইত অশ্লীল গান, ধর্ম্মসংগীতের চলতি ছিল গ্রামে, আজ আপনারা গ্রামের যুবকদের মুখে যে গান শুনবেন, তাতে আছে কিষাণদের সমস্যার, তাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা, আছে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কথা। এইভাবে গ্রাম-সমাজে আনন্দের ধারা ফিরে আসছে, নাচ-গান কবিতার ভিতর দিয়েই নূতন সমাজ-সেবার আদর্শ জেগে উঠছে।

আপনারা জানেন, কিষাণসভার শত্রুও আছে। কিষাণসভাকে একটি মজবুত প্রতিষ্ঠানে গঠিত হতে দেখে অনেক ভদ্রলোকেরা বলছেন, কিষাণসভা কমিউনিষ্টদের পকেটে। এ কথা মিথ্যা। সত্য বটে কিষাণসভার মাঝে কমিউনিষ্টদের প্রভাব সব চেয়ে বেশি, আর তার কারণ হোল কমিউনিষ্টরা কিষ সেবা করেছে সব চেয়ে বেশি, দুঃখের দিনে এর মাঝে তারা কিষাণদের পাশে দাঁড়িয়ে ল কিন্তু কিষাণসভা কিষাণদের হাতে গড়া বহু ক্ষতি, বহু লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে তারা তুলেছে।

মজুতদারদের শায়েস্তা কর

আজ ঝগড়ায়, বাদবিসম্বাদে কো হবে না, বরং অনর্থই বাড়বে। বি বাংলায়। এখানে বস্ত্রসংকট চরমে উঠে মজুতদারের রাজত্ব অবাধে চলেছে। এই বাংলা তারা ৪৫ লক্ষ লোককে মেরেছে, ৬ কোটি লোককে উলংগ করে রাখতে চাইছে। তাদের লোভের অন্ত নেই, এমন কি তারা মেয়ে বিক্রি ব্যবসায় পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছে। এরা নারী সমাজের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এদের আজ অসাধারণ ক্ষমতা। রেলওয়ে কর্ম্মচারী, মাঝিমাল্লা, কুলি এদের হাতধরা। এরা সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশ করে।

তাই এদের ঘায়েল করতে হলে জোর লড়াই করতে হবে। শুধু কি তাই? এরা আমলাতন্ত্রকেও এদের পেছনে খাড়া করেছে। এদের সাথে পাল্লা দেওয়া, এদের নিশ্চিহ্ন করা শুধু কি এক দলের কাজ? আজ এগিয়ে আসতে হবে সব দলের—কংগ্রেস, লীগ, কিষাণসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি আর যত দল আছে সবারই। সকলেরই একজোট হয়ে এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে কাজে নামতে হবে। তবেই ত এদের এবং এদের আশ্রয়দাতা আমলাতন্ত্রকে কাবু করা সম্ভব। আজ যদি মুসলিম লীগ মুসলমান মজুতদারের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে, কংগ্রেসের চোখ খুলবে, কংগ্রেস আরো এগিয়ে আসবে। তেমনি কংগ্রেসও য মজুতদার ঘায়েলে লেগে যায়, মুসলিম লীগও থাকতে পারবে না, এগিয়ে আসবে। ফলে প্রতিষ্ঠানেরই শক্তি বাড়বে, বাংলায় আবার হাওয়া বইবে। তাই আমার দুই দলেরই সমস্ত দেশভক্তদের কাছে আবেদন, এগিয়ে আপনারা, বাংলায় মজুতদারি রাজত্ব শেষ ক বাঙ্গালীকে বাঁচান, সোনার বাংলা আজ মধ্যযু বর্ব্বরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে উদ্ধার করুন।

★ অন্ধ্রের গৌরবময় কৃষক আন্দোলন ★

নেত্রকোণা ডেলিগেট অধিবেশনে পি সুন্দরাইয়ার বক্তৃতা

★ পতিত জমি উদ্ধার

পতিত জমি যাতে কৃষকের হাতে আসে অন্ধ্র প্রদেশে প্রথমেই তার ব্যবস্থা হ'ল। সেচ অঞ্চলে ছিটে ফোঁটা যেখানে যা জমি আছে, কৃষক সমিতি গ্রামের জমিহীন ক্ষেতমজুর আর গরীব কৃষকদের মধ্যে সেই সমস্ত জমি বিলি করতে চেষ্টা ক'রল। কৃষকেরা যদি জমিতে চাষ করে তবে জমির স্বত্ব তাদেরই হাতে চলে যাবে—এই ছিল জমিদারদের ভয়। কৃষকেরা জমিস্বত্বের আইন বদলাবার জন্যে জোর আন্দোলন আরম্ভ ক'রল। ফলে, আইন বদলালো। কিন্তু পতিত জমি কৃষকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে সরকার জমিদারকে বাধ্য ক'রল না, জমিদারের মর্জ্জির ওপর ছেড়ে দিল। অনেক জমিদার কৃষক সমিতির হাতে জমি ছেড়ে দিল। আবার অনেকে নিজের তাঁবের লোকদের জমি দিয়ে কৃষক সমিতি ভেঙে দেবার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হ'ল। নতুন নতুন জমিতে বিরাট ভাবে চাষ শুরু হ'ল।

ক্ষেত মজুরদের মধ্যে সমবায় সমিতি দানা বেঁধে উঠল। নতুন জমিতে পাকাপাকি ভাবে খাই-খালাসী স্বত্ব পাবার জন্যে আন্দোলন শুরু হ'ল।

যে আইনের ফলে মাদ্রাজ প্রদেশের দু হাজার গ্রামের কৃষক দখলী স্বত্ব হারিয়েছিল, সে আইন বদলাবার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে' উঠল। আইন বদলে গেল। কৃষকদের সমবেত শক্তির কাছে সরকারকে হার মানতে হ'ল। নতুন নতুন এলাকায় তুষানলের মত কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে প'ড়ল। রঙ্গপন্থীদের (যারা অন্ধ্রে কৃষক সমিতির বিরোধী সংগঠণ খাড়া করেছে) আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত কৃষক সমিতিতে এসে যোগ দিল। কিন্তু শুধু জমি পেলেই হয় না, জমি চাষ করবারও অনেক সমস্যা আছে।

খাল কাটা

বাংলা দেশ কিম্বা মালাবারের মত অন্ধ্র প্রদেশে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য নেই। সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলেও উপযুক্ত জল পাওয়া যায় না। পশ্চিমাংশের জেলাগুলিতে তাই দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। তাই সেচ-ব্যবস্থাই হচ্ছে এখানে কৃষির প্রাণ।

রয়ালাসিমা জেলা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১০ হাজার বর্গমাইল। এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের রিলিফ বাবদ গত দুশো বছরে বৃটিশ সরকার দুশো কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু সেচ ব্যবস্থার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করেনি। গত বেজওয়াদায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষক সমিতি এই অঞ্চলে ৯ মাইল লম্বা খাল কেটে ১০ হাজার একর নতুন জমিতে জলের ব্যবস্থা করেছে। কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা মাত্র অল্পদিনের আয়োজনে ১ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করেছে। এমন কি মেয়েরাও এসে একদিন এই কাজে হাত লাগায়। মাত্র একদিন—কিন্তু এই একদিনেই তাদের সমাজের দীর্ঘ দিনের অন্ধ সংস্কার খসে পড়ল। এর আগে কৃষকের ঘরের মেয়েরা মাঠে কখনও কাজ করত না। এবার সমাজের সে নিষেধ উঠে গেল। আজ কৃষকের বধূ, কৃষকের মেয়ে নিঃসঙ্কোচে মাঠে দাঁড়িয়ে ধান বোনে, ফসল কাটে। ক্ষেতমজুরের অভাব অনেকটা দূর হয়েছে, মেয়েরা স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। তাই অন্ধ্রের কৃষক মেয়েরা কৃষক সমিতিকে প্রাণ ভরে আজ আশীর্ব্বাদ করে।

নতুন জাগরণ

গ্রামে গ্রামে আজ সাড়া জেগেছে। খাল কাটা আর পুকুর সংস্কারের কাজে কৃষকেরা উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে। শুধু কৃষ্ণা জেলাতেই ৩৭টা খাল কাটা হয়েছে। তাছাড়া অসংখ্য পুকুরও সংস্কার করা হয়েছে। কৃষকেরা দলে দলে বিনা মজুরীতে যখন জমিদারদের পুকুর কাটতে নেমে পড়ে, তখন জমিদাররা লজ্জায় পড়ে পুকুর সংস্কারের সমস্ত খরচ বহন করতে বাধ্য হয়। অন্ধ্রের কৃষকেরা শুধু দাবী জানিয়ে বসে থাকে না। কি করে কাজ করিয়ে নিতে হয়, সে কৌশল তারা জানে।

তাই সরকারকেও তারা নত ক'রতে পেরেছে। সরকারী কৃষি বিভাগ আজ কৃষকদের রায়ত সমিতিকে ডেকে তাদের মতামত ধৈর্য্য ধ'রে শোনে, কৃষি পরিকল্পনাগুলি কাজে লাগানোর জন্য সাহায্য চায়। সরকারী পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের দুর্নীতিও আজ কৃষক সমিতি অনেক পরিমাণে দূর করতে পারছে। তাই ঘুঁষখোর কর্ম্মচারীরা আজ কৃষক সমিতিকে যমের মত ভয় করে। সরকার কৃষক সমিতিকে তুচ্ছ দেখতে পারে না। কিন্তু সেই কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদেরই সেচব্যবস্থার পরামর্শদাতা সরকারী কমিটিতে বাধ্য হ'য়ে নিতে হয়েছে।

আগে সরকারী বহু স্কীমই কাজে লাগানোর অভাবে দপ্তরবন্দী হ'য়ে থাকত। আজ কৃষকেরা

অন্ধ্র কৃষকের প্রিয়তম নেতা সুন্দরাইয়া

এই সমস্ত সরকারী স্কীম অনেক বেশী নিজেদের কাজে লাগাতে পারছে। দ্বিতীয়ত, আগে সরকারী বরাদ্দ টাকার অর্দ্ধেক যেত ঠিকাদারদের পকেটে, কাজ হ'ত অর্দ্ধেক। যেখানে যেখানে কৃষক সমিতি এই কাজ হাতে নিয়েছে সেখানে কাজ হ'য়েছে ঠিকাদারদের দু'গুণ। কৃষি বিভাগের কর্ত্তারা পর্য্যন্ত এ সমস্ত দেখেশুনে অবাক হয়েছে। কৃষকদের শক্তি দেখে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চোখও কপালে উঠেছে।

চোরাবাজার জব্দ

এ ছাড়াও কৃষক সমিতির মারফৎ কৃষিবিভাগ থেকে আদায় করা ১৪ লক্ষ টাকা'র সার এবং ৬ হাজার মণ বীজ কৃষকদের মধ্যে বিলি হয়েছে।

কৃষি বিভাগ থেকে সার আদায় ক'রে কৃষক সমিতি আজ কৃষকদের মধ্যে সমবায় ভাণ্ডার মারফৎ বাঁধা দামে সার বিলি করছে। যারা এতদিন অগ্নিমূল্যে কৃষকদের মধ্যে চোরাবাজারে সার বিক্রি ক'রে এসেছে, যেসব কর্ম্মচারী আগে মোটা ঘুঁষ আদায় করত, তারা আজ কৃষক সমিতির হাতেই শায়েস্তা হচ্ছে।

সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যেও এসব দেখেশুনে উৎসাহ এসেছে। এতদিন তারা ছিল সরকারের একটা অবজ্ঞাত বিভাগ। আজ এই বিভাগের এত গুরুত্ব দেখে তাদের মধ্যে উদ্যোগ বেড়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশে লোহার যন্ত্রপাতির বেজায় অভাব। কিন্তু চোরাবাজার থেকে এ সমস্ত উদ্ধার ক'রে অন্ধ্রের কৃষক সমিতি কৃষি বিভাগ ও সমবায় সমিতি মারফৎ অর্দ্ধেক মাল গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে। বেজওয়াদার ভি, রেড্ডির মত যারা অন্ধ্রের চোরাকারবারী তারা কৃষক সমিতিকে ঘৃণা করে, কিন্তু অন্ধ্রের লক্ষ লক্ষ কৃষক আজ কৃষক সমিতিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

কৃষক সমিতি আজকাল জেলায় জেলায়, তালুকে তালুকে পশুপ্রদর্শনী ও সেচ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর জন্য কৃষকদের মধ্যে পুরস্কারও বিতরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কৃষকেরা যাতে হাঁস মুর্গী পালন ক'রে, ঘি মাখন তৈরী ক'রে এবং তরিতরকারি বুনে অতিরিক্ত কিছু রোজগার করতে পারে তার জন্যেও কৃষক সমিতি থেকে চেষ্টা চলছে।

নতুন সংস্কৃতি

এই ভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক জীবন সুসংগঠিত করার ফলে অন্ধ্রের কৃষকদের সাংস্কৃতিক জীবনও আজ বহুগুণ বিকশিত হতে চলেছে। কৃষক সমিতির সংস্কৃতি উৎসবে বুরাকাথার পাঁচালী শুনতে আর পল্লীনৃত্য দেখতে রথযাত্রার মত ভীড় হয়। এই সমস্ত গানে গ্রাম্য কুসংস্কারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করা হয়। কৃষকেরা দেখে শুনে মুগ্ধ হয়। আগে আগে নববর্ষ, নবান্ন, দশহরা প্রভৃতি উৎসবে জুয়া খেলা, মদ্যপান, মুর্গীর লড়াই ইত্যাদির চল ছিল। আজ সেখানে ধারা বদলে গেছে। এখন খেলাধুলা, পাঠাগার, নৈশ বিদ্যালয়, জনসেবা ইত্যাদি ত সংস্কৃতি জীবনে নতুন প্রেরণা দিচ্ছে!

সারা ভারত কৃষক সম্মেলন ঃ লক্ষ চাষীর মেলা

নেত্রকোণা নাগরার মাঠে বাঁশের শহরের জীবনকাহিনী

[সোমনাথ লাহিড়ী]

…ণ ভারতের মালাবারে এবার সারা ভারত কৃষক সভার এই নবম অধিবেশন হবার কথা ছিল। কিন্তু …র তা নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। তাই শেষ মুহূর্ত্তে ঠিক হ'ল, নেত্রকোণায় কনফারেন্স হবে। মাত্র তিন …ময়, হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলতে হবে, প্রচার করতে হবে। লক্ষ লোকের সম্মেলন, গড়ে হবে বিরাট মণ্ডপ। সারা ভারতের প্রতিনিধিরা আসবে, দূর গ্রামাঞ্চল থেকে আসবে হাজার কৃষকের মিছিল—তাদের আহার চাই, বাসস্থান চাই। ময়মনসিংহের কৃষককর্মীরা …লার কৃষক সভা এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ময়মনসিংহ মুসলমানপ্রধান জেলা, স্বভাবতই মুসলমান কৃষকদের ওপর কৃষক সমিতির প্রভাব …ত কম। তারওপর ঠিক মাসখানেক আগে এল স্বামী সহজানন্দের ভেদপ্রচেষ্টা; সমস্ত …ড় অনেক কংগ্রেসকর্মী বলতে আরম্ভ করলেন, কৃষক সভা কৃষকদের সংগঠন নয়, …ইদের গুঁওতা মাত্র। তাতে কংগ্রেসভক্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও কৃষক সভার বিরুদ্ধে কুসংস্কার …ভাবনা এল।

বাংলা দেশের কৃষক সভা আর ময়মনসিংহের কর্মীদের মুশকিল আরও বাড়ল। এতগুলি ধাকা …মলে উঠে বাংলা দেশ কি সারা ভারত সম্মেলনের মর্য্যাদা রাখতে পারবে? তার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি কি আশেপাশের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত কৃষককে সম্মেলনের পতাকার নীচে জমা করতে পারবে? এই ছিল সকলের মনে প্রশ্ন আর সংশয়।

এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল ময়মনসিংহ টঙ্ক এলাকার হাজং আর গারো চাষীর দল। জবাব দিয়েছিল নেত্রকোণার আশে পাশের গ্রাম থেকে অগণিত মুসলমান চাষী—যারা কয়েক বছর ধরে কৃষক সভাকে লীগের মতই ভালবাসতে শিখেছে। আর জবাব দিয়েছিল বাংলা দেশের বহু দেশভক্ত মানুষ, যাদের জীবনে কৃষক সভা অসামান্য প্রভাব …নেছে। তাই মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে সম্মেলনের …কৃষক আর অকৃষকের অকুন্ঠিত দানে পঞ্চাশ …র টাকার তহবিল ভ'রে উঠল।

* * *

নেত্রকোণার চারিদিক ঘিরে প্রচার আরম্ভ হল। শহরের পর মগরা নদী; নদী পার হয়ে নাগরার মাঠ। সেখানে প্রায় ৭০ একর ধানী জমি হিন্দু আর মুসলমান চাষীদেরই সম্পত্তি, তাদের লাঙ্গল দেওয়ার সময়ও এই এপ্রিল মাসে। কিন্তু কৃষক সভার ডাকে সম্মেলনের জন্যে তারা গোটা জমিটাই ছেড়ে দিল। স্থানীয় বাদ্ধক্য ভদ্রলোক যোগেন্দ্র তালুকদার পুরানো স্বদেশী; তিনি শুধু জমিই …লেন না, কাছাকাছি নিজের বাসাবাড়ীও ছেড়ে …ন নেতাদের বাসস্থানের জন্যে। গ্রামের …র সেক্রেটারী দেওয়ান মজলিস সাহেবও … বাড়ী ছেড়ে দিলেন। কাছাকাছি গ্রামের … অনেকে নিজেদের ঘরে সাদরে প্রতিনিধিদের …গা করে দিলেন।

বাঁশের শহর

মাসখানেক আগে থেকে নাগরার দিগন্তবিস্তৃত মাঠে উঠতে লাগল বাঁশের তৈরী নতুন শহর! প্রতিনিধিদের জন্যে দু'দুটো ফুটবল মাঠের সমান লম্বা দুটো ছাউনি এমন করে বানাতে হবে যাতে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে প্রতিনিধিরা বাঁচতে পারেন। দেড় লক্ষ লোক বসে শুনতে পারে, এমনি বিরাট জায়গা চাটাই দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে পাঁচশ লোকের বিরাট মঞ্চ। তাছাড়া উনুন, রান্নাঘর, প্রদর্শনী, দোকানপাট, হাসপাতাল, পায়খানা—সমস্তই মজবুত করে বানাতে হবে।

শুধু ঘরের খুঁটির জন্যই ৮ হাজার বাঁশ চাই, বর্ত্তমান দিনে তার দাম ৮ হাজার টাকা। ৮ মাইলের মধ্যে যত চাষী ছিল, তারা নিজেদের ঝাড় উজাড় ক'রে বাঁশ কাটল। আর সেই বাঁশ তারা গাড়ীর অভাবে নিজেরাই ঘাড়ে করে নাগরার মাঠে পৌঁছে দিল। বাঁশ আর অক্লান্ত পরিশ্রম—সম্মেলনের কাছে এই তাদের চাঁদা। এ ছাড়াও নেত্রকোণা মহকুমার কৃষকেরা প্রায় নগদ ৫ হাজার টাকা আর ১০০ মণ চাল চাঁদা দিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত যানবাহনের অভাবে অজস্র চাল, ডাল নেওয়াই গেল না।

রান্নাঘর প্রভৃতির ছাউনির জন্য টিন চাই—কিন্তু কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। ৩০ মাইল দূরের কৃষকেরা নিজেদের ঘর থেকে টিন খুলে নিয়ে …রাই বয়ে দিয়ে গেল দূর নাগরার মাঠে। এক …কৃষকও দলের অন্য সকলের সঙ্গে মাথায় টিন নিয়ে হাজির হ'ল। দেখে শুনে নেত্রকোণা শহরের অনেক ভদ্রলোকও অনুপ্রাণিত হ'লেন। তাঁরা নিজেদের ঘরের টিন খুলে নিয়ে সম্মেলনকে ধার দিলেন।

ধূ ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে উঠতে লাগল আলাদিনের বাঁশের শহর। অজিত মিত্র এই নতুন শহরের ইঞ্জিনিয়ার; আবার কমরেডও বটে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কংগ্রেস সম্মেলনের মত কন্ট্রাক্টরদের হাতে কিষাণ নগরের গঠনভার ছেড়ে দিতে পারেন নি—তাতে ব্যবসাদারী ছোঁয়াচ লাগে, সম্মেলনের অঙ্গহানি হয়। অর্থের অপচয় ত' হয়ই।

প্রায় একশো জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে শহর গড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বেশীর ভাগই সুস্থ সবল হাজং চাষীর সন্তান। আর কিছু মুসলমান চাষী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মী। শহর বানানোর কাজ কারুরই জানা নেই। কিন্তু উৎসাহ আর উদ্যম দিয়ে তারা সে অভাব পূরণ করবে—এই ছিল তাদের কঠিন সংকল্প।

কাজেই ইঞ্জিনিয়ারের মত দূর থেকে শুধু নক্সা এঁকে আর উপদেশ দিয়েই অজিত মিত্রের পার ছিল না। নিজের হাতে কাজ ক'রে স্বেচ্ছাসেবকদের শেখাতে হয়েছে। কাজ না জানায় যখন তারা মুষড়ে পড়েছে, তখন তাদের উৎসাহ দিয়ে চাঙ্গা করতে হয়েছে।

তার ওপর সম্মেলনের হপ্তাখানেক আগে এল দারুণ ঝড়। স্থানীয় লোকদের অভিজ্ঞতা আর পরামর্শক্রমে ঘরদোরগুলি হাল্কা ক'রে বানানো হয়েছিল—ঝড়ে তার অনেকখানি ভেঙে প'ড়ল। তখন মাথায় হাত দিয়ে বসার অবস্থা।

কিন্তু এতো কন্ট্র্যাক্টরের মজুর নয়। ঝড় শেষ হ'তে না হ'তেই সবাই ঘর মেরামতের কাজে লেগে গেল—২৪ ঘণ্টার আগেই সব ঠিক করে তুলবে। রাত্রে ঝড়ে সম্মেলনের মণ্ডপ ভেঙ্গে গেছে শুনে বিকেল বেলা শহর থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন বাঁশের শহরের দুর্দ্দশা দেখতে। তাঁরা এসে দেখলেন, কোথাও ভাঙ্গাচোরার চিহ্ন মাত্র নেই—১০।১২ ঘণ্টার মধ্যেই বাঁশের শহর আবার মজবুতভাবে মেরামত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে শহর থেকে হাজার হাজার নরনারী সম্মেলনে আনাগোনা করছে। এত লোক ফেরী দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাই মগরা নদীর এপার ওপার তিনটে লম্বা বাঁশের পুল তিন দিনের মধ্যে নিজেরাই বেঁধে দিল।

* * *

আর তারপর সম্মেলনের দু এক দিন আগে থেকে দলে দলে মার্চ্চ করে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকেরা আসতে আরম্ভ করল দূর দূরান্ত থেকে। শুধু নালিতাবাড়ী, লেঙ্গুরা প্রভৃতি টঙ্ক এলাকার হাজং ছেলে, বুড়ো, মরদ, মেয়েই এসেছিল প্রায় ৩৫০০ হাজার—তারা প্রত্যেকেই ৩০ মাইল থেকে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে এসেছে। এবং পৌঁছাবামাত্রই এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করে তাদের মধ্যে প্রায় ২ হাজার জন তখনি ভলান্টিয়ারের কঠিন পরিশ্রমে লেগে গেছে। খেয়ে নিয়ে তারপর কাজে লাগতে পর্য্যন্ত অনেকে রাজী হয়নি।

ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক সংগঠনের মেরুদণ্ড এই পাহাড়ী হাজংয়েরা। তাদের নেতা মণি সিংহ এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—এই সম্মেলনের প্রাণ। রাজ পরিবারের আত্মীয়, ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী আর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সৈনিক। যখন কমিউনিজমের কথা প্রথম শুনলেন তখন থাকেন শহরে, কলকাতায়। সেখানে মেটেবুরুজের মজুরদের বস্তীতে বস্তীর একজন হয়েই আস্তানা গাড়লেন, মজুর সংগঠনের কাজ আরম্ভ করলেন। তারপর দীর্ঘকাল রাজবন্দী, সেই জেলখানার পাঠশালায়ই কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিজমের প্রতি অনুরাগ আরও গভীর হল। বেরিয়ে এসে ফিরে গেলেন নিজের দেশের কৃষকদের মধ্যে, গারো আর হাজংদের মধ্যে, তাদের বেদনা ও সংগ্রামের মধ্যে—কমিউনিজম তাঁকে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার এই শিক্ষাই দিয়েছিল।

হাজং চাষীর দল

টঙ্ক প্রথার (ফসল যাই হোক না কেন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিদারকে দিতেই হবে এই নিয়ম) অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা টঙ্ক এলাকার চাষী সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল, খানিকটা জিতল—পশ্চাৎপদ পাহাড়ী হাজংদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি এল। তাদের মধ্যে থেকে নেতা বেরিয়ে এল—হৃদয়, ললিত, জলধর। দুর্ভিক্ষের দিনে যখন দুনিয়ার সবাই বলছে চাচা আপন বাঁচা, তখন হাজংরা লাগল পরস্পরকে বাঁচাতে, যৌথ প্রথায় চাষের প্রবর্ত্তন করে সকল চাষীর ফসল বাঁচাল, বাড়াল।

দিল-খোলা, সরল পাহাড়ী জাত, মেয়েদের পর্দা নেই, বুক থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলানো নিজেদের হাতে বোনা একখানা কাপড় তাদের পরিচ্ছদ। আমরা এদের ফটো তুলতে গিয়ে দেখি কয়েকজন মেয়ে শহুরে ধরণের ব্লাউজ পরে আছে—কৃষক সভা তাদের শুধু সংগ্রামেই টানেনি, সভ্যতার আসরেও টেনে এনেছে—তাই তারা এই সমস্ত শিখে নিয়েছে! আমরা ফটো তুলব শুনে বাকী সকলেও তাড়াতাড়ি ব্লাউজ পরতে আরম্ভ করল—ছবি তোলার মত এতবড় একটা কাণ্ড, সভ্য ভব্য না হ'লে মানাবে কেন! আবার যখন আমরা বললাম, না, তাদের গ্রামের মত বেশেই আমরা ছবি তুলতে চাই, তখন সবাই হাসতে হাসতে ব্লাউজ খুলে বুকে কাপড় বেঁধে দাঁড়াল, এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

২৭ বছরের সুন্দরী যুবতী স্বর্ণমণি কতদূর থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে। বাড়ীতে একজন থাকতে হবে বলে তার স্বামী আসতে পারেনি—নইলে তার ভাসুর দিগীন্দ্র সরকার, ভাসুরঝি সুরধনী, নিজের ছোট মেয়েটী প্রভৃতি নিয়ে তারা একেবারে সপরিবারেই এসেছে। স্বর্ণমণিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বল্লে, "সবাই না এলে চলবে কেন? সমিতি তো আমাদেরই—আমরা না এলে খাটবে কে?"

কৃষক সভার আন্দোলনই আজ হাজংদের মধ্যে এই সভ্যতা এনে দিয়েছে যে, স্ত্রী সম্মেলনে যায় আর স্বামী ঘর পাহারা দেয়—আগের দিনে হলে স্বামীই সম্মেলনে 'মজা' দেখতে যেত, স্ত্রী সংসারের দাসীবৃত্তি চালু রাখত। তাদের সমাজে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আগেও ছিল বটে কিন্তু স্বামীর হাতে মারধোর, অত্যাচার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এখন হাজংরা সব মেয়েকেই 'মহিলা' বলে সম্ভাষণ করে, স্বামী-স্ত্রী সমান মর্য্যাদায় জীবনের অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই হাজং চাষী কৃষক আন্দোলনের জন্যে প্রাণ দেবে, তার মেয়েরা ৫০ মাইল পায় হেঁটে এসে পরিশ্রম করবে তাতে আর বিচিত্র কি?

সত্যি। টঙ্ক এলাকার মোট লোক সংখ্যাই ১ লাখের কিছু ওপরে, তার মধ্যে থেকে একেবারে ৩৫০০ হাজার লোক বাড়ী ঘর ফেলে এতদূর চলে এসেছে—কৃষক সভার কতখানি প্রভাব থাকলে তা সম্ভব সহজেই বুঝতে পারা যায়।

মুসলমান চাষী

হাজংদের তুলনায় মুসলমান কৃষকদের ওপর প্রভাব কম নিশ্চয়ই কিন্তু নেত্রকোণার আশেপাশে গ্রামগুলিতে সংগঠণের প্রভাব নিতান্ত কম নয়। কৃষকদের চাঁদার পরিমাণ থেকেই তা বোঝা যায়। কনফারেন্স থেকে তিন মাইল দূরে বালিগ্রাম; সেই গ্রামের নেতা আব্দুল হান্নান ভলান্টিয়ারদের অন্যতম কাপ্তেন। তিনি বল্লেন, আগে আগে তাঁরা কি রকম কৃষক সভার সংগঠকদের (ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদী) স্বদেশী ডাকাত বলে ভয় করতেন, মুসলমানদের ঐ সভায় যাওয়া উচিত নয় বলেও মনে করতেন। তারপর জমিদার কর্ত্তৃক চাষীর জমি অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল, কৃষক সভার নেতৃত্বে কত চাষী জমি ফিরে পেল। যুদ্ধের প্রথম দিকে কৃষক সভার ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের ওপর সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি তাঁদের চোখ আরও ফোটালো, তারপর তাঁরা শুনলেন কমিউনিষ্ট পার্টির আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, দেখলেন কৃষক সভার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সেবাকার্য্য। আজ তাঁদের হাজার খানেক মানুষের গ্রামে প্রায় সাত শো জন কৃষক সভার সভ্য তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই মুসলমান। তাঁদের ইউনিয়নে মোট সভ্য পাঁচ হাজার।

কনফারেন্সের দুদিন আগে বালিগ্রামে আমরা গিয়েছিলাম। গ্রামে তখন পুরুষ মানুষ প্রায় নাই বল্লেই হয়, সবাই সম্মেলনের কাজে খাটতে গেছে। গ্রামবাসী প্রায় সবাই মুসলমান এবং ভদ্রলোক বলে কোন বস্তু নেই, সবাই চাষী (২।১ ঘর ছাড়া)।

দেখলাম দাদু আব্দুর রহমানের স্ত্রী দাদিকে। এঁরা কমিউনিষ্ট পার্টির গোপন অবস্থার দিনে জেলের ভয় তুচ্ছ করে গোপন কর্মীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, কৃষক সভাকেও দমননীতির ভেতর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজ সেই ১০০০ লোকের গ্রামে পার্টি মেম্বরের সংখ্যাই ৩৮ জন। দাদি, তাঁর ছেলে প্রভৃতি সবাই পার্টি মেম্বর, শুধু কর্ত্তা এখনও কৃষক সভা থেকে আর অগ্রসর হতে পারেন নি।

দাদির যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনই মিষ্টি কথা। আমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না। তখন স্থানীয় লীগ কৃষক কনফারেন্সের বিরোধিতা করছে, বলছে মুসলমানেরা কনফারেন্সে যেওনা। দু একজন লীগপক্ষীয় গ্রামবাসী এতে খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। নিজেদের তো প্রকাশ্যে যাওয়ার উপায় নাই, কিন্তু বিবিরা না'ছোড়বান্দা, অথচ তাদের নিয়ে কনফারেন্সে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। অগত্যা কেউ কেউ দাদির কাছে বা অন্য কর্মীদের স্ত্রীর কাছে বিবিদের পাঠিয়ে দিচ্ছে, তোমরা বোরখা পরিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেও!

কিন্তু পুরুষ তো গ্রামে নেইই, মেয়েরাও যদি সব চলে যায় তবে ঘর-দুয়ার আগলাবে কে—এই হ'ল দাদির সমস্যা। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল পালা করে যাওয়া যাবে।

* * *

ময়মনসিংহ জেলার রাজনীতিক জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টি আর কৃষক সভার স্থান বড় কম নয়। তাঁদের নেতা খোকা রায়, ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী, ক্ষিতীশ সরকার, আলতাফ আলি, খুস্তু রায় এরাই তো জেলার স্বদেশী আর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, বার বার জেল খেটেছে; যখন যেখানে কংগ্রেসের কাজ তাতে ভলান্টিয়ারদের

রুজভেল্টের মৃত্যু ও আমেরিকার ভবিষ্যৎ

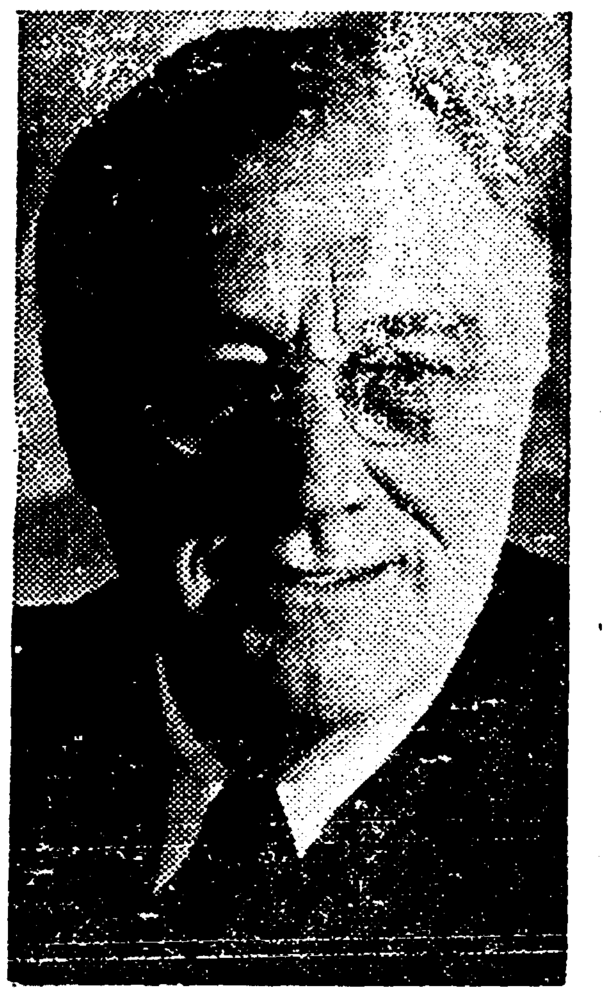

[ফটো : ইউ-এস-ও-ডবলিউ-আই

১২ই এপ্রিল তারিখে হঠাৎ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। মার্শাল ষ্টালিন এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে বলেছেন যে রুজভেল্ট ছিলেন একজন বিশ্ববরেণ্য নেতা, ফ্যাশিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

১৯৩৩ সাল থেকে রুজভেল্ট অবিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমেরিকার ইতিহাসে আর কেউ কখনও এতদিন ধরে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হননি, আর কেউ কখনও পর পর চারবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত হননি।

একই লোককে বার বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করা আমেরিকান্ কেন, যে কোন দেশের জনসাধারণেরই মনঃপূত হয় না। কিন্তু রুজভেল্টকে আমেরিকানরা বার বার বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচন করেছে। সে দেশের ফ্যাশিষ্টঘেঁষা বড় লোকের দল হাজার চক্রান্ত করেও তাদের মন ভাঙতে পারে নি।

রুজভেল্টের হাতে খড়ি

রুজভেল্টের জন্ম হয়েছিল অবস্থাপন্ন পরিবারে, যথারীতি শিক্ষা সাঙ্গ করে আইন ব্যবসায়ে তিনি যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন, রাষ্ট্রপতি উইলসনের সময় তিনি নৌবিভাগের সহকারী কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ১৯২০ সালে ডেমোক্রাটিক দলের পক্ষ থেকে তিনি ভাইস্-প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির সহকারী পদে নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে ভোটযুদ্ধে পরাজিত হন।

রুজভেল্টের অমায়িক ব্যবহার ও হাসিখুসি ভাব বহু লোকের চিত্ত জয় করেছিল। কিন্তু তাঁর চারিত্রবল যে কত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ১৯২১ সালে হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে তিনি আক্রান্ত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে নাম করার আশা যারা রাখে, তাদের পক্ষে অল্পবয়সে অমন নিদারুণ রোগের আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রুজভেল্ট কিছুতেই রোগের কাছে হার মানেন নি। সহজভাবে পায়ে হাঁটতে তিনি আর কখনও পারেননি বটে, কিন্তু দেহের একটা অঙ্গ বিকল হলেও মনের জোর তিনি হারান নি।

সারা আমেরিকার রাজনীতিতে রুজভেল্ট প্রথম দাগ কাটতে পারেন নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের গভর্ণর হিসাবে। সেখানে বিরুদ্ধবাদী রিপাবলিকানরা দলে ভারী হলেও তিনি অনেকটা নিজের ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহের জোরে সাধারণ লোকের কল্যাণ সাধনের জন্য কিছু করতে পারেন। আমেরিকার ৪৮টা ষ্টেটের মধ্যে প্রথম নিউইয়র্কেই বেকারদের অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

১৯৩২ সালের শেষে ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত হন। আমেরিকার তখন দারুণ দুর্দিন চলছে, যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ১৯২৯ সালে হাজির হয়ে আমেরিকানদের জীবনে একটা ওলট-পালট এনেছিল, তার জের তখনও বেশ জোরদার হয়েই চলছিল। "দেশের লোককে নতুন একটা ব্যবস্থা জুগিয়ে দাও" বলে রুজভেল্ট যে রব তুললেন, অধিকাংশ লোক তাতে সোৎসাহে সাড়া দিল, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হলেন।

তারপর থেকে বারো বৎসর ধরে রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতির আসন অধিকার করে এসেছিলেন। সর্ব্বদাই যে তিনি নির্ভুল নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, তা অবশ্য বলা চলে না, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মাঝে মাঝে ভুল করে বসলেও ১৯৩৬ সাল থেকে রুজভেল্ট স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে দুনিয়ার ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে হলে ফ্যাশিজমের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটানো নিতান্ত দরকার, আর সে-কাজ থেকে আমেরিকা কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারবে না।

রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব

রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব যে আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে কতটা জায়গা নিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা তাঁর পার্টি—ডেমোক্রাটিক পার্টিরই ভিতরের খবর খুঁজি। সবাই জানে যে আমেরিকার প্রধান দুটো দলের নাম হল ডেমোক্রাটিক (গণতান্ত্রিক) আর রিপাবলিকান (সাধারণতান্ত্রিক)। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে ডেমোক্রাটিক পার্টির সকলেই রীতিমত গণতন্ত্রের ভক্ত, কিম্বা রিপাবলিকানদের একমাত্র কামনা হল জনসাধারণের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব স্থাপনা করা, তাহলে মস্ত একটা ভুল করে ফেলা হবে।

মোটের উপর রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্রাটরা তুলনায় প্রগতিশীল, কিন্তু ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে আবার এমন অনেকে ছিল বা এখনও আছে যাদের প্রগতিশীল বলা অসম্ভব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বহু লোক নাম-কা-ওয়াস্তে ডেমোক্রাট; কিন্তু তারা রীতিমত প্রগতিবিরোধী, কাফ্রীদের দাবিয়ে রাখার জন্য তারা দৃঢ়সংকল্প। গরীবেরা এবং বিশেষ করে কাফ্রীরা যাতে ভোটই না দিতে পায় সেজন্য এক বিশেষ খাজনা তারা সেই অঞ্চলে আদায় করার ব্যবস্থা চালু রেখেছে। কেউ যদি এ ধরণের রাজনীতির বিরোধিতা করতে যায় তো সেখানে তার পাত্তা পাওয়াই অসম্ভব হয়, ভালো মানুষরা পালিয়ে প্রাণ আর মান বাঁচাতে বাধ্য হয়। অথচ এখানে ডেমোক্রাটিক পার্টিরই প্রতিপত্তি বেশী! সম্প্রতি সেখানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী।

এ হেন ডেমোক্রাটিক পার্টিকে না ভেঙে তারই নেতা হিসাবে রুজভেল্ট প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে আমেরিকায় অর্থব্যবস্থাকে নতুন ঢঙে গড়ার চেষ্টা যখন তিনি করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে টেনিসি নদীর কাছে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বিরাট এক পরিকল্পনা যখন কার্য্যকরী করা হয়, তখন আমেরিকায় পুঁজিদাররা একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত তারা গিয়ে সর্ব্বোচ্চ আদালত "সুপ্রীম কোর্টে"র শরণ নেয়। আদালতের জজেরা বড়লোকদেরই পক্ষ নিলে রুজভেল্ট এমন প্রস্তাব করতেও কুণ্ঠিত হন নি যে প্রগতিশীল আইন-বিশারদদের বিচারক নিযুক্ত করে আদালতের জজ সংখ্যা বাড়াতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত এ প্রস্তাব অনুসারে কাজ হয় নি, কিন্তু রুজভেল্টের সৎসাহসের এ হল একটা বড় প্রমাণ।

ফ্যাশিষ্টপক্ষীয়দের প্রচার

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ এই সময়ে রুজভেল্টের পরামর্শদাতাদের মধ্যে জেনারল জনসনের মত ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট কয়েকজন ছিল, কিন্তু জনসনকে রুজভেল্ট পরে বরখাস্ত করেন। "লিবার্টি লীগ" বা স্বাধীনতা সংঘ নাম দিয়ে রুজভেল্ট বিরোধী একটা সংগঠন ফ্যাশিষ্ট পক্ষ সমর্থন করার জন্যই স্থাপিত হয়। এই সময় রুজভেল্ট বেশ পরিষ্কার ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন। ইউরোপে হিটলার-মুসোলিনি তখন আবেসিনিয়া থেকে স্পেন পর্য্যন্ত নিজেদের প্রতাপ বিস্তার করার জন্য নির্ব্বিকার চিত্তে যুদ্ধ চালাল; এশিয়াতে জাপান খোস মেজাজে চীনদেশকে খণ্ড খণ্ড করে নিজের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টায় ছিল। রুজভেল্ট বলেছিলেন যে ফ্যাশিষ্ট দেশগুলো যাতে পররাজ্য গ্রাস করে যেতে না পারে সেজন্য তাদের 'একঘরে' করে রাখতে হবে "(quarantine of the aggressor nations)"। আমেরিকার কমিউনিষ্টরা তখন রুজভেল্টকে পূর্ণ সমর্থন জানায় কিন্তু রুজভেল্টের নিজের দল পর্য্যন্ত তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হয় নি। ফলে পৃথিবীর দুর্দ্দিনই আরও ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিল। ফ্যাশিষ্টদের চক্রান্ত স্পেনে, অষ্ট্রিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সফল হয়ে চলল। সবাই মিলে ফ্যাশিষ্টদের রাস্তা বন্ধ করার যে প্রস্তাব সোভিয়েট বার বার উপস্থাপিত করছিল, তা কেউ কানে তুলল না।

ইতিহাসের চাকা ঘুরল

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১, এই সময়টা কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রায়ই রুজভেল্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়েছিল। তার কারণ হল এই যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কি ভাবে পরিণতি লাভ করছে, তা যথার্থ প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও রুজভেল্ট বুঝতে পারেন নি, কিম্বা বুঝেও সেকথা দেশকে নির্ভয়ে জানাবার সংকল্প গ্রহণ করতে পারেন নি। ফিনল্যাণ্ডের বদমায়েস সর্দ্দার মানারহাইমকে পর্য্যন্ত যখন ব্রিটেনের মত আমেরিকা সাহায্য করল, সোভিয়েটকে অকথ্য গালাগাল যখন সবাই দিতে লাগল, তখন আমেরিকান কমিউনিষ্টরা বহু অপমান অগ্রাহ্য করে সোভিয়েটের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচার চালিয়ে গেল। সে-সব দিনের কথা আজকাল অনেকেরই মনে পড়ে না জোর করে

আমেরিকার কমিউনিষ্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার

মনে করিয়ে দেওয়ারও অবশ্য সব সময় দরকার থাকে না। সে যাই হোক্, ১৯৪১ সালের ২২শে জুন থেকে ইতিহাসের মোড় আবার ঘুরে গেল—ব্রিটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করল, চুক্তি স্বাক্ষর করল। ১৯৩৫ সালে যা ঘটলে বহু লক্ষ মানুষের প্রাণহানি আর অসংখ্য দুর্দ্দৈব এড়িয়ে ফ্যাশিষ্টদের নির্ম্মূল করা যেত, তা ঘটল ১৯৪১ সালের শেষার্দ্ধে। নিদারুণ যুদ্ধের যন্ত্রণার মধ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার অধ্যায় আরম্ভ হল।

তখন থেকে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত রুজভেল্ট ছিলেন প্রতিভাশালী আমেরিকানদের নায়ক, তিনি ছিলেন ফ্যাশিষ্ট বিরোধী যুদ্ধপরিচালনার একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। বহু বাধা বিপত্তি তখনও তাঁর পথ আটকে ছিল। পূর্ব্বের চেয়ে জোর গলায় তাঁকে "কমিউনিষ্ট" বলে নিন্দা করা হয়েছে; দেশটাকে তিনি রসাতলে পাঠাচ্ছেন বলা হয়েছে; পুরুষানুক্রমে আমেরিকা যেভাবে নিজের শক্তি ও শিল্পসম্পদ বাড়িয়ে এসেছে তাকে উল্টে দিয়ে লালঝাণ্ডা-মার্কা ব্যবস্থা তিনি চাপাচ্ছেন বলা হয়েছে; রুজভেল্টেরই দলস্থ মার্টিন ডাইজের মত প্রগতিবিরোধীরা আন্দোলন চালিয়েছে যাতে কমিউনিষ্ট আর তাদের দূর সম্পর্কিত বন্ধুদেরও একেবারে ঝেঁটিয়ে বার করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সব লোক বা তাদের কথা রুজভেল্টকে টলাতে পারে নি। আর দেশ ১৯৪৪ সালের নির্ব্বাচনে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে রুজভেল্টের নীতি প্রত্যাখ্যান করা হল দেশদ্রোহেরই সামিল।

১৯৪৪ সালের নির্ব্বাচন

গত নির্ব্বাচনে রুজভেল্টের প্রতিপক্ষ যথাসাধ্য সুকৌশলে চক্রান্ত করেছিল। সোজাসুজি রুজভেল্টের আন্তর্জ্জাতিক নীতির বিরুদ্ধে কিছু বললে দেশ বরদাস্ত করবে না জেনে তারা বলে যে ঐ নীতিই তারা আরও ভালোভাবে চালাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানা ভঙ্গীতে তারা সোভিয়েটের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তির বিরুদ্ধেই কথা বলতে থাকে—সোজাসুজি না বলতে পারলে বেঁকিয়ে বলেছে, ইয়োরোপ বলশেভিক হয়ে যাবে এই জুজুর ভয় আমেরিকানদের দেখিয়েছে, পোলাণ্ড নিয়ে সোভিয়েটের কুৎসা ছড়িয়েছে, জার্ম্মানী বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করবে না রটিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার সমালোচনা করেছে। মোটের ওপর জার্ম্মানী আর জাপানের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তই যে তাদের মনের কোনে লুকানো মতলব, তা ধরা পড়ে গেছে।

হার্স্ট, লুস, ম্যাককমিক প্রভৃতি নামজাদা প্রগতিবিরোধী নির্ব্বাচনে রুজভেল্টকে হারাবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছিল। কিন্তু রুজভেল্ট যে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হলেন, তার একটা কারণ এই যে আমেরিকার সাধারণ লোক রুজভেল্ট-বিরোধী দুমুখো সাপেদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পেরেছিল। রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিউই কাফ্রিদের কাছে গিয়ে তাদের দুরবস্থার জন্য কাঁদলেও কাফ্রিরা ঠিকই জানতেন যে রুজভেল্টই তাদের বন্ধু। হাজার ব্যাঘাত সত্ত্বেও কাফ্রিদের অবস্থা উন্নত করার জন্য রুজভেল্ট অনেক কিছু করেছিলেন। ইহুদীদের কাছে ডিউই ভোট চাইতে গিয়ে শুধু হাতে ফিরলেন, কারণ বক্তৃতায় তিনি যাই বলুন, তাঁর দলের পাণ্ডারা যে হিটলারের বন্ধু আর হিটলারকে আশ্রয় দেবার জন্যও যে তারা ব্যাকুল, একথা আর ঢেকে রাখা গেল না। আমেরিকার জনসাধারণও বুঝেছিল যে রুজভেল্ট প্রকৃতই তাদের শুভার্থী। আর রুজভেল্টের নীতি সমর্থন না করলে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আজ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হবে।

ট্রুম্যানের দায়িত্ব

আমেরিকার কমিউনিষ্টরা তাই গত নির্ব্বাচনে রুজভেল্টের পক্ষে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। পুঁজিদারদের ধামাধরা "সোশালিষ্ট" মার্কা রাজনীতিকরা যে চক্রান্ত করেছিল, তার মুখোস খুলে ধরা ছিল কমিউনিষ্টদের একটা প্রধান কাজ। তেহেরাণ ও ক্রাইমিয়া সম্মেলনে রুজভেল্ট আবার প্রমাণ করেন যে বর্ত্তমান যুগে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন তিনি। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ জয়ের পর যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে, সে সমস্যা সমাধানের কাজে তাঁর মত বহুপরীক্ষিত পরিণতবুদ্ধি দেশভক্ত সত্যই আমেরিকার ঐক্যবদ্ধ জনগণের প্রকৃত নেতৃত্ব করতেন। কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁর জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আমেরিকার কানুন অনুসারে রুজভেল্টের পদে বসেছেন। অটলভাবে রুজভেল্টের নীতি অনুসরণ তিনি করবেন। সোভিয়েট ও ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে সম্মিলিত জাতিসমূহের নেতা হিসাবে আমেরিকাকে ফ্যাশিজম ধ্বংসের কাজে অগ্রসর হতে হবে।

আমেরিকার জনগণ রুজভেল্টের স্মৃতির অপমান করবে না, ফ্যাশিষ্টদের তারা রেহাই দেবে না। নতুন দুনিয়া বানাবার কাজে কোন গলদ যেন তারা বরদাস্ত না করে।

ঢাকা বরিশাল ও দিনাজপুরে বস্ত্র-চোর ও অ

ঢাকেশ্বরী কটন মিলে বিরাট চোরাকারবার আবিষ্কার?

অন্যে বাদ পড়িলেও অতিরিক্ত জিলা মেজিষ্ট্রেট সূতার কোটা নিয়মিতই পান

কিছুদিন আগে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্ম্মচারীরা নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী কাপড়ের মিলে ব্যাপক খানাতল্লাস করিয়া কয়লার একটি বিরাট চোরা-ব্যবসা আবিষ্কার করে। মিলের হিসাবের খাতায় দেখা যায় যে ২৫,০০০, টাকার কয়লা ২,৫০,০০০, টাকায় কেনা হইয়াছে বলিয়া লেখা আছে। ক্রেতা ঢাকেশ্বরী মিলের পক্ষে মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সূর্য্য বসু ও বিক্রেতা স্বনামধন্য রণদা সাহা। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ মিলের কাগজপত্র সমস্ত হস্তগত করিয়াছে এবং তদন্তের জন্য মিলে স্থায়ীভাবে দুইজন কর্ম্মচারী মোতায়েন করিয়াছে। প্রকাশ তদন্ত শেষ হইতে ২।৩ মাস সময় লাগিবে।

কোটার মাল যায় কোথায়?

এই ঘটনার পিছনে ঢাকায় সূতা ও কাপড়ের বাজারে চোরাকারবারী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের যোগাযোগের একটি দীর্ঘ কাহিনী আছে। কিছুদিন আগে ঢাকা জিলা তন্তুবায় সমিতি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে যে ঢাকেশ্বরী মিলের কয়েকজন সূতা ও কাপড়ের হোল্ডার তাহাদের সূতা ও কাপড়ের সম্পূর্ণ কোটা তো পানই না, অনেক ক্ষেত্রে কোন কোটাই পান না। তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদেরই প্রাপ্য কোটা অন্যান্য লোকের মারফৎ চোরাবাজারে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ জানান হয় যে, ঢাকেশ্বরী মিলের মিহি সূতার শতকরা ৭১ ভাগের কোটা-হোল্ডার এস, এম বসাক এণ্ড সন্স তাহাদের কোটার সূতা পান নাই। তাহারই প্রাপ্য সূতা দেওয়া হয় ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নরোনা, ভূতপূর্ব্ব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কে, এল, বসাক ও তাহার এক কর্ম্মচারীকে। অমূল্য রায় চৌধুরী নামে অন্য একজন কাপড়ের কোটা-হোল্ডারের প্রাপ্য কাপড়ও এই ভাবে অন্যত্র চলিয়া যায়। উপরোক্ত দুইজন কোটা-হোল্ডারই আমাকে বলেন যে মিল হইতে তাঁহাদের কাছে পুরা কোটারই বিল পাঠান হয়, অথচ পুরা কোটা কদাচিৎ তাঁহারা পান। কোটা বাতিল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় এই সম্বন্ধে তাঁহারা কোন উচ্চবাচ্য করেন না। তাহাদের এই অভিযোগ সম্বন্ধে মিল কর্তৃপক্ষের জবাব আমরা চাই।

মিঃ নরোনা শুধু অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজই করেন না, সূতার ব্যবসাও করেন। তাহার পরলোকগত পিতার কাপড় ও সূতার ব্যবসাটি তিনিই এখন চালাইতেছেন। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ঢাকেশ্বরী মিল হইতে মাসে প্রায় ২০০ পাউণ্ড সূতার কোটা পায়। ইহা ছাড়া তিনি এস, এম, বসাক এণ্ড সন্সেরও একজন সাবকোটাহোল্ডার। মিঃ নরোনা যত সূতা পান তাহা সমস্তই তিনি তন্তুবায় সমিতির মারফৎ কন্ট্রোল দরে বিক্রি করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কখনও রক্ষিত হয় নাই। মিঃ নরোনা তাহার এই মোটা কোটার সূতা বিভিন্ন ব্যবসায়ী, বিশেষ করিয়া কে, এম, বসাকের মারফৎ বিক্রি করেন। সূতা কোথায় কি ভাবে বিক্রি হয় তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা জানি যে প্রকাশ্য-বাজারে কন্ট্রোল দরে তাঁতীরা সূতা পায় না। চোরাবাজারে তিন গুণ চড়া দামে প্রচুর সূতা পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মিঃ নরোনার সূতাও আছে কিনা তাহা অবশ্য আমাদের চিনিয়া বাহির করা কঠিন।

২৫ হাজার টাকার কয়লা ২॥০ লক্ষ!

তন্তুবায় সমিতি এই সমস্ত ঘটনা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানায়। ফলে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্ম্মচারীরা তদন্ত করিতে ঢাকেশ্বরী মিলে যায়। প্রথমে মিল কর্তৃপক্ষ ইহাদের কাগজপত্র দেখাইতে অস্বীকার করে কারণ তাহারা নাকি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের কাছে দায়ী, অন্য কাহাকেও তাহারা আমল দিতে রাজী নয়। বাধ্য হইয়া এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্ম্মচারীরা তল্লাসী পরওয়ানা লইয়া মিল খানাতল্লাস করে। ফলে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়—২৫ হাজার টাকার কয়লা ২॥০ লক্ষ টাকায় কেনা-বেচার উল্লেখিত ঘটনাটি ধরা পড়ে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ সন্দেহ করেন যে এই লেনদেনের পিছনে নিশ্চয়ই ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন গোপন চুক্তি আছে, কারণ চোরাবাজারের চলতি দর ১০ গুণ বেশী হয় না। এই সম্বন্ধে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ একটি মামলা রুজু করিবার কথা ভাবিতেছে। অবশ্য রণদা সাহা জড়িত বলিয়া মামলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা স্বভাবতই সন্দিহান, কারণ রণদা বাবুর ক্ষমতা অসীম।

হুমকি না সাফাই?

কয়লার ক্রেতা সূর্য্য বসু ইতিমধ্যেই অবশ্য নিজের জবানবন্দী তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে খবরের কাগজে বড় বড় হরফে এমন একটি খবর বাহির হয় যাহা পড়িলে স্বভাবতই মনে হয় যে সূর্য্যবাবু জনস্বার্থে বহু কষ্টে চোরা-বাজার হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া মিল চালু রাখিতেছিলেন। এখন সরকারী হস্তক্ষেপে বস্ত্রোৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু জনস্বার্থ রক্ষায় সূর্য্য বাবুর এই অসীম আগ্রহকে সন্দেহের চোখে দেখিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সম্প্রতি শোনা গেল যে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পক্ষ হইতে ঢাকেশ্বরী মিলের গত বৎসরের যে হিসাব পেশ করা হইয়াছিল মিঃ বিনয় রায় ও মিলের অন্যান্য কয়েকজন ডাইরেক্টর সেই হিসাব পাশ করেন নাই। এই সম্বন্ধে একটি মামলাও নাকি চলিতেছে।

১৫ই মার্চ তারিখের 'জনযুদ্ধে' ঢাকেশ্বরী মিল সম্বন্ধে একটি অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ২নং মিলে কয়েকটি টানায় আগের তুলনায় বর্ত্তমানে ৪০টি করিয়া বেশী সূতা খরচ হইতেছে বলিয়া হিসাব দেখান হইতেছে, অথচ ঐ কাপড়ের কোয়ালিটি আগের চেয়ে ভালতো হইতেছে না, বরং খারাপই হইতেছে। সংবাদদাতা হিসাব করিয়া দেখান যে এই ভাবে যদি সূতার মিথ্যা হিসাব দেখান যায় তবে কর্তৃপক্ষ অনায়াসেই বৎসরে ৯।০ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারে। 'জনযুদ্ধ' এই অভিযোগ সম্বন্ধে সূর্য্যবাবুর জবাব চাহিয়াছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন জবাব আসে নাই।

তাহা ছাড়া কয়লার বিক্রেতা রণদা সাহার সঙ্গে সূর্য্য বাবুর ঘনিষ্ঠতাও সর্ব্বজনবিদিত। উভয়ে একই সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের ডেভিড কোং কিনিতেছেন এবং শোনা যায় আরও একটি মিল খুলিবার পরিকল্পনা করিতেছেন।

সূর্য্য বসু সম্বন্ধে এই অভিযোগ ও রণদা সাহার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতার জন্য এই ১০ গুণ বেশী দামে কয়লা ক্রয়ের পিছনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা গোপন চুক্তি সন্দেহ করা মোটেই অসঙ্গত নয়।

এনফোর্সমেন্ট বিভাগের বড় কর্ত্তাদের কাছে আমরা এই সব রহস্যময় লেনদেন ও ঢাকেশ্বরী মিল সম্বন্ধে এই সব অভিযোগের জবাব চাই।

—গোপাল বসাক

'চোরাকারবার আ

দিনাজপুরে পুলিশের গ

গত ২৯শে মার্চ পুলিশ দিনাজপুর সহরে
হাজার থানা ধুতী-শাড়ী, ৭০০ থান জামার কাপড় ও
দোকান খানাতল্লাস করে নাই। বড় বড় দোকান
নাই। যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে
ধুতি পাইতে পারে।

অথচ এই দিনাজপুর সহরেই গত কয়েক মাস ধ
(বুকের উপর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লুঙ্গির মত কা
জানি যিনি ছেঁড়া লেপের ওয়াড় পরিয়া কোন রকমে

চোরাবাজারের রক্ষক

কেন্দ্রীয় ফুড কমিটির তরফ হইতে এই অবস্থার প্রতিকার দাবী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরবার করিলে তিনি নিতান্ত অসহায়ের মত ভাব দেখান।

এই অবস্থায় সহরে খানাতল্লাস হয়। শোনা যায় এই খানাতল্লাসীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বা জিলা সাপ্লাই অফিসারের মত ছিল না। পুলিশ সাহেবের হস্তক্ষেপেই নাকি তল্লাসী হয়। ব্যবসায়ীরা খানাতল্লাস হইবে এই খবর আগেই পান এবং তল্লাসীর আগের দিন তাহাদের মুখপত্র রামনিবাস আগরওয়ালাকে ঘন ঘন ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাপ্লাই অফিসারের কাছে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। রামনিবাস বাবু ব্যবসায়ীদের এক সভায় সাপ্লাই অফিসারকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং সেখানে প্রস্তাব করেন যে ব্যবসায়ীদের ঘরে মাত্র দেড় লাখ টাকার মাল আছে, তাহারা উহার একটা লিষ্ট দেবেন, সুতরাং তল্লাসী করা যেন না হয়। শোনা যায় সাপ্লাই অফিসার এই প্রস্তাবেই রাজী হন।

কিন্তু পুলিশ সাহেব তল্লাসীর জন্য জেদ করেন এবং তল্লাসী হয়। তল্লাসীর দিন ভোরবেলায়

বস্ত্রচোরের যুক্তি—'পুলিশ ঘুষ লয় তাই এত দাম'

অথচ উজিরপুরে পুলিশ কাপড়ের মজুত ধরিয়াও মামলা চালায় না

খেয়াটা পার হইলেই উজিরপুর বন্দর। দক্ষিণ পার হইতে দেখা যাইতেছে বন্দরের একটানা টিনের ঘরগুলি, স্কুলের মাঠ, তারপর থানার ঘরবাড়ী। এখানে সেখানে কতগুলি ছোট বড় নৌকা বাঁধা—থানার পাশেও বড় বড় ৯।১০ খানা। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম থানার পাশে বাঁধা নৌকাগুলি চোরাবাজারে চালান দেওয়া চাউল আর কাপড়, নদীর পথে যাইবার সময় আটক করা হইয়াছে।

শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ খেয়া নৌকায় বলিতে বলিতে চলিয়াছে—"একখানা কাপড়ের দাম চায় ৯।১০, টাকা। আর দোকানদাররাই বা কি করিবে? পুলিশকে ঘুষ দিতে যাইয়াই দাম যায় চড়িয়া।" বলিলাম 'ঘুষ দেয় কেন?' বৃদ্ধ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। কলিকাতায় হাজার হাজার গাইট কাপড় ধরিবার কথা তাহাকে শুনাইলাম, অনেক কপড়ের আবার মালিকই জোটে নাই, এদিক সেদিক ফেলিয়া চোরেরা পলাইয়াছে। বৃদ্ধর চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা 'এবার তা'হইলে পাইব তো?'

* * *

মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের গ্রাম উজিরপুর—চারিপাশে কৃষক, তাঁতী, কামার। মাঝে মাঝে আবার শিক্ষিত চাকুরীয়াদের বসতি অঞ্চল—সিকারপুর, দেহেরগতি, নারায়ণপুর। সকলের জন্যই উজিরপুর বন্দর—প্রধানতঃ আমদানী জিনিষপত্রের কেন্দ্রস্থল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে ছিল ১২০ ঘর ছোট বড় ব্যবসাদার—কুড়ি ঘর শেষ হইয়া আজ দাঁড়াইয়াছে একশতে।

এই বন্দরের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক রমেশ রায়ের। তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। বলিতে লাগিলেন—৮।১০ ঘর বড় ব্যবসাদার আর সব ছোট ছোট। ছোটদের মূলধন লাগিত সামান্যই। পাইকারী দরে বড়দের নিকট হইতে মালপত্তর নিয়া বিক্রী করিয়া টাকা দিত। এই ভাবেই ছোটরাও বাঁচিত। কিন্তু আজ সব উল্টা পাল্টা। আট দশ ঘর আজও আছে। শুধু আছে তাহাই নহে—দোকানে মাল না দেখা যাইলেও আয়ের অঙ্ক বাড়িয়া চলিয়াছে।

কাপড়ের কারবারী পাঁচ সাহা। তাহাদের মধ্যে মাখম সাহার নামে তাঁতীদের মধ্যে কন্ট্রোল দরে দেওয়া সূতা চোরাবাজারে বিক্রীর জন্য মামলা চলিতেছে—আর শ্রীমন্ত সাহার নামে কাপড়ের জন্য। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের জোরেই বাঁচিয়া আছে নকুল সাহা। একই দিনে টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর জ্যোতিষ সেন শ্রীমন্ত সাহা ও নকুল সাহার দোকান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল কাপড়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু মতিলাল রায়ও সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমন্ত সাহাকে চালান দেওয়া হইল কিন্তু নকুল সাহা সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য নাই। কিন্তু কৃষক সমিতির কর্ম্মী এস ডি ও-কে সংবাদটি দিলে নকুল সাহার কাপড় আবার ধরা হয় এবং আদেশ হইয়াছে নকুল সাহাকে ঐ কাপড় সরকারী নির্দ্দেশ মতে বিক্রী করিতে হইবে। কিসের জোরে নকুল সাহা মামলা হইতে বাঁচিয়া গেল, তাহা আজ সকলের আলোচনার বস্তু!

তাঁতীরা নিজেদের কো-অপারেটিভ গড়িয়াছে এবং তাঁহার মারফৎ সূতা দাবী করিতেছে। কিন্তু এই মাসের সূতাও পাইয়াছে মাখম সাহা। সূতার চোরাকারবার তাহার 'ডিলারসিপ' নষ্ট করিতে পারে নাই।

এখানকার কাপড়ের ব্যবসায়ীদের কয়েকজন আত্মীয় কলিকাতা ৭২ নং খাতাপট্টিতে থাকিয়া কাপড়ের দালালী করে। ইহারাই গোপনে মারোয়ারীদের নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিয়া নৌকা যোগে জিলায় মাল চালান দেয়। এই মালের কোন পারমিট নাই। এই সব নৌকা ঘুষ দিতে দিতে বন্দরে পৌঁছে। বন্দরে মাল পৌঁছিলে সেই রাত্রেই বড়বড় মাহাজনরা নৌকায় করিয়া বিভিন্ন হাটে বন্দরে নিজেদের ফড়িয়াদের মধ্যে মাল বিলি করিয়া দেয়। এই ফড়িয়ারা ৫০।৬০ জোড়া কাপড় লইয়া ছোট ছোট হাটে বাজারে বিক্রি করে। মাঝে মাঝে ইহাদের কেহ কেহ ধরাও পরে। কিন্তু অধিকাংশকেই বাঁচাইয়া রাখে মজুতদারের অর্থ, আর তাহাদের ছড়ান যুক্তি—ইহাদের আর দোষ কি। পুলিশ ঘুষ লয় বলিয়াই তো দাম বাড়ে। আর ইহারা আছে বলিয়া তবু ২।১ জোড়া কাপড় পাই।

* * *

মুদী ব্যবসায়ের নেতা মধু সাহা। খাদ্য কমিটির বরাদ্দ প্রথার চাপ নাই—আটা, সোডা, সরিষার তৈল প্রভৃতি জিনিষের ব্যবসা করে। চিনি, লবনের জোগাড়ও আছে। একথা সবাই আজ আলোচনার বস্তু যে অক্সফোর্ড মিশনের রিলিফের খাতে দেওয়া চিনির কর্ত্তা প্রিয়লাল ডাক্তার মধু সাহার দোকান মারফৎ ব্যবসা চালাইত। প্রিয়লাল ডাক্তার রিলিফের ব্যবসাটি খোয়াইয়াছেন কিন্তু মহকুমা খাদ্য কমিটির সভ্য হিসাবে তদ্বির করিবার ব্যবসা তাহার আজও কমে নাই।

থানা ডিলার বন্দে নেওয়াজ খাঁ এবং উজিরপুর কো-অপারেটিভ। থানার নয়টি ইউনিয়নের বরাদ্দ মাল তাহাদের কাছে আসে।

বানরিপাড়া বাড়ী বন্দে নেওয়াজ খাঁর উজিরপুর বন্দরে জুতার কারবার করিত। শতকরা ৫০ ভাগ 'ডিলারসিপ' মুসলমান পাইবে—বন্দে নেওয়াজ খাঁ 'ডিলার' হইল। মাসিক আয় ১৫০০।১৮০০, টাকা। পাশাপাশি আর পাঁচখানি মুসলমানের দোকান মরিতে বসিয়াছে—ঐ আয় ভাগ হইলে তাহারাও বাঁচিতে পারে।

ামলাদের অখণ্ড রাজত্ব

ছে তাই কাপড় পান'--ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তি

ফিলতি সত্ত্বেও ১৫ হাজার লোকের কাপড় উদ্ধার

কাপড়ের দোকান খানাতল্লাস করিয়া প্রায় ১০
২৫ গাঁট কাপড় পায়। তাও পুলিশ সব
তা বাদই গিয়াছে, চোরাগুদামও তল্লাস করা হয়
নাজপুর সহরের অর্দ্ধেক লোক একখানা করিয়া

য়িয়া কাপড়ের অভাবে অনেক ভদ্রমহিলা বুকনি
াড়) পরিতে বাধ্য হন। এক মহিলার খবর
লজ্জা নিবারণ করেন।

রামনিবাস বাবু আবার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, সাপ্লাই অফিসার ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে দরবার শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটাইতে থাকেন সহরে পুলিশের জুলুম শুরু হইয়াছে।

রামনিবাস বাবুর এত পরিশ্রম অবশ্য বার্থ হয় নাই—তাল্লাসী কতকটা লোকদেখানো গোছের হয়। প্রকাশ্য দোকান ছাড়া অন্য কোথাও তাল্লাসী হয় নাই। চোরা গুদাম ধরিবার চেষ্টা হয় নাই। মাধোলাল আগরওয়ালা প্রমুখ সবচাইতে বড় ব্যবসায়ীদের গুদাম তাল্লাসী হয় নাই। তা' ছাড়া আগে খবর পাওয়াতে ব্যবসায়ীরা অনেক মাল সরাইয়া ফেলিয়াছে। যে চোরাই কাপড় পাওয়া গিয়াছে তাহাও আবার ব্যবসায়ীদের ঘরেই রাখা হইয়াছে, সব কাপড় শিল মোহর করাও হয় নাই।

তাল্লাসীর দিন বিকালে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, বার এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি ডেপুটেশন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদের যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম: চোরাবাজার ধরার প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু ব্যাপক তাল্লাসী করলে ব্যবসায়ীরা ক্ষেপে যাবে। আর দেখুন, তবু তো চোরাকারবার আছে বলেই লোক কাপড় পাচ্ছে, না হলে তো উলঙ্গ হয়েই থাকতে হতো!

'চোরাবাজার জিন্দাবাদ'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার এই নীতি শুধু মুখেই প্রচার করেন না, কাজেও পরিণত করেন। কিছু দিন আগে ফুড কমিটির ভলাণ্টিয়াররা দুই গাঁট কাপড় ধরিয়া থানায় লইয়া যায়, কিন্তু এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ উহা ছাড়িয়া দেয়। এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্ত্তা একজন ভূতপূর্ব্ব গোয়েন্দা। স্বদেশী ঠেঙ্গাইতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু চোরাকারবারীয়দর ধরিতে তাঁহার হাত ওঠে না। রক্তের টান কিনা!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় চোরাকারবারীদের ঔদ্ধত্য ও সাহস এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে একদিন ফুড কমিটি হইতে যখন স্কোয়াড বাহির করিয়া শ্লোগান দেওয়া হইতেছিল, 'চোরাবাজার ধ্বংস হউক', তখন চোরাকারবারীদের কতিপয় অনুচর সহরের প্রকাশ্য রাজপথে "চোরাবাজার জিন্দাবাদ", "মজুতদার জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি করে। ইহাদের মধ্যে রামনিবাসবাবুও নাকি ছিলেন। এই রামনিবাস বাবুই আবার হিন্দুমহাসভার একজন পাণ্ডা এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাপড়-পরামর্শদাতা কমিটির সম্পাদক।

তাল্লাসীর পরদিন সহরে প্রায় ৩ হাজার লোকের এক জনসভা হয়। জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, লীগের সম্পাদক প্রভৃতি সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামনিবাসবাবুর নেতৃত্বে একদল মারোয়ারী এই সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রামনিবাস বাবু বক্তৃতা করিবার দাবী করেন এবং প্রকাশ্য সভায় ব্যবসায়ীদের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

কিন্তু চোরাকারবারীদের স্বরূপ সহরবাসী চিনিয়াছে। তাই সভায় আরও চোরাই কাপড় ধরিবার এবং সমস্ত কাপড় ফুড কমিটির মারফৎ বিলির ব্যবস্থা করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়।

—বিভূতি গুহ

সাতলা, বারতা, জল্লা প্রভৃতি ইউনিয়নের সরবরাহকারী বন্দে নেওয়াজ খাঁ। সেখানকার লোকেরা বরাদ্দ মাল পায় না মাসের পর মাস। গত দুইমাসের জিনিস না নেওয়ায় সম্প্রতি মহকুমা সাপ্লাই অফিসার জানাইয়াছেন যে ইউনিয়ন কেন নিতেছে না তাহা খোঁজ হইবে—ইতিমধ্যে যেন জিনিষপত্র ঠিক থাকে। কিন্তু এই দুই মাসের পূর্ব্বে জনসাধারণ যাহা পায় নাই, অনুসন্ধান করা দরকার সেই সকল কোথায় গেল।

উজিরপুর কো-অপারেটিভের একজন নেতার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। বলিলেন—'কো-অপারেটিভের মাসিক আয় ২৫০৲।৩০০ টাকা। বন্দে নেওয়াজ যত মাল পায়, কো-অপারেটিভ তাহা পায় না।"

বড়দের এই ব্যবসার পাশে ছোটরাও স্থান করিয়া মরিতে মরিতে টিকিয়া থাকিতে চায়। সমস্ত বন্দরটাই তাই আজ সচকিত, সন্ত্রস্ত, বিভৎস। সব মিলিয়া অগণিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মরিতে বসিয়াছে উজিরপুরের সভ্যতা বোধ। বন্দরের স্থানে স্থানে স্বদেশী পোষ্টার: বারুজীবি ভাইসব, আন্দোলনের জন্য ধান পাইতেছ—কাহাকেও ঘুষ দিও না'। উজিরপুরের বর্ত্তমান সমাজচৈতন্য যেন পোষ্টারটিকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

* * *

ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মতিবাবুর তত্ত্বাবধানে ঋণ বিলি হয়। ১৯৩০ সনে কংগ্রেসের আন্দোলনে তিনি জেল খাটিয়াছেন—বরিশালের কংগ্রেস নেতা প্যারীলাল রায়ের ছোট ভাই।

কিছুদিন আগে তাঁতিরা নালিশ করে ইউনিয়ন বোর্ডের কোরাণী ঋণ দিতে যাইয়া ঘুষ লইয়াছে। সার্কেল অফিসারের সম্মুখে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এক বৃদ্ধ তাঁতী তাহার কথা বলিতে সুরু করিলে সেই সভার মধ্যেই তাহাকে গালাগালি করিয়া মার দিলেন মতিবাবু। মামলায় মতি বাবুর জরিমানা হইল ১৫৲ টাকা।

শীঘ্রই পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসরের পুরাতন উজিরপুর স্কুলের কমিটি নির্ব্বাচন হইবে। একজনকে সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়াও সভাপদের জন্য দাঁড়াইলে একটি ভোট দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক। প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন—'পুরাতন সব কিছু ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে চারিপাশে। ভালমন্দর বিচার কোথায়ও নাই। আমিও সেই পথই গ্রহণ করিয়াছি। যাহাকে ভোট দিতে চাই, প্রয়োজন মত তাহার কাছে দুই পয়সার চিনি কেরোসিন পাইব'!

উজিরপুর গ্রাম আর বন্দরই পাশাপাশি আর দশটি ইউনিয়ের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। উজিরপুরের স্বদেশী আন্দোলনই পাশাপাশি গ্রামগুলিকে দীক্ষিত করিয়াছিল। আর আজ সেই উজিরপুরই সমাজদ্রোহী মজুতদারের যুক্তিকেই যুক্তিতে পরিণত করিতেছে—তাহার মৃত্যুর চোরা-শৃঙ্খলে আর পঞ্চাশটা গ্রামকে জড়াইয়া ফেলিতেছে।

বরিশাল জিলার বৃদ্ধ কংগ্রেস সভাপতি নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য ও প্যারীলাল রায়ের জন্মভূমি উজিরপুর গ্রাম। তাহাদের প্রচেষ্টাই উজিরপুরকে আবার তাহার গৌরবের আসনে ফিরাইয়া আনিতে পারে।

উজিরপুর বন্দরের এই পরিবর্ত্তনই আর পঞ্চাশটা গ্রামের পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিবে।

—জ্যোতি দাশগুপ্ত

চটকল মালিকদের গোপন নিয়মাবলী

মজুরদের বেকার-ভাতা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র

গত ফেব্রুয়ারী মাসে চটকল মালিক সমিতির বাৎসরিক সভার সভাপতি মিঃ ওয়াকার বলিয়াছিলেন যে মজুরের স্বার্থ-রক্ষার জন্য চটকল মালিক সমিতি বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছে। ওয়াকার সাহেব ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এই ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসাবে চাকুরীর নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক সরকারের সমর্থন পাইলেই ইহা চালু করা হইবে।

'গোপন' নিয়মাবলীর খসড়া

এই নিয়মাবলী চটকল মালিক সমিতি আজ পর্য্যন্ত সাধারণের কাছে প্রকাশ করে নাই। এই জন্যই বোধ হয় করে নাই যে, তাহা হইলে ইহা লইয়া হৈচৈ হইবে এবং ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিয়া প্রাদেশিক সরকারের সমর্থন আদায় করা মুস্কিল হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এই 'গোপন' নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পাইয়াছি, তাহাতেই বোঝা যাইবে ওয়াকার সাহেবের "মজুরের স্বার্থরক্ষার" অর্থ মজুরদের সর্ব্বনাশ সাধন করা।

এই নিয়মাবলীর ১৩নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, মালিকের আয়ত্তের মধ্যে নহে এরূপ কারণে, অর্থাৎ আগুন লাগা, যন্ত্রপাতি খারাপ হওয়া, বিদ্যুৎ বা কয়লার অভাব প্রভৃতি কারণে বিনা নোটিশে মিল বন্ধ করা যাইবে এবং তার জন্য মজুরকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

এই নিয়ম চালু হওয়ার মানে, কয়লার অভাবে চটকল বন্ধ হওয়ার ফলে যে সমস্ত মজুর বেকার হইয়া আছে, তারা যে ভাতা পায়, সেই ভাতা বন্ধ হইবে। চটকল-মালিকরা অনেক দিন হইতেই বাহানা তুলিতেছিল যে, কতদিন তারা এই ভাতা দিবে? কিন্তু মজুর আন্দোলনের জোরে আজ অনিচ্ছাকৃত বেকারীর জন্য ভাতা দেওয়া একটী ন্যায্য প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শুধু চটকল কেন সমস্ত কারখানার জন্যই ইহাকে স্থায়ী নিয়ম হিসাবে চালু করিবার চেষ্টা সরকার হইতে চলিতেছে। চটকল মালিকরা নূতন কায়দায় সেই ব্যবস্থাকেই উল্টাইয়া দিতে চায়। চটকল বন্ধে মালিকদের কোনো ক্ষতি তো হয়ই নাই, বরং লাভের হার বাড়িয়াছে ['জনযুদ্ধে'-র ৩৬শ ও ৪০শ সংখ্যা দেখুন]। এখন মজুরদের মারিয়া সেই লাভের হার আরো বাড়াইবার জন্য চটকল মালিক সমিতির এই পরিকল্পনা।

কারখানা না, কয়েদখানা?

নিয়মাবলীর আর একটী ধারায় বলা হইয়াছে কারখানায় আসিতে যাইতে বা যে কোন জরুরী অবস্থায় মজুরকে তল্লাসী করা হইবে এবং দেখা হইবে কোম্পানীর কোন জিনিষ বা কারখানার ক্ষতিকারক কোন জিনিষ তাহার কাছে আছে কি না।

এই রকম নিয়ম আছে এক টাঁকশালায়, আর আছে জেলখানায়। চটকল টাঁকশাল নয় যে দামী জিনিষ হারাইয়া যাইবে। তবে কি মালিক মজুরদের জেলখানার চোরের মত মনে করে যে, কথায় কথায় তাদের তল্লাসী করিবে?

শুধু তাই নয়, এই নিয়মের মধ্যে মালিকের আরও উদ্দেশ্য আছে। কারখানার পক্ষে ক্ষতিকারক কোন জিনিষ মজুরের কাছে থাকিতে পারিবে না—এই নিয়মের দ্বারা ইউনিয়নের ইস্তাহার, রসিদ বই এমন কি কোন খবরের কাগজ বা বই পর্য্যন্ত মজুরের কাছে পাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারিবে। ইউনিয়নের প্রচার ও সংগঠনকে নষ্ট করিবার কাজেই যে এই নিয়মটী বেশী করিয়া লাগান হইবে, তা বোঝাই যায়।

১৬নং ধারায় বলা হইয়াছে কি কি কারণে দুঃস্বভাবের জন্য মজুরকে বরখাস্ত ও জরিমানা করা চলিবে। চাকুরীর নিয়মের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কারণ নাই। কিন্তু মালিক যেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা এবং মজুর যেখানে সাধারণতঃ মালিকের বিরাগভাজন, সেখানে দুঃস্বভাবের বোঝা মজুরের ঘাড়ে বিনা কারণেই যে আসিয়া পড়ে তাহা টেকনিকাল পারসোনেল আইনের ব্যাপারেই আমরা অনেক দেখিয়াছি। চটকল মালিকরা কিন্তু আরো এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। দুঃস্বভাব বলিতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তাছাড়া তাঁরা আরো একটা বিষয় জুড়িয়াছেন—সেটা হইতেছে, কারখানার মধ্যে কারখানা সংক্রান্ত নয় এমন বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করা।

এই রকম অর্থ সংগ্রহ মজুররা একটী মাত্র কারণে করে, তাহা হইতেছে ইউনিয়নের চাঁদা। পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে এই নিয়ম দ্বারা মালিক ইউনিয়নের চাঁদা তোলা বন্ধ করিতে চায়। এবং এই সামান্য 'অপরাধেই' মজুরকে বরখাস্ত করা চলিবে।

হিটলারী জুলুম

২০ নং ধারায় বলা হইয়াছে, মজুরের চাকুরীর গেলে বা সে চাকুরী করিতে অস্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 'কোয়ার্টার' ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ ন্যায্য কারণে হোক, অন্যায় ভাবে হোক মালিক তাকে 'জবাব' দিলেই স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া মজুরকে পথে বসিতে হইবে। ধর্ম্মঘটের সময়েও মজুরকে কোয়ার্টার হইতে তাড়াইয়া সপরিবারে পথে বসিতে বাধ্য করা যাইবে।

এই কয়েকটী ধারা ছাড়া আরো যে সমস্ত নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতেও অল্পবিস্তর বহু অন্যায়ের পথ খোলা রাখা হইয়াছে। যেমন, রোগের জন্য ছুটী লইতে গেলে কোম্পানীর ডাক্তার ছাড়া অন্য ডাক্তারের কথা গ্রাহ্য হইবে না; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে কাজে আসিলে সারা দিনের জন্যই মাহিনা কাটা যাইবে; বিনা-অনুমতিতে সামান্য ক্ষণের জন্যও অনুপস্থিত থাকিলে মাহিনা কাটা যাইবে ইত্যাদি। এই সমস্ত নিয়মের ফাঁকে কোম্পানী অবাঞ্ছিত মজুরদের উপর ইচ্ছামত জুলুম চালাইয়া যাইবে।

তা ছাড়া, জখমের জন্য ক্ষতি পূরণকে ফাঁকি দিবার ব্যবস্থাও মালিক করিয়া রাখিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট কাজের বাহিরে কোন কাজ করিলে তাহাতে মজুরের শাস্তি হইবে। এই নিয়মের ফলে, যখনই কেহ জখম হইবে, মালিক বলিয়া দিবে যে সে তার নির্দ্দিষ্ট কাজের বাহিরে গিয়া জখম হইয়াছে, সুতরাং ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক বাধ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষতিপূরণের মামলায় মালিকের পক্ষ হইতে এইরকম কৈফিয়ৎ শোনা যায়। এখন তো আরো বেশী শুনা যাইবে।

মোটের উপর এই সমস্ত নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে চটকল মজুরদের আন্দোলনকে নষ্ট করিবার জন্য এবং তাদের গোলামের পর্য্যায়ে টানিয়া নামাইবার জন্য, তা উপরোক্ত কয়েকটী ধারা হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সম্প্রতি মজুর আন্দোলনের ধাক্কায় সামান্য একটু মাগগীভাতা বাড়াইতে চটকল মালিক সমিতি বাধ্য হইয়াছে। এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া মালিক তারই প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাদেশিক সরকার এই নিয়মাবলীতে সমর্থন দিয়াছেন কিনা, এখনও জানা যায় নাই। তবে চটকল মালিক সমিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস যে লেবার ডিপার্টমেণ্টের এখনও হয় নাই, তা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

আমরা সরকারের কাছে দাবী জানাইতেছি এই নিয়মাবলী গোপন না রাখিয়া কাগজে প্রকাশ করিতে মালিকদের বাধ্য করা হোক। তাহা হইলে ইহার উপর জনসাধারণ মত প্রকাশ করিতে পারিবে। লোকের অগোচরে মজুরের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিতে মালিক সমিতিকে কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়।

চটকল মজুরের উপর যে হামলা আসিতেছে, তাকে রুখিতে হইবে চটকল মজুরেরই এবং দেশবাসীরই আন্দোলনের জোরে। চটকল মালিক সমিতির এই ষড়যন্ত্রকে উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য ও ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সর্ব্বত্র এখনই সভা ও জলুশ করা হোক। দেশবাসী সকলেরই শক্তি ইহাতে নিয়োজিত না হইলে ইউরোপীয় মালিকদের এই ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিবে না।

—তুষার চট্টোপাধ্যায়

সপ্রু কমিটি বৃটিশের সাহায্যেই নয়া শাসনতন্ত্র চাপাইতে চায়

গান্ধীজীর ঐক্য প্রস্তাবের সমাধি

লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী অস্বীকার ঃ হিন্দুমহাসভার উল্লাস

লেখক :
ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী

লর্ড ওয়াভেলের কাছে সপ্রুর তার পাঠানোর অব্যবহিত পরেই সপ্রু কমিটির রিপোর্টের মূল সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম তাহাই ফলিয়া গিয়াছে। অচল অবস্থা অবসানের জন্য কংগ্রেস ও লীগ যাহাতে একযোগে বৃটিশকে বাধ্য করিতে পারে, তাহার জন্য কংগ্রেস-লীগ মিলনের কোন পরিকল্পনা ইহাতে নাই। বরং ইহার দ্বারা জবরদস্তির জাল পাতা হইয়াছে। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য যে দাবী, সে দাবীকে এই পরিকল্পনায় আগাগোড়া নাকচ করা হইয়াছে। মুসলমানরা যদি কমিটির এই সিদ্ধান্ত না মানে, তাহা হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জোর করিয়া এই ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবে, পরিকল্পনার পিছনে রহিয়াছে এই বিশ্বাস।

প্রারম্ভেই এই জরুরী কথাটা জানিয়া রাখা দরকার যে, এই রিপোর্টে সপ্রু কমিটির সমস্ত সভ্যেরই সায় ছিল না। প্রবীণ শ্রমিক-নেতা শ্রীযুক্ত এন, এম, জোশী আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকার এবং কংগ্রেস-লীগ মীমাংসাকে কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে প্রাণপণে গ্রহণ করাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু না পারায় তিনি সপ্রুর রিপোর্টের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

কমিটির অন্য দুই জন সভ্য সার এইচ, পি, মোদী ও ডাঃ মাথাইও কমিটির কাছে এক সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল স্মারকলিপি পেশ করেন; এই স্মারকলিপিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের পাকিস্তান অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সীমানা নির্দ্ধারণ সত্ত্বেও ইহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে আত্মনির্ভর হইতে পারে—অবশ্য যদি দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে পাকিস্তান অঞ্চলগুলির সহিত ভারতের বাদবাকি অঞ্চলগুলির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এই কয়েকজন সভ্যের যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে সপ্রু কমিটি কর্ণপাত করেন নাই। রিপোর্টের বর্ত্তমান চেহারা হইতে বোঝা যায় ডাঃ জয়াকর ও জগদীশ প্রসাদের নেতৃত্বে কমিটীর উদারপন্থী ও মহাসভাপন্থীদেরই জিৎ হইয়াছে।

গঠনতন্ত্ররচনাকারী পরিষদ

ইহাতে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা 'ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র রচনার পূর্ণ খসড়া নয়।' প্রস্তাব রচয়িতারা জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, পুরা রিপোর্টটি দেখার আগে কোন চূড়ান্ত মত কেহ যেন গঠন না করে। কিন্তু ইহার ভিতরকার কুমতলব বুঝিবার পক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিই যথেষ্ট।

কমিটির প্রথম সিদ্ধান্ত হইতেছে 'গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ' সম্পর্কে। মূল ভিত্তি হিসাবে ইহাতে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাদেশিক আইন-পরিষদগুলি নির্ব্বাচন কেন্দ্র হিসাবে যে সমস্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে তাহাদের লইয়া গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ গঠিত হইবে। এই প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা হইবে ১৬০; অনুন্নত সম্প্রদায় বাদ দিয়া শুধু হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা হইবে ৫১ জন; বাকি প্রতিনিধিদের মধ্যে মুসলমান ৫১ জন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ২০ জন, শিখ ৮ জন, ভারতীয় খৃষ্টান ৭ জন। গঠনতন্ত্র রচনার জন্য একটি মাত্র পরিষদ গঠিত হইলে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কায়েম হইয়া থাকিবে এবং ফলে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে—মুসলমানদের এই আপত্তির কারণ দূর করার জন্যই সপ্রুর প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা সমান করা হইয়াছে।

> গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ নির্ব্বাচন কালে মুসলমানরা যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথায় যদি রাজী হয়, তবেই হিন্দুদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি তাহারা পাঠাইতে পারিবে। ক্রিপস্ প্রস্তাবে এই কথাই বলা হইয়াছে।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, "যদি কোন প্রস্তাবের পক্ষে উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ প্রতিনিধির ভোট না পাওয়া যায়, তাহা হইলে গঠনতন্ত্র কমিটিতে সেই প্রস্তাব পাশ হইতে পারিবে না।" কাজেই গঠনতন্ত্র কমিটির প্রতিনিধিদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী মুসলমান থাকায়, মনে হয় যেন কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমান প্রতিনিধি ঐক্যবদ্ধ হইলে মুসলমানদের উপর তাহা জোর করিয়া চাপানো যাইবে না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার

গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সপ্রু কমিটির নিজস্ব কতকগুলি মতামত আছে। প্রথমত, মুসলমানদের স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবী অস্বীকার করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছে 'কোন প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত না থাকিবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের ও বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার ইহার দ্বারা অস্বীকার করা হইয়াছে।

অনেকে বলিবে, এ সমস্তই ত' কমিটির নিজস্ব মতামত মাত্র; গঠনতন্ত্র কমিটিতে যখন হিন্দু মুসলমানেরা সমান সমান আছে এবং তা ছাড়া তিন-চতুর্থাংশের ভোটের কথা আছে, তখন গঠনতন্ত্র কমিটিতেই ইহার মীমাংসা হওয়ার কোনই বাধা নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা কতখানি সত্য, তাহা আলোচনার মধ্য দিয়াই ধরা পড়িবে। দু ভাবে ইহা দেখা যাক ঃ

প্রথমত কংগ্রেস যদি স্থির করে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমানদের স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবীর সে বিরুদ্ধতা করিবে, তাহা হইলে হিন্দুমহাসভা, শিখ, কায়েমী স্বার্থ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাহায্যে গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধির ভোট যোগার করা কংগ্রেসের পক্ষে আদৌ শক্ত হইবে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর পক্ষে যদি শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান প্রতিনিধিরও ভোট থাকে, তাহা হইলেও এই ভাবে সে প্রস্তাব কংগ্রেস বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ও লীগ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর পক্ষে একমতও হয়, তাহা হইলেও হিন্দুমহাসভা, শিখ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধতার ফলে তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধির ভোটাধিক্য প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে।

ঘুরাইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, গঠনতন্ত্র কমিটির এমন ভাবে পরিকল্পনা হইয়াছে যাহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কোন সমাধানে পৌঁছিবার সুবিধা ত' হয়ই না, বরং আরও বাধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই ধরণের কমিটির ফল খুব সম্ভবত ইহাই দাঁড়াইবে যে, মূল সমস্যার আর মীমাংসা হইবে না। সপ্রু প্রস্তাবের রচয়িতারা ইহা আগে হইতেই আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন ঃ

"গঠনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ যে সমস্ত নিয়মসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহারই ভিত্তিতে এবং **যে সমস্ত অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোটাধিক্য পাওয়া যায় নাই, সরকারী হুকুম বলে সেগুলিকেও গ্রহণ করিয়া** বহুমান্য গবর্ণমেণ্ট এক গঠনতন্ত্র খাড়া করিবে।"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সপ্রু কমিটির প্রস্তাবগুলি মুসলমানদের হুমকী দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। হয় তোমরা আমাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনতন্ত্রে রাজী হও, নহিলে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দিয়া হুকুমনামা দেওয়াইব! আপোষ-মীমাংসা সম্বন্ধে ইহাই তাঁহাদের বুদ্ধির দৌড়।

'রাষ্ট্রপতি'

সপ্রু কমিটি যে ধরণের ইউনিয়ন গঠনতন্ত্র প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা ফেডারেল গঠনতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক ইউনিয়নগুলি হইবে স্বায়ত্তশাসিত—কেন্দ্রের বাকি ক্ষমতা ইহাদেরই হাতে থাকিবে। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রের হাতে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা সামান্য এবং সমগ্র ভারতের স্বার্থ হিসাবে পররাষ্ট্র নীতি, দেশরক্ষা, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক, বাণিজ্য, যানবাহন, শুল্ক প্রভৃতি বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

একজন 'রাষ্ট্রপতি' এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ ও দেশীয় রাজ্য পরিষদ এই দুই আইনসভা—ইহা লইয়া ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই রাষ্ট্রপতি হইবে আবার ঠিক বড়লাট বা নতুন কোন বাদশার মত। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনের সমস্ত ক্ষমতা পুরাপুরি তাঁহারই থাকিবে। এই রাষ্ট্রপতি হইবেন বৃটীশ রাজ কর্তৃক মনোনীত; যদি বৃটিশরাজের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যের একজন নৃপতিকে রাষ্ট্রপতি করা হইবে—হয় তিনি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, কিম্বা কেন্দ্রীয় পরিষদের দুটির যে কোন একটি আইনসভা হইতে তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন।

সপ্রু কমিটি দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে কোনই উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু মনে হয়, এই সমস্ত নৃপতিদের একে একে ইউনিয়ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিত্ব দিয়া তাহাদের দলে ভিড়াইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন!

একটি মাত্র ফেডারেল বা ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত হইলে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য কিছুতেই দূর হইবে না এবং উহার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাতিল হইয়া যাইবে—মুসলমানদের এই প্রধান আপত্তির বিরুদ্ধে সপ্রু কমিটির বক্তব্য কি? সপ্রু কমিটি কেবলমাত্র একটি সর্ত্তে কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের সমানসংখ্যক আসন দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সে সর্ত্তটি এই যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার বদলে বরাবর যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় রাজী থাকিতে হইবে এবং ইহাতে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত থাকিবে।'

> মুসলিম লীগ অবশ্য কখনই যুক্ত নির্ব্বাচনে রাজী হইবে না। আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা চালু করিলে মুসলমানদের উপর অবিচার করা হইবে। কারণ এই ব্যবস্থায় মুসলমান প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচনে হিন্দু ও কংগ্রেসপন্থীরাই হইবে সংখ্যায় বেশী। ফলে, যে সমস্ত মুসলমান লীগের বাইরে এবং যাহাদের উপর অধিকাংশ মুসলমানেরই আস্থা নাই, তাহারাই নির্ব্বাচনে জয়ী হইবে এবং মুসলমানদের আস্থাভাজন লীগ প্রতিনিধিরা পরাস্ত হইবে।

মুসলমানদের কাছে সপ্রু কমিটি এই ভাবে আবেদন জানাইতেছে যে ঃ তোমরা ভয় করিতেছ যে, কেন্দ্রে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে তোমাদের স্বায়ত্তশাসন বাতিল হইবে? বেশ, যদি তোমরা যুক্ত নির্ব্বাচন মানিয়া নাও, তাহা হইলে হিন্দুদের সমান সমান প্রতিনিধি তোমরা পাঠাইতে পারিবে। তোমরা যদি ইহাতে রাজী না হও, তাহা হইলে হিন্দুদের আমরা বলিব, মুসলমানদের সমানসংখ্যক আসন গ্রহণ করিতে তাহারা যেন রাজী না হয় এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাও যেন তাহারা ওলট পালট করিয়া দেয়।

মুসলিম কাগজে প্রতিক্রিয়া

সপ্রু কমিটি নিজেদের সালিশী কমিটি বলিয়া জাহির করে। কিন্তু এই কমিটি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সেই ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য কোনই চেষ্টা করে নাই। গান্ধিজী মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উপলব্ধি করার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভাইয়ের মত ভাগাভাগিতে তাঁহার সম্মতি আছে।

কিন্তু সপ্রু কমিটি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারেই অস্বীকার করিয়াছে এবং পুরাতন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গে নতুন করিয়া বিরোধের ভয় দেখাইয়া মুসলমানদের উপর ফেডারেশন ও যুক্ত নির্ব্বাচনের পুরানো গলিত ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাহিতেছে!

কমিটি ভাল করিয়াই জানে ইহাতে কাজ হইবে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাহারা বহুমান্য গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে তাহাদের প্রস্তাব যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে কমিটির এই ইচ্ছা যে, গবর্ণমেণ্ট 'একটি অস্থায়ী' গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করুক এবং এই (সপ্রু কমিটির) প্রস্তাবাবলীর উপর সাধারণ ভাবে ভিত্তি করিয়া একটি নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়া তৈরীর ব্যবস্থা করুক। এই গঠনতন্ত্র পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করিয়া যথাশীঘ্র তাহা চালু করা হউক।

ওয়াভেলের কাছে সপ্রুর প্রেরিত তার ও সপ্রু কমিটির এই নূতন প্রস্তাবাবলী দুটিকেই মুসলিম সংবাদপত্রে তীব্র ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। সপ্রু কমিটির প্রস্তাবাবলীর উপর মুসলিম পত্রিকাগুলির মন্তব্যের সবটুকু এখনও পাওয়া যায় নাই। দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'আঞ্জাম' পত্রিকায় সপ্রুর তারের উত্তরে মিঃ জিন্নার বিবৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

> 'সপ্রু কমিটি আপোষ মীমাংসার জন্য বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় নাই। জাতীয় দাবীগুলি অগ্রাহ্য করা, মুসলিম ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া বৃটেন ও হিন্দু-ভারতের মধ্যে বনিবনা করা—ইহাই ছিল সপ্রু কমিটির আসল লক্ষ্য।' (৬।৪।৪৫)

দিল্লীর 'মনসুর' পত্রিকায় সপ্রু প্রস্তাবের প্রতিবাদে ব্যাপকভাবে সভা করিতে বলা হইয়াছে। (আসর-জাদিদ) পত্রিকায় সপ্রু প্রস্তাবকে 'টম্ রাজের (অর্থাৎ বৃটিশ রাজ) তাঁবে রাম রাজ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এমন কি জমিয়ৎ উল-উলেমার (জাতীয়তাবাদী মুসলিম) মুখপত্র 'আন্‌সারি' সপ্রু প্রস্তাব সম্বন্ধে দুঃখের সহিত লিখিয়াছে যে, ইহার ফলে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তফাৎ আরও বাড়িয়া যাইবে।'
(৬।৪।৪৫)

বিভেদের হাতিয়ার

জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেস সমর্থক কাগজগুলি ইহাকে কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হিসাবেই দেখিয়াছে এবং এই প্রস্তাবের ফলে লীগের দাবীর কি দশা হইবে, তাহা তাহারা আলোচনাই করেন নাই। তাহাদের মন্তব্যের সুর অনেকটা এই রকম যে, এই প্রস্তাব ত' খুবই নরম ভাবে করা হইয়াছে, এখন গবর্ণমেণ্ট ইহা কি মানিবেন? লীগকে ও লীগের পাকিস্তান দাবীকে বাদ দেওয়ায় হিন্দু মহাসভাপন্থী কাগজগুলি সপ্রু কমিটির এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়াছে।

এমন কি 'বোম্বে ক্রনিকল্'-এর মত পত্রিকাও, যে পত্রিকা সাধারণত কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সমর্থন করিয়া থাকে,—তাহাতেও সপ্রু প্রস্তাবের সমর্থনে লেখা হইয়াছে; অবশ্য এক জায়গায় দুর্ব্বলভাবে মন্তব্য করা হইয়াছে।

> "অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই নীতির (আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পাকিস্তান) ভিত্তিতেই হিন্দু মুসলিম সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান সম্ভব। এক কথায় বলিতে গেলে, সপ্রু কমিটির প্রস্তাব অপেক্ষা গান্ধিজী যে প্রস্তাব মিঃ জিন্নার কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন, মীমাংসার পক্ষে বোধহয় সেই প্রস্তাবই ঢের বেশী কাজের হইবে।" (১০।৪।৪৫)

সপ্রু প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসপন্থী ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্রের এই প্রশ্রয়ের ভাব দেখিয়া লীগ মনে করিতেছে যে মুসলিম দাবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইহাদেরও সমর্থন আছে। সপ্রু প্রস্তাব তাই মিটমাটের আবহাওয়া আনে নাই, ইহাতে ভেদচেষ্টাই বাড়িয়াছে।—'**পিপল্‌স্ ওয়ার**'-১৫ই এপ্রিল

...কার চাপ

...টির মুখপত্র

...ই বৈশাখ '৫২ [দাম ছয় পয়সা

...র মুক্তি আপোষের প্রথম ধাপ

...াগ আজ উপস্থিত।
...ই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে
...স নেতৃবৃন্দের মুক্তি একান্ত দরকার।
...বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিয়া দেখিতে
...ব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে
...ত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত

...ত হওয়ার কোন
...কার বিবৃতিতে

...ংগ্রেসের
...ণ

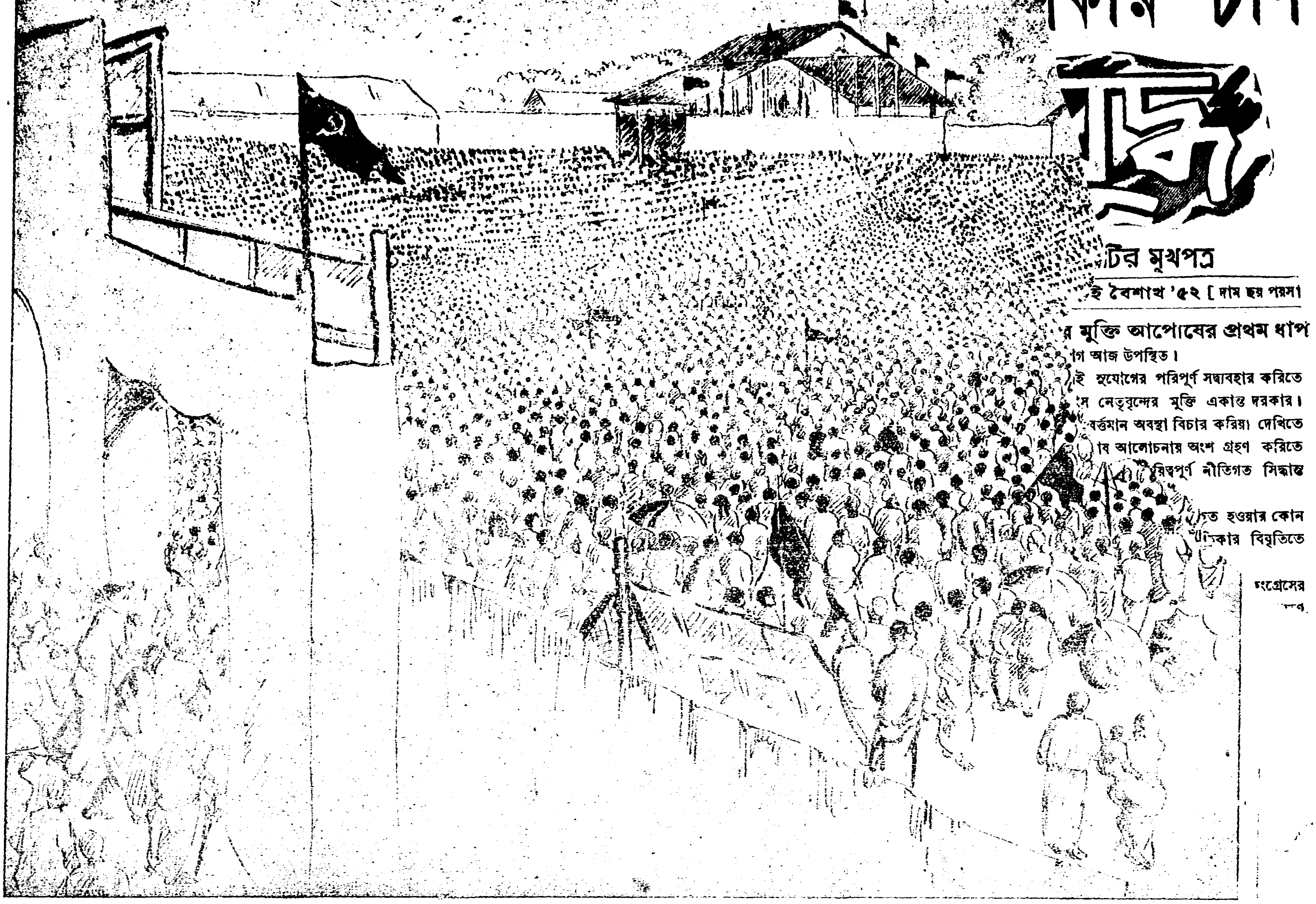

নেত্রকোণা নাগরার মাঠে লক্ষ কৃষকের অধিবেশনের অপূর্ব্ব দৃশ্য —শিল্পী : নীরদ মজুমদার

অগ্রণী হয়েছে, আর দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সময় অনেকেই প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে।

তাই কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট-কৃষক সভা বিতর্ক যতই চলুক ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা শহরের মধ্যবিত্ত মহলও সম্মেলনে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেন নি। শুধু ময়মনসিংহ জেলার ভেতরেই প্রায় ২৬ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে তার বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান, এবং এঁদের অনেকেই কংগ্রেস বা লীগভক্ত। কৃষক সভা কি, সেটা যে কংগ্রেসও নয় লীগও নয় তা জেনেশুনেই তাঁরা দান করেছেন। নেত্রকোণার বৃহত্তম ব্যবসায়ী সর্ব্বেশ্বর বণিক তাঁর স্ত্রীর নামে একটী টিউব ওয়েলের জন্যে ৫০০ টাকা দিয়েছেন, অন্যান্যেরা অর্থ, ডেগচি, বালতি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেছেন। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ৬টী টিউব ওয়েল ব্যবহার করতে দিয়েছেন আরও দুটী মিউনিসিপালিটী থেকেই বসিয়েছেন।

'কংগ্রেসীদের' ভয় ও অপপ্রচার

স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশ ধর প্রথম দিকে সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজন সভায় পর্য্যন্ত উপস্থিত থেকেছেন, লীগের নেতারাও এসেছেন। কিন্তু বিশাল প্রান্তরের মধ্যে কিষান নগর যখন ক্রমেই মাথা উঁচু করে উঠতে লাগল, বহু দেশভক্ত সাহায্যে এগিয়ে এলেন, জেলাময় কৃষকদের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির সাড়া পড়ে গেল তখন কংগ্রেসের উপরের মহলে টনক নড়া। কলকাতায় শ্রীকিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতাদের কাছ থেকে স্থানীয় কর্ম্মীদের প্রশ্নের জবাবে নির্দ্দেশ এল— কৃষক সম্মেলনের সঙ্গে কংগ্রেসকর্ম্মীদের কোন সংস্রব রাখা চলবে না।

আরম্ভ হ'ল গড়া জিনিষকে ভাঙবার আত্মঘাতী চেষ্টা। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটনা করলেন যে সম্মেলনের জন্তে কংগ্রেসের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। অমনি দেখাদেখি কয়েকজন লীগনেতাও ঠিক একই ধরণের প্রচার সুরু করলেন যে, লীগের নামে টাকা তোলা হচ্ছে। ভেদ-সৃষ্টির পদ্ধতিতে কংগ্রেস ও লীগের কি অদ্ভুত ঐক্য! কৃষক সভা থেকে প্রকাশ্য হ্যাণ্ডবিলে যখন এর প্রতিবাদ করা হ'ল তখন কংগ্রেস বা লীগ নেতারা এরকম অর্থ সংগ্রহের একটীও প্রমাণ দিতে পারলেন না, কিন্তু তবুও কংগ্রেস নেতারা আবার ইস্তাহার ছাড়লেন যে, এ সম্মেলনকে যেন সব কংগ্রেসকর্ম্মীই বর্জ্জন করেন। আর-এস-পি প্রভৃতি উপদল আরও "বিপ্লবী" উপায়ে সম্মেলন ও উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করতে লাগল।

এমন কি নেত্রকোণার জনকয়েক "কংগ্রেসী" মহিলা ছাপানো হ্যাণ্ডবিলে সম্মেলন বর্জ্জনের উপদেশ দিয়ে জানালেন যে, বাইরে থেকে যেসব মহিলা নেত্রকোণা শহরে "সম্মেলনে আসিতেছেন, তাহারা কমিউনিষ্ট, সুতরাং এদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব বা এদের প্রতি কোন সহানুভূতি আমাদের নাই বা থাকিতে পারে না।"

দু হাজার বছরের সভ্যতা আমাদের দেশবাসীকে ও বিশেষ করে আমাদের মাতৃজাতিকে আতিথেয়তার যে ঐতিহ্য দিয়েছে—ভেদবিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী গ্লানি তাঁদের সে ঐতিহ্যও একদিনে ধ্বংস করে দিল। শুধু কমিউনিষ্টই নয়, গ্রাম থেকে যে শত শত চাষী মেয়ে বহুদূর হেঁটে অপরিচিত শহরে পৌছাল তাদের প্রতি আতিথেয়তার দায়িত্বও তাঁরা অস্বীকার করলেন। এটুকুও তাঁদের মনে হল না যে, তাতে কমিউনিষ্টদের ক্ষতি হোক বা না হোক তাঁদের নিজেদেরই প্রাচীন সভ্যতা ও দেশপ্রেমের যে ক্ষতি তাঁরা করলেন তার আর তুলনা নেই।

বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের পক্ষ থেকেও অপপ্রচারের অভাব ছিল না। তারা প্রথমে বলেছিল—সম্মেলনে যেওনা, ও গবর্ণমেণ্টের সম্মেলন, ওখানে গেলে সব সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে নেবে। তাতেও যখন শোনেনা তখন বলেছিল ওখানে সরকারের বিরুদ্ধে কথাবার্ত্তা হবে, লাঠি চলতে পারে, গুলি চলতে পারে। কলেরা বসন্তে মরবার ভয়ও অনেকে দেখিয়েছিল।

তবুও দেশভক্তিই জিতল

কিন্তু এই সমস্ত অপপ্রচার সম্মেলনের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে নি। দিনের পর দিন মাঠের মধ্যে মায়াপুরীর মত যে বিরাট নগরী গড়ে উঠতে লাগল, সম্মেলন আরম্ভ হবার আগেই শহর থেকে গ্রাম থেকে যে হাজার হাজার নরনারী নিত্য ভিড় করে দেখতে আসতে লাগল, কৃষকের প্রাণের স্পন্দন যখন সম্মেলনের ক্রমবিকাশে ধ্বনিত হতে লাগল, তখন শহরের অধিবাসীরাও তাঁদের দেশভক্তির কর্ত্তব্য ভুলতে পারলেন না। বার লাইব্রেরীর মেম্বরেরা নিজেদের বাড়ীতে জায়গা দিলেন, মোক্তার লাইব্রেরী এবং মিউনিসিপালিটী নিজেদের অফিস-বাড়ীই ছেড়ে দিলেন, "কংগ্রেসী" মহিলাদের হ্যাণ্ডবিল সত্ত্বেও মেয়ে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষয়িত্রীরা শত শত মহিলা দর্শকের জন্তে গোটা স্কুলবাড়ী ছেড়ে দিলেন, পরিচর্য্যায় সাহায্য করলেন—ছেলেদের স্কুলও হাজংদের বাসভবনে পরিণত হ'ল। দেশভক্তির ঐতিহ্য ভেদ-বিচ্ছেদের গ্লানিকে পরাস্ত করল।

* * *

কনফারেন্স তো ৮-৯ তারিখ কিন্তু ৬-৭ তারিখ থেকেই সম্মেলন স্থল এক তীর্থ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠের চারদিকে যে কটা পথ আছে সে সব কটা পথ দিয়ে অনবরত মানুষ আসছে, যাচ্ছে—পুরুষ, নারী, ছেলে, বুড়ো, শহুরে ভদ্রলোক, গ্রামের মানুষ। দিনে রাতে অনবরত তারা আসছে, কেউ প্রদর্শনী দেখছে, কেউ পতাকা, মণ্ডপ, সম্মেলন স্থল, দোকান পাঠ ঘুরে ঘুরে দেখছে, কেউ পাকশালার বিরাট বিরাট ফুটন্ত ডেকচির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। এই ভিড় গভীর রাত্রেও কমে না, রাত বারোটার পর আসতে আরম্ভ করেন বোরখা পরা মুসলমান মেয়েরা—লজ্জা সরমের দায়ে পরিচিত লোকের চোখ তাঁরা যতটা সম্ভব এড়াতে চান।

এক ডাকেই হাজার হাজার লোক জমা হয়ে যায়। হাজার কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে ৬ই তারিখ বিকাল বেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে জাতীয় সপ্তাহের উদ্বোধন হিসাবে আজ একটী সভা করা উচিত। কিন্তু শহরে বা গ্রামে খবর দেবার সময় নাই। তার প্রয়োজনও নাই, শহর গ্রাম তো সম্মেলন স্থলেই ভেঙ্গে পড়েছে। কয়েকটা চোঙ্গা নিয়ে মণ্ডপের চারদিকে কয়েকবার হাঁক দিতেই দশ পনের হাজারের বিরাট জনতা এসে জমা হয়ে গেল—২৫ বছর আগে জালিনওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতি-তর্পণ করতে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তারা ভবানী সেন আর অন্য বক্তাদের বক্তৃতা শুনল।

* * *

সম্মেলনের প্রবেশ-পথ দিয়ে ভেতরে ...বশিষ্ট ...জার প্রথমেই চোখে পড়ে এক বিরাট মাটির মূর্ত্তি—সবল কৃষকের সংগ্রামশীল জীবন-রূপ, কোলের উপর ধানের গুচ্ছ, বাঁ হাতে কাস্তে উঁচু করে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, জোরালো পেশীগুলো টান টান হয়ে ফুটে বেরিয়েছে, হাতের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়েছে, পায়ের শৃঙ্খলও যায় যায়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী ফণী পাল এটী তৈরী করেছেন, হৃদয় নামে একজন হাজং কৃষক নেতার চেহারার অনুকরণে।

পিল পিল করে চারদিক দিয়ে যত মানুষ আসে প্রথমেই এই মূর্ত্তির সামনে থমকে দাঁড়ায়, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মেয়েরা অনেকেই প্রণাম করে তারপর এটা কি তা নিয়ে অসংখ্য জল্পনা চলে।

[৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

দ্রাবিড় বর্মী হাজং উড়িয়া মণিপুরী—সারা ভারতের মিছিল

নীয়)
রম্পরের
াপে না
অত্যন্ত
এ কোন্

মাইল পথ
ম বল্ল, "দূর,
।"

এত
রিটা
মত।"
"নেতা
তার মতই

রেছিল তারা
েতে যেতে বল্ল, "দেবতা

* * *

ালে বিরাট সম্মেলন প্রাঙ্গণের পতাকা উত্তোলিত হ'ল। প্রায় র দর্শক ও ডেলিগেটের সমাবেশ য়েছে।

আনাভিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ শিখ কৃষক নেতা বাবা কেশর সিং পতাকার পুরোহিত। জীবনের ৩৩ বৎসরই তিনি জেলখানার মধ্যে কাটিয়েছেন, মাত্র দুতিন মাস হ'ল অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এম্নি ধারা নেতাই কৃষক সভার সৈনিক—পাঞ্জাবের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে।

সভাপতির শোভাযাত্রা

তারপর সভাপতিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করবে। নদী পার হয়ে শহরে একটা সুবিধাজনক স্থান দখল করার জন্য দৌড়চ্ছিলাম, ঘাটের হিন্দুস্থানী ঠিকাদার ও দোকানদার চেপে ধরে বল্লেন, "কামরেড—হামারা বিহারসে ভি লিডার আইসে, হামার আপন গাঁওয়ের লিডর, হামার সঙ্গে মোলাকাৎ হইয়েসে।"

এখানে এখন সাধারণ মানুষ সবাই সবাইকে কমরেড বলে—তার মানে যে যা বুঝুক। ঘাটওয়ালা থম থেকেই আমাদের ধরেছিলেন—দুনিয়ার সব গা থেকে যখন এত লোক এসেছে তখন তাঁদের শের লোকও নিশ্চয় এসেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় রিয়ে দিতে হবে। এখন জানালেন যে যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেছেন।

মাঠ থেকে শোভাযাত্রা বাঁশের পুল দিয়ে নদী পার হয়ে শহরের ঘাটের কাছে জমা হবে, তারপর সভাপতিকে সুসজ্জিত গরুর গাড়ীতে চড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হবে। কাতারে কাতারে মানুষ পার হতে হতে পুল মড়মড় করে উঠল, তাড়াতাড়ি ভলন্টিয়ারেরা ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে নিজেদের কাঁধ পুলকে ঠেকাল।

আমরা তাড়াতাড়ি শোভাযাত্রার চেয়ে খানিকটা গিয়েছিলাম। শহরের ভেতরে তখন দোকানের ধারে, বাড়ীর দরজায় ও জানালায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সারা শহর এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে শোভাযাত্রা দেখবার জন্য। একটী আর-এস-পি ছাত্র হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে—এই সম্মেলনের সঙ্গে "কংগ্রেস, প্রগতিবাদী অন্যান্য রাজনৈতিক দল এমন কি নিখিল ভারত কিষাণ সভা……কাহারও সহিত ইহাদের সংস্রব নাই…।" মোড়ের মাথায় শোভাযাত্রার শুধু আগের অংশটুকু দেখে সে পার্শ্ববর্ত্তীদের লক্ষ্য করে বল্ল "ওঃ সারা ভারতের এই প্রসেশন!"

তাতে পার্শ্ববর্ত্তীদের কোন ভাবান্তর হ'লনা। তারা গলা বাড়িয়ে শোভাযাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথমে কিছু ভলান্টিয়ার, তারপরে গরুর গাড়ীর র রথের মঞ্চের মত ঘেরাটোপ—রক্তধ্বজ চিহ্নিত সভাপতির আসন। সে আসনে হাজার নির্যাতনের বীর নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ, কিন্তু এত সম্মানে যেন সন্ত্রস্ত, লজ্জিত। তারপরে মহিলা ডেলিগেট ও বহিরাগত দর্শক কাতারে কাতারে—তার মধ্যে শহরে মেয়ে, কৃষক মেয়ে, হাজং মেয়ে, নানা রঙের অফুরন্ত সমারোহ।

ভদ্রবেশী কয়েকজন দর্শক অবাক হয়ে বল্লেন, "বাপরে, এত মেয়ে দুরদেশ থেকে এই সম্মেলনে এসেছে! কংগ্রেস অধিবেশনেও তো এত মেয়ে বড় একটা দেখিনি।"

কৃষক আন্দোলন সমাজের নিপীড়িতদেরই আন্দোলন, আর বাংলার সমাজে মেয়েদের চেয়ে নিপীড়িত কে আছে? তাই কৃষক আন্দোলন মেয়েদের মনে এম্নি বিপুল সাড়া জাগাতে আরম্ভ করেছে।

তারপর দীর্ঘকায় পাঞ্জাবী ডেলিগেটের দল; তারা যেন সভাপতির বডি-গার্ড। তারপর যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, গোয়ালিয়র, বোম্বাই, অন্ধ্র, মালাবার, আসামী, মণিপুরী, গুর্খা, গারো, হাজং, বর্মীজ—ভারতের সমস্ত প্রদেশের নরনারী—সারা ভারতই যেন মিছিল করে চলেছে। এমন কি দুজন ইয়োরোপীয়ান সৈন্য এবং একজন ইয়োরোপীয়ান মহিলাও শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন—বিদেশের মুক্তিকামী জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের কৃষকের ঐক্যের আভাষ।

* * *

দর্শকেরা স্তব্ধ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। একদল মন্তব্য করলেন "না, সারা ভারত সম্মেলনই বটে, কোনো প্রদেশের লোকই বাকী নেই। এবার নেত্রকোণার নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে যাবে।"

আর-এস-পি ছাত্রটী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বল্ল, "কিন্তু বিহারের লোক কত কম দেখলেন তো—স্বামী সহজানন্দ এদের বয়কট করেছেন কিনা।"

আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে একজন দোকানদার ধরণের অল্পশিক্ষিত লোক অন্যদের বলছেন: "সার্থক জীবন এই মুজফ্ফর আহ্মদের, আমাদেরই মুসলমান জাতের লোক, কত পুণ্য করলে এমন সম্মান পাওয়া যায়, কিন্তু তোমরা জানো, আনন্দবাজারে লিখেছে লাট সাহেব একটা টেলিগ্রাম করলেই সভা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা গবর্ণমেন্টের লোক কিনা!"

আর একজন বল্লেন, "এত বড় যজ্ঞ, কিন্তু নেত্রকোণার বাজার থেকে এক পয়সার জিনিষও কিনল না! সব বাইরে থেকে এসেছে, নয় তো কৃষকদের কাছ থেকে এনেছে। বাহাদুরি আছে।"

"হ্যাঁ তাতো আছেই। ঐ হাজং টাজং সব বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছে দেখনি—বাড়ীতে ওদের তালাও দিয়ে আসতে হয় না, চুরি করবার কারও সাধ্যিই নেই। ওরা কি তোমার আমার মত। সত্যি একটা কাণ্ডই করলে এই কৃষকেরা।"

মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব

তাঁরাই শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। একদিকে বিভেদকারীদের রাজনৈতিক অপপ্রচার আগে থেকেই তাঁদের মনে কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছে, অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনের শক্তি ও জনপ্রিয়তার চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁদের মনকে নাড়া দিচ্ছে—তাই মনের মধ্যে সহানুভূতিই প্রবল হয়ে উঠছে।

সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে শহরের একেবারে ভেতরে আর একটা চায়ের দোকানে দেখলাম খদ্দর-পরিহিত কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। পরে জানতে পেরেছিলাম এঁরা স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা ও কর্ম্মী।

একজন বলছিলেন, "যে রকম প্রসেশন হয়েছে, তাতে সভার সময় লোক আসা কেউ ঠেকাতে পারবেনা। কি করে দেখতে যাওয়া যায় বল দেখি?"

আর একজন বল্লেন, "হ্যাঁ; হৈ-চৈ করলে অমন লোক সব সময়েই হয়।"

উপস্থিত সকলেরই কথায় বোঝা গেল যে দেখতে যাওয়ার সকলেরই খুব ইচ্ছা কিন্তু একজন বল্লেন, "কি করে যাই—আমরাই হ্যাণ্ডবিল দিয়েছি যে কংগ্রেসকর্ম্মীরা যেন সম্মেলনে যোগদান না করেন—এখন আমরা গেলে তো লোক হাসবে।"

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল যে সভায় না গিয়ে কাছাকাছি কোন এক আমতলায় গিয়ে দেখতে হবে শোনা যায় কিনা!

* * *

বেলা প্রায় ৪ টার সময় সম্মেলন আরম্ভ হল। মাঠের মধ্যে প্রচণ্ড, উম্মুক্ত রৌদ্র, কিন্তু তখনই প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সেই রৌদ্রে ভিড় করে বসে আছে। চারিদিকের পথ দিয়ে অনবরত লোক আসছে, ফিরে যেতে বড় একটা কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মণি-সিংহ সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন, দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলায় মানুষের জীবন, সমাজ, নীতি সবই কেমন করে বিকারগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে তার বর্ণনা দিলেন, কৃষক সভা এর বিরুদ্ধে বসে নাই, কাজ করছে, কিন্তু সে কাজ কত সামান্য তা সবাইকে বোঝালেন।

তারপর সভাপতি মুজফ্ফর আহ্মদের সুচিন্তিত অভিভাষণ—কৃষক সমাজের ধ্বংস, বেদনা, সংগ্রাম ও সংগঠনের ইতিহাস তা আপনারা খবরের কাগজেই পড়েছেন।

লোকের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে, প্রকাণ্ড মাঠের তিন চতুর্থাংশ প্রায় ভরে উঠেছে। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মত প্রায় ৫টা পার্ক সেই মাঠের মধ্যে ধরে।

কারা এবং কত এসেছিল?

লোক কত হয়েছিল কে বলতে পারে! ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড ভারতের সমস্ত বড় বড় ব্যাপারের ছবি তুলে সিনেমায় দেখায়, তাদের প্রতিনিধি মিঃ ঘটক এই সম্মেলনে চলচ্চিত্র নিচ্ছিলেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক ভিড় দেখেছেন। তিনি বল্লেন, এত বড় জনতা আমি আগে কখনো দেখিনি—দু লাখ থেকে দেড় লাখের মত লোক নিশ্চয়ই হবে। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন, তিনি বললেন লোক ৮০ হাজার হবে। অন্য প্রদেশের দু একজন প্রতিনিধি বললেন ৫০।৬০ হাজার। তিন জন আর-এস-পি যুবক সভার এক কোণে বসে নানা রকম মস্করা করছিল, কিন্তু তাদের মস্করায় কেউ যোগ দিল না দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে যেতে যেতে বলল "হ্যাঃ, ভারি তো দশ পনের হাজার লোক হয়েছে।"

আড়াই বা তিনখানা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মত জায়গায় লোকে বেশ কাছাকাছি বসে বক্তৃতা শুনছিল। আমার মনে হয় সভার শ্রোতার সংখ্যা ছিল ৭০।৮০ হাজার, আর বাইরে প্রদর্শনী, দোকান-পাট, গাছতলা ইত্যাদিতে যারা ভিড় করে ছিল তাদের ধরলে লাখ খানেক হবে।

যারা এসেছিল তার প্রায় অর্দ্ধেকই মুসলমান! একসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের এত বড় সমাবেশ কোনো সভায়ই দেখা যায় না, এইখানেই কৃষক সভার বিশেষত্ব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না, হাজার দশেক নিশ্চয়ই হবে। স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন প্রায় আট হাজার। সমস্ত শ্রেণীর নরনারীকে একত্রে এত বিপুল সংখ্যায় জড়ো করাও কৃষক সংগঠনেরই বিশেষত্ব।

কিন্তু সংগঠনের দুর্ব্বলতার ফলেই প্রথম দিনের এই বিপুল সভার সম্পূর্ণ ফল কৃষক সভা লাভ করতে পারল না। উপস্থিত জনতার মধ্যে যারা কৃষক সভার কথা জানে, তার প্রতি আনুগত্য আছে, তারা স্থির হয়ে বসে সব কথা বুঝবার চেষ্টা করছিল। আর বাকী লোক অসংগঠিত, তারা জানতে এসেছিল কৃষক সভা কি, কি বলে, তাদের জন্যে কি করবে। কিন্তু এদের অনেকে উঠে গেল। এত বড় সভা অথচ আগে থেকে ভাল করে সর্ব্বত্র লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা হয়নি—পিছনের দিকে অনেকেই শুনতে পাচ্ছিল না। তার ওপরে সভাপতির একটানা, ক্ষীণ সুরের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে বা বুঝতে আরও অসুবিধা হচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে একজন মুসলিম কৃষক বললেন, "এতদুর থেকে এত খরচ করে এলাম, কিন্তু কিছু শোনা যায় না, ব্যবস্থা এত খারাপ কেন?"

[৭-এর পৃষ্ঠা দেখুন]

মণিপুরী চাষী —শিল্পী : নীরদ মজুমদার

ওয়াভেলের উপর বৃটিশ কমিউনিষ্ট পত্রিকার চাপ

জনযুদ্ধ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র
৩য় বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা] ২৬শে এপ্রিল, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ১৩ই বৈশাখ '৫২ [দাম ছয় পয়সা

অবিলম্বে নেতাদের মুক্ত করো
'ডেলি ওয়ার্কারে' গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

বড়লাট পদে বহাল থাকা অবস্থায় যুক্তি-পরামর্শের জন্য লণ্ডনে ছুটিয়া আসাটা যেমন তেমন ঘটনা নহে। লর্ড ওয়াভেলের আগমন সম্ভবত ভারতবর্ষে বড় রকমের আশু পরিবর্ত্তনেরই পূর্ব্বলক্ষণ।

প্রকাশ, লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষে তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া একটা মিটমাটের প্রস্তাব লইয়া এখানে আসিয়াছেন। চার্চিল ও আমেরির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে: এখানকার গবর্ণমেণ্ট কি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবে? তাহারা কি নূতন চোখে এবং বাস্তব ও গঠনমূলকভাবে ভারতের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইবে?

আশু মীমাংসা কেন চাই?

যে কারণে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত দরকার, সে কারণগুলি খুবই স্পষ্ট।

ইউরোপে যুদ্ধ জয় করার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর প্রাচ্য যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের গতি দ্রুততর করার জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত অন্যান্য দেশগুলি তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারে তাহার পরিকল্পনা ও যোগাড়যন্ত্র চলিতেছে।

এই পরিকল্পনার পিছনে ভারতের সার্থক সহযোগিতা চাই।

সৈন্যবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি হিসাবেই শুধু নয়, সরবরাহ এবং শিল্পোৎপাদনের প্রধান নির্ভর হিসাবেও ভারতবর্ষকে প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলের যে বিপুল জনবল আজও যুদ্ধের কাজে অব্যবহৃত, তাহাদের পাইতে হইলেও ভারতবর্ষকেই প্রয়োজন।

* * *

রণনীতির দরুণ ত' বটেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জন্যও ভারতবর্ষে বিরাটভাবে শিল্পোন্নতির প্রয়োজন।

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ও দেশের জনসাধারণের অসন্তোষ যতদিন না মিটিবে, ততদিন ভারতবর্ষে সত্যকার যুদ্ধায়োজন সম্ভবই নয়।

অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতের দুরবস্থা আজ চরমে উঠিয়াছে।

আমেরি এবং তাঁহার ভারত দপ্তর গত ৩ বছর ধরিয়া যে নিষ্ফল, নেতিবাচক নীতি চালাইয়া আসিতেছে, সে নীতির আজ দেউলিয়া অবস্থা।

বৃটেনের প্রগতিশীল জনমত

বৃটেনের প্রগতিশীল জনমতের ও সম্মিলিত দেশগুলির মিত্রপক্ষীয় জনমতের রাজনৈতিক চাপে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনিতে বাধ্য করিতেছে।

গত ডিসেম্বর মাসে কার্য্যকরী পরিষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও লেবার পার্টি কনফারেন্সের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বন্দীমুক্তির জন্য এবং ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালাইবার জন্য দাবী জানানো হইয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে জনমত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শক্তিশালী জনমত শুধু শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সম্প্রতি 'টাইমস' পত্রিকায় ভারত সংক্রান্ত চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়া জনমতের সাধারণ মতৈক্য প্রকাশ পাইয়াছে। ২০শে মার্চ 'টাইমস' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহাকে এইভাবে চুম্বকাকারে সাজানো হইয়াছে:

'হয় গ্রহণ করো, না হয় বর্জ্জন করো' এই মনোভাব লইয়া বৃটেন আজও ক্রিপস্ প্রস্তাবকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে! কিন্তু আজ আর ইহাতে চলিবে না। বরং ইহার ফলে যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরেও ভারত ও বৃটেনের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার সম্বন্ধ বিপন্ন হইবে।

লেখক: রজনী পাম দত্ত

"রাজনৈতিক উদ্যোগ এই দেশ হইতেই আগে আরম্ভ করা দরকার—সকলেই এই মত পোষণ করে।"

সম্প্রতি 'ওয়ার এণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস' পত্রিকায় 'ভারতীয় সমস্যা' নামে যে বাস্তব তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে (৪৭শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' দেখুন—অনুবাদ) এই প্রসঙ্গে তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হইয়াছে:

"ভারতবর্ষের দুর্ব্বলতার মূল কারণ তাহার রাজনৈতিক পশ্চাদ্বর্ত্তিতা। এই কারণ দূর করিতে পারিলে তবেই তাহার সমস্যার সমাধান সম্ভব।

"দেশের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে যদি গণতন্ত্র ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যদি গণতান্ত্রিক নীতি চালু করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের নিপীড়িত জনসাধারণ ঔপনিবেশিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং যে বাধার জন্য ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি রুদ্ধ হইয়া আছে, সে সমস্ত বাধাও দূর হইবে। তবেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিপুঞ্জের মধ্যে যোগ্য আসন লাভ করিবে।"

ভারতের আপোষে আগ্রহ

ভারতের অভ্যন্তরে আজ অবস্থা কি? সেখানেও আজ কতকগুলি শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ইহা সত্য যে, গান্ধী-জিন্না আলাপ-আলোচনায় কোন মীমাংসা হইতে পারে নাই।

কিন্তু একদিকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনের নেতৃমহলেই এবং অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণ ও ভারতীয় সংবাদপত্রের এক বিরাট অংশের মতামতের মধ্যে বর্ত্তমান নিষ্ফল ও অকেজো নীতির অবসানের জন্য, সহযোগিতা ও মিলিত অগ্রগতির পন্থা গ্রহণের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইতেছে।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে এই সহযোগিতা সফল করিয়া তোলার জন্য এবং ভারতের সমস্ত জাতীয় শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চালাইতেছে, তাহার ফলও আজ ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কংগ্রেসের মধ্যে যে আজ এক নূতন স্রোত বহিতেছে, তাহা বুঝা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের শক্তিবলে এবং আসাম প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গঠন হইতে।

কংগ্রেস ও লীগের বুঝাপড়া

কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা প্রতিটি ব্যাপারে একযোগে দাঁড়াইয়া যেভাবে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্টকে পরিষদের মধ্যে বার বার পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা ভুলাভাই দেশাই ও মুসলিম লীগ দলের নেতা লিয়াকত আলি খাঁ যুদ্ধাবস্থায় সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের এক পরিকল্পনায় রাজী হইয়াছেন। এই চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস ও লীগ প্রত্যেকে শতকরা ৪০টি আসন ও অন্যান্য অংশগুলি শতকরা বাকি ২০টি আসন পাইবে।

কংগ্রেস বা লীগ সরকারী ভাবে এই পরিকল্পনা উপস্থিত করে নাই, বরং অস্বীকার করিয়াছে—তাহা হইলেও ইহা মনে করিবার কারণ আছে যে, এই প্রস্তাবগুলি নেতৃমহলের উপস্থিতিতেই আলোচিত হইয়াছে।

তাছাড়া গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স-এর সভায় লর্ড ওয়াভেল যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

"প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থনের ভিত্তিতে যদি নূতন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ত্তমান ভারত সরকার অপেক্ষা তাহাতে ভারতের ঢের বেশী কল্যাণ সাধিত হইবে।"

নেতাদের মুক্তি আপোষের প্রথম ধাপ

সে সুযোগ আজ উপস্থিত।

কিন্তু এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি একান্ত দরকার। তবেই তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন, আপোষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং নিজেরা দায়িত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আজ আর যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার কোন প্রশ্ন নাই। গান্ধিজী তাঁহার সম্প্রতিকার বিবৃতিতে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন:

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির ও কংগ্রেসের অন্যান্য সভ্যেরা কারাগারে বন্দী থাকিবেন, ততক্ষণ অচল অবস্থা অবসানের প্রস্তাব শুধু কথার কথা হইয়া থাকিবে।

"যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টির অপবাদ আসলে জুজুর ভয় দেখানো ছাড়া কিছুই নহে। যখন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা ছাড়া পাইবেন এবং যখন তাঁহাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইবে, তখনই ভারতবর্ষে সত্যকার জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে এদেশের গণতান্ত্রিক জনমতের আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নহে।

কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং যাহাতে সাময়িক ভাবে আপোষ মীমাংসা হইতে পারে, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমাদের জোর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। এই মীমাংসা এখনই করা সম্ভব।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বার্থে এবং যে সমস্ত বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের স্বার্থে ইহা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

(৬ই এপ্রিলের 'ডেলি ওয়ার্কার' হইতে)

ইঁহারা ঠিক ঠিক কাপড় পান!
অথচ জনসাধারণকে প্রায় বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদিগকে (সংখ্যা: প্রায় ২৫০) একখানি করিয়া ধুতি ও শাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে। দাম মাত্র ৮/০ আনা।

সরবরাহ করিয়াছেন ঢাকেশ্বরী মিলের লক্ষপতি এজেণ্ট মিঃ ভিওয়ানিওয়ালা। আপনার-আমার মত গরীব কেরানী, গৃহস্থ বা মজুর মিঃ ভিওয়ানিওয়ালার কাছে গেলে ৭৸০ আনায় একখানি ধুতিও সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কাপড়ের সরকারী কর্ত্তা মিঃ টুলি বা গ্রিফিথসের কাছে গেলে শুনিবেন আরও কিছুদিন সবুর করুন—এখন কিছুতেই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। কিন্তু বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার ও তাঁহাদের পত্নীর প্রয়োজনে মিঃ ভিওয়ানিওয়ালা মুক্তহস্ত, সরকারী আমলারাও নির্ব্বিকার।

মিঃ ভিওয়ানিওয়ালা যে এলাকায় ব্যবসা করেন সেই এলাকা হইতে প্রায় ২০ হাজার গাঁট কাপড় ধরা পড়িয়াছে সকলেই জানেন। কাপড়ের মালিকেরা এখন ঐ কাপড় আবার নিজেদের দখলে আনিবার জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মহলকে সস্তায় কাপড় দিবার সঙ্গে মামলার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা মিঃ ভিওয়ানিওয়ালা জানাইবেন কি?

* * *

সাধারণ নরনারী কাপড় পায়না। কিন্তু জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন: কেন্দ্রীয় এম, এল, এ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে তাঁহাকে ৫৬ জোড়া ধুতি ও শাড়ী বেচিবার জন্য ঢাকেশ্বরী মিলের কাছে রায় বাহাদুর রণদা সাহা সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে কাপড় পাইতে ধীরেন্দ্র বাবুর কোনই কষ্ট হইবে না। সরকারের কল্যাণে সুতোর বাজার যাঁহার একচেটে সেই রণদা বাবুর চিঠি! তার উপরে ঢাকেশ্বরীর সূর্য্য বাবুর তিনি বিশিষ্ট বন্ধু—শুনিলাম ঢাকেশ্বরী মিলের হিসাবে ২৫ হাজার টাকা দামের কয়লা ২। লক্ষ টাকা বলিয়া লিখিত হওয়ার অভিযোগে সূর্য্য বাবু ও রণদা বাবু উভয়েরই নামে নাকি কয়েকদিন আগে মামলা রুজু হইয়াছে। রণদা বাবু নাকি এই বহুমূল্য কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপারের সত্যাসত্য রণদা বাবু সূর্য্য বাবু জানাইবেন কি?

ধীরেন্দ্র বাবু কংগ্রেসী এম-এল-এ। কাপড়ের সুপারিশের খবর যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা ধীরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—দেশের মানুষ যখন বিবস্ত্র তখন পুত্রের উপনয়নে কাপড়ের ধুমধাম কি দেশভক্তির পরিচয়?

—জনযুদ্ধের "বাজার সংবাদদাতা"

সম্পাদকীয়

কাপড় চাই

এক মাসের উপর হইতে চলিল বাংলার বাজারে কাপড় সরবরাহ বন্ধ আছে। বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতে বস্ত্রাভাবের খবর আসিতেছে। বর্দ্ধমানে অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর মিছিল, ঢাকায় কাপড়ের দোকান উত্তেজিত জনতাকর্ত্তৃক লুঠ, দিনাজপুরে ও মেদিনীপুরে কাপড়ের ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ, এই সমস্ত ঘটনা হইতে বাংলায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ বড়বাজারের আটক করা কাপড় এখনও বিলি করা আরম্ভ হইল না, নূতন কাপড়ের আমদানিও কিছু কিছু নিশ্চয়ই হইতেছে, কিন্তু তাহাও সরকারী গুদামে আটক পড়িয়া আছে।

মফঃস্বলের দুর্গতির ত অন্ত নাই। কলিকাতা সহরের উপর সাধারণতঃ সরকারী কর্ত্তাদের বেশী নজর থাকে, কিন্তু সেখানেও ঐ একই অবস্থা। বড়বাজারের কাপড় ধরার সময় গ্রিফিথস্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে—১লা মে মধ্যে কলিকাতায় রেশনিং হইবে এবং তাহার আগে সর্ব্বদলীয় কমিটির মারফৎ কাপড় বিলি করার ব্যবস্থা হইবে। সর্ব্ব-দলীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৯টি কমিটি তৈরী হইয়াছে অথচ এখনও পর্য্যন্ত এই কমিটিগুলির কাছে কাপড় দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে হ্যাণ্ডলিং এজেন্টদের মারফৎ সীল করা কাপড় ছাড়া হইতেছে, সে কাপড় কোথায় যাইতেছে তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত।

গ্রিফিথস এবং টুলি সাহেবের অজুহাত এই যে, কলিকাতার সমস্ত পাড়ায় কমিটি গঠিত হইলে তবে কাপড় ছাড়া হইবে। এ রকম জিদ ধরার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। কলিকাতায় কয়েকটি পাড়ায় কমিটি গঠন লইয়া বেশ কিছুটা দলাদলি ও গোলমাল লাগিয়াছে, তাহার আঁচ পাইয়াই কর্ত্তারা বুঝিয়াছেন যে, কমিটির মারফৎ কাপড় বিলি এখন বন্ধ রাখিলে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদলের কমিটির দায় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এবং আবার চোরাকারবারীদের সঙ্গে চুক্তি ঝালাইয়া লওয়া সম্ভব হয়।

কলিকাতার কয়েকটি ওয়ার্ডে মহাসভার পক্ষ হইতে কোন কোন ব্যক্তি গোলমাল আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই যে, এই কমিটিগুলি ঠিকমত প্রতিনিধিমূলক হইতেছে না। ন্যাশনালিষ্ট পত্রিকাও অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছে। আসল কথা এই যে, হিন্দুমহাসভার পছন্দমত বহুসংখ্যক লোক এইসব কমিটিতে নাই। এদিকে মুসলিম লীগের কোন কোন শাখা পাল্টা অনুযোগ করিতেছে। ৯নং ওয়ার্ডের লীগ কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কমিটির সভ্যসংখ্যা অর্দ্ধেক হিন্দু এবং অর্দ্ধেক মুসলমান না হইলে কোন সহযোগিতা করিবে না।

কমিটি গঠনের সময় এই নীতিই অনুসরণ করা হয় যে সকল দলের মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়া হইবে এবং সকলে একমত হইয়া কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা করিবে। ইহার ভিতর দলের প্রভাব, সাম্প্রদায়িক অনুপাত এসব দাবী আসে কেন?

তাহার কারণটা বোঝা কিছু শক্ত নয়। এই কমিটির হাতেই ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে স্থানীয় খুচরা বিক্রীর দোকান মনোনয়ন করার। দোকান মনোনয়ন করার ভার যতদিন ঘুষখোর সরকারী আমলা এবং চোরাকারবারী পাইকারের হাতে ছিল, ততদিন দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িকতার দাবী ওঠে নাই; যে মুহূর্ত্তে জনগণের হাতে কাপড় বিলির ক্ষমতা আসিবার সম্ভাবনা হইল সেই মুহূর্ত্তে এই এইসব দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে। খুচরা দোকান মনোনয়ন করার ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্যই এই সব ঘটিতেছে। আমার দলের জনগণ কাপড় হইতে বঞ্চিত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার দলের দোকানীরা ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত না হয়—এই নীতিই হইল ভেদপন্থীদের নীতি।

সরকারী আমলা এবং হ্যাণ্ডলিং এজেন্টরা এই সুযোগই চাহিতেছে। কাজেই ১৯টা ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করা সত্ত্বেও কাপড় বিলির নাম নাই। মিঃ ভেলডি আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই কাপড়ের রেশনিং হইবে এবং সেও জুনমাসের জন্য ১২ গজ করিয়া দেওয়া হইবে। কাপড়ের দুর্ভিক্ষ আছে একথা অস্বীকার করিলেও কাপড়ের টানাটানি আছে একথা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এটা "দুর্ভিক্ষ" না "টানাটানি" এই লইয়া তর্ক করিতে চাহি না,—মোট কথা কাপড় চাই। প্রথমতঃ আটক কাপড় এখনই ছাড়িতে আরম্ভ কর, আর একদিনও দেরী করা চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ জনগণের কমিটির মারফৎ এই কাপড় ছাড়িতে হইবে। যেখানে যেখানে যখনই জনগণের সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠিত হইবে তখনই সেখানে কাপড় বিলি করা আরম্ভ হউক। তৃতীয়তঃ শুধু কলিকাতায় নয়, মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলায় অবিলম্বে জনগণের কমিটির মারফৎ কাপড় বিলি করার নীতি ঘোষণা করিয়া কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ কর।

বাংলার প্রত্যেক দল যদি এখন আপোষ এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন না করেন, যদি কোন দল নিজ দলের দোকানীদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখেন এবং তাহাদের প্রভাবে সর্ব্ব-দলীয় কমিটি গঠন করা পণ্ড করেন, তাহা হইলে বাংলায় কাহারও কাপড় পাইতে হইবে না, চোরা-কারবারীরই জিত হইবে।

কমিটির প্রতিনিধিত্ব লইয়া সত্যকার কোন অভিযোগ থাকিলে সকল দলের মিলিত বৈঠক ডাকুন এবং সেই বৈঠকে অভিযোগ উপস্থিত করুন, মীমাংসা নিশ্চয়ই হইবে।

যেমন করিয়া হউক কাপড় চাই।

বার্ণপুরে লোহা মজুর সম্মেলন

আগামী ২৯শে এপ্রিল বার্ণপুরে আসানসোল লোহা মজুর ইউনিয়নের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। বার্ণপুর এলাকায় সাধারণতঃ সভা নিষিদ্ধ। এক বছর পরে এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সভা করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবের বিখ্যাত মজুর নেতা কমরেড কোর্বান সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। বাংলার বিশিষ্ট মজুর নেতারাও যোগ দিবেন।

ঘটনা ও রটনা

স্ত্রী-শিক্ষায় রণদা সাহা

এর আগে রায় বাহাদুর রণদা সাহা সম্বন্ধে একটা খবর আপনারা এই কলমের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়েছেন। বাংলায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কঙ্কালাকীর্ণ শ্মশানের মধ্যে যে ক'জন মহাপুরুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন অর্থাৎ কোটিপতির ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেছেন এই রণদা বাবু তার মধ্যে প্রধান।

কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যে কোটিপতিকেও কিছুটা "তদ্বির" করতে হয় তা রণদাবাবুর মত বুদ্ধিমান লোক ভাল করেই জানেন—বিশেষতঃ তিনি যখন হঠাৎ-বড়লোক এবং তাঁর অতীত জীবন সম্বন্ধে যখন অনেকে অনেক রকম কানাঘুষা করে। শোনা যায় কিছু কাল আগে তিনি রেল কোম্পানীতে চাকরী করতেন এবং সেই রেল কোম্পানীকে ঠকানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে নাকি দীর্ঘকাল ফৌজদারী মামলা চলেছিল। সেই সূত্রেই বোধ হয় তাঁর চাকরীতেও জবাব হয়ে গিয়েছিল—এ খবরের সঠিক বিবরণ রণদা বাবু যদি জানান তো আমি বাধিত হই।

স্বয়ং কেসি সাহেব তাঁর গৃহে পদধূলি দিয়েছেন, মন্ত্রী সুহরাবর্দ্দি সাহেব তাঁকে প্রথমে নুন এবং পরে সুতার বাজারের ইস্পাহানি বানিয়ে দিয়েছেন, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতি সেদিন তাঁর সঙ্গে এক বক্সে বসে থিয়েটার দেখলেন—কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রণদা বাবু এখন দেশের শিক্ষা জগতেও একটা দিকপাল হবার চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে আমি তারই একটা ঘটনা রটনা করছি।

কিছুদিন আগে আপনারা খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন যে টাঙ্গাইল কুমুদিনী গার্লস কলেজ থেকে প্রবীণ কংগ্রেস-নেত্রী ও শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রিন্সিপালের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন এবং কলেজের মেয়েরা ষ্ট্রাইক করেছে তাঁকে কলেজে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কলকাতার সবাই আমরা যাঁকে কংগ্রেসের "ছোড়দি" বলে শ্রদ্ধা করি, স্বদেশীর জন্যে যিনি বার বার জেল খেটেছেন, এবং শিক্ষাব্রতী হিসাবেও বাংলা দেশময় যাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে—সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে কেন কলেজ ছেড়ে চলে আসতে হ'ল তা ভেবেও নিশ্চয়ই আপনারা আশ্চর্য্য হয়েছেন। কিন্তু ঘটনার পিছনে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান্বেষী হবু শিক্ষানায়ক রায় বাহাদুর রণদা সাহা ছিলেন তা আপনারা জানতেন কি?

* * *

এক লক্ষ ষোল হাজার টাকা দান করে রণদাবাবুই নিজের মায়ের নামে টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রণদাবাবু নিজে খুব শিক্ষিত নন কিন্তু তবুও টাকা দিয়েছেন সুতরাং কলেজের গভর্ণিং বডির তিনিই সভাপতি। সরকারী আমলাতন্ত্রের কল্যাণেই তাঁর এত বাড় বাড়ন্ত সুতরাং স্থানীয় আমলা-রাজ এস-ডি-ও সাহেব কলেজের "অধিবাসী-সভাপতি"। টাঙ্গাইলবাসীদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সরকারী এজেন্ট মিঃ মহম্মদ আরফান খাঁ গভর্ণিং বডির সভ্য। স্থানীয় প্রবীণ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযোগেন্দ্র মজুমদার ও নৃপেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন সভ্য ছাড়া এই ধরণেই গভর্ণিং বডি সংগঠিত।

বলা বাহুল্য রণদা বাবুই গভর্ণিং বডি "মনোনীত" করেছেন। যে-টাকা তিনি কলেজের জন্য দান করেছেন তার কোন "ট্রাষ্ট" বা দলিলপত্র করে দেন নি, এখনও পর্য্যন্ত কলেজটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলা চলে। কলেজের জন্য জমি রণদা বাবুর নামেই কেনা হয়েছে।

ছাত্রীদের কাছে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কত জনপ্রিয় ছিলেন তা তাদের ষ্ট্রাইক থেকেই বোঝা যায়। তেমনি স্থানীয় অভিভাবক ও জনসাধারণের কাছেও। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বিদায়ের আগে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে টাঙ্গাইল শহরের সমস্ত শ্রেষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমান নাগরিক একসঙ্গে সভা ডেকেছিলেন এবং খিলাফতের পর ২৫ বছরের মধ্যে অত বড় জনসভা, নাকি টাঙ্গাইলে কখনও হয়নি। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চেষ্টায়ই কলেজটা অল্প দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এফিলিয়েশন পেয়েছে। তাছাড়া তিনি দেশসেবার কর্ত্তব্যও ভোলেন নি। স্থানীয় অধিবাসীরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের প্রতিনিধিকে জানালেন যে তিনি টাঙ্গাইলের অধিবাসীদের দুধ, নুন প্রভৃতির অভাবের দিনে প্রচুর পরিশ্রম ও আন্দোলন করেছেন, ছাত্রীদের পড়ার জন্য কেরোসিন আদায়ের চেষ্টা করেছেন, মহকুমা ফুড কমিটিতে যাতে চোরা-কারবারী রাজত্ব না করে সেজন্য তিনি অক্লান্ত আন্দোলন করেছেন।

বোধ হয় এই জন্যেই তিনি স্থানীয় এস-ডি-ও এবং রণদা বাবু প্রমুখ কারবারীদের বিষ-নজরে পড়েছিলেন।

* * *

গত বৎসর লাট সাহেব মিঃ কেসি যখন রণদা বাবু প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী হাসপাতাল উদ্বোধন করতে রণদা বাবুর স্বগ্রাম মীর্জ্জাপুরে পদধূলি দেন তখন রণদা বাবুর নির্দ্দেশে লাট সাহেবের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে সেখানে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় করাতে বাধ্য হন। শোনা যায় রণদা বাবু চেয়েছিলেন যে ছাত্রীরা যেন ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে লাট সাহেবকে অভ্যর্থনা করে, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জন্যে তা সম্ভব হয় নি।

তারপর রণদা বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে স্যর নাজিমুদ্দীনের পদার্পণ উপলক্ষে রণদা বাবু আবার ছাত্রীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সে নির্দ্দেশ মানতে পারেন না, ছাত্রীদের অভিভাবকেরাও আপত্তি করেন।

টাঙ্গাইলে চোরাবাজারে যখন নুনের সের ২৲ টাকা তখন রণদা বাবু গবর্ণমেণ্টের ষ্টক থেকে নুন আনান। সব দোকানে ।৶০ আনা সের দরে নুন বিক্রী হতে থাকে, চারিদিকে রণদা বাবুর নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। সে সময় আমার এই ঘটনা-রটনাইই ফাঁস করে দেওয়া হয় যে গবর্ণমেণ্ট থেকে রণদা বাবু নুন পেয়েছেন প্রায় ছ পয়সা সের দরে—এবং সে খবর স্থানীয় কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়।

হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙ্গায় রণদা বাবু বোধ হয় বে-সামাল হয়ে পড়েন! গত ২০শে জানুয়ারী টাঙ্গাইলে "দানবীর" রণদা বাবুর আগমন উপলক্ষে "বর্ত্তমান সমস্যা আলোচনার জন্য" একটা জনসভায় রণদা বাবু বক্তৃতা দিতে উঠে যখন অঙ্ক কষে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে ছ আনা সের নুন বেচে তিনি ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন তখন লোকে হেসে ওঠে, কিন্তু তবুও তারা চুপ করে শুনতে থাকে। কিন্তু প্রকাশ যে, রণদা বাবু আরও অগ্রসর হয়ে মহাত্মা গান্ধীকেই আক্রমণ করে বলেন, "গান্ধী হচ্ছে মেড়ো—বাংলা দেশের শত্রু। গান্ধীর মত সকল স্বদেশীই জেলে যায় নাম কেনার জন্যে, ওদের কথা কেউ শুনবেন না।"

তখন লোকের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়—রণদা বাবু অতি কষ্টে কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে পলায়ন করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও গান্ধীজির অপমান সহ্য করতে না পেরে সেই সভায় বক্তৃতা করেন, বলেন যে টাঙ্গাইলবাসী রণদাবাবুর কাছে উপকার পেয়েছে সত্য, কিন্তু গান্ধীজির অপমানের বিনিময়ে সে উপকার কেউ চায় না।

* * *

এর পরেই গভর্ণিং বডির কংগ্রেসী সদস্য দুজনকে বাদ দিয়ে একটা সভা হয় এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সুযোগ পেলেই পদচ্যুত করতে হবে বলে নাকি সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে কলকাতার কোনো বন্ধুর কাছ থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী জানতে পারেন যে রণদা বাবু নাকি তাঁকে কলেজে রাখতে চান না বলে তাঁদের জানিয়েছেন। শুনবামাত্র গত ৮ই ফেব্রুয়ারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পদত্যাগ করেন।

বলা বাহুল্য যে, রণদা বাবুর "মনোনীত" গভর্ণিং বডি অবিলম্বে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। কংগ্রেসী সদস্য যোগেন্দ্র বাবু যখন বলেন যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে অতীত কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ দেবার মামুলি শিষ্টাচারের প্রস্তাবও গভর্ণিং বডি গ্রহণ করতে রাজি নন তখন তিনি সভ্য পদে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন।

এর পর থেকেই ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট চলছে। এস-ডি-ও সাহেবের রাষ্টিকেটের হুমকি সত্ত্বেও শহরের ২৭টির বেশী ছাত্রী আজও কলেজে যায় না—অচল অবস্থাই বজায় আছে।

রণদা বাবুর মত "দানবীর শিক্ষাব্রতীদের" দানের উৎস এবং তা ব্যবহারের আসল রূপ এই ঘটনা থেকে সবাই বুঝতে পারবেন। দুর্ভিক্ষের দিনে সঞ্চিত টাকা থেকে কিছু কিছু খরচ করে এঁরা যদি এমনি ভাবে দেশের শিক্ষার ওপরেও হাত বাড়াতে পারেন তো সে শিক্ষা আমাদের দেশভক্তি, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সব কিছুই লোপ পাইয়ে দেবে। হঠাৎ-বড়লোকদের আক্রমণে দেশের আর্থিক জীবন তো চুরমার হয়েই গেছে, এখন সামাজিক ও নৈতিক জীবনও না যায়।

—দেশাভিমানী

ভুল সংশোধন

জনযুদ্ধের গত সংখ্যায় 'নেত্রকোণা সম্মেলন' প্রবন্ধে হাজং চাষীর বিরাট মৃণ্ময় মূর্ত্তির শিল্পী কবী পাল না হইয়া শ্রীলক্ষ্মী পাল হইবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। জঃ সঃ

জনযুদ্ধের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী ৩রা মে 'জনযুদ্ধের' বার্ষিক সংখ্যা বাহির হইবে। দাম দুই আনা। প্রত্যেক এজেন্ট অবিলম্বে অর্ডার দিন। ম্যানেজার, জনযুদ্ধ

নেতাদের অভিনন্দন

[৬ পৃষ্ঠার পর]

এক ফাঁকে প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতির তৈরী কাপড়ের দোকানের সামনেই সব চেয়ে বেশী ভিড়। কিন্তু ২৲১৩০ টাকা দাম শুনে সকলেই পিছিয়ে আসছে। একজন কৃষক রমণী জিজ্ঞাসা করলেন, সস্তায় কাপড়ের কথা হবে না, সস্তায় কাপড় দেওয়ানোর কোন ব্যবস্থা হবে না? শুনবামাত্র আরও অনেকে এসে একেবারে ঘিরে দাঁড়াল। বুঝলাম, কাপড়ই এখন সব চেয়ে প্রচণ্ড সমস্যা।

নমাজের পরে লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা উন্নত হ'ল, কিন্তু তখন অনেকে চলে গেছে। পি, সি, জোশীর বক্তৃতার প্রথম দিকটা ভদ্রলোক ছাড়া সাধারণ কৃষকদের বিশেষ বোধগম্য হয়েছে মনে হল না, তবে শেষ দিকে মজুতদারের অত্যাচারের কথা, তাকে সামাজিক বয়কট করার কথা শুনে অনেকেই উঠে বসল—একজন কৃষক একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন মজুতদার কাকে বলে। জোশী যখন বললেন—মুসলিম লীগই অগ্রসর হয়ে মুসলিম মজুতদারদের ধরুক তখন অনেক মুসলিম শ্রোতাকেই দেখলাম সম্মতিসূচক ঘাড় হেলাতে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আবুল হাশেম, আসাম পরিষদের স্পীকার বসন্তকুমার দাস, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী ডাঃ রাজন প্রভৃতির তার ও অভিনন্দন পড়া হ'ল, তারপর কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে সভার কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হ'ল।

আরাকান ও গাড়োয়াল থেকে

আরাকানের বিখ্যাত নেতা উ পিন্যা তিহা'র পরিচয় সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল। ১৯৩৭ বা ৩৮ সালে আরাকানের জাতীয় কংগ্রেস তিনিই পত্তন করেন, সারা আরাকানবাসী তাঁকে নেতা বলে মানে। জাপানী আক্রমণের সময়ে প্রচণ্ড ব্রিটিশ-বিদ্বেষের বশে বর্ম্মার অন্যান্য পার্টির মতই তিনিও মনে করেছিলেন যে, জাপানীরা তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবে, তাই দোবামা প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও জাপানী দলে যোগ দেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁর চোখ খুলল, দেখলেন জোর করে সবাইকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করানো হচ্ছে, কারো ঘরে খাদ্য নেই, চাষীর শস্য কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, স্ত্রীলোক কেড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাপানী সৈন্যদের জন্যে। মর্ম্মাহত হয়ে তিনি রেঙ্গুনে গেলেন "স্বাধীন" বর্ম্মার মন্ত্রীদের কাছে আবেদন জানাতে, কিন্তু মন্ত্রীরা জানালেন তাঁদের কোনো ক্ষমতা নেই, কিছু করতে পারেন না। অন্যদিকে রেঙ্গুনের হাসপাতালে গিয়ে দেখলেন পাঁচ হাজার জারজ জাপানী সন্তান। তাঁর চোখ আরও খুলল। দেশে ফিরে এসে গোপনে গোপনে তারা সংগঠন করলেন, জাপানীদের গতিবিধি বৃটিশ সৈন্যদলকে জানাতে লাগলেন—সেই জন্যেই এত সহজে আরাকান দখল সম্ভব হয়েছে। আজ তাঁদের দেশে অন্নের অভাব, বৃটিশও আবার তাঁদের নিরস্ত্র করতে চাইছে। কিন্তু সংগঠনের প্রেরণা তাঁরা এখান থেকে পেয়েছেন, সারা আরাকানবাসী কৃষককে জাগিয়ে তুলবেন, দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে নিজেদের চেষ্টায় প্রতিরোধ করবেন—এই প্রতিজ্ঞা তিনি জানালেন।

তারপরে গাড়োয়ালী সৈন্যদলের দেশভক্ত বীর ঠাকুর চন্দ্র সিং—বেতনভুক সৈন্য হয়েও তাঁরা কেমন করে দেশবাসীর ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিলেন, তার জন্যে কত দীর্ঘ কারা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আর আজ বৃদ্ধ বয়সে বেরিয়ে এসে কৃষকের সন্তান তাঁরা কৃষক আন্দোলনেই বাকী জীবন সমর্পণ করেছেন—এই পরিচয় শুনে বাস্তবিকই সভার প্রত্যেকটী কোণ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাততালি উঠল।

তারপর মণিপুরী নেতা ইরাবত সিং, কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমীর হায়দর খাঁ ইত্যাদির পরিচয়।

* * * * *

সব প্রদেশ থেকে গ্রাম্য নাচগানের দল এসেছে। পাঞ্জাবের কৃষকেরা প্রেমের সুললিত সুরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছে। ইউ পি, বিহার অন্ধ্র থেকেও গ্রাম্য গায়কের দল এসেছে। ময়মনসিংহের কৃষক জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দূর দেশের এই গান শুনেছে—ভাষার অপরিচয় কৃষকের একাত্মবোধকে হার মানাতে পারেনি। পাঞ্জাবী গীতকার পরদেশীর গান 'লুটপুটকে খা লিয়া' যে শুনেছে, তারই অদ্ভুত ভাল লেগেছে। মণিপুরের নেতা ইরাবত সিং মণিপুরের নাচের দলেরও নেতা। নিজে তিনি ভাল নাচতে পারেন। ফসল কাটার 'থাঙ্গল নৃত্য,' মহাদেব পূজার 'লাইহারোবা নৃত্য, বর্শা নৃত্য আর রথযাত্রার গান 'থোবাক ঈশৈ'—সকলে অবাক হ'য়ে দেখল আর শুনল। ময়মনসিংহের বিখ্যাত বাউল গায়ক মজিদ ও রসিদুদ্দিনের গানেই জনতা বেশী সাড়া দিল। মণিপুরের বীরত্বব্যঞ্জক নাচ দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু মজিদ, রসিদুদ্দিনের গানের সুরেই যে তাদের প্রাণের তার বাঁধা। সে গানে পূর্ব্ববঙ্গের কূলছাপানো নদী, সবুজ প্রান্তর আর জনগণের ব্যথাবেদনার ছবি। মজিদ গাইলেন: হায় রে, এমন বোকার দেশ পাইল... স্ত্রী বলে, ওগো স্বামী উলঙ্গিনী আছি আমি, শরম হ'তে মরণ ভালো গরল আনো না।'

এই আসর সভার মত নয়, এখান থেকে চাষীরা উঠতেই চায় না। সেগুলো তারা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, সাড়া দেয়। শুধু তামাসার জন্য নয়, কারণ তামাসার উপাদান তা থেকে বর্জ্জিত, দেশের ও দশের কথাই তার প্রধান কথা—তবুও কৃষক ভিড় করে শোনে, বাহবা দেয়। এই নতুন ধরণের মধ্যে দিয়েই কৃষক সভা কৃষকের নিজস্ব লোক-কলাকে কৃষকেরই দেশপ্রেমের প্রেরণার বাহন করে তুলেছে এবং দ্রুত সার্থক হতে চলেছে।

* * *

পরদিন সকালে শহরের মধ্যে সেই কংগ্রেসী-অধ্যুষিত চায়ের দোকানে আবার গিয়েছিলাম। এবার তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন হাজির আছেন। তিনি বলছিলেন: "হ্যাঁ লাখ খানেক লোক হয়েছিল তবে কিনা চাল পাওয়া যাবে, কাপড় পাওয়া যাবে এই সব ভেবেই তো অনেক লোক এসেছিল।" অর্থাৎ সভায় তিনি গিয়েছিলেন, নিষেধ সত্ত্বেও এবং লোকসংখ্যা দেখে তিনিও আশ্চর্য্য হয়েছেন।

এমন সময় কয়েকজন লোক (মনে হল উচ্চ শ্রেণীর কৃষক) দোকানে ঢুকল, দেখেই পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ অত ভিড় কিন্তু ভলান্টিয়ার সংগঠন খুব খারাপ, যখন শোনা যাচ্ছে না তখন কি করতে হবে তা তারা কিছুই জানে না।"

নবাগতরা বল্লেন, "তা তো হবেই, ওরা তো আপনাদের মত শিক্ষিত লোক নয় যে সব কথা চট করে বুঝে নেবে—গাঁয়ের চাষী ভলান্টিয়ারী করবার শিক্ষা তো বিশেষ পায় নি তাই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে হবে। আর এমন ধারা এত বড় হবে তা তো কেউ ভাবতেও পারেনি, গোলমাল না হয়ে উপায় কি? তাই না বাবু?"

বাবু আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করলেন না।

* * *

৯ তারিখ বিকেলে আবার সম্মেলনের অধিবেশন। ৪০।৫০ হাজার লোক হয়েছে। লাউড-স্পীকারের বন্দোবস্তও ভাল। ইতিমধ্যে বক্তা হিসাবে বঙ্কিম বাবুর যথেষ্ট নাম হয়ে গেছে। তাঁর কথা যতটা বুঝুক বা না বুঝুক গলার স্বর, বলার ভঙ্গি আর চেহারা দেখে লোকে অবাক হয়ে শোনে।

এই দিনের প্রধান বক্তৃতা ভবানী সেনের। চোরাবাজার কেমন করে সারা বাংলা গ্রাস করল, আমলাতন্ত্র সেই চোরাবাজারকেই কি ভাবে পুষছে, কেমন করে কৃষক সভার সমস্ত সংগঠককে কৃষকদেরই একজন হয়ে চোরাবাজার ধরার কাজে নামতে হবে, ফসল বাড়ানোর কাজে নামতে হবে, আমলাতন্ত্রকে হারাতে হবে তাই তিনি সহজ, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করলেন। মনে হ'ল যে কোনো কৃষকেরই বুঝতে কষ্ট হয়নি। চট্টগ্রামের নারীরা কেমন করে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য হচ্ছে একথা যখন তিনি শোনালেন তখন একজন মুসলমান চাষী কেঁদেই ফেল্লেন—তাঁর মেয়েকে তিনি ঐ চট্টগ্রামেই বিয়ে দিয়েছেন।

[৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বহু দূর পায়ে হাঁটিয়া কিষাণ সম্মেলনে আগত একটী হাজং পরিবার বিশ্রাম করিতেছে   শিল্পী: নীরদ মজুমদার

...াঙ্গনের মিলন আসন্ন

সম্ভব"—'অপরাজেয়' নাৎসীনেতার উক্তি

...না, ...সহরে ...ভাঙ্গিয়া ...গানোভার ...কল চড়িয়া ... সামনে ... পর মিত্র- ...রণ। পূর্ব ... মিত্র- মাইল।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে মার্শাল তলবুখিন ভিয়েনা দখল করিয়া জার্ম্মান প্রদেশ বেভেরিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মার্শাল ভেসিলেভস্কি জার্ম্মান জঙ্গীবাদের প্রাণকেন্দ্র পূর্ব্বপ্রুশিয়ার রাজধানী কোনিগসবার্গ দখল করিয়াছেন। ১৬ই মার্চ হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে লাল ফৌজ ১ লক্ষ ৩০ হাজার জার্ম্মান সৈন্ত বন্দী করিয়াছে। বার্লিন দখলের জন্ত মার্শাল জুকভ ও কনিয়েভের শেষ আক্রমণও আসন্ন। এই আক্রমণের আশঙ্কায় নাৎসীরা এতদূর আতঙ্কিত যে পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহাদের এত বড় বিপদ সত্ত্বেও ১২৫ ডিভিসন শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান সৈন্ত এই আসন্ন আক্রমণ রুখিবার জন্ত মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

হিটলার মধ্য জার্ম্মানী রক্ষার আশা অসম্ভব মনে ছাড়িয়া দিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহার শেষ আত্মরক্ষা ব্যূহ হইবে ষ্টেটিন হইতে এমডেন পর্য্যন্ত উত্তর সাগরের উপকূল এবং দক্ষিণ জার্ম্মানীর পার্ব্বত্য অঞ্চল। তাই এই দুই অঞ্চলে জার্ম্মান প্রতিরোধ এখনও তীব্র। রয়টারের খবরে প্রকাশ যে, এই ব্যূহও ভাঙ্গিয়া পড়িলে নাৎসীরা নরওয়ে ও সুইজারল্যাণ্ডে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু হিটলারের এই শেষ ব্যূহও ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মার্শাল মন্টোগোমারীর আক্রমণের মুখে উত্তর সাগরের তীরের জার্ম্মান প্রদেশ ওল্ডেনবুর্গের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিখ্যাত বন্দর এমডেন ও হামবুর্গের পতনও আসন্ন। অন্যদিকে মার্শাল তলবুখিনের অষ্ট্রিয়া আক্রমণ ও জেঃ প্যাটনের বেভেরিয়ায় প্রবেশের ফলে দক্ষিণ জার্ম্মানীতে নাৎসীদের শেষ প্রতিরোধ চেষ্টাও নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে।

নাৎসীবাদের পুনরভ্যুত্থানের আশা

তাহাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের যে আর বিলম্ব নাই নাৎসীরা নিজেরাও তাহা জানে। তাই হিমলারের পত্রিকা 'ডাস সারজে কোর' স্বীকার করিয়াছে, "যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করা সম্ভব।" কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পরও নাৎসীবাদ বাঁচিয়া থাকিবার আশা রাখে। তাহাদের এই আশার ভিত্তি হইল মিত্রপক্ষের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও ... স্পেনকে ভিত্তি করিয়া পুনরভ্যুত্থানের ...

তাহাদের এই পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তিও রহিয়াছে। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া মিত্রপক্ষের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে স্বীকার করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব করিতেছে এবং সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে এই সরকারের প্রতিনিধিদের দাবীও অস্বীকার করিয়াছে। মিত্রপক্ষের এই বিরোধে উল্লসিত হইয়া গোয়েবলস তাহার 'ডাস রাইখ' পত্রিকায় লিখিয়াছে, "যদি আমরা মিত্রপক্ষের বর্ত্তমান বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার সুযোগ না দিই, তবে এই বিরোধই তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে।"

অন্যদিকে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে নাৎসীরা বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। হিটলারের পতন যতই আসন্ন হইতেছে ফ্রাঙ্কো মিত্রপক্ষের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টায় ততই বেশী আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ফ্রাঙ্কো মিত্রপক্ষের প্রতি 'অকৃত্রিম সহানুভূতি' জানাইয়া এক বক্তৃতা দিয়াছে। জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদও মিত্রপক্ষের বন্ধুত্ব লাভের আর একটি চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে স্পেনে নাৎসী ঘাঁটির সংগঠন। বহু নাৎসী নেতা পরিচয় বদলাইয়া স্পেনে আশ্রয় নিয়াছে। ৪০,০০০ নাৎসী সৈন্যও ফ্রান্স হইতে পলাইয়া স্পেনে আশ্রয় নিয়াছে।

পরাজিত নাৎসীবাদকে বাঁচাইবার এই ষড়যন্ত্রের পিছনে বৃটেন ও আমেরিকার ধনী প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন রহিয়াছে। ইহাদেরই সাহায্যে ফ্রাঙ্কোর অনুচরেরা নাৎসীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহারাই পোল্যাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া মিত্রপক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধাইতেছে এবং ইহাদেরই মুখপত্র 'ইকনমিষ্ট' জার্ম্মানীর সঙ্গে মোলায়েম সন্ধির ওকালতি করিতেছে। সম্প্রতি বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রী মিঃ বেভিন ইহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "এই দেশের বড় বড় ধনী ও ব্যবসায়ীরা জার্ম্মানীর বড় বড় ধনী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলাইতে ... পারে।"

এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যদি সময় থাকিতে পরাজিত না করা যায় তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবার অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫

...াজ পুনর্গঠনে ...ম্মেলনের প্রস্তাব

[৭ পৃষ্ঠার পর]

...পরেই উঠল প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। তবুও ...লেগেটরা এবং অনেক লোক দাঁড়িয়েই থাকলেন, ...দি সভা আবার আরম্ভ হয়। কিন্তু থামার লক্ষণ নাই তাই সভা মুলতুবী হল। দার্জিলিংয়ের গুর্খা ...র হাজং চাষীরাই সকলের শেষে সভা ত্যাগ করল—নিজেদের সংগঠনের প্রতি শৃঙ্খলার মূল্য তারাই সব চেয়ে বেশী বোঝে।

প্রদর্শনী, হাসপাতাল, পায়খানা-ব্যবস্থা, রন্ধনশালা প্রভৃতি সম্মেলনের আর সব বিভাগের প্রত্যেকটাই ...ক একটী বিরাট সংগঠন। রন্ধনশালায় শুধু এক-...ই প্রায় ২১ হাজার লোক খেয়েছিল। স্থানাভাবে সব বিভাগের বিবরণ দিতে পারলাম না।

* * *

...সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে দেশের সকল মানুষের মূল ঐক্যের কথাগুলি একত্র করা হয়েছে, ...চ্ছেদের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। অচল অবস্থা শেষ স্বাধীনতার দিকে সবাই অগ্রসর হতে চায়, কংগ্রেস উভয়েই চায় জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ... (দেশাই-লিয়াকৎ আপোষ), প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রয়োজন সম্বন্ধেও সবাই একমত হচ্ছে। ...ক সভাও তাই চেয়েছে, আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেছে যে নেতাদের মুক্তি, জনগণের দুর্দ্দশা দূরীকরণ ইত্যাদির জন্যই এই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রয়োজন। দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তির মধ্যে সরকারে হিন্দু মুসলমান সংখ্যানুপাতের কথা আছে, কিন্তু কি করে তা আদায় হবে সে কথা নেই। কৃষক সভা অগ্রসর হয়ে বলেছে যে সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেই তা আদায় করতে হবে।

পাকিস্তান চাই বলে কৃষক সভা দাবী করেনি কারণ তারা জানে যে কৃষক সভার প্রস্তাবের উপর পাকিস্তান নির্ভর করে না, লীগ ও কংগ্রেসের নেতাদের সম্মতির উপরই পাকিস্তান নির্ভর করছে। জনসাধারণ ঐক্য চায়, কিন্তু নেতারা যতক্ষণ ঐক্যবদ্ধ না হচ্ছেন ততক্ষণ তারা পাকিস্তান দাবীর সমাধান করতে পারবে না। এ অবস্থায় পাকিস্তানের দাবী তোলা কৃষক সভার কাজ নয়, কারণ তাতে কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন কৃষক কৃষক-সভা ছেড়ে চলে যাবে ঐক্য বরং ব্যাহতই হবে। পাকিস্তান দাবী কংগ্রেস ও লীগের যে-বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করে সেই বোঝাপড়ার জন্যই কৃষক সভা আবেদন জানিয়েছে—পাকিস্তান দাবী তোলেনি বটে কিন্তু সেই দাবীরই একমাত্র সর্ত্ত পূরণের ক্ষেত্র তৈরী করেছে।

লীগ বা কংগ্রেসের সমস্ত দেশপ্রেমিককে কৃষক সভা আমন্ত্রণ জানিয়েছে কৃষক সভার মধ্যে এসে কাজ করতে, তার জন্যে সকল মতের কৃষকদেরই যাতে পারেন এমনি ধারা নীতিই কৃষক সভা গ্রহণ ...কাজও যোগ দেবার পথে কোন বাধা নেই। স্বামী ... চেষ্টার পরেও কৃষক সভা তাঁকে আ... যে গণতান্ত্রিক সংগঠন-নীতি মেনে ...ক সভার মধ্যে এসে কাজ করুন।

তারপর সব চেয়ে ... প্রস্তাব হল—ফসল বাড়াও। তার জন্যে শুধু ... বা আন্দোলনের দিন শেষ হয়েছে, এখন প্রত্যক্ষ কাজের ওপরই সমস্ত নির্ভর করছে। তাই কৃষক সভা প্রত্যেক সংগঠনকারীকে নির্দেশ দিয়েছে—গ্রাম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটী পরিকল্পনা ভাল করে অনুসন্ধান কর, নিজের গ্রামের কৃষকদেরই একজন হয়ে ভাল করে বুঝে নাও তারা বাস্তবিক কি ভাবে ও কি চায়, কোন্ কোন্ মূল বিষয়ে তাদের অভাব দূর হতে পারে। তারপর সেই অনুসারে আন্দোলন কর, গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা থেকে যথাসম্ভব আদায় করার চেষ্টা কর, খাল কেটে, বাঁধ বেঁধে নিজেদের স্বাবলম্বনে নিজেদের ফসল বাড়াও!

খাদ্য প্রস্তাবে বলা হয়েছে—কৃষকের ফসলের জন্য উচিত ও নির্দ্দিষ্ট মূল্য চাই। এ দাম চোরাকারবারী মজুতদার দেয় না, গবর্ণমেণ্টের ব্যবসাদার এজেন্টরাও দেয় না। সেজন্যে কৃষকদের দাবী করতে হবে যে উচিত দামে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বাড়তি শস্য কিনে নিক এবং বিতরণের ব্যবস্থা করুক—তবেই চাষী ন্যায্য দামের ভরসা পাবে, গবর্ণমেণ্টও রেশন চালু করে লোককে বাঁচাতে পারবে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত বাংলার গ্রাম জীবনকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে কিষাণ সভা দাবী জানিয়েছে যে বাংলা সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণ করুক এবং ওয়ার্ক হোম, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি গঠনের উপযোগী জিনিষ তাদের হাতে দিক। কিষাণ-কর্ম্মীরা গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে মিলে পুনর্গঠনের বাস্তব পরিকল্পনা তৈরী করুন। সমস্ত দেশভক্ত গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনাকে জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করুন, দেশভক্তদের নিজেদের চেষ্টায় যে মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে তাকে আরও সাহায্যপুষ্ট করে বাঁচিয়ে রাখুন, সব জায়গায় সকল দেশভক্ত বাংলা পুনর্গঠনে এক হোন।

মোট কথা কিষাণ সভা এবার নতুন ধরণের সংগঠনের পর্য্যায়ে প্রবেশ করল। কৃষককে জাগানো, তার দুঃখের কথা নিয়ে আন্দোলন করা এখন আর এর একমাত্র কাজ নয়—প্রধান কাজ হ'ল প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ কিষাণরূপে কিষাণের সমষ্টিগত জীবনের সকল দিককে গঠিত করে তোলা—চোরাকারবারীকে খুঁজে বার করে ধরিয়ে দেওয়া, সকলে মিলে ফসল বাড়ানোয় অগ্রসর হওয়া, গবর্ণমেণ্টের স্কীমগুলিকে গ্রাম গঠনের কাজে প্রয়োগ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ কিষাণকেই এখন কিষাণ সভার প্রধান নেতা হ'তে হবে, নেতাকে এখন প্রধানত কিষাণ হতে হবে।

* *

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন—সম্মেলন তো হয়ে গেল, এখন লোকের মনে কি থাকবে?

লোক তো একরকম নয়—সংগঠিত, অসংগঠিত, অচেতন প্রভৃতি বহু রকমের। যারা সংগঠিত তারা ওপরের কথা মনে করে নিয়ে যাবে, যে-যতটুকু বুঝল তাই নিজেদের জীবনে ও আন্দোলনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করবে। ৭০ বছরের মণিপুরী চাষী-মা এসেছিলেন ৭০ মাইল পায়ে হেঁটে। মণিপুরীরা অন্য লোকের রান্না খায় না, তাই প্রথম দিন তাঁরা কিছুতেই পাকশালায় খেতে রাজি হন নি, কোন রকমে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখলাম বক্তৃতা শুনবার ভীষণ আগ্রহ অথচ রাঁধতে গেলে বক্তৃতা শোনা ফস্কে যায়—শেষ পর্য্যন্ত আন্দোলনের টানে সামাজিক সংস্কারও বিসর্জ্জন দিলেন, পাকশালায় খেয়েই বক্তৃতায় গেলেন। সেই মাকে সম্মেলনের শেষে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সম্মেলনে কি হ'ল? চট করে জবাব দিলেন, "খুব ভাল হ'ল, এখন আমাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে আরও জোরে চরখা চালাতে হবে, তাঁত চালাতে হবে, ফসল বাড়াতে হবে—তবেই তো আমরা বাঁচব।" একটু ভেবে আবার বলেছিলেন, "হাঁ, নাচ-গানটাও আরও ভাল করে সাজাতে হবে, নইলে লোকে চট করে সাড়া দেবে না।" মায়ের মনে এই থাকবে, তেমনি আরও হাজারো মা-ভাই-বোনের মনে।

যারা এসেছিল বুঝতে—কিষাণ সভা ব্যাপারটা কি—তারা বল্ল "হাঁ কথাগুলো তো খুব ভাল, এখন দেখি আমাদের গাঁয়ে গিয়ে কি করে।" এদের মনে তাই থাকবে। কিষাণ সভা যদি এদের গ্রামে পৌঁছতে পারে, কাজ করে সবাইকে টানতে পারে—তবে সম্মেলনের ফসল ফলবে, নইলে শুকিয়ে যাবে।

আর চার পাশের সাধারণ মানুষ? ১১ তারিখ বিকালে আমরা সম্মেলন থেকে রওনা হয়েছিলাম ময়মনসিংহ—বাসে করে। পি, সি, জোশী ও অন্যান্য প্রায় ৩০ জন আমরা। মাইল তিন চার গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে এক গ্রামের বাজারের কাছে বাস বিকল হয়ে রইল। বৃষ্টি থামার পরও আর গরম হ'ল না। অগত্যা সেখানেই রাত কাটাতে হবে বলে ভয় হল।

বৃষ্টি থামতেই গ্রামের বহু সাধারণ মুসলমান চাষী, দোকানদার এগিয়ে এলেন, বল্লেন রাত্রিটা এখানেই থাকুন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমরা তাঁদের চিনি না, কিন্তু তাঁরা শুনেছেন পি, সি, "যুশি"-আর সম্মেলনের নেতারা আমাদের মধ্যে আছেন। কি উৎসাহ! বল্লেন "আমরাও তো মানুষ, এত বড় নেতার কি আমরা মান রাখতে জানি না!" আমাদের আপত্তি তাঁরা গ্রাহ্যও করলেন না, মহা উৎসাহে রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। সম্মেলন তাঁদের মনে এনে দিয়েছে এই উৎসাহ, কিষাণ সভার নেতাদের জন্যে সাধারণ কিষাণের মনে এই মমতাবোধ। তাঁদের মনে তাই থাকবে।

কিন্তু খাওয়া আর হল না। ড্রাইভার এক মনে বসে বসে মোটর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। আমরা যখন আরামে খাওয়া ও নিদ্রার স্বপ্ন দেখছি তখন রাত ৯টার সময় হঠাৎ বাস ধক্ধক্ করে উঠল, ড্রাইভার বল্লেন, রাস্তায় কাদা আর জল, খুব সাবধানে চলতে হবে, তবে এখন তাড়াতাড়ি রওনা হলে ময়মনসিংহে রাত্রের গাড়ী ধরিয়ে দিতে পারব।

একটু বিরক্ত হয়েই বাসে চড়লাম। ড্রাইভারকে বল্লাম, "আজ রাত্রে না গিয়ে কাল সকালে গেলেই বা কি ক্ষতি হ'ত?"

ড্রাইভার বল্লেন, "আমার তো ক্ষতি হত না, বরং এই অন্ধকার রাত্রে জল-কাদায় কাঁচা রাস্তায় মোটর চালানোর বিপদ থেকে বাঁচতাম। কিন্তু আপনারা রয়েছেন, আপনাদের কত কাজ! সভার সময় তো কিছু করতে পারলাম না, এখন যেটুকু পারি করি।"

গভীর রাত্রে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন ময়মনসিংহের এপারে ব্রহ্মপুত্রের চড়ায় আমাদের নৌকা প্রায় এক ঘণ্টা আটকে রইল তখন ঠাণ্ডা জলে নেমে নৌকা ঠেলতে কোনো কমরেডও বড় সাহস করেন নি। শুধু নেমেছিলেন কমরেড গোপাল আচার্য্য আর এই ড্রাইভার। ড্রাইভারের তখন আমাদের সঙ্গে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর চুক্তিমত বাসের পাড়ি এপারেই ফুরিয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি এসেছিলেন এবং কৃষক আন্দোলনের জন্যে "যেটুকু পারেন" করেছিলেন। সাধারণের মনে সম্মেলন এই ভাবেই জেগে থাকবে।

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২১ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

৯৩ ধারা জাঁকিয়া বসিতেছে--প্রতিবাদে সকলে এক হোন

কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্বদলীয় মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা করুন

৩১শে মার্চ্চ গবর্ণর ঘোষণা করেন যে, ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী তিনি বাংলার সমস্ত শাসনভার নিজে গ্রহণ করিলেন। ঘোষণাপত্রে গভর্ণর লিখিয়াছেন যে, বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া অচল অবস্থার কথা চিন্তা করিবেন। এই উক্তি হইতেই অনুমান হয় যে, বর্ত্তমানে নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইবে না, বিরোধীদলকেও ডাকা হইবেনা। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেল যে, আমাদের অনুমানই ঠিক। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এখন ৯৩ ধারাই চলিবে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

৩য় বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা] ৫ই এপ্রিল, '৪৫, বৃহস্পতিবার, ২২শে চৈত্র '৫১ [দাম ছয় পয়সা

LOOK OUT THEN QUARREL

দেখে শুনে ঝগড়া করবেন

তিনটি ঘটনা

গত সপ্তাহে পর পর তিনটি ঘটনার ফলে বাংলার রাজনীতিতে এই পরিণতি ঘটিয়াছে। ২০শে মার্চ্চ, তিন হাজার কাপড়ের দোকান খানাতল্লাস করিয়া মাল আটক করা হয় এবং শীঘ্রই রেশনিং চালু হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বড়বাজারের ব্যাপারীরা ব্যাকুল হইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর পতনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় আরম্ভ করে।

তিনদিন পরেই দেখা যায় ঢাকার নবাব প্রমুখ ১৯ জন লীগ পক্ষীয় সদস্য হঠাৎ দলত্যাগ করিয়াছেন, ফলে বাজেটের কৃষি বরাদ্দ আলোচনায় মন্ত্রিমণ্ডলী পরাস্ত হয়। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী বলেন তাঁহাদের সমস্ত শক্তি উপস্থিত ছিল না তাই হারিয়াছেন—

লেখক : **ভবানী সেন**

পরের দিনও যদি তাঁহারা ভোটে হারেন তবেই পদত্যাগ করিবেন, নহিলে নয়। কিন্তু পরদিন ইহাতে বিরোধী দল আপত্তি তুলিলে পরিষদের স্পীকার রুলিং দেন যে, পরাজয়ের পর মন্ত্রীসভার আর অস্তিত্ব নাই, সুতরাং নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিষদ স্থগিত থাকিল।

ইহার পর নাজিমুদ্দিন আশা করিতেছিলেন : তিনি যতক্ষণ না পদত্যাগ করেন মন্ত্রিত্ব তাঁহার থাকিবেই ; বাজেট পাশ করিবার জন্য গভর্ণর সাময়িক ভাবে ৯৩ ধারা জারী করিবেন তাহার পর আবার মন্ত্রিমণ্ডলীকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। কংগ্রেসদল ভাবিতেছিলেন, শেষে হয়ত আবার নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিত্ব ফিরাইয়া দিবে সুতরাং আবার আইন সভায় মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার তোড়জোড়ও তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিরোধী দল চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে গভর্ণরের উপর এমন চাপ দেওয়া যায় যে ফজলুল হককেই মন্ত্রিত্ব দিতে ডাকে। গভর্ণর কেসি সকলকেই নিরাশ এবং স্তম্ভিত করিয়া সমস্ত ক্ষমতা দীর্ঘকালের জন্য নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

লীগের চেয়ে আমলাতন্ত্র ভাল

শুনিলাম কোন কোন কংগ্রেসনেতা বলিতেছেন যে, ৯৩ ধারা হইল বাঁচা গেল, অন্ততঃ লীগমন্ত্রিত্ব দুর হইল। কংগ্রেসসেবীদের অনেকেরই মনোভাব এই যে, লীগমন্ত্রিত্বের চেয়ে ৯৩ ধারা ভাল। বিরোধী দলগুলি ৯৩ ধারায় একটু মর্ম্মাহত হইয়াছেন এই জন্য যে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব পাইলেন না, কিন্তু তবু ভাবিতেছেন ইহা মন্দের ভাল, লীগ ত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইল, সাহাবুদ্দিনের ও সুহরাবর্দ্দির দুর্নীতি বন্ধ হইল! নাজিমুদ্দিনের চেয়ে কেসি ভাল—এই দাসসুলভ মনোভাবই মিঃ কেসিকে আইন-সভার অধিকার কাড়িয়া লইবার সুযোগ দিয়াছে।

গুজব শোনা যায়, মিঃ কেসিও নাকি বলিতেছেন আইন সভার সব দলই দুর্নীতিগ্রস্ত, সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিলেই নাকি বাংলাদেশ হইতে চোরাবাজার উঠিয়া যাইবে! এস, ডি, ও এবং সার্কেল অফিসারদের চিনি, নুন ও কাপড় প্রভৃতির ডিলার মনোয়ন করিবার কাহিনী যাহাদের জানা আছে তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন দুর্নীতি এবং চোরাবাজারের প্রধান ঘাঁটিই আমলাতন্ত্র। চোরাকারবারীকে সরকারী কর্ম্মচারীরাই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। যাহারা অন্ধ নয় তাহারা ৯৩ ধারার আমলে চোরাবাজার ও দুর্নীতি দমন আশা করে না। বরং সভাসমিতির অধিকার যেটুকু ছিল তাহাও এখন হারাইতে হইবে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সম্ভাবনা আরও পিছাইয়া গেল, আইন সভার ভিতর এবং সংবাদ-পত্রের আন্দোলনে সরকারী অব্যবস্থার উপর যেটুকু চাপ পড়িত তাহাও বন্ধ হইল। তাহার ফল হইবে আরও দুর্নীতি, আরও চোরাবাজার।

৯৩ ধারা যাহাতে না আসে, সেই জন্যই আসামের কংগ্রেস লীগের সঙ্গে যোগ দিয়া সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাদুল্লার চেয়ে গভর্ণর ভাল এরূপ বিকৃত ধারণা আসামী দেশভক্তদের নাই বলিয়াই আসামের গভর্ণর ৯৩ ধারা জারী করিবার সুযোগ পান নাই।

মন্ত্রিত্ব গেল কেন ?

লীগ পন্থীরা অনেকে বলিতেছেন, মাড়োয়ারী মজুতদারের টাকার জোরে মন্ত্রিত্ব গেল, আমাদের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু মজুতদার ব্যাপারী আজ এত শক্তিশালী হয় কেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকেরাই বা ঘুষ খাইয়া দল ছাড়িতে সাহস পায় কেন? ধান চাউল ক্রয় বিক্রয়ের কাজে তাঁহারা বড় বড় ব্যাপারীদেরই এজেন্ট এবং সাব্-এজেন্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের তৈরী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে ২৬ জনের মধ্যে ১৭ জনই অর্থাৎ মেজরিটিই বাছা বাছা পাইকার ব্যাপারী ; এস, সি, রায়, রণদা সাহা প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদেরই তাঁহারা কাপড় ও সূতা বণ্টনের ভিতর রাখিয়াছেন। নাজিমুদ্দিন, সাহাবুদ্দিন সুহরাবর্দ্দি এবং বরদা পাইন এই কয়জনে মিলিয়া লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীকে দুর্নীতিগ্রস্ত মজুতদারের প্রভাবের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। মজুতদারের সেবা করিয়া এখন মজুতদারের হাতেই তাঁহারা আঘাত খাইয়াছেন।

লীগ বিরোধী দলের লোকেরা আস্ফালন করিতেছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া বাংলাদেশকে বাঁচাইয়াছি। কাপড়ের ব্যাপারীদের অর্থবৃষ্টির কথা তাঁহারা জানেন এবং অনেকেই তাহার ভিতর জড়িত আছেন। চুক্তিতে ১৮ জনকে তাঁহারা যেভাবে দলে লফামারী তাহাকে আর যাহাই বলুক দুর্নীতি দমনমূলকভাবে

লীগ এবং লীগবিরোধী উভয় পক্ষই মজুতদারের কারসাজিতে পরিচালিত হইয়াছেন এবং জনগণের অধিকার নষ্ট করিয়া মিঃ কেসির হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন।

(২ পৃষ্ঠা দেখুন)

৯৩-এর ধাক্কা : দমনরাজের বিক্রম সুরু

বাংলা দেশের আসল রাজা পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র। যখন মন্ত্রিমণ্ডলী থাকে তখন ইহাদের যথেচ্ছ রাজত্বে সামান্য একটু টান পড়ে তাহাতেও ইহাদের ক্ষোভের অন্ত থাকে না।

অন্যতম সিভিলিয়ান লেবার কমিশনার সাহেব মজুরদের কিছু উপকার করিতে পারুন বা না পারুন, তাঁহার অফিসে গিয়া অভিযোগ জানানো সম্বন্ধে অন্ততঃ এতদিন মজুরদের অবাধ অধিকার ছিল। কিন্তু ২৮ তারিখে মন্ত্রিমণ্ডলী ভোটে হারিয়া টলমল করিয়া উঠিবামাত্র দেখা গেল এই সিভিলিয়ানতন্ত্রও উৎসাহে উঠিয়া বসিয়াছে। ২৯ তারিখে বেলা সাড়ে চারটার সময় একদল বিজলী মজুর লেবর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিতে যায়, তাহাদের কেস অনেক দিন ধরিয়া কমিশনার মহাশয়ের দপ্তরে চাপা পড়িয়া আছে। কিন্তু দেখা গেল মজুরদের অভিযোগ "শুনিবার" জন্য রাতারাতি নূতন "ব্যবস্থা" হইয়াছে—কমিশনার সাহেব অফিস বন্ধ হওয়ার আগেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন এবং একদল পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদি মোতায়েন হইয়া অফিস পাহারা দিতেছে যাহাতে মজুরেরা ভিতরে না যাইতে পারে।

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মজুরেরা ইউনিয়ন অফিসে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল ইউনিয়ন অফিসের দরজায়ও একদল পুলিশ সহ একটী হেড কনষ্টেবল মোতায়েন।

* * *

বিভিন্ন লোহা কারখানার মজুরেরা এক হইয়া ৩১শে মার্চ্চ একটী সভা করিবার জন্য পুলিশের অনুমতি চাহিয়াছিল। সমস্ত লোহা-কারখানার মজুরদের মিলিত সভা অতীতে অনেকবার হইয়াছে, অনুমতি পাইতে কোনো মুস্কিল হয় নাই। কিন্তু এবার ৯৩ ধারার রাজত্ব : মিটিংয়ের কয়েক মুহূর্ত্ত আগে পুলিশ আসিয়া হুকুম শুনাইয়া দিল যে, সব লোহা কারখানার মজুর এক সঙ্গে সভা করিতে পারিবেনা, মাত্র ষ্টীল প্রডাক্টস ইউনিয়ন সভা করিতে পারে, অন্য কারখানার মজুরদের সভা ত্যাগ করিতে হইবে।

তিরানব্বয়ী শাসনের ইহা তো উপক্রমণিকা মাত্র—দমননীতির জল আরও কত গড়াইবে সময়ে টের পাওয়া যাইবে।

রংপুরের

সম্পাদকীয়

★ জাতীয় সপ্তাহ ★

২৬ বছর আগে এই চৈত্র মাসেই ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বিরাট ঝড় উঠিয়াছিল। জালিনওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ও শান্ত নরনারীর উপর ১৬০০ রাউণ্ড গুলি চালাইয়াও জেনারেল ডায়ার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—গুলি ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহাকে থামিতে হইয়াছে! উলঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী বিভীষিকার প্রতিনিধি জেনারেল ডায়ার সেদিন ভারতীয় জনতাকে "শিক্ষা দিতে" চাহিয়াছিল।

ভারতবাসীও সেদিন শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনের রক্তস্রোতের মধ্যে দাঁড়াইয়া কোটী কোটী ভারতবাসী শপথ করিয়াছিল—সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

তারপর বহু পথ আমরা অতিক্রম করিয়াছি, বহু বাধা বিঘ্ন জয় করিয়াছি, বহু পরাজয়কে পরাস্ত করিয়াছি। হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টার মধ্যেই বৃহত্তর ঐক্যের কথাও আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি, আন্তর্জ্জাতিক পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু তবুও আজ ১৯৪৫-এর জাতীয় সপ্তাহে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই—স্বাধীনতার লক্ষ্য হইতে আমরা এখনও বহু দূরে, আমাদের রাজনীতিক শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমাদের স্বাধীনতায় পৃথিবীর মানুষের সাহায্য করার শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা তাহাদের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিয়াছি। তিক্ত ব্যর্থতার হতাশায় পড়িয়া আরও বেশী হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করিয়াছি। তাই সমস্ত পৃথিবীর দেশে দেশে যখন সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিজমের হাত হইতে ক্ষমতার পর ক্ষমতা অধিকার করিয়া চলিয়াছে তখন আমরা কিছুই হইল না বলিয়া ...শ্বাস করিতেছি।

...লিনওয়ালাবাগের মহাদুঃখ ও মর্ম্মান্তিক ...ার মধ্যেই জাতীয় ঐক্যের মহান প্রেরণা ...লাভ করিয়াছিল, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ...য়ারের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ...নে তাহাতে ভাটা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ...নের মহাদুঃখ আরও ভয়ঙ্কর, তাহার ভিতর আবার ঐক্যের নূতন আভাস জাগিতেছে। ...ানীর মৃত্যুযন্ত্রণা কংগ্রেস ও লীগকে ...ক্ত করিয়াছে। সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রীমণ্ডল ...ন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছে, কংগ্রেসী দলও ...ণ্ডলীর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হইতে ...কিয়াছে। পাঞ্জাবে কংগ্রেস ও লীগ ...সঙ্গে ইউনিয়নিষ্ট প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতেছে। ...ন্ত প্রদেশে লীগকে হারাইয়া কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ...িত হইলেও লীগের অনেক সভ্যই ইহাতে ...া অনুভব করেন নাই। আরও শোনা ...ছে যে একজন লীগ সভ্য সীমান্ত পরিষদে ... পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন এবং ...ী মন্ত্রীমণ্ডলী নাকি প্রস্তাবের বিরোধিতা না করিয়া পরিষদ সদস্যদিগকে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার সুবিধা করিয়া দিবেন।

শুধু আমাদের বাংলা দেশই আজও এই নূতন সুরে সাড়া দেয় নাই। বাংলার কংগ্রেসীরা ভাবিতেছেন লীগের সঙ্গে ঐক্যের অপেক্ষা কৃষক-প্রজা, হিন্দুসভা, বাতিল-কংগ্রেস প্রভৃতির স্বার্থরক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন—তাহার জন্য যদি লীগের সঙ্গে ঐক্য না হয় কিংবা ৯৩ ধারার নিরঙ্কুশ আমলাতান্ত্রিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। লীগের অনেকে ভাবিতেছেন, আমাদের কোট ছাড়িবার প্রয়োজন নাই, কেসি বা ওয়েভল একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।

জালিনওয়ালাবাগের আমলাতান্ত্রিক দমননীতি যে ঐক্যের প্রেরণা দিয়াছিল আজ ২৬ বছর পরে তেমনই নিরঙ্কুশ আমলাতান্ত্রিক রাজত্বের মধ্যে জালিনওয়ালাবাগের মর্ম্মান্তিক স্মৃতি সেই ঐক্যেরই জন্ম দিক। তবেই জাতীয় সপ্তাহ উদযাপিত হইবে, ...দেশ সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচিবে।

চোরাবাজারের স্বাধীনতার জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীদের 'সংগ্রাম'

সরকারের ভরসা হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট ও সিভিলিয়ানতন্ত্র

২৩শে মার্চ বস্ত্রব্যবসায়ীদের দোকানে হাজার হাজার গাঁট কাপড় আবিষ্কার হইবার পর বস্ত্র ব্যবসায়ীরা হিন্দু মহাসভার নেতাদের সাহায্যে হরতাল করিয়াছিল এ সংবাদ আমি আগে জানাইয়াছি। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিতে বাধ্য হইয়াছিল যে বস্ত্রব্যবসায়ীদের দোকান খুলিতে হইবে—যাহাতে লোকে কাপড় কিনিতে পারে। কিন্তু বস্ত্রব্যবসায়ীরা গবর্ণমেণ্টের হুকুম মানে নাই। গত রবিবার বড়বাজারের মাহেশ্বরী ভবনে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে য. যতক্ষণ না মিঃ কেসি তাহাদের কথা শুনি...ছেন ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই দোকান খুলিবেনা। এই ভাবেই তাহারা গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ অনিয়া রেশনিং ও কণ্ট্রোল দরে বিক্রয়-ব্যবস্থা বানচাল করিতে চায়, চোরাবাজারাভিমুখী "স্বাধীন বাণিজ্য ধারা" অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়।

রেশনিং এখনি সম্ভব

সরকারী মহলে সংবাদ লইয়া শোনা গেল যে পুলিশ কর্তৃক বস্ত্র অভিযানের ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ হাজার গাঁট কাপড় হাতে আসিয়াছে। বাংলার বাহির হইতেও অল্প দিনের মধ্যে প্রায় আরও বিশ হাজার গাঁট আসিয়া জমা হইবে। মোট এই চল্লিশ হাজার গাঁট কাপড়ে প্রায় এক কোটী লোক একখানি করিয়া ধুতি পাইতে পারে। সুতরাং মাথা পিছু বরাদ্দ করিয়া বিলি করিবার প্রয়োজন সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে এই পরিমাণ কাপড় লইয়া বরাদ্দের কাজ অনায়াসেই আরম্ভ করা যায়, তাহার পর মাসে মাসে কাপড় তো আসিতেই থাকিবে। মিল ও তাঁতের উৎপাদন বাড়াইয়া, বাংলার বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং ঘন ঘন মজুত-বিরোধী অভিযান চালাইয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কাপড় সংগ্রহ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে সরকার চারজন হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছে। হুকুম জারি হইয়াছে ঃ যে কে. ...কোটা হোল্ডারের মালই বাংলায় আসুক সে মাল এই এজেণ্টদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে, অবশ্য কোটা হোল্ডাররা দামের উপর ন্যায়সঙ্গত লাভ পাইবেন। কিন্তু কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এই হুকুমও এখনও পর্য্যন্ত মানিতে রাজি হয় নাই—কারণ বোধ হয় এই যে, হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের হাতে মাল ছাড়িয়া দিলে চোরাকারবার কি লইয়া করা যাইবে? কিন্তু সরকার যদি মালের উপর কর্তৃত্ব না করিতে পারে তবে রেশনিং, বিতরণ প্রভৃতি সবই বিফল হইবে। সুতরাং অত্যন্ত কঠোর ভাবে এই হুকুম চালাইতে হইবে, যাহাতে বস্ত্রব্যবসায়ীরা এখনই হুকুম মানিতে বাধ্য হয়।

হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট

হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টরা মাল সংগ্রহ করিয়া আপাতত মফঃস্বলে পাঠাইবে, সেখানে এস-ডি-ও সাহেবদের উপদেশ মত বিলির ব্যবস্থা হইবে। এস-ডি-ও-দের বিলি-ব্যবস্থার নমুনা ৩য় পৃষ্ঠায় রংপুরের সংবাদ হইতে পাইবেন, ঠিক হইয়াছে বাধ্যতামূলক চাঁদা না দিলে কেহ কাপড় পাইবে না। অন্যান্য জেলায়ও এইরূপ বা অন্যরূপ দুর্নীতি ঘটিতে পারে। সুতরাং এস-ডি ওর হাতে না দিয়া স্থানীয় জনসাধারণের কমিটির উপর বিলির ভার দেওয়া প্রয়োজন—ফুড কমিটিগুলিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠিত করিয়া তাহাদের উপরও ভার দেওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতায় আপাততঃ স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত দোকানদার মারফৎ বিলি করিবার কথাবার্তা চলিতেছে, কিন্তু সরকারী মহল এখনও সিদ্ধান্ত করে নাই।

হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেঃ (১) ক্যালকাটা ক্লথ এজেন্সি (ডি, পি, খৈতান প্রভৃতি) (২) প্রতাপমল রামেশ্বর (৩) গঙ্গাধর ব্যানার্জি এণ্ড কোং (৪) এস, এম, হানিফ।

একজন সোল এজেণ্ট করার অপেক্ষা চারজন এজেণ্ট করা যে ভাল কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টরাই সমস্ত মালের মালিক হইবেন, শহর ও মফঃস্বলে সমস্ত মানুষের বস্ত্র-বিতরণ ইঁহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। বস্ত্র-অভিযান হইতে দেখা গেল যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধুতা বলিয়া কোনো বস্তুই আর বাকী নাই। ইহাও বোঝা গেল যে আমলাতন্ত্র যদি ইচ্ছা করিয়াই ইহাদের বাড়িতে না দিয়া থাকিত, তাহা হইলে বহু কাল আগেই বড়বাজারের কাপড় আবিষ্কার করা যাইত। সুতরাং হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট আর আই, সি, এস অফিসারের হাতেই যদি বস্ত্র ব্যবস্থার ভার ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উলঙ্গপ্রায় বাঙ্গালীর শেষ কৌপীনটুকুও খুলিয়া দিতে হইতে পারে।

সর্ব্বদলীয় তদারক কমিটি

সরকার হইতে ব্যবসাদারপ্রধান টেক্সটাইল এডভাইজরি কমিটি তুলিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে—ইহা জনগণের দাবীরই প্রাথমিক জয়। কিন্তু উহার বদলে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট ও আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে চলিবে না। হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের তথা বস্ত্র-সংগ্রহ ও বণ্টনের সমস্ত ব্যাপার তদারক করার ভার জনসাধারণের হাতে দিতে হইবে, এবং সেজন্য সমস্ত দলের মিলিত পরামর্শ কমিটির উপর তদারকের ভার দিতে হইবে।

হিন্দুসভা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল দলের নেতাই এ বিষয়ে একরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখনও টালবাহানা করিতেছে। জনসাধারণের আন্দোলনই এ টালবাহানা ভাঙ্গিতে পারে।

—ভূপেশ গুপ্ত

৯৩ ধারার কবলে বাংলা দেশ

[১ম পৃষ্ঠার পর]

কংগ্রেসের কথা ও কাজ

বঙ্গীয় কংগ্রেস পালামেণ্টারী পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনই আমাদের কাম্য। কিন্তু তাহার পরই তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, গবর্ণরের উচিত এখন বিরোধী দলের নেতাকে (অর্থাৎ ফজলুল হককে) মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের জন্য আহ্বান করা; হিন্দু মহাসভা এবং কৃষক প্রজাদলও এই দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব মুখে চাহিতেছেন কিন্তু কার্য্যতঃ লীগবিরোধীদের একতাবদ্ধ করিয়া হক্ মন্ত্রীমণ্ডলী পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। নাজিমুদ্দিন এবং সাহাবুদ্দিনের জায়গায় ফজলুল হক এবং ঢাকার নবাবকে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসাইলে বাংলার কোন লাভ হইবে না। যে ১৮ জন লীগ হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমর্থনের জোরে মন্ত্রিত্ব চালাইতে হইলে দুর্নীতির পঙ্কে তলাইয়া যাইতে হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে কেহ কেহ এ কথাও বলিতেছেন যে, মিঃ কেসির উপর চাপ দিলে কেসিই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে পারেন। কেসি চাপ দিলে লীগও সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব গঠনে রাজী হইবে। অন্ধ লীগবিরোধিতার ফলে আসিয়াছে আমলাতন্ত্রের প্রতি আস্থা। লীগের সঙ্গে একতাবদ্ধ হইতে পারি না আর কেসি আমাদের একতাবদ্ধ করিয়া দিবেন? সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্বের জন্য কেসি একটুও আগ্রহান্বিত নন এবং কেসি চাপ দিলেও লীগ তাহার নিজস্ব নীতি পরিত্যাগ করিবে না।

মন্ত্রীদের কথা

মন্ত্রীরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাংলার বর্ত্তমান অবস্থায় একদলের মন্ত্রিত্ব চলে না। ৯৩ ধারা চলুক তাহাও তাঁহারা চান না। তাঁহারা আশা করেন যে, কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একত্র হইয়া যুক্তভাবে মন্ত্রিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া ৯৩ ধারার অবসান ঘটাইবে। তাঁহাদের আশা যে গান্ধীজি ইচ্ছা করিলেই বাংলার কংগ্রেসকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অনুমতি দিয়া এই সংকট দূর করিতে সাহায্য করিতে পারেন। মন্ত্রীরা জানেন না যে গত দুই বৎসরে তাঁহারা বাংলার কংগ্রেসকে কত বেশী লীগবিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের তাঁহারা মুক্তি দিতে চান নাই, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, আসাম এবং সিন্ধুদেশে মন্ত্রীমণ্ডলী প্রমাণ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তি দেওয়া নাজিমুদ্দিনের পক্ষে সম্ভব ছিল। জেলখানায় যে সব ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদী বন্দী সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দ্বারা যুদ্ধের সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন তাহাদের অনেকের মেয়াদ অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন তাঁহাদের মুক্তি দিতে চান নাই। এই সব কারণে বাংলার লীগ কংগ্রেসের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারে নাই, বরং কংগ্রেসকে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। লীগের মন্ত্রীরা লীগের যত ক্ষতি করিয়াছেন, ফজলুল হক কিংবা শ্যামাপ্রসাদ তত ক্ষতি করিতে পারেন নাই।

লীগ যদি এখন সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনে রাজী হয় তাহা হইলেই কংগ্রেসের আস্থা ও সহযোগিতা অর্জ্জন করিতে পারে, এমন কি কংগ্রেস তখন ফজলুল হকের মত ব্যক্তিদের বর্জ্জনও করিতে পারে।

লীগের আপত্তি

লীগদল বলে—আমাদের নীতি হইল মুসলিম লীগের সভ্য ছাড়া অন্য কোন মুসলিমের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব পরিচালনা না করা, কাজেই আমরা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্বের বিরোধী। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব গঠন করিলে কৃষক-প্রজাদলকেই মানিয়া লইতে হয় অথচ আমরা মুসলিম লীগকেই একমাত্র মুসলিম সংগঠন বলিয়া গণ্য করি। লীগের এই নীতির ফল কার্য্যতঃ কি দাঁড়াইবে? ঘুষ দিয়া লীগের সভ্য দলে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আবার ঘুষের লোভে তাহারা ভাগিয়া যাইবে, বিশ্বাসের অযোগ্য লোকদের উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে হইবে। অথবা ফজলুল হককেই মন্ত্রিত্বে বসাইয়া বাংলার মুসলমানদের সর্ব্বনাশ দেখিতে হইবে।

কংগ্রেসের আপত্তি

কংগ্রেস নেতারা বলেন—লীগ কিছুতেই অন্যদলের মুসলমানের সহিত একসঙ্গে চলিবে না, আমরাও কিছুতেই লীগের এই নীতির কাছে মাথা নত করিতে পারি না। কংগ্রেস নেতারা এই নীতি অনুসরণ করিয়া কার্য্যতঃ ৯৩ ধারাই স্থায়ী করিতেছেন অথবা ফজলুল হকের মত সুবিধাবাদীদের পাল্টা মন্ত্রিত্ব সমর্থন করিতে যাইতেছেন। লীগ অন্য কোন দলের মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চায় না এই ভয়ে যে তাহার ফলে মুসলমানদের সংহতি নষ্ট হইবে। আসামের কংগ্রেসও মুসলমানদের এই নীতি মানিয়া সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনে সাহায্য করিয়াছে। আসামের স্বতন্ত্র মুসলিম নেতা আলি হায়দার নিজে উদ্যোগী হইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদলীয় ঐক্যকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া নিজে স্বতন্ত্র মুসলমানদের জন্য কোন মন্ত্রীত্ব দাবী করেন নাই। বাংলার কৃষক-প্রজাদল যদি আলি হায়দারের উদাহরণ অনুসরণ করিতে না পারে তবে কংগ্রেসই বা কি জন্য লীগকে দোষারোপ করিবে?

জনগণের জীবন যখন আমলাতন্ত্র ও চোরাকারবারীর দুর্নীতিতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে তখন আমাদের দেশের দুইটি প্রধান গণপ্রতিষ্ঠান সংগঠনগত নীতির তর্ক লইয়া ব্যস্ত—ইহাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয়।

(৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

মফঃস্বলে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ ঃ বস্ত্রবণ্টনে আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা

জনপ্রিয় ফুড কমিটির হাতে কাপড় বিলির ভার চাই

মিঃ সুহরাবর্দ্দী গত ২৭শে মার্চ্চ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, কলিকাতার চোরাগুদাম হইতে উদ্ধার করা কাপড়ের অনেকটা যাহাতে মফঃস্বলবাসীদের কাছে পৌঁছায় তাহার তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার বিবৃতিতে মফঃস্বলের জনসাধারণ খুশী হইবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুরাপুরি আশ্বস্ত হইতে পারিবেন না। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট—এতদিন আমলাদের হাত দিয়া যেটুকু কাপড় মফঃস্বলে গিয়াছে তাহার অধিকাংশই গিয়াছে চোরাবাজারের গর্ভে। কেমন করিয়া যায়, তাহা আজ কাহারও অজানা নাই। কাজেই পুরানো প্রথায় নতুন করিয়া সরবরাহ করা কাপড়েরও কি দশা ঘটিবে, তাহাও অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়। তাই বাইরে যে কাপড়ই যাক, রেশন প্রথায় তাহা জনগণের ফুড কমিটি মারফৎ বিলি করিতে হইবে। যেখানে ফুড কমিটিতে দুর্নীতিপরায়ণ লোকজন প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে আমলাদের মনগড়া ফুড কমিটি গড়া হইয়াছে, সেখানে গণতান্ত্রিক কায়দায় নতুন ফুড কমিটি নির্ব্বাচিত করা হউক।

ঢাকার মাণিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর স্ত্রীর (স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী) কাছে জয়রা গ্রামের এক মহিলা চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, যদি তিনি একখানি কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়া দেন, তবে মহিলাটি আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইবেন; কারণ, কিছুতেই কাপড় যোগাড় করিতে না পারিয়া তিনি গত কয়েকদিন ধরিয়া তিন টুকরা ছেঁড়া ন্যাকরা পরিয়া আছেন।

বস্ত্রাভাবে সমাজে কলঙ্ক

গ্রামাঞ্চল হইতে বস্ত্রাভাবের দরুণ আত্মহত্যার একাধিক খবরও আমাদের কাছে আসিয়াছে।

ময়মনসিংহের টঙ্ক এলাকার একটি গ্রাম চৈতননগর। ইহাদের পিছনে আছে ১৯৩০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। বুকের রক্ত ঢালিয়া ইহারা কৃষক সমিতি বানাইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা একে অন্যকে বাঁচাইয়াছে। আজ তাহাদের সে গর্ব্ব ভাঙিতে বসিয়াছে। একটি মাত্র কাপড় যার, কি করিয়া সে অন্যকে লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইবে! মহাজনরা আজ নতুন কৌশলে গরীব কৃষকের জমিজমা, ঘরবাড়ী লুটিয়া নিতেছে। তাহারা চোরাবাজারে চড়া দামে কৃষকদের কাছে কাপড় বেচে—ইহার উপর টাকায় চার আনা সুদ। বাজার দর যদি ৫৲ টাকা হয় তবে ৪৲ টাকা মণ দরে মহাজনকে ধান দিয়া এই ঋণ কৃষকদের পরিশোধ করিতে হইবে। হাজং সমাজে যে কথা কোনদিন কেহ শোনে নাই—সেই কলঙ্কের কথা আজকাল ক্রমশ শোনা যাইতেছে। ঘরের বউ ইজ্জত বেচিয়া লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি খুঁজিতেছে। কাহারও পরণে নূতন শাড়ী দেখিলেই অমনি কলঙ্ক রটিয়া যায়। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ঈর্ষায় হাজংদের মধ্যে অতীতের সেই প্রীতির সম্পর্ক দিন দিন পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

মেয়েদের লাইনেও পুলিশের লাঠি

বাকুড়া মিউনিসিপ্যাল শহরে ৪৬ হাজার লোকের মধ্যে ১৩ হাজার রেশন কার্ড। এই ১৩ হাজার রেশন কার্ডে মাত্র মোট ৮ হাজার কাপড় বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে। পুলিশ জনতার উপর নানা রকমে অত্যাচার করে, মেয়েদেরও অসম্মান করে। ইহা ছাড়া খরিদ্দারদের কাছ হইতে ঘুষ লইয়া তাহারা কাপড় কিনিয়া দেয় ও নিজেরা খুশিমত কাপড় কেনে। গত ১২ই মার্চ্চ পুলিশ রামনাথ নাগের দোকানের সামনে জনতার উপর লাঠি চালায়। ২১শে মার্চ্চ তারিখেও আবার দামোদর বস্ত্রালয়ের সামনে কাপড়ের লাইনে পুলিশ লাঠি চালায়। ফলে, পদ্মা বাউরী নামে একজন মেয়ের চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। পুলিশের ধাক্কায় গৌর গরাই নামে একজন ১ ঘণ্টাকাল অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সুশীলা বাগ্দীকে পুলিশ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, আরও ৩।৭ জন লোক পুলিশের ধাক্কায় তাহার উপর পড়িয়া যায়। প্রাণভয়ে সুশীলা কাপড় না নিয়াই চলিয়া যায়। পুলিশের এই ধরণের অত্যাচার এখানে দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘুষের দায়ে পুলিশ অফিসার

২৪-পরগণা জেলার **বসিরহাট** শহরে একজন পুলিশের কর্ত্তা নাকি হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছেন বলিয়া একজন সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন। কণ্ট্রোলের কাপড় বিক্রেতা অমূল্য কর্ম্মকারের কাছ হইতে নাকি স্থানীয় পুলিশ অফিসার ইতিপূর্ব্বে কয়েক হাজার টাকা ঘুঁষ নিয়াছেন। অফিসারের দাবীদাওয়া মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ীটি বাধ্য হইয়া সরকারী উপরওয়ালাদের কাছে জানান। ঠিক যে সময় পুলিশ অফিসারটি ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ৫০০৲ টাকা ঘুঁষ নিতেছিলেন, সেই সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলেন। শোনা গেল, ব্যাপারটি নাকি চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। ঘটনাটি সত্য কিনা সে বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা তদন্ত দাবী করিতেছি।

হাজার হাজার কাপড় পচিয়াছে

খাস কেসি সাহেব সেদিন **বর্দ্ধমান** সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চমুখে কাপড়ের স্থানীয় হোলসেল ডিলারের গুণগান করিলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরই ফাঁস হইয়া গেল যে, ৩৫ হাজার টাকার কাপড় পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। হয়ত ইহাতে ৮।১০ হাজার মানুষের লজ্জা নিবারণ হইত। এই অমানুষিক অপরাধের জন্য মাত্র 'সসপেণ্ড' হওয়ার সাজা হইয়াছে।

মেদিনীপুর শহরে কাপড় জমা থাকিতেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত কো-অপারেটিভ ষ্টোরে কাপড় সরবরাহ করা হয় নাই। অথচ ২২৩ বেল কাপড় অর্থাৎ যাহাতে প্রায় ৪৪।৪৫ হাজার স্ত্রী পুরুষের লজ্জা নিবারণ হইতে পারিত, তাহা আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা ও হৃদয়হীনতার জন্যই পচিয়া নষ্ট হইয়া গেল।

বেপরোয়া চোরাকারবার

পুলিশের কাছে চোরাবাজার ধরিয়া দিলে অনেক সময় উল্টা তাহারাই চোখ রাঙ্গায়। **ময়মনসিংহের কমলকান্দা** থানার পুলিশ চোরাবাজার হইতে কৃষককর্ম্মীদের ধরা তিনটি কাপড় হাত করিয়া কৃষককর্ম্মীদের ধমক দিয়া তাড়াইয়া দেয়। সে কাপড় তিনটি কাহাদের বরাতে জুটিয়াছে কেহই জানে না। বরিশালের মূলাদী গ্রামে কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগের মিলিত চেষ্টায় স্থানীয় ব্যবসায়ী হরেন্দ্রনাথের ঘর হইতে ৪১টি কাপড় উদ্ধার হয়। এক জোড়া কাপড় ২০৲ টাকায় বিক্রি করার জন্য পরে আবার তাহাকে ধরা হয়। অথচ যখন স্থানীয় এনফোর্সমেণ্ট অফিসারের কাছে কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগ হইতে মিলিত ভাবে চোরাবাজার বন্ধ করার কাজে সাহায্য চাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন, আমার সময় নাই।

জলপাইগুড়ীর এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্ত্তা হইতেছেন অখিল চৌধুরী। ইনি কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর। [illegible]ট বিভাগের [illegible] অনেক লোকেরই ধারণা, এনফো[illegible] সহিত স্থানীয় চোরাবাজারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের পর কাপড়ের চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে ৫৩টি মামলা রুজু হইয়াছে। অবশ্য এ পর্য্যন্ত যাহাদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সাজা হইয়াছে বড় জোর ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড। অথচ গত ফেব্রুয়ারী মাসের খানাতল্লাসীতে কোন চোরা-মজুত বাহির হইল না। অন্যান্য দোকান তল্লাসের পর নামজাদা বস্ত্র-ব্যবসায়ী রামজিলাল শর্ম্মার দোকান তল্লাস করিতে ২ ঘণ্টা পরে কেন যাওয়া হইল, তাহাও কেহ বুঝিতে পারে নাই।

ভুঁইফোড় ব্যবসায়ীর দল

বরিশাল জেলা খাদ্য কমিটির অন্যতম সভ্য অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভূপেশ দত্ত একাধারে জেলা ও সদর দক্ষিণ মহকুমার পাইকার এবং বরিশাল শহরের খুচরা কাপড় বিক্রেতা হইয়াছেন। সম্প্রতি বরিশাল শহরের যে ১১টি দোকান হইতে বস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দোকানটি তাহার অন্যতম। ১০খানি দোকান ১ দিনে খানাতল্লাস হইল কিন্তু মিঃ দত্তের দোকানটি তারও একদিন পর তল্লাস করা হইল।

আইন অনুযায়ী লাইসেন্স কেবলমাত্র ৩ বৎসরের পুরানো দোকানেরই পাওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৪৪ সালেই শহরের কাপড়ের কয়েকটি দোকান মারফৎ কাপড় বিলি হইবার সময়ই হঠাৎ মিঃ দত্তকে কাপড় ব্যবসায়ীর ভূমিকায় দেখা গেল।

উপরোক্ত কাপড় আবার ফিরিয়া পাওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছে। মিঃ দত্তই নাকি মহাজনদের বৈঠকে ভরসা দিয়াছেন যে, কাপড় ফেরত পাওয়া যাইবেই। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক টেক্সটাইল বোর্ড হইতেও নাকি তার গিয়াছে যে, ঐভাবে কাপড় আটক হইলে স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোতে ভাঁটা পড়িবে।

জলপাইগুড়ীতেও শহরের কাপড় বিলির সোল-এজেণ্ট হইল দেবদাস বিজয়কুমার নামে সম্পূর্ণ নূতন একটি দোকানদার। দোমোহনীতে ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন নামে এমন একটি নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কাপড় দেওয়া হইল, আজ পর্য্যন্ত যাহাদের কোন দোকানের অস্তিত্ব নাই। জলপাইগুড়ীতে সর্ব্বদলের মিলিত জনসভায় ইহার প্রতিবাদ করা হয়।

ব্যাঙ্ক মারফৎ কাপড় বিলি

১৯৪৪ সালে **যশোহরের** সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য কাপড় বিক্রির জন্য সদর মহকুমার সোল-এজেন্সী দেওয়া হয়। জন-সাধারণের কোন সহযোগিতা না লইয়া মহকুমা হাকিমের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্ক হইতে পাইকারী ও খুচরা কাপড় বিক্রি আরম্ভ হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন কাপড়ের নিদারুণ সঙ্কট দেখা গেল, তখন হঠাৎ ব্যাঙ্ক হইতে কাপড় বিক্রি বন্ধ হইয়া গেল। স্থানীয় জনসাধারণের সর্ব্বদলীয় বস্ত্র কমিটির অনুসন্ধানে কিছুদিনের মধ্যেই জানা যায় যে, ঐ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন রকমের ৩৫৪ গাঁট কাপড় ১৯৪৪ সালের জুন মাস হইতে স্থানীয় ধানচালের আড়তদার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের গুদামে মজুত আছে। ইহার কিছু অংশ বৃষ্টিতে ও উই পোকায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সিভিল সাপ্লাইয়ের সহকারী-ডিরেক্টর মিঃ ফারুকী সর্ব্বদলীয় বস্ত্র কমিটির প্রতিনিধিদের বলিলেন, [illegible]ান কাপড় যশোহরে বিক্রি হইতেছে না বলিয়া কলিকাতার বড়বাজা[illegible] এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করিবার জন্য প্রাদে[illegible] ডিরেক্টরেট হইতে তার আসিয়াছে। ঐ কা[illegible] যশোহরের স্থানীয় জনসাধারণকে রেশন প্রথায় [illegible] করার প্রস্তাবে তিনি বলিলেন, আমাদের [illegible] করার উপায় নাই। —সুভাষ মুখোপাধ্যা[illegible]

চাঁদা ছাড়া কাপড় মিলিবে না

রংপুর জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও "কংগ্রেসী" ব্যাঙ্কারের যোগসাজে

একটি ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া **রংপুরে** জেলাব্যাপী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ বণ্টনের একটি আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা খাড়া করা হইয়াছে। ইহার নূতন নামকরণ করা হইয়াছে 'ইউনাইটেড সার্ভিস ষ্টোর্স।' সমস্ত ফুড কমিটি ও গ্রাম্য সমবায় সমিতি বাতিল করিয়া দিয়া শুধু আমলাতন্ত্র ও ব্যাঙ্কের উপর এই নূতন ব্যবস্থা নির্ভর করিবে। ফুড কমিটির মধ্য দিয়া যাহাতে কোন রকমে জনশক্তি মাথা চাড়া না দিতে পারে অর্থাৎ ফুড কমিটি তুলিয়া দিবার জন্যই এই নূতন আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা। লাভের উপর জন-সাধারণের কোন হাত থাকিবে না, লোকসান হইলে গুণগার তাহাদেরই দিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের এই ষড়যন্ত্রে স্থানীয় কমিউনিষ্টবিদ্বেষী কংগ্রেস নেতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অতুল রায় একজন উৎসাহী পাণ্ডা। জেলা কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলনে কমিউনিষ্ট বর্জ্জনের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অতুল রায়ই উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী কংগ্রেস নেতার আসল রূপ আজ প্রকাশ পাইয়া গেল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আপন খুশী মাফিক যে গভর্ণিং বডি ও ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে কোষাধ্যক্ষের পদগৌরব অতুল বাবুই লাভ করিয়াছেন।

গভর্ণিং বডির অর্দ্ধেক সভ্য সরকারী কর্ম্মচারী, আর ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে এক অতুল বাবু ছাড়া বাকী সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী। জেলায় যত কাপড় আসিবে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এই আমলাদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

যাহারা অতুল বাবু ও ম্যাজিষ্ট্রেটের এই পরিকল্পনা অনুসারে নির্দ্ধারিত চাঁদা [illegible] কেবল তাহারাই কাপড়ের [illegible] পাইবে [illegible] আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] ইউনাইটেড সার্ভিস ষ্টোর্সের [illegible] নীলফামারী[illegible] জনসাধারণের কাছ হইতে বাধ্যতামূলকভা[illegible] মাথাপিছু ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা আদায় কর[illegible] হইতেছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। অতুল [illegible] রংপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টা[illegible] সেই ব্যাঙ্কেই ষ্টোরের টাকা জমা হইবে। সুতর[illegible] অতুল বাবু কেন আমলাতন্ত্রের দলে ভিড়িয়াছে[illegible] তাহা বোঝা শক্ত নয়। রংপুরের জন[illegible] ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই জেলার সর্ব্বত্র লীগ, বার লাইব্রেরী, সর্ব্বদলীয় রিলিফ কমিটি ও জনসভা হইতে এই জনগণবর্জ্জিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। ১৫ই মার্চ্চ শহরের সদর ফুড কমিটির সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আয়েঙ্গার দম্ভভরে বলিয়াছেন, 'আপনারা ইহা গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি ইহা চালু করিবই।' ১৮ই মার্চ্চ হইতে রংপুর শহরের সমস্ত ফুড কমিটি তুলিয়া দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯শে মার্চ্চ হইতে রংপুর শহরে নূতন পরিকল্পনা চালু করা হইতেছে। অন্যান্য স্থানেও শীঘ্রই ইহা জোর করিয়া চালু করা হইবে।

জনসাধারণের সহযোগিতা বাদ দিয়া শুধুমাত্র সরকারী ও সরকারের পেটোয়া লোকদের দিয়া কোন পরিকল্পনাই আজ সফল হইতে পারে না। লোভ দেখাইয়া দু'একজন নামকরা 'স্বদেশী' লোককে দলে টানিলেও জনসাধারণকে ভুল বুঝানো যাইবে না। জনমতের চাপে রংপুরের জনসাধারণ তাহাদের দাবী আদায় করিবেই।

কৃষক সভার গত বেজওয়াদা অধিবেশনে দেড়

কৃষক সভা সম্পর্কে সহজান

তিনি কমিউনিষ্টদের সাধুতা সম্বন্ধে

নিখিল ভারত কৃষক সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে হঠাৎ একটা ফতোয়া জারী করেন যে কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় অফিস, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রভৃতি সকলকেই তিনি বরখাস্ত করিয়াছেন। কৃষক সভার গঠনতন্ত্র অনুসারে এইরূপ ডিক্টেটরী হুকুম জারি করিবার কোনো ক্ষমতাই সভাপতির নাই একথা প্রত্যেকটী কৃষককর্ম্মী জানেন। ন্তু সে যাহাই হোক, স্বামীজির সিদ্ধান্ত হইতে ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে ষক সভার বেশীর ভাগ সভ্য ও সমর্থকদের সহিত স্বামীজির বিরোধ বাধিয়াছে এবং তিনি পৃথক হইতে চাহিতেছেন। ইহার কারণ কি ?

ক সভার বিরুদ্ধে নালিশ

জির কাজে যাঁহারা খুশী হইয়াছেন অনেকেই অনেক দিন ধরিয়া কৃষক সভার রুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেছিলেন এবং গুলির সাহায্যে কৃষক সভাকে অপদস্থ ও বিভক্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রচার করেন নিখিল ভারত কৃষক সভায় কমিউনিষ্টরাই কৃষক সভার নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া নো কোনো কর্ম্মী কৃষক সভার অধিবেশন বর্ত্তমান যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার) তাহারা কৃষকসভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সমর্থন করেন—যদিও পাকিস্তানের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো করে নাই।

নে স্বামীজিও প্রায় এইরূপ অভিযোগেই চাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছেন। অভিযোগগুলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা স্বামীজির নিজের সম্মতি সহকারেই কৃষক সভা হইতে বার বার প্রমাণ করা হইয়াছে। এক বৎসর আগে বেজওয়াদায় কৃষক সভার বাৎসরিক অধিবেশনে স্বামীজিরই সভাপতিত্বে এবং তাঁহারই তিক্রমে "কৃষক সভার নীতি" সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত দ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

"কয়েকটী দেশদ্রোহী বিভেদপন্থী উপদল কৃষক সভার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছে এবং কৃষক সভা কমিউনিষ্টদের প্রভাবাধীন, কমিউনিষ্টরা তাহাদের নীতি কৃষক সভার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেয়—এই সমস্ত কথা বলিয়া কৃষক সভার বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতেছে।"

গত ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ মাত্র ৪ মাস আগে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। ঐ সময়েও কৃষক সভা ও কংগ্রেস-কর্ম্মী শীর্ষক একটি প্রস্তাব স্বামীজীর সভাপতিত্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে কৃষকদের সেবা ও সংগঠন করিতে ইচ্ছুক সমস্ত দেশপ্রেমিকদের কৃষকসভায় যোগদান করিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

কৃষক সভায় সকলের স্থান

…"নিখিল ভারত কৃষক সভা কৃষক শ্রেণীর একমাত্র দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে কৃষকদের সেবা ও সংগঠন করিতে ইচ্ছুক সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী কৃষক সভায় যোগদান করিবেন। কিন্তু কয়েকটী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও উপদল একটি প্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা করিতেছে এবং নিখিল-ভারত কৃষক সভার নীতি ও কাজ সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মীদের ঐ প্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠানে লইবার চেষ্ট করিতেছে। বেজওয়াদায় গৃহীত কৃষক সভার নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রতি কাউন্সিল সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।"

গত ১৭।১২।৪৪ তারিখে স্বামী সহজানন্দ নিজেই কৃষক সভার নীতি সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন। এখানে তাহা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"নিখিল ভারত কৃষক সভার নীতি, কর্ম্মসূচী ও বাস্তব কাজের ভিত্তি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বাধীনতাকামীদের জন্য কৃষকসভার দ্বার উন্মুক্ত তো বটেই তাঁহারা কৃষকসভার মধ্যে সর্ব্বদাই স্বাগত।"

"তারপর, তাহাদের আশঙ্কা হইতে পারে যে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক পার্টির (কমিউনিষ্ট পার্টি) কর্ম্মীরা কৃষক সভার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহারা নিজেদের রাজনীতিক মত ও নীতি কৃষক সভায় যোগদানকারী কংগ্রেসকর্ম্মীদের উপর চাপাইতে পারেন। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে [উপরোক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির (কমিউনিষ্ট পার্টির) কর্ম্মীরাই কৃষকের একতা ও কৃষক সভার আসল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন।—লেখক] যে কৃষকসভার গঠনতন্ত্রে এইরূপ একটি বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে যাহাতে বারো আনা অংশের বা অনুরূপ সংখ্যাধিক্য হইলে তবেই কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে।……এই পদ্ধতির ফলে প্রত্যেক দল ও গ্রুপের প্রকৃত কাজের অনুপাতে তাহাদের শক্তি কৃষক সভায় প্রতিফলিত হইবে এবং এইভাবে যে দল সবচেয়ে বেশী কাজ করিবে, অতিশীঘ্র কৃষক সভায় তাহাদেরই প্রভাব হইবে।"

"সুতরাং আমি সমস্ত দলের ও গ্রুপের কর্ম্মীদের বিশেষতঃ কংগ্রেস কর্ম্মীদের নিকট আবেদন করিতেছি যে তাঁহারা কৃষক সভায় যোগদান করুন অথবা কৃষক সভার বাস্তব কাজে অন্যভাবে সাহায্য করুন এবং এইভাবে এমন একটি দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন যাহা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিবে।"

নিঃ ভাঃ কৃষক সভার সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জি

১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এই বিবৃতি দেওয়ার পর স্বামী সহজানন্দ অকস্মাৎ কেন ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কৃষক সভার অফিস বরখাস্ত করিয়া বসিলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা যখন নিখিল ভারত সম্মেলনের আয়োজনে অত্যন্ত ব্যস্ত তখন তাহাকেও সস্পেণ্ড করিলেন ইহার কারণ বুঝিতে হইলে স্বামীজির রাজনীতি সম্বন্ধে একটু ধারণা করা দরকার। তাহা হইলেই স্বামীজির এই আচরণের গূঢ় কারণ পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

স্বামীজির রাজনীতি

গত তিন বৎসরের মধ্যে স্বামীজির রাজনীতিতে কত বার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে কোন বিষয়ে এই তিন বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার লেখা পড়িলে ইহা পরিষ্কার দেখা যা কটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ঃ—

(ক) যুদ্ধ সম্পর্কে

হুঙ্কার নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক স্বামীজির নিজের কাগজ বলিলেই চলে। ১৯৪২ সালের ৩০শে মে তারিখের হুঙ্কার পত্রিকায় স্বামীজি লেখেন, "…এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে যদিও আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আমরা আপোষ রফা চাই, তবুও আপোষ হোক কিংবা নাই হোক, জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা কোন অবস্থাতেই বাধা দিতে পারি না। আমরা কখনই তাহা করিব না। জাপানীদের বিরুদ্ধে যাহারা দাঁড়াইতে চায়, তাহাদের সকলকেই আমাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে হইবে।" [ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত]

ঐ সংখ্যাতেই স্বামীজি অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ রূপে গ্রহণ না করি, তাহা হইলে দুনিয়ার অত্যাচারিত ও শোষিতদের মুক্তির কোন আশা নাই। জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা ও যুদ্ধের বিরোধিতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য।"

ঐ সংখ্যাতেই অহিংস প্রতিরোধ সম্পর্কে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন, "অহিংস অসহযোগের ঘোষণা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। জাপানী বোমারু, ট্যাঙ্ক ও কামান হইতে আমাদের ঘরবাড়ী তাহা দ্বারা রক্ষা হইবে না। আমরা যদি কিছু করিতে চাই, যদি নিজেদের ফাঁকি না দিয়া সত্যই কিছু করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমাদের এখনই দুটী কাজ করিতে হইবে ঃ প্রথমতঃ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জাপ বিরোধী প্রচার অভিযান চালাইয়া জাপ প্রতিরোধের জন্য জনমত গঠন করিবে হইতে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের আধুনিক যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হইতে হইবে।"

(খ) লীগ সম্পর্কে

১৯৪২ সালের ৩০শে মে তারিখের হুঙ্কারে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। উহাতে স্বামীজি বলেন, "জনযুদ্ধে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার জন্য দরকার এই যে কংগ্রেস, কিষাণ সভা, মজদুর সভা, মুসলীম লীগ, ছাত্র ফেডারেশন সকলেরই অবিলম্বে জাতীয় সরকারের জন্য জাতীয় দাবী আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ঐক্য ব্যতীত জাতীয় দাবী পূরণ হইতে পারে না। এই একতা গড়িয়া তুলিবার জন্য বৃহত্তম রাজনৈতিক পার্টিকে ও সবচেয়ে বড়ো সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হইবে। এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ইহা করিবার দায়িত্ব বৃহত্তম রাজনৈতিক পার্টির (কংগ্রেসের) ও প্রধান সম্প্রদায়ের উপর রহিয়াছে।"

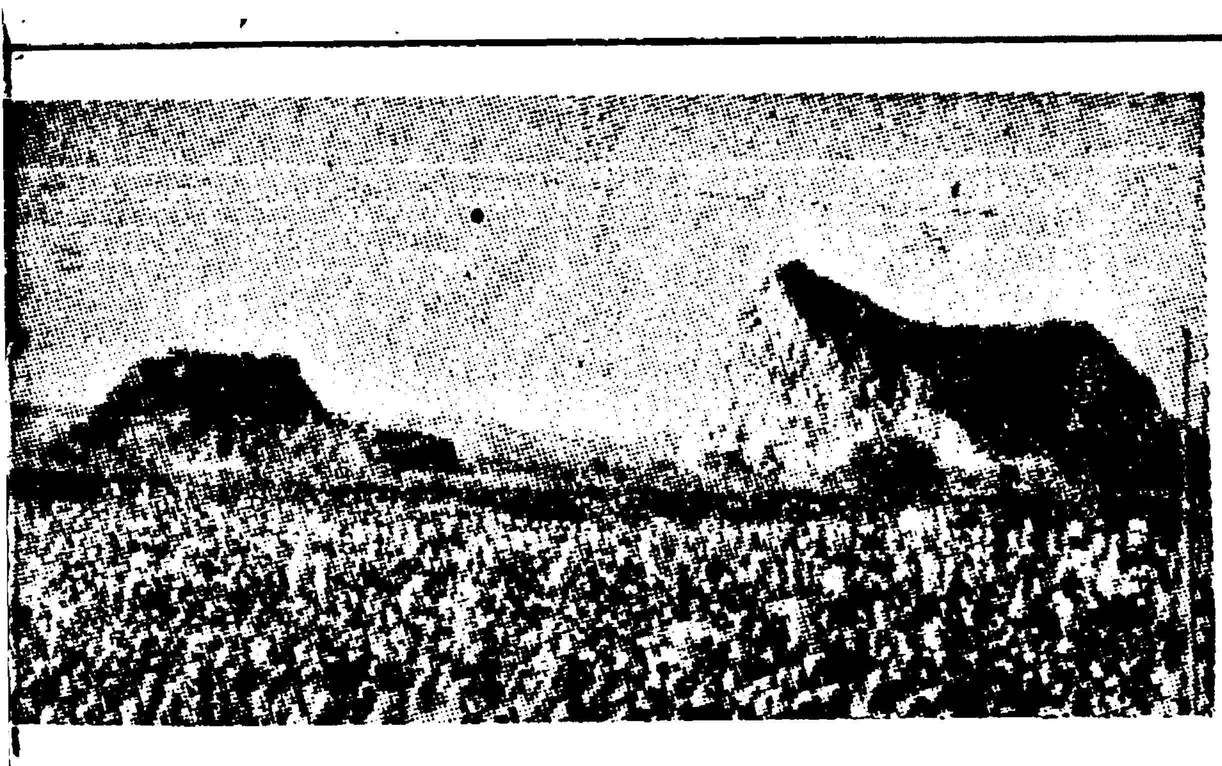

ক্ষ কৃষকের বিরাট সমাবেশের একাংশ

ন্দের অভিযোগ ভিত্তিহীন

নিজস্ব স্বীকৃতিই চাপিয়া গিয়াছেন!

(গ) আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে

স্বামীজী বলেন, "সরল কৃষকেরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের নামে প্রতারিত হইতেছে।" ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের হুঙ্কারে স্বামীজি লেখেন, "...ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের গুপ্ত উপায়ে সেনাবাহিনীতে ঢুকিতে হইত।... কিন্তু আজ সব বাধা দূর হইয়াছে। এখন প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে।... এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা যোদ্ধার সমস্ত সেনা বিভাগে যোগদান করা ও সম্ভবমত সকল উপায়ে প্রস্তুত হওয়া দরকার।"

এই সব লেখা হইতে দেখা যায় গত ত্রিশ মাসের মধ্যে স্বামীজি কোথাও কমিউনিষ্ট নীতি সমর্থন করিয়াছেন, কোথাও কমিউনিষ্ট নীতির বিরোধিতা করিয়া মানবেন্দ্র রায়ের মত সমর্থন করিয়াছেন; কোথাও বা কমিউনিষ্ট নীতির বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস নেতাদের গালিগালাজ করিয়াছেন।

ভিত্তিহীন অভিযোগ

নিজে এই সমস্ত কথা বলা ও লেখার পর আজ কমিউনিষ্টদের উপর দোষারোপ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। বিভেদকারীদের যুক্তি কৃষক সভায় কমিউনিষ্ট প্রভাবের অভিযোগ স্বামীজীর মুখে নতুন শোনা যাইতেছে।

'জনযুদ্ধ' সম্পর্কিত অভিযোগের সম্বন্ধেও একই কথা। তিনি নিজে আগে এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার লেখা হইতে দেখানো হইয়াছে। তিনি কৃষক সভার সম্বন্ধে এ অভিযোগ গত এক বছরের মধ্যে কখনও করেন নাই।

১৭ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ইহার আভাস নাই। পূর্ব্বেও কোন বিবৃতিতে তিনি ইহার উল্লেখ করেন নাই। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিবৃতিতেও এ অভিযোগ স্বামীজি উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন সে সম্পর্কে বেশী লেখা নিরর্থক।

তৃতীয় অভিযোগ পাকিস্তান সম্পর্কে। ১৯৪২ সালে বিহিটাতে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করে যে, "পাকিস্তানের পক্ষে বা বিপক্ষে কৃষক সভা কোন মত প্রচার করিবে না।" সেই হইতে কৃষক সভা পাকিস্তান সম্পর্কে নীরব আছে। কিন্তু কৃষক সভা চিরদিনই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সমর্থন করিয়া আসিতেছে। বেজওয়াদায় 'কৃষক সভার নীতি' শীর্ষক প্রস্তাবেও কংগ্রেস লীগ ঐক্যের নীতি গৃহীত হয়। গত বৎসর গান্ধী-জিন্না আপোষ-আলোচনার পূর্ব্বে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটি এক প্রস্তাব এই মর্ম্মে গ্রহণ করে যে পাকিস্তানের বিতর্কমূলক প্রশ্ন না তুলিয়া এই কমিটি গান্ধীজির মিলন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিতেছে। ঢাকা ও খুলনা জেলা কৃষক সমিতি তাহাদের কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলকে পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করে। পাকিস্তানের পক্ষে কোন মত তাহারা সেই প্রস্তাবে প্রচার করে না। এই সমস্ত বিষয় ১৯৪৪ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয় এবং ডিসেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠকে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার স্বামীজী বা কাউন্সিল অনুভব করেন না। ইহার পর নূতন কোন কারণ ঘটে নাই। তথাপি স্বামীজি বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় ২৭শে ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতি বাহির করায় কৃষক সভার ভিতরে সাংঘাতিক অন্যায় কাজ চলিতেছে এইরূপ একটা ভাব সৃষ্ট হয়।

স্বামী সহজানন্দ

স্বামীজির গণতন্ত্র বিরোধিতা

ইহার আসল কারণ কি? তাহা স্বামীজির চিঠির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজি ২৫শে জানুয়ারী তারিখে সাধারণ সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখিয়া দাবী করিয়া বসিলেন—(১) স্বামীজিকে সাধারণ সম্পাদক করিতে হইবে, (২) স্বামীজির মনোনীত কোন একজন অকমিউনিষ্ট নেতাকে—তিনি কৃষকসভার এক আনার সদস্য না হইলেও এবং কৃষকসভার গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহাকে—কৃষকসভার সভাপতি করিতে হইবে, (৩) কৃষকসভার একটি মুখপত্র বাহির করিতে হইবে এবং তাহার সম্পাদক হইবেন একজন অ-কমিউনিষ্ট, ইত্যাদি। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত বঙ্কিম মুখার্জ্জী বিহিটাতে স্বামিজীর সহিত দেখা করিয়া কয়েক দিন আলোচনা করেন ও কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকিবার প্রস্তাব করেন। স্বামীজি তাহাতে সম্মত হন না। তারপর বঙ্কিম বাবু ফিরিয়া আসিলে স্বামীজি বঙ্কিম বাবুকে জানান যে স্বামীজির দাবী সম্পর্কে মতামত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। বঙ্কিম বাবু ২৭শে ফেব্রুয়ারী তার করেন যে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের সকলের মত জানা সম্ভব নয় তবে বাংলা দেশে যে চার জন আছেন তাহারা এখনই ঐরূপ প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের মত না জানিয়া আগে হইতে সম্মতি দিতে পারেন না। ঐ দিনই স্বামীজি সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় আফিস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রভৃতিকে ২ মাস পর্য্যন্ত বরখাস্ত করিয়া বিবৃতি দেন।

স্বামী সহজানন্দ কোন্ পথে?

কৃষক সভা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্বামীজিও তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু স্বামীজি আজ সেই কৃষক সভাকে ধ্বংস করার পথে চলিয়াছেন। তাঁহার ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের আকস্মিক বিবৃতি সারা দেশে সাংঘাতিক কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছে এবং কেহ কেহ ভাবিতেছে কৃষকসভা ভাঙিয়া গেল। বিভেদকারীরা এই আগুনে ঘৃত ঢালিয়া দিতেছে। বাংলাদেশে নিখিল ভারত কৃষক সভার বৈঠক হইবে। সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব কৃষক সভার গঠনতন্ত্র অনুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার উপর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভাকে এই সময় বরখাস্ত করার অর্থ সম্মেলন পণ্ড করা। স্বামীজির মনোভাব আলোচনা করিবার জন্য সাধারণ সম্পাদক যখন কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান করিলেন, স্বামীজি তখন প্রেসিডেন্ট পদ পরিত্যাগ করিয়া কাগজে এক বিবৃতি বাহির করিলেন! ইহার অর্থ কৃষক সভাকে একেবারে অচল করা। আবার কয়েকদিন পরেই অন্যদিক ভাবিয়া স্বামীজি ৪।৩।৪৫ তারিখে লি লে সভাপতিপদ পরিত্যাগ করিয়া নি "নিজেই নিজের পদত্যাগ প গ্রহণ করেন নাই!" র বিরে' বিবৃতি তিনি বলিতেছেন—আমি পদ ই্ করি-ই না পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি 'মাত্র ৮।৩।৪৫ তারিখে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলে বৈঠক হইয়াছে। এখন তিনি বলিতেছেন, ঐ বৈঠ যাহারা যোগদান করিয়াছে তাহাদের বরখাস্ত ক হইল। বিহার ব্যতীত আর সমস্ত প্রাদে সভাকেও তিনি বরখাস্ত করিয়াছে

সকলকে বরখাস্ত করিয়া

কিষাণ সভা হইয়া থাকিব—

এই কি স্বামীজির পথ! এ পথ কৃষকের পথ নয় কৃষক সভার পথ নয়। কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ও সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি ঘোষণা করিয়াছে—কৃষক সভার নীতির ভিত্তিতে সমস্ত কৃষকের একতা, সকল দলের সকল মতের কৃষক সেবীদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া কৃষক সংগঠন—ইহাই কৃষক সভার পথ। কৃষকের ও কৃষক সভার ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল স্বামীজিকে নেত্রকোনায় আসিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। তাহার সহিত ভারতের কোটী কোটি কৃষকের আবেদন মিশানো রহিয়াছে। নেত্রকোনায় সমাগত এক লক্ষ কৃষক স্বামীজিকে তাহাদের মধ্যে পাইবার আশা করিতেছে, আশাকরি স্বামীজি তাহাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন না। কৃষকসভার শক্তি বাড়াইয়াই চলিবে; স্বামীজি কৃষক সভার ঐক্য অব্যাহত রাখিয়া সেই অগ্রগতিতে সাহায্য করুন স্বামীজির নিকট কৃষকেরা এই আবেদনই জানাইয়াছে।

—কৃষ্ণবিনোদ রায়

সওয়া আট লক্ষ সভ্য

নিঃ ভাঃ কৃষক সভার বিরাট শক্তি

১ বছরে শতকরা ৫০ ভাগ শক্তি বৃদ্ধি

১৯৩৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লক্ষৌ শহরে নিখিল ভারত কৃষক সভা সর্ব্বপ্রথম গঠিত হয়। মাত্র এই নয় বৎসরে কৃষক সভা আজ ভারতের সব চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সাল হইতে আমাদের দেশ দারুণ সংকটের মধ্যে চলিতেছে, তবুও এই সংকটের মধ্যে কৃষক সভা কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

নিখিল ভারত কৃষক সভা

বৎসর	সদস্য সংখ্যা
১৯৪৩ জানুয়ারী	২,৮৫,৫০০
১৯৪৪ "	৫,৫৫,৪২৭
১৯৪৫ "	৮,২৯,৬০২

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

বৎসর	সদস্য সংখ্যা
১৯৪৩ জানুয়ারী	৮৩,০০০
১৯৪৪ "	১,৭৭,৬২৯
১৯৪৫ "	২,৫৫,১০৪

অন্যান্য প্রদেশ

প্রদেশের নাম	১৯৪৪ জানুয়ারী সদস্যসংখ্যা	১৯৪৫ জানুয়ারী সদস্যসংখ্যা
১। অন্ধ্র	১,০১,৫০২	১,৬৮,৩৮৪
২। আসাম	১,৫৩৬	৭,৯৮৮
৩। বিহার	৬৯,৩০৯১	৮০,০০০
৪। মধ্যপ্রদেশ (মারাঠী)	১,২০০	৩,৬১০
৫। গুজরাট	৪,৩৭৬	৫,২২৪
৬। গোয়ালিয়র রাজ্য	২,৩৬৭	৩,০০৮
৭। কেরল প্রদেশ	২৩,০০৪	২৬,১৬৮
৮। মহারাষ্ট্র	১৫,০১২	২৬,০০৫
৯। সীমান্ত প্রদেশ	—	২,০০০
১০। পাঞ্জাব	১,০০,৬০৮	১,৩৬,৮০০
১১। সিন্ধু	৪,০৩২	৪,০০০
১২। সুরমা উপত্যকা	৮,১৮৪	১৬,১২৮
১৩। তামিলনাদ	১০,২৭২	৪১,২০২
১৪। যুক্ত প্রদেশ	২৭,৯৪৮	৩৪,৩৬৮
১৫। উৎকল	৪,৪১৬	৯,৬১২
১৬। বিদর্ভ	৪,০৩২	১০,০০২
১৭। বঙ্গদেশ	১,৭৭,৬২৯	২,৫৫,১০৪

নেত্রকোনা অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে

★ যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন ★

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী (হাসপাতালের জন্য) ৫০০০৲, সোশ্যালিষ্ট লিটারেচর পাবলিশিং কোং (আগ্রা) ১৫৲, আর এল মাহেশ্বরী ২৲, ক্ষেত্রমোহন ভার্গব ৫৲, আশুতোষ পাল ২৲, বি ভট্টাচার্য ২৲, তারাশঙ্কর ব্যানার্জী ৫৲, এ এন সান্যাল ৫৲, নীরেন দে ৫৲, মিসেস এলা মিত্র ১০৲, সাধনা নিয়োগী ৫৲, কল্যাণী সেন ১০৲, এন কে দত্ত ৫৲, হীরেন্দ্রকিশোর দত্ত চৌধুরী ২৫৲, ইন্দু দেব ২৲, রাতুল চ্যাটার্জী ১০০৲, ভাস্কর মিত্র ৭৫৲, বি এল মল্লিক ২০৲, এম গুই ১০০৲, জনৈক বন্ধু ৭৫৲, গণেশ ব্যানার্জী ৫৲ ভৈরব চক্রবর্তী ২৲, প্রকাশ মিত্র ৩৲, নসিরুল্লা ২৲, পার্ব্বতী ঘোষ ১০৲, সুবোধ সরকার দুলালচন্দ্র পুরকায়স্থ ২৲, মনোরঞ্জন দাস পরেশচন্দ্র চন্দ ২৲, কে, পি চক্রবর্ত্তী ২৲, এস, সি ১৲, মহেশচন্দ্র ঠাকুর ১৲, জানকী সরদার ১৲, এ এল, চন্দ ২৲, বিধুভূষণ কুণ্ড ২৲, পৃথ্বীশকুমার রা মনোরঞ্জন রায় ২৲, আতিয়ার রহমান ২৲, সু চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ২৲, নিখিলচন্দ্র নারায়ণ চৌ ২৲, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, প্রিয়লাল চন্দ ২৲, এ ১৷০, সুনীলা দেবী ১৲। [তালিকা অস

বৃটীশ ও ফরাসী ভারতের মুক্তি আন্দোলন অবিচ্ছেদ্য

পণ্ডিচেরীতে ফরাসী-ভারত শ্রমিক সম্মেলন

ফরাসী জনসাধারণ ফ্রান্সকে স্বাধীন করিয়াছে; নূতন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই নীতিকে ফরাসী ভারতে প্রয়োগ করা হয় নাই। ফরাসী ভারতে গভর্ণরের ডিক্টেটারী ক্ষমতা ও ফরাসী রিপাব্লিকের আগেকার ১৮৪০ সনের অর্ডিন্যান্স পুরাতন সাম্রাজ্য-বাদী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাই কায়েম রাখিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা ও সমিতি-গঠনের প্রাথমিক নাগরিক অধিকার লুপ্ত। মিউনিসিপালিটী হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করিয়া মনোনীত কর্মচারীদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের শুধু পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আছে—কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই। তা' ছাড়া নির্ব্বাচন প্রথাও প্রহসন মাত্র।

এই ডিক্টেটারী শাসন ব্যবস্থা তাই জননেতাদের উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের প্রাণধারণের ব্যবস্থা ...ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসী ভারতের ফ্যাসিষ্টবিরোধী জননেতা শ্রীযুত সুব্বায়া আজও ফরাসী ভারত হইতে বহিষ্কৃত। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের কোন ক্ষমতা নাই।

শ্রমিকদের অবস্থা

পণ্ডিচেরীর এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থা সব চাইতে কাহিল। প্রয়োজনীয় ...িসপত্রের দর তিনগুণ বাড়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের ...ম মজুরী, মাগ্‌গীভাতা ও বোনাস কিছুই ...তেছে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা অকর্ম্মণ্য ...পড়িলে তার সাহায্যের কোন ব্যবস্থাই নাই। ...গরের ৪০০০ চটকল মজুর মালিকের ...চারের সামনে আজ সম্পূর্ণ অসহায়। বিলাতী ...প্রভুদের বিরোধিতায় ১৯৩৭ সনের মজুর ...আইন এখনও বলবৎ হইতে দেওয়া হয় ...ফরাসী প্রজা না হওয়ায় তাহাদের ট্রেড ... সংগঠিত হইবার অধিকারও নাই। ...হলা তাহারা ফরাসী এলাকায় চটকলে ...রে ও বহু বছর ধরিয়া বাস করে। এই ...র দাবী দাওয়ার সুরাহা করার জন্য যতবারই ...র চেষ্টা হইয়াছে ততবারই বিলাতী মিল- ...নীয় ফরাসী কর্ম্মচারীদের তরফ হইতে ...ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

...র খাওয়া পরার ব্যবস্থার জন্য একমাত্র ...রই ভরসা। বাসস্থানের ব্যবস্থা অত্যন্ত

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীই আন্দোলন সুরু করিল

এই দুরবস্থার মধ্যে ফরাসী ভারতের জনসাধারণের ...শা ভাঙ্গিল পণ্ডিচেরীর বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী। ...দের দাবী দাওয়ার পূরণ ও ফরাসী ভারতের ...তিক অধিকার অর্জ্জনের জন্য তাহারা ১৯৩৬ হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। ৮ হাজার ...কল শ্রমিক আজ এক ইউনিয়নের মধ্যে ...বদ্ধ। তাহারা শ্রমিক ভাইদের সচেতন করিবার জন্য ১১টা পাঠাগার খুলিয়াছে, বড় বড় ...মিক সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়াছে। শ্রমিক ও অশ্রমিক সকলের ভিতর চেতনা আনিয়া ফুড কমিটী গঠন করিয়াছে এবং খাদ্যাদি বিতরণে দুর্নীতি অনেকাংশে দুর করিতে পারিয়াছে। তাহাদের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ১০ হাজার তাঁতশিল্প মজুররাও সংগঠিত হইতেছে।

মাত্র ৭ দিনের মধ্যে রোডিয়ার ময়দানে ১৫ হাজার লোক সংকুলানের মত বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ফরাসী ভারতের নেতাদের সহিত বৃটীশ ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কমরেড ডাঙ্গে, এন, এম্ যোশী প্রমুখ নেতৃবর্গের তৈলচিত্রে, ফ্রান্সের শ্রমিকনেতা মরিস থোরে ও ফ্রান্সের মুক্তি-সংগ্রামের গেব্রিয়েল পেরি, পিয়ের সেমার প্রমুখ শহীদদের বিরাট প্রতিকৃতিতে মণ্ডপ তোরণ সজ্জিত করা হইয়াছিল। ফরাসী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য সম্মেলনে শ্রমিক ব্যতীত কৃষক, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, উকীল, ডাক্তার, ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা, সাংবাদিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন।

"বিদেশী" হিসাবে মাদ্রাজের বরেণ্য নেতা কল্যাণসুন্দরম ও রামমূর্ত্তির বক্তৃতা দেওয়ার সরকারী বাধা শ্রমিকরা ধূলিসাৎ করে। তাঁহারা বলেন, "বৃটিশ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন হইতে ফরাসী ভারতের শ্রমিক আন্দোলন পৃথক নয়। বৃটীশ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত ফরাসী ভারতের মুক্তি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।" সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যদ্বয় ফরাসী কনসালটেটিভ এসেমব্লীর ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুত জীবারত্নম ও শ্রীযুত কালী ঘোষের অভিভাষণে ফরাসী ভারতের শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণের নিদারুণ অবস্থার প্রতিচ্ছবি ও তার প্রতিকারে ফরাসীভারতে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও সংযুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের আহ্বান ফুটিয়া উঠে।

অতঃপর বিভিন্ন শ্রমিকদের মজুরী, মাগগীভাতা বোনাস, গ্র্যাচুটি, সোস্তাল ইনসিওরেন্স প্রভৃতি নানা দাবীর উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও গ্রহণ করা হইয়াছে:

(ক) ১৮৪০ সালের গণতন্ত্রবিরোধী রাজকীয় আইন "লোয়া অর্গ্যানিকের" বিলোপ ও সভা সমিতি ও শোভাযাত্রার অবাধ অধিকার;

(খ) জননেতা শ্রীযুত সুব্বায়ার উপর হইতে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার;

(গ) খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য জনপ্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটী গঠন ও সর্ব্বত্র রেশনিং প্রবর্ত্তন;

(ঘ) দুই লিষ্ট নির্ব্বাচন প্রথার বিলোপ এবং নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত নূতন পরিষদ গঠন। আইন পরিষদের উপর আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা দান এবং আইন সভা হইতে দায়িত্বশীল মন্ত্রী পরিষদ গঠন। গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতার বিলোপ।

ইহা ছাড়া একটী প্রস্তাবে বৃটীশ ভারতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের দাবীকে সমর্থন জানানো হইয়াছে।

ফরাসী ভারতের ইতিহাসে এই ধরণের সম্মেলন এই প্রথম। শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী ভারতের এই শ্রমিক সম্মেলন একটী জাতীয় সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়।

ঘড়িবিক্রেতার মামলা সম্পর্কে স্যর আজিজুলের তার

গত সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' পুলিশ কর্ত্তৃক কলিকাতায় একটী ঘড়ীর দোকানদারকে ৩০২টী ঘড়ি সহ গ্রেপ্তার ও পরে ছাড়িয়া দেওয়ার খবর দিয়া আমরা জানাইয়াছিলাম যে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভারত সরকারের বাণিজ্য সদস্য স্যর আজিজুল হকের হস্তক্ষেপেই নাকি ঘড়ি বিক্রেতা ছাড়া পাইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা আমরা স্যর আজিজুলের কাছে জানিতে চাহিয়াছিলাম।

গত ৩০শে মার্চ্চ স্যর আজিজুল হক আমাদের কাছে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন:—

"গত ২২শে মার্চ্চ তারিখের 'জনযুদ্ধে' ৩০২টী মজুত সোনার ঘড়ী উদ্ধার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে বিনা কারণে আমার নাম যুক্ত করা হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ঘড়ীর মজুতদারের মুক্তির জন্য আমার হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। আমাদের পাক্ষিক রিপোর্টে এই মজুত উদ্ধার সম্বন্ধে উল্লেখ ছাড়া এই ঘটনা সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানিনা। কেন্দ্রীয় পরিষদে অন্যান্য মজুত উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাটিও আমি প্রকাশ্যে উল্লেখ করিয়াছি এবং মজুতদারী ও চোরাকারবারের বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রকাশ্য প্রচারকার্য্য দ্বারা সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যেরও প্রশংসা করিয়াছি। আপনাদের প্রবন্ধ পড়িয়া আমি এই ঘটনা সম্বন্ধে পুরা রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছি।

নয়াদিল্লি
৩০-৩-৪৫

স্বাঃ আজিজুল হক
বাণিজ্য সচিব।"

[আমরা স্যর আজিজুলের উপর দোষারোপ করি নাই, তবে সংবাদদাতার সংবাদ সাধারণ গুজব দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় স্যর আজিজুলের কাছেই জানিতে চাহিয়াছিলাম ব্যাপারটী সত্য কিনা। এখন তাঁহার উপরোক্ত বক্তব্য পত্রস্থ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান দিনে প্রত্যেকটী সন্দেহের পরিষ্কার জবাব দেওয়া সকল রাজকর্ম্মচারীরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তবেই জনসাধারণ সাহস করিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। স্যর আজিজুল এ বিষয়ে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। তাঁহার তদন্তের ফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমরা আশা করিতে পারি যে স্যর আজিজুলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্থানীয় এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চও ঐ ব্যাপার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিবেন। এবং এইরূপ ধৃত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয় না কেন তাহাও জানাইবেন কি?

— জঃ সঃ]

মেদিনীপুরে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড

—২২টি গ্রাম দগ্ধ—গৃহহীনদের সাহায্য করুন

[মেদিনীপুর হইতে শ্রীসরোজ রায় নিম্নলিখিত চিঠিতে এক ভয়াবহ ও বিস্ময়কর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দিয়াছেন। প্রায় ২২টি গ্রামে একসঙ্গে আগুন লাগিল, অথচ ইহার কারণ কেহই জানে না—কেহ বলিতেছে আকাশ হইতে আগুন পড়িয়াছে, কেহ বলিতেছে ভগবানের বজ্রপাত হইয়াছে। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, এতদিনের মধ্যেও এই অগ্নিকাণ্ডের কোনও খবর সরকার জানায় নাই, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিও জানায় নাই। আমরা সরকারের কাছে দাবী করিতেছি যে অবিলম্বে এই ঘটনার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হোক। ঘটনাটি সত্য হইলে ক্ষতির পরিমাণও অত্যধিক। সেজন্য সরকারকে ও সহৃদয় দেশবাসীকে এই অগ্নিদগ্ধ পরিবারগুলির সাহায্যের আয়োজন করিতে হইবে।—জঃ সঃ]

মেদিনীপুর হইতে শ্রী সরোজ রায় লিখিয়াছেন:

'গত ২০শে মার্চ্চ সকাল ১০টার সময়ে মেদিনীপুর শহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে রহস্যজনক ভাবে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এই সংবাদ পাইয়া বারোটার সময়ে আমরা কয়েকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে ও শুনিতে পাই যে ২০।২২টী গ্রামে দু'চারটী ছাড়া সব কয়টী বাড়ীঘরই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গ্রামবাসীরা কোথাও কোথাও কয়েকজন এ-আর-পি কর্ম্মীর সাহায্যে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জলের অভাবে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সারাদিন সারারাত আগুন জ্বলিতে থাকে। ফলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সকলেই যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া নিঃস্বে পরিণত হইয়াছে, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পর্য্যন্ত কাহারও নাই।

সরকারের তরফ হইতে এই দুর্ভাগ্য গ্রামবাসীদের সাহায্য করিবার জন্য নামমাত্র প্রচেষ্টা ছাড়া বিশেষ কিছুই হয় নাই। ঘটনার দিন বৈকালে সিভিক গার্ড মারফৎ কিছু দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল, পরের দিন বৈকালে খিচুড়ী বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু বাড়ীতে নিয়া যাইতে আপত্তি করায় অধিকাংশই খাইতে আসে নাই।

এই সংবাদ মেদিনীপুর শহরে পৌছিলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরের দিনই শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সম্মিলিত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। ছাত্ররা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামবাসীদের সাহায্য করিতে যায়। এ পর্য্যন্ত নগদ ৯০৲ টাকা, ৫১ মণ চাউল, ২৫ মণ ডাল এবং ১০ মণ তরকারী রিলিফ কমিটির হাতে আসিয়াছে।

বাংলাদেশের রিলিফ কমিটিগুলির প্রতি আমাদের আবেদন: অবিলম্বে খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ দিয়া বিপন্ন গ্রামবাসীদের সাহায্য করুন।"

কেশোরাম মিলের অভ্যন্তরে মজুর-কর্ম্মী গ্রেপ্তার

মিঃ বিড়লার বাসভবনে ১০০০ মজুর

কেশোরাম কটন মিলের অন্যতম মালিক মিঃ বিড়লা খুবই সুপরিচিত, 'স্বদেশী' বলিয়াও তাঁহার কিছুটা খ্যাতি আছে। অথচ এই কেশোরাম মিলের মজুরদের উপর যে নানা রকম জুলুম চলে তার রিপোর্ট আমরা অনেকবারই পাইয়াছি। গত ১৭ই মার্চ্চ মজুরকর্ম্মী কমরেড নিত্য ব্যানার্জি ও মদন দাসকে মিলের ভিতরেই ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যানেজার প্রথমে তাঁহাদের তাঁহার অফিসে ডাকেন, পরে অফিস হইতে পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। মজুর আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে কেশোরাম কটন মিলের কর্ত্তৃপক্ষ একটুও কুণ্ঠিত হয় নাই।

এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রায় ১০০০ মজুর তাহাদের বক্তব্য স্বয়ং বিড়লাজীকে জানাইতে ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতায় মিঃ বিড়লার বাস ভবনে আসে। এখানেও সেই একই কাহিনী, পুলিশ আসিয়া মজুরদের তাড়াইয়া দেয়। শোনা যায়, মালিকের ইচ্ছায়ই পুলিশ আসিয়াছিল। তবুও অতিকষ্টে ১০জন মজুর মিঃ বিড়লার সহিত দেখা করেন। তিনি সরাসরি মজুরদের জানাইয়া দেন যে মাগ্‌গী ভাতা সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই চলিবে না। এছাড়া মজুরদের দাবী দাওয়া লইয়া যে ২ জন কর্ম্মী দিনরাত খাটিতেছেন মিলের ভিতরই তাঁহাদের গ্রেপ্তারের কথা মালিককে জানাইতে তিনি ইহা পুলিশের কাজ বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দেন।

এই গ্রেপ্তারের ফলে কেশোরামের মজুরদের ভিতর খুবই বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

নিরপেক্ষ তদন্তের মুখোসে অখণ্ড হি...

সপ্রু কমিটির ভিতরকার রহস্য

[নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সপ্রু কমিটির তথাকথিত 'নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ' সভ্যদের লইয়া পাকাপাকি ভাবে সুপারিশ তৈরীর যে সভা হয়, তাহাতে পর্দার আড়ালে যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সপ্রু কমিটি এতদিন 'সর্বসম্মত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে ইচ্ছুক কয়েকজন নিরপেক্ষ লোক লইয়া গঠিত তদন্ত কমিটি' বলিয়া নিজেদের জাহির করিয়া আসিয়াছে; বিশ্বস্তসূত্রে আমি ভিতরকার যে খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে ইহা একটি বড় রকমের ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শেষ সুপারিশগুলি খসড়া প্রস্তাবে যোগ করার জন্য কমিটির যখন সভা বসে, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটে। আলোচনার সময় কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শান্তনম্ হঠাৎ অসাবধান মুহূর্তে প্রকাশ করিয়া দেন যে, খসড়া প্রস্তাবটি জনৈক নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্মীর রচনা। ইহাতে কমিটির সভ্যদের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায়। প্রত্যেকেই রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। ডাঃ জয়াকর ত' রাগিয়া আগুন; তিনি বলিলেন, ঐ বিশেষ ভদ্রলোকটি যখন কমিটির সভ্য নন, তখন কেন তাঁহাকে ঐ খসড়া তৈরী করিতে দেওয়া হইয়াছে? শেষ পর্যন্ত ঐ খসড়াটি বাতিল করিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণকে একটি নূতন খসড়া প্রস্তুত করার জন্য বলা হয়।

প্রথমোক্ত খসড়াটি আমার কাছে আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সপ্রু কমিটির শেষের প্রস্তাবটির সহিত প্রথম খসড়াটির তুলনা করিলে দেখা যায় কতকগুলি প্রধান সিদ্ধান্তে দুটি প্রস্তাবেরই হুবহু মিল আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সার্বভৌম স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারের জন্য পাকিস্তানের যে দাবী, সে দাবী দুটি প্রস্তাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে। দুটি খসড়াতেই ফেডারেশন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, কেন্দ্রের বাকি ক্ষমতা প্রাদেশিক ইউনিটগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; আবার দুটি প্রস্তাবেই কেন্দ্র হইতে ইউনিটগুলির বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী অস্বীকার করা হইয়াছে।

প্রথমোক্ত যে প্রস্তাবটিতে হিন্দু মহাসভাপন্থী ডাঃ জয়াকর এত ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কতকগুলি ভালোর দিকও ছিল। কিন্তু শেষের প্রস্তাবটিতে সেগুলি নির্মম ভাবে ছাঁটিয়া দিয়া তাহার জায়গায় আগাগোড়া হিন্দু সভার বক্তব্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম খসড়াটিতে গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী কমিটি অথবা কেন্দ্রীয় পরিষদ কোনটার জন্যই মুসলমানদের ঘাড়ে যুক্তনির্বাচন জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শেষের খসড়াটিতে মুসলমানদের ঘাড়ে জোর করিয়া যুক্তনির্বাচন প্রথা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম খসড়াটিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, আইনসভা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী কমিটির নির্বাচনে হিন্দু (অনুন্নত শ্রেণী বাদে) ও মুসলমানদের সমান সংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শেষের নূতন খসড়াটিতে বলা হইয়াছে, যুক্ত নির্বাচন না মানিয়া নিলে মুসলমানরা এই সুবিধা পাইতে পারিবে না। প্রথম প্রস্তাবটিতে যে ভাবে অকপট মন লইয়া সমান নীতি অনুসারে আসন ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয়টিতে যে তাহা করা হয় নাই, নীচের তালিকা হইতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে:

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে আসন ভাগ

	প্রথম খসড়ায়	দ্বিতীয় খসড়ায়
হিন্দু	৬০	৫১
মুসলমান	৬০	৫১
অনুন্নত	২০	২০
অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি	২০	৩৮
মোট	১৬০	১৬০

দেশীয় রাজ্য অথবা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনীত একজনকে রাষ্ট্রপতি করার যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাব দ্বিতীয় খসড়াটিতে আছে, প্রথম খসড়াটিতে তাহা ছিল না।

প্রথম খসড়ায় প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, দেশীয় রাজ্য পরিষদের ও ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা সমান সমান হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় খসড়াটিতে সে সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই।

কাজেই দেখা যায়, প্রথম খসড়াটিতে যদিও মুসলিম অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই, তাহা হইলেও প্রাদেশিক ইউনিটগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকারের দিক হইতে প্রথম খসড়াটি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাছাড়া কেন্দ্রে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্যের কায়েমী ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যাহাতে বানচাল না হয়, তাহার জন্যও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বীকার করার এই যৎসামান্য চেষ্টাও শেষের খসড়া হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'তত্ত্ব-অনুসন্ধানকারী'দের ভয়

আসলে, সপ্রু কমিটির সভ্যেরা তদন্তের আগেই তৈরী সিদ্ধান্ত লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন। অথবা বলা যায়, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু তাঁহার কমিটিতে অধিকাংশই এমন লোক বাছাই করিয়াছিলেন যাঁহারা আগে হইতেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও লীগ দাবীর বিরোধী ছিলেন। 'অখণ্ড হিন্দুস্থান'ওয়ালারাই এই কমিটিকে আসলে চালনা করেন। ফলে, কমিটির যে দু'একজন সাচ্চা লোক 'তত্ত্ব-অনুসন্ধানের ও সর্বসম্মত সমাধান' খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই তৎক্ষণাৎ দাবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক দিক' সম্বন্ধে মিঃ মোদী ও ডাঃ মাথাইয়ের যুক্ত স্মারকলিপি সম্পর্কে ৪ঠা এপ্রিল 'ডন' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয়। ইহার ফলে কমিটির মধ্যে দারুণ সোরগোল পড়িয়া যায়। ডাঃ মাথাইয়ের কাছ হইতে এ সম্বন্ধে জবাব চাওয়া হয়। ডাঃ মাথাই বলেন, 'আমি ও মিঃ মোদী যে সমস্ত তথ্য যোগাড় করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসিয়াছি যে, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে পাকিস্তান ও বাকি ভারতের সহিত যদি বরাবর সক্রিয় সহযোগিতা রাখা যায়, তাহা হইলে পাকিস্তান নির্বিঘ্নে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।' মনে হয়, সপ্রু নিজে এই স্মারকলিপি পছন্দ করেন নাই; তাই মিঃ মাথাইকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কমিটির তৃতীয় সদস্য মিঃ নলিনী সরকার তাঁহাদের সহিত একমত কি না। ইহার উত্তরে ডাঃ মাথাই বলেন, মিঃ সরকারের কথা তিনি বলিতে পারেন না, কারণ এখন পর্য্যন্ত তাঁহার মতামত তাঁহাদের হাতে আসিয়া পৌছায় নাই।

কমিটির সভ্যেরা নলিনী সরকারের মতামত ভাল করিয়াই জানিতেন। তাঁহারা নলিনী সরকারের পাকিস্তান বিরোধিতাকে মোদী-মাথাই স্মারকলিপির বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখী হইতে এই 'সত্যানুসন্ধানী'রা রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন!

আলোচনার সময় স্যার জগদীশপ্রসাদ ডাঃ মাথাইকে কটাক্ষ করিয়া বলেন: আপনারা বোম্বাই পরিকল্পনাকারীরা শিল্পব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। আপনারা সব কমিউনিস্ট।

ইহার জবাবে ডাঃ মাথাই বলেন: জনসাধারণ চায় সামাজিক উন্নতি। কায়েমীস্বার্থদের যদি নিয়ন্ত্রণ না ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা'হলে মুস্কিল বাড়বে।

'সালিশী কমিটি নয়'

স্যার জগদীশ বলেন: রেলওয়ের কথাই ধরুন না, রেলওয়ে ত' রাষ্ট্রের অধীন। কিন্তু তাতে কি আর এমন উপকার হচ্ছে।

—এই হচ্ছে সপ্রু কমিটির বড় বড় চাঁইদের মগজের দৌড়!

কয়েকজন মুসলমানের প্রেরিত স্মারকলিপি পাঠ করিয়া সপ্রু যখন পাকিস্তান সম্বন্ধে শেষবারের আলোচনা আরম্ভ করেন তখন স্যার জগদীশ প্রসাদ বলেন: পাকিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে লাভ কি? তার চেয়ে আসুন যে সমস্ত বাস্তব প্রস্তাব আছে, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেমন, ধরুন ভুলাভাই-লিয়াকৎ প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত এন. এম. জোশী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন: ও প্রস্তাব যুদ্ধের মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্যে; লীগ তার পাকিস্তানের দাবী কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আমাদের উচিত এমন ভাবে প্রস্তাব তৈরী করা যাতে তাদের দাবী কিছুটা আমরা মেটাতে পারি। যে সব সমাধান আজকের দিনে একেবারে অচল, সে সমস্ত মান্ধাতা আমলের প্রস্তাব তুলে লাভ কি? লীগ সে ধরণের প্রস্তাব আমলই দেবে না।

ইতিপূর্ব্বে ফেব্রুয়ারী মাসে যে সভা হয়, সে সভায় স্যার হোমি মোদী এই কথাই বলিয়াছিলেন। তখন সে কথায় কেহই কান দেয় নাই। আর এবারকার সভায় এন, এম, জোশীর কথায় ডাঃ জয়াকর একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন: তা হ'তেই পারে না। এদেশে মুসলমানরা হ'চ্ছে সিকি ভাগ, অথচ তারা চাইছে অর্দ্ধেক আসন। আমরা যতই দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দাবীও বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের এখন শক্ত হওয়া দরকার। এভাবে প্রশ্রয় দেবারও একটা সীমা আছে।

ইহার উত্তরে এন, এম, জোশী বলেন: লীগ গ্রহণ ক'রবে না একথা আগে জেনেও আমরা যদি শুধু শুধু প্রস্তাবই ক'রে যাই, তা'হলে সালিশী কমিটি বলে নিজেদের জাহির করার কী অর্থ থাকতে পারে?

ডাঃ জয়াকর এবার প্রায় ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন: কে ব'লেছে আমরা সালিশী কমিটি? আমরা এখানে দু'দলের মধ্যে মিল ক'রতে আসিনি। আমরা চাই সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাব উপস্থিত করতে।

জয়াকরকে সমর্থন করিলেন কমিটির হিন্দুসভাপন্থী অন্য একজন সভ্য বক্সী টেকচাঁদ।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর একমাত্র এন, এম জোশী ছাড়া কমিটির আর সকলেই রাধাকৃষ্ণণের পাকিস্তান বর্জ্জিত খসড়া প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। দেশীয় রাজ্য পরিষদের সদস্য স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ভারত ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কমিটির সর্বসম্মত অভিমত লিখিয়া নিতে বলিলেন।

তখন এন, এম, জোশী আপত্তি জানাইয়া বলেন: এর সঙ্গে আমি একমত নই। আমি অবশ্য ভারতের ঐক্যের পক্ষপাতী, কিন্তু লীগ যাতে গ্রহণ করতে পারে, এমন প্রস্তাবই আমাদের তৈরী করা উচিত।

সর্দার সন্ত সিং ইহার উত্তরে চীৎকার করিয়া বলেন: এই এন, এম, জোশী লোকটি মজুরদের প্রতিনিধি। সব সময় গোলমাল বাধানোই ওঁর মতলব। গঠনতন্ত্র রচনায় উনি কেন নাক গলাতে আসেন?

কমিটির অধিকাংশ সভ্যই কেন্দ্রকে দুর্ব্বল করা ও প্রদেশগুলিতে কেন্দ্রের বাকি ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ডাঃ জয়াকর, আয়েঙ্গার ও টেকচাঁদ ইহারও পর্য্যন্ত বিরোধিতা করেন।

এন, ..
স্যার গো
প্রস্তাবে এন, এ
দিতে চাহিয়াছিলে
যুক্ত নির্বাচনের সিদ্ধা
শ্রেণীর সভ্য আপত্তি তোলে
ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবা
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদক
লিখিয়া রাখা উচিত হইবে না এবং উদারতার
তিনি নিজেও তাঁহার কোন আপত্তি লেখেন নাই।

ইহার জবাবে এন, এম, জোশী বলেন: তা হ'তেই পারে না। কমিটির মতের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার মতের সঙ্গে যে অমিল আছে,তা লিখতেই হবে।

কমিটির কয়েকজন সভ্য তখন নিতান্ত ভাল মানুষ সাজিয়া এন, এম, জোশীকে বলেন যে, একমত হওয়ার জন্য সবাই তাঁহারা নিজেদের ভি... মত বিসর্জন দিয়াছেন। সুতরাং তিনিও তাহাই করুন।

সিন্ধুপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টর নবী বক্স— অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া সপ্রু এই একমাত্র মুসলমান সভ্যটিকে কমিটিতে আনিয়াছেন। তিনি ভাঁড়ের মত উঠিয়া এন, এম, জোশীকে বলিলেন: ধরুন, আমি যদি ব'লি লীগ আমাদের এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হবে, তা'হলেও কি আপনি পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করতে থাকবেন?

এন, এম, জোশী ইহার জবাব দিয়া বলিলেন: এ আমার নিজস্ব মত। যা আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত, তাকেই আমি সমর্থন ক'রব। কোন বিশেষ দল সে মত গ্রহণ ক'রল বা ক'রল না, তা দেখা আমার দরকার নেই।

সর্দার সন্ত সিং আবার ফোঁস করিয়া উঠি
মজুর দলের লোকগুলোকে নিয়ে যত ঝ
লোকটাকে পরিষদের মধ্যেও এক
গোলমাল ক'রতে বরাবর লক্ষ্য ক'রে

কমিটির অন্যান্য অনেক সভ্যই এই এন, এম, জোশীকে বিদ্রূপ করিয়া নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছিলেন।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু উঠিয়া বলিলে
জোশী, মুসলমানদের আমি ভাল করেই
আমার অনেক মুসলমান বন্ধু আছে। আপনি
বলুন না কেন, লীগই মুসলমানদের এ
প্রতিষ্ঠান নয়। মোমিন, মজলিশ ইত্যাদি
আমি আলাপ করেছি। তারা সব
বিরোধী। তাদের স্মারকলিপি দে
পাকিস্তানকে অপছন্দ ত' করেই, এ
নির্বাচনেরও তারা পক্ষে। লাহোরেও আ
মুসলমানকেই দেখেছি পাকিস্তানের বিরো

কমিটির যিনি নেতা, তাঁহার এই
সত্যই অবাক লাগে। কমিটির কা
সংগঠন স্মারকলিপি পাঠাইয়াছে,
একটি মাত্র মুসলমান সংগঠন। এই
মুসলিম মজলিশ। তাহারা পাকিস্ত
করিয়াছে বটে, কিন্তু আপোষ-
হিসাবে মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলে
অধিকার দাবী করিয়াছে। যে
কাছ হইতে প্রশ্নপত্রের উত্তর আসিয়াছে, তাঁহাদে
মধ্যে ৭ জন মাত্র মুসলমান। এই সাত জনের মধ্যেও মাত্র তিনজনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা নাম আছে, বাকি সকলে একেবারে অখ্যাত। এই তিনজনের মধ্যে দুইজন অর্থাৎ ডাঃ সৈয়দ আব্দুল লতিফ ও স্যার আব্দুল গজনভী তাঁহাদের প্রস্তাবে মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলে সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসন স্বীকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠনতন্ত্র দাবী করিয়াছেন।

লীগের ভিতরে ও এমন কি লীগের বাহিরেও যে সমস্ত মুসলমান আছে, তাহাদের কাছ হইতে সপ্রু কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে কোন সমর্থনই যে পাওয়া যাইবে না—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও কমিটির 'অখণ্ড হিন্দুস্থান'ওয়ালা চাঁইদের এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি ছিল। তাঁহারা জানিতেন, গান্ধী-রাজাজী ফর্মুলায় যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা আরও পিছনে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, তাঁহারা তাঁহাদের অবাস্তব পরিকল্পনাকে 'নিরপেক্ষ' কমিটির সর্বসম্মত রায় হিসাবে চালাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে এবং ইহাতে সাম্রাজ্যবাদীদেরই উল্লাস বাড়িবে।

বুকে লালফৌজ

...র ঐতিহাসিক আক্রমণ বর্ণনা করিয়া মস্কোর সংবাদদাতা লিখিতেছেন, : ...এ আদেশ উচ্চারিত হওয়া মাত্র সহস্র সহস্র রুশ কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ...ও লাগিল রেলষ্টেশনে, কারখানায় আর উইলহেল্ম প্লাজার বড় বড় সরকারী দপ্তর খানার দিকে। গোলার আঘাতে বাড়ীগুলি সব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ...র নীচে শত শত জার্ম্মাণের মৃতদেহ চাপা পড়িয়া আছে। সহর হইতে পলায়নের ...এ রাস্তাও অজস্র পলায়নপর জার্ম্মাণের ভীড়ে রুদ্ধ। রাস্তার অসংখ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ ...রিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া লালফৌজ ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে জার্ম্মাণ রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অগ্রসর ...তেছে। বার্লিনের সবগুলি বড় বড় রাস্তাই বিজয়ী লালফৌজের পদভরে প্রকম্পিত।

লালফৌজের এই আক্রমণ নাৎসীরা বহুদিন হইতেই আশঙ্কা করিতেছিল ...ং ইহার জন্য সমস্ত উপায়েই প্রস্তুত হইতেছিল। গত দুই মাসে অন্যান্য রণক্ষেত্র ...তে ৪৪ ডিভিশন সৈন্য এই আক্রমণ রুখিবার জন্য আনা হইয়াছিল। পূর্ব্ব রণাঙ্গনের সৈন্যদের কাছে হিটলারের বাণীতেই প্রকাশ যে গত জানুয়ারী মাস হইতে সযত্নে বার্লিন রক্ষার জন্য বহুদূর বিস্তৃত আত্মরক্ষার ব্যূহ রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার উপর ভরসা করিয়াই হিটলার তাহার বিধ্বস্ত সৈন্যদের অভয় দিয়াছিল, 'কোন ভয় নাই।' বার্লিনের প্রবেশদ্বার আমাদের জাতশত্রু 'বলশেভিকদের রক্তে লাল হইবে।'

কিন্তু হিটলারের এই সদম্ভ উক্তিকে উপহাস করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে লালফৌজ ওডার নদীর তীর হইতে বার্লিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। খাস বার্লিন ও তাহার উপকণ্ঠের পাঁচটি বিভিন্ন স্থান হইতে লালফৌজ সহরের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ চালাইতেছে। বার্লিনের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র, রেলওয়ে ষ্টেশন ও বিমান ঘাটিতে যুদ্ধ চলিতেছে। প্রবল বাধা সত্ত্বেও রুশ ট্যাঙ্কবহর সহরের প্রধান রাস্তা উনটারডেন লিণ্ডেনের এক মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সহরের ভিতরে ও উপকণ্ঠে ১৯টি স্থান দখল করার ফলে বার্লিন প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত। পলায়নের এখন একটি মাত্র পথ আছে পশ্চিমদিকে। বার্লিনের দক্ষিণেও মার্শাল কনিয়েভ জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়া বার্লিন পৌঁছিয়াছেন। স্কাণ্ডিনেভিয়া টেলিগ্রাফ এজেন্সির বার্লিনের সংবাদদাতা জানাইতেছে যে আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইবে।

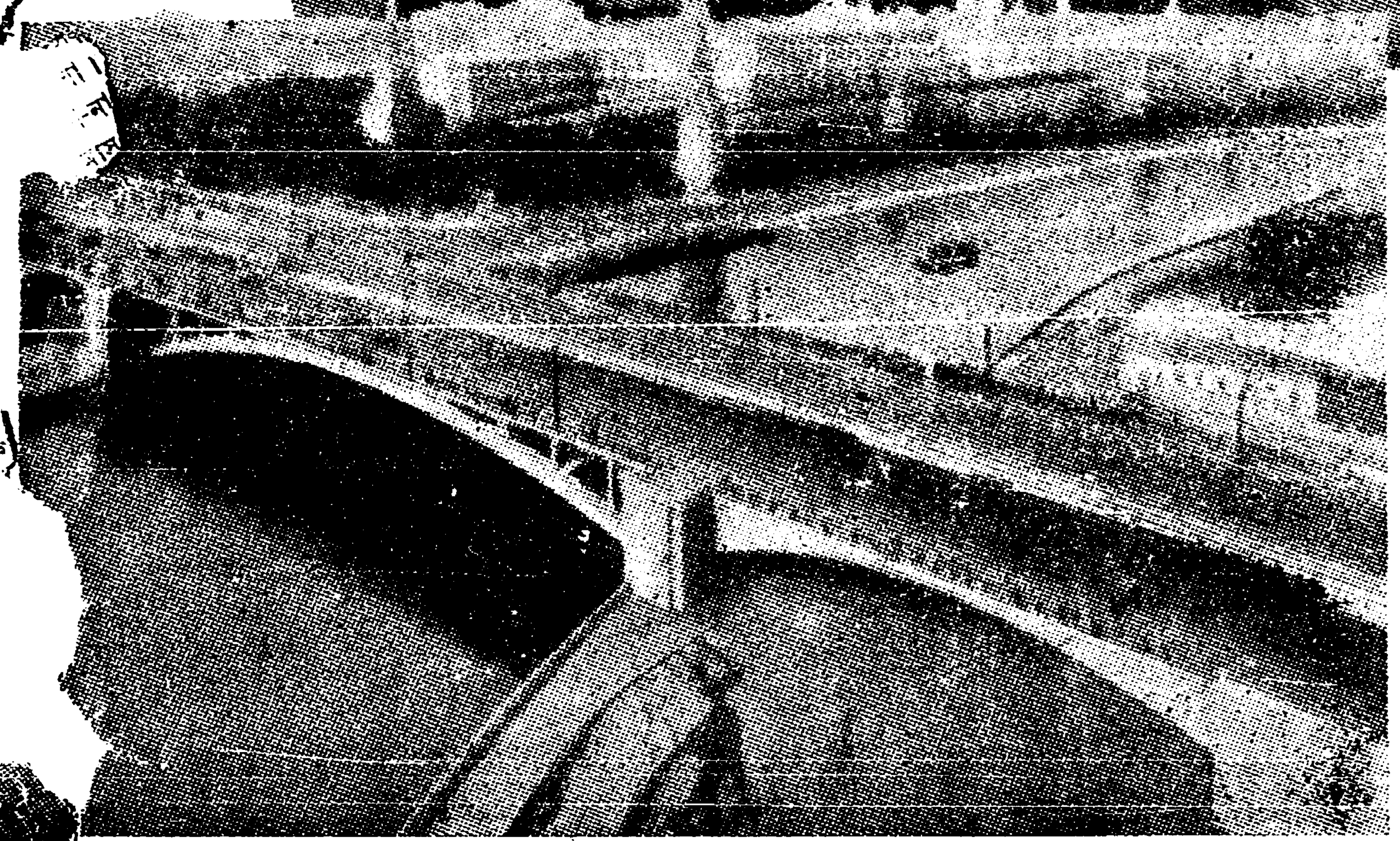

লালফৌজ

★

মস্কো

[নীচের ছবি]

হইতে

বার্লিন

[উপরের ছবি]

★

নাৎসীরা এই আক্রমণ রুখিবার জন্য তাহাদের শেষ সম্বল নিয়োগ করিয়াছে। ১৫ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত বার্লিনের সমস্ত পুরুষকে যুদ্ধে লাগান হইয়াছে। সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দিয়া ছাত্রদের ও শিক্ষকদের যুদ্ধে পাঠান হইতেছে।

হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যদের নির্দ্দেশ দিয়াছে, "শত্রুর পশ্চাতে ও পাশে ছোট ছোট দলে আক্রমণ চালাও।" হিটলারের এ নির্দ্দেশ হইতে মনে হয় যে পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যাপক প্রতিরোধ চালাইবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা হিটলারের নাই। বস্তুতঃ এই আক্রমণের বহু আগেই হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যাপক প্রতিরোধের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সমস্ত শক্তি লাল ফৌজকে রুখিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিল। তাই পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হয় নাই। এখন হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে আরও সৈন্য সরাইয়া বার্লিন রক্ষার নিয়োগ করিবে। তাই সেখানকার অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রতি ছোট ছোট দলে গেরিলা যুদ্ধের এই নির্দ্দেশ।

কিন্তু হিটলারের এই শেষ চেষ্টাও সফল হইবার আশা নাই। পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে আরও সৈন্য সরাইলে সেখানে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি আরও সহজ হইবে। ইতিমধ্যেই মিত্রবাহিনী হামবুর্গ হইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত এলব নদীর বরাবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অচিরে তাহারাও বার্লিনের পশ্চিমে লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলাইবে।

নাৎসীবাদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। শিশুদের গায়ের চামড়া দিয়া বই বাঁধান বা মাজদেনেকে মেয়েদের চুল দিয়া মাদুর তৈরীর সৌখীনতা তাহাদের আর বেশীদিন করিতে হইবে না। —২৩শে এপ্রিল।

...কাতা বেতারকেন্দ্রে শিল্পীদের ধর্ম্মঘট

...ক্তিপত্রের নামে কর্ত্তৃপক্ষের দাসখৎ দাবী

...শে এপ্রিল আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় কলিকাতার বেতারশিল্পীরা বেতারকর্ত্তৃপক্ষের জুলুমের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট ...ণা করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্পীদের এই সংঘবদ্ধতা বাংলাদেশে ...াই প্রথম। এই সভায় বিশিষ্ট নাগরিকেরা শিল্পীদের দাবীর প্রতি জনসাধারণের সমর্থন জানান।

বেতারকেন্দ্রের পরিচালকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ নূতন নয়। ১৯৪২ সালে জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় বেতার-কর্ত্তৃপক্ষকে যে তদন্ত চালাইতে হয়, তাহাতে শিল্পীদের কাছ হইতে প্রোগ্রামের বদলে ...ব আদায়, আত্মীয়বন্ধুদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ...হিলাসংক্রান্ত বহু দুর্নীতি ধরা পড়ে এবং কয়েকজন ...াজকর্ম্মচারীর শাস্তিও হয়। ১৯৪৩ সালেও ...দৈনিক বসুমতী' কাগজে তখনকার প্রোগ্রাম-কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কোন জবাব দেন নাই।

বিজ্ঞানের এতবড় একটি আশীর্ব্বাদ বিদেশী শৃঙ্খলের গুণে বানরের গলায় মুক্তার হার হইয়া আছে, ইহা কম দুঃখের কথা নহে। তাই বেতার সংস্কারের কথা শুনিলেই শ্রোতাদের মনে স্বভাবতই ক্ষীণ আশা জাগে।

কলিকাতার বেতারকেন্দ্রের নূতন পরিচালক মিঃ বোখারী খুব চালাক লোক। বিলাতের সরকারী বেতারকেন্দ্র বি-বি-সি হইতে বিলাতী প্রভুদের কাছে সদ্য হাতে খড়ি দিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি আসিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন, বেতারকেন্দ্রে তিনি আমূল সংস্কার আনিবেন। এই ভাবে কায়দা করিয়া তিনি জনৈক শ্রোতার প্রশংসাপত্রও জোটাইয়াছেন ও তাহা 'বেতার জগতে' ফলাও করিয়া ছাপাইয়াছেন। কিন্তু 'সংস্কারে'র আড়ালে তিনি যে আসলে বাংলার শিল্প ও শিল্পীদের গলায় গোলামীর শিকল পরাইতে চান, তাহা কয়েক-দিনের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া গেল।

আক্রমণ আসিল প্রথমে যন্ত্রীদের উপর। মিঃ বোখারী আসিয়া বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রী পরেশ ভট্টাচার্য্য ও সফদার আলিকে বিদায় করিয়া দিলেন। দুজনেই বেতারের পুরানো যন্ত্রী। পরেশ বাবু গত ১৫ বছর ধরিয়া বেতারকেন্দ্রে চাকুরী করিতেছেন। তারপর আসিল অন্যান্য যন্ত্রীদের পালা। যন্ত্রীদের উপর হুকুম হইল নূতন বছর হইতে শিফ্‌ট প্রথায় কাজ করিতে হইবে। মাহিনা বৃদ্ধির ত' কোন কথাই নাই, এমন কি বাহিরে বাজাইয়া দুপয়সা রোজগারের অনুমতি পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। তার উপর আছে প্রোগ্রামকর্ত্তাদের অভদ্র ব্যবহার ও ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বিতাড়নের ব্যবস্থা। মন্ত্রীরা এই অন্যায় মানিতে রাজী নন। তাঁহাদের দাবী কর্ত্তৃপক্ষ না মানায় ১৫ জন যন্ত্রী ১লা এপ্রিল হইতে নূতন বছরের চুক্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত এই দাবী সমর্থন করিয়া রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গিরিজা চক্রবর্ত্তী, কমল দাসগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কনক বিশ্বাস (দাস), দীপালি নাগ চৌধুরী (তালুকদার) প্রভৃতি প্রায় ২০০ শত বিখ্যাত বেতারশিল্পী কাগজে বিবৃতি দেন।

মিঃ বোখারী 'আমূল সংস্কার' চান। তাই, যন্ত্রীদের পর আসিল গায়কদের পালা। কম মজুরী দিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা গায়ক-গায়িকাদের খাটাইয়া নেবার তিনি নূতন এক ফন্দী বাহির করিয়াছেন। এবার গায়কদের নূতন চুক্তিপত্রে টাকার উল্লেখ আছে কিন্তু সময়ের জায়গায় লেখা হইয়াছে: 'যতক্ষণ দরকার।' তাছাড়া এবার একেকজন গায়কের উপর নূতন ধরণের গানের হুকুম হইয়াছে—কে কোন ধরণের গানে পারদর্শী তাহা বিচার করা হয় নাই। মিঃ বোখারী উচ্চাঙ্গের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকগীতির উন্নতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাই যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে অভ্যস্ত, তাঁহার উপর লোকসঙ্গীত, যিনি লোকসঙ্গীতে পারদর্শী তাঁহার উপর হিন্দী ভজন গাহিবার হুকুম হইয়াছে। বাংলা গান এবার যে উন্নতির শেষ স্বর্গে উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিল্পীদের এইভাবে জব্দ করিবার পিছনে মিঃ বোখারীর অন্য অভিসন্ধিও আছে। ইতিমধ্যেই তিনি বাংলার বাহির হইতে বেশী টাকা দিয়া কয়েকজন অখ্যাত (একজন ছাড়া) যন্ত্রী ও গায়ক আনাইয়া ভাল বাঙালী শিল্পীদের তাড়াইয়াছেন।

কলিকাতার বেতার কেন্দ্র হইতে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির এই বহিষ্কার কোন বাঙালীই সহ্য করিবে না। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙালীর কণ্ঠই আমলা-তান্ত্রিক এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হইবে।

সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। অফিস: ১২: লোয়ার সার্কুলাররোড, কলিকাতা।